অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র

অখণ্ড সংস্করণ

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা: পৃথ্বীরাজ সেন



অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র – অখণ্ড সংস্করণ

বিষ্ণুপুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ

উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি। শক্তির পুত্র মহামুনি পরাশর। তিনি ধর্মশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। মহামুনি মৈত্রেয় তারই শিষ্য। তার মনে জাগে নানা প্রশ্ন, যেমন–এই চরাচর জগৎ কেমন করে সৃষ্টি আর লয় হয়। সমুদ্র-পর্বতের স্থিতি, আকাশের পরিমাণ, সূর্যের অবস্থান, দেবতার বংশ বিস্তার, চতুর্যগের বিবরণ, দেবর্ষির চরিত, ব্যাসদেব দ্বারা বেদের শাখা বিভাগ ইত্যাদি।

সেই সব প্রশ্নের উত্তরে মহামুনি পরাশর বললেন– ভগবান বিষ্ণুর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করলে, কখনও কোন বিপদে পড়তে হবে না। যদিও বা বিপদ হয় তিনি উদ্ধার করে দেন। ভূল করে পাপ কাজ করলেও তিনি ক্ষমা করে দেন। হরিস্মরণকারীকে যমালয়ে যেতে হয় না। শ্রীবিষ্ণুর মহিমাই এই পুরাণের মূল বিষয়, তাই এর নামকরণ করা হয়েছে বিষ্ণুর পুরাণ।

০১. ঋভু ও নিদাঘের কাহিনি

দেবিকা নদীর ধারে অপূর্ব এক নগর, যার নাম বীরনগর। বহুকাল আগে অগস্ত্য মুনি এই দেশে এসে সেখানে বসতি গড়ে তোলেন। এই দেশেরই এক প্রান্তে বাস করেন নিদাঘ মুনি। তিনি শিক্ষা লাভ করেন ব্রহ্মার পুত্র ঋভুর কাছে। মহা পণ্ডিত তিনি। পণ্ডিতের সকল গুণই তাঁর মধ্যে বর্তমান। গুরুদেবের অনুমতিক্রমেই তিনি বীরনগরে সংসার পাতলেন। প্রাতঃস্নান থেকে শুরু করে পূজা, আহ্নিক, জপ, হোম, শাস্ত্রের অনুশীলন সবই যথাযথ ভাবে পালন করে তিনি সংসার ধর্ম অতিবাহিত করেন।

কাল অতিক্রান্ত হয়, এর মধ্যে বহুদিন গুরু শিষ্যে দেখা হয়নি। নিদাঘের সর্বদা মনে পড়ে গুরুর কথা। গুরুও মনে ভাবেন শিষ্য কেমন আছে–।

নিত্যদিনের মতই নিদাঘ তাঁর করণীয় কাজ শেষ করে অপেক্ষা করছেন। পত্নী রান্না শেষ করেছেন। বিষ্ণুকে ভোগ নিবেদন করে, তারপর অতিথিগণকে আহার দিয়ে তবে নিজেরা আহার করবেন। কিন্তু আজ কোনো অতিথি এল না, অতিথিকে না দিয়ে নিজেদের আহার সম্ভব নয়। দুপুর গড়িয়ে যায়, এমন সময় তারা দেখলেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই পথ দিয়ে চলছেন।

নিদাঘ দেখতে পেয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং বললেন, আজ আপনি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করুন। আজ কোনো অতিথি আসেন নি। তাই আমরা অভুক্তই আছি।

নিদাঘের সাদর অভ্যর্থনা শুনে অতিথি ব্রাহ্মণ বললেন– মধ্যাহ্ন কাল অতীত প্রায়, এখনও আপনারা অভুক্ত, কাজেই আমাকে আতিথ্য গ্রহণ করতেই হবে।

এই কথা বলে অতিথি ব্রাহ্মণ নিদাঘের ঘরে এলেন। নিদাঘ জল দিয়ে অতিথির চরণ ধুইয়ে দিলেন। তারপর আহারে বসালেন।

ব্রাহ্মণ বললেন–তোমাদের বাড়িতে কী কী রান্না হয়েছে? আমার খাওয়ায় একটু বাচ বিচার আছে। যা তা খাদ্য গ্রহণ করতে আমি পছন্দ করি না।

নিদাঘ বললেন– আপনার জন্য কী ব্যবস্থা করব বলুন? বাড়িতে অন্ন, তরকারী, সামান্য ফলমূল আছে। বলুন আপনাকে কী দেব?

ব্রাহ্মণ বললেন– এসবে আমার মন ভরবে না, আমি বরং উঠি। অন্য কোথাও যাই।

নিদাঘ বললেন–এ সব খাদ্যে আপনার যদি তৃপ্তি না হয় বলুন কি জোগাড় করবো? ব্রাহ্মণ বললেন– ক্ষীর, পায়েস, দই, মিষ্টি– এইসব আমার আহার। এ সব যখন তোমার বাড়িতে নেই, তাহলে আমি উঠি।

এই বলে ব্রাহ্মণ আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। হায় হায় করে উঠলেন নিদাঘ, বললেন,–না, না, আপনি যাবেন না, অতিথি অভুক্ত অবস্থায় চলে গেলে গৃহস্থের অমঙ্গল হবে, আপনি অপেক্ষা করুন। এখুনি সব তৈরি করে দিচ্ছি।

তারপর স্ত্রীকে বললেন–অনেক বেলা হয়ে গেল তাড়াতাড়ি সব তৈরি করে দাও।

ব্রাহ্মণ পত্নী আর দেরি না করে ক্ষীর, পায়েসাদি তৈরি করলেন। বহু খাবার তৈরি হল অল্প সময়ে। নিদাঘ পুনরায় ব্রাহ্মণকে আসনে বসালেন। ব্রাহ্মণের পাতে দিলেন প্রচুর পরিমাণ ক্ষীর, মিষ্টি, পায়েস, পিঠে, পুলি। কিন্তু ব্রাহ্মণ অল্প খেলেন, একটু একটু মুখে দিলেন, তারপর উঠে পড়লেন।

ব্রাহ্মণের হাত ধুইয়ে দিলেন নিদাঘ। কর্পূর, এলাচ, সুপারি দেওয়া পান দিলেন ব্রাহ্মণের হাতে। ব্রাহ্মণ সেই পান চিবোতে চিবোতে বিছানায় বিশ্রাম করতে গেলেন।

নিদাঘ জিজ্ঞাসা করলেন– আপনার ক্ষুধার উপশম হয়েছে তো? আহারে তৃপ্তিলাভ করছেন তো? আপনার নিবাস কোথায়? এই পথ ধরে কোথায় যাচ্ছিলেন?

একসঙ্গে বহু প্রশ্ন করে শুনে ব্রাহ্মণ মুচকি মুচকি হাসেন। তারপর উত্তর দিলেন তোমার প্রথম প্রশ্ন হল– আমার ক্ষুধা মিটেছে কিনা? তার উত্তরে বলি- যার ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধ নেই, তার আবার খিদে মেটার প্রশ্ন ওঠে কেমন করে?

ব্রাহ্মণের উত্তর শুনে নিদাঘ আর তার পত্নী তো অবাক, কি বলবেন বুঝতে পারছেন না।

তাই দেখে ব্রাহ্মণ বললেন– তোমরা আমার কথায় অবাক হয়েছে বলে মনে হচ্ছে? যে মনে করে দেহাদি রয়েছে, তখন তার খিদে পাওয়ার কথা। শরীরের দিকে যার মন নেই, তার তো ক্ষুধা-তৃষ্ণাও নেই। আমি ওই দ্বিতীয় শ্রেণীর।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন- ভোজন করে আমি তৃপ্তি লাভ করেছি কিনা? তার উত্তরে বলি- তোমার দেওয়া অন্ন, ব্যঞ্জনাদি না খেয়ে আমার মনোমত আহার গ্রহণ করেছি, তাই স্বাভাবিকভাবেই আমার তৃপ্তি লাভ করার কথা। আচ্ছা তুমি বল, ভাল খাবার আর মন্দ খাবার বলে জগতে কি কিছু আছে? যখন খুব খিদে পায় তখন ভালো-মন্দের বিচার থাকে না। সকল আহারই তৃপ্তিদায়ক লাগে। আর যদি পেট ভর্তি থাকে তখন যে কোন সুস্বাদু খাবারই তৃপ্তি জনক লাগে না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে তাহলে আমি, ভাল ভাল খাবারের কথা বললাম কেন? সেটা কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য।

অতিথি ব্রাহ্মণের কথা শুনে নিদাঘ খুব আশ্চর্য বোধ করলেন।

ব্রাহ্মণ আবার বললেন– তোমার তৃতীয় প্রশ্ন আমার বাড়ি কোথায়? তার উত্তরে বলি, এই যে তুমি আজ এই ঘরটাতে বাস করছ এটা কার? আজ বলবে–এটা তোমার। কিন্তু যখন তুমি এখানে থাকবে না, তখন অন্য কেউ বাস করবে। তাহলে প্রকৃতপক্ষে মরণশীল কোন জীবেরই কোন ঘর নেই, ভগবান যখন যাকে যে ঘরে থাকতে দেবেন, তখন সে সেই ঘরেই থাকবে। আমরা এই সব গৃহের গৃহকর্তা নই, ভাড়াটে বলতে পার।

আসলে আমাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি আলাদা। তুমি আমাকে একরকম দেখছ, আর আমি তোমাকে অন্যরকম দেখছি, জগতে সকল জীবেরই দৃষ্টি আলাদা। তাই এত বিভ্রান্তি, এত

অশান্তি, এত গন্ডগোল। বাইরের শরীরটাকে না দেখে আমাদের ভেতরটাকে দেখো, তখন বুঝতে পারবে আমরা সবাই সেই এক বাসুদেবেরই অংশ।

অতিথি ব্রাহ্মণের মুখে এমন সব আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা শুনে স্থির থাকতে পারলেন না নিদাঘ। ঝড়ে গাছ পড়ার মত লুটিয়ে পড়লেন অতিথির চরণতলে। তখন ব্রাহ্মণ তাকে স্নেহ ভরে তুলে বললেন–নিদাঘ আমি তোমার গুরু, বহুদিন হল আমার তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি, তাই একবার দেখতে এলাম, তুমি কেমন আছো। সুখে আছ জেনে খুব ভাল লাগল। আর অতিথি সেবা- সে তো নিজের চোখেই দেখলাম! এখন আমি আসি, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

এইকথা বলে গুরুদেব বিদায় নিলেন। এরপর অনেকটা সময় কেটে গেল। দেবিকা নদীর তীরে বীর নগর এখন আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। নিদাঘের পোবন আজও বিদ্যমান।

বহুদিন পরে গুরুদেব ঋভুর আবার মনে পড়ল প্রিয় শিষ্য নিদাঘের কথা। তিনি চললেন এক ব্রাহ্মণের বেশ ধরে। উপস্থিত হলেন বীরনগরে। দেখলেন–সারা দেশ জুড়ে এক মহান উৎসব। কত হাতী, কত ঘোড়া, কত পতাকা, কত লোক তার সীমা নেই। সবার পরণে নতুন পোশাক ঝলমল করছে। নানারকম বাজনা বাজছে। ছদ্মবেশী মুনি ঋভু সেই মহা কোলাহলের মধ্যে নিদাঘকে খোঁজ করছেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন পথের ধারে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে এক বোঝা কাঠ নিয়ে। তার মুখটি দেখেন শুকনো। তার মনে কোনো আনন্দ নেই। ঋভু তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন–সবাইকে আজ আনন্দে মেতে উঠতে দেখছি, কিন্তু তুমি এমন মুখ শুকনো করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ঐ ব্যক্তি নিদাঘ। তিনি বললেন, ওই সব হৈ চৈ আমার ভাল লাগে না। তাই দূরে দাঁড়িয়ে আছি। ওইসব লোক জন চলে গেলে আমি তারপর যাব।

ঋভু বললেন–ও কিসের উৎসব?

নিদাঘ বললেন–রাজা আসছেন হাতীর পিঠে চড়ে।

ঋভু অবাক হয়ে বললেন–কোথায় রাজা? কই আমি তো দেখতে পাচ্ছি না? নিদাঘ বললেন, ওই তো নীচে হাতী, আর হাতীর পিঠের ওপর গদিতে বসে রাজা। মাথায় পাগড়ী, গায়ে ঝলমলে পোশাক। গলায় ঝুলছে মুক্তার হার।

ঋভু বললেন–আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, নীচ-উপর সব কি বলছ? আমার যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, কে রাজা? কোথায় তিনি?

ব্রাহ্মণের এমন কথায় নিদাঘ বিরক্ত হয়ে বললেন–এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না? এই দেখুন আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

এই কথা বলে নিদাঘ তাঁর কাঠের বোঝাটা নামিয়ে রেখে সেই ব্রাহ্মণের কাঁধের উপর চড়ে বসলেন। তারপর বললেন–এবার বুঝতে পারছেন? আপনি নীচে আর আমি উপরে।

ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ বললেন–ও বুঝেছি। আমি নীচে অর্থাৎ হাতী, আর তুমি ওপরে অর্থাৎ রাজা। কিন্তু এখনও আমার বোঝাটা ঠিক হল না। আচ্ছা তুমি কি আরও একটু সরল করে দেখতে পারো নীচে আমি হাতী কে? আর উপরে তুমি রাজাই বা কে?

ব্রাহ্মণের কথা শুনে নিদাঘ চমকে উঠলেন। এ কি, আমি যাঁকে এতক্ষণ গবেট মুখ বলে মনে করছিলাম, তিনি এখন কি বলছেন?

সঙ্গে সঙ্গে তার কাধ থেকে লাফিয়ে নীচে পড়লেন, তারপর তাঁর চরণতলে লুটিয়ে পড়লেন। মনে মনে ভাবছেন, তবে কি ইনি আমারই গুরুদেব? প্রভু এ জগতে যিনি সবাইকে এরূপ অভিন্ন রূপে দেখেন, এমন জগৎ দর্শন জগতে আর কারও নেই।

গুরুদেবের দুটি চরণ ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন– হে গুরুদেব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।

মহর্ষি ঋভু তখন নিজের আসল রূপ ধারণ করে সস্নেহে নিদাঘকে তুলে বললেন, নিদাঘ, বহুদিন আগে তোমার অতিথি সেবায় আমি তুষ্ট হয়েছিল তাই তোমাকে আমি কখনই ভুলতে পারিনি। চলে এলাম তোমাকে দেখব বলে। মনে করে দেখ, তুমি কে আর আমি কে। কে রাজা আর কে প্রজা, আমরা সবাই সেই ভগবান বাসুদেবেরই অংশ।

তারপর ঋভু নিদাঘকে আশীর্বাদ করে ফিরে গেলেন। নিদাঘ গুরুদেবের চরণ চিন্তা করতে করতে যেন আত্মভোলা হয়ে গেলেন।

০২. দেবরাজের অহঙ্কারের ফল

দুর্বাসা ঋষি ভীষণ রাগী। যখন তখন যাকে তাকে অভিশাপ দিয়ে বসতেন। তাই সকলেই তাকে সমীহ করে চলত। রাগে অন্ধ হয়ে একদিন ঋষি দুর্বাসা চলছেন এক বনের মধ্যে দিয়ে। চলতে চলতে হঠাৎই ফুলের সুগন্ধ এল নাকে। গন্ধ অনুসরণ করে এগিয়ে চললেন তিনি, দেখতে পেলেন এক বিদ্যাধরীর হাতে একটি সুন্দর ফুলের মালা। সেই মালা থেকেই এত গন্ধ বেরিয়ে আসছে। ঋষির খুব লোভ হল মালাটির ওপর। বললেন–তিনি–এই মালাটি খুব সুন্দর আর গন্ধে চারদিক আমোদিত। তাই এটি নিতে ইচ্ছা করছে। যদি কোন অসুবিধা না থাকে, তাহলে আমাকে মালাটি দাও।

ঋষির কথায় বিদ্যাধরী মহা সমস্যায় পড়লেন। এখন তিনি কি করবেন? এই ঋষি এত রাগী, না দিলে আবার শাপ দিয়ে দেবেন। অথচ এমন সখের জিনিস দিয়ে দিতে ইচ্ছা নেই, এখন না দিলেও নয়। তাই ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও প্রণাম জানিয়ে মালাটি দিয়ে দিলেন তিনি।

মহর্ষি দুর্বাসা মনের আনন্দে মালাটি নিয়ে চললেন। মালাটি গলায় পরে দেখলেন বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। তারপর ভাবলেন, না, আমি একজন ঋষি, ঋষির গলায় মানায় না এ মালা। তখন তিনি মালাটি খুলে মাথার ওপর জটায় ছড়িয়ে নিলেন। তারপর আবার নিজের পথ ধরলেন।

পথে যেতে যেতে দেখলেন, দেবরাজ ইন্দ্র আসছেন ঐরাবতে চড়ে। দেবরাজ কাছাকাছি আসতেই দুর্বাসা তাঁর জটা থেকে মালাটি খুলে নিয়ে ইন্দ্রের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। দেবরাজ সেই মালাটি হাতে ধরে নিয়ে ঐরাবতের শুঁড়ে জড়িয়ে দিলেন। পশুজাতি সুন্দর গন্ধযুক্ত অপরূপ মালার কদর করবে কেমন করে? ঐরাবত মালাটি ফেলে দিল মাটিতে। তারপর পা দিয়ে চলে গেল।

ইন্দ্র ও তার হাতীর এমন ব্যবহার দেখে দুর্বাসা রেগে গেলেন। এত বড় স্পর্ধা যে আমার দেওয়া মালাকে সম্মান না জানিয়ে ফেলে দিল হাতীর শুড়ে। আর সেই ঐরাবত কিনা তা মাটিতে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে চলে গেল। স্বর্গের রাজা হয়ে এত অহংকার ইন্দ্রের? আমি শাপ দিচ্ছি– তোর সর্বনাশ হবে। লক্ষ্মীহীন হবি তুই। আমাকে সাধারণ ব্রাহ্মণ ভেব না ইন্দ্র। আমি হলাম দুর্বাসা। ত্রিভুবনে সবাই আমাকে সম্মান দেখায়। আর তুমি কিনা আমাকে অসম্মান করলে।

দুর্বাসার অভিশাপ–বাণী শুনে ইন্দ্র যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। হাতীর পিঠ থেকে অবতরণ করে, ভূতলে মুনির পায়ে পড়ে বললেন–হে মহর্ষে, আমি মহা অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।

দুর্বাসা বললেন–না, না, আমার কাছে কোনো ক্ষমা হবে না। আমাকে অসম্মান করে ক্ষমা চাইলেও পার পাবে না।

বিপদে পড়লেন ইন্দ্র। ঋষির বাক্য অব্যর্থ। সামান্য একটা ভুলের জন্য তাঁকে হতে হবে লক্ষ্মীহীন। লক্ষ্মীই তো সব। এতদিন স্বর্গে লক্ষ্মী অচঞ্চলা হয়ে ছিলেন। এবার তিনি ইন্দ্রকে ছেড়ে চলে যাবেন। এখন ঋষির শাপে ফলভোগ করতে হবে। তবু ভাবলেন, তাকে শান্ত করে যদি ফল ভোগটা কমান। যায়।

তাই হাতজোড় করে নতজানু হয়ে কাতর কণ্ঠে বললেন–হে ঋষিবর, এবারের মত আমাকে মার্জনা করুন, এমন ভুল আমি আর কখনও করব না। এই আমি আপনার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি।

এভাবে কাতর কণ্ঠে ইন্দ্র বললেও দুর্বাসা মুনির ক্রোধ কিন্তু এক বিন্দুও কমল না বরং আরও বেড়ে গেল। তিনি বললেন– এ তোমার ভুল নয়, এতো স্বর্গে সিংহাসন পাওয়ার অহংকার। অহংকারী লোকের কাছে লক্ষ্মী থাকবে কেমন করে? কোনো মার্জনা পাবে না আমার কাছে।

তখন দেবরাজ ভাবলেন এই রাগী মুনির রাগ দমন করা সম্ভব নয়, বেশি জোর করলে আরও বিপদ বাড়বে। তাই কথা না বাড়িয়ে দুঃখিত মনে ফিরে গেলেন স্বর্গে। স্বর্গ এখন লক্ষীহীন। স্বর্গের সব সৌন্দর্য ঐশ্বর্য নষ্ট হয়েছে। মণি মানিক্য খচিত প্রাসাদগুলিও শ্রীহীন হয়েছে, নন্দন-কাননে আর সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে না। সব যেন ঝরে পড়ে যাচ্ছে। প্রাসাদগুলো যেন প্রেতের বাড়ি, সকল দেবতারা শ্রীহীন, মনে কারও আনন্দ নেই। শুধু স্বর্গে নয়, পৃথিবীতেও তার প্রভাব পড়েছে। অসৎ পথে লিপ্ত হয়েছে মানুষজন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি কত ভালোবাসা ছিল, তা যেন একদম উঠে গেছে। সবাই যেন হিংস্র হয়ে উঠেছে।

এতে অপূর্ব সুযোগ এল অসুরদের। স্বর্গে এখন আর লক্ষ্মী নেই। দেবতাদের আর শক্তি নেই। এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই উচিত। অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে দানবরা স্বর্গ আক্রমণ করতে চলল। না, যুদ্ধ হল না, দেবতারা বুঝতেই পারছেন এ যুদ্ধে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, কাজেই অযথা বলক্ষয় করে কি লাভ? তাই পালিয়ে বাঁচলেন।

কিন্তু দেবতারা যাবেন কোথায়? অগ্নিকে সঙ্গে নিয়ে দেবতারা চললেন ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সঙ্গে দেখা করতে, সেখানে গিয়ে ব্রহ্মাকে সব কথা বললেন।

ব্রহ্ম সব কথা শুনে বললেন– মুনির অভিশাপ খণ্ডন করার সাধ্য কারও নেই, তবে লক্ষ্মীকে আবার পেতে হলে এ বিষয়ে স্বয়ং বিষ্ণুর পরামর্শ নেওয়া ভাল।

এই সব কথা বলে ব্রহ্মা সকল দেবতাকে নিয়ে চললেন ক্ষীরোদ সাগরে, যেখানে বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা শ্রীবিষ্ণুর বহু স্তব-স্তুতি করলেন, তাতে নিদ্রা ভেঙে গেল নারায়ণের। শুকনো মুখে কেন দেবতাগণ, কি বিপদ উপস্থিত হয়েছে, সবিস্তারে আমাকে বলুন।

তিনি বললেন–শ্রীবিষ্ণুকে আদ্যপ্রান্ত সকল কথাই বললেন– লক্ষ্মীছাড়া হয়েছি আমরা সবাই, কি ভাবে স্বর্গে লক্ষ্মীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারব, বলুন।

বিষ্ণু বললেন– লক্ষ্মীকে লাভ করতে হলে বহু কষ্ট করতে হবে। দেবগণ, কেবল আপনাদের শক্তিতে তা সম্ভব হবে না। অসুরদেরও সাহায্য নিতে হবে। আপনারা এখন বলহীন, এই ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করতে হবে। কাজেই আপনারা এখন অসুরদের কাছে গিয়ে অমৃতের লোভ দেখিয়ে তাদের রাজি করান সাগর মন্থন করতে। মন্দারগিরিকে দণ্ড করে নাগরাজ বাসুকিকে মন্থন দড়ি করে সমুদ্র মন্থন করতে হবে। সাগর মন্থন করার পর অমৃতসমা লক্ষ্মীদেবী সাগর থেকে উত্থিত হবেন। এই কাজে আমিও সাহায্য করব। তারপর দেবতারা অসুরদের সাহায্যে সমুদ্র মন্থন করে অমৃত সহ লক্ষ্মী লাভ করে পুনরায় স্বর্গরাজ্য অধিকার করলেন।

০৩মৌন ব্রতভঙ্গের পাপমোচন .

পরম ধার্মিক রাজা শতধনু পুত্রসম রাজ্য শাসন করেন। রাজ্যে অরাজকতা নেই, তাকে সকলেই সম্মান করে। রাজা হলে কি হবে, তিনি অধিকাংশ সময়টাই পূজার্চনা, নামজপ নিয়েই থাকেন। নিষ্ঠার সঙ্গে বার-ব্রত করেন, উপবাস করেন। রাজমহিষী শৈব্যাও পতির মতই সেবাপরায়ণা। দেবতা ও ব্রাহ্মণগণে তার ভক্তি অটুট।

কার্তিক পূর্ণিমা–এই মহা তিথিতে রাজা রানি দুজনেই মৌনব্রত ও উপবাস করে গঙ্গাস্নান করলেন। তারপর গঙ্গাতীরে উঠে দেখেন পরিচিত একজন দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে কথা না বললে, তিনি কি মনে করবেন, তাই বাধ্য হয়েই রাজা মৌনব্রত ভঙ্গ করলেন– তাঁর সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু রানি সূর্যের স্তব করতে করতে সূর্যের দিকে তাকিয়ে চলে গেলেন। মৌনভঙ্গে রাজার মনে শান্তি নেই। দীর্ঘকাল ধরে এই ব্রত করে আসছেন, কিন্তু আজ তার ব্যাতিক্রম হল। কি আর করবেন–ফিরে গেলেন প্রাসাদে, তারপর যা করণীয় সকলই যথানিয়মে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেন। তারপর দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর বৃদ্ধকালে পরলোকে গেলেন রাজা। মহিষী শৈব্যাও চিতার ওপর সহমৃতা হলেন।

বহুকাল পরে কাশীর রাজকন্যারূপে জন্ম হল রানি শৈব্যার। তাঁর রূপে কাশীরাজের প্রাসাদ হল আলোকিত। রাজা ও রানির মনে খুব আনন্দ হতে লাগল। ধীরে ধীরে রাজকন্যা বড় হল। বাল্যকালে আর পাঁচজনের মত নয় সেই কন্যা। সাধারণ খেলাধূলা নেই, কেবল ঠাকুর দেবতা নিয়েই তার খেলা। নিজের মনের খেয়ালেই থাকে। তার দেব দ্বিজে ভক্তি দেখে রাজা-রানি সহ সকলেই অবাক। এতটুকু মেয়েকে কে শেখাল এমন করে? কেউ ভেবে পায় না।

ক্রমে ক্রমে রাজকন্যার বিয়ের বয়স হল। কাশীরাজ চিন্তিত হলেন। এমন সুন্দরী গুণবতী কন্যার উপযুক্ত রাজপুত্র চাই।

রাজাকে চিন্তিত দেখে মেয়ে জিজ্ঞাসা করল- বাবা, তুমি চিন্তিত কেন? আমার মনে হয় তুমি আমার জন্য পাত্রের সন্ধান করছ? কিন্তু আমার যিনি স্বামী হবেন, আমি তাঁকে চিনি। যথাসময়ে আমাদের বিয়ে হবে, এ বিষয়ে চিন্তা করার দরকার নেই।

মেয়ের কথা শুনে রাজা অবাক। লক্ষ্মীর প্রতিমা এই মেয়ে কেমন করে নিজেই ঠিক করবে নিজের পাত্র, ভেবে পান না তিনি। এখন মেয়ের কথামত চিন্তা না করাই ভালো। যখন যা

হবার তা ভগবানই করবেন। তাছাড়া মেয়ে যেভাবে ব্রত করছে, তাতে তার কোনো অমঙ্গল হবে না।

পূর্বজন্মে বিষ্ণুভক্তি ছিল বলে সেই কন্যা এখন জাতিস্মর। পতির কারণে ধ্যানে নিজমন জানতে পারল–পূর্বজন্মে তাঁর স্বামী ছিলেন রাজা শতধনু। কিন্তু একটি বিশেষ দুষ্কর্মের ফলে তিনি কুকুর যোনিতে জন্ম নিয়েছেন। এখন বৈদিশপুরে আছেন, মা-বাবার অনুমতি নিয়ে শৈব্যা চলে গেলেন সেখানে। কুকুর দেখে কন্যা চিনতে পারত পতিকে। বন্দনা করেন ভক্তি ভরে, প্রসাদসহ নানা খাদ্য খাওয়াল তাকে। কুকুরেরা অতি অনুগত স্বভাবত। আহার পেলে তোষামোদ করে।

কুকুররূপী স্বামীকে রাজকন্যা কেঁদে কেঁদে বলল- হে স্বামী, পূর্বজন্মের কথা কী তোমার মনে পড়ে না? একদিন আমরা মৌনব্রত করে গঙ্গায় স্নান করতে যাই। তোমার গুরুর সখা পাষণ্ড একজন, তার সঙ্গে তুমি ব্রত ভঙ্গ করে সম্ভাষণ করেছিলে। তাতে মৌনভঙ্গ হল। সেই দোষে কুকুর জন্ম হল তোমার। কত দুর্দশা ভোগ করেছ। মহারাজ এ সব কি তোমার মনে পড়ে না? শান্ত হয়ে মনে চিন্তা কর। সব জানতে পারবে।

তখন কুকুর জন্মের কারণ বুঝতে পেরে। রাজা মনের আগুনে জ্বলতে লাগলেন। বহু দুঃখ পেলেন মনে। তারপর যে গৃহে এতদিন বাস করতেন সেই গৃহ থেকে বেরিয়ে একটা গিরিশৃঙ্গের উপরে উঠে ঝাঁপ দিল।

তারপর সেই রাজার জন্ম হল শৃগাল যোনিতে। কাশীর রাজকন্যা ধ্যানযোগে জানতে পারলেন। চললেন কোলাহল পর্বতে। দেখলেন– শৃগাল রূপে তাঁর স্বামী ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে দুঃখ ভরে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন– হে নাথ, তুমি জন্মান্তরে পৃথিবীর রাজা ছিলে, তোমার কী মনে পড়ে না, ব্রতহেতু গিয়েছিলে তুমি স্নান করতে ভাগীরথীতে, সেখানে পাষণ্ডীসনের সাথে কথা বললে সেই পাপে তোমার কুকুর জন্ম। এখন পেলে শৃগাল যোনি। মনে মনে চিন্তা কর- সকল কথা বুঝতে পারবে।

পত্নীর এমন বাক্য শুনে নৃপতির সব মনে পড়ল। সেই চিন্তা করে অনাহারে নিজের প্রাণ ত্যাগ করলেন।

তারপর সেই রাজার জন্ম হল নেকড়ে বাঘ যোনিতে। রাজকন্যা তাঁর কাছে গিয়ে সব জানালো, রাজা সব স্মরণ করে সেই দেহ ত্যাগ করে পরবর্তী জন্মে শকুন দেহ লাভ করল। এভাবে কাক, তারপর ময়ুর জন্ম লাভ করল। রাজকন্যা সকলকে একথা জানাল।

নানান খাদ্য দান করে ময়ূরটিকে যত্নে রাখেন রাজকন্যা শৈব্যা।

এইভাবে কিছুদিন কাটল, তারপর একদিন শুনলো রাজর্ষি জনক এখন যজ্ঞ করছেন। রাজকন্যা ময়ূরকে নিয়ে সেই যজ্ঞে গিয়ে ময়ূরকে স্নান করিয়ে নিজেও স্নান করলো। স্বামীকে পূর্বের কথা মনে করাতে রাজার মনে দুঃখ হল। তারপর সেই ময়ূর যজ্ঞাগারেই দেহত্যাগ করল। রাজকন্যা ফিরে গেল কাশীরাজপুরে।

কিছুকাল পরে সেই রাজা শতধনু রাজপুত্ররূপে জন্ম নিল জনকের ঘরে। অপূর্ব শিশু হয়ে সকলের মনোরঞ্জন করতে লাগল। নানান বিদ্যায় পারদর্শী হলেন, তারপর এল যৌবনকাল।

পাষণ্ডীর সঙ্গে আলাপ করে মৌনব্রত ভঙ্গ করার ফলে রাজা শতধনু বহুবার নীচযোনি লাভ করেছেন। এতদিনে ব্রতভঙ্গ পাপের মোচন হল।

এদিকে কাশীরাজকন্যা পিতাকে বললো–বাবা, এবার আমার বিবাহের ব্যবস্থা কর। স্বয়ম্বর সভার আয়োজন কর। দেশবিদেশের সকল রাজা ও রাজপুত্রদের আহ্বান কর।

কাশীরাজ সকল ব্যবস্থা করলেন। সকলে উপস্থিত হলেন এমনকি পূর্বজন্মে যিনি শৈব্যোর পতি ছিলেন সেই শতধনু যিনি এখন জনক রাজার পুত্র; তিনিও উপস্থিত হলেন।

নানা রত্নে ও আভরণে সজ্জিত হয়ে কাশীরাজকন্যা সেই জনকপুত্রের গলায় বরমালা পরিয়ে নিজের পূর্ব জন্মের পরিচয় দিলো। এইভাবে পুনরায় নিজের পতিকে লাভ করে কাশীরাজকন্যা খুব আনন্দিত।

কিছুদিন পরে জনকরাজার মৃত্যু হল, শতধনু রাজা হলেন।

দশ যজ্ঞাদি করলেন, পুত্র জন্মাল, সুখে থাকতে লাগলেন।

০৪পরঞ্জয়ের কাহিনী .

পূর্বকালে ত্রেতাযুগে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে একবার তুমুল যুদ্ধ বাধে। দেবতারা অমর, মরবেন না কিন্তু বার বার পরাজিত হন। দানবরা স্বর্গরাজ্য অধিকার করে নেয়। তখন স্বর্গচ্যুত দেবতারা বিষ্ণুর আরাধনা করতে লাগলেন। বিষ্ণু প্রসন্ন হয়ে বললেন– তোমরা বার বার হেরে যাচ্ছ। আমার কথা শোন, মর্তে বিকুক্ষি নামে এক রাজা আছেন, তার পুত্র পরঞ্জয়। তার অংশে আবির্ভূত হয়ে বিনাশ করব দানবগণদের। কাজেই এখন তোমরা সেই পরঞ্জয়ের কাছে গিয়ে সাহায্য চাও।

বিষ্ণুর কথা শুনে দেবতারা মর্ত্যে গেলেন। পরঞ্জয়ের কাছে গিয়ে বললেন–হে মহারাজ, আমরা অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি। বিষ্ণুর পরামর্শে আমরা আপনার কাছে এসেছি, আমাদের সাহায্য করুন।

দেবতাদের প্রার্থনা শুনেও পরঞ্জয় যুদ্ধে না যাওয়ার কথাই ভাবলেন। কিন্তু সরাসরি না বলবেন কেমন করে? তখন তিনি বললেন– আমি একটা শর্তে যুদ্ধ করতে যেতে পারি। যদি ইন্দ্র আমার বাহন হন, অর্থাৎ আমি ইন্দ্রের কাঁধে চড়ে যুদ্ধ করব। যদি তিনি রাজি হন তবেই যুদ্ধ করব, নতুবা যাব না।

এই অভূতপূর্ব শর্তে দেবতাগণ যারপরনাই অপমানিত বোধ করলেন। আজ তাঁরা পরাজিত হয়ে স্বর্গ-চ্যুত। তাই শত্রুবিনাশের জন্য এই শর্তে রাজি হওয়াই উচিত। তা না হলে স্বর্গরাজ্য ছেড়ে ভিখারীর মত ঘুরতে হবে।

দেবতারা সকলে রাজি হলেন। পরঞ্জয় ইন্দ্রের পিঠে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চললেন। বিষ্ণুর তেজ যুক্ত হল তাঁর শরীরে। মনের সুখে পরঞ্জয় যুদ্ধ করল। দৈত্যরা মারা গেল, দেবতারা জয়ী হলেন। ইন্দ্রের কাঁধে চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন বলে, পরঞ্জয়ের নাম কুৎস্থ হয়।

০৫রাজা যুবনাশ্বের গর্ভে মান্ধাতার জন্ম .

মহারাজ প্রসেনজিতের পুত্র যুবনাশ্ব। কালক্রমে ধরায় আধিপত্য লাভ করে প্রজাদের পুত্ররূপে পালন করেন। কিন্তু একটাই দুঃখ তাঁর অন্তরে, বহুকাল পুত্রধনে বঞ্চিত আছেন। একদিন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চিন্তা করলেন– ঋষিরা যোগবলে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারেন। যদি আমার ভাগ্য ভালো হয়, তাহলে তারা আমাকে পুত্রলাভের কোনো পরামর্শ দেবেন।

এমন চিন্তা করে একদিন রাজা যুবনাশ্ব অরণ্যে গিয়ে ঋষিদের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। এবং প্রণাম জানিয়ে নিজের সকল দুঃখ জানালেন।

সব কথা শুনে ঋষিরা যজ্ঞ করবার পরামর্শ দিলেন। পুত্রলাভের আশায় আনন্দে বিঘল যুবনাশ্ব সকল আয়োজন করলেন। কোনো ত্রুটি রাখলেন না। ঋষিরা যথাকালে যজ্ঞ শুরু করলেন। মধ্যরাত্রে সেই যজ্ঞের সমাপ্তি হল।

তারপর ঋষিগণ বেদীর উপর একটি জলপূর্ণ কলসী রাখলেন। সকলে একযোগে মন্ত্রপাঠ করলেন। রাজা যুবনাশ্ব সারা দিন-রাত্রি উপবাসে রয়েছেন। যজ্ঞের শেষে ঋষিরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। রাজাও ঘুমিয়ে পড়েছেন, সহসা রাজার ঘুম ভেঙে গেল। পিপাসা পেল, নিদ্রা জড়িত অবস্থায় অন্য কোথাও জল দেখতে না পেয়ে তৃষ্ণায় কাতর রাজা তাড়াতাড়ি সেই মন্ত্রপূত জলপূর্ণ কলসী থেকে জল গড়িয়ে পান করে সুস্থ বোধ করলেন।

তারপর ভোর হলে ঋষিরা রাজাকে জাগালেন, আর বললেন– হে রাজন, এই কলসিতে সেই মন্ত্রপূত জল আছে, ওই জল যেই নারী পান করবে, তার গর্ভে বীরপুত্র অবশ্যই জন্ম নেবে।

রাজা যুবনাশ্ব এই কথা শুনে বিস্মিত ও দুঃখিত হলেন। এক ঋষি গিয়ে দেখলেন কলসিতে কোনো জল নেই- কি হল জল? কে পান করল?

তখন যুবনাশ্ব কাতর কণ্ঠে বললেন– ঋষি, ওই জল আমি পান করেছি। তৃষ্ণার জন্য। রাজার কথা শুনে ঋষি বললেন–মন্ত্রপূত জল যে খাবে তারই গর্ভ হবে, পুরুষ কিংবা নারী যেই হোক। ঋষিরা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এদিকে গর্ভের লক্ষণ হল রাজার শরীরে। সাতদিন পরে প্রসবের ব্যথা উঠল। কিন্তু প্রসব হবে কেমন করে?

তখন একজন ঋষি কুশ দিয়ে তার কুক্ষিদেশ ছিন্ন করে দিলেন। সেই পথ দিয়েই জন্মাল এক পুত্র। কুক্ষিভেদ করে পুত্র জন্মাণেও রাজার মৃত্যু হল না। কয়েকদিন পরেই রাজা সুস্থ হয়ে

উঠলেন। এদিকে শিশু জন্মানমাত্র ক্ষুধায় কাঁদতে লাগল। মা নেই তার, স্তন দুগ্ধ পাবে কোথায়? মহা চিন্তায় পড়লেন ঋষিরা।

এমন সময় এলেন দেবরাজ ইন্দ্র, বললেন–আপনারা এর জন্য চিন্তা করবেন না, আমি এর আহারের ব্যবস্থা করছি।

এই কথা বলে ইন্দ্র তার বুড়ো আঙুল সেই শিশুটির মুখের মধ্যে ধরলেন, মাতৃস্তন ভেবে সেই শিশু তাই চুষতে লাগল, আঙুল চুষতে চুষতেই সেই শিশু যুবকে পরিণত হল। ঋষিরা অবাক হলেন, তার নাম রাখলেন মান্ধাতা। কিন্তু সেই যুবনাশ্বের পুত্র 'মান্ধাতা' নামেই বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন।

যুবনাশ্বের পর বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হলেন তিনি।

০৬সৌভরি মুনির উপাখ্যান .

মান্ধাতার তিন পুত্র-পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকন্দ আর পঞ্চাশজন কন্যা, তারা সবাই রুপে গুণে অতুলনীয়।

তাপসের আর এক নাম সৌভরি, জলের ভেতরে ধ্যান করে হয়েছেন দিবা-বিভাবরী, অদ্ভুত সেই মুনি। বাইরের কোলাহল থেকে মুক্ত জলের ভিতর। কোনো বিঘ্ন নেই, তাই তিনি তপস্যার জন্য বেছে নিলেন, এমন নিরাপদ জায়গা। দীর্ঘকাল সাধনা করতে করতে মহান যোগী হলেন তিনি। বহুদিন জলের তলায় থাকার জন্য গায়ে শ্যাওলা ভাসছে। বহুকাল পৃথিবীর মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই নেই, একটানা দীর্ঘ বারো বছর বসে আছেন জলের তলায়।

মুনি সৌভরি যেখানে বসে তপস্যা করতেন সেখানে থাকত একটা বিরাট মাছ, আর তার স্ত্রী। অনেক ছেলেপুলে, নাতি-নাতনীরও অভাব নেই, সুখে ভেসে বেড়ায়, কখন মুনির মাথায় গায়ে পিঠেও ঘুরে বেড়ায়। পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্রাদি নিয়ে মীনবর, সুখেতে কাটায় জলের ভিতর। মুনিবর মাছের এমন সুখের সংসার দেখে মনে মনে ভাবতেন-সংসার সুখের গৃহ বুঝলাম এখন। মনে জাগল সংসারী হবার বাসনা। জল থেকে উঠে পড়লেন বিশাল জটা, গোঁফ, দাড়ি, গায়ে শ্যাওলা, ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে, চললেন মান্ধাতা রাজার কাছে।

মুনিকে দেখে রাজা তো অবাক। বসতে আসন দিলেন, পাদ্য-অর্ঘ্যে পূজা করলেন– ভক্তিভরে, অতঃপর জোড়হস্তে নিবেদন করলেন, আপনার আগমনের কারণ কী?

মুনি বললেন– আমি সংসারী হবো মনস্থ করে এখানে এসেছি। তোমার এক কন্যা আমায় দান করো, কুৎসের বংশে জন্ম তোমার। তোমার কাছ থেকে কেউ ভগ্ন মনোরথ হয়ে ফিরে যায় না। তাই তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। পৃথিবীতে অনেক রাজা আছে। অনেকের বহু সুন্দরী কন্যাও আছে।

মুনির মুখে এমন কথা শুনে রাজা ভেবে পাচ্ছেন না কি বলবেন। জরাজীর্ণ দেহ তার। বিশাল জটাভার, শেওলাপূর্ণ দেহ, তাকে কে করবে? শাপভয়ে রাজা কিছু বললেন–না, কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন।

রাজার এমন ভাব দেখে সৌভরি মুনি তাকে বললেন– এত চিন্তাতুর তুমি কিসের জন্য? অনুচিত কি কিছু বলেছি? কন্যাদের একদিন তো বিয়ে দিতেই হবে। তাহলে আমায় এক কন্যা দান করতে আপত্তি কোথায়?

মুনির কথা শুনে রাজা শাপভয়ে বললেন, আপনি অপেক্ষা করুন।

রাজার দ্বিধাগ্রস্ত কথা শুনে মুনি ভাবলেন, আমাকে জরাগ্রস্ত দেখে রাজা কন্যা সম্প্রদানে অসম্মত বলে মনে হচ্ছে। রাজার যে পঞ্চাশজন কন্যা আছে অন্দরমহলে, তারা কেউই আমাকে মনোনীত করবে না, কাজেই আমি যে উপায়ে বিয়ে করতে পারি, সেই চেষ্টা করব।

তখন তিনি নৃপতিকে সম্বোধন করে বললেন– হে রাজন, আমার কিছু বক্তব্য আছে, শোনো। তোমার অন্তঃপুরে আমায় যাবার অনুমতি দাও। তোমার কন্যাগণের মধ্যে যে কেউ আমাকে দেখে যদি পতিত্বে বরণ করতে চায়, তাহলে আমি তাকেই গ্রহণ করব। তা হলে কেন বৃথা সময় নষ্ট করছ? অগত্যা রাজা অনুমতি দিলেন।

রাজা মনে মনে ভাবছেন এখুনি কোনও বিপদ ঘটে যাবে। কোনও কন্যাই যখন মুনিকে মনোনীত করবে না, তখন তিনি নিশ্চয়ই অভিশাপ দেবেন।

এদিকে মুনি তপোবলে দিব্যরূপ ধারণ করলেন। তারপর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন, কন্যাগণকে সম্বোধন করে বললেন– হে রাজকন্যাগণ, আমি বিবাহে ইচ্ছুক হয়ে এখানে এসেছি। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আমাকে পতিত্বে বরণ করতে চাও তো বল। তাকেই রাজা আমার হাতে তুলে দেবে।

মুনির কথা শুনে পঞ্চাশজন কন্যাই তার রূপে মুগ্ধ হয়ে বললো, আমি বিবাহ করবো। তাতে ভীষণ কলহের সৃষ্টি হল। প্রত্যেকে মুনির হাত চেপে ধরে নিজের দাবী জানাতে থাকল।

অন্তঃপুরের সকল কথা শুনে রাজা কি করবেন বুঝতে পারছেন না। অন্তঃপুরে এসে কন্যাদের এমন অবস্থা দেখে সকল কন্যাকেই মুনির হাতে সম্প্রদান করলেন।

মহানন্দে সৌভরি ঋষি ফিরে এলেন আশ্রমে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করে প্রত্যেকটি কন্যার জন্য একটি করে প্রাসাদ তৈরি করে দিলেন। বিশাল সরোবরও তৈরি করে দিলেন। সেই সব জলাশয়ে পদ্ম, শালুক, আদি ফুল, হংসাদি জলচর পক্ষী কলতান করতে লাগল। প্রত্যেক জলাশয়ের পাশে ছিল সুন্দর সুন্দর উপবন যা স্বর্গের নন্দনকাননকেও হার মানায়।

বিশ্বকর্মা মুনিবরের আদেশে সব তৈরি করে দিলেন। ভোগ্য রাজকন্যাগণ প্রত্যেকেই এক একটি প্রাসাদে মুনিকে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করছেন, জপ-তপ বিসর্জন দিয়ে সৌভরি মুনি পুরোপুরি এখন সংসারী।

দূত মারফত রাজা খবর পেলেন তাঁর কন্যারা সুখেই আছেন। কারুর কোনো অভিযোগ নেই। মুনিবর সকলকে মহাসুখেই রেখেছেন।

রাজা ভাবলেন মুনিবর কেমন করে সকল কন্যাকে সুখী করছেন একবার দেখে আসি। এই কথা ভেবে গেলেন মুনির আশ্রমে। সেখানে দেখলেন অপূর্ব প্রাসাদমালা ও উপবন।

রাজা প্রবেশ করলেন– একটি প্রাসাদে, দেখলেন এক কন্যা সুখেই বসে আছে। পিতার আগমনে রাজকন্যা আনন্দিত হৃদয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এক রত্নখচিত সিংহাসন দিল বসতে। রাজা আসনে বসে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন- তোমার মনে কোনও অসুখ নেইতো? মনে হয় সুখেই আছ।

কন্যা বলল–ওই দেখুন পিতা দিব্য উপবন, ও নুতন প্রাসাদ, সুদর্শন পুষ্পে শোভিত পূর্ণ জলাশয়, ভূষণাদির কোনো চিহ্ন নেই, কোন কিছুর অভাব নেই। সদাই মুনিবর আমার ওপর অনুরক্ত। আমার গৃহেই সব সময় থাকেন। অন্য কোনও ভগ্নীর কাছে যান না, তাই আমার ভগ্নীগণ সর্বদা দুঃখে কাল কাটাচ্ছে।

কন্যার মুখে এমন কথা শুনে রাজা অন্যান্য কন্যার ভবনে গেলেন। পূর্বের কন্যার মতো এইকন্যাও সুখে আছে, এবং যা চায় তাই পায় এবং আশ্চর্য্য, মুনিবর সদাই তার কাছে থাকে, অন্য ভগিনীদের কাছে যান না।

পরে সকল কন্যার কাছে এই একই বাক্য শুনতে পেলেন।

সকল কন্যার একই উত্তরে বিস্মিত হয়ে রাজা মুনিকে বললেন–আপনার তপোবন দেখলাম, এত ঐশ্বর্য জগতে কারও নেই।

তারপর রাজা মুনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে গেলেন।

এইভাবে মুনি পঞ্চাশজন কন্যাকে নিয়ে সুখেই সংসার পেতেছেন। ক্রমে দেড়শো পুত্র উৎপাদন করলেন। ক্রমে ক্রমে মুনির সংসারের প্রতি আসক্তি বাড়ল। স্নেহ ভীষণ বস্তু!

মুনিবর ভাবেন কি মধুর কথা বলে শিশু পুত্রগণ। কেমন সুন্দর হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যাচ্ছে এইসব শিশুরা। যখন যৌবনপ্রাপ্ত হবে, তখন এক একজন সুন্দরী কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেব, পুত্র, পৌত্রগণে আমি বেষ্টিত হব, সুখেতে কাল কাটাব। এইভাবেই যতই বংশ বৃদ্ধি হবে ততই বাড়বে সুখ।

একদিন মুনিবরের অন্তরে দিব্যজ্ঞান জন্মায়, তখন আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন–হায়, এ আমি কি করলাম, ভয়ানক মোহে আমি মগ্ন হয়েছি। অনেক বছরের বাঞ্ছা হল না পূরণ।

এইভাবে বিষয় বাসনায় মানুষ সমাসক্ত হলে, কখনও পরম সিদ্ধিলাভ হবে না, হায় হায় আমি কি নির্বোধ। মাছেদের মধ্যে আমার বাস ছিল, সহসা এমন মোহ জন্মাল, পঞ্চাশজন কন্যার পাণিগ্রহণ করে আমি কত কুকর্ম করেছি, অনন্ত বাসনার উদয় হল তা কখনই পূরণ হবে না, ক্রমে অভাববোধ হবে, দুঃখ বাড়বে। অতএব সংসারী হতে গিয়ে নারী গ্রহণ করে দুঃখকেই আলিঙ্গন করলাম, ক্রমে ক্রমে মায়াজালে বদ্ধ হলাম।

পূর্বে কঠোর তপে মগ্ন ছিলাম। এইসব ঐশ্বর্য্য তপস্যায় অতি বিঘ্নকর অতএব এখন আমি বুঝেছি –নিঃসঙ্গ যদ্যপি হয়না নরগণ মুক্তিলাভ কখন করবে, কুসঙ্গ দোষেতে নর অধঃপাতে যায়, অতএব এ কি উপায় হবে? আমি পুনরায় তপস্যাই করব কঠোরভাবে। সেই শ্রীহরির আরাধনাই করব। আদি অন্তহীন সেই বিষ্ণু ভগবান, অতুল তেজস্বী তিনি বিশ্বের নিদান।

যতদিন সংসারে থাকবেন, বাসনার জালে আরও জড়িয়ে পড়বেন। তাই সঙ্কল্প মাত্রেই বেরিয়ে পড়লেন সকল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে। কিন্তু এত সখ করে যাদের বিয়ে করে নিয়ে এলেন তারা যাবে কোথায়? তখন তারাও স্বামীর সঙ্গে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে নির্জন তপোবনে। উপস্থিত হয়ে যাবতীয় পাপমোচন করে আকুল প্রার্থনায় শ্রীবিষ্ণুর চরণে নিজেদের ধ্যান-জ্ঞান, পাপ-পুণ্য সকলই দিল অঞ্জলি।

০৭প্রতারক ইন্দ্র .

চন্দ্রবংশের রাজা আয়ুর পুত্র রাজি, মহাবীর, মহা পরাক্রমশালী, রণজয়ী শাসক।

সে সময় দেবতা ও অসুরদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত। বহুদিন ধরে চলেছে এক বিশাল লড়াই, কোন মতে শেষ নেই তার। জয় কিংবা পরাজয় যে কোন একটা হলেই শান্তি। কিন্তু সব সময় যুদ্ধ লেগে থাকলে কখনই শান্তি আসবে না। উভয় পক্ষই চিন্তিত, একটা কিছু উপায়ে যুদ্ধ শেষ করতে হবে। উভয় পক্ষই চলল পিতামহ ব্রহ্মার কাছে। অদিতির পুত্র দেবতা, আর দিতির পুত্রেরা দানব, সকলেই কিন্তু প্রজাপতি কাশ্যপের পুত্র। অর্থাৎ তারা বৈমাত্রেয় ভাই। তবুও সকল সময় দ্বন্দ্ব উপস্থিত, যুদ্ধ লেগেই আছে। একটা মীমাংসার দরকার, তারা বললে সব ব্রহ্মাকে।

ব্রহ্মা বললেন, এ যুদ্ধের নিষ্পত্তি করতে পারে একমাত্র রাজা রজি, যার দলের হয়ে সে লড়বে তারই জয় হবে। কাজেই তোমরা তার কাছে গিয়ে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য বল।

ব্রহ্মার কথা শুনে দানবেরা ছুটল সবার আগে, গিয়ে সব কথা বলল। রাজি বলল–ঠিক আছে, আমি তোমাদের দলে যোগ দেব। কিন্তু তোমরা জয়লাভ করলে আমার লাভ কী? জয়ী হয়ে কি দেবে তোমরা আমাকে? দানবেরা বলল–তুমি যা চাইবে তাই দেব।

তখন রাজি বললে–যুদ্ধে জয়লাভ করে আমি তোমাদের ওপর আধিপত্য করব। আমার কথা মতই চলবে তোমরা, অন্যথা করা চলবে না। এই আমার শর্ত, দেখ যদি মেনে নিতে পারো।

রাজির কথা শুনে দানবেরা সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল–না, এমন শর্ত আমরা কখনই মেনে নেব না। আমাদের রাজা প্রহ্লাদ, তার কথামতই আমরা চলব। তাকে আমরা সব সময় মান্য করি। তার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখব। তবে আমাদের হয়ে আপনি লড়াই করে যুদ্ধে জয়লাভ করলে, আমরা অবশ্যই যথা-যোগ্য সম্মান দেব আপনাকে।

রাজি বলল– না তা হবে না, আধিপত্য আমার চাই-ই। তোমরা যখন তা মেনে নেবে না, তাহলে যাও আমাকে আর বিরক্ত কর না।

হার মানতে রাজি আছি তবু অন্যের বশ্যতা কিছুতেই স্বীকার করব না–এই কথা বলে দানবেরা চলে গেল।

এবার এলেন দেবতাগণ ইন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে। একই ভাবে নিবেদন করলেন– রাজা রাজির কাছে। বললেন– হে রাজন, আপনি আমাদের সাহায্য করুন। যুদ্ধে পরাজিত করুন দানবদের, ওদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠছি না। পিতামহ ব্রহ্মার কথামত আমরা এসেছি আপনাদের কাছে। আপনি আমাদের সহায় হোন।

রাজি বললেন–আমি আপনাদের সাহায্য করব কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ হলে আমার কি লাভ হবে? ইন্দ্র বললেন– আপনার যা মনের ইচ্ছা আমার কাছে প্রকাশ করুন। অবশ্যই তা পূরণ করব।

রাজি বললেন–আমি বেশি কিছু চাইব না। কেবল একটা জিনিস, সেটা হল ইন্দ্রত্ব, আমি দেবরাজ্যের সিংহাসনে বসতে চাই, পারবে কি দিতে?

রাজির অভিলাষ শুনে সকল দেবতা নির্বাক হয়ে গেলেন। একে অপরের দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছেন। কিন্তু ইন্দ্র কোনো চিন্তা-ভাবনা না করেই বললেন–আমি রাজা, আপনি আমাদের হয়ে প্রাণ সংশয় করে লড়াই করবেন, আর আমরা আপনাকে এটুকু দিতে পারব না সে কি হয়? আপনার ইচ্ছা পূরণ হবে। রাজির আর কিছু বলার নেই। রওনা হলেন যুদ্ধের সাজে। শুরু হল আবার দেবা-সুরের ভীষণ যুদ্ধ। কিন্তু বেশিক্ষণ চলল না সেই যুদ্ধ। দানবপক্ষের বহু হতাহত হল রাজির অস্ত্রের আঘাতে। পিতামহ তো আগে থেকেই বলে রেখেছেন–যুদ্ধে জয়লাভ হবে রাজি আমাদের পক্ষে থাকলে।

জয় হল দেবতাদের। যে কয়েকজন অসুর বেঁচেছিল প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচল। আর পিছন ফিরে তাকাল না। দেবতারা জয়োল্লাস করে উঠলেন।

এবার পূর্ব শর্ত মত রাজি হবেন দেবরাজ, এলেন ইন্দ্র রাজির কাছে। সাষ্টাঙ্গে পড়লেন তার পায়ের কাছে।

আপনি আমাদের জীবনদাতা, কাজেই আপনি আমাদের পিতা। আপনি অবশ্যই পিতার কর্ম করলেন, অসুরদের যুদ্ধে হারিয়ে। আপনি শুধু পিতা নন, ভয়ত্রাতাও, কি ভীষণ মহাভয় থেকে আমাদের রক্ষা করলেন। আপনি আমাদের সকল অমঙ্গল দূর করলেন। এখন আপনি আশীর্বাদ করুন–যেন আমরা আপনার সম্মান যথাযথভাবে রাখতে পারি।

ইন্দ্রের এমন বিনীত কথা শুনে রাজি বুঝতে পারলেন ইন্দ্রের ইচ্ছে কী। কৌশল করে তার প্রতিশ্রুতি পালন এড়িয়ে যেতে চায়। কি আর করবেন তিনি? ইন্দ্র সিংহাসন না ছেড়ে কেবল কথায় যেভাবে পিতা, জন্মদাতা, ভয়ত্রাতা প্রভৃতি বলে সম্মান দেখালেন, তার উপর আর কি বলবেন? বাধ্য হয়েই নিজেকে সামলে নিলেন রাজি, দেবরাজ আর হতে পারলেন না।

ইন্দ্রের বাজিমাত হল, মনে মনে তাই ভারি উল্লাস। কথার জাদুতেই এই মহান কার্য সাধিত হল। এখন কে হটাবে তাঁকে? যথা পূর্ব তথা পরং আগে যেমন ছিলেন তেমনিই রয়ে যাবেন দেবরাজের সিংহাসন। আগের থেকে আরও নিশ্চিন্ত। দানবরা পলাতক, রাজি বশীভূত কথার কৌশলে, সকল অশান্তি দূর হয়েছে। কাজেই এবার শুধু ভোগবিলাসে মেতে উঠলেন দেবতাগণ।

দেবর্ষি নারদের কোনো কিছুই অজানা নেই। তিনি মনে মনে ভাবলেন–দেবতাদের রাজা হয়ে ইন্দ্র এত বড় অন্যায় করল। তার একটু সাজা হওয়া দরকার। তাই তিনি চললেন রাজির পুত্রদের কাছে। গিয়ে বললেন– তোমরা মহারাজ রাজির পুত্র বলে আমার মনে হয় না। যদি হতে, তাহলে এমন ব্যবহার তোমাদের হত না। তোমরা বীর নামে পরিচিত, কিন্তু আমার তা মনে হচ্ছে না।

দেবর্ষি নারদের কথা শুনে রাজির পুত্ররা তো অবাক, আমরা কি এমন দোষ করলাম যে, নারদ ঠাকুর আমাদেরকে এমন হেয় প্রতিপন্ন করছেন?

তারা বলল—হে দেবর্ষি, আমরা আপনার কথার কোনো অর্থ বুঝতে পারছি না। আপনি দয়া করে সরল করে বলুন যা আপনি বলতে চান। আমাদের মনে হচ্ছে আপনি অযথা আমাদেরকে অপমান করেছেন।

দেবর্ষি বললেন–আচ্ছা, তোমরা কি বলতে পার দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কি?

রাজির পুত্রগণ বলল–তিনি আমাদের দাদা হন।

দেবর্ষি বললেন–দাদা মানে কী রকম দাদা? নিজের দাদা তো? না পাতানো দাদা। তোমাদের বাবাকে ইন্দ্রত্ব দেবে বলে অঙ্গীকার করে দানবদের সঙ্গে লড়াই করিয়ে নিয়ে জয়ী হলেন দেবতারা। তারপর কৌশল করে ইন্দ্র তোমার বাবার কাছে এসে বলল, আপনি আমাদের রক্ষাকর্তা পিতার মতো। তাই আমরা তোমার পুত্র, সকল পুত্রকে রক্ষা করা পিতার কর্তব্য।

আপনি পিতার কাজই করেছেন। এইভাবে নানা কথার জাল বুনে তোমাদের পিতাকে তোষামোদ করে দেব সিংহাসনের দাবি থেকে বঞ্চিত করেছেন। এখন তোমাদের বাবা আর কেমন করে স্বর্গের সিংহাসনে বসতে যাবেন? এইভাবে ইন্দ্র তোমাদের বাবার সঙ্গে নেমক হারামের কাছ করেছে। আমার মনে হয় তার প্রতিশোধ নেওয়া দরকার। এভাবে প্রতারণা করে যারা, তাদের বরদাস্ত করা দুর্বলতার লক্ষণ। তোমরা সেই রাজির পুত্র মহা বলবান বলে গর্ব কর, এই কি তার নমুনা? তাই এমন দুবৃত্তদের এখনও ক্ষমা করে বসে আছ।

দেবর্ষি নারদের কথা যতই শোনে রাজির পুত্রদের মাথা ততই গরম হয়ে ওঠে। তারা চিন্তা করল। দেবর্ষি নারদ ঠিক কথাই বলেছেন। ঐ অকৃতজ্ঞ দেবতাদের সাজা দেওয়া উচিত। ইন্দ্র যদি তাদের প্রকৃত দাদা হত তাহলে আপদে বিপদে সাহায্য করত। কই কখনও তো আসে নি এদিকে। না, আর অপেক্ষা না করে স্বর্গ আক্রমণ করাই উচিত।

এইভাবে যখন তারা চিন্তা করছে, নারদ ঠাকুর বুঝলেন, তার ঔষধ কাজে লেগেছে, এখন সরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

তারপর রাজির পুত্ররা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে মহাক্রোধে স্বর্গ আক্রমণ করল,প্রতিরোধ করতে এলেন দেবগণ। রাজিসম বল ধরে পুত্রগণ, তারা দেবেদের দিল মহা মহা মার। মার খেয়ে দেবতারা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালালেন। তারপর দেবগুরু বৃহস্পতি এসে রাজির পুত্রদের অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে স্বর্গ সিংহাসন ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দিলেন। প্রতারণার ফল পেলেন ইন্দ্র।

০৮কল্মষপাদের কাহিনি .

সগর বংশের রাজা ছিলেন ঋতুপর্ণ। পাশাখেলায় মহা ধুরন্ধর তিনি। তাঁর পুত্র সুদাস পরম ধার্মিক ও দয়ালু। সুদাসের পুত্র সৌদাস। অতি বড় শিকারী বীর তিনি। সৌদাসের তির গায়ে লেগে বেঁচেছে এমন কোনও প্রাণী জগতে নেই। একদিন তিনি জঙ্গলে গিয়ে তির দিয়ে একটি বাঘকে মেরে ফেললেন।

তারপর দ্বিতীয় বাঘকে মারবার জন্য সৌদাস যখন উদ্যত, তখন সেই বাঘটি বিশাল ভয়ঙ্কর রাক্ষস মূর্তি ধরে গর্জন করতে করতে বলল–তুই আমার ভাইকে মারলি কেন? কি দোষ করেছিল তোর কাছে? আমি তোকে দেখছি?

এই কথা বলেই সেই রাক্ষসটা বনের ভিতরে কোথায় লুকালো, সৌদাস আর তাকে দেখতে পেলেন না। তারপর বহুদিন কেটে গেছে। একসময় সৌদাস কুলগুরু বশিষ্টকে আচার্য করে এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করলেন। মহা ধূমধামে শেষ হল যজ্ঞ।

বশিষ্টদেব রাজাকে বললেন–যজ্ঞ শেষ হল। এরপর কোনও সদ ব্রাহ্মণকে মাংস খাওয়াতে পারলে, এই যজ্ঞের ঠিক ঠিক ফল পাওয়া যাবে।

রাজা সৌদাস বললেন–আপনিই সেই সদ ব্রাহ্মণ। আপনাকেই আমি মাংস ভোজন করাতে চাই। আমি পাঁচককে দিয়ে সব ব্যবস্থা করছি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

স্নান শেষ করে এলেন বশিষ্টদেব। ভোজনে বসলেন রাজা পরিবেশন করলেন– অন্ন ব্যঞ্জনাদির সঙ্গে মাংস। রান্না করা মাংসের দিকে তাকিয়ে বশিষ্টদেবের একটু খটকা লাগল। তারপর ভালো করে তাকিয়ে বুঝলেন তাকে পরিবেশিত মাংস প্রকৃতপক্ষে নরমাংস যা মানুষের আহার্য্য নয়। কী স্পর্ধা! সেই নরমাংস আমাকে দিয়েছে খেতে। রাগে তার চোখ লাল হয়ে গেল। তিনি উঠে পড়লেন।

গর্জন করে তিনি বলতে লাগলেন, এতখানি দুঃসাহস তোমার? মানুষের মাংস আমায় খেতে দিলে? মুনির কথা শুনে সৌদাস অবাক। কেমন করে সম্ভব। পাঁচককে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন, কিন্তু সে সুযোগ না দিয়ে বশিষ্টদেব শাপ দিলেন। আমাকে যেমন তুমি নরমাংস খাওয়াতে চেষ্টা করেছিলে, তেমনি তুমি নরমাংস ভোজী রাক্ষস হবে। সৌদাস বিনীত কণ্ঠে

বললেন–গুরুদেব আমাকে এ কি অভিশাপ দিলেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি স্বেচ্ছায় এই অন্যায় করিনি। আপনি মাংস খেতে চাইলেন, আমি পাঁচককে বললাম। কেমন করে নরমাংস এল আমাকে একটু জানবার সুযোগ দিন।

এই কথা বলতে বলতে রাজা সৌদাসের মাথাটা গরম হয়ে উঠল। অভিশাপ দেবার জন্য উদ্যত হলেন। হাতে মন্ত্রপূত জল নিলেন। রানি দময়ন্তী সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে বাধা দিলেন রাজাকে, এ কি করছ তুমি? উনি আমাদের কুলগুরু! তাঁর প্রতি রুঢ় আচরণ মানায় না।

রানির কথায় শান্ত হয়ে সৌদাস ভাবলেন–আমাদের অজ্ঞাতে হয়তো নরমাংস এসে গেছে গুরুদেবের পাতে। হয়ত এটাই ভাগ্যের লিখন। কিন্তু এই অভিশপ্ত জল কোথায় ফেলি? এ জল যদি পৃথিবীতে পড়ে গোটা পৃথিবী জ্বলে পুড়ে ছাই হবে। অনেক ভাববার পর সৌদাস নিজের পায়েই ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে পা দুটো বিচিত্র রঙের কল্মষ (মলিন) হয়ে গেল। সেই থেকে সৌদাসের নাম কল্মষপাদ।

এতক্ষণে বশিষ্টদেব শান্ত হলেন, ভাবলেন–কেন এমনি হল? ধ্যানযোগে বুঝতে পারলেন সৌদাসের কোনো দোষ নেই। সকল চক্রান্ত সেই বাঘরূপী রাক্ষসের। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য এমন ঘটনা ঘটিয়েছে।

অভিশাপ বাক্য যখন মুখ থেকে বেরিয়েছে, তা অব্যর্থ। বশিষ্টদেব এই শাপদানের জন্য অনুতপ্ত হলেন। তিনি রাজাকে প্রদত্ত অভিশাপ লঘু করে দিলেন, তাকে সারা জীবন রাক্ষস রূপে থাকতে হবে না, মাত্র বারোটা বছর, তারপর আপনা আপনি শাপমুক্ত হবেন।

তারপর কল্মষপাদ রাক্ষসরূপে বনে চলে গেলেন। ক্ষুধার জ্বালা মেটান নরমাংস খেয়ে। একদিন তিনি দেখতে পেলেন এক ব্রাহ্মণ দম্পত্তিকে। অল্পদিন হল তাদের বিয়ে হয়েছে। তাই কোনো সন্তান হয়নি। কল্মষপাদ এসে ধরলেন ব্রাহ্মণকে। তাই দেখে আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ব্রাহ্মণী। বলল–এ আপনি কি করছেন? আপনি কি ভুলে গেলেন যে, আপনি প্রকৃতপক্ষে রাক্ষস নন। আপনি রাজা সৌদাস। কিন্তু সৌদাস ব্রাহ্মণীর কথা না শুনে খেয়ে ফেললেন ব্রাহ্মণকে। তখন রাগে দুঃখে ব্রাহ্মণী শাপ দিলেন–তুমি যখন আমাকে সন্তান লাভের সুযোগ দিলে না তখন তুমিও কখনও সন্তানের পিতা হতে পারবে না।

তারপর বারো বছর কেটে যাওয়ার পর কল্মষপাদ শাপমুক্ত হলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর অভিশাপে সারাজীবন অপুত্রক রইলেন।

০৯নিমি হলেন বিদেহ .

সূর্যবংশের এক বিখ্যাত রাজা নিমি। একবার তিনি সঙ্কল্প করলেন–এক হাজার বছর ধরে যজ্ঞ করবেন। যজ্ঞের আগুন জ্বলবে হাজার বছর ধরে।

কুলগুরু বশিষ্টদেবের কাছে গিয়ে জানালেন তাঁর মনোবাঞ্ছার কথা।

বশিষ্টদেব বললেন–যজ্ঞ করবে সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু আমি তাতে যোগ দিতে পারব না। কারণ ইন্দ্র অন্য একটি যজ্ঞে আমাকে নিযুক্ত করেছেন। তাই এখন আমার কিছু করার নেই। তবে তুমি যদি ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর, তাহলে আমি যোগ দিতে পারি তোমার যজ্ঞে।

বশিষ্টদেবের কথা শুনে নিমি রাজার খুব রাগ হল। তিনি ভাবলেন আমি রাজা, আমার আশ্রিত গুরুদেব। তিনি কিনা আমার যজ্ঞে না গিয়ে যাবেন ইন্দ্রের যজ্ঞে? ঠিক আছে, আমি বিলম্ব করব না। যথাসময়েই যজ্ঞ শুরু করব অন্য কাউকে প্রধান হোতা করে।

এই চিন্তা করে গেলেন গৌতম ঋষির আশ্রমে। বললেন, যজ্ঞ করার কথা। রাজি হলেন তিনি। আরও কিছু মুনিকে নিয়ে যজ্ঞ শুরু হল। বশিষ্টদেব এ-সবের কিছুই জানতে পারলেন না।

ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ করে ফিরে এলেন তিনি। দেখলেন নিমির যজ্ঞের প্রধান হোত গৌতম মুনি। মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেন তিনি। ভাবলেন কুলগুরুকে অবজ্ঞা? নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে চলে গেলেন নিমির প্রাসাদে। দেখলেন রাজা পালঙ্কে ঘুমাচ্ছেন। দেখামাত্রই রাগটা আরও বেড়ে গেল। অভিশাপ দিলেন- কুলগুরুকে অবজ্ঞা করে গৌতমকে দিয়ে যজ্ঞ করালে? আমার অভিশাপে তুমি বিদেহ হও। তোমার দেহ প্রাণহীন হবে।

বশিষ্টের শাপে রাজা নিমির মৃত্যু হল, আর নিমির শাপে বশিষ্টদেব নতুন দেহ ধারণ করলেন–মিত্র বরুণের পুত্ররূপে।

গৌতম মুনির দ্বারা যজ্ঞ তখনও চলছে। তাই সুগন্ধ তেল মাখিয়ে রাজার দেহকে যত্ন করে রাখা হল। এদিকে ঋষিরা যজ্ঞ শেষ করে রাজাকে আশীর্বাদ করতে গেলেন। মৃত-রাজার সামনে দাঁড়ালেন। বললেন– হে রাজন, আপনার যজ্ঞ সমাপ্ত ও সার্থক হয়েছে। সেই পুণ্যে কিবা হয় তব অভিলাষ, আমাদের কাছে তাহা প্রকাশ কর।

সবাইকে অবাক করে নিমির স্বরে কেউ যেন কথা বলে উঠল–ঋষিগণ, দেহ ছাড়া প্রাণ নিয়ে থাকা যে কত কষ্ট তা এখন অনুভব করতে পারছি। দেহের উপর প্রাণের বড় মায়া। আমি আর ঐ কায়াকে ধরে মায়ায় বন্দি হতে চাই না। কিন্তু আমি সবার কাছেই থাকতে চাই।

তখন ঋষিরা আশীর্বাদ করলেন–তুমি বিদেহ হয়েই থাক। সেই থেকে নিমি রাজা বিদেহ হয়েই থাকলেন। কিন্তু দেহ না থাকলে রাজত্ব চালাবেন কেমন করে? পুত্রও নেই, তখন ঋষিরা তাঁর মৃতদেহকে মন্থন করে এক পুত্র সন্তান সৃষ্টি করলেন। তার নাম দিলেন জনক। তিনি মিথিলার সিংহাসন বসে রাজ্য পরিচালনা করলেন। এই জনক রাজার কন্যাই সীতা, শ্রীরামের ঘরণী।

১০পুরুরবার কাহিনি .

সূর্যের পুত্র মনু এক সময় পুত্র কামনায় বশিষ্টদেবকে প্রধান পুরোহিত করে যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে তাঁর স্ত্রী কিন্তু কন্যা কামনার সংকল্প করলেন। কাজেই যজ্ঞশেষে রানির গর্ভে জন্মাল এক কন্যা। রানি খুব খুশি কিন্তু বিস্মিত হলেন স্বয়ং মনু। তিনি পুত্র কামনায় যজ্ঞ করে পেলেন কন্যা। এ কেমন করে হয়? ক্ষুণ্নমনে জিজ্ঞেস করলেন– বশিষ্টদেবকে।

তখন বশিষ্টদেব কন্যার আকাঙ্ক্ষায় রানির অন্তরের প্রবল বাসনার কথা বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রাজা আরও ক্রুদ্ধ হলেন। রাজার ইচ্ছার থেকে রানির ইচ্ছাটাই বড় হল মহর্ষির কাছে?

অগত্যা মহর্ষি তাকে বললেন– হে রাজন, আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না। শান্ত হোন, আমি আমার যোগবলে আপনার কন্যাকে পুত্রে পরিণত করে দেব।

মন্ত্র বলে কন্যা হল পুত্র। রাজার মনে আনন্দ আর ধরে না। নাম সুদ্যুম্ন। ধীরে ধীরে সে বড় হতে লাগল। নানান শাস্ত্র এবং শাস্ত্র বিদ্যা শিখল। সুদুম্নের বড় শখ শিকার করা। একদিন তীর ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মৃগয়ার উদ্দেশ্যে। একটা ঘোড়ায় চড়ে সারাদিন ধরে অনেক শিকার করল। তবু তার শখ মেটে না। রাত্রি হয়ে গেল, তখন সে বনের মধ্যেই তাঁবু গাড়ল, এইভাবে অরণ্য অভ্যন্তরে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল।

সেই সুস্মের তাঁবুর অল্প দূরে ছিল এক যক্ষের ঘর, তার সঙ্গে তার বউ থাকে। দুজনে নির্জনে বাস করে। খায়, দায়, মনের আনন্দে থাকে। কিন্তু কোথাকার এক রাজপুত্র এসে তাদের নির্জনতায় বাধা হয়ে দেখা দিল। বনের কত জন্তু জানোয়ার ঘুরে বেড়াত। এই রাজকুমার আসার জন্য অরণ্য প্রায় পশুশূন্য, যক্ষ চিন্তা করে কিভাবে এই রাজপুত্রকে অরণ্য থেকে বিতরণ করা যায়।

একদিন যক্ষ তার বউকে বলল- তুমি ওকে উমাবনে নিয়ে যাও লোভ দেখিয়ে, তাহলেই বাছাধন জব্দ হবে।

বড়ই অদ্ভুত এই উমাবন। এই বনে যে ঢুকবে, সঙ্গে সঙ্গে সে নারী হয়ে যাবে। শিবের অভিশাপ আছে। যক্ষিণী একদিন সুদ্যুম্নকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল সেই বনে, সঙ্গে সঙ্গেই সে নারীতে

পরিণত হল। লজ্জায় তার মাথা ছোট হয়ে গেল। বনে বনে ঘুরছে। লজ্জায় আর প্রাসাদে ফিরতে পারে না।

তারার গর্ভে চন্দ্রের এক পুত্রের নাম বুধ। সুদ্যুম্নের রূপ দেখে সে বিমোহিত হল। একে অন্যের প্রেমে পড়ল এবং মনের আনন্দে বিয়ে করলো, নারী রূপে সুদ্যুম্নের নাম হল ইলা। সে গর্ভবতী হল। তারপর যথা সময়ে বিয়ে করলো। এক পুত্র হল– নাম রাখলেন পুরুরবা।

কিন্তু মনুর আর কোন সন্তান না থাকায় পরবর্তীকালে রাজ্য শাসন করবে কে?

বশিষ্টদেব এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে শিবের কাছে গিয়ে তার বহু স্তবস্তুতি করে বললেন– হে মহেশ, আপনার অভিশপ্ত উমাবনে প্রবেশ করে সুদ্যুম্ন নারী হয়ে গেছে। এখন মনু বংশ রক্ষা হয় কিসে? আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিন।

শিব বললেন–আমার আর কি করার আছে? তবে একটা ব্যবস্থা করছি সুদ্যুম্ন একমাস পুরুষ ও একমাস নারী হয়ে থাকবে। শেষ পর্যন্ত তাই হল। সুদ্যুম্ন একমাস পুরুষরূপে রাজ্য শাসন করলেন। পরবর্তী একমাস নারীরূপে বুধের সঙ্গে কাটালেন। তারপর আবার রাজা হলেন। এইভাবে বহুকাল রাজত্ব করার পর সুদ্যুম্ন বৃদ্ধ বয়সে তার পুত্র পুরুরবাকে প্রতিষ্ঠানপুরের সিংহাসনে বসালেন।

রাজা হওয়ার পর পুরুরবার জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। স্বর্গলোকে যত অপ্সরা আছে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল উর্বশী। তাই দেবরাজ ইন্দ্র উর্বশীকেই বেশি ভালোবাসেন। কিন্তু তাদের এত ভালবাসা মিত্র-বরুণের সহ্য হল না। একদিন সামান্য কারণে তিনি অভিশাপ দিলেন উর্বশীকে অভিশাপের কারণে উর্বশী স্বর্গলোকে ছেড়ে সাধারণ নারীর বেশে ঘুরতে লাগলো এই মর্ত্যধামে।

সহসা একদিন পুরুরবাকে দেখতে পেল। পুরুরবাও উর্বশীকে দেখল। উভয়ই বিস্মিত হল। পুরুরবা ভাবছে– জগতে এমন নারী সে আগে কখনও দেখেনি। আর উর্বশী ভাবছে মর্তে মানুষ কি এত সুন্দর হতে পারে? উভয় উভয়কে ভালবেসে ফেলল।

কিন্তু উর্বশীর মনে ভয় হল, শাপের মেয়াদ ফুরোলে তাকে স্বর্গে চলে যেতে হবে। তখন পুরুরবার কি অবস্থা হবে? আবার এমন একজন পুরুষের সঙ্গলাভের প্রবল বাসনা। তাই মনে মনে তিনটে শর্ত ঠিক করল– প্রথম শর্ত হল সে কেবল ঘী খাবে। অন্য কিছু খাবে না। দ্বিতীয়

শর্ত হল দুটো ভেড়া থাকবে তার শোবার ঘরে তাদের কেউ দূরে সরাতে পারবে না। আর তৃতীয় শর্ত হল সে যেন রাজাকে কখনও বিবস্ত্র না দেখে।

এমন সুন্দরী মেয়েকে দেখে পুরুরবা কোন চিন্তা না করেই স্বীকার নিল তিনটে শর্ত। মনের আনন্দে কাটাল বহুদিন। নানারকম মনোরম স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এতদিন উর্বশী ভুলেই গেল যে সে স্বর্গের অপ্সরা।

এদিকে উর্বশীকে হারিয়ে ইন্দ্রের খুব খারাপ অবস্থা। বন্ধুর এমন অবস্থা দেখে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু খুবই চিন্তিত। উর্বশীকে স্বর্গে ফিরিয়ে আনার জন্য মর্তে গেলেন। গোপনে ঢুকলেন পুরুরবার শয়ন কক্ষে। রাতের বেলায় ঘন অন্ধকারে উর্বশীর ভেড়া চুরি করলেন। তারা চিৎকার করে উঠল। উর্বশী জেগে উঠে পুরুরবাকে জাগিয়ে বলল- কেউ ভেড়া চুরি করতে এসেছে। এই বলে কাঁদতে লাগলো। ঘুম ভেঙ্গে গেল পুরুরবার।

ভেড়া চোরকে ধরতে বিছানা ছেড়ে উঠল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিশ্বাবসু কৌশলে আলো জ্বেলে দিলেন। সেই সময় পুরুরবা ছিল বিবস্ত্র। উর্বশী সেই অবস্থায় দেখে শর্তানুযায়ী স্বর্গে চলে গেল।

এতদিন উর্বশীকে নিয়ে পুরুরবা মনের আনন্দেই ছিল কিন্তু এখন আর সে নেই। তাই মন খুব খারাপ। রাজ কাজে মন নেই। খিদে নেই, পাগলের মতো খুঁজে বেড়াল উর্বশীকে। না পেলে তার প্রাণ বোধ হয় চলে যায়।

একদিন উর্বশী তার কয়েকজন সখীকে নিয়ে মতে এল। অম্ভোজ সরোবরে এসে। মনের আনন্দে স্নান করছিল। দৈবক্রমে সেই পথে পুরুরবা যাচ্ছিল। উর্বশীকে খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেল। তারই কামনার ধন সেখানে তার সখীদের সঙ্গে। সোজা চলে গেল তার কাছে। তার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল।

উর্বশী পুরুরবাকে দেখে অবাক। একি চেহারা হয়েছে তার, সেই রূপ আর নেই। একেবারে জীর্ণ, মলিন বেশ, পুরুরবাকে বলল– আমি গন্ধর্বলোকের বাসিন্দা, মর্তে শাপভ্রষ্ট হয়ে ছিলাম। এখন আর থাকা সম্ভব নয়। তবে তোমার ঔরসে আমার গর্ভে এক পুত্র হয়েছে, নাম আয়ু, একে তুমি নাও।

পুরুরবা বলল- আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না। তুমি ছাড়া জগতে আমার আর কোন অভাব নেই।

তখন উর্বশী কয়েকজন গন্ধর্বকে পুরুরবার কাছে রেখে চলে গেল। সেই গন্ধর্বগণ পুরুরবার দুঃখ দূর করার চেষ্টা করল। তবুই রাজার দুঃখ দূর হল না।

তখন তারা রাজাকে একটি অগ্নিস্থালী দিল। বলল, আপনি উর্বশীর সাথেই আছেন মনে করে ঈশ্বর চিন্তা করে এই অগ্নির পূজা করবেন তিনবার, তবে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

উর্বশীকে না পেয়ে পুরুরবার মনে শান্তি নেই। বনের মধ্যে ফেলে দিল সেই অগ্নিস্থালী ফিরে এল প্রাসাদে পুত্র আয়ুকে নিয়ে। আবার কি ভেবে সেই বনে গেল অগ্নিস্থালীটি আনবার জন্যে কিন্তু দেখল–সেখানে একটা শাল গাছ তার ভেতরে আবার একটি অশ্বথ গাছ। পুরুরবা সেই জোড়া গাছকেই নিয়ে এল প্রাসাদে। সেই কাঠে কাঠ ঘষে আগুন জ্বালিয়ে হোম করলেন–তিনবার। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। যতক্ষণ হোম করে, ততক্ষণ উর্বশীর সঙ্গসুখ অনুভব করে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ

উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

০১.

প্রণাম করা উচিত নারায়ণ, নরোত্তম নর এবং দেবী সরস্বতাঁকে। ওঁদের জয়কীর্তন করা উচিত।

দেবতা ঈশানকে প্রণাম করা উচিত। তিনি নিখিল জগতের পতি, তিনি ধ্রুব, শাশ্বত এবং অবিনাশী। তিনিই মহাত্মা মহেশ্বর।

প্রণাম জানানো উচিত ব্রহ্মাকে। তিনিই সর্বজ্ঞ তিনি অপরাজিত লোকস্রষ্টা। তিনি সাধুশ্রেষ্ঠ, ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমানের নিয়ন্তা।

কেবলমাত্র সেই জ্ঞানবানই পুরাণ আখ্যান বিবৃত করতে পারেন যার মধ্যে নিম্নলিখিত সকল গুণের সমাহার ঘটে গেছে। যাঁর জ্ঞান ও বৈরাগ্য অতুলনীয়। যিনি স্থৈর্য সত্য করুণা ও ঐশ্বর্যের অধিকারী। যিনি লোকস্রষ্টা এবং লোকতত্ত্বজ্ঞ। এই বিশ্বের সকল প্রাণীকে যিনি সৃষ্টি করেন, যিনি এই নিখিল বিশ্বের সদাত্মক ও অসদাত্মক উভয় ভাবপদার্থেই সতত অবলোকন করেন, যাঁর মনে কখনও কোনো অবসাদ অসে না, যিনি যোগাবলম্বী এবং যোগী। সেই মতে আমি পুরাণ আখ্যান জানতে ইচ্ছুক। আমি জগৎপতি লোকসাক্ষী অজ এবং বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলাম।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বশিষ্ঠ, তাঁর পৌত্র অতি যশস্বী ঋষি জতুকর্ণ, পুণ্যাত্মা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে স্মরণ করে আমি বেদ সম্মত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ কীর্তন করছি। এই পুরাণ শব্দ, অর্থ যুক্তি সমন্বিত এবং বিবিধ শাস্ত্রবাক্য ভূষিত।

একসময় অতুলতি ভূপতিশ্রেষ্ঠ রাজণ্যবৃন্দ এই ভূমণ্ডল শাসন করতেন। তখন সংযত আত্মা, সত্যব্রত পরায়ণ ঋষিরা বিশিষ্ট ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পবিত্র দৃষদ্বতী নদীর তীরে দীর্ঘকাল ব্যাপী এক যজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞে অংশ গ্রহণকারী ঋষিরা সবাই ছিলেন সরল, রজঃগুণ শূন্য এবং মাৎসর্য্য দোষ বর্জিত।

সেই ঋষিরা ছিলেন যথাশাস্ত্র দীক্ষিত নৈমিষারণ্যবাসী। তাদের দেখবার জন্য পৌরাণিক প্রবর মহাবুদ্ধি সূত ওই স্থানে সমাগত হয়ে অশ্রুতপূর্ব বক্তৃতার দ্বারা শ্রোতাদের রোমরাজি হর্ষিত করেছিলেন।

এই কাজের জন্যই পরবর্তীকালে ‘রোমহর্ষণ’ নামে তিনি এই পৃথিবীতে প্রশংসিত হন।

রোমহর্ষণ ছিলেন ধীমান বেদব্যাসের শিষ্য। তিনি তপস্যশ্রুতি, সদাচারনিমি ও মেধাবী রূপে ত্রিলোক বিখ্যাত ছিলেন। নিখিল পুরাণ ও বেদ তার অধিগত ছিল। ভূতলে উগত ওষধির মতোই তাঁর পরিভাষা।

সেই ন্যায়বিদ সুত কুরুক্ষেত্র প্রান্তে যজ্ঞাসীন ন্যায়-বুদ্ধি সম্পন্ন সেইসব মুনি পুঙ্গবদের কাছে গেলেন। করজোড়ে তাঁদের প্রণাম করলেন। এইভাবেই তিনি ঐ ঋষিশ্রেষ্ঠদের যথাযোগ্য আপ্যায়িত করার চেষ্টা করলেন। প্রত্যুত্তরে যজ্ঞদীক্ষিত ঋষিবৃন্দরাও মহাত্মা সূতের প্রতি প্রীত হয়ে তাঁকে যথাবিহিত শ্রদ্ধা ও পূজা নিবেদন করলেন।

সমীপে অতি বিশ্বস্ত বিদ্বান ও সত্যনিষ্ঠা সূতকে দেখে সেই ঋষিদের অন্তর পুরাণ কথা শ্রবণের ইচ্ছায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেই সময় ঐ দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ছিলেন সর্বশাস্ত্র শৌনক। তিনি ইঙ্গিত দ্বারা মুনিবৃন্দের অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন। এবং সূতকে পুরাণ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত করতে সচেষ্ট হলেন। বিনয় সহকারে সূতকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, সূত তুমি ইতিহাস পুরাণে কৌতূহলী হয়ে মহাবুদ্ধি ব্রহ্মাণ্ড শ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীশ্রীব্যাসদেবকে উত্তমরূপে উপাসনা করেছিলেন। অতীতেও তুমি তাঁর পুরাণ আশ্রয়ী মতিকে দোহন করেছিলে। এই মুহূর্তে তোমার থেকে অধিক পূরাণ ব্যাখ্যা কেউ জানে না। হে মহাবুদ্ধি সূত, এই ধীমান ঋষি প্রবরেরা তোমার কণ্ঠে পুরাণ শুনতে অভিলাষ করছেন। অতএব হে মহৎ প্রাণ, তোমার উচিত এঁদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে সেই পুরাণ অখ্যান শোনানো।

আজ এই পবিত্র প্রান্তরে এইসব বিভিন্ন গোত্রীয় ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা সপুত্র সমাগত হয়েছেন, তুমি এঁদের পুরাণ কথা শ্রবণ করাও। এঁরা পুরাণের মাধ্যমে নিজ নিজ বংশাবলি শ্রবণ করুন। বিশেষত এই কারণেই এই দীর্ঘকালব্যাপী সত্র যজ্ঞ সমাপ্ত হবার আগেই আমরা তোমাকে স্মরণ করেছি।

শৌনকের মুখে এই প্রশংসাবাক্য শুনে সূত বিশেষ প্রীত হলেন। সত্যব্রত পরায়ণ পুরাণজ্ঞ ঋষিদের সমীপে পুরাণ ব্যাখ্যায় প্রেরণা পেলেন। শৌনকের আহ্বানের উত্তরে শুভ ভাষণে সূত বললেন, হে দেবগণ, ঋষিগণ, অমিততেজা রাজন্যবৃন্দ, শ্রুতি নির্দিষ্ট মহাত্মাবৃন্দ এবং ইতিহাস পুরাণে যাঁরা ব্রহ্মবাদী ঋষি বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের সকলকে আমি প্রণাম জানাই। এঁদের সমীপে পুরাণ ব্যাখায় আমি গর্বিত। কারণ এঁদের বংশাবলি স্মরণে রাখা সজ্জন নির্দিষ্ট স্বধর্ম।

আপনারা নিশ্চয়ই অবহিত যে, বেদে সূতের কোন অধিকার নেই।

এক সময় বেনপুত্র মহাত্মা পৃথু যখন যজ্ঞ করছিলেন তখন সেই যজ্ঞে সূত জাতীয় রমণীর গর্ভে প্রথম বর্ণবিকৃত সূতের আবির্ভাব ঘটে। ভ্রমবশত সেই যজ্ঞে ইন্দ্রের হবির সাথে বৃহস্পতির হবির মিশ্রণ ঘটে যায় আর সেই মিশ্রিত হবি দেবেন্দ্রের উদ্দেশ্যে আহুত হয়, এর পরেই সূত জন্মলাভ করে।

শিষ্যের হবির সাথে গুরুর হবি মিশ্রিত হয়েছিল। অর্থাৎ উত্তম-অধমের মিশ্রণ ঘটেছিল। সেই কারণেই বর্ণ-বিকৃত সূতের উদ্ভব হয়। যদিও এই গর্হিত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা হয়েছিল।

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণনিকৃষ্ট যোনিতে সূতের জন্ম হয়। তাই পূর্বের স্বধর্মে সূতের তুল্য ধর্মই উল্লিখিত হয়েছে। সেই কারণেই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পরিচর্যার মাধ্যমেই সূত তাঁর জীবিকা অর্জন করে থাকেন। এছাড়া রথ, হস্তী, অশ্বাদি চালনাও সূতের নিকৃষ্ট ধর্ম রূপে নির্ধারিত হয়েছে।

সুতরাং এক্ষণে আমি আমার স্বধর্মে পুরাণ পাঠ করব। আপনাদের মতো ব্রহ্মবাদিদের নির্দেশে ঋষিস্তুত পুরাণ পাঠ অমার অবশ্য কর্তব্য।

পিতৃগণের বাসবী নামে এক মানসী কন্যা ছিল। একবার ক্রোধবশত সেই কন্যাকে পিতৃগণ মৎস্যযোনিতে জন্মাবার জন্য অভিশাপ দেন। অরণী যেমন অগ্নির জন্মের কারণ, তেমনভাবে এই ঘটনাও একটি হিতকারী কাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণ হল। মহাযোগী বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্যাস সেই মৎস্যযযানিগতা বাসবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। আমি এক্ষণে সেই বিধাতৃরূপ ভগবান ব্যাসদেবকে প্রণাম করি। তিনি পুরাণ পুরুষ। বাহ্য এবং অভ্যন্তরে উভয় স্থলে তার নিবাস। তিনি মনুষ্যরূপে বিষ্ণুরূপধারী প্রভু বিষ্ণু। তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসহ সাঙ্গবেদ জাতুকর্ণের কাছ থেকে তার কাছে উপস্থিত হয়েছিল। শ্রুতির সাগর থেকে মতির মন্থন চালিত করে মনুষ্যলোকে মহাভারত চন্দ্রমাকে তিনিই প্রকাশ করেছিলেন। ভূমিগুণ এবং কালগুণ লাভ করে বৃক্ষ যেমন বহু শাখায় বিস্তৃত হয়, তেমন ভাবেই বেদবৃক্ষ তাকে লাভ করে বহু শাখায় বিকশিত হয়েছিল।

আমি সেই সর্বজ্ঞ, সর্ববেদপূজিত, দীপ্ততেজা, ব্রহ্মবাদী ব্যাসদেবের কাছ থেকেই পুরাণ কথা শ্রবণ করেছিলাম। এক্ষণে সেই শ্রুত বাণীই আপনাদের কাছে কীর্তন করব। পূর্বকালে নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণের আহ্বানে মহাপ্রাণ বায়ু তাদেরকেও এই পুরাণকথা বলেছিলেন।

এই পুরাণে নিশ্চিত হয়েছে যে মহেশ্বর হলেন স্বয়ম্ভু, পরম অব্যক্ত, চতুবাহু, চতুর্মুখ অচিন্ত্য, অপ্রমেয় এবং হেতু ভূত। যিনি ঈশ্বর তার থেকে মহেদাদি বিশেষ পর্যন্ত অব্যক্ত নিত্য সদাসদাত্মক কারণের সৃষ্টি ঘটেছে। আর এর ফলে হে হিরন্ময় বস্তুটি আবির্ভূত হয়েছিল, তার আবরণ হল জল, জলের আবরণ তেজ, তেজের আবরণ বায়ু এবং বায়ু আকাশে আবৃত। এইভাবে আকাশ ভূতাদিতে আবৃত, ভূতাদি মহতে এবং মহান অব্যক্তে আবৃত বলে পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। এরপর এতে ঋষিগণ নদী ও পর্বত সমূহের প্রাদুর্ভাব বর্ণিত হয়েছে। তারপর সমস্ত মন্বন্তর ও কল্পের বর্ণনা এবং ব্রহ্মক্ষত্র ও ব্রহ্মজন্মের কীর্তন করা হয়েছে।

তারপর বিবৃত করা হয়েছে কল্পসমূহের বৎসর বিভাগ, জগতের স্থাপন, হরির শয়ন, পৃথিবীর উদ্ধার, বর্ণাশ্রম বিভাগ অনুসারে নগরাদির সন্নিবেশ, বৃক্ষ ও গৃহস্থিত সিদ্ধদের বিনাশ, যোজন পরিমিত পথের বহু বিস্তৃত সঞ্চার, স্বর্গস্থানের বিভাজন, মর্ত্যলোকের ভূবিচরণশীল জীব, ওষধি, লতাদির কীর্তন এবং মর্ত্য লোকের অধিবাসীদের বৃক্ষ ও নারকীয় কীটত্ব প্রাপ্তির বর্ণনা করা হয়েছে। দেবতা ও ঋষিদের দুই প্রকার পথের নির্দেশ, অঙ্গাদি তনু প্রভৃতির সৃষ্টি ও ত্যাগ, এইসব কথাও পুরাণে কীর্তিত হয়েছে।

সব শাস্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মা প্রথমে পুরাণ কথা ধারণ করেন। তার পর তার মুখগহ্বর থেকে বেদ, বেদাঙ্গ, ধর্মশাস্ত্র ও ব্রত নিয়মাদি নিঃসৃত হয়।

পুরাণে বর্ণিত হয়েছে পশু ও পুরুষনিচয়ের উদ্ভব ও বিনাশ কল্প পরিগ্রহ, ব্রহ্মা কর্তৃক নয়টি মানস সৃষ্টি, অতঃপর আরও তিনটি মানস সৃষ্টি, তার লোক-কল্পনা, তার অবয়ব সমূহ থেকে ধর্মাদির সমুদ্ভব প্রভৃতি কল্পারম্ভে বারবার দ্বাদশ প্রজা সৃষ্টির কথা, দুইটি কল্পের মধ্যবর্তী সময় ও তার প্রতি সন্ধি, তমোগুণের আবরণবশত ব্রহ্মা থেকে অধর্মের উদ্ভব, সেই ভাবে শতরূপার জন্ম, তারপর নিষ্পাপ, প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, প্রসূতি এবং আকৃতি—যাঁদের ওপর লোক প্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে। প্রজাপতি রুচির সংসর্গে আকৃতিতে মিথুন-উদ্ভব, প্রসূতির গর্ভে দক্ষের কন্যাদের জন্ম, অতঃপর শ্রদ্ধা প্রভৃতি দক্ষকন্যাদের গর্ভে মহাত্মাদের উৎপত্তি, সাত্বিক ধর্মের সুখপ্রদ সৃষ্টি—এসবের কীর্তন করা হয়েছে।

এছাড়াও অধর্মের সংসর্গে হিংসাতে অশুভ লক্ষণ, তামস সৃষ্টি, মহেশ্বর ও সতীর মিলনে প্রজা সৃষ্টি—এই দুটি বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। সেগুলি হল—মুক্তিকাক্ষী দ্বিজদের কাছে যোগনিধির যোগের বিষয়ে বলা, রুদ্রের প্রাদুর্ভাব, মহাভাগ্য ত্রিবৈদ্য কথা, এবং ব্রহ্মা ও নারায়ণের প্রকীর্তিত স্তোত্র। কথিত আছে, ব্রহ্মা ও নারায়ণের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবেশ ভগবান মহাত্মা

ব্রহ্মার অঙ্গে আবির্ভূত হন। কিন্তু মহামনা রোদন করছিলেন বলে তিনি রুদ্র' নামে পরিচিত হন। স্বয়ম্ভু যেভাবে রুদ্র প্রভৃতি আটটি নাম লাভ করেছিলেন আর সেই আটটি নামের দ্বারা যেভাবে চরাচরে পরিব্যপ্ত হয়েছিলেন, সেই সব বর্ণনাও এই গ্রন্থে আছে।

কীর্তিত হয়েছে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিদের প্রজাসৃষ্টি বর্ণনা, ব্রহ্মজ্ঞানী বশিষ্টের গোত্রবর্ণন, অগ্নির থেকে স্বাহাগর্ভে প্রজা সৃষ্টি প্রভৃতি। এরপরে পিতৃবংশ প্রসঙ্গক্রমে মহেশ্বর ও স্বধা থেকে দ্বিবিধ পিতৃগণের উদ্ভব, সতীর জন্য দক্ষের প্রতি ধীসম্পন্ন ভৃগু প্রভৃতির অভিশাপ, রুদ্রের উদ্দেশ্যে অদ্ভুতকর্ম দক্ষের অভিশাপ, দোষদর্শনে বৈরিতা রোধ, বৈরপ্রতিষেধ এসবও কীর্তিত হয়েছে। এছাড়াও মন্বন্তর প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। কালজ্ঞান, প্রজাপতি কদমের কন্যার গর্ভে প্রিয়ব্রতের পুত্রদের আগমন, ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও দ্বীপাদিতে তাদের বাসনিয়োগ, তার স্বয়ম্ভুব সৃষ্টির অনুকীর্তন, মহাত্মা নাভি ও রজের সৃষ্টি, দ্বীপ সমুদ্র পর্বত সৃষ্টি প্রভৃতি। বর্ষ ও নদী ও তার সর্বপ্রকার বিভাজন, সহস্রবিধ দ্বীপ ভেদের মধ্যে সপ্ত প্রকার অন্তর্ভেদ, মণ্ডল ক্রমে জম্বুদ্বীপ ও সমুদ্রের বিস্তার, যোজন অনুসারে পর্বত বিভাজন এসবও কীর্তিত হয়েছে। এখানে হিমবান, হেমকূট, নিষধ, মেরু, নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান–এই ধরনের কয়েকটি বর্ষ পর্বতের বর্ণনা আছে। এঁদের মধ্যে যাঁরা বিষ্কম্ভ, উচ্ছায়, আয়াম, বিস্তার এবং যোজনাগ্রে বাস করে থাকেন তাদের বিবরণও আছে। বিবরণ আছে নদী, পর্বত, ভূত, গতিশীল ধ্রুব প্রভৃতির সাথে উপনিবিষ্ট ভারতাদি বর্ষ, সপ্ত সমুদ্র পরিবৃত জম্বু প্রভৃতি দ্বীপ, জলমগ্ন দ্বীপ, লোকালোক প্রভৃতি বিষয়গুলিরও। অন্ত-অভ্যন্তরবর্তী এইসব লোক, সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, প্রাকৃত আবরণসহ ভূরাদি লোক, তার পাশাপাশি সকলের একদেশিক পরিমাণ এবং ব্যাস পরিমাণ–এসবের কথাও বলা হয়েছে।

সূর্য, চন্দ্র, সমগ্র পৃথিবী, অত্যুন্নত পর্বত সমূহের যোজন প্রমাণ মানসশিখরের পুণ্য মহেন্দ্রাদি আবার এদেরও ওপরে অলাতচক্রতুল্য গতি, নাগবীথি অজবীথির লক্ষণ দুটি কাটা ও দুটি লেখা, মণ্ডল, যোজনা, লোকালোক, সন্ধ্যা, বিষয়ানুসারে দিন, ঊর্ধ্বস্থিত ও চতুর্দিকস্থিত লোকপাল, পিতৃলোক, দেবলোক, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের রজঃ ও সত্ত্বগুণাশ্রয় বশতঃ যথাক্রমে দক্ষিণপথ ও উত্তরপথে প্রাপ্তি, ধর্মাদি দ্বারা অবীষ্ঠিত বিষ্ণুপদ, ধ্রুব সামর্থ্যবলে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও জ্যোতিষ্ক পদার্থের সঞ্চার এবং তদনুসারে প্রজাদের শুভাশুভ, প্রয়োজন, বংশে স্বয়ং ব্রহ্মার নির্মিত সৌররথ–যার সাহায্যে স্বয়ং ভগবান স্বর্গে গমন করেন, আর যে রথে অধিষ্ঠান করেন দেবগণ, আদিত্যগণ ও ঋষিগণ–এসব কিছুর বর্ণনাও আছে।

এই একইভাবে একটি জলরথের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে ওই রথে থাকেন গন্ধর্ব, অপ্সরা, গ্রামণি, সর্প ও রাক্ষস। সূর্য হল চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ, এমন কথাও বলা হয়েছে। সূর্যাদির স্যন্দন সমূহের ধ্রুব থেকে কীর্তন প্রসঙ্গেও আলোচনা আছে। আর আছে সেই শিশুমারের কথা, যার পুচ্ছে ধ্রুবের অবস্থান, গ্রহগণ সহ তারা-রূপী নক্ষত্ররাজি, পুণ্যকর্মা দেবগণের যেখানে নিবাস।

সূর্যের সহস্র রশ্মিতে বর্ষা, শীত ও উষ্ণের প্রস্রবণ, নাম ও অর্থভেদে রশ্মিসমূহের প্রবিভাগ এবং সূর্যের আশ্রয়ে গ্রহদের পরিমাণ ও গতিও ব্যক্ত হয়েছে।

বিষের প্রভাবে অচিরে মহাদেবের নীলত্ব প্রাপ্তি, ব্রহ্মা কর্তৃক প্রসাদিত শূলপানিশম্ভুর বিষাদ। দেবগণের দ্বারা স্তুিত হয়ে বিষ্ণু যেভাবে দেব মহেশ্বরের স্তব করেছিলেন, যার পুণ্য প্রভাবে সর্বপাপনাশী লিঙ্গের উৎপত্তি ঘটেছিল, সেই পুণ্যকথাও এখানে কীর্তিত হয়েছে।

বিশ্বরূপ থেকে যেভাবে প্রধানের অপূর্ব পরিমাণ ঘটে, ইলার পুত্র পরুরবার মাহাত্ম্য বর্ণন, দুই প্রকার পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহান অনুগ্রহ বিবৃত হয়েছে। যুগসংখ্যা ও কৃতযুগের প্রমাণ অপকর্ষ হেতু ত্রেতা যুগে বার্তা প্রবর্তন ধর্মানুসারে বর্ণ ও আশ্রমের সংস্থান, যজ্ঞ প্রবর্তনা, বসুর সাথে ঋষিদের কথোপকথন, বসুর পুনর্বার অধোগতি–এসবও কীর্তিত হয়েছে। স্বয়ম্ভ মনু সম্পর্কিত প্রশ্ন ভিন্ন অন্যান্য প্রশ্নের নিকৃষ্টতা, যাবতীয় যুগাবস্থা, দ্বাপর ও কলিযুগের বর্ণনাও আছে।

তবে যুগে যুগে দেব, তির্যক ও মনুষ্য প্রভৃতির প্রমাণ যুগ সামর্থ্য অনুসারে। নিণীত হয়েছে আয়ুর দীর্ঘতা ও উন্নতি, শিষ্ট ব্যক্তিদের আবির্ভাব, বেদ ও বেদজাত মন্ত্ররাজির কীর্তন, বেদব্যাস কথিত বেদের শাখা সমূহের পরিমাণ সমস্ত মন্বন্তরের সংহার এবং সংহার অন্তে আবার তাদের আবির্ভাব, দেবতা, ঋষি, মনু ও পিতৃগণের উদ্ভব এসব বিস্তারিতভাবে সাধ্যাতীত বলে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষ যে মন্বন্তরের সংখ্যা ও লক্ষণ নির্দেশ করেছে সকল মন্বন্তরের সেই লক্ষণ বর্তমানের সাথে অতীত ও অনাগত মন্বন্তরের লক্ষণ কীর্তন, মন্বন্তর সমূহের প্রতিপূরক লক্ষণ এবং স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরের অতীত ও অনাগত মন্বন্তরের লক্ষণও বর্ণিত হয়েছে। মন্বন্তরক্রম কালজ্ঞান মন্বন্তরগুলিতে দেবগণ প্রজাধিপতিদের কীর্তন, ধীমান দক্ষের দ্বারা দৌহিত্র অর্থাৎ দক্ষের প্রিয় দুহিতার সন্ততিগণ এবং যাদের জনক ব্রহ্মাদি তাদের এবং মরুবাসী সাবন্যাদি মনুদের কীর্তনও এতে আছে।

উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবের প্রজাসৃষ্টি বর্ণন, বেনুপুত্র পৃথুর ভূমিদোহন প্রবর্তন, পাত্র দুগ্ধ ও বৎসগণের বর্ণনা, পুর্বে ব্রহ্মাদিরা যেভাবে এই বসুন্ধরাকে দোহন করেছিলেন তার বিবরণ আছে। আছে দশ প্রচেতা থেকে চন্দ্রের অংশে ধীমান প্রজাপতি দক্ষের জন্মবর্ণনা, মহেন্দ্রদের ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমানকালীন শক্তিকীর্তন। যেভাবে মনু প্রমুখরা বহুবিধ আখ্যানে পরিবৃত হবেন সে বিষয়ে কীর্তনও আছে। বৈবস্বত মনুর সৃষ্টিবিস্তার, যজ্ঞে ব্রহ্মশত্রু থেকে বারুণী মূর্তি ধরে মহাদেবের আবির্ভাব, ভৃগু প্রভৃতির উৎপত্তির কীর্ত্তন করা হয়েছে।

চাক্ষুষ মনুর শুভ প্রজা সৃষ্টি শেষ হলে বৈবস্বত মনুর সময়ে দক্ষ ধ্যান করে প্রজাসৃষ্টি করেছিলেন। ব্রহ্মার প্রিয় পুত্র প্রিয়সংবাদী নারদ সেই সব মহাবল দক্ষপুত্রকে অভিশাপ দিয়ে নষ্ট করে দিয়েছিলেন। এরপর দক্ষ বারণীর গর্ভে বিখ্যাত একাধিক কন্যা সৃষ্টি করেছিলেন, এসব কিছুর বর্ণনাই আছে।

ধীমান কাশ্যপের ধর্মসৃষ্টি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের একত্ব, পৃথকত্ব ও বিশেষত্ব কীর্তিত হয়েছে। ঈশ্বর অর্থাৎ সব বিষয়ে সামর্থ্য থাকায় স্বায়ম্ভব কর্তৃক সপ্তদেবতার সৃষ্টি, মরুৎদের প্রতি দেবতাদের অনুগ্রহ, দেবতাদের অংশে দিতির সন্তানদের উদ্ভব, পিতৃগণের বাক্য অনুসারে এদের দেবত্ব এবং বায়ুস্কন্ধে আশ্রয় আবার দৈত্য দানব গন্ধর্ব, সর্প, রাক্ষস, সমস্ত ভূত-পিশাচ, পশুপক্ষী, লতা এবং অপ্সরাদের বহু বিস্তৃত উৎপত্তি বর্ণনা করা হয়েছে। সমুদ্রের সাথে সংযোগের ফলে কেমন করে ঐরাবত হস্তীর জন্ম হল, সেকথাও বলা হয়েছে। গরুড়ের উৎপত্তি ও অভিষেক, ভৃগু, অঙ্গিরাগণ, কশ্যপ, পুলস্ত্য, মহাত্মা, অত্রি, পরাশর মুনি প্রমুখের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তারপরেও দেবতা ও ঋষিদের প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও কীর্তিত হয়েছে সেই তিন কন্যার কথা যাঁদের ওপরে লোকসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে। বর্ণিত আছে পিতৃদৌহিত্রে নির্দেশ এবং দেবতাদের জন্মকথা। এই পুরাণে কীর্তিত হয়েছে ভগবান পঞ্চ-এর সুমাহাত্ম্য, আদিত্যের বিস্তারিত বিবরণ, বিকুক্ষি চরিত্র, ধুন্ধুবিনাশ, ইক্ষবাকু প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত চরিত্র কীর্তন, নিমি থেকে জহ্নুগণ পর্যন্ত ক্ষিতিপতিদের বিবরণ। এছাড়া ভূপতি যযাতি, চরিত, যদু বংশ নির্দেশ, হৈহয় এবং ক্রোট রাজবংশের বর্ণনা, বিষ্ণুর দিব্যকথা, ধীমান বিবস্বানের মনিরথ, পুনর্জন্ম ও জীবনী, কংসের উৎপত্তি ও তার দৌরাত্ম্য, বসুদেব থেকে দেবকী গর্ভে প্রজাপতি বিষ্ণুর জন্ম থেকে শুরু করে বিষ্ণুর অভিশাপ লাভ সবই বিস্তারিত ভাবে কীর্তিত হয়েছে।

দৈত্যদের কাছ থেকে ভৃগু কীভাবে শত্রুজননীকে উদ্ধার করেছিলেন, দেব-অসুর কী প্রকারে দ্বাদশযুতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, সব কথাই এখানে বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া নরসিংহ প্রভৃতি প্রাণনাশক অবতার, ঘোর তপস্যার দ্বারা শক্রের মহাদেব আরাধনা, বর পাওয়ার লোভে শক্র কর্তৃক মহাদেবের স্তবকীর্তন, দেব-অসুরদের ক্রিয়াকলাপ, এ সবেরও বর্ণনা আছে।

বলা হয়ে থাকে মহাত্মা শত্রু যখন জয়ন্তীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন তখন বুদ্ধিমান বৃহস্পতি শক্রের রূপ ধারণ করে অসুরদের মোহিত করে তাদের বশীভূত করেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে মহাদ্যুতি শত্রু তাকে অভিশাপ দেন। এই সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণও পুরাণে আছে। তারপর বিষ্ণুর মহাত্ম্য, বিষ্ণুর জন্মদি, শক্রের দৌহিত্র, দেবযানী যদুর পুত্র তুর্যস, আবার অনু, দ্রুহ্য, পুরু, যযাতি তনয়ের রাজকাজ এবং তাদের বংশে যেসব মহাপ্রাণ দীর্ঘ যশস্বী প্রচুর অর্থ তেজে তেজস্বী, শ্রেষ্ঠ তাঁদের কথা, এমনকি সেই শ্রেষ্ঠ রাজা বিপ্রঋষি কুশিকের সম্যক ধর্মাচরণ যার দ্বারা তিনি সুরভি বৃহস্পতির শাপ অপমোদন করেছিলেন সে-সবের বিবরণও আছে এই গ্রন্থে।

এই পুরাণে সন্নিবেশিত হয়েছে জহ্নুবংশের কীর্তন,শান্তনুর বীরত্ব,ভবিষ্যৎ রাজাদের বর্ণনা, অনাগত সপ্ত মনুর বর্ণনা, কলিযুগ অন্তে সকল সৃষ্টির সংহার প্রভৃতি। এরপর পরার্ধ ও পরের লক্ষণ, ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের যোজন অনুসারে পরিমাণ নির্দেশ,সকল প্রাণীর নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক এই ত্রিবিযী প্রতি-সঞ্চার ভাস্কর থেকে অনাবৃষ্টি, ঘোর সম্বর্তক অগ্নি, মেঘ, একার্ণব, বায়ু, রাত্রি মহাত্মাদের ও ব্রহ্মার সংখ্যা এবং লক্ষণ, ভূপ্রকৃতি, সপ্তলোক প্রভৃতি ভীষণভাবে উপবর্ণিত হয়েছে।

এই গ্রন্থে আরও কীর্তিত হয়েছে বিভিন্ন পাপের জন্য নির্দিষ্ট রৌরবাদি নরক, ব্রহ্মলোকের ওপরে যে উত্তম শিবলোকের অধিষ্ঠান, যেখানে সমস্ত প্রাণী বিনাশের পর সংহার লাভ করে সেই সমস্ত প্রাণীর পরিমাণ নির্ণয়, ব্রহ্মার প্রতিটি সৃষ্টি ও বিনাশের বর্ণনা, অষ্ট প্রাণের অষ্ট রূপ বর্ণনা, ধর্ম ও অধর্মের আশ্রয়ে ঊর্ধ্বগতি এবং অধোগতি বর্ণনা, কল্পে কল্পে মহাভূতবৃন্দের সংহার, দুঃখের স্বরূপ বর্ণনা, ব্রহ্মার অনিত্যতা, ভোগ প্রবাহের দৌরাত্ম্য ও তার পরিমাণ নির্ণয়। মোক্ষের দুর্লভতা, বৈরাগ্যের ফলে সংসারের দোষ-দর্শন, নানা তত্ত্ব দর্শনের ফলে যে ব্রহ্মানিষ্ট সত্ত্ব পরিশুদ্ধি লাভ করেছে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত পরিহার করে সেই ব্রহ্মানিষ্ট সত্ত্বে অধিষ্ঠান, ত্রিবিধ তাপের অতীত রূপহীন নিরঞ্জন অকুতোভয় ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি।

এই পুরাণ কীর্তিত হয়েছে ব্রহ্মার আগের মতো আবার ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, সর্বাপাপনাশী ঋষিবংশ সম্পর্কিত আলোচনা, পুরাণের উদ্দেশ্যে, নিখিল জগতের প্রলয় বিকার, আর প্রাণীদের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ফল।

এখানে বশিষ্টের প্রাদুর্ভাব, শক্তির জন্ম, বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় সৌদাসের কাছ থেকে তার নিগ্রহ পরাশরের উৎপত্তি, বিভুর অদৃশ্যত্ব পিতৃগণের কন্যার গর্ভে ব্যাসমুনির জন্ম, ধীমান শুঁকের জন্ম, বিশ্বামিত্রের সপুত্র পরাশরের প্রতি দ্বেষ, বিশ্বামিত্রকে হত্যা করার ইচ্ছেয় বশিষ্টের অগ্নি উৎপাদন, বিশ্বামিত্রের মঙ্গল কামনায় সন্তানের জন্য শ্রীমান স্কন্দের তপস্যা প্রভৃতি। এছাড়াও এখানে বর্ণিত হয়েছে ভগবান নিজের বুদ্ধি-বলে এক বেদকে চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন। তার কীভাবে পরবর্তী সময়ে তার শিষ্য এবং প্রশিষ্যরা সেই বেদকে যে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করেছিলেন তার বর্ণনা।

একবার ধর্মাকাঙ্ক্ষী মুনিরা পুণ্যদেশে যাবার অভিলাষী হয়ে উঠলেন। তারা ব্রহ্মার কাছে পবিত্র দেশের নির্দেশ জানতে চাইলেন। ভু ব্রহ্মা ছিলেন সততই মুনিদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি মুনিদের বললেন, এই ধর্মচক্রটি সুনাভ, সত্যঙ্গ, শুভবিক্রম এবং অনুপম। তোমরা আগ্রহী হয়ে ধর্মচক্রের অনুবর্তন কর। তাহলে তোমাদের অভীষ্ট অবশ্যই সিদ্ধ হবে। যেতে যেতে যেখানে গিয়ে এই ধর্মচক্রটির নেমি বিলীন হয়ে যাবে, নিশ্চিত জানবে সেই দেশই পুণ্যদেশ। তোমরা সানন্দে সেখানে অধিষ্ঠান করতে পার। বিভু ব্রহ্মা এই কথা বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মুনিরা যাত্রা শুরু করলেন। গঙ্গাগর্ভের কাছে নৈমিষারণ্যে এসে তারা একটি সত্র যজ্ঞের আয়োজন করলেন। যজ্ঞ চলাকালীন তাদের মধ্যে শরদ্বান নামে এক ঋষির মৃত্যু হল। ঋষিরা নিজ নিজ পুণ্য তেজে তাকে আবার জীবিত করে তুললেন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিরা পরম শ্রদ্ধাভরে ঋষি শরদ্বানকে এই সমগ্র সীমাহীন পৃথিবীর অধীশ্বর রূপে ঘোষণা করলেন। যথাবিধি ও যথাশাস্ত্র অনুসারে তার অতিথি সৎকার করলেন। রাজা অতিথি-সকারে প্রীত হতে দেখে ক্রুর স্বভাব রাহু অন্তরাল থেকেই তাকে হরণ করলেন। মুনিরা দেখতে পেলেন, ঐ নৃপ গন্ধর্বদেব সাথে কলাপ গ্রামে বাস করছেন। মহাত্মা ঋষিরা রাজাকে পুনরায় যজ্ঞস্থলে নিয়ে এলেন। কিন্তু নৈমিষারণ্যবাসী মুনিদের দ্বাদশবর্ষব্যাপী সত্রযজ্ঞে সমস্ত যজ্ঞীয় বস্তুকে সুবর্ণময় দেখে ঐ রাজা তাদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়লেন। ফলস্বরূপ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। ইতিমধ্যে, অরণ্যপ্রান্তে রাজার পুত্র আব্দুর জন্ম হল। তাকে যজ্ঞস্থলে নিয়ে আসা হল। মহাত্মা মুনিরা তাঁর উপাসনা শুরু করলেন।

সূত বললেন, হে দ্বিজবরগণ, ঘটনাক্রম সমস্ত কিছুই আমি আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করলাম। লোকতত্ত্ব ব্রহ্মা যেমন পুরাকালে পরমশ্রেষ্ঠ ঋষিদের কাছে প্রাচীনকালের উত্তম জ্ঞানযোগের কথা বলেছিলেন কিংবা ব্রহ্মবাদী বায়ু ব্রাহ্মণদের কাছে তার অনুগ্রহ দেখাবার জন্য রুদ্রাবতার পাশুপতযোগ বিভিন্ন পুণ্য স্থানের বিবরণ, মহাদেবের লিঙ্গোদ্ভব ও তাঁর নীলকণ্ঠত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি বর্ণনা করেছিলেন, আমিও তেমনি আনুপূর্বিক সবকিছু আপনাদের কাছে বিবৃত করছি।

এই পুরাণ কথা যদি উত্তমরূপে ও বিশদভাবে শ্রবণ, কীর্তন বা ধারণ করা যায় তবে ধন, মান প্রতিপত্তি, দীর্ঘ আয়ু বা আয়ু বৃদ্ধি, পাপনাশী পুণ্যলাভ করা যায়।

এই রকম ক্রম অনুসারেই এই পুরাণ কীর্তিত হয়ে থাকে। পুরাণের বিষয়গুলি যদি সংক্ষেপে জানা থাকে, তবে বিশাল হলেও অনায়াসেই এর অর্থ উপলব্ধি করা যাবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে সংক্ষেপে বলে পরে বিশদে এর বিস্তৃত কীর্তন করা হয়। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি এর আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেন তাঁর সমগ্র পুরাণই নিঃসংশয়ে অধ্যায়ন করা হয়ে যায়।

যে ব্রাহ্মণ ছয়টি বেদাঙ্গ ও উপনিষদ সহ চারটি বেদ জানেন অথচ পুরাণ জানেন না, তিনি কখনোই বিচক্ষণ নন। ইতিহাস এবং পুরাণের দ্বারাই বেদজ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটে। বিশেষ করে দেখা গেছে, এই ব্যক্তি আমাকে প্রহার করবে এই বিবেচনায় বেদ অল্পজ্ঞ ব্যক্তি তাকে সর্বদাই ভয় করে থাকেন। এই অন্যায়ের বক্তা সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু সুতরাং যিনি এই অন্যায় অভ্যাস করেন তিনি উপস্থিত সকল আপদ থেকে মুক্ত হন এবং অবশেষে সদগতি লাভ করেন। এটি অতি পুরাতন এবং সমস্ত শাস্ত্রের পূরক। এই কারণেই একে পুরাণ বলা হয়। পুরাণের এই ব্যুৎপত্তি যিনি জানেন তিনি সর্বপাপ মুক্ত হন। মনে রাখতে হবে নারায়ণ এই নিখিল বিশ্বব্যাপ্ত করে বিরাজ করছেন। আবার সেই জগৎস্রষ্টারও স্রষ্টা হলেন দেব মহেশ্বর। তিনি সৃষ্টিকালে সব কিছু সৃষ্টি করেন এবং প্রলয়ে সব কিছু পুনরায় গ্রহণ করে থাকেন।

০২.

সেই নৈমিষারণ্য তপোবনবাসী ঋষিরা সূতের কাছে জানতে চাইলেন, সেই অদ্ভুতকর্মা মহাত্মা ঋষিদের সত্রযজ্ঞ কোথায় হয়েছিল? যজ্ঞ সম্পূর্ণ হতে কতদিন সময় লেগেছিল? আর কিভাবেই বা তা অনুষ্ঠিত হল? তারা আরও জানতে চাইলেন, আর বায়ুই বা কীভাবে তাদের কাছে পুরাণ কথা বলেছিলেন? বৎস সূত, আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে, তুমি আমাদের কাছে সবকিছু বিস্তারিত ভাবে বল।

ঋষিবর্গের এই আন্তরিক আগ্রহ দেখে সূত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শুভ ভাষণে বললেন, হে বীরবৃন্দ, সেই নৈমিষারাণ্যবাসী ঋষিরা যে স্থানে সেই উত্তম সত্রযজ্ঞটির অনুষ্ঠান করেছিলেন, ঐ পবিত্র যজ্ঞটি যতকাল চলেছিল এবং যেভাবে চলেছিল সবই আপনাদের সমীপে আনুপূর্বিক বিবৃত করছি। আপনারা মন দিয়ে শুনুন।

পুরাকালে যে স্থলে বিশ্বসৃষ্টির কামনায় বহু বৎসর ধরে বিশ্বস্রষ্টারা পুণ্য সযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, যে স্থলে ইলার পত্নীত্ব ও স্বামীত্ব লাভ হয়েছিল, যে স্থলে বুদ্ধিমান মহাতেজা যমসত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন, ভ্রমণরত ধর্মচক্রের নেমি বিশীর্ণ সেই স্থানটি সর্বমুনিপূজিত নৈমিষ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

এই স্থলের মহিমা শেষ হবার নয়। এই স্থলের ওপর দিয়েই সিদ্ধচরণসেবিকা পুণ্য গোমতী প্রবাহিত হয়েছে। রোহিণী, এখানেই মহাত্মা বশিষ্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র সৌমাকৃতি শকত্রি-কে প্রসব করেছিলেন। এখানেই অরুন্ধতীর গর্ভ থেকে বশিষ্টের মহাতেজস্বী একশত পুত্রের জন্ম হয়েছিল। এখানে দাঁড়িয়েই বশিষ্ট তনয় শকত্রি রাজা কল্মষপাদকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। এখানেই বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্টের চরম বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এখানেই অদৃশ্যন্তীর গর্ভে পরাশর মুনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর জন্মের ফলে বশিষ্টের পরাভব অপগত হয়েছিল। হে ঋষিবৃন্দ, পুরাকালে সেই অঞ্চলটি ব্রহ্মবাদী 'নৈমিষেয়' নামে পরিচিত লাভ করেন। ঐ স্থানে সেই সকল ধীমান ঋষিদের যজ্ঞ দ্বাদশ বর্ষ ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ঐ সময় প্রবল পরাক্রান্ত রাজা পুরুরবা বসুন্ধরা শাসন করেছিলেন। তার ধনতৃষ্ণা ছিল অত্যন্ত বেশি। তিনি অষ্টাদশ দ্বীপ ভোগ করেও ধনরত্নের প্রতি লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। এই লোভবশত তিনি বিন্দুমাত্র পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। অবশেষে দেবহুতি দ্বারা প্রেরিত হয়ে উর্বশী তাঁকে পতিত্বে বরণ করেন। এইভাবেই তাকেই ধনলিপ্সার কবল থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা করা হয়। পুরুরবা উর্বশীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সাথে মিলিত হলেন। সাময়িকভাবে তাঁর

লক্ষ্য পরিবর্তিত হল। বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করে পুরুরবা একটি সত্রযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন।

কথিত আছে, পাবকের সংসর্গে গঙ্গা সেই মহাবলশালী দীপ্ততেজা পুরুরবাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। এই গর্ভ পর্বতে ন্যস্ত হয়ে সুবর্ণ আকার লাভ করে। পরবর্তীকালে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিরা যখন তাঁরই শাসনকালে সযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তখন স্বয়ং বিশ্বকর্মা ও বৃহস্পতি ঐ সুবর্ণের দ্বারা অমিততেজা হয়ে মহাত্মা ঋষিদের যজ্ঞস্থল সুবর্ণময় করে তুলেছিলেন।

রাজা পুরুরবা এই বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল না। একদিন রাজা পুরুরবা মৃগয়ার উদ্দেশ্য ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি সেই যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। অতি আশ্চর্য, সেই হিরন্ময় যজ্ঞভূমি দেখে তাঁর মধ্যে লোভের প্রাবল্য দেখা দিল। তিনি লোভ বশত হতবুদ্ধি হয়ে তৎক্ষণাৎ সেই সুবর্ণ গ্রহণে উদ্যত হলেন। তার এহেন আচরণ দেখে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিরা তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। পুরুরবার পাপবৃত্ত এই কাজে সম্পূর্ণ হল। তখন রাত্রিশেষে এক দৈববাণী হল। সেই দৈববাণীর অনুপ্রেরণায় সেই মহাত্মা মুনিরা কুশময় বজের দ্বারা রাজন পুরুরবাকে প্রহার করলেন, সেই প্রহারে এখানে উর্বশীর পুত্র আয়ুর জন্ম হয়। নিষ্পেষিত হয়ে পুরুরবা হতোদ্যম হয়ে যান।

মহীপতি আয়ু তপোবনবাসী মুনিদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে উত্তমভাবে ধর্ম আচরণ করতে লাগলেন। এই ব্রহ্মবাদী ঋষিরা তাঁর প্রতি প্রীত হন। তাঁরা পুরুরবার প্রিয় পুত্র নর আয়ুকে রাজপদে স্থাপন করে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় যথাবিধি যজ্ঞ আরম্ভ করলেন।

সেইসব মহাত্মা অদ্ভুতকর্মা ঋষিদের সত্রযজ্ঞটি বিশ্বসৃষ্টিতে ইচ্ছুক বিশ্বস্রষ্টাদের অনুরূপ বিস্ময়কর হয়ে উঠেছিল। ঐ যজ্ঞস্থল মহৎ ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে ধন্য হয়ে উঠল। সেই যজ্ঞস্থলে অগ্নি প্রভাবিশিষ্ট মুনিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরা ও সিদ্ধগণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রিয়সম বৈমানিকগণ, বালখিল্যগণ, মরীচিগণ, উত্তগগণ এবং চারণগণ। নানাবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যসম্ভারে এ যজ্ঞস্থল ইন্দ্রিপুরীর মতো শোভা পেতে লাগল।

এরপর যজ্ঞকারী মুনিরা আরাধনায় ইচ্ছুক হয়ে সত্রযজ্ঞের দ্বারা দেবগণকে, পিতৃকর্মের দ্বারা পিতৃগণকে এবং অন্যান্য ক্রিয়ার দ্বারা গন্ধর্ব প্রভৃতিকে যথাবিধি জাতিভেদ অনুসারে আপ্যায়িত করলেন। ঐ যজ্ঞভূমির কোথাও হতে লাগল গন্ধর্বদের সামগান, কোথাও অপ্সরাদের নৃত্য, কোথাও মুনিঋষিদের বিচিত্র অক্ষরপদযুক্ত শুভ বচন অথবা মন্ত্রাদিতত্ত্ব ও

বিদ্বানদের পারস্পরিক বিচার। কোথাও দেখা গেল সাংখ্য, ন্যায় প্রভৃতি দর্শনতত্ত্বজ্ঞ বিদ্বানগণ বিতণ্ডাবাদের দ্বারা তাদের প্রতিবাদীদের আঘাত করছেন। সেখানে ব্রহ্ম রাক্ষসগণ, যজ্ঞঘাতী দৈত্যগণ অথবা যজ্ঞোপহারী অসুরগণ–কেউই কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারল না। কোনোপ্রকার দুরভিসন্ধি, প্রায়শ্চিত্ত সেখানে জন্মাতে পারল না। মহর্ষিদের শক্তি, প্রজ্ঞা ও ক্রিয়াযোগে সেই যজ্ঞবিধি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হয়েছিল।

এইভাবে ভৃগু প্রভৃতি মনীষী ঋষিগণ দ্বাদশবর্ষ পর্যন্ত ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন। এরই সাথে সাথে জ্যোতিষ্টোম যোগসমূহও পৃথক পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হল।

এই যজ্ঞে অংশগ্রহণকারী যাজ্ঞিকগণ প্রত্যেকে অযুত পরিমাণ দক্ষিণা লাভ করলেন।

হে দ্বিজগণ, যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ায় আপনারা যেমন আমাকে বংশকীর্তনের জন্য নির্দেশ দিলেন, সেই রকম ভাবে সেই ব্রহ্মবাদী ঋষিরাও অমিতাত্মা বায়ুকে বংশ বর্ণনার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রফুল্ল চিত্ত বায়ু তখন পুরাণ বিষয়ক সমধুর বাক্য দ্বারা মুনিদের আহ্লাদিত করতে লাগলেন। সেই বায়ুদেবতা অসীম গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন স্বায়ম্ভবের শিষ্য।

তিনি ছিলেন বশেন্দ্রিয় সর্বপ্রত্যক্ষদর্শী। অষ্ট ঐশ্বর্যে ভূষিত। তিনি ধর্ম দ্বারা তির্যগযোনি প্রভৃতি নিখিল বিশ্ব পালন করতেন। তার সপ্তস্কন্দাদি জগৎ নিয়ত প্লাবিত হত। তার সপ্তগণ নিয়ত বিষয়সমূহে অবস্থান করত। তার বৃত্তি হল প্রাণ অপ্রাণ প্রভৃতি। তিনি ইন্দ্রিয়দের বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত করে দেহীদের ধারণ করে থাকেন। তার আকাশ হল যোনি। তিনি শব্দ ও স্পর্শগুণমুক্ত। মনীষীরা তাঁকে 'তৈজস প্রকৃতি' বলেও আখ্যা দিয়ে থাকেন। তিনিই হলেন অত্যন্ত ক্রিয়াত্মক সর্বশাস্ত্র পারদর্শী অভিমানী ভগবান বায়ু।

.

০৩.

সূত বলতে লাগলেন, সৃষ্টিসংহারকর্তা মহেশ্বরকে প্রণাম জানাই। তিনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ ও অনলের মত তেজস্বী। তার বুদ্ধি ও প্রভাব অপরিমিত। তাকে প্রণাম জানানো অবশ্য কর্তব্য। লোকনমস্কৃত প্রজাপতিগণ, স্বয়ম্ভু রুদ্র প্রভৃতি মহেশ্বরগণ, ভৃগু, মরীচি, পরমেষ্ঠী, মনু, রজঃ ও তমোগুণ যুক্ত কশ্যাপ, বশিষ্ট, দক্ষ, অত্রি, পুলস্ত্য, কদম, রুচি প্রজাবৃদ্ধির জন্য যাদের ওপর কার্য শাসনভার অর্পিত হয়েছে সেইসব বিশ্রুত চতুর্দশ মনু ছাড়া অন্যান্য বৈধক্রিয়া সম্পন্ন মুনিদের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে কলিপাপনাশীনী প্রজাপতির অতি উত্তম সৃষ্টিকথা কীর্তন করব।

এই সৃষ্টিকথা শুভ ও অতুলনীয়। এটি দেবর্ষি ও সুরেন্দ্রদের বিবরণে অলংকৃত। যাঁদের বাক্য, বুদ্ধি, শরীর ও তেজ বিশুদ্ধ, সেইসব প্রদীপ্ত প্রভার তপস্বী প্রজাপতি ও ঋষিদের কাছে এই সৃষ্টিতত্ত্ব অত্যন্ত প্রিয়। এই সৃষ্টিকথা ব্রহ্মার দিনের মতোই আদিকালিক। শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিষয়টি দৃষ্টান্তমূলক ভাবে প্রসারলাভ করেছে। বায়ু প্রকৃতিতে এই সৃষ্টিকথাটি সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ত সমাসবন্ধে বিশিষ্ট শব্দবিন্যাসে চিত্তাহর্ষক। এতে আছে সৃষ্টিকারী ঈশ্বরের প্রথম ও প্রধান প্রবৃত্তি। ব্রহ্মা, প্রধান প্রকৃতি, প্রসূতি আত্মা, গুহা, যোনি, চক্ষু, ক্ষেত্র, অমৃত, অক্ষর, শুক্র, তপঃস সত্ত্ব–এইসব নামের দ্বারা অপ্রমের আদি কারণের স্মরণে হয়ে থাকে। সৃষ্টিকালে লোক পিতামহ স্বয়ম্ভু পুরুষের সাথে ঐ অপ্রমেয় পুরুষ সংযুক্ত হয়ে থাকেন। ঐ অপ্রমেয় পুরুষ এবং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা স্বরূপগতভাবে অভিন্ন হলেও সৃষ্টিকালে পৃথক রূপ প্রকাশ পায়। উৎপাদকত্ব, রজোগুণের বাহুল্য, কালযোগ ও নিয়মাবধিত্ব হেতু মহেশ্বরের সংকল্পমাত্রই অষ্ট প্রকৃতি যা যা প্রসব করেছিল, তা লোকসমূহের বৃদ্ধির কারণ। প্রকৃতির ক্ষেত্রযুক্ত নিয়ত বিকারভূত দেবতা, অসুর, পর্বত, বৃক্ষ, সাগর, মনু, প্রজা, রাজা- ঋষি, পিতৃগণ, দ্বিজ, পিশাচ, যক্ষ, নাগ, রাক্ষস, তারা, গ্রহ, সূর্য, ভল্লুক, নিশাচর, বানর, মাস, ঋতু, বৎসর, রাত্রি, দিন, দিক, কাল, যুগ, বনৌষধি, লতা, জলচর, অপ্সরা, পশু, বিদ্যুৎ, নদী, মেঘ ও আকাশব্যাপী এই যে সৃষ্টি–তার মধ্যে যা কিছু সূক্ষ্ম, যা কিছু স্থাবর পদার্থ দেখা যায়, তারা প্রত্যেকে গতি সম্পন্ন, পরস্পর বিভক্ত। এছাড়া এই সৃষ্টি প্রকরণে ছন্দঃ ঋক্, যজুঃ, সাম প্রভৃতি বেদ, সোমযাগ, জীবসমূহের জীবিকা, প্রজাপতি দেবতার অভীষ্ট বস্তু আর বৈবস্বত মনুর আবির্ভাব আছে। দ্বাপর যুগে বেদব্যাস যেভাবে বেদবিভাগ করেছিলেন, সে সবই এখানে ক্রমিকভাবে নিবদ্ধ হয়েছে।

যেমন সর্বলোকপূজিত পুণ্যকারী ব্যক্তিদের সৃষ্টি, দেবেন্দ্র, দেবর্ষি, মনু, প্রভৃতি দ্বারা পরিপূরিত ও বিভূষিত ত্রিলোক, রুদ্রের অভিশাপে মনুষ্যলোকে দক্ষের পৃথিবীতে বাস, দক্ষ কর্তৃক মহাদেবের প্রতি অভিশাপ লাভ, মন্বন্তরের পরিবর্তন, প্রতি যুগে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি কল্পনা, যুগ অনুসারে ঋষিদের ঋষিত্ব বৃদ্ধি প্রভৃতি। আবার কল্পের সংখ্যা, ব্রহ্মার দিনের সংখ্যা, অন্তজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, জরায়ুজ জীবসমূহ, স্বর্গনিবাসী ধর্মাত্মা, যাতনাস্থানগত জীবসমূহ ও তর্কানুসারে তাদের প্রমাণ। অত্যন্তিক, প্রাকৃতিক ও নৈমিত্তিক সৃষ্টিকারণ, বিশেষ করে বন্ধ মোক্ষ পরম সংসারগতি প্রকৃতির অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন কারণের মধ্যে যে স্থিতি ও পুনঃপ্রবৃত্তি আছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ধীর ও বুদ্ধিমান ঋষিরা তাদের বুদ্ধিবলে যথাযথ শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করে যত্নসহকারে উপরোক্ত বিবিধ বিষয় নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হে বিপ্রগণ, আমি তদনুরূপ সবকিছু আপনাদের সামনে বিবৃত করছি। আপনারা শুনুন।

.

০৪.

সূতভাষ্যে এইসব বিষয়ে জানতে পেরে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ আকুল নয়নে সূতের দিকে তাকালেন। তারা সূতকে অনুরোধ করে বললেন, তুমি সূতবংশীয়। তুমি ব্যাসদেবের কাছ থেকে সবকিছুই প্রত্যক্ষভাবে জেনেছ। এক্ষণে তুমি নিখিল ভুবনের লোকচরিত্র বর্ণনা কর। আমরা জানতে ইচ্ছা করি, কোন্ কোন্ ঋষি কোন্ কোন্ বংশের ধারক। জানতে ইচ্ছা করি, প্রজাপতি ব্রহ্মা কীভাবে তার পূর্বতন ঋষিদের সৃষ্টি করেছিলেন। তুমি বিস্তৃতভাবে এসব বিষয়ে বল।

সাধুশ্রেষ্ঠ রোমহর্ষণকে তারা বারবার এইরূপে অনুরোধ করতে থাকায় তিনি আনুপূর্বিক বিস্তারিতভাবে সব ঘটনা বর্ণনা করতে লাগলেন।

আপনাদের জিজ্ঞাসিত যে পুরাণের কথা আমি বলব তা দিব্য, সুললিত, পাপনাশক, বিচিত্র, অনেকার্থক ও শ্রুতিসম্মত। যিনি এই পুরাণকথা চিন্তা করেন, বারবার শোনেন, আর বিশেষ করে যিনি স্বয়ং শুচিযুক্ত আত্মাতে তীর্থক্ষেত্র পর্বের দিনগুলোতে বিপ্র, যতি প্রভৃতিকে শুনিয়ে থাকেন–তিনি পুরাণের কীর্তনের ফলে দীর্ঘ আয়ু লাভ করেন এবং নিজের বংশের প্রতিপালন শেষ হয়ে গেলে স্বর্গলোকে পূজিত হয়ে থাকেন। এখন আমি ঠিক যেমনটি শুনেছি তেমন শব্দ প্রয়োগ করে বিস্তারিতভাবে স্থিরকীর্তি সমস্ত পূর্ণর্বান ব্যক্তিদের চরিত্র কীর্তন করব। তাঁদের সেই কীর্তিত চরিত্র সমস্ত শত্রুনাশক, স্বর্গের হেতু, সকলের কীর্তি-যশ-আয়ুবর্ধক। আপনারা মনোযোগ সহকারে আমার মুখনিঃসৃত কথকতা শ্রবণ করুন।

পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ। যথা–সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত। এই পঞ্চ লক্ষণযুক্ত কল্পকাল থেকেও পবিত্র, বেদসম্মত হল ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। আমি তাই কীর্তন করব। ইতিপূর্বে সৃষ্টি, প্রলয়, স্থিতি, উৎপত্তি এবং প্রক্রিয়া নামে প্রথম পাদ ক্রিয়াবস্তু পরিগ্রহ, ধর্মর্জনক, যশ ও আয়ুবর্ধক ও পাপানাশক অনুষঙ্গ, উপপাদাঘাত ও উপসংহার নামে চারটি পাদ সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। এখন তাই আবার ক্রম অনুসারে বিস্তারিতভাবে বলব। যিনি অজ, আদিভুত, প্রজাদের আত্মস্বরূপ এবং যিনি লোকনিয়া সেই হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর-পুরুষ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে প্রণাম জানিয়ে মহৎ থেকে শুরু করে বিশেষ পর্যন্ত সবিকায় সলক্ষণ পঞ্চভৌতিক দেহ ও ভূত সৃষ্টির বিষয়ে সংশয়বিহীন হয়ে বলছি।

প্রধান প্রকৃতি, শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-রূপ অজাত, ধ্রুব, অক্ষয়, নিত্য, আত্মস্থিত, জগৎযোনি মহভূত, পর, ব্রহ্মা, সনাতন, সর্বভূতবিগ্রহ, অব্যক্ত, অনাদি, অনন্ত, অজ, সূক্ষ্ম, ত্রিগুণ, প্রভব, অব্যয়, আসম্প্রত, অবিজ্ঞেয় ও ব্রহ্মারও পূর্বে বর্তমান। এইভাবে তত্ত্ববিদগণ সদসদাত্মক নিত্য অব্যক্ত কারণকেই নানাভাবে অভিহিত করে থাকেন। একদা এর দ্বারাই তমোময় নিখিল বিশ্ব পরিব্যপ্ত ছিল। তারপর এই তমোময় বিশ্বে গুণসাম্যে উপস্থিত হল, ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত প্রধানের সৃষ্টিকাল এল। তখনই সর্বপ্রথম তিন গুণের তারতম্য হেতু 'হেতু' তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটল। এই মহৎ তত্ত্ব সূক্ষ্ম এবং মহান অব্যক্ত দ্বারা সমাদৃত। সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত এই মহৎ তত্ত্বকে সত্ত্বগুণ প্রকাশন মন বলেও বিবেচনা করা যেতে পারে। এই মনকে 'করণ'ও বলা হয়। ক্ষেত্রজ্ঞা অধিষ্ঠিত লিঙ্গমাত্র মহৎ তত্ত্ব থেকে লোকতত্ত্বার্থের হেতু ভূত ধর্মাদির উৎপত্তি হয়। এই সময় সৃষ্টি করবার ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়ে মহৎ তত্ত্বের সৃষ্টিকাজ শুরু হল। মনে রাখবেন, এই মহৎ তত্ত্বই মন, মতি, ব্রহ্মা, পুর, বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, চিতি, স্মৃতি, সংবিৎ বিপুর এই সব নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

প্রধানত দুটি কারণে 'বিভু'কে 'মন' বলে অভিহিত করা হয়। এটি সমস্ত প্রাণীর চেষ্টার ফল অনুভব করে এবং এটি বৃহৎ বস্তুগুলোর সূক্ষ্মরূপ।

সমস্ত তত্ত্বের অগ্রজাত অবশিষ্ট সমস্ত গুণ অপেক্ষা পরিমাণে 'মহৎ' এই কারণে তার নাম বলা হল মহান। পরিমাণ ধারণ, বিভাগ জ্ঞান এবং ভোগ সম্বন্ধ হেতু পুরুষের অনুমান–এই তিনটি কারণে তিনি 'মতি' নামেও খ্যাত। বৃহত্ত্ব ও বৃংহনত্ত্ব গুণে তিনি অনুগ্রহ করে সমস্ত দেহের পরিপোষণ করে থাকেন, তাই তার নাম 'ব্রহ্মা'। আবার অনুগ্রহ করে তিনি সমস্ত তত্ত্বভাবকে পূরণ করেন, তাই তিনি 'পুর' নামেও অভিহিত হয়ে থাকেন।

পুরুষ যাতে প্রতিরুদ্ধ হয় এবং যিনি যাবতীয় হিত-অহিত ও সমগ্র ভাববস্তুকে বোধিত করেন তার নাম 'বুদ্ধি'। ভোগ জ্ঞাননিষ্ঠ হওয়ায় যাঁর খ্যাতি ও প্রত্যুপভোগের প্রবর্তন ঘটে, কিংবা যাঁর গুণ ও নামাদি বিশেষ বিখ্যাত, সেই মহানই 'খ্যাতি' নামে পরিচিত হন।

অন্যদিকে সাক্ষাত্তাবে সবকিছু জানেন, তাই তিনি ঈশ্বর। গ্রহরা তার থেকে উদ্ভব হয়েছে তাই তিনি 'প্রজ্ঞা'। 'জ্ঞানাদি', রূপ, এবং যাগাদি কর্মের ফল তিনি সঞ্চয় করে থাকেন, তাই তিনি 'চিতি'। আবার বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ এবং অনাগত–সবকিছুকেই তিনি স্মরণ রাখেন, তাই তার নাম 'স্মৃতি'। তিনিই 'মাহাত্মা' কারণ তিনি সমস্ত জ্ঞান লাভ করে থাকেন। তিনি

সবকিছুতেই বিদ্যমান এবং সবকিছু তার মধ্যে বিদ্যমান। এই কারণে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সেই মহানকে 'সংবিৎ' আখ্যা দিয়ে থাকেন। তিনি জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানের কাছে তিনি আছেন। তাই তিনি জ্ঞান নামে অভিহিত। আবার দ্বন্দ্ব মাত্রেরই বিপরীতভাব হয়ে থাকে, তাই তাঁর 'বিপুর' নাম।

লোকসমূহের সর্বময় কর্তা হলেন ঈশ্বর। তিনি বৃহৎ, তাই তিনি ব্রহ্মা, এই ভাবেই তিনি ভূতত্ত্ব হেতু 'ভব', ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের 'বিজ্ঞান' এবং একত্ববশত 'ক'। আর যেহেতু তিনি পুরি অর্থাৎ দেহে বাস করেন তাই তিনি পুরুষ। আপ পুরুষ যেহেতু স্বয়ং অনুৎপন্ন সমস্ত পদার্থের পূর্ববর্তী–সেহেতু তিনি 'স্বয়ম্ভু' নামে পরিচিত।

তত্ত্বভাব এবং সদ্ভাব চিন্তাকারীরা এইসব পর্যায়বাচক শব্দদ্বারা সেই আদ্যশ্রেষ্ঠ মহৎ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে থাকেন। সৃষ্টির ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়ে মহান সৃষ্টি করে থাকেন। সংকল্প এবং অধ্যাবসায়–এই দুটি তার বৃত্তি। লোকতত্ত্বার্থের হেতু ভূত-ধর্মাদি তার রূপ। সত্ত্ব, রজঃ, তমো–এই তিনটি তার গুণ। মহত্তত্ত্ব এমনিতেই ত্রিগুণবিশিষ্ট হয়ে থাকে। তবে রজঃগুণের আধিক্যবশত তার থেকে মহৎ পরিবৃত এবং ভূতাদি বিকৃত অহংকারের সৃষ্টি হয়। অহংকারে তমোগুণের আধিক্য থাকে। তমোগুণ-আক্রান্ত ভূতসমূহের আদিকারণ হল ভূত-তন্মাত্র। অহংকার থেকেই তার সৃষ্টি। ভূত-তন্মাত্র থেকে উৎপন্ন হয় শব্দ-তন্মাত্র এবং সচ্ছিদ্র শব্দ লক্ষণ আকাশ। ভূতাদি যখন শব্দ-তন্মাত্রকে আবৃত করে তখন সেই শব্দ তন্মাত্র থেকে জন্মগ্রহণ করে স্পর্শতন্মাত্র ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট বলবান বায়ু। শব্দ তন্মাত্র ও আকাশের আবরণে স্পর্শতন্মাত্র ও তার থেকে উৎপন্ন রূপ তন্মাত্র ও তেজের উৎপত্তি। রূপতন্মাত্রের আবরণে রসতন্মাত্রও জল, রসতন্মত্রের আবরণে গন্ধতন্মাত্র এবং গন্ধগুণসম্পন্ন ক্ষিতির আবির্ভাব ঘটে।

যে যে তন্মাত্র থেকে যে যে ভূতের উৎপত্তি ঘটেছে সেই সব ভূতে সেই সেই তন্মত্রের অংশ থাকায় তাদের তন্মাত্র বলা হয়। ভূততন্মাত্রগুলি পরস্পর থেকে সমুৎপন্ন হওয়ায় প্রত্যেকেই অভিন্ন অথবা অশান্ত। ঘোর ও মূঢ়তাদি গুণবেশে তাদের ভিন্ন বলেও নির্দেশ করা হয়।

বৈকারক অহংকারে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হলে তা থেকে একই সাথে সত্ত্বাগুণবহুল বৈকারিক সৃষ্টি প্রবর্তিত হয়। পাঁচটি বুদ্ধি ইন্দ্রিয় আর পাঁচটি কর্ম ইন্দ্রিয় এই দশটি ইন্দ্রিয় এবং একাদশ মন, এগুলিকে একত্রে বৈকারিক বলে। যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধকে গ্রহণ করে তাদেরকে বুদ্ধিন্দ্রিয় বলে। এগুলি হল–চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক, অন্যদিকে পাদ,

পায়ু, উপস্থ, হস্ত, বাগেন্দ্রিয় এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় যথাক্রমে গতি, ত্যাগ, আনন্দ, শিল্প ও বাক্যালাপের সাধক হওয়ায় এদের কর্মেন্দ্রিয় বলা হয়।

শব্দ মাত্রেই আকাশকে স্পর্শ করে প্রবিষ্ট হয়। তাই বায়ুতেই শব্দ ও স্পর্শ এই দুটি গুণই থাকে। শব্দ ও স্পর্শ এই গুণ রূপতন্মত্রে প্রবেশ করে। তাই তেজঃ তিনটি গুণবিশিষ্ট হয়। এই তিনটি গুণ হল–শব্দ, স্পর্শ ও রূপ।

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ–এই তিনটি গুণ আবার রসতন্মাত্রে প্রবেশ করে। তাই জল শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস চারটি গুণবিশিষ্ট হয়।

এইভাবে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গন্ধতন্মত্রে প্রবেশ করে বলে উপরোক্ত পাঁচটি গুণ পৃথিবীর গুণ বলে অভিহিত হয়। এই কারণেই পঞ্চগুণবিশিষ্ট ক্ষিতি স্থলভূতে দেখা যায়। এই ভূত সমূহ যথাক্রমে শান্ত, ঘোর ও মূঢ় এবং বিশেষরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এরা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে পরস্পরকে ধরে রাখে। লোকালোক ও পাহাড়, পর্বত দ্বারা পরিবৃত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ–সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষগুলি নিয়ত হওয়ায় এরা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। উত্তর-উত্তর ভূতসমূহ পূর্ব-পূর্ব ভুতের সমস্ত গুণ গ্রহণ করে। অবশ্য কোনো অনিপুণ ব্যক্তি অগ্নি ও বায়ুর গন্ধ উপলব্ধি করে সেই গন্ধই পৃথিবীতে অশ্রিত বলে নির্দেশ দেন।

মহৎ থেকে আরম্ভ করে বিশেষ পর্যন্ত এই সাত মহাত্মা মহাবীর্যশালী হলেও সম্পূর্ণভাবে পরস্পর মিলিত না হলে সৃষ্টি করতে সমর্থ হন না। যখন এই মহাত্মারা পরস্পর মিলিত হয়ে পুরুষের অধিষ্ঠান লাভ করেন, তখনই অব্যক্তের অনুগ্রহে এঁরা অণ্ড উৎপন্ন করেন। বিশেষ পদার্থগুলি থেকে জল বুদবুদের মতো একই কালে উৎপন্ন। সেই বৃহৎ অণ্ডটি জলেই অবস্থান করে। এই অণ্ডই তখন ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্যের করণ রূপে সিদ্ধ হয়। এই প্রাকৃত অণ্ডটি যখন বিবুদ্ধ হয়, তখন ক্ষেত্রজ্ঞ ব্রহ্মসংজ্ঞক, ভূতসমূহের আদিকর্তা–সেই হিরণ্যগর্ভ চতুর্মুখ ব্রহ্মা সর্বপ্রথম প্রাদুর্ভাব হন। তিনিই প্রথম শরীরী এবং পুরুষ নামে উক্ত হন।

সুবর্ণময় সুমেরু শৈলই সেই মহাত্মা হিরণ্যগর্ভের গর্ভ। সমুদ্র তার গর্ভোদক এবং পর্বতরা হল জরায়ু। সপ্তদ্বীপ এই পৃথিবী, সপ্ত সমুদ্র, বিশাল শত সহস্র নদী, এই সব চরাচর, বিশ্বজগৎ, চন্দ্র, আদিত্য, নক্ষত্র, গ্রহ, বায়ু, লোক, আলোক–এইসব কিছুই সেই অণ্ডে প্রতিষ্ঠিত। অণ্ডটির বাইরের দিক দশগুণ জলে পরিবেষ্টিত থাকে। জলবেষ্টিত থাকে দশগুণ তেজে, তেজ আবার দশগুণ বায়ুতে, বায়ু দশগুণ আকাশে আবৃত থাকে। আকাশ বেষ্টিত থাকে ভূতবর্গে, আর ভূতগণ মহতে এবং মহান অব্যক্তে পরিবৃত থাকে। মোট সাতটি প্রাকৃত আবরণ দিয়ে অণ্ডটি

আবৃত থাকে। বিকারে সমূহে বিকারের যেমন আধার আধেয়ভাবে হয়ে থাকে, ঠিক তেমনই সৃষ্টিকালে অষ্ট প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে আবৃত করে অবস্থান করে। আর প্রলয়কালে পরস্পর পরস্পরকে গ্রাস করে। এইভাবেই পরস্পরের সাহায্যে উৎপন্ন হয়ে তারা পরস্পরকে ধারণ করে। এই অব্যক্তই ক্ষেত্র নামে পরিচিত। ব্রহ্মাকে বলা হয় ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞের দ্বারা অধিষ্ঠিত এই হল প্রকৃতি সৃষ্টি। এই সৃষ্টি বিদ্যুতের মতো প্রথমে অবুদ্ধিপূর্বক হয়ে থাকে।

হিরণ্যগর্ভের এই জন্ম-বিবরণ যথাযথ বিদিত হলে মানুষ আয়ুষ্মন ও কীর্তিমান হয়। সে ধন এবং পুত্র লাভ করে। আর যাঁর কোনো কামনা নেই এমন শুদ্ধ-আত্মা পুরুষ মুক্তি লাভ করে। পুরাণ শ্রবণের ফলে নিত্য সুখ ও মঙ্গল লাভ হয়।

.

০৫.

রোমহর্ষণ বললেন, যে পুণ্যাত্মা দ্বিজগণ, সৃষ্টিপ্রসঙ্গে আমি যে কালের কথা উল্লেখ করেছি, মনে রাখবেন তা হল পরমেশ্বর দিবারাত্রি। সৃষ্টিকালটি হল তার দিবা এবং প্রলয়কালটি তার রাত্রি। সৃষ্টিকর্তার মধ্যে দিন বা রাত এই ভেদ ধারণা নেই। লোকদের হিতকামনায় যে সকল উপাচার করা হয়ে থাকে, প্রজা, প্রজাপতি, ঋষি, মনু, সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণ, ব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ করেছে এমন জীবগণ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, কর্মেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন–সকলেই পরম ঈশ্বরের দিবাভাগে বিদ্যমান থাকেন। দিনের শেষে প্রলয় হয় এবং রাত্রির শেষে বিশ্বের উৎপত্তি হয়ে থাকে। বিকার বস্তু অর্থাৎ সৃষ্টি বস্তুর সংহার হয়ে গেলে সত্ত্ব আত্মায় লীন হয়ে যায়। প্রকৃতি ও পুরুষ সমধর্মী হয়ে অবস্থান করে। তমঃ এবং সত্ত্বগুণ সমতা লাভ করে।

সৃষ্টির সময়ে তমঃ সত্ত্বগুণ পরস্পর উদ্রিক্ত হয়ে প্রসূত হয়, এই কারণে গুণের সাম্যাবস্থাকে বলা হয় প্রলয় এবং বৈষম্য অবস্থাকে বলে সৃষ্টি। তিলে যেমন তেল, দুধে যেমন ঘি, ঠিক তেমনই তমঃ ও সত্ত্বগুণ অব্যক্তাশ্রিত রজঃগুণ অবস্থিত। মহেশ্বরের সমগ্র প্রলয় রজনী অতিবাহিত হওয়ার পর দিনের কাজ আরম্ভ হয়। প্রকৃতির আবির্ভাব ঘটে। এরপর পরমেশ্বর পরম যোগবলে পুরুষে প্রবেশ করে। তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। ক্ষোভের ফলে রজঃগুণের প্রকাশ ঘটে। বীজে জলসেচের মতো রজঃগুণ প্রবর্তিত হলেই সত্ত্ব ও তমোগুণ বৈষম্যপ্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মাদি অধিষ্ঠিত দেবতা প্রসূত হতে থাকে। যেমন–সত্ত্বাদি গুণগুলি ক্ষুব্ধ হতে থাকলে পরম শাশ্বত সত্য সর্বাত্মা ও শরীরী–এই তিন পরম গুণের আবির্ভাব ঘটে। যেমন–রজঃগুণ থেকে ব্রহ্মা, তমোগুণ থেকে রুদ্র এবং সত্ত্বগুণ থেকে বিষ্ণু উৎপন্ন হন।

রজঃগুণ প্রকাশক ব্রহ্মা সৃষ্টিকাজে, তমোগুণ প্রকাশক রুদ্র সংহার কাজে, এবং সত্ত্বগুণ প্রকাশক বিষ্ণু উদাসীনভাবে অবস্থিত থাকেন। এই তিন দেবতাই তিন বেদ এবং অগ্নি। এঁরা পরস্পর আশ্রিত, পরস্পর অনুগত। পরস্পর মিথুন ও পরস্পর উপজীবি হয়ে পরস্পরকে ধারণ করে অবস্থান করেন। এঁরা ক্ষণকালের জন্যও পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন না। এঁদের কখনও বিয়োগ ঘটে না।

মহেশ্বর শ্রেষ্ঠ দেবতা, বিষ্ণু মহান থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মা রজঃগুণের দ্বারা উদ্রিক্ত হয়ে সৃষ্টিকাজে প্রবৃত্ত হন। পুরুষও যেমন পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, প্রকৃতিও তেমন শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত।

মহেশ্বরের দ্বারা অধিষ্ঠিত এই পুরুষ যখন চারদিক আলোড়িত করে সৃষ্টিকাজে প্রবৃত্ত হয়, তখন নিজের নিজের বিষয়ে দীর্ঘকাল ধরে স্থিত 'মহৎ' প্রভৃতি তার অনুবর্তন করে।

এই গুণবৈষ্যমের ফলেই প্রকৃতি সৃষ্টিকাজে প্রবৃত্ত হয়। সেই ঈশ্বর-অধিষ্ঠিত সদাসদাত্মক প্রকৃতি থেকে, ব্রহ্মা ও বুদ্ধির মিথুনভাবের যুগপৎ আবির্ভাব ঘটে। এই মিথুন থেকেই তমঃ ও অব্যক্তময় ক্ষেত্রজ্ঞের উৎপত্তি ঘটে থাকে। এই ক্ষেত্রজ্ঞের নামই হল ব্রহ্মা।

কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা সিদ্ধ ব্রহ্মা যেমন আগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, ধীমান অব্যক্তও তেমন প্রথমেই তেজের দ্বারা আত্মপ্রকাশ লাভ করেন। অতুলনীয় জ্ঞান ও ঐশ্বর্য, ধর্ম ও বৈরাগ্যের সঙ্গে যুক্ত এই অব্যক্তই প্রথম শরীরী ও প্রথমে কারণ। সেই ঈশ্বরের এই বৈরাগ্যলক্ষণজ্ঞান তা এককথায় তুলনাহীন। ধর্মৈশ্বৈর্যগত অভিমান থেকে ব্রাহ্মীস্থিতি অর্থাৎ ব্রহ্মোস্থিত বুদ্ধির সৃষ্টি হল। মনে মনে যা ইচ্ছা করা হয়েছিল, তা-ই অব্যক্ত থেকে উৎপন্ন হল।

এইভাবে সবকিছু বশীভূত হওয়ায় এবং নিজ গুণাতীত এবং স্বভাবত সুরশ্রেষ্ঠ হওয়ায় চতুর্মুখ দেবতা ব্রহ্মারূপ সৃষ্টি করেন, কাল রূপে সংহার করেন এবং সহস্রমূর্ধা পুরুষরূপে অবস্থান করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রজাপতি ব্রহ্মার তিন অবস্থা ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি, কাল রূপে সংহার এবং পুরুষ রূপে উদাসীনতা।

স্বয়ম্ভু যখন ব্রহ্মারূপে প্রকাশ পান তখন তাঁর মধ্যে সত্ত্বগুণ বিরাজ করে, যখন কাল স্বরূপ হন তখন তার মধ্যে রজঃ ও তমোগুণ বিরাজ করে এবং যখন তিনি পুরুষরূপে প্রকাশিত হন তখন তার মধ্যে পুনরায় সত্ত্বগুণের উন্মোচন ঘটে যায়। এইভাবে স্বয়ম্ভুর মধ্যে তিন গুণ অবস্থান করে। অর্থাৎ তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মা রূপে লোকসৃষ্টি করেন, কাল রূপে সংহার করেন, এবং পুরুষরূপে উদাসীন থাকেন। প্রজাপতি স্বয়ম্ভুর তিন অবস্থা কিন্তু রূপাতীত। অবশ্য পরমাত্মার পূর্বোক্ত তিনটি অবস্থার মধ্যে তিনটি রূপের প্রকাশ ঘটে যায়। যেমন–তিনি যখন ব্রহ্মা, তখন তাঁর পদ্মগর্ভের মতো বর্ণ, তিনি যখন কাল স্বরূপ তখন তার বর্ণ কাজলকৃষ্ণ, এবং যখন তিনি পুরুষ স্বরূপ তখন পুণ্ডরীকাক্ষ রূপ ধারণ করেন।

যোগেশ্বর নিজের লীলা অনুসারে নানা আকৃতি, ক্রিয়ারূপ এবং নাম গ্রহণ করেন, বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করেন এবং সংহার করেন। বিশ্বচরাচরে তিনি তিনভাবে অবস্থান করেন। তাই তিনি ত্রিগুণ। তিনি চারভাগে বিভক্ত, তাই 'চতুকূহ', সর্বদা সব অবস্থাতেই তার প্রাপ্তি ও গ্রহণ ঘটে চলেছে। সব বিষয়েই তিনি বিদ্যমান, তাই তার অপর নাম 'আত্মা'। এইভাবে বিভিন্ন কারণবশত তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়ে থাকেন। যেমন সর্বব্যাপী বলে

তিনি ঋষি’, শরীরের আদি কারণ বলে স্বয়ং, যেহেতু একধারে তিনি স্বামী এবং প্রভু, এবং সবকিছুর মধ্যে তিনি বিষ্ণু। আবার যেহেতু তিনি ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টি ভাগের অধিকারী, তাই তিনি ভগবান। অন্যদিকে তিনি রাগের শাসনকর্তা হওয়ায় ‘রাগ’, প্রকৃতত্বের কারণ হওয়ায় ‘পর’, অবন অর্থাৎ রক্ষাকর্তা হওয়ায় ‘ওম’, সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান হওয়ায় সর্বজ্ঞ। সর্ব পদার্থের উৎপত্তিস্থান হওয়ায় সর্ব, এবং পরসমূহের একমাত্র আশ্রয়স্থল হওয়ায় নারায়ণ’ নামে বিভূষিত হয়ে থাকেন।

এই নারায়ণই নিজেকে তিনভাগে বিভক্ত করে থাকেন। এইভাবে তিনি সংসারের সৃষ্টি, গ্রাস এবং পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এইভাবেই ত্রৈলোেক্যের সৃষ্টি ঘটে। এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম চতুর্মুখ হিরণ্যগর্ভ আবির্ভূত হন। তিনিই আদি। তাই তিনি ‘আদিদেব’ নামে খ্যাত। তার জন্ম নেই, অর্থাৎ তিনি অজাত। তাই তিনি ‘অজ’। তিনি প্রজাদের পালক তাই তিনি প্রজাপতি। তিনি দেবতাদের মধ্যে মহান, তাই ‘মহাদেব’। তিনি সকলের ঈশ্বর বা প্রভু, তাই তাঁকে ‘সর্বেশ’ও বলা হয়ে থাকে। আবার তিনি কারোর বশ্য নন সে কারণে ‘ঈশ্বর। এর বাইরেও তিনি একাধিক নামে মহিমান্বিত হয়ে আছেন। তিনি বৃহৎ হওয়ার ফলে ব্রহ্ম’, অতীত হওয়ার ফলে, ‘ভূত’, ক্ষেত্রকে জানেন বলে ক্ষেত্রজ্ঞ’ এবং সর্বগত বলে ‘বিভু’ রূপেও পরিচিত। যেহেতু তিনি পুরে অর্থাৎ শরীরে বাস করেন, তাই তিনি পুরুষ। তিনি অনুৎপন্ন এবং পূর্বতন হওয়ায় ‘স্বয়ম্ভু’। যজনীয় হওয়ায় ‘যজ্ঞসংক্রান্তদর্শী’। কবি এবং কমনীয়তার আশ্রয় হওয়ায় ‘কমন’। আবার তিনি বর্ণধর্মের পালন করে থাকেন তাই আদিত্য নামক কপিল। অগ্রে জন্মেছেন বলে তিনি ‘অগ্নি’। তার গর্ভেই হিরণ্যের জন্ম আবার তিনি হিরণ্যের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই দুটো কারণে তিনি পুরাণে ‘হিরণ্যগর্ভ’ নামে পরিচিত। শত বৎসর ধরে চেষ্টা করলেও সেই স্বয়ম্ভুর আদিকালের সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

অতএব, ব্রহ্মার কল্পকালের সংখ্যা নিবৃত্তির পরবর্তী কালকেই ‘পর’ নামে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। এই কালের অবশিষ্ট যে কাল, সেই কালের শেষে পুনর্বার ‘পর’ নামক কালের সৃষ্টি হয়। এবং এই কালের যে অবশিষ্ট অংশ, তার মধ্যেই কোটি কোটি সহস্র অর্বুদ ও অযুত সংখ্যক কল্পকাল অতীত হয়ে গেছে।

বর্তমান এই ধরনেরই কল্পকাল চলছে, তার নাম বরাহ কল্প।

হে দ্বিজগণ, আপনারা সাম্প্রতিক ওই কালকেই প্রথম কল্প বলে জানবেন। এই কল্পে স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মনুর চতুর্দশ সংখ্যা পর্যন্ত আবির্ভূত হবেন। এর মধ্যে কতগুলি অতীত, কতগুলি বর্তমান ও কতগুলি ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে।

এই সব মনু প্রভৃতি নরনাথেরা পূর্ণ যুগ সহস্র ধরে তপশ্চারণ ও পুত্র উৎপাদন করে এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে সব দিক থেকে প্রতিপালন করে থাকেন। এঁদের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আমি আপনাদের বলব। একটি মন্বন্তরের বিষয় শুনেই অন্যান্য সমস্ত অতীত ও অনাগত এবং ভবিষ্যৎ কল্পের কথা আপনারা বুঝে নিতে পারবেন।

.

০৬.

সূত শুভ ভাষণে বললেন, অগ্নি থেকে বিপুল সলিলরাশি উৎপন্ন হয়েছিল, এর ফলে স্থাবর জঙ্গল সবকিছুই বিনষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবী একার্ণবে পরিণত হয়। সেসময় সেই সুনীল অর্ণব সলিলে বাকি কাউকেই দেখা যায়নি। এদিকে সেই সময়েই সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, সহস্রশীর্ষ, কনকবর্ণ অতীন্দ্রিয় নারায়ণাখ্য ব্রহ্মা সত্ত্বগুণের উদ্রেক হবার ফলে জেগে ওঠেন। কিন্তু বিশ্বচরাচকে শূন্য জলধিমগ্ন দেখে পুনরায় ঐ সলিল রাশির মধ্যে নিদ্রিত হয়ে পড়লেন।

কেন এই অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মা 'নারায়ণ' নামে খ্যাত হলেন এই বিষয়ে শ্লোকে নির্দেশ আছে। বলা হয়েছে, অপ, পার ও তনু এই তিনটি শব্দ হল সলিলের নামান্তর। এক্ষেত্রে সত্ত্বাগুণাধিকারী ব্রহ্মা নারা অর্থাৎ জলে শয়ন করেন, তাই তার নাম নারায়ণ। এইভাবে তিনি যুগসহস্র পরিমিত রাত্রিকাল নিদ্রামগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করেন। তারপর রাত্রিশেষে আবার সৃষ্টিকাজে প্রবৃত্ত হলেন। খদ্যোত অর্থাৎ জোনাকি বর্ষাকালের রাত্রে ইতস্তত বিচরণ করে, ঠিক সেইরকমভাবে ব্রহ্মাও সেই অগাধ সলিলে বিচরণ করতে থাকলেন। তিনি অনুমানে বুঝতে পারলেন যে, পৃথিবী জলমগ্ন হয়েছে। বিন্দুমাত্র বিমূঢ় না হয়ে তিনি পূর্ব পূর্ব কল্পের মতো পৃথিবীর উদ্ধারকল্পে অন্য একটি রূপ ধারণ করলেন। সেই মহাত্মা পুরুষ চারদিক জলমগ্ন দেখে মনে মনে একটি দিব্যরূপ চিন্তা করতে থাকলেন। এমন একটি দিব্যরূপের তিনি সন্ধান করছিলেন যাতে বিপুল বেগে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে পারবেন। তার স্মরণে এল বরাহের রূপ। আহা, জলকেলিকালে কী সুন্দরই না দেখায়। তিনি বরাহরূপ ধারণ করলেন।

সেই মহাত্মা যে বরাহের রূপ পরিগ্রহণ করলেন– তা ছিল সব প্রাণীরই আক্রমণের অযোগ্য। সে ছিল দশযোজন বিস্তৃত এবং শত যোজন উন্নত, নাম ধর্ম। বরাহটি ছিল বাঙময়। তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ছিল বিশেষত্ব যুক্ত। বরাহটি দেখতে যেমন ছিল মেঘের মতো, গর্জনেও ছিল তার মতোই। বিশাল পর্বতের মতো তার দেবাবয়ব থেকে সুতীক্ষ্ণ দুটি শ্বেতদন্ত বেরিয়ে ছিল। বিদ্যুৎ তথা অগ্নির মতোই। জ্বলন্ত তার চোখের দৃষ্টি। আদিত্যের মতো ছিল তার তেজ। বৃহৎ আকৃতির বরাহটির স্কন্দ ছিল দেখার মতো। যেমন সুবন্ত, তেমনই স্থূল আয়তন। বকটি দেশ ছিল পীনোন্নত। এককথায় বলতে গেলে সুন্দর মসৃণ গাত্র সম্পন্ন বরাহটি ছিল সব দিক দিয়ে শুভ লক্ষণযুক্ত। এই ভাবেই হরি বিশালাকার অমিত বলশালী বরাহরূপ ধারণ করে পৃথিবীকে উদ্ধারের জন্য রসাতলে প্রবেশ করলেন।

সেই মহাতাপস বরাহটির অনিন্দ্য বৈশিষ্ট্যের শেষ ছিল না। তার দংস্ট্রা দুটি ছিল বেদবাদী, বক্ষস্থল যেন যজ্ঞস্থল, মুখমণ্ডল যজ্ঞের চিতা, জিহ্বা যেন যজ্ঞের অগ্নি, রোমরাজি যেন যজ্ঞের দর্ভ, শিরোদেশ যেন ব্রহ্মা-তুল্য। তার চক্ষুদুটিতে দিবা ও রাত্রি যেন পর্যায়ক্রমে বিরাজ করত। তার কর্ণভূষণ কেবলমাত্র বেদাঙ্গর সঙ্গে তুলনীয়। ধৃত ও সুবের সাথে তার নাসিকা দণ্ডের মিল ছিল।

বিশালাকৃতি বরাহটি ছিল ঘোর সত্য ধর্মময়। শ্রীমান ধর্মপরাক্রান্ত ও প্রায়শ্চিত্ত রত। তার গর্জন শুনলে মনে হবে বুঝি উচ্চরবে সামবেদ ধ্বনি গুঞ্জিত হচ্ছে। পশু তার জানুস্থানীয়, হোম হল লিঙ্গ, মহৌষধি অন্তরাত্মা, মন্ত্র তার হৃদয়, ঘৃত সমন্বিত সোম হল শোণিত, বেদ হল স্কন্ধদেশ, হবিগন্ধ হব্যকব্য তার প্রবল বেগ, প্রাবংশ শরীর স্বরূপ, দক্ষিণা হৃদয় স্বরূপ, উপকর্মেষ্টির মতো তার শোভা, প্রবর্গ তাঁর ভূষণ, বিবিধ ছন্দ হল গতিপথ, গুহ্য উপনিষদ হল আসন, ছায়া তার পত্নী ছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি নানা দীক্ষায় দীক্ষিত। দ্যুতিময়, যজ্ঞময় যোগী, মহাকৃতি ও মণিশৃঙ্গের মতো উন্নত হয়ে বিচরণ করেন।

যখন প্রভু যজ্ঞবরাহ হয়ে জলে প্রবেশ করলেন, প্রজাপতি সেই পৃথিবীকে দেখে কাছে এলেন। শীঘ্রই সেই জলরাশিকে সরিয়ে দিলেন। সমুদ্রের জল সমুদ্রে, নদীর জল নদীতে স্থাপন করে জলাচ্ছাদিত পৃথিবীকে দুই দংষ্ট্রায় তুলে ধরলেন। লোকহিতের উদ্দেশ্যে রসাতলে নিমগ্ন পৃথিবীকে এইভাবে পৃথিবীর স্রষ্টা ধরণীধর প্রভু নারায়ণ পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে তার নিজের স্থানে এনে মুক্ত করলেন। দেবতার অপার অনুগ্রহ পৃথিবী সেই অতলান্ত জলরাশির মধ্যে নিমজ্জিত হল না। বরং একটা বিরাট নৌকার মতো ভাসতে লাগল। পৃথিবী উদ্ধার পেল।

এইভাবে কেলবমাত্র পৃথিবীর ভূমিখণ্ড রক্ষা পেল। পদ্মলোচন এবার পৃথিবীর স্থিতি কামনায় পৃথিবীর বিভিন্ন বিভাগে মন দিলেন। পৃথিবীকে সমান করলেন। সমতল পৃথিবীর স্থানে স্থানে পর্বতরাশি সঞ্চিত হল। পূর্বেই ঐসব পর্বত সম্বর্তক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছিল। সেই অগ্নি দ্বারা বিশীর্ণ পর্বতের যেসব স্থানে বায়ুস্পর্শে শীতল ঘনীভূত জলরাশি সংযুক্ত হল, সেইসব স্থান অচল হয়ে রইল। অন্যান্য স্থান থেকে গলিত হয়ে এসে সেই স্থানে সঞ্চিত হল, তাই পর্বতের আর এক নাম হল 'অচল। ইহা শৃঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন পর্বে বা অংশে বিভক্ত থাকে বলে একে পর্বতও বলা হয়। পর্বতের আরেক নাম গিরি। কারণ পর্বতের অন্তঃ প্রদেশ থেকে নিগীর্ণ অর্থাৎ নিঃসৃত হয় নদী। আবার শিলারাশির উচ্চেয় সঞ্চয় থেকে উৎপন্ন বলে শিলোচ্চয় নামেও ডাকা হয়ে থাকে।

ধীরে ধীরেএই বসুন্ধরা, পৃথিবী ও পর্বত–এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত হল। তখন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূর্ব পূর্ব কল্পের মতো তাকে সবসমুদ্রা সপ্তদ্বীপ্তা ও পর্বত শোভিতা করে তুললেন। পৃথিবী বাসযোগ্য হল।

স্বয়ম্ভু ভগবান ব্রহ্মা বিধি প্রজাদের সৃষ্টির কামনায় পূর্ব পূর্ব কল্প অনুসারে সৃষ্টি করে যেতে লাগলেন। প্রথমেই স্রষ্টা ভগবান ভূর্লোক প্রভৃতি চারটি লোকের কল্পনা করলেন। লোককল্পনার পর প্রজা সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টিকাজের প্রাথমিক পর্ব যখন সমাপ্ত হল, তখন তিনি নিশ্চিত মনে অপরাপর সৃষ্টির বিষয়ে ধ্যান করতে লাগলেন।

স্বয়ম্ভু ভগবান যখন ধ্যানমগ্ন, ঠিক সেই সময়ে সেই মহান আত্মা থেকে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তমিস্র ও অন্ধ নামক তমোময় এই পঞ্চ অবিদ্যার আবির্ভাব হল। এগুলিই হল ধ্যানরত অভিমানী দেবতার পাঁচ প্রকার সৃষ্টি। এরা সকলেই কুম্ভাবৃত দ্বীপের মতো বাইরে তমো আবরণে আবৃত ও সংজ্ঞাবিহীন কিন্তু অন্তর্দেশে সংজ্ঞাবিশিষ্ট। এই পঞ্চপ্রকার অবিদ্যা দ্বারা বুদ্ধি ও প্রধান প্রধান ইন্দ্রিয় আবৃত হয়। সে কারণে এরা সংবৃতাত্মক এবং মুখ্য নগ বলে নামাঙ্কিত হয়েছে।

প্রথম সৃষ্টিতেই এই ধরনের অবৈধ বৃষ্টি হতে দেখে ব্রহ্মা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন। কী করে এই ত্রুটি সংশোধন করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করছিলেন, তখন যেসকল প্রাণীর উৎপত্তি হল তার 'তির্যকস্রোতঃ' নামে পরিচিত হল। তির্যক স্রোতঃদের মধ্যে প্রচুর তমোগুণ লক্ষ্য করা যায়। তাই তারা সকলেই অজ্ঞান বহুল জড়কটপহগ্রাহী, অহংকৃত, অহংমনা, অষ্টাবিংশবিধাত্মক, একাদশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট, নবধা উদর সম্পন্ন এবং অষ্টবিধ তারকাদি শক্তি সম্পন্ন। এরা সকলেই প্রকাশশীল এবং বহিরাবৃত। তির্যকভাবে প্রবর্তিত হয় বলেই তির্যকস্রোত নামে পরিচিত।

তির্যকস্রোত রূপ দ্বিতীয় বিশ্ব দর্শন করলেন– প্রভু। অবার ধ্যানস্থ হলেন। এই বার ধ্যানকালে সত্ত্বগুণবহুল তৃতীয় উধ্বস্রোতঃগণ ঊর্ধ্বভাবে প্রবাহিত হল। ঊর্ধ্বদিকে প্রবর্তিত হয় বলে তার ঊর্ধ্বস্রেতঃ নাম। এগুলি সুখবহুল, প্রীতিবহুল, বহিরাবৃত ও অন্তরাবৃত, তাই ঊর্ধ্বস্রোতঃ থেকে উদ্ভূত দেবতাদির বহিঃপ্রকাশ এবং অন্তঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই ঊর্ধ্বশ্রোতঃ পরমাত্মা ব্রহ্মার তৃতীয় সৃষ্টিরূপে পরিগণিত।

এই ঊর্ধ্বস্রোতরূপ দেবতাদের সৃষ্টি করে প্রভুপ্রজা ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রীত হলেন। এবার তিনি হৃষ্টচিত্তে সাধক সৃষ্টির জন্য ধ্যানমগ্ন হলেন।

সেই তৃতীয় সৃষ্টি পরবর্তী অবস্থায় উদ্ভূত সাধকেরা অবাক অর্থাৎ নীচের দিকে প্রবর্তিত হন। তাই এঁরা অবাকস্রোতঃ নামে খ্যাত। অবাকস্রোতরা প্রকাশবহুল। এঁদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় তাই এঁদের জীবন দুঃখবহুল। এইসব সাধক ধরনের মনুষ্যদের বহিঃপ্রকাশ অন্তঃপ্রকাশ দুই-ই আছে। এঁরা অষ্টবিধ তারকাদি লক্ষণে চিহ্নিত। আবার এইসব মনুষ্যরা সিদ্ধাত্মা, এঁরা গন্ধর্বধর্মী। এইভাবে যে তেজের সৃষ্টি হল তা অবাকস্রোতঃ নামে নির্দিষ্ট হল। স্রষ্টা এবার তার পঞ্চম সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করলেন। পঞ্চম সৃষ্টি অনুগ্রহ। এটি বিপর্যয়, শক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি–এই চারভাগে বিভক্ত। এই অনুগ্রহ চতুষ্টয় অতীত ও বর্তমান বিষয়ে তত্ত্বতর জানতে পারে।

পঞ্চম সৃষ্টি সম্পন্ন হতেই সহস্রাক্ষ স্রষ্টা পাঞ্চভৌতিক প্রাণীদের সৃষ্টি করলেন। এটি হল তার ষষ্ঠ সৃষ্টি। বিপরীত ক্রমে অসমর্থ ভূতাদির কথাও বলা হয়েছে। প্রথমে মহৎ-এর সৃষ্টি হয়। মহৎ থেকে দ্বিতীয় সৃষ্টি হিসেবে তন্মাত্র সৃষ্টি হয়। তৃতীয় হল ঐন্দ্রিয়ক বৈকারির সৃষ্টি, বুদ্ধিপূর্বক এই সৃষ্টির নাম প্রাকৃত সৃষ্টি। এরপরেই মুখ্য যে স্থাবর সৃষ্টি তা চতুর্থ সৃষ্টি, পঞ্চম সৃষ্টি হল তির্যক যোনি। ঊর্ধ্বস্রোত দেবতাদের সৃষ্টি। আর অবাকস্রোত সাধকের সৃষ্টি। মানুষদের সৃষ্টি সম্পত সৃষ্টি।

এখানেই শেষ নয়, পঞ্চবিধ সৃষ্টি, বৈকৃত সৃষ্টি, আর ত্রিবিধ সৃষ্টিকে একত্রে প্রাকৃত সৃষ্টি বলা হয়। এছাড়া প্রাকৃত ও বৈকৃত এই উভয় লক্ষণযুক্ত যে কৌমার সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় পরমেশ্বরের নবম সৃষ্টি।

প্রাকৃত তিনটি সৃষ্টি এবং বৈকৃত ছয়টি সৃষ্টি-ব্রহ্মার এই সমুদয় সৃষ্টিই বুদ্ধিপূর্বক।

এবার আমি আপনাদের কাছে অনুগ্রহ সৃষ্টি সম্বন্ধে বিস্তারিত বলছি, শুনুন। পূর্বোক্ত অনুগ্রহ-চতুষ্টয় (বিপর্যয়, শক্তি, সিদ্ধি, তুষ্টি) সর্বভূতেই অবস্থান করে। বিশেষ করে স্থাবরে বিপর্যয়, তির্যক যোনিতে শক্তি, মনুষ্যে সিদ্ধি এবং দেবসমূহে তুষ্টি নামক অনুগ্রহ অবস্থান করে থাকে।

এতক্ষণ এই যে নয়টি (প্রাকৃত ও বৈকৃত্য) সৃষ্টির কথা বলা হল, এদের পরস্পর সৃষ্টিও বহু প্রকারের। ব্রহ্মা প্রথমেই নিজের সমান বিদ্বান মানসপুত্রদের সৃষ্টি করেন। তারা হলেন সনন্দ, সনক ও সনাতন। ব্রহ্মার এই তিনজন মহাতেজা পুত্র বৈবর্ত বিজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্তি লাভ করেন। এঁরা সংবুদ্ধ হন। এই কারণেই এরা প্রজাসৃষ্টি না করেই প্রতিসর্গ লাভ করেন। এরপর ব্রহ্মা যাবতীয় স্থানাভিমানী পদার্থকে পর পর সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি হল অপ (জল), অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দিক, স্বর্গ, দিক সমুদ্র, নদ, পর্বত, বনস্পতি,ওষধি, বৃক্ষ, লতা, কাষ্ঠ,

কলা, মুহূর্ত, সন্ধি, রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর, যুগ প্রভৃতি। এগুলি সবই প্রলয় কাল না আসা পর্যন্ত স্থায়ী হল।

এবার ব্রহ্মা মানুষ সৃষ্টির প্রতি মন দিলেন। মানব সৃষ্টিকালে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বক্ষ থেকে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ থকে বৈশ্য এবং পদতল থেকে শুদ্রের প্রাদুর্ভাব ঘটল। এইভাবে সকল বর্ণই ব্রহ্মার শরীর থেকে উৎপন্ন হল।

পুনরায় অব্যক্ত থেকে শ্রেষ্ঠ দেবতা নারায়ণের জন্ম হল। অব্যক্ত থেকে থেকে অণ্ডেরও উৎপত্তি হল। আবার অণ্ড থেকে ব্রহ্মা জন্মালেন। এবং সেই ব্রহ্মাই স্বয়ং সৃষ্টি করলেন– যাবতীয় লোকসমূহকে। এটাই হল তার প্রথম পাদ। বিস্তারিতভাবে না হলেও এর দ্বারা সংক্ষেপে পুরাণকথা কীর্তিত হল।

.

০৭.

প্রক্রিয়াপদ নামে প্রকীর্তিত এই প্রথম পাদটি শুনে পুরাণ শ্রবণে ইচ্ছুক নৈমিষ অরণ্যবাসী ঋষিবৃন্দ যারপরনাই আনন্দিত হলেন। তাঁদের মধ্যে থেকে কশ্যপ নন্দন সনাতন সূতকে সম্বোধন করে বললেন, হে সূতশ্রেষ্ঠ, স্পষ্ট বুঝতে পারছি পুরাণ ব্যাখ্যায় আপনি অত্যন্ত নিপুণ। আপনি কল্পজ্ঞ। আপনি এবার আমাদের অতীত ও বর্তমান কল্পের প্রতিসন্ধির বিষয়ে অবহিত করুন। আমরা সকলেই এ বিষয়ে অধিক জানতে উৎসুক।

রোমহর্ষণ বা লোমহর্ষণ বললেন, যথা অজ্ঞা ধীরবৃন্দ। অতীত ও বর্তমান কল্পের মাঝখানে যে প্রতিসন্ধি, আমি এখন সে বিষয়ে আপনাদের সবিস্তারে বলব। এই দুই কল্পে যেসব মন্বন্তর ঘটেছে সে বিষয়েও আপনাদের জ্ঞাত করব। উপস্থিত যে কল্পটি চলেছে সেটি বরাহ কল্প। এর আগে সনাতন কল্প অতিবাহিত হয়েছে। এই দুই কল্পের মাঝখানে যে কল্প সেই বিষয়েই বর্ণনা করছি, শুনুন।

পূর্বকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর যে কালে পরবর্তী অন্য একটি কল্পের আরম্ভ হয় তাকেই কল্পের প্রতিসন্ধি বলা হয়ে থাকে। এই প্রতিসন্ধিকালে পূর্বকল্পের সমস্ত ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায় এবং ঐ কল্প মধ্যবর্তী মন্বন্তর যুগ প্রভৃতি সন্ধিগুলিও নষ্ট হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, মন্বন্তর যুগগুলির স্বার্থেই পূর্বকল্পগুলি পরপর প্রবর্তিত হতে থাকে। এই পূর্ববল্পগুলি সম্বন্ধে প্রক্রিয়াপদে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এই পরাধ সংখ্যক কল্পগুলির পরবর্তী কল্পই বর্তমান কল্পের পূর্বকল্প এবং এই বর্তমান কল্পই ভবিষ্যৎ কল্পসমূহের প্রথম কল্প বলে জ্ঞান করতে হবে।

পূর্বোক্ত পরাধসংখ্যক কল্পের পরবর্তী এবং ভবিষ্যৎ কল্পের পূর্ববর্তী যে কাল, তাই হল এক একটি কল্পকালের স্থিতিকাল। তার পরেই সেই সেই কল্পের সংহার ঘটে। সেইমতো যুগ শেষে যখন দাহকাল উপস্থিত হল, তখন বর্তমান কল্পের পূর্ববর্তী যে সনাতন কল্প, সেই কল্প জীর্ণ হয়ে এল; আর মন্বন্তরগুলির সাথে অতীত হয়ে গেল। সেই কল্পের এক এক মন্বন্তরে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা প্রভৃতি অন্তরীক্ষস্থিত (দেবতাদের আবির্ভাব ঘটে)। এইভাবে এক একটি করে চতুর্দশটি মন্বন্তরে অর্থাৎ সমস্ত কল্পে অন্তরীক্ষস্থিত দেবতাদের সংখ্যা ছিল তিনশত কোটি বিরানব্বই হাজার একশত আট। এইভাবে এক একটি কল্পে দেবতারা অন্তরীক্ষবাসী অর্থাৎ বৈমানিক হয়ে থাকেন। সম্প্রতি যে কল্পটি অতীত হয়ে গেল সেই কল্পে দেবতাদের সংখ্যা হল সাতশো আট হাজার।

চতুর্দশ মন্বন্তরে দেবতা, পিতৃগণ, মুনিগণ ও মনুগণ তাদের অনুচরবর্গ ও মনুপত্রবৃন্দ–এঁরা সকলেই স্বর্গের অধিবাসী ছিলেন। সেই সময়ে মন্বন্তরগুলিতে বর্ণাশ্রম ধর্মপূজ্য যেসব স্বর্গবাসী দেবতারা দেবলোকে বিরাজমান ছিলেন, তাঁরা দেহান্দ্রিয়াদির সংযোজক তন্মাত্র প্রভৃতির সাথে মিলিত হলেন। এঁরা ছিলেন বশীভূত স্বভাবের। তাই কল্পান্তকাল উপস্থিত হওয়া মাত্র এঁরা নিজের নিজের বিপর্যয় অনুভব করলেন। তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত সেইসব ত্রৈলোক্যবাসী দেবতারা ঔৎসুক্যপূর্ণ বিষাদে বিমর্ষ হৃদয়ে মর্ত্যলোকে যাবেন বলে স্থির করলেন। এইসব কল্পবাসী ব্রাহ্মণরা ছিলেন তেজোময় শরীরধারী, যোগ্যরূপে বিবেচিত, বিশুদ্ধিবহুল, মানসসিদ্ধিযুক্ত; তবুও তারা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং তাদের ভক্তজনদের সাথে সেইসব চতুর্দশ দেবসংঘ মহলোক ত্যাগ করে শঙ্কাকুচিত্তে জনলোকে যাবেন বলে সংকল্প করলেন।

সেই জনলোক থেকে সর্বাধিক দশবার তারা স্বর্গলোকে যাতায়াত করলেন। অতঃপর দশকল্পকাল তপোলোকে অবস্থান করে আবার সত্যলোকে গেলেন। এইভাবে কল্পলোক নিবাসীর বিভিন্ন লোকের মধ্যে ক্রমিক যাতায়াত করে থাকেন।

এইভাবে পরের পর সহস্র দেবযুগ অতিক্রান্ত হলে দেবতারা স্থায়ীভাবে ব্রহ্মলোকে চলে যান। সেখান থেকে আর তাদের প্রত্যাবর্তন করতে হয় না। ব্রহ্মলোকে অধিষ্ঠানকালে একমাত্র ঐশ্বর্য ব্যতীত রূপ ও বিষয়ে ঐশ্বর্য্যে তারা ব্রহ্মার (ব্রহ্ম) তুল্যই হয়ে থাকেন। এখানে তারা ব্রহ্মানন্দ লাভ করে ব্রহ্মেই মুক্তি লাভ করে থাকেন।

মুক্তিপ্রাপ্ত হবার পর প্রকৃতি নিয়মানুসারে তাদের মনে জাগ্রত ব্যক্তির মতো স্বরূপজ্ঞান হয়ে থাকে। অত্যন্ত অবশ্যম্ভাবী ভাবে তাদের মধ্যে সেইরকম জ্ঞানের বিস্তার ঘটে যায়। ভিন্ন এবং সূক্ষ্ম অবস্থায় তাদের মধ্যেকার সব ভেদাভেদ বিলুপ্ত হয়। তখন তাদের সাথে কার্য এবং করণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। পূর্বে এরা সকলেই ছিলেন নানাতত্ত্বদর্শী ব্রহ্মলোকবাসী। নিজের নিজের ক্ষমতা চলে গেছে জেনেও তখন তারা শুদ্ধাত্মা, সিদ্ধ, নিরঞ্জন ও কারণাতীত হয়ে নিজ নিজ প্রতীতিতে অবস্থান করেন। এঁরা পরম পুরুষরূপে স্থিত হন। প্রকৃতিও আর এঁদের প্রতি নিজেকে প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হয় না। কারণ পুরুষ এই প্রকৃতিকে চিনে ফেলেছে।

পুনঃসৃষ্টির সময়ে এইসব পুরুষদের অবস্থা হয় নির্বাপিত তেজের মতো। এই মুক্ত পুরুষদের আর পুনরুৎপত্তি হয় না। এঁরা আর পথপরিক্রমায় প্রবৃত্ত হন না। এইসব সুমহাত্মাদের ত্রৈলোক্য থেকে ঊর্ধ্বলোকে উত্তরণ ঘটে। কিন্তু যাঁরা মহর্লোক থেকে তাদের সাথে যেতে

পারলেন না, অবশিষ্ট তারাই কল্পান্তরে দেহ ধারণ করে এখানে অবস্থান করেন। সেই সময়ে গন্ধর্ব শুরু করে পিশাচ পর্যন্ত দেবযোনি, ব্রাহ্মণাদি, মানুষ, পশুপক্ষী, স্থাবর, সরীসৃপ–সব এই পৃথিবীতেই বাস করেন।

সূর্যের সহস্ররশ্মিত সপ্তরশ্মিতে পরিণত হয়ে এক একটি সূর্যে পরিণত হয়। এরা একসঙ্গে উদিত হয়ে তিনলোক দাহ করতে থাকে। দাহ করতে থাকে স্থাবর, জঙ্গল, নদী, পর্বত, সবকিছু। এর আগেই ভীষণ অনাবৃষ্টিতে সমস্ত স্থাবর, জঙ্গল শুকিয়ে যাওয়ায় এক্ষণে সূর্যরশ্মিতে তারা নিঃশেষে দগ্ধীভূত হয়।

এরপর পাপ যুগ অতিবাহিত হলেও সেইসব দগ্ধদেহ প্রাণী পাপপুণ্যফলক যোনি থেকে মুক্ত হতে পারে না। তারা সেখানেই নিজ নিজ কর্মানুসারে ফললাভ করে।

যেসব অতি বিশুদ্ধগণ মানসীসিদ্ধিতে অবস্থিত ছিলেন, তাঁরা অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার প্রলয়রজনী অতিবাহিত করে পুনঃসৃষ্টিতে ব্রহ্মার মানসপ্রজা হলেন।

সপ্তসূর্যের দ্বারা ত্রিলোক দগ্ধ হতে লাগল। তারপর পৃথিবী হল বৃষ্টিপ্লাবিত। জীবের বাসস্থান বিশীর্ণ হয়ে গেল। সমুদ্র, মেঘ, জল সহ যতকিছু পার্থিব পদার্থ ছিল সবই জলমগ্ন হয়ে একার্ণব হয়ে গেল। গমনাগমনশীল সেই জলরাশি অর্ণব আখ্যা লাভ করল। ভূমিতল দৃষ্টির অগোচর হল। কোনো বস্তুই সেই জলাবরণে আভাসিত হতে পারে না। তাই জলরাশিকে 'অম্ভ' বলা হয়ে থাকে। আবার পৃথিবীর সব স্থানেই বিস্তৃত হয়ে ছিল বলে বিস্তারার্থক 'তন' ধাতুকে অনুসরণ করে জলের অপর নাম দেওয়া হল 'তনু'। এছাড়া কবিরা শীঘ্র অর্থে 'অরম' নিপাত ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু একার্ণবত্ব অবস্থায় জলের এই শীঘ্রতা দেখা যায় না। তাই সেসময়ে জলকে 'নার' নামে কথিত হয়।

দেখতে দেখতে ব্রহ্মার যুগসহস্র দিনের অবসান ঘটল। জলময়ী প্রলয়রূপিণী রজনী উপস্থিত হল। পৃথিবী দগ্ধকারী আগুন সেই জলে বিনষ্ট হল। বায়ু প্রশান্ত হল। চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। সেই আলোক বিহীন অবস্থায় জগৎ-অধিষ্ঠাতা প্রভু পরমপুরুষ ব্রহ্মা আবার লোকবিভাগ করতে ইচ্ছা করলেন।

সেইসময় সেই এক-সাগরে পৃথিবীর স্থাবর-জঙ্গম যাবতীয় পদার্থ আচ্ছাদিত হয়ে গেল। পরমপুরুষ ব্রহ্মা 'সহস্রাক্ষ' 'সহস্রপাদ', 'সহস্রশীর্ষ', 'সুবর্ণবর্ণ', এবং অতীন্দ্রিয় নারায়ণ' নাম

ধারণ করে সেই সলিলে নিদ্রা গেলেন। তারপর তার মধ্যে সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হল। তিনি জাগরিত হলেন। চোখ মেলে দেখলেন বিস্তীর্ণ শূন্যলোক।

প্রসঙ্গত ব্রহ্মার এই ‘নারায়ণ’ নামধারণকে ব্যাখ্যা করার জন্য আরও একটি শ্লোকের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বলা হয়েছে–অপ, নারা ও তনু-জলের এই তিনটি নাম। ব্রহ্মা সেই জলতলে নাভিদেশ পূর্ণ করে অবস্থান করেন, তাই তার নাম নারায়ণ।

এই ‘সহস্রশীর্ষ’, ‘সুমনা’, ‘সহস্রপাদ’, ‘সহস্রচক্ষু’, ‘সহস্রবদন’, ‘সহস্রভুক’, ‘সহস্রবাহু’, ‘প্রথম’, ‘আদিত্যবর্ণ’, ‘ভুবনরক্ষক’, ‘এক’, ‘অপূর্ব’, ‘হিরণ্যগর্ভ’, মহাত্মা পুরুষ ব্রহ্মা, যিনি অন্ধকারের পরপারে অবস্থান করেন, সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা কল্পের আদিতে রজঃগুণে উদ্রিক্ত হয়ে প্রজা সৃষ্টি করলেন। আবার কল্পান্তে তমোগুণে উদ্রিক্ত হয়ে আবার সবকিছু গ্রাস করে ফেললেন।

সমুদ্রে সুপ্ত অবস্থায় নারায়ণাখ্য দেবতা ব্রহ্মা সত্ত্বগুণের উদ্রেকবশত নিজেকে তিনভাগে বিভক্ত করে তিনলোকে অবস্থান করেছিলেন। তিনি সেই তিনটি অংশের এক একটি দ্বারা সৃষ্টি, গ্রাস ও দর্শন করতে থাকেন।’

এই যে চতুর্যগ সহস্রের অবসানে সবকিছু সলিলাবৃত হল, সেই সময় নারায়ণ নামধারী কালরূপী ব্রহ্মা চতুর্বিধ প্রজা গ্রাস করে ব্রাহ্মী রাত্রিতে মহার্ণবে সুপ্ত হয়ে রইলেন। মহর্ষিরা মহলোক থেকে তার যাবতীয় কর্মাবলী নিরীক্ষণ করে গেলেন। এইসব মহর্ষিরা বর্তমান কল্পের ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিদের মতোই ছিলেন। তাঁদের মহর্ষি বলা হত। কারণ, ঋ’ ধাতুর অর্থ গমন। এঁরা প্রথমেই গত হন অর্থাৎ নিবৃতি লাভ করেন তাই তাঁদের ঋষি আখ্যা দেওয়া হয়। এঁরা যেহেতু সেইসব ঋষিদের মধ্যে মহান, তাই এঁরা মহর্ষি।

অতীত কল্পে সত্য প্রভৃতি মহর্ষি ছিলেন। তাঁরা মহর্লোক অবস্থানকালে কালরূপী দেবতাকে সুপ্ত অবস্থায় দেখেন। এইভাবে সহস্র সহস্র ব্রহ্মরাত্রি অতিবাহিত হল। প্রত্যেক রাত্রির অবসানেই ঐ সকল মহর্ষিরা সুপ্ত কালরাজী দেবতাকে একই তীক্ষ্ণতায় নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

সর্বভূতের প্রচেষ্টায় ব্যক্ত-অব্যক্ত মহাদেব ব্রহ্মকল্পের প্রারম্ভে চোদ্দোটি সংস্থার বহুবিধ কল্পনা করেছিলেন। তাই সৃষ্টিকালের নাম দেওয়া হয়েছে ‘কল্প। বর্তমান ও অতীত কল্পের মধ্যস্থিত প্রতিসন্ধি এবং পূর্ববস্থা সংক্ষিপ্তাকারে এতক্ষণ ধরে আপনাদের কাছে কীর্তন করলাম। এবার বর্তমান কল্পের বিষয়ে বর্ণনা করব।

.

০৮.

সূত রোমহর্ষণ বললেন, সহস্রযুগ পরিমিত প্রলয়রূপী রাত্রিকাল অতিক্রান্ত হল। রাত্রি অতীত হলে প্রজাপতি অভিমানী ব্রহ্মা বর্তমান কল্পের প্রথম সৃষ্টির প্রয়োজনে ব্রহ্মত্বের অবতারণা করলেন।

তখন সবদিক অন্ধকারে আবৃত। দূর দূর পর্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাদি কোনোপ্রকার পার্থিব বস্তুর অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। প্রাণীকুল অবিভক্তভাবে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তখন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বায়ুরূপ ধারণ করে সেই বিস্তীর্ণ জলরাশির ওপর বর্ষাকালের খদ্যোত বা জোনাকির মতো বিচরণ করতে লাগলেন। এইভাবে বিচরণ করতে করতে তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টির পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপায় অন্বেষণ করতে লাগলেন। অনন্ত জলরাশির মধ্যে পৃথিবী অন্তর্নিহিত হয়ে আছে–এই বাক্যকে সার সত্য বলে ধারণা করে তিনি পুনরায় সৃষ্টিকাজে নিয়োজিত হলেন। নিশ্চিত মনে পূর্ব পূর্ব কল্পের মতো এবারেও তিনি পৃথিবী উদ্ধারের জন্য অন্য রূপ ধারণ করে জলে প্রবেশ করলেন। সমুদ্রের জল সমুদ্রে এবং নদীর জল নদীতে বিন্যস্ত করলেন। এইভাবে তিনি জলে আবৃত পৃথিবীকে উদ্ধার করলেন।

জলবিন্যাসের পর তিনি পৃথিবীতে গিরিচয়ন করলেন। পূর্ব পূর্ব কল্পের যে সমস্ত পর্বত সম্বর্তক অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছিল, বায়ুরূপী ব্রহ্মা সেই সমস্ত পর্বতকে শীতল জলময় সমুদ্রে সঞ্চিত করলেন। পর্বতগুলো সেই সেই স্থানে অচল হয়ে যায়। এইভাবে শুষ্ক হয়ে অচলভাবে অবস্থান করেছিল বলেই পর্বতের একটি নাম অচল। আগেই উল্লেখ করেছি এগুলি পর্ব অর্থাৎ ভাগের দ্বারা বিভক্ত বলে ‘পর্বত’, জলরাশি দ্বারা উদগীর্ণ বা প্রকাশিত বলে ‘গিরি’ এবং সঞ্চিত হয়েছে বলে ‘শিলোচ্চয়’ নামেও কথিত হয়।

প্রজাপতি জলমধ্য থেকে নিমজ্জিত ক্ষিতিকে উদ্ধার করে স্বস্থানে স্থাপিত করলেন। সপ্তবর্ষ এবং সপ্তদ্বীপ রূপে বিভক্ত করলেন, এতেও ভূমিভাগে সমতা ফিরল না। তখন অসম স্থানগুলিকে সমান করে অসংখ্য শিল দ্বারা অগনিত পর্বত নির্মাণ করলেন। সপ্তদ্বীপ মধ্যে সপ্তবর্ষ, সপ্তবর্ষের মধ্যে চল্লিশ প্রকার ভাগ, বর্ষান্ত স্থায়ী পর্বতমালা–এরা স্বভাববশেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। অন্য উপায়ে নয় এদের মধ্যে আবার সপ্তদ্বীপ ও সমুদ্র বৈশিষ্ট্যের টানেই সন্নিবিষ্ট হয়ে পরস্পরকে আবৃত রেখেছিল। অন্যান্য সৃষ্টির পূর্বেই এইসব পদার্থের আধার স্বরূপ ভূর্লোক প্রভৃতি চারটি লোক এবং গ্রহগণের সাথে চন্দ্র এবং সূর্যকে নির্মাণ করলেন। উদাহরণ হিসেবে

এই কল্পের পূর্বে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা জল, অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, দিক সমুদ্র, নদী, পর্বত, ওষধি, বৃক্ষলতাদির আত্মা, লব, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত, সন্ধি, রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ, স্থানাভিমানী এবং স্থান প্রভৃতি পৃথক পৃথক পার্থিব দ্রব্যসম্ভার সৃষ্টি করে যুগসৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা নির্মাণ করেছিলেন।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি–এই চারটি যুগ আছে। কল্পারম্ভে প্রজাপতি প্রথমেই সত্যযুগের প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। পূর্বে যেসকল প্রজার বিষয়ে বলা হয়েছে, তারাও সত্যযুগের প্রজা। ঐ সত্য যুগে যাঁরা তপোলোকে না যেতে পেরে জনলোকেই অবস্থান করেছিলেন, তারাই সম্বর্তক অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে বীজের জন্য আবার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এইভাবে সৃষ্টির কারণে বীজের প্রয়োজনে তারা সেখানেই অবস্থান করেন। তারপর তাঁরা সন্তান অর্থাৎ বংশ বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হন। দেববৃন্দ, পিতৃগণ, ঋষি এবং মনুগণ এই মর্ত্যলোকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের সাধকরূপে অভিহিত হয়ে থাকেন। তারপর তারা তপস্যায় নিমগ্ন হন। তপস্যার উপযুক্ত স্থান পূরণ করেন। তাঁরা ব্রহ্মার মানস পুত্র, তারা সিদ্ধাত্মা।

অপরদিকে যে সমস্ত প্রজা দ্বেষমুক্ত কর্মের দ্বারা স্বর্গে গেছেন, তারা যুগে যুগে জন্ম লাভ করে ফিরে আসেন। নিজের নিজের কর্মফল অনুসারে খ্যাত হয়ে থাকেন। একটি জগৎ থেকে অন্য জগতে লোকের জন্ম হয়। তা প্রধানত কর্মাশয়ের বন্ধনবশত। কর্মের সংস্কারকেই জন্মান্তরের কারণরূপে গণ্য করা হয়। শুভ-অশুভ সেইসব কর্মানুসারে লোকেরা এক জগৎ থেকে অন্য জগতে জন্ম লাভ করেন। দেবতা থেকে স্থাবর পর্যন্ত নানাবিধ শরীর পরিগ্রহ করেন। তারা সৃষ্টির পূর্বে যে যে প্রকার কর্ম সম্পাদন করেছিলেন, বারবার জন্ম লাভ করে, সেই সেই কর্মেরই ফলভোগ করেন। হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, কুর, ধর্ম, অধর্ম, সত্য, অসত্য–এই সমস্ত সংস্কার অনুসারে জন্মলাভের পর জীবেরা ঐ সমস্ত কর্মের প্রতিই আকৃষ্ট হয়। পূর্ব পূর্ব অতীত কল্পে লোকদের যেসব নাম রূপ নির্দিষ্ট লক্ষ্য করা গেছে, পরবর্তী কল্পে তাঁরা সেইসব নাম রূপই পরিগ্রহ করেন।

সৃষ্টির নেশায় আচ্ছন্ন ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ম যখন স্তব্ধ হয়ে এল, তখন তিনি আবার নতুন করে প্রজাসৃষ্টির কথা ভাবতে লাগলেন। সেই সত্যধানী দেবতার মুখমণ্ডল থেকে আবির্ভূত সত্য গুণ–উদ্রিক্ত পবিত্র আত্মা সহস্র মিথুন, বক্ষস্থল থেকে রজঃগুণসম্পন্ন তেজস্বী সহস্র মিথুন, উরুদেশ থেকে রজঃ ও তমোগুণ–উদ্রিক্ত চেষ্টাশীল সহস্র মিথুন এবং পদযুগল থেকে তমোগুণ সম্পন্ন হীনশ্রী অল্পতেজা সহস্র মিথুন।

এইসব মিথুন প্রাণীরা উৎপন্ন হওয়া মাত্র পরস্পর হৃষ্টচিত্তে মৈথুনে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এই কল্পে সেই বিশেষ সময় মিথুনোৎপত্তি উক্তিটির প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু সেই সময় রমণী দেহে মাসে মাসে ঋতু হবার নিয়মনীতি ছিল না। তাই মৈথুন করা সত্ত্বেও তাদের সন্তান উৎপত্তি হল না। তখন জীবনের শেষভাগে একবারই মাত্র তাদের মিথুন-প্রসব হত। এই জন্যই কুটক ও কুবিক মুমূর্য অবস্থায় জন্ম লাভ করেছিল। এই সংস্কার আজও বজায় আছে। সেই থেকেই বর্তমান কল্পে মিথুনের উৎপত্তি হয়ে আসছে।

এরপর ব্রহ্মা মনে মনে ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। ধ্যানারম্ভ তাদের প্রত্যেকে শব্দাদি পঞ্চলক্ষণ সহ প্রাদুর্ভূত হল। সুমনাঃ প্রজাপতি মনে যাদের সৃষ্টি করেছিলেন বর্তমান কালের প্রজারা তাদেরই বংশে সম্ভূত হল এঁদের দ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

সত্য যুগে উৎপন্ন এইসব প্রজারা যথেচ্ছভাবে এই পৃথিবীর নদী, সরোবর, সমুদ্র ও পর্বত ভোগ করলেন। গ্রহণ করলেন– পৃথিবীর রসে উদ্ভূত রসাহার এবং অতঃপর সেই সকল নাতিশীতোষ্ণশালী মানস প্রজারা সিদ্ধিলাভ করলেন। বৈশিষ্ট্যগত ভাবে এইসব প্রজারা ছিলেন নির্বিশেষ অর্থাৎ তাদের নিজস্ব কোনো বিভিন্নতা ছিল না। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন সমান আয় সম্পন্ন, সমান সুখ ও সমান রূপ বিশিষ্ট। এই সত্যযুগে তাদের জন্য কোনোপ্রকার ধর্ম-অধর্ম নির্দিষ্ট ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা যা খুশি তাই করবার স্বাধীনতাও পেতেন না। তারা নিজ নিজ অধিকারে যুক্ত থাকতেই বেশি স্বচ্ছন্দ ছিলেন।

দৈববর্ষ পরিমাণে চার হাজার বছর হল প্রথম সত্যযুগের অবস্থিতি কাল। আর তার সন্ধিকাল হল দৈববর্ষ পরিমাণে চারশো বছর।

এই যুগের নাতিশীতোষ্ণশালী প্রজাদের মধ্যে কোনোরকম ঘাত-প্রতিঘাত, শতোষ্ণাদি জনিত দুঃখ বা অন্য কোনো ক্রম কিছুই ছিল না। তাদের কোনো গৃহ আশ্রয় ছিল না। তারা শৈল উপত্যকায় অথবা সমুদ্র উপকূলে বাস করতেন। তারা সকলেই ছিলেন শোকবিহীন, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং একান্ত সুখী। তারা ছিলেন নিঃশ্বাসচারী। তাদের চিত্ত সর্বদাই আনন্দিত থাকত। সেই সময়ে অধর্মের সংস্রব ছিল না বললেই চলে। তাই অধর্ম প্রসূত পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি এবং ফলমূল পুষ্প, ঋতু প্রভৃতিরও উৎপত্তি হয়নি। সেই সময়ে সুখপ্রদ নাতিশীতোষ্ণ কালই একমাত্র বর্তমান ছিল। সে সময়ে সর্বত্র এবং সর্বদা তাদের অভিলাষিত বস্তু মাত্রই পরিব্যপ্ত ছিল।

সেই সময়ে চিন্তা করা মাত্রই পৃথিবী থেকে একপ্রকার রস উত্থিত হত। এই রস ছিল একপ্রকার রোগনাশক পানীয় যা সেই সত্য যুগোৎপন্ন নাতিশীতোষ্ণশালী মানস প্রজাদের বর্ণ তথা বর্ণের কারণ ছিল। এই পানীয় ছিল তাদের কাছে সিদ্ধি স্বরূপ। এর প্রভাবেই তার অসংস্কৃত শরীরেও চির যৌবনশালী ছিলেন। তাদের বিশুদ্ধ সংকল্প থেকে মিথুন প্রজার জন্ম হত। তাদের সকলেরই জন্মবৃত্তান্ত ও রূপ সমান ছিল। সকলেরই সমানভাবে মৃত্যু হত। সত্য, লোভহীনতা, ক্ষমা, তুষ্টি, সুখ, আয়ু, শীলতা ও চেষ্টা–এইসব গুণে তাদের মধ্যে কোনোই প্রভেদ ছিল না। সব থেকে বড়ো কথা, গুণগুলো নিজে নিজেই উদ্ভূত হয়েছিল। এইসব গুণের পিছনে কোনো বুদ্ধির প্রেরণা ছিল না।

সত্যযুগে কর্মের পাপ-পুণ্য বিভাগ ছিল না। বর্ণাশ্রম বা বর্ণসংস্কার ব্যবস্থা ছিল না। প্রজাদের পারস্পরিক ব্যবহার ছিল সৌজন্যমূলক ও বিদ্বেষবর্জিত। প্রজাদের রূপ ও আয়ু সমান ছিল বলে তাদের মধ্যে উত্তম-অধম ভেদাভেদ ছিল না। সত্যযুগবাসী প্রজারা সকলেই ছিলেন সুখবহুল, শোকবিহীন সর্বদা হৃষ্ঠচিত্ত। তারা সকলেই ছিলেন মহাসত্ত্ব ও মহাবল।

সত্যযুগের সেই সকল সরল প্রজাদের মধ্যে লাভ-অলাভ, মিত্র-অমিত্র, প্রিয়-অপ্রিয় ভেদজ্ঞান ছিল না। তাদের মনে অন্যের সুখ-সমৃদ্ধির প্রতি বিন্দুমাত্র লিপ্সা বা অনুগ্রহ ছিল না। এর একটি জোরালো কারণও ছিল। তারা সংকল্প মাত্রই সব কিছু পেয়ে যেতেন।

সত্যযুগে ধ্যানই ছিল একমাত্র ধর্ম। এইভবে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতির্ষ্ঠিত ছিল। যেমন–ত্রেতা যুগে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দান শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে বিবেচিত হত। এছাড়াও সত্যযুগে সত্ত্বগুণ, ত্রেতা যুগে রজঃগুণ, দ্বাপরে রজঃ ও তমোগুণ এবং কলিযুগে তমোগুণের বাহুল্য দেখা যায়।

এইবার সেইসব যুগের সময় সংখ্যা সম্পর্কে আপনাদের বিস্তারিত বলছি শুনুন। সত্য যুগের অবস্থিতি কাল ছিল দেববর্ষ পরিমাণে চারসহস্র বৎসর। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের অবস্থিতিকাল চারশো বৎসর। মানুষের পরিমাণে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের কাল চল্লিশ সহস্র বৎসর। এরপর সত্যযুগের সন্ধ্যাংশ সময়টুকুও বিগত হয়। এই অবস্থায় সমস্ত ধর্ম বিনষ্ট হয়ে যায় মাত্র এক পাদ যুগসন্ধিতে অবশিষ্ট থাকে এবং সন্ধিশেষেও এই রকম মাত্র সন্ধিধর্মই অবশিষ্ট থাকে।

এইভাবে সত্যযুগ নিঃশেষিত হয়। তার সাথে সাথে সিদ্ধিও অন্তর্হিত হয়। এইভাবে প্রজাপতি ব্রহ্মার সেই মানসী সৃষ্টি নষ্ট হলে ত্রেতাযুগের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্বোক্ত প্রথম কল্প সময়ের অষ্টসিদ্ধির মতো অন্য অষ্টসিদ্ধির উৎপত্তি হয়। যথানিয়মে ঐসব সিদ্ধিও আবার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

আদিকল্পের ঐ অষ্টসিদ্ধিই সত্য যুগের সিদ্ধি। মন্বন্তরগুলিতে চারটি যুগের বিভাগ অনুসারে বর্ণাচার এবং আশ্রমাচার জনিত কর্মসিদ্ধির উদ্ভব হয়ে থাকে। সত্যযুগ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ–এদের যুগধর্ম স্বরূপ তপঃত বল ও আয়ুর তিনপাদ অংশ জীর্ণ হয়ে আসতে থাকে। সেই অবশিষ্ট সত্যযুগের অংশ থেকেই অন্য যুগ অর্থাৎ ত্রেতাযুগের আবির্ভাব ঘটে যায়। সত্যযুগের নাশের সাথে সাথে সত্যযুগের সিদ্ধি সমূহেরও নাশ ঘটে যায় এবং অন্য সিদ্ধির উৎপত্তি ঘটে।

ত্রেতাযুগের উৎপত্তিকালে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা মেঘকণায় পরিণত হয়। অবশেষে সেই ভাসমান মেঘকণা জমাট বেঁধে গভীর গর্জনকারী ঘনঘটায় পরিণত হয়। ক্রমে তা থেকে বর্ষণ শুরু হয়। এইভাবে পৃথিবীতল অর্থাৎ উত্থিত ভূমিভাগ বৃষ্টির সাথে সংযুক্ত হয়। একবার সংযুক্ত হওয়ার পর থেকেই সেখানে নানাবিধ বৃক্ষ জন্মাতে শুরু করে। সেইসব বৃক্ষরাজি থেকে ত্রেতাযুগের প্রজাবৃন্দ উপভোগ্য পদার্থ সমূহের জোগান পেতে থাকে। প্রজারা এইসব পদার্থের সাহায্যেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। এভাবে বহুকাল নির্বাহ করার পর বিপর্যয় দেখা দিল। সেই আকস্মিক বিপর্যয়ের পর থেকেই রাগ, লোভ, প্রভৃতি ভাবসমূহের প্রাদুর্ভাব হল। স্বাভাবিক জীবন-যাপনের ক্ষেত্রেও দেখা দিল পরিবর্তন। যেমন–পূর্বকালে স্ত্রীদের জীবনান্তে একবার মাত্র ঋতু হত, কিন্তু এবার তার অন্যথা হল। রমণীদের প্রতি মাসে ঋতু হতে লাগল। সুতরাং অকালেই সকলের গর্ভ উৎপত্তি হল। পরবর্তীকালেও নারীদের এই বিপর্যয় অব্যাহত থাকায় গৃহপালিত পশু ও সমস্ত বৃক্ষ একে একে নষ্ট হল। এইভাবে একের পর এক সবকিছু নষ্ট হতে থাকায় সত্যধ্যানী প্রজারা ব্যাকুল হয়ে সিদ্ধি চিন্তায় মনোনিবেশ করলেন। আবার তাদের থেকে পাওয়া যেতে লাগল বস্ত্র, ফল, আভরণ। আবার এগুলির মধ্যে থেকে উৎপন্ন হতে লাগল গন্ধ-বর্ণ-রস সমন্বিত মহাবীর্য মক্ষিকাবিহীন মধু।

সেই যুগপ্রারম্ভে প্রজাসকল সেই মধু দ্বারাই বিকল্পভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সেই সিদ্ধি দ্বারা তারা হৃষ্ট, তুষ্ট এবং রোগশূণ্য ছিলেন। কিন্তু কালান্তরে আবার একদিন তারা লোভাভিভূত হয়ে পড়লেন। লোভের বশে বলপ্রয়োগ করে সেইসব কল্পবৃক্ষ থেকে মক্ষিকা বিহীন মধু অবাধে চয়ন করতে লাগলেন। তাদের সেই লোভজনিতঅনাচারের ফলে কোথাও কোথাও মধুসহ কল্পবৃক্ষগুলি নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। সিদ্ধির অল্প মাত্র অংশ অবশিষ্ট রইল। এই অবস্থায় সন্ধ্যা কালবশত শীত-উষ্ণ আদি দ্বন্দ্বের আবির্ভাব ঘটে গেল। এইসব তীব্র দ্বন্দ্বরূপ শীত-তাপ-বায়ু দ্বারা পীড়িত হতে হতে তারা শরীরের আবরণ প্রস্তুত করলেন। সেই সঙ্গে এইসব দ্বন্দ্বের প্রতিকারের লক্ষ্যে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। অতএব পূর্বে যাঁরা ছিলেন নিতান্তই কামাচারী এবং গৃহ আশ্রয়হীন, এখন তারাই যোগ্যতা অনুসারে সুখপ্রদ বাসস্থান নির্মাণ করতে প্রবৃত্ত হলেন। মরুপ্রান্তরে, পর্বতের সানুদেশে ও নদী অববাহিকায় তাঁরা আশ্রয়

নিলেন। মরুদেশের ক্ষেত্রেও তারা এমন স্থানগুলিকেই কেবল নির্বাচন করতেন, যেখানে জল পাওয়া যাবে সর্বদা, অর্থাৎ মরুদ্যানগুলিই তাদের পছন্দের তালিকায় ছিল। এইভাবে অনেকাংশে যোগ্যতা অনুসারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথেচ্ছ অনুসারে তারা সমান ও অসমান স্থানে শীতোষ্ণনিবারক বাসগৃহ নির্মাণ করতে লাগলেন।

সেই যুগ প্রারম্ভিক পর্বের প্রজাদের সেইসব আরাম আলয় ক্রমে পুর, অন্তঃপুর, গ্রাম, নগর, পল্লি, প্রদেশ প্রভৃতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এইসব সন্নিবেশে যোজন পরিমাণ ছিল এইরকম– অনুষ্ট থেকে তর্জনীর অগ্রভাগ পর্যন্ত যে পরিমাণ তার নাম 'প্রদেশ' বা 'ব্যাস', অনুষ্ট থেকে মধ্যমার অগ্রভাগ পর্যন্ত যে পরিমাণ তার নাম 'তাল', অঙ্গষ্ট থেকে অনামিকার অগ্রভাগ পর্যন্ত যে পরিমাণ তার নাম 'গোকর্ণ'। এবং অনুষ্ট থেকে কনিষ্ঠা পর্যন্ত পরিমাণ 'বিতস্তি'। এই বিতস্তি আঙ্গুল পরিমাণে বারোটি আঙ্গুল থাকে। একুশটি আঙ্গুলে এক 'রঙ্গি' বা 'অরত্নি' গণ্য করা হয়, এইভাবে কুড়িটি রত্নিতে এক 'ধনু' কুড়িটি আঙ্গুলে এক 'হস্ত' বা 'কিস্কু', ছিয়ানব্বই আঙ্গুলে এক 'দ্বিরঙ্গি', হিসাব করা হত, এই দ্বিররি 'চতুর্হস্ত', চতুর্দণ্ড 'নালিকা' ও 'যুগ' নামে পরিচিত ছিল। দুই হাজার ধনুতে এক 'গব্যুতি' এবং আট হাজার ধনুতে এক যোজন গণনা করা হত।

ত্রেতাযুগের প্রজারা যে ধরনের দ্বন্দ্ব নিবারকে নিকেতন প্রস্তুত করেছিলেন তারও একটা বিশেষ গঠন ছিল। তাদের নির্দিষ্ট চারটি দুর্গের মধ্যে তিনটি দুর্গ ছিল স্বাভাবিক এবং একটি কৃত্রিম। কৃত্রিম দুর্গটি অতি উচ্চ প্রাকারবেষ্টিত ভাবে তৈরি করা হত। এতে থাকত চতুঃশালা গৃহ, বহির্ধার, ও অন্তঃপুর। এর চতুর্দিকে পরিখা কাটা ছিল। এই দুর্গের আটটি দ্বার ছিল। এই দুর্গের দ্বার আট, নয় বা দশ হাত পরিমাণ পর্যন্ত হত। এই দুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে গ্রাম ও নগর, পল্লি গঠন করা হত।

স্বাভাবিক দুর্গগুলিও পর্বত ও জলবেষ্টিত স্থানেই নির্মাণ করা হয়েছিল। তাদের আয়তনের পরিমাপ ছিল দৈর্ঘ্যে আট যোজন এবং বিস্তারে চার যোজন। নগরের অর্ধেক ভাগ দৈর্ঘ্য বিস্তৃতি এবং পূর্বদিকে ক্রমশ নিম্নগামী ছিল। তবে এগুলি কোনো ভাবেই ছিন্নকর্ণ, বিকর্ণ, ব্যাঞ্জনস, কৃশ, বৃত্তিহীনতা বা দীর্ঘাদি দোষে দুষ্ট ছিল না। চব্বিশ থেকে শুরু করে আটশো হাত পর্যন্ত যে পরিমাণ, তার মধ্যবর্তী স্থানে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট ও সরলভাবে সেইসব নগর নির্মিত হয়েছিল। প্রজাদের প্রধান আবাসস্থলের পরিমাপ ছিল আটশো হাত। নগরের আয়তন অনুসারে তার নামকরণ করার রীতি ছিল। পরিমিত স্থান নিয়ে গঠিত নগরের নাম 'মেট', তার চেয়ে বেশি পরিমাপ হলে তাঁর নাম 'গ্রাম', অথবা নগর অপেক্ষা বেশি যোজন হলে সে স্থানের

নাম ‘মেট’, মেট অপেক্ষা অর্ধযোজন পরিমিত স্থানকে ‘গ্রাম’ বলা হত। এসবের চরম সীমা দুই ক্রোশ এবং ক্ষেত্রসীমা চারি ধনু ধার্য করা হয়েছিল। এইসব নগরীতে বিংশতি, অর্থাৎ কুড়িটি। ধনু বিস্তৃত হল ‘দিকমার্গ। কুড়ি ধনু হল ‘গ্রাম মার্গ। দশ ধনু হল ‘সীমা মার্গ। রাজপথ দশ ধনু পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। অশ্ব, রথ ও হস্তীদের যাতে অবাধ সঞ্চরণ হতে পারে তা সুনিশ্চিত করা হয়। এছাড়া চার ধনু বিস্তৃত শাখাপথ, গৃহপথ, উপপথ, অর্ধপদ, বৃত্তিমার্গ, প্রাথংশ পদসাত্র অবস্কার, এবং চারদিকের জলজপ্রাণী প্রভৃতি ও পৃথক পৃথকভাবে নির্দেশ করা হয়েছিল।

এই নগরাদি স্থানসমূহ যথাভাবে সন্নিবেশিত হল। পূর্বে গৃহস্থিত বৃক্ষগুলি যেমনভাবে ছিল ঠিক তেমন ভাবেই রক্ষিত করার কথা তারা বারবার চিন্তা করতে লাগলেন। গৃহাদি নির্মাণের ক্ষেত্রেও তারা একই বিষয়ে চিন্তা করলেন। বৃক্ষের শাখাসমূহ যেমন ঊর্ধ্ব ও তির্যকভাবে বিস্তৃত ছিল, তাদের গৃহগুলিকেও সেই ভাবে নির্মাণ করা হল। এই জন্য গৃহের অপর নাম হল শালা। আবার এই শালাগুলির প্রতি নিরীক্ষণে মন প্রসাদ লাভ করে অর্থাৎ এই গৃহ বা শালাগুলি মনকে প্রসাদ দান করে। তাই গৃহগুলির অপর নাম প্রাসাদ।

এইভাবে যথাক্রমে নগর এবং শীতোষ্ণাদি নিবারক গৃহের নির্মাণ সম্পূর্ণ হল। এদিকে মক্ষিকা বিহীন মধুর দুষ্প্রাপ্যতা বুদ্ধির সাথে কল্পবৃক্ষগুলিও অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রজারা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন। তারা বিষাদ ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।

ত্রেতাযুগে তাদের সুবিধার জন্য বার্তা সাধিকা নামক অন্য একপ্রকার মানস সিদ্ধির প্রাদুর্ভাব ঘটল। তাদের ইচ্ছামাত্র জল-বৃষ্টি হতে লাগল এবং তা থেকে নদীনালা প্রভৃতির উৎপত্তি হল। দ্বিতীয় বৃষ্টির ফলে জল ও ভূমির সংযোগ হল। পুষ্প ফল-মূল বিশিষ্ট ওষধি বৃক্ষ, চতুর্দশ প্রকার অকাল সৃষ্ট, অনুপ্ত গ্রাম ও অরণ্যজাত ঋতু, পুষ্প, ফল, বৃক্ষ ও গুল্মের জন্ম হল। ইতিমধ্যে ত্রেতা যুগীয় প্রভাবের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বশত আবার তাদের মধ্যে রাগ লোভ প্রভৃতি চেতনা উপস্থিত হল। তারা তখন নিজ নিজ বল অনুসারে নদী, ক্ষেত্রে পর্বত, বৃক্ষ গুল্ম ওষধি প্রভৃতি অধিকার করতে লাগলেন। পূর্বে যেসব সিদ্ধাত্মাদের কথা বলা হয়েছে সেইসব ব্রাহ্মণ মানুষদের আবার উৎপত্তি হল। যাঁরা শান্ত চিত্ত ও তেজস্বী ছিলেন তাদেরও উৎপত্তি হল। কিন্তু তারা জন্মালেন কমী ও দুঃখী মানুষরূপে অর্থাৎ তাঁরা। ত্রেতাযুগে আবার জন্মগ্রহণ করলেন। পূর্বজন্মে শুভ-অশুভ, পাপ-পুণ্য যে প্রকারের কর্ম তিনি করেছিলেন সেই কর্মফল ভোগের জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শুদ্র জাতিভুক্ত হয়ে জন্মলাভ করলেন। এঁদের কিছু কিছু ধর্মাদ্রোহী প্রজাও জন্ম নিলেন। এঁরা তৎকালীন সামাজিক বিন্যাসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি

করলেন। দেখা গেল, এই সমস্ত ধর্মদ্রোহী প্রজারা যাঁরা অপেক্ষাকৃত অধিক বলবান কিংবা অল্প বলবান অথচ যারা সত্যশীল অহিংসক, নির্লোভ ও জিতেন্দ্রিয় তাদেরকে পরাভূত করে তাদের অধিকার বাড়াতে শুরু করেছেন। এইভাবে তারা যখন পরস্পর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তাঁদের কৃত সেই পাপে মুষ্টি সংগৃহীত বালুকণার মতো ফল ও পুষ্পপ্রদ চতুর্দশ প্রকার গ্রাম্য ও আরণ্যক ওষধি প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। এইসব মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার নষ্ট হলে প্রজারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ক্ষুধাতুর হয়ে তারা স্বয়ম্ভু প্রজাপতির কাছে যেতে বাধ্য হলেন।

স্বয়ম্ভু প্রজাপতি সহস্রাক্ষী অন্তর্যামী। তিনি প্রজাদের মনের ইচ্ছা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে জানতে পারলেন। এইভাবে ত্রেতাযুগের আদিতে প্রজাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় অন্বেষণ পূর্বক ওষধি প্রভৃতি বৃক্ষের আবার যাতে উদগম হয় তার জন্য সুমেরু বৎসরূপে কল্পনা করে এই পৃথিবী দোহনে প্রবৃত্ত হলেন। এর ফলে কতগুলি গ্রাম্য বীজ, আরণ্যক বীজ এবং ফল পাকার সাথে সাথে নষ্ট হয়ে যায় এমন কতগুলি ওষধির জন্ম হল। ধান্য, যব, গোধুম, অনু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কারুষ, বার্ণক, যাষ, মুদগ, মসুর নিস্রাব, কুলদ্ম, আরক ও চনক–এই সমস্ত ওষধিকে বলা হয় গ্রাম্য ওষধি, আবার ধান্য, যব, মাষ, গোধূম, অনু, তিল, প্রিয়ঙ্গ, কলন্থ এই আট রকমের গ্রাম্য ওষধি ছাড়াও শ্যামক, নীবার, জর্তিল বেধূক কুরুবিন্দ, বেনুব, মর্কটক–এই ছয় প্রকার অরণ্য জাতীয় ওষুধ বহুল প্রচলিত ছিল। ত্রেতাযুগের আদিতে এই চতুর্দশ প্রকার ওষধি সর্বপ্রথম উৎপন্ন হয়েছিল। প্রথমে পৃথিবীতলের কিছু অকৃষ্টভূমিতে এইসব গ্রাম্য ও আরণ্য জাতীয় ওষধি। বৃক্ষ, গুল্মলতা, বল্লী, বীরুষ, তৃণ, ফল-মূল, পুষ্প এমনকি স্বয়ম্ভু প্রজাপতি পৃথিবী দোহনকালে যেসব বীজ পেয়েছিলেন সেইসব বীজ ইত্যাদি উৎপন্ন হল। এই সকল বৃক্ষাদি ঋতু অনুসারে ফল-মূল পুষ্পদি দ্বারা পরিশোভিত হত। কিন্তু পরে এইসব ওষধি বন্ধ হয়ে গেল তখন ব্রহ্মা সেই সময়কার প্রজাদের কর্মজন্য সিদ্ধি দেখে তাদের জীবিকার অন্য উপায় স্থির করলেন। সেই থেকে ওষধি প্রভৃতি বৃক্ষ বৃষ্টপচ্যরূপে সৃষ্টি হল। সুনির্দিষ্টভাবে প্রজাদের বৃত্তির উপায় স্থির হল।

ত্রেতাযুগীয় প্রজাদের দুর্ভাবনা প্রশমিত হলে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি তাদের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদা স্থাপন করলেন। প্রজাদের মধ্যে যাঁরা পরিগৃহীত এবং অপর প্রজার রক্ষক তাদের ক্ষত্রিয় বলে স্থির করলেন। যাঁরা "সর্বভূতেই ব্রহ্মা বিদ্যমান"–এই শাস্ত্রবাক্যকে শিরোধার্য করে ক্ষত্রিয়দের আশ্রয় নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করতেন তাঁদের ব্রাহ্মণ বলে চিহ্নিত করা হল। যাঁরা কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন তাঁরা হলেন বৈশ্য। পরিশেষে শুদ্রদের জন্য একটি সুচিন্তিত মাপকাঠি নিবারণ করলেন, বলা হল শোক বা দুঃখে বিগলিত হয়ে যাওয়া

যাঁদের স্বভাব, যাঁরা নিস্তেজ অল্পবীর্য ও অপর তিন জাতির পরিচর্যায় রত তারাই শুদ্র বলে প্রতিষ্ঠিত হবেন। চতুর্বর্ণ নির্দিষ্ট করে ব্রহ্মা অসলে ধর্ম কত্তরের বিধিবিহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল না। প্রজারা অচিরেই মোহবশত সেইসব ধর্ম কর্ম অতিক্রম করতে লাগলেন। বর্ণধর্ম পালন না করে পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ শুরু করে দিলেন। তখন ব্রহ্মা অন্য উপায় চিন্তা করে অন্যরকম কর্মের বিধান দিলেন যেমন–বর্ণ অনুসারে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম হল–বল, দণ্ড ও যুদ্ধ। ব্রাহ্মণের জন্য নির্দিষ্ট ধর্ম হল–যাজন, অধ্যাপনা ও পতিগ্রহ। পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষি বৈশ্যের ধর্ম। আর শিল্প ও দাসত্ব শুদ্রদের জীবিকা হিসেবে নির্দিষ্ট করা হল। এছাড়া অভিমানী ব্রহ্মা অতিরিক্ত কর্তব্য হিসেবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-কে সৃজন, অধ্যয়ন ও দান–এই তিনটি কর্মের সমান অধিকার দিলেন।

এইভাবে পৃথিবীবাসী ত্রেতাযুগীয় প্রজাদের প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী কর্ম জীবিকার ব্যবস্থা করা হল। এরপর লোকান্তরেও তাদের জন্য সিদ্ধিনুসারে পৃথক পৃথক স্থান নির্দিষ্ট হল। এক একটি বর্ণের জন্য এক একটি লোক স্থির করা হল। উদাহরণ হিসাবে ক্রিয়াবান ব্রাহ্মণদের জন্য ব্রহ্মলোক, যুদ্ধস্থলে যে সব ক্ষত্রিয় পলায়ন না করে বীরের মতো প্রয়াণ প্রাপ্ত হন, তাদের জন্য ইন্দ্রলোক, স্বধর্ম প্রতিপালক বৈশ্যদের জন্য বায়ুলোক এবং পরিচর্য্যা পরায়ণ শুদ্রদের জন্য গন্ধর্বলোক নির্দিষ্ট করা হল। চতুর্বর্ণের মধ্যে যাঁরা যথাযথ বর্ণ ধর্ম পালন করবেন কেবল তারাই নির্দেশিকা অনুযায়ী স্থান লাভ করবেন।

এইভাবে লোকান্তরে চতুর্বর্ণের জন স্থান নির্দিষ্ট করার পরে স্বয়ম্ভু ভুবন রক্ষক ব্রহ্মা তাদের জন্য চারটি আশ্রম স্থাপন করলেন। যথা–গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস। তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় যেসব আশ্রমবাসী বর্ণকর্মের অনুষ্ঠান করতেন না তারা ধর্মের পথে ক্ষতিকারক বলে গণ্য হতেন। তাই ব্রহ্মা সেই চতুঃআশ্রমবাসীদের সম-নিয়মাত্মক বর্ণের নির্দেশ দিলেন। এই চারটি আশ্রমের মধ্যে প্রথম যে গার্হস্থ আশ্রম তাতে ব্রাহ্মণাদি চারটি বর্ণেরই অধিকার রইল। অবশিষ্ট তিনটি আশ্রমের মূল এবং প্রতিষ্ঠা হল এই গৃহস্থ আশ্রম, এই পর্যায়ে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। এখন আপনাদেরকে সেই চারটি আশ্রমের সম-নিয়ম ইত্যাদি যথাক্রমে বলছি।

গৃহস্থ আশ্রমের ধর্ম হল দারপরিগ্রহ, অগ্নিস্থাপন, অতিথি সৎকার, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও প্রজা উৎপাদন। এগুলি গৃহস্থবাসীর পরম ধর্ম। দণ্ড মেঘলা জটাধারণ, ভূমিতে শয়ন, গুরুশুশ্রূষা, ভিক্ষা প্রভৃতি হল ব্রহ্মচারীর ধর্ম, পরবর্তী পর্যায়ে কৃচ্ছসাধনের ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। জীর্ণ বস্ত্র কিংবা পত্র বা মৃগচর্ম পরিধান, ধান্য এবং ফল-মূল ও ওষধি আহার, উভয় সন্ধ্যায়

অবগাহন ও হোম, অরণ্যবাসীদের অনুরূপ স্বস্তিকাদি আসন অভ্যাস, বস্ত্রে ভিক্ষা গ্রহণ, অচৌর্য, শুচিতা, অপ্রমাদগুলি; অব্যভিচার, জীবে দয়া ও ক্ষমা, ক্রোধহীনতা, গুরু শুশ্রূষা ও সত্যকথন–এই গুলি ভিক্ষুর ধর্ম। এইগুলিকে ভিক্ষুব্রত বলা হয়। এ ছাড়া আচার শুদ্ধি, নিয়ম, শৌচ,প্রতিকর্ম ও সম্যদর্শন–এই পাঁচটি উপব্রতও তাদের পালনীয় ছিল। পরিব্রাজক অর্থাৎ সন্ন্যাস পর্যায়ে সব রকমের বাহুল্য বর্জিত হয়ে মুক্তির কামনায় ব্রতী হতে হত। ইন্দ্রিয় ও মনের সমাধি গনে অগ্রসর হয়ে ভিক্ষা করা, মৌনতা, পবিত্রতা ও মুক্তি আকাঙ্ক্ষা এগুলি হল পরিব্রাজকদের ধর্ম। এই সমস্ত নিয়মনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি কথাই বিবেচনা করা হয়েছিল। যে ব্যক্তির চিত্ত অশুদ্ধ, তার পক্ষে সত্য, সরলতা যোগ যজ্ঞ, দম, বেদ, অধ্যয়ন, ব্রত নিয়ম প্রভৃতি কোনো বাহ্যকর্মেই সুসম্পন্ন হতে পারে না। যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ কলুষিত, সেই ব্যক্তি যদি পরাক্রমবশে কোনো জনহিতকর কাজ করেন তবেও তার ধর্মাচরণ হয় না। কারণ চিত্তশুদ্ধিই হল ধর্মের তপশ্চর্য্যা একমাত্র ভিত্তি। এর অন্যথা গ্রহণীয় হবে না।

এইসব বর্ণাশ্রমের অনুষ্ঠান অনুসারে পরলোকেও স্থান বিশেষ করা আছে। দেবতাগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, মনুগণ প্রমুখ যে স্থানে অবস্থান করেন ঊর্ধ্বোরেতা ও গুরুগৃহবাসী মুনিদের জন্য সেইসব অষ্টআশি হাজার সংখ্যক স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে। স্বর্গবাসীরা সপ্তর্ষিদের স্থান লাভ করেন। একইভাবে গৃহস্থরা যদি স্বধর্ম পালন করেন তাহলে পরলোকে প্রজাপত্যস্থান লাভ করেন। যোগীরা অমৃতস্থান লাভ করেন। আর সন্ন্যাসীরা লাভ করেন অক্ষয় ব্রহ্মলোক। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে যদি মনের চাঞ্চল্য থাকে তবে কেউ কোনো স্থান পান না। কারণ যাঁরা নিজ নিজ আশ্রমধর্ম প্রতিপালন করেন কেবলমাত্র তাদের জন্যই এই সকল স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

প্রথম মন্বন্তরে লোকনিয়ন্ত্রা ব্রহ্মা এই চারটি আশ্রমকেই দেবযান নামক পথরূপে সৃষ্টি করেন। রবি হল সেই দেবযানের দ্বার স্বরূপ। একইভাবে চন্দ্র হল পিতৃযানের দ্বার।

ব্রহ্মা কর্তৃক একইভাবে বর্ণাশ্রম বিভাগের পর যখন দেখা গেল বর্ণাশ্রমবলম্বী প্রজারা আর জন্মলাভ করছেন না, তখন ত্রেতাযুগের মধ্যসময়ে আত্মা ও নিজের শরীর থেকে আত্মতুল্য কতকগুলি সত্ত্ব ও রজঃ গুণসম্পন্ন মানসপ্রজার সৃষ্টি করলেন। আত্মা সৃষ্টি মানসপ্রজারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও কর্তার সম্পাদক।

তখন সেই প্রজাধর্ম উপস্থিত হলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা নানাপ্রকার মানসপ্রজার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁর সেই ঐকান্তিক কামনার ফলে জললোক আশ্রিত প্রজারা যুগ অনুরূপ ধর্মযুক্ত

হয়ে দেব, পিতৃ ঋষি, মনু প্রভৃতি রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন। ফলস্বরূপ পরবর্তী মন্বন্তরে প্রথমেই এই সমস্ত প্রজারা তাঁদের কৃত শুভ বা অশুভ কর্মফল অনুসারে দেবতা, অসুর পিতৃলোক পশুপক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, নারকী ও কীট প্রভৃতি ভাব পরিগ্রহ করে প্রজাপতির প্রজাসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটাতে লাগলেন।

.

০৯.

সৃষ্টি রহস্য ব্যাখায় প্রবৃত্ত হয়ে সূত বললেন, অনন্তর ব্রহ্মা পুনরায় ধ্যানস্থ হলেন। তার সেই ধ্যানমগ্ন জ্যোতির্ময় দেহ থেকে উৎপন্ন হলেন কার্যকরণ সমন্বিত ক্ষেত্রজ্ঞ দেব অসুর, পিতৃগণ ও চতুর্বিধ মানব। বায়ুকতক এই সকল মানসী প্রজার সৃষ্টিকথা বর্ণিত হয়েছিল।

স্বয়ম্ভু যখন মানসী প্রজা সৃষ্টির কামনায় অতলান্ত জলরাশির মধ্যে তমোগুণের মধ্যে নিমজ্জিত হলেন তখন, তার মধ্যে তমোগুণের আবির্ভাব ঘটল। সেই তমোগুণঋদ্ধ অবস্থায় সৃষ্টির কথা চিন্তা করার সময়ে তাঁর জঙেদশ থেকে যে প্রজার উৎপন্ন হলেন তাদের নাম অসুর। ‘অসুর’ শব্দের অর্থ প্রাণ। প্রাণ থেকে উৎপন্ন হওয়ায় এঁদের নাম হল অসুর।

অসুর সৃষ্টি করার পরে পরেই প্রজাপতি তনু পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সেই পরিত্যক্ত তনু ছিল তমোবহুল। তাই তার সেই পরিত্যক্ত তনু তমাবৃত ত্রিযামা রাত্রিতে পরিণত হল। এরপর তিনি সম্মুখে অসুরদের দেহে অন্য এক শরীর ধারণ করলেন। তার সেই শরীর ছিল অব্যক্ত ও সত্ত্ববহুল। এইপ্রকার রূপ পরিগ্রহ করে অতীব প্রীত হলেন। সেই প্রসন্ন হৃদয়ে ক্রীড়ারত অবস্থায় তার মুখে দেবতারা উৎপন্ন হলেন। ’দেব’ ধাতুর অর্থ ক্রীড়া করা। ক্রীড়া মুখর অবস্থায় সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির দিব্য তনু থেকে সৃষ্টি হয়েছিলেন বলেই তারা ‘দেবতা’ বলে পরিচিত হলেন।

দেবতাদের দেখে দেবেশ ব্রহ্মা আবার অন্য তনু ধারণ করলেন। তার এই নব পরিগৃহীত তনু ছিল সত্ত্বগুণ বহুল। এই সাত্ত্বিক তনু থেকে পিতৃগণের আবির্ভাব হল। এঁদের প্রতি ব্রহ্মার মনোভাব ছিল অন্য প্রজাদের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। এই পিতৃগণ স্বয়ম্ভুর মানস সন্তান হলেও স্বয়ম্ভ এদের পিতার মতো জ্ঞান করতেন। রাত্রি ও দিন এবং কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের সন্ধিক্ষণে পিতৃগণ জন্ম নিয়েছিলেন। তাই পিতৃগণের মধ্যে দেবত্ব ও পিতৃত্ব উভয় গুণই বিদ্যমান ছিল। পিতৃ সৃষ্টির পর ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মা সেই তনুও পরিত্যাগ করলেন। তার সেই পরিত্যক্ত তনু সন্ধ্যা রূপে পরিণত হল।

এই ভাবে দিবা দেবতাদের, রাত্রি অসুরদের এবং সন্ধ্যা পিতৃগণের জন্য নির্দিষ্ট হল। এঁদের মধ্যে পিতৃ তনু সন্ধ্যারই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। দেব, অসুর, ঋষি, মনু প্রমুখরা ব্রহ্মার মধ্যমা মূর্তি সন্ধ্যার উপাসনা করে থাকেন।

এরপর ব্রহ্মা অপর একটি মূর্তি ধারণ করে কতকগুলি অতিরিক্ত মানসপ্রজা সৃষ্টি করলেন। তার এই মূর্তিটি ছিল রজঃগুণ সমৃদ্ধ। এবার তার মন থেকে মানসী প্রজারা সৃষ্টি হলেন। এইসব প্রজাদের দেখার পর শেষ পর্যন্ত প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই তনুও ত্যাগ করলেন। তা থেকে জ্যোৎস্নার আবির্ভাব ঘটল। জ্যোৎস্নার আগমনে প্রজাসকল হৃষ্ট হলেন।

এইভাবে একের পর এক তনু ধারণ করে সৃষ্টিকর্তা পরমপুরুষ প্রজাপতি ব্রহ্মা দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্নার সৃষ্টি করেছিলেন। এর মধ্যে জ্যোৎস্না ও দিবা হল সত্ত্ব গুণাত্মক এবং রাত্রি তমোগুণাত্মক। রাত্রিতে তমোগুণের বাহুল্য থাকায় এর একটি নাম 'ত্রিযামা। এছাড়া দেবতারা দিবাভাগে আবির্ভূত, তাই এরা দিব্যতজ্ঞ। হৃষ্ট এবং দিনমানে বিশেষ বলশালী হয়ে থাকেন। অপরদিকে অসুররা প্রাণের সাহায্যে ব্রহ্মার জঙ্ঘা থেকে রাত্রিকালে জন্মলাভ করেছিলেন বলে তারা রাত্রিকালেই অধিক বলবান হয়ে ওঠে।

একটা কথা সবসময়ে স্মরণে রাখবেন, জন্ম সময়ের পার্থক্যই দেবতা ও অসুরদের মধ্যে বিবাদের কারণ। সুদূর অতীত বা অনাগত মন্বন্তরেও দেবতা, পিতৃ, মানব ও অসুরদের উৎপত্তির কারণ এই ভাবেই বিশ্লেষণ করতে হবে।

ব্যাপ্তি ও দীপ্তি অর্থে 'ভা' শব্দটি প্রযুক্ত হয়। দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা বা জ্যোৎস্না–সময়কাল যা-ই হোক না কেন এরা ব্যাপ্তি ও দীপ্তিতে প্রতিভাত হয় বলে এদের 'আভাসিত' বলা হয়।

এইভাবে ক্রমান্বয়ে প্রজাপতি জলরাশি, দেব, দানব, মানব, সৃষ্টি করতে লাগলেন। সৃষ্টিকাজ সম্পূর্ণ হলেই তিনি সেই তনু পরিত্যাগ করেছিলেন। শেষে আবার যখন রজঃ ও তমো গুণ সমৃদ্ধ তনুবাহার ধারণ করলেন তা থেকেও কিছুসংখ্যক প্রজা জন্মলাভ করল। এই পর্যায়ে সৃষ্ট প্রজাদের মধ্যে কতকগুলি প্রজা সেই অন্ধকারের মধ্যে উৎপন্ন হয়েই ক্ষুধার্ত হয়ে উঠলেন। তারা আর কিছু না পেয়ে জলরাশি পান করতে উদ্যত হলেন। অপর প্রজারা একই সময়ে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও সেই অনন্ত জলরাশিকে রক্ষা করেছিলেন। তাই এরা 'রাক্ষস' নামে পরিচিত। যারা দাবি করছিলেন যে, আমরা অচিরেই এই জলরাশি পান করে তার ক্ষয় করব, সেই ক্রুরকর্মা প্রজারা জুহ্যক ও যক্ষ নামে পরিচিত হলেন। মনে রাখতে হবে, 'রক্ষ' ধাতু যেমন রক্ষা তথা পালনার্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনিই 'ক্ষয়' ধাতু ক্ষয়র্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই সকল প্রিয় দুষ্টমতি প্রজাদের দেখার সাথে সাথে পরমপিতা ধীমান প্রজাপতির কেশরাশি বিশীর্ণ হতে লাগল। তা থেকে উৎপন্ন হতে লাগল শীত ও উষ্ণ অর্থাৎ সুখ ও দুঃখপ্রদ সর্পাদি প্রাণীর। মস্তক থেকে চ্যুত হওয়ায় সর্পসমূহের অপর নামগুলি হল 'অহি' 'পতন' 'হেতু'

‘পন্নগ’। এরা সর্পন বা সরীসৃপের মতো গমন করে বলে এদের নাম সর্প। পৃথিবীতে এদের নিবাস সূর্য চন্দ্রের নীচে। ক্রোধের কারণে ব্রহ্মার শরীরে যে নিদারুণ অগ্নির উদ্ভব হয়েছিল, তাই বিষরূপে সর্পকুলের শরীরে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু দেখা গেল, সর্পদের দেখে ব্রহ্মা আবার ক্রোধিত হলেন, সেই ক্রোধ থেকে এবার যাদের জন্ম হল তারা হলেন কপিশবর্ণস উগ্র, মাংসাশী ভূতবিশেষ। ভূতত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন বলে তাঁরা ‘ভূত’ আবার পিশিত অর্থাৎ মাংস ভক্ষণ করেন বলে এদের নাম ‘পিশাচ’।

তখনও পর্যন্ত আর একটি সৃষ্টি অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল। ব্রহ্মা যখন সংগীত বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন তখন তাদেরও জন্ম হয়ে গেল। এঁরা হলেন গন্ধর্ব। দেখা গেল এই অষ্টযোনি সৃষ্টি হবার পরেও পৃথিবীর বহু স্থান শূন্য পড়ে আছে। তখন ব্রহ্মা নিজের ইচ্ছা অনুসারে বয়স অর্থাৎ আয়ু থেকে বায়স অর্থাৎ পক্ষী সৃষ্টি করলেন। এই ভাবে তিনি মুখ থেকে সৃষ্টি করলেন অজ, বক্ষঃস্থল বা আয়ু। থেকে পক্ষী, উদরদেশ ও পার্শ্বদ্বয় থেকে লক্ষ্য, পাদদ্বয় থেকে অশ্ব, হস্তী, শরভ, গবম, মৃগ, উষ্ট্র, অশ্বেতর এবং অন্যান্য পশু আর সেইসঙ্গে জন্মলাভ করল ওষধি ও ফলমূল।

কল্পের আদিতে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে স্রষ্টা ব্রহ্মা পশু, ওষধি প্রভৃতি সৃষ্টি করলেন। এগুলিকে যজ্ঞে ব্যবহার করা হতে লাগল। এইসব প্রাণীদের মধ্যে ছাগ, মনুষ্য, মেষ, অশ্ব, শ্বাপদ, হস্তী, বানর, পক্ষী–এই প্রকার জীব এবং উন্দক ও সরীসৃপ প্রভৃতিকে অরণ্যজীব বলা হয়।

চতুর্মুখ ব্রহ্মার চারটি মুখ থেকে চার প্রকারের জীবের সৃষ্টি হল–অথর্ব, অমান, অনুষ্ঠুভ ও বৈরাজ। দক্ষিণ মুখ থেকে পাঁচ প্রকারের ছন্দ–ত্রৈষ্ঠুভ, কর্ম, স্তোত্র, বৃহৎ সাম ও উবয্য, পূর্ব মুখ থেকে যজ্ঞ। যজ্ঞীয় দ্রব্যের মধ্যে গায়ত্রী, বরুণ, ত্রিবৃত ও রথন্তর সাম, এবং পশ্চিম মুখে থেকে সৃষ্টি করলেন জগতী ছন্দঃ। সাম, পশ্ব দশ প্রকার ছন্দোস্তোম বৈরূপ্য ও অতিরাত্র প্রভৃতি। ভগবান প্রজাপতি স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্ঠির পূর্বেই কিনৃত, বজ্র, মেঘ, রোহিত, ইন্দ্রধনু ইত্যাদি সৃষ্টি করলেন।

এইভাবে চতুরানন ব্রহ্মার সুবর্ণ বর্ণ শরীর থেকে যে বিবিধ ভূতগ্রাম সৃষ্টি হল, এবার তাকে আমরা ক্রম অনুসারে সাজাতে পারি। সর্বপ্রথমে দেবতা, অসুর, পিতৃলোক ও মানস প্রজার সৃষ্টি হল। তারপর তিনি যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ, সর্প এবং অপরাপর স্থাবর জঙ্গমাদি সৃষ্টি করেন। পূর্ব পূর্ব সৃষ্টিতে প্রজাদের জন্য যে যে কর্ম নির্দিষ্ট ছিল পরবর্তীকালে তাদের বারবার সৃষ্টিতেও সেই সেই কর্ম অর্থাৎ কর্মফল তারা লাভ

করেছিলেন। যেমন–পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার অনুসারে মানসী প্রজাদের মধ্যে হিংস্র-অহিংস্র, মৃদু-কঠোর, ধর্ম-অধর্ম, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি কর্ম সামূহে প্রবৃত্তি জন্মায়। অবশ্য এর বাইরে মহাভূত, ইন্দ্রিয়ার্থ ও মূর্তি সমূহের অনেকত্ব কিংবা ভূতসমূহের বিনিয়োগ হওয়া এইসব বিধাতার বিধান। আবার কারো কারো মতে, পুরুষকার কর্ম দেব অথবা স্বভাবই এর কারণ। বৈশিষ্ট্যগত বিচারে পুরুষকার, কর্ম, দৈব ও স্বভাব এক না হলেও পরস্পর পৃথকও নয়। আবার এই তিনের অতিরিক্ত কোনো কারণও নেই। কিন্তু সমদর্শী সাত্ত্বিক পুরুষগণ এদের একটিকেও আলাদা ভাবে কারণ বলেন না, কিন্তু তিনটিকে একত্রে কারণ বলেন।

পূর্বকালে সৃষ্টি-ইচ্ছুক ব্রহ্মা 'বেদ' শব্দ থেকেই মহাভূত সমূহের নাম রূপ বিভাগ এবং সৃষ্টি পদার্থের বিস্তার সাধন করেছিলেন। প্রলয় অবসানে প্রথম যে দেবতাগণ ও ঋষিগণ উদ্ভূত হয়েছিলেন তাদের নামাবলিও তাঁর নির্দেশেই হয়েছিল। দেখা গেছে যে, প্রত্যেক ঋতুবিপর্যয় ঘটার পর ঋতুচিহ্ন স্বরূপ যে বিবিধ রূপ তারও বিপর্যয় ঘটে। আরও দেখা গেছে যে, রাত্রিশেষে অব্যক্ত জন্মা ব্রহ্মা যখনই মানসসিদ্ধি অবলম্বন করেন তখনই নানা বিধ চরাচর সৃষ্টি হতে থাকে। ধীমান প্রজাপতি কর্তৃক সৃষ্ট মানসপ্রজা যখন যথাযথভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল না। তখন সেই চতুরানন ব্রহ্মা নিজ সদৃশ আর অনেক মানসপুত্র সৃষ্টি করতে লাগলেন, তারা হলেন ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, আঙ্গিরস, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ট। এই নয়জন ব্রহ্মবাদী পুরুষই পুরাণে 'নব ব্রহ্মা' নামে কীর্তিত হয়ে থাকেন। এর পর ব্রহ্ম তার রোষানল একীভূত করে রুদ্র দেবতাকে সৃষ্টি করলেন। পূর্বপন্থা অবলম্বন করে সৃষ্টি করলেন সংকল্প এবং ধর্মকে।

ব্রহ্মা সর্বপ্রথম যে সকল বিদ্বান এবং সনাতন মানসপুত্রদের সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা হলেন সনন্দ, সনক, বিদ্বান, সনাতন। তাঁরা কেউই লৌকিক বিষয়ে মগ্ন হবার প্রতি সামান্য আগ্রহটুকু দেখালেন না। তাঁরা সনাতন উদাসীন, তত্ত্বজ্ঞানী, বীতরাগ মাৎসর্য্য দোষহীন হয়েই রইলেন।

ব্রহ্মা যখন দেখলেন তাঁর বিদগ্ধ মানসপুত্রেরা লৌকিক আচরণের অনুকরণের প্রতি উদাসীন, তখন তিনি পরমেষ্ঠী হিরণ্য গর্ভের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তার রোষ থেকে আবির্ভূত হলেন সূর্যের সমান দ্যুতি বিশিষ্ট এক তেজস্বী পুরুষ। তিনি হলেন অগ্নিতুল্য তেজশালী এবং অর্ধনারী নর-রূপধারী রুদ্র। অর্ধনারীশ্বর পুরুষটিকে দেখামাত্র নিজেকে বিভক্তকর এই নির্দেশ দিয়ে ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন। ব্রহ্মার এই আদেশ শোনার পর সূর্যসমতেজা পুরুষটি স্ত্রী ও পুরুষরূপে পৃথক পৃথক ভাবে নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করলেন। তার এই পৃথক পুরুষরূপটি আবার একাদশ ভাগে বিভক্ত হল। তার এই একাদশ মূর্তি জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী রূপে প্রতীয়মান হল।

প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই তেজস্বী পুরুষটির অর্ধ নরদেহের একাদশ মূর্তিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, লোকবৃত্তান্ত হেতু এবং বিশ্বলোকের স্থাপনা ও হিতের প্রয়োজনে অতিন্দ্রত হয়ে জগতের প্রতি যত্নশীল হও এরকম আদেশ শুনে একাদশ মূর্তি ইতস্তত রোরুদ্যমান অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। একই সঙ্গে রোদন এবং ভ্রমণ অর্থাৎ ছোটাছুটি করেছিলেন বলেই হয়তো সেই একাদশ মূর্তি রুদ্র নামে খ্যাত হন। যে সকল সর্বলোকপরায়ণ অযুতসংখ্যক নাগশক্তি সম্পন্ন বিক্রমশীল অন্বেশ্বরগণ ত্রৈলোক্যকে ব্যাপ্ত করে রেখেছেন তারা ঐ একাদশ রুদ্রেরই অনুচর। এবার তেজস্বী পুরুষটি অর্ধনারীদেহের কথা বলি। সূর্যসমতেজা শংকরের যে পৃথক নারীদেহের কথা এখানে বলা হয়েছে স্বয়ম্ভর মুখোদগত সেই নারীদেহের দক্ষিণ অংশ ছিল শুক্ল এবং উত্তর অংশ ছিল কৃষ্ণ। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সেই দেবীকেও দেহ বিভক্ত করতে বলেছিলেন। পৃথক পুরুষদেহের মতো রুদ্রের এই পৃথক নারী দেহটিও নিয়ে দেহকে বিভক্ত করে একাধিক রূপ পরিগ্রহ করলেন। এই বিভাজিত রূপগুলি হল–স্বাহা, স্বধা, মহাবিদ্যা, মেধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অপর্ণা, একপর্ণা, পাটলা, উমা, হেমবতী, ষষ্ঠী, কল্যাণী, খ্যাতি, প্রজ্ঞা, গৌরী, মহাভাগা ইত্যাদি। বিশ্বরূপা এই দেবী আরও যেসব নামে প্রসিদ্ধ হলেন সেগুলি আনুপূর্বিকভাবে বর্ণনা করছি, শুনুন—'প্রকৃতি' 'নিয়তা, 'ভদ্রা', 'রৌদ্রী', 'দুর্গা', 'প্রশমিনী', 'কালরাত্রি', 'মহামায়া', 'রেবতী', 'ভূতনামিকা'। দ্বাপর যুগের শেষে সেই দেবীর নামগুলি হল—'গৌতমী', 'কৌশিকী', 'আর্যা', 'চণ্ডী', 'কাত্যায়নী', 'সতী', 'কুমারী', 'কৃষ্ণপিঙ্গলা', 'বরদা', 'দেবী', 'যাদব', 'বরা', 'বহিধ্বজা', 'পরমব্রহ্মচারিণী', 'মাহেন্দ্রী', 'ইন্দ্রিভগিনী', 'একবাসকী', 'অপরাজিতা', 'বৃষকন্যা', 'বহুভূজা, 'প্রগলভা', 'একানসা', 'মায়া', 'সিংহাবাহিনী', 'দৈত্যহনী', 'আমোষা', 'মহিষমর্দিনী', 'বিন্ধ্যনিলয়া', 'বিক্রান্তা', 'গণনায়িকা' ইত্যাদি।

হে পুরাণকথা শ্রবণেচ্ছুক নৈমিষারণ্যবাসী দ্বিজগণ, এতক্ষণ আমি আপনাদের কাছে রুদ্রের অর্ধনারীদেহের প্রবর্ধিত নামসমূহ কীর্তন করলাম। দেবীর এই নামাবলী যাঁরা কীর্তন করেন, যারা শ্রবণ করেন বা স্মরণ করেন তাদের অরণ্য, প্রান্তর, মরু বা গৃহ কোনোস্থানেই কোনো ভাবে পরাভূত হতে হয় না। জলে-স্থলে কোনো বিপদ তাদের স্পর্শ করতে পারে না। হিংস্র জন্তু-জানোয়ার বা কুকর্মী মানুষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশেষ করে প্রেতস্থানে এমনকি দুরারোগ্য রোগ ব্যাধিতে দেবীর নাম কীর্তন করা উচিত। বালগুহ ভূত প্রেতাদি ও প্রতনা মাতুদের দ্বারা নিগৃহীত, পীড়িত বালকেরা এই নাম কীর্তন করে রক্ষা পায়।

পূর্বোক্ত দেবীর উভয়ভাগে প্রজ্ঞা ও শ্রী নামে দুই মহাদেবী কীর্তিতা হয়ে আছেন। এই দুই দেবী থেকে সহস্র সহস্র দেবী আবির্ভূত হয়ে সমগ্র ধরণীকে পরিব্যাপ্ত করেন। এই মহাদেবীই সমস্ত

ভূত-প্রাণীর সুখবহ ধর্ম সৃষ্টি করেছিলেন। কল্পের আদিতে ভূতসমূহের সংকল্প ও সেই অব্যক্ত যোনি থেকে উৎপন্ন হয়েছিল।

ব্রহ্মার মানসপুত্ররা তার ব্রহ্মবাদী তেজোময় দেহের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে তার মন থেকে রুচি, প্রাণবায়ু থেকে দক্ষ, চক্ষুযুগল থেকে মরীচি, হৃদয় থেকে ভৃগু, জিহ্বা থেকে ঋষি, মস্তক থেকে অঙ্গিরা, কর্ণ থেকে অত্রি, উদানবায়ু থেকে পুলস্ত্য, ধ্যানবায়ু থেকে পুলহ, সমান বায়ু থেকে বশিষ্ঠ, আপন বায়ু থেকে ক্রেতু, এবং অভিযান থেকে নীললোহিত ভদ্র উৎপন্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মার এই দ্বাদশ সংখ্যক মানস পুত্রদের প্রত্যেকই ছিলেন, সৃহমেধী ও পুরাণ পুরুষ। এঁরা কেউই পূর্বেকার মানসপুত্রদের মতো ব্রহ্মবাদী ছিলেন না। এরাই ধর্ম প্রবর্তন করেন এবং রুদ্রের সাথে সমুৎপন্ন হন। প্রথম কল্পকালে তারা অর্থাৎ ব্রহ্মার এই দ্বাদশ মানস কুমার যখন জন্মগ্রহণ করেননি তখন ঋভু ও সনৎকুমার নামে ব্রহ্মার অন্য দুই মানসপুত্র আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারা দুজনেই ছিলেন ঊর্ধরেতা ও যোগধর্মী। তারা আত্মায় আত্মাকে আরোপিত করে তেজ সংকোচ করে অবস্থান করেছিলেন। তারাও মহাতেজের সঙ্গে প্রজাধর্ম এবং কাম প্রবর্তিত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সনৎকুমার আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। অর্থাৎ জন্ম সময় থেকে শুরু করে শেষ জীবন পর্যন্ত কুমার ছিলেন। তাই তিনি সনৎকুমার নামে প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মার ভৃগু প্রমুখ দ্বাদশ মানসপুত্র হতে দ্বাদশটি বংশ প্রবর্তিত হয়। প্রত্যেকটি বংশ দিব্য দেবগুণান্বিত, ক্রিয়াবান, প্রজাবান, মহর্ষিদের দ্বারা অলংকৃত ছিল। মহৎ থেকে শুরু করে বিশেষ পর্যন্ত যত প্রকৃতির বিকার এবং যা কিছু ইন্দ্রিয় থেকে উদ্ভূত হতে পারে স্বয়ম্ভ প্রজাপতি ব্রহ্মা সেসব কিছুই সৃষ্টি করলেন। এরা ছিলেন চন্দ্র সূর্যের জ্যোতিতে আলোকিত। গ্রহ-নক্ষত্রে মণ্ডিত এবং নদী, সমুদ্র, পর্বত, বিবিধাবৃতি পুর ও সমৃদ্ধ জনপদের দ্বারা সমাবৃত। এমতাবস্থায় ব্রহ্ম সেই অব্যক্তরূপে বনমধ্যে রাত্রিযাপন করেন।

প্রথমে ব্রহ্মারই অনুগ্রহে অব্যক্ত রূপ বীজের উৎপত্তি হল। তারপর বুদ্ধিরূপ স্কন্দ, ইন্দ্রিয় রূপ অঙ্কুর, মহাভূতরূপ শাখা, বিশেষ রূপ পত্র, ধর্মাধর্মরূপ পুষ্প, সুখ-দুঃখ রূপ ফল ইত্যাদি সুশোভিত সর্ব ভূতে জীবন স্বরূপ একটি সনাতন বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। সদাসদাত্মক নিত্য অব্যক্ত, ব্রহ্মবলই এই ব্রহ্মবৃক্ষের একমাত্র কারণ। পরমেশ্বর মহাতেজোশালী ব্রহ্মার এই প্রাকৃত সৃষ্টি অনুগ্রহ সৃষ্টি বলে কীর্তিত হয়।

অভিমানী ব্রহ্মার প্রজাবলে প্রধান প্রধান যে ছয় রকম বিবৃত সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হয়েছিল, তা তিনকাল ধরে প্রবর্তিত হয়। ইহাই সৃষ্টি পরম্পরার কারণ বলে পণ্ডিতেরা মনে করে থাবেন। আবার এই যে দুই প্রকার সৃষ্টি এ যেন দিব্য সুপর্ণ, সহযুক্ত শাখা যুক্ত দুটি বৃক্ষ আকাশ যার শীর্ষ স্বরূপ, স্বলোক যার নাভি, চন্দ্র-সূর্য যার দুই নেত্র, দিক সকল যার বর্ণ, ভূমি যার চরণ, তিনিই তো অচিন্ত আত্মা। নিখিল ভূতের তিনিই উৎস। তাঁর মুখ থেকে সনপ্রসূত ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল থেকে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় থেকে বৈশ্য, চরণ থেকে শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছে। বিদ্যমান সমস্ত বর্ণই একইভাবে তার শরীরের কোনো না কোনো অংশ থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

অব্যক্ত সম্ভুত এই যে অন্ত এর থেকেই আবার নিখিল প্রজার স্রষ্টা ব্রহ্মার জন্ম।

.

১০.

পুরাণ কথক সূত বললেন, লোক স্রষ্টা ব্রহ্মার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর মানস প্রজারা সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হোন। কিন্তু কিছু কারণবশত প্রজারা যখন আর সৃষ্টি কাজে প্রবৃত্ত হলেন না তখন তমোভাবাক্রান্ত ব্রহ্মা নিতান্ত দুঃখিত হলেন। তিনি এর প্রতিকারের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। এই গভীর দুঃখ থেকে তীব্র শোকের সৃষ্টি হল। এরপর তিনি নিজদেহে বর্তমান রজঃগুণের পরাভব ঘটিয়ে তমোগুণকে উদ্রিক্ত করলেন। তমঃ ও রজঃ এই দুইয়ের মিলনে মিথুনের উৎপত্তি হল। এবং তা থেকে শোকের অধার্মিক আচরণবশত ক্রমশ হিংসার জন্ম হল। ভগবান প্রজাপতি ব্রহ্মা এই মিথুন দর্শনে অধিক প্রীতি লাভ করলেন। তিনি তমোগুণ যুক্ত সেই অভাস্বর তনুকে দ্বিধাবিভক্ত করলেন। তার অর্ধাংশ থেকে পুরুষ এবং অপর অর্ধাংশ থেকে ভূতদাত্রী শতরূপা প্রাকৃত নারী আবির্ভূত হলেন। এই নারী স্বর্গ ও পৃথিবীকে একই সঙ্গে নিজের মহিমায় আচ্ছন্ন করলেন। দ্যুলোক, ভূর্লোক ব্যাপ্ত এই প্রাকৃত নারী পূর্ব আকাশে অবস্থান করতে লাগলেন।

ব্রহ্মপুরুষের তমোদ্রিক্ত তনু থেকে এই শতরূপা নারী অর্ধ সৃষ্ট অবস্থায় জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি নিযুত বৎসর দুষ্কর তপঃসাধন করে অর্ধদেহজাত দীপ্তযশা পুরুষকে নিজের পতিরূপে লাভ করলেন। সেই বিশেষ পুরুষই স্বয়ম্ভুব মনু নামে খ্যাত হয়ে আছেন।

এই মনুর মন্বন্তরকাল এক সুপ্তিতি যুগরূপ জ্ঞেয়। এই পুরুষ অযোনিজা শতরূপাকে পত্নী রূপে লাভ করে তার সাথে রমণ করতে লাগলেন। তাই শতরূপার আরেকটি নাম হল রতি। প্রথম কল্পাদিতে এর প্রথম প্রয়োগ ঘটল।

ব্রহ্মা এবার সৃষ্টি করলেন বিরাট পুরুষ বিরাজকে। ব্রহ্মার মানসলোক থেকে উৎপন্ন মনু। বীর বৈরাজ মনু। বীর বৈরাজ এবং শতরূপার মিলনে জন্মগ্রহণ করলেন প্রিয়ব্রত ও উত্থানপাদ নামে দুই পুত্ররত্ন। এবং প্রসূতি ও আকৃতি নামে দুই কন্যা। শতরূপার গর্ভে জন্ম নেওয়া এই কন্যাদ্বয় হলেন যাবতীয় প্রজার জননী। প্রভু স্বয়ম্ভুব স্বয়ং দক্ষের কাছে প্রসূতিকে এবং রুচির কাছে আকৃতিকে সম্প্রদান করেন। প্রসঙ্গত সৃষ্টিকর্তার প্রাণবায়ু থেকে দক্ষ এবং মন রুচি উদ্ভূত হয়েছিলেন। রুচি আকৃতির সংযোগে আকৃতির গর্ভে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে যমজ সন্তান জন্ম নিল। পরবর্তীকালে যজ্ঞ ও দক্ষিণার দ্বাদশ পুত্র জন্ম নেয়। এই দ্বাদশ পুত্রই হলেন স্বয়ম্ভব মন্বন্তর মধ্যবর্তী যাম নামক দেবগণ। এদের নামকরণের পিছনে দুটি কারণের সন্ধান পাওয়া যায়। যজ্ঞের আর এক নাম যম। তাই যজ্ঞের পুত্রদের নাম যাম। অথবা দ্বিতীয় মত অনুসারে,

অজিত ও শূক নামে ব্রহ্মার দুই গণের দ্বারা পরিক্রান্ত হয়েছিলেন বলে এঁদের নাম রাখা হয়েছিল যাম। অপরদিকে প্রাণবায়ুজাত দক্ষও স্বায়ম্ভব কন্যা প্রসূতির গর্ভে চতুর্বিংশতি কন্যাসন্তান উৎপাদন করেন। এই সকল কন্যারা সকলেই লোকমাতা, কমললোচনা, মহাভাগা, যোগপত্নী ও যোগমাতা। এঁদের নামগুলি হল শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি, কীর্তি। স্বয়ম্ভুর বিধান অনুসারে দক্ষ এই তেরোজন কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। পরবর্তী এগারো জন সুলোচনা কন্যা খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনুসূয়া, উজ্জা, স্বাহা, এবং স্বধা। দ্বাদশ মানসপুত্রের অন্যান্য মহর্ষিরা এঁদের গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা হলেন–ভৃগু, ক্রতু, রুদ্র, মরীচি, আঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, বশিষ্ট, পিতৃগণ ও অগ্নি, অর্থাৎ সতাঁকে সমর্পণ করা হয়েছিল রুদ্র মহাদেবের হাতে। খ্যাতিকে সমর্পণ করা হয়েছিল মহর্ষি ভৃগুর হাতে। এইভাবে সভৃতিকে মরীচির হাতে। স্মৃতিকে আঙ্গিরার হাতে, প্রীতিকে পুলস্ত্যর হাতে, ক্ষমাকে পুলহের হাতে, সন্নতিকে ক্রতুর হাতে, অনুসূয়াকে অত্রির হাতে, উজ্জাকে বশিষ্ঠের হাতে, স্বাহাকে অগ্নির হাতে, এবং স্বধাকে পিতৃগণের হাতে সমর্পিত করা হয়েছিল। দক্ষ এবং প্রসূতির মিলনের ফলে জাত এই চতুর্বিংশতি কন্যার গর্ভে ও অসংখ্য পরাক্রমশালী পুত্রসন্তান জন্ম নিয়েছিলেন। তারা সকলেই ছিলেন প্রাজ্ঞ, মহাভাগ এবং আপন আপন অনুষ্ঠানস্থিত, তাঁদের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল তারা সকলেই প্রতি মন্বন্তরে প্রলয়ান্ত কাল পর্যন্ত অবস্থান করতেন।

ঐসব কন্যাদের গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রদ্ধাপুত্র কাম, লক্ষ্মীপুত্র দর্প, ধৃতিপুত্র নিয়ম, তুষ্টিপুত্র সন্তোষ, পুষ্টিপুত্র লাভ, মেধাপুত্র সূত, ক্রিয়াপুত্র নম, দণ্ড ও সময়, বুদ্ধিপুত্র বোধ ও অপ্রমাদ, লজ্জাপুত্র বিনয়, বপুপুত্র ব্যবসায়, শান্তিপুত্র ক্ষেম, সিদ্ধিপুত্র সুখ ও কীর্তিপুত্র যশঃ। এরা প্রত্যেকেই ধর্মপুত্র বলে মহীতে খ্যাতিলাভ করেছেন।

আবার রতিদেবীর গর্ভে কামের ঔরসে হর্ষ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এইভাবে ধর্মের ঔরসে যত সন্তান উৎপাদিত হয় তাদের প্রত্যেকেরই পরিণতি সুখ। অধর্ম ও হিংসা থেকে নিবৃতি ও অনৃন্নেতর উৎপত্তি হয়। নিকৃত ও অনৃত থেকে ভয় ও মায়া এবং নরক ও বেদনা এই দুই মিথুনের উৎপত্তি হয়েছিল। ভয় ও মায়া এই মিথুন থেকে ভূত বিনাশক মৃত্যু এবং নরক ও বেদনা এই মিথুন থেকে দুঃখ জন্মলাভ করে। ভয় ও মায়াজাত এই মৃত্যু থেকে ব্যাধি, জরা, শোক এবং নরক ও বেদনাজাত দুঃখ থেকে ক্রোধ ও অসূয়ার আবির্ভাব। অধর্ম থেকে কোনো না কোনো ভাবে সম্পর্কযুক্ত বলে এঁরা সকলেই অধর্ম পরায়ণ, অধার্মিক লক্ষণাক্রান্ত হলেও এঁদের পুত্ররা সকলে নিধন নামে খ্যাত। পুরাণে এই অধর্ম নিয়ামক সৃষ্টি পরম্পরাকে তামস সৃষ্টি নামে অভিহত করা হয়।

ব্রহ্মা নীললোহিত ভদ্রকে প্রজা সৃষ্টি করার আদেশ দিয়েছিলেন। নীললোহিত তখন মনে রুদ্রদেব ভার্য্যা সতীদেবীকে কামনা করলেন– মনে। এই মিলনের ফলে তার আত্মসম্মান সহস্র সহস্র পুত্র জন্মলাভ করল। এঁরা যেমন অত্যধিক উৎকৃষ্ট ছিলেন না। তেমনি নিকৃষ্টও বলা যাবে না। এবং তাঁরা প্রত্যেকেই নীললোহিতের মতো রূপ ও বল সম্পন্ন ছিলেন। এইসব অহস্রধিক পুত্ররা প্রত্যেকেই ছিলেন পিঙ্গল বর্ণ, জটাজুট-তুণীর এবং কপাল ধারী, বিলোহিত, বিবস্ত্র, হরিৎবেশ, দৃষ্টিগ্ন, বহুরূপ, বিরূপ, বিশ্বরূপ, রূপী, রথি, বর্মী, ধার্মিক, বরাহধারী, সহস্রশত বাহু, শত দিব্য, ভূমি ও অন্তরীক্ষচারী স্থলশীর্ষ, দংস্রাবিহীন, দ্বিজিহ্বা ও ত্রিলোচন– সর্ববিধ গুণের সমাহার ঘটে গিয়েছিল তাদের মধ্যে। তারা অন্ন মাংস ভক্ষণ করতেন। পানীয় হিসবে ঘৃত, সোমরস ও মেদ গ্রহণ করতেন। এঁরা অতিশয় উগ্র ক্রোধ, উপাসঙ্গ, উপধর্মী, শিতিবস আসীন জৃম্ভনকারী, অধ্যায়ন ও অধ্যাপনশীল, ধাবমান, জপশীল, জ্বলন ও বর্ষণকারী, প্রধূজিৎ, সুতিমান, ব্রহ্মিষ্ঠ, শুভদর্শন, বুদ্ধ, বুদ্ধতম, নীলগ্রীব, সহস্রাক্ষ, ক্ষপাঁচর সর্বভূতের অদৃশ্য। মহাযোগাচারী, মহাতেজসম্পন্ন, রোদন ও দ্রবণশীল ছিলেন।

নীললোহিতের এই রুদ্ররূপী সুরোত্তম রুদ্রপুত্রদের দেখে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁকে এইপ্রকার বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট প্রজা সৃষ্টি করতে বারণ করলেন। তিনি তাকে পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে বললেন, আর এরকম আত্মতুল্য প্রজা সৃষ্টি কোরো না। অন্যবিধ প্রজা উদ্ভূত করো।

রুদ্রদেব প্রত্যুত্তরে বললেন, ব্রহ্মা আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য, আমি উৎপাদনে বিরত হলাম। এবার আপনি আপনার মনোমতো প্রজা সৃষ্টি করুন।

প্রজাপতি সৃষ্টিকর্তা স্বয়ম্ভু নীললোহিতের এই মনোভাবে তুষ্ট হলেন। তাঁকে প্রীত হতে দেখে রুদ্রদেব আবার বলতে লাগলেন, তবে আমার একটি অনুরোধ আছে। আমি নিজসদৃশ সহস্র সহস্র বিরূপ বলশালী নীললোহিত প্রজা উৎপন্ন করলাম, এঁরা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যেন 'রুদ্র' নামে বিখ্যাত হন। যুগ-যুগান্ত ধরে প্রতি মন্বন্তরে যেসকল দেবতা আবির্ভূত হবেন, এঁরা যেন তাদের সাথে সমমর্যাদার সঙ্গে পূজিত হন। এবং এঁরা যাতে যজ্ঞভাগের অধিকারী হন, আপনি সেই আশীর্বাদ করুন।

মহাদেবের এই বাণী শুনে ধীমান প্রজাপতি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি তুষ্ট চিত্তে বললেন, প্রভু তবে তাই হোক। তোমার আত্মতুল্য এইসব শত শত রুদ্রসংজ্ঞক দেবতারা তোমার ইচ্ছানুসারেই জগতে বিখ্যাত হবে এবং যজ্ঞ ভাগেরও অধিকারী হবে। ব্রহ্মার আশীর্বাদে তখন থেকেই সবকিছু সেই অনুসারেই চলতে লাগল। রুদ্রদেব নীললোহিত আর প্রজা সৃষ্টি

করলেন– না। প্রলয়কাল আসা পর্যন্ত। ঊর্ধ্বেরেতা হয়ে স্থাণুর মতো অবস্থান করতে লাগলেন। ব্রহ্মার আদেশ বচন শুনে 'স্থিতোহস্মি' অর্থাৎ 'আমি বিরত হলাম'–এই কথা উচ্চারণ করেছিলেন বলে রুদ্রদেব শংকরের অরেক নাম স্থানু। জ্ঞান, বৈরাগ্য ঐশ্বর্য, তপঃ, সত্য, ক্ষমতা, ধৃতি, সৃষ্টত্ব, আত্মসম্বোধ ও আধিষ্ঠাতৃত্ব–এই দশটি গুণ শংকর শরীরে সর্বদাই অবস্থান করে। তেজের দ্বারা তিনি সমস্ত দেবতাকে, ঋষিকে ও অসুরকে অতিক্রম করেছিলেন। তাই তার নাম মহাদেব। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে তিনি ঐশ্বর্য দ্বারা দেবগণকে, বল দ্বারা মহাসুরগণকে আর যোগদ্বারা ভূত গ্রামকে অতিক্রম করেছিলেন।

নৈমিষারণ্যবাসী সেইসব অদ্ভুতকর্মা ঋষিবৃন্দ পুরাণ কথক বায়ুকে বললেন–হে মহামুনি, এক্ষণে আমরা মহেশ্বরের যোগ, তপঃ, সত্য, ধর্ম ও জ্ঞানসাধন এই কটি বিষয়ে শুনতে ইচ্ছা করি। সেইসব ধর্ম সম্পর্কেও শুনতে ইচ্ছা করি, যে ধর্ম আচরণ করলে ব্রাহ্মণরা সদগতি লাভ করবে। হে প্রভো, বিশেষভাবে মহেশ্বরের যোগ বিষয়ে সবকিছু শুনতে চাই।

বায়ু বললেন, মুনিগণ, অক্লিষ্টকর্মা রুদ্ররা এ পঞ্চধর্মের বিষয়ে বলেছেন এবং পঞ্চধর্মের বিষয় পুরাণেও উল্লিখিত হয়েছে। অধিকাংশ আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুৎগণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, ভৃগু, যম, শুক্র, পুরোগ, পিতৃগণ, কালান্তক, প্রমুখ দেবতা এবং অন্যান্য দেবতারাও পুর্বোক্ত ধর্মের উপাসনা করেছেন। তাদের কর্মবন্ধন ক্ষীণ হয়ে গেছে। তারা শরৎ আকাশের মতো নির্মল দেহে বিরাজ করতে যাবেন। তারা সন্ধ্যায় আত্মস্থিত হয়ে আত্মোপসানয় মগ্ন থাকবেন। তারা গুরুর প্রিয় ও হিত কর্মে রত থাকেন বলে গুরুর প্রিয়কাঙ্ক্ষী। তারা মনুষ্যজন্ম ত্যাগ করে দেবতাদের মতো বিহার করেন। মহেশ্বর কথিত সেন সনাতন পঞ্চধর্ম বিষয়ে এখন আমি যথাক্রমে কীর্তন করছি শুনুন।

প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার ও স্মরণ–এই চারটিকে যোগধর্ম বলে। মহাদেব এই যোগধর্ম বিষয়ে যে সমস্ত উক্তি করেছেন আমি সেই লক্ষণ ও কারণগুলি আপনাদের বলছি।

প্রাণের আয়াম অর্থাৎ যা দ্বারা প্রাণের গতি রক্ষিত হয়, তাই হল প্রাণায়াম। প্রাণায়াম তিন প্রকার–মন্দ, মধ্য, উত্তম। প্রাণসমূহ নিরোধের নামও প্রাণায়াম। প্রাণায়াম প্রমাণ দ্বাদশমাত্রারূপে নির্দিষ্ট। এই দ্বাদশ মাত্রার উন্নতি প্রাণায়াম হল মন্দ। মন্দের দ্বিগণ অর্থাৎ চতুর্বিংশতি অর্থাৎ চব্বিশ মাত্রার প্রাণায়াম হল মধ্য। আর ত্রিগুণ অর্থাৎ ষটত্রিংশত বা ছত্রিশ মাত্রার উদ্ধত প্রাণায়ামকে উত্তম প্রাণায়াম বলা হয়। উত্তম প্রাণায়ামের সময়ে স্বেদ, কল্প ও বিষাদের উৎপত্তি হয়। এই তিনটি হল প্রাণায়ামের লক্ষণ।

এখন আমি সংক্ষিপ্তাকারে প্রাণায়ামের প্রণামের বিষয়ে বলছি।

সিংহ হোক, হাতি হোক, অথবা অন্য কোনো বন্য জন্তু হোক, এদের যেমন সেবা দ্বারা বশীভূত করা যায়, সেইরকম যোগাভ্যাস দ্বারা সমস্ত অসংযত ব্যক্তিদের দূর্বিনীত প্রাণকেও বশীভূত করা যায়। দীর্ঘকালের যোগাভ্যাসের ফলে পরিমর্দিত প্রাণবায়ুও দুর্বল সিংহ বা হাতির মতো বশীভূত হয়ে পড়ে। মুখ্যত মনকে অবলম্বন করেই সেই প্রাণবায়ু বশীভূত হয় এবং মনকে বশীভূত করেই উজ্জীবিত থাকে।

যোগাভ্যাস দ্বারা বশীভূত প্রাণবায়ুকে স্বচ্ছন্দে ইচ্ছেমতো চালিত করা যায়। এর প্রভাবে সিংহ, হাতি যেমন বশীভূত হয়ে মানুষ প্রমুখের প্রতি অভয়ের কারণ হয়, সেইরকম বিশ্বতোমুখ এই প্রাণবায়ু ধ্যানবস্থায় অন্তঃনিরুদ্ধ হয়ে শরীরের পাপরাশি দহন করে।

প্রাণায়ামকারী সংযত আত্মা, বিশ্বের সব দোষ একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়, ফলে সে যোগীপুরুষ সত্ত্বেও অধিষ্ঠান লাভ করে।

তপস্যা, ব্রত, নিয়ম ও সমস্ত যজ্ঞের যা ফল, প্রাণয়ামেরও সেই ফল। প্রতি মাসান্তরে কুশাগ্র পরিমাণ জল পান করে শত শত বৎসর তপস্যা করে যে ফল পাওয়া যায়, প্রাণায়ামের নিয়মিত অভ্যাসে সেই একই ফল লাভ করা যায়। প্রাণায়ামের দ্বারা দোষসমূহ, ধারণ দ্বারা পাপারাশি, প্রত্যাহারের বিষয় আসক্তি, এবং ধ্যান দ্বারা ঈশ্বরেও প্রাপ্ত নয় এমন গুণগুলিকে দগ্ধ করা যায়, অতএব মুক্ত যোগীমাত্রেই প্রাণায়ামপর হবেন এবং সর্ব পাপ থেকে পরিশুদ্ধ হয়ে পরমব্রহ্মে লীন হয়ে যাবেন।

বায়ু পাশুপাত যোগ কীর্তন করতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, তপঃস্থিত মহাত্মা ঋষিরা একদিন থেকে আরম্ভ করে যথাক্রমে অহোরাত্র, অর্ধমাস, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ, সহস্র মহাযুগ পর্যন্ত দিব্যচক্ষু দ্বারা প্রাণের উপাসনা করে থাকেন।

এরপর তিনি মহাদেবের মতোই প্রাণায়ামের প্রয়োজন ও ফল বিশেষভাবে বর্ণনা করতে শুরু করলেন।

শান্তি, প্রশান্তি, দীপ্তি ও প্রসাদকে প্রাণায়ামের চারটি ফল বলে বর্ণনা করা হয়। দুই ধরনের বিনাশকে শান্তি বলে গৃহীরা ইহলোকে ও পারলোকে নিজেরা যেসব ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় কর্ম করে থাকেন, সেই সব কর্মফলের বিনাশ, এবং দুই। পিতা, মাতা, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী এবং

সংকর বর্ণজাত আত্মীয়রা যেসব পাপ করে থাকেন, সেইসব পাপের বিনাশ। ইহলোকে ও পরলোকের হিতের জন্য লোভ ও অভিমান জাত পাপের সংযমের নাম প্রশান্তি। যার দ্বারা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারার মতো তেজস্বী হওয়া যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন প্রসিদ্ধি লাভ করা যায়। অতীত ও অনাগত ঋষিদের দর্শন লাভ হয় ও বর্তমান বুদ্ধির সমতা আছে, তার নাম দীপ্তি। যার দ্বারা ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও পঞ্চ বায়ু প্রসন্নতা লাভ করে, তাকে বলা হয় প্রসাদ। এই প্রত্যক্ষ ফলদায়ী এবং কালপ্রসাদ থেকে সদ্যোজাত এই চার প্রকার প্রাণায়ামই প্রথম ধর্ম বলে পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

এবার আমরা প্রাণায়ামের লক্ষণ, আসন তত্ত্ব ও যোগাভ্যাস যোগের বিষয় আলোচনা করব।

যোগারম্ভের প্রথমে ওঁকার উচ্চারণ করতে হবে। বারবার ওঁকার উচ্চারণের ফলে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে। তারপর স্বস্তি বচন ও চন্দ্র সূর্যকে নমস্কার করে অর্ধপদ্মাসনে বসতে হবে। অথবা, সমজানু, একজানু বা উত্তানভাবে থেকে দৃঢ়মত অবলম্বন করে চরণদ্বয় সংহত করতে হবে। তারপর মুখ ও চক্ষুর নিমীলন, সম্মুখের বক্ষদেশের বিস্তৃতি, চরণের পশ্চাৎ অংশ দ্বারা বৃষণের আচ্ছাদন, মস্তক ও গ্রীবাকে উন্নত করে অপর কোনোদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে কেবলমাত্র নাসিকার অগ্রভাবে স্থিরভাবে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখতে হবে। এই ধরনের প্রক্রিয়ার ফলে রজঃগুণ দ্বারা তমোগুণ আচ্ছাদিত হবে। এই ভাবেই সমাহিত যোগী যোগাভ্যাস করতে থাকবেন। এই অবস্থায় পৌঁছে গেলে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও পঞ্চ বায়ু একসাথে নিগৃহীত করে প্রত্যাহার করার চেষ্টা করে যেতে হবে। কচ্ছপ যেমন সবদিক থেকে নিজের অঙ্গ সংকোচন করতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি সমস্ত কামনাকে সংকোচিত করে আত্মরতিতে মগ্ন হন, এবং এক তত্ত্বস্থ হতে পারেন, সেই ব্যক্তিই আত্মার আত্মদর্শন লাভে সমর্থ হন। এইভাবে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে শুচি ব্যক্তি নিঃশ্বাসবায়ু দিয়ে আকণ্ঠ নাভি পর্যন্ত শরীর পরিপূর্ণ করে শ্বাস প্রত্যাহারের উপক্রম করবেন। নিমেষ উন্মেষের পালা কণামাত্র। দ্বাদশ নিমেষ উন্মেষে প্রাণায়াম, দ্বাদশ প্রাণায়ামে ধারণা, ধরণদ্বয়ে যোগ সাধিত হয়ে থাকে। এইভাবে যোগাভ্যাস ঋদ্ধ ব্যক্তি ষড় ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে স্বতেজে দীপ্যমান পারমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে থাকেন। প্রাণায়ামে যুক্ত নিয়তাত্মা বিপ্রের সর্ব দোষের বিনাশ ঘটায় এবং যোগী পুরুষও উৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণে অবস্থান করেন।

এইভাবে নিয়তাহার প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তি যোগবিরুদ্ধ অবস্থাকে পরাভূত করতে করতে ক্রমে যোগভূমিতে আরোহণ করেন। এই মহান যোগভূমিতে বিজয় লাভ না করলে বহু দোষ উৎপন্ন হয়। পরিণামে মোহ বর্ধিত হতে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বলবান ধনবান

ব্যক্তি যেমন বহু অর্থব্যয়ে ও পরিশ্রমে নানামন্ত্রের ব্যবস্থা করে তার দ্বারা জলপান করে থাকেন, তেমনভাবেই বহু যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করে প্রাণবায়ুকে লাভ করতে হয়। এইভাবে প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রিত হলে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, বক্ষ, মুখ, নাসা, নেত্র, ভ্রূযুগল ও বিন্দুর ঊর্ধ্বে মূর্ধাদেশে পরতত্ত্বে ধারণা করতে হয়। যেমন করে প্রাণ আপনাদি বায়ুর সংবোধের ফলে প্রাণায়াম সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়, তেমন করে মনের ধারণার জন্যই ধারণা সংজ্ঞার অবতারণা।

সংক্ষেপে বিষয়ের নিবৃত্তিকে প্রত্যাহার প্রাণায়াম বলা হয়। ধারণাও প্রত্যাহারের সম্মেলনে যে সিদ্ধি, তাকে বলে যোগ এবং ধারণার অনুসারী সিদ্ধি বিশেষকে বলা হয় ধ্যান। ধ্যান যুক্ত পুরুষ সর্বদা চন্দ্র-সূর্যের মতো প্রদীপ্ত পরমাত্মার দর্শন লাভ করে থাকেন। সত্ত্বগুণের উৎপত্তি না হলে কিংবা অকালে যোগ উৎপন্ন হলে আত্মদর্শন সম্ভব হয় না।

যোগাভ্যাসের স্থান নির্ধারণের বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। যে-কোনো স্থানে যখন তখন যোগবিদ্যার অনুশীলন করা উচিৎ নয়। শুষ্ক পত্রারাশি দ্বারা আচ্ছাদিত বনাঞ্চল, শ্বাপদাকীর্ণ শ্মশান, জীর্ণ গোষ্ঠ, অগ্নির সমীপবর্তী স্থান, শব্দ যুত্ত বা ভয়াবহ চৈত্য, বল্মীক ক্ষেত্র, উদপাদন ও নদীতট প্রভৃতি স্থান সমূহ যোগের পক্ষে নিতান্তই নিন্দনীয় স্থান। এক্ষেত্রে এগুলি বাধাকর স্থান রূপেই পরিগণিত হবে। একইভাবে ক্ষুধা, অসন্তোষ, মানসিক ব্যাকুলতা জাতীয় অস্থির মুহূর্ত হল যোগের অপ্রশস্ত কাল। এই ধরনের দোষযুক্ত দেশ ও কালে যোগীপুরুষ কখনোই যোগনিমগ্ন হবেন না। আর যদি কোনো ক্ষেত্রে প্রমাদবশত কেউ এসব দোষের কথা জেনেও সেই ধরনের দেশ বা কালে যোগযুক্ত হন, তাহলে তার শরীরে যোগবিঘ্ন শারীরিক দোষগুলি প্রকটিত হয়ে ওঠে। দেখা দেয় জড়তা, বধিরতা, মূঢ়তা, অন্ধত্ব, স্মৃতিলোপ প্রভৃতি রোগ ও জরা। উপরিউক্ত অজ্ঞান অবস্থায় যোগাভ্যাস করলে এ ধরনের দোষের প্রকোপ কোনো ভাবেই এড়ানো সম্ভব নয়। তাই যোগীর উচিত শুদ্ধ জ্ঞানে, দোষবর্জিত স্থানে যোগসমাহিত হওয়া। অপ্রমত্তভাবে নিয়মিত যোগাভ্যাস করলে যোগীপুরুষের কোনো দোষোৎপত্তি ঘটে না।

এবার ক্রম অনুসরণ করে প্রাণায়াম থেকে যেসব রোগের উৎপত্তি হয়, তার চিকিৎসার কথা বলা দরকার। অনিচ্ছাকৃতভাবে যোগাভ্যাসকালে দোষার্জন করলে এই চিকিৎসার ফলে সেই প্রাণায়ামজাত দোষগুলো চলে যায়।

অতি উষ্ণ খাদ্য ঘৃত দ্বারা স্নিগ্ধ করে ভোজন করলে ও গুল্মস্থান ধারণ করলে বাতগুল্ম প্রশমিত হয়। উদাবর্ত পীড়ার চিকিৎসায় দধি ভক্ষণ করে বায়ুকে ঊদিকে চালনা করতে হবে। তারপর বায়ুকে বায়ুগ্রন্থি ভেদ করে বায়ুদেশে প্রয়োগ বা প্রেরণ করতে হবে। এই প্রয়োগে

কোনো উপকার না পেলে ঐ বায়ুকে মস্তকে ধারণ করতে হবে। সত্ত্বসম্পন্ন পুরুষ যদি যোগাভ্যাসরত অবস্থায় উদাবর্ত রোগের পীড়ায় আচ্ছন্ন হন তবে তার প্রতিকারের জন্য এই চিকিৎসা করা দরকার। উদাবৃর্ত রোগের জন্য যে চিকিৎসা গাত্রকম্পন রোগেও সেই একই চিকিৎসা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, এবং উভয় ক্ষেত্রেই এই চিকিৎসার দ্বারা রোগী শান্তিলাভ করে থাকেন।

শুধু উদাবর্ত বা গাত্র কম্পন রোগে নয়, দধি মিশ্রিত স্নিগ্ধ তরলের সূত্র দ্বারা সেবনে অপরাপর কয়েকটি রোগেও দ্রুত আরোগ্য লাভ করা যায়। যেমন, উৎকট ধ্যানের ফলে বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগলে বক্ষঃস্থলে, কণ্ঠদেশে, বাগিন্দ্রিয়ের অভিঘাত হলে দুই কর্ণে, এবং তৃষ্ণা রোগে জিহ্বায় এই স্নিগ্ধ তরল ধারণ করালে অচিরেই যোগী এসবের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন। ক্ষয়, কুষ্ঠ ও কীলাস রোগে ভিন্ন প্রকার আহারের বিধি আছে, এসব ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সাত্ত্বিক আহার আরোগ্য এনে দেয়।

যোগাবিপ্রের আরও বহুবিধ সমস্যা এবং তজনিত বিবিধ চিকিৎসার আয়োজন আছে। যোগকালে যদি কেউ ভয় বা দুর্বলতাবশত সংজ্ঞা হারান, তাহলে তার মাথায় এক খণ্ড বাঁশ ধরে অন্য একটি কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে তার মাথাটি চেপে ধরে থাকতে হবে। এভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে সেই ব্যক্তি কিছুটা সুস্থ বোধ করলে বা তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এলে ধারণা'কে মাথায় ধারণ করতে হবে। তারপর তাকে স্নিগ্ধ ও অল্প ভোজন দিতে হবে। এই প্রকারে চিকিৎসা করলে যোগী অবশ্যই সুস্থতা লাভ করবেন।

মানুষ ভিন্ন অন্য কোনো জন্তু দ্বারা পীড়িত হলে যোগী প্রথমেই পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি ও আকাশকে চিন্তা করবেন। ক্ষতিকারক যে প্রকারেরই হোক না কেন প্রথমে প্রাণায়াম দ্বারা তাকে বিনষ্ট করা উচিত। প্রাণায়ামাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করলে সবকিছুই নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য এইসব চিকিৎসার পরেও মাথায় যবাগু ধারণ করা অবশ্য কর্তব্য।

যোগাভ্যাসকালে যোগীকে কৃষ্ণসর্প দংশন করলে মহঃ, জ্ঞান, তপ ও সত্যলোককে চিন্তা করে হৃদয়ে ও উদরে ঐ স্নিগ্ধ সবাগ্র ধারণ করতে হবে। বিষফল খেয়ে থাকলে বিশল্যকরণী ধারণ করতে হয়। এটাই প্রথমে করতে হবে। তারপর ভাবতে হবে যাবতীয় দেবতার কথা। ভাবতে হবে প্রকৃতির রূপ ও বৈভবের কথা। এই পৃথিবী পর্বতময়, আর নিখিল পৃথিবীই সমুদ্রময়–এই চেতনার বিস্তার ঘটাতে হবে মনের মধ্যে। তারপর সহস্র ঘট জল দিয়ে রোগীকে স্নান করাতে হবে। যদি অন্যকোনোভাবে রোগীর দেহে বিষের প্রবেশ ঘটে, তাহলে চিকিৎসা পদ্ধতির

সামান্য পরিবর্তন করতে হবে। তাকে জলমধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থাকতে হবে, এবং ঐ বিশল্যকরণী মাথায় অথবা সর্বাঙ্গে ধারণ করতে হবে।

যোগাভ্যাস করতে করতে শরীর শীর্ণ হয়ে উঠলে আকন্দ পাতার পুটমধ্যে বল্মীক মৃত্তিকা অর্থাৎ উই ঢিবির মাটি পূর্ণ করে তা ভোজন করতে হবে।

প্রাথমিকভাবে এটাই হল যোগাকালে উৎপন্ন বিবিধ রোগের চিকিৎসা প্রণালীর রূপরেখা।

কোথাও কোথাও কোনো কোনো বিপ্র যোগের প্রবৃত্তির কথা উল্লেখ করে থাকেন। এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত, মোহবশত জ্ঞান লুপ্ত হলে তাকে কোনো অবস্থাতেই যোগপ্রবৃত্তি লক্ষণ বলা উচিত নয়। কয়েকটি লক্ষণ দেখেই যোগপ্রবৃত্তির নির্ধারণ করা সম্ভব। লক্ষণগুলি হল– সত্ত্বগুণের আবির্ভাব, আরোগ্য, লোভহীনতা, বর্ণ, প্রভা, কণ্ঠস্বরের সৌম্যতা, শুভ গন্ধ, মলমূত্রাদির অল্পতা, উপরোক্ত সবগুলিই হল যোগ প্রবৃত্তির শারীরিক লক্ষণ।

যোগাভ্যাসকালে যদি এমন উপলব্ধি হয় যে প্রদীপ্ত পৃথিবী মধ্যে জ্যোতির্ময় আত্মা প্রবেশ লাভ করেছে তাহলে বুঝতে হবে যে যোগসিদ্ধি সমুপস্থিত হয়েছে।

১১.

সনাতন সূত দ্বিজগণকে সম্বোধন করে বললেন, এবার তত্ত্বদর্শীর দেহে যে সমস্ত উপসর্গ দোষের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে, সেগুলো সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করব।

যোগী উপসর্গ দোষযুক্ত হয়ে মনুষ্যভোগ্য বিবিধ অভিলাষ যেমন–ঋতুসুখ, স্ত্রীসম্ভোগ, বিদ্যাদান ফল, অগ্নিহোত্র, দুবির্ষজ্ঞ অনাক্রপাদি মায়ায় কর্ম, ধন ও স্বর্গ বিষয়ে কামনা করে। অবিদ্যার বশীভূত হলেই যোগীপুরুষ এইসব কর্মে লিপ্ত হন। কিন্তু উপসর্গযুক্ত ঐ যোগীর উচিত বুদ্ধির সাহায্যে এইসব লোভ বর্জন করা। তাই একমাত্র নিত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই এইসব উপসর্গ থেকে মুক্তি পেয়ে থাকেন।

পূর্বোক্ত উপসর্গগুলো ও শ্বাসবায়ু বশীভূত হলেই সাত্ত্বিক রাজন্ ও তামস্ উপসর্গের আবির্ভাব ঘটে। প্রতিভা, শ্রবণ, দেবদর্শন, ও ভ্রমাবর্তা এই চারটি হল এই উপসর্গের সিদ্ধিলক্ষণ।

বিদ্যা, কাব্য, শিল্প, অন্যান্য শাস্ত্র এবং বিদ্যার উপাসনাকে একত্রে প্রভাব বলা হয়।

উপসর্গকালে যোগীজন শত যোজন দূরে অবস্থিত শ্রবণযোগ্য শব্দ শুনতে পান। তিনি সর্বজ্ঞ ও বিধিজ্ঞ হয়ে উন্মত্তের মতো হয়ে ওঠেন। যোগীদেহে যখন উপসর্গ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন তিনি যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব ও দিব্য মানুষদের দর্শন করতে থাকেন। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, ঋষি, পিতৃ ও পিতৃ পুরুষদের দর্শন করতে করতে তাঁর তখন উন্মত্তের মতো অবস্থা হয়ে যায়। অন্তরাত্মা তাকে ঘোরায়, আর তিনিও উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকেন। এই বিভ্রান্তির ফলে তার বুদ্ধিবিভ্রম ঘটে। তাঁর সমস্ত লব্ধ জ্ঞান নষ্ট হয়ে যায়। তার আত্মার অবচেতন স্তর থেকে বিবিধ বিষয়বার্তা প্রাদুর্ভূত হয়ে তাঁর চিত্তের বিকার ঘটায়। এইভাবে বিষয়বার্তাসংক্রান্ত বুদ্ধির দাপটে যোগীর সকল জ্ঞানই বিনষ্ট হয়ে যায়।

এইরকম অবস্থায় যোগীজন অবিলম্বে পরব্রহ্মকে স্মরণ পূর্বক শুক্লপটে কিংবা শ্বেতকমল দ্বারা আবরিত করে চিন্তা করতে থাকবেন। এহেন অবস্থাতেও যদি কোনো মেধাবী যোগীপুরুষ নিজের সিদ্ধি ইচ্ছা করে থাকেন, তাহলে তিনি আত্মার ঐ উপসর্গ দোষগুলিকে পরিত্যাগ করবেন। যতদিন পর্যন্ত এইসব উপসর্গ দোষ থাকবে, ততদিন পর্যন্ত পূর্বোক্ত ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, উরগ, মহাসুর প্রভৃতি বারবার তার মনে উদিত হতে থাকবে। তা ব্যতিরেকে যোগযুক্ত যোগী সর্বদা লঘু আহার করবেন ও জিতেন্দ্রিয় হবেন এবং একাগ্র চিত্তে মূর্ধদেশের সাতটি সূক্ষ্ম পদার্থের প্রতি মনোনিবেশ করবেন। এর ফলে যোগাসম্পন্ন, যোগার বিঘ্ননাশক অন্যপ্রকার উপসর্গের আবির্ভাব ঘটে।

এরপর যোগী সমগ্র পৃথিবীকে 'ধারণা'-র অন্তর্গত করবেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন ও বুদ্ধি, এই সমস্ত পদার্থকেও ধারণার অন্তর্গত করতে থাকবেন। এটা তাঁর কর্তব্য।

ধারণকালে যোগী এক একটি ধারণা করার সময়ে প্রতিটি সিদ্ধির লক্ষণ অনুপুঙ্খ খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। এই অবস্থায় তিনি পূর্ব পূর্ব পদার্থের ধারণা পরিত্যাগ করে পর পর পদার্থের ধারণা গ্রহণ করতে থাকেন। মনে মনে পৃথিবীর ধারণা করতে করতে প্রথমে যোগীর কল্পজগতে সূক্ষ পৃথিবীর জ্ঞান জন্মায়, পরে তিনি নিজেকেই পৃথিবী বলে ভাবতে থাকেন, আর ধারণার সর্বশেষ পর্যায়ে এই পৃথিবীজ্ঞান থেকেই তাঁর মধ্যে গন্ধজ্ঞান জন্মায়। একই ভাবে অন্য অন্য পদার্থের ধারণা করার সময়ে তাঁর মনে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের জন্ম হয়। যেমন, জলের ধারণা থেকে সূক্ষ্ম জলের জ্ঞান, সেই সূক্ষ্ম জলের সাথে আত্মার অভেদাজ্ঞান আর পরিশেষে তার থেকে রসজ্ঞান হয়ে থাকে। কিংবা তেজের জ্ঞান, পরে সেই যোগী আত্মাকেই তেজোময় প্রকাশ বলে ভাবতে শুরু করেন। এই রকম পরিবর্তন বায়ু, আকাশ, মন সব ধরনের ধারণার সময়েই ঘটতে পারে। হতে পারে ধারণাসীন যোগী বায়ুর ধারণা করতে করতে প্রথমে সূক্ষ্ম বায়ুর জ্ঞান লাভ করলেন, পরে আত্মাকে বায়ুরূপে উপলব্ধি করায় তিনি নিজেকেই বায়ুর মণ্ডলী ভাবতে থাকেন। আকাশ-এর ধারণা দ্বারা প্রথমে সূক্ষ্ম আকাশ জ্ঞান, তারপর সূক্ষ্ম মণ্ডল দর্শন করে থাকেন। কিংবা, মনের ধারণা করতে করতে যোগীচিত্তে সূক্ষ্ম মনের প্রবর্তন ঘটে যায়, যোগী নিজের মনের দ্বারা সর্বভূতের মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন। সবশেষে তাদের বুদ্ধির সাথে তার নিজের বুদ্ধি সম্মিলিত হওয়ায় তিনি সমগ্র পদার্থবিজ্ঞানের সম্যক রূপ উপলব্ধি করতে পারেন।

যে বুদ্ধিমান যোগীপুরুষ এই সাতটি সূক্ষ্ম পদার্থ উপলব্ধি করে বুদ্ধি যোগে এই সব কিছু পরিহার করতে পারেন, তিনিই পরমপদ লাভের অধিকারী হন। কিন্তু যে যে ঐশ্বর্য লক্ষণে ভূতের সংযোগ আছে, যোগীরা তাতে আসক্ত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যান। এইজন্য যে দ্বিজ যোগীপুরুষ উল্লিখিত সূক্ষ্ম পদার্থসমূহ পরস্পর সংযুক্ত বিবেচনা করে পরিত্যাগ করেন, তিনি সহজেই পরমপ্রাপ্ত হন।

পরমপদ লাভের পথ খুব একটা সহজ নয়, দেখা গেছে, অনেক দিব্যদর্শী মহাত্মা ঋষিবর এই সূক্ষ্ম ভাবে আসক্ত রয়েছেন, অথচ আনুপূর্বিক শর্তপূরণ হচ্ছে না। সেক্ষেত্রেও ঐসব পদার্থ দোষ বলে বিবেচিত হবে। অতএব সূক্ষ্ম পদার্থগুলিতে কখনও নিশ্চয়ভাব বিধেয় নয়, ঐশ্বর্য থেকে রাগ বা অভিলাষ জন্মায় অপরদিকে বিরাগ অর্থাৎ বৈরাগ্যই ব্রহ্ম বলে পরিচিত।

সুতরাং সপ্ত সূক্ষ্ম পদার্থ ও প্রধান পুরুষ ষড়ঙ্গ মহেশ্বরকে অবগত হয়ে বিনিয়োগ বিজ্ঞানী হতে পারলেই পরম ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে।

সর্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদি জ্ঞান, স্বতন্ত্রতা, নিত্য অলুপ শক্তি, অনন্ত শক্তি বিবিধ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই ছয়টি বিশেষজ্ঞকে মহেশ্বরের ষড়জ্ঞ বলে থাকেন। নিয়ত ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে যোগযুক্ত হলে উপসর্গ সমূহ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। যে সকল যোগীজন শ্বাস-প্রশ্বাস, উপসর্গ সমূহ ও অভিলাষাদিকে অতিক্রম করেছেন, তাদের একটি বাহ্যিক সর্ব কামিকী ধারণা জন্ম লাভ করে। এর প্রভাবে তিনি যোগযুক্ত হয়ে যে-কোনো স্থানে মনঃসংযোগ করতে সমর্থ হন। তাতে প্রবেশ করতে পারেন। আর কেবলমাত্র এই জাতীয় ধারণার দ্বারাই দেহ থেকে দেহান্তরে গমন করা সহজে সম্ভব হয়। বিপরীত ক্রমে সে ঐ দেহ থেকে প্রত্যাবর্তন করার সামর্থ্য লাভ করেন।

মনই হল যোগের দ্বারস্বরূপ। মন দেহস্থ ইন্দ্রিয়দের 'আদান' অর্থাৎ গ্রহণ করে। এই 'আদান' শব্দটি থেকে ইন্দ্রিয়ের আর এক নাম রাখা হয়েছে 'আদিত্য'। বিধান অনুসারে যোগী পুরুষ যদি বিবিক্ত ও সূক্ষবর্জিত হয়ে প্রবৃত্তি অতিক্রম করতে পারেন, তাহলে তিনি রুদ্রলোকে অবস্থান করার অধিকার লাভ করেন। ঐশ্বর্য গুণ প্রাপ্ত ব্রহ্মভূত সেই প্রভুকে সমস্ত দেবস্থানে নিবৃত করতে হবে। তিনি পৈশাচ স্থান দ্বারা পিশাচদের, রাক্ষস স্থান দ্বারা রাক্ষসদের, গান্ধর্ব স্থান দ্বারা গান্ধবদের, কৌরব স্থান দ্বারা কুবেরদের, ঐন্দ্র স্থান দ্বারা ইন্দ্রকে, সৌম্য স্থান দ্বারা সৌম্যকে, প্রজাপত্য স্থান দ্বারা প্রজাপতিকে এবং ব্রাহ্ম স্থান দ্বারা প্রভু ব্রহ্মকে আমন্ত্রণ করবেন। কিন্তু এসব বিষয়ে আসক্ত হলে তাঁকে উন্মত্ত হতে হবে। তাই নিত্য ব্রহ্ম, তৎপর হয়ে যোগাবলম্বন করে ঐসব স্থান তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করবেন। যে দ্বিজবর কোনো স্থানেই আসক্ত নন, তিনিই সর্বগত বিভু হয়ে থাকেন।

.

১২.

বিস্তারিতভাবে উপসর্গ দোষের বিষয়ে বর্ণনা সমাপ্ত হলে বায়ু বললেন, এখন আমি ঐশ্বর্য গুণরাশির বিষয় কীর্তন করব। যোগীরা যে বিশেষ যোগ অবলম্বন করে সর্বলোক অতিক্রম করতে সক্ষম হন, সেই যোগবিশেষ অষ্ট গুণযুক্ত ঐশ্বর্যের কথা বলা হয়েছে। আমি সেই সব কিছু যথাক্রমে বর্ণনা করছি, আপনারা শ্রবণ করুন।

অনিমা, লখিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা প্রভৃতি হল ঐশ্বর্য। সর্ব কামপ্রদ ঐশ্বর্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে–সাবদ্য, নিরবদ্য, সূক্ষ, সংক্ষেপে, পঞ্চভূতময় তত্ত্বের নাম সাবদ্য। পঞ্চভূতময় ইন্দ্রিয়, মন ও অহংকারের নাম নিরবদ্য এবং পঞ্চভূতময় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহংকারের নাম সূক্ষ্ম। এদের মধ্যে সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য সর্বময় বলে একে আত্মস্থ খ্যাতিও বলা হয়ে থাকে। সবদ্যাদি ঐশ্বর্য-ও অবস্থাভেদে সূক্ষ্মসংজ্ঞক ঐশ্বর্যের অন্তর্গত বলে পরিগণিত হয়।

ভগবান স্বয়ম্ভু এই ত্রিবিধ ঐশ্বর্যের অন্তর্ভূক্ত পূর্বোক্ত ঐ অষ্টবিধ ঐশ্বর্যের লক্ষণ সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, আমি তাই আপনাদের সামনে বিবৃত করছি। ত্রিলোকস্থিত সর্ব-ভূতের মধ্যে জীবের অনিমা শক্তি অনিয়মিতভাবে বিদ্যমান। অনিমা শক্তিতেই সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ প্রতিষ্ঠিত। এই ত্রিলোকের যা কিছু দুষ্প্রাপ্য, যোগী মহাত্মারা তা সবই অনিমা শক্তির প্রভাবে পেয়ে থাকেন।

যোগীপুরুষের দ্বিতীয় ঐশ্বর্য সঘিমা। এই লঘিমা অধিক গুণ সম্পন্ন। লঘিমা লাভ হলে লম্বন, প্লবন ও সকল ভূতে শীঘ্র গমনাদি কাজে সামর্থ্য জন্মায়।

তৃতীয় ঐশ্বর্য হল মহিমা। যে শক্তির প্রভাবে ক্ষুদ্র বস্তু মহৎ হয়, তাকে মহিমা বলে। চতুর্থ ঐশ্বর্য প্রাপ্তি। এর দ্বারা ত্রিলোকোস্থিত সমস্ত ভূতবর্গকে কাছে পাওয়া যায়। আবার ত্রিলোকমধ্যে সর্বভূতে যথেচ্ছ গমন ও যথেচ্ছ বিষয়ে ভোগকে প্রকাশ্য ঐশ্বর্য বলে। ঈশিত্ব ঐশ্বর্য হল সেই ঐশ্বর্য যার বলে যোগী সুখ-দুঃখের ওপার নিজের আধিপত্য স্থাপন করতে পারেন।

সপ্তম ঐশ্বর্য বশিত্ব। যিনি ত্রিলোকের চরাচর ব্যাপী সর্বভূত-কে বশীভূত করে নিজের সকল কাজে নিযুক্ত করতে পারেন, জানবেন তিনিই বশিত্ব লাভ করেছেন।

অষ্টম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য হল কামাবসায়িত্ব ঐশ্বর্য। যিনি নিজের ইচ্ছা অনুসারে পঞ্চইন্দ্রিয়কে ত্রিলোকের সমস্ত স্থানেই নিযুক্ত ও মুক্ত করতে পারেন, তিনিই কামাবসায়িত্ব ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত হয়েছেন বলে মনে করতে হবে। কামাবসায়িত্ব ঐশ্বর্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ, রূপ প্রভৃতি বিষয়ে ইচ্ছেমতন মনকে প্রবর্তিত অথবা অপ্রবর্তিত করতে পারেন। তিনি জন্ম, মৃত্যু, ভেদ, ছেদন, দহন, ক্ষয়, ক্ষরণ, দুঃখ, মোহ, ত্যাগ, লিপ্ততা প্রভৃতি কোন কিছুতেই প্রভাবিত হন না। তিনি সব কাজই করেন। কিন্তু, কখনও বিকৃত হন না। তিনি শব্দ, স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ শূণ্য। তিনি নির্মম, নিরহংকার, কামাবসায়িত্ব ঐশ্বর্য-প্রাপ্ত ব্যক্তি বুদ্ধিজ্ঞান বিবর্জিত, অবর্ণ ও নিকৃষ্ট অবস্থায় বিরাজ করেন। তিনি নিরন্তর বিষয় ভোগ করেন বটে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই বিষয়ের সাথে যুক্ত হন না। এইভাবে তিনি পরম সূক্ষ্ম মোক্ষ অনুভব করেন। এরূপ মোক্ষ ব্যাপক। এই এ জাতীয় মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষও 'ব্যাপী' আখ্যা লাভ করেন। সূক্ষ্মভাব হেতু মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষ ঐশ্বর্য থেকে ভিন্ন অবস্থান করেন। কিন্তু সূক্ষ্ম ঐশ্বর্যের গুণান্তর বলে খ্যাত, অপ্রতিঘাতি ঐশ্বর্য যুক্ত অত্যুত্তম যোগপ্রাপ্তি হলে সেই পুরুষের পরমপদ মোক্ষ লাভ হয়ে থাকে।

.

১৩.

মহামুনি বায়ু বলতে লাগলেন, উল্লিখিত উপায়ে জ্ঞান লাভ করা সত্ত্বেও অনুরাগবশত কেউ যদি রাজস, বা তামস্ কর্ম করেন, তাহলে সেই কর্মানুসারে তাকে ফল লোগ অবশ্যই করতে হবে। সুকর্ম অনুষ্ঠান করলে স্বর্গে সেই সুকৃতির ফল ভোগ করবেন, তবে স্বর্গলোকে ফলভোগ করার পর স্বর্গভ্রষ্ট পুরুষটিকে আবার মনুষ্যলোকে নরজন্ম ভোগ করতে হবে। অতএব পরমসূক্ষ্ম পরব্রহ্ম শাশ্বত ব্রহ্মেরই সেবা করা উচিত।

যজ্ঞ পরিশ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল হয়ে থাকে। এর ফল হল বারবার মৃত্যুর বশ্যতা। তাই মোক্ষই হল পরম সুখ।

যে ব্রহ্মজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তি বিশ্ব পাদশিরোগ্রীবা সম্পন্ন, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বভাবন, বিশ্বখ্য, বিশ্বরূপী, বিশ্বগন্ধ, বিশ্বমাল্য ও বিশ্বাম্বরধারী প্রভুপুরুষের ধ্যানে সংযুক্ত, শত শত মন্বন্তরেও তাকে অভিভূত করা যায় না। এক এবং একমাত্র যোগের দ্বারাই তার সাক্ষাৎ মেলে। যিনি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধীনস্থ হবেন না বলে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন, যিনি সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম, মহান থেকেও মহান, যিনি কবি, পুরাণকার, অনুশাসক, এই গুণান্বিত নিরিন্দ্রীয় সুবর্ণপুরুষের সাক্ষাৎ যোগের সাহায্যেই পাওয়া যায়, চক্ষু দ্বারা নয়। অবশ্য ত্রিগুণ, নির্বিকার, লিঙ্গযুক্ত, নিগুণ চেতন, নিত্য, সর্বদা, সর্বগত, শৌচ অচল ও স্বপ্রকাশ এবং লিঙ্গহীন এই পুরুষকে অবশ্য যুক্তি দ্বারাও পাওয়া যায়। ইনি চিন্তনীয় পুরুষ, ইনি তেজে দীপ্যমান। এঁর হস্ত, পদ, উদর, পার্শ্ব, জিহ্বা কিছুই নেই। ইনি অতীন্দ্রিয় অতিসূক্ষ্ম এবং এক। ইনি চক্ষুশূণ্য, তবু দর্শন করেন। ইনি কর্ণবিহীন, তবু শ্রবণ করেন। তার বুদ্ধি না থাকলেও এই জগতে তার অবোধ্য কিছুই নেই। ইনি সর্বজ্ঞ কিন্তু বেদের দ্বারা অভেদ্য। অর্থাৎ বৈদিক শব্দ দ্বারা এর প্রকৃত স্বরূপ কোনো অবস্থাতেই সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায় না।

মুনিগণ এই মহান পুরুষকে আদি, সচেতন, সর্বগত, অতি সূক্ষ্মরূপে অভিহিত করে থাকেন। আর যোগীরা এঁকে চেতনামধ্যে সর্বভূতের প্রসবধর্মী প্রকৃতিরূপে দর্শন করে থাকেন। তারা সর্বত্রই তার হস্ত ও পদ, সর্বদিকে তার অক্ষি, মস্তক ও মুখ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি সর্বত্র কর্ণযুক্ত, তিনি সব কিছুকে আবৃত করে অবস্থান করেন। তিনি ঈশান অর্থাৎ প্রভু। তিনি সনাতনা, সর্বভূতের একমাত্র আশ্রয় পুরুষ। তিনি ভূতাত্মা, মহাত্মা, পরমাত্মা। তিনি অব্যয় অর্থাৎ বিকারহীন। তিনি সর্বাত্মা পরব্রহ্ম। তাঁকে হাজার বৎসর ধ্যান করলেও মোহপ্রাপ্তি ঘটে

না। সর্ব মূর্তিতে বিচরণ করেন বলে বায়ু যেমন ‘গ্রাহ্য’ নামে অভিহিত হন, সেইরকম গগনব্যাপী ব্রহ্মা পুরী অর্থাৎ দেহমধ্যে, অবস্থান করেন বলে ‘পুরুষ’ নামে বিশেষিত হন।

ধর্মলোপ হয়েছে এমন ব্যক্তি তার নিজের বিশেষ বিশেষ কর্মানুসারে স্ত্রী-পুরুষ সহযোগে শুক্রশোণিত থেকে বারবার যোনিমধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। গর্ভকালে প্রথমেই কলন উৎপন্ন হয়। তারপর সেই কলন বুদবুদে পরিণত হয়। এই সময় ঘূর্ণিত চক্রের মাঝখানে স্থাপিত মৃতপিণ্ডে হস্তসংযোগ করলে যেমন বিবিধ আকারের বস্তু নির্মিত হয়, তেমনি বায়ুর ক্রিয়ানুসারে সেই কলনোদ্ভূত বুদবুদ থেকে আত্মা ও অস্থির সংযোগে যথাসম্ভব রূপ ও মনোবিশিষ্ট মানুষ উৎপন্ন হয়। এই উৎপাদন প্রক্রিয়া কয়েকটি পর্যায়ে সম্পাদিত হয়। প্রথমে যে বায়ু জন্মায় সেই বায়ু থেকে জল জন্মায়, জল থেকে প্রাণ এবং প্রাণ থেকে শুক্রের বৃদ্ধি ঘটে।

গর্ভ উৎপত্তির মূল কারণ যে শুক্রশোণিত তাতে শোণিত ও শুক্রের শতকরা অনুপাত হল তেত্রিশ ও চোদ্দো।

এই শুক্রশোণিতভুক্ত উভয় বস্তুই গর্ভমধ্যে অর্ধপলভাগ প্রবেশ করে ও পঞ্চবায়ু দ্বারা আবৃত হয়। এরপর যখন পিতাপাতার শরীর অনুসারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি উদ্ভূত হয়, তখন থেকে মাতা যে আহার গ্রহণ করে ও যে পানীয় পান করে সেইসব খাদ্যদ্রব্যাদি নাড়ি নাভি দ্বারা ভ্রূণের শরীরে প্রবেশ করে ও তাকে জীবিত রাখে। এইভাবে নয় মাস অবধি তাকে জীবিত রাখে। এইভাবে নয় মাস অবধি দ্রুণটি সমস্ত শরীর দিয়ে নিজের মস্তক ও উদরকে বেষ্টিত করে অতিকষ্টে অতিবাহিত করে। তারপর দশমাস পূর্ণ হলে নিম্নমুখ হয়ে যোনিছিদ্র দিয়ে নির্গত হয়।

শিশুটি জন্মগ্রহণ করার পরেও যদি পাপধর্মী আচরণ করে তাহলে তাকে অসিপত্রবন ও শালী ছেদভেদ প্রভৃতি দুঃসহ যাতনাময় ঘোর কুম্ভীপাক নরকে গমন করতে হয়। সেখানে ভৎর্সনা, পুঁজ, শোণিত ভোজন, প্রভৃতি নরকনির্দিষ্ট যাতনা সহ্য করার পর ছিন্নভিন্ন হয়ে ভূবিচ্ছিন্ন জলের মতো আবার নিজের স্বরূপ প্রাপ্তি ঘটাতে হয়।

জীব এইভাবে ক্রমান্বয়ে নিজ কৃত পাপাঁচরণের ফলে তপ্ত হতে হতে অপর কোনো কর্মফল জনিত দুঃখ অবশিষ্ট থাকলে তাও ভোগ করতে থাকেন। এক্ষেত্রে একটিমাত্র সুকৃতি দ্বারাই, ভোগ সুখও প্রাপ্ত হয়। অতএব ধর্মাচরণই জীবের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। মৃত্যুকালে কেবলমাত্র কৃতকর্ম ব্যতীত আর কেউই জীবের অনুগমন করে না। যাঁরা অধর্ম আচরণ করেন তারা নিয়তই শমন ভবনে বিভিন্ন দেহ ধারণ করে চিৎকার করতে থাকেন, অনিষ্টকর কর্মের

জন্য বহুবিধ চরম অধর্ম যাতনা সহ্য করতে করতে তাদের শরীর ক্রমশ শুষ্ক হতে থাকে। লোকে কায়মনোবাক্যে যে অভীষ্ট বস্তু কামনা করে, পাপ বলপূর্বক সেই সবকিছুই হরণ করে। অতএব ধর্মাচরণ একান্ত প্রয়োজন।

জীব পূর্বজন্মে যেরকম পাপকর্ম করবেন, পরজন্মে তদনুসারেই দু'রকম তামস জন্ম লাভ করবেন, এটাই বিধিনির্দিষ্ট বিধান। এই জন্মচক্র মানুষ থেকে স্থাবর পর্যন্ত বিস্তৃত। একে 'তামস-সংসার' নামে অভিহিত করা হয়। ক্রমানুসারে এই সংসারচক্র মনুষ্য থেকে পশুভাব, পশুভাব থেকে মৃগত্ব; মৃগত্ব থেকে পক্ষীভাব এবং পক্ষীভাব থেকে সরীসৃপত্ব ও সরীসৃপত্ব থেকে স্থবিরতা–এইভাবে বারবার পরিবর্তিত হতে থাকে। স্থবিরত্ব প্রাপ্তির পর যখন জীবের মনে আবার ধর্মচিন্তা জাগ্রত হয়, তখন সে কুম্ভকারের চক্রভ্রমণের মতো আবার মনুষ্যত্ব লাভ করে। ব্রহ্মা থেকে পিশাচ পর্যন্ত সাত্ত্বিক সংসার নামে পরিচিত, এদের স্থান হয় স্বর্গে। ব্রাহ্ম সংসারে সত্ত্বগুণ, স্থাবর সংসারে তমোগুণ ও চতুর্দশ স্থানে কেবল রজোগুণের বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। আপনাদের মনে আশঙ্কা হতে পারে, বেদনার্ত দেহী কীভাবে কর্মের অবসানে পরম ব্রহ্মকে স্মরণ করবেন, তবে জেনে রাখুন, তাঁরা সংস্কারবশত পূর্ব ধর্মের ভাবনার প্রেরণায় মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ হন। অতএব ধর্মচরণই নিয়ত কর্তব্য।

.

১৪.

বায়ু বললেন, এইভাবে চতুর্দশ প্রকার সংসার জানার পর সংসারচক্রে পরিভ্রমিত ব্যক্তি স্বাভাবিক নিয়মেই সংসার ভয়ে পীড়িত হয়ে পড়েন। সেক্ষেত্রে এই ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য ঐ ব্যক্তির এমন কর্ম আচরণ করা কর্তব্য যা দ্বারা আত্মদর্শন হয়। এজন্য যোগমুক্ত ও ধ্যান পরায়ণ হওয়া উচিত। আত্মাই হল সংসারের আদিভূত জ্যোতিস্বরূপ এবং সর্বোত্তম সেতুবিশেষ। এই আত্মা সকল ভূতের ধারক। এই আত্মা শাশ্বত। সংসার সমুদ্রের সেতুস্বরূপ, অগ্নিস্বরূপ, বিশ্বততন্মুখ, সর্বভূতের হৃদয়স্থিত এই আত্মাই যোগবিধানজ্ঞ ব্যক্তির উপাস্য।

আত্মোপসনার বিশেষ পদ্ধতি আছে। প্রথমে সম্যক শুচি ও তর্গত চিত্তে হৃদয়োস্থিত বৈশ্বানরের স্মরণ করে আটটা আহুতি দান করতে হয়। এরপর আচমন সেরে মৌনভাবে বৈশ্বানরের উপাসনা করতে করতে “প্রাণায় স্বাহা” এই মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রণাহুতি নামে আহুতি দান করতে হবে। এরপর অপানের উদ্দেশে “অপানায় স্বাহা”, সমানের উদ্দেশে “সমানায় স্বাহা”, উদানের উদ্দেশে “উদানায় স্বাহা” এবং ব্যানের উদ্দেশে “ব্যানায় স্বাহা”, বলে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আহুতি দান করতে হবে। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা ইচ্ছেমতো ভোজন করে একবার জলপান পূর্বক তিনবার আচমনের পর হৃদয় স্পর্শ করতে হবে। অনুভব করতে হবে আত্মপ্রাণের গ্রন্থি, আত্মা বিশান্তক রুদ্র, আত্মা রুদ্রেরও প্রাণ। এইভাবে চিন্তা করার সময় নিজের তৃপ্তিবিধানের উদ্দেশে বলতে হবে–তুমি সুরজ্যেষ্ঠ, উগ্র, চতুর ও ইন্দ্র, তুমি আমাদের মৃত্যু-সংহারক, তোমাদের উদ্দেশ অর্পিত এই হবিও আমাদের মঙ্গল করুক। এই বলে হৃদয় থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করে নাভি স্পর্শ করবেন, তারপর আবার জল স্পর্শ করে নিজের শরীর স্পর্শ করে দুই চক্ষু, নাসিকা, দুই কর্ণ, হৃদয় ও মস্তককে যথাক্রমে স্পর্শ করতে হবে।

প্রাণ ও আপান, দুইই আত্মস্বরূপ। এর মধ্যে প্রাণবায়ু অন্তরাত্মাস্বরূপ ও আপান বায়ু বহিরাত্মস্বরূপ। অন্ত্র হল প্রাণ আর আপান, মৃত্যু ও জীবিত স্বরূপ অন্নকে ব্রহ্মজ্ঞান করতে হয়। অন্নই প্রজা উদ্ভবের কারণ, অন্ন থেকে ভূদগাণের উৎপত্তি ও স্থিতি। অন্ন দ্বারাই ভূতগণের বৃদ্ধি। অন্ন বৃদ্ধিকারক বলেই এরূপ নামকরণ হয়েছে। এই অন্ন অগ্নিতে আহুত বলে দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণ তা ভক্ষণ করে।

.

১৫.

পুরাণ কথক বায়ু সেই অদ্ভুত কর্মা দ্বিজগণের উদ্দেশে বললেন, এবার আমি শৌচাচারের লক্ষণ বিষয়ে আপনাদের জ্ঞাত করাব। এই আচার অনুষ্ঠানে শুদ্ধত্মা ব্যক্তি ইহলোক ত্যাগ করে স্বর্গলোকে যাত্রা করেন। শৌচের শেষে জলের কাজ মুনিদের পক্ষে উত্তম পদ। যিনি অপ্রমত্ত হয়ে সেই কাজ করেন, তিনি কখনও অবসাদগ্রস্ত হন না। তাঁর কাছে মান-অপমান যথাক্রমে বিষ ও অমৃত বলে পরিগণিত হয়। অথচ অন্য সকলের শৌচাচার সম্পন্ন ব্যক্তি গুরুর প্রিয় কর্মে আত্মনিয়োগ করে এক বৎসর কাল তার গৃহেই বসবাস করবেন। ঐ সময়ে সচেতনভাবে তিনি যমনিয়মাদি সর্বদা পালন করবেন। এইভাবে ধর্মের অবিরোধী আচরণ করতে করতে যখন উত্তম জ্ঞান লাভের পর্ব শেষ হবে, তখন গুরুর অজ্ঞতা লাভ করে গৃহস্থাশ্রমের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে পৃথিবীতে বিচরণ করবেন। এই সময় তাকে চোখ মেলে পথ চলতে হবে, পাত্রের মুখে বস্ত্র দিয়ে পান করতে হবে। এবং অবশ্যই সত্য কথা বলতে হবে। তাঁকে মনে রাখতে হবে ধর্ম হল শাস্ত্রের অনুশাসন। যোগীপুরুষ শাস্ত্রযজ্ঞে আতিথ্য গ্রহণ করবেন না। সদা সর্বদা অহিংস আচরণ করবেন। এ সবই শাস্ত্রীয় বিচারের ফলশ্রুতি।

পরিতৃপ্ত যোগীপুরুষ নিঃসন্দেহে অঙ্গারহীন বক্তির মতো সমস্ত পরিতৃপ্ত জনেরই সংসর্গ করতে পারেন। অবশ্য সবসময় নয়। যেখানে অপমানিত ও পরাভূত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে সেখানে সত্য ধর্মকে দূষিত না করে ভিক্ষা গ্রহণ করাই যোগীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে। যোগী কেবলমাত্র সদাচারচারী গৃহস্থের গৃহেই ভিক্ষা গ্রহণ করবেন। এই ভিক্ষাই তাঁর পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। এছাড়া প্রয়োজনে সম্পদশালী গৃহস্থ অথবা শ্রদ্ধাশীল, সংযত, মহাত্মা, ক্ষত্রিয়দের কাছ থেকেও তিনি ভিক্ষান্ন নিতে পারেন। কিন্তু দুষ্টবৃত্তি নিকৃষ্ট বর্ণের গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ তাঁর পক্ষে নিকৃষ্ট বৃত্তি বলে উপদিষ্ট হয়েছে।

যোগীর সিদ্ধিবর্ধক আহার সামগ্রীগুলি হল—ভিক্ষালব্ধ যবাগু, তক্ত, দুগ্ধ, যব, পক্ক, ফলমূল, পিন্যাক। যে যোগী মাসান্তরে কুশাগ্র দ্বারা জলবিন্দু পান করেন বা যিনি ন্যায় অনুসারে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করেন সেই যোগী পূর্বোক্ত সকল যোগী থেকে স্বতন্ত্র বলে বিবেচিত হবেন।

যে-কোনো যোগীর পক্ষেই চান্দ্রায়ণ হল শ্রেষ্ঠ ব্রত। প্রত্যেক যোগীর সাধ্যানুসারে একটি, দুটি, তিনটি, বা চারটি চান্দ্রায়ণ ব্রত পালন করা উচিত। অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অলোভ, ত্যাগ, ভিক্ষাব্রত, অহিংসা, পারমার্থতা, আক্রোশ, গুরুশুশ্রূষা, শৌচ, লঘু আহার, নিত্য বেদপাঠ, প্রভৃতিকে চান্দ্রায়ণ ব্রতের নিয়ম রূপে পরিকীর্তিত করা হয়েছে। যেমন ভাবে কোনো কোনো লোক অঙ্কুশের সাহায্যে বন্যজন্তুকে অচিরেই নিয়ন্ত্রিত করবেন। এরপর শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যাবীজ দগ্ধ হলে নিষ্পাপ বন্ধনহীন, শান্ত ঐ যোগী মুক্ত পুরুষ বলে অভিহিত হন।

বেদ গ্রন্থে যাবতীয় যজ্ঞাদি ক্রিয়া উক্ত আছে। জ্ঞানী মহাত্মাদের পক্ষে বিবিধ যজ্ঞের সর্ব সাধন উপাস্য দেবতার কথাও এখানে বলা আছে। উপাস্যের জ্ঞান থেকে আসক্তি-রাজা বর্জিত উপাস্য বিষয়ক ধ্যান আসে। এই ধ্যান এলেই শাশ্বতের উপলব্ধি ঘটে। বিশুদ্ধ সত্ত্ব জ্ঞানী যোগীরা শ্রম, দম, সত্য, নিষ্পপতা, মৌন, অখিল ভূতে সরলতা প্রভৃতিকে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানস্বরূপা বিবেচনা করেন। যাঁরা সমাহিত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, অপ্রমাদি, শুচি, আত্মপ্রিয়, জিতেন্দ্রিয়, সেই সব অনিন্দিত মেধাবী অমলমনা মহর্ষিরা এইভাবে শৌচাগারে যোগকে লাভ করে থাকেন।

.

১৬.

বায়ু বললেন, যোগীপুরুষ পূর্ব পূর্ব তিনটি আশ্রম পরিত্যাগ করে চতুরাশ্রমে গুরুর কাছে এক বৎসর কাল বাস করে থাকেন। সেখানে থাকার সময় তিনি অতি উত্তম জ্ঞান লাভ করেন। তারপর গুরুর আজ্ঞানুসারে পৃথিবীর নানা স্থানে ঘুরে বেড়ান। যে জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুর সাধক এবং যে জ্ঞান সকল জ্ঞানের সারভূত–সেই জ্ঞানেরই উপাসনা কর্তব্য হওয়া উচিত। যদি তার বিভক্ত জ্ঞান কেবল এই হল জ্ঞান আর এই হল জ্ঞেয়র মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে সেই রকম জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কল্পনাতেও জ্ঞেয় বস্তু লাভ করতে পারবেন না। জ্ঞান লাভ করতে হলে আসক্তি পরিত্যাগ, ক্রোধ জয়, লঘু আহার, ইন্দ্রিয় জয় প্রভৃতিকে আত্মস্থ করে বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়কে আবৃত করে সমগ্র চিত্ত ধ্যানে সমর্পণ করা উচিত। আকাশের মতো অবকাশ স্থানে, গুহায়, নদীতটের সঙ্গে যোগীর নিত্য যোগাযোগ থাকা উচিত। যাঁর কথার ওপর কর্মের ও মনের সম্পূর্ণ শাসন রাখবার ক্ষমতা জন্মেছে অর্থাৎ যিনি বাগদণ্ড, কর্ম্মদণ্ড ও মনোদণ্ড সাধন করেছেন, তিনিই 'ত্রিদণ্ডী' নামে অভিহিত হলে থাকেন। এইভাবে যে যোগী সমাহিত ধ্যানে অনুরক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে শুভাশুভ উভয় প্রকার কর্মই ত্যাগ করতে সমর্থ হন, তিনিই এই দেহত্যাগের পর মুক্তি লাভ করেন। তাকে আর কোনোদিন জীবধর্মের বশীভূত হয়ে জন্ম-মৃত্যু ভোগ করতে হয় না।

.

১৭.

বায়ু বলে চললেন, এখন আমি যতিদের কামকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও তত্ত্ব আপনাদের কাছে বিবৃত করব।

সূক্ষকর্মবিদরা বলে থাকেন কামকৃত অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত পাপ ত্রিবিধ। বাক্যজ, মনোজ ও কায়জ জগৎ। এই সমস্ত কর্ম দ্বারাই দিবারাত্র আবদ্ধ। এ বিষয়ে পরমা শ্রুতির উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, কর্ম ও জগৎ কিছুই স্থায়ী নয়। এই ক্ষণিক জগৎ ক্ষণিক আয়ুর পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়। যোগই হল পরম বল। যোগভিন্ন মানুষের আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। ধার্মিক মনীষীরা এই কারণেই যোগবিদ্যার প্রশংসা করে থাকেন। যাঁরা পরমৈশ্চর্য ও ব্রহ্মলোক লাভ করেন, তারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

ভিক্ষুশ্রেণির কিছু সুনির্দিষ্ট ব্রত এবং উপব্রত আছে, তার মধ্যে কোনো একটির ব্যতিক্রম হলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। যেমন, কোনো ভিক্ষু যদি কামনার বশবর্তী হয়ে স্ত্রীগমন করেন তাহলে তাকে প্রাণায়ামের সাথে শান্তপন ব্রত প্রায়শ্চিত্ত রূপে পালন করতে হয়। এই কৃচ্ছসাধন সমাহিত হলে ঐ ভিক্ষু পুনরায় আশ্রমে ফিরে আসেন এবং জীতেন্দ্রিয় হয়ে ভিক্ষু ব্রত পালন করেন। মহান মনীষীগণ বলে থাকেন যে–ধর্মযুক্ত বচন পীড়াদায়ক হয় না। কোনো প্রসঙ্গেই পীড়াজনক বাক্য প্রয়োগ উচিত নয়। এই বিষয়ে ‘শ্রুতি’র নির্দেশ হল–”পীড়াকর বাক্য আপেক্ষা অধিক অধর্ম আর কিছুতেই হয় না“। দেবতা ও ধী সম্পন্ন মুনিরা বাক্যকেই শ্রেষ্ঠ হিংসা বলে থাকেন। এই যে বাক্যরূপ ধন তা হল মানুষের বাইরের প্রাণস্বরূপ। যিনি যার ধন হরণ করেন, তিনি তার প্রাণহরণ করেন। যে দুষ্টাত্মা এইরূপে পাপাচারণ করেন তিনি অসদাচারণ হেতু ব্রতচ্যুত হন। এইভাবে কার্য সম্পাদিত হবার পর পরিতাপ আসলে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সংবৎসরের সাধ্য চান্দ্রায়ম ব্রত চারণ করবে–এটিই হল শ্রুতির নির্দেশ। এক বৎসর পূর্ণ হলে তার পাপক্ষয় হবে। পাপক্ষয় হয়ে আবার যখন নির্বেদ জন্মায়, তখন সেই ব্যক্তি আবার অতন্দ্রিত হয়ে ভিক্ষু বৃত্তি অবলম্বন করবেন।

কায়মনোবাক্য সর্বভূতে অহিংসা প্রদর্শনই আমাদের পরম কর্তব্য। যদি কোনো ভিক্ষু অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো পশু বা মৃগের প্রতি হিংসা প্রদর্শন করেন, তবে তার কৃচ্ছাতিকৃচ্ছু চান্দ্রায়ন বিধেয়। যদি কোনো যতির কামিনী দর্শনে ইন্দ্রিয় দর্শনে ইন্দ্রিয় দৌর্বল্য হেতু বেতঃস্খলন হয়, তবে তিনি ষোড়শ বার প্রাণায়াম করবেন। আর যদি কোনো ব্রাহ্মণ দিনেরবেলায় রেতঃস্খলন

করেন তাহলে তাঁর ত্রিরাত্রি উপবাস ও শত সংখ্যক প্রাণায়াম বিধেয়। রাত্রিবেলায় রেতঃস্খলন হলে স্নান ও দ্বাদশ বার প্রাণায়াম বিধেয়। ব্রাহ্মণ প্রাণায়াম দ্বারাই নিষ্পাপ হয়ে শুদ্ধ হন।

একান্ত, মাংস, মধু, আমশ্রাদ্ধ ও প্রত্যক্ষ লবণ ভক্ষণ যতির অভোজ্য। এদের এক একটির লঙ্ঘনে কৃচ্ছ্রপ্রজাপত্য রূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপমুক্তির বিধান দেওয়া হয়েছে। ভ্রমবশত বাক্য ও মন ও কার্যজনিত পাপ কাজ হলে সেখানে সাধুদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য, যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ চিত্ত, যাঁর লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমান জ্ঞান এবং যিনি সমাহিত চিত্ত হয়ে সর্বভূতে সমানভাবে বিচরণ করেন, তিনিই ধ্রুব, শাশ্বত, অব্যয় এবং সজ্জনোচিত পরম অক্ষয় পদ লাভ করেন। এই স্থান প্রাপ্তির পর তাকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

.

১৮.

বায়ু বলতে লাগলেন, এবার আমি আপনাদের অরিষ্ট বিষয়ে অবহিত করব। অরিষ্ট সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞানে নিজের মৃত্যুকে চাক্ষুস করা সম্ভব। বলা হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি ধ্রুব, অরুন্ধতী, চন্দ্রচ্ছায়া ও মহাপথ দেখতে পান না, তিনি এক বৎসরের পর আর জীবিত থাকেন না। যিনি সূর্যকে রশ্মিহীন এবং অগ্নিকে রশ্মিময় দেখেন তিনি একাদশ মাসের বেশি জীবিত থাকেন না। যিনি স্বপনে বা জাগরণে মূত্র, করীষ, সুবর্ণ বা রজত বমন করেন, তিনি দশমাসকাল জীবিত থাকেন। যাঁর মাথার ওপর কাক, কপোত, গৃধ্র বা অপর কোনো মাংসাশী পাখি এসে বসে, তার জীবন ছয় মাসও স্থায়িত্ব পায় না। যিনি ঘন ঘন কাকের সারি বা ধূলিবর্ষণে আবদ্ধ হন, অর্থাৎ যাঁর চারিদিকে কাক উড়তে থাকে বা যাঁর চারপাশে ধুলো উড়তে থাকে অথবা যিনি নিজের বিকৃত ছায়া দেখতে পান, তিনি তার পরে আর চার-পাঁচ মাস জীবিত থাকেন। বিনা মেঘে যিনি দক্ষিণদিকে বিসুত দর্শন করেন, অথবা ইন্দ্রধনু দর্শন করেন, তিনি এক-দুই বা একাধিক তিন মাস কাল মাত্র জীবিত থাকেন। যিনি জলে বা দর্পণে মাঝে মাঝেই প্রতিবিম্ব দেখতে পান না, অথবা নিজেকে মস্তকহীন দেখেন তিনি কোনো অবস্থাতেই এক মাসের বেশি বাঁচেন না।

অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের শরীর শবগন্ধি বা দুর্গন্দগন্ধি হয়ে ওঠে। এমন হলে বুঝতে হবে তাঁর মৃত্যু ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। তিনি পনেরো দিনের বেশি বাঁচবেন না।

স্বপ্নের মধ্যে অনেক সময়েই মৃত্যুর আভাস ফুটে ওঠে। যিনি স্বপ্ন দেখেন যে তিনি ভালুক ও বানরযুক্ত রথে চড়ে বসেছেন আর গান করতে করতে এক কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিতা শ্যামাঙ্গি অঙ্গনা তাকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে ঐ ব্যক্তিও অচিরেই মারা যান। যিনি স্বপ্নে নিজেকে জীর্ণ বস্ত্রাবৃত দেখেন অথবা মনে করেন তিনি শ্রবণ শক্তিহীন তারও মৃত্যু ক্ষণ উপস্থিত। যিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি পাক সাগরে নিমজ্জিত হন তার মৃত্যু আসন্ন জানবেন। স্বপ্নে যদি কেউ ভস্ম, অঙ্গার, কেশ, শুষ্ক নদী ও ভুজঙ্গ দেখেন, তবে সেই ব্যক্তি দশ রাত্রিও আর জীবিত থাকবেন না বলে নিশ্চিত জানবেন। যিনি স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার কোনো ব্যক্তির উদ্যত অস্ত্রের দ্বারা নিজেকে তাড়িত অবস্থায় দেখবেন তিনি যে শীঘ্রই মরণ প্রাপ্ত হবেন তা নিশ্চিত।

যদি দেখা যায় সূর্যোদয় অর্থাৎ প্রত্যুষকালে কোনো শৃগালী চিৎকার করতে করতে কোনো ব্যক্তির দিকে এগিয়ে আসছে, তাহলে তার আয়ু শেষ হল বলে জানবেন। স্নানের সঙ্গে সঙ্গে যাঁর অতীব হৃদয়পীড়া উপস্থিত হয়, অথবা 'দন্তহর্ষ' নামে দন্তরোগ জন্মায়, তিনিও গতায়ু

বলেই বুঝতে হবে। যিনি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং যিনি দীপগন্ধ লাভ করেন না, তার জানা উচিত যে, তার মৃত্যু সমুপস্থিত। অন্যদিকে, যার মর্মস্থান বায়ুতে পীড়িত, যাঁর শরীর জলস্পর্শেও হর্ষ লাভ করে না, তার মৃত্যুও নিকটবর্তী। যিনি রাত্রিবেলা ইন্দ্রধনু ও দিনেরবেলা নক্ষত্রমণ্ডল দর্শন করেন, একে-অপরের চোখে নিজের প্রতিবিম্ব চাক্ষুস করেন না, তিনি বেশিদিন জীবিত থাকেন না। যার একটি নেত্র দিয়ে জল পড়ে, কর্ণদ্বয় স্থানচ্যুত হয়, নাসিকা বক্রাকৃতি হয়, তার জীবন গতপ্রায় বলে মনে করবেন। যাঁর জিহ্বা খরা ও কৃষ্ণবর্ণ, মুখ রিবর্ণ, দন্ত ও চিবুক রক্তবর্ণ তার মৃত্যু উপস্থিত। যাঁর শরীর থেকে বারবার শ্বেত সর্ষপের মতো স্বেদবিন্দু নিঃসৃত হতে থাকে, তার মৃত্যু সমীপে জানবেন। যাঁর রক্ত দৃষ্টি নানা দিকে পরিবর্তিত হলেও প্রধানত ঊর্ধ্বদিকে অবস্থান করে, যাঁর মুখ থেকে উত্মা নির্গত হয়, নাভি শুষ্ক হয়, মূত্র অত্যুষ্ণ ও অস্থানে পড়ে, তার জীবন সংশয় দেখা দিয়েছে জানবেন। তাছাড়াও আরও কয়েক প্রকার স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা উচিত। যিনি স্বপ্নে দেখেন যে তিনি মুক্ত কেশে হাসতে হাসতে গান ও নৃত্যরত অবস্থায় দক্ষিণদিকে যাচ্ছেন, তাঁর জীবনান্ত আসন্ন। যিনি স্বপ্নে দেখেন উট বা গদর্ভযুক্ত কোনো রথ তাঁকে দক্ষিণদিকে নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে তার জীবন অতি দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। দিনে বা রাত্রে যিনি স্বপ্নে নিজের ঘাতককে সামনে দেখেন এবং নিজেকে হত বলে মনে করেন তার জীবন সংশয় নিশ্চিত। যে ব্যক্তি স্বপ্নবস্থায় অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করেন, কিন্তু স্বপ্নের বিষয়টি স্মরণ করতে পারেন না, তার মৃত্যু অবশ্যই ঘটবে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে নিজের বস্ত্র শুক্ল, রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ দেখেন, নিশ্চয় জানবেন তাঁর মৃত্যু সমুপস্থিত হয়েছে।

এই সকল অরিষ্ট সূচিত শরীর এবং কাল আসন্ন হলে ধীমান বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তি ভয় বা বিষাদ ত্যাগ করতে আরম্ভ করবেন। তিনি পূর্বদিকে বা উত্তরদিকে গিয়ে কোনো পবিত্র সমতল নির্জন প্রদেশের সন্ধান করবেন, উপযুক্ত স্থান পাওয়া মাত্র উত্তরমুখে বা পূর্ব মুখে স্বস্তিকাসনে উপবেশন করে আচমন করবেন ও দেবাদিদেব মহেশ্বরকে প্রণাম করবেন। অন্য কোনোদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে সমস্ত শরীর ও গ্রীবাকে সমানভাবে ধারণপূর্বক মহেশ্বরকে আরাধনা করতে থাকবেন। তাকে দেখে মনে হবে বায়ুহীন স্থানে দীপ যেমন নিষ্কম্প ভাবে অবস্থান করে, সেই একইরকম ভাবে তিনিও উত্তরদিক প্রবণ দেশে যোগাতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির মতন যোগ অভ্যাস করবেন। তিনি যোগী-ব্যক্তি, তিনি প্রাণ অর্থাৎ পরম ব্রহ্মে রত থাকবেন, দুই চক্ষুকে স্পর্শ করবেন, শ্রোত্র, মন, বুদ্ধি ও বক্ষে চিত্তের ধারণা'কে ধারণ করবেন।

মৃত্যুলক্ষণগুলি প্রকৃষ্টভাবে জানতে পারার পর গতায়ু ব্যক্তি একশতবার বা আটশতবার 'ধারণা' কে মুদ্রায় ধারণ করবেন। তার 'ধারণা' নামক যোগের প্রভাবে বায়ু কোনোদিকে

পরিবর্তিত হবে না। তাকে এরপর সমাহিত অবস্থায় ওঁকারের দ্বারা দেহকে পূরিত করতে হবে, ওঁকার ধ্যানপরায়ণ যোগীর ক্ষয় নেই। তাই তিনি অমর, অক্ষয়।

.

১৯.

ধীমান বায়ু বললেন, এরপর আপনাদের ওঁকার প্রাপ্তির লক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলছি। ওঁকার ব্যঞ্জনাত্মক, এটি ত্রিমাত্রিক রূপে জ্ঞেয়। এর প্রথম মাত্রা বৈদ্যুতী, দ্বিতীয় মাত্রা তামসী, তৃতীয় মাত্রা নিগুণী রূপে বর্ণনা করা হয়। অক্ষর গামিনী মাত্রাকে এইভাবেই জানতে হবে। ঐ গান্ধারস্বসম্ভবা প্রাণস্বরূপিণী শক্তি গান্ধবীরূপে জ্ঞান করতে হবে। এই শক্তি যখন মস্তিষ্কে অনুভূত হয়, তখন সেই অনুভূতি পিপীলিকার স্পর্শের মতো মনে হয়। ওঁকার উচ্চারিত হয়ে যখন মূর্ধ্বায় উপলব্ধ হয় তখন যোগীপুরুষ ওঁকারময় হয়ে অক্ষরস্বরূপ হয়ে ওঠেন। 'প্রণব' হল ধনুঃ স্বরূপ, 'মন' হল তার শর, আর ব্রহ্মা হলেন লক্ষ্য। যদি অপ্রমত্তভাবে ঐ লক্ষ্য চিত্ত দ্বারা বিদ্ধ হয়, তবে জীব তন্মস অর্থাৎ ব্রহ্মময় হন। 'ওঁ' এই একাক্ষর ব্রহ্ম হৃদ-গুহ নিহিত থাকে। ঋক, যজু, ও সাম এই তিনটি বেদের সমষ্টি হল 'ওঁকার'। এদের ওঁকারের স্বরূপও বলা যেতে পারে, এই বেদত্রয়কে বিষ্ণুর তিনটি পদক্রম বা পদক্ষেপ হিসেবেও বর্ণনা করা যায়। ভূঃ, ভূবঃ ও স্বঃ–এই তিনলোক হল তিন অগ্নি। পারমার্থতঃ ওঁকারের চারটি মাত্রা। যে যোগীপুরুষ তাতে সংযুক্ত হন, তিনি তার সালোক্য লাভ করেন। অকার অক্ষর, উকার স্বরিত, মকার প্লতস্বরূপ–প্রণবের এই তিন মাত্রা তিনটি লোককে নির্দেশ করে। অকার ভূর্লোক, উকার ভুবর্লোক, এবং ব্যঞ্জনসহ মকার স্বলোক বলে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে এই ত্রিলোকাত্মক ওকারে মস্তকদেশই হল ত্রিপিষ্টপ।

ওঁকার ভুবনান্ত সমস্ত লোকের আশ্রয়ভূত। এটি ব্রহ্মপদরূপে অভিহিত হয়ে থাকে। রুদ্রলোক মাত্রা বিশিষ্ট শিবপাদ মাত্রাহীন–এই ধ্যান বিশেষে জীব সেই পদ লাভ করে। অতএব জীবের উচিত ধ্যানরত হওয়া। এমনটা মনে করা হয় যে, যে ব্যক্তি শাশ্বত পদ লাভ করতে চান, তিনি প্রযত্নে মাত্রাবিহীন অক্ষরের নিত্য উপাসনা করবেন। হ্রস্ব হল প্রথম মাত্রা, দীর্ঘ হল দ্বিতীয় মাত্রা, প্লুত হল তৃতীয় মাত্রা রূপে উপদিষ্ট হয়েছে। যথাযথভাবে এই মাত্রাগুলিকে আনুপূর্বিক জানতে হবে। যতটা সামর্থ্য এই বিষয়ে ঠিক ততটাই ধারণা রাখতে হবে। আত্মাতে ইন্দ্রিরস মন ও বুদ্ধির উপাসনা করলে যে ফল পাওয়া যায়, এই অষ্টমাত্রা ওঁকার উপাসনা দ্বারাও যোগী সেই ফল লাভ করেন। ওঁকার মাত্রার এই উপাসনা দ্বারা যে সকল ফল পাওয়া যায়, শতবৎসর ধরে মাসে মাসে অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেও সেই ফল পাওয়া যায় না। বলা হয়ে থাকে শত বৎসর ধরে প্রতিমাসে কুশাগ্র দ্বারা জলবিন্দু গ্রহণ দ্বারা তপস্যা করলে যে পুণ্যফল সঞ্চিত হয়, এই মাত্রা উপাসনাতেও সেই একই ফল লভ্য হয়। এমনকি প্রভুর জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে যেসব বীরপুরুষেরা প্রাণত্যাগ করে পুণ্য সঞ্চয় করে, মাত্রা উপাসনা অর্থাৎ ওকার সাধনাতেও

সেইরূপ ফল লাভ করা যায়। উগ্র তপস্যায় প্রচুর দক্ষিণা যজ্ঞেও সেই পুণ্যফল লাভ করা যায় না।

পূর্বে যে অর্ধমাত্রা ও পুতমাত্রা ওঁকারের কথা বলা হয়েছে, তাঁকে উপাসানর সেসব ঐশ্বর্য তারা সবাই সমান। তবুও এর উপাসক যোগীদের অণিমাদি আটপ্রকার ঐশ্বর্য হয়ে থাকে। অতএব ব্রাহ্মণদের অবশ্য কর্তব্য হল এই ওঁকারের উপাসনায় নিয়ত থাকা। যোগযুক্ত পুরুষ যদি শুচি, দমনশীল ও জিতেন্দ্রীয় হয়ে উপাসনা করে আত্মাকে লাভ করেন, তাহলে তিনি সংসারের সবকিছুই লাভ করেন। ব্রাহ্মণ মাত্রেই যোগজ্ঞান দ্বারা ঋক্, যজুঃ, সাম বেদোপনিষদের সবকিছুকে জানতে পারেন। উপাসনার ফলে যোগীপুরুষ সর্বভূতের লয়স্থান প্রাপ্ত হন। নিজে উৎপত্তি প্রভৃতি বিকারবর্জিত হয়ে বীর্য কারণ অতিক্রম করে শাশ্বত পদ লাভ করেন। শুধু তাই নয়, এই ধ্যানের দ্বারা যোগী পুরুষ দিব্য চক্ষু লাভ করে চতুর্মুখী বিশ্বরূপাখ্যা প্রকৃতিকে দর্শন করেন। রক্ত, শুক্ল ও কৃষ্ণ–নিজের অনুরূপ এই ত্রিবর্ণের বহু বহু সন্তান প্রসবকারিণী অথবা বহু বহু কার্য উৎপাদনকারিণী রক্ত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপা। প্রকৃতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে কোনো অজা অর্থাৎ জন্মরহিত অবিদ্যাগ্রস্ত জীব তাকে ভেগ করে। কিন্তু অন্য-অন্য জীব তার ভোগের অবসানে সেই অজাকে অর্থাৎ সেই ত্রিগুণা প্রকৃতিকে ত্যাগ করে। এই অষ্টাক্ষরা যোড়শপানিপাদ চতুমুখী ত্রিশিরা একশৃঙ্গা আদ্যা অজ বিশ্বসৃষ্টিকারিণী স্বরূপাকে জেনে জ্ঞানীপুরুষরা অমৃতত্ত্ব লাভ করেন। যে ব্রাহ্মণরা ঐ প্রণবের ধ্যান করেন তাদের আর বারবার এই সংসারে যাতায়াত করতে হয় না। যিনি এই অক্ষয় অক্ষয় ব্রহ্মাকে ওঁকার-এর উপাসনা করেন বা অধ্যাপনা করেন, অথবা ধ্যান করেন, তিনি সংসার চক্র অতিক্রম করে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হন। তিনি অচিরেই সেই স্থান লাভ করেন যা অচল, নিগুণ ও মঙ্গলময়।

এতক্ষণ আমি ওঁকার প্রাপ্তির লক্ষণগুলির কথা আপনাদের কাছে বর্ণনা করলাম। মনে রাখবেন, সংকল্পাত্মক জগতের আশ্রয়স্বরূপ লোকেশ্বর মহান মহঘলরূপা। নির্গুণ সর্বত্রস্থিত সেই পরমব্রহ্মকে নমস্কার করি, যিনি ভক্তযোগীর অভীষ্ট ফল দান করে থাকেন। জলকে ধারণ করে পদ্মপাত্র যেমন বিশুদ্ধ থাকে, তেমনই ওঁকার রূপী ব্রহ্ম এই সৃষ্ট জগৎকে ধারণ করেও তার থেকে স্বতন্ত্র। তিনি সমস্ত পবিত্র বস্তুর মধ্যে পবিত্র। এই যে হ্রস্ব-দীর্ঘ- প্লতবিশিষ্ট ওঁকার তা কিন্তু শব্দের সাম্য নয়। তার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ কিছুই নেই। এই ব্রহ্মই ধ্যানী যোগীর উপাস্য। এই ব্রহ্মকে প্রণাম করি। সমগ্র বিশ্বই তার রূপ। তিনি অবিদ্যার ঈশান অর্থাৎ অবিদ্যার নিয়ন্ত্রক। তিনি দ্যুলোককে উগ্র আর পৃথিবীকে দৃঢ় ও শব্দময় করেছিলেন। তিনি নাক নামক স্বর্গ ও আকাশস্বরূপ ও দেবতাদের হৃদয় বিশ্বের স্বরূপ। তার প্রাণ ও অপানের

সাথে কারো উপমা হয় না। এই ওঁকারই বিশ্ব, যজ্ঞ, বেজ ও নমস্কার স্বরূপ, ইনিই রুদ্র। এই যোগশ্বর অধিপতি রুদ্রকে নমস্কার। যেহেতু এই রুদ্র কামনানুসারে ফল প্রদান করেন, তাই সায়ংকাল, প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নকালে পরম সিদ্ধিপ্রদ এই রুদ্রকে নমস্কার করি।

অকস্মাৎ বায়ুচালিত হলে পাকা ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়, তেমনই সিদ্ধিপ্রদ রুদ্রের নমস্কারে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। অন্য দেবতার প্রতি নমস্কারে যে ফল পাওয়া যায় না, রুদ্রের নমস্কারে তাই হয়। অর্থাৎ ইহা সর্বধর্মফলস্বরূপ। সুতরাং যোগী পুরুষের উচিত তিনকালে (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা) রুদ্র মহেশ্বরের উপাসনা করা। দশ আঙ্গুল পরিমিত বিস্তৃত স্থান থেকেও বিস্তৃত ব্রহ্মরূপ ওঁকারের উপাসনা সর্বকালেই বিহিত। ওঁকারের উপাসনা করলে মহাযশা হয়। বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হয়।

যজ্ঞ প্রণবের স্তব করে, নমস্কার যজ্ঞের স্তব করে, রুদ্র নমস্কারের স্তব করে সুতরাং শিবই হলেন রুদ্রপাদ, যে যোগী ব্যক্তি এই যদি রহস্য যথাক্রমে ধ্যান করেন ও অধ্যাপনা করেন, তিনিই নিঃসংশয় ভাবে পরমপদ লাভ করেন।

.

২০.

রোমহর্ষণ সূত বললেন, সে সময় নৈমিষ আরণ্যবাসী অগ্নিকল্প ঋষিদের মধ্যে সাবর্ণি নামে কোনো এক শ্রুতিধর প্রাজ্ঞ ঋষি ছিলেন। মহাদ্যুতি বায়ুদেবতা সত্র যাজকদের প্রিয় কাজ করতে সর্বদা সতত তৎপর, বাক্যবিশারদ সাবর্ণি ঋষি তাই তার কাছে এগিয়ে এলেন, সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে বিভু, আপনি সর্বদর্শী, আপনার প্রসাদে আমরা বেদানুমোদিত পুরাণকথা ভালোভাবে বিস্তার পূর্বক শুনতে ইচ্ছা করি। আমরা জানতে ইচ্ছা করি, ভগবান হিরণ্যগর্ভ কীভাবে ললাট থেকে তেজঃস্বরূপ নীললোহিত দেবতাকে নিজের পুত্ররূপে লাভ করলেন। কীভাবে ভগবান ব্রহ্মা পদ্ম থেকে উদ্ভূত হলেন। কীভাবে নিজপুত্র শংকরের রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হল। আর কেনই বা সমস্ত দেবতাদের মধ্যে প্রীতির উদ্ভব হল, আর কেনই বা সমস্ত দেবতারা বিষ্ণুময়, সমস্ত গণেরা বিষ্ণুময়, কেন বিষ্ণুনাম বিনা আর কোনো গতি নেই, দেবতারা কেন তাকে সতত কীর্তন করে থাকেন, কেনই বা ভগবান হরি ভবকে প্রণাম করেন?

সূত বললেন, এইরকম অনুরোধ করা হলে ভগবান বায়ু সাবর্ণিকে বললেন, হে সাধু সাবর্ণি, আপনি অতি উত্তম প্রশ্ন করেছেন, ব্রহ্মা কীভাবে পদ্মযোনি হলেন, ভব কীভাবে ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্মলাভ করেন। শংকর কীভাবে রুদ্র’ নামে পরিচিত হলেন, কী প্রকারে বিষ্ণু ও ভবের মধ্যে প্রীতির সঞ্চার হল, শংকরের প্রতি বিষ্ণু কেনই বা সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করেন– এসবই আমি আপনাদের কাছে বিস্তারিতভাবে এবং আনুপূর্বিকভাবে বলছি, আপনারা শ্রবণ করুন। এছাড়াও বর্তমান বরাহকল্পের পূর্ববর্তী যে সপ্তম পদ্মকল্প তার কথাও আমি আপনাদের নিকটে বিস্তারিত ভাবে বলব।

সাবর্ণি বললেন, হে সাধুশ্রেষ্ঠ বায়ু, কতখানি সময় নিয়ে এক একটি কল্প হয় এবং কীভাবে হয় তাও

আমাদের জিজ্ঞাসা। তাছাড়া কল্পের প্রমাণ কী? দয়া করে আমাদের এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিন।

বিভু বায়ু বললেন, আমি সংক্ষিপ্ত আকারে এবং ক্রম অনুসারে সপ্ত মন্বন্তরের কাল সংখ্যা বলছি, আপনারা শুনুন।

দ্বিসহস্র অষ্টশত দ্বিষষ্টিকোটি সপ্ততি নিযুত কাল হল প্রত্যেকটি অর্ধকল্পের পরিমাণ। পূর্বোক্ত গুণচ্ছেদ দুটি বর্ষাগ্র’ নামে খ্যাত। এই বর্ষাগ্রের পরিমাণ হল বৈবস্বত মন্বন্তরের মধ্যবর্তী মানুষ

প্রমাণ অনুসারে একশত অষ্টসপ্ততি কোটি ও দুই সহস্র দুই শত নবতি নিযুত। এই কল্পার্ধকালকে দ্বিগুণ করলে যে কাল পরিমাণ পাওয়া যায়, তাই কল্পকালের পরিমাণ রূপে জ্ঞান করা হয়। কিন্তু অনাগত সপ্তকালের কাল পরিমাণ হল–অশীতিশত অষ্টপঞ্চশত ও চতুশীতি মেশালে যে পরিমাণ হয়, সেই পরিমাণ। বর্ষাগ্রের পরিমাণ প্রত্যেক কল্পের বর্ণনাকালে জানতে পারবেন। এছাড়া কল্পকালের সপ্তঋষি, মনু, ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রমুখ বিষয়েও আপনারা যথাসময়ে অবহিত হবেন, এর মধ্যেই মন্বন্তরের মানবগণ, প্রণবাণত দেবগণ, সাধ্যসমূহ এবং শাশ্বত বিশ্বদেবগণ বর্তমান আছেন। স্বয়ম্ভুবাদি মনু কর্তৃক অধিকৃত এই কল্পের নাম বরাহকল্প।

ঋষিরা প্রশ্ন করলেন, হে বিভু বর্তমান কল্পের নামে কেন কী কারণে বরাহ কল্প রাখা হল, আপনি বিস্তারপূর্বক বলুন ভগবান বরাহ কে, কোন্ যোনিতে তাঁর জন্ম হয়েছে, কীভাবে তিনি প্রাদুর্ভূত হয়েছেন, এসবই আমরা জানতে ইচ্ছা করি।

সর্বজ্ঞ বায়ু বললেন, একটি বিশেষ প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে ভগবান বরাহ রূপ ধারণ করেছিলেন, যেভাবে তা বরাহ কল্পে কল্পিত হয়েছে। এবং এই দুই কল্পের মধ্যবর্তী সময়ে যেসব ঘটনা ঘটেছে বলে আমি শুনেছি এবং যা আমি যেমন যেমন ভাবে দেখেছি, তা সবই বর্ণনা করব।

আদি লোকসৃষ্টির প্রথমকালেই 'ভব' নামক কল্পের ধারণা করা হয়। এই কল্পে ভগবান 'আনন্দ' রূপে আবির্ভূত হন। ভবকল্পের অবসানে সেই সপ্তম ভগবান আনন্দ দিব্য ব্রহ্ম স্থান লাভ করেন। পরপর আসে দ্বিতীয় কল্প, যা 'ভুব' নামে বিদিত হয়ে আছে। পরবর্তী তৃতীয় থেকে চতুর্দশ পর্যন্ত কল্পের নাম যথাক্রমে তপঃ', 'ভাব', 'রম্ভ', 'ঋতু', 'ক্রতু', 'বহ্নি', 'হব্যবান', 'সাবিত্র', 'ভুব', 'উশিক', 'কুশিক', এবং 'গান্ধার'। আবার পঞ্চদশ কল্পের নাম হল 'ঋষভ'। এই কল্পের লোক মনোহর ঋষভ স্বর এবং ঋষি সমূহ আবির্ভূত হন। এইভাবে ষোড়শ কল্পের নামকরণ করা হয়েছে ষড়জ। এতে শিশির, বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত নামে ব্রহ্মার ছয়-ছয়টি মানসপুত্র উৎপন্ন হয়েছিলেন। এঁরা প্রত্যেককেই ছিলেন ষড়জ-স্বয়ং সিদ্ধ ঋষি। এঁদের থেকে মহেশ্বর এবং সাগর-সদৃশ ষড়জস্বর জন্মগ্রহণ করেন।

এরপর এল 'মার্জালীয়' কল্প নামে সপ্তদশ কল্প। মার্জালীয় নাম ব্রাহ্মকর্মের সংকল্প করা হয়েছিল এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। অষ্টাদশ কল্প 'মধ্যম' নামে খ্যাত। এতে ধৈবত স্বর

উৎপাদিত হয়েছিল। ঊনবিংশ কল্পে বৈরাজ নামে ব্রহ্মার এক মানসপুত্র মনু জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে এই পর্বের নাম রাখা হয়েছে 'বৈরাজ'। এই মনুর পুত্র হলেন মহাতেজস্বী, ধর্মাত্মা, ধার্মিক প্রজাপতি দধীচি। পরবর্তী সময়ে তিনি ত্রিদশাধিপতি হয়েছিলেন। গায়ত্রী এই দধীচি প্রজাপতিকে বিবাহ করেছিলেন। আর দধীচির ঔরসে গায়ত্রীর গর্ভে যজ্ঞেশ্বর নামে দধীচির প্রিয় পুত্র জন্ম নেন।

এরপর এল 'নিষাদ' নামক বিংশতি কল্প। স্বয়ম্ভু উৎপন্ন নিষাদের আবির্ভাব সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে হৃষ্ট করেছিল। তাই এই সময়ে তিনি প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে বিরত হন। এই সময়ে নিরাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে নিষাদও দিব্য পরিমাণে সহস্র বৎসর পর্যন্ত তপস্যা করেন। তার ফলে মহাতেজা লোকপিতামহ ব্রহ্মা তপোম্লান ক্ষৎ-পিপাসাপীড়িত ঊর্ধ্ববাহু শান্ত "নিবৃত্ত হও" অর্থাৎ "নিষাদ" বলে নিষ্ক্রিয় করেন। তাই তার নাম হয় নিষাদ। নিষাদস্বরও এই কল্পে উদ্ভূত হয়েছিল।

একবিংশতি কল্পের নাম 'পঞ্চম। এই কল্পে ব্রহ্মার পাঁচটি মানস পুত্র আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারা হলেন আপান, সমান, উদান, ব্যান, এবং প্রাণ। এঁরা সুমধুর সমবেত পঞ্চম স্বরে মহেশ্বরের স্তব করতে থাকেন। তাই এই স্নিগ্ধ কল্পের নাম রাখা হয় পঞ্চম।

দ্বাবিংশ কল্প "মেখবাহন" নামে পরিচিত। এই কল্পে মহাবাহু বিষ্ণু মেঘরূপ ধারণপূর্বক দিব্য পরিমাণ সহস্র বৎসর ধরে মহেশ্বর কৃত্তিবাসকে বহন করেছিলেন। এই কল্পের শেষে বিষ্ণু ভারাক্রান্ত হয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাই লোকপ্রকাশক মহাকায় কালের উদ্ভব ঘটে। এই কল্পই 'কশ্যপপুত্র বিষ্ণু' নামে খ্যাত।

ত্রয়োবিংশতি কল্পের নাম 'চিন্তক'। প্রজাপতি পুত্র শ্রীমান চিন্তি ও মিথুন একসঙ্গে ব্রহ্মার উপাসনা করতে আরম্ভ করেন এই সময়ে। ফলে চিন্তার উৎপত্তি হয়। এই হেতু এই কল্পেরও নাম রাখা হয় চিন্তক।

চতুর্বিংশতি কল্পের নাম রাখা হয় 'আকৃতি'। এই কল্পে আকৃতি ও দেবীর উৎপত্তি হয়। পঞ্চবিংশতি কল্পের নাম 'বিজ্ঞাতি'। এতে বিজ্ঞাতি নাম্নী মহাদেবী মিথুন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই কল্পে পুত্র কামনা করতে করতে ধ্যানমগ্ন হিরণ্য গর্ভের মনোমধ্যে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের জন্ম হয়। তাই এই কল্পের নাম বিজ্ঞাতি। ষড়বিংশ কল্প হল 'মন'। এই কল্পে দেবী শংকরী মিথুন এসব করেছিলেন এবং স্বয়ম্ভু এই সময়ে

প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করেন। তাই ভাবনার উদ্ভব হয়, সে কারণেই সপ্তবিংশতি কল্প ‘ভাব’ নামে পরিচিত। এই কল্পে দেবী পৌর্ণমাসি সৃষ্টি কামনায় পরমাধ্যানে তৎপর পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সাথে মিলিত হন। এই ভাবকল্পে অগ্নি রশ্মিজালে সমাচ্ছন্ন হয়ে মণ্ডলাকার ধারণ করেন এবং বিশাল সেই অগ্নি ভুবলোকে এবং দিব্যলোককে নিয়ন্ত্রিত করে প্রকাশ পেতে থাকলেন। এইভাবেই সহস্র বর্ষ কেটে গেল। তারপর পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা পূর্ণ জ্যোতির্মণ্ডলে উৎপন্ন সূর্যমণ্ডলকে দেখতে পেলেন। সেই সূর্যমণ্ডল ভূতদের অদৃশ্য। যেহেতু পূর্ণমণ্ডল ভগবান সূর্যদেব এবং তার সাথে সাথে যোগ এবং মন্ত্র–এদের সব কিছুকে দর্শন করা হয়েছিল, এই কারণে এই কল্পকে বলা হয় দর্শকল্প। পূর্বে ভগবান সোম যে সময়ে পরমেষ্টী ব্রহ্মার মনোমধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছিলেন, এই কারণে সেই সময়ের নাম পৌর্ণমাসী, যোগীরা আপন আপন হিত কামনায় পৌর্ণমাসীকে উভয়পক্ষের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বলে স্বীকার করে থাকেন। যে দ্বিপাতিরা এই দর্শ ও পৌর্ণমাসীকালে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা ব্রহ্মলোক থেকে আর কখনও ফিরে আসেন না। অথবা যে লোক অগ্নি স্থাপন করে সংযত হৃদয়ে বীরাচার অবলম্বন করেন এবং ক্ষমাহিত মনে “ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহো দিব হৃং শার্ব্বে মারুতং পৃষ্ঠ ঈশিষে। ত্বং পাশা গান্ধর্ব শিষ্যং পুষা বিধত্তপাশিনা”–এই বলে তারা তীব্রতার সাথে অথচ ধীরে ধীরে এবং মনে মনে উত্তম ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন। মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতেই তারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করেন এবং রুদ্রলোকে গমন করেন।

অষ্টবিংশতি কল্পের নাম ‘বৃহৎ’। এই কল্পে পুত্র কামনায় ব্যাকুল ব্রহ্মা সৃষ্টি ইচ্ছায় ধ্যান পরায়ণ পুন। তারপরেই রথন্তর ও কৃত সাপের উৎপত্তি হল। এই কল্পেই সর্বতোমুখ ‘বৃহৎ’-এর উৎপত্তি হয় বলে তত্ত্বচিন্তকরা এই কল্পকে ‘বৃহৎ কল্প’ বলে বর্ণনা করে থাকেন। অষ্টআশি সহস্র যোজন পরিমিত বিরাট সূর্যমণ্ডলকে রথন্তর বলা হয় থাকে। আর এর মধ্যে যে অভেদ্য সূর্যমণ্ডল আছে তাকে বলা হয় বৃহৎ সোম। কেবলমাত্র দৃঢ়ব্রত যোগাত্মার দ্বিজগণ তাকে ভেদ করে চলে যেতে পারেন। এতক্ষণ আমি সংঘাত, উপনীত এবং অন্যান্য কল্প অর্থাৎ অধ্যাত্মদর্শনুকুল চিত্তে বিবিধ বিষয়গুলি ব্যক্ত করলাম। এরপর আমি কল্প বিবরণ বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করব।

৩১.

অন্য অন্য পর্বত সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে সূত বললেন, এই চক্রবাট গিরি প্রজাপতির অমরবৃন্দের দ্বারা পরিপূর্ণ। অতিউচ্চ প্রাকার ও তোরণে শোভিত এই গিরিটি বলদৃপ্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষসদের কাছেও দুর্ধর্ষ বলে বিবেচিত হয়। এই গিরিটি দেবতাদের শত শত দ্বার ও বলভি দ্বারা চিত্রত, শত শত প্রতোলী দ্বারা মণিজত, তপ্ত জাম্বনদে পরিপূর্ণ এবং সিদ্ধ মহাত্মাদের অসংখ্য কোটি কোটি নানা রত্ন দ্বারা চিত্রত বিশাল ভবনে বিভূষিত। এর উত্তর ও পূর্বদিকে যে অতিরিক্ত স্থানটুকু আছে তা সমান দীপ্তিময়, রত্ন বিভূষিত, মনোরম অমরগণে আকীর্ণ এবং শুভ্রকান্তি তরু বিমণ্ডিত। এখানে এই চক্রবাটের সামনে মনোহর অমরাবতী নামে এক পুরন্দর পুরী আছে। এই ইন্দ্রপুরী অমরাবতী রম্য সমৃদ্ধ। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকায় সমাকীর্ণ এই পুরী শত শত বিমানে ও শত শত সুবৃহৎ জলাশয়ে পরিপূর্ণ। এখানে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত আছে বিশাল বিশাল দেব বিমান, পুষ্কর, সরোবর, সমস্ত নগরীই চিত্র-বিচিত্রিত পতাকা ও মালা দ্বারা শুশোভিত। নগরীর সর্বত্র এমনই একটি শান্তির ঐশ্বরিক বাতাবরণ সদা সর্বদা বিরাজ করে যে এখানকার বিবিধ আশ্রম সংলগ্ন যে তপঃস্থান সেখানে এসে পুণ্যবান মহাযজ্ঞ, মহানাগ, মহাগন্ধর্ব, মহাসাধু, মহা অপ্সরা, মহামুনি এবং আর আর সিদ্ধ মহাপুরুষগণ আশ্রয় নিয়েছেন।

এই মহাপুরীর মাঝখানে আছে মহেন্দ্রর বহু লোকপ্রসিদ্ধ মনোহর 'সুধর্মা' নামে এক সভা। ঐ সভায় দেবতা ও মহাত্মা ঋষিরা সুখে অবস্থান করেন। হেমজাল সংস্কৃত এই সভার সম্মুখভাগ তোরণ ও দ্বারে সুশোভিত। বহু দুর্মূল্য রত্নখচিত সহস্র স্তম্ভ ওই সভার ছাদকে ধারণ করে আছে। সভার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূমিভাগ বিবিধ রত্নে চিত্রিত। তার ওপর বিচিত্র এক তোরণবেদী রচিত হয়েছে। বেদীর উপরিভাগ মহামূল্য রত্নখচিত দুর্লভ আস্তরণে ও আসনে পরিবৃত। বিচিত্র সূত্রবদ্ধ রত্নসমূহ ও বিচিত্র রত্নবলয়ে সমুজ্জল এই সভা বহু মনোরম পুষ্পমালায় সুশোভিত। ওই মালা বায়ু দ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত হতে থাকে। সভাটি বিশেষভাবে কনক-উজ্জ্বল-কান্তি পরিজাত কুসুমে বিরচিত লম্বমান মালায় সমুজ্জ্বল। ওই সভায় দ্যুতিমান রুদ্র, মরুৎ, বসু, আদিত্য, পক্ষীরাজ, পিতৃ, দেব, গন্ধর্ব, অপ্সরা, মহাসরীসৃপ, সাধ্য, ঋষি এবং ব্রহ্মা নিয়ত অবস্থান করেন। পরম বিভূতি ও দ্যুতিতে পরিপূর্ণ এই সভায় দেবতার অধিষ্ঠান ঘটান যে চতুর্দিকে দেবতেজঃ রাশি বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায়।

ওই সভায় শ্রীমান শ্রীপতি সহস্রাক্ষ পুরন্দরদেব বসে আছেন। তারই পাশে অধিষ্ঠান করেছেন মহাযোগী দেবর্ষি ও দেবতারা। সূর্যসম তেজের অধিকারী লেকপতি মহারাজ, মহেন্দ্রর এই স্থানটিকে সমস্ত সিদ্ধরা পূজা করে থাকেন। দেবরাজ বিরাজিত এই স্থানটি প্রচুর সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দেবতাদের নিত্য নৈমিত্তিক সেবায় স্থানটি প্রদীপ্ত। পূর্বোল্লিখিত ব্রহ্মসভার দক্ষিণ-পূর্বাংশের উচ্চতর দ্বিতীয় তটে একটি উদ্যান আছে। জাম্বুনদে সিঞ্চিত এই উদ্যানটি অসংখ্য রত্নময়, নানা ঋতুতে চিত্রত সুরম্য, অতি তেজোময়, অনেক অনেক স্তম্ভযুক্ত এবং সুন্দর সুন্দর বহু রত্নবেদীতে শোভিত।

এই উদ্যানে সূর্যের মতো দীপ্ত এক অতি উৎকৃষ্ট মহামণ্ডপ আছে। মণ্ডপটি হল অগ্নিদেবের তেজোময়ী মহাসভা। শত সহস্র শিখায় সমুজ্জল জ্বালাময়ী দেবশ্রেষ্ঠ সর্বদেবের মুখ স্বরূপ অগ্নিদেব সেখানেই বিরাজ করছেন। এই মহামণ্ডপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নিদেব সেখানে দ্যুতিমান দেবতা ও ঋষিগণের দ্বারা স্তুত ও আহূত হয়ে থাকেন। বিপ্রগণ তাঁকে দেবতা বিশেষ রূপেই অভিহিত করে থাকেন। কারণ তার সর্বত্রই অগ্নিকে তেজের বিভাগ রূপে দেখে থাকেন। সেই একই বিভুতেজ যুক্তি অনুসারে কার্যকারণ রূপে পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। বীর্য ও পরাক্রমবশতঃ সেই অগ্নি বিবিধ লোকজ্ঞ, মহাসিদ্ধ, মহাভাগ ও মহাত্মাদের দ্বারা নমস্কৃত হন।

এই অগ্নিদেবের আভ্যন্তরীণ তৃতীয় তটে বৈবস্ততের সুসংযমা' নামে একটি বিখ্যাত সভাগৃহ আছে। চতুর্থ দিকের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নৈঋত্যা অধিপতির সভা আছে। সভাটির নাম, 'কৃষঙ্গনা। এবং সভাটি ধীমান বিরূপাক্ষের। পঞ্চম দিকের তটেও অনুরূপভাবে জলধিপতি মহাত্মা বৈবস্বত বরুণের একটি 'শুভবতী' নামক সভা আছে। ষষ্ঠ তটে আছে পবনদেবের সর্বগুণোত্তম 'গন্ধবতী' নামক সভা। এটি বায়ু কোণে অবস্থিত। এছাড়া সপ্তম তটে উত্তরদিকে নক্ষত্রধিপতির শুদ্ধ বৈদুর্য বেদীময়ী 'মহোদয়া এবং অষ্টম তটে বা শৃঙ্গে ঈশান কোণে মহাদেবের তপ্ত কাঞ্চনপ্রভ 'যশোবতী' নামে সভা প্রতিষ্ঠিত আছে।

এই সভাস্থলের আটদিকে ইন্দ্রাদি আটজন দেবপ্রধানের আটটি মহা বিমানযান সদা বিরাজমান থাকে। মহাভাগ বেদবেদাঙ্গবিদ ঋষি, দেব, গন্ধর্ব, অপ্সরা এবং মহা সরীসৃপেরা নিয়মিত এ সভাস্থলে এসে এই দেববিমানগুলির সেবা করে থাকেন। তাঁরা স্বর্গের পর্যায়বাচক শব্দ প্রয়োগ করে এই সভাকে সংযতাত্মা দেবগণের বামস্থান বলে বর্ণনা করে থাকেন। স্থানটি গিরিমধ্যবর্তী দেবলোক রূপেও সমস্ত শ্রুতিতে গীত হয়ে থাকে। সংযতাত্মা ব্যক্তিরাই বিবিধ নিয়ম, বহু যজ্ঞ ও অসংখ্য শত শত জন্মে অর্জিত পুণ্যের দ্বারা যে দেবলোক লাভ করে

থাকেন, তাই-ই স্বর্গ বলে অভিহিত হয়ে থাকে। এই কারণেই এই মেরুপবত স্বর্গ বলে সর্বজন মাঝে বর্ণিত হয়ে থাকে।

.

৩২.

সূত বললেন, আপনাদের কাছে ইতিপূর্বে মেরুকর্ণিকার মূলের কথা বলেছি। এই মূলভাগ এক হাজার যোজন বিস্তৃত ও আটচল্লিশ হাজার যোজন পরিধি বিশিষ্ট, সেই হাজার হাজার পর্বতের মধ্যে যেসব পর্বত অতি-উচ্চ, কেবলমাত্র সেইসব পর্বত এই মেরুমূলের চারিদিকে অবস্থিত। এইসব পর্বতরাজি নিকুঞ্জ, কৃত্রিম গিরিগুহা, নদী ও নিঝর শোভিত। এছাড়া গিরিপ্রপাত, লম্বমান পুষ্পমালা, কুসুমসম উজ্জ্বল তটদেশ, ধাতুমণ্ডিত সানুদেশ এবং অনেক অনেক প্রস্রবণা বৃত হেম ও কপিল বর্ণের শিখরও এইসব উচ্চতম পর্বতরাজির শৃঙ্গে শোভা পায়। আবার বহুবিধ রত্ন ও শত শত বিহঙ্গে সেবিত অনুপমগুণ কুঞ্জ দ্বারাও এইসব পর্বত শোভমান হয়ে থাকে। পশুরাজ সিংহ, শার্দুল, শরভ, একাধিক চামর, বানর, পক্ষী, এদের দ্বারাও এই পর্বতগুলি সেবিত হয়। পূর্বদিকে অবস্থিত জঠর ও দেবকূট নামে মণিকর্ণিকার দুটি পর্বত উত্তর– দক্ষিণে বিস্তৃত নীল ও নিষধ পর্বতের সাথে সংযুক্ত। উত্তর দক্ষিণের দুটি স্বখ্যাত পর্বত হল কৈলাস এবং হিমালয়। আর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী পর্বত হল নিষধ এবং পরিপাত্র। এ দুটি পর্বতও পূর্বের মতো দীর্ঘ এমন একটি শ্রুতিবাক্য প্রচলিত আছে। উত্তরের দুটি উৎকৃষ্ট পর্বতশৃঙ্গ হল ত্রিশৃঙ্গ ও জরুথি এরা পূর্ব-পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

মনীষীরা পূর্বোক্ত আটটি পর্বতকে মর্যাদা পর্বত’ বলে থাকেন। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ, আমি এখন আপনাদের সমীপে দীর্ঘকায় কনক পর্বতের বিষয়ে তথ্য প্রদান করছি, আপনারা একাগ্র মনে শুনুন।

মেরুর চারিদিকে চারিটি পাদ বিদ্যমান আছে। তাদের আয়তন প্রায় দশ সহস্র যোজন। এদের দ্বারা বিধৃত বলেই সপ্তদ্বীপবর্তী পৃথিবী বিচলিত হয় না। এই সব পর্বতদেশ দেব, গন্ধর্ব ও যক্ষদের নানা রত্নে উপশোভিত। রত্ন-আকর বলে শুধু নয়, অসংখ্য সুন্দর নিঝর ও গিরিকর এই সকল পর্বতের শোভাবর্ধন করছে। এমনকি এইসব পর্বতের যেসব বিচিত্র সানুদেশ সেগুলিও নিতম্ব ও কদম্ব পুষ্পে শোভিত। এছাড়া এই সব পর্বত চতুর্দিক হতে মনঃশিলা, হরিৎ আভাযুক্ত তট, সুবর্ণ মণিচিত্রিত গুহা, শুদ্ধ হিলোক নামক ধাতুমণ্ডিত উৎকৃষ্ট কাঞ্চনচিত্রিত

জলপ্রপাত দ্বারা সমলংকৃত। সুন্দর শত পর্বত বিশিষ্ট সিদ্ধ নিবাস, আনন্দময় এইসব পর্বত চারিদিকে শ্রীময় মহাবিমানে পরিবেষ্টিত এই সকল পর্বতই মেরুর পাদ নামে প্রসিদ্ধ।

এই চারিটি পাদ চারিটি দিক অধিগ্রহণ করে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিরুল এবং উত্তরে সুপার্শ্ব নামে পর্বত বিরাজমান। এই মেরুপাদেপর সহস্র শৃঙ্গে ব্রজের মতো কঠিন বৈদূর্যমণি নির্মিত বেদীর ওপর চারিটি মহাবৃক্ষ বিদ্যমান, বেদীগুলি সহস্র শাখায় বেষ্টিত, দৃঢ়মূল ও সুপ্রতিষ্ঠিত স্নিগ্ধ নীল পত্র ও বিশাল পুষ্প ফলে পরিপূর্ণ দ্বীপ পতাকাস্বরূপ এই চারটি মহাবৃক্ষ অনেক যোজন বিস্তীর্ণ। এই বৃক্ষ চতুষ্টয় যক্ষ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও চারণদের দ্বারা সেবিত হয়ে থাকে।

হে মনুজ শ্রেষ্ঠ পূর্বোল্লিখিত মন্দর পর্বতের শৃঙ্গে কেতুশ্রেষ্ঠ যে কদম্ব মহাবৃক্ষটি আছে তার নাম ভদ্রাশ্ব। এর শাখা থেকে শুরু করে শিখর পর্যন্ত ফুলে ফুলে ভরা। ফুল গুলি মহাকুম্ভের মতো বিশাল কেশরগুলিও বিকশিত। সর্বকালীন মনোজ্ঞ মহাগন্ধে পরিশোভিত বৃক্ষটি মৃদুমন্দ বায়ুতে আন্দোলিত হলে সহস্রাধিত যোজন পর্যন্ত দিমণ্ডল এই পুষ্পগন্ধে পরিপূরিত হয়ে ওঠে। এই কেতুশ্রেষ্ঠ ভদ্রাশ্ব বৃক্ষে সাক্ষাৎ হৃষিকেশ সিদ্ধদের দ্বারা পূজিত হয়ে থাকেন। অশ্ববদন হরি সমস্ত দ্বীপ আলোকিত করে অনেক সময় এখানে অবস্থান করেন তাই অমরশ্রেষ্ঠ অশ্ববদন হরির নামানুসারেই এই বৃক্ষের ‘ভদ্রাশ্ব’ নাম হয়েছে।

মেরুর দক্ষিণ দিকস্থ পর্বতের দেবসেবিত শিখরে ও ‘জম্বু’ নামক এক মহাবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। বৃক্ষটিতে সতত পুণ্যফল সঞ্চিত আছে। বৃক্ষটি প্রায়শই মাল্য শোভিত, মহামূল মহা-স্কন্ধ স্নিগ্ধ পত্রে বিভূষিত, নব নব পুষ্প ও ফলপ্রদ এবং আরও অসংখ্য তরুতে উপশোভিত। সাধারণত এই বৃক্ষসমূহ হস্তী পরিমিত আয়তন সম্পন্ন অর্থাৎ একটু স্থুল প্রকৃতির হয়ে থাকে। এর স্বাদু, মৃদু ও অমৃতকল্প ফলগুলি গন্ধমাদন পর্বতের উপরিভাগে পতিত হয়। এই গিরিচূড়া থেকে স্যন্দনশীলা এক মধুবহিনী নদীর উৎপত্তি হয়েছে। এর নাম জাম্বু নদী। এই নদীতে অগ্নিবর্ণ, ‘জাম্বনদ’ নামক একপ্রকার সুবর্ণ উৎপাদিত হয়। এই দুর্লভ সুবর্ণ হতেই দেবতাদিগের ব্যবহার্য পাপনাশক অতুলনীয় অলংকাররাজি প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই অমৃতস্বরূপ মধুর জম্বুরস দ্রবা দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ সকলেই প্রিয় পানীয়। এই জম্বু নামক মহাবৃক্ষের নামানুসারেই দক্ষিণ দ্বীপের কেতুস্বরূপ লোকপ্রসিদ্ধ এই মনুষ্য নিবাস জম্বুদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

মেরুর পশ্চিম দিকেও 'বিপুল' নামক এক সুউচ্চ পর্বত আছে। তার উপরিস্থিত এক শৃঙ্গে অতি সুমহান এক বৃক্ষ আছে। অশ্বথ নামেই এর ব্যাপক পরিচিতি। বৃক্ষটি দীর্ঘ এবং উৎকৃষ্ট মালায় সমৃদ্ধ। আর এক মূলদেশে আছে সুবর্ণ নির্মিত মণিবেদিকা। এর শাখাপ্রশাখা ও স্কন্ধরাজি অতি উচ্চ। সর্বোপরি বৃক্ষটি সুপ্রচুর সত্ত্বগুণের আশ্রয়স্থল। এই বৃক্ষ হতে সকল কালে সকল ঋতুতে সুখদায়ক কুন্তসদৃশ বৃহদাকার এবং শুভময় ফুল উৎপন্ন হয়। এই দেব-গন্ধর্ব সেবিত অশ্বত্থ বৃক্ষকে কেতুমাল দ্বীপের কেতু। স্বরূপ বলেই জ্ঞান করবেন।

হে বিপ্রগণ, যে কারণে এই দ্বীপের নাম কেতুমাল রাখা হয়েছে এবার সেই কারণটির কথাও জেনে রাখুন, ক্ষীরোদ সাগর মন্থন শুরু হলে দৈত্য পক্ষ পরাজিত হয়। দেব-দানবের এই মহাসমরে ক্ষীরোদ সাগরে মধ্যভাগে স্থাপিত এই বৃক্ষ ভীষণভাবে বিক্ষোভিত এবং মথিত হল। বৃক্ষটির এই ব্যাথার উপসম করার জন্য সহস্রাক্ষ ইন্দ্র নানাবিধ পুষ্পের সমাহারে একটি অনুপম মালা রচনা করলেন এবং সেটি এই অশ্বথ বৃক্ষের স্কন্ধে আরোপ করলেন। এই মালা সর্বদাই পূর্বের মতো মহাগন্ধময় আমোদকর ও মনোহর তাই মহাভাগ বিবিধ সিদ্ধচারণ দ্বারা পূজিত হয়ে সেই কেতুর মালা হয়ে বিরাজ করতে লাগলেন। দেবতাবৃন্দের প্রদত্ত এই অপূর্ব পুষ্পমাল্য কেতুর কণ্ঠে সর্বদাই শোভা পেত। মৃদুমন্দ বায়ুতাড়িত হয়ে মাটির মাতাল করা দিব্য গন্ধ বহু দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হতে থাকে এইভাবে এই দ্বীপটি কেতুমালা সূত্রে পরিচিতি লাভ করে। শেষ পর্যন্ত কেতুমালায় নামাঙ্কিত হয়ে পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এই দ্বীপটি স্বর্গে পৃথিবীতে এবং অন্যান্য স্থানেও 'কেতুমালা' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে।

.

৩৩.

সূত এবার বললেন, হে পৃথিবীশ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী ঋষিবৃন্দ এবার আমি পূর্বোল্লিখিত চারটি শ্রেষ্ঠ পর্বতের বিষয়ে বলব। প্রথমেই আমি এদের সর্বকালাত্মক রম্যাবস্থার কথা বিবৃত করছি।

পূর্বোক্ত ওই চারটি পর্বতের সংলগ্ন প্রদেশে চারটি বিহারবন বিদ্যমান। ওই সব বনানীতে কত যে। পাখি, কত যে পুষ্পরাজি তার ইয়ত্তা নেই। সরিকা, ময়ূর, মদোকট, চকোর, শুক, ভৃঙ্গরাজ, চিত্রক। প্রভৃতি পাখিরা অবাধে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জীবন্ধজীব, হেমকার, মত্ত কোকিল, বর্ত্তক, সুগ্রীবক ও কলঙ্ক এইসব পাখিরা সমস্ত সুরম্য বনভূমি মুখরিত করে তুলছে, পুষ্প প্রেমে মদোন্মত্ত ভ্রমরের গুঞ্জনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বনভূমি। স্থানে স্থানে কিন্নরগণ গান গাইছেন, কোথাও আবার চারু পল্লব শোভিত হয়ে পুষ্পবর্ষণ করে চলেছে। নানা ঋতুতে বিচিত্র বর্ণপ্রাপ্ত, কান্তিময় শত শত শিলাখণ্ড ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। সেখানকার সমুদয় পুষ্পস্তবক মঞ্জরী ও তাম্র কিশলয় মন্থরগামী পবনস্রোতে নিয়ত চঞ্চল ও দোদুল্যমান হয়ে আছে। সিদ্ধ মহাত্মা, অপ্সরা, দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ ও উরগরা এই বনভূমির সেবায় নিরন্তর ব্যস্ত রয়েছেন, দেবতাদের বিচরণক্ষেত্র চতুর্দিকে বিস্তৃত মনোহর সেই চারটি বিশাল ক্রীড়াস্থলের কথা এবার আপনাদের বলছি।

পূর্বদিকে অরণ্যের নাম চৈত্ররথ, পশ্চিমদিকের অরণ্য বিভ্রাজ, উত্তর সবিতৃবন ও দক্ষিণে নন্দন এর অবস্থান। এই চারটি মহারণ্যে চারিটি মহা সরোবর আছে। সরোবরগুলি রম্য বিহঙ্গ-কূজিত এবং মহাপুণ্যতম। এইসব সরোবরের ঘাটগুলি বিস্তীর্ণ বনে সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে। সরোবরগুলি নিরন্তর মহাত্মাগণের দ্বারা সেবিত হয়ে থাকে। ফলে এগুলি মঙ্গলময়তা ও সুখময়তার দ্যোতক হয়ে উঠেছে। সরোবরের স্বচ্ছ পবিত্র ও দেবভোগ্য জলে বিশাল বিশাল নাগেদের বসবাস। এই জলে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ পুরুষ, দেব ও অসুরগণ আচমন করে থাকেন। ছত্র প্রমাণ, বিকশিত, মহাগন্ধ মনোহর পুণ্ডরীক আর মহাপাত্র উৎপল এই সব সরোবরের শোভা বর্ধন করে।

চারটি দিকে অবস্থিত এই মহাসরোবর চারটি চারটি সুনির্দিষ্ট নামে পরিচিত। পূর্বদিকের সরোবরের নাম অরুণোদ, পশ্চিমের নাম সিতোদ, উত্তরের নাম মহাভদ্র আর দক্ষিণের সরোবরের নাম মানস, এই প্রতিটি মহা সরোবরের চতুষ্পর্শ্বে অসংখ্য পর্বত বা মহাশৈল আছে। আমি এবার বিস্তারিতভাবে ওইসব পর্বতরাশির নাম আপনাদের কাছে বলছি, মন দিয়ে শুনুন।

অরুণোদ সরোবরের পূর্বদিকে শীতাম্ভ, কুমুঞ্জ, সুবীর, বিকঙ্ক, মণিশৈল, বৃষভ, মহানীল, রুচক, সবিন্দু মন্দর, বেনুমান, সুমেধ ও নিষেধ নামে কতকগুলি পর্বতশ্রেষ্ঠ আছে। এগুলি ছাড়া আরও কিছু পর্বত এখানে ছিল, মন্দরের পূর্বে এইসব সিদ্ধদের নিবাসস্থানের উদাহরণ দেওয়া হল। এবার মানস সরোবরের দক্ষিণে যে সকল মহাপর্বত আছে, যাদের কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তাদের নামসমূহ শুনুন। মানস সরোবর সংলগ্ন ত্রিশিখর, শিশির, কলিঙ্গ, পতঙ্গ, কীচক, সানমান, তাম্রভ, বিশাখ, সুমূল, শ্বেতোদয়, বিষাধার রত্নধার একশৃঙ্গ, মহামূল, গজ, পিশাচক পঞ্চশৈল, কৈলাস ও পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় প্রভৃতিতে দেবতাদের নিবাস রচিত হয়েছে। এরা উৎকৃষ্ট, পর্বতোত্তম, দেবতুল্য দীপ্তিমান ও মেরুর দক্ষিণে বিরাজমান। হে দ্বিজোত্তমগণ সিতোদ সরোবরের পশ্চিমে যে সমস্ত উত্তম মহাশৈল আছে তাদের কথা বলছি, শুনুন, সিতোদের পশ্চিমদিকে রয়েছে, সুরক্ষাঃ শিখী, কাল, বৈদুর্য, কপিল, রুদ্র, পিঙ্গল, কুমুদ, সুরস, মধুমান, অঞ্জন, মুকুট, কৃষ্ণ, পাণ্ডব, সহস্রশিখর, পরিপাত্র, বৈদুর্য, ভুতি পর্বতশৃঙ্গ।

মহাভদ্র সরোবরের জল অত্যন্ত নির্মল এবং পবিত্র। এর উত্তরদিকে যেসব পর্বত আছে ক্রমানুসরে তাদের নামগুলি হল–শঙ্কুকুট, বৃষভ, হংস, নাগ, কপিল, ইন্দ্র, সানমান, নীল, কনকশৃঙ্গ, শতশৃঙ্গ, পুষ্পক, মেঘ, বিরাজ ও জারুধি। এবার এইসব প্রধান প্রধান পর্বতের মধ্যে যেসব স্থানে দ্রোণী ও সরোবর আছে তাদের কথা বলছি, শুনুন।

.

৩৪.

লোমহর্ষক সূত বললেন, পর্বতপ্রবর শীতান্ত ও কুমুঞ্জের মধ্যবর্তী স্থানে প্রায় তিনশত যোজন দীর্ঘ ও শত যোজন বিস্তৃত বহুতর দ্রোণী আছে। এগুলি বিবিধ প্রাণী কর্তৃক সেবিত এবং বিহঙ্গ কূজিত স্থান। এর মধ্যে সুমিষ্ট নির্মল সলিলপূর্ণ এক সুন্দর সরোবর আছে। এর জলে দ্রোণীর সমান দীর্ঘ সুগন্ধি পুণ্ডরীক এবং শত সহস্র পত্রবিশিষ্ট মহাপদ্মে অলংকৃত। এর জলে ভয়ংকর বিষধর বিশাল বিশাল সর্প বসবাস করে। দেব, দানব ও গন্ধর্বরা জলে আগমন করে থাকেন। এই পুণ্যসরোবর 'শ্রী সরোবর' নামে স্বর্গে এবং পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ। এই সরোবরের মাঝখানে আছে পদ্মরন, এই পদ্মবনে কোটি জলশালী প্রস্ফুট তরুণ অরুণের দীপ্তিতুল্য এক মহাপদ্ম। দিব্যকান্তি এই মহাপদ্মটি কোশমুক্ত, অজর, চঞ্চল, মণ্ডলাকার, মনোহর, কেশরজালে সমৃদ্ধ মত্ত ভ্রমর গুঞ্জিত। এই পুণ্যপদ্মে মূর্তিমতী শ্রী ভগবতী নিত্যই অবস্থান করে থাকেন। তার আশীর্বাদ প্রসন্ন জলে পূর্ণ এই সরোবরটি সকল প্রাণীর আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে।

সিদ্ধগণসেবিত এই শ্রীসরোবরের পূর্বতীরে সতত পুষ্পফল সমৃদ্ধ মনোরম এক বিশাল এক বিল্বন আছে। বিকাননটি তিনশত যোজন দীর্ঘ ও শত যোজন বিস্তীর্ণ। এতে সহস্র সহস্র বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ বিরাজ করছে। সমস্ত বৃক্ষগুলি অর্ধকেশ পরিমিত উচ্চ শিখরবিশিষ্ট সহস্র শাখা মণ্ডিত এবং মহাস্কন্ধ। এইসব বৃক্ষের যেসব ভেরীপরিমিত সুগন্ধি ফল উৎপন্ন হয় তা সুবর্ণের মতো দীপ্ত পাণ্ডুর ও হরিৎবর্ণ এবং অমৃতের মতো স্বাদু হয়ে থাকে। বিশীর্ণ অবস্থায় ফলগুলি নিজে থেকেই পড়ে যায়। আর তাতেই এই বন প্রান্তর সর্বদা পরিকীর্ণ হয়ে থাকে। এই বিশ্ববন সর্বলোকে 'শ্রীবন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, মহানাগ, সিদ্ধ ও নিত্যামোদী প্রমুখ সকলেই এই সুমিষ্ট বিফলভোজী, তাই এই বর্ণ এধরনের বিবিধ ভূত সংঘে পরিপূর্ণ, এই বনে সিদ্ধ সংঘবন্দিতা শ্রীদেবী ভগবতী সাক্ষাৎ বিরাজ করেন। তাই দেবীর অনুগ্রহ ধন্য এই বন আদ্যন্ত পবিত্রভূমি।

শৈলশ্রেষ্ঠ বিকঙ্ক ও মণিশৈলের মাঝখানে প্রায় শত যোজন পরিমাণ বিস্তৃত ও দ্বিশত যোজন দীর্ঘ এক বিপুল রম্য গন্ধ ও গুণময় চম্পক বন আছে। এই বন সিদ্ধ চারণগণ দ্বারা সেবিত হয়ে থাকে। শোভামণ্ডিত হয়ে আছে। এই বন মনঃ শিলা চূর্ণাতুল্য পাণ্ডুকে শরশালী, দুই হাত উচ্চ ও তিন হাত বিস্তৃত একপ্রকার মনোহর, মুক্তকেশে ও গন্ধময় কুসুমে পরিকীর্ণ, ভ্রমর গুঞ্জিত এই শ্রীবান দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, অপ্সরা ও মহানাগরা বিরাজ করছেন। এই শ্রীবনে ভগবান প্রজাপতি কশ্যপের সিদ্ধ সাধ্যগণের সমাকীর্ণ এক রমণীয় আশ্রম আছে। সেই আশ্রম নানাজনের দ্বারা সেবিত হয়ে থাকে।

এছাড়া মহানীল ও কুমুঞ্জ পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সুখদায়িনী মহানদীর তীরে একটি সিদ্ধসেবিত মনোরম তালবন আছে। এই তালবনটির আয়তন দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ যোজন ও বিস্তারে শত যোজন। এই তালবনে যত বৃক্ষ আছে সকলেই অর্ধ কেশে পরিমিত উচ্চ। বৃক্ষগুলি স্থির, অবিচল, শুভ মহাসাগর ও বিশাল মূল যুক্ত। এই বৃক্ষগুলি থেকে যে মহাফল উৎপন্ন হয় তা পরিপূর্ণ গোলাকার ও কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট। এই স্থান সবসময় দিব্য গন্ধরসে আমোদিত থাকে। সিদ্ধসেবিত এই তালবন মহেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গজ ঐরাবতের প্রিয় নিবাসস্থল।

বেনুমান ও সুমেধ পর্বতের উত্তরদিকেও সহস্র যোজন দীর্ঘ ও শত যোজন বিস্তীর্ণ এক বিশাল বন আছে। বৃক্ষ-গুল্ম, লতা-গুচ্ছ বেষ্টিত, দূর্বাচ্ছাদিত এই সকল প্রকার প্রাণীশূন্য।

ইহা ব্যাতিরেকে নিষধ ও দেবগিরির উত্তরদিকে সহস্র যোজন দীর্ঘ এবং শত যোজন বিস্তৃত বিস্তীর্ণ এক তরুলতাহীন প্রান্তরের অস্তিত্ব আছে। সর্বত্র পাদ পরিমিত জল দ্বারা আপ্লুত এই বনে শিলাময় নানা আকারের আভ্যন্তরীণ সানুদেশ আছে। এই বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ, এখন মেরুর পূর্বদিকে অবস্থিত। এইসব সানুদেশের কথা বলছি, শুনুন।

.

৩৫.

সূত বললেন, এগুলি ছাড়া দক্ষিণদিকেও একাধিক সিদ্ধসেবিত সানুদেশ আছে। এবার আমি সেগুলির কথা আনুপূর্বিক ভাবে বলছি, শুনুন।

শিশির ও পতঙ্গ পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বিহঙ্গকূজন সেবিত রম্য উড়ম্বর অরণ্য আছে। অরণ্যাঞ্চল সমতল। এই অরণ্যে যেসব বৃক্ষ আছে তাদের শাখা প্রশাখা উচ্চতায় প্রায় আকাশকে ছুঁয়েছে। লতা দ্বারা আলিঙ্গিত এই বৃক্ষগুলো আকারেও বিশাল। এইসব বৃক্ষের পরিপক্ক ফল অত্যন্ত মধুময়। তারা দেখতে স্ফটিকের মতো নির্মল এবং মহাকুম্ভের মতো বিশাল। অনেক সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব, সর্প, কিন্নর এবং বিদ্যাধর আনন্দিত চিত্তে ওই বৃক্ষের ফলে নিত্যদিন জীবনধারণ করে থাকেন। এই অরণ্যকে চারিদিক থেকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য নদী। নদীগুলিতে সবসময় প্রচুর জল থাকে। সেই জল যেমন স্বচ্ছ, তেমনি স্বাদু। ভগবান প্রজাপতি এটি স্থাপন করেছেন। তার সেই সুন্দর আশ্রমটিতে দেবতাগণের নিত্য যাতায়াত এবং এর সবদিকে রয়েছে বিচিত্র কানন। এই কাননের চারপাশের পরিধি একশত যোজন প্রায়।

তাম্রবর্ণ পতঙ্গ পর্বতের মাঝখানে প্রায় শত যোজন বিস্তৃত এবং দুই শত যোজন দীর্ঘ একটি সরোবর আছে সরোবরে প্রান্ত বরাবর শ্বেত পদ্মের বাহার। বাকি সব জায়গায় রক্তলাল ও আকাশনীল বর্ণের অসংখ্য সুগন্ধির কমল প্রফুল্ল বদনে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। এই কমলদলে কত যে উন্মানা ভ্রমর এসে বসে, তার ইয়ত্তা নেই। সরোবরটি পুণ্য সলিল দেবদানব নির্বিশেষে সেবিত হয়। এর জলে খেলা করে অসংখ্য মহাকায় সর্প ও বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য। এই সরোবরে ঠিক মাঝখানে আছে একটি জনপদ। রক্তধাতু বিভূষিত এই জনপদটির বিস্তার দৈর্ঘ্যে প্রায় শত যোজন এবং প্রস্থে প্রায় তিরিশ যোজন পর্যন্ত। এই জনপদস্থিত বিদ্যাধরপুরি উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত, রাজপথ ও তোরণে শোভিত, অসংখ্য নরনারী প্রচুর ঐশ্বর্যের সাথে এখানে

বাস করেন। এছাড়া এখানে আছে অসংখ্য বল্লভী, অসংখ্য মণি বিভাগ। সরোবরের জলে এই পুরীর রত্নময় প্রদীপ্ত মসৃণ চিত্রের প্রতিবিম্ব রচিত হয়। আর এই নগরীতে আছে বিশাল, উৎকৃষ্ট ও অত্যুচ্চ ভবনমালা। এই পুরীর খ্যাতনামা বিদ্যাধরপতি হলেন পুলোমা নামে এক বিখ্যাত ব্যক্তি। এখানে তার যা বিক্রম তা মহেন্দ্রতুল্য। মণিমালায় ভূষিত বিচিত্র ধরনের বেশভূষা তার। তিনি হলেন দীপ্ত বিচিত্রকেশ সূর্যসমতেজস্বী সহস্র সহস্র বিদ্যাধরের সম্রাট।

বিশাখ ও পতঙ্গ পর্বতের মাঝখানে তাম্রবর্ণ সরোবরের পূর্ণ তীরে এক সর্বকালীন ফলপ্রসূ মনোরম শাখাযুক্ত বর্ণাঢ্য আম্রবন আছে। আম্রবনটি পঞ্চবাণের ক্ষেপণে বিদ্ধ, স্ফীত এবং বিশাল। এই বনে যে ফলই জন্মায় তা সুবর্ণ বর্ণ, অতি স্বাদু, সুগন্ধি এবং মহাকুম্ভের মতো বিশাল হয়ে থাকে। বৃক্ষগুলোর চারপাশে ছড়িয়ে থাকে বিশাল বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা। এইসব অমৃত ফলের অতি স্বাদু ও অমৃততুল্য পান করে গন্ধর্ব কিন্নর, যক্ষ, সর্প ও বিদ্যাধরগণ তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হন। অমৃতরস পান করার পর হৃষ্ট ও তুষ্ট হয়ে এঁরা যে মহানাদ করেন বহু দূর থেকে সেই শব্দ শোনা যায়।

ত্রিশ যোজন বিস্তীর্ণ ও পঞ্চাশ যোজন দীর্ঘ এক বিল্ববন আছে সুমূল ও বসুধা পর্বতের মাঝখানে। এই বিশ্ববনের বৃক্ষগুলো শুদ্ধ এবং ফলভারে নত হয়ে আছে। এইসব বৃক্ষের বিশীর্ণ ফল অরণ্যের মৃত্তিকা তলকে কর্দমাক্ত করে তুলেছে। এই অরণ্যের বৃক্ষগুলো সুরভিত পর্ণে সমৃদ্ধ ও বিহঙ্গ পূর্ণ। নিত্য বিফলভোজী বহু যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, সিদ্ধ এবং নাগগণের উপজীবিকা হল এই বিশ্বস্থলী।

এরপর বসুধা ও রত্নধার পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে প্রায় ত্রিশ যোজন বিস্তৃত শতযোজন দীর্ঘ এক কিংশুক বন আছে। কিংশুক বৃক্ষগুলি নিত্য পুষ্পিত এবং গন্ধময় হয়ে থাকে। দূর থেকে বনটিকে দেখে মনে হয় যেন প্রদীপ্তের মতো শোভা পাচ্ছে। এর দিব্যপুষ্প গন্ধে সমগ্র পরিমণ্ডল সুরভিত হয়ে থাকবে। এই রমণীয় কিংশুক বনে বহু সিদ্ধচারণ ও অপ্সরারা বাস করে থাকেন। জলাশয় ভূষিত সেই বনে আদিত্যদেবের এক দীপ্ত মহাগৃহ আছে। সেখানে প্রতি মাসে প্রজাপতি সূর্য অবতীর্ণ হন। সিদ্ধগণ কালকর্তা সুরোত্তম সর্বলোক নমস্কৃত সেই সূর্যদেবকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে নমস্কার করেন।

পঞ্চকূট ও কৈলাশ পর্বতের মাঝখানে ছত্রিশ যোজন দীর্ঘ ও শত যোজন বিস্তীর্ণ যে স্থান আছে তা যেমন দুর্গম তেমনই লোমহর্ষক। হংসপাণ্ডুর এই স্থানটিকে ক্ষুদ্র প্রাণীরা সহসা আক্রমণ করতে পারে না। স্থানটি সাধারণভাবে সকল প্রাণীর পক্ষেই দুর্গম এবং

এর শেষ কোথায় কেউই তা সঠিকভাবে বলতে পারেন না। দক্ষিণে অবস্থিত এই যে বিকৃত অঞ্চল সিদ্ধদের নিবাসস্থল। হে দ্বিজোত্তমবৃন্দ, পশ্চিমদিকে যে সকল অন্তর সানুদেশ আছে, এবার আমি সেগুলোর যথাযথ বর্ণনা প্রদান করছি, মন দিয়ে শুনুন।

সুরক্ষা ও শিখি পর্বতের মধ্যবর্তী অন্তর সানুদেশে শত যোজন দীর্ঘ এক শিলানির্মিত, সদা তপ্ত, মহাঘোর, দুঃস্পর্শ এক নিদারুণ স্থান আছে। এই স্থান যে কোনো প্রাণী এমনকি দেবতাদেরও অগম্য। এই শিলময় দেশে ত্রিংশৎ যোজন পরিধিযুক্ত সহস্রজ্বালাময় এক দারুণ বহ্নিস্থান আছে। এখানে বিরাজ করেন ইন্দনবিহীন, জ্বালা মালাময়, জাজ্বল্যমান হুতাশনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সংবর্তক অগ্নি। শৈলশ্রেষ্ঠ দেব ও পিঞ্জর পর্বতের অন্তর সানুদেশে চারিদিক থেকে দশ যোজন দীর্ঘ এক দাড়িম্ব বন আছে। সুবর্ণ বর্ণ মধুমাখা, রসময় দাড়িম্ব ফলের গন্ধে সেই বনস্থলী মথিত হয়ে থাকে। সেখানে শুদ্ধচেতা বৃহস্পতির এক মহাপুণ্য আশ্রম আছে। এই আশ্রমে বহু সিদ্ধ সংঘের নিবাস গড়ে উঠেছে। আনন্দময় এই আশ্রম কামনা অনুসারে ফল দান করে থাকে।

শৈলকেশর কুমুদ এবং অঞ্জনের মধ্যে একটি নাগকেশর বন বিদ্যমান আছে। বনটি চারিদিক থেকে বহু বহু যোজন দীর্ঘ। এই বনে যে নাগকেশর কুসুম জন্মায় কেবল তাদের আয়তনই অবাক করার মতো। এগুলি দুই হস্ত পরিমাণ উচ্চ তিন হস্ত বিস্তৃত এবং চন্দ্র রশ্মির মতো বর্ণশালী। এইসব প্রস্ফুটির প্রকাণ্ড কুসুমে চঞ্চল ভ্রমরেরা নিত্য ক্রিড়াশীল। ভ্রমরের গুঞ্জন এবং সর্বকালীন মনোহর এইসব নাগকেশরের মৃততুল্য গন্ধে বিচিত্র সেই বন সদা পরিশোভিত থাকে। এই বনেই দেবগুরু বিষ্ণুর ত্রিলোক খ্যাত সর্বলোক নমস্কৃত এক বিরাট শুদ্ধ ও পবিত্র আশ্রম গড়ে উঠেছে।

কৃষ্ণ ও পাণ্ডুর পর্বতের মধ্যবর্তী মসৃণ অংশে ত্রিশ যোজন বিস্তৃত নব্বই যোজন দীর্ঘ সম্পূর্ণভাবে বৃক্ষলতা বর্জিত সুখবিচরণ যোগ্য, এক শিলাময় সমতল প্রদেশ আছে। তার মধ্যে যে শুদ্ধ সলিল সরোবর আছে, তাতে একটি অত্যন্ত রমণীয় স্থলপদ্ম শোভমান। প্রস্ফুটিত এই স্থলপদ্ম ছত্রাকৃতি বিকশিত শতদলবিশিষ্ট মনোহর ও সৌগন্ধময়। এই পদ্মের চারিপাশে মধুলোলুপ, মদৌকট ভ্রমরের দল ঘুরে বেড়ায়। কিন্নরগণ গদগদকণ্ঠে মৃদু স্বরে গান গেয়ে চলেছেন। এই সুবিশাল স্থলপদ্মটিকে যক্ষ, গন্ধর্ব ও অন্যান্য সিদ্ধ চারণেরা নিত্য সেবা করে চলেছেন।

এই স্থলপদ্মিনীর মধ্যে পঞ্চ যোজন পরিধি বিশিষ্ট বিপুল স্কন্ধ, অসংখ্য শাখামণ্ডিত এক বিশাল বটবৃক্ষ আছে। যিনি চন্দ্রতুল্য দীপ্তিশালী, যিনি সহস্রবদন, নীলাম্বর, যিনি অসুরসংহারক, যাঁকে ত্রিভুবনের কেউই পরাজিত করতে পারে না; সেই মহাভাগ, জন্মমৃত্যুহীন, পদ্মমালাধারী শ্রীমান শ্রীহরি এখানে অধিষ্ঠান করেছেন। গন্ধর্ব যক্ষ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধচারণগণ কমলপুষ্পসহযোগে তার অর্চনা করে থাকেন। সর্বলোক বিশ্রুত প্রসিদ্ধ লম্বমান বিবিধ প্রকারের পদ্মমালায় উপশোভিত এই স্থানটির নাম "অনন্তসদ"।

সহস্রশিখর কুমুদ পর্বতের মধ্যেও পক্ষীসেবিত এক বন আছে। ইহা পঞ্চম যোজন দীর্ঘ ও ত্রিশ যোজন বিস্তৃত। উচ্চ পরাদপরিবৃত সেই বনে গজদেহের মতো বিশালাকৃতি একাধিক মহাবৃক্ষ আছে। এইসব মহাবৃক্ষজাত ফলগুলি সুস্বাদু মধুরগন্ধি ও মধুস্রাবী। সেই বনে শুক্রাচার্যের একটি আশ্রম আছে। আশ্রমটি শুক্রাচর্যের আশ্রম নামেই খ্যাত। দেবর্ষিগণ সেবিত এই আশ্রমটিকে মহাপুণ্য ভস্বর ও সকল পুণ্যফলের ফলস্বরূপ রূপে বর্ণনা করা হয়। আশ্রমটি বৃষভ ও শৈলকূট পর্বতের মাঝখানে অবস্থিত। এর পাশেই বহু যোজন পরিধিযুক্ত দীর্ঘ সুন্দর এক ফলের বাগান আছে। এর এক-একটি ফলের আয়তন বিশ্ব প্রমাণ। এইসব সুগন্ধি, মহাস্বাদু, বৃন্তচুত ফলের কারণে এই বাগানের ভূমিতল সর্বদা আর্দ্র থাকে। এইসব বিল্ব প্রমাণ ফল দ্বারা গন্ধর্ব, কিন্নর, উরগ ও সিদ্ধগণ জীবিকা নির্বাহ করেন। এখানকার গণ্যমান্য চারণেরাও সেই ফলের রসে উন্মত্ত।

কপিঞ্জল ও নাগ পর্বতের মধ্যে প্রায় দুই শত যোজন দীর্ঘ এবং শত যোজন বিস্তৃত একটি মনোরম উদ্যান আছে। এখানে দ্রাক্ষা, নাগকেশর, খর্জর, নীলাশোক, দাড়িম্ব, স্বাদু অক্ষোটক, অতসী, তিলক, কদলী ও বদরীবন আছে। নানা বর্ণের নানা প্রজাতির পুষ্পফলশোভিত এই উদ্যান কিন্নর আর সর্পদের প্রিয় নিবাস ভূমি। এই স্থানের উপর দিয়ে বহু স্বাদু ও শীতল জলপূর্ণ নদী প্রবাহিত হয়েছে।

ষাট যোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন দীর্ঘ এক দারুণ বনস্থলী পুস্পক ও মহামেঘ পর্বতশৃঙ্গের মাঝখানে আছে। মসৃণ এই স্থানটি জলের তলার মতো সমান, কঠিন ও পাণ্ডুবর্ণ। এখানে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ এমনকি কোনো প্রাণী–কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। স্থানটি দেখলেই শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

. হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, দক্ষিণদিকে অবস্থিত এই সমস্ত স্থানগুলিতে বহু মহাসরোবর, মহাবৃক্ষ, মনোহর মহাবন আছে। এগুলি ছাড়াও এখানে যত সাধারণ এবং ক্ষুদ্র সরোবর, সাধারণ বন

ও প্রজাপতির দল আছে, সে সবের কোনোটারই সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এছাড়াও এখানে আরও অনেক স্থলী, পর্বত ও অন্তর সানুদেশ বা উপত্যকা আছে। আছে অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত সরোবর ও বন তাদের মধ্যে কারও আয়তনের পরিমাণ দশ, কারও বারো, কারও সাত বা আট, কারও আবার কুড়ি কিংবা ত্রিশ যোজন। হে দ্বিজোত্তমবৃন্দ, এছাড়া এখানে এমন কিছু পর্বত গুহা আছে যেখানে বছরের কখনও কোনোদিন সূর্যরশ্মিজাল প্রবেশ করতে পারে না। এগুলি মহাঘোর শ্যামবর্ণ, হিমশীতল দুর্গম স্থান হিসেবে সাধারণের অগম্য রয়ে গেছে। এরকম কোনো কোনো পর্বতের মধ্যে উত্তপ্ত জলরাশিময় শত সহস্র সরোবর চোখে পড়ে।

৩৬.

সূত বললেন, হে ভূর্লোকশ্রেষ্ঠ ঋষিবৃন্দ এবার আমি যে যে শিলাখণ্ডে যে যে বিবিধ দেবতাগণের উৎকৃষ্ট নিবাসগৃহ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সে বিষয়ে বলছি, শুনুন।

প্রথমেই আমি পর্বতপ্রবর শীতান্ত-র বিষয়ে বলব। শীতান্ত সবদিক দিয়ে সুদীপ্ত এক পর্বত। ইহা শত শত বিচিত্র ধাতু ও শত শত রত্নের উদ্ভব স্থান। অনেক সত্ত্বগুণের নিকেতন এই পর্বতের নিতম্বদেশ বিবিধ পুষ্পমাল্যে ভূষিত থাকে। পর্বতটি মহামূল্য মণিমাণিক্য ও প্রবালে চিত্রিত স্বর্ণাভরণে অলংকৃত। এক কুসুমাকীর্ণ গাত্রে মদোকট ভ্রমরেরা নিত্য ঝংকার করে। এই পর্বতে যেসব রত্নভূষিত অন্তর সানুদেশ আছে, তা লতালম্বিত চিত্র-বিত্রিত শত শত ধাতু দ্বারা আবৃত। পর্বতটির অসংখ্য প্রস্রবণ আছে। এদের জল যেমন নির্মল, তেমনি মধুর। কুসুমে কুসুমে সমাকীর্ণ, অসংখ্য নিকুঞ্জশোভিত এই পর্বতগাত্র পুস্পনির্মিত ভেলা শোভিত বহু নদী দ্বারা অলংকৃত। এই পর্বতের গৃহংকন্দরগুলি কন্দর্প ও যক্ষদের প্রিয় বিচরণভূমি। এই পর্বতে এমন বহু বিচিত্র বৃক্ষ বিদ্যমান যারা মুখসেব্য, নানা বন্য জীবজন্তুতে সমাকীর্ণ, পশুপাখিদের পক্ষে সুখকর আশ্রয় এবং নানা পুষ্প ফলে সমৃদ্ধ এই পর্বতেরই এক গোপন করে দেবরাজ ইন্দ্রের ক্রীড়াবনক্ষেত্র স্বরূপ বিশাল পারিজাত বন আছে। পারিজাত বনের বিশেষত্ব হল এখানে সমস্ত কামনাসঞ্জাত ধন, যা কিছু ত্রিলোক প্রসিদ্ধ এবং মনোরম–সেসব কিছুই পাওয়া যায়। শীতান্ত পর্বতে তরুণ অরুণের মতো দীপ্ত, সুবাসিত, মনোহর পুষ্পরাজির এক দুর্লভ সমাহার ঘটে গেছে। সর্বোপরি পারিজাত ফুলের সুগন্ধ মাহেন্দ্র কানন থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহে ওই পর্বতের চারিপাশে শত যোজন জুড়ে সুগন্ধ বিস্তার করছে। এখানে পর্বতশিখরে প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট জলাশয়গুলিতে ভূষণরূপে শোভা পাচ্ছে। বৈদুর্য্যমণির মতো বর্ণবিশিষ্ট নীলোৎপল শোভা পাচ্ছে এমন আরও অনেক কোকোনদ, অপঙ্কজাত সুবর্ণ কমল যাদের কেশগ্র বজ্রের মতো

কঠিন, যার স্পর্শ ও গন্ধগুণে পরিপূর্ণ, যারা কেশমুক্ত, বিকশিত, যারা শত শত মনোহর মহাপত্রে শোভিত এবং মত্ত ভ্রমরের গুঞ্জনে ঝংকৃত। এইসব জলাশয়ের জলে সুবর্ণমণিমণ্ডত চক্ষুঃস্পন্দনতুল্য সহস্র সহস্র মীনযুথবদ্ধ হয়ে বিরাজ করছে। সেই সঙ্গে এই জলে বিচরণ করছে অনেক অবয়বসম্পন্ন হেমরতুবিভূষিত বহু কচ্ছপ–ফলে জলের রূপ বিচিত্রর শোভা ধারণ করেছে। আর ধীমান দেবরাজের ওই পারিজাত কাননে নানা বর্ণ ও নানা রত্নে ভূষিত পক্ষীদের পক্ষপ্রদেশ সুবর্ণরচিত, তাদের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুমধুর এরা সর্বদাই মত্ত অবস্থায় আকাশের বুকে ইচ্ছেমত উড্ডয়নরত। ভ্রমরকুলের মত্ত নিনাদে এবং বিহঙ্গ কূজনে দেবেন্দ্রের এই ক্রীড়াবন এককথায় নিত্য আনন্দিত। এই দেবসেবিত বন মণিমুক্তোমণ্ডিত মণিময় শৃঙ্গযুক্ত সুবর্ণপার্শ্ব হরিণ, শাখামৃগ ও নানা প্রকারের রত্নভূষিত বিচিত্র অঙ্গ অন্য অন্য প্রাণী দ্বারা পরিপূর্ণ। এই বনে জাললতায় আবৃত পারিজাত বৃক্ষসমূহ ধীরগতি পবণহিল্লোলে আন্দোলিত হয়ে পুষ্পবর্ষণ করে থাকে। হে দ্বিজবৃন্দ, এখানেই সেই বনের বিশিষ্টতার শেষ নয়। সেখানে স্থানে স্থানে রত্নমণ্ডিত শয়নাসন ও মঙ্গলময় বিহারভূমি নিষেধহীন বিস্তৃত রয়েছে।

পারিজাত কাননের আবহাওয়াও অতি মনোরম। এখানে একদিকে যেমন অতি শীত বা অতি গ্রীষ্ম নেই, তেমনি শ্রমবিমুখতাও নেই। সূর্য এখানে সর্বদা সমানভাবে কিরণ দান করে। সেই বনে প্রস্ফুটিত নানা পুষ্পের গন্ধে সুরভিত। মধুমদে উন্মাদিত হয়ে যে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়ে চলেছে তা স্পর্শ মাত্র শরীরে এক অত্যাশ্চর্য সুখানুভূতি দেখা দেয়। এবং শ্রমক্লান্তি দূরীভূত হয়। সেই চির সৌন্দর্যের বিরাজভূমি ইন্দ্রবনে দেব, দানব, পন্নগ, রাক্ষস, যক্ষ, গুহা, অমিত, তেজঃ গন্ধর্ব সিদ্ধ, কিন্নর, বিদ্যাধর এবং অপ্সরাগণ আনন্দের সঙ্গে নিত্যদিন ক্রীড়া করে থাকেন।

কুমুঞ্জ পর্বত এই শীতাম্ভ পর্বতশৃঙ্গের পূর্বদিকে অবস্থিত। কুমুঞ্জ পর্বতে অনেক নির্ঝর ও কন্দর আছে। আছে মহাত্মা দানবদের আটটি সুসমৃদ্ধ পুরী। এগুলি ধাতুবিচ শৃঙ্গ সমূহে তৈরি হয়েছে। আবার বজ্রক পর্বতের অসংখ্য শিখরশীর্ষে রাক্ষসদের নিবাসযোগ্য একাধিক পুরী নির্মিত হয়েছে। এগুলিতে রাক্ষসপ্রজাতির নরনারীগণ বসবাস করে থাকেন। এই পুরীর অধিবাসী রাক্ষসগণ "নীলক" নামে পরিচিত। এঁরা ভয়ানক স্বভাবের হয়ে থাকেন। আর ইচ্ছেমতো রূপ ধারণ করতে পারেন। মহাবলশালী তেজঃসম্পন্ন রাক্ষসেরা সেখানে সর্বদা ভ্রমণ করে থাকেন। মহানীল পর্বতেও কিন্নরগণের বাসোপযোগী পঞ্চদশটি পুরী আছে। মহাত্মা অশ্ববদন কিন্নরেরা এসব পুরীতে বাস করেন। তবে নানান বর্ণের কিন্নর নৃপতিরা গঠিত সুবর্ণ পার্শ্ব পঞ্চদশ বনে বিরাজ করেন। তারা ছাড়াও এইসব পর্বত এমন কিছু শত শত বিশালাকৃতি সর্প বাস করেন

যাঁরা নিদারুণ প্রকৃতির। যাঁদের দৃষ্টিতে বিষ, যাঁরা অতি ক্রোধী, দুর্ধর্ষ এবং যাঁরা গরুড়ের বশবর্তী মহাশৈল সুনাগ পর্বতে আছে অনেকগুলি হর্মরাজি প্রাসাদ সমন্বিত উচ্চ প্রাচীর ও তোরণে সুরক্ষিত দৈত্যপুরী।

বেণুমান মহাশৈলশিখরে তিনটি বিদ্যাধরপুরী আছে। এগুলি প্রত্যেকটি ত্রিশ যোজন বিস্তৃত ও পঞ্চাশ যোজন দীর্ঘ। এই পুরী তিনটি তিনজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যাধরের নিয়ন্ত্রণাধীন। ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সেই তিনজন বীর্যবান বিদ্যাধর হলেন–উলুক, রোশন ও মহানেত্র।

শৈলবৃষভ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনন্য করঞ্জ পর্বতে বিশাল বিশাল নির্ঝর ও কন্দর আছে। এগুলি বিবিধ রত্নধাতুতে বিচিত্রত। এই করঞ্জ পর্বতেই পরণগতি সম্পন্ন দুর্দান্ত দুর্ধর্ষ গরুরপুত্র এবং নিত্যসর্পশত্রু সুগ্রীবের আবাস। এই পর্বত এরকম অনেক মহাবল পরাক্রান্ত সপশত্রু পক্ষীদের দ্বারা পরিপূর্ণ। করঞ্জ পর্বতের উত্তরদিকে ভূতপতি বৃষভবাহন যোগিবর প্রভু শংকর অবস্থান করছেন আর তাকে কেন্দ্র করে এই পর্বতের চতুর্দিকে নানাবেশধারী দুর্ধর্ষ প্রেতেরা বিচরণ করেন। বসুধারা পর্বতে অমিততেজা ধনশালী অষ্টবসুর আটটি বাসস্থান আছে। এগুলি মহাত্মাগণ দ্বারা পূজিত হন। রত্নধাতু পর্বতেও মহাত্মা সপ্তর্ষিদের সিদ্ধনিবাস আছে। এখানে সাতটি মহাত্মাপূজিত পুণ্য আশ্রমও আছে। নগশ্রেষ্ঠ হেমশৃঙ্গ পর্বতে চতুর্মুখ প্রজাপতি ব্রহ্মার সর্বলোক পূজিত বাসস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গজশৈল পর্বতে ভগবান রুদ্রদেবগণ বহুবিধ ভূতগণের সাথে সানন্দে অবস্থান করেন। এতসব পর্বতের মাঝে সুমেঘ পর্বতের একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। এই মেঘতুল্য শৈলেন্দ্রটি একদিকে যেমন সুন্দর সুন্দর মেঘে শোভমান অন্যদিকে তেমনি বিচিত্র ধাতুতে সমৃদ্ধ। পর্বতটি বহু গর্ভকন্দর অন্তর সানুদেশ এবং নিকুঞ্জ নিকুঞ্জে শোভমান। এই পর্বতদেশ অমিত তেজা আদিত্য ও বসু এবং রুদ্রগণের প্রিয় আবাসস্থল। এছাড়া এখানে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং সিদ্ধ দেবতাবৃন্দের বিশাল বিশাল রমণীয় গৃহ স্থাপিত হয়েছে। যাঁরা নিত্যপূজাপরায়ণ, সেই সকল যজ্ঞ গন্ধর্ব-কিন্নরগণ এখানে নিত্য বসবাস করে থাকেন। এই ধরনের মহিমা থেকে হেমকক্ষ পর্বতটিও বঞ্চিত নয়। এই পর্বত উচ্চ থেকে উচ্চতর প্রাচীর ও তোরণ দ্বারা সুরক্ষিত। দেবপুরীর সমতুল্য আশিটি উৎকৃষ্ট বিলাসবহুল গন্ধর্বপুরী এই শৈলশৃঙ্গের শোভা বর্ধন করছে। আশিজন গন্ধর্ব নারী এইসব পুরীতে অধিষ্ঠান করেন। তারা ছাড়াও যুদ্ধবিশারদ গন্ধর্ব ও অপত্তন নামে কয়েকজন সিদ্ধ এখানে বাস করেন। রকাজ শ্রেষ্ঠ কপিঞ্জল এঁদের অধিপতি হিসাবে বিশেষ সম্মান পেয়ে থাকেন।

আরও অন্য অন্য পর্বতে যাঁদের বসবাস পর্বতটিকে পবিত্র ও শোভনসুন্দর করে তুলেছে। সংক্ষেপে তাদের কথা বলে নিই।

শতশৃঙ্গ পর্বতে অমিত-তেজাঃ বীর্যশালী যক্ষগণের একশত পুরী এবং তাম্রাভ পর্বতে রুদ্রতনয় তক্ষকের একটি অতি মনোহরপুরী বিদ্যমান। অনল পর্বতে মহাবলশালী রাক্ষসগণ এবং পঞ্চকূট পর্বতে দেবারিশ্রেষ্ঠ মহাবলপরাক্রান্ত তথা উদৃপ্ত দানবগণ বাস করে বিশাল পর্বতের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল অসংখ্য গুহা ও বহু অন্তর সানুদেশের অবস্থিতি। গুহনিবাসপ্রিয় গুহ তাই বিশাখ পর্বতের গোপন গুহ্যকন্দরে বিরাট বাসস্থান গড়ে তুলেছেন। শ্বেতোদর মহাশৈলটি অনেক উত্তম ভবনে মণ্ডিত। এখানে রয়েছে গরুড়পুত্র মহাত্মা সুনাভের পবিত্র বাসস্থান। পিশাচক পর্বতে রয়েছে। কুবেরের বিরাট ভবন। হর্মপ্রাসাদ মণ্ডিত এই ভবনে যক্ষ-গন্ধর্বরাও অবাধে বিচরণ করে থাকেন। হরিকূট পর্বতের গাত্র হতে অত্যন্ত, দীপ্তি সম্পন্ন আভা প্রকাশিত হতে থাকে। সর্বলোকপূজিত দেবতা হরি এখানে অবস্থান করে থাকেন। তার প্রভাবেই ওই দীপ্তি বিচ্ছুরণ। কিন্নর, মহাসর্প ও গন্ধর্বদের জন্য যথাক্রমে কুমুদ পর্বত, অঞ্জন পর্বত ও কৃষ্ণ পর্বতের শীর্ষদেশে উত্তম ও বিলাসবহুল গৃহবিশিষ্ট নগরী বিরাজ করছে। একইভাবে মনোহর খিরশালী পাণ্ডুর পর্বত বিদ্যাধরবৃন্দের মহাভবনমালায় শোভিত হয়ে আছে। এই বিদ্যাধর পুরী মহাপ্রাচীর ও মহাতোরণ দ্বারা বেষ্টিত। বলদৃপ্ত দেবতারা নিজেদের জন্য সহস্য-শিখর পর্বতের সুউচ্চ শিখরশীর্ষ নির্দিষ্ট করেছেন। এখানে হেমমালাধারী উগ্রকর্মা বলশালী দেবতাবৃন্দের এক সহস্র মনোশোভা নিকেতন বিদ্যমান। মুকুট পর্বত অনেক অনেক সর্প নিবাসের জন্য বিশিষ্ট। মহাত্মা দৃঢ়তার মুনিগণ তাদের সাধনার উপযুক্ত স্থল হিসেবে পুষ্পক পর্বতে সানন্দে বাস করেন। বৈবস্তব, সোম, বায়ু ও নগাধিপতির চারটি আলাদা আলাদা পুরী সুপক্ষ পর্বতের শোভা অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে। এইসব স্থানে শুদ্ধচিত্ত গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর নাগ বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ নিয়মিত পূজাপার্বণ করে থাকেন।

.

৩৭.

মহর্ষি সূত বললেন, হে পুণ্যাত্মা ঋষিবৃন্দ, আরও শুনে রাখুন, সেই গিরিশ্রেষ্ঠ সুমেরুর বিস্তীর্ণ মধ্যবর্তী স্থলে মহাপুণ্যবান আরও একটি পর্বত আছে। পর্বতটির নাম মর্যাদা পর্বত। মর্যাদা পর্বতমালার একটি শুভ্র পর্বতকূটের নাম হল দেবকূট। এই দেবকূট শৃঙ্গে শত যোজন বিস্তৃত স্থান জুড়ে বিরাট একটি অনিন্দ্য ভবনমণ্ডিত স্থান আছে। বিনতানন্দন ধীমান গরুড় এই ভবনেই জন্ম নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে গরুড় শাল্মলিদ্বীপনিবাসী হন। সেই হিসেবে মহাবায়ুবেগশালী সেই মহাত্মা গরুড়ের এটিই প্রথম বাসস্থান। এখানেই তিনি শীঘ্রগামী সম্পূর্ণ বীর্য, দুর্গম, দুর্দান্ত সর্পর্শ অসংখ্য নিজ বংশীয় মহাপক্ষীদের সাথে বসবাস করতেন।

শ্বেত শুভ্র দেবকূটের দক্ষিণদিকে বিচিত্র মনোরম এবং মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন সাতটি উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ বর্তমান আর সাতটি শৃঙ্গেই ত্রিশ যোজন বিস্তৃত ও চল্লিশ যোজন দীর্ঘ সাতটি গন্ধর্ব নগরী আছে। দেবনির্মিত বিশাল বিশাল ভবনরাজিতে শোভিত এই গন্ধর্ব নগরীগুলি সুবর্ণ নির্মিত প্রাচীর ও তোরণে পরিবৃত। তাই দূর থেকে এইসব গন্ধর্ব নগরীগুলিকে দেখলে মনে হত বুঝি সন্ধ্যার মেঘ ঘনীভূত হয়ে আছে। এখানে বহু স্ত্রী ও পুরুষ একত্রে বাস করেন। এই সপ্তপুরীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এখানে যেসব পরাক্রান্ত গন্ধর্বরা বাস করেন আগ্নেয় নামে প্রসিদ্ধ তারা সকলেই হলেন উত্তম আলয়ের অধিকারী।

দেবকূট মহাশৈলের দক্ষিণদিকে এই সপ্তগন্ধর্ব নগরী থাকলে উত্তরদিকে কেবলমাত্র একটি নগর আছে। নগরটি দেবকূট মহাগিরির উত্তরদিকের একটি শৃঙ্গের উপর অবস্থিত। নগরটির আয়তন চতুর্দিকে ত্রিশ যোজন পরিমাণ। বিবিধ হর্মরাজি প্রাসাদ উদ্যান কাননে শোভিত এই নগরটি উচ্চ প্রাকার ও তোরণ দ্বারা সুরক্ষিত। এখানকার বাতাসে সবসময় শত শত বাদ্যযন্ত্রের শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে।

হে দ্বিজগণ, এই নগরী সিংহীকাত নয়, দেবতা ও সিদ্ধদের প্রিয় নিবাসস্থল। তাই এই নগরটি দেবশত্রুদের পক্ষে দুঃসহ নিদারুণ। তারা এই নগরটি সম্পর্কে বিশেষভাবে অনাসক্তি প্রকাশ করে থাকেন।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, এ তো গেল প্রথম মর্যাদা পর্বতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এবার দ্বিতীয় মর্যাদা পর্বতের কথা বলি। এখানে কালকেয় অসুরদের এক নগর আছে। নগরটির বিস্তার প্রস্থে তাই যোজন ও দৈর্ঘ্যে শত যোজন পর্যন্ত। এই নগরটিতে সারাদিন বহু নরনারীর সমাগম ঘটে থাকে। প্রাচীর ঘেরা তোরনালংকৃত এই দুর্গম নগরটি কনক ও মণিমাণিক্য দিয়ে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত। নানা বর্ণের বিশাল ভবনমালায় আবৃত প্রশস্ত পথবিশিষ্ট নিত্য আনন্দময় ও মঙ্গলময়। রমণীয় দেবকূটতটে সন্নিবিষ্ট সুদুর্জয় মহামেঘাকৃতি এই নগরটি “সুনাসত” নামে পরিচিত।

এই দ্বিতীয় মর্যাদা পর্বতের দক্ষিণদিকস্থ শৃঙ্গশীর্ষে ত্রিকশ যোজন বিস্তৃত এবং বাষট্টি যোজন দীর্ঘ এক মহানগর আছে। সুবর্ণ প্রাচীরে শোভিত আনন্দময় এই নগরটি কামরূপী দুর্ধর্ষ, হৃষ্টপুষ্ট ও গর্বিত রাক্ষসদের প্রিয় নিবাসস্থল।

দেবকূট পর্বতের মধ্যম মহাকূটে ভূতবট নামে একটি সুদৃশ্য বৃক্ষ আছে। অসংখ্য ভূতপ্রেত এই বৃক্ষে বাস করে থাকেন। বৃক্ষটি আগাগোড়া কনক ও মণিমাণিক্য পাষাণে চিত্রিত। মসৃণ মঙ্গলকর এই বৃক্ষ শত সহস্র শাখায় বিভক্ত এবং প্রচুর আরোহে সমাকুল। এর মূলদেশ বিশাল। স্কন্ধ অসংখ্য আর পত্ররাশি স্নিগ্ধ। সুন্দর পবিত্রতার প্রতীক এই বৃক্ষটির অবিচ্ছিন্ন ছায়া প্রায় দশ যোজন বিস্তৃত ভূমিতলকে অধিকার করে থাকে। এই ভূতবট বৃক্ষের কাছেই মহাত্মা ত্র্যম্বক মহাদেবের সর্বলোকসিদ্ধ দীপ্তিমান আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভূতবৃক্ষতলে অসংখ্য ভূত মহাপারিষদরূপে নিত্য অবস্থান করে থাকেন। বাঘ, সিংহ, শূকর, ভালুক, শকুনি, করভ, পেরচক, মেষ, উট এবং ছাগলের যেমন উগ্র ধরনের মুখ হয়, এদের মুখেও সেই আদল দেখা যায়। এরা বিরাট, বিকট, দীর্ঘকেশী, খুললোম, নানা বর্ণ ও নানা আকৃতিধারী হয়ে থাকেন। এঁরা কোনো এক জায়গায় ঘনসন্নিবদ্ধভাবে না থেকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতেই বেশি পছন্দ করেন। এঁরা যেমন দীপ্ত তেমনই উগ্র পরাক্রমশালী, ঝঝর, শঙ্খ, পটহ, ভেরী, ভিণ্ডিম, গোমুখ শত-শত বিস্ফূর্জিত এবং তালঝংকার সহ নানা উচ্চস্বরের গীতবাদ্য সহযোগে সর্বলোকপূজিত ভূতপতির নিত্য পূজা আরাধনা করেন। তবে তাদের এই পূজায় কোনো বলি ব্যবস্থা ছিল না। ত্রিপুরারি মহাদেবের অনুচরবর্গ গণপতি ভূতেরা আনন্দিত ও প্রীত চিত্তে সর্বদা এই ভূতবটতলে ক্রীড়ারত থাকতে পছন্দ করেন।

দেবর্ষি, মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ ও সিদ্ধশ্রেষ্ঠগণ সর্বদা এই ভূতবটবৃক্ষতলে তাদের পরম আরাধ্য সেই লোকমঙ্গল শিশু মহাদেবের নিত্যপূজা করে থাকেন।

.

৩৮.

ত্রিকালদর্শী লোমহর্ষক সূত বললেন, হে ভূর্লোক শ্রেষ্ঠ দ্বিজবৃন্দ, নির্জন চারুশিখর শঙ্খদীপ্ত যে কৈলাসপর্বত, তা সুকর্মশীল দেবভক্তদের আলয়–একথা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। এই মহান পর্বতের মধ্যবর্তী কোনো এক কুন্দ শুভ্র মনোহর শিখরদেশে ধনাধ্যক্ষ মহাত্মা দেবতা কুবেরের এক সুন্দর নগর ছিল। নগরটির বিস্তার ছিল খুব বেশি। কেবলমাত্র দৈর্ঘ্যেই তা ছিল দেড়শত যোজন। সুবর্ণ মণিচিত্রিত বহু বিশালাকৃতি হর্সরাজিতে ভূষিত এই নগরকটি সদা আনন্দময় ও সমৃদ্ধির প্রতীক বলে মনে করা হত। অনাক্রম্য সেই শহরে বিবিধ কনকমণ্ডিত বিপুল স্তম্ভতোরণে সমৃদ্ধ “বিপুলা” নামক এক মনোরম সভা ছিল। পুস্পক নামে নানা রত্নভূষিত সকল কামনার পরিপূরকাদি গুণযুক্ত মনোহর এক মহাবিমান সেখানে সর্বদা বিরাজ করত। যধিপতি মহাত্মা কুবেরের বাহনস্বরূপ হেমজাল ভূষিত এই মহাবিমানটি মনের গতির মতো ত্বরিৎ গতিতে নিজের ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করতে পারে। ওই সভাতেই দেবপ্রবর মহাত্মা কুবের বহুসংখ্যক অপ্সরা, যক্ষ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও চারণদের সঙ্গে বসবাস করতেন। কুবের দেবতা ব্যতীত সর্বভূত নমস্কৃত একপিঙ্গল নামে এক যক্ষেন্দ্র সেই সভায় বাস করতেন। যেখানে ধনেশ্বর কুবেরের আবাসস্থল সেই মহাশৈল কৈলাস ছিল আমি, যম প্রমুখ দেবতা এবং অনিন্দ্যসুন্দরী অপ্সরাদের নিবাসস্থল।

বিপুলা এই সভায় আটটি মহানিধি সযত্নে সঞ্চিত ছিল। এগুলি ধনেশ্বর কুবেরের ধন সম্পদ। এগুলি হল পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, শঙ্গ, নীল ও নন্দন।

কৈলাস শিখরদেশে যক্ষেন্দ্র কুবের ও তার সেবকবৃন্দের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা আছে। এর পূর্বদিকে যক্ষেশ্বর কুবের দেবতার আলয় আর পশ্চিমদিকে তার পরিচারকদের আবাসস্থান।

সুরম্য বিপুলোদকা সুবর্ণমণি সোপানা নানাপুষ্প রেণু সুরভিত মন্দাকিনী নদী এই কৈলাস পর্বতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। নীলাভ বৈদূর্য্যমণির মতো দ্যুতিমান পত্রশোভিত গন্ধময় বিশাল বিশাল উৎপল এবং পদ্ম ও কুমুদ খণ্ডে অলংকৃতা এই মন্দাকিনী নদীতে যক্ষরমণী, গন্ধবনারী ও অপ্সরাদের জলকেলি এক বিশেষ শোভা সৃষ্টি করত। এই নদীতে যেসব পদ্ম প্রস্ফুটিত হত, সেগুলি জাম্ব নদের পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত হল। সেগুলি জাম্বনদের পদ্মের মতো গন্ধ-স্পর্শ-সুখ সমৃদ্ধ হত। মন্দাকিনী ছাড়াও কৈলাস শৃঙ্গে যে জলাশয় ছিল দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ রাক্ষস কিন্নরেরা সেই জলাশয় আর মন্দাকিনীর জল মহানন্দে স্পর্শ করতেন এখানে অলকানন্দা ও নন্দা নামে আরও দুটি নদী প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। দুটি নদীই দেবর্ষি সেবিত মন্দাকিনীর স্রোতধারায় যে যে গুণ আছে সেইসব গুণ এই নদী দুটিতেও ছিল।

শৈলবর কৈলাসের পূর্বশৃঙ্গে দশটি নির্মল আনন্দমগ্ন নগর ছিল। এর আয়তন দৈর্ঘ্যে সহস্র যোজন এবং প্রস্থে ত্রিশ যোজন পর্যন্ত। অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন এই নগরগুলিতে বিশাল বিশাল বহু শ্রেণীবদ্ধ প্রসাদ দূর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করত। সুবাহু, হরিকেশ, চিত্রসেন, জর প্রথম দশজন গন্ধর্বরাজা ওই নগরগুলি শাসন করতেন। তারা সকলেই ছিলেন দীপ্তবহ্নির মতো পরাক্রমশালী।

কৈলাসশৃঙ্গের পশ্চিমশৃঙ্গে আশি যোজন দীর্ঘ ও চল্লিশ যোজন বিস্তৃত বিশাল ভবনমালায় সজ্জিত আনন্দ ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন আরও ত্রিশটি নগর ছিল। কৈলাসের এই পশ্চিম শৃঙ্গটি ছিল কুকুসুম ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ সিদ্ধ দেবর্ষি দ্বারা সেবিত ও নানা বর্ণের ধাতুতে চিত্রকবিচিত্ত। বায়ু ও অগ্নির মতো তেজস্বী, মহামানী, সুনেত্র, মুনিবর প্রভৃতি ত্রিশজন ছিলেন ওই ত্রিশটি নগরের রাজা শ্রীমান প্রভুস্বরূপ বৈশ্বর্বণদেব ছিলেন এঁদের সকলের অধিপতি।

এই কৈলাস পর্বতের দক্ষিণ দিকেই রয়েছে সুমহান হিমালয় পর্বতমালা। এতে বহুবিধ নিকুঞ্জ, নিঝর, উপত্যকা ও গুহা-গহ্বর আছে। এর আয়তন পূর্বসাগর থেকে পশ্চিমসাগর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। হিমালয় পর্বত অসংখ্য শৃঙ্গময় এর কোথাও কোথাও হৃষ্টপুষ্ট নরনারীপূর্ণ কিন্নরনগর আছে এরকম প্রায় একশত কিন্নর নগরের সন্ধান পাওয়া গেছে। তেজস্বী, সুগ্রীব, ভগদ ও দ্রুম প্রমুখ একশত ব্যক্তি হলেন দৃপ্ত ও বলশালী ওই সব কিন্নরদের রাজা।

সর্বলোক প্রসিদ্ধ যে উমাবন তাও হিমালয়েই অবস্থিত। এই বনেই মহাদেবী উমার সাথে রুদ্রের বিবাহ হয়েছিল। এখানেই বারাঙ্গনা গৌরী দেবদেব রুদ্রকে পতিরূপে পাবার জন্য ঘোর তপস্যা

শুরু করেছিলেন। এখানেই রুদ্রদেব কিরাতরূপ ধারণ করে গৌরীর সাথে ক্রীড়া করেছিলেন, এখান থেকে হরগৌরী প্রসিদ্ধ জম্বুদ্বীপ দর্শন করেছিলেন। এখানেই রুদ্রদেবের বিচিত্র ভূতপ্রেত পরিবেষ্টিত রং বেরং-এর আনন্দিত ক্রীড়াভূমি। এই উমাবনেই বহু গিরিগুহাবাসিনী কৃশোদরী সুলোচনা মনোরমা সুন্দরী কিন্নরনারী বিশাললোচনা যক্ষবধূগণ বারাঙ্গনা অপ্সরারা এবং গন্ধর্বাঙ্গ-নারীবৃন্দ সানন্দে সারাক্ষণ রমন করতেন। এই স্থানেই ভগবান শিবশংকর অর্ধনারীদেহ ধারণ করেছিলেন। সর্বোপরি ষড়ানন কার্তিকেয় যে শরবনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটিও এই উমাবনের মধ্যেই অবস্থিত।

হে দ্বিজগণ, এখানে কার্তিকেয় সম্বন্ধে কটি কথা আপনাদের জানিয়ে রাখব। ক্রেঞ্চৈ ঘাতী কার্তিকেয়র প্রিয় ক্রীড়াভূমি হল পাণ্ডশিলা। এই ভূমিটি নানাভুতগণে সমাকুল হিমালয়ের মঙ্গলময় পূর্বদেশেই অবস্থিত। শুধু হিমালয় পর্বতমালার পূর্বদেশেই শ্রীমান কার্তিকেয়র বিচরণ সীমাবদ্ধ নয়। এই হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশেই এমন একটি স্থান আছে যেখানে কার্তিকেয় ক্রৌঞ্চবিদারণে উৎসাহিত হন। যেখানে তার বহুবিধ ধ্বজপতাকা ও কিঙ্কিনীমণ্ডিত সিংহরথ অবস্থিত থাকে। এছাড়া এই হিমালয়ের পৃষ্ঠদেশেই বিচিত্র পুষ্পময় নিকুঞ্জশোভিত ক্রৌঞ্চগিরির তটে দেবারিপীড়ক স্কন্দদেব শক্তি অস্তর বিমোচন করেন। এই সুখ্যাত ক্রৌঞ্চগিরিতটে দ্বাদশ সূর্যের প্রতাপশালী দৈত্যরিগুহ অর্থাৎ বুদ্ধিমান কার্তিকেয়কে ইন্দ্র উপেন্দ্র সহ অন্যান্য সুরশ্রেষ্ঠগণ পরমাদরে দেব সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করেছিলেন।

হিমালয় পর্বতের সুরম্য পূর্বশৃঙ্গে সিদ্ধ আনন্দময় আবাসভূমি আছে। ইহা পণ্ডিতগণের কাছে। 'কলাপগ্রাম' নামে খ্যাত। শুধু সিদ্ধগণ নন, এই হিমালয় শৈলশিখরে শত-সহস্র উগ্রতপা শুদ্ধাত্মা ঋষিবরের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশিষ্ট বিশ্বমিত্র, মৃকণ্ড, উদ্দালক, নল, ভরত প্রমুখ সকলেরই এই স্থানে এক একটি পবিত্র ধার্মিক আশ্রয় গড়ে উঠেছে। এই হিমালয় শৈলে এমন বহু আশ্রয় আছে যেখানে বিশিষ্ট সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব ও নানা স্লেচ্ছ জাতি বসবাস করে থাকেন। এই হিমালয় পর্বতমালারই অগনন গিরিশৃঙ্গ এমন বহুপ্রকার রত্নের আকর আছে, এমন বহু উৎসমুখ আছে যেখান থেকে কত যে পুণ্যসলিলা নদী নির্গত হয়েছে, তা সংখ্যায় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

.

৩৯.

মহর্ষি সূত বললেন, হে ভূর্লোকশ্রেষ্ঠ দ্বিজবৃন্দ, আমি এক্ষণে পশ্চিমের নিষদ শৈলশিখরের যথাযথ এবং নিঃশেষ বিবরণ দিচ্ছি, আপনারা বিশেষভাবে শ্রবণ করুন।

নিষধ গিরির মধ্যম শৃঙ্গটি স্বর্ণ ও ধাতু ভূষিত। এখানে বিষ্ণুর একটি দীপ্ত আশ্রম আছে। আশ্রমটি সিদ্ধ ও ঋষিগণের দ্বারা নিত্য সেবিত হয়ে থাকে। যক্ষ, গন্ধর্ব ও অপ্সরারা পরমানন্দে এইসব আশ্রমে বাস করেন। সেই আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত পীতাম্বরধারী বরদ সনাতন লোকবিধাতা দেবশ্রেষ্ঠ হরি সিদ্ধ সম্প্রদায়ের দ্বারা ভক্তিভরে পূজিত হন। এই মধ্যম শৃঙ্গেই উল্লঙঘন পরিধিবিশিষ্ট অতি-বিস্তীর্ণ এক বিশাল পুরী আছে। এই পুরীতে বহু হ্যরাজি, তপ্তকাঞ্চন তোরণ, অসংখ্য চূড়াময় প্রাসাদ শত-শত রাজপথ শেষ না হওয়া উদ্যানমালা আছে। পুরীটি সর্পতুল্য শত্রুপক্ষের কাছেও যেন অত্যন্ত দুঃসহ।

নিষধশৈলের দক্ষিণ শৃঙ্গদেশে বহু বহু দৈত্যপরিপূর্ণ এক দুর্গম নগর আছে। গুহার মধ্য দিয়ে এই নগরে প্রবেশ করতে হয়।

নিষধশৈলের পশ্চিম শৃঙ্গদেশে পরিপাত্র নামে দেব, দানব ও নাগদের সমৃদ্ধিসম্পন্ন বহু শিলাময় পুরী আছে, এখানেই সোমশিলা নামক একটি পুরীতে ভগবান সোমদেব প্রত্যেক পর্বে পর্বে অবতরণ করে থাকেন। এই স্থানে বসেই ঋষি, গন্ধর্ব এবং কিন্নরগণ তমোনাশক অনিন্দিত সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ তারাপতি চন্দ্রদেবের উপাসনা করে থাকেন।

এরই উত্তরদিকের শৃঙ্গদেশে "ব্রহ্মপার্শ্ব" নামে এক পবিত্র স্থান আছে। সুরেশ্বর ব্রহ্মা এখানে বিরাজ করেন। এই স্থান স্বর্গের দেবতাদের মধ্যেও প্রসিদ্ধ। সিদ্ধ, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব–এঁরা সকলেই যজ্ঞ-পূজা-নমস্কারে সেই স্বায়ম্ভব মহাত্মার আন্তরিক উপাসনা করে থাকেন। এই

শৃঙ্গেই বিরাজ করছে সর্বলোক প্রসিদ্ধ বহ্নিদেবতার মন্দির। সেখানে চারণেরা সিদ্ধ সম্প্রদায়ের ভক্তরা বিগ্রহবাণ। বহ্নিদেবতার সেবা করে থাকেন।

এরও উত্তরে আছে “ত্রিশৃঙ্গ” নামে এক পর্বত। এই মনোহর পর্বতে নানা ভূতগণেরালয় ত্রিলোক প্রসিদ্ধ “হেমচিত্র” নামে এক পুরী আছে। এই পুরী নানা সিদ্ধচারণ ও ঋষি দ্বারা সেবিত হয়ে থাকে। হে দ্বিজোত্তমগণ, এই “হেমচিত্র” পুরীতে তিনজন প্রধান প্রধান দেবতার মন্দির আছে। যেমন–পূর্বদিকে ভগবান নারায়ণ শংকরের মন্দির বিরাজমান। দৈত্য, দানব, রাক্ষস, পন্নগ, গন্ধর্ব, যক্ষ সকলেই ত্রিশৃঙ্গস্থিত মহাবল দেবদেব এই তিনজন দেবতার উদ্দেশ্যে নিত্যদিন যজ্ঞ ও পূজা, আরাধনা করে থাকেন। এই পর্বতরাজ ত্রিশৃঙ্গের কোনো কোনো গুপ্ত স্থানে গন্ধর্ভ, যক্ষ ও নাগেদের অনেক রমণীয় পুরী আছে।

ত্রিশৃঙ্গ পর্বতের উত্তরদিকে জারুথ নামে একটি দেবসেবিত পর্বত আছে। পর্বতটি অসংখ্য শৃঙ্গ বিশিষ্ট। সিদ্ধ ও সাধুগণ দ্বারা সেবিত এই মহাবল পর্বতে সহস্র সহস্র যক্ষ, নাগ গন্ধর্ব, রাক্ষস, কিন্নর ও দৈত্যরা বাস করে থাকেন। রত্নধাতুভূষিত সিদ্ধ দেবর্ষি সেবিত এই পর্বতটির রমণীয় মধ্যম শৃঙ্গে আনন্দর্জল নামে এক সরোবর আছে। প্রস্ফুটিত সুগন্ধিত পদ্ম ও কুমুদবন এর শোভাবর্ধন করে চলেছে। এছাড়া বহু জলজ প্রাণী, হংস ও কারণ্ডবাদি পক্ষী ও মণ্ডত ভ্রমরের গুঞ্জন ও বিহঙ্গ কূজনে এই সরোবর সদা মুখরিত। সরোবরটির জলরাশি সম্পূর্ণভাবে জলদোষবর্জিত ও পুণ্যবতী। সিদ্ধগণ ভক্তিভরে এর জলে আচমণ করেন। সরোবরটির ঘাটসকল অতিশয় মনোরম। এর মণ্ডলাকার পরিধি ত্রিংশত যোজন বিস্তৃত। মন্দ নামে এক দুর্ধর্ষ নাগপতি আছে।

এই সরোবরে দীর্ঘকাল ধরে বাস করছেন। এই মহাভাগের মস্তক এক শত এবং শরীর বিষ্ণু চক্রে অঙ্কিত।

এই যে আটটি বিচিত্র পর্বতের বিবরণ দিলাম, এগুলি সবই দেবপর্বত বলে জ্ঞেয়।

সমগ্র বসুন্ধরা এই রকম এই রকম বিশাল আয়তনের বহু পুণ্যপ্রদ সরোবর, অসংখ্য সুবর্ণগিরি, রকজতকিরি, হরিতাল পর্বত, হৈঙ্গলক পর্বত, মনঃশিলাদি, বিবিধ ধাতুতে বিচিত্র ভাস্বর ভাস্করপ্রভ, একাধিক মণিপর্বত এবং আরও অনেক বিশালায়তন পর্বতরাজিতে পরিপূর্ণ। এই যেসব সহস্র সহস্র পর্বত নানাবর্ণের পৃষ্ঠদেশ–তাতে যে কত নদী, কত কন্দর, কত শত বিচিত্ররূপা অন্তর সানুদেশ আছে তার ইয়ত্তা নেই। বসুন্ধরার এইসব পুণ্যপ্রদ পর্বতপৃষ্ঠে দৈত্য, দানব, রাক্ষস, কিন্নর, গন্ধর্ব, উরগ, বিচিত্র সিদ্ধ, ও অপ্সরাগণের বাস, যে সকল পর্বত

কেসরাকৃতি সেগুলি পুণ্যবান ব্যক্তিতে সমাকুল। মেরুপ্রদেশে যে গিরিজাল, তা সিদ্ধলোক রূপে প্রসিদ্ধ। এই বিচিত্র গিরিজাল পুণ্যাত্মাদের আশ্রয়, যাঁরা কখনও অত্যুগ্রকর্ম করেননি, অর্থাৎ যাঁরা সকাম কর্ম করে থাকেন, তাদের কাছেই এই সিদ্ধলোক স্বর্গরূপে খ্যাত।

প্রাচীন ঋষিরা এই স্বর্ণগর্ভা পৃথিবীকে "চতুর্মহাদ্বীপবর্তী" বলে নির্দেশ দিয়েছেন প্রত্যেক দ্বীপই বিবিধ বর্ণে চিত্রিত। প্রত্যেক দ্বীপই বিবিধ ভক্ষ্য, অন্ন-পানীয়, নানাপ্রকার বস্ত্র ও ভূষণে পরিপূর্ণ। এইসব বিবিধবর্ণ দ্বীপে বিধি বিচিত্র অদ্ভুত অদ্ভুত পরানীরা বাস করেন। এই মহান চারটি দ্বীপের নামে ভদ্রাশ্ব, ভরত, কেতুমাল ও উত্তর কুরু। এর মধ্যে কেতুমাল দ্বীপ পশ্চিমদিকে এবং পুণ্যাশ্রয় ব্যক্তিদের বাসভূমি কুরুদ্বীপ উত্তরদিকে অবস্থিত।

চতুমহাদ্বীপবিশিষ্ট পদ্মাকার এই পৃথিবীতলে আরও বহু দ্বীপ আছে। হে দ্বিজবৃন্দ, সেই সকল দ্বীপসমুদয়ের কথা আমি আগেই বলেছি। মনে রাখবেন, সেইসব দ্বীপগুলি কিন্তু এই চারটি মহাদ্বীপেরই অন্তর্গত। শৈলশিখর বনাঞ্চল ও কাননে-কাননে শোভিত বহুদূর বিস্তৃত এই সমগ্র পৃথিবীলোক "পদ্ম" নামে পণ্ডিত সমাজে অভিহিত হয়ে থাকে। এই পৃথিবীতলেই সর্বপ্রাণীর ব্যবহার্য ব্রহ্মলোক, দেবাসুর লোক ও মনুষ্য লোক নামে তিনটি লোক প্রতিষ্ঠিত আছে। লোকপদ্মের যে স্থান শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, বর্ণ ও রসে পরিপূর্ণ যে স্থান চন্দ্র-সূর্যের কিরণছটায় পরিব্যাপ্ত সেই স্থানকে "জগৎ" নামে অভিহিত করা হয়। 'শ্রুতি' তে এই লোকপদ্মই 'পদ্ম' নামে চিহ্নিত বা নির্দেশিত হয়েছে। হে ঋষিগণ সকল পুরাণেই এই ক্রম অত্যন্ত সুপরিচিত বলে জানবেন।

.

৪০.

সূত বলে চললেন, যে সমস্ত পুণ্যদা দেবনদী ও অন্যান্য মহাবেগা নদী পূর্বে উল্লিখিত ওই সকল সরোবর থেকে বিনির্গত হয়েছে। এবার ক্রমানুসারে তাদের বিবরণ প্রদান করছি, আপনারা মনোনিবেশ সহকারে শুনুন।

আমরা আকাশতলে যাকে জলবিধি রূপে দেখি তার নাম হল সোম। এই সোম হল দেবতাদের অমৃতের আকর, সকল প্রাণীর আধার। পুণ্যপ্রদ সরোবর থেকে বিনির্গত হয়ে পুণ্যসলিলা বিমলোদক নদীটি বায়ুর সপ্তম পথে বিচরণপূর্বক জ্যোতির্গণ নিষেধিত হয়ে এবং স্বয়ং জ্যোতিষ্ক পদার্থ দ্বারা সেবা করতে করতে আকাশপথে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই ভাবে চলতে চলতে কোটি-সহস্র বছর অতিক্রান্ত হল। তার মধ্যে আকাশপথেই মাহেন্দ্র, গজেন্দ্র, ঐরাবতের সাথে ক্রীড়াস্থলে তার বিপুল জল হল বিক্ষিপ্ত। তারপর সেই নদীবিদ্যমান জল ও তৈজস বায়ুর সাহায্যে মেরুপর্বতের উত্তরাংশের শৃঙ্গে পতিত হল। সেই মেরুকূটের তট প্রান্ত থেকে এই নদীর জল দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে প্রথমে চারিভাগে বিক্ষিপ্ত হল এবং তারপর ষাট হাজার যোজন বিলম্ব হয়ে চলতে চলতে একসময় মেরুর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আকাশপথে প্রবাহিত হওয়ার সময় বিমানযোগে গমনশীল সিদ্ধদের স্পর্শে নদীটির জল প্রথম থেকেই অতিশয় পুণ্যপ্রদ তথা মঙ্গলপ্রদ হয়েছিল। মেরুপ্রদেশের পৃষ্ঠতলে নিপতিত হওয়ার পর সেই সিদ্ধস্পর্শিত পুণ্যসলিলা মহানদী মন্দরের পূর্বদিক দিয়ে এসে পড়েছে। মন্দরপর্বতের স্থানে স্থানে বহু পর্বত নিঝর ও মনোহর কন্দর আছে। মন্দর পর্বতের পার্শ্বভাগ সুবর্ণ চিত্রিত। তার ওপর পর্বতটি দেব ও সিদ্ধগণের প্রিয় আলয়। নদীটি রোগপ্রশমক অসংখ্য স্ফটিকজল। প্রবাহে সেই মন্দর পর্বতের পূর্ব ভাগ প্লাবিত করে প্রবাহিত হচ্ছে। এই একই গতিপথে অম্বর নামক নদীটি প্রদক্ষিণ অন্তে রম্য চৈত্ররথ উদ্যান প্লাবিত করে অরুণোদ সরোবরে প্রবেশ করেছে। তারপর সেই শীণগামিনী নদী অরুণোদ সরোবর থেকে নির্গত হয়ে রমণীয় নিঝরময় সিদ্ধনিবাস শীতান্ত শৈলশিখরে এসে পড়েছে। শীতাম্ভ শৈলের নিকুঞ্জ গুঞ্জে ওই নদীর বেগ

তীব্রভাবে নিরুদ্ধ হলে তা বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। যে স্থানে ওই মহাপুণ্যা নদী শ্রেষ্ঠা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়েছে, সেই স্থানে তা "সীতা" নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। শীতাম্ভ শিখর হতে এই তীব্র বেগবতী নদী প্রথমে পর্বতশ্রেষ্ঠ সুকুঞ্জে এসে পড়ল। সেখান থেকে সুসমঞ্জস পর্বতে, তারপর মাল্যবান পর্বতের উচ্চশিখরে পতিত হল কিন্তু ওই নদীশ্রেষ্ঠার দুঃসাহসী বেগ মাল্যবান পর্বতও ধারণ করতে না পারায় সেখান থেকে ভ্রষ্ট মণিপর্বতে, মণিপর্বত থেকে অসংখ্য কন্দরময় মহাশৈল বক্ষে এসে পড়েছে।

এইভাবে সব স্থান প্লাবিত করতে করতে, বহু শৈল-শিখরকে বিদীর্ণ করতে করতে সেই মহানদী সিদ্ধসেবিত মহাশৈল জঠর পর্বতে উপনীত হল। তারপর সেই মহাশৈলের কুক্ষি থেকে নির্গত হয়ে বিশাল বিশাল জলকণায় সহস্র বনস্থলী, শত শত শৈলরাজ, বিচিত্র বিবিধ সরোবর প্লাবিত করে সেই বিমল সলিলা মহাভাগা মহানদী ক্রমে ক্রমে সমুদ্রান্তা পৃথিবীতে এসে মিলিত হল। এই মহাভাগ নদী শ্রেষ্ঠকে সহস্র সহস্র নদী অনুসরণ করে চলল।

এবার সেই মহানদী ভদ্রাশ্ব নামে মহাদ্বীপকে এবং অন্যান্য পর্বতকেও প্লাবিত করে পুবদ্বীপবর্তী সমুদ্রে প্রবেশ করল। বিভিধ বিচিত্র বেগে ও কলকল ধ্বনিতে নদীটির জল বিস্ফারিত হতে লাগল। ক্রমে নদীটি দক্ষিণদিকে বাঁক নিয়ে গন্ধমাদন পর্বতশৃঙ্গে এসে পতিত হল এবং অচিরেই গুহাময় আনন্দজনক গন্ধমাদন বন প্রদক্ষিণ ও প্লাবন সম্পূর্ণ করল।

এরপর এই নদীশ্রেষ্ঠ সর্বলোক প্রসিদ্ধ অলকানন্দা নাম গ্রহণ করে উত্তরদিকের দেবসেবিত মানস সরোবরে প্রবিষ্ট হল। তারপর সরোবর থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে কলিঙ্গ শিখরে, কলিঙ্গ শিখর থেকে রুচক পর্বতে, রুচক পর্বত থেকে নিষধে, নিষধ থেকে তাম্রাভশৈলে এবং সেখান থেকে শ্বেতোদর পর্বতে এসে সাময়িকভাবে স্তব্ধ হল। তারপর আবার সেখান থেকে সমূল ও বসুধার শৈলখণ্ডে, বসুধার থেকে হেমকূটে, হেমকূট থেকে দেবশৃঙ্গে, সেখান থেকে মহাশৈলে এবং মহাশৈল থেকে পিশাচক শৈল, পিশাচক থেকে পঞ্চকূট শৈল এবং পঞ্চকূট থেকে দেবগণের আবাসভূমি শিলাময় কৈলাস শিখরে এসে পতিত হল। কৈলাস পর্বতের চমৎকারিত্ব এর বহু বিচিত্র কন্দর-এ সানুম্য কৈলাস উদর পরিভ্রমণ করে শৈলরাজ দেবগিরি হিমালয়ের শিখরগুলিতে এসে পড়েছে। এইভাবে এই ত্বরিতগতি মহাভাগা মহানদী সহস্র সহস্র শৈলশিখর থেকে ভ্রষ্ট হয়ে শত-সহস্র বনস্থলী ও কন্দর বিদারিত ও প্লাবিত করে দক্ষিণদিকে এগিয়ে চলল। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ, বহু যোজন বিস্তীর্ণ শৈলোদরে আশ্রিত এই পুণ্যসলিলা বেগবতী নদীকে মহাত্মা দেবাদেব শংকর মস্তকে ধারণ করেছিলেন। সর্বলোক প্রসিদ্ধ এই নদী শ্রেষ্ঠা

খোরক পাপ রাশিকেও পবিত্র করে। ধীমান শংকর মহাদেবের অঙ্গ স্পর্শ করায় এর জল অতি পবিত্র হয়ে উঠেছে।

একটি পর্বতশীর্ষ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অপর শৈলশিখরে পতিত হতে হতে বিভিন্ন গুহা কন্দর সানু মরু প্লাবিত করতে করতে এইভাবে এই পুণ্যপ্রদ নদী পর্বতগুলির বিভিন্ন স্থানকে চারিদিক থেকে বেষ্টন ও প্লাবিত করে বহু মুখে প্রবাহিত হয়েছে এবং সহস্র সহস্র ভিন্ন ভিন্ন নামে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। পূর্বোল্লিখিত হিমালয় শীর্ষ থেকে নিপতিতা সিদ্ধসেবিতা এ মহানদী প্রথমেই “গঙ্গা” নামে প্রকাশিত হল। রুদ্রসাধ্য-অনিল-অদিত্যে সেবিত যশস্বিনী গঙ্গা নামী এই মহানদী যেসব দেশে বিরাজমান, সেইসব দেশ এর পুণ্য স্পর্শে ধন্য।

মেরুর পশ্চিমে অবস্থিত মহাপাদ নামক বিপুল শৈলরাজের কথা এবার বলছি, শ্রবণ করুন। এই পুণ্যপ্রদ শৈলরাজ নানাবিধ রত্নের আকর ইহা পুণ্যবানদের দ্বারা সেবিত। এর উদর ও কন্দর মহাভাগা নদীর সলিলে প্লাবিত। আবার এই শৈলরাজের যে উদর দেশ, তা বিমল কটক কুঞ্জেও সুশোভিত। এই স্থানে ওই বিমলোদক নদীটির জলরাশি মহাদেব ইন্দ্রাদি দেবতা স্পর্শ করে থাকেন। বায়ুবেগাহত এই নদী সে স্থানে লতার মতো কম্পিত হয়। মেরুপর্বতের কূটতট থেকে মহাভাগা এই, নদীটি যখন নীচের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে তখন এর জলরাশি ক্রমশ বিস্তারিত হতে থাকে। আর নদীটিকে ঠিক একটি নির্মল বসনের মতো দেখায়।

মেরুকুটের অম্বর নদী সিদ্ধ ও চারণের দ্বারা পূজিত হয়ে দেবভ্রাজ, মহাভ্রাজ ও বৈভ্রাজ বনকে প্রদক্ষিণ করে প্লাবিত হতে থাকে। তারপর সেই মহাভাগা নদী নানা পুষ্পফলেশোভিত ও নানা বনাঞ্চলে বিভূষিত হয়ে নানা দিক প্রদক্ষিণ করতে করতে “সিতোদ” নামে নির্মল এক পশ্চিম সরোবর এসে প্রবিষ্ট হল। অতঃপর এই সরোবর থেকেও নিষ্ক্রান্ত হয়ে সেই নদী সুপক্ষ শৈলে অবতরণ করল। এখানেও নদীর গতি রুদ্ধ হল না। তাই দেবর্ষি সেবিত সুপক্ষ পর্বত থেকেও নদীটি নিষ্ক্রান্ত হল। তারপর সেখান থেকে রমণীয় শিখিশৈলে, শিখিশৈল থেকে কঙ্কশৈলে, কঙ্কশৈল থেকে বৈদূর্য্যশৈলে, বৈদুর্য্য থেকে কপিল এবং কপিল থেকে গন্ধমাদন শৈলশিখরে পতিত হল। এরপরও গন্ধমাদন অতিক্রম করে নদীটি পতিত হল পিঞ্জর শৈলে, পিঞ্জর থেকে সুরস শৈলে, সুরস থেকে কুমুদাচলে, কুমুদাচল থেকে মধুমান শৈলে এবং মধুমান থেকে অঞ্জাজন শৈলে। আবার সেখান থেকে মুকুট শৈলে, মুকুট থেকে কৃষ্ণ শৈলে, কৃষ্ণ থেকে মহানাগসেবিত শ্বেতশৈলে এবং শেতশৈল থেকে সহস্রশিখর শৈলে গিয়ে পড়ল। অবশেষে বহু নরনারী সেবিতা মঙ্গলদায়িনী দ্রুতবেগা মহানদী অসংখ্য নিটর, নদী, গুহা ও সামুতে বিভূষিতা হয়ে সহস্র শৈলশিখর বিদীর্ণ কয়েক পরিজাত মহাশৈলে এসে আপতিত হল। কিন্তু পারিজাত

মহাশৈলের অসংখ্য কুক্ষিতে তরঙ্গিত নীর জল বারেবারে বিভ্রান্ত হতে লাগল। তার ফলে নদীটির বেগ বারবার গণ্ডশৈলে ব্যাহত হতে লাগল, তার বিপুল জলরাশি মথিত হতে লাগল। এইভাবে বারে বারে স্রোত পরিবর্তন করতে করতে ধরণীতলের নানা ম্লেচ্ছ পরিপূর্ণ কেতুমাল মহাদ্বীপে উপনীত হল।

এইভাবে বিচিত্র প্রবাহপথে প্রবাহিত হয়ে সেই মহাভাগা মহানদী উত্তরাংশের মেরুর বিচিত্র মহাপাদ এসে পড়ে। এই মহাপাদের পার্শ্ববাহ সুবর্ণখোচিত হওয়ায় এর নাম রাখা হয়েছে সুপার্শ্ব। এই সুপার্শ্বে বিরাট বিরাট প্রাণীরা বাস করে।

এদিকে মেরুকূটতট ভ্রষ্টা সেই পুণ্যপ্রদ নদীর জল যতই বায়ুতাড়িত হতে লাগল ততই আকাশপথে নদীটি ক্ষিপ্ত হতে লাগল। ষাট হাজার যোজন নিরালম্ব শূন্য পথ অতিক্রম করে সেই নদীটি বিকীর্ণ মালার মতো ভূপতিত হল।

এইভাবে মেরুকূট তট ভ্রষ্টা অসংখ্য দেবর্ষিসেবিতা বিকীর্যমান জেলা, পুষ্প ও উড়প শোভিতা মহাভাগা মহানদী সুপার্শ্বের শৃঙ্গ থেকে বিনির্গত হয়ে নানরত্নভূষিত সবিতবন নামে এক মহাবন প্রদক্ষিণ ও প্লাবিত করে মহানাগসেবিত 'মহাভদ্র' নামে মহাপুণ্যবতী মঙ্গলময় নির্মলোদক সরোবরে প্রবেশ করল। অতীব দ্রুতগামিনী এই নদী সেই স্থান থেকে নির্গত হবার পর 'ভদ্রসোমা নামে অতিবেগবতী ও মহাপারা হয়ে অনেক নিঝর ও পর্বতপ্রাচীরে সমৃদ্ধ শঙ্কুট শৈল প্রান্তে উপনীত হয়ে সেখান থেকে গিরিবর চিত্রকূটে পদার্পণ করল। ক্রমে চিত্রকূটের তলদেশ থেকে বৃষ পর্বতে, বৃষ পর্বত থেকে বৎস পর্বতে, বস্ পর্বত থেকে, নাগশৈলে, নাগশৈল থেকে নীলনামধেয় বর্ষ পর্বতে, সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে কপিঞ্জও শৈলে, ইন্দ্রশৈলে, সুনগে এসে পড়ল। আবার সেই সুনগ পর্বতের চূড়া থেকে নদীটি এল শতশৃঙ্গ শৈলে, শতশৃঙ্গ গিরিচূড়া থেকে পুষ্পমণ্ডিত মহাশৈল পুষ্করে, পুষ্করে শৈল থেকে বিরাজ শৈলে, বিজার শৈল থেকে বরাহ শৈলশিখরে। এই এক শিখর থেকে অন্য শিখরে আসার প্রতিটি ক্ষেত্রে নদীটির বেগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। বরাহ থেকে ময়ূর, ময়ূর থেকে একশিখর এবং একশিখর থেকে জারুমি পর্বতে পতিত হওয়ার সময় সেই মহাভাগা নদীটি দ্রুততম বেগে উপনীত হল।

এইভাবে সহস্র সহস্র পর্বত বিদীর্ণ করে সেই মহানদী যখন বহু শৃঙ্গবিশিষ্ট ত্রিশৃঙ্গ নামে মর্যাদা শৈলশৃঙ্গে এল তখন তার বিস্তৃতি অনেক বেড়ে গেল। এবার সে ওই ত্রিশৃঙ্গ শৈল তটকে পরিত্যাগ করে মেরুশৃঙ্গ তটে এল। আবার মেরুশৃঙ্গ থেকে বিচ্যুতা অবস্থায় বায়ুচালিত হয়ে

অমল সলিলা সেই নদী এসে পড়ল বীরুধ পর্বতে। এবং বীরুধ পর্বত প্লাবিত করা শেষ হলে সে পশ্চিম সমুদ্রে এসে মিলিত হল। নদীটি এইভাবে মহাপ্রাণীপরিপূর্ণ সুপার্শ্ব নামক মেরুর উত্তরপাদে এসে পড়ল এবং সেখানকার গুহা থেকে বিনির্গত হয়ে তরঙ্গিণী পৃথিবীতে এসে পড়ল। এরপরে বিচিত্র পুষ্পরাজি ও উড়পশোভিতা আনন্দিতা মঙ্গলময়ী সেই নদী উত্তরদিকের কুরুদ্বীপ প্লাবিত করে এবং সেই মহাদ্বীপের মধ্যভাগ দিয়ে উত্তর সাগরে গিয়ে পড়ল।

এইভাবে মহাগিরিতট থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বচ্ছ সলিলা ওই চারটি মহানদী চারটি ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়ে চলল।

এতক্ষণে এই যে বহুবিস্তৃত পৃথিবীর কথা বললাম, সেই পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে আছে মেরু নামক মহাশৈল, চারটি মহাদ্বীপ, চুরাশিটি কানন-উদ্যান, চারটি শ্বেত মহাবৃক্ষ, চারটি সরোবর, চারটি নদী, চারটি সর্প, আটটি উত্তর মহাশৈল এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ পর্বতরাজি।

৪১.

মহাজ্ঞানী সূত বললেন, গন্ধমাদন গিরিশৃঙ্গের পাশে উপরের দিকে সমৃদ্ধি সম্পন্ন এক গণ্ডিকা আছে। এর শুধুমাত্র পূর্ব-পশ্চিমের বিস্তার বত্রিশ হাজার যোজন এবং দৈর্ঘ্যে অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণে চৌত্রিশ হাজার যোজন। সেখানে কতিপয় সকর্মশীল প্রাণী বাস করেন। এঁরা কেতুমাল নামে পরিচিত। কেতুমাল পুরুষেরা অত্যন্ত বলবীর্যসম্পন্ন ও কালানলের মতো প্রখর। স্ত্রীলোকেদের বর্ণ উৎপলের মতো এবং তারা সকলেই প্রিয়দর্শিনী। সেখানে একটি ছয়বাস পূর্ণ বিরাট পনস বৃক্ষ আছে। ব্রহ্মসূত কামচারী মনের মতো গতিসম্পন্ন ঈশ্বর এবং কেতুমালনিবাসী প্রাণীরা এই স্বর্গীয় ফলের রস পান করে থাকেন। এর ফলেই তারা অযুত বৎসর জীবিত থাকেন।

গন্ধমাদনের উপরিস্থিত এই গণ্ডিকার মতো মাল্যবান পর্বতের পূর্বদিকেও আরও একটি বিস্তৃত ও দীর্ঘ গণ্ডিকা আছে। সেখানে নিত্য আনন্দিতচিত্ত ভদ্রাশ্বগণ বাস করেন। সেখানে এক নয়নাভিরাম সালবন এবং কয়েকটি মহাবৃক্ষ আছে। এই মহাবৃক্ষগুলি কালা নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ভদ্রাশ্ব পুরুষেরা শ্বেতবর্ণের ও মহাবলবীর্য সম্পন্ন হয়ে থাকেন, তুলনায় স্ত্রীলোকেরা চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রবর্ণা বলা যেতে পারে। ভদ্রাশ্ব রমণীর অঙ্গলাবণ্য কুমুদতুল্য এবং তারা অতিশয় সুন্দরী ও প্রিয়দর্শিনী হয়ে থাকেন। তাদের আনন পূর্ণচন্দ্রের মতো, শরীর চন্দ্রের মতো শীতল, এবং সারা গায়ে পদ্মের মতো সুগন্ধ। তারা একবারে দশ সহস্র বৎসর নিরাময় আয়ু ভোগ করে থাকেন। কালারস পান করে তারা যৌবনকে একইভাবে ধরে থাকেন।

ব্রহ্মবাদী ঋষিরা বললেন, হে সূতবর, পর্বত নদী দেশ জনপদ–এসব কিছুই যথাযথভাবে কীর্তিত হয়েছে। এবিষয়ে কোনো কিছুই আর অব্যক্ত নেই। এখন আপনি সেখানকার অধিবাসীদের প্রমাণ, বর্ণ ও সম্ভোগ বিষয়ে কিছু বলুন।

ত্রিকালদর্শী সূত বললেন, চতুর্মহাদ্বীপবাসীগণের বর্ণ ও আয়ুষ্কাল আমি যথাযথভাবে বর্ণনা করছি, শুনুন। পূর্বপূর্ব কল্পের সিদ্ধগণ দ্রাশ্বগণের যে যে লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, হে কীর্তিবর্ধন ঋষিগণ, আমি তা বিস্তারপূর্বক কীর্তন করছি, মন দিয়ে শুনুন।

দেবকূটগিরির বিষয়ে আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি। পূর্বকথিত এই বিখ্যাত গিরির পূর্বদিকে পঞ্চকুলাচল নদী ও জনপদ সম্বন্ধে যেমন শোনা গেছে এবং দেখা গেছে–আমি অনুরূপ বর্ণনা করছি। পঞ্চকুলপর্বত বলে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে শৈবাল, বর্ণমালা, কোরঞ্জ, শ্বেতবর্ণ ও নীল এই পঞ্চশৈল এদের থেকে উদ্ভূত আরও শতশত সহস্র সহস্র পর্বত এই ভূলোকে আছে। পর্বত মিশ্রিত জলপদগুলি নানাবিধ প্রাণী নানাজাতীয় নৃপ ও পর্বতে পরিকীর্ণ।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ ওই সব জনপদগুলিকে নৃপতি নামধেয় পরাক্রান্ত সমৃদ্ধিশালী শ্রেষ্ঠ পুরুষদের মনোহর বাসস্থান বলে বর্ণনা করেছেন। পর্বতের অন্তর্নিবিষ্ট সম ও বিষম ভূমিভাগে এই সমস্ত বিবিধ রাষ্ট্র ও জনপদ গড়ে উঠেছে। এরকম কয়েকটি লোকঅধ্যুষিত জনপদের নাম হল–সুমঙ্গল, চন্দ্রকান্ত, তট, শুদ্ধ, সুনন্দন, বজ্রক, নীলমৈলেয়, হৌলেয় বিজয়াস্থল, শম্ভব, মহানেত্র, শৈবাল, শুঙ্কল, কুমুদ, কাশমণ্ড, পর্ণভৌম, হারভৌমক, হেমভূমক, মহাস্থল, মহাকাল, সুকাশ, সেমাসঙ্গ, বাতারংহ, কুশূলজ, পরিবার পরাচক, মেদক, বৎসক, এক বরাহ, বিটশৌণ্ড, শঙ্খতা, উত্তর, কৃষ্ণভৌম, সুভৌম ও মহাভৌম প্রভৃতি।

আদিকাল থেকে ত্রিলোকখ্যাত হিমজলবাহিনী মহাপুণ্যা মহানদী মহাগঙ্গায় অবস্থান করে আসছে। এই মহাগঙ্গা হতে যেসব নদী বিনির্গত হয়েছে, তারা হল–হংসবসতি, শাখাবহতী, সোমনদী, মহাব, চক্রা বরকা কৌশিকী, সুরসা, সোমাবর্তা, আপগোত্তমা, হরিতোয়া, মেষা, অঙ্গারবাহিনী, কাবেরী, শতদা, বনমালা, বসুমতী, পদ্মাবতী, চম্পা, সুবর্ণা, সুব, পঞ্চগঙ্গা, বপুত্মতী, মণিব, ব্রহ্মাভোগা, বিনাশিনী, কৃষ্ণতোয়া, পুন্যদা নাগপদী, শৈবলিনী, ক্ষীরোদা, অরুণাবতী, মণিতটা, বিষ্ণুপদী, হিরণ্যবাহিনী, নীলা, কন্দমালা, সুরাবতী, বামেদা পতাকা ও বৈতালী, এই সমস্ত নদীই গঙ্গার মতো নায়িকা রূপে পরিকীর্তিত। এছাড়া আরও অনেক শত সহস্র ক্ষুদ্র নদী আছে। পূর্বদ্বীপবাহিনী এইসব নদী পুণ্যবহতী বলে কীর্তিত হয়েছে। এইসব নদীর মান কীর্তনকেও পবিত্র কর্ম বলে জ্ঞান করা হয়।

প্রচুর সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ও জনপদ সমন্বিত এই দ্বীপরাষ্ট্র নানা বৃক্ষবনে পরিপূর্ণ নানা পর্বতে সুবেষ্টিত, নানা নরনারীগণে সমাকীর্ণ, সেখানে নিত্য আনন্দ ও সুমঙ্গল বিরাজ করছে। এই রাজ্য বহু

ধনধান্যে পরিপূর্ণ। নানা নৃপতি দ্বারা পালিত শত শত লোকের দ্বারা কীর্তিত এবং নানা রত্নের আরকস্থল।

এই দ্বীপবাসী পুরুষেরা সকলেই সুবর্ণ অথবা শঙ্গা বর্ণের অধিকারী। সকলেই বিশালাকায় মহাবলবীর্যধারা এবং বর পুরুষশ্রেষ্ঠ। এই দ্বীপবাসী মহাভাগ প্রজাবৃন্দ দেবতাদের সাথে সহজ সম্ভাষণ দর্শন ও উপবেশন করে থাকেন। এঁদের বিশেষ কোনো ধর্মাধর্ম নেই। এঁদের সাধারণ আয়ু দশ সহস্র বৎসর। এখানে অহিংসা ব্রত এবং সত্য বাক্যই প্রাকৃতিক নিয়ম বলে পরিগণিত। তাঁরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পরম ভক্তিভরে দেবাদেব শংকর ও পরমবৈষ্ণবী গৌরীদেবীর উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ–পূজা নমস্কারে সতত নিযুক্ত থাকেন।

.

৪২.

সূত বললেন, হে মহান দ্বিজবৃন্দ, ভদ্রাশ্ব বর্ষের নৈসর্গিক নিয়ম আপনাদের সামনে যথাযথভাবে বললাম। এবার কেতুমালবর্ষের বিবরণ বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করুন।

কেতুমালবর্ষের পশ্চিমদিকে সাতটি কুলাচল, কতিপয় নদী ও কতকগুলি জনপদ আছে। এবার তাদের কথা বিস্তারিতভাবে বলছি শুনুন। কেতুমালবর্ষের সাতটি কুলপর্বত হল–বিশাল, কম্বল, কৃষ্ণ, জয়ন্ত, অশোক, বর্ধমান এবং হরিপর্বত। এইসব কুলপর্বত থেকে আরও বহু শতত সহস্র কোটি কোটি পর্বত উদ্ভূত হয়েছে। এইসব পর্বতে মিশ্রিত হয়ে আছে। নানা জাতি সমাকীর্ণ অনেক নৃপতিপালিত নানাবিধ পরাক্রান্ত ও পৃথিবীখ্যাত জনপদ আছে। পর্বতগুলির সমস্থান ও বিষমস্থান–উভয় স্থানেই এই জনপদগুলি গড়ে উঠেছে। এরকম বিভিন্ন নামধারী কয়েকটি রাষ্ট্রে বিবিধ গো, মনুষ্য ও কপোতাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। কোথাও আবার ভ্রমরকুল সুখে গুঞ্জন করছে। এইসব প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রগুলি হল–করম্ভ, কূটক, শ্বেত, সুবর্ণকটক, স্তাবক, ক্রৌঞ্চ, সুমোল, কৃষ্ণাঙ্গ, মণিপুঞ্জক, তট, কম্বল, মৌষীয়, সমুদ্রান্তরক, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণপাদ, চিতা, কপিল, কণিকা, উগ্র, করাল, গোজ্বাল, করঞ্চভ, করবাট, হীনাম, মহিষ, বনপাতক, কুমুদাভ, মহোৎকট, শুকনামস, মহানাস, পীতাস, কজভূমিক, সঙ্গম, পান্ডুভৌমিক, কুবের, বাহ, যমজ, জঙ্গ, বগ, বীচাঙ্গ, মহাঙ্গ, রাজীব, কোকিল, মধুরেয়, সুরোচক, পিত্তল, কাঁচল, শ্রবণ, মত্তকাসিক, গোদ, বাড়, কুলাবণ্য, বর্জিত, সোদয় ও অলক প্রভৃতি।

কেতুমালবর্ষের মহাভাগ অধিবাসীবৃন্দ যে যে পবিত্র মহানদীর জল পান করে থাকেন, সেইসব মহানদীর তীর বা ঘাট সুন্দরভাবে বাঁধানো একম কিছু মহানদী হল–কম্বলা, বকুলা, বিকীর্ণা, শিখিমালা, তামসী, শ্যামা, সুমেধা, ভীমা, দর্ভাবতী, ভদ্রানদী, শুকনদী, পলাশা, মহানদী, কুসাবতী, প্রভঞ্জনা, দক্ষা, কাঞ্চী, শাকবতী, চন্দ্রাবতী, সুমূলা, ঋষভা, সমুদ্রমালা, চম্পাবতী, একাক্ষা, পুণ্যোদা, ভাততী, সীতোদা, পাতিকা, ব্রাহ্মা, বিশালা, পীবরী, কুমকারী, রুথা, মহিষী,

মানুষী ও দণ্ডা, এছাড়াও বহু দেবর্ষিসেবিতা সিদ্ধপূজিতা পুণ্যসলিলা পাপনাশিনী মঙ্গলা শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নদী আছে। পূর্বোক্ত রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দরাই এই সব মঙ্গলদায়িনী নদীর জল পান করে থাকেন।

নানা জলপদে স্ফীত, নানা রত্নে বিভূশিত, মহাপর্বতে শোভিত, নিত্য আনন্দিত, মঙ্গলবার ধনধান্যে সমৃদ্ধ কেতুমাল নামে এই যে পশ্চিম দ্বীপ-তা কিন্তু কেবল সুকর্মা ব্যক্তিদেরই নিবাসস্থান। এই দ্বীপের চারিদিকেই অধিবাসীবৃন্দের আলয় গড়ে উঠেছে।

হে ঋষিগণ, কেতুমাল দ্বীপের নৈসর্গিক বিবরণ এখানেই শেষ হল।

.

৪৩.

মহাঋষি শংশপায়ন বললেন, আপনার কাছে পূর্ব ও পশ্চিমের দ্বীপদুটির কথা জানলাম, এবার আপনি বিস্তারিতভাবে উত্তর ও দক্ষিণ বর্ষের নৈসর্গিক রূপ এবং সেখানকার অধিবাসীদের বিষয়ে যথাযথভাবে বলুন।

লোমহর্ষক বললেন, শ্বেতশৈলের দক্ষিণে এবং নীলশৈলের উত্তরেও একটি বর্ষ আছে। এর নির্মল যশাঃ এখানকার অধিবাসীবৃন্দ রত্তি প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এরা অজর এবং দুর্গন্ধ বর্জিত। এই রমণকবর্ষে যে দিব্য বটবৃক্ষ আছে, প্রধানত তার ফলের রস পান করেই ওই বর্ষনিবাসীগণ দশ সহস্র এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পঞ্চদশ শত বৎসর জীবন ধারণ করে থাকেন। এই দীর্ঘ। আয়ুমধ্যে তাদের কখনও কোনো দুঃখ ভোগ করতে হয় না। এঁরা সর্বদা আনন্দিত থাকেন।

শ্বেত শৈলের উত্তরে এবং শৃঙ্গবান শৈলের দক্ষিণে হিরণ্যক বর্ষ বিদ্যমান রয়েছে। এই হিরণ্যক বর্ষে যেসব প্রাণীরা জন্মগ্রহণ করেন, তারা সকলেই সকল ঋতুতেই মহাবল সুতেজঞ্চ কামপ্রিয় সত্ত্বগুণাধিকারী ধনী এবং প্রিয়দর্শন হয়ে থাকেন। এখানকার অধিবাসীরা অমিততেজা। একাদশ সহস্র একশত পঞ্চাদশ বৎসর পর্যন্ত এঁরা জীবিত থাকতে পারেন। অর্থাৎ এঁরা প্রমাণ আয়ুকাল পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারেন। হিরণ্যবতী নামক মহানদী হিরণ্যকবর্ষকে চতুর্দিকে প্লাবিত করেছে। এই বর্ষে 'লকুচ' নামে এক মহাবৃক্ষ জন্মে, ইহা ষটরসময়। এরই ফলরস পান করে হিরণ্যক বর্ষব্যাপী জীবনধারণ করেন।

পূর্বোক্ত শৃঙ্গবান শৈলের তিনটি উচ্চ এবং বিস্তৃত শৃঙ্গ আছে। এক একটি শৃঙ্গের এক একটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমটি মণিময়, দ্বিতীয়টি হিরন্ময় এবং তৃতীয়টি সর্বরত্নময়। তবে একটি বিষয়েই শৃঙ্গগুলির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তিনটি শৃঙ্গই ভবনশোভিত।

উত্তর সমুদ্রের দক্ষিণাংশে কুরু নামে একটি সিদ্ধসেবিত বর্ষ আছে। এই কুরুবর্ষের কোথাও কোথাও সর্বকামফলপ্রদ রমণীয় বৃক্ষ আছে। এইসব বৃক্ষফল গন্ধ-বর্ণ-রস-এ অতুলনীয়। এই বৃক্ষফল থেকে ক্ষরিত উত্তম মধু পান করে কুরুবর্ষের মানুষেরা জীবনধারণ করে থাকেন। এছাড়াও সেখানে পুষ্পফলময় একপ্রকার বৃক্ষ আছে। এইসব বৃক্ষ ও তার ফল থেকে সদা সর্বদাই উত্তম অমৃততুল্য ষট রসময় ক্ষীর ক্ষরিত হয়ে চলেছে। এগুলিও এখানকার অধিবাসীবৃন্দের প্রিয়।

কুরুবর্ষের ভূমিতল মণিমণ্ডিত। খুবই সূক্ষ্ম স্বর্ণ বালুকণায় তা সমাকীর্ণ হয়ে আছে। এই ভূমির সর্বাংশই সুখস্পর্শ। এখানে কোনো পঙ্ক বা ক্লেদ নেই। প্রধানত দেবলোকচ্যুত শুভ মানুষেরাই কুরুবর্ষে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। এঁদের কোনো রোগ-শোক নেই। সকলেই শুভ্রযশঃ সম্পনান ও স্থির যৌবন, এখানকার রমণীরা অতিমনোহর ও প্রিয়দর্শিনী। তারা একসঙ্গে মিথুন প্রসব করেন। এই ক্ষীরীবৃক্ষের অমৃততুল্য ষ-রসময় ক্ষীর পান করে অস্তিত্ব রক্ষা করে মিথু একদিনেই জন্ম নেয় এবং দুজনেই সমানভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাদের স্বভাব ও রূপ সমপ্রকার হয়। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা একই কালে তাদের মৃত্যু হয়। এই মিথুনেরা চক্রবাকের সমর্থ। এঁরা পরস্পর অনুরক্ত ও রোগশোক রহিত হয়ে নিত্য সুখে কালযাপন করে থাকেন।

কুরুবর্ষীয় পুরুষেরা ত্রয়োদশ সহস্র একশত পঞ্চদশ বৎসর সুখে জীবন কাটান। এঁরা কখনোই পরস্ত্রী সম্ভোগ করেন না।

এই যে কুরুবর্ষ, এর উত্তরদিকে শৈলশ্রেষ্ঠ জারুধির উত্তরভাগে যেখানে যা কিছু প্রাকৃতিক নিসর্গ চিত্র আছে, তা আপনাদের কাছে বিস্তারপূর্বক বলছি, শ্রবণ করুন।

এখানে চন্দ্রকান্ত ও সূর্যকান্ত নামে দুটি সমুন্নত ও বিশালাকৃতি কুলপর্বত আছে। এই দুটি পর্বতেই সিদ্ধ ও চারণ সেবিত। এই পর্বতদ্বয়ে বহু কন্দর, গুহা, নিঝর, কুঞ্জবন, চিত্রিত সানুদেশ, অসংখ্য ধাতু, পুষ্প, মূল ও ফল আছে। এই দুই কুলপর্বতের মধ্যে দিয়ে ভদ্রসোমা নামে এক মহানদী প্রবাহিত হয়েছে। ভদ্রসোমা ছাড়াও কুরুবর্ষদ্বীপে কুরু অধিবাসীবৃন্দে স্থান পান ও অবগাহনের নিমিত্ত আরও অনেক মুরসা প্রসন্নসলিলা নদী আছে। এক একটি নদী এক একটি দ্রব্য বহন করে চলেছে। কোনো নদী মধুবাহিনী তো কোনো নদী মধ্যবাহিনী, আবার কোথাও হয়তো মৃত বা দধিবাহিনী শতহ্রদা মহানদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এখানে যত ধরনের ফলমূল আছে সবই গন্ধ, বর্ণ, রসে সেরা, অমৃত স্বাদময় এই বিবিধ ফলগুলির

মহাগন্ধ এত তীব্র যে পঞ্চ যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। এছাড়া এই দ্বীপরাজ্যে নানা বর্ণ নানা জাতের সুখ-স্পর্শ সহস্র সহস্র পুষ্প ফুটে থাকে। এখানে একটি অন্নময় পর্বর্তও আছে।

হে দ্বিজেন্দ্রগণ, এই করুদ্বীপে তমাল ও অগুরুগন্ধ ও চন্দনের বন আছে। বনস্থলী প্রফুল্ল ও ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত। এছাড়া আরও অসংখ্য বৃক্ষগুল্ম-লতাসমৃদ্ধ সুখময় বর্ণ আছে। এইসব বনপথ একদিকে যেমন ভ্রমরগীতে গুঞ্জিত তেমনি দ্বিজগণের বেদমন্ত্রে মুখরিত। এছাড়া এখানে কমলবনে সমৃদ্ধ সহস্র সহস্র সরোবর এবং ভক্ষ্য ও পেয় বস্তুতে সমৃদ্ধ অসংখ্য রমণীয় বিহারভূমি আছে। বিহারভূমিগুলি রম্য ও গুণসম্পন্ন। বহুবিধ পুষ্পমাল্যে অনুলেপিত, বিচিত্র শয়নাসনে বিভূষিত ও সুখশ্রাবী বিহগকূজনে মুখরিত হয়ে এই বিহার ভূমিগুলি সকল ঋতুতেই সুখ প্রদান করে থাকে। এই বিহার ভূমিগুলি নিয়মিত মণি ও সুবর্ণ দ্বারা পরিষ্কৃত হয়। এর স্বল্পব্যবধানে স্থানে স্থানে বহু ক্রীড়াস্থান শিলাগৃহ, বৃক্ষগৃহ, রমণীয় কদলী গৃহ, সুখময় ও সহস্র লতাগৃহ গড়ে উঠেছে। এছাড়া বিহাক্ষেত্রের চতুর্দিকে মণিজালাবৃত সুবর্ণ গবাক্ষ সুবর্ণ ও মণিবিচিত্র সহস্র সহস্র বরণীয় মহাবৃক্ষ আছে। এখানকার শত শত ভূমি ও গৃহ বিশুদ্ধ শঙ্খের মতো শ্বের শুভ্রবর্ণ। নানা আকারের সূক্ষ্ম ও সুখকর বস্ত্র এবং মৃদঙ্গ বেণুপণ বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের বহুল ব্যবহার আছে। বিহারভূমির কল্পবৃক্ষগুলি শতসহস্র দেবভক্ষ্য ফল প্রসব করে। নগরের বিভিন্ন উদ্যানে বৃক্ষগুলি চোখে পড়ে। অগনন নরনারী অধ্যুষিত এই নগরগুলিকে কেন্দ্র করে এক-একটি আনন্দপূর্ণ সমৃদ্ধি সম্পন্ন দ্বীপ গড়ে উঠেছে। কুরুবর্ষে এরকম বহু দ্বীপ আছে। নানা পুস্পসুরভিত মন্থর পবন দ্বীপগুলিকে সবসময় মথিত করে রাখে।

কুরুবর্ষ দ্বীপ নিত্য-সুখকর ও অত্যন্ত রমণীয় কেবলমাত্র স্বর্গভ্রষ্ট মানুষেরাই এখানে জন্মলাভ করে থাকেন। উত্তমগুণযুক্ত হওয়ায় ভূমিস্থিত এই স্থান স্বর্গের চেয়ে কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছে। ভিন্ন ধরনের মানুষেরা বসবাস করেন। যেমন পূর্বতীরে শ্যামবর্ণ মানুষেরা আর পশ্চিমতীরে শ্যাম ও ধ্বলকান্ত মানুষের বসবাস। পূর্বকুলজাত মানুষেরা “চন্দ্রকান্ত” এবং পশ্চিমকুলজাত মানুষেরা, “সূর্যকান্ত” নামে অভিহিত হয়ে থাকেন এঁরা সকলেই দেববল পরাক্রমশালী ও উত্তম তেজের অধিকারী হওয়ায় জগতে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হন। এঁরা ইচ্ছেমতন ইতস্তত বিহার করে বেড়ান। বলয় অঙ্গদ কেয়ুর হার ও কুণ্ডলে ভূষিত, মালা বিচিত্র মুকুট ও আচ্ছাদন বস্ত্রে সুসজ্জিত এইসব অধিবাসীবৃন্দের যৌবন কোনোদিন বিগত হয় না। এঁরা সুপ্রিয় ও প্রিয়দর্শন। এঁরা অজর-অসর বহু সহস্র বৎসর এঁরা সহজেই জীবিত থাকতে পারেন। কুরুবর্ষবাসী রমণীরা কখনোই সন্তান প্রসব করেন না। তাই এঁদের বংশক্ষয় অথবা বংশবৃদ্ধি কোনোকিছুই হয় না। এখানে মহাবৃক্ষগুলি থেকেই মিথুন জন্মায়।

কুরুবর্ষবাসীরা সকলেই সাধারণ বিত্তের অধিকারী এবং সকলেই মমত্ব বর্জিত। এঁদের কাছে ধর্মাধর্ম বলে কিছুই নেই। ব্যাধি, জরা, দুর্মেধা বা ক্লান্তি কোনো কিছুই এঁদের ভোগ করতে হয় না। আয়ুষ্কাল পূর্ণ আপনা হতেই বিনষ্ট হয়ে যান এঁরা সকল প্রকার দুঃখবোধহীন ও অত্যন্ত সুখী।

উত্তরকুরুদ্বীপের পাশে একটি স্থান আছে। যেখান থেকে সাগরের তরঙ্গ দেখতে পাওয়া যায় সেখানে নাগ ও অসুরেরা বাস করেন। এখান থেকে পঞ্চ সহস্র যোজন দূর চন্দ্রদ্বীপ নামে অপর একটি স্থানে চন্দ্রমণ্ডল ও দেবগণ বিরাজ করেন। এই চন্দ্রদ্বীপের আকৃতি মণ্ডলাকার। এর পরিধি সহস্র যোজন পরিমিত স্থান জুড়ে রয়েছে। স্থানটির বিস্তার দশ যোজন এবং উচ্চতা শত যোজন। দ্বীপটি নানাবিধ পুষ্প ফুলে শোভিত ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। সিদ্ধচারণ সেবিত এমন একটি শ্রেষ্ঠ পর্বত এখানে আছে, যার প্রভা ও কান্তি যথাক্রমে 'চন্দ্র এবং কুমুদের সঙ্গে তুলনীয়।

এই পর্বত শ্বেতমণি বৈদূর্য্যমণি ও কুমুদে চিত্রিত। বহু চন্দ্রলক্ষণে সুসম্পন্ন। এবং বহু বিচিত্র উদ্যান অনেক নিঝর বিস্তৃত সানুদেশ, গুহা ও বিবিধ কুঞ্জে অলংকৃত। এই সিদ্ধসেবিত পর্বত থেকে কেটি উত্তমগুণ সম্পন্ন পবিত্র সলিলা নদী নির্গত হয়েছে। নদীটির নাম চন্দ্রবর্তা। এই তরঙ্গিনী নদীটির জল চন্দ্রের কিরণের মতো নির্মল। এরই অনতিদূরে নক্ষত্র অধিপতি চন্দ্রের নিবাসস্থল। এখানে গ্রহনায়ক চন্দ্র সর্বদা অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। দ্যুতিমান, চন্দ্রের নামেই পর্বতটি 'চন্দ্রদ্বীপ' নামে বিখ্যাত। স্বর্গ মর্তে এই চন্দ্রদ্বীপ তাই মহাদ্বীপ বলে বিখ্যাত। যেখানে যে সমস্ত, প্রজারা বাস করেন, গুণগত দিক দিয়ে তারা সকলেই চন্দ্রের তুল্য। প্রত্যেকেরই পূর্ণ চন্দ্রের মতো মুখ, নির্মল মন এবং আচরণে শুদ্ধচার প্রকাশ পায়। চন্দ্রদেব স্বয়ং তাঁদের অধিদেবতা। তার কারণেই চন্দ্রদ্বীপবাসীগণ অত্যন্ত ধার্মিক, সৌম্য, সত্যসন্ধ, তেজস্বী ও সদাচারী হন। এদের আয়ুষ্কাল দশ শতবর্ষ।

পশ্চিমদ্বীপের পশ্চিমদিকে চারি সহস্র যোজন আয়তন বিশিষ্ট একটি সমুদ্র আছে। তার অপর পারে নানাবিধ পুষ্পে শোভিত মণ্ডলাকার এক দ্বীপ আছে। নাম ভদ্রাকর। এর পরিধি দশ সহস্র যোজন। এই দ্বীপ প্রভূত পরিমাণ ধনধান্যে সমৃদ্ধ এবং অনেক নৃপতি কর্তৃক প্রতিপালিত। এই দ্বীপ নিত্য-আনন্দিত পর্বতরাজিতে স্ফীত সজ্জিত। বায়ুদেবতার নানা রত্নখচিত এক ভবন এই দ্বীপের মহিমা বর্ধিত করেছে। এই মন্দিরভবনে বিগ্রহবান বায়ুদেবতা সমস্ত পূর্বেই পূজিত হয়ে থাকেন। এই দ্বীপবাসী বৃন্দের অধিদেবতা হলেন স্বয়ং বায়ু। অধিবাসীরা সকলেই তপ্তকাঞ্চন বর্ণের অধিকারী। এই দ্বীপে যে সকল মহাভাগ্য প্রজারা বাস করেন তারা প্রত্যেকেই কনভূষণে

সজ্জিত। বিচিত্র বস্ত্রমাল্যধারী বীর্যবান, সদানন্দ এবং সত্যসন্ধ, এঁদের কোনো দুঃখ ভোগ করতে হয় না। এঁদের আয়ুষ্কাল পঞ্চশত বৎসর।

ধীমান সূতপূত্রের কথকতা সমাপ্ত হলে নৈমিয় অরণ্যবাসী সেইসব ব্রহ্মবাদী ঋষিরা আরও কিছু শুনবার অভিলাসে সূতপূত্রের কাছ তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন।

তাদের জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে সূত বললেন; হে ঋষিবৃন্দ, ভারত যুগে পরম তত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা এই ভাবেই বর্ষসমূহের নৈসর্গিক অবস্থা দেখে ছিলেন, এবার আমি আপনাদের কাছে তার কি বর্ণনা করব?

ঋষিরা অনুরোধ করলেন, হে প্রাজ্ঞবর, যে বর্ষে স্বায়ম্ভবী প্রভৃতি চতুর্দশ মন প্রজাদের সৃষ্টি করেছিলেন, সেই ভারবর্ষের কথা আমরা জানতে ইচ্ছা করি, হে সত্তম, আপনি সেই বিষয়ে আমাদের কিছু বলুন।

এই কথা শুনে সূতপুত্র পুরাণজ্ঞ লোমহর্ষণ সমহিত হয়ে বিশুদ্ধ আত্মা সেই ঋষিবৃন্দের উদ্দেশ্যে বিস্তারিত ভাবে আবার বলতে লাগলেন, হে ঋষ্যিগণ এর আগে আমি কুরুবর্ষের নৈসর্গিক অবস্থার কথা আপনাদের কাছে যথাযথভাবে বর্ণনা করেছি। এমন ভারতবর্ষের বিষয়ে বিস্তারিত বলছি শুনুন। পুণ্যতীর্থ হিমালয়ের দক্ষিণদিকে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত যেসব জনপদ আছে, প্রথমেই আমি তাদের বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছি।

হিমালয়ের দক্ষিণে এবং সমুদ্রের উত্তরে এই ভারতবর্ষ বিরাজমান। শুভাশুভ ফলোদয় এই ভারতবর্ষ মধ্যমবর্ষ নামেও ততোধিক পরিচিত। এখানকার প্রজারা "ভারতী" নামে প্রসিদ্ধ প্রজাদের ভরণ করতেন বলে, মনুকে ভরত বলা হয়। অতএব, ভরত মনু কর্তৃক প্রতিপালিত বলেই এই বর্ষ ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। মনে রাখবেন, এই ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোথাও কর্মানুসারে স্বর্গ, মোক্ষ এবং মধ্যম এই তিন প্রকার ফল লাভ করা যায় না।

ভারতবর্ষকে নয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ভাগ পরস্পরের থেকে সুস্পষ্ট ব্যবধানে অবস্থিত। এর ফলে এর এক ভাগ থেকে অন্যভাগে যাওয়া কষ্টসাধ্য তো বটেই এ দুঃসাধ্য। নয়ভাগে বিভক্ত এই দেশগুলি হল– ইন্দ্রদীপ, কসেরুসান, তাম্রপাদি, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, গান্দভ, সৌম্য, বারুণ এবং ভারত। নবম এই দ্বিপটি সাগরবেষ্টিত। এর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার হল সহস্র যোজন, কুমারিকা, থেকে গউনা পর্যন্ত এর দৈঘ্য। এই নবম দীপটি উত্তরদিকে

সামান্য বক্রভাবে অবস্থান করছে। নবম দ্বীপটির এক একটি প্রান্তে এক একটি জাতি বাস করেন। এই দ্বীপের অন্তভাগে বাস করেন ম্লেচ্ছ প্রজাতির লোকেরা। পূর্ব প্রান্তে বাস করেন কিরাতেরা, পশ্চিম প্রান্তে যবনরা। এর মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের সমাবেশ ঘটে গেছে। এঁরা যথাক্রমে যজ্ঞ, আরাধনা, যুদ্ধ, বাণিজ্য ও পরিচর্যাকে জীবিকা হিসাবে গহণ করেছেন, যদিও এঁদের নিজেদের মধ্যে যথাসম্ভব পারস্পরিক সামাজিক ব্যবহারও সুপ্রচলিত আছে। এই ব্রাহ্মণাদি চারটি বর্ণ–অপবর্গ লাভের নিমিও যথাবিধি সংকল্পপূর্বক নিজের নিজের ধর্মানুষ্ঠানে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ্ম–এই চতুবর্গ লাভ করে থাকেন।

ভারতবর্ষের এই নটি খণ্ড সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, যিনি এই বক্রায়তনশীল নবম দ্বীপমাণ্ডকে অধিকার করতে পারবেন, ভূলোলাকে তিনিই সম্রাট বলে কীর্তিত হবেন; এই ভাবে তিনি এ মর্ত্যলোকে সম্রাট আন্তরিক্ষলোকে বিরাট এবং অন্য কোনো উচ্চ লোকে স্বরাট বলে অভিহিত হয়ে থাকেন।

এ হল ভারত দ্বীপের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। হে দ্বিজবৃন্দ এবার আমি বিস্তারিতভাবে আবার নতুন করে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বলব। এই ভারত ভূখণ্ডে মহেন্দ্র, মলয়, শক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্যা, পরিপাত্র প্রভৃতি সাতটি প্রধান কুলপর্বত আছে। এই প্রধান কুলপর্বতগুলির সন্নিকটে আরও সহস্র সহস্র অভিজাত; সর্বগুণশালী, বিপুল বিচিত্রমান পর্বত আছে। যেমন-পর্বত শ্রেষ্ঠ মৈনাক, বৈভার, মন্দর, দর্দুর, কোলাহল, সুরস, বৈদ্যুৎ, বাতন্ধম, পাণ্ডুর, গৌধন, গণ্ডপ্রস্থ, কৃষ্ণপর্বত পুষ্পগিরি, উজয়ন্ত, রৈবতক, শ্রী, কারু ও কুটশৈল প্রভৃতি এছাড়াও আরও অনেক স্বল্ডজীবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত আছে। এই পর্বত সমাকীর্ণ স্থানগুলিতে আর্য ও ম্লেচ্ছ জাতির লোকেরা নিয়মিত ভাবে সহাবস্থান করেন।

এই পর্বতময় দেশগুলিতে যেসব নদী প্রবাহিত হচ্ছে, তারা সবাই হিমালয়ের পাদনি ঋঃসৃত। আর্য ও ম্লেচ্ছ জাতির লোকেরা এই নদীগুলির জলই পান করেন। গউনা, সিন্ধু, সরস্বতী, গোমতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, সরযূ, ইরাবতী, বিতস্তা, কুহুত, বাহুগ, বিপাশা, দেবিকা, তৃতীয়া, ধূতপাপা, দৃষদ্বভী, কৌশকী, নিশাচারী, গণ্ডকী, ইক্ষু ও লোহিত।

এই নদীগুলি ছাড়াও পরিপাত্র পর্বত থেকে নিঃসৃত নদীর জলও অধিবাসীরা ব্যবহার করেন, পরিপাত্র পাদনিঃসৃত নদীগুলি হল–বেদস্মৃতি, বেদবতী, বৃত্রঘী, সিন্ধু, বর্ণাশা, চন্দনা, সদানীরা, মহী পরা, চমতী, বিদিশা, রেবতী, শিপ্রা, অবন্তী প্রভৃতি এভাবে ঋক্ষ পর্বতের পাদনিঃসৃত নদীগুলি হল–শেন, মহানদী, নর্মদা, সুবহা, দ্রুমা, মন্দাকিনী, দসার্ণা, চিত্রকূট, তমসা, পিম্পলা,

শ্রোণী, করতোয়া, পিশঅচিকা, নীলোৎপলা, বিপাশা, জম্বুলা, বালুবাহিনী সিতেরজা, ভক্তিমতী মক্ষণতন, ত্রিদিবা প্রভৃতি।

বিন্ধ্য পর্বত থেকেও কিছু পূত জলবাহী নদীর উদ্ভব ঘটেছে। সেগুলি হল–পয়েষ্ণী, নির্বিন্ধ্যা, মদ্রা, নিথিধা, বেন্থা, তাপী, বৈতরণী, শিতিবাহু কুমুদ্বতী, তোষ, মহাগৌরী, দুর্গা, অন্তঃশিলা ইত্যাদি। আবার গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষতা, বৈণী, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োনা কাবেরী,–এই নদীগুলি সহ্য পর্বতের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণাপথের পথে চলে গেছে। মলয় পর্বতের নদীগুলিও মঙ্গলকর এবং হিমজলবাহী, মহেন্দ্র পর্বত থেকে জন্ম হয়েছে ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, ইহ্লা, ত্রিদিবা, লাঙ্গুলিনী ও বংশধারা নদীর। শব্দিমাল পর্বত থেকে জন্ম ঋষিকা ও পলাশিনী নদীর।

নবম দ্বীপমণ্ডকে বিধৌত করে বয়ে চলা এই সমস্ত নদীই কিন্তু গঙনার মতো স্বচ্ছসলিলা, সমুদ্রগামিনী, মাতৃস্বরূপিণী ও পাপশিলী, এইসব নদীর আবার একাধিক উপনদী আছে। সংখ্যার বিচারে তাদের মোট সংখ্যা শত সহস্রের অধিক।

এইসব বড়ো বড়ো স্রোতস্বতা নদীর ধারে ধারে বেশ কয়েকটি মধ্যদেশীয় জনপদ গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে কুরু, পাঞ্চাল, শ, জাঙ্গল, শূরসেন ভদ্রাকার, বেবি, বৎস্য, শতপথে শ্বর, কুসস্ত, কুল্য, কুন্তল, কাশী, কেশেল, কলিঙ্গ প্রথম, মগধ ও বৃক উল্লেখযোগ্য।

গোদাবরী নদী সহ্য পর্বতের উত্তরপ্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এখানে গড়ে উঠেছে সারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ, মনোরম একটি প্রদেশের। তার নাম গোবর্ধন, পুরাকালে বিষ্ণু অবতার সীতাপতি রামচন্দ্র এটি নির্মাণ করেছিলেন। পরে রামচন্দ্রের প্রতি প্রীতিবশত, তাঁর সুখানুভবের জন্য ভরদ্বাজ মুনি বৃক্ষ ওষধি প্রভৃতি দিয়ে এই প্রদেশস্থিত এক উদ্যানময় স্বর্গ রচনা করেছিলেন।

বাহ্লীক, বাঘধান, আধার, কালতোষক, শুদ্র পল্লব, অপরীত, চর্মমণ্ডিক, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, সৌবীর, মদ্রক, শক, হূণ, কুলিন্দ পারদ, হারহুণ, রমন, কেকয়, রূদ্ধককট ও দশমালিক–এইসব দেশগুলিতে ক্ষত্রিয়দের উপনিবেশ গড়ে উঠেছে, তবে এখানে বৈশ্য ও শূদ্রদেরও বসবাস আছে।

ভারতবর্ষের চারিটি দিকে কত শত শ্রেষ্ঠ দেশ আছে, এবার আমি তাদের নামোল্লেখ করছি। কম্বোজ, কাশ্মীর, দরদ, বর্বর, চান, তুষার, অঙ্গল্যেকিক, পল্লব, ক্ষতোদর, আত্রেয়, ভরদুর্তি

প্রস্থল, কসেরুক, লম্বাক, স্তনপ, পীদিক, জুহড়, অপগ, অলিমদ্র, কিরাতজাতি, তোমর হংসমাগ, অঙ্গন, চুলিক, আহুক, উর্ণা, দেব ভারতের উত্তরদিকে অবস্থিত পাণ্ড্য, কেরল চৌল্য, কুল্য, কেসতুক, মূষিক, কুনাস, বনবাসক, মহারাষ্ট্র, মহিষত, বর, পুলিন্দ, ঐষীক, আষ্ট্য কলিঙ্গ, আভীর, বিন্ধ্যমূকি, বৈদর্ভ, দণ্ডক, সৌনিক, মৌলিক, অশমাষ, ভোগবর্ধন, মৈন্দিক, কুন্তল, অন্ধ্র, উদ্ভিদ ও নলকলিক– এগুলিকে নিয়ে ভারতবর্ষের দক্ষিণাত্যের জনপদ গড়ে উঠেছে, এবার পূর্বদিকে যেসব দেশ আছে। তাদের নাম বলছি শুনুন–প্রাগর্জোতিষ, পৌন্ড্র, বিদেহ, অন্ধ্রবার্ক, গোনান্দ, আন্তগিরি, সুজরক, বঙ্গ, প্রবঙ্গ, মন্দ, মালবর্ণিক, ভার্গব, ব্রহ্মোত্তর প্রবিজয়, তাম্রলিপ্তক, মাল, মগধ ইত্যাদি। সবশেষে পাশ্চাত্য জনপদগুলির বিষয়ে শুনুন–কোলবন, দুর্গ, তালিকট, তাপস, তুরসিত, পুলেয়, সুরাল, সুশরিক ও রূপস, এছাড়াও নর্মদা নদীর তীরবর্তী জনপদগুলিও ভারত ভূখণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ অংশে এই সবদেশ সম্পরীত নামে পরিচিত। নর্মদা নদীর তটস্থিত, এরকম কয়েকটি সম্পূরিত জনপদ হল–কচ্ছীয়, আনর্ত, অকূদ, ভারু কচ্ছ, নাসিক্যাদি দেশ, শ্বাশত, সমাহেয়, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি, হে ঋত্বিগণ এবার বিন্ধ্য পর্বতের পার্বত্য সানুদেশে উদ্ভূত দেশগুলির কথা শুনুন–অনুশ, উৎকল, উত্তম, অবন্তি, কোশল, কিষ্কিন্ধক, করুষ, মলিব, মেকল, দশর্ণ, গোসল, ত্রৈপুর, তুম্বর, বৈদিশ, তুক, ষাটসূর, নিষেধ, তুণ্ডিনের, ভোজ, জীতিহোত্র।

এই উপরিলিখিত দেশগুলি বিন্ধ্যাচলে অবস্থিত, সবশেষে পর্বতশ্রিত দেশগুলির কথা বলে ভারতবর্ষের দেশ সমূহের কথা সমাপ্ত করব। এই পর্বশ্রিত দেশের মধ্যে কুপথ, খস, কিরাত, বর্ণ প্রবারণ, তঙ্গন, তামস, দব নিগহর, ত্রিগত, বহুদবত, মালব, হূণ, হংসমার্গ উল্লেখযোগ্য।

এবার আমরা ভারত সম্পর্কিত পরবর্তী আলোচনা আরম্ভ করছি। ভারতবর্ষের চারিটি যুগ, যথা–সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। আমি এখন পর পর এদের কথা বলছি, শুহন এই কথা শুনে মৈমিষারাণ্যবাসী ঋষিরা সেইসব বিষয়েও আরও কিছু শোনবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তারা লোমহর্ষনকে বললেন, আপনি ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও অবস্থান সম্পর্কে যেমন মহাতত্ত্বহ বিবৃতি দিলেন, অনুরূপভাবে কিম্পুরার বর্ষ ও হরিবর্ষ বিষয়েও তথ্য প্রদান করুন।

ঋষিগণ এইভাবে জিজ্ঞাসা করায় মহাতা সূত ওইসব দ্বিজবৃন্দ দ্বারা নির্দিষ্ট প্রশ্নানুসারে পুরাণ সম্পর্কে আরও বহু জ্ঞানগর্ভ তথ্যালোচনা করতে লাগলেন, সূত বললেন, আপনাদের যে বিষয়ে শুনবার ইচ্ছা হয়েছে, সে বিষয়ে আনন্দের সাথে শুনুন।

কিশুরুষ বর্ষের অধিবাসীরা জন্মমাত্রই অপ্তকাঞ্চন প্রভার অধিকারী হতেন। এরা সকলেই বিশুদ্ধ চিত্ত ও রোগশোকহীন কিম্পুরূষ বর্ষে নন্দনবনের মতো এক বিশাল প্লক্ষ বন ছিল, এই বনের পূর্ণপ্রদ প্লক্ষ বৃক্ষি একপ্রকার অমৃততুল্য মধু বহন করত। কিশুরুষ নাগরিকরা সেই বৃক্ষফলের উত্তম রস পান করে জীবনধারণ করতেন। তারা সাধারণ নিয়মেই সহস্র বৎসর আয়ুভোগ করতেন। তাদের বর্ণ ছিল সুবর্ণের মতো বিশেষ করে রমণীরা অপসার মতো মোহময় রূপের অধিকারিণী ছিলেন। কিম্পুরুষ বর্ষের পর হরিবর্ষের কথা বলছি; হরিবর্ষে যেসব মানুষ জনমান, তাঁরা সকলেই দেবরাশ কান্তার অধিকারী এবং দেবলোকচ্যুত। জীবনধারণের জন্য এরা সবাই ঈক্ষুরস পাণ করতেন, জরা কোনোদিন এঁদের গ্রাস করত না, তাই এঁদের কোনোদিন জরাজীর্ণ হতে হয়নি। এরা সানন্দে স্থির যৌবনবস্থায় একাদশ সহস্র বৎসর বেঁচে থাকতেন, হরিবর্ষে জন্মপ্রান্ত দেবলোকচ্যুত মানুষের। সকলেই মহারজত প্রভার অধিকারী ছিলেন।

এর আগে ইলাবৃত বর্ষ নামে মধ্যবর্তী একটি বর্ষ সম্পর্কে আপনাদেরকে বলেছি, ইলাবৃত। বর্ষে সূর্যের তাপ ছিল না। মানুষেরা জীর্ণ হতেন না। সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্ররাজি-সব সময় অপ্রকাশিত হয়ে থাকত। ইলাবৃত বর্ষের অধিবাসীরা পদ্মবর্ণ ও পদ্মপ্রভাবিশিষ্ট ছিলেন। এঁদের চোখ ছিল ঠিক যেন পদ্মপত্রের মতো। এঁরা জন্মাতেনও পদ্মপত্রের সুগন্ধ নিয়ে, কমলসৌরভ এইসব মানুষেরা জম্বুফলের রস আহার হিসাবে গ্রহণ করতেন এঁরা ছিলেন মনস্বী। প্রধানত দেবলোক বিচ্যুত হয়েই তাঁরা এই বর্ষে জন্মান; অজর ও অমর এইসব মানুষেরা তাই পুরো আয়ুষ্কাল ধরে ভোগ্যবস, তু এবং সকর্মের ফল ভোগ করতেন। এই বর্ষের মানুষে ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন। ইলাকৃত বর্ষটি মেরুর চারিপাশে নয় হাজার পরিমাণ স্থান জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। এই বর্ষের সামগ্রিক বিস্তার ছত্রিশ হাজার যোজন, এর আকৃতি চতুষ্কোণ এক শরাবের মতো। মেরুর পশ্চিম দিকে যে ইলাবৃত বর্ষের নয় হাজার যোজন স্থান আছে, সেখানে প্রায় চৌত্রিশ হাজার যোজন স্থান জুড়ে গন্ধমাদন পর্বত আছে। এই পর্বতের উত্তর দক্ষিণের বিস্তার নীল থেকে সিন্ধাচল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বত ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে চল্লিশ সহস্র যোজন উচ্চ। এর মধ্যে হাজার যোজন পৃথিবীর মধ্যে রয়েছে। এবং পর্বতটির বিস্তার দুই হাজার যোজন,

মেরুর পূর্বভাগেও গন্ধমাদনের মতো দীর্ঘ মাল্যবান নামক পর্বত আছে। এর অবস্থান নীল শৈলের দক্ষিণে এবং নিষধ শৈলের উত্তরে। এইসব শৈলসমূহের মধ্যে অতি উচ্চ মহামেরু বিরাজমান। এই পর্বতের ভূগর্ভস্থ অংশে পরিমাণ অন্যান্য পর্বতের মতো এবং এর দৈর্ঘ্য

বরাবর বিস্তৃত প্রায় নিযুত দশ হাজার যোজন। মনে করা হয় সমুদ্র ও পথিবী মণ্ডলাকার হওয়ায় পার্শ্ববর্তী চতুষ্কোণ পর্বতগুলো দৈর্ঘ্যহীন হয়ে পড়েছে।

ইলাবৃত বর্ষকে চারিদিক দিয়ে বেষ্টন করে এর মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কম্বুরসবাহিনী একটি নদী। এই নদীর জল গুটিভাউ। কাজলের মতো কৃষ্ণবর্ণ, মেরুর দক্ষিণ ভাগে এবং নিষধ শৈলের উত্তর দিকে এক বিশাল সনাতন জম্বুবৃক্ষ আছে, বৃক্ষটির নাম সুদর্শন। সিদ্ধচারণ সেবিত এই বৃক্ষটি নিত্য পুষ্পেফলে পরিপূর্ণ থাকে। এই জম্বুবৃক্ষের নাম অনুসারেই এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত লাভ করেছে। সবদিক থেকেই এই বৃক্ষরাজের উচ্চতা স্বর্গস্পর্শী বলেই তত্ত্বদশী ঋষিরা নির্ণয় করেছেন, এই মহামের পরিমাণ শত সহস্র যোজন। আর কেবল এর ফলের পরিমাণই আট শত একষট্টি অরতিন। এই জম্বুফল যখন মাটিতে পড়ে তখন, ভয়ংকর শব্দে পৃথিবী কেঁপে ওঠে। সেই পরিপক্ক-জম্বুফলের রস নদীরূপে প্রবাহিত হয়ে মেরুকে প্রদক্ষিণ করে আবার জম্বুবৃক্ষের নীচে প্রবেশ করেছে। জম্বুদ্বীপের অধিবাসীর সেই নদীর জল পান করেন বলে কোনোদিন জরাগ্রস্ত হন না। তারা সদানন্দ লাভ করেন, এই দ্বীপবাসীদের চক্ষুর ক্লান্তি নেই, নেই কোনো মৃত্যুভয়ও।

এই নদীতীরে জাম্বুনদ নামে একপ্রকার সুবর্ণ পাওয়া যায়। এটি দেখতে ইন্দ্রগোপ কীটের মতো ভাস্বর। এ দ্বারা দেবতাদের ভূষণ প্রস্তুত হয়। বলা হয়ে থাকে সমস্ত বর্ষের বৃক্ষরসি অপেক্ষা এই জম্বুদ্বীপের জম্বুফলের রস কল্যাণ। এই রস শুষ্ক ও শুভ্র হয়ে দেবতাদের ভূষণোপযোগী সুবর্ণে পরিবর্তিত হয়। এই জম্বুদ্বীপের অধিবাসীদের মলমূত্র নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হলেও ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভূমি সেসব গ্রাস করে থাকে।

পবিত্র হিমালয় শৃঙ্গে সমস্ত রাক্ষস, পিশাচ ও যক্ষেরা এবং হেমকূট শৃঙ্গে গন্ধগণ বাস করে থাকেন। নিষধ পর্বতে শেষ, বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি নাগজাতি এবং মহামেরুতে তেত্রিশ জন যজ্ঞিক দেবতা বাস করে থাকেন। বৈদূর্য্যমণ্ডিত নীলাচল শৃঙ্গে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ ও ব্রহ্মবাদী ঋষিদের বসবাস, শ্বেত শৈলে দৈত্যদানবদের বসবাস, পর্বতশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গবান পিতৃগণের বিচরণ স্থান রূপে প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন ভাগে–অবস্থিত এই ন'টি বর্ষে বহু স্থাবর ও গমনশীল প্রাণী বাস করে থাকেন। এখানে যেসব মানুষ ও দেবতারা বসবাস করেন তাদের বহুল বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয়, যদি কেউ শ্রদ্ধার সাথেও এঁনাদের সংখ্যা নিরূপণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবুও তার পক্ষে কোনোমতেই তা সম্ভব নয়।

ব্রহ্মবাদী সূত আবার বলতে শুরু করলেন, হিমালয় পর্বতের বামদিকে কৈলাস নামে এক পবিত্র পর্বত আছে, সেখানে রাক্ষস আর অপ্সরাদের সাথে শ্রীমান ধনপতি কুবের স্বয়ং বাস করেন। কৈলাস পাদ থেকে নিঃসৃত শারদ মেঘকান্তি শীতল মঙ্গলকর পুণ্যজনক ও কুসুমপূর্ণ এক দিব্য সরোবর এখানে আছে। এই সরোবর থেকে দেবানুগ্রহপ্রাপ্ত শুভ মন্দাকিনী স্রোতস্বিনী উৎপন্ন হয়েছে। এই নদীর তীর বরাবর এক বিশাল আনন্দজনক বন আছে।

এছাড়া কৈলাস পর্বতের উত্তর-পূর্বকোণে দিব্যঔষধিযুক্ত হেমরত্নময় বিধিত ধাতুচিত্রিত এবং শুভ্রবর্ণ রত্নতুল্য পর্বত আছে, পর্বতটির নাম চন্দ্রপ্রভ। এর পাদদেশেই অচ্ছেদ নামে এক বিশাল ও দিব্য সরোবর আছে। এর থেকে অচ্চেদা নামে নদী উৎপন্ন হয়েছে। এই নদীর তীরে চৈত্ররথ নামে এক দিব্য কানন গড়ে উঠেছে। পূর্বে উক্ত মন্দাকিনী এবং এই অচ্ছোদা নদী সংলগ্ন ভূমমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মহাসাগরে প্রবেশ করেছে। এছাড়া এই চন্দ্রপ্রভ পর্বতে কক্ষ সেনাপতি মণিভদ্র তার একান্ত অনুগ ক্রুর গুহ্যকদের সাথে বাস করেন।

কৈলাস পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মলঃশিলাময় এক দিব্য পর্বত আছে; নাম পিশজি পর্বত। এই পর্বত নানা মঙ্গলকর প্রাণী ও ঔষধিতে পরিপূর্ণ। ওই পর্বতের পাশে লোহিত নামে সূর্যতুল্য স্বর্ণ শৃঙ্গ বিশিষ্ট এক বিশাল পর্বত আছে। ওই পর্বতের পাশে লোহিত নামেই এক বিশাল দিব্য সরোবর আছে। সেই সরোবরের বরফগলা জল থেকে লৌহিত্য নামে এক পবিত্র মহান সৃষ্টি হয়েছে। এই লৌহিত্য নদীর তীরভূমিতে রোগশোকদিবর্জিত এক বৃহ্য দেববন আছে; এখানে পূর্বোক্ত চন্দ্রপ্রাৎ পর্বতের সংযজেন্দ্রিয় এক যক্ষ তার অনুগত সৌম্য ও সুধামিক গুহ্যকগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বাস করেন।

কৈলাস পর্বতের দক্ষিণ দিকে বিবিধ ঔষধি লতায় সমাকুল ত্রিশৃঙ্গবিশিষ্ট অঞ্চল নামে এক পর্বত আছে। পর্বতটি বৃত্রকাঅজুরী থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই পর্বতে নানা ক্রুর স্বভাবের প্রাণী আছে। ওই পর্বতের সন্নিকটে বৈদ্যুৎ নামে আরও একটি সর্বধাতুময় বিশলি পর্বত আছে। মানস নামে সিন্ধুসেবিত এক দিব্য সরোবর এর পাদদেশে আছে, এই মানস সরোবর থেকে উদ্ভূত হয়েছে, লোকপাঠনী পুণ্যসলিলা সরযু নদী। সরযুর তীরে বৈভ্রাজ নামে এক প্রসিদ্ধ বন আছে। সেখানে ব্রহ্মপাত নামে এক অমিতবিক্রম রাক্ষস তার অন্তরিক্ষচারী শত শত ভয়ংকর রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বাস করেন। ব্রহ্মপাত শ্রেষ্ঠ কুবের অনুচর; প্রহেতুতনয় ও বশেন্দিয় রাক্ষস।

কৈলাস গিরিশিখরের পশ্চিমদিকে পৃথিবীর সকল প্রধান প্রধান প্রাণী ও ঔষধিলতাকীর্ণ সুবর্ণ ধাতুময় অরুণ নামে পর্বত অবস্থান করছে। এর পাশেই মেঘাকৃতি অপর একটি সুদৃশ্য পর্বত আছে। পর্বতটির নাম মুঞ্জবান। এর সুবর্ণমণ্ডিত সুউচ্চ শীর্ষদেশ শুভ্র বর্ণের শিলাজালে সমাবৃত্ত পর্বতটি এতই উন্নত যে মনে হয় যেন স্বর্ণময় শত শৃঙ্গ দিয়ে স্বর্গকে স্পর্শ করতে চাইছে, পর্বতটি হিমাস্নগ্ধ, দেখে মনে হয় ঠিক যেন মহাদিব্য দুর্গশৈল, নীললোহিত গিরিশ এই পর্বতে বাস করেন, শৈলোদ নামে এক পুণ্য সরোবর তার চরণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, আর সেই সরোবর থেকে শৈলেদা নদী চক্ষু ও সীতার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। শৈলেদা নদীর তীরে সুরভি নামে এক প্রসিদ্ধ দিব্য বন আছে।

কৈলাস শৈলচূড়ার উত্তর দিকে নানা মঙ্গলকর প্রাণী ও জীবনদায়ী ঔষধিতে পরিপূর্ণ হরিতালম্ব এক শুভদা পর্বত আছে। গৌর নামে সেই পর্বতটি সুবর্ণ শৃঙ্গ বিশিষ্ট সুবিশাল, দিব্য ও মণিময়। এই গৌর পর্বতের পাদদেশে বিন্দু নামে এক রমণীয় সরোবর আছে। সরোবরটির আয়তন চোখে মাপা যায় না। সরোবরটি যেমন শুভ তেমন কাঞ্চন বালুকাময়। এই বিন্দু সরোবরের তীরে রাজর্ষি ভগীরথ গঙ্গার আরাধনা করবার জন্য বহু বৎসর বাস করেছিলেন। তিনি সংকল্প করেছিলেন যতদিন না তার পূর্বপুরুষেরা গঙ্গাজলে পবিত্র হয়ে স্বর্গে যাবেন ততদিন তিনি ওই স্থান ত্যাগ করবেন না। এই স্থানের মহিমা বলে শেষ করা যাবে না। প্রথমতঃ এখানেই চন্দ্রমণ্ডল হতে উদ্ভবা ত্রিপথগামিনী দেবী ভাগীরথী প্রথম প্রতিষ্ঠিত হন এবং সপ্তভাগে বিখ্যাত হন। দ্বিতীয়তঃ এখানেই বহু মণিময় যজ্ঞীয় যুপ ও হিরন্ময় দেবী বিদ্যমান। সর্বোপরি দেবরাজ ইন্দ্র' এখানেই অন্যান্য দেবতাদের সাথে যজ্ঞ করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

এখানে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা সম্পর্কে ক'টি কথা আপনাদের বলব, রাত্রিকালে আকাশপৃষ্ঠে নক্ষত্রমণ্ডলের পিছনে যে ভাস্বর বর্ণ ছায়াপথ দেখা যায়, সেই ছায়াপথই হল ত্রিপথগামিনী গঙ্গা। ঐ গঙ্গাদেবী যখন আন্তরিক্ষলোক ও স্বর্গলোক প্লাবিত করে পৃথিবীতে আসতে উদ্যত হলেন, তখন তীব্র বেগসহ মহাদেবের মস্তকে পতিত হয়ে যোগমায়ায় অবরুদ্ধ হন। এই অবস্থায় বেগবতী গঙ্গা সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে কিছু কিছু জলবিন্দু পৃথিবীতে এসে পড়ে। এইসব উৎক্ষিপ্ত জলবিন্দু সংযোজিত হয়েই সৃষ্টি হয়েছে বলেই গৌর পর্বতের পাদভূমিস্থিত এই সরোবরটি বিন্দু সরোবর নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

এদিকে তরঙ্গিনী গঙ্গাকে গর্বিত মহাদেব বেশ সহজেই তাঁর জটাজালে আবদ্ধ করলেন। রুদ্ধ গঙ্গাদেবী মহাদেবকে বিক্ষিপ্ত করার জন্য মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি ঠিক করলেন, আমি প্রথমে স্রোতের বাহুল্যে শংকরকে আলোড়িত করব। এবং তারপর পৃথিবী

ভেদ করে পাতালে প্রবেশ করব, কিন্তু সর্বজ্ঞ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, দেবাদিদেব মহাদেব গঙ্গাদেবীর এহেন অভিপ্রায়ের কথা জানতে পারলেন।

তাই তিনিও দেবীর ক্রুর অভিসন্ধি ব্যর্থ করার জন্য গঙ্গা নদীকে স্বীয় অঙ্গে বিলুপ্ত করলেন বলে সংকল্প করলেন। বিপুল জলরাশির তুমুল স্রোতের বিষয়ে গঙ্গাদেবীর অহংকারের কথা জানতে পেরে রুদ্রদেব রোষমুক্ত হলেন, সবেগে পৃথিবীতে পতনোন্মুখ গঙ্গানদীকে মস্তকে অবরুদ্ধ করে রাখলেন, এই সময়ে মহাদেব তাঁর সামনে ধমনীব্যস্ত ক্ষীণ ক্ষুধাব্যাকুল দুর্বল ইন্দ্রিয় রাজা ভগীরথকে দেখতে পেলেন। তিনি ভগীরথকে দেখামাত্র স্মরণ করতে পারলেন– এই রাজা পূর্বেও গঙ্গার মর্ত্য অবতরণের জন্য তপস্যার মাধ্যমে আমাকে প্রীত করেছিলেন এবং আমিও বরদান করেছিলাম। মহাদেব যদিও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে গঙ্গাদেবীকে চিরদিন নিজের মস্তকে ধারণ করে রাখবেন কিন্তু ব্রহ্মার বচন শুনে এবং অনেকাংশে ভগীরথের উগ্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি নিজের ক্রোধ সংবরণ করলেন, এবং নিরুদ্ধ গঙ্গাকে নিজ তেজে বিসর্জন দিলেন।

এইভাবে বিসর্জিত হয়ে গঙ্গার সেই সুতীব্র স্রোত সাত ভাগে বিভক্ত হল। নলিনী, হ্লদিনী এবং পাবনী নামে এই তিনটি স্রোত পূর্বদিকে এবং সীতা, চক্ষু ও সিন্ধু নামে এই তিনটি স্রোত পশ্চিম দিক অভিমুখে প্রবাহিত হল। আর ভগীরথী নামে সপ্তম স্রোতটিকে স্বক্ত মহাত্মা ভগীরথ দক্ষিণ দিকে নিয়ে এলেন; এইভাবে সপ্তধারা বিভক্ত গঙ্গানদী লবণসাগরে প্রবিষ্ট হলেন। এই হিমবর্ষ উল্লিখিত সাতটি ধারার দ্বারা প্লাবিত হয়েছে।

যদিও ইন্দ্রদেব যথাকালে সমস্ত দেশ বর্ষণ করে থাকেন তাও কিন্তু সরোবর থেকে উৎপন্ন এই সাতটি শুভঙ্করী গঙ্গাধারা ম্লেচ্ছ প্রায় বিভিন্ন দেশকে প্লাবিত করে এগিয়ে চলেছে এদের মধ্যে সীত নদী সিন্ধি, কুকু, চীন, বধর, যবন, দ্রুহ, কুন্তি, রুষ, অঙ্গলোকবর প্রভৃতি দেশকে বিধৌত করে ও সিন্ধুমেরুকে, দুইভাগে বিভক্ত করে পশ্চিম সাগরে পতিত হয়েছে; চীন, মরু, তঙ্গন, সর্বলিক, সখ্রিং তুষরে, লম্পাক, পহ্নব, দরদও শক–এই দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চক্ষু নদীও পশ্চিম সাগরে গিয়ে মিশেছে। পশ্চিমবাহিনী সর্বশেষ নদী সিন্ধু দরদ, কাশ্মীর, গান্ধার হ্রদ, শিবপৌর, বরপ, ইন্দ্রহাস, বসতি, বিসর্জয়, সৈন্ধব, রন্ধকারক, ভ্রমর, আভীর, রোমক, শুনামুখ ঊর্ধ্বমেরু এইসব দেশে প্রবাহিত হয়েছে।

দক্ষিণবাহী গঙ্গানদী কিন্নর, কলাপগ্রাম, গান্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, বিদ্যাধর, উরগ, পারদ, সীগল, ক্ষ, বিত, পুলিন্দ্য করু, ভরত, পাঞ্চাল, কাশী, মৎস্য, মগধ, অঙ্গ, ব্রাহ্মোতর, বঙ্গ, তাম্প্রলিপ্ত

প্রভৃতি আর্য জনপদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু বিন্ধ্য পর্বতের কাছে এর গতি রুদ্ধ হওয়ায় তা লবণ সাগরে গিয়ে মিশেছে। পূর্বোল্লিখিত হ্লদিনী পূর্বদিক বরাবর, প্রবাহিত হয়ে ক্রমে ক্রমে নিষাদ, ধীবর, ঋষিক, নীল মুখ, কেরল, উষ্ট্রকর্ণ, বিয়াবি কালের বিবর্ণ, স্বর্ণভূষিত ঘুমার দেশে প্লাবন ঘটিয়ে পূর্বসাগরের জলে গিয়ে মিশেছে। অপথ, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, ঘরপথ, ইন্দ্রশঙ্কুপথ, উদ্যান, মস্কারের মধ্যজগ ও কুর্থী প্রাবরণ জনপদগুলি পূর্ববহিনী পাবনী নদীর গতিপথের মধ্যে পড়ে, শেষে এই নদী ইন্দ্রদ্বীপের কাছে লবণ সাগরে এসে পড়ল।

একইভাবে পূর্ববাহিনী নলিনীও তীব্রবেগে প্রবাহিত হয়ে তোমর, বহুদক, হংসমার্গ প্রভৃতি পূর্বদিকস্থ দেশগুলিকে প্রথমে প্লাবিত করে, বহু ভূধর ভেদ করে, আবার ও কর্ণবিররণ, অশ্বমুখ, বালুকাময় শৈলমেরু ও বিদ্যাধর প্রভৃতি দেশ প্লাবিত করে নেমি মণ্ডলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পূর্ব সাগরে প্রবেশ করেছে, এই সাতটি প্রধান নদী থেকে বহু নদী ও উপনদী উদ্ভূত হয়েছে, আর তার প্রতিষ্টতে আরও বেশি জলপ্লাবনের জন্য ইন্দ্রদেবও যথাসম্ভব বারিবর্ষণ করে থাকেন।

বস্কোকসারা নদীর তীরে হরিশৃঙ্গ নামে একটি সুসন্ধিত ও জলমগ্ন পর্বত আছে। এখানে সুবিক্রম নামে এক যজ্ঞশীল বশেন্দ্রিয় বিদ্বাণ, অমিতবলশালী কুবেরানুরে বাস করতেন। একইসঙ্গে অগস্ত্যগণ, বিদ্বান ও ব্রহ্মরাক্ষসদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আরো চারজন কুবেরের অনুচরে সেখানে বাস করতেন। তারা গুণ গরিমায় সুবিক্রমের সমতুল্য ছিলেন। এঁদের ধর্ম, অর্থ ও কামবিষয়ক সমৃদ্ধি ছিল। পরস্পরের দ্বিগুণ। হেমকূট পর্বতের সায়ন সরোবর থেকে মনস্বিনী ও জ্যেতিষ্মতী নামে দুটি পশ্চিমবাহিনী নদী উদ্ভূত হয়েছে। দীর্ঘ যাত্রাপথের শেষে এরা দুজনেই পশ্চিম সাগরে পতিত হয়েছে আর পুণ্যদায়িনী জন্ধু নদী উদ্ভূত হয়েছে। মেরুর পশ্চিমদিকস্থ চন্দ্রপ্রভ হ্রদ থেকে নীলাচলে পয়োদ নামে একটি পুণ্যদা নামে দুটি নদী উৎপন্ন হয়েছে।

শ্বেত পর্বতের পাদদেশে আছে উত্তর মানস নামে এক পুণ্যসলিলা সরোবর। এর থেকে জ্যোৎস্না ও মৃগকান্তা নামে দুটি সরোবর উৎপন্ন হয়েছে, এই শ্বেত পর্বতে রুদ্রকান্ত নামেও একটি সরোবর আছে। সরোবরটির জল অত্যন্ত মধুময় ও পবিত্র। এতে বিভিন্ন বর্ণের পদ্ম, নানারকমের মৎস্য ও বিভিন্ন পক্ষী বিচরণ করেন। এই সরোবরটি রুদ্রনির্মিত বলে জ্ঞেয়, এই মনোজ্ঞ সরোবরটি বহু কল্পবৃক্ষে সমাকীর্ণ, এছাড়াও এই শ্বেতপর্বতে পদ্ম, মৎস্য ও পক্ষীতে শোভিত। রুদ্র, জয়া প্রভৃতি বারোটি সমুদ্রতুল্য বিখ্যাত সরোবর আছে। এইসব সরোবর থেকে শান্তা ও মাধবী নামে দুটি নদী উদ্ভূত হয়েছে।

মনে রাখবেন, কিম্পুরুষাদি অপরাপর যেসব বর্ষ আছে সেগুলোতে বর্ষণদেবতা বৃষ্টি বর্ষণ করেন না। এখানে যেসব বড়ো নদী প্রবাহিত হয় তাদের জলেই গাছপালা, বৃক্ষাদি জন্মে, বৃদ্ধি লাভ করে। ঋষজ, দুন্দুভি ও ধ্রু নামে তিনিটি মহাপর্বত পূর্বদিকে আয়ত হয়ে ক্রমে অবনত হতে হতে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। চন্দ্র, কঙ্কা, প্রাগ ও বিশাল অগ্নিশৈল চতুষ্টয় পশ্চিম সীমা বরাবর উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ সাগরে গিয়ে মিশেছে। সোমক্ত বরাহ ও নারদ শৈল একইভাবে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে লবণ সমুদ্রে পতিত হয়েছে। চক্র, বলাহক, মৈনাক–এই তিনটি শৈলশিরা দক্ষিণ সাগর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এদের মধ্যে চক্র ও মৈনাক শৈলের মধ্যে সংবর্তক নামে একটি আগ্নেয়গিরি বিরাজমান রয়েছে। সেই সংবর্তক বা বড়বামুখ নামে অগ্নিদেব সমুদ্রের জল পান করেন বলে তাকে "সমুদ্রপ" নামেও অভিহিত করা হয়। পূর্বোল্লিখিত ঋষভ প্রভৃতি দ্বাদশ শৈল মহেন্দ্রর কাছ থেকে পক্ষচ্ছেদের ভয়ে ভীত হয়ে লবণ সাগরে প্রথমে অন্তর্হিত হয়। পরে সেখান থেকে তাদের উত্থান ঘটে। তাঁরা চন্দ্রমণ্ডলে যায়। এই কারণেই শুক্লপক্ষের চন্দ্রে একটি কৃষ্ণবর্ণ শশকাকৃতি চিহ্ন দেখা যায়।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণনুসারে আমি ভারতবর্ষের নয়টি বিভাগের কথা আপনাদের বলেছি। কিন্তু অন্যান্য পুরাণদিতে অন্যরকম বিভাজন বা বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। এইসব পুরাণমতে ভারতবর্ষে ধর্ম, অর্থ ও কাম, আরোগ্য, আয়, প্রমাণ–এসব গুণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় ভারত প্রমুখ বর্ষে আরোগ্যাদি গুণযুক্ত নানা জাতীয় প্রাণীগণ যথাভাগে বাস করবেন। এই পৃথিবী ওই বর্ষসমূহকে ধারণ করেছেন।

ধীমান সূত আবার বলতে শুরু করলেন, দ্বিজবৃন্দ শুনুন, ভারতবর্ষের দক্ষিণে মহাসমুদ্রের অভ্যন্তরে দশ হাজার যোজন দূরত্ব অতিক্রম করে নানা পুষ্পফল শোষিত এক কূলপর্বত বিরাজমান থাকতে দেখা যায়। পর্বতটির নাম বিদ্যুত্বান পর্বত। দৈঘ্য বরাবর পর্বতটির বিস্তৃতি তিন হাজার যোজন ও প্রস্থে এক হাজার যোজন এই পর্বতের উপরিস্থিত ভূমিভাগ বিদ্যুত্বান দ্বীপ নামে পরিচিত। স্বভাবতই দ্বীপটি বহুবিধ শৃঙ্গশ্রেণীতে অলংকৃত হয়ে আছে। ওই দ্বীপ সুমধুর স্বচ্ছসলিল সহস্র সহস্র ব্যাপী নদী বিদ্যমান রয়েছে।

বিশাল বিশাল নানা আকারের এক যুক্ত শত সহস্র নগর আছে। পর্বতটিতে প্রতিটি নগরই সমৃদ্ধিবান নরনারীতে পরিপূর্ণ, পরস্পর সুসম্বন্ধ এই সব নগর পর্বতের অন্তর্গত এবং এইসব নগরে প্রবেশ করতে হয় তলদেশ দিয়ে। এইসব নগর দীর্ঘশ্মশ্রুধারী নীলমেঘবর্ণ বিশিষ্ট কিছু সংখ্যক মানুষ বাস করেন। এঁরা বানরের মতো ফলমূল খেয়ে থাকেন। এঁরা সেবা পারয়ণ, ধর্মনিষ্ঠ অথচ শৌচাচার বর্জিত। এঁদের দেহের পরিমাণ এক জানুমাত্র এবং আয়ুর পরিমাণ

আশি বছর। এইভাবে ক্ষুদ্রাবয়ব মানুষের দ্বারা এই সকল অন্তঃদ্বীপগুলি আনুপূর্বিক ব্যাখ্যাত হয়েছে।

আমি যে সমস্ত অন্তর দ্বীপের বিষয়ে আলোচনা করছি, তাদের আয়তন ও বিস্তার যথাসম্ভব কুড়ি, ত্রিশ, পঞ্চাশ, ষাট, আশি, একশো ও হাজার যোজন বলে জ্ঞান করবেন। এই সব অন্তরদ্বীপের মধ্যেই হাজার হাজার "বহিন" নামে দ্বীপপর্বত ও আরও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। কয়েকটি প্রসিদ্ধ দ্বীপ হল– অঙ্গদ্বীপ, যবদ্বীপ, মলয়দ্বীয়, শঙখদ্বীপ ও বরাদ্বীপ। এগুলি বহু প্রাণী আশ্রিত ও নানা রত্নের আকর। দ্বীপছয়টি জম্বুদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত, এদের মধ্যে প্রথমে আমি অঙ্গ দ্বীপ বিষয়ে আলোচনা করছি।

নদী, শৈলশ্রেণী ও বনাঞ্চলে সমাকীর্ণ অঙ্গ দ্বীপটিকে চারিদিক দিকে লবণ সাগর বেষ্টন করে আছে। দ্বীপটি আয়তনে অতি বিস্তৃত। পৃথিবীতে বিদ্যমান নানা সংঘ ও ম্লেচ্ছ প্রাণীবর্গ বাহুল্য দেখা যায়। সুবর্ণ, প্রবাল ও নানাবিধ দুর্মূল্য রত্নের আকর, এই দ্বীপে চক্র নামে এক শ্রেষ্ঠ পর্বত আছে। এই পর্বতে বহু নিঝর ও বন্দর বর্তমান এখানে একটি গিরিগুহা আছে যা নানা প্রাণীতে পরিপূর্ণ। এই চক্র নামক মহাগিরি নাগদেশের মধ্যভাগে বিরাজ করছে। পর্বতটির উভয়প্রান্ত সাগর স্পর্শ করেছে।

দ্বিতীয় হল যবদ্বীপ, এই দ্বীপও নানা দুষ্প্রাপ্য রত্নের আকর। নানা ঋতুময় 'দ্যুতিমান নামে এক পর্বত এই দ্বীপে আছে। এই পর্বতের পাদদেশ থেকে অনেক পবিত্র স্বচ্ছ সলিলা নদীর জন্ম হয়েছে।

মলয় দ্বীপ বহু মণিমাণিক্য, রত্ন, সুবর্ণ, চন্দন ও মুক্তাদির আকর। এই দ্বীপে নানা ম্লেচ্ছ জাতির অধিক্য আছে। বহু নদী ও পর্বতের উদ্ভব স্থান মলয় পর্বত অসম্ভব শ্রীমণ্ডিত ও রৌপের আঁকা। এই পর্বতশ্রেষ্ঠটি "মহামলয়" নামেও বিখ্যাত। এছাড়া মলয়দ্বীপে মন্দর নামে অপর একটি পর্বত আছে। মন্দর পর্বতে দেবাসুর বন্দিত অরস্ত্যমুনির পবিত্র আশ্রম আছে। এছাড়াও মলয় পর্বতের স্বর্ণময় পাদদেশে সিদ্ধসেবিত দ্বিতীয় একটি আশ্রম আছে, আশ্রমটি নিকুঞ্জ, তৃণ ও পুষ্প বলে সমৃদ্ধ হওয়ায় স্বর্গ অপেক্ষা বিশিষ্টতা লাভ করেছে। সেখানে প্রতিটি পর্বে স্বর্গের অবতরণ ঘটে গেছে। ত্রিকূট শৈল নানাধাতুভূষিত অনেক যোজন উচ্চ বিচিত্র সানুদেশ ও বর্ণময় গুহাশোভিত-এর রমণীয় শৃঙ্গে 'লঙ্কা' নামে এক মহাপুরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিত্য আনন্দিত ও চির সমৃদ্ধ এই মহাপুরীর প্রাচীর ও তোরণগুলিও সুবর্ণনির্মিত। শৃঙ্গদেশের শতযোজন বিস্তীর্ণ ও ত্রিশ যোজন দীর্ঘ স্থান জুড়ে এই মহাপুরীটি গড়ে উঠেছে। নগরটি রম্য

প্রাসাদ মালায় ও বল্লভিতে সুসজ্জিত। এখানে যথেচ্ছ রূপধারী বলদৃপ্ত রাক্ষসেরা বাস করেন। এঁরা সুরদ্বেষা। এই স্থান মানুষের অগম্য বলে কমলও মনুষ্য দ্বারা পীড়িত হয় না।

এই মহাদ্বীপের পূর্ব তীরে নদনদীপতি গোকর্ণ। শংকরের এক মহান আলয় আছে। আর আছে শত যোজন বিস্তীর্ণ প্রকটি ম্লেচ্ছ অধ্যুষিত রাজ্য। এই রাজ্যেই শঙ্খ নামে পর্বত আছে। বিধৌত শঙ্খের মতো শুভ্রকান্তি এই পুণ্য পর্বতটিতে বহু পুণ্যবান মানুষেরা একসঙ্গে বাস করেন। এই পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে শঙ্খলাগা নামে এক মহাপুণ্য নদী। শতম পর্বতেই শঙ্খমুখ নাগরাজের সুশোভন আলয় রয়েছে।

এইরকমেরই অপর একটি দ্বীপ হল কুমুদ দ্বীপ। দ্বীপটি অশেষ কল্যাণকর। নানা পুণ্যে ধন্য, নানা গ্রামে সমাকীর্ণ ও নানা রঙের রথের আকর এই দ্বীপের অধিবাসীরা মহাদেব ভগিনী দুষ্ট চিত্ত বিনশিল্পী কামদা দেবীর পূজা করে অভীষ্ট লাভ করে থাকেন। বরাহ দ্বীপে বহুবিধ নদী, ফুলফলভরা অনেক কন্দব গুহা, বন ও নিঝর শোভিত বরাহ নামে এক সুবিশাল শিলাময় রমণীয় পর্বত আছে। এই পর্বত থেকে পুণ্যতীর্থরঙ্গিনী বারার্থী নামে এক বরদা নদীর জন্ম হয়েছে। তাই এই দ্বীপটি ধনধান্যে সমৃদ্ধ। দ্বীপের মানুষজনও অতিধার্মিক। বরাহ দ্বীপে বহুসংখ্যক ম্লে◌্ছের বসবাস। তাঁরা বরাহ রূপী প্রভুবিষ্ণু দেবতাকেই পূজার্চনা করে থাকেন। অন্য কোনো দেবতা তাদের আরাধ্য নন।

হে ঋষিবৃন্দ, এই যে আমি ভারতবর্ষের চতুর্দিকের ছয়টি অনুদ্বীপের কথা বললাম, সেগুলো ছাড়াও দ্বীপের দেশ ভারতবর্ষের দক্ষিণেও অসংখ্য দ্বীপরাজ্য আছে। এক অখণ্ড সমুদ্র যেমন অগণন সমুদ্র ফেনায় মণ্ডিত হয়, ঠিক তেমনভাবেই অখণ্ড ভারতবর্ষও বহু খণ্ড দ্বীপে বিমণ্ডিত। যেমন জম্বুদ্বীপের মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে তেমনি অনান্য মহাদ্বীপের মধ্যেও বহুবিধ দ্বীপ ও অন্তরদ্বীপ আছে। এরকম বহুসংখ্যক অনুদ্বীপে সন্নিবেশিত হয়ে পূর্বোক্ত চারটি মহাদ্বীপ মেরুর চারিদিকে অবস্থান রয়েছে। পুরাণ তত্ত্ব মহর্ষি সূত বললেন, হে দ্বিজোত্তমগণ, আমি এমন প্লক্ষ দ্বীপের বিষয়ে সংক্ষেপে এবং তত্ত্বনিষ্ঠভাবে আপনাদের কাছে বলব। আপনার মন দিয়ে শ্রবণ করুন।

প্লক্ষ দ্বীপের বিস্তার জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণেরও বেশি। আর আয়তন জম্বুদ্বীপের বিস্তারের তিনগুণ। লবণ সমুদ্র এই দ্বিপন্তে চারদিক থেকে বেষ্টন করে আছে। এখানে বহু পূণ্যপদ জনপদ আছে। প্রজারা বহুকাল আয়ু ভোগ করেন। কারোর ব্যধির ভয় নেই। দুর্ভিক্ষও হয় না। দ্বীপের সর্বত্র সমৃদ্ধির লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, প্লক্ষ প্রভৃতি সাতটি দ্বীপের প্রত্যেকটিতেই ঋজু অথচ

আয়তকার করে প্রতিদিকে সাতটি পর্বত আছে। প্লক্ষ দ্বীপে যে সাতটি পর্বত আছে, তাদের নাম হল গোমেদক, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোমক, সুমনা ও বৈভ্রাজ। এবার এদের বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা আপনাদের বলব। প্লক্ষ দ্বীপের প্রথম পর্বত হল গোমেদক, পর্বতটির এহেন নাম থেকেই এই স্থান "গোমেদক্ষ বর্ষ" রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। দ্বিতীয় পর্বত হল সর্ব ঔষধিবৃক্ষলতা পূর্ণ চন্দ্র, এখানে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবতাদের চিকিৎসার জন্য ঔষধি রোপণ করেছেন। তৃতীয় হল নারদ পর্বত, পর্বতটি এত উচ্চ যে দুর্গশৈল বলে ভ্রম হয়। এই পর্বতে নারদ ও পর্বত মুনি দুজনেই জন্মেছিলেন। চতুর্থ পর্বতের নাম দুন্দুভি। পুরাকালে দেবগণ এই পর্বতে আরোহণ করে "শব্দ মৃত্যু" নামে ভীষণ এক দুন্দুভি আহরণ করতেন, সে থেকে এই পর্বতের নামকরণ হয়েছে দুন্দুভি। পঞ্চম পর্বতের নাম সোমক। সোমক পর্বতের গোপন গুহায় পুরাকালে দেবতারা অমৃত সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। মাতৃআজ্ঞা পালনের জন্য গরুড় প্রমাণ থেকেই সেই অমৃত হরণ করেছিল।

সুমনা হল প্লক্ষ দ্বীপের ষষ্ঠ পর্বতের নাম। এর অপর নাম হল ঋষভ। বরাহবতার নারায়ণ এখানেই দেবত্রাস হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন। সপ্তম এবং সর্বশেষ পর্বত হল বৈভ্রাজ। পর্বতটির স্ফটিকের মতো নির্মল স্বচ্ছতা ও দ্যুতি আছে। কিরণজালে দীপ্যমান বলেই এই পর্বতের বৈভ্রাজ নাম রাখা হয়েছে।

এবার উল্লিখিত পর্বতগুলি দ্বারা যে যে বিভক্ত হয়েছে তার নামগুলো বলছি, গোমেদক পর্বত দ্বারা শান্তি ভয় বর্ষ, চন্দ্রপর্বতদ্বারা শিকর বর্ষ, নারদ পর্বত দ্বারা সুমোদর বর্ষ, দুন্দুভি পর্বতদ্বারা আনন্দ বর্ষ, ঋষভ পর্বত দ্বারা ক্ষেমকবর্ষ এবং বৈভ্রাজ পর্বত দ্বারা ধ্রুব বর্ষ বিভজিত হয়েছে। এইসব বর্ষগুলিতে দেব, গন্ধর্ব ও সিদ্ধগণকে চারগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দে বিহার করতে দেখা যায়। উপরোক্ত সাতটি বর্ষেই সমুদ্রগামিনী গঙ্গা সদৃশ সাতটি নদী প্রবাহিত হয়ে গেছে। এবার আমি ওইসব নদীর নামগুলো ক্রমানুসারে বলছি, নদীগুলি হল–অনুজ্ঞা, সমতী, বিপাশা, ত্রিদিব, ক্রমু অমৃতা ও সুকৃতা। এই সাতটি প্রধান নদী থেকে অন্যান্য সহস্র নদীর উৎপত্তি ঘটেছে,–প্রধান নদী থেকে উৎপন্ন অন্যান্য নদীগুলি হল–শুভা, শান্তভয়া, প্রমোদা, রেবকা, আনন্দ, ক্ষেমকা ও ধ্রুবা। এই সমস্ত নদীগুলি ইন্দ্রের প্রদত্ত বর্ষণের দ্রাব্য পরিপূর্ণতা লাভ করে ক্রমে বেগবতী হয়ে দীর্ঘ যাত্রাপথ অতিক্রম করে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়। প্লক্ষ দ্বীপের অধিবাসীবৃন্দ এই সমস্ত নদীর জল পান করে থাকেন।

স্মরণে রাখবেন, পূর্বোল্লিখিত সপ্তবর্ষে যে সকল প্রজারা বাস করেন, তারা সকলেই বর্ণাশ্রম মেনে চলেন ও আচারনিষ্ঠ। তারা সকলেই রোগব্যধিমুক্ত ও অতিবলবান। ঐ সাতটি বর্ষে

কিন্তু ভারতবর্ষের মতো ক্রমান্বয়ে চারটি যুগের আবির্ভাব ঘটে না। সেখানে সর্বদা একটাই যুগ বিরাজ করে, তা হল ত্রেতাযুগ।

প্লক্ষ দ্বীপ থেকে আরম্ভ করে পঞ্চম যে শক দ্বীপ পূর্বোক্ত দেশবিধানুসারে অবস্থিত সেই শক দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বীপপুঞ্জে সদা সর্বদা ত্রেতাযুগ তুল্য একটি কাল বিদ্যমান থাকে। স্বভাবতই এখানকার অধিবাসীরা কমপক্ষে পাঁচ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকেন। এঁরা রূপবান, সুসজ্জিত ও বলবান হয়ে থাকেন, এককথায় লক্ষদ্বীপ থেকে শুরু শাক দ্বীপ পর্যন্ত যা বিরাজ করে তা হল– সাম্য, শন্তিবল, রূপ, আরোগ্য এবং ধর্ম।

হে দ্বিজোত্তমগণ, প্লক্ষ দ্বীপ হল বিশাল, সব দিক দিয়েই শ্রীযুক্ত। ধনধান্যে পরিপূর্ণ। নানাবিধ দিব্য ফলমূল ও ঔষধি এবং বনস্পতিতে শোভিত। সহস্র সহস্র গ্রাম্য ও আরণ্যক পশুতে পরিবৃত। এই দ্বীপের মধ্যে জম্বু বৃক্ষের মতোই প্লক্ষ নামে এক মহাবৃক্ষ বিরাজমান। সেই বৃক্ষের নামানুসারেই দ্বীপটির নামকরণ হয় প্লক্ষ। এই দ্বীপস্থিত সমৃদ্ধ জনপদগুলির মধ্যে ভগবান স্থানু বিশেষভাবে পূজিত হয়ে থাকেন। এই প্লক্ষ দ্বীপ নিজ বিস্তারের দ্বিগুণ ইক্ষু সমুদ্রের দ্বারা চারিদিক থেকে বেষ্টিত হয়ে আছে। এতক্ষণ আমি আপনাদের কাছে প্লক্ষ দ্বীপের সন্নিবেশদিক্রমে বললাম। সংক্ষেপে এবং আনুপূর্বিক ভাবে শাশ্মল দ্বীপের বিষয়ে বলছি।

প্লক্ষ দ্বীপ থেকে তৃতীয় হল শাশ্মল। এই দ্বীপ অপরাপর সাতটি দ্বীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠত। এর বিস্তার প্লক্ষ দ্বীপের দ্বিগুণ। এই দ্বীপও চারিদিক থেকে ইক্ষু সমুদ্রবেষ্টিত হয়ে আছে। শাশ্মল দ্বীপেও সাতটি মণিভূষিত রত্নপ্রসূ বর্ষ পর্বত আছে। আছে সাতটি রত্ন প্রসবিণী নদী। সেই সপ্ত পর্বতের মধ্যে প্রথম পর্বতের নাম কুসুম সর্বধাতুময় অসংখ্য শৃঙ্গ ও প্রকট শিল্পজালে সুবিন্যস্ত এই পর্বতটি সূর্য সমদ্বীপ্তিমান। দ্বিতীয় গিরিশৃঙ্গের নাম উন্নত। হরিতালময় অসংখ্য শৃঙ্গযুক্ত এই পর্বতটি দেখলেই মনে হয় যেন আকাশকে আবৃত করে অবস্থান করছে। তৃতীয় পর্বতটি বলাহক নামে প্রসিদ্ধ। এই পর্বতটিও মালতীলতায় আবৃত হয়ে অঞ্জনময় শৃঙ্গগুলিকে ঊর্ধ্বে তুলে আকাশকে আবৃত করে অবস্থান করছে। চতুর্থ পর্বত দ্রোণ বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনীর মতো মহাশক্তিশালী ঔষধিলতার এই পর্বত পরিপূর্ণ হয়ে আছে। পঞ্চতম পর্বত কঙ্ক যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি উচ্চতাতেও বিরাট, দিব্য পুষ্পফলে ও বৃক্ষাদি লতায় পর্বতশৃঙ্গটি সমাবৃত হয়ে আছে। মেঘের মতো আকৃতিবিশিষ্ট ষষ্ঠ পর্বতটির নাম মহিয। সপ্তম ও বিশেষ পর্বত ককুমান। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ককুমানের শৃঙ্গ দেশে রত্নকনকাদি বর্ষণ করে থাকেন। আর ব্রহ্মা সেইসব রত্ন সংগ্রহ করে প্রজাদের মধ্যে বণ্টন করেন। সংক্ষেপে এই হল শাশ্মল দ্বীপের সাতটি মণি ভূষিত পর্বতের কথা, এবার কোন্ পর্বতের কোন্ বর্ষ তা বলছি,

কুমুদ পর্বতের শ্বেতবর্ষ, উন্নত পর্বতের লোহিত বর্ষ, বলাহক পর্বতের জীমূত বর্ষ, দ্রোণ পর্বতের হরিৎবর্ষ, কঙ্ক পর্বতের বৈদ্যুৎ বর্ষ, মাহিয় পর্বতের মানস বর্ষ, এবং কুকুমান পর্বতের সুপ্র বর্ষ। শাশ্মল দ্বীপ এই সাতটি বর্ষেই বিভক্ত।

হে পুণ্যাত্মা ঋষিবৃন্দ। এই উল্লিখিত বর্ষগুলিতে যে যে নদী আছে, এবার আমি তাদের বিষয়ে বলছি। সোনী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুল্কা, বিমোচণী ও নিবৃত্তি উপরিউক্ত সাতটি বর্ষে এই সাতটি নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই সমস্ত নদী থেকে আরও সহস্র সহস্র নদী উৎপন্ন হয়েছে। তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা সকলের পক্ষেই দুরুহ ব্যাপার।

সংক্ষিপ্তাকারে শাশ্মল দ্বীপের বিষয়ে আর বিশেষ কিছুই বলার নেই। প্লক্ষ দ্বীপের মতো। এক বিপুল স্কন্ধ শাশ্মল বৃক্ষের কারণেই ঐ দ্বীপ শাশ্মল দ্বীপ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এবার অন্যান্য দ্বীপের কথা বলছি, শুনুন, প্রথমে চতুর্থ দ্বীপ হিসেবে খ্যাত কুশ দ্বীপের কথা বলছি।

কুশ দ্বীপের আয়তন শাশ্মল দ্বীপের দ্বিগুণ অর্থাৎ প্লক্ষ দ্বীপের চতুগুণ, এটি চারিদিক থেকে সুরা সাগরে বেষ্টিত। কুশ দ্বীপে যে সাতটি বর্ষ পর্বত আছে, তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। উল্লিখিত সাতটি পর্বতের মধ্যে প্রথম হল অতি উচ্চ বিদ্রুপ। দ্বিতীয় তৃতীয় মেঘের মতো। দীপ্তমান দ্যুতিমান। চতুর্থ পুষ্পবান, পঞ্চম কুশেশয়, ষষ্ঠ হবি এবং সপ্তম মান্দার। প্রসঙ্গত, জলের অপর নাম হল মন্দ। সমুদ্রমন্থনকালে এই মন্দর পর্বত দ্বারা জলের বিদারণ ঘটেছিল। সেই কারণে এই পর্বতের নামকরণ করা হয় মন্দব। এইসব পর্বতসমূহের প্রধান বিশেষত্ব হল– ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ এদের যতটা বিস্তৃত আছে, তার থেকে দ্বিগুণ ভূমধ্যে নিহিত আছে। ক্রমানুসারে কুশ দ্বীপস্থিত বর্ষসমূহের নাম বলি– উদ্ভিদ বর্ষ, বেণুমাদল বর্ষ, স্বৈরযাকার বর্ষ, লবণ বর্ষ, রতিমল বর্ষ, প্রভাকর বর্ষ এবং কপিশ বর্ষ।

এই সপ্তবর্ষ পর্বতেই একটি দৃশ্য লক্ষিত হয় যে, দেবতা ও গন্ধব্যগণ একত্রে বিচরণ করছেন ও খেলা করেছেন। তবে এই সাতটি বর্ষের কোনোটিতেই দস্যু বা ম্লেচ্ছ জাতির বসবাস নেই। এখানকার লোকরা সকলেই গৌরবর্ণা। যথাকালে এঁরা মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। কুশ দ্বীপের এই সাতটি বর্ষে যে সাতটি নদী আছে তারা হল–ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সমিতি, সুতি, গর্ভা ও মহী। এছাড়া এই সাতটি প্রধান নদী থেকে উৎপন্ন হয়েছে–আরও শত সহস্র বেগবতী নদী। এরা সকলেই ইন্দ্রের কাছ থেকে বর্ষণপ্রাপ্ত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

হে ঋষিতল, কুশ দ্বীপের সন্নিবেশ বর্ণনা করলাম। এবার ক্রৌঞ্চ দ্বীপের বিবরণ দিচ্ছি, শুনুন।

ক্রৌঞ্চ দ্বীপের বিস্তার কুঞ্জ দ্বীপের দ্বিগুণ আয়তনে সমান ঘৃত সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। এই দ্বীপে যে সাতটি বর্ষ পর্বত আছে, তাদের নামগুলি হল– ক্রোঞ্চ, বামনক, পুণ্ডরীক, দিব্যবৃত, দিবিন্দ, দুন্দুভিস্বন ও অন্ধকারক। এই সাতটি পর্বতই রত্নমণ্ডিত ফলময় ও নানাবিধ গুণসম্পন্ন বৃক্ষলতায় আবৃত। এরা পরস্পর দ্বিগুণ এবং এদের বিষ্কম্ভ অর্থাৎ ভূগর্ভনিহিত ভাগও পরস্পর দ্বিগুণ। ঐ সাতটি বর্ষপর্বত এক একটি বর্ষকে নির্দিষ্ট করেছে। যেমন–ক্রৌঞ্চ পর্বতের কুশল বর্ষ, বামন পর্বতের মনোনুগবর্ষ, অন্ধকারকের উষ্ণবর্ষ, এইভাবে চতুর্থ হল প্রাবরক, পঞ্চম অন্ধকারক, ষষ্ঠ মুনি এবং সপ্তম দুন্দুভিস্বন।

ক্রৌঞ্চ দ্বীপের এই সমস্ত বর্ষ সিদ্ধ ও চারণগণে পরিপূর্ণ। উল্লিখিত সাতটি বর্ষের মধ্যে দিয়ে গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, বক্রি, মনোজ্ঞা, খ্যাতি ও পন্ডরীকা নামে সাতটি নদী যথাক্রমে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। লোকমুখে এরা সকলেই গঙ্গা নামে খ্যাত। এইসব নদী সমুদ্রগামিনী, এছাড়া আরও বহু নদী আছে যারা প্রচুর জলপূর্ণ হয়ে নিকটবর্তী সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। এইসব এই শ্রীময় ক্রৌঞ্চ দ্বীপ নিজের সমান বিস্তৃত দধিমণ্ড সাগরে বেষ্টিত হয়ে আছে। ক্রৌঞ্চ দ্বীপের প্রজারা সকলেই গৌরবর্ণ ও প্রিয়দর্শন।

এতক্ষণ পর্যন্ত প্লক্ষ প্রভৃতি দ্বীপসমূহের কেবল আনুপূর্বিক সৃষ্টিকরা। এখানকার প্রজাদের সৃষ্টি ও সংহারের কথা শতবর্ষ সময় দিলেও যথাযথভাবে বলার সামর্থ্য আমার নেই। অতএব এই প্রসঙ্গ ত্যাগ করছি। আসুন শাক দ্বীপের সন্নিবেশের কথা যথাযথভাবে বর্ণনা করি। আপনার মান শ্রবণ করুন।

শাকদ্বীপ বিস্তারে ক্রৌঞ্চ দ্বীপের দ্বিগুণ। এই শাক দ্বীপ ক্রৌঞ্চদ্বীপ বেষ্টনকারী দধিমণ্ড সমুদ্রকে বেষ্টিত করে অবস্থান করছে। শাক দ্বীপের জনপদগুলি সমৃদ্ধি, পবিত্রতা ও পুণ্যের প্রতীক। এদ্বীপে কোথাও কোনোদিন দুর্ভিক্ষ হয় না। প্রজাদের জীবনে জরাব্যাধির কোনো ভয় নেই। তারা রোগহীন, সবল শরীরে দীর্ঘকাল জীবনধারণ করে থাকেন। অন্যান্য দ্বীপের মতে শাকদ্বীপেও অতীব শুভ্র বর্ণ তদুপরি মণিমণ্ডিত সাতটি বর্ষপর্বত আছে। তাদের কনকপাদদেশ থেকে উদ্ভূত সাতটি রত্নবাহী স্রোতস্বিনী,–এই বর্ষপর্বতের নামগুলি হল–উদর, জলধার, রৈবতমত, শ্যাম, অস্ত, আম্বিকেয়, কেশরী। এই পর্বতগুলি খুব সুন্দরভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

পূর্বদিকে বিস্তৃত প্রথমবর্ষ পর্বত উদর অবস্থান করছে। এই পর্বতের সুবর্ণমুখ শৃঙ্গদেশ দেবর্ষি ও গন্ধর্বদের নিবাসযোগ্য। এখানে মেঘেরা বর্ষণের জন্যই উদিত হয় এবং অন্তর্হিত হয়। এই

পর্বতের পশ্চিমদিকে রয়েছে জলাধার নামে এক সুবিশাল পর্বত। দেবরাজ ইন্দ্র নিয়মিত এই পর্বত থেকে জল গ্রহণ করে থাকেন এবং প্রজাদের উপকারের জন্য বর্ষাকালে আবার তা বর্ষণ করে দেন। এর পশ্চিমে আছে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বৈরতক পর্বত। স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা এর সৃষ্টি করেন। নক্ষত্ররূপিণী রেবতী এখানে বিরাজ করছেন, এর পশ্চিমে আছে শ্যাম নামে এক মহাগিরি। প্রজাদের শ্যামরূপ এই মহাগিরি থেকেই এসেছে। রজতবর্ণ অস্ত শৈলকন্যা পর্বতের পশ্চিমে দাঁড়িয়ে আছে আর তার পশ্চিমে দাঁড়িয়ে আছে অম্বিকেয় পর্বত। এই পর্বত শ্রেষ্ঠ হিমঘর ও গিরি দুর্গতুল্য। সর্ব ঔষধিসমৃদ্ধ কেশরী পর্বত সকল পর্বতের শেষে আম্বিকের পর্বতের পশ্চিমে অবস্থান করে আছে। এই পর্বত থেকে সদাই মুক্ত বায়ু। প্রবাহিত হয়ে থাকে।

এবার পূর্বোক্ত বর্ষ পর্বতসমূহে বিভক্ত বর্ষসমূহের কথা বলছি।

উদয় পর্বত দ্বারা বিভক্ত বর্ষকে বলা হয় উদয় বর্ষ। এই পর্বতের অপর নাম. জলদ। দ্বিতীয় জলাধার পর্বত বিভক্ত বর্ষের নাম সুকুমার। তৃতীয় বৈরতক পর্বত বিভক্ত বর্ষ কৌমার। শ্যাম পর্বত বিভক্ত বর্ষটি চতুর্থ বর্ষ মণিচক, অস্ত পর্বত সিক্ত পঞ্চমবর্ষ মেদাক, সপ্তম কেশর পর্বত বিভক্ত বর্ষটি হল মহাম।

অন্যান্য দ্বীপের মতো শাক দ্বীপের পূর্বোল্লিখিত সাতটি বর্ষে যে সাতটি প্রধান নদী প্রবাহিত হচ্ছে, তারা সকলেই সমুদ্রগামিনী ও গঙ্গা নামে খ্যাত। ক্রমানুসারে এই সাতটি নদী হল সুকুমারী নামান্তরে অলুপ্তা, দ্বিতীয় কুমারী, তৃতীয়টি তটতীর নন্দা নামান্তরে পার্বতী, চতুর্থ শিবেতিকা নামান্তরে ত্রিদিবা, পঞ্চম ইক্ষু নামান্তরে ক্রতু। ষষ্ঠ রেণুকা যা স্থানান্তরে মৃতা নামেও পরিচিত এবং সপ্তম নদী গভস্তী। এই সব কটি নদীর জলই মঙ্গলপ্রদ জলে পরিপূর্ণ।

শাক দ্বীপনিবাসী নাগরিকেরা প্রফুল্ল চিত্তে এর জল পান করে থাকেন। সাতটি নদীতে আরও বহু সহস্র নদী মিশেছে। ইন্দ্রের বর্ষণ ধারা লাভ করে এইসব নদী সর্বদাই জলপূর্ণ হয়ে থাকে, আমার পক্ষেও এই সমস্ত পুণ্যপ্রদ শ্রেষ্ঠ নদীগুলির নাম এবং পরিমাণ নিশ্চিত করে বলা সামর্থ্যের অতীত কার্য।

হে শাংশপায়ন, বিস্তীর্ণ এই দ্বীপটি চক্রের মতন গোলাকার। প্রভূত জলসমৃদ্ধ নদী মণি, ধাতু, বৃক্ষশোভিত মেঘতুল্য পর্বতশ্রেণী এবং বিবিধ প্রকার সমৃদ্ধ জনপদ নিয়ে দ্বীপটি গড়ে উঠেছে। ধনধান্যময় এই দ্বীপটির দিকে দিকে ছড়িয়ে আছে বৃক্ষ, পুষ্প ও ফলের বিচিত্র সম্ভার। এই দ্বীপে পূর্বোক্ত পর্বত বিভক্ত যে সাতটি বর্ষ আছে, তাদের সমৃদ্ধ জনপদগুলিতে বর্ণাশ্রম প্রথা পালিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ জনপদগুলি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র–এই চতুবর্গে পরিপূর্ণ।

শুধু তাই হব, এখানে কোনো বর্ণ সংকর্ষ ও আশ্রমসাংকর্য নেই। অর্থাৎ শাক দ্বীপে মিশ্রজাতি ও মিলিত আশ্রম নেই। এখানকার প্রজারা ব্যভিচার বর্জিত এবং ধর্মপরায়ণ, তাই এঁরা একান্ত সুখী। এঁদের মধ্যে লোভ, ঈর্ষা, অসূয়া, কপটতা, অধৈর্য–এসব কিছুই দেখা যায় না। এঁদের এইসব গুণ এতটাই স্বাভাবিক যে এর কোনো বিপর্যয় ঘটেনি, এই দ্বীপের কল্যাণদায়ী গুণ এত প্রবল যে এখানকার অধিবাসীদের সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও দেবগণদের সাথে খেলা ও ভ্রমণ করতে প্রায়ই দেখা যায়।

শাক দ্বীপের ধার্মিক প্রজারা নিজ ধর্মানুসারেই পরস্পকে রক্ষা করে থাকেন। এর সাতটি বর্ষের কোনোটিতেই দণ্ডদাতা, দণ্ডবিধান বা দণ্ডণীয় বলে কিছুই নেই। এমনকি দেশ শাসনের জন্যেও রাজকরের ব্যবস্থা নেই। এই দ্বীপবাসী প্রজাদের বিষয়ে এই পর্যন্তই বলা যায়।

হে ঋষিগণ, এবার আমি সপ্তম দ্বীপ সম্বন্ধে কিছু তথ্য বিবৃতি দিচ্ছি।

বিস্তারে শাক দ্বীপের দ্বিগুণ বিস্তৃতি সম্পন্ন দ্বীপ হল পুষ্কর। বহিঃসীমা বরাবর এই দ্বীপকে পরিবেষ্টিত করে আছে ক্ষীর সমুদ্র। এই দ্বীপে অন্যান্য দ্বীপের মতো সাতটি করে পর্বত নেই কেবল একটিমাত্র বিচিত্র মণিময় অত্যুচ্চ শিখর শোভিত শ্রীসমৃদ্ধ পর্বত আছে। পর্বতটির নাম মহাশিব। এর পূর্বভাগে। অতিমনোহর বিচিত্র সানু এক শৈলচূড়া আছে। শৈলচূড়াটির চারিদিকের মণ্ডলাকার পরিধি পঁচিশ সহস্র যোজন। এই দ্বীপের পূর্বাধ জুড়ে মানসোত্তম নামে এক পর্বত বিস্তৃত রয়েছে। মানসোত্তমের উচ্চতা চৌত্রিশ সহস্র যোজন। সমুদ্রতীরে অবস্থিত পর্বতটিকে দেখলে মনে হয় যেন নবেদিত সূর্য, এই দ্বীপের পশ্চিমার্ধ জুড়ে বিরাজ করত মানস পর্বত। সুউচ্চ এই পর্বত মণ্ডলাকার পরিধি পঞ্চাশ সহস্র যোজন। এই মহাসানু মানস পর্বত একক হলেও নিজ সন্নিবেশ বশতঃ দুই ভাগে বিভক্ত এবং সুস্বাদু স্বচ্ছসলিল সাগরে পরিবৃত হয়ে আছে। বিস্তারের পরিমাণে ইহা পুষ্কর দ্বীপের বিস্তারের সমান এদের মধ্যে মহাবীত নামে যে বর্ষ তা মানস পর্বতের বাইরের দিকে অবস্থিত।

আর দ্বিতীয় যে ধাতকী খণ্ড নামে বর্ষ, তা মানস পর্বতের মধ্যভাগে অবস্থিত। মহাবতী ও ধাতকী খণ্ড–উৎসরূপেই অনেক সুখ, আয়ু ও রূপ বর্তমান, এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ছোটো বড়ো উচ্চ নীচ ভাব নেই, এঁরা সকলেই রূপে গুণে শীলে সমান। পুষ্কর দ্বীপের এই বর্ষে বঞ্চনা, ঈর্ষা, চৌর্য্য, ভয়, নিগ্রহ, দণ্ড, দণ্ডনীতি, সত্য কিন্তু ধর্ম-অধর্ম, লোভ, পরিগ্রহ, বার্তা, পশুপণ্য বাণিজ্য ইত্যাদি কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। বর্ণ-শ্রমবাহিত ব্যবহার, অসৌজন্য, বেদ-এর, দণ্ডবিধি, শুশ্রূষা বা শিল্প–কোনো কিছুরই এখানকার জনমানসে কোনো প্রভাব পড়ে

না। এখানে কোনো পদবি নেই। শীত বা উষ্ণতা নেই। এখানে বছরের কোনো সময়েই বর্ষা হয় না। এখানকার নাগরিকগণ উদ্ভিজ্জ খাদ্য এবং গিরি প্রস্রবণের জল পান করে জীবনধারণ করে থাকেন। এখানকার প্রজারা উত্তর করুষের প্রজাদের মতো সর্বকালেই জরা-ক্লান্তি রোগ-শোক বিবর্জিত হয়ে বহুবিধ সুখানুভূতি উপভোগ করে থাকেন। এঁদের আয়ুষ্কাল, দশ হাজার বছর। এঁরা সিদ্ধ মানবী। এঁরা দেবানুগ্রহে প্রভূত সুখ ও আরোগ্যের অধিকারী।

মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে পুষ্কর দ্বীপের সকল জ্ঞাতব্য তথ্য বিষয়ে আলোচনা করলাম,– আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে এই পুষ্কর দ্বীপ স্বাদুজলবিশিষ্ট সমুদ্রের দ্বারা চারিদিক থেকে বেষ্টিত হয়ে আছে। এই বেষ্টনকারী সমুদ্রের আয়তন পুষ্কর দ্বীপের সমান, এইভাবে সাতটি দ্বীপদেশই নিজের নিজের সমান বিস্তার সম্পন্ন সাতটি সমুদ্র দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছে। অর্থাৎ দ্বীপের অন্তরবর্তী সাগর ও দ্বীপ সমান বিস্তার বিশিষ্ট। এইভাবে দ্বীপ ও সাগরসমূহের পারস্পরিক পরিমাণ বৃদ্ধির হার ধারণা করে যেতে হবে। জোয়ারের সময় সাগরের জল সম্যকরূপে উদ্রিক্ত অর্থাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বলে এই সুবিস্তৃত জলভাগের নাম সমুদ্র।

চতুর্বিধ প্রজা ও ঋষিগণ যেখানে বাস করেন, তার নাম বর্ষ। ঋ’ ধাতু থেকে যেমন ঋষি, তেমনভাবে শক্তিবর্ধক ‘বৃষ’ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হওয়ায় উল্লিখিত বর্ষসমূহে শক্তির প্রবৃদ্ধি হয়ে থাকে। এই জন্যই এদের নাম বর্ষ। পূর্বোল্লিখিত বর্ষসমূহে প্রজারা অত্যন্ত সুখপ্রদ জীবন অতিবাহিত করে থাকেন।

শুক্লপক্ষের চন্দ্রের যতই বৃদ্ধি ঘটে, সমুদ্রেরও ততই স্ফীতি ঘটতে থাকে। আবার কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র যতই ক্ষীণ আকার ধারণ করে, সমুদ্রও তত ক্ষীণ হয়ে যায়। এই ঘটনাকে পাত্রমধ্যস্থ জলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অগ্নিসংযোগে পাত্রের জল যেমন স্ফীত হয়ে ওঠে চন্দ্রযোগে সমুদ্রের জল তেমনভাবেই উদ্রিক্ত হয়, এবং চন্দ্র ক্ষীণ হলেও সমুদ্রের জলও ক্ষীণ হীনবল হয়ে পড়ে। এইভাবে কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষে পর্যায়ক্রমিক ভাবে সমুদ্রজল কখনও অন্ন, কখনো বা অতিরিক্তভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ ও শুল্কপক্ষের চন্দ্রের অস্ত বা উদয়ের সাথে সমুদ্রেরও যথাক্রমে ক্ষয় ও বৃদ্ধি হতে থাকে। সমুদ্রের এই পর্যায়ক্রমিক হ্রাস বৃদ্ধি যখন চরম অবস্থায় উপনীত হয়, তখন সেই হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাণ একশো পনেরো অঙ্গুল পরিমাণ বিশেষ হয়। সমুদ্রের এইসব বিভিন্ন পর্বেই তার জলের ক্ষয়বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হতে থাকে। প্রসঙ্গত, দুই দিকে জল থাকে বলে ‘দ্বীপ’ নামকরণ হলেও প্রকৃতপক্ষে দ্বীপের চারিদিকেই জল থাকে আবার উদককে ভারণ করে বলে সমুদ্রের আরেক নাম ‘উদধি’।

যে-কোনো নামকরণের ক্ষেত্রেই এধরনের কোনো না কোনো কারণকে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। যেমন–যার পর্বত নেই, তাকে 'গিরি বলে আর যার পর্বত আছে, তাকে 'পর্বত' বলা হয়ে থাকে। পূর্বোক্ত দ্বীপগুলির ক্ষেত্রেও এধরণের কোনো না কোনো কারণকে লক্ষ্য করা যায়। শাল্মল দ্বীপে শাশ্মলি নামে এক মহাবৃক্ষকে পূজা করা হয়। কুশদ্বীপেও একটি কুশস্তম্ভ আছে। সেই অনুসারেই এই দ্বীপদুটি যথাক্রমে শাল্মলি ও কুশ দ্বীপ নামে চিহ্নিত হয়েছে। আবার ক্রৌঞ্চ দ্বীপের মধ্যজনপদে ক্রৌঞ্চ নামে এক বিশাল পর্বত আছে। শাক দ্বীপে বিরাজ করছে শাক নামে এক বৃক্ষ। পুস্কর দ্বীপেও রয়েছে সুমহান বষ্টবৃক্ষ অবস্থান। এই বটবৃক্ষ্যটি পুস্করবাসীদের দ্বারা বিশেষভাবে পূজিত হয়ে থাকে। পুস্করে ত্রিভুবনেশ্বর সর্বলোকবন্দিত মহান দেবতা ব্রহ্মার পূজার্চনা হয়। তিনি সেখানে সাধ্যদের সাথে বাস করেন। সেখানে দেবতারা তেত্রিশ জন মহর্ষির সাথে দেবাদিদেব দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার পূজা ও উপাসনা করে থাকেন। জম্বুদ্বীপে প্রচুর পরিমাণে বিবিধ রত্ন উৎপাদিত হয়।

পূর্বোল্লিখিত প্লক্ষ প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে বসবাসকারী প্রজারা দ্বিগুণ পরিমিত ব্রহ্মাচার্য, সত্য, দর্ম আরোগ্য ও আয়ুসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তারপর যে সমস্ত দ্বীপ আছে সেগুলিতে তার চেয়ে দ্বিগুণ পরিমিত ব্রহ্মচর্য, আয়ু–ইত্যাদি এবং তারপরে দ্বীপগুলিতে একইভাবে উত্তরোত্তর দ্বিগুণ পরিচিত ব্রহ্মচর্য, আয়ু ইত্যাদি দৃষ্ট হয়।

পুস্কর দ্বীপের যে দুটি বর্ষের কথা বলা হয়েছে, সেখানে স্বয়ং ত্রিভুবনেশ্বর ব্রহ্মদণ্ডের সাহায্যে ভগবান বিষ্ণু ও মহাদেবের সাথে সজ্জনপরিবৃত প্রজাবৃন্দকে রক্ষা করে থাকেন। সেখানে মহাবল দায়ী ছয়রসযুক্ত বিবিধ ভোজ্য বস্তু বিনা আয়োজনে নিজে নিজেই উৎপন্ন হয় এবং এখানকার প্রজারা সেইসব সুস্বাদু ভোগ্য বস্তু সবসময় ভোজন করেন।

পুস্কর দ্বীপের বহিঃসীমা বরাবর মধুর জলময় যে বিশাল সমুদ্র দ্বীপটিকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে আছে, সেই পরে এক শোভন কাঞ্চন ভূমি আছে। এই কাঞ্চন ভূমির বিস্তার সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর থেকেও বেশি। এটি একশিলায় নির্মিত এবং লোকবাসবর্জিত। কাঞ্চন ভূমির শেষ সীমানায় প্রকাশ ও অপ্রকাশময় মণ্ডলাকার লোকালোক পর্বত বিরাজমান। পর্বতটির উচ্চতা ও বিস্তার দশ সহস্র যোজন। এর অধভাগে যে আলোক আছে, তাকে 'লোক' বলা হয়। বাইরের যে অধভাগে আলোক নেই তাকে "আলো" বলে। এই দুইয়ে মিলে তাই "লোকালোক' নাম দেওয়া হয়েছে। বলয়াকার লোকালোকের যে অর্ধভাগ আলোকময় সেখানে লোকালয় গড়ে উঠেছে এবং যে অর্ধভাগ আলোকবিহীন তা লোক নিবাসের অযোগ্য।

লোকনিবাসের উপযুক্ত যে স্থানটি “লোক” বলে পরিচিত সেই আলোকদীপ্ত স্থানটি জল দিয়ে চারিদিক থেকে আবৃত। আবার “অলোক বলে জ্ঞাত লোকবাসের অযোগ্য অন্ধকারময় স্থানটি; তারপর অন্তকে আবৃত করে অবস্থিত অন্য একটি স্থান এবং এই অন্তস্থিত সপ্তদ্বীপ পৃথিবী; এবং ভুঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপং ও সত্য এই সাতটি লোক–এইসবের সম্মিলিত রূপই হল সপ্তলোক পরিচয়। এর পরেই লোকান্তর স্থান। শুক্লপক্ষের প্রথমেই যেমন পশ্চিমদিকে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকে দেখা যায়, পূর্বোক্ত অন্ত ও সেইরকম। অব্যয়াত্মক কারণের ঊর্ধ্ব, অধঃ এবং বক্রদেশে এই রকম সহস্রকোটি অন্ত বিরাজ করছে। এই প্রাকৃত কারণগুলি নিজ অপেক্ষা দশগুণ অধিক স্বজাতীয় পরস্পর থেকে উৎপন্ন, পরস্পর দ্বারা সমাবৃত ও বিধৃত হয়ে অবস্থান করছে। অর্থাৎ ভূত প্রাকৃত কারণ অপেক্ষা কারণ দশগুণ অধিক, তার থেকে যার উদ্ভব ঘটেছে, তা-ই আবার তার দ্বারা আবৃত ও বিধৃত হয়ে অবস্থান করছে।

এই অন্তকে চতুর্দিকে ঘন জলবিশিষ্ট সমুদ্র-বেষ্টন করে আছে। এর ফলে অন্তটি স্থির হয়ে আছে। কারণ ঘনজল অন্তটিকে স্থান পরিবর্তন করতে দিচ্ছে না। এই ঘনজলের বাইরে আবার বক্রাকার ও মণ্ডলাকৃতি মনতেজ বিদ্যমান রয়েছে। এই তেজ ঘনজলকে ধরে রেখেছে। সেই কারণেও ঘন জল স্থির হয়ে আছে। এই মনতেজ হল একপ্রকার লৌহগুড়াকৃত মণ্ডলাকৃতি বহ্নিবিশেষ থাকে ঘনবায়ু চতুর্দিকে থেকে ধরে রেখেছে, আর তাই সেই মণ্ডলাকার বহ্নি অঞ্চল হয়ে অবস্থান করছে। এই নিয়মানুসারে ঘন বায়ু আকাশ দ্বারা, আকাশ ভূতদি দ্বারা, ভূতাদি মহানের দ্বারা এবং মহান অনন্ত অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত ও বিধৃত হয়ে আছে, এই অনন্ত অব্যক্ত অতিসূক্ষ্ম। এর আদি নেই, বিনাশ নেই।

উল্লিখিত অন্ত ও আবরণ সমূহের পরে সহস্র সহস্র যোজন দূরে যে ঘোর আলম্বনহীন অনাময় দেশ আছে তা আলোকবিহীন হওয়ায় অন্ধকারাবৃত। এই স্থান নিরালোক নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানটি সীমালা ও দেশশূন্য এবং দেবতাদেরও জ্ঞানের অগোচর বলে এখানে কোনো ধরনের পর্থিব ব্যবহারই অনুসৃত হয় না। আকাশ ও অন্ধকার যেখানে শেষ হয়েছে সেই সীমানায় মঙ্গলময় মহান প্রজাপতি দেবদেব ব্রহ্মার এক বিশাল ও ভাস্বর মন্দির আছে। শ্রুতি অনুসারে এই দিব্য স্থান, দেবগণেরও অগম্য। যেসব লোক চন্দ্র ও সূর্যের আলোকে আলোকিত, তার জগতের কাছে সংশয়াতীত ভাবে ‘লোক’ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। পন্ডিতদের কাছে এইসব লোক সুবিদিত।

হে দ্বিজোত্তমগণ, এই পৃথিবীতে সাতখানি রসাতল স্থান, সাতটি ঊর্ধ্বতল স্থান একটি কক্ষনিকেতন স্থান, সাত প্রকার বায়ুর স্থান, পাতাল থেকে স্বর্গ পর্যন্ত স্থান–এই কটি স্থানে মোট

পাঁচ প্রকার গতি আছে। এই সংসার সাগরই জগতের গতির প্রমাণ। জগতের এই যে বিচিত্রধর্মী প্রবাহ গতি, এর কোনো আদি অন্ত নেই। এই প্রবাহ থেকে অসংখ্য জন্মের সমুদ্ভব ঘটেছে। চলমান এই গতি কোথাও কোনো অবস্থাতেই থামতে চায় না। আরও শুনুন, পূর্বোল্লিখিত যে বহুবিস্তৃত ভৌতিক সৃষ্টি, তাও অতীন্দ্রিয়। হে প্রজ্ঞাশ্রেষ্ঠবৃন্দ, এই পৃথিবীতে অগ্নি আপ্ত, তমঃ, বায়ুমহান ঈশ্বরের ক্ষয়, পরিমাণ অথবা কোনো অন্ত নেই, অর্থাৎ অন্যভাবে বলা যায় এঁদের বাস্তবিক ক্ষয়াদি না থাকায় এঁরা সর্বদাই অনন্ত নামে জ্ঞাত। ইতিপূর্বে আপনাদের সমীপে শিব নামক মহান দেবতার বিষয়ে বিস্তরিত ভাবে কীর্তন করেছি। তার সম্পর্কে বলা হয় তিনি সর্বগত। তিনি ভূমি, রসাতল, আকাশ, অনল, পবন, নিখিল সমুদ্র ও স্বর্গ সর্বস্থানে পূজিত হয়ে থাকে, শুধুমাত্র একাগ্র তপস্যার দ্বারাই এই মহাদ্যুতি পুরুষকে জানা যায়। এই মহাযোগী মহাশ্বরের অঙ্গ বহুধাবিভক্ত। তিনি লোকসমূহে “প্রভুলোকেশ” রূপে বহুভাবে পূজিত হয়ে থাকেন।

এই প্রকার পরস্পরোৎপন্ন বিকারগুলি অধির আধেয়ভাবে থেকে নিজের নিজের বিকার ধারণ করে। পৃথিবী প্রভৃতিতে সমস্ত বিকার পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পর অধিকগুণ সম্পন্ন। অর্থাৎ কারণ অপেক্ষা কার্যে অধিক গুণ দেখা যায়। এঁরা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভীষণভাবে প্রবৃষ্ট থাকে বলে প্রত্যেকেই স্থির ভাবে অবস্থান করছে। প্রথমে পৃথিবীর সব কিছুই অবিশেষভাবে থাকে। তখন এতে কোনো বিশেষ গুণ থাকে না। পরে পরস্পরের মধ্যে যুক্ত হয়ে বিশেষ তাপে পরিণত হয়। পৃথিবী থেকে শুরু করে বায়ু পর্যন্ত অর্থাৎ পৃথিবী, জল ও বায়ু এই তিনটি পদার্থ গুণের উপচয় ও অপচয় বসত পরস্পর পরিচ্ছিন্ন হয়। এভাবেই এরা বিশেষ আখ্যা লাভ করে। এছাড়া একপ্রকার পদার্থ আছে যারা সূক্ষ্ম। এর ফলে তাদের পরিচ্ছেদ নির্ণয় সম্ভব হয় না।

উল্লিখিত পৃথিবী, জল প্রভৃতির চারিদিকে আলোক আছে। আর ওইসব ভূতগম আলোক পরিচ্ছিন্ন হয়ে আকাশে অবস্থান করছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যেমন একটি বিশাল পাত্রের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্র একে অন্যের স্থানধিকার না করেও অবস্থান করতে পারে, আনেকটা সেরকম ভাবেই আকাশতলে আলোক ও পৃথিবী প্রভৃতি ভূতগণ পরস্পর অবস্থান করতে পারে, অনেকটা সেরকমভাবেই পৃথিবী, জল তেজ ও বায়ু–এই চারটি ভূত পরস্পরের স্থান কখনোই অধিকার করে না। এই চারিটি ভূত যতখানি স্থান অধিকার করে আছে, ঠিক ততখানি স্থান পর্যন্তই, জীবজ উৎপত্তি ঘটে থাকে। প্রাণীদের পূর্বজন্মের সর সংস্কার এইসব ভূতেই নিহিত থাকে। এইসব ভূতের বাইরে উৎপত্তি বলে কোনো পদার্থ নেই, অর্থাৎ যখন পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা লাভ করে, তখন সেই অবস্থান্তর প্রাপ্তিতেই উৎপত্তি

বলা হয়। অতএব হে পণ্ডিতগণ, পরিচ্ছিন্ন বিশেষজ্ঞ কার্যস্বরূপ এবং অপরিচ্ছিন্ন মহদাদিদের কারণস্বরূপ বলে জ্ঞান করবেন। . হে দ্বিজবৃন্দ, এই আমি পুরাণজ্ঞ সূতপুত্র সপ্ত দ্বীপা ও সমুদ্রবেষ্টিতা বসুমতীর সকল সন্নিবেশের বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে এবং যথাযথভাবে বললাম। বিস্তার ও মন্তলের আকারে আকারিত এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড– একে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির একদেশিক আংশিক পরিণাম রূপে বিবেচনা করা হয়। এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে স্বয়ং ভগবান অধিষ্ঠিত এবং এখানে সপ্তবিধ ভূতবর্গ পরস্পর সন্নিবিষ্ট হয়ে বিরাজ করছে।

আমি ভূমণ্ডলের সন্নিবেশের কথা এই পর্যন্তই বলতে পারি। সবকিছু আমি আপনাদের কাছে ব্যক্ত করলাম। এবার যে সপ্ত প্রকৃতি পরস্পরকে ধারণ করে বিরাজ করছে, তাদের সম্পর্কে বলতে উৎসাহ বোধ করছি। এই সপ্ত প্রকৃতির সংখ্যা নির্ধারণ করা যায় না, এরা বক্রভাবে, ঊর্ধ্বভাবে ও নিম্নভাবে অবস্থান করছে। দিব্যমণ্ডলের যতখানি স্থান জুড়ে তারকাজির সন্নিবেশ এবং যতখানি সীমানার সন্নিবেশ।ততখানিই পৃথিবীর অনুমণ্ডল বলে বিবেচিত হয়।

.

৪৪.

সূত বলতে লাগলেন–হে ঋষিগণ, এবার আমি অধোভাগ ও ঊর্ধ্বভাগের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি, শুনুন।

।পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ–এই পাঁচটি অসংখ্য ধাতুময় এবং ব্যাপকরূপে প্রসিদ্ধ। সর্বপ্রাণীর আধারস্বরূপ এই ধরণী জননীস্বরূপা। এই ধরণীতে বহু নগর, বহু অধিষ্ঠান, বহু জনপদ, বহ নদনদী, পাহাড় ও বহু জাতি আছে। বহুবিস্তৃতা এই পৃথিবী, নদনদী, সমুদ্র, ক্ষুদ্র পর্বত, ভূমধ্যসিত জল সর্বসম্ভব যোগ্য সর্বলোকখ্যাত অগ্নি এই সবকিছুই সর্বাত্মক ও অনন্ত। অসংখ্য প্রাণীর আশ্রয়স্থল, নিরালম্ব, রম্য আকাশ, আকাশজাত বায়ু–এই দুটিও সর্বব্যাপী ও অনন্ত রূপে প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর নীচে জল, জলের নীচে পৃথিবী, তার নীচে আকাশ, আকাশের নীচে আবার পৃথিবী এবং পৃথিবীর নীচে আবার জল–এইভাবে অনন্ত জল আকাশাদি পঞ্চ ভূতের সীমানা কেউই নির্ণয় করতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে পুরাকালে দেবতারা যা বলেছিলেন তা নিশ্চিতরূপে শুনে রাখুন। তারা বলেছিলেন, "ভূমি, জল ও আকাশ প্রভৃতি পরম্পরা অর্থাৎ ধারবাহিকরূপে অবস্থিত এবং সপ্ত সাতকের এদের অবিস্থিতি ধারার অবসান ঘটেছে। সপ্তভাগে অবস্থিত প্রত্যেক রসাতলের আয়তন দশ সহস্র যোজন এবং প্রত্যেক রসাতলেই একমাত্র তল বিদ্যমান। পণ্ডিতগণ এক একটি রসাতলকে বহু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

এই সাতটি রসাতলের প্রথম হল অতল, দ্বিতীয় সুতল, তৃতীয় অতিবিস্তৃত নিতল, চতুর্থ গভস্তল, পঞ্চম মহাতল, ষষ্ঠ শীতল এবং সপ্তম পাতাল। প্রত্যেক রসাতলে ভূমির বর্ণ পরিবর্তিত হতে থাকে, যেমন–প্রথম রসাতলের ভূমি কৃষ্ণবর্ণ, দ্বিতীয় রসাতলের ভূমি পাণ্ডুবর্ণ এবং এইভাবে যথাক্রমে রক্তবর্ণ, পীতভূমিময়, শর্করাময়, শিলাময় ও সুবর্ণময়।

হে ভূর্লোকশ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ, শুধু ভূমিবর্ণে নয়, এক একটি রসাতলে একেক কুলের সমাবেশ ঘটে গেছে। যেমন, কৃষ্ণভূমিময় এবং রসাতলে ইন্দ্র শত্রু অজুরেন্দ্র নসুষি, মহানাদ শঙ্কু, কবন্ধ, মিদ্ধলাদ, ভীমরক্ষা, শূলদণ্ড রাক্ষস, লেহিতাঙ্গ কলিঙ্গ, স্বপদ, মহাত্মা ধন প্রস্তরে মাহেন্দ্র ছাড়াও কালীয়নাম কুলিক নাগ প্রভৃতি দানব, রাক্ষস ও নাগগণের আনন্দমুখর জনগণে পরিপূর্ণ সহস্র সহস্র নিবাসপুরী বিরাজ করছে।

দ্বিতীয় রসাতলে দৈত্যশ্রেষ্ঠ সুরক্ষঃ, মহাজম্ভ, প্রত্যয়, হয়গ্রীব, কৃষ্ণ, নিকুম্ভ, শঙ্খ, গোমুখ, নীল, মেঘ, ক্রমণ করুপাদ, মহোবীর রাক্ষস, কম্বল নাগ, অশ্বতরং রুদ্রপুত্র মহাত্মা, তক্ষুখের নিবাসসস্থান প্রতিষ্ঠিত, এরা ছাড়াও এই দ্বিতীয় রসাতলে নাগ, দানব ও রাক্ষসদের সহস্র সহস্র পুরী বিদ্যমান।

পীতভূমিময় তৃতীয় রসাতলে মহাত্মা প্রহ্লাদ, অগ্নিমুখ, তারকাখ্য শিশুমার, রাক্ষস চলন, রাক্ষসরাজ কুম্ভিল, খর হেমকনাগ, পামরক, মণিমন্দ্র কপিল, নাগপতি নন্দ ও বিশালের পুরী প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সবপুরী আনন্দিত জনগণে সমাকুল।

এইভাবে রসাতলের এই তৃতীয় তলেও নাগ, দানব আর রাক্ষসদের সহস্র সহস্র পুরী বিদ্যমান। চতুর্থ রসাতলে আছে দানবসিংহ মহাত্মা কালনেমি, গজকর্ণ, কুঙ্কুরে, রাক্ষসে মুমলি ও বৃকবক্রেয় আলয় এবং বিনতাতনয় পক্ষীরাজের বহু সহস্র যোজন বিস্তৃত পক্ষীনগর। যোজন যোজন ব্যাপী শর্করা ভূমিক্ষয়। পঞ্চম রসাতলে দানবশ্রেষ্ঠ দৈত্যসিংহ ধীমান বিরোচন ও লোকনাথ, ধীমান রাক্ষস বিদ্যুৎজিহ্ব, দেবদ্বেষী রাক্ষস মহামেঘ, নাগবর্মা, স্বস্তিক ও জয়ের পুরী এবং নাগ, দানব ও রাক্ষসের সহস্র সহস্র নগরী।

ষষ্ঠ রসাতলে রয়েছে দৈত্যপতি কেশরী, সুপবা, সুলোমা, মহিষ ও রাক্ষসপতি মহাত্মা উৎক্রোমণ। এখানেই মহেন্দ্রময় সুরমাপুত্র শতমস্তক আনন্দিত নাগরাজ বাসুকি অবস্থান করছেন। এইভাবে শিলাময় এই প্রখ্যাত ষষ্ঠতলে নাগ, দানব ও রাক্ষসদের সহস্র সহস্র নগরী গড়ে উঠেছে।

সবেশেষে সপ্তম রসাতলের কথা বলবো। এটা হল সমস্ত রসাতলের শেষের তল। সেখানে বলির বহুনরনারী পূর্ণ প্রমোদবহুল পুরী আছে। এই পুরী বহু দেববিদ্বেষী উদ্ধত অসুর এবং সর্পে পরিপূর্ণ। মুচুকুন্দ দানববরের বিরাট এক নগর আছে এখানে। অসংখ্য নাগ, দানব, দৈত্য এবং রাক্ষসদের সহস্র সহস্র নিবাসপুরীতে অকীর্ণ সপ্তম রসাতল। রক্ত পদ্মাক্ষি ধৌতশঙ্খের মতো উদর ও বিশাল শরীরযুক্ত নীল বসন পরিহিত মহাবহু বিশাল বিশাল সর্প ও বিচিত্র মাল্যধারী অনন্তদেব, সুবর্ণচুড়ার মতো শ্বেতশুভ্র এবং দ্বীপ্তিমান সহস্র সহস্র বদলে শোভিত হয়ে বিরাজ করছে।

এখানে দুরন্ত জ্বালাময় 'অগ্নির মতো তেজময় জিহ্বায় পরিশোভিত হওয়ায় অনন্তদেবকে দেখে মনে হয় যেন শিখাবিশিষ্ঠ বহ্নিমালায় বিচ্ছুরিত কৈলসশিখর! স্নিগ্ধ মণ্ডলাকার আনন্দদেবের দ্বিগুণী ভূত সহস্র সহস্র নয়ন যেন বলয়সূর্যের মতো। তাম্রবর্ণ শ্বেতপর্বতের শৃঙ্গাপরে যেমন

তরুণ অদিত্যের দ্যুতি শোভা পায়, তেমনি কুন্দ ও ইন্দ্রের মতো শুভ্রবর্ণ অনন্তদেবের শিরোভঙ্গে অক্ষমালা শোভামান। শয়নাসনে ফণাকরাল দ্যুতিমান আনন্দদেব পৃথিবীর উপর বিস্তীর্ণ সহস্র শিখরে পর্বতের সঙ্গে বিরাজ করছেন। স্বয়ং মহাভাগ মহাভোগী মহাবল অসংখ্য মহানাগ এই মহানাগপতি মহাতেজা দেবতাকে উপাসনা করেন। অনন্তনাগের অপর নাম শেষনাগ। তিনি হলেন সমস্ত সাপেদের রাজা, তার মহাদ্যুতিময় রূপ দেখলে মনে হয়, যেন বিষ্ণুভক্তি সর্পতনু ধারণ করে রসাতল সীমান্ত পর্যন্ত বিরাজমান।

মনে রাখবেন, এই সাতটি রসাতল দেবতা, অসুর, মহানাগ এবং রাক্ষসদের নিবাসরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরপরও আরও কিছু স্থান আছে। কিন্তু সে সমস্ত স্থান আলোকবিহীন, সিদ্ধ ও সাধুদের অগম্য, এমনকি দেবতাদেরও অজ্ঞাত ও ব্যবহারবর্জিত। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, মহাত্মা প্রাজ্ঞ ঋষিগণ এইভাবেই পৃথিবী, অগ্নি, জল, বায়ু ও আকাশের মহত্ত্ব বর্ণনা করে থাকেন এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

পূর্বকথনের সূত্র ধরে সূত বললেন, এরপর আমি সূর্য ও চন্দ্রের গতির বিষয়ে বলতে ইচ্ছা প্রকাশ করছি। মণ্ডলাকারে অবস্থিত এই সূর্য ও চন্দ্র পরিভ্রমণ করতে করতে নিজ নিজ প্রভাপুঞ্জে সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপ সমন্বিত পৃথিবীর অধভাগ প্রকাশ করতে থাকেন। পৃথিবীর অপর যে অর্ধবাহ্য ভাগ সেখানেও সূর্য ও চন্দ্র পর্যায়ক্রমে পৃথিবী প্রকাশ করতে থাকেন।

ব্যাসের পরিমাণে বিচার করে দেখলে স্বর্গকে পৃথিবীর তুল্যই বলা চলে। যেহেতু সূর্যদেব পুরভ্রমণরত অবস্থায় এই ত্রিলোক প্রকাশ করে থাকেন, এই কারণে তিনি 'অব' ধাতু থেকে উৎপন্ন 'রবি' নামেও সমধিখ্যাত।

এরপর আমি চন্দ্রসূর্যের পরিমাণের বিষয়ে বলছি। ভারতবর্ষই হল এমন একমাত্র পূজ্যবর্ষ যেখানে 'মহ' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'মহী' শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই ভারতবর্ষের আয়তন সুবিশাল।

এবার সূর্যের যোজন বিস্তৃত মঙ্গলের বিষয়ে বলছি, শুনুন। সূর্যের নিজের বিস্তার নয় সহস্র যোজন। আর এর মঙ্গলাকার পরিধির বিস্তার হল সূর্যের নিজের বিস্তারের তিনগুণ। আবার এই সূর্যের বিস্তার ও মঙ্গলাকার পরিধি থেকে দ্বিগুণতর বিস্তার ও পরিধি সম্পন্ন হল চন্দ্র। সপ্তদ্বীপযুক্ত ও সপ্তসাগর বেষ্টিতা পৃথিবীর নিজের বিস্তার এবং এর মঙ্গলাকার পরিধির বিস্তার; উভয়ই বহু বহু যোজন। এই বিষয়ে কিছু কিছু তত্ত্বালোচনা আমি আগেও বলেছি।

এই পর্যন্ত পৃথিবী প্রভৃতির পরিমাণাদির বিষয়ে যা কিছু বললাম সবই পুরাণে উল্লেখ করা আছে। এখন পৃথিবীর বর্তমান অধিষ্ঠাতা দেবতাদের সাথে সাথে অতীত অধিষ্ঠাতা দেবতাদের বিষয়েও বলব। অভিমান অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃত্বহীন যেসব, অতীত দেবতা, তারা নাম-রূপ ইত্যাদিতে বর্তমান কালের অভিমান প্রবণ দেবতাদের সমান। তাই আমি বর্তমান কালের অভিমানী দেবতাদের সাথে পৃথিবীর এবং স্বর্গের বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করব।

এই পৃথিবীর বিস্তার পঞ্চাশ কোটি যোজন। এর মেরুদেশীয় স্থানগুলোও একই রকম প্রমাণ বিশিষ্ট। ঋষিরা যোজনা পরিমাণন থেকে সেই পৃথিবীর পরিমাণ বিস্তার বর্ণনা করেছেন। মেরুর মধ্যস্থান থেকে প্রতিদিকে এই পৃথিবীর বিস্তারের পরিমাণ এগারো কোটি এক লক্ষ উননব্বই যোজন এবং পৃথিবীর বিস্তার পঞ্চাশ সহস্র যোজন। এই সপ্তদ্বীপযুক্তা সপ্তসমুদ্রা বিশিষ্ট পৃথিবীর মেরুর চতুর্দিকে যে বিস্তার, তা হল, তিনকোটি এক লক্ষ উনআশি যোজন। মনে রাখবেন; পৃথিবীর মেরুপ্রদেশের বিস্তার অপেক্ষা পৃথিবীর অন্তের মঙ্গলাকার পরিধির বিস্তার তিন গুণ বেশি। যোজনাগ্রের পরিমাণ এগারো কোটি এক লক্ষ সাঁইত্রিশ সহস্র যোজন। এইভাবে পৃথিবীর অঙ্গের মঙ্গলের প্রমাণের কথা বলা হয়েছে। আকাশলোকে তারকা অগ্নিবেশের মঙ্গলাকার পরিধির পরিমাণ যেমন, পৃথিবীর সন্নিবেশের মঙ্গলাকার পরিধিও সেইরকম। পৃথিবীর ব্যাসের পরিমাণ যতখানি, সপ্তলোক ও স্বর্গের ব্যাসের পরিমাণ ততখানি, এইসব পৃথিবীর যোজনব্যাপী বিশাল বিস্তার সম্পর্কিত জ্ঞতব্য বিষয়।

এত গেল পৃথিবীর পরিমাণের কথা-এরই মধ্যে সমস্ত লোক ও সপ্তদ্বীপা পৃথিবী অবস্থান করছে। এই যেসব লোকের বিষয়ে উল্লেখ করছি, এরা অনেকটা মঙ্গলকারে ছত্রের মতো পর পর ওপরে ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। এই লোকসমূহে বহু প্রাণী বাস করে। ছত্রাকৃতি এই সাতটি লোক হল– ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য। অর্থাৎ ভূলোকের ওপর ভূবলোক, তার ওপরে স্বর্গলোক। এই রকম একের পর এক ছত্রের আকারে ওপরে ওপরে অবস্থান করছে। এইসব লোক দশগুণেরও বেশি সূক্ষ্ম কারণাত্মক পদার্থ সমূহকে নিজ নিজ আবরণ বিশেষের দ্বারা ধৃত হয়ে অবস্থান করছে।

এই অঙ্গ চতুর্দিক থেকে ঘন সমুদ্র দ্বারা সন্নিবেষ্টিত হয়ে আছে। সমগ্র পৃথিবীমঙ্গলই এই ঘনজলে বিধৌত হয়ে আছে। আর সেই ঘনসমুদ্র যেন ঘনতেজে বিধৃত হয়ে আছে। তারপর সেই মনতেজঃ মূলে চতুর্দিক থেকে ঘনবাতের দ্বারা, ঘনবাত আকাশের দ্বারা, আকাশ মহাত্মা ভূতাদি দ্বারা, ভূতাদি ‘মহত’ তত্ত্বের দ্বারা, মহৎ অনন্ত অব্যয় প্রধানের দ্বারা আবৃত হয়ে আছে।

ঘনাতেজকার তির্যক মঙ্গলটি বাইরে ও ওপরে এবার লোকপালদের পুর সমূহের বিষয়ে আলোচনা করা যাক। পরে জ্যোতিঃ সমূহের। প্রচারের প্রধান বিষয়ে বলব।

বস্কোকসারা নামে অশেষ পুণ্যপ্রদ সুবর্ণ নির্মিত মহেন্দ্র ভবনটি মেরুর পূর্বদিকে ও মানসের শিখরদেশে স্থাপিত হয়েছে। সূর্যপুত্র যম অর্থাৎ মহর্ষি ধৈবস্বত মেরুর দক্ষিণদিকে ও মানসের শিখরদেশে এক নগরে বাস করেন ধীমান বরুণ সেখানে তার এক রম্য নিকেতন আছে। মেরুর পশ্চিমদিকে ও মানসের শিখরদেশে অবস্থিত অনুপম এই বরুণভবনটি সুখা নামে পরিচিত। মেরুর উত্তরদিকে ও মানসের শিখরদেশে বিভাবরী নামে যমেরপুরী আছে সবদিক দিয়ে এই পুরী মহেন্দ্রের পুরীর সঙ্গে তুলনীয়।

মানস পর্বতের উত্তর পৃষ্ঠদেশে চারিদিকের ধর্মব্যবস্থা ও লোক সংরক্ষণের জন্য লোকপালগণ অবস্থান করেন। এই লোকপালদের ওপর দিয়ে দক্ষিণদিকে যাবার সময় সূর্যের অবস্থা বারে বারে পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম অবস্থায় সূর্যদেব ক্ষিপ্ত বাণের মতো অগ্রসর হতে থাকেন এবং জ্যোতিষচক্র অবলম্বনে সম্মুখাভিমুখে চলতে থাকেন। সূর্য যখন অমরাবতীর মাঝখানে আসেন, তখন 'সংযমন' নামে যমপুরীতে তার উদয় হয়। সেই সময় তাকে 'সুখা' বা বারুণীপুরীতে উদিত হওয়ার মতো দেখায়। সূর্য যখন বারুণীপুরীতে উদিত হয়, তখন 'বিভা' নামক কুবের পুরীতে অর্ধরাত্র ও 'মাহেন্দ্র' পুরীতে সূর্যাস্ত হয়। সেই একই সময় দক্ষিণ-পূর্বদিকে অপরাহ্ন হতে থাকে অথচ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তখনও পূর্বাহ্ন, উত্তর দিকে শেষরাত্র এব, উত্তর-পূর্ব দিকে পূর্বরাত্র অর্থাৎ রাত্রির প্রথম পাদ দৃষ্ট হয়, এইভাবে সুখাপুরীতে উদয়কালে সূর্য উত্তর ভুবন সমূহে বিরাজ করেন। আবার সুখায় যখন মধ্যাহ্নকাল অনুষ্ঠিত হয়, তখন এই হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় সূর্যকে বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যায়। 'বিভাবরী' নামক সোমপুরীতে তখন প্রথম সূর্যোদয় ঘটে। সেই একই সময় অমরাবতীতে অর্ধরাত্র, সোমপুরী বিভাবরীতে মধ্যাহ্নকাল এবং যমপুরীতে সূর্যাস্ত ঘটে থাকে। একইভাবে মহেন্দ্রর 'অমরাবতী'তে যখন সূর্যের উদয় ঘটে তখন সংযমনপুরে অর্ধরাত্র, ও বরুণপুরীতে সূর্যের অস্ত সূচিত হয়। সূর্য অলাতচক্রের মতো শীঘ্রগতিতে ঘুরতে থাকে আর তার, সাথে সাথে অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জ ও পরিভ্রমণ করতে থাকে, এইভাবে সূর্য দক্ষিণায়নের চারপাশে ভ্রমণ করেন এবং এইভাবেই সূর্যের বারবার উদয় ও অস্তাগমন ঘটতে থাকে।

ভ্রমণরত সূর্য পূর্বাহ্নকালে ও অপরাহ্নকালে দুটি দেবালয়কে এবং মধ্যাহ্নকালে একটিমাত্র দেবালয়কে রশ্মিতপ্ত করে। উদরের পর থেকে সূর্যরশ্মিজালের প্রখরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মোটামুটি মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত তারা খুব তাপ দেয়। তারপর আবার রশ্মিজাল হ্রাস পেতে

থাকে। হ্রাস পেতে পেতে একসময় সূর্য অস্ত যায়। এই উদয় ও অস্তানুসারেই পূর্ব ও পশ্চিমদিক নির্মিত হয়। সূর্য সামনের দিকে যতটা, পেছনে ও পাশেও ঠিক ততটাই তাপ দেয়, যেদিকে সূর্যকে উদিত হতে দেখা যায় অর্থাৎ যে দিকে উদয় ঘটে; তাকে বলে পূর্বদিক আর যেদিকে সূর্য অস্তমিত হয় সে দিকটা হল পশ্চিম।

সূর্যের পরিভ্রমণ পথে সবার উত্তরে আছে সুমেরু আর সর্ব দক্ষিণে লোকালোক পর্বত। রাত্রিকালে সূর্য অতি দূরে সময় করে এবং পৃথিবী দ্বারা আবৃত হয়ে থাকে। এসময় সূর্যরশ্মির অন্তধান ঘটে বলে তাকে খালি চোখে দেখা যায় না। গ্রহ, নক্ষত্র, তারা এবং সূর্যের ক্ষেত্রেও যখন তাদের তেজ বর্ধিত হতে থাকে, কেবলমাত্র তখনই তাদের দেখা যায়, কিন্তু যখন তারা অনূদিত থাকে অর্থাৎ অস্তাবস্ত্রীয় অবস্থায় তাকে তখন তার দৃশ্যমানতা হয় না। অগ্নি ও জলের ছায়া শুক্লবর্ণ এবং পৃথিবীর ছায়া কৃষ্ণবর্ণের হয়ে থাকে।

উদয়ের সময়ে অনেক দূরে থাকে বলে সূর্যের রশ্মিজাল দেখা যায় না। রশ্মিজালের অভাবে সূর্যকে রক্তিম বর্ণ দেখায়। ফলে তাতে উষ্ণতাও থাকে না, যে যে স্থান সূর্য রেখা দ্বারা অবস্থান করেন, সেই সব স্থানেই সূর্যকে দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে গমন করলেও সূর্যকে দেখা যায় না। সূর্য যখন অস্ত যায়, তখন তার প্রভাপুঞ্জের একাংশ অগ্নিতে প্রবেশ করে। এজন্য রাত্রিবেলা দুর থেকে অগ্নি প্রকাশ পায়। পরে যখন আবার অগ্নি উদিত হন তখন অগ্নির প্রভাপুঞ্জ অস্তমিত হয়ে সূর্যের মধ্যে প্রবেশ করে। সেই জন্যই সূর্য অগ্নি সহযোগে দিনেরবেলায় তাপ দেয় এবং সেই জন্যই সেই সময় তার প্রকাশ ও উষ্ণতা অনুভূত হয়। এই দিনেরবেলায় এবং রাত্রিবেলায় সূর্যতেজ ও অগ্নিতেজ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং পরস্পর পরস্পরকে বর্ধিত করে।

যখন ভূমির উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগে সূর্যের উদয় ঘটে, তখন রাত্রি জমধ্যে প্রবেশ করে। রাত্রির প্রবেশের ফলে দিনেরবেলায় জলের রং তাম্রবর্ণ থাকে। তারপর আবার যখন সূর্য অস্ত যায়, তখন দিন জলের মধ্যে প্রবেশ করে। তাই দিনের প্রবেশের কারণে রাত্রিবেলায় জলের রং শুক্লবর্ণ হয়। এইভাবে ক্রমযোগনুসারে ভূমির উত্তরার্ধ ও দক্ষিণার্ধ ভাগে সূর্যের উদয় এবং অস্তকালে দিন ও রাত্রি পর্যায়ক্রমে জলে প্রবেশ করে। জলের বর্ণ পরিবর্তন করে। এই যে দিনে সূর্যের প্রকাশ ও রাত্রিতে অন্ধকারের প্রকোপ ঘটে, এ কারণে দিনের আর এক নাম, 'সূর্য প্রকাশ এবং রাত্রির অরেক নাম 'তাপসী। সেই কারণে সূর্যের ওপর নির্ভর করে দিন ও রাত্রি ঘটে থাকে।

এইভাবে সূর্য যদি জলমধ্যে ভ্রমণ করে, তখন একমুহূর্তে সূর্য পৃথিবীর ত্রিশভাগ পরিক্রমা করে। এই এক মুহূর্তকাল মধ্যে পৃথিবীর যতখানি দুরত্ব সূর্য অতিক্রম করে তার পরিমাণ হল এক লক্ষ একত্রিশ সহস্র যোজন, একে সূর্যের "মৌতৃর্তকী গতি" বলা হয়।

এই মৌতূর্তিকী গতিতে সূর্য ক্রমশ দক্ষিণদিকে এগিয়ে আসে এবং মাঘ মাসে দক্ষিণদিকের প্রান্তভাগে এসে উপস্থিত হয়। দক্ষিণদিকে আসতে সূর্যকে নয় কোটি এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করতে হয়। সূর্যের গতি অহোরাত্র একই রকম থাকে। এরপর সূর্য দক্ষিণ দিক থেকে পিছিয়ে আছে। তিনি বিষুবস্তিত হয়ে ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তর সীমান্তে চলে আসেন।

এবার বিষুবমণ্ডলের পরিমাণ বিষয়ে যথাতত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করছি শুনুন। বিষুবমণ্ডলের বিস্তারের পরিমাণ হল তিন কোটি একশত সহস্র একাশি যোজন, শ্রাবণ মাসে 'চিত্রভানু' নাম গ্রহণ করে সূর্য উত্তর দিকে সরে যান। সে সময় তিনি ষষ্ঠ শাকদ্বীপের উত্তর প্রান্তের সমস্ত দিক ভ্রমণ করে। উত্তরদিকের এই মণ্ডলের পরিমাণ এক কোটি আশি নিযুত আটান্ন যোজন।

উত্তরদিকস্থ ভাগের নাম 'নাগবিথি', দক্ষিণভাগের নাম 'অজবীথি', নাগবীথিতে অভিজিৎ, অজবীথিতে মূলা, উত্তরাষাঢ়া ও পূর্বষাঢ়া এবং পূর্বে স্বাতীর উদয় হয়ে থাকে। এই দুটি কাষ্ঠার মধ্যে ব্যবধান একলক্ষ একত্রিশ শত তেত্রিশ যোজন পরিমাণ। এই দুটি কাষ্ঠার মধ্যে এই যে যোজন পরিমাণ ব্যবধান তা এইভাবে যোজন দ্বারাই পরিমিত হয়ে থাকে। এবার দুই কাষ্ঠা ও দুই রেখার উত্তর ও দক্ষিণভাগে যে যোজন পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়ে আছে, তা শুনুন।

এদের প্রত্যেকের পারস্পরিক ব্যবধান হল একাত্তর নিযুত এক সহস্র পঁচাত্তর যোজন। দুই কাষ্ঠার বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দুটি রেখা বিদ্যমান। এর মধ্যে উত্তরায়নকালে সূর্যদেব অভ্যন্তর ভাগ এবং দক্ষিণায়ন কালে বাহ্যভাগ পরিভ্রমণ করে থাকেন। এই উত্তর ও দক্ষিণের ভ্রমণ স্থান একশত আশি মণ্ডল যোজন পরিমান এদের সংখ্যা হিসাবের কথা বললেন। আপনাদের কাছে বিষয়টি আরও প্রাঞ্জলে হয়ে উঠবে। যেমন–যোজন মণ্ডলের পরিমাণ হল একুশ সহস্র দুইশত একুশ যোজন। যোজন পরিমিত এই যে মণ্ডল এর নাম 'বিষ্কম্ভ'। সময়ে সময়ে এই বিষ্কম্ভ আবার বক্রও হয়ে থাকে। মণ্ডল ক্রমানুসারে সূর্যদেব প্রতিদিন এই সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করেন।

তবে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ ভেদে সূর্যের গতির তারতম্য ঘটতে দেখা যায়। উত্তরায়ণের সময় কুম্ভকারের চক্রের মধ্যভাগের মতো সূর্য মন্দ গতিতে আবর্তন করে। এই জন্য একই যোজন

পরিমাণ স্থান অতিক্রম করতে দক্ষিণায়নের তুলনায় অনেক দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হয়। উত্তরায়ণকালীন সূর্যের এই মন্দ গতির ফলে আঠারোটি মুহূর্তে একদিন হয়। আবার ভ্রমণকালের এই একদিনের মধ্যে দিনের বেলার সাড়ে ছয়টি নক্ষত্র এবং আঠারোটি মুহূর্তে এবং রাত্রিকালে আরও সাড়েছয়টি নক্ষত্র পরিভ্রমণ করে। অন্যদিকে দক্ষিণায়ণকালে সূর্যের গতি কুম্ভকারের চক্রের প্রান্তভাগের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সে সময়ে শীঘ্র আবর্তনের ফলে অল্পকাল সময়ের মধ্যেই সূর্য অনেক বেশি প্রকৃষ্ট স্থান অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। এই দক্ষিণায়নকালে সূর্য দিনেরবেলায় বারাটি মূহুর্তে সাড়ে ছয়টি নক্ষত্র এবং রাত্রিবেলায় আঠারোটি মুহূর্তে সাড়ে ছয়টি নক্ষত্র ভ্রমণ করে থাকে।

উভয় কাষ্ঠার মধ্যে মণ্ডল ভ্রমণের সময়ে সূর্যের মন্দগতি ও শীঘ্রগতি অনুসারে পর্যায় ক্রমিক ভাবে দিন ও রাত্রি অনুষ্ঠিত হতে থাকে। দক্ষিণায়নের সমর দিনের বেলায় সূর্যের শ্রীঘ্রগতি ও রাত্রিবেলায় মন্দগতি লক্ষ্য করা যায়। গতিবিশেষের এই তারতম্যের ফলে দিন ও রাত্রিতে বিভক্ত করে সূর্য সম্ভবে ও বিষমভাবে বিচরণ করে থাকেন।

লোকালোক পর্বতের চতুপার্শ্বে যে সকল লোকপাল গণ অবস্থান করেন, তাঁদের ওপরে অগস্ত্য গতিবিশেষ অনুসারে দিন ও রাত্রি বিধান করে বেগে বিচরণ করতে থাকে। লোকালোক শৃঙ্গের উত্তরে বৈশানর পথের বাইরে দক্ষিণ নাগবীথীতে ইনিই। লোক গণ্ডারক' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। সূর্যপ্রভা এখানে সব জায়গায় সমানভাবে পতিত হয়। লোকালোক শৃঙ্গটি দশ সহস্র যোজন উন্নত। এর সব অংশ সমানভাবে দৃষ্ট হয় না। কিছু অংশ প্রকাশিত এবং কিছু অংশ অপ্রকাশিত থাকে।

এই সুউন্নত পর্বতশ্রেষ্ঠর অভ্যন্ত ভাগে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি নিত্য প্রকাশমান এই জন্য পর্বতটির অভ্যন্তরভাগ 'লোক অর্থাৎ প্রকাশিত বলে চিহ্নিত করা হয়। আর অপর অংশকে "নিরালোক" বা অপ্রকাশিত বলা হয়। এই লোক ভাগটি মাত্র একপ্রকার কিন্তু নিরালোক ভাগ বহু প্রকার। যে সময়ে সূর্যলোকালোক পর্বতের শৃঙ্গে-পড়ে অবস্থান করেন, সেই সময়কে সন্ধ্যা বলা হয়। এই সন্ধ্যা আবার 'উষা' ও 'ব্যষ্টি' এই দ্বিবিধ নামে প্রচারিত। রাত্রিকালীন সন্ধ্যার নাম 'উষা' এবং দিবাকালীন সন্ধ্যার নাম 'বৃষ্টি' উভয় সন্ধ্যাকালে যেসব পাপাত্মা রাক্ষস সূর্যদেবকে গ্রাস করেন তারা অক্ষয় দেহের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রজাপতির আদেশে শাপগ্রস্থ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পূর্ব কালে সন্দেহ নামে পরিচিত তিন কোটি সংখ্যক রাক্ষস প্রতিদিন সূর্যোদয়ের কামনায় প্রার্থনা করতেন। তারপর যখন সূর্য উদিত হত, সেইসময় নিপীড়ক দুরাত্মা রাক্ষসেরা সূর্যকে ভক্ষণ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন। এর ফলে তাদের সাথে সূর্যের এক দারুণ লড়াই শুরু হত। তখন এই অবস্থার অবসানকল্পে প্রজাপতি ব্রহ্মা, বরেণ্য দেবগণ ও অতি সৎ ব্রাহ্মণগণ নিবিষ্ট মনে সন্ধ্যার উপাসন করতে থাকেন। তারা ওঁ-কার ও ব্রহ্মসংযুক্ত গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত মহাজল বজ্ররূপ ধারণ করে এবং অমস্ত সূর্যগ্রাসী মহাজল বজ্ররূপ ধারণ করে এবং অমস্ত সূর্যাগ্রাসী দৈত্যকুল বিনষ্ঠ হয়। কিন্তু সেইদিন থেকে মহাতেজবান মহাদ্যুতিময় পরাক্রমী সূর্যের শতসহস্র যোজন ঊর্ধ্বে উদয় শুরু হয়। এবং সেই একই সময়ে কৃতার্থ বালখিল্য এবং মরীচি প্রভৃতি মুনি ও পুণ্যবান ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হয়ে তেজোময় ভগবান সূর্যের প্রয়াণ ঘটে।

পনেরো নিমেষে এক কাষ্ঠা ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত এবং ত্রিশ মুহূর্তে এক এক দিবারাত্র গণিত হয়। দিবসের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে এইসব মুহূর্তাদির সময় পরিমাণ ও সন্ধ্যার প্রাতঃকাল বলে। দিনের পাঁচ ভাগ সময় প্রাতঃকাল রূপে পরিগণিত হয়। প্রাতঃকালের পরে তিন মুহূর্ত পর্যন্ত সময় হল মধ্যাহ্ন কাল। মধ্যাহ্ন কালের পর তিন মুহূর্ত পর্যন্ত অপরাহ্ন কাল। অপরাহ্ন কালের পরবর্তী তিন মুহূর্ত কাল সায়াহ্ন কাল। এইভাবে তিন মুহূর্ত-বিভাগ অনুসারে একটি সমগ্র দিন, পঞ্চাদশ অর্থাৎ পনেরো মুহূর্ত বলে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সূর্যের বিষুবরেখার অবস্থান কালে এইভাবে পঞ্চদশ মুহূর্তে দিন গণনা করা হয়। দিন ও রাত্রি উভয় বেলাতেই তার কম পঞ্চাদশ মুহূর্ত হয়ে থাকে। কেবলমাত্র দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণের সময়ে দিন ও রাত্রি এই কাল বিভাগের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে থাকে। কেন না দক্ষিণায়ন বা উত্তরায়ণ যাই-ই হোক না কেন, ওই উভয় ক্ষেত্রে কখনও দিবাভাগ রাত্রিকে গ্রাস করে আবার কখনও রাত্রি দিবা ভাগকে গ্রাস করে।

পনেরো দিনে এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন এবং দুই অয়নে এক বৎসর গণনা করা হয়। নিমেষাদি দ্বারাও কাল গণনা করা হয়ে থাকে, যেমন- পনেরো নিমেষে এক কাষ্ঠা হয়ে থাকে, আবার ত্রিশ কলায় এক কাষ্ঠা এবং একশো ষাট মাত্রাতেও এক কাষ্ঠা হয়ে থাকে। চার হাজার আটশো মাত্রায় বিদ্যুতি হয়ে থাকে। চারশো নব্বই বৈদ্যুতি এক বৈধ যুগ হিসেবে গণ্য হয়। একে চরাংশও বলা হয়ে থাকে। এই বিভিন্নতার জন্য নলিকা-কেই কারণ রূপে বিবেচনা করা হয়। সম্বৎসরাদি পাঁচটি বিভাগ চার প্রকার পরিমাণে হয়ে থাকে। এই পাঁচটি বিভাগের মধ্যে প্রথম বিভাগের নাম সম্বৎসর, দ্বিতীয় পরিবৎসর, তৃতীয় ঈদ্বৎসর, চতুর্থ অনুবৎসর এবং পঞ্চম কাল বৎসর। একটি যুগে সূর্যের

একশো কুড়ি পর্বকাল পূর্ণ হয় এবং এক হাজার আটশো ত্রিশটি সূর্যোদয় অর্থাৎ সারন দিন অতিবাহিত হয়। যুগ কালের ঋতু সংখ্যা হল ত্রিশ, অয়ন সংখ্যা দশ এবং মাসের সংখ্যা আট। এরকম তিনটি অহোরাত্র একত্রিত হয়ে এক সৌরমাস হয়ে থাকে। সমস্ত ভুবন পরিক্রমা করে আসতে সূর্যের একশো তিরাশি দিন সময় লাগে। এই সময়কাল সৌর, সৌম, নক্ষত্র, সারন, এই চারটি পর্বে বিভক্ত। পুরাণেই এই নির্দেশ দেওয়া আছে।

শ্বেতদ্বীপের উত্তরদিকে এমন একটি পর্বত আছে যার তিনটি শৃঙ্গই নেভস্তলকে স্পর্শ করেছে। এই জন্যই এই পর্বতটি শৃঙ্গবান নামে সর্বলোকে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অবশ্য পর্বতটি আরও তিনটি নামেও কীর্তিত হয়ে থাকে। যথা–একমার্গ, বিস্তার ও বিষ্কম্ভ। শৃঙ্গবান পর্বতটির ওই ত্রিশৃঙ্গ তিনটি আলাদা আলাদা ধাতু দ্বারা নির্মিত। প্রথম শৃঙ্গটি সুবর্ণমণ্ডিত, দক্ষিণ শৃঙ্গটি কৌল্যমণ্ডিত এবং তৃতীয় শৃঙ্গটি স্ফটিকপ্রভা বিশিষ্ট। এর মধ্যে উত্তর শৃঙ্গটি সর্বোত্তম। এটি সর্বরত্নে পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

শরৎ ও বসন্ত কালের মধ্যবর্তী সময়ে সূর্য মধ্যম গতি অবলম্বন করে। এ সময় মন্দগতিতে চলতে চলতে সূর্য যখন বিষুবরেখা শৃঙ্গের ওপরে অবস্থান করে তখন পৃথিবীতে দিন ও রাত্রি সমান হয়। ওই সময়ে ভগবান সূর্যের মহারথে নিযুক্ত দিব্য হরিবর্ণ অশ্বগুলিকে পদ্মরাগের মতো রক্তবর্ণ কিরণ লিপ্ত বলে মনে হয়। যদি মেঘ ও তুলারাশির শেষ ভাগে সূর্যের উদয় হয়, তবে দিন ও রাত্রি উভয়ই পনেরো মুহূর্ত করে হয়ে থাকে। যে সময় সূর্যদেব কৃত্তিকার প্রথম অংশে আসেন, সেই সময় চন্দ্র বিশাখার চতুর্থাংশে আছে বলে জানবেন। সূর্য যখন বিশাখার তৃতীয় অংশে যান, তখন চন্দ্র কৃত্তিকার শিরোভাগে আছেন বলে জানবেন। মহর্ষিগণ এই সময়কে বিষুবকাল বলে অভিহিত করে থাকেন। সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা এই বিষুবকাল নির্দেশিত হয়ে থাকে। বিষুবকালে যখন দিন ও রাত্রি সমান হয়, তখন পিতৃগণ বিশেষত ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে দানাদি কর্ম অতি অবশ্যই করা উচিত। কারণ ব্রাহ্মণরাই হলেন দেবতাদের মুখপাত্র স্বরূপ। ব্রাহ্মণগণ ছাড়াও ঊনরাত্র, আর্মস, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত, পৌর্ণমাসী অর্থাৎ পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি–এদের উদ্দেশেও অনুরূপ শ্রদ্ধার সঙ্গে দানকার্য করা বিধেয়।

বছরের বারো মাসের মধ্যে তিন-তিন ব্যবধানে পর্যায়ক্রমে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ ঘটে থাকে। বৎসরের শুরুতে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, ও শেষে মাঘ ফাল্গুন ও চৈত্রে সূর্যের উত্তরায়ণ চলে এবং শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ এই ছয়মাস দক্ষিণায়ণ

চলে। হে মহাত্মা ব্রহ্মপুত্রগণ, এইভাবে সম্বংসরাদি পঞ্চাব্দ ও ধাতুগুলিকেও জানতে হবে। ধাতুগুলিকে 'অন্তরা' নামেও ডাকা হয়ে থাকে।

এতক্ষণ আমি আপনাদের যে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করলাম, তা অতিমূল্যবান। মানুষ এইসব জ্ঞান লাভ করার পরে আর দৈবকার্যে ও পিতৃকার্যের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে না। এই কারণে পুণ্যকামী প্রজারা সর্বত্রগামী 'বিষুবতত্ব' কে সর্বদা স্মরণ করে থাকেন। অমাবস্যাদি যে ঋতুসুখ পর্বের অন্তর্গত তা থেকে দেব ও পিতৃগণের হিতকারক বিষুবকাল উৎপন্ন হয়।

আগেই উল্লেখ করেছি, যে সমস্ত স্থান আলোকে প্রকাশিত হয়, সেইসব স্থান 'লোক' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। লোক ও আলোকের মধ্যবর্তী স্থানে লোকপালক লোকপাল গণ অবস্থান করেন। তাদের মধ্যে কেবল চারজন মহাত্মা লোকপাল প্রলয়কাল না আসা পর্যন্ত অবস্থান করেন। কয়েকজন খ্যাতনামা লোকপাল হলেন–সুধামা, বৈরাজ, কর্দম, শঙ্কপ, হিরণ্যলোমা, পজন্য, কেতুমাল ও জাতনিশ্চয়। এরা প্রত্যেকেই শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বজ্ঞানবর্জিত, নিরভিমান, তন্দ্রাবিহীন ও পরিগ্রহ হীন।

অগস্ত্যের উত্তরদিকে, অজবীথীর দক্ষিণে এবং বৈশ্বানর পথের বাইরে পিতৃযান নামে একটি পথ। আছে। সেই পিতৃযান পথের পথে পথে প্রজাবান ও প্রজাবর্ধক অগ্নিহোত্র মুনিরা বসবাস করেন। দক্ষিণ পিতৃযানে বসবাসকারী এই সব মুনিরা পৃথিবীর বিপুল ভার বহন করেন। তারা আশীর্বাদের দ্বারা ঋত্বিক সুলভ কর্ম সম্পাদন করেন। এরা প্রজাসৃষ্টিতেও একই রকম অভিলাষী, এঁরা প্রজাবৃদ্ধি, তপস্যা, মর্যাদা, শাস্ত্রচর্চা প্রভৃতির দ্বারা বিচলিত ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। এঁদের মধ্যে পূর্ববর্তী মুনিরা পরবর্তী মুনিদের স্থানে জন্মলাভ করেন। অর্থাৎ পরবর্তী মুনীদের মৃত্যু হলে পূর্ব্বর্তী মুনিরা আবার তাদের স্থানে আবির্ভূত হন। এইভাবে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন অনুসারে এইসব অগ্নিহোত্র মুনিরা প্রলয়কাল পর্যন্ত অবস্থান করে থাকেন।

চন্দ্রমণ্ডল ও তারকামণ্ডল সূর্যের দক্ষিণমার্গে অবস্থান করছে। এখানে প্রায় অষ্টআশি সহস্র শ্মশানবাসী মুনি বাস করেন। লোকব্যবহার ভূতারম্ভকর্ম, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রকৃতি, মৈথুন ইত্যাদি কায়কৃত কার্যাবলী ও বিষয় সেবা দ্বারা এঁরা সিদ্ধপ্রাপ্ত হন এবং শ্মশান অবলম্বন করেন। এই সমস্ত প্রজাভিলাষী শ্মশানবাসী মুনিগণ শেষবার দ্বাপর যুগে সত্যভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

'দেবযান' নামে পরিচিত নাগবীথীর উত্তরদিকে ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের দক্ষিণে যে পথ রয়েছে তা 'সূর্যের উত্তরপথ' বলে অভিহিত হয়ে থাকে। এই পথে বিমলচিত্ত, সিদ্ধ ব্রহ্মচারীরা বাস করে

থাকেন। এরা সর্বদাই পাপ ভয়ে ভীত ও মৃত্যুঞ্জয় হয়ে থাকে। এইসব ঊর্ধরেতাঃ মুনিদের সংখ্যাও অষ্টআশি সহস্র, তাঁরাও প্রলয়কাল পর্যন্ত উত্তরপথেই অবস্থান করেন। এঁরা যে সমস্ত শুদ্ধাচার পালন করেন সেই কারণহেতুই এঁরা প্রলয়কাল পর্যন্ত অমরত্ব লাভ করে থাকেন। এ-ই হল এঁদের ত্রৈলোক্য অবস্থান কাল। অন্তর্বর্তী সময়ে এঁরা অন্যমার্গে গমন করেন না। কিন্তু ব্রহ্মহত্যা বা অশ্বমেধ প্রভৃতি পাপপুণ্য অনুষ্ঠান পালন করলে এই সব ঊর্ধরেতা মুনিদেরও প্রলয়ান্তে ক্ষয় হয়ে থাকে।

ওপরে বর্ণিত এই ঊর্ধরেতা ঋষিদের বিচরণক্ষেত্র হল উত্তরভাগে অবস্থিত ধ্রুবলোক। এই লোক আকাশমার্গে সমুজ্জল হয়ে আছে। এই স্থান তৃতীয়লোক বলেও বর্ণিত হয়ে থাকে। বিষ্ণুপর পরমপদ এই ধ্রুবলোক। যেতে পারলে আর শোকাদি থাকে না। এই লোকে কেবল ধার্মিক মাধকরা বাস করে থাকেন।

.

৪৫.

মহাজ্ঞানী পুরাণজ্ঞ সূত বললেন, স্বায়ম্ভুর সৃষ্টির সময়কার অতীতে ঘটিত ও ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ঘটনাগুলির ব্যাখ্যান এখানেই সমাপ্ত হল। এবার আমি এসবের আনুমানিক বিবরণ দেব।

সূতকণ্ঠের এই ভাষণ শুনে সেইসব ব্রহ্মবাদী মুনিঋষিরা তাকে সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহদের বিষয়ে সর্বপ্রকার সঞ্চারণ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। ঋষিরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে লোমহর্ষক, আপনি আমাদের বলুন কীভাবে এইসব জ্যোতিষ্ক পদার্থ বক্র ও পরস্পর পৃথকভাবে ভ্রমণ করে? এরা কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভ্রমণ করে নাকি কেউ এদের দিয়ে ভ্রমণ করায়? হে সাধুর্বর, এ বিষয়ে আমরা অধিক কিছু জানতে ইচ্ছা করি, আপনি আমাদের বিস্তারিতভাবে সবকিছু বলুন।

সূতপুত্র লোমহর্ষক বললেন, এই বিষয়টি সম্পর্কে যা কিছু আমার জানা আছে, সে সবই বলছি। এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেও প্রজাদের সম্মোহিত অবস্থা হয়।

আকাশ মণ্ডলের চারিদিকে বিস্তৃত রয়েছে শিশুমার পুচ্ছ। এই পুচ্ছমধ্যে উত্তান পাদপুত্র মেধাভৃতধ্রুব নামে এক নক্ষত্র আছে। এই ধ্রুব নিজে যেমন ভ্রমণ করে, তেমনি সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহরাজিকেও ভ্রমণ করায়। কারণ ধ্রুব নক্ষত্র ভ্রমণ করতে থাকলে অন্যান্য নক্ষত্রগুলোও সেই ধ্রুব নক্ষত্রকে চক্রের মতো অনুসরণ করে।

বাস্তবিক অর্থে ধ্রুব নক্ষত্রের গতি অনুসরণ করেই সূর্য, চন্দ্রমা, তারা, নক্ষত্র ও গ্রহ ভ্রমণ করতে থাকে। তারা বায়ুস্তূপরূপে রজ্জু দিয়ে ধ্রুব নক্ষত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। সুতরাং ধ্রুব থেকেই তাদের যোগ-বিয়োগ, অস্ত-উদয়, কাল সঞ্চারণ উৎপাত, দক্ষিণাপন, উত্তরায়ণ, বিষ্ণুবর্ত ও গ্রহবর্ণ সংঘটিত হয়ে থাকে। এছাড়া বর্ষা, গ্রীষ্ম, শীত কিংবা রাত্রি, সন্ধ্যা, দিন ইত্যাদি যা কিছু প্রাকৃতিক পরিবর্তন এবং শুভাশুভাদি সবকিছুই ধ্রুব থেকেই হয়ে থাকে। এমনকি গ্রহাদি সকলও ধ্রুব দ্বারা অধিকৃত, সূর্য পর্যন্ত ধ্রুব দ্বারা আবৃত হয়ে থাকেন। এইভাবে আবৃত্ত থাকার কারণেই সূর্য দীপ্তিকিরণ ও কলাগ্নি স্বরূপ হয়ে, দিবাকর হতে পেরেছেন এবং পরিবর্তন সাপেক্ষে দীপ্তিপুঞ্জের দ্বারা চারিদিক আলোকিত করছেন। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ, শুনে রাখুন, সূর্যই সর্বব্যাপী বায়ুযুক্ত কিরণজালে সমগ্র জগতের জল গ্রহণ করে থাকেন। সূর্যযোগ চন্দ্র থেকে যে জল নিঃসৃত হয়, তা প্রথমে চন্দ্রের অগ্রভাগে অবস্থান করে। তারপর বায়ুস্রোতের জোরালো আঘাতের ফলে মেঘসমূহের দ্বারা সেই জল পৃথিবীতে বর্ষণ করে। অর্থাৎ প্রথমে জল উৎক্ষিপ্ত হয়, তারপর আবার সেই জল উৎসস্থলে বা নীচে ফিরে আসে।

এই ভাবে নানা প্রকারে জল পরিবর্তিত হতে থাকে। বিশ্বব্যাপী এই যে মায়ার খেলা চলছে, এসবই প্রাণীদের প্রতিপালনের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বচরাচর এই মায়া দ্বারা ব্যাপ্ত হয়ে আছে, সূর্যই এসব কিছুর মূল। তাই সূর্যকে বিশ্বেশ্বর বিধাতা, বিষ্ণু, সমগ্র লোকের প্রভু, দিবাকর, লোকস্রষ্টা ঈশ্বর, সহস্রাংশু প্রজাপতি, প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

আকাশে বিরাজিত চন্দ্র থেকেই এই সর্বলৌকিক জল নিঃসৃত হয়। সে কারণে সমস্ত দৃশ্যমান জগৎ "সমাধার" নামে কীর্তিত হয়ে থাকে। সূর্য থেকে উষ্ণতা এবং চন্দ্র থেকে শীতলতার উৎপত্তি ঘটে থাকে। এই কারণে সূর্যকে 'উষ্ণবীর্য এবং চন্দ্রকে 'শীতবীর্য' বলা হয়ে থাকে। এই চন্দ্র ও সূর্যই কিন্তু আমাদের জগৎকে ধারণ করে রেখেছে।

হে দ্বিজোত্তমগণ, গঙ্গা নদীর বিষয়ে আমি আপনাদের আগেও বলেছে। এই পবিত্র গঙ্গা নদীকে সোমের আধারস্বরূপ কল্পনা করা হয়। গঙ্গা অন্যান্য মহানদী সমূহের মধ্যে অগ্রণী।

সমস্ত প্রাণীর শরীরে জলরাশি সঞ্চিত হয়ে আছে। চরাচরাদি অগ্নিজালে দগ্ধ হবার সময়ে সেই সঞ্চিত জলরাশি ধূম্ররূপে বায়ুতে মিশে যায়। তাই থেকে মেঘ জন্মায়। এই মেঘই হল সকল জলরাশির উৎস স্থান। সূর্যকিরণ ভূতবর্গের দেহ থেকে জল গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে রশ্মিসমূহের দ্বারা জল গৃহীত হয়। এছাড়া সমুদ্র থেকেও বায়ু সংযোগের মাধ্যমে সূর্য জল গ্রহণ করে থাকে। সূর্য রশ্মির তেজ ঋতুভেদে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। শুক্লরশ্মিজাল সমূহের মাধ্যমে মেঘ থেকে শুক্লজলরাশিই সিঞ্চিত হয়ে থাকে ও মেঘস্থিত জলরাশি বায়ু দ্বারা চালিত হয়। তারপর আবার বায়ুবশেই সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলের জন্য ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। সমস্ত প্রাণীর বৃদ্ধি যাতে ঠিকমতো হয়, তাই বৎসরের মধ্যে ছয়মাস বর্ষণ হয়ে থাকে। মেঘের গর্জন কিংবা বিদ্যুতের অগ্নি–এই দুটি ঘটনার নিমিত্ত বায়ু ক্ষরণ হয় বলেই ক্ষরনার্থক মিশ্র ধাতু থেকে মেঘ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। উৎপত্তি অনুসারে মেঘকে তিনভাগে ভাগ করা যায়–আগ্নেয়, ব্রহ্মাজ ও পঙ্কজ। আমি এই তিন প্রকারের মেঘের উৎপত্তি সম্পর্কে আপনাদের সবিশেষ বলব।

আগ্নেয় মেঘের উৎপত্তি হয় সমুদ্র থেকে। এই মেঘ 'অনর্জ' নামেও সমধিক প্রসিদ্ধ। আগ্নেয় মেঘের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল–শৈত্য, গতিময়তা ও প্রবহন ওই মেঘ থেকেই এদের উৎপত্তি। এই পৃথিবীতে অনেক মাতঙ্গগামী মহিষ ও শূকর প্রভৃতি জন্তু জন্মায়, বিচরণ করে, ও রমণ করে থাকে। মেঘকেই এই সমস্ত জীবের উৎপত্তির কারণ স্বরূপ বলা হয়। এজন্য মেঘের অপর নাম জীমূত'। এই জীমূত মেঘের কিন্তু বিদ্যুৎ গুণ নেই। এবং এই জীমূত মেঘ জলধারায় লম্বিত হয়ে বর্ধিত হয়। এক ক্রোশ বা অর্ধ ক্রোশ স্থান জুড়ে এই

মেঘের বর্ষণ হয়ে থাকে। বিশেষ করে গগনস্পর্শী সুউচ্চ পর্বতের শিখরদেশে ও নিতম্ব দেশে আগ্নেয় মেঘসঙ্ঘুতে বর্ষণ ও রক্ষণ হয়ে থাকে। বলাকা শ্রেণীর গর্ভধারণ করায় বলে এই মেঘ 'বলাকা গর্ভদ' নামেও সমধিক প্রসিদ্ধ। এইসব মেঘ শব্দহীন মহাকার্য ও প্রবাহের বশীভূত।

দ্বিতীয় প্রকার মেঘ হল ব্রহ্মাজ মেঘ। ব্রহ্মার নিঃশ্বাস বায়ু থেকে উৎপন্ন হয় বলে এর এরকম নামকরণ হয়েছে। এই মেঘের গর্জন ব্রহ্মার খুব প্রিয়। এই মেঘ বিদ্যুৎ গুণযুক্ত হওয়ায় বর্ষণের সময় প্রবল শব্দ করতে থাকে। এই শব্দ শ্রবণ করে ভূমির অঙ্কুরোদগম ঘটে, ভূমি রাজ্যভিষিক্তা রাজ্ঞীর মতো পুনর্যৌবন লাভ করে। এই নবযৌবনবতী ভূমির প্রতি জীমূত মেঘের স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতির সঞ্চার ঘটে। ফলে তা ওই ভূমির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে তার ওপরে বারিবর্ষণ ঘটায়। এর ফলে তা থেকে বিবিধ প্রাণীর জীবন সঞ্চার হয়ে থাকে। ব্রহ্মাজ মেঘ 'প্রবাহ' নামক দ্বিতীয় বায়ু অবলম্বন করে থাকে। এবং সপাদ এক যোজন অর্থাৎ সওয়া এক যোজন স্থান জুড়ে বর্ষণ ও ধারাসার দান করে থাকে।

পক্ষ থেকে যেসব মেঘের উৎপত্তি ঘটে, তাদের পক্ষজ মেঘ বলা হয়। এদেরকে 'পুষ্করাবর্তক' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। অনেক কাল পর্বতরা যথেচ্ছগামী এবং খেয়ালী প্রকৃতির ছিল। তাই প্রাণীদের মঙ্গল কামনায় দেবরাজ ইন্দ্র এইসব মহাতেজাঃ যথেচ্ছ গামী পার্বতদের পক্ষ ছেদন করেন। সেই কর্তিত পক্ষ থেকে একটি বৃহৎ জলভরা মেঘ উৎপন্ন হয়। সেই কারণে পক্ষ মেঘের নাম শুষ্করাবর্তক রাখা হয়েছে। এই সব অতিঘোরতর মেঘ নানারকম রূপ ধারণ করতে পারে। এইসব মেঘ 'তৃতীয়মেঘ' নামেও উল্লিখিত হয়ে থাকে।

মেঘ সম্পর্কিত আলোচনায় একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যারা সাধারণভাবে অংশ থেকে উৎপন্ন, তারাও মেঘ বলেই প্রসিদ্ধ। ধূম নির্বিশেষে সমস্ত মেঘেরই পক্ষ মেঘ অনেক রূপ ধারণ করে মহীতলাকে পূর্ণ করে, ও পরবায়ুকে প্রবাহিত করায়। সেই কারণে এই ধরনের মেঘ দেবতাদের আশ্রিত এবং কল্পসাধক। পরিবর্ধক। এই সমস্ত মেঘের মধ্যে পর্জন্যই শ্রেষ্ঠ মেঘ। তাই চারপ্রকার মেঘকেই দিগগজ বলে।

গজ, পর্বত, মেঘ ও সর্পদেব কুল ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু এক জলই এদের উৎপত্তির কারণ। গর্জন্যও শীতদ্ভূত দিগগজরা হেমন্তকালে সমস্ত শস্যের বৃদ্ধির জন্য তুষারবৃষ্টি ঘটিয়ে থাকে।

'পরিবহ' বায়ুকে বায়ুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। এই বায়ু হল ভগবান স্বরূপ, আকাশস্থিতা বিদ্যাস্বরূপা বিপুলোদক স্বর্গপথপ্রবাহিণী পুণ্যসলিল দিব্য গঙ্গাকে এই পরিবর্ত বায়ু-ই ধারণ করে থাকে। ওই স্বচ্ছসলিলা গঙ্গার উচ্ছ্বাস সঞ্জাত জল দিগজেরা নিজেদের স্থূল খুঁড় দিয়ে

গ্রহণ করে জলকণা রূপে দূরে নিক্ষেপ করে। এই নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণাকে ‘নীহার’ বলা হয়।

উত্তরদিকে অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণভাগে ‘হেমকূট’ নামে একটি পর্বত আছে। ওই পর্বতের পাদদেশে পুন্ড্র নামে এক নগর আছে। পুন্ড্র নগরে প্রচুর পরিমাণে তুষারগলা জল এসে পড়ে।

হিমশৈলের তুষারাবৃত শিখর দেশ বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে তা মহাগিরিতে সেচিত হয়। হিমালয় গিরিশালা অতিক্রম করার পর অন্যান্য ভূখণ্ডের বৃদ্ধির জন্য ওই জল এদিকে আসে। এইভাবে উত্তরোত্তর মেঘ ও জলের বৃদ্ধি ঘটায়।

সূর্যই বৃষ্টিরাশির স্রষ্টা হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে থাকেন। সূর্য ধ্রুব দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকেন। ফলে সূর্য ও ধ্রুব উভয় থেকেই বৃষ্টি হয়ে থাকে বিপরীত দিকে। বায়ু ধ্রুব দ্বারা আবেষ্টিত হয়ে বৃষ্টির সংহার ঘটায়। সূর্য থেকে সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডল নিঃসৃত হবার পর তারা আবার ধ্রুব পরিবেষ্টিত সূর্য মধ্যে প্রবেশ করে।

এরপর আমি সূর্যরথের সন্নিবেশ সম্পর্কে যথাসম্ভব তত্ত্ব প্রদান করছি, শুনুন।

ভগবান সূর্য যে রথে চড়ে ভ্রমণ করেন, এককথায় তার তুলনা মেলা ভার। রথটিতে একটি চক্র, পাঁচটি অর, তিনটি নাভি, পথের অন্ধকার বিনাশী ছয় প্রকার নেমি আছে। একাধিক পর্বে বিভক্ত এই রথ সুবর্ণ দ্বারা নির্মিত হয়েছে। মহাতেজস্বী এইরকম প্রোজ্জ্বল রথেই ভগবান সূর্য পরিভ্রমণ করেন। ইষাদণ্ড প্রমাণানুসারে এই রথের বিস্তার পরিমাণ দশ সহস্র যোজন, এবং দৈর্ঘ্য পরিমাণ এর দ্বিগুণ। এই রথের স্রষ্টা হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। প্রথম অবস্থায় কাঞ্চনময় এই দিব্য রথ সঙ্গহীন থাকে। তারপর প্রয়োজনানুসারে রথটিতে অতিবেগবান অশ্বদের যোজিত করা হয়। এই রথে অশ্বরূপ ছন্দোরাজি নিয়োজিত আছে। সূর্যরথের পূর্বোক্ত প্রত্যঙ্গগুলি সম্বৎসারের অবয়ব রূপে কল্পিত হয়ে থাকে। যেমন সূর্যের নাভি হল দিন, যা এখানে এক চক্র হিসাবে নিরূপিত হয়েছে। ঋতুরা হল তাঁর পঞ্চ অর এবং ছয় ঋতু এর ছয়টি নেমি, অব্দ হল বর্তনীড়, অয়ন দুটি হল কবীর। মুহূর্তগুলো হল বন্ধুর সমূহ, কলানিচয় হল শয্যা, সমস্ত কাষ্ঠা হল যোনি, ক্ষণসমূহ ঈষাদণ্ড, নিমেষ সমূহ অনুকর্য। এছাড়া সমস্ত লবকে ঈষা রূপে জ্ঞান করতে হবে। রাত্রিকে স্বীকার করতে হবে বরূথ রূপে। দিন হল এর সদান্নত ধ্বজ। অর্থ ও কোম হল যুগাক্ষ কোটি, ছন্দোরূপী সাতটি অশ্ব সুবর্ণময় সূর্য রথকে বহন করে চলে। অশ্বগুলি হল–গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ, জগতী পংক্তি, বৃহতী ও উষ্ণিক, অক্ষে চক্র নিবদ্ধ থাকে

আর সেই অক্ষ আবার ধ্রুবের সাথে আবদ্ধ থাকে। অক্ষ যেমন চক্রের সাথে ঘোরে, তেমনি ধ্রুব অক্ষের সাথে ঘোরে। এককথায় বলা যায় ধ্রুব দ্বারা চালিত হয়েই ওই অক্ষ চক্রের সাথে ঘোরে।

সূর্যরথের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গে এইরকম বিরল সন্নিবেশ ঘটে গেছে এবং এর সংযোগভাগে উজ্জ্বল রং সংসিদ্ধ হয়ে আছে। এই জন্যই আকাশপথে সূর্যকে এত দ্রুত বেগে গমনাগমন করতে দেখা যায়। রথের দুই রশ্মি রথের যুগ ও অঙ্গকোটির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। ধ্রুবের ভ্রমণ ক্রমে ক্রমে চক্র ও যুগের দুটি রশ্মিও সমান তালে ভ্রমণ করতে থাকে। তখন তার সঙ্গে সঙ্গে আকাশচারী রথের মণ্ডলও আবর্তন করতে থাকে। আরও বিশদভাবে বলতে গেলে, সূর্যরথের দক্ষিণভাগে যুগ ও অক্ষকোটি নিবদ্ধ রয়েছে। দ্বিচক্রের শ্বেতরঙ্গুর মতো ওই দুটি পদার্থ ধ্রুব দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে। এর ফলে ধ্রুব ভ্রমণ করতে থাকলে ওই রশ্মি দুটি ভ্রমণ করতে থাকে। একই সময় যুগ ও অক্ষকোটি ওই রশ্মি দুটিকে এবং বার্তোমি ওই রথকে অনুসরণ করে। লক্ষ্য করলে দেখবেন কীলক অর্থাৎ কাঠের গোঁজে কোনো রঞ্জুকে আবদ্ধ করলে তা সবদিকে ঘোরে। একই নিয়মে সূর্যমণ্ডলের উত্তরায়ণের সময়ে ওই রশ্মিদুটি হ্রাস পায় এবং দক্ষিণায়ন কালে বৃদ্ধি পায়। ধ্রুব দ্বারা গৃহীত রশ্মিদুটি সূর্যকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের টানে সূর্য তাদের মাঝখানে মণ্ডলক্রমে ভ্রমণ করতে থাকে। রশ্মিদুটি যতক্ষণ পর্যন্ত ধ্রুব দ্বারা মুক্ত না হয় ততক্ষণ সূর্যকে দুই কাষ্ঠার মাঝখানে পরিভ্রমণ করে যেতে হয়। এইভাবে সূর্য আশিশত মণ্ডল ভ্রমণ করে ফেলেন, তারপর বাইরের দিকের মণ্ডল বেষ্টন করে তির বেগে ভ্রমণ করতে থাকেন।

.

৪৬.

পূর্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধরে সূত্র বলতে লাগলেন, এই অনিন্দ্যসুন্দর সূর্যরথে সূর্যদেব একা নন, আদিত্য দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, গ্রামমীন, সর্প ও রাক্ষস–সকলেই অধিষ্ঠিত আছে। ধাতা ও অর্যমা, পুলস্ত্য ও পুলই প্রজাপতি, বাসুকি ও সংকীর্ণার নামে দুই সর্প, গায়কশ্রেষ্ঠ তুমুর ও নারদ, ক্রতুস্বলা ও পুঞ্জিকস্বলা নামে দুই অপ্সরা, রথকৃচ্ছ ও তপোর্য নামে দুই যক্ষলতা, হোত ও প্রহেতি নামে দুই রাক্ষস এবং পূর্বোক্ত আদিত্য দেবতা প্রভৃতি সপ্তগণ চৈত্র ও বৈশাখ মাসব্যাপী সূর্যমণ্ডলে পর্যায়ক্রমে অবস্থান করেন। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে মিত্র ও বরুণ নামে দুই দেবতা সূর্যমণ্ডলে বাস করেন। এছাড়া অত্রি ও বশিষ্ট এই দুই ঋষি, তক্ষক ও রম্ভ নামে দুই সর্প, মেনকা ও সহজন্যা নামে দুই অপ্সরা, হাহা ও হুহু এই দুই গন্ধর্ব, রথস্বন ও রথচিত্র নামে দুই যক্ষ, পৌরুষেয় ও ধব নামে দুই রাক্ষস সমস্ত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস ধরে সূর্যমণ্ডলে অধিষ্ঠান করে থাকেন, শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে যথাক্রমে ইন্দ্র ও বিবস্বান দেবতা, অঙ্গিরা ও ভৃগু ঋষি, এলার্ন ও শঙ্খপাল নামে সর্প, বিশ্বাবসু ও উগ্রসেন নামে দুই গন্ধর্ব প্রতি ও তরুণ নামক যক্ষ, প্রশ্লেচা ও নিম্লেচা নাম্নী দুই তাপরূপা অপ্সরা, সর্প ব্যাঘ্র ও শ্বেত নিশাচর এবং আদিত্য দেবাদি সপ্তগণ সূর্যদয়ে সাড়ম্বরে অবস্থান করে থাকেন। আশ্বিন ও কার্তিক মাসে সূর্যরথে অধিষ্ঠান করেন। ভরদ্বাজ ও গৌতম ঋষি, বিশ্বাবসু ও সুরভি গন্ধর্ব, সুষেন যক্ষ, আপ ও বলাত রাক্ষস, সেনানী সেনজিৎ ঐরাবত ও ধনঞ্জয় নামক সর্প, সুন্দরী শ্রেষ্ঠা বিল্বাচী ও ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরা এবং লোকবলিত পর্জন্য ও পুষা দেবতা। হেমন্ত ঋতু এলে সূর্যমণ্ডলে বাস করতে আসেন অংশ ও ভগ নামে দুই দেবতা, ঋষিবর কশ্যপ ও ঋতু, মহাপদ্ম ও কর্কোটক নামে দুই সর্প, চিত্রসেন ও ঊর্ণায়ু নামে দুই গন্ধর্ব ঊর্বশী ও বিচিত্তি নামে দুই অপ্সরা, তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি যক্ষ এবং দুই মহাবলবান রাক্ষস বিদ্যুৎ ও ফুর্জ। এরপর আসে শীত ঋতু। যে সময় সূর্য মণ্ডলের অধিকার চলে যায় ত্বষ্টা ও বিষ্ণু নামে ঋদ্ধ দুই দেবতা, জমদগ্নি ও বিশ্বামিত্র নামে দুই ঋষি, কদ্রুপুত্র কম্বল ও অশ্বতর নামক দুই সর্প, তিলোত্তমা ও রম্বা নামে দুই অপ্সরা, ধৃতরাষ্ট্র ও সূর্যবর্চ্চা নামে দুই গন্ধর্ব, ঋতজিৎ ও সত্যজিৎ নামে দুই লোক বিখ্যাত যক্ষ ব্রহ্মোপেত ও যজ্ঞোপেত নামে দুই কৃতবিদ্য, দক্ষ প্রমুখের হাতে। শীতকালে এঁরাই সূর্যরথে অবস্থান করেন।

এই উল্লেখিত বারোটি সপ্তকের মধ্যে যাঁরা স্থানাভিমানী তারা নিজ নিজ তেজে সূর্যদেবের উত্তম তেজের আরো বেশি বৃদ্ধি ঘটান। ঋদ্ধ মুনিগণ প্রসিদ্ধ স্তোত্রের দ্বারা সূর্যের বন্দনা করেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ নৃত্যগীতের দ্বারা সূর্যের উপাসনা করেন। যক্ষ্য ও ভূতবৃন্দ সূর্যরথের রশ্মি যোজনা করেন। সর্পগণ সূর্যদেবকে বহন করেন, রাক্ষসগণ তাকে অনুগমন

করেন, বালখিল্যগণ উদয়াবধি সূর্যের পরিচর্য্যা করে তারপর তাকে সসম্মানে অস্তাচলে নিয়ে যায়।

এইভাবে উপাসক দেবতারা যার যেমন সাধ্য–যেমন–বীর্যধারী তপস্যা, যোগবল, সত্য, ধর্ম ও বল, তিনি তদনুসারে সূর্যদেবের সেবা করেন। পরিবর্তে সূর্যদেবও তাদের প্রদত্ত সেই সেই বীর্যাদি দ্বারা পুষ্ট হয়ে সমধিক তাপ প্রদান করেন। দেবতা, অপ্সরা, যক্ষ, গন্ধর্ব, ঋষি, সর্প ও রাক্ষসগণ–এঁরা প্রত্যেকেই একাদিক্রমে দুই দুই মাস কালব্যাপী সূর্যমণ্ডলে অবস্থান করেন। ক্ষমতা অনুযায়ী তাপ দেন, বর্ষণ করেন, আলো দেন, প্রবাহিত হন ও সৃষ্টি করেন। কথিত আছে, এঁরা প্রাণীকুলকে অশুভকর্ম হতে বিদূরিত করেন। এঁরা দুরাত্মা মানুষদের মঙ্গল হতে দেন না। অবশ্য কোথাও কোথাও সাধু সজ্জন ব্যক্তিদের অমঙ্গলও হরণ করেন। এঁরা যথেচ্ছগামী, দিব্য বিমানে চড়ে যখন যেখানে খুশি যেতে পারেন। এঁদের গতি পবন গতিতুল্য। এঁরা প্রতিদিন সূর্যদেবের সাথে নির্দিষ্ট দূরত্ব ভ্রমণ করেন। এঁরা মন্বন্তর না আসা পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীদের সকল প্রকার দুর্যোগ হতে রক্ষা করেন। এবং এই অন্তর্বর্তী সময়ে কাম্য বর্ষণ ও তাপ দিয়ে প্রজাবৃন্দের মনে আনন্দ প্রদান করেন। এঁরা স্থানাভিমানী, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ–এই ত্রিকালের বিভিন্ন মন্বন্তরে এঁরা সেই পূর্ব নির্ধারিত স্থানেই অবস্থান করেন। এইভাবে ওই সপ্তকবৃন্দ চোদ্দটি মন্বন্তরেই সূর্যকে আবেষ্টন করে বাস করে থাকেন।

কালের গতি ও ঋতুভেদে সূর্যরশ্মির পরিবর্তন ঘটে থাকে। গ্রীষ্ম, বর্ষা বা হিমকালে যথাক্রমে উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত ও শীতলতা প্রদান করে ভগবান সূর্যদেব মনুষ্যগণ, দেবগণ ও পিতৃগণের তৃপ্তি বিধান করে থাকেন। এইভাবে সূর্যদেব একদিকে যেমন অমৃতের দ্বারা দেবতাদের প্রীত করেন, তেমনি শুক্লপক্ষে সুষুম্ন রশ্মি দিয়ে প্রতিদিন চন্দ্রকে বর্ধিত করেন। কৃষ্ণপক্ষে দেবতাগণ সেই সোমরস আকণ্ঠ পান করেন। দেবতাদের দ্বারা এইভাবে প্রীত হবার ফলে কৃষ্ণপক্ষ ক্রমশ ক্ষয় পেতে থাকে। শেষে চন্দ্রের মাত্র দুটি কলা অবশিষ্ট থাকে। চন্দ্র সেই অবশিষ্ট দুই কলার রশ্মিসমূহের দ্বারাই ক্ষরিত হতে থাকলে পিতৃগণ সেই সুধাময় চন্দ্রকে পান করতে শুরু করেন। দেবতাগণ ও সৌম্যরাও সেই একইভাবে কব্য পান করে থাকেন।

সূর্যদেব তাঁর প্রখর রশ্মি সমূহের সাহায্যে মহীর জল আহরণ করে আবার তা পৃথিবীতে বর্ষণ করেন এবং পৃথিবী প্লাবিত হয়। এর ফলে ওষধির বৃদ্ধি ঘটে। মর্তবাসী প্রজাগণ অন্নাদি ভক্ষণ করে নিজেদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে থাকেন, প্রাচীন পন্ডিতগণের হিসাব অনুযায়ী দেবতাগণ অমৃত পানের মাধ্যমে এক পক্ষ, পিতৃগণ স্বধাপানের মাধ্যমে এক মাস এবং মনুষগণ অন্নভোজনে সবসময় বিপুল তৃপ্তি লাভ করে থাকেন। এইভাবে একচক্র রথে চড়ে সূর্যদেব

নিয়ত অতিবেগে ভ্রমণ করতে থাকেন। সাতটি ভদ্র অক্ষত অশ্বকে নিজের দিব্য রথযানে রোজিত করে দিনরাত সাগরান্ত, সপ্তদ্বীপ তিনি ভ্রমণ করতে থাকেন। সূর্যদেবের রথচক্রের সামনে গায়ত্রী প্রভৃতি সপ্ত চন্দ্রই অবিনাশী হরিবর্ণ সপ্ত অশ্ব রূপে বিরাজ করে। এরা মাত্র একবারই রথে যযাজিত হয়। এরা ইচ্ছা মতন বিবিধ রূপ ধারণ করতে পারে। এরা অমিত, এরা মনের গতির চেয়েও দ্রুতগতি সম্পন্ন। এরা অব্যয় এবং ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী। এই সপ্ত অশ্ব প্রতিদিন, আশিশত মণ্ডল বিস্তৃত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করতে পারে, এই সপ্তাশ্ব কল্পের আদিতে রথে যোজিত হয়েছিল। তারপর থেকে দিনরাত তারা সূর্যমণ্ডলের বাইরে ও ভেতরে সূর্যদেরকে বহন করে চলেছে। প্রলয়কাল না-আসা পর্যন্ত তারা এই কাজই করতে থাকবে। এই প্রলয়কাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মহর্ষিগণ প্রসিদ্ধ ও মনোহর বচনে সূর্যদেবের স্তব করে যাবেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরারা নৃত্যনাট্য গীতে তাঁর সেবা করবেন। আর দীননাথ ভগবান সূর্য, এইসব ভ্রাম্যমান অজেয় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে ভ্রমণ করে যাবেন, এসবই বিধি নির্দিষ্ট।

সূর্যদেবের মতো একই ভাবে নক্ষত্র ও চন্দ্রও এক একটি নির্দিষ্ট কক্ষকে আশ্রয় করে ভ্রমণ করতে থাকেন। সূর্যরশ্মির মতো চন্দ্রকিরণেরও অবস্থাভেদে ক্রমান্বয়ে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। চন্দ্রের রথ অশ্ব ও সারথি সহ জলগর্ভ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। চন্দ্ররথের উভয় পাশে তিনটি করে চক্র ও একশত করে অর আছে। চন্দ্ররথের অশ্বগুলি শুক্ল বর্ণ বিশিষ্ট ও অতি উত্তম। এই অশ্বগুলিও সূর্যরথের অশ্বের মতো মনের গতির চেয়ে দ্রুতগতিময়। চন্দ্ররথের অশ্বগুলিও মাত্র একবার করেই তার রথের সঙ্গে যোজিত হয়। এইভাবে এক এক করে দশটি কৃশ অশ্ব যুগান্ত পর্যন্ত চন্দ্রকে বহন করে যাবে। চন্দ্রের রথে যোজিত সকল অশ্বই শ্বেতাভ ও শঙ্খের মতো দীপ্তিমান। এরা চক্ষুঃশ্রবা অর্থাৎ এরা চোখের সাহায্যে শোনে। ক্রমান্বয়ে যোজিত চন্দ্রের দশটি অশ্বের নাম হল–যযু, ত্রিমনু, বৃষ, রাজী, বল, বাম, তুরণ্য, হংস ব্যোমী ও মৃগ। স্বর্গলোকে এরাই চন্দ্রনাথকে দিনরাত বহন করে চলেছে। ভ্রমণকালে চন্দ্রদেব দেবগণও পিতৃগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকেন।

শুক্লপক্ষের শুরু থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন সূর্যদেব সামনের দিক থেকে চন্দ্রকে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ করে ফেলেন। আবার কৃষ্ণপক্ষে দেবতারা যখন চন্দ্রকে পান করতে থাকেন, যখন চন্দ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে, তখন সূর্যদেব সেই ক্ষয়মান চন্দ্রের বৃদ্ধি ঘটান। সূর্যদেব সুষুম্ন নামক একটি রশ্মি দিয়ে প্রতিদিন এক এক ভাগে চন্দ্রকে পূর্ণ করেন। এইভাবে পূর্ণ হতে হতে পনেরো দিনের দিন চন্দ্রের সকল কলা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সূর্য হতে নির্গত এই সুষুম্না রশ্মির দ্বারা শুধু যে চন্দ্রের কলাগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাই নয়, চন্দ্রের শুক্লকগুলিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইভাবে

কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের হ্রাস ও শুক্লপক্ষে চন্দ্রের বৃদ্ধি ঘটে থাকে। সেই কারণেই প্রতি পূর্ণিমাতে চন্দ্রকে শুক্লবর্ণ ও পূর্ণমণ্ডল বলে মনে হয়। অর্থাৎ রসসারময় চন্দ্রদেব প্রতি শুক্লপক্ষে বর্ধিত হয়ে থাকে। তারপর কৃষ্ণপক্ষের আগমনে দেবতারা সেই শুধাময় জলময় চন্দ্রকে পান করতে থাকে। দ্বিতীয় থেকে চতুর্দশী পর্যন্ত এই পানপর্ব অব্যাহত থাকে। বাকি অর্ধমাসে চন্দ্রদেব আবার সূর্যতেজে অমৃতময় হয়ে ওঠেন। তখন সেই অমৃতরস পান করার জন্য সকল দেবগণ, পিতৃগণ ও মহর্ষিগণ পূর্ণিমা রাতে পরম নিষ্ঠা সহকারে তার উপাসনা করতে থাকেন। কৃষ্ণপক্ষের প্রারম্ভে সূর্যদেবের সামনেই দেবগণ ও মহর্ষিগণ চন্দ্রের কলা পান করতে থাকায় সেই অমৃতময় চন্দ্রের সমস্ত কলা ক্রমশ ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে। অবশ্য শুক্লপক্ষে আসার পর তা আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইভাবে প্রতিবার অর্ধমাস ধরে চন্দ্রসুধা পান করতে করতে দেবগণ অমবস্যায় উপনীত হন। তারপর যখন চন্দ্রকলার মাত্র পনেরো ভাগ অবশিষ্ট থাকে তখন সেই অপরাহ্নেই সেই অবশিষ্ট চন্দ্রসুধা পান করার জন্য দেবগণ চন্দ্রদেবের উপাসনা আরম্ভ করে দেন। দেবতাদের পান করার পর অবশিষ্ট মাত্র দুটি চন্দ্রকলা থেকেই অবিশ্রান্ত কিরণরাশির মধ্যে দিয়ে সেই ঘোর অমাবস্যায় চন্দ্রসুধামৃত নিঃসৃত হতে থাকে। পিতৃগণ একমাস কাল ধরে তা পান করে দেহ-মনে হৃষ্ট হন। সেইসব সুধীভোগী সৌম্য, বর্হিষদ, অগ্নিদ্বত্তা ও কব্য নামে প্রসিদ্ধ।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, পিতৃসৃষ্টিতে যা সংবৎসর কব্য নামে পরিচিত, পণ্ডিতগণ তাকেই পঞ্চাব্দ বলে অভিহিত করে থাকেন। যা সৌম্য ঋতু তাকেই দ্বিজগণ বহিষদ মাস ও অগ্নিদ্বারী ঋতু বলে থাকেন।

পঞ্চদশী তিথি না-আসা পর্যন্ত সুধাময় চন্দ্র পিতৃগণের দ্বারা একনাগাড়ে পীত হতে থাকেন। পঞ্চদশী তিথিতে চাঁদের ক্ষয় সম্পূর্ণ হয়। ওই সময় পর্যন্ত অমাবস্যা চলে। তারপরেই আবার তা পূর্ণ হতে আরম্ভ করে। এইভাবে প্রতি ষোড়শ দিনে পক্ষ আরম্ভের পূর্বে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। প্রধানত সূর্যের কারণেই তার অর্থাৎ চন্দ্রের এই হ্রাস-বৃদ্ধি।

এবার আমি আকাশমার্গে স্থিত তারা, রাহু ও অন্যান্য গ্রহরাজির রথসমূহের বিষয় বর্ণনা করছি।

সোমগ্রহের অত্যন্ত শ্রীযুক্ত কাঞ্চনময় একটি রথ আছে। রথটি আটটি অশ্বযুক্ত। এই অষ্ট অশ্বগুলি নিতান্তই নিঃসঙ্গ, সর্বত্রগামী, অগ্নিসম্ভূত এবং লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট। এই সুবর্ণযুক্ত রথ

সকল ও বক্র চক্রশালী। শ্রীমান কুমার সোম এই রথে আরোহণ করে সরল ও বক্রপথে ভ্রমণ করেন।

সোমপুত্র বুধ গ্রহের রথ শুভ্রকান্তি বিশিষ্ট অত্যন্ত তেজোময় এবং জলময়। এতে বিশঙ্গ বর্ণের আটটি অশ্ব নিয়োজিত আছে। অশ্বগুলি বায়ুগতি সম্পন্ন। বুধ রথটি সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত এবং এতে বাণাধরা, পতাকা ও ধ্বজা আছে। সর্বোপরি এই রথটির চালকের সামনে এক দিব্যকান্তি সুমহান সারথি বিরাজমান।

শুক্রগ্রহের রথে শ্রীময়তায় ও তেজে সূর্য রথের সঙ্গে তুলনীয়। শ্বেত, পিশঙ্গ, সারঙ্গ, নীল, পীত, লোহিত, কৃষ্ণ, হরিৎ, পৃষত ও পৃষিও নামে দশটি অকৃশ অশ্ব শুক্ররথে যোজিত আছে। এইসব অশ্ব মহাবাগ এবং বায়ুগতিসম্পন্ন।

অঙ্গিরাসূত শ্রীমান বিদ্বান বৃহস্পতি যে রথে চড়ে চতুর্দিক পরিভ্রমণ করেন, সেই রথটিও সুবর্ণময়। এতে আটটি দিব্য রক্তবর্ণ অশ্ব নিয়োজিত আছে। অশ্বগুলির গতি বায়ুগতিসম্পন্ন। বৃহস্পতি দেব আচার্য। তিনি এক বছর পর্যন্ত সর্বাধিক একটি নক্ষত্রে বাস করেন। তারপর তিনি অন্য গ্রহের উদ্দেশ্যে বায়ুবেগে চলতে থাকেন। এর ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটতে দেখা যায় শনৈশ্চর গ্রহের ক্ষেত্রে। শনৈশ্চর গ্রহটি বিচিত্রবর্ণ বিশিষ্ট। আকাশ সম্ভূত অশ্ব নিয়োজিত একটি লৌহনির্মিত রথে চড়ে ধীর গতিতে শনি গ্রহ চলতে থাকেন।

স্বর্ভানু রাহুর রথ মনের মতো গতিসম্পন্ন। আটটি কৃষ্ণবর্ণের অশ্ব রাহুর রথে নিয়োজিত আছে। এরা একবার যোজিত হয়ে রাহু গ্রহের তমোময় রথ প্রলয়কাল পর্যন্ত বহন করে চলে। আদিত্য থেকে নির্গত হবার পর রাহু চন্দ্রের বিভিন্ন পর্বে প্রবেশ করে থাকেন, তারপর চন্দ্র থেকে আবার বিভিন্ন পর্বের মাধ্যমে সূর্যের কাছে ফিরে ফিরে আসে। রাহুর মতো কেতুর রথের অশ্ব সংখ্যাও আট। তবে এরা বায়ুর মতো বেগযুক্ত। এদের দেহের বর্ণ একইসঙ্গে ধূমের মতো ধূসর ও গদর্ভের মতো অরুণ বর্ণের হয়ে থাকে।

হে অসীম জ্ঞানধিকারী ব্রাহ্মণগণ, এ যাবৎ আমি যত গ্রহ ও তাদের রথারে কথা বললাম, সেইসব রথাশ্বগুলি বায়ুরশ্মি যারা ধ্রুব নক্ষত্রে নিবদ্ধ হয়ে আছে। এইসব বায়ুরশ্মি অদৃশ্য অবস্থায় থাকে। তবু তাদের প্রবল আকর্ষণে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় এইসব গ্রহাদি যথানিদিষ্ট পথে ভ্রমণ করে যেতে থাকে। এইভাবে পারস্পরিক আকর্ষণে বায়ুরজ্জবদ্ধ অবস্থায় সূর্য, চন্দ্র, গ্রহাদি, তারকাপুঞ্জ সকলেই ভ্রমণরত অবস্থায় ধ্রুব নক্ষত্রে নিবদ্ধ হয়ে আকাশমার্গ ভ্রমণ করছে।

নদীর জলে ভাসমান নৌকাকে, তা সে যত বড়োই হোক, নদীর জল বহন করে নিয়ে যায়। ঠিক তেমনি ভাবে আকাশমার্গস্থিত দেবালয়গুলিকে বায়ুরজ্জু বহন করে নিয়ে যায়। এই জন্য আকাশে দেবতাদের দেখা যায়। এই আলোচনা প্রসঙ্গে হে দ্বিজবৃন্দ, আপনাদের জানিয়ে রাখছি আকাশলোকে যতগুলো তারা আছে, ততগুলো বায়ুরজ্জুও আছে। তারকাগুলি ধ্রুব নক্ষত্রে নিবদ্ধ থেকে ভ্রমণ করতে করতে ধ্রুব নক্ষত্রকেও ভ্রমণ করায়। বলতে পারেন, তৈলপেষক যন্ত্র যেমন দণ্ড প্রকৃতিকে ভ্রমণ করায়, তেমনি বায়ুও জ্যোতিষ্ক মণ্ডলকে ভ্রমণ করায়। বায়ু জ্যোষ্কি মণ্ডলকে বহন করে, তাই বায়ুর নাম প্রবহ। বায়ু দ্বারা চালিত হয়ে এই মণ্ডল অলাত চক্রের মতো আচরণ করে। শুধু ধ্রুব নক্ষত্র মন্ডলই নয়, তারাময় শিশুমার নক্ষত্রও আকাশমার্গে স্থির হয়ে থাকে। এই জ্যোতিষ্ক অত্যন্ত পুন্যপদ। রাত্রিকালে একে দর্শন করলে দিনের সমস্ত পাপ মুক্ত হওয়া যায়। এবং আকাশলোকে যতগুলো তারা শিশুমারের আশ্রিত ততবর্ষকাল দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়। শিশুমার শাশ্বত। তাকে বিভিন্ন রূপে জানতে হলে গভীর মনোনিবেশের প্রয়োজন। উত্তানপাদ-এর উত্তর হনু, ধর্ম এর মস্তক এবং যজ্ঞ এর অধর। এর হৃদয়ে দেবদেব নারায়ণ এবং পূর্ব-পাদদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ে বিরাজ করছেন। বরুণ ও অর্যমা এর পশ্চিম উরুদেশ, সাংবৎসর-এর জননেন্দ্রিয় এবং মিত্র এর আপন আশ্রয় করে আছে। এর পুচ্ছদেশে অবস্থান করছেন অগ্নি ও মহেন্দ্র। আকাশলোকে বিরাজমান চারটি তারা–শিশুমার, কশ্যপ, মরীচি ও ধ্রুব, এরা কখনও অস্ত যায় না।

এই জটিল আলোচনার সারসূত্র হিসেবে আমি বলতে পারি, নক্ষত্ররাজি বা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহগণ– যাই-ই হোক, এরা সকলেই একটি চন্দ্রকে আশ্রয় করে ঘূর্ণনরত উন্মুখ এবং পরস্পর পরস্পরের অভিমুখে অবস্থিত। ধ্রুব, কশ্যপ ও অগ্নি এই তিন তারকার মধ্যে আবার ধ্রুব শ্রেষ্ঠ। এই ধ্রুব নক্ষত্র একাই মেরু পর্বতের শীর্ষে ভ্রমণ করতে দেখা যায়। অন্যান্য ভ্রাম্যমাণ গ্রহ-তারকাদি সকলেই শ্রেষ্ঠ মেধীভূত ধ্রুবকে অনেক সময়ই আকাশপথে প্রদক্ষিণ করে থাকে। এই ধ্রুব নিম্নমুখ অবস্থায় জ্যোতিশ্চক্রকে সদা সর্বদা আকর্ষণ করতে করতে মেরুকে আলোকিত ও প্রদক্ষিণ করে থাকে।

.

৪৭.

শংশাপায়ন বললেন–এত পর্যন্ত শ্রবণ করে পুণ্যব্রতা মুনিগণের হৃদয়ে সংশয়ান্বিত হয়ে উঠল। তারা আবার লোমহর্ষণ সূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, আপনি যে সমস্ত নক্ষত্র ও গ্রহের কথা বললেন, যে সবই প্রসিদ্ধ তখন আপনি দেবগৃহ কীরকম, জ্যোতিষমণ্ডলই বা কীরকম– এইসব বিষয়ে বিস্তারিত বলুন।

মুনিবরদের আগ্রহী, বাক্য শুনে সূত প্রীত হলেন। তিনি বললেন, এ বিষয়ে মহাপ্রাজ্ঞ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যাক্তিরা যেমন বলেছেন, আমি আপনাদের কাছে সেই ভাবেই সব কথা ব্যক্ত করব। প্রথমেই আমি দেবগণ ও চন্দ্র ও সূর্যের গৃহ কেমন তা বর্ণনা করব। দিব্য, ভৌতিক ও পার্থিব এই তিন রকম অগ্নির উৎপত্তি বিষয়েও বলব। আপনারা শ্রবণ করুন।

অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার রজনী অতিক্রান্ত হয়ে প্রভাত হলেও এই বিশ্বচরাচর নৈশ অন্ধকারে আবৃত ও অব্যাকৃত ছিল। এই বিশ্বচরাচরের চতুর্ভূত অবস্থায় যে অগ্নি বিরাজ করে, তাকে পার্থিব অগ্নি বলে। আদিকাল থেকে এই অগ্নিই সূর্যকে তাপ প্রদান করে। সূর্যকে তাপ দানকারী এই অগ্নি শুদ্ধ। এর নাম বৈদ্যুত। বৈদ্যুত অগ্নির কিছু কিছু নিজস্ব লক্ষণ আছে। এই বৈদ্যুত অগ্নি তিন প্রকার বৈদ্যুত, সৌর, সূর্য। বৈদ্যুত অগ্নিময়। এই অগ্নিজাত কিরণের সাহায্যেই সূর্য ভূ-পৃষ্ঠ থেকে জল আকর্ষণ করে আকাশে দীপ্ত হতে থাকে। জলে একে নির্বাপিত করতে পারে না। মানুষের কুক্ষিস্থ অগ্নি হল জাঠরাগ্নি। অগ্নি মণ্ডালাকার শুক্ল বর্ণযুক্ত ও নিরুষ্মা। অগ্নিতে প্রকাশিত অগ্নি হল সৌর। রাত্রিবেলা সূর্য অস্ত গেলে সূর্যপ্রভা অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করে। তাই তখন সৌরদ্যুতি দূর থেকে প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে সূর্যের উদয় হয়, সেই মুহূর্তে আগ্নেয় উষ্ণতা আবার সূর্যের মধ্যে প্রবেশ করে। সেইজন্যই দিনেরবেলা সূর্য তাপ দান করে থাকে।

সৌর আগ্নেয় অবস্থায় প্রকাশ ও উষ্ণতা নামক অগ্নির যে তেজ, সেই দুই তেজ পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করে সকাল-সন্ধে নিজেদের বর্ধিত করে চলেছে। পৃথিবীর উত্তরার্ধ ও দক্ষিণার্ধ, যেখানে যে সময়ে সূর্যোদয় হয়, সেখানে তখন রাত্রি জলমধ্যে প্রবেশ করে সেইজন্যই সব জায়গায় জল দিনমানে তাম্রবর্ণ হয়। তারপর আবার সূর্যাস্ত হয়, তখন দিন জলে প্রবেশ করে। তাই রাত্রিকালে জল ভাস্বর ও শুক্লবর্ণ হয়ে ওঠে। এইভাবে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাবার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে দিন ও রাত্রি জলমধ্যে প্রবেশ করতে থাকে।

উদিত সূর্য যখন তাপের বিচ্ছুরণ ঘটায় তখন পবিত্র পার্থিব অগ্নি কিরণের সাহায্যে জল পান করতে থাকে। এই অগ্নি কুম্ভকার। ওই অগ্নির নাম সহস্রপদ। কারণ ওই পবিত্র পার্থিব অগ্নি সহস্রপাদ অর্থাৎ কিরণের সাহায্যে চারিদিকের সাগর, নদী, কূপ, মরু, স্থাবর ও জঙ্গম প্রভৃতি সকল বস্তুর রস আকর্ষণ করে। আবার যে সূর্য হিরন্ময় সেই সূর্য সহস্র-রশ্মিচ্ছটা বর্ষা, শীত ও উষ্ণতা সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে নাড়ী, নূতনা, অমৃতা, বন্দনা, চিত্রমূর্তি, বন্দি ঋতনা প্রভৃতি নামে চারশো সংখ্যক রশ্মি অবিরাম বৃষ্টিবর্ষণ করে। এছাড়া চন্দ্রা নামে তিনশত পীতবর্ণময়, হিমবাহ রশ্মি আছে এইসব রশ্মি থেকে হিম অর্থাৎ শীতলতার সৃষ্টি হয়। আছে শুক্ল নামে তিনশত সংখ্যক আহ্লাদজনক শুক্লবর্ণ বিশিষ্ট রশ্মিগুচ্ছ। এই শুক্লরশ্মিগুলি উষ্ণতা সৃষ্টি করে এবং মনুষ্য পিতৃ ও দেবগণকে পালন করে, তবে যে-কোনো ধরনের রশ্মিই হোক না কেন, সূর্যরশ্মি মাত্রেই মনুষ্যগণ, পিতৃগণ ও দেবগণকে ঔষধ, স্বধা, ও অমৃত দান করে তৃপ্ত করে। এর প্রভাবে তারা বল লাভ করে থাকেন। এইভাবে অগ্নিময় সূর্যের সহস্র সহস্র রশ্মি লোকার্থ সাধকরূপে বিভিন্ন ঋতুতে জল, হিম ও উষ্ণতা দান করে থাকে। তবে ঋতুভেদে সূর্যের অগ্নিপ্রদায়ী রশ্মি সংখ্যার হেরফের ঘটে থাকে। যেমন–বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে সূর্য তার তিনশত সংখক রশ্মির সাহায্যে উত্তাপ দান করে, বর্ষাকালে ও শরৎকালে চারিশত রশ্মি দ্বারা বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং হেমন্তকালে ও শীতকালে পুনরায় ওই তিনশত সংখ্যক রশ্মির সাহায্যে হিম দান করে থাকেন।

এই যে শুক্ল ভাস্কর সূর্যমণ্ডল, ইহাই গ্রহ, নক্ষত্র ও চন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রেও উৎসস্থল স্বরূপ। চন্দ্র হলেন নক্ষত্রদের অধিপতি। এইসব নক্ষত্র, গ্রহ ও চন্দ্র চন্দ্র থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। একইভাবে সূর্য হলেন গ্রহদের অধিপতি। এর বাইরে অবশিষ্ট পঞ্চগ্রহ ঈশ্বর ও কামরূপী বলে বিখ্যাত। সূর্য যেমন অগ্নিময়, চন্দ্রও তেমনি জলময় রূপে কীর্তিত হন।

এবার আমি অপরাপর গ্রহদের বিষয়ে বলিছ, শ্রবণ করুন।

ভগবান নারায়ণ জ্ঞানীদের কাছে বুধ গ্রহ বলে বন্দিত হন। পৃথিবীতে বিরাজিত স্বয়ং প্রভু স্বরূপ যে রুদ্র দেবতা, তিনি মন্দগামী মহাগ্রহ শনৈশ্চর নামে খ্যাত। দেবসেনাপতি মহেশপুত্র কার্তিক হলেন মঙ্গলগ্রহ। দেবগুরু বৃহস্পতি ও অসুরগুরু শুক্রাচার্য–এঁরা দুজনেই প্রজাপতির পুত্র। এঁরাও ভানুমান নামে দুই মহাগ্রহ হয়ে আছেন। দৈত্য ও মহেন্দ্র–এই দুজনের ওপর এঁদের আধিপত্য সন্দেহাতীত, আদিত্য যে এই ত্রিভুবনের মূল এ বিষয়ে কারো মনেই কোনো সন্দেহ নেই।

হে বিপ্রেন্দ্রবৃন্দ! রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র চন্দ্র, বিপেন্দ্র এবং অন্যান্য যে সব দ্যুতিমান স্বর্গবাসী দেবতারা আছেন, তাঁদের সকলের সার্বলৌকিক তেজ ও দ্যুতির মূল কারণ হলেন সর্বাত্মা, সর্বলোকেশ ও পরমদৈবত সূর্য। এই জগতে প্রকাশ পাচ্ছে এমন সবকিছুই সূর্য থেকেই জন্মাচ্ছে এবং সূর্যের মধ্যেই লয় পাচ্ছে। পুরাকালেও লোকসমূহের ভাব ও অভাব–দুইই আদিত্য থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। আসলে সূর্য একটি প্রখর দীপ্তিসম্পন্ন ভুবনবিখ্যাত সুগ্রহ। তাই সবকিছুই তার মধ্যে লয় পেয়েও বারে বারে জন্মগ্রহণ করে। ক্ষণ, মুহূর্ত, দিবস, নিশা, পক্ষ, মাস, সংবৎসর, ঋতু, যুগ এই যেসব কালের নির্ণয়, এসব সূর্য ছাড়া অসম্ভব। এই বিষয়গুলির ওপর আরও আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্ত রয়েছে। যেমন ঋতু বিভাগ না হলে পুষ্প, ফল, মূল, শস্য, ঔষধি প্রভৃতি কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না। অতএব সেই সূর্য কাল অগ্নি এবং দ্বাদশাত্মা প্রজাপতি। সেই সূর্য একটি সার্বলৌকিক তেজোরশ্মি। যা জগৎ বায়ুকে পাশে, ওপরে ও নীচে থেকে তাপিত করছে।

পূর্বেই আমি আপনাদের কাছে সূর্যের সহস্র রশ্মির কথা বলেছি। এত রশ্মির মধ্যে কেবল সাতটি রশ্মি হল শ্রেষ্ঠ। এই সাতটি রশ্মিই গ্রহাদির উৎস। এই সাতটি রশ্মির নামগুলি হল– সুষুম্ন, হরিকে, বিশ্বকর্মা, বিশ্বশ্রবা, সম্পদবসু, অর্বাবসু ও স্বরাট। এই সাতটি রশ্মি সুনির্দিষ্ট দিক থেকে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট গ্রহকে উত্তপ্ত করে থাকে যথা–সুষুম্ন নামে সূর্যরশ্মি তির্যক ও উর্ধ্বদিক থেকে ক্ষীণ শশীকে বর্ধিত করে তোলে। হরিকেশ নামে সূর্যরশ্মি নক্ষত্রাদির দ্যুতির কারণ। এই রশ্মি নক্ষত্রদের আদি উৎস, বিশ্বকর্মা নামে সূর্যরশ্মি বুধ গ্রহকে দক্ষিণ দিকে বর্ধিত করে। বিশ্বশ্রবা নামক সূর্যরশ্মি শুক্রগ্রহের সকল জ্যোতির উৎস। সম্পদ বসু ও অর্বাবুস নামে সূর্যরশ্মি যথাক্রমে লোহিত গ্রহ ও বৃহস্পতির উৎস। আর স্বরাট নামে সূর্যরশ্মি শনিগ্রহকে আলোকিত করে রেখেছে। এইভাবে সূর্যের সহস্র রশ্মির প্রভাবে গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকরাশি বর্ধিত হচ্ছে। জ্যোতিঃপ্রভা দিক থেকে এরা কেউ ক্ষীণ হয় না, তাই এদের নক্ষত্র বলে। এইসব ক্ষেত্র রশ্মি দ্বারা পূর্বে পতিত হয়। তারপর সূর্য নক্ষত্রত্ব লাভ করলে এইসব ক্ষেত্রকে অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেন।

যারা সুকর্ম দ্বারা উত্তীর্ণ হয়েছেন, তারা সুকর্মের শেষে কোনো একটি গ্রহকে আশ্রয় করে তারকা রূপে বিরাজ করেন। এরা শুক্লবর্ণের বলেই এদের তারকা বলা হয়।

অগ্নির দিব্য, পার্থিব ও ভৌতিক অবস্থা দ্বারা নৈশ তেজ ও অন্ধকার আদান অর্থাৎ গ্রহণ করে বলে সূর্যকে আদিত্য বলা হয়। স্পন্তনার্থক “সু” ধাতু থেকে “সূর্য” শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। তেজ ও জলকে স্পন্দিত করে বলে সূর্যকে “সবিতা”ও বলা হয়ে থাকে। সূর্যের মতো চন্দ্র

শব্দটিরও একাধিক অর্থ আছে। যেসব ধাতু আহ্লাদ, শুক্লত্ব, অমৃতত্ব ও শীতত্ব প্রভৃতি অর্থকে পরিস্ফুট করে, সেইসব ধাতু থেকেই চন্দ্র শব্দটির উৎপত্তি। তবে গোলাকার কুম্ভের মতো আয়তন বিশিষ্ঠ সূর্যমণ্ডল শুক্ল ও ঘনতেজোময় হলেও চন্দ্রমণ্ডল ঘন জলাত্মক। এবং তা সূর্যমণ্ডলের সাথে সন্নিবিষ্ট অবস্থায় থাকে। সমস্ত .. মন্বন্তরেই সকল গ্রহ, নক্ষত্রাদি সেইখানে আশ্রয় নেয়। তাতে দেবগণেরাও প্রবেশ করেন। সেই দেবগণের গৃহ অতিসূক্ষ্ম। সূর্য সৌর স্থান, চন্দ্র চান্দ্র স্থান শুক্র শৌক্র স্থান, ষোলটি দীপ্তির অধিকারী প্রতাপবান বৃহস্পতি বৃহৎ স্থান, মঙ্গল লৌহিত স্থান এবং শনৈশ্চর স্থান অবলম্বন করে থাকেন। এইসব স্থান রবিরশ্মি যোগ প্রকাশ পেয়ে থাকে।

সূর্যমণ্ডলের বিস্তার সাতাশ সহস্র যোজন। এর পরিমাণ নয় সহস্র যোজন। তবে সূর্যের পরিব্যাপ্তি থেকে চন্দ্রের পরিব্যাপ্তি বিষ্কম্ভ দ্বিগুণ বিস্তৃত। চন্দ্র ও সূর্যের আয়তনের সমান হয়ে রাহু তাঁদের নীচে গমন করেন। তারপর পৃথিবীর ছায়ায় সন্নিবিষ্ট অবস্থায় মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করতে থাকেন। রাহুর স্থান বৃহৎ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। রাহুস্থানটি পূর্ণিমায় সূর্য থেকে নির্গত হয়ে চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং প্রতি অমাবস্যায় চন্দ্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে আকাশে স্বয়ং দীপ্তি পায় বলে রাহুর অপর নাম স্বর্ভানু।

ভার্গবের পরিমাণ চন্দ্রের ষোড়শ ভাগ। ভার্গব থেকে বৃহস্পতি একপাদহীন। বৃহস্পতি থেকে মঙ্গল ও শনি একপাদহীন। শনি ও মঙ্গল থেকে বুধ একপাদহীন। যেসব নক্ষত্র কান্তিময় তারা বিস্তার ও মণ্ডলে বুধের সমতুল্য। দেখা গেছে বিস্তার ও মণ্ডলের দিক থেকে মঙ্গল ও শনি থেকে বুধ একপাদহীন। হে দ্বিজোশ্রেষ্ঠগণ, চন্দ্রের সাথে প্রায়শই নক্ষত্রদের যোগ হয়। তারা ও নক্ষত্ররা পরস্পর পরস্পর থেকে হীন এবং এদের মণ্ডল পরিমাণ চোদ্দো যোজনের অধিক। এখানে অর্ধমণ্ডলের কম পরিমাণ মণ্ডল নেই; এর একটি থেকে অপরটি আরও নিকৃষ্ট। এদের ওপরে আছে সৌর, অঙ্গিরা ও বক্র নামে তিনটি গ্রহ। এই তিনটি হল ধীরগামী গ্রহ। এদের নীচে আছে সূর্য, সোম, বুধ ও ভার্গব নামে চারটি মহাগ্রহ। এই চারটি মহাগ্রহ অতীব দ্রুতগামী। পণ্ডিতগণ হিসেব করে দেখেছেন আকাশমণ্ডলে যত কোটি তারা আছে তত কোটি নক্ষত্র আছে। নক্ষত্রগুলির পরিক্রমণপথ শ্রেণীবিভাগ অনুসারে বিন্যস্ত। এই নক্ষত্রদের পরিক্রমণ পথে উচ্চ ও নীচ ভাবে অয়নানুসারে সূর্যের গমন ঘটে থাকে। পূর্ণিমা দিবসে চন্দ্র উত্তরায়ণ মার্গে থাকলে বুধগ্রহ বৌধ স্থানে রাহু রাহু স্থানে এবং নক্ষত্রনিচয় নক্ষত্র স্থানে প্রবেশ করে।

কল্পের আদিকালে স্বয়ম্ভু স্বয়ং গ্রহনক্ষত্রাদি সৃষ্টি করেছিলেন। এইসব গ্রহ নক্ষত্রনিচয়ের স্থানসমূহ প্রলয় পর্যন্ত একইভাবে অবস্থান করবে। এইসব স্থান অতীতের সাথে অতীত হয়েছে। ভবিষ্যতের সাথে ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সাথে বর্তমান হয়ে আছে। একথা নির্দিষ্ট হয়ে আছে যে বৈবস্বত মন্বন্তরে অদিতির পুত্র বিবস্বান সূর্য হবেন, দ্যুতিমান ধর্মপুত্র সোমদেব হবেন বসু, ভৃগুসূত শুক্রাচার্য হবেন দেবাচার্য এবং মনোহর ত্বিষিপুত্র হবেন বুধ। কিন্তু বিকল্প থেকে অগ্নির জন্ম হলো। তিনি লোহিতাপতি– যুবা রূপে জন্ম নিলেন। দক্ষায়ণগণ হলেন নক্ষত্রগামী। সিংহীকাপুত্র রাহু হলেন প্রাণিসন্তাপক অসুর। এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব স্থানের কথা বলা হল চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র হলেন সেইসব স্থানের অভিমানিনী দেবতা।

সহস্ররশ্মিময় সূর্যের জলময় স্থানও অগ্নিময় স্থান দুইটি শুক্রবর্ণের। মনোহর পঞ্চরশ্মির স্থান শ্যামবর্ণের। ষোড়শ রশ্মিময় শুক্রের স্থান জলময়। দ্বাদশ রশ্মিময় বৃহস্পতির স্থান বৃহৎ আকার ও হরিৎ বর্ণ বিশিষ্ট। নররশ্মিময় মঙ্গলের স্থান জলময় ও লোহিত বর্ণ। অশ্ব রশ্মিময় বুধের স্থান জলময় ও কৃষ্ণবর্ণ। একরশ্মি বিশিষ্ট তারকারাশির স্থান জলময়। সে প্রাণিদের তাপ প্রদান করে। আর সবশেষে রাহুর জলময় স্থান। এরা সকলেই পুণ্যশ্লোকের আশ্রয়স্থল। এদের সকলের বর্ণ শুক্ল। কল্পরম্ভ কালেই বিধাতা পুরুষ এদের নির্মাণ করেছেন।

উচ্চতাবশত সূর্যকে এই পৃথিবীলোক থেকে অতিব্যক্ত কিরণমালার মতো দেখায়। কিন্তু পূর্ণিমা বা অমাবস্যার দিনে সূর্য যদি দক্ষিণমার্গে অবস্থান করেন এবং ভূমিরেখায় আবৃত হয় তাহলে তাকে আর যথাকালে যথাস্থানে দেখা যায় না, সূর্য তখন অতি শীঘ্র অস্তমিত হন। একই নিয়মে চন্দ্র যখন উত্তরমার্গে অবস্থান করেন তখন সেই অমাবস্যায় চন্দ্রকে যথাস্থানে দেখা যায় না। নক্ষত্রসমূহের গতির পরিপ্রেক্ষিতে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই বিষুবৎ সংক্রান্তির দিন উদিত ও অস্তমিত হন। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় তারা অজ্যোতিশ্চক্রের অনুসরণ করে থাকেন। সূর্য যখন দক্ষিণ মার্গে বিচরণ করেন তখন সমস্ত গ্রহরাজির অধধাদেশে তাকে দেখতে পাওয়া যায়। একসময় সূর্যের ঊর্ধ্বদেশে চন্দ্র নিজের অত্যুজ্জ্বল মণ্ডলকে বিকৃত করে সঞ্চরণ করে থাকেন। সে-সময় সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলকে চন্দ্রের ঊর্ধ্বদেশে অবস্থান করতে দেখা যায়। এসময় দেখা যায় নক্ষত্রের ঊর্ধ্বদেশে রয়েছে বুধ, বুধের ঊর্ধ্বদেশে বৃহস্পতি, বৃহস্পতির উর্ধ্বে শনি এবং শনির ঊর্ধ্বে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থান করছে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঊর্ধ্বে ধ্রুব নক্ষত্রকে বিরাজ করতে দেখা যায়। এই যে তারকা গ্রহ বা নক্ষত্রের অবস্থান বিষয়ে বললাম এরা সকলেই কিন্তু দুই শত সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে অবস্থান করে থাকে। গ্রহগণ, চন্দ্র ও সূর্য দিব্য তেজোদীপ্ত রূপ পরিগ্রহ করে আকাশলোকে নক্ষত্রদের সাথে মিলিত হন এবং নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে পরিভ্রমণ করে। গ্রহ, নক্ষত্র ও সূর্য যথাক্রমে নীচ, উচ্চ ও মৃদুভাবে বিরাজিত। এরা যখন

পরস্পর মিলিত বা বিচ্ছিন্ন হয়, তখনও এরা একই সাথে প্রজাদের দেখে থাকে। এরা পরস্পরের অবলম্বনে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়। পণ্ডিতরা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, তারা নিঃসন্দেহে জানেন যে এদের মিলনে সংকর অর্থাৎ মিশ্রণ ঘটে না।

পৃথিবী, জ্যোতিষ্কমণ্ডল, দ্বীপমালা, সমুদ্রসমূহ, পর্বতরাজি, বর্ষ ও নদী বিষয়ক সন্নিবেশের কথা, যা কিছু আমি জ্ঞেয় হয়েছি সবই আপনাদের কাছে ব্যক্ত করলাম। উল্লিখিত সকল স্থানেই প্রাণীরা বাস করতে থাকে। এইসব গ্রহরা বহু বহুকাল পূর্বে নক্ষত্র থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। চাক্ষুষ মন্বন্তরে বিশাখা নক্ষত্রে আবির্ভূত হওয়ার পর সূর্য এইসব গ্রহদের মধ্যে প্রধান বলে বিবেচিত হতে লাগল। ধর্মপুত্র রশ্মিময় চন্দ্র বিশ্বাবসু নামে কৃত্তিকায় জন্ম লাভ করলেন, ষোড়শ রশ্মিযুক্ত ভৃগুপুত্র শুক্র পুষ্যা নক্ষত্রে উৎপত্তি লাভ করে সূর্যের নীচে অবস্থিত তারা ও গ্রহরাজির ওপর আধিপত্য করতে লাগল। দ্বাদশরশ্মিযুক্ত ঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতি ফাল্গুনী নক্ষত্রে উদ্ভূত হয়ে জগৎগুরু বলে বন্দিত হলেন। দেবদেব প্রজাপতির ঔরসে আষাড়া গর্ভে উৎপন্ন হলেন নবরশ্মিযুক্ত লোহিতাঙ্গ মঙ্গল। শনি রাহু ও কেতু গ্রহের জন্মবিষয়ে কিছু শ্রুতিবাক্য প্রচলিত আছে। বলা হয়ে থাকে সপ্তরশ্মিসমন্বিত শনি সূর্যের ঔরসে রেবতীর গর্ভে জন্মলাভ করেছেন। আর চন্দ্রসূর্যপীড়ক রাহু ও কেতু রোহিনী নক্ষত্রে সমুৎপন্ন হয়েছেন। হে দ্বিজোত্তমবৃন্দ, আপনারা ভার্গব প্রভৃতি গ্রহদের 'তারাগ্রহ' বলে জ্ঞান করবেন, জন্মনক্ষত্র পীড়িত থাকলে গ্রহরা প্রতিকূল হয় এবং গ্রহভোগ সময়ে সেই দোষ তাদের স্পর্শ করে। আদিত্যকে এইসব গ্রহের মধ্যে আদি বলে মান্য করা হয়। এছাড়া তারকামণ্ডলের মধ্যে শুক্র, কেতুদের মধ্যে ধূমকেতু, নক্ষত্রদের মধ্যে বিষ্ঠা, অয়নদের মধ্যে উত্তরায়ণ, বর্ষদের মধ্যে সংবৎসর, ঋতুমধ্যে শিশির, মাস মধ্যে মাঘ, পক্ষ মধ্যে শুক্ল, তিথি মধ্যে প্রতিপদ, দিনরাত্রির মধ্যে দিন, এবং মুহূর্তের মধ্যে আদ্য মুহূর্তকে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়।

কালবিদ পণ্ডিতগণ চক্ষুর নিমেষ প্রভৃতিকে কাল বলে ঘোষণা করেছেন। সূর্যের গতি বিক্ষেপে বিষ্ঠা থেকে শ্রবণা পর্যন্ত ব্যাপ্ত পাঞ্চ বার্ষিক যুগ চক্রের মতো পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এই নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রবিন্দু বলে সূর্যকে কাল বলে অভিহিত করা হয়। আপনারাও একে ঈশ্বর বলে জ্ঞান করবেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ—এইচারিভূতের প্রবর্তক ও নিবর্তক হলেন সূর্য। স্বয়ং স্বয়ম্ভু ঈশ্বর লোকব্যবহারের জন্য এই জ্যোতিশ্চক্রের সন্নিবেশ নির্মাণ করেছেন, এই জ্যোতিশ্চ শ্রবণা নক্ষত্রে উৎপত্তি লাভ করে ধ্রুব নক্ষত্রে স্থির হয়ে আছে। সন্নিবেশটি চতুর্দিকে বৃত্তাকার। এই জ্যোতিশ্চক্র সৃষ্টি করার সময় ভগবান কিছু সুনির্দিষ্ট সত্য প্রকাশের কথা চিন্তা করেছিলেন, এই জ্যোতিশ্চক্র হল প্রকৃতির আশ্রয়। অভিমানীও সত্ত্বস্থিত এবং প্রকৃতির অদ্ভুত পরিণাম বিশেষ মনুষ্যলোকে বসবাসকারী কোনো প্রাণীই এইসব জ্যোতিষ্ক পদার্থের

গমনাগমন চর্মচক্ষু দিয়ে অবলোকন করতে পারেন না। কেবলমাত্র সিদ্ধ প্রাজ্ঞ পণ্ডিতেরাই আগম, অনুমান, প্রত্যক্ষ ও উপপত্তি বলে অত্যন্ত নিপুণভাবে ও ভক্তিবশে এই যাতায়াত যথাযথ ভাবে নির্ধারণ করতে পারেন। চক্ষু, শাস্ত্র, জল, লেখ্য ও গণিত-কে জ্যোতিশ্চক্রের গণনার হেতু বলে স্বীকার করা হয়েছে।

.

৪৮.

সুব্রত ঋষিগণ বললেন–হে তপোধন, আপনি যথাযথভাবে আমাদের বলুন কোন্ কালে কোন্ মহাদীপ্ত দেশে ব্রহ্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠদের এই উত্তম আখ্যান বিবৃত হয়েছিল?

প্রত্যুত্তরে সূত বুললেন–হে ব্রতচারী দ্বিজবরগণ, আপনাদের জ্ঞানস্পৃহা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সহস্র বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠেয় সত্রযজ্ঞে জগৎপ্রাণ বায়ুর কাছে এ বিষয়ে যেমন শ্রবণ করেছি, আপনাদের তেমনই বলব।

শুভ্রশিখর শোভিত শৈলরাজ হিমালয়ের উত্তরদিকে বহু পবিত্র সরোবর, নদী ও হ্রদ আছে, এরই মাঝে যেসব পুণ্য উদ্যান, তীর্থস্থান ও দেবালয় গড়ে উঠেছে সেখানে দেবভক্ত মহাত্মা ব্রতনিষ্ঠ মুনিঋষিরা যথাযথ নিয়ম অবলম্বন করে ঋক, যজুঃ ও সামমন্ত্র, নৃত্যগীতাদি সহযোগে অর্চনা, প্রণব মন্ত্র ওঙ্কার উচ্চারণ ও নমস্কারের মাধ্যমে সর্বদা শিবের পুজো করে থাকেন। সংযত আত্মা সম্পন্ন দেবতারা মনে করেন জ্যোতিশ্চক্র যখন নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় তখন সূর্য মধ্যদেশে অবস্থান করেন। একদিন পূর্ব বিধিমতো দেবতারা যখন জ্যোতিশ্চক্র সম্পর্কে তাদের বিশ্বাসের কথা আলোচনা করছিলেন, তখন সতত গতি সমীরণ সেখানে উপস্থিত হয়ে নীলকণ্ঠ-কে নমস্কার জানালেন। সে সময় সেখানে বালখিল্য নামে প্রসিদ্ধ সুর্যের অন্যতম সহচারী, ব্রতচারী, বায়ুপত্র ও অম্বুমাত্রভোজী ঊর্ধরেতাঃ সহস্র সংখ্যক মুনি উপস্থিত ছিলেন। তারা বায়ুকে বললেন–হে পবন সত্তম! আপনি এক্ষণে যে নীলকণ্ঠ শব্দটি উচ্চারণ করলেন, আমরা তার গুহ্য ও পূর্ণ বিবরণ শুনতে ইচ্ছা পোষণ করছি। ও হে প্রভঞ্জন, কোন্ কারণে অম্বিকাপতি মহাদেবের কণ্ঠ নীল বর্ণ ধারণ করেছিল, আপনার মুখনিঃসৃত বাক্য থেকে আমরা তা আরও ভালোভাবে জানতে ইচ্ছা করি। হে সমীরণ, আপনার উচ্চারিত সকল বাক্যই সার্থক। কেননা বায়ু বর্ণের উচ্চারণস্থানে প্রবেশ করলেই বাক্যের প্রকাশ হয়ে থাকে। হে পবন-সত্তম, আপনার থেকেই প্রথমে জ্ঞান ও পরে উৎসাহের প্রবর্তনা হয়। আপনার স্পন্দনেই বর্ণমালার ব্যবহার। এমনকি যেখানে বাক্যের ব্যবহার নিবৃত্ত হয়, যেখানে দেহবন্ধ দুর্লভ হয়, সেখানেও আপনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। হে সদানীল! হে সমীরণ! হে সর্বত্রগামী! আপনি ভিন্ন আর অপর কোনো দেবতা যথেচ্ছগামী নন। হে অনিল! এই জীবলোকের সবকিছুই আপনার প্রত্যক্ষ। আপনিই সম্যকভাবে সেই বাচস্পতি মনোনায়ক ঈশ্বরকে জানেন। আপনি আমাদের বলুন, কীভাবে তার কণ্ঠের এই রূপবিকার সম্ভব হল? আমাদের এই সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনি রক্ষা করুন দেব!

সেইসব শুদ্ধাত্মা সংযতাত্মা ঋষিপ্রবরদের স্তুতিবাক্য শ্রবণ করে লোকপ্রণম্য মহাতেজোময় বায়ু প্রীত হলেন। তিনি বললেন, এই ঘটনার সূত্র নিহিত আছে পুরাকালের ঘটনার ইতিবৃত্তে, আমি সে বিষয়ে যথাতত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করছি।

পুরাকালে সত্যযুগে বেদার্থ নির্ণয়ে তৎপর এক ধর্মাত্মার জন্ম হয়েছিল। তার নাম বশিষ্ঠ। তিনি ছিলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র। একদিন এই মহাপ্রাজ্ঞ বশিষ্ঠের সাথে মহিষাসুর নারীদের নয়নারঞ্জন দূরকারী, ক্রৌঞ্চের জীবনহারক, পার্বতীর হৃদয়নন্দন, ময়ূরবাহন মহাবল কীর্তিকেয়র, সাক্ষাৎ হল। পরম ভক্তিভরে কার্তিকেয়কে প্রণাম জানিয়ে বশিষ্ঠ মুনি তাকে দেবাদিদের কণ্ঠের রূপবিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন–হে উমাগর্ভজাত সূত! হে হরানন্দদায়ক কার্তিকেয় আপনাকে প্রণাম জানাই। আপনি অগ্নিগর্ভ, গঙ্গাগর্ভ, শরগর্ভ ও কৃত্তিকাপুত্র, আপনাকে প্রণাম। হে দ্বাদশনেত্র, হে ষড়ানন, আপনাকে প্রণাম, এইভাবে বিধি প্রকারে ময়ূরবাহন মহাসেনের স্তব করে বশিষ্ঠ কুমার কার্তিকেয়কে প্রশ্ন করলেন, হে মহাভাগ, আমি আপনার অতি-বিশ্বস্ত ও সংযত ভক্ত। দেবাদিদেবের কুন্দ ধবল কণ্ঠে এই যে বর্ণাবিকার দেখা যাচ্ছে, তা কীভাবে হল প্রভু? আমি আপনার একান্ত ভক্ত, আপনি যদি পাপনাশক সেই পবিত্র মঙ্গলকথা শেষ পর্যন্ত বিবৃত করেন, তাহলে আমি সাতিশয় আনন্দিত হব।

মহাত্মা বশিষ্ঠের এই অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে সেই মহাতেজাঃ দৈত্যদলনাশী দেবতা বললেন–হে বাগীশ্রেষ্ঠ, আমি যা কিছু জানি যথাতত্ত্ব আপনাকে বলছি, শ্রবণ করুন। বাল্যকালে জননী উমার স্নেহার্দ্র সান্নিধ্য বসে যা কিছু শুনেছি, সব বলছি। ঘটনাকালে পত্নী পার্বতীর সাথে সেই মহাত্মা দেবপুরুষের কী কী বাক্যালাপ হয়েছিল, আপনার প্রীতি উদ্রেকবশত তা কীর্তন করব।

কৈলাসশিখর। ত্রিভুবনের সকলের পরম কাঙিক্ষত ও পবিত্র দেবস্থান। নানা ধাতুতে বিচিত্রিত এই শৈলশিখর অতি-রমণীয়। চক্রবাকশোভিত, নানা দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষলতায় পরিকীর্ণ এই শিখরদেশ নিত্য ভ্রমরের সংগীতে মুখর। ধারাধৌত কন্দরগুলি মত্ত ক্রৌঞ্চ ও ময়ুরের ধ্বনিত মন্দ্রিত। অপ্সরা ও কিন্নরগণ এখানে সোল্লাশে বিরাজমান। স্থানটি সিদ্ধবারণসেবিত। জীবনজীবক গুল্মলতায় আচ্ছন্ন। কোকিলকূজন বা দূর থেকে ভেসে আসা ধেণুরবে কৈলাসের পরিবেশ অভিভূত। এখান হস্তীকুল গজাননের ভয়ে ভীত হয়ে গিরিকন্দরে প্রবেশ করে। এখানে দেববনিতারা লতার দোলায় দুলে দুলে খেলা করে। তাদের শ্রুতিমধুর বীণাবাদ্যের ধ্বনিতে স্থানটি যথাসম্ভব মুখরিত। এখানকার মন্দিরগুলি মুখবাদ্য আর ক্রীড়া ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে আছে। সংলগ্ন শিখরপ্রদেশ পতাকালম্বিত দোলা ও ঘণ্টার ধ্বনিতে

আকুল হয়ে পড়েছে। এছাড়া ক্রীড়ারত গণপতিদের করালবদন, ভয়াবহ হাসি এবং বিচিত্র দেহগন্ধ সকলের কাছে সন্ত্রাসজনক হয়ে উঠেছে। এখানকার শিলাতল হীরে আর স্ফটিক দিয়ে তৈরি। এই যে মনোরম শান্ত ধার্মিক স্থান, এখানেই ভূতপতি দেবাদিদেব বিরাজ করেন। তাকে বেষ্টন করে রয়েছে অগণন ভূতবৃন্দ। তাদের কেউ বাঘ, কেউ সিংহমুখ, কেউ গজ, কেউ অশ্বমুখ। কেউ কেউ উগ্র শৃগালমুখ। কেউ আবার হ্রস্ব, কেউ শ্রী দীর্ঘ, কেউ লম্বোদর। কারোর জানুদেশ হ্রস্ব, কারোর ওষ্ঠ লম্বমান। এরা কেউ তালজঙ্ঘ, কেউ গোকর্ণ, কেউ এককর্ণ বা মহাকর্ণ বা অকর্ণ। আবার কেউ কেউ বহুপাদ, মহাপাদ, একপাদ, বা পাদহীন, কেউ বহুমস্তক, কেউ মহামস্তক অথবা একমস্তক বা মস্তকবিহীন, এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বহুনেত্র, মহানেত্র, একনেত্র ও নেত্রবিহীন।

সেই কৈলাস শিখরের বিশুদ্ধ মনি-মুক্তোরত্নে ভূষিত, সুবর্ণমণ্ডিত শিলাতলে আসীন মহাদেবকে আপনারই মতে কৌতূহলবরে গিরিরাজকন্যা পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন, হে ভূত, ভবেশ্বর ভগবন, বৃষভধ্ব মহাদেব, আপনার কণ্ঠদেশে মেঘবর্ণ নীল অঞ্জনপুঞ্জের মতে এ কী শোভমান? আপনার কণ্ঠের এই যে নীলত্ব– যা অতি-স্পষ্ট নয়, আবার অতি-শুভ্র নয়, এর কারণ কী প্রভূ? আমি খুব কৌতুহলী হয়ে পড়েছি, আপনি আমাকে এসব কিছু যথার্থ কারণ দর্শান।

পার্বতীপ্রিয় শংকর পত্নীর কাছে এরকম কৌতূহলপূর্ণ বাক্য শুনে মঙ্গলযুক্ত কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন–বরাননে, তোমার স্মরণে আছে, পুরাকালে দেব-দানব কর্তৃক ক্ষীর সমুদ্র মন্থনকালে প্রথমে কালানলের মতো বিষ উগত হয়েছিল। সেই বিষের বিধ্বংসী তেজে দেব ও দৈত্যরা বিষণ্ণ বদনে প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে যান। মহাদ্যুতি ব্রহ্মা সেই ভীত ত্রস্ত মন্থনরত সুরাসুরদের দেখে বললেন–হে মহাভাগ, বলুন আপনারা কীসের ভয়ে ভীত হয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছেন। আমি আপনাদের জন্য আটপ্রকার গুণৈশ্বর্য সৃষ্টি করেছি। হে সুরসমগণ, কেউ কি সেই ঐশ্বর্য থেকে আপনাদের বঞ্চিত করেছে? হে সংযমাত্মা দেবগণ, আপনাদের এত উদ্বিগ্ন বোধ করছি। কেন?

আপনারা ত্রিলোকেশ্বর। আপনাদের কোনা মনস্তাপ থাকতেও পারে না। তবে কি আমার সৃষ্ট প্রজাবর্গের মধ্যে থেকেই কেউ আপনাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করার দুঃসাহস করেছে?

আপনারা সকলে দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্বক, যথাইচ্ছা গমন করতে পারেন, আপনারা সর্বদা কর্মবিপাক অনুসারে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিষয়ে প্রজাদের

প্রবর্তিত করতে পারেন। তাহলে এমন কি ঘটনা ঘটল যাতে আপনারা সিংহমর্দিত মৃগদের মতো ভয়োদ্বিগ্ন হয়ে আছেন? কী আপনাদের দুঃখ? কী জন্য এ সন্তাপ? কোথা থেকেই বা এত ভয় পেয়েছেন? কেনই বা আমার কাছে এসেছেন? এইসব বিষয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব যথাযথ বর্ণনা দিন।

ব্রহ্মার আশ্বাসবাণী শুনে সেই মহাত্মা দেবগণ বললেন–হে মহাঋষি, আমরা সুরাসুররা যখন সমবেতভাবে সমুদ্রমন্থন করছিলাম, তখন নীল মেঘের মতো, সর্প ও প্রমত্ত ভ্রমরের মতো বা বলতে পারেন কালান্তক অগ্নির মতো ঘোর বিষ উদগত হতে শুরু করে। এই বিষের তীব্রতা এমনই যে মনে হচ্ছিল যে কালমৃত্যু অথবা যুগান্তে উদিত সূর্যের তেজ অথবা ত্রিলোক থেকে বিচ্ছুরিত আভা ছড়িয়ে পড়ছে। কালানদের মতো সেই বিষ উত্থিত হল, তখন সেই বিষভার গ্রহণ করে জনার্দনের রক্তাভ গৌরবর্ণ অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। আমরা, উপস্থিত দেবতারা, রক্তগৌরাঙ্গ জনার্দনকে কৃষ্ণাঙ্গ দেখে খুবই ভীত হয়ে পড়েছি। তাই এর আশু সমাধানের জন্য আপনার শরণাগত হয়েছি।

দেবতাদের আবেদন শুনে লোকপিতামহ নিজেও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি সকলের হিতকামনায় অভিমত পোষণ করলেন–হে দেবগণ, হে তপোবন সুব্রত ঋষিগণ, আপনারা সকলে আমার বচন শ্রবণ করুন; মহাসমুদ্র মন্থনকালে এই যে কালানতুল্য বিষ সর্বপ্রথমে উত্থিত হল, তা 'কালকূট' নামে খ্যাত। ওই বিষ উদ্ভূত হওয়া মাত্র জনার্দন কৃষ্ণাঙ্গ হয়ে গেছেন কারণ শংকর ভিন্ন বিষ্ণু বা আমিও বা অন্য কোনো দেবপুঙ্গ ওই বিষের তীব্রতা সহ্য করতে সমর্থ নন। তাঁর মহিমা অপার। ওই কাল বিয়ের দহনজ্বালা থেকে বিশ্বের প্রাণীদের তিনি রক্ষা করতে, সৃষ্টি রক্ষা করতে, আসুন, আমরা সকলে মিলে বন্দনা করি। এই বলে সেই অযোনিসম্ভব পদ্মযোনি লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্তব করতে শুরু করলেন, হে পিনাকপাণি ব্রজপানি, ত্রৈলোক্যনাথ, ভূতনাথ-আপনাকে নমস্কার। হে বিরূপাক্ষ, আপনি অনেক নেত্রশালী, আপনাকে নমস্কার। আপনি দেবশত্রুদের সংহারকারী, আপনি ত্রিনয়ন, তাপস, ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণু–আপনাকে নমস্কার, আপনি সাংক্যযোগ ভূতগ্রাম, মদনের অঙ্গনাশক, কালের কাল, রুদ্র, সুরেশ্বর, দেবদেব–আপনাকে প্রণাম। কপর্দী, করাল, শংকর, কপালী, বিরূপ, একরূপ, শিব, বরদ, ত্রিপুরারি, বন্দ্য, মাতৃপতি, বুদ্ধ, শুদ্ধ মুক্ত কেবল, কমনুহস্ত, দিগম্বর, শিখণ্ডী, ত্রিলোকবিধাতা, চন্দ্র, বরুণ, অগ্র, উগ্র, বিপ্র, অনেক চক্ষুঃ–আপনাকে শতকোটি প্রণাম। রজ-সত্ত্ব-তমঃ, অব্যক্তযযানি, নিত্য, অনিত্যরূপ, নিত্যনিত্য, ব্যক্ত, অব্যক্ত, চিন্তা, অচিন্ত্য চিন্ত্যাচিন্ত্য, ব্যক্তাব্যক্ত–আপনাকে নমস্কার। হে উপাপ্রিয়, শর্ব, মন্দিচক্রাঙ্কিত, পক্ষ-মাস-অধর্মস, সংবৎসর, বহুরূপ, মুণ্ড দণ্ডী বরূষী, ধ্বজী, রথী, যমী, ব্রহ্মচারী, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ,

সামবেদ, পুরুষ, ঈশ্বর আপনাকে নমস্কার। আপনি যথাকালে ভক্তদের দুঃখ নাশ করেন। আপনি নরনারায়ণ, আপনাকে সহস্র সহস্র প্রণাম জানাই। দেবাদেব শংকর, এইসব মহিমাবর্ধক, স্তবগানে কীর্তিত করে আপনাকে প্রণাম জানাই।

বরাননে এইভাবে পিতামহ ব্রহ্মার পৌরহিত্যে দেবতারা বার বার আমার স্তবগান করলেন। তারা এই ভাবে স্তব করায় আমার প্রতি তাদের সে ভক্তি প্রকাশিত হল, তাতে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হলাম। তাই সূক্ষ্মযোগের আতিশয্যবশত এই আমি অচিন্দ্য দেবাদিদেব আমার কেশকলাপ গঙ্গাজলে সিক্ত করলাম। তখন আমার মস্তকে শোভিত চন্দ্র আর ব্যক্ত ভাবে প্রকাশ পেল না। এইভাবে বিবিধ স্তব স্ত্রোত্র, বেদবেদাঙ্গময় বাক্যে, আমার স্তব করার ফলে আমি লোককর্তা সুমহাত্মা ব্রহ্মার প্রতি যারপরনাই প্রীত হলাম। আমি তাকে সম্বোধন করে সূক্ষ্ম কথায় বললাম, হে ভগবান! হে ভূতভব্যেশ! হে লোকনাথ জগৎপতি সুব্রত ব্রাহ্মণ! আপনার সুমিষ্ট স্তুতি আমাকে প্রীত করেছে। বলুন, আমাকে লোকহিতার্থে কী করতে হবে?

চতুরানন ব্রহ্মা এই কথা শুনে স্মিত হেসে বললেন–হে ভূত! ভব্যনাথ পদ্মলোচন ভগবান কারণেশ্বর, আমাদের সহায় হোন। দেবতা ও অসুরেরা সাগরমন্থন শুরু করলে অতীব নীল মেঘবর্ণ কালাগ্নিতুল্য এক ঘোর বিষের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। সে তো বিষ নয়, যেন কালমৃত্যু! তাতে যেন মিশে আছে যুগান্ত সূর্যের তেজ! যেন ত্রিলোকবিচ্ছুরিত সেই সূর্যাভয় চতুর্দিক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মন্থনজাত প্রথম উপঢৌকন রূপে এই কালানল বিষ দেখে আমরা সবাই ভীত ও উদ্বিগ্নচিত্ত হয়ে পড়েছি। হে মহাদেব, তাই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, মানুষের হিতার্থে আপনি ওই বিষ পান করুন। আপনিই হলেন এই বিষের প্রথম ভোক্তা। প্রভু, এই বিশ্বসংসারে আপনিই শ্রেষ্ঠ। মহাদেব, এই ত্রিভুবনে আপনি ভিন্ন আর কেউ নেই যিনি এই বিষ সহ্য করতে পারেন।

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সেই বচন শুনে আমি চিন্তান্বিত। আমি বললাম–তথাস্তু। বরাননে, আর ক্ষণমাত্র মুহূর্ত দেরী না করে আমি ব্রহ্মার আদেশকে শিরোধার্য করলাম। এবং সেই অনুসারে প্রাণঘাতী সেই বিষ পান করতে শুরু করলাম। বরবর্ণিনি, বিষ পান করার ফলে দেখতে দেখতে আমার কণ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল, যেন লেলিহান নাগরাজ তক্ষককেই বুঝি কণ্ঠে ধারণ করেছি। এরপর লোকপিতামহ মহাত্মা ব্রহ্মা বললেন–হে রক্ষাকর্তা শংকর মহাদেব, কালকূট আপনার কণ্ঠে উপনীত হয়েছে। নীলবর্ণ কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে তার।

হে গিরিরাজ নন্দিনী! হে বরাননে, এই করে ব্রহ্মবচনানুসারে দেব, দৈত্য, ভূত, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস যক্ষ গন্ধর্ব সকলের সাক্ষাতে সেই ঘোর বিষ আমি কণ্ঠে ধারণ করলাম। সেই থেকে আমার নাম নীলকণ্ঠ।

ওহে পর্বতরাজপুত্র, সেই উগ্র তেজ কালকুটকে কণ্ঠে ধারণ করছি দেখে দেবাসুররা বিস্মিত হয়ে উঠলেন। তখন সমস্ত দেবতা দৈত্য, উরগ, রাক্ষস সকলে কৃতাঞ্জলী হয়ে বললেন, অহো! হে দেবাদিদেব, আপনার বল-বীর্য, পরাক্রম অতীব বিস্ময়করা। আপনার প্রভুত্ব, আপনার যোগফল বিস্ময়কর গঙ্গাজলে সিক্ত আপনার মুক্তকেশ। আপনিই বিষ্ণু, আপনিই চতুরানন, আপনিই মৃত্যুবরদ! আপনিই সূর্য চন্দ্র ভূমি সলিল যজ্ঞ ও সূক্ষ্ম পুরুষ, সূক্ষ হতে ও সূক্ষ্মতর আপনার রূপবৈভব। আপনি বহ্নিপবন আপনি এই চরাচরের কর্তা এবং প্রলয়কালের সংহর্তা। আমার উদ্দেশ্যে এইসব বহুবিধ স্তুতিবাক্যের বিচ্ছুরণ করে নতমস্তকে আমাকে প্রণাম করে সেইসব মহাত্মাদেবতারা নিজ নিজ দিব্য বিমানে আরোহণ পূর্বক অনিয়ন্ত্রিতবেগে সুমেরু গিরিশৃঙ্গের দিকে প্রস্থান করলেন।

হে দেবী নীলকণ্ঠ আখ্যান লোকবিখ্যাত কথা। ইহা অতি-গুহ্য কথা, পুণ্য থেকে পুণ্যতর। স্বয়ং স্বয়ম্ভু সেই পুণ্য পাপনাশক কথা বলেছেন। যিনি ব্রহ্মা থেকে উদ্ভূত এই কথা নিত্য শ্রবণ করেন, তার বিপুল ফললাভ হয়।

হে বরারহে, স্থাবর-জঙ্গমে যত বিষ আছে, সব তার শরীর স্পর্শ লাভ করা মাত্রই বিনষ্ট হয়ে যাবে, এছাড়া এই কথা যিনি শুনবেন তার ঘোর অশুভ উপশমিত হয়, দুঃস্বপ্ন দূর হয়, সে ব্যক্তি রমণীদের মধ্যে প্রিয় হন, সভায় রাজার প্রিয় হন, তার গৃহে অতুল সম্পদ নিত্য বিরাজ করে। বরাননে, সেই ব্যক্তি ইচ্ছামতন নারীশরীর রমণ করতে পারেন। সেই ব্যক্তি ইচ্ছামাত্র নীলকণ্ঠ, হরিৎশ্মশ্রু, শশিশেখর, ত্রিশূলপাণি, ত্রিনেত্র, বৃষন, পিনাকধারী ও নন্দী–এদের সমান পরাক্রমশালী হতে পারেন। আকাশের মাঝে বায়ু যেমন অব্যাহত গতিতে চলে বেড়ায়, তিনি-ও তেমনি আমার আদেশে সর্বলোক বিচরণ করতে পারেন। সেই ব্যক্তি প্রলয় পর্যন্ত আমার মতো বলশালী হয়ে থাকবেন।

হে বরারোহে, যেসব ব্যক্তি এই কথা শোনেন, এবার তাদের ইহলোক ও পরলোকের গতির কথা বলব, যেমনু ব্রাহ্মণ বেদলাভ করেন, ক্ষত্রিয় পৃথিবী জয় করেন, বৈশ্য ব্যবসায় লাভবান হন এবং শূদ্র জীবন ধরে সুখী থাকেন। রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রোগ থেকে এবং বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন থেকে মুক্ত হন। গর্ভিনী পুত্র লাভ করেন, কন্যা সৎচরিত্র পতি লাভ করেন, ইহলোক বা

পরলোকের নষ্ট দ্রব্য আবার ফিরে পাওয়া যায়। শত সহস্র গো-দানে যে ফল মেলে বিভু ঈশ্বরের এই দিব্য বচন শুনেও সেই একই ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি নিত্যদিন একটি শ্লোক অথবা অর্ধশ্লোক অথবা শ্লোকের একটি চরণ বা অর্ধচরণ পাঠ করেন, তিনি জীবনান্তে রুদ্রলোক লাভ করেন।

গুহাপ্রিয় নন্দিচক্রাঙ্কিত উমাপ্রিয় শশিশেখর দেবীর কাছে এই পাপনাশক দিব্য কথা বিবৃত করে দেবীর সাথেই বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করে কিষ্কিন্ধ্যা পর্বত গুহার দিকে চলে গেলেন।

এই সমুদয় বৃত্তান্ত বিবৃত করে জগৎপ্রাণ পবন সত্তম বায়ুও আদিত্য পথে চলে গেলেন। তার মুখনিঃসৃত এই সুলক্ষণ লোককথা শ্রবণ করে জ্ঞান-অভিলাষী সুব্রত ঋষিগণ ধন্য হলেন।

.

৪৯.

ধর্মপ্রাণ ঋষিদের জিজ্ঞাসার কোনো অন্ত ছিল না। তার পুনরায় পুরাণজ্ঞ লোমহর্ষণকে বললেন, হে বাগ্মীবর, আপনি আমাদের বলুন–গুণ, কর্ম ও প্রভাবের বিচারে এই বিশ্বসংসারে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? এইসব আশ্চর্য কথা আমরা আরও ভালোভাবে শুনতে ইচ্ছা করি।

মহর্ষি সূত বললেন, এ সম্বন্ধে মহেশ্বরের মহাত্মময় এক অতি-পুরাতন ইতিহাস আছে। বহু পূর্বে ত্রিলোকবিজয় সম্পূর্ণ করার সময় দেবাদেব বিষ্ণু এটি কীর্তিত করেছিলেন।

পুরাকালে একবার ত্রৈলোক্যাধিপতি মহাতেজঃ বলিকে অবরুদ্ধ করেন। সঙ্গী দৈত্যরা পলায়ন করলেন। কার্যসমাধা করে শচীপতি সন্তুষ্টি লাভ করলেন। ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ এই বিপুল জয়লাভের সৌভাগ্য প্রদায়ক প্রভুর স্তুতি করলেন। তিনি তখন ক্ষীর সমুদ্রের কাছে বিশ্বরূপাত্মা রূপে বিরাজ করছেন। দেবাদিদেবের গুণকীর্তন করার জন্য সিদ্ধ, চারণ, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সরা দেবর্ষি, নাগ, নদী ও পর্ব, সকলেই তার কাছে গিয়ে স্তব করতে লাগলেন। তারা বলতে লাগলেন, এই জগতের ধাতা আপনি, কর্তাও আপনি। প্রভো! আপনিই লোকসমূহ সৃষ্টি করেছেন। আপনার প্রসাদে ত্রিলোক অব্যয় কল্যাণলাভ করেছে। আপনি সমস্ত অসুরকুলকে পরাজিত করেছেন, দুরাত্মা বলিকে অবরুদ্ধ করেছেন। আপনাকে যতখানি রক্ষাকর্তা প্রজাপালক বলে বোধ হয় আপনি তার থেকে অধিক সংবেদনশীল।

সিদ্ধগণ, মহাঋষিগণ এবং দেবতাদের দ্বারা স্তুত হয়ে পুরুষোত্তম বিষ্ণু এখন দেবতাদের উদ্দেশে বললেন, হে সুরসমগণ, আপনারা কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। যে লোকহিতকর কর্মের বশে আপনারা আমার গুণকীর্তন করছেন, সে বিষয়ে আরও কিছু আপনাদের জ্ঞেয় হওয়া উচিত। আমি সাধ্যমতো আপনাদের কারণ বিবৃত করছি, শুনুন।

সর্বভূতের স্রষ্টা ও সংহারক কালনির্মাতাও প্রভুস্বরূপ স্বয়ম্ভ প্রজাপতি ব্রহ্মাই মায়ার সহায়তায় এই দৃশ্যমান লোকসমূহের সৃষ্টি করেছেন। তারই অনুগ্রহে এই আদিসিদ্ধি সম্ভব হয়েছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন অব্যক্ত পুরাকালে যখন অন্ধকার ত্রিলোককে গ্রাস করেছিল, তখন ভূতগণকে উদরে স্থাপিত করে এই আমি সহস্র শীর্ষ ভূতাত্মা সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ বিষ্ণু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হাতে ক্ষীর সমুদ্রের বিমলোদকে শায়িত ছিলাম। এমন সময়ে দূর থেকে এক পুরুষকে দেখতে পেলাম। তিনি চতুর্মুখ মহাযোগী কৃষ্ণাচর্মধারী কমণ্ডলু বিভূষিত এক অমিত প্রভাময় দেবতা। তার নিজের দীপ্তি শত সূর্যের সঙ্গে তুলনীয়। তিনি নিজের তেজেই তেজস্বী। নিমেষ মধ্যে সর্বলোক প্রণম্য সেই পুরুষোত্তম ব্রহ্মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? কোথা হতেই

বা এখানে এসেছেন? কেনই-বা এই সমুদ্র মধ্যে অবস্থান করছেন? আমি প্রজাপতির কাছে তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি এই জগৎ-চরাচরের কর্তা, স্বয়ম্ভু ও বিশ্বতোমুখ। ব্রহ্মা আত্ম পরিচয় দেওয়ার পর আমি তাকে বললাম, এই সৃষ্টিকে আমি রক্ষা করে চলেছি। এই চরাচরের আমিই কর্তা। আমি বারংবার এই চরাচরের সৃষ্টি করি আর পরক্ষণেই সংহার করি। এই তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে আমাদের মধ্যে তুমুল বাগবিতণ্ডা শুরু হল এবং আমরা দুজনেই যেকোন মূল্যে পরস্পরের ওপর কর্তৃত্ব করতে চাইলাম। বলা যায় পরস্পরের জয়াভিলাষী হয়ে উঠলাম।

এমন সময় উত্তর দিশাতে এক জ্বলন্ত জ্বালা আমাদের দৃষ্টিগোচর হল। সেই জ্বালার বিশালতা দেখে আমাদের দুজনের মনেই বিস্ময় জন্মাল। সেই জ্বালার তেজে আমাদের সমস্ত পুণ্য জ্যোতি ম্লান হয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে সেই আদ্যন্ত অদ্ভুত বহ্নিশিখা বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমি ও ব্রহ্মা, দুজনেই তৎক্ষণাৎ সেই জ্বালার কাছে ছুটে গিয়ে দেখলাম, স্বর্গ-মর্ত্যকে অবদমিত করে সেই জ্বালা মণ্ডল অবস্থান করছে। তার মধ্যে শোভা পাচ্ছে বিপুল প্রভাবিশিষ্ট এক লিঙ্গ। লিঙ্গটি কেবল একটি স্থান বিশেষেই অবস্থান করছে। লিঙ্গটি অব্যক্ত, অতি-দীপ্ত অথচ সুবর্ণ বা শিলা বা রজত নির্মিত নয়। লিঙ্গটি অনির্দেশ্য, অচিন্ত্য, বারবার ব্যক্ত-অব্যক্ত, মহাতেজাঃ মহাঘোর ও শীঘ্র বর্ধনশীল। আগ্নেয় দীর্ঘায়িত লিঙ্গটি বিক্ষিপ্ত ও সর্বভূতের পক্ষে ভয়ংকর। স্পষ্ট অনুধাবন করলাম, এই ঘোররূপী লিঙ্গের আদি-অন্তকে জানা স্বর্গ ও পৃথিবীকে ভেদ করার মতোই কঠিন কাজ।

জ্বালাময় লিঙ্গের এই অতি-দীপ্ত ভয়ংকরতা প্রভু-ব্রহ্মাকেও একইভাবে বিস্ময়াভূত করল। ব্রহ্মা আমাকে বললেন, আপনি অতন্দ্রিত হয়ে এই লিঙ্গের অধোদেশে গমন করুন। আমি ঊর্ধ্বদেশের দিকে প্রস্থান করছি। আমরা এইভাবেই এই মহাত্মা লিঙ্গের রহস্যভেদ করতে পারব।

তখন আমরা দুজন ঊর্ধ্ব ও অধোদেশে গেলাম। আমি সহস্র বৎসর অর্ধেদেশে সন্ধান করেও কোনো অন্ত খুঁজে পেলাম না। আমি নিসন্দেহে ভীত হয়ে পড়লাম। একইভাবে ব্রহ্মাও উধ্বদেশে গিয়ে কোনো সীমানা খুঁজে পেলেন না। তিনিও অতিশয় শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। অগত্যা দুজনেই সেই মহাসমুদ্রের কাছে ফিরে এলাম। আমরা দুজনেই বিস্ময়াবিষ্ট হলাম। সেই জ্বালাময় মহান মহাত্মার মায়ায় মোহিত হলাম। এক সময় তার বিপুলতায় সংজ্ঞা পর্যন্ত হারালাম। পুনরায় সেই সর্বতোমুখ, সর্বজ্ঞ চরাচরের সৃষ্টি ও নিধনকারী অব্যয় প্রভুর ধ্যানে মগ্ন হলাম। আমরা কৃতাঞ্জলী হয়ে সেই শূলপানি, শর্ব, মহাভৈরবনাদ, ভীমরূপ ও দ্রংষ্ট্রী, সকল

জীববিনাশক, অব্যক্ত অব্যয়কে ধ্যান করতে শুরু করলাম। তাকে প্রণাম করে তার স্তুতি বশে বললাম, হে দেব, হে দেবাদিদেব, হে নরগণের প্রভু! আপনাকে প্রণাম। আপনি পরমেশ্বর। পরম ব্রহ্মা, অক্ষর, পরমপদ, বামদেব, রুদ্র, স্কন্দ, শিব ও প্রভু নিঃশংসয়ে জেনেছি আপনিই শ্রেষ্ঠ।

আপনি মহান্ত, শাশ্বত, সিদ্ধযোনি ও সর্বজগতের প্রতিষ্ঠা। আপনাকে প্রণাম। আপনি যজ্ঞ, আপনি বষটকার, আপনি ওঁঙ্কার, আপনি পরাৎপর, আপনি স্বাহাকার নমস্কার সর্বকর্মের সংস্কার, স্বধাকার, জাপ্যব্রত ও নিয়ম আপনাকে প্রণাম। হে সর্বজ্ঞ ভগবান, আপনি বেদনোক ও সর্বতোভাবে দেবস্বরূপ। আপনি আকাশের শব্দ, আপনি প্রাণীদের অব্যয় কারণ। আপনি পৃথিবীর গন্ধ, জলের রস, তেজের রূপ। আপনাকে নমস্কার। আপনি মহেশ্বর, বায়ুর স্পর্শ ও চন্দ্রমার দিব্যদেহ। হে দেবেশ, আপনি তো প্রাজ্ঞ, আপনি জ্ঞান ও প্রকৃতির বীজস্বরূপ। আপনি সর্বভূতের কর্তা, কাল, মৃত্যু ও সর্ব বিনাশক যম। আপনি এই ত্রিলোক ধারণ করে আছেন। আপনি প্রণম্য, আপনিই তো ভূমিতলে প্রজাদের সৃষ্টি করেছেন। আপনিই তো ভূমিতলে প্রজাদের সৃষ্টি করেছেন। তাদের কাছে পূর্ববদনে ইন্দ্রত্ব প্রকষ্ট করেছেন, দক্ষিণ বদনে লোকসমূহের ক্ষয়সাধন করেছেন, পশ্চিম বদনে বরুণত্ব প্রকাশ করেছেন। আপনার উত্তর মুখে সৌমত্ব প্রতির্ষ্ঠিত। অতএব হে দেব, আপনি লোকেদের অব্যয় কারণরূপে বহু প্রকারে বিরাজ করেন। আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

হে দেবেশ! অশ্বিনীকুমার দ্বয়, আদিত্য, বসু রুদ্র, মরুৎ, সাধা, বিদ্যাধর নাগ, চারণ, তপোবন বালখিল্য মহাত্মা তপোসিদ্ধ, সুব্রত ও ব্রতনিরত পুরুষগণ—এঁরা সকলেই তো আপনার থেকেই প্রসূত হয়েছে। এমনকি কুহু, ক্রিয়া, সীতা, উমা গায়ত্রী, সিনীবালী, লক্ষ্মী, কীর্তি, ধৃতি, মেধা, লজ্জা, ক্ষান্তি, বপুঃ, স্বধা, তুষ্টি, পুষ্টি, বাগদেবী সরস্বত, সন্ধা, রাত্রি—হে দেবেশ আপনার থেকেই উৎপন্না হয়েছেন। আপনি অযুত সূর্য প্রভার অধিকারী, সহস্র চন্দ্রকান্তির অধিকারী। পর্বতরূপধারী সর্বগুণাকর। আপনাকে সহস্র সহস্র নমস্কার। পটিশরূপধারী, চর্মবিভূতিধারী, পিণাকপাণি রুদ্রও সায়ক চক্রধারী আপনি-আপনাকে প্রণাম। হে মদন মথন! হে ভস্মভূষিত তণু! আপনি সুবর্ণ বস্ত্রধারী, সুবর্ণবাহু, সুবর্ণরূপ সুবর্নাভ—আপনাকে প্রণাম। আপনার বিচিত্র সহস্র নেত্র। হে হিরণ্যরেতঃ হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যগর্ভ—আপনাকে প্রণাম। হে হিরণ্যমালী, হিরণ্যদায়ী, হিরণ্যবাহী, হিরণ্যপথ আপনাকে প্রণাম, হে ভৈরবনাদনাদী, ভৈরব বেগবেগ দেবদেব শংকর! হে নীলকণ্ঠ—দিব্যসহস্যরবাহু, নৃত্যবাদ্য প্রিয় আপনাকে শতকোটি প্রণাম।

ভীমরূপ সর্বতোমুখ মহামতি শূলপানি এইভাবে বিবিধ ভাষণে স্তুত হয়ে ব্যক্ত হলেন। কোটি কোটি সূর্যপ্রভার অধিকারী হয়ে সেই মহাযোগী দেবতা তীব্রতার সঙ্গে দীপ্তি পেতে লাগলেন। এইভাবে অবিভাষিত হয়ে সেই মহেশ্বর মহাদেব সন্তুষ্ট হলেন। তাকে দেখে মনে হল যেন তিনি কোটি কোটি মুখ বিস্তার করে সবকিছুকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছেন। নানা ভূষণ ভূষিত নানা চিত্র বিচিত্রকলেবর নানা মাল্য গন্ধশোভিত সেই একগ্রীব একটজঠা দেবেশ্বর শূল, দণ্ড ও কৃষ্ণাজিন ধারণ করে বিকট হাসিতে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করলেন। মহাত্মা বৃষভাসনের সেই বিকট হাসিতে আমরা ভীত হয়ে উঠলাম। তখন সেই মহাযোগী বললেন, হে সুরসত্তমযুগল, আমি আপনাদের দুজনের প্রতিই সম্যক্ প্রীত হয়েছি।

আমার এই দুর্লভ মহামায়াকে দর্শন করুন। মনু থেকে সমস্ত ভয় ত্যাগ করুন। আপনারা হয়তো বিস্মৃত হয়েছেন যে, পুরাকালে আপনারা দুজনে আমার গাত্র প্রসূত ছিলেন। লোক পিতামহ ব্রহ্মা আপনি ছিলেন আমার দক্ষিণবাহু আর মহাত্মা বিষ্ণু ছিলেন আমার বামবাহু। আপনাদের প্রতি স্তবস্তুতি অর্চনায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই আপনাদের দুজনকে ইচ্ছেমতো বরদান করতে ইচ্ছা করি।

তখন প্রহৃষ্ট চিত্তে নিষ্পাপ পুরুষ ব্রহ্মা আমি স্বয়ং মহাদেবের চরণে প্রণত হয়ে বললাম, হে দেব, হে সুরেশ্বর যদি আপনি প্রকৃতই আমাদের প্রতি প্রীত হন এবং যদি প্রকৃতই বরদান করতে চান, তবে এই বর দিন যেন আপনার প্রতি আমাদের নিত্য ভক্তি থাকে।

ভগবান শ্রীমান শংকর বললেন, তবে তাই হোক। আপনারা পৃথিবীতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করুন। এই বলে ভগবান অন্তর্হিত হলেন।

পূর্ব কথন সাঙ্গ করে সমবেত মহিমাকীর্তক দেবতাদের উদ্দেশ্য করে সহস্রাক্ষ বিষ্ণু বললেন, এতক্ষণ সেই যোগীর সুপ্রভাবে আমি আপনাদের কাছে এইসব কথা বললাম। সেই মহেশ্বরই এই বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আমরা নিতান্তই হেতুমাত্র, শিবসংজ্ঞক এই রূপ অজ্ঞাত, অব্যক্ত, অতিন্ত্য এবং অদৃশ্য। যাঁদের জ্ঞানচক্ষু আছে, কেবলমাত্র তারাই তাঁকে দর্শন করেন। তাঁরা সাহায্যেই জ্ঞানচক্ষুগণ সূক্ষ্ম ও অচিন্ত্যকে দর্শন করে থাকেন। আমি সেই দেবাধিপতিকে প্রণাম জানাই। হে মহাদেব, হে মহেশ্বর, হে সুরাসুরশ্রেষ্ঠ মনোহংস, আপনাকে প্রণাম!

সূত বললেন–বিষ্ণুকণ্ঠে শিবমহিমা শুনে সব দেবতারা হৃষ্টমনে নিজের নিজের গৃহে প্রস্থান করলেন। আপনারাও স্মরণে রাখবেন, মহাত্মা শিব শংকরের উদ্দেশ্যে যিনি প্রণাম নিবেদন করেন, যিনি সেই মহাত্মা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে স্তব পাঠ করেন তিনি সমস্ত কাম্য বস্তু লাভ

করবেন, পাপ থেকে মুক্ত হবেন। মহাদেবের অনুগ্রহে সেই প্রভু বিষ্ণু সনাতন ব্রহ্মাকে এই যা কিছু বলেছিলেন, আমি লোমহর্ষণ সূত মহেশ্বরের বলসহ সবকিছু আপনাদের কাছে ব্যক্ত করলাম।

.

৫০.

পরম আগ্রহ ভরে মহর্ষি শাংশপায়ন বললেন–সূত আপন সর্বজ্ঞ। আপনি আমাদের কাছে কীভাবে ইলার পুত্র রাজা পুরূরবা প্রতি মাসে অমাবস্যায় স্বর্গে গমন করতেন এবং কীভাবেই বা পিতৃতর্পণ করতেন, তা কীর্তিত করুণ।

সূত প্রত্যুত্তরে বললেন, শাংশপায়ণ, যেভাবে আদিত্যের সাথে ইলাপুত্র পুরূরবা এবং মহাত্মা চন্দ্রের সংযোগ ঘটে থাকে, আমি তা যথাতত্ত্ব বর্ণনা করব। যেভাবে পক্ষান্তরে জলময় চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে, যেভাবে দেবকাল ও পিতৃকালের নির্ণয় করা হয়, যেভাবে চন্দ্র থেকে অমৃত প্রাপ্তি ঘটে, যেভাবে ইলাসূত পুরারবা পিতৃতর্পণ করেছিলেন এবং যেভাবে পীতচন্দ্র পিতৃগণের ও কব্যাগ্নি দর্শন ঘটেছিল সেইসব ঘটনার উৎস পুর্বানুসারে এবং ক্রমানুসারে বিবৃত করব।

যখন অমাবস্যার রাত্রিতে চন্দ্র ও সূর্য নক্ষত্রের সাথে মিলিত হয়ে এক মণ্ডলে বাস করে, সেই সময় মহারাজ পুরূরবা চন্দ্র-সূর্যকে দর্শন করার জন্য স্বর্গে গমন করেন। সেখানে মাতামহ ও পিতামহকে অভিবাদন জানিয়ে কিছুকাল অবস্থান করেন। এভাবে প্রতি অমাবস্যায় মহারাজ পুরূরবা স্বর্গে অবস্থানপূর্বক চন্দ্রের সাথে সযত্নে পিতৃগণের উপাসনা করেন। তারপর পুরূরবা সূর্যে এক কলা অপেক্ষা করে দেখতে থাকেন। কীভাবে চন্দ্র থেকে পনেরোটি কলায় সুধামৃত নিঃসৃত হয়ে থাকে। রাজেন্দ্র পুরূরবা প্রতি কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকিরণের সাথে তা থেকে সদঃক্ষরিত মধু ও সুধা দিয়ে পিতৃগণের তর্পণ করেন সেই সাথে তিনি সৌম্য, বহির্ষদ, কাব্য, অগ্নিদাত্ত প্রমুখেরও তর্পণ করেন।

অগ্নি নামে যে ঋতু উক্ত হয়েছে, তাই-ই হল সংবৎসর। এই সংবৎসর থেকেই সকল ঋতুর আবির্ভাব ঘটেছে। আবার ঋতুগণ থেকে আর্তবের উদ্ভব ঘটেছে। অর্ধমাস নামক আর্তবগণ হলেন পিতা এবং তারা অব্দের পুত্র। পিতামহ, মাস ও ঋতু-এঁরাও অব্দপুত্র। প্ররিতামহগণ, দেবগণও পঞ্চাব্দগণ হলেন ব্রহ্মার পুত্র। সোম থেকে সৌমের এবং কবি থেকে কাব্যের জন্ম হয়েছে। সৌমোৎপন্ন দেবগণ উপহূত হয় সোমরস পান করেন।

কবিজাত কাব্যগণ উপহৃত হয়ে আজ্য পান করেন। পিতৃগণ আবার তিন প্রকারের হয়ে থাকেন। যথা–কাব্য, বহিষদ ও অগ্নিধাত্ত। আর গৃহস্থ, যজ্বা, অগ্নিধ্বাত্ত, আর্তব, অষ্টকাপতি ও কাব্য এবং পঞ্চাব্দ এঁরা সকলেই বহির্ষদ নামে খ্যাত। এঁদের সাংবৎসর হল অগ্নি, পরিবৎসর হল সূর্য, ইম্বৎসর হল সোম, অনুবৎসর হল বায়ু এবং রুদ্র হল বৎসর। এঁরা আবার কিছু কিছু পঞ্চাব্দ ও যুগাত্মক-এ বিভক্ত। তাঁরা হলেন লেখ, উত্মাপ, ও দিব্যকীর্তা। তারা প্রত্যেক

মাসের অমাবস্যায় স্বর্গে অবস্থান করে সুধাপান করে থাকেন। সোম বা চন্দ্র থেকে প্রতি মাসে সুধা নির্গত হয়। এই গলিত সুধারস সোমপায়ী পিতৃগণের কাছে অমৃততুল্য। এই চন্দ্রসুধারুপ অমৃত দিয়েই পুরূরবা পিতৃগণর তর্পণ করতেন। সোম থেকে সমুৎপন্ন এই অমৃতকে 'সুধা' ও 'মধু' নামে অভিহিত করা হয়। কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ চন্দ্রের পনেরোটি কলাকে এক এক করে পান করেন। এইভাবে এক মাস কাল ধরে অমৃত পান করার পর দেবগণ চতুর্দশ কলায় উপনীত হন। দেবগণের দ্বারা এক একটি করে কলা গৃহীত হবার পর অমাবস্যার নির্দিষ্ট দিনটিতে চন্দ্র পঞ্চদশ কলায় অবস্থান করেন। অমাবস্যার দিনে চন্দ্রের কলাসমূহ সুষম্না দ্বারা আপ্যায়িত হয়। পিতৃগণ দ্বিকলা পরিমিত কাল পর্যন্ত চন্দ্রসুধা পান করেন। তারপর পানের ফলে চন্দ্র ক্ষয় পেতে থাকে। সূর্য তখন সেই ক্ষয়িত চন্দ্রকে সুষুম্না নামক রশ্মি দ্বারা আপ্যায়িত করে। চন্দ্রকলা সকল নিঃশেষিত হবার পর এইভাবে চন্দ্রকে আবার বর্ধিত করা হয়। সুষুম্না রশ্মির দ্বারা বাধিত চন্দ্রের কৃষ্ণকলায় ক্ষয় ও প্রতিদিন শুক্লকলার বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এইবাবে সূর্যের সুষুম্না রশ্মির প্রভাবে চন্দ্রের কলা বৃদ্ধি পেতে পেতে পৌর্ণমসীতে শুক্লবর্ণ ধারণ করে এবং পরিপূর্ণ মণ্ডল হয়। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের পরিবর্তনে এইভাবে পর্যায়ক্রমে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এই পিতৃমান পরিপূর্ণ চন্দ্র ক্রমে 'ইষৎসব' নামে বিখ্যাত হয় এবং পনেরোটি সুধামৃতধারার সঙ্গে চন্দ্রপথ অতিক্রম করে।

এবার আমি পর্ব ও পর্বসন্ধি বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করব।

আখ ও বাঁশ গাছের পর্বগ্রন্থি আছে, আপনারা দেখেছেন। ঠিক সেইরকম শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ হল অর্ধমাসের পর্ববিশেষ। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার ভেদে যে গ্রন্থি বা সন্ধি আছে তা হল অর্ধমাস পর্ববিশেষ। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার ভেদে যে গ্রন্থি বা সন্ধি আছে তা হল অধর্মসস্বরূপ এবং তাই-ই পর্ব। তৃতীয়া থেকে সেই পর্বের আরম্ভ শুরু হয়। পর্বারম্ভের সেই দিন থেকে অগ্ন্যানক্রিয়া করতে হয়। সায়াহ্নে প্রতিপাদ হলে সেই কাল 'পৌর্ণমাসিক' বলে নিরূপিত হয়। সূর্য যদি ব্যাতীপাতে অবস্থান করে তাহলে যুগান্তরে লোখোর্ধ এবং যদি যুগান্তরে উদিত হয় তাহলে চন্দ্রের লোখোর্দ্ধ হয়ে থাকে, পৌর্ণমাসী ব্যতীপাতে চন্দ্র ও সূর্য পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। যে সময়ে তাকে সীমান্তে দেখা যায়, তাকেই বলা হয় ব্যাতীপাত। ব্যাতীপাত দ্বারাই ক্রিয়াকাল নির্ণীত হয়।

চন্দ্র শুক্লপক্ষীয় রজনীতে পূর্ণতা লাভ করে। এই নাম পূর্ণিমা, এই পূর্ণিমাকে পিতৃগণ দেবগণের সাথে একসঙ্গে দেখে থাকেন। সেইজন্য অনুমতি নামের পূর্ণিমাকে প্রথমা বলা হয়। আবার যেহেতু পৌর্ণমাসীতে চন্দ্রের দীপ্তি খুবই বৃদ্ধি পায়, তাই পণ্ডিতেরা এই পূর্ণিমাকে 'রাকা'

বলে অভিহিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যে রজনীতে চন্দ্র ও সূর্য এক নক্ষত্রে অবস্থান করে তাকে বলে অমাবস্যা। পূর্ণিমার পনেরো দিন পর যে রাত্রি আসে তাকে অমাবস্যা বলে। যে কালে অমাবস্যার পর্ব সন্ধিগুলিতে দুটি করে লব থাকে, সেই কালকে দুই অক্ষরযুক্ত কুহু নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে। যদিও লুপ্তচন্দ্রা তবুও অমাবস্যা মধ্যসূর্যের সাথে মিলিত হয়। দিনের অধভাগ থেকে রাত্রির অর্ধভাগ পর্যন্ত সময় সূর্যের সাথে মিলিত হবার পর চন্দ্র শুক্লপক্ষের প্রতিপদে সূর্যমণ্ডল থেকে হঠাৎ মুক্ত হয়। প্রভাতে দুই মুহূর্তের মিলনকে সঙ্গম বলে। মধ্যাহ্নকালে সূর্য এখান থেকেই নিষ্ক্রান্ত হয়। প্রতিপদে, চন্দ্র সূর্যমণ্ডলে থেকে বিযুক্ত হয়। বিমুক্ত সূর্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যবর্তী কালই সেই আহুতি ও বষট্ ক্রিয়ার কাল যে অমাবস্যা তাকে এই পর্বের ঋতুমুখ বলে জানবেন। ক্ষীণ চন্দ্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যাই দিবাপর্ব। এই জন্যই অমাবস্যার দিনে সূর্যকে দেখা যায়। লোকমান্য ও প্রাজ্ঞ পণ্ডিতেরা চন্দ্রের সেইসব কলাকে তিথি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দান করেছেন। তখনও পর্যন্ত সূর্য ও চন্দ্র এরা দুজনেই পরস্পরকে দেখে থাকে। এরপর ক্রমে সূর্যমণ্ডল থেকে চন্দ্র নির্গত হতে থাকে। দিন ও রাত্রি মিলিয়ে চন্দ্র দুই লব মাত্র সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে। সেই কালকে 'আহুতি ও বষট্‌ক্রিয়ার কাল' বলা হয়ে থাকে। কোকিলের ডাক অনুসারে চিহ্নিত এই অমাবস্যার কালটি কুহু নামেও পরিচিত হয়ে থাকে। সিনীবালী পরিমাণ অনুযায়ী ক্ষীণ চন্দ্র অমাবস্যার দিবাভাগে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে।

পর্বের কাল পর্বের তুল্য। সূর্য ও চন্দ্রের ব্যাতীপীতে সেই উভয় পূর্ণিমা সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রতিপদ ও পঞ্চদশীতে দ্বিমাত্রা পরিমিত পর্বকাল হয়ে থাকে। কুহু ও সিনীবালীতে সমস্ত পর্বকাল দ্বিলব পরিমিত হয়ে থাকে। চন্দ্র নির্মল হলে পর্বকালও কলাতুল্য হয়। এই পর্বসন্ধিসমূহে রাত্রির সেই শুক্লপক্ষ হয়ে থাকে এবং পূর্ণমণ্ডল শ্রীমণ্ডিত চন্দ্র উপরঞ্জিত হয়। ক্রমে পঞ্চদশীতে চন্দ্র বৃদ্ধি লাভ করে। তাই তখন হয় পূর্ণিমা, এইভাবে একটু একটু করে পঞ্চদশ দিনে চন্দ্রে পঞ্চদশ কলাই পূর্ণ হয়। সে কারণেই চন্দ্রের পঞ্চদশ কলাই পূর্ণ হয়। সে কারণেই চন্দ্রে কেবলমাত্র পঞ্চদশ কলাই আছে, যোড়শ কলা নেই। আর এই একই কারণে পঞ্চদশীতে অর্থাৎ অমাবস্যার দিনে চন্দ্রের অত্যন্ত ক্ষয় হয়।

পূর্বোক্ত পিতৃগণ এইভাবে সোম পান করে বৃদ্ধি পেয়ে থাকেন। আপনারা আর্তব, ঋতু ও অব্দদেরও দেবতাদের মতো জ্ঞান করবেন। এরপর আমি আমাদের মাংস শ্রাদ্ধ ভোক্তা পিতৃগণের বিষয়ে বলব। চর্মচক্ষু দিয়ে তো একেবারেই নয়, এমনকি প্রসিদ্ধ তপস্যার দ্বারাও তাদের গতি, সত্ত্ব, শ্রাদ্ধপ্রাপ্তি, অমৃতলাভ, পুনরাগমন বিষয়ে জানা যায় না। এঁরা হলেন শ্রাদ্ধদের নামক পিতৃগণ, এঁদের আপনারা লৌকিক বলেই জানবেন। দেব, সৌম ও যজ্বা এঁরা

সকলেই অযোনিসম্ভব। এরা সকলেই দেবপিতৃগণকে পালন করে থাকেন। মনুষ্যপিতৃগণ কিন্তু দেবপিতৃগণ থেকে ভিন্ন। এঁরা হলেন লৌকিক পিতৃগণ, পিতা পিতামহ প্রপিতামহ–সকলেই সোমরস দিয়ে যজ্ঞ করেন, তাই এঁদের সকলকেই 'সোমবান' বলা হয়। এঁদের মধ্যে যাঁরা যজ্বা, তাদের নাম বহির্ষদ। এঁরা বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত থেকে দেহসম্ভব না হওয়া পর্যন্ত তৃপ্তিলাভ করে থাকেন। এই লৌকিক পিতৃগণের মধ্যে কিছু আছেন যাঁরা হোম ও যাগাদি শ্রৌতকর্মের অনুষ্ঠান করে থাকেন। এছাড়া তারা আশ্রম ধর্মাচরণবশে প্রস্থান অর্থাৎ সংসার যাত্রায় ব্যবস্থিত থাকেন। এঁদের অগ্নিস্বাও বলে অভিহিত করা হয়, অন্যান্য যেসব পিতৃগণ শ্রদ্ধাবণত চিত্তে ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, যজ্ঞ, প্রজাবৃদ্ধি, শ্রদ্ধা, বিদ্যা ও দান–এই সাতটি কাজে নিযুক্ত থাকেন, তারা কখনও অবসাদগ্রস্ত হন না, এঁরা একেবারে দেহপাত না হওয়া পর্যন্ত এইকাজে ব্যাপৃত থাকেন। জীবনান্তে এঁরা সোমপায়ী দেবগণ ও দেবতুল্য পিতৃগণের সাথে স্বর্গে গিয়ে সেখানে প্রীতিলাভ করেন এবং পিতৃগণের উপাসনা করেন। যাগাদি ক্রিয়াশীলদের মধ্যে যাঁদের সন্তান আছে তারা প্রশংমার্থ রূপে চিহ্নিত হয়েছেন। তাদের বংশধর ও বান্ধবরা তাদের উদ্দেশে নিরাপদান করলে তা গ্রহণ করে মাংসশ্রাদ্ধভোক্তা পিতৃগণ বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন। এই মনুষ্যপিতৃগণ মাসে মাসে শ্রাদ্ধভোজন করেন। কর্মনিযুক্তদের মধ্যে আরও এক শ্রেণীর পিতৃগণ আছেন। তারা সংকীর্ণ বলে খ্যাত। এঁরা সকল প্রকার আশ্রম ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট, স্বাহা ও স্বধাবর্জিত হয়ে থাকেন, এঁদের মধ্যে আরও অনেক নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। এঁরা অদ্ভুত দেহধারী, দুরাত্মা, যমালয়ে প্রেতস্বরূপ, বিবস্ত্র, বিবর্ণ, কিন্তু দীর্ঘকায় ও অতিশয় শুষ্ক প্রকৃতির এঁরা ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত অবস্থায় ইতস্তত বিচরণ করেন। এবং যাতনাময় স্থানে অবস্থানপূর্বক নিজ নিজ কর্মফল অনুসারে ফল ভোগ করে থাকেন। এঁরা এতটাই পিপাসার্ত থাকেন যে সবসময় নদী, সরোবর, তরাগ ও দীঘির খোঁজে ঘুরে বেড়ান। ক্ষুধাবশে তারা পরান্নে লিপ্সু হন। বিভিন্ন যাতায়াত স্থানে তারা স্থান পেয়ে থাকেন। পরে শাল্মলী, বৈতরণী, করম্ভবালুকা, অসিপত্রবন এবং শিলাসম্পেষণ–এইসব নরকস্থানে নিজের নিজের কর্মফল ভোগের জন্য পতিত হন। এই সমস্ত সহস্র দুঃখময় স্থানের দক্ষিণদিকে ভূমির ওপরে বিস্তৃত দুর্ভে তিনটি পিণ্ড দান করা হয়। পিতৃগণের বান্ধবেরা লোকান্তর প্রাপ্ত ওইসব পিতৃগণের নাম ও গোত্র উল্লেখ করে ওই তিনটি পিণ্ড তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এর মাধ্যমে বান্ধবেরা প্রেতস্থানে অধিষ্ঠিত পতিতদের তৃপ্তিবিধান করে। পিতৃগণের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা যাতনাস্থানে উপস্থিত না হয়ে কর্মানুসারে এই পৃথিবীতেই পশু থেকে শুরু করে স্থাবর পর্যন্ত নানা জাতীয় তির্যগযোনিতে জন্মলাভ করেন। জীবিতাবস্থায় সেই সেই জাতির লোকেরা যেসব দ্রব্য আহার করেন, শ্রাদ্ধে নিবেদিত অন্নাদিত্ত সেইসব দ্রব্যরূপে পরিণত হয়ে তাদের কাছে এসে পৌঁছায়। যদি যথাকালে যথা নিয়মে উপস্থিত সৎপাত্রকে বিধিমত অন্নদান করা হয়,

তাহলে লোকান্তরপ্রাপ্ত বান্ধবেলা সেখানেই থাক না কেন, সেই অন্ন ভাগ পেয়ে থাকেন। সহস্র সহস্র সংখ্যক গাভীদের মধ্যে থেকে যেমন কোন একটি গোবৎস বিশেষভাবে তার মা-কে খুঁজে নেয়, ঠিক তেমনিভাবে শ্রাদ্ধবাসরে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রপূর্বক নিবেদিত অভীষ্ট ভোজ্য সেই সেই পিতৃগণের কাছে গিয়ে পৌঁছে যায়।

দেবকুমার সনৎ ছিলেন প্রেতকুলের গতাগতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি নিজে দিব্য চক্ষুতে সবকিছু দর্শন করে তবেই প্রেতজনের শ্রাদ্ধসম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। বল্বীক, উত্মপ ও দিব্যকীর্ত্য নামে প্রেতদের কথাই তিনি আলোচনা করেছেন। কৃষ্ণপক্ষ এঁদের কাছে দিন, আর শুক্লপক্ষ রাত্রি। তাই শুক্লপক্ষে এঁরা নিদ্রা যান। মনুষ্য ও দেবের মধ্যে দেবপিতৃগণের প্রীতিতেই মনুষ্য পিতৃগণ প্রীতিসুধা লাভ করেন।

পিতৃগণবিষয়ক কীর্তন এখানেই সমাপ্ত হল। পুরাণে সোমপায়ী পিতৃগণ সমন্ধে এইসকল তত্ত্বই বিবৃত হয়েছে। পুরাণনুসারে সূর্য, সোম, পিতৃগণ, ইলাপুত্র পুরূরবার সমাগম, সুধামৃত লাভ, পিতৃগণের তৃপ্তি, পূর্ণিমাকাল ও অমাবস্যাকাল এবং পিতৃগণের স্থান বিষয়ে সবকিছুই সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি। এই সৃষ্টি আমরা চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি, এ হল অনাদি অনন্ত, এতক্ষণ এর বিশ্বরূপ অর্থাৎ সমগ্র রূপের একাংশ মাত্রের কথা বলা হল। মনে রাখবেন, এই একাংশে পরিমাণ নির্ণয় করাও কিন্তু সহজ কথা নয়। তাই মঙ্গলকামী ব্যক্তি এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই সৃষ্টির কথা আনুপূর্বিক বললাম। এর অধিক আর কিছুই আমার বলা নেই।

৫১.

নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ বললেন, হে পুরাণজ্ঞ সুকথক সূত, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যে চারটি যুগ ছিল আমরা সেই যুগগুলির উৎপত্তি বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে শুনতে ইচ্ছা করছি।

সুব্রত ধার্মিক সূত বললেন, পৃথিবী সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে আমি পূর্বে যে যে বিষয়ের উল্লেখ করেছি, এখন সেই সেই বিষয়ের চারটি যুগের কথাই বলব। আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য সর্বতোভাবে এবং বিস্তারিতভাবেই পুরো বিষয়টি আলোচনা করব। প্রথমে আমি যুগ, যুগভেদ, যুগধর্ম, যুগসন্ধি, অংশ ও যুগসন্ধান এই ছয় রকম যুগ সম্বন্ধীয় বিবরণ যথাযথভাবে প্রদান করব। লৌকিক প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত যে মনুষ্য অব্দ, সেই অব্দ দ্বারা গণনা করে চতুর্যগ বিষয়েও বলব।

নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা ও মুহূর্ত–এই চারভাগে সময়কে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে নিমেষ কালের পরিমাণ হল একটি লঘুঅক্ষর উচ্চারণের সমতুল্য সময়। এরকম পনেরোটি নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত এবং ত্রিশ মুহূর্তে এক অহোরাত্র নির্ধারণ করা হয়। সূর্যের উদয় অস্তের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের দিন ও রাত্রি বিধান করা হয়। তার মধ্যে দিন হল কর্ম নির্বাহ এবং রাত্রি নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে। মানুষের পরিমাণে এক মাসে পিতৃগণের এক দিনরাত্রি হয়। তার মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ হল পিতৃগণের কাছে দিন আর শুক্লপক্ষ হল রাত্রি। ভূর্লোকবাসী মানুষের ত্রিশমাসে পিতৃগণের একমাস এবং মানুষের তেষট্টি মাসে পিতৃগণের এক সংবৎসর হয়ে থাকে। আরও জেনে রাখুন মানুষের শতবর্ষে পিতৃগণের তিন বৎসর চারমাস হয়ে থাকে। লৌকিক মান অনুযায়ী যে মানুষ অব্দ প্রচলিত আছে, এই শাস্ত্রে তাকে দিব্য দিনরাত্রি রূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সেই দিব্য দিনরাত্রির একটি সুনির্দিষ্ট বিভাগ আছে। সেটি হল–উত্তরায়ণ হল দিবা এবং দক্ষিণায়ণ হল রাত্রি। মানুষের ত্রিশ বৎসরে এখানে দিব্য এক মাসে গণিত হয়ে থাকে। মানুষের একশত বৎসরে দিব্য তিন মাস দশ দিন হয়। এইবারেই দিব্য বা বলা ভালো দৈব বৎসরাদি গণনা করতে হয়। এরকম আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন মানুষের তিনশত ষাট বৎসরে দিব্য এক বৎসর এবং মানুষের তিন সহস্র ষাট বৎসরে দিব্য এক সপ্তর্ষি বৎসর হয়ে থাকে। মানুষের নয় সহস্র নব্বই বৎসরে এক ক্রৌঞ্চ বৎসর দিব্য এক সহস্র বৎসর হয়ে থাকে। প্রাচীনকালের প্রাজ্ঞ ঋষিরা এইভাবেই অতুল জ্ঞান এবং দিব্য প্রমাণের সাহায্যে যুগসংখ্যা নিরূপণ করে থাকেন।

পণ্ডিতগণ ধারণা অনুসারে এই ভারতবর্ষে চারটি যুগ আছে। সেগুলি হল যথাক্রমে কৃত বা সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপর ও কলিযুগ। সত্যযুগে বিস্তারকাল চার সহস্র বৎসর। সত্যযুগের সন্ধ্যা আছে চার শত বর্ষ আর সন্ধ্যাংশও চার শত বর্ষ। ত্রেতা যুগের পরিমাণ দুই সহস্র বৎসর। দ্বাপর যুগস্থিত সন্ধ্যা হল দুইশত এবং সন্ধ্যাংশও দুইশত। কলিযুগের ব্যাপ্তী এক সহস্র বর্ষ, সন্ধ্যা এক শত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও এক শত বৎসর। অতএব সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি–এই চারটি যুগের মোট পরিমাণ হল বারো সহস্র বৎসর। মানুষের গণনানুসারে এইসব যুগের সাংবৎসর নিরূপণ করা যায়। যেমন–সত্যযুগের পরিমাণ ১৪৪০০০০ বর্ষ। কলিযুগের পরিমাণও প্রায় একইরকম। আবার মানুষের পরিমাণানুসারে যদি সন্ধ্যাংশ ভিন্ন চতুর্যুগের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, তাহলে সংখ্যার হিসাবে তা হবে ৪৩২০০০০ বর্ষ।

একাত্তরটি চতুর্যগে এক মন্বন্তরে অনুষ্ঠিত হয়। মানুষের ত্রিশ কোটি নিরূপিত হয়। যুগের সাথে এভাবেই মন্বন্তরের সাতষট্টি নিযুত কুড়ি সহস্র বৎসরে একটি দিব্য মন্বন্তর হিসাব রক্ষী করা হয়।

এবার আমি অবশিষ্ট ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের কথা বলব। একসঙ্গে একটির বেশি যুগের কথা বলা যায় না। তাই ক্রমানুসারে ঋষি বংশের আলোচনা প্রসঙ্গে অবশিষ্ট যুগগুলির ক্রমিক কথা আপনাদের কাছে বলব।

ব্রহ্মা কর্তৃক ত্রেতাযুগের সূচনাতেই মনু সপ্তর্ষি শ্রৌত ধর্ম ও স্মার্তধর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল। আমি পূর্বেই বলেছি, দ্বারা, অগ্নিহোত্র, সংযোগ, ঋক, যজুঃ ও সাম প্রভৃতি শ্রোতধর্ম সপ্তর্ষিদের দ্বারা আলোচিত হয়েছে। স্বায়ম্ভুব মনু স্মার্ত্ত ধর্মের পালনীয় আচরণ, লক্ষণ সমূহ ও বর্ণাশ্রমের আচরণীয় ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সত্য ব্রহ্মচর্য, শ্রুতি ও তপস্যা, বিষয়ে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভেই তপস্যারত সপ্তর্ষিগণ ও মনুযুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। এইসমস্ত মন্ত্রই কোনোরকম সচেতনতা ও ক্রিয়া প্রচেষ্টা ছাড়াই তারকা প্রভৃতি দর্শনের সাথে সাথে তাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। আদিকল্পে উচ্চারিত এই সমস্ত মন্ত্রই দেবতা থেকে সমুদভূত এবং কল্পবিনাশ কালে তাদের সিদ্ধির প্রবর্তন ঘটিয়ে থাকে। অতীতের সহস্র সহস্র কল্পে যাঁদের যা যা মন্ত্র ছিল, প্রতিজ্ঞানের ফলে কল্পনান্তরেও তাঁদের সেইসব মন্ত্র রয়ে গেল। এভাবেই ত্রেতার প্রারম্ভে সপ্তর্ষিগণ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব মন্ত্র প্রকাশ করেন। আর মনু প্রকাশ করেন স্মার্ত্ত ধর্ম। মনে রাখবেন, ত্রেতা যুগের শুরুতে কেবল বৈদিক ধর্মই ছিল। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে আয়ুর পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় দ্বাপর যুগে ধর্ম বিপর্যয় দেখা দেয়। স্বয়ম্ভ ব্রহ্মা ত্রেতাযুগে দেবতাদের, তারপর কলি ও দ্বাপর যুগে তপস্বী ও ঋষিদের উৎপত্তি ও বিনাশরহিত

করেছিলেন। সাঙ্গবেদবাণী যুগে যুগে ধর্মযুক্ত এবং সমান অর্থযুক্ত হয়েই প্রবর্তিত হয়ে এসেছে। ক্ষত্রিয়ের উৎসাহ যজ্ঞ বৈশ্যের হবির্যজ্ঞ শূদ্রের পরিচর্য্যা যজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণের জন্য জপযজ্ঞ নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ত্রেতাযুগের জতুর্বর্ণই ধর্মপালক, ক্রিয়ানিষ্ঠ, প্রজাহিতৈষী, সমৃদ্ধশালী ও সুখী ছিলেন। সে-সময় ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের এবং শূদ্র বৈশ্যের অনুগমন করতেন। তাদের শুভ প্রবৃত্তি বর্ণাশ্রমের পক্ষে মঙ্গলদায়ী ছিল। ত্রেতাযুগবাসীগণ নিজনিজ মানসিক সংকল্প অনুসারে বা নির্দিষ্ট কর্ম অনুসারে বা বাক্য অনুসারে মে কমই আরম্ভ করুন না কেন, তাতে সিদ্ধিলাভ করতেন। ত্রেতাযুগে সর্ব সাধারণের আয়ু, মেধা, বল, রূপ, আরোগ্য ও ধর্মশীলতা ক্ষেত্রে সমপ্রবণতা লক্ষ্য করা যেত। প্রজাপতি লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই যুগের অধিবাসীদের জন্য এমনই এক প্রকারের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোহবশত এঁরা সেই সব ধর্ম পালন করতে পারলেন না। পারস্পরিক বিরোধ শুরু হল। এঁরা একে একে প্রাণত্যাগ করে আবার জন্মগ্রহণ করলেন।

স্বায়ম্ভুব মনু সর্বতোভাবে ন্যায়-অন্যায়ের অনুসারে প্রজাপালন করেন। সেই তিনি শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুটি পুত্রসন্তান উৎপন্ন করেছিলেন। তাঁরাই হলেন পৃথিবীর প্রথম রাজা। তাদের সময় রাজা বলা হল। পৃথিবীতে এমন বহু মানুষ আছেন যারা দুর্জয় প্রকৃতির যাঁদের মনের মধ্যে কোনো-না-কোনো পাপমতি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তাদের মধ্যে ধর্মস্থাপনের জন্যেই আমি তপস্যা ও বর্ণবিভাগ বিষয়ে শাস্ত্রের নির্দেশ দিয়ে থাকি। এই ত্রেতাযুগেই ঋষি ও ব্রাহ্মণদের দ্বারা সংহিতা ও মন্ত্রাতি উক্ত হয়েছে। দেবতাদের দ্বারা যজ্ঞ প্রবর্তিত হয়েছে। পূর্ববর্তী স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরেই মহাতেজশালী মহেন্দ্রের সাথে যুগ্মভাবে দেবগণ শুক্ল, যাম, সর্বসম্ভার, সংবৃত ও বিশ্ববোজী যজ্ঞ প্রভৃতির প্রবর্তন করেছেন। ত্রেতাযুগের পালনীয় হল সত্য, জপ, তপ ও দান। ত্রেতাযুগে ক্রিয়াধর্মের হ্রাস ও সত্য ধর্মের বৃদ্ধি দেখা যায়। কেবল সেইসব মানুষেরাই ত্রেতাযুগে জন্মলাভ করেন যাঁরা বীর, আয়ুষ্মন, মহাশক্তিধর, দণ্ডধারী, মহাভাগ, যজ্বা ব্রহ্মবাদী, মত্ত মাতঙ্গগামী পদ্মপলাশলোচন, বিশাল বক্ষ, সিংহ, ঘাতক, মহাধনুর্ধর, চক্রবর্তী ও সর্বলক্ষণযুক্ত এঁদের দুই বাহু ন্যগ্রোধের মতো। তাই এঁরা ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল নামেও খ্যাতমান। ন্যগ্রোধ শব্দের পরিচিত অর্থ হল উচ্চ বা বিশাল।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালে যত যত ত্রেতা যুগ আছে সেইসব ত্রেতাযুগেই চক্রবর্তীগণ জন্ম নিয়েছেন। অতীত ও অনাগত সমস্ত মন্বন্তরেই চক্রবর্তীগণ বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। মোট চোদ্দোটি দিব্যরত্ন চক্রবর্তীদের ক্ষেত্রে সিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। এর মধ্যে চক্র রথ, মণি, খড়্গ, ধনু, রত্ন, কেতু ও নিধি এই সাতটি প্রাণহীন বলে জ্ঞাত, আর অশ্ব, হস্তীশাবক, ভার্যা, পুরোহিত সেনানী, রথকৃৎ মন্ত্রী ও যুবক এই সাতটি প্রাণী রূপে কীর্তিত। এই চোদ্দোটি

দিব্যরত্ন সম্পন্ন চক্রবর্তী রাজাদের ক্ষেত্রে চারটি অদ্ভুত মঙ্গল সাধিত হয়ে থাকে। তা হল বল, ধর্ম, সুখ ও ধনু। এঁরা পরস্পরের মধ্যে বিরোধ না ঘটিয়ে সমানভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম যশ ও বিজয় লাভ করে থাকেন। এঁরা অনিমাদি ঐশ্বর্য, প্রভুশক্তি ও অন্যান্য তপস্যা দ্বারা ঋষিগণের এবং বলও তপস্যা দ্বারা দেব, দানব ও মানুষদের পরাস্ত করে থাকেন। এঁরা সকলেই কিছু দেহলক্ষণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। যেমন–এঁদের দন্ত ওষ্ঠদ্বয় উন্নত। এঁদের বাহু অজানুলম্বিত। হস্ত জালিকাকৃতি ও বৃষঙ্কিত। জিহ্বা পরিমার্জিত কিন্তু তাম্প্রভ। ললাটে, ঊর্ধনাভসম্মত কেশ। এবং ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মতো উন্নত দেহ। এঁরা সুমেহন গজেন্দ্রগতি সিংহস্কন্ধ ও বিশাল হনুযুক্ত। এদের দুই চরণে চক্র ও মৎস্যরেখা ও দুই হস্তে শঙ্খ ও পদ্মরেখা লক্ষিত হয়।

ত্রেতাযুগে এইরকম পঁচাশি হাজার জরাহীন রাজা বর্তমান ছিলেন। অন্তরীক্ষ, সমুদ্র, পাতাল ও পর্বতে এঁদের গতি ছিল অপ্রতিহত। বর্ণাশ্রমের বিভাগ অনুসারে ধর্ম প্রবর্তিত হতে থাকে। ক্রেতা যুগ শেষ হবার আগেই যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও সত্য ত্রেতাযুগের ধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। মর্যাদা ও ঔচিত্য বোধের সীমানা নির্দেশ করার জন্যই দণ্ডনীতির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই যুগের প্রজারা সকলেই স্বাস্থ্যবান, রোগহীন ও পূর্ণমানস সম্পন্ন ছিলেন। ত্রেতাযুগে এক বেদকে চতুষ্পদ রূপে স্মরণ করা হত। মানুষেরা ন্যূনতম তিনসহস্র বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকতেন এবং অনন্তকালে পুত্রপৌত্রাদির মুখদর্শন করে যথাকালে মৃত্যুমুখে পতিত হতেন। এই হল ত্রেতাযুগের লোকজীবনের বৈশিষ্ট্য ত্রেতাযুগের উল্লিখিত স্বভাব সন্ধ্যাপদে এবং সন্ধ্যার স্বভাব যুগপদে লক্ষিত হয়ে থাকে।

.

৫২.

শাংশয়ান আগ্রহান্বিত চিত্তে বললেন, হে সূত ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে স্বায়ম্ভব সৃষ্টিতে কীভাবে যজ্ঞাদি উপাসনার প্রবর্তন হল? বলুন সত্য যুগের অবসানের সাথে সাথে যখন সন্ধ্যাকাল অন্তর্হিত হল এবং যখন ত্রেতাযুগের প্রবর্তন হল, তখন কীভাবে বর্ণাশ্রমের প্রচলন নির্দিষ্ট হয়েছিল এবং কীভাবেই বা যজ্ঞসম্ভার সংগ্রহ করে যজ্ঞকার্যের প্রবর্তন হয়েছিল, তা বর্ণনা করুন।

এই কথা শুনে সূত বললেন, যজ্ঞের প্রবর্তন বিষয়ে যা কিছু আমি জেনেছি তা বলছি, শুনুন।

পৃথিবীতে বৃষ্টি আরম্ভ হলে ওষধি সমূহের আবির্ভাব ঘটল। গৃহাশ্রম ও সমস্তপুরে বার্তা প্রতিষ্ঠিত হল। তখন দেবরাজ ইন্দ্র বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ় করলেন। তিনি মন্ত্র ও সংহিতাকে ঐহিক ও পারত্রিক কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন। তারপর অন্য অন্য সকল দেবতাদের সাথে মিলিত হয়ে প্রয়োজনীয় যজ্ঞসম্ভার সংগ্রহ করে যজ্ঞ করতে শুরু করলেন। অনন্তর অশ্বমেধ যজ্ঞ বিস্তৃত হল। মহর্ষিরা সমাগত হলেন। তারা সকলে মিলে বেধ্যপশু দ্বারা যাগ করতে লাগলেন। ঋত্বিক মাত্রেই যজ্ঞকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেইসব যজ্ঞকার্যে আগমাদি যথাসম্ভব দ্রুত গীত হতে লাগল। পৃথিবী শ্রেষ্ঠ অযুগণ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান করতে লাগলেন।

এই সময় থেকেই বেধ্যপশুদের বলি দেওয়া শুরু হল। দেবতাদের আহ্বায়ক হোতৃগণ দেবতাদের উদ্দেশে অগ্নিমধ্যে ঘৃতাহুতি প্রদান করলেন। ফলে এক দিকে যেমন যজ্ঞভাগী দেবতারা আহুতি লাভ করলেন, অন্য দিকে তেমনি ইন্দ্রিয়াত্মক যজ্ঞভাগী দেবতারাও পূজিত হয়ে আহুতি লাভ করলেন। কিন্তু যথা কালে সেইসব দীন পশুদের দেখে মহর্ষি অর্ধ্যযুগলের মনে ভাবান্তর হল। তারা ইন্দ্রকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, এ আপনার কেমন যজ্ঞবিধি দেবেন্দ্র? হিংসার মাধ্যমে এই যে ধর্ম লাভের ইচ্ছা এতো প্রবল অধর্ম! হে সুরোত্তম, পবিত্র যজ্ঞানুষ্ঠানে এভাবে পশুবধ কখনও কাম্য নয়। আপনি এভাবে পশুবধের বিধান দিয়ে ধর্মনাশের দিকে উদ্যোগী হয়েছেন। এই অধর্ম আপনি বন্ধ করুন। হিংসা, তা যে-কোনো প্রাণীর প্রতিই প্রদর্শিত হোক না কেন, আমরা তাকে কোনো মতেই ধর্ম বলতে পারি না। হে সুরশ্রেষ্ঠ; আপনি যদি প্রকৃতই যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক হোন তবে এমন যজ্ঞ করুন যা বেদ ও বিধির অনুগত। অথচ যা অক্ষয়ের হেতু এবং যাতে হিংসা নেই। হে ইন্দ্রদেব, স্মরণ করুন সেই মহান

ধর্ম যা পূর্বে স্বয়ম্ভূ দ্বারা বিহিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, যা তিন বর্ষকাল ধরে রক্ষিত এবং প্ররোহের অযোগ্য–এমন বীজ দ্বারা যজ্ঞ করলে হিংসার প্রকাশ ঘটে না।

এইভাবে যজ্ঞভোজী বিশ্বভূক ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে তত্ত্বজ্ঞানী ত্রিকালদর্শী মুনিবৃন্দ যজ্ঞের ঔচিত্য বিষয়ে প্রশ্ন তুললেন।

ইন্দ্রের কাছে এই বিষয়ে কোনো গ্রহণযোগ্য অভিমত ছিল না। মহর্ষিরা তার সঙ্গে বিবাদে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তখন এই গূঢ় প্রশ্নের সদুত্তর কামনা করে ইন্দ্র ও সেইসব তত্ত্বজ্ঞঋষিবৃন্দ তাকে বললেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ মহারাজ, উত্তানপাদকে আপনি যখন যজ্ঞবিধি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন উনি আপনার দ্বিধা দূর করার জন্য যা উত্তর দিয়েছিলেন নিঃসংশয়ে আমাদের বলুন। আমাদের এই ধর্মসংকট দূর করুন।

লোকপাল মহারাজা তাদের প্রশ্নের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলেন না। তিনি ফলাফল বিচার না করেই বেদ্শাস্ত্র সম্মত যজ্ঞতত্ত্ব হুবহু বলে দিলেন। তিনি আরও বললেন, দেবগণ কর্তৃক যে মনু উপদেশ দেওয়া হবে, সেইরকমই যজ্ঞ করবেন। প্রয়োজনে বেধ্যপশু, বীজ কিংবা ফল দ্বারা যজ্ঞ করবেন।

দীর্ঘতপা মহর্ষিগণ ও তারকাদি দর্শনকারীগণ এই হিংসাত্মক সংহিতামন্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। এবং তাদের সেই বচন-প্রামাণ্য অনুসারেই আমি এসব কথা বলছি।

আপনাদের কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ আপনারা অসন্তুষ্ট হবেন না। হে দ্বিজবৃন্দ, আপনারাই বিবেচনা করুন, যদি সমস্ত মন্ত্রবাক্যই হিংসাময় বলে প্রমাণ হয়, তবে যজ্ঞ আরম্ভ করাই কি উচিত কাজ নয়?

সেই যুক্তাত্মা তপস্বীরা মহারাজার এই কথার প্রত্যুত্তর দিতে পারলেন না। নীচের দিকে বাড়ি দেখে তারা সেই নৃপতিকে বললেন, বাক সংযম করুন রাজন! মিথ্যেবাদী রাজাকে রসাতলে যেতে হয়।

এইকথা বলা মাত্র রাজা রসাতলে গমন করলেন। এভাবে রাজা বসু উর্ধ্বচারী হয়েও রসাতলচারী হলেন। তিনি কেবল মুনিদের বাক্যের সত্যতা রক্ষার জন্যই বসুধাতলবাসী হলেন এবং অধোগতি লাভ করে ধর্মবিষয়ক সংশয়ের ছেদন করলেন।

অতএব হে ধর্মাত্মা দ্বিজবৃন্দ, মনে রাখবেন, কোনো বহুজ্ঞ ব্যক্তিও যেন ধর্মের বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলবেন না। ধর্মের একাধিক ধারা আছে। এর গতি অতি সূক্ষ্ম ও দুর্লভ। তাই দেব, ঋষি ও স্বায়ম্ভুব মুনি ভিন্ন কেউ ধর্ম বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারেন না। অতএব সেই মহর্ষিদের কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হল যে হিংসা কখনোই ধর্মের দ্বার নয়।

মনে রাখবেন, নিজ নিজ পুণ্যকর্মের প্রভাবে সহস্র কোটি ঋষি স্বর্গে গমন করেছেন। এইজন্য মহান ঋষিরা কখনোই যজ্ঞ বা দানের প্রশংসা করেন না। কেননা সামান্য ফলমূল শাক ও উদকপাত্র দান করে তারা তো ইতিমধ্যেই নিজ প্রভাবে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অদ্রোহ, অলোভ সর্বভূতে দয়া, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, সত্য; অক্রোধ, ক্ষমা ধৈর্য্য—এরা হল সনাতন ধর্মের মূল যা লাভ করা অতীব দুঃসাধ্য। যজ্ঞহল ধর্মমন্ত্রাত্মক কিন্তু তপস্যা হল অনাহরাত্মক। যজ্ঞ করলে দেবত্ব পাওয়া যায়, কিন্তু তপস্যায় বৈরাগ্য মেলে। কর্মসন্ন্যাসে ব্রাহ্মণ্য, বৈরাগ্যে লয় এবং জ্ঞানলাভে কৈবল্য আসে। এইভাবেই এই পঞ্চগতি নির্দিষ্ট আছে। এইভাবে পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যজ্ঞের প্রবর্তনকে কেন্দ্র করে দেবতা ও ঋষিদের মধ্যে এই বিষয়ে ভয়ানক বিবাদ দেখা দিয়েছিল।

এরপর ধীমান ঋষিগণ রাজা বসুর বাক্যের প্রতি অনাদর প্রকাশ করে যে যে স্থান থেকে এসেছিলেন, সেই সেই স্থানে প্রস্থান করলেন, তাদের সঙ্গে কয়েকজন দেবতাও গিয়েছিলেন এবং যজ্ঞলাভ করেছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র ব্রহ্মক্ষত্রময় নৃপতিগণই তপঃসিদ্ধ হয়েছিলেন বলা হয়ে থাকে। এর ফলে প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, ধ্রুব, মেধাতিথি বসু, সুমেধা, বিরজাঃ শঙ্খপাদজ, প্রাচীণবর্হি, পর্জন্য, হর্বিদ্ধান প্রভৃতি রাজারা এবং আরও অন্য অনেক রাজা সিদ্ধ হয়ে স্বর্গে গমন করেন। তারা সকলেই রাজর্ষি অথবা মহাসত্ত্ব ছিলেন। মহীতে তাদের সকলের কীর্তিই ছিল প্রতিষ্ঠিত। এই রকম বিভিন্ন কারণেই যজ্ঞ অপেক্ষা তপস্যাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। এমনকি ব্রহ্মা প্রথমে তপস্যা বলেই এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন। যজ্ঞে তপস্যাকে অতিক্রম করা যায় না। সুতরাং তপস্যাই হল মূল।

এইবাবে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রথম যজ্ঞ প্রবর্তিত হল। সেই থেকে যুগাদিক্রমে সেই যজ্ঞকার্য অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

.

৫৩.

সূত বলতে লাগলেন—ক্রমানুসারে এবার আমি দ্বাপর যুগের কথা বলব।

ত্রেতাযুগ ক্ষীণ হয়ে গেলে দ্বাপর যুগের প্রবর্তন ঘটে। যদিও যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে সেই যুগের সিদ্ধিরও বিনাশ ঘটে। তবুও দ্বাপরাদি যুগের প্রজাদের সিদ্ধি প্রায় ত্রেতা যুগের অনুরূপ বলেই বোধ হয়। ফলে লোভ, অধৈর্য্য, বাণিজ্য, যুদ্ধ যথার্থ তত্ত্বের অনিশ্চয়, চারবর্ণের সাংকর্য্য কার্যের অনির্ণয়, যজ্ঞে, ওষধি ও পশুর নিপীড়ন মদ, দম্ভ, অক্ষমা, বলহীনতা প্রভৃতির সাথে সাথে রজোময় ও তমোময় যা কিছু প্রবৃত্তি-সবেরই প্রকাশ ঘটে দ্বাপরে। প্রথমে যে সত্য যুগ সেই যুগে সর্বত্র ধর্ম বিরাজ করত। ত্রেতা যুগের অধিবাসীরা যথাসম্ভব সেই ধর্ম পালন করেছেন। কিন্তু দ্বাপর যুগে সেই প্রচলিত ধর্মক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেয়। এবং সবশেষে কলিযুগে ধর্মের নাশ ঘটে। একইসঙ্গে কলিযুগে বর্ণাশ্রম প্রথার নাশ ঘটে এও সাংকর্য্য দেখা দেয়। শ্রুতি ও স্মৃতিতে দ্বৈভাব জাগরূক হয়। শ্রুতি ও স্মৃতির এই দ্বৈধীভাবের ফলে শাস্ত্র নির্ণয় সম্ভব হয় না। শাস্ত্রবিষয়ক নিশ্চয়তা বোধের অভাবে অচিরেই ধর্মতত্ত্ব বিপন্ন হয়। মানুষে মানুষে মতভেদ দেখা দেয়। এই পারস্পরিক মতভেদ দীর্ঘস্থায়ী হলে মানুষের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটতে থাকে। কোটি ধর্ম, কোটিই বা অধর্ম—সেই বোধ মানুষ হারিয়ে ফেলে। পরম্পরার ক্ষেত্রে যে বৈকল্য দেখা দেয়, কার্যপরম্পরা ক্ষেত্রেও তা সঞ্চারিত হয়। তাই কলি যুগে দেখা গেল, ‘মতভেদ’ অর্থাৎ মত বিষয়ে বৈকল্য থাকার ফলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দিল। আর একইসঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিভ্রম বিষয়ে আধিক্য ঘটলে সমস্ত শাস্ত্রেরই ধ্বংস ঘটবে এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

দ্বাপরাদি যুগে বেদব্যাস মানুষের আয়ুর স্বল্পতাকে প্রত্যক্ষ করে বেদকে চারভাগে বিভক্ত করেন। এর আগে চতুষ্পদে একই বেদ বারবার সংগৃহীত হত। অচিরেই দৃষ্টির পার্থক্যের কারণে ঋষিপুত্রগণ বেদকে আরও নানাভাগে বিভক্ত করেন। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বিন্যাস এবং স্বর ও বর্ণের বিপর্যয়ের কারণে বেদজ্ঞ মহর্ষিরা ঋক, সাম, যজুঃ এই তিনটি সংহিতা সংগ্রহ করেন। সামান্য কিছু ভ্রান্তি ও কোথাও কোথাও তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ ঘটে বলে বেদবিদ ঋষিগণ ব্রাহ্মণ কল্পসূত্র ও মন্ত্রপ্রবচন সমূহেরও সংহিতা প্রণয়ন করেন। অন্য শিষ্যরা তাদের গুরুদের সাথে সেই স্থান ত্যাগ করেন। কেউ কেউ আবার তাদের সাথেই অবস্থান করতে থাকেন।

পূর্বে একমাত্র অধ্বর্থব ছিল, শেষ অবধি তা আবার দুই প্রকার হল। এই ভাবে সামান্য ও বিপরীত অর্থ দিয়ে সমস্ত শাস্ত্র আকুল হল। ক্রমে অধ্বর্থবের বহুল প্রস্তাবে এই আকুলতা বৃদ্ধি পেল। ঠিক একইভাবে ঋক, সাম ও অথর্ব বেদের ক্ষয়হীন বিকল্পের ফলে সমস্ত শাস্ত্রই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। ভিন্ন দৃষ্টির মানুষেরা দ্বাপর যুগে শাস্ত্রের বিভিন্নতা ও ক্ষয়বিহীন বিকল্প কল্পনা করে থাকেন। এর ফলে শাস্ত্রসমূহ দ্বাপরযুগে প্রবর্তিত হয়েও আবার কলিতে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এইসব কিছু বিপর্যয়ের সূত্রপাত দ্বাপর যুগেই হয়েছিল। সেই জন্যই দ্বাপর যুগে অনাবৃষ্টি, মরণ ও কর্মজনিত দুঃখের ফলে মানুষের মনে নির্বেদ জন্মায়। নির্বেদ থেকে দুঃখমোচনের জন্য বিচার করার ক্ষমতা জন্মায়। বিচার থেকে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য থেকে দোষদর্শন, দোষদর্শনের থেকে সেই অভিমানী মানুষদের জ্ঞানোৎপত্তি দেখা দেয়। আবার এই দ্বাপর যুগেই শাস্ত্রের পাপপন্থীদের জন্ম হয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্তর্গত অঙ্গ শাস্ত্র, অর্থ শাস্ত্র ও হেতু শাস্ত্রের বিকল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রভেদ তাদের পৃথক পৃথক প্রস্থান এবং তাই নিয়ে মানুষদের মধ্যে মতভেদ দ্বাপর যুগেই ঘটতে দেখা যায়। মনু কর্ম ও বাক্যে বার্তা শাস্ত্রের সিদ্ধি হয়। এই যুগে সমস্ত ভূতবর্গের মধ্যে কায়ক্লেশ জন্মায়। এর ফলে লোভ, অধৈর্য, বর্ণিগযুদ্ধ, তত্ত্বসমূহের অনিশ্চয়তা বেদ শাস্ত্রপ্রণয়ন, ধর্মের সাংকর্য্য যোগ, শোক, বধ, কাম, দ্বেষ, বর্ণাশ্রম ধ্বংস প্রভৃতি ঘটতে থাকে। দ্বাপর যুগে মানুষের পরমায়ু দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ণ করে। যখন মানুষের আয়ুষ্কালের পাদমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেই সময় দ্বাপর যুগের সন্ধ্যাকাল প্রবর্তিত হয়। দ্বাপরযুগীয় ধর্মগুলি যখন গুণহীন অবস্থায় পৌঁছে যায়, তখন সন্ধ্যাকাল প্রবর্তিত হয়। তিষ্য দ্বাপরের বর্ষমানের শেষ অর্ধ্বে কী থাকে, এবার আমি সে বিষয়ে বলব।

দ্বাপরের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকতে থাকতেই কলিযুগের প্রতিপত্তি শুরু হয়ে যায়। দ্রুত পরিবর্তিত এই সময়ে তাই হিংসা, অসূয়া, মিথ্যা, মায়া ও তপস্বী বধ প্রভৃতি নিম্নগামী ঘটনা ঘটতে থাকে। একেই তিষ্য দ্বাপর যুগের বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র বলা যেতে পারে। প্রজাগণ এই চরিত্রের অনুযায়ী কর্ম সাধন করতে থাকেন। সমস্ত ধর্মের স্বরূপ ছিল অন্তঃসারশূন্য। তাতে প্রকৃতপক্ষে ধর্মকেই পরিত্যক্ত হতে দেখা যায়। এই সময় মনু, কর্ম ও স্তুতি সমন্বিত বার্তাশাস্ত্র কখন সিদ্ধ হয়, কখনও হয়না। কলিযুগে প্রচণ্ড ক্ষুধার ভয়, ঘোর অনাবৃষ্টির ভয়, মারক রোগ, বিপরীত দৃষ্টি–এইসব ঘটে থাকে, প্রজাগণ কেউ গর্ভস্থ অবস্থায়, কেউ যৌবন বয়সে, কেউ কৌমার্য কালে, কেউ কেউ বৃদ্ধ বয়সে মারা যায়। তিষ্য দ্বাপর যুগে কোনো স্মৃতির প্রমাণই গ্রাহ্য করা হয় না।

তিষ্য যুগের প্রজাসকল সতত অধার্মিক অনাচারগ্রস্ত মোহ ও কোপের বশীভূত, অল্পতেজ সম্পন্ন ও মিথ্যেবাদী হয়ে থাকেন। বিপদের অঙ্গহীন ও অবিহিত যাগ অবিহিত অধ্যয়ন নিন্দিত আচার দুষ্ট আগম ও নানাবিধ দূষিত কর্মের প্রভাবে প্রজাদের মনে ভয় জন্ম নেয়। ফলে সেইসব সাধারণ প্রজাদের মনে হিংসা, মায়া, ঈর্ষা, ক্রোধ, অসূয়া, অক্ষমতা মিথ্যা, রোগ লোভ–এইসব সদাই হতে থাকে। আর এরই মধ্যে যখন কলিযুগ আসে তখন প্রজাদের মধ্যে বিপুল সংক্ষোভ দেখা দেয়। দ্বিজগণ বেদপাঠে উৎসাহ হারান, যাগযজ্ঞ বন্ধ করে দেন। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন বিপন্নতার সূত্র ধরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি অন্ত্যজরা উৎপন্ন হতে থাকেন। কলিযুগে ব্রাহ্মণদের সাথে সহজেই শূদ্রাদি অন্ত্যজদের শয়ন, আসন ও ভোজন সম্পর্ক স্থাপিত হয়, এমনকি তখন রাজাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন শূদ্র। এইসব রাজাদের মাধ্যমে পাষণ্ড ধর্মের প্রবর্তন ঘটে এবং প্রজাদের মধ্যে অবাধে ভ্রূণহত্যা চলতে থাকে। শুধু তাই নয়, কলিযুগবাসী প্রজাগণ আরও নানারকম দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হন। তাঁদের আয়ু, মেধা, বল, রূপ ও কুল পরিত্যক্ত হয়। বিভিন্ন বর্ণের মানুষ পরস্পরের আচার বিচার সাদরে গ্রহণ করে। শূদ্রকে ব্রাহ্মণদের এবং ব্রাহ্মণকে শূদ্রদের আচরণীয় ধর্ম পালন করতে দেখা যায়। যুগান্ত সমুপস্থিত হলে চোরেরা রাজকার্য করতে থাকে, রাজারা চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করেন, ভৃত্যদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিনষ্ট হয়। স্ত্রীলোকদের মধ্যেও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। তারা ব্রত আচারহীন ও কপট হয়ে ওঠেন। তারা হয়ে ওঠেন মদ ও আমিষপ্রিয়। কলিযুগে হিংস্র বন্য জন্তুদের স্বভাবেও দেখা দেয় পরিবর্তন।

তারা প্রবল হয়ে ওঠে। গোরুদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কলিযুগে সাধু ব্যক্তির অভাব এতটাই প্রকট হয়ে ওঠে যে ভোগীদের কাছে সূক্ষ্ম মহাফল বস্তু দুর্লভ হয়। এদিকে চতুরাশ্রম প্রথার শৈথিল্য হেতু ধর্ম একপ্রকার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে যুগান্তকাল ঘনিয়ে এলে মহীয়সী ভূমিদেবী অল্পফল প্রসব শুরু করেন এবং শূদ্ররা তপস্যায় নিমগ্ন হন। ধর্মের এই যে ক্রম-অবনিত সংখ্যার হিসেবেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সত্যযুগে এক বৎসরের সামান্য বেশি, ত্রেতা যুগে এক বৎসর, দ্বাপর যুগে এক মাস, আর কলিযুগে ধর্ম মাত্র এক দিন স্থায়ী হয়েছিল।

কলিযুগের সব ক্ষেত্রেই অধঃপতন লক্ষ্য করা যায়। রাজারা প্রজাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হন, কিন্তু গ্রহণ চলতে থাকে। সেই যুগান্তকালে অক্ষত্রিয়রা রাজাসনে বসেন, বৈশ্যরা শূদ্রদের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করেন আর দ্বিজগণ শূদ্রদের অভিবাদন করেন। ফলে দেখা যায়, রাজারা নিজেদের রক্ষা করতে ব্যস্ত। দেশে ও জনপদে সমূহ অশান্তি স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। যাঁরা রক্ষক তারা রক্ষকের কাজ না করায় পৃথিবী শাসনবিহীন হয়ে পড়ে। এই

কলিযুগে পৃথিবীপতির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পর্যন্যদেব বিচিত্রবর্ষী হয়ে পড়েন। বর্ষণ করা বা না করা সম্পূর্ণত তার ইচ্ছাধীন হয়ে পড়ে। বসুমতী নরশূন্য ও শব্দশূন্য হয়। বসুন্ধরা হয় অল্পসম্পন্না ও অল্পফল। এই আদমযুগে সমস্ত বর্ণের মানুষ অর্থের লোভে বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তারা বহুলভাবে মিথ্যাচার করে পণ্য বিক্রয় শুরু করেন। কুশীল, পাষণ্ড ও বৃথাচিহ্নধারী মানুষে পৃথিবী ভরে যায়। পুরুষদের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং অধিক হারে স্ত্রীলোক জন্মাতে থাকেন। পরস্পর যাচকের সংখ্যা বাড়ে। বহু লোক মাংসাশী, ক্রুস্বভাবী, সারল্যশূন্য ও অসুয়াপরবশ হয়ে পড়েন, এই সময়ে লোকসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় অন্যায়ের প্রতিকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। এবং পতিতজনের প্রতি কোনোরূপ শঙ্কা থাকে না। এইসব হল প্রকৃত অর্থে যুগান্তকালের লক্ষণ।

এই কলিযুগে অধর্মের ফলে মানুষের মধ্যে কিছু নীচ প্রবৃত্তি দেখা দেয়। মানুষ পরধনহরী পরদারধর্ষী, কামুক, দুরাত্মা ও দুঃসাহসপ্রিয় হয়ে ওঠে, তার মধ্যে জ্ঞানহীনতা প্রকাশ পায়। পুরুষ হয় মুক্তকেশ ও দুর্বল। ষোলো বৎসর অতিক্রম করার আগেই মানুষের মৃত্যু ঘটতে থাকে। কলিযুগে শূদ্রদের ব্যবহারে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। শুক্লদন্ত, জিতেন্দ্রিয়, মুণ্ডিত মস্তক, কাষায় বস্ত্র পরিহিত শূদ্ররা ধর্মাচরণ করতে থাকেন। বহু লোক শস্যচোর ও বস্ত্রচোর হয়ে ওঠেন। চোরেরা চোরের, অপহারকেরা অপহারকের ধন পর্যন্ত চুরি করতে থাকেন। জ্ঞান ও কর্মের পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটে যায়। প্রত্যেকটি লোক ক্রিয়ানুষ্ঠান রহিত হলে কীট, মূষিক ও সর্প মানুষের বিনাশক রূপে দেখা দেয়। সুভিক্ষ, সুমঙ্গল, আরোগ্য ও সামর্থ্য ক্রমশ দুর্লভ হয়ে ওঠে। পেচকেরা ক্ষুধাতুরা দেশে বাস করতে বাধ্য হয়।

কলিযুগে দুস্পরিপ্লত মানুষের আয়ুষ্কাল লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পায়। বেদসমূহ প্রায়ই দুর্লভ হয়ে ওঠে। যজ্ঞ অধর্মপীড়িত হয়ে উৎপন্ন হয়। কষায় বস্ত্রপরিহিত গ্রন্থবিহীন শূভ্র কাঁপালিকেরা প্রবল হয়ে ওঠেন। এছাড়া কেউ বেদ বিক্রয় করেন, কেউ তীর্থ বিক্রয় করেন, কেউ আবার হয়ে ওঠেন বর্ণাশ্রমপরিপন্থী পাষণ্ড। কলিযুগ সূচিত হবার সময় থেকেই বেদ অধ্যয়ন ক্রমশ কমে আসে। ধর্মার্থ বিষয়ে শূদ্ররাই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। ধর্ম ভিন্ন রাজপদে শূদ্রদের একাধিপত্য ঘটে। তারা অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন বন্ধ করে দেন। স্ত্রী বধ ও গোবধ করে প্রজারা নিজেদের অভীষ্ট পূরণ করতে থাকেন। ভূণহত্যাও অধরা থাকে না। দেশে রোগ, মোহ, গ্লানি, অসুখ ও তমোগুণ পরিপূর্ণ হয়। আয়-বল-রূপাদি–সবদিক দিয়েই কলিকাল হীন হয়ে পড়ে।

যুগান্তকালের এই হীনাবস্থার মধ্যে কিছু কিছু ধার্মিক দ্বিজ ধর্মাচরণে ব্রতী থাকেন। মানুষের পক্ষে সিদ্ধিলাভ সহজ হয়ে ওঠে। এই সময়ে যে ব্যক্তি অসূয়াবিহীনভাবে স্মৃতি ও শ্রুতি অনুসারে কর্মানুষ্ঠান করতে সমর্থ হতেন, তিনিই শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করতেন। তাই ত্রেতা যেখানে যুগে এক বৎসর, দ্বাপরে এক মাস সেখানে কলি কালে মাত্র একদিন যথাশক্তি ধর্মাচরণ করলেই সিদ্ধলাভ সম্ভব হয়। সংক্ষিপ্তাকারে এই হল কলিযুগের অবস্থা। এখন আমি সন্ধ্যাংশ কালের বিবরণ দেব, শুনুন।

যুগে যুগে সিদ্ধি সমূহের তিন তিন পদের হানি ঘটে। এইসব সন্ধ্যা স্বভাবতই পাদমাত্র থাকে এবং সন্ধ্যা স্বভাববশত সব সন্ধ্যাংশ পাদ অনুসারে বর্তমান থাকে। এই কালে যুগান্তকালে সন্ধ্যাংশের কাল উপস্থিত হলে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রমিতি নামে এক রাজা মাধবের অংশে জন্ম নেন। এই রাজা চন্দ্রের গোত্রানুসারী। অসাধুদের শাসক এবং ভৃগুবংশীয়দের নিধনের কারণ রূপে তার আবির্ভাব। তিনি দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরে পৃথিবী পর্যটনের পর যে সেনাবাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন তাতে হস্তী, অশ্ব ইত্যাদির বিশাল সমাবেশ ছিল। এরপর তিনি অস্ত্রধারী শতসহস্র বিপ্রদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে পৃথিবীকে ম্লেচ্ছমুক্ত করলেন।

সর্বত্রগতি সম্পন্ন ও প্রভাবশালী সেই রাজা প্রমিতি সমুদয় শূদ্রযোনিজাত পাষণ্ড রাজাদের নিঃশেষ করলেন। অত্যধিক ধর্মশালী নন এমন সমস্ত শূদ্রযোনিজাত পাষণ্ড রাজা তিনি হত্যা করলেন। পৃথিবী থেকে অধর্ম অসুখ অসূয়া গ্লানি নাশ করার পর সর্বপ্রাণীর অজেয় হয়ে রাজা প্রমিতি পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন। পৃথিবী ভ্রমণের সময়েও তিনি পৃথিবীকে রক্ষা করার কাজে অব্যাহতি দেন নি। উত্তর দিক পার্বতীয় মধ্য পূর্ব ও পশ্চিম দিক, বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চিমদিক, দাক্ষিণাত্য, দ্রাবিড়, সিংহল গান্ধার এবং পারদ দেশের মানুষদের তিনি হত্যা করেছিলেন। এছাড়া প্রহ্নব, যবন, তুষার, বর্বর, চীন, শুলিক, দরদ, লম্বাক, মস, কেত, কিরাত, এবং অন্যান্য বহু ম্লেচ্ছ জাতির তিনি বিনাশ ঘটান। রাজা প্রমিতি ছিলেন পূর্বজন্মবিধাজ্ঞ, বীর্যবান এবং বিজ্ঞ। জন্মগ্রহণের পর বত্রিশ বছর অতীত হলে তিনি এই বিনাশযজ্ঞ শুরু করেন। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে সহস্র সহস্র দুবৃত্ত মানুষ ও অধর্মী মানুষদের হত্যা করেন। এইভাবে উগ্র কর্ম দ্বারা এই পৃথিবীতে তিনি নিজের বীর্য মাত্র অবশিষ্ট রেখেছিলেন। তিনি প্রায়শই আকস্মিক কোপবশত অধার্মিক শুদ্রদের বিনাশ করতেন এবং অনুগামীদের সাথে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থানে অবস্থান করতেন। সমস্ত ম্লেচ্ছ রাজা ও স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদের বিনাশ করার পর সেই সত্য সৈনিক রাজা যখন বিগত হলেন, তখন যুগান্তকালে সন্ধ্যাংশ কাল উপস্থিত হলে কোথাও অল্প কিছুসংখ্যক ম্লেচ্ছ প্রজা অবশিষ্ট রইলেন।

কালক্রমে এইসব অবশিষ্ট প্রজারা দুর্দমনীয় হয়ে উঠলেন। এঁরা দলে দলে নিন্দিত আচারের বশবর্তী হয়ে পরস্পরের হত্যানেশায় মেতে উঠলেন। শেষে যুগবশে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হলে সেই সমস্ত প্রজারাও ভয়কাতর হয়ে পড়লেন। তারা যুদ্ধ করতে করতে পরিশ্রান্ত ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে গৃহিণী ও গৃহস্থান দুটোই ত্যাগ করলেন। তারা নিজের নিজের প্রাণ রক্ষার বিষয়ে তৎপর হয়ে গৃহপরিবেশ পরিত্যাগ করে দুঃখের সাথে কালযাপন করতে লাগলেন। এভাবে যুগান্তকালে বৈদিক ধর্ম ও সমাতন ধর্ম দুটোই পারস্পরিক আঘাতে নষ্ট হবার উপক্রম হলে প্রজারা আরও বেশি মর্যাদাহীন, অভিমানহীন, স্নেহশূন্য ও লজ্জাবোধহীন হয়ে পড়লেন।

তাদের সুস্থ বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেল। তারা মাত্র পঁচিশ বৎসর আয়ুর অধিকারী হয়ে রইলেন। ইন্দ্রিয় বিষাদ তাঁদের তীব্র ভাবে অধিকার করল। এরই মাঝে বসুধাতলে দেখা দিল অনাবৃষ্টি প্রজাগণ দুঃখিত মনে অর্থাদি উপার্জনের চিন্তা পরিহার করলেন। গৃহছাড়া প্রজারা এবার নিজের নিজের উৎপাদনটিকেও পরিত্যাগ করলেন এবং জনপদের প্রান্ত সীমায় গিয়ে বসবাস করতে থাকলেন। তারা নদী, সাগর, কুপ ও পর্বতে গিয়ে ফলমুল, মধু, মাংস ইত্যাদি সংগ্রহ করে অতীব দুঃখের সঙ্গে জীবনধারণ করতে লাগলেন। দারা ও পুত্রহীন অবস্থায় জীর্ণবস্ত্র পরিহিত এইসব ভীত দুঃখী প্রজারা বর্ণাশ্রমধন ভ্রষ্ট হয়ে ভয়াবহ এক সংকর জাতির সৃষ্টি করলেন।

এতদ্বারা এইসব অল্পাবিশিষ্ট প্রজারা কষ্টের চরম পরাকণ্ঠায় এলেন। তারা জরা, ব্যাধি ও ক্ষুধাকাতর হয়ে পীড়িত অবস্থায় দুঃখ ভারে নির্বেদ লাভ করলেন। এই নির্বেদ থেকে বিচার, বিচার থেকে সাম্যাবস্থা, সাম্যাবস্থা থেকে সম্বোধ এবং সম্বোধ থেকে ধর্মশীলতা ফিরে এল। সুতরাং কলিযুগে অবসান কালে এইসব অল্পবিশিষ্ট প্রজারা বিচারবুদ্ধি লাভ করলেন। তখন অহোরাত্র ও যুগের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। ভবিষ্যৎ বিষয়ে বলবত্তা হেতু তাদের চিত্তে সম্মোহন ঘটিয়ে সপ্তম সত্যযুগ এল।

সত্যযুগের সূচনা হলে কলিযুগের অল্প অবশিষ্ট প্রজারা পূর্বেকার সত্যযুগে উৎপন্ন প্রজাদের মতো হলেন। সেই পূর্ব সত্যযুগে যে সিদ্ধ সম্প্রদায় ছিলেন দেখা গেল সপ্তম সত্যযুগের প্রজারাও তেমন আচরণ করছেন। সেই সময় সেইসব সপ্তর্ষিগণও অবস্থান লাভ করলেন। সত্যযুগের বীজের জন্য যেসব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণজাত মানুষ অবশিষ্ট ছিলেন, কলিকালে উৎপন্ন মানুষদের সাথে তাদের কোনোরকম পার্থক্য রইল না। সপ্তর্ষিগণ এই সকল সুব্রত মানুষদের উদ্দেশে ধর্মোপদেশ বিতরণ করলেন। বৈদিক ও স্মার্ত্ত ধর্মানুসারে বর্ণাশ্রমের

আচরণ সম্পন্ন ধর্মও দুই ভাগে বিভক্ত হল। এইভাবে কুত যুগের প্রজারা ক্রিয়াবান হলেন এবং সপ্তর্ষিগণ দ্বারা প্রদর্শিত বৈদিক ও স্মার্ত্ত ধর্ম প্রবর্তিত হল।

প্রজাদের মধ্যে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য এই সপ্তর্ষিমণ্ডল মন্বন্তর অধিকারে যুগক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকলেন। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, প্রখর গ্রীষ্মকালে তৃণসমূহ দাবদগ্ধ হয়ে গেলেও তাদের মূলে যেমন নূতন অঙ্কুরোদগম দেখা যায়, সেই রকম ভাবে একটি যুগ নষ্ট হয়ে গেলেও তা থেকে অপর একটি যুগের উৎপত্তি হয়ে থাকে এবং এই যুগধারা একটি মন্বন্তরের ক্ষয় পর্যন্ত চলতে থাকে। সুখ, আয়ু, বল, রূপ, ধর্ম-অধর্ম, কাম প্রভৃতি যুগপদক্রমে ক্ষীণ হয়ে যায়। যুগ সমূহের সমস্ত ধর্ম সিদ্ধির যুগ–সন্ধ্যাংশকালের সাথে যুগে যুগে ক্ষীণ হয়ে যায়।

হে দ্বিজগণ, এতক্ষণ আমি আপনাদের কাছে প্রতিসন্ধি বিষয়ে বললাম! এবার আমি অনুষঙ্গপাদের বিষয়ে বিস্তারিত বলব, আপনারা শ্রবণ করুন।

সমস্ত যুগেই পূর্বোল্লিখিত ভাবে ক্রিয়া ও ধর্মাদিকর্ম সম্পন্ন হয়ে থাকে। এইসব চতুর্যগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। একেই ব্রহ্মার দিবাকাল বলা হয়ে থাকে। ব্রহ্মার রাত্রিও সেই পরিমাণে হয়। ব্রহ্মার যুগক্ষয় না আসা পর্যন্ত জীবদের সরলতা ও জড়তা অক্ষুণ্ণ থাকে। সমস্ত যুগের এটাই হল স্বাভাবিক লক্ষণ। এইভাবে চতুর্থযুগের যে গণনা তা সত্তর সংখ্যক হয়। এরকম একটি সত্তর সংখ্যক যুগ পরিবর্তিত হলেই তাকে এক মন্বন্তর বলা হয়। এই যে নিয়ম প্রতি চতুর্যগেই তেমনটি হয়ে থাকে এবং সেই ক্রমে অপর যুগেও হয়ে থাকে।

প্রতি সৃষ্টিতে মন্বন্তর সমূহের ভেদ হয়। তার পরিমাণ পঞ্চবিংশতি। এর কোনো ন্যূনতা বা আধিক্য হয় না। কল্পযুগের সাথে এদের লক্ষণ সমান। সমস্ত মন্বন্তরের ক্ষেত্রে এই-ই হল সাধারণ লক্ষণ। চিরকাল যুগের ভাবনানুসারেই যুগের পরিবর্তন সাধিত হয়ে এসেছে। আর জন্ম ও মৃত্যুর দ্বারা। জীবলোকের পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু এই পরিবর্তিত অবস্থা সমূহ কখোনই চিরস্থায়ী হয় না। সমস্ত মন্বন্তরে দৃষ্ট অতীত ও অনাগত যুগসমূহের এই লক্ষণগুলির বিষয়ে আমি যা বললাম তা থেকে আপনারা এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠুন।

আশা করি, প্রাজ্ঞজন মাত্রেই অতীত ও অনাগত সমস্ত মন্বন্তরেই এই ধরনের লক্ষণ দেখে বুঝে নেবেন। এক মন্বন্তরের ক্ষেত্রে যেমন লক্ষণাদির কথা বললাম, কল্পে কল্পে সকল মন্বন্তরেই তেমন লক্ষণ দেখা দেবে বলে জানবেন। তবে এই মন্বন্তরের সমস্ত অভিমানীরা নাম ও রূপের দ্বারা ভিন্নি ভিন্ন হবেন। ক্রমান্বয়ে আটজন দেবতা এইসব মন্বন্তরগুলির অধীশ্বর হয়ে থাকেন।

মন্বন্তর কালে আর্বিভূত ঋষিগণ ও মনুগণের প্রয়োজন পরস্পরতুল্য। এই ভাগে যুগের পর যুগ ধরে বর্ণাশ্রম বিভাগ অপরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রভাবশালী লোকপিতামহ ভগবান ব্রাহ্ম যুগ স্বভাবানুসারে বর্ণাশ্রম ও যুগবিধান করে যাবেন।

অনুষাঙ্গপাদের কথা এখানেই শেষ হল এখন আমি সৃষ্টিসর্গ বিষয়ে বলব। এই পর্যায়ে সমস্ত যুগের বিস্তৃতিরূপে সমস্তই আনুপূর্বিক বর্ণনা করব।

.

৫৪.

পুরাণজ্ঞ সূত বলতে লাগলেন, কোন্ যুগে কোন্ কোন্ গো-রাক্ষস অসুর সর্প পক্ষী যক্ষাদি প্রজা জন্মগ্রহণ করবে এবং সেই নির্দিষ্ট যুগকালে তাদের আয়ুষ্কাল হবে, এবার সেই বিষয়ে বিস্তারিত বলছি, শ্রবণ করুন।

বিভিন্ন যুগের নিজস্ব ধর্মানুসারে সমস্ত স্থাবর পদার্থের সাথে মনুষ্য পশু ও পক্ষীকুলের আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কলিযুগে প্রাণীদের আয়ুষ্কালে অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ ভাবে যুগনির্বিশেষে মানুষের আয়ু শতবর্ষ নির্ধারিত করা হয়েছে। আর পিশাচ, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও সরীসৃপরা এক যুগ পর্যন্ত জীবিত থাকে। কেউ বধ না করলে এদের মৃত্যু হয় না। শুধু জীবনসীমাই নয় প্রাণীদের দেহ পরিমাণও যুগ অনুযায়ী বর্ধিত বা হ্রাসমান হয়।

দেখা গেছে দেবাসুরদের দেহ পরিমাণ একশো আটান্ন আঙুল। এই পরিমাণের সঙ্গে তুলনা করলে মানুষের দেহ পরিমাণ সাতান্ন আঙুল হ্রস্ব হয়। দেবাসুরদের উচ্চতার পরিমাণ মানুষের উচ্চতার পরিমাণের তুলনায় চুরাশি আঙুল বেশি হয়। এই যে আপাদমস্তক পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় তা নিজের নিজের আঙুলের পরিমাণ অনুসারে করতে হয়। মানুষের এই যে দেহ পরিমাণ এটাও কিন্তু যুগান্তকালে হ্রস্ব হয়ে আসে।

অতীত ও অনাগত সব যুগেই মানুষের দেহ নিজের আঙুলের পরিমাণ অনুসারে অষ্টতাল হয়। যে মানুষের দেহ আপাদমস্তক নবতলে পরিমিত, দুই বাহু আজানুলম্বিত ও সুদৃঢ়, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরেরও পূজ্য। শুধু মানুষ নয়, গে, অশ্ব, অজ, মহিষ, গত ও স্থাবর পদার্থসমূহের ক্ষেত্রেও দেহপরিমাণ ও উচ্চতার যুগে যুগে হ্রাস অথবা বৃদ্ধি ঘটে। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক যে পরিমাণ সুচি পাওয়া যায় তা হল পশুদের ককুদ ছিয়াত্তর আঙুল, হস্তীদের পরিমাণ একশত আট আঙুল, অশ্ব ও বানরদের উচ্চতা পঞ্চাশ আঙুল পরিমাণ।

যদি তত্ত্বদৃষ্টিতে বিচার করা হয়, তাহলে মানুষের শরীর সন্নিবেশ যেরকম, দেবতাদেরও অনুরূপ শরীর সন্নিবেশ দেখা যায়। তবে দেবতাদের শরীরে অতি বুদ্ধি তুলনায় মানুষের অল্প বুদ্ধি থাকে। মানুষ বা দেবতার বাইরে অন্যান্য যুগপ্রাণী যেমন; পশু, পক্ষী ও স্থাবরদের বিষয়েও আপনারা জানতে চাইবেন নিশ্চয়ই। তবে জেনে রাখুন, গরু, হস্তী, অশ্ব, মহিষ, অজ, পক্ষী ও বৃক্ষসমূহ সকল প্রকার যজ্ঞীয় কার্যকলাপের উপযুক্ত। এরা জীবনান্তে স্বর্গে গিয়েও সেই সেই পূর্বশরীর লাভ করে আর তাকে যথেচ্ছভাবে উপভোগ করে। এরা স্বর্গে গিয়ে

দেবতাদের মতো শুভ মূর্তি ধারণ করে থাকে। তাদের মতো কৃতী ব্যক্তিরাও সেই সেই রূপের ও সেই সেই পরিমাণের মনোজ্ঞ স্থাবর ও জঙ্গমাবস্থা লাভ করে।

এবার যাঁরা শিষ্ট, সৎ ও সাধু প্রকৃতির, তাঁদের কথা বলব।

ব্রহ্মার আরেক নাম হল সৎ। যাঁরা তাঁর মতো স্বভাব, ব্রহ্মার তারা তারা সাযুজ্য লাভ করে থাকেন। এইজন্য তাদেরকেও 'সৎ' বলে অভিহিত করা হয়। যাঁরা দশপ্রকার ভোগে ও আটপ্রকার কারণে ক্রুদ্ধ হন না, সতত হৃষ্ট থাকেন, তাদের বিজিতাজ্ঞা বলা হয় ধর্ম-বর্ণতর বাইরে এগুলিকে মানুষের সাধারণ গুণ বলে জানবেন।

এই পৃথিবীতে ব্রহ্মা কর্তৃক বিভাজিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামে তিনটি প্রধান জাতি আছে। এঁরা সবসময় সামান্য ধর্ম অথবা বিশেষ ধর্মে নিরত থাকেন বলে এঁদের 'দ্বিজাতি' বলা হয়। দ্বিজাতি মাত্রই বর্ণাশ্রমে যুক্ত থাকা এবং শ্রৌত ও স্মার্ত ধর্মের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দ্বিজাতিভুক্ত যে কেউ সাধু হতে পারেন। চতুরাশ্রমের যে কোনো পর্যায়েই তা হওয়া সম্ভব। যেমন–যদি কেউ বিদ্যার সাধন করেন, তিনি হবেন বিদ্বান সাধু। যদি কেউ গুরুর হিতসাধন করেন, তাহলে তিনি হবেন ব্রহ্মচারী সাধু। আবার গৃহে থেকেও যদি কেউ নিষ্ঠাভরে ধর্মাদি ক্রিয়া পালন করেন, তাহলে তিনি হবেন গৃহস্থ সাধু। সর্বোপরি কেউ যদি যোগসাধনে সচেষ্ট হন তবে তিনিও সাধু বলেই পরিচিত হবেন। আবার অরণ্যের নির্জনে তপঃ সাধনের রত বৈখানসত্ত সাধু নামের যোগ্য। এইভাবে নিজের নিজের আশ্রম ধর্ম পালন করার মধ্যে দিয়ে গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ গমনকারী ও ভিক্ষুক অবধি সাধু নামে অভিহিত হতে পারেন।

এই মর্ত্যলোকে ধর্ম ও অধর্ম নামে শব্দ দুই কার্যানুসারেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে। প্রধানত কুশল ও অকুশল কর্মই ধর্ম ও অধর্ম নামে পরিবেশিত হয়ে থাকে। ধৃতি অর্থযুক্ত ধাতু থেকে ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়। যাঁরা বয়োবৃদ্ধ, নির্লোভ, আত্মসংযমী, অদাম্ভিক, অতি বিনীত ও সরল এই লোকে তারাই আচার্য পদবাচ্য হয়ে যাবেন, এঁরা নিজেরা যা যা আচরণ করেন তা-ই স্থাপন করেন। এঁরা যম ও নিয়মে যুক্ত থেকে শাস্ত্রার্থ চয়ন করেন। এঁদের উপদেশ মতো যা অভীষ্ট দ্রব্যার্থকে লাভ করায় তা-ই হল ধর্ম। অন্যদিকে কারো আচরণে উল্লিখিত ধারণা ও মহত্বের অভাব ঘটলে তাকে অধর্ম আচরণ বলা হয়। দেবগণ, পিতৃগণ, মুনিগণ এবং সংযমাত্মা মানবগণ অভেদ দর্শন করে থাকেন বলে কোনো বিষয়েই এটি ধর্ম বা এটি অধর্ম বলে মত প্রকাশ করেন না। ধর্ম দুই প্রকার শ্রৌত ধর্ম ও স্মার্ত ধর্ম।

পূর্বাচার্যদের কাছে থেকে জ্ঞান লাভ করে সপ্তর্ষিগণ সেই অনুসারে শ্রৌত ধর্ম সম্বন্বিত উপদেশ দিয়ে থাকেন। ঋক্‌ সাম্‌, যজু, সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং বেদাঙ্গসমূহ থেকে অতীত মন্বন্তরের আচার বিচার স্মরণ করে সপ্তর্ষিগণ এগুলোকেও প্রকাশ করে গেছেন। এই কারণে বর্ণাশ্রম থেকে উৎপন্ন ধর্মকে স্মার্ত ধর্ম বলে। এবার আমি শিষ্টাচার বিষয়ে সংক্ষেপে আপনাদের কাছে কিছু তত্ত্ব প্রদান করব।

শেষ শব্দ থেকে শিষ্ট শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এই কারণে 'শেষ আচার'-কে শিষ্টাচার বলা হয়ে থাকে। মন্বন্তরগুলিতে যেসব শিষ্ট ধার্মিকগণ থাকেন, যেমন শিষ্ট মনু এবং সপ্তর্ষিগণ। এঁরা লোকের বিস্তার কল্পে ধর্মের সম্যক আচরণ করে থাকেন। এজন্য তারা যেসব ধর্মতত্ত্ব যথাযথভাবে বলেন, সেসব শিষ্ট মন্ত্রাদির কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ এইসব শিষ্ট মনু ও সপ্তর্ষিগণ যুগে যুগে ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি, যজ্ঞ, বর্ণাশ্রমজনিত আচরণ বারবার করে থাকেন। যেহেতু শিষ্টাচারগুলি পূর্ব পূর্ব ঐতিহ্য অনুসারে চলে আসে, তাই পূর্বাচার্যদের দ্বারা আচরিত শিষ্টাচারকে শ্বাশ্বত বলে মনে করা হয়।

দান, সত্য, তপস্যা, অলোভ, বিদ্যা, যজ্ঞ, সন্তান উৎপাদন এবং দয়া–এই আটটি হল শিষ্টাচারের লক্ষণ। প্রত্যেক মন্বন্তরেই শিষ্ট মনুগণ ও সপ্তর্ষিদের দ্বারা এই ধর্মাচরণ পালিত হয় বলে সমস্ত মন্বন্তরেই এই ধর্ম শিষ্টাচার বলে প্রসিদ্ধি পায়। এগুলি শ্রবণ করা হয় বলে শ্রৌত ও স্মরণ করা হয় বলে স্মার্ত নাম নির্দিষ্ট হয়েছে। যাগযজ্ঞ ও বেদাত্মক আচরণ হল শ্রৌত আর বর্ণশ্রমাত্মক ধর্ম হল স্মার্ত।

এবার আমি প্রত্যক্ষ ও ধর্মের লক্ষণ বিষয়ে আপনাদের বলব।

প্রচুর অর্থশালী হওয়া সত্ত্বেও যিনি জিজ্ঞাসিত হলে বিষয় কোপন করেন না, উপরন্তু যথাযথ বর্ণনা দেন তার সকল কথা সত্য। তপস্যার মূল শর্ত ব্রহ্মচর্য। জপ, মৌন ও অনাহার। যিনি এই সমস্ত আচরণ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন তিনিই প্রকৃত তপস্বী, কিন্তু মনে রাখবেন, এগুলি যথার্থভাবে পালন করা অতি-ভয়াবহ ও ক্লেশসাধ্য। পশু, দ্রব্য, হবিঃ, ঋক, সাম, যজুঃ ঋতিকও এসবের একত্র সংযোগ হল যোগ। সর্বভূতে আত্মদৃষ্টি হিতাহিত ব্যতিরেকে সকলকেই সমদৃষ্টিতে দেখাকে দয়া বলা হয়।

কেউ আপনার প্রতি আক্রোশ প্রদর্শন করলেও তার প্রতি আক্রোশ না করা কেউ আঘাত করলেও তাকে পাল্টা আঘাত না করা এবং বাক্য-মনু-কর্ম দ্বারা সর্বান্তকরণে ক্ষমা করার যে গুণ তাকেই তিতিক্ষা বলা হয়।

ধনস্বামী যে ধন রক্ষা করতে না পেরে পরিত্যাগ করছেন, কিংবা যে ধন মালিকানাহীন ভাবে মাটিতে পড়ে আছে–সেইসব পরধন পর্যন্ত গ্রহণ না-করার নাম হল অলোভ। মৈথুন আচরণ, দর্শনচিন্তা এমনকি কল্পনা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখার নাম ব্রহ্মচর্য। যিনি এই নিবৃত্তি সার্থকভাবে পালন করেন, তিনিই ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচর্য যখন নির্দোষ হয় তখনই তাকে 'দম' বলা হয়।

নিজের জন্যই হোক অথবা পরের জন্যই হোক অকারণে ইন্দ্রিয়ে প্রবৃত্তি না হওয়াই হল শমের লক্ষণ।

যিনি দশ প্রকারের ভোগ্য পদার্থে এবং আট প্রকারের কারণে প্রতিহত হয়েও ক্রুদ্ধ হন না, তাঁকে জিতাত্মা বা বিজিতাত্মা বলা হয়।

নিজের যা যা কিছু ইষ্টতম বস্তু এবং যে যে বস্তু ন্যায্যত সৎপথে উপার্জিত হয়েছে সেইসব আকাঙিক্ষত বস্তুসম্ভার বিনা দ্বিধায় গুণবান পাত্রে দান করাই হল মহান দানের লক্ষণ, এই দান জ্যেষ্ঠ, মধ্যম, কনিষ্ঠ–এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। যে দান নিঃস্বার্থ নিশ্চিত মঙ্গলকর তা জেষ্ঠ্য দান। যে দান করুণাবশত সম্পর্কিত প্রাণী ও বন্ধুদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় তা মধ্যম দান। আর সম্পর্নভাবে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে দান তা হল অধম দান। এই দানকে কনিষ্ঠ দানও বলে। শ্রুতি ও স্মৃতি

অনুমোদিত যে বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং শিষ্টাচারের দ্বারা অবরুদ্ধ যে কার্যাবলি তাই-ই হল ধর্ম। কেবলমাত্র সৎ ও সাধু ব্যক্তির সঙ্গে সংসর্গের মাধ্যমেই ধর্ম সুষ্ঠভাবে পালিত হতে পারে।

প্রীতি পরিতাপ ও বিষাদ থেকে নিবৃত্তি লাভ করলেই জীবনে বৈরাগ্য আসে। ইষ্ট পরম ইঙ্গিত নয়, এমন বস্তুতেও যখন বিরক্তি উৎপাদন হবে না আবার ইষ্ট বহু লাভ করেও যখন আনন্দ হবে না তখন চিত্তে বৈরাগ্য জন্মেছে বলে জানতে হবে।

অকৃতকর্মের সঙ্গে সঙ্গে কৃতকর্মের সমর্পণ এবং কুশল-অকুশল সকল প্রকার কর্মের পরিত্যাগ ত্যাগ বলে বিবেচিত হয়।

যে-কোনো বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি হল জ্ঞান। এই অচেতন জগতে অব্যক্ত অবিশেষের বিকার এবং চেতন থেকে অচেতনের পৃথকীকরণ এই ধরনের বিশেষ জ্ঞান।

পূর্ব পূর্ব স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ধর্মতত্ত্ব প্রাজ্ঞ ঋষিরা ধর্মের এইসব প্রত্যক্ষের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন, এবার আমি বর্তমান মন্বন্তরের পারস্পরিক বর্ণ ও চতুর্বর্ণের বিধি বিষয়ে আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা দেব। যেহেতু প্রতি মন্বন্তরেই শ্রুতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তাই এই আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ঋক, সাম যজুঃ–এই তিনটি বেদই প্রলয়কালে প্রতিটি দেবতার সাথে পরিবর্তিত হয়। কেবলমাত্র শতরুদ্রিয় পরিবর্তিত হয় না।

বিধি, হোত্র ও স্তোত্রও পূর্বের মতো মন্বন্তর ভেদে পরিবর্তিত হয়। দ্রব্যস্তোত্র, গুণস্তোত্র, কর্মস্ত্রোত্র ও অভিযোনিক এই চার প্রকারের স্তোত্র আছে। যে যে মন্বন্তরের যে যে দেবতা কর্তৃত্ববান হবেন তারাই এই চার প্রকার ব্রাহ্ম স্তোত্র নির্দিষ্টভাবে প্রবর্তিত করে দেন। এই একই ভাবে মন্ত্র ও গুণের উৎপত্তিও চার প্রকার হয়ে থাকে।

পূর্ব পূর্ব মন্বন্তরের মহাতেজাঃ ঋষিরা যখন উগ্র ও অতিদুশ্চর তপস্যা করেছিলেন, তখন অথর্ব এই তিনটি বেদে ওইসব ঋষিবৃন্দের পরিতোষ, সাম, যজুঃ, দুঃখ, ভয়ভীতি, সুখ, শোক প্রভৃতি থেকে পৃথক পৃথক মন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল।

ইচ্ছামতো দর্শন এবং সমগ্র জীবনব্যাপী যে তপস্যা করেন, তারই পুণ্যফলে ঋষিগণ ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন। ঋষিত্ব-র লক্ষণ বিষয়ে এখন আমি আপনাদের সচেতন করব।

অতীত ও অনাগত কালসমূহের মধ্যে পাঁচ শ্রেণীর ঋষি আছেন। এখন আমি সেইসব ঋষিদের কথা বলব। আর কীভাবে তাদের উৎপত্তি হয়েছে সেই সম্বন্ধেও বলব।

গুণসাম্যাবস্থায় যখন প্রলয় শুরু হল তখন দেবতাদের ওপর অত্যাচার হতে থাকায় জগৎ তমোময় হয়ে পড়ে। তখন বুদ্ধি না থাকলেও চেতনার জন্য প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটত। সেই অবস্থায় বুদ্ধিলাভের পূর্বেই জগতে চেতনা অধিষ্ঠিত ছিল। জলে যেমন মাছ ও জল দুই-ই থাকে তেমনিভাবে চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়েই বুদ্ধিতত্ত্ব গুণরূপে প্রবর্তিত হয়।

তারপর থেকেই বিষয়ের বিষয়িত্ব হেতু, অর্থের অথিত্বহেতু ও কার্যের কারণত্বহেতু চেতন প্রবর্তিত হতে থাকে। প্রাপ্তব্য কালের সাহায্যে কারণাত্মক ভেদগুলি সিদ্ধ হতে থাকে। আর তখন থেকেই ক্রমে ক্রমে মহাদদি, ব্যক্ত হতে থাকে। এই মহৎ তত্ত্ব থেকে অহংকার, অহংকার থেকে ভূতপদার্থ এই ভাবে পরপর ক্রমানুসারে সৃষ্টি হতে থাকে কেন না কারণ সংসিদ্ধ হলে

কার্য সাথে সাথে প্রবর্তিত হয়। জ্বলন্ত অঙ্গারের ঊর্ধ্বর্ভাগ স্খলিত হলে তা যেমন এককালে প্রবর্তিত হয়ে থাকে, সেই রকমভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এককালে ও এক ক্রিয়ায় প্রকাশিত হন।

অন্ধকার পরিবেশে জোনাকি পোকা যেমন হঠাৎ আলোর ঝলকানি নিয়ে আসে, সেই রকম জ্যোতিপ্রভা সহ অব্যক্ত থেকে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে।

পূর্ব পূর্ব অবস্থায় সেই মহান বিদ্বান সশরীরে যেখানে যেমনভাবে অবস্থান করছিলেন, সেখানে তেমন ভাবেই তিনি দ্বারশালার মুখে অবস্থান করলেন। এ সম্পর্কে শ্রুতিতে বলা হয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যবশতঃ সেই মহান বিদ্বান পুরুষ সেই তমের প্রান্তভাগেই অবস্থান করেন।

সেই বিবর্তমান থেকে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ও ধর্ম–এই চার প্রকার বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটে।

সেই শরীরধারী মহৎ তত্ত্বের বিবর্তন থেকে সাংসিদ্ধিক ও সুপ্রতীক নামে সিদ্ধির উৎপত্তি ঘটে।

এই শরীর রূপ পুরীতে যিনি শয়ন করেন তার নাম পুরুষ (পুরী-শ) এবং ক্ষেত্রজ্ঞান সম্পন্ন বলে তার নাম হয়েছে ক্ষেত্রজ্ঞ। এই একই কারণে ক্ষেত্রজ্ঞ ভগবান 'মতি' নামে অভিহিত হন। বুদ্ধিপূর্বক শয়ন করেন বলে তাকে 'বোধাত্মক'ও বলা হয়। সৃষ্টি সংসিদ্ধির জন্য ইনিই একাধারে ব্যক্ত, অব্যক্ত ও অচেতনরূপে পরিণত হয়েছেন।

ক্ষেত্রজ্ঞের দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞতা যখন সংগৃহীত হন, তখনই নিবৃত্তি উৎপন্ন হন। প্রাথমিক অবস্থায়। এই নিবৃত্তি বুদ্ধির বিষয় হয়ে থাকে। পরে এই বিষয় যখন ক্ষেত্রজ্ঞের দ্বারা পরিজ্ঞাত হয় তখন তা ভোগ্যা হয়ে থাকে।

গমনার্থক ঋষ ধাতু থেকে ঋষি শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এঁরা বেদ অধ্যয়ন, সত্য ও তপস্যায় সতত নিযুক্ত থাকেন বলে ব্রহ্মা এঁদের ঋষি আখ্যা দিয়েছেন।

নিবৃত্তির সমান কালে ঋষি তার স্বয়ংবুদ্ধিবলে অব্যক্ত স্বরূপ হন, যেহেতু ঋষি পরমব্রহ্মকে লাভ করেন তাই তিনি পরম খ্বিষি নামে খ্যাত হন।

গমনাথুক 'ঋষ' ধাতুর অর্থ আদি থেকে নিবৃত্তি এবং স্বয়ং উদ্ভূত। এই অর্থজনিত কারণেও আত্মার ঋষিত্ব আছে। কারণ ঈশ্বর স্বয়ং উদ্ভূত আর ব্রহ্মার মানসপুত্র তার মনু থেকে উদ্ভূত।

এই যে ঈশ্বর এবং ব্রহ্মপুত্র–এঁদের সম্মান কখনও নষ্ট হয় না। আবার যেহেতু এঁরা সর্বপ্রকার গুণযুক্ত হয়ে বুদ্ধির পরমতত্ত্বকে আত্মস্থ করেন, তাই এরা পরমর্ষি (পরম-ঋষি) বলে নিরূপিত হয়ে থাকেন।

ঋষিগণ সতত ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, তারা সর্ববিধ অহংকার ও তমোগুণ পরিহার করে তবেই ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন। তাই তাদের হৃদয় অন্তঃস্থল পর্যন্ত আনন্দরসের ধারা সদা প্রবহমান থাকে।

এই যে সদানন্দচিত্ত ঋষিবৃন্দ এঁরা ভূতাদির ভক্তবিষয়ক ঋষি বলে জগদ্বিখ্যাত। ঋষিদের মৈথুনজাত এবং ঋষিপত্নীদের গর্ভসম্ভূত বলে ঋষিপুত্ররা ‘ঋষিক’ নামে খ্যাত।

এই মহাতেজঃ দৃঢ়ঃব্রতা ঋষিগণ বাস্তবিক অর্থেই তন্মাত্র মাত্র ভোগ করে থাকেন বলে এঁরা কোনো মতে ‘সত্যর্ষি সতদানি’ নামেও অভিহিত হয়ে থাকেন।

ঋষির পুত্ররা ঋষিপুত্রক বা ঋষিক নামে চিহ্নিত হন। তারা বিশেষভাবে এবং তত্ত্বগতভাবে শ্রুতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও পরিদর্শন করেন বলে তাঁরা ‘তর্ষি’ নামেও আখ্যায়িত হন।

তর্ষি ঋষিপুত্রদের অব্যক্ততা, মহাত্মা, অহংকারাত্মা, ভূতাত্মা, ও ইন্দ্রিয়াত্মা বিষয়ে জ্ঞান আছে। নামোল্লেখ সহকারে সেই পাঁচ শ্রেণীর ঋষির কথা এখন আপনাদের কাছে বলব।

ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, পুলহ, পুলস্ত্য, মনু, ক্রতু, দক্ষ–এঁরা দশজন হলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র। এঁরা প্রত্যেকেই স্বয়ংসম্ভূত এবং ঐশ্বর্যসম্পন্ন।

ঋষি থেকে মহান বোধের উন্মেষ ঘটে বলে এঁদের মহর্ষি বলা হয়। এই মহর্ষিরাও ঈশ্বরের মানসপুত্র। এবার এঁদের বিষয়ে এখন বলব।

শুক্র, বৃহস্পতি, বামদেব, কশ্যপ, উশনা, উতথ, অপোজ, ঐশিজ, কদম, বিশবা, শক্তি, বালখিল্য ও ধর–এদের ঋষি বলা হয়। কারণ এরা জ্ঞান লাভ করে ঋষিত্ব অর্জন করেছিলেন।

এবার ঋষিপত্নীদের গর্ভজাত ঋষিপুত্রদের বিষয়ে শ্রবণ করুন।

ভরদ্বাজ, অগস্ত্য, বৎসর, নগ্রহ, বৃহদুকথ, শরদ্বান, ঔসিজ, দীর্ঘতপা, শরদ্বত, বাজবা, সুবিত্ত, ঈশ্বর, সুবান্বেষপরায়ণ, দধীচি, শঙ্খমান ও রাজা বৈশ্রবন কেবলমাত্র সত্যের বলে ঋষিত্ব প্রাপ্ত

হয়েছিলেন। মহাত্মা মহাতেজাঃ ঋষিবৃন্দ, ঋষিপুত্রগণ এবং এরকম আরও যাঁরা আছেন, তারা সকলেই মন্ত্রকর্তা। এবার এদের কথা শুনন।

মন্ত্রবাদী মহান ঋষিদের মধ্যে যাদের নাম বিশেষ সম্মানের সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয় তারা হলেন–ভৃগু, পৃথ, কাব্য, প্রচেতা, দধীচি, নভঃ, আত্মবান, জমদগ্নি, ঔব, বিদ, সারস্বত, অষ্টিষেন, অকপ, বীতহব্য, সুমেধা, বৈন্য, দিবোদাস, প্রশ্বার, গৃত্তসমান প্রমুখ।

মহর্ষি অঙ্গিরসের তেত্রিশ জন পুত্র ছিলেন। তারা সকলেই ছিলেন মন্ত্রপ্রণেতা তাঁদের নামগুলি হল–অঙ্গিরা, গার্গ, শেনী, পুরুকুৎস, পৌরকুৎস, ঔশিজ, বৃহদুথ, মেধস, ভরদ্বাজ, বাষ্কলি, অমৃত, . সংহতি, মান্ধাতা, অম্বরীষ, আহার্য, ঋষভ, কন্থ, অজমীঢ়বলি, পৃষাদ, বিরূপ, মুদগল, যুবনাশ্ব, এসদুস্য, দস্যুমান, উতথ, বাজশ্রবা, ভরদ্বাজ, আযাপ্য, সুবিত্ত, বামদেব, দীর্ঘতপা, কক্ষীবান প্রমুখ।

এবার কশ্যপপুত্রদের পরিচয় দেব।

কাশ্যপ, বৎসার, বিভ্রম, রৈভ্য, অসিত ও দেবল–এই ছয়জন ব্রহ্মবাদী ঋষি হলেন কশ্যপপুত্র। এঁরা মন্ত্র প্রণয়ণের অধিকারী।

অত্রিপুত্রদের মধ্যে মহর্ষি অত্রি, অর্চিসেন, শ্যামবান, নিষ্ঠুর, বলসূতক, ধীমান ও পূর্বাতিথি সকলেই প্রণম্য মন্ত্রপ্রণেতা।

এঁরা ছাড়া বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর চতুর্থ ইন্দ্রপ্রমতি, পঞ্চ্য, ভরদ্বসু, ষষ্ঠ মৈতবরাবরুণ, সপ্তম কুন্তিন, অষ্টম, সুদ্যন্ন, নবম বৃহস্পতি ও দশম ভরদ্বাজ–এঁরা সকলেই মন্ত্রপ্রণেতা ও ব্রাহ্মণ সংকলক রূপে প্রসিদ্ধ।

এঁরা প্রত্যেকেই অজস্র মন্ত্রের কর্তা সকল প্রকার বিধর্মের ধ্বংসকারকও। এঁরা পরম ব্রহ্মের ও সমস্ত বেগ রাখার লক্ষণ প্রকাশ করেছেন।

‘হি’ ধাতু থেকে “ব্রহ্মা” শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। শব্দটি “মঙ্গলের হেতু”, অর্থের বোধক রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে শত্রুদের উত্থান যিনি রোধ করেন অর্থের ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ করা যেতে পারে। অনেক সময় যা থেকে গতি ও কার্যের প্রাপ্তি ঘটে এমন কিছু বোঝাতেও ব্রহ্ম বা বেদ শব্দের অবতারণা হয়।

বাক্যের অর্থ অবধাবন করার নাম নির্বচন। যাতে বাক্য নিন্দিত হয়। তাকে আচার্যরা নিন্দা বলেন। প্রপূর্বক 'শংস' ধাতু থেকে প্রশংসা নামক পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ ভাল গুণ প্রকাশ।

অনিশ্চয়তা অর্থাৎ যার সাহায্যে কোনো বিষয়ে স্থির প্রত্যয় জন্মাবে না, যা এরকম অথবা অন্যরকম হলেও হতে পারে তার নাম সংশয়।

যে নির্দেশ অনুসারে 'এটি এই ভাবেই করতে হবে' গোছের বার্তা প্রেরিত হয়, তার নাম বিধি।– এই বিধি অন্যের দ্বারা উক্ত হলে তাকে পরকৃতি বলে।

প্রাচীনকালেই যে উক্তি প্রচারিত হয়েছে তাকে 'পুরাকল্প' বলে। পুরাকালের অতীত ঘটনা বিবৃত করার জন্য পুরাকল্পের কল্পনা করা হয়। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের মতো শুদ্ধ এবং বিস্তর নিগম থেকে অবধারণ করাকে ব্যবধারণ কল্পনা বলে। এটি যেমন এটিও তেমন, অথবা এটি তো আবার অপরটির মতো–এ ধরনের পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ঐক্যানৈব্য সূচক যে উপদেশাবলি তা 'দশম ব্রাহ্মণ' নামে নির্দিষ্ট।

পূর্বে বধুগণ যে ব্রাহ্মণের লক্ষণ প্রকাশ করেছিলেন, পরে দ্বিজগণের দ্বারা যার ব্যাখ্যান প্রদান করা হয়, তারই নাম বৃত্তি।

বিধিনির্দিষ্ট কর্মেও মন্ত্রের কল্পনা মিশে আছে। 'মন্ত্রণা' করে এই অর্থে মন্ত্র এবং 'ব্রহ্মাকে রক্ষা করে।' এই অর্থে ব্রাহ্মণ শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

সূত্রবিদগণ অল্পাক্ষর বিশিষ্ট সারবান, সততঃপ্রসারী, অচঞ্চল, এবং অনবদ্য নিয়মগুলিকে 'সূত্র' নামে অভিহিত করে থাকেন।

.

৫৫.

এই দীর্ঘ ভাষণ শোনার পর জ্ঞানলিপ্সু সেইসব ঋষিগণ সূতকে বললেন–হে মহামতি, পূর্ব্ব কল্পে কী এমন কারণ দেখা গিয়েছিল যাতে বেদ পৃথক পৃথক ভাবে বিভক্ত হয়েছিল–অনুগ্রহ করে সেই বিষয়ে আপনি আমাদের কিছু কথা বলুন।

সূত প্রত্যুত্তরে বললেন–হে মহাভাগগণ, স্বায়ম্ভব মন্বন্তরে দ্বাপর যুগ অতিক্রান্ত হলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা মনুকে এ বিষয়ে যা যা কিছু বলেছিলেন সে সবই আমি আপনাদের বলব।

হে তাত, জেনে রাখুন সকল দ্বিজাতিই যুগ পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে যথাক্রমে স্বল্পবীর্য হয়ে পড়েছেন। বীর্য, তেজ, বল, বাক্য ইত্যাদি কোনো কিছুই যুগদোষে বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়নি, এভাবে নষ্ট হতে হতে সত্যযুগের দশ সহস্র ভাগের মধ্যে এক ভাগ অংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু অচিরেই এসব বিনষ্ট হয়ে যাবে। অতএব অবিলম্বে বেদবিহিত কাজ আরম্ভ হাওয়া উচিত। বেদ যাতে বিধ্বংস না হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ বেদ বিনষ্ট হলে তার সাথে সাথে যজ্ঞেরও বিনাশ ঘটবে। আর যদি যজ্ঞের বিনাশ হয়, তাতে দেবতাদেরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ফলত সৃষ্টির সব কিছুরই বিনাশ ঘটবে।

প্রথমে চতুষ্পদ বেদ ছিল একসূত্রে গাঁথা। পরে তা শত সহস্র ভাগে বিভক্ত হয়। ক্রমে ক্রমে তা আবার দশ গুণ বিভক্ত হয়।

এই বেদবিহিত যজ্ঞ যজ্ঞকারীর সমস্ত কামনা পূর্ণ করবে–লোক পিতামহের মুখে এমন কথা শুনে লোকহিতে রত প্রভু মনু ‘তথাস্তু’ বলে সেই চতুষ্পদ বেদকে চারভাগে বিভক্ত করলেন।

হে তাত, বর্তমান যুগে সে-কারণেই আপনারা নানাভাবে বেদের কল্পনা করে থাকেন। যে সাধুবৃন্দ, অতীত মন্বন্তরে সংঘটিত সেই সব বেদকল্পনা আপনাদের পরোক্ষ হলেও আমি এখন তা প্রত্যক্ষভাবে আপনাদের কাছে ব্যক্ত করব।

পরাশরপুত্র এই কলিযুগে ব্যাস দ্বৈপায়ন নামে আখ্যায়িত হয়েছেন, তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর ‘অংশরূপে’ কীর্তিত। তিনিই প্রথম ব্রহ্মার প্রেরণায় বেদবিভাগ শুরু করলেন। এই বেদবিভাগের জন্য তিনি চারজন শিষ্য গ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন জৈমিনি, সুমন্ত, বৈশম্পায়ন ও পৈল। এরপর তিনি আর একজনকে পঞ্চম শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি হলেন লোমহর্ষণ।

ব্যাসদেব এঁদের সকলকে বিধিপূর্বক গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ঋগবেদের জন্য শ্রাবক দ্বিজ পৈলাকে। যজুর্বেদবক্তা বৈশম্পায়নকে সামবেদার্থ শ্রাবক জৈমিনি, অথর্ব বেদের জন্য সপ্তম সুমন্তকে ভালো ইতিহাস ও পুরাণ বলার জন্য আমাকে অর্থাৎ লোমহর্ষণ সূতকে শিষ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

যজুর্বেদও প্রথমে এক ছিল। ব্যাসদেব তাকে চারভাগে বিভক্ত করলেন। তাতে চতুহোত্র হল এবং তা থেকে তিনি যজ্ঞ কল্পনা করলেন।

এইভাবে তিনি যজুর্বেদ দ্বারা আধ্বর্ষব, ঋকবেদ দ্বারা হোত্র, সামবেদ দ্বারা উদগাত্র ও অথর্ব বেদ দ্বারা ব্রহ্মত্ব কল্পনা করলেন। এরপরেই তিনি সমস্ত ঋমন্ত্র উদ্ধৃত করে ঋগ্বেদের কল্পনা করেন, তা থেকেই জগতের পক্ষে হিতকর যজ্ঞবাহক হোতার কল্পনা করা হয়।

ব্যাস দ্বৈপায়ণ সাম মন্ত্র থেকে সাম বেদ ও তা থেকে উদগাত্র রচনা করেন এবং অথর্ব বেদানুসারে তিনি রাজাদের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেন। পুরাণার্থ বিশারদরা আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কুলকর্মসমূহের সাথে পুরাণসংহিতা রচনা করেন।

যজুর্বেদের অনেকগুলি পদ উঠিয়ে দেওয়ার ফলে তা বিষম অর্থাৎ ছন্দোহীন হয়ে পড়ে। তখন সেই ছন্দহারা যজুর্বেদমন্ত্রগুলি বেদপারগ ঋত্বিকদের দ্বারা উদ্ধত বীর্য অশ্বমেধ যজ্ঞেও প্রযুক্ত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারাই বেদ মন্ত্র ব্যাবহারিক জীবনে প্রযুক্ত হয়।

এরপর যজুর্বেদে যা অবশিষ্ট ছিল তা দিয়ে যজ্ঞবিধি প্রস্তুত করা হয়, সেইজন্য যজুর্বেদকে যুজ্ঞান বলা হয়। এই-ই হল শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত।

ঋগ্বেদশ্রাবক পৈল ঋষি ঋক মন্ত্রগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। পরে সেগুলোকে আরও দুই ভাগে ভাগ করেন। এবং আবার তা সংযুক্ত করে দুই শিষ্যকে তা সমর্পণ করলেন। এই দুই ভাগের মধ্যে প্রথমটি ইন্দ্রপ্রমতি নামে শিষ্যকে এবং দ্বিতীয়টি বাস্কল নামে শিষ্যকে অর্পণ করেন। পরবর্তী দ্বিজ শ্রেষ্ঠ বাস্কল চারখানি সংহতি প্রণয়ন করে শুশ্রূষারত হিতাকাঙ্ক্ষী শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। বাস্কল তাঁর অনুগামী এই চারজন শিষ্যের মধ্যে বোধ নামক শিষ্যকে প্রথম শাখা, অগ্নিমাঠর নামক শিষ্যকে দ্বিতীয় শাখা, পরাশরকে তৃতীয় শাখা ও যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে চতুর্থ শাখা পড়িয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে পৈলশিষ্য ইন্দ্রপ্রমতি তার অন্যতম অনুগামী মহাভাগ যশস্বী মার্কণ্ডেয়কে একটি সংহিতা অধ্যয়ন করান। সেই সংহিতা মহাযশাঃ মার্কণ্ডেয় তার জ্যেষ্ঠসূত সত্যবাকে, সত্যবা সত্যহিতকে, সত্যহিত তার নিজ পুত্র সত্যতরকে এবং বিভু সত্যতর মহাত্মা সদাসত্যধর্ম পরায়ণ সত্যশ্রীকে অধ্যয়ন করিয়েছিলেন।

সত্যশ্রীর চারজন মহাতেজশালী বিদ্বান এবং শাস্ত্রজ্ঞ শিষ্য ছিলেন। সত্যশ্রীর মধ্যে শাকল্য ছিলেন প্রধান। অপর তিনজন হলেন রমন্তর, বাষ্কলি ও ভরদ্বাজ। এঁরা সকলেই কোন-না কোনো শাখার প্রবর্তক ছিলেন। শাকল্য ছিলেন দেবমিত্র। কিন্তু জ্ঞান ও অহংকারে গর্বিত হয়ে পড়লে জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁর বিনাশ ঘটে।

শংসপায়ন এ পর্যন্ত শুনে আরও বেশি কৌতূহলী হয়ে পড়লেন। তিনি লোমহর্ষণকে জিজ্ঞাসা করলেন-হে মহাভাগ, জ্ঞানগর্বিত সেই মুনির ঠিক কী কারণে বিনাশ হয় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত বলুন। এও বলুন যে জনকরাজার অশ্বমেধ যজ্ঞে কেনই বা বিবাদ ঘটল? কার সাথে কোন্ বিষয়কে কেন্দ্র করে এই বিবাদ হয়েছিল? এসব বিষয়ে সকল কথা যথাযথ ভাবে বলুন প্রভু।

ঋষিশ্রেষ্ঠের কথা শুনে সূত বললেন–আপনার অনুমান সঠিক, দ্বিজবর। এ বিষয়ে কোনো কথাই আমার অবিদিত নয়। এ সকলই আপনাদের জ্ঞাতার্থে আমি নিশ্চয়ই বলব।

মহান রাজা জনকের অশ্বমেধ যজ্ঞেও বিরাট জনসমাগম ঘটেছিল, শত-সহস্র ঋষি ও ঋষিশ্য জনকের সেই মহাযজ্ঞ দেখার অভিলাষে সেখানে গিয়েছিলেন। সমাগত এই বিপুল ব্রাহ্মণ সমাবেশ দেখে মহারাজাধিরাজ জনকের সহসা জানতে ইচ্ছা হল যে এঁদের মধ্যে কে হলেন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ? এ বিষয়ে কী ভাবেই বা নিশ্চিত হওয়া যায়? এ সম্পর্কে অনেক ভাবনা-চিন্তা করার পর রাজা জনক মনে মনে একটা উপায় স্থির করলেন।

পরের দিন সকাল হতে না হতেই সহস্র গোধন, প্রচুর স্বর্ণ, অগুন্তি গ্রাম, রত্ন ও দাসদাসী নিয়ে রাজা জনকের সভায় এলেন। তিনি উপস্থিত মুনিদের উদ্দেশে বললেন, হে দ্বিজবৃন্দ, আপনারা সকলেই শ্রেষ্ঠ, সকলকেই আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি। হে দ্বিজোত্তমগণ তবু আমার এই কৌতূহল আপনারা প্রশমিত করুন।

আপনাদের মধ্যে কে অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী সেকথা আমি জানতে চাই। আজ আমি এই অপরিমেয় ধনরাশি তারই জন্য সভাগৃহে এনেছি। আপনাদের মধ্যে যিনি বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ তার বিদ্যার স্বীকৃতি স্বরূপ এই ধন সম্পদ তাকে আমি উপহার হিসেবে দিয়ে ধন্য হতে চাই।

জনক রাজার মুখে এই কথা শুনে এবং স্তূপীকৃত বনরাজির জৌলুস দেখে সেইসব বেদ বিশেষজ্ঞ মুনিগণ তা গ্রহণ করার জন্য সাতিশয় ইচ্ছুক হয়ে পড়লেন।

বেদজ্ঞানমদে উন্মুক্ত হয়ে তারা পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা প্রদর্শন করতে লাগলেন। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন ইতিমধ্যেই সেই ধনদৌলত পেয়ে গেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অহংকার বশে বলে উঠলেন, আমিই শ্রেষ্ঠ। তাই এ ধন আমার পরক্ষণেই তার মত খণ্ডন করতে অন্য কেউ বলে উঠলেন, এ ধন আমার ছাড়া অন্য কারোর হতেই পারে না। তোমাদের মনে অযথা সন্দেহ দেখা দিচ্ছে কেন? এইভাবে সেই সভাস্থলে উপস্থিত ব্রাহ্মণরা ধনলোভে বহু বাদানুবাদ করলেন।

সেই সময় সভাস্থলে অন্য অন্য ব্রহ্মবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মহাতেজাঃ, মহাতপস্বী, বিদ্বান কবি ও ব্রহ্মার অঙ্গজাত যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সমুপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই তুমুল কোলাহলের মধ্যে নিতান্ত সুমধুর স্বরে নিজ শিষ্যদের উদ্দেশে বললেন, ওহে বৎসগণ! অবিলম্বে এই ধনরাজি আমার আশ্রমে নিয়ে যাবার উদ্যোগ কর। এই ধন-সম্পদ যে আমার সে সম্পর্কে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

এখানে আমার সমকক্ষ আর কেউ উপস্থিত নেই। আমি সকল বেদের প্রবক্তা, আমার সমান আর কেউ-ই-হবেন! অবশ্য কোনো ব্রাহ্মণ যদি আমার ঘোষণায় প্রীত না হয়ে থাকেন, তিনি এখনই বিচারের জন্য আমাকে আহ্বান করতে পারেন, আমি তার সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে প্রস্তুত।

যাজ্ঞবুল্ক্যের এমন কথায় প্রলয়কালীন সমুদ্রের মতো তুমুল গর্জনে সেই ব্রাহ্মণ সমুদয় ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন।

তাঁদের সেই অবস্থা দেখে প্রকৃতিস্থ যাজ্ঞবল্ক্য হাসতে হাসতে তাদের উদ্দেশে বললেন, আপনারা তো নিজেদের বিদ্বান ও সত্যবাদী বলে দাবি করেন। এমন ক্রোধী মূর্তি আপনাদের শোভা পায় না। তার চেয়ে আপনারা পরস্পর যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তা আমায় জিজ্ঞাসা করুন আমি যথাযোগ্য উত্তর দেব।

বেদ প্রবক্তা যাজ্ঞবল্ক্য এবং বেদপরাঙ্গম মুনিগণ কেউ কারোর মত স্বীকার করলেন না। ফলে সেই ধনের জন্য মহাত্মাদের মধ্যে সকলপ্রকার লৌকিক, বৈদিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে সহস্র সহস্র সূক্ষ্ম। দর্শন সদ্ভূত বিদ্যাগুণে অলংকৃত নানাপ্রকার বাদানুবাদ চলতে লাগল।

একপক্ষে একা যাজ্ঞবল্ক্য ও অপরপক্ষে সমস্ত ঋষিরা মিলিত হয়ে তুমুল বিচার শুরু করলেন। ধীমান যাজ্ঞবল্ক্য সমস্ত মুনিদের এক এক করে প্রশ্ন করলেন। কিন্তু তারা কেউই সেইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। মুনিরা শ্রেষ্ঠত্বর বিচারে পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হলেন। ব্রহ্মাতেজোশালী মহাদ্যুতি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর দাবির যৌক্তিকতার প্রমাণ দিলেন।

যতক্ষণ মুনিদের সাথে যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছিল বেদকর্তা শাকল্য একটিও প্রশ্ন করেননি। তাই বিজিত হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমেই শাক্যকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে শাকল্য আপনি এমন ধ্যানস্থ হয়ে আছেন কেন? আপনার কি কোনোই বক্তব্য নেই? আপনাকে বায়ুপূর্ণ মতো জড় বলে মনে হচ্ছে। আমি আপনাকেও একটি সুযোগ দিতে চাই।

যাজ্ঞবল্কের কথা শুনে মহর্ষি শাকল্য অপমানিত বোধ করলেন। ক্রোধে তাঁর চোখ-মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। অন্যান্য মুনিদের সামনেই তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য আপনি আমাদের এবং এইসব দ্বিজশ্রেষ্ঠদের তৃণের মতো অবজ্ঞা করে বিদ্যার জন্য এই মহোৎকৃষ্ট ধন কেবল নিজের উদ্দেশ্যেই নিতে চাইছেন।

শাকল্য এই কথা বললে উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, তত্ত্ব ও অর্থ এই দুটোই দর্শনই ব্রাহ্মণদের শক্তি। কাম অর্থের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত। তাই এই অর্থ আমি কামনা করছি। কাম হল বিপ্রদের ধন। তাই আমি কাম বিষয়ক প্রশ্নই রাখছি। এই রাজর্ষির পণই এই রকম। তাই আমি ধন গ্রহণ করেছি।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই কথা শুনে মহর্ষি শাকল্য আর নিজের ক্রোধ সংবরণ করতে পারলেন না। ক্রোধে অভিভূত হয়ে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে কামবিষয়ক প্রশ্ন করতে লাগলেন। তিনি দম্ভভরে যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন, বেশ, আমি আপনাকে কামবিষয়ক প্রশ্নই করব, আপনি তার যথার্থ উত্তর দিন।

এইভাবে দুই ব্রহ্মবিদজ্ঞের মধ্যে বাগযুদ্ধ শুরু হল। শাক্য তাকে সহস্র প্রশ্ন করলেন। যাজ্ঞবল্ক্য অকাতরে তার উত্তর দিতে লাগলেন, উপস্থিত অন্যান্য মুনিঋষিরা তাদের তত্ত্বালোচনা নীরবে শুনে যেতে লাগলেন। দেখতে দেখতে শাকল্যের সমস্ত কথা নিঃশেষ হল। তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাকে বললেন, শাক্য আমারও কামবিষয়ক এক প্রশ্ন আছে। এবং এই প্রশ্নের পণ হল অভিশাপ। আপনি উত্তর দিতে না পারেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আপনার মৃত্যু ঘটবে।

শাকল্য এই শর্তে সম্মত হলে যাজ্ঞবল্ক্য তাকে কামসংক্রান্ত একটি গুঢ় প্রশ্ন করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রশ্নটির উত্তর শাকল্যের অজানা ছিল। ফলে সাথে সাথে শাকল্যের মৃত্যু ঘটল।

মহর্ষি শাকল্যের এইভাবে বিনাশ ঘটলে ধনার্থী মুনিঋষিরা আবার যাজ্ঞবল্ক্যের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হলেন। তারা যাজ্ঞবল্ক্যকে পুনরায় সহস্র সহস্র প্রশ্ন করলেন। মহামতি যাজ্ঞবল্ক্য তাদের সেইসব কঠিন প্রশ্নের যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা করে উত্তর দিতে লাগলেন। এইভাবে তিনি নিজের যশ সূচনা করে ধনদৌলত নিয়ে শিষ্য পরিবৃত হয়ে সুস্থ মনে বাড়ি চলে গেলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে পরাভব স্বীকার করলেও দেবমিত্র শাকল্য দ্বিজসত্তম ব্রহ্মবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি পাঁচখানি সংহিতাও প্রণয়ন করেছিলেন। যে পাঁচজন তাঁর অন্যতম শিষ্য ছিলেন তাঁরা হলেন– মৃদুগল, গোলক, খালীয়, মৎস্য ও শৈশিরীয়। শাকল্যের মৃত্যু ঘটলে এঁরা সকলেই ব্রহ্মঘাতী হলেন। অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে তারা ব্রহ্মার কাছে গেলেন।

ব্রহ্মা মনে মনে এইসব ঘটনা জানতে পেরে তাদের পবনপুরে পাঠিয়ে দিলেন, এবং আশ্বাস দিলেন যে তারা সেখানে গেলে অবিলম্বে তাদের পাপ বিনষ্ট হবে। তিনি বললেন–তোমরা দ্বাদশাক, বালুকেশ্বর একাদশ রুদ্র ও বিশেষত বায়ুপুত্রকে প্রণাম করে চারটি কুণ্ডে স্নান করুন। তাহলেই তোমরা ব্রহ্ম হত্যার পাপ থেকে উত্তরণ করতে পারবে।

ব্রহ্মার আদেশ শুনে শাকল্যের ওই চারজন শিষ্য শীঘ্র সেই পবনপুরে এলেন। নিয়মমতো স্নান করলেন এবং দেবতাদের দর্শন করলেন। এরপর বাড়বদের প্রাসাদে গিয়ে উত্তরেশ্বরকে প্রণাম জানাতেই সকল পাপ হতে মুক্ত হলেন। তারপর সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করলেন। সেই থেকে সেই বায়ু নির্মিত বায়ুপুরী পবিত্র পাপবিনাশক তীর্থরূপে পরিগণিত হতে লাগল। পবনপুত্র অঞ্জনা গর্ভজাত সত্য বিক্রমশালী হনুমান জন্মগ্রহণ করলে সন্তান গর্বে সুখী ব্রহ্মোৎপন্ন বায়ুদেবতা এই তীর্থ নির্মাণ করেন।

পৃথিবীতে চতুরাশ্রম প্রথা প্রচলিত হলে ব্রাহ্মণদের সেবার জন্য যেসব শুদ্র জন্মেছিলেন, জীবিকা নির্বাহের উপায়ে হিসাবে ব্রহ্মযজ্ঞের জন্য তাদের উপর এক ধরনের কর স্থাপিত হয়। এই বিধি দ্বারা সেই সময় ব্রাহ্মণদের মহৎ শাসনকাল স্থাপিত হয়। আরও বলা হয়–পাপী হোক, কৃতঘ্ন হোক, সুরাপায়ী বা গুরুশয্যাগামীই হোক, বাড়াদিত্যকে নতমস্তকে প্রণাম করলে সর্বপাপ থেকে তার মুক্তি ঘটবে।

.

৫৬.

পূর্বকথার সূত্র ধরে সূত বলতে লাগলেন ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, ধীমান শতবলাক, দ্বিজোত্তম নৈগম, গালকি, সালকি, বষ্কালি ও ভরদ্বাজ–এই সব পৃথিবীশ্রেষ্ঠ ঋষিবৃন্দ তিনটি সংহিতা প্রণয়ণ করেছিলেন। রথীতর রচনা করেছিলেন চতুর্থ নিরুক্ত।

এই রথীতর সম্পর্কে জানা যায় তার তিনজন মহৎ গুণবান শিষ্য ছিলেন তাদের নামগুলি হল– ধীমান নন্দায়নীয়, বুদ্ধিমান পন্নগরি ও তৃতীয় আর্য। এঁরা সকলেই ছিলেন মহান তপস্বী, নিষ্ঠাবান ব্রতী, বীতরাগ সম্পন্ন, মহাতেজঃ মণ্ডিত, ও সংহিতাজ্ঞানী। সংহিতা বিষয়ে এঁরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সেই কারণে তাদের 'সংহিতা প্রবর্তক বহ্বচ' বলা হয়।

বৈশম্পায়ন গোত্রীয় ঋষিরা যজুর্বেদের ভেদকল্পনা করেন। তারা ছিয়াশিটি শুভ যজুঃসংহিতা প্রণয়ন করেন। তিনি সেইসব সংহিতা শিষ্যদের দান করলে তারাও বিধিমতো সেইসব গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে কেবল একজন মহাতপা যাজ্ঞবল্ক্য পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই সংহিতাই তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

প্রাথমিক এই তিনটি বিভাগ আরও তিনভাগে বিভক্ত হয়ে নয়প্রকার হয়ে ওঠে। উত্তরদেশ, মধ্যদেশ ও পূর্বদেশের বিভিন্ন স্থানে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে যজুর্বেদের অধ্যয়ন করা হয়। এর মধ্যে উত্তর দেশের শ্যামায়নি, মধ্যদেশের আরুণি এবং পূর্বদেশের অলম্বি যজুর্বেদে পাঠের প্রধান পীঠস্থান। বলে পরিগণিত। এইসব সংহিতাবাদী দ্বিজরাই পরবর্তীকালে "চরক" নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।

এ পর্যন্ত বিবরণ শুনে ঋষিদের মনে প্রশ্ন জাগল। তারা সূতকে জিজ্ঞাসা করলেন–কী কারণে চরক অধৈর্য্য হলেন। কী কারণে তার এই নাম হল, এসব আপনি যথাযথভাবে বলুন।

তাদের এই অনুরোধ শুনে সূত তাদের কাছে চরকত্ব বিষয়ে বলতে সম্মত হলেন। তিনি বললেন, হে দ্বিজবরগণ, ঋষিদের কিছু করণীয় কর্তব্য ছিল। তাই তারা সকলে মিলে মেরুপৃষ্ঠে গিয়ে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। আলোচনার মাধ্যমে তারা স্থির করলেন যে, আমাদের মধ্যে যিনি সপ্তরাত্রির মধ্যে এখানে ফিরে আসতে পারবেন না, তিনি ব্রহ্মরধ্যাব্রতের

অনুষ্ঠান করবেন। এই-ই হল সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। এই নিয়ম আমাদের সকলকে পালন করতে হবে।

বৈশম্পায়ন ব্যতীত সকল মহর্ষি সশিষ্য সপ্তরাত্রির মধ্যে সেই স্থানে চলে এলেন। ফলে ব্রাহ্মণদের বচন অনুসারে বৈশম্পায়ন ব্রহ্মরধ্যা ব্রতের আয়োজন ভার গ্রহণ করলেন। তিনি তার শিষ্যদের ডেকে বললেন, তোমরা আমার জন্য সত্বর ব্রহ্মরধ্যা ব্রতের অনুষ্ঠান করো। এ বিষয়ে যা আমার পক্ষে হিতকর বলে মনে হবে তা আমাকে বলুন।

বৈশম্পায়ন তার সকল শিষ্যকে এই আদেশ দিলেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, আপনার অন্যান্য মুনিশিষ্যদের প্রয়োজন হবে না। আমি একাই এই ব্রতের আয়োজন করতে পারব। এতে আমার বল বিষয়ে আপনিও নিঃসন্দেহে হতে পারবেন।

ব্রহ্মবিদদের মধ্যে অন্যতম যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে এহেন গর্বিত বচন শুনে গুরুদেব বৈশম্পায়ন অতি ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে আদেশ করলেন, তুমি আমার কাছে এযাবৎ যা কিছু অধ্যয়ন করেছ, এখনই তা প্রত্যার্পণ কর।

গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে যাজ্ঞবল্ক্য সমস্ত যজুর্বেদ রক্তাক্ত অবস্থায় বমন করে গুরুকে প্রত্যার্পণ করলেন। ক্ষুণ্ণ মনে যাজ্ঞবল্ক্য সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। তার এতদিনের অধীত বিদ্যা হারিয়ে তিনি মনে মনে খুবই দুর্বল হয়ে পড়লেন। এরপর তিনি সূর্যের ধ্যানে মগ্ন হলেন। তিনি জানতেন সূর্যরূপ বেদ পৃথিবী থেকে উঠে আকাশলোক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার সাথে সাথে সমস্ত যজুর্বেদ ঊর্ধ্বগমন করে আদিত্যমণ্ডলে অবস্থান করছে। একমাত্র সূর্যদেব সন্তুষ্ট হলেই হৃত যজুর্বেদজ্ঞান ফিরে পাওয়া সম্ভব।

যাজ্ঞবল্ক্যের কঠোর তপস্যায় সূর্যদেব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বর হিসেবে হৃত সমস্ত যজুর্বেদ অশ্বরূপধারী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রদান করলেন। অশ্বরূপধারী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রদান করা হয়েছিল বলে যে– কেউ যজুর্বেদ অধ্যয়ন করেন তারাই 'বাজী' নামে প্রসিদ্ধ হন। বিপরীতক্রমে যাঁরাই ব্রহ্মরধ্যা ব্রত্যানুষ্ঠান করেন তারাই "চরক" নামে পরিচিত হন। সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য ব্যতীত বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যগণ 'চরক' নামে খ্যাত।

এই চরকদের বিষয়ে আমার বক্তব্য বললাম। এবার বাজীদের বিষয়ে বলছি, শুনুন।

কম্ব, বৈধেয়, শালী, মধ্যন্দিন, শাপেয়ী, বিদিগ্ধ, চাপ্য, উদ্দল, তাম্রায়ণ, বাংস্য, গালব, শৈশিরি, আটবী, পণী, বীরণী ও পরায়ণ–এই পনেরোজন যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্য “বাজী” আখ্যা লাভ করেছিলেন। এইভাবে ক্রমশ একশো জন্য ব্রহ্মবিদ মুণি যজুর্বেদের বিভাগকর্তা হয়েছেন।

জেমিনি তার নিজ পুত্র সুমন্তকে, সুমন্ত তাঁর পুত্র সুত্বাকে, সুত্ব তাঁর পুত্র সুকর্মাকে বেদ গ্রন্থ অধ্যয়ন করান। সুকর্মা সকল সংহিতা অতি-শীঘ্র অধ্যয়ন করে অধ্যাপনা করতে শুরু করলেন। সুকর্মা যথার্থই সহস্র সু-কর্মের হোতা এবং সুর্যতেজের অধিকারী ছিলেন। সে সময় একটা নিয়ম ছিল অনধ্যায় দিনে অর্থাৎ যেদিন অধ্যয়ন হয় না, সেই সময় যাঁরা অধ্যয়ন করেন ইন্দ্র তাদের বিনাশ করেন। এরকম নীতিহীন নিয়মের বিরুদ্ধে সুকর্মা তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রয়োপবেশন ব্রত শুরু করলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন বুঝে ইন্দ্র তাকে বরদান করে বললেন–হে মহাভাগ, আপনার মহাবীর্যবান এই দুই শিষ্য সহস্র সংহিতা অধ্যয়ন করে মহাপ্রাজ্ঞ ও অগ্নিতেজা হবেন। অতএব হে দ্বিজবর, আপনি আর ক্রোধিত হবেন না। ইন্দ্রের এই আশীর্বাদ লাভ করে সুকর্মার ক্রোধের উপশম ঘটল।

হে দ্বিজগণ যে দুজন শিষ্যের হিতার্থ কামনায় সুকর্মা এমনু কঠিন ব্রত পালন করেছিলেন, তাঁদের নাম হল ধীমান ও পৌষ্যঞ্জী। পৌষঞ্জীর হিরণ্যাভ ও কৌশিক নামে দুজন শিষ্য ছিলেন। পৌষ্যঞ্জী পাঁচশত সংহিতা অধ্যয়ন করিয়েছিলেন। তাই তাঁর শিষ্যরা মঙ্গলকর ‘উদীচ্য সমান হয়েছিলেন। আর হিরণ্যাভের শিষ্যরা ‘প্রাচ্য সমগ’ নামে প্রসিদ্ধ হন। পৌষঞ্জীর প্রিয় শিষ্য বীর্যবান কৌশিক্য পাঁচশত সংহিতা প্রণয়ন করেছিলেন।

কৌশিক ও হিরণ্যাভ ছাড়া পৌষঞ্জীর অন্য চারজন শিষ্য হলেন– লোকাক্ষী, কুথুমি, কুশীতী, লাঙ্গলি। এবার এদের ভেদের বিষয়ে শুনুন।

লোকাক্ষীর শিষ্যরা হলেন–তণ্ডিপুত্র রানায়নীয়, সুবিদ্বান মূলাচারী, সকেতিপুত্র, সহসাত্যপুত্র, তণ্ডিপুত্র রানায়নীয়ও সৌমিত্র ছিলেন সমবেদবিশারদ।

শৌরিদ্য ও শৃঙ্গিপুত্র এঁরা দুজন ব্রতচারণ করেন।

মহাতপাঃ শৃঙ্গিপুত্র তিনখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন।

পৌষাঞ্জীশিষ্য কুথুমির ঔরস, রসপিশর ও তেজস্বী ভাগবিত্তি নামে তিনজন পুত্র ছিলেন। এঁরা কৌথুম নামে জগতে খ্যাতি হয়ে আছেন।

কৌথুম পরাশর্য, বেদপরায়ণ ও পৃদ্ধপরায়ণ অসুরায়ণ বৈশাখী এবং চৈল, প্রাচীন যোগ ও সুরাল প্রমুখ দ্বিজোত্তমসন ছয়খানি করে সংহিতা প্রণয়ন করেন।

প্রাচীন যোগের পুত্র হলেন বুদ্ধিমান পতঞ্জলি।

অন্যদিকে লাঙ্গলী ও শালিহোত্র দুজনেই ছয়টি করে সংহিতা প্রণয়ন করেন। লাঙ্গলির অনুগামী শিষ্যবৃন্দ “লাঙ্গল” বলে প্রসিদ্ধ। তারা হলেন–ভালুকি, কামহানি, জৈমিনি, লোমগায়নি বণ্ড ও বোহল।

হিরণ্যাভের শিষ্য মানবশ্রেষ্ঠ নৃপাত্মজ চব্বিশটি সংহিতা প্রণয়ণ করেন। তিনি অন্য যেসব শিষ্যদের শিষ্যা দান করেছিলেন তাঁরা হলেন–তালক, পাণ্ডক, কলিক, রাজিব, গৌতম, জবন্ত, সোমরাজ, আপতস্তুত, পৃষ্ঠঘব, পরিকৃষ্ট, উলুলদ, যবীয়স, বৈশাল, অঙ্গুলীয়, কৌশিক, সালিমঞ্জরী, সত্য, কাপীয়, কানিক, ধর্মাত্মা পরাশর প্রমুখ। এঁরা সবাই “ক্রান্তদর্শী সমগ্র” নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

সমস্ত সংহিতার প্রভেদকর্তা সামগ্রদের মধ্যে কৃতি এবং পৌষ্যঞ্জী, এঁরা দুজনেই বিশে কীর্তিত ছিলেন।

হে দ্বিজগণ, আরও শুনন, জৈমিনিপুত্র সুমন্ত অর্থবেদকে দুইভাগে ভাগ করে কবন্ধকে দান করেন। কবন্ধও যথারীতি অথর্ববেদ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। পরে তিনি আবার তাকে দু-ভাগে ভাগ করে এক ভাগ পথ্যকে ও দ্বিতীয় ভাগ বৈদস্পর্শকে দান করলেন। বেদস্পর্শের চারজন দৃঢ়ব্রতা শিষ্য ছিলেন। তাঁরা হলেন ব্রহ্মপরায়ণ মোদ, পিপ্পলাদ, ধর্মজ্ঞ, শৌক্কায়নি এবং তপন।

বেদস্পর্শ এই চার শিষ্যের মধ্যে অথর্ববেদকে চারভাগে ভাগ করে বিতরণ করলেন। পথ্যও অনুরূপভাবে তার নিজের ভাগের অথর্ববেদকে তিনভাগে ভাগ করে জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনককে দান করলেন। শৌনক এদের মধ্যে আবার নিজের ভাগের বেদজ্ঞান দু-ভাগে বিভক্ত করে একভাগ ব্রভুকে ও অপরভাগ ধীমান সৈন্ধবয়নকে দিয়েছেন। সৈন্ধব নিজের বেদাংশ দিলেন মঞ্জুকেশকে।

মঞ্জুকেশ যতটুকু পরিমাণ বেভাগ লাভ করেছিলেন তাকে তিনি ছয় ভাগে বিভক্ত করলেন। এর মধ্যে নক্ষত্রকল্প, বৈতান, তৃতীয় সংহিতা, বিধি, চতুর্থ অঙ্গিরস কল্প এবং পঞ্চম শান্তিকল্প বিখ্যাত হল। অথর্ববেদের ভাগকর্তাদের মধ্যে এই ঋষিকেই প্রধান বলে জানবেন।

হে পৃথিবীশ্রেষ্ঠ ঋষিবৃন্দ, ইতিপূর্বে আমি ছয়ভাগে ভাগ করে পুরাণ ব্যাখ্যা করেছি। আত্রেয়, ভরদ্বাজ, সুমতি, ধীমান, কশ্যপ, অকৃতব্রণ, অগ্নিচর্চা, বশিষ্ঠ, মিত্রয়ু, আবর্নি, সোমদত্তি, সুশর্ম, শাংশপায়ন প্রমুখ হলেন পুরাণ বিষয়ে আর দৃঢ়ব্রত শিষ্য।

পুরাণ বিষয়ে সর্বমোট সাতাশটি সংহিতা প্রণীত হয়েছে। কশ্যপ, সাবণি ও শাংশপায়ন তিনটি করে সংহিতা প্রণয়ন করেন। আর সীমীকা নামে যে চতুর্থ সংহিতা রয়েছে, তা পূর্বেই প্রমীত হয়েছিল। এইসব সংহিতার প্রত্যেকটিরই চারটি করে পাদ আছে।

হে দ্বিজবৃন্দ, এই যে এত বিভাজন, তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি সংহিতার অর্থেই কিন্তু এক। পাঠান্তরের ফলে এইসব সংহিতা পৃথক পৃথক হয়ে পড়ে। এবং ফলশ্রুতি স্বরূপ বিভিন্ন বেদশাখার উদ্ভব ঘটে। শাংশপায়ন ভিন্ন অন্য প্রণেতাদের সংহিতাতে চার হাজার মন্ত্র বা শ্লোক আছে, যা দ্বিগুণ হয়ে সংখ্যায় আট হাজার হয়ে গেছে।

যজুবাক্যার্থে পণ্ডিত লোম হর্ষণিকা প্রথম দ্বিতীয় হলেন কশ্যপিকা এবং তৃতীয় সাবর্ণিকা।

এছাড়া অন্যান্য যেসব শাংশপায়নিকা আছে তাদের অংখ্যা আট হাজার ছয়শো। এই ছাড়া বালখিল্য সমপ্রৈখ্য ও সাবর্ণ সংহিতা প্রসিদ্ধ।

আটহাজার এবং তার সাথে আরও চোদ্দহাজার সামন্ত্র এবং সোহোম আরণ্যক মন্ত্র আছে। সামগ ব্রাহ্মণরা এইসব মন্ত্রীসংগীত উচ্চারণ করে থাকেন।

ব্যাস দ্বৈপায়ণ বেদ ও ব্রহ্মণের গামারণ্যক ও মন্ত্রকরণের সাথে সাথে বারোহাজার আধবর্যব ও বেদের বিভাগ করেন।

ঋক্ ব্রাহ্মণ ও যজুর তিনটি গ্রামারণ্যও সমগ্র ভেদে দুই প্রকার। আর হারিদ্রবীয়রা খিল ও উপখিল নামে দু-ভাগে বিভক্ত। এই ভাবে তৈত্তিরীয়দের পরেও এই সব ক্ষুদ্র বেদ কল্পিত হয়। বাজসনেয় সংহিতায় এক হাজার নয়শো পাদ আছে। আয়তনের দিক থেকে ঋক সংহিতার চারগুণ হল ব্রাহ্মণ।

যাজ্ঞবল্ক্য প্রণীত অবশিষ্ট যজুর্বেদের সংহিতাগুলিতে ও শুক্র প্রণীত ঋকবেদীয় সংহিতাগুলিতে আট হাজার এবং অষ্টআশির বেশি পাদ পরিমাণ আছে।

এবার চরণবিদ্যা সমূহের সংহিতা ও প্রমাণ বিষয়ে বলছি, শুনুন। ঋক সমূহের পরিমাণ ছয় হাজার। এরপর ঋকসমূহ ছাব্বিশ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যজুর্বেদের পাদ পরিমাণ ঋকবেদের পাদ পরিমাণ অপেক্ষা অধিক, যজুঃ সমূহের পদ সংখ্যা এগারো হাজার কুড়ি।

ঋক বিষয়ে মহর্ষি ভৃগু বিস্তারিত তথ্য দিয়ে বলেছেন যে ঋকের মন্ত্র সংখ্যা দশ হাজার তিনশো আশি। ঋকের পরিমাণ এক হাজার। এছাড়া আর্থবিক আরও অনেক আছে। ঋকসমূহেরও অথর্বসমূহের মধ্যে মোট পাঁচ হাজার চরণ আছে। অন্যগুলিতে এই সংখ্যা কুড়ি হাজারের কম। অন্যান্য বলতে মহর্ষি অঙ্গিরা আরণ্যকের কথা উল্লেখ করেছেন।

এইভাবে আমি বিভিন্ন সংখ্যক শাখাভেদের কথা যথা সম্ভব বিস্তারিত ভাবে আপনাদের কাছে। বললাম। শাখা সমুহের কর্তার কথা ও শাখা ভেদের হেতুর কথাও যথাসম্ভব বিস্তৃতবাবে আলোচনা করলাম। হে দ্বিজোসত্তমগন, সব মন্বন্তরেই শাখাভেদ সমান বলে মনে জানবেন।

একমাত্র প্রজাপত্য শ্রুতি নিত্য। আর সকলই তার বিকল্প মাত্র। দেবতাদের অনিত্যতা হেতু বারবার এ ধরনের মন্দ্রোৎপত্তি ঘটে থাকে। তবে একটি কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে মন্বন্তরের আদিতে দেবতাদের নাম অবশ্যই থাকে। পরে দ্বাপর যুগে উপনীত হয়ে আবার এই সব ভেদকল্পনা শুরু হয়।

সুতরাং ঋষিসত্তম ভগবান ব্যাস দ্বৈপয়াণই বেদবিভাগ করে শিষ্যদের মধ্যে দান করেন। অতঃপর আবার তপস্যা করার জন্য বনে গমন করলেন, তারই শিষ্য ও উপশিষ্যরা এই সব শাখাভেদ করেছেন।

চারটি বেদ। ছয় বেদাঙ্গ। মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ মিলে চোদ্দটি বিদ্যা এবং আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ব বিদ্যা, ও অর্থশাস্ত্র মিলে মোট আঠারো রকম বিদ্যার অস্তিত্ব আছে।

প্রথমে ব্রহ্মর্ষিগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ থেকে দেবর্ষিগণ, তাদের থেকে রাজর্ষিগণ-ঋষিদের এই যে তিন ক্রমপর্যায় এঁরা সকলেই ব্রতাবলম্বী বলে পরিচিত এই ঋষিদের প্রকৃতিগণ বলে জ্ঞাত।

কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা ও অত্রি নামক পাঁচটি গোত্রে সমস্ত ব্রহ্মবাদী ঋষিরা জন্ম নিয়েছেন এঁরা ব্রহ্মার কাছে সমন করেন বলে এঁদের ব্রহ্মর্ষি বলা হয়।

পুলস্ত্য, পুলহ, ধর্ম, ক্রতু, প্রত্যুষ, প্রভাস ও কশ্যপেরক পুত্রগণ দেবর্ষি নামে পরিচিত হন। এবার সেইসব দেবর্ষিদের নাম বলছি শুনুন। দেবর্ষি নর ও নারায়ণ হলেন ধর্মপুত্র। দেবর্ষি বালখিল্য ক্রতুর পুত্র। অচল প্রত্যুষপুত্র। পর্বত ও নারদ কশ্যপের পুত্র। কর্দম পুলহের পুত্র এবং কুবের হলেন পুলস্ত্যের পুত্র। এঁরা দেবতাদের কাছে গমন করেন বলে এঁরা দেবর্ষি নামের অধিকারী।

সবশেষে, মানব, বৈষয় ও ঐড়বংশে জাত নৃপতিগণ, ঈক্ষাবাকুগণ ও নাভাদি পর্বতগণ রাজর্ষি নামে নামাঙ্কিত হয়েছেন। প্রজানুরঞ্জনের জন্য এরা প্রজাদের কাছে গমন করেন বলে এঁদের এই নামে অভিহিত করা হয়।

জন্ম, তপস্যা ও মন্ত্র ব্যবহারের বিভিন্নতার কারণে ব্রহ্মর্ষি, দিব্য রাজর্ষি ও দেবর্ষি হয়ে থাকেন। ব্রহ্মর্ষিরা ব্রহ্মলোকে, দেবর্ষিরা দেবলোকে ও রাজর্ষিরা ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠিত হন।

হে দৃঢ়ব্রতা ব্রাহ্মণগণ, এবার এঁদের লক্ষণ বিষয়ে বলছি। শুনুন–ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান এই তিন কালের সবল জ্ঞান ও সত্যবাদিতা সহযোগে যারা স্বয়ং বোধি সম্পন্ন, যাঁরা তপস্যার জন্য প্রসিদ্ধ, যারা গর্ভাবস্থায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করেন, যাঁরা মন্ত্র প্রবক্তা, যাঁরা ঐশ্বর্যবশত সর্বত্রগামী–সেই সব দেবতা, দ্বিজ ও রাজাগণ ‘ঋষি’ বলে জগতে বিখ্যাত হয়ে আছেন। সপ্ত ঋষি সপ্ত জ্ঞানে গরিমান্বিত হয়ে সপ্তর্ষি অভিধায় খ্যাতনামা হয়েছেন।

এঁরা স্বভাবতই দীর্ঘায়ু, মন্ত্রকারী ঈশ্বর, দিব্যচক্ষু, বোধিসম্পন্ন, প্রত্যক্ষধর্মা, গোত্র প্রবর্তক; যজনাদি ছয় প্রকার কর্মে রত। নিত্যশালী, গৃহমেধী হন। এর কর্মবশে অদৃষ্টানুসারে তুল্য ব্যবহার করে থাকেন। এরা স্বয়ং প্রস্তুত আগ্রাম্যরসে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। এঁদের এমন অনেকে সমৃদ্ধিবান কুটুম্ব আছেন, যাঁরা দেশের বাইরে ও ভেতরে বাস করেন।

সত্যযুগে এঁরাই প্রথম বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা প্রচলন করেন। যাঁরা সর্বতোভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রবর্তিত করেন। তাদের বংশেই বারবার বীরগণের জন্ম হয়।

পিতা পুত্র বা পুত্র পিতাতে অনেক সময়েই জন্মগ্রহণ করে যাবেন। এইভাবে জন্ম লাভের অবিচ্ছিন্নতা হেতু তারা যুগক্ষয় কাল পর্যন্ত বর্তমান থাকেন।

গৃহশ্রমীরা সংখ্যায় অষ্টআশি হাজার হয়ে থাকেন। এদের আবার দুটি ভাগ–দ্বারহোত্রী এবং অগ্নিহোত্রী। যারা অমার দক্ষিণে পিতৃযান আশ্রয় করে থাকেন, তারা দারহোত্রী, আর যারা প্রজাহেতুর মূল তারা হলেন অগ্নিহোত্রী।

এই যে অষ্টআশি হাজার দারপরিগ্রহকারী যাঁরা শ্মশানে আশ্রয় করেন, তারা সকলেই কিন্তু উত্তরায়ণকালে বিনষ্ট হয়ে যান। যে ঊর্ধ্বরেতাঃ ঋষিগণ স্বর্গগমন করেছেন বলে শোনা যায় যুগান্তকালে তারা পুনরায় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণবর্তা রূপে জন্ম লাভ করেন। এই ভাবে দ্বাপর যুগে তাঁদের গমনাগমন বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। তারপর যুগক্ষয় হলে তারা কল্পবিদ্যা, ভাষাবিদ্যা ও নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করে থাকেন।

পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে ভবিষ্য দ্বাপরে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তার কাল অতীত হলে মহাতপাঃ সুব্রত দ্বৈপায়ণ বেদব্যাস হবেন। সমস্ত ভবিষ্য দ্বাপর যুগ ধরে বেদগ্রন্থের একাধিক শাখা প্রণীত হবে। তাই বেদরূপ ব্রহ্ম থেকে ব্রহ্ম এবং তপস্যা দ্বারা অব্যয় পদ লাভ সম্ভব হবে।

তাই সেইসব ঊর্ধরেতা ঋষিগণ ক্রমে তপস্যা দ্বারা কর্ম, কর্ম দ্বারা যশ, যশ দ্বারা সত্য, সত্য দ্বারা অব্যয়, অব্যয় দ্বারা অমৃত এবং অমৃতে সর্বশুক্র লাভ করে থাকেন।

'ওঁ' এই একাক্ষর ব্রহ্মা আত্মাতেই বিরাজিত। বৃহত্ব হেতু তিনিই ব্রহ্মরূপে অভিহিত হন।

ব্রহ্ম প্রণবে অবস্থিত। তাই-ই আবার ভূঃ ভুবঃ সরঃ নামে অভিহিত। ঋক, সাম, যজুঃ অথর্বরূপী সেই পরম ব্রহ্মকে আমার প্রণাম জানাই।

যিনি অগাধ, যিনি অদ্বিতীয় ও অক্ষয়, যিনি জগৎ সম্মেলনের প্রধান আশ্রয়, যিনি প্রকাশ ও প্রবৃত্তি বলে পুরুষার্থ সাধক, যিনি সাংখ্যজ্ঞানীদের নিষ্ঠাস্বরূপ, যিনি শম-দমের গতি, যিনি অব্যক্ত অমৃত প্রকৃতি ও শ্বাশত ব্রহ্ম, যিনি প্রধান আত্মযোনি গুহ্য ও সত্ত্ব শব্দের দ্বারা পরিচিত, যিনি অবিভাজ্য শুক্র অক্ষর প্রভৃতি শব্দবাচ্য সেই পরমপূজ্য ব্রহ্মকে আমি নিত্য নমস্কার জানাই।

সত্যযুগে ক্রিয়া নেই। তাই অকৃতক্রিয়াও সম্ভব নয়। যা লোকে কৃত এ অকৃতরূপে ব্যবহৃত। তা একবারই করা হয়েছে।

যা কিছু শ্রুত বা শ্রোতব্য, যা কিছু অসাধুতা ও সাধুতা, যা কিছু জ্ঞাতব্য, মন্তব্য, প্রস্যব্য, ভোজ্য, দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য এবং যা কিছু দেবতাদের জ্ঞানরূপে গণ্য সে-সবই ব্রহ্মই প্রদর্শন করেছেন।

কোনো ব্যক্তি যখন যা কিছু করছে, সেই সবই তিনি জানতে পেরে যান! ইনি পূর্বে যা যা কিছু করেছেন, বহুকাল পরে অন্য সে বিষয়ে ভাবতে পারে।

কোনো ব্যক্তি যদি কোথাও কোনো শাস্ত্র প্রণয়ন করেন তাহলেও সেটা যেন তিনিই পূর্ব থেকে স্থির করে রেখেছেন বলে প্রতিভাত হয়।

জ্ঞান ও অজ্ঞান, প্রিয় ও অপ্রিয়, ধর্ম ও অধর্ম, বিরাগ ও অবিরাগ, সুখ ও দুঃখ, মৃত্যু ও মুক্তি, ঊর্ধ্ব অধঃ ও তির্যক–এই তিন প্রকার গতি এবং অদৃষ্ট–পরম ব্রহ্মই এ সব কিছুর মূল কারণ।

সমস্ত ত্রেতা যুগ ধরে জ্যেষ্ঠ স্বায়ম্ভব পরমশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার বারে বারে এক বিদ্যা হয়। পরে সমস্ত দ্বাপর যুগ ধরে সেই একই বিদ্যা বারে বারে বিভক্ত হয়।

বৈবস্বত মন্বন্তরের আদিকালে স্বয়ং ব্রহ্মা এইসব কথা বলে গেছেন। সমস্ত দ্বাপর যুগ বেদবিভাগকারী ঋষিগণ সংহিতা প্রণয়ন করেন। তাদের গোত্র পরম্পরাতেই সেইসব বেদশাখা বারে বারে প্রবর্তিত হয়। আর সেই গোত্রীয় ঋষিগণ যুগক্ষয়ের পরেও সেই সেই শাখা বিভাগ করে থাকেন। বেদ প্রণয়নকারী এইসব ঋষিদের সংখ্যা অষ্টআশি হাজার।

তাদের প্রণীত সংহিতাই যুগে যুগে আবর্তিত হতে থাকে। এদের সম্পর্কে আর সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে সূর্যের দক্ষিণাপথ অবলম্বন করে যারা শ্মশানে আশ্রয় করেন, তারাই যুগে যুগে বারবার এইরূপ শাখা বিভাগ করে থাকেন।

অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে বেদপারগ ঋষিগণ এইভাবে বেদশাকার বিভাজন করতে থাকেন।

অতীত ও বর্তমান মন্বন্তর ধরে অতীত শামা এবং অনাগত মন্বন্তরে অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ শাখাসমূহের প্রবর্তন হস্ত।

পূর্বের সাথে পশ্চিমের এবং বর্তমানের সাথে পূর্ব-পশ্চিম উভয়ের প্রবর্তন ঘটে। এইভাবে ক্রমানুসারে মন্বন্তর নিশ্চয় হয়ে থাকে।

দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও মনুগণ—এরা বেদমন্ত্রের সাথে উধ্বগমন করেন এবং বেদমন্ত্রের সাথেই আবার পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

দেবতাদের পশুকল্প জনলোক থেকে উপযুক্ত সময়ে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁরা অবশ্যম্ভাবী ভাবে অদৃষ্টকালের সাথে যুক্ত হন এবং অনুরাগ ভরে দোষমুক্ত জন্ম প্রত্যক্ষ করেন। তারপর তারা জনলোক থেকে চিরকালের জন্য তপোলোকে গমন করেন।

এইভাবেই সহস্র সহস্র দেবযুগ অতিবাহিত হয়ে যায়। যেহেতু কাল অনাদি এবং অসংখ্যেয় তাই দেবগণ মুনিগণের সাথে ব্রহ্মালোকে চলে গেলেন ইত্যাদি দিব্য বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আনুপূর্বিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

কালক্রম অনুসরণ করেই প্রতিটি সৃষ্টি ও যুগসমূহের নিবৃত্তি ঘটে থাকে। এইভাবেই ক্রম অনুসরণ করেই যাবতীয় প্রজাদের সাথে শত শত ও সহস্র সহস্র কল্প ও মন্বন্তর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে।

দিব্য সংখ্যায় যা আট শত সহস্র, অন্য অন্য হিসেবে তা বাহান্ন সহস্রেরও বেশি পরিমাণ মন্বন্তর হয়ে থাকে।

এর চোদ্দগুণে এক প্রলয়কাল হয় এক পূর্ণ সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন উদ্যাপিত হয়।

দেবতা ও ঋষিদেব সাথে মনুর স্থিতিকাল বিষয়ে একটি বর্ণনার কথা শোনা যায় তা হল—

সূর্যরশ্মিতে সমস্ত জীবজগৎ দগ্ধ হতে থাকলে দেব ঋষি ও দানবেরা ব্রহ্মাকে আগে রেখে দেবাদিদেব মহেশ্বরের শরণাপন্ন হলেন। তিনি দেবতাদের সহায় হলে সৃষ্টি রক্ষা পেল। এইভাবে কল্পসমূহের আদিতে দেবদেব মহাদেব নিখিল ভূতের স্রষ্টা হন।

এবার সমস্ত মন্বন্তরের প্রতিসন্ধিকাল সম্বন্ধে শুনুন—

হে দ্বিজসত্তমগণ, আমি পূর্বেই আপনাদের কাছে যে যুগের বিষয়ে বলছি, তা সত্য ক্রেতাদিযুক্ত হয়ে চতুর্যগ নামে চিহ্নিত হয়েছে। একে একাত্তর দিয়ে গুণ করলে যত পরিমিত সময় হয় তাই-ই মনুর অধিকার কাল বলে মনে করতে হবে। কারণ স্বয়ং ভগবান প্রভু ব্রহ্মা এই রূপ নির্দেশ দিয়েছেন, সমস্ত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎই মন্বন্তরে এরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

এইভাবে আমি স্বায়ম্ভুব মনুর সৃষ্টিকথা বর্ণনা করলাম। এবার অন্য মনুর প্রতিসন্ধি বিষয়ে যথাতত্ত্ব বলব।

এক্ষেত্রেও পূর্ব পূর্ব কল্পের মতো ঋষি ও দেবতাদের সাথে এবং অবশ্যম্ভাবী মন্বন্তরের সাথে মন্বন্তরের নিবৃত্তি ঘটে।

পূর্বে এইসব মন্বন্তরে যে সকল সপ্তর্ষি, দেবপিতৃ ও মনু এই ত্রিলোকে অধীশ্বর ছিলেন মন্বন্তরের সময় পূর্ণ হলে তাদের অধিকার ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে তখন তারা নিজের নিজের পর্যায় উপলব্ধি করে মহর্লোকের প্রতি উন্মুখ পুষেণ গমন করতে থাকেন। ফলে সেই বিশেষ মন্বন্তরে দেবতারা ক্ষীণ হয়ে যান। তখন সম্পূর্ণ স্থিতিকালে একমাত্র সত্য যুগ কালই বলবৎ থাকে। তারপর ভবিষ্যৎ মন্বন্তরের সূত্রপাত ঘটলে অধীশ্বর দেবতাগন পিতৃগণ, ঋষিগণ ও মনু আবার জন্ম নিয়ে থাকেন।

মন্বন্তর কালে কলিযুগ যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাতেই সত্যযুগ সম্পন্ন হয়। যেমনভাবে কলিযুগবাসী প্রজা সত্যযুগের প্রথম প্রজা বলে অভিহিত হন, তেমনভাবেই মন্বন্তর সমূহের অন্তিম ভাগের প্রজা অন্য মন্বন্তরের আদিম প্রজা বলে বিবেচিত হয়।

পূর্বের মন্বন্তর যখন ক্ষীণ হয়ে আসে এবং নতুন মন্বন্তরের সূচনা হয়, তখন সত্যযুগের আদিতে অবশিষ্ট সপ্তর্ষিরা মনুর কাল অপেক্ষা করেন অর্থাৎ অপর মন্বন্তরের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকেন।

মন্বন্তরের ব্যবস্থার জন্য এবার প্রজাদের উৎপত্তি তারা অর্থাৎ সপ্তর্ষিরা পূর্ব পূর্ব যুগের মতো ত্রিলোকের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হন। তারপর পূর্বের মতো ওষধি জন্মাতে আরম্ভ করলে প্রজারাও : কোথাও কোথাও গৃহাদি নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন।

এই নবীন মন্বন্তরেও যখন ঋষিদের পূর্ব ভাবনা অনুসারে সৎ ধর্ম ও বার্তা শাস্ত্র প্রবৃত্ত হয়, তখন চরাচর বিনষ্ট হয়ে যায়। বর্ণাশ্রমবর্জিত গ্রাম ও নগরগুলি নিরানন্দ হয়ে পড়ে। সেই সময় পূর্ব মন্বন্তর অবশিষ্ট থাকলে সেখানে যে সকল ধার্মিক সপ্তষি ও বেদবিদ মনু সন্তানের জন্য অতি দুশ্চর তপস্যা করেছিলেন তারাই সবকিছুর নিধনের মধ্যে পুনরায় উৎপন্ন হয়ে থাকেন।

এই ভাবে দেবতা অসুর, পিতৃগণ, মুনিগণ, পিশাচগণ, সর্পগণ, ভূতগণ, গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণ ক্রমে উৎপন্ন হন।

মন্বন্তরের আদিতে প্রথমেই ত্রেতা যুগের শুরুতে দেবতা তারপর সপ্তর্ষি, মনু ও মনুষ্যগণ সকলেই ধর্মপথে অবস্থান করতেন। এইভাবে ব্রহ্মচর্য ঋষিদের, সন্তান উৎপাদনে পিতৃদেব ও যজ্ঞেও দেবতাদের ঋণ পরিশোধ হয়ে থাকে। এঁদের মধ্যে যাঁরা আবার শিষ্ট প্রকৃতির তারা কেবল শিষ্টচারের কথাই বলতে থাকেন।

মন্বন্তরের আদিতে সপ্তর্ষিগণ মনু ও মনুষ্যগণ দেবতাদের সাথে কর্ম সম্পাদন করতে থাকেন।

তারা শত-সহস্র বর্ষ ধরে একই বর্ণ ধর্মে অবস্থান করেন এবং ত্রয়ী বার্তা, দণ্ডনীতি ধর্ম ও বর্ণাশ্রম স্থাপনান্তে স্বর্গ গমন করবেন বলে মনঃস্থির করেন।

পূর্বে সেইসব দেবতারাই স্বর্গের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলে প্রথমে দেবতারা, তারপর অন্যরা সামগ্রিকভাবে ধর্ম অবলম্বন করে সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন। পরে যখন মন্বন্তরের পরিবর্তন হল, তখন তারা সর্বভাবে পূর্ব অনুসৃত স্থান পরিত্যাগ করে মন্ত্র উচ্চারণের সাথে সাথে ঊর্ধ্বগমন করেন এবং অনাময় মহর্লোকে স্থান লাভ করেন। তখন তাদের সকল প্রকার মানসিক বিকার বিনষ্ট হয়ে যায়। তারা সংযম পালন করে প্রলয়কাল পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকেন।

তারপর এসময় এঁরা সকলেও যখন অতীত হলেন, তখন ত্রৈলোক্যের সেইসব দেবস্থান পুনরায় শূন্য হয়ে পড়লে, তখন মনে হতে লাগল যেন অন্যান্য স্বর্গবাসী দেবতারা আবার এখানেই এসে উপস্থিত হয়েছেন।

তখন দেখা যায় তারা আবার তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, সত্যপালন ও বেদ অধ্যয়ন সমন্বিত হয়ে নিজ নিজ স্থান পূরণ করে চলেছেন।

ইহলোকে সপ্তর্ষি মনু ও দেবতাগণ পিতৃগণের সাথে নিধন আদিকালেও যেখন সংঘটিত হয়েছিল, তেমনি ভবিষ্যতেও হবে।

ইহলোক মন্বন্তরের ক্ষয় ঘটলেও তাদের চিরবিচ্ছেদ ঘটে। এইভাবে ক্রমানুসারে সমস্ত মন্বন্তরের প্রলয় কাল পর্যন্ত তাঁদের স্থিতাবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

স্বায়ম্ভব বর্ণিত অতীত ও অনাগত মন্বন্তর সমূহের প্রতিসন্ধানের লক্ষণসমূহের এই হল আনুপূর্বিক বিবরণ।

সমুদয় মন্বন্তর অতীত হলে প্রলয়কাল পর্যন্ত তাদের আত্যন্তিক বিচ্ছেদ ঘটে।

মন্বন্তর সমূহের সেইসব পরিবর্তনগুলি প্রথমে একান্তভাবে মহর্লোকে দৃষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে তা মর্ত্যলোক থেকে জনতোক, তপোলোক ও সত্যলোকে গমন করে।

কোনো মন্বন্তরে যে যে বস্তুরাশির উদ্ভব ঘটে বা জন্মায় সেই সেই সময়ে ওইসব লোকসমূহে ওইসব বস্তু দেখতে পাওয়া যায়। এখন ওইসব বস্তুর নানা বিধত্ব দেখা যায় এবং সেই অনুসারে প্রত্যয়ত্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি সৃষ্টিকালের বিকারপ্রাপ্তি ঘটলে সেইসব কিছু ইহলোকে সত্যে অবস্থান করে, অপরান্তে মন্বন্তরের পরিবর্তন সমূহ সত্যকে পরিত্যাগ করে তারপর অভিযোগবশতঃ বিষমমূর্তি দেবনারায়ণে প্রবেশ করে।

বিধিবশে মন্বন্তরের পরিবর্তনসমূহ যখন বিলম্বে শুরু হল, তখন ক্ষয় ও উদয়ের দ্বারা নিয়মিত হয়ে জীবনোক ক্ষণকালের জন্য হলে আনন্দে অবস্থান করে।

এইভাবে ঋষিস্তত ধর্মাত্মা দিব্যদৃষ্টি মনসমূহের বায়ু প্রণিত সমগ্র উত্তরভাগই ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে। দৃষ্ট হয়ে থাকে।

রাজর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবতা, উরগ, সুরেশ, সপ্তর্ষি পিতৃগণ ও রাজগণ সকলের ক্ষেত্রেই মন্বন্তর সমূহের পরিবর্তনকালে উত্তম পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

যে সকল দেবতারা উদারমনা, বংশাভিজাত্যে দীপ্ত, প্রকৃষ্ট মেধাযুক্ত, কীর্তিমান ও খ্যাতি যুক্ত তাঁদের গুণকীর্তন সব সময় পুণ্যপ্রদ। তাদের কীর্তি কীর্তন করলে স্বর্গসুখ। পবিত্র শান্তি, পুত্রের মতো প্রিয় অনন্ত রহস্যময় পর্বে জপযোগ্য ও মহান দুঃস্বপ্নে স্বস্তি ও পরমায়ু বৃদ্ধি ঘটে।

এই আমি জন্মরহিত প্রজা-ঈশ্বর, দেবর্ষি মনু প্রধানদের সুখশ্রাব্য বংশচরিতাবলি অতিশয় সংযমের সাথে কীর্তন করলাম। এই বর্ণনা শ্রবণ করে আপনারা মহেশতত্ত্ব জ্ঞানে সিদ্ধিলাভ করুন।

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সকল কিছুই আনুপূর্বিকভাবে বর্ণনা করলাম। এরপর আর কোন্ বিষয়ে জানতে চান বলুন?

.

৫৭.

মহর্ষি শাংশপায়ন বললেন, হে পুরাণতজ্ঞ এ পর্যন্ত যতগুলি মন্বন্তর আছে এবং সেই সেই মন্বন্তরে যে যে বরেণ্যে দেবতা আছেন তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানতে ইচ্ছা করছি।

লোমহর্ষণ বললেন, যথা ইচ্ছা। অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তর সমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও প্রয়োজনে বিস্তারিত বর্ণনা করছি, শুনুন।

প্রথমে আমি অতীত মন্বন্তর বিষয়ে বলব।

অতীতে যে ছয়জন মনু ছিলেন তারা হলেন–স্বায়ম্ভব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ। প্রথমেই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর অতিক্রান্ত হয়েছে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর বিষয়ে আমি পূর্বেই আলোচনা করছি। তাই এবার দ্বিতীয় মনু যথাত্মা স্বারোচিষের প্রজাসৃষ্টি দিয়েই কথোপকথন শুরু করব।

স্বরোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামে দেবতাসমূহ এবং পারাকত ও বিদ্বান নামে দুই সন ছিলেন। তুষিতার গর্ভে স্বারোচিষ মনুর পুত্র পারাবত ও শিষ্ট জন্মলাভ করেন। এঁরা প্রত্যেকেই বারোজন দেবতা নিয়ে এক একটি গণ গঠন করেন। ছন্দজগণের মধ্যেও চব্বিশজন দেবতা ছিলেন।

ক্রুতাপুত্র বিবস্বান, তোপ, দেবসাধ্য যুগ, অজ, ভগবান, দেব, দুরোণ, মহাবল, আপ, মহাবাহু, মহৌজঃ বীর্যবান, চিকিত্বান, নিভৃত, অংশ প্রমুখ সকলেই ছিলেন সোমপয়ী।

স্বরোচিষ মন্বন্তরের দেবতা ছিলেন সেইসব পরাক্রান্ত পারাবত হোতা ও যস্বা, তারা হলেন প্রচেতা নামক দেবতা বিশ্বদেবগণ, সমঞ্জ, বিশ্রুত, অজিহম, অরিমর্জন, অজিহমান, মহীয়ান বিদ্যাবান, মহাভাগ দুই অজোয়া ও মহাবল যবীয়।

সেই সময় সোমপায়ী ও লোক বিশ্রুত চব্বিশ জন দেবতাই ছিলেন।

সপ্তর্ষি ছিলেন বষিষ্ঠপুত্র উজ্জ, স্বব্ব, কাশ্যপ, ভার্গব, দ্রোণ, ঋষভ, অঙ্গিরস, পৌলস্ত্য, দত্ত অত্রি আত্রেয়, নিশ্চল, পৌলহ ও আধ্ববীর প্রমুখ।

স্বারোচিষ মনুর বংশধরদের সময়টি পুরাণে দ্বিতীয় মন্বন্তর বলে খ্যাত। তারা হলেন চৈত্র, কবিরুত, কৃতান্ত, বিভূতি, রবি, বৃহদগুহ ও নব।

সপ্তর্ষিগণ, মনু, দেবগণ ও পিতৃগণ–এই চারজন হলেন মন্বন্তরের মূল ভিত্তি শক্তি। এঁদের মধ্যে প্রজারা বাস করে থাকেন। শাস্ত্রবিদিত সিদ্ধান্ত অনুসারে ঋষিদেব পুত্র দেবগণ দেবগণের পুত্র পিতৃগণ এবং দেবগণের পুত্র ঋষিগণ হলেন সেই মন্বন্তরের প্রজাবৃন্দ। এছাড়াও মনুর পুত্র হলেন ক্ষত্র ও বৈশ্যগণ এবং দ্বিজগণ হলেন সপ্তর্ষিদের পুত্র।

এইভাবে আমি স্বারোচিষ মন্বন্তরের বিষয়ে সংক্ষেপে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করলাম। তবে স্বায়ম্ভব স্বয়ং স্বারোচিষ মন্বন্তরের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে গেছেন। প্রজাদের বিভিন্ন কুলে তার বিবরণীর বহু পুনরুক্তি হয় বলে শত বৎসরেরও এর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

তৃতীয় পর্যায় আসে উত্তম মনুর মন্বন্তর। এই মন্বন্তরে পাঁচটি সন আছে। এবার আমি তাদের বিষয়ে বলব।

উত্তম মন্বন্তরের গণগুলি হল–সুধামাগণ। অন্যান্য বংশরক্ষক দেবগণ। প্রতদনগণ, শিবগণ ও সত্যগণ। বারোজন দেবতাকে নিয়ে একটি গণ গঠিত হয়েছে।

ঈর্ষ, উর্ষ, উজ্জ, ক্ষণ, ক্ষাম, জ্যেষ্ঠ, দম, দান্ত, ধুতি, বপুস্মান ও সত্য–এই দশজনকে নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠা।

অর, জ্যোতি, বৃহদবসু, বিশ্বাত্মা, বিশ্বধা, বিশ্বকর্মা, বিভাব্য, বিরাট যশা, মনস্বন্ত, সহস্রধারক ও শমিতা হলেন বংশরক্ষক দেবগণের বারোজন বন্দিত দেবতা, সুবিও।

অন্য অনাবাধিত, ক্রতু, কেতুমান, দেব, দিক, বসুধিষ্ণু, বিভাবসু, সুধর্মী, যশসী প্রমুখ। প্রতদনগনের দেবতা।

অহিহা, জন্তবাহ, বসুদান, বিষ, প্রতর্দন, যশস্কর, যতি, সুত্তি, সুনয়, সুদান, সুমঞ্জস ও হংসর–এই বারোজন হলেন উত্তম মন্বন্তরের সত্যগণ দেবতা।

মহাত্মা উত্তমের তেরোজন পুত্র ছিলেন। তাঁরা হলেন–অজ, অপ্রতিম, ঔশিজ, দিব্য, দিব্যৌষধি, দেবানুজ, নয়, পরশু, বিনীত মহোৎসাহ, সুকেতু, সুমিত্র, সুবল ও শুচি। এরা হলেন ক্ষত্রদের নেতা এবং তৃতীয় মন্বন্তরের দেবতা।

স্বারোচিষ মনু এই উত্তম মন্বন্তরে তামস মন্বন্তরের সৃষ্টির বিষয়ে বলে গেছেন।

তামস মন্বন্তর চতুর্থ পর্যায়ে কথিত হয়েছে। এই মন্বন্তরে সত্য, স্বরূপ, সুধা ও হরি–এই চারটি গণ বিদ্যমান।

তামস মন্বন্তরে পুলস্ত্যের পুত্রদের মধ্যে পঁচিশ জনকে নিয়ে এক-একটি গণ নির্ধারিত হয়েছে।

মুনিগণ বলে থাকেন, ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একশত। এর মধ্যে সত্যপ্রাণগণ হলেন প্রধান। তামস মন্বন্তরে এইসব ইন্দ্রিয়গণ দেবতা হন এবং সমস্ত দেবতাদের প্রভু প্রতাপবান শিবি সেই সময়ে ইন্দ্র হয়েছিলেন।

তামস মন্বন্তরে সততম সপ্তর্ষি ও অন্যান্য পুণ্যবান ঋষিগণ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এঁরা হলেন ভৃগু বংশীয় হর্ষ, কশ্যপবংশীয় পৃথু, আত্রিবংশীয় অগ্নি, জ্যোতিধামা, ভার্গব, জনুখণ্ড, বনপীঠ, পৌলহ, বশিষ্ঠগোত্র, চৈত্র ও পৌলস্ত।

অবিক্ষ, ঋত, ঋতবন্ধু, খ্যাতি, জনুখণ্ড, দৃদ্রেদ্যত, নর, পৃষ্ঠলোঢ়, প্রিয়ভৃত্য, ভয়, শান্তি প্রমুখ হলেন তামস মনুর দৃঢ়ব্রতা পুত্রান।

চারিষ্ণব মন্বন্তরের পঞ্জব পর্যায়ে দেবতাদের মধ্যে যে বিখ্যাত গণগুলির সমাবেশ ঘটে যায়। এবার সে সম্বন্ধে কিছু কথা শুনুন। এতে ছিলেন অমৃতাভ; ভূতরজা, বৈকুণ্ঠ ও সুমেধা–এই চার দেবতা। আর ছিলেন চরিষি প্রজাপতি বশিষ্ঠের পুত্রগণ এবং চোদ্দোজনকে নিয়ে গঠিত চারটি ভাস্করগণ।

অগ্নি, অমৃত, প্রাত্যতির্ষ্ঠ, প্রবিরাশী, বাঁচিনোদ, বাদ, প্রাণ, বিপ্র, বারিরার, ভাস সত্র ও সুবা–চারিষব মন্বন্তরে এই চোদ্দটি অমিতাভ গণ ছিল। আর এঁরাই ছিলেন সেই মন্বন্তরের দেবতা।

চারিষ্ণব মন্বন্তরের আরতি ঋত, জেতা, দ্যুতিমান, বিনয় বিরতি বিষ্ণু, যতি, মদ বস, সুমতি, সহ প্রমুখরা আভূত রজোগণ নামে নির্দিষ্ট।

অজেয় কৃশ, গৌর, জয়, দান্ত, নাথ, ধ্রুব, বৃষভেত্তা, বিদ্বান, ভীম, শুচি, যশোদম হলে চারিষ্ণব মন্বন্তবের বৈকুণ্ঠগণ।

অল্পমেধা, অশ্বমেধা, দীপ্তিমেধা, প্রতিমেধা, পৃশ্নি মেধা, ভূয়োমেধা, মেধাতিমি, সত্যমেধা, সর্বমেধাঃ, স্থিরমেধা, যশোমেধা এরা হলেন সুমেধা গণের দেবতা। তাদের সকলেরই ইন্দ্র ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত পুরুষ, বিক্রান্ত পৌরুষ বিভু।

বৈরত মন্বন্তরের ঋষিগণ হলেন অঙ্গিরস, আত্রেয়। ঊর্ধ্বীবাহু, কাশ্যপ, পর্জন্য, পৌলহ, বেদশ্রী, বশিষ্ট, সত্যনেত্র, যজুঃ ও হিরণ্যরামা।

মহাপুরাণ সম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গপরহা, বলবন্ধু নিরামিত্র, শুচি, কেতুভৃঙ্গ, দৃঢ় ব্রত–এরা সকলেই হলেন চরিষ্ণব মনুর পুত্র। এবং এই-ই হল পঞ্চম মন্বন্তর।

স্বারোচিষ, উত্তম, তামস ও বৈরত–এরা চারজনেই হলেন প্রিয়ব্রত-র বংশসম্ভূত।

চাক্ষুষ মন্বন্তরের ষষ্ঠ পর্যায়ে যে পাঁচজন দেবগণ রূপে স্মরণীয়, তারা হলেন আদ্য, ভাব্য, প্রসুত, পৃথক মহানুভব ও লেখ। মাতৃনামেরা এদের দেবসৃষ্টি বলে অভিহিত করেন।

অত্রিপুত্র আরণ্য প্রজাপতির পৌত্রেরা দেবগন এঁদের আটজন করে পৌত্রকে নিয়ে এক-একটি গণ হয়।

যারা আদ্য গণ রূপে খ্যাত তারা হলেন অন্তরিক্ষ, অতিথি, প্রিয়ব্রত, বসু, সুমন্তা, শ্রোতা, মন্তা ও জয়।

পদ্মনেত্র, পশ্য, দ্যুতি, মহাসত্ত্ব, মহাফল, সুবেশা, সুমনা, সুপ্রচেতন ও শ্যেনভদ্র হলেন প্রসূতগণ। অর্থপতি, উদ্যান, বিজ্ঞান, বিজয়, মন, সুজয়, সুপরি, সুমতি হলেন ভাবগণ।

অজিস্ট, মহাভাগ, অজিত, দেব, বিজয়, বানপৃষ্ঠ, বিষ্ণু, শাক্যন ও শংকর হলেন পৃথকুগণ। এবার আমি লেখকগণের কথা বলছি শুনুন।

মনোজেব, ধ্রুবক্ষিতি, প্রচেতাঃ, বৃহস্পতি, প্রখাশ, বীর্যবান, অবন, অদ্ভুত ও বাত লেখকগণ রূপে কীর্তিত হয়ে থাকেন। এই দেবগণের ইন্দ্র রূপে ছিলেন মহাবীর্য মনোজেব ।

চাক্ষুষ মন্বন্তরের সপ্তর্ষি হিসেবে ছিলেন অঙ্গিরার পুত্র হবিস্মান অত্রি বংশীয়, মধু কশ্যপবংশীয়, সুধামা পুলস্ত্যবংশীয়, অতিমান পুলহবংশীয়, সহিষ্ণু বশিষ্ঠবংশীয়, বীরজল্প এবং ভৃগু মুনির বংশধর উন্নত।

চাক্ষুষ মনুর পুত্রগণ হলেন অগ্নিৎ, অতিরাত্র, ঊরু, কৃতি, তপস্বী, পরু, সত্যবাক, সুদ্যুম্ন এবং শতদ্যুম্ন এঁরা নয় জন ছাড়াও নডলি মনুর পুত্র অভিমুন্য হলেন চাক্ষুষ মনুর দশতম পুত্র।

বৈবস্বত মনু সেইসব মহাত্মাদের সৃষ্টিকথা বিবৃত করেছিলেন, হে দ্বিজগণ, আমি আনুপূর্বিকভাবে এবং বিস্তারিত ভাবে মনু কথিত সকল কথাই ব্যক্ত করলাম।

শাংশপায়ন সহ অন্যান্য ঋষিরা অনুরোধপূর্বক বললেন–মনুর নিকটাত্মীয়রা কশ্যপ বংশে জন্ম নিয়েছিলেন। তারা ছাড়াও চাক্ষুষ মনুর বংশে অন্য যেসব মহাত্মা জন্মেছিলেন, তাদের বিষয়ে আমাদের যথাযত তত্ত্ব প্রদান করুন।

সূত বললেন, চাক্ষুষ মন্বন্তরের সৃষ্টি রহস্য আমি সংক্ষেপে বলব, শুনুন।

চাক্ষুষ মনুর বংশে বেনপুত্র প্রতাপবান পৃথু, অন্যান্য প্রজাপতিরা, দক্ষ এবং তেসরা জন্মলাভ করেছিলেন। এদের মধ্যে প্রজাপতি দক্ষের পুত্র রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। কারণ স্বায়ম্ভুব মনু অত্রির জন্য তাকে দান করেছিলেন তাই প্রজাপতি অত্রি উত্তানপাদকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

হে সংযতাত্মা দ্বিজগণ, সম্প্রতি ভবিষ্যৎ ষষ্ঠ চক্ষুষ মন্বন্তর অবলম্বন করে ভূমিকাসহ আপনাদের কাছে বর্ণনা করব।

উত্তানপাদের সহধর্মিণী হলেন সুনৃতা, ধর্মপত্নী লক্ষীর গর্ভে শুচিস্মিতা শুভবুদ্ধিসম্পন্না এই কন্যা জন্মেছিলেন। তিনিই পরে ধ্রুবের জননীরূপে জগতে বিখ্যাত হন। এ ছাড়াও ধ্রুব উত্তানপদের ঔরসে মহারানি সুনৃতার গর্ভে কীর্তিমান, অরস্নান ও বসু নামে তিন পুত্র ও মনস্বিনী এবং স্বরা নামে দুই কন্যা জন্মান। এই ধ্রুবু ছিলেন স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র, ত্রেতা যুগের প্রথম দিকে সুমহৎ যশ প্রার্থনা করে তিনি যোগমার্গে আত্মসংযম পালন করেন এবং কঠোর তপস্যা করতে থাকেন।

ধ্রুব ছিলেন মহাত্মা পুরুষ। তিনি প্রায় দিব্য দশ সহস্র বৎসর নিরাহারী থেকে তপস্যা করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় প্রীত হয়ে লোকাধিপতি ব্রহ্মা তাকে প্রলয়কাল পর্যন্ত জ্যোতিষ্কদের মধ্যে উদয়াস্তবিহীন এক মনোরম স্থান প্রদান করেন। দৈত্যাসুর আচার্য শুক্র ধ্রুবের অতিরিক্ত সমৃদ্ধি ও মহিমা দেখে এই শ্লোক গান করেছিলেন “আহো!” ধ্রুবের তপস্যার বীর্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও যজ্ঞানুষ্ঠান কত না আশ্চর্যকর! কারণ সপ্তর্ষিরা পর্যন্ত ধ্রুবকে তাদের স্থান দিয়েছেন।

সেই স্বর্গপতি লোকাধিপতী ঈশ্বর ও ধ্রুবের এই দুই পুত্র আকর্ষণ বোধ করেছেন।

সেই ভূমি ধ্রুবের ঔরসে দুটি পুত্র সন্তান উৎপাদন করেন। পুষ্টি ও ভব নামে প্রবের এই দুই পুত্র পরবর্তীকালে রাজা হয়েছিলেন। পুষ্টি তার নিজের ছায়াকেই পত্নী হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সত্যবাদী বিভু পুষ্টি এই বাক্য উচ্চারণ করামাত্র দিব্যকৃতি দিব্যাভরণ ভাষিতা সেই ছায়া সাথে সাথে তার সহধর্মিণী হলেন। এই পুষ্টি ছায়ার গর্ভের পাপশূন্য পুত্র উৎপাদন করেন। তাদের নামগুলি হল–প্রাচীনগর্ভ, বৃষক, বৃক, বৃকল ও ধৃতি। প্রাচীন গর্ভের ঔরসে তার পত্নী সুর্বচার গর্ভে উদারধী নামে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। এই উদারধী সম্পর্কে জানা যায় ইনি পূর্বজন্মে ইন্দ্র ছিলেন। তিনি সহস্র বৎসর পরে পরে একবার মাত্র আহার করতেন। এই জন্যই উদারধী কালে তিনি ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। উদারধী এই জন্মেও পরবর্তীকালে রাজা হয়েছিলেন।

উদারধীর পত্নী হলেন ভদ্রা, ভদ্রার গর্ভের উদারধীন নামে এক পুত্রসন্তান জন্মায়। দিব্যঞ্জয় নামে সেই পুত্র বহু দিব্য গুণের অধিকারী ছিলেন। বরাঙ্গী নামে সুলক্ষনা কন্যা দিব্যঞ্জয়ের ঔরসে রিপু নামে একটা পুত্রসন্তান প্রসব করেন। রিপুর ঔরসে বৃহতীর গর্ভের গুণবান সর্বতেজার চাক্ষুষ জন্মগ্রহণ করেন। মহাত্মা চাক্ষুষ অরণ্য প্রজাপতির কন্যা বারুণীকে পত্নীরূপে বরণ করেন।

এই বারুণী পুষ্করিণীতে মনু নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। মনুর পত্নী হলেন মহাভাগ বৈরাত প্রজাপতির কন্যা নাঙ্কালা। নাঙ্কালার গর্ভে মহাত্মা সংযতাত্মা মনুর দশ-দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই মনু পুত্ররা হলেন–ঊরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক, কবি, অগ্নিষ্ঠুৎ অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু। উরুর ঔরসে আত্রেয়ীর গর্ভে অঙ্গ, অঙ্গ রস, ক্রতু, সুমনা, স্বাতী ও শিব নামে ছয়টি মহাপ্রভাবশালী পুত্র জন্মায়। অঙ্গেয় ঔরসে সুনীথার গর্ভে বেণ নামে এক মহাতেজাঃ পুত্র জন্মায় তবে তিনি ছিলেন অত্যাচারী।

তাঁর দুনিবার দুর্ব্যবহারে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ দেখা দেয়। তখন বেণ-এর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় হিসেবে ঋষিগণ বেণের সন্তান লাভের কামনায় তার দক্ষিণ বাহু মন্থন করেন। বেণের দক্ষিণ বাহু মথিত হলে তা থেকে বৈণ্য নামে এক সন্তান জন্ম নিলেন। ইনি পরবর্তীকালে রাজা হয়েছিলেন। রাজা হিসাবে 'ইনি পৃথ' নামে পরিকীর্তিত হন।

জন্মকালে মহারাজা পৃথু, ধনুক ও কবচ ধারণ করেই স্বতেজে প্রজ্বলতি হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম সর্বলোক রক্ষা করেছিলেন। এছাড়াও সেই বেণপুত্র রাজাধিরাজ

পৃথু রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত। রাজাদের মধ্যেও আদি তার স্তবের জন্য স্তোত্রনিপুণ সুত ও মাগধ জাতি উৎপন্ন হয়।

সেই ধীমান মহারাজ বেণপুত্র বৈন্যস্বীয় প্রজাদের ভরণ-পোষণের জন্য গোরূপধারিণী বসুন্ধরা থেকে শস্যদুগ্ধ দোহন করেছিলেন। এই কাজে তাকে সাহায্য করেছিলেন দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, দানব, গন্ধর্ব, অস্পরা, লতা, পর্বত এবং অন্যান্য পুন্যাত্মা ব্যক্তিবর্গ। তাদের অভীষ্ট সেই সেই পাত্রে পৃথিবীকে দোহন করা হয়। এইভাবে রাজা পৃথু ইচ্ছামতো প্রজাদের দুগ্ধ করলেন এবং এতে সকলের জীবিকা নির্বাহ হয়।

এতদূর পর্যন্ত শ্রবণ করে উপস্থিত ঋষিগন বলে উঠলেন, হে মহামতি পৃথুর জন্মবৃত্তান্ত আপনি বিস্তারিত বলুন। কীভাবেই বা সেই মহাত্মা প্রবলপুরুষ বসুমতিকে দোহন করেছিলেন সে কথাও বলুন। পূর্বকালে এই কাজে কোন্ কোন্ পাত্র ব্যবহার করা হয়েছিল দোহনকর্তা কে ছিলেন? কোন বস্তু ক্ষীর হয়েছিল? কারা হয়েছিল বৎস? হে সূত এই সব বিষয়ে জানতে আমরা আগ্রহ বোধ করছি। আপনি সব কথা বিস্তারিত ভাবে বলুন। আরও বলুন ঠিক কী কারণে মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হয়ে বেণের বাহু মন্থন করেছিলেন।

লোমহর্ষণ সূত বললেন, হে দ্বিজোত্তমবৃন্দ বেণের পুত্ররূপে পৃথুর জন্ম অতি রোমাঞ্চকর এক অধ্যায়। আমি সেই উৎপত্তি-রহস্য আপনাদের কাছে ব্যক্ত করছি। আপনারা একাগ্র চিত্তে সংযতভাবে সব কথা শ্রবণ করুন।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, জেনে রাখুন সকলে এই বৃত্তান্ত শোনার অধিকার অর্জন করতে পারেন না। যাঁরা অশুচি, পাপমতি, অশিষ্ট্য, অহিতকারী ও প্রতহীন, তাঁরা এই পুণ্যকথা শোনার যোগ্য নন, এ অতি পবিত্র পাপহর গাথা। যে ব্যক্তি সাভিনিকেশ সহকারে অসূয়াহীন মনে ঋষিকথিত এই স্বর্গপ্রদ, যশস্কর আয়স্কর পুণ্য ও বেদসম্মত কাহিনী শ্রবণ করেন এবং মর্ত্যলোকবাসী ব্রাহ্মণদের নমস্কার করে বেণপুত্র পৃথুর জন্ম ইতিহাস শ্রবণ করেন তাকে কোনোদিন তার কৃত কাজ ও অকাজের জন্য শোক করতে হয় না।

অত্রিবংশে অঙ্গ নামে এক প্রজাপতির জন্ম হয়েছিল, বেণ হলেন তারই পুত্র। বেণের মতো অতি ধার্মিক সমসাময়িক পৃথিবীতে আর কেউ ছিলেন না। প্রজাপতি অহগ মৃত্যুর কন্যা সুনীথাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন, প্রজাপতির ঔরসে এই সুনীথার গর্ভেই বেণ জন্মগ্রহণ করেন। রাজা বেণ তাঁর মাতামহের দোষে ধর্মকে অবগত করতে শুরু করেন। নিজের হীন

কামনা চরিতার্থ করার জন্য তিনি লোভানলে জড়িয়ে পড়েন। ফলে অচিরেই ধর্মবিচ্যুত হয়ে অধর্মকে তার রাজ্যে স্থাপন করেন।

এইভাবে অঙ্গপুত্র বেণ বেদশাস্ত্রসম্মত নিয়মনীতি অতিক্রম করে অধর্ম কাজে রত হলেন। তার শাসনকালে প্রজারা বেদ অধ্যয়ন, কষ্টকারযুক্ত যাগযজ্ঞাদি সব পরিত্যাগ করেছিল। ফলে সেই সময় দেবতারা যাগযজ্ঞে আহুত সোম পান করতে পারতেন না।

এই ধরনের অধার্মিক কাজের ফলে বেণের বিনাশ কাল ঘনিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত অহংকার আর ক্ষমতার গর্বে রাজা বেণ একটি ক্রুর প্রতিজ্ঞা করলেন। তিনি বললেন, আজ হতে আমি আর কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ বা হোম করব না। আমার প্রজারাও করবে না। বরং দ্বিজগণ সমস্ত যজ্ঞে আমারই যজন করবে, আমারই পূজা করবে। এই রাজ্যে কেবল আমারই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হবে। কেবল আমারই উদ্দেশ্যে হোম হবে।

রাজা এই অনুচিত কার্যে প্রবৃত্ত হলেন, মরীচি প্রমুখ বেদবিদ মহর্ষিরা তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তারা বললেন–আপনি যা অনাচার প্রবর্তন করতে চাইছেন, তা সনাতন ধর্ম নয়। আপনি নিঃসংশয়ে নিজের নিধনের পথ প্রশস্ত করছেন।

ব্রহ্মজ্ঞাণী ঋষিদের এই সদুপদেশ বেণ তাচ্ছিল্যবাগীশ রাজা, উপরন্তু তাদের বললেন, আমিই হলাম ধর্মের সৃষ্টিকর্তা। আমি আর অন্য কারো কথাই শুনব না। এই পৃথিবীতে আমার মতো বেদশাস্ত্রজ্ঞ, তপোসম্পন্ন বীর্যবাণ ও সত্যবান পুরুষ আর কেউ নেই। আপনারা সর্বান্তকরণে আমাকেই মহাত্মা তথা সর্বলোকের উৎস বলে জানিবেন।

আমি ইচ্ছামাত্র পৃথিবীকে দগ্ধ করতে পারি, আমি ইচ্ছামত পৃথিবীকে জলপ্লাবিত করতে পারি, চাইলে সৃষ্টি করতে পারি, অথবা প্রলয়ও ঘটাতে পারি। আপনারা আমার ক্ষমতার প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ রাখবেন না।

অভিমানে অতিমানে বেণের মতিভ্রম দেখা দিল, ঋষিগণ বারংবার সংশোধনের পথে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। একসময় তারাও রাজা বেণের আচরণে ক্রুদ্ধ হলেন। তারা ক্রোধবশত অগ্নির মতো বিস্ফারিত হলেন, এবং সেই মহাবলশালী মহাবাহুকে নিগৃহীত করতে লাগলেন। তারা রাজা বেণের বাম বাহুকে মন্থন করতে লাগলেন।

রাজা বেণের বাম বাহুর মন্থন চলাকালে পূর্বেকার যজ্ঞে প্রতিশ্রুত এক অতিহ্রস্ব কৃষ্ণবর্ণের পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। এই অনন্তবিক্রম লোকটিই নিষাদবংশের পূর্বপুরুষ।

আর্বিভূত হওয়ার পর সেই খর্বাকৃতি মানুষটি ভীত ত্রস্ত ও ইন্দ্রিয়াকুল হয়ে ইতস্তত অঞ্জলিবদ্ধভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। ঋষিগণ তার আত্মবিহ্বল দশা দেখে তাকে বললেন, নিষাদ অর্থাৎ উপবেশন করো।

উপবিষ্ট হয়ে সেই অমিততেজাঃ ব্যক্তি বেণের পাপ-উৎপন্ন ধীবরদের সৃষ্টি করলেন। বেণকৃত পাপ থেকে আরও যারা উৎপন্ন হল, তারা হল অধর্ম, রুচি, বিন্ধ্যনিবাসী তুম্বুর, তবুর এবং খস।

বেণের প্রতি ক্রুদ্ধ সেইসব মহর্ষিরা তখন আবার বেণের দক্ষিণ বাহু অরণির মতো মন্থন করতে লাগলেন। সেই মথিত দক্ষিণ বাহুর তেজোরাশি থেকেই পৃথু জন্মগ্রহণ করলেন। স্থুল করতল হতে জন্ম নিয়েছিলেন বলে তার নাম হয় পৃথু।

জন্মের সময় পৃথুর শরীর আগুনের মতো প্রজ্বলিত হয়ে দীপ্তি পেতে থাকে। তিনি প্রজাগণকে রক্ষার জন্য প্রথমেই মহারবকারী “আজগব” নামে ধনুঃ, বৃহশ্বর এবং মহাপ্রভাজ্জ্বল কবচ ধারণ করলেন।

পৃথুর জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বেণরাজ স্বর্গে গমন করলেন। জগতের সকল প্রাণী আনন্দিত হল। তিনি সৎপুত্রের জন্মদানের মাধ্যমে “পুত” নামক নরক থেকেও পরিত্রাণ লাভ করলেন।

বেণপুত্র আদিরাজ প্রতাপবান মহারাজ পৃথু অঙ্গিরাপুত্র দেবতাদের দ্বারা অভিষিক্ত হলেন। নদী ও সমুদ্ররা বহু ধনসম্পদ এনে তাকে ভূষিত করলেন। মর্তবাসী ধন্য হল।

পিতা বেণ প্রজানুরঞ্জনে সমর্থ হননি। পৃথু কিন্তু প্রজাবর্গের অনুরঞ্জন করতে লাগলেন তাই প্রজারাও অনুরাগবশত তাকে “রাজা” উপাধি প্রদান করলেন।

পৃথু ছিলেন সকলেরই প্রিয়। তিনি যখন সমুদ্রে যেতেন, তখন জলরাশি স্তম্ভিত হত। যখন পর্বতে যেতেন পর্বত বিদীর্ণ হত। তিনি চিন্তা করামাত্র অন্ন পাওয়া যেত। তাঁর সমস্ত ধেনুই ছিল কামধেনু। প্রতিপটপুটে পাওয়া যেত সুমিষ্ট মধু।

তার আমলে অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞে সৌত্যদিনে যজ্ঞের অভিষবভূমিতে মহামতি সূত ও প্রাজ্ঞ মাগধ নামে দুই জাতি জন্ম নিয়েছিল।

ইন্দ্রের হবির সাথে বৃহস্পতির হবিঃ মিশ্রি করে দেবপ্রধান ইন্দ্রের উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়। তার থেকেই জন্ম লাভ করে সূত জাতি। আর দেবগুরু বৃহস্পতির হবিঃ ও শিষ্যশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের হবির মিশ্রণে প্রদত্ত আহুতিতে উত্তম ও অধমের সংযোগে বিকৃত বর্ণ মাগধ জাতির উদ্ভব ঘটল। এই সময় থেকেই যাগদিকর্মে প্রসাদনিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চালু হয়।

এইভাবে হীনযোনি ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণীতে 'সূত' জাতি উৎপন্ন হল। পূর্ব পূর্ব জাতির নিজ নিজ ধর্মানুসারে এই নবসৃষ্ট সূত জাতির ধর্ম নিরূপিত হল।

তদনুসারে রথ, হস্তী, অশ্বশিক্ষা, এক ক্ষত্রিয় ধর্মমতে জীবিকা নির্বাহ করা সূত, জাতির পক্ষে মধ্যম ধর্ম এবং চিকিৎসা কার্যসমূহ অধম ধর্ম রূপে স্বীকৃত হল।

দেবর্ষিরা নবোদ্ভূত সূত ও মাগধ জাতিকে আহ্বান করে তাদেরকে পৃথুর স্তব করার নির্দেশ দিলেন। তারা বললেন, ইনি সংশয়াতীতভাবে স্তবের যোগ্য। তোমরা এঁর স্তব করো।

সূত ও মাগধ প্রত্যুত্তরে ঋষিদের এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, আমরা দেবতা ও ঋষিদের শ্রেষ্ঠ কর্মাবলি জানি, সেই সেই কর্মের স্তুতি করে আমরা তাদের প্রতিবর্ধন করতে পারি। কিন্তু হে দ্বিজসত্তমগণ, আমরা যে এই তেজস্বী রাজার কর্ম, লক্ষণ, যশ, কোনো কিছুই জানি না। তবে কী প্রকারে আমরা তার স্তুতি করব?

ঋষিরা তাদের দুজনকে ভবিষ্যৎ কর্ম দ্বারা পৃথুর স্তব করার নির্দেশ দিলেন।

মহারাজাধিরাজ পৃথু প্রকৃত অর্থেই সত্যবান, জিতেন্দ্রিয়, জ্ঞানশীল, বদান্য ও সংগ্রামে অপরাজিত ছিলেন। তিনি নিয়তই দানকর্মে নিরত থাকতেন। মহাবল পৃথু যে যে কর্ম করতেন, সূত ও মাগধ সেই সেই অনুসারে তার স্তবগান করতেন। যেহেতু সেইসব কর্মাবলি ছিল পৃথুর স্বাভাবসিদ্ধ, তাই সূত ও মাগধের কীর্তিত স্তুতিও নিরন্তর হয়ে উঠল। প্রজানাথ পৃথু তাদের স্তরে সন্তুষ্ট হয়ে সূতকে অনুপদেশ এবং মাগধকে মগধদেশ দান করলেন।

সেই থেকে সূত ও মাগধবাসীরা রাজাদের স্তব করে চলেছেন এবং সূত ও মাগধ বন্দিদের আশীর্বাদমূলক গানে রাজাদের জাগরণ ঘটে চলেছে।

বেণপুত্র পৃথুর কার্যাবলি প্রত্যক্ষ করে পরমপ্রীত প্রজাদের প্রতি সেইসব মহর্ষিরা বললেন, এই নরাধিপ হলেন বেণের পুত্র। ইনিই তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করবেন।

মহর্ষিদের আশিষ বচন শুনে আহ্লাদিত প্রজাগণ তাদের অন্নজীবিকা সংস্থান কল্পে মহারাজ বৈণ্যের দিকে ধাবিত হলেন।

প্রজারা নিজেদের হিতকামনায় মহারাজের উদ্দেশে ছুটে গেলে সেই বলশালী রাজা বৈণ্য ও প্রজা সকলের মঙ্গলকামনায় ধনুর্বান ধারণ করে পৃথিবীকে প্রহার করতে লাগলেন। পৃথিবী সেই তীব্র প্রহার সহ্য করতে না পেরে গো-রূপ ধারণ করে বেগে পলায়ন করলেন। পৃথুও তার পশ্চাদধাবন করলেন। পৃথুর পরাক্রান্ত পৌরুষের হাত থেকে রক্ষা পাবার আশায় সেই পৃথিবী ব্রহ্মালোকাদি নানা লোকে গমন করলেন। কিন্তু সর্বত্রই বেণুপুত্র বৈণ্যকে উদ্যত ধর্নধারণ করে সামনে উপস্থিত দেখলেন।

প্রজ্জ্বলিত শিখাযুক্ত অসংখ্য শরে দীপ্ততেজাঃ অচ্যুত মহাযোগী মহাত্মা এবং দেবতাদেরও দুর্ধর্ষ সেই বৈণ্য পৃথুকে দেখে ত্রাণহীনা পৃথিবী উপায়ান্তর না দেখে সেই পৃথুরই শরণাপন্ন হলেন। ত্রিলোকপূজিতা সেই পৃথিবী কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন–হে রাজন, এক্ষণে স্ত্রীবধে আপনি কি কোনোই অধর্ম দেখছেন না! আমাকে ছাড়া আপনি কিভাবেই বা প্রজারক্ষা করবেন? পুরাণ/১৩

হে রাজাধিরাজ, আমাতেই লোকসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত। আমিই বিপুলা এই জগৎ ধারণ করে আছি, আমি না থাকলে প্রজারা বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

হে রাজসত্তম, আপনি যদি সত্যই প্রজাদের মঙ্গল করতে চান, তাহলে আমাকে বধ করা আপনার উচিত হবে না। আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন। আপনি নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে উপায়কে অনুসরণ করে যদি সমস্ত কাজ আরম্ভ করা যায় তবে সেইসব কাজ অবশ্যই সিদ্ধ হয়। প্রজাপালন বিষয়ে আমি হলাম এমনই এক উপায়। আমাকে বধ করলে আপনি কোনো অবস্থাতেই প্রজাহিত সাধনে সফল হবেন না।

হে দ্যুতিমনি মহাত্মা, আপনি আমার সহায় হলে আমি প্রজাদের অন্নস্বরূপ হব। আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন।

হে রাজন, তির্যগযোনিদের মধ্যেও যাঁরা স্ত্রীজাতি, তারা সকলের অবধ্য। এই কথা বিবেচনা করেও অন্তত আপনি ধর্ম ত্যাগ করবেন না।

সেই মহাভাগ ধর্মাত্মা রাজা পৃথিবীর কাছ থেকে এইরকম বহুবিধ কথা শুনলেন। তাঁর ক্রোধ সংবরণ হল। তিনি বললেন, হে দেবী, নিজ অথবা পর একজন মাত্র ব্যক্তির জন্য বহুসংখ্যক প্রাণ। হত্যা করা নিঃসন্দেহে মহাপাতক। কিন্তু একজন অভদ্রের অর্থাৎ ক্ষতিকারকের নিধনে যদি বহু লোকের সুখ হয়, তাহলে তাকে বধ করলেও পাতক বা উপপাতক কোনো পাপই হয় না।

হে বসুন্ধরে, একথা বলার তাৎপর্য এই যে, আপনি যদি আমার ইচ্ছা অনুসারে জগৎ তথা প্রজাবর্গের মঙ্গল না করেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ প্রজামঙ্গল সাধনের নিমিত্ত আমি অবশ্যই আপনাকে বধ করব।

হে ত্রিলোকের পূজিতা দেবী, আপনি যদি আমার আদেশ পালনে স্বীকৃত না হন, তাহলেও আমি এখনই আপনাকে বাণ নিক্ষেপ করে বধ করব। এবং এইভাবে নিজেকে সুবিস্তৃত করে প্রজাদেরও করব।

এরপর সেই মহাবলী পৃথু আদেশ দিলেন, হে ধার্মিকশ্রেষ্ঠা, আপনি এই মুহূর্তে আমার আদেশ শিরোধার্য করে প্রজাদের সঞ্জীবিত করুন, এই ব্যাপারে আপনি যে কতখানি পারদর্শী তা আমার অবগত আছে।

হে ঘোরদর্শনে আপনি আমার কন্যাত্ব গ্রহণ করুন। আপনার দিক থেকে এটিই যথার্থ হবে। আমি আজ হতেই আপনাকে ধর্মের কাজে নিযুক্ত করলাম।

বেদশাস্ত্রজ্ঞ বৈণ্যের মুখে ওই সংকল্পের কথা শুনে সতী পৃথিবী উত্তরে বললেন, রাজন্ আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আমি এই কাজ করব।

হে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে বৎস দান করুন। এর ফলে আমি সন্তানবৎসলা হয়ে দুগ্ধদান করতে পারব। আপনি এখন ব্যবস্থা করুন যাতে আমি সর্বত্র সমানভাবে দুগ্ধক্ষরণ করতে পারি।

দেবী পৃথিবীর এই কথা শুনে রাজা পৃথু ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে উত্থিত শিলারাশি অপসারিত করেন। তাতে শৈলর শির উপরিভাগ মসৃণ হয়ে ওঠে। এর আগে মন্বন্তরগুলি অতীত অতীত হলে বসুন্ধরা স্বভাবতই বন্ধুর হয়ে পড়েছিল। এতদিনে সেইসব স্থান সমতা লাভ করল।

পূর্বে সৃষ্টির আদিকালে সেই বন্ধুর পৃথিবীতে নগর, গ্রামাদির বিভাগ শস্য, গোরক্ষা, কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি কিছুই ছিল না। এবার বৈবস্বত মন্বন্তরে এসে সেই সব কিছুর নবভাবে উৎপত্তি হল। অবশ্য চাক্ষুষ মন্বন্তরে এসবের মস্তিত্ব ছিল।

বৈবস্বত মন্বন্তরে রাজা পৃথুর ধর্ণুর্চালনোর ফলে অসমতল ধরিত্রী যেখানে সেখানে সমতল হল, সেখানে সেখানেই এই যুগের প্রজারা বাসস্থান গড়ে তুললেন।

এই মর্ত্যলোকে বেণুপুত্রের সময় থেকেই প্রজাদের হিতার্থে ফলমূলাদি উৎপন্ন হতে থাকে।

পূর্বে ওষধিসমূহ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই রাজা পৃথু চাক্ষুষ মনুকে স্মরণ করে তাকে বৎসরূপে কল্পনা করলেন। এইভাবে বহু কষ্টে তিনি পৃথিবী থেকে শস্য দোহন করে প্রজাদের পালন করলেন। একই সঙ্গে তিনি বসুন্ধরা থেকে ভূমিপাত্র শস্যদুগ্ধ দোহন করলেন। তখন তার রাজ্যবাসী পূজারা সেই অন্ন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন।

এরপর ঋষি সত্তমদের সমবেত স্তব-স্তোত্র পাঠে আবার বসুন্ধরার দোহন শুরু হল। এইবার দোগ্ধা, হলেন বৃহস্পতি, বৎস হলেন চন্দ্র, পাত্র হলো গায়ত্র্যাদি বেদ, আর দুগ্ধ হল শাশ্বত তপোব্রহ্ম।

এরপর ইন্দ্র সহ অন্যান্য দেবগণ আবার স্তবপাঠে বৃত হলেন। তারা সুবর্ণময় পাত্রে অমৃতরূপ দুগ্ধ দোহন করলেন। আর তা থেকেই ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণের জীবিকা নির্বাহ হল।

নাগগণও স্তব দ্বারা পৃথিবীর ভূমিভাগ থেকে বিষদুগ্ধ দোহন করলেন। নাগগণের ক্ষেত্রে বাসুকি হলেন দোগ্ধা। কপুত্রগণ সেই দুগ্ধ পান করে মহাতেজঃ সম্পন্ন হয়ে উঠলেন। নাগ একা সমগ্র সর্পকুল ওই দুগ্ধ পান করে জীবনধারণ করলেন। এর ফলে অচিরেই তারা উগ্র মহাকায় ও ভয়ংকর হয়ে ওঠেন।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ওই বিষদুগ্ধকেই নাগ ও সর্পকুলের আহার, আচার, বীর্য ও আশ্রয় বলে জানবেন।

যক্ষগণও পৃথিবী দোহনে অংশ নিলেন। তারা বৈশ্রবণ কুবেরকে বৎস কল্পনা করে তাম্রপাত্রে অন্তর্ধান দুগ্ধ পৃথিবী থেকে দোহন করেন। এই কাজে মুনিবরের পিতৃদেব জহ্নুনাভ হয়েছিলেন দোগ্ধা, এই দোগ্ধা ছিলেন যক্ষপুত্র, মহাতেজশালী বশী ও মহাবল। এইভাবেই যক্ষরা জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন।

তারপর রাক্ষস ও পিশাচগণও বসুধা দোহন শুরু করেন। তাদের ক্ষেত্রে ব্রহ্মোপেত হলেন দোগ্ধা, কুবেরক হলেন বৎস ও রক্ত হল দুগ্ধ। রাক্ষসদের দোহনকালে বলবান সুমালী দোগ্ধা হলেন যে রক্ত দুগ্ধ হয়েছিল, তাই দিয়েই রাক্ষসরা জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন।

গন্ধর্বগণ ও অপ্সররা চিত্ররথকে বৎস কল্পনা করে পদ্মপাত্রে শুচিগন্ধ দুগ্ধ দোহন করেন। তাদের মধ্যে বিশ্বাবসু ছিলেন দোগ্ধা। সে-সময়ে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর মতো অতিবল মহাত্মা ও সূর্যতুল্য তেজের অধিকারী আর কেউ ছিলেন না।

এরপর আবার শলরা স্তব দ্বারা সন্তুষ্ট করে দেবী বসুন্ধরাকে দোহন করেন। এই দোহনের ফলে মূর্তিমতী ওষধি ও বিবিধ রত্ন লাভ হয়। এক্ষেত্রে শৈলরাজ হিমালয় হয়েছিলেন বৎস, মহাগিরি মেরু হয়েছিলেন। দোগ্ধা, শৈল হন পাত্র। দোহনের পরে সেইভাবেই শৈলসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৃক্ষলতারা যখন দোহন করতে এলেন, তখন কামপ্রদ পুষ্পিত শৈল হয়েছিলেন বৎস, পলাশ হল পাত্র, ছিন্ন প্ররোহণ হয় দুগ্ধ। এছাড়া ভূতভাবিনী যশস্বিনী সর্বকামপ্রদ পৃথিবী স্বয়ং ধেণু হয়েছিলেন।

সূতমুখে এই বিশাল বৃত্তান্তে আনুপূর্বিক বিবরণ শুনে হৃষ্টচিত্ত ঋষিগণ বললেন, হে পুরাণজ্ঞ সূত, আমরা শুনেছি, এই বসুন্ধরাই ধাত্রী ও বিধাত্রী হয়ে সর্বলোক ধারণ করেন। মহারাজ বেণপুত্র পৃথু লোকহিতার্থে পৃথিবীকে দোহন করেন, যার ফলে লোকচরাচরের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল, একথা কি যথার্থ?

.

৫৮.

প্রত্যুত্তরে সূত বললেন–পণ্ডিতদের মুখে এমন কথাও শোনা যায়, এই পৃথিবী সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এই পুণ্যপ্রদ ভূমিভাগ বসু অর্থাৎ ধন ধারণ করেন বলে এর নাম রাখা হয়েছে বসুধা, এছাড়া এই পৃথিবীতল মেদিনী নামেও পরিচিত। বলা হয়, পূর্বমধু ও কৈটভ নামে দুই দানবের মেদে পৃথিবী সমুদ্র পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। তাই সন্নিহিত ভূ-ভাগ হল "মেদিনী", পরে ধীমান ধেন্য অর্থাৎ রাজা পৃথুর দুহিতৃত্ব স্বীকার করেছিলেন বলে তার নাম হয় পৃথিবী।

মহারাজা পৃথু এই পৃথিবীকে কন্যারূপে গ্রহণ করে তাকে মানব কল্যাণের কাজে নিযুক্ত করলেন। তিনি বসুন্ধরার আয়তনের বৃদ্ধি ঘটালেন। তার শোভা বর্ধন করলেন। বসুন্ধরা হয়ে উঠলেন শস্যের ও নগরাদির আকর। রাজা পৃথু চতুবর্ণযুক্ত পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করলেন।

প্রজাকল্যাণের নিমিত্ত সদা তৎপর থাকতেন রাজা পৃথু। তিনি ছিলেন সমস্ত প্রাণীর নমস্য ও পূজ্য। যতভাবে বললাম তার চেয়েও বুঝি শতগুণে প্রভাবশালী ছিলেন রাজা বৈণ্য। যথার্থই তিনি ছিলেন নৃপসত্তম।

অতএব, বেদবেদাঙ্গপারগ মহাভাগ ব্রাহ্মণদের অবশ্য কর্তব্য হল ব্রহ্মযোনি সনাতন পৃথুকে নমস্কার কর।

যে সমস্ত মহাভাগ রাজাগণ মহৎ যশ প্রার্থনা করেন, তাদেরও কর্তব্য আদিরাজ প্রদাপবান বৈণ্যকে নমস্কার করা।

যে সমস্ত রণকুশল যোদ্ধা সংগ্রামে সতত জয় প্রার্থনা করেন, সেইসব যোদ্ধাদেরও মানুষের আদিকর্তা পৃথুকে নমস্কার করা উচিত।

বলা হয়, যে যোদ্ধা পৃথুর নাম স্মরণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন, তিনি ঘোর সংগ্রামে কতুশলী ও কীর্তিমান হয়ে থাকেন।

মহান বৃত্তিদাতা মহাযশাঃ রাজা বৈণ্য, সকল বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বনকারীদের কাছেও নমস্কার্য ছিলেন।

আমি ক্রমে ক্রমে বৎসপিশষের কথা, দেগ্ধোগণের কথা, দুগ্ধের কথা, পাত্রের কথা, সকলই বললাম।

পুরাকালে মহাত্মা ব্রহ্মা সর্বপ্রথম পৃথিবীকে দোহন করতে শুরু করেন। তিনি একাজে বসুকে বৎস কল্পনা করে পৃথিবী থেকে বহুপ্রকার বীজরূপ দুগ্ধ দোহন করেন।

তারপর আবার স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথিবীকে দোহন করা হয়। এবার বৈণপুত্র পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকেই বৎস কল্পনা করে পৃথিবীকে দোহন করেন।

তারপর স্বারোচিষ মন্বন্তরে পুরাকালে স্বারেচিষ মনুকে বৎস কল্পনা করে ধীমান চৈত্র পৃথিবী থেকে শস্য দোহন করতে উদ্যোগী হন।

উত্তম মন্বন্তরে সর্বত্তম দেবভূজ মনুকে বৎসরূপে কল্পনা করে ধীমান সর্বোত্তম পৃথিবী থেকে সর্ব শস্য দোহন করেন।

পঞ্চম তামস মন্বন্তরে বলবন্ধু তামসকে বৎস করে পুরাণ পৃথিবী দোহন করেন। তারপর চাক্ষুস মন্বন্তর উপস্থিত হলে একইভাবে পুরাণ প্রজাপতি চাক্ষুষকে বৎস কল্পনা করে পৃথিবী দোহন করেন।

চাক্ষুষ মন্বন্তর-অন্তে এবার বৈবস্বত মন্বন্তর ফিরে এল। এবার বৈণপুত্র পৃথু পৃথিবীকে সর্বপ্রকারে দোহন করেন। পৃথু কর্তৃক পৃথিবী দোহন পর্ব আমি আগেই বর্ণনা করেছি।

পুরাকালে সমস্ত অতীত মন্বন্তরে এইভাবেই দেবতা, মানুষ ও প্রাণীরা বারে বারে পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন।

এইভাবে সমস্ত অতীত ও অনাগত মন্বন্তরের দেবতাদের কথা বলা সম্পূর্ণ হল। এবার সেই মহান রাজা পৃথুর বংশধরদের বিষয়ে কিছু শুনুন।

পৃথুর ঔরসে শিখণ্ডিনীর গর্ভে অন্তর্ধি ও পালী নামে দুই বিক্রমশীল পুত্র জন্মলাভ করে। এছাড়া অন্তর্ধানের গর্ভে হবির্ধান নামে এক পুত্র জন্ম নেন।

অগ্নিকন্যার গর্ভে হবিধানের ঔরসে বিষণা প্রাচীন বর্হি ইত্যাদি ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হয়।

প্রাচীনবর্হি ছিলেন মহান ভগবান প্রজাপতি। সমগ্র, পৃথিবীতে বল, শ্রুতি ও তপোবীর্যে তার তুলনীয় আর কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সমসাময়িক পৃথিবীর একছত্র সম্রাট। যে সমস্ত কুশের অগ্রপ্রান্ত অতি প্রাচীন, সেই সমস্ত কুশ তিনি সংগ্রহ করতেন। সেই কারণেই তার নাম হয়েছে। প্রাচীনবর্হি।

প্রাচীনবর্হি এক সমুদ্র তনয়াকে বিবাহ করেন। তার নাম ছিল সবর্ণা। বিবাহের পরে মহততম কাল অতিক্রান্ত হলে প্রজাপতি প্রাচীনবর্হির ঔরসে সবর্ণার গর্ভে দশটি সন্তান জন্ম লাভ করে। মহীতে তাদের সকল সন্তান "প্রচেতা" নামে পরিচিত হন। এঁরা সকলেই ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

প্রাচীনবর্হি-সবর্ণার সন্তান এই দশজন প্রচেতা সবসময় একসঙ্গে ধর্মাচরণ করতেন। তারা দশসহস্র বৎসর ধরে সমুদ্রতরে নিমজ্জিত থেকে এক কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। তাদের এই ঘোর তপস্যার পরে পৃথিবী অরক্ষিত হয়ে পড়ল। আর তাকে রক্ষা করার মত কেউ রইল না। বহু বৃক্ষ ভূমিভাগকে আচ্ছন্ন করল। ফলে দ্রুত প্রজাক্ষয় হতে লাগল।

চাক্ষুষ মন্বন্তরের বাতাস ও তাঁদের তপশ্চর্চার তীব্র বল সহ্য করতে পারল না। বিশাল আকাশের সুনীলতা বৃক্ষরাজিতে আচ্ছন্ন হল। এতসব দুর্বিপাকের মধ্যে প্রজারা দশ সহস্র বৎসর ধরে কোনো রকমের কাজই করতে পারলেন না।

প্রচেতাগণ যখন এই সংবাদ জানতে পারলেন, তারা অত্যন্ত ক্রোধিত হয়ে উঠলেন। তারা মুখ থেকে বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করলেন।

দেববল উৎপন্ন এই বায়ু পৃথিবী আচ্ছন্নকারী বৃক্ষরাজিকে সমূলে উৎপাটিত করার ব্যবস্থা করল। সেই তীব্র বায়ুস্রোতে বৃক্ষগুলো উন্মল হয়ে শুষ্ক হয়ে পড়ল। আর যোর অগ্নি সেই শুষ্ক বৃক্ষগুলোকে দগ্ধ করে নিঃশেষ করে দিল। বায়ু ও অগ্নির দাপটে পৃথিবীর বুকে উৎপন্ন অধিকাংশ বৃক্ষ বিনষ্ট হল। যে স্বল্পসংখ্যক বৃক্ষ অবশিষ্ট ছিল রাজা সোম অর্থাৎ তাদেরকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি স্বয়ং প্রচেতাদের কাছে গিয়ে বললেন, যে প্রাচীনবহিপুত্র প্রচেতাগণ, পৃথিবীতে লোক বিস্তারের জন্য এই অবশিষ্ট বৃক্ষরাজির প্রয়োজন আছে। আপনারা নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করুন। পৃথিবীকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এদের রক্ষা করুন।

তিনি আরো বললেন–হে মহাভাগ প্রচেতাগণ, ইতিমধ্যেই পৃথিবী প্রায় বৃক্ষশূন্য হয়ে পড়েছে। এই ভীষণ অগ্নি ও বায়ু প্রশমিত থেকে চেয়ে দেখুন, এই রত্নবিভূষিতা বরবর্ণিনী নারী হলেন বৃক্ষকন্যা।

ভবিষ্যৎ জানার বৃথা গর্বে আমি একে অসংখ্য বৃক্ষে নির্মাণ করেছি। এঁর নাম মারিষা। আমার কিরণ বর্ধিতা মারিষাকে আপনি ভার্যারূপে গ্রহণ করুন। আমি আশীর্বাদ করছি আপনার তেজের অর্ধেক ও আমার তেজের অর্ধেক দিয়ে এঁর গর্ভে দক্ষ নামে এক বিদ্বান ধর্মপ্রাণ মহাত্মা প্রজাপতি উৎপন্ন হবেন। আপনাদের সকলের তেজোময় অগ্নিচ্ছটায় সেই অগ্নিসম প্রজাপতি দক্ষ এইসব অতি দগ্ধ, বৃক্ষদেরও বৃদ্ধি ঘটিয়ে পুনর্বার প্রজাবৃদ্ধি করবেন।

রাজা সোমের এই সুমধুর বচন শুনে তপস্যারত প্রচেতারা তাদের ক্রোধ সংবরণ করলেন। তারা মহিষা ধর্মমতানুসারে পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন।

প্রচেতাগণ মনে মনে মারিষার গর্ভাধান করলেন। সেইমতো দশজন প্রচেতা ও সোমের অংশ সহযোগে মারিষার গর্ভে অত্যন্ত তেজস্বী বীর্যবান পুত্ররূপে দক্ষ জন্মলাভ করলেন।

এইভাবে বিনা মৈথুনে মনে মনে প্রজা সৃষ্টি করার পর অচর, চরু, দ্বিপদ, চতুষ্পদ বহু কন্যা সৃষ্টি করলেন। এই সমস্ত মানসী কন্যাদের মধ্যে ধর্মকে দশটি, কশ্যপকে তেরোটি, কালনিয়ন্ত্রণে নিযুক্তা নক্ষত্ররূপা সাতাশটি কন্যাকে চন্দ্রের উদ্দেশ্যে দান করলেন, এছাড়াও তারা অরিষ্টমেমিকে তিন কন্যা, বাহু পুত্রকে দুইটি কন্যা, অঙ্গিরাকে একটি কন্যা এবং কৃশাশ্বকেও একটি করে কন্যা দান করলেন। এবার তাদের সন্তানদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা বিষয়ে শুনুন।

এই সময় চাক্ষুষ মনুর ষষ্ঠ মন্বন্তরের অবসান হলে প্রজাপতি মনুর সপ্তম মন্বন্তর সূচিত হল।

পূর্বে মারিষার গর্ভজাত যত সংখ্যক কন্যার কথা বলেছি সেইসব কন্যাদের গর্ভে দেবতা, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব, পক্ষী, নাভা, অপ্সরা এবং অন্যান্য বহুজাতির জন্ম হল।

সেই ঘটনার পর থেকেই এই পৃথিবীতে সকল প্রজা মৈথুনের ফলে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এর পূর্বাবস্থায় সংকল্প, দর্শন ও স্পর্শে প্রজা সৃষ্টি হত।

ঋষিরা বললেন, হে মহাভাগ আপনার মুখ থেকে দেবতা, দানব, দেবর্ষি ও মহাত্মা দক্ষের উৎপত্তি বিষয়ে বিস্তারিত জানলাম। আমরা ধন্য।

আপনি পূর্বে বলেছিলেন যে প্রাণ হতেই প্রজাপতি দক্ষের জন্ম হয়। তাহলে কীভাবে সেই মহাত্মা প্রাচেত সত্ব লাভ করলেন? প্রাচেতাদের পুত্ররূপে তার এই আবির্ভাব কিভাবে সম্ভব হল?

হে সূত এর আগে আপনার মুখেই শুনেছি দক্ষ হলেই সোমের দৌহিত্র, সেই তিনি আবার কীভাবে তার শ্বশুর হয়ে উঠলেন? এতে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। আপনি এর যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিন।

সূত উত্তরে বললেন, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ, প্রাণীদের উৎপত্তি ও লয় নিত্যই হয়ে থাকে। তার দ্বারা বিদ্বান ঋষিগণ কখনোই মোহিত হন না।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, পূর্বে জ্যেষ্ঠত্ব বা কনিষ্ঠত্ব বলে কিছুই ছিল না। তপস্যাই ছিল প্রধান এবং প্রভাবই ছিল এধরনের বিষয়ের একমাত্র কারণ।

যে ব্যক্তি চাক্ষুষ মন্বন্তরের এই চরাচর সৃষ্টি বিষয়ে জানিতে পারেন, তিনি সাধারণ প্রজাদের তুলনায় সঠিক আয়ু লাভ করেন এবং মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গমন করে পূজিত হন।

এই হল চাক্ষুষ মনুর সংক্ষিপ্ত সৃষ্টি তত্ত্ব।

হে দ্বিজসত্তমগণ, এইভাবে আজ পর্যন্ত স্বায়ম্ভুবাদি চাক্ষুষ পর্যন্ত ছয়টি মন্বন্তর সৃষ্টি অতীত হয়েছে। এইসব সৃষ্টি বৃত্তান্ত আমি আমার জ্ঞানানুসারে বললাম।

এবার বৈবস্বত মনুর সৃষ্টি বিষয়ে জানতে হবে। প্রথমেই জানা দরকার–বৈবস্বতের সৃষ্টিগুলি অনন্ত বা অতিরিক্ত কিছুই না। যে ব্যক্তি অসয়াবিহীন হয়ে এইসব পাঠ করেন, তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম, আরোগ্য, আয়ু এইসব পেয়ে থাকেন। তিনি জীবন ধরে অতিশুভ ফল লাভ করে স্বর্গে গিয়েও পূজিত হয়ে থাকে।

এবার আমি সেই মহান বৈবস্বত মনুর সৃষ্টি বিষয়ে তত্ত্বালোচনা করব। শ্রবণ করুন|

.

৫৯.

বৈবস্বত মনুর সৃষ্টি রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সূত বললেন, বৈরিণীর গর্ভ সম্ভূতা সতী দক্ষের কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দক্ষের অপরাপর কন্যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও বিশিষ্টা ছিলেন। তদুপরি সতী ছিলেন আদ্যন্ত ব্রহ্মপরায়না।

একদিন দক্ষ সতাঁকে নিয়ে বৈরাজ ব্রহ্মার সন্দর্শনে গেলেন। ব্রহ্মালোকে পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন ধর্ম ও ভব (শিব) ব্রহ্মার উপাসনায় মগ্ন। তখন ভব ও ধর্মের দেখাদেখি দক্ষ ও তার সুরক্ষণা নন্দিনী সতীও ব্রহ্মার চরণ বন্দনা করতে লাগলেন। পিতা-পুত্রী নির্ণিমেষ ব্রহ্মার তেজোময় রূপ দেখতে লাগলেন।

ব্রহ্মা প্রীত হলেন। ভব ও ধর্মের উপস্থিতিতেই তিনি দক্ষের উদ্দেশ্যে বললেন, দক্ষ আপনারা এই সুব্রতা কন্যা চারিটি পুত্র প্রসব করবে। পুত্ররা সকলেই প্রভাব সম্পন্ন ও চতুবর্ণের কারণ হবেন।

ব্রহ্মার আশীর্বাদ বচন শুনে দক্ষ, ধর্ম, ভব ও ব্রহ্মা–এঁরা চারজনেই পুত্রলাভের আশায় মনে মনে সেই কন্যার কাছে গমন করলেন। দক্ষ, ব্রহ্ম, ধর্ম ও ভবের দ্বারা অচিরেই সতীর গর্ভে সন্তান এল। এই ব্যাপারটি তাদেরও অবগত হল। যেহেতু তারা চারজনেই ছিলেন সত্যবাদী, তাই তাদের সৎ সংকল্প অনুসারে তাদের চারটি কুমার জন্মলাভ করলেন।

সতীর গর্ভে উল্লিখিত চার মহাত্মার ঔরসে যে শিশুরা জন্ম নিলেন তারা সকলেই ছিলেন সিদ্ধেন্দ্রিয়, শ্রীমণ্ডিত উপভোগক্ষম ও শরীরধারী' সেই সদ্যোজাত পুত্রদের দেখামাত্র দক্ষ, ব্রহ্মা, ধর্ম ও ভব–এঁরা চারজন 'এ আমার পুত্র' বলে তাদের আকর্ষণ করতে লাগলেন। প্রথমে নিজেদের ইচ্ছামত কোনো একজন পুত্রকে "এ আমারই অভিধ্যানে জন্মেছে।" এরূপ ধারণা করে শেষে অতি তেজ সম্পন্ন দুই মনু জন্মলাভ করেন।

পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়লেন।

এরপর যে পুত্র যাঁর দেহের অনুরূপ অর্থাৎ রূপ ও বর্ণানুসারে যিনি যার সবর্ণ তিনিই তাকে সৃষ্টি করেছেন বলে নির্ণিত হল।

এইভাবে পুত্র সর্বদা উৎপাদক পিতার অনুরূপ হয় বলে পুত্রকে পিতা-মাতার আত্মা বলে চিহ্নিত করা হয়।

শেষে অতি তেজসম্পন্না দুই মনু জন্মলাভ করেন।

বৈবস্বত মন্বন্তরে বৈবস্বতের দুই মনু পুত্র রূপে জন্মলাভ করেন।

প্রজাপতি রুচির পুত্র রৌচ্য মনু নামে জ্ঞাত হলেন।

আর কবির পুত্র যে মনু ভূমিতে জন্মগ্রহণ করলেন তিনি ভূম্য মনু নামে খ্যাত হলেন।

বৈবস্বত মনু ও সাবর্ণ মনু নামে যে দুজন বিখ্যাত মনু আছেন, তাদের মধ্যে পাঁচজন হলেন সাবর্ণ মনু এবং চারজন মহর্ষিজাত মনু।

এদের মধ্যে সাবর্ণ ও বৈবস্বত মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপে যে জন্মগ্রহণ করলেন, তার নামও মনু।

বৈবস্বত মনুন্তরে এঁদের শুভউৎপত্তি বিষয়ে আমি বিস্তারিত এবং আনুপূর্বিক বর্ণনা দেব। বেদ স্মৃতি এবং পূরাণসমূহে কীর্তিবর্ধক অশেষ প্রভাব সম্পন্ন যে চোদ্দজন মনুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই নিজের নিজের কালে সর্বর্ণের স্রষ্টা ও প্রজাসকলের প্রতি ছিলেন। তাদের সেই সময়ে সাগরান্ত নগরময় এই পৃথিবী ব্যাপ্ত করেছিলেন।

স্বায়ম্ভরাদি চোদ্দোটি সৃষ্টি পূর্ণ সহস্র যুগ ধরে চলেছিল বলে জ্ঞাত হয়ে থাকে।

আমি যথাকালে এই প্রজাপতিদের তপস্যাদি বিষয়ে সবিস্তারে বলব। অব্যন্তর অধিকার অর্থাৎ নিজ নিজ মন্বন্তরকালে তারা যে কীর্তিমান ছিলেন, সে বিষয়েও বলব।

অধিকার লোপ পাওয়ার পর প্রজাপতিরা সকলেই মহালোকে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল ছিয়াশি ও অবশিষ্টরা সর্ব মোট সাতজন ছিলেন।

পূর্বতনদের মধ্যে বৈবস্বত মনুর স্থান সপ্তম তিনি পৃথিবী শাসন করে থাকেন।

এবার অবশিষ্ট দেবতা, সপ্তর্ষি মানবদের বিবরণ দিচ্ছি শুনুন।

পূজাযুক্ত সৃষ্টি দ্বারা তাদের বিস্তৃত বিবরণ জানতে হবে। মনে রাখবেন, সৃষ্টিগুলি পরস্পর অতিরিক্তও নয়, আবার অসম্পূর্ণ নয়।

অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে অনেক কিছুরই বহুত্ব হেতু পুনরুক্তি ঘটেছে। বিভিন্ন মন্বন্তরের বিভাগ অনুসারে বিভিন্ন সৃষ্টির কথা আপনাদের অনুপুঙ্খ জানতে হবে।

.

৬০.

পুরাণজ্ঞ ব্রহ্মবিদ সূত্র বললেন, বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তম পর্যায়ে মারীচ কশ্যপ থেকে দেবগণ ও মহর্ষিরা জন্মগ্রহণ করেন।

এই দেবগণ হল আটটি। যথা–আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ, ভার্গবগণ ও অঙ্গিরাগণ।

এঁদের মধ্যে আদিত্যগণ, মরুৎগণ ও রুদ্রগণ হলেন কশ্যপের পুত্র এবং সাধ্যগণ বসুগণ ও বিশ্বদেবগণ এঁরা তিনজন হলেন ধর্মপুত্র।

ভার্গবগণ হলেন ভৃগুর পুত্র, অঙ্গিরণগণ হলেন অঙ্গিরার পুত্র, বৈবস্বত মন্বন্তরে এঁরা ছন্দজ দেবতা রূপে খ্যাত হয়ে আছেন।

সম্প্রতি এই যে সৃষ্টি চলছে, এটি মারীচের সৃষ্টিকলি। তাদের মধ্যে অন্যতম তেজস্বী মহাবল হলেন ইন্দ্র।

কালেই মন্বন্তর ঘটে যাবে হত্যাক্ষ। তারা পুরন্দকভাবে

অতীত, অনাগত ও বর্তমান–এইসব কালেই মন্বন্তর ঘটে যাবে।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের নাথ ইন্দ্রগণরা সকলেই সহস্রাক্ষ। তারা পুরন্দর অর্থাৎ শত্রুনগরভেদী, মখবা অর্থাৎ পূজা, এঁরা শৃঙ্গী ও বজ্রপানি। এঁরা সকলেই পৃথক পৃথক ভাবে শতগুণান্বিত একশত যজ্ঞ করেছিলেন।

ত্রিলোকে যত সত্ত্ব, যত গতিমান, যত ধ্রুব দেখা যায়, তারা ধর্ম ও অর্থের কারণেই এখানে অবস্থান করে। এগুলি জীবদের পূর্ণমাত্রায় অভিভূত করে।

সত্ত্ব, গতিমান আর ধ্রুব–এঁদের যেরকম প্রভাব এঁরা যেভাবে নিজ নিজ তেজ, তপস্যা, বুদ্ধি, বল শ্রুতি ও পরাক্রম বলে অতীত, বর্তমান এমনকি ভবিষ্যৎ কালের পর্যন্ত প্রভু হয়েছিলেন, সম্প্রতি আমি সে-কথাই বলব, আপনারা হৃষ্টচিত্তে শ্রবণ করুন।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও ভব্য (বর্তমান)–ত্রিলোককে এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। এই ভূমি ভূর্লোক অন্তরীক্ষ হল ভুবর্লোক আর ভব্য হল দিবলোক। এবার এদের সাধনের বিষয়ে বলছি, শুনুন।

পূর্বকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা পুত্রকামনায় ধ্যানস্থ হন। ধ্যান করতে করতে তার মুখ দিয়ে "পূঃ" এই শব্দটি উচ্চারিত হয়। সেইহেতু তখন তা ভূর্লোক হয়।

"ভূ" ধাতুর অর্থ হল সত্তা। লোকদর্শনে ভূতত্ত্ব ও দর্শনতত্ত্ব হেতু একে ভূর্লোক বলা হয়।

লোকসমূহের মধ্যে এই লোকের স্থান প্রথম। আর সেই কারণেই দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ এর নাম রেখেছেন ভূর্লোক অর্থাৎ প্রথম লোক।

দ্বিতীয়বার ব্রহ্ম "এই ভূতে হোক" কথা ক-টি উচ্চারণ করলেন। "ভবতি" অর্থাৎ উৎপাদিত হচ্ছে এই অর্থে "কাল" শব্দ প্রযুক্ত হয়। "ভবন" অর্থাৎ কাল উৎপন্ন হয় বলে অধিধানজ্ঞ প্রাচীন পণ্ডিতগণ একে ভূর্লোক বলেন।

অন্তরীক্ষ হল ভুবর্লোক। একে দ্বিতীয় লোকও বলা হয়ে থাকে।

ভুবর্লোক উৎপন্ন হবার পর ব্রহ্মা তৃতীয়বার "ভবৎ" এই কথা বলায় ভব্য লোকের উদ্ভব ঘটে।

"ভবৎ" শব্দটি অনাগত বা ভবিষ্যৎ বোঝাতে প্রয়োগ করা হয়। সেই কারণে ভব্যলোকের আরেক নাম দিবলোক।

এই সময় ব্রহ্মা আবার "স্বর" শব্দটি উচ্চারণ করেন। এর ফলেই ভাব্যলোকের উৎপত্তি হয়। "ভাব" শব্দের ধাতুমূলক অর্থ হল ভাবৎকাল।

এইভাবে ব্রহ্মার মুখ থেকে তিনবার তিনটি শব্দ উচ্চারিত হয়। "ভূ" শব্দে ভূমি, "ভুবঃ" শব্দে অন্তরীক্ষ এবং "স্বর' শব্দে ভাব্য বা দিবলোক নির্দেশিত হয়ে থাকে।

ধাতুজ্ঞদের মতে "নাথ" শব্দের অর্থ হল পালন। সেই কারণে ভূ, ভব ও ভব্য এই লোকত্রয়ের যে প্রভুগণ এরা ইন্দ্ররূপে কীর্তিত হয়ে থাকেন। দ্বিজগণ এরকম অভিমতই পোষণ করেন।

দেবেন্দ্র হলেন সকলের প্রধান ও সর্বগুণে গুণান্বিত। সমস্ত মন্বন্তরেই তিনি দেবগণের যজ্ঞভাগ পেয়ে থাকেন। তিনি স্বর্গে বাস করেন।

যক্ষ, রাক্ষস, উরগ বা সর্প, গন্ধর্ব এবং দানবেরা–এঁরা সকলেই দেবতাদের মহিমা স্বরূপ।"

দেবেন্দ্রগণ গুরু, নাথ, রাজা, পিতা এইসব বিশেষণে ভূষিত হয়ে থাকেন। তারা ধর্মানুসারে প্রজাদের রক্ষা করে থাকেন।

সংক্ষেপে এই হল দেবেন্দ্রদের লক্ষণসমূহ।

এবার আমি সপ্তর্ষিদের বিষয়ে বলব।

বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে আটজন ঋষি বর্তমান আছেন। তারা হলেন–অত্রি (শ্বয়ম্ভর পুত্র) ঔতথ্য (বৃহস্পতি পুত্র), প্রতাপবাণ জমদগ্নি, বৎসার (লোকবিশ্রুত বসুমান কশ্যব বংশীয়), বিশ্বামিত্র (কুশিবংশীয় গাধিরাজ পুত্র মহাতপা ধর্মাত্মা), মহাতপস্বী ভরদ্বাজ, ভার্গব (ঊরুবংশজাত) এবং শরদ্বান (ইনি গৌতমবংশীয় বিদ্বান ও পরম ধার্মিক)।

এর বাইরে আমরা বৈবস্বত মনুর নয়জন পুত্রের কথাও জানতে পারি, তারা হলেন কর, ইক্ষবাকু, ধৃষ্ট, নাভাগ, নাভনেদিষ্ট, নীরষ্যন্ত, পৃষ, বসুমান এবং শর্যাতি।

হে দ্বিজসত্তমগণ এই আমি সপ্তম মন্বন্তরের বিবরণ এবং দ্বিতীয় অনুষঙ্গ পদের বিস্তারিত ও আনুপূর্বিক বর্ণনা কীর্তিত করলাম।

বরাহ পুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ

উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

ব্রহ্মা যখন কল্পের অবসানে সৃষ্টিকার্য থেকে বিশ্রাম নেন তখন হিরণক্ষ দৈত্য পৃথিবীকে হরণ করে নেয়। পুনরায় পরবর্তী কল্পের শুরুতে পৃথিবীকে না দেখতে পেয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা ও শ্রুতির মুনিগণ আহ্বান করেন বিষ্ণুকে। তখন ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মার নাসিকা হতে বরাহরূপে বহির্গত হয়ে হিরণক্ষ দৈত্যকে বধ করেন এবং দশনাগ্রে পৃথিবীকে উত্তোলন করেন। তারপর সেই বরাহরূপেই এই পুরাণ কথা কীর্তন করেন। তাই এই পুরাণের নাম হয়েছে বরাহ পুরাণ।

লোমহর্ষণ সূতকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই পুরাণটি শিক্ষা দেন। তিনি পরে নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি মুনিগণের সামনে এটি কীর্তন করেন।

রাজা দুর্জয় ও মুনি সৌরমুখ

সুপ্রতীকের পুত্রের নাম দুর্জয়। যেমন তার নাম তেমনি তাঁর কাজ, তাঁকে কেউ জয় করতে পারে না। তিনি অস্ত্রবিদ্যাদি শিখে একদিন একটা প্রতিজ্ঞা করলেন যে, "আমি ত্রিভুবন জয় করব।" তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞামত কাজ শুরু করে দিলেন এবং একে একে সবাইকে জয় করতে লাগলেন। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সব কিছুকে তিনি জয় করে নিলেন। কেউ তাকে হারাতে পারলো না। তখন সবাইকে স্বর্গ ছেড়ে বারাণসী ধামে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে হলো।

তার আর জয় করতে কাউকে বাকি থাকল না। যুদ্ধ শেষ অতএব তাঁর এখন আনন্দ উপভোগ করবার সময়। কেমন করে করবেন আনন্দ লাভ; বাইজির নৃত্য, আর নানা রসের খাবারদাবার খেয়ে। রাজা যেখানেই থাকবেন সেখানেই তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হবে। দুর্জয় ভাবল সারা পৃথিবীতে যত তীর্থস্থান আছে তা ঘুরে ঘুরে দেখব। শুরু করলেন, তীর্থযাত্রার আয়োজন। হাতী, ঘোড়া, রথ সাজানো হল। সঙ্গে বহু লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র রাখলেন।

তিনি একের পর এক তীর্থ ঘুরে দেখতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা একদিন গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে পৌঁছালেন। সারা পর্বতে সাড়া পড়ে গেল, এখানে ত্রিভুবনের রাজা বেড়াতে এসেছেন। চারিদিকে ছাউনি ফেলা হল। চারিদিকে অশ্বারোহী, গজারোহী, রথাদি দৈত্যলোক সে যেন এক তুলকালাম কাণ্ড । স্বয়ং রাজা এসেছেন বলে কথা, তা তো কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়।

রাজা সব ঘুরে ঘুরে দেখছেন। তিনি কখনো হেঁটে দেখছেন, কখনো তিনি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরছেন। কখনও আবার গজে চড়ে, আবার কখনোবা রথে চড়ে দুর্জয়ের গন্ধমাদন পর্বতের শোভা দেখতে লাগলেন। দেখে তার খুব ভালো লাগল।

রাজা দুর্জয় তার পরে মন্দার পর্বতে এলেন। সেখানেও তাবু করা হল। হাতির পিঠে চড়ে দুর্জয় সব ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। তিনি দেখলেন কি বিচিত্র ধরনের গাছ, কত বিচিত্র ধরনের ফুল। এমন শোভা সে আগে কখনো দেখেনি। সব কিছু দেখতে দেখতে তার মন আনন্দে ভরে উঠল। এগিয়ে যেতে যেতে তিনি দেখলেন একটি সুন্দর বটগাছ। আর সেই গাছের নীচে বসে আছে দুটি মেয়ে। তাদের দেখতে অপরূপ সুন্দরী এবং তাদের দেহের রঙ সোনার রঙের মতো।

তাদের দেখে রাজা অবাক হলেন। ভাবলেন এখানে এই দুজন সুন্দরী এলো কিভাবে। রাজা এগিয়ে গেলেন। দেখলেন বটগাছের ছাল থেকে দুজন সাধু বেরিয়ে আসছেন। যাদের গায়ের বসন গেরুয়া। রাজা হাতির পিঠ থেকে নেমে পড়লেন এবং সাধুদের প্রণাম জানালেন। সাধুরা রাজকে কুশের আসনে বসতে দিলেন।

তাঁদের অভ্যর্থনা পেয়ে রাজা খুব খুশি হলেন। সাধুদের জিজ্ঞাসা করলেন–কে আপনারা? আর মেয়ে দুটি এখানে কেন?

দুই সাধু বললেন–আমরা স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র, নাম হেতা ও প্রহে। দেবতারা আমাদের উপর খুব অবিচার করেছিল। তারই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমরা সুমেরণ পর্বতে যাই। অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম। এখন আমরা আমাদের দুটি মেয়েকে নিয়ে এখানেই থাকি। আপনি দয়া করে যদি এই মেয়ে দুটিকে গ্রহণ করেন, তাহলে কৃতার্থ হবো। আমাদের কোনো চিন্তা থাকবে না।

মেয়ে দুটিকে দেখেই রাজার তো বিয়ে করার বাসনা ছিলই; এখন যখন হেতা ও প্রহে যেচে বলছেন তখন আর কথা কী? তখন রাজা দুর্জয় হেতার মেয়ে সুকেলী এবং প্রহেতার মেয়ে মিশ্রকেশীকে বিয়ে করলেন। এবং সেই বিবাহ অনুষ্ঠান হল সেই মন্দার পর্বতেই।

তারপরে তিনি ফিরে এলেন রাজধানীতে। ত্রিভুবনের অধিপতি দুর্জয় বহুদিন তীর্থ ভ্রমণ করেছেন, এবং ভোগবিলাসও করেছেন, তাই এতদিন তিনি হাতে কোনো অস্ত্র নেননি। হাতে অস্ত্র নেওয়া মানে তো যুদ্ধ করা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করারই তো কেউ ছিলনা। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নেন তিনি শিকারে যাবেন।

সবার মধ্যে সাজো সাজো রব উঠল। হাতি, ঘোড়া, রথ, লোকলস্কর সবাই তৈরি হল। তার সঙ্গে চলল মন্ত্রী আর সেনাপতি, বনের পর বনে যেতে যেতেই সে শিকার করা শুরু করে দিল। শিকারের নেশা যেন সবাইকে পেয়ে বসল।

সবাই ঠিক করেই গিয়েছিল যে, সন্ধ্যা হবার আগেই সবাই রাজধানীতে ফিরে আসবে। কিন্তু শিকারের নেশায় তারা জঙ্গলের মধ্যে বহুদূর চলে গেছে। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হলো। তখন সবাই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আকুল হয়ে উঠল। তখন রাজা ভেবে দেখলেন–এতদূর পথ ফিরে যেতে অনেক রাত্রি হবে। তার চেয়ে রাত্রিটা বনে থাকাই ভালো। সেইমতো শিবির করা হলো। কিন্তু

ক্ষুধা তৃষ্ণার জন্য কি ব্যবস্থা হবে। তারা দেখল কাছেই এক মুনির আশ্রম। রাজা সবাইকে নিয়ে সেই দিকেই এগোলেন।

আশ্রমটি ছিল মুনি গৌরমুখের। মুনিবর রাজাকে আসতে দেখে সাদরে আহ্বান করলেন। কিন্তু রাজার সঙ্গে এতো লোক ছিল তাদের তিনি বসতে দেবেন কোথায়? তাঁর সামান্য একটা কুঁড়েঘর ছাড়া আর তো কিছুই নেই। এমনকি রাজাকে যে বসতে দেবেন তার জন্য একটা আসন পর্যন্ত নেই।

রাজাকে গৌরমুখ মুনি বললেন–রাজা মশায়, আপনারা এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি এক্ষুনি আসছি।

মুনিবর গেলেন একটা নদীতে, সেখানে তিনি স্নান করলেন। তারপরে অতি আকুল হয়ে ভগবান হরির প্রার্থনা করলেন। বললেন–হে প্রভু, এ কী পরীক্ষায় আমায় ফেললে। আমার কি আছে যে, এতজনের সেবা করতে পারি? আর অতিথিরা যদি ফিরে যায় তাহলে আমার মহাপাপ হবে। এই সঙ্কটে তুমিই আমাকে উদ্ধার করতে পারো।

গৌরমুখের আকুল প্রার্থনা শুনে শ্রীহরি বললেন–তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। আমি তোমাকে একটি মণি দিচ্ছি। এই মণিটি হাতে নিয়ে তুমি আমাকে স্মরণ করে যা চাইবে, সঙ্গে সঙ্গেই তুমি তা পেয়ে যাবে। হাত পাত।

হরির মুখে দৈববাণী শুনে গৌরমুখ হাত পাতলেন। তিনি দেখলেন তার হাতে একটি মণি এসে গেল। মহানন্দে মুনি ফিরে এলেন নিজের কুটিরে। সবাই দাঁড়িয়ে আছে। মুনি ভাবলেন যেহেতু সন্ধে হয়ে গেছে, সেহেতু প্রথমে সবার থাকার ব্যবস্থা করা উচিত। এই কথা চিন্তা করে তিনি মণিটি হাতে করে শ্রীহরিকে স্মরণ করে সবার থাকার জন্য প্রাসাদের কথা ভাবতেই বিশাল বিশাল প্রাসাদ সহসা যেন মাটি খুঁড়ে গজিয়ে উঠল। যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসও সেই প্রাসাদে থাকল। তাতে খাবার দাবার, বিছানা, আসবাবপত্র, কোনো কিছুর অভাব থাকল না। শুধু তাই নয়, হাতিশালা, ঘোড়াশালাও তৈরি হয়ে গেল।

তখন রাজা ও গৌরমুখ ছাড়া সবাই সেই প্রাসাদে প্রবেশ করল। তারা সবাই আনন্দ করে খাবার খেল, আরাম করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তারা এমন প্রাসাদ জীবনে দেখেনি, এবং এমন আনন্দ তারা এর আগে কখনো ভোগ করেনি। কত দাস-দাসী এসে তাদের সেবা করছে।

মুনি ভাবলেন রাজাকে এই সাধারণ প্রাসাদে রাখা যাবে না। তিনি রাজার উপযুক্ত বাসস্থানের কথা যখন চিন্তা করছেন তখনই সেখানে এক সুন্দর প্রাসাদ সৃষ্টি হল। সেই প্রাসাদ ছিল মণি-মাণিক্যে খচিত। সেই প্রাসাদ স্বর্গের ইন্দ্রপুরীকেও হার মানায়। গৌরমুখ রাজাকে নিয়ে গেলেন সেই প্রাসাদে। রাজা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কেমন করে সেখানে এতো দাস-দাসী এলো, এমন সেবা-যত্ন রাজা দুর্জয় তার নিজের প্রাসাদেও কখনও পায়নি।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এলো। তখনই চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠল। রাজা যত দেখেন ততই অবাক হয়ে যান। কুটিরে থাকা মুনির এ কি যাদু। ক্ষণিকের মধ্যে এত আয়োজন তিনি কেমন করে করলেন? রাজা মুনির এই আশ্চর্য কীর্তির কথা ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়লেন।

সকাল হতে সকলে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এলো, তারা দেখল প্রাসাদটি যেন সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় মিলিয়ে গেল। প্রাসাদ-দাস-দাসী কিছুই নেই। সেই বন, সেই মুনির কুটির আবার দেখা দিল। কিন্তু রাত্রে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা তো স্বপ্ন ছিল না। চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়–যা খেয়েছে, পেট তো এখনও ভারী হয়ে আছে, তার অপূর্ব স্বাদ এখনো যেন মুখে লেগে আছে। কিন্তু মুনি এইসব করলেন কীভাবে।

গত রাত্রে রাজা লক্ষ্য করেছিলেন মুনির হাতে একটি মণি ছিল এবং সেটি নিয়েই তিনি এইসব করেছেন। তখন রাজার লোভ হল ওই মণিটিকে নেওয়ার। মন্ত্রী বিরোচনকে তিনি বললেন– যেমন করেই হোক মুনির কাছ থেকে ওই মণিটি আদায় করতে হবে।

বিরোচন মুনির কাছে গিয়ে রাজার অভিসন্ধির কথা জানালেন। গৌরমুখ দুঃখ পেয়ে বললেন– রাজার কি কোনো অভাব আছে? রাজা তো মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণদের দান করবেন। তিনি এসব না করে নিজেই চাইছেন। এইভাবে ভিখারী হওয়া রাজার সাজে না।

বিরোচন রাজার কাছে গিয়ে মুনির সব কথা জানাল। গৌরমুখের কথা শুনেই রাজা দুর্জয় রেগে উঠলেন। তিনি ত্রিভুবনের অধিপতি। তাঁকে কিনা একজন সাধারণ মুনি বলল ভিখারী। এই মুনি রাজা দুর্জয়কে তাহলে এখনো চিনতে পারেনি।

সেনাপতি নীলকে ডেকে রাজা বললেন–যাও সেনাপতি, মুনির মণিটি নেওয়ার জন্য যদি বলপ্রয়োগ করতে হয় তাই করো। ছলে বলে যে করেই হোক এই মণিটি আমার চা-ই-চাই।

মন্ত্রীকে বললেন–তুমিও সঙ্গে থাক। যদি প্রয়োজন হয় বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করবে।

রাজার আদেশ পেয়ে সেনাপতি চতুরঙ্গ সেনা সাজিয়ে চলল গৌরমুখের আশ্রমে। গিয়ে দেখলো মুনি আশ্রমে নেই। তিনি বাইরে কোথাও গেছেন। তাহলে নির্জন আশ্রম থেকে মণিটা বের করে নিলেই তো হয়। এতে সৈন্য–সামন্তের কি দরকার?

এই কথা ভাবতে ভাবতে নীল আর বিরোচন ঢুকল গৌরমুখের আশ্রমে। কিন্তু হঠাৎই ভীষণ গর্জন ও হুঙ্কার করে অসংখ্য সৈন্য বেরিয়ে এল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। ঝাঁপিয়ে পড়ল নীল আর বিরোচনের ওপর। এই ব্যাপার দেখে তারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কোথা থেকে এত সৈন্য বেরিয়ে এল? তারা বুঝতে পারল না কিছুই। তারপর শুরু হল মুণিসৈন্য আর রাজসৈন্যের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম। সংবাদ গেল রাজা দুর্জয়ের কাছে। রাজা বুঝতে পারলো মুণির শক্তি অনেক। তাই সেই মণি লাভের বাসনা তার আরও প্রবল হয়ে উঠল। একটা রথে চড়ে রাজা দুর্জয় ছুটলেন সেই সমরক্ষেত্রের দিকে। ততক্ষণে মন্ত্রী বিরোচনের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে, তর্জন গর্জন করে রাজাও মেতে গেলেন ভয়ঙ্কর যুদ্ধে।

বনতল এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ রাজসৈন্য তখন ধরাশায়ী, মুনিবর নিজের আশ্রমে ফিরলেন, কিন্তু এ কি? এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কারা করছে। পরে তিনি বুঝতে পারলেন এইসব মণির জন্য হয়েছে। তখন মুনি ছুটে গেলেন নদীতে স্নান করে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন হলেন। মনপ্রাণে ডেকে বললেন–প্রভু, আপনার দেওয়া মণিতে যে রাজার নত উপকার হল, সেই রাজা এখন মণি হরণের চেষ্টা করছে, হে দয়াময় এটা থামাও।

গৌরমুখ আকাশবাণী শুনতে পেলেন। আকাশবাণী হতে লাগল–এই যুদ্ধ হতে দাও। দৈব্যদের খুব বাড় বেড়েছে। এই যুদ্ধের ফলে তারা ধ্বংস হবে। তুমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ কি কি ঘটে। আমার সুদর্শন চক্র গিয়ে সকলকে শেষ করে দেবে।

আকাশবাণী শেষ হওয়ার পরে, একটি সুদর্শন চক্র এসে নিমেষে রাজা ছাড়া আর সকল অসুরকে ছেদন করে দিল। সেই অরণ্যে নিমেষে একটি প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল। তাই শ্রীহরি সেই অরণ্যের নাম রাখলেন নৈমিষারণ্য।

একমাত্র রাজা দুর্জয় প্রাণে বেঁচে থাকলেন। সকল ঘটনা নিজের চোখে দেখলেন। মনে তাঁর নৈরাশ্য এল। ভাবলেন ত্রিভুবন জয় করে এলাম। সব দেবতারা মিলেও আমাকে হারাতে পারল না। আর এই সামান্য কুটিরবাসী মুনির কাছে পরাজিত হলাম। এই মুনি কার কাছ থেকে এত শক্তি পেল?

তিনি তাঁর সমস্ত অহংকার ত্যাগ করে মুনির চরণে স্মরণ নিলেন। বলল–হে মুনিবর, হে তাপস শ্রেষ্ঠ, আমি মহাপাপী। আপনি বাসস্থান, আহারাদি দিয়ে আমাদের রক্ষা করলেন। আর আমি এমন পাষণ্ড যে, আপনার সম্পদ হরণ করতে চললাম। তার যথেষ্ট শাস্তিও পেলাম। এখন আপনিই আমাকে রক্ষা করুন।

গৌরমুখ রাজাকে বললেন–বিষ্ণুর কৃপা থাকলে কোনো কিছুর অভাব থাকে না। তুমি বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তপস্যা কর। রাজ্য, রাজপ্রাসাদ, ঐশ্বর্য, আত্মীয়স্বজন সব পড়ে রইল, সকল কিছুর মায়া ত্যাগ করে রাজা দুর্জয় চিত্রকূট পর্বতে গিয়ে বিষ্ণুধ্যানে মগ্ন হলেন। দীর্ঘকাল পরে তার তপে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু সাক্ষাৎ দর্শন দিয়ে বললেন–কি চাই তোমার?

দুর্জয় নমস্কার করে বললেন, প্রভু আমার একটাই প্রার্থনা, আপনি যেন সব সময় আমার স্মরণে থাকেন। আর আমি যেন অন্য চিন্তা থেকে বিরত থাকি।

বিষ্ণু বর দিয়েই চলে গেলেন। রাজা আপন রাজ্যে ফিরে গেলেন। দেবতারা ফিরে গেলেন স্বর্গে।

কোকক্ষেত্রের মাহাত্ম্য

আনন্দপুরে এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম শক। তাঁর একটিমাত্র পুত্র। সেই রাজকুমার দেখতে যেমন অপূর্ব সুন্দর ছিলেন, তেমনি গুণবানও ছিলেন এবং বিক্রমশালীও ছিলেন।

কোশলরাজের এক কন্যা ছিল। সে খুব সুন্দরী। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সেই রাজকন্যা মনে মনে ভাবত আমার স্বামী যেন আমার থেকেও সুন্দর হয়। তাই সে বিষ্ণুর ধ্যান করত এবং প্রার্থনা করত গুণবান, সৎচরিত্র ও অপরূপ স্বামী যেন তার হয়।

সেই রাজকন্যা শ্রহরীর কৃপায় স্বামীরূপে লাভ করল শক রাজার পুত্রকে। মহা ধুমধামে বিয়ে হল তাদের। তারা দুজনেই এই বিয়েতে খুব খুশি হল।

বিয়ের কয়েকদিন পরে রাজকুমারের মাথায় যন্ত্রণা দেখা দিল। বৈদ্যকে ডাকা হল, বৈদ্য ওষুধ দিলেন। সাময়িকভাবে উপশম হল বটে কিন্তু আবার কয়েকদিন পরে সেই ব্যথা ফিরে এলো। ভীষণ যন্ত্রণা, বৈদ্য এসে আবার ওষুধ দিলেন। যন্ত্রণা কমল কিন্তু পুরোপুরি সেরে গেল না।

একদিন রাজকুমারকে কোশলরাজকন্যা জিজ্ঞেস করল–তোমার এ রোগ কত দিনের?

কুমার বলল–ছোটাবেলা থেকেই এই রোগটি আছে। ওষুধ খেয়ে মাঝে মাঝে ঠিক থাকে। কিন্তু একেবারে এটি সেরে যায়নি।

রাজকন্যা বলল–এই রোগ সারানোর উপায় কী? এই রোগের কারণ কী?

রাজকুমার বলল–এ রোগ সারবার নয়। আর এই রোগের কারণ আমি জানি। কিন্তু এখানে বলা উচিত হবে না। একথা যদি বলতেই হয় তবে আমাদেরকে যেতে হবে কোকক্ষেত্রে।

কোকক্ষেত্র তো একটি তীর্থস্থান। রাজকন্যা অবাক হল।

রাজকুমার বলল–তুমি চেন সেই তীর্থস্থান। চল আমরা দুজনে মিলে একদিন সেই কোকক্ষেত্রে যাই। আমার মনে হয় সেখানে গেলেই আমার রোগ সারতে পারে।

রাজকুমারের কথা শুনে রাজকন্যা বলল–তাহলে কালবিলম্ব না করে সেখানে আমাদের যাওয়া উচিত।

কুমার স্ত্রীর কথার উত্তরে বলল–যাব বললেই যাওয়া যায় না, মা-বাবার অনুমতি নিতে হবে। গোপনে যদি চলে যাই তাহলে তাঁরা দুঃখ পাবেন।

স্ত্রী বলল–ঠিক আছে। আমরা তাঁদের অনুমতি নিয়েই যাব। এই কথা বলেই রাজকন্যা রাজা রানির কাছে গিয়ে কোকক্ষেত্রে যাবার অনুমতি চাইল।

রাজা বললেন–কোকক্ষেত্রের কথা শুনেছি কিন্তু তা চোখে দেখিনি। আমাদের বয়স হয়েছে। আমরা এখন যাই তীর্থ করতে। তোমরা পরে যাবে।

বধূমাতা বলল–বাবা আমরা শুধু তীর্থ দর্শনের জন্য যাচ্ছি না, আপনার পুত্রের মাথায় যে যন্ত্রণা হচ্ছে, সেটিতে বৈদ্যমহাশয় নির্মূলভাবে সারাতে পারছেন না। ওই তীর্থে গেলে তার রোগ সারতে পারে বলে সে মনে করে। তাই আমরা ওখানে যেতে চাই।

তাঁরা মনে করলেন–সত্যিই তো বহু চিকিৎসা করেও একমাত্র পুত্রের রোগ সারানো সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে একবার দেখুক, যদি রোগটা সেরে যায়। তাই তারা অনুমতি দিলেন।

রাজকুমার তার স্ত্রীর সঙ্গে কোকতীর্থে উপস্থিত হল। রাজকন্যা স্বামীকে জিজ্ঞেস করল–এবার বল স্বামী তোমার রোগের কারণ কী?

কুমার বলল–আজকের রাতটা চলে যাক, আগামীকাল সকালেই তোমাকে সব গোপন কথা বলব।

রাজকন্যার মনে কৌতূহল জন্মাল। কিন্তু তবুও সে স্বামীর কাছে আর আপত্তি করল না। রাত শেষে ভোর হতেই স্বামীর কাছে আবার সেই প্রশ্ন রাখল।

রাজকুমার বললস্নান করে এসে বলব। রাজকন্যার কৌতূহল আরও বাড়তে লাগলো, কুমার বলল–বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসি। উভয়েই যথাবিধি মতো ষোড়শোপচারে পুজো করল শ্রীবিষ্ণুর।

রাজকন্যা আর ধৈর্য্য ধরতে পারল না। এবার তাকে বলতেই হবে ব্যাধির কারণ। রাজকুমার স্ত্রীকে নিয়ে চলল এক সরোবরের ধারে। বলল–দেখ, ওখানে কতগুলো মাছের কাটা পড়ে আছে। ওগুলো আমার পূর্বজন্মের মাছের অস্থি।

রাজকন্যা অবাক হল। রাজকুমার বলল–পূর্বজন্মে আমার জন্ম হয়েছিল মাছের যোনিতে। এই সরোবরে আমার বাস ছিল। একদিন একটি শিকারি এলো এই সরোবরে। সে এক বঁড়শিতে আমাকে ধরে ফেলল। আমি ভীষণ ভাবে ছটফট করতে লাগলাম। ছিঁড়ে গেল তার বঁড়শির ডোর। ভাবলাম শিকারির হাত থেকে মুক্তি পেলাম। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একটি বাজপাখি এসে তার নখের সাহায্যে আমাকে আকাশে তুলে নিয়ে গেল। আমি তার নখে আবদ্ধ থাকলাম এবং খুব ছটফট করতে লাগলাম। তাই সে আমাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারলো না। আমি পড়ে গেলাম মাটিতে এবং আমার মাথায় আঘাত লাগে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে আমার দেহ থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়।

কোকক্ষেত্রের মাহাত্মের জন্য আমি মৎস্য যোনি থেকে একেবারে মানুষ হয়ে জন্মালাম। রাজার ঘরে রাজপুত্র হলাম। মানুষ হয়ে জন্মালেও আগের লাগা মাথার আঘাতের জন্য আমার মাথায় ব্যথা থেকেই গেল। পূর্বজন্মের এই কারণের জন্যই আমার যন্ত্রণা কেউ সারাতে পারছে না। একমাত্র এই ক্ষেত্রই পারে আমাকে এই রোগ থেকে মুক্তি দিতে।

রাজকুমারের কথা মন দিয়ে শুনছিলেন রাজকন্যা। সে হঠাৎ বলে উঠল–আমারও এই মুহূর্তে পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ছে।

রাজকুমার কৌতূহলী হল এবং বলল তোমারও পূর্বজন্মের কথা আছে নাকি? তাহলে এক্ষুনিই বল তোমার কথা।

রাজকন্যা বলল–পূর্বজন্মে আমি চিল ছিলাম। একদিন আকাশের খুব উঁচুতে উড়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম এক ব্যাধিনী গাছের নীচে বসে আছে, এবং সেখানে প্রচুর শিকার করে নিয়ে একটি ব্যাধ এলো। মাংসের ঝোলাটা রেখে দিয়ে ব্যাধ বনের মধ্যে গেল শুকনো কাঠের সন্ধানে। ব্যাধিনী তখন পশুদের ছাল ছাড়ালো। ব্যাধ কাঠ এনে আগুন জ্বালাল। সেই আগুনে মাংসগুলো তারা ঝলসালো এবং মনের আনন্দে খেতে লাগলো।

আমার খুব খিদে পেয়েছিল। ওদের খেতে দেখে আমার লোভ হলো। কিন্তু কীভাবে ওই মাংস খাব। সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। দেখলাম–ব্যাধিনী খেতে খেতে উঠে গেল, ব্যাধ তখন একা বসে মাংস খাচ্ছিল। সে চোখ বুজে মাংস খাচ্ছে, সেই সুযোগে আমি গাছের ডাল থেকে নেমে খানিকটা মাংস ছোঁ মেরে আবার গাছের ডালে এসে বসলাম এবং মনের আনন্দে খেতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে ব্যাধ চোখ খুলল এবং দেখল তার সামনে মাংস নেই। এদিক ওদিক দেখতে লাগলো। তখন সে আমাকে দেখতে পায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই তির ছুঁড়ে মারল আমার দিকে। আমি পালাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। সেই শরের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। তারপরেই আমার এই জন্ম রাজার ঘরে রাজকন্যারূপে। সবই এই তীর্থের মাহাত্ম্য, বহু যোনি পার হয়ে তবে মানব জন্ম পায়। কিন্তু এই তীর্থের মাহাত্মের জন্য একেবারে মানুষ হয়ে জন্মালাম।

ওই দেখ স্বামী, এখনও আমার অস্থিগুলো ওখানে পড়ে আছে।

তারপর তারা দুজনে থেকে গেল কোকক্ষেত্রে। শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরে নিত্য পূজার্চনা করতে থাকল। তারা। তারা আর রাজধানীতে ফিরে এল না। তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, রাজা-রানি বহু চেষ্টা করলেন কিন্তু রাজকুমার তার মাথার যন্ত্রণার কথা স্মরণ করিয়ে দিল অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তারা পিতামাতাকে রাজধানীতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিল।

নিষ্ঠুর ব্যাধ হল সত্যতপা ঋষি

মহান তপস্যী আরুণির আশ্রম ছিল দেবিকা নদীর তীরে। নিত্যদিনের মত আরুণি স্নান করলেন, নারায়ণের নাম উচ্চারণ করে যখন তীরে উঠলেন, তখন এক সর্বনাশা কাণ্ড দেখলেন। একটা ব্যাধ ধনুকে তির যোজনা করে দাঁড়িয়ে আছে তাকে মারবার জন্য। মুনি ভয়ে কাঁপতে থাকেন, কিন্তু ব্যাধ তো কখনও কোনো মুনিঋষিকে হত্যা করে না। তারা তো কেবল পশুপাখি হত্যা করে। এখন আমি নিজেকে রক্ষা করবো কীভাবে।

তিনি কিছু স্থির করতে পারলেন না। তিনি আবার নদীতে নেমে গেলেন। জলে নেমে তিনি নারায়ণকে স্মরণ করলেন।

সেই ব্যাধ কিন্তু তির নিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। ব্রাহ্মণদের প্রতি তার ভীষণ আক্রোশ। কারোর গলায় পৈতা দেখলে তাকে সে হত্যা করে। মুনি যখন নারায়ণকে স্মরণ করছিলেন, তখন ব্যাধ দেখল মুনির কাছ থেকে এক অপূর্ব জ্যোতি বেরোচ্ছে। সেই জ্যোতিতে চোখ যেন ঝলসে যায়। ব্যাধের হাত থেকে আপনা আপনি তির-ধনুক খসে পড়ে গেল।

আরুণি দেখলেন ব্যাধের হাতে তির-ধনুক নেই। সে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আগের ক্রোধ ও রক্তচক্ষু তার নেই। মুনিবর তখন সাহস সঞ্চার করে নদীর তরে উঠে এলেন। আর তখন ব্যাধটি লুটিয়ে পড়ল তার চরণে।

সে মুনিকে বলতে লাগল–আমি বড় পাপী, জীবনে বহু পাপ করেছি। আমি বহু মুনি-ঋষি, ব্রাহ্মণ ও নারীকে হত্যা করেছি। আমাকে বলুন আমি এখন কি করে উদ্ধার পাব।

সে বহুক্ষণ কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। কিন্তু আরুণির মনে কোনোরূপ করুণার সঞ্চার হল না। বহু কষ্টে নিজের পা থেকে সেই ব্যাধকে ছাড়িয়ে নিজের আশ্রমে চলে গেলেন আরুণি।

ব্যাধ তখন প্রতিজ্ঞা করল–আমি একদিন না একদিন এই মুনির করুণা পাবই পাব। সে ধনুর্বান ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে সেই দেবিকা নদীর তীরে একটি গাছের তলায় বসে রইল। মন থেকে সে হিংসা দূর করে দিল।

আরুণি রোজ সেই দেবিকা জলে স্নান করেন এবং আশ্রমে চলে যান। ব্যাধ প্রতিদিন তার চলার পথের ধারে হাতজোড় করে বসে থাকে এবং কাঁদতে থাকে মুনির করুণা লাভের

আশায়। কিন্তু মুনি তাকে দেখেও দেখে না যেন। ব্যাধ কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার পাত্র ছিল না। নিত্যদিন সেই নদীতে স্নান করে এবং সে সেই নদীর জল খেয়ে বেঁচে আছে। আর সে কিছুই খায় না।

এইভাবে দিন বয়ে যেতে থাকে। একদিন একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল। নিত্যদিনের মত আরুণি মুনি জলে স্নান করলেন এবং নামজপ করলেন। তারপর সেই তীরে উঠতে যাবেন তখন দেখেন একটা বাঘ তার দিকে লক্ষ্য করে কঁপাতে আসছে।

ব্যাধ সেই বাঘটিকে দেখে তৎক্ষণাৎ ধনুকের তির মারল। বাঘের দেহ বিদীর্ণ হয়ে গেল। বাঘ সেখানেই লুটিয়ে পড়ল। এদিকে বাঘকে দেখেই মুনিবর ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীতে এবং নারায়ণ’ নারায়ণ’ নাম উচ্চারণ করতে থাকলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। মরে যাওয়া বাঘের শরীর থেকে বেরিয়ে এল এক দিব্য সুপুরুষ।

মুনিবর বিস্মিত হলেন। এগিয়ে এলেন সেই পুরুষের দিকে। ব্যাধ এল এগিয়ে। মুনি জিজ্ঞাসা করলেন–কে তুমি? কোথা থেকে এখানে এলে?

সুপুরুষ মুনির চরণে প্রণাম জানিয়ে বলল–আমি রাজা দীর্ঘবাহু।

কিন্তু আপনি বাঘের দেহের মধ্যে এলেন কেমন করে? জানতে চাইলেন মুনিবর।

রাজা দীর্ঘবাহু তখন তাঁর করুণ কাহিনি বলতে লাগল–আমি ক্ষত্রিয় রাজা হলেও বাল্যকাল থেকেই আমার শাস্ত্রজ্ঞান লাভের প্রবল ইচ্ছা থাকায় বহু বিদ্যা অর্জন করি। বেদাদি প্রায় সকল শাস্ত্রই আমি অধ্যয়ন করি। সকল শাস্ত্র পড়ে আমি পণ্ডিত হয়ে যাই। তারপর আমার মনে হল আমিতো সকল শাস্ত্র পড়ে পণ্ডিত হয়ে উঠেছি, তাহলে আমি ব্রাহ্মণদের থেকে কম কিসে! তাই আমি ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করতাম না। তারপর আমি রাজা হলাম, পিতার রাজসভায় যে-সকল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাদেরকে রাজসভা থেকে বিদায় দিলাম।

সেই ব্রাহ্মণরা অপমানিত হয়ে আমাকে অভিশাপ দিলেন–তোমার এমন দম্ভের কারণে তুমি বাঘ হয়ে জন্মাবে।

ব্রাহ্মণদের মুখে অভিশাপ শুনে আমার জ্ঞান হল–আমি একি করলাম! পাণ্ডিত্যের অভিমানে আমি জ্ঞানীগণকে অপমানিত করলাম। তখন আমি সেই ব্রাহ্মণদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইলাম।

ব্রাহ্মণগণ আমার বিনয় দেখে বললেন–ব্রাহ্মণবাক্য কখনও মিথ্যা হবার নয়। বাঘ তোমাকে হতেই হবে। যদি তুমি কখনও তিরবিদ্ধ হও, আর তখন যদি তুমি নারায়ণের নাম শুনতে পাও, তখন তোমার মুক্তি হবে।

অনেকদিন ধরে আমি বাঘরূপে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এতদিন পরে আমার সেই শাপমুক্তি হল। হে সুব্রত, আজ আপনি আমার খাদ্য হয়ে নারায়ণ নাম শোনালেন। তাতেই আমি মুক্তি পেলাম। তাই আপনার চরণে আমার অসংখ্য প্রণাম।

তারপরে রাজা ব্যাধের দিকে তাকিয়ে বলল–তুমি না তির মারলে আমার মুক্তি সম্ভব হতো না, তোমার মঙ্গল হোক।

এই কথাগুলো বলে দীর্ঘবাহু রাজা চলে গেল।

তারপরে মুনিবর আরুণি সেই ব্যাধকে ডাকলেন। বললেন, তুমি বহুদিন এই পবিত্র নদীতে স্নান করেছ, আর প্রত্যেকদিন আমার কণ্ঠে নারায়ণ নাম শুনেছ। তাই তুমি পবিত্র আর আমাকে তুমি বাঘের হাত থেকে রক্ষা করলে, তাই তোমার শরীরে কোনো পাপ থাকতে পারে না। তোমাকে আমি দীক্ষা দেব, তুমি স্নান করে এস।

ব্যাধ আনন্দে স্নান করে এলো। আরুণি তার কানে মন্ত্র দিলেন। বললেন–তুমি 'নারায়ণ' নাম করবে। এবং চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণের ধ্যান কর।

ব্যাধ খুব খুশি হলো। সে গুরুকে প্রণাম করল এবং নারায়ণের ধ্যানে বসে গেল। সারাদিনের মধ্যে একবার সে গাছের পাতা খেত, তারপরেই বসে যেত নারায়ণের ধ্যানে।

কিছুদিন এমনিভাবে চলার পরে ব্যাধ নদীতে স্নান সেরে খাওয়ার জন্য গাছের পাতা তুলতে গেল, তখন যেন কে বলে উঠল–তুমি গাছের পাতা তুলে খাবে না।

সেদিন থেকে ব্যাধ আর গাছের পাতা তুলল না। গাছের তলায় যে শুকনো পাতাগুলো পড়ে থাকত, সেগুলোই সে খেতো।

কিছুদিন পরে সে আবার শুনল তুমি শুকনো পাতাও খাবে না। সে আর পাতা খেল না। সম্পূর্ণ না খেয়ে সে নারায়ণ নাম জপ করতে লাগল। জড়দেহে খাবার না দিলে কেমন করে থাকবে সেই দেহ। ক্রমে ক্রমে তার শরীর কঙ্কালসার হয়ে গেল। দেহটি হাড়সার হয়ে উঠল।

দুর্বাসা মুনি একদিন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন এক কঙ্কালসার ব্যাধকে। মনে মনে ভাবলেন–এর তপস্যার শক্তি একবার পরখ করে দেখি। এই ভেবেই তার কাছে চলে গেলেন।

মুনিকে দেখে ব্যাধ প্রণাম জানাল এবং তাকে বসবার জন্য আসন দিল।

মুনি তখন ব্যাধকে বললেন–তার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। বহু পথ ঘুরে ঘুরে তিনি ক্লান্ত। তিনি সারাদিন কিছু খাননি।

ব্যাধ মহা সঙ্কটে পড়ে গেল। নিজে কিছু আহার করে না, তাই তার কাছে কোনো আহারের সামগ্রী নেই, এখন নারায়ণই ভরসা। তখন সে একমনে নারায়ণকে ডাকতে লাগল। হে নারায়ণ, তুমিই আমার সহায়। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নাই। আমি যদি এই অতিথির সেবা না করতে পারি, তাহলে আমার মহাপাপ হবে। তুমি দেখো ঠাকুর আমার দ্বারা যেন কোনো পাপ না হয়।

এইভাবে জপ করতে করতে ব্যাধের হাতে একটি থালা এসে পড়ল। ব্যাধ তখন দুর্বাসা মুনিকে বলল–হে মুনিবর, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।

এই বলে ব্যাধ চলল নগরের দিকে। হঠাৎ কয়েকজন রমণী এসে তার থালা ভর্তি করে দিল ফলমূল আর সুস্বাদু খাবার দিয়ে। ফিরে এলো ব্যাধ, খেতে দিলেন মুনিবরকে।

এতো খাবার দেখে দুর্বাসা খুশি হলেন, এবং অবাকও হলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে সে এতো খাবার পেল কী করে। তারপর বললেন–আমার আচমনের জন্য নদীর জল চাই। এখান থেকে নদী তো অনেক দূরে। আমার বর্তমানে যে ক্ষুধার জ্বালা, তা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি এক্ষুনি একটা ব্যবস্থা কর।

অতিথির নদীর জল ছাড়া আচমন হবে না। আর নদী থেকে জল আনতে অনেক সময় লাগবে। মুনি ততক্ষণ ধৈর্য্য ধরতে পারবেন না। তখন ব্যাধ আবার নারায়ণকে স্মরণ করলেন।

বললেন–হে ঠাকুর, আমার অতিথি অভুক্ত আছেন নদীর জলের অভাবে, তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। তুমি একটা ব্যবস্থা কর।

ব্যাধ চোখ বুজে নারায়ণের কাছে আবেদন জানালো। হঠাৎ দুর্বাসা মুনি অবাক হয়ে দেখেন, দেবিকা নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে তারই কাছ দিয়ে বয়ে চলেছে।

ব্যাধের তপস্যার প্রভাব দেখে দুর্বাসা মুনি অবাক হয়ে যান। তিনি ব্যাধকে আলিঙ্গন করে বললেন– ধন্য তোমার জপের সাধন। আমি তোমাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। আর সেই পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছে। আমি তোমার নাম রাখলাম 'সত্যতপা' আর আশীর্বাদ করছি– তুমি শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত হবে।

দুর্বাসাকে প্রণাম করে ব্যাধ বলল–আমি জাতিতে ব্যাধ, শুদ্র, পশু-পাখি হত্যা করা ছিল আমার পেশা। আমি মুখ মানুষ। শাস্ত্র পড়ার ক্ষমতা আমার নেই, আর পড়ার অধিকারও নেই।

দুর্বাসা বললেন–তোমার দেহ পূর্বে অধম শূদ্র ছিল। কিন্তু বর্তমানে তপস্যা দ্বারা তা শুদ্ধ হয়েছে। তাই তুমি বেদশাস্ত্র পড়ার অধিকারী হয়েছে।

তখন থেকেই ব্যাধ 'সত্যতপা' নামে পরিচিত হয়। সে মহাজ্ঞানী হয়। সে আরো কঠোরভাবে তপস্যা করার জন্য হিমালয়ে যায়। সেখানে পুরুষাভদ্রা নামে এক নদীর তীরে ভদ্রবট নামে এক অক্ষয় বটের তলায় বসে 'সত্যতপা' সাধনায় বসলেন। শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে নিত্য হোম করতে লাগলেন।

কিন্নর আর তার স্ত্রী সেই ভদ্রবট গাছে থাকত। তারা সত্যতপার নিত্য সাধনা দেখতো। একদিন সত্যতপা মুনি হোমের জন্য জপ করে কাঠ কাটছেন। তখন কাঠ কাটতে গিয়ে তার একটা আঙ্গুল কেটে গেল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেই কাটা জায়গা দিয়ে কোন রক্ত বের হল না। শুধু একটু ছাই বেরোলো।

কিন্নর মুনির সেই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখল। তারপরে সে বিস্মিত হয়ে ছুটে চলল রুদ্র সরোবরে। সেই সময় ইন্দ্র, দেবতাগণ, যক্ষগণ আর গন্ধবরাও ছিলেন সেখানে। কিন্নর একে একে সবাইকে বললেন–সত্যতপা ঋষির আশ্চর্য ঘটনা।

এই ঘটনা শুনে ইন্দ্রের খুব ইচ্ছা হল ঋষিকে দেখার। তিনি বিষ্ণুকে বললেন–চলুন দেখে আসি। পরীক্ষা করে দেখব কত বড় তপস্বী তিনি।

ইন্দ্র ব্যাধ এবং বিষ্ণু শূকরের রূপ ধারণ করলেন। এরপরে তারা ভদ্রবটের কাছাকাছি এলেন সত্যতপাকে পরীক্ষা করবেন বলে। ঋষি দেখলেন–একটা শূকর তার সামনে দিয়ে ছুটে গেল। একটু পরেই একজন ব্যাধ ধনুকে তির যোজনা করে ছুটে আসছে, তারপর সেই শূকরটা যেন কোথায় ঝোপে হারিয়ে গেল।

ব্যাধ সত্যতপা ঋষিকে এসে জিজ্ঞেস করল–একটা শূকরকে দেখেছেন এখানে, অনেকক্ষণ ধরে পিছু নিয়েছি, কিন্তু কিছুতেই বাগে আনতে পারিনি। এদিকেই এল, কিন্তু আর দেখতে পাচ্ছি না। আর সকাল থেকে কোন শিকার পাইনি। একটা শূকরকে যদিও দেখতে পেলাম কিন্তু ধরতে পারলাম না, কোথায় গিয়ে লুকিয়ে গেল। আজকে যদি কোনো শিকার না পাই, তাহলে আমার পুরো পরিবার না খেয়ে মারা যাবে। আপনি কি দেখেছেন–সেই শূকরটা কোন দিকে গেল?

সত্যতপা ঋষি ব্যাধের কথা শুনে উভয়সঙ্কটে পড়লেন। শূকরটি কোথায় লুকিয়ে আছে তা বলে দিলে, সে বেচারা মারা যাবে। আর তার খোঁজ না দিলে ব্যাধের পরিবার মারা যাবে না খেতে পেয়ে।

তিনি তখন চোখ বুজে নারায়ণের শরণ নিলেন। ঠাকুর তুমিই বলে দাও এখন আমি কি করব?

ঋষি যখন আকুলভাবে শ্রীহরিকে ডাকছেন, তখন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। চোখ খুলে ঋষি দেখলেন, সামনে নারায়ণ দাঁড়িয়ে আছেন, আর তার পাশে ইন্দ্র, ব্যাধও নেই, শূকরটিও নেই। তাঁদের দেখে ঋষি প্রণাম জানালেন। ঋষিকে বর দিয়ে তারা অন্তর্হিত হলেন।

সত্যতপার সাধনা হল বহুদিনের। হঠাৎ একদিন তার আশ্রমে এসে হাজির হলেন তার গুরুদেব মুনিবর আরুণি। সত্যতপা গুরুদেবকে দেখে প্রফুল্লিত হল। গুরুর চরণে সে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালো। আরুণি তাকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন। গুরু শিষ্যের অপূর্ব মিলন হলো।

আরুণি বললেন–সত্যতপা, তোমার সাধনা সিদ্ধ হয়েছে। এখন চল আমরা নিত্যধামে ফিরে যাই।

সেখানে তখন এক দিব্য রথ এল। দুজনে তাতে চড়ে বসলেন, ধীরে ধীরে সেই দিব্য রথ তাদেরকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক বণিক ও প্রেতের কাহিনি

এক বণিক ছিল। সে বয়সে যুবক ছিল। তার মা ও স্ত্রী ছিল। বাণিজ্য করে তার বাবা বহু সম্পদ করেছিল। একদিন কয়েকজন চোর এসে সব চুরি করে নিয়ে যায়। সেই থেকে তারা খুব গরীব হয়ে পড়ে। এখন সংসারের হাল ধরল তার ছেলে। তিনজনের সংসার। কেমন করে চলবে? সে ঠিক করলো বাণিজ্যে যাবে। ঘরে যে থালা বাসন ছিল সেগুলোকে সে বিক্রি করে দেয়। এছাড়া প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও ধার নেয়। এইভাবে কিছু জিনিস কিনে সে অন্য দেশে গেল বাণিজ্য করবার জন্য।

বনের মধ্যে দিয়ে একা একা যাচ্ছিল সে। সহসা এক প্রেত এসে দাঁড়াল তার সামনে। বিকট তার চেহারা, শরীরে মাংস নেই। চোখ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। দাঁতগুলো বেশ উঁচু। তাকে দেখে ভয়ে আঁতকে উঠল সেই বণিক। সে থরথর করে কাঁপছে, ছুটে পালাতেও সে পারছে না।

প্রেত বলল–আমি তোকে খাব, আমার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

যুবকটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলে–দোহাই, তুমি আমাকে খেয়ো না। ঘরে আমার মা বউ আছে। তাদেরকে বহুদিন কষ্টে রেখেছি। আমাদের সবকিছু চোর চুরি করে নিয়েছে। সামান্য কিছু জোগাড় করে বাণিজ্যে বেরিয়েছি। আমি যদি ফিরে না যাই, তাহলে আমার মা আর স্ত্রী দুজনেই মারা যাবে। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও।

প্রেত বলল–খাবার যখন পেয়েছি তখন তা আমি ছাড়ব না। আমি ক্ষিদের জ্বালা সহ্য করতে পারছি না।

তারপরে প্রেতের কি মনে হল, সে যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করল–তোমার বাড়ি কোথায়?

বণিক যুবকটি ভয়ে ভয়ে বলল–আমি মথুরা থেকে আসছি।

মথুরার কথা শুনে প্রেত যুবকটিকে বলল–তুমি যদি আমার একটা কাজ করে দিতে পার, তাহলে তোমাকে আমি ছেড়ে দেবো।

যুবক সাহস করে বলল–বল কি কাজ?

প্রেত বলল–মথুরায় চাতুঃসামু দিক নামে একটা কূপ আছে। তুমি সেখানে গিয়ে যদি আমার নামে পিণ্ড দাও, তাহলে আমি এই প্রেতযোনি থেকে উদ্ধার পাব। তুমি যদি আমার কাছে কথা দাও, তুমি যদি এই কাজ কর, তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো।

প্রেতের কথা শুনে বণিক যুবকের মনে সাহসের সঞ্চার হল। সে বলল–তা আমি করতে পারব। তবে সেই কাজ করতে গেলে অনেক অর্থ লাগবে, অত অর্থ আমার নেই, আমি বড়ই গরীব।

প্রেত বলল–তোমার অনেক অর্থ আছে, তুমি আমার শ্রাদ্ধ দিতে পারবে। এমনকি তোমার সংসারও চালাতে পারবে। তোমার সুখে দিন চলে যাবে, তোমাকে আর বাণিজ্য করতে যেতে হবে না।

প্রেতের কথা শুনে যুবক অবাক হল। যে দুবেলা দুমুঠো ভাত জোগাড় করতে পারে না, প্রেত বলে কিনা অগাধ অর্থ আছে।

প্রেত যুবকের ভাবভঙ্গি দেখে বলল–আমি জানি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছ না। তোমার ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি কলসী ভর্তি সোনা আছে। তাড়াতাড়ি ফিরে যাও, মাটি খুঁড়লেই সেই কলসী পাবে।

প্রেতের কথা শুনে যুবকটি খুব আনন্দিত হলো। মনে মনে ভাবল প্রেতের কথা যেন সত্যি হয়। তারপর প্রেতকে বলল–আচ্ছা তুমি পূর্বজন্মে কে ছিলে? কি কারণে তোমাকে প্রেত হতে হলো? যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে তাহলে আমাকে বলতে পার।

প্রেত বলল–আমার প্রতিষ্ঠানগরে বাড়ি ছিল। আমার পেশা ছিল বাণিজ্য করা। প্রচুর ধন সম্পদ ছিল। আমি ভীষণ কৃপণ ছিলাম। নিজের বাড়ির লোক ছাড়া অন্য কারোর জন্য একটা পয়সা খরচ করতাম না। গরীব-দুঃখীদের সামান্য ভিক্ষাও দিতাম না। ভিখারীদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতাম।

সেই পাপের জন্য আমার এই প্রেজন্ম। কত ক্ষুধার্তকে তাড়িয়ে দিয়েছি তখন, আর এখন ক্ষুধার জ্বালায় ঘুরে ঘুরে মরছি। তবে দু-একটা পুণ্য কাজও করেছি। যার ফলে তোমাদের মত দু-একজনকে মাঝে মাঝে পাই। যুবকটি বলল–তুমি কি পুণ্য কাজ করেছিলে?

প্রেত বলল–আমার দু-একজন বন্ধু ছিল। একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে এসে উপস্থিত হলাম এক বিষ্ণু মন্দিরে। তখন সেখানে বসে এক ব্রাহ্মণ পুরাণ পাঠ করছিল। অনেকেই শুনছিল সেই পাঠ। বন্ধুও সেখানে বসে গেল পাঠ শুনতে। অগত্যা আমি কি করি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসে পড়লাম।

তখন পাঠক ব্রাহ্মণ বললেন–মথুরায় চাতুঃসামুদ্রিক কূপ একটি তীর্থক্ষেত্র সেখানে কারও উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করা হলে তার পিশাচত্ব নাশ হয়।

তারপর পুরাণ পাঠ শেষ হলো। সকলে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে চলে গেল। আমার বন্ধুও প্রণামী হিসাবে কিছু অর্থ দিল। কিন্তু আমি কিছু দিলাম না, অপব্যয় ভেবে।

তখন বন্ধুটি আমায় বলল–পুরাণ পাঠ শোনার পর পাঠককে কিছু দিয়ে প্রণাম করতে হয়। না হলে পাপ হয়।

বন্ধুটি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে ভেবে অনিচ্ছায় সামান্য অর্থ দিলাম। আমার বিশ্বাস অবহেলা করে সেই অর্থ দিলেও তার জন্যই আমি মাঝে মাঝে খাবার পাই।

প্রেত নিজের কাহিনি বলার পরে, যুবককে বলল–তুমি বাড়ি ফিরে যাও। তোমার কাছে যে অর্থ আছে, তাকে খরচ করলেও সেই অর্থ কোনদিন শেষ হবে না। আমার নিবেদন তুমি মথুরায় গিয়ে আমাকে উদ্ধার কর।

যুবকটি প্রেতের কথা বিশ্বাস করে নিজের ঘরে ফিরে গেল। একটা শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে। সে কাউকে কিছু বললো না। তার স্ত্রী তাকে মাটি খুঁড়তে দেখে ভাবল–সে বুঝি পাগল হয়ে গিয়েছে। তারা অনেক নিষেধ করল। বলল কেন এভাবে ঘরের মেঝেটা নষ্ট করছ।

বণিক কোনো কথা না বলে মাটি খুঁড়তে থাকল। অবশেষে সে দেখতে পেল একটা কলসী পোঁতা আছে সেখানে। সে বহু যত্নে তুলল সেটাকে। কলসীর মুখের ঢাকনা খুলে দেখেই অবাক হল সকলে। মোহরে সেটা ভর্তি ছিল। তারপরে যুবকটি সব কথা তার মা ও স্ত্রীকে বলল, আর মহা ধূমধামে প্রেতের শ্রাদ্ধ দিল।

সৌধর তীর্থের মাহাত্ম

তখন ত্রেতাযুগ। কলিঙ্গ রাজা পরম ধার্মিক ছিলেন। তার কিছুর অভাব ছিল না। তার একটা মাত্র দুঃখ ছিল, তিনি অপুত্রক ছিলেন। ভগবানের কৃপায় প্রৌঢ় বয়সে তার একটি পুত্র হল। রাজা ও রানি খুব আনন্দিত হলেন। অতি যত্নে আদরে বড় হতে লাগল রাজকুমার। বড় হয়ে সে নানা শিক্ষা গ্রহণ করল। রূপে গুণে সে সবার মন জয় করে নিল।

কাঞ্চী রাজার একটা কন্যা ছিল, সে রূপে স্বর্গের অপ্সরীদের মতো ছিল। সে খুব গুণবতী ছিল। সুশিক্ষিতা লজ্জাশীলা, সৎস্বভাবা, ভক্তিমতী ছিল সে। ধীরে ধীরে কন্যাটি যৌবনপ্রাপ্ত হল।

কাঞ্চী রাজার চিন্তা হতে থাকে। এতো গুণবতী কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাবেন। দূতের মুখে তিনি জানতে পারেন কলিঙ্গ রাজার পুত্র রূপে গুণে অতুলনীয়। তখন সেই ছেলের সঙ্গেই তার কন্যার বিয়ে দেবেন। তিনি ঘটক পাঠালেন কলিঙ্গ রাজার কাছে। তিনি তখন দূতের দ্বারা খোঁজ নিলেন কাঞ্চীরাজের কন্যার বিষয়ে। দূত জানালো কন্যার কোনো খুঁত নেই। তারপরেই মহাসমারোহে বিয়ে হয়ে গেল কলিঙ্গ রাজপুত্রের সঙ্গে কাঞ্চীরাজকন্যার।

ভোগবিলাসে নবদম্পতি দিন কাটাচ্ছে। একদিন রাজকন্যা রাজকুমারকে বলল স্বামী তোমার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।

রাজকুমার অবাক হয়ে বললেন, তুমি কি কথা বলছ? তুমি কি আমার কাছে আবেদন করবে। দাবি করতে পার। তুমি হলে এই রাজ্যের ভাবী রাজরানি। তোমার মুখে এই আবেদন-নিবেদন কথাগুলো ভাল শুনায় না। তোমার মনের বাসনা আমি পূর্ণ করব না এমন চিন্তা তুমি করলে কিভাবে? কি চাই বল।

রাজকন্যা বলল–আমি যা চাইব তুমি কি তা দেবে?

রাজকুমার বললেন–তুমি এমন করে বলছ কেন? তোমাকে আমার অদেয় কি আছে?

রাজকন্যা বলল তিন সত্যি করে বল।

সত্যি, সত্যি, সত্যি এবার বল, তোমার কি আর্জি? বলল রাজকুমার।

রাজকন্যা বলল–আমি একটা ব্রত করব ঠিক করেছি।

এই কথা, ঠিক আছে এটা তো খুব ভাল কথা। তার জন্য আমাকে ত্রি-সত্য করালে।

রাজকন্যা বলল–সেজন্য তোমাকে তিন সত্য করাইনি। এই ব্রতটি কঠোর। আজ পর্যন্ত কেউ এই ব্রতের নাম শোনে নি। শয়ন ব্রত। কি? শুনেছ কখন? আমি যতক্ষণ নির্জন ঘরে শুয়ে থাকব, ততক্ষণ আমার কাছে কেউ থাকবে না। এমনকি আমার দাসীরাও না। কেমন করে শুয়ে আছি, কেউ দেখবে না। এমনকি তুমিও দেখবে না।

রাজকুমার স্ত্রীর কথা শুনে অবাক হল। ভাবল এমন ব্রতের কথা তো কোনও শাস্ত্রে নেই। এ আবার কেমন ব্রত। তারপরে বলল ঠিক আছে তাই হবে।

রাজকন্যা ব্রত আরম্ভ করল। নিষ্ঠার সঙ্গে সে ব্রত করে চলল। যখন সে শয়ন কক্ষে থাকবে, কেউ তাকে দেখবে না। যখন বাইরে আসবেন তখন কোনো অসুবিধা নেই। রাজকুমার তার সত্য পালন করে চলেছেন।

বৃদ্ধাবস্থায় কলিঙ্গরাজ রাজকুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। সে রাজা হয়ে সুশাসনে রাখল প্রজাদের, সবাই খুব খুশি। ক্রমে-ক্রমে তার আটাত্তর বছর বয়স হলো। এখনকার হিসেবে বেশি মনে হলেও ত্রেতাযুগের মানুষের গড় আয়ু ছিল দশ হাজার বছর। সে তুলনায় আটাত্তর বৎসর কিছুই নয়। ইতিমধ্যে পাঁচটি পুত্রের বাবা হলেন রাজা। রানির শয়ন ব্রত, কিন্তু তখনও নির্দিষ্ট নিয়মেই চলছে।

একদিন রাজা ভাবলেন প্রতিটি ব্রতের শেষ আছে। কিন্তু রানি এমন কী ব্রত করছেন যার শেষ নেই। কী এমন ব্রত? রানি কার কাছে থেকে এমন ব্রতের বিধান পেল? ভাবতে ভাবতে রাজার মনে কৌতূহল হল। তিনি ঠিক করলেন ব্যাপারটা লুকিয়ে দেখবেন। মনে পড়ে গেল তিন সত্যর কথা। যদি ধরা পড়ে যায়? তাহলে রানির কাছে লজ্জিত হতে হবে। আর যদি ধরা না পড়ে তাহলে আর কি?

তিনি প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। তার সঙ্গে প্রজারা রোজ দেখা করতে আসেন। এমনকি সামান্য অসুবিধা হলেও তারা রাজার কাছে আসেন। রাজা তাদের সবাইকে খুশি করেন।

একদিন রাজা মন্ত্রীকে বললেন–আগামীকাল কেউ যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না আসে। আগামীকাল তিনি নির্জনে রাজপ্রাসাদের মধ্যেই থাকবেন। কেউ যেন তাকে না দেখে।

মন্ত্রী রাজার কথামতো সেই কথা রাজ্যে প্রচার করে দিলেন। আগামীকাল কেউই রাজার সাক্ষাৎ পাবে না।

পরের দিন রাজা সেই ঘরে ঢুকলেন, যে ঘরে রানি শয়নব্রত করছিল। খাটের তলায় গিয়ে চুপ করে পড়ে রইলেন। তারপরে রানি এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দুহাতে মাথাটি চেপে ধরে কাঁদছেন। আর বলছেন হায় আমার কি দুর্ভাগ্য। চুপ করে এই মাথার যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে। সৌকর তীর্থে কি আমি কোনদিন যেতে পারব না? স্বামীর সঙ্গে কপটতা করে এই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে এখানেই মরতে হবে আমাকে।

রানির বিলাপ শুনে রাজা স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এলেন। রানিকে বললেন, আমি তিন সত্য ভেঙেছি। সেজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এবার বল তুমি কেন মাথার যন্ত্রণা সহ্য করছ। আর এমন ছলনার আশ্রয় নিলে কেন। বৈদ্য ডেকে কি এর চিকিৎসা করা যেতো না?

রানি বললেন—আমার এই রোগ সারানোর সাধ্য বদ্যির নেই।

রাজা রানিকে বললেন—তুমি কাঁদতে কাঁদতে সৌকর তীর্থের কথা বলছিলে, শুনেছি সেই তীর্থে গেলে মানুষ মুক্তি লাভ করে। সেখানে তোমার মন যেতে চাইছে, তাহলে আমাকে বলনি কেন?

রানি বললেন—আমি ভয়ে তোমাকে বলি নি। তুমি যদি কষ্ট পাও।

রাজা বললেন—কষ্ট পাব কেন? তুমি আমার স্ত্রী। স্ত্রীর কোনো অসুবিধা হলে সে তো তার স্বামীকে অবশ্যই বলবে তাতে কি কোনও স্বামী কষ্ট পাবে।

রানি বললেন—তার জন্য চিন্তা কি? আমার পাঁচ পুত্রের জ্যেষ্ঠকে সিংহাসনে বসিয়ে আমরা দু'জনে চলে যাব।

রাজার কথা শুনে রানি খুব আনন্দিত হলেন।

রাজা একদিন মন্ত্রীকে ডেকে বললেন—আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে তীর্থে যাব কবে ফিরব তার ঠিক নেই। তাই আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে যেতে চাই।

মন্ত্রী রাজার আদেশমত সব ব্যবস্থা করল। আর নির্দিষ্ট দিনে রাজা তার জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজছত্র দান করলেন। তার পর বেরিয়ে পড়লেন সৌকর তীর্থের উদ্দেশ্যে, সঙ্গে শুধু রানি নয়, যারা যারা রাজাকে ভালবাসত, তারও বেরিয়ে পড়ল সৌকর তীর্থ দর্শনের জন্য।

সবার থাকার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান তৈরী হল। জমজমাট হয়ে উঠল সৌকর তীর্থ। রাজা রানিকে বললেন–এবার বল, তোমার সৌকর তীর্থে তো এসেছি। আর তো তোমার কোনো আপত্তি নেই বলার।

রানি বললেন–বলব কিন্তু আমাদের দুজনকে এর আগে তিন দিন উপবাস করতে হবে।

রাজা ও রানি দুজনেই উপবাস করলেন তিনদিন। চতুর্থ দিনে রানি রাজার হাত ধরে ডেকে নিয়ে গেলেন এক নির্জন স্থানে। তারপর বললেন–স্বামী গত জন্মে এখানেই আমার মৃত্যু হয়েছিল। আমি তখন শৃগাল ছিলাম। কলিঙ্গনগরের রাজকুমার সোমদত্ত একদিন মৃগয়ায় এলেন। তিনি সারাদিন কোন শিকার না পেয়ে আমাকেই হত্যা করল। রাজকুমারের তির আমার মাথায় এসে লাগে। আমি ছটফট করতে করতে মারা যাই।

এই তীর্থের গুণে আমি শৃগালী থেকে রাজকন্যারূপে জন্মলাভ করি। এতোদিন সেই যন্ত্রণা ভোগ করছি। আজ এখানে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলাম।

রাজা রানির সব কথা শুনে বললেন–আমি তোমায় আমার গোপন কথা বলছি। আমি গতজন্মে শকুন ছিলাম। সেই সোমদত্তর তিরের আঘাতেই মারা যাই আমি। সোমদত্ত আমার ডানা দুটো কেটে নেয়, তিরের পেছনে বাধবে বলে। এই সৌকর তীর্থের গুণে আমিও এ জন্মে রাজপুত্র হলাম। আর আজকেই আমার মুক্তি হল। তারপর রাজা ও রানি দুজনেই সৌকর তীর্থে দেহত্যাগ করলেন। তাদের সঙ্গে যেসব প্রজারা গিয়েছিল তারা কিন্তু সেখানে থেকে গেল।

কুব্জাম্রকের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে জন্মান্তরের খেলা

কুব্জাম্রক নামে একটা নির্জন স্থান ছিল। সেখানে একটা বিষ্ণু মন্দির ছিল। সেখানে প্রত্যেকদিন বহু ভক্ত আসত বিষ্ণুর পূজা করতে। সেই মন্দিরের একটি কোণে একটি গর্তে সাপিনী থাকত। ভক্তরা পূজার জন্য অনেক ফলমূল আনত। তারা সেই ফলমূলের খোসাগুলো মন্দিরের পাশে ফেলে দিত। সাপিনী সেইগুলো খেয়ে বেঁচে থাকত।

একদিন দুপুরে সবাই পূজা করে চলে গেল। সবাই যখন চলে গেছে তখন সাপিনী গর্ত থেকে বেরিয়েছে। সে বারান্দার দিকে খেতে খেতে চলে এসেছে। এমন সময় ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে এল এক নেউল। সাপে নেউলে চিরকালই শত্রুতা, কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। দুজনের দেখাদেখি হতেই বাঁধল লড়াই। উভয়ে উভয়কে কামড় দিল। নেউলের কামড়ে সাপিনী টুকরো টুকরো হয়ে শেষ হয়ে গেল। আর সাপিনীর কামড়ে নেউলেরও সেই একই দশা হল।

পরের দিন ভক্তরা এসে দেখল মন্দির প্রাঙ্গণ রক্তারক্তি হয়ে আছে। আর একটা মরা নেউল ও একটা সাপ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে।

তারপর অনেক কাল কেটে গেল, সে ঘটনাও সবাই ভুলে গেল।

কোশলের রাজপুত্র রূপে অতুলনীয় ছিলেন এবং তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

প্রাগ জ্যোতিষপুরের রাজকন্যা রূপে, গুণে, নাচ-গানে অদ্বিতীয়া। ভাগ্যচক্রে রাজকন্যা কোশল রাজকুমারকে পতিরূপে লাভ করলেন। নানা ভোগবিলাসে তাঁদের সময় কাটতে লাগল। বনে উপবনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দুজনে। এই বয়সে আনন্দ উপভোগ করা ছাড়া আর করবেই বা কি?

একদিন দুজনে উপবনে একটি গাছের গোড়ায় বসে গল্প করছেন। রাজপুত্র দেখলো একটা সাপিনী একটু দূরে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

রাজকুমার তাকে দেখেই লাফিয়ে উঠলো। আর হাতে একটা পাথর তুলে নিয়ে সেই সাপিনীকে মারতে উদ্যত হলো।

এই দেখে রাজকন্যা রাজকুমারের হাত চেপে বললো একি? তুমি ওই নির্দোষ সাপিনীকে মারতে চাইছো কেন? সে তোমার কি ক্ষতি করেছে। সে তো তোমাকে দংশন করতে আসেনি যে, তুমি তাকে মারবে।

রাজকন্যার হাত ছাড়িয়ে দিয়ে রাজকুমার বললেন–সাপ হিংসুটে প্রাণী। সাপকে কখনও ছেড়ে দিতে আছে? কামড়ালে আর রক্ষা থাকবে না।

রাজকুমার এই কথা বলে সাপিনীর মাথা লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারলেন। পাথরের আঘাতে সাপিনীর মাথাটা একেবারে থেঁতলে গেল। ছটফট করতে করতে সে মারা গেল।

রাজকুমারের ব্যবহারে রাজকন্যা খুব দুঃখ পেলো তিনি ঠিক করলেন সে স্বামীর সঙ্গে কথা বলবেন না। তিনি একপাশে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকেন।

এমন সময় ঝোঁপ থেকে একটা নেউল বেরিয়ে এল। দেখামাত্র রাজকন্যা একটা পাথর তুলে মারতে উঠলো তাকে।

রাজকুমার বাধা দিয়ে বললো ও কি! তুমি নেউলটাকে মারতে যাচ্ছ কেন? ও কি তোমার ক্ষতি করেছে।

রাজকন্যা রাজপুত্রের কথার কোনো উত্তর দিলো না। তিনি সেই পাথরটি ছুঁড়ে মারলো। নেউলটার মাথা চৌচির হয়ে গেল। শেষ হল তাদের বেড়ান।

রাজকুমার খুব রেগে গেলো। বললো–তোমাকে নিষেধ করলাম। তুমি আমার কথার কোন উত্তর দিলে না, আমাকে অগ্রাহ্য করে তুমি নেউলটাকে মেরে ফেললে।

এসব রাজকন্যা উত্তর দিলো। আমি ও তো সাপিনীকে মারতে বারণ করেছিলাম, তুমি শুনেছিলে আমার কথা।

রাজকুমার বললো–আমি এদেশের রাজা, কাকে কি সাজা দেবো সেই যোগ্যতা আমার আছে। আমি একটা হিংসুটে প্রাণীকে মেরেছি। আর তুমি নিরীহ প্রাণীকে মেরেছ। আমাকে তুমি নীতিকথা শেখাতে যেও না।

এইভাবে শুরু হল দুজনের মধ্যে বাগবিতণ্ডা, কেউ কম যান না। শেষে রাজকুমার বললো, আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।

রাজকন্যা ভাবলো ঠিক হল, আমি ও চাই না এমন স্বামীর মুখ দেখতে।

প্রাসাদে তাঁরা দু'জনে আলাদা আলাদা ভাবে ফিরে গেলো। দুজনের আলাদা ঘরে শয্যা পাতা হল। কেউ কাউকে দেখতে চান না। রাজকুমার এদিকে যান তো রাজকন্যা ওদিকে।

রাজবাড়ির সবাই জানতে পারলো রাজকুমার ও রাজকন্যার ব্যাপার। কিন্তু এর কারণ কি তারা জানতে পারল না। দুজনের মধ্যে কি নিয়ে যে গন্ডগোল তা কেউ বুঝতে পারল না।

ব্যাপারটা কোশলরাজ জানতে পারলেন। রাজা তো অবাক, ছেলে তার সবদিক দিয়েই সুন্দর। বধূমাতাও তাই। তাহলে তাদের মধ্যে আমোদ-আহ্লাদ নেই কেন। তারা কথাবার্তাও বলে না। এমনকি দেখাদেখি বন্ধ।

একদিন কোশলরাজ রাজপুত্র ও বধূমাতাকে ডেকে পাঠালেন। মুখ তাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। রাজকুমার সব কথাই বললো। রাজা সব শুনে হাসলেন, বললেন–এই সামান্য একটা ব্যাপারে তোমরা একে অপরের সঙ্গে কথা বল না। বউমার তো কোনো খারাপ ব্যবহার দেখিনি। স্বামী-স্ত্রী একটু আধটু ঝগড়া করে থাকে। কিন্তু এমন রাগ দেখিনি।

রাজকুমার বললো–কথা আপনিই ঠিক বলেছেন। আমি ওর স্বামী। আমি যখন বারণ করেছি, তখন ও আমার কথাকে অগ্রাহ্য করল কেন? যে নারী স্বামীর অবাধ্য হয়, সে স্বামীর কি ভাল লাগে।

রাজকন্যা বললো–আমারও একই বক্তব্য, আমিও নিষেধ করেছিলাম সাপিনীকে মারতে, তা উনিও শোনেন নি। আমিও তো ওনার স্ত্রী, আবার এই রাজ্যের ভাবী রানি। আমাকে অগ্রাহ্য করার অর্থ হল আমাকে অপমান করা।

দুজনের কথা শুনে কোশলরাজ অবাক হয়ে গেলেন। ভাবলেন এই একটা তুচ্ছ ব্যাপারে এমন হতে পারে না। এর আড়ালে নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে।

তারপরে রাজকুমারকে ডেকে বললেন–বল কুমার আসল ব্যাপরটা কি? আমার মনে হচ্ছে তুমি কোন কথা গোপন করছ।

রাজকুমার বললেন–এখানে তা বলা যাবে না। কুব্জাম্রকে বলতে হবে।

রাজা বললেন–সেটা তো তীর্থক্ষেত্র, কিন্তু সেখানে যেতে হবে কেন? আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।

কুমার বললো–সেখানে না গেলে কোনো কথাই বলা যাবে না। আর একটা কথা সেখানে আমরা গেলে আর ফিরে নাও আসতে পারি। তাই ছোট ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে তবে আমরা সেখানে যাব।

কোশলরাজ বললেন–বড় থাকতে ছোটকে সিংহাসনে বসানো কি উচিত হবে?

কুমার বললো–আমার রাজ্যে কোনো লোভ নেই, আপনি ছোট ভাইকে সিংহাসনে বসাতে পারেন।

তারপরে রাজা কোনো উপায় না দেখে মন্ত্রীদের ডেকে ছোট ছেলেকে সিংহাসনে বসালেন। তারপরে রাজা-রানি, কুমার, বধূমাতা আরও লোকজন নিয়ে সকলে কুজাম্রের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

সেখানে স্নান করে বিষ্ণু মন্দিরে পূজা দিলেন। তারপরে সকলে বসলেন সেই মন্দিরে।

তারপরে রাজকুমার ও রাজকন্যা তাঁদের পূর্বজন্মের কথা বললেন। তাঁরা পূর্বে সাপিনী ও নেউল ছিলো। এখনো তাঁরা কেউ পূর্বজন্মের আক্রোশের কথা ভুলতে পারেননি।

কাহিনি শুনে সবাই অবাক। সেখান থেকে কুমার ও রাজকন্যা চলে গেলো পৌণ্ডরীক তীর্থে। সেখানে বহু সাধনার পর দিব্য ধামে গমন করলো। আর রাজা রানি মায়াতীর্থে গিয়ে বিষ্ণু সাধনায় রত হলেন।

বণিক গোকর্ণ ও শুকপাখির কাহিনি

মথুরায় বসুকর্ণ নামে এক সম্ভ্রান্ত বণিক ছিল। তার স্ত্রীর নাম সুশীলা। সে বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছে। এইজন্য বণিকমহলে তার খুব খ্যাতি। তার রাজার মত সম্পদ ছিল। সে রাজার হালে থাকত। দাস-দাসী কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু ভগবান সবাইকে সব সুখ দেয় না। বসুকর্ণের যশ, খ্যাতি, অর্থ, সম্পদ ছিল কিন্তু তাদের কেউ বাবা মা বলে ডাকার ছিল না। অর্থাৎ তাদের কোন সন্তান ছিল না। প্রাসাদের মত বাড়ি প্রচুর ঐশ্বর্য কিন্তু তা ভোগ করার কেউ ছিল না। তাদের প্রৌঢ় বয়স তবুও তাদের সন্তান হল না।

একদিন সুশীলা নদীতে স্নান করতে গেছে। সেখানে কত মেয়েই এসেছে। তাদের সকলেরই দু একটা করে ছেলেমেয়ে আছে। মনের আনন্দে তারা জলে ঝপাচ্ছে। সাঁতার কাটছে, জল ছুঁড়োখুঁড়ি করছে, আবার কেউ বা আদর করে ছেলে-মেয়েদের গা ধুইয়ে দিচ্ছে। যত্ন করে স্নান করিয়ে দিচ্ছে।

সুশীলার স্নান করার দিকে মন নেই। সে দেখছে, সেই মেয়েদের আদর যত্ন স্নেহ মাখা ভালবাসা ছেলে মেয়েদের প্রতি। তার মন এইসব দেখে কেঁদে কেঁদে উঠছে। তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল জল। সে কোনরকমে নদীর জলে একটা ডুব দিয়ে উঠে এল নদীর তীরে। একটা গাছের তলায় বসে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সে কাঁদতে লাগল।

সেই সময় নদীর পাড়ের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন এক সাধু। গাছতলায় সেই মেয়েটিকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন–কি হয়েছে তোমার? তুমি কাঁদছ কেন?

সুশীলা মুখ তুলে দেখল। কিন্তু সে কোনো উত্তর দিতে পারল না। তার চোখ ভেসে গেল জলে। আবার শুরু করল কাঁদতে।

সাধু বললেন–মাগো তোমার অনেক দুঃখ। তুমি একটা কাজ কর। ওই যে সামনেই গোকর্ণের শিবলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছ, ওর পূজা কর। মহেশ্বর যদি খুশি হন তাহলে তোমার মঙ্গল হবে।

এই বলে সাধু চলে গেল। তারপরে সুশীলা যখন মুখ তুলল তখন দেখল সেই ব্যক্তিটি আর নেই। বাড়িতে এসে সুশীলা স্বামীকে সেই সাধুর কথা বলল।

বসুকর্ণ ধর্মপ্রাণ ছিল। তাই তার স্ত্রী সুশীলার কথা শুনে গোকর্ণেশ্বরের পূজার আয়োজন করল মহাধুমধামে। তারা দুজনে মিলে মহেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালো।

তারপর থেকে তারা নিত্য এসে গোকর্ণেশ্বরের পূজা দিয়ে যান। একদিন তারা শিবের পূজা করে চোখ বুজে তার ধ্যান করছেন, এমন সময় এক জ্যোতি দেখা গেল সেই মন্দিরে। সেই জ্যোতির মধ্যে আবির্ভূত হলেন দেবাদিদেব মহেশ্বর। হাত তুলে বরদান করলেন–তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

আনন্দে প্রফুল্লিত হয়ে তাঁরা দুজনে জোড়হাতে প্রণাম করলো শিবকে। তারপরেই সুশীলা গর্ভবতী হলো এবং যথাসময়ে তাঁদের পুত্র হলো। গোকর্ণেশ্বরের কৃপায় এই পুত্র হয়েছে বলে বণিক তার নাম রাখলো গোকর্ণ। তারপর আস্তে আস্তে গোকর্ণ বড় হতে লাগল। লেখাপড়াও শিখল। এক সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হল।

বসুকর্ণের এখন বৃদ্ধদশা চলছে। ঘরে অনেক সম্পদ থাকায় বাণিজ্যে তিনি আর যান না। কিন্তু বসে বসে খেলে নদীর জলও শেষ হয়ে যায়। তাই বসুকর্ণ গোকর্ণকে বাণিজ্যের সুবিদ্যা শিখিয়ে দিলেন নিজেই। যখন প্রয়োজন হবে বাণিজ্য করতে যেন পারে।

গোকর্ণের বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। কিন্তু তার কোনও সন্তান হল না। বৃদ্ধ বসুকর্ণের বড় সাধ নাতি-নাতনিকে নিয়ে একটু আনন্দ করেন। কিন্তু বহুদিন অপেক্ষা করেও যখন তা হল না তখন তিনি আবার তার পুত্রের বিয়ে দিলো। এই ভাবে একে একে পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন পুত্রের। কিন্তু যার কপাল খারাপ তার শত স্ত্রীতেও কি করবে?

তারপরে বসুকর্ণ আর গোকর্ণ দুজনেই মন দিলো দান-ধ্যানে। তারা দেশে যত দীন-দুঃখী ছিল সবাইকে দান করলো। কাউকে অর্থ, কাউকে বস্ত্র, আর কাউকে বা গরু, মাঝে মাঝে অন্ন ব্যয়ও করল প্রচুর। এইভাবে বসুকর্ণের সঞ্চিত অর্থ শেষ হতে থাকে।

গোকর্ণ দেখলো এবার বাণিজ্যে না গেলে আর সংসার চলবে না। তাই তিনি জিনিস নিয়ে নৌকায় বাণিজ্যে গেলো। পাঁচ স্ত্রীকে রেখে গেলো বাবা-মার সেবার জন্য।

তিনি বহুদেশ ঘুরে ঘুরে বাণিজ্য শুরু করলো। তিনি অর্থ লাভ করলেন। এবার তার বাড়ি ফেরার পালা। নৌকা মথুরার দিকে ফিরতে লাগল। নৌকার সামনের দিকে পাটাতনে বসলো

গোকর্ণ এবং দু দিকের শোভা দেখতে দেখতে চললো। হঠাৎ এক জায়গায় গোকর্ণ মাঝিদের বললো–এইখানে নৌকা নোঙর কর। আমি নামব।

নৌকা বাঁধল মাঝিরা, গোকর্ণ নামলো। নদীর পাশেই একটি সুন্দর পাহাড় ছিল, কত সুন্দর গাছ। ছিল যা দেখে মন ভরে যায়। তিনি পায়ে পায়ে কিছুদুর চলে গেল। এক জায়গায় এক পাহাড়ী সৌন্দর্য দেখে গোকর্ণ দাঁড়িয়ে পড়লো।

এমন সময় তাঁর পিছন দিক থেকে যেন কেউ বলল–ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? আসুন আমার ঘরে, আপনি আমার অতিথি, আমার কি সৌভাগ্য।

গোকর্ণ চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকালো। কে এমন করে ডাকছে তাকে? তিনি দেখলো একটা ঝুপড়ি ঘর। এবং খাঁচার মধ্যে একটা শুকপাখি এবং সেখানে কোন মানুষকে দেখা যাচ্ছে না। তাহলে কার গলার স্বর সে শুনল?

গোকর্ণ অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। তখন তিনি আবার শুনতে পেলেন কেউ যেন বলছে– অতিথি দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। আপনি ভিতরে এসে বসুন, এখানে আসন পাতা আছে আর সামনে ঢাকনা চাপা দেওয়া আছে খাবার। আপনি ইচ্ছামতো আহার করতে পারেন, মা-বাবা বাইরে গেছেন। তারা এলে আপনার সেবা করবে।

গোকর্ণ বুঝতে পারলো যে এই কথাগুলো খাঁচার ভিতরে থাকা শুকপাখিটিই বলছে। সে আরও অবাক হয়ে গেল কেমন করে পাখিটা নীতিকথা শিখল?

গোকর্ণ আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে গেলো খাঁচার দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করল তুমি দেখতে একটা পাখি। আসলে তুমি কে? তোমার আসল পরিচয় কি বল? এখন তুমি যদি সত্যি পরিচয় না দাও তাহলে আমি তোমার অতিথি হতে পারব না।

শুকপাখি বলল–অতিথি ফিরে গেলে আমাদের অমঙ্গল হবে। তাই আমি আমার পরিচয় তোমাকে বলছি শোন।

আমি জাতিস্মর তাই আমার পূর্বজন্মের কথা সব মনে আছে। পূর্বজন্মে আমার নাম ছিল শকোদর। আমি ছিলাম মহর্ষি বামদেবের শিষ্য, তাঁরই আশ্রমে থাকতাম বিদ্যার্জনের জন্য। সেই গুরুদেবের কাছে বহু দেবর্ষি, মহর্ষি, আর রাজর্ষিরাও শাস্ত্র আলোচনার জন্য আসতেন। সেখানে মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, অঙ্গিরা, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিরা আসতেন।

আমার গুরুদেবের কাছে যেসব মুনি ঋষিরা আসতেন, তাদের শাস্ত্র আলোচনার মাঝে আমি ফোড়ন কাটতাম। গুরুদেব আমাকে শাসন করতেন। বলতেন, সন্মানীয় ব্যক্তিদের কথার মাঝে কথা বলতে নেই। তর্ক করার একটা নিয়ম আছে। আমি তখনকার মত গুরুদেবের নিষেধ মানলেও আবার পুনরায় তর্ক শুরু করে দিতাম।

আমাকে অবাধ্য হতে দেখে গুরুদেব অভিশাপ দেন–যা তুই শুকপাখি হয়ে পরের জন্মে জন্মাবি।

এই অভিশাপ বাক্য শুনে সেখানে উপস্থিত মুনি ঋষিরা হায় হায় করে উঠলেন। এইটুকু বালক সে কীই বা দোষ করেছে। তাকে এমন অভিশাপ দেওয়া উচিত হয়নি। আপনি এই অভিশাপ ফিরিয়ে নিন।

মহর্ষি বামদেব বললেন–অভিশাপ কখনও ব্যর্থ হবে না। তবে অমি আশীর্বাদ করছি–পাখি হয়েও তুমি মানুষের মতো কথা বলতে পারবে আর এ জন্মে যা জ্ঞান অর্জন করেছো, সব তুমি মনে রাখতে পারবে। আর তুমি মথুরায় মারা গেলে মুক্তি পাবে।

তারপর থেকেই শুরু হয় আমার পাখির জীবন।

একদিন একটা ব্যাধ আমাকে ধরে খাঁচায় পুরল। তারপর থেকে এই ব্যাধের কুটিরে আছি।

গোকর্ণ বলল–আমার, মথুরায় বাড়ি। বাণিজ্য সেরে আমি বাড়িতে ফিরছি। তুমি কি আমার সঙ্গে মথুরায় যাবে?

অতিথির মুখে এই কথা শুনে শুক খুব প্রফুল্লিত হল। বলল– হায়, তেমন সৌভাগ্য কি হবে আমার? এখানকার বাবা, মা কি আমায় ছাড়বে? যদি আমাকে নিয়ে যাও, আমি তোমার ছেলে হয়ে থাকব।

এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ব্যাধের বউ। এতক্ষণ সে ভিতরে ঘুমাচ্ছিল।

তাকে দেখে শুক বলল–মাগো আজ আমাদের বাড়িতে অতিথি এসেছেন। তুমি হাত-মুখ ধোওয়ার জল দাও, আর কিছু ফলমূল খেতে দাও।

শবরী অতিথিকে সমাদরে ঝুপড়ির ভিতরে নিয়ে গেল আসনে বসতে দিল। একটা পাথরের থালায় খাবার সাজিয়ে দিল। গোকর্ণ খেতে শুরু করল, এমন সময় ব্যাধ শুকপাখি শিকার করে ঘরে ফিরল। তাকে দেখে শুক বলল–বাবা আজ আমাদের কি সৌভাগ্য, আমাদের ঘরে অতিথি এসেছে।

অতিথিকে ঘরে ঢুকে দেখল শবর। তারপর তালপাতার পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগল। খাওয়া শেষ হলে হাতে জল ঢেলে দিল হাত মুখ ধোওয়ার জন্য। অতিথি সেবা করে সে খুব খুশি হল।

তারপরে শবর অতিথিকে বললেন–আমরা মূর্খ গরীব মানুষ। আপনার ঠিকমত সেবাযত্ন করতে পারিনি। তবু বলুন, আপনার জন্য আমরা কি করতে পারি?

গোকর্ণ ব্যাধের কথা শুনে বলল–তোমাদের সেবায় আমি খুব খুশি হয়েছি। তবে আমার একটা প্রার্থনা আছে যদি অভয় দাও তো বলি।

ব্যাধ বলল–কি আপনার প্রার্থনা। গোকর্ণ বললেন–তোমাদের এই শুকপাখিটিকে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে। যদি আমাকে দাও, তাহলে খুশি হবো।

অতিথিকে না বললে মহাপাপ হবে। কিন্তু এই পাখিটি আবার তাদের কাছে অতি আদরের। তবু পাখিকে দিয়ে দিল গোকর্ণের হাতে। পাখিটিকে পেয়ে গোকর্ণ মনে করলেন তিনি যেন অমূল্য কোন ধন হাতে পেয়েছেন। তিনি মনের আনন্দে নৌকায় ফিরে এলেন। নোঙর তুলে দেওয়া হল, পালও তুলে দেওয়া হল। নৌকা চলল মথুরার দিকে। যথাসময়ে নামল মথুরার দিকে। তিনি তাড়াতাড়ি করে পৌঁছলেন নিজের ঘরে। প্রথমে বাবা ও মাকে প্রণাম করলেন, এবং শুকপাখিকে দেখিয়ে বললেন–দেখ বাবা, দেখ মা, এটা একটা শুকপাখি। এ মানুষের মত কথা বলে। এখন এই আমার ছেলে। আর আমার দুঃখ নেই।

শুক বলল–হ্যাঁ দাদু, ঠাকুমা, আমি আপনাদের নাতি।

গোকর্ণ বাণিজ্য করে অনেক সম্পদ এনেছেন। তিনি আবার দান করতে শুরু করলো। শুকপাখি বেশিরভাগ সময় থাকত দাদু-ঠাকুমার কাছে। সে বুড়ো বুড়িকে নানা শাস্ত্রকথা পুরাণ কাহিনি শোনাতে লাগল। তার কণ্ঠ মধুর ছিল। শাস্ত্রকথা শুনে তাঁদের খুব ভাল লাগল। সংসারে পুত্রের যে অভাবের জন্য একটা দুঃখ ছিল, সেই দুঃখ আস্তে আস্তে কেটে গেল। বেশ

আনন্দেই দিন কাটতে লাগল। শুক এখন খাঁচায় বন্দি থাকে না। সে স্বাধীনভাবে থাকে। যেখানে খুশি উড়ে বেড়ায়।

মথুরানগরে অনেক রত্ন ব্যবসায়ী আছে। গোকর্ণ পাকা জুহুরী, তিনি কোনও রত্ন দেখলে বলে দিতে পারতেন সেই রত্নটি আসল না নকল এবং তার দামও নির্ধারণ করে দিতেন। তাই সকল রত্ন ব্যবসায়ী নকল রত্ন কিনে ঠকে যেত। তাই তারা সবাই ঠিক করল, এবার যখন তারা রত্ন কিনতে বিদেশে যাবে, তখন তারা সঙ্গে গোকর্ণকে নেবে। তাদের প্রস্তাবে গোকর্ণ রাজী হয়ে গেলেন। তিনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চললেন নৌকায় চড়ে, সঙ্গে নিলেন তার সখের শুকপাখিটিকে। বাতাসের জোরে নৌকা চলল তাড়াতাড়ি; বহুদূর চলে গেল নৌকা। নৌকাটি গিয়ে পড়ল একেবারে লবণ সমুদ্রে, এই প্রথম নয়, ইতিপূর্বে অনেকবার লবণ সমুদ্রে তারা এসেছে।

একদিন হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠল। নৌকা ভীষণভাবে টাল খাচ্ছে, যে কোন সময় ডুবে যেতে পারে। মাঝি-মল্লারা নৌকা সামলাতে পারছে না। হাল-দাঁড় সব ছেড়ে দিয়ে কেবল বলতে লাগল, হে মধুসূদন, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

কিন্তু ঝড় আর থামে না। নাবিক ও বণিকরা ভাবল–এ যাত্রায় কেউ রক্ষা পাবে না। বণিকদের মধ্যে একজন বলল–এবারে আমাদের মধ্যে নিশ্চয় কোনও মহাপাপী আছে। তা না হলে এতোবার আমরা এখান দিয়ে গেছি এসেছি, আগে তো এমন হয়নি। তাকে এক্ষুনি সমুদ্রে ফেলে দাও।

কথাটা শোনামাত্রই গোকর্ণের বুকটা কেঁপে উঠল। তার মনে হল তাকে উদ্দেশ করে বলছে সবাই। মনে মনে গোকর্ণ নিজেকে পাপী মনে করেন। তার কারণ পাপী না হলে ছেলের মুখ দেখতে পেলেন না কেন তিনি? মহাপাপী বলেই তিনি আজ পুত্রহীন। ভাবতে ভাবতে গোকর্ণ বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। কোলের উপর বসেছিল শুক। তার গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন।

গোকর্ণের মনের কথা শুক বুঝতে পারল। বলল–তুমি কিছু চিন্তা করো না। আমি বুঝতে পারছি তোমার বিপদের কথা। তুমি শ্রীহরির শরণ নাও। আর আমি দেখছি কি করা যায়।

শুক উড়ে গেল আকাশে, দুরন্ত ঝড়ের গতির মধ্যে ছোট্ট শুক টাল খেতে লাগল। সে কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে দেখল একটা পাহাড়। আর তারই উপরে একাট বিষ্ণুমন্দির সেখানে ঝড়-ঝঞ্ঝা কিছুই নেই।

সেই মন্দিরে শুক থামল। সে চুপি চুপি করে মন্দিরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। মন্দিরে চতুর্ভুজ মূর্তি দেখে প্রণাম করল। তারপর সে দেখল সেখানে কয়েকটা মেয়ে এল। যাদের হাতে ফুলের মালা ছিল, আবার কারো হাতে ফুল, কারো হাতে ফল-মূল। তারা এসে সেগুলো শ্রীবিষ্ণুর চরণে দিলো। এবং আনন্দে নাচ গান করে চলে গেল।

তারপর শুক দেখল বিশাল বড় বড় জটায়ু পাখি সেখানে উপস্থিত হল। তাদের মধ্যে একজন ছোট শুককে দেখে জিজ্ঞাসা করল–এইটুকু পাখি তুমি কেমন করে সমুদ্রে পেরিয়ে এখানে এলে।

জটায়ুর আদর স্নেহ মাখা কথা শুনে শুকপাখির সাহস সঞ্চয় হল এবং সে সব কথা বলল–কেমন করে তার বাবা বিপদের মধ্যে পড়ে আছে।

জটায়ুর মধ্যে একজন বলল, আমি তোমার বাবাকে পিঠে করে এখানে নিয়ে আসতে পারি। তোমার বাবাকে চিনব কেমন করে? তুমিও আমার সঙ্গে চল।

তারপর জটায়ুকে নিয়ে চলল শুক সেই নৌকার দিকে। জটায়ু সেই নৌকার পাশে সমুদ্রের জলে ভাসতে লাগল। আর শুক গোকর্ণের কানে কানে বলল–বাবা, আর দেরী নয়, ওই জটায়ুর কাঁধে চড় ও তোমাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবে।

শুকের কথামতো গোকর্ণ নৌকা থেকে ঝাঁপ দিলেন এবং চড়ে বসলেন জটায়ুর পিঠে। তারপর জটায়ু উড়ল আকাশে। বেশ কিছুক্ষণ পরে তারা পৌঁছে গেল সেই পাহাড়ে, যেখানে বিষ্ণুমন্দির আছে।

এখানে ঝড়ের লেশ নেই। মন্দিরের পাশে একটা সরোবর আছে। তার জল পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। শুঁকের কথামতো গোকর্ণ সেই সরোবরে স্নান করলেন। এবং তারপরে মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর ঢুকলেন মন্দিরের ভেতরে। দেখলেন বিষ্ণুমূর্তির সামনে বসে আছে এক সুন্দরী ফুলপরী, আরও কতকগুলি ফুলপরী গান গেয়ে গেয়ে নাচছে। কি অপূর্ব সেই নাচ আর গান। দেখলে ও শুনলে প্রাণ যেন জুড়িয়ে যায়।

নাচ-গান বন্ধ হওয়ার পরে মেয়েটি ওদের মধ্যে থেকে একজনকে ডেকে বলল গোকর্ণ খুব ক্ষুধার্ত। আগে ওর জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা কর।

তারপরে সেই মেয়েটি গোকর্ণকে নানান খাবার খাওয়াল। তারপরে ফুলপরী সব সেখান থেকে চলে গেল। যাবার আগে সেই মেয়েটি গোকর্ণকে বলল–তুমি এই মন্দিরেই থাক আর নিত্য নিত্য শ্রীবিষ্ণুর পূজা কর। একদিন না একদিন তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে।

সবাই চলে গেল। সেখানে থাকল কেবল গোকর্ণ আর শুকপাখি। ফুলপরীর কথামতো গোকর্ণ নিত্য নারায়ণের পূজা করে। আর প্রতিদিন সেইসব ফুলপরীরাও আসে নৃত্য-গীত করতে, তারপরে তারা চলে যায়। তারা যে কোথা থেকে আসত তা গোকর্ণ জানতে পারে না।

এদিকে গোকর্ণ চলে আসার পর সামুদ্রিক ঝড় ধীরে ধীরে শান্ত হল। সূর্য উঠল। বণিক ও নাবিকরা স্বস্তি পেল। তারা যেন নবজীবন লাভ করল। কিন্তু গোকর্ণ কোথায়? তাকে তো দেখা যাচ্ছে না। সেকি তাহলে নৌকার ছাউনির বাইরে গিয়েছিল? জোরে নৌকা দোলার জন্য হয়তো সমুদ্রে পড়ে গেছে। সে চিৎকার করে আমাদেরকে ডাকলেও ঝড়ের দাপটে আমরা শুনতে পাইনি। আমরা বাড়ি ফিরে গিয়ে তার মা-বাবার কাছে কি করে এই খবর দেব? তারপর নাবিকরা দিক ঠিক করে চলল। তারা গিয়ে ঠেকল এক দ্বীপে। নৌকা নোঙর ফেলল। সেই দ্বীপে রাশি রাশি রত্ন, যার যত ইচ্ছা করে, সে তত থলে ভর্তি করে নিল। তারপর তারা মনের আনন্দে মথুরায় ফিরল।

গোকর্ণের বাবার কাছে গেল বণিকরা। অকপটে সব কথা স্বীকার করল তারা। গোকর্ণ কোথায় কিভাবে আছে তারা কেউ জানে না। খুব দুঃখ প্রকাশ করে তারা প্রত্যেকেই কিছু কিছু রত্ন বসুকর্ণকে দিয়ে চলে গেল।

পুত্রের খবর পেয়ে বাবা-মা কেঁদে অস্থির। সেই সঙ্গে তার পাঁচ স্ত্রীও কান্নায় ভেঙে পড়ে। এমন সময় সেখানে শুকপাখি এসে হাজির হয়। এবং সে খবর দেয়–কয়েকদিন বিষ্ণুমন্দিরে কাটাবার পর গোকর্ণ তার মা-বাবা ও পত্নীদের জন্য মন চঞ্চল হয়ে পড়ে।

গোকর্ণকে চিন্তিত দেখে শুক বলল–বাবা, এই বিশাল সমুদ্র, আর আমি একটা ছোট্ট পাখি। নয়তো আমিই তোমাকে পিঠে করে নিয়ে যেতে পারতাম। এখন আর সেই জটায়ুও আসে না। তাহলে তাদেরকে বলা যেত। তোমার জন্য দাদু ও ঠাকুরমা খুব চিন্তা করছে। আমি বরং একা গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি।

গোকর্ণের মন কিছুতেই চাইছে না। তবুও মা-বাবার কথা ভেবে রাজী হয়ে যায়। তারপর শুক উড়তে উড়তে চলে আসে মথুরায়। সব কথা খুলে বলে। পুত্র বেঁচে আছে শুনে বাড়ির

সকলেই স্বস্তি পেল। কিন্তু তাকে কোনদিন দেখতে পাবে কিনা তা নিয়ে তাদের সন্দেহ হতে থাকে। তাই তাদের মনে দুঃখ লেগেই থাকে।

বসুকর্ণ শুককে আর ছাড়ল না। নিজের কাছে রেখে দিল। তারা তার মুখ থেকে ধর্মকথা শুনতে থাকে এবং পুত্রের বিরহ কিছুটা ভোলার চেষ্টা করে।

এইভাবে তেরোটা দিন কেটে গেল। এদিকে গোকর্ণ নিত্য বিষ্ণুপূজায় রত আর সেই ফুলপরীরাও সেখানে এসে পূজা করে চলে যায়। কিন্তু গোকর্ণ লক্ষ্য করলেনসেই পরীদের দেহের সৌন্দর্য যেন হারিয়ে গেছে। তারা যেন ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে। তার নিজের শরীরও ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হচ্ছে এর পিছনে একটা কারণ আছে। আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে থাকতে মন চাইছে না। আর তাদের সাথে কোনদিন দেখা হবে সে আশাও নেই।

কিন্তু এদের অবস্থা এরকম কেন?

সেই পরীদের প্রধানা বললেন–আমরা স্বর্গলোক থেকে এখানে প্রত্যেকদিন এসে বিষ্ণুপূজা করি। আমাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে। আর এখানে আসতে পারব না। সেই দুঃখে আমাদের এই অবস্থা।

গোকর্ণ জিজ্ঞাসা করলেনকেন তোমরা আসতে পারবে না?

সেই রমণী বলল–এখানে বিষ্ণুর যারা সেবাইত, তারা খুব ভাল, এই মন্দিরের চারপাশে কি সুন্দর সুন্দর ফুলগাছ আর ফলের গাছ ছিল। যা দেখে আমরা নিত্য আসতাম। এখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আনন্দ করতাম। কিন্তু সেই সব সেবাইতদের নিষেধ সত্ত্বেও রাজার লোকেরা এসে সেইসব গাছ। কেটে ফেলেছে। যার আকর্ষণে আসতাম তা যখন নেই, তাহলে আর আসব কেন?

তাদের কথা শুনে গোকর্ণ খুব দুঃখ পেলেন, তারপর বললেন–তোমরা যদি আর না আস, তাহলে আমি একা থাকব কেমন করে?

মেয়েটি বলল–তুমি দেশে ফিরে যাও।

গোকর্ণ বললেন–কেমন করে যাব? সে যে অনেক দূর।

মেয়েটি বলল তোমার দেশের নাম কি?

গোকর্ণ বললেন–মথুরা।

শুনেই মেয়েটি চমকে উঠল। তারপর জিজ্ঞেসা করল–কেমন করে এখানে এলে?

তখন তাদের সব কথা বলল গোকর্ণ।

মেয়েটি বলল–মথুরায় যাওয়ার জন্য আমাদের খুব ইচ্ছা। গোকর্ণ, তুমি যদি যেতে চাও, আমরা সে বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। তোমার সঙ্গে আমরাও যাব। তবে আমরা স্বর্গের পরী। তাই সকলের সামনে বেরোতে পারবো না।

মেয়েটির কথাতে গোকর্ণ রাজী হলেন। অনেকদিন বাবা-মা আর পত্নীদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি, তাই তার মন আনচান হতে লাগল। তিনি সেখানে যেতে পারবেন অর্থাৎ মথুরায় সেকথা ভেবে তিনি আনন্দিত হলেন।

এমন সময় দেখতে পেলেন এক সুন্দর বিমান আকাশ থেকে নামছে। সেই রথটি মণি মাণিক্য খচিত নানা রঙের ফুল দিয়ে সাজানো। তার মধ্যে কত নামী-দামী বহু সামগ্রী।

মেয়েটি গোকর্ণকে বলল–এই যে বিচিত্র জিনিসগুলো দেখছ ওগুলো তোমাদের রাজার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। এখনি এস এই বিমানে করে মথুরায় যাই।

সেই বিমানে ফুলপরীদের সঙ্গে গোকর্ণও বসলেন। তারপর আকাশের মধ্য দিয়ে যেতে শুরু করল সেই দিব্য বিমান। সুবিশাল সমুদ্র পার হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে সেই বিমান এসে উপস্থিত হল মথুরায় রাজপ্রাসাদের সামনে।

বিমান থেকে নেমে গোকর্ণ রাজসভায় চলে গেলেন। রাজা মশায়ের খুব আনন্দ গোকর্ণকে দেখে। তার কুশল জিজ্ঞাসা করে আলিঙ্গন করলেন।

তারপর গোকর্ণ বিমান থেকে সেই উপহারগুলো রাজাকে দিলেন। সকলেই গোকর্ণের প্রসংসা করলেন। তারপর গোকর্ণ কেবলমাত্র রাজাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন সেই বিমানের কাছে। ফুলপরীরা বিমান থেকে বেরিয়ে এল। রাজার বিমানে চড়ে মথুরা দর্শন করানোর জন্য গোকর্ণকে ধন্যবাদ জানিয়ে, ধীরে ধীরে সেই বিমান অদৃশ্য হয়ে যায়।

গোকর্ণের এই কীর্তি দেখে রাজা তাঁকে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাঁর রাজ্যের একাংশ দান করেছিলেন। এবং গোকর্ণ হল মথুরার দ্বিতীয় রাজা।

তারপরে গোকর্ণ গেলেন মা-বাবার কাছে। তাঁদেরকে প্রণাম জানিয়ে সে সব বললেন। গোকর্ণকে ফিরে পেয়ে তাঁদের আর আনন্দের সীমা থাকে না। গোকর্ণকে দেখবার জন্য আত্মীয়স্বজন সবাই ছুটে এল। মথুরাতে যেন আনন্দের হাট বসে গেল।

গোকর্ণ শুককে নিয়ে আদর করতে লাগলেন, চুমু খেলেন। তারপর সে সবাইকে বললেন– আমাকে সব বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে আমার এই ছেলে শুক।

গুরুদেব বামদেবের অভিশাপের দিন এবার শেষ। আশীর্বাদ অনুসারে মথুরায় মৃত্যুতে শুঁকের হল মুক্তি।

তারপরে গোকর্ণের পাঁচ পত্নীর গর্ভে অনেক সন্তান জন্মাল। সকলেই খুব আনন্দিত হল। বসুকর্ণ আর তার স্ত্রী সুশীলার আনন্দের সীমা থাকল না।

লিঙ্গ পুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ

উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

ব্রহ্মা মহাদেবের প্রাধান্য প্রমাণের জন্য লিঙ্গ পুরাণ বর্ণনা করেন। পরবর্তীকালে ব্যাসদেবের কাছে মহামুনি লোমহর্ষণসূত জ্ঞানলাভ করে নৈমিষারণ্যে শোণকাদি মুনিদের কাছে ব্যক্ত করেন।

শিবভক্ত দধীচি মুনির প্রতাপ

তপোবনে বাস কলেন দধীচি মুনি, যিনি মহাত্মা চ্যবণ মুনির পুত্র। ক্ষুপ নামে এক মহান তেজস্বী রাজা ছিলেন অহংকারে মাটিতে যাঁর পা পড়ত না। দধীচ মুনি যিনি পূজার্চনা নিয়ে কাল কাটান এবং একজন অহংকারী রাজা যিনি রাজপ্রাসাদে বিলাস ব্যসনে থাকেন। কিন্তু দু'জনের মধ্যে খুব বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল।

একবার অসুর আর দেবতাদের মধ্যে সংগ্রাম শুরু হলে দেবতারা অসুরদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। তখন ইন্দ্র অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ক্ষুপ রাজাকে আহ্বান জানালেন আর এই যুদ্ধে দেবতাদের জয় হল। খুশি হয়ে ইন্দ্র ক্ষুপ রাজাকে একটি বজ্রান্তর পুরস্কার হিসাবে দিলেন। ইন্দ্রের নিজস্ব অস্ত্র বজ্র, সেই বজ্র থেকে আর একটি একই রকম তেজসম্পন্ন বজ্র সৃষ্টি করেন ইন্দ্র, সেটি হচ্ছে বজ্রান্তর। স্বাভাবিকভাবে এই পুরস্কারের জন্য ক্ষুপ রাজার অহঙ্কার একটু বেশি তো হবেই।

ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, না ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ–এই বিষয় নিয়ে দীচ মুনির সঙ্গে ক্ষুপ রাজার একবার বিবাদ শুরু হয়।

রাজা বলেন যে ক্ষত্রিয়রাই শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি রাজ্য শাসন করে সব প্রজাকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছেন। আবার দেবতাদের হয়ে যুদ্ধ করেছেন, একি কম কথা। গর্ব করে বলেন যে, তিনি ইন্দ্র, সূর্য এবং যম। এ জগতে তিনি ঈশ্বর। কাজেই তাকেই সবার পূজা করা উচিত।

রাজা ক্ষুপের উত্তরে দধীচ মুনি বলেন যে, এটা কখনই হতে পারে না। ব্রাহ্মণ সব সময়েই শ্রেষ্ঠ। রাজা ব্রাহ্মণদের উপদেশমতো চলবে। ব্রাহ্মণের অনুশাসন মেনে চলাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। তাদের মর্যাদা রক্ষা করাই কর্তব্য। আর তাঁদের ভরণ পোষন তো অবশ্যই করবে।

ক্ষুপ রাজা দধীচ মুনির কথা শুনে রেগে বললেন যে, তা কখনই হতে পারে না। ক্ষত্রিয় রাজা কখনই কারো কাছে মাথা নত করে না। সামান্য ব্রাহ্মণের থেকে ক্ষত্রিয় রাজারা অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে। আর সেই কারণে রাজাদের কোনো প্রয়োজন নেই ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে বুদ্ধি নেওয়ার। ব্রাহ্মণেরা যদি রাজাদের অবজ্ঞা করে তাহলে তিনি সহ্য করবেন না।

তারপর মহা বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হল। হার স্বীকার করতে কেউ রাজী নয়, অবস্থা এমন চরম সীমায় পৌঁছল যে ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে দধীচ মুনি রাজার মাথায় বামহাত দিয়ে এক ঘুসি মারলেন।

তখন আর রাজার ক্রোধ দেখে কে? ইন্দ্রের দেওয়া বজ্রের কথা মনে পড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে সেটি তিনি মুনির দিকে ছুঁড়ে মারলেন। বজ্রের প্রহারে মুনি জ্বলে পুড়ে মরতে বসলেন। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি একমনে শুক্রাচার্যের ধ্যান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে শুক্রাচার্য হাজির হলেন। ক্ষুপ রাজা ততক্ষণে সেখান থেকে চলে গেছেন।

মহাদেবের কৃপায় শুক্রাচার্য 'সঞ্জীবনী বিদ্যা' নামে এক মোক্ষম বিদ্যা পেয়েছেন। সেই বিদ্যার দ্বারা। শুধু আহত লোকই সুস্থ হয়ে ওঠে তা নয়, মরা লোকও প্রাণ ফিরে পায়। এই বিদ্যার দ্বারা শুক্রাচার্য দধীচ মুনিকে শুধু বিপদ মুক্ত করলেন না, তাকে পূর্ণ যৌবন এক দিব্য পুরুষে পরিণত করলেন।

মুনিবর কৃতজ্ঞতায় শুক্রাচার্যের চরণতলে লুটিয়ে পড়লেন। শুক্রাচার্য তাকে তুলে উপদেশ দিলেন– সে কোন অস্ত্রাঘাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এবং অমরত্বের বাসনা থাকলে মহাদেবের আরাধনা করতে। কারণ মহাদেবের কাছ থেকে শুক্রাচার্য সকল বিদ্যা লাভ করেছে। মুনিবর যদি সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করতে পারে, তাহলে ক্ষুপ রাজা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বজ্র তো অতি তুচ্ছ কথা, তার চেয়েও কোনো মারাত্মক অস্ত্র তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

এই উপদেশ দিয়ে শুক্রাচার্য অন্তর্হিত হলেন। শুক্রাচার্যের কথা মনে ধরল দধীচ মুনির। তিনি মহাদেবের আরাধনায় মনোনিবেশ করলেন। তার কঠোর সাধনায় শিব তিনটি বর দিলেন। তিনটি বর হল, অন্য কারুরই দ্বারা তার মৃত্যু হবে না, আর কারো অধীনও হবে না তিনি। আর বজ্রাস্থিত্ব অবধ্যতা এবং অধীনতা। অর্থাৎ বজ্র তাঁর কাছে স্তম্ভিত হয়ে যাবে। তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

এর ফলে দধীচ মুনির বুক অহংঙ্কারে ভরে উঠল। ক্ষুপ রাজার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দধীচ মুনি রাজার সভায় গেলেন। রাজা সিংহাসনে বসে আছেন। তিনি মুনিকে সমাদর করা তো দূরের কথা যেন দেখেও দেখলেন না। দধীচ মুনি রেগে দিবিদকি জ্ঞানশূন্য হয়ে একেবারে তার মাথায় লাথি মারলেন।

সভার মাঝে মুনির দ্বারা এভাবে অপমানিত হয়ে ক্রোধে রাজা ইন্দ্রের প্রদত্ত বজ্র মুনির বুকের উপর মারলেন। কিন্তু মহাদেবের বলে বলীয়ান মুনির সামান্যতম ক্ষতি করতে পারল না বজ্র। অবাক হয়ে গেলেন রাজা। ইন্দ্রের বজ্রও স্মৃম্ভিত! পরে জানতে পারলেন যে মুনি মহাদেবের বলে বলীয়ান। বড় অনুতাপের সঙ্গে শ্রীহরির শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু উপাসক রাজা ক্ষুপ। শুদ্ধচিত্তে শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্মধারী শ্রীহরির আরাধনা করে চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন হলেন। এরপর শ্রীবিষ্ণুর দিব্যরূপ দর্শন করে আনন্দে অভিভূত হয়ে স্তুতিবাক্যে তার স্তব করে বললেন–যে–হে বিষ্ণু, হে নারায়ণ তাঁর দধীচ নামে বিনয়ী ব্রাহ্মণ বন্ধু ছিল। কিন্তু বর্তমানে সে শিবের বলে বলীয়ান হয়ে এমন উদ্ধত হয়েছে তার অর্থাৎ আমার মাথায় পদাঘাত করেছে। তাই শ্রীহরির কাছে তার নিবেদন এই যে তিনি যেন ঐ মুনিকে যেমন করেই হোক পরাস্ত করেন।

ক্ষুপ রাজার প্রার্থনা শুনে ভগবান শ্রীহরি দধীচের অবধ্যত্ব ও শিবের অতুল বিক্রম কথা স্মরণ করে তাঁকে বললেন–যে, হে রাজন, শিবের শরণাপন্ন হলে ব্রাহ্মণদের আর কোনো ভয় থাকে না। শিবের ভক্তরা সব সময় অজেয় হয়। নীচ ব্যক্তিরাও যদি শিবের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে তারাও নির্ভয় হতে পারে। কাজেই এই প্রার্থনা পূরণ করা সম্ভব নয়। রাজা তার ভক্ত, তাই রাজাকে রক্ষা করা বা প্রার্থনা পূরণ করা তাঁর কর্তব্য কিন্তু শিবের ভয়ে তিনি আর কিছু করতে পারবেন না।

শ্রীহরির কথা শুনে ক্ষুপ রাজা দুঃখিত হয়ে বললেন–যে, প্রভু যখন এমন কথা বলছেন তখন তিনি আর কার কাছে দুঃখ জানাবেন। প্রভুর যা ইচ্ছা তাই করবেন।

রাজা ক্ষুপ এর এই বিনয় বাক্য শুনে শ্রীহরি বললেন–যে, তিনি চেষ্টা করে দেখবেন দধীচ-বিজয় করা যায় কিনা।

এই বলে শ্রীহরি অন্তর্হিত হয়ে ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে দধীচের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। মুনি শিবার্চনা শেষ করে দুয়ারের দিকে তাকিয়ে বিবরকে দেখতে পেলেন। কী প্রয়োজন জানতে চাইলেন।

বিপ্রবেশী শ্রীহরি বললেন–যে, তার কিছু নিবেদন আছে, মুনিবর যাতে দয়া করে শুনে তা পূরণ করেন।

শ্রীহরির কথা শুনে দধীচ মুনি হেসে বললেন–যে শ্রীহরির অভিপ্রায় তিনি সব জানেন। ভক্তের জন্য তিনি ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করেছেন। আর মুনিবর শিবের কৃপায় ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান

সব জানতে পারেন। তিনি এ জগতে কাউকে ভয় পান না। তাই শ্রীহরি এখন যাতে এই ব্রাহ্মণবেশ ত্যাগ করেন।

দধীচ মুনির কথা শুনে শ্রীহরি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আসল চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করলেন। সহাস্য বদনে বললেন–যে, মুনির কোনো ভয় নেই। তিনি শিবের আরাধনা করেন তাই কোন বিষয়ে অজ্ঞতাও নেই। শুধু একটি প্রার্থনা মুনিবর যাতে ক্ষুপ রাজার সভায় গিয়ে একটিবার বলেন, আমি ভয় পেয়েছি।

দধীচ মুনি নারায়ণের প্রার্থনা শুনে রাজসভায় গেলেন বটে, কিন্তু বিপরীত কথা বললেন। দেবাদিদেব শঙ্করের প্রভাবে তিনি এ জগতের কাউকে ভয় পান না।

শ্রীহরি মুনির মুখে এমন কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে দগ্ধ করবার জন্য চক্র উত্তোলন করলেন। কিন্তু শিবভক্ত দধীচ মুনির প্রভাবে সেই চক্রের তেজ ক্ষুপ রাজার সামনে বিনষ্ট হয়ে গেল। চক্র মাঝপথেই আপনা-আপনি থেমে গেল।

দধীচ মুনি চক্রের এমন অবস্থা দেখে একটু ব্যঙ্গ করে বললেন–যে, শ্রীহরি যাঁর অনুগ্রহে এই চক্র পেয়েছেন, সেই মহাদেবের ভক্তকে তিনি হত্যা করতে চান? তাতে তিনি কখনও সফল হতে পারবেন না। বরং ব্রহ্মাস্ত্র বা অন্য কোনো অস্ত্রে আঘাত করার চেষ্টা করতে পারেন।

ভগবান শ্রীহরি তার সুদর্শন চক্র নিবীর্য্য দেখে এবং দধীচ মুনির এমন বাক্য শুনে মুনিকে ক্ষতবিক্ষত করার জন্য চারিদিক থেকে বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র ছুঁড়তে লাগলেন। নারায়ণকে সাহায্য করার জন্য অন্য সব দেবতারাও বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হলেন। দধীচকে বিনাশ করার জন্য সকলেই চেষ্টা করলেন। কিন্তু মুনিবর মাহদেবকে স্মরণ করে কেবলমাত্র কুশমুষ্টি ধারণ করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন। আর সেই কুশগুলি প্রলয়াগ্নি তুল্য ত্রিশূলের রূপ ধরে দেবতাদের দগ্ধ করতে উদ্যত মাঝপথে মুনি চক্রের এমন বস্তু তিনি হত্যা করতে চেষ্টা করল হল।

বড় আশ্চর্য ব্যাপার! শ্রীহরি ও দেবতাদের নিক্ষিপ্ত সব অস্ত্রগুলি তখন দধীচের নিক্ষিপ্ত ত্রিশূলকে প্রণাম করতে লাগল। এই দেখে প্রাণভয়ে সব দেবতারা সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচল। শ্রীহরি তখন একা। তাই তিনি নিজের দেহ থেকে নিজের তুল্য লক্ষ লক্ষ যোদ্ধার সৃষ্টি করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই যোদ্ধাদের মুনিবর বিনাশ করলেন।

তখন শ্রীহরি বিরাট মূর্তি ধারণ করলেন মুনিকে বিস্মিত করার জন্য। ভগবানের শরীরের ভেতর পৃথক পৃথক দেবতা, কোটি কোটি রুদ্র ও প্রমথগণ আর অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখে দধীচ মুনি সেই বিভু নারায়ণকে জলদ্বারা অভিষিক্ত করে সবিস্ময়ে বললেন–যে, হে বিরাট পুরুষ, আপনি বিচার করে প্রতিভার দ্বারায় আপনার মায়া ত্যাগ করুন। এসব দেখিয়ে হতোদ্যম করবেন না। শিবের দয়ায় তিনিও এইসব ভেল্কি দেখাতে পারেন। এরপর তিনি শ্রীহরিকে দিব্যদৃষ্টি দান করে নিজের শরীরের মধ্যে শ্রীহরির সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দর্শন করালেন। তারপর সব দেবময় হরিকে মুনিবর বললেন–যে, হে বিষ্ণো, এই সব মায়া, দ্রব্যশক্তি বা ধ্যানশক্তিতে কি লাভ হবে? এই সব ছেড়ে যদি পারেন তবে যুদ্ধ করুন। আর তা যদি না পারেন, তাহলে তিনি শ্রীহরিকে অভিশাপ দিতে ছাড়বেন না।

হঠাৎই ব্রহ্মা এমন সময়ে সেখানে এসে তাঁদের যুদ্ধ নিবারণ করলেন। ব্রহ্মার বাক্যে তখন বিষ্ণু যুদ্ধ না করে মুনিকে প্রণাম করে সেখান থেকে চলে গেলেন।

ক্ষুপ রাজা এই সমস্ত ঘটনা নিজের চোখেই দেখলেন এবং বুঝলেন শিবভক্তের প্রতাপ। দধীচ মুনির পূজা ও বন্দনাদি করে তিনি প্রার্থনা করলেন যে, তিনি জ্ঞানত যা কিছু করেছেন বা বলেছেন তাতে অবশ্যই তার অপরাধ হয়েছে। হে সখে, হে মুনে, তিনি যেন নিজ গুণে ক্ষমা করে দেন। যে শিবের একান্ত ভক্ত, তাকে নারায়ণ কিংবা দেবতারা কি করতে পারে?

তখন ব্রহ্মর্ষি সত্তম দধীচ অনুগ্রহ করলেন বটে ক্ষুপ রাজাকে, কিন্তু অভিশাপ দিতে ছাড়লেন না–"মুনীন্দ্রগণ, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ভগবান শ্রীহরির সঙ্গে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞে হর কোপানলে বিনষ্ট হউন।" এই অভিশাপ বাক্য উচ্চারণ করে মুনিবর ক্ষুপ রাজাকে বললেন–যে, দেবতা-রাজাদের চেয়েও ব্রাহ্মণেরা পূজনীয়। ব্রাহ্মণেরাই প্রকৃত বলবান, তাঁরাই নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করতে সমর্থ।.

এই কথা বলে ব্রহ্মর্ষি দধীচ নিজের পর্ণকুটিরে ফিরে গেলেন।

নন্দীশ্বরের কাহিনি

মানবের জন্ম হয় পুরুষ ও নারীর মিলনের ফলে। সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য ইত্যাদি অতিক্রম করার পর। যার জন্ম হল, একদিন তার মৃত্যু হবেই।

মহাত্মা শিলাদ মনে মনে চিন্তা করলেন–আমি এভাবে পুত্রসৃষ্টি না করে শিবকে তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করে অযোনিজ ও মৃত্যুহীন পুত্র লাভ করব। এই চিন্তা করে শিলাদ মহাদেবের আরাধনা করে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। নিশ্চলভাবে বসে সহস্র যুগ কেটে গেল, তাঁর দেহ বল্মীক অর্থাৎ উইপোকায় ঢেকে গেল। এর ফলে তার বদলে কেবল উইমাটি দেখা যেতে লাগল। বজ্রকীট সূচীমুখ রক্তকীটেরা তার দেহের রক্ত ও মাংস খেয়ে নিঃশেষ করার ফলে তিনি মাংসহীন রক্তহীন হয়ে এমন তপস্যায় নিমগ্ন থাকলেন যে, নিজের দেহের এমন অবস্থার কথা তিনি জানতেও পারলেন না। কেবলমাত্র দেহের অস্থিগুলিই রইল।

সহস্র যুগ কেটে যাবার পর মহাদেব উমা ও তার গণের সঙ্গে সেই বিপ্র শিলাদের কাছে উপস্থিত হয়ে স্পর্শ করলেন তাকে। তারপর বললেন–তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট বিপ্র, তোমার মনোমত বর। চাও।

শিবের স্পর্শে শিলাদ আবার পূর্ব শরীর লাভ করলেন। তারপর চোখ মেলে মহেশ্বরের অপূর্ব মূর্তি দেখতে পেয়ে প্রণাম জানিয়ে বললেন–হে দেব, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে অযোনিজ ও মৃত্যুহীন পুত্র দান করুন।

মহাদেব বললেন–কেউ এ জগতে অমর নয়। একদিন না একদিন সবার মৃত্যু হবে। মৃত্যুঞ্জয় একমাত্র আমি অর্থাৎ আমার মরণ নেই। আমি তুষ্ট তোমার তপস্যায়। তাই তোমার পুত্ররূপে আমি জন্ম নেব। পুত্রলাভের জন্য এক যজ্ঞ কর তুমি। তোমার আযযানিজ পুত্ররূপে সেই যজ্ঞেই আমি উৎপন্ন হব। আমার নাম রাখবে নন্দী। তাতে আমার ও জগতের পিতা হবে তুমি।

শিব এই কথা বলে সগোষ্ঠী অন্তর্হিত হলেন। শিবকে পুত্ররূপে পাওয়ার আশায় শিলাদ যজ্ঞ করলেন। প্রলয়ের অগ্নিসদৃশ এক শিশুর উদ্ভব হল সেই যজ্ঞ থেকে। আকাশ থেকে সেই সময় মেঘেরা আনন্দে বর্ষণ শুরু করল। সিদ্ধ-সাধ্যগণ পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগল।

সেই শিশু কাল-সূর্যসম, ত্রিনয়ন, চতুর্ভুজ, জটামুকুটধারী, হীরক কুণ্ডলধারী, হীরক বর্মাবৃত। শূল টঙ্ক-গদা হাতে। সেই শিশু গর্জন করতে লাগল মেঘের মতো। ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ আর মুনীন্দ্রগণ সকলেই শিলাদের যজ্ঞাগারে উপস্থিত ছিলেন। তারাও সেই শিশুর স্তব শুরু করলেন। শিলাদত্ত এমন অদ্ভুত পুত্রলাভ করে প্রীতিভাবে প্রণাম করে তাঁর স্তব করতে লাগলেন।

তখন শিলাদ বললেন—হে দেব, আপনি আমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং আমাকে ও সারা জগতকে দুঃখ থেকে রক্ষা করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। হে সর্বজ্ঞপুত্র, যেহেতু আপনি জগতের রক্ষক তখন আমারও পিতা। যেহেতু আমি আপনার দ্বারা আনন্দ লাভ করেছি, তাই নন্দী নামে আপনি জগতে খ্যাত হবে। হে দেব, আপনাকে পুত্ররূপে জ্ঞান করে যা যা আমি বলেছি তা আমার প্রতি সদয় হয়ে ক্ষমা করুন।

তারপর শিলাদ মুনিগণের উদ্দেশ্যে বললেন—হে মুনিগন, আমি অতি ভাগ্যবান যে স্বয়ং মহেশ্বরকে আমি পুত্র রূপে লাভ করেছি। আমার জন্ম সার্থক। এই কথা বলে তিনি নন্দী' কে কোলে নিয়ে নিজের কুটিরে প্রবেশ করলেন। ধনলাভ করে নির্ধন যেমন আনন্দ পায়, তেমনি মহেশ্বরকে পুত্ররূপে পেয়ে শিলাদ আনন্দ লাভ করলেন।

নন্দী শিলাদের কুটিরে প্রবেশ করার কিছুক্ষণের মধ্যে দৈবদেহ ত্যাগ করে মানুষের রূপ ধরল এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় নন্দীর দৈব-স্মৃতিও লোপ পেল। পুত্রের এমন রূপ পরিবর্তন দেখে শিলাদ ও তার আত্মীয় স্বজনেরা কিছুক্ষণ কাঁদল।

সবই ভগবানের ইচ্ছা এই চিন্তা করে শিলাদ বৈদিক ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুত্রের জাত-কর্মাদি সম্পন্ন করালেন। নন্দী বড় হয়ে সকল রকমের শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করলেন। চারিবেদ, ধনুবেদ, গন্ধর্বশাস্ত্র, অশ্বলক্ষণ, হস্তীচরিত, নরলক্ষণ প্রভৃতি উপদেশ দিলেন শিলাদ।

নন্দীকে দেখবার জন্য শিলাদের কুটিরে মিত্রাবরুণ নামে দুজন মুনি একদিন এলেন। ভালোভাবে সেই বালককে নিরীক্ষণ করার পর তারা শিলাদকে বললেন—হে বিপ্র, এই পুত্রকে আমরা অল্পায়ু বলে মনে করছি। সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হলেও এই পুত্র এক বছরের বেশি বাঁচবে না।

শিলাদ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মিত্র ও বরুণের কথা শুনে। একি? যজ্ঞে মৃত্যুহীন পুত্র লাভের কথা স্বয়ং মহাদেব বলেছেন। দুই মহর্ষি এখন কি বলছেন? তারপর পুত্রকে আলিঙ্গন করে শিলাদ আক্ষেপ করে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

তার আত্মীয়স্বজনেরাও শিলাদের অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগল। উমাপতি শঙ্করের স্তব করলেন। অযুত সংখ্যায় দূর্বা মধুসিক্ত করে হোম করলেন। পৌত্রের মৃত্যু আশঙ্কায় শিলাদের পিতাও মূর্ছা গেলেন। এই দেখে নন্দী তাদের এবং নিজে মৃত্যু ভয়ে সেই মৃতবৎ পিতাও পিতামহকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতে লাগল। আপন হৃদয়ে দশভূজ পঞ্চানন শিবের ধ্যান করতে লাগল।

নন্দীর প্রতি তুষ্ট হয়ে মহাদেব বললেন–তোমার মৃত্যুভয় কেন হে বৎস নন্দিন? তোমার পার্থক্য নেই। বিপ্রদ্বয়কে আমিই পাঠিয়েছি। আমার অতি প্রিয় গণপতি হবে তুমি। আমার মত বীর্য্যবান ও পরাক্রমী হবে। আমার পাশে সবসময় তুমি থাকবে।

এই কথা বলে মহেশ্বর তার পদ্মমালাটি নন্দীর গলায় পরিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে নন্দীর তিনটি চোখ এবং দশটি হাতের সৃষ্টি হল।

বৃষধ্বজ শিব তার জটা থেকে জল গ্রহণ করে এই জল নদীরূপে প্রবাহিত হোক বলে পরিত্যাগ করলে সেই জল নদীরূপ ধারণ করল। মহেশ্বর তার নাম রাখলেন ‘জটোদশ।

মহাদেব নন্দীকে ‘তোমার এই পুত্র’ বলে উমার সামনে আনলে, দেবী পার্বতী নন্দীর মস্তক চুম্বন করে তাঁর গাত্র স্পর্শ করলেন। তখন দেবীর পুত্রস্নেহের কারণবশতঃ স্তনদ্বয় হতে ত্রিস্রোতাকারে শ্বেতবর্ণ দুগ্ধে নন্দীকে অভিষিক্ত করলেন। দেবীর সেই স্তনদুগ্ধের স্রোতত্রয়কে মহাদেব ত্রিস্রোতঃ নামে অভিহিত করলেন। নন্দীকে দেখে শিবের বৃষ আনন্দে উচ্চঃস্বরে শব্দ করলে বৃষনাদ সম্ভূতারূপে আর এক নদীর উৎপন্ন হল। শিব তার নাম রাখলেন বৃষধ্বনি। স্বর্ণোদিকা ও জাম্বু নামে দুটি নদীর সৃষ্টি হল। এই পঞ্চনদীর জল নিয়ে মহেশ্বরের পূজা যে করবে, সে শিবের সাযুজ্য ও মুক্তি লাভ করবে।

উমার অনুমতি নিয়ে নন্দীকে গণেশ্বর পদে অভিষিক্ত করার জন্য মহেশ্বর সকল গণপতিকে স্মরণ করলেন। মহেশ্বর নন্দীশ্বরকে গণ-সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করবার কথা সকলকে জানালে, আনন্দে সেইসব গণপতিগণ সকল কিছু সংগ্রহ করলেন। সুন্দর একটি মণ্ডপ নির্মাণ করে কলস, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা, পাদপীঠ প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করা হল। বিভিন্ন তীর্থের জল, শঙ্খ,

ব্যজন দেবভোগ্য, বস্ত্রযুগল, হার, ছত্র, কেয়ুর, কুণ্ডল প্রভৃতি আনা হল। দেবতা, ঋষি, ব্রহ্মা ও তার মানসপুত্রেরা সমবেত হলেন সেখানে।

পিতামহ ব্রহ্মা মহেশ্বরের আজ্ঞায় নন্দীশ্বরকে পঞ্চনদীর জলে স্নান করিয়ে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। তারপর বিষ্ণু, ইন্দ্র এবং লোকপালকগণও নিয়মানুসারে নন্দীশ্বরের অভিষেক কার্য সম্পন্ন করলেন।

এইভাবে শিবের সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হলেন শিলাদের পুত্র নন্দীশ্বর। মরুতের কন্যা দেবী সুযশাকে পিতামহের অনুমতিক্রমে বিবাহ করলেন। যৌতুক হিসাবে লাভ করলেন–উত্তম সিংহাসন, সুবিমলছত্র, চামরধারিনী বহু পরিচারিকা প্রভৃতি। দেবী মহালক্ষ্মী মুকুটাদি সুমনোহর ভূষণে ভূষিত করলেন।

শিবের অনুগ্রহে আজ পর্যন্ত কোথাও এই নন্দীর সদৃশ বিভু উৎপন্ন হয়নি। তারপর পার্বতী ও নন্দীকে নিয়ে মহাদেব বৃষের পৃষ্ঠে চড়ে কৈলাসে উপনীত হলেন।

শরভরূপে শিবকর্তৃক নৃসিংহদেবের তেজ হরণ

বিষ্ণুবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর ছোট ছেলে প্রহ্লাদ, শ্রীহরির একান্ত ভক্ত। বিষ্ণুবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুকে নিধন কারার জন্য শ্রীহরি ভক্তের ডাকে স্ফটিক স্তম্ভের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হলেন নৃসিংহ রূপে। উপরের দিকে মানুষের মত বলে এঁর নাম-নরসিংহ। ভয়ঙ্কর তার মূর্তি, ভীষণ তার গর্জন। আর হাতের নখগুলো করাতের মত ধারালো।

ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হিরণ্যকশিপু দিনে কিংবা রাতে, ঘরে কিংবা বাইরে, জলে-স্থলে-আকাশে, ব্রহ্মার সৃষ্টি কোনো প্রাণীর দ্বারা, এমনকি কোনো অস্ত্রশস্ত্রে মরবে না। তাহলে তার মৃত্যু হবে কিসে? হিরণ্যকশিপু ভাবল যে সে তাহলে অমর।

জগতে কেউ অমর নয়, সকলেরই মৃত্যু আছে। তাই ব্রহ্মার বরকে রক্ষা করবার জন্য ঠিক সন্ধ্যার সময়, দরজার গোড়ায়, নৃসিংহ দেব তার উরুর উপরে হিরণ্য কশিপুকে রেখে কোন অস্ত্রছাড়া নখের আঁচড়ে তার বুক চিরে বিনাশ করলেন তাকে। প্রচুর রক্তের স্রোত দেখে নৃসিংহদেব মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। শ্রীহরি তার আসল পরিচয় ভুলে নিজের দশটি নখের দ্বারা সামনে যত দানবকে দেখতে পেলেন সবাইকে বিনাশ করলেন। রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে প্রচণ্ড গর্জনে দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগলেন। যেন ত্রিভুবন ধ্বংস করে ফেলবেন।

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ দূরে দাঁড়িয়ে তার বহু স্তব স্তুতি করলেন। সেই স্তুতির মধ্যে তাঁকে জানানো হল যে তিনি সামান্য সিংহ মাত্র নন, দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করার জন্য দেবতাদের অনুরোধে তিনি এমন বীভৎস রূপ ধারণ করেছেন। কাজ সমাপ্ত। এখন তিনি নিজেকে সংবরণ করুন। এই উন্মাদনায় সৃষ্টি লোপ পেতে বসেছে। এই ধ্বংসলীলা থেকে নিজেকে বিরত করুন। নরসিংহদেব ভীষণভাবে তর্জন গর্জন করায় দেবতাদের স্তুতিবাক্য তার কানে প্রবেশ করল না। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্রহ্মা অন্য দেবতাদের নিয়ে কৈলাসে গিয়ে শিবের কাছে বহু স্তব-স্তুতি করলেন। শিবকে বললেন–যে নরসিংহদেবের কবল থেকে ত্রিভুবনকে রক্ষা করুন এবং সকলের হিতের জন্য নৃসিংহের তেজ বিনাশ করুন।

ব্রহ্মার বিনীত নিবেদন শুনে শিব অভয় দিয়ে বললেন–যে, কোনো ভয় নেই, সবাইকে রক্ষা করার জন্য তিনি নৃসিংহদেবের তেজ হরণ করবেন।

ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবগণ শিবের আশ্বাস পেয়ে সেই নৃসিংহদেবের কাছে ফিরে গেলেন। এরপর সকল গণের অধিনায়ক বীরভদ্রকে মহাদেব স্মরণ করতেই সে উপস্থিত হল। বিকট তার মূর্তি, যেন সাক্ষাৎ যম, দক্ষের বিশাল যজ্ঞ লন্ডভন্ড হয়েছিল বীরভদ্রের দাপটে। শিবকে প্রণাম করে সে জানতে চাইল কিসের জন্য তাকে স্মরণ করা হয়েছে?

মহাদেব বললেন–শ্রীহরি নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করে হিরণ্যকশিপুকে বধ করে নিজের অস্তিত্ব ভুলে রক্তপিপাসু সিংহের মত বিচরণ করে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছেন। তাকে যেমন করে তোক সংযত করতে হবে।

গর্বভরে বীরভদ্র বলল, সে কি তার মুণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে আসবে, যেমন এনেছিল প্রজাপতি দক্ষের।

মহেশ্বর তার কথায় বাধা দিয়ে বললেন–না, তাকে আগে ভালোভাবে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করতে হবে। তাতে যদি কোন ফল না হয়, তখন তার মুণ্ডটাই ছিঁড়ে আনবে।

যেখানে নৃসিংহদেব দাপাদাপি করছেন সেখানে যাবার আদেশ পাওয়া মাত্রই ছুটল বীরভদ্র। ভীষণাকৃতি বীরভদ্রকে দেখে রক্তমাখা দেহেই নৃসিংহদেব একটু থমকে দাঁড়ালেন। তখন বীরভদ্র তাকে প্রণাম করে বলল–আপনি কি করছেন? আপনি কি ভুলে গেছেন যে আপনি জগতের পিতা? মৎস্য, কূর্ম, বরাহদি রূপে জগতকে বারে বারে আপনি রক্ষা করেছেন। নৃসিংহ রূপের কাজ শেষ হয়েছে, এবার লীলা সম্বরণ করুন। এই ভীষণ রূপ ত্যাগ করে ত্রিভুবনের সকলকে নির্ভয় করুন।

বীরভদ্রের কথা শুনে নৃসিংহদেব ভীষণভাবে গর্জন করে বললেন–সাবধান বীরভদ্র, আমাকে উপদেশ দিও না। তুমি জান না আমার স্বরূপ। আমার কাছে নতি স্বীকার করে সেই পালেন ভোলা প্রভুর কাছে তুমি ফিরে যাও। আমি বিষ্ণু, ব্রহ্মা আমার পুত্র, আর শিব ব্রহ্মার পুত্র। সৃজন, পালন, সংহার সবকিছুই আমি করি। আমারই অংশে এই সকল দেবগণ। এখন আমার ইচ্ছা হচ্ছে সবকিছু সংহার করবার। তুমি বলার কে?

শ্রীহরির কথা শুনে ভীষণভাবে গর্জন করে বীরভদ্র বলল–তুমি মহেশ্বরকে পৌত্ররূপে জ্ঞান করছো হে বলবান সিংহ। কিন্তু তাহলেও তুমি স্রষ্টা কিংবা সংহর্তা ও স্বাধীন কিছুই হতে পারছ না। তোমার কপালে এখনও বর্তমান তোমার কূর্মরূপের চিহ্ন। যখন তুমি বরাহরূপ ধারণ করে হিরণ্যাক্ষকে বধ করতে গিয়েছিলে, তখন সেই দৈত্য শিববরে বলীয়ান হয়ে তোমার

একটা দাঁত তুলে নিয়েছিল, তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি। দক্ষের শিবহীন যজ্ঞে তুমি আমার হাতে যে সাজা পেয়েছিলে তা নিশ্চয়ই মনে আছে। ব্রহ্মাকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিচ্ছ, সেই ব্রহ্মা শিব নিন্দা করেছিল বলে ভগবান শঙ্কর তার পঞ্চম মাথাটি ছিঁড়ে ফেলেছিল। আশা করি তা মনে আছে। তোমার কি মনে আছে যে তুমি শিবভক্ত দধীচ মুনির কাছে যুদ্ধে হেরেছিলেন জগতে তুমি চক্রধারী নামে পরিচিত যে সুদর্শন চক্র ধারণ করে, সেটি কে দিয়েছিলেন, মনে হয় তা ভুলেই গেছ। আজ কি তোমার মনে নেই যে তুমি বিষসেন রূপে রুদ্রের শূলাগ্রে দগ্ধ হয়েছিলে। জগতের পালনের দায়িত্ব তোমায় দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখন তুমি সৃষ্টি আর সংহারের কর্তা হতে চাইছ। এমন পাগলের মতো কথা বোলো না।

এই কথাগুলি বীরভদ্র ব্যঙ্গের হাসি হাসতে হাসতে বলেই আবার ভয়ঙ্কর শব্দে হুঙ্কার করে বলল– এখুনিই এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা সম্বরণ করো হে বিষ্ণো, তা যদি না কর, তবে শিবশক্তির প্রভাব এখনই দেখতে পাবে।

নৃসিংহরূপী বিষ্ণু বীরভদ্রের এমন ক্রুদ্ধমূর্তি দেখে আরো রেগে গিয়ে মহা হুঙ্কার করে বীরভদ্রকে যেই আক্রমণ করতে গেলেন, তখনই আকাশ থেকে হঠাৎ এক বিশালাকার শরভ নেমে এল। সেই শরভের হাজার হাত, মস্তকে জটা, তাতে অর্ধচন্দ্র, দেহের অর্ধেক দেহ হরিণের মত, পক্ষ দুটি বিশাল, চক্ষু আর দাঁতগুলি অতি ধারালো, তিনটি চোখ থেকে আগুনের হল্কা বেরোচ্ছে। সে ভীষণভাবে গর্জন করছে। নৃসিংহরূপী বিষ্ণু সেই শরভমূর্তি দেখে এবং ভয়ঙ্কর গর্জন শুনে, দুর্বল ও অবাক হয়ে পড়লেন। সেই শরভের তেজের কাছে নিজেকে জোনাকির মতন মনে হল। হঠাৎ সেই শরভ নৃসিংহকে পায়ের ফাঁকে বেঁধে ডানার ঝাঁপটা মেরে ভীষণ ঝড়ের সৃষ্টি করে শূন্যপথে উঠে আবার মাটিতে নেমে এল। আবার শূন্যে উড়ে গেল। শূন্য থেকে শুরভরূপী শিবের বিক্রম দেখে ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা স্বস্তি বোধ করলেন। ত্রিভুবন নাশের ভয় নিবারিত হল।

শরভের বিক্রমের কাছে নৃসিংহদেবকে হার মানতে হল। শরভরূপী মহাদেবের শরণাপন্ন হয়ে তিনি বহু স্তব স্তুতি করলেন।

তারপর বললেন–হে পরমেশ্বর, আমার অহঙ্কারজনিত মোহ যখন উপস্থিত হবে, আপনি তখন নিবারণ করতে ক্ষান্ত হবেন না।

শরভরূপে শিবকর্তৃক নৃসিংহদেবের তেজ হরণ

বিষ্ণুবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর ছোট ছেলে প্রহ্লাদ, শ্রীহরির একান্ত ভক্ত। বিষ্ণুবিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুকে নিধন কারার জন্য শ্রীহরি ভক্তের ডাকে স্ফটিক স্তম্ভের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত হলেন নৃসিংহ রূপে। উপরের দিকে মানুষের মত বলে এঁর নাম-নরসিংহ। ভয়ঙ্কর তার মূর্তি, ভীষণ তার গর্জন। আর হাতের নখগুলো করাতের মত ধারালো।

ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হিরণ্যকশিপু দিনে কিংবা রাতে, ঘরে কিংবা বাইরে, জলে-স্থলে-আকাশে, ব্রহ্মার সৃষ্টি কোনো প্রাণীর দ্বারা, এমনকি কোনো অস্ত্রশস্ত্রে মরবে না। তাহলে তার মৃত্যু হবে কিসে? হিরণ্যকশিপু ভাবল যে সে তাহলে অমর।

জগতে কেউ অমর নয়, সকলেরই মৃত্যু আছে। তাই ব্রহ্মার বরকে রক্ষা করবার জন্য ঠিক সন্ধ্যার সময়, দরজার গোড়ায়, নৃসিংহ দেব তার উরুর উপরে হিরণ্য কশিপুকে রেখে কোন অস্ত্রছাড়া নখের আঁচড়ে তার বুক চিরে বিনাশ করলেন তাকে। প্রচুর রক্তের স্রোত দেখে নৃসিংহদেব মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। শ্রীহরি তার আসল পরিচয় ভুলে নিজের দশটি নখের দ্বারা সামনে যত দানবকে দেখতে পেলেন সবাইকে বিনাশ করলেন। রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে প্রচণ্ড গর্জনে দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগলেন। যেন ত্রিভুবন ধ্বংস করে ফেলবেন।

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ দূরে দাঁড়িয়ে তার বহু স্তব স্তুতি করলেন। সেই স্তুতির মধ্যে তাঁকে জানানো হল যে তিনি সামান্য সিংহ মাত্র নন, দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করার জন্য দেবতাদের অনুরোধে তিনি এমন বীভৎস রূপ ধারণ করেছেন। কাজ সমাপ্ত। এখন তিনি নিজেকে সংবরণ করুন। এই উন্মাদনায় সৃষ্টি লোপ পেতে বসেছে। এই ধ্বংসলীলা থেকে নিজেকে বিরত করুন। নরসিংহদেব ভীষণভাবে তর্জন গর্জন করায় দেবতাদের স্তুতিবাক্য তার কানে প্রবেশ করল না। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্রহ্মা অন্য দেবতাদের নিয়ে কৈলাসে গিয়ে শিবের কাছে বহু স্তব-স্তুতি করলেন। শিবকে বললেন–যে নরসিংহদেবের কবল থেকে ত্রিভুবনকে রক্ষা করুন এবং সকলের হিতের জন্য নৃসিংহের তেজ বিনাশ করুন।

ব্রহ্মার বিনীত নিবেদন শুনে শিব অভয় দিয়ে বললেন–যে, কোনো ভয় নেই, সবাইকে রক্ষা করার জন্য তিনি নৃসিংহদেবের তেজ হরণ করবেন।

ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবগণ শিবের আশ্বাস পেয়ে সেই নৃসিংহদেবের কাছে ফিরে গেলেন। এরপর সকল গণের অধিনায়ক বীরভদ্রকে মহাদেব স্মরণ করতেই সে উপস্থিত হল। বিকট

তার মূর্তি, যেন সাক্ষাৎ যম, দক্ষের বিশাল যজ্ঞ লন্ডভন্ড হয়েছিল বীরভদ্রের দাপটে। শিবকে প্রণাম করে সে জানতে চাইল কিসের জন্য তাকে স্মরণ করা হয়েছে?

মহাদেব বললেন–শ্রীহরি নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করে হিরণ্যকশিপুকে বধ করে নিজের অস্তিত্ব ভুলে রক্তপিপাসু সিংহের মত বিচরণ করে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছেন। তাকে যেমন করে তোক সংযত করতে হবে।

গর্বভরে বীরভদ্র বলল, সে কি তার মুণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে আসবে, যেমন এনেছিল প্রজাপতি দক্ষের।

মহেশ্বর তার কথায় বাধা দিয়ে বললেন–না, তাকে আগে ভালোভাবে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করতে হবে। তাতে যদি কোন ফল না হয়, তখন তার মুণ্ডটাই ছিঁড়ে আনবে।

যেখানে নৃসিংহদেব দাপাদাপি করছেন সেখানে যাবার আদেশ পাওয়া মাত্রই ছুটল বীরভদ্র। ভীষণাকৃতি বীরভদ্রকে দেখে রক্তমাখা দেহেই নৃসিংহদেব একটু থমকে দাঁড়ালেন। তখন বীরভদ্র তাকে প্রণাম করে বলল–আপনি কি করছেন? আপনি কি ভুলে গেছেন যে আপনি জগতের পিতা? মৎস্য, কূর্ম, বরাহদি রূপে জগতকে বারে বারে আপনি রক্ষা করেছেন। নৃসিংহ রূপের কাজ শেষ হয়েছে, এবার লীলা সম্বরণ করুন। এই ভীষণ রূপ ত্যাগ করে ত্রিভুবনের সকলকে নির্ভয় করুন।

বীরভদ্রের কথা শুনে নৃসিংহদেব ভীষণভাবে গর্জন করে বললেন–সাবধান বীরভদ্র, আমাকে উপদেশ দিও না। তুমি জান না আমার স্বরূপ। আমার কাছে নতি স্বীকার করে সেই পালেন ভোলা প্রভুর কাছে তুমি ফিরে যাও। আমি বিষ্ণু, ব্রহ্মা আমার পুত্র, আর শিব ব্রহ্মার পুত্র। সৃজন, পালন, সংহার সবকিছুই আমি করি। আমারই অংশে এই সকল দেবগণ। এখন আমার ইচ্ছা হচ্ছে সবকিছু সংহার করবার। তুমি বলার কে?

শ্রীহরির কথা শুনে ভীষণভাবে গর্জন করে বীরভদ্র বলল–তুমি মহেশ্বরকে পৌত্ররূপে জ্ঞান করছো হে বলবান সিংহ। কিন্তু তাহলেও তুমি স্রষ্টা কিংবা সংহর্তা ও স্বাধীন কিছুই হতে পারছ না। তোমার কপালে এখনও বর্তমান তোমার কূর্মরূপের চিহ্ন। যখন তুমি বরাহরূপ ধারণ করে হিরণ্যাক্ষকে বধ করতে গিয়েছিলে, তখন সেই দৈত্য শিববরে বলীয়ান হয়ে তোমার একটা দাঁত তুলে নিয়েছিল, তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি। দক্ষের শিবহীন যজ্ঞে তুমি আমার হাতে যে সাজা পেয়েছিলে তা নিশ্চয়ই মনে আছে। ব্রহ্মাকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিচ্ছ,

সেই ব্রহ্মা শিব নিন্দা করেছিল বলে ভগবান শঙ্কর তার পঞ্চম মাথাটি ছিঁড়ে ফেলেছিল। আশা করি তা মনে আছে। তোমার কি মনে আছে যে তুমি শিবভক্ত দধীচ মুনির কাছে যুদ্ধে হেরেছিলেন জগতে তুমি চক্রধারী নামে পরিচিত যে সুদর্শন চক্র ধারণ করে, সেটি কে দিয়েছিলেন, মনে হয় তা ভুলেই গেছ। আজ কি তোমার মনে নেই যে তুমি বিষসেন রূপে রুদ্রের শূলাগ্রে দগ্ধ হয়েছিলে। জগতের পালনের দায়িত্ব তোমায় দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখন তুমি সৃষ্টি আর সংহারের কর্তা হতে চাইছ। এমন পাগলের মতো কথা বোলো না।

এই কথাগুলি বীরভদ্র ব্যঙ্গের হাসি হাসতে হাসতে বলেই আবার ভয়ঙ্কর শব্দে হুঙ্কার করে বলল– এখুনিই এই ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা সম্বরণ করো হে বিষ্ণো, তা যদি না কর, তবে শিবশক্তির প্রভাব এখনই দেখতে পাবে।

নৃসিংহরূপী বিষ্ণু বীরভদ্রের এমন ক্রুদ্ধমূর্তি দেখে আরো রেগে গিয়ে মহা হুঙ্কার করে বীরভদ্রকে যেই আক্রমণ করতে গেলেন, তখনই আকাশ থেকে হঠাৎ এক বিশালাকার শরভ নেমে এল। সেই শরভের হাজার হাত, মস্তকে জটা, তাতে অর্ধচন্দ্র, দেহের অর্ধেক দেহ হরিণের মত, পক্ষ দুটি বিশাল, চক্ষু আর দাঁতগুলি অতি ধারালো, তিনটি চোখ থেকে আগুনের হল্কা বেরোচ্ছে। সে ভীষণভাবে গর্জন করছে। নৃসিংহরূপী বিষ্ণু সেই শরভমূর্তি দেখে এবং ভয়ঙ্কর গর্জন শুনে, দুর্বল ও অবাক হয়ে পড়লেন। সেই শরভের তেজের কাছে নিজেকে জোনাকির মতন মনে হল। হঠাৎ সেই শরভ নৃসিংহকে পায়ের ফাঁকে বেঁধে ডানার ঝাঁপটা মেরে ভীষণ ঝড়ের সৃষ্টি করে শূন্যপথে উঠে আবার মাটিতে নেমে এল। আবার শূন্যে উড়ে গেল। শূন্য থেকে শুরভরূপী শিবের বিক্রম দেখে ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা স্বস্তি বোধ করলেন। ত্রিভুবন নাশের ভয় নিবারিত হল।

শরভের বিক্রমের কাছে নৃসিংহদেবকে হার মানতে হল। শরভরূপী মহাদেবের শরণাপন্ন হয়ে তিনি বহু স্তব স্তুতি করলেন।

তারপর বললেন–হে পরমেশ্বর, আমার অহঙ্কারজনিত মোহ যখন উপস্থিত হবে, আপনি তখন নিবারণ করতে ক্ষান্ত হবেন না।

এই প্রার্থনা করে নরসিংহ শান্তভাব ধারণ করলেন। এরপর বীরভদ্র নরসিংহের মুণ্ড ছেদন করে, তাঁর গায়ের ছাল ছাড়িয়ে মহাদেবকে উপহার দিলেন। মহাদেব বসনরূপে সেই ছালটিকে ব্যবহার করলেন। তারপর সব দেবতারা মহেশ্বরের অনেক স্তব স্তুতি করলেন। তখন শরভরূপী মহেশ্বর বললেন–এই নরসিংহরূপী বিষ্ণু আমার মধ্যে লীন হয়েছেন। উভয়েই

আমরা অভিন্ন। জগতের সংহার করতে এই মহাবলদর্পকারী নৃসিংহই প্রবৃত্ত আছেন। আমাতে ভক্তিমান হয়ে যাঁরা সিদ্ধি কামনা করেন, এই মহাবলদর্পকারী নৃসিংহকেই পূজা ও নমস্কার করুন। এই উপদেশ দিয়ে ভগবান মহেশ্বর অন্তর্হিত হলেন।

এই প্রার্থনা করে নরসিংহ শান্তভাব ধারণ করলেন। এরপর বীরভদ্র নরসিংহের মুণ্ড ছেদন করে, তাঁর গায়ের ছাল ছাড়িয়ে মহাদেবকে উপহার দিলেন। মহাদেব বসনরূপে সেই ছালটিকে ব্যবহার করলেন। তারপর সব দেবতারা মহেশ্বরের অনেক স্তব স্তুতি করলেন। তখন শরভরূপী মহেশ্বর বললেন–এই নরসিংহরূপী বিষ্ণু আমার মধ্যে লীন হয়েছেন। উভয়েই আমরা অভিন্ন। জগতের সংহার করতে এই মহাবলদর্পকারী নৃসিংহই প্রবৃত্ত আছেন। আমাতে ভক্তিমান হয়ে যাঁরা সিদ্ধি কামনা করেন, এই মহাবলদর্পকারী নৃসিংহকেই পূজা ও নমস্কার করুন। এই উপদেশ দিয়ে ভগবান মহেশ্বর অন্তর্হিত হলেন।

শিব কর্তৃক বিষ্ণুকে সুদর্শন চক্র দান

প্রজাপতি কশ্যপের প্রথমা পত্নী অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন দেবতাগণ এবং দ্বিতীয়া পত্নী দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন অসুরগণ। দেবতা অসুরগণ বৈমাত্রেয় ভাই। ফলে তাঁদের মধ্যে কখনও সদ্ভাব ছিল না, বরাবর যুদ্ধ লেগেই থাকত। বর্তমান জগতেও ধার্মিক এবং অধার্মিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে আছে।

একবার অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবতারা বাণ, শক্তি, মুষল ও কুন্তাদি অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে এবং দারুণভাবে পরাজিত হয়ে ভয়ে রণস্থল থেকে পালিয়ে বাঁচলেন।

পরাজিত দেবতারা তখন তাঁদের রক্ষাকর্তা হিসাবে শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন।

দেবগণকে বিষণ্ণ দেখে বললেন–হে দেবগণ, এমন দশা তোমাদের করল কে? এমন বিক্রমশূন্য অবস্থা কেন? সত কথা নেই খুলে বল। আমি তোমাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করব।

এই আশ্বাসবাণী শুনে দেবতারা তাকে প্রণাম জানিয়ে সবকথা খুলে বললেন। হে ভগবান, আপনি আমার আমাদের গতি, এ জগতের কর্তা। আপনি শরণাগতবৎসল। আমরা দানবদের দ্বারা পরাজিত হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। দানবদের বিনাশ করে আমাদের আপনি রক্ষা করুন। দৈত্যরা অজেয় হওয়ার বর লাভ করেছে। বৈষ্ণবাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, মাম্যাস্ত্র, বারণ, পার্জন্য, ঐশান, প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করেও আমরা তাদের মারতে পারলাম না।

হে দেবেশ, আপনার সূর্যমণ্ডলে উৎপন্ন যে চক্র দীচ মুনিকে নিক্ষেপ করেছিলেন, সেটি সেই মুনি কুক্ষিগত করে রেখেছে। দণ্ড, ধনু, প্রভৃতি আপনার অস্ত্রগুলিও দৈত্যগণ লাভ করেছে। তাহলে এখন ঐ দুষ্ট দৈত্যরা বিনষ্ট হবে কিভাবে? দেবাদিবের মহেশ্বর জল-রাসুরকে বিনাশ করবার জন্য সুতীক্ষ্ণ এক সুদর্শন চক্র সৃষ্টি করেন। আপনি যদি সেই চক্রটি লাভ করতে পারেন তবে এর দ্বারা দৈত্যের বিনাশ করতে পারবেন।

ব্রহ্মাদি দেবতাদের এই কথা শুনে শ্রীহরি তখন বললেন– হে দেবগণ, আর কালবিলম্ব না করে এস আমরা মহেশ্বরের কাছে গিয়ে এই অভিলাষ পূর্ণ করব। সেই সুতীক্ষ্ণ সুদর্শন চক্র লাভ করে অসুরগণকে সবান্ধবে নিধন করে তোমাদের পরিত্রান করব।

এই কথা বলে শ্রীহরি বিশ্বকর্মার দ্বারা মেরু পর্বতের তুল্য শিবলিঙ্গ স্থাপন করে ত্বরিতাখ্য রুদ্রমন্ত্রে আর রূদ্রমুক্ত দ্বারা স্নান করিয়ে যথা বিধিমত পূজা করলেন। তারপর শঙ্করের সহস্র নাম পাঠ করে প্রণাম জানালেন।

মহাদেবের সহস্র নাম স্তব করে বিষ্ণু শিবলিঙ্গকে স্নান করালেন। এরপর একশো আটটি পদ্মফুল নিয়ে, একটি একটি করে পদ্ম নিয়ে রুদ্রায় নমঃ বলে শিবলিঙ্গের উপর দিচ্ছেন। তখন মহেশ্বর বিষ্ণুকে পরীক্ষা করার জন্য পদ্মগুলি থেকে একটি ফুল হরণ করে নিলেন।

একটি পদ্মের অভাবে শিবপূজা সম্পূর্ণ না হওয়ার জন্য চিন্তায় পড়লেন শ্রীহরি। শিবই আমাকে ছলনা করেছে এই কথা ভেবে তিনি নিজের একটি নেত্রকমল উৎপাদন করে মহেশ্বরের পূজা করলেন।

এই দেখে মহেশ্বর আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি সেখানে আবির্ভূত হলেন। কোটি সূর্য যেন একত্রে মিলেছে, এই রকম শিবের দেহ থেকে জ্যোতি বের হল।

দিব্যাকার ভস্মমাখা মহেশ্বরকে দেখে শ্রীহরি আনন্দে উন্মত্তের মত হয়ে নমস্কার করলেন।

শিবের ঊর্ধ্ব দেহভাগে দ্বীপিচর্ম উত্তরীয় আকারে, দন্তরাশি তীক্ষ্ম–ত্রিলোচনের এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সেখানে থেকে পালিয়ে গেলেন। সেই মূর্তির চারিদিকে তেজের দ্বারা সাতযোজন পর্যন্ত দগ্ধ করে ফেলল। তখনও শ্রীহরি জোড়হাতে মহেশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

এই অবস্থা দেখে ঈষৎ হেসে মহাদেব বললেন–হে জনার্দন, দেবকার্য্য সাধন করার জন্য আমি আপনাকে এই সুদর্শন চক্র দান করলাম। আপনি গহণ করুন।

এই কথা বলে মহেশ্বর শত সূর্যতুল্য সুদর্শন চক্র আর তার পদ্মের সদৃশ নয়নও দান করলেন। সেই থেকে নারায়ণ কমলনয়ন নামে অভিহিত হন।

গায়ক বিষ্ণুভক্ত কৌশিকের কাহিনি

ত্রেতাযুগে পৃথিবীতে কৌশিক নামে পরম বিষ্ণুভক্ত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি একটি বিষ্ণুমন্দিরে সব সময়ই তাঁর নাম-গান করতেন। কৌশিকের সংসার বা আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না। তার কোনো চিন্তা ছিল না।

সেই বিষ্ণুমন্দিরের কাছে পদ্মাখ্য নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি ছিলেন ধনবান, কিন্তু কৃপণ ছিলেন না। একদিন তিনি কৌশিকের সুমধুর গান শুনে মোহিত হয়ে খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। তিনি জানতে পারলেন যে কৌশিকের কেউ নেই। তিনি ভিক্ষা করেন না। তাঁর গান শুনে যে যা দেয় তাতেই তাঁর পেট চলে। কোনদিন কিছু না পেলে সেদিন উপবাস।

পদ্মাখ্য এই খবর পেয়ে সেই বিষ্ণুমন্দিরেই কৌশিকের আহারের ব্যবস্থা করে দিলেন। কৌশিকের আর কোনো চিন্তা নেই। সে এখন মনের আনন্দে গান গায়। পদ্মাখ্যও ছুটে আসেন তার গান শুনতে। কৌশিকের গানের শ্রোতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। কৌশিকের নাম সর্বত্র প্রচারিত হল। কুশস্থল থেকে একদিন পঞ্চাশজন ব্রাহ্মণ এসে কৌশিকের গান শুনে মোহিত ও অবাক হলেন। বিষ্ণুর প্রসাদ সেবার সুযোগ পেয়ে তারা আর ফিরে গেলেন না। দেখতে দেখতে কৌশিকের একটি হরিনামের দল গড়ে উঠল।

কৌশিকের গানের প্রশংসা শুনে এবং তাঁর গান নিজের কানে শোনবার জন্য সপারিষদ কলিঙ্গ দেশের রাজা সেই বিষ্ণুমন্দিরে এসে হাজির হলেন। সেই সময় কৌশিক গান গাইছিলেন। গান শেষ হতে কৌশিক সমাদর করে রাজাকে নিজের কাছে বসালেন।

কলিঙ্গ রাজা গান শুনে খুব প্রশংসা করে বললেন–লোকমুখে যা শুনেছিলাম সবই সত্যি। আমার ইচ্ছে, যে তুমি আমার নাম গান করে আমাকে খুশি কর। আমি তোমাকে অনেক উপহার দেব।

হাতজোড় করে কৌশিক বলল–আমাকে মাপ করবেন রাজামশাই। ভগবান শ্রীহরির নাম ছাড়া আমি আর কারোর নাম করতে পারব না।

এই কথা শুনে কলিঙ্করাজ খুব রেগে বললেন–আমি রাজা, তোমার হরির চেয়ে কোনো অংশে কম নই। গায়কের কাজ রাজার নাম গুণগান করা। তাহলে কেন তুমি পারবে না?

কৌশিক এবং তাঁর শিষ্যভক্তগণও এই কথা শুনে কিছু না বলে চুপ করে থাকলেন।

কলিঙ্গরাজ গর্জন করে বললেন–আমার গুণগান যখন তোমরা করতে পারবে না, তখন আমার গায়করা গাইবে, তোমরা শুনবে।

রাজার গায়করা তার গুণগান শুরু করল। কৌশিকের দলবল এই গান শুনে কানে আঙুল দিল। কারণ হরি গুণগান নয়, রাজার নামগান।

মহাত্মা কৌশিক কলিঙ্গরাজের অভিপ্রায়ে বুঝতে পেরে, আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। দেখাদেখি। তার ভক্তশিষ্যরাও উঠে পড়লেন। সেখান থেকে তারা চলে গেলেন।

প্রতাপশালী রাজা যদি বাধ্য করেন তাদের রাজা নামগান করতে তাই সকলেই কৌশিকের নির্দেশ মত ছুরি দিয়ে নিজের নিজের জিভ কেটে ফেললেন, কৌশিকও তাই করলেন। যাতে আর কখনও গাইতে না পারেন।

এমন ব্যবহার দেখে কলিঙ্গরাজ ভীষণ রেগে কৌশিকের সঙ্গী তার বাদ্যযন্ত্রাদির আসবাবপত্র এমনকি পোষাকাদিও কেড়ে নিয়ে তাঁদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। পদ্মাখ্যাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

কুশস্থলের সেই পঞ্চাশজন ব্রাহ্মণ আর সদলবলে কৌশিক তখন মহাভাবনায় পড়লেন। তাদের জিভ কাটা গেছে এমনকি রাজাও সর্বস্ব নিয়েছে। এখন কি হবে। তারা তখন মৃত্যুপণ করে এক জায়গায় বসে থেকে অনাহারে মারা গেলেন সবাই।

যমদূতেরা তাদের সবাইকে নিয়ে গেল যমলোকে। ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক থেকে সবকিছু জানতে পারলেন। ব্রহ্মা তখন দেবাতদের স্মরণ করে জানালেন যে কৌশিক সহ ব্রাহ্মণগণ শ্রীহরির নাম স্মরণ করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছে। আর যমরাজ তাদের যমলোকে নিয়ে গেছে। তিনি দেবগণকে বললেন–তোমরা এক্ষুনি যমলোকে গিয়ে সেইসব কৃষ্ণ ভক্তদের আমার কাছে নিয়ে এস।

ব্রহ্মার আদেশে দেবতাগণ যমলোকে গিয়ে যমকে বললেন–বিষ্ণু ভক্তদের এখানে তুমি নিয়ে এসেছ কেন?

যমরাজ তখন নিজের অপরাধ স্বীকার করে দেবতাদের হাতে কৌশিক সহ ব্রাহ্মণদের সমর্পণ করলেন। দেবতাগণ তাদের ব্রহ্মার সামনে হাজির করলে, ব্রহ্মা তাদের নিয়ে গেলেন বিষ্ণুলোকে, একেবারে বিষ্ণুর সামনে। ব্রহ্মাকে হরিভক্ত ব্রাহ্মণদের নিয়ে আসতে দেখে বিষ্ণু

আসন ছেড়ে উঠে একে একে সকলের নাম ধরে ডেকে আলিঙ্গন করে সেই বিষ্ণুলোকেই তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

বিষ্ণুর এমন কার্যকলাপ দেখে দেবতারা ভাবলেন যে সম্মান বহু সাধ্যসাধনা করে দেবতারাও পান না, মর্তের মানুষ হয়ে এরা এত সম্মান পেল। তারা তখন হরিভক্তের জয়ধ্বনি দিতে দিতে স্বস্থানে চলে গেলেন।

ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ, মুনি ঋষিরা সেখানে রয়ে গেলেন। লক্ষ্মীদেবী সেই সময় সেখানে উপস্থিত হলেন। বিষ্ণুর দূতগণ তখন সেই সভা থেকে সকলকে বের করে দেওয়ায় সেখানে শুধুমাত্র লক্ষ্মীদেবী ও নারায়ণ ছাড়া আর কেউ রইল না। তখন নারায়ণের ইঙ্গিতে গান গাইবার জন্য তুম্বুরুকে ডেকে আনা হল। হরি ভক্ত তুম্বুরু হলেন গন্ধবদের গুরু এবং সেই সঙ্গে সঙ্গীতেরও গুরু।

নারায়ণ নিজেই আসন ছেড়ে উঠে ফুলের মালা তুম্বুরুর গলায় পরিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন– তোমার মধুর গীত শুরু কর তুম্বুরু।

বীণা বাজিয়ে তুম্বুরু সুমধুর গান শুরু করলেন। তান-মান-লয়ে সে এক অপূর্ব পরিবেশনা। সকলে তাঁর প্রসংসা করে অনেক উপহার দিয়ে সম্মানিত করলেন তাঁকে।

এঁরই সঙ্গে নারদও গান শিখেছিলেন। কিন্তু নারায়ণ তাঁকে না ডেকে তুম্বুরুকে গান শোনানোর জন্য ডাকলেন। নারদ অবাক হলেন। তিনি শ্রীহরির অতি প্রিয়জন। মনে মনে ভাবলেন যে তাহলে তিনি কি এখনো ভালোভাবে গান শিখতে পারেন নি। নারায়ণ তাকে কোনো আমলই দিলেন না। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে নারদ প্রতিজ্ঞা করে বসলেন–যে ভাবেই হোক গান গেয়ে প্রভুর কাছে তিনি সন্মানের পাত্র হবেন। তিনি আবার চিন্তা করলেন কার কাছে গান শেখার জন্য সাহায্য নেবেন। সুকণ্ঠের অধিকারী কিভাবে হবেন। ভাবলেন তপস্যা করেই সব সমস্যার সমাধান হবে। তারপর তিনি তপস্যায় বসলেন। একদিন আকাশবাণী শুনলেন–হে নারদ, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য তোমাকে মানস সরোবরের উত্তরে যেতে হবে। সেখানে গান বন্ধু' নামে পরিচিত উলুক পাখির কাছে। তুমি গানের তালিম নাও।

আকাশবাণী শুনে দেবর্ষি নারদ ছুটে চললেন মানস সরোবরের উত্তর পর্বতে। সেখানে দেখলেন– বহু গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, অপ্সরাগণ একটি পাখিকে ঘিরে বসে গানের তালিম

নিচ্ছে। গান বন্ধুর সুমধুর গলা শুনে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। নারদ ধীরে ধীরে সেদিকে অগ্রসর হলেন।

নারদকে দেখে গান বন্ধু প্রণাম জানিয়ে বললেন–আপনি এখানে কি মনে করে হে দেবর্ষি নারদ? আসুন, বসুন আমি কি সেবা করতে পারি আপনার।

উলুকের আতিথেয়তায় নারদ খুশি হয়ে বললেন, হে গানবন্ধু, আমি আপনার কাছে গান শিখব বলে এসেছি। শ্রীহরির প্রিয়পাত্র কৌশিক বা তুম্বুরুর মতো হতে পারিনি। কিন্তু গান আমি শিখেছি। ভালভাবে গাইতে না পারার জন্য নারায়ণ আমাকে উপেক্ষা করেছেন। আমি যাতে শ্রীহরির প্রিয়পাত্র হতে পারি, সেইভাবে আমাকে শিক্ষা দিন।

নারদের প্রার্থনা শুনে উলুক বললেন–আপনি যা বললেন, খুবই সত্যি কথা। নাম, গান, কীর্তন শ্রীহরি পছন্দ করেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বরে আমি দীর্ঘজীবন লাভ করেছি। তাই অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করেছি। হরিদ্বেষী রাজা ভুবনেশ হরিনাম বন্ধ করে দিলেন। হরিমিত্র নামে এক ব্রাহ্মণ সেই নির্দেশ না মেনে শ্রহরির সুন্দর এক চতুর্ভুজ মূর্তি গড়ে অতি ভক্তির সঙ্গে পূজা করতেন। তার গুণ-গান গাইতেন।

রাজার আদেশ অমান্য করার জন্য হরিমিত্রের সবকিছু কেড়ে নিয়ে, শ্রীহরির মূর্তি ভেঙ্গে দিয়ে, তাঁকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

তারপর কালক্রমে রাজা মারা গেলেন। হে দেবর্ষি, সেই রাজা এখন এখানকার একটা গাছের কোটরে বাস করেন। আর ক্ষিদের জ্বালায় নিজের মাংস খাচ্ছেন। আর হরিমিত্র মৃত্যুর পরে চলে গেলেন বৈকুণ্ঠে। এই দৃশ্য দেখে আমার হরিগুণ গান শেখার প্রবল ইচ্ছা জাগে। একশো কুড়ি বছর কেটে গেল আমার। এই গান শিখতে গন্ধর্ব-কিন্নরদের সঙ্গে গান শিখতে ধৈর্য্য ধরতে পারলে আপনি সুগায়ক হবেন।

নারদ উলুককে গুরুরূপে বরণ করে নিয়ে বললেন–আমি আপনাকে গুরুপদে অভিষিক্ত করছি। আপনার উপদেশ মতো আমি চলব, কখনও তা থেকে বিচ্যুত হব না।

উলুক মনপ্রাণ ভরে নারদকে গানের শিক্ষা দিলেন। একান্ত সাধনায় এক হাজার বছর কেটে গেল, নারদের গলায় ঝরতে লাগল গানের সুধাবর্ষণ।

তারপর উলুক বললেন–হে দেবর্ষি, আপনার 'গীতবিদ্যা' শেষ হল। আমি আমার সবকিছু আপনাকে উজাড় করে দিয়েছি। এবার আমার পরমায়ুর শেষ অবস্থা। আপনি ত্রিকালদর্শী। এখন বলুন মৃত্যুর পর আমার কি গতি হবে?

ধ্যান যোগে উলুকের ভবিষ্যত জীবন দর্শন করে নারদ বললেন–হে গানবন্ধু, মৃত্যুর পর কশ্যপের ঔরসে বিনতার গর্ভে আপনি গরুড় পক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করে শ্রীহরির বাহন হয়ে তার সেবা করবেন।

শ্রীহরির কাছে বহুদিন পরে নারদ এলেন, প্রণাম করে বললেন, প্রভু আমি গান শিখেছি। তখন শ্রীহরি বললেন–তাহলে গান শুরু কর। দেখি কেমন শিখেছ। নারদ তখন মহানন্দে বীণা বাজিয়ে সুমধুর গান শোনালেন শ্রীহরিকে।

তখন শ্রীহরি নারদকে বললেন–বহুদিন ধরে গানবন্ধুর কাছে সঙ্গীতচর্চা করেছ। কিন্তু তুম্বুরুর মত গলা তোমার নয়। এখনও অনেক বাকি আছে শিখতে। দ্বাপরযুগ যখন আসবে, আমি কৃষ্ণ নামে তখন ধরাধামে আবির্ভূত হব। তখন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করে আমি যা বলেছি আমাকে তা মনে করিয়ে দেবে। তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে তখন। আশীর্বাদ করছি তুমি তুম্বুরুর চেয়েও ভালো গায়ক হবে।

নারায়ণকে প্রণাম করে নারদ বিদায় নিলেন। তারপর থেকে বীনা বাজিয়ে সর্ব সময়ে গান গাইতে গাইতে চতুর্দশ ভুবন ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শ্রীহরির গুণ-গান ছাড়া কোনো গান করেন না।

এইভাবে দেবর্ষির কত মন্বন্তর কেটে গেছে, তার কোনো ঠিক নেই। একদিন হঠাৎ রৈবতক পর্বতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেলেন তিনি। মনে পড়ে গেল তার সেই পূর্বের কথা। ছুটে এসে কৃষ্ণের চরণে প্রণাম করে মনে করিয়ে দিলেন তার সঙ্গীতের কথা। তখন কৃষ্ণ বললেন– নারদ, আমার স্ত্রী সত্যভামার গানের গলা খুব সুন্দর। তুমি তার কাছে গিয়ে কিছুদিন গলাটা ভাল করে সেধে নাও।

শ্রীকৃষ্ণের কথামত নারদ দ্বারকায় এসে সত্যভামার কাছে গান শিখলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের কাছে গানের পরীক্ষা দিলেন। তার গান শোনার পর কৃষ্ণ বললেন–নারদ, তুমি রুক্মিণীর কাছে কিছুদিন গানের তালিম নাও।

নারদ রুক্মিণীর কাছে গিয়ে সব বললেন। নারদের গান শুনে রুক্মিণী বললেন–দেবর্ষি, আপনি বহুদিন গানের রেওয়াজ করেছেন বটে, কিন্তু এখনো অনেক কিছু শেখার বাকি আছে। যা হোক আমার যা কিছু জানা আছে আমি আপনাকে শেখাবো।

দেবর্ষি নারদ অতি যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে রুক্মিণীর কাছে গানের চর্চা করবার পর কৃষ্ণের কাছে এসে তাঁকে গান শোনালেন।

শ্রীকৃষ্ণ নারদের গান মন দিয়ে শুনে, দু-এক জায়গায় ভুল ধরিয়ে দিলেন। সেগুলি সংশোধন করে দিলেন। তারপর বললেন–দেবর্ষি, এতদিন পরে তুমি যথার্থ গায়ক হতে পেরেছ।

শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম জানিয়ে বীণাটি হাতে নিয়ে নারদ আবার বেরিয়ে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণ এতদিন পরে গায়ক বলে তাঁকে স্বীকার করার জন্য তার মনে অসীম আনন্দ।

মহারাজ অম্বরীষের কন্যার স্বয়ম্ভর সভায় দেবর্ষি নারদ ও পর্বত মুনি

পরম বিষ্ণুভক্ত মহারাজ অম্বরীষ। তাঁর পিতা ত্রিশঙ্কু এবং মাতা ভক্তিমতী পদ্মাবতী। রাজরানি হয়েও তিনি নিজেকে বিষ্ণুর একজন সেবিকা মনে করতেন। সব সময়েই শ্রীহরির সেবায় মনোনিবেশ করতেন। তার মুখে সব সময় হরিনাম। এইভাবে রানি পদ্মাবতী দশ হাজার বছর ভগবান শ্রীহরির সেবায় কাটালেন। তিনি যথাযথভাবে দীন-দুঃখীদের দান ও সম্মান করলেন।

একদিন ত্রিশঙ্কু মহিষী পদ্মাবতী দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করে নিশি জাগরণের জন্য বিষ্ণুমন্দিরে আছেন। মহারাজ ত্রিশঙ্কু পাশে আছেন। বহুক্ষণ জেগে থাকার পর শেষ রাতের দিকে চোখে ঘুম জড়িয়ে এলে তিনি সেখানেই শুয়ে পড়লেন।

ভগবান শ্রীহরি পদ্মাবতাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন–হে ভামিনি, কি কারণে তুমি আমার এত ব্রত উপবাস করছ? কি তোমার অভিলাষ?

স্বপ্নে নারায়ণের দর্শন পেয়ে পদ্মাবতী আনন্দে অভিভূত হয়ে বললেন–প্রভু, আমাকে এমন এক পুত্র দিন, যে আপনার একান্ত ভক্ত হবে। আর তেজস্বী ও সর্বগুণান্বিত হবে।

নারায়ণ বললেন–আমার প্রদত্ত এই ফল খেয়ে তুমি গর্ভবতী হবে। যথাসময় তুমি মনের মত পুত্র লাভ করবে। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।– এই কথা বলে শ্রীহরি অন্তর্হিত হলেন। রানি জেগে উঠে তাকিয়ে দেখলেন নারায়ণ নেই। মনে মনে ভাবলেন তিনি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন, আর স্বপ্ন কখনো সত্যি হয় না। কিন্তু সামনে একটা ফল পড়ে থাকতে দেখতে পেলেন। সেটি হাতে নিয়ে ভাবলেন, তাহলে তো মিথ্যে নয় এ স্বপ্ন। এটি নিশ্চয়ই শ্রীহরি প্রদত্ত ফল। তারপর গোবিন্দের প্রসাদ রূপে সেটি ভোজন করলেন রানি।

যথাসময় একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন রানি। রাজা-রানি আনন্দের সঙ্গে তার নাম রাখলেন অম্বরীষ। ত্রিশঙ্কুর মৃত্যুর পর অম্বরীশ রাজা হলেন। কিন্তু রাজকার্যে তার মন না থাকায় মন্ত্রীর হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে তিনি তপস্যা করার জন্য বনে চলে গেলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শ্রীহরি সেখানে এলেন। তবে তিনি ইন্দ্রের রূপ ধরে রাজা অম্বরীষের সামনে এলেন।

ইন্দ্ররূপী শ্রীহরি রাজার সামনে গিয়ে বললেন–হে রাজন, তুমি দেখ, আমি দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে বরদান করার জন্য এসেছি। সকল লোকের প্রভু আমি, মঙ্গল হোক তোমার। বল তোমাকে কি বর দেব?

চোখ খুলে অম্বরীষ দেখলেন, সত্যিই ইন্দ্র তাঁর সামনে উপস্থিত। তখন তিনি বললেন–হে ইন্দ্র, আমি শ্রীহরির তপস্যা করছি। আপনার উদ্দেশে কোনো তপস্যা করিনি, তাই আপনার দেওয়া বরেও কোনো প্রয়োজন নেই আমার। শ্রীহরি আমার একমাত্র প্রভু। আপনি আপনার নিজের স্থানে গমন করুন।

মহারাজ অম্বরীষের এই কথা শুনে শ্রীহরি গরুড়ের উপর চুতর্ভুজ মূর্তিতে বিরাজ করতে লাগলেন। দেবতা এবং গন্ধর্বগণ চারিদিকে তার স্তুতি করছেন। গরুড় ধ্বজ শ্রীহরিকে দর্শন করে

অম্বরীষ আনন্দে বিহ্বল হয়ে প্রণাম করে স্তব-স্তুতি শুরু করলেন।

ভগবান শ্রীহরি রাজার স্তবে তুষ্ট হয়ে বললেন–হে সুব্রত, আমি সর্বদাই ভক্তপ্রিয়। তুমি আমার পরমভক্ত। তোমার অভিলাষ আমি পূর্ণ করব।

তখন রাজা বললেন–হে পরমানন্দ, কায়-মনবাক্যে আমি যেন নিরন্তর আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকতে পারি। সমস্ত জগতবাসীকে বিষ্ণুপরায়ণ করে যেন পৃথিবী পালন করতে পারি। দেবতাদের পূজাও হোমের দ্বারা সন্তুষ্ট করতে পারি। বৈষ্ণবদের প্রতিপালন এবং শত্রুদের বিনাশ করা আমার মনের বাসনা।

রাজার কথা শুনে শ্রীহরি আনন্দের সঙ্গে বললেন–তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। তোমাকে আমার এই সুদর্শন চক্র দান করছি। এটি তোমার পাহারায় থাকবে। এই চক্র শত্রু বিনাশ করবে এবং অকাল মৃত্যু বা সকল প্রকার ব্যধিকে বিনষ্ট করবে। . এই বর দিয়ে শ্রীহরি অন্তর্হিত হলেন। রাজা অম্বরীষ নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন। তিনি সর্বদা নারায়ণ পরায়ণ হয়ে বিষ্ণু ভক্তগণকে বিশেষ ভাবে প্রতিপালন করলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ, বাজপেয় যজ্ঞ, সাধন করে পৃথিবী পালন করলেন। সব গৃহেই বেদ অধ্যয়ন, হরিনাম কীর্তন হতে লাগল। কোন প্রজা কোন দিন দুর্ভিক্ষে পীড়িত হল না।

ব্রহ্মার পুত্র নারদমুনির কথা সবাই শুনেছে। তিনি ছিলেন চিরকুমার। তিনি বিবাহ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, তাই তিনি বিবাহ করেননি।

মহারাজ অম্বরীষের দরবারে একদিন পর্বত মুনিকে সঙ্গে নিয়ে নারদমুনি এসে উপস্থিত হলেন। রাজা মহাসমাদরে তাদের অভ্যর্থনা করে পাদ্যাদি ধারায় পূজা করলেন। সেই সময়

মহারাজের কন্যা হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলে, দুই মুনি কন্যার রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন, কন্যা সর্বসুলক্ষণাও।

নারদমুনি রাজা অম্বরীষকে জিজ্ঞাসা করলেনএই রূপবতী কন্যা কে?

অম্বরীষ বললেন–আমার কন্যা শ্রীমতী। বিয়ে দেবার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করছি।

নারদমুনি সহসা বললেন–তোমার এই বিবাহযোগ্যা মেয়েকে আমিই বিয়ে করব।

রাজা অম্বরীষ বললেন–সে তো আমার মেয়ের সৌভাগ্য।

পর্বতমুনির মনেও ইচ্ছা ছিল রূপবতী শ্রীমতাঁকে বিয়ে করবার। আগেভাগে নারদ বিয়ের কথা বলে ফেলায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তারপর ভাবলেন–যা হয় তোক, একবার আমিও বলে দেখি, এই চিন্তা করে তিনি রাজাকে বললেন–মহারাজ, আপনার কন্যা শ্রীমতাঁকে আমিই বিয়ে করব।

রাজা অম্বরীষ মহা সমস্যায় পড়লেন। যাঁকে তিনি কন্যাদান করবেন না, তিনিই শাপ দেবেন। তারপর অনেক ভেবেচিন্তে বললেন–আমার কন্যা যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতীও। তার বিয়ের জন্য আমি যদি স্বয়ম্বরের আয়োজন করি, তাহলে সে স্বামী বেছে নেবে। আগামীকাল আমার গৃহে আপনারা আসুন। স্বয়ংম্বরের ব্যবস্থা করছি।

'তবে তাই হোক' বলে দুই মুনি, সেখান থেকে চলে গেলেন। তারপর নারদমুনি সোজা বিষ্ণুলোকে গিয়ে, বিষ্ণুকে গোপনে বললেন–প্রভু, আপনার পরম ভক্ত অম্বরীষের কন্যা সুন্দরী শ্রীমতাঁকে আমি বিবাহ করতে চাই। কিন্তু আমার সঙ্গে থাকা পর্বতমুনিও একই প্রস্তাব দিল রাজ অম্বরীষকে। সঙ্কটে পড়ে রাজা কন্যার স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করেছে। হে মাধব, আপনি যদি আমার হিত করতে চান, তাহলে স্বয়ম্বর সভায় রাজকন্যার দৃষ্টিতে পর্বতমুনির মুখ যেন বানরের মত হয়। আপনি তাই করুন।

ভগবান শ্রীহরি নারদের কথা স্বীকার করে বললেন–তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে। পর্বতমুনিকে শ্রীমতী বানরমুখো দেখবে। বিষ্ণুর কথা শুনে নারদমুনি আনন্দে বিষ্ণুকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

তার কিছুক্ষণ পরে পর্বত মুনিও বৈকুণ্ঠে এসে একই প্রস্তাব দিলেন বিষ্ণুর কাছে। শ্রীমতীর স্বয়ংম্বর সভায় নারদমুনি হবেন বানরমুখো, বিষ্ণুর কাছে এই কথা আদায় করে আনন্দে চলে গেলেন।

স্বয়ম্বর সভায় বহু রাজাদের নিমন্ত্রণ করে এনেছেন রাজা অম্বরীষ। সবার জন্য সমাদরের ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি ছিল না। যথাসময় রাজা শ্রীমতাঁকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করলন। নারদমুনি ও পর্বত মুনিও সেই সভায় পাশাপাশি দুটি সুসজ্জিত সিংহাসনে বসেছেন।

মহারাজ অম্বরীষ মুনিদ্বয়কে প্রণাম জানিয়ে নিজ কন্যাকে বললেন–হে কল্যাণী, এই যে দুজন মুনি বসে আছেন, এদের মধ্যে যাঁকে তোমার পছন্দ তার গলায় মালা পরিয়ে দাও। পিতার বাক্যে শ্রীমতী মুনিদ্বয়ের কাছে গিয়ে দেখলেন দুটি বানরমুখো মানুষ সিংহাসনে বসে আছেন। শ্রীমতী ভীত হয়ে কাঁপতে লাগলেন।

কন্যার অবস্থা দেখে রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেনকি হল তোমার, এমন করে কাপছ কেন?

শ্রীমতী বলল–বাবা, তুমি বললে যে দুজন মুনি বসে আছেন। কিন্তু আমি দুজন নরবানরকে দেখছি। দেবর্ষি নারদ বা পর্বতমুনিকে তো দেখতে পাচ্ছি না। তবে এদের মাঝখানে এক সুন্দর পুরুষকে দেখতে পাচ্ছি। বহু মূল্যবান অলঙ্কারে ভূষিত। দীর্ঘবাহু কি অপরূপ সুন্দর দেহ। কান পর্যন্ত লম্বা দুটি চোখ।

"ইনিই আমার পতি হোন"–এই কথা বলে শ্রীমতী তাঁরই উদ্দেশে মালা দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই রাজকন্যা অদৃশ্য হয়ে গেল। সভায় সবাই এমন দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল। পূর্বকালে শ্রীহরিকে পতিরূপে লাভ করার জন্য এই শ্রীমতী বহুকাল তপস্যা করেছিল। ফলে শ্রীহরি ভক্ত অম্বরীষের ঔরসে শ্রীমতী জন্মলাভ করে শ্রীহরিকে পতিরূপে লাভ করল।

দুই মুনি মনে মনে ভাবছেন যে শ্রীহরির দয়ায় অন্যের মুখ বানরমুখো হওয়ার কথা। কিন্তু আমার মুখ বানরের মত হল কেন? তাঁরা দু'জনে নিজেদের ধিক্কার দিতে দিতে বিষ্ণুলোকে বাসুদেবের কাছে গেলেন। মুনিদ্বয় এসে বাসুদেবকে বললেন– হে গোবিন্দ, আপনি আমাদের হিতকার্য্য করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি সেই কন্যাকে হরণ করেছেন।

মুনিদ্বয়ের কথা শুনে শ্রীহরি তার দুই কান বন্ধ করে বললেন–তোমরা কি আশ্চর্য্য কথা বলছ, নিজ নিজ ইচ্ছানুসারেই তোমাদের এমন ভাব হয়েছে। আমি তোমাদের উভয়ের হিতকার্য্যই করেছি।

শ্রীহরিকে নারদ মুনি জিজ্ঞাসা করলেনআমাদের উভয়ের মাঝে এসে শ্রীমতাঁকে যিনি হরণ করলেন তিনি কে?

শ্রীহরি নারদের প্রশ্নে বললেন–জগতে কত মায়াবী রয়েছে। শ্রীমতী তাদের কাছেই হয়ত অদৃশ্য হয়ে লুকিয়ে আছে।

এই কথা শুনে মুনিদ্বয় অযোধ্যায় অম্বরীষের কাছে গিয়ে বলল–রাজা তুমি মায়া সৃষ্টি করে, আমাদের উপেক্ষা করে, কন্যাকে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছ। তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি–অন্ধকাররাশি তোমাকে ঢেকে রাখবে। তুমি তোমার নিজের দেহকেও পূর্বের মত স্পষ্ট করে দেখতে পাবে না।

অভিশাপ বাণী উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার রাজাকে ঢেকে ফেলল। তখন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র রাজাকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভুত হল। চক্র রাজাকে রক্ষা করে মুনিদ্বয়কে আক্রমণ করল। মহাবিপদে পড়লেন মুনিদ্বয়। "ওহে, আমাদের কন্যা সিদ্ধিলাভ হয়েছে" একথা বলতে বলতে দুই মুনি এ লোকে থেকে সে লোকে হাঁপাতে হাঁপাতে নিরন্তর ছুটে বেড়াচ্ছেন। স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছেনা। চক্র তাড়া করছে। "হে গোবিন্দ, আমাদের রক্ষা করুন।" এই কথা বলতে বলতে তারা বিষ্ণুলোকে। উপস্থিত হলেন।

তখন শ্রীহরি সেই অন্ধকার ও তার আপন চক্রকে নিবারণ করে দুই মুনিকে রক্ষা করলেন। মুনিদ্বয় ভয়মুক্ত শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম জানিয়ে বিষ্ণুলোক থেকে প্রস্থান করলেন এবং শোকাভিভূত হয়ে পরস্পর বলতে লাগলেন–আজ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা বিবাহ করব না।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বিষ্ণুর তপস্যায় বসলেন। সেই তপস্যার তেজে সূর্যমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে উঠল। চঞ্চল হয়ে উঠল দেবলোক। কি চান ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণ যেন মনে মনে এই চাইছেন–হে বিষ্ণু, মানুষকে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে না রেখে, তাদের চৈতন্য দাও। তারা তোমাকে যেন ভুলে না যায়। কলির মোহ-ফঁদে যাতে পা না দেয়।

স্বর্গের কশ্যাপ অদিতি, মথুরার বসুদেব দেবকী, অযোধ্যার দশরথ কৌশল্যা তারা এলেন নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র আর শচীদেবী রূপে, এই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী তাদেরই সঙ্গে মিলে গেলেন।

সেই সূর্যমণ্ডলের তেজ প্রথমে এল জগন্নাথ মিশ্রের শরীরে, তার থেকে শচীদেবীর অঙ্গে।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যার সময় সকলঙ্ক চন্দ্রে গ্রহণের ছলে জগতের সকল জীবকে হরিনাম বলতে বলতে নবদ্বীপ ধামে অকলঙ্ক শ্রীগৌরহরি আবির্ভূত হলেন। অন্তরীক্ষ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল। দেবতারা স্তবগান করছে–হে শচীনন্দন, তুমি যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে। কখন নৃসিংহ, কখন মৎস্য, কখন বরাহ, কখন বামন রূপে ধরে পৃথিবীকে বারে বারে তুমিই উদ্ধার করেছ। কলির মানুষরা স্রষ্টাকে অস্বীকার করছে। তারা আত্মজ্ঞান হারা। নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। মোহ-মায়ার জালে তারা আবদ্ধ। পৃথিবীর এই দুর্দিনে তোমার আবার আবির্ভাব হল। তুমি অসুর বিনাশকারী। কলির মানুষেরা প্রত্যেকেই অসুরভাবাপন্ন। প্রেম দান করে অসুরভাব থেকে সকলকে মুক্ত কর। জীবকে চৈতন্য দান কর। জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে তুমি খ্যাতি লাভ করবে।

যবন শক্তি যখন ভারতবর্ষকে গ্রাস করতে উদ্যত হল, চারিদিকে বৌদ্ধধর্ম যখন প্রবল হয়ে উঠেছে–ঠিক সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে অবতীর্ণ হলেন নবদ্বীপে। অল্প বয়সেই পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন তিনি। গৃহী হয়ে ও সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে প্রেমধর্ম প্রচার করলেন। সবরকম বিভেদ প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে একাকার করে দিলেন। তাঁর অপ্রতিহত গতির সামনে বৌদ্ধ ও যবন শক্তি থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

ভবিষ্য পুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ

উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

চতুর্দশ ভুবনের কথা জানা যায় ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করে। আর এ সবই অতীত কাহিনি। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা জানতে আমরা সকলেই কৌতূহলী। নিজের ভবিষ্যত জানার ইচ্ছায় প্রত্যেকেই ছুটে যায় জ্যোতিষির কাছে।

অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করেন মহামুনি ব্যাসদেব। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ষাট হাজার মুনির সামনে প্রথমতঃ লোমহর্ষণ মুনি সেই সব পুরাণ কথা বর্ণনা করেন। লোমহর্ষণ সূতের মুখে পৃথিবীর আদি বৃত্তান্ত, পুরাণ, ইতিহাস বিশদভাবে শুনলেন শৌনকাদি মুণিগণ। ভবিষ্যতের বিষয় সম্বন্ধে শুনতে ইচ্ছা হল।

প্রশ্ন করলেন–ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সামান্য ব্যাধের দ্বারা তার লীলা সম্বরণ করলেন। পাণ্ডবদের মধ্যে কত বিপর্যয় ঘটে গেল, তারা পরীক্ষিতকে পৃথিবী পালনের ভার দিয়ে মহাপ্রস্থানে গমন করলেন। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়ে সর্পদংশনে মৃত্যু হল পরীক্ষিতের। তার পুত্র জন্মেজয় রাজা হলেন। তিনি সর্প নিধন যজ্ঞ করলেন। সে যজ্ঞ আস্তিক মুনির উপদেশেও সমাপ্ত হল না।

এরপর শৌনকাদি মুনিগণ জানতে চাইলেন ও ত্রিভুবনে কি ঘটনা ঘটবে? সৃষ্টি কিভাবে চলবে?

মহামুনি পরাশর নন্দন বেদব্যাস ত্রিকালজ্ঞ, দিব্যদর্শী। অসীম আনন্দ জ্ঞানের অধিকারী। দিব্যদৃষ্টি দ্বারা ভবিষ্যতের সকল বিষয় অবগত হয়ে তা জানিয়ে দিলেন তাঁর শিষ্য লোমহর্ষণকে। শৌনকাদি মুনিগণের কৌতূহল মেটাবার জন্য তিনি সেই ভবিষ্যতের কথা বলতে শুরু করলেন। ভবিষ্য পুরাণ সেইসব কাহিনিতে ভরা।

ম্লেচ্ছ বিনাশ যজ্ঞ করে রাজা প্রদ্যোত হলেন ম্লেচ্ছ হন্তা

দ্বাপর যুগের শেষে যাদবরা অত্যাচারী হয়ে ওঠাতে কৃষ্ণ নিজে থেকেই যদুকুল ধ্বংস করলেন। গান্ধারীর অভিশাপ বাক্যকে সত্যে পরিণত করলেন। অবশ্যম্ভাবীকে কেউ রোধ করতে পারে না। বর্ণাশ্রম ধর্ম বলে কিছু রইল না।

আগে নিয়ম ছিল ক্ষত্রিয়রাই রাজা হয়ে দেশশাসন করবে। কিন্তু তখন ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, যে যখন সুযোগ পেল রাজা হয়ে বসল। খাঁটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় নেই বললেই চলে। দেশ থেকে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম উঠে গেল, ব্রাহ্মণেরা যাগ-যজ্ঞ ছেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী-বাকরী করছে।

আগে ছিল সপ্তদ্বীপা একমাত্র পৃথিবী কিন্তু ক্রমে তা টুকরো টুকরো হয়ে অসংখ্য রাজ্যে পরিণত হল। এক এক রাজ্যে এক একজন রাজা। সকলেই সর্বেসর্বা হতে চায়। শুরু হল ম্লেচ্ছের রাজত্ব। অনাচার শুরু হল।

সেই সময় হস্তিনাপুরে রাজা ছিলেন পাণ্ডবদের বংশধর ক্ষেমক। রাজ্যে এমন অনাচার দেখে তিনি পুত্র প্রদ্যোতকে রাজ্যের ভার দিয়ে চলে গেলেন কলাপ গ্রামে। সেখানে সাধারণ ভাবে থেকে শ্রীহরির আরাধনায় মগ্ন হলেন।

প্রদ্যোত রাজ সিংহাসনে বসে প্রজা শাসন করতে সাধ্যমত চেষ্টা করলেন। সফলও হলেন তিনি অনেকাংশে। হস্তিনাপুরকে যথাসাধ্য শান্তিতে রাখবার চেষ্টা করলেন।

প্রদ্যোতের পিতা ক্ষেমক কলাপ গ্রামে সাধন ভজন নিয়ে থাকেন। কোথায় কি হচ্ছে খবর রাখেন না। ম্লেচ্ছরা গুপ্তচরের দ্বারা ক্ষেমকের খবর পেয়ে গোপনে ক্ষেমককে হত্যা করল। রাজা প্রদ্যোত কিছু জানতে পারলেন না।

একদিন রাজা প্রদ্যোত রাজসভায় বসে রাজকার্য পরিচালনা করছেন, সেই সময় দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন। মুনিকে দেখে রাজা তাকে একটি সুন্দর আসনে বসিয়ে পাদ্য-অর্ঘ দিয়ে তার পূজা করলেন। তারপর বললেন–আপনার চরণধূলি পড়ায় আমার পুরী ধন্য হল। এখন আপনার আগমনের কারণ বলুন।

দেবর্ষি নারদ বললেন–আমরা ঋষি মানুষ, ভগবানের নামগান নিয়ে থাকি। পৃথিবীর মানুষজন ভাল থাকলেই আমাদের আনন্দ। রাজা আমি একটি দুঃখের খবর তোমাকে জানাতে এসেছি। মনে হয় তোমার কানে সে খবর এখনো পৌঁছায়নি।

এই কথায় রাজা প্রদ্যোতের বুকটা দুরু দুরু করে উঠল। তিনি জানেন নাকি এমন দুঃখের কথা। উদ্বেগের সঙ্গে তিনি মুনিবরকে সেই দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

দেবর্ষি বললেন–ম্লেচ্ছরা তোমার বাবাকে হত্যা করেছে। শোনামাত্রই রাজা প্রদ্যোত চমকে উঠলেন।

দেবর্ষি আবার বললেন–তোমার মত ধার্মিক রাজা থাকতেও তারা তোমার বাবাকে হত্যা করল। এমন নিষ্ঠুর কর্মের জন্য আমার মনে শান্তি নেই। তাই ভাবলাম এ খবরটা তোমাকে জানানো দরকার।

রাজ প্রদ্যোত দুঃখে-ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠলেন।

দেবর্ষি আবার বললেন–অপঘাতে মৃত্যু হওয়ার জন্য তোমার পিতাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। যদি তাকে সেখান থেকে মুক্ত করতে চাও, তবে ম্লেচ্ছ নিধন যজ্ঞ কর।

এই কথা বলে দেবর্ষি নারদ রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বীণা বাজাতে বাজাতে চলে গেলেন। রাজা প্রদ্যোত ক্রোধে জ্বলতে জ্বলতে বললেন–আমি এই শ্লেচ্ছদের যতদিন না বিনাশ করতে পারি ততদিন এই ম্লেচ্ছনিধন যজ্ঞ চলবে, তবেই শান্তিলাভ করব আমি।

রাজা প্রদ্যোত পণ্ডিতদের বললেন–অবশ্যই আমি যজ্ঞ করব। বেদবিদ ব্রাহ্মণ যেখানে যত আছেন তাহাদের আমন্ত্রণ জানান। আমার পূর্বপুরুষ মহারাজ জন্মেজয় যেমন সর্পনিধন যজ্ঞ করেছিলেন, আমিও তেমন ম্লেচ্ছনিধন যজ্ঞ করব।

কুরুক্ষেত্রের বিশাল স্থান জুড়ে যজ্ঞের কুণ্ড তৈরি হল। সেই কুণ্ডের চারিদিকে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগন বসলেন। সেই কুণ্ডে প্রচুর পরিমাণে কাঠ ও ঘি ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল। ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র উচ্চারণ করে ঘৃতাহুতি দিতে থাকলেন।

মন্ত্রশক্তির আকর্ষণে যেখানে যত ম্লেচ্ছ ছিল, যজ্ঞ কুণ্ডের মধ্যে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। ভয়ঙ্কর দৃশ্য, কাতারে কাতারে ম্লেচ্ছজাতি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। দেখতে দেখতে ম্লেচ্ছকুল প্রায় নির্মূল হল। ঘৃতাহুতি সমাপ্ত করলেন ব্রাহ্মণেরা। নির্বিঘ্নে যজ্ঞের সমাপ্তি হল।

এইভাবে ম্লেচ্ছদের বিনাশ করবার জন্য রাজা প্রদ্যোতের আর এক নাম হল ম্লেচ্ছহন্তা। এরপর এক এক করে বহুবছর কেটে গেল। ম্লেচ্ছরা এই সময়ের মধ্যে আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। এরপর দ্বাপরের পর আসবে কলি। ম্লেচ্ছ ধর্ম, ম্লেচ্ছ কর্ম, ম্লেচ্ছর আচার সব কিছুই কলিতে হবে। বিধাতার নিয়ম অনুসারে এইভাবেই পৃথিবীতে আসতে হবে কলিতে।

কলির সাধনার ফলস্বরূপ ধরায় আবার ম্লেচ্ছাচার

বহু বছর কেটে গেছে রাজা প্রদ্যোতের ম্লেচ্ছ নিধন যজ্ঞের পর। আর্য সভ্যতার বৃদ্ধি ঘটছে। আর্যদের শাসনের জোরে ম্লেচ্ছদের আর মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না।

দ্বাপরের পর এল কলি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর–প্রত্যেকেই যে যার নিজের ধর্ম পালন করেছে এবং কলিতে সবাই ম্লেচ্ছচারী হবে। কলিকেও তার ধর্ম পালন করতে হবে। ধার্মিক রাজা প্রদ্যোত, তার পুত্র বেদবান, পৌত্র সুনন্দ প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছেন যাতে রাজ্যে অনাচার প্রবেশ না করে। কোনো শ্লেচ্ছদের এখানে স্থান নেই। কিন্তু কলির আগমন কি করে হবে?

রাজ্য বিস্তার করতে না পারার জন্য কলি পড়েছেন মহা সমস্যায়। মানুষকে অনাচারী করার চেষ্টায় বিফল হয়ে শেষে শ্রীহরির শরণাপন্ন হলেন। তাঁর আকুল প্রার্থনায় শ্রীহরি দেখা দিয়ে বললেন– ভেবনা কলি। ধৈর্য্য ধর, দেখ সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আমার স্মরণ নিয়েছ, সব দায়িত্ব আমার।

স্বয়ং নারায়ণের আশ্বাস পেয়ে কলি মহানন্দে নীলাচল পাহাড়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আর্যদের রাজত্বে সুনন্দ শেষ রাজা। তার কোনো সন্তান ছিল না। এমন ধার্মিক রাজার রংশ লোপ পেল সন্তানের অভাবে। ঋষি মুণিগণ শঙ্কিত হয়ে পরম পবিত্র স্থান নৈমিষারণ্য ত্যাগ করে হিমালয়ে চলে গেলেন। তাঁরা সেখান থেকে ম্লেচ্ছাচার নিবারণের জন্য বিষ্ণুকে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু বিধাতার নিয়ম ভঙ্গ করার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নেই।

রাজ্যের প্রধান নগরের পূর্বদিকে সুবিশাল এক মহাবন আছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেই বলে সৃষ্টি বল এক পুরুষ আর এক নারীর। পুরুষের নাম আদম এবং নারীর নাম হব্যবতী। তারা স্বামী-স্ত্রী। তারা ধার্মিক, শান্ত, পরম উদার, তাদের মনে কোনো লোভ নেই, লালসা বা হিংসা নেই। সেই বনে তারা দুজনে মহাসুখে বাস করত। গাছের ফলমূল ছিল তাদের খাদ্য। কিন্তু একটি গাছ ছিল তার নাম পাপ গাছ। সেই গাছের ফল ছিল খুব মিষ্টি, কিন্তু একবার সেই ফল যে খাবে তার সর্বনাশ হবে।

বিষ্ণু কলিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আদম ও হব্যবতাঁকে প্রলুব্ধ না করার জন্য। কিন্তু কলি বিষ্ণুর আদেশ অমান্য করে সেই বনে প্রবেশ করামাত্র গাছগুলি ভেঙে সাপের আকৃতি হয়ে গেল।

ওদিকে আদম ও হব্যবতীর মতিভ্রম ঘটল। তার পাপ গাছের ফল খেল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উদার মন হয়ে উঠল হিংসায় পরিপূর্ণ। তারা অনাচারী হয়ে ম্লেচ্ছের মত ব্যবহার কর। তাদের বংশধরেরা ম্লেচ্ছরূপেই জন্মগ্রহণ করল। সারাদেশ ম্লেচ্ছ ধর্মে ভরে গেল।

আর্যবর্ত টুকরো টুকরো হয়ে ম্লেচ্ছদের রাজত্ব হল। কেউ বেদ মানে না, যজ্ঞ করে না। মাথাচাড়া দিয়ে উঠল শক, হুণ, যবনের দল। কলির অভিলাষ পূর্ণ হল।

ম্লেচ্ছ রাজা ন্যূহকে স্বপ্নযোগে বিষ্ণুর নির্দেশ এবং পৃথিবীতে প্রলয় ও পুনরায় ন্যূহের বংশ

ন্যূহ হচ্ছেন আদমের বংশধর লোমকের ছেলে। কলির প্রভাবে সে ম্লেচ্ছ ছিল। সে বেদের ভাষা না বুঝলেও মনে মনে বিষ্ণুর ভক্ত ছিল। বিষ্ণু ন্যূহকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন–বৎস ন্যূহ, আজ থেকে সাতদিন পরে মহাপ্রলয় হবে। কেউ বাঁচবে না। তুমি আমার ভক্ত। তোমাকে রক্ষা করবার জন্য বলছি। তোমার আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে তুমি একটি নৌকায় উঠে জীবন রক্ষা করবে। আর সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। প্রলয়ের পর তুমিই হবে এই পৃথিবীর নতুন রাজা।

বিষ্ণুর নির্দেশমতো ন্যূহ আত্মীয়-পরিজনদের একস্থানে জড়ো করলেন। একটি নৌকো তৈরি করে তাতে সকল প্রকার শস্যদানাও মজুত করলেন। তার এই কর্ম দেখে সবাই ভাবল রাজা বুঝি পাগল হয়ে গেছে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন–সময় হলেই সব বুঝতে পারবে।

তিনশো হাত লম্বা, পঞ্চাশ হাত চওড়া আর তিরিশ হাত উঁচু এই বিশালাকার নৌকো দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। কারণ ইতিপূর্বে এমন নৌকো কেউ কখনো দেখেনি।

সময় আর বেশি নেই তাই নূহ তার আত্মীয়-পরিজনেদের সেই নৌকায় উঠিয়ে নিলেন। আর নিলেন সংগ্রহ করা বিভিন্ন প্রকার দানাশস্য।

সেই সপ্তম দিন এল। সেইদিন আর ভোর হয় না। চারিদিকে শুধু অন্ধকার। মেঘের ওপর মেঘ তারপর নামল প্রবল বৃষ্টি। খানা, ডোবা, নদী, সাগর সব জলে ভরে উঠল। পার্থিব জিনিস, প্রাণী, সবকিছুই জলের তলায় চলে গেল। শুধুমাত্র রাজা নূহের নৌকো ভেসে থাকল জলের ওপর। স্রোতের টানে চলল সাগরে।

একটানা চল্লিশ দিন ধরে চলল সেই মুষলধারা বৃষ্টি। গোটা দেশটাই চলে গেল জলের তলায়। শুধু রাজার নূহের নৌকো ভেসে চলল সেই প্রলয়ঙ্করী ঢেউ-এ।

বিষ্ণুর কথামতো সবকিছুই তেমনি ঘটতে লাগল। শুধু একটিমাত্র স্থান ছাড়া আর কোথাও কোন স্থল সেই। সেই জায়গাটি হল বিশালা। মুনি-ঋষিরা নৈমিষারণ্য থেকে হিমালয়ের সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই স্থানটি হল বিশালা।

বিশালায় বসে ঋষিরা মহামায়ার স্তব করছেন। ন্যূহের নৌকো সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। নূহ নৌকোতেই বসে রইলেন। ঋষিদের স্তবে মহামায় তুষ্ট হলে বর্ষা থেমে গেল। মেঘ কেটে

আকাশ পরিষ্কার হল। সূর্যের প্রকাশ হল। জলরাশি নেমে গেল। ‘শিষিনা’ নামে হিমালয়ের তটভূমি রাজার দৃষ্টিগোচরে হল।

ন্যূহ সেখানে সবাইকে নিয়ে নৌকো থেকে নামলেন। গড়ে তুললেন নতুন দেশ।

বিক্রমাদিত্য-বেতাল-সংবাদ

শকদের অত্যাচারে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য এক রাজার আবির্ভাব হল। তার নাম বিক্রমাদিত্য। তিনি শুধুমাত্র তেজস্বী রাজা নন, বুদ্ধিমান এবং সূক্ষ্ম বিচারে দক্ষ।

ইন্দ্রের আদেশে একজন অস্পরা বীরমণি নামে মানবীরূপে গন্ধর্বসেনকে বিয়ে করে মর্ত্যে ঘর সংসার করছে। সেই বীরমতির একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিল। সেই সময় তার মাথায় স্বর্গ থেকে। পুষ্পবৃষ্টি হওয়ার ফলে তার নাম রাখা হল শিববৃষ্টি। বাল্যকালেই শিববৃষ্টি বনে গিয়ে শিবের তপস্যায় মগ্ন হল। ক্রমে ক্রমে মহাযোগী হয়ে সে নিজেই শিব হয়ে গেল।

পরজন্মে শিববৃষ্টি বিক্রমাদিত্য নামে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি পাঁচ বছর বয়সে বনে গেলেন তপস্যার জন্য। তিনি বারো বছর। কঠোর পরিশ্রম করলেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে বরদান করলেন। বিক্রমাদিত্য শিববরে বলীয়ান এবং মহাজ্ঞানী হলেন। এরপর রাজ্যে ফিরে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। শিব বত্রিশটি পুতুল দিয়ে তৈরী একটি অপূর্ব সিংহাসন তাকে দিলেন। সেই সিংহাসনে বসে তিনি রাজ্য পরিচালনা করতেন। পার্বতীর আদেশে বেতালরা সকলের অলক্ষ্যে তাঁকে ঘিরে থাকত, যাতে কেউ তাঁর কোন ক্ষতি করতে না পারে।

উমার সঙ্গে মহাকালেশ্বর শিবের পূজা করতে গিয়ে বিক্রমাদিত্য সেখানে একটি সুন্দর প্রাসাদ তৈরী করালেন। প্রচুর মণি-মাণিক্য খচিত সেই প্রাসাদ। শিবের প্রদত্ত সিংহাসন এনে তিনি সেই প্রাসাদে স্থাপন করলেন। সেই সিংহাসনে বসে তিনি ধর্মকথা আলোচনা করতেন। দেশের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতরা সেই ধর্মসভায় আসতেন।

এই ধর্মসভা চালকালীন একদিন এক ব্রাহ্মণ সেখানে এলেন। ব্রাহ্মণকে খুব সমাদর করে রাজা সেখানে বসালেন।

আসলে এক বেতাল বিক্রমাদিত্যের ধর্মবুদ্ধির পরীক্ষা নেবার জন্যই এই ব্রাহ্মণের বেশ ধরে এসেছিলেন। রাজা কিন্তু তাঁকে ব্রাহ্মণ বলেই জানতেন।

ব্রাহ্মণরূপী বেতাল বলল–রাজমশাই, আমি আপনাকে একটি পুরানো ইতিহাস বলব, আপনি মন দিয়ে শুনুন।

শিবের মহাপবিত্রধান হল বারাণসী। বারাণসীর রাজার নাম ছিল প্রতাপমুকুট। রানি মহাদেবী। বজ্রমুকুট ছিল তাদের পুত্র। আর মন্ত্রীপুত্রের নাম বুদ্ধিদক্ষ। বজ্রমুকুট আর বুদ্ধিদক্ষের মধ্যে

গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। একদিন বজ্রমুকুট বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চলে শিকারে চলল। শিকারের পর দুজনেই খুব ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম দরকার। একটু খোঁজার পর তারা এক শিবালয় দেখতে পেল। তারা সেখানে গেল।

সেই শিবালয়ের পাশে এক সরোবর ছিল, তার ধারে বসল তারা। সেখানে তারা সুন্দরী সহচারী পরিবৃতা এক অপরূপা মেয়েকে দেখতে পেল। মেয়েটির রূপে বজ্রমুকুট মুগ্ধ হল।

সেই মেয়েটির মাথায় একটি পদ্মফুল ছিল। খোঁপা থেকে পদ্মফুলটিকে বের করে মেয়েটি কানে লাগাল, তারপর পায়ে ঠেকাল, দাঁত দিয়ে একটু কাটল। তারপর নিজের বুকের উপর ফুলটিকে চেপে ধরল। তারপর সেখান থেকে চলে গেল।

বজ্রমুকুট একদৃষ্টে মেয়েটিকে এইভাবে তাকিয়ে দেখল। তারপর বজ্রমুকুট রাজপ্রাসাদে চলে এল। মেয়েটিকে দেখার পর থেকে চঞ্চল হয়ে উঠেছে তার মন। তার মুখে হাসি নেই, বন্ধুদের সাথে খেলা নেই। আহার পর্যন্ত ত্যাগ করল। সকলেই চিন্তায় পড়লেন। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিদক্ষ অনেক বুঝিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসল কারণটা জানতে পারল।

তারপর রাজপুত্রকে বুদ্ধিদক্ষ বলল–যাকে দেখে তোমার মন চঞ্চল হয়েছে, সেই মেয়েটি কর্ণাটকের রাজা দন্তবক্রের কন্যা। তার নাম পদ্মাবতী। তার সঙ্গে তোমার কিভাবে মিলন হবে তাই ভাবছি। খুব কষ্টকর হবে বলে মনে হয়।

তারপর রাজা প্রতাপমুকুটের কাছে গিয়ে বুদ্ধিদক্ষ আসল কথা গোপন করে বলল–একটা কঠিন অসুখ হয়েছে বজ্রমুকুটের তার আহার ত্যাগ করেছে। ওর এই অসুখ সারাতে হলে কর্ণাটকে চিকিৎসা করতে হবে। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে কর্ণাটকে নিয়ে গিয়ে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো আমি।

রাজা প্রতাপমুকুট বুদ্ধিদক্ষের কথা শুনে তাকে বললেন–আরো লোকজন সঙ্গে নিতে। বুদ্ধিদক্ষ বলল–বেশি লোক গেলে অসুবিধা হবে। আমরা দুজনে দুটি ঘোড়ায় চড়ে সেখানে চলে যাব।

এইভাবে কৌশলে রাজার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তারা কর্ণাটকের উদ্দেশে রওনা হল। সন্ধ্যার সময় তারা কর্ণাটকে উপস্থিত হল। এক বৃদ্ধের বাড়িতে তারা রাতে আশ্রয় নিল। সেই

বৃদ্ধা ছিল রাজবাড়ীর দাসী। বৃদ্ধার মন জয় করার জন্য প্রচুর ধন দিয়ে তাকে খুশী করে, 'মা' সম্বোধন করে ডাকতে লাগল। রাত কেটে গেল।

পরের দিন সকালে যখন রাজবাড়ির উদ্দেশে রওনা হল তখন বুদ্ধিদক্ষ তাকে বলল– মা, তোমাকে আমাদের জন্য একটি কাজ করতে হবে। রাজকন্যা পদ্মাবতাঁকে গোপনে বলবে যে, রাজকুমারের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল সে তোমার বাড়িতে আছে।

বৃদ্ধ তাদের কাছে থেকে প্রচুর অর্থ পেয়েছে। তার উপর 'মা' ডাক শুনে আর 'না' বলতে পারে না। গোপনে সে রাজকন্যাকে সব কথা বলল। রাজকন্যা মুখে কিছু না বলে ইঙ্গিতে তার অন্তরের কথা জানিয়ে দিল। সে নিজের উরু থাবড়ে যেন চীৎকার করে উঠল–যা...যা তারপর নিজের আঙ্গুল কপালে ঠেকিয়ে প্রায় দূর করে দিল বুড়িকে।

রাজকন্যার হেঁয়ালি কিছুই বুঝতে পারল না মূর্খ বুড়ি। তারপর বাড়িতে এসে যা যা করল এবং বলল, অবিকল তেমনি জানিয়ে দিল মন্ত্রিপুত্রকে।

বুড়ির কথা শুনে রাজপুত্রের মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু মন্ত্রিপুত্র রাজকন্যার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে হেসে, বন্ধুকে বলল–আর তিনটি দিন অপেক্ষা করো বন্ধু। তোমার মনোবাসনা সিদ্ধ হবে।

তিন দিন কেটে যাবার পর চতুর্থ দিন বুড়িকে রাজপ্রাসাদে যেতে দেখে বুদ্ধিদক্ষ বলল–মা, গোপনে তুমি রাজকন্যাকে বলবে যে, তাকে দেখবার জন্য রাজকুমার একেবারে ব্যাকুল।

বুড়ি ফিরে এসে রাজকন্যার সংকেত জানিয়ে দিল। বজ্রমুকুটের সেই সংকেত বোঝার মত বুদ্ধি নেই। কিন্তু বুদ্ধিমান বুদ্ধিদক্ষ রাজকন্যার ইঙ্গিত বুঝতে পারল। তারপর রাজপুত্রের যা করণীয়, সব বুঝিয়ে বলে দিল।

গভীর রাতে রাজপুত্র রাজপ্রাসাদের পশ্চিম দিকে যেতেই এক দাসী এসে তাকে একেবারে অন্দরমহলে নিয়ে গেল। রাজকন্যার সঙ্গে নিভৃতে মিলন ঘটল রাজকুমারের।

এক এক করে তিরিশ দিন, কেটে গেল। বজ্রমুকুট পদ্মাবতাঁকে বলল–আমার একবার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা দরকার। তার বুদ্ধির জন্যই আমি তোমাকে পেয়েছি। প্রথম দিন থেকে তোমার হেঁয়ালি আমি বুঝতে পারিনি। ওই বন্ধুই তোমার হেঁয়ালি বুঝে আমাকে এভাবে তোমার কাছে পাঠিয়েছে।

এই কথা শুনে পদ্মাবতী বলল–এতদিন আমাকে তোমার বুদ্ধিমান বন্ধুর কথা বলনি কেন? একজন উপকারী বন্ধুর সঙ্গে খালি হাতে দেখা করতে যাওয়া উচিত নয়। আমি নিজের হাতে তার জন্য কিছু মিষ্টি তৈরী করে দিচ্ছি। তুমি নিয়ে যাও।

বজ্রমুকুট খুব খুশি হয়ে পদ্মাবতীর দেওয়া মিষ্টি নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বুড়ির বাড়িতে এল। অনেক দিন পরে দুই বন্ধুর দেখা হল, কথা হল। রাজপুত্র বন্ধকে মিষ্টি খেতে দিল, কিন্তু বন্ধু মিষ্টি না খেয়ে ফেলে রাখল। তারপর রাজপুত্রের পীড়া পীড়িতে বুদ্ধিদক্ষ সেই মিষ্টি না খেয়ে রাস্তায় ফেলে দিল।

.

বুদ্ধিদক্ষের ব্যবহারে রাজপুত্র রেগে গিয়ে বলল–আমি রাজপুত্র, তোমার সম্মানীয়। আমি যাকে ভালোবেসে বিয়ে করতে যাচ্ছি, সেও তোমার সন্মানীয়া। তার পাঠান মিষ্টি এভাবে তুমি ফেলে দিলে?

রাজপুত্র রাগে মাথা ঠিক রাখতে না পেরে বুদ্ধিদক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই সময়েই দেখা গেল, একটি কুকুর এসে সেই মিষ্টিগুলি যেই খেয়েছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গেই ছটফট করতে করতে কুকুরটি মারা গেল।

এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল রাজপুত্র। বন্ধুকে আর কিছু বলার থাকল না। রাজকন্যার চাতুরী সে বুঝতে পেরেছে।

তারপর বুদ্ধিদক্ষ বলল–বন্ধু, দেখলে তো, মিষ্টিতে বিষ দেওয়ার কারণ কি?

রাজপুত্র লজ্জায় আর মাথা তুলতে পারছে না। বন্ধুর হাত ধরে বলল–আর নয় খুব হয়েছে, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই। তা না হলে আমাদের দুজনকেই ঐ পিশাচীনির হাতে মরতে হবে।

বুদ্ধিদক্ষ বলল–না, আমরা চলে যাব না। দুষ্টের সাজা হওয়ার দরকার। তুমি আবার রাজকন্যার কাছে গিয়ে গোপনে তার একটি অলঙ্কার নিয়ে আসবে। যেন সে জানতে না পারে। একটি ছোট ত্রিশূলের দাগ তার জানুতে দিয়ে আসবে।

বুদ্ধিদক্ষের কথামতো রাজপুত্র সব কাজ করল। রাজকন্যার অলঙ্কার বন্ধুর হাতে দিল। তারপর দুজনেই ছদ্মবেশ ধরল। মন্ত্রীপুত্র যোগীর বেশ ধরে ত্রিশূল হাতে রুদ্রমণ্ডল শ্মশানে এসে যোগ সাধনায় বসল, রাজপুত্র হল তার চেলা। রাজকন্যার অলঙ্কারটি নিয়ে সে রাজারে বেচতে গেল। রাজবাড়ির গহনা চুরি হওয়ার কথা সর্বত্র জানাজানি হয়ে গেছে। বেচতে গিয়ে ছদ্মবেশী রাজপুত্র ধরা পড়ল। তাকে নিয়ে যাওয়া হল রাজার কাছে বিচারের জন্য।

রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করল যে, সে এই অলঙ্কার কোথায় পেয়েছে।

বজ্রমুকুট বলল যে, তার মহাযোগী গুরুদেব এটি তাকে দিয়েছে বিক্রি করার জন্য। তিনি এখন রুদ্রমণ্ডল শ্মশানে যোগসাধনায় রত আছেন।

ধরে আনা হল ছদ্মবেশী বুদ্ধিদক্ষকে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল–গত রাত্রে এক পিশাচিনি তার কাছে এসেছিল। আমাকে সে এই অলঙ্কার দিয়ে বশ করতে চেয়েছিল। তার জানুতে আমার হাতের এই ত্রিশুল দিয়ে দাগ এঁকে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে পালিয়ে গেছে।

তার রাজ্যে পিশাচী। সর্বনাশ! মহা চিন্তায় পড়লেন দন্তবক্র। তাকে খুঁজে বার করার জন্য সারা রাজ্যে তল্লাসী চলল। কারুর জানুতে ত্রিশুলের চিহ্ন পাওয়া গেল না। শেষে রাজবাড়িতে খোঁজ নেওয়া হল। রাজকন্যার জানুতে ত্রিশূলের খোঁজ পাওয়া গেল। রাজা বুঝলেন পদ্মাবতী সেই পিশাচী বিচারে তিনি কঠোর। ক্ষমা করলেন না নিজের কন্যাকে। রাজ্য থেকে বের করে দিলেন পদ্মাবতাঁকে।

বিক্রমাদিত্যকে বেতাল এই কাহিনি শুনিয়ে বলল–মহারাজ, বলুন তো, এই কাহিনিতে ধর্মত সবচেয়ে বেশী পিপ কে করেছে?

বেতালের প্রশ্নের উত্তরে বিক্রমাদিত্য বললেন–ধর্মের বিচারে রাজা দন্তচক্র সবচেয়ে বেশি পাপ করেছে। রাজপুত্র বজ্রমুকুটের কোনো অপরাধ নেই। যথার্থই বন্ধুর কাজ করেছে মন্ত্রীপুত্র বুদ্ধিদক্ষ। কিন্তু রাজা দন্তচক্র! তার মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত, যথাসময়ে মেয়ের যে বিয়ে না দেয়, সে হয় মহাপাপী।

বিক্রমাদিত্যের উত্তর শুনে ব্রাহ্মণবেশী বেতাল খুশি হল।

ব্রাহ্মণবেশী বেতালের দ্বিতীয় কাহিনি

কর্ণাটকের রাজকন্যা পদ্মাবতীর কাহিনি শুনিয়ে এবং প্রশ্নের উত্তর পেয়ে বিক্রমাদিত্যের ওপর খুশি হয়ে বেতাল বলল—আমি আর একটি কাহিনি বলছি, শুনুন মহারাজ।

বহু পূর্বে যমুনার তীরে ধর্মস্থল নামে এক নগর ছিল। সেখানকার রাজার নাম গুণাধিপ। পরম ধার্মিক তিনি।

তার রাজ্যে হরিশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণীর নাম সুশীলা। তাদের সত্যশীল নামে এক ছেলে এবং মধুমতী নামে এক মেয়ে ছিল। কাশীরাজের ছেলে কেশর ছিল মহাগুণী সত্যশীল-এর বন্ধু।

অতীব সুন্দরী মধুমতী। ব্রাহ্মণ সুযোগ্য পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। কারণ মধুমতীর বিয়ে দিতে হবে। বারো বছর বয়স হল। সত্যশীলের ইচ্ছা কেশবের সঙ্গে তার বোনের বিয়ে দেবেন। ব্রাহ্মণ হরিশর্মা অমত করলেন না। মধুমতী কেশরের অচেনা নয় তাই রাজী হয়ে গেল। একটা দিন ও ঠিক করা হল বিয়ের।

হরিশর্মার মেয়ের পরিচয় অনেকেই জানে। সে সুন্দরী। তার বিয়ের কথা শুনে দুই ব্রাহ্মণ যুবক মধুমতাঁকে বিয়ে করতে এলেন। তাঁরাও প্রত্যেকে রূপবান। একজনের নাম বামন এবং অপরজনের নাম ত্রিবিক্রম।

সত্যশীল তার বন্ধু কেশবকে আনতে গেছে। কাকে কন্যাদান করবেন হরিশর্মা, এই ভেবে মহাচিন্তায় পড়লেন।

হরিশর্মা বুঝতে পারছেন না এখন তিনি কি করবেন। তিনি ব্রাহ্মণ যুবকদের বললেন—সত্যশীল আসুক কেশবকে নিয়ে। তোমরা এখানে থাক। তারপর যাকে বেশি গুণী বলে মনে হবে, তার সঙ্গেই আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব। সেই রাতেই ঘটে গেল মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনা।

রাতে বিছানায় শুয়ে মধুমতী হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। তার পায়ে কিছু কামড়ে দিয়েছে। দেখতে দেখতে বিষে নীল হয়ে উঠল তার দেহ। কারোর আর বুঝতে বাকী থাকল না যে, কোন বিষধর সাপ কামড়ে দিয়েছে। বামন আর ত্রিবিক্রম ছুটে গেল এক ওঝার কাছে। ওঝা এসে অনেক ঝাড়ফুঁক করল, কিন্তু কোনো ফল হল না। মধুমতী পরলোকে চলে গেল। বামন আর ত্রিবিক্রমের খুব মন খারাপ।

মৃতদেহটি পোড়ান হল। সত্যশীলের কাছে বিয়ের প্রস্তাব শোনামাত্রই কেশব মনে মনে মধুমতাঁকে বিয়ে করে ফেলেছে। কিন্তু সে এসে যা শুনল, তাতে শোকে কাতর হয়ে পড়ল– যেন তার স্ত্রীই মারা গেছে।

তিনজনেই শোকে কাতর। যেখানে মধুমতাঁকে পোড়ান হয়েছে, সেখান থেকে ছাই নিয়ে সারা গায়ে মেখে শ্মশানেই বসে থাকল বামন।

শ্মশান থেকে মধুমতীর অস্থি সংগ্রহ করে মাদুলীর মত করে গলায় বেঁধে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগল কেশব। আর ত্রিবিক্রম মনের দুঃখে সন্ন্যাসী হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে বেড়াতে লাগল। ত্রিবিক্রম ঘুরতে ঘুরতে একদিন সরযূ নদীর তীরে এক নগরে এসে উপস্থিত হল। এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে সেদিন ভিক্ষে করতে এল। ব্রাহ্মণের নাম রাম শর্মা। তিনি শিবভক্ত। সন্ন্যাসী অতিথিকে পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন। ব্রাহ্মণী ও সন্ন্যাসীর জন্য ভালো ভালো খাবার তৈরী করলেন।

সেই সময় হঠাৎ খবর এল ব্রাহ্মণের একমাত্র বালক পুত্র বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে খেলতে হঠাৎ মারা গেছে। ব্রাহ্মণী শোকে আকুল হয়ে মৃত পুত্রের কাছে ছুটে গিয়ে তার উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন।

রাম শর্মা শিব পূজা শেষ করে গৃহে ফিরে এই মর্মান্তিক খবর শুনে কোনো দুঃখ করলেন না। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে মন্ত্রবিদ্যাবলে পুত্রকে বাঁচিয়ে তুললেন। সঞ্জীবনী মন্ত্র তার জানা ছিল। তারপর সন্ন্যাসীর সেবা করলেন সমাদরে।

সন্ন্যাসী ত্রিবিক্রম সেই রাতে সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে রয়ে গেল। রাতেরবেলা রাম শর্মার চরণ জড়িয়ে ধরে ত্রিবিক্রম তার সব কথা খুলে বলল। এই সন্ন্যাসীর বেশ সেই মধুমতীর জন্যই।

ত্রিবিক্রমের প্রতি রাম শর্মার করুণা হল, তিনি তাকে সঞ্জীবনী মন্ত্র দান করলেন। ত্রিবিক্রম মনের আনন্দে হরিশর্মার বাড়িতে ফিরে এসে তাকে সব কথা জানাল। কিন্তু অস্থি ছাড়া তো এই মন্ত্র কাজ করবে না। অস্থি পাবে কোথা? তখন সত্যশীল বলল যে, তার বন্ধু কেশব মধুমতীর হাড় গলায় বেঁধে পাগলের মতো নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তারপর কেশবের সন্ধান পেয়ে তার কাছ থেকে মধুমতীর অস্থি নিয়ে ত্রিবিক্রম তার শেখা সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রয়োগ করল। দেখতে দেখতে সেই অস্থি থেকে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি বালিকা দেহের

সৃষ্টি হল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মধুমতী তার পূর্বরূপ ধারণ করল। প্রাণ ফিরে পেল। এখন তিন জন দাবিদার এই মধুমতীর।

এই কাহিনি শেষ করে রাজ্য বিক্রমাদিত্যকে বেতাল বলল–এই তিনজনের মধ্যে মধুমতীর কার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার উচিত।

রাজা বিক্রমাদিত্য হেসে বললেন–মধুমতীর বিয়ে হওয়ার উচিত বামনের সঙ্গে।

বেতাল জিজ্ঞাসা করল–কেন? বামন তো কিছু করেনি। মধুমতাঁকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য কেশব অস্থি সংগ্রহ করে রেখেছিল, আর ত্রিবিক্রম তার উপর সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রয়োগ করেছিল। তা না হলে মধুমতী কেমন করে বাঁচত? তাহলে মধুমতাঁকে বামন কেন পাবে?

এই কথার উত্তরে বিক্রমাদিত্য বললেন–কেশব মধুমতীর অস্থি সংগ্রহ করে পুত্রের কাজ করেছে। সঞ্জীবনী মন্ত্রের দ্বারা তার জীবন দান করে ত্রিবিক্রম পিতার কাজ করেছে। কোনও নারীর পিতা বা পুত্রের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না। বামন মধুমতীর দেহের ছাই মেখে স্বামীর কাজ করেছে।

বিক্রমাদিত্যের উত্তর শুনে বেতাল খুব খুশি হলো।

পাণিনির রুদ্র সাধনা

একদিন শৌনকাদি মুনিগণ মহামুনি লোমহর্ষণকে জিজ্ঞাসা করলেন –যে, আপনি হচ্ছেন মহাজ্ঞানী, আপনি ত্রিকালদর্শী ব্যাসদেবের শিষ্য, কোনো কিছুই আপনার অজানা নেই। তাহলে বলুন, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ কোনটি?

লোমহর্ষণ বললেন–সত্যি কথা যে, পৃথিবীতে তীর্থক্ষেত্রের কোনো অভাব নেই। কিন্তু কোনোটি সেরা তীর্থক্ষেত্র সে বিচার করা খুবই কঠিন। এ বিষয়ে একটি কাহিনি আপনাদের বলব, মন দিয়ে শুনুন।

সমান ঋষির ছেলে পাণিনি অল্প বয়সেই সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। বিদেশ থেকে আসা এক পণ্ডিত দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন।

বিভিন্ন দেশ ঘুরে পাণিনির গ্রামে এসে লোকমুখে পাণিনির পাণ্ডিত্যের কথা শুনলেন। তাঁকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। শুরু হল তর্কযুদ্ধ। উভয় উভয়কে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে থাকলেন। তারপর পাণিনি সেই বিদেশী পণ্ডিতের কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। যাঁকে এতদিন দেশের লোক সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে জানত, তিনি কিনা আজ পরাস্ত। লজ্জায় তিনি দেশ ছেড়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কেদার তীর্থে এসে পৌঁছোলেন। কেদারনাথের মন্দির দেখে এবং স্থানটি দেখে পাণিনির খুব ভালো লাগল।

পাণিনি স্থির করলেন, আর কোথাও না গিয়ে এখানে বসেই তিনি শিবের আরাধনা করবেন। প্রথম কয়দিন গাছের শুকনো পাতা, তারপর শুধু জল খেয়ে কাটালেন। এরপর সম্পূর্ণ অনাহারে তিনি কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন।

এইভাবে একমাস কেটে গেল। রুদ্রদেবের আসন নড়ে উঠল, তিনি ভক্তকে দর্শন না দিয়ে আর থাকতে পারলেন না। পাণিনির সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বললেন–তোমার তপস্যায় আমি প্রসন্ন। কিসের জন্য এমন কঠোর তপস্যা করছ? আমাকে বল, আমি নিশ্চয়ই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করব।

মহাদেবের মনোহর মূর্তি দেখে পাণিনি আনন্দে শিবের স্তব স্তুতি করে বললেন–হে মহেশ্বর, আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, যদি আমার মনস্কামনা পূর্ণ করতে চান, তাহলে আমাকে এই বর দিন, আমি যেন পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ লাভ করি।

পাণিনির প্রার্থনায় মহাদেব বললেন—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ মানস তীর্থ। অবশ্যই তুমি সে তীর্থ লাভ করবে। মানস তীর্থের জল হল জ্ঞান। নির্মল জ্ঞান লাভ করলে মানুষের মন থেকে রাগ, ভয়, হিংসা সব দূর হয়ে যাবে। যাও পাণিনি কাল বিলম্ব করো না, আমার প্রসাদে তুমি মানসতীর্থ লাভ করবে। অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করবে।

এই কথা বলে শিব অন্তর্হিত হলেন। আপন গৃহে ফিরে নিত্য মানসতীর্থে স্নান করে পাণিনি নির্মল জ্ঞান লাভ করলেন। জ্ঞানের আলোকে মন ভরে উঠল। তারপর একের পর এক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করতে লাগলেন। সূত্রপাঠ, গণপাঠ, লিঙ্গসূত্র, ধাতুপাঠ প্রভৃতি। এই সব গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি আজও অমর হয়ে আছেন।

কলিকালে পঞ্চপাণ্ডবের পুনরায় জন্মগ্রহণ

কুরুক্ষেত্রের মহাসমর আঠারো দিনব্যাপী চলেছিল। আর মাত্র দু-একদিন বাকী আছে। প্রায় নিশ্চিহ্ন কৌরবকুল। দুর্যোধনকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বললেন–রাত্রিবেলা আমি একাই যুদ্ধ করে পঞ্চপাণ্ডবকে নির্মূল করে দেব। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিলেন দুর্যোধন। তখনকার দিনে রাতে যুদ্ধ নিষেধ ছিল।

পাণ্ডবদের বিপদ বুঝতে পেরে শ্রীকৃষ্ণ শিবের শরণাপন্ন হলেন। তার প্রার্থনায় শিব রাতে পঞ্চপাণ্ডবের শিবির রক্ষা করবেন বলে রাজী হলেন। শিব যখন দায়িত্ব নিয়েছেন, তখন আর কোনো চিন্তা নেই। নিশ্চিন্ত হলেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে চলে গেলেন, আর শিবির থেকে বেরিয়ে পঞ্চপাণ্ডব গেলেন সরস্বতী নদীর তীরে রাত কাটাবার জন্য। রাতে তো আর যুদ্ধ হবে না তাই নিশ্চিন্ত।

অশ্বত্থামা মাঝরাতে পাণ্ডব শিবিরে এলেন। শিবিরে এসে দেখল ত্রিশূল হাতে শিবিরের দ্বারা স্বয়ং মহাদেব দাঁড়িয়ে আছেন। অশ্বত্থামা সঙ্গে সঙ্গে শিবের স্তব-স্তুতি আরম্ভ করে দিলেন। শিব একটুতেই সন্তুষ্ট হন। তিনি অশ্বত্থামাকে বললেন–কেন এত আমার স্তব স্তুতি করছ? তোমার কি চাই?

অশ্বত্থামা বললেন–আমি এই শিবিরে ঢুকতে চাই। শিব দ্বার ছেড়ে দিলেন, শুধু তাই নয় তাঁর হাতে একটা তলোয়ারও দিলেন। কিন্তু এর পরিণাম কি হবে একটু ভেবে দেখলেন না শিব।

এখন পায় কে অশ্বত্থামাকে। সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলে একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়েছিল। তাদেরকেই পঞ্চ পাণ্ডব মনে করে শিবের দেওয়া তলোয়ার দিয়ে মাথা কেটে ফেললেন অশ্বত্থামা।

প্রভাত হতেই পঞ্চপাণ্ডবের কাছে গেল দ্রৌপদীর পাঁচ ছেলেই নিহত। শিব শিবির পাহারায় থেকে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করলেন। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন পঞ্চপাণ্ডব। পাঁচ ছেলের মৃত্যুতে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তাঁরা শিবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁরা যত অস্ত্র মারেন সবকিছুই আত্মসাৎ করে নেন শিব। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব তখন অস্ত্র ফেলে শিবের বুকে পেটে চড়, চাপড়, ঘুসি মারতে লাগল। শিবের গায়ে কিন্তু যুধিষ্ঠির হাত তোলেন নি।

সেই প্রহারের ফলে শিব খুব রেগে গিয়ে অভিশাপ দিয়ে বসলেন। তোমরা কৃষ্ণের ভক্ত মানে আমারও ভক্ত। আমার প্রতি তোমরা আজ যে আচরণ করলে, কলিযুগে তোমাদের এর ফল ভোগ করতেই হবে। এই বলে শিব অন্তর্হিত হলেন।

শিবের অভিশাপে পাণ্ডবদের মনে খুব দুঃখ হল। তারা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলে তিনি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাদের কাছে সব শুনে কৃষ্ণ আবার শিবকে স্মরণ করলেন।

কৃষ্ণ শিবকে বললেন–যে, তিনি পাণ্ডবদের যত অস্ত্র আত্মসাৎ করেছেন সব যেন ফিরিয়ে দেন। আর ওদের ওপর দেওয়া অভিশাপ থেকে যেন মুক্ত করেন তাদের।

শিব বললেন–সবই তোমার মায়া কৃষ্ণ। উচ্চারিত বাক্য আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। বিফল হবে না, কিছুটা অন্তত ফলবেই। যুধিষ্ঠির কলিতে বৎসরাজের পুত্র হয়ে জন্মাবে। তার নাম হবে বলখানি। রাজা হবে শিরীষপুরের। ভীম আমাকে দারুণ দুর্বাক্য বলেছে। ম্লেচ্ছকুলে বীরণ নামে ওর জন্ম হবে। অর্জুন পরিমলের পুত্র হয়ে ব্রহ্মানন্দ নামে খ্যাত হবে। নকুল লক্ষ্মণ নাম নিয়ে কান্যকুব্জের রাজা রত্নভানুর পুত্র হয়ে জন্মাবে। সহদেব রাজা ভীমসিংহর পুত্র হয়ে দেব সিংহ নাম নিয়ে জন্মাবে। শুধু তাই নয় ধৃতরাষ্ট্রও জন্মগ্রহণ করবে আজমীরে। কলিতে তার নাম হবে পৃথ্বীরাজ। তখন তার মেয়ে রূপে দ্রৌপদী জন্মগ্রহণ করবে।

শ্রীকৃষ্ণ আর কিছু না বলে শিবের কথা মেনে নিলেন। তারপর বললেন–সব কিছুর প্রয়োজন হবে কলিতে। আমিও আর চুপ করে থাকতে পারব না। তখন পাণ্ডবদের রক্ষা করবে আমার শক্তি। মায়াদেবী আমারই মায়ায় এর রমণীয় পুরী তৈরী করবে, যার নাম হবে মায়াবতী। সেখানে দেবরাজের পুত্র রূপে আমারই অংশে জন্ম হবে উদয়সিংহের।

ঈশ্বরদ্বয়ের মুখে ভবিষ্যৎবাণী কখনও মিথ্যা হবার নয়। শাপগ্রস্ত হয়ে পঞ্চপাণ্ডবের আবার কলিকালে জন্ম হয়েছিল।

ভোজরাজের দ্বারা আর্য্যধর্মের প্রবাহ সচল, কলির দুরবস্থা ও বিষ্ণুর আশ্বাস

শালিবাহনের বংশের শেষ রাজা ছিলেন রাজা ভোজরাজ। ভোজরাজের মনে খুব দুঃখ। কারণ শালিবাহন যে প্রতাপে রাজত্ব করে গেছেন, সেই প্রতাপ কমতে কমতে তার আমলে একেবারে নিশ্চিহ্ন, হয়ে গিয়েছিল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন কেমন করে হৃত গৌরব উদ্ধার করা যায়। শাস্ত্রবল, লোকবল, অর্থবল কোন কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না। তাঁর রাজসভায় বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু হৃত গৌরব উদ্ধারের উপায় খুঁজে তিনি পাচ্ছিলেন না।

অনেক চিন্তা করে ভোজরাজ দিগ্বিজয়ে যাওয়াই ঠিক করলেন। বিক্রমাদিত্য না থাকায় এখন তাই ম্লেচ্ছদের আধিপত্য আবার প্রবল হয়েছে। বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দিগ্বিজয় বেরিয়ে পড়লেন ভোজরাজ। কয়েকজন ব্রাহ্মণও সঙ্গে ছিলেন। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসও রাজার সঙ্গে ছিলেন।

গান্ধার, কাশ্মীর, নারব, প্রভৃতি দেশ তিনি একে একে জয় করলেন। তারপর সিন্ধুতীরে এসে সেখানে মরুস্থলে তিনি শিবের আরাধনা করলেন।

হঠাৎ আকাশবাণী হল–তুমি কালেশ্বরে যাও ভোজরাজ। বাহিক দেশটাকে গ্রাস করেছে ম্লেচ্ছরা। পূর্বকালে যে ত্রিপুরকে আমি বিনাশ করেছিলাম, আমারই বরে মহমদ নামে তাদের একজন বাহিক দেশকে মোহগ্রস্ত করেছে। সে পিশাচ ধর্মে অতিশয় দক্ষ। আমার প্রাসাদে তোমার কোন ভয় থাকবে না।

আকাশবাণী শুনে বাহিকে ফিরে গেলেন ভোজরাজ। একদিন মহমদ রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসে বলল–যে দেবতাদের তোমরা পূজা করো, এখন তারা আমাদের চাকর। এমনকি তারা আমাদের এঁটো পর্যন্ত খায়।

এমন দুর্বাক্য শুনে কালিদাস ভীষণভাবে রেগে গিয়ে বললেন–নরাধম, তুই যা নয় তাই বললি। এখন দেখ আমাদের ক্ষমতা।

এই কথা বলে কালিদাস ব্রাহ্মণদের দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে দশ হাজার নবার্ণ মন্ত্র জপ করে এমন এক যজ্ঞ করলেন, সেই মহমদ তাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এভাবে গুরুর মৃত্যু দেখে তার শিষ্যরা ভয়ে গুরুর পোড়ানোর কিছু ছাই নিয়ে পালিয়ে গেল মহদীনপুরে। সেখানে মৃত গুরুর ছাই সযত্নে রেখে তারা বসবাস করতে লাগল। সেই মহদীনপুর হল স্লেছেদের তীর্থস্থান।

একদিন সেই মায়াবী মহমদ বিকটাকার মূর্তি ধরে রাত্রিবেলা ভোজরাজকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলল– রাজা, আমি স্বীকার করছি যে তোমাদের আর্যধর্ম খুবই শক্তিশালী। তাই বলে আমি কখনই তোমাদের পদানত হব না। আমিও পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিপক্ষ ধর্ম স্থাপন করব। তোমাদের ধর্মে অনেক বিধি-নিষেধ, খাদ্যের বিচার আছে। ওসব কিছুই আমাদের ধর্মে থাকবে না।

যাই হোক, লুপ্তপ্রায় আর্যধর্মকে ভোজরাজ পুনরুদ্ধার করলেন। যবনরা তাদের আচার নিয়ে সিন্ধুর ওপারেই থেকে গেল। আর যারা আর্যাবর্তে থেকে গেল তারা আর্যধর্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে লাগল।

ভোজরাজ এখন আর নেই। কিন্তু তিনি যে আর্যধর্মের প্রবাহকে ত্বরান্বিত করেছেন এখনও সেই প্রবাহ চলছে। শুরু হল ধর্মলোচনা। ম্লেচ্ছরা আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারল না। কলির হল বড় বিপদ। তার অস্তিত্বই যে লোপ পাবে। তিনি বিষ্ণুর স্তব-স্তুতি করলেন। বিষ্ণু আশ্বাস দিলেন–ভয় নেই কলি, তোমার জন্য আমি ম্লেচ্ছ রাজ্য স্থাপন করব।

শ্রীচৈতন্যের মাতা-পিতার পূর্বজন্মের কাহিনি

পূর্বকালে বিষ্ণু শর্মা নামে একজন নিরহঙ্কারী, সদাচারী, মিষ্টভাষী, সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার স্ত্রীও স্বামীর মতো। ভিক্ষাই ব্রাহ্মণের জীবিকা।

নিত্যদিনের মতো ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। গৃহে ব্রাহ্মণী হরিনামের মালা জপ করছেন। এমন সময় ব্রাহ্মণী কুটিরের ভিতর থেকেই দেখলেন একজন জটাজুট ধারী সন্ন্যাসী কুটিরের দ্বারে এসে ভিক্ষা চাইছেন। ব্রাহ্মণী ভাবলেন, সন্ন্যাসীকে কি দিয়ে আপ্যায়ণ করবেন, ঘরে যে কিছুই নেই। পরনে ও শতচ্ছিন্ন একটি শাড়ী। কুটিরের বাহিরে আসতেও লজ্জা করছে। তখন তিনি ভিতর থেকেই বললেন–আসুন, বসুন এই পিঁড়িতে। আমার স্বামী ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। তিনি এলেই রান্না করে আপনার সেবার ব্যবস্থা করব। এখন আপনি হাত মুখ দুয়ে একটু জল সেবা করুন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর দেখল, যে এরা সত্যিই খুবই দরিদ্র। ভাবলেন, দীর্ঘদিন তপস্যা করে যে স্পর্শমণি আমি পেয়েছি, তাই দিয়ে এই কুটির বাসিনীকে যদি ধনী করে তুলি তাতে মন্দ কি? দারিদ্র্যের জ্বালা আমি বুঝি। সেই জ্বালা দূর করবার জন্য শিবের আরাধনা করে আমি এই স্পর্শমণি পেয়েছি।

তারপর সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণীকে বললেন–আমার বড় ক্ষুধা মা। ত্রিশ বছর অনাহারে থেকে শিবের বরে আমি একটি পাথর পেয়েছি। গৃহে ফিরতে আমার অনেক পথ যেতে হবে। তাই ভাবলাম তোমার কুটিরেই কিছু আহার করি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য। তোমাদের এমন দুর্দশা যে, সামান্য কিছু আহারও বাড়িতে নেই। কি আর করা যাব, ততক্ষণে আমি স্নান সেরে আসি। এক কাজ কর মা তোমার বাড়িতে যত লোহা আছে এই স্পর্শমণি দিয়ে সব সোনা করে নাও। তোমাদের দুঃখ ঘুচবে, আর ভিক্ষা করে খেতে হবে না।

এই বলে সেই স্পর্শমণিটি সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণীকে দিতে চাইলে, তিনি সেটি নিজের হাতে না নিয়ে শুধু বললেন–ওখানে রেখে দিন। সেটি রেখে সন্ন্যাস স্নানের জন্য চলে গেলেন।

ব্রাহ্মণী তখন চিন্তা করলেনবড় গরীব আমরা, ভিক্ষা ছাড়া আর কোনো সংস্থান নেই আমাদের। ব্রাহ্মণ বুড়ো হয়েছেন। আর কতদিন ভিক্ষা করবেন। কোনো ছেলেপুলে ও আমাদের নেই যে শেষের দিনে আমাদের দেখবে। এই পাথরের দ্বারা আমরা যদি বড়লোক হতে পারি, তাহলে আমাদের আর কোনো চিন্তা থাকবে না।

আবার তিনি ভাবলেন–না, স্বামী আগে ফিরে আসুন। তিনি যা বলবেন, তাই হবে। আমি না হয় তাকে বুঝিয়ে বলব। যদি তিনি স্বীকার করেন তো ভালই, না হলে সন্ন্যাসীর জিনিস সন্ন্যাসীকে ফিরিয়ে দেব।

এই রকম সাত পাঁচ ভাবছেন ব্রাহ্মণী। সেই সময় ভিক্ষে করে ব্রাহ্মণ ফিরে এলেন। ব্রাহ্মণী সন্ন্যাসী ঠাকুরের সব কথা তাকে বললেন।

সব শুনে ব্রাহ্মণ বললেন–ওসব পাপের জিনিস ব্রাহ্মণী, ঘরে রাখতে নেই ওসব কি হবে বড়লোক হয়ে? এই তো বেশ আছি। ভগবান আমাদের ভাগ্যে যা দিয়েছেন, তার বেশি কিছু আশা করা উচিত নয়। যখন আমি অথর্ব হয়ে পড়ব, আর ভিক্ষায় যেতে পারব না, গোবিন্দই তখন আমাদের দেখবেন, আমাকে মণিটি দাও, আমি নদীতে ফেলে দিয়ে আসি।

ব্রাহ্মণী বাধা দিয়ে বললেন–না, সেটা করা উচিত হবে না। আমরা গরীব তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর যখন তার এই মণিটি চাইবেন, তখন কী উত্তর দেব?

ব্রাহ্মণ বললেন–তখন যা হয় দেখা যাব। এই নদীতে ফেলে দিয়ে আসি। ব্রাহ্মণী আর কোনো প্রতিবাদ করলেন না। ব্রাহ্মণ স্পর্শমণিটি নদীতে ফেলতে চলে গেলেন।

সন্ন্যাসী স্নান সেরে এসে দেখলেন ব্রাহ্মণের কুটিরে কোনো সোনা নেই। লোহার টুকরোগুলো তেমনিই পড়ে আছে। তিনি ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করলেন–কই আমার স্পর্শমণিটা দাও। আর তোমার বাড়ির কোনো লোহাকেই তো সোনা করে নাওনি দেখছি।

ব্রাহ্মণী ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন–আমার স্বামী ওসব পছন্দ করেন না। তাই তিনি সেই মণিটি নদীতে ফেলে দিয়েছেন।

এই কথা শুনে সন্ন্যাসী রাগে জ্বলতে লাগলেন এবং গভীর দুঃখে সে বলতে লাগলেন–হায়! হায়! এ আমার কি সর্বনাশ হলো গো। ত্রিশ বছর কঠোর সাধনা করে যে মণি পেলাম, তার গুরুত্ব না বুঝে সেটিকে নদীতে ফেলে দিলেন। এই বলে সন্ন্যাসী কেঁদে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। এই সময় ব্রাহ্মণ ফিরে এসে সন্ন্যাসীর সেই দৃশ্য দেখলেন। তাকে দেখে সন্ন্যাসী উঠে পড়ে বললেন–তুমি আমার এ কি সর্বনাশ করলে। আমার শিবদত্ত মণিকে তুচ্ছ জ্ঞান করলে। তুমি গরীব ব্রাহ্মণ, কেমন করে বুঝবে স্পর্শমণির গুণ। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দেখে করুণা করতে গেলাম আর তুমি ভিক্ষুক হয়ে সেটা নদীতে ফেলে দিয়ে এলে?

সন্ন্যাসীর দুঃখ দেখে ব্রাহ্মণ বললেন–আপনার যখন এত প্রয়োজন মণিটির, তাহলে আবার কুড়িয়ে দিলেই হবে। আমার সঙ্গে চলুন। ঘর্ঘরা নদীতে এসে ব্রাহ্মণ অল্পজলে নেমেই সেই মণিটি কুড়িয়ে দিলেন। বললেন–এই নিন আপনার সেই মণি।

মণিটি হাতে নিয়ে সন্ন্যাসী বললেন–এটা তো সেই মণি নয়। শিব প্রদত্ত স্পর্শমণিটি ছিল বেশ ছোট। এটাতো দেখছি বেশ বড়। তুমি কি আমাকে বালক ভেবেছ? কঁচকে হীরা বলছ?

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন–আপনার মনিটির কি গুণ ছিল?

সন্ন্যাসী বলল যে সেটি কোনো লোহাতে ঠেকালে সেটি সোনা হয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণ বললেন–আপনি লোহা এখানে কোথায় পাবেন? এক কাজ করুন, কত নুড়ি, পাথর পড়ে আছে। তাতেই একটু ছুঁড়ে দেখুন না।

সন্ন্যাসী অবহেলা ভরে একটি পাথরে মণিটি ঠেকাতেই সেটি উজ্জ্বল সোনায় পরিণত হল। পাশে ছিল কয়েকটি কাটা গাছ। সেই গাছগুলিও মণির স্পর্শে সোনা হয়ে গেল।

সন্ন্যাসী অবাক হয়ে ভাবলেন যে মণি শুধুমাত্র লোহাকেই সোনা করতে পারে, কিন্তু কাটা গাছ, নুড়ি-পাথর সোনা হচ্ছে কিভাবে? এই ব্রাহ্মণ কে? যিনি ইচ্ছে করলে অসীম ধনসম্পদের অধিকারী হতে পারেন। অথচ তার মনে বিন্দুমাত্র লোভ নেই। ভিক্ষাই যাঁর সম্বল। সাধারণ নন এই ব্রাহ্মণ। নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্মণ এমন কোনো ধনে ধনী, যার সন্ধান অন্য কেউ জান না।

সন্ন্যাসী মণিটি ঘর্ঘরার জলে ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মণের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললেন–আপনিই প্রকৃত ধনী। তা না হলে এই পার্থিব ধনকে এমন করে অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলতে পারতেন না। দয়া করে আমাকে আপনার গোপন ধনের এক কণা দিন।

বিষ্ণুর উপাসক ব্রাহ্মণ বললেন–এ জগতে বিষ্ণু ছাড়া বড় ধন আর কি আছে? তাকে আশ্রয় করে, নির্বিকার চিত্তে তার শরণ নিলে কোনো অভাব থাকে না।

সন্ন্যাসীকে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বিষ্ণুর তপস্যায় বসলেন। সেই তপস্যার তেজে সূর্যমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে উঠল। চঞ্চল হয়ে উঠল দেবলোক। কি চান ব্রাহ্মণ?

ব্রাহ্মণ যেন মনে মনে এই চাইছেন–হে বিষ্ণু, মানুষকে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে না রেখে, তাদের চৈতন্য দাও। তারা তোমাকে যেন ভুলে না যায়। কলির মোহ-ফঁদে যাতে পা না দেয়।

স্বর্গের কশ্যাপ অদিতি, মথুরার বসুদেব দেবকী, অযোধ্যার দশরথ কৌশল্যা তারা এলেন নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র আর শচীদেবী রূপে, এই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী তাদেরই সঙ্গে মিলে গেলেন।

সেই সূর্যমণ্ডলের তেজ প্রথমে এল জগন্নাথ মিশ্রের শরীরে, তার থেকে শচীদেবীর অঙ্গে।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যার সময় সকলঙ্ক চন্দ্রে গ্রহণের ছলে জগতের সকল জীবকে হরিনাম বলতে বলতে নবদ্বীপ ধামে অকলঙ্ক শ্রীগৌরহরি আবির্ভূত হলেন। অন্তরীক্ষ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল। দেবতারা স্তবগান করছে–হে শচীনন্দন, তুমি যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে। কখন নৃসিংহ, কখন মৎস্য, কখন বরাহ, কখন বামন রূপে ধরে পৃথিবীকে বারে বারে তুমিই উদ্ধার করেছ। কলির মানুষরা স্রষ্টাকে অস্বীকার করছে। তারা আত্মজ্ঞান হারা। নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। মোহ-মায়ার জালে তারা আবদ্ধ। পৃথিবীর এই দুর্দিনে তোমার আবার আবির্ভাব হল। তুমি অসুর বিনাশকারী। কলির মানুষেরা প্রত্যেকেই অসুরভাবাপন্ন। প্রেম দান করে অসুরভাব থেকে সকলকে মুক্ত কর। জীবকে চৈতন্য দান কর। জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে তুমি খ্যাতি লাভ করবে।

যবন শক্তি যখন ভারতবর্ষকে গ্রাস করতে উদ্যত হল, চারিদিকে বৌদ্ধধর্ম যখন প্রবল হয়ে উঠেছে–ঠিক সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে অবতীর্ণ হলেন নবদ্বীপে। অল্প বয়সেই পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন তিনি। গৃহী হয়ে ও সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে প্রেমধর্ম প্রচার করলেন। সবরকম বিভেদ প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে একাকার করে দিলেন। তাঁর অপ্রতিহত গতির সামনে বৌদ্ধ ও যবন শক্তি থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

পদ্ম মহাপুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ

উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

সাত্ত্বিক পুরাণগুলির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের পরেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে এই পদ্মপুরাণ। এই পুরাণখানি সুবিশাল। এই পুরাণের ছয়টি খণ্ড বর্তমানে পাওয়া যায়। স্বর্গ, ভূমি, পাতাল, ব্রহ্মা, ক্রিয়াযোগ ও উত্তর। বৈষ্ণবদেব কাছে বহুতত্ত্বে পূর্ণ এই পুরাণটি অতি আদরের গ্রন্থ। বহু কাহিনী সম্বলিত এই পুরাণ। বিশেষ করে শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনী পাতাল খণ্ডে সুবিস্তৃত। জাম্ববান কথিত পুরাকল্পীয় রামায়ণ, একদশীর কাহিনি প্রভৃতি।

নর্মদা বা রেবা-মাহাত্ম্য

প্রমোহিনী, সুশীলা, সুস্বরা, সুরারা আর চন্দ্রিকা এই পাঁচজন গন্ধর্ব-কুমারী পরস্পর পরস্পরকে খুব ভালবাসত। তারা যেন পাঁচ বোন। সকলেই রূপবতী। তারা ভাব-নৃত্য এবং বেণু-বীণাদি বাদ্যযন্ত্র বাদনে সকলেই দক্ষা। একেবার বৈশাখ মাসে দেবী গৌরীর আরাধনা করবার ইচ্ছায় পঞ্চসখী মিলিতা হল। নানা পুষ্প চয়ন করতে করতে বনে ভ্রমণ করে অবশেষে তারা অচ্ছেদ সরোবরে উপস্থিত হল। তারপর মাটি দিয়ে গৌবীর মূর্তি গড়ে সোনা-মুক্তো দিয়ে ভূষিত করে গন্ধ চন্দন পুষ্প দিয়ে দেবীর পূজা করে বিভিন্ন কৌশলে নৃত্যও করল তারা। তারপর পাঁচসখী মধুর স্বরে গান শুরু করল।

যখন তারা সঙ্গীতের রসে একেবারে নিমগ্ন, এমন সময় মুনিবর বেদনিধির জ্যেষ্ঠ পুত্র তীর্থপ্রবর স্নান করবার জন্য অচ্ছেদ সরোবরে এসে উপস্থিত হল। মদনকেও যেন হার মানায় তার রূপ। তীর্থ প্রবরকে দেখে পাঁচ গন্ধর্ব কুমারী মনে মনে ভাবছে–এই ব্যক্তি বোধ হয় আমাদের অতিথি হবে। তখন তারা নৃত্য-গীত ছেড়ে এসে আরও ভালভাবে এই যুবককে দেখাবার জন্য উৎসুক হল। কারও চোখের যেন পলক পড়ছে না। তারা মনে মনে বিচার করছে এই পুরুষ কি রতিপতি মদন। আবার ভাবছে, যদি মদন হত তাহলে তার সঙ্গে নিশ্চয় রতি থাকতো। অশ্বিনীকুমার যুগলও নয়। তারা সবসময় যুগ্মচারী, অর্থাৎ কেউ তারা একা একা হয়ে থাকে না। তাহলে এ যুবক নিশ্চয় কোনও গন্ধর্ব, কিন্নব, সিদ্ধ অথবা কোন কামরূপধারী হবে। কোন ঋষিপুত্রও হতে পারে।

গন্ধকুমারীগণ ভাবছে–গৌরী আমাদের পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে, আমাদের জন্য এই রূপবান বরকে পাঠিয়েছেন। তখন পাঁচ কুমারীই এই বাক্য উচ্চারণ করল–"আমি একে বরণ করলাম।"

ঋষিপুত্র তীর্থপ্রবর স্নান, তর্পণ, মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করে সেই কুমারীদের কথা শুনে মনে মনে চিন্তা করল–কি আশ্চর্য! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, প্রভৃতি দেবগণ, যোগাবলম্বী মুণিগণ ও রমণীদের নীলাদ্বারা বিমোহিত হন। ধর্মরক্ষণের চেষ্টা করেও আমি তাদের দ্বারা মোহিত হচ্ছি। আমার এখন কর্তব্য হচ্ছে এরা আমার কাছে আগে আমার গৃহে ফেরা উচিত।

এই চিন্তা করে ঋষিকুমার যোগবলে হঠাৎ অদৃশ্য হল। এই দৃশ্য দেখে পাঁচকুমারী শূন্যহৃদয়ে দশদিক অন্ধকার দেখতে লাগল। তারা তখন পরস্পর বলাবলি করল–এ নিশ্চয় ইন্দ্রজাল অথবা মায়াজাল। নচেৎ এই তো দেখলাম, তাহলে আবার অদৃশ্য হল। কেমন করে? হায়! কি কষ্ট। বিধাতা কেনই বা তোমাকে দেখালেন, আর এখানেই বা আনলেন কেন? তোমার চিত্ত কি

দয়াহীন? আমাদের প্রতি কি তোমার মন নেই? কি নিষ্ঠুর তুমি। আমাদের মনহরণ করে তুমি কি আমাদের পরীক্ষা করছ? হে হৃদয়েশ্বর, যদি তোমার আর দেখা না পাই, তাহলে আমরা আর বাঁচব না। তুমি আবার ফিরে আসবে এই আশায় এখনও আমার জীবিত আছি। যেখানে তুমি আছ, সেখানেই আমাদের কে নিয়ে চল।

কন্যাগণ এইভাবে বিলাপ করেও যখন ঋষিপুত্রের আর দেখা পেল না, তখন নিজ নিজ পিতার ভয়ে তারা নিজেদের গৃহের দিকে যেতে শুরু কর। অপরাহ্নে সকলেই গৃহে ফিরলে, তাদের মা নিজ নিজ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করল–এত দেরী হবার কারণ কি?

তার উত্তরে তারা বলল–অচ্ছেদ সরোবরে কিন্নরীগণের সঙ্গে খেলা করতে করতে এত বেলা হয়ে গেছে বুঝতে পারে নি। কারোরই যেন কথা বলবার ইচ্ছা নেই। কখন তারা মাটিতে শয়ন করল। জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। কখন বা বিছানায় পড়ে কাঁদল। আহারে তাদের রুচি নেই। এইভাবে জ্বরাক্রান্তের মতো সেই রাত্রিটি কোনমতে ধৈর্য্য ধরে কাটাল। রাতে কারো চোখের ঘুম আসে না। যেই মুহূর্তে পূর্বাকাশে সূর্যোদয় লক্ষ্য করল, আর ঘরে মনে থাকল না। নিজ নিজ মায়ের কাছে অনুমতি নিয়ে আবার তারা গৌরী পূজার জন্য বেরিয়ে পড়ল। সেই সরোবরে স্নান করে আগের মতো ধূপদীপ দিয়ে গৌরী পূজা করে নৃত্যগীত শুরু করল।

সেই ঋষিকুমার আগের দিনের মতো স্নানের জন্য অচ্ছেদ সরোবরে উপস্থিত হলে সেই কন্যাগণ অতি আনন্দের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কুমারের কাছে গিয়ে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে এক বেষ্টনী তৈরী করে তাকে বন্ধন করল। তারপর বলল–প্রিয়, আগের দিন তুমি চলে গিয়েছ। কিন্তু আজ আর যেতে পারছ না। আমরা তোমাকে হরণ করেছি।

তখন ঋষিকুমার বলল–ভাল কথাই তোমরা বলেছ, কিন্তু আমি ব্রহ্মচারী। বিদ্যাশিক্ষা লাভের জন্য গুরুকুলে বাস করি। তোমাদেরকে আমি যদি বিবাহ করি, তাহলে আমার ধর্ম নষ্ট হবে। যে আশ্রমে যেমন ধর্ম বিহিত আছে, পণ্ডিতগণের তা পালন করা উচিত। তাই আমি এই বিবাহ ধর্ম বলে মণি করি না।

ঋষিকুমারের এই কথা শুনে সেই কন্যাগণ বলল–ধর্ম থেকে অর্থ, অর্থ থেকে কাম এবং কাম থেকে সুখরূপ ফল সৃষ্টি হয়। তোমার ধর্ম বাহুল্য প্রযুক্ত সেই কাম সামনে উপস্থিত। তাই নানাবিধ ভোগসহ তার সেবা কর।

ঋষিকুমার বলল–সত্য বটে তোমাদের বাক্য। কিন্তু আমি আবশ্যক ব্রত সমাপন করে গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে তবেই বিবাহ করব। এর অন্যথা কখনো করতে পারব না।

তার উত্তরে কন্যাগণ বলল–তুমি সুন্দর, কিন্তু মূর্খ। বেদজ্ঞ সুধী ব্যক্তির সিদ্ধ ঔষধ, সিদ্ধ রসায়ন, সিদ্ধ নিধি, সকুলসম্ভূতা বারাঙ্গনা, সিদ্ধ মন্ত্র, সিদ্ধ রস–এই সবই ধর্মতঃ সেব্য। কার্য্য যদি দৈববশতঃ সিদ্ধিলাভ করে, তবে নীতিজ্ঞ ব্যক্তি তাতে উপেক্ষা করে না। কারণ উপেক্ষা কখনই ফলপ্রদ হয় না। তাই আর দেরী করা উচিত নয়, বিষ থেকেও অমৃত গ্রহণ করা উচিত। অপবিত্র স্থান থেকেও কাঞ্চন গ্রহণ করা কর্তব্য, নীচের কাছ থেকেও উত্তমা বিদ্যা শিক্ষণীয়, এক নীচকুল থেকেও স্ত্রীরত্ব গ্রহণ করা উচিত। একএই সব কারণে তুমি এই মঙ্গলকর্ম স্বীকার কর, এখন গান্ধর্ব বিবাহ ছাড়া আমাদের বাঁচবার আর কোন উপায় নেই।

কুমারীদের এমন কথা শুনে ঋষিকুমার বলল–অর্থ, মোক্ষ, কাম, ধর্ম–এই চারটি যথাক্রমে উপাসিত হলে ফলপ্রদ হয়। তার বিপরীত হলে নিষ্ফল হয়। আমি ব্রতী, অকালে দার পরিগ্রহ করব না। যে জন ক্রিয়াকাল জানে না, সে ক্রিয়াফল পায় না।

ঋষিকুমারের এখন কথা শুনে প্রমোহিনী হাত ছেড়ে দিয়ে ঋষিকুমারের পদযুগল ধরল। সুশীলা ও সুস্বরা তার দুই বাহু ধরল। সুস্বরা তাকে আলিঙ্গন করল। আর চন্দ্রিকা তার মুখে চুম্বন করতে লাগল।

তবুও সেই ঋষিকুমার নির্বিকার। কিন্তু পরে সেই ব্রহ্মচারী প্রচণ্ড ক্রোধে পাঁচ কুমারীকে অভিশাপ দিল–তোরা আমার সঙ্গে পিশাচীর মত ব্যবহার করলি, তাই তোরা পিশাচী হবি।

এই অভিশাপ শুনে কুমারীগণ অতি ক্ষোভের সঙ্গে বলল–তোর হিতের জন্য আমরা চেষ্টা করলাম, আর তুই কিনা আমাদের অভিশাপ দিলি, আমরাও তোকে অভিশাপ দিচ্ছি, তুই ও পিশাচ হবি।

এইভাবে পরস্পর শাপ প্রদানের ফলে পাঁচ কুমারী আর ঋষিকুমার পিশাচত্ব লাভ করল। তারা তখন দারুণ ক্লেশে কান্নায় ভেঙে পড়ল। তাদের সবার পিতামাতা তাদের এই দশা দেখে গভীর শোকে মুহ্যমান হল। পরে এই পিশাচ-পিশাচীরা সেই সরোবরের তীরে আহার সন্ধানের জন্য ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করে অতি দুঃখে বাস করতে লাগল।

এই ভাবে বহুকাল কেটে যাবার পর সদৃচ্ছ বিচরণকারী মহর্ষি লোমশ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তখন তাকে ভক্ষণ করার জন্য সেই পিশাচ-পিশাচীগণ তার দিকে ধাবিত হল। কিন্তু মুনিবরের তেজে তাদের সকলের গা পুড়ে যাচ্ছিল, তাই কেউ তার কাছে যেতে পারল না। সকলে দূরেই দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু সেই ঋষিকুমার পূর্বজন্ম প্রভাবে মুনিবরের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে বলল–হে বিপ্র মহাভাগ্যের ফলে সাধুসঙ্গ লাভ হয়।

তারপর সেই পিশাচ কিভাবে ব্রহ্মচারী থেকে পিশাচত্ব লাভ করল, সবকিছুই লোমশ মুনিকে বলল। লোমশ মুনি সব কথা শুনে বললেন–তোমরা সবাই আমার সঙ্গে রেবা নদীতে স্নান কর, সকলকে অবশ্যই রেবা নদী শাপমুক্ত করবে। রেবা স্নানে সকলের পাপ নাশ হয়, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পণ্ডিতগণ যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখতে পান না, সেই সমস্ত পাপ নর্মদা অর্থাৎ নদীতে স্নানের ফলে বিনষ্ট হবেই হবে। নর্মদা স্নানের ফলে মানব আর গর্ভবাস করে না, মুক্তিলাভ করে।

তখন সেই পিশাচ-পিশাচীরা মুনির সঙ্গে নর্মদার তীরে গিয়ে উপস্থিত হলে এক প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহের দ্বারা সেই নর্মদার জলকণা তাদের অঙ্গ স্পর্শ করল। আর সঙ্গে সঙ্গেই তাদের পিশাচত্ব দূর হয়ে গেল। তারা দিব্য দেহ ধারণ করে বহু প্রশংসা করল নর্মদার। তারপর মহর্ষি লোমশের আদেশ অনুসারে ঋষিকুমার ঐ গন্ধর্বকুমারীদের বিবাহ করে নর্মদার তীরেই বসবাস করতে লাগল। আর নর্মদাকে অর্চনা করে তারা বিষ্ণুলোকে গমন করল।

ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার ফল কীর্তন প্রসঙ্গে রাজা দীননাথের নরমেধ যজ্ঞের বৃত্তান্ত

সূতমুনি শৌনক মুনিক প্রশ্নের উত্তরে বললেন–যে পুণ্যের দ্বারা মানব পাপ যুক্ত হয়ে হরিধামে গমন করতে পারবে, আমি তা বলছি। ধনের দ্বারা অথবা প্রাণের দ্বারা যে মানব ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করে, সেই মানব বিষ্ণুলোকে গমন করে। তুমি শ্রবণ কর, আমি এ সম্বন্ধে একটি পুরাতন ইতিহাস বর্ণনা করব।

পুরাকালে দ্বাপর যুগে এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম দীননাথ। তিনি অপুত্রক ছিলেন। মহামুনি গালব দীননাথের গৃহে উপস্থিত হলে তিনি তার বিধিমত সেবা করে জিজ্ঞাসা করলেন-হে মহর্ষি, আমি হয়তো পূর্বজন্মে কোন পাপ কার্য্য করেছি, তাই এজন্মে অপুত্রক হয়ে রয়েছি। হে ব্রাহ্মণ এমন কোন কি পুণ্যকর্ম নেই, যার সাহায্যে আমার পুত্র লাভ হতে পারে? তেমন যদি কিছু তাকে তো আমাকে বলুন, আমি নিশ্চয় তা করব। যে মানুষের কোন পুত্র নেই, তার জীবনই অর্থহীন।

গালব মুনি দীননাথের প্রশ্নের উত্তরে বললেন–যদি তুমি নরমেধযজ্ঞ করতে পার, তাহলে সর্বগুণান্বিত পুত্রসন্তান লাভ করবে। নরমেধ যজ্ঞেই সকল যজ্ঞের বলি দেবে, যার দেহ খুব সুন্দর, মনে সুন্দর, সর্বশাস্ত্রজ্ঞান যার, আর সকুলে জন্ম, অঙ্গহীন, মূর্খ, কৃষ্ণবর্ণ দেহ, বলির জন্য তাকে গ্রহণ করবে না।

গালব মুনির উপদেশ পালন করবার জন্য রাজা দীননাথ তার দূতগণকে যজ্ঞের জন্য যেমন বলির প্রয়োজন সব বুঝিয়ে, উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে আদেশ করলেন। বহু দেশ ঘুরে তেমন লোক না পেয়ে অবশেষে দশপুর নামে এক দেশে গিয়ে দূতেরা দেখল যে সেখানকার প্রত্যেক নারী পুরুষ সুন্দর দেখতে। সেই দেশে কৃষ্ণদেব নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম সুশীলা। তার তিন পুত্র। সেই ব্রাহ্মণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি নিত্য বিষ্ণু পূজা করতেন।

কৃষ্ণদেবের কাছে গিয়ে রাজা দীননাথের দূতেরা বলল–হে ব্রাহ্মণ, আমরা শুনেছি, তিন পুত্র আপনার, প্রত্যেকেই পিতৃভক্ত, শাস্ত্রবিৎ এবং অবশ্যই সুন্দর দেহ। আমাদের রাজার কোন সন্তান না থাকায় তার মনে খুব দুঃখ। মহর্ষি গালব তাকে নরমেধ যজ্ঞ করবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। আপনি আপনার তিন পুত্রের মধ্যে যদি কোন একজনকে দান করেন, তাহলে খুব উপকার হয়। রাজা আপনাকে সেই পুত্রের বিনিময় চতুর্লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে। আর আপনি

যদি অর্থের বিনিময়ে পুত্রদের মধ্যে কোন একজনকে দান না করেন, তাহলে আমরা জোর করেই একজনকে নিয়ে যাব। কারণ আমরা রাজ-আজ্ঞাকারী।

ব্রাহ্মণী এমন ভয়ঙ্কর কথা শুনে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর প্রাণত্যাগ হবার উপক্রম হল। ব্রাহ্মণী কাতর কণ্ঠে বললেন–পুত্র ছাড়া কোন প্রয়োজন নেই ধনে বা জীবনে।

ব্রাহ্মণীর কথা শুনে রাজার দূতেরা ভীষণ রেগে গিয়ে তার গৃহে চারলক্ষ স্বর্ণমুদ্র ফেলে রেখে তার জ্যেষ্ঠপুত্রকে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে, ব্রাহ্মণ জোড় হাতে কাঁদতে কাঁদতে বললেন–তোমরা যখন একান্তই ছাড়বে না, তখন জ্যেষ্ঠপুত্রকে রেখে অন্য কোন পুত্রকে নিয়ে যাও।

ব্রাহ্মণের কথায় দূতেরা তাদের জ্যেষ্ঠপুত্রকে ছেড়ে দিয়ে ব্রাহ্মণীকে বলল–তাহলে, তোমাদের কনিষ্ঠ পুত্রকে দাও। নরমেধ যজ্ঞের জন্য আমরা তাকে নিয়ে যাই। ব্রাহ্মণী তাদের কথা শুনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে নিজের মাথায় করাঘাত করতে করতে কেঁদে বললেন–আমি আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে কখনই দেব না।

তখন ব্রাহ্মণের মধ্যম পুত্র মা-বাবাকে প্রণাম করে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল–মা যদি বিষদান করে, পিতা যদি বিক্রয় করে, আর রাজা যদি সর্বস্ব হরণ করে নেন, তাহলে মানুষ কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে প্রতিকারের জন্য?

এই কথা বলে মধ্যম পুত্র রাজদূতদের সঙ্গে রাজার নরমেধ যজ্ঞের উদ্দেশ্যে চলে গেল। পুত্রের বিচ্ছেদে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কেঁদে কেঁদে অন্ধের মত হয়ে গেলেন।

রাজদূতেরা মধ্যম পুত্রকে নিয়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হল বিশ্রামের উদ্দেশে। মুনিবর তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে রাজদূতেরা অনুপূর্বিক সব ঘটনা বলল।

সব কথা শুনে মুনিবর চিন্তা করলেনআমার প্রাণ যায় যাক, তবু এই বালক সুখী হোক ব্রাহ্মণের জন্য, বালকের জন্য এবং প্রভুর জন্য যে প্রাণ ত্যাগ করে, সেই জন সনাতন লোকে গমন করে। মুনিবর এই কথা মনে মনে চিন্তা করে রাজদূতদের বললেন–তোমরা এই বালকের পরিবর্তে আমাকে নিয়ে চল। এই বালক মরবে কেন? এ এখন ও সংসারের কোন সুখ ভোগ করেনি। এই বালককে নিয়ে আসার পর এর পিতা-মাতা জীবিত আছেন কিনা সন্দেহ। এই বালককে তার পিতামাতার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এস তোমরা। রাজা আমাকে তার নরমেধ যজ্ঞের পশু হিসাবে গ্রহণ করুক।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের এই কথা শুনে রাজদূতেরা বলল–রাজ অনুমতি ছাড়া আপনাকে আমরা নিয়ে যেতে পারব না। তারা মহর্ষিকে এই কথা বলে মধ্যম পুত্রকে নিয়ে নরমেধ যজ্ঞাগারে উপস্থিত হল মহর্ষি বিশ্বামিত্রও তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজদূতেরা রাজাকে মুনির বক্তব্য বিষয়ে বললেন–রাজা শঙ্কিত হয়ে মুনির চরণতলে পড়ে বলল–হে মহর্ষি, আমাকে দিয়ে আপনি এমন যজ্ঞ করান, যাতে বলিদান ছাড়াই আমি পুত্র লাভ করি। তাহলে আপনি এই ব্রাহ্মণপুত্রকে নিয়ে যেতে পারেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র বললেন–হে রাজা, আমি যখন এসেছি, আমার দর্শন যখন পেয়েছ, তুমি পুত্রলাভ করবেই। মহর্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞের অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে কোন বলি ছাড়াই যজ্ঞ সমাপন করলেন। তারপর মহর্ষি ব্রাহ্মণ পুত্রকে সঙ্গে করে নিয়ে তার বাড়ীতে গিয়ে তার পিতাকে ডাকলেন–বাড়ি আছ বিবর?

ঘরের মধ্যে থেকে ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন–হ্যাঁ আছি তবে মৃতবৎ। আমার পুত্রকে রাজা জোর করে নিয়ে গেল। এখন আর আমরা কি করবো? তাই মৃতের মতো অন্ধের মতো পড়ে আছি।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র তখন বললেন–এই দেখ তোমার সেই পুত্রকে আমি নিয়ে এসেছি। একে গৃহে নিয়ে যাও। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী তাঁদের পুত্রের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে বাইরে বেরিয়ে এসে মধ্যম পুত্রকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তারপর মুনির চরণে প্রণাম করে বললেন–হে মুনিবর, আপনি আমাদের জীবন দান করলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাদের আশীর্বাদ করে নিজের আশ্রমে চলে গেলেন।

কিছুকাল পরে রাজা দীননাথের একটি সুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করল। রাজা মহা আনন্দে প্রচুর ধন দান করলেন, যে মানুষ ধন বা প্রাণদান করে ব্রাহ্মণকে পালন করে তার বিষ্ণুলোকে গতি হয়।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদের পূর্বজন্মের কাহিনী

সূতমুনিকে শৌনকাদি মুনিরা জিজ্ঞাসা করলেন-হে মহামুনি, ভক্তরাজ প্রহ্লাদ শিশুকাল থেকেই বাসুদেবের নাম স্মরণ করে তার ভক্তরূপে পরিণত হয়েছিলেন, এ কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু যখন দেবাসুর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন সেই যুদ্ধে হরির সঙ্গে প্রহ্লাদ যুদ্ধ করলেন এবং তারই হস্তে নিহত হলেন। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এমন যুদ্ধ কেন? আপনার অজানা কিছুই নেই। অতএব দয়া করে বলে আমাদের মনের সংশয় দূর করুন।

সূতমুনি বললেন–এই বিষয়টি পিতামহ ব্রহ্মা মহাত্মা ব্যাসের কাছে বর্ণনা করেন। পরে এই বিষয়টি ব্যাসদেব প্রকাশ করেন। সেই কাহিনী আপনারা এখন শ্রবণ করুন।

শিবশর্মা নামে একজন দেবজ্ঞ মহাযোগী পশ্চিম সাগর প্রান্তে দ্বারা কাপুরীতে বাস করতেন। তিনি যোগবলে যখন যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করতেন। তার পাঁচ পুত্রের প্রত্যেকেই শাস্ত্রজ্ঞ এবং পিতৃভক্ত। সেই পুত্রদের নামযজ্ঞশর্মা, বেদশর্মা, ধর্মর্শর্মা, বিষ্ণুশর্মা ও সোমশর্মা। শিবশর্মা চিন্তা করলেন–আমার প্রত্যেক পুত্রই পিতৃভক্ত, আমি যা বলি, সঙ্গে সঙ্গে তা তারা পালন করে। একবার পরীক্ষা করে দেখি এদের। তারপর তিনি মায়া বিস্তার করে পুত্রদের সামনে ছল প্রদর্শন করে দেখালেন যে, তাদের জননী প্রবল জ্বরে রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

পুত্ররা মাতার মৃত্যুতে গভীর দুঃখ পেল। তারপর পিতাকে বলল–পিতা, যার গর্ভে আমাদের জন্ম, তিনি নিজে দেহ ত্যাগ করে স্বর্গে গমন করেছেন। এখন আমাদের কর্তব্য কি? মাতার দেহ কিভাবে সকার করব?

শিবশর্মা জ্যেষ্ঠপুত্র যজ্ঞশর্মাকে বললেন–তুমি একটি শাণিত অস্ত্রের দ্বারা তোমার মৃত মাতার শরীর খণ্ড খণ্ড করে যত্র তত্র ছড়িয়ে দাও।

পিতার আদেশ শুনেই কোন কথা না বলে যজ্ঞশর্মা একটি তীক্ষ্ণ খড়ের সাহায্যে মায়ের মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করে একটি ঝুড়িতে করে নিয়ে যত্রতত্র ছড়িয়ে দিল। তারপর পিতার কাছে এসে বলল– আপনার আদেশ আমি যথাযথভাবে পালন করেছি পিতা। এবার অন্য কাজের জন্য আদেশ করুন। অতি দুষ্কর হলেও সেই কাজ আমি করব।

শিবশর্মা খুব খুশী হলেন যজ্ঞশর্মার এই কথা শুনে। বুঝলেন তাঁর প্রথম পুত্র প্রকৃতই পিতৃভক্ত। এরপর দ্বিতীয় পুত্র বেদশর্মাকে তিনি পরীক্ষা করবার জন্য ডাকলেন। বললেন–

বেদশর্মা, তোমাদের মাতা এখন পরলোকগতা, কিন্তু আমার অন্তর এখন কামানলে দগ্ধ হচ্ছে। এই কথা বলে তিনি মায়াবলে বাড়ি থেকে কিছুদূরে এক সুন্দরী নবযৌবনা রমণী সৃষ্টি করে পুত্রকে দেখিয়ে বললেন– ওই যে নারীমূর্তি দেখতে পাচ্ছে, আমারই জন্য ওই নারীকে তুমি অবশ্যই নিয়ে আসবে।

পিতার আদেশে বেদশর্মা পিতাকে প্রণাম করে সেই মায়া-নারীর কাছে গিয়ে বলল–দেবী, আমার পিতা কামনার পীড়িত হয়ে আপনাকে প্রার্থনা করছেন। অতএব আপনি আমার বৃদ্ধ পিতার সেবাকার্যে নিযুক্ত হন।

মায়া-নারী বেদশর্মার কথা শুনে বলল–তোমার পিতা একজন বৃদ্ধ জরাগ্রস্থ শিথিলেন্দ্রিয়, আর আমি নবযৌবনা সুদর্শনা নারী। কখনই আমি তাকে সঙ্গ দান করতে পারব না। তুমি রূপ সৌভাগ্যবান, দিব্য লক্ষণযুক্ত, মহাতেজা সুপুরুষ। আমি বরং তোমারই সেবা করব। তুমিই আমার এই অঙ্গ ভোগ করবার যোগ্য।

মায়া-নারীর এমন পাপযুক্ত কথা শুনে বেদশর্মা বলল-দেবী, আমাকে তুমি এমন কথা বলো না। আমি পিতৃভক্ত, পিতার জন্য আমি তোমাকে প্রার্থনা করছি। তুমি অন্যকথা বলো না, আমার পিতাকেই ভজনা করো। দেবী, তুমি যা চাইবে, যদি পৃথিবীতে দুর্লভও হয়, তবে স্বর্গরাজ্য থেকে এনে দিতে পারি।

মায়া-নারী বলল-পিতার জন্য তুমি এতদূর করতে পার, তাহলে এখনই তুমি আমাকে ইন্দ্র ও মহাদেবকে দর্শন করাও। তুমি নিশ্চয় এই দুর্লভ সামগ্রী আমাকে প্রদান করবে।

এই কথা শুনে বেদশর্মা ধ্যানরত হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেবরাজ ইন্দ্র এবং দেবদেব মহেশ্বর সেখানে উপস্থিত হলেন। বেদশর্মাকে বললেন–তুমি আমাদেরকে কি জন্য স্মরণ করেছ? তুমি যা প্রার্থনা করবে, আমরা তা অবশ্যই প্রদান করব।

বেদশর্মা বলল–আমার প্রতি আপনারা যদি প্রসন্ন হন, আমাকে তাহলে অমন পিতৃভক্তি প্রদান করুন। তখন ইন্দ্র মহাদেব 'তাই হবে বলে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।

মায়া-নারী বলল-ব্রাহ্মণ, তোমার পোন দেখলাম। আমার দেবতায় কোনো প্রয়োজন নেই। পিতার জন্য যদি তুমি আমাকে আকাঙ্ক্ষা কর, তাহলে তুমি নিজের হাতে নিজের মস্তক ছেদন করে আমাকে দাও।

মায়া-নারীর কথা শুনে মহা আনন্দে বেদশর্মা বলল–আমি ধন্য হলাম ঋণ থেকে মুক্ত হলাম। এই আমি নিজের মস্তক ছেদন করছি, তুমি ধর। এই কথা বলে, দেবশর্মা নিজের মাথা কেটে মায়া নারীর হাতে দিল।

মায়া-নারী বেদশর্মার কাটা মাথা নিয়ে শিবশর্মার কাছে গিয়ে বলল–ব্রাহ্মণ, আপনার পুত্র বেদশর্মা আপনার জন্য নিজেই নিজের মস্তক ছেদন করে পাঠাল। আপনি এটি গ্রহণ করুন। আপনার সেই পিতৃভক্ত পুত্র আপনার জন্যই আমায় এই উত্তমাঙ্গ দিয়েছে, অতএব আমায় আপনি উপভোগ করুন।

মায়া-নারীর মুখে এই কথা শুনে বেদশর্মার দুই ভাই ভায়ের এই সাহস দেখে কাঁপতে কাঁপতে বলাবলি করতে লাগল–আমার মাতা সদ্য প্রাণত্যাগ করেছেন। আর এই ভাই আমাদের পিতার জন্য প্রাণত্যাগ করল। অশেষ ধন্যবাদের যোগ্য আমাদের এই ভাই।

ব্রাহ্মণ শিবশর্মা পুত্রদের মুখে এই কথা শুনে বুঝলেন যে, প্রকৃতই পিতৃভক্ত বেদশর্মা। ভক্তিবলেই সে নিজের মস্তক ছেদন করেছে। এরপর তিনি তার তৃতীয় পুত্র ধর্মশর্মাকে বললেন– এই ভ্রাতার মস্তক গ্রহণ কর।

পিতার আদেশ পালন করবার জন্য ধর্মশর্মা ভ্রাতার মস্তক নিয়ে বাড়ির বাইরে এসে যোগসাধনা শুরু করল। তপস্যা ও সত্যবলে যমরাজ ধর্মের আরাধনা করল। ধর্মরাজ তার সামনে আর্বিভূত হলে তিনি বললেন–হে ধর্মশর্মা, তুমি কিসের জন্য আমার আরাধনা করলে? আমায় কি করতে হবে বল?

ধর্মর্শর্মা বলল–যদি–হে সব্রত, তোমার তপস্যা ও পিতৃভক্তি দেখে অতি প্রসন্ন হয়েছে আমি। তুমি তোমার ভ্রাতা বেদশর্মার ছিন্ন মস্তকটি তার ছিন্ন দেহের সঙ্গে যুক্ত কর, আমার বর–প্রভাবে আবার জীবন লাভ করবে। এখন তুমি অন্য কোন দুর্লভ বর প্রার্থনা কর।

ধর্মরাজার কথা শুনে ধর্মশর্মা বলল–যদি আপনি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে আমার পিতার পাদ-পূজনে অচলা ভক্তি, ধর্মে অনুরাগ এবং অন্তে মোক্ষধাম প্রার্থনা করি।

তোমার সমস্তই হবে এই কথা বলে ধর্মরাজ সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।

তারপর ধর্মশর্মা বেদশর্মার ছিন্ন মস্তকটি দেহের সঙ্গে যুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই দেবশর্মা যেন ঘুম থেকে উঠে বলল–সেই দেবী কোথায় গেলেন ভাই? আর পিতাই বা কোথায় আছেন?

তার উত্তরে ধর্মশর্মা তাকে সব কথা বলে পিতার সামনে উপস্থিত হল দুই ভাই। তারপর ধর্মশর্মা পিতাকে বলল "পিতা, আমি তপস্যাবলে এই বেদশর্মাকে পুনরায় লাভ করেছি। আপনি আপনার পুত্রকে গ্রহণ করুন।

শিবশর্মা পুত্রের পিতৃভক্তির পরিচয় পেয়ে কোন কথাই বললেন–না। আবার চিন্তা করে চতুর্থ পুত্র বিষ্ণুশর্মাকে ডেকে বললেন–পুত্র, আমি বৃদ্ধ জরাতুর, ইন্দ্রিয় শিথিল। কিন্তু আমি এই কামিনীর সহবাস ইচ্ছা করি। এই ললনা আমার সহবাস ইচ্ছা করছে না। আমি যাতে একে লাভ করি তুমি তাই করো। আমি জানি সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠেছিল, সেই অমৃত সর্বব্যাধি হয়, কুৎসিতকে সুন্দর করে, বৃদ্ধকে যুবায় পরিণত করে, অতএব সুরপুরে গিয়ে তুমি আমার জন্য অমৃত আন। আমি সেই অমৃত সেবন করে এই কামিনীর সঙ্গ পরম আনন্দে উপভোগ করি।

বিষ্ণুশর্মা পিতার এমন কথা শুনে বলল–পিতা, আপনার সুখকর সকল উত্তম কার্যই আমি করতে প্রস্তুত আছি। এই কথা বলে পিতাকে প্রণাম করে উত্তম বল, তপস্যা ও নিয়ম-প্রভাবে অন্তরীক্ষ পথে অগ্রসর হল। ক্রমশঃ সে গগনান্তরে প্রবেশ করল।

বিষ্ণুশর্মার উদ্দেশ্য জানতে পেরে দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তা করলেন, এই যুবক সাধন বলে স্বর্গের অমৃত মর্তে নিয়ে যাবে আর মর্তবাসীরা অমর হয়ে থাকবে, তা আমি কখনো হতে দেব না। যেমন করেই হোক একে স্বর্গে আসায় বাধা দিতে হবে। এই চিন্তা করে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গবেশ্যা সুন্দরী মেনকাকে ডেকে বললেন–শিবশর্মার পুত্র বিষ্ণুশর্মা স্বর্গে আসছে। যেমন করেই হোক তুমি তার গতি রোধ কর।

ইন্দ্রের কথা শুনে মেনকা নন্দনকাননে গিয়ে বীণা বাজিয়ে মধুর স্বরে গান করতে শুরু করল। মেনকাকে দেখতে পেয়ে তার উদ্দেশ্য বুঝতে বিষ্ণুশর্মার আর বাকী থাকল না যে সুধা আনার জন্য বিঘ্ন ঘটাতেই সে এভাবে ওত পেতে বসে আসে। কাজেই তার দিকে দৃষ্টিপাত না করেই সে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল।

মেনকা ভাবল–হায়! আমার মত একজন সুন্দরী এখানে বসে মধুর স্বরে গান গাইছি, তবুও এই যুবক আমার দিকে তাকাচ্ছে না। মেনকা তখন ব্রাহ্মণ পুত্রের উদ্দেশে বলল–হে মহামতে, তুমি কোথায় যাচ্ছ? কিছুক্ষণ তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমাকে বল, তোমার কি প্রয়োজন। আমি তোমার শরণাপন্ন হলাম কারণ আমি তোমার রূপ দেখে কামবানে জর্জরিত, তুমি আমাকে রক্ষা কর।

মেনকার কথা শুনে বিষ্ণুশর্মা বলল–পিতার জন্য আমি তাড়াতাড়ি ইন্দ্রলোকে যাচ্ছি। দেবতাদের চরিত্র আমার অজানা নয়। অেমার চরিত্রও আমি খুব ভালভাবে জানি। কিন্তু তেমন চরিত্রের মানুষ আমি নই। বিশ্বামিত্রাদি মুনি তোমার রূপে মুগ্ধ হতে পারেন, কিন্তু আমি শিবশর্মার পুত্র, যোগ তপঃসিদ্ধ, অনেক আগেই কামাদি মহাদোষ আমি জয় করে ফেলেছি। কাজেই হে সুন্দরী, আমি এখন ইন্দ্রলোকে যাই, তুমি অন্য কোন ব্যক্তিকে ভজনা কর।

মেনকার চেষ্টা ব্যর্থ করে বিষ্ণুশর্মা সত্বর অগ্রসর হতে লাগল। তখন স্বয়ং ইন্দ্র নানারকম ভয় দেখাতে লাগলেন তাকে। কিন্তু পতিভক্ত ব্রাহ্মণের তেজে সেই সব বিভীষিকা সঙ্গে সঙ্গেই তুলারশ্মির মত ভস্মীভূত হয়ে গেল। ইন্দ্র বারে বারে বিঘ্ন সৃষ্টি করাতে বিষ্ণুশর্মার আর বুঝতে বাকী রইল না যে, দেবরাজ ইন্দ্রই এই সব কাজ করছেন। তখন বিষ্ণুশর্মা মনে মনে ভাবল–আমি স্বধর্মে রত আছি, তাই যে আমার বিঘ্ন সৃষ্টি করবে তাকে আমি রক্ষা করব না। আমি ইন্দ্রকে ইন্দ্রলোক থেকে পাতিত করব, কিছুতেই তার অন্যথা হবে না। যে হনন করে সে নিজেই হত হয়ে থাকে। আমি অন্য দেবরাজ সৃষ্টি করব।

এই চিন্তা করে ইন্দ্রকে বিনাশ করবার জন্য বিষ্ণুশর্মা উদ্যত হলে, ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে এসে বললেন–হে বিপ্র, তপস্যা, সত্য, নিয়ম, মৌচ ও দমনগুণে তোমার সমান অন্য কেউ নেই। তুমি আমার সব অপরাধ ক্ষমা কর। দুর্লভ হলেও আমি নিশ্চয়ই তোমায় বরদান করব।

ইন্দ্রের কথা শুনে বিষ্ণুশর্মা বলল-ব্রাহ্মণের মহারৌদ্র তেজ দেবগণের লক্ষ্যেও দুঃসহ। বিশেষতঃ যিনি পিতৃভক্ত ব্রাহ্মণ, তার তেজ একান্ত পক্ষেই অসহনীয়। মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের তেজোভঙ্গ করা কখনই উচিত নয়। হে দেবেশ, এখন আপনি যদি না আসতেন, তাহলে আমি নিজতেজ প্রভাবে অন্য কোন মহাত্মাকে এই স্বর্গরাজ্য দান করতাম। আপনি নিজেই যখন এসে আমাকে বর দান করবার জন্য উৎসুক হয়েছেন, তাহলে এই বর প্রার্থনা করি, অমৃত আর অবিচলা পিতৃভক্তি আপনি আমায় দান করুন।

বিষ্ণুশর্মার বাক্যে ইন্দ্র প্রসন্ন হয়ে বললেন–আমি অমৃতসহ এই বরই তোমাকে দান করলাম এই কথা বলে সাদরে অমৃতকুম্ভ তাকে দান করে বহু সম্মান জানিয়ে বিদায় দিলেন।

তারপর বিষ্ণুশর্মা সর্বব্যাধি বিনাশক অমৃত নিয়ে মর্ত্যধামে এসে পিতাকে বলল-পিতা, স্বর্গ থেকে এই অমৃত আমি এনেছি। এর দ্বারা আপনি নিরোগ হয়ে পরম তৃপ্তিলাভ করুন। পুত্রের এই কথা শুনে শিবশর্মা পরম আনন্দে সকল পুত্রদের ডেকে বললেন–তোমরা সকলেই পরম পিতৃভক্ত। তাই তোমরা প্রীতমনে বর গ্রহণ কর।

তখন বিষ্ণুশর্মার পাঁচ পুত্র একটু আলোচনা করে পিতাকে বলল–পিতা, আমাদের সুব্রতা–মাতার মৃত্যু হয়েছে। আপনার প্রসাদে তিনি নীরোগ হয়ে জীবিত হোন। আর জন্ম-জন্মান্তর ধরে

আপনারাই আমাদের পিতা ও মাতা হোন। আমরা পুণ্যচারী হয়ে আপনাদের পুত্র হই।

শিবশর্মা বললেন–তোমাদের পুত্রবৎসল মাতা সদ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, সদ্যই তিনি জীবিত হয়ে আসবেন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্ত্রী সেখানে এসে হৃষ্টভাবে বললেন–এই কারণেই সৎপুত্র সমুৎপন্ন হয়, এই কারণেই প্রত্যেক মানুষ কুল প্রদীপ সৎপুত্র কামনা করে হে পুত্রগণ, যে স্বামীর ঔরসে তোমাদের মতন পুত্র আমি লাভ করেছি, জানি না, এই ধর্মাত্মা ধর্মবৎসল মহাপুণ্যশালী আমার ভর্তা কোন্ পুণ্যবলে উৎপন্ন হয়েছেন। তোমাদের পিতা এইরূপ পুণ্যপ্রভাব, তোমরাও পুত্রবৎসল। যে মুহূর্তে শিবশর্মার বিবাহিতা স্ত্রী আবির্ভূত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই মায়া নারী অন্তর্হিত হলেন।

মাতার এই কথা শুনে পুত্রেরা মহা আনন্দে বারবার জননীর পায়ে প্রণাম করে বলল–লোকে সন্মাতা ও সৎ পিতা লাভ করে উত্তম পুণ্যবলে। আমাদের ভাগ্য বলেই আমরা আপনার মত পুণ্যবতী মাতা লাভ করেছি। আমাদের জন্মে জন্মে যেন আপনারাই পিতা-মাতা হন।

তারপর শিবশর্মা বললেন–আমি তোমাদের প্রতি অতি প্রসন্ন পুত্রগণ। আমার কাছে তোমরা বর প্রার্থনা কর।

পঞ্চপুত্র বলল–পিতা, প্রসন্ন হয়ে যদি বরদানে উৎসুক হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের সেই সপ্তাপবর্জিত গোলোকে প্রেরণ করুন।

শিবশর্মা বললেন–তপস্যা এবং পিতৃভক্তি গুণে আর আমার প্রসাদে তোমরা গোলোকে প্রস্থান কর।

ব্রাহ্মণ শিবশর্মা এই আশিসবাণী উচ্চারণ করা মাত্রই শ্রীবিষ্ণু সেখানে আবির্ভূত হয়ে শিবশর্মাকে বললেন–হে দ্বিজ, সৎপুত্রগণ সহ ভক্তিবলে তুমি আমাকে জয় করেছ। এখন তুমি তোমার এই পুণ্যশীলা পুত্রশীলা ভার্যার সঙ্গে আমার ধামে আগমন কর।

শ্রীহরির এই কথা শুনে শিবশর্মা বললেন–আমার কনিষ্ঠ পুত্র সোমশর্মা ব্যতীত অন্য চারপুত্র বৈষ্ণবলোকে গমন করুক। আমি আমার ভার্য্যা ও কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে ভূতলে বাস করতে চাই।

সত্যবাদী ব্রাহ্মণ শিবশর্মার এই কথা শুনে শ্রীহরি তার চারপুত্রকে চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদাধর ইন্দ্রনীল তুল্য বর্ণে মহাতেজা হার-কঙ্কণাদি শোভিত রত্নমালা মণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুর মূর্তি ধারণ করিয়ে আপন দেহেই বিলীন করালেন। তারপর শ্রীহরি শিবশর্মার সামনেই অন্তর্হিত হলেন।

তারপর শিবশর্মা তার কনিষ্ঠ পুত্র সোমশর্মাকে বললেন–তুমি পিতৃভক্তি পরায়ণ, এই অমৃতের কুম্ভ তোমাকে দিচ্ছি। তুমি এটি রক্ষা কর। আজই আমি ভার্য্যার সঙ্গে তীর্থযাত্রার উদ্দেশে বার হব। এই কথা বলে শিবশর্মা অমৃতকুম্ভ কনিষ্ঠ পুত্রের হাতে দিয়ে সস্ত্রীক তীর্থের উদ্দেশে চলে গেলেন। দশ বছর ধরে বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করে এবার ঘরে ফেরার জন্য চিন্তা করলেন। ভাবলেন–আমার চারপুত্রকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছি। সোমশর্মাকে এবার পরীক্ষা করব। এই চিন্তা করে তিনি মায়াবলে কুষ্ঠরোগী হলেন আর তার স্ত্রীও একইভাবে রোগগ্রস্ত হলেন। এরপর তারা গৃহে ফিরলেন।

এদিকে ধর্মাত্মা সোমশর্মা অতীন্দ্রিয় প্রহরীর মতো দিনরাত সেই অমৃতকুম্ভ রক্ষা করছে। সস্ত্রীক শিবশর্মা গৃহে ফিরলে, পিতামাতাকে রোগগ্রস্ত দেখে সোমশর্মা খুবই দুঃখ পেল। ভক্তিভরে পিতামাতাকে প্রণাম করে বলল–আপনার মতো তপোনিধি সর্বগুণান্বিত ব্যক্তি এ জগতে কাউকে দেখি না। তাহলে এমন দশা কি করে হল?

শিবশর্মা বললেন–পুত্র, তুমি দুঃখ কর না। পাপপুণ্যময় কর্মী তার কর্মের জন্যই ফলভোগ করে। তুমি যদি পুণ্য ইচ্ছা কর, তাহলে আমাদের দুজনার সেবা-শুশ্রূষা কর।

সোমশর্মা বলল–হে পিতা, আমি অবশ্যই আপনাদের সেবা করব।

এই কথা বলে সোমশর্মা পিতামাতার দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাদের শ্লেষ্ম, মল-মূত্র শোধন, পাদ ধৌত করণ স্নানাদি করতে লাগল। নিজ হাতে রান্না করে পিতামাতাকে ভোজন করায়, তাদের যখন যা প্রয়োজন সবসময় তা পূরণ করে। এককথায় তাদের সেবায় কোন রকম ত্রুটি রাখে না।

পুত্রের এইরকম প্রিয় ব্যবহার দেখে শিবশর্মা মনে মনে খুব খুশি। তিনি ভাবলেন–এই পুত্রকে আরো কঠিন পরীক্ষা করে দেখবো। দেখি, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় কি না? এই চিন্তা করে শিবশর্মা একদিন সোমশর্মাকে ডেকে অতি নিষ্ঠুর বাক্যে বললেন–তুই আমাদের ঠিকমতো সেবা করিস না। আমাদের প্রতি যথাযোগ্য আচরণ করিস না। কেন? তোর এই রকম ব্যবহারে আমরা তুষ্ট নয়। এই কথা বলে শিবশর্মা একটা লাঠি দিয়ে পুত্রকে প্রহার করতে লাগল।

শিবশর্মার এমন নিষ্ঠুর ব্যবহারেও কোনরকম রাগ না করে সন্তুষ্ট মনে সোমশর্মা আগের মতনই সেবা-শুশ্রূষা করতে থাকল। কাজেই সেই পরীক্ষায় সোমশর্মা ভাবলেন–একে আরও কঠিন পরীক্ষা করব। এই চিন্তা করে মায়াবলে সেই অমৃতকুম্ভ থেকে অমৃত হরণ করে বললেন–পুত্র, এতদিন আমার মনে ছিল না যে আমার বাড়িতে এই অমৃত আছে। সেই অমৃত পান করে নীরোগ হতে পারি আমরা। দাও, আমাদের সেই অমৃত এনে দাও। তাড়াতাড়ি সেই অমৃতকুম্ভ আনতে গিয়ে সোমশর্মা দেখল কুম্ভ আছে ঠিকই কিন্তু তাতে অমৃত নেই। তখন সে গভীর দুঃখের সঙ্গে ভাবছে–আমার কোন পাপের ফলে এই অমৃতকুম্ভ অমৃতশূন্য হয়েছে। পিতার কাছে এই কথা বললে রোগার্ত পিতা আমার প্রতি আরো কুপিত হবেন।

তারপর সোমশর্মা মনে মনে চিন্তা করল–আমার সত্য প্রতিষ্ঠা, গুরুশুশ্রূষা তপস্যাদিতে যদি সত্যধর্ম রক্ষা হয়ে থাকে, তাহলে এই কুম্ভ অমৃতযুক্ত হোক। সোমশর্মার এই রকম চিন্তায় সেই কুম্ভ পুনরায় অমৃতে পূর্ণ হয়ে গেল। তখন সোমশর্মা মহানন্দে অমৃতপূর্ণ কুম্ভ নিয়ে পিতাকে দিয়ে বলল– পিতা, এই অমৃত পান করে আপনি অচিরে নীরোগ হবেন।

সোমশর্মার কথা শুনে শিবশর্মা অতি আনন্দে বললেন–হে পুত্র, তোমার তপস্যা, ইন্দ্রিয় সংযম, গুরুস্তশ্রুষা এবং ভক্তিদর্শনে আমি অতি পরিতৃপ্ত। আমাদের বিকৃতরূপ পরিত্যাগ করছি তুমি দেখে সুখ লাভ কর।

পিতামাতার পূর্বেকার সুন্দর রূপ দেখে সোমশর্মা আনন্দে পিতামাতার চরণে বার বার প্রণাম জানাতে লাগল।

তারপর শিবশর্মা সস্ত্রীক আপন পুণ্যপ্রভাব বিষ্ণুলোকে যাত্রা করলেন। মহাত্মা সোমশর্মা তারপর তপস্যা শুরু করলেন। আহারাদি সংযমন করে, কারো কাছে কিছু ভিক্ষা না করে অযাচিতভাবে যা পায় তাতেই সে জীবন রক্ষা করে। ক্রমশঃ তার মৃত্যুকাল উপস্থিত হল। এইবার স্বয়ং ভগবান তাকে পরীক্ষা করার জন্য তার কাছে কতকগুলি দৈত্যকে পাঠালেন।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত সোমশর্মা তার চারপাশে দৈত্যদের উচ্চস্বরে কথা শুনে তাদের দেখে ভয়ে ভীত হয়ে পরলোকে যাত্রা করল। দৈত্যভয়ে ভীত হয়ে মৃত্যুর জন্য সেই মহাত্মা সোমশর্মাকে দৈত্যগৃহে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করতে হল।

পূর্বতন যোগাভ্যাসের জন্য সে জাতিস্মর হল। পূর্বের সবকথা চিন্তা করে সে ভাবল– সারাজীবন ধর্মপথে থেকে শুধুমাত্র মৃত্যুর সময় দৈত্যদের দেখে দেহত্যাগ করার জন্য দৈত্যকুলে আমাকে জন্মগ্রহণ করতে হল। তাহলে এবার যদি আমি বিষ্ণুর হাতে মৃত্যুবরণ করি, তাহলে দিব্যগতি লাভ করতে পারব। সবসময়েই সে এই চিন্তা করত। শ্রীমদ্ভগবতগীতায় ভগবান বলেছেন, মৃত্যুর সময় যে যেই ভাব। স্মরণ করে মরবে, পরের জন্মে সে সেই ভাব নিয়েই জন্মাবে। ভগবান তার অভীষ্ট পূরণও করেছিলেন। ঘোরতর দেবাসুর তিনি চক্রপানির হাতে নিহত হলেন। এমন গুণবন্ত পুত্র নিহত হওয়ার কারণে তার মা কমলা পুত্রের জন্য খুব কাদলেন। তখন দেবর্ষি নারদ তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–ভগবান শ্রীহরি তোমার পুত্রের ইচ্ছাতেই তাকে নিধন করেছেন। আবার তোমার গর্ভেই সেই পুত্র জন্মলাভ করবে। তুমি দুঃখ করোনা, আর কারোর কাছে এ বিষয়ে প্রকাশ করো না। তোমার ওই পুত্রের অসুরভাব থাকবে না। দেবভাবে অন্বিত হবে, সকল দেবতারও নমস্য হবে। তুমি সর্বদা সেই পুত্রের দ্বারা সুখলাভ করবে। এই বলে দেবর্ষি চলে গেলেন।

তারপর যথাসময়ে কমলার গর্ভে প্রহ্লাদের জন্ম হল। বাল্যকাল থেকেই কৃষ্ণধ্যান করতে লাগল। ভগবান শ্রীহরি তার জন্যই হিরণ্যকশিপুর নৃসিংহমূর্তি ধারণ করে বধ করলেন।

পতিব্রতা নারী সুকলার কাহিনি

বারাণসীধামে কৃকল নামে এক বৈশ্য বাস করতেন। তার স্ত্রী সুকলা মহা সতীসাধ্বী, নিত্য ধর্মাচারপরায়ণা, পতিগতপ্রাণা, বৈশ্য কৃকলও উত্তর পুরুষ। মহাজ্ঞানী ধর্মজ্ঞ, গুণবান। কৃকল পুরাণে "তীর্থযাত্রায় বহুপুণ্য" এই উক্তি পাঠ করে, কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে বার হলেন।

তখন তার স্ত্রী সুকলা বলল–হে প্রিয়, তোমার সঙ্গে আমিও যাব। আমারও তীর্থদর্শন করার খুব ইচ্ছা। বিশেষতঃ আমি সবসময়ই তোমার অনুগামিনী, পতি পরায়ণা নারীই পুণ্যশীলা নাম ধরে। যে নারী স্বামীর দক্ষিণ-পদকে প্রয়োগ আর বামপদকে পুষ্কররূপে কল্পনা করে আর স্বামীর পাদোদকে স্নান করে, সেই নারী মহা পুণ্যবতী। স্বামীই হচ্ছেন সতীর্থময় এবং সর্বপুণ্যময়। দীক্ষিত হয়ে যজ্ঞসাধনে যে পুণ্য হয়, স্বামীর সেবাতেই একমাত্র সেই পুণ্য লাভ হয়। রমণীর পতিশুশ্রূষা ছাড়া আর কোন ধর্ম নেই। তাই হে কান্ত, তোমার ছায়া আশ্রয় করে তোমারই সাহায্যে সুখদান করতে করতে আমি সদাই তোমার অনুগামিনী হব।

কৃকল পত্নী সুকলার কথা শুনে চিন্তা করল যে, সুকলা রূপবতী এবং তার বয়সও অল্প, তীর্থভ্রমণের সময় অনেক দুর্গম পথ পার হতে হবে। কোন স্থানে প্রচণ্ড শীত বা প্রচণ্ড গরম হবে তাতে প্রত্নীর রূপের সৌন্দর্য নষ্ট হতে পারে। উত্তম বর্ণালিনী অঙ্গ মলিন হয়ে যাবে। কোমল পদদ্বয় কাকরযুক্ত পথে চলতে গেলে ব্যথা পাবে। পথে আহারাদিও সবসময়ে নাও পাওয়া যেতে পারে তাহলে এই রমণী ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করবে কেমন করে? কাজেই আমি একাই তীর্থভ্রমণে যাব, এই কথা চিন্তা করে একদিন রাতে কৃকল সঙ্গীদের সঙ্গে গোপনে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করল।

তার স্ত্রী সুকলা সকালে স্বামীকে শয্যায় দেখতে না পেয়ে বড়ই দুঃখ পেল। বুঝতে পারল যে তার স্বামী তীর্থভ্রমণেই গেছে। মনে মনে চিন্তা করল যে, তাকে সঙ্গে না নেওয়ার কারণ কি। কিছুই ঠিক করতে পারল না। সুকলা স্থির করল যে তার স্বামী ফিরে না আসা পর্যন্ত সে ভূমিশয্যাতেই শয়ন করবে। ঘৃত, তৈল, দধি, ক্ষীর, লবণ, তাম্বুল প্রভৃতি মধুর বস্তু ত্যাগ করবে। দিনে একবার মাত্র আহার করবে। সুকলার চোখে সবসময় অশ্রুধারা। পরিধেয় বস্ত্র মলিন। স্বামী বিয়োগানলে সে দগ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ হল। চোখে ঘুম নেই। দেহ ক্ষীণ হল ক্রমশঃ।

সুকলাকে কৃশ ও দুঃখিত দেখে তার সখীরা তাকে বলল–তোমার স্বামী তীর্থভ্রমণে গেছেন, ফিরে আসবেন। বৃথা দেহকে শোষণ করে লাভ কি? এ সংসারে কে কার স্বামী, পুত্র, স্বজন,

বান্ধব? এ সংসারে কারও সঙ্গে কারও সম্বন্ধ নেই। তাই তুমি সবকিছু ভোগ কর, অযথা দেহকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

এই কথা শুনে পতিব্রতা সুকলা বলল–তোমরা বেদসম্মত বাক্য বলছ না। তোমরা পাপিয়সী, নারী স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করে একা থাকে। নারী স্বামীর কাছে থেকেই সবসময়ে তার সেবা করবে। স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ার চেয়ে প্রাণ ত্যাগ করা মঙ্গলজনক। স্বামীই নারীদের তীর্থ স্বরূপ, তাই মনো বাক্যে নারীর স্বামী সেবা করা উচিত। নারীর রূপযৌবন ও সৃষ্টি সব কিছুই একমাত্র স্বামীর জন্য। স্বামী তুষ্ট থাকলে সব দেবতাই সেই নারীর প্রতি তুষ্ট থাকেন। তাই স্বামীই নারীর প্রভু, দেবতা, তীর্থ আর পুণ্য। স্বামীর অভাবে নারী শৃঙ্গার ভূষণ, রূপ, সৌগন্ধ সমস্তই ত্যাগ করে।

সখীরা, স্বামীই নারীর পরম ধর্ম, স্ত্রী কখনই সনাতন ধর্ম ত্যাগ করবে না। আমি এই মহৎ সনাতন ধর্ম অবগত আছি। তবুও স্বামী কেন আমাকে ত্যাগ করলেন তা আমি বুঝতে পারছি না। আমি স্বামী বিনা জীবন ধারণ করতে পারব না।

সুকলার এমন কথা শুনে তার সখীরা খুব প্রশংসা করল। দেবতারা ধর্মবৎসলা সুকলার ধ্যান করতে লাগল। দেবরাজ ইন্দ্র সুকলার কথা জানতে পেরে মনে মনে চিন্তা করল–এমন পতিব্রতা ধর্মপ্রাণা নারী এ জগতে বিরল। আমি এর পতিস্নেহ ও ধৈর্য্য বিনাশ করব।

এই কথা চিন্তা করে রতিপতি মদনকে ইন্দ্র আহ্বান করে বললেন–হে মদন, পতিব্রতা সুকলাকে তুমি আমায় বশীভূত কর। ইন্দ্রের এই আদেশ শুনে গর্বভরে মদন বলল– ইতিপূর্বে কত মুনি, ঋষি, দেবতাকে আমি জয় করেছি। অবলা এই নারীকে জয় করা অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

ইন্দ্র বললেন–কৌতুকবশতই আমি রূপ, গুণ, ধন-সম্পন্ন পুরুষ হয়ে ঐ নারীকে বিচলিত করব। কামে, লোভে, ক্রোধে, কিংবা অন্য কোন কারণে আমি এমন করছি না। ওই নারীর সপাতিব্রত্য কেমন তা পরীক্ষা করার জন্য তোমাকে তার কাছে পাঠাচ্ছি।

কামদেব এই কথা শুনে খুব সুন্দর রূপ ধরে ইন্দ্রের সকুলার সামনে গেলেন। কামদেব তাকে আকর্ষণ করার বহু চেষ্টা করল কিন্তু সুকলা ইন্দ্রের দিকে এবারও তাকাল না। নানাভাবে কাম চেষ্টা দেখাতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই সুকলার মন টলাতে পারলেন না। ইন্দ্র তখন এক দূতাঁকে সুকলার কাছে পাঠালেন।

সেই দূতী সুকলার কাছে গিয়ে বলল–তোমার মত রূপবতী নারী আমি দেখিনি। তুমি কার ভার্য্যা? তোমার স্বামী কোথায়?

দূতীর প্রশ্নের উত্তর সুকলা বলল–ধর্মাত্মা। কৃকল আমার স্বামী। তিন বৎসর হল তিনি তীর্থযাত্রায় গেছেন। স্বামী বিনা একান্তই দুঃখিতা আমি। কিন্তু তুমি আমাকে এমন প্রশ্ন করছ কেন? কে তুমি?

দূতী বলল–যে কারণে তোমার কাছে এসেছি তা আমি সত্যই বলব। সব শুনে যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আমার মনে হয় তোমার স্বামী মহাপাপী, তাই তোমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। তুমি সাধ্বী রমণী। সে আর বেঁচে আছে কিনা কে জানে? তুমি কেন বৃথা শোক করছ? এই দিব্য হেমকান্তি দেহকে কেন নষ্ট করছ? মানব বাল্যকালে বাল্যখেলা ছাড়া আর কোন সুখলাভ করে না, বৃদ্ধকালে জরা এসে তার দেহকে কুৎসিত করে তোলে। কেবলমাত্র যৌবনেই মানুষ সুখ ভোগ করে। যৌবন চলে গেলে তখন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। হে ভদ্রে, জল চলে গেলে সেতুবন্ধের যেমন প্রয়োজন হয় না, তেমনি যৌবন চলে গেলে ভোগবিলাসও নিষ্ফল। যতক্ষণ দেহে যৌবন ততক্ষণ সুখভোগ কর। কামশরে তোমার দেহ দগ্ধ হচ্ছে, তুমি মদিরা পান কর। ওই দেখ, মহা ধনবান এক রূপগুণশালী পুরুষ তোমার জন্য স্নেহযুক্ত।

দূতীর কথা শুনে সুকলা বলল–জীবের বাল্য, তারুণ্য, বার্ধক্য নেই। জীব স্বয়ংসিদ্ধ, অমর, নির্জর, অকাম হয়ে লোকে আত্মরূপে বর্তমান। দেহের বিনাশের পর আবার নতুন দেহ ধারণ করে।

সুকলার বহু তত্ত্ব কথা শুনে দূতী ইন্দ্রের কাছে এসে সুকলার ধর্মজ্ঞান, ধৈর্য্যশীলতা প্রভৃতির কথা বলল। ইন্দ্র মনে মনে চিন্তা করলেন–এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এই মহীমণ্ডলে আর কোন নারী বলতে পারে না। ইন্দ্র মদনকে নিয়ে সুকলার গৃহে এলেন। একাকী সুকলা তখন গৃহে পতির চরণ ধ্যান করছে। যোগী যেমন কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুরই ধ্যান করে, তেমনি সুকলা পতিচিন্তা ছাড়া অন্য কিছু জানে না।

সেই সময় মদন এবং দেবরাজ সেই সতীর মনকে বিচলিত করার জন্য বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। মদন যখন এই নারীর কাছে হার মানল তখন ইন্দ্র তাঁকে বললেন–হে কাম, সত্বস্বরূপের ধ্যাননিবিষ্টা সতী সুকলাকে জয় করবার শক্তি তোমার নেই। এই সতী বীর্য্য গর্বিত বীরের মত ধর্মরূপ চাপ এবং জ্ঞানরূপ উত্তম শক্তি নিজহাতে গ্রহণ করে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত। তুমি একে লক্ষ্য করে আত্মপৌরুষ করেছ, কিন্তু এ যুদ্ধে এই সতী

তোমাকেই জয় করেছে। তাই এখান থেকে পলায়ন কর, নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা কর। পূর্বে তুমি মহাত্মা শিবের দ্বারা দগ্ধ হয়েছিল আর এখন এই সতীর সঙ্গে বিরোধ করলে তুমি নিশ্চয়ই কুৎসিত যোনি পাবে। অতএব এই সতীকে এখন ত্যাগ করা উচিত আমাদের।

এই কথা শুনে কাম বললেন–হে সুরেশ, যদি আমি এই নারীকে এখন ত্যাগ করে চলে যাই তাহলে জগতে আমার কীর্তি নাশ হবে। সকলে বলবে মদনকে এই নারী জয় করেছে। যে মুনি-ঋষি, দেবাসুরদের আমি জয় করেছি, আমাকে তারা উপহাস করবে। এখনও বলছি, ঐ নারীকে আমি জয় করবই। আপনি কিসের জন্য ভয় পাচ্ছেন?

মদন রতি ও প্রীতিকে সুকলার কাছে পাঠিয়ে তাকে জয় করবার চেষ্টা করলেন। রতি ও প্রীতি নানাভাবে সুকলাকে বোঝাবার চেষ্টা করলে, সুকলা তাদের বলল-আমার মহামতি স্বামী আমার রতি প্রতিগ্রহ করে বিদেশে গেছেন। আমার এই দেহ বর্তমানে নিরাশ্রয়। আমার স্বামী যেখানে আছেন আমিও সেখানে আছি। আমার কাম ও প্রেম দুটিই সেই স্বামীর কাছে।

রতি ও প্রীতি সুকলার এই কথা শুনে লজ্জিতা হল। তারা মদনের কাছে গিয়ে বলল– এ নারী দুর্জয়া। সুকলা সত্যই পতিব্রতা ও পতিকামা, অতএব হে কাম, তুমি আত্মপৌরুষ ত্যাগ কর।

এই কথা শুনেও কাম দমলেন না। বললেন–সুকলা যখন দেবরাজ ইন্দ্রের রূপ দেখবে, আমি তখন তাকে আহত করব।

ইন্দ্র সুবেশ ধারণ করে রতির সঙ্গে সুকলার কাছে এসে বললেন–ভদ্র পূর্বে প্রীতিবশতঃ আমি তোমার কাছে একজন দূতাঁকে পাঠিয়েছিলাম। আমি তোমার ভজনা করতে চাই। কেন তা প্রত্যাখ্যান করলে?

সুকলা বলল–আমি একাকিনী নই, সেই কারণে কাউকে আমি ভয় করি না। পুরুষকার শূরগণ আমাকে সবসময়ে রক্ষা করছে। যতক্ষণ আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরবে, ততক্ষণ আমি আপনার প্রস্তাবে উত্তর দিতে বাধ্য নই। আমার স্বামীর কর্ম সাধনেই আমি ব্যস্ত আছি। কিন্তু কে আপনি মরণকেও ভয় করেন না?

ইন্দ্র বললেন–আমি একমাত্র তোমাকেই এখানে একা দেখেছি। যে সব রক্ষকগণের কথা তুমি বলছ, কেমন দেখতে তাদের? একবার দেখাও আমাকে।

তার উত্তরে সুকলা বলল–যিনি ধৃত, মতি, গতি বুদ্ধি প্রভৃতি নিজ আত্মপরিজনের আধিপত্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাঁর সব ধর্ম অবিচল, যিনি নিত্যযুক্ত ও মহাত্মা, সেই ধর্মাত্মা সব সময় আমাকে রক্ষা করছেন। শান্তি ও ক্ষমার সঙ্গে সত্য আমার সঙ্গে সর্বদা বর্তমান। আমি সব সময় সত্যাদি সমস্ত ধর্মকে রক্ষা করছি। আমাকে কি তুমি বলাকার করবার ইচ্ছা কর? তুমি কে? আমার স্বামীর সত্য, ধর্ম, পুণ্য ও জ্ঞানাদি পরম সহায়। তাদের দ্বারা আমি রক্ষিত হয়ে ইন্দ্রিয় দমন ও শান্তি পরায়ণা হয়েছি। যদি বীর্য্যবান কামদেবও আমাকে আঘাত করার চেষ্টা করে তবে তা ব্যর্থ হবে। অতএব, তুমি যেই হও, এখান থেকে পলায়ন কর। যদি তুমি আমার নিষেধ অমান্য কর, তাহলে আমার তেজে এখনই তুমি দগ্ধ হবে।

সুকলার কথা শুনে ইন্দ্র আশ্চর্য হয়ে কামদেবকে বললেন–এ নারীর সতীত্ব দেখ। ইন্দ্রের এই কথার পর সুকলার কাছ থেকে সবাই যে যার নিজ স্থানে চলে গেল। আর পুণ্যশীলা সুকলা পতিধ্যানে নিজের গৃহে প্রবেশ করল।

তীর্থযাত্রা থেকে প্রত্যাগত কৃকলের পথিমধ্যে পিতৃবন্ধন দর্শন, পত্নীহস্তে অন্ন পাকানন্তর শ্রাদ্ধকারণে কৃকলের পিতৃমুক্তি

ভারতবর্ষে প্রায় সকল তীর্থ দর্শন করে সঙ্গীসাথীদের নিয়ে কৃকল বাড়ি ফিরছেন, হঠাৎ পথের মাঝে এক বিরাট পুরুষকে দেখলেন, কৃকলের পিতৃ পুরুষগণকে তিনি বন্দী করে কৃকলকে বললেন–তোমার যথাযথ উত্তম পুণ্য লাভ হয়নি। তীর্থফলও তোমার নেই। এতদিন ধরে তীর্থ দর্শন করা তোমার বৃথা হল। তোমার নিজের সন্তোষলাভ হল কিন্তু উত্তম পুণ্যলাভ হল না।

সেই বিরাট পুরুষের কথা শুনে কৃকল খুবই আশ্চর্য হয়ে বলল–কে আপনি? আমার পিতৃপুরুষগণকে আমার কোন্ দোষের জন্য বন্ধন করলেন? কেন আমার তীর্থযাত্রার ফল লাভ হবে না?

তখন সেই বিরাট পুরুষ ধর্ম বললেন–যে নিজের পুণ্যতমা স্ত্রীকে ত্যাগ করে যায়, তার সব পুণ্যই বৃথা। যে স্ত্রী ধর্মশীলা পতিব্রতানিষ্ঠা, পুণ্যবৎসলা তাকে ত্যাগ করে যে ধর্মকর্ম করতে চেষ্টা করে, তার সব ধর্মকর্মই বৃথা হয়। সর্বসদাচারনিরতা, ধর্মসাধনা-তৎপরা পতিব্রতনিষ্ঠা এমন গুণশালী মহামতী স্ত্রী যার ঘরে, তার ঘরে মহাতেজা দেবগণ বিরাজ করেন। তার পিতৃগণ তার গৃহে অবস্থান করে সর্বদাই মঙ্গল চিন্তা করেন। তার গৃহে সমস্ত তীর্থক্ষেত্রই বিরাজমান। পুণ্যভার্য্যার দ্বারাই গার্হস্থ্য-ধর্ম সিদ্ধ হয়, গার্হস্থ্য আশ্রয় করে সমস্ত জীব জীবনধারণ করে, গার্হস্থ্যর মত অন্য উত্তম আশ্রম আর হয় না। যেজন ভার্য্যাহীন, তার গৃহ শ্মশানের সমান, যজ্ঞ দান তার কিছুই সিদ্ধ হয় না, সেই পুরুষের কোন ব্রতই সফল হয় না। ধর্ম সাধনের জন্য স্ত্রীর তুল্য কেউ নেই। ভার্য্যা সম পুণ্য নেই, ভার্য্যা মম সুখ নেই, ভার্য্যা সম তীর্থ নেই।

হে নরাধম, স্ত্রীকে ত্যাগ করে তীর্থে গেল পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য, কিন্তু সেই তীর্থফল তোমার কোথায়? ভার্যাহীন হয়ে তীর্থে যে শ্রাদ্ধ-দানাদি করেছ, তাতে কোন ফল হল না, বরং অনেক অপরাধ হয়েছে। সেই অপরাধের জন্যই তোমার পিতৃপুরুষগণকে আমি বন্ধন করেছি। তুমি স্ত্রী ব্যতীত যে শ্রাদ্ধান্ন দিয়েছ তা বৃথা হয়েছে।

যে সুপুত্র শ্রদ্ধায় শ্রাদ্ধ দান করে, স্ত্রী শ্রাদ্ধান্ন প্রস্তুত করে, সেই শ্রাদ্ধকর্তা সুপুত্রের পিতৃগণ ঐ শ্রাদ্ধে তৃপ্তি লাভ করে। তুমি স্ত্রীকে বঞ্চিত করেছ। যেহেতু তোমার পিতৃগণ স্ত্রী ব্যতীত অন্যের প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণ করেছে তাই এরা চোররূপে গণ্য হয়ে আবার কাছে বন্দী রয়েছে। স্ত্রী

নিজের হাতে যে অন্ন পাক করে তা অমৃত সমান হয়। সেই অন্নই পিতৃগণ তৃপ্ত হয়ে ভোজন করে। স্ত্রী ব্যতীত পুরুষের ধর্ম সিদ্ধ হয় না। স্ত্রী বিনা যে ধর্ম তা বিফল।

ধর্মের এই কথা শুনে কৃকল অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল–হে ধর্মরাজ, আমি পত্নীকে তীর্থে না নিয়ে গিয়ে, আর তার হাতে প্রস্তুত করা শ্রাদ্ধান্ন না দিয়ে যে অপরাধ করেছি, তার থেকে কীভাবে মুক্ত হব? কেমন করে. আমার এই পিতৃপুরুষগণ উদ্ধার পাবে তা আমাকে বলুন।

ধর্মরাজ বললেন–এখন তুমি গৃহে যাও কৃকল। তুমি গৃহে না থাকায় তোমার গৃহিণী খুবই দুঃখ ভোগ করছে। গৃহে গিয়ে সেই পতিব্রতাকে সান্ত্বনা দাও। তার হস্তে শ্রাদ্ধ দানাদি সম্পাদন করে, পুণ্যতীর্থ সমস্ত স্মরণ করে সুরোত্তম গণের অর্চনা কর। এতেই তোমার তীর্থযাত্রার ফল লাভ করবে।

ধর্মরাজ কৃকলকে এই কথা বলে অন্তর্হিত হলেন। তারপর মহাত্মা কৃকল গৃহে এসে পতিব্রতা পত্নীকে দেখে খুব আনন্দ লাভ করল। সুকলাও গৃহাগত স্বামীকে দেখে আনন্দে তৎকালীন পুণ্য– মঙ্গলাচরণ করল।

তারপর কৃকল এক দেবমন্দিরে পত্নীর সঙ্গে শ্রদ্ধা যুক্ত হয়ে পরম পুণ্যাবহ শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করল।

তখন ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবগণ পিতৃগণ এবং অন্যান্য দেবতাগণ আকাশমগুলে সমাগত হয়ে সেই দম্পতিকে বললেন–তোমাদের মঙ্গল হোক তোমরা বর প্রার্থনা কর। আর মুনিরা সেই দম্পতির স্তব করলেন।

কৃকল বলল–আমাদের কোন পুণ্য প্রভাবে বরদান করবার জন্য আপনারা এখানে সমাগত হয়েছেন?

তার উত্তরে ইন্দ্র বললেন–হে কৃকল, তোমার এই পত্নী পতিব্রতা সুফলা পরম মঙ্গলময়ী, এই সত্যবলেই তুষ্ট হয়ে আমরা তোমাদের বরদান করবার জন্য এখানে এসেছি।

তারপর ইন্দ্র সুফলাকে পরীক্ষা করবার জন্য যা যা চেষ্টা করেছেন এবং কিভাবে বিফল হয়েছেন সবকথা কৃকলের কাছে বললেন। কৃকল মহা আনন্দ লাভ করল সুফলার চরিত্র শুনে। তারপর তারা সব দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে বলল–আপনারা যদি আমাদের প্রতি তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে যেন জন্মে জন্মে দেবতাদের প্রতি আমার ভক্তিমান থাকি। ধর্মে ও সত্যে

আমাদের যেন অনুরাগ থাকে। আপনাদের প্রসাদে পিতৃপুরুষগণের সঙ্গে যেন আমরা বৈষ্ণবলোকে গমন করি।

কৃকল এই বর প্রার্থনা করলে দেবতাগণ বললেন–তোমাদের প্রার্থিত সমস্তই লাভ হবে, এই কথা বলে সেই দম্পতির মাথায় পুস্পবৃষ্টি করে এবং তাদের স্তব করে নিজ নিজ ধামে গমন করলেন।

মহাত্মা যযাতিকতৃক সত্যধর্মে প্রজাপালন তাঁকে স্বর্গধামে আনয়নের জন্য ইন্দ্র কর্তৃক মাতলিকে প্রেরণ এবং যযাতির অস্বীকার ও মর্ত্যধামেই স্বর্গের মতো সুখ সৃজন এবং পুনরায় কামাতিকে প্রেরণ করে যযাতিকে জরাগ্রস্তকরণ।

নহুষের পুত্র সত্ত্বগুণান্বিত ধর্মশীল মহামতি যযাতি। যযাতির এই সব গুণের জন্য নহুষ তাকে রাজপদে অভিষিক্ত করে ইন্দ্রপদ লাভ করেন। রাজা হবার পর যযাতি সত্যধর্মে সকল প্রজাপালন করলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযাত্রী এবং দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন। এই দুজনের গর্ভে পাঁচজন পুত্র জন্মলাভ করে। প্রত্যেকেই পিতৃতুল্য পরাক্রমশালী। ধর্মানুসারে রাজ্য প্রতিপালনের জন্য ত্রিভুবনে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন যযাতি।

একসময় দেবর্ষি নারদ স্বর্গধামে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে যযাতির সত্যধর্মের কথা বলে বললেন, তিনি বহু যজ্ঞ, বহু দান করেছেন। মহারাজ নহুষের থেকে যযাতি অধিক গুণসম্পন্ন।

এই কথা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র খুবই চিন্তিত হলেন। ভাবলেন–শত যজ্ঞ করে নহুষ আমার পদ লাভ করেছিলেন, শচীর বুদ্ধিবলে সে ইন্দ্রপদ থেকে ভ্রষ্ট হল। তার পুত্র যযাতিও আমার ইন্দ্রত্ব হরণ করতে পারে। কাজেই ঐ যযাতিকে যে-কোন ভাবে স্বর্গপুরে আনতে হবে।

এই চিন্তা করে ইন্দ্র তার সারথি মাতলিকে যযাতির কাছে পাঠালেন তাকে স্বর্গে আনবার জন্য। মাতলি মর্ত্যধামে যযাতির রাজসভায় উপস্থিত হয়ে বললেন–হে রাজন, আপনি ইন্দ্রলোকে চলুন। স্বয়ং দেবরাজ আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য। মহাবীর্য্য পুরূরবা, বিচিত্তি, শিবি, মনু, ইক্ষবাকু, আপনার পিতা নহুষ, শান্তনু, ভরত, নরেশ্বর কার্তবীর্য প্রভৃতি নৃপতিগণ মর্ত্যে বহু যজ্ঞ সাধন করে স্বর্গে মহাসুখ ভোগ করছেন। আপনি ও অশীতি সহস্রবর্ষব্যাপী রাজত্ব করে বহু যজ্ঞে দান, পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করেছেন। সেই পুণ্যগুণে

আপনি স্বর্গে মহাসুখ ভোগ করুন। ইন্দ্রের সঙ্গে সেখানে সখ্য স্থাপন করুন। তাই আর দেরী না করে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করে স্বর্গে চলুন।

রাজা যযাতি মাতলির কথা শুনে তাকে বহুবিধ তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করলেন। মাতলি পঞ্চভূতের সৃষ্টি ও লয়ে, স্বর্গ ও নরকে গতি, কর্মবিপাক, ধর্মের ফল, যমরাজকর্তৃক পীড়া প্রভৃতি বিষয়ের কথা বললেন। তারপর যযাতি বললেন–আমি শরীর ত্যাগ করব না, পার্থিব শরীর ব্যতীত আমি স্বর্গেও যাব না। বয়ঃ ক্রমের অনন্তকাল আমার অতীত হয়েছে। তবুও আমার দেহ ষোড়শ বর্ষ বয়স্কের যুবকের মত বলবীর্য রূপ সমন্বিত হয়ে শোভিত। গ্লানি, হানি, শ্রম, জরা, ব্যাধি কিছুই নেই। হে মাতলি, আমি প্রতিদিন হৃষীকেশের ধ্যান ও নামোচ্চারণ রূপ উত্তম রসায়ন পান করেছি। তাতেই আমার পাপব্যাধির নাশ হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণনামরূপ মহৌষধ এ সংসারে থাকতে মূঢ়গণ তা পান না করে পাপব্যাধি পীড়িত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। ধ্যান, জ্ঞান, পূজা, দান ও পুণ্যের সাহায্যে আমার সাহায্যে আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। গোবিন্দের প্রসাদে এইরকম দেহশুদ্ধি হয় বলেই আমি আর স্বর্গে যাব না। এই স্থানকে স্বর্গধামে পরিণত করব। আপনি স্বর্গে গিয়ে দেবরাজকে বলুন। আর কোন কথা না বলে মাতলি যযাতিকে নমস্কার করে প্রস্থান করলেন।

তারপর মহারাজ যযাতি তার দূতদের আদেশ করলেন–হে দূতগণ, তোমরা আমার রাজ্যের সর্বত্র প্রচার কর, যাতে শ্রীহরির নাম সংকীর্তন সবাই করে। প্রজাগত যেন জড় বিষয় ত্যাগ করে অমৃতোসম ভাব, ধ্যান, পুণ্য তপ, যাগ, দান প্রভৃতির দ্বারা একমাত্র শ্রীমধুসূদনের আরাধনা করে।

আর যে আমার আদেশ পালন করবেন না, তাকে চোরের মতন শাসন করবে।

রাজার দূতেরা তার আদেশ সর্বত্র প্রচার করল। এই আদেশ শুনে সব প্রজারা তখন থেকে বিষ্ণুর পূজা, ধ্যান, গুণগান, মন্ত্র জপ করতে লাগল, প্রজারা বৈষ্ণবভাবে ভাবিত হয়ে জয়যুক্ত হল। এইভাবে রাজ্যশাসন করা যযাতির রাজ্যে দুর্ভিক্ষা, ব্যাধি এবং প্রজাদের অকাল মরণ হল না। প্রত্যেকের গৃহে বিষ্ণু মন্দির তুলসী কানন দেখা গেল। সকলের মুখে কৃষ্ণ, হরি, কেশব, মধুসূদন, মুকুন্দ, রাম, নরসিংহ, পদ্মনাভ, বাসুদেব, বামন, গোবিন্দ, হৃষিকেশ, শ্রীধর শ্রীপতি প্রভৃতি নাম উচ্চারিত হল। নারীরাও গৃহের কাজে ব্যস্ত থেকেও সর্বদা এই সব নাম উচ্চারণ করল।

এইভাবে মহীতল বিষ্ণুলোক সদৃশ হল। জনগণ তখন সকলেই তরুণ শরীরে বহুবর্ষ জীবিত থাকত। সকলেই, নীরোগ, জ্ঞানবান যজ্ঞদান পরায়ণ দয়ালু, পরোপকারী হল। বিষ্ণুভক্ত ও নিত্য সর্বধর্ম পরায়ণ ছিলেন মহারাজ যযাতি। তাঁর রাজত্বকালে প্রজারা যমালয়ে যেত না। তারা সকলেই রাগ-দ্বেষ বর্জিত ছিল। যমদূতেরা সর্বত্র ভ্রমণ করেও কোন পাপীকে দেখতে পায় না। রাজা যযাতি তরুণের মতো প্রতিভাত হয়ে ক্রৌর প্রসাদে বহু কীর্তি ও যশঃ অর্জন করে পৃথিবীতে লক্ষ বৎসর রাজত্ব করলেন। ধর্মরাজের দূতেরা যযাতির রাজত্বে কোন পাপীকে না পেয়ে তারা যমালয়ে ফিরে ধর্মরাজকে যযাতির ধর্ম–ধর্মের কথা বলল। তিনি বিষ্ণুভক্ত, অতি পবিত্র, তিনি স্বর্গে পরিণত করেছেন পৃথিবীকে।

তাই একদিন যমরাজ দেবরাজের সভায় গমন করে, দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন–পরম বৈষ্ণব মহাত্মা যযাতি সব মর্তবাসীকে বৈষ্ণবে পরিণত করেছেন। মর্ত্যলোকেই বৈকুণ্ঠ বিরাজ করছে। তারা কেউ পাপ করে না, মিথ্যা কথা বলে না। প্রত্যেকই কামক্রোধ বিজয়ী, দানশীল, ধর্মপরায়ণ এবং শ্রীহরির অর্চনায় রত।

ধর্মরাজের কথা শুনে ইন্দ্র বললেন–আমি দেবর্ষি নারদের কাছে যযাতির বিষয় জানতে পেরে তাঁকে স্বর্গধামে আনার জন্য সারথি মাতলিকে পাঠাই, কিন্তু তিনি স্বর্গসুখভোগ চান না, তিনি ভূমণ্ডলকেই স্বর্গে পরিণত করেছেন। আমি তার কারণে তাই ভীত হয়ে আছি।

ধর্মরাজ তখন বললেন–হে দেবেশ–যদি আপনি আমার হিত চান, তাহলে যে কোনভাবে যযাতিকে এখানে নিয়ে আসুন।

ধর্মের কথা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তা করে কামদেব, গন্ধর্বগণকে মকরন্দ ও রতিকে আদেশ করে বললেন–যে, যেভাবেই হোক যযাতিকে স্বর্গে আনা চাই।

দেবরাজের আদেশ পেয়ে কামাদিগণ যযাতির রাজসভায় উপস্থিত হয়ে, তাকে আশীর্বাদে অভিনন্দিত করে নাটকাভিনয়ের প্রস্তাব করল। যযাতির সম্মতি নিয়ে, বিপ্ররূপী বামন চরিত ও তার আবির্ভাব বিষয়ক অভিনয় অনুষ্ঠিত হল। জরা অপ্রতিম রূপবতী নারীর বেশ ধারণ করে সুস্বরে উত্তম সঙ্গীত পরিবেশন করল। তার সেই কন্দর্পমায়াময়গীত বিলাস, হাস্যললিত, দিব্যচরিত ও দিব্যভাবে মহারাজ মুগ্ধ হলেন।

সেই অভিনয় দেখে রাজা যযাতি এমন মুগ্ধ হলেন যে, মল-মূত্র পরিত্যাগ করে পাদ প্রক্ষালন করেই আসনে বসলেন। সেই অবকাশে জরা তাকে ধারণ করলেন। কামদেব এইভাবে দেবরাজের হিতসাধন করলেন।

নাটকাভিনয় শেষ হলে কামাদি সকলে প্রস্থান করলেন। আর ধর্মাত্মা যযাতি জরাভিভূত হয়ে অত্যন্ত কামাসক্ত হয়ে পড়লেন। বিষয়কর্মে পরান্মুখ হলেন। মহাত্মা যযাতির মৃগয়ায় গমনে কাম কন্যা দর্শনে মোহিত এবং আপন জরা পুত্র পুরুকে দান করে তার তারুণ্য গ্রহণপূর্বক কামকন্যাকে বিবাহ ও সুখভোগ শেষে পুরুকে তারুণ্যে প্রদান করে আপন জরা গ্রহণ করতঃ সর্ব প্রজাপুঞ্জের সঙ্গে স্বর্গাদিলোকে গমন।

জরাভিভূত হয়ে মহারাজ যযাতি মৃগয়ার জন্য একদিন বনে গমন করেন। সেই সময় এক মৃগ তার কাছে আসে। স্বর্ণময়, সর্বাঙ্গসুন্দর চতুঃশঙ্গ সেই মৃগকে দেখে রাজা বধ করবার জন্য উদ্যত হলে, মৃগটি সেখান থেকে ছুটে পালাল। রাজাও তার পিছু পিছু ছুটতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর রাজা আর সেই মৃগটিকে দেখতে পেলেন না। রাজা সুশোভিত বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একটি সুন্দর সরোবর দেখতে পেলেন। সেই সরোবর তটে এক গাছের তলায় রাজা বসলেন।

সহসা এক নারীকণ্ঠের সুমধুর গান রাজা শুনতে পেলেন। এমন সময় দিব্যরূপা এক নারী রাজার কাছে এলে রাজা তাকে প্রশ্ন করলেন–কে তুমি? কার কামিনী? এখানে কিজন্য এসেছ? কিন্তু সেই বীণাধারিণী নারী কোন উত্তর না দিয়ে কেবল হেসে সেখান থেকে চলে গেল। রাজা তখন চিন্তা করলেন, এই নারী কে? কেন আমার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেল? মনে হয় যে মৃগটিকে আমি দেখেছি, সেই মৃগটি মায়াবলে নারীরূপ ধারণ করেছে। নিশ্চয় কোন দানবকুলের মায়ারূপ।

রাজা যখন চিন্তা করছেন তখন সেই নারী আবার রাজার দিকে তাকিয়ে হেসে অন্তর্হিত হল। সেই সুমধুর গান আবার রাজার শ্রবণগোচর হলে সেই সংগীত অনুসরণ করে রাজা গিয়ে দেখলেন–জলের ওপর সহস্রদল পদ্মের ওপর বসে অতি মনোরমা এক নারী মধুরস্বরে গান গাইছেন। রাজা দেখে ভাবলেন, নিখিল চরাচরে এখন রমণীরত্ন আর নেই। এই সুন্দরী নারীর রূপ দেখে ও গান শুনে রাজার দেহ-মন কামাকুলিত হল। কামানলে দগ্ধ হয়ে রাজা ভাবতে লাগলেন কেমন করে এই কামিনী আমার ভোগ্যা হবে? এই পদ্মাননবালা যদি আমাকে আলিঙ্গন করে তবে আমার জীবন সফল হবে।

এই চিন্তা করে সেই কামিনীকে উদ্দেশ্য করে রাজা যযাতি বললেন–কে তুমি শুভে? আমি যে রমণীকে আগে দেখেছি, সেই নারী কি তুমি? আমি চন্দ্র বংশীয় নহুষনন্দন যযাতি সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর। হে ভদ্রে, তুমি আমার হও, আমার চিত্ত তোমাতেই আসক্ত। তোমার যা কাম্য, অবশ্যই আমি তা দেব। কামাহত হয়ে তোমার শরণ নিলাম, তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর।

মহারাজের এমন উক্তি শুনে সেই দিব্যনারী তার সখী বিমলাকে বলল–সমাগত রাজাকে আমার পরিচয় জানিয়ে দাও তুমি সখী।

তখন বিশালা বলল–পুর্বকালে কামকে মহাদেব দগ্ধ করলে তার পত্নী রতিদেবী এই স্থানে রোদন করতে থাকেন। রতি প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তখন দেবতারা মহাদেবকে বলেন-হে মহাদেব, আপনি কামকে জীবিত করুন। না হলে রতি জীবনধারণ করতে পারবে না।

মহাদেব বললেন–আমি কামের জীবন দান করব। কিন্তু সে কায়াবিহীন হয়ে থাকবে এবং মাধবের সখা হবে, তখন কন্দর্প জীবন লাভ করল। তারপর এই সরোবরে আগমন করল। এটি কামসরোবর। মদনদেব দগ্ধ হলে দুঃখ পীড়িতা রতির কোপ থেকে দারুণাকৃতি অনল উত্থিত হল। রতি সেই অনলে দগ্ধ হয়ে মোহ মূর্ছিত হয়ে অশ্রু মোচন করে। সেই সব অশ্রুবিন্দু থেকে জরার উৎপত্তি হয়। তা থেকে অনিষ্টকারক বিয়োগ নামে দুর্মেধা সৃষ্টি হয়। আর দুঃখ ও সন্তাপক নামে দুই ভ্রাতারও জন্ম হয়।

হে মহারাজ, তারপর কেউ বলল, কাম এসেছে। তখন রতির কামকে দেখে অশ্রুপূর্ণ দুই চোখ থেকে আনন্দাশ্রু নির্গত হয়ে জলের মধ্যে পতিত হল। তাতে প্রীতি, খ্যাতি, লজ্জা এবং শান্তির সৃষ্টি হল। তার থেকে দুটি কন্যার জন্ম হল। তাদের নাম লীলা ও ক্রীড়া। তারপর রতির সঙ্গে যখন কামের একান্ত সংযোগ ঘটল, তখন রতির কামচক্ষু থেকে নির্গত আনন্দাশ্রু দ্বারা একটি সুন্দর পদ্মের সৃষ্টি হল। আর সেই সুপদ্ম থেকেই এই সুন্দরী ললনার জন্ম হল। এর নাম অশ্রুবিন্দুমতী। আমি বরুণের কন্যা বিশালা।

হে রাজেন্দ্র, আমি এই সুন্দরীর জন্মবৃত্তান্ত ও আমার পরিচয় দিলাম। আমার এই সখী পতি কামনায় তপস্যা করছে।

বিশালার কথা শুনে যযাতি বললেন–হে শুভে, তোমার কথা সমস্তই শুনলাম, এখন আমার কথা শ্রবণ কর, এই সুন্দরী রতিকন্যা আমাকে ভজন করুক। এই কন্যা যা আকাঙ্ক্ষা করবে, সবই তার প্রাপ্য হবে। যাতে ইনি আমার বশীভূত হন, হে কল্যাণী তুমি তেমন কর। রাজার

কথা শুনে বিশালা বলল–আমার সখীর এক ব্রত আছে, মহারাজ, সর্বজ্ঞ, সুন্দর দেহ, বীরলক্ষণাক্রান্ত, ধর্মপরায়ণ, তেজস্বী, দাতা, ব্রাহ্মণের একান্ত প্রিয়, সুমতি এমন গুণসম্পন্ন বরকেই ইনি মনে মনে কামনা করেন।

এই কথা শুনে মহারাজ যযাতি খুশি হয়ে বললেন–বিধাতা আমাকে তেমনই গুণসম্পন্ন করেই সৃজন করেছেন।

রাজার কথা শুনে বিশালা বলল–হে রাজন্ আপনাকেই ত্রিজগতে পুণ্যবান বলে মনে করি। আপনার মধ্যে সমস্ত গুণ থাকলেও একটি মাত্র দোষের জন্য আমার সখী আপনাকে মনোনীত করবেন না, সেটি হল আপনার জরাগ্রস্ত দেহ। তাই তখনই আমার সখী আপনার প্রিয়া হবে, যখন আপনি জরাহীন দেহ হবেন। হে ভূপতে, আমি শুনেছি পুত্র, ভ্রাতা বা ভৃত্য, এদের কারোর ওপরে জরা সংক্রামিত করে তার তারুণ্য গ্রহণ করা যায়। অতএব আপনি পুত্রকে জরা দান করে তার তারুণ্য গ্রহণ করে সুন্দর রূপ ধারণ করে আমার সখীর কাছে আসুন।

বিশালার মুখে এই কথা শুনে কামাসক্ত যযাতি গৃহে ফিরে আপন পুত্রগণকে ডেকে বললেন–হে পুত্রগণ, তোমরা আমার সুখানুষ্ঠান কর। আমার মন বর্তমান কামানলে দগ্ধ। তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজন আমার জরা গ্রহণ করে আপন যৌবন আমাকে দান কর। আমি ইচ্ছামত কামিনী উপভোগ করি। যে আমার এই জরা গ্রহণ করবে, পরবর্তীকালে আমার রাজ্য সেই ভোগ করবে।

পিতার বাক্যে যদু-আদি চারপুত্র বিভিন্ন তত্ত্বকথা বলে সেই আদেশে অসম্মত হলে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার জরা গ্রহণ করল। আর যযাতি পুরুর তারুণ্য গ্রহণ করে নবযৌবন সম্পন্ন হলেন।

তারপর রাজা যযাতি যুবকের মত নবকলেবর ধারণ করে কামাসক্ত হয়ে ঐ নারীর ধ্যান করতে করতে কামসরোবরে গমন করলেন। অশ্রুবিন্দুমতী সেই সরোবরেই ছিলেন। পরমানন্দে যযাতি তার সখীকে বললেন–জরা ত্যাগ করে, তরুণ দেহ ধারণ করে আমি এসেছি। তোমার সখী এখন আমার ভজনা করুক।

বিশালা বলল–হে মহারাজ, আপনি জরা ত্যাগ করে এসেছেন, কিন্তু একটি দোষে আমার সখী আপনাকে মনোনীত করছেন না, আপনার দুই ভার্য্যা বর্তমান। আপনি কিভাবে এর বশীভূত হবেন? অগ্নিতে প্রবেশ কিংবা পর্বত শিখরে থেকে পতনও ভাল, তবুও সপত্নী

বিষসংযুক্ত স্বামী গ্রহণ করা উচিত নয়। আপনি গুণের সাগর হলেও আপনাকে কান্ত বলে মনে করা যায় না।

রাজা বললেন–আমি কখনই ভার্য্যান্তর সঙ্গ করব না। এই প্রতিজ্ঞা করছি আমি।

তখন অশ্রুবিন্দুমতী বললেন–হে রাজন, এই অঙ্গীকারে আমি আপনার ভার্য্যা হলাম। রাজা যযাতি এই কথা শুনে পরম আনন্দে তাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করলেন। তারপর তিনি সেই কামিনীর সঙ্গে বনে, উপবনে, সমুদ্রতটে বিংশতি সহস্র বৎসর সুখে বিহার করলেন।

তারপর রাজা অশ্রুবিন্দুমতীর ইচ্ছায় পুত্র পুরুকে দিয়ে মহাযজ্ঞ সম্পাদন করলেন। এবার কামকন্যা ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, শিবলোক আর বিষ্ণুলোক দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মহারাজ যযাতি বললেন–প্রিয়ে, তুমি কৌতুকবশে যা অভিলাষ করেছ, আমার পক্ষে তা অসাধ্য, পুণ্য। দান, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারাই এটি সাধন করা যায়। মর্তে এখন কোন ব্যক্তিকে আমি দেখিনি, যিনি মর্ত থেকে সশরীরে স্বর্গে গেছেন, তোমার অন্য কোন অভিলাষ থাকলে আমাকে বল, আমি অবশ্যই তা পূরণ করব।

তার উত্তরে কামপুত্রী বললেন–আমি যা প্রার্থনা করেছি অন্যের কাছে তা অসাধ্য হলেও, আপনার কাছে তা অসাধ্য নয়। হে নৃপতি, তপস্যায়, যশস্বিতায়, বীর্য্যে, দানে, যজ্ঞে আপনার মতো মানুষ, এই মর্ত্যে আর একজনও নেই। আমি যা বলব তা আপনি করবেন, এই অঙ্গীকার করে আমাকে গ্রহণ করেছেন। এখন সেই অঙ্গীকার রক্ষা করছেন না কেন? এই কারণে আমি আপনাকে পরিত্যাগ করে পিতৃগৃহে যাব।

রাজা বললেন–আমার কথিত বিষয় নিশ্চয় পালন করব, কিন্তু কেমন করে আশ্চর্য্য সাধন করব? আমার যা সাধ্য তা বল, আমি নিশ্চয় তা করব।

তার উত্তরে অশ্রুবিন্দুমতী বললেন–হে নরেশ, আমি আপনার বশীভূত হয়েছি এই আশা করেই, যে আপনি সর্বলোক গমন করতে পারবেন। আপনি সকল গুণসম্পন্ন। এই আশাতেই আমি আপনাকে স্বামীরূপে বরণ করেছি। যার প্রতি বিষ্ণু প্রসন্ন আছেন, সে সর্বত্রই ভ্রমণ করতে পারে। আপনি যম ও ইন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ করে এই মর্ত্যকে ব্যাধি ও পাপহীন করেছেন। তাই আপনার মত নৃপতি এই জগতে আর নেই।

যযাতি বললেন– হে প্রিয়ে, তোমার বাক্য সত্যি, আমার সাধ্য কিছুই নেই। শ্রীহরির কৃপায় সমস্ত সুলোকই আমার সাধ্য। আমার স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছা নেই একটি কারণে। স্বর্গে গেলে দেবগণ আমাকে আর মর্তে ফিরতে দেবেন না। আর আমি যদি না আসি তাহলে আমার বিরহে সমস্ত প্রজা মৃতবৎ হবে।

কামকন্যা বললেন–আপনি আমায় ইষ্টলোক দেখিয়ে আবার মর্ত্যে আসবেন।

তখন যযাতি চিন্তা করলেন–মানুষকে কালই কামে নিয়োগ করে কাল মানবকে দাতা, আবার কখনও যাচক করে। মন্ত্র, তপ, দান, মিত্র, কেউই কাল কবলিত মানবকে রক্ষা করতে পারে না। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ–এই তিনটি যেখানে যখন যার দ্বারা সংঘটিত হবে, তার অন্যথা কখনও হবে না। সংসারে কর্মই সব। কর্মই পুরুষকে সুখ-দুঃখে প্রেরণ করে। স্বকৃত সুখ-দুঃখ সকলেই ভোগ করে।

চিন্তিত রাজা যযাতিকে তখন রতিকন্যা অশ্রুবিন্দুমতী বললেন–হে রাজন, সব স্ত্রীলোক চপল হয়। কিন্তু আমি চপলতাবশে আপনাকে এভাবে পরিচালিত করছি না। আমার দেবলোক দর্শনের প্রবল ইচ্ছা। দেবদর্শন মানুষের পক্ষে দুর্লভ, কিন্তু মহাপুণ্যপদ, এতে যদি আপনার দুঃখ হয়ে থাকে, তাহলে থাক্ আর আমি বলব না। আপনাকে স্বর্গে যেতে হবে না। আমি এমন কাজ করব না যাতে আপনার দুঃখ হয়।

তখন যযাতি বললেন–হে দেবী, আমি চিন্তা করছি যে, আমি যখন স্বর্গে যাব, তখন আমার প্রজাবৃন্দ দীন হয়ে যাবে। দুরাত্মা শামনরাজ ব্যাধির দ্বারা তাদের ত্রাস সৃষ্টি জন্মাবে। যাই হোক, তোমার সঙ্গে আমি স্বর্গে যাব।

এই কথা বলে মহারাজ যযাতি তার জরাগ্রস্ত পুত্র পুরুকে ডেকে বললেন–হে পুত্র, তুমি এতদিন আমার জরা গ্রহণ করে অনেক কষ্ট ভোগ করেছ, আর তোমার তারুণ্য গ্রহণ করে আমি বহুকাল সুখভোগ করলাম। এখন এস, তুমি তোমার তরুণ্য গ্রহণ কর, আর আমি আমার জরা ফিরিয়ে নিই। আমার রাজ্যের অধিকারী হবে তুমি। ধর্ম অনুসারে প্রজাপালন করবে। দুষ্টের দমন ও সাধুর সেবা করবে। ত্রিজগতের পুজ্য ব্রাহ্মণদের ভক্তিভরে পালন করবে। বিচক্ষণ ব্যক্তির সঙ্গে মাঝে মাঝে নিজ কোষাগার পর্যবেক্ষণ করবে। প্রসাদ, ধন ও ভোজন দানে নিত্য নিজের সৈন্যদের সম্মানিত করবে। সব দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবে। নিজে সংযতাত্মা থাকবে। কখনও মৃগয়ায় গমন করবে না। স্ত্রীজন ও মহাবলশালী ব্যক্তিকে কখনও বিশ্বাস করবে না। যজ্ঞের দ্বারা শ্রীহরির অর্চনা করবে। প্রজাদের সুখ সুবিধার কথা

সব সময় চিন্তা করবে। পরধন আর পরদারে কখনও লোভ করবে না। পূর্বপুরুষদের সব সময়ে অনুসরণ করবে। সর্বদা তুমি বেদ ও শাস্ত্র আলোচনা করবে।

মহামতি যযাতি পুত্র পুরুকে জ্ঞানমূলক বহু উপদেশ দান করে আশীর্বাদ করে তাকে রাজসিংহাসনে বসালেন। তারপর প্রজাদের আহ্বান করে আনন্দের সঙ্গে বললেন–হে প্রজাবৃন্দ আপনারা, সুখে কাল যাপন করুন, আমি আমার পত্নীর সঙ্গে স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক, শিবলোক এবং সবশেষে বৈষ্ণবলোকে গমন করব।

রাজার এই কথা শুনে প্রজারা দুঃখে ভেঙে পড়ল। তারা বলল–হে মহামতি রাজাধিরাজ আপনি যেখানে থাকবেন, আমাদেরও সঙ্গে সেখানে নিয়ে চলুন। আপনি বিনা আমাদের জীবনধারণের প্রয়োজন নেই। আপনি যেখানে সেখানেই আমাদের পরম সুখ। আমরা আপনার সঙ্গেই গমন করব। মহারাজ যযাতি প্রজাদের এমন কথা শুনে তাদের সবাইকে নিয়ে স্বর্গে গমন করলেন। ঋষিগণ, চারণগণ মহামতি যযাতির স্তব করতে লাগল। সবার সঙ্গে যযাতি যখন ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হলেন, তখন দেবতা গন্ধর্ব ও চারণগণের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্র তার সামনে এসে উপস্থিত হয়ে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর যযাতি ব্রহ্মলোক, রুদ্রলোক এবং বিষ্ণুলোকে গমন করলেন, সর্বত্রই তিনি পরম সম্মানিত হলেন।

মহেশ্বর ক্রোধে সমুদ্রের পুত্ররূপে জলন্ধরের জন্ম

পঞ্চপাণ্ডবের বনবাসকালে একদিন দেবর্ষি নারদ তাদের আশ্রমে উপস্থিত হলে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন –হে মুনিবর, কোন্ কর্মফলে আমরা দুঃখ সাগরে পতিত হলাম।

দেবর্ষি বললেন–সকলেই মানবজন্ম ধারণ করে দুঃখ ভোগ করে, এর থেকে কারোও রেহাই নেই। স্বয়ং ভগবান যখন মনুষ্য দেহ ধারণ করেন, তখন তিনিও দুঃখ ভোগ করেন। সূর্য্যকেও রাহু গ্রাস করে। দেবদেব মহেশ্বরও জালন্ধরের দ্বারা সাগরে নিক্ষিপ্ত হন। সেই জালন্ধরকে অবশ্য মহেশ্বর নিধন করেন।

নারদের মুখে জালন্ধরের কথা শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন–জালন্ধর কে? কার পুত্র? এমন বনমালী কেমন করে হল? কেমন করে মহেশ্বর সেই জালন্ধরকে নিধন করলেন বলুন।

দেবর্ষি বললেন–মহেশ্বরের স্তব করার জন্য একদিন দেবরাজ ইন্দ্র, অন্যান্য দেবতা, গান্ধবগণ, অপ্সরাগণ কৈলাস পুরে গেলেন। কৈলাস শিখরে শঙ্করের সুবিশাল প্রাসাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে ভেতরে প্রবেশ করবার জন্য প্রাসাদের দ্বাররক্ষী নন্দীকে বললে, নন্দী শঙ্করের অনুমতি নিয়ে এসে সবাইকে প্রবেশ করবার জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। দেবরাজ বৃষধ্বজের কাছে গিয়ে তার স্তব শুরু করলেন। নর্তকীরা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে সহর্ষে শিবের সামনে নৃত্য আরম্ভ করল।

তখন মহেশ্বর ইন্দ্রকে বললেন–আমি প্রসন্ন হয়েছি, এখন মনের মত বর গ্রহণ কর।

এর উত্তরে ইন্দ্র গর্বভরে শিবকে বললেন–হে হর, আমার সঙ্গে আপনি সংগ্রাম করুন, আমি এই বরই গ্রহণ করছি। যেখানে আপনার মত যোদ্ধা আছে, সেখানে তার সঙ্গে আমার যুদ্ধ বাধিয়ে দিন। তারপর শিবের কাছে বর লাভ করে ইন্দ্র সহ সকলে সেখান থেকে চলে গেলেন।

এরপর মহেশ্বর প্রমথগণকে বললেন–ইন্দ্র বড়ই গর্বিত হয়েছে। এই কথা বলে শিব খুব রেগে গেলেন। তখন মূর্তিমান ক্রোধ আবির্ভূত হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর বলল–হে প্রভু, আমি আমার কোন্ কার্য্য সমাধান করব বলুন।

শঙ্কর বললেন–তুমি সাগর সঙ্গমে সাগর-বীর্য্যে উৎপন্ন হয়ে ইন্দ্রকে জয় কর। শিবের আদেশ শুনে ক্রোধ সেখান থেকে অন্তর্হিত হল। ঈশান কল্পে স্বর্গ গঙ্গার সঙ্গে সাগরে সঙ্গম হয়েছিল। তাতে একটি সুস্থ সবল সন্তানের জন্ম হয়েছিল। জন্মগ্রহণ করা মাত্রই সেই সন্তান উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে, তাতে ত্রিভুবন বিচলিত হল। তখন ইন্দ্রের কথায় ব্রহ্মা সেখানে উপস্থিত হলে, সমুদ্র তার অর্চনা করে আপন নবজাত পুত্রকে তার কোলে তুলে দিলেন। অপূর্ব সেই সমুদ্রের পুত্রকে দেখে ব্রহ্মা বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন। তারপর তার বিক্রম দেখে তার নাম দিলেন জালন্ধর। আর স্নেহ ভরে তাকে, দেবতাগণের অজেয় হবে, স্বর্গ ও পাতাল রাজ্য ভোগ করবে, এই বর দিয়ে ব্রহ্মা চলে গেলেন।

বৃন্দার সঙ্গে জালন্ধরের বিবাহ

ক্রমে ক্রমে জালন্ধর বড় হতে লাগল। বাল্যকালেই সিংহশাবক ধরে খাঁচায় বন্দী করে খেলাধুলা করতে লাগল। আকাশে উঠে বড় বড় পাখি ধরে মাটিতে ফেলতে লাগল। সাগর থেকে স্বর্গ পর্যন্ত তার ঘোর গর্জনে সকলেই ভীত, সন্ত্রস্ত। জালন্ধরের ভয়ে সমুদ্রে বসবাসকারী প্রাণীরা লুকিয়ে থাকল।

সাগরনন্দন ক্রমশঃ যৌবনে পদার্পণ করল। তখন জালন্ধর পিতা সমুদ্রকে বলল–আমায় বাসযোগ্য বিস্তৃত স্থান দান করুন। তার উত্তরে সমুদ্র বললেন–তোমাকে আমি ভূতলে দুর্লভ রাজ্য প্রদান করব। এই সময় দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সমুদ্রের কাছে এলে সমুদ্র তার যথাবিধি অর্চনা করে বললেন–আপনার কোন্ কার্য্য আমি সাধন করব বলুন।

শুক্রাচার্য বললেন–হে সাগর, তোমার পুত্র জালন্ধর অবশ্যই আপন বলে ত্রিভুবন ভোগ করবে। জাম্বুদ্বীপে এক মহাপীঠ আছে, ঐ পীঠই জালন্ধরের উপযুক্ত গৃহ। তোমার জন্যই সেই স্থান জলে প্লাবিত রয়েছে, এখন তুমি ওই স্থানকে জল মুক্ত করে তোমার পুত্রকে দান কর। জালন্ধর ওই স্থান থেকে অজেয় ও অবধ্য হবে।

শুক্রাচার্য্যের উপদেশমত সমুদ্র সেই পীঠস্থান থেকে সরে গেলে তা স্থলেই পরিণত হল। শত যোজন বিস্তৃত আর তিনশত যোজন দীর্ঘ সেই স্থানে সমুদ্রের নির্দেশমত ময়দানব একটি রত্নময় পুরী নির্মাণ করল। সেই পুরীতে সমুদ্র শুক্রাচার্য্যকে দিয়ে তার পুত্র জালন্ধরের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। তারপর মহাপদ্ম জালন্ধরকে সহস্র সংখ্যক সৈন্য অর্পণ করলেন। শুক্রাচার্য জালন্ধরকে স্নেহভরে মৃতসঞ্জীবনী ও রুদ্র মোহিনী মায়া বিদ্যা দান করলেন। সেই দেশ জালন্ধর নামে খ্যাত হল। কালনেমি প্রমুখ পাতালের দৈত্যরা সেখানে উপস্থিত হয়ে শুম্ভাসুরকে জালন্ধরের সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত করলেন। আর জালন্ধর নিজের সৈন্যদের বশীভূত করে মহা আনন্দে পিতৃদত্ত রাজ্য ভোগ করতে লাগল।

স্বর্গে স্বর্ণা এক অপ্সরা ছিল। ক্রৌঞ্চের দ্বারা তার বৃন্দা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। অতি সুন্দরী জনমোহিনী প্রমদা বৃন্দাকে কার হাতে সম্প্রদান করবে, এই কথা চিন্তা করে অস্পরা স্বর্ণা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যকে সব কথা বললেন। দৈত্যগুরু সেই কন্যাকে দেখে চমৎকৃত হলেন, পরে কন্যাকে বললেন–এই রূপ নিয়েই তুমি দীর্ঘায়ু ও সুখিনী হও। এ জগতে যাকে সবচেয়ে সুন্দর রূপে সৃজন করে বিধাতা নিজেই আশ্চর্য হয়েছেন, সেই বীরপুরুষকে পতিরূপে প্রাপ্ত হবে।

যথাসময়ে জালন্ধরের সঙ্গে বৃন্দার বিবাহ হল। বৃন্দাকে স্ত্রী রূপে পেয়ে জালন্ধরও খুব সুখী।

দৈত্যরাজ জালন্ধরের সঙ্গে দেবতাগণের যুদ্ধ, শ্রীহরি ও দেবতাগণের সহায় ইন্দ্র কর্তৃক বলাসুর বধ, বলাসুরের দেহ থেকে সকল রত্ন ও ঠাকুর উৎপত্তি, যুদ্ধে শ্রীহরির পরাজয় ও ক্ষীরসমুদ্র বাস।

ক্ষীরসাগর জালন্ধরের পিতৃব্য। ক্ষীরসাগর মন্থন করে জালন্ধরের সব ধনরত্ন দেবতারা চুরি করে নিয়ে যায়। এমনভাবে চুরি করার কারণ জানার জন্য জালন্ধর দুর্বারণ নামে এক পুত্রকে স্বর্গে পাঠান।

ইন্দ্র দূতকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দুর্বারণ বলল–ত্রিভুবনের রাজা জালন্ধরের দূত আমি। আপনাকে এই কথা বলার জন্য আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন যে, কেন আমার মহাধন পূর্ণ কোষাগার হরণ করেছেন? সেইসব, সম্পদ সত্বর প্রদান করে এই স্বর্গপুরী থেকে শীঘ্র চলে যান। তারপর দুর্বারণ বলল–হে ইন্দ্র, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, ফল চাও তবে, জালন্ধরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

ইন্দ্র দূতের কথা শুনে হেসে বললেন–জড়রুপী সাগর আমার শত্রু হিমালয়ের পুত্র মৈনাককে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছে, ধর্মবিদ্বেষী দানবদের সাগর আশ্রয় দিয়ে নিত্য ঘৃত, দধি ক্ষীর দান করছে। এই কারণে আমরা তাকে মথিত, দণ্ডিত ও শ্রীভ্রষ্ট করেছে। জালন্ধর যদি তার সব সৈন্য নিয়েও আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তবুও তাকে আমরা নাশ করব।

ইন্দ্রের এমন গর্বিত কথা দূতের মুখে শুনে জালন্ধর রাগে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ভূতল আর রসাতলের সমস্ত দানবসৈন্যকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলেন। ঐ সব দানবসৈন্যকে বিকট আকারে দেখতে। তারা সবাই স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করার জন্য স্বর্গ অভিমুখে ধাবিত হল। সেই সময় স্বর্গে দিব্য, ভৌম, অন্তরীক্ষে নানান উৎপাত শুরু হল। প্রচুর ধুলাবৃষ্টি হল। ইন্দ্রের বর্জ্য নিষ্প্রভ হয়ে নীচে পড়ে গেল। এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ইন্দ্র ভয় পেয়ে দেবগুরু বৃহস্পতিকে বললেন–হে গুরুদেব, আমি এখন কি করব? কার শরণ নেব? মনে হয় ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত।

তারপর বৃহস্পতির কথামতো ইন্দ্র দেবতাদের সঙ্গে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা বৈকুণ্ঠ দ্বারে এসে দাঁড়ালে, দ্বারপাল বিজয় প্রভু শ্রীহরির কাছে গিয়ে দেবতাদের আগমনের কথা জানালেন। তখন সমুদ্র নন্দিনী লক্ষ্মীদেবী নারায়ণকে বললেন–প্রভু, আমার ভ্রাতা জালন্ধরকে বধ করবেন না। লক্ষ্মীদেবীর কথা শুনে নারায়ণ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের সামনে এলেন।

ইন্দ্র শ্রীহরিকে নমস্কার করে সব কথা জানালে, শ্রীহরি ইন্দ্রকে যুদ্ধের আয়োজন করতে বললেন, এবং তিনি নিজে এই যুদ্ধ দেবতাদের সহায় হবেন একথাও জানালেন।

এরপর দেবতারা যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হয়ে দৈত্যসৈন্যদের বধ করবার জন্য সুমেরুর উত্তর ভাগে জমায়েত হল। আর জালন্ধরের সৈন্যরা সুমেরুর দক্ষিণাংশে অবস্থান করল। ইতিপূর্বে শুক্রাচার্য্য বলেছিলেন যে, যে পক্ষ সুমেরুর দক্ষিণাংশে অবস্থান করে যুদ্ধ করবে, তারাই যুদ্ধে জয়লাভ করবে। তারপর দেব-দানবদের ভীষণ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। উভয় পক্ষের সৈন্যগণের সংঘর্ষণে যেন ত্রিলোক বিধ্বস্থ হবার উপক্রম হল।

শ্রীহরি ক্রুদ্ধ হয়ে গদাঘাতে কালনেমিকে আহত করলেন। কালনেমি তাতে অজ্ঞান হয়ে গেলেও পরে চেতনা লাভ করে বিষ্ণুর অঙ্গে শরাঘাত করলেন। তখন ভগবান শ্রীহরি ক্রোধে কালনেমিকে বধ করলেন। চন্দ্র রাহুকে খড়গদ্বারা আঘাত করলে রাহু তাকে ত্যাগ করে সূর্যের দিকে ধাবিত হল। বহু যুদ্ধ করে সূর্যকে পরাস্ত করবার পর রাহু আবার চন্দ্রকে আক্রমণ করল। তারপর রাহু উচ্চৈঃশ্রবাকে নিয়ে জালন্ধরের কাছে গেল। ময়দানব পাশদ্বারা মৃত্যুকে বন্দী করে জালন্ধরের কাছে সমর্পণ করল। ইন্দ্র নমুচিকে পাশে বন্দী করে তাকে রসাতলে পাঠিয়ে দিল।

এরপর সমরে প্রবেশ করলেন জালন্ধর। তখন ইন্দ্র আর বল দানবের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলছে। ইন্দ্রের নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্রই বলের দেহে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্র তখন ছল করে বজ্রদ্বারা বলকে আঘাত করলে তার দেহ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। বলাসুরের সেই বিশুদ্ধ দেহের অংশগুলি রত্নবীজরূপে পরিণত হল। তার চোখ থেকে ইন্দ্রনীল মণি, কর্ণ থেকে মাণিক্য, রক্ত থেকে পদ্মরাগ, মেদ থেকে মরকত, জিহ্বা থেকে প্রবাল, দন্ত থেকে মুক্তা, নাসিকা থেকে গারুত্মতের সৃষ্টি হল। বলাসুরের বিষ্ঠাত্রে সৃষ্টি হল কাংস্য, বীর্য্যে রজত, মূত্রে তাম্র, নখরাজিতে সোনা, রক্ত থেকে রস, মেদ থেকে স্ফটিকাদি উৎপন্ন হল। এইভাবে পৃথিবীতে যত রত্ন ধাতু দেখা যায়, সবই বলাসুরের দেহ থেকে সৃষ্টি।

এইভাবে ইন্দ্র বলাসুরকে বধ করলে জালন্ধর ইন্দ্রকে বলল–হে অধম, কপটতার সাহায্যে বলাসুরকে নিধন করে তুই পালাবি কোথায়? এই কথা বলে শর নিক্ষেপ করে ইন্দ্রের সারথি, অশ্ব, গজ, রথ সব বিচ্ছিন্ন করে দিল। ইন্দ্র শরবিদ্ধ হয়ে মুচ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। চেতনালাভ করে ইন্দ্র জালন্ধরের দিকে বজ্র নিক্ষেপ করলে, জালন্ধর সেই বজ্র হাতে ধরে

ইন্দ্রকে ধরবার জন্য তার দিকে ধাবিত হল। তাকে আসতে দেখে ইন্দ্র রথ ছেড়ে ছুটে পালালেন।

তারপর শ্রীহরি ক্রুদ্ধ হয়ে দৈত্যবাহিনীর বহু সৈন্য বিনাশ করলেন। তখন জালন্ধরের আদেশে সৈন্যরা শ্রীহরিকে সব দিক থেকে ঘিরে ফেলল, আর বাণ নিক্ষেপ করল। বিষ্ণু ক্রোধে অসুরদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে সকলকে ধরাশায়ী করলেন।

তারপর জালন্ধরের সঙ্গে ভীষণভাবে সংগ্রামে রত হলেন।

এদিকে শুক্রাচার্য মন্ত্রবলে সমস্ত দৈত্য-সৈন্যগণকে জীবিত করে দিলে, তারা আবার দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে উঠল। তাতে বহু দেবতার বিনাশ হলে দেবগুরু বৃহস্পতি দ্রোণাচল থেকে ঔষধি এনে নিহতদের বাঁচিয়ে দিলেন। জালন্ধর এই ব্যাপার জানতে পেরে কৌশলে। দ্রোণাচলকে রসাতলে পাঠিয়ে দিল। আবার যুদ্ধ আরম্ভ হলে দেবতারা নিহত হলেন। তখন বৃহস্পতি। দ্রোণাচলের ক্ষয় হেতু ঔষধি না পেয়ে জীবিত দেবগণকে বললেন–ঔষধি আর পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব দেত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হওয়া কখনই সম্ভব নয়, তোমরা সকলে পালাও, তখন দেবগুরুর বাক্যে দেবতারা রণস্থল পরিত্যাগ করে চলে গেল। বৃহস্পতিও সেই পথ ধরলেন।

এরপর বিষ্ণু আর জালন্ধরের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হল। হঠাৎ জালন্ধর বিষ্ণুর কাছে এসে এক হাতে বিষ্ণুর গরুড় এবং অন্য হাতে তার রথ ধরে শূন্যপথে ঘুরিয়ে শ্বেতদ্বীপে নিক্ষেপ করলেন। তখন শ্রীহরি রথ ও গড়ুর বিহীন হয়েও জালন্ধরের হৃদয়ে তীক্ষ্ণ শক্তি নিক্ষেপ করলেন। তাতে দৈত্যরাজ পতিত হল। আবার চেতনা লাভ করে জালন্ধর বিষ্ণুর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু করল। লক্ষ্মীর প্রেমে হরি জালন্ধরকে বধ করলেন না, পরন্তু তিনি নিজেই তার মারে পতিত হলেন।

তখন জালন্ধর জগন্নাথকে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হতে দেখে রথে তুলে নিজ শিবিরে নিয়ে এল। লক্ষ্মীদেবী যেখানে উপস্থিত হয়ে অচেতন হরিকে দর্শন করে জালন্ধরকে বললেন–ভ্রাতঃ তুমি বিষ্ণুকে জয় করেছ। কিন্তু ভগিনীর বৈধব্য সম্পাদন করা উচিত নয়।

লক্ষ্মীর কথায় জালন্ধর বিষ্ণুকে যুক্ত করে ভগিনী এবং শ্রীহরিকে প্রণাম করলেন। তখন বিষ্ণু দৈত্যরাজকে বললেন–তোমার ব্যবহারে আমি তুষ্ট, তুমি বর প্রার্থনা কর। জলন্ধর বললেন–হে কেশব যদি তুষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে এই বর প্রার্থনা করছি, আপনি কমলার সঙ্গে আমার পিত্রালয়ে বাস করুন। শ্রীহরি তাকে বর প্রদানের জন্য কমলাকে নিয়ে ক্ষীরসাগরে গমন

করলেন। জালন্ধরকে বধ হেতু দেবগণসহ বিষ্ণু ও শিবের উদ্যোগে, চক্রসৃষ্টি, রাহুকে দূতরূপে শিবের নিকট প্রেরণ, জালন্ধরের পুনরায় যুদ্ধযাত্রা, বৃন্দা কর্তৃক নিষেধকরণ এবং জালন্ধর ও শিবের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম।

দেবতাগণ দেবাসুর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হল। তারপর জালন্ধর শুম্ভকে স্বর্গ-সিংহাসনে আর নিশুম্ভকে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত করে নিজে জালন্ধর পীঠে বহুকাল রাজত্ব করল। দৈত্যরাজ সকল যাতে ভাগ ভোগ করতে লাগল। তার রাজত্বকালে সকলেই সুখে-স্বচ্ছেন্দে বাস করতে লাগল। কোন জরা ব্যাধি ছিল না। সকলেই সৎপথে কাল যাপন করতে লাগল। কারও প্রতি কারও হিংসা-দ্বন্দ্ব ছিল না।

অন্যদিকে দেবতারা চরম দুর্দশা ভোগ করতে লাগল। যজ্ঞানুষ্ঠানও বন্ধ। তখন দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে দুঃখের কথা জানালে, ব্রহ্মা তাদের নিয়ে শিবের কাছে গেল। শঙ্করের বহু স্তব স্তুতি করে দেবতারা তাদের দুঃখের কথা নিবেদন করলে দেবদেব মহাদেব বললেন–বিষ্ণুর হাতে যে শত্রুর নিধন হল না, সেখানে আমি কি করব? প্রাচীন অস্ত্রের দ্বারা জালন্ধরকে বিনাশ করা যাবে না, হে ব্রহ্মণ, আপনি সুরগণসহ ক্রোধযুক্ত তেজ নিঃসরণ করুন।

তখন শিবের বাক্যে ব্রহ্মাসহ সব দেবতারা তাদের ক্রোধযুক্ত তেজ ত্যাগ করলেন, স্বয়ং রুদ্রও ত্রিনেত্রজাত তেজ ত্যাগ করলেন। তারপর শিবের স্মরণে শ্রীহরি সেখানে উপস্থিত হলে, শিব বললেন, হে হরি, কি কারণে আপনি জালন্ধরকে বধ করলেন না? আর কি কারণে দেবগণকে পরিত্যাগ করে ক্ষীরোদ সাগরে শয়ন করে আছেন?

শিবের প্রশ্নের উত্তরে বিষ্ণু বললেন–আমার ভার্য্যা সাগর নন্দিনী, আর জালন্ধর সাগরনন্দন, আমি যদি জালন্ধরকে বিনাশ করি তাহলে লক্ষ্মী আমার প্রিয়া থাকবে কেমন করে? তাই হে হর, আপনিই জালন্ধরকে যুদ্ধে বিনাশ করুন।

শিবের ইচ্ছায় বিষ্ণু ক্রোধযুক্ত তেজ ত্যাগ করলেন। এরপর দেবদেবি শম্ভু হাস্য করে সব তেজের উপর উৎপতিত হয়ে নৃত্য শুরু করলেন। আর দেবতারা সহর্ষে বাদ্যধ্বনি করলেন। তখন শম্ভুর নর্তন ও মর্দনে এক চক্র উৎপন্ন হল। শিব সেই চক্র উৎপন্ন ব্রহ্মার হাতে তুলে দিলেন কিন্তু সেই চক্রের তেজে ব্রহ্মার মস্তক দগ্ধ হতে থাকলে শিব সেই চক্র নিয়ে নিজের কাছে রাখলেন।

তারপর দেবর্ষি নারদ জালন্ধরের কাছে গিয়ে বধের জন্য শিব সচেষ্ট হচ্ছে জানালে, জালন্ধর ক্রোধে রাহুকে পুত্র রূপে কৈলাসে শিবের কাছে পাঠাল। রাহু শিবের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল–হে গিরিশ, তুমি নিষ্ঠুন, তপোনিষ্ঠ, ধর্ম বর্জিত, তোমার পিতামাতা নেই, কোন গোত্রও নেই। মহাবাহু জালন্ধর ত্রিভুবনপতি, তাই তুমি তার বশ্য।

কিন্তু মহেশ্বর রাহুর কথার কোন উত্তর দিলেন না। তখন রাহু নন্দীকে বলল–তোমার প্রভু আচার ভ্রষ্ট, তাকে শিক্ষা দাও তুমি, ইনি আমার প্রভুর ক্রোধের সমরে নিহত হবেন। এই কথা বলে রাহু জালন্ধরের কাছে এসে সব কথা জানাল। এমনকি গৌরীর রূপের কথাও জানাল।

দূতের কথায় জালন্ধর সৈন্য সজ্জিত করে শিবের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য উদ্যত হয়ে প্রথমে অনন্ত শয্যায় শায়িত শ্রীহরিকে বলল–আমি তোমার ভোগের নিমিত্ত কি প্রদান করতে পারি?

নারায়ণ হেসে বললেন–তোমার কি প্রিয় কার্য্য আমি করব?

তার উত্তরে জালন্ধর বলল–আমি যুদ্ধে যাচ্ছি, এই সাগরেই তুমি সুখে অবস্থান কর। এই কথা বলে দৈত্যরাজ পিতাকে প্রণাম করে বলল-পিতা, আমাকে আশীর্বাদ করুন, যাতে আমি রুদ্রকে জয় করতে পারি।

তখন সমুদ্র পুত্রকে বললেন–আমার প্রদত্ত রাজ্য ভোগ করে তুমি সুখেই আছ। মর্তকে স্বর্গের থেকেও উন্নত করেছ। তোমার রাজ্যে ধরিত্রী বৈকুণ্ঠের মত বিরাজ করছে। হরিকে তুমি লক্ষ্মীর সঙ্গে এনেছ। তাই তোমাকে আমি নিষেধ করছি, ভিক্ষুক শিবকে তুমি পরিত্যাগ কর। তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব কর না।

কিন্তু জালন্ধর পার্বতীর ওপর অনুরাগবশতঃ পিতার কথা আগ্রাহ্য করে সৈন্যদের কাছে উপস্থিত হলেন। জালন্ধরের পত্নী বৃন্দাদেবী স্বামীকে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত দেখে তাকে বললেন–হে নাথ, আপনি শঙ্করের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না। পার্বতীর প্রতি আপনার মন নিবিষ্ট হয়েছে, তা আপন নিবরণ করুন। গৌরী তপস্বিনী, নিরাশ্রয়া, বন্ধ্যা, কাজেই আপনি তাকে ত্যাগ করে আমার ভজনা করুন।

তখন জালন্ধর বৃন্দাকে নানা সান্ত্বনা বাক্যে তুষ্ট করে যুদ্ধের জন্য কৈলাস অভিমুখে যাত্রা করল। কিন্তু মহেশ্বর কৈলাস ত্যাগ করে মানসোও নামে এক দুর্গম মহাপর্বতে গেছেন। এই বার্তা জালন্ধরকে শুক্রাচার্য্য দিলে, জালন্ধর বলল–যেখানে শঙ্কর আছে আমিও সেখানে

যাব। তারপর শুক্রাচার্যের সঙ্গে জালন্ধর মানসোও গিরিতে উপস্থিত হল। অসংখ্য দৈত্য সৈন্যতে সেই স্থান বেষ্টিত হল।

সেই সুবিশাল দৈত্য বল দর্শন করে মহেশ্বর পার্বতীকে গিরিশৃঙ্গে সখীদের কাছে রেখে বহুতর প্রমথ সৈন্য নিয়ে নন্দীর সঙ্গে যুদ্ধে গমন করলেন। তারপর তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। প্রমথদের তীক্ষ্ণ বাণে বহু দানব নিহত হল। প্রথমদের দানবরাও আহত করল। কার্তিক গণেশও পরাজিত হলেন। মহেশ্বর তাই দেখে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করলেন। জালন্ধর ও মহেশ্বরের যুদ্ধ বর্ণনাতীত।

মহেশের রূপ ধারণ করে জালন্ধরের পার্বতীর নিকট গমন ও তাকে মোহিতকরণ। শ্রীহরির মায়ায় বৃন্দার দুঃস্বপ্ন দর্শন, শ্রীহরির মায়াপুণ্যাশ্রমে গমন ও বৃন্দার সতীত্বনাশ, বৃন্দার পরমপদ প্রাপ্তি ও বৃন্দাবন নামের সৃষ্টি।

জালন্ধর বহুক্ষণ যুদ্ধ করবার পর চিন্তা করল নারদের মুখে গিরিজার যে রূপ শুনেছি, তাতো আমার তখনও দেখা হল না। তারপর মতলব খাঁটিয়ে শুম্ভ দৈত্যকে ডেকে বলল হে শুম্ভ, তুমি যুদ্ধে আমারই মত পরাক্রমশালী, এখন আমার বস্ত্রাদি নিয়ে তুমি এই সংগ্রাম পরিচালনা কর। এই বলে জালন্ধর নিজের যুদ্ধের পোষাক শুম্ভকে দিয়ে গৌরীকে দেখবার জন্য চললেন। সবার অলক্ষে মানসোত্তর গিরির সুরক্ষিত গুহায় গিয়ে শঙ্করের রূপ ধারণ করল তার দূত দুর্বারণ নন্দীর রূপ ধারণ করল।

সখীগণের সঙ্গে যেখানে গৌরী আছেন, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে, গৌরীর সখীরা মহেশ্বর ও নন্দীকে দেখে জিজ্ঞাসা করল হে প্রভু, কে এমন দশা করেছে আপনার? হে নাথ, শল্যযুক্ত হয়ে আপনি সংসারী লোকের মত কেন রোদন করছেন? শঙ্কর নন্দীর কাঁধে ভর দিয়ে আসছেন দেখে শঙ্করী। বিস্মিত হলেন, তারপর দেবী যখন শঙ্করের হাতে কার্তিক ও গণেশের ছিন্নমুণ্ড দেখলেন, তখন 'হা রুদ্র' বলে কাঁদতে লাগলেন। তার সখীরাও শোকাতুরা হয়ে কাঁদতে লাগল।

কপট শিব দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে গিরিজাকে বললেন–প্রিয়ে, নিহত পুত্রদ্বয়ের জন্য শোক করে আর লাভ কি? এখন তোমারা সানন্দে আমাকে পরিত্রাণ কর।

শঙ্করের এমন অসময়োচিত কুবাক্য শুনে দেবী বললেন–হে নাথ, ভয়ে সমাধি অবস্থানে, শ্রাদ্ধ যাত্রা কালে, গুরু ও বৃদ্ধাজনের সন্নিধানে রতিক্রিয়া জ্ঞানীগণ নিষিদ্ধ বলেছেন। তাই বর্তমান অতীব দুঃখিতা আমাকে কেন আকাঙ্ক্ষা করছেন?

কপট শঙ্কর অম্বিকার এমন কথা শুনে তাঁর রূপে মোহিত হয়ে আপন স্বার্থসাধনের জন্য বলল যে স্ত্রী প্রার্থনাকারী পুরুষকে রতিদান করে না, সে নরকে পতিত হবে, আমি সময়ে পুত্রহারা, প্রমথগণ শূন্য হয়ে ধনশূন্য ছিলাম। সম্প্রতি গৃহশূন্য হয়ে সর্বশূন্য হলাম। এখন আমি স্বগৃহ ত্যাগ করে পত্নী ত্যাগ করে তীর্থে ভ্রমণ করব। নন্দী তুমি আমার আগে গমন কর।

মায়া মহেশের এমন বাক্য শুনে দেবী গিরিজা শোকে একেবারে অভিভূত হলেন। কিন্তু শঙ্করের এই দারুণ ক্ষোভে কোন উত্তর দিলেন না। যিনি স্থাবর জঙ্গম সর্বচরাচর মোহিত করে রেখেছেন, তিনিই মায়া মহেশ কর্তৃক মোহিত হলেন।

এদিকে হরির হৃদয় হঠাৎ ক্ষুব্ধ হল। আরও বিষম উৎপাতের লক্ষণ দেখে তিনি গড়ুরকে পাঠিয়ে সব কিছু অবগত হয়ে বৃন্দাদেবীর সতীত্ব নাশ করবার জন্য যোগমায়া বলে অন্যরূপে নির্গত হলেন। শ্রীহরির সঙ্গে অনন্তদেবও জটা বল্কল ধারণ করে সর্বকাল ফলপ্রদ এক পুণ্যাশ্রম প্রস্তুত করলেন। তারপর হরি সেই বনে মন্ত্রবলে জালন্ধরের ভার্য্যা বৃন্দাকে আকর্ষণ করলেন। বৃন্দার অন্তরে তখন প্রিয় সমাগম চিন্তা প্রকট হল। রাতে এক ভয়ানক বৈধব্য সূচক স্বপ্ন দেখলেন–জালন্ধরের মস্তক বিচ্ছিন্ন, মুক্তকেশী করাল বদনী কালী হাতে খপ্পর নিয়ে তা ভক্ষণ করছে। বৃন্দা গৃহে স্থির থাকতে না পেরে রথে আরোহণ করে এক সৌভাগ্য কাননে এসে উপস্থিত হলেন।

সেই বন তাঁকে সুখ দিতে না পারলে, অন্য বনে বৃন্দাদেবী গেলেন। সেই সময় এক রাক্ষস এসে তাকে বলল আমি শুনেছি, তোমার পতি জালন্ধর শিবের হাতে নিহত হয়েছে। তাই তুমি আমাকেই পতিরূপে বরণ কর।

এই কথা শোনামাত্র বৃন্দাদেবী অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। তখন জটা বল্কলধারী শ্রীহরি সেখানে উপস্থিত হলেন। বৃন্দায় স্মরদূতী তাদেরকে দেখে বিলাপ করলে মাধব বললেন–ভয় নেই, আমরা তোমাদের উদ্ধার করবার জন্য এসেছি, এই বলে তিনি ক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সেই রাক্ষসকে ভস্ম করে দিলেন।

তারপর শ্রীহরির মায়ামুগ্ধা বৃন্দাদেবী বললেন–কে আপনি, হঠাৎ এখানে এসে আমাকে রক্ষা করলেন আমি আপনার আশ্রমে বাস করে তপস্যা করব।

জটা বল্কলধারী শ্রীহরি বললেন–আমি ভরদ্বাজের পুত্র দেবশর্মা। সকল প্রকার ভোগ ত্যাগ করে এই শিষ্য বালকের সঙ্গে অরণ্যে এসেছি। যদি তুমি আমার আশ্রমে থেকে তপস্যা করতে চাও, তাহলে চল অন্য বনে গমন করি, এই বলে পূর্বদিকে শ্রীহরি গমন করলেন। তার পশ্চাতে স্মরদূতী সহ বৃন্দাদেবীও চললেন।

তারপর বৃন্দাদেবী ছদ্মবেশী শ্রীহরির সঙ্গে আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন তার পতিদেবতা দিব্যপাল শয়ন করে আছেন। বিস্মিতা বৃন্দাদেবী বললেন–হে নাথ, এই আশ্রমে তুমি কেমন করে এলে? কিভাবে শিবের সঙ্গে যুদ্ধ হল?

তার উত্তরে কপট নারায়ণ বললেন–প্রিয়ে রুদ্রদেব, রৌদ্র চক্রদ্বারা আমার মস্তক ছেদন করলে তোমার সাধনাযোগে আমার ছিন্ন শির দেহের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুনরায় জীবিত হল।

মায়ারূপী জালন্ধরের এই কথা শুনে বৃন্দার হৃদয়ে পূর্বভাগ জাগরিত হল। প্রিয়তম জ্ঞানে নারায়ণকে গাঢ় আলিঙ্গনে ও রতিলালসায় চুম্বন করতে লাগলেন। তখন শ্রীহরি সুরত ব্যাপারে পরম সুখ অনুভব করলেন। রতিশ্রম জনিত বৃন্দার দেহস্বেদ থেকে তুলসীর জন্ম হল।

এইভাবে কয়েকদিন বৃন্দার অঙ্গ সঙ্গসুখ অনুভব করে শিবকার্য্য স্মরণ করলেন। একদিন রতিক্রিয়ার পর বৃন্দাদেবী দেখলেন, সেই পূর্বের দেখা মুনি তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে রয়েছে। হঠাৎ তাকে এই রূপে দেখে কণ্ঠ থেকে বাহুবন্ধন ছিন্ন করে বললেন–মুনিবেশ ধারণ করে আমাকে মোহিত করলেন, আপনি কে?

শ্রীহরি বৃন্দার কথা শুনে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–আমি নারায়ণ। বৃন্দা তোমার স্বামী মায়ারূপে পার্বতীকে মোহিত করবার জন্য কৈলাস শিখরে গেছে। কিন্তু যে শিব, সেই আমি। আমার অভিন্ন হয়েও ভিন্নাকারে বিরাজিত। তোমার জালন্ধর সমরে নিহত হয়েছে, কাজেই এখন আমাকেই তুমি ধ্যান। কর।

শ্রীহরির কথা শুনে বৃন্দা কুপিতা হয়ে বললেন–যদি নিত্য ধর্মের পতি, কেন তিনি পরস্ত্রীতে রত? মনীষীগণ বলেন–ভগবানকেও কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। তাই তুমি যেমন

আমাকে, মায়া তপস্বীবেশে মোহিত করলে, তেমনি তোমার বধূকেও কোন মায়া তপস্বী হরণ করবে।

বৃন্দার দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে হরি অন্তর্হিত হলে, বৃন্দার বুঝতে বাকী থাকল না যে, এ সবই বিষ্ণুর কার্য। এক সরোবরে বিষ্ণুঃসঙ্গ দূষিত দেহ, ধৌত করে সেই সরোবরের তীরে নির্বিকার চিত্তে আপন দেহকে শোষণ করতে লাগলেন। তারপর তিনি যোগাভ্যাসের দ্বারা পরমপদ প্রাপ্ত হলেন। দেবগণ তার প্রশংসা করে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। বৃন্দার স্মরদূতী তাঁর পবিত্র দেহ কষ্টদ্বারা ভস্মে পরিণত করে নিজেও সেই অগ্নিতে প্রবেশ করল। দুই সতীর ভস্মশেষ অপ্সরাগণ মন্দাকিনীর জলে নিক্ষেপ করল। বৃন্দা যেখানে দেহত্যাগ করে মোক্ষধাম প্রাপ্ত হলেন, গোবর্ধন গিরির সমীপেস্থ সেই স্থানই বৃন্দাবন নামে খ্যাত হল। জায়ার দ্বারা পার্বতীর মায়া শিবকে পরীক্ষা, পুনরায় জালন্ধর ও শিবের যুদ্ধজালন্ধর কর্তৃক মায়া গৌরী ও মায়া জয়া সৃষ্টি করে শিবকে মোহিত করেন এবং শিব কর্তৃক জালন্ধরের বধ হল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন-হে দেবর্ষি, শিবের রূপ ধরে জালন্ধর কীভাবে পার্বতীকে মোহিত করল, আমাকে বলুন। তার উত্তরে দেবর্ষি বললেন–পুত্রশোকে ব্যথিতা পার্বতীকে মায়া শিব যখন আকাঙ্ক্ষা করল, তখন পার্বতী মনে মনে চিন্তা করলেন আমার স্বামী দেবদেব মহশ্বের কখনই এই অবস্থায় আতুর হতে পারেন না।

এই চিন্তাকরে মায়া শিবকে উপেক্ষা করে স্থান ত্যাগ করে গঙ্গাতীরে গমন করলেন। সেই জলে সখীসহ স্নান করে দেহ সংস্কার করে সখী জয়াকে বললেন–জয়া, আমার রূপ ধরে তুমি ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে জানবার চেষ্টা কর প্রকৃতই উনি শিব না অন্য জন। যদি তোমাকে আলিঙ্গন, চুম্বনাদি করে, তাহলে নিশ্চয় জানবে, সে কোন অসুর। যদি তোমাকে দেখে আমার শুভাশুভ তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে জানবে নিশ্চয় তিনি দেবদেব মহেশ্বর।

পার্বতীর আদেশে জয়া মায়া শিবের কাছে গেলে কামপীড়িত জালন্ধর তাকে পার্বতী জ্ঞানে জোর করে আলিঙ্গন ও সুরত ক্রিয়ায় রত হল।

জয়া তখন নিজ রূপ ধারণ করে বলল দৈত্য, আমি পার্বতী নই। তুই বড় দুরাচারী। এই পাপেই তুই মহেশের হাতে নিধন হবি, এই কথা বলে জয়া পার্বতীর কাছে গিয়ে সব বললে দেবী ভীত হয়ে একটি পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

এদিকে মানসোত থেকে ফিরে জালন্ধর তার দূতের মুখ থেকে বৃন্দার সব কথা শুনে ক্রোধে বলল–বুদ্ধিমান লোক গৃহস্থিত জামাতাকে কখনও বিশ্বাস করবে না। তারপর চিন্তা করে দুর্বারণকে জিজ্ঞাসা করল এখন কোন কর্তব্য আগে করা দরকার আমার? উত্তরে দুর্বারণ বলল যে যেমন কর্ম আগে করে তেমন কর্মফল তাকে ভোগ করতে হবে। হে দৈত্যপতি, আপনি গৌরীকে হরণ করতে গিয়েছিলেন, আর হরি আপনার বন্ধুকে হরণ করেছেন, আগে আপনি শিবের সঙ্গে সংগ্রাম করুন। যদি হরিকে আগে জয় করতে যান, তাহলে রুদ্র পশ্চাৎ দিক থেকে আপনাকে সংহার করবে। আগে মহেশকে জয় করুন।

এই কথা শুনে জালন্ধর শিবের উদ্দেশ্যে রণক্ষেত্রে গমন করে ভীষণ ভাবে যুদ্ধ শুরু করল। বহুক্ষণ যুদ্ধ হবার পর শিব এক মহাবান দ্বারা জালন্ধরের হৃদয় ভেদ করলেন। এই দেখে দৈত্যগণ শিবকে আক্রমণ করল। যতক্ষণ জালন্ধর অচেতন ছিল ততক্ষণ শিব বহু দৈত্য সৈন্য বিনাশ করলেন।

জালন্ধর চেতনা লাভ করে দেখলেন তার বহু সৈন্য নিহত। ভীত হয়ে শুক্রাচার্য্যকে স্মরণ করলে তিনি সকল সৈন্যকে সঞ্জীবনী মন্ত্রের দ্বারা জীবিত করে দিলেন। আবার প্রচুর দৈত্যসৈন্য যুদ্ধ করছে। দেখে চিন্তিত শিব দেখতে পেলেন ভাগবকে। তাকে বধ করার জন্য উদ্যত হলে, হঠাৎ তার মনে হল ভার্গব ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ। একে নিগৃহীত করা উচিত। এই চিন্তা করে তিনি তৃতীয় নয়নদ্বারা এক কৃত্যার সৃষ্টি করে তার দ্বারা শুক্রাচার্য্যকে আবদ্ধ করে রাখলেন।

এই দৃশ্য দেখে জালন্ধর ক্রুদ্ধ হয়ে শিবকে বলল হে শিব, যেখানে বিষ্ণু আছে, তোমাকে সেখানে নিক্ষেপ করব, ক্ষমতা থাকে নিজেকে রক্ষা কর। তারপর ব্রহ্মকেও সাগরে নিক্ষেপ করব। তিন দেবতাকে আবদ্ধ করে আমি সর্বেশ্বর হব। তারপর তুমুল যুদ্ধ শুরু হল।

জালন্ধর মায়াবলে গৌরী ও জয়াকে সৃষ্টি করে শিবের কাছে পাঠাল তাকে মোহিত করবার জন্য। মায়া জরা কাঁদতে কাঁদতে শম্ভুকে বলল হে প্রভু, পার্বতীকে জালন্ধর দৈত্য মানসোত্ত শৈল থেকে হরণ করেছে।

প্রিয়া হরণ বার্তা শুনে শঙ্কর চিন্তান্বিত হলেন। দৈত্যমায়ায় শঙ্কর আপন স্বরূপ বিস্মৃত হলেন। এই সময়ে জায়া পার্বতীকে নিয়ে জালন্ধর শিবের সামনে উপস্থিত হল। শত্রুর রথের ওপর আপন পত্নী গৌরীকে দেখে শিব বিলাপ করতে লাগলেন। সেই সময় গৌরীও পতি বিরহে কাতর হয়ে রোদন করছে। শিব তাকে গ্রহণ করবার জন্য উদ্যত হলে, শুম্ভাসুর উমাকে নিয়ে

আকাশে উঠে গেলেন। শম্ভ শুম্ভাসুরকে বধ করার জন্য শূল ছুঁড়লে, তা দেখে শুম্ভাসুর পার্বতীকে ছেড়ে দিলেন। পার্বতী সেই শূলের উপরে পতিত হয়ে শিবের সামনে প্রাণত্যাগ করলেন।

মায়া গৌরীকে মৃত দেখে শঙ্কর শোকে মোহে আচ্ছন্ন ও মূচ্ছিত হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। চেতনা লাভ করার পর তিনি শুম্ভাদি সহ অসুরদের অভিশাপ দিলেন গৌরীই তোদেরকে বিনাশ করবে।

শঙ্করের সেই অভিশাপের ফলেই গত মন্বন্তরে শুম্ভাদি অসুরগণ দেবীর হাতেই নিহত হয়েছে।

শিবকে দৈত্যমায়ায় মোহিত জেনে অন্তরীক্ষ থেকে ব্রহ্ম অবতরণ করে বললেন–হে প্রভু, পার্বতী, আপনারই অর্ধাঙ্গরূপিণী, তিনি কখনও বিপন্না হতে পারেন না। এটি জালন্ধরের মায়া। আপনি এই মায়া নাশ করুন। কমলকেশের মধ্যে পার্বতী বিরাজ করছেন। কোন চিন্তা না করে আপনি যুদ্ধ করুন।

অদৃশ্যবাণী শুনে শঙ্কর এটি দানবীমায়া বুঝতে পেরে আবার ভীষণভাবে যুদ্ধ শুরু করলেন। আবার শম্ভুকে মায়ামুক্ত দেখে জালন্ধরে মায়া বিস্তার করলে, বিমোহিত শিবকে শ্রীহরি মায়াযুক্ত করলেন। তখন শিব কুপিত হয়ে সৃষ্টি সংহারকর রূপ ধারণ করলেন। তখন শুম্ভ, রাহু প্রভৃতি দৈত্য রুদ্রকে দেখে ভয় পাতালে প্রবেশ করল। জালন্ধর শিবের রুদ্ররূপ দেখে বলল হে হর, আপনি চরাচর সংহার করেন, আপনার এই রূপ ত্যাগ করে যোগবল ছেড়ে অস্ত্র ধরে সংগ্রাম করুন।

এই কথা শুনে শিব বললেন–দৈত্যরাজ, তুমি আমার ভয়ঙ্কর রূপ দেখেও নির্ভয়ে রয়েছ, সেজন্য তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন। তুমি বর প্রার্থনা কর। জালন্ধর সাযুজ্য মুক্তি প্রার্থনা করলে, শিব বললেন–যদি আমার পরম পাদে লীন হতে চাও তাহলে শরদ্বারা আঘাত করে আমার কোপ উৎপন্ন কর, তাহলে তোমাকে নিধন করব, আর তুমি আমার আলয়ে যেতে পারবে।

দুজনের মধ্যে আবার তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। জালন্ধর মায়া বলে সহস্র হস্ত হয়ে শিবকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করল। তখন শঙ্কর কৃপাণের সাহায্যে দৈত্যের সব বাহু ছেদন করলে দৈত্যরাজ অস্ত্রহীন, হস্তহীন হয়েও শিবের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে প্রীত করলে, শিব তাকে পুনরায় বর দিতে চাইলেন।

তখন জালন্ধর বলল–আমি বাহু ও অস্ত্রহীন বলে আমাকে অবজ্ঞা করবেন না। আমাকে আত্মপ্রদ দান করুন। অন্যথা আমি আপনাকে সংহার করব। এই কথা বলে দৈত্য যোগবলে বাহু ধারণ করে শঙ্করের বক্ষে আঘাত করল।

তারপর শঙ্কর যে চক্র পূর্বে সৃষ্টি করেছিলেন তার দ্বারা জালন্ধরের শিরচ্ছেদ করলেন। তখন দৈত্যের ছিন্ন শির আকাশে উঠে গেলে রুদ্রদেব আবার দৈত্যের মস্তক চক্রের দ্বারা ছেদন করলেন। দ্বিধা বিভক্ত সেই মস্তক হিমাচলে পতিত হল। তারপর দুই মস্তক খণ্ড রুদ্রদেহে প্রবেশ করল। জালন্ধরের স্কন্ধ দেশ থেকে শত সহস্র দৈত্য উৎপন্ন হলে রুদ্রের চক্রাঘাতে তারাও বিনাশপ্রাপ্ত হল। এই ভাবে বারে বারে যত দৈত্য সৃষ্টি হল, সবই রুদ্রের দ্বারা ধ্বংস হল। জালন্ধরের মেদ রাশি দ্বারা সমস্ত পৃথিবীপুরি পূরিত হল। দৈত্যরাজের শোনিত রাশি কৈলাসের উত্তরভাগে যেখানে শৈলাকার হয়েছিল, সেই স্থানেই শোনিতপুর প্রতিষ্ঠিত হল।

জালন্ধরের মাংসরাশি সর্বস্থানে পড়ে বীভৎস আকার ধারণ করেছে দেখে, মহাদেব যোগিনীদের স্মরণ করলে, তারা হরের ইচ্ছানুসারে ক্ষণকালের মধ্যে তা ভক্ষণ করে নিঃশেষ করে দিল। অতঃপর মহেশ্বর পার্বতী ও আপন বাহন বৃষকে স্মরণ করা মাত্র সেখানে উপস্থিত হল। তখন মহেশ গিরিজার সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রীত হলেন। তারপর গৌরী মহেশের সঙ্গে কৈলাসে যাত্রা করলেন। করুণাময় শঙ্কর অতঃপর দেবগণকে স্ব স্ব পদে স্থাপন করলেন। দেবতাগণ স্বরাজ্য লাভ করে আবার পূর্বের মতো যজ্ঞভোজী হলেন।

দেবর্ষি নারদ বললেন–হে রাজা যুধিষ্ঠির, সমুদ্র নন্দন জালন্ধরের বশ্য হয়ে আজও শ্রীহরি ক্ষীরোদ সমুদ্র ত্যাগ করতে পারেন নি। সুতরাং স্বকৃত কর্মফল সকলকেই ভোগ করতে হয়। কর্মের গতি সদা বলবতী, এই কথা জেনে তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর। শত্রু জয় করে পুনরায় স্বরাজ্য লাভ করবে।

জাম্ববান কথিত পুরাকল্পীয় রামায়ণ

মানুষের ২৪ ঘণ্টায় এক দিবা রাত্র। এক বৎসর হয় ৩৬৫ দিনে। ৪,৩২,০০০ বৎসর কলিযুগ, দ্বাপরযুগ ৮,৬৪,০০০ বৎসরে ১২,৯৬,০০০ বৎসরে ত্রেতাযুগ আর সত্যযুগ ১৭,২৮,০০০ বৎসরে। এই চারটি যুগ এক করে দিব্যযুগ। এইভাবে ব্রহ্মার একদিন হয় ১০০০ দিব্য যুগে। এর সমপরিমাণ সময়ে ব্রহ্মার এক রাত্রি। ব্রহ্মর এক দিবারাত্রকে এক কল্প বলে ভগবান শ্রীগোবিন্দ যিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তিনি প্রতি কল্পেতেই তার লীলার পুনরাবৃত্তি করেন। প্রতিবারেই কিন্তু তিনি একই রকম লীলা করেন না। রাম অবতারে দেখা যায় যে তিনি কুম্ভকর্ণকে আগে বধ করে পরে রাবণকে বধ করেছিলেন। কিন্তু অন্য কল্পে দেখা যায় তিনি রাবণকে আগে বধ করে পরে কুম্ভকর্ণকে বধ করেন। সবাই জানে যে সমুদ্র বন্ধনের জন্য পাথর জলে ভাসিয়ে তিনি লঙ্কায় গমন করেছিলেন, কিন্তু অন্য কল্পে দেখা যায় মহাদেবের ধনুর সাহায্যে সকল বানর সৈন্যাদি লঙ্কা পারাপার করে।

অন্য এক কল্পে ভগবান রামচন্দ্র যেভাবে লীলা বিলাস করেছিলেন, সেই কাহিনী কমলাগণ ব্রহ্মার শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করে ঋষরাজ জাম্ববান এই কল্পের শ্রীরামচন্দ্রের কাছে বর্ণনা করেন।

অযোধ্যার মহারাজ দশরথ সুমনা নামে এক সুন্দর রাজ্য জয় করবার প্রবল বাসনা নিয়ে গুরুদেব বশিষ্ঠাকে প্রণাম করে যুদ্ধের জন্য অনুমতি চাইলেন। অনুমতি লাভ করে ব্রহ্মার আরাধনা করে শত অক্ষৌহিনী সেনা নিয়ে একটি সুন্দর শ্বেতবর্ণ অশ্বের পিঠে চড়ে যুদ্ধে যাত্রা করলেন। ২১,৮৭০ রথ, ২১,৮৭০ গজ, ৬৫,৬১০ অশ্ব এবং ১,০৯,৩০৫ পদাতিক নিয়ে এক অক্ষৌহিনী হয়। সুমনা রাজ্যের রাজার নাম সাধ্য দশরথের সঙ্গে এক মাস ব্যাপী যুদ্ধ করে পরাজিত ও বন্দী হলেন। সাধ্য রাজার পুত্র ভূষণ কতিপয় সৈন্য নিয়ে দশরথের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলে, তার রূপ দেখে দশরথের মনে স্নেহ দয়ার উদয় হল। ভাবলেন এই বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করলে এর পিতামাতা দুঃখ পাবে। আমারও এক পুত্র এমনি সুন্দর ছিল। সেই পুত্র ভল্লুকের আক্রমণে প্রাণ না হারালে তার এমনিই বয়স হত। একে দেখে আমার তার কথা মনে পড়ছে। আমি এর সঙ্গে যুদ্ধ করব না, তবে একে কৌশলে বন্দী করব।

এমন চিন্তা করে ভূষণকে রাজা দশরথ কৌশলে বন্দী করলেন। তারপর সাধ্য ও ভূষণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে সেই রাজপ্রাসাদেই এক মাস অবস্থান করলেন। প্রত্যেক দিন ভূষণকে দেখে আনন্দ পেতেন আর মনে মনে ভাবতেন, এ যদি আমার পুত্র হত,

তা হলে না জানি আরও কত সুখ হত। আমার কিভাবে পুত্র লাভ হবে, সে বিষয়ে এই সাধ্যকে জিজ্ঞাসা করি।

মনে মনে এই কথা চিন্তা করে সাধ্যকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি রাজা দশরথকে বললেন, একাদশীতে উপবাস, বিষ্ণু পূজা, বিষ্ণুর নামকীর্তন, বিষ্ণুর অঙ্গে ধৃত লেপন, তুলসী দ্বারা বিষ্ণুর সেবা ও বিভিন্ন পুষ্পের দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করতে হবে। শ্রীহরির প্রতিকামনায় বিভিন্ন ব্রত করতে হবে। ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন হলে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

মহারাজ দশরথ সাধ্যের উপদেশ শুনে অযোধ্যায় এসে উপদেশ মতো সমস্ত কার্য্য করলেন। বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পুত্র কামনায় যজ্ঞ করলেন, সেই যজ্ঞাগ্নি থেকে ভগবান নারায়ণ উত্থিত হয়ে দশরথকে বর প্রার্থনা করতে বললেন।

দশরথ বললেন–আমাকে দীর্ঘজীবি, লোকোপকারী অতি ধার্মিক চার পুত্র দান করুন। তারপর রাজার চার মহিষী কৌশল্যা, সুমিত্রা, সুরূপা ও সুযেশা বললেন–আমাদের গর্ভে এক এক করে পুত্রের জন্ম হোক, কৌশল্য বললেন–হে নারায়ণ, আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, তাহলে আপনিই আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুন।

শ্রীহরি প্রসন্ন হয়ে বললেন–তাই হবে। এই কথা বলে তিনি যজ্ঞীয় চরুতে প্রবেশ করলে রাজা সেই চরু চার ভাগ করে চার মহিষীকে দিলেন ভক্ষণ করবার জন্য। পরে কৌশল্যার গর্ভে রাম, সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ, সুরূপার গর্ভে ভরত ও সুবেশার গর্ভে শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্ম চার পুত্রের নামকরণ করলেন।

একদিন এক ব্রহ্মরাক্ষস এসে রামকে গ্রহণ করলে রাম মুচ্ছিত হন। রাজা দশরথ কোলে নিলেও রামের মূচ্ছা ভঙ্গ হল না। মূচ্ছিত রামকে নিয়ে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে গেলে মুনিবর রামের গায়ে মন্ত্রপুত্র ভস্ম নিক্ষেপ করে ব্রহ্মরাক্ষসের হাত থেকে মুক্ত করলেন।

তারপর বশিষ্ঠদের চার কুমারকে উপনয়ন দিয়ে নানাবিধ নীতিশাস্ত্র পাঠ দিলেন, ধনুর্বেদ, আয়ুর্বেদ, যুদ্ধবিদ্যাও শিক্ষা দিলেন।

পুত্রগণের যৌবনকালে রাজা দশরথ তাদের বিবাহের কথা চিন্তা করে নানা দেশে দূতদের পাঠালেন সুন্দরী কন্যার সন্ধানে। কিছুদিন পরে এক দূতের মুখে তিনি শুনলেন, বিদর্ভনগরে রাজা জনকের সীতা নামে এক কন্যা আছে, যাকে তিনি যজ্ঞের দ্বারা লাভ করেছেন।

সর্বলক্ষণ সম্পন্না সেই কন্যা রামের উপযুক্ত এবং রাজা জনকও তার কন্যাকে রামকে দান করতে ইচ্ছুক আছেন।

এই সংবাদ পেয়ে রাজা দশরথ বিদর্ভনগরে বশিষ্ঠদেবকে পাঠিয়ে বিবাহের লগ্ন স্থির করে নির্দিষ্ট দিনে লোকজন সহ চার পুত্রকে নিয়ে মিথিলায় গমন করলেন।

তারপর মিথিলারাজ সপরিজনে ধান্য দূর্বা, দিয়ে সমাগত সবাইকে সম্বর্ধনা করে তার পুরীর কাছে নবনির্মিত বাসস্থানে নিয়ে এলেন।

এই সময়ে দেবর্ষি নারদ মিথিলায় আগমন করলে, বিদেহরাজ তাঁর চরণ পূজা করে জিজ্ঞাসা করলেন-হে দেবর্ষি কাল আমার জানকীর বিবাহ আপনি উপস্থিত থেকে বিবাহকার্য্য সমাপন করবেন।

নারদ বললেন–আগামীকাল বিবাহের লগ্ন ভাল নয়। এই শুনে বিদেহরাজ গর্গ মুনিকে ডেকে পুনরায় লগ্ন স্থির করবার জন্য বললে, নারদ ও গর্গচার্য্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল।

অবশেষে স্থির হল, আগামীকাল ক্ষত্রিয় বিবাহ হতে পারে। তা স্বয়ম্বর নিয়মেই সাধিত হওয়া দরকার।

এই কথা শুনে জনকরাজ ভাবলেন, বর বাড়িতে উপস্থিত, এদিকে কন্যার স্বয়ম্বর হবে কিভাবে? এতে বরকে অপমান করা হবে। চিন্তায় পড়লেন তিনি। দশরথকে গিয়ে দুঃখিত ভাবে সবকথা বললেন–জনকরাজ। দশরথ কোন আপত্তি করলেন না। তখন রাজা দিকে দিকে স্বয়ম্বরের বার্তা পাঠালেন।

কিন্তু জনকরাজা মনে মনে ভাবছেন এ আমি কি করলাম। রামকে কন্যা দেব স্থির করেও স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করা উচিত হয়নি। তখন তিনি পার্বতীসহ মহেশ্বরের ধ্যান করতে লাগলেন।

সেই ধ্যানে তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর দর্শন দিলেন, বললেন–আমি বর দান করবার জন্য এসেছি। তুমি বর প্রার্থনা করো।

জনকরাজা তার বিপদের কথা মহেশ্বরকে জানিয়ে বললেন–হে মহেশ্বর, এই অবস্থায় রাম যাতে আমার জামাতা হয়, যাতে বিবাহকার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তার ব্যবস্থা করুন। এই আমার নিবেদন।

মহাদেব বললেন–এই আমার পিনাক ধনু তুমি রেখে দাও। যে জন এই ধনুতে জ্যা রোপণ করবে, তাকেই কন্যাদান করবে। এই কার্য্য রাম ছাড়া আর কেউ করতে পারবেনা।

এই কথা বলে মহেশ্বর পিনাক ধনুটি রেখে অন্তর্হিত হলেন। মিথিলায় সকলের মনে জনকনন্দিনী সীতাকে বিবাহ করবার ইচ্ছা জাগল। ইন্দ্র, সূর্যদেব, অন্যান্য দেবতাগণ, অসুর, রাক্ষস সবাই ধনুতে জ্যা রোপণ করতে ব্যর্থ হল।

তারপর রাজা দশরথ সকলের শেষে রামকে পাঠালেন। রাম পিতার চরণবন্দনা করে উপস্থিত সর্বজনকে নমস্কার করে সেই ধনুকে স্পর্শ করলেন। তারপর প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে বাম হস্তদ্বারা সেই ধনু তুলে তার অগ্রভাগ নত করে তার মধ্যভাগ জানু রেখে এক হাতে অগ্রভাগে জ্যা রোপণ করলেন। এই দৃশ্য দেখে সকলেই আশ্চর্য্য হল। তখন রাজা জনক রামকে কন্যা সম্প্রদান করলেন। অন্যান্য রাজারা এতে অপমানিত বোধ করে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। রাম যুদ্ধে তাদের পরাজিত করে সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন।

দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলে সবাই যখন খুশি হলেন, তখন ভরতের মা কেকয় রাজের কন্যা সুবেশা রামের প্রশংসায় খুশি হতে পারলেন না। তিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে দশরথের কাছে দুটি বর চাইলেন। এক, রাম চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে বাস করবে। দুই, ভরত অযোধ্যার রাজা সিংহাসনে বসবে।

এই বর প্রার্থনায় রাজা দশরথ দুঃখিত হলেও মিথ্যাবাদী হবার ভয়ে অতিকষ্টে স্বীকার করলেন।

রঘুনাথ পিতা-মাতার চরণ বন্দনা করে বনে যাত্রা করলেন। সীতাদেবী ও লক্ষ্মণও রামের সঙ্গে বনে গমন করল। প্রথমে একদিন উদ্যানে অবস্থান করে জানির্মাণ করলেন। বসন ত্যাগ করে গাছের ছাল পরলেন। সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখলেন। তার পর তারা বনে প্রবেশ করলেন। সেখানে তারপর রাক্ষস বধ করে বহু অদ্ভুত কর্ম সাধন করলেন। তারপর মারীচের সাহায্য রাবণ সীতাকে হরণ করলে, রাম পঞ্চবটী বন থেকে ঋষ্যমূক পর্বতে গমন করলেন। তারপর ক্লান্তি দূর করবার জন্য লক্ষ্মণের কোলে মাথা রেখে শয়ন করলেন। তখন শুনতে পেলেন কাছাকাছি কেউ মধুর গান গাইছে। উপর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, স্বর্ণবর্ণের একটি বানর যার কর্ণে কুণ্ডল, গলায় যজ্ঞোপবীত। সেই বানরকে দেখে রাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন–তুমি কে? তোমার নাম কি?

বানর বলল–আমার নাম হনুমান। সুগ্রীবের লোক আমি। এই বলে রামকে প্রণাম করে সে সুগ্রীবের কাছে গিয়ে বলল দেব, দ্বিতীয় নারায়ণের মতো এক সুন্দর ঘনশ্যাম যুবা পুরুষকে দেখলাম। মাথায় জটা, অজানুলম্বিত বাহু, দেখে মনে হল তিনি পরম যশস্বী। আর একজন যুবকও আছেন সাথে । মনে হয় তারা কোনো রাজার পুত্র।

হনুমানের মুখে সব শুনে সুগ্রীব জল আর পূজার দ্রব্য নিয়ে রামের কাছে এসে, তাদের পদ প্রষালন করে আহারের জন্য ফল দিয়ে বললেন–কে আপনারা? এখানে কিসের জন্য এসেছেন?

সুগ্রীবের প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মণ বললেন–মহারাজ দশরথের পুত্র আমরা, আমাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য আমরা বনে এসেছি। বর্তমানে আমার অগ্রজের ভার্য্যাকে কেউ অপহরণ করেছে, তার খোঁজে এসেছি, তাকে উদ্ধারের জন্য আমরা সমুদ্র পার হতে পারি, পাতালে প্রবেশ করতে পারি, এমনকি ইন্দ্রকেও রাজ্যচ্যুত করতেও প্রস্তুত আছি।

তার উত্তরে সুগ্রীব বললেন–কয়েকদিন পূর্বে এক রমণীকে লঙ্কার রাজা হরণ করে নিয়ে যায়। যাবার সময় সেই রমণী কাঁদতে কাঁদতে এই অলঙ্কারগুলি ফেলে দিয়ে যান। এইগুলি তার কিনা দেখুন।

রাম সেই অলঙ্কারগুলি দেখে বুঝতে পারলেন, সেগুলি সীতারই অলঙ্কার। তখন সুগ্রীবকে বললেন–রাবণ কোন্ দিকে গেছে? উত্তরে সুগ্রীব বললেন–দক্ষিণ দিকে রাবণ গেছে।

তারপর সুগ্রীব রামকে বললেন–যে, সে স্থানহীন, ভার্যাহীন হয়ে এই বনে অবস্থান করছে। তার রাজ্য ও পত্নীকে তার ভাই বালী হরণ করেছে। তখন রাম বালীকে বধ করে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসন সুগ্রীবকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। তারপর বালী ও সুগ্রীবের মধ্যে মল্লযুদ্ধের সময় রাম বালীকে বধ করলেন।

সমুদ্রতীরে এসে রাম সুগ্রীবকে জিজ্ঞাসা করলেন–কত দূরে লঙ্কা? সীতা কোথায়? কিভাবে শত্রুকে বধ করব?

হনুমান বলল-লঙ্কায় প্রবেশ করে সীতার খোঁজ করব, সবকিছু জানব, তারপর হয় সন্ধি না হয় যুদ্ধ, যা হবার হবে। অনুমতি দিন, আমি লঙ্কায় যাই। রামের অনুমতি নিয়ে হনুমান লঙ্কায় প্রবেশ করে অশোক কাননে সীতাকে দেখতে পেল। তারপর লঙ্কায় বহু বন ভেঙে বন

রক্ষকদের বধ করলে, রাক্ষসেরা হনুমানকে বেঁধে তার লেজে আগুন ধরিয়ে দিল। হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করে আবার রামের কাছে। ফিরে এসে সকল ঘটনা জানাল।

জাম্ববান বললেন–আমি নারদের মুখে শুনেছি বানর সেনার সাহায্যে রাম লঙ্কাপুরী ছারখার করবেন। তাহলে আমাদের এখন সমুদ্র পার হতে হবে।

কিভাবে সমুদ্র পার হবেন, এই কথা চিন্তা করে রাম শঙ্করের আরাধনা করলেন। তখন শিবলিঙ্গ থেকে তেজোময় মূর্তি আবির্ভূত হলেন। তাঁর মাথায় কিরীট, সর্বাঙ্গে অলঙ্কার, অঙ্গের জ্যোতিতে দশদিক আলোকিত, তিনি পদ্মাসনে বসে। তার কোলের উপর পার্বতী।

মহাদেবকে দর্শন করে রাম তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বললেন–আমি সীতাকে উদ্ধারের জন্য লঙ্কায় যাব। সমুদ্র পার হবার একটা উপায় বলে দিন।

শঙ্কর বললেন–কোন চিন্তা নেই, আমার পিনাক ধনু আছে। সেই বিশাল ধনুকের এক প্রান্ত এপারে রেখে অন্য এক প্রান্ত লঙ্কায় রাখবে। তাহলেই তার উপর দিয়ে সকলে সহজেই পার হয়ে যেতে পারবে। রাম সেই ধনুক পূজা করলেন। মহাদেব সেই ধনুক রামকে দিলে ধনুকটিকে তিনি লঙ্কা অভিমুখ সমুদ্র ফেলে দিলেন। সেই ধনুকের অগ্রভাগ সমুদ্রের অপরপারে লঙ্কার তটে গিয়ে লাগল। তখন রাম। লক্ষ্মণ সহ সুগ্রীবের সকল সৈন্যবল খুব সহজে পিনাক ধনুর ওপর দিয়ে লঙ্কা গিয়ে পৌঁছিলেন।

সুগ্রীবের বানর সৈন্যরা লঙ্কার প্রাচীরে উঠে গাছের ডালপালা, অট্টালিকা সমস্ত কিছু ভাঙচুর আরম্ভ করল। রাক্ষসেরা তাদের তাড়া করল। রাক্ষসেরা অট্টালিকার ভাঙা স্তম্ভ নিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিল। এই যুদ্ধে রাক্ষস জাতির বহু বালক, বৃদ্ধ, বণিতা হতাহত হল। তখন রাবণের আদেশে ইন্দ্রজিৎ এসে বানরদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে বানরেরা ভয়ে পালিয়ে গেল।

হনুমান ভীত বানরদের যুদ্ধে উৎসাহ দিয়ে তাদের দশ ভাগে বিভক্ত করল। তখন ইন্দ্রজিৎ আকাশের অলক্ষ্যে থেকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করলেন। কেউ তাকে দেখতে পায় না। তখন হনুমান আর জাম্ববান লাফ দিয়ে আকাশে উঠে পর্বতের শৃঙ্গ দিয়ে প্রহার করে ইন্দ্রজিৎকে মাটিতে ফেলে। দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বাণ মেরে লক্ষ্মন ইন্দ্রজিৎকে বধ করলেন।

তারপর অতিকায় আর মহাকায় নামে দু'জন রাক্ষসের সঙ্গে রাম ও সুগ্রীবের যুদ্ধ হল। শেষে হনুমান ও জাম্ববান এর সঙ্গে যুদ্ধ করে দুই রাক্ষস তাদের হাতে বন্দী হল।

রাম বন্দী দুই রাক্ষসকে বললেন–রাবণ আর তার মন্ত্রীগণকে গিয়ে বল, যেন সীতাকে ফিরিয়ে দেয়, তা না হলে আমরা লঙ্কাপুরের কাউকে জীবিত রাখব না।

অতিকায় রাক্ষস তখন বলল–আমরা স্থির করেছি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব। বিদ্যুৎম্মানী নামে এক মহারাক্ষস সৈন্য পরিচালনা করে তখন দৃশ্য বা অদৃশ্য ভাবে যুদ্ধ করবে। কিছু পরে দেখবেন রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য দিক থেকে এসে আপনাকেই নিধন করবেন। কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি পরাক্রমশালী রাক্ষসগণ ভীষণমূর্তি ধারণ করে আপনাকে বন্দী করে সীতার কাছে নিয়ে গিয়ে তার সামনেই আপনাকে বধ করবে।

তার উত্তরে রাম বললেন–ও হে, বলবানের অসাধ্য কি? তোমরা কি জান যে তোমাদের বিষম বিপদ খুব কাছেই?

তখন অতিকায় বলল–হে রাম, কোনমতেই রাবণকে আপনি বধ করতে পারবেন না। কারণ লঙ্কাদ্বারে যে পঞ্চানন মূর্তি আছে, যে তাকে এক বাণে পাঁচ খণ্ডে ছেদন করতে পারবে, তারই হাতে রাবণের মৃত্যু হবে, অন্যথায় রাবণকে কেউ মারতে পারবে না।

রাবণের মৃত্যুর উপায় জানতে পেরে রাম সঙ্গে সঙ্গেই ধনুতে শর সন্ধান করে লঙ্কাদ্বারের শিব মূর্তিকে পাঁচখণ্ড ছেদন করে দিলেন। এই দেখে রাক্ষস দুজন বুঝতে পারল যে রাক্ষস বংশ এবার নির্মূল হবে, তখন তারা রামের চরণে শরণ নিয়ে বলল–মহাশয়, অনুগ্রহ করে আমাদের বালক পুত্রগুলিকে রক্ষা করবেন। তাদের কথায় সম্মতি জানিয়ে রাম তাদের ছেড়ে দিল।

তারপর সুগ্রীবের সৈন্যরা রাবণের প্রথম প্রাচীরটি ভেঙে দ্বিতীয় প্রাচীর ভাঙবার উপক্রম করলে রাবণ নিজে এসে বহু বাণ মারতে মারতে রামের সামনে উপস্থিত হলেন। প্রথমে রাবণ রামকে পাঁচবাণে বিদ্ধ করলেন। তাদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হল। শেষে রামের বাণে রাবণ ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ নিয়ে পালিয়ে গেলেন।

পরের দিন রাবণ রাজসভায় বসে মন্ত্রীদের সঙ্গে যখন শলাপরামর্শ করছেন তখন বিভীষণ তাঁকে বললেন–শত্রুর এবং নিজের শক্তি ভালভাবে বুঝে শত্রু শক্তির অপেক্ষা নিজের শক্তির অধিক হলে, তবেই যুদ্ধ করা উচিত। নতুবা প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকে। আপনি দুর্বল তাই বলবান রামের সঙ্গে আপনার যুদ্ধ করা কোনমতেই উচিত নয়। বালী, মারীচ প্রত্যেককেই রাবণ যমালয়ে পাঠিয়েছেন। একবাণে পঞ্চানন মূর্তি ছেদন করেছেন রাম। কাজেই সীতাকে আপনি প্রত্যর্পণ করে রামের চরণে আশ্রয় নিন। অন্যথায় তার হাতে বিনাশ হবেন।

বিভীষণের সৎ উপদেশ শুনে রাবণ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন–বিভীষণ তুমি বীর নও, রাক্ষস নও। রাজার কর্তব্য তুমি জান না। পররাজ্য, পরস্ত্রী, পরদ্রব্য বলপূর্বক হরণ করা বীর পুরুষের ধর্ম, তোমার ক্লবদের জন্য সে ধর্ম নয়। তোমার একান্ত ইচ্ছা থাকলে যাও, শত্রুর পদতলে গিয়ে পড়। আমি তোমার কথা মানতে পারছি না।

তখন বিভীষণ রামের চরণে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তাকে সাদরে গ্রহণ করলেন রাম। তারপর হল মহাসংগ্রাম। কিছুতেই রাবণকে বধ করা যাচ্ছে না। তখন বিভীষণের দিকে রাম দৃষ্টিপাত করলে, যে বাণে রাবণের মৃত্যু হবে সেটি বিভীষণ দেখিয়ে দিলে সেই বাণের দ্বারা রাম রাবণকে বিনাশ করলেন।

তারপর অসময়ে রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙিয়ে তাকে যুদ্ধে পাঠালে, যুদ্ধে এসেই সে বহু বানরকে খেয়ে ফেলল, গদা হাতে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে, রামকে আঘাত করার চেষ্টা করলে একটি মাত্র বাণের দ্বারা তার ভবলীলা শেষ করে দিলেন রাম।

তারপর রাম বিভীষণের দ্বারা রাবণের শ্রাদ্ধাদি কর্ম করে রাবণের নামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। লঙ্কারাজ্যে বিভীষণকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সীতাকে অগ্নি পরীক্ষার দ্বারা শুদ্ধি করে উমা মহেশ্বরের চরণে উভয়ে প্রণাম করলেন।

তারপর মহাসমরোহে সকলে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে বশিষ্ঠ মুনির চরণে প্রণাম করে নাগরিকদের অভিনন্দন গ্রহণ করে স্বগৃহে প্রবেশ করলেন।

দেবতারা রাবণ বধের জন্য পরমানন্দ লাভ করে শ্রীরামের বহু স্তব স্তুতি করে ফিরে গেলেন। অযোধ্যাবাসী প্রজাবৃন্দ রামকে বললেন–যে, আপনি শত্রু নিধন করে ফিরে এসেছেন, আপনি আমাদের সর্বদা পালন করুন।

রঘুনাথ তাদের কথায় খুশি হয়ে বস্ত্রাদি দান করে সকলকে সমাদৃত করলেন। তারপর মুনিগণ রামকে আশীর্বাদ করে স্ব স্ব আশ্রমে ফিরে গেলেন।

তারপর বিভিন্ন সৎকর্মানুষ্ঠানের দ্বারা ভগবান রামচন্দ্র সর্বজনে প্রিয় হয়ে সমগ্র রাজ্যকে শান্তিময় করে তুললেন।

যিনি এই উপাখ্যান শ্রবণ ও কীর্তন করবেন, তার সকল দুর্গতি নষ্ট হবে।

গরুড় পুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ

উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

সুতপুত্র উগ্রশ্রবা কর্তৃক গরুড় পুরাণের মাহাত্ম্য বর্ণনা

সুতমুনি উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যে বসে ঋষিদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। সাত্ত্বিক পুরাণগুলির মধ্যে এই পুরাণ অন্যতম সেরা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই পুরাণের প্রবক্তা। তিনি তার বাহক বিনতানন্দন গরুড়কে এই পুরাণ শ্রবণ করিয়েছিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস এই পুরাণ লিপিবদ্ধ করেন। উগ্রশ্রম তাঁর কাছ থেকে এই পুরাণের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বিদিত হয়েছিলেন। এই পুরাণ যে পাঠ ও শ্রবণ করে, তার মঙ্গল সাধিত হয়।

.

গরুড় পুরাণের দুটি খণ্ড–পূর্ব খণ্ড ও উত্তরখণ্ড। বিভিন্ন ধরনের দেবদেবীর পুজো-আচ্চা, নানা উপাখ্যান, বৈদ্যশাস্ত্র, ধর্মকথা, অর্থনীতি, শ্রীগোবিন্দের ধ্যান ও পূজার নিয়ম, নীতিসার, নানা ধরনের ব্রত, সূর্য-চন্দ্রাদি বংশকথা নানা ধরনের প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি নিয়ে পূর্বখণ্ড রচিত। উত্তরখণ্ডের মধ্যে আছে মানুষের মৃত্যুর পারলৌকিক ক্রিয়াদি, বৃষোৎসর্গ প্রেতত্বনাশকর্ম ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন নরকের নাম ও তার শাস্তি, বিবিধ দানের ফলাফল, অপমৃত্যুর গতি, পাপভেদে চিহ্নভেদ সম্পর্কেও অনেক কথা এই খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। মানুষ যা কিছু জ্ঞাত হতে চায়, গরুড় সেই সকল প্রশ্ন তার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের কাছে রেখেছেন। স্বয়ং শ্রীগোবিন্দ তার উত্তর দিয়েছেন। এর মধ্যে কোনো কল্পনার স্থান নেই। আমরা কলিকালের মানুষ। আমরা কী জানি? গুরু? ধর্ম? না, এসব কিছুই আমাদের কাছে মান্য নয়। আর পরলোকের কথা তো চিন্তাই করি না। কিন্তু এই গরুড় পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করলে জানা যাবে যে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে উত্তর প্রদান করেছেন, তা বাস্তবক্ষেত্রে একেবারেই মিথ্যা নয়।

মানব-মানবীর মঙ্গল ও অমঙ্গল সূচক লক্ষণ

যে পুরুষের পিঠ কচ্ছপের খোলকের মতো উঁচু, যার ঘাম হয় না, নখ তাম্রবর্ণের, পায়ের তলা নরম, আঙুলগুলো পরস্পর লাগানো, সে লোক রাজা হয়। যার হাত পায়ের নখ রুক্ষ এবং পাণ্ডু বর্ণের, মুখের শিরাগুলি স্পষ্ট, আঙুলগুলো রুক্ষ, সে অর্থাভাবে দুঃখ ভোগ করে। যার গায়ে প্রতিটি রোমকূপে একটি করে রোম, জঙ্ হাতির শুড়ের মতো গোলাকার সেও রাজা হয়, আর যদি রোমকূপে রোমের সংখ্যা এদের বেশি হয়, তা হলে পণ্ডিত হওয়ার লক্ষ্মণ জানতে হবে। তবে প্রতি রোমকূপে তিনটি রোম থাকলে দারিদ্রতা লাভ হয়। শীর্ণ জানুবিশিষ্ট পুরুষ আজীবন রোগ যন্ত্রণা ভোগ করে। স্থলাকার লিঙ্গবিশিষ্ট পুরুষ দরিদ্র হয়। যার অণ্ডকোষ একটি, চিরকাল দুঃখভোগের লক্ষণ। অণ্ডকোষ একটি বড়ো ও অন্যটি ছোটো, সুমতি যুক্ত পত্নী লাভ হয় না। যে পুরুষ দুটি সমান আকারের অণ্ডকোষের অধিকারী সে রাজা হয়। কোষ দুটি প্রলম্বিত হলে অল্পায়ু হয়। যে পুরুষের লিঙ্গ মণি পাণ্ডুর অথবা বিবর্ণ তাকে আজীবন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। শব্দের সঙ্গে যে মূত্র ত্যাগ করে, সে হয় দরিদ্র। মূত্র ত্যাগকালে বেশি শব্দ না হলে নরপতি হয়। সমানকার উদর ভাগ্যবানের লক্ষণ। কুম্ভের ন্যায় জঠর যার, সে হতদরিদ্র হয়।

সুগঠিত তিনটি সমানাকার রেখা বিশিষ্ট কপালের অধিকারী ষাট বছর পর্যন্ত পূর্ণ সংসার করে। দুটো রেখাবিশিষ্ট কপাল চল্লিশ বছর আয়ুর লক্ষণ। বিশ বছর পরমায়ু হয় তার, যে একটি রেখাযুক্ত কপাল লাভ করে। স্বল্পায়ুদের কপালের রেখা কান পর্যন্ত ঝুলে পড়ে। কান পর্যন্ত প্রলম্বিত তিন ললাট রেখা শতায়ুর লক্ষণ। রেখাগুলো স্পষ্ট না হলে বিশ বছর বেঁচে থাকে। যার কপাল রেখাবিহীন, সে হয় চল্লিশ বছরের অধিকারী। ললাটে রেখা কাটাকুটি থাকলে অপঘাতে মৃত্যু নিশ্চয়ই হবে। কপালে ত্রিশূল আকারের রেখা থাকলে সে হবে পরিমা যুক্ত নারী বা পুরুষ। ধনে-মনে পুণ্যবাণ হয়, পৃথিবীতে একশো বছর বেঁচে থাকে।

যে স্ত্রীর কেশদাম কোঁকড়ানো, নাভী দক্ষিণাবর্ত, সে হল কুলবর্দ্ধিনী। সুবর্ণ গাত্রবর্ণ, হাতের তালু পদ্মের মতো লাল লক্ষণ যুক্ত নারী পতিব্রতা হয়। বক্রকেশযুক্ত গোলাকার চোখ বিশিষ্ট রমণী অচিরে বিধবা হয়। সে আজীবন দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে। যে রমণীর মুখ চাঁদের ন্যায়, নতুন অরুণের ন্যায় অঙ্গের রং, ঠোঁট দুটি লাল, টানা টানা দুটি চোখ–এমন নারী কখনও দুঃখকষ্ট পায় না। অসংখ্য রেখাবিশিষ্ট করতল যুক্তা নারী দুর্ভাগ্য ভোগ করে। শাস্ত্রে বলেছে, যে রমণীর হাতে রেখার সংখ্যা অত্যন্ত কম সে দীনদরিদ্র হয়, হাতের রেখা লালাভ যার, সে সর্বদা সুখ ভোগ করে। হাতের রেখা কালো হলে, সেই কন্যা দাসবৃত্তি করে।

আয়ুরেখা তর্জমা ও মধ্যমার মাঝখানে দিয়ে সোজা চলে গেলে দীর্ঘায়ু লাভ হয়। জ্ঞানরেখা, অঙ্গুষ্ঠের মূল হতে উদগত হয়। মধ্যমাঙ্গুলির মূলগত রেখা হল আয়ুরেখা। কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল থেকেই এর উৎপত্তি। বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত আয়ুরেখা শতায়ুর লক্ষণ। আয়ুরেখা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলেও শতবর্ষ লাভ হয়। কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল থেকে মধ্যমার মূল পর্যন্ত আয়ুরেখা বিস্তৃত হলে সে ষাট বছর বেঁচে থাকে।

যে কন্যার হাতে প্রকার ও তোরণাকার রেখা থাকে সে প্রথমে দুঃখী হয়, পরে রানি হয়। নাভিদেশে লোম দেখা দিলে এবং তা ইতস্ততঃ পিঙ্গলবর্ণ হলে, উর্ধ্বদিকে বৃত্তাকারে গমন করলে, সে রাজপরিবারে জন্মালেও দীন দুঃখিনী হয়। যে কন্যার পায়ে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠগুলি হাঁটার সময় মাটিতে পড়ে না, সে অচিরেই স্বামীকে হারিয়ে বিধবা হয়। উজ্জ্বল চোখ সৌভাগ্যের লক্ষণ। যার দাঁত উজ্জ্বল, সে খাদ্যরসিক হয়। উজ্জ্বল গাত্রবর্ণযুক্ত কন্যা উত্তম শয্যালাভ করে। পা দুটি স্নেহযুক্ত হলে উত্তম বাহন লাভ করে। কন্যার চরণ দুখানি স্নিগ্ধ সমুন্নত হয়, নখগুলো তামাটে রঙের সেখানে মৎস্য, অঙ্কুশ, পদ্মাদি চিহ্ন থাকলে জানবে শুভ লক্ষণযুক্ত। সুলক্ষণা নারীর মধ্যে কোমল চরণতল ও ঘামবিহীন দেখা যায়। জঙ্ঘা ও উরুরোমবিহীন এবং হাতির শুড়ের মতো গোলাকার, সুগভীর নাভিদেশ ত্বক ও দক্ষিণাবর্ত, স্তনদুটি লোমবিহীন, এই শ্রেণীর রমণীকে ভগবান সুলক্ষণাযুক্ত বলেছেন।

বলাসুরের দেহ থেকে সৃষ্ট রত্নরাজি

মহাবলশালী এক অসুর, নাম "বল", দেবতাদের সঙ্গে তার প্রবল যুদ্ধ হল। সে অধিকার করে নিল দেবতাদের সিংহাসন ও সম্পত্তি। জাতে দানব, কিন্তু ধর্মে ছিল তার প্রবল জ্ঞান। কেউ তার কাছে গিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করলে, বিমুখ হয়ে ফিরে আসত না।

দেবতারা সকলেই স্বর্গচ্যুত। কীভাবে হৃত সিংহাসন ফিরে পাওয়া যায়, তাই নিয়ে সভা ডাকা হল। চলল জল্পনা কল্পনা। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির করা হল, যেভাবেই হোক বলের প্রাণভিক্ষা চাইতে হবে।

দেবতারা সদলবলে অসুর বলের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

বল তাঁদের দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হল। উৎফুল্ল চিত্তে জানতে চাইল–হে দেবতাগণ, বলুন, কী কারণে আমার কাছে আপনাদের আগমন?

–আমরা সকলে মিলে একটা যজ্ঞ করার মনস্থ করেছি।

দেবতাদের জবাব শুনে অসুর বলল–তাতো খুব ভালো কথা। উত্তম কথা। শুনে আনন্দিত হলাম। বলুন কী দিতে হবে আমায়, দ্বিধা করবেন না।

বলের এহেন কথা শুনে দেবতারা একটু বুকে বল পেলেন। সাহসে ভর করে জবাব দিলেন–হে অসুররাজ, কিছু মনে করবেন না, আসলে আমরা সব জিনিস জোগাড় করে ফেলেছি, কেবল ওই একটা ছাড়া, তাই আপনার কাছে আমাদের আগমন।

–বলুন, কী সেই জিনিস? আমি কথা দিচ্ছি, আপনাদের যজ্ঞের সব উপকরণ আমি দেব।

–জানেন তো, উত্তম বলি ছাড়া যজ্ঞ পূর্ণতা লাভ করে না। দেবতারা. বলতে থাকলেন, শাস্ত্রে বলেছে, ধার্মিক জনের দেহ যজ্ঞে বলি হলে, সেই যজ্ঞ সার্থক হয়। তাই এই কাজের জন্য আপনার প্রাণ আমরা প্রার্থনা করছি।

দেবতাদের ছল বুঝতে পারল অসুররাজ বল। তথাপি তিনি নিজেকে ওই যজ্ঞে উৎসর্গ করতে আপত্তি করল না। প্রফুল্ল চিত্তে যজ্ঞানুষ্ঠানে এসে হাজির হল।

পরম পুণ্যাত্মা বল। দেবতাদের মঙ্গলের জন্য যুপকাষ্ঠে মাথা গলিয়ে দিল বলির জন্য। দুনিয়াতে এমন দাতা পাওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। বলাসুর দেহ দান বৈকুণ্ঠ ধামে যাত্রা করল। পড়ে রইল তার দেহ। তার প্রতিটি অঙ্গ প্রতঙ্গ থেকে জন্ম নিল এক একটি রত্ন।

অসুরের মৃতদেহ নিয়ে দেবতারা বিমানে চড়ে আকাশপথে ভ্রমণ করলেন। তার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পৃথিবীর সমুদ্র, পর্বত, নদ, হ্রদ, বন, উপবন, সমভূমি, প্রতিটি স্থলে পড়ল। যেসব জায়গায় বলির দেহাংশ পড়ল সেখানে সৃষ্টি হল এক-একটি রত্নের খনি। পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, বৈদুর্য্য, পুলক, স্ফটিক, মণি, প্রবাল, পুষ্পরাগ, মুক্তো, মরকত ইত্যাদি রত্নরাজি।

অতি উজ্জ্বল প্রভামুক্ত মণির নাম হীরক বা বজ্র! অসুরের অস্থিকণা থেকে সৃষ্টি হল বজ্র। বিভিন্ন অঞ্চলে ওইসব বজ্র বা হীরক পড়ল। তাদের বিভিন্ন রং ও আকার। তীক্ষ্ণধার যুক্ত হীরার খনি যেখানে আছে, সেই অঞ্চল মহাপুণ্যস্থান হিসেবে সুবিদিত। এ হল দেবতাদের বাসভূমি। হীরার বর্ণানুসারে জাতি-ভেদ হয়। হরিবর্ণ হীরায় শ্রীহরির বাস। তাম্রবর্ণ হীরায় পবনের আসন, পিঙ্গলে অগ্নি থাকেন। পীতবর্ণ হীরাতে ইন্দ্র বিরাজ করেন। যম থাকেন শ্যামবর্ণ বজ্রে। রক্তের ন্যায় লাল বা হরিদ্রা রঙের মতো হীরা রাজা রাজরারা ব্যবহার করে থাকেন।

সম্পদ দানকারী হীরা গুণযুক্ত আর যে হীরা খারাপ, তা ব্যবহারে দুঃখ ভোগ হয়। অশেষ গুণের অধিকারী অথচ এক শৃঙ্গ এবং বিশীর্ণ, এমন হীরা ধারণ করলে সর্বনাশ অনিবার্য। বজ্র শৃঙ্গ অগ্নিদগ্ধ, স্ফুটিত হলে কিংবা মধ্যস্থলে যদি বিশীর্ণ হয়, কিংবা কিছুচিহ্ন যুক্ত হয়, তাহলেও তা ধারণ করা উচিত নয়।

বর্তমানে হীরার বদলে কাঁচের ব্যবহার হচ্ছে, হীরা বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাই সঠিক হীরা যাচাই করে নেওয়া উচিত।

বলাসুরের মাংসখণ্ড, হস্তী, মেঘ, শঙ্খ, মৎস্য, সর্প, বাঁশ ও শুক্তিকে পড়ে মুক্তোর সৃষ্টি করেছে। এসবের মধ্যে শুক্তিতে যে মুক্তো সৃষ্ট হয়, তা হল অন্যতম। শুক্তিজ মুক্তো ছাড়া আর কোনো মুক্তো বিদ্ধ করা যায় না। এই ধরনের মুক্তো উজ্জ্বলও হয়। তবে সব ধরনের মুক্তোই মঙ্গলদায়ক। সর্পমুক্তো গৃহে রাখলে সাপের বা রাক্ষসের উৎপাত হয় না। মেঘ থেকে সৃষ্ট মুক্তো পৃথিবীর মানুষ পায় না, তা দেবতারাই গ্রহণ করে। মেঘমণি যেখানে থাকে, তার সহস্র যোজনের মধ্যে অমঙ্গল প্রবেশ করতে পারে না।

অন্নের পাত্রে রেখে জামরসে ভিজিয়ে পাক করে ভেলার মূলে ঘষলে, মুক্তো বিশুদ্ধ হয় এবং তার উজ্জ্বলতা বাড়ে। মাছের পেটের মধ্যে মুক্তোকে রেখে কাদা মাখিয়ে পুড়িয়ে দুধ বা জলে পাক করলে সুচিকণ মুক্তো পাওয়া যায়। পরে পরিষ্কার কাপড়ে ঘষে নিলে উজ্জ্বলতা আসে।

মুক্তো ব্যবহার করার আগে খাঁটি কিনা যাচাই করে নেওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে লবণ মেশানো জলে একরাত মুক্তো ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর শুকনো কাপড় নিয়ে ঘষে ঘষে মুছে ফেলতে হয়। তারপর শুকনো কাপড়ে জড়িয়ে রাখতে হয়, যদি মুক্তো মলিন না হয়, তাহলে জানবেন এটা খাঁটি।

শ্রেষ্ঠ মুক্তো চেনার উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে–শ্বেতবর্ণ, স্বচ্ছ, নির্মল, বৃহৎ প্রমাণ, স্নিগ্ধ, ভারী, উজ্জ্বল ও বৃত্তাকার মুক্তোই অন্যতম সেরা। এই ধরনের মুক্তো অনর্থ দূর করে।

রত্নবীজ বলাসুরের রত্ন নিয়ে আকাশে ফিরে যেতে গিয়ে বাধা পেলেন সূর্যদেব। লঙ্কেশ্বর রাবণ তেড়ে এলেন। সূর্য ভীত হয়ে সেই রক্ত লঙ্কার এক নদীতে ফেলে দিলেন। নদীটির নামকরণ করা হল রাবণ গঙ্গা। নদীর তীরে জাত বহু রত্নরাজির মধ্যে আছে পদ্মরাগ, সৌগন্ধিক, স্ফটিক, এছাড়া আরও নানাধরনের বহু মূল্যবান মণি। পদ্মরাগ মণি নানা প্রকারের। স্ফটিক সূর্যের আলো পড়লে কাছাকাছি সকল বস্তুই দীপ্ত হয়। সৌগন্ধিক মণিতে ঈষৎ নীলের আভা আছে। কুরুবিন্দ মনি বর্ণহীন।– তাই তার রঙের ছটা দেখা যায় না।

দোষমুক্ত মণি অর্থাৎ ছিদ্রযুক্ত, মলিন, অমসৃণ, অনুজ্জ্বল–এই ধরনের মণি ধারণ করলে রোগ শোক ভোগ করতে হয়। এমনকি প্রাণনাশ পর্যন্ত হতে পারে। তাই ত্রুটিপূর্ণ মণি ব্যবহার না করাই শুভ। পদ্মরাগ মণি শত্রুর বিনাশ ঘটায়।

নাগরাজ বাসুকি বলাসুরের পিত্ত নিয়ে ফিরে যাওয়ার উপক্রম করলেন। গরুড় তা দেখতে পেয়ে পাখা বিস্তার করে তার পথ আটকে দিলেন। বাসুকি তাড়াতাড়ি সেই পিত্ত ফেলে দিলেন সাগরে। সেই পিত্ত থেকে জাত হল মরকতের, গরুড় সেই পিত্তের সামান্য কিছুটা গ্রহণ করে জ্ঞান হারালেন। সেই পিত্ত তার নাকের ছিদ্র দিয়ে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। সেখানেও সৃষ্টি হল মরকত মণির। যে মরকত মণির ছটা তির্যকভাবে পড়ে, সেই মণি ধারণ করলে যুদ্ধে জয় অনিবার্য, কিন্তু মণির তেজ চিরকাল স্থায়ী থাকে না।

বলাসুরের চোখ থেকে সৃষ্টি হল ইন্দ্রনীল মণি।

দেহত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্তে, অসুররাজ এক বিকট গর্জন করেছিল, যা থেকে পুষ্পরাগ মণি জন্মায়। আর হল বৈদুর্য মণি। কর্কেচল মণির জন্ম দিল অসুরের নখ। এই মণি সর্বপাপ হরণকারী, পরমায়ু দানকারী।

অসুরের বীর্য থেকে সৃষ্ট ভীষ্মক মণি কণ্ঠে ধারণ করলে সম্পত্তি লাভ হয়। হিংস্র জন্তু-জানোয়ার দুরে চলে যায়। এই মণি সর্বপাপ হরণকারী, পরমায়ু দানকারী।

এই মণি ধারণ করে পিতৃতর্পণ করলে পিতার কুল বহুবর্ষ তৃপ্তি লাভ করে। সাপের সাহায্যে বলাসুরের নিপতিত নখ স্থানে স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। যেখানে যেখানে পড়ল সেখানে অপূর্ব চিত্রিত ও উজ্জ্বল পুলক মণির জন্ম হল। এই মণি মঙ্গল ও শুভবুদ্ধিদায়ক। অসুরের ত্বকে জন্ম দিল ইন্দ্রপোপ মণি, এটি নর্মদা প্রদেশে পড়েছিল। বলাসুরের মেদ নিয়ে গেলেন হলধর রাম। নেপাল ও চীন দেশে তা পড়ল। সৃষ্টি হল স্ফটিক, যাকে মহামণি বলা হয়। বিদ্রুম মণির জন্ম দিল বলাসুরের অস্ত্র। এই মণি ধারণ করলে ধনশালী হওয়া যায়।

গয়াতীর্থের উৎপত্তি ও তার মাহাত্ম্য বর্ণন

পুরাকালে গয় নামে এক অসুর ছিল। সে প্রবল শক্তি ধরত। কঠোর তপস্যায় সে বসল। তার তপস্যায় স্বর্গ মর্ত্য-পাতাল কেঁপে উঠল। দেবতাদের তখন থরহরি কম্প অবস্থা। কী করবেন? দিশা না পেয়ে সকলে শ্রীহরির শরণ নিলেন। তারা সবিস্তারে গয়াসুরের তপস্যার কথা জানালেন। ওই অসুর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করলে স্বর্গ থেকে সকলকে বিদায় নিতে হবে।

শ্রীহরি দেবতাদের আশ্বস্ত করে বললেন–তোমরা শান্ত হও। তপস্যার বলে ও দেহ ছেড়ে শিবধামে গমন করবে। ওকে নাশ করার চেষ্টা করো না।

দেবতারা বললেন–গয় যদি শিবত্ব লাভ করে, তাহলেও সৃষ্টির বিনাশ হবে না। কিন্তু অসুর যদি নিধন না হয়, তাহলে সৃষ্টি ধ্বংস হবে, তাই বলছি, ওকে বিনাশ করুন, প্রভু।

–বেশ, তাই হবে।

শ্রীবিষ্ণুর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে দেবতারা ফিরে গেলেন যে যার আলয়ে।

গয়াসুর ছিল শিবভক্ত। ক্ষীরোদ সাগরে গেল ফুল আনতে, শিবের চরণে তা নিবেদন করবে। ফুল নিয়ে ফিরে আসার সময় স্বয়ং বিষ্ণু তার ওপর মায়া বিস্তার করলেন। বিষ্ণুর মায়ার প্রভাবে গয়াসুর অচৈতন্য হয়ে সেখানে পড়ে গেল। এ সুযোগ শ্রীহরি নষ্ট করলেন না। গদা দিয়ে আঘাত করলেন তার মাথায়, গয়াসুরের মৃত্যু হল। তার দেহ যেখানে পড়েছিল সেখানে সৃষ্টি হল একতীর্থ স্থান। নাম গয়া।

এই পুণ্যক্ষেত্রে যে স্নান করে যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, পিণ্ড দানাদি করে, সে ব্রহ্মলোকে ঠাঁই পায়। তাকে কখনও নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না।

সেই গয়াক্ষেত্র হল তীর্থস্থান। ব্রহ্মা সেখানে যজ্ঞের আয়োজন করলেন। অনেক ব্রাহ্মণ এলেন পৌরোহিত্য করার জন্য। ব্রহ্মা সহর্ষে ওই তীর্থভূমি ব্রাহ্মণদের দান করলেন।

ব্রাহ্মণরা ছিল অত্যন্ত লোভী। তারা যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ গ্রহণ করে সেখানেই নদীর তীরে বাস করতে শুরু করলেন।

ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদের প্রতি রুষ্ট হলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে অভিশাপ বর্ষণ করলেন।

–তোমাদের তিন পুরুষের অর্জিত বিদ্যা ও ধন সব নষ্ট হবে। এই পাষাণ পর্বত আর এই নদী হবে আজ থেকে তোমাদের একমাত্র সহায়।

ব্রাহ্মণগণ এমন অভিশাপ শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তারা তখন ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করার জন্য তার স্তব করতে লাগলেন।

ব্রহ্মা তখন সদয় হলেন। বললেন–এই শাপ থেকে মুক্ত হওয়ার একটা উপায় আছে। যেসব পুণ্যার্থী এখানে শ্রাদ্ধাদি করার জন্য আসবে, তারা তোমাদের পুজো করবে, আমিও সেই সঙ্গে অর্চিত হব। ব্রহ্মজ্ঞান, গয়াশ্রাদ্ধ, গোগৃহে মরণ, কুরুক্ষেত্রে বাস–এই চরিটি হল মুক্তির কারণ। গয়াতীর্থে স্নান করলে সকল তীর্থের স্নানের সমান ফললাভ করা যায়।

ব্রহ্মা হত্যা, চুরি, সুরাপানদি, মতো মহাপাপগুলির হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এই গঙ্গাতীর্থে শ্রাদ্ধকর্ম নিষ্পন্ন করার ফলে। যারা পশু বা চোরের দ্বারা, সাপের দংশনে অথবা দীক্ষা নেওয়ার আগেই মারা যায়, তাদের শ্রাদ্ধকর্মাদি এই গয়াতীর্থে করলে স্বর্গলাভ হয়। গয়াতীর্থে গমন করতে যে প্ররোচণা দেয়, সেও পুণ্য লাভ করে এবং পিতৃঋণ থেকে মুক্তি পায়।

বিনতানন্দনের প্রশ্নে ভগবানের উত্তরদান

বিনতার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে গরুড়ের জন্ম। সে শ্রীবিষ্ণুর বাহন। প্রভুকে পিঠে চড়িয়ে সমস্ত লোক ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সব জায়গা ভালোভাবে দেখা হয় না তার। মনে তার প্রবল ইচ্ছা একবার সমস্ত লোক একা একা ভ্রমণ করবে। তাই একদিন শ্রীবিষ্ণুর অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বৈকুণ্ঠ থেকে মনুষ্যলোক, গন্ধর্বলোক, স্বর্গলোক, পাতাললোক, প্রেতলোক–সব জায়গায় ঘুরে বেড়াল। কিন্তু কোথাও গিয়ে শান্তি পেলনা। সর্বত্রই দুঃখ বিরাজ করছে। চিত্তে সুখ না পেয়ে বিষণ্ণ বদনে ফিরে এল বৈকুণ্ঠধামে।

প্রভুর সামনে করজোড়ে অবনত মস্তকে দাঁড়াল।

নারায়ণ স্মিত হেসে জানতে চাইলেন–বলো গরুড়, কেমন ভ্রমণ হল? কোথায় কোথায় গিয়েছিলে?

গরুড় বলল–প্রভু যমলোক ছাড়া সব লোকেই ঘুরেছি। মনুষ্যলোককে আমার খুব ভালো লেগেছে। আর ভারতবর্ষের কথা কী বলব। ওই মহান দেশে দেবতারা পর্যন্ত মনুষ্যশরীর ধারন করে যেতে আগ্রহী।

হে বৈকুণ্ঠ অধিপতি, ওই মনুষ্যলোক সম্পর্কে আমার মনে হাজার প্রশ্নের উদয় হয়েছে। জীবগণ কীভাবে মনুষ্যত্ব লাভ করে? আবার কীভাবে তাদের মরণ হয়? দেহের মধ্যে কে অবস্থান করে, যে বিদায় নেয় আবার ফিরে আসে? ইন্দ্রিয় সমূহ কোথায় ঠাঁই পায়? অস্পৃশ্য হয় কেমন করে? জীব কর্ম করে এবং মরণের পরে সেই কর্ম অনুসারে ভোগ লাভ করে কীভাবে? মৃতলোককে কেন মাটিতে ঠাঁই দেওয়া হয়? কেনই বা তার মুখে পঞ্চরত্ন দেওয়া হয়? মৃত্যুর পরে মানুষ কোথায় যায়? মৃতজনের উদ্দেশ্যে তর্পণ করার কারণ কী? মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করা হয় কেন?

হে দেবেশ, হে প্রভু আমি সবলোক ঘুরেছি বটে, কিন্তু কোথাও সুখের দেখা পাইনি। এমনকি দেবলোকেও তা বিরল। দানবদের জীবনে স্বর্গরাজ্য সর্বদা আতঙ্কিত। মনুষ্যলোকে আছে রোগ, শোক, মৃত্যুর হাহাকার। ইষ্টের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন, তাই তারা সর্বদা ভীত।

গেলাম পাতাললোকে। সেখানেও সকলে ভয়ে তটস্থ। অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য পাতাল সর্বত্রই ভয়ের বাতাবরণ। সবখানে যেন ইন্দ্রজালের মতো মিথ্যার প্রলেপন। একমাত্র বৈকুণ্ঠধামে আপনার

পাদপদ্মযুগলে নির্ভয়ে ঠাঁই পাওয়া যায়। কালের কবলে পড়ে সকল মানবই দুঃখ জর্জরিত। সকল স্থানের থেকে ভারতবর্ষকে আমার বেশি হতদুঃখী মনে হল। সেখানে কানা, খোঁড়া, আতুর, বোবা, কালা, পঙ্গুর অভাব নেই। সর্বদা সেখানে হিংসা আর লোভের আগুন জ্বলছে। চলছে হানাহানি মরামারি। তারা ক্লেশ ভোগ করছে। একদণ্ড সুখ পাচ্ছে না। দিনে দিনে তাদের আয়ু কমে আসছে। কারো কারো কালের আগেই মৃত্যু হচ্ছে। এই মৃত্যু কেন হয়? মৃত্যুর পর সে কোথায় যায়? শুনেছি নরকে গমন করে। সেখানে কর্মফলের প্রায়শ্চিত্ত করে। হে মাধব, দয়া করে আমার এসকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমার মনকে শান্ত হতে সাহায্যে করুন।

শ্রীহরি বললেন–হে গরুড়, তোমার সমস্ত প্রশ্নের আমি জবাব দিচ্ছি শোনো।

স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, জরায়জ ও অণ্ডজ– এই হল জীবের জন্মের প্রকারভেদ। গর্ভাবস্থায় জীবের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটে। প্রথমে প্রথমে শক্র ও শোণিতের সংযোগে পিণ্ড গঠন হয়। পিণ্ডের মাঝে থাকে জীব। সেটা বর্ধিত হতে থাকে। একদিন রাতে হয় আকার। পঞ্চম দিনে বুদবুদ আকার লাভ করে। চৌদ্দ দিনে তাতে মাংস ও ধাতু গজায়। কুড়ি দিন পর সেই মাংস দৃঢ়তা লাভ করে। পঁচিশ দিনে পুষ্টি ও বল পায়। এক মাসে তা পূর্ণ পঞ্চতত্ত্ব লাভ করে। ত্বক ও মেদ জন্মায় দ্বিতীয় মাসে। তৃতীয় মাসে অস্থিমজ্জা গঠিত হয়। চতুর্থ মাসে কেশ ও অঙ্গুলি জন্মায়। পঞ্চম মাসে সে কান, নাক, মুখ আর বক্ষদেশ লাভ করে। সপ্তম মাসে উদর, উপস্থ, কণ্ঠরন্ধ্র, গুহ্যদেশ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জন্মায়। প্রাণের স্পন্দন তখন সূচিত হয়। অষ্টম মাসে মাতৃজঠরে প্রাণ নড়াচড়া করতে শুরু করে। নবম মাসে জীব সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং দৃঢ় হয়। রক্ত, মাংস, ত্বক, অস্থি, মজ্জা সহ দশমাসে সে ভূমিষ্ঠ হয়। এই হল পঞ্চভৌতিক জীবনরহস্য কথা।

ক্ষিতি, তেজ, জল, বায়ু ও আকাশ–এই হল পঞ্চভূত। ক্ষিতির বিকারে সৃষ্ট পঞ্চদ্রব্যের মধ্যে আছে ত্বক, অস্থি, নাড়ী, রোম ও মাংস। জলের বিকারে সৃষ্টি হয় মজ্জা, রক্ত, মল, মূত্র ও শুক্র। তেজ থেকে এসেছে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ভ্রাতি ও আলস্য। বায়ুদান করে ধারণ, চলন, সঙ্কোচন, প্রসারণ ও ক্ষেপণ। আকাশ থেকে লাভ হয় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও লজ্জাগুণ ভাব। প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান নিয়ে গঠিত পঞ্চ বায়ু। যার দ্বারা পান, ভোজন, পোষণ ও পরিপাকাদি কাজ সুসম্পন্ন হয়।

জীবদেহ নিজ নিজ কর্মানুসারে মর্ত্যে আসে। আয়ু, বিত্ত, মৃত্যু ও বিদ্যাকে সঙ্গে নিয়েই জীব গর্ভাবস্থা হতে ভূমিষ্ঠ হয়। কর্মের দ্বারাই জীব সমুৎপন্ন ও কর্মের দ্বারাতেই ক্ষয় লাভ করে। গর্ভস্থ জীবকে বায়ু অপোম্মুখে আকর্ষণ ও ঊর্ধ্বপাদে নিঃসরণ করে। জানুর ওপরে দুই অঙ্গুষ্ঠ,

জানুর পৃষ্ঠদেশে হাতের আঙুলগুলো আর দুটি চোখ এবং জানু দুটির মধ্যে নাক রেখে গর্ভের জীব বর্ধিত হতে থাকে।

মায়ের জঠরে জীব এইভাবে কুণ্ডলি অবস্থায় থাকে। মা যেসব জিনিস খায়, তার থেকে নিঃসৃত রস জীবকে বাড়তে সাহায্য করে। তার নাভিতে থাকে একটি নাভি যুক্ত অবস্থায়। মায়ের অমধ্যে যে খাদ্য পাচিত, সেই রস ওই নাড়ির দ্বারা সঞ্চারিত হয়।

মাতৃগর্ভে জীব এইভাবে যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। এই সময় আগের স্মৃতি তার মনে জাগে। তখন পরিতাপ করে আর ভাবে, আর কখনও কুকর্মে লিপ্ত হব না। এই গর্ভে বাস যন্ত্রণাদায়ক। যে কর্ম করলে মাতৃজঠরে ঠাঁই পেতে হয় না, এবার সেই কাজ করব।

নবম মাসে গর্ভের জীব নীচের দিকে মাথা করে। প্রজাপত্য বায়ু এইসময় তাকে পীড়ণ করে। সে চেতনা হারায়। মায়া তখন তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সে পূর্বজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। পরে সেই জীব ভূমিষ্ঠ হয়। বাল্যকাল কাটিয়ে কৈশোরে পা দেয়। যৌবনকাল অতিবাহিত করে প্রৌঢ় হয়ে এবং একদিন কালের নিয়মে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইভাবে বার বার জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার আসা যাওয়া ঘটে। তবে প্রত্যেকবার এক যযানি লাভ করে না, বিভিন্ন যোনিতে সে আশ্রয় নেয়। পুণ্যের ফলে স্বর্গবাস ঘটে, নতুবা নরকে গমন হয়। সেখানে যন্ত্রণা ভোগ করে পাপ কিছুটা লাঘব করে। তারপর অবশিষ্ট কর্মভোগের জন্য সে আবার যোনি লাভ করে পৃথিবীতে ফিরে আসে।

স্বর্গে পরম সুখ, আর নরকে চরম দুঃখ– এই উপলব্ধি সর্বজনবিদিত। তাই স্বর্গবাসী সুখভোগ করার সময় সর্বদা মনে আতঙ্ক জাগে, হয়তোবা আমার পুণ্য ক্ষয় হল, আমাকে আবার ওই নরকগামী লোকের মতো দুর্গতি লাভ করতে হবে।

এমন চিন্তায় যদি সর্বদা দুঃখ পায়, তাহলে স্বর্গবাসী হয়েও কি সে সুখ পায়? গর্ভবাসে বহু দুঃখ সইতে হয়, জন্মকালে যোনির পেষণে মহাক্লেশ ভোগ করতে হয়। তারপর সেই জীব শিশুকাল থেকে ধীরে ধীরে একদিন বৃদ্ধ হয়। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে। যমদূতের অনুচররা তার মাথার শিয়রে এসে দাঁড়ায়। তাকে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করে। তারপর তাকে পাঠিয়ে দেয় স্বর্গ অথবা নরকে। এইভাবে সংসার–চক্র আবর্তিত হচ্ছে। কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ জীব বারে বারে আনাগোনা করছে।

যমলোকে অসংখ্য নরককুণ্ড আছে। তার মধ্যে ৮৪ টি প্রধান। যে যেমন পাপ করে তাকে সেইরকম কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে যমের অনুচররা সর্বদা তাদের ওপর পীড়ণ চালায়। কাউকে আগুনে পোড়ানো হচ্ছে, কারো মাথায় মুগুর দিয়ে বেদম মার মারা হচ্ছে। করাত দিয়ে কারো দেহ। কাটা হচ্ছে, হিংস্র কুকুর বা বাঘকে দিয়ে কাউকে খাওয়ানো হচ্ছে। কারও জিভ ছিঁড়ে নেওয়া হচ্ছে। সকলেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে। চিৎকার চেঁচামেচি। ত্রাহি ত্রাহি রব। কিন্তু এই যন্ত্রণা থেকে রেহাই পায় না সে। মর্তের দেহ ছেড়ে সে যখন এখানে আসে, তখন নতুন একটি দেহ লাভ করে, যার মৃত্যু নেই। কোটি কোটি বছর ধরে আগুনে পোড়ালেও সে দেহ বিকৃত দেহ দাপাদাপি করবে। পাপীর একদিন নরক যন্ত্রণা ভোগের পর মনে করে শত বছর কেটে গেছে।

এরপর অবশিষ্ট কর্ম ভোগের জন্য তাকে আবার পাঠানো হয় পৃথিবীতে। নানা যযানি ঘুরে ঘুরে জন্মলাভ করে। কেউ মনুষ্য যযানি লাভ করে, কেউ কীট বা কৃমি হয়, কেউ বা জীবজন্তুর যোনিতে জন্ম নেয়। কর্মানুসারে তারা হয় কালা, বোবা, খোঁড়া, পঙ্গু, অন্ধ, তোতলা, আবার কুষ্ঠরোগী। তারপর শুদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও পরে ব্রাক্ষণ যোনিতে আসে। এইভাবে ধীরে ধীরে নিকৃষ্ট যোনি থেকে উচ্চ যোনি লাভ করে একসময় দেবত্ব অর্জন করে। . হে গরুড়, পিতার মৃতদেহ পুত্ররা কাঁধে করে বহন করে নিয়ে গেলেও, তারা মুখাগ্নি করতে পারে না, পৌত্র তার মুখে আগুন দেয়। তিলদর্ভসহ শব মাটিতে রাখলে সেই বাড়ি ঋতুবতী হয়। মুখের মধ্যে পঞ্চরত্ন রাখলে জীবের প্রবোহ হবে। ঋতুপুষ্প নাশে গর্ভধারণ না হলে, বংশ নির্বংশ হয় জানবে। বংশ নাশে পৃথিবীতে আবার টান অনুভব করে, ফলে পুনরায় জন্ম নিয়ে ফিরে আসে ভারতে।

মাটিতে গোবর লেপন করে কুশ তিল আর তুলি ছড়িয়ে সেখানে রোগীকে শোয়াতে হয়। সেখানেই যদি মৃত্যু হয়, তাহলে জানবে সমস্ত পাপ নাশ হয়ে সে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়েছে। তখন তিলকুশ আর তুলি শ্মশানে ফেলে দিতে হয়।

তিলকে দৈত্য দানোরা ভয় পায়, কারণ আমার স্বেদ বিন্দু থেকে তিল সৃষ্ট হয়েছে। সাদা ও কালো, দুই রকমের তিল আছে। এরা দেহকৃত পাপরাশিকে নাশ করে। কুশের জন্ম হয়েছে আমার লোম থেকে। শ্রাদ্ধে তাই তিল ও কুশ প্রদান করা হয়। এর ফলে দেবতা ও পিতৃগণ পরিতুষ্ট থাকেন। কুশের মধ্যে জনার্দনের অবস্থান, মূলে আছেন ব্রহ্মা আর অগ্রে পশুপতি বিরাজ করছেন।

কুশ, তুলসী, বিপ্র, অগ্নি, মন্ত্র–এগুলো কখনও বাসি হয় না। বারবার ব্যবহার করা যায়। একাদশী, গো, বিষ্ণু, তুলসী ও ব্রাহ্মণ এই হল পঞ্চ মানবগণের পোতস্বরূপ। একাদশী, গীতা, বিপ্র, ধেনু, বিষ্ণু ও তুলসী–সংসার দুর্গে মুক্তিদাতা।

দীক্ষাহীন হয়ে কুশশয্যায় শয়ন করে মৃত্যু হলেও সে পাপী হয় না, বরং তার বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়।

মৃত্যুশয্যায় শুয়ে মানব যন্ত্রণা ভোগ করে, পরকালের যাবার দ্বার উন্মুক্ত পায় না সে। সেসময় মাটিতে তাকে শুইয়ে দিতে হয়। এর ফলে তার মৃত্যুযন্ত্রণা তাড়াতাড়ি লাঘব হয়।

মৃত্যুর কাল উপস্থিত হলে যমরাজ তার অনুচরদের পাঠিয়ে দেন প্রাণ নিয়ে যেতে। মৃত্যুপথযাত্রী তাদের দেখে কাঁদতে শুরু করে। হাহাকার করে। ভয়ে ত্রাসে, চোখ বিস্ফারিত হয়। সেই সময় যমদূতরা তাকে নিয়ে যায় যমালয়ে।

যারা ধর্মে শ্রদ্ধাবান, ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাদের সুখে মৃত্যু হয়। পূর্বকৃত কর্মের কারণ ভোগের বৈচিত্র্যময় ঘটে, কর্মের তারতম্যের জন্যই নানান যোনিতে জন্মলাভ হয়। মহাপাপীরা মৃত্যুর পর নরকভোগ করে পৃথিবীতে আবার জন্ম নেয়। যে যেমন পাপ করে, সে তেমন যোনি লাভ করে।

পুণ্যাত্মারা বিমানযোগে স্বর্গে গমন করে এবং সেখানে মহাসুখে বসবাস করে। স্বর্গবাস করে পুণ্যক্ষয় হয়। তারপর আবার ফিরে আসে পৃথিবীতে। রাজা অথবা সাধুকুলে জন্ম নেয়। সুখ ভোগ করে।

জন্মালেই মৃত্যু অনিবার্য, এটাই কালের নিয়ম। পাপী অধোগতি লাভ করে আর পুণ্যবানেরা ঊর্ধ্বগতি হয়। জীব তাই ইন্দ্রিয়সমূহের সাথে এক দেহ থেকে অন্য দেহে যাতায়াত করে। কিন্তু এই দেহ বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্ম, পুরীদি, শরীরে সৃষ্ট সকল ব্যাধি সপ্ত ধাতু, মেদ, মাংস ও অস্থি দেহের সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়।

হে বিনতানন্দন, এ জগত-সংসার দুঃখের আধার। সুখ নেই কোথাও। তাই মুক্তিলাভ করার জন্য প্রতিটি মানুষ অন্তরে যত্নবান হবে।

মৃত্যুপথযাত্রীর সেবা

শ্রীহরি, বললেন–হে গরুড়, এই হল জীবের গর্ভাবস্থা থেকে সারা জীবনের কষ্টভোগের কাহিনী। নরকলোকের কথাও তুমি শুনলে। আর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলল, আমি জবাব দেব।

গরুড় বলল–হে ভগবান, মরণাপন্ন রোগীর কীভাবে পরিচর্য্যা করা দরকার, কী করলে তাকে আর যমালয়ে যেতে হবে না, এইসবের প্রতিকার কী? এসব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আমার মন বড়ই উতলা হয়ে উঠেছে।

শ্রীনারায়ণ বললেন–মৃত্যুপথযাত্রীকে পঞ্চ জলে স্নান করানো উচিত। পঞ্চজল অর্থাৎ তীর্থজল, কুশোদক, গোমূত্র, গোময় ও গঙ্গামৃত্তিকা। গোবর দিয়ে মাটি লেপন করে সেখানে দক্ষিণভাগে কুশ, বিছিয়ে তার ওপরে তিল ছড়িয়ে দিতে হয়। এবার দুটি পোয় কাপড় রোগীকে পরিধান করিয়ে উত্তর অথবা পূর্বদিক করে মাথা রেখে শোয়াতে হবে। রোগীর মুখে থাকবে একটি সোনার টুকরো।

শালগ্রামশিলা, তুলসী গাছ, ঘিয়ের প্রদীপ রোগীর পাশে থাকবে। এবার ভগবান বাসুদেবকে পুজো করবে। মহামন্ত্র জপ করবে। পুষ্প, ধূপ, দিয়ে শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করা দরকার। এরপর স্তব পাঠ করবে। বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করার পর দানধ্যান করতে হয়। সংসার-পরিজন, পুত্র কন্যা, শত্রু-মিত্র, বনসম্পদ সকলের কথা মৃত্যুপথযাত্রী ভুলে যাবে, সে তখন বিষ্ণুর চরণকমল বন্দনা করবে।

রোগী জ্ঞান হারালে আত্মীয়স্বজন জোরে জোরে পুরুষসূক্ত পাঠ করবে। এখন শোনো, এই প্রক্রিয়ার ফল। স্নান করানোর ফলে বিশুদ্ধতা লাভ হয়, অপবিত্রতা দূর হয়। শ্রীবিষ্ণুর চরম বন্দনার প্রভাবে সর্বকার্য সিদ্ধ হয়। তিল, কুশ ও তুলির ওপর শয়নের ফলে স্বর্গলাভ হয়। তিলকুশ যুক্ত হয়ে স্নান করলে সর্বজ্ঞের সমান ফল পাওয়া যায়। মণ্ডল অঙ্কন করা দরকার। শরণ-এর মাঝে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, লক্ষ্মী ও অগ্নি অবস্থান করেন। উত্তম লোক লাভ করার জন্য উত্তর বা পূর্বদিকে মাথা রেখে শোয়াতে হয়। সকল পাপ নাশও হয়। স্বর্ণ খণ্ড রোগীর মুখে। থাকার ফলে জ্ঞান লাভ হয়। তখন ভবসাগরে পড়ে মুমূর্ষ জন হাবুডুবু খায়, দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। বিষ্ণু, একাদশী, গো, তুলসী ও ব্রাহ্মণ, এদের স্মরণ করে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে বিষ্ণুর সমান পুণ্য লাভ হয়। দানধ্যান করার ফলে মৃত্যুপথযাত্রী মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকে সুখে থাকে। মমত্ব বিনাশ করার জন্য পুরুষসুক্ত

পাঠের প্রয়োজন। সাধ্যমত দান ধ্যান করলে ভগবান সন্তুষ্ট হন। দাতার মনোবাঞ্ছা শ্রীহরির দয়ায় পূর্ণ হয়।

বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের শ্রেষ্ঠতা

শ্রীবিষ্ণু বললেন–বৃষোৎসর্গ না করলে শ্রাদ্ধের ফল পাওয়া যায় না, সবই নিষ্ফল হয়।

বিনতানন্দন গরুড় বলল–বৃষ দান করলে কী ফল হয়? এর নিয়ম বিধিই বা কী? কোন সময় তা করা উচিত? কে প্রথম এই শ্রাদ্ধ করেছিলেন? প্রভু, আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমাকে শান্ত করুন।

ভগবান বললেন–এ সম্বন্ধে এক পুরোনো কাহিনী আছে। বলছি, তুমি শ্রবণ করো।

বিবাধ নগরে এক অধার্মিক রাজা ছিলেন। তার নাম বীরবাহণ। মৃগয়ার উদ্দেশ্যে তিনি একদিন অরণ্যে প্রবেশ করলেন। বনের এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে দাঁড়ালেন বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে; তার দর্শন লাভের আশায়। রাজার মন উদগ্রীব হল। তিনি আশ্রমে প্রবেশ করলেন। অবনত মস্তকে করজোড়ে মুনিকে প্রণাম জানালেন। ধর্মতত্ত্ব জানার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন-হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আমি ধর্ম অনুসরণ করে বহু কাজ করেছি, তবুও যমতাড়না আমার মনকে অশান্ত করে তোলে। নরকযন্ত্রণার হাত থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, আপনি দয়া করে সেই বৃত্তান্ত আমাকে বলুন।

বশিষ্ঠ মুনি বললেন–বহু ধর্ম কাজের মধ্যে পিতা-মাতার শ্রাদ্ধ কাজ একটি। সেই শ্রাদ্ধের মধ্যে বৃষোৎসর্গই শ্রেষ্ঠ বলে জানবে।

প্রেতের উদ্দেশ্যে বৃষ যজ্ঞ করতে হয়। এর প্রভাবে প্রেতত্ব নাশ হয়। একটি বৃষের ডান পাঁজরায় ত্রিশূল চিহ্ন ও বাম পাঁজরায় চক্র চিহ্ন এঁকে মৃতের উদ্দেশ্য দান করাই নিয়ম। তার ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেল, মৃতব্যক্তি প্রেতত্ব থেকে এইভাবে মুক্তি পায়।

হে রাজা, এক উপাখ্যান বলছি শোনো। ত্রেতাযুগে এক নির্লোভ ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুশ সংগ্রহের জন্য বনে গিয়েছিলেন। আচমকা চারজন পুরুষ তাকে আক্রমণ করল। তিনি বিমানযোগে আকাশপথে উড়ে চললেন। তারপর একসময় এসে থামলেন।

সেখানকার মানুষদের চেহারা দেখে ব্রাহ্মণ অবাক হলেন। কেউ কেউ রোগা, কেউ মোটাসোটা, ভীষণ নোংরা জামাকাপড় তাদের পরণে। কেউ কেউ দামী দামী গয়নায় অলঙ্কৃত হয়েছে, কোনো মানুষ দেখতে অতীব সুন্দর। ঠিক যেন কোনো দেবতা।

চারজন পুরুষ সেই ব্রাহ্মণকে নিয়ে প্রবেশ করল মস্ত বড়ো এক প্রাসাদে, বুঝি রাজপুরী। সেখানে সোনার সিংহাসন, বসে আছেন রাজা, তার মাথায় সোনার মুকুট, গায়ে মণি-মাণিক্য খচিত পোশাক পরেছেন। তাকে ঘিরে আছে কয়েকজন অনুচর। তাদের কেউ রাজার মাথায় ছাতা ধরে আছে, আবার কেউ চামর দোলাচ্ছে। সবাই তাঁর সেবাতে ব্যস্ত।

ব্রাহ্মণকে দেখেই সেই রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তার পাদপদ্ম বন্দনা করলেন। তারপর অনুচরদের বললেন–এই ব্রাহ্মণকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। যেখান থেকে এসেছিলে, সেখানে।

রাজার ব্যবহার দেখে ব্রাহ্মণ একেবারে অবাক হয়ে গেলেন।

বিনীত কণ্ঠে রাজা বললেন–আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আপনার দর্শনাভিলাষী ছিলাম আমি। তাই আমার আদেশে আমার দুতেরা এখানে নিয়ে এসেছে। এখন আমার লোকেরা আপনার জায়গাতেই রেখে ফিরে আসবে।

ব্রাহ্মণের বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

তখন রাজমন্ত্রী বললেন–এই রাজা গতজন্মে বিশ্বম্ভর নামে এক বণিক ছিলেন। বিরাজনগরে বাস করতেন। সেখানে ছিল ব্রাহ্মণদের বাস, বণিক তার অর্জিত অর্থের বেশিরভাগটাই ব্রাহ্মণদের সেবায় খরচ করতেন। একসময় বিশ্বম্ভর তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। বহু তীর্থস্থান ঘুরলেন। এবার বাড়ি ফেরার পালা। পথে দেখা হল এক মুনির সঙ্গে, তার নাম লোমশ।

মুনিকে নতমস্তকে প্রণাম জানিয়ে বণিক জানতে চাইলেন–হে মুনি, আমি বহু তীর্থস্থান দর্শন করলাম, ভ্রমণ করলাম বহু পথ। কিন্তু বিষয়-আশয়ের প্রতি আসক্তি আমার নিবৃত্ত হল না। আপনি দয়া করে আমাকে সেই উপায় বলে দিন, যার ফলে আমি বিষয় তৃষ্ণা থেকে মুক্তি পাব।

লোমশ মুনি বললেন–দান-ধ্যান করতে হবে। দেব-দ্বিজে ভক্তি প্রদর্শন করো। ধীরে ধীরে বিষয়াসক্তি নষ্ট হয়ে যাব। তখন বিষয় হবে, বিষ। যাও পুষ্করতীর্থে বৃষোৎসর্গ করে সব তীর্থ দর্শনের ফল লাভ করো।

মুনির বাক্য মাথায় করে বণিক এলেন পুষ্করে। সেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে বৃষ দান করে যজ্ঞ করলেন। এরপর একদিন তার মৃত্যু হল। তিনি দিব্য বিমানে চড়ে স্বর্গে এলেন। স্বর্গসুখ ভোগ

করলেন। তারপর রাজপুত্র হয়ে জন্মালেন। তখন তার নাম হল বীর পঞ্চানন, যাকে আপনি সামনে দেখছেন।

বাহ্মণ জানতে চাইলেন–পথে আসতে আসতে নানা ধরনের মানুষ দেখলাম। এর কারণটা বলবেন কি?

মন্ত্রী বলল–দেবতাদের মতো দেখতে যাদের, তারা বৃষোৎসর্গের সাহায্য করেছিল। যারা মোটাসোটা, তারা ওই সময় দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। তাদের থেকে দূরে যারা ছিল, তারা ময়লা নোংরা কাপড় পরা রোগা চেহারাধারী।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত মনে স্বস্থানে ফিরে এলেন।

মহামুনি বশিষ্ঠের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজা বীরবাহন এলেন মথুরায়। সেখানে ধৃত যজ্ঞ করলেন। এবার এলেন নিজের রাজ্যে।

যথাসময়ে ওই রাজার মৃত্যু হল। যমরাজার অনুচররা তাকে নিয়ে চলল। পথে দেখা হল স্বয়ং ধর্মরাজের সঙ্গে। তিনি রাজার চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন। তাঁর আদেশে যমদূতরা রাজাকে স্বর্গে নিয়ে গেল।

রাজা বীরবাহন জানতে চাইলেন–তাকে কেন ধর্মরাজ প্রণাম করছেন। কেনই বা তাকে স্বর্গে পাঠানো হল।

ধর্মরাজ বললেন– হে রাজন, আপনি মহাত্মা। আপনি এমন বড়ো পুণ্য কাজ করেছেন, যার ফলে আপনার স্বর্গবাস হল। বৃষোৎসর্গ করে আপনি সেই পুণ্য অর্জন করেছেন, এমন পুণ্য কাজ জগতে আর একটিও নেই।

বিভীষিকাময় পুতিগন্ধ যুক্ত নরক যন্ত্রণা রাজা বীরবাহনকে ভোগ করতে হল না। বৃষ যজ্ঞের ফলেই তিনি স্বর্গ লাভ করলেন।

পঞ্চপিশাচের কাহিনী

শ্রীহরি বললেন–এবার পাঁচ পিশাচের গল্প বলছি শোনো।

সংসারের অশান্তি সহ্য করতে না পেরে এক ব্রাহ্মণ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল এক অরণ্যে। ঘুরতে ঘুরতে গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করল। দেখতে পেল অত্যাশ্চর্য ভয়ঙ্কর দৃশ্য–গাছের ডাল থেকে ঝুলছে একটা মরা দেহ। আর পাঁচটা প্রেত সেই দেহ থেকে মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে, আর উল্লাস করছে।

ব্যাপার স্যাপার দেখে ব্রাহ্মণের পিলে চমকে গেল। সর্বাঙ্গ কঁপছে। পিশাচ তো নয়, যেন পাঁচ পাঁচটা জ্যান্ত কঙ্কাল। কোটরাগত চোখ। পেট-পিঠ আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে না। হাড়গুলো গোনা যায়। নাকহীন।

ব্রাহ্মণকে দেখে তারা মরাটাকে ফেলে এগিয়ে এল জ্যান্ত টাটকা মাংস খাবে বলে। সরু সরু কাঠির মতো পা ফেলে ছুটে এল, লম্বা হাত বাড়িয়ে দিল। এবার শুরু হল, ব্রাহ্মণকে নিয়ে টানা হাঁচড়া। প্রত্যেকেরই একই কথা–আমি আগে ধরেছি তাই আমি আগে খাব।

ব্রাহ্মণ দেখল এই প্রেত-পিশাচের হাত থেকে একমাত্র শ্রীগোবিন্দই তাঁকে রক্ষা করতে পারে, নতুবা প্রাণটা দিতে হবে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভগবানকে স্মরণ করল–হে কৃষ্ণ, হে মধুসূদন, বিপদত্তারণ, এই সঙ্কট থেকে আমাকে রক্ষা করো। তুমি আমার একমাত্র ভরসা, তুমিই অগতির গতি ।

ব্রাহ্মণের সেই আকুল প্রার্থনা আমার সিংহাসন নড়িয়ে দিল। ব্রাহ্মণকে ওই পিশাচদের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সেখানে গেলাম।

তখন পিশাচেরা ব্রাহ্মণকে নিয়ে আকাশপথে ওড়ার তোড়জোড় করছে, নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে খাবে বলে হয়তো। তখনই গাছের ডাল থেকে কীভাবে মরাদেহটা পড়ে গেল। পিশাচেরা তা লক্ষ্য করে ফিরে এল নীচে। একটাকে সামলাতে গিয়ে আর একটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তারা তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণকে নিয়ে ওই মরাদেহের সামনে এল।

জীবন্ত আর মৃত–দুটি দেহ নিয়ে তখন পিশাচেরা উড়ে চলেছে শূন্যপথে। আমি তাদের অনুসরণ করলাম, অবশ্য গোপনে। ঠিক সেই সময় ওই পথ দিয়ে যক্ষমণিভদ্র যাচ্ছিল। তাকে

বললাম, ওই পিশাচদের হাত থেকে ওই মরদেহটা ছিনিয়ে নাও, দেখো ব্রাহ্মণের যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

আমার আদেশ পেয়ে যক্ষ বিশাল আকারের এক পিশাচের রূপ ধরল। সে তার লম্বা লম্বা হাতে ওই শব কেড়ে নিল পাঁচ পিশাচের কাছ থেকে।

পর্বতের মাথায় ব্রাহ্মণকে রেখে পিশাচেরা মণিভদ্রকে তাড়া করল। তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে তারা মানবে কেন? কিন্তু মণিভদ্রের শক্তির কাছে তারা হেরে গেল। মণিভদ্র বাগিয়ে দিল এক ঘুষি, মাথা ঘুরে পড়ে গেল সবকটা পিশাচ। মণিভদ্রও পালিয়ে গেল। তাকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে এল পর্বতের উপর, এবার আয়েস করে ব্রাহ্মণকে খাবে। কিন্তু অবাক কাণ্ড। ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করতেই তারা বিদ্যুৎ পিষ্টের মতো ছিটকে গেল। তারা তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে দাঁড়াল।

পিশাচদের এমন অনুগত ভাব দেখে ব্রাহ্মণ আশ্চর্য হল।

পঞ্চ-পিশাচ বলল–হে ব্রাহ্মণ, আমাদের মাফ করুন। না জেনে আর একটা পাপ কাজ করে ফেলেছিলাম।

বিস্মিত কণ্ঠে ব্রাহ্মণ বললেন–তোমাদের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

–আপনার স্পর্শে আমরা গতজন্মের সব কথা মনে করতে পারছি।

ব্রাহ্মণ বললেন– তোমাদের পরিচয় কী?

–আমি হলাম পর্য্যুষিত, পিশাচদের মধ্যে একজন বলল, আর এদের নাম সূচীমুখ, শীঘ্রক, রোধক আর লেখক।

–তোমারা পিশাচ হলে কীভাবে?

প্যুষিত জবাব দিল–পিতৃশ্রাদ্ধাদি শেষ করে ব্রাহ্মণ ভোজন করলাম। কিন্তু এক ব্রাহ্মণ তখনও এসে পৌঁছাননি। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছিল। ওই ব্রাহ্মণের জন্য অপক্ষো না করে খেয়ে নিলাম। তারপরেই ওই ব্রাহ্মণ এসে হাজির হলেন। কিন্তু কী খেতে দেব? খাবার তো নেই, তাই পাত্রগুলোর গায়ে লেগে থাকা খাবার আর নিজের এঁটো খাবার থেকে কিছুটা নিয়ে ওই

ব্রাহ্মণকে ভোজন করালাম। এ হল চরম পাপ। যার ফলে পিশাচ হলাম। সেই থেকে আমি হলাম পর্য্যুষিত।

সূচীমুখ তার কাহিনী শোনাল–ক্ষত্রিয় বংশে আমার জন্ম হলেও তার ধর্ম মানতাম নয়। ভীষণ উগ্র স্বভাব ছিল আমার। পরের ওপর অত্যাচার করে সুখ পেতাম। একবার এক ব্রাহ্মণীকে ধরে খুব আঘাত করলাম। যা কিছু ছিল, সব কেড়ে নিলাম। সঙ্গে ছিল তার পাঁচ বছরের ছোটো ছেলে। জল খেতে চাইল। কিন্তু আমি তাকে জল খেতে দিলাম না। বরং তাকে বেত দিয়ে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলাম। একরত্তি ছেলে। পারে কি সহ্য করতে অত মার। ছটফট করতে করতে মারা গেল। এ দৃশ্য দেখে, ব্রাহ্মণ আর বেঁচে রইল না, একটা কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিল।

দিনের পর দিন আমার অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে লাগল। এর জন্য কোনো তাপ অনুতাপ হত না আমার। মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতাম। তাদের মুখকে সূচী করেছিলাম। তাই পিশাচত্ব লাভ করলাম, হলাম সূচীমুখ। বিশাল পিশাচদেহ পেলাম আমি, কিন্তু মুখ পেলাম ক্ষুদ্র সূচের ছ্যাদার মতো। আপনার স্পর্শে আমি পিশাচমুক্ত হলাম।

শীঘ্রক বলল–আমি এক নরাধম, এমনকি সারা দুনিয়া ঢুড়েও দ্বিতীয়টি পাবেন না। বণিক বংশে জন্ম নিয়েছিলাম। সর্বদা অকাজ-কুকাজে মেতে থাকতাম। একবার আমি আর আমার দাদা বিদেশে সওদা করতে গিয়ে প্রচুর মুনাফা করে ফিরে এলাম।

নদীপথে ফিরছি। মনে এক বদবুদ্ধি এল, এর কারণ আমি জানি না। ভাবলাম, দাদাকে যদি এখানেই সরিয়ে দিতে পারি, তাহলে মুনাফার অর্ধেক ভাগ দিতে হবে না। যেমন ভাবা তেমন কাজ। নৌকা নিয়ে এলাম। দাদাকে নিয়ে চূড়ায় নামলাম। তারপর দাদাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে নিমেষে দ্রুত লাফিয়ে উঠলাম নৌকোতে, নির্দেশ পেয়ে মাঝি নৌকো ছেড়ে দিল।

বাড়ি ফিরে এলাম। কাঁদতে কাঁদতে বৌদিকে বললাম–দস্যুদের আক্রমণ রুখতে গিয়ে দাদা মারা গেছে।

স্বামীর শোকে বৌদি কান্নাকাটি করতে লাগল। তারপর চিতা সাজিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দিল।

ধনসম্পদ সব আমার হল। মন ভরে সব ভোগ করলাম। কিন্তু এমন মহাপাপ করলাম, যার ফলে আমি পিশাচত্ব লাভ করলাম।

এরপর চতুর্থ পিশাচের পরিচয় প্রদানের পালা। সে বলল–আমি রোধক। চাষির ঘরে জন্ম। মা-বাবা-ভাই-বোন নিয়ে ভরা সংসার। আমার ভাই কোনো কাজকর্ম করতে চাইত না, শুধু ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসত। খাওয়ার সময় হলেই তার টিকি পাওয়া যেত। তাই তার বিষয়-আশয় আলাদা করে দিলাম। সে পৃথক হল। কয়েকদিনের মধ্যে জমি-জায়গা বিক্রি করে দিল। দুবেলা খাওয়া পর্যন্ত জুটল না। মা-বাবাকে নিয়ে আমি তখন বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছি।

ছেলে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরছে। কোনো মা-বাবা তা সহ্য করতে পারে বলুন? আমার সংসার থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে নিয়ে মা তার ছোটো ছেলেকে খাবার জোগাত। আমি একদিন টের পেয়ে মাকে যাচ্ছে-তাই করে বকাবকি করলাম। ওদের ঘরে আটকে রেখে দিয়ে তালা, লাগিয়ে দিলাম। সেই দুঃখে মা বাবা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল।

আর আমার ভাই? সেও অনাহারে একদিন মা-বাবার পথ অনুসরণ করল। আমি হলাম পাপী পাপের ফলে হলাম পিশাচ।

–অবন্তী নগরে আমার জন্ম। পঞ্চম পিশাচ বলতে শুরু করল। রাজপুরোহিত ছিলাম। ছিলাম খুব লোভী, রাজমন্দিরে ঠাকুরের গায়ে সোনার অলংকার যা ছিল, আমি চুরি করলাম। রাজা চুরির খবর পেয়ে ঘোষণা করলেন যে চোরকে ধরতেই হবে। তাকে শূলে চড়াব।

আমার কানেও এই রাজপ্রতিজ্ঞার কথা পৌঁছে গেল। ঠিক করলাম, রাজাকে খুন করব। একদিন প্রকাশ্যে রাজবাড়িতে প্রবেশ করলাম। সকলের পরিচিত বলে কেউ বাধা দিল না আমায়। রাজার ঘরে গিয়ে পালঙ্কের নীচে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। রাত হল ক্রমশ তা ঘন হল। ধারালো অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। রাজার গলা কেটে ফেললাম। সেখান থেকে মন্দিরে বেরিয়ে এলাম। এসে বাকি সব গয়নাগাঁটি প্রতিমার গা থেকে চলে খুটিয়ে খুঁটিয়ে বের করে নিলাম। তারপর চোরের মত সেখান থেকে চলে এলাম। বনের পথ ধরলাম। পড়লাম এক হিংস্র বাঘের মুখে। সে আমাকে ভক্ষণ করল। জীবনে যত পাপ করেছি তার যন্ত্রণা ভোগ করলাম পিশাচ হয়ে। বিগ্রহের গায়ে আঁচড় কাটায় আমি হলাম লেখক পিশাচ।

পাঁচ পিশাচের কাহিনী শেষ হল। ব্রাহ্মণ জানতে চাইল-তারা এখন কোথায় থাকে? কী খায়?

পিশাচেরা জবাবে বলল-লজ্জা, ধর্ম, ক্ষমা, ভীতি, জ্ঞান যেখানে বিরাজ করে সেখান থেকে

আমরা যোজন যোজন দূরে থাকি। এসব যেখানে নেই সেখানেই আমরা বাস করি। যা খাই তা তো নিজের চোখেই আপনি দেখলেন। অনাচারীদের রক্ত-মাংস আমরা আহার করি। আপনি একজন সিদ্ধযোগী। তাই আপনার স্পর্শে আমরা আজ ধন্য হলাম। পূর্বস্মৃতি ফিরে পেলাম।

শ্রীহরির মুখ থেকে গরুড় এই কাহিনী শ্রবণ করছিল।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন–ওদের কথাবার্তা আমি অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। আমি তারপর ওদের সামনে নিজমূর্তি ধারণ করে দাঁড়ালাম। ওরা আমাকে দেখে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। আমি তাদের নিরস্ত করলাম। ছটা দিব্য বিমানে করে ওই পাঁচ পিশাচ আর বিশ্বকসেন নামে ওই ব্রাহ্মণকে নিয়ে গেলাম বৈকুণ্ঠধামে।

গরুড় শ্রীহরির চরণে প্রণাম নিবেদন করে বলল–হে ভগবান, আপনি দয়াময়, আপনার অসাধ্য কিছুই নেই।

বভ্রুবাহন ও প্রেতবাহন

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় বাহন গরুড়ের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন একটি একটি করে।

তিনি বললেন–শ্রাদ্ধ কালে পুত্র যে অন্নজল দান করে তা খেয়ে প্রেতলোকে পিতা তৃপ্তি লাভ করে। নরক থেকেও মুক্তি পায়।

গরুড় জানতে চাইল–যারা পুত্রহীন, তাদের কী গতি হয়? তাছাড়া ছেলের দেওয়া অন্নজল পিতা যে গ্রহণ করল, তা কী করে বোঝা যায়? হে প্রভু আপনি আমার এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমাকে শান্ত করুন।

শ্রী ভগবান বললেন–এ অতি উত্তম প্রশ্ন। সন্তানহীনদের ধনসম্পদের যে অধিকারী হয়, সে-ই অন্নজল দান করতে পারে। সে করবে শ্রাদ্ধ। আর যার ধনসম্পত্তি কিছু নেই, নিঃস্ব, এক্ষেত্রে সেদেশের রাজাই তার পারলৌকিক ক্রিয়া করবে, কারণ রাজা হলেন সকলের পালনকর্তা।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ একটি সুন্দর উপাখ্যান বললেন।

পূরাকালে বল্‌বাহন নামে এক প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। সেই রাজ্যে সর্বদা শান্তি বিরাজ করত। একদিন রাজা তার লোকলস্কর নিয়ে মৃগয়া করতে বেরোলেন। বনে ঢুকেই একটা হরিণকে দেখে তির নিক্ষেপ করলেন। তির হরিণের পায়ে লাগল। আহত হয়েও সে প্রাণের তাগিদে ছুটতে শুরু করল। রাজা তার পিছু ধরলেন। ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। কিন্তু খানিক যাওয়ার পর হরিণটাকে আর দেখতে পেলেন না।

এসময় রাজার খুব জলতেষ্টা পেল। সামনেই এক সুন্দর সরোবর। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে শীতল জল গণ্ডুষ করে পান করলেন। শরীর ও মন জুড়াল। গাছের তলায় বসলেন জিরিয়ে নেবার আশায়। ফুরফুরে বাতাসে রাজার চোখে ঘুম এল। তিনি ঘাসের উপর শুয়ে পড়লেন।

আধো ঘুম আধো তন্দ্রার মধ্যে রাজা একটা বিশ্রী কটু গন্ধ পেলেন। নাক কুঁচকে চোখ মেলে দিলেন। কী আশ্চর্য দৃশ্য। ভূতরাজা তার বিশাল ভূতবাহিনীকে নিয়ে রাজার দিকেই এগিয়ে আসছে।

রাজা তড়াক করে উঠে বসলেন। ধনুকে তির সংযোজন করলেন। ভূতের দলকে লক্ষ্য করে। তাক করলেন।

ভূত রাজা বলল–দাঁড়ান, ধনুক নামান। তির ছোঁড়ার আগে আমার কথা শুনুন।

রাজা ধনুকসহ হাত নামিয়ে নিলেন।

ভূতরাজা বলল–হে রাজা, আমি হলাম প্রেতবাহন, পিশাচদের রাজা। গতজন্মে আমি ছিলাম এক বণিক। তখন নাম ছিল সুদেব। সে সময় দানধ্যান করেছি অনেক। সৎপথে থেকেছি। ধর্ম মেনে চলেছি। তবুও আমাকে মৃত্যুর পরে ভূত হতে হল।

রাজা অবাক হলেন। জানতে চাইলেন–এর কারণ কী?

প্রেতরাজা বলল–আমি ছিলাম নিঃসন্তান। এমনকি কোনো আত্মীয়স্বজন না থাকায় অন্নজল পেলাম না। তাই হলাম পিশাচ।

–আর ওরা? রাজা ভূতবাহিনীর দিকে চোখ তুলে জানতে চাইলেন।

ভূতরাজা বলল–ওদের অবস্থাও আমারই মতো। আমাদের বীভৎস চেহারা দেখে সকলে ভয় পায়। কেউ সামনে আসতে চায় না। মনের দুঃখের কথা কাউকে বলতে পারি না। আপনি দেশের পালনকর্তা। আপনাকে সব বললাম। আপনি আমাদের জন্য পিণ্ডদান করুন। বৃষ দান করে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করুন।

ঠিক এ সময় রাজার লোকজন রাজাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে হাজির হল। ভূতবাহিনীকে আর দেখা গেল না।

রাজা নিজে রাজ্যে ফিরে এসে নিয়মমতো বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করলেন ওইসব ভূত-পিশাচদের উদ্দেশ্যে।

শ্রীহরি এবার বললেন–রাজা হলেন প্রজার পাপতাপের কারণ। তিনি প্রজাকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে পারেন।

গরুড়ের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর শ্রীহরি বললেন–তোমাকে এমন এক কাহিনী শোনাব, নিষ্ঠাভরে পারলৌকিক ক্রিয়া করলে, নবরূপে পিতৃগণ পৃথিবীতে সেইস্থানে ফিরে আসে, বুঝতে পারবে।

পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণ ও স্ত্রী সীতাদেবীকে নিয়ে বনবাসে গিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে ভাই ভরতের কাছ থেকে জানতে পারলেন অযোধ্যার রাজা ও তাঁদের পিতা

দশরথ। মারা গেছেন। তিনি বউ এবং ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বনেতে অশৌচ পালন করলেন। তারপর পিতার উদ্দেশ্যে অন্নজল দান করলেন। শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে অতিথিরা খেতে বসলেন, সেখানে বহু মুনি ঋষি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু বনবাসী রামচন্দ্রের আয়োজন ছিল অত্যন্ত অল্প।

সবাইকে সাদরে আসন গ্রহণ করতে বললেন–রাম। তারপর সীতাকে ডাকলেন পরিবেশন করার জন্য। সীতা অন্নের পাত্র নিয়ে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। কয়েকজনের পাতে অন্ন দিয়ে তিনি চলে গেলেন। সীতাকে ফিরতে না দেখে রামচন্দ্র উদগ্রীব হয়ে তাকে ডাকতে লাগলেন– সীতা, সীতা কোথায় গেলে? অতিথিরা যে বসে আছেন?

কিন্তু কোনো সাড়া পেলেন না। তিনি নিজে ভেতরে এলেন। দেখলেন, সীতা উবু হয়ে বসে অঝোরে কাঁদছেন।

রামচন্দ্র অবাক হয়ে জানতে চাইলেন–সীতা, তুমি কাঁদছ কেন? কী হয়েছে?

সীতাদেবী চোখ মুছে বললেন–আমি এই বাকল পরে ওই অতিথিদের সামনে যেতে পারব না। তাছাড়া তোমার আয়োজন এত সামান্য, এই সামান্য আয়োজনে সব মুনিঋষিদের তৃপ্ত করা সম্ভব নয়। রামচন্দ্র বললেন–অতিথিরা সবাই তোমার আমার পরিচিত। ওই মুনিঋষিদের সামনে তুমি কয়েকদিন ধরেই বাকল পরে কাটিয়েছ। অথচ আজ কী এমন হল, যে তুমি ওদের সামনে যেতে চাইছ না।

সীতাদেবী বললেন–আজকের ব্যাপারটা একেবারে আলাদা। অতিথিদের শেষের দিকে বসেছেন তোমার পিতা, তার পাশে তাঁর পিতা, অবশ্য এঁরা আমার অচেনা। কিন্তু তোমার পিতাকে আমি চিনতে ভুল করিনি। তাকে আমি সোনার থালায় খেতে দিয়েছি। রূপোর গ্লাসে জল, ভালো কাপড় জামা ও অলংকার সজ্জিত হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছি। তাই আজ বাকল পরে ওনাদের সামনে দাঁড়াতে লজ্জা করছে।

এই বলে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন সীতাদেবী। অগত্যা ভাই লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রামচন্দ্র অতিথিদের ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করলেন। সকলে খেয়ে তৃপ্ত হলেন। আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন, তারা।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন–বিনতানন্দন সীতাদেবী যা দেখেছেন, তা একবর্ণও মিথ্যা নয়। মৃত্যুর পর অন্নজল পাওয়ার জন্য সকল পিতৃপুরুষ উদগ্রীব হয়ে থাকেন। বিধি মেনে শ্রদ্ধা সহকারে যে এই কাজ করে সে তাদের দেখা পায়।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ

উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

ব্রহ্ম খণ্ড

হে মুগ্ধগণ! পুরাণ প্রভৃতি স্তুতিশাস্ত্র পাঠ করার আগে সেই সর্বব্যাপক ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করো, যিনি গণেশ, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, দেবরাজ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গিরিজা দুর্গা প্রমুখদের ও দেবী এবং মুনি শ্রেষ্ঠগণের প্রণম্য। তিনি স্থূল দেহে এই বিশাল বিশ্বকে নিজের লোমকূপে ধারণ করেছেন। তিনি স্থাবর ও জঙ্গম জগতের সৃষ্টিকারী। তার বন্দনা করো, সেই নির্গুণ নিরাকার। শ্রী হরির পদবন্দনা করো। যিনি ভক্তদের ধ্যানের জন্য অনুপম, সুচারু, শ্যামসুন্দর রূপ ধারণ করেছেন।

হে মায়ামুগ্ধ জীব, তোমরা সেই অপূর্ব মনোরম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ রূপ পরমপ্রিয় দুধ পান করো, তার ধ্যান করো। নারায়ণ নরোত্তম নর, দেবী, দূর্গা, সরস্বতী ও ব্যাসদেবের চরণে প্রনাম নিবেদন করো।

ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের পাদবন্ধনা সমাপ্তে নারায়ণ, নর, নরোত্তম এবং সরস্বতী দেবী ও অন্যান্য দেবতাকে প্রণিপাত জানিয়ে জয়ধ্বনি দাও। প্রকৃতি ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং রুদ্রাদি প্রকাশ ঘটেছে, যা থেকে সেই পরম ব্রহ্মা অচ্যুত কৃষ্ণের ভজনা করো। হে শ্রোতৃবর্গ, তোমরা এই সুন্দর ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ উচ্চারণ করে আনন্দ লাভ করো।

ভারতীয় নৈমিষরণ্যে বলা হয়েছে শৌণক প্রভৃতি সহস্র ঋষিবৃন্দ নিজ নিজ নিত্য সুশাসনে ব্রতী হয়েছিলেন। এই সময় সৌতির আগমন ঘটে, ঋষিবৃন্দ তাকে আসন গ্রহন করার অনুরোধ করলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ শৌণক অতিথির উদ্দেশ্যে ভক্তি প্রদর্শন করলেন, তাঁকে প্রীত করলেন ও তার কুশল জানতে চাইলেন।

যে পুরাণ বিষয় শ্রীকৃষ্ণ সখার দ্বারা যুক্ত সেই পুরাণ বিষয়ে সৌতির কাছে সুস্থির আসনে সমাসীন সর্বতত্ত্ব বিশারদ পুরাণবেত্তা মহামুনি শৌনক জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন যে পুরাণ মঙ্গলের আবাসক্ষেত্র, যে পুরাণ সুখ মোক্ষ প্রদানকারী। যে পুরাণ পাঠে তত্ত্বজ্ঞান জন্মায়। যে পুরাণে, স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্র বর্ধনকারী। সেই পুরাণ সম্পর্কে দ্বিজ জানতে চাইলেন।

শৌণক বললেন, হে মহাভাগ, আপনার মঙ্গল কামনা করি। আপনার দর্শন লাভে আমরা কৃতার্থ। কলিযুগে আমরা সকলেই অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছি। মুক্তি লাভে ব্যক্তিদের উদ্ধারের কারণে আপনার এখানে আগমন। হে পুরাণ পরমবেত্তা, আপনি সাধু ও মহান ভাগ্যবান। সেই জ্ঞানবর্ধক পুরাণ বিষয় বর্ণনা করুন। যা শ্রবণ করে শ্রীকৃষ্ণ পদে মতি নিশ্চল থাকে।

হে সৌতে! আপনি সেই পরমব্রহ্মের গুণকীর্তন করুন যিনি জীবগুণের চিত্তে শ্বাশত সুখ ও আনন্দ দান করেন। সেই পরমাত্মার স্বরূপ আকার নিরাকার তাঁর ধ্যান কী ভাবে করা যাবে। তার ভাবনা কী ভাবে করতে হবে, বৈষ্ণবরা কী ভাবে তার জপ করেন, সাধু যোগীপুরুষগণ কী ভাবে ধ্যান করেন, সব কিছু আমাদের সামনে ব্যক্ত করুন।

যে পুরাণে প্রকৃতির আকার প্রকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। যে পুরাণে গোলকের বৈকুণ্ঠের ও শিবলোকের বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে স্বর্গের বর্ণময় রূপ পরিস্ফুটিত হয়েছে। যেখানে প্রকৃত ও প্রহতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে। সেইসব শ্রবণ করতে আমরা আগ্রহী।

যে পুরাণ প্রকৃতির অংশ, যা সমগ্র চরিত্র, ধ্যান ও পুজো পদ্ধতি, শুভ স্তোত্র ইত্যাদি বর্ণনা করেছে। সে পুরাণ সম্পর্কে আমাদের অবগত করুন। দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, সাবিত্রী ও অমৃতের মতো অত্যন্ত অপূর্ব রাধিকার কাহিনী। মানুষ কর্মের বিপাকে ও নরকের বর্ণনা যেখানে বলা হয়েছে। কর্মের মন্তন এবং পাপ থেকে মুক্তি লাভের উপায় বলা হয়েছে। বর্ণানুসারে জীব যে যোনিতে জন্মলাভ করে কর্ম থেকে যেসব রোগের উৎপত্তি হয়, যে কর্ম করলে মানুষের মুক্তি লাভ হয় সব কিছু আপনি আমাকে শ্রবণ করান।

হে মুনিবর, যেখানে মনসা, তুলসী, কালী, গঙ্গা, পৃথিবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, শালগ্রাম শিলা ও দানের নিরূপণ এবং ধর্মাধর্মের নিরূপণ যেখানে করা হয়েছে, সেই পুরাণের বিষয়ে বলুন।

গণেশের জন্মবৃত্তান্ত, তার চরিত্র ও কাজের কথা, অত্যন্ত ফলদায়ী সূরকবচ মন্ত্রের কথা যেখানে বলা হয়েছে। এমন সব অপূর্ব কাহিনী যা আগে কেউ ব্যক্ত করেননি। একমাত্র আপনিই আমাদের এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন। পরমাত্মা কৃষ্ণের জন্ম পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের কোন পুণ্যবানের গৃহে হয়েছিল। কে বা সেই পরম পুণ্যবতী গর্ভধারিনী জননী? তিনি কেন জন্ম নিয়েছিলেন? কেনই-বা ফিরে এলেন? কে তাঁর কাছে এই পৃথিবীর ভাব অবতরণ প্রার্থনা করেছিল? গোলকধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য কোন সেতু নির্মিত হয়েছিল? সেই দুলর্ভ পুরাণ কীর্তন করুন যা মুনিদের দধিজ্ঞেয় যা মনকে পবিত্র রাখার কারণ স্বরূপ।

সৌত বললেন– সিদ্ধক্ষেত্র থেকে আমার আগমন। নারায়ণের আশ্রম উদ্দেশ্যে গমন, আপনার পদ্মরূপ চরণযুগলের দর্শন লাভ করে আমরা মঙ্গল লাভ করলাম, হে ব্রাহ্মণবৃন্দ আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। ভারতের পুণ্যদানের স্থান ধর্মমিষারণ্য দর্শন হেতু আগমন। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরু প্রণম্য। এ নীতি লঙঘনকারী কালসূত্র নরকে পচে মরে। ভগবান শ্রী

কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের বেশে ভারতের পুণ্য ভূমিতে সর্বদা চলমান। পুণ্যবান ও সুকৃতিবান বিনীত ভাবে হরিরূপী ব্রাহ্মণের পাদবন্দন করে।

হে ভগবান, আপনি কোন অভিপ্রায় আমার কাছে জিজ্ঞাসা রেখেছেন তা অনুমেয়। ব্রহ্মবৈবর্ত হল সর্বশ্রেষ্ঠ সারবান পুরাণ। অন্যসব পুরাণ, উপপুরাণ ও বেদের অপূর্ণতা দরকারী হরিভক্তি প্রদানকারী, তত্ত্বজ্ঞান বর্ধক। এই পুরাণ পাঠের ফলে গমেচ্ছুক কাম প্রবৃত্তি ও মোক্ষকামী মোক্ষলাভ করে। এই পুরাণ কল্পবৃক্ষের ন্যায় বৈষ্ণবদিগকে ভক্তি প্রদান করে। পরব্রহ্ম সমস্ত কিছুর মূলস্বরূপ ব্রহ্মখণ্ডে তা নিরূপিত হয়েছে।

হে শৌনক মহামুনি, সন্তযোগী পুরুষের বৈষ্ণবের কোনো পার্থক্য নেই। সাধুসন্তদের সঙ্গে থাকলে তিনি হন সপ্তপুরুষ আর যোগী পুরুষের সঙ্গলাভে হন যোগী পুরুষ। ভক্ত সঙ্গে বৈষ্ণব। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে তারা সদযোগী পুরুষে পরিণত হন। প্রকৃতি খণ্ডে দেবতাদের সমস্ত জীবের সৃষ্টিকারী এবং দেবীদের শুভচরিত নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পুরাণে জীবের কর্মের বিপাক ও শালগ্রাম শিলার নিরূপণ কবচ ও স্তোত্রমন্ত্র সবই নিরূপিত হয়েছে। প্রকৃতির অংশ কলা এবং লক্ষ্মণ সম্পর্ক নির্ণত হয়েছে। পাপ এবং পুণ্যের বিচারে স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা করা হয়েছে। নানারকম রোগব্যাধির যুক্তির কথা এই পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রকৃতির পরে আছে গণেশ খণ্ড। যেখানে গণেশের জন্ম ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে অত্যন্ত গূঢ় কবচ স্তোত্র মন্ত্র এবং তন্ত্রের বিবৃত হয়েছে। গণেশ এবং ভৃগুর কথোপকথনের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত। তার কাজকর্ম সমস্ত বর্ণিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে। এই খণ্ড সাধুজনদের সেতু বিধান নিরূপিত করেছে।

হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ কীর্তন করছি, যেখানে সমস্ত ধর্মের কথা ব্যক্ত হয়েছে। এ পুরাণ পাঠে সকলের অভীষ্ট পূরণ হয়। আশা আকাঙ্খ পূরণকারী, বেদ স্বরূপ এই পুরাণ সমস্ত পুরাণের সার। এখানে ব্রহ্মর পূর্ণতা সম্বন্ধে কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। তাই এই পুরাণকে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রথমে এই পুরাণ সূত্র ব্রহ্মাকে দান করা হয়েছিল। ব্রহ্মা আবার তা শ্রীকৃষ্ণকে দিয়েছিলেন।

তারপর এ পুরাণ চলে যায় নারায়ণের হাতে। এটি গ্রহণ করে দেবর্ষি নারদ তা মহানন্দে ব্যাসদেবকে দান করেন। ব্যাসদেব তা মহান রূপে প্রস্তুত করেন। আমি তার কাছ থেকে এই সুমনোহর পুরাণ লাভ করি। ব্যাসদেব বিরচিত আঠারো হাজার শ্লোক সমৃদ্ধ এই পুরাণ শ্রবণ করলে যে ফল লাভ করা যায় যে, একটা অধ্যায় পাঠে তার সমান ফল পাওয়া যায়।

মুনিশ্রেষ্ঠ শৌণকের বিনীত অনুরোধে সৌতি পরব্রহ্ম খণ্ড ব্যাখ্যা করলেন।

তিনি বললেন–মহাতেজস্বী গুরুদেব ব্যাসের পাদবন্দনা করে হরি প্রভৃতি দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের প্রণাম নিবেদন করি। হে ব্রাহ্মণ, শ্রী ব্যাসদেবের মুখ নিঃসৃত ব্রহ্মখণ্ড শ্রবণ করুন। প্রলয়ের পর এক উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জের প্রকাশ ঘটে। স্বেচ্ছাধীন ভগবানের ওই জ্যোতি ছিল অত্যন্ত মহান। তার অন্তরালে ছিল এই ত্রিভুবনের জ্যোতি। সবার ওপরে ছিল গোলকধাম। যা তিন কোটি যোজন জুড়ে বিস্তৃত। এ ধাম বহু মূল্য রত্ন সমৃদ্ধ ও তেজস্বরূপ। যেখানে বৈষ্ণবদের গমন ঘটে।

কিন্তু যোগীরা তা স্বপ্নেও দেখতে পারেন না। ভগবান সেই শ্রেষ্ঠ স্থানে অবস্থান করেছেন, এখানে রোগ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর প্রবেশ নিষেধ। তার নীচে দক্ষিণে আছে বৈকুণ্ঠলোক এবং উত্তরে শিবলোক অবস্থিত–এই দুটি লোক পঞ্চাশ কোটি যোজন জুড়ে বিস্তৃত। গোলকধামের মতো এই দুটি ধামও অমূল্য রত্নরাজিতে সমৃদ্ধ। প্রলয়ের পরে সৃষ্ট বৈকুণ্ঠধামে লক্ষ্মী ও নারায়ণের সহচর, সহচারীগণ চতুঃহস্ত ও পদ বিশিষ্ট। জরা, মৃত্যু এঁদের গ্রাস করতে পারে না।

প্রলয়কালে শিবলোক শূন্য হলেও সৃষ্টির সময় তা শিব ও তাঁর অনুচরবৃন্দের দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করে। গোলকধামের মধ্যে এক আনন্দপূর্ণ আকার শূন্য ও শ্রেষ্ঠতর জ্যোতি আছে। ভেতরের জ্যোতির গাত্রবর্ণ নতুন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণের। চোখ দুটি যেন রক্ত পদ্ম। শরৎকালের পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্রের শোভার ন্যায় অতি মনোহর শোভামণ্ডিত তার মুখ। তাঁর লাবণ্য এককোটি কামদেবের লাবণ্য স্বরূপ। তার হাতে বাঁশি, সদা হাস্যময় দুটি ওষ্ঠ, পরণে পীতবস্ত্র। তিনি মহামূল্যবান অলংকাররাজিতে সুশোভিত।

তিনি ভক্তদের সর্বদা মঙ্গল করেন। কস্তুরী চন্দনে তার দেহে সুবাসিত। তার মস্তকে মহামূল্যবান রত্নখচিত কিরীট। তিনি রত্ন সিংহাসনে আসীন। বুনো ফল তার ভূষণ। তিনি সনাতন পরম ভগবান। তিনিই পরাৎপর। তিনি রাসমণ্ডল রচনাকার। তিনিই সকলের মঙ্গলদায়ক। তিনি অব্যয়। তিনি সিদ্ধিদাতা। তিনি নির্গুণ। তিনি আদি পুরুষ। তিনি সত্যাসত্য স্বরূপ। তিনি অদ্বিতীয় ও অনন্য। বৈষ্ণবরা এই শান্ত পরমপ্রিয় রূপের আরাধনা করে থাকেন। দিক আর আকাশস্থ শূন্য বিশ্বকে তিনিই প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই পরমরূপধারী শ্রীভগবানের চরণে শতকোটি প্রণাম।

সৌত বললেন– হে ব্রাহ্মণ, বায়ু শূন্য, প্রাণী শূন্য, শস্যবিহীন, পাহাড় পর্বত ও সাগর শূন্য গোলককে প্রত্যক্ষ করে ভগবান নিজের ইচ্ছাতে এই সৃষ্টির সূচনা করেন।

প্রথমে তিনি তার ডানদিকে তিন গুণের আর্বিভাব ঘটালেন-সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। জগতের কারণ স্বরূপ এই ত্রিগুণ মহান, অহংকার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ। পরমপুরুষের দাক্ষিণ্যে আবির্ভূত হন স্বয়ং নারায়ণ, তিনি পীত বস্ত্রধারী, শ্যামবর্ণ, চারহস্ত বিশিষ্ট। তিনি চারহাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, ও পদ্ম ধারণ করে আছেন। তার গলায় কৌস্তভমণি শোভা পায়। তাঁর ধনু শৃঙ্গ নির্মিত চাঁদের ন্যায় প্রভাযুক্তা। তাঁর সুন্দর মুখমন্ডল। শ্রীবৎস চিহ্ন তাঁর বুকে স্থান পেয়েছে। তিনি শ্রীদেবীর দ্বারা বিভাবিত।

নারায়ণ সেই আদি পুরুষের গুণকীর্তন করলেন এইভাবে–হে প্রভু, তুমি বরের কারণ। তিনি কর্মের কর্মস্বরূপ। তুমি তপস্বীদের তপস্যায় প্রীত হয়ে বর দান করো। সেই আত্মারাম, মনোহর, নবঘন শ্যামকে বন্দনা করি। তুমি সকলের ঈশ্বর, সর্বোত্তম, সর্বকারণ স্বরূপ ফল দান করো। তুমি বেদজ্ঞ। তোমার চরণে প্রণিপাত জানাই, ভক্তিপূর্ণ স্তব শ্রবণ করে শ্রী কৃষ্ণ তার পাশের আসনে উপবিষ্ট হতে বললেন। ত্রি সন্ধ্যায় এই নারায়ণ স্তোত্র শ্রবণ বা পাঠ করলে পাপনাশ হয়। সন্তান লাভেচ্ছু সন্তান লাভ করে। রাজা রাজ্য লাভ করেন। ধনহীন ধন পায়। কারাগারে বসে এই স্তোত্র পাঠের গুণে বিপদমুক্ত হওয়া যায়। প্রাণ দিয়ে রোগী এই স্তোত্র জপ করার ফলে রোগমুক্ত হয়।

সৌতি বলতে থাকলেন–সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামদিকে দিগম্বর মহাদেবের আবির্ভাব ঘটল। বিশুদ্ধ স্পটিকমণির মতো শুভ্র মাথায় তপ্ত সোনার মতো উজ্জ্বল জটাভার। তিনটি চোখ সমন্বিত মুখমণ্ডলে প্রসন্নতা বিরাজ করছে। চন্দ্র তার কপালের শোভা বৃদ্ধি করেছে। তিনি ত্রিশূলধারী। সেই মহাজ্ঞানী জ্ঞানানন্দময় পরমেশ্বরের এক হাতে পট্টিশ অন্য হাতে জপমালা। তিনি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। তিনিও ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন। শ্রীকৃষ্ণের সামনে, তিনি করজোড় দণ্ডায়মান। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে তার দেহ পুলকিত।

তিনি অশ্রুসজল নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করলেন হে ভগবান, তুমি জয়দাতা। তুমি অজেয়। তোমাকে আমি বন্দনা করি। তুমি বিশ্বপতি। বিশ্বের আধার, বিশ্বের কারণের কারণ। বিশ্ব তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়। আবার তুমিই তার লয় ঘটাও। তুমি তেজস্বী শ্রেষ্ঠ, তোমাকে প্রণিপাত।

শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবের মুখনিঃসৃত স্তব শ্রবণ করে পুলক বোধ করলেন। এক রত্নময় সিংহাসনে তাঁকে বসতে বললেন। মহাদেব বর্ণিত এই কৃষ্ণস্তোত্র সকল কাজের সিদ্ধিদাত্রী। যে

সংযতচিত্তে নিত্য এই স্তোত্র স্মরণ করে, সে জয়ী হয় সকল কাজে। বন্ধুবান্ধব ধনসম্পদের অধিকারী হয়। শত্রু নাশ হয়। এ হল পাপ ও দুঃখ হরা মন্ত্র।

সৌত বললেন– এবার আর্বিভূত হলেন মহাতপস্বী বৃদ্ধা ব্রহ্মা। কৃষ্ণের নাভিপদ্ম থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন, চতুর্ভুজ শ্বেতবস্ত্র পরিহিত, কমণ্ডলধারী। শুভ্র কেশ ও শুভ্র দন্ত। তিনি যোগী শ্রেষ্ঠ, তিনি সকলের গুরু ও জনক। শান্ত, সুন্দর, সমাহিত এ মূর্তি সরস্বতীর প্রিয়ভক্ত। তিনি সমস্ত কাজের স্রষ্টা ও বিধাতা। চারবেদের বিধানকর্তা ও জ্ঞাতা।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে গদগদ হয়ে শুরু করলেন স্তুতি। ব্রহ্মা বললেন, আমি সেই গোবিন্দ কৃষ্ণের চরণ বন্দনা করছি। যিনি গোপবেশধারী গুণাতীত, যিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি অব্যয়, অক্ষয়। যিনিই বর্ষার জল ভরা মেঘের ন্যায় পীত বর্ণধারী। যিনি কিশোর বয়সে শান্ত গোপীদের প্রিয়। তুমি কামদেবের থেকেও সুন্দর। হে রাজেশ্বর রাসনিবাসী তোমাকে প্রণাম জানাই।

স্তব শেষ করে ব্রহ্মা নারায়ণ ও মহাদেবকে সম্ভাষণ জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ তাকে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট হতে আজ্ঞা করলেন। ব্রহ্মার বর্ণিত এই শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র সকল পাপের নাশ করে, দুঃস্বপ্ন দূর করে। নিত্য ভোরে এই স্তুতি যে পাঠ করে ধনেজনে তার সংসার ভরে ওঠে। সে দীর্ঘায়ু হয়।

এইভাবে শেষ হল ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র পাঠ।

সৌতি বললেন– এবার সেই পরমাত্মার বক্ষস্থল থেকে ধর্ম উঠে এলেন। তিনি শুক্লবর্ণ জটাধারী ওষ্ঠপুটে স্মিত হাসির রেখা। তিনি দয়াবলে দ্বেষশূন্য। সর্বত্র তিনি সমান দৃষ্টি প্রদর্শন করেন। সমস্ত কর্মের স্বরূপ যিনি সেই ধর্ম শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে বললেন– আমি সেই পরমাত্মার বন্দনা করি, যিনি কৃষ্ণ। বিষ্ণু বাসুদেব পরমাত্মা, ঈশ্বর গোবিন্দ, পরমানন্দ, এক ও অদ্বিতীয়। অক্ষয় ও অদ্ভুত। গোপেশ্বর গোপীশ, গোপ, গোরক্ষক, বিভু, গাভীদের পতি, গোঠ বিহারী, গোবৎস, পুচ্ছধারী, গো, গোত্র ও গোপীদের মধ্যে অবস্থানকারী প্রধান পুরুষোত্তম, নবঘনশ্যাম, রাসবিহারী, মনোহরণকারী।

শ্রীকৃষ্ণের স্তব শেষ করে ধর্ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সম্ভাষণ করে শ্রীকৃষ্ণর অনুমতি ক্রমে এক রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করলেন।

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ধর্ম যে চব্বিশটি নাম উল্লেখ করেছেন, প্রতি ভোরে তা উচ্চারণ করলে সর্বত্র জয়লাভ করা যায়। মৃত্যুর সময়ে হরির নাম উচ্চারণ করলে শ্রীহরিপদে আশ্রয় পাওয়া যায়। সে নিশ্চিত ভাবেই হরির দাসত্ব লাভ করে, ধর্ম তাকে সর্বদা আশ্রয় দেয়, অধর্ম তাকে ত্যাগ করে, চতুর্বেদের ফল সে লাভ করে। তার সমস্ত পাপ নাশ হয়। তার কোনো ভয় থাকে না। সে সকল দুঃখকে জয় করে।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র শেষ হল। সুতপুত্র বলতে থাকেন–ধর্মের বাঁদিক থেকে উঠে এলেন পদ্মালয়া লক্ষ্মীর ন্যায় এক কন্যা মূর্তি। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মুখ থেকে এক দেবীর সৃষ্টি করলেন। তিনি হলেন সরস্বতী। বাণী ও পুস্তক ধারিণী। শুভ্র গাত্রবর্ণা দেবী। চন্দ্রের ন্যায় সুষমামণ্ডিত।

তার আঁখিপল্লব যেন দুটি পদ্ম। তিনি আজ্ঞন রঙা পট্ট বস্ত্রে সুসজ্জিতা। বিভিন্ন অলংকার ও রত্নরাজিতে তিনি সুশোভিতা। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী নারী। শ্রুতি ও শাস্ত্র সকলের শ্রেষ্ঠা। তিনি জ্ঞানীদের কাছে উত্তম মাতা হিসেবে বিরাজিতা, তিনি জগধিষ্ঠাত্রী। তিনি শুদ্ধ সত্ত্বময়ী, তিনি শান্তরূপা। কবিগণ তাকে ইষ্টদেবী রূপে বন্দনা করে থাকেন।

বীণাধারিণী সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে তিনি সুখ লাভ করেন। তিনি বীণা বাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র গীত করেন। নৃত্য প্রদর্শন করেন, তার নাচ গানের মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে শ্রীহরির ক্রিয়াকলাপের প্রকাশ ঘটে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করলেন এইভাবে–আপন রাসমণ্ডলে অবস্থানকারী রাসোল্লিত। রত্নসিংহাসন আরূঢ়। রত্নভূষণে শোভিত। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, আপনি রাসেশ্বরী শ্রীরাধার সঙ্গী, আপনি রাসবিহারী, আপনার চরণে প্রণিপাত জানাই। আপনি প্রতিটি রাসে বিহারকারী, রাসোৎসুক গোপীগণের পরম কান্ত প্রিয়তম, আপনি সকলের মনোহরণকারী, আপনি শ্রীকৃষ্ণ, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

দেবী সরস্বতী তার কৃষ্ণস্তুতি শেষ করে হাসিমুখে সকলের সঙ্গে আলাপন সারলেন। তারপর শ্রেষ্ঠ রত্ন সিংহাসনে বসলেন। সরস্বতীর মুখ নিঃসৃত এই স্তোত্র যে প্রত্যহ ভোরে পাঠ করে সে হয় ধনবান। সে বিদ্যা ও পুত্র লাভ করে। তার দুর্বুদ্ধি নাশ হয়। সুবুদ্ধির উদয় হয়।

এইভাবে দেবী সরস্বতী তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র সমাপ্তি করলেন।

সৌত বললেন– এবার শ্রীকৃষ্ণের মন থেকে উদিত হলেন দেবী মহালক্ষ্মী। তিনি গৌরবর্ণা, পীতবস্ত্র পরিহিতা, ঠোঁটে স্মিত হাসি। অল্পবয়সী, বিভিন্ন অলংকার ও রত্নরাজিতে বিভূষিতা।

তিনি হলেন সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী এবং রাজার কাছে রাজলক্ষ্মী হিসেবে এই দেবী পূজিতা।

মহালক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের সামনে হাতজোড় করে ভক্তি অবনত চিত্তে দাঁড়ালেন। তিনি পরমাত্মাকে প্রণাম জানালেন। বললেন–যিনি সত্য স্বরূপ, সত্যেশ্বর, যিনি সত্যের মূল, সেই সনাতন পরম পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। শ্রীহরিকে প্রণিপাত জানিয়ে তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা দেবী স্বর্গলক্ষ্মী উপস্থিত সকল দেবদেবীকে অভিবাদন জানিয়ে রত্ন সিংহাসনে আরোহন করলেন।

এবার জন্ম নিলেন প্রকৃতি দুর্গাদেবী, শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি থেকে যার সৃষ্টি। এই দেবী শতভূজা। ত্রিশূল, শক্তি, শাঙ্গধনু, খঙ্গা, বান, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অক্ষমালা, কমণ্ডুল, বজ্র, অঙ্কুশ, পাশ, ভূশণ্ডী, নারয়াণস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, রৌদ্রস্তু, পাশুপতাস্ত্র, পর্যন্যাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, গান্ধাস্ত্র ও বারণাস্ত্রে সুসজ্জিত। তিনি দুর্গতি নাশিনী, তিনি সমস্ত শক্তির অধীশ্বর, তিনি ভয়ংকরী, তিনি পরামাত্মার শক্তি স্বরূপা ও জগন্মাতা।

প্রকৃতি দুর্গাদেবী শ্রীকৃষ্ণের সামনে উপনীত হয়ে তার দর্শনে পুলক অনুভব করলেন। স্মিত হাস্যে তিনি পরমাত্মার স্তব করলেন এইভাবে-হে পরমানন্দ স্বরূপ, আপনাকে বন্দনা করি। আপনি জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা, সংহারকারী। আমি আপনার সৃষ্টি তাই আমি সর্বরূপিনী প্রকৃতি। আপনি পলকের মধ্যে ব্রহ্মার পতন ঘটাতে পারেন। আপনার ভ্রুকুটি ইঙ্গিতে কোটি কোটি বিষ্ণুর জন্ম হয়। আপনি লীলাচ্ছলে কত দেবীর আর্বিভাব ঘটান। আপনি আমার প্রণম্য। আপনি অসংখ্য বিশ্বের আশ্রয়স্থল, আমি সেই ঈশ্বরকে পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সমস্ত দেব, চারবেদ, এমন কি আমিও আপনার স্তব করতে অপরাগ। আমি সেই প্রকৃতির অতীত পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

দেবী দুর্গা কৃষ্ণস্তুতি বন্দনা শেষ করে তাঁকে প্রনাম জানালেন। তিনি রত্নখচিত এক সিংহাসনে বসলেন। দুর্গার পরমাত্মা কৃষ্ণের এই স্তোত্র যে পুজোর সময় পাঠ করে সে হয় সর্বজয়ী। সে সুখ লাভ করে, তার ঘরে দেবী দুর্গা অধিষ্ঠিত থাকেন, মৃত্যুকালে ওই ব্যক্তি শ্রীহরি লোকে গমন করে।

সৌতি বললেন–এরপর দেবী সাবিত্রী আবির্ভূত হলেন। পরমাত্মার রসনা থেকে তার উৎপত্তি স্ফটিক মণির মতো উজ্জ্বল তাঁর মূর্তি। তিনি শ্বেত বসনা, মূল্যবন মণিমাণিক্যখচিত আভরণে সজ্জিতা। তিনি জপমালা হস্তে ধারণ করেছেন। সাধ্বী সাবিত্রী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে প্রণিপাত

করলেন। শ্রীকৃষ্ণের সামনে নত মস্তকে তার গুণকীর্তন করলেন-হে নির্বিকার নিরঞ্জন, সমস্ত কিছুর মূল সনাতন ব্রহ্মজ্যোতি আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

বেদ জননী মুচকি হেসে শ্রীকৃষ্ণকে আবার প্রণাম জানিয়ে রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন। এবার শ্রীকৃষ্ণ তার মন থেকে এক দিব্য পুরুষের আবির্ভাব ঘটালেন। তপ্ত সোনার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট সেই পুরুষ সমস্ত কামী ব্যক্তির মনকে পাঁচটি বান দিয়ে মথিত করেন, তাই তিনি মন্মথ।

মন্মথের বাঁদিকে এসে দাঁড়ালেন কামদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ কামিনী রতি। অত্যন্ত সুন্দরী সেই নারীর ওষ্ঠে স্মিত হাসি। তিনি সকলের অনুরাগ প্রিয়।

ধনুর্ধারী পঞ্চবাণ কামদেব ও কামিনী রতি একত্রে শ্রীহরির পাদবন্দনা করলেন। তারপর তারা একটি সুদৃশ্য আসনে বসলেন। মারণ, স্তম্ভন, শোষণ, জৃম্ভন, শোষণ ও উন্মাদন, এই পাঁচটি বাণ কামদেব ধারণ করেন। তিনি বাণ নিক্ষেপ করলেন। ভগবানের ইচ্ছায় সকলে কামপীড়িত হলেন। রতি অনুরাগী হয়ে ব্রহ্মার বীর্যপাত হল। মহাযোগী ব্রহ্মা লজ্জা পেলেন। তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে তা আড়াল করলেন। কিন্তু সেই বীর্য থেকে সৃষ্টি হল আগুন। আগুনের লেলিহান শিখা কাপড় পুড়িয়ে ঊর্ধ্বমুখী হল। একটি তাল গাছের সমান উঁচু হল সেই শিখা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন অগ্নির বীভৎস ধ্বংসকারী চেহারা দেখে মুখ থেকে বিন্দুর ন্যায় তেজের প্রকাশ ঘটালেন। সেই তেজ নিশ্বাসের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল জল হয়ে। সেই জলধারায় আগুন নিভে গেল, বিশ্ব প্লাবিত হল। সেই থেকে অগ্নি শিখা সর্বদা জলকণার কাছে মাথা নত করে আছে।

এই জল থেকে এক পুরুষের আবির্ভাব হল। তিনি জলের অধিদেবতা। তিনি হলেন বরুণদেব। তিনি সমস্ত জলজদের অধিপতি।

অগ্নির বাঁদিক থেকে স্বাহা নাম্নী এক সুন্দরী কন্যা উঠে এলেন। মনীষীরা তাকে বহ্নির স্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বরুণের পরম প্রিয়া। তিনি বরুণানী নামে খ্যাত। বিষ্ণুর নিশ্বাস বায়ু থেকে যে পুরুষের আর্বিভাব তিনি হলেন সকলের প্রাণস্বরূপ শ্রীমান পবনদেব। তিনি শ্রীকৃষ্ণের দেহ থেকে উৎপন্ন নিঃশ্বাস থেকে জাত।

বায়ুর বামদিকে থেকে উঠে এলেন এক কন্যা। তাঁকে সকলে বায়ুদেবের পত্নী হিসাবেই জানেন। তিনি বায়ুবী নামে বিখ্যাত।

কামদেবের নিক্ষিপ্ত বানে শ্রীকৃষ্ণের বীর্যপাত হলে তিনি লজ্জা ও সঙ্কোচে তা ছুঁড়ে জলে ফেললেন। হাজার বছর সেই বীর্য জলে ছিল। তা পরিণত হয় ডিমে, তা থেকে এক মহাপুরুষের সৃষ্টি হয়। তিনি সমগ্র বিশ্বের আধার। তার এক একটি লোমকূপে এক একটি বিশ্ব অবস্থান করছে। তিনি পরমাত্মা শ্রীহরির ষোলো ভাগের এক ভাগ। তবুও তাকে মনীষীরা মহাবিষ্ণু নামে জানেন।

মহাপ্রলয় কালে তিনি পদ্মপাতার ন্যায় মহাসাগরে গাত্র ভাসমান রেখেছিলেন। তাঁর কানের ময়লা দুই দৈত্যের জন্ম দেয়, তারা জল থেকে উঠে আসে। ব্রহ্মাকে বধ করার জন্য তেড়ে এলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাদের উরুতে ধারণ করেন এবং হত্যা করেন। তাদের দুজনের মেদ থেকে জন্ম হল এই বসুন্ধরার। যিনি সমগ্র পৃথিবীর দেবী।

মহামুনি শৌনক সৌতির কাছে জানতে চাইলেন গো, গোপ ও গোপীরা কি সত্য না কল্পিত। এর উত্তরে সৌতি বলেছিলেন–সৃষ্টি হবার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত এরা কল্পিত ছিলেন বটে। কিন্তু প্রলয় কাল পর্যন্ত এঁরা বর্তমান থাকেন। সৃষ্টি রহস্য আপনাকে ব্যাখ্যা করছি, শুনুন।

হে দ্বিজ, সর্বপ্রথম সৃষ্টিকালে নারায়ণ ও মহেশ্বর কল্পিত ছিলেন। প্রতিপ্রলয়ের সময় তাদের প্রকাশ ঘটে। প্রকৃতি দেবীর ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। ব্রহ্মকল্পের সূর্যি বৃত্তান্তের মধ্যে বারাহকল্প ও পদ্মকল্পের কথা বলছি। কল্প কী, সেটা আগে জেনে নিন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি–এই চারটি প্রকার যুগের, তিনশো ষাট যুগ হলে হয় এক দিব্য যুগ। দিব্য একযুগও মিলে মন্বন্তর হয়। চৌদ্দ মন্বন্তরকে বলে ব্রহ্মার একদিন।

তিনশো ষাট দিন অতিক্রান্ত হলে তা হয় ব্রহ্মার একবর্ষ। একশো আট বছর ব্রহ্মার আয়ু এবং পরমাত্মা শ্রীহরির একনিমেষ কাল হল ব্রহ্মার পরিপূর্ণ আয়ু, ব্রহ্মার এই আয়ুস্কালকেই কালকল্প বলেছেন। ব্রাহ্ম, বারাহ, এবং পাদ্ম- কল্পের তিনটি প্রকার। সন্বত্ত ইত্যাদি নামে অনেক ছোটো ছোটো কল্পের জন্ম হয়েছে। ব্রহ্মার সাতদিন পর্যন্ত মহামুনি মার্কেণ্ডেয়র আয়ুস্কাল।

ব্রহ্মকল্পে সৃষ্টিকর্তা প্রভুর আদেশে মধু ও কৈটভের মেদে মেদিনীর জন্ম হলে তাঁর কাজ শুরু করেন। প্রলয় সাগরে হারিয়ে ও ডুবে যাওয়া মেদিনীকে বরাহরূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধার করেন,

বরাহকল্পে তাই বর্ণিত হয়েছে। পাদ্মকল্পে সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থান করে গোলক। বৈকুণ্ঠলোক, শিবলোক ব্রহ্মলোক ত্রিলো◌েকাদি সৃষ্টি করতে থাকেন। এই কাল সংখ্যা অনুসারে সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

শৌণক প্রশ্ন করলেন, সৃষ্টি করার পর গোলকধামে কী হল তা আমরা শুনতে আগ্রহী। অনুগ্রহ করে আপনি তা বলে আমাদের জ্ঞান পিপাসা মেটান।

সৌতি বললেন– ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলকে নিয়ে রাসমণ্ডলে অবস্থান করতে লাগলেন। চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, ও কুমকুম দিয়ে রাসমণ্ডল সুবাসিত করা হয়েছে। খই, দই, সাদা ধান, দুর্বা ও পাতা যুক্ত কলাগাছের স্তম্ভ, যা পাটের সুতো দিয়ে বাধা হয়েছে। উত্তম রত্নসার দিয়ে মণ্ডলগুলি নির্মিত। তিন কোটি রত্ন প্রদীপ জ্বলছে।

জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ সকলকে নিয়ে রাসমণ্ডলে উপস্থিত হলে সকলে বিস্মিত হলেন। এই সময় শ্রীকৃষ্ণ এক সুন্দরী যুবতীর সৃষ্টি করেন। তিনি কৃষ্ণের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার চরণে পুস্পার্ঘ্য নিবেদন করলেন। তিনি হলেন কৃষ্ণ প্রাণাধিকা রাধা। রাধা শ্রীকৃষ্ণেরই এক অংশ।

তিনি ষোড়শ বর্ষের এক সদ্য যৌবনা দেবী। অনিন্দ সুন্দর মুখোনি, ঠোঁটে মুচকি হাসি। তার রাঙা ওষ্ঠযুগল দেখে কমলও বুঝি লজ্জা পাবে। তিনি সুন্দরী ও মনোহারিণী, তার চোখ দুটি শরকালের প্রস্ফুটিত পদ্ম। তিনি স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা। কপালে চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও সিন্দুরের ফোঁটা তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

সুবিন্যস্ত খোঁপায় মালতী ফুলের মালা, তাঁর চরণযুগল যেন স্থল পদ্ম। শ্রীরাধা স্মিত হাসলেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর সুন্দর রত্নসিংহাসনে বসলেন। এই সময় শ্রীরাধার লোমকূপ থেকে ঠিক তার মতো রূপ, বেশভূষা সম্পন্ন প্রায় তিরিশ কোটি গোপীকাদের জন্ম হয়। এরপর এল নানা রঙের গরুড়। যারা শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ থেকেই সৃষ্ট, এরাও স্থির যৌবনপ্রাপ্ত। সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হল অসংখ্য বলদ, নানা ধরনের গোবৎস ও কামধেনুর। এরা তমসাবর্ণ যুক্ত ও উত্তম লক্ষণযুক্ত।

এইসব বলদের মধ্যে একটি বলদ শ্রীকৃষ্ণ শিবকে দান করলেন। এই বলদ কোটি সিংহানের সমান শক্তি ধারণ করে। শিব তা বাহন হিসেবে গ্রহণ করলেন। সুন্দর সুন্দর সবৎস রাজহংসী ও রাজহংসের জন্ম দিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নখ থেকে। মহাযোগী ব্রহ্মা একটি প্রভূত শক্তিশালী রাজহংসকে। বাহন হিসেবে লাভ করলেন।

পরমাত্মা কৃষ্ণ তাঁর বাঁ কান থেকে অশ্বদের জন্ম দিলেন। তাদের থেকে খুব সাদা বর্ণের একটি অশ্ব ধর্মকে দিলেন, যা বাহন হিসেবে ধর্ম গ্রহণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ কান থেকে বেরিয়ে এল অসংখ্য শক্তিশালী সিংহের দল। তাদের মধ্যে থেকে মহাপরাক্রমশালী এক সিংহ পরম সমাদরে প্রকৃতি দেবীর হাতে তুলে দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে পাঁচটি মনোহর রথ সৃষ্টি করলেন। এগুলি ছিল বিশুদ্ধ রত্নে তৈরি। রথগুলিতে ছিল এক লক্ষ চাকা ও এক লক্ষ খেলাঘর, রথগুলি বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারত। প্রত্যেকটি রথ বিভিন্ন ভোগ্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। এই শ্রেষ্ঠ রথ পাঁচটির তিনটি নিজে রেখে বাকি দুটির একটি নারায়ণ ও একটি শ্রীরাধিকে দান করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুহ্যদেশ থেকে পিঙ্গলবর্ণের পুরুষের সৃষ্টি করলেন। এঁরা গুহ্যক নামে অভিহিত। গুহ্যকদের প্রধান হলেন কুবের। তিনি ধনেশ্বর নামে খ্যাত। কুবেরের পত্নী স্বামীর বাঁদিক থেকে উঠে এলেন, এই সময় কুবেরের গুহ্য দেশ থেকে বেতাল, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির জন্ম হল।

শ্রীকৃষ্ণ তার মুখ থেকে সহচরদের জন্ম দিলেন। যাদের পরণে পীতবস্ত্র, তাদের চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, কিরীট ও কুলাধারী। বহু অলংকারে তারা সুসজ্জিত। এইসব চার হাতবিশিষ্ট সহচরদের কৃষ্ণ নারয়ণের হাতে তুলে দিলেন। কুবের পেলেন গুহ্যকদের দায়িত্ব এবং ভূত প্রেত অর্পিত হল মহাদেবের হাতে। শ্রীকৃষ্ণের চরণ যুগল থেকে সৃষ্টি হল যমের দাস সকল। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মই তাদের মন, তারা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা।

শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ নেত্র থেকে ত্রিশূল আর পট্টিশধারী মহাভয়ংকর ত্রিলোচন চন্দ্রশেখর ভৈরবদের সৃষ্টি হল। বিরাট দেহধারী এইসব ভৈরবরা জ্বলন্ত, এরা শিবতুল্য। রুরু, সংহার, কাল, অসিত, ক্রোধ, ভীষণ, মহাভৈরব ও খট্টাঙ্গ–এই আট ভৈরব।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বামচোখ থেকে ঈশানের জন্ম দিলেন। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, তিনি ত্রিশুল, পট্টিশ, গদাধারী বিশালকার দিগম্বর। তিনি হলেন দিগপালদের রাজা। ডাকিনী, যোগিনী ও সহস্র সহস্র ক্ষেত্রপাল জন্ম নিল শ্রীকৃষ্ণের নাসারন্ধ্রের মধ্য ভাগ থেকে। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশ থেকে সহসা আবির্ভূত হলেন তিন কোটি দিব্য মূর্তির শ্রেষ্ঠ দেবতার দল।

সৌত বললেন–এরপর নারায়ণ শ্রেষ্ঠরত্নখচিত মণিমালা ভূষিত লক্ষ্মী ও সরস্বতাঁকে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে গ্রহণ করলেন। এভাবে ব্রহ্মা পেলেন সাবিত্রীকে। ধর্ম পেলেন মুক্তিকে। কামদেব

পেলেন রতিকে এবং কুবের পেলেন মনোরমাকে। অন্য সব দেবতা ও পুরুষরা যে সমস্ত দেবী ও কন্যাদের সৃষ্টি করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাদের সেইসব পুরুষ ও দেবতার হাতে সমর্পন করলেন।

সিংহবাহিনী দুর্গাকে রুদ্রের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করতে চাইলে তিনি সম্মত হলেন না। জটাজুটধারী শিব বললেন– এই প্রকৃতি কামাতুরা, কামনা বাসনাকে তাড়িত করে, এই প্রকৃতি তত্ত্ব জ্ঞানকে আড়াল করে যোগদ্বারের দরজা বন্ধ করে, মুক্তির ইচ্ছাকে প্রশমিত করে, সবুদ্ধির বিনাশ ঘটিয়ে সুবুদ্ধির জন্ম দেয়।

বিষয়বস্তুর প্রতি মোহ সৃষ্টি করে, হে নাথ, আমি প্রকৃতির স্বামী হতে চাই না। আপনি আমাকে ইচ্ছেমতো বরদান করুন। আমি পঞ্চমুখে আপনার মঙ্গলময় নাম ও গুণকীর্তন যেন স্বপ্নে জাগরণে সর্বদা গান করতে পারি ঘুরে ঘুরে। আমি আপনার রূপের ধ্যানে মগ্ন থাকতে চাই কল্পকাল ধরে। ভোগের প্রতি আমার যেন অনীহা জন্মায়।

হে শ্রেষ্ঠ বরদানকারী পরম পুরুষ আমি আপনার কাছে বর প্রার্থনা করছি। আপনার নাম, গুণের স্মরণ, কীর্তন ও শ্রবণ, আপনার সুন্দর রূপের ধ্যান, আপনার চরণ যুগলের বন্দনা, আত্মসমর্পণ, নিত্য ধনবেদ্য ভোজন–এই নয় রকম ভক্তিলক্ষণরূপ বর অভিলাষী। মুক্ত মহাপুরুষরা যে ছয়টি মুক্তির কথা বলেছেন, শ্রেষ্ঠী সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সাম্য ও লীনতা, আপনি আমাকে সেই ছয়। মুক্তি দান করুন।

শ্রেষ্ঠী হল পরমেশ্বর তুল্য ষড়েশ্বর্য যুক্ত হওয়া। সালেক্য হল গোলকবাসী হওয়া। পরমেশ্বর তুল্য রূপ লাভ করা যায় সারাপ্য মাধ্যমে সামীপ্য পরমেশ্বর কাছাকাছি আনয়ণ করে, পরমেশ্বরের মমতা লাভ হয় সাম্যমুক্তিতে এবং পরমেশ্বরে বিলীন হল লীনতা।

আঠারো প্রকার সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে দ্রুত বা হালকা হওয়া, ক্ষুদ্র হওয়া, কোনো কিছু লাভ করা, কামনা পূরণের সামর্থ্য, ঈশ্বরকে লাভ করা, বশীকরণ, সমস্ত রকম কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হবার ক্ষমতা, সর্বজ্ঞানী হওয়া, দুর থেকে শোনা, দুর থেকে বলা, পরদেহে প্রবেশ করা,

বাকসিদ্ধি, কল্পতরু হওয়া, সৃষ্টি ও নাশ করার ক্ষমতা লাভ, অমরত্ব ও সর্বশ্রেষ্ঠত্ব। যোগ, তপস্যা, দানধ্যান, ব্রত, যশ, কীর্তি, পূজার্চনা, দেবতা দর্শন, পৃথিবী প্রদক্ষিণ, স্বর্গলোক দর্শন ব্রহ্মলোক দর্শন, রুদ্রত্ব লাভ, বিষ্ণুত্ব পরমপদ- এ ছাড়াও আরও যেসব আকাঙ্খিত বস্তু আছে

যা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। হে হে সর্বেশ্বর, তা আমি আপনার কাছে ব্যক্ত করছি, সেইসবই আপনার ষোলো কলার ভক্তির এক কণাও হতে পারে না।

রুদ্রদেবের কথা শুনে ভগবান শ্রীহরি হেসে উঠলেন। তাঁকে বরদান করে বললেন– হে সর্বেশ্বর মহাদেব, শতকোটি কল্পকাল পর্যন্ত তুমি আমার পদসেবা করতে পারবে, তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ হও, বেদজ্ঞান ও সর্বজ্ঞত্ব লাভ করো, যশ ও তেজে তুমি আমার সমান হও। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত, আমার প্রাণাধিক প্রিয়। তুমি আত্মস্বরূপ, হে দেবাদিবের মহাদেব শত কোটি কল্প অন্তে তুমি প্রকৃতিকে তোমার ঘরণী রূপে গ্রহণ করবে।

দিব্য সহস্র বছর ধরে তোমরা দুজনে শৃঙ্গার সুখ উপভোগ করবে। আমি যেমন এক ঈশ্বর তুমিও তাই। তুমি যেমন সংসারী হতে পারো, তেমন হতে পারো যোগী পুরুষ। আবার কখনও হও স্বেচ্ছাধীন প্রভু। যেসব রমণী কু-স্ত্রী হয় তারা স্বামীকে দুঃখসাগরে ভাসায়, কিন্তু কুলজা ঘরণী স্বামীকে পুত্রস্নেহে পালন করে। কারণ কুলস্ত্রীর কাছে পতি হল সব। সে সৎ অথবা অসৎ, কৃপণ অথবা ধনী যাই হোক না কেন?

অসৎ বংশে যে কন্যার জন্ম, সে হয় পরভোগা, স্বামীর নিন্দাতে সর্বদা ব্যস্ত থাকে। যে সতী স্ত্রী আমাকে এবং তোমার থেকেও পতি প্রাণাধিক হয় সে নারী স্বামীর সঙ্গে গোলোকে কোটি কল্পকাল সুখ ভোগ করে। তুমি শিব, প্রকৃতি হবে শিবা। নিজের মঙ্গলের জন্য তুমি ওই সাধ্বী স্ত্রীকে গ্রহণ করবে।

প্রকৃতির যোনি সংযুক্ত তোমার লিঙ্গ তীর্থক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে পবিত্রভাবে পঞ্চ উপচারে দক্ষিণার সঙ্গে হাজারবার ভক্তি ভাবে পুজো করে সে গোলকে কোটি কল্প কাল ধরে আমার সঙ্গে বাস করে।

যে জন তীর্থক্ষেত্রে শিবলিঙ্গকে লক্ষবার পুজো করে উত্তম দক্ষিণা প্রদান করে, সে গোলকে বাস করে নিশ্চল ভাবে। গোবর, মাটি, ছাই বা তীর্থের বালি দিয়ে শিবলিঙ্গ গড়ে পুজো করলে অযুত কল্পকাল স্বর্গ বাস হয়। শিবলিঙ্গের পুজো যে জায়গায় করা হয়, সেই স্থান তীর্থের সমান। মৃত্যুপথযাত্রী শিব নাম উচ্চারণ করে স্মরণ করলে সে কোটি জন্মের পাপ থেকে উদ্ধার পায়।

শিব হল কল্যাণ ও মুক্তির অন্য নাম। পাপহরণকারী 'শি' এবং মুক্তি দানকারী 'ব' মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে শিব। শিব' নাম উচ্চারণ করে কথা বললে কোটি জন্মের পাপ নাশ হয়। পরমাত্মা

শ্রীকৃষ্ণ এবার শিবকে কল্পবৃক্ষ স্বরূপ মন্ত্র প্রদান করলেন। তারপর তিনি প্রকৃতি দুর্গাদেবীর উদ্দেশে বললেন– হে সুমুখি! তুমি গোলোকে আমার কাছে অবস্থান কর।

মঙ্গলময় শিবের ভজনা করো। তোমাকে সমস্ত দেবতারা তেজপূর্ণ অস্ত্র প্রদান করবে। তুমি হবে অসুরমর্দিনীও সংহার রূপিণী। সকলে তোমাকে পুজো করবে। সত্যযুগে তুমি দক্ষের ঘরে জন্মলাভ করবে। সুশীলা সতী হয়ে শিবের ঘরণি হবে। দক্ষযজ্ঞে পতি নিন্দা সহ্য করতে না পেরে নিজের দেহ বিসর্জন দেবে।

এবার তোমার জন্ম হবে পার্বতী নামে হিমালয়ের ঘরে মেনকার গর্ভে। তখন শম্ভুর সঙ্গে দিব্য সহস্র : বৎসর ধরে বিহার করবে। এই সমস্ত কাল অতিক্রান্ত হলে তোমরা আবার মিলিত হবে। পৃথিবীবাসী প্রতি বছর তোমার শ্রীচরণে অর্ঘ্য প্রদান করবে। শারদীয়া মহাপূজা ধুমধামের সঙ্গে পালন করবে। গ্রাম্যদেবী হিসেবে তোমার আরাধনা করবে।

শিবের নানারকম শাস্ত্রে তোমার স্তোত্র যুক্ত করে পুজোর নিয়মবিধি লিখিত হবে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ– এই চারবর্গের ফলভোগী হয়ে তোমার পরিচারকরা সিদ্ধ মহাপুরুষত্ব লাভ করবে। হে মা, পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে যে তোমার পুজো করে সে যশ, কীর্তি, ধর্ম ও ঐশ্বর্য লাভ করে। সৌতি বলতে থাকেন হে ব্রাহ্মণ, একথা বলে শ্রীকৃষ্ণ কামবীজমুক্ত অত্যুতম এগারো অক্ষর যুক্ত মন্ত্র দুর্গাকে দান করলেন। তাঁর আজ্ঞায় বিধি অনুসারে ধ্যান মন্ত্র রচিত হল। সর্বব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির উপযোগী শক্তি ও কামপ্রদানকারী সর্বসিদ্ধি এবং তার থেকেও বিশিষ্ট যে তত্ত্বজ্ঞান তা তাকে দান করলেন।

কবচ ও স্তোত্র যুক্ত তেরো অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র শঙ্করকে দান করেন। এবার জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ কামদেব, বহ্নি, কুবের ও বায়ুকে একে একে উপদেশ দান করলেন। তাদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রাদিতে অভিষিক্ত করলেন। তারপর তিনি ব্রহ্মাকে উদ্দেশ করে বর প্রদান করলেন দিব্য হাজার বছর ধরে শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা করে তিনি নানাবিধ শ্রেষ্ঠ জিনিস সৃষ্টি করুন। একটি সুন্দর মালা শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে উপহার দিলেন। তারপর তিনি গোপ ও গোপিনীদের সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন বৃন্দাবনের দিকে।

সৌতি বললেন– শ্রীকৃষ্ণের বর লাভ করে ব্রহ্মা তপস্যায় সিদ্ধ হলেন। প্রথমে সৃষ্টি করলেন পৃথিবীকে। মধু ও কৈটভের মেদ থেকে যার উৎপত্তি। তারপর সৃষ্টি হল বহু পর্বতশ্রেণী। যেমন সুমেরু, কৈলাশ, মলয়, হিমালয়, উদয়, অস্ত, সুবেল এবং গন্ধমাদন। সৃষ্টি হল অসংখ্য সাগর, নদী, গাছপালা, গ্রাম, নগর আরও কত কী। প্রধান সাতটি সমুদ্রের মধ্যে আছে লবঙ্গ, ইক্ষু,

সুরা, ঘৃত, দধি বা দুধ এবং জল। ব্রহ্মার সৃষ্টি পদ্মাকার। সাতটি দ্বীপ, সাতটি উপদ্বীপ ও সাতটি সীমান্ত পর্বত স্থান পেল এই পৃথিবীর বুকে।

হে দ্বিজ, জম্বু, শাক, কুশ, প্ল, ক্রৌঞ্জ, ন্যগ্রোধ অর্থাৎ বট এবং পুস্কর এই সপ্তদ্বীপ ব্রহ্মা আগে সৃষ্টি করেছিলেন। আটটি পুরী নির্মিত হল মেরু পর্বতের আটটি চূড়ায়। যেখানে আট দিকপাল ঘুরে বেড়াবেন। মেরু পর্বতের নীচে একটি পুরী নির্মাণ করা হল অনন্তের জন্য। সেই পুরীর উপরে শোভা পেল আরও সাতটি স্বর্গলোক। এই সাতলোকের মধ্যে আছে ভূর্লোক, ভূবলোক, অত্যন্ত সুন্দর স্বলোক, মহলোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক।

হে শৌনক, যেখানে চির যৌবন বিরাজিত সেই ব্রহ্মালোক স্থাপিত হল সুমেরু পর্বতের শৃঙ্গদেশে, তারও ওপরে সৃষ্টি হল অত্যন্ত সুন্দর ধ্রুব লোকের। অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল, রসাতল–এই সাতটি তলের সৃষ্টি করলেন ব্রহ্মা। সব থেকে ওপরের তল অতল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পাতাল। সাতটি পর্বত, সাতটি দ্বীপ এবং সাতটি পাতাল নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড গড়ে উঠল। যার অধিপতি ব্রহ্মা স্বয়ং।

হে বিপ্র মহাবিষ্ণুর লোমকূপ থেকে এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর দেবতা ও মানুষ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় আচ্ছন্ন। দিকপালগণ ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সংখ্যা গণনায় অপরাগ ঈশ্বর বিশ্ব আকাশ ও দিক সমূহের সর্বত্র সংখ্যা গণনাতে সক্ষম হলেও ব্রহ্মাণ্ডের নির্ভুল সংখ্যা বলা অসম্ভব। এই বিশ্বের যা কিছু সবই কৃত্রিম, অনিত্য। এই বিশ্ববহির্ভূত আত্মা, আকাশ ও দিক বৈকুণ্ঠলোক, শিবলোক ও অন্যান্য গোলোকের মতোই নিত্য।

সুতপুত্র বললেন– বিশ্ব সৃষ্টির কাজ শেষ করে ব্রহ্মা পরম শ্রেষ্ঠ স্ত্রী সাবিত্রী দেবীর গর্ভে বীর্যপাত ঘটালেন, দিব্য একশো বছর ধরে সাবিত্রী দুঃসহ প্রসব বেদনা সহ্য করেন। তারপর তার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয় তর্ক, ব্যাকরণ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ, ছত্রিশ রকমের দিব্য মনোরম রাগিণী, নানা ধরনের তালযুক্ত অত্যন্ত সুন্দর ছয় প্রকারের রাগ। তিনি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির জন্ম দিলেন। প্রসব করলেন বৎসর, মাস, ঋতু, তিথি, ক্ষণ, দিনরাত্রি, সকাল, সন্ধ্যা, পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, বিজয়া, জয়া, ষষ্টমৃত্তিকা। বিভিন্ন রকমের যোগ আর কারণগুলি।

হে মহাযোগী! দেবী সাবিত্রী সমস্ত মাতৃকাগণের শ্রেষ্ঠ বালাদেরও আরাধ্য দেবী। ব্রহ্ম, বারাহ ও কল্প– এই তিন পাদ্ম, নিত্য নৈমত্তিক দ্বিপাদ্ম ও প্রাকৃত চার ধরনের প্রলয় এবং সমস্ত রকম ব্যাধিকে তিনি প্রসব করলেন। ধাতার পৃষ্ঠভাগ থেকে অধর্মের উৎপত্তি স্থল। তার বামদিক

থেকে উঠে এলেন কামিনী অলক্ষ্মী। শিল্পী গুরু বিশ্বকর্মা তার নাভিদেশ থেকে জন্ম নিলেন। মহাবলশালী ও পরাক্রমশালী অষ্টবসুর জন্ম হল। চারজন কুমারের উৎপত্তি হল ধাতা ব্রহ্মার মন থেকে। এরা প্রত্যেকে পাঁচ বছরের বালক, ব্রহ্মতেজে পরিপূর্ণ।

ব্রহ্মার মুখ থেকে জন্ম হল স্বায়ম্ভর মনুর যাঁর সুন্দরী রূপবতী ভার্য্যা শতরূপা নামে খ্যাতা এবং শ্রীলক্ষ্মীর অংশ স্বরূপা। ব্রহ্মার আজ্ঞায় স্বংস্তু মনু স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তাঁদের চারপুত্র সৃষ্টি করার কথা বললেন। কিন্তু তাঁরা অসম্মতি জানালে কৃষ্ণ ধ্যানমগ্ন হলেন। জগৎপতি ব্রহ্মা ক্রোধান্বিত হয়ে ললাট দেশ থেকে ব্রহ্মতেজ নির্গত করলেন যা থেকে এগারো জন রুদ্রের উৎপত্তি হল। সংহারকারী কালাগ্নিরুদ্র ছিলেন একজন। যিনি বিশ্ববাসীর কাছে তামস নামে খ্যাত। এ ছাড়া আছেন মহান, মহাত্মা, মতিমান, ভীষণ, ভয়ংকর, ঋতধ্বজ, উর্দ্ধকেশ, পিঙ্গলায়, রুচি এবং শুচি।

হে শৌনক। ব্রহ্মার দক্ষিণ কান থেকে পুলস্ত্য, বাম কান থেকে পুলহ, ডান ও বাম চোখ থেকে যথাক্রমে অত্রি ও ক্রতু, নাকের ছিদ্র থেকে অরণি, মুখ থেকে অঙ্গিরা, বাঁদিক থেকে রুচি ও ভৃগু এবং দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে রুদ্রের আর্বিভাব ঘটে। কর্ম সৃষ্টি করেছে ছায়াকে, পঞ্চশিখ এসেছে নাভি থেকে, বোঢ় এসেছে বুকের থেকে, কণ্ঠ দিয়েছে নারদকে। রক্ষার কাধ থেকে মরীচি, জিহ্বা থেকে অপান্তরতমা এবং অধর থেকে প্রচেতার সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মার বাঁদিকের উদর থেকে হংস এবং ডান দিকের উদর থেকে স্বয়ং যতির আবির্ভাব ঘটে। এইসব পুত্রদের তিনি সৃষ্টি করার কথা বললেন।

নারদ বললেন– হে পিতামহ ব্রহ্মা, আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সনকাদিকের নিয়ে আসতে আজ্ঞা করুন। তাদের স্ত্রীযুক্ত করুন। তাদের আপনি তপস্যামগ্ন হতে আজ্ঞা করেছেন তাহলে আমরা গৃহী হই কী করে। সর্বশক্তিমানের বুদ্ধি ও মাঝেমধ্যে বিপরীতগামী হয়। হে পিতা, অমৃতের থেকেও বেশি প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সেবা। তা ত্যাগ করে কোন সুখ বিষয়সমূহের বিষ পান করা যা তুচ্ছ, যা অসত্য। তা মানুষের বিনাশ ঘটায়। বিজয়ী ব্যক্তিদের বিষয়ই হয় মৃত্যুর কারণ।

নারদ এবার থামলেন। তিনি তখন জ্বলন্ত আগুন শিখার ন্যায় ক্রোধে জ্বলছেন। পুত্রের এ আচরণে পিতা অত্যন্ত কুপিত হলেন। রাগে তার সমস্ত শরীর কম্পমান। তিনি বললেন–ওহে নারদ! তোমার দুঃসাহস দেখে আমি স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছি। তোমাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান ভুলে যাবে, তুমি হবে এক স্ত্রীলুব্ধ লম্পট যেন এক ক্রীড়ামৃগ।

পঞ্চাশজন স্থির যৌবনা রূপবতী রমণী তোমাকে সর্বদা সঙ্গ দান করবে। তুমি হবে তাদের প্রাণপ্রিয় ভর্তা। বিভিন্ন রকম শৃঙ্গারে নিপুণ ব্যক্তিদেরও মহাগুরু হবে, তুমি হবে শ্রেষ্ঠ বীণাবাদক, স্থির যৌবন, মধুর ভাষী, শান্ত, সুন্দর সুশীল। তুমি তখন উপবহণ নাম ধারণ করবে, দিব্য লক্ষ যুগ এইভাবে অতিবাহিত করবে। তারপর দাসীপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। কামিনী সঙ্গ লাভে সুখী হবে।

হে পুত্র! বৈষ্ণবদের সঙ্গে কাল অতিবাহিত করবে। তাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করবে। তুমি কৃষ্ণের কৃপা লাভ করবে। তখন তুমি হবে আমার পুত্র। তোমাকে আমি হারানো দিব্য জ্ঞান ফিরিয়ে দেব।

সৌত বলতে থাকলেন–জগৎ গুরু ব্রহ্মা এই বলে চুপ করলেন। তখন নারদ অশ্রুপাতে বুক ভাসালেন। পিতার কাছে মিনতি করে বললেন– হে সংহারকারী পিতা, আপনি রাগ দমন করুন। আপনি সৃষ্টিকর্তা, আপনার এই রকম ক্রোধ করা কি সাজে? হে পিতা, আপনি আশীর্বাদ করুন যত নীচ যোনিতে আমার জন্ম হোক না কেন হরির প্রতি আমার ভক্তি যেন অটুট থাকে।

পাপীদের দেওয়া পাপের স্থলনের জন্য নিজেদের পবিত্রতার জন্য তীর্থক্ষেত্রগুলিও বৈষ্ণবদের স্পর্শ অভিলাষী হয়। এই ভাবে গুরুদেবের কাছ থেকে মন্ত্রোপদেশ পাওয়া মাত্রই মানুষ তার পূর্বতম কোটি পুরুষের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। মন্ত্র লাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কোটি জন্মের পাপ থেকে উদ্ধার পায়। যে গুরু শিষ্যের বিশ্বাসের অমর্যাদা করে অসৎ পথ প্রদর্শন করে, চন্দ্র সূর্য যতদিন থাকবে ততদিন সেই গুরু কুম্ভীপাক নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। শ্রীকৃষ্ণের পাদকমল যিনি বন্দনা করতে জানেন না তাকে গুরু বলি কী ভাবে, তিনি পিতা হতে পারেন না। পারেন না উত্তম স্বামী বা পুত্র হতে।

হে চতুরানন, আমি জানি আমি নির্দোষ। তবু আপনি আমাকে অভিশাপ দিয়েছেন। শাস্ত্রজ্ঞরা বলে থাকেন হত্যাকারীর হত্যা করা উচিত। তাই আপনাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি আপনি সমস্ত কবচ, স্তোত্র, পুজোর মন্ত্র সব বিস্মৃত হবেন। সমগ্র বিশ্ব আপনাকে পুজো দিতে ভুলে যাবে। তিন কল্পকাল অপূজ্য হিসেবে কাটাবেন। তারপর পূজ্য ব্যক্তিদেরও পুজো পাবেন। তবে দেবীগণ সকলেই আপনার বন্দনা করবেন।

নারদ এবার চুপ করলেন। ব্রহ্মা তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলেন। তারপর পিতার অভিশাপে নারদ উপবর্হন নামে গন্ধর্ব হলেন এবং দাসী পুত্র হন। পরে দিব্যজ্ঞান লাভ করে মহর্ষি নারদে পরিণত হন।

সূত্র পুত্র বললেন– এরপর ব্রহ্মার আদেশে অন্যান্য ছেলেরা সৃষ্টি কার্যে রত হলেন। মরীচি তার মন থেকে জন্ম দিলেন প্রজাপতি কশ্যপের, চন্দ্র আর্বিভূত হলেন ক্ষীরোদ সাগরে অত্রির নেত্রফল থেকে। এইভাবে প্রচেতার মন থেকে গৌতম এবং পুলস্ত্যের মন থেকে মৈত্রাবরুণ জন্মগ্রহণ করলেন। আকুতি, দেবদুতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যার জন্ম দিলেন মনুপত্নী শতরূপা। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে মনুর দুই পুত্র।

উত্তানপাদের পুত্রের নাম ধ্রুব। রুচি এবং দক্ষ যথাক্রমে আকুতি ও প্রসূতিকে গ্রহণ করেন। কর্ম গ্রহণ করেন দেবদুতিকে। তাদের গর্ভে ভগবান কপিলের জন্ম হয়। দক্ষ প্রজাপতির বীর্যে এবং প্রসূতির গর্ভে ষাটজন কন্যার জন্ম হল। তাদের মধ্যে আটজন ধর্মকে, এগারোজন রুদ্রকে, তেরোজন কশ্যপকে এবং সাতাশ জন কন্যা চন্দ্রকে দান করলেন। সতী নামে এক কন্যার পাণি গ্রহণ করলেন শিব।

হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ! শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্ট, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, মতি ও স্মৃতি– এই আট ধর্মপত্নীর গর্ভে মায়া জন্ম নিয়েছিলেন। তারা হলেন যথাক্রমে শান্তির সন্তোষ, পুষ্টির মহান, ধুতির ধৈর্য, তুষ্টির হর্ষ ও দর্প। ক্ষমার সহিষ্ণু, শ্রদ্ধার ধার্মিক, মতির জ্ঞান এবং স্মৃতির পুত্র জাতিস্মর। পূর্বপত্নী যুক্তির গর্ভে দুই ঋষির জন্ম হয়–নর ও নারায়ণ।

হে ব্রাহ্মণ! এবার বলি রুদ্রপত্নীর নাম, তারা হলেন কলা, কলাবতী, কাষ্ঠা, কালিকা, কলহপ্রিয়া, কালী, ভীষণা, প্রশ্লোচা ও শূকী, তাঁরা অনেক পুত্রের জন্ম দিয়েছেন এবং শিবের অনুগামী হন।

শিবপত্নী সতী স্বামীনিন্দা শুনে দক্ষযজ্ঞ স্থলেই দেহত্যাগ করেন এবং পরে হিমালয়ের কন্যা রূপে জন্মলাভ করেন। শংকরকে পতিরূপে গ্রহণ করেন।

কাশ্যপের স্ত্রীদের মধ্যে আছেন অদিতি, দিতি, রুদ্রু, বিনতা, সুরভি, সরমা ও দনু। অদিতি হলেন দেবমাতা, দৈত্যদের জন্ম দিয়েছিলেন দিতি, সাপদের মা হলেন কদ্রু। পাখীদের প্রসব করেন বিনতা। গোরু ও মহিষদের মাতা সুরভি। সারমেয় প্রভৃতি জন্তুদের মায়ের নাম সরমা। দানবদের মাতা হিসেবে দনু পরিচিতা।

হে ধার্মিক শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্র, বারোজন আদিত্য ও উপেন্দ্র প্রভৃতি নামে পরাক্রমশালী ও শক্তিশালী দেবতারা অদিতির পুত্র নামে খ্যাত। ইন্দ্র ও শচীর পুত্রের নাম জয়ন্ত। বিশ্বকর্মার কন্যা সবর্ণার স্বামী সূর্য। তাদের দুই পুত্র শনৈশ্চর ও যম এবং কন্যা কালিন্দী। উপেন্দ্র ও পৃথ্বীর সন্তান মঙ্গল।

শৌনক জানতে চাইলেন- হে সৌতে! মঙ্গলের জন্ম রহস্য শ্রবণ করতে আমরা আগ্রহী, আপনি অনুগ্রহ করে সেই বৃত্তান্ত বলুন।

সুত পুত্র সৌতে এই প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন– বসুন্ধরা ছিলেন কামিনী, নব যৌবনে চলাচলে তাঁর অনুবাহার। তিনি চন্দন গাছের নতুন পাতায় ভরা মলয় পর্বতের নির্জন স্থানে চন্দনে সুবাসিত হয়ে বিচরণ করেছিলেন। তিনি স্মিত হাস্যে শ্রীনারায়ণের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন। সুন্দর মালতী মালা ও সুগন্ধ মুক্ত চন্দন তাকে দান করেন। পৃথ্বীর রূপ যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে ভগবান উপেন্দ্র তার সঙ্গে নানারকম শৃঙ্গারে মেতে উঠেন। পৃথ্বীর গর্ভে উপেন্দ্র বীর্যপাত ঘটালেন। বসুন্ধরা মুছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

সুখসম্ভোগে বেহুঁশ হাস্যমুখী বিপুল স্তনভার যুক্ত পৃথ্বীকে কিছুক্ষণ বুকে আলিঙ্গনাবদ্ধ রেখে যাচ্ছিলেন। পৃথিবী দেবীকে জাগিয়ে তুলে এভাবে পড়ে থাকার কারণ জানতে চাইলেন। পৃথিবী সব কথা বললেন। নারায়ণ বীর্য ধারণ করতে দেবী অসমর্থ হওয়ার প্রবালের খনির মধ্যে তা নিক্ষিপ্ত হল। সেই বীর্য জন্ম দিল, প্রধান বর্ণের এক পুত্রের যে সূর্যের সমান তেজীয়ান। নারায়ণপুত্র মঙ্গল ও মেধার পুত্রের নাম ঘটেশ্বর। যিনি বিষ্ণুতুল্য তেজস্বী ও বরদাতা রূপে বিদিত।

হে যোগী শ্রেষ্ঠ! দিতির পুত্র এবং কন্যা যথাক্রমে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ এবং সিংহকি। সিংহিকার গর্ভজাত পুত্র সিংহিকেয় রাহু। সিংহিকার অপর নাম নিঋতি। তাই রাহু নৈঋতি নামে চিহ্নিত। হিরণ্যা তখন যুবক, বিষ্ণু শূকরের রূপ ধরে তাকে হত্যা করেন। হিরণ্যকশিপুর পুত্রের নাম প্রহ্লাদ। তিনি পরম বৈষ্ণব। তার পুত্র বিরোচন এবং বিরোচনের পুত্র হলেন বলি। বলির পুত্র বান।

হে শৌণক, এবার শুনুন কদ্রুর সাপ সন্তানদের কথা। অনন্ত, বাসুকি, কালীয়া, ধনঞ্জয়, কর্কেটক তক্ষক, পদ্ম, ঐরাবত, মহাপদ্ম, শঙ্কু, শঙ্খ, সংবরণ, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্ধর্ষ, দুর্মুখ, বল, গোক্ষ্য, বিরুপ ও গোকাসুক-এরা সবাই কমায়ের সন্তান কন্যা হলেন ইনি মহা তেজস্বিনী, লক্ষ্মীর অংশ লাভ করেছেন। জরকারু মুনির পত্নী হলেন মনসা, যিনি নারায়ণের অংশজাত।

আস্তিক হলেন। মনসাদেবীর গর্ভজাত পুত্র। সুরূপা, বিনতার বংশের প্রথম দুই সন্তান গরুড় ও অরুণ। ধীরে ধীরে সমস্ত পক্ষীজাত এঁরা সৃষ্টি করেছেন।

চন্দ্রের পত্নীরা হলেন অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশির্ষা, আদ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মখা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যোষ্ঠা, মূলা, পূর্বষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদী, উত্তরভাদ্রপদী ও রেবতী–এই সাতাশ জন চন্দ্রের পত্নীদের মধ্যে প্রধান রোহিণী। তিনি রাসিকাপ্রিয়া।

তাই চন্দ্র সর্বদা এই পত্নীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। অন্যান্য পত্নীরা স্বামীর সান্নিধ্য লাভের আশায় আক্রান্ত হলেন। রোগগ্রস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত শরীর নিয়ে চন্দ্র ভগবান শঙ্করের কাছে আর্জি জানালেন। শিব চন্দ্রকে রোগমুক্ত করে নিজের শিরে স্থান দিলেন। সেই থেকে চন্দ্র হলেন অমর এবং নির্ভয়। চন্দ্রকে শেখরে স্থান দেওয়ায় শিবের আর এক নাম চন্দ্রশেখর।

চন্দ্রপত্নীগণ স্বামীকে রোগ মুক্ত দেখে কাঁদতে লাগলেন। তারা ছুটে এলেন পিতা দক্ষের কাছে। বললেন– হে পিতা, স্বামী সৌভাগ্য লাভের আশায় আপনার সাহায্যের প্রার্থনা করেছিলাম। অথচ আপনি আমাদের দুঃখ দিলেন। আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ। স্বামী থাকলেও স্বামী সঙ্গসুখ ভোগ থেকে বঞ্চিত হলাম। হে পিতা, এখন আমরা মর্মে মর্মে অনুধাবন করতে পারছি। স্ত্রীদের কাছে স্বামী গতি, প্রাণ ও সম্পদ।

পতির মাধ্যমেই এই সংসার ধর্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ লাভ হয়। নারায়ণ ব্রত ও সনাতন ধর্ম স্ত্রীদের পতি। পতির পদসেবন যে রমণী করে তাকে আর তীর্থে তীর্থে ঘুরে পুণ্য সঞ্চয় করতে হয় না। সমস্ত আত্মীয়পরিজন বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সবার প্রিয় হল পুত্র, যে পতিরই অংশজাত।

যেসব নারী পতি নিন্দা করে বা পতিবিমুখ হয় তারা অসৎ বংশজাত, তারা চঞ্চল ও দুষ্টমনা। সতী নারী স্বামী দুষ্ট বা অসৎ যাই হোক না কেন, তাকে ছেড়ে অন্যত্র গমন করে না। পতি সগুণ বা নির্গুণ যাই হোন যে অসতী নারী বিদ্বেষবশত তাকে পরিত্যাগ করে, সে রমণী সূর্য ও চন্দ্র যতদিন থাকবে, ততদিন কালসূত্র নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে। যেখানে ক্ষুধার তাড়নায় নিজের মাংস নিজেকে ভক্ষণ করতে হয়। হিংস্র প্রাণীরা তাকে কুরে কুরে খায়। সহস্র কোটি বার সে শকুনি হয়ে জন্মায়, শতবার শূকর, শতবার স্বাপদ হয়ে জন্মাবার পর বন্ধু হত্যাকারিণী রূপে মানুষ হয়ে জন্মায়।

হে পিতা! সৃষ্টি কর্তার পুত্র আপনি। আপনিও সৃষ্টি করতে পারেন, তাই আপনার কাছে বিনীত প্রার্থনা আমাদের স্বামীকে ফিরিয়ে দিন আমাদের কাছে।

কন্যাদের কাতর প্রার্থনা শুনে দক্ষ আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি শিবের কাছে গেলেন। শিব উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন। দক্ষ তাকে আশীর্বাদ করলেন। বললেন– হে শঙ্কর! তুমি আমার জামাতাকে ফেরত দাও। আমার কন্যারা স্বামী বিরহে পাগলিনী হয়েছে। তাদের প্রাণাধিক পতিকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আজ্ঞা করছি। আর যদি তুমি আমার আদেশ অমান্য করো তাহলে এমন শাস্তি পাবে যে কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

করুণা সাগর শিব নিজ শ্বশুর দক্ষের কথা শুনে মোটেও ক্রুদ্ধ হলেন না। তিনি সুমিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করলেন- হে দক্ষরাজ, আমি আপনার আদেশ পালন করতে অক্ষম। এর জন্যে যেকোনো প্রয়োগ করকে দিতে পারেনও হয়ে অভি

দক্ষ তখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন, তা দেখে শিব বিপদত্রাতা কৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণবেশী নারায়ণের আবির্ভাব হল। তিনি শিব ও প্রজাপতি দক্ষকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর শিবকে লক্ষ্য করে বললেন– হে শঙ্কর! নিজ আত্মা সকলের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার বস্তু। সেই প্রাণ আজ বিপন্ন। তুমি দক্ষের কাছে তার জামাতাকে ফিরিয়ে দাও। তুমি বৈষ্ণব প্রধান, তুমি যোগী শ্রেষ্ঠ, তুমি সমদৃষ্টি সম্পন্ন, তুমি দ্বেষ ও ক্রোধ শূন্য। আর ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ তেজস্বী, ক্রোধী।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনে শঙ্কর মৃদু হাসলেন, বললেন– আমি আমার যা কিছু সব ত্যাগ করতে পারি এমন কি নিজ আত্মাও অন্য হাতে সমর্পণ করতে কুণ্ঠিত হব না। কিন্তু যে আমার শরণ নিয়েছে, আমার আশ্রিত, তাকে পরিত্যাগ করলে ধর্মের অবমাননা করা হবে। হে জগৎপতি, আমি সব কিছু হারাতে রাজি কিন্তু নিজের ধর্মের অমর্যাদা হতে দিতে পারি না। যে ধর্মকে রক্ষা করে ধর্ম হন তার সহায়। হে প্রভু, আপনাকে ধর্ম সম্বন্ধে কি আর ব্যক্ত করব। এই বিশ্ব চরাচর আপনারই সৃষ্টি, আপনিই পালনকারী এবং আপনি বিনাশ ঘটান, সেই আপনার পাদপদ্মে যার মতি, সে কীসে ভয় পাবে।

শ্রীকৃষ্ণ তখন শঙ্করের ললাট থেকে অর্ধচন্দ্রকে আকর্ষণ করে নামিয়ে নিয়ে এলেন। দক্ষকে অর্ধচন্দ্র প্রদান করলেন। সেই থেকে অর্ধচন্দ্র শিবের ললাটে অবস্থান করতে লাগলেন। যক্ষারোগগ্রস্ত চন্দ্রের আরোগ্য লাভের আশায় দক্ষ মাধবের শরণ নিলেন। দক্ষের স্তবে

গোবিন্দ সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন– এক পক্ষকাল চন্দ্র পূর্ণ থাকবে, এবং এক পক্ষকাল ক্ষত গ্রস্থ হবে।

কৃষ্ণ ফিরে গেলেন নিজধামে। দক্ষ তার কন্যাদের হাতে চন্দ্রকে তুলে দিলেন। পত্নীদের কাছে পেয়ে চন্দ্র অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করলেন। সেই থেকে চন্দ্র প্রত্যেকটি পত্নীর ওপর সমান নজর দিতে শুরু করলেন।

হে শৌণক, আমি এ পর্যন্ত যে ক্রম বর্ণনা করলাম তা আমাকে পুস্কর তীর্থে মুনিদের সভায় গুরুদেব শুনিয়ে ছিলেন। সতপুত্র বললেন, হে ব্রাহ্মণ! চ্যবন ও শুক্র নামে দুই পুত্র ভৃগুর জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ক্রতুপত্নী ক্রিয়াদেবী বালখিল্যদের মাতা। বৃহস্পতি, উতথ্য ও মন্থর তিন মুনি অঙ্গিরার পুত্র। শ্রীমান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন হরি হলেন পরাশরের পুত্র, পরাশরের পিতার নাম শক্তি, শক্তির পিতা বশিষ্ঠ। শিবের অংশজাত জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শুকদেব হলেন ব্যসদেবের পুত্র। বিশ্বশ্রবা হলেন পুরস্ত্যের পুত্র এবং তাঁর পুত্র ধনেশ্বর। শৌনক প্রশ্ন করলেন–জন্মরহস্য অত্যন্ত জটিল। আপনি কি এ ব্যাপারে ব্যাখা করবেন?

সৌত বললেন–দিক পালগণের পূর্ব স্রষ্টা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন। পরে ব্রহ্মার অভিশাপে ধনেশ্বর কুবের বিশ্বশ্রবার ঘরে জন্ম নেন। বিশ্বশ্রবার আরও তিন পুত্রের নাম জানা যায়, রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও মহাত্মা ধার্মিক বিভীষণ। বাৎস্য হলেন পুলহের পুত্র, রুচির পুত্রের নাম শাণ্ডিল্য, ঋষি গৌতমের পুত্র মুনি শ্রেষ্ঠ সাবার্ণ।

এই পাঁচ মুনি পাঁচটি গোত্রের জন্মদাতা। কশ্যপ থেকে কাশ্যপ গোত্র, বৃহস্পতি থেকে ভরদ্বাজ, পুলহ থেকে বাৎস্য। গৌতম থেকে সাবর্ণ এবং শাণ্ডিল্য গোত্রের সৃষ্টি। ব্রহ্মা তার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ জাতির জন্ম দিয়েছেন। তাদের কোনো গোত্র নেই। চন্দ্র, সূর্য ও মনু এবং ব্রহ্মার বাহু থেকে ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মার উরু থেকে বৈশ্য ও তার চরণ থেকে শূদ্র জাতির উৎপত্তি। তাদের সংমিশ্রণে বর্ণশঙ্করের উদ্ভব হয়েছে।

হে যোগী শ্রেষ্ঠ! গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক, কুবর, তাম্বুলিক, স্বর্ণকার আর বণিকদের বলা হয় সং শূদ্র। বৈশ্য ও শূদ্রর গর্ভজাত সকলে করণ নামে পরিচিত। যদি ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যর গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহলে সে অশ্বষ্ঠ নামে পরিচিত হবে। মালাকার, কর্মকার, শঙ্কার, কুবিক, কুম্ভকার, কংসকার ছয়জন বর্ণশঙ্কর শিল্পকারী পুত্রের জনক-জননী বিশ্বকর্মা ও শূদ্রা। ব্রহ্মশাপে সূত্রধর, চিত্রকার ও সর্ণকার পতিত হয়ে অযাজ্য নামে পরিচিত।

মুনি শ্রেষ্ঠ শৌণক এবার জানতে চাইলেন-হে সৌতে, আমার মনে কয়েকটি প্রশ্নের উদয় হয়েছে। দেবশিল্পী কেন অধম শূদ্রার সঙ্গে শৃঙ্গারে লিপ্ত হয়েছিলেন? সূত্রধর, চিত্রকার ও স্বর্ণকার কেন ব্রহ্মশাপে পতিত হয়েছিলেন?

সৌত বললেন– পুষ্করতীর্থে গমন কালে বিশ্বকর্মা কামবর্ধক মনোহর বেশধারী অপ্সরা ঘৃতাচীকে দর্শন করেছিলেন। বিশ্বকর্মা তখন সূর্যলোক থেকে ফিরছেন। স্বভাবতই মন তার প্রফুল্ল ও আনন্দিত। তিনি ওই অপ্সরার প্রতি কাম বোধ করলেন। ঘৃতাচি ষোল বছরের একস্থির যৌবনা নারী বিশাল, গোলকার এবং উঁচু তার দুটি স্তন। তার কটাক্ষে সদা চঞ্চলতা। তার মনমোহিণী রূপ এবং কটাক্ষপাতে মুনি ঋষিরা পর্যন্ত কামান্ধ হয়ে পড়েন।

কামশাস্ত্রবিদ বিশ্বকর্মা ওই অপ্সরার কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন– হে সুন্দরী, তুমি আমার প্রাণ হরণ করেছ, তুমি এখানে একটুক্ষণ দাঁড়াও। আমি সারা জগত তোমায় অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছি। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ। তোমা বিনা আমি মৃত। ভেবেছিলাম আত্মহত্যা করব। যখন রম্ভা জানাল যে তুমি কামালোকে গমন করেছে, তখন আমি ছুটে এলাম।

আহা! কী মনোরম নির্জন উদ্যান। সরস্বতী থেকে উঠে আসছে ঠান্ডা বাতাস, এস আমরা এই পুষ্পেদ্যানে শৃঙ্গারে রত হই। তুমি স্থির যৌবনা, তুমি কোমলাঙ্গী। তুমি সুন্দরী শ্রেষ্ঠা আর আমি মৃত্যুঞ্জয় বর লাভ করেছি। বরুণ আমাকে দিয়েছে রত্নমালা, কুবের প্রাসাদ নির্মাণ করে দিয়েছি, পারিশ্রমিক হিসেবে পেয়েছি প্রভূত ধনসম্পদ।

বায়ু দিয়েছেন স্ত্রী রত্নভূষণ। বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুগল অগ্নির কাছ থেকে লাভ করেছি। কামদেবের কাছ থেকে কামিনী মনোরঞ্জন কামশাস্ত্র আর চন্দ্রের কাছ থেকে পেয়েছি রতিবিদ্যা শিক্ষা।

আমার যা কিছু অলংকার, রত্নমালা, বস্ত্রযুগল সব তোমার। সুখসম্ভোগ শেষ হলেই আমি তোমার হাতে ওইসব সামগ্রী তুলে দেব।

কামুক বিশ্বকর্মার সুন্দর সুন্দর কথা শুনে ঘৃতাচি একটু হাসলেন। বললেন– হে কামপুরুষ, আপনার সব কথা আমি মেনে নিলাম। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন না, যে দিন যার উদ্দেশ্যে আমরা গমন করি সেদিন তার জন্যই আমরা প্রস্তুত থাকি, আজ আমি কামপত্নী। আর আমি হলাম আপনার গুরু পত্নী। কারণ আমি নিজ মুখে স্বীকার করেছেন যে কামদেবের কাছ থেকে কর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন।

বিদ্যাদাতা ও মন্ত্রদাতা গুরু পিতার থেকে লক্ষগুণে এবং মাতার থেকে শতগুণে শ্রেষ্ঠ। হে বীর্যবান পুরুষ, বেদে বর্ণিত হয়েছে, মাতার সঙ্গে সঙ্গমে যত না দোষ হয়, দোষ হয় গুরুপত্নী সঙ্গমে। যে নারীকে মা বলে একবার সম্বোধন করা হয় সেই নারী হয় মাতৃসম। তার সঙ্গে দেহ সম্ভোগ করলে চন্দ্র সূর্য যতদিন থাকবে, ততদিন কালসূত্র নরকে পচে মরতে হবে। গুরুপত্নীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হলে কুম্ভীপাক নরকে গমন হয়। ব্রহ্মার বয়সকাল পর্যন্ত সেখানে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

হে শৌণক, কুম্ভীপাক নরক সম্পর্ক বলা হয়েছে যে এই নরক দেখতে কুম্ভকারের চক্রের মতো গোলাকার, তার কিনারা খঙ্গের মতো তীক্ষ্ণ। মল-মূত্রতে পরিপূর্ণ। শূলের মতো তীক্ষ্ণবীর কৃমিরা সব সময় ঘুরে বেড়ায়। আগুনের মত এখানকার জল টগবগ করে ফুটছে। সব পাপীরা এখানেই ঠাঁই পায়। যেখান থেকে আর উদ্ধারের আশা থাকে না। হে যোগী, ঘৃতাচি তাই বললেন, অন্য পুরুষের সাথে গুরুপত্নী যদি স্বেচ্ছায় রমণ করে তাহলে তারা একই দোষে দুষ্ট হবে। তাই বলছি আজ আমি কামিনী কামদেবের ভবনে যাচ্ছি কামদেবের সঙ্গে রমন করব বলে। অন্যদিন আপনার ঘরনী হয়ে সেজে আসব। আমি চলি।

ঘৃতাচির এহেন আচরণে বিশ্বকর্মা অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। তিনি তাকে ভূতলে শুদ্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করার অভিশাপ দিলেন। ঘৃতাচি বললেন– তুমি স্বর্গ থেকে ভ্রষ্টা হয়ে মর্ত্যে জন্ম নেবে। আমি এই অভিশাপ দিলাম।

ঘৃতাচি চলে গেলেন কামদেবের ভবনে। তার সঙ্গে রমন ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। তারপর পথে বিশ্বকর্মার সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে, সব বললেন।

ঘৃতাচি মর্তে জন্ম নিলেন ভারতবর্ষের প্রয়াগ, ধামে মদন নামে এক গোপের মেয়ে হয়ে। জাতিস্মর ধর্মপরায়ণা এই কন্যা মনোরম গঙ্গাতীরে তপস্যায় ব্যাপৃত হলেন। দেখতে দেখতে একশো বছর অতিবাহিত হল। তপস্বিনীর শরীরের কান্ত তখন তপ্তকাঞ্চন সম।

এদিকে ঘৃতাচির অভিশাপ শুনে বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার দারস্থ হলেন। ব্রহ্মার পাদবন্দনা করে তাকে সব কথা শোনালেন। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা পৃথিবীতে জন্ম নিলেন এক ব্রাহ্মণের ঘরে। তিনি ব্রাহ্মণ পুত্র হয়েও শিল্পকর্মে পারদর্শিতার পরিচয় দেন। রাজা ও গৃহস্থদের ভবনে তার ডাক পড়ে। যথেষ্ট খ্যাতি তার সর্বদা, কত রকমের শিল্পকর্ম, সৃষ্টিতে মেতে থাকেন।

প্রয়াগরাজের এক শিল্পকর্ম শেষ করে তিনি সেদিন গিয়েছিলেন গঙ্গায় স্নান করতে। তপস্বিনীকে দেখে সেই শিল্পীর গত জন্মের কথা মনে পড়ে গেল। এই তপস্বিনী আর কেউ নয় ঘৃতাচি। তিনি কাম আগুনে দগ্ধ হতে হতে ছুটে গেলেন তপস্বিনী রূপী ঘৃতাচির কাছে। বললেন– হে ঘৃতাচি, তোমাকে এখানে দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। আমি বিশ্বকর্মা, নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছ হে সুন্দরী! আমি তোমাকে গ্রহণ করতে চাই। কামদেব আমার মনকে পীড়া দিচ্ছেন। তুমি এসো সম্ভোগে লিপ্ত হও, এবং শাপমোচন করে স্বর্গে ফিরে যাও।

তপস্বিনী রূপী ঘৃতাচি বললেন– হে বিশ্বকর্মা, এই ভারতবর্ষ এক পুণ্য ক্ষেত্র। এই মনোরম গঙ্গাতীরে শৃঙ্গার দান করা কি সম্ভব? ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি তপস্যার বলে মোক্ষলাভ করার উদ্দেশে মর্তে আসে, বিষ্ণুর মায়ার বাঁধনে আবদ্ধ থেকে নির্দিষ্ট কর্ম করে। ঈশানমায়া দুর্গাদেবী যার প্রতি সদয় হন, শ্রীকৃষ্ণ তাকে ভক্তি ও ইপ্সিত মন্ত্র দান করেন। আর যে বিষ্ণু মায়ায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পুজো করতে ভুলে যায়, সে হল মূর্খ। হে কামুক, গত জন্মের কথা আমার সব মনে পড়েছে। অন্য জায়গায় পাপ করলে এই গঙ্গায় নাশ হয়। কিন্তু এই গঙ্গাতীরে পাপ কাজে লিপ্ত হলে পাপ লক্ষ গুণ বেড়ে যায়। তাই বলছি আপনি নিশি হয়। কিন্তু এই গঙ্গার কথা আমার সব মুগ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পুজে

বিশ্বকর্মা তখন ঘৃতাচিকে অদৃশ্যভাবে মলয় পর্বতের সেই চন্দন উদ্যানে নিয়ে গেলেন। সেখানে নির্জন স্থানে পুষ্পশয্যাতে তারা সম্ভোগে প্রবৃত্ত হলেন। বিশ্বকর্মার বীর্য ঘৃতাচি নিজের গর্ভে ধারণ করলেন। সেখানেই তিনি নয়টি পুত্রের জন্ম দেন। বিশ্বকর্মা ও ঘৃতাচি তাদের নয় পুত্রকে বরদান করেন। তারপর মানবদেহ পরিত্যাগ করে স্বর্গে ফিরে যান।

ব্রাহ্মণদের আদেশ লঙঘন করার ফলে বিশ্বকর্মার বংশের অনেকে ব্রহ্মার শাপে পতিত হয়েছিল। চিত্রকারের বীর্যে শূদ্রার গর্ভে অট্টালিকাকারের জন্ম হয়। এর বীর্যে এবং কুম্ভকার ও কোটক রমণীর মিলনে সৃষ্টি হয় তৈলকার জাতির। তীবর জাতি এল ক্ষত্রিয় রাজপুত রমণীর সম্ভোগের, স্ত্রীর গর্ভজাত লেট জাতি দস্যু ও পতিত। চণ্ডাল জাতির জন্ম দেয় শূদ্র বীর্য ও ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভ। চণ্ডাল বীর্যে ও চর্মকার গর্ভে মাংসচ্ছেদ জাতির জন্ম হয়।

হে মুনি, গঙ্গা তীরে লেট বীর্য ও তীবর কন্যার মিলনে জন্ম হয় গঙ্গাপুত্রের। বৈশ্য বীর্যে তীবর কন্যাতে শুন্ডী বা শুড়ি জাতির সৃষ্টি হল। বৈশ্য বীর্যে ও শুণ্ডি কন্যাতে শৌণ্ডক জাতির উৎপত্তি হল। রাজপুত জাতির সৃষ্টি হয় ক্ষত্রিয় বীর্য ও কুন কন্যার মিলনের ফলে। এইভাবে

কৈবর্ত্ত, ধীবর, কোয়ালি, সদ্বস্বী, ব্যাধ, হুন্ডি, জাতির সৃষ্টি হল। ক্ষত্রিয় ঔরসে বৈশ্য গর্ভে ঋতুর প্রথমদিনে জাত পুত্রের নাম ধনুর্ধর। তিনি ছিলেন মহাপরাক্রমশালী এক দস্যু।

ক্ষত্রিয় বীর্যে শূদ্রকন্যার ঋতুদোষের কারণে অবিনীত। কুর, নির্ভীক, রণদুর্জয় এক জাতির জন্ম হয়। তারা ম্লেচ্ছ নামে পরিচিত। ম্লেচ্ছর ঔরসে কুবিন্দ কন্যার গর্ভে জোলাজাতির সৃষ্টি হয়। জোলা ও কুবিন্দ মিলন সৃষ্টি হল শারক জাতি। বর্ণ সঙ্কর দোষে এই ভাবে নানা জাতির উৎপত্তি হয়েছে। অশ্বিনী কুমারের ঔরসে ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে বৈদ্যজাতির সৃষ্টি হল। বর্ণসঙ্করের দোষে এইভাবে বহু জাতির উৎপত্তি হয়েছে, যার হিসাব কার ও জানা নেই।

শৌণক জানতে চাইলেন–সূর্যপুত্র অশ্বিনী কুমার কেন ব্রাহ্মণ কন্যাতে বীর্যপাত ঘটিয়ে ছিলেন, তা ব্যাখ্যা করবেন কি? সৌত বললেন– হ্যাঁ সেই কারণ আমি বর্ণনা করছি শুনুন। হে শৌনক অশ্বিনী কুমার একদিন পুষ্পেদ্যানে ভ্রমণ করছিলেন। পথে এক ব্রাহ্মণ রমণীকে হেঁটে যেতে দেখলেন। তিনি তীর্থে যাচ্ছিলেন। ওই রমণীকে দেখে অশ্বিনী কুমার কামাসক্ত হয়ে পড়েন। ব্রাহ্মণী বার বার আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু বলবান অশ্বিনী কুমারের সাথে পারবেন কেন? অশ্বিনী কুমারের বীর্য গর্ভে ধারণ করে ব্রাহ্মণ পত্নী গর্ভবতী হলেন। সেখানেই তাঁর এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হল। তার কান্তি যেন গলা পাকা সোনা। ব্রাহ্মণী পুত্রকে কোলে নিয়ে ফিরে এলেন ঘরে। লজ্জা ও সংকোচে তার মাথা অবনত।

.

পথে যেতে যেতে ঘটেছিল যে ঘটনা সব স্বামীকে বললেন। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কুপিত হয়ে পত্নী ও পুত্রকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। যোগবলে সেই ব্রাহ্মণী গোদাবরী নদীতে পরিণত হলেন। অশ্বিনী কুমার নিজে সেই পুত্রকে চিকিৎসাশাস্ত্র ও নানাধরনের শিল্পকর্মে পারদর্শী করে তুললেন। তাকে মন্ত্রদান করলেন। ওই পুত্র পৃথিবীতে গণক নামে পরিচিত। এই ব্রাহ্মণ লোভী। শূদ্রদের আগে দান গ্রহণ করে, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দেওয়া দানও আগে গ্রহণ করে। তাই তারা অগ্রদানী। আমাদের পূর্বপুরুষ ধর্মবক্তা ও সুত যিনি ব্রহ্মার যজ্ঞের কুণ্ড থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। জাতি নির্ণয়ক কিছু পুরাবৃত্ত বর্ণনা করে শোনালাম।

হে শৌণক, এবার শুনুন সমস্ত জাতির মধ্যে কার সঙ্গে কার কী সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ ব্রহ্মা নির্ণীত। যিনি জন্মদান করেন তিনি পিতা, তাত নামে পরিচিত। প্রসব যিনি করেন তিনি হলেন মাতা, জননী। পিতার পিতা পিতামহ। তার পিতা প্রপিতামহ, তারও ওপরে আছেন যাঁরা হলেন

সগোত্র ও জ্ঞাতি। মায়ের পিতা পিতামহী তাঁর পিতা প্রপিতামহী। মায়ের মাতা মাতামহী। তার মাতা প্রমাতামহী। পিতার ভাই পিতৃব্য বা কাকা, মায়ের ভাই মাতুল বা মামা। পিতার বোন হল পিতৃস্বসা বা পিসি।

মায়ের বোনকে ডাকা হয় মাসুরী বা মাসী নামে। পুত্রকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন তনয়, কন্যার স্বামী জামাতা। পতি, প্রিয়, স্বামী, ভর্তা ও কান্ত নামে স্বামীকে ডাকা হয়। স্বামীর ভাই দেওয়র বা দেবর এবং বোন ননান্দা বা ননদ। প্রিয়া, ভার্যা, জায়া, স্ত্রী নামে পরিচিতা তার ভাই স্বামীর সম্পর্কে শ্যালক এবং বোন শ্যালিকা, পত্নী বা স্বামীর পিতা ও মাতা যথাক্রমে শ্বশুর ও শাশুড়ি নামে ডাকা হয়।

শ্বশুর পিতা জন্মদাতা পিতার সমান পূজনীয়। অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, পত্নীর পিতা, বিদ্যাদাতা ও জন্মদাতা– এই পাঁচ ধরনের পিতা এবং মাতা, কন্যা, ভগিনী, অন্নদাতার স্ত্রী, গুরুপত্নী, মাতৃসদৃশপত্নী, পুত্র পত্নী, মায়ের মা, বাবার মা, শাশুড়ি, বাবার বোন, মায়ের বোন, কাকার স্ত্রী, এবং মামার পত্নী এই চোদ্দ ধরনের মাতা জগতে আছে। পুত্রের পুত্র হল পৌত্র এবং তার পুত্র প্রপৌত্র। প্রপৌত্রের পুত্ররা হল কুলজ এবং বংশধর কন্যার পুত্র দৌহিত্র।

ভ্রাতার পুত্ররা হল জ্ঞাতি। গুরুপুত্র ও ভ্রাতাসম গুরুকন্যা ভগিনীসম। তাই সে মায়ের মতো পূজনীয়। পুত্রের ও কন্যার শ্বশুর সম্পর্কে ভ্রাতৃ স্থানীয় এবং বান্ধব। গুরুর শ্বশুরের গুরু ভাইয়ের গুরু সকলেই নিজের গুরুর মতো প্রণম্য। সুখের কারণে বন্ধুত্ব জন্ম নেয় যাকে বলা হয় মিত্র। আর দুঃখের কারণ শত্রুতা ডেকে আনে যাকে বলে রিপু, যোনিজ বিদ্যাজ ও প্রীতিজ, এই তিন রকম সম্বন্ধ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। প্রীতিজ সৃষ্টি হয় মিত্রতা থেকে, যা জগতে অত্যন্ত বিরল। মিত্রের মা এবং পত্নী মায়ের সমান।

মিত্রের বাবা এবং ভাই নিজের বাবা ও ভাইয়ের সমান। উপপতি ও বন্ধুর সঙ্গে যে দুষ্টু রমণী সম্ভোগ করে তারা হল উপপত্নী। এদের তিনটি ভাগ আছে, নবাজ্ঞা, প্রেয়সী ও চিত্রহারিণী। দেশভেদে নাম সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটে। পুরুষদের চেয়ে স্ত্রী লোকের পক্ষে এই সম্বন্ধ বিশেষভাবে নিন্দনীয়। কিন্তু মহান ব্যক্তিরা এখনও এই সম্বন্ধ পরিত্যাগ করতে পারেনি। তাই অনেক দেশে এ সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। তেজস্বী ব্যক্তিরা এই ধরনের সম্বন্ধকে দোষ বলে মনে করেন না। তাই যুগ যুগ ধরে এই নাম সম্বন্ধ চলে আসছে।

সৌত বললেন–হে ব্রাহ্মণ! এবার আমি সেই বৃত্তান্ত বর্ণনা করছি, যিনি নিজের পত্নীকে ত্যাগ করেছিলেন।

ওই ব্রাহ্মণ ছিলেন ভরদ্বাজ বংশজাত সুতপা। তিনি হিমালয়ে গিয়ে তপস্যায় ব্রতী হন। লক্ষ বছর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কাটায়, আকাশমার্গে পলকের জন্য শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির দর্শন লাভ করেন। তারপর তিনি দেখলেন সেই পরমাত্মাকে যিনি প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন। এ দৃশ্য দেখে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হলেন। তিনি দাস্য ও ভক্তি বিষয়ক বর প্রার্থনা করলেন। স্বয়ং বিধাতা তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। সেখানে এসে হাজির হলেন এক মানসী কন্যা। সেই কন্যার গর্ভে কল্যান মিত্র নামে এক পুরুষের জন্ম হয়। তিনি হলেন মুনি শ্রেষ্ঠ। তিনি অশ্বিনী কুমারের উদ্দেশ্যে অভিশাপ বর্ষণ করলেন। সেই থেকে অশ্বিনী কুমারদ্বয় জগতে অপূজ্য ও অকীর্তিমান হিসেবে রয়ে গেলেন।

ব্রাহ্মণ সুতপা ছেলে কল্যাণ মিত্রকে নিয়ে ফিরে এলেন গৃহে। সূর্যদেব তার দুই পুত্রকে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি ব্যাধিগ্রস্ত পুত্রদের সঙ্গে মুনিশ্রেষ্ঠ সুতপার বন্দনা করতে লাগলেন। সূর্যদেব বললেন–"হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি দয়া করে আপনার অভিশাপ ফিরিয়ে নিন। আপনি ভরদ্বাজ বংশজাত মুনীশ্বর বিষ্ণুর অংশ। যুগে যুগে ধরাধামে ব্রাহ্মণরূপে আপনার আর্বিভাব ঘটে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি সমস্ত দেবতা ব্রাহ্মণ প্রদত্ত পুষ্প ফলফলাদি গ্রহণ করেন। এই ব্রাহ্মণদের দ্বারাই তাঁরা প্রতিপালিত হন। পৃথিবীতে তাই পুজো লাভ করেন।

ব্রাহ্মণদের থেকে শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেউ নেই। কারণ স্বয়ং হরি যেখানে ব্রাহ্মণরূপ গ্রহণ করেছেন। শ্রেষ্ঠ অতএব তিনি প্রীত হলে নারায়ণকে সন্তুষ্ট করা যায়। আর নারায়ণ সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ সমস্ত দেবতারও প্রীত। শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ উত্তম বৈষ্ণব ভগবান শঙ্কর, সহিষ্ণু শ্রেষ্ঠ, পৃথ্বী, শ্রেষ্ঠ সাধ্বী পার্বতী, শ্রেষ্ঠ বলবান দেব, শ্রেষ্ঠ তীর্থ গঙ্গা যেমন তেমনই পুত্রের থেকে অধিকতর প্রিয় আর কেউ হয় না। একাদশী ব্রত যেমন শ্রেষ্ঠ ব্রত। শ্রেষ্ঠ রত্ন ধনের মধ্যে, সমস্ত ধনের মধ্যে বিদ্যা যেমন শ্রেষ্ঠ রত্ন তেমনই সমস্ত আশ্রমে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং তার ন্যায় গুরু আর কেউ হয় না।

সূর্যদেবের মুখে নিজের স্তুতি শুনে ব্রাহ্মণ সুতপা প্রীত হলেন। তিনি সূর্যদেবকে প্রণাম করলেন। নিজের তপস্যার গুণে তার দুই পুত্রকে নীরোগ করে দিলেন এবং তিনি তার অভিশাপ ফিরিয়ে নিলেন। সেই থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় যজ্ঞাংশ–ভাগী হলেন। তাঁরা হলেন জগতের পূজ্য।

সূর্যদেব ব্রাহ্মণ সুতপা সমীপে যে স্তব করেছিলেন। এই স্তব পাঠ করলে বিপ্রপাদ প্রসাদে সর্বত্র বিজয়ী হওয়া যায়, যে প্রত্যহ ভোরে ব্রাহ্মণেভ্যঃ নমঃ মন্ত্র উচ্চারণ করে, সে সমস্ত তীর্থের

ফল লাভ করে। ব্রাহ্মণের পাদোদক এক মাস পান করলে মহারোগীও সুস্থ হয়ে ওঠে। যে মূর্খ ব্রাহ্মণ সর্বদা শ্রীহরিতে ভক্তিমান হয় তাহলে সে বিষ্ণুর সমান হয়। প্রতিদিন ব্রাহ্মণের পাদোদক ও নৈবেদ্য গ্রহণ করলে রাজসূয় যজ্ঞের সমান ফল লাভ করা যায়। একাদশী তিথিতে অনাহারে থেকে যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ ভজনা করেন তার পাদোদকে সেই স্থান তীর্থ স্থানের সমান হয়। যে ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত উচ্ছিষ্ট ভোগ গ্রহণ করেন তিনি পৃথিবীতে পবিত্র হয়ে জীবন্মুক্ত হন।

পদ্মযোনি ব্রহ্মা বলেছেন উচ্চ বংশজাত ব্রাহ্মণ যদি বিষ্ণুকে নিবেদন করা হয়নি এমন অন্ন ও দ্রব্য গ্রহণ করে, তাহলে সেই অন্ন জল মল ও মূত্রের সমান হয়। পিতা, মাতা, মাতামহ সহ ও গুরুর সংসর্গ দোষে যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন না, তিনি মরে বেঁচে থাকেন। যে গুরু বা পিতা বা পুত্র বা সখা বা রাজা কৃষ্ণভক্তিতে মনকে উদ্বুদ্ধ না করে তার সঙ্গী কী দরকার।

যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করে না, পবিত্রতা পালন করে না, শ্রীকৃষ্ণ পদে যার মতি নেই, সে নামেই ব্রাহ্মণ। গুরুদেব যার কানে বিষ্ণুমন্ত্র দান করেন তিনি হলেন জীবন্মুক্ত মহাপবিত্র বৈষ্ণব। বৈষ্ণবরা সবসময় শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মের ধ্যান করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের ন্যায় পৃথিবীতে আর একটি জাতি আছে, তা হল বৈষ্ণব জাতি। স্বয়ং গোবিন্দ সর্বদা বৈষ্ণবদের রক্ষা করে চলেছেন।

ঋষি বংশের উৎপত্তি বিষয় বর্ণনা শেষ করে সুতপুত্র এবার প্রজাদের সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন।

তিনি বললেন– হে শৌণক! হংসী যতি, অরুণী, বোয়ু, পঞ্চাশিখ, অপান্তরতমা ও শনক ছাড়াও ব্রহ্মার পুত্ররা পিতার আজ্ঞা পালন করে চলেছেন। নারদের অভিশাপে স্বয়ং ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিত্যাজ্যা পিতার অভিশাপে নারদ ও গন্ধর্ব কুলে জন্ম নিলেন। গন্ধর্বকুলে তিনি কী ভাবে জন্ম নিয়েছিলেন, সেই বৃত্তান্ত বলছি এখন, সমস্ত গন্ধর্বদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বরাজ্যের অতুল ঐশ্বর্য ছিল তার, কিন্তু ছিল না কোনো পুত্র সন্তান। তাই মনোদুঃখে কাতর ছিলেন। গুরুর আদেশে তিনি পুস্করতীর্থে গিয়ে কৃপানু শঙ্করের ধ্যান করতে বসলেন।

বশিষ্ঠ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে শিবের স্তোত্র, কবচ ও দ্বাদশ পক্ষের মন্ত্র প্রদান করলেন। গন্ধর্বরাজ পরম যত্নে দিব্যশত বছর শিবমন্ত্র জপ করেছিলেন। তারপর ব্রহ্মাতেজে তেজীয়ান এক আলোক পুরুষকে তিনি দর্শন করেন। ইনি হলেন ভগবান শঙ্কর, যিনি ভক্তদের

সর্বদা কৃপা করেন। তাঁর দয়ায় সম্পদহীন সম্পদ লাভ করে। সেই ত্রিলোচন জটাধারী মহাদেব স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। তিনি ত্রিশূল ও পটিশ ধারণ করেন। নীলবর্ণ তাঁর গলদেশ। সর্বজ্ঞ সাপ তিনি উপবীতের মতো ধারণ করে আছেন। তিনি নিজে মৃত্যুঞ্জয় হয়েও সকলের সংহার করেন।

সমুখে হরি ভক্তি প্রদানকারী স্মিতহাস্য বদন শিবকে দেখে গন্ধর্বরাজ বললেন– হে প্রভু, আমাকে হরিভক্তি ও পরম বৈষ্ণব পুত্র দান করুন। ভোলা মহেশ্বর হেসে বললেন– ওহে বৎস। তুমি একবারেই ধন্য হবে। শ্রীহরিতে সর্বমঙ্গলময়ী সুদৃঢ় ভক্তি যার আছে, সে অনায়াসে এই ধরাধামকে পবিত্র করতে পারে। তার পুণ্যে কোটি বংশের কোটি পুরুষ ও মাতামহ বংশের শত পুরুষ উদ্ধার পায়।

কোটি জন্মের তিন রকম পাপ নাশ করে তবেই শ্রীহরির দাস হওয়া যায়। যতদিন সংসারের প্রতি আসক্তি থাকে, ততদিন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের কথা সে বিস্মৃত থাকে। পরম বৈষ্ণবরা সহজেই কোটি কুলকে উদ্ধার করতে পারে। আমরা যেমন বিষ্ণুর দাস, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত, তাই তুমি অন্য কোনো বর প্রার্থনা করো। শ্রীহরির দাসত্ব প্রার্থনা কোরো না। তোমার প্রার্থনা পূরণ করতে আমি অপারগ।

হে শৌণক, গন্ধর্বরাজ একথা শুনে চমকে উঠলেন। তিনি বললেন–ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব, সিদ্ধি, অমরত্ম, জ্ঞান, কিছুই আমার চাই-না, আমি নির্বাণ বা মোক্ষ, কিছুই প্রার্থনা করি না। আমি দুর্লভ হরিদাস হতে অভিলাষী। হে কল্পতরু! আপনি আমাকে বিমুখ করবেন না, কৃপা করে হরিদাস্য ও বিষ্ণুভুক্ত একটি পুত্র দান করুন। আপনি যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ না করেন তাহলে এই মূহুর্তে জীবন ত্যাগ করব। নিজের মাথা কেটে আগুনে উৎসর্গ করব।

কৃপা সাগর ভোলানাথ বললেন– ওহে তোমাকে আমি দুটি বর দান করব। প্রথম বরে হরিভক্তি হরিদাস্য আর দ্বিতীয় বরে পুত্র হবে দীর্ঘজীবী, গুরুভক্ত এবং জীতেন্দ্রিয়। হে মুনি এই কথা বলে শঙ্কর তাঁর নিজের ভবনে ফিরে গেলেন। সন্তুষ্ট চিত্তে গন্ধর্বরাজ ফিরে এলেন আপন গৃহে। গন্ধর্ব রাজের বৃদ্ধা স্ত্রী গন্ধমাদন পর্বতে এক পুত্রের জন্ম দিলেন, সেই পুত্র হলেন মানুষরূপী নারদ। ভগবান বশিষ্ঠ শিশুর নামকরণ করলেন উপবর্ণ অর্থাৎ যে বালক পূজনীয় পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পুজা পায়।

সৌত বলতে লাগলেন–পুত্রের জন্ম উপলক্ষে গন্ধর্বরাজ আনন্দিত চিত্তে ব্রাহ্মণদের দান ধ্যান করলেন। যথাসময়ে উপবহণ গুরু পশিষ্ঠের কাছ থেকে হরিমন্ত্র লাভ করলেন। গুগুকি নদীর

তীরে তিনি তপস্যায় মগ্ন হলেন। এই নব যৌবনে প্রাপ্ত তপস্বীকে দেখে গন্ধর্ব পত্নীর পত্নীরা বিমোহিত হলেন। তারা তপস্যার ফলে যোগবলের মাধ্যমে প্রাণত্যাগ করলেন চিত্ররসের কন্যা হয়ে সেই একশ জন গন্ধর্ব পত্নী আবার জন্ম লাভ করলেন।

তাঁরা কামের বশবর্তী হয়ে আনন্দের অতিশয্যে উপবহণের গলায় মালা প্রদান করলেন, তিন লক্ষ বছর ধরে তিনি ওইসব গন্ধর্ব কন্যাদের সাথে নির্জনে শৃঙ্গার ক্রীড়ায় ব্যাপৃত রইলেন। তাদের সঙ্গে কিছুকাল রাজ্যসুখ ভোগ করলেন। একদিন তিনি হরির গুণকীর্তন করতে করতে পুষ্করতীর্থে এসে হাজির হলেন। তখন দেব সভায় রম্ভা নৃত্য পরিবেশন করছিলেন। দেবতারা তা উপভোগ করেছিলেন।

রম্ভার মসৃণ উরুদেশ ও নিটোল স্তনযুগল দেখে উপবহণ নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি কাম পীড়িত হয়ে সেখানে বীর্যপাত ঘটালেন এবং মূর্ছা গেলেন। দেবতারা এ দৃশ্য দেখে সকৌতুকে হেসে উঠলেন। ব্রহ্মা অত্যন্ত রেগে গেলেন। তিনি অভিশাপ দিলেন– তুমি গন্ধর্বদেহ ত্যাগ করে শূদ্রপুত্র হয়ে জন্মাবে। বৈষ্ণব সংসর্গ লাভ করে আমার কাছে ফিরে আসবে তখন তুমি হবে আমার পুত্র।

হে শৌণক, উপবর্হণের নিজের দেহ ত্যাগ করার অদ্ভুত ঘটনা বলছি এবার শ্রবণ করুন। সেই গন্ধর্বপুত্র ছয় চক্র ও ষোলো নাড়ী ভেদ করে যোগবলে মনের সঙ্গে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ করালেন। এইভাবে তিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করলেন। ত্রিতন্ত্রী বীণা বাঁ কাঁধে রেখে ডান হাতে শুদ্ধ স্ফটিকের শুভ্র মালা ধারণ করে বেদের সারমন্ত্র, পরাৎপর শ্রেষ্ঠ ও নিস্তারবীজ, পরম ব্রহ্ম 'কৃষ্ণ' দুটি বর্ণ জোরে জোরে চিৎকার করে কীর্তন করতে শুরু করলেন। তারপর পূর্বদিকে মাথা ও পশ্চিমদিকে রেখে কুশশয্যা গ্রহণ করলেন।

পুত্রের এই অবস্থা থেকে সস্ত্রীক গন্ধর্বরাজ শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ নিলেন। উপবহণ যোগবলে ব্রহ্মত্ব লাভ করলেন। উপবর্হণের পঞ্চাশ জন পত্নী স্বামীর শোকে বিলাপ করতে শুরু করলেন। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন মালাবতী, শোকবিহ্বল হয়ে মালাবতী শোকবিলাপ করতে লাগলেন– হে নাথ! আমার রমণেশ্বর আমি তোমার শোকে পাগলিনী, দয়া করে দেখা দাও। যে শ্রীপাদ পদ্ম শোভিত গন্ধমাদন পর্বতের নির্জন সেখানে বসন্ত কালে তুমি এই হতভাগিনীর সঙ্গে রমনক্রীড়ায় মেতে উঠেছিলে।

এই মুহূর্তে সে কথা স্মরণ করে মন ব্যথাতুর হয়েছে। যেসব অমৃতবাক্য তুমি আমাকে শুনিয়ে ছিলে, তা মনে পড়ায় মর্মান্তিক কষ্ট পাচ্ছি। হায়! পরমাত্মা কী অতি দারুণ। পতি বিয়োগের

মতো মর্মান্তিক ঘটনা আর কিছুই নেই। শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, চলতে ফিরতে প্রতি সময়ে স্বামী বিচ্ছেদের কথা নতুন নতুন ভাবে উপস্থিত হয়। সকুলজাত রমণীদের কাছে স্বামীই পরম বান্ধব। হে দিকশ্রেষ্ঠ দিকপ্রাণ গন্ধ হে প্রজাপতি, হে ধর্ম, হে গিরীশ, হে কমলাকান্ত আপনাদের কাছে এই হতভাগিনী করুণ মিনতি জানাচ্ছে, কৃপা করে আমার স্বামীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন।

শোকে মুহ্যমান হয়ে মালাবতী সেখানেই লুটিয়ে পড়লেন। প্রিয়কে বুকে চেপে ধরে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলেন সারা রাত। দেবতারা তাঁকে রক্ষা করলেন। সকালে জ্ঞান ফিরতেই আবার চিত্ররথের কন্যা বিলাপ শুরু করলেন।

সেই সতী সাধ্বী স্ত্রী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রার্থনা জানালেন- হে প্রভু, হে শ্রীহরি। হে জগৎ রক্ষাকারী। আমি আপনার সৃষ্ট জগতের এক অভাগিনী। আমাকে রক্ষা করা আপনার কর্তব্য। আপনার মায়াতেই আমি আমার পতি বলে বিলাপ করেছি। এইসব হল কর্মের ছকে বাধা। আসলে আপনি জগতের সকলের স্বামী। হে নাথ! বিধাতার লিখনে আমরা যে যার ভূমিকা পালন করে থাকি। আমরা আসলে কেউ কারও নয়।

এ জগতে মুখলোকর সংযোগ ঘটালে দারুণ আনন্দ ও বিয়োগে প্রাণ সংকট উপস্থিত হয়। কিন্তু আত্মারামের কাছে এসব্য মূল্যহীন। বিষয়বস্তু, বন্ধুবান্ধব সবই নশ্বর। যিনি স্বেচ্ছায় সবকিছু পরিত্যাগ করেন, তিনি হলেন সুখী আর যিনি অন্যের কথায় ত্যাগ করে তিনি দুঃখ ভোগ করেন। এই জগতে সাধুজনরাই জ্ঞানী হতে পারল কই। তাই হে জগদ্বীশ্বর, আমি আমার স্বামীর প্রতি মোহগ্রস্ত। আমি মোক্ষ চাই না, আপনি আমার পতিকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন।

হে হরি! জগতে এমন একজনও নারী নেই, যে আমার মতো পতি লাভ করেছে। আমার স্বামী হরিভক্ত, হরিতুল্য আগুনের মতো যিনি ছিলেন বিশুদ্ধ, সাগরের মতো গম্ভীর, সূর্যের মতো মান দ্বীপ্তিচ্ছটা। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, শুক্রচার্যের মতো কবিত্বক্তি সম্পন্ন।

তিনি সর্বশাস্ত্রে সরস্বতীর তুল্য, ভৃগুর ন্যায় প্রতিভাধর, তিনি চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, কামদেবের মতো সুদৃশ্য, সহিষ্ণুতায় পৃথিবী তুল্য। হায়! এমন গুণসম্পন্ন স্বামী বিহনে আমি কেমন করে এখনও বেঁচে আছি? ধিক আমাকে।

ওহে নিষ্ঠুর দেবগণ! তোমাদের আমি অভিশাপ দেব। তোমাদের অযজ্ঞভাগী হতে হবে আমার অভিশাপে। হে নারায়ণ। আপনি আমার বৈধব্য যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিন। নতুবা অভিশাপ লাভ করবেন। হে প্রজাপতি ব্রহ্মা! আপনি আপনার পুত্রের অভিশাপেও জগতে অপূজ্য হয়ে আছেন। আমার অভিশাপে জগতের ওপর থেকে আপনার অধিকার লোপ পাবে। আর শিব ও ধর্ম এবং যমরাজও আমার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে না। জরা ও ব্যাধিতে আমার স্বামীর মৃত্যু হয়নি। তাহলে তারা নীরব কেন?

মহামতী, পাগলিনী, সাধ্বী মালাবতী স্বামীর মরদেহকে বুকে করে এলেন কৌশিকী নদী তীরে। তিনি দেবতাদের উদ্দেশ্য অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন।

হে শৌনক! তখন দেবতারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। সকলে মিলে ক্ষীর সাগরের তীরে এলেন। বিষ্ণু সমেত সকলে সেই জলে স্নান করে জগদ্বীশ্বর পরমাত্মার স্তব করলেন।

ব্রহ্মা বললেন– হে মাধব! এই সঙ্কট থেকে আমাদের রক্ষা করুন। নিদ্রা, জাগরণে ও সব অবস্থায় আপনি সাধুজনদের সঙ্গ দান করেন। যে আনন্দচিত্তে শ্রীহরির পাদপুজো করে সে সকল বিপদ থেকে আপনার কৃপায় পরিত্রাণ পায়। তাই আপনার দ্বারস্থ হয়েছি আমরা। আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হোন। হে প্রভু, যে সম্পদ আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি আজ তা চিত্ররথের কন্যা ও উপবহনের পত্নীর অভিশাপে হাতছাড়া হতে বসেছে।

মহাদেব বললেন– হে প্রভু আপনার কাছ থেকে লাভ করা সমস্ত দুর্লভ ও অত্যন্ত গোপনীয় মহাজ্ঞান আজ ওই মহিলার অভিশাপে নষ্ট হতে বসেছে। সমস্ত তেজ থেকে শ্রেষ্ঠ এই পতিব্রতার তেজ যার আগুনে আমি দগ্ধ হচ্ছি। আপনি আমাদের রক্ষাকর্তা, দয়া করে ওই নারীকে শান্ত করুন।

ধর্ম বললেন– হে শ্রীহরি। সমস্ত রত্নের শ্রেষ্ঠ সনাতন ধর্মরূপ রত্ন আপনি আমাকে দান। করেছিলেন, তা আজ নষ্ট হতে বসেছে। সপ্তমন্বন্তর কাল ব্যাপী তপস্যার ফলে যে ধর্ম আমি অর্জন করেছি তা এক নারীর অভিশাপে বিনষ্ট হবে। তা কী করে সহ্য করব?

সমস্ত দেবতারা সমস্বরে বললেন– হে গোবিন্দ, আপনার বরে আমরা যজ্ঞাংশ ভাগী হতে পেরেছি, ঘৃত ভোজনের অধিকার লাভ করেছি। সেই অধিকার আজ বিপদগ্রস্ত, আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

দেবতারা সকলে সেখানে নীরবে অবস্থান করতে লাগলেন। হঠাৎ শোনা গেল আকাশবাণী: ওহে দেবতাগণ! তোমরা সকলে সেই নারী মালাবতীর কাছে গিয়ে অবস্থান করো। আমি তোমাদের শান্তি ও রক্ষার ব্যবস্থা করছি। জনার্দনকে পাঠাচ্ছি, সে ব্রাহ্মণবেশে সেখানে হাজির হবে।

দেবতারা আনন্দিত চিত্তে কৌশিকী নদীর তীরে এসে উপনীত হলেন। সাধ্বী মালাবতীর পরণে তখন আগুনরঙা বিশুদ্ধ বস্ত্র, কপালে সিন্দুরের টিপ শোভা পাচ্ছে। অঙ্গ নানা অলঙ্কারে সজ্জিত। তার উজ্জ্বলতা শরৎকালের চাঁদকেও হার মানায়। তার দেহ সুষমায় চারদিক উদ্ভাসিত।

দীর্ঘকাল ধরে তিনি পতির সেবা করছেন। সেই পুণ্য মহান ধর্মের সঞ্চিত তেজে শরীর যেন জ্বলন্ত আগুন শিখা। যোগাসনে বসে মালাবতী বুকে আগলে রেখেছেন স্বামীর মরদেহ। তাঁর ডান হাতে স্বামীর বীণাখানি এবং স্ফটিকের মালা তর্জনী অঙ্গুষ্ঠার মাথায় ধরে আছেন। প্রিয়তম পতির মুখোনি তিনি বারবার অবলোকন করেছেন। ধর্মভীরু দেবতারা এ দৃশ্য দেখলেন এবং বিস্মিত হলেন।

সৌতি বলতে থাকলেন- হে মুনি, শিব ও ব্রহ্মা সমেত অন্যান্য দেবগণ মালাবতীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। মালাবতী তাদের ভক্তি সহকারে প্রণাম জানালেন। মৃত স্বামীকে তাঁদের পায়ের কাছে রেখে বিলাপ করতে শুরু করলেন।

সেখানে এমন সময় লাঠি, ছত্রধারী, শ্বেতবসনা এক বালকের আবির্ভাব ঘটল। তার কপালে টিপটিপ জুলজুল করেছে। তার হাতে একটি মস্ত বড়ো বই। চন্দন চর্চিত দেহখানি ব্রহ্মাজ্ঞ সম্মুজ্জ্বল। সেই বিচক্ষণ বালক দেবতাদের মাঝখানে উপবেশন করলেন। ঠিক যেন, নক্ষত্র মাঝে চাঁদের আবির্ভাব। তিনি প্রত্যেক দেবতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন– এখানে আপনাদের আগমনের কারণ কী? জগতের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ব্রহ্মা কেন এখানে পাদপদ্ম রচনা করেছেন?

শঙ্করই বা কী জন্য এখানে আবির্ভূত হয়েছেন? ত্রিভুবনের সমস্ত কাজের হিসাব রাখেন যিনি, সেই ধর্মকেও এখানে দেখতে পারছি। সূর্য দেব চন্দ্র, অগ্নি, কাল, সূত্যু কন্যা ও যম আপনারা কেন এখানে এসেছেন? তারপর মালাবতীর দিকে তাকিয়ে সেই বালক বললেন–মালাবতী, তুমি কার শুকনো মরদেহ বুকে আগলে আছ? জীবিত স্ত্রীর কোলে এই শবদেহ মানায় না।

মালাবতী সেই বালক ব্রাহ্মণকে প্রণাম জানালেন। বললেন– হে ব্রাহ্মণরূপী জনার্দন! আমি এক শোক পীড়িতা নারী। আমি চিত্ররসের কন্যা, গন্ধর্বরাজ উপবর্হন আমার স্বামী। আমি মালাবতী, হে। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, সতী নারীর পতির প্রতি কী ধরনের স্নেহ থাকে, তা আশাকরি আপনার অজানা নয়। ব্রহ্মার শাপে হঠাৎ আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। আমি তাই শোকবিহ্বল হয়ে পড়েছি। দেবতাদের কাছে নিবেদন জানাচ্ছি তারা যেন আমার স্বামীর দেহে প্রাণ সঞ্চার করেন। কিন্তু আমার এই হাহাকার এই শোক ক্রন্দন কারও কানে পৌঁচচ্ছে না।

সকলেই যে যার কাজে ব্যস্ত, স্বার্থপরের দুঃখ শোনার মতো সময় কোথায় তাদের। সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক সন্তাপ, ঐশ্বর্য, জন্ম, মৃত্যু সবই সৃষ্টি করেছেন দেবতারা। তারা সকলে কর্মানুসারে বর দান করেন। কর্মরূপ বৃক্ষের মূল তারা ইচ্ছেমতো তুলে ফেলতে পারেন। দেবতারা হলেন শ্রেষ্ঠ দয়ালু ও দাতা, তাদের ওপরে আর কেউ নেই। দেবতারা হলেন কল্পবৃক্ষ। তাদের কাছে যা প্রার্থনা করা যায়, তাই পাওয়া যায়। আমার মনোবাঞ্ছা পূরণে যদি তারা অপরাগ হন, তাহলে আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবেন তারা। তাদের আমি অভিশাপ দেব, যা নিবারণ করার ক্ষমতা দেবতাদের নেই।

হে শৌণক! সেই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ জনার্দন বললেন– হে মালাবতী। দেবতারা ফলদাতা একথা অস্বীকার করি না। তবে ফল দানের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয়, ঠিক যেমন বীজ বোনার সঙ্গে ধান পাওয়া যায় না। এর জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এই ভারতের মাটিতে পুণ্যবান জনেরা দীর্ঘকাল তপস্যা করার পরে কর্মফল লাভ করে। তাই বল, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, ধন, স্ত্রী, পুত্র, পতি কোনো কিছুই তপস্যার তুল্য নয়। মহাত্মা জ্ঞানানন্দ, মঙ্গল পরমেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় শিবকে যে পুরুষ বা নারী ভক্তি ভরে ভজনা করে সে সতীস্ত্রী বা সৎ পতি লাভ করে। ভোলা মহেশ্বর তাকে জ্ঞান, বিদ্যা, পুত্র, সংসার, ঐশ্বর্য, বল ও বিক্রম দান করেন। ব্রহ্মাকে প্রীত করতে পারলে শ্রী বিদ্যা, ঐশ্বর্য, আনন্দ ইত্যাদি লাভ করা যায়। দীননাথ সূর্যের উপাসনা ভক্তি ভরে করলে বিদ্যা, আরোগ্য, ধন, পুত্র লাভ হয়। সমস্ত দেবতাকে পুজো করার আগে যে দুর্গা-নন্দন গণেশের আরাধনা করে সে স্বপ্নে ও জাগরণে সমস্ত রকমের বিঘ্নের বিনাশ ঘটাতে পারে। সুরেশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারলে সমস্ত অভীপ্সা পূর্ণ হয়। তার নিষ্কাম মোক্ষলাভ হয়। মূর্খ লোক বিষ্ণুর পুজো দিয়ে বর প্রার্থনা করে সে বিষ্ণুর মোক্ষ মায়ায় আচ্ছন্ন হয়, কিন্তু নারায়ণী তাঁকে বিষ্ণুমন্ত্র দান করে কৃতার্থ করেন।

ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মের ভজনা করে সকল ধর্মকে জয় করে। সেই ব্যক্তির ইহলোকে গমন হয়, এবং বিষ্ণুঃসঙ্গ লাভ করে। আগে যে দেবতাকে পুজো করে তুষ্ট করা যায় সেই দেবতার অপার

করুণা তার ওপর বর্ষিত হয়। কিন্তু নির্গুণ লোক প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে ভজনা করে সে জীবন্মুক্ত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যে ভগবানকে আরাধনা করেন, তিনি সকলের পূজনীয়, তিনি অক্ষয়। পরম ব্রহ্মা তার কোনো আকার নেই, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি পরমানন্দ।

হে মালাবতী! কৃষ্ণভক্তের কাছে মুক্তি, ব্রহ্মত্ব, অমরত্ব ও নির্বাণ মোক্ষ মূল্যহীন। তার কাছে। ধনসম্পদ মাটির ডেলা ছাড়া আর কিছু নয়। সেই ভক্ত সবসময় কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা থাকে সে। শ্রীকৃষ্ণের দাস হতে চায়। সেই সুস্থির ব্যক্তির পুণ্য ফলে নিজের কোটি কুল, মাতার শতকুল এবং শ্বশুরের পূর্বকূল অনায়াসেই উদ্ধার পায়। কৃষ্ণভক্ত গোলোকে গমন করে কৃষ্ণ সেবা করে সে গর্ভ থেকে মুক্তি পায়। তার আগে পর্যন্ত সে যম যন্ত্রণা ভোগ করে। তখন সে হয় সংসারী। ভোগ বাসনা করে। গুরু যার কানে বিষ্ণুমন্ত্র উচ্চারণ করেন, যমরাজ ভীত হয়ে তার ললাট লিখন পালটে দেন।

সেই হরিভক্তের কোটি জন্মের পাপও ধুয়ে মুছে যায়। তার যত পুরোনো ভালোমন্দ কর্ম সব শ্রীকৃষ্ণের চক্রের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। ওই চক্রের ভয়ে জরা ও মৃত্যু ওই কৃষ্ণভক্তের কাছ ঘেঁষতে সাহস পায় না। তখন সেই ব্যক্তি নির্ভয় নিজের মানবদেহ ত্যাগ করে গোলোকে গমন করে। সেখানে গিয়ে দিব্য দেহ ধারণ করে এবং মনপ্রাণ কৃষ্ণ সেবায় সঁপে দেয়। গোলোকে কৃষ্ণ যতদিন অবস্থান করবেন ওই হরিভক্ত ততদিন সেখানে থাকতে পারবেন।

জনার্দন বলতে থাকেন– ও হে সাধ্বী নারী! তুমি কী জানো, কোন ব্যাধিতে তোমার স্বামী মারা গেছে? আমি একজন চিকিৎসক। রোগে মৃত বা মৃতের ন্যায় যে কোনো লোককে আমি ব্যাধি মুক্ত করতে পারি। কোন কোন কারণে মানুষের শরীর রোগক্রান্ত হয়। তাও আমার অজানা নয়। যে লোক যোগ বলে বা দুঃখ শোকে প্রাণ হারায় তাকে আমি যোগধর্মের সাহায্যে বাঁচিয়ে তুলতে পারি।

ব্রাহ্মণরূপী জনার্দনের এসব কথা শুনে মালাবতী অত্যন্ত খুশী হলেন। বললেন– সত্যি, আজ আমি ধন্য হলাম। দেখতে বালকের ন্যায়। অথচ জ্ঞান দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে যাচ্ছি। আপনি আমার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছেন। আমি ধরেই নিতে পারি, তিনি আবার বেঁচে উঠেছেন।

কারণ সৎ ব্যক্তি কখনও কথার খেলাপ করেন না। হে শ্রেষ্ঠ, বৈদজ্ঞ পুরুষ আমি জানি, আপনি আমার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেবেন। তবুও কয়েকটা প্রশ্ন আমার মনে উঁকি দিচ্ছে।

এখানে যেসব দেবতারা উপস্থিত আছেন, আপনার মতো শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ পুরুষ আছেন, কিন্তু আপনারা কেউই আমার নিয়ন্তা নন।

স্বামীই স্ত্রীকে রক্ষা করে আবার শাস্তি দেয়– এক্ষেত্রে কেউ বাধা দান করতে পারে না। নারীদের কাছে স্বামীই কর্তা, পরম অভীষ্ট, দেবতা ইন্দ্র, ব্রহ্মা বা রুদ্রের থেকেও স্বামী হয় পূজনীয়। সদবংশ জাতা কন্যা পতির বশে থাকে, কিন্তু নীচবংশে যে নারীর জন্ম হয় সে সর্বদা পরপুরুষাভিমুখী হয়, সে হয় কুলটা এবং স্বেচ্ছাচারী। স্বামী নিন্দায় তারা সর্বদা মুখর থাকে।

হে ব্রাহ্মণ! আমার প্রথম পরিচয় আমি উপবনের ঘরণী। চিত্ররথ আমার পিতা, গন্ধর্বরাজ আমার শ্বশুর। আমি একজন পতিভক্তা নারী। হে বেদজ্ঞ! আপনার ক্ষমতা অসীম। কাল, যম ও মৃত্যুকন্যার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। দয়া করে তাঁদের এই সভায় আনয়ন করুন।

জনার্দন মুহূর্তের মধ্যে সকলকে সেখানে হাজির করলেন। প্রথমে দেখা গেল শ্রেষ্ঠকন্যা মৃত্যুকে, শান্ত, ছয়হাত বিশিষ্টা কালো বর্ণা, গাঢ় রক্তবর্ণ বসনা। সেই ভয়ংকরী রূপধারী দেবীর মুখে স্মিত হাসি। স্বামী মহাকালের বাঁদিকে তিনি অবস্থান করেছেন। তার চৌষট্টি পুত্রকেও তার সঙ্গে দেখা গেল।

ছয় মুখ ষোলোটি হাত, চব্বিশটি চোখ আর ছয়টি পা বিশিষ্ট এক ভয়ংকর মূর্তির দিকে মালাবতী নজর দিলেন। তিনি হলেন মহাকাল। নারায়ণের অংশজাত, গ্রীষ্মের সূর্যের ন্যায় তার তেজ কালো বর্ণের উত্তম লালবস্ত্র পরিহিত। ইনি হলেন সংহারকারী। তিনি ভগবান সনাতন, সকলের নিয়ন্ত্রক তাঁকে খুব সুখী মনে হল কারণ তার ঠোঁটে হাসির টুকরো, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পরম ব্রহ্মা শ্রী কৃষ্ণের উদ্দেশ্য জপমালা ঘুরিয়ে জপ করছেন।

তারপর এলেন ধর্ম স্বরূপ এবং ধর্মাধর্ম বিচারকারী সনাতন ভগবান যমরাজ। তিনি ও পরমব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তবে ব্যাপৃত।

মালাবতী সকলকে দেখে খুশি হলেন। তিনি প্রথমে যমরাজের কাছে প্রশ্ন রাখলেন– হে ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত যমরাজ! আপনি কি বলতে পারেন, অকালে আমার স্বামীর প্রাণ কেন কেড়ে নিলেন?

যমরাজ জবাবে বললেন–হে সতী সাধ্বী নারী! মৃত্যুর সময় না হলে কেউ কারো প্রাণ কেড়ে নিতে পারে না। ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ দাস আমি। যাদের পরমায়ু শেষ হয়, তারাই ঈশ্বরের

মৃত্যুকন্যা ও দুর্দান্ত ব্যাধি, মৃত্যুদেশে প্রেরিত হয়। মৃত্যুকন্যা বিচার করে পরমায়ু শেষকারীকে গ্রহণ করে আমি তাকে অধিকার করি। তাই মৃত্যুকন্যাই তোমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে।

মালাবতী বললেন– হে মৃত্যুকন্যা! স্বামীর শোক যন্ত্রণা যে কী দুঃসহ, তা তোমার অবিদিত নয়, তা হলে তুমি কেন আমার স্বামীকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন?

মৃত্যুকন্যা বললেন– এই কাজ করার জন্য বিধাতা পুরুষ আমাকে জন্ম দিয়েছেন। কোনো সদবংশজাতা তেজস্বী নারী যদি আমাকে অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করে দিতে পারে, তবেই আমি ধ্বংস হব। তাই বলছি হে সুন্দরী! আমি এবং আমার পুত্র ব্যাধি কালের দ্বারা প্রেরিত হয়ে সব কাজ সমাধা করি। আমাদের কোনো দোষ নেই।

মালাবতী এবার ধর্ম মহাত্মা কালের কাছে প্রশ্ন রাখলেন– হে ভগবান মহাকাল! আপনি সমস্ত কাজের সাক্ষী। সমস্ত কর্মের নিয়ন্তা আপনি, নারায়ণের অংশরূপ, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি সর্বজ্ঞ, তাই আমার দুঃখের কারণ আপনার অজানা নয়। বলুন কেন আপনি আমার পতির প্রাণ কেড়ে নিলেন।

মহাকাল বললেন– হে সতী তুমি ভুল করছ, এই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি কর্তাই আসল মালিক।

আমরা কে? আমরা তাঁর আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। যার ভয়ে বায়ু বয়, সূর্য আলো দেয়, যাঁর আজ্ঞায় ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, যাঁর শাসনে ভগবান শিব সমস্ত জগত সংসার ধ্বংস করেন, ধর্ম যার আজ্ঞা পালন করেন, সমস্ত কাজের সাক্ষী থাকেন, যার আজ্ঞায় রাশি চক্র ও গ্রহগুলি আপন কাজ করে চলেছে, যার ভয়ে ক্ষমাবতী পৃথিবী মাঝে মাঝে আন্দোলিত হয়, এমনকি প্রকৃতি দেবীও তার ভয়ে মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠেন, যার আজ্ঞায় পৃথিবীতে জল গাছপালা, পাহাড়, পর্বত ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে, বেদ পুরাণাদি সমস্ত যার স্তুতি বন্দনা করে, যিনি পরাৎপর, যিনি মৃত্যুরও মৃত্যু, যিনি কালের কাল সেই সমস্ত বিঘ্ন নাশকারী সৃষ্টিকর্তা শ্রীকৃষ্ণের পুজো করো।

তিনি কৃপার সাগর। তিনি তার ভক্তের সকল অভীষ্ট পূরণ করেন।

কালপুরুষের কথা শেষ হলে ব্রাহ্মণরূপী জনার্দন বললেন– হে শুভাকন্যা! তুমি কি আর কোন প্রশ্ন করতে চাও? মালাবতী আনন্দিত চিত্তে বললেন– হ্যাঁ, আপনি এমন উপায়ের কথা বলুন,

যার সাহায্যে প্রাণীরা অমঙ্গলকর প্রাণনাশকারী ব্যাধির হাত থেকে রেহাই পায়। আপনি দয়া করে এর ব্যাখ্যা বিস্তৃত করুন।

ব্রাহ্মণবেশী নারায়ণ বৈদিকী সংহিতা ও সংহিতার্থ বলতে শুরু করলেন। যিনি বেদ ও বেদাঙ্গের বীজের বীজ স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম নিবেদন করি, সেই পরমেশ্বরকে বন্দনা করি যিনি সকল মঙ্গলের মঙ্গলকর বীজ স্বরূপ। মঙ্গলের কেন্দ্ররূপ হল চারটি বেদঋক, সাম, যজুর ও অথর্ব। প্রজাপতি ব্রহ্মা আয়ুর্বেদ নামে আর একটি বেদের সৃষ্টি করেছেন। সেই পঞ্চম বেদ সূর্যদেবতাকে ব্রহ্মা উপহার হিসেবে দিলেন। অথর্ববেদ থেকে সূর্যদেব সংহিতা নামে আর একটি বেদ রচনা করে শিষ্যদের মধ্যে দান করলেন। শিষ্যরা তাদের সংহিতা শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে এক-একটি সংহিতার জন্ম দিলেন।

ষোলজন ব্যাধিনাশক বৈদ্য হলেন–ধন্বন্তরি, দিবোদাস, কপিরাজ, অশ্বিনীর দুই পুত্র নকুল, সহদেব, যমরাজ, চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি পৈল, করথ ও অগস্ত্য। এঁরা বেদ ও বেদাঙ্গ শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ বিশারদ। এঁরা প্রত্যেকেই চিকিৎসা সম্পর্কীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ধন্বন্তরি চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান দিবোদাস–চিকিৎসা দর্পণ, কাশিরাজ–চিকিৎসা কৌমুদী, অশ্বিনী পুত্রদ্বয় চিকিৎসাসার তন্ত্র। নকুল–বৈদ্যক সর্বস্ব, সহদেব-ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দন যমরাজ-জ্ঞানার্নব। চ্যবণ–জীবদান। জনক–বৈদ্যসন্দেহ ভঞ্জন। চন্দ্র পুত্র বুধ– সর্বসার, জাবাল-তন্ত্রসার। জাজলি-বেদঙ্গসার। পৈল-নিদান করথ-সর্বধর এবং অগস্ত্য মুনি দ্বৈধনির্ণয়তন্ত্র নামে তন্ত্র রচনা করেন। গ্রন্থে রোগদূর করার মূল কারণ ও শক্তি সঞ্চয়ের বিধান দেওয়া আছে।

হে সুন্দরী! বৈদ্য কেবল আয়ুর্বেদশাস্ত্র জানে, চিকিৎসা ব্যাপারে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, বৈদ্যত্বই তার পরিচয়। কিন্তু আয়ুদান করার ক্ষমতা তার নেই। রোগের উৎপত্তির মূল কারণ জ্বর। তিনটি পা, তিনটি মাথা, ছয়টি হাত এবং নয়টি চোখ বিশিষ্ট ভয়ংকররূপী জ্বর ভস্মরূপ অস্ত্র ধারণ করে আছে। কালান্তক যমের সমান এই জ্বর, এই শিবভক্ত এবং যোগী জ্বর জন্ম লাভ করে মন্দাগ্নি থেকে। শ্লেখা, পিত্ত ও বায়ু হল মন্দাগ্নির জন্মদাতা। বায়ুজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও ত্রিদোষজ এই জ্বরের চারটি প্রকার।

হে মালাবতী! ব্যাধির ৬৪ রকম ভেদ আছে– যেমন পান্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, শোথ, কাশ, ব্রণ, প্লীহা, শূল, জরা, অতিসার, হলীমক, মূলুকৃচ্ছ, গুল্ম, রক্তদোষ, বিকার বিষমেহ, কুজ, গোদ গলগণ্ডক, ভ্রমরী, গ্রহণী অগ্নিপাত, বিসূচী দারুনী, প্রভৃতি। জরা বাদে এরা সকলেই মৃত্যু কন্যার পুত্র, জরা তার কন্যা। উপায়বেত্তা ও সংযত যারা তাঁদের কাছে ঘেঁষতে এরা ভয় পায়।

চোখে জল দিলে, ব্যায়াম করলে, পায়ের নীচে তেল দিলে, দুই কানে ও মাথায় তেল দিলে জ্বরা ও ব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বসন্তকালে ভ্রমণ করে যে অল্প পরিমানে অগ্নিসেবা এবং যথা সময়ে যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে, জরা তার থেকে দূরে থাকে।

খিদে পেলে যে পেট ভরে আহার করে, জল পান করে তেষ্টা মেটায়, প্রতিদিন পান খায়, সেই লোকের ধারেকাছে জরা এগোয় না। শীতকালে গরম জামাকাপড় পরলে, অল্প গরম খাবার খেলে, অল্প গরম জলে স্নান করলে জরাকে জয় করা যায়। যে লোক সংযোগী প্রতিদিন, দুধ, দই, খই, গুড় খায়, সে লোক জ্বরা দ্বারা আক্রান্ত হয় না। যে লোক হেমন্তকালে ঘরের জলে স্নান করে, আগুন পোহায়, অল্প গরম নবান্ন খায় সে জরাগ্রস্ত হয় না।

যে লোক বৃষ্টির জলে স্নান করে না, প্রতিদিন রুটিনমাফিক ভোজন করে তার কাছ থেকে জরা অনেক দূরে থাকে। যে লোক সদ্য মাংস ও নতুন ভাত খায়, যুবতীর সেবা করা দুধ, ঘি খায়, জরা তার কাছে যেতে ভয় পায়। যে লোক খাতের ঠান্ডা জলে স্নান করে, গায়ে চন্দন লেপন করে এবং গ্রীষ্মকালে মুক্ত বায়ু গ্রহণ করে তার জুরা ব্যাধি হয় না।

ওহে সতী নারী! যে লোক রাতের বেলায় দই খায়, কুলটা ও রজঃস্বলা স্ত্রীর কাছে যায়, জরা এবং তার ব্যাধি ভাইরা তার কাছে গিয়ে হাজির হয়। রজঃস্বলা, কুলটা, সবীরা, জার, দুতিকা, শূদ্রযাজকপত্নী ও ঋতুহীনা নারীর কাছ থেকে অন্ন খেলে যে পাপ হয় তা ব্রহ্মা হত্যার সমান। এইসব লোক খুব শীঘ্র জুরা দ্বারা আক্রান্ত হয়। ব্যাধি, জরা, দৈন্যতা, দুঃখ, শোক–সব কিছুর মূলে আছে পাপ, যে সর্বদা বর্ণ মেনে চলে, ব্রত ও উপবাস পালন করে, তীর্থে ভ্রমণ করে, গুরু, দেবতা ও অতিথির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, যে হরির সেবা করে সে তোক জরা এবং ব্যাধিগুলিকে জয় করতে পারে। তবে এসবই একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। সময় হলে সবই ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে।

হে নারী! এবার শোনো, রোগ কী ভাবে প্রাণীদেহে সংক্রমিত হয় তার কথা, প্রথমে পিত্ত সৃষ্টির কারণগুলি সম্পর্কে বলছি, তাল ও বেল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি জল পান করা হয় তাহলে পিত্তের সৃষ্টি হয়। প্রচন্ড খিদের সময় খাবার না খেলে পিত্ত দেখা দেয়। শরৎকালে গরম জল ও ভাদ্র মাসে তেঁতো রস পান করার ফলে পিত্ত দেখা দেয়। ঠান্ডা চিনির জলে ধনের গুঁড়ো, ছোলা এবং দই ও ঘোল ছাড়া অন্যান্য সব রকম গব্য, পাকা বেল ও তাল, আখের রস থেকে তৈরি সবরকমের খাবার। আদা, মুগকলায় জুস, চিনি মেশানো তিলের গুঁড়ো এসব বস্তু পিত্ত নাশ করে, পুষ্টি ও বল বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

এবার শ্লেষ্মর কারণগুলি বলছি। তেষ্টা না পেলেও জল পান করা, আহারের পরে স্নান করা, বাসি খাবার, পাকা কলা, পাকা তরমুজ খেলে, অত্যন্ত ঠান্ডা জল, বৃষ্টির জল, চিনির জল, নারকেলের জল পান করলে, তিল তেল, ঠান্ডা তেল ব্যবহার করলে, বর্ষাকালে জলে স্নান করলে শ্লেষ্মা আক্রমণ করে। ব্রহ্মর চক্র শ্লেষ্মর উৎপত্তি স্থল। শ্লেষ্মর দ্বারা আক্রান্ত হলে দেহের শক্তি কমে যায়। শ্লেষ্ম বিনাশকারী হিসেবে শুকনো ও পাকা হরতকী, ঘি মেশানো হলুদের গুঁড়ো। ঘি মেশানো শুকনো চিনি, পিপুল, শুকনো আদা, জীবক, কাঁচকলা ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারো। এর ফলে বল ও পুষ্টিলাভ হয়।

আহারের পরেই ছুটোছুটি করা বা দৌড়ানো, আগুনের তাপ গ্রহণ করলে, ঘুরে বেড়ালে, যখন তখন স্ত্রী সম্ভোগ, বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস, অত্যন্ত শুকনো কোনো কিছু খেলে, ঝগড়া করলে, খারাপ কথা বললে, ভয় ও শোক পেলে বায়ুর উৎপত্তি হয়। আজ্ঞাচক্রে এর জন্ম হয়। বীজ সমেত পাকা কলা, চিনির সরবত, নারকেলের জল, টাটকা তত্ত্ব, মোষের দুধ এবং সেই দুধ থেকে তৈরি দই অথবা চিনি মেশানো দই, বাসি অন্ন, সৌবীর, ঠান্ডা জল, পাকা তেল, বিশুদ্ধ তিলতেল, নারকেল, তাল, মেথি, খেজুর, শীতল জলে স্নান, সুগন্ধ-চন্দন মাখা, স্নিগ্ধ পদ্মপত্রের শয্যায় শয়ন করা, শীতল পাখার বাতাস খাওয়া এইসব বায়ু নাশকারী দ্রব্য।

আমি তোমাকে যেসব ব্যাধির কারণ ও তার বিনাশের কথা বর্ণনা করলাম, এইসব সাধু ব্যক্তিরা নানা তন্ত্রগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছে। বিচক্ষণ মহাত্মারা যে সমস্ত রোগ ক্ষয়কর তন্ত্রসমূহের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন তা বলে শেষ করা যাবে না। তুমি কি জানো, কোন রোগ তোমার স্বামীর মৃত্যুর কারণ আমি তাহলে হয়তো একটা উপায় বলতে পারি। যার সাহায্যে তুমি তোমার জীবন্ত স্বামীকে ফিরে পেতে পারো।

উপবর্হন ঘরণী বললেন–আমার স্বামী ব্রহ্মার অভিশাপে লজ্জা ও সঙ্কোচ নিয়ে যোগবলে প্রাণত্যাগ করছেন। আপনি এতক্ষণ যে মনোহর উপাখ্যান শোনালেন, তাতে বুঝলাম, বিপদ ব্যতীত কারোরই কোনো মঙ্গল হয় না। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, তাই বলছি, আপনি অনুগ্রহ করে আমার প্রাণাধিক পতির দেহে প্রাণ সঞ্চার করুন। আমি আপনাদের প্রণাম করে আনন্দিত চিত্তে নিজগৃহে গমন করি।

.

সৌতি বলতে থাকলেন– এই কথা শুনে ব্রাহ্মণরূপী শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। ব্রাহ্মণ সমস্ত দেবতাদের সম্বোধন করে মধুর ভাষায় প্রাণীদের হিতকর এই সত্য কথা শোনালেন।

ব্রাহ্মণ বললেন– উপর্বহনের ভার্য্যা ও চিত্ররথের কন্যা পতিশোকে কাতর হয়ে স্বামীর প্রাণভিক্ষা করেছে। এই অবস্থায় আমার কী করা উচিত, আপনারাই তার বিধান দিন। ওই সতীসাধ্বী রমণী আপনাদের অভিশাপ দিতে উদ্যত হলে আমিই তাঁকে নানা কথা বলে শান্ত করেছি। আপনারা শ্রীহরির দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি আপনাদের বিপদ থেকে কেন রক্ষা করতে এলেন না। কেবল দৈববাণী শোনলেন– তোমাদের শান্তির ব্যবস্থা করাচ্ছি। এইসব কি কেবল কথার কথা।

জগদগুরু ব্রহ্মা বললেন–সেই চরম সত্য কথা– আমার পুত্র নারদ আমরাই অভিশাপে উপবর্হন নামধারী গন্ধর্ব রূপে জন্ম নিয়েছিলেন। আমিই তাকে যোগবলে দেহত্যাগ করার শাপ দিয়েছি। সে লক্ষ যুগ ধরে পৃথিবীতে থাকবে। তারপর শূদ্র যোনিতে জন্ম দেব। তারপর আমি আমার পুত্র হিসেবে তাকে গ্রহণ করব। সেই নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হতে এখনও হাজার বছর বাকি। বিষ্ণুর কৃপায় আমি তার জীবন ফিরিয়ে দেব।

কোনো অভিশাপ তাকে যাতে স্পর্শ করতে না পারে তারও উপায় এবার করব। হে ব্রাহ্মণ! আপনার কথা ধরেই বলছি, শ্রীহরির পাদস্পর্শ এখানে পড়েছে। তিনি এখানে উপস্থিত, অথচ আমরা তাকে কেউ দেখতে পারছি না। কারণ তিনি নিরাকার। নিরাকারের কোনো অবয়ব হয় না। ভক্তদের প্রতি দয়া করে সেই পরম ব্রহ্ম নিজ মূর্তি ধারণ করেন। তিনি সর্বদ্রষ্টা, তিনি সর্বজ্ঞানী, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, 'বি' ওষ ব্যাপ্তি এবং 'ণু হল সর্বত্র কাজে বোঝায় অর্থাৎ, বিষ্ণু সেবা করলে দেহ ও মন পরিশুদ্ধি লাভ করে।

হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ! অসম্পূর্ণ কাজ বিষ্ণুর অনুগ্রহে সম্পূর্ণতা লাভ করে। তার আজ্ঞায় আমি জগতের সৃষ্টিকর্তা হয়েছি। মহাদেব সংহারকর্তা আর ধর্ম সমস্ত কাজের সাক্ষী। যার আদেশে ভীত হয়ে মহাকাল সমস্ত লোককে সংহার করেন, যমরাজ সকলকে শাস্তি দেন আর মৃত্যু তাকে গ্রাস করে। যে প্রকৃতি সকলের মূল, সকলের জননী, সকলের ঈশ্বরী, তিনিও তাঁর আজ্ঞা পালনের জন্য তটস্থ থাকেন। সেই পরম পুরুষের কথা আপনি জানেন নি?

শিব বললেন– হে ব্রাহ্মণ, আপনার পরিচয় কী? কোন বংশে জাত? মুনি, আপনার গুরু কে? পরমাত্মা দেহত্যাগ করলে সে দেহ শূন্য হয়ে পড়ে থাকে। সেই পরমাত্মার পেছন পেছন যায়

জীবাত্মা, মন, জ্ঞান, চেতনা, প্রাণ, ইন্দ্রিয় সব কিছু শক্তি সর্বদা অনুসারী ঈশ্বর হয়। কারণ এসব শক্তি তারই আজ্ঞা পালনকারী মাত্র। পরমাত্মাবিহীন দেহ অস্পৃশ্য ও ত্যাজ্য হয়। সেই মহান শক্তিধরকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যুগ যুগ ধরে শ্রীহরির আজ্ঞা অনুসারে ব্রহ্মা সৃষ্টি করে চলেছে। শ্রীচরণ কমল সব সময় ধ্যান করেন, সেই ব্রহ্মা কখনও তার দর্শন লাভ করতে পারেনি।

আমি শিব, সর্বদা তার শ্রীচরণ বন্দনা করে চলেছি। তবুও আশ মেটে না, পাঁচ মুখে তার নাম গান করি বলেই মৃত্যু আমায় গ্রাস করতে পারে না। যে লোক সর্বদা হরিনাম সংকীর্তন করে তাকে মৃত্যু স্পর্শ করতে পারে না। অনন্তকাল ধরে তপস্যা ও তার নাম জপ করার পুণ্যফলে আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সংহারকারী হতে পেরেছি। আগুন ও স্ফুলিঙ্গের মধ্যে যেমন কোনো পার্থক্য থাকে না, সেই রকমই তাঁর এবং আমাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। গোলকে, বৈকুণ্ঠে, শেতদ্বীপে একাই তিনি বিরাজ করছেন। আমি এবং অন্যান্য ঋষিগণ সেই পরামাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশ মাত্র। তার মহিমার কথা বলে শেষ করা যায় না।

সৌত বললেন– শঙ্করের বলা শেষ হলে ধর্ম কৃষ্ণের মাহাত্ম শোনাতে মুখর হলেন। তিনি বললেন– হে ব্রাহ্মণ! তোমার প্রশ্ন শুনে আমি হতবাক হয়ে যাচ্ছি। যিনি সকলের অন্তরাত্মা, সাধুজন যাকে সর্বদা প্রত্যক্ষ করে, দুরাত্মাকে যিনি প্রত্যক্ষ করেন না, যিনি সর্বত্র বিরাজমান, যিনি সবকিছু চোখ দিয়ে দেখছেন তিনি কেন এই দেব সভায় উপস্থিত হননি। সে প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারছি মুনিদেরও। মতিভ্রম হয়। কোনো মহাত্মা কোনো সাধুর নিন্দা শোনেন না।

যে নিন্দা শোনে এবং যে নিন্দা করে উভয়েই পাপী সাব্যস্ত হয়। কুম্ভী পাক নরকে গমন করে। যদি বা কোনো ব্যক্তি কোনো মহাত্মার নিন্দার কথা শ্রবণ করেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিষ্ণুর জপ করেন। তার সমস্ত পাপ নাশ হয়। যে ইচ্ছাতে অথবা অনিচ্ছাতে শ্রীবিষ্ণুর নিন্দা করে বা শোনে সে ব্রহ্মা যতদিন অক্ষয় থাকবেন, ততদিন কুম্ভীপাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। ত্রিজগতে বিষ্ণু ও গুরু সকলের পিতা। তারা জ্ঞান দান করেন, পালন করেন, নির্ভয়ী করেন, বর দান করেন।

ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ তখন শিব ও ধর্মের কথা শুনে হেসে উঠলেন। বললেন– হে ধার্মিক দেবতাগণ, আমি তো একবারও বিষ্ণু নিন্দা করিনি। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে আকাশবাণী অনুযায়ী তার এখানে পদার্পণ হয়নি। অর্থাৎ দৈববাণী মিথ্যে। আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন করি

আপনারাই বলেছেন, শ্রীবিষ্ণু সর্বত্র বিরাজমান, তাহলে কেন নিজেদের বাঁচানোর জন্য দেবলোক ছেড়ে শতদ্বীপে হাজির হয়েছিলেন।

পরমাত্মার অংশ ও অংশীর মধ্যে কোনো ভেদ যদি নাই থাকে, তাহলে সাধুজনেরা কলা পরিত্যাগ করে পূর্ণতমের সেবা করেন। বামন যেমন চাঁদকে মুঠোবন্দি করার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যায় তেমনই ক্ষুদ্র, অক্ষুদ্র সকলেই মহান পদ লাভে আগ্রহী। আপনারা দেবতারা যে বিশ্বে অবস্থান করছেন সেই সুরলোক ও ওই চরাচর সবই প্রতিবিম্বে থাকে। ভক্তদের কৃপা করার জন্য সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই সকলের ঈশ্বর। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একেবারে শীর্ষে বৈকুণ্ঠধাম। সেই ধাম থেকে গোলকধাম আরও পঞ্চাশ কোটি যোজন উঁচুতে অবস্থিত। যেখানে স্বয়ং চতুর্ভুজ নারায়ণ তার প্রিয় লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে বিরাজ করছেন।

ইনি পরিপূর্ণতম ও সমস্ত দেহধারী জীবদের আত্মা। তিনিই রাসমণ্ডলে ইচ্ছেমতো রূপ গ্রহণ করে অবস্থান করেন। সাধুজনেরা সব সময় সেই উজ্জ্বল নিরাময় মণ্ডলাকার জ্যোতির ধ্যানে নিমগ্ন। সেই শ্রীকৃষ্ণ পীত বসনধারী, তিনি কামদেবের ন্যায় লাবণ্য বিশিষ্ট, তিনি কিশোর ও মনোহর, সেই ঈশ্বর সত্যাবিগ্রহের ধ্যান ও সেবা মহান ব্যক্তিরা করে। আপনারা বৈষ্ণব, আমার বংশ পরিচয়, নাম ধাম জানতে চেয়ে ছিলেন, এখন আর সে সব প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কে মূর্খ তা বিচারের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে? হে সুরেশ্বর! হে দেবেশ্বর। এখন শীঘ্র ওই সতী মালাবতীর পতির মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করুন।

সৌত বললেন– হে শৌণক, ব্রাহ্মণের কথা শুনে ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য দেবতারা মুগ্ধ হলেন। তারা ওই ব্রাহ্মণের সঙ্গে এলেন শ্বেতদ্বীপে। যেখানে মালাবতী আগলে বসে আছেন তার পতির মরদেহ। ব্রহ্মা কমণ্ডলু থেকে মৃতদেহের ওপর জল ছিটিয়ে দিতেই মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার ঘটল, দেহ হল লাবণ্যময়, শিব দিলেন জ্ঞান, ধর্ম দিলেন ধর্মজ্ঞান, আর ব্রাহ্মণ দান করলেন জীবন।

অগ্নিদেব দিলেন জঠরানল, কামদেব কামনার সঞ্চার ঘটালেন। বায়ুর আবির্ভাবে তার শ্বাসপ্রশ্বাস শুরু হল। সূর্যদেব দিলেন দৃষ্টি শক্তি, বাগদেবী সরস্বতী দান করলেন বাক্য এবং স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর দর্শনে শোভার প্রকাশ ঘটল। এতসব করা সত্ত্বেও সেই দেহ মরার মতো পড়ে রইল। ওঠার ক্ষমতা নেই, অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত তার মধ্যে পরমাত্মার প্রবেশ ঘটেনি। তাই সে বোধশক্তি হীন। তখন ব্রহ্মা ওই সতী নারীকে শ্রীবিষ্ণুর বন্দনা করতে বললেন। মালাবতী নদী থেকে স্নান করে এলেন। শুদ্ধ বসন পরিধান করে হাতজোড় করে পরমেশ্বরের স্তব করতে

লাগলেন- হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি সমস্ত কারণের কারণস্বরূপ, সব কাজে নির্লিপ্ত থাকেন বটে, কিন্তু সাক্ষী হিসেবে বিরাজ করেন। যার সেবা করে ব্রহ্মা জগতের স্রষ্টা হয়েছেন, স্বয়ং মহাদেব সংহারকর্তা আর শ্রীবিষ্ণু পালনকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম নিবেদন করছি।

আপনি পরাৎপর, আপনি সাকার আবার নিরাকার, আপনি তপস্বীকে ফলদান করেন। ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্য রূপ ধারণ করেন। কোটি সূর্যের মতো যার উজ্জ্বল ও মণ্ডলাকার তেজ তা অতি কমনীয় এবং অতি মনোহর। যাঁর গায়ের রং নতুন মেঘের মতো শ্যামবর্ণ, যার দুটি ওষ্ঠ পল্লব, যার সর্বঙ্গ চন্দনে সুবাসিত, যিনি কোটি সংখ্যক কামদেবের ন্যায় লাবণ্যময়, যিনি কিশোর, শান্ত এবং অক্ষয়। যিনি গোপনীদের সঙ্গে নির্জন স্থানে বিহার করেন। বৃন্দাবনে গোপবালকদের সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করি। যিনি কখনও নিজের অংশরূপে জগতকে পালন করার জন্য বিষ্ণুরূপ ধারণ করে শ্বেত-দ্বীপে পদ্মার সেবা গ্রহণ করেন। যিনি নিজের অংশে মঙ্গলরূপী মঙ্গল দান করেন। যিনি নিজের ষোলো ভাগের এক ভাগ দিয়ে বিরাটাকার প্রাপ্ত হয়েছেন। যিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকারী, যিনি বারে বারে নিজের অংশে সৃষ্ট বিভিন্ন অবতার রূপে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন, যিনি যোগীদের মধ্যে বাস করেন, আবার সাধুদের মধ্যে বাস করেন, আবার সাধুদের মধ্যেও তার দেখা মেলে, সেই নির্গুণ পরমাত্মা পরমেশ্বরকে আমি এক অবলা নারী হয়ে কীভাবে স্তব করব? পঞ্চানন শিব, চুতমুখ ব্রহ্মা, গজমুখ গণেশ, ছয় মুখ কার্তিক এমনকি হাজার সুখের অনন্তদেব যাঁর স্তব করতে অক্ষম, যার স্তব করতে গিয়ে স্বয়ং সরস্বতী বাহিত হয়ে যান, যাঁর স্তব করতে বেদ পর্যন্ত পারে না, সেখানে আমি এই শোককাতরা রমণী তো সামান্য? আমি কীভাবে আপনার স্তুতি করব। আপনার প্রশস্তির সীমা পরিসীমা নেই, আপনি অনন্ত।

গন্ধর্বী মালাবতী চুপ করলেন এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। আর কৃপাসাগর শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য প্রণাম জানালেন। পরমাত্মা নিরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণের শক্তির সঙ্গে উপবনের দেহে প্রবেশ করা মাত্র তিনি উঠে দাঁড়ালেন। স্নান সারলেন, বাঁহাতে বীণা তুলে নিলেন, দেবতাদের প্রণাম জানালেন। দেবতারা আনন্দিত হলেন। আকাশ থেকে এই গন্ধর্ব স্বামী-স্ত্রী ওপর বর্ষিত হল পুষ্পসকল।

মালাবতী তার স্বামীকে নিয়ে ফিরে এলেন আপন গৃহে। ব্রাহ্মণ ভোজন করলেন, তাদের দান ধ্যান করলেন। হরিনাম সংকীর্তনে মেতে উঠলেন।

হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, যে বিষ্ণু ভক্ত এই সম্পূর্ণ স্তব উচ্চারণ করে সে হয় হরিদাস্য। যে আস্তিক লোক পরম ভক্তি ভরে এই স্তব করে তার সকল অভীষ্ট পূরণ হয়। সে ভোগ ও মোক্ষ লাভ করে। আসক্ত ভরে এই স্তব পাঠ করার ফলে পুত্রহীনা পুত্র লাভ করে। নির্ধন ধন পায়। অধার্মিক সুধর্ম লাভ করে। যশপ্রার্থী যশ পায়। রাজ্যহারা রাজা রাজ্য লাভ করে। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যাধিমুক্ত হয়। কারাগারে বন্দি থেকে যে শ্রীকৃষ্ণ স্তব করে সে অচিরেই মুক্তি পায়। দাবানলে বা সাগরে ডুবতে ডুবতে এই স্তব করলে প্রাণ সংশয় থাকে না।

.

সুতপুত্র বুললেন– মালাবতী এবার নানা বেশভূষায় নিজেকে সজ্জিত করলেন। স্বামী সেবা ও শুশ্রূষার প্রতি নজর দিলেন। তারা বহু বছর সুখে শান্তিতে কালানিপাত করেছিলেন। বশিষ্ঠ পুস্করতীর্থে শ্রীহরির স্তোত্র, পুজোর বিধান ও একমন্ত্র মালাবর্তী ও উপবর্হনকে দান করেছিলেন। গন্ধর্ব কুমার পুজোর বিধান কৃপাসিন্দু বশিষ্ঠ আবার উপবর্হনকে মনে করিয়ে দিলেন।

বশিষ্ঠদেব মালাবতাঁকে পরমেশ্বর যে স্তব দান করেছিলেন তা হল এইরকম– ষোল অক্ষর যুক্ত মন্ত্র। ওঁ নমো ভগবতে রাসমন্ডলেশায় স্বাহা। এই মন্ত্র পূর্বে গোলকে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করকে শুনিয়ে ছিলেন। কুমারকে পুস্করতীর্থে এই মন্ত্র দিয়েছিলেন। বেদে যে বিষ্ণুর ধ্যানের কথা বলা হয়েছে, তাও শঙ্কর লাভ করেছিলেন। নৈবেদ্য এবং অন্যান্য উপাচার নিবেদন করার সময় মূলমন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। আমি বাবার মুখে ভগবানের অত্যন্ত গোপন এই কবজের কথা শ্রবণ করেছি। পূর্বে গোলকধামে রাসমন্ডলে শ্রীকৃষ্ণ এই কবচ ব্রহ্মা, শঙ্কর ও ধর্মকে দান করে ছিলেন। গঙ্গার তীরে ভোলানাথের কাছ থেকে এই কবচ লাভ করেন, ব্রহ্মা, শিব এবং ধর্ম ব্রহ্মাণ্ডপাবণ নামক কবচের মাহাত্ম্য জানতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন- এই কবচ অত্যন্ত দুর্লভ এবং গোপনীয়। এই কবচের ঋষি হলেন স্বয়ং শ্রীহরি ছন্দ গায়ত্রী আর দেবতা, আমি জগতের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ। হে ব্রহ্মা, তুমি এই কবচ গ্রহণ করে ত্রিজগতের স্রষ্টা হও। হে শঙ্কর, তোমাকে এই কবচ দান করলাম। তুমি হও সংহার কর্তা।

তিন লক্ষ বার পাঠঅন্তে এই কবচের গুণে সিদ্ধিলাভ হয়। যে সিদ্ধ কবচ লাভ করবে সে তেজ, সিদ্ধযোগ জ্ঞান ও বিক্রমে আমার সমান হবে। প্রণব আমার মাথা, নমো রামেশ্বর আমার কৃষ্ণ আমার। দুটি কান, হে হরি আমার নাক, কপাল। 'স্বাহা' জিহ্বাকে ও শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা এই অক্ষরে গলা, হ্রীং কৃষ্ণায় নমঃ 'মুখ' ক্লীংকৃষ্ণায় নমঃ মন্ত্র আমার দুটি হাত রক্ষা করুন। নমো

গোপাঙ্গ নেশায় এই আট অক্ষরের মন্ত্র আমার কাঁধ, নমো গোপীশ্বরায় মন্ত্রে দুই পাটি দাঁত আর ঠোঁট দুটিকে রক্ষা করুন।

ষোলো অক্ষর বিশিষ্ট ওঁ নমো ভগবতে রাসমণ্ডলেশায় স্বাহা মন্ত্রে আমার বুক রক্ষা করুন। ওঁ গোবর্ধন ধারণে স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণ করে বলতে হয়, হে কৃষ্ণ আমার সমস্ত শরীরকে রক্ষা করুন। পশ্চিমদিকে গোবিন্দ, বায়ু কোণে রাধিকেশ্বর, উত্তর দিকে রাসেশ, এবং ইশাণ কোণে স্বয়ং অচ্যুত আমাকে রক্ষা করুন। পরমাত্মা নারায়ণ আমাকে সর্বত্র ভাবে সবসময় আমাকে রক্ষা করুন।

এই কবচ ধারণ করার নিয়ম সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–স্নান করে বস্ত্র অলংকার ও চন্দন দ্বারা বিধিমতো গুরুদেবের আরাধনা করবে। গুরুদেবকে প্রণাম জানাবে, কবচকে প্রণাম জানাবে, তারপর কবচ ধারণ করবে। এই কবচের গুণে মনুষ্য জীবনের মুক্তি ঘটে, যে সিদ্ধ কবচ হয়, সে হয় বিষ্ণুতুল্য।

সৌত বললেন– হে শৌণক, ব্রাহ্মণ্ডপাবণ কবচের কথা শুনলেন। এবার বলি শঙ্কর কবচের কথা, যে মন্ত্র বশিষ্ঠ গন্ধর্বকে দান করেছিলেন এই মন্ত্র আগে রাবণ ব্রহ্মার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। মহাদেব আবার বানরাজ ও দুর্বাসা মুনিকে এই কবচ প্রদান করেছিলেন। শিব পুজো করা কালে ধ্যায়েন্নিতাং মহেশ্বং পুস্পার্ঘ্য নিবেদন করার বিধান দেওয়া হয়েছে।

বাণেশ্বর সংসারপাবন কবচের মাহাত্ম শুনতে আগ্রহী হলে মহাদেব বললেন– শোনো বৎস, অতন্ত দুর্লভ ও গোপন এই কবচ তোমাকে দান করছি। প্রজাপতি ছন্দ, গায়ত্রী এবং আমি শঙ্কর এই সংসার পাবন কবচের ঋষি। চতুর্বগ অর্থাৎ ধর্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ এতে নিয়েজিত। পাঁচ লক্ষবার জপ করলে এই কবচ সিদ্ধ হয়।

সিদ্ধিলাভকারী হয় তেজসম্পন্ন। তপস্যা ও বিক্রমে সে হয় আমার তুল্য। আমার মস্তক হল শম্ভ, মুখ মহেশ্বর, দাঁত নীলকণ্ঠ, অধর হর, কণ্ঠ চন্দ্রচূড়, স্তনদ্বয় বৃষভবাহন, বুক- নীলকণ্ঠ, পিঠ-দিগম্বর এবং সবদিক বিশ্বেশ। আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রক্ষা করুন। ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় আমি হলাম স্থাণু। এই কবচ যে ধারণ করে সে সমস্ত তীর্থের সমান পুণ্য সঞ্চয় করে। না জেনে এই কবচ কু লোক পাঠ করলে শত লক্ষ বার সিদ্ধ হতে পারে না। যে সুধী ব্যক্তি ভক্তি সহকারে এই কবচ ধারণ করে সে অনায়াসে ত্রিভুবন জয় করতে পারে।

শঙ্কর প্রদত্ত কবচের বৃত্তান্ত শেষ করে সুত পুত্র বললেন– হে যোগী শ্রেষ্ঠ বানররা কী ভাবে সংসার পাবণ কবচের স্তুতি করেছিলেন তা শুনুন।

বাণরাজ বলেছিলেন–আমি সেই মহাদেবকে প্রণাম জানাই যিনি দেবতা শ্রেষ্ঠ, সুরেশ্বর নীললোহিত, যোগীশ্বর। যিনি জ্ঞান ও আনন্দময়, জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানের বীজ, সকল তপস্যার ফল ও সকল সম্পদ দান করেন, যিনি তপস্যার বীজ, যিনি মুনিদের ধনস্বরূপ ভোলা মহেশ্বরের বন্দনা করি। তাঁর দেহ হিম, চন্দন, কুন্দফুল, চাঁদ, কুমুদ ও পদ্মফুলের ন্যায় শুভ্র। তিনি ব্রহ্মজ্যোতি স্বরূপ। ভক্তদের তিনি অনুগ্রহ দান করেন এবং নিজের দেহ ধারণ করেন। তিনি বাঘছাল পরিধান করেন, পট্টিশ ও ত্রিশূলধারী মস্তকে অর্ধচন্দ্রকে ধারণ করছেন। তিনি স্মিতহাস্য।

হে মুনি! এই স্তোত্র পূর্বে বশিষ্ঠ গন্ধর্বকে শুনিয়েছিলেন। আপনি এখন আমার কাছ থেকে এই মহাস্তোত্র শ্রবণ করলেন। ভক্তি সহকারে যে জন এই স্তোত্র পাঠ করেন, সমস্ত তীর্থ স্থান যে ফল পাওয়া যায় তার সমান ফললাভ হয়। এই স্তোত্র একবছর ধরে যে শ্রবণ করে সে পুত্র লাভ করে। যে জন গলিত কুষ্ঠ অথবা মহাশূল রোগে আক্রান্ত হয়েছে, সে লোক যদি হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও সংযম পালন করে এবং মহাদেবকে প্রণাম করে এক বছর ধরে এই মহাস্তোত্র শ্রবণ করে তাহলে তার রোগ মুক্তি ঘটে।

আস্থা ভরে ধনহারা এই স্তব করলে ধনবতী হয়। রাজ্যহারা রাজ্যলাভ করে। রোগব্যাধি আক্রান্ত ব্যক্তি এক বছর কাল স্তব পাঠ করে শঙ্করকে তুষ্ট করতে পারলে ব্যাধি থেকে মুক্তি পায়। সে লোক বিধিসম্মতভাবে প্রতিদিন জপ করে সে ত্রিজগত জয় করে। গুরুর উপদেশের ন্যায় যে মূর্খ এই স্তোত্র শ্রবণ করে সে বিদ্যা ও বুদ্ধি লাভ করে। কর্মদোষে দুঃখী ও দরিদ্র ব্যক্তি এই স্তবরাজ শুনলে সুখ লাভ করে। প্রত্যহ তিন সন্ধ্যায় এই উৎকৃষ্ট স্তোত্র শুনলে মহাদেবের পার্ষদ পদ লাভ করা যায় এবং শিবলোকে শিবের সঙ্গে অবস্থান করতে পারে।

.

গন্ধর্ব উপবর্হন তারপর মালাবতী ও অন্যান্য স্ত্রীদের নিয়ে নির্জন স্থানে রমন করে সময় কাটাতে লাগলেন। তারপর একদিন নিয়তির ডাকে সাড়া দিয়ে গন্ধর্বরাজ ও তার পত্নী সুশীলাদেবী গঙ্গার নির্জন স্থানে প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁরা হলেন বৈকুণ্ঠবাসী। গন্ধর্বপুত্র উপবর্হন বাবা মায়ের সন্ধার কার্য শেষ করে ব্রাহ্মণদের ভোজন করালেন। তাঁদের বহু মূল্য সামগ্রী ও সম্পদ দান করলেন। তারপর যথাসময়ে ব্রহ্মার অভিশাপ অনুসারে উপবহনের মৃত্যু

হল। তিনি ব্রাহ্মণের বীর্যে শূদ্রানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। এ জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে আমি পরে বলছি। তার আগে মালাবতীর কথা শুনুন।

সতী মালাবতী পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মার যজ্ঞকুণ্ডে নিজের বাঞ্ছিত কামনা করে প্রাণত্যাগ করলেন। তারপর তিনি অনুবংশজাত রাজা সৃঞ্জয়ের স্ত্রীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন। তিনি ছিলেন জাতিস্মর এবং পুণ্যবতী। সুন্দরী শ্রেষ্ঠা মালাবতী মৃত্যুর প্রাক্কালে গন্ধর্ব উপবর্হনকে নিজের পতি হিসেবে কামনা করেছিলেন।

সৌত বললেন– হে শৌণক। কান্যকুব্জ দেশে গোপিদের রাজা ছিলেন দ্রুমিল। পতিব্রতা কন্যা। তাঁর স্ত্রী হলেন কলাবতী। স্বামীর দোষেই তিনি ছিলেন সন্তানহীনা।

স্বামীর আদেশে কলাবতী একদিন এক গভীর অরণ্যে এসে প্রবেশ করলেন। সেখানে কাশ্যপ মুনি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। মধ্যাহ্নের সূর্যের ন্যায় সেই মুনির চারদিক উদ্ভাসিত, কলাবতী একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ ভক্ত মুনি শ্রেষ্ঠ একসময় চোখ খুললেন। অনতিদূরে স্থির যৌবনা সুন্দরী বধুকে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। আহা! কী অপুর্ব দেহ বল্লরী, চম্পক ফুলের বর্ণচ্ছটা তার তনু বাহার, চোখ দুটি যেন শরতের পদ্মফুল, শরতের চাঁদের মতো রমণীয় তার মুখ। সে মূল্যবান ভূষণে ভূষিত, স্তন মন্ডল অত্যন্ত মাংসল, নিতম্ব বিরাট এবং ভারী, সে পীতবস্ত্র পরিহিতা, মুখে স্মিত হাসি, আলতার রেখা তার দুটি পায়ের শোভা বৃদ্ধি করেছে, তার কপালে সিন্দুরের ফোঁটা তাঁকে আরও মোহময়ী করে তুলেছে। সেই স্ত্রীলোক মুনির রূপে আকৃষ্ট হয়ে কামসিক্ত হয়ে পড়ল। সে তার স্তনযুগল ও শ্রোণীমণ্ডল মেলে ধরল। তুমি কে? কী তোমার পরিচয়? তুমি কি এক বীরাঙ্গনা।

মুনির প্রশ্ন শুনে কলাবতী তখন কম্পমান। সে শ্রীহরির স্মরণ করে বলল– হে যোগী শ্রেষ্ঠ, আমি গোপরাজ মিলের ভার্যা। স্বামীর আদেশে এ স্থানে আমার আগমন। আমি এক পুত্র প্রার্থীণী! আপনি দয়া করে আমার গর্ভে বীর্যপাত ঘটান।

অগ্নি যেমন যেকোনো কাজ করে দোষের ভাগী হয় না, তেমনই মহাত্মা তেজস্বী ব্যক্তিকে কোনো কিছুই দুষ্ট করতে পারে না। তথাপি কাশ্যপ রেগে বললেন–ধিক সেই পুরুষকে, যে তার পত্নীকে অন্যের ভোগের জন্য প্রেরণ করে। বেদ বলেছে, এমন পতি মুখ ও লক্ষ্মীছাড়া হয়। তুমি আর কোনোভাবেই মিলের ভোগযোগ্য হবে না। আর যদি সে কামাকেরিকে বিরক্ত হয়ে পরিত্যাগ করে থাকে তাহলে তোমাকে গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না। অল্পজ্ঞানী যে ব্রাহ্মণ শূদ্রপত্নীকে গ্রহণ করে সে হয় চণ্ডাল সমান। ব্রাহ্মণের কোনো কাজেই তার কোনো অধিকার

থাকে না। সে শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করে দেবতা পুজো করতে পারবে না। পিতৃশ্রাদ্ধ, যজ্ঞ সমস্ত থেকে সে হয় বঞ্চিত। সে তার মাতামহ এবং নিজের বংশের উপরের দিকের দশ পুরুষ এবং নীচের দিকের দশ পুরুষকে নিয়ে কুম্ভীপাক নামক নরকে গমন করে। তার করা তর্পণ ও পিণ্ডদান মূত্র মলের সমান। তার দেওয়া ধনৈবদ্য ও জল দেবতাও গ্রহণ করেন না। সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদের সে অন্নজল দান করতে পারে না। যে নীচবংশ জাত ব্রাহ্মণ শূদ্রদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে এবং শূদ্র পত্নীর অধর চুম্বন করে সে হয় শূদ্রের তুল্য। তাকে চৌদ্দ জন ইন্দ্রের কাল কাল সূত্র নামক নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য সে ব্রাহ্মণও শাস্তি ভোগ করে। আঠারোজন ইন্দ্রের পরিমিত কাল পর্যন্ত সে কালসূত্র নরকে কৃমিদের দ্বারা যন্ত্রণা ভোগ করে, শেষে ওই ব্রাহ্মণী চণ্ডাল যোনিতে জন্মলাভ করে। আর শূদ্রও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়। সে জ্ঞাতিদের দ্বারা পরিত্যাজ্য হয়।

হে শৌণক! সুতপুত্র আবার কাশ্যপের কথা টেনে এনে বললেন, গোপপত্নীর গলাও ঠোঁট তখন শুকিয়ে কাঠ। ঠিক এই সময় ঐ পথ দিয়ে অপ্সরা মেনকা যাচ্ছিল। তাকে দেখে মুনি কাশ্যপের বীর্যপাত হল। বৃষলী তৎক্ষণাৎ আনন্দিত চিত্তে ওই বীর্য পান করল। মুনিকে প্রনাম জানিয়ে ফিরে এল স্বামী গৃহে। সে সমস্ত ঘটনা স্বামীকে জানাল।

দ্রুমিল খুব পুলকিত হল। বলল– তুমি হবে এক বিষ্ণুভক্ত পুত্রের জননী, পরম ভাগবতী সতী। তুমি কোনো এক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে দিন কাটাও, বৈকুণ্ঠ ধামে হরির সামনে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

রাজা দ্রুমিল এবার দান ধ্যানে মেতে উঠলেন। ইষ্ট দেবের পুজো করলেন। চার লক্ষ ঘোড়া, একলক্ষ হাতি ও একশো পাগলা হাতি দান করলেন। পাঁচলক্ষ উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া, হাজার রথ, তিনলক্ষ শকট, বারো লক্ষ গরু, তিন লক্ষ মোষ ও রাজহাঁস, একলক্ষ পায়রা, একশো শুকপাখি ও একলক্ষ দাসদাসী ব্রাহ্মণদের হাতে তুলে দিলেন। এমনকি অসংখ্য ভূষণ ও রত্ন অলংকারে সুসজ্জিত প্রিয় পত্নী কলাবতাঁকে ব্রাহ্মণদের হাতে তুলে দিলেন। শেষ পর্যন্ত নিজ রাজ্যও ব্রাহ্মণ হস্তে সমর্পন করলেন। শ্রীহরিকে স্মরণ করে তিনি মনের মতো দ্রুতগামী হয়ে বদরিকাধামে এসে হাজির হলেন। গঙ্গার নির্জন স্থানে ধ্যানে বসলেন। একমাস পরে মহর্ষিদের যোগবলে সেখানে প্রাণত্যাগ করলেন। বৈকুণ্ঠধামে হরিদাস হয়ে শ্রীহরির চরণে ঠাঁই পেলেন।

হে শৌণক! স্বামীর দ্বারা পরিত্যাজ্য হয়ে কলাবতী উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে লাগল। প্রাণ বিসর্জন দেবে ভেবে আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হল। এক ব্রাহ্মণ এসে সে কাজ থেকে তাকে

বিরত করে। ব্রাহ্মণ তাকে মা সম্বোধনে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানে যথাসময়ে কলাবতী এক শ্রেষ্ঠ সন্তান প্রসব করল। সেই পুত্র ব্রহ্মতেজে উজ্জ্বল, তপ্ত গলানো সোনা তার গায়ের রং। পদ্ম ও চক্র চিহ্নিত তার পা দুটি; পদ্মের ন্যায় দুটি আঁখি, কামদেবের মতো সে লাবণ্যময়, আশপাশের গৃহ থেকে অন্যান্য ব্রাহ্মণ পত্নীরা ছুটে এল। সেই তেজসম্পূর্ণ অপূর্ব শান্তিময় দেবশিশুকে দেখে সুখে আহ্লাদিত হল। ব্রাহ্মণ বাড়িতে বালক ধীরে ধীরে বড়ো হতে লাগল।

.

সৌতি বলতে থাকেন, সে বালক ছিল জাতিস্মর ও জ্ঞানী। পূর্বের মন্ত্রের কথা সে ভুলে যায়নি। তাই সর্বদা কৃষ্ণমন্ত্রে মুখর থাকত। কৃষ্ণগান গাইতে গাইতে কখনও তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ত। আপন মনে নেচে উঠত। কৃষ্ণের লীলাকথা বা তাকে কেন্দ্র করে কোনো পুরাণ পাঠের খবর পেলেই সে ছুটে যেত। হরি বিনা সে কিছু জানাত না, এমনকি নাওয়া খাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে যেত।

হে শৌণক! এই বালক জন্মের আগে পৃথিবী অনাবৃষ্টির রুক্ষ শুষ্ক হয়ে উঠেছিল। এই বালক ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বসুন্ধরার জলের ধারা নেমে আসে। “নার অর্থাৎ জল, তাই তার নাম হয় নারদ। আবার অন্যান্য বালকদের সে “নার” ও জ্ঞান দান করত, তাই তাকে ডাকা হত নারদ নামে। নারদমুনীন্দ্রের ঔরসে তার জন্ম বলে সে নারদ নামে প্রসিদ্ধ।

শৌণক জানতে চাইলেন– ওই মুণিবরের নাম নারদ হওয়ার কারণ কী?

সৌতি বললেন– ধর্মের পুত্র নর নামে মুনি অপুত্রক কশ্যপকে ওই পুত্র দান করেন, তাই তিনি নারদ?

শৌনক জানতে চাইলেন ব্রহ্মপুত্র নারদের নাম নারদ হওয়ার কারণ কি আপনি বর্ণনা করবেন?

সৌতি বললেন–ব্রহ্মার কণ্ঠকে নরদ বলে, কারণ সেখান থেকে বহু মানুষ জন্ম নিয়েছিল। ব্রহ্মার কণ্ঠনিঃসৃত বালকই হল নারদ। ব্রহ্মা তার এই নাম রেখেছিলেন। ব্রাহ্মণের গৃহে সেই গোপিকা ও তার ছেলে কালাতিপাত করতে লাগল, ব্রাহ্মণ তাদের কন্যা আর নাতি হিসেবে দেখত। বালকের বয়স যখন পাঁচ তখন চার তেজস্বী বালকের আবির্ভাব ঘটল ওই বাড়িতে।

তাদের তেজ যেন গ্রীষ্মের মধ্যদুপুরের সূর্যের তেজকেও হার মানায়। ব্রাহ্মণ তাদের সাদরে আপ্যায়ন জানাল, তারপর সেই পাঁচ বছরের চার তেজস্বী বালকের উচ্ছিষ্ট গোপিকা পুত্র গ্রহণ করল। চতুর্থ তেজস্বী বালক ওই শিশুপুত্রকে সানন্দে কৃষ্ণমন্ত্র দান করলেন।

একদিন পথে সাপের কামড়ে তার মায়ের মৃত্যু হল। মৃত্যুকালে হরিনাম স্মরণ করেছিল। তাই সে বিষ্ণুধামে স্থান পেল। নারদ সেই চার ব্রাহ্মণের সাথে পালক ব্রাহ্মণের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। নারদ তাদের কাছ থেকে নানাতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করল। তারপর তারা ফিরে গেল স্বস্থানে আর নারদ গঙ্গার জলে স্নান করে সেখানে বসেই বিষ্ণুমন্ত্র জপে নিমগ্ন হল। যে মন্ত্র ক্ষুধা, রোগ, শোক নাশ করে সেই বিষ্ণু মন্ত্র জপ করতে করতে বহু বছর কেটে গেল।

সৌতি বলতে থাকেন–পূর্বে গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ এই মন্ত্র ব্রাহ্মণকে দান করেছিলেন। বাইশ অক্ষর বিশিষ্ট এই মন্ত্র পরে কুমার ব্রহ্মার কাছ থেকে লাভ করেন। সেই মন্ত্র সনকুমারের কাছ থেকে বালক নারদের কাছে চলে আসে। কল্পবৃক্ষের মতো এই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র হল– ওঁ শ্রীনমো ভগবতে রাসমণ্ডলেশ্বরায় শ্রীকৃষ্ণ স্বাহা। যোগীরা, সিদ্ধ পুরুষেরা ও দেবতারা এই মন্ত্রর উচ্চারণ করে কোটি সূর্যের তেজসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন। তার রূপ কালো মেঘের ন্যায় শ্যাম বর্ণের, তার চোখ দুটি শরতের পদ্ম, মুখ যেন শরতের পূর্ণিমার চাঁদ, পাকা বিম্ব ফলকেও হার মানায়, তার দুটি সুন্দর অধর, তার দাঁত মুক্তোর থেকেও বেশি উজ্জ্বল, তিনি পীতবস্ত্র পরিধান করেন, তিনি দ্বিভুজ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান, গলায় রত্নহার, মাথায় চূড়া, তাতে ময়ূরের পেখম শোভা বর্ধন করছে, বুনোমালায় সজ্জিত, চন্দনে সুবাসিত। শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ বৈষ্ণবরা চিন্তা করেন। কৃষ্ণের বুকে রাধা অবস্থান করছেন, গোপিকারা তাদের ঘিরে নৃত্য প্রদর্শন করছে। ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাকে তারা পুজো করছেন। কিশোর রাধিকানাথ শান্ত, পরাৎপর, নির্গুণ, নিরাকার প্রকৃতির অতীত যিনি, সেই শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করি।

হে মুনি! মন্ত্রের উপযোগী ধ্যান, স্তোত্র, কবচ ও কল্পবৃক্ষরূপে মন্ত্রের কথা শুনলেন।

দিব্য সহস্র বছর ধরে আহার নিদ্রা, ত্যাগ করে বালক নারদ ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। কিন্তু তিনি দুর্বল হয়ে পড়েননি। সিদ্ধ মন্ত্রের প্রভাবে তিনি ছিলেন বলশালী ও মোটাসোটা। তিনি ধ্যানচোখে প্রত্যক্ষ করলেন এক বালককে, যিনি নানা অলংকারে বিভূষিত হয়ে রত্নসিংহাসনে বসে আছেন। কিশোর বয়সী সেই বালকের দেহের রং শ্যামবর্ণ, তিনি গোপের বেশ পরেছেন, ঠোঁটে মৃদু হাসি, গোপগোপীদের মাঝখানে তিনি পীতবসন পরিধান করে বাঁশি বাজাচ্ছেন।

তার দুটি হাত, চন্দন চর্চিত শরীর। ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু সকল দেবতারা তাকে স্মরণ করে ধ্যান করছেন।

এক সময় সেই বালক শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি গোপিকাপুত্র নারদের চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এমন সময় শোনা গেল আকাশবাণী– নারদ, তুমি কু যোগী, তাই একবার যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছ, তা দ্বিতীয়বার দেখার চেষ্টা করো না। মৃত্যু অন্তে দিব্য দেহ লাভ করে জরাব্যাধি নাশকারী গোবিন্দের দর্শন আবার পাবে।

এই বাণী শুনে বালক নারদ কান্না থামিয়ে আনন্দ করল। মরণকালে সে শ্রীকৃষ্ণের পদ-যুগলের কথা চিন্তা করতে করতে প্রাণ দিল। স্বর্গ থেকে পুষ্প বৃষ্টি হল। শোনা গেল দুন্দুভি বাজানোর শব্দ। অভিশাপ থেকে মুক্তি পেলেন মহামুনি নারদ। ব্রহ্মার শরীরে তিনি আশ্রয় পেলেন। হে শৌণক! নারদ ছিলেন স্থির যৌবন, তথাপি তাঁকে জন্ম নিতে হয়েছিল এবং মরণ বরণ করতে হয়েছিল। কারণ এসবই হল কর্মফল।

.

সুতপুত্র বললেন– ব্রহ্মার গলা থেকে নারদের জন্ম হল। যেহেতু ব্রহ্মার কণ্ঠকে নরদ বলা হয়, তাই ঐ মুনির নাম হল নারদ। বিধাতার চিত্ত থেকে নারদের উৎপত্তি হয়েছিল বলে তিনি প্রচেতা নামেও পরিচিত। বিধাতার ডানদিক থেকে যে জন্ম নেয় এবং সমস্ত কাজে যে পারদর্শী, সে হল দক্ষ। বিধাতার ছায়া থেকে তার জন্ম হওয়ায় সে হল কর্দম, বেদে এই শব্দের অর্থ বলেছে ছায়া। ব্রহ্মার তেজ অর্থাৎ মরীচি থেকে যে অতীতে তেজস্বী মুনির জন্ম হয় তিনি হলেন মরীচি, অন্য জন্মে হলেন যে পুত্র অনেক যজ্ঞ করে তিনি হলেন ক্রতু, ব্রহ্মার প্রধান অঙ্গ মুখ থেকে অঙ্গিরার জন্ম হয়। ভৃগু শব্দের অর্থ অতি তেজস্বী, পুত্রের নাম ভৃগু। ব্রহ্মার আর এক পুত্রের নাম অরুণী, কারণ তিনি অরুণ বর্ণের ছিলেন, এবং তপস্যাবলে উপরের দিকে অরুণ বর্ণের তেজ প্রজ্বলন ঘটিয়ে ছিলেন। আর যোগী শ্রেষ্ঠর নাম হংসী, তিনি হংসীদের বশীভূত করেছেন যোগবলে। বশিষ্ঠ শব্দের অর্থ যিনি ব্রহ্মার বশীভূত এবং পরমপ্রিয়।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যতি অর্থাৎ যিনি তপস্যা যত্ন সহকারে করেন এবং কর্মে সংযত থাকেন। পুলহ হলেন প্রস্ফুট তপস্যা স্বরূপা। পুলস্ত্য অর্থাৎ পূর্ব জন্মে যার তপস্যা আছে। ত্রিগুণা প্রকৃতি এবং বিষ্ণুর প্রতি যিনি সমান ভক্তি প্রদর্শন করেন, তিনি হলেন অত্রি। পঞ্চশিখ শব্দের অর্থ যার মস্তকে তপস্যা ও তেজ থেকে সৃষ্ট পাঁচটি জ্বলন্ত শিখা আছে। অপান্তরতমা হলেন সেই

মুনি যিনি গত জন্মে অপান্তরতম জায়গায় কঠিন তপস্যা করেছিলেন। যে মুনি নিজে তপস্যায় রত হন এবং অন্যকে তপস্যা করার ইন্ধন জোগান, তিনি বটু নামে পরিচিত। রুচির মনে তপস্যার রুচি বা ইচ্ছে আছে। বিধাতা কুপিত হয়ে এগারোজন মুনির জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁরা রুদ্র নামে পরিচিত, তাঁদের কোপন স্বভাব এবং তারা ক্রন্দনরত।

সৌতি বলতে থাকেন, রক্ষাকর্তা বিষ্ণু সত্ত্বগুণের সৃষ্টিকর্তা, ব্রহ্মা রজো গুণের এবং দুর্ধর্ষ ভয়ংকর রুদ্ররা তমোগুণের অধিকারী, এইসব রুদ্রদের মধ্যে একজন ছিলেন কালগ্নি নাম্নী। ইনি শঙ্করের অংশজাত এবং ধ্বংসে মেতে উঠতেন। কিন্তু মঙ্গলদায়িনী শিব হলেন শুদ্ধসত্ত্বা। বিষ্ণু ও শিব পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের অংশে সৃষ্টি, বাদবাকি অন্যরা শ্রীকৃষ্ণের অংশ সনক মায়ায় মোহিত হয়ে মুনিরাও বিপরীতগামী হন। সনন্দ, সনাতন ও ভগবান সনকুমার। এরা হলেন ব্রহ্মার পুত্র। তিনি পুত্রদের সৃষ্টি কাজ শুরু করতে বললেন। কিন্তু তারা অস্বীকার করলেন। তখন ব্রহ্মার কোপ থেকে যাদের সৃষ্টি হয়েছিল তারাই হল রুদ্র। সনক ও সনন্দ অর্থাৎ যারা সবসময় আনন্দে গা ভাসিয়ে দেয়। তাই ব্রহ্মার দুই পুত্রের নামকরণ করলেন সনক ও সনন্দ। সনাতন কথার অর্থ, সে সর্বদা কৃষ্ণপদে মতি রাখে। সনৎ অর্থাৎ নিত্য এবং কুমার অর্থাৎ শিশু, তাই থেকে সৃষ্টি হয় সনৎকুমার।

.

শৌনক বললেন– ব্রহ্মার পুত্রদের নামের ব্যুপত্তি সম্পর্কে অবগত হলাম। এবার দয়া করে নারদের নামের অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

সৌতি বললেন–বেদাঙ্গ পারদর্শী নারদকে পিতা ব্রহ্মা কাছে ডাকলেন বললেন, তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, আমার কুলশ্রেষ্ঠ। তোমার কৃপায় অজ্ঞানী জ্ঞান লাভ করে, প্রণম্য দেবতাদের মধ্যে পিতা হলেন শ্রেষ্ঠ গুরু। যিনি শিক্ষক ও মন্ত্র দান করেন তিনি একাধারে বাবা, অন্যধারে মন্ত্র গুরু। তুমি বিবাহ করলে আমি সন্তুষ্ট হব। হে বৎস, যে পুত্র পিতৃআজ্ঞা পালন করে এবং গুরু আদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করে সে হল প্রকৃত শিষ্য ও পুত্র। আর যে তা করে না, সে হল চরম মূর্খ। গৃহস্থ আশ্রমই হল সকল আশ্রমের সেরা। কারণ পর্বকালে পিতৃ পুরুষরা আর তিথি কালে দেবতারা গৃহস্থের কাছে আসে। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য– এই তিন ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গৃহীরা নানা ধরনের সুখভোগ করে এবং মৃত্যুর পরে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। নিজের ধর্ম পালন করে যে সে পুণ্যবান, সে যশ ও ধন লাভ করে। যশস্বী ও কীর্তিমান পুরুষ মরণের পরেও তার কীর্তির জন্য অমর থাকে।

পিতা ব্রহ্মার এই সব্ব উপদেশ শুনে নারদ ভয় পেলেন। বললেন– হে পিতা। এর আগে এই বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে তর্ক বেঁধেছিল, আপনি আমায় অভিশাপ দিয়েছিলেন, আমি গন্ধর্বযোনি ও শূদ্রয়োনি জন্ম নিয়ে কর্মফল ভোগ করেছি। আর আমার শাপে আপনি জগতে অপূজ্যা হয়েছেন।

কালের নিয়মে আমি সেই শাপ মোচন করে স্বস্থানে ফিরে এসেছি। আপনিও আবার জগৎবাসীর পুজো পাবেন। আমাদের এই অমীমাংসিত বিরোধ হল নির্গুণ। যে শ্রীকৃষ্ণের চরণ সর্বদা বন্দনা করে, সেই শ্রীহরি তার সখা হয়। তিনি হন সেই কৃষ্ণপ্রেমিকের পিতা গুরু ও পুত্র। ইনিই হলেন প্রকৃত ঈশ্বর। পুত্র অসৎ পথে গেলে কৃপার সাগর শ্রীকৃষ্ণ তাকে সুপথে নিয়ে আসেন। আর আপনি পিতা হয়ে পুত্রকে সেই বিষরূপ সংসারে প্রবেশের আজ্ঞা দিচ্ছেন। স্ত্রী গ্রহণ করলে তপস্যা, স্বর্গ, ভক্তি, মুক্তি সর্বনাশ হয়, কেবল লাভ হয় দুঃখ। সাধ্বী, ভোগ্যা ও কুলটা– এই তিন ধরনের স্ত্রীরা নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যস্ত থাকে। স্বাধ্বী নারী পরলোকের ভয়ে এবং ইহকালে নিজের যশ বৃদ্ধির জন্য স্বামীর মনরক্ষা করে চলে। ভোগ্যা সর্বদা নিজের কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য স্বামীমুখী হয়। কুলটা স্ত্রী কপটতার আশ্রয় নেয়। সে হয় সংসারের কলঙ্কিনী। এরা কামবাসনা পূরণের জন্য অন্য পুরুষের সঙ্গ লাভ করে। এদের উপপতির সংখ্যা অনেক। উপপতির জন্য এই শ্রেণীর নারীরা স্বামীকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। এই তিন শ্রেণীর স্ত্রী বাইরে দেখায় কত স্বামী অনুগত প্রাণা, অথচ মনে তাদের ক্ষুরধার করাত। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে স্বার্থ হাসিল করতে চায়। যদি ঈপ্সিত ইচ্ছা পূরণ না হয় তাহলে সাপের মতো ফুসলে ওঠে, গালিগালাজ করে।

হে জগৎগুরু। আপনি তো জানেন, স্ত্রীদের আহার দ্বিগুণ, নিষ্ঠুরতা তার দ্বিগুন এবং কাম প্রবণতা তার দ্বিগুণ। এইসব নারীদের ওপর কি ভরসা করা যায়। রমণী সম্ভোগ তেজ ম্লান হওয়ার কারণ বেংসূর্যালোক বলে। গল্প করলে যশের ক্ষতি হয়। বেশি প্রেম প্রদর্শনের ফলে ধনক্ষয় হয়, বেশি আসক্তিতে দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। রমণীর সঙ্গে সহবাসে পৌরুষ নষ্ট হয়। তার সঙ্গে বা কথা। কাটাকাটি করলে সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। যে স্বামী ব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধ বা দরিদ্র, তাকে লোকাঁচারের ভয়ে সামান্য খেতে দেয়। নারীকে বশে রাখতে হলে চাই ধন, তেজ, ঐশ্বর্য ও যোগ্যতা। যে পুরুষের এইসব নেই সে ক্লীবে পরিণত হয়! হে বিভু, আপনি আত্মারাম ও ঈশ্বর, আপনি সর্বজ্ঞ। আপনাকে আমি নতুন করে কী জ্ঞান দেব। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি মঙ্গলকর, শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানে ব্রতী হই।

কথা বলা শেষ করে নারদ ব্রহ্মাকে প্রণাম জানালেন। আর ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন।

এতক্ষণ নীরবে ব্রহ্মা সব কথা শুনছিলেন। আর তিনি নিজেকে সামলাতে পারলেন না। আত্মারাম মহাত্মা ঈশ্বর পুত্রের বিচ্ছেদ ব্যথা সহ্য করতে না পেরে ছোট্ট শিশুর মতো হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। নারদকে বুকের মাঝে টেনে নিলেন। চুম্বনে চুম্বনে তাকে অস্থির করে তুললেন। নিজের জানুর ওপর পুত্রকে বসালেন।

.

সৌত বললেন– হে শৌণক! ব্রহ্মা তখন বিষ্ণুর মায়ায় মোহিত হয়ে পুত্র বিচ্ছেদে কাতর ও শোক পীড়িত হয়ে পড়লেন। তিনি পুত্র নারদকে বললেন– বৎস! তুমি যদি তপস্বী হও, তাহলে আমার সংসার করার কী প্রয়োজন? সনক; সনাদ, তৃতীয় সনাতন এবং চতুর্থ পুত্র সনৎকুমার কেউই গৃহী হল না। মতী, হংসী, অরুণি বোঢ় এবং পঞ্চশিখ তারাও আমার বাক্য শ্রবণ করল না। কেবল মরীচি, অঙ্গিরা, ভৃগু, রুচি, অত্রি, কর্দম, প্রচেতা, ক্রতু, মনু ও বশিষ্ঠ, আমার বাধ্য। বাকি সবাই বড়ো বেশি বিবেকী। তাই সংসার ত্যাগ করে আমিও শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনে গোলকধামে যাব ঠিক করেছি।

হে পুত্র, তোমাকে বেদসম্মত চারটি বর্গের সম্পর্কে কিছু জ্ঞান দিই। ধর্ম হল বেদের স্বরূপ। আর বাকি সব অধর্ম। যজ্ঞসূত্র ধারণ করে ব্রাহ্মণ নিয়মমতো বেদ পাঠ করে, তারপর গুরুকে দক্ষিণা দান করে, তারপর কোনো এক উত্তম বংশের কন্যাকে বিয়ে করে সংসারী হয়। সদ্বংশজাত নারী কখনও স্বামীর বিরোধিতা করে না। যে কন্যা নীচ বা খারাপ বংশে জন্মায় সে তার পিতা মাতার দোষে দুষ্ট হয়। যারা স্বর্গের সার অংশে জন্মায় তারা অসদ্বংশে জন্ম নেয়। এবং তারা হয় দুর্বিনীত। যে নারী সতী সে নির্গণ স্বামীকে সেবা করে। কিন্তু কুলটা নারী স্বামী যতই গুণবান হোক না কেন, নিন্দা করতে ছাড়ে না। তাই সদ্বংশের কন্যাকেই সাধুলোকেরা বিবাহ করেন।

বৎস! তুমি বেদ সম্পর্কে আমার কাছে শুনলে, জ্ঞান লাভ করলে। আমি তোমার গুরু হিসেবে দক্ষিণা চাইছি। তুমি যদি তোমার পূর্বপত্নী মালতাঁকে বিবাহ করো, তাহলে সেটাই হবে আমার দক্ষিণা। সেই সতী মনুবংশের সৃঞ্জয়ের ঘরে জন্ম নিয়েছে। এখন সে তপস্যায় মগ্ন। সে লক্ষ্মীর অংশজাত। ভারতবর্ষের মাটিতে বসে যে তপস্যা করে, তার তপস্যা কখনও বৃথা হয় না। বেদ বলেছে, প্রথমে সংসারে তারপর বাণপ্রস্থ এবং তপস্যা, যা মোক্ষ লাভ ঘটায়। সে বৈষ্ণব শ্রীহরির পূজার্চনা করে তাকে আর আলাদা করে তপস্যা করার জন্য বনে যেতে হয় না। তুমি ঘরে বসে সংসার করার মাঝে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে বিভোর হতে পারো। যার মনের ভেতরে ও

বাইরে শ্রীহরি তার আর তপস্যার প্রয়োজন হয় কি? তপস্যার দ্বারা যাঁকে আরাধনা করা হয়, তিনি স্বয়ং শ্রীহরি। কৃষ্ণ সেবার নামই তপস্যা। তাই আমি বলছি, তুমি সংসার ধর্ম পালন করো। রমণীর স্পর্শ সুখ যে পায় না সে অত্যন্ত দুর্লভ জিনিস হারায়। তাই প্রেয়সীকে প্রিয়া নামে ডাকা হয়। পুত্রের থেকে প্রিয় কিছু আর কে হতে পারে। সেই প্রিয় বন্ধুর সন্ধান দিতে পারে তোমার পত্নী। কথায় আছে পুত্রের কাছ থেকে পরাজয়ের গ্লানি লাভ করলেও তা অতি মিষ্টি লাগে, কিন্তু অন্যের কাছে তা হয় তিক্ত। যদিও আত্মা প্রিয়। কিন্তু পুত্র তার চেয়েও প্রিয়। প্রিয়তম পুত্রকে আত্মার থেকেও শ্রেষ্ঠ ধন দান করবে।

মহাজ্ঞানী নারদ বললেন– হে পিতা। বেদ ও দর্শনশাস্ত্র জ্ঞাত হয়েও আপনি আমাকে সংসারে প্রবেশ করাতে চাইছেন, আপনাকে আমি দয়ালু পিতা বলি কী করে, সংসার অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী জলের রেখার মতো মুছে যায়। কিছুদিন পরে, স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি সম্পর্কগুলি সৃষ্টি হয় কাজের খাতিরে। যে লোক হরিপদ ছেড়ে সংসার বিষ সাগরে নামে, সে ডুবে মরে অতলে। যে লোক ছেলেকে কুপরামর্শ দেয়, সে শত্রু নামে পরিচিত। আর ছেলেকে যে সৎ উপদেশ দেয়, সে বাবা এবং গুরু। হে পিতা! বেদের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে যা জানি, তাই বললাম। এই তত্ত্ব এতটুকু মিথ্যে নয়। তবুও আপনার আদেশ আমি মাথায় করে নিলাম আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, পাণিগ্রহণ করব। তবে এখন না। আগে আমি যাব বদরিকা আশ্রমে। সেখানে নারায়ণের মাহাত্ম কথা শ্রবণ করব।

নারদ চুপ করলেন। তার ওপর পুস্পবৃষ্টি হল।

নারদ আবার বললেন– পানিগ্রহণ করার আগে আমি আপনার কাছ থেকে কৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধীয় ও কৃষ্ণ মাহাত্ম্যযুক্ত কথা শুনতে চাই। আমার ইপ্সিত সেই কৃষ্ণমন্ত্র দান করুন। মনের বাসনা পূরণ হলে চিত্ত পুলকিত হয়। তখন যে কোনো কাজ করতে ভালো লাগে।

নারদের কথা শুনে পিতা ব্রহ্মা অত্যন্ত খুশি হলেন, তিনি বললেন– পিতা এবং পতি কখনও মন্ত্র দান করতে পারে না। এমনকি আশ্রমবাসী যে নয়, তার কাছ থেকে মন্ত্র নিলে, তা মোটেও মঙ্গলজনক হয় না। মন্ত্র গুরু, স্ত্রী, বিদ্যা, সুখ, দুঃখ ও ভয়–এইসবই নিয়তির নির্দেশমতো মানুষের জীবনে আসে। পৌরুষ যা করতে চায়, তাই তুমি করতে পারো না। তুমি বরং সেই মঙ্গলদায়ক শান্ত ও জ্ঞানী গুরুর কাছে যাও, যিনি আমাদের থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই মহেশ্বর তোমাকে কৃষ্ণমন্ত্র দান করতে পারে, কৃষ্ণ লীলা ও মাহাত্ম বিষয়ক কথা শোনাবেন। তুমি শিবলোক থেকে ঘুরে না আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব, তুমি এখন আসতে পারো।

মহাজ্ঞানী নারদ পদ্মযোনি পিতা ব্রহ্মাকে প্রণাম নিবেদন করে সে স্থান ত্যাগ করলেন।

.

সৌতি বললেন– মুণি শ্রেষ্ঠ, নারদ অল্পক্ষণের মধ্যেই শিবলোকে এসে পৌঁছোলেন। ধ্রুবলোক থেকে লক্ষযোজন ঊর্ধে শিবলোকের অবস্থান। মহাদেব নিজের পরিকল্পনাতে এই রত্নখচিত সুন্দর প্রাসাদটি তৈরি করিয়েছেন। এখানে অনেকগুলি বাড়ি আছে। মূল আশ্রম যেখানে স্বয়ং শিব বিরাজমান, সেটি যোগবলে শূন্যমার্গে ভেসে আছে। পুণ্যত্ম সাধক শ্রেষ্ঠরা সাধনাবলে ওই শিবলোক মানবচক্ষে দেখতে পারেন। এখানে চন্দ্রসূর্যের আলো প্রবেশ নিষেধ, প্রাচীরাকার অত্যন্ত লম্বা ও উঁচু এবং অগনিত উজ্জ্বল শিখাসমেত আগুনের শিখা চারিদিক বেষ্টন করে আছে, সেখানে আছে মন্দার প্রভৃতি সুন্দর ফুল ও দেবগাছ। শিবলোকের আকাশ কামধেনুতে সুসজ্জিত। প্রধান শিবসেবকরা কল্পকাল পর্যন্ত এই শিবলোকে বাস করেন। এখানে সিদ্ধ পুরুষের সংখ্যা শতকোটি লক্ষ, শিবপার্ষদ আছেন তিন কোটি লক্ষ, তিনলক্ষ ভয়ংকর ভৈরব ও চার লক্ষ ক্ষেত্রপালের বাস।

শিবলোকের সৌন্দর্য দেখে নারদ বিস্মিত হলেন। জ্ঞানী ও যোগীদের গুরুর পথেই তো এমন বিচিত্র কাজ করা সম্ভব। শিবপুরীতে ভয়, মৃত্যু, রোগ, শোক, ও জরার প্রবেশ নিষেধ। শিব তখন শান্ত ও মনোহর ভঙ্গিতে তার আসনে বসেছিলেন। নারদ সেই রূপ প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন ভালোভাবে আহা! কী অপরূপ রূপ, কপালে চন্দ্রের শোভা, মাথায় গঙ্গাকে ধারণ করেছেন, চাঁদের ন্যায় পাঁচটি মুখ, ত্রিনেত্র যেন এক একটি পদ্ম ফুল। সোনারঙের মতো জটাজুট নেমে পড়েছে। মাথা থেকে। তিনি বাঘছাল পরেছেন। গলা থেকে খুলে পড়েছে মারত্মক বিষাক্ত সাপ। তিনি নীলকণ্ঠ। তিনি সিদ্ধিবিধানের কারণ ও সিদ্ধেশ্বর যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র ও সিদ্ধেগণ তার ধ্যান করছেন। তিনি মঙ্গল ও বরদান করেন।

নারদ এগিয়ে গেলেন আশুতোষের দিকে, তারপর করজোড়ে মাথা অবনত করে প্রণাম জানালেন। তার সমস্ত দেহ পুলকিত হল। তিনি বীণা বাজিয়ে কৃষ্ণ গানে বিভোর হলেন। সেই পরমেশ্বর শূলপানি নিজের আসন থেকে উঠে এলেন। সঙ্গে এলেন যোগীন্দ্র, মুনিন্দ্র ও সিদ্ধেন্দ্রদের দল। মহেশ্বর নারদকে সম্ভাষণ জানালেন। স্মিত হেসে তাকে উত্তমাসন গ্রহণ করতে বললেন। মহাদেব নারদের আসার কারণ জানতে চাইলেন।

শিব তার পার্ষদদের নিয়ে নিজের আসনে ফিরে গেলেন। নারদ কিন্তু বসলেন না। তিনি দাঁড়িয়ে থেকেই ভক্তি সহকারে প্রভুর স্তব করতে শুরু করলেন। গন্ধর্বরাজের কাছে থেকে লাভ করা শিব স্তোত্র উচ্চারণ করলেন। তারপর মহাদেবের বাঁদিকে আসন গ্রহণ করলেন।

.

সৌতি বললেন– হে শৌণক! অভীপ্সা মতো শিব নারদকে হরির কবচ, মন্ত্র, স্তোত্র, পুজোর নিয়মাবিধি, ধ্যান জন্মান্তরীণ-জ্ঞান দান করলেন। মনোবাসনা পূর্ণ হতে নারদ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। গুরু মহাদেবকে প্রণাম করে নারদ জানতে চাইলেন, যার দ্বারা প্রতিদিন স্বধর্মের পালন হয়ে থাকে, সেই আহ্নিক কর্তব্য কী।

এই প্রশ্নের উত্তরে শিব বললেন– ব্রাহ্মমুহূর্তে ব্রাহ্মণ বিছানা ত্যাগ করে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করবে। ব্রহ্মারন্ধ্রের মধ্যেকার পদ্মের মধ্যেই গুরুকে স্মরণ করবে, যে পদ্মের সূক্ষ্ম হাজার পাপড়ি আছে, যা নির্মল ও গ্লানিশুন্য। গুরুকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা করবে। তিনি শান্ত মুখে স্মিত হাসি, গুরু শিষ্যের ধ্যানে সন্তুষ্ট হলে ইষ্টদেবের ধ্যান করার আদেশ দেবেন। নির্মল শুভ্র হাজার পাপড়ি সমেত বিস্তীর্ণ হৃদয়পদ্মে ইষ্টদেবের অবস্থান। পরে তার অনুমতি পেলে অন্য সব দেবতার ধ্যান। করতে হয়। যে দেবতার যেমন ধ্যান তাঁকে সেইভাবে চিন্তা করা কর্তব্য। ইষ্টদেবের থেকে গুরু শ্রেষ্ঠ। কারণ, ইষ্টদেব গুরু নির্দেশিত পথেই গমন করেন। ব্রহ্মা কে? বিষ্ণু কে? কে বা মহেশ্বর? সবই গুরু। গুরুই সৃষ্টির প্রধান সহায়ক। চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, মাতা, পিতা বন্ধু– সবই গুরু। গুরু সর্বশ্রেষ্ঠ প্রণম্য এবং পূজনীয়। গুরু কুপিত হলে তাঁকে শান্ত করার ক্ষমতা কোনো দেবতার নেই, কিন্তু ইষ্টদেব ক্রোধান্বিত হলে গুরু তাঁকে শান্ত করতে পারেন। গুরুমাকে যে তুষ্ট করতে পারে, সে সর্বজয়ী হয়। আর গুরুকে রুষ্ট করলে সর্বনাশ অবধারিত। তাই গুরুদেবকে আগে পুজো করা কর্তব্য, নচেৎ ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ হয়। গুরু ও ইষ্টদেবের ধ্যান ও বন্দনা শেষ করে মল মূত্র ত্যাগ করবে। বেদ বলেছে নদীর মধ্যে মন্দিরের সামনে গাছের গোড়ায়, পথে চাষবাসের স্থানে, শস্যক্ষেত্রে গোচারণ ভূমিতে, কোনো প্রাণীর সম্মুখে, গ্রামের মধ্যে মানুষের বাড়ির সামনে, ফুলের বাগানে, শরবনে, শ্মশানে, আগুনের সামনে, সেতুতে, খেলার মাঠ, নিবিড় অরণ্যে, পরিষ্কার কোনো স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে কোথায় প্রাত্যহিত কাজ সম্পন্ন করবে। বেদে বর্ণিত হয়েছে, উল্লিখিত স্থানগুলি বাদে যেখানে গর্ত খুঁড়ে মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত। দিনের বেলায় উত্তরে, রাত্রি বেলায় পশ্চিমদিকে এবং সন্ধেবেলা দক্ষিণ দিকে মুখ করে ওই সব কাজ সারবে।

কী ভাবে শৌচ, করবে, তা শোনো। মাটি ও জল দিয়ে শৌচ ক্রিয়া করবে। লিঙ্গে একবার, বাঁ হাতে চারবার, এবং দুহাতে দুবার মাটি দেবে এবং জল দিয়ে ধুয়ে নেবে। মৈথুনের পর এর দ্বিগুণ হবে শৌচের মাত্রা এবং মূত্র শৌচ করতে হয় চারগুন। মলত্যাগের পর শৌচ করা নিয়ম বলা হয়েছে! এইভাবে লিঙ্গে একবার, গুহ্যে তিনবার, হাতে দশবার, দুহাতে সাতবার এবং দুপায়ে দুবার মাটি দিয়ে ধৌত করতে হয়।

গৃহী সাধকরা এইভাবে মল ও মূত্র শৌচ করবে। ক্ষত্রিয় বৈশ্যরা গৃহী ব্রাহ্মণদের মতো শৌচ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। গৃহীদের চারগুণ পালন করবে। সন্ন্যাসী ব্রহ্মর্ষি, ও ব্রহ্মচারীদের তবে নিয়ম করে পালন করতেই হবে। অতিরিক্ত বার শৌচ কর্ম করলে ফলভোগ করতে হয়। ব্রাহ্মণ মাটি দিয়ে শৌচ করলে তবেই সে শুচি হবে, নতুবা নয়, কোন মাটি শৌচ কর্মে ব্যবহার করা যায়? এ সম্পর্কে শ্রীহরির বিধান, উই ও বেড়ালের ভোলা মাটি, একবার শৌচ করা হয়েছে, সে মাটি, ঘরের মাটি, লাঙ্গলের মুখের মাটি, যেখানে প্রাণী মরে পড়ে আছে, এমন মাটি, কুশ দুর্বা ও অশ্বত্থের মূলের মাটি, চারপথের মাটি, গোষ্ঠের মাটি–এসব মাটি ছাড়া অন্য সব মাটিতে শৌচ কাজ করা যাবে।

এরপর মুখ শুদ্ধি করতে হবে। ব্রাহ্মণ মলমূত্র ত্যাগ করে এসে স্নান না করলেও চলে। কিন্তু মুখ শুদ্ধ করতেই হবে। এক্ষেত্রে বলা হয় ব্রাহ্মণ মুখে মাটি দিয়ে ষোলোবার কুলকুচি করে ফেলে দেবে। তারপর আবার মুখ বেধে কাঠি দিয়ে দাঁত মাজবে। তারপর ষোলোবার মুখ ধোবে, অপামার্গ, সিন্ধুবার, আম, করবী, খদির, শিরীষ, জাতি, পুন্নাগ, শাল, অশোক, অর্জুন, ক্ষীরি, কদম, জাম, বকুল, যজ্ঞডুমুর আর পলাশ গাছের কাঠ দিয়ে দাঁতের কাঠি তৈরির কথা বলা হয়েছে। কুল, মাদার, আকন্দ, শিমূল, পিপুল, পিয়াল, তেঁতুল, তাল, খেজুর, নারকেল, তাল এবং লতাছাড়া কাঁটাওয়ালা গাছের কাঠ দিয়ে দাঁত মাজলে প্রায়শ্চিত করতে হবে। যে গৃহীব্রাহ্মণ দন্ত মার্জনা করে না, সে কখনও শুদ্ধি নয়। আর এইসব ব্রাহ্মণ কোনো কাজে যোগ দিতে পারে না।

শৌচ কর্মাদি সেরে সে ধোয়া কাপড় পরে চাদর গায়ে জড়াবে। পা ধোবে তারপর আচমন করতে বসবে। যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যায় সন্ধ্যাবন্দনা করে তীর্থ স্থানের সমান ফললাভ হয়। যে এর ব্যতিক্রম, সে অন্য সব আহ্নিক করলেও কোনো সুফল দেয় না। যে ভোরে আহ্নিক না করে অন্য দুইবার উপাসনা করে সে ব্রহ্ম হত্যা ও আত্মহত্যার পাপের ভাগী হয়। একাদশী উপবাসী না থাকলে এবং সন্ধাহ্ণিক না করলে কালমূত্র নরক যন্ত্রণা ভোগ করে।

একজন উত্তম সাধক ব্রাহ্মণের উচিত, প্রাতঃ আহ্নিক শেষ করে গুরু, ইষ্টদেব এবং অন্যান্য দেবতাদের বন্দনা করে ঘি, আয়না, মধু ও সোনা স্পর্শ করে স্নান করা ধার্মিক ও জ্ঞান ব্রাহ্মণ। পরের পুকুরে বা জলাশয়ে স্নান করার আগে পাঁচ মুঠো পাঁক তুলে নিয়ে, স্নান করে সংকল্প করতে হয়, তারপর আবার মাথা জলে ডোবাতে হয়। সংকল্প শেষ করে দেহ শুদ্ধি করবে গায়ে মাটি মেখে। এসব যে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয় তা বেদে বলা হয়েছে। নাভি পর্যন্ত জলে ডোবাবে। চার হাত জায়গা ছড়িয়ে একটি মণ্ডল রচনা করবে মাত্র। বলতে হবে–হে বসুন্ধরা, তুমি অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা এই তিনটি প্রকার। হে মৃত্তিকা, শ্রীকৃষ্ণ বরাহ রূপ ধরে তোমাকে উদ্ধার করেছেন। তার শত হাত দিয়ে এখন তুমি আমার গায়ের পাপ নাশ করো। হে মহান, আমাকে পুণ্যবান করো। স্নান করার অনুমতি প্রদান করো। তারপর ওই জলের ওপর হাত রেখে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী তীর্থকে আহ্বান জানাবে, তারপর দেবীদের স্মরণ করবে, যেমন নলিনী, নন্দিনী, সীতা, মালিনী, ত্রিপথগামিনী বিশ্বকায়া শিবা, অসিতা, মহাপাথগা, ক্ষেমা, বৈষ্ণবী সুভগাপূর্থী, ভোগবতী, লোপামুদ্রা, দূর্গা, মহালক্ষ্মী, তুলসী, শান্তিপ্রদায়িনী সরস্বতী, সুপ্রসন্না বিদ্যাধরী, কৃষ্ণপ্রাণাধিকা, শতরূপা, অরুন্ধতী অদিতি, অহল্যা, সংজ্ঞা স্বধা, স্বাহা, রতি, দেবহূতি, স্বর্ণরেখা, বিধ্যাধরী এবং কৌশিকী। এরপর মন্ত্র পড়ে স্নান সেরে কপালে তিলক কাটবে। তিলকহীন ব্রাহ্মণ সব কাজের অযোগ্য। গলায়, বুকে ও হাতের ওপর দিকে তিলক কেটে সন্ধ্যাহ্নিক করতে হয়। দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভক্তিসহকারে প্রণাম জানাবে।

স্বয়ং হরি বলেছেন, পা ধুয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকবে। যে পা ধৌত করে না, তার স্নাত জপ হোম, সবকিছু বিসর্জন যায়। পুজো করার বিধি বেদে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শালগ্রাম শিলাকে পুজো দেবে। এ ছাড়া মণি, যন্ত্র প্রতিমা, জল, স্থল, গোরুর পিঠ, গরু এবং ব্রাহ্মণকেও শ্রীহরির উদ্দেশ্যে পুজো করা চলে। শালগ্রাম শিলার জলে অভিষিক্ত হলে সমস্ত তীর্থ স্নান এবং সমস্ত যজ্ঞে, সমান ফল লাভ হয়। শালগ্রাম শিলা ধোয়া জল প্রতিদিন পান করলে মোক্ষ লাভ হয় এবং গোলোকে শ্রীহরির সঙ্গ পায়।

হে নারদ, প্রত্যেক তীর্থস্থানে শালগ্রাম শিলাচক্র থাকে জানাব। কারণ এখানে সচক্র ভগবান বাস করেন। জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে ওই স্থানে মৃত্যু হলে রত্নযানে চেপে সে গোলোকে যায়। শালগ্রাম শিলা ব্যতীত পুজো করা বিধেয় নয়।

নারদ এবার তোমাকে পুজোর ক্রম বর্ণনা করছি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রীহরির পাদ বন্দনা করতে পারো। কেউ ষোলো কেউ বারো, কেউবা পাঁচরকম উপকরণ দিয়ে

নারায়ণের পুজো দেয়। তবে একথা জানবে, উপচার যেমনই থাকুক না কেন, আসল হল ভক্তি। যার ভক্তির অভাব, সে হাজার রকম উপচার দিয়ে শ্রীহরিকে তুষ্ট করতে পারে না। যে ষোলোটি উপকরণ শ্রীহরির পুজোয় লাগে তার মধ্যে আছে আসন, পাদ্য, বস্ত্র অর্ঘ্য, আচমনীয়, ফুল, ধূপ, দীপ, চন্দন, উত্তম নৈবদ্য, সুবাস, মালা, নরম ও মনোহর শয্যা, সাধার জল ও অন্ন এবং পান। দ্বাদশ উপাচারের মধ্যে আছে সুবাস, অন্ন, শয্যাও পান ছাড়া উপরোক্ত সবগুলি। পঞ্চ উপচার–পাদ্য, অর্ঘ্য, জল, নৈবেদ্য ও ফুল মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে ব্রাহ্মণ এইসব উপকরণ একটি একটি করে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করবে।

গুরুর দান করা মন্ত্রই সব কাজে প্রযোজ্য, কুর্ম দেবতার পুজো করার আগে বর্ণন্যাস করবে এবং অর্ঘ স্থাপন করে সেখানে ত্রিকোণাকৃতি মণ্ডল মনজল তৈরি করবে। তার আগে মন্ত্রন্যাস, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ন্যাস, প্রাণায়াম এবং ভূত শুদ্ধি করতে হয়। জলশঙ্খে জল দিয়ে জল দেবতার পুজো করবে। সমস্ত তীর্থের আবাহন করবে। তারপর ওই শাঁখের জলে ওই সমস্ত উপচারগুলি ধুয়ে নেবে। একটা ফুল হাতে নিয়ে যোগাসন করে বসবে একমনে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করে মূলমন্ত্রে তার উদ্দেশ্যে সব কিছু উৎসর্গ করবে। তারপর ওই মন্ত্রে ইষ্টদেবতাকে বন্দনা করা কর্তব্য। স্তবকবচ পাঠ করার সময় নানা উপকরণ নিবেদন করতে হয়। মাটিতে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানাতে হয় এবং বলতে হয়– হে শ্রীকৃষ্ণ! হে দেবতাগণ, আমাকে রক্ষা করুন। বেদ ও স্মৃতি অনুসারে বৈশ্ববলি প্রদান করে নিত্যশ্রাদ্ধ ও যথা শক্তি ধন দান করা উচিত। তারপর অন্যান্য কাজ করার কথা বলা হয়েছে। এই হল বেদে বর্ণিত কৃতী ব্রাহ্মণের প্রতিদিনের কাজের বিধি।

.

নারদ বললেন, হে প্রভু! আপনি দয়া করে বলুন, ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী, বিষ্ণব বা বিধবা কী ধরনের আহার করবে?

মহাদেব বললেন–লোকের খাওয়ার রুচি একরকম নয়। কোনো মুনি কেবল বায়ু খেয়ে জীবন কাটান। কারও জীবন কেবল ফলের ওপর নির্ভর করে। তবে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ হবিষ্য খাবে। নিজে আহার করার আগে নারায়ণকে নিবেদন করে সেই প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত। ঠাকুরকে নিবেদন না করে অন্নজল গ্রহণ করলে তা হয় মল ও মূত্রের সমান। একাদশী তিথিতে উপবাসী না থেকে অন্নজল গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণের ত্রৈলোক্য জনিত পাপ হয়।

শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব, কোনো গৃহী ব্রাহ্মণ একাদশীতে একেবারেই অন্ন স্পর্শ করবে না। তাহলে তাকে কালমূত্র নরকে কৃমিদের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় চৌদ্দজন ইন্দ্রে সময়কালব্যাপী একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করার ফলে যত না পাপ হয় রামনবমী, শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমীতে অন্ন স্পর্শের ফলে দ্বিগুণ পাপ হয়। নিরম্বু উপবাসী না থাকলেও চলবে। ফলমূল, জল খেতে পারে। কারণ খিদের তাড়নায় উপোসী শরীর কষ্ট পেলে তা আত্মহত্যার সমান। বিষ্ণুকে নিবেদন করে হবিষ্যান্ন ও দিনে একবার খাওয়া যেতে পারে। ভারতের গৃহী ব্রাহ্মণদের জন্য বলা হয়েছে একাদশীর দিন নির্জলা উপবাসী থাকলে বৈকুণ্ঠধামে গমন করা যায় এবং ব্রহ্মার বয়স পর্যন্ত সেখানে বাস করতে পারে।

বৈষ্ণব মতি ও ব্রহ্মচারীদের খাদ্য গ্রহণের বিষয়ে বলা হয়েছে, প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত অন্নজল ও ফলমূল খায় যে বৈষ্ণব সে শত উপবাসের ফললাভ করে। সে দেবতা সমান হয়। তীর্থে দেবতারা তার স্পর্শ পেতে আগ্রহী হয়। তার সঙ্গে কথা বললে বা তাকে দর্শন করলে সমস্ত পাপ নাশ হয়। সেদ্ধ চালের অন্ন ও চিঁড়ে ব্রাহ্মণ খাবে না এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করবে না। যতি, বিধবা ও ব্রহ্মচারীদের পান খাওয়া নিষেধ। স্বয়ং শ্রীহরি সামবেদে আহ্নিক ক্রম বর্ণনায় বলেছেন –তামার গ্লাসে দুধ পান করা, এঁটো পাতে ঘি খাওয়া, লবণ দিয়ে দুধ খাওয়া ব্রাহ্মণদের পক্ষে হিতকর নয়। এসব হল গোমাংসের ভক্ষণ করার সমান কাঁসার পাত্রে নারকেলের জল, তামার পাত্রে মধু এবং আখ থেকে তৈরি যে খাদ্যদ্রব্য ব্রাহ্মণের কাছে সুরার সমান। ব্রাহ্মণের কাছে সুরার সমান হল। এটা হাতে তুলে জল খাওয়া উচিত নয়, সে সমস্ত কাজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ব্রাহ্মণ কার্তিমাসে বেগুন, মাঘ মাসে মূলো এবং হরিশয়নে কলমী শাক খাবে না, তা নিশ্চয়ই গোমাংসের মতো, ব্রাহ্মণদের মাছ, মুসুর ডাল এবং সাদা রঙের ডাল খাওয়ার নিয়ম নেই, যদি বা মাছ খাওয়া হয় তাহলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হতে হবে। প্রতিপদে কুমড়ো খেলে অর্থ নাশ হয়। দ্বিতীয়াতে ছোটো বেগুন খেলে শ্রীহরিকে পুজো করার অধিকার হারাতে হয়। তৃতীয়াতে পটল গ্রহণের ফলে শত্রু সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, ধননাশ হয়। চতুর্থীতে মূলো খেলে, পঞ্চমীতে বেল খেলে কলঙ্ক, ষষ্ঠীতে নিম খেলে পরজন্মে তির্য্যগ যোনি লাভ হয়, সপ্তমীতে তাল খেলে ব্যাধি হয়, অষ্টমীতে নারকেল খেলে রোগ বুদ্ধি নাশ, নবমীতে লাউ ও দশমীতে কলমী শাক গোমাংসের মতো। একাদশী তিথিতে, শিম দ্বাদশীতে, পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দশীতে মাংস খেলে মহাপাপে পড়তে হয়। গৃহস্থরী অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে মোটেও মাংস ভক্ষণ করবে না।

হে নারদ, সরষের তেল ও পাকা তেল যদি ভোরে স্নানে, শ্রাদ্ধের দিনে, অমবস্যা পূর্ণিমাতে সংক্রান্তি, চতুর্দশী ও অষ্টমীতে ব্যবহার করা হয় তাহলে সুফল পাওয়া যায়। স্ত্রী সহবাস,

তিলতেল মাখা, লাল রঙের শাক খাওয়া এবং কাঁসার থালায় ভোজন রবিবার, শ্রাদ্ধের এবং ব্রতের দিন বর্জনীয়। যে গৃহী ভোরবেলা, দুপুর বেলা এবং সন্ধেবেলা নিদ্রা যায় রাতে দই খায় বা ঋতুমতী স্ত্রী সম্ভোগ করে সে নরক লাভ করে। রজঃস্বলা স্ত্রী, অবীরা, বেশ্যা, শূদ্রের শ্রাদ্ধের অন্ন সুদখোরগণক, অগ্রদানী ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করলে পাপ হয়। হস্তা, চিত্রা ও শ্রবণা নক্ষত্রে তেল ব্যবহার করা বারণ। মূলা, মৃগশিরা ও ভাদ্রপদ নক্ষত্রে মাংস রান্না করবে না। তা হয় গোমাংসের সমান। দেবতা বা মৃত পিতার উদ্দেশে তর্পণ করার আগে স্ত্রী সম্ভোগ বা ক্ষৌর কাজ করা উচিত নয়। তাহলে অর্পিত জল রক্তের সমান হয় এবং যে জল নিবেদন করে তার অনন্ত নরক বাস হয়। এই হল খাওয়ার বিধিনিধেধ, মঙ্গল অমঙ্গলের কথা।

নারদ বললেন–হে সর্বজ্ঞ! আপনার দয়ায় আমি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করলাম। ব্রহ্ম স্বরূপ সম্পর্কে জানতে আমি আগ্রহ। আপনি কি এ বিষয়ে আমাকে জ্ঞান দেবেন।

.

নারদের কথা শুনে জগৎগুরু একটু হাসলেন। তিনি বললেন–ব্রহ্ম নিরুপণ বিষয়ে বলছি, শোনো। তুমি অত্যন্ত গূঢ় প্রশ্ন করেছ। এ এমন জ্ঞান, যা বেদ ও পুরাণেও পাওয়া যায় না। ব্রহ্মের প্রকৃততত্ত্ব নিরুপণ করা সাধ্যের বাইরে। এই একই প্রশ্ন বৈকুণ্ঠধাম শ্রীকৃষ্ণের কাছে আমি রেখেছিলাম, ধর্ম ও ব্রহ্মারও একই জিজ্ঞাসা ছিল। শ্রীহরি এ বিষয়ে যা বলেছিলেন, তার কিছু জ্ঞান তোমাকে দান করছি। ব্রহ্মতত্ত্ব সমস্ত ত্বত্তের মূল ঠিক যেন অন্ধকারের চোখের মতো। সমস্ত দেহে পরব্রহ্ম সনাতন পরমাত্মা স্বরূপ বিরাজ করে।

তিনিই সমস্ত প্রাণীর কাজের সাক্ষী থাকেন। বিষ্ণুর মন হল প্রজাপতি ব্রহ্মা, আমি অর্থাৎ মহাদেব তার জ্ঞানের আধার, তার প্রকৃতি হলেন স্বয়ং ঈশ্বরী প্রকৃতি। তা সত্ত্বেও আমরা তার দান। তিনি যেমন চালান, আমরা তেমন চলি। অর্থাৎ, বীজ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব স্বরূপ, আসলে সে সমস্ত কাজের ফলভোগ করে, সৃষ্টির সংহার ঘটলে জীবের মৃত্যু হয়। কিন্তু পরম ব্রহ্ম বিদ্যমান থাকেন। আমরা এবং এই জগৎ চরাচর অবশেষে তার মধ্যেই বিলীন হয়ে যাই। তার বিস্তার আকাশের ন্যায়।

কোটি সূর্যের তেজও তার তেজের কাছে ম্লান হয়। তিনি অক্ষয়, তার কোনো আকার নেই। তার ক্ষয় নেই, বৃদ্ধিও নেই। যোগীরা তাকে দেখতে পান, তারা ওই তেজপুঞ্জকে সর্বমঙ্গলময় ও সনাতন ব্রহ্মজ্ঞানে পুজো করেন। তার ধ্যান করেন। তিনি সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন আবার

সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত। তিনি পরমপুরুষ, তিনি পরমানন্দের কারণ। নির্গুণ পরমব্রহ্মে নির্গুণ প্রকৃতি স্বাভাবিক গুণ মাত্র, ঠিক যেন আগুনের দাহিকা শক্তি।

হে মুনি, সেই পরমানন্দ পরমপুরুষ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নিজের ইচ্ছায় আপন অংশে সগুণ প্রকৃত বিষয়ী পুরুষে পরিণত হন। তখন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি তার সঙ্গে ছায়ার মতো থাকে। মাটি ছাড়া কুমোর যেমন ঘট তৈরি করতে পারে না। তেমনই প্রকৃতি ভিন্ন সৃষ্টিকার্য চলে না। মৃত্তিকা নিত্য কিন্তু ঘট অনিত্য, তেমনই প্রকৃতি ও পরমব্রহ্ম নিত্য, কিন্তু তাদের সৃষ্টি সব অনিত্য, অনেকে বলে থাকেন প্রকৃতির থেকে ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ, আসলে তারা দুজনেই সমান, তাদের নিত্যতা ধ্রুব সত্য। বেদ ব্রহ্মের লক্ষণ উল্লেখ করে বলেছেন –ব্রহ্ম সকলের আত্মা, তিনি নির্লিপ্ত ও সাক্ষীস্বরূপ। তিনি সকলের জায়গা জুড়ে অবস্থান করছেন। তিনি সকলের আদি। সমস্ত কিছুর মূল যে প্রকৃতি সে হল ব্রহ্মের শক্তি, শক্তি ব্রহ্মে অবস্থিত–এই হল প্রকৃতির লক্ষণ, সেই জ্যোতির্ময় ব্রহ্মার ধ্যান যোগীরা করেন। কিন্তু পরম বিবেকে বৈষ্ণব তা মানে না।

তাদের মতে, পুরুষ ব্যতীত সেই তেজের ধ্যান করা কীভাবে সম্ভব, এই তেজ কোথা থেকে এল। তেজ থাকলেই আধার থাকবে। আর আধার হলেই তেজ অবস্থান করবে। তাই তারা এক মনোহর রূপের চিন্তা করে যিনি লক্ষ কোটি যোজন বিস্তৃত চার কোণ বিশিষ্ট অতি সুন্দর গোলক পুরীতে বাস করেন। এই গোলকধামের কোনো আধার বৈকুণ্ঠধামের থেকে পঞ্চাশ কোটি যোজন ঊর্ধ্বে এর অবস্থান। বিরজা নদী একে বেষ্টন করে আছে। এখানে গোপ ও গোপীরা তার পার্ষদ। তুলসী বনে ভরা। গোলকধামের মধ্যে আছে লক্ষ কোটি আশ্রম ও একশো মন্দির, বনে বনে পরিজাত ফুলেরা ফুটে আছে। কস্তুভমনি ও ইন্দ্রনীলমনির ফল গাছে গাছে ঝুলছে। হীরে দিয়ে তৈরি সিঁড়ি। উৎকৃষ্ট মনির তৈরি কপাট। রত্ন প্রদীপ সর্বদা গোলকধাম আলোকিত করে রেখেছে।

চিত্রবিচিত্র শোভামণ্ডিত সুন্দর রত্নসিংহাসনে সবার ঈশ্বর এক পরম পুরুষ উপবেশন করে আছেন। তার চোখদুটো শরৎকালের মেঘহীন দুপুরের সূর্যের তেজকেও হার মানিয়ে দেয়। তার মুখের সৌন্দর্যের কাছে পূর্ণিমার চাঁদও বুঝি লজ্জা পায়। তার ঠোঁটে অল্প হাসি, হাতে বাঁশি। পীত রঙের বস্ত্র তিনি পরিধান করেছেন। হাঁটু পর্যন্ত ঝুলছে মালতী মালা। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় তিনি দণ্ডায়মান। তার পায়ে নূপুর, ময়ুরের শিখি তার মাথার চুড়ার সৌন্দর্য, বৃদ্ধি করেছে। তিনি চন্দনে সুবাসিত। তার টিকালো সুন্দর নাক। ঠোঁট দুটি যেন পাকা বিম্বফল। তিনি গোপিকাদের দ্বারা বেষ্টিত।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং অন্যান্য দেবতারা তার পুজো করেন। তিনি সুরসিক রাসেশ্বর। তিনি ভক্তদের দয়া প্রদর্শন করেন। তিনি সিদ্ধিদাত্রী সর্ব স্বরূপ, তিনিই ঈশ্বর। রাসমণ্ডলে গোপ গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ লীলায় মেতে উঠেছিলেন। দুই হাতবিশিষ্ট কিশোর শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধিকার ঈশ্বর। "কৃষি" অর্থাৎ সমস্ত কিছু আর "ন" কথার অর্থ আত্মা। অর্থাৎ যিনি সর্বাত্মা, তিনিই হলেই পরম ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ, আবার কৃষ্ণ হলেন আদি পুরুষ অর্থাৎ "কৃষির সব এবং "ন" এর আদি।

শ্রীরাধিকার দুই হাত বিশিষ্ট কৃষ্ণ যখন বৈকুণ্ঠধামে কমলার পতি হিসেবে বিরাজ করেন, তখন তার চার হাত দেখা যায়। তার পার্ষদরাও চতুর্ভুজ। তিনি বিষ্ণু রূপে জগতের রক্ষাকর্তা, আবার শ্বেতদ্বীপে লক্ষ্মীর স্বামী, আমরা সব সময় যে বাঞ্চত, পরমব্রহ্মের ধ্যান, সেবা ও চিন্তা করে থাকি।

নারদ এবার গন্ধর্ব রাজের কাছ থেকে পাওয়া শিবস্তব পাঠান্তে প্রণাম করলেন। নারদের স্তবে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব অত্যন্ত তুষ্ট হলেন। তার অভীষ্ট পূরণ করলেন। এবং নারায়ণের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

.

সৌতি বললেন–মহাদেবের আদেশে নারদ মুনি এসে হাজির হলেন নারায়ণের আশ্রমে। কুলগাছে ছাওয়া সেই আশ্রম। নানারকম ফুল গাছ। হিংস্র প্রাণীরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশ্য ঋষির প্রভাবে ওইসব জানোয়ারেরা হিংসা করতে ভুলে গেছে। এই মনোরম আশ্রম স্বর্গের সৌন্দর্যকেও হার মানায়। দুর্গম বনের চারপাশ পরিপূর্ণ, মাঝে আশ্রম। তাই সচরাচর সেখানে যেতে অনেকে ভয় পেত। সভার মধ্যস্থলে পঞ্চাশ কোটি মহর্ষি পরিবৃত্ত হয়ে জ্যোতি তেজসম্পন্ন সেই মনোহর ঋষিকে নারদ দেখতে পেলেন। তার পার্ষদ সিদ্ধ, পুরুষের সংখ্যা তেষট্টি কোটি। যোগীদের গুরু নারায়ণ এক রত্নসিংহাসনে বসে কৃষ্ণার্জুনমরুলীলা সঙ্গীত শুনছিলেন, বিদ্যাধরীরা নৃত্য প্রদর্শন করছে। নারায়ণ তখন পরমাত্মা পরমেশ্বর পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জপ করছিলেন।

ব্রহ্মপুত্র নারদ নারায়ণকে প্রণাম জানালেন, রত্নসিংহাসন থেকে উঠে এলেন নারায়ণ। নারদকে আলিঙ্গন করলেন। তার আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। রত্নসিংহাসনে বসতে বললেন।

নারদ নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। তারপর সেই ঋষি শ্রেষ্ঠ সনাতন ভগবান নারায়ণকে প্রশ্ন করলেন– হে ভগবান, দুর্গম বেদসমূহ সম্পর্কে আমার পিতা ব্রহ্মার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছি। স্বয়ং মহাদেবও আমাকে মন্ত্র ও জ্ঞান দান করেছেন। তথাপি আমার জ্ঞান পিপাসা মেটেনি। জন্ম, মৃত্যু, জরা বিনষ্ট হয় যে কৃষ্ণের গুণগান শুনলে, আপনি তা আমাকে বলুন। দেবতারা, মুনিরা, বুদ্ধিমান মনুরা যার ধ্যান করেন। সৃষ্টি কার থেকে হয় এবং কোথায় গিয়ে তা বিলীন হয়? যিনি সমস্ত কিছুর কারণ সেই সর্বেশ্বর বিষ্ণু আসলে কে? হে বিভু। আপনি কৃপা করে আমার কৌতূহল নিরসন করুন।

নারদের প্রশ্ন শুনে নারায়ণ মুচকি হাসলেন।

.

শ্রী নারায়ণ বললেন–হে নারদ, তুমি সেই ভুবনপাবনীর পবিত্র কথা শুনতে আগ্রহী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহশ্বেরাদি দেবতারা মুনীরা, যোগীন্দ্র, মনু, সরস্বতী, লক্ষ্মী, দূর্গা– সকলেই সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দনা করেন। স্ত্রীরূপ সাপে ঘেরা অত্যন্ত ভয়ংকর গভীর সংসার সাগর পার হয়ে যে হরির দাস হতে চায়, সে শ্রীহরির পাদবন্দনা করবে। যিনি বেদ বেদাঙ্গের বিধান কর্তা, জন্ম, মৃত্যু ও শোকের আকুল হওয়া লোক সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের পুজো করবে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বরাহ রূপ ধরে দাঁতের সামনের দিক দিয়ে মেদিনীকে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি নিজের লোমকূপের সমান অংশ দ্বারা বিশ্বকে ধারণ করে আছেন, তাঁর চরণে শতকোটি প্রণাম। প্রকৃতি থেকে আলাদা, সর্বব্যাপী বিরাজমান, সেই ভগবানের ধ্যান সকলে করে। এ জগতে এমন কেউ নেই যে, তার কাজের হিসাব দিতে পারবে। তুমিও সেই শ্রীহরির পাদপদ্ম বন্দনা করো। ব্রহ্মা, মহাদেব, বিষ্ণু, প্রভৃতি দেবতারা সেই মহান বিরাট অংশে সৃষ্ট। আমরা, তোমরা, সুরপতিগণ, মুনি ও মুনীরা সেই ভগবানের কলার কলাংশ মাত্র। তিনি হাজার মস্তক বিশিষ্ট অনন্তদেব। একটি সাদা সরষের মতো এই জগৎ চরাচরকে মস্তকে ধারণ করে আছেন। তিনি কচ্ছপের ওপর হাতির পিঠে মশার ন্যায় অবস্থান করছেন। সেই কচ্ছপ তার কণার কণা দিয়ে তৈরি।

সেই সর্বব্যাপী গোলকপতি, পরমেশ্বর, পরমব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের যশের কথা বেদসমূহ ও পুরাণগুলি স্পষ্ট করে বলতে অক্ষম। হে নারদ, তুমি সেই সর্বেশ্বর ঈশ্বরকে ধ্যান করো। সেই পরমেশ্বর বিধাতার বিধাতা সবার আগে। তিনি নিত্য প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন, যিনি জগতের মাতা সকলে যাকে ভক্তিদায়িণী শ্রী বলে বর্ণনা করে থাকে। প্রকৃতি ও পরমেশ্বরের মধ্যে

কোনো ভেদ নেই। সমস্ত নারীজাতি তার অংশজাত। শ্রীকৃষ্ণ নিজে পরমাত্মা, তবুও প্রকৃতি ছাড়া তিনি শক্তি প্রদর্শন করতে পারেন না, তাঁকে বাদ দিলে সৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে যাবে।

হে বৎস, তুমি বাবার কাছে ফিরে যাও। পিতা হলেন গুরুর গুরু। তাঁর আদেশ পালন করা পুত্রের কর্তব্য। এর ফলে তুমি হবে সর্বত্র জয়ী এবং পূজনীয়। বস্ত্র, অলংকার, চন্দন দিয়ে যে ব্যক্তি স্ত্রীকে বিশেষভাবে ভালোবাসে, তার প্রতি, প্রকৃতি সদয় হয়। স্ত্রীদের অপমান করার অর্থ প্রকৃতিদেবীকে অমর্যাদা করা। রাধিকা হলেন শ্রীকৃষ্ণের অন্য সব কান্তার থেকে বেশি প্রিয়। সর্বসম্পৎ স্বরূপিণী সেই প্রকৃতি লক্ষ্মী নারায়ণেরও প্রিয়া। নারায়ণের প্রিয়া সরস্বতী, যিনি বিদ্যা ও রাগের দেবী। সাবিত্রী হলেন বেদমাতা ও বিধাতার প্রিয়। গণেশ জননী দূর্গা মহাদেব প্রিয়া এই হল প্রকৃতির পাঁচটি প্রকার।

প্রকৃতি খণ্ড

প্রথম অধ্যায় শ্রীনারায়ণ বললেন–বৎস নারদ! প্রকৃতিতত্ত্ব সম্বন্ধে মহাদেবের কাছ থেকে আমি যতটুকু জ্ঞান লাভ করেছি, তা তোমাকে দান করছি, শোনো, প্রকৃতি কে? তিনি কোথা থেকে আবির্ভূত হয়েছেন? তার লক্ষণ কী? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কারও সম্ভব নয়। সৃষ্টির ব্যাপারে যিনি প্রধান তিনি হলেন প্রকৃতি। "প্র" শব্দের অর্থ "কৃত্তি' মানে সৃষ্টি বেদ "প্রকৃতি" শব্দটিকে এইভাবে বিশ্লেষিত করেছে –"প্র" –সত্ত্বগুণ, "কৃ" –মধ্যম রজোগুণ এবং "তি" –নিকৃষ্ট তমোগুণ। অর্থাৎ যিনি ত্রিগুণাত্মিকা ও সমস্ত শক্তিযুক্ত এবং সৃষ্টির প্রধান নায়িকা, তিনিই হলেন প্রকৃতি, পরমাত্মার সাথে সাথে প্রকৃতি ছায়ার মতো থাকেন। তাই মুনি ঋষিরা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কোনো আলাদা কিছু দেখেন না।

হে ব্রাহ্মণ। পরমাত্মা ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করার ইচ্ছায় মেতে উঠলেন, তখনই মূল প্রকৃতি ঈশ্বরীর আবির্ভাব ঘটে। সৃষ্টির কাজের জন্য প্রকৃতির পাঁচটি প্রকার নির্ণীত হয়েছে- (১) দূর্গা, (২) রাধিকা, (৩) লক্ষ্মী, (৪) সরস্বতী এবং (৫) সাবিত্রী। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা, মুনিগণ এবং মনুগণ সকলের অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মময়ী, সনাতনী দূর্গাদেবীর ধ্যান করে থাকেন। ধর্ম, সত্য, পুণ্য, কীর্তি, যশ ও মঙ্গল, দূর্গাদেবী দান করে থাকেন। যে তাঁর শরণ নেয়, দুঃস্থ পীড়িত, তিনি তাদের উদ্ধার করেন। সমস্ত শক্তির আধার এই প্রকৃতি। কৃষ্ণের সৃষ্টি সহায়িকা শক্তি। বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, ছায়া, তন্দ্রা, দয়া, স্মৃতি, জাতি, ক্ষান্তি, শান্তি কান্তি, শ্রান্তি, চেতনা, তুষ্টি, পুষ্টি, লক্ষ্মী, বৃত্তি সবই তিনি। তিনি জননী। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তি স্বরূপা অনন্ত রূপিণী দূর্গার গুণের অন্ত নেই।

পরমাত্মার আর এক শক্তি লক্ষ্মী। তিনি শুদ্ধসত্ত্ব সম্পদ স্বরূপা। তিনি কান্তা। তিনি শান্ত স্বভাব ও সুশীলা। তিনি সকলের মঙ্গল করেন। কাম, ক্রোধ, অহংকার, লোভ, মোহ ইত্যাদি দোষে লক্ষ্মীদেবী দুষ্ট নন। তিনি পতিপ্রিয়া, প্রিয়ভাষিণী, শ্রীভগবানের প্রেমতুল্য প্রিয়পাত্রী, তিনি সকল জীবের শস্যস্বরূপা, তিনি মহালক্ষ্মী, পতি নারায়ণের মহালক্ষ্মী। পতি নারায়ণের পাশে তার অধিষ্ঠান। স্বর্গে তিনি স্বর্গলক্ষ্মী নামে বিরাজিতা, রাজার ঘরে রাজলক্ষ্মী এবং সাধারণ মানুষের ঘরে তিনি গৃহলক্ষ্মী রূপে অবস্থান করেন। বাণিজ্যে তার বাস। তিনি পাপীদের ক্ষমা করেন না। ভক্তদের প্রতি তিনি দয়া প্রদর্শন করেন, তার অভীষ্ট পূরণ করেন। লক্ষ্মীদেবী ব্যতীত জগৎ অন্ধকার। তিনি পূজনীয় এবং বন্দনীয়।

সর্বসম্মত তৃতীয় শক্তি বিদ্যার স্বরূপ সরস্বতী। তিনি সৎলোকের কবিতায় বাস করেন। তিনি শান্তরূপিণী, বীণা আর বই ধারণ করে আছেন। তিনি শ্রীহরিপ্রিয়া শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপা দেবী। তিনি তুষার চন্দনে চর্চিত। কুমুদ ও পদ্মফুল শুভ্রতায় তার গাত্রবর্ণের কাছে হার মানে। তিনি বিদ্যা ও সিদ্ধিদাত্রী তিনি ব্যাখ্যা ও বোধস্বরূপ। সন্দেহ দূরকারী, বিচারকারী, বই লেখিকা ও শক্তিরূপিণী। তিনি রাগ ও তালের দেবী।

চতুর্থ শক্তি শ্রীরাধিকা তিনি পঞ্চপ্রাণ স্বরূপা। তিনি মানিনী, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁর গুণ ও তেজ। শ্রীকৃষ্ণের বাঁদিক থেকে তিনি উদ্ভূত। তিনি পরমানন্দ রূপিণী, তিনি পরাৎপরা সমস্ত রকম ব্রতযুক্ত দেবী পূজনীয়। কৃষ্ণ রাসলীলার কারণে শ্রীরাধিকে সৃষ্টি করেছিলেন। রাসমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী ও সুরসিকা দেবী গোপিনীর রূপে গোলকে অবস্থান করেন।

তিনি সন্তোষ রূপিণী ও আনন্দময়ী। তিনি শান্ত ও নিরহঙ্করী। ভক্তদের কৃপা করেন। তিনি শুদ্ধবস্ত্র পরিহিত, নানাধরনের অলংকারে বিভূষিত। কোটি চন্দ্রের সৌন্দর্যও তার সৌন্দর্যের কাছে ম্লান হয়। তাঁর দয়াতেই হরিদাসত্ব লাভ করা যায়। স্ত্রী রত্নের শ্রেষ্ঠ অংশ থেকে এই দেবী ঘনকালো মেঘের মধ্যে চঞ্চল, বিদ্যুতের মতো কৃষ্ণের বক্ষে সবসময় অবস্থান করছেন। মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি বৃষভানু কন্যা হয়ে শূকরী রূপে জন্ম নিয়েছিলেন, তাঁর পাদস্পর্শে ভারতবর্ষের মাটি পবিত্র হয়েছে। যে দেবীকে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা প্রত্যক্ষ করতে পারেন না, মর্তবাসী তাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েছে, পূর্বে ব্রহ্মা তার পায়ের নখ দেখার এবং নিজের শুদ্ধতার জন্য ষাট হাজার বছর ধরে তপস্যা করেন। কিন্তু সে নখের দর্শন তিনি পাননি, এমনকি স্বপ্নেও তার আবির্ভাব ঘটেনি। কিন্তু তপস্যার গুণেই বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকার দর্শন লাভ তিনি করেছিলেন।

পঞ্চম প্রকৃতি সাবিত্রীর কথা এবার বলছি। ইনি চারবেদ, বেদাঙ্গ ও সমস্ত ছন্দের জননী। এই। বিচক্ষণ দেবী সন্ধ্যা বন্দনার মন্ত্রের ও তন্ত্রের মা। তিনি ব্রহ্মতেজ স্বরূপা। তাপসী। ব্রাহ্মণরা তার জপ করেন।

সংক্ষেপে এই হল পাঁচ প্রকৃতির কথা। পরিপূর্ণতম পাঁচ জন দেবী হলেন মূল প্রকৃতি। জগতের দেবী ও নারীগণ মূল প্রকৃতির অংশজাতা। ভুবনপাবনী প্রকৃতির প্রধান অংশস্বরূপা গঙ্গা বিষ্ণুর দেহ থেকে তার উৎপত্তি। দ্রবীভূত এই সনাতনী এই দেবী জ্বলন্ত কাঠের ন্যায় প্রাণীদের পাপের বিনাশ ঘটান। ভুবন পাবনীর জলে স্নান করলে, পান করলে, স্পর্শ করলে মোক্ষ লাভ হয়। সেরা নারীদের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, মহাদেবের জটার মধ্যে তিনি মুক্তা শ্রেণীর মতো

অবস্থান করছেন। ভারতের মাটি তার স্রোতধারায় পবিত্র হয়েছে। তিনি পদ্ম ও শাঁখের মতো শুভ্র। তিনি শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপা। দেবী গঙ্গা শুদ্ধ ও সতী সাধ্বী। তিনি নারায়ণের প্রিয়তমা। তিনি নিরাহঙ্করী।

প্রকৃতির প্রধান অংশ স্বরূপা তুলসী বিষ্ণুর প্রিয়া। তিনি বিষ্ণুর চরণ সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। সর্বদা বিষ্ণুর পদসেবা করে চলেছেন। তপস্যা, সংকল্প, পুজো প্রভৃতি কাজে তুলসী ব্যস্ত থাকেন। যে তুলসীর দর্শন পায় বা তার স্পর্শ অনুভব করে, তার নির্বাণ লাভ হয়। কলিযুগের পাতাল ধ্বংস করতে তুলসী আগুনের মতো কাজ করেন। তিনি মুমূর্ষদের মুক্তি দান করেন, সকলের অভীষ্ট পূরণ করেন। তীর্থগুলি যাঁর স্পর্শ ও দর্শন লাভ করে আত্মশুদ্ধি লাভ করতে চায়, যিনি এই ভারতে কল্পবৃক্ষ স্বরূপ ও জগৎ স্বরূপ তিনিই তুলসী, মর্তবাসীদের উদ্ধার করার একমাত্র দেবী তিনি।

হে নারদ, প্রকৃতির অংশ স্বরূপিনী, মাতৃকাদের মধ্যে পূজ্যতম দেবী ষষ্ঠী। জগতের সমস্ত শিশুর লালন পালনের কাজে ব্যস্ত থাকেন। ইনি সমস্ত জগতের ধাত্রী ও সন্তানাদি দান করে থাকেন। তিনি দেব সেনাপতি কার্তিকের পত্নী। ইনি বিষ্ণুর তপস্যায় মগ্ন। এই দেবীর উদ্দেশ্যে শিশুর জন্মের ছয় দিনের দিন আঁতুর ঘরে এবং একুশ দিনে পুত্রের মঙ্গল কামনা করে যে পুজো করা হয়, তা নিত্য এ ছাড়া অন্যান্য সব পুজো কাম্য শিশুদের যেকোনো বিপদ থেকে তিনি রক্ষা করেন। মাতৃরূপা ও দয়ারূপা এই দেবীকে শিশুরা স্বপ্নে দর্শন করে। প্রকৃতির মুখ থেকে তার আবির্ভাব ঘটেছে।

প্রকৃতির আর এক অংশজাত দেবী মনসা। কশ্যপ মুনির কন্যা, মহাদেব প্রিয় শিষ্য অনুগামিনী। মনসাদেবীর জ্ঞানের সীমা পরিসীমা নেই। ইনি সাপদের সম্রাজ্ঞী। এই দেবীর বাহন সাপ। সাপ দ্বারা তিনি সুসজ্জিতা। নাগলোকে এই দেবীর বসবাস। মনসা বিষ্ণু ভক্ত। তার ফলে তিনি বিষ্ণু স্বরূপিনী। ইনি তপস্যা স্বরূপিনী। তিনলক্ষ বছর ধরে ইনি হরির ধ্যান করে তপস্যাবলে তপস্বী ও তপস্বিনীদের পূজনীয়াতে পরিণত হয়েছেন। ব্রহ্মতেজ স্বরূপিনী দেবী সাপ মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী। ইনি সর্বদা পরম ব্রহ্মের সেবায় নিয়োজিত। জরুকারু মুনির স্ত্রী মনসার ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ। শিব তার গুরু। ইনি আস্তিক মুনির মাতা।

প্রতি মঙ্গলবার পঞ্চ উপচারে রমণীরা যার পুজো করেন, যিনি মঙ্গলরূপা এবং ধ্বংসের সময় চণ্ডীরূপা, যিনি সকল নারীর সকল কামনা বাসনা পূর্ণ করেন, যিনি কুপিত হলে মুহূর্তের মধ্যে

সবকিছু ধ্বংস করে দিতে পারেন, তিনি হলেন মঙ্গলচণ্ডী। তিনি পুত্র, পৌত্র, ধন, যশ ইত্যাদির দেবী। দুঃখ, শোক, পাপ, তাপ ও ব্যাধির হাত থেকে ভক্তকে রক্ষা করেন।

যিনি শুম্ভ নিশুম্ভ যুদ্ধে দুর্গাদেবীর কপাল থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যিনি কোটি সূর্যের তেজের সমান উজ্জ্বল, তিনি হলেন কমললোচনাকালী, কালী কৃষ্ণের সমকক্ষ। শক্তিশ্রেষ্ঠা, সিদ্ধিধাত্রী ও শ্রেষ্ঠ সিদ্ধযোগিনী এই দেবীর দেহ শোভাময়। ইনি দূর্গার অর্ধাংশস্বরূপা। তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন। জগৎ রক্ষার জন্য তিনি অতি সহজেই দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ধর্ম, অর্থ, কাম ও নির্বাণ লাভ হয়। এই দেবীর আরাধনা করলে। এই মহাদেবীর স্তব করে চলেছেন শিব প্রভৃতি দেবতারা, মুনিরা, মনুরা এবং মানুষ।

প্রকৃতির প্রধান অংশস্বরূপ বসুন্ধরা শস্য স্বরূপিণী। তিনি সমস্ত রত্নের জন্মদাত্রী। জগৎবাসী বসুন্ধরার আশ্রয়ে বসবাস করে। তিনি দয়াবতী। সমস্ত সম্পদ দান করে সকলের জীবিকার সংস্থান করেন। প্রজা ও প্রজাপতিরা এই মহাদেবীর পুজো করেন।

হে নারদ, এবার শোনো প্রকৃতির কলাস্বরূপ দেবীদের কথা। অগ্নির স্ত্রী স্বাহাদেবী সর্বত্র পূজা লাভ করেন। আগুনে ঘি আহুতি দিলে এঁর নাম উচ্চারণ করতে হয়। নতুবা দেবতাদের গ্রহণীয় হয়। দক্ষিণা যজ্ঞের পত্নী ছাড়া জগতের সমস্ত কাজ স্তব্ধ হয়ে যায়। সর্বত্র ইনি পূজিত, গণপতির স্ত্রী পুষ্টি পৃথিবীতে পুজো পান। যে পুষ্টি সকলের স্বাস্থ্যের মঙ্গল করে। অনন্ত দেবের স্ত্রী তুষ্টি, অর্থাৎ এই দেবীকে বাদ দিয়ে পুজোপার্বণ করলে দেবতারা অসন্তুষ্ট হন। মুনি, মনু ও মানুষ সবাই যার পুজো করেন তিনি হলেন পিতৃদের পত্নী স্বধা। এই দেবীকে বাদ দিয়ে পিতৃদের উদ্দেশ্যে সমস্ত দানই নিষ্ফল হয়। বায়ুর স্ত্রী স্বস্তি ত্রিভুবনে ইনি পূজিতা। এই দেবীকে ছাড়া আদান প্রদান সফল হয় না। ঈশানের স্ত্রী সম্পত্তিকে তুষ্ট করতে না পারলে ধনহীন হতে হয়। কপিলের পত্নীর নাম ধৃতি এই দেবীকে পুজো করে খুশি করতে না পারলে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। সুশীলা ও সতীসাধ্বী ক্ষমা হলেন যমের স্ত্রী, ইনি জগতে পুজ্য, ইনি উন্মত্ততা রুষ্টের কারণ। কামদেবের স্ত্রী রতিকে পুজো করে সকলে। এই দেবীকে ছাড়া জগৎ ক্রীড়া আনন্দহীন হয়ে পড়ে।

সত্যের স্ত্রী মুক্তিদেবী সকলের প্রিয়। এর অভাবে জগতে মিত্রের অভাব ঘটে। দয়া হলেন মোহের পত্নী। সকলের পূজনীয়। এই দেবীকে তুষ্ট না করলে জগতে নিষ্ঠুরতা দেখা দেবে। পুণ্যের ভার্য্যা প্রতিষ্ঠা সকলের পুণ্য করেন। কারণ তিনি স্বয়ং পুণ্যময়ী। সুকর্মের ভার্য্যা কীর্তি

ত্রিভুবনকে যশ ও খ্যাতিবান করে। উদ্যোগপত্নী ক্রিয়াকে জগতের সকলের পুজো করেন। ইনি সর্বত্র বিরাজিতা।

হে বৎস, এইসব ক্রিয়া ব্যতীত জগৎ রসাতলে যায়। অধর্মের ভার্য্যা মিথ্যা ধূর্তরাই অধর্মকে পুজো করে। মিথ্যার ক্রিয়ার ফলে বিধাতার এই সৃষ্টি উচ্ছন্নে যায়। প্রথম তিনটি যুগে ছদ্মবেশে মিথ্যা প্রবেশ করেছে জগতে। কখনও অদৃশ্যভাবে, কখনও সূক্ষ্ম রূপে। কখনও বা অর্ধেকাংশ। আর কলিযুগে সবকিছু মিথ্যার মুঠোবন্দী। সুশীলের দুই পত্নী শান্তি ও লজ্জা। এরা ছাড়া জগৎ উন্মাদের মতো হয়। বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি — জ্ঞানের তিন স্ত্রী। এরা জগতের মানুষকে বুদ্ধি দান করে মেধা ও স্মৃতি সম্পন্ন হতে সাহয্য করে। ধর্মের স্ত্রী মূর্তি বিহনে পরমাত্মা ও বিশ্ব রূপধারণের কোনো অবলম্বন পেত না। ইনি হলেন মূর্তিমতী লক্ষ্মী।

জগতে এই সতীকে সকলে পুজো করে। নিদ্রা হলেন কালাগ্নিরুদ্রের ভার্যা। সিদ্ধ পুরুষদের কাছ থেকে পুজো গ্রহণ করেন। নিদ্রাদেবীর কোলে রাতে জগৎ আশ্রয় নেয়। কালের তিনজন পত্নী– সন্ধ্যা, রাত্রি ও দিন। এদের সাহায্যে বিধাতা পুরুষ সময় পরিমাপ করতে পারেন। ধন্য ও মান্য দুই সতী, ক্ষুধা ও পিপাসা হলেন লোভের দুই স্ত্রী। এঁরা জগতে পূজনীয়া। এঁদের মায়ার প্রভাবে জগৎ ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হয়। তেজের দুই পত্নীর নাম প্রভা ও দাহিকা। এঁরা বিধাতার জগৎ সৃষ্টির সহায়িকা। প্রচারের দুই প্রিয় পত্নী হলেন মৃত্যু ও জরা। এঁরা জগতকে কেবল ধ্বংসপ্রাপ্ত করেন। প্রীতি ও তন্দ্রা নিদ্রাদেবীর দুই কন্যা এবং সুখের দুই প্রিয় ভার্য্যা জগতের ব্যাপ্ত হতে সাহায্য করেন। শ্রদ্ধা ও ভক্তি নামে বৈরাগ্যের দুই স্ত্রী জগতে পুজো লাভ করেন।

চন্দ্রের পত্নী রোহিনী, সূর্যের স্ত্রী সংজ্ঞা, মনুপত্নী, শতরূপা, ইন্দ্রপত্নী শচী, বৃহস্পতি পত্নী তারা, বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী, কর্মপত্নী দেবহূতি, গৌতমপত্নী অহল্যা, অত্রিপত্নী অনসূয়া, পিতৃদের মানসকন্যা মেনকা, লোপামুদ্রা, আহুতি, কুবের পত্নী, বরুণ স্ত্রী বরুনানী, যমপত্নী –বলি পত্নী বিন্দ্যবলী, যশোদা, দেবী, সতী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, শৈবা, সত্যবানের পত্নী সাবিত্রী, বৃষভাণু পত্নী কলাবতী (রাধার মা) মন্দোদরী, লক্ষ্মণা, জাম্ববতী, মিত্রবিন্দা, নাগ্নার্জিতী, রুক্মণী, সীতা — এঁরা প্রত্যেকেই লক্ষ্মী অংশ।

আরও কয়েকজনের নাম বলছি, যাঁরা প্রকৃতির অনেক অংশ। ব্যাসজননী মহাসতী যোজনগন্ধা বলরামের মাতা রোহিণী, শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী দূর্গা, বাণের কন্যা ঊষা, তার সখী প্রভাবতী মায়াবতী, চিত্রলেখা, ভানুমতী, গুরুমা রেণুকা, ইত্যাদি। স্ত্রীকে অপমান করা মানে

প্রকৃতিকে অপমান করা। কারণ জগতের প্রত্যেকটি নারী প্রকৃতির কলাংশ দ্বারা গঠিত। স্বামী পুত্র বেঁচে আছেন, এমন কোনো ব্রাহ্মণীকে চন্দন ও অলংকারে ভূষিত করে পুজো করলে প্রকৃতিদেবীর পুজো করাই হয়। আবার আট বছর বয়সী ব্রাহ্মণ কন্যাকে পুজো করলে আসলে প্রকৃতিদেবীর আরাধনা করা হয়।

পৃথিবীতে তিন ধরনের নারী দেখতে পাওয়া যায়–ভালো, মন্দের মিশেল এবং মন্দ। এরা সকলেই প্রকৃতি থেকে আবির্ভূত হয়েছে, প্রকৃতির সত্ত্ব অংশ থেকে যাদের জন্ম হয়েছে, তারা উত্তম বা ভালো, এরা সুশীলা ও পতিব্রতা। মধ্যম শ্রেণির নারী সৃষ্ট হয়েছে প্রকৃতির বর্জ্য অংশ থেকে। এরা হয় স্বার্থপর। নিজের সুখ ছাড়া অন্য কিছু জানে না। প্রকৃতির তমঃ অংশ থেকে সেসব নারীর জন্ম হয়েছে, তারা মন্দ বা অধম। এরা কোন বংশে জন্মেছে, তার হিসাব কেউ দিতে পারে না। এইসব নারী হয় কুলটা, পতির সঙ্গে বিবাদ করতে ভালোবাসে। এরা যখন তখন কুস্থানে চলে যেতে পারে। এরা ধূর্ত ও দুর্মুখও বটে। এইসব কুলটা নারী বেশ্যা নামে চিহ্নিত। স্বর্গের অপ্সরাও প্রকৃতির তমঃ অংশ থেকে উঠে এসেছে।

শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর সর্বত্র এইসব দেবীরা পুজো লাভ করে থাকেন। সর্বপ্রথম দূর্গাপুজোর প্রচলন করেছিলেন রাজা সুরথ । ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, রাবণ বধের কামনা করে দ্বিতীয়বার দুর্গা পুজো করেছিলেন। তারপর থেকে জগতে এই পুজোর প্রচলন শুরু হয়। জগন্মাতা দুর্গা প্রথমে দক্ষপত্নীর গর্ভে জন্মলাভ করেন। দক্ষযজ্ঞে স্বামীর নিন্দা শুনে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তারপর আসেন হিমালয়ের কন্যা হয়ে। এই সময় তিনি শিবকে পতি রূপে গ্রহণ করেন। দূর্গার দুই পুত্র –গণেশ ও স্কন্দ। গণেশ শ্রীকৃষ্ণের এবং স্কন্দ বিষ্ণুর অংশ।

মর্ত্যে লক্ষ্মী পুজো শুরু করেন রাজা মঙ্গল। সেই থেকে ত্রিভুবনের সর্বত্র তার পুজো ও বন্দনা হয়ে থাকে। ভক্তি প্রথমে সাবিত্রীদেবীর পুজো করে তিন লোকেই তা প্রচলন করেন। দেবতা, মুনি এবং মানুষ তার বন্দনা করে থাকে। ব্রহ্মার সরস্বতী বন্দনার দেখাদেখি তিনলোকেই তাঁর পুজো প্রচলন হয়। গোলকে রাসমণ্ডলে কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় শ্রীরাধাকে প্রথমে পুজো করেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সেই থেকে ত্রিভুবনের সর্বত্র দেবতা, মুনি ও মানুষরা তাকে পূর্ণার্ঘ্য নিবেদন করে।

হে নারদ! প্রকৃতির কলস থেকে আবির্ভূত দেবীরা এইভাবে ভারতের শহরে ও গ্রামে পূজিত। এই হল আগমন ও লক্ষণ অনুসারে প্রকৃতির মঙ্গলময় সব চরিত্র।

.

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৌতি বললেন–হে শৌনক, এখন আমি প্রকৃতি দেবীর সৃষ্টির কারণ তার কলারূপে যারা আর্বিভূত হয়েছেন তাদের জন্মবৃত্তান্ত, পুজোর নিয়মবিধি, মঙ্গলজনক মহিমা, স্তোত্র কবচ বর্ণনা করছি। ভগবান নারায়ণ মহর্ষি নারদকে এ বিষয়ে ব্যক্ত করেছেন, তাই শোনো।

নারায়ণ বলেছেন –পরমাত্মা, আকাশ, কাল দিকের মতো গোলোকও নিত্য। বৈকুণ্ঠ ধামও অনিত্য নয়। ব্রহ্মে লীন সনাতনী প্রকৃতিও অনিত্য নয়। সূর্যের সাথে তেজ যেমন যুক্ত থাকে, তেমনি প্রকৃতি আত্মার সাথে সংযুক্ত, এদের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। মাটি ছাড়া কুম্ভকার যেমন ঘট গড়তে পারে না, তেমনই প্রকৃতি সৃষ্টির জন্য পরম ব্রহ্মা ঈশ্বরকে প্রকৃতির সহায়তা নিতে হয়। সমস্ত শক্তির আধার হলেন প্রকৃতি। “শক” অর্থাৎ ঐশ্বর্য আর “তি” শব্দের অর্থ পরাক্রম। যিনি ঐশ্বর্য ও পরাক্রম পরমেশ্বর সর্বক্ষণ এই ভগবতীর সঙ্গে যুক্ত, তাই তার আর এক নাম ভগবান। ভগবান কারো অধীন নন। তিনি সাকার ও নিরাকার। যোগীর তার নিরাকারকেই সর্বদা ধ্যান করে থাকেন। তাদের মতে কৃষ্ণ পরমব্রহ্ম, সর্বজ্ঞ সমস্ত রূপবিশিষ্ট আবার রূপশূন্য। তিনি হলেন সকলের পোষণকারী কিন্তু সূক্ষ্ম বৈষ্ণবরা একথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন –তেজস্বী ব্যক্তি ছাড়া তেজ আসবে কোথা থেকে? এই তেজস্বী শ্রেষ্ঠ তেজোমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করছেন তিনি কারণের কারণ, তিনি বয়সে বালক, সুশীল মনোহর ও পরাৎপর।

বৈষ্ণবরা শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ ব্যক্ত করেন তা হল এই রকম –সেই শ্যাম সুন্দরের চোখ দুটি শরৎকালের ফোঁটা পদ্ম, তার দন্ত মুক্তার শুভ্রতাকেও লজ্জা দেয়, তার মস্তকে মুকুট, সেখানে ময়ূরের শিখি শোভা পাচ্ছে, মালতীমালা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলছে। তিনি স্মিত হাসিতে মনোহর মুখোনিকে আরও সুন্দর করে তুলেছেন। তার গলায় ঝুলছে কৌস্তভমণি। তিনি দুই হাতে বাঁশি ধারণ করেছেন। বিভিন্ন মূল্যবান অলংকারে তিনি বিভূষিত।

তিনি ভক্তদের কৃপা করার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। তিনি ঐশ্বর্য দান করেন। তিনি সকল অভীষ্ট পূরণ করেন। তিনি পরিপূর্ণ স্বয়ং প্রসিদ্ধ। সিদ্ধ দান করে নিজে সিদ্ধির কারণ হন। যে সনাতন

শ্রীকৃষ্ণ জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যধি, শোক-তাপ থেকে বৈষ্ণবদের রক্ষণ করেন, তারা সেই পরম পুরুষের পুজো করেন। কৃষ্ণ অর্থাৎ কৃষি ও ণ। তাঁর অর্থ ভক্তি ও দাসত্ব। যিনি ভক্তি ও দাসত্ব দান করে তিনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। আবার যিনি সমস্ত কিছুর মূল তিনিই কৃষ্ণ।

হে নারদ! সকল গুণের আধার হলেন ব্রহ্মা। সৃষ্টিকারিরা বাসনা প্রকাশ করতে শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত কাল প্রভুকে সৃষ্টি করার প্রেরণা দান করেন, এসময় শ্রীকৃষ্ণ নিজের দেহকে স্বেচ্ছায় দুটি ভাগে ভাগ করেন। বাঁপাশ স্ত্রী ডানপাশ পুরুষ। তার বাম পাশ থেকে আবির্ভূত হলেন প্রকৃতিদেবী। শ্রীকৃষ্ণ সেই রমণীয় সুন্দর চম্পক ফুলের ন্যায় শোভাযুক্ত নারীর দিকে তাকালেন। এই নারীর স্তনদুটি বেলের মতো মনোরম। কলা গাছের মতো সুন্দর তার দুটি শ্রোণি। তিনি উজ্জ্বল ও সুললিত। সুশীলা, মিষ্টহাসিনী, চোখ দুটি অল্প বাঁকা। তিনি আগুনরঙের বস্ত্র পরিধান করেছেন। নানা আভরণে আভিরিত তাঁর তনুবাহার, তার কপালে কস্তুরী বিন্দু, নীচে চন্দন আর সিঁদুরের ফোঁটা। তার গলায় ঝুলছে মালতী ফুলের মালা। মহামূল্যবান কণ্ঠহার ঝুলছে কণ্ঠে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখে পুলকিত হয়েছেন। তার মনে কামবাসনা জেগেছে। ব্রহ্মার বয়স পরিমিত কাল পর্যন্ত প্রকৃতি সুন্দরীর সঙ্গে শৃঙ্গারে মেতে উঠলেন। নানাভাবে রতিসুখ উপভোগ করলেন। দেবীগর্ভে জগৎপিতা শ্রীকৃষ্ণের বীর্য ধারণ করলেন। তিনি গর্ভবতী হলেন। ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন দেবীর গা থেকে ঘাম ঝরতে লাগল, তিনি ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন।

প্রথমে সেই ঘাম গোল হয়ে ঝরে পড়ল, তা থেকে গোলাকার বিশ্বের সৃষ্টি হল। তার নিঃশ্বাস হল বায়ু, যা সমস্ত জগতকে জীবন দান করেছে, বায়ুর বাঁদিক থেকে এলেন তার প্রাণপ্রিয়া এবং পাঁচ পুত্র। প্রকৃতির ঘাম ঝরানো জল থেকে সৃষ্টি হল বরুণ দেবতার। তিনি হলেন জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তার বাঁদিকে এসে দাঁড়ালেন বরুণপত্নী বা বরুণানী। তারপর সেই কৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণের বীর্যতেজ গ্রহণ করে একশো মনুর সময়কাল পর্যন্ত গর্ভধারণ করলেন। তিনি কৃষ্ণ প্রাণেশ্বরী রাধিকা। কৃষ্ণের সঙ্গে সর্বক্ষণ বসবাস করেন। কৃষ্ণের রথে তার অবস্থান।

একশো মনু সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরে প্রকৃতিদেবী সর্বশ্রেষ্ঠ সোনালি রঙের বিশ্বের আধার স্বরূপ একটি ডিম প্রসব করলেন। ডিম দেখে তিনি অত্যন্ত হতাশ হলেন। রাগে দুঃখে সেটি জলে নিক্ষেপ করলেন। এ দৃশ্য দেখে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মর্মাহত হলেন। তিনি রাধাকে অভিশাপ দিয়ে বললেন– হে কোপন স্বভাবা নারী, এই কৃতকর্মের জন্য তোমাকে ফল ভোগ করতে হবে। অপত্য সুখ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করলাম। তোমার অংশ থেকে উদ্ভূত সুরস্ত্রীরা তোমার মতো সন্তানহীনা ও স্থির যৌবনা হয়ে দিন কাটাবে।

পীতবস্ত্র পরিহিতা এবং বই ও বীণা হস্ত যুক্ত এক নারীর সৃষ্টি হল ওই দেবীর জিভ থেকে। ইনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। এমন সময় কৃষ্ণপত্নী দুভাগে বিভক্ত হলেন। বাঁদিকের অঙ্গ কমলা এবং ডানদিকের অঙ্গ রাধিকা। কৃষ্ণ তাঁর দেহ দুভাগে ভাগ করলেন। তার ডানদিকের অঙ্গ দুই হাত বিশিষ্ট এবং বাঁদিকের অঙ্গ চতুর্ভুজ। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণকে বললেন–তুমি সরস্বতী ও কমলার পাণিগ্রহণ করো। রাধাকে লাভ করার চেষ্টা করো না, তাহলে তোমার ভালো হবে না, লক্ষ্মী ও সরস্বতাঁকে সঙ্গে নিয়ে জগৎপতি নারায়ণ ফিরে এলেন তার বাসস্থানে। এই দুই দেবীও ছিলেন সন্তানহীনা, কারণ রাধার অংশ থেকে এরা সৃষ্ট হয়েছিলেন।

তারপর নারায়ণের অংশ থেকে চারহাত বিশিষ্ট বহু পার্ষদ আবির্ভূত হলেন। তেজ, বয়স, রূপ ও গুণে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সমান। লক্ষ্মীর অংশ থেকে কোটি কোটি দাসীর সৃষ্টি হল। এরা সবাই লক্ষ্মীর তুল্য।

হে মুনি, তার লোমকূপ থেকে অসংখ্য গোপের সৃষ্টি করলেন, যার তেজে ও বয়সে ভগবানের সমান। এইসব সহচরদের তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন, তারা ছিল তার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। মহাপ্রকৃতিও তার লোমকূপ থেকে অগুনতি গোপিনীর জন্ম দিলেন। তারা রূপে, চলনে, বলনে, রাধা তুল্য। তারাও নিত্য যৌবনা এবং সন্তানহীনা। এই সময় আবির্ভূত হলেন বিষ্ণুমায়া সনাতীন দূর্গা। তিনি কৃষ্ণের দেহ থেকে সৃষ্ট তিনি নারায়ণী, সর্বশক্তিরূপিণী। তিনি কৃষ্ণের বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি তেজস্বরূপিনী, তিনি লাবণ্যময়ী, তিনি প্রসন্না এবং শান্ত। তিনি সহস্র হস্তে নানা ধরনের অস্ত্র ধারণ করে আছেন। তিনি ত্রিনয়নী, পরিশুদ্ধপট্ট আগুন বর্ণের বসন পরিধান করেছেন। নানা ধরনের অলংকারে বিভূষিতা। তিনি শাস্ত্রস্বরূপিনী, তিনি কৃষ্ণভক্ত। বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ ভক্তি বিতরণ করেন। সুখীকে তিনি সুখ এবং মুমুক্ষকে মোক্ষ দান করেন। তিনি স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী এবং গৃহস্থের ঘরে গৃহলক্ষ্মী হিসেবে পূজিতা। রাজ গৃহে রাজলক্ষ্মী স্বরূপ তিনি, আগুনের বাহিকা শক্তি, সূর্যের প্রভাবে শক্তি, চাঁদ এবং পদ্মের মনোহর শোভাবৃদ্ধিকারী শক্তিস্বরূপ, প্রকৃতির সাহায্যে তিনি জগৎকে কৃপা করেন। তাঁকে ছাড়া জগৎ হয় প্রাণহীনের মতো। সংসার রূপ.বিশাল গাছের বীজস্বরূপ। সেই দূর্গা বিভিন্ন রূপে বিরাজ করেন –দয়া, শ্রদ্ধা, তন্দ্রা, পিপাসা, ক্ষুধা, ক্ষমা, ধৃতি, শান্তি, লজ্জা তুষ্টি, পুষ্টি, ভ্রান্তি, ক্লান্তি — এ সবই তার অংশে সৃষ্ট নারীজাতি। তার অংশের অংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে সর্বেশ্বর কৃষ্ণের প্রশস্তি বর্ণনা করে তার আদেশে দূর্গাদেবী রত্নসিংহাসনে উপবেশন করলেন।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ইতিমধ্যে কৃষ্ণের নাভিপদ্ম থেকে বেরিয়ে এলেন চতুর্মুখ ব্রহ্মা। পরম সুন্দর সেই পুরুষ জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর হাতে কমন্ডলু। নিজের জ্যোতি তেজে নিজেই তিনি

উদ্ভাসিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করতে লাগলেন। তার পাশ থেকে উঠে এলেন সুন্দরী শ্রেষ্ঠা, আগুনের মতো শুদ্ধবস্ত্র বসন পরিহিত নানা আভরণে সজ্জিতা এক নারী। তিনি ব্রহ্মপত্নী ব্রাহ্মণী। তিনিও জগৎ গুরুর বন্দনা করলেন। তারপর তারা দুজন সুন্দর উত্তম একটি সিংহাসনে বসলেন।

শ্রীকৃষ্ণ আবার দুটি ভাগে ভাগ হলেন। বামদিক থেকে উঠে এলেন মহাদেব তিনি ত্রিশূল ও পটিশধারী, বাঘের ছাল পরেছেন। মাথায় জটা ভার, কাঁচা সোনার রঙের ওপর ঈষৎ লালচে আভাযুক্তা। তিনি সর্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করেছেন। তার মস্তকে চাঁদ শোভা পাচ্ছে। শুদ্ধ স্ফটিকের মতো শুভ্র তার গাত্রবর্ণ। তার দেহের উজ্জ্বলতার কাছে শত কোটি সূর্যও হার মানে। তিনি নীলকন্ঠ, তিনি দিগম্বর। সর্প তার দেহাভরণ, ডান হাতে সুসংস্কৃত রত্নের মালা ঘুরিয়ে পাঁচ মুখে ব্রহ্মজ্যোতির্ময় সত্যস্বরূপ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জপ করছেন। তিনি কারণগুলির কারণ। তিনি ভক্তের মঙ্গল করেন। জরা, ব্যাধি, শোক, তাপ তিনি দূর করেন।

মহাদেবের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে মৃত্যুঞ্জয় নামে অভিহিত করলেন, এবং উত্তম সিংহাসনে বসতে বললেন।

এইসময় শ্রীকৃষ্ণের ডান অঙ্গ থেকে যাদের আবির্ভাব ঘটেছিল তারা গোপিনীদের পতিতে পরিণত হল।

.

তৃতীয় অধ্যায়

নারায়ণ বললেন-–হে নারদ! ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পর জলে নিক্ষিপ্ত ডিমটি ফেটে গেল, সেখান থেকে বেরিয়ে এল এক সুন্দর শিশু, যার প্রভা শতকোটি সূর্যের মতো, সেই শিশু খিদের তাড়নায় কঁদছিল নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যিনি রক্ষাকারী, তিনি তখন অসহায়ের মতো অন্য দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। তিনি স্থুল থেকেও স্থূলতর। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ষোলোভাগের এক ভাগে জাত। এই মহাবিষ্ণুকে প্রকৃতি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। অসংখ্য বিশ্বকে তিনি ধরে আছেন। মহাবিষ্ণুর এক একটি লোমকূপ থেকে এক একটি বিশ্ব তৈরি হয়েছে এর সংখ্যা যে কত, তা সৃষ্টিকারী স্বয়ং কৃষ্ণও হিসাব রাখেন না। প্রতিটি বিশ্বেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতাদের অবস্থান। তাদের সংখ্যাও বলা মুশকিল।

পাতাল থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গা জুড়ে ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত। ব্রহ্মাণ্ডের ওপরে বহুঁকোটি যোজন দূরে বৈকুণ্ঠধাম। তার ওপরে পঞ্চাশ কোটি যোজন উঁচুতে গোলকধাম অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় এই গোলকধাম সত্য ও নিত্য।

অনেক সাগর, মহাসাগর, দ্বীপ, উপদ্বীপ, পাহাড় পর্বত, গাছপালা, অরণ্য নিয়ে পৃথিবী গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর নীচে সাতটি পাতাল। ওপরে সাতটি স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক। এ সবই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত।

এই পৃথিবীর যা কিছু সবই নিত্য, কারণ এসবের বিনাশ হয় জলের বুদবুদের ন্যায়, কাজ ফুরিয়ে গেলে মৃত্যু হবে। এটাই নিয়ম। হে নারদ! প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডে শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং তিনকোটি দেবতা, দিগশ্রী, দিগপাল, নক্ষত্র ও গ্রহসকল সর্বদা বিরাজমান। পৃথিবীতে চারটি বর্ণ, নীচে সাপের দল এবং চরাচর বর্তমান। ওই বিরাট পুরুষ বারংবার ওপরের দিকে তাকালেন, শূন্য ডিম দেখে চিন্তিত হলেন। খিদের জ্বালায় কেঁদে উঠলেন। সেখানেই তার জ্ঞান লাভ হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন, তাঁর মুদ্রিত চোখের সামনে ভেসে উঠল শ্রীকৃষ্ণের সেই মনোমুগ্ধকর মুখোনি। তিনি অল্প হাসছেন, ব্রহ্মজ্যোতিতে তার চারপাশ উদ্ভাসিত। পীতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করেছেন। দুই হাতে বাঁশি বালকরূপী বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে আনন্দিত হলেন। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বরদান করে বললেন–হে বৎস ক্ষুধা, তৃষ্ণা নিবৃত্তি করে তুমি আমার মতো জ্ঞানী হয়ে ওঠো। তুমি হবে কামনা শূন্য। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের আধার হয়ে অবস্থান করে, মহাপ্রলয়কাল না আসা পর্যন্ত নির্ভয়ে থাকো।

শ্রীকৃষ্ণ তার জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক ও পীড়া নাশ করলেন। তারপর প্রকৃতির গর্ভ থেকে, সৃষ্ট নিজের পুত্র মহাবিরাটের কানে মন্ত্র শোনালেন। বেদ ও তন্ত্রের ছয় অক্ষর বিশিষ্ট, সেই মন্ত্রের প্রথমে প্রণব, পরে কৃষ্ণ, তারপর স্বাহা, সর্ববিঘ্ননাশকারী সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র দিলেন, তারপর তার খিদে মেটাবার ব্যবস্থা করলেন।

বিষ্ণুর উদ্দেশে যে নৈবেদ্য দান করা হয়, তার ষোলো ভাগের এক ভাগ বিষ্ণু গ্রহণ করেন। পুজো শেষে দেবতাকে নিবেদন করা নৈবেদ্য, কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর শুভ দৃষ্টিতে সেই দেবতার খাওয়া নৈবেদ্য একই রকম থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ এবার জানতে চাইলেন –বৎস! তোমার আর কিছু জানার আছে?

মহাবিরাট বললেন– কতোদিন আমি বাঁচব, আমি জানি না। তবে আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা, আমার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত আপনার পাদপদ্মে যেন আমার মতি স্থির থাকে। এ জগতে যে আপনার পুজো করে না, সে হয় মৃত্যুর সামিল, আবার আপনার ভক্ত আপনার কৃপায় জীবন্মুক্ত হয়, যে জীবন কৃষ্ণ ভক্তিহীন, তার বেঁচে থাকা নিষ্প্রয়োজন। কৃষ্ণের ধ্যান যে করে তাকে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে হয় না, পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য যজ্ঞ হোম, তপস্যা জপ, ব্রত, উপবাস ইত্যাদি সবই নিষ্ফল হয়। শরীরে যতদিন আত্মা বর্তমান, ততদিন শক্তিও বর্তমান থাকে। আত্মা চলে গেলে, শক্তিও ছায়ার মতো তার পিছু পিছু গমন করে।

সেই বিরাট পুরুষ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করলেন হে মহাভাগ, আপনি স্বেচ্ছাধীন, আপনি সনাতন সবার আবির্ভূত ব্রহ্মজ্যোতি স্বরূপ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুত্রকে আশীর্বাদ করে বললেন– তুমি আমার মতো চিরকাল সুস্থির হয়ে অবস্থান করো। অসংখ্য ব্রহ্মার নাশ হলেও তুমি থাকবে অবিনাশী।

একথা বলে শ্রীকৃষ্ণ নিজের বাসভবন গোলোকধামে চলে গেলেন। তিনি ব্রহ্মা ও শিবকে ডেকে পাঠালেন। ব্রহ্মার ওপর সৃষ্টি এবং শিবের ওপর সংহারের দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন। ব্রহ্মা ও শিব ভগবানকে প্রণাম করে তার আদেশ পালনে বেরিয়ে পড়লেন।

মহাবিরাটের লোমকূপে যা কিনা ব্রহ্মণ্ডের মতো গোলাকার জলরাশি, তার মধ্যে ব্রহ্মা প্রবেশ করলেন। সেই মহাবিরাট তখন ক্রমশ ক্ষুদ্র হতে থাকলেন, তাঁর যুবক চেহারা, শ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্র পরিহিত, স্মিতহাসি, প্রসন্ন, ইনি বিশ্বরূপী জনার্দন। জলের ওপর শয্যা গ্রহণ করলেন, তার নাভিপদ্ম থেকে আবির্ভূত হলেন ব্রহ্মা। সেই পদ্মের মৃণালে লক্ষ যুগ ধরে ঘুরে বেড়ালেন, কিন্তু মৃণাল দন্তের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ব্রহ্মা পৌঁছাতে পারলেন না। ব্রহ্মা স্বস্থানে ফিরে এলেন। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ধ্যানে মগ্ন হলেন। মুদ্রিত দিব্য চোখে তিনি সেই পরাৎপরের ক্ষুদ্র রূপ প্রত্যক্ষ করলেন। ব্রহ্মা সেই শ্রীকৃষ্ণর স্তব করতে লাগলেন, যিনি তার প্রতিটি লোমকূপ থেকে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন যিনি সারা গোলোক জুড়ে বিরাজমান। যিনি জলশয্যা গ্রহণ করেছেন, যিনি গোপ গোপিনীদের সাথে হাস্য রসিকতায় মেতে উঠেছেন। বন্দনা শেষে সৃষ্টি করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

ব্রহ্মা সৃষ্টির কাজ শুরু করলেন, তার মন থেকে সণক প্রভৃতি পুত্রদের আবির্ভাব ঘটল। তার কপাল থেকে মহেশ্বরের অংশে সৃষ্টি হল এগারো জন রুদ্রের। সেই ক্ষুদ্র আকারের বিরাট পুরুষের বাম অঙ্গ থেকে শ্বেতদ্বীপের নিবাসী বিষ্ণুর আবির্ভাব হল। তার চার হাত। সেই ক্ষুদ্র

মহাবিরাটের নাভিযোনিতে অবস্থান করে ব্রহ্মা একের পর এক সৃষ্টি করে চললেন। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মান্ড, স্বর্গ, মর্ত, পাতাল — সমস্ত সৃষ্টি করলেন।

.

চতুর্থ অধ্যায়

সুতপুত্র বললেন–হে শৌনক, অমৃতের মতো, এইসব অপূর্ব বৃত্তান্ত শুনে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি এবার প্রভু নারায়ণের কাছে প্রকৃতিদের পুজো পদ্ধতির বিধি-নিয়ম জানতে আগ্রহী হলেন। তার প্রশ্ন শুনে নারায়ণ যা বলেছিলেন, সেকথাই আপনাকে ব্যক্ত করছি।

নারায়ণ বললেন– প্রকৃতির পাঁচ রূপের কথা তোমাকে পূর্বেই বলেছি। এই কাহিনী যে শ্রবণ করে, সে অমৃত লাভ করে। এঁদের প্রভাব যেমন আশ্চর্যজনক, তেমনই মঙ্গলময় এঁদের চরিত্র। পৃথিবী, গঙ্গা, তুলসী, মনসা, নিদ্রা, ষষ্ঠী, সকলে মঙ্গলচণ্ডী, সরস্বতী, স্বাহা, স্বধা ও দক্ষিণা–এঁরা রূপে, গুণে ও তেজে আমার সমতুল্য, এদের চরিত্র প্রথমে বর্ণনা করছি।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন–সরস্বতীর দয়ায় মূর্খও পন্ডিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের পত্নী প্রকৃতি দেবীর মুখ থেকে সরস্বতীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তার প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে বলেছিলেন– হে নারী! তুমি নারায়ণের স্তব করো, যিনি আমার মতো চার হাত বিশিষ্ট সমস্ত গুণের আধার, নারায়ণ তোমার কামনা বাসনা পূর্ণ করবেন। কোটি কামদেবের মতো তিনি লাবণ্য মন্ডিত। আর তুমি যদি আমাকে পাওয়ার আশা করো, তাহলে ফল ভালো হবে না। কারণ আমার প্রাণাধিক প্রিয়া রাধা তোমার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। আমি ঈশ্বর, আমি সমস্ত শাসনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু রাধাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। সে রূপে, গুণে, তেজে আমার সমান। রাধা আমার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সেই প্রাণকে ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি কেন, কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই বলছি, নারায়ণকে তুমি পতিরূপে গ্রহণ করো। বহু কাল ধরে শৃঙ্গারে মেতে থাকো। সুখ লাভ করো।

এরপর শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতী বন্দনার নিয়মবিধির কথা বললেন– হে কান্তা, মাঘ মাসের শুক্লপঞ্চমীর তিথিতে বিদ্যার শুরুতে সমস্ত বিশ্বের মানুষ, মনু, দেবতা মুনীন্দ্র, মৃত্যুপথযাত্রী,

যোগী, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, সাপ এবং কিন্নরা তোমাকে ভক্তিভরে ষোলোটি উপাচারে পুজো করবে। প্রলয় কাল

আসা পর্যন্ত তুমি এই ভাবে বিরাজ করবে। সোনার মাদুলি তৈরি করে, গন্ধ ও চন্দন লেপন করে সেই কবচ গলায় বা ডান হাতে বাঁধবে।

শ্রীকৃষ্ণ নিজে দেবী সরস্বতীর পুজো করলেন। শুরু হল সরস্বতী বন্দনা। বিষ্ণু শিব, ব্রহ্মা — সমস্ত দেবতারা সরস্বতী আরাধনা করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সমস্ত লোকে বাগদেবী সরস্বতীর পুজোর প্রচলন হল।

শ্রীনারায়ণ বললেন–এবার সরস্বতীর কান্বশাখা মত পুজোর বিধি বলছি, শ্রবণ করো, মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে এবং বিদ্যারম্ভ করার দিনে সরস্বতী পুজো করার নিয়ম। পুজোর আগের দিন সংযম পালন করতে হয়। ভক্তিভরে ঘট বসিয়ে বস্ত্র দিয়ে গণেশ, সূর্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, শিবা– এই ছয় দেবতার পুজো দিতে হয়। তারপর অভীষ্ট দেবতার পুজো করার কথা বলা হয়েছে। বেদ বলেছে– দুধ, দই, খই মাখন, তিলের ছাতু, আখ, আখের রস এবং তা থেকে প্রস্তুত সাদা গুড়, মধু, স্বস্তিক, চিনি, সাদা ধানের আতপচাল, আধীবন, আতপ চালের চিড়ে, সাদা মিষ্টি, ঘি এরু, সৈন্ধব লবণ দিয়ে রান্না করা নানারকম সবজির হবিষ্যান্ন, যব ও গমের গুড়োয় তৈরি পিঠে, স্বস্তিকের পিঠে পাকা কুলের পিঠে, ঘি দিয়ে তৈরি করা পোলাও, ভালো ঘিয়ে তৈরি করা মিষ্টি, নারকেল, নারকেলের জল, বকুল ফল মূলক, আদা, পাকা কলা, ভালো বেল, কুল, নানা ধরনের মিষ্টি ও পাকা ফল, সুবাসিত সাদা ফুল, সাদা চন্দন, নতুন সাদা কাপড়, উত্তম শাখ, সাদা ফুলের মালা, সাদা হার ও সাদা অলংকার –এইসব উপকরণ দিয়ে সরস্বতী বন্দনা করা উচিত।

সরস্বতী আগুনের মতো শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করেন। তিনি শান্ত প্রকৃতির, তার অধরে মৃদু হাসি। কোটি চন্দ্রের প্রভা তার কাছে পরাভূত হয়, তিনি সামান্য হৃষ্টপুষ্ট গঠনের। তিনি সৌন্দর্যবতী, মহামূল্যবান রত্ন অলংকারে তিনি বিভূষিতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবতারা তার পুজো করেন। বিচক্ষণ লোকেরা তার ধ্যান করে, মূলমন্ত্র সহযোগে তার নৈবেদ্য নিবেদন করে, স্তব ও কবচ পাঠ করে, তারপর সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করে। সরস্বতী যার আরাধ্য দেবী, তার প্রত্যহ এই দেবীর পুজো করা কর্তব্য। সরস্বত্যৈ স্বাহা– এই আট অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র কল্পবৃক্ষের মতো।

হে নারদ, পূর্বে কৃপা সাগর নারায়ণ পুণ্যভূমি ভারতের বুকে গঙ্গার তীরে বাল্মীকিকে এই মন্ত্র দান করেন। অমাবস্যা তিথিতে পুষ্কর তীর্থে ভৃগুর কাছ থেকে শুক্ল এই মন্ত্র লাভ করেন। পূর্ণিমা তিথিতে মারীচ এই মন্ত্র বৃহস্পতিকে প্রদান করেন। ভৃগুর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বদরিকাশ্রমে এই মন্ত্র দিয়েছিলেন। আস্তিক মুনি ক্ষীর সাগরের তীরে জরৎকারু মুনির কাছ থেকে এই মন্ত্র লাভ করেন। বিভাণ্ডক মুনি ঋষ্য শৃঙ্গকে পর্বত শিখরে এই মন্ত্র উপদেশ দিয়েছিলেন। কর্ণাদ মুনি ও গৌতমমুনি এই মন্ত্র শিবের কাছ থেকে লাভ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়ন মুনি সূর্যের কাছ থেকে এই মন্ত্র শুনেছিলেন। পাণিণি, ভরদ্বাজ এবং পাতালে বলির সভায় শাকটায়ন এই মন্ত্র অনন্তদেবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। যে মানুষ চারলক্ষবার এই মন্ত্র জপ করে, সে সকল কাজে সিদ্ধ হয়। সে হয় বৃহস্পতি তুল্য।

এখন সেই কবচের কথা বলি, যা গন্ধমাদন পর্বতে স্বয়ং ব্রহ্মা তার পুত্র ভৃগুকে দান করেছিলেন।

ভৃগু সেই বিচক্ষণ, সর্বজ্ঞ, সর্বস্রষ্টা ব্রহ্মার কাছে সরস্বতীর বিশ্ববিজয়ী মন্ত্রকবচের কথা জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন –হে পুত্র, বেদে যার পুজো করা হয়েছে, যে কবচ সমস্ত কামনা বাসনা। পূরণকারী, সেই কবচের কথা গোলোকে, বৃন্দাবনের বনের মধ্যে রাসমন্ডলে রাসেশ্বর প্রভু শ্রীকৃষ্ণ প্রথম বলেছিলেন। এই কবচের মন্ত্র বড়ো অদ্ভুত এবং গোপনীর। যে কবচ ধারণ করে শুক্র দৈত্যদের দ্বারা পুজো পেয়ে থাকেন। এই কবচের মহিমায় ও প্রভাবে বাল্লীকি হয়ে উঠেছিলেন বাগ্মী ও শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে সেরা। স্বায়ম্ভুব মনুও এই কবচ ধারণ করে পুজো পেয়ে থাকেন। এই কবচের ক্ষমতায় শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ বিভাগ ও পুরাণ গুলি অতি সহজেই রচনা করেছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরাও এই কবচ অঙ্গে ধারণ করে সকলের পূজ্য হয়েছেন।

হে মহান ব্রাহ্মণ এই কবচের ঋষি স্বয়ং প্রজাপতি, কৃষ্ণ নিজে তার দেবতা এবং ছন্দ বৃহতী। সমস্ত তত্ত্বপরিজ্ঞান বিষয়ে, সমস্ত অভিলক্ষিত বিষয় সাধনে এবং সমস্ত কবিতাতে এই কবচের বিনিয়োগ ঘটেছে। হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা 'ওঁ' আমার মাথার চারিদিক রক্ষা করুন, 'শ্রীং বাগু দেবতায়ৈ স্বাহা' এই মন্ত্রে আমার কপাল এই মন্ত্র রক্ষা করুন।

ঐং হ্রীং বাগবাদিন্যৈ স্বাহা –আমার নাক সবদিক দিয়ে রক্ষা করুন।

ওঁ সরস্বতৈ স্বাহা –আমার কানদুটিকে রক্ষা করুন।

ওঁ শ্রীং হ্রং ভারত্যৈ স্বাহা –আমার চোখ দুটিকে রক্ষা করুন।

শ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাত্রীদেবাৈ স্বহা –আমার ঠোঁট দুটিকে রক্ষা করুন।

ওঁ শ্রীং শ্রীং ব্রাহ্মৈ স্বাহা –আমার দাঁত গুলির রক্ষা করুন।

ওঁ হ্রীং হ্রীং –আমার ঘাড়, শ্রীং, কঁধ, হ্রীং, শ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠতৃদেব্যৈ স্বাহা– বুক ওঁ হ্রীং হ্রীং বাণ্যৈ স্বাহা –আমার পিঠের দিক রক্ষা করুন।

ওং সার্বার্ণত্মিকায়ে স্বাহা– পা দুটিকে রক্ষা করুন।

ওঁ ওঁ সর্বকণ্ঠবাসিন্যৈ স্বাহা পূর্ব দিকে,

ওঁ হ্রীং জিহ্বাগ্রবসান্যৈ স্বাহা-অগ্নিকোণে

ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং সরস্বত্যৈ বুধজনন্যৈ স্বাহা দক্ষিণ কোণে

ওঁ ঐং হ্রীং নৈঋর্তকোণে, ওং কবিজিহ্বাগ্রেবাসিন্যৈ স্বাহা–পশ্চিমদিকে,

ওঁ সদাম্বিকয়ৈ স্বাহা –বায়ু কোণে

ওং গদ্যপদ্যবাসিন্যৈ স্বাহা –উত্তরদিকে

ওং সর্বশাস্ত্রবাসিন্যৈ স্বাহা –ঈশাণ কোণে

ওং সবপূজিততায়ৈ স্বাহা — ওপরের দিকে

ওং ঐং হ্রীং পুস্তকবাসিন্যৈ স্বাহানীচের দিকে

ওং গ্রন্থবীজরূপায়ে স্বাহা– আমাকে সব দিকে থেকে রক্ষা করুন,

হে ব্রাহ্মণ! বিশ্বজয় নামক নিখিলা মন্ত্রাত্মক কবচ তোমাকে দান করলাম। গন্ধমাদন পর্বতে ধর্মের কাছ থেকে ব্রহ্মস্বরূপ এই কবচের মাহাত্ম কথা আমি শুনেছিলাম। পাঁচ লক্ষবার জপ করলে এই কবচ সিদ্ধ হয়। এবং কবচ সিদ্ধকারী বৃহস্পতির সমান হয়। সে হয় মহাবাগ্মী, কবীন্দ্র এবং ত্রৈলোক্য বিজয়ী, প্রথমে গুরুকে বিধিমতো চন্দন, বস্ত্র, অলংকার দিয়ে পুজো

করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবে, তারপর কবচ ধারণ করবে। এই হল সরস্বতী কবচ, স্তোত্র পুজোর বিধি, ধ্যান ও বন্দনা কথা–তোমাকে কান্বশাখায় যা আমি দান করলাম।

.

পঞ্চম অধ্যায়

নারায়ণ বললেন–হে নারদ! পুরাকালে গুরুর অভিশাপে যাজ্ঞবল্ক্য বিদ্যাহীন হয়েছিলেন। তিনি ভারাক্রান্ত মনে পূণ্যদায়ক সূর্যের দ্বারস্থ হলেন। বিশেষ ভাবে তপস্যা করে কোণারকে সূর্যের দেখা পেলেন ও তিনি তার স্তব করলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তার মনদুঃখের কথা জানালেন। বেদ ও বেদাঙ্গ সমূহ জ্ঞান দান করে সূর্যদেব তাকে বাগদেবীর স্তব করতে বললেন। মুনি স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে ভক্তি ভরে অবনত মস্তকে বাগদেবীর স্তব পাঠে মগ্ন হলেন। মুনি যাজ্ঞবল্ক্য দেবীর বন্দনা করলেন–হে মা, বাগেশ্বরী! শ্রী গুরুর অভিশাপে আমি স্মৃতিশক্তি হারিয়েছি, আমি এখন দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। হে, বিদ্যা দেবী আমাকে জ্ঞান দিন, স্মৃতি শক্তি দিন, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, কবিতা দান করুন। আমি যেন গুরু হওয়ার সামর্থ্য লাভ করতে পারি। সৎশিষ্য লাভ করার, গ্রন্থ কবিতা রচনা করার ক্ষমতা আপনি আমাকে দান করুন। সব জ্ঞান আমার দুর্ভাগ্যবশত বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। আপনি কৃপা করে আমার হারানো স্মৃতিশক্তি ফিরিয়ে দিন। আপনি পরম ব্রহ্মা স্বরূপা, আপনি জ্যোতির্ময়ী, সনাতনী, সমস্ত বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। বাক্যে আপনার বসবাস, আপনাকে ছাড়া জগৎ বোবা ও মৃতপ্রায় হয়ে ওঠে। সেই বাণীকে আমি বন্দনা করি। অক্ষর স্বরূপা, শ্বেতবর্ণা ভারতাঁকে আমি প্রণাম জানাই। সেই কাল ও সংখ্যাস্বরূপা দেবীকে আমি প্রণাম জানাই। স্মৃতিশক্তি, জ্ঞানশক্তি বৃদ্ধি শক্তি, প্রতিভা শক্তি ও কল্পনাশক্তি যা কিছু আপনার আছে, ধ্যানের কল্যাণে তা আমার হোক।

একবার পুত্র সনৎকুমার পিতা ব্রহ্মার কাছে জ্ঞানের বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা এবিষয়ে সম্পূর্ণ জবাব দিতে পারবেন না ভেবে স্থবির হয়ে বসে রইলেন। তখন সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটল। তিনি ব্রহ্মাকে বাগদেবীর বন্দনা করার আদেশ দিলেন। ব্রহ্মা আপনার স্তব করেছিলেন। এবং আপনার কৃপায় সেই মহান সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। এই ভাবে আপনি অনন্তদেব, মহামুনি বাল্মীকিকে অনুগ্রহ করেছিলেন। ব্যাসদেব আপনার কাছ থেকে কবীন্দ্র উপাধি লাভ করে চারখন্ড বেদ ও সমস্ত পুরাণ রচনা করেছিলেন। মহেন্দ্র পর্বতে দেবী দুর্গা তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক কিছু প্রশ্ন করলে শিব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আপনার

কথা চিন্তা করেন এবং আপনার অনুগ্রহ লাভ করে মহাদেব দেবী দুর্গাকে তত্ত্বজ্ঞান দান করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

একদিন ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির কাছে শব্দশাস্ত্র বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আপনি বৃহস্পতিকে বর দান করেন, যার প্রভাবে বৃহস্পতি দিব্য হাজার বছর ধরে শব্দশাস্ত্রের জ্ঞান ইন্দ্রকে দান করেছিলেন। সেই শব্দশাস্ত্র থেকে আহরিত জ্ঞান তিনি মহেন্দ্রকে দিয়েছিলেন। অন্যান্য ঋষিরা এই শব্দশাস্ত্র অধ্যয়ন করে জ্ঞান লাভ করেন এবং শিষ্যদের তা দান করেন।

সমস্ত মস্তক বিশিষ্ট অনন্তদেব, পঞ্চানন শিব এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মা যাঁর স্তব করতে গিয়ে সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেন, কেবলমাত্র হাত জোড় করে পুজো করেন, সেখানে আমার মতো একমুখ বিশিষ্ট সাধারণ লোকের কী ক্ষমতা আপনাকে স্তব করে তুষ্ট করি।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মাথা নুইয়ে প্রণাম করলেন এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। অচিরেই তিনি জ্যোতির্ময়ী দেবীর দর্শন পেলেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে উত্তম কবি হওয়ার বর দান করলেন।

যে লোক যাজ্ঞবল্ক্যর করা স্তব পাঠ করে নিত্য সরস্বতীর বন্দনা করে সে কবিকুলের শ্রেষ্ঠ হয়, মহাবাগ্মী এবং জ্ঞানী হয় বৃহস্পতির তুল্য। মুখ ও অক্ষরাজ্ঞানহীন লোকও যদি এক বছর নিয়ম করে এই স্তোত্র, পাঠ করে, তাহলে সে নিশ্চয়ই ভাবে পন্ডিত, মেধাবী ও শ্রেষ্ঠ কবিতে রূপ পরিণত হয়।

.

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারায়ণ বললেন–হে মুনি; একবার বৈকুণ্ঠধামে গঙ্গাদেবীর সঙ্গে সরস্বতীর ঝগড়া হয়। গঙ্গাদেবী। তাঁকে অভিশাপ দেন। সরস্বতী নদী হয়ে কলিযুগে ভারবর্ষের বুকে অবতীর্ণ হবেন। সরস্বতী স্বয়ং পুণ্যতীর্থ স্বরূপা। তিনি পুণ্য দান করেন। পুণ্যবান ব্যক্তিরা এই নদীর তীরে বসবাস করেন। এই নদী জ্বলন্ত আগুনের মতো পাপীদের পাপ পুড়িয়ে দেয়, সজ্ঞানে যে লোকের সরস্বতীর জলে মৃত্যু হয় সে বৈকুণ্ঠধামের যাত্রী হয়। পাপীরা এই নদীর জলে স্নান করে পাপ নাশ করতে পারে। যে কোনো পুণ্য দিনে এবং, চতুর্দশী, অক্ষয়াতিথি, পূর্ণিমা, ব্যাতীপাতযোগ গ্রহণে এই জলে স্নান করে, তাহলে সে বৈকুণ্ঠধামে গমন করে বংশীধারির চরণে ঠাঁই পায়। যে কোনো মহামূর্খ যদি একমাস সরস্বতীর মন্ত্র নিয়মমতো উচ্চারণ করে,

তাহলে সে মহাকবি হতে পারে। স্নান করে মাথা ন্যাড়া হলে তাকে আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয় না।

সুতপুত্র বললেন–হে শৌণক, নারদ আবার শুনতে চাইলেন, কেন গঙ্গাদেবী সরস্বতাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন? এই ভারতে নিজের অংশে সরস্বতী কীভাবে পুণ্যদাতা হয়েছিলেন?

নারায়ণ বললেন–এই বৃত্তান্ত যে শোনে, সে পাপ মুক্ত হয়। শ্রীহরির তিন স্ত্রী গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, এরা স্বামীকে প্রেম নিবেদনের ব্যাপারে কেউ কারো অপেক্ষা কম ছিলেন না। তারা সর্বক্ষণ শ্রীহরিকে ঘিরে থাকতেন স্বামীর সান্নিধ্যলাভের আশায়।

একদিন গঙ্গা শ্রীহরির দিকে তাকিয়ে কটাক্ষপাত করলেন, উত্তরে শ্রীহরিও তার এই স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং মুচকি হাসতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখেও লক্ষ্মী দেবী কোনো প্রতিবাদ করলেন না। কিন্তু সরস্বতী তখন প্রচন্ড রেগে গেছেন। শ্রীহরি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে বিফল হলেন। সরস্বতী ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ লাল করে রাগ প্রকাশ করে বললেন– অধার্মিক স্বামী তার সকল স্ত্রীর প্রতি সমান অনুরাগ দেখান না, কিন্তু সুবিবেচক, সৎ ও ধার্মিক স্বামী বিপরীত করে থাকেন। হে গদাধর! আমি বুঝতে পারলাম গঙ্গার প্রতি আপনি বেশি অনুরক্ত। লক্ষ্মীকেও ভালোবাসেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আপনার ভালোবাসার ভাণ্ডার শূণ্য। যে স্ত্রী স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয় তার জীবনের কী দাম? বোকা, মূর্খ, মুনিরাই আপনাকে সত্ত্বময় বলে থাকেন। আপনার মতিগতি জানা নেই, তাই বেদ আপনার প্রশস্তি কীর্তন করেছে।

কুপিত সরস্বতীর কথা শুনে নারায়ণ চিন্তিত হলেন, তিনি সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

গঙ্গাকে একা পেয়ে ক্রুদ্ধ সরস্বতী কটু বাক্যবাণ ছুঁড়ে দিলেন– নির্লজ্জ, বেহায়া তুই আমাকে কি বোঝাতে চাইছিস, স্বামী তোকে কত ভালোবাসে। তোর গুমোর আমি শ্রীহরির সামনেই ভাঙব। দেখি, তিনি আমার কী করেন। এই কথা বলে তিনি গঙ্গার চুল ধরার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এই সময় লক্ষ্মীদেবী তাঁদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। সরস্বতাঁকে ঝগড়া করতে বারণ করলেন। এবার সরস্বতীর রাগ গিয়ে পড়ল লক্ষ্মীর ওপর। অভিশাপ দিয়ে বললেন–তুমি এই বিপরীত ভাব দেখেও চুপ করে আছ গাছ আর নদীর মতো। তুমি গাছ ও নদীর মতো অবস্থান করবে।

লক্ষ্মীদেবী একথা শুনে রাগ প্রকাশ করলেন না বা সরস্বতাঁকে অভিশাপ দিলেন না।

সরস্বতীর উগ্রভাব দেখে গঙ্গা বললেন–হে লক্ষ্মী, তোমাকে ওই কুমুখী সরস্বতী অভিশাপ দিয়েছে, আমিও ওকে শাপ দিচ্ছি, ও নদীর মতো অবস্থান করবে। সতী লক্ষ্মী, তুমি দেখো কার ক্ষমতা ও শক্তি বেশি। কলিকালে পাপীদের মাঝখানেও থাকবে।

রুক্ষ সরস্বতী বললেন–শুধু আমি কেন? তুমিও মর্তে যাও, পাপীদের সঙ্গে বাস করো।

এই সময় ঘটনাস্থলে পারিষদবর্গ নিয়ে চতুর্ভুজ নারায়ণ এসে প্রবেশ করলেন। তিনি সরস্বতীর হাত ধরে কাছে টেনে নিলেন, তাকে বুকে আলিঙ্গন করলেন। পুরানো সব জ্ঞানের কথা শোনালেন। তার অনুপস্থিতিতে ইতিমধ্যে যে ঝগড়া হয়েছে এবং শাপ-শাপান্ত চলেছে –তা শুনে ভগবান নারায়ণ মনে ব্যথা পেলেন। তিনি বললেন–হে লক্ষ্মী! তুমি পৃথিবীতে ধর্মধ্বজের ঘরে গিয়ে অযোনিসম্ভবা হয়ে তার কন্যা রূপে জন্ম নেবে। সেখানেই তুমি সরস্বতীর অভিশাপের কারণে বৃক্ষে পরিণত হবে, তুমি হবে ত্রৈলোক্য পাবণী তুলসী, আমার অংশ থেকে উৎপন্ন অসুর শঙ্খচূড়ের পত্নীরূপে বিরাজ করবে। এই ভাবে শাপ ভোগ করার পর আমার কাছে ফিরে আসবে। আমি তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করব।

হে সুবদনা, তুমি সরস্বতীর শাপের প্রভাবে নদী হয়ে ভারতে জন্ম নেবে। সেখানে তুমি পদ্মাবতী নামে অভিহিত হবে। গঙ্গা তুমিও সরস্বতীর শাপে পতিতপাবণী হয়ে ভারতে অবতীর্ণ হবে। সেখানকার মানুষদের পাপ নাশ করো। ভগীরথ কঠোর সাধনা করে তোমাকে মর্ত্যে আনবে। তোমাকে সকলে ভাগীরথী নামে জানবে।

হে সুরেশ্বরী! গঙ্গার অভিশাপের প্রভাবে তুমিও ভারতে জন্ম নেবে। সেখানে আমার অংশ জাত সমুদ্র এবং আমার অংশ থেকে উৎপন্ন রাজা শান্তনুর স্ত্রী হয়ে দিন কাটাতে হবে। দুই সপত্নী লক্ষী ও গঙ্গার সাথে তুমি ঝগড়া করেছে তার ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে। তুমি স্বয়ং ব্রহ্মার কাছে। যাও। তাকে পতি হিসাবে গ্রহণ করো। গঙ্গাকেও আমি বিদায় জানাচ্ছি। লক্ষ্মী শান্ত, সে হিংসা করতে জানে না। সে মহাসতী, সুশীলা ও ধার্মিকা। তাই আমি তাকে নিজের কাছে রেখে দিলাম। লক্ষ্মীর অংশের অংশগত হিসেবে যে সব নারী জন্মাবে তারা হবে তার মতো সুশীলা শান্তরূপা ও ধর্মপরায়ণা এবং পতিব্রতা। বেদ বলেছে, তিন জন সতী, তিনজন চাকর ও তিনটি বাড়ি অমঙ্গলের কারণ। যে স্বামীর স্ত্রী কেবল ঝগড়া করে, দুর্বুদ্ধি মাথায় রাখে, তার বনে বাস করা উচিত। কারণ তারা ঘর থেকে বনেই শান্তি পায়। দুষ্ট স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করা আর আগুনে ঝাঁপ দেওয়া সমান। যে স্বামী স্ত্রীর বশীভূত তার জীবন ব্যর্থ,

সে নিজের মতো করে কোনো কিছু ভোগ করতে পারে না। যে পুরুষ অনেক স্ত্রী নিয়ে ঘর করে, সে অসুখী হয়। যশ ও কীর্তিহীন লোকের বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া সমান।

যার স্ত্রী স্বামীর বশীভূতা, শান্ত, সুশীলা ও পতিব্রতা, সে বেঁচে থেকে স্বর্গের সমান সুখ লাভ করে। পরলোকে সে ধর্ম ও নির্বাণ লাভ করে। পতিব্রতা স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী মুক্ত, শুদ্ধ ও সুখী জীবন কাটায়। কিন্তু দুশ্চরিত্র স্ত্রী স্বামীর জীবনে কেবল দুঃখ টেনে আনে।

জগন্নাথ নারায়ণের কথা বলা শেষ হলে তিনি সপত্নী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করে তাঁরা ভয় ও শোকে কাঁপতে লাগলেন।

ব্যথিত কণ্ঠে সরস্বতী বললেন– হে জগৎপতি! দুষ্ট স্বভাবের স্ত্রীকে কোনো স্বামী পছন্দ করে, আমি জানি, আমার এই শাস্তি প্রাপ্য। স্বামী পরিত্যক্ত স্ত্রীর বেঁচে থাকার কী প্রয়োজন? আপনার আদেশে আমি ভারতে যাচ্ছি। যোগবলে সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করব।

গঙ্গা বললেন–হে নাথ! আমি কি দোষ করেছি জানি না। তবুও নিজেকে আমি নিরাপরাধ বলছি। আপনি আমাকে আপনার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করলেন, নিশ্চয়ই করে বলছি, এ জীবন আমি বিসর্জন দেব। আর আপনি হবেন স্ত্রী হন্তারক। আপনি সর্বজ্ঞ। তবুও আমি বলছি, বিনা দোষে স্ত্রীকে ত্যাগ করলে স্বামীর কল্পান্তকাল পর্যন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

লক্ষ্মীদেবী বললেন– হে প্রভু! আপনি সত্ত্বস্বরূপ, আপনার রাগ হওয়ার কথা নয়, ক্ষমা প্রদর্শন করা সৎপতির শ্রেষ্ঠ গুণ। তাই বলছি, আপনি আপনার পত্নীদের ওপর সদয় হোন। হে নাথ! সরস্বতীর অভিশাপের অংশের দ্বারা আমি ভারতে গেলে কতকাল সেখানে কাটাব, কবে আপনার পাদপদ্মে ঠাঁই পাব? পাপীরা আমার জলে স্নান করে সব পাপ আমাকে দিয়ে যাবে। সেই পাপ থেকে আমি কীভাবে মুক্ত হব? সরস্বতী ও গঙ্গা কীভাবে কত কাল পরে পাপ মুক্ত হবে, কৃপা করে বলুন।

লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের চরণ দুটি জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তাদের ক্ষমা করার কথা বারবার বললেন।

ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্য কাতর পদ্মনাভ নারায়ণ লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করলেন। হেসে বললেন– হে সুরেশ্বরী! আমি এমন ব্যবস্থা করব, যার ফলে আমাদের দুজনের কথাই রাখা হবে। কীভাবে? সে কথা বলছি শোন। সরস্বতী নিজের অংশের দ্বারা নদীরূপে ভারতবর্ষে যাবে। ব্রহ্মার কাছে এবং স্বয়ং আমার কাছে অবস্থান করবে। গঙ্গাকে ভগীরথ নিয়ে এলে সেই প্রসিদ্ধ গঙ্গা প্রবাহিনী হয়ে ভারতবর্ষকে পুণ্যতীর্থে পরিণত করবে। এবং নিজে আমার কাছে থাকবে। শিবের অত্যন্ত দুর্লভ মস্তকে সে স্থান পাবে। এতে তার পবিত্রতার মাত্রা অনেকগুণ বেড়ে যাবে। হে লক্ষ্মী! তুমি মর্তে পদ্মাবতী নদী ও তুলসীগাছ হয়ে অবস্থান করবে। কলিযুগের পাঁচ হাজার বছর পর্যন্ত তোমরা এই শাপ ভোগ করবে। তারপর শাপমুক্তি ঘটবে, ফিরে আসবে আমার কাছে। বিপদে পড়লেই লোকে ধর্মের আশ্রয় নেয়। আমার মন্ত্র, উপাসকদের স্নান ও অবগাহনের ফলে তোমরা পাপীদের দেওয়া পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে। মর্তের সমস্ত তীর্থে আমার ভক্তদের দর্শনে ও স্পর্শে পুণ্য লাভ করবে।

লক্ষ্মী ভগবান অনুগ্রহকারীদের লক্ষ্য জানতে চাইলে নারায়ণ বললেন–হে সাধ্বী নারী! আমার মন্ত্রের উপাসকরা ভারতের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা পৃথিবীকে পবিত্র করার কাজে ব্যস্ত। আমার ভক্তরা যে জায়গায় যাবে, সেই জায়গায় পাপ রোধ হবে, সেই জায়গা মহা তীর্থে পরিণত হবে, আমার ভক্তদের স্পর্শ ও দর্শন করে পাপীদের পাপের বিনাশ ঘটাবে। যে লোক পুজোআচ্চা মানে না, সন্ধ্যা-আহ্নিক করে না, একাদশী তিথি পালন করে না, স্ত্রী বা গরু হত্যা করে, উপকারীর উপকার মনে না রেখে তার অপকার করে –সেই সব পাপীরা আমার ভক্তদের স্পর্শে ও দর্শনে পবিত্র হয়। ঋণী ব্যক্তি, সুদখোর, বিশ্বাসঘাতক বন্ধু হত্যাকারী এমন কোন লোক আমার ভক্তকে স্পর্শ ও দর্শন করে, তাহলে তাদের পাপ নাশ হয়। যে লোক অশ্বত্থ গাছের কাছে আমার ভক্তদের দুর্নাম করে, যে কন্যা বিক্রি করে, ব্রাহ্মণের দ্রব্য যে চুরি করে, যে পারদ বিক্রি করে, শ্বশুর-শাশুড়ির ভার যে গ্রহণ করে না, যে সাধু ব্যক্তির নিন্দা করে, যে সবসময় নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে, যে সংসারের প্রতি কোনো কর্তব্য পালন করে না, যার শ্রীহরির প্রতি কোনো ভক্তি নেই– তারা মহাপাপী। তারা আমার ভক্তদের স্পর্শে ও দর্শনে ধন্য হয়। আমার ভক্তরা যে স্থানে উপনীত হয়, সেই স্থান পবিত্রতা লাভ করে।

সেধতি বললেন–হে ঋষিশ্রেষ্ঠ শৌণক! নারায়ণের এই কথা শ্রবণ করে মহালক্ষ্মী জানতে চাইলেন, যে সব ভক্তদের পায়ের ধুলায় সেই স্থান পবিত্র হয়, যাদের স্পর্শ ও দর্শন পেলে মহাপাতকীরও পাপ নাশ হয়, সেইসব বিষ্ণুর লক্ষণচিহ্ন দয়া করে বলুন। নারায়ণ তখন হাসতে হাসতে সেই গোপন তত্ত্ব তাকে শোনালেন।

জনার্দন বললেন–হে লক্ষ্মী! আমার ভক্তদের লক্ষণ তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্লভ ও গোপনীয়। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ এবং অত্যন্ত পবিত্র। তাই তোমাকে বলতে আমার কোনো বাধা নেই। যে লোক সাধারণ বৈষয়িক কামনা করে না, হরিনাম শুনে যে পুলকিত হয়, যে সর্বদা হরিনাম সংকীর্তনে ব্যাপৃত থাকে, যে আমার পুজো করে, আমার প্রতি যার ভক্তি আছে, আমার গুণ-গুলি শ্রবণ করা মাত্র যে মনে প্রাণে আনন্দ লাভ করে, তারাই হল প্রকৃত বৈষ্ণব। আমার ভক্তস্বরূপ আমার ভক্তরা– ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব, দুর্লভ দেবত্ব এবং স্বর্গরাজ্য প্রভৃতি ভোগের কথা কল্পনাও করতে পারে না। হে সতী, আমার ভক্তরা এই ভারতবর্ষকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে মানুষরূপে পৃথিবীতে আসে। তার নিজের নিজের কাজ সম্পূর্ণ করে ফিরে যায় বৈকুণ্ঠধামে। তারপর বললেন–হে পদ্মা তুমি তোমার প্রশ্নের জবাব পেলে, আশা করি আর কোনো কিছু জানার নেই। এবার তোমাদের বিবেচনায় যা হয় তাই করো। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গাদেবী যার যার নির্দিষ্ট কাজে মনোনিবেশ করলেন।

.

সপ্তম অধ্যায়

নারায়ণ বললেন–হে নারদ! গঙ্গার অভিশাপে সরস্বতী নদী রূপে এই পবিত্র ভারতের ভূমিতে অবতীর্ণ হলেন। এইসময় সরস্বতীর নাম হল–ব্রাহ্মী কারণ তখন তিনি ব্রহ্মার প্রিয়া। ভারতে আসার জন্য তিনি হন ভারতী। সরঃশয়ী শ্রীহরি সমুদ্রে সমস্ত বিশ্বব্যাপী অনেককাল ধরে শুয়ে ছিলেন। বাণী তার স্ত্রী, তাই তিনি সরস্বতী। আমার ইষ্টদেবী সরস্বতী হলেন তীর্থরূপা এবং জ্বলন্ত আগুন হয়ে তিনি পাপরূপ কাঠ পুড়িয়ে থাকেন।

পরে গঙ্গাকে মহারাজ ভগীরথ মর্ত্যে নিয়ে এলেন। গঙ্গা হলেন মঙ্গলময়ী ভাগীরথী, এসময় গঙ্গার বেগ এত প্রবল ছিল যে, পৃথিবীর পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। শিবকে এইজন্য প্রার্থনা জানালে তিনি গঙ্গাদেবীকে নিজের মস্তকে ধারণ করতে সম্মত হলেন।

সরস্বতীর অভিশাপে লক্ষ্মীও অবতীর্ণ হলেন মর্তে। নাম নিলেন পদ্মাবতী, নিজে শ্রীহরির কাছে রয়ে গেলেন। লক্ষ্মীর অন্য এক অংশ ভারতে ধর্মধ্বজরাজের দুহিতা হয়ে তুলসী নাম নিয়ে থাকতে লাগলেন। তিনি হলেন বিশ্বপাবনী তুলসী গাছ। পাঁচ হাজার বছর সমাপ্ত হলে তিনি আবার নিজের রূপে ফিরে গেলেন বৈকুণ্ঠধামে।

কলিযুগে কাশী আর বৃন্দাবন ছাড়া পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ আছে তাঁরা সবাই লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গাদেবীর সঙ্গে বৈকুণ্ঠে চলে যাবেন। কলি যুগের দশ হাজার বছর অন্তে শ্রীহরির দুই মূর্তিরূপ শালগ্রাম আর জগন্নাথ ভারত ত্যাগ করে বৈকুণ্ঠে চলে যাবেন। তাদের সঙ্গে বিদায় নেবে বেদেবর্ণিত যে সব ক্রিয়াকলাপের কথা বলা হয়েছে তারা, পুরাণ, সাংখ্যা সমাজবিদ। ওই সময় পৃথিবী থেকে ব্রত উপবাস, তপস্যা, হরির পুজো, হরির সংকীর্তন, সত্য, ধর্ম, গ্রাম্যদেবতারা, সত্ত্বগুণ এসবও লোপ পাবে। মানুষ হবে মিথ্যাবাদী, কপটতায় পূর্ণ। কাম বিলাসে মত্ত হবে। পুজো পার্বনে মন দেবে না। যদিও পুজো করে, তাহলে তুলসী দেবে না। হরিকথা শুনলেই বিরক্তি প্রকাশ করবে। পৃথিবী শঠ, কুটিল, হিংসুটে, দাম্ভিক, চোর, ডাকাতে ভরে যাবে। রাশিচক্র বিচার করে বিয়ে করার প্রয়োজন বোধ করবে না। পুরুষ হবে স্ত্রীর বশীভূত। ঘরে পত্নীকে ফেলে রেখে বেশ্যার সঙ্গে সময় কাটাবে। মা-বাবাকে ত্যাগ করে পত্নী-কন্যা-পুত্রকে নিয়ে সুখে দিন কাটাবে। মা, বাবা শ্বশুর-শ্বাশুড়ি দাসীর মতো হবে। মা বাবা, শ্বশুড়-শাশুড়ির সঙ্গে দাসীর মতো ব্যবহার করবে। স্ত্রীর অনুমতি না নিয়ে পুরুষ কোনো কাজে ব্যাপৃত হবে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যরা নিজেদের শাস্ত্র মানবে না। শূদ্রদের শাস্ত্র পড়বে। তাদের সাথে কুটুম্বিতা করবে।

পৃথিবীতে গাছপালা জন্মাবে না। থাকবে না শস্যের ক্ষেত্র। গাছে ফুল ফল ঝুলতে দেখা যাবে না। স্ত্রীরা সন্তানাদি লাভ করবে না। গরু দুধ দেবে না। ফলে ঘি পাওয়া যাবে না। বাড়িতে অশান্তি বিরাজ করবে, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসায় কপটতা থাকবে। সে ভালোবাসা খাঁটি হবে না। প্রতাপান্বিত রাজা তার ক্ষমতা হারাবে। করের ভারে প্রজারা জর্জরিত হবে।

কুৎসিত বিশ্রি চেহারা নিয়ে স্ত্রী পুরুষ, বালক, পুণ্যহীন, ধমহীন এই পৃথিবীতে জন্ম নেবে। জলাশয়গুলি শুকিয়ে যাবে। জলের অভাব হবে। মানুষ ঝগড়া-ঝাটি, মারামারি রক্তপাতে মেতে উঠবে। বেশিরভাগ গ্রাম ও শহর হবে জনশূণ্য। সেই জনশূণ্য নগর অরণ্যে ভরে যাবে। মানুষ বনে গিয়ে বাস করবে। উর্বরা জমি ভালো ফলন আর দেবে না। নদী বা জলাশয়ের ধারে কিছু কিছু শস্যের চাষ হবে।

কলিযুগে সদ্বংশজাত মানুষ মিথ্যাবাদী, কপট, খারাপ লোকে পরিণত হতে বাধ্য হবে। বৈশ্যরা পতিব্রতাকে, পাপীরা তপস্বীদের, অবৈষ্ণবরা বৈষ্ণবদের উপহাস ও ঠাট্টা করবে। ধূর্তরা সন্ন্যাসীর বেশ ধরে ধর্মের নামে কুৎসা রটাবে। নির্বোধ, ঠগ, জোচ্চর, মাতাল, লম্পট ব্যক্তিরা সমাজে গণ্যমান্য হিসাবে পরিগণিত হবে। মানুষের আয়ু কমে যাবে। যৌবন বয়স অতিক্রান্ত হবার আগেই প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছাবে। মেয়ে পাচারকারীরা রমরমা ব্যবসা করবে। কালোবাজারী

যত্রতত্র চলবে। ব্যাভিচারের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করবে, আর সেই পয়সায় বিলাসিতায় ডুবে যাবে।

এই যুগে মানুষের সংসারে বনিবনা থাকবে না। শাশুড়ী-বউ, বোনে-বোনে, ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ করবে। কেউ কেউ হরিনাম বিক্রি করে স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করবে। যশ ও অর্থ লাভ করবে। কেউ ছেলের বউয়ের কাছে শাশুড়ির কাছে অথবা কন্যা, বোন, সত্মায়ের কাছে যাবে। মায়ের সঙ্গ ছেড়ে সকলে স্ত্রীর সঙ্গে ঘুরবে এবং নিজের স্ত্রীর কোনো ঠিক থাকবে না। এই রকম স্বামীরা লাগামছাড়া হবে। দয়ামায়া, বিবেক, বিসর্জন দিয়ে মানুষ মানুষকে হত্যা করবে। ব্রাহ্মণরা অনাচার, অধর্মের কাজ করবে। শূদ্রদের মৃতদেহ পোড়াবে। তাদের কাছ থেকে আহার গ্রহণ করবে, শূদ্র পত্নীর সাথে সম্ভোগে রত হবে। বেশ্যা, স্বামী ও পুত্রহীনা রমণী, বৃদ্ধা ও মনমরা নারী ব্রাহ্মণের ঘরে রাঁধুনির কাজ করবে। আশ্রম ও জনসমাজের মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকবে না। কলিযুগে পৃথিবী ম্লেচ্ছতে পরিপূর্ণ হবে। গাছের উচ্চতা এবং মানুষের উচ্চতা কমে কমে একহাত ও এক আঙুল সমান হবে।

কলিযুগে এই সময় ভগবান কল্কি নারায়ণের অংশে ব্রাহ্মণের পুত্র হয়ে জন্মাবেন। তাই নাম হবে বিষ্ণু-যশা। তিনি বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ম্লেচ্ছপূর্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে বিশাল তরোয়াল উচিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ভ্রমণ করবেন। তিন রাতের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীকে ম্লেচ্ছ শূন্য করে বিদায় নেবেন। এর ফলে অরাজকতা বাড়বে। দুঃখ কবলিত পৃথিবীতে তারপর প্রবল ধারায় বৃষ্টি হবে। ছয় দিন-রাত সমানে বৃষ্টি হওয়ায় সবকিছু ডুবে যাবে। জলের তলায় পড়ে থাকবে পৃথিবীর মানুষজন, গাছপালা, ঘরবাড়ি সবকিছু।

এই সময় আকাশে বারোটি সূর্যের উদয় হবে। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে সেই বিপুল জলরাশি শুকিয়ে যাবে। কলিকাল রসাতলে গিয়ে শুরু হবে সত্যযুগ। এই সময় পৃথিবীতে ধর্ম নেমে আসবে। আসবে সত্য। জগতে জ্ঞানী, ব্রাহ্মণ ও বেদজ্ঞদের বাসস্থান হবে। ঘরে ঘরে পতিব্রতা ও ন্যায় পরায়ণা স্ত্রীর জন্ম হবে। ব্রাহ্মণ সমাজে অগ্রগণ্য ভূমিকা নেবে। এই সময় পৃথিবী হবে অধর্ম লেশশূণ্য। এখানে মিথ্যা থাকবে না।

ত্রেতা যুগে ধর্ম তিন পাদ, ধর্ম দ্বিপদ হচ্ছেন দ্বাপর যুগে, কলিযুগে ধর্ম হন একপাদ এবং কলিযুগের শেষে বিদায় নেয়। হে নারদ! সাতটি বার, ষোলোটি তিথি, বারোটি মাস, ছয়টি ঋতু, দুইটি পক্ষ, দুইটি অয়ন, চার প্রহর ও এবং চার প্রহরে একদিন একরাত্রি, তিরিশ দিনে একমাস ও বারো মাসে এক বছর হয়। বিধির ক্রমানুসারে বছরের পাঁচটি প্রকার। বছর

যেভাবে চার যুগ সম্পন্ন হয় –সত্য, ত্রেতা দ্বাপর ও কলি। মানুষের একবছর দেবতাদের একদিনের সমান। মানুষের তিনশো ষাট যুগ দেবতাদের এক যুগের সমান। দেবতাদের একাত্তর যুগ অন্তে আসে একটি মন্বন্তর। এই সময়সীমা ইন্দ্রের আয়ুষ্কাল। আঠাশ জন ইন্দ্রের পতন হলে ব্রহ্মার একদিন ও একরাত্রি হবে। এই ভাবে একশো আট বছর পর্যন্ত ব্রহ্মার আয়ু। ব্রহ্মার পতনের সাথে সাথে পৃথিবী লুপ্ত হবে। তখন শ্রীকৃষ্ণের অংশ, অংশের অংশ, এমনকি তার কণার দ্বারা সৃষ্ট দেবতা, ঋষি, মুনি, প্রাণীরা বৃষ্টিতে আবার বিলীন হয়ে যান। স্বয়ং প্রকৃতিও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এক হয়ে যান। একে বলা হয় প্রাকৃতিক বলয়। প্রাকৃতিক বলয় ও ব্রহ্মার পতন কালকে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এক নিমেষকাল বলা হয়ে থাকে। জগতের বিলুপ্তি ঘটলে শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থান করেন। নতুন এক নিমেষকাল এলে আবার সৃষ্টির কাজ শুরু হয়। এইভাবে প্রলয় ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে।

হে মুনি! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই হলেন বিধাতা। তার নির্দেশেই ত্রিভুবন পরিচালিত হয়। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে প্রকৃতি, ক্ষুদ্র, মহা বিরাট, সকলেই তার অংশজাত। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সামান্য ঘাস সবই প্রকৃতি হতে উৎপন্ন হয়েছে। প্রকৃতি থেকে আসা যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সবই অনিত্য, নশ্বর। একমাত্র পরমব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ, নিত্য, সনাতন, স্বেচ্ছাধীন, নির্লিপ্ত, তিনি সাকার এবং নিরাকার। ভক্তদের দর্শন দেবার ইচ্ছায় তিনি রূপ ধারণ করেন। অত্যন্ত মনোহর তার সে রূপ। চালক রাখাল বেশে সজ্জিত, হাতে বাঁশী, বিভিন্ন অলংকারে তিনি সজ্জিত। তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি অক্ষয়, তিনি পরমাত্মা বিধাতা পুরুষ। যার জ্ঞান, তপস্যা, ভক্তি ও সেবায় মহামায়া প্রকৃতি সর্ব শক্তির আধার পরমেশ্বরী হয়েছেন, যাঁর জ্ঞান ও সেবায় দেবী সাবিত্রী বেদমাতা, যার সেবা, তপস্যা ও জ্ঞানে দেবী সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাঁর সেবা ও তপস্যায় লক্ষ্মী বাণিজ্য ও শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি সমস্ত ঐশ্বর্য দান করে মহালক্ষ্মী দেবী রূপে বিখ্যাত হয়েছেন। যার সেবা ও তপস্যায় দুর্গাদেবী সকলের পূজনীয়, যাঁকে সবাই পুজো ও বন্দনা করে তিনি সর্বজ্ঞা ও দুর্গতিনাশিনী হয়ে সর্বেশ্বর শিবকে পতিরূপে পেয়েছেন। কৃষ্ণের সেবায় যিনি শ্রীকৃষ্ণের বাম অঙ্গ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, তিনি কৃষ্ণ প্রাণাধিকা দেবী রাধা।

পুরাকালে দিব্য হাজার যুগ ধরে তপস্যা করার ফলে রাধিকা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস শূন্য এবং চাঁদের অংশের মতো ক্ষীণ হয়ে পড়েছিলেন। এ দৃশ্য দেখে শ্রীকৃষ্ণের মনে দুঃখ জাগে। তিনি রাধিকাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দুর্লভ সেই বরদান করলেন হে দেবী, তুমি হও আমার প্রিয়া। আমার বক্ষ মাঝে তোমার স্থান হোক সর্বক্ষণ। তুমি হও আমার শ্রেষ্ঠ অভিলষিত। রমণীদের মধ্যে তুমি হবে সেরা। আমি সর্বদা তোমার বশে থাকব। হব তোমার আরাধ্য দেবতা। তুমি হবে আমার আরাধ্য দেবী।

দেবী দুর্গা দিব্য হাজার বছর ধরে হিমালয় পর্বতে তপস্যা করে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেছেন। তিনি সকলের পুজো পেয়ে থাকেন। গন্ধমাদন পাহাড় দিব্য লক্ষ বছর তপস্যার ফলে দেবী সরস্বতী সুকলের পুজো পেয়েছেন। দিব্য ষাট বছর হিমালয় পর্বতে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করে দেবী সাবিত্রী ব্রাহ্মণদের ইষ্টদেবীতে পরিণত হয়েছেন। বিষ্ণু একশো মন্বন্তর কাল ধরে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করে সিদ্ধি লাভ করেছেন। তিনি হলেন জগতের রক্ষাকর্তা, এইভাবে সমস্ত দেব এবং দেবীরা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বন্দনা ও ধ্যান করে পূজনীয়া হয়েছেন।

.

অষ্টম অধ্যায়

সুতপুত্র বললেন–হে শৌনক, সমস্ত কাজের যিনি মঙ্গল করেন, যিনি বাধা বিপত্তি নাশ করেন, যিনি পুণ্যের কলস পূর্ণ হতে সাহায্য করেন, যিনি পাপের মৃত্যু ঘটান, সেই বসুধার অদ্ভুত জন্ম বৃত্তান্ত শুনুন। এই কাহিনি স্বয়ং নারায়ণ ব্রহ্মপুত্র মহর্ষি নারদকে শুনিয়েছিলেন।

নারায়ণ বললেন–অনেকের অভিমত মধু কৈটভনামে এক অসুরের মেদের থেকে পৃথিবীর আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু কেউ কেউ বলে থাকেন, তেজস্বী বিষ্ণুর যুদ্ধ তৎপরতা দেখে মধু কৈটভ মুগ্ধ হন। পৃথিবী যেখানে ডুবে যায়নি, সেই রকম কোনো স্থানে তাদের বধ করার বাসনা পোষণ করলেন। অর্থাৎ মধু কৈটভ এই পৃথিবীর বুকে সেসময় বেঁচে ছিলেন। তাদের বধ করা হলে তাদের মেদ জমে জমে পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়। পৃথিবী আগে জলমগ্ন ও কৃশ ছিল। তাই তার অন্য নাম মেদিনী। অর্থাৎ পৃথিবী আগে ছিল জলপূর্ণ সেখানে শুধু মধু কৈটভের মেদ পড়ে জমা হয়েছে। তবে এসব মত একেবারেই যুক্তিসম্মত নয়। শ্রুতি প্রসিদ্ধ ও সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে তোমাকে আমি এখন বর্ণনা করছি। যা আমাকে পুষ্করতীর্থে ধর্মরাজ দান করেছিলেন।

বহুকাল জলের মধ্যে মগ্ন থাকার পর মহাবিরাটের শরীরে মল জন্মায়। সেই মল সারা শরীর হয়ে লোম কূপে আসে। অনেক কাল পরে সেই লোমকূপ থেকে পৃথিবীর সষ্টি হয়েছে। এইভাবে তার আবির্ভাব ঘটে। তিরোভাব কালে জলমগ্ন হয়। বিলীন হয়ে যায়। আবার তার আগমন ঘটে। এই পৃথিবীর যা কিছু সবেতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি দেবতারাও তাতে যুক্ত আছেন। এখানে অনেক সংখ্যক তীর্থস্থান আছে। নীচের সাতটি পাতাল এবং ওপরে আছে পৃথিবী, তার ওপরে ব্রহ্মলোক। তারও ওপরে আছে গোলোকধাম ও বৈকুণ্ঠধাম। এ

দুটিলোকে যা কিছু আছে, সবই অবিনশ্বর ও অকৃত্রিম। নিত্য বিশ্বের সাথে এই দুটিলোকের প্রভেদ আছে।

হে ব্রহ্মা! প্রাকৃতিক প্রলয়ে সব ধ্বংস হয়ে আবার সৃষ্টির সময়কাল এসে গেল। প্রথমে তিনি মহাবিরাটকে সৃষ্টি করলেন। বরাহ রূপে ক্ষিতির অধিশ্বরী দেবী পৃথিবীর সকলের কাছ থেকে পুজো পেয়েছিলেন। সেইসময় হিরণ্যক্ষে প্রভৃতি অসুরদের দ্বারা পৃথিবী তাড়িত হয়েছিল। ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করেন। শ্রীকৃষ্ণ বরাহ অবতার হয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। সমস্ত অসুরদের বধ করে পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। এবং সাগরে ভেসে থাকা পদ্মপাতার মতো জলে ভাসিয়ে ছিলেন, সেই স্থানেই সৃষ্টি হল সুন্দর এক বিশ্ব। পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী বরাহরূপী সেই ভগবান শ্রীহরিকে দেখে ভালোবাসা দান করতে উন্মুখ হলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁর প্রতি দুর্বল হলেন। নির্জনে তারা দিব্য একবছর রতিক্রিয়া উপভোগ করলেন। বছরের শেষে কামার্ত বিষ্ণু চেতনা ফিরে পেয়ে সকামা বসুন্ধরাকে পরিত্যাগ করলেন। তিনি আবার শূকররূপ ধারণ করলেন। তিনি সতী বসুন্ধরার স্তব করে তার পুজো করলেন। তারপর থেকে সকলের কাছে তিনি পুজো পেতে থাকলেন।

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বসুধা বরাহরূপ ধারণ করে পৃথিবীময় বেড়াতে লাগলেন। মুক্তো, শুক্তি, শিবলিঙ্গ, শিলা, শঙ্খ, প্রদীপ, রত্ন, যজ্ঞসূত্র, ফুল, বই, তুলসী, জপমালা, ফুলমালা, সোনা, কর্পূর চন্দন, শালগ্রাম শিলার স্নানের জল যে বসুন্ধরার ওপর নিক্ষেপ করে সে কালসূত্র নামক নরকে বাস করে, দিব্য একশো বছর তারা নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে।

এই সময় পৃথিবী থেকে তেজস্বী মঙ্গল গ্রহের জন্ম হল। কান্তশাখায় বর্ণিত দেবীর মন্ত্রোচ্চারণ করে শ্রীহরির আদেশে দেবতারা পৃথিবীর পুজো করলেন। এইভাবে বসুন্ধরা জগতে পূজনীয় হলেন। বরাহরূপী বিষ্ণুর পর পৃথিবী দেবীর পুজো করেছিলেন ব্রহ্মা। তারপর একে একে পৃত্থিরাজ, শ্রেষ্ঠ মুনি, মনু এবং সবশেষে মানুষ তার পুজো করেন।

স্বয়ং বরাহ রূপী শ্রীকৃষ্ণ 'ওঁ হ্রীং শ্রীং, বাং বসুধায়ৈ স্বাহা' মন্ত্রে বসুধারাকে বন্দনা করেছিলেন। তিনি তার গুণকীর্তন করেছেন এইভাবে –হে জয় স্বরূপ দেবী জয়া! তুমি জয়ের আধার, তুমি বিজয় দান কর, যজ্ঞকর বরাহের পত্নী। আমাকে বিজয়ী করো। হে দেবী! তুমি সমস্ত কিছুর আধার। সকল অভীষ্ট পূরণ করো। আমার মনোবাসনা পূর্ণ করো। তুমি রাজাদের ধনস্বরূপ, অহঙ্কার স্বরূপ। হে দেবী! তুমি শস্য ও ভূমি প্রদায়িনী। তুমি আমাকে ভূমি দান করো।

এই স্তব পাঠ করে যে পৃথিবী পুজো করে সে রাজা হয়, কোটি কোটি বছর ধরে রাজত্ব করে। এই স্তব পাঠ করলে ভূমি দানের সমান পুণ্য লাভ হয়। অম্বুবাচীর দিন মাটি খনন করলে ও অন্যের জমিতে শ্রাদ্ধকাজ করলে যে পাপ হয় এই স্তব পাঠের ফলে তার বিনাশ হয়। মাটিতে প্রদীপ রাখলে যে পাপ হয়, এই স্তব পাঠ করলে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান পুণ্য হয়।

.

নবম অধ্যায়

সৌতি বললেন– হে শৌনক! পৃথিবী অন্যান্য যে সব কারণে পাপ দেন এবং সেই পাপ থেকে উদ্ধার পাবার উপায়ের কথা আপনাকে এখন বলছি। নারদ এ প্রশ্ন নারায়ণের কাছে রেখেছিলেন। নারায়ণ যা বলেছিলেন, তাই অভিব্যক্ত করছি।

বেদাঙ্গ শ্রেষ্ঠ নারায়ণ বললেন–যে লোক শস্যপূর্ণ জমি ব্রাহ্মণকে দান করে, সে জমি ধুলিকণা পরিমিত বছর পর্যন্ত বিষ্ণু সঙ্গ লাভ করে। গ্রাম, ভূমি এবং ধান দান যে করে এবং যে গ্রহণ করে তারা দুজনেই পাপ থেকে মুক্তি পায় এবং বিষ্ণুপদে অবস্থান করে। নিজের দেওয়া বা পরের দান করা ব্রহ্মত্ব চুরি করলে কালসূত্র নামক নরকে বাস হয়। গরুর যাতায়াতের পথ বন্ধ করে জমিদান করলে কুম্ভীপাক নরকে গমন হয়। দিব্য শত বছর সে ওই নরকে যন্ত্রণা ভোগ করে। গরুর চারণভূমি এবং জলাশয় বুজিয়ে দিয়ে পথ ও শস্য দান করলে চৌদ্দজন ইন্দ্রের আয়ুষ্কাল পর্যন্ত অসিপত্র নরক বাস হয়। যে বোকালোক জমির মালিকের বাবাকে পিন্ড দেয় না, নিজের বাবাকে পিন্ডদান করে, সে অবশ্যই নরকে যাবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। মাটিতে শাঁখ রাখলে যে পাপ হয়, তার দোষে পরের জন্মে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়। মাটিতে সোনা, রূপা হীরে, মানিক্য রাখলে সাতজন্ম পরপর দরিদ্রতা ভোগ করে। জপমালা, ফুলের মালা, কর্পূর মাটিতে রাখার ফলে সেই পাপীকে নরকে যেতে হয়। যজ্ঞসূত্র ও বই মাটিতে রাখা ব্রহ্মহত্যা সমান পাপ। ভূমিকম্পের সময় এবং গ্রহণের সময় যে মাটি কোপায় সে মহাপাপী হয়। তাকে বিকলাঙ্গ হয়ে পরেরবারে জন্মাতে হয়।

যিনি সকলকে ধরে আছেন তিনি ধরা, ধরিত্রী ও ধরণী। হরির উরু থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি। তাই তিনি উর্বী। নানারকম যাগযজ্ঞের ক্রিয়ার আধার বলে এই দেবীর নাম ইজ্যা। খন্ড প্রলয় কালে ইনি ক্ষীণ হয়ে যান বলে তিনি ক্ষৌণী। মহাপ্রলয়কাল পৃথিবী ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাই তাকে ক্ষিতি নামেও ডাকা হয়। পৃথিবী হলেন কশ্যপের কন্যা কাশ্যপী। তিনি নড়চড়া করেন না, তাই

অচলা। বিশ্বকে ধারণ করে নাম নিয়েছেন, বিশ্বম্ভক। অনন্ত রূপ তাঁর তাই তিনি অনন্তা। মহারাজ পৃথুর কন্যা হিসাবে পৃথিবী এবং বিস্তৃত বলে পৃথ্বী নামে অভিহিত।

.

দশম অধ্যায়

নারদ বললেন–হে ভগবান! আমি আপনার কাছ থেকে অত্যন্ত মনোহর পৃথিবীর উপাখ্যান শ্রবণ করলাম। এখন আপনি সেই পুণ্যদানকারী, পাপনাশকারী সুরেশ্বরী গঙ্গার মর্ত্যে আগমনের কাহিনি বিবৃত করুন।

নারায়ণ বললেন–সূর্যবংশে জাত রাজ চক্রবর্তী রাজা সগরের দুই পত্নী শৈব্যা ও বৈদভী। রাজা সগর সত্য যুগে জন্মেছিলেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক ও ন্যায় পরায়ণ। সত্যকথা শুনতে বা বলতে ভালোবাসতেন। শৈব্যার গর্ভে অসমঞ্জ নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। অন্য স্ত্রী পুত্র কামনা করে ভগবান শিবের পুজো করেন। দীর্ঘ একশো বছর পর তিনি এক মাংস পিন্ডের জন্ম দেন। তা দেখে বৈদভী কেঁদে উঠলেন। তখন সেখানে বিপ্রের বেশ ধরে স্বয়ং শিব এসে হাজির হলেন। তিনি ওই মাংসপিন্ডটিকে ষাটটি টুকরো করলেন। এক একটি টুকরো থেকে মহা পরাক্রমশালী পুত্রের জন্ম হল। কপিল মুনির কোন্ দৃষ্টিতে পড়ে সগরের ষাট হাজার ছেলে ভস্মে পরিণত হল। ছেলেদের শোকে কাঁদতে কাঁদতে সগর রাজার মৃত্যু হল। তার পুত্র অসমঞ্জ তপস্যায় বসলেন। লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হলে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। তার পুত্র অংশুমান মর্তে গঙ্গাকে আনয়নের উদ্দেশ্যে তপস্যায় বসে লক্ষ বছর পর মারা গেলেন। তাঁর পুত্র দিলীপও গঙ্গা আনয়নে অকৃতকার্য হলেন।

দিলীপের পুত্র ভগীরথ। তিনি ছিলেন খাঁটি বৈষ্ণব। মহাপরাক্রমশালী অজেয় এবং অমর। একই উদ্দেশ্যে তিনিও তপস্যায় বসলেন। দিব্য চক্ষে বংশী বাদনরত কিশোর গোপীবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবতারা তার জপ করছেন। প্রসন্ন সেই রূপ, আগুনের মতো শুদ্ধ বস্ত্র পরিহিত, নানা রত্নে বিভূষিত।

রাজা ভগীরথ তাঁকে বারংবার প্রণাম নিবেদন করলেন। তার স্তুতিবন্দনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হলেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে তাঁর অভীষ্টমনোবাসনা পূরণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে গঙ্গাদেবী সেখানে এসে দাঁড়ালেন এবং ভগবানের বন্দনা করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন–হে সুরেশ্বরী গঙ্গে, সরস্বতীর অভিশাপ ফলপ্রসু করতে তোমাকে এখনই ভারতে যেতে হবে। তোমার পবিত্র বায়ু ও স্পর্শে সগরের ষাট হাজার পুত্রকে বাঁচিয়ে তোলো। তারা দিব্যদেহে রথে চড়ে আমার ভবনে ফিরে আসবে। তাঁরা তাদের কর্মফল ভোগ করবে ও চিরকাল নিরাময় রূপে পারিষদ হয়ে আমার কাছে থাকবে।

গঙ্গার স্পর্শ ও তার বায়ুর ছোঁয়ায় মানুষের কোটি জন্মের পাপের বিনাশ ঘটে। গঙ্গাজলে স্নান করে কতখানি পুণ্য হয়, তা বলা বেদেরও সম্ভব হয়নি। ব্রহ্মহত্যার মত পাপও গঙ্গাজলে ধুয়ে মুছে যায়। মাথা ডুবিয়ে গঙ্গাজলে স্নান করলে সংক্রান্তিতে তিরিশগুণ পুণ্য হয়। দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে গঙ্গায় অবগাহনে যে পুণ্য হয়, উত্তরায়ণে তার দশগুণ ফল পাওয়া যায়। যুগাদ্যা, মাঘীসপ্তমী, ভীমাষ্টমী, অশোকাষ্টমী, রামনবমী, দশহরা, দশমী, মহাবারুণীতে গঙ্গাস্নান অসংখ্য পুণ্যলাভের জন্ম দেয়। অর্ধোদয়যোগের গঙ্গাস্নান সূর্যগ্রহণে স্নানের থেকে শতগুণ বেশি পুণ্যবান।

বৈষ্ণব ছাড়া সকলেই গঙ্গাস্নান কালে সংকল্প করে থাকেন। হরিভক্তরা কেবল বিষ্ণুর প্রীতি লাভ করতে চায়। বেদের মত অনুসারে, গুরুর মুখ থেকে বিষ্ণুমন্ত্র শ্রবণ করলে শিষ্য হয় এবং বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুমন্ত্র জীবন্মুক্ত। সে বৈষ্ণবের পিতার কুলের উপরের দিকের একশো পুরুষ এবং মাতার কুলের একশো পুরুষ, নিজের সঙ্গে উদ্ধার পায়। বৈষ্ণবদের পা ধোয়া জল যেখানে পড়ে সেই স্থান

তীর্থস্থানের মত পবিত্র হয়। বৈষ্ণবরা বিষ্ণুকে অন্নজল নিবেদন করে নিজ আহারে নিযুক্ত হন, নতুবা। সেই অন্ন-জল বাহ্য-মূত্রের সমান হয়। বিষ্ণুর পা ধোয়া জল যে রোজ পান করে তার পায়ের স্পর্শে ত্রিভুবন পবিত্র হয়। যারা সন্তান, বিষয় আশয় সকলই বিষ্ণুকে উৎসর্গ করেন তারা বৈষ্ণবদের মধ্যে অগ্রগণ্য। যারা বিষ্ণুর গুণগানে আনন্দিত হন, চিত্তে পুলকিত হন, অশ্রুসিক্ত হন বিষ্ণুনামে তারাই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা থেকে চরাচর সকলই বিষ্ণু হতে সৃষ্ট। মহাপ্রলয়ের সময় অসংখ্য কোটি ব্রহ্মান্ড, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মিলিয়ে যান। একথা যারা জানেন ও মানেন তারাই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।

সুরেশ্বরী গঙ্গা জানতে চাইলেন হে নাথ, আপনার আদেশে, সরস্বতীর অভিশাপে এবং রাজেন্দ্র, ভগীরথের তপস্যাতে আমি নিশ্চয়ই মর্তে যাব। কিন্তু আমি পাপীদের পাপ গ্রহণ করে কিভাবে মুক্ত হব! আমাকে এভাবে কত সময় ধরে পৃথিবীর বুকে পড়ে থাকতে হবে? কবে আমি আবার আপনার চরণে ঠাঁই পাব! আমাকে বলুন। শ্রী কৃষ্ণ বললেন–হে দেবী, তুমি লক্ষ্মী স্বরূপা। আমারই অংশ স্বরূপ লবণাক্ত সমুদ্র হবে তোমার স্বামী। কলিযুগের পাঁচ হাজার কাল ব্যাপী তুমি নদীরূপে ভারতে অবস্থান করবে। তুমি নিজে রসিকা, তাই শ্রেষ্ঠ রসিক সমুদ্রের সঙ্গে তোমার রতিসুখ, সম্পন্ন করবে। তুমি মর্তবাসীদের কাছ থেকে পুজো পাবে। কৌথুমশাখায় বর্ণিত তোমার ধ্যানই তোমার পুজোর স্তব হবে।

প্রতিদিন যে গঙ্গাস্তব ও প্রণাম করে সে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফল লাভ করে। গঙ্গানামে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হাজার হাজার পাপীর পাপ গ্রহণ করে তুমি পূর্ণ হবে। আমার ভক্তের স্পর্শে সেই পাপ লীন হয়ে যাবে। যেখানে যেখানে আমার গুণকীর্তন করা হবে, সেখানে সেখানেই নিজের পাপ মোচনের জন্য সরস্বতী ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ নদীগুলির সঙ্গে তুমি যুক্ত থাকবে। সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে কেউ যদি হরিনাম নিয়ে তোমার জলে ডুবে মরে, তবে সে বৈকুণ্ঠধামে যাত্রা করবে। অন্য কোথাও কেউ তোমার নাম স্মরণ করে মারা গেলে, সে পাপ মুক্ত হয়ে যাবে। হরিনামের নৈবেদ্য দান করলে মানুষ সত্যিকারের মুক্তি লাভ করবে। জীবমুক্ত হয়ে যাবে ও স্বর্ণরথে চেপে মৃত্যুর পর গোলোকধামে যাত্রা করবে।

তারপর শ্রীহরির আদেশে রাজেন্দ্র ভগীরথ কৌথুমশাখায় বর্ণিত ধ্যানে গঙ্গাদেবীর পুজো করলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন।

নারায়ণ বললেন– হে নারদ! রাজা ভগীরথ কোন ধ্যান, স্তব ও বিধি মেনে গঙ্গাদেবীর পুজো করেছিলেন, এখন তবে তা বলছি। স্নান সেরে নিত্য ক্রিয়া শেষে শুদ্ধ কাপড়ে গণেশ, সূর্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব ও শিবা– এই ছয় দেবতার পুজো করতে হবে। জ্ঞান ও বুদ্ধি লাভের কামনা করে মানুষ শিব দূর্গার পুজো করে।

দেবী গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের দেহ থেকে তৈরি হয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠ সতী, শ্রীকৃষ্ণ তুল্য। তার গাত্র বর্ণ চাপা ফুলের মতো। তিনি পাপ নাশকারী। আগুন রঙা শুদ্ধ বস্ত্র পরিহিতা। মূল্যবান অলংকারে ভূষিতা। তাঁর দেহের জ্যোতি শরৎকালের একশ পূর্ণ চন্দ্রকেও হার মানায়। স্বল্প স্মিতহাসিনী, সুস্থিরা ও নিত্যযৌবনা। তার মাথায় মস্ত বড় খোঁপা, মালতী ফুলে সজ্জিতা। কপালে চন্দনের তিলক ও সিন্দুর বিন্দু। দুটি বাঁকানো চোখে বিদ্যুৎ দৃষ্টি। পদপদ্মে শোভিত

নূপুর ও আলতা রাঙা চরণ কমল যা মুমুক্ষুদের মুক্তি দান করে। কামীদের স্বর্গ ও ভোগ দেন। এই দেবী বরণীয় ও দয়াবতী। ইনি ভক্তদের কৃপা করেন।

যে মানুষ মঙ্গলময়ী ত্রিপথ গামিনী গঙ্গার ধ্যান করে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বুল, ঠান্ডাজল, কাপড়, অলংকার, মালা, সুগন্ধী, শয্যা ও আচমনীয় – এই ষোলো উপাচারে গঙ্গা পুজো করেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও পুন্য লাভ করেন।

নারদ বললেন– হে ভগবান, আপনি আমাকে বিষ্ণুপদী গঙ্গার পাপ নাশক ও পুন্যকরণ স্তোত্রের কথা বলুন। শ্রীনারায়ণ বললেন, শ্রীকৃষ্ণের ও রাধার অঙ্গ গলে যে গঙ্গার উৎপত্তি, আমি তাকে বন্দনা করি। আমি সেই গঙ্গা দেবী কে স্মরণ করি, যিনি পুণ্য রাধা মহোৎসবে গোপ গোপীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতে জন্মেছিলেন। আপনি লক্ষ্য যোজোন বিস্তৃত, দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ যোজোন দীর্ঘ এবং সমগ্র বৈকুণ্ঠধাম পরিবেষ্ঠিত হয়ে আছেন, আপনাকে প্রণাম জানাই। চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, তপোলোক, জনলোক পরিবেষ্টিত, গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম জানাই। হাজার যোজোন বিস্তৃত কৈলাস পর্বতকে যে গঙ্গাদেবী আবৃত করে আছেন, তাকে আমি প্রণাম জানাই। যিনি দশ যোজোন বিস্তৃত, ও একশ যোজন দীর্ঘ হয়ে ভোগবতী নামে প্রবাহিত সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম জানাই। একশো ক্রোশ ব্যাপী বিস্তৃত হয়ে অলকানন্দা নামে পরিচিত গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণাম জানাই। সত্যযুগে যিনি ক্ষীরবর্ণা, ক্রেতা যুগে যিনি চাঁদের মতো, দ্বাপরে চন্দনের মতো শুভ্র, সেই গঙ্গাকে আমি নমস্কার জানাই।

কলিযুগে আপনি ভারতের মাটিতে প্রবাহিনী রূপে বিরাজমান, আপনি পাপ বিনাশিনী, আপনি পুন্য দানকারী– আপনাকে প্রণাম জানাই। আপনার জলকণা স্পর্শে ব্রহ্মাহত্যার ন্যায় কোটি জন্মের পাপের বিনাশ ঘটে, আপনি সেই দেবী গঙ্গা, আপনাকে জানাই শত কোটি প্রণাম।

নারায়ণ বললেন–এইভাবে একুশটি শ্লোকে গঙ্গা দেবীর স্তোত্রকথা কৌধুমশাখায় বর্ণিত হয়েছে। এই সকল স্তব পুণ্য বীজস্বরূপ সকল পাপের বিনাশ ঘটায়। যে লোক নিত্য গঙ্গাদেবীর অর্চনা করে এবং ভক্তিভরে তার স্তব পাঠ করে, তার অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান পুণ্য লাভ হয়। এই স্তব পাঠের গুণে পুত্রহীন পুত্র পায়, স্ত্রীহীন স্ত্রী পায়, রোগী হয় সুস্থ সবল, মুখ পান্ডিত্য অর্জন করে, কীর্তিহীন কীর্তি লাভ করে। প্রাতঃকালে নিত্য গঙ্গাস্তব পাঠ নিত্য গঙ্গাস্নানের সমান সুফল দেয়।

ভগীরথের স্তব পাঠে গঙ্গাদেবী তুষ্ট হলেন। সগরের ছেলেরা যেখানে ভঙ্গ হয়ে পড়ে আছে, সেখানে গঙ্গা গেলেন। তার বায়ুর স্পর্শে সগরের আট হাজার পুত্র উদ্ধার পেলেন। তাদের আশ্রয় মিলল, বৈকুণ্ঠধামে। মর্ত্যে গঙ্গাদেবীকে এনেছিলেন ভগীরথ, তাই গঙ্গাদেবীর অপর নাম ভাগীরথী।

নারায়ণ বললেন–পুণ্যদায়ক ও মোক্ষদায়ক গঙ্গাদেবীর উপাখ্যান তোমাকে বললাম। শিবের সঙ্গীতে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও মহাপ্রকৃতি রাধাদেবী দ্রবীভূত হওয়ার পর কী ঘটনা ঘটেছিল তা এখন বর্ণনা করছি শোনো। –হে নারদ! কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতে গোলোকধামে মহা ধুমধামের সঙ্গে রাধা মহোৎসব পালিত হল। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে প্রথম পুজো করলেন। তখন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা রাধাকে পুজো নিবেদন করেন। সরস্বতী তার বীণার তারে ঝংকার তুললেন। শ্রীকৃষ্ণ শুরু করলেন কীর্তন। হরিগান শুনে ব্রহ্মা তুষ্ট হলে তিনি সরস্বতাঁকে শ্রেষ্ঠ রত্নের তৈরি হার ও মুকুট উপহার দেন। কৃষ্ণ কৌস্তভমনি, রাধা অমূল্য রত্ন নির্মিত হার, ভগবান নারায়ণ মনোহার বনমালা এবং লক্ষ্মী অমূল্য রত্নের মকারাকার কুন্ডল সরস্বতাঁকে উপহার দিলেন। দূর্গা দিলেন অত্যন্ত দুর্লভ ভক্তি, ধর্ম দিলেন ধর্ম, বুদ্ধি ও যশ। আগুনের মতো পট্টবস্ত্র, দান করলেন অগ্নিদেব। মণিনির্মিত নূপুর বায়ু তাঁকে দিলেন।

শিব ব্রহ্মার অনুরোধে গাইলেন রসোল্লাস মিশ্রিত শ্রীকৃষ্ণের গান। সেই গানে দেবতারা সম্মোহিত হলেন। দেবতারা সকলেই হলেন একেবারে স্থির মূর্তি। কিছুক্ষণ পর তাদের হুশ হ'ল। দেখলেন রাসমন্ডলের স্থলভাগ জলে পরিপূর্ণ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা হয়েছিলেন অন্তর্হিত। ধ্যানযোগে ব্রহ্মা জানতে পারলেন শিবগানের মহিমায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা দ্রবীভূত হয়েছেন। ব্রহ্মা, শিব ও সকল দেবতারা তখন শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে শুরু করলেন। হে বিভু! আপনি স্বমূর্তি ধারণ করুন। আমাদের অভীষ্ট পূরণ করুন।

হঠাৎ দৈববাণী শোনা গেল– আমি সকলের পরমাত্মা স্বরূপ। আর দেবী রাধা শক্তিস্বরূপিনী। তাই আমাদের শরীর ধারণ নিষ্প্রয়োজন। বৈষ্ণব, মনু, মুনি, মানব — সকলেই আমার মন্ত্র বলে পবিত্র হয়ে আমার ভবনে আসবে। হে দেবতারা তোমরা যদি আমার মূর্তি প্রত্যক্ষ করার জন্য উতলা হও, তাহলে অপেক্ষা কর। হে ব্রহ্মা, তুমি স্বয়ং বিধাতা। জগৎ গুরু শিব অতি মনোহর বেদাঙ্গ স্বরূপ শাস্ত্র রচনা করবেন। সেই শাস্ত্রে পুজোর বিধি, মন্ত্র, ধ্যান, স্তব, স্তোত্র, কবচ সব কিছুর কথা লেখা থাকবে। যা অভিলষিত বস্তু দান করবে। আমার মন্ত্র, কবচ, ধ্যান, তোমরা লাভ করবে। এই মন্ত্র অত্যন্ত দুর্লভ ও গোপনীয়। হাজার জনের মধ্যে একজন

এই মন্ত্রের উপাসক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে। সে আমার মন্ত্র উচ্চারণে পবিত্র হয়ে গোলোকধামে প্রবেশ করবে।

এই আকাশবাণী শ্রবণে ব্রহ্মা অত্যন্ত উল্লসিত হলেন। তার অনুরোধে শিব বেদাঙ্গ শাস্ত্র রচনা করতে স্বীকার করলেন। মহাদেব প্রতিজ্ঞা করলেন, বিষ্ণুমায়াদি ও মন্ত্র প্রভৃতি যুক্ত বেদসার উত্তম শাস্ত্র রচনা করে আমি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ও আমার কথা রাখব।

এই কথা শুনে গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হলেন। তিনি রাধাকে সঙ্গে নিয়ে দেবসভায় আবির্ভূত হলেন। দেবতারা আনন্দিত হলেন। রাধা ও কৃষ্ণের দেহ থেকে বিগলিত গঙ্গা গোলোকে উৎপন্ন হল। গঙ্গাদেবী সমগ্র গোলোকে ও ব্রহ্মান্ডে পূজিতা হলেন।

.

একাদশ অধ্যায়

সৌতি বললেন– হে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ! আপনার ইচ্ছা অনুসারে নারায়ণ সুরশ্রী গঙ্গার শাপমোচনের কথা শোনাবেন। নারায়ণ বললেন–কলিযুগের পাঁচ হাজার বছর শেষ হলে গঙ্গার অভিশাপ কেটে যাবে। তিনি বৈকুণ্ঠধামে ফিরে যাবেন। শ্রীহরির কাছে। গঙ্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী ছাড়াও অপর শ্রীহরির স্ত্রী তুলসীর কথাও বেদে বলা হয়েছে। তুলসী রাধাকৃষ্ণ স্বরূপা। ইনি অসামান্যা সুন্দরী। নানা অলংকারে ভূষিতা। মুখশ্রী যেন শরতের দুপুরে ফোঁটা পদ্ম। তিনি স্নিগ্ধ ও স্মিতহাসিনী। তার গায়ের রঙ যেন গলানো সোনা। কপালে অতি সুন্দর চন্দন ও সিঁদুর ফোঁটা। বন্দুক ফুলের মতো লাল দুটি ঠোঁট। দুটি বসনে তার দেহ আবৃত। শ্রীকৃষ্ণের রূপ সৌন্দর্য্যে তিনি আলোড়িত হলেন ও অপলক চোখে সেই রূপ সুধা পান করলেন। অতঃপর তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হলেন। সে সময়ে রাধিকা তার তিরিশ কোটি গোপিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। রাধিকার আঁখি পল্লব কোটি চন্দ্রের মতো, তার গলায় দুলছে অমূল্য রত্নহার। কটিবন্ধে পীত রঙের দুটি কাপড়। কপালে তার কস্তুরি বিন্দুযুক্ত গোলাকার চন্দন তিলক ও সিন্দুর ফোঁটা সুসজ্জিত। খোঁপায় পারিজাত ফুলের মালা। তিনি রাগে কুঁসছিলেন। তিনি এসে শ্রীকৃষ্ণের পাশে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করলেন। সখীরা সাদা চামর দিয়ে বাতাস করতে লাগল।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্তব করলেন। সভাস্থ সকলে তাঁর বন্দনা গাইলেন। গঙ্গা ভয়ে ভয়ে শ্রীরাধাকে, সম্ভাষণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গাকে অভয় দিলেন।

গঙ্গা কিছু সময় পর অপর এক রাধাকে দেখলেন। এ রাধা ব্রহ্মতেজে উদ্ভাসিতা নবযৌবনা শান্ত। ও কোমল। ইনি অনন্ত স্বরূপা, আদি ও অন্তহীন প্রকৃতি। তিনি কৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, প্রাণাধিকা প্রিয়া। এই রাধা নিত্যা মাননীয়া এবং ধন্যা, এই রাধার রূপ সৌন্দর্য দেখে যেন গঙ্গার আশা মিটছে না। তিনি অপলক চোখে রাধার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শান্ত বিনয়ী রাধা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বললেন–হে প্রাণনাথ, এই নারীর পরিচয় কি? ও যেভাবে তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তাতে পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এই নারী তোমার প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়েছে। তাই বারবার কাপড়ের আড়ালে মুখ ঢাকছে। তুমিও ওকে দেখে মুচকি হাসছ! কিন্তু আমি থাকতে তোমার এই রকম দুবৃত্তাচরণ কিছুতেই সহ্য করব না। নারীর মন নরম হয়। আমিও এর

একদিন তুমি চন্দনবনে বিরজার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলে। আমার সাড়া পাওয়া মাত্র, তুমি সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলে। আর বিরজা নদী রূপ ধারণ করে। তোমার হাহাকার শুনে বিরজা স্বমূর্তি ধারণ করে। তোমরা পুনরায় মিলিত হও। তোমার বীর্যে বিরজার গর্ভে সাত সাগরের সৃষ্টি হল। আজও বিরজা কোটি যোজন বিস্তৃত ও চার যোজন দীর্ঘ নদী হয়ে বয়ে চলেছে।

আরও একদিন চন্দন বনে তুমি শোভা নামে এক গোপিনীর সঙ্গে দেহ সম্ভোগে লিপ্ত হও। আমার উপস্থিতিতে তুমি অদৃশ্য হও। আর শোভা প্রাণ ত্যাগ করে চন্দ্রমন্ডলে চলে যায়। তার দেহরূপের স্নিগ্ধতা তেজে পরিণত হল। তোমারই কৃপায় সেই তেজ পাকা ফল, রত্ন, সোনা, চন্দন, নতুন পাতা, শষ্য, উত্তম বস্ত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়ে বিলীন হয়ে গেল।

একদিন বৃন্দাবনে গোপিনীর সঙ্গে তোমাকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখেছিলাম। এরপর তুমি অদৃশ্য হলে প্রভা প্রাণ ত্যাগ করে সূর্যমণ্ডলে গমন করেছিলো। প্রভার তেজ তুমি বক্ষে ধারণ করে আগুন, রাজা, মানব, মুনি, দস্যু, সাপ, দেবতা, তপস্বী, ভাগ্যবতী নারী, কীর্তিমান পুরুষের মধ্যে বিলিয়ে দিলে। সকলেই তোমার দান গ্রহণ করে শক্তিশালী হয়ে উঠল।

এরপর রাসমন্ডলে শান্তি গোপিনীর সাথে তোমাকে প্রেমালাপে মগ্ন থাকতে দেখেছি। তুমি ফুলের শয্যায় শায়িত। পুষ্প অলংকারে সজ্জিত তুমি! রত্ন অলংকারে ভূষিতা ওই গোপিনীর

সাথে সোনার মন্দিরে বিহার করছিলে। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে তুমি অদৃশ্য হলে। শান্তি দেহত্যাগ করে তোমার সঙ্গে মিশে গেল। তুমি তার দেহ থেকে লব্ধ শ্রেষ্ঠ গুণ গুলির কিছু কিছু বিষ্ণু, লক্ষ্মী, বৈষ্ণব, তপস্বী, ধার্মিক ও ভক্তদের মধ্যে ভাগ করে দিলে।

আর একদিনের কথা। কন্যার সঙ্গে সঙ্গম সুখে তৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আমি তোমাদের ঘুম ভাঙাই। রাগে তোমার ভূষণ, বাঁশি কেড়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু সখিদের অনুরোধে আর প্রেমের বশে আবার সেগুলি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। লজ্জায় তুমি মুখ লুকিয়েছিলে। ক্ষমা দেহত্যাগ করলে তার দেহের গুণ গুলি তুমি বিলিয়ে দিলে বিষ্ণু, বৈষ্ণব, ধার্মিক, দুর্বল তপস্বী, ও দেবতাদের মধ্যে।

রাগে রাধা ফুসছিলেন। গঙ্গার মাথা লজ্জায় অবনত হল। রাধা তাঁকে কিছু বলতে যাবেন, এমন সময় গঙ্গা সিদ্ধ যোগে তা বুঝে ফেললেন ও দেবসভা ছেড়ে জলের মধ্যে মিশে গেলেন। রাধাও নাছোড়। যোগ বলে তিনিও সব জেনে ফেলে এখান সেখান থেকে গঙ্গার জল গন্ডুষ ভরে পান করলেন। গঙ্গা যোগবলে তা জানতে পেরে শ্রীকৃষ্ণের পদকমলে আশ্রয় নিয়ে লীন হয়ে গেলেন। রাধা গোলোক, বৈকুণ্ঠ ধাম, ব্রহ্মলোক সর্বত্র গঙ্গাকে খুঁজে বেড়ালেন, কিন্তু দেখা পেলেন না।

এদিকে জল সঙ্কট দেখা দিল। রাধা জল পান করেছেন। সব জায়গা শুকিয়ে কাঠ। জীবজন্তু, গাছপালা সব একে একে জলাভাবে মরতে শুরু করল। দেবতাদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল। ব্রহ্মা শিব বিষ্ণু সকল দেবতা যোগী, তপশী সকলে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ নিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যিনি সকলের প্রভু, প্রকৃতি থেকে আলাদা। যিনি নির্লিপ্ত, নিরাশ্রয়, নির্গুণ, নিরুৎসাহ, নিরঞ্জন। যিনি সাকার, স্বেচ্ছাধীন, ভক্তবৎসল, অশ্রুসজল, শক্তিময় রূপ সনাতন। দেবতারা ভগবান শ্রীহরির স্তব করলেন। তারা প্রত্যক্ষ করলেন রত্ন খচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট সেই মনোহরা রূপময় জ্যোতির্ময় শ্রীকৃষ্ণ। গোপরা তাকে চামর দিয়ে বাতাস সেবন করছে। গোপিনীরা তাকে পরিবেষ্টন করে আছেন। নৃত্য প্রদর্শন করছেন। সেই মূর্তি কিশোর, আর শ্যামবর্ণের। পরণে তার পীত বস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ যেন এক বারো বছরের বালক। গোপাল রূপ ধারণ করেছেন। প্রভু যেন নিজের প্রভায় সমুজ্জ্বল গোপীরা তার রূপসুধা পান করছেন। রাধিকা তার বুকে প্রাণাধিক প্রিয়া হয়ে শোভা পাচ্ছেন। রাসমন্ডলের সর্বত্র দেবতারা এই দৃশ্যই প্রত্যক্ষ করলেন।

সকলে আনন্দে মেতে উঠলেন। দেবতারা ঠিক করলেন, ব্রহ্মা পরমাত্মার সঙ্গে কথা বলবেন। ব্রহ্মা এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণের দুপাশে দাঁড়িয়ে আছেন বিষ্ণু। শিব দুটি আসনে বসে আছেন। রাসমন্ডলের সর্বত্র কৃষ্ণময়। সবাই সমান বেশ ধারণ করেছেন। সকলের পোশাক, অলংকার, গুণ, তেজ বয়স, কার্য, কীর্তি, যশ সবই একরকম, কোনো প্রভেদ নেই। এর মধ্য থেকে প্রভুকে খুঁজে বের করা কঠিন। কখনও কৃষ্ণ রাধার রূপ ধরছেন, কখনও রাধা কৃষ্ণ হয়ে যাচ্ছেন।

ব্রহ্মা পড়লেন ধাঁধায়। তিনি মনকে ধ্যানস্থ করে হৃৎকমলের শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিভরে ধ্যান করলেন। নিজের অপরাধের জন্য দোষ স্বীকার করে নিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তিনি চোখ মেললেন। দেখলেন রাধার বুকে শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ পরিব্যপ্ত হয়ে আছেন সহচর ও গোপীদের দ্বারা। সকল দেবতা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। কৃষ্ণের স্তব পাঠ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সকল দেবতাদের মনের কথা বুঝতে পারলেন। বললেন–আমি জানি কেন আপনারা সকলে মিলে আমার কাছে এসেছেন। রাধার ভয়ে ভীত হয়ে গঙ্গা আমার চরণ কমলে স্থান নিয়েছে। কিন্তু আপনারা যদি অভয় দেন তবে গঙ্গাকে আমি সম্মুখে আনতে পারি।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে সকল দেবতাগণ রাধার স্তব করতে শুরু করলেন। পরম ভক্তিতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা রাধার স্তুতি বন্দনা করলেন। তারপর ব্রহ্মা বললেন–রাসমন্ডলের যথোৎসবে শিব সংগীত আপনাকে ও শ্রীকৃষ্ণকে এতই মুগ্ধ করে যে, আপনারা গলে জল হয়ে যান। আর সেই জলস্রোতই হ'ল গঙ্গা। তাই গঙ্গা আপনার দুহিতা তুল্য। সে আপনার মন্ত্র পাঠ করে আপনাকে পুজো করবে ও চার হাত বিশিষ্ট নারায়ণের পত্নী হবে। বৈকুণ্ঠ হবে তার বাসস্থান। অতঃপর গঙ্গা অংশ স্বরূপ হয়ে মর্তে অবতীর্ণ হলে, তখন সে হবে লবণ সমুদ্রের পত্নী। হে দেবী, জগদম্বিকা! আপনিই যেই দেবী যিনি বিস্তৃত জায়গা জুড়ে গোলোকে অবস্থান করছেন। গঙ্গা কেবল আপনার দেহ জাত, আপনার অংশেই যার জন্ম। আপনার কন্যা।

ব্রহ্মার কথা শুনে রাধা সন্তুষ্ট হলেন। রাধার শান্ত ও স্মিত হাস্যে পরিবেশ সহজ হয়ে উঠল। শ্রীকৃষ্ণের পায়ের বুড়ো আঙুলের নখের ডগা থেকে বেরিয়ে এল গঙ্গা। জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গঙ্গা শান্ত ভাবে জল ছেড়ে উঠে এলেন। ব্রহ্মা নিজের কমন্ডলুতে কিছুটা জল ধরে রাখলেন। শিব, তার জটায় কিছুটা জল ধারণ করলেন। গঙ্গা লাভ করলেন রাধামন্ত্র ও রাধার স্তব ধ্যান করা পূজোর বিধি অনুসরণ করে রাধার স্তব করলেন। তারপর ফিরে গেলেন নিজের

জায়গায়। এইভাবে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা এবং বিশ্বপাবনী তুলসী এই চার কন্যাই হলেন নারায়ণের পত্নী।

শ্রীকৃষ্ণ এবার উপস্থিত দেবতাদের দুর্বোধ কালের কাহিনী শোনালেন। বললেন– হে ব্রহ্মা, হে শিব, হে বিষ্ণু, হে দেবতাগণ, মুনি, তপস্বীগণ যাঁরাই আমার স্মরণ নিয়েছেন, তারাই আমার কাছে ঠাঁই পেয়েছেন। কিন্তু এখন কালচক্রের নিয়মানুসারে প্রকৃত প্রলয় শুরু হতে চলেছে। সমস্ত বিশ্ব জলে ডুবে যাবে। সকল দেবতারা পতনের ভয়ে আমার মধ্যে লীন হয়ে যাবে। হে পদ্মযোনি ব্রহ্মা, গঙ্গার পথ রুদ্ধ করো। বৈকুণ্ঠ ছাড়া অন্যান্য সব লোকই জল প্লাবিত হয়ে গেছে। হে ব্রহ্মা, আপনি নিজ জায়গায় ফিরে যান। সৃষ্টির কাজ শুরু করুন। ব্রহ্মলোক সমেত এক একটি স্বতন্ত্র বিশ্ব সৃষ্টি হবে। ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি হলে আমিও নিজ কার্যে ব্রতী হব।

শ্রীকৃষ্ণ সভাস্থল ত্যাগ করলেন। দেবতারা ফিরে গেলেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে। শুরু হল সৃষ্টির কাজ। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আদেশে গঙ্গাকে পূর্বের দেহ ধারণ করেই প্রবাহিত হতে হল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বৈকুণ্ঠ, গোলোক, শিবলোক ও ব্রহ্মলোক জুড়ে অবস্থান করতে থাকলেন। শ্রী বিষ্ণুর পাদপদ্ম থেকে গঙ্গার জন্ম হয়েছে বলে, গঙ্গার অপর নাম বিষ্ণুপদী। নারায়ণ বললেন–হে দেবর্ষি নারদ, এই হল মোক্ষ ও সুখ প্রদায়িনী গঙ্গার বৃত্তান্ত, বলো, আর কিছু জানতে চাও।

.

দ্বাদশ অধ্যায়

নারদ জানতে চাইলেন, "গঙ্গা বৈকুণ্ঠে যাত্রা করলে ব্রহ্মাও তার সঙ্গে গেলেন। তারা জগতের প্রভু বিষ্ণুর পাদপদ্ম বন্দনা করে প্রণাম জানালেন। গঙ্গার প্রশস্তি করে ব্রহ্মা বললেন, হে প্রভু শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের অবগলিত জলে এই গঙ্গার উৎপত্তি। এই গঙ্গা শান্ত, নবযৌবনা, ক্রোধ ও অহংকার শূন্য। ইনি শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপা। গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণকেই পতি রূপে বরণ করতে চাইছেন। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ থেকেই তার উৎপত্তি। কিন্তু শ্রীরাধা তাতে বাদ সাধছেন। মহা তেজস্বিনী রাধা গঙ্গাকে গন্ডুষে পান করতে চাইলে গঙ্গা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আশ্রয় নেন। ফলতঃ সমগ্র গোলোক ও ত্রিভুবন জলশূন্য হয়ে পড়ে। অতঃপর দেবতাদের অনুরোধে ও শ্রীরাধার কৃপায় শ্রীকৃষ্ণ তার পাদপদ্ম থেকে গঙ্গাকে মুক্তি দেন। আমি গঙ্গাকে তখন রাধামন্ত্র দান করি। গোলোক ধাম থেকে তাকে নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। হে প্রভু, আপনি এই রসিকা সুরেশ্বরী গঙ্গাকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করুণ। সমস্ত দেবতা এবং পুরুষের মধ্যে আপনি রত্ন স্বরূপ আর এই গঙ্গাও স্ত্রীরত্ন স্বরূপ, আপনারা সুখী হবেন। যে পুরুষ এই কন্যাকে বিবাহ

না করে অহংকার বশতঃ দূরে সরিয়ে দেন, সে পুরুষ মহালক্ষ্মীর কোপে পড়বে। পন্ডিতেরা জানেন প্রকৃতিই সমগ্র পুরুষের সৃষ্টি দাতা। নারী সেই মাতা প্রকৃতিরই অংশ। তাই নারী মাতা প্রকৃতির অংশ স্বরূপা। আপনি এমত নারীকে অবহেলা করবেন না। তিনি আরও বললেন— হে ভগবান! পরমাত্মার দুই ভাগের বাম অঙ্গ দুই হাত বিশিষ্ট কৃষ্ণরূপ ধারণ করে আর ডান অঙ্গ চার হাত বিশিষ্ট শ্রীবিষ্ণুর রূপ ধারণ করে। তার বামদিক থেকে রাধা ও কমলার উৎপত্তি। সেইরকম ডান দিক থেকে গঙ্গার আবির্ভাব। আপনিই গঙ্গার জন্মদাতা। সুতরাং গঙ্গা আপনাকে পতিরূপে গ্রহণ করতে চায়।

গঙ্গাকে শ্রীবিষ্ণুর হাতে সমর্পণ করে এরপর ব্রহ্মা ফিরে আসেন। বিষ্ণু গঙ্গাকে গান্ধবর্মতে মন্দিরে বিবাহ করে ভার্যারূপে গ্রহণ করেন। ফুল সজ্জিত চন্দন চর্চিত শয্যায় তাঁরা রতিসুখে প্রবৃত্ত হলেন।

'গাং' শব্দের অর্থ স্বর্গ। নির্দিষ্ট কাল মর্ত্যে যাপন করে তিনি আবার স্বর্গে ফিরে গিয়েছিলেন, তাই তিনি গঙ্গা। বিষ্ণুর পা থেকে উৎপত্তি বলে তার অপর নাম বিষ্ণুপদী। বিষ্ণুর সঙ্গে রতিসুখে মিলিত হবার পর গঙ্গা সুখ শিহরণে মূচ্ছা গেলেন। এমতাবস্থায় গঙ্গার সতীন লক্ষ্মীদেবী ঈর্ষান্বিতা না হলেও অপর সতীন দেবী সরস্বতী তা মেনে নিতে পারলেন না। নারায়ণ পরে তুলসীকেও বিবাহ করেন। ফলে তাঁর পত্নীর সংখ্যা হয় চার লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা ও পতিত পাবনী তুলসী।

.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সৌতি বললেন–হে শৌনক, এবার আপনাকে সতী তুলসীর উপাখ্যান বলছি। নারদের অনুরোধে নারায়ণ এই উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন।

বিষ্ণু অংশ হতে এক মনু উৎপন্ন হন। নাম তার দক্ষ সাবর্ণি। তিনি বিষ্ণুভক্ত, পবিত্র, যশস্বী, কীর্তিমান ও পুণ্যবান। তাঁর পুত্র ধর্মসাবর্ণিও বিষ্ণুর উপাসক ও ধার্মিক ছিলেন। তাঁর পুত্র বিষ্ণু সাবর্ণি, তাঁর পুত্র দেব সাবর্ণি ও তার পুত্র রাজ সাবর্ণি — এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক ও ধার্মিক। রাজ সাবর্ণির পুত্রের নাম বৃষধ্বজ। তিনি ছিলেন ভগবান শিবের অনুগামী। মহাদেব বৃষধ্বজকে নিজের পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন। তাঁর কাছে মহাদেব দিব্য তিন যুগ কাটিয়েছিলেন।

রাজা বৃষধ্বজ ভগবান শিবের প্রতি ছিলেন অন্ধবিশ্বাসী। তার আদেশে রাজ্যে অন্যান্য দেবদেবীর পুজো বন্ধ করা হ'ল। ভাদ্রে লক্ষ্মী, মাঘে সরস্বতী পুজো সব বন্ধ হ'ল। বিষ্ণুর নিন্দায় তিনি মুখর হয়ে উঠলেন। দেবতারা তার প্রতি রুষ্ট হলেন। কিন্তু শিবউপাসক বলে দেবতাদের শাপশাপান্ত থেকে তিনি মুক্তি পেলেন। সূর্যদেব কিন্তু এ অপমান সহ্য করলেন না। তিনি রাগতঃ হলেন ও বৃষধ্বজকে অভিশাপ দিলেন–তুমি শ্রীহীন হও। শিব তখন ত্রিশুল উঁচিয়ে সূর্যদেব কে আক্রমণ করে বসলেন। ভীত সূর্য তখন পিতা কশ্যাপকে সব কথা জানালেন। পিতা পুত্র উভয়েই ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ক্রুদ্ধ শিব ত্রিশূল হাতে তাদের পিছু পিছু এলেন ব্রহ্মলোকে। শিবের তখন রণংদেহি মূর্তি। ব্রহ্মা, সূর্য ও কশ্যপ ভয়ে কাঁপতে থাকলেন। তারা অতঃপর বৈকুণ্ঠধামে শ্রীনারায়ণের কাছে এলেন। নারায়ণের স্তব করে প্রণাম জানালেন এবং আগমনের কারণ ব্যক্ত করলেন।

নারায়ণ তাঁদের অভয় দান করে বললেন– হে দেবতাগণ তোমরা শান্ত হও। আমার দ্বারাই জগৎ পালিত হয়। আমি একাধারে ব্রহ্মার রূপ ধরে সৃষ্টি করি আবার শিবের রূপ ধরে সংহার করি। বিপদে পড়ে যে আমার স্মরণ নেয়, আমি সুদর্শন চক্র নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হই। ভক্তকে আমি বিপদমুক্ত করি। তোমরা ভয় দূর করো। আমি তোমাদের বর দান করলাম। আজ থেকে মহাদেব তোমাদের আর ভয় দেখাবে না।

হে ব্রহ্মা! শিব হলেন শঙ্কর, আশুতোষ। তিনি সৎ লোকের মঙ্গল করেন। তিনি ভক্তের ঈশ্বর। শিব এই সুদর্শনচক্রের মত আমার কাছে প্রিয়। সে সারাক্ষণ আমার ধ্যান নাম ও গুণ কীর্তন করে। আমিও শিবের মঙ্গল চিন্তায় ব্যস্ত থাকি। কল্যাণের অধিষ্ঠাতা শিবকে জ্ঞানী লোকেরা পুজো করে থাকেন।

ঠিক এ সময়ে শিব সভাস্থলে এসে হাজির হলেন। তার চোখ দুটি রাগে রক্তজবা হয়ে আছে। বৃষের পিঠ থেকে শিব নেমে এলেন। অবনত মস্তকে নারায়ণকে প্রণাম জানালেন।

নারায়ণ রত্নসিংহাসনে বসে আছেন। নতুন মেঘের শ্যামবর্ণ তার গায়ের রঙ। মাথায় কিরীট, হাতে চক্র। গলায় বুনোফুলের মালা! সহচরেরা তার সেবা করছে। চামর দুলিয়ে বাতাস দিচ্ছে।

হে নারদ! পীতবস্ত্র পরিহিত চন্দন চর্চিত সেই দেবতা তখন লক্ষ্মীর দেওয়া তাম্বুল খাচ্ছিলেন। আর নৃত্য গীত উপভোগ করছিলেন।

শিব নারায়ণের পরে ব্রহ্মাকেও প্রণাম জানালেন। সূর্য ভীত চিত্তে শিবকে প্রণাম জানালেন। কশ্যপ শিবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করলেন। তার স্তব করে তাকে নমস্কার করলেন।

সর্বেশ্বর নারায়ণের আদেশে শিব এক উত্তম আসনে উপবেশন করলেন। শ্রী বিষ্ণুর পারিষদবর্গেরা তাঁকে চামর দুলিয়ে বাতাস দিতে লাগল। শিব শান্ত হলেন। প্রসন্ন হলেন। পঞ্চমুখে। শিব নারায়ণের স্তব গান শুরু করলেন।

নারায়ণ শিবমুখে নিজ প্রশংসা শুনে অতীব তুষ্ট হলেন। তিনি অমৃততুল্য মধুর ভাষায় বললেন–হে শিব! তোমার কল্যাণের কথা জানতে চাওয়া মুখামি, কারণ তুমি নিজেই মঙ্গলময়। যে নিজে সমস্ত তপস্যার ফল দান করে, তার কাছে তার তপস্যার কথা জানতে চাওয়া নিরর্থক। যে নিজে জ্ঞান দান করে, তার কাছে তার জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাও বৃথা। তোমার নিশ্চয় কোনো বিপদ হয় নি, কারণ তুমি নিজেই মৃত্যুঞ্জয়ী। সুতরাং, কুশল জিজ্ঞাসা না করেই জানতে চাইছি। কেন এমন হন্তদন্ত হয়ে তুমি এখানে ছুটে এসেছ!

শ্রীমহাদেব বললেন, হে ভগবান! আপনি তো সর্বজ্ঞ। আপনার কাছে কিছুই অজানা থাকবার কথা নয়। আমি যাকে প্রাণের থেকেও বেশি ভালোবাসি আমার অন্ধ উপাসক বৃষধ্বজকে সূর্য অভিশাপ দিয়েছে। পুত্রকে অভিশাপ দিলে কোন পিতা স্থির থাকতে পারে বলুন। তাই সূর্যকে বধ করার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। সূর্য তার বাবা কাশ্যপের শরণাপন্ন হয়। কাশ্যপ ও সূর্য যান ব্রহ্মার কাছে। এখন সকলে মিলে আপনার আশ্রয়ে এসেছে। আপনার শরণাগতরা নিরাপদ ও নিঃশঙ্ক হয়। কিন্তু সূর্যের অভিশাপে শ্রীহীন বৃষধ্বজের কথা একবার চিন্তা করুন।

শ্রী ভগবান বললেন–শিব, তুমি আর দেরি না করে শীঘ্র রাজবাড়ি চলে যাও। বৈকুণ্ঠের অর্ধ ঘটিকা সময়েই একুশটি দিব্য যুগ অতিক্রম কালে বৃষধ্বজের মৃত্যু হয়েছে। তার ছেলে পুংসধ্বজও শ্রীহীন অবস্থায় মারা গেছে। তার দুই ছেলে ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ পরম বৈষ্ণব হওয়ায় প্রাণে বেঁচে গেছে। কিন্তু তারাও শ্রীহীন ও রাজ্যহীন হয়ে পড়েছে। এ অবস্থাতেও তারা তপস্যায় রত রয়েছে। লক্ষ্মী অচিরেই তার অংশে তাদের স্ত্রীদের গর্ভে জন্ম নেবে। ফলতঃ তারা তাদের হৃত শ্রী ও রাজ্য পুনরায় ফিরে পাবে। শিব তুমি আর, দেরি কর না। এই বলে ভগবান নারায়ণ লক্ষ্মীকে নিয়ে অন্তর্ধান হলেন।

.

চতুর্দশ অধ্যায়

নারায়ণ বললেন–ধর্মধ্বজ ও কুশধ্বজ লক্ষ্মীদেবীর কঠিন তপস্যা করে তাদের হৃতরাজ্য ফিরে পেলেন। সন্তান ও ধনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল তাদের সংসার। কুশধ্বজের শ্রী সতী মালাবতী যথাসময়ে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন। সে কন্যা লক্ষ্মী দেবীর অংশ স্বরূপা। সে কন্যা ছিল উত্তম জ্ঞান স্বরূপা। আতুর ঘরেই তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। মনীষীরা-তার নাম রাখলেন বেদবতী। তপস্যা করার জন্য সে নির্জন অরণ্যে প্রবেশ করল। তাকে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু সে ছিল নারায়ণ পরায়ণা, সকলের কথা অগ্রাহ্য করে সে দীর্ঘকাল পুষ্কর তীর্থে তপস্যায় রত ছিলেন। তপস্যার ফলে তার শরীর ক্ষীণ হল না। উপরন্তু সে হল নবযৌবনা। তার উদ্দেশ্যে আকাশ থেকে দৈববাণী ভেসে এলহে সুন্দরী! আগামী জন্মে তুমি শ্রীহরির পত্নী হবে।

একথা শুনে বেদবতী রেগে গেলেন। তিনি গন্ধমাদন পর্বতে বসে গভীর তপস্যা শুরু করলেন। সেখানে একদিন দুর্নিবার রাবণ এসে উপস্থিত হলেন। বেদবতী অতিথি ভেবে তাকে বসতে বললেন। সুমিষ্ট ফল ও ঠান্ডা জল দিয়ে অতিথির সেবা করলেন। পাপিষ্ঠ রাবণ বেদবতীর প্রতি কামাসিক্ত হয়ে পড়ল। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে সে বেদবতীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সতী বেদবতী তার দিকে কোপ দৃষ্টিতে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে রাবণ এক জড়জীবে পরিণত হল।

বেদবতী অভিশাপ দিয়ে বলল–আমার কোপে তোমার বংশে বাতি দেওয়ার কেউ থাকবে না। তোমার মত পাপিষ্ঠ কামাতুর পুরুষ আমার দেহ স্পর্শ করেছে। এ দেহ আমি বিসর্জন দেব।

রাবণ তার ভুল বুঝতে পারলেন। মনে মনে বেদবতাঁকে বন্দনা করলেন। বেদবতী তুষ্ট হলেন। বেদবতীর দয়ায় রাবণ আবার সচল হলেন। তারপর যোগসিদ্ধ বেদবতী দেহ ছেড়ে চলে গেলেন। রাবণ তাকে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করলেন।

এই সতী বেদবতীই পরজন্মে জনক রাজার কন্যা হয়ে জন্মেছিলেন। যার নাম ছিল সীতা। পূর্বজন্মের তপস্যার ফল তিনি পরজন্মে পেয়েছিলেন। পরিপূর্ণতম হরি শ্রীরামকে তিনি স্বামী রূপে লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন জাতিস্মর। তাই পূর্বজন্মের সকল প্রেম তার মনে পড়ে গেল। শ্রীরামের স্ত্রী হয়ে পরজন্মে তিনি নানান বৈভবে সময় কাটাতে লাগলেন। শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন পরম গুণবান, রসিক, শান্ত, মনোহর রূপের অধিকারী, স্ত্রীর প্রতি তার প্রেম ছিল একনিষ্ঠ। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্রকে বনবাসী হতে হল। সঙ্গে গেলেন স্ত্রী সীতা ও ছোটো ভাই লক্ষ্মণ। সেই সময়ে তারা সমুদ্রতীরে পর্ণকুটিরে বাস করতেন। একদিন অগ্নিদেব

ব্রাহ্মণের রূপ ধরে শ্রীরামচন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়ান। দুঃখিত রামচন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি মর্মাহত হলেন। রামকে তিনি সত্য ও প্রিয় কথা শোনালেন।

অগ্নিদেব বললেন–হে ভগবান! কাল তার নিজস্ব পথে এগিয়ে যাবে। সেই কালের কাছে কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। আপনিও পারবেন না। এতে দুঃখ বা শোকের কিছু নেই। সীতা হরণের সময় আগত। তাই আমার অনুরোধ সীতা মাকে আপনি আমার আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিন। আর মায়া সীতাকে নিয়ে আপনি থাকুন। অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে সীতা আবার আপনার কাছে ফিরে আসবে।

অতঃপর ব্রাহ্মণ নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন–আমি অগ্নিদেব। সকল দেবতাদের পক্ষ থেকে আমি আপনার কাছে দরবার করতে এসেছি।

রাম সম্মতি জানালেন। অগ্নিদেব যোগবলে সীতার মধ্যে থেকে মায়া সীতার সৃষ্টি করলেন। সে সীতার মতই রূপবতী ও গুণবতী। মায়া সীতাকে রামের হাতে তুলে দিয়ে আসল সীতাকে নিয়ে অগ্নিদেব চলে গেলেন। যাবার সময় তিনি রামকে সাবধান করলেন যেন তৃতীয় কেউ এ সত্য জানতে না পারে।

এই সময় সীতা এক সোনার হরিণ দেখতে পেয়ে রামের কাছে আবদার ধরলেন, ওই সোনার হরিণ তার চাই। লক্ষ্মণের ওপর সীতার দেখাশোনার ভার দিয়ে রাম গেলেন সেই হরিণ ধরতে। বাণ। মেরে হরিণকে বিদ্ধ করলেন। সে ছিল মায়া হরিণ মারীচ। সে মায়া বলে ত্রাহি ডাক ছাড়ল –'লক্ষণ।

রামচন্দ্র মারীচের সামনে এসে দাঁড়ালেন। স্বয়ং নারায়ণকে চোখের সামনে দেখে মারীচ হরিণরূপ ত্যাগ করে বৈকুণ্ঠে ফিরে গেল।

জয় ও বিজয় ছিল বৈকুণ্ঠের দ্বার রক্ষক। আর ছিল জিত নামের এক পরাক্রমশালী কিঙ্কর। জিত, সনক প্রভৃতি ঋষিদের শাপে রাক্ষস হয়ে জন্মায়। তারপর রামচন্দ্রের হাতে তার মৃত্যু হয়। জয় বিজয়ের আগেই সে বৈকুণ্ঠে ফিরে আসে।

মায়াবী রাক্ষসের ডাকা লক্ষ্মণ' 'লক্ষ্মণ' সীতার কানে এসে পৌঁছোলো। তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি দাদাকে রক্ষার জন্য লক্ষ্মণকে পাঠিয়ে দিলেন। এই অবসরে পাপিষ্ঠ রাবণ ছলনা করে সীতাকে চুরি করে নিয়ে পালাল। লক্ষ্মণকে দেখে রামচন্দ্র বিষণ্ণ হলেন। দুই

ভাই পর্ণকুটিরে ফিরে এলেন। কিন্তু সীতার দেখা পেলেন না। বহু খোঁজ করেও সীতাকে রামচন্দ্র পেলেন না। প্রিয় পত্নী সীতার অদর্শনে রামচন্দ্র বারংবার জ্ঞান হারালেন। চৈতন্য ফিরে পেয়ে পুনরায় সীতার খোঁজ করলেন। নদীতীরে দেখা হল জটায়ুর সাথে। জটায়ুর কাছ থেকে সীতা হরণ সম্পর্কে রামচন্দ্র জানতে পারলেন। অতঃপর রাবণের রাজ্য লঙ্কা আক্রমণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বানর সেনার শরণাপন্ন হলেন। বানর সৈন্যের সাহায্যে রামচন্দ্র সাগরের উপর সেতু বন্ধন করলেন। অতঃপর সেতু পেরিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করলেন শ্রী রামচন্দ্র। ভয়ংকর সেই যুদ্ধে লঙ্কায় রাবণের বংশের আর কেউ বেঁচে রইল না। স্বয়ং রাবণও প্রাণ হারালেন। দুঃখিনী সীতা উদ্ধার হলেন। কিন্তু অগ্নিপরীক্ষা ছাড়া রামচন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করতে পারলেন না। এই সময় প্রকৃত সীতাকে নিয়ে এসে অগ্নিদেব হাজির হলেন। রামের হাতে আসল সীতাকে সমর্পণ করলেন।

রামচন্দ্র ও অগ্নিদেবের কাছে ছায়া সীতা জানতে চাইলেন এখন তার কি করা উচিত?

অগ্নিদেব বললেন, তুমি মহাপুন্য স্থান পুস্কর তীর্থে গমন কর। সেখানে বসে তপস্যা কর। তপস্যার ফলে তুমি স্বর্গ লক্ষ্মী লাভ করবে।

ছায়া সীতা তখনি চলে গেলেন পুস্কর তীর্থে। কঠোর তপস্যার বলে তিনি স্বর্গলক্ষ্মী হলেন। অতঃপর তিনি দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদী হয়ে জন্মেছিলেন। সত্যযুগে যিনি ছিলেন বেদবতী, ত্রেতা যুগে তিনিই ছিলেন সীতা এবং দ্বাপর যুগে তিনি হলেন দ্রৌপদী।

নারায়ণকে চুপ থাকতে দেখে নারদ সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। বললেন– ভগবান, দ্রুপদ রাজার কন্যা দ্রৌপদী একই সঙ্গে পঞ্চ পান্ডবের অর্থাৎ পাঁচ পুরুষের ঘরনী ছিলেন। এটা কী করে সম্ভব সে বৃত্তান্ত আমাকে বলুন।

নারায়ণ বললেন–হে দেবর্ষি ছায়াসীতা অগ্নিদেবের আদেশে পুস্কর তীর্থে চলে গেলেন। তপস্যায় তিনি শিবের কাছে বর প্রার্থনা করলেন ত্রিলোচন হে! "আমাকে স্বামী দান করুন। রামচন্দ্রের রূপে ছায়াসীতা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং কামাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি পাঁচবার 'স্বামী দান করুন' বলেছিলেন। শিব স্মিতহাস্যে বলেছিলেন তথাস্তু"। পরজন্মে ছায়াসীতা দ্রৌপদী হন ও পঞ্চস্বামীর ঘরনী হন।

এদিকে রামচন্দ্র রাবণ কে বধ করে তার ভাই হরিভক্ত বিভীষণের হাতে লঙ্কার ভার তুলে দিয়ে সপত্নী ফিরে এলেন অযোধ্যায়। রামচন্দ্র দীর্ঘ এগারো বছর প্রজাবৎসল, ধর্ম পরায়ণ,

নিরহংকারী রাজা হিসেবে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। তারপর তিনি পরিবারবর্গ, দাসদাসী সকলকে নিয়ে বৈকুণ্ঠধামে গমন করলেন।

বেদবতী ছিলেন লক্ষ্মীর অংশ। তাই তিনি লক্ষ্মীতেই মিশে গেলেন। যার জিভে সর্বদা চর্তুবেদ অবস্থান করে তিনিই হলেন বেদবতী।

.

পঞ্চদশ অধ্যায়

সৌতি বললেন–হে মুনিশ্রেষ্ঠ শৌনিক কুশধ্বজ কন্যা বেদবতী উপাখ্যান সংক্ষেপে আপনাকে বললাম। এবার শুনুন ধর্মধ্বজের কন্যা তুলসীর কাহিনী। নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে এই কথা শুনিয়েছিলেন। তাঁর কথাতেই আপনি শুনুন।

নারায়ণ বললেন–রাজা ধর্মধ্বজের পত্নী মাধবী ছিলেন স্ত্রীরত্নস্বরূপা। তিনি ছিলেন কামবতী ও রসিকা। গন্ধমাদন পাহাড়ে ফুল চন্দন যুক্ত রতি শয্যা রচিত হল। যেখানে তিনি রাজার সঙ্গে রতিসুখে কাল কাটাতে লাগলেন। তারা দুজনেই ছিলেন রমণ বিষয়ে অভিজ্ঞ। তারা এইভাবে দৈব একশ বছর কাটিয়ে গেলেন। শেষে রাজার চেতনা হল। তিনি রতি ক্রিয়া থেকে বিরত হলেন। কিন্তু কাম তাড়িত মাধবীর তৃপ্তি এল না। সতী সাধ্বী নারী সেই সময় গর্ভবতী হলেন। কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শুক্রবারে তিনি মনোহর এক কন্যার জন্ম দিলেন। সেই কন্যার পায়ে ছিল পদ্মের চিহ্ন। সে লক্ষ্মীর অংশস্বরূপা। শরৎকালের পদ্মের মতো আঁখি পল্লব মেলে যে আতুর ঘরের চারিদিকে দেখছিল আর মুচকি হাসছিল। কন্যার হাত পায়ের তালু রক্তের মতো লাল। সুন্দর নাভিটি নীচের দিকে মুখ করে আছে। সাদা চাপা ফুলের মতো তাঁর গাত্রবর্ণ। মাথায় সুন্দর কালো চুল। তার দেহের জ্যোতি গোল হয়ে চারিদিকে ঘুরছিল। এই মনোমুগ্ধকর রূপের তুলনা না পেয়ে পন্ডিতেরা তাঁর নাম দিলেন তুলসী। বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা করলেন তুলসী। নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করলেন ভালো স্বামীর জন্য। দৈব একলক্ষ বছর ধরে তিনি তপস্যা করলেন। এই সময় তিনি ফল, জল, ঝরা পাতা, বায়ু খেয়ে ও উপবাসে কাটিয়ে দিলেন। শেষে এক পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। হংসের পিঠে চড়ে ব্রহ্মা সেখানে হাজির হলেন।

তুলসী বললেন–হে তাত! আপনি সর্বজ্ঞ, আপনার অজানা কিছু নেই।

হে নারদ! তুলসীর আসল পরিচয় তোমায় আগেই দিয়েছি। গোলোকধামে থাকাকালীন তিনি ছিলেন এক গোপকন্যা। একদিন গোবিন্দের সঙ্গে রতিক্রিয়ায় আসক্ত হয়ে অতৃপ্ত অবস্থায় তিনি মূচ্ছা যান। রাধা সেই সময়ে সেখানে আসেন ও অভিশাপ দেন। রাধার অভিশাপে তিনি মানবযোনিতে জন্ম লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বলেন, তুমি মর্তে গিয়ে তপস্যা করে ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত হবে এবং আমার অংশস্বরূপ নারায়ণকে পতি রূপে পাবে।

ব্রহ্মা তুলসী কে বললেন–গোলোকধামে সুদামা নামের এক গোপ ছিল। সেও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজাত। সে ছিল অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও তেজস্বী পুরুষ। রাধার অভিশাপে সে দৈত্য বংশে জন্ম নিয়ে শঙ্খচূড় নামে অভিহিত হয়েছে। গোলোকে থাকাকালীন সুদামা তোমার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু রাধার প্রভাবে কিছু করতে পারে নি। সে জাতিস্মর। তপস্যা করে সে তোমাকে লাভ করবে। তুলসী, তুমিও জাতিস্মর। তোমারও অজানা কিছু নেই। তাই বলছি শঙ্খচূড়কে পতি করে সুখে দিন কাটাও। অন্য জন্মে দৈবযোগে তুমি নারায়ণের অংশরূপে তুলসীগাছ হয়ে জন্মাবে। তুমি হবে সমস্ত গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ফুলেদের মধ্যে তুমিই হবে শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুর প্রাণাধিকা। সমস্ত দেবতার পুজোতে তুমি থাকবে। নয়তো পূজো ব্যর্থ হবে। তুলসী পাতা দিয়ে গোপ গোপীরা মাধবের পুজো দেবে। তুমি সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সাথে বিহার করবে। ব্রহ্মার কথা শুনে তুলসী খুশি হলেন।

বললেন–হে তাত! আপনার দয়ায় আমি আবার দুর্লভ গোবিন্দের কাছে ফিরে যাব। কিন্তু রাধা ভীতি আমি কাটাব কি করে!

ব্রহ্মা বললেন– রাধার স্তব করবে। ষোলো অক্ষরের রাধামন্ত্র তোমায় দান করছি। রাধাস্তব করে তুমি রাধার প্রাণাধিক প্রিয় হয়ে উঠবে।

এই কথা বলে ব্রহ্মা তাঁর বাহনে চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তুলসী রাধামন্ত্র স্তব করতে শুরু করল। কেটে গেল বারো বছর। অবশেষে রাধা সন্তুষ্ট হলেন। তুলসী মনের মত বর লাভ করে বিশ্ব সংসারে আনন্দে বিচরণ করতে লাগল।

.

ষোড়শ অধ্যায়

নারায়ণ বললেন– নবযৌবনা রমণীশ্রেষ্ঠ তুলসী তখন ফুল চন্দনে পরিব্যাপ্ত শয্যায় শুয়ে মনে মনে পতি বাসনা করতে লাগলেন।

এই সময়ে কামদেব তাকে লক্ষ্য করে পঞ্চশরে বিদ্ধ করলেন। ক্ষণে ক্ষণে তুলসী দেহমনে পুলকিত হতে থাকলেন। তিনি মূচ্ছা যাচ্ছিলেন ঘন ঘন। কখনও তিনি সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। কখনও মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন। আবার কখনও শয্যা ত্যাগ করে হাঁটতে শুরু করছেন আপন মনে। কিছুটা হাঁটছেন, আবার বসে পড়ছেন। প্রায় উন্মাদিনী অবস্থা। দিনে দিনে এই অসুস্থতা বেড়ে চলল। পুষ্পশয্যা কন্টকিত হতে থাকল। সুস্বাদু ফল যেন বিষময় হয়ে উঠল। কপালের সিঁদুর বিন্দু যেন অসহ্য মনে হল।

একদিন তুলসী তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় এক সুবেশধারী যুবককে দেখতে পেলেন। স্মিত হাস্যে যুবকটি এগিয়ে এল। চন্দন চর্চিত তার দেহ। গলায় মালা। তুলসীর পাশে সে শয্যা গ্রহণ করল। রতিক্রিয়ায়

এগিকে উদ্দীপ্ত করল।ভায় যুবকটি ফিরে যেতেই প্রাণনাথ, আমাহেল।

কিন্তু তুলসী স্তব্ধ থাকায় যুবকটি ফিরে যেতে উদ্যত হল। সেই মুহূর্তে যুবকটিকে তুলসীর অতি প্রিয় মনে হল। তুলসী কেঁপে উঠলেন। বললেন–হে প্রাণনাথ, আমাকে ত্যাগ করে তুমি কোথায় যাচ্ছ! এভাবেই বিলাপ করতে করতে তুলসীর সময় অতিবাহিত হয়ে গেল।

এদিকে মহাযোগী শঙ্খচূড় মুনিবর ইতিমধ্যে কৃষ্ণ মন্ত্র লাভ করেছেন। পুস্করতীর্থে মন্ত্রসিদ্ধ হয়ে গলায় দুলিয়েছেন বর্ণমালা কবচ। ব্রহ্মার কাছ থেকে বর লাভ করে তিনি এলেন বদরিকা আশ্রমে।

হে নারদ! শঙ্খচূড় কে আসতে দেখে তুলসী স্তম্ভিত হলেন। কামদেবের মতোই তিনি মনোমুগ্ধকর কান্তি মনে গাত্রবর্ণ সাদা চাপা ফুলের মতো। নবযৌবনের দীপ্তি তার দেহে। নানা ভূষণে ভূষিত। পদ্মের ন্যায় দুটি আঁখি। গলায় পারিজাত ফুলের মালা। কস্তুরি ও কুমকুম চর্চিত। রত্নকুন্ডল গন্ডদেশে শোভা পাচ্ছে।

তুলসী তাকে দেখে কামাসক্ত হলেন। কাপড়ের আড়ালে মুখ ঢেকে সেই পুরুষের রূপসুধা পান করতে লাগলেন।

শঙ্খচূড় জানতে চাইলেন, হে সুন্দরী! তুমি এই নির্জন আশ্রমে একাকী বসে আছ কেন? তুমি রমণী শ্রেষ্ঠা, মায়ার আধার, তোমার রূপে মুনিদেরও মোহ জন্মাতে পারে। চুপ করে থেক না। বল তুমি কে? আমার কথার উত্তর দাও।

তুলসী বললেন—ধর্মধ্বজের কন্যা আমি। তপস্যার কারণে এই আশ্রমে আমার আগমন। কিন্তু আপনার পরিচয় জানার আগ্রহ আমার নেই। আপনি যেখানে খুশি যেতে পারেন। যে পুরুষ অধার্মিক এবং লম্পট, তারাই কামুক হয়! কামিনীর সঙ্গ লাভ করতে চায়। সৎ বংশে জাত কোনো পুরুষ নারীকে প্রশ্ন করে না। নারীজাতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। তারা ওপরে মিষ্টি মধুর কথা বলে আর অন্তরে ক্ষুরধারে পুরুষকে বধ করে। তাদের চরিত্র নিরূপণ করতে বেদ পুরাণ হিমসিম খায়। কোনো বিদ্বান লোক কামিনীকে বিশ্বাস করে না। কামিনী পুরুষকে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে। নারী প্রকাশ্যে লজ্জাশীলা। কিন্তু গোপনে তারা সুপুরুষকে গ্রাস করতে চায়। তারা সর্বদা কামাতুর থাকে আর মৈথুনে অংশ নিতে চায়। অল্প মৈথুন তাদের তৃপ্ত করতে পারে না। সর্বদা মনের মধ্যে ঝগড়ার বীজ বপন করে। রতিদাতা পুরুষ পেলে এরা নিজেদের গর্ভজাত সন্তানের কথাও ভুলে যায়। মৈথুনে অক্ষম বা বৃদ্ধ এদের কাছে শত্রু বিশেষ। রতিদাতা পুরুষের এরা রক্ত শুষে খায়। মোহময়ী রূপবতী কামিনীর ছল চাতুরী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও উপেক্ষা করতে পারেন না। এরা হরি উপাসনায় বিঘ্ন ঘটায়। এদের অন্তর দূষিত, এদের রক্ত অসংস্কৃত। বিধাতা এইসব কামিনীদের মায়াবী রূপের সৃষ্টি করেছেন।

তুলসীর কথা শুনে শঙ্খচূড় মৃদু হাসলেন। তিনি বললেন–হে দেবী! তুমি এতক্ষণ যা বললে তার সবই সত্যি। এবার আমার কথা শোনো।

বিধাতা পুরুষ বাস্তব ও কৃত্যা দুই ধরণের নারীরূপ সৃষ্টি করেছেন। বাস্তব প্রশংসা পায় আর কৃত্যা নিন্দা পেয়ে থাকে। দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী ও রাধা আদি সৃষ্টি স্বরূপ। কিন্তু এরা ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট হন নি। এদের অংশ স্বরূপ যে সকল স্ত্রীলোক, তারাই হল বাস্তব।

যুগে যুগে বহু নারীর আবির্ভাব ঘটেছে। শতরূপা, দিতি, অদিতি, স্বধা, স্বাহা, লোপামুদ্রা, মনসা, পুষ্টি, তুষ্টি, শচী, বরুণানী, দক্ষিণা, ছায়াবতী, রোহিনী, দেবাহুতি, অনুসূয়া, কেতকী, কালিকা, স্মৃতি, মেধা, বসুন্ধরা, ষষ্ঠী, ধর্মপত্নী, শ্রদ্ধা, কান্তি, নিদ্রা, তন্দ্রা, বিপাসা, ক্ষুধা, দিন, রাত্রি, প্রভা, শোভা, ক্রিয়া, প্রভৃতি নারীরা বাস্তব স্ত্রী রূপে খ্যাতি লাভ করেছেন। কৃত্যা স্ত্রীরূপী নারীরা কুলটা হন। তারা নিন্দার যোগ্য। রজো ও তমো দুই গুণ বিশিষ্ট কৃত্যা নারী দেখা যায়। রজোরূপী কৃত্যা নারীর সতীত্ব উৎপন্ন হয়। তাদের জীবনে উপযুক্ত প্রার্থীর ও স্থানের অভাব

ঘটে। তারা দেহের কষ্ট ও ব্যাধিতে ভোগেন। বহুলোকের মধ্যে বাস। তাদের জীবনে রাজার ও শত্রুর ভয় থাকে।

হে সুন্দরী! ব্রহ্মার আদেশে তোমাকে আমি বিবাহ করে সুখী হতে চাই। আমি সেই গোলোক ধামের সুদামা। রাধার অভিশাপে শঙ্খচূড় হয়ে দৈত্যবংশে জন্ম লাভ করেছি। শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রের প্রভাবে আমার সব মনে আছে। তুমি শ্রীহরির উপযুক্ত গোলোক বাসিনী। তুলসী, তুমিও আমার মতোই জাতিস্মর।

তুলসী বললেন, নারীরা পন্ডিত লোককে পছন্দ করে। তুমি সেই পন্ডিত লোক নও। স্ত্রীর কাছে যে স্বামী হার স্বীকার করে সে জগতের কাছে নিন্দনীয় হয়ে থাকে।

ব্রাহ্মণেরা দশদিন অশৌচ পালন করে, ক্ষত্রিয়েরা বারো দিন, বৈশ্যেরা পনেরো দিন আর শূদ্রেরা এক মাস। কিন্তু যে পুরুষ স্ত্রীর কাছে পরাজিত তাকে আজীবন অশৌচ পালন করতে হয়। দেবতারা তার নিবেদিত অন্ন জল গ্রহণ করেন না। এমন কি পূর্বপুরুষেরাও তার দেওয়া পিন্ড-অন্ন-জল গ্রহণ করেন না। যে পুরুষ স্ত্রীর মন জয় করতে পারে, তার ধ্যান, জল, হোম, যশ, বিদ্যা কিছুরই প্রয়োজন। হয় না। আসলে, এইসব কথার মধ্য দিয়ে আমি তোমার জ্ঞান প্রভাব ও বিদ্যা যাচাই করে নিলাম।

যে পিতা গুণহীন, বুড়ো, মুখ, গরীব, যোগী, পঙ্গু, অঙ্গহীন, জড়, কালা, বোবা, অন্ধ, কদাকার, রাগী, বা নপুংসক পুরুষের সাথে মেয়ের বিয়ে দেয় সে পিতা ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ করে। শান্ত, গুণী, সুশীল, বৈষ্ণব, ও পন্ডিত পুরুষের হাতে কন্যাদান করলে পিতা অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান পুণ্য লাভ করে। যে পাপিষ্ঠ অর্থলোভে কন্যাকে বিক্রি করে তাকে কুম্ভীপাক নরকে গমন করতে হয়। যেখানে সে চোদ্দজন ইন্দ্রের আয়ুষ্কাল পর্যন্ত কাক আর কৃমির যন্ত্রণা ভোগ করে। মেয়ের মলমূত্র খেতে বাধ্য হয়। সেই পাপের ফলে সে ব্যাধের ঘরে জন্মায়। মাংসের বোঝা কাঁধে নিয়ে পথে পথে বিক্রি করে।

তুলসী আর শঙ্খচূড় যখন তর্কে বিতর্কে মগ্ন তখন সেখানে ব্রহ্মার আবির্ভাব ঘটল। তারা দুইজন ব্রহ্মাকে প্রণাম জানালেন। আসন গ্রহণ করে ব্রহ্মা তাদের কিছু উপদেশ দান করলেন।

ব্রহ্মা বললেন– শঙ্খচূড়! তুমি পুরুষ শ্রেষ্ঠ আর তুলসী স্ত্রী শ্রেষ্ঠ। তোমরা উভয়ে বিবাহ করে অবশ্যই সুখী হবে। যে পুরুষ সহজেই এই সুখ ত্যাগ করে সে পশুর সমান। তুলসীকে বললেন– তুলসী! দেবতা ও দানবদের বিমর্দনকারী মহা শক্তিশালী সর্বগুণসম্পন্ন এই

প্রিয়জনকে তুমি কেন গুরুত্ব দিচ্ছ না। নারায়ণের সঙ্গে যেমন লক্ষ্মী, কৃষ্ণের সঙ্গে যেমন রাধা শঙ্কর-ভবানী, হিমালয়-মেনকা, চন্দ্র রোহিনী, কাম-রতি, বশিষ্ঠ-অরুন্ধতী, গৌতম-অহল্যা, ইন্দ্র-পুষ্টি, মনু-শতরূপা, যেমন রতি মিলনে প্রবৃত্ত হয়েছেন তুমিও তেমনি শঙ্খচূড়ের সঙ্গে মিলনে প্রবৃত্ত হও। শাপমোচনের পর তুমি আর শঙ্খচূড় ফিরে যাবে গোলোকে আর তুমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের সঙ্গে মিলিত হবে।

একথা বলে ব্রহ্মা অদৃশ্য হলেন। তুলসী ও শঙ্খচূড় গন্ধর্বমতে বিবাহ করলেন। তাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি হল। প্রিয়তমের সঙ্গে নবসঙ্গমে মিলিত হলেন তুলসী। চৌষট্টি কলায় পারদর্শী শঙ্খচূড়ের সঙ্গে রতি মিলনে তুলসী বিরামহীন সুখ ভোগ করতে লাগলেন।

তুলসী এবার তার প্রিয়তমকে সাজাতে বসলেন। শঙ্খচূড়ের কপালে এঁকে দিলেন কুমকুম ও চন্দনের তিলক। সুগন্ধী দ্রব্য দ্বারা তার দেহ মার্জনা করলেন। আগুনের মতো বিশুদ্ধ দুটো কাপড় পরিয়ে দিলেন। পারিজাতের মালা পরালেন গলায়। আঙুলে পরিয়ে দিলেন অমূল্য রত্নের এক সুন্দর আংটি। দান করলেন এক দুর্লভ মনি। তুলসী স্বামীকে প্রণাম জানিয়ে বললেন, হে প্রিয়তম, আমি তোমার দাসী।

শঙ্খচূড় দান হিসেবে বরুণের কাছ থেকে দুটি বিশুদ্ধ কাপড় ও রত্নের মালা পেয়েছিলেন। স্বাহা তাকে দিয়েছিলেন এক জোড়া পায়ের নুপুর। ছায়া দিয়েছিলেন একজোড়া রত্নের আংটি, বিশ্বকর্মা দিয়েছিলেন উত্তম অলংকার ও বিচিত্র ও সুন্দর শঙ্খ। শঙ্খচূড় এইসব প্রীতি উপহার তুলসীর হাতে তুলে দিলেন। তুলসীকে বুকে টেনে নিয়ে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিলেন তার ঠোঁট গাল, দেহ। প্রিয়ার খোঁপায় পরিয়ে দিলেন পারিজাত ফুলের মালা। প্রিয়ার গালে চন্দনের প্রলেপ দিলেন। কপালে দিলেন সিঁদুরের ফোঁটা। আলতা দিয়ে হাত ও পায়ের পাতা রাঙিয়ে দিলেন। তারপর পদ্মের মতো প্রিয়ার দুটি পা নিজবক্ষে ধারণ করে বললেন, ওগো প্রিয়া, আমি তোমার দাস।

তারপর তাঁরা রত্ন খচিত রথে চড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। দেবালয়ে, পাহাড়, পুষ্প উদ্যান, নদীর তীর, নন্দন কানন, গন্ধমাদন পর্বত, সুন্দর ঝর্ণার ধার। কখনও তাদের দেখা গেল কেতকীবনে, কখনও আবার মাধবী বনে। কখনও সোনার পাহাড়ের কোনো নির্জন স্থানে, কখনও আবার পারিজাত বনে। যে স্থান তাদের পছন্দ হ'ল, সেখানেই তারা চন্দন ও ফুলশয্যা রচনা করলেন। শঙ্খচূড় ও কামাতুর তুলসী সুরতক্রিয়া সুসম্পন্ন করলেন। তবুও তারা রইলেন অতৃপ্ত। তাদের কামনাবাসনা আরও বেড়ে গেল।

একসময় তুলসী ও শঙ্খচূড় তপোবনে ফিরে এলেন। সেখানে শঙ্খচূড় মনের সুখে রাজ্যভোগ করতে লাগলেন। মহাবলশালী শঙ্খচূড় এক মন্বন্তর কাল পর্যন্ত দেবতা, দানব, অসুর কিন্নর, রাক্ষস, গন্ধর্ব সকলের ওপর অত্যাচার চালাতে থাকলেন। গায়ের জোরে দেবতাদের পুজো, হোম, যজ্ঞ, অস্ত্র শস্ত্র অলংকার সব কেড়ে নিলেন। দেবতারা হয়ে উঠলেন অসহায়। চিন্তিত ও দুঃখিত দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। শঙ্খচূড়ের কীর্তিকাহিনী শুনে ব্রহ্মার কপালে চিন্তা রেখা ফুটে উঠল। তিনি সকল দেবতাদের নিয়ে গেলেন শিবলোকে। শিব ও অন্যান্যরা এসে হাজির হলেন বৈকুণ্ঠধামে।

জরা ও মৃত্যুহীনের পরম আশ্রয় এই বৈকুণ্ঠধাম। দেবতারা সকলে শ্রীহরির মন্দিরের সর্বোত্তম দরজায় নিয়ে হাজির হলেন। সেখানে দ্বার রক্ষকেরা রত্ন সিংহাসনে বসে আছে। দ্বার রক্ষকের অনুমতি নিয়ে দেবতারা সকলে ষোলোটি দরজা অতিক্রম করে শ্রীহরির সভায় এসে উপস্থিত হলেন।

সভাস্থল তখন চর্তুভুজ পারিষদে পরিপূর্ণ। তাদের বেশভূষা, অলংকার, আকৃতি সবই নারায়ণের সমান। শ্রীহরি তার ইচ্ছে মত শ্রেষ্ঠ মণি ও হীরে দিয়ে সভাটি তৈরি করেছেন। অমূল্য সব রত্ন সভার শোভা বৃদ্ধি করছে। সামন্তক মণি দিয়ে তৈরি হয়েছে সেই সভার একশোটা সিঁড়ি। তাতে পদ্মরাগ মণি দিয়ে কৃত্রিম পদ্ম সিঁড়ির শোভা বৃদ্ধি করেছে। সভাকক্ষের চারিদিকে সুগন্ধি চন্দন আর কুমকুমের সুবাস। বিদ্যাধরীরা সুন্দর নাচ গান পরিবেশন করছে।

ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতারা দেখলেন, সভার মধ্যস্থলে অমূল্য রত্ন সিংহাসনে চন্দ্রের ন্যায় বসে আছেন শ্রীহরি। তিনি চতুর্ভুজ। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী। মৃদু হাস্যে সুগন্ধ যুক্ত তাম্বুল সেবন করছেন। লক্ষ্মীদেবী তার চরণপদ্ম ক্রোড়ে নিয়ে বসে আছেন। গঙ্গাদেবী পরম ভক্তিভরে সাদা চামর দুলিয়ে তাকে বাতাস করে সেবা করছেন। ভক্তরা তাঁর বন্দনা গান গাইছেন।

পরমাত্মার এমন মনোমুগ্ধকর রূপ দেখে ব্রহ্মা শিব ও অন্যান্য দেবতারা দেহ মনে পুলক বোধ করলেন। তাদের চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ল। দেবতারা সকলে মিলে শ্রী হরিকে প্রণাম জানালেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হাতজোড় করে সবিনয়ে তাদের আগমনের কারণ বর্ণনা করলেন।

শ্রী ভগবান বললেন– হে পদ্মযোগি ব্রহ্মা, শঙ্খচূড়ের সকল ঘটনা আমার অবগত আছে। আমি এক পুরোনো কাহিনী শোনাই। যা পাপনাশকারী ও পুণ্যদানকারী। রাধার অভিশাপে সুদামাশঙ্খচূড় নামে দানবে পরিণত হয়েছে। আমি একদিন রাসমন্ডলে গিয়েছিলাম। রাধা

এক দাসীর মুখে খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন। আমি সেখানে বিরাজা নামের এক গোপিনীর সাথে মিলিত হয়েছিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলে বিরজা নদীতে পরিণত হয়। রাধা অতিমাত্রায় রাগান্বিতা হন ও সখাদের নিয়ে স্বগৃহে ফিরে যান।

একদিন মন্দিরে সুদামার সঙ্গে আলাপ চারিতায় সময় কাটাচ্ছিলাম। সেজন্য রাধা আমাকে তিরস্কার করল। সুদামা এ ঘটনায় গেলেন রেগে। রাধাও পাল্টা রাগ প্রদর্শন করলেন। রাধা সুদামাকে আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে আদেশ জানালেন। সুদামাও রাধার উদ্দেশ্যে কটুক্তি করতে লাগলেন। রাধা অধিক রুষ্ট হয়ে সুদামাকে অভিশাপ দিলেন– তুই দানব বংশে দানব হয়ে জন্ম নিবি।

প্রচন্ড দুঃখে সুদামা মর্মাহত হল। আমায় প্রণাম করে তিনি বিদায় নিতে উদ্যত হলে রাধার মনে দয়ার সঞ্চার হ'ল। রাধা তাকে যেতে মানা করলেন। কিন্তু সুদামা রাধার কথা কানে তুললেন না। সুদামার বিদায়ে দাস দাসী সখীগণ চোখের জল ফেলল। আমি অতঃপর রাধাকে শান্ত করলাম।

রাধা অতঃপর সুদামার উদ্দেশ্যে বললেন– হে সুদামা! তোমাকে আমি বর দান করছি ও শাপমুক্ত হয়ে তুমি গোলোকে এসে অবস্থান করবে।

কৃষ্ণ বলতে থাকেন- হে দেবতাবৃন্দ! আমার এই ত্রিশূল গ্রহণ করো। তোমরা মর্ত্যে যাও। দানব শঙ্কচূড়কে বধ করবার দায়িত্ব আমি শিবের উপর ন্যস্ত করলাম। কিন্তু শঙ্খচূড়ের গলায় আমার সর্বমঙ্গল কবচ আছে। যার প্রভাবে সে সমগ্র জগৎকে মুষ্টিবদ্ধ করতে পেরেছে। যতক্ষণ ওই কবচ ওর দেহে থাকবে ততক্ষণ কেউ ওর ক্ষতি করতে পারবে না। তাই আমি নিজে ব্রাহ্মণের বেশ ধরে ওই কবচ শঙ্খচূড়ের কাছ থেকে চেয়ে নেব।

তাছাড়া ব্রহ্মার বর অনুযায়ী শঙ্খচূড় কে হারাতে গেলে তার স্ত্রী তুলসী কে অসতী হতে হবে। আমি তুলসীর গর্ভে বীর্যপাত ঘটাব। তুলসী হবে অসতী। তখন শঙ্কচূড়কে বধ করতে অসুবিধা হবে না। পরে তুলসী তার স্ত্রীদেহ ছেড়ে আমার কাছে চলে আসবে।

.

সপ্তদশ অধ্যায়

নারায়ণ বললেন– হে দেবর্ষি নারদ! শঙ্খচূড় দানবকে বধ করবার দায়িত্ব শিবের উপরে দিয়ে ব্রহ্মা নিজের বাসস্থানে ফিরে গেলেন।

চন্দ্রভাগা নদীর তীরের একটি মনোহর বটগাছের নীচে শিব এসে দাঁড়ালেন। গন্ধর্বরাজ পুঞ্জদন্তকে দূত হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন শঙ্কচূড়ের কাছে।

দশ যোজন দীর্ঘ এবং পাঁচ যোজন চওড়া বিস্তৃত জায়গা জুড়ে শঙ্খচূড়ের রাজত্ব। অত্যন্ত দুর্গম সাতটি পরিখা দ্বারা সে নগর বেষ্টিত। চারপাশে স্ফটিক আকারের মণি দিয়ে তৈরি পাঁচিল। মণিমানিক্য খচিত বেদি, পরিবেষ্টিত শত শত উপবন, শত কোটি আশ্রম। দেবরাজ ইন্দ্রের নগর অমরাবতী আর কুবেরের ভবন শঙ্খচূড়ের নগরের কাছে সৌন্দর্য্যে নগণ্য।

পুঞ্জদন্ত নগরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। পূর্ণিমার চাঁদের মত গোলাকার ভবন চারটি পরিখা দিয়ে ঘেরা। জ্বলন্ত আগুনের শিখা রূপ আকাশ সমান উঁচু পাঁচিলের মাঝখানে ভবনটি দন্ডায়মান। বারোটি দরজায় প্রহরী সদা জাগ্রত। শত্রুরা কোনো ক্রমেই সে ভবনে প্রবেশ করতে পারবে না। ফটকের দরজায় দরজায় নানা রত্ন দিয়ে তৈরি কৃত্রিম পদ্ম শোভা পাচ্ছে। শঙ্খচূড়ের বাসভবনের সিঁড়ি, থাম, মন্দির এমন কি দেয়ালের ছবি গুলোও মূল্যবান রত্ন নির্মিত।

বাড়ি সুরক্ষার দায়িত্বে আছে শতকোটি দানব, প্রত্যেকেই মহা পরাক্রমশালী। নানা অলংকার ও অস্ত্রে তারা সজ্জিত।

পুঞ্জদন্ত বাড়ির প্রধান ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সেখানে যে দানবটি পাহারায় ছিল, তার গায়ের রং তামাটে, কটা চোখ, বীভৎস চেহারা, দেখলে ভয়ে কাঁটা দেয়। তার হাতে শূল। পুঞ্জদন্ত জানালেন, তিনি দূত হিসেবে এসেছেন। রাজার সঙ্গে দেখা করতে চান।

প্রধান দরজা পেরিয়ে দ্বিতীয় দরজায় এলেন। সেখানেও তিনি তার আগমনের হেতু জানালেন। এইভাবে নয়টি দরজা পার হয়ে এসে দশম দরজার দ্বাররক্ষী পুঞ্জদন্ত বললেন– রাজাকে গিয়ে জানাও যুদ্ধের বার্তা নিয়ে দূত এসেছে।

দ্বাররক্ষক ভিতরে প্রবেশ করল। খানিক বাদে এসে পুঞ্চদন্তকে জানাল– আপনি ভিতরে যেতে পারেন। গন্ধর্বরাজ পুঞ্জদন্ত সভাগৃহের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

সভার মাঝখানে এক রত্ন বিশিষ্ট সিংহাসনে পারিষদবর্গের মাঝে বসে আছেন রাজা। এক দাস তাঁর মাথায় ছাতা ধরে আছে। অন্য দুই পার্ষদ সাদা চামর দুলিয়ে বাতাস করছে।

অতীত সুন্দর অলংকারে সুসজ্জিত রাজা শঙ্খচূড় এইভাবে সেবা নিচ্ছিলেন। পুঞ্জদন্ত বিস্মিত হলেন।

পুঞ্জদন্ত শঙ্খচূড়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন– ভগবান শিবের দূত হয়ে আপনার কাছে। এসেছি। দেবাদিদেব শিবের ভাষাতেই তাঁর কথা ব্যক্ত করছি। শিব বলেছেন, শঙ্খচূড়ের অত্যাচারে দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তারা সর্বশ্রেষ্ঠ হরির দ্বারস্থ হয়েছেন। তুমি আমাদের রাজ্য ও সুখ শান্তি কেড়ে নিয়েছ। সব ফিরিয়ে দাও। নয়তো যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

গন্ধর্বরাজ পুঞ্জদন্ত বলতে থাকলেন– এখন চন্দ্রভাগা নদীর তীরে ত্রিলোচন শিব অপেক্ষারত। আপনি কী জবাব দেবেন দিন, আমি শিব কে গিয়ে জানাব।

শঙ্খচূড় বললেন– বেশ, তুমি ফিরে যাও। দেবাদিদেব শিবকে গিয়ে বল, কাল সকালে আমি তার সঙ্গে দেখা করব।

পুস্পদন্ত ফিরে এল বটগাছের নীচে। শঙ্খচূড়ের জবাব ও তার বৈভবের কথা সবিস্তারে শিবকে জানাল।

ইতিমধ্যে দেবতারা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেই স্থানে একে একে উপস্থিত হতে শুরু করেছেন। প্রথমে এলেন রূপবীর কার্তিক, তারপরে নন্দী, মহাকাল, সুভদ্রক, বিশালাক্ষ, বীরভদ্র, কপিলক্ষি, মণিভদ্র, দুর্জয়, বিকট, বাণ, বিকম্পন, বিরূপ, বিকৃতি, তালোচন, কালঙ্কট, বলীভদ্র, কুটিচর, কালজিষকা, দুর্গম, দীর্ঘদংষ্ট্রা, বলোম্মত্ত ও বলীভ। এলেন আট ভৈরব। এগারোজন রুদ্র। কী বিকট তাদের চেহারা, আটজন বসু, বারোজন আদিত্য, ইন্দ্র, অগ্নি, চন্দ্র, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, বিশ্বকর্মা, যম, কুমেরী, জয়ন্ত, নলকুবের, বায়ু, বরুণ, মঙ্গল, বুধ, ধর্ম, শনি, ঈশান ও কামদেব উপস্থিত হলেন। উগ্রচন্ডা, উগ্রদংষ্ট্রা, কোট্টরী, কৈটভী এবং ভয়ংকরী ভদ্রকালী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রেষ্ঠ তৈরী একটি বিমানের উপর ভদ্রকালী বসে আছেন। শত হাতে তিনি অস্ত্র ধারণ করেছেন। তাঁর ত্রিশূল আকাশ ছুঁয়েছে। তার শক্তি যোজন বিস্তৃত। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বাণ, মুগুর, মুষল, বজ, খ, ভয়ঙ্কর চাপ, উজ্জ্বল ফুলক বৈষ্ণবাস্ত্র, বারুনাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, নারায়ণস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্রে, নাগপাশ, গারুড়াস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র,

জৃম্ভনাস্ত্র, মহেশ্বরাস্ত্র, দম্ভ, বায়ব্যাস্ত্র, সন্মোহনাস্ত্র এবং শত শত দিব্য ও অব্যর্থ অন্যান্য অস্ত্রে তিনি সজ্জিত।

সেই ভয়ংকরী দেবীর বিরাটকার জিহ্ব বহু যোজন ব্যাপ্ত। তার হতে গোলাকার ও গভীর যোজন ব্যাপ্ত। তার হাতে গোলাকার ও গভীর যোজন আয়তন যুক্ত নরমুন্ড। তিনি লাল রঙের বস্ত্র পরিহিতা। লাল রঙের মালা ঝুলছে তার গলায়। লালরঙের সুবাস অনুলেপন করেছেন। তিনি কখনও গান গাইছেন। কখনও নৃত্য পরিবেশন করছেন। কখনও হুংকার তুলে শত্রুদের ভয় দেখাচ্ছেন। নতুবা হাতের মুদ্রাতে ভক্তদের অভয় দিচ্ছে।

সেখানে এসে জমা হল বিরাটাকার তিনকোটি যোগিনী, ভূত, পেত্নি, পিশাচ, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল, যক্ষ, রাক্ষস, ও কিন্নরের দল। কার্তিক শিবকে প্রণাম জানালেন। অন্যান্য শক্তিরাও শিবকে প্রনাম জানালেন। পিতার আদেশে কার্তিক তার পাশে বসলেন।

এদিকে শঙ্খচূড়ের দূত পুষ্পদন্ত চলে যাওয়ার পর অন্দরে গেলেন তুলসীর কাছে। যুদ্ধের কথা তাকে জানালেন। এ সংবাদ শুনে দুশ্চিন্তা ও ভয়ে তুলসীর হাত পা সেঁধিয়ে গেল। তিনি বললেন– হে প্রভু! আমার অধিষ্ঠাতা দেবাতা! আমাকে রক্ষা করো। দুশ্চিন্তায় আমার হাতপা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। এসো যতটুকু সময় আছে, আমি, প্রাণভরে তোমার রূপ সৌন্দর্য পান করি। তুমি আমার বুকে এসো প্রিয়। জানো, আজ ভোর রাতে আমি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি। আমার প্রাণের বাসনা পূর্ণ কর প্রিয়।

রাজা শঙ্খচূড় ছিলেন বুদ্ধিমান দানব। তিনি সত্য ও মঙ্গলজনক কিছু উপদেশ তুলসীকে দান করে বললেন– হে প্রিয়া! তুমি সত্যক অস্বীকার কর না। কালের নিয়মে যা ঘটতে চলেছে তাকে তুমি অমান্য করতে পার না। জীবের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, ভয়-শোক, মঙ্গল-অমঙ্গল সব কিছুই কর্মফলের সঙ্গে জুড়ে থাকে। যেমন গাছ জন্মায় বেড়ে ওঠে, ফুল-ফল দান করে। তারপর একদিন তার কাজ শেষ হলে গাছটি শুকিয়ে মরে যায়। প্রতিটি জীবের ক্ষেত্রেই একই নিয়ম। এর কোনো ব্যাতিক্রম হয় না। কালের হাত ধরেই বিশ্বের সব কিছু সৃষ্টি হয়। আবার তা কালের গহ্বরেই হারিয়ে যায়। যেমন সময় হলে স্রষ্টা সৃষ্টি করেন। রক্ষাকর্তা রক্ষা করেন এবং সময় হলে ধ্বংসকর্তা তার কাজ সম্পন্ন করেন। কালের আবর্তেই সবকিছু ঘুরছে।

হে আমার প্রাণাধিকা প্রিয়া তুলসী! তুমি সেই ত্রিগুণাতীত, সত্যস্বরূপ, সর্বেশ্বর, সর্বাত্মা অনন্ত, পরমেশ্বর, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শরণ নাও। যিনি সৃষ্টি, পালন ও সংহারের অধিকর্তা। সেই শ্রীহরির ভজনা করো। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবতাদের ঈশ্বর প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র। সেই

বিশ্বপিতা শ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দনা করো। যাঁর আদেশে বায়ু দ্রুতগামী হয়ে সর্বদা প্রবাহিত হয়, যাঁর আদেশে সূর্য উদিত হয় ও অস্ত যায়, যাঁর আদেশে ইন্দ্র সঠিক সময়ে বৃষ্টি দান করে, অগ্নি সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়, যাঁর আদেশে চন্দ্রোদয় হয়, তুমি সেই পরমব্রহ্মের শরণাপন্ন হও। তিনিই আমাদের সব। পিতা, মাতা, বন্ধু, সখা, পত্নী কেউ কারো নয়, তারই নির্দেশে আমরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। আবার তাঁরই নির্দেশে আমরা একে অন্যকে ছেড়ে চলে যাব। শ্রীকৃষ্ণ সকলের পরম বন্ধু। তুমি তার পাদপদ্মে অর্ঘ্য নিবেদন করো।

তুলসী! বিপদের সময় যারা শোকে কাতর হয়ে পড়ে তারা জ্ঞানহীন। জ্ঞানী লোকে কখনও এরকম আচরণ করবে না। কারণ সে জানে সুখদুঃখ কখনও হাত ধরাধরি করে আসে না। সুখ দুঃখ চক্রাকারে ঘোরে। তাই বলছি, তুমি শ্রীহরির পাদপদ্ম বন্দনা কর। যাকে লাভ করবার জন্য বদারিকা আশ্রমে কঠোর তপসা করেছিলে। তুমি গোলোকে গোবিন্দের দেখা পাবে। আমিও এই দানব দেহ থেকে মুক্তি পাব। ঠাঁই পাব গোলোকধামে। যেখানে আবার আমরা পরস্পরকে সম্পূর্ণ ভাবে দেখব। তাই দুঃখ কর না। এই নশ্বর দেহ ছেড়ে আবার আমরা গোলোকেই ফিরে যাব।

দিন তখন অতিক্রান্ত হতে চলেছে। শঙ্খচূড় তাঁর পত্নীকে নিয়ে রত্ন প্রদীপ যুক্ত রত্ন মন্দিরে প্রবেশ করলেন। ফুলে ফুলে সজ্জিত শয্যা সুবাসিত চন্দনের গন্ধে বাতাস আমোদিত। শঙ্খচূড় ও তুলসী সুরত কার্যে লিপ্ত হলেন। কিন্তু তুলসীর মন তখনও ভারাক্রান্ত। তিনি কাঁদছেন। শঙ্খচূড় তুলসীকে বুকের মাঝখানে টেনে নিলেন। তাকে আদর করতে করতে অনেক তত্ত্বজ্ঞান শোনালেন। যে জ্ঞান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে তিনি লভে করেছিলেন। উৎকৃষ্ট সেই জ্ঞান সমস্ত শোক দূর করে তুলসীর মুখে আনন্দের প্রকাশ ঘটাল। তিনি স্বামীর সঙ্গে আবার সুখ সাগরে ডুব দিলেন। হে মুনি! স্বামী স্ত্রীর দেহে এইভাবে পুলক জাগল। সুরতের সময় তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল যেন হরগৌরীর প্রতিমূর্তি। কখনও নিদ্রায়, কখনও একে অপরের দেওয়া তাম্বুল খেয়ে, কখনও গল্প করে, কখনও নানা রসের ভাব অবলম্বন করে তাদের সে রাত কেটে গেল। তার দুজনেই ছিলেন রতিক্রিয়ায় পারদর্শী।

.

অষ্টাদশ অধ্যায়

নারায়ণ বললেন– কৃষ্ণভক্ত শঙ্খচুড় বিছানা থেকে ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করলেন মনে মনে। বাসি জামাকাপড় ছেড়ে স্নান করে পবিত্র হলেন। কপালে কাটলেন তিলক। তারপর বিধি সম্মত ভাবে সন্ধ্যা আহ্নিক সারলেন। ইষ্টদেবতার পুজো করলেন। দই, ঘি, মধু, খই, ইত্যাদি দিয়ে পুজো করলেন। অন্যান্য দিনের মত ব্রাহ্মণদের দান ধ্যান করতে লাগলেন।

মণিমাণিক্য, ধনরত্ন, কাপড়, সোনা ভক্তিভরে দান করলেন। যুদ্ধের মঙ্গল কামনা করে গুরুদেবকে অমূল্য রত্ন এবং মণিমুক্ত ও হীরে দান করলেন। সাধারণ ব্রাহ্মণেরা পেল হাতি, ঘোড়া, গোরু, মোষ আরও কত কী।

তিন লক্ষ নগর ও একশ কোটি গ্রাম স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে বিলিয়ে দিলেন। রাজসিংহাসনে ছেলে সুচন্দ্রকে বসিয়ে তার হাতে তুলে দিলেন রাজ্যভারের দায়িত্ব। প্রজা দাসদাসী, রাজকোষ, বাহন সবকিছুই সমর্পন করলেন।

এবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য তৈরি হলেন। গলায় দোলালেন মৃত্যুঞ্জয়ী কবচ। হাতে নিলেন ধনুক।

ইতিমধ্যে সৈন্যসামন্ত এসে হাজির হয়েছে। এসেছে পাঁচলক্ষ হস্তি বাহিনী, তিন লক্ষ অশ্ববাহিনী, দশ হাজার রথ, ধনুকধারী সৈন্য। সব সমেত দানব সংখ্যা নয় কোটি অর্থাৎ অপরিমিত সৈন্যসংখ্যা। তাদের মধ্যে একজনকে শঙ্খচূড় সেনাপতি নির্বাচন করলেন। তিনি ছিলেন বীর, রণকুশলী, সাহসী ও বুদ্ধিমান। তিন লক্ষ অক্ষৌহিনী সেনা তার অধীনে দেওয়া হল। তারা যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে সকলকে হুঁশিয়ারি দেবে।

শঙ্খচূড় শিবির থেকে বেরোবার আগে শ্রীহরির বন্দনা করলেন। তারপর রত্ন-নির্মিত রথে উঠে বসলেন। শঙ্খচূড় চন্দ্রভাগা নদীতীরে এসে পৌঁছোলেন।

এই নদীর উৎস হিমালয়। এই জল প্রবাহ গোমস্তক পাহাড়ের কোল ঘেঁষে পশ্চিম সাগরে গিয়ে পড়েছে। এই নদীর তীরে সিদ্ধক্ষেত্র নামে যোদ্ধাদের একটি সিদ্ধাশ্রম আছে। এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। সেই পবিত্র অক্ষয়বট গাছ। সেই পবিত্র অক্ষয় বট গাছ, পাঁচশ যোজন ও পাঁচ যোজন বিস্তৃত লম্বা ও চওড়া। এই জায়গার পশ্চিম দিকে পশ্চিম সাগর, পূর্বে মলয় পর্বত, দক্ষিণে শ্রীশৈল এবং উত্তরে গন্ধমাদন পাহড়। চন্দ্রভাগা ও শাশ্বতী নদী শান্ত ভাবে বয়ে চলেছে।– শঙ্খচূড় অক্ষয় বটের সামনে এলেন। দেখলেন, যেখানে শিব যোগাসনে বসে

আছেন। ব্রহ্মতেজে তিনি উজ্জ্বল। বিশুদ্ধ স্ফটিকের মত সাদা তার গায়ের রং। তিনি সদা আনন্দময় এবং স্মিতহাস্য। পরণে বাঘের ছাল। গলানো সোনার মত জটাজাল মাথা থেকে নেমে এসেছে। তিনি ত্রিলোচন ও পঞ্চানন ত্রিশূল ও কুড়াল ধারী। সাপই তার অঙ্গের ভূষণ। তিনি মৃত্যুঞ্জয়, শান্ত ও সুন্দর। তিনি বিশ্বের পালক। তিনি ভক্তবৎসল ও বিশ্বপ্রণেতা।

শঙ্খচূড় শিবকে প্রণাম করলেন। তার সমস্ত সৈন্যরাও ভোলা মহেশ্বরকে ভক্তিভরে প্রণাম জানাল। শিবের সামনে ছিলেন কার্তিক ও বাঁদিকে ভদ্রকালী। শঙ্খচূড় তাঁদের উদ্দেশ্যেও প্রণাম জানালেন।

শিবের পার্ষদবৃন্দ উঠে দাঁড়িয়ে শঙ্খচুড়কে সম্মান জানালেন। মহেশ্বর শঙ্খচূড়কে হাত তুলে তথাস্তু বললেন। তারপর তাদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হল।

শিব বললেন– শঙ্খচুড়। তোমাকে অতীতের এক কাহিনী বলছি শোনো। জগতের সৃষ্টিকারী ধর্মজ্ঞ ব্রহ্মা ছিলেন ধর্মের পিতা। তার পুত্রের নাম মরীচি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং বিষ্ণুর উপাসক।

মরীচির পুত্রের নাম ধার্মিক কশ্যপ। কশ্যপ প্রজাপতি দক্ষের তেরো জন মেয়েকে স্ত্রী রূপে পান। তাদের একজন ছিলেন পরমসৌভাগ্যবতী সতী। তাঁর নাম দনু। দনুর গর্ভজাত চল্লিশ জন পুত্রও অত্যন্ত পরাক্রমশালী। দনুর নাম থেকেই এই পুত্ররা দানব নামে পরিচিত। চল্লিশজন দানবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বিচিত্তি। তার ছেলের নাম দম্ভ। তিনি ছিলেন ধার্মিক, জিতেন্দ্রীয় এবং শ্রীহরির অনুগামী, তার গুরু ছিলেন শুক্রাচার্য। দম্ভ পুষ্করতীর্থে এক লক্ষ বছর ধরে শ্রীকৃষ্ণের তপস্যায় ডুবে ছিলেন। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং শ্রীহরির আশীবাদে দম্ভ যে পুত্র সন্তান লাভ করেন, সে হলে তুমি, শঙ্খচূড়। রাধার অভিশাপে দানব বংশে জন্মের আগে তুমি ছিল গোলোকে। শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় আটজন গোপের মধ্যে তুমি ছিলে একজন, তুমি এখনও বৈষ্ণব, তবে প্রত্যেক বৈষ্ণব এক অভির্ষক পোষণ করে যে ব্রহ্ম থেকে শুরু করে স্তম্ভ পর্যন্ত সবকিছুই মিথ্যা।

তারা শ্রীহরির সালোক্য, সৃষ্টি, সারূপা সামীপ্য ও ঐক্য-এসব সম্পর্কে তারা তত্ত্বজ্ঞান শুনতে চায় না। ব্রহ্মত্ব বা অমরত্ব তাদের কাছে মূল্যহীন। আর ইন্দ্রত্ব বা কুবেরত্বের কথা বাদই দাও। হে রাজা! তুমি কৃষ্ণের ভক্ত, তোমার ওই ভ্রমমূলক দেবতাদের রাজ্যের অধিকার নিয়ে কি লাভ? তুমি ওদের অধিকার ও রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে, নিজের রাজ্য নিয়ে সুখে দিন কাটাও, আর কৃষ্ণ ভজনা করো, দেবতাও দানব– সকলেই কাশ্যপের বংশধর। দেবতা ও দানব

সম্পর্কে ভাই। নিজেদের মধ্যে বিবাদ ঘটিয়ে কি লাভ হবে, বলতে পারো, জ্ঞাতির সাথে ঝগড়া বিবাদ করা এক মস্ত বড়ো পাপ, যা ব্রহ্মহত্যার পাপের ষোলো ভাগের বেশি। তুমি হয়তো ভাবছ এতে তোমার সম্পদ ও সম্মানহানি হবে। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। কোনো জিনিসই অক্ষয়ও অমর নয়, প্রাকৃতিক প্রলয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মেরও পতন ঘটে।

আর তুমি তো সামান্য। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আবার সৃষ্টির কাজ শুরু হয়। এইসব সৃষ্টি প্রাণীদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি আগের জন্মের তপস্যার ফল অনুসারে হয়ে থাকে। সত্য যুগে ধর্মত্ত সত্য পাশাপাশি পরিপূর্ণ ভাবে ছিল। ত্রেতা যুগে তা হয় তিন ভাগ, দ্বাপরে দুই ভাগ এবং কলিযুগে তা তলানিতে এসে ঠেকেছে। ধীরে ধীরে তা হ্রাস পেয়ে অমাবস্যার চাঁদের মতো কলামাত্র বর্তমান থাকে। গ্রীষ্মকালে সূর্যের তেজ যেমন থাকে শীতকালে তা থাকে না। আবার সন্ধ্যাবেলা বা সকাল বেলার সূর্যের তাপ দুপুর বেলার মতো হয় না। সূর্য প্রত্যহ নির্দিষ্ট নিয়মে উদিত হয়, সময়ের সাথে তার প্রকান্ডতা বেড়ে যায়। আবার যথা সময়ে পশ্চিমাকাশে ডুবে যায়। ঘন বর্ষায় সূর্যের মুখ দেখা যায় না। আবার রাহুর কোপে সূর্য ঢাকা পড়ে যায়, রাহু সরে গেলে সূর্য কিরণ দেয়।

পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু অন্যান্য তিথিতে তা হয় না। চাঁদ রাহুগ্রস্ত হলে বা কালো মেঘে ঢাকা পড়লে চাঁদের জ্যোৎস্না দেখা যায় না। কালক্রমে সেই চাঁদই পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ কালের ভেদে সবকিছু ঘটে চলেছে। স্বয়ং ইন্দ্রও কালের অধীন, কখনও ঐশ্বর্যশালী এবং কখনও ঐশ্বর্যহীন। সম্পদ শূণ্য হয়ে যে বলি সুতলে অবস্থান করবে কালের হাত ধরে সেই একদিন ইন্দ্রের রত্ন সিংহাসনে বসার অধিকার লাভ করবে। ব্রহ্মা, শিবা প্রভৃতি দেবতারা, দানব, মুনীন্দ্র, যোগীন্দ্র, মানব– সকলেই কালক্রমে সৃষ্টি হয়ে বিনাশের পথে চলে যায়। একমাত্র পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ হলেন অবিনশ্বর। তাঁর সৃষ্টি যেমন নেই তেমন ধ্বংসও নেই। তিনি অনিত্য। শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃত রূপধারী এবং প্রকৃত পুরুষ। তিনিই আত্মা ও জীব। শ্রীকৃষ্ণপদে যে স্থির মতি রাখে সে কাল ও মৃত্যুকে জয় করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা ও ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মা হয়েছেন সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা এবং আমি, মহাদেব, সংহারকারী।

হে রাজা! আমি ধ্বংসের কাছে কালাগ্নি রুদ্রকে নিয়োগ করি এবং তার গুণগান করি, তাই মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যু আমার ধারে কাছে আসতে ভয় পায়।

সর্বভাবন, সর্বজ্ঞ শিবের উপদেশ শুনে রাজা শঙ্খচুড় মুগ্ধ হলেন। ধীর স্থির কণ্ঠে শঙ্খচুড় বললেন– হে নাথ! আপনি এতক্ষন যে তত্ত্বজ্ঞান দিলেন, তা সবই সত্যি। তবুও কয়েকটি প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে, আপনার কথা অনুসারেই বলছি জ্ঞাতি বিরোধ যদি পাপ হয় তাহলে কেন দেবতারা ভাই হিরণ্য কশ্যপের সঙ্গে হিরণক্ষকে বধ করলেন? কেন বলিরাজকে চুরি করে নিয়ে পাতালে পাঠানো হল, আমি নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে সুতল থেকে যে সব ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছি, তা নারায়ণের পক্ষেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। দেবতারা কেন স্তম্ভ প্রভৃতি অসুরদের একের পর এক হত্যা করেছেন?

সমুদ্র মন্থনের সময় দেবতারা পেলেন অমৃত। আর আমরা পেলাম কষ্ট। জগতের সবখানে শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। তিনি যা করতে চান তাই করেন। দেব দানবদের বিবাদ রোজই লেগে আছে, কখনও এরা মিশ খায় না, জল আর তেলের মতো। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, আত্মীয় ও বন্ধুজ্ঞান করি, আমাদের বিরোধের মধ্যে আপনার থেকে কাজ নেই। তবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, যুদ্ধের সন্ধি করার কথা বলতে আপনি এসেছেন দেখে আপনার অপমান বোধ করা উচিত। আর যদি যুদ্ধ হয় এবং সে যুদ্ধে দেবতারা হেরে যায়, তাহলে আপনার মান, যশ, কীর্তি, সব ধুলোয় মিশে যাবে। তাই বলছি, আপনি আপনার সু-কীর্তি নিয়ে ফিরে যান নিজের ভবনে।

মহাদেব রাজা শঙ্খচূড়ের কথা শুনে স্মিত হাসলেন, মিষ্ট সুরে বললেন– শোনো রাজা, তোমরা আর আমরা একই ব্রহ্মার সৃষ্টি। অতএব লড়াই করে তোমাদের কাছে হেরে গেলে লজ্জা পাব কেন? আর আমার যশ, কীর্তির হানির সম্ভাবনাও নেই। এর আগে বহুবার দানবদের সঙ্গে দেবতারা যুদ্ধ করেছেন। শ্রীহরি স্বয়ং যুদ্ধ করেছিলেন মধু ও কৈটভের সঙ্গে, বিষ্ণুর সঙ্গে হিরণ্যকশিপুর, হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে নারায়ণের, আমার সঙ্গে ত্রিপুরের যুদ্ধ হয়েছিল। এমন কি প্রকৃতিদেবী ও স্তম্ভ প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে ছিলেন। তবে এইসব যুদ্ধে যেসব দানবেরা মারা গেছে, তাদের সঙ্গে তোমার তুলনা করা উচিত নয়। তুমি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এক অন্যতম পার্ষদ। অতএব তোমার সাথে যুদ্ধ করতে আমি এতটুকু লজ্জিত নই। তাছাড়া স্বয়ং শ্রীহরি আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, দেবতাদের অধিকার তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। নতুবা যুদ্ধ অনিবার্য। আর কোন কথা নয়।

.

ঊনবিংশ অধ্যায়

সুতপুত্র বললেন– মহাদেবের কথা শুনে রাজা শঙ্খচূড় পারিতবর্গকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, শিবকে প্রণাম জানালেন। তারপর রথে চড়ে চলে গেলেন। সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হলেন। হে শৌণক, তারপর কি ঘটেছিল তা নারায়ণের মুখ থেকে শুনুন।

নারায়ণ বললেন– হে নারদ! রাজা শঙ্খচূড় যখন সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হলেন তখন শিব তাড়াতাড়ি, উঠে দাঁড়ালেন। তার নির্দেশে রণভেরী বেজে উঠল। শুরু হলো দানব ও দেবতাদের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ।

স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র বৃষপর্বার সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। বিচিত্তির সঙ্গে সূর্য, দম্ভাসুরের সঙ্গে চন্দ্র, কাল, কালেশ্বর, অগ্নি গোকর্ণে, বিশ্বকর্মা-ময়, কুবের কালকেয়, যম সংহার, বরুণ কলাবিঙ্ক, বায়ু চঞ্চল, বুধ ঘৃত পৃষ্ঠ, জয়ন্ত রত্নসার, শনৈশ্বর রক্তাক্ত, অশ্বিনী কুমারদ্বয় দীপ্তিমান, ধর্ম–দুজন, নলকুবের ধুম্রাপুর, ঈশান শোভাকর, মন্মথ পীঠর, মঙ্গল মন্ডুকাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ, শুর হল। বসুরা বর্চাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করলেন। আদিত্যদের সাথে উল্কামুখ ধুম্র খড়্গ, ধ্বজ, পিন্ড, সহানন্দী, বিশ্ব কাঞ্চীমুখ, পলাশ প্রভৃতি দানবদের প্রচন্ড যুদ্ধ চলতে লাগল। এগারো জন ভয়ংকর অসুর তখন এগারো জন মহারুদ্রের সাথে সংগ্রামে রত। দেবী মহামারী উগ্রচন্ড বা নন্দীশ্বরা প্রভৃতি দানবদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন।

দেবী কালী এবং পুত্র কার্তিককে নিয়ে মহাদেব বট গাছের গোড়ায় বসে ছিলেন। আর দৈত্যরাজ শঙ্খচূড় রত্ন, অলংকারে সজ্জিত হয়ে কোটি দানবদের সঙ্গে সুন্দর রত্নসিংহাসনে বসে ছিলেন।

যুদ্ধ করতে করতে দেবতারা ক্ষত-বিক্ষত হলেন। তখন শিবের দলের শক্তি কমে এসেছে। দৈত্যদের যুদ্ধের প্রচন্ডতায় দেবতারা ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। তখন স্কন্দ রেগে গিয়ে দেবতাদের অভয় দিলেন। তাঁর তেজের প্রভাবে মিত্রদের তেজ বেড়ে গেল। তিনি একা দৈত্যদের সঙ্গে লড়াই চালাতে লাগলেন। শত্রুপক্ষের একশো অক্ষৌহিনী সেনার মৃত্যু হল। আর কমললোচনা কালী নিজের হাতে নরকপাল পাতিত করে তা দিয়ে দানবদের রক্ত একশো নরকপালে পান করলেন। দশলক্ষ শ্রেষ্ঠ হাতি ও একশো লক্ষ ঘোড়া। তিনি তখন একহাতে ধরেছেন আর অতি সহজে মুখে ভরে দিচ্ছেন।

হে নারদ! হঠাৎ রণস্থানে পড়ে থাকা গলাকাটা দেহ উঠে দাঁড়াল। তারা নেচে বেড়াতে লাগল। স্কন্দ তার বাণ নিক্ষেপ করে দানবদের এত ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন যে, তারা পড়িমরি করে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচল। এবার স্কন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল বৃষপর্বা তারপর

বিচিত্তি। এই ভাবে দম্ভ ও বিকঙ্কণ প্রভৃতি দানবের সঙ্গে তার ভীষণ যুদ্ধ চলতে লাগল। মহামারী তখনও বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করে চলেছেন। স্কন্দের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়ে সব দৈত্যরা রেগে গেল। স্বর্গে দুন্দুভি বেজে উঠল। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি ঝরে পড়ল স্কন্ধের উপর। কাতারে কাতারে দানব ধরাশায়ী হল। যুবক দানবেরা ধ্বংস হল।

রাজা শঙ্খচূড় আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি রথে বসেই একের পর এক তীর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁর নিক্ষিপ্ত বাণ থেকে অন্ধকার আর আগুন সৃষ্টি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে। এ দৃশ্য দেখে দেবতারা ভয়ে যে যার মতো পালিয়ে গেল। দেখা গেল শিবের দলের সেনাপতি কার্তিক ছাড়া আর কেউ নেই। রাজা শঙ্খচূড় তাকে লক্ষ করে বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। তার নিক্ষিপ্ত বাণে পাহাড়, সাপ, বরফ, গাছ আরও কত কিছু সৃষ্টি হল। মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো কার্তিক পড়ে গেলেন। শঙ্খচূড়ের শক্তিশালী তীর এসে স্কন্দের ভয়ংকর ও দুরুহ ধনুক ভেঙ্গে টুকরো হল। তার দিব্য রথ হল ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো। রথের ঘোড়া গুলি মারা পড়ল, শঙ্খচূড়ের নিক্ষিপ্ত দিব্যবাণ এসে লাগল কার্তিকের বুকে। তিনি চেতনা হারালেন। ওখানে লুটিয়ে পড়লেন, খানিক বাদে উঠে বসলেন। তিনি অন্য একটি রথে চড়ে আবার যুদ্ধ শুরু করলেন। বিষ্ণু তাঁকে দিলেন এক দিব্য ধনুক।

কার্তিক তখন ভীষণ ক্ষেপে গেছেন। তার অস্ত্র দানবদের ছোঁড়া সমস্ত সাপ, পাহাড়, গাছ ও পাথরকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিল। পার্জন্য অস্ত্রের সাহায্যে তিনি আগুন নিভিয়ে দিলেন। শঙ্খচূড়ের ধনুক, রথ বর্ম, সারথি এবং তার মাথার মুকুট সব চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন। উল্কার বেগে শক্তিশালী এক বাণ ছুটে এল শঙ্খচূড়ের দিকে সেটি তার বুকে আঘাত করল, তিনি জ্ঞান হারালেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি হুঁশ ফিরে পেলেন। নতুন একটি রথে চড়ে আবার যুদ্ধ করার জন্য তৈরী হলেন।

হে দেবর্ষি নারদ! তখন মায়াবীদের শ্রেষ্ঠ শঙ্খচূড় মায়াবলে বাণের জাল সৃষ্টি করে তা দিয়ে কার্তিককে আবৃত করলেন এবং এমন এক অব্যর্থশক্তি প্রয়োগ করলেন যা বিষ্ণুতেজে তেজিয়াল এবং প্রলয়কালের আগুনের শিখার সমান। সেই শক্তির প্রভাবে মহাবলী কার্তিক মুচ্ছা গেলেন। দেবীকালী তাকে তুলে নিলেন কোলে। শিবের কাছে নিয়ে এলেন। শিবের সাহায্যে কার্তিক আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং অর্জিত শক্তি লাভ করলেন।

নন্দীশ্বর প্রভৃতি বীর, সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সমস্ত দেবতা গন্ধব যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর শতকোটি বক ও অনেক রকম বাদ্যমন্ত্র সঙ্গে নিয়ে কালী নিজে রণক্ষেত্রে এসে প্রবেশ

করলেন। তার রণ হুংকারে দৈত্যরা পটাপট মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সংজ্ঞা হারালেন। তাঁর বীভংস হাসিতে বিশ্বচরাচর কেঁপে উঠল। তিনি আনন্দিত হয়ে মাধ্বীকসুরাপান করতে থাকলেন এবং নৃত্য করতে লাগলেন। উগ্রচন্ডা, উগ্রদংষ্ট্র, কোট্টরী, ডাকিনী যোগিনী ও সমস্ত দেবতারা তখন সেই অমৃতসুরা পান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রাজা শঙ্খচূড়কে লক্ষ্য করে কালী প্রলয় কালীন আগুনের শিখার সামনে অগ্নিবাণ ছুঁড়ে দিলেন। শঙ্খচূড়ের পার্জন্য অস্ত্র সহজেই তা প্রতিরোধ করল। এবার মহেশ্বরের অস্ত্র ছুটে এল। রাজার বৈষ্ণব অস্ত্র তাকে কেটে ফেলল। এবার দেবী কালী মন্ত্রপুত নারায়ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। শঙ্খচূড় রথ থেকে নেমে এসে ওই শক্তিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই অস্ত্র শক্তিপথ পালটে ওপর দিকে চলে গেল। শঙ্খচূড় সাষ্টাঙ্গে নারায়ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলেন।

কালীর নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র ফিরে গেল শঙ্খচূড়ের পাঠানো ব্রহ্মাস্ত্রের কাছ থেকে। এবার দুই পক্ষেই দিক থেকে ছুটে এল দিব্যাস্ত্র। সেগুলো শত্রদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, কারোকে আঘাত করল না। যোজন বিস্তৃত শক্তিকে শঙ্খচূড়ের ধারালো অস্ত্র একশো টুকরো করে দিল। বার বার ব্যর্থ হয়ে দেবী কালী প্রচন্ড রেগে গেলেন। পাশুপত শক্তি প্রয়োগ করার জন্য তিনি তৈরি হলেন।

ঠিক এইসব আকাশবাণী ধ্বনিত হল– হে দেবী! পাশুমতাস্ত্রও বিফলে যাবে। রাজা শঙ্খচুড়ার গলায় আছে হরিকবচ যতদিন ওই কবচ আর ওর স্ত্রীর তুলসীর সতীত্ব অটুট থাকবে ততদিন রাজা শঙ্খচূড়ের মৃত্যু হবে না। ব্রহ্মা তাকে এই বর দিয়েছেন।

দেবীকালী তখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে রণাঙ্গন জুড়ে লাফালাফি করতে লাগলেন, আর শত শত দানো ধরে মেরে ফেললেন, এবার ছুটে এলেন শঙ্খচূড়ের দিকে। শঙ্খচূড় সঙ্গে সঙ্গে ধারালো দিব্য অস্ত্র দিয়ে তাকে প্রতিহত করলেন। তা দেখে দেবী একটা খড় শত্রুকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। রাজার নিক্ষিপ্ত ধারালো অস্ত্রের আঘাতে সেই খড়গ ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। দেবী তাকে গিলে খাওয়ার জন্য তেড়ে গেলেন। রাজা তাঁকে বারণ করলেন। দেবী রেগে গিয়ে দানবরাজের রথ ভেঙে টুকরো করে দিলেন, রথের সারথিকে ধ্বংস করলেন এবং প্রলয়কালীন আগুনের শিখার ন্যায় শূল নিক্ষেপ করলেন। অনায়াসেই সেইখুল দানবরাজের মুঠোবন্দি হল। দেবী ক্রোধে ফেটে পড়লেন। এক ঘুসি লাগিয়ে দিলেন। দুটির আঘাতে রাজা শঙ্খচূড় সাময়িক ভাবে জ্ঞান হারালেন। পরক্ষণেই উঠে বসলেন। দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন এবং দেবীর ছোঁড়া সমস্ত অস্ত্র নিজের শক্তি দিয়ে কাটলেন ও নিয়ে নিলেন।

দেবীকে লক্ষ্য করে আর কোন শক্তি প্রয়োগ করলেন না। কালী তাকে তুলে ধরলেন। পাক খাইয়ে খাইয়ে ওপরে দিকে ছুঁড়ে মারলেন। শঙ্খচূড় পাক খেতে খেতে সজোরে নীচে এসে পড়লেন। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ভদ্র কালীর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানালেন। তারপর এক রত্ন রথে উঠে বসলেন।

এদিকে ভদ্রকালী ছুটে এলেন শিবের কাছে। তিনি বললেন– হে প্রভু! আমি দানবদের রক্ত পান। করে মাংস খেয়ে সবাইকে শেষ করে দিয়েছি। রাজা শঙ্খচূড়ের মাত্র এক লক্ষ দানব বেঁচে আছে। রাজাকে বধ করার জন্য শক্তিশালী অস্ত্র ছুঁড়েও বারবার ব্যর্থ হয়েছি। এই সময় দৈববাণী শুনতে পাই– পদ্মযোনি ব্রহ্মার বরে রাজা শঙ্খচূড় অমর হয়ে আছে। রাজেন্দ্র-মহাজ্ঞানী ও মহাপরাক্রমশালী শঙ্খচূড় আমাকে একবারও আক্রমণ করেনি। সে কেবল আমার পাঠানো শক্তিগুলিকে ধারালো অস্ত্রের দ্বারা প্রতিহত করেছে।

.

বিংশ অধ্যায়

নারায়ণ বলে চললেন– যুদ্ধের খবরাখবর শুনে স্বয়ং মহাদেব রণাঙ্গনে এসে হাজির হলেন। দানবরাজ রথ থেকে নেমে দাঁড়ালেন। সাষ্টাঙ্গে শিবের সামনে প্রণাম জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার রথে উঠে বসলেন। গায়ে বর্ম পরে নিয়ে দুর্বহ এক ধনুক হাতে তুলে নিলেন। শুরু হল শঙ্খচূড় ও মহাদেবের মধ্যে যুদ্ধ। টানা এক বছর ধরে এই সংগ্রাম চলছিল। জয় পরাজয় কারোরই হল না, শেষ পর্যন্ত দুই মহান শক্তিধর রথী হাতের অস্ত্র নামিয়ে রেখে যে যার বাহনে উঠে বসলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রের এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল মৃত সৈন্যের দেহ। তখন জীবিত অসুরসৈন্যের সংখ্যা মাত্র একশো, শিবের তেজবলে মৃত দেবতারা প্রাণ ফিরে পেলেন।

একময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে মায়াবলে স্বয়ং বিষ্ণু যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালেন। তিনি শঙ্খচূড়কে বললেন– হে অসুরপতি! আমি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, দয়া করে এই বুড়ো ব্রাহ্মণকে কিছু ভিক্ষে দাও। শুনেছি, তুমি নাকি, কল্পতরু, যে যা চায়, তাই-ই তুমি দিয়ে থাকো।

রাজা শঙ্খচূড় মৃদু হেসে বললেন– আপনি কি নিতে চাইছেন বলুন, আমি তাই দেব। তোমার গলায় যে কবচটা ঝুলছে, সেটি আমাকে ভিক্ষা দাও। শঙ্খচূড় কোনো রকম ভাবনা চিন্তা করে

গলা থেকে কবচটি খুলে ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মায়ারূপে আবির্ভূত ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হলেন। এবার ব্রাহ্মণের ভেক ছেড়ে নারায়ণ হলেন রাজা শঙ্খচুড়। উদ্দেশ্য শঙ্খচূড়ের পত্নীর সতীত্ব হরণ করা।

ওদিকে যুদ্ধ আবার বেধে গেল। মহাদেব শ্রীহরির কাজ থেকে লাভ করা শূল তুলে নিয়ে শঙ্খচূড়ের দিকে তেড়ে গেলেন। সেই শূলের তেজ গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নের একশো সূর্যের দীপ্তিকে হার মানায়, ওই অস্ত্রের সম্মুখ ভাগে অবস্থান করছেন নারায়ণ, মূলে শিব আর মধ্যভাগে স্বয়ং ব্রহ্মা, শূলের শানের দায়িত্বের আছেন ভৈরব কাল। প্রলয়কালীন আগুনের শিখায় ন্যায় শূল জ্বাজল্যমান। দুর্নিবার, দুর্ধর্ষ, অব্যর্থ ও শত্রুঘাতিক এই শূল সুদর্শন চক্রের ন্যায় তেজস্বী। যে কোনো অস্ত্র এই আগুন শিখার সামনে জ্বলে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এই ভয়ংকর অস্ত্র বহন করার ক্ষমতা রাখেন একমাত্র শিব ও বিষ্ণু, চার হাজার ও একশো হাত পরিমাপ বিশিষ্ট এই নিত্য অনির্মিত অস্ত্রটি ব্রহ্মস্বরূপ।

শিব সেই ব্রহ্মান্ড ধ্বংস কারী অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। সেটি তীব্র পাক খেতে লাগল শূন্যপথে। তারপর চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ছুটেলো রাজা শঙ্খচূড়ের দিকে। শঙ্খচূড় এ দৃশ্য দেখে তৎক্ষনাৎ নিজের হাত থেকে ধনুক পরিত্যাগ করলেন। আসন করে বসলেন। পরম ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল, বন্দনা করলেন। সেই দুর্ধর্ষ অস্ত্র ততক্ষণে শঙ্খচুড়ের রথের কাছাকাছি চলে এসেছে। রথকে কেন্দ্র করে পাক খাচ্ছে সে তখন। দানব রাজের রথে আগুন ধরে গেল। সেই সঙ্গে রাজা শঙ্খচূড়ও পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন। তিনি নিজের দেহ ত্যাগ করে গোলোকধামে যাত্রা করলেন। তারপর রাজা শঙ্খচূড়, দুই হাত বিশিষ্ট–এক হাতে বাঁশী, রত্ন অলংকারে সজ্জিত কিশোরদিব্য গোপবেশেও কোটি গোপ তাকে সংবর্ধনা করে নিয়ে চললেন। রত্ন নির্মিত এক রথে চড়ে তিনি গোলোকে এলেন।

হে নারদ! তখন শ্রীরাধামাধব রাসমন্ডলে বৃন্দাবনে কুঞ্জের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। সুদামা পরম ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন, সকলে তাঁকে দেখে আহ্লাদ প্রকাশ করলেন। স্নেহের বশবর্তী হয়ে অনেকে তাকে কোলে তুলে নিলেন।

শঙ্খচূড়কে ধ্বংস করে সেই শূল ফিরে এল শিবের হাতে। শিব হলেন শূলপানি। শঙ্খচূড়ের হাড়গুলি লবণ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সেই হাড়গোড় থেকে এক জাতির সৃষ্টি হয়, তারা হল। শঙ্খজাতি। এই শঙ্খ নানা আকার বিশিষ্ট, নিত্য ও পবিত্র। শঙ্খের জল দেবতাদের আনন্দ দান করে। পূজোতে শঙ্খের জল প্রয়োজন হয়। শিব পূজোয় জলশঙ্খ বিধেয়। শঙ্খের জল

তীর্থের জলের সমান পবিত্র। যেখানে শাঁখ বাজানো হয়, সেখানে লক্ষ্মীদেবী অচলা থাকেন। শাঁখের মধ্যে শ্রীহরির অবস্থান। তাই যেখানেই শঙ্খ, সেখানেই শ্রীহরি বর্তমান। শ্রীহরির পাশাপাশি লক্ষ্মীদেবীও সেখানে অবস্থায় করেন, সেখানে কোনো অমঙ্গল ঘটেনা, যে কোনো স্ত্রী অথবা পুরুষ শূদ্র শাখ বাজালে লক্ষ্মীদেবী কুপিত হন। তিনি সেই স্থান ত্যাগ করেন।

শিব তাঁর অভীষ্ট কাজ শেষ করে বৃষের পিঠে চেপে বসলেন। দেবতারাও তাকে অনুসরণ করলেন। দানব রাজ শঙ্খচুড়কে বধ করতে পেরে সকলেই তখন আনন্দিত। শিব ফিরে গেলেন তাঁর নিজস্ব বাসমন্দিরে। দেবতারা নিজের নিজের রাজ্য, অধিকার ক্ষমতা– সব ফিরে পেলেন। স্বর্গে তখন আনন্দের বান ডেকেছে। দুন্দুভি বেজে উঠল নৃত্য ও গীত শুরু হল। দেবতারা শিবের মাথায় পুষ্প বৃষ্টি ঝরালেন। দেবতা ও মুনীন্দ্রদের শিবস্তুতিতে তখন সভাস্থল মুখরিত।

.

একবিংশ অধ্যায়

সৌতি বললেন– হে মুনি, হরি শ্রেষ্ঠ! তুলসীর গর্ভে কিভাবে ভগবান বীর্যধান করেছিলেন, সে কাহিনী নারদকে শোনালেন নারায়ণ! আপনাকে তাঁর কথাতেই বলছি, শ্রবণ করুন।

নারায়ণ বললেন– দেবতাদের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য স্বয়ং ভগবান শঙ্খচূড়ের রূপ ধরলেন। দানবরাজ পত্নী তুলসীর দরজার সামনে এসে তিনি দুন্দুভি বাজালেন। নিজের ফিরে আসার কথা ঘোষণা করলেন। তুলসী স্বামী ফিরে আসার কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের ধন দৌলত দান করলেন। মাঙ্গলিক ক্রিয়াকার্য শেষ করলেন। ভিখারী, বন্দি, স্তুতিপাঠকদের দুহাত ভরে ধন বিতরণ করলেন।

এদিকে শঙ্খচূড়রূপী শ্রীবিষ্ণু রথ থেকে নেমে এসে দাঁড়ালেন তুলসীর অমূল্যরত্ন নির্মিত ভবনের দরজার সামনে। পতি প্রিয়া তুলসী সোহাগে স্বামীর পা ধুইয়ে দিলেন। প্রণাম করলেন। আনন্দের অতিশয্যে তাঁর চোখ দিয়ে তখন অঝোরে জল গড়াচ্ছে। কামবিলাসিনী সুন্দরী তুলসী স্বামীকে নিয়ে বসালেন এক রত্ননির্মিত সিংহাসনে, তার হাতে তুলে দিলেন কর্পূর দেওয়া তাম্বুল। মনে মনে বললেন– আহা, আজ আমার জীবন সার্থক হল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পতি আবার আমার কাছে ফিরে এসেছেন। এ সুখ আমি কোথায় রাখি! তিনি মিষ্টি হেসে স্বামীর দিকে কটাক্ষপাত করলেন। আনন্দে গদগদ হয়ে মধুর শব্দচয়নে জানতে চাইলেন- হে কৃপাময়

প্রভু! অসংখ্য বিশ্বকে ধ্বংস করা যে পুরুষের কাছে সামান্য, তাকে আপনি কী করে পরাজিত করলেন? আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে, দয়া করে আমার কৌতূহল দমন করুন।

শঙ্খচূড়রূপী শ্রীবিষ্ণু বললেন– হে প্রিয়তমা! আমরা দুজনে এক বছর ধরে যুদ্ধ করেও কেউ কাউকে হারাতে পারলাম না। তখন ব্রহ্মা এসে মীমাংসা করে দিলেন। আমরা তখন পরস্পরের বন্ধু হলাম। আমি দেবতাদের রাজ্য ও অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে যাত্রা করি, শিব শিবলোকে ফিরে গেলেন। শ্রীবিষ্ণু এই কথা বলে শয্যা গ্রহণ করলেন এবং তুলসীর সাথে রমণসুখ উপভোগ করতে লাগলেন, কিন্তু সম্ভোগের সুখ আকর্ষণ অন্য রকম বলে সতী তুলসীর খটকা লাগল। তিনি চিৎকার করে বললেন–আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি কে? তুমি মায়া বলে আমাকে উপভোগ করেছ। তুমি মায়াবী ঈশ্বর। আমার সতীত্ব নষ্ট করেছ, তোমাকে এর শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমি অভিশাপ দেব।

হে নারদ! অভিশাপের ভয়ে শ্রীহরি স্বমূর্তি ধারণ করলেন। দেবী তুলসী তখন সামনে কিশোর নীরদশ্যাম সনাতন পরম পুরুষ নারায়ণকে দেখতে পেলেন। শরৎকালের পদ্মফুলের মত তাঁর দুটি আঁখি। অনিন্দ সুন্দর দুটি অধরে স্মিত হাসি। সেই মূর্তি নানা দুর্মূল্য ভূষণে ভুষিত, তিনি পীতবস্ত্র পরিহিত। কোটি কামদেবের থেকেও বেশি তিনি লাবন্যময়। স্বয়ং শ্রীহরিকে দেখে কামিনী তুলসী কামাবেশে মূচ্ছা গেলেন। খানিকবাদে তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন। উঠে বসলেন। বললেন– হে প্রভু! ভক্তরা আপনাকে দয়াবান বলে জানেন। আপনি সকলকে কৃপা চোখে দেখেন। অথচ আমার ক্ষেত্রে কী করলেন? আমার স্বামীও আপনার পরম ভক্ত, কিন্তু তাকে বধ করলেন পরের জন্য, ছলনাকরে আমার ধর্মভঙ্গ করেছেন, আপনি পাষণ্ড, আপনার হৃদয় দয়ামায়া শূন্য।

আপনি সর্বাত্মা ও সর্বাজ্ঞা হয়েও অন্যের দুঃখে দুঃখিত হন না। তাই আপনাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি। আপনি একজন্ম নিজেকে বিস্মৃত হবেন। হে ব্রহ্মা! তুলসী একথা বলে নারায়ণের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে হাউ হাউ কেঁদে উঠলেন। নারায়ণ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– হে সতী! শান্ত হও। আমাকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার জন্য তুমি অনেককাল তপস্যা করেছিলে, আর শঙ্খচূড় তোমাকে লাভ করার জন্য কঠিন তপস্যা করেছিল। সেই তপস্যার প্রভাবে শঙ্খচূড় তোমাকে স্ত্রী হিসাবে লাভ করেছিল। কিন্তু তোমার তপস্যার ফল পাওনা থেকে গেছে। তাই তোমাকে বরদান করছি, তুমি এ দেহ ত্যাগ করে দিব্যরূপে গোলকে ফিরে যাবে। লক্ষ্মী যেমন আমার কাছে প্রিয়, তুমিও তেমনিই হবে। রাসমণ্ডলে আমরা দুজনে বিহার

করব। আর তোমার এই ত্যাগ করা দেহটি নদীতে পরিণত হবে। সেই নদী গন্ডকী নামে ভারতবর্ষে পরিচিতি লাভ করবে।

গন্ডকী নদীকে মানুষ পবিত্র জ্ঞানে পূজা করবে। তোমার মাথার কেশরাশি পুণ্যদায়ক গাছের ন্যায় হয়ে উঠুক। সেইসব গাছের নাম হোক তুলসী। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে দেবতাদের পূজোর জন্য ফুল ও পাতা লাগে। এদের মধ্যে তুলসী অন্যতম। হে সুন্দরী! সমস্ত ফুল গাছের থেকে তুলসী হবে শ্রেষ্ঠ' যা আমার অত্যন্ত প্রিয়। বিভিন্ন পুণ্যস্থানে এবং গোলকের বিরজার তীরে বৃন্দাবনের মাটিতে, রাসমন্ডলে চম্পক বনে, চন্দন বাগানে, মাধবী, কেতকী, কুন্দ মল্লিকা, ও মালতীবনে পুণ্য দানকারী তুলসী গাছ জন্মাবে। তুলসীর ঝরা পাতা কুড়োবার জন্য দেবতারা সর্বদা ওই গাছের গোড়ায় ভিড় করবেন। তুলসী পাতার জলে অভিষিক্ত হলে সমস্ত তীর্থে স্নান ও সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষার সমান ফল লাভ হয়।

একটা তুলসী পাতা শ্রীহরিকে যতটা সন্তুষ্ট করতে পারে, অমৃতপূর্ণ হাজার হাজার কলস তাকে সেই সন্তষ্টি দিতে পারে না। শ্রীহরির চরণে মাত্র একটি তুলসী পাতা নিবেদন করলে দশ হাজার গোরু দানের সমান ফল লাভ করা যায়। মৃত্যুকালে তুলসীপাতার জল খেলে সমস্ত পাপের ক্ষয় হয় এবং গোলোকে গমন করা যায়।

যে লোক প্রতিদিন তুলসীপাতার জল খায় সে হয় জীবন্মুক্ত এবং গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে, নিত্য তুলসী পাতা নারায়ণের চরণে উৎসর্গ করলে লক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফললাভ করা যায়। হাতে ও দেহ‌ে তুলসী ধারণ করে তুলসীতীর্থে মরণ হলে বিষ্ণুলোকে যাওয়া যায়। তুলসীকাঠের মালা অশ্বমেধ যজ্ঞের বেশি ফলদায়ক। তুলসীপাতার কণামাত্র মৃত্যুকালে গ্রহণ করলে রত্ননির্মিত রথে চড়ে সে বিষ্ণুলোকে যায়।

তুলসীকে সাক্ষী রেখে যে লোক মিথ্যা বচন দেয় সে পাপাত্মা। কুম্ভীপাক নরক যন্ত্রণা তাকে চন্দ্র সূর্যের স্থিতি কাল পর্যন্ত ভোগ করতে হয়। তুলসী ছুঁয়ে নিজের কথার খেলাপ করলে চৌদ্দজনম ইন্দ্রের সমায় পর্যন্ত কুম্ভীপাক নরক যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী ও সংক্রান্তি তিথিতে তুলসী গাছের পাতা ছিঁড়তে নেই। দুপুরবেলা তেল মেখে স্নান না করে, রাতে, অশৌচকালে, অশুচি অবস্থায় অথবা বাসি জামাকাপড় পরে গাছ থেকে তুলসী পাতা তোলার অর্থ স্বয়ং শ্রীহরির মুন্ডচ্ছেদ, ঘটানো। শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বাসি তুলসী পাতা দিয়ে দেবতার পূজো দেওয়া যেতে পারে। বিষ্ণুকে নিবেদন করা তুলসী পাতা মাটিতে বা

জলে পড়ে গেলে তা আবার ধুয়ে নিলে শুদ্ধ হয়ে যায়। অন্য কোনো কাজে সেই পাতা ব্যবহার যোগ্য।

তুমিই হবে এই তুলসী গাছের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নিরাময় বিষ্ণুলোকে শ্রীকৃষ্ণ হবেন তোমার নির্জনে নিত্যক্রীড়ার সঙ্গী। তোমার দেহজাত পুণ্যদায়ক নদী ভারতে গন্ডকী নামে প্রসিদ্ধ হবে। আমার অংশে লবণ সমুদ্রের উৎপন্ন হবে। সে হবে তোমার স্বামী। হে মহাসতী! তুমি সর্বদা বৈকুণ্ঠধামে লক্ষ্মীর সমান হয়ে আমার সঙ্গে রাসমন্ডলে বিরাজ করবে। তোমার শাপে আমি হব পাষাণ পাহাড়, গন্ডকীর তীরেই হবে আমার অবস্থান। সেখানে বাস করবে বজ্রকীটরা, যাদের দাঁত বাজের মতো। তারা আমার শিলাগাত্রে আমার চক্র রচনা করবে। যে শিলার একটা দ্বারে চারটে চক্র আঁকা থাকবে এবং বনমালার মতো যে শিলায় একটামাত্র মালা আঁকা থাকবে, নতুন মেঘের মতো শ্যামবর্ণা–শিলার নাম হলো লক্ষী-নারায়ণ।

একদিকে চারটি চক্রবিশিষ্ট, বর্ণমালাহীন, নীরদশ্যাম বর্ণ শিলার নাম লক্ষীজনার্দন। দধিবামন নামক শিলার আকার খুব ছোট, দুই চক্রবিশিষ্ট, নতুন মেঘের মতো কালো রং হবে। দুটো চক্র এবং বর্ণমালা যুক্ত অত্যন্ত ছোটো শিলা শ্রীধর নামে পরিচিত হবে, রঘুনাথ শিলার চারটে চক্র থাকবে, বনমালাহীনও গোস্পদ চিহ্ন যুক্ত হবে, এবং দুটো দ্বার বর্তমান। বড়োসড়ো গোলাকার, বনমালা শূণ্য শিলার নাম দামোদর। দু চক্র খুব ভালোভাবে দেখা যাবে এবং ফলদায়ক। মাঝারি, গোলাকার, দুটি চক্র, বাণের দ্বারা ক্ষত বিক্ষত শরণ চিহ্ন যুক্ত এমন শিলার নাম হবে রণরাম। মাজারি, সাতচক্র বিশিষ্ট চক্র ও তৃণচিহ্ন ও ছত্রচিহ্ন যুক্ত, রাজ্য দানকারী শিলা রাজরাজেশ্বর। অনন্ত শিলার রং হবে নতুন মেঘের ন্যায় কালো, আকারে বড়ো, অনন্তদেব ধর্ম অর্থাৎ কার্য ও মোক্ষ প্রদায়ক।

মধূসুদন নামক শিলার আকার হবে গোল, সেখানে দুটো চক্র যাদবে, গোস্পদের চিহ্ন থাকবে এবং রং হবে কালো। যে শিলায় সুদর্শন চিহ্নের একটা চক্র এবং গুপ্ত চক্র থাকবে, তাকে বলা হবে গদাধর। অশ্বমুখাকৃতি দুই চক্র বিশিষ্ট শিলার নাম গ্রীব, ভয়ংকর দর্শনধারী নরসিংহ শিলায় দুটি চক্র এবং অত্যন্ত বড়ো মুখ থাকবে। দুটি চক্র, মস্ত বড়ো মুখ এবং বনমালা আছে, এমন শিলার নাম লক্ষীনৃসিংহ। এই শিলা যার ঘরে থাকে তার শ্রীবৃদ্ধি হয়। বাসনা অনুসারে যশদানকারী শ্রীযুক্ত বাসুদেব শিলায় দুটি চক্র পরিষ্কার দেখা যাবে।

হে সুন্দরী! প্রদ্যুম্ন নামক শিলার সম্মুখ ভাগে বহু ছিদ্র এবং ভেতরে সূক্ষ্ম চক্রের চিহ্ন থাকবে। এর রং কালো মেঘের মতো। ইনি গৃহকে সুখ দান করেন। যে শিলার পিঠের দিক অত্যন্ত

প্রশস্ত, দুটি চক্র পাশাপাশি সংলগ্ন, এমন শিলার নাম সঙ্কর্ষন। অত্যন্ত সুন্দর পীতরং গোলাকার, এমন শিলা অনিরুদ্ধ নামে পরিচিত। এই শালগ্রাম শিলা যেখানে থাকবে, সেখানে হরি এবং সমস্ত তীর্থের সঙ্গে স্বয়ং লক্ষ্মী বিরাজ করেন।

শালগ্রাম শিলার নিত্য সেবা করলে ব্রহ্মা হত্যার ন্যায় পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, ব্রত, দান, শ্রাদ্ধ, দেবপুজো সবই শালগ্রামশিলাকে সাক্ষীরেখে করা উচিত। শালগ্রাম শিলা ছাতার আকারে হলে রাজ্য লাভ হয়, গোলাকার হলে অসীম ঐশ্বর্য, শকট আকারের হলে দুঃখ, শুলের অগ্রভাগের মতো হলে মৃত্যু অনিবার্য। বিকৃত মুখ শিলা দারিদ্র বহন করে আনে। পিঙ্গলবর্ণ শিলা ক্ষতির বাহক। লগ্নচক্র হলে ব্যাধি এবং ফাটা হলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে দানধ্যান করলে, নানাধরনের যজ্ঞ, তীর্থ ভ্রমণ, ব্রত উপবাস ইত্যাদির প্রভাবে যে পুণ্য লাভ হয়, তা শালগ্রাম শিলার স্নানের জলে অভিষেক করার সমান, সমস্ত তীর্থস্থান তার স্পর্শ পেতে চায়। শালগ্রাম শিলা পূজো করলে চারবেদ ও সমস্ত রকম তপস্যার সমান ফল লাভ করা যায়। শালগ্রাম শিলা ধোয়া জল নিত্য পান করলে সে পরিত্রাণ লাভ করে। দেবতারাও এই জল লাভে ধন্য হয়। জন্ম, মৃত্যু ও জরা রহিত হয়। এই জল বৈকুণ্ঠধামে সেই মহাপুণ্যবান এর পদধূলিতে পবিত্র হয়ে ওঠে। তার পুণ্যে লক্ষ পিতৃপুরুষ উদ্ধার হয়। মৃত্যুর সময় শালগ্রামশিলার জল গ্রহণ করলে বিষ্ণুলোকে ঠাঁই হয়। তার সমস্ত পাপের বিনাশ ঘটে, শালগ্রামশিলা স্পর্শ করে মিথ্যে কথা বললে যে ভয়ংকর পাপ হয়, তার ফলে কূর্মদংষ্ট্র নামক নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত তাকে ওই নরকে কাটাতে হয়। শালগ্রাম শিলাকে সাক্ষীরেখে যে কথা দিয়ে কথার খেলাপ করে সে লক্ষমন্বন্তর পর্যন্ত অসিপত্রনাম নামক নরকে বাস করে। শালগ্রামশিলা আর তুলসী পাতা কখনও আলাদা রাখবে না। এর ফলে পরের জন্মে স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। শাঁখের থেকে তুলসীকে আলাদা করা উচিত নয়। এর ফলে সাত জন্ম ধরে রোগব্যাধি ভোগ করতে হয়। শালগ্রামশিলা, তুলসী ও শঙ্খ পরস্পর সংলগ্ন যে রাখে যে মহাজ্ঞানী হয়। সে শ্রীহরির অনুগ্রহ লাভ করে।

হে সতী! তাই বলছি এক মন্বন্তরকাল শঙ্খচূড়ের ঘরণী থাকার পর, তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে। শোক করাই স্বাভাবিক। সর্বজ্ঞ, সর্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তুলসীকে উপদেশ দান করলেন। তুলসী নিজের দেহ ছেড়ে দিব্যমূর্তি লাভ করলেন। তিনি শ্রীহরির বক্ষ সংলগ্ন হলেন, লক্ষ্মীর মতো কমলাপতি শ্রীহরি তাকে নিয়ে নিজস্ব বাসভবনে ফিরে গেলেন! হে নারদ! গঙ্গা লক্ষ্মী সরস্বতী এবং তুলসী এইভাবে নারায়ণকে পতি হিসাবে পেয়েছিলেন।

তুলসীর ছেড়ে যাওয়া দেহ থেকে গন্ডকী নদীর সৃষ্টি হল। নদীর তীরে আর্বিভাব ঘটল এক পাহাড়ের, যা শ্রীকৃষ্ণের অংশে উৎপন্ন। সেই থেকে ওই পাহাড়ের বুকে নানা কীট বিভিন্ন ধরনের শিলা তৈরী করে চলেছে। কিছু, কিছু এসে পড়ে গন্ডকীর জলে সেগুলি নতুন মেঘের মতো কালো রঙ লাভ করে। যেসব শিলা জলে না পড়ে ডাঙ্গাতে পড়ে থাকে, সেগুলো সূর্যের তাপে পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে। হে নারদ! এখন তোমাকে তুলসীদেবীর পূজোর নিয়ম ও মন্ত্রস্তোত্রের কথা বর্ণনা করছি, শোনো।

.

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নারদ বললেন– হে ভগবান, আপনি আমাকে বলুন কে প্রথম তুলসীদেরীর পুজো ও স্তব করেছিলেন? কি ভাবেই বা তিনি জগৎবাসীর কাছ থেকে পূজো লাভ করেন। এসব বিষয় শুনতে আমি বড়োই আগ্রহী। গরুড়ধ্বজ নারায়ণ হেসে বলতে শুরু করলেনতুলসীকে লাভ করে শ্রীহরি লক্ষীর সঙ্গে রমনে মেতে উঠলেন। আবার তুলসীকেও লক্ষীর সমান গৌরব ও সৌভাগ্য দান করলেন। শ্রীহরির সপত্নী হিসেবে তুলসীকে গঙ্গা ও লক্ষী মেনে নিলেন। কিন্তু সরস্বতী শ্রীহরির সামনে তুলসীর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করলেন, এমনকি মারধোরও করলেন। তুলসী এতে ভীষণ অপমানিত হলেন। লজ্জার হাত থেকে নিজেকে ঢাকতে অন্তধান করলেন। সেই সর্ব সিদ্ধেশ্বরী জ্ঞানশালিনী সিদ্ধযোগিনী তুলসী রইলেন সকলের অগোচরে, এমনকি শ্রীবিষ্ণু তাকে দেখতে পেলেন না? সরস্বতাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করে শ্রীহরি গেলেন তুলসীবনে।

স্নান করে শুদ্ধ বসন পরে তিনি ধ্যান করলেন। তুলসী পুজো করলেন। তুলসীপাতা নিবেদন করে মন্ত্র বললেন, শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং বৃন্দাবনৈ স্বাহা। লক্ষী মায়া, যম ও রানীর বীজযুক্ত দশ অমর বিশিষ্ট এই মন্ত্র কল্পতরুর ন্যায় পুণ্যদায়ক। হে নারদ! এই মন্ত্রোচ্চারণ করে যে তুলসী পুজো করে, তার সকল অভীষ্ট পূরণ হয়। ধূপ-দীপ-ঘি-সিন্দুর-চন্দন-নৈবেদ্য ও ফুল দিয়ে ভক্তিসহকারে তুলসী পূজো শেষ করলেন। তুলসীদেবী সন্তুষ্ট হয়ে তুলসীগাছ থেকে আবির্ভূত হলেন। তিনি শ্রীহরির চরণে আশ্রয় নিলেন। শ্রীহরি বললেন– তোমাকে আমি বর দিলাম, আজ থেকে তুমি দেবী তুলসীরুপে সকলের পূজো লাভ করবে। তুমি থাকবে আমার মাথায় আর বুকে। সমস্ত দেবতারা তোমাকে তাঁদের মস্তকে স্থান দেবেন। এই কথা বলে শ্রীহরি সেখানে থেকে অদৃশ্য হলেন।

নারায়ণ বলতে থাকেন –শ্রীভগবান তুলসী দেবীর বন্দনা করে বলেছিলেন– আমি তাঁর স্তব করি, যিনি এক স্থানে অসংখ্য গাছরূপে উৎপন্ন হয়ে বৃন্দা নাম ধারণ করেছেন, তিনি আমার প্রিয়বৃন্দা। পুরাকালে যিনি বৃন্দাবনের বনে গাছ হিসাব আর্বিভূত হয়েছেন, তিনি সৌভাগ্য মুক্ত, বৃন্দাবনী, আমি তার ভজনা করি। যিনি সর্বদা অসংখ্য বিশ্বকে পবিত্র করে বিশ্বপাবনী হয়েছেন আমি সেই দেবীর শরণ নিলাম। যিনি বিশ্বপূজিতা। যিনি সর্বদা অসংখ্য বিশ্বে পূজো পাচ্ছেন, আমি সেই জগৎ পূজ্য দেবীর আরাধনা করি, যিনি বিশ্বসংসারে ভক্তি ও আনন্দের হিল্লোল তোলেন। তিনি হলেন নন্দিনী আমি তাঁর ভজনা করি।

হে পুষ্পসারা দেবী, শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আমি আপনার দর্শন লাভ করতে চাই। যে সতী দেবী শ্রীকৃষ্ণের জীবনের জীবন, সেই কৃষ্ণজীবনী দেবী আমাকে রক্ষা করুন।

এই ভাবে শ্রীহরি তুলসী দেবীর স্তব করে চললেন। হঠাৎ সেখানে স্বয়ং তুলসীর আর্বিভাব ঘটল। তিনি শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করলেন। তারপর আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলেন। অভিমানিনী তুলসীকে শ্রীহরি বুকে টেনে নিলেন। পরে সরস্বতীর অনুমতি নিয়ে তুলসীকে নিয়ে ফিরে গেলেন নিজের বাসভবনে। সরস্বতী সাথে যাতে তুলসীর মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে সে ব্যবস্থা করলেন। সরস্বতী তুলসীকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর লক্ষ্মী, গঙ্গা ও তুলসীকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে অদৃশ্য হলেন।

বৃন্দা, বৃন্দাবনী, বিশ্বপাবনী, বিশ্বপূজিতা, নন্দনী পুষ্পসারা কৃষ্টজীবনী এবং তুলসী– এই অষ্টনাম যুক্ত স্তোত্র ভক্তি সহকারে পাঠ করে যে তুলসী পূজো করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান পুণ্য লাভ করে। পুরাকালে শ্রীহরি কার্তিকমাসের পূর্ণিমা তিথিতে তুলসী পূজা প্রথম করে ছিলেন, ওই শুভ দিনটিতে পূণ্যদায়িনী তুলসীর জন্ম। তুলসীর জন্ম দিনটিতে তার পুজো করলে সমস্ত পাপ নাশ হয় এবং বিষ্ণুর চরণে ঠাঁই হয়। কার্তিকমাসে বিষ্ণুকে তুলসীপাতা দিয়ে পূজো করলে দশহাজার গোরুদানের সমান পূণ্য লাভ হয়। তুলসীর স্তব পুত্রহীনের পুত্র, স্ত্রীহীনের স্ত্রী, বন্ধুজনের বন্ধু দান করে। এই মন্ত্রের গুনে রোগ ব্যাধি দূর হয়। কাপুরুষ সাহসী হয়, পাপাত্মার মনে পাপের লেশমাত্র থাকেনা।

হে নারদ! কাম্বশাখায় তুলসীর ধ্যানের পূজোর নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। আবাহন ব্যতীত ষোলোটি উপাচার দিয়ে ভক্তিভরে দেবীর পূজোর করা উচিত। ধ্যান করার সময় বলতে হয়–হে দেবী তুলসী। তুমি সমস্ত ফুলের শ্রেষ্ট, তুমি জগতপূজ্য ও মনোহর — তোমাকে প্রণাম জানাই। সমস্ত পাপরূপ কাঠকে তুমি তোমার দেবরূপ আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দাও। তুমি

পবিত্ররূপা, সকল দেবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি তুলনাহীন, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি তুলসী, তুমিই সকলের ইষ্টদেবী, তুমি সকলের মাথায় অবস্থান করো, তুমি জীবন্মুক্ত, তোমার ভজনা করি। তুমি মুক্তি ও হরিভক্তি দানকারী, তুমি বিশ্ব পবিত্রকারিনী তোমাকে নমস্কার।

নারায়ণ বললেন– অমৃততুল্য তুলসীর উপাখ্যান তুমি শুনলে, আর কিছু জানতে চাও তো বলো।

.

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

নারদ বললেন– হে প্রভু! বেদমাতা সাবিত্রীর আবির্ভাব বৃত্তান্ত আপনি আগেই আমাকে বলেছেন। এখন বলুন, কীভাবে তিনি সকলের পূজ্য হয়ে উঠেছিলেন।

নারায়ণ বললেন– দেবতাদের মধ্যে পদ্মযোনি ব্রহ্মা প্রথম, বেদমাতা সাবিত্রীর পূজা করেছিলেন। তারপর অন্যান্য সকলের মতো তিনি প্রথম পুজো লাভ করেন মদ্রদেশের অধিপতি রাজা অশ্বপতির কাছ থেকে। এ অত্যন্ত পূর্ণদায়ক উপাখ্যান মন দিয়ে শোনো।

পুরাকালে ভারতবর্ষের মদ্রদেশে এক মহাপরাক্রমশালী মহারাজ ছিলেন। তার নাম অশ্বপাতি। তার পত্নীর নাম ছিল মালতী। তিনি ছিলেন সতী সাধ্বী, পতি প্রিয়া, ধর্মাত্মা নারী। রাজা অশ্বপতি ও রাণী মালতী ছিলেন ভূলোকের লক্ষী নারায়ণ। মহর্ষি বশিষ্ট মালতাঁকে ভক্তিভরে সাবিত্রী দেবীর পূজো করতে বললেন। পরম নিষ্ঠা সহকারে তিনি দেবীর ব্রত পালন ধরলেন, তার আরাধনা করলেন। কিন্তু দেবীর দেখা তিনি পেলেন না। এমন কি কোনো দৈববাণীও হল না। রাজমহিষী অত্যন্ত শূন্যচিত্তে প্রাসাদে ফিরে এলেন। রাজা অশ্বপতি পত্নীর দুঃখে দুঃখিত হলেন, নানা নীতি কথা শুনিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর নিজেই পুষ্কর তীর্থের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে পরম ভক্তিভরে প্রণাম জানালেন এবং ধ্যান করতে লাগলেন। ওইভাবে চোখ বুজে একশো বছর কেটে গেল। একদিন রাজা শুনতে পেলেন এক আকাশবার্তা– হে রাজা, তুমি এখানে বসে দশ লক্ষবার গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করো।

তখন সেখানে এসে উপস্থিত হন মহামুণি পরাশর। রাজা তাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রনাম করলেন। হে নারদ, মহামুণি পরাশর তখন সাবিত্রী জপের মাহাত্ম্য ও বিধি বর্ণনা করলেন। তিন জন্মের

পাপের বিনাশ ঘটে, একশো লক্ষবার গায়ত্রী জপ সর্ব পাপ নাশকারী। আর দশশত লক্ষবার গায়ত্রী জপের ফলে মুক্তি লাভ ঘটে, যে ব্রাহ্মণ লক্ষবার গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করে তার সারা জীবনের পাপ ধুয়ে মুছে যায়। হাজার বার সারা বছরের পাপ, একশো বার– একমাসের পাপ, দশবার একদিন ও রাতের পাপ এবং যে একবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে সে সে দিনের পাপ থেকে মুক্ত হয়। গায়ত্রী মন্ত্র জপ করার সময় পূর্বদিকে মুখ করে বসবে। মুদ্রিত হাত সাপের ফণার মতো মাথার ওপর রাখবে। সামান্য নীচু হয়ে একমনে এই মন্ত্র জপ করা উচিত। ক্রমানুসারে জপ করা বাঞ্ছনীয়। ডান হাতের অনামিকার মধ্যে থেকে শুরু হয়ে নীচের দিকে বা দিক দিয়ে তর্জনীর গোড়া পর্যন্ত আঙুল চালনা করা নিয়ম। হে রাজন! জপকরার সময় হাতে রাখবে জপমালা। সাদা পদ্ম ফুলের বীজ বা স্ফর্টিকের দানা দিয়ে মালা তৈরি করে শোধন করিয়ে নেবে। তীর্থে বা দেবস্থানে বসে জপ করার নিয়ম। সাতটি অশ্বত্থাপাতার ওপর জপমালা রেখে গোচনা মাখাবে এবং গায়ত্রী মন্ত্রে স্নান করাবে। তারপর তাতে একশোবার গায়ত্রী জপ করবে।

এভাবেই মালা সংস্কার করতে হয়। এছাড়া পঞ্চগব্য বা গঙ্গাজলে ধুয়ে নিয়েও মালা শোধন করা যায়। হে রাজা! যে লোক স্নান করে, কাঁচা কাপড় জামা পরে ত্রিসন্ধ্যা দেয়, তার সকল কাজে অধিকার জন্মায়। যে লোক সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা কালে সন্ধ্যা করে না, সে হয় অশুচি। সারাদিন ধরে সে যা যা কাজ করে সব বিফলে যায়। সকালে বা সন্ধ্যাকালে যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা বন্দনা করে না, সে হয় শুদ্রের সমান, সে ব্রাহ্মণের অধিকার থেকে বিচ্যুত হয়।

প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা আজীবন যে পালন করে সে সূর্যের সমান তেজস্বী হয়। পবিত্র ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা বন্দনা করে জীবন্মুক্ত হয়ে ওঠে। এমন পুণ্যবানের পায়ের স্পর্শে সেই স্থান পবিত্র হয়ে ওঠে। স্বেচ্ছায় সন্ধ্যাবন্দনা যে ত্যাগ করে, তার দেওয়া পুজো দেবতারা গ্রহণ করেন না। এইসব অশুচি লোকের অর্পণ করা তর্পণ জল বা শ্রদ্ধপিন্ড মৃত পূর্বপুরুষরা গ্রহণ করে না। বিষ্ণু মন্ত্র জপ করে না যে, যে একাদশী পালন করে না, যে ত্রিসন্ধ্যা পালন করেন সে হয় নির্বিষ সাপের মতো নিস্তেজ, ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয়।

হে রাজর্ষি! হরিকে নিবেদন করা প্রসাদ গ্রহণ না করা, দূত বা ধোপার কাজ করা, বলদের পিঠে চড়ে বেড়ানো, শুদ্রের অন্ন গ্রহণ করা, শুদ্রের মৃত দেহ পোড়ানো, শূদ্র মেয়েকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ করা, শূদ্রের রান্না করে দেওয়া, শূদ্রের দান গ্রহণ করা, শূদ্রের যজ্ঞ করা, ঋতুস্নাতা বা স্বামী পুত্রহীন স্ত্রীর অন্ন গ্রহণ করা, সুদখোর হওয়া, নিজের মেয়ে বিক্রি করা,

ভিক্ষে করে জীবিকা নির্বাহ করা, উদয়াস্তের মধ্যে দুবার আহার গ্রহণ করা, মাছ খাওয়া, শালগ্রাম শিলা পূজো না করা এই সমস্ত ব্রাহ্মণ নির্বিষ সাপের মতো ব্রহ্মতেজ শূন্য হয়।

এইভাবে মুনি শ্রেষ্ঠ পরাশর সাবিত্রী পূজো ও তার মন্ত্রের বিধি বর্ণনা করে অদৃশ্য হলেন। রাজা অশ্বপতি মুনির উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। তিনি সবিত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, স্তব করলেন। তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে সাবিত্রী দেবী রাজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। রাজা তাঁর অভীষ্ট বর লাভ করলেন।

জৈষ্ঠ্য মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে সাবিত্রী পূজো করা এবং নিয়ম বিধির কথা মাধ্যন্দিন শাখায় বলা হয়েছে। জৈষ্ঠ্য মাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশী তিথি এই পূজো করার শ্রেষ্ঠ সময়। চৌদ্দ ধরনের ফলমূল, চৌদ্দটি নৈবেদ্য, কাপড়, পৈতা, ধূপ, দীপ ইত্যাদি উপাচার। চৌদ্দ বছর ধরে সাবিত্রী ব্রত পালন করার নিয়ম কালে ঘট বসিয়ে ছয় দেবতা অর্থাৎ গণেশ, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য এবং শিবার পূজো করতে হয়। আবাহন পর্ব শেষ করে সাবিত্রী পূজো করবে। এই দেবী গলানো স্বর্ণবর্ণ, ব্রহ্মাতেজে তেজস্বিনী, গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নের সূর্য তেজস্বিত তার কাছে হার মানে। তিনি ভক্তকে অনুগ্রহ দান করেন। বিভিন্ন রত্ন অলংকারে সুসজ্জিতা, তিনি আগুন রঙা পট্ট বস্ত্র পরেছেন, তিনি সুশীলা, সুপ্রসন্না স্মিতবন্দনা। সুখ ও মোক্ষদানকারী সমস্ত সম্পদ রূপিনী, সম্পদ দানকারী, বেদের অধিষ্টাত্রী দেবী, বেদের স্রষ্ঠা বিধির প্রিয় ভার্য্যা আপনাকে আমি ভজনা করি। প্রথমে দেবীর ধ্যান করে নিজের মাথায় ফুল রাখবে। ভক্তি সহকারে দেবীর পূজো করা উচিত, আবার ধ্যান করে ঘটে দেবীকে আবাহন জানাবে। আসন, অর্ঘ্য, পাদ্য, অনুলেপন, স্নানীয়, নৈবেদ্য, পান, বস্ত্র, ঠান্ডা জল, অলংকার, মালা, গন্ধ, শয্যা, ধূপ, দীপ এবং অচমনীয়–বেদোক্ত এই ষোলো উপাচারে নিয়ম অনুসারে দেবীর পূজো সম্পন্ন করতে হয়। তারপর স্তব করার শেষে প্রণাম করবে।

প্রত্যেকটি উপচার নিবেদন করার মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। আসনদানের মন্ত্র– হে দেবী, আপনাকে এই আসন নিবেদন করলাম। আপনি এই আসনে উপবেশন করুন। অর্ঘ্য দানের মন্ত্র দুর্বা, ফুল ও আতপ চলযুক্ত শঙ্খজল মিশ্রিত পুণ্য দায়ক এই পবিত্র অর্ঘ্য আপনি গ্রহণ করুন। পাদ্য প্রদানের সময় বলবে, সময় বলবে, পূণ্য ও আনন্দদায়ক শুদ্ধ ও মহৎ তীর্থ জলময় এই পাদ্য আপনাকে নিবেদন করলাম। অনুলেপন-মলয় পর্বতে জাত সুখ প্রদানকারী সুবাস যুক্ত চন্দনের অনুলেপন আপনার শোভা বৃদ্ধি করুক স্নানীয়– সুগন্ধি ধাত্রীতেল রূপ দেহ সৌন্দর্য বর্ধক এই স্নানীয় পরম ভক্তিভরে আপনাকে নিবেদন করলাম। নৈবেদ্য– তুষ্টি, পুষ্টি ও

প্রীতি পুণ্য দানকারী এবং ক্ষুধানিবৃত্তকারী সুস্বাদু নৈবেদ্য আপনাকে নিবেদন করছি। পান–তুষ্টি ও পুষ্টিদায়ক কর্পূরযুক্ততম পান আপনাকে উৎসর্গ করলাম।

জল–যে জল জগতের জীবন, স্বরূপ, যে জল পান করলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়, সেই ঠান্ডা ও সুগন্ধ যুক্ত জল নিবেদন করলাম। অলংকার দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, সুখ ও পুণ্য দান করে। সেই স্বর্ণ অলংকার আপনাকে নিবেদন করলাম। মালা–যে ফুল আনন্দ ও পুণ্যদানকারী, সেই চন্দন মাখানো নানা ধরনের ফুল নিবেদন করলাম। গন্ধ–মঙ্গল দানকারী, পুণ্যদায়ক ও সুগন্ধ যুক্ত গন্ধ আপনাকে নিবেদন করলাম গ্রহন করুন। শয্যা –উত্তমরত্ন নির্মিত চন্দন ও ফুলে সজ্জিত সুখদায়ক ও পুণ্যদায়ক এই শয্যা আপনি গ্রহণ করুন।

ধূপ-যে ধূপ বিভিন্ন গন্ধদ্রব্যে তৈরী হয়, যা প্রীতি ও দিব্য গন্ধ দান করে, যা পুণ্যস্বরূপ সেই ধূপ ভক্তিসহকারে আপনাকে নিবেদন করলাম। দীপ– সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত করে যে সমস্ত জগতকে দেখতে সাহায্য করে সেই দীপ আপনাকে নিবেদন করলাম। আচমনীয় যা শুদ্ধলোকের অত্যন্ত আনন্দের কারণ যে শুদ্ধি দান করে এবং পবিত্র, সেই আচমন আমি আপনাকে নিবেদন করলাম। আপনি গ্রহণ করুন সিস্টুর– যে সিঁদুর নিজেই পরম রমণীয় যে সমস্ত অলংকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে কপালের শোভা বৃদ্ধিকরে সেই সিদূর আপনাকে নিবেদন করলাম। ফল–যা গাছে জন্মায় ফলদায়ক ও ফলস্বরূপ সেই ফল আপনি-গ্রহণ করুন।

ব্রতকারী মূলমন্ত্র পাঠ করে এসব উপাচার নিবেদন করবেন। তারপর স্তব করে দেবীকে প্রণাম জানাবেন। ব্রাহ্মণকে দান ধ্যান করবেন এবং ভোজন করিয়ে সন্তুষ্ট করবেন। সাবিত্রীর মূলমন্ত্র, শ্রীং হ্রং ক্রীং সাবিত্র্যৈ স্বাহা লক্ষ্মীবীজ, মায়াবীজ আর কামবীজকে আগে রেখে অগ্নিদেবের পত্নী সাবিত্রীপদের উত্তর চতুর্থ বিভক্তি যোগ করে এই আট অক্ষরের মন্ত্র।

হে নারদ, পুরাকালে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলেন, তুমি সাবিত্রীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করো। কিন্তু সাবিত্রী এ প্রস্তাবে রাজী নয়। তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বললেন, সাবিত্রীর পূজো করতে। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে স্তব করে ব্রহ্মা সাবিত্রীকে সন্তুষ্ট করলেন। ব্রহ্মা বললেন– হে সুন্দরী! তুমি সনাতনী এবং নারায়ণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তাই তুমি নারায়ণী, তুমি আমার প্রতি সদয় হও। হে তেজস্বরূপিনী তুমি পরমাস্বরূপা, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মনদের জাতিস্বরূপ। সর্বমঙ্গলময়ী হে দেবী আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে প্রসন্নময়ী! তোমার ব্রহ্ম তেজে পাপ রূপ কাঠ জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। তুমি পাপবিনাশিনী। হে সুন্দরী ভক্তের প্রতি তুমি অনুগ্রহ দান করো। আমার প্রতি তুষ্ট হও।

ব্রহ্মার স্তরের প্রভাবে সাবিত্রীদেবী ব্রহ্মাকে কামনা করলেন। এবং বেদমাতা সাবিত্রী ব্রহ্মার সাথে পতিগৃহে গমন করলেন। এই মন্ত্র উচ্চারণ করে রাজা অশ্বপতি সাবিত্রীর পূজো করেন, স্তব পাঠ করে তাকে প্রসন্ন করেন। এবং মনের মতো বর লাভ করেন। সমস্ত বাঞ্ছিত ফলদায়ক এবং ব্রাহ্মণদের স্তবত্রিসন্ধ্যায় প্রাণস্বরূপ এই পূণ্যদায়ক শ্রেষ্ঠ যে উচ্চারণ করে সে নিঃসন্দেহে চারবেদ পাঠের ফল লাভ করে।

.

চতুর্বিংশ অধ্যায়

নারায়ণ বলে চললেন– রাজা অশ্বপতির সাধনায় প্রসন্ন হয়ে এক দেবী মূর্তির আর্বিভাব ঘটল। রাজা দেখলেন, অপূর্ব পরমা সুন্দরী সেই দেবী ব্রহ্মতেজে জ্বলছেন, সহস্র সূর্যের সমান সেই তেজ। নিজের দেহের জ্যোতিতে তিনি উদ্ভাসিত সাবিত্রী। মিষ্টি হেসে মধুর কণ্ঠে সেই দেবী বললেন– হে মহারাজ! আমি সর্বজ্ঞ। তোমার এবং তোমার স্ত্রীর মনোবাসনা অনুসারে তোমরা পুত্র ও কন্যার জনক জননী হবে। বর দান করে সাবিত্রীদেবী ব্রহ্মালোকে ফিরে গেলেন। রাজা অশ্বপতি নিজ প্রাসাদের দিকে পা বাড়ালেন।

দেবী সাবিত্রীর ইচ্ছা অনুসারে কিছু দিন পরেই তাঁদের সংসারে এক ফুটফুটে কন্যার আর্বিভাব ঘটল। এই কন্যা লক্ষীদেবীর অংশ থেকে উৎপন্ন। সাবিত্রী দেবীকে আরাধনার ফল। তাই কন্যার নাম রাখা হল সাবিত্রী। যত দিন যায়, ততই কন্যার রূপ বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে রাজকন্যা যৌবনে পা দিলেন। তিনি মনে মনে সত্যবানকে নিজের পতি হিসাবে বরণ করে নিলেন। সত্যবান ছিলেন নানাগুণে সমৃদ্ধ দ্যুমৎসেনের পুত্র। রাজা অশ্বপতি নানা মূল্যবান অলংকার ও পোশাকে সজ্জিত করে সত্যবানের হাতে সম্প্রদান করলেন। সত্যবান পত্নীকে সঙ্গে করে বাড়ি ফিরে এলেন। রমণে ভ্রমণে, সুখে-আনন্দে একটা বছর কেটে গেল।

একদিন বাবার আদেশে সত্যবিক্রম সত্যবান বনে গেলেন কাঠ ও ফল সংগ্রহ করতে। দৈবযোগে সাবিত্রীও তার সঙ্গী হয়েছিলেন। কিন্তু বিধির বিধান কে খন্ডাতে পারে। আচমকা সত্যবান গাছ থেকে পড়ে মারা গেলেন। সেখানে যমরাজ তার অনুচর বৃন্দকে নিয়ে হাজির হলেন। তিনি সত্যবানকে নিয়ে চললেন। সাবিত্রীও তার পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন। পেছন পেছন সুন্দরী সাবিত্রীকে আসতে দেখে সাধু প্রধান মহাপুরুষ যমরাজ মধুর কণ্ঠে বললেন– হে সতী, তুমি কি তোমার স্বামীর সাথে যমলোকে যেতে চাও। কিন্তু পঞ্চভূতে যে

দেহ বিলীন হয় সেই দেহ নিয়ে যমরাজ্যে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। অতএব তোমাকে দেহত্যাগ করতে হবে।

হে সাবিত্রী! কর্ম করতেই সকলের জন্ম হয়। কর্ম ফুরিয়ে গেলে তার মৃত্যু হয়। সত্যবানও তার ব্যাতিক্রম নয়। নিজের কাজের ফলভোগ করতে সে এখন যমালয়ে যাচ্ছে। কর্মই সকল সংসারের সুখ, দুঃখ ভয়, শোক উৎপন্ন করে। যে রকম কাজ করে, তার ফল অনুসারে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, শ্রীহরির দাসত্ব লাভ করবে। কাজ অনুসারে সকল রকমের সিদ্ধি, অমরত্ব, আর বিষ্ণুর সালোক্য, প্রভৃতি চাররকমের মুক্তি লাভ সম্ভব। কর্মের ফলেই দেবত্ব, মনুত্ব, রাজেন্দ্রত্ব লাভ করে, কর্মের ফলে মানুষ ম্লেচ্ছ, শূদ্র, গাছ, পাহাড়, পশু, পাখি ইত্যাদি রূপে জন্ম গ্রহণ করে। ক্ষুদ্র জন্তু, কৃমি, সাপ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, কিন্নর, যক্ষ, কুস্মান্ড, প্রেত, বেতাল, পিশাচ, ডাকিনী, দৈত্য, দানব ও অসুর সবই কর্মফলের দোষে বা গুণে জীব প্রাপ্ত হয়। কর্মফল যেমন হয় সেই অনুসারে জীব সুন্দর রোগমুক্ত জীবন কাটায়, আবার কেউ আজীবন রোগ ভোগ করে। কেউ হয় অন্ধ, কেউবা বধির, কেউ কদাকার চেহারা প্রাপ্ত হয়, কেউ আবার পঙ্গু। সবই কর্মফল, স্বর্গে বা নরকে, যাওয়াও নির্ভর করে কর্মফলের উপর।

নিজের কর্মফল অনুসারে জীব চন্দ্রলোক, ইন্দ্রলোক বহ্নিলোক বা ফুলোক, বরুণলোক কুবেরলোক, শিবলোক, জললোক, তপোলোক, নক্ষত্রলোক, সত্যলোক, পাতাললোক প্রাপ্ত হয়। কর্মফল অনুসারে কেউ বৈকুণ্ঠে, কেউবা গোলোক বা কেউ ভারতবর্ষে গমন করে। কর্মফলেই কেউ কোটি কল্পবছর বছর বেঁচে থাকে, কেউ হয় স্বল্পায়ু হয় ক্ষণজীবী, কেউ গর্ভে থেকেই মারা যায়। হে দেবী! তোমাকে মহতত্ত্ব জ্ঞান দান করলাম। তোমার স্বামীও কর্মফলের দাস। অতএব, তুমি নির্দ্বিধায় নিজের গৃহে ফিরে যাও।

.

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

শ্রী নারায়ণ বলতে থাকেন–ধর্মরাজ যমের জ্ঞানবাক্য শ্রবণ করে সতী সাবিত্রী খুশি হলেন। তিনি ধর্মদেবতার স্তব করে প্রশ্ন তুলে ধরলেন। হে ধর্মরাজ! আমার মনে অনেকগুলো প্রশ্নের উদয় হয়েছে। আপনি অনুগ্রহ করে তার জবাব দিন। কর্মের বীজ কী আমি জানি না। মানুষের কোন কাজ ভালো আর কোন কাজ অমঙ্গলজনক তা আপনি বলেন। কর্ম উৎপন্ন হয় কীভাবে? এই কর্মফল ভোগকারী কে? সেই কর্মে কে প্রযুক্ত থাকে? দেহ ও দেহীর মধ্যে পার্থক্য কী বিজ্ঞান কাকে বলে? মন বা বুদ্ধির সংজ্ঞাই বা কী? দেহধারী প্রাণীদের মধ্যে

প্রাণের সঞ্চার ঘটে কীভাবে। ইন্দ্রগুলির লক্ষণ সম্পর্কে বলুন। এইসব ইন্দ্রিয়দের দেবতাদের নাম কি? কে প্রাণীকে আহার যোগান? আর কে সেই আহার গ্রহন করে? জীবের পরিচয় কি? ভোগ এবং ভোগের নিষ্কৃতিই বা কীভাবে ঘটে। পরমাত্মা কী?

যম বললেন– মঙ্গলদায়ী কর্মের কথা বেদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যা অশুভ, মঙ্গল দান করে না, তা বেদে ব্যক্ত হয়নি। অর্থাৎ তা অকর্ম। হরি ভক্তের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি কিছুই আক্রমণ করতে পারে না। সে মোক্ষ লাভ করে। একথা শাস্ত্র বলছে। সাধুব্যাক্তি বাসনা ও কামনাহীন হয়ে বিষ্ণুর সেবা করেন, যা তাদের সমস্ত কর্মকে নির্মূল করে এবং হরিভক্তি দান করে। শাস্ত্রজ্ঞ, পন্ডিত ব্যাক্তিবর্গ মুক্তিকে নির্বাণ ও মোক্ষ নামে চিহ্নিত করেছেন। বৈষ্ণবগণ হরিভক্তিরূপে মোক্ষ কামনা করেন এবং অন্যান্য সাধকরা নির্বাণের পথে মুক্তি পেতে চায়। প্রকৃতি থেকে শ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কর্মের বীজস্বরূপ, কর্মের ফলদাতা ও কর্মস্বরূপ। তিনিই কারণস্বরূপ। হে সতী সাবিত্রী। তিনিই সমস্ত কর্মের উৎপত্তির কারণ। জীব কর্মফল ভোগ করে। কিন্তু আত্মা থাকে নির্লিপ্ত। আত্মার প্রতিবিম্ব হল জীব অর্থাৎ দেহী পৃথিবী, বায়ু জল, আকাশ ও তেজ এই পাঁচটি ভুত পদার্থ ধারা দেহ গঠিত। যা নশ্বর ও নিত্য পরমাত্মা হলেন ভোজয়িতা। ঐশ্বর্যের নাম ভোগ আর ভোগ, থেকে নিষ্কৃতি লাভের মাধ্যমে মুক্তি ঘটে।

হে দেবী! সৎ নিত্য ও অসৎ অনিত্য। নানা ধরনের জ্ঞান আছে। রূপ, সার, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এইসব বিষয় সমুহ ভেদের বিভিন্ন বীজ। বিবেচনা করার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধি জ্ঞানস্বরূপা। প্রাণ, অপন, সমান, উদান ও ধ্যান- এই পাঁচটি প্রাণ দেহীদের বলস্বরূপ বায়ু বিশেষ। প্রাণীর দেহে যে মন থাকে তাকে দেখা যায় না। ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, সকল কাজে প্রেরণাদানকারী সেই মনকে দেহীরা নিরুপণ করতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা পাঁচ–চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক। এরা দেহীর অঙ্গস্বরূপও সমস্ত রকমের কাজের প্রেরণা জোগায়। এইসব ইন্দ্রিয় সকল কখনও দেহীর সাথে শত্রুতা বা মিত্রতা পাতায়, ফলে জীব সুর্য বা দুঃখের সাগরে পতিত হয়। সূর্য, বায়ু, পৃথিবী ইত্যাদির দেবতারা এইসব ইন্দ্রিয়ে অবস্থান করেন। যে প্রাণ ও দেহ এবং অন্যান্যদের পোষণ করে তাকেই বলা হয় জীব, প্রকৃতি থেকে যিনি শ্রেষ্ঠ নিজেই সমস্ত কারণের কারণ, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরমাত্মা। ও হে বৎস! তোমাকে জ্ঞানীদের জ্ঞান স্বরূপ সেই শাস্ত্র পাঠ করালাম। এবার তুমি নিজের বাসভবনে ফিরে যাও।

সতী সাবিত্রী বললেন, হে জ্ঞানী পন্ডিতজ্ঞানের সাগরে প্রিয় পতিকে ছেড়ে চলে যেতে হবে ধর্মরাজ। আপনি দয়া করে আর কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমার কৌতূহল দমন করুন। কী ভাবে মানুষ স্বর্গে বা নরকে গমন করে? কোন কর্মফলে জীব কোন কোন যোনিতে

জন্মলাভ করে? কীভাবে হরির পাদপদ্ম লাভ করা যায়? মুক্তি লাভের পন্থা কী? সুখ দুঃখই বা কীভাবে লাভ করা যায়? দীর্ঘায়ুর বা স্বল্পায়ুর অধিকারী মানুষ কীভাবে হয়? কেনই বা মানুষ পঙ্গু বা অন্ধ, বোবা, কালা হয়ে জন্মগ্রহণ করে? কোন কর্মফলের শাস্তি কেন বা মানুষ পাগল হয়? কেন বা কৃপণ বা দাতা হয়? কেন মানুষ খুন করতে পিছপা হয় না? কী করলে বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়? নিরাময় গোলোকে যাওয়ার পন্থা কী? নরকের সংখ্যা প্রকার ভেদ, নাম, নরক যন্ত্রণা ভোগের পদ্ধতি ইত্যাদি আমাকে ব্যাখ্যা করুন।

.

ষড়বিংশ অধ্যায়

সুতপুত্র বললেন– হে মনিষী, সতী সাবিত্রীর প্রশ্ন শুনে ধর্মরাজ যম অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। মাত্র বারো বছরের এক কিশোরীর জ্ঞান যে কোনো প্রাচীন জ্ঞানী ও যোগীকে হার মানায়। সাবিত্রী জানেন, তা নারায়ণের কথাতেই শুনুন।

নারায়ণ বললেন– হে নারদ! মৃদু হেসে যম তখন শুরু করলেন। তিনি বললেন– হে কল্যাণী! তুমি হলে লক্ষ্মীস্বরূপা। তোমার পিতা রাজা অশ্বপতি কন্যা লাভের আশায় সাবিত্রীর তপস্যা করেছিলেন। সেই তপস্যায় তুষ্ট হয়ে সাবিত্রীদেবী তাঁকে বর দান করেন। তুমি অশ্বপতির কন্যার রূপে জন্মগ্রহণ করেছ। তুমি হলে সতী শ্রেষ্ঠ। তুমি স্বামী সত্যবানের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যশালিনী হবে। তুমি হবে তার প্রিয়। ঠিক যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের কোলে শচী, কৃষ্ণের কোলে রাধা, নারায়ণের কোলে লক্ষ্মী, শিবের কোলে দুর্গা, গৌতমে অহল্যা, বশিষ্ঠে অরুন্ধতী, কশ্যপে অদিতি, চন্দ্রে রোহিনী, দিবাকরে সংজ্ঞা, বরুণে বরুণানী, যজ্ঞে দক্ষিণা। বরাহে ধরা, দেব সেনাপতি কার্তিকের কোলে অনুরক্ত, ঠিক তেমনই সত্যবানের প্রেয়সী তুমি, সাবিত্রী, হে বৎস! তুমি আর কী আমার থেকে আশা করো বলো, আমি তা পূরণ করব।

সাবিত্রী বললেন– হে পিতা যম! আপনি আমাকে এই আশীবাদ করুন, আমার স্বামীর ঔরসে আমি যেন একশো পুত্রের জননী হতে পারি। আর আমার বাবা একশো পুত্রের জনক হন। আমার শ্বশুর দৃষ্টি ও রাজ্য ফিরে পান। আমি আমার, স্বামী সত্যবানের সঙ্গে মর্ত্য ভূমিতে সন্তানাদি নিয়ে লক্ষ বছর কাটাতে পারি। তারপর আমরা দুজনে একত্রে হরির পাদপদ্মে ঠাঁই পেতে চাই। জীবের আগ্রহী।

মহাভাগ যম বললেন– হে মহাসতী। আমি তোমায় বর দান করছি। তুমি যা চাইছ, সব কামনা সিদ্ধ হবে। জীবের কর্মবিপাক সম্বন্ধে এবার শোনো। পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মে নিয়ে মানুষ ভালো মন্দ কাজ করে। শুধু মানুষ নয়, রাক্ষস, গন্ধর্ব, দৈত্য, দানব এমনকি দেবতারাও কর্মের অধীনস্থ দাস। কর্ম বিনা নিজের ইচ্ছেমতো জীবন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। পূর্বজন্মে কে কতখানি পাপ পূণ্য করেছে তা বিচার করেই কর্ম নির্দিষ্ট হয় এবং পরজন্মে তা ভোগ করতে হয়। বিশিষ্ট জীবরা এমনকি মানুষও সব যোনিতে জন্মলাভ করে। শুভ কর্ম করলে স্বর্গলোকের যাত্রী হওয়া যায়, পাপ করলে নরকবাস হয়। মুক্তি ব্যতীত কর্মভোগ নির্মূল করা সম্ভব নয়। নির্বাণ রূপ এবং হরির সেবারূপ– এই দুটি পন্থায় মুক্তি লাভ সম্ভব। কর্ম ফল যার যেমন, সে তেমন ভোগ করে, যেমন কেউ হয় ব্যাধিগ্রস্ত, কেউবা নীরোগ সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী, কেউবা দীর্ঘায়ু হয়ে জন্মায়, কেউ বা ক্ষণস্থায়ীত্ব লাভ করে, কেউ সুখী, কেউ দুঃখী, কেউ চক্ষুস্মান, কেউ চক্ষুহীন– প্রকৃতির নিয়ম শাস্ত্রীয় কর্মের ফলে সিদ্ধিলাভ হয়।

হে সত্যবান প্রিয়া! এই ভারতে সমস্ত জন্মের মধ্যে মানবজন্মই দুর্লভ। সমস্ত মানবজাতির চার বর্গের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত কাজে ব্রাহ্মণের অগ্রাধিকার। যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর দাস, সে হল ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ হল দুই ধরনের–সকাম ও নিষ্কাম। সকাম ভক্ত কর্মভোগ করতে চায় আর নিষ্কামরা হয় শান্ত উদ্বেগহীন। এরাই শ্রীহরির আসল ভক্ত। মৃত্যুর পর নিরাময় পরমপদে ঠাঁই পায়। দিব্যরূপে গোলোকে গমন করে এবং দুই হাত বিশিষ্ট পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার সুযোগ পায়।

যারা সকাম ভক্ত। তারা মৃত্যুর পর চতুর্ভুজ নারায়ণের সেবা করার সুযোগ পায় এবং দিব্যরূপে বৈকুণ্ঠে যায়। কিন্তু ফল ভোগ করার পর আবার জন্ম নেয়। ভারতের বুকে ব্রাহ্মণ হয়ে ফিরে আসে। কেননা তখনও তাদের কামনা বাসনার পরিতৃপ্তি ঘটেনি। যতক্ষণ না এরা নিষ্কাম হতে পারে, ততক্ষণ এরা বারে বারে জন্মলাভ করে। তীর্থে বসে যারা তপস্যা করেন, তাদের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু আবার তাদের জন্ম নিয়ে ভূলোকে ফিরে আসতে হয়। যারা তীর্থে বাস করে, অথচ তপস্যা করে না, তারা সত্যালোকে গমন করে এবং ফিরে আসে ভারতে। সূর্যের উপাসক যারা তারা তপস্যার বলে সূর্যালোক লাভ করে এবং যথা সময়ে আবার ভারতের মাটিতে জন্ম নেয়। যারা শিবশক্তি বা গণপতি গনেশের আরাধনা করে তারা শিবলোকে গেলেও আবার জন্ম নিতে বাধ্য হয়।

হে মহাসতী! যারা হরি শিব, শক্তি ও গণেশ ছাড়া অন্য কোনো দেবতার তপস্যা করে তারা ইন্দ্রলোকে গমন করলেও, আবার জন্ম নেয় ভারতে। যেসব ব্রাহ্মণ হরির প্রতি নিষ্কাম ভক্তি

প্রদর্শন করে, তাদের তপস্যা করার প্রয়োজন হয় না, তারা শ্রীহরি ধাম লাভ করে। স্বধর্ম পালন না করে অন্য ধর্মের প্রতি যে ব্রাহ্মণ বেশি আকৃষ্ট হয়, অনাচার করে, তাহলে তাকে নরকে যেতেই হবে– একথা তোমাকে আমি নিঃসন্দেহে বলে দিতে পারি। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা হচ্ছে। নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন না করে অন্য ধর্ম পালন করলেও নরকে যেতে হয়। যদি কোন ব্রাহ্মণ স্বধর্ম ব্রাহ্মণের সাথে কন্যার বিয়ে দেয়, তাহলে তার চন্দ্রালোকে যাত্রা হয়। সেখানে চোদ্দ জন ইন্দ্রের আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বাস করা যায়।

ব্রাহ্মণকে ঘি, চাল, কাপড়, তামা, ফলমূল, জল ইত্যাদি দান করলে দাতা পূণ্য লাভ করেন এবং সেই পূণ্যের জোরেই সে বিষ্ণুলোকে এক মন্বন্তর সময় কাটাতে পারে। সোনা, তামা, গোরু ইত্যাদি দিয়ে যদি একজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মনকে দান করা হয়, তাহলে সেই পূণ্যে সূর্যালোকে অযূত বছর কাটানো সম্ভব। সে হবে জরাব্যাবিমুক্ত, জমি ও প্রচুর ধান ব্রাহ্মণকে দান করার ফলে সেই পুণ্যবান বিষ্ণুধামে গমন করে। চন্দ্র ও সূর্য যতদিন না অদৃশ্য হবে, ততদিন শ্বেতদ্বীপে সে বসবাস করবে। যে দেবতার উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি দান করা হয়, মৃত্যুর পর সেই দেবলোকে সে যাত্রা করেও অনেক বছর সেখানে থাকতে পারে। ঘর বাড়ি দান করার ফলে যতখানি পূণ্য লাভ হয়, সৌধ দান করলে তার চারগুণ, পূর্তদানে একশো গুণ লাভ হয়ে থাকে। উৎকৃষ্ট জলাশয় দান করলে তার থেকেও আটগুণ ফল লাভ করা যায়। জীবের উদ্দেশ্য জলাশয় খনন করার ফলে অযুত বছর জনলোকে বাস করা যায়। সেতুদান করলে পুকুর দানের সমান ফল লাভ করা যায়।

দৈর্ঘ্যে প্রস্থে চার হাজার ক্ষেত্র বিশিষ্ট পুকুরকে বাপী বলে। এই ধরণের পুকুর দান করার ফলে সাধারণ পুকুরের থেকে একশো গুণ বেশি পুণ্য হয়। দশটা বাপী দান করে যে ফল পাওয়া যায়, তা সৎপাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদানের ফলের সমান। আবার মেয়েকে যদি স্বর্ণালংকারে সজ্জিত করে উত্তম বরের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাহলে দ্বিগুণ ফল লাভ করা সম্ভব। পুকুর থেকে পাক তোলা আর পুকুর দান করার ফল সমান। অশ্বত্থ গাছ রোপন করার ফলে অযুত বছর তপোলোকে বাস করা যায়। মানুষের মনোরঞ্জনের উপকারের উদ্দেশে ফুলের বাগান দান করলে ধ্রুবলোকে যাওয়া যায়। সেখানে অযুত বছর বাস করা যায়। বিষ্ণুর নাম স্মরণ করে যে বিমান দান করে, সেই পূণ্যবান দাতা এক মন্বন্তর বিষ্ণুলোকে কাটাতে পারে। শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশে ভক্তি সহকারে দোলমন্দির দান করার ফলে বিষ্ণুলোকে গমন হয় এবং এক মন্বন্তর সেখানে থাকতে পারে।

হে পতিব্রতা নারী, রাজপথে মস্তবড়ো প্রাসাদ তৈরী করলে ইন্দ্রলোক লাভ হয়। অযুতকাল পর্যন্ত সেখানে নিশ্চিন্তে অতিবাহিত করা যায়। দেবতাকে দান করলে যে ফলপাওয়া যায়, ব্রাহ্মণকে দান করলেও সেই একই ফল লাভ হয়। দান করার ফলেই পরে ভোগ করা সম্ভব। কিন্তু যা দান করা হয়নি তা কখনোই লাভ করা সম্ভব নয়। পুণ্যবান ব্রাহ্মণ স্বর্গ সুখ ভোগ করে আবার ভারতের মাটিতেই ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নেন। পুণ্য কাজ করার ফলে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি আবার ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বংশে জন্ম লাভ করে। ব্রাহ্মণরা নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। সেখানে কর্মফল ভোগ করার পর আবার ব্রাহ্মণ কুলে জন্মায়। অভুক্ত কর্মের বিনাশ হয় না, শতকোটি কল্প সময় ধরেও তা ক্ষয় লাভ করে না। তাই নিজের ভালো বা মন্দ কাজের ফল নিজেকেই ভোগ করতে হয়। অন্য কেউ এ ভার গ্রহণ করে না, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য শত কোটি কল্প তপস্যা করলেও ব্রাহ্মণ কুলে জন্মাতে পারে না। বহু জন্ম ধরে দেবতাদের তীর্থ ভ্রমণের মাধ্যমেই শুদ্ধি লাভ ঘটে। বেদ ও পুরাণাদির অত্যন্ত দূর্বল ও গোপন তত্ত্ব জ্ঞান তোমাকে শোনালাম। আর কোনো প্রশ্ন আছে তোমার?

সাবিত্রী বললেন– হে ধর্মরাজ! আর কী কী কাজের ফলে মানুষ পাপ-পুণ্যের ভাগীদার হয়ে স্বর্গ বা নরকে যায়, তা বিশদে বলুন।

.

সপ্তবিংশ অধ্যায়

যম বললেন– হে সাবিত্রী! যা সকলের কাছে প্রার্থিত এবং সর্বসম্মত বলে সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই কর্ম বিপাকের সম্বন্ধে তোমাকে তত্ত্বদান করছি। শোনো, ভারতের কোনো ব্রাহ্মণকে অন্নদান করলে ইন্দ্রলোকে সে গমন করে। দুধেল গাই-গোরু দান করার ফলে বৈকুণ্ঠে যাত্রা হয় এবং গরুর লোম সংখ্যক সেখানে সুখে কাল যাপন করা যায়। এই দান তীর্থে করলে শত গুণ আর নারায়ণ ক্ষেত্রে দান করলে কোটি গুন এবং কোনো পূণ্য দিনে দান করলে চার গুণ ফল লাভ করা সম্ভব। আসন দিয়ে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে নিবেদন করলে অযুত বছর বহ্নিলোকে থাক যায়। শালগ্রামশিলা সহ বস্ত্র দান করলে চন্দ্র ও সূর্যের আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বৈকুণ্ঠ ধামে বাস করা যায়। সুন্দর ছাতা দান করার ফলে দশ হাজার বছর ধরে বায়ুলোকে সুখে কালযাপন করা যায়। উত্তম শয্যা দান করলে দাতা চন্দ্রলোকে গমন করবে। এবং চন্দ্র সূর্য যতদিন থাকবে ততদিন বাস করতে পারবে। দেবতা ও ব্রাহ্মণকে প্রদীপ দান করার ফলে ব্রহ্মলোকে এক মনুর সময় পর্যন্ত সাদরে থাকতে পারে। পরের জন্মে সে চক্ষুষ্মন হয়। পুণ্যের ফলে সে আর

যমলোকে যায় না। ব্রাহ্মণকে হাতি দান করলে ইন্দ্রের পরমায়ু পর্যন্ত তার অর্ধেক আসন লাভ হয়।

হে দেবী! যে লোক ব্রাহ্মণকে অশ্বদান করে সন্তুষ্ট করে সে পুণ্যের ফলে বরুণলোকে যায়, সেখানে চৌদ্দজন ইন্দ্রের সময়কাল পর্যন্ত সুখে অতিবাহিত করে। উৎকৃষ্ট শিবিকা দানের ফলে বিষ্ণুলোকে গমন হয় এবং এক মন্বন্তর কাল থাকতে পারে। পাখা ও সাদা চামর ব্রাহ্মণকে দান করার ফলে দানী ব্যক্তি বায়ুলোকে দশ হাজার বছর আনন্দে কাটাবে। পর্বত প্রমাণ ধান দান করার ফলে বিষ্ণুলোকে আদর পায় এবং যত ধান তত বছর সেখানে থাকে। পরে নিজের যোনিতে জন্মলাভ করে চিরজীবী ও সুখী হয়। ধান দাতা ও গ্রহীতা–দুজনেই বৈকুণ্ঠে যেতে পারে। হরিনাম জপ যে সর্বদা করে গরুড়কে দেখে সাপ যেমন পালিয়ে যায়, তেমনই মৃত্যু তার ধারে ঘেঁষতে পারে না। যে লোক ভারতে পূর্ণিমা রাতের শেষে শ্রীহরির দোলোৎসব করে, সে হয় জীবন্মুক্ত। জগতের সুখ ভোগ করে যায় বিষ্ণুভবনে।

সেখানে নিশ্চয়ই শত মন্বন্তর কাল পর্যন্ত পূজো পায়। উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে যদি দোলোৎসব পালিত হয়, তাহলে ফল পাওয়া যায় দ্বিগুণ। কল্পান্ত পর্যন্ত তার আয়ু হয়। তিল দান করার ফলে তিল পরিমাণ সময় কাল পর্যন্ত বিষ্ণুধামে নিশ্চিন্তে বাস করা যায়। পরে সে নিজের যোনিতে জন্ম নেয় এবং সুখে চিরজীবন কাটায়। তামার পাত্রে ওই তিল দান করলে দ্বিগুণ ফল পাওয়া যায়। নিজের মস্তবড়ো বাড়ি, শস্য পূর্ণ ক্ষেত এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ব্রাহ্মণকে দান করার ফলে কুবেরলোকে যাত্রা হয়। সেখানে এক মন্বন্তর কাল সুখে কাটিয়ে নিজের যোনিতে মহান ও ধনবান রূপে জন্ম গ্রহণ করে। শস্য সমেত জমি দান করলে শত মনুর কাল পর্যন্ত বৈকুণ্ঠ ধামে আনন্দে কাটাতে পারে। পরে নিজের যোনিতে জন্ম নিয়ে মহান ও ধনবান হয়। সে হয় পুত্রবান। রাজা হয়ে প্রজাবৃন্দের সঙ্গে দীর্ঘকাল সুখে অতিবাহিত করে।

হে কল্যাণী! প্রজা সমেত উত্তম একটি গ্রাম দান করার ফলে বৈকুণ্ঠে গমন হয়। সেখানে লক্ষ মন্বন্তর আদরে থাকে। পরে নিজের যোনিতে জন্ম লাভ করে। সে হয় লক্ষ গ্রামের পতি। সেইসব গ্রাম লক্ষ জন্ম পর্যন্ত তাকে ত্যাগ করে না। যে তোক ভারতে ব্রাহ্মণকে সমস্ত অলংকার সহ পতিব্রতা স্ত্রী ও ভোগ্যা সুন্দরী দান করে, সে নিঃসন্দেহে, চৌদ্দজন ইন্দ্রের সময় পর্যন্ত ইন্দ্রলোকে আনন্দে অতিবাহিত করে। অপ্সরাদের সঙ্গে সুখ ভোগ করার সুযোগ পায়। চন্দ্রলোক থেকে সে গন্ধর্ব লোকে যায়। সেখানে দশ হাজার বছর বাস করে। দিনরাত উর্বশীর সঙ্গে সকৌতুকে মেতে ওঠে। পরে সে নিজের যোনিতে জন্ম নেয়।

সতী সাধ্বী ও সৌভাগ্যবতী সুন্দরী প্রিয়ংবদা পত্নী লাভ করে। হাজার জন্ম পর্যন্ত সেই পত্নী তাকে ত্যাগ করে না। গাছপালা, বহু সংখ্যক পুকুর, পাকা শস্যক্ষেত, ফল ও ফুলের বাগানসহ নগর ব্রাহ্মণকে দান করলে বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়। সেখানে দশ লক্ষ পর্যন্ত সুখে কাটিয়ে আবার নিজের যোনিতে জন্ম নিয়ে মহারাজ হওয়া যায় এবং দশ লক্ষ নগর লাভ করা সম্ভব। দশ হাজার জন্ম পর্যন্ত সে সুখ ভোগ করতে পারে। সে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী। যে লোক ভারতে ব্রাহ্মণকে ফল সমেত গাছ দান করে, সে ফলসংখ্যক বছর ইন্দ্রলোকে পূজা পায়। পরে নিজের যোনিতে জন্ম নেয়। সে হয় পুত্রবান, কেবল ফলদান করলে বহু বছর স্বর্গে বাস করার পরে আবার ভারতে জন্ম নেয়। বাগী ও পুকুর, অসংখ্য গাছপালা ও উত্তম প্রজাসহ শত নগর ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণকে যে ব্যাক্তি দান করে সে কোটি মন্বন্তর কাল বৈকুণ্ঠে আদর পায়। পরে নিজের যোনিতে জন্ম নিয়ে ফিরে আসে, সে হয় জম্বুদ্বীপের রাজা এবং ইন্দ্রের সমান সম্পদের অধিকারী। কোটি জন্ম পর্যন্ত সে পৃথিবীতে থাকে। সে মহারাজ হয়ে কল্পান্ত কাল পর্যন্ত সুখভোগ করে।

হে মহাসতী, জম্বুদ্বীপ ব্রাহ্মণকে দান করলে এর থেকে একশো গুণ বেশি ফল লাভ করা যায়। যারা সমস্ত তীর্থের সেবা, সমস্ত তপস্যা, সমস্ত উপপাসব্রতের ফল, অন্যান্য সামগ্রী, সাতটি দ্বীপ সহ পৃথিবী দান করে, তাদেরও আবার ভারতে জন্ম হয়। সংসারের সুখ দুঃখ ভোগ করতে হয়। কিন্তু বিষ্ণু ভক্তরা এর ব্যতিক্রম। তারা আর জন্ম নেয় না। বিষ্ণু মন্ত্রের উপাসক বৈষ্ণবরা মানবদেহ ত্যাগ করে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুরহিত হয়ে দিব্যরূপ প্রাপ্ত হয়। তারা বিষ্ণুর রূপ সৌন্দর্য পান করে এবং বিষ্ণুর সেবায় কাল কাটায়। এই সময় যত প্রকৃতিলয় হয়, সব গোলকে বসেই তারা প্রত্যক্ষ করে, প্রকৃতিলয়ের সাথে সাথে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হয়। কিন্তু যাঁরা বিষ্ণুভক্ত, তারা জন্ম, মৃত্যু ও জরা শূণ্য হয়ে কৃষ্ণের চরণে অবস্থান করেন। তাদের বিনাশ ঘটে না।

কার্তিক মাসে ভক্তি ভরে যে শ্রীহরিকে তুলসী নিবেদন করে সে হরি ভবনে ঠাঁই পায়। পাতার সংখ্যা সমান যুগ ধরে সে সুখে বাস করে। তারপর আবার ভূলোকে ফিরে আসে। নিজের যোনিতে জন্ম নিয়ে সুখী ও চিরজীবন লাভ করে। সে হরিদাস্য হয়। ওই মাসে শ্রীহরি উদ্দেশ্যে ঘিয়ের প্রদীপ দান করলে যত সময় ধরে প্রদীপ জ্বলবে সেই পলপরিমিত বছর সে হরিভবনে সুখ অতিবাহিত করে। আবার সে নিজের কুলে জন্ম লাভ করে। সে নিঃসন্দেহে মহাধনশালীতা চক্ষুষ্মান ও প্রতাপযুক্ত হয় এবং হরিভক্তি লাভ করে। যে লোক মাঘ মাসে ব্রাহ্ম মূহুর্তে গঙ্গাস্নান করে সে বিষ্ণুর সঙ্গী হয়। ষাট হাজার যুগ ধরে সে পুজো পায়। তারপর ফিরে আসে জন্ম নিয়ে। শ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় ব্যাক্তিতে পরিণত হয় এবং অবশ্যই হরিভক্তি লাভ

করে। ওই মাসে ওই সময় প্রয়াগে গঙ্গাস্নান করলে লক্ষ মন্বন্তর কাল পর্যন্ত শ্রীবৈকুণ্ঠে আনন্দে বসবাস করা যায়। তারপর আবার নিজের কুলে জন্ম নিয়ে বিষ্ণুভক্ত হয়। মৃত্যুর পর আবার শ্রীহরি ধামে যাত্রা করে, তাকে আর সংসার যাতনা সহ্য করতে হয় না। সে হয় শ্রীহরির দাস। রোজ গঙ্গায় ডুব দিয়ে স্নান করলে সূর্যের মতো পবিত্রতা লাভ করা যায়। অশ্বমেধ যজ্ঞ করে যে ফলপাওয়া যায় তার সমান ফলপ্রাপ্তি ঘটে। সে যেখানে যায় সেই স্থান পবিত্র হয়। তাকে ছোঁয়ার জন্য সকলে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। সে সানন্দে বৈকুণ্ঠে অবস্থান করে চন্দ্র ও সূর্য উদিত হওয়ার কাল পর্যন্ত। তারপর নিজের কুলে জন্ম নেয়। সে হয় মহাতপস্বী, নিজের ধর্ম পালন করে শুদ্ধ, বিদ্বান ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে ওঠে।

গ্রীষ্মকালে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়– এই তিন মাস সূর্যের প্রচন্ড তাপে চারদিক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই সময় সুবাসিত ঠান্ডা জল যে দান করে সে সানন্দে বৈকুণ্ঠে গমন করে। চোদ্দজন ইন্দ্রের সময়কাল পর্যন্ত সেখানে সুখভোগ করে। তারপর নিজের বংশে জন্ম নিয়ে সুখে জীবন কাটায়, সে হয় সৎ ও ধনী। বৈশাখ মাসে চন্দন দান করলে ষাট হাজার যুগ ধরে বিষ্ণুধামে বাস করা যায়। তারপর নিজের কুলে জন্ম গ্রহণ করে রূপবান ও সুখী হওয়া যায়।

ভগাবন শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর ব্রত পালন করে শত জন্মের পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সে বৈকুণ্ঠের সুখ ভোগ করে। চোদ্দজন ইন্দ্রের পরামায়ুকাল পর্যন্ত কাটিয়ে ফিরে আসে নতুন জন্ম নিয়ে নিজের যোনিতে। সে হরি ভক্তি লাভ করে। শিবরাত্রির ব্রত পালন করার ফলে শিবলোকে সুখ ভোগ করা যায়। সাতজন মনুর আয়ুষ্কাল পর্যন্ত সে সেখানেই কাটাতে পারে। আর শিবকে ওই দিনে বেলপাতা নিবেদন করলে বেলপাতার সংখ্যা সমান যুগ ধরে শিবলোকে আনন্দে থাকা যায়, তারপর নিজের কুলে ফিরে আসে আর একজন্ম নিয়ে। সে হয় বিদ্বান, পুত্রবান, ধনবান এবং প্রজাবৎসল রাজা। মাঘ বা চৈত্র মাসে শিবের পূজো করে ব্রত উদযাপন করলে, ব্রত পালনের সংখ্যা যুগ পর্যন্ত শিবলোকে আদরে কাটাতে পারে।

যে লোক এই পূণ্য ভূমি ভারতবর্ষে ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি থেকে এক পক্ষকাল ধরে ভক্তিভরে রোজ উত্তম ষোলোটি উপাচারে মহালক্ষীর পূজো করে, সে সূর্য-চন্দ্রের স্থায়িত্ব পর্যন্ত বৈকুণ্ঠে পূজো পায়। পরের জন্ম নেয় নিজের জাতিতে। তখন সে হয় রাজার রাজা। শ্রীরামনবমী ব্রত পালন করে যে ভক্তিভরে পূজো করে সে বিষ্ণু মন্দিরে গমন করে। সাতজন মনুর সময়কাল পর্যন্ত সেখানে আনন্দে অতিবাহিত করে। পরে নিজের যোনিতে জন্ম নেয়। সে রামভক্তি লাভ করে। সে হয় মহান ও ধার্মিক এবং শ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয়। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্দশীতে ভক্তি সহকারে যে সাবিত্রীদেবী পূজো করে সে ব্রহ্মালোকে পূজো পায়।

সাতজন মনুর সময় পর্যন্ত সুখ ভোগ করে ফিরে আসে নতুন জন্ম নিয়ে আপন কুলে। সে মহা বিক্রমশালী, বিদ্বান এবং ধনবান হয়। তাকে পৃথিবী ত্যাগ করে না। রবিবার সূর্য সংক্রান্তি ও শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে যে বিধি মেনে সূর্যের উপাসনা করে, হবিষ্যান্ন আহার করে, সে সূর্যালোকে আপন সম্মানে বাস করে। সূর্য ও চন্দ্রের স্থায়িত্ব পর্যন্ত সেখানে কাটায়। তারপর জন্ম নিয়ে পূণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে ফিরে আসে। সে হয়, নীরোগ এবং ধনবান। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে নিয়মানুসারে ষোলোটি উপাচার নিবেদন করে সরস্বতী দেবীর পূজো করলে বৈকুণ্ঠধামে সসম্মানে বাস করা যায়। ব্রহ্মার দিনরাতি পরিমাণকাল পর্যন্ত সেখানে বাস করে নতুন জন্ম নিয়ে কবি ও বিদ্বান হয়। যে লোক রোজ ব্রাহ্মণদের সোনা ও গোরু দান করে এবং আজীবন ওই দানধ্যান করে ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করেছে সে সহজেই বিষ্ণু মন্দিরে স্থান পায়। গোরুর লোম পরিমিত বছরের দ্বিগুন বছর শ্রীহরির পার্ষদ থাকে। তারপর নতুন জন্ম নিয়ে নিজের জাতিতে ফিরে এসে অনেক রাজ্যের রাজা হয়। বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ করে সে হয় পুত্রবান। প্রত্যহ শালগ্রামশিলা পূজো করে তার চরণামৃত পান করে একশো বৎসর আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বৈকুণ্ঠে শ্রদ্ধার সঙ্গে বাস করা যায়।

তারপর নিজের বংশে জন্মগ্রহণ করে সে অবশ্যই শ্রীহরি ভক্তি লাভ করে। বিষ্ণুলোকে পূজো পায়। তাকে আর সংসারের কালপাকে ফিরে আসতে হয় না। পৃথিবীর সমস্ত তীর্থে যে লোক স্নান। করে তার নির্বাণ লাভ হয়, সে ভারতে আর ফিরে আসে না। সমস্তরকম তপস্যা ও ব্রত ভারতের যে লোক পালন করে সে বৈকুণ্ঠে চোদ্দজন ইন্দ্রের পরমায়ুকাল পর্যন্ত সুখভোগ করে ফিরে আসে নিজের কুলে এবং রাজরাজেশ্বর হয়। তারপর তার মোক্ষলাভ হয়। আর জন্ম নিতে হয় না।

ব্রাহ্মণকে মিষ্টি খাওয়ালে যে পূণ্য হয়, তার ফলে ব্রাহ্মণের লোমপরিমিত বছর বিষ্ণুমন্দিরে পূজো পাওয়া যায়। তারপর নতুন জন্ম হয়। সে অবশ্যই হরিদাস্য লাভ করে। নারায়ণক্ষেত্রে এই ধরনের দান করলে ফল লাভ হয় কোটি গুণ, আর যে নারায়ণক্ষেত্রে কোটিবার হরিনাম জপ করে তার সমস্ত পাপের বিনাশ ঘটে।

সে বিষ্ণুর পার্ষদ হয় সে বৈকুণ্ঠে কাল অতিবাহিত করে। তাকে আর জন্ম নিতে হয় না। যে ভারতের পূণ্য ভূমিতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে আমরণ প্রত্যহ পূজো করে, সে শিবলোক প্রাপ্ত হয়, মাটির ধূলো পরিমান বছর সেখানে কাটিয়ে আবার ফিরে আসে, সে রাজ্য লাভ করে সুখে দিন কাটায়। রাজসূয় যজ্ঞ করে সে ঘোড়ার লোম সংখ্যার চারগুণ বছর ইন্দ্রের অর্ধেক আসন লাভ করে। আর অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয় একগুণ। নরমেধ বা গোমেধ যজ্ঞ করলে

অশ্বমেধের অর্ধেক ফল পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণযজ্ঞ ও বৃদ্ধি যাগ করলে গোমেধযজ্ঞের সমান এবং পদ্মযজ্ঞের ফলে তার অর্ধেক লাভ হয়। বিজয়যজ্ঞের ফলে রাজা বিজয়ী হন এবং পদ্মযজ্ঞের সমান স্বর্গ ভোগ করেন। প্রজালাভ ও ভূমি বৃদ্ধির জন্য রাজা প্রাজাপত্য যজ্ঞ করেন। রাজলক্ষী এখানে সুস্থির থাকেন।

হে কল্যাণী। ব্রহ্মা মহা ধুমধাম করে যে যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, তার নাম বিষ্ণুযজ্ঞ। সমস্ত যজ্ঞের প্রধান এই যজ্ঞকে কেন্দ্র করে শিব ও দক্ষের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রাহ্মণরা নন্দীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। নন্দীও রেগে পাল্টা অভিশাপ তাদের দিয়েছিলেন। তাই প্রজাপতি দক্ষ পরে বিষ্ণু যজ্ঞের আয়োজন করলে শিব ওই যজ্ঞ নষ্ট করে দিয়েছিলেন। হাজার রাজসূয় যজ্ঞের সমান ফলদায়ক এই বিষ্ণুযজ্ঞ। ধর্ম, কর্দম, কশ্যপ, মনু, তার ছেলে প্রিয়ব্রত, শিব, সনৎকুমার অনন্ত, কপিল ও ধ্রুব এই যজ্ঞ করেছিলেন। বস্তুত এমন কোন দ্বিতীয় যজ্ঞ নেই, যা বিষ্ণুযজ্ঞের সমান ফলদায়িনী। এই যজ্ঞ করলে জ্ঞান ও তপস্যায় বিষ্ণুর সমান হওয়া যায়। সে হয় জীবন্মুক্ত। দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু, ধর্মাত্মার মধ্যে শিব, তীর্থের মধ্যে গঙ্গা, ফুলের মধ্যে তুলসী, স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃতি, নক্ষত্রের মধ্যে চাঁদ, পাখির মধ্যে গরুড়, আধারের মধ্যে বসুন্ধরা, বনের মধ্যে বৃন্দাবন, বর্ষের মধ্যে ভারত, পবিত্রদের মধ্যে বৈষ্ণব, ব্রতের মধ্যে একাদশী, দ্রুতগামী চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, শ্রীসম্পদের মধ্যে লক্ষ্মী, পতিব্রতাদের মধ্যে দুর্গা, সৌভাগ্যবতীদের মধ্যে রাধা, পন্ডিতদের মধ্যে সরস্বতী, ঠিক তেমনই সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে বিষ্ণুযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ এক বিষ্ণুযজ্ঞের সমান ফলদায়ক। সমস্ত তীর্থে স্নান, সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষা, সমস্ত বেদ ও তপস্যার আচরন পালন করা, চারবেদ পাঠ, পৃথিবী ভ্রমণ– এইসব শুভ কাজের কারনে যে ফল প্রাপ্ত হয় তা এক কৃষ্ণ সেবার সমান। শ্রীহরির সেবার মাধ্যমে হরি মন্দিরে যাওয়া যায় এবং মুক্তি লাভ হয়, সমস্ত কাজের মধ্যে যা প্রধান, সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবার কথা বেদ ও পুরাণাদিতে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা তার ধ্যান ও নামগুণের কীর্তন, তার স্তবপাঠ, স্মরণ, বন্দনা, উপাসনা, জপ, ধ্যান, তাঁর চরণামৃত জল ও প্রসাদ খাওয়া– সবই বেদে রচিত হয়েছে। তাই বলছি বাছা, স্বামীকে নিয়ে গৃহে ফিরে যাও, যিনি পরমব্রহ্ম, পরমেশ্বর, নির্গুণ প্রকৃতি থেকে শ্রেষ্ঠ, সেই পরমাত্মার পূজো করো। সুখে কালাতিপাত করো।

.

অষ্টবিংশ অধ্যায়

নারায়ণ বলেছেন- হে নারদ! ধর্মরাজ যমের মুখে শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্তি শুনে আনন্দে সাবিত্রীর চোখে জল এল। তিনি চোখ মুছে বললেন– হে ভগবান! হরির নামের মাহাত্ম কথা শুনে আমি বড়োই অভিভূত হয়েছি। বুঝেছি, এ এমন এক নাম, যার কাছে সমস্ত দানধ্যান, ব্রতসিদ্ধি, তপস্যা, শ্রেষ্ঠ বেদ, মোক্ষ, সিদ্ধি, সবই তুচ্ছমাত্র। এই নামকীর্তন যে শোনে এবং যে বলে, উভয়েই পুণ্য লাভ করে। জন্ম, জরা মৃত্যু-কোনোটাই তাদের স্পর্শ করতে পারেনা। হে বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ! আমার মতো এক সাধারণ নারী কিভাবে সেই পরমাত্মা শ্রী কৃষ্ণের পূজো করবে, আপনি বলে দিন। শুভ ও মঙ্গলদায়ক কাজের পরিনাম কি হতে পারে, তা আপনি আমাকে শুনিয়েছেন। কিন্তু খারাপ কাজ করলে কী ফল লাভ হয়, তা বলেননি, আমাকে তা বিশদে বলুন।

সাবিত্রী এবার ধর্মরাজের পায়ের সামনে মাথা হেঁট করে বসলেন, তারপর ধর্মরাজের বন্দনা করলেন, বেদোক্ত মন্ত্রে সাবিত্রী স্তুতি শুরু করলেন পুরাকালে পুষ্কর তীর্থে ধর্মের আরাধনা করে সূর্যদেব যে পুত্র লাভ করেছিলেন, যিনি ধর্মের অংশ স্বরূপ, যিনি ধর্মরাজ আমি তাকে প্রণাম জানাই, যিনি সমস্ত কাজের সাক্ষীস্বরূপ, যিনি জগতের সমস্ত প্রাণীর কাজের অনুরূপ কালে অন্ত করে থাকেন, যিনি কৃত্যন্ত, তাকে আমি প্রণাম করি। যিনি সমস্ত কাজের শাসক, যিনি পাপীদের শুদ্ধির জন্য শাস্তির বিধান দেন এবং দন্ড ধারণ করেন, সেই দন্ডধরকে নমস্কার করি। সমস্ত জীবের কর্মফল যিনি, তপস্বী, বিষ্ণুর দাস, যিনি সংযমী, ধার্মিক সেই জিতেন্দ্রিয়কে পজো করি, সেই দুর্নিবার যমকে প্রণাম করি, যিনি সকলের আয়ুক্ষয় করেন, যিনি পরমব্রহ্মের ভক্ত, যিনি ব্রহ্মতেজস্বরূপ আমি সেই ব্রহ্ম বংশজাত ধর্মরাজ যমকে প্রণাম নিবেদন করি, হে স্বাত্মাসম, সর্বজ্ঞ, পুণ্যমিত্র, আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

সাবিত্রী স্তবে সন্তুষ্ট হলেন যমরাজ। সাবিত্রী তাঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন, যম তাঁকে বিষ্ণুর ভজনা ও কর্ম বিপাক সম্বন্ধে উপদেশ দান করলেন। তারপর বললেন– এই আটটি স্তব রোজ ভোরবেলায় যে আমাকে স্মরণ করে পাঠ করে তার যমভয় দূর হয়ে যায়, যমমন্ত্র সমস্ত পাপনাশক।

.

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

নারায়ণ বললেন– হে নারদ, ভক্তি সহকারে কোনো পাপাত্মা যদি বেদোক্ত আটটি স্তব রোজ কীর্তন করে, তাহলে যমরাজ তার প্রতি সদয় হন। কায়ব্যুহ’ এর সাহায্যে তার সমস্ত পাপের বিনাশ ঘটান এবং তাকে পবিত্রতা দান করেন।

যমরাজ মন্দ কাজের পরিণতি সম্পর্কে সতী সাবিত্রীকে কী বলেছিলেন তা শোনো এবার।

যমরাজ বললেন– হে সতী, ভালো কাজের ভালো ফল পাওয়া যায়। আর যা অশুভ, তা অমঙ্গলজনক। অর্থাৎ নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। বিস্তৃত, গভীর, ভয়ংকর, বিকট, বীভৎস ও প্রাণীদের যন্ত্রণাদানকারী নরক কুন্ডের সংখ্যা অনেক। তবে বেদে যেসব নরকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর নাম বলছি, শোনো– তপ্তকুন্ড, ক্ষরকুন্ড, বহ্নিকুন্ড, মূত্রকুন্ড, বিটকুন্ড, শ্লেষ্মকুন্ড, গরকুন্ড, বসাকুন্ড, অসৃককুন্ড, শুক্রকুন্ড, অকুন্ড, দূষিকাকুন্ড, গাত্রমলকুন্ড, কর্ণাবিটকুন্ড, দন্ডকুন্ড, কৃমিকুন্ড, নখকুন্ড, ঘর্মকুন্ড, লোহারকুন্ড, কেশকুন্ড, সর্পকুন্ড, দন্তকুন্ড, তপ্ত তেলেরকুন্ড, তপ্ত সুরাকুন্ড, লবণকুন্ড, মশককুন্ড, বজ্র দংষ্ট্রকুন্ড, কাককুন্ড, গোলকুন্ড, খড়গকুন্ড, পাষাণকুন্ড, বজ্রকুন্ড, লালকুন্ড, অসিকুন্ড, চূর্ণকুন্ড, চক্রকুন্ড, কুর্মকুন্ড, বক্রকুন্ড, জ্বালাকুন্ড, ভীমকুন্ড, তপ্তশূর্মি, বাজকুন্ড, সঞ্চানকুন্ড, নকুন্ড, শূলকুন্ড, শরকুন্ড, পূতিকুন্ড, গোধাকুন্ড, প্রাতকুন্ড, গোধাকুন্ড, সূচীমুখ, গজদংশ, গোমুখ, কুম্ভীপাক, কালমূত্র, অরুন্তুদ, অবটোদ, দন্ডতারণ, জালবন্ধ, নাগবেষ্টন, জিম্ভ, দেহচূর্ণ, দলন, শোষণ, কষ, পূতিলামুখ, প্রকম্পন, ধূমান্ধ, পাশবেষ্ট, পাংশুভোজ, শূলপোত ইত্যাদি। পাপীরা নিজে নিজ কর্মফল অনুযায়ী এইসব নরকে নিক্ষিপ্ত হয় এবং যন্ত্রনা ভোগ করে।

এইসব কুন্ড রক্ষার দায়িত্বে আছে আমারই নিযুক্ত কিঙ্করের দল। এরা প্রয়োজনমতো যোগবলে নানারকম বেশ ধারণ করতে পারে। এদের চোখ ও গায়ের রং তামার মতো পিঙ্গল। এরা দয়ামায়াহীন, দুর্নিবার তেজস্বী ও নির্ভয়। এইসব মদমত্ত যমদূতদের তারাই দেখতে পায়, যারা পাপের ঘড়া পূর্ণ করে মৃত্যুর দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু যারা শিব, শক্তি, সূর্য এবং গণেশের উপাসক এবং যারা পূণ্যকর্ম করে সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁদের চোখে ওইসব মৃত্যুদূতরা অদৃশ্য থাকে। শক্তিমান ও নির্ভীক বৈষ্ণবরা তা কল্পনাও করতে পারে না।

.

ত্রিংশ অধ্যায়

নারায়ণ বললেন– হে মহর্ষি নারদ! যম যে সমস্ত নরক কুণ্ডের কথা বললেন–যেখানে পাপীরা তাদের কর্মফল অনুযায়ী নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। কোন পাপ কাজের ফলে কোন নরকে নিক্ষিপ্ত হতে হয়, সে বিষয়ে যমরাজ কী বলছেন শোনো।

যম বললেন– হে সতীসাধ্বী সাবিত্রী, যে তোক নিজের বা অন্যের দেওয়া ব্রাহ্মণবৃত্তি হরণ করে, সেই পাপী বিটকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়। ষাট হাজার বছর সেখানে মলমূত্রের মধ্যে বাস করে। তারপর কৃমি হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। মলমূত্রের মধ্যে বাস করে, অপরের পুকুরে। পুকুর খুঁড়ে দৈবদোষে উৎসর্গ করলে মূত্রকুন্ড লাভ হয়। সেখানে সে পুকুরের ধূলো পরিমান বছর মূত্রভোজী হয়ে থাকে।

তারপর গোসাপ হয়ে জন্ম নেয়, শ্লেষ্মকুন্ড নরক লাভ করে সেইজন যে কাউকে না দিয়ে একা একা মিষ্টি খায়। ওই নরকে একশো বছর ধরে শ্লেষ্ম খায়, তারপর প্রেত হয়ে জন্ম নেয়। শ্লেষ্ম, মূত্র, পুঁজ, বিষ খেয়ে পাপের বিনাশ ঘটায়। পিতামাতা, গুরু, গুরুপত্নী, পুত্রকন্যা ইত্যাদির যে ভরণ পোষন করে না সে গরকুন্ডে গিয়ে হাজার বছর বিষ খেয়ে কাটায়। তারপর ভূত হয়ে জন্মে একশো বছর কাটিয়ে পাপমুক্ত হয়।

যে শক্তিমান, খলস্বভাবের, কটুবাক্য বলে; সে বহ্নিকুন্ডে গমন করে। সেখানে আগুনে মধ্যে গায়ের লোম সংখ্যক বছর কাটায়। তারপর পরপর তিন জন্ম পশু হয়ে জন্ম নেয়, রোদে পুড়ে পুড়ে তার পাপের নাশ হয়। পরে পুণ্য লাভ করে। যে বাড়িতে উপস্থিত তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মনকে না খাইয়ে ফিরিয়ে দেয় সে তপ্ত কুন্ড লাভ করে, আগুনের মতো গরম সেই নরকে নিজের গায়ের সমান লোমসংখ্যক বছর সেখানে দুঃখ ভোগ করে, তারপর পরপর সাতজন্ম পাখি হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে এভাবে সে শুদ্ধ হয়।

অমাবস্যা, রবিবার, রবিসংক্রান্তি বা শ্রাদ্ধ দিনে কাপড় জামা সাবান দিয়ে কাঁচতে নেই। তাহলে যে পাপ হয় তার ফলে কাপড়ের সুতো সমান সংখ্যক বছর-ক্ষারযুক্ত নরক লাভ হয়। তারপর ভারতে ফিরে এসে ধোপার কাজ করে, এইভাবে দুবার জন্ম নেবার পর তার পাপ মোচন হয়। অসৃককুন্ড তাদের জন্য নির্দিষ্ট যারা ব্রাহ্মন বা গুরুকে আঘাত করে রক্তপাত ঘটিয়ে পাপ করে। সেখানে রক্ত খেয়ে একশো বছর কাটিয়ে সাত জন্ম ব্যাধ হয়ে পাপ থেকে মুক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন শুনে অনেকে ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে কান্নায় গড়াগড়ি খায়। এদৃশ্য দেখে যে ঠাট্টা করে তাকে অকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়।

একশো বছর জল খেয়ে সেখানে কাটায়। তারপর পরপর তিনবার ভারতে চন্ডাল হয়ে জন্ম নেয়। যে লোকের মন কুটিলতায় ভরা, ইচ্ছাকৃত ভাবে বারবার মানুষকে ঠকায়, সে দশ বছর গাত্রমলকুন্ডে পাপ ভোগ করে। পরে ছবার জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে গাধা ও শেয়াল হয়ে। যে পুরুষ ও নারী পরস্পরের মধ্যে শুক্র বিনিময় করে তবে তারা শুক্রকুন্ডে গিয়ে একশো বছর শুক্র খেয়ে কাটায়। তারপর কৃমি হয়ে জন্ম নেয়। এইভাবে তারা তাদের পাপ থেকে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণকে দান করা জিনিস অন্য কাউকে দিলে বসাকুণ্ডে যেতে হয় এবং একশো বছর বসা খেয়ে থাকতে হয়। তারপর তিনজন্ম চন্ডাল এবং সাতজন্ম কৃকলাস হয়ে মর্তে কাটাতে হয়। পরে শুদ্ধ হয়ে গরীব ও স্বল্পায়ু লাভ করে। অতিথি দেখে যারা মনে মনে অসন্তুষ্ট হয় তাদের দেওয়া তর্পন করা জল মৃত পূর্বপুরুষ প্রত্যাখ্যান করে। সে হয় ব্রহ্মা হত্যার সমান পাপী। তাকে দূষিকাকুন্ডে দূষিকা খেয়ে একশো বছর কাটাতে হয়। তারপর সাতবার দরিদ্র হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেয়।

কানে কালা, এমন লোককে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করার ফলে কর্ণবিটকুন্ডে যেতে হয়। সেখানে কানের ময়লা খেয়ে একশো বছর কাটানোর পর কালা ও দরিদ্র হয়ে মানুষ রূপে সাতবার জন্ম নেয়। পরের সাতজন্ম অঙ্গহীন হয়। এইভাবে সে শুদ্ধতা লাভ করে। লোভের বশবর্তী হয়ে বা নিজের পোষণের জন্য প্রাণীহত্যা করা মহাপাপ, এই ধরনের পাপীরা মহাকুন্ডে যায়, সেখানে মজ্জা খেয়ে কাটায়, তারপর সাতজন্ম মাছ ও সাতজন্ম হরিণ হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। অর্থের লোভে যে পিতা কন্যাকে বিক্রি করে সে মেয়ের গায়ের নোম পরিমিত বছর মাংস খেয়ে মাংসকুন্ডে কাটায়। কিঙ্কর প্রহরীর দল তাকে নির্মম ভাবে প্রহার করে। মুখের সামনে থেকে যে মাংস কেড়ে নেয়, খিদের জ্বালায় সে নিজের রক্ত পান করে। তারপর ক্রিমি হয়ে মেয়ের মলে জন্ম নেয়। তারপর সাতজন্ম ব্যাধ, তিন জন্ম শূকর ও সাতজন্ম কুকুর, সাতজন্ম ব্যাং, সাতজন্ম জোঁক এবং সাতজন্ম কাক হয়ে শুদ্ধতা লাভ করে। ব্রত, উপোস, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সংযমের দিনে চুল, দাড়ি, নখ কাটে না, শাস্ত্র তাকে অশুচি আখ্যা দিয়েছে। সেই পাপাত্মা নখাদিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়, তাকে প্রহর করা হয়। যত দিন চুল দাড়ি কাটেনি, ততদিন পরিমিত বছর নখ ইত্যাদি খেয়ে নরক ভোগ করতে হয়।

হে কল্যাণী, নিজের গর্ভবতী স্ত্রীর সঙ্গে যে স্বামী সঙ্গম করে সে মহামুখ। তাকে একশো বছর পরম তাম্র কুন্ডে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। পতি পুত্রহীন রমণীর দেওয়া খাবার বা ঋতুবতী নারীর দেওয়া খাবার যে লোক খায় সে একশো বছর তপ্ত লৌহকুন্ডে বাস করে। পরে সাতজন্ম ধোপা, সাতজন্ম কামার এবং মহাব্রণী ও গরীব হয়ে জন্ম নেয়। শুদ্রের দেওয়া খাবার যে ব্রাহ্মণ গ্রহণ করে, সেই পাপীকে তপ্ত সুরাকুন্ডে একশো বছর ধরে কাটাতে হয়।

তারপর সাতজন্ম শুদ্রযাজী ব্রাহ্মণ হয় এবং শুদ্রের শ্রাদ্ধের খাবার খায়। এইভাবে সে তার পাপ থেকে মুক্তি পায়। গয়ায় গিয়ে বিষ্ণুর চরণে মৃত পরিজনের উদ্দেশে পিন্ড দান না করে সেই লোক তার কর্মফল ভোগ করে অস্থিকুন্ডে নিজের গায়ের নোম পরিমান বছর কাল অতিবাহিত করে। তারপর সাতজন্ম ঘোড়া ও অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে নিজের কুলে ফিরে আসে।

মৃত্যুর পর সে পাপ থেকে মুক্তি পায়। চুলওয়ালা পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজো করা শাস্ত্র সম্মত নয় তবুও যে মহামুখ এই পাপ কাজে লিপ্ত হয় তাকে শিবলিঙ্গের রেণু পরিমান বছর কেশকুন্ডে বাস করতে হয়। পরে যবন হয়ে একশো বছর কাটায়, এইভাবে নিজেকে শুদ্ধ করে এবং পরে নিজের বংশে জন্ম নেয়। তিক্ত বা কটু কথা বলে যে কন্যা দুঃখ যন্ত্রণা দেয়, তাকেও মৃত্যুর পর কন্টককুন্ডে যেতে হয়। তীক্ষ্ম সুঁচালো কাঁটার যন্ত্রণা আর দন্ডের প্রহার তাকে চারযুগ সহ্য করতে হয়। পরে সে উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া হয়ে সাতবার জন্ম নেয়। এইভাবে সে পাপের বিনাশ ঘটায়। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলে বিষকুন্ডে হাজার বছর ধরে বিষ খেয়ে কাটায়। পরে সাতজন্ম সে-মানুষ হত্যাকারী হিসেবে পৃথিবীতে ফিরে আসে। যে ষাড়বাহক নিজে বা চাকরকে দিয়ে লাঠি দিয়ে ষাঁড়কে আঘাত করে, সে চার যুগ তেলকুন্ডে কাটাবার পর গোরুর নোম পরিমান বছর ধরে ষাঁড় হয়ে থাকে। লাঠি লোহা বা কাটা দিয়ে কাউকে খুন করলে খুনীকে দশ হাজার বছর দন্তকুন্ডে থাকতে হয়, তারপর নিজের যোনিতে জন্ম নেয়। পেটের অসুখে জীবন কাটায়, মৃত্যুর পর সে শুদ্ধ হয়। মৎস্য ভক্ষনকারী ব্রাহ্মণ যদি কোনো কারণে মাংস খায় আর শ্রীহরিকে নিবেদন না করে অন্ন গ্রহণ করে, তাহলে সেই ব্রাহ্মণ কৃমিকুন্ডে গিয়ে শাস্তি ভোগ করে। ম্লেচ্ছজাতিতে পরপর তিনবার জন্ম নেয়। তারপর শুদ্ধ হয়ে স্বজাতিতে ফিরে আসে।

পুঁজকুন্ডে গিয়ে পাপের শাস্তি ভোগ করে সেই পাপাত্মা, যে ব্রাহ্মণ শুদ্রের যজ্ঞ করে এবং তার অন্ন গ্রহণ করে, তার শবদাহ সৎকার করে ওই পুঁজ খেয়ে যজমানদের নোম পরিমাণ বছর পর্যন্ত সে কাটায়। কিঙ্করররা তাকে প্রহার করে। নরক যন্ত্রণা ভোগ করার পর ফিরে আসে পৃথিবীতে, শুদ্রের ঘরে সাতবার জন্ম নেয়। সে হয় মহাশূলের দ্বারা ব্যাধিগ্রস্ত। অবশ্যই সে গরীব হয়। এরপর সে পবিত্রতা লাভ করে, নিজের কুলে জন্ম নেয়। সর্পকুন্ড নামক নরকে সাপেদের বাস, পাপীদের তারা খায় আর যমদূতরা লাঠি দিয়ে তাদের বেদম মার মারে। এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করে তারাই যারা শ্রীকৃষ্ণের পায়ের চিহ্নযুক্ত সাপকে হত্যা করে। নিজের দেহের লোম পরিমাণ বছর সেখানে সাপের বিষ্ঠা খেয়ে কাটায়, তারপর স্বল্পায়ু নিয়ে সর্পকুলে জন্ম লাভ করে। দরোগে আক্রান্ত হয় এবং সাপের বিষেই মারা যায়। অন্যকে ছোট প্রাণী বধ করার জন্য উপায় বাতলে দিলে বা নিজে খাবারের টোপ ফেলে ছোটো ছোটো প্রাণীদের প্রাণ

কেড়ে নিলে জন্তু পরিমিত বছর ধরে দংশমশককুন্ডে কাটায়, বড়ো বড়ো ডঁস মাছির অত্যচার সহ্য করতে হয়। তাকে কিছু খেতে দেওয়া হয় না। সে কেবল যমদূতের ধোলাই খেয়ে আর্তনাদ করে মরে। যত ক্ষুদ্র জন্তু মারবে, তত ক্ষুদ্র জন্তু হয়ে বারে বারে পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে ফিরে আসবে। তারপর মানুষ হয়ে জন্মলাভ করতে। কিন্তু হয় পঙ্গু, মৃত্যুর পরে সে এই পাপ থেকে মুক্তি পায়। অকারণে কোনো ব্রাহ্মণ বা লোককে শাস্তি দিলে বজ্র দংষ্ট্রকীটদের কুন্ডে, যাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তার লোম পরিমাণ বছর থাকতে হয়। সেইসব ভয়ংকর কীটেরা তাকে সর্বদা কামড়ে ধরে। সে মুক্তি পাওয়ার জন্য চীৎকার করে। এইভাবে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে সে শুদ্ধ হয় এবং অবশ্যই মানুষ হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। যে ব্রাহ্মণের চিত্তে হরির প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নেই, যে অন্যের বাহকের কাজ করে, শস্ত্র ধারণ করে, সে শবাদিকুন্ডাদিতে যায়। তার দেহের লোমের পরিমাণ বছর থাকতে হয়। সেইসব ভয়ংকর কীটরা তাকে সর্বদা কামড়ে ধরে। সে মুক্তি পাওয়ার জন্য চীৎকার করে। এই ভাবে নরক যন্ত্রনা ভোগ করে সে শুদ্ধ হয় এবং অবশ্যই মানুষ হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। যে ব্রাহ্মনের চিত্তে হরির প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নেই, অন্যের বাহকের কাজ করে শাস্ত্র ধারণ করে, সে শরাদিকুন্ডাদিতে যায়। তার দেহের লোমের পরিমান বছর ধরে সে শরের দ্বারা সর্বক্ষণ বিদ্ধ হয়। যন্ত্রণা ভোগ করে, তারপর মানুষ হয়ে ফিরে আসে।

হে সুব্রতা! কোনো রাজা যদি নিজের স্বার্থের জন্য অনর্থক প্রজাদের শাস্তি দেয় সে রাজা পাপের ফল ভোগ করে। বৃশ্চিক কুন্ডে গিয়ে প্রজাদের দেহের লোম পরিমাণ বছর সেখানে কাটিয়ে সাতজন্ম বৃশ্চিক হয়ে ফিরে আসে। পরে সে অবশ্যই মানুষ হয়ে জন্ম নেয়, কিন্তু সে হয় অঙ্গহীন এবং রোগগ্রস্ত। মৌমাছিদের মেরে মধু সংগ্রহ করার ফলে গরলকুন্ড নামক নরকে ঠাঁই হয়। যতগুলো মৌমাছি মেরেছে তত পরিমাণ বছর সেখানে বিষ আর যমদূতের দন্ডের আঘাত খেয়ে কাটাতে হয়। পরে সে মৌমাছি হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং মৃত্যুর পর অবশ্যই পবিত্রতা লাভ করে ও মানুষ হয়ে জন্ম নেয়। যে লোক জলাশয় থেকে ওঠা কুমিরকে হত্যা করে, তাকে কুমিরের দেহের কাটার পরিমাণ বছর নকুন্ডে বাস করতে হয়, পরে সে কুমির হয়ে জন্মায়। শাস্তি ভোগ শেষ হলে অবশ্যই মানবদেহে ফিরে আসে। কামের বশবর্তী হয়ে পরস্ত্রীর লজ্জা অঙ্গ তারিয়ে তারিয়ে চোখ দিয়ে উপভোগ করে, সেই পাপীর চোখ কাকের ঠোঁটের আঘাতে কানা করে দেওয়া হয়। নিজের দেহের লোম পরিমাণ বছর কাককুন্ডে কাটিয়ে তিনজন্ম অন্ধ হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। তামা ও লোহাচুরি করার ফলে নিজের দেহের লোম পরিমাণ বছর বাজের ঠোঁটের আঘাতে চোখ কানা হয়ে বাজকুন্ডে কাটাতে হয়। সেখানে সে বাজপাখির বিষ্ঠা খায়। এইভাবে শুদ্ধতা লাভ করে, মানুষ হয়ে

জন্মায়, যে মহামুখ দেবতা ও ব্রাহ্মণের সোনা হাতিয়ে নেয়, সে লাভ করে সজ্ঞানকুন্ড নামক নরক। সেখানে সে নিজের দেহের লোম পরিমাণ বছর বাজপাখির বিষ্ঠা খেয়ে তাদের ঠোঁটের আঘাতে অন্ধ হয়ে, যমদূতের মার খেয়ে কাটায়। পরের তিন জন্ম সে অন্ধ হয়। পরের সাত জন্ম হয় গরীব, মহাকুর ও পাপকারী। তারপর নিঃসন্দেহে মনুষ্যদেহ লাভ করে, সে হয় স্বর্ণব্যবসায়ী।

সুদুষ্কর বক্রকুন্ডে সেইসব পাপীদের নিক্ষেপ করা হয়, যারা দেবতার মূর্তি বা দেবতার অলংকার চুরি করে। পাপীর নিজের দেহের লোম পরিমাণ বছর যমদুতের মারের আঘাত আর বজ্রাঘাতে দগ্ধে যাওয়া দেহ নিয়ে যন্ত্রণায় না খেতে পেয়ে চিৎকার করে কাটাতে হয়। এইভাবেই পাপের স্খলন ঘটিয়ে তাকে আবার মনুষ্য জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

দেবতা ও ব্রাহ্মণের পিতল, কাসার বাসনপত্র চুরি করলে তীক্ষ্ণ পাষাণকুন্ডে নিজের দেহের লোম পরিমাণ বছর কাটিয়ে সাতজন্ম ঘোড়া হয়। তারপর মানুষ হয়, কিন্তু তার অতিরিক্ত অঙ্গ হয়। তারপরের জন্মে পায়ের রোগ নিয়ে ফিরে আসে। এইভাবে সে তার পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। দেবতা ও ব্রাহ্মণের শস্যাদি, পান, আসন শয্যা ইত্যাদি চুরি করলে পাপীকে একশো বছর চূর্ণকন্ডে যমদুতের প্রহার খেয়ে কাটাতে হয়। তারপর সে পরপর তিনবার ভেড়া ও তিনবার কুকুর হয়ে জন্ম নেয়। তারপর স্বল্পায়ু, বংশহীন, দরিদ্র ও কাশির রোগ গ্রস্ত এক মানুষ হয়ে জন্ম নেয়। এইভাবে সে। তার পাপের শাস্তি ভোগ করে শুদ্ধ হয়। যে লোক ব্রাহ্মণ ও দেবতার রূপো, ঘি ও বস্ত্র চুরি করে, সে পাষণকুন্ডে নিজের দেহের লোম পরিমাণ বছর কাটায় পরে তিনবার বক, তিনবার সাদা হাঁস, এক বা শঙ্খচিল হয়ে জন্মায়। পরে সাতজন্ম স্বল্পায়ু, রক্ত বিকার ও শূলরোগগ্রস্ত হয়ে মানুষরূপে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এর পরে শুদ্ধতা লাভ করে সুন্দর মানুষের জন্ম নেয়। বেশ্যার অর্থে যে নিজের জীবিকা নির্বাহ করে সে লোক দেহের নোম পরিমাণ বছর লালাকুন্ডে থেকে নিজের লালা এবং যমদুতের প্রচন্ড মার খেয়ে কাটাতে হয়। পরে মানুষ হয়ে জন্মালেও সে হয় চক্ষুঃশূল রোগী। এভাবে সে শুদ্ধি লাভ করে। যে ব্রাহ্মণ হরি শয়নকালে কচ্ছপের মাংস খায়, সে একশো বছর ধরে কচ্ছপের কামড় খেয়ে কুমকুন্ডে বাস করে। পরের নয় জন্মে শূকর, বিড়াল এবং ময়ূর বংশে জন্ম নেয়। দেবতা ও ব্রাহ্মণের সুগন্ধি তেল বা সুগন্ধযুক্ত অন্যান্য দ্রব্য যে চুরি করে। সেই পাপী নিজের দেহের লোম সমান সংখ্যক বছর দুর্গন্ধকুন্ডে কাটায়। তারপর সাতজন্ম দুগন্ধিকা, তিনজন্ম মৃগনাভি এবং সাতজন্ম সুগন্ধি প্রাণী হয়ে জন্ম নেয়। পরে শুদ্ধ হয়ে সুস্থ মনুষ্য দেহে ফিরে আসে। শক্তি খাঁটিয়ে বা ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে অন্যের জমি ছিনিয়ে নিলে, সেই মহাপাপীকে তপ্তসূর্যী নরকে পাঠানো হয়।

সেখানে রাতদিন জ্বলে পুড়ে মরতে হয়। কিন্তু সে দেহ ছাই হয় না। কারণ ভোগদেহ অবিনাশী। ওই নরকে সাত জন মনুর সময়কাল পর্যন্ত যমদুতের দন্ডের আঘাত ভোগ করে। ষাট হাজার বছর বিষ্ঠার কৃমি হয়ে জন্ম নেয়। এইভাবে ওই লোক পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ হয়ে জন্ম নেয়। অবশ্য গরিব হয়, তারপর নিজের বংশে জন্ম নিয়ে মঙ্গলজনক কাজ করে। যে অর্থের বিনিময়ে অস্ত্রের আঘাতে মানুষ খুন করে সে চোদ্দোজন ইন্দ্রের বয়স কাল পর্যন্ত আসপত্র নরকে থাকতে বাধ্য হয়। যাদের খুন করা হয়, তাদের মধ্যে যদি কেউ ব্রাহ্মণ থাকে তাহলে শাস্তির মাত্রা আরও ভয়ংকর হয়। একশো মনুর সময় পর্যন্ত তাকে খঙ্গের আঘাত সহ্য করতে হয়। তার উপোসী দেহ ভয়ংকর যমদূতদের দন্ডের আঘাতে জর্জরিত হয়।

সে তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে। তারপর শতবার শূকর, শতবার কুকুর ও সাতবার শিয়াল হয়ে জন্ম নিয়ে ভারতে ফিরে আসে। পরে সাতজন্ম বাঘ, তিনজন্ম বৃষ, সাতজন্ম গরুড় এবং তিনজন্ম মোষ হয়ে জন্মায়, বন্ধু ও ব্রাহ্মণের সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করলে বা হিংসা করলে একযুগ বক্রকুন্ডে বাস করার পরে সাতজন্ম বক্র অঙ্গ, হীন অঙ্গ, গরীব, বংশহীন ও পত্নীহীন হয়ে পাপের স্খলন ঘটাতে হয়। পরে সে মুক্তি লাভ করে। পরের নিন্দা শুনে যে প্রশংসা করে এবং পরের নিন্দা করে সে লোক সূচীমুখ নরক যন্ত্রণা ভোগ করে।

তিনযুগ ধরে সূচীবিদ্ধ হতে হয়। পরে সেই পাপী সাতবার বিছা, সাতবার সাপ, সাতবার বজ্রকীট ও সাতবার ভষ্মকীট হয়ে জন্মাবার পর ভয়ংকর রোগগ্রস্থ মানুষ হয়ে ফিরে আসে। পরে সে পাপ থেকে মুক্তি পায়। সাধারণ জিনিস চুরি করার ফলে চোর নমুখ নরকে এক যুগ কাটিয়ে মহারোগগ্রস্ত হয়। পরে শুদ্ধি লাভ করে এবং মানুষ দেহ লাভ করে। তৃষ্ণার্ত গোরুকে যে জল খেতে দেয় না, গোরুর যত্নআত্তি করে না, তাকে গোমুখ নরকে যেতে হয়! গোরুর মুখাকৃতি এই নরকে কৃমিদের বাস। গরম জলে ভরা এখানে এক মন্বন্তর যন্ত্রনা ভোর করার পর সাতবার গোরুহীন মহারোগিও গরীব মানুষ হয়ে জন্মলাভ করে। পরের সাতবার শুদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে মুক্তি পায়।

যে ব্রাহ্মণ যেখানে সেখানে গমন করে, সন্ধ্যা আহ্নিক করে না, দীক্ষা নেয় না, সুরা পান করে, শুদ্রের অনুগামী হয়, গোরু বা ব্রহ্ম বা স্ত্রী হত্যা করে সেই মহাপাপী কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। চোদ্দজন ইন্দ্রের জীবিতকাল পর্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে। যমদূতের প্রহারে তাকে নাস্তানুবাদ হতে হয়। সে আগুনে, গরম জলে বা তেলের কড়ায় পড়ে আর্তনাদ করে। কখনও উত্তপ্ত লোহার দন্ড দিয়ে ছ্যাকা দেওয়া হয়।

নরক যন্ত্রণা ভোগ করার পর শকুনি হয়ে জন্ম নেয়। এককোটি বার এবং একশোবার শূকর হয়ে জন্মায়। সাতজন্ম কাক, সাতজন্ম, সাপ এবং ষাট হাজার বছর কৃমি হয়ে বিষ্ঠা খেয়ে থাকে। তারপর সে শুদ্রবংশে জন্ম নেয়। সে হয় দরিদ্র, যক্ষ্মা, কুষ্টরোগ গ্রস্ত, তার কোনো স্ত্রী হবে না। এইভাবে জন্ম ধরে শাস্তি ভোগ করার পর পাপীর পাপ স্খলন হয়। সে মুক্তি পায়। হে দেবী! যে ব্রাহ্মণ হরিসেবা করে, শুদ্ধযোগী, সিদ্ধ, ব্রত, উপোস পালন করে, তারা নরকপ্রাপ্ত হয় না।

সাবিত্রী বললেন– হে যমরাজ, ব্রহ্মহত্যা বা গো হত্যা পাপের ভাগী কীভাবে হওয়া সম্ভব? অগম্যাগামী সন্ধ্যাহীন, অদীক্ষিত, গ্রামবাসী, ব্রাহ্মণ, শূদ্রের সূপকার– এরা, কারা? এদের লক্ষণ সম্পর্কে আপনি অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করুন।

যমরাজ বললেন– নির্গণ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সকলের আত্মা, সমস্ত কারণের কারণ, তিনি সকলের আদি, মায়াবলে অসংখ্যরূপ ধারণ করেছেন। ব্রহ্মা, শিবা প্রভৃতি দেবতারা তাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজো করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে যে অন্য দেবতাদের সমান দেখে, সে হয় ব্রহ্ম হত্যার ভাগীদার, নিজের গুরু ও ইষ্টদেবতার মধ্যে এবং জন্মদাতা বাবা ও গর্ভধারিনী মায়ের মধ্যে যে পার্থক্য দেখে সে হয় ব্রহ্ম হত্যার ভাগী। শ্রীকৃষ্ণ ও তার পূজোর আধার মাটির প্রতিমাতে, শিব ও শিবলিঙ্গ, সূর্য ও সূর্যমণিতে গণেশ ও তার পূজোর মাটির মূর্তিতে এইভাবে অন্যান্য দেবদেবী ও তাদের মাটির প্রতিমার সাথে পার্থক্য দেখে সেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম হত্যার সমান শাস্তি পায়।

যিনি বিষ্ণুভক্তি দান করেন, সকলের শক্তি স্বরূপ এবং সকলের জননী, সকলের কাছে যিনি পূজ্য, যিনি সকলের আদি ও কারণ সেই বিষ্ণুমায়া প্রকৃতিকে নিন্দা করলে, ব্রহ্ম হত্যার ভাগীদার হতে হয়। যে লোক পূণ্যদায়ক পাঁচটি ব্রত অর্থাৎ জন্মাষ্টমী, বামনবাসী, শিবরাত্রি, একাদশী ও রবিবার পালন করে না তারা চন্ডালের থেকেও বেশী পাপী হয় এবং ব্রহ্ম হত্যার ভাগী হয়। বেদক্ত দেবদেবী ও পিতৃগণের পূজো নিজে না করলে এবং অন্যকে পূজো করতে বাধা দিলে ব্রহ্ম হত্যার সমান শাস্তি পায়। ব্রহ্ম হত্যার পাপের ভাগী তাকেও হতে হয়। যে সংসার প্রতিপালন করে না, যে লোকের শ্রীহরির প্রতি ভক্তি নেই, যে লোক নিত্য বিষ্ণু ও পার্থিব শিবলিঙ্গের প্রতি অনাস্থা পোষন করে সে লোক ব্রহ্মহত্যার ভাগী হয়।

যে মূর্খ ব্রাহ্মণ গোরুকে ভাল খাদ্য খেতে দেয় না, তাকে বেত দিয়ে আঘাত করে, গোরুর সেবা করে না, সে গোহত্যা পাপের ভাগী হয়, যে লোক গোরুকে উচ্ছিষ্ট খেতে দেয়, বৃষবাহক

ব্রাহ্মণকে দিয়ে পুজো করায় এবং তার অন্ন গ্রহণ করে, শত গোহত্যার সমান পাপের ফল তাকে ভোগ করতে হয়। যে লোক পা না ধুয়ে খায় এবং ঘুমোয়, সূর্য উঠলে দুবার খাদ্য গ্রহণ করে, স্বামী পুত্রহীন স্ত্রীর অন্ন যে খায় এবং যে ত্রিসন্ধ্যা বন্দনা করে না, তাকে গোহত্যা পাপের ভাগী হতে হয়।

নারায়ণ বললেন– হে নারদ, বাস্তব ও আরোপিত পাপপূণ্যের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সাবিত্রী জানতে চাইলে যমরাজ বলেছিলেন, হে সতী সাধ্বী সাবিত্রী। বাস্তব ও আরোপিত কোনোটি প্রধান বা কোনোটি অপ্রধান নয়। বেদে প্রামাণ্য দুটিই সমান। বেদের প্রমাণের ওপর বিশ্বাস না রাখলে গুরুহত্যার সমান পাপী হয়। পূর্ব পরিচিত ব্রাহ্মণ যদি বিদ্যা বা মন্ত্র দান করেন, তিনি হন গুরু। যিনি জন্মদাতা পিতার থেকেও শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ গুরুর ওপর পিতৃত্ব আরোপিত হয়। যা বাস্তব, বেদ বলেছে, বাবার থেকে মা সাতগুণ বেশি পূজ্য এবং সেই মায়ের থেকে বিদ্যাদাতা ও মন্ত্রদাতা গুরু শতগুণে পূজ্য। যেমন ইষ্টদেবতার থেকে তার পত্নী শ্রেষ্ঠ, তেমনই গুরুদেবের থেকে গুরুপত্নী বেশী পূজ্য। সেই ব্রাহ্মণ শিবের সমান, এই রাজা বিষ্ণুর সমান মহাপরাক্রমশালী–আরোপিত থেকে বাস্তব লক্ষণগুণে শ্রেষ্ঠ। সকল ব্রাহ্মণই ব্যাসদেবের সমান– এখানে সকল ব্রাহ্মণ ও ব্যাসদেবের মধ্যে সমতা নির্ণীত হয়েছে। পদ্মযোনি ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সমস্ত দেবতাদের অভিমত, আরোপিত হত্যা যত না পাপজনক, তার থেকে চারগুন বেশি পাপ হয় বাস্তব হত্যা করলে।

নারী অগম্য সম্পর্কে বেদ বলেছে, নিজের স্ত্রী ছাড়া সব নারীই অগম্য। শুদ্রের ব্রাহ্মনস্ত্রী এবং ব্রাহ্মণের শূদ্র স্ত্রী মোটেও গম্য নয়। বেদে ও লোকসমাজে এদের কঠোর ভাবে নিন্দা করা হয়েছে। শূদ্র ব্রাহ্মণ হতে গেলে শত ব্রহ্ম হত্যার পাপভাগী হয়। আর ওই রমণী ও একই পাপে পাপী হয়। দুজনে কুম্ভীপাক নামক নরকে বাস করে। যে ব্রাহ্মণ মদ ও একাদশীতে অন্ন খায়, শুদ্র রমনীকে পত্নী হিসাবে গ্রহণ করে, সেই ব্রাহ্মণকেও কুম্ভীপাক নরকে যেতে হয়। গুরুপত্নী রাজমহিষী, মা, মেয়ে, বিমাতা, শাশুড়ি, ছেলের বউ। নিজের বোন, নিজের ভাইয়ের পত্নী, ঠাকুরমা দিদিমা, পিসিমা, মাসীমা, মামীমা, শিষ্যা, শিষ্যের পত্নী, ভাইয়ের ছেলের বউ, বোনের ছেলের বউ ব্রহ্মা এইসব নারীদের অগম্যা বলেছেন। যে মুখ ব্যক্তি এইসব নারীদের মধ্যে একজনকে বা অনেকের সঙ্গে দেহ সম্পর্ক গড়ে তোলে, তারা শত ব্রহ্ম হত্যার সমান শাস্তি ভোগ করে। বেদ এদেরকে নিজের মাতৃগামী বলে উল্লেখ করেছে।

সন্ধ্যাহীন ব্রাহ্মণ তাকেই বলা হয় যে, সন্ধ্যাবন্দনা করেনা, যারা শিব, বিষ্ণু, শক্তি, সূর্য, গণেশ ইত্যাদি দেবতার দীক্ষা গ্রহণ করে না, তারা হল অদীক্ষিত ব্রাহ্মণ, গঙ্গার স্রোতের মধ্যে চার হাত

ব্যাপী জায়গার স্বামী হলেন নারায়ণ। এই নারায়ণ স্বামীকে উৎকৃষ্ট গঙ্গার গর্ভমধ্যে কুরুক্ষেত্রে, বদরিকাশ্রমে, হিমালয়ে, ত্রিবেনীতে, গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, সোমতীর্থে, কেদারনাথে, বারনসীতে পুরুষোত্তমে, পুষ্করে, সরস্বতী নদীর তীরে, বৃন্দাবনে, গোদাবরী বা কৌশকী নদীর তীরে এছাড়া অন্য যে কোন ধর্মস্থানে ইচ্ছে। করে ব্রাহ্মণ যদি দান গ্রহন করে, তাহলে সে হয় তীর্থপ্রতিগ্রাহী। এরা কুম্ভীপাক নামক নরকে গমন করে, যে ব্রাহ্মণ শূদ্র ব্যতীত অন্য তিনবর্ণের পূজো করে, তাকে বলে গ্রামজী এবং দেবতার পূজো আর্চা করে যে জীবিকা নির্বাহ করে সে ব্রাহ্মণ অবশ্যই দেবল। শূদ্রের আহার তৈরি করে যে ব্রাহ্মণ রোজগার করে সে হল সূপকার, প্রমত্ত ও পতিত ব্রাহ্মণেরা পূজো ও সন্ধ্যাহ্নিক করে না। এইসব মহাপাপাত্মাদের কুম্ভীপাক নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

.

একত্রিংশ অধ্যায়

নারায়ণ বললেন–হে নারদ! ধর্মরাজ যম অন্যান্য নরক কুম্ভ বিষয়ে সাবিত্রীকে কী জ্ঞান দান করেছিলেন তা এবার শ্রবণ করো।

ধর্মরাজ বললেন– হে কল্যাণী! শুভ বা অশুভ যে কোনো কাজের ফল খন্ডন করার জন্য বিষ্ণুসেবা অবশ্যই প্রয়োজন। ভালো কাজের পরিবর্তে স্বর্গ লাভ হয়। নতুবা নরকে পচে মরতে হয়। বেশ্যার অন্ন খেয়ে যে জীবিকা নির্বাহ করে, সেই ব্রাহ্মণ কালসূত্র নরকে যায়। একশো বছর সেখানে বাস করার পর শূদ্রকূলে রোগগ্রস্ত হয়ে জন্ম নেয়। এভাবেই শুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ যোনি লাভ করে।

বাগদত্তা কন্যাকে যে ব্রাহ্মণ অন্য পাত্রে সম্প্রদান করে সে পাংশুভোজন নরকে যায়, সেখানে পাংশু খেয়ে একশো বছর কাটায়। পরের গচ্ছিত দ্রব্য চুরি করার ফলে পাপবেষ্ট নরকে যেতে হয়। সেখানে একশো বছর ধরে যমের কিঙ্করদের প্রহারের আঘাত সহ্য করতে হয়। তাকে শরশয্যায় শুতে বাধ্য করা হয়। ব্রাহ্মণদের ওপর নির্যাতন বা অত্যাচার করা হলে সেই পাপী লোককে প্রকম্পন নরকে পাঠানো হয়। নিজের দেহের লোমসংখ্যক বছর সেখানে অতিবাহিত করে।

হে দেবী! পতিব্রতা নারী কেবল নিজের স্বামীতেই পরিতুষ্ট থাকে। কিন্তু কুলটা নারী তাকেই বলা হয় যে দুজন পুরুষের সঙ্গ ছাড়া বাঁচতে পারে না। তিনজন পুরুষে যে নারী উপগত হয়

সে হল ধর্ষিণী এবং পুংশ্চলী স্ত্রী চারজন পুরুষে গমন করে, বেশ্যা রমনী চার অথবা পাঁচজন পুরুষে উপরত হয়। যুগ্মীরা সাত অথবা আট পুরুষ গামিনী এর থেকে বেশি সংখ্যক পুরুষে যারা উপগত হয় তারা হল মহাবেশ্যা, কুলটা, ধর্ষিণী, পুংশ্চলী। যুগ্মী বেশ্যা ও মহাবেশ্যা নারীতে যে লোক উপগত হয় সে অবটোদ নরকে গমন করে। কুলটার ক্ষেত্রে একশো, ধর্ষিণীর ক্ষেত্রে তার চারগুণ। পুংলীর জন্য ছয়গুণ, বেশ্যার ক্ষেত্রে আটগুণ, যুগ্মীগামীর ক্ষেত্রে তার দশগুণ বছর ওই নরকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

আর মহা বেশ্যাগামী হলে ওই নরকে বাস করার ফল হয় একশো গুণ বেশি। তবে পদ্মযোনি ব্রহ্মা বলেছেন যে ব্রাহ্মণমহাবেশ্যাতে উপগত হয় সে সর্বগামী নিঃসন্দেহে। যেখানে যমদুতের দন্ডের আঘাতে সে আর্তনাদ করে। কুলটাগামী যে সে তিতির পাখি, পুংশ্চলগামী কোকিল, বেশ্যাগামী হলে বক, যুগ্নীগামী হলে শূকর। মহাবেশ্যাগামী শ্মশানে শিমূল গাছ হয়ে সাতবার জন্ম নেয়। যে অজ্ঞানী সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ মানে না সেই সময় আহার গ্রহণ করে সে অরন্তুদ নরকে চাঁদের আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বাস করে। নরক যন্ত্রনা ভোগ করার পর মানুষ হয়ে জন্ম নেয়। সে হয় গুল্মরোগগ্রস্ত। উদরী রোগে ভোগে, অন্ধ এবং দাঁতহীন হয়। এইভাবে পাপ থেকে মুক্তি পায়।

হে সতী সাধ্বী, যে ব্রাহ্মণ নিজের ব্রাহ্মণী ছাড়া অন্য ব্রাহ্মণীতে গমন করে, তা হলে ওই ব্রাহ্মণ এবং পরস্ত্রীকে কষনরকে বারো বছর ধরে গরম কষায় জল খেয়ে কাটাতে হয়। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য তিনবর্ণের ক্ষেত্রেও একই বিধান দেওয়া হয়েছে। নরক যন্ত্রণা ভোগ করার পর এরা পবিত্রতা লাভ করে। শিবের পুজো না করলে তার কোপে পড়তে হয়।

একশো বছর তাকে শূলস্রোত নরকে বাস করতে হয়। তারপর সে সাতবার হিংস্র প্রাণী, সাতবার পূজারি ব্রাহ্মণ হয়ে জন্ম নেয়। তারপরে শুদ্ধ হয়। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণীতে গমন করে তা হলে তারা হয় মাতৃগামী। এই পাপের ফলে শূর্পনরকে তাদের যেতে হয়। শূর্প আকারের কৃমিদের আর যমদূতদের দন্ডের তাড়না ভোগ করতে হয়। গরম মূত্র খেয়ে চোদ্দজন ইন্দ্রের আয়ুষ্কাল পর্যন্ত যন্ত্রনা ভোগ করার পর সাতবার শুয়োর, সাতবার ছাগল হয়ে জন্ম নেয়। এবং শুদ্ধ হয় তুলসী হাতে নিয়ে গঙ্গাজল, শালগ্রাম শিলা বা অন্য কোনো দেবতাকে স্পর্শ করে যে ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা করে, অথচ পরে তা খেলাপ করে সেই ব্রাহ্মণ জ্বালামুখ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়।

যে লোক গোরু বা আগুন ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে ও তার খেলাপ করে, যে বন্ধুদ্রোহী, বিশ্বাস ঘাতক, কৃতঘ্ন, মিথ্যা সাক্ষী দেয়, সেও জ্বালামুখ নরকে ইন্দ্রের সময়কাল পর্যন্ত যমদূতদের তাড়না সহ্য করে, অঙ্গীরে পুড়ে মরে, তারপর তুলসী স্পর্শ করে যে প্রতিজ্ঞা করে ও ভঙ্গ করে সে সাতজন্ম চণ্ডাল, গঙ্গাজলের ক্ষেত্রে সাতজন্ম বিষ্টার কৃমি, দেবতার প্রতিমার ক্ষেত্রে সাতজন্ম ব্রণকৃমি হয়ে পবিত্রতা লাভ করে। ডান হাত দিয়ে তুলসী, গঙ্গাজল বা যে কোনো দেবতার বিগ্রহ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করার পর, কথা না রাখার ফলে জ্বালামুখ নরকে গিয়ে সাতজন্ম শাস্তি ভোগ করে এবং পরে হস্তহীন হয়ে জন্ম নেয়।

মন্দিরে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলার ফলে সাতবার পূজারি হয়ে জন্ম নিতে হয়, যে ব্রাহ্মণকে ছুঁয়ে মিথ্যে কথা বলে সে সাতজন্ম অগ্রদানী- বামুন হয়ে জন্মায়, পরে তিনবার বোকা, কালা ও বোবা হয়ে ফিরে আসে। এর কোনো বংশপরিচয় ও ভাষা থাকে না। বন্ধুদ্রোহী সাতজন্ম বেজি, কৃতঘ্ন সাতজন্ম গন্ডার ও বিশ্বাসঘাতক সাতজন্ম বাঘ হয়। মিথ্যা সাক্ষী যে দেয়, সে সাতবার ভাল্লুক হয়ে ভারতে ফিরে আসে, তার পাপের তাড়নায় তার নিজের পূর্বতন সাতপুরুষ ও অধস্তন সাত-পুরুষও শাস্তি ভোগ করে। দেবতা ও ব্রাহ্মণের সম্পত্তি চুরি করার পাপে ধোঁয়া ও ঘন অন্ধকারময় ধূসান্ধনরকে ধোঁয়া খেয়ে ও যন্ত্রনা সহ্য করে চারযুগ ব্যাপী বাস করে। সে তার ও পরের ও নীচের দশ পুরুষকে নীচে নামায়, নরক যন্ত্রণা ভোগ শেষ হলে ফিরে আসে পৃথিবীতে-সাতবার ইঁদুর, বিভিন্ন পাখি, কৃমি ও নানারকম গাছপালা হয়, তারপর স্ত্রীহীন, বংশহীন, রোগক্রান্ত এক মানুষ হয়ে জন্ম নেয়। মৃত্যুর পর স্বর্ণকার তারপর সুবর্ণবনিক এবং সেবী ব্রাহ্মন, সবশেষে গণক হয়।

যে ব্রাহ্মণ বৈদ্য গিরি করে বা লাক্ষা, লোহা, রস ইত্যাদি বেচে জীবিকা নির্বাহ করে। সে নাগবেষ্ট নরকে নিজের দেহের লোম সংখ্যক বছর সাপের কামড় খেয়ে কাটাতে বাধ্য হয়, তারপর যে গণক, বৈদ্য, গোয়ালা, কামার, শঙ্কার হয়ে সাতবার জন্ম নেবার পর পাপ থেকে মুক্তি পায়। যে বেদ বিশ্বাস করে না, জড়তা বশতঃ ব্রাহ্মণদের নিত্যক্রিয়া পালন করে না, ব্রত ও উপবাসের কথা শুনে হাসিঠাট্টা করে, বেদকে উপহাস করে, মিথ্যে কথা অনর্গল বলে, পরের নামে নিন্দা রটায় এমন ধরনের লোক একশো বছর নরকের বরফপূর্ণ জলে কাটায়। তারপর একশো জন্ম জলজন্তু, নানাধরনের মাছ হয়, পরে শুদ্ধ হয়।

যে স্ত্রী ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে স্বামীর দিকে কটাক্ষপাত করে, স্বামীকে যাচ্ছেতাই শব্দে গালিগালাজ করে, সে কন্যা উল্কামুখ নরকে পতিত হয়। সেখানে যমদূত তার মাথায় লাঠির ও নিক্ষিপ্ত উদকার আঘাত স্বামীর দেহের লোম সংখ্যক পরিমান বছর সহ্য করতে হয়।

তারপর সাতজন্ম রোগী ও বিধবা হয়ে দুঃখ ভোগ করার পর শুদ্ধ হয়, সে ব্রাহ্মণী অন্ধকূপ নরকে যায়। যেখানে চোদ্দোজন ইন্দ্রের সমানকাল পর্যন্ত গরম শৌচজল ভরা ঘন অন্ধকারে শৌচজল খেয়ে সময় কাটাতে হয়, যমদূতরা তাকে ভীষণ মারে। নরকের দুঃখ ভোগ করা শেষ হলে হাজার জন্ম স্ত্রী কাক, একশো জন্ম শূকরী, একশো জন্ম কুকুরী সাতজন্ম শিয়ালী, সাতজন্ম স্ত্রী পায়রা এবং সাতজন্ম বানরী হওয়ার পর সর্বভোগ্যা চন্ডালী হয়ে জন্ম নেয়, এরপর ধোপানী ও যক্ষারোগী পুংশ্চলী হয়। পরে কুষ্ঠরোগী তৈলকারী হয়, পরে শুদ্ধিলাভ করে।

কুলটা দেহচূর্ণ পুংশ্চলী হয় পরে কুষ্টরোগী, তৈলকারী হয়, পরে শুদ্ধিলাভ করে, কুলটা দেহচূর্ণ, পুংশ্চলী দলন, ধর্ষিণী শোষক, যুগ্মী, দন্ডতাড়ন, বেশ্যা, বেধন এবং মহাবেশ্যা জালবন্ধ নরকে গমন করে। এক মনুর সময়কাল পর্যন্ত তারা মলমূত্র খেয়ে ও যমদূতদের দন্ডের আঘাত খেয়ে নরক যন্ত্রনা ভোগ করে পাপের সঙ্খলন ঘটায়। তারপর বিষ্ঠার কৃমি হয়ে পৃথিবীতে লক্ষ্য বছর কাটায়, শেষে পবিত্রতা লাভ করে। হে সতীসাধ্বী সাবিত্রী। তোমাকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নরক ও তার কর্মকলের কথা বললাম। এছাড়া আরো অনেক নরককুন্ড আছে যেখানে পাপীরা পাপের শাস্তি ভোগ করে। নানা জন্মান্তরের মাধ্যমে তারা শুদ্ধ হয়।

.

বত্রিশতম অধ্যায়

মহাভাগ ধর্মরাজ যিনি বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শী। সাবিত্রী বললেন–তিনি নানা পুরান, ইতিহাস ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, সাবিত্রী জানতে চাইলেন কোন কাজ করলে আর কাজ করতে হয় না। যা প্রশংসনীয় কাজ ও সুখদায়ক। যা যশ দেয়, ধন দেয় ও মঙ্গলদায়ক, যা করলে যমালয়ে যেতে হয় না, সংসারে জ্বালা ভোগ করতে হয় না এবং আবার জন্মগ্রহণ করতে হয় না। পূর্বে বলা নরককুন্ডে যেতে হয় না। যাতে দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

ধর্মরাজ শ্রীগুরুকে নমস্কার করে, হরিকে স্মরণ করে সাবিত্রীর প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করলেন। বললেন–চারবেদ, সকল ধর্মসংহিতা, পুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র ও বেদাঙ্গ মধ্যে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সেবা সকলেরই প্রার্থনীয় ও সর্বশ্রেষ্ট। যা সকলকে উদ্ধার করে জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক ও সন্তাপ থেকে। সকল সিদ্ধির কারণ কৃষ্ণসেবা। যা উদ্ধার করে, নরক সাগর থেকে। কর্মভোগী, গৃহীরা হরিব্রত ও হরিতীর্থে স্নান,

হরি বাসরে উপোস করে, নিত্য হরিকে প্রণাম করে ও পূজা করে তারা কখনও ভয়ঙ্কর সংযমনীপুরীতে যান না, যে ত্রিসন্ধ্যায় শুদ্ধাচারী হয়ে নিজের ধর্ম পালন করে ও শান্ত হয় সেও আমার ভবনে যায় না।

ব্রহ্মা নিজেই তাদের 'মধুপক' তৈরি করে রাখেন যখন তারা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করে গোলকের উদ্দেশ্যে যায়। কৃষ্ণভক্তের স্পর্শেই সকল পাপ পুড়ে যায় যেমন জ্বলন্ত আগুনে কাঠ ও ঘাস পুড়ে যায়। দেহীদের দেহের প্রধান কারণ হল বিধাতার সৃষ্টি পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, বেদ ও জল। সূক্ষ্মদেহকে ভোগ দেহ বলা যায়, যা শস্ত্রের আঘাতে বা অস্ত্রের আঘাতেও নষ্ট হয় না। এরপর তিনি শাস্ত্র অনুসারে লিঙ্গ দেহের বিবরণের কথা বলবেন বললেন।

.

তেত্রিশতম অধ্যায়

অত্যন্ত নীচে ও বিশেষ পাথরে তৈরি সকল নরককুন্ডই পুর্ণ চাঁদের মতো গোল। যা পাপীদের শাস্তি দানের জন্য নির্মিত, বহ্নিকুন্ড নরক জ্বলন, কয়লার মত উজ্জ্বল ও ওপরের দিকে একশো হাত ও চারদিকে একক্রোশ বিস্তৃত যা পাপীদের আর্তনাদে পরিপূর্ণ। হিংস্র জলজন্তুতে ভর্তি তপ্তোদক কুন্ড, আর তারপর একক্রোশ বিস্তৃত ক্ষারকুন্ড, যা তপ্ত ক্ষার জলে পরিপূর্ণ। এরপর গরম মূত্রে পূর্ণ মূত্রকুন্ড। শ্লেষ্মতে পরিপূর্ণ শ্লেষ্মকুন্ড, নেত্রমলকুন্ড, শুক্রকুন্ড, রক্তকুন্ড, গাত্রমলকুন্ড, নখকুন্ড, অস্থিকুন্ড, কেশকুন্ড ও লোমকুন্ড।

একলব্য তামার মূর্তি যুক্ত তপ্ত অকুন্ড, ঘর্মকুন্ড, তপ্তসুরা কুন্ড, কন্টককুন্ড, যার কাটার পরিমাণ চারহাত, একক্রোশ বিস্তৃত বিষকুন্ড যা সাপের বিষে ভর্তি। গরম তেলে ভর্তি তপ্তৈতেল কুন্ড। এর দৈর্ঘ্য চার ক্রোশ, শকুন্ড একক্রোশ বিস্তৃত, কুন্তকুন্ড, পুঁযকুন্ড যা দুর্গন্ধ যুক্ত, পুঁজে পূর্ণ যায় পরিমান আধক্রেশন, এরপর মশককুন্ড, শরাদিকুন্ড যা তিন শরাদি পূর্ণ একশো কোটি বিরাট কাক সেখানে পাপীদের খায়। বাজকুণ্ড বাজপাখিতে পরিপূর্ণ, ব্রজকুন্ড অন্ধকার ময়। তপ্ত পুষাণকুন্ড জ্বলন্ত কয়লার মত, উজ্জ্বল পাষাণকুন্ডে রক্তাক্ত দেহে পাপীরা বাস করে। এরপর দুর্গন্ধ যুক্ত লালাকুন্ড, গরমজলে পূর্ণ মসীকুন্ড, এক ক্রোশ দীর্ঘ চূর্ণদ্রবকুন্ড, চারক্রোশ পরিমাণ বক্রকুন্ড, এক ক্রোশ বিস্তৃত জ্বালাকুন্ড, গরম ছাইয়ে পূর্ণ ভষ্মকুন্ড।

একক্রোশ পরিমাণ সম দগ্ধকুন্ড। সূচের মুখের মত অস্ত্রে ভর্তি কুন্ড হল সূচীমুখ কুন্ড। গোধাকুন্ড হল গোসাপের মুখের আকারের মত। গোমুকুন্ড, গোরুর মুখের মত। কোথাও গরম

লোহার কুন্ড আবার কোথাও গরম তামার কুন্ড, গরমজলে ভর্তি কালসূত্র নরক, অবটৌক নরক হল কূপের মতো যার বিস্তার আশি হাত। এখানে পাপীদের গা পুড়ে গেলেও দূতেরা তাড়না করে। চারশো হাত বিস্তৃত পাংশুভোজ নরক। উল্কা মুখ নরক হল যেখানে পাপীদের মুখে উল্কা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। দন্ডতাড়ন নরক হল চৌষট্টি হাত। জ্বালবদ্ধ নরকে এখানে পাপীরা বিরাট জালে আবদ্ধ থাকে। দলন নরকে দূতরা পাপীদের সর্বদা গদা দিয়ে দলন করে থাকে। শোষণ নরক হল যার আয়তন একশো কুড়ি হাত ও গভীরতা একশো পুরুষের মতো জ্বালামুখ নরক ভীষণ কষ্টদায়ক। অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও আয়তনে চারশো হাত বিস্তৃত নরকের নাম ধূমান্ধ নরক। যম ছিয়াশি রকম কুন্ডের বর্ণনা দিলেন।

.

চৌত্রিশতম অধ্যায়

সাবিত্রী এরপর যমকে অত্যন্ত দুর্লভ ও শ্রেষ্ট হরিভক্তি দান করতে বললেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন রূপ ধর্মের কথা জানতে চাইলেন। যম সাবিত্রীকে বললেন, তিনি তার মনের মতো সকল বর দিয়েছেন। যম বললেন–শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন যে শোনে তার সকল কুলই উদ্ধার হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যাঁর চরণপদ্ম ধ্যান করছেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন করা ভক্তদের পক্ষে সহজ। যা অন্য লোকের কাছে দুর্লভ।

ঈষৎ হাস্যময় শ্রীকৃষ্ণ অমূল্য পীতবস্ত্রে সুশোভিত এবং ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত। পরম ব্রহ্ম স্বরূপ, তার মূর্তি শান্ত ও দেখতে সুন্দর। চারিদিকে দাঁড়িয়ে গোপীরা তাকে দেখছে সবসময়। তিনি রাসমন্ডলের মাঝে উপবিষ্ট রত্নসিংহাসনে। জীব যদি জ্বলন্ত আগুনেও পড়ে, গভীর জলসাগরে ডোবে, গাছের মাথা থেকে পড়ে, মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে কাল যাঁর ভয়ে তাকে হরণ করে। আটাশ জন ইন্দ্রের বিনাশ রূপ বললে ব্রহ্মার দিন গণনা অনুসারে তিরিশ দিনে ব্রহ্মার এক মাস হয়।

দুমাসে ব্রহ্মার এক যুগ হয়, ছয় ঋতুতে হয় এক বছর। শ্রীহরির চোখের এক পলক পড়ে একশো বছর বয়সী ব্রহ্মার বিনাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণে অবস্থান করেন শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্টাত্রী দেবী রাধা, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মহা আনন্দে অবস্থান করেন বৈষ্ণবরা। তার লোমকূপে সকল বিশ্ব অবস্থিত। পৃথিবীর ধূলোর মতো ব্রহ্মার সৃষ্টি ও ধ্বংসেরও কোন সংখ্যা করা যায় না। মহাত্মারা দিব্যরূপ ধারন করাকে মোক্ষ্য বলেন।

সেবাশূন্য মুক্তি হল চার রকম। জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিষেক বলে কৃতকর্মের ভোগকেই। শ্রীকৃষ্ণ সেবায় সমস্ত কৃতকর্মের খন্ডন হয়ে যায় ও শুভ ফল লাভ হয়। শ্রেষ্ট তত্ত্বজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ সেবা। সাবিত্রীকে সুখে থাকার কথা বললেন–যম। এবং বললেন–পুণ্যক্ষেত্র ভারতে লক্ষ বছর ধরে সুখভোগ করার পর গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ ভবনে যাবে। জৈষ্ঠ্যমাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে মঙ্গলদায়ক সাবিত্রী চুতর্দশীর ব্রত করতে হয়। ভক্তিভরে ষোল বছর ধরে প্রতি বছর ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমি তিথি থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত আটদিন ধরে মহালক্ষীর ব্রত পালন করে সে শ্রীহরি ধাম বৈকুণ্ঠে যায়।

যে নারী ধন ও সন্তান কামনা করে মঙ্গলবার দেবী মঙ্গলচন্ডীকে প্রতি মাসের শুক্লা ষষ্টীতে, মঙ্গলদায়ক ষষ্টীকে আষাঢ়, সংক্রান্তিতে সর্বসিদ্ধি দাতা মনসাদেবীকে, কার্তিক মাসের রাস পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের থেকেই প্রিয় শ্রীরাধাকে ও প্রতিমাসে শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উপোস করে বরদাতা দুর্গতিনাশিনী জগতের জননী প্রকৃতি বিষ্ণুজায়া ভগবতী দূর্গাদেবীকে পতিপুত্র আছে। এমন নারীর উপরে কিংবা পতিব্রতা শুদ্ধ সাধারণ নারী বা মন্ত্রে বা প্রতিমাতে ভক্তির সঙ্গে পূজা করে, সেই নারী ইহলোকে সুখভোগ করে শেষে শ্রীহরিধাম বৈকুণ্ঠে গিয়ে থাকে। এরপর যম সাবিত্রীকে একথা বলে নিজের মন্দিরে চলে গেলেন। আর সাবিত্রিও নিজের স্বামীকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন।

.

পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়

নারায়ণ নারদকে বললেন–পুরাকালে সৃষ্টির প্রথমে রাসমন্ডলে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাঁদিক থেকে এই দেবীর আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, তার স্তন ছিল কঠিন ও নিতম্ব বিশাল, সাদা চাপা ফুলের মত গায়ের রঙ। রাধা প্রথমে দুহাত বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে বরণ করলেন। মহালক্ষীও তাঁকে কামনা করলে শ্রীকৃষ্ণ দুই রূপ ধরলেন। দ্বিভূজ শ্রীকৃষ্ণ হলেন রাধাকান্ত আর চুতভূর্জ নারায়ণ হলেন লক্ষীকান্ত। নারায়ণ লক্ষীর সঙ্গে বৈকুণ্ঠে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণ দুজনে সর্বদিক দিয়েই সমান, পরমাত্মা, পরম পুরুষ। মহালক্ষী সকল রমণীদের মধ্যে প্রধান হলেন, তিনি চাঁদ ও সূর্য রূপা, ক্ষীরোদসাগর কন্যা ও শ্রীরূপে পদ্মিনীতে আছেন, তিনি ঘরে, শস্যে, কাপড়ে, দেব প্রতিমায়, মানিক, মালায় আছেন। মহালক্ষীর পূজা ব্রহ্মা নিজে করেছিলেন। ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী থেকে শুরু করে পূর্ণিমা পর্যন্ত

আটদিন। বর্ষার শেষে মনু, পৌষ সংক্রান্তির দিন ও চৈত্রমাসের সংক্রান্তির দিন ঘরের ভেতরে শ্রীমহালক্ষ্মীকে আবাহন করে তার পূজা করেছিলেন।

.

ছত্রিশতম অধ্যায়

নারায়ণ প্রিয়া রূপে বৈকুণ্ঠে বাস করেন মহালক্ষ্মী। পূর্বে দুর্বাসার শাপে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা ও সকল মর্তবাসী শ্রীভ্রষ্ট হলে দেবী রেগে দুঃখ পেয়ে স্বর্গ ছেড়ে বৈকুণ্ঠ ধামে গিয়ে মহালক্ষীতে লীন হলেন। দৈন্য দশায় তখন দেবতাদের গলা ঠোঁট ও তালু শুকিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা তখন নারায়ণের স্মরণ নেন। দেবী তখন নারায়ণাদেশে নিজ অংশ দ্বারা সিন্ধুর মেয়ে রূপে উৎপন্ন হলেন ও ইন্দ্রের সম্পৎস্বরূপ হন। দেবতারা দৈত্যদের সাথে মিলিত হয়ে ক্ষীর সাগরে মন্থন করে লক্ষ্মীদেবীর দেখা পান ও তার কাছে বর লাভ করেন।

নারদ জানতে চাইলেন লক্ষ্মীদেবী কী করে সিন্ধুর কন্যা হলেন। মহর্ষি দুর্বাসার শাপে ইন্দ্র ও অন্য দেবতারা ও মর্তবাসী শ্রীভষ্ট হলে লক্ষীদেবী রেগে দুঃখিত হয়ে স্বর্গ ছেড়ে বৈকুণ্ঠে গিয়ে মহালক্ষ্মীতে লীন হয়ে যান। দেবতারা তখন ব্রহ্মসভায় উপস্থিত হন। তখন দেবী নারায়ণের আদেশে সিন্ধু কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন দেবতারা ক্ষীরোদসাগর মন্থন করে দেবীর কাছে বর চাইলে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে বর দিলেন ও বিষ্ণুকে বরমাল্য দিলেন। নারদ এরপর নারায়ণকে নানা প্রশ্ন করলে তার উত্তরে নারায়ণ বলতে লাগলেন। একদিন ইন্দ্র মধু খেয়ে কামার্ত হয়ে নির্জন জায়গায় রম্ভার সাথে ক্রীড়া করছিলেন।

পরে কামুকী রম্ভাকে কামোন্নত্ত অবস্থায় গভীর বনের মধ্যে অবস্থান করতে লাগলেন, দুর্বাসা বৈকুণ্ঠ থেকে কৈলাস পর্বতের দিকে যাচ্ছিলেন,তার গলায় ছিল সাদা যজ্ঞের পৈতা, পরনে কৌপীন, ইন্দ্র তাকে দেখামাত্র প্রণাম করলেন। তাকে দেখে ঋষি ও তার শিষ্যরা আর্শীবাদ করলেন। দুর্বাসা ইন্দ্রকে পারিজাত ফুল দান করলেন। ইন্দ্র সেই ফুল ভুলকরে নিজ হাতির মাথায় রাখলে, হাতি বিষ্ণুর সমতুল্য হয়ে উঠল। তখন মুনি এই কান্ড দেখে ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যার শাপ দিলেন। তার দেওয়া ফুল হাতিরমাথায় রাখার জন্য লক্ষ্মী ইন্দ্রকে ছেড়ে বৈকুণ্ঠে চলে যাবেন। শ্রীহরির কৃপায় দুর্বাসা ভয়শূন্য হয়ে গেছেন। সুতরাং তার পিতা কশ্যপ তার কিছু করতে পারবে না। পুত্র তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন– তাকে কিছু জ্ঞান দান করতে। ইন্দ্রের কথা শুনে, জ্ঞানশ্রেষ্ট সনাতন মহর্ষি দুর্বাসা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে হেসে তত্ত্বকথা বলতে লাগলেন এবং ইন্দ্রকে বললেন–যে সে বিপদের সময়েও মঙ্গলময়

ইষ্টমার্গ সম্বন্ধে জানতে চেয়েছে। সকল মার্গের শ্রেষ্ট জ্ঞানমার্গ থেকে সন্তোষ সন্তুতি লাভ করা যায়।

মানুষের স্বর্গলাভ হয় তপস্যা বা উপোস করলে, জ্ঞানীরা যে সাত্ত্বিক কাজ করেন তা শ্রীকৃষ্ণের পায়ে সমর্পন করে পরব্রহ্ম কৃষ্ণে লীন হন। এটাই নির্বাণ মোক্ষের কারণ বলে নির্দিষ্ট আছে সংসারীদের কাছে।

বৈষ্ণবরা জীবন্মুক্ত ও নিজের কুলকে উদ্ধার করে। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পৃথিবীর রাস পর্যন্ত সকল পদার্থই স্বপ্নের মত মিথ্যা, একমাত্র পরব্রহ্ম রাধাকান্তই সত্য। তার ভজনা করা উচিত, যোগীকে কর্মফল ভোগ করতে হয় না, শ্রীকৃষ্ণের সেবকদের ছোঁয়া মাত্রই সব পাপ ধুয়ে যায়। সমস্ত তপস্যার সার ও নিশ্চিতরূপে যোগ, সিদ্ধি, বেদপাঠ ও সকল ব্রতের সারব্রত।

যে কোনা কৃষ্ণভক্তই কৃষ্ণমন্ত্র নেওয়া মাত্রই ঐ মন্ত্রে বলীয়ান হয়ে পিতৃকূলের ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন লক্ষপুরুষ, মাতমহকুলের ঐরকম শত পুরুষ এবং বাবা, মা, গুরু, ভাই, স্ত্রী, বন্ধু, শিষ্য, চাকর, শ্বশুর, মেয়ে, জামাই, গুরুপুত্রও নিজেকে উদ্ধার করে থাকে। পবিত্রভাবে তিনজন্ম সূর্যের আরাধনা করে সবরকম বিঘ্নবিনাশকারী গণেশের উত্তম মন্ত্র লাভ করা যায়। গণেশের কৃপায় দিব্যজ্ঞন লাভ হয়, এরপর মহামায়ার আরাধনা আরম্ভ করা উচিত।

মানুষ একশো জন্ম পর্যন্ত মহামায়ার আরাধনা করে থাকে, যে দীর্ঘায়ু অমরত্ব, ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব ও রাজেন্দ্রত্ব দান করতে পারেন–সেই জ্ঞান ও হরি ভক্তিদায়ক আশুতোষকে তিনজন্ম সাধনা করে তার কৃপায় ও বরে নির্মল জ্ঞান লাভ করে থাকে। তখন সেই তত্ত্বজ্ঞানী মানুষ, জ্বলন্ত, নির্মল জ্ঞান রূপ প্রদীপের আলোয় ব্রহ্ম থেকে শুরু করে ঘাস পর্যন্ত সবই যে মিথ্যা একথা জানতে পারে। যারা বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক, গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থ সেবী, নিজ ধর্ম পালন করেন এবং ভিক্ষু তাদের জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। সকল পাপ ত্যাগ করে হরিসেবা করাই তীর্থ সেবীদের স্বধর্ম বলে বিধাতা নির্দেশ করেছেন। সন্ন্যাসী থাকবে শুদ্ধ, তবেই সে সন্ন্যাসী হবে। যে আপনা থেকে পাওয়া সুস্বাদু বা বিস্বাদ খাবার খান, নিজের খাবার জন্য অন্যের কাছে কিন্তু চান না তিনি সন্ন্যাসী, যে কাঠের তৈরী নারীমূর্তিও ছোঁয় না সে ভিক্ষু। গর্ভে বাস করার দুঃখ সব জায়গায় সমান তা সে দেব বা শূকর যে যোনিতেই হোক না কেন।

যোনির মধ্যে পুরুষের বীর্য পড়লে সেই বীর্য স্ত্রীর রক্তের সঙ্গে তক্ষুনি মিশে যায়। তবে যদি রক্তের অধিক্য থাকে, তবে কন্যা আর শুক্রের আধিক্য থাকলে পুত্র হয়। জোড়দিন ও রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতিবার যোগ হলে পুত্র আর বিজোড় বা অন্য দিনে হলে কন্যা হয়। অল্প আয়ু হয়,

প্রথম প্রহরে জন্মালে। চিরজীবী হয় চতুর্থ প্রহরে জন্মালে। রক্ত ও বীর্য একরাতের মধ্যে মেশে ও বীজ সৃষ্টি হয়। এভাবে সাতদিনে কুলের মত হয় ও একমাসে বালিশের মতো হয়। তিন মাসে হাত পা শূন্য এক মাংসপিন্ড হয় ও পাঁচ মাসে আঁটযুক্ত হয়। ছয়মাসে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। জীব মাতৃগর্ভে আবদ্ধ হয়ে দুঃখ পায়, সেখানে সে মায়ের খাবার ও জলের অংশ খায়, প্রসবের সময় বেরিয়ে আসে, শৈশবে সে পরাধীন থাকে ও খালি কাঁদে। শিশুর পাঁচ বছর অবধি কথার জড়তা থাকে।

যৌবন আসে পৌগন্ড পর্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করার পরে। এবং খাবার ও মৈথুনের জন্য নানা মোহে পরিবেষ্টিত হয়ে যত্নের সঙ্গে অনুগত ছেলে ও বউকে পালন করে। এবং বুড়ো হয়ে যাবার পর পরিবারের মানুষ তাকে বুনো ষাঁড়ের মত অবহেলা করবে। কানে কম শুনবে, শ্বাসকষ্টে পীড়িত হয়ে পরাধীন হবে। এবং আফশোষ করে বলবে সামনে জন্মে সে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করবে। মৃত্যুকালে তাকে যমদূতেরা নিয়ে যায়। দূতের দেখামাত্রই ভয়ে মলমূত্র ত্যাগ করে ও পঞ্চ ভূতে তৈরি দেহ ত্যাগ করে। যমদূত তখন লিঙ্গদেহকে ধরে যমালয়ে নিয়ে যায়। যম আগুনের মত শুদ্ধ কাপড় পরেছেন ও নানা রত্ন অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে তিনকোটি দূতের মধ্যে শোভিত।

জ্যোতির্বিদ পন্ডিতরা সময় ঠিক করার জন্য বলেন– ষাট পলে এক দণ্ড, ও দুই দন্ডে এক মুহূর্ত হয়। একদিনরাত হয় তিরিশ মূহুর্তে। একপক্ষ হয় পনের দিনে। কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষে হয় এক মাস। দুমাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন ও দুই অয়নে হয় এক বছর। এক যুগ হয় তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার বছরে। আয়ুষ্কাল হয় পঁচিশ হাজার পাঁচশো ষাট যুগে এক ইন্দ্রে। এক মনুর কাল হয় দশলক্ষ ইন্দ্রের আয়ুর সমান। এক ব্রহ্মার কাল হয় আট হাজার মন্বন্তরে। এক ব্রহ্মার বিনাশ হয় আট হাজার মন্বন্তরে, প্রাকৃতিক প্রলয় হয় ব্রহ্মার বিনাশে। মহাদেব নিজে বলেছেন যে, পৃথিবীর ধুলোবালি পৃথিবী থেকে যেমন মুক্ত হয় না সেরকম জীবরাও মোক্ষলাভ করতে পারে না।

.

সাঁইত্রিশতম অধ্যায়

নারদ জানতে চাইলেন হরির গুণকীর্তন শুনে জ্ঞান লাভ করে ঘরে ফিরে গিয়ে কি করেছিলেন তা দয়া করে বলুন। ইন্দ্রর দিনে দিনে বৈরাগ্য বাড়তে লাগল। ইন্দ্র স্বর্গরাজ্যকে শত্রুদের হাতে চলে যেতে দেখে গুরু বৃহস্পতির কাছে গেলেন এবং গঙ্গার তীরে বৃহস্পতিকে দেখতে পেলেন

তিনি। গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে সূর্যমুখ করে পরমব্রহ্মকে ধ্যান করেছিলেন। তাকে এভাবে ধ্যানমগ্ন দেখে ইন্দ্র সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন! এক প্রহর কেটে যাওয়ার পর বৃহস্পতি উঠে আসলেন এবং ইন্দ্র তাঁকে দেখে কাঁদতে লাগলেন। ইন্দ্র তাকে দুর্বাসার শাপের কথা সব বললেন। শিষ্য ইন্দ্রর কথা শুনে বুদ্ধিমানদের শ্রেষ্ঠ ও সৎপুরুষ বৃহস্পতির চোখ রাগে লাল হয়ে উঠল। তখন তিনি বললেন–দুঃখের কারণ নেই, যে যার মতো কাজের ফল ভোগ করবে। শ্রীকৃষ্ণ নিজে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে সম্বোধন করে নিজের সুখে সামবেদের অন্তর্গত কৌমুথশয্যা এই তত্ত্ব উপদেশ করেছেন।

চাষী যেমন নিজ অভিজ্ঞতায় উর্বর জমিতে অধিক শস্য ফলায়, তেমন দানের পাত্রভেদেও ফলোভের পার্থক্য ঘটে। চন্দ্রগ্রহণে দান করলে, কোটিগুণ ফল হয়, সূর্য গ্রহণে করলে দশগুণ বেশী হয়, অসংখ্য অক্ষয় লাভ হয় অক্ষয় তৃতীয়ায় দান করলে, গঙ্গাতীরে দান করলে কোটিগুণ লাভ হয়। অব্যয় ফল লাভ হয়, নারায়ণ ক্ষেতে দান করলে। কোটিগুণ ফললাভ হয় কুরুক্ষেত্রে, বদরিকা ও কাশীতে দান করলে। লক্ষগুণ ফল লাভ হয় কেদার ও হরিদ্বারে দান করলে। দশলক্ষ গুণ বেশী ফল লাভ হয় পুষ্কর ও ভাস্কর তীর্থে দান করলে। দেবাদিদেব শিব নিজে একথা বলেন যে, যে লোক বিপদে পড়ে মধূসূদনকে স্মরণ করে, তার বিপদে সম্পদের আবির্ভাব হয়। এই বলে বৃহস্পতি ইন্দ্রকে শুভ আশীর্বাদ দান করে, মঙ্গলজনক উপদেশ দেন।

.

আটত্রিশতম অধ্যায়

ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করে বৃহস্পতিকে সামনে রেখে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সভায় গেলেন। ব্রহ্মা দেবগুরুর কাছে সব শুনে ইন্দ্রকে বললেন– তুমি আমার প্রপৌত্র, বৃহস্পতির শিষ্য ও দেবরাজ। তোমার মাতামহ দক্ষ হলেন বিষ্ণুর ভক্ত। সুতরাং শুদ্ধ কুলের সন্তান অহঙ্কারী হতে পারে না। তিনি বললেন, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপায়ের নির্মাল্য ফুল যাঁর মাথায় থাকে, সকল দেবতার মধ্যে তারই আগে পূজা হয়। তুমি দুর্ভাগ্যবশতঃ তা থেকে বঞ্চিত হয়েছ। এখন তুমি বৃহস্পতি ও আমার সাথে বৈকুণ্ঠে চল। সেখানে নারায়ণের স্তুতি করে তার বরে লক্ষ্মীকে লাভ করতে পারবে।

যেখানে নারায়ণের নিন্দা হয় লক্ষ্মী সেখানে নিজের অপমান মনে করে চলে যায়। যেখানে শালগ্রাম শিলা পুজো হয় না ও ব্রাহ্মণদের খাওয়ান হয় না, লক্ষ্মী সেখানে থাকে না। লক্ষ্মী

নিজের পরাজয় মনে করে সেখানে থেকে চলে যায়। যে হরিনাম বিক্রি করে টাকা নেয়, যে নিজ কন্যা বিক্রয় করে, যে বাড়ীতে অতিথি খাওয়ান হয় না সে বাড়ী থেকেও লক্ষ্মী দেবী চলে যান। শুদ্রের রান্না করে যে ব্রাহ্মণ, এবং লাঙ্গল চষে জলপান ভয়েই লক্ষ্মী তাকে ছেড়ে চলে যান। যে ব্রাহ্মণ বিশ্বাসঘাতক, বন্ধু হত্যা করে, মানুষ হত্যা করে, লক্ষ্মী তাকে ছেড়ে চলে যান। মহাপাতকীর ঔরসে বেশ্যার গর্ভে যার জন্ম, পতিপুত্র হীন নারীর প্রতারণা করে খায়, লক্ষ্মী তার ঘর ছেড়ে চলে যান। যে ব্রাহ্মণ এক সূর্যে দুবার খায়, দিনের বেলা শুয়ে ঘুমায় ও দিনের বেলা শ্রীসংসর্গ করে হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী তার ঘর ছাড়েন। যে লোক ভেজা পায়ে বা উলঙ্গ হয়ে শোয় এবং অল্প বিদ্যাসম্পন্ন ও অত্যন্ত বাঁচাল হয় তাকে ছেড়ে লক্ষ্মী দেবী চলে যান।

যেখানে শাঁখবাজে ও শাঁখ, শালগ্রামশিলা ও তুলসী এবং শ্রীহরির সেবা, বন্দনা ও ধ্যান করা হয়– লক্ষ্মী সেখানে থাকেন। নারায়ণ দেবতাদের একথা বলে লক্ষ্মীকে বললেন–দেবী, তুমি নিজ কলার দ্বারা ক্ষীরোদ সাগরে জন্মগ্রহণ কর। লক্ষ্মী ক্ষীরোদশায়ী সর্বেশ্বর বিষ্ণুকে বনমালা দান করলেন।

লক্ষ্মীদেবী ব্রহ্মশাপ দূর করার জন্য দেবতাদের ঘরের দিকে তাকালেন ও দয়া করে বর দিলেন। দেবতারা নিজেদের রাজ্য ফিরে পেলেন। ভগবান নারদকে বললেন– যে মহালক্ষ্মীর উত্তম কথা বললেন–আর কি জানতে চায় সে।

.

উনচল্লিশতম অধ্যায়

নারদ লক্ষ্মীদেবীর স্তব ও ধ্যান শুনতে চাইলেন। নারায়ণ বলেন– তীর্থে স্নান করে ইন্দ্র ধোওয়া বস্ত্রে ক্ষীরসাগর তীরে ঘট পেতে গণেশ, সূর্য, বহ্নি, বিষ্ণু, শিব ও শিবার পুজো করে ব্রহ্মাকে পুরোহিত করে সেখানে পরম ঐশ্বর্যরূপিনী লক্ষ্মীকে আবাহন করে তার পূজো করেন। লক্ষ্মীকে বিশ্বকর্মা নির্মিত আসনে বসতে বলেন, তাকে মহামূল্য রত্নে তৈরী ফুল চন্দনযুক্ত রত্ন অলঙ্কারে সজ্জিত সুন্দর বিছানা গ্রহণ করতে বললেন।

ইন্দ্র এরপর তার স্তব করে বললেন, মহালক্ষ্মীকে আমার প্রণাম। পদ্মপাতার তুল্য চোখ যার, যে সিদ্ধি দান করেন তাকে আমার প্রণাম। রত্নপদ্মে সুশোভিত ও সকল সৌন্দর্য যুক্ত কৃষ্ণ শোভাবরণ সকল সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নিজ শস্যস্বরূপাকে প্রণাম।

নারদ বললেন–প্রভু! আপনি বলছেন দুর্বাসার দেওয়া শ্রীহরির পায়ের ফুল যার মাথায় থাকে তার পুজো হয় সকল দেবতার আগে ঐ ফুল ঐরাবতের মাথায় রাখেন ইন্দ্র। নারায়ণ বলেন–দুর্বাসা ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন। তখন গণেশ জন্মায়নি, গণেশের জন্ম হয়েছিল ইন্দ্র যখন লক্ষ্মীর পূজো করেন তখন। দুর্বত্সর শাপে দেবতারা বহুকাল দুঃখভোগ করে চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে শ্রীহরির বরে আবার লক্ষ্মীদেবীকে ফিরে পান।

.

চল্লিশতম অধ্যায়

নারদ তাঁকে বললেন–যে তার অর্থাৎ ভগবানের উপাখ্যান শুনতে পেলেন। এরপর অন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাখ্যান শুনতে চাইলে তিনি বলেন– পূর্বে দেবতারা সৃষ্টির প্রথমে খাবার জন্য ব্রহ্মালোকে অগম্য মনোহর ব্রহ্মসভায় গেলেন। ব্রহ্মার কাছে খাবার চাইলে তিনি তা দিতে সম্মত হলেন ও হরির ধ্যান করতে লাগলেন। ব্রহ্মা ঘি কে দেবতাদের খাবার হিসাবে ঠিক করলেন। কিন্তু দেবতারা তা না পেয়ে পুনরায় তার কাছে গেলেন, তখন তিনি হরির আদেশে প্রকৃতি দেবীর পূজা করলেন। প্রকৃতিদেবী দাহিকাশক্তি রূপে অগ্নির স্ত্রী স্বাহা নামে বিখ্যাত হলেন। এবং ব্রহ্মাকে বললেন–মনের মত বর চাইতে। ব্রহ্মা বললেন, অগ্নির দাহিকা শক্তি হয়ে তার পত্নী হতে, অগ্নি যেন তার সাহায্য ছাড়া কিছু পোড়াতে না পারে।

এরপর দেবী কামমোহন কৃষ্ণকে দেখে কামার্ত হলেন ও মূছ গেলেন। তার মনের কথা বুঝে হরি তাকে কোলে তুলে নিলেন। এরপর অগ্নি দেবের ঔরসে স্বাহার দক্ষিন, গার্হপত্য ও আহুনীয় নামে সুন্দর তিন পুত্র জন্মায়, ব্রাহ্মণ ও ঋষিরা বৈদিক মন্ত্রের শেষে স্বাহা উচ্চারণ করে এবং তা উচ্চারন করার সাথে সাথে সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয়। যে ‘ওঁং’ হ্রীং শ্রীং বহ্নিজায়ায়ে স্বাহা মন্ত্রে তার পূজা করে তার সকল কামনা বাসনা পূর্ণ হয়। যে ভক্তিভরে স্বাহার নাম কররে তার ইহ ও পরলোক সিদ্ধি লাভ করবে।

.

একচল্লিশতম অধ্যায়

নারায়ণ বললেন, এই স্বধা উপাখ্যান পিতৃগণের কাছে তৃপ্তির কার, যা সকল শ্রাদ্ধের ফল বাড়ায়, যে লোক জন্মে হরির সেবা করে না, হরির নৈবেদ্য বিহীন অন্ন খায় তার আমৃত্যু জন্ম

অশৌচ থাকে। তার অধিকার নষ্ট হয় দৈব কোন কাজে। যে ঘটে বা শালগ্রামশিলায় স্বধা দেবীর পূজা করবে, যে শ্রাদ্ধের সময় সমাহিত মনে স্বধাস্তোত্র শোনে, সে শত শ্রাদ্ধের পুণ্য ফল লাভ করে- পূর্বে স্বাহা গোলোকে রাধার সখী ছিলেন।

এবং কৃষ্ণকে রমণের কথা বলেছিলেন। বসন্তকালে তাকে কৃষ্ণের সাথে প্রমত্ত অবস্থায় দেখে রাধা। তাকে অভিশাপ দিলে সে মর্ত্যলোকে এসে অগ্নির স্ত্রী হয়েছেন। যে লোক শুদ্ধ হয়ে একমনে স্ববীর স্তব শোনে তার সব তীর্থে স্নান ও সব বেদ পাঠের ফল লাভ হয়।

.

বিয়াল্লিশতম অধ্যায়

এরপর নারায়ণ দক্ষিণা দেবীর উপাখ্যান বলবেন বললেন, পৌরাণিক কালে শ্রীকৃষ্ণের সুশীলা নামে এক প্রেয়সী ছিলেন পুরাণে। তিনি ছিলেন বিদ্যাবতী-গুণবতী-রূপবতী; সুশীলা রাধার সামনে কৃষ্ণের ডান কোলে বসেন। রাধা অভিমান করে, আসেন ঠোঁট ফুলিয়ে তা দেখে শ্রীকৃষ্ণ পালিয়ে যান! রাধা গোপীদের শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে পালাতে দেখে সুশীলাও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পালান।

এদিকে গোপীরা বিপদের আশঙ্কা করে ‘দেবী রক্ষা কর’ বলতে বলতে তার পায়ে আশ্রয় নিল। দক্ষিণা দেবী গোলোক থেকে ভ্রষ্ট হয়ে দীর্ঘকাল তপস্যা করে দেহে ঢোকেন এবং ব্রহ্মা শ্রীহরির ধ্যান করলেন। তিনি তখন মহালক্ষ্মীর দেহ থেকে মর্তের লক্ষী স্বরূপ দক্ষিণাকে বের করে এনে ব্রহ্মাকে দান করলেন। সৎলোকদের কাজের পূর্ণতার, সিদ্ধির জন্য ব্রহ্মা সেই দক্ষিণাকে যজ্ঞের হাতে দিলেন। যজ্ঞ নির্জন বনে দক্ষিণার সঙ্গে দৈব পরিমাণ একশো বছর পরমানন্দে বাস করলেন এবং যজ্ঞের বীর্যে বার বছর ধরে গর্ভধারণ করলেন। ব্রহ্মধন যে চুরি করে আর দক্ষিণা দেয়না তারা দুজনেই দড়িকাটা ঘটের মত নীচের দিকে যায়, যজমান দক্ষিণাপ্রার্থী ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা না দেয় সে ব্রহ্মধন চুরি করে ও কুম্ভিপাক নরকে যায় সেখানে লক্ষ বছর ধরে কষ্ট পায় যমদূতের তাড়নায়। নারদ বললেন– যে সব কাজের দক্ষিণা দিতে হয়। না যেসব কাজের ফল কে ভোগ করে, পুরাকালে যজ্ঞ কোন নিয়ম অনুযায়ী দক্ষিণার পূজো করেছিলেন? তা আমায় বলুন দক্ষিণাহীন ফল কি করে হবে। শ্রীকৃষ্ণের ডান কোলে বসার জন্য শ্রীরাধার অভিশাপে এখন নাম হয়েছে দক্ষিণা। যে মন দিয়ে দক্ষিণার ধ্যান শোনে সে লোকের কোনো কাজের অঙ্গহানি ঘটে না। বিপদে, বন্ধু বিচ্ছেদের সময়, সঙ্কটে ও বাঁধা থাকা অবস্থায় এই স্তোত্রপাঠ একমাস শুনলে তার সব বিপদ কেটে যাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

.

তেতাল্লিশতম অধ্যায়

নারদ এবার ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী ও মনসা প্রকৃতির কলা এই দেবীদের নামের অর্থ ও চরিত্র বিশেষভাবে শুনতে চাইলেন। নারায়ণ তাকে বললেন– ষষ্ঠী হলেন প্রকৃতি দেবীর ষষ্ট অংশস্বরূপ ইনি মাতৃকাদের মধ্যে দেবসেনা নামে বিখ্যাত। ষষ্টীদেবী সবসময় মায়ের মত বালকদের পরমায়ু বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন। রাজা প্রিয়ব্রত হলেন স্বায়ম্ভর মনুর ছেলে। তিনি সবসময় তপস্যা করতেন তাই অবিবাহিত থেকে যান। ব্রহ্মার আদেশে বিয়ে করলেও বহুদিন তাঁর পুত্র হয়নি। তাঁর স্ত্রী মালিনী কশ্যপের যজ্ঞের চরু খেলে তার গর্ভ সঞ্চার হয় এবং তা তিনি বার বছর ধরে তা ধারণ করেন। তারপর তাঁর এক পুত্র হলেও তার চোখের মণি বেরিয়ে এসেছিল।

রাজা তাকে বুকে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাজা বনে এক দেবীকে দেখলেন যে ভক্তদের জন্য দয়ালু ও তৎপর। রাজা দেবীর পরিচয় চাইলে তিনি বললেন–তিনি দেবসেনা। দেবী মরা ছেলেকে নিয়ে মহাজ্ঞান বলে অবলীলাক্রমে শিগগিরই তাকে বাঁচিয়ে তুললেন। দেবী তাকে নিয়ে আকাশ পথে চলে যেতে উদ্যত হলেন। রাজা ভয় পেলেন। তিনি দেবীর স্তব করতে লাগলেন। দেবী তখন তাঁকে তাঁর পুজো প্রচার করতে বললেন। তাতেই তিনি এই পুত্র ফেরত দেবেন বললেন।

রাজা পুত্রকে পেয়ে খুশি মনে রাজ্যে ফিরে প্রতিমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্টী তিথিতে ষষ্ঠীদেবীর পূজা শুরু করলেন, এতে সদ্যোজাতদের মঙ্গলকামনা হয়। রাজা একুশ দিনের দিন যত্নসহ ষষ্ঠীপুজোর আদেশ দিলেন। রাজা প্রিয়ব্রত ষষ্টীদেবীর স্তবকরে তার কৃপায় যশস্বী হলেন ও রাজেন্দ্র সন্তান লাভ করলেন। যে লোক ষষ্টীস্তোত্র এক বছর শোনে তার সন্তান হয় ও সেই সন্তান দীর্ঘজীবী হয়। মহাবন্ধ্যা নারীও সন্তান লাভ করে। কাকাবন্ধ্যা নারী এ স্তব শুনলে দেবীর কৃপায় তার যশস্বী সন্তান লাভ হয়। রোগগ্রস্ত সন্তানের বাবা মা এই স্তব শুনলে ষষ্টীদেবীর দয়ায় সন্তান রোগমুক্ত হয়।

.

চুয়াল্লিশতম অধ্যায়

এরপর নারায়ণ নারদকে মঙ্গল চন্ডীর পূজোর কথা বললেন। পুরাকালে পরমেশ্বর বিষ্ণু মহাদেবকে ত্রিপুরাসুর বধের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন, তখন শিব এই পরমেশ্বরীকে সবার প্রথমে পূজো করেন। শিব তখন সঙ্কটাপন্ন হলে ত্রিপুরাসুর রাগে আকাশ থেকে মহাদেবের রথ নীচে ফেলে দেয়, মহাদেব তখন দূর্গার স্তব করলে, দেবী মঙ্গলচন্ডী রূপে আবিভূর্ত হন ও মহাদেবকে বলেন আপনার কোন ভয় নেই, শিবের বাহন হলেন বিষ্ণু। তিনি ষাঁড়ের রূপ ধরেন। শিব বিষ্ণুর দেওয়া অস্ত্রের সাহায্যে ত্রিপুরাসুরকে হত্যা করলেন। ত্রিপুর দৈত্য মারা গেলে সকল দেবতা ও মহর্ষিরা মাথা নিচু করে শিবকে প্রণাম করে তার স্তব করলেন।

শ্রী শ্রী মঙ্গলচন্ডী দেবীর পূজা করলেন। আর মাধ্যন্দিন শাখায় ধ্যান এর কথা বলা হয়েছে, ভক্তি করে দেবীর ধ্যান করে মূলমন্ত্র বলে ঐ সকল উপাচার করলেন, শ্রী শ্রী মঙ্গলচন্ডীর দেবীর, 'ও হ্রীং শ্রীং ক্লীং সবপূজ্যায়ে দেবী মঙ্গলচন্ডিকায়ে ফট স্বাহা' এই একুশ অক্ষরের মূলমন্ত্র। মঙ্গলচন্ডীকে মুনি দেবতা মনু ও মানুষরা পূজো করতে লাগল। যে দেবী মঙ্গল চন্ডীর মঙ্গল স্ত্রোত্র শোনেন তার সব সময় মঙ্গল হয়। তার পুত্র পৌত্রের ও মঙ্গল বাড়তে থাকে।

.

পঁয়তাল্লিশতম অধ্যায়

এরপর নারায়ণ মনসা দেবী উৎপন্ন হয়েছেন তার গল্প কথা বললেন। মনসা উৎপন্ন হয়েছিলেন কশ্যপ ঋষির মন থেকে। ইনি মনে পরমেশ্বরের ধ্যান করেন বলে তাঁর নাম মনসা, আত্মারাম বৈষ্ণবী মনসা দেবী তিন যুগ ধরে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে সিদ্ধযযাগিনী হয়েছিলেন। দেবী সর্বদা বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন বলে তাঁর নাম বৈষ্ণবী। সাপের ভয় আছে এমন বিছানায়, সাপ থাকে এমন মন্দিরে, সাপ কামড়ালে পর সেই দুর্দান্ত মহাবিপদের সময় এবং সারা দেহে সাপ জড়িয়ে গেলে পর যে লোক বারোটি নামযুক্ত মন্ত্র পাঠ করে, সাপের ভয় থেকে সে মুক্ত হয়ে যায়।

.

ছেচল্লিশতম অধ্যায়

মনসাদেবীর স্তোত্র–যাঁর গায়ের রঙ সাদা চাপা ফুলের মত, যিনি রত্নালংকারে সজ্জিতা, যার পরণে অগ্নিশুদ্ধ কাপড়, যাঁর গলায় সাপের মত পৈতা, যিনি মহাজ্ঞান যুক্ত, সেই মনসা দেবীর

ভজনা কর। মহর্ষি কশ্যপ তপস্যায় মন থেকে সাপের মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসাকে সৃষ্টি করলেন। শিব সকলের পূজ্য যে স্তব, ভুবন ধ্যান, বেদোক্ত সর্বসম্মত পুরশ্চর্য্যাক্রমও মনসাদেবীকে দান করলেন। দেবী তখন শিবের কাছ থেকে মৃত্যুঞ্জয় নামক শ্রেষ্ঠজ্ঞান পেলেন। পুরাকালে কশ্যপমুনি শ্রেষ্ঠ জরকারুকে সেই কন্যা দান করেন ও ব্রহ্মার আদেশে জরৎকারু মুনি অযাচিত ভাবে সেই মনসা দেবীকে গ্রহণ করেন।

যে লোক শৃঙ্গার মুহূর্তে ও ঘুমের সময় ব্যাঘাত ঘটায়, তাকে অনন্তকাল কালসূত্র নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। বিশেষভাবে পতিব্রতা নারীর পক্ষে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ এই কথা বলে মনসাদেবী ভয়ে পেয়ে ভক্তি ভরে স্বামীর পায়ে পড়লেন ও কাঁদতে থাকলেন। মুনি তখন সূর্যকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলে, সূর্যদেব ভয় পেয়ে সন্ধ্যাদেবীর সঙ্গে সেখানে এলেন।

সকল তত্ত্বের মূল কথা হল শ্রীহরি। তিনি ছাড়া সবকিছুই বিড়ম্বনা মাত্র। সে গুরু, পিতা বা বন্ধু। হবে না যে লোক গর্ভযন্ত্রণা ও যম যাতনা থেকে মানুষকে মুক্ত না করে।

ইন্দ্র মনসা দেবীর স্তব করে নানা অলংকারে সাজিয়ে তাঁর সঙ্গে নিজের পুরীতে গেলেন। পুত্র আস্তিকের সাথে মনসা দেবী চিরকালই বাবার বাড়িতেই থাকতে লাগলেন। গোমাতা সুরভী মনসা দেবীকে চিরকালই অত্যন্ত দুর্লভ জ্ঞান দিলেন।

.

সাতচল্লিশতম অধ্যায়

নারদ সুরভীদেবীর জন্ম ও চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাইলেন। নারায়ণ বলতে লাগলেন– গোরুদের অধিষ্টাত্রী দেবী হলেন সুরভীদেবী। তিনি গোলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। সুরভীর জন্ম হয়েছিল বৃন্দাবনের সুন্দর বনে। একদিন শ্রীকৃষ্ণ রাধার সঙ্গে গোপী দ্বারা পরিবৃত হয়ে বৃন্দাবনে গেলেন। সেখানে তাঁর দুধ খাওয়ার ইচ্ছা হল। তিনি তখন তার বাঁদিক থেকে সুন্দর বাছুরযুক্ত দুধেল গরু দেখে দুধ দোয়ালেন। শ্রীকৃষ্ণ দুধ খাওয়ার পর পাত্রের দুধ দিয়ে এক সরোবর সৃষ্টি হল। যার বিস্তার একশো যোজন। তা ক্ষীর সরোবর নাম পেল। রাধা ও তার সহচরীদের জল কেলির জায়গা হল এটি। এর চারধার রত্ন দিয়ে বাঁধানো। সুরভী দেবীকে 'ওঁ সুরভৈ নমঃ এই ছয়অক্ষরের মূলমন্ত্র লক্ষবার জপ করে সিদ্ধ হলে তা কল্পতরু মত হয়। ঘটে, গরুর মাথায়, গরু বাঁধার খুঁটিতে, শালগ্রাম শিলায়, আগুনে কিংবা জলে ব্রাহ্মণ এই সুরভি দেবীর পূজা করবে। জগতে সবাই তাঁর পূজা করবে। ইন্দ্র তাঁকে প্রণাম করে বললেন, আপনি

সকল গরুর বীজস্বরূপ, আপনি সবার প্রিয় আপনি লক্ষ্মীর অংশস্বরূপ। আপনি কৃষ্ণপ্রিয় ও গরুদের মা, আপনি শ্রেষ্ঠ কল্পতরুর মতো। আপনি তুষ্ট হয়ে সকলকে মঙ্গল ও গোধন দান করেন। আপনি যশ-ধর্ম ও কীর্তি দান করেন। আপনাকে সহস্র প্রণাম।

.

আটচল্লিশতম অধ্যায়

নারদ এরপর উত্তম রাধার উপাখ্যান, তার জন্মবৃত্তান্ত ধ্যান ও কবচ মন্ত্র শুনতে চান। নারায়ণ বললেন– পুরাকালে কৈলাস পর্বতে ভগবান সনাতন, সিদ্ধেশ্বর, সিদ্ধিপ্রদ, সর্বস্বরূপা, মহাদেব কার্তিকের কাছে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের রাসমন্ডলে রাধার সঙ্গে রাসলীলা বর্ণনা করে ছিলেন। মহাদেব দূর্গাকে অপূর্ব রাধার উপাখ্যান বললেন। দূর্গা পুনরায় তা শুনতে চাইলেন। মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে অপূর্ব রাধার উপাখ্যান বলতে শুরু করলেন। পরম রমণীয় রমণী রাসেশ্বরী রাধা রমণ করতে উৎসুক হলেন। নানা বহুমূল্য রত্ন অলংকারে সজ্জিত রাধা রত্ন সিংহাসনে বসলেন। গ্রীষ্মকালের সূর্যের মত সৌন্দর্যযুক্ত রত্ন মালা ধারণ করেছিলেন। সেই মুক্ত মালা গঙ্গা স্রোতের মত সাদা ও পবিত্র ছিল। কৃষ্ণভক্তরা শ্রীরাধার রাস মন্ডলে উদ্ভব এবং শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনের জন্য দৌড়চ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের সন্দতে রাধা অভিসার করছেন। শ্রীরাধার লোমকুপ থেকে সকলগোপীরা আর শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ থেকে সকল গোপদের উৎপত্তি হয়েছে। শ্রীরাধার পাদপদ্ম ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের পক্ষে পাওয়া কঠিন হলেও, তার ভক্তদের পক্ষে পাওয়া কঠিন না।

.

উনপঞ্চাশতম অধ্যায়

পার্বতী জানতে চাইলেন শ্রীরাধাকে সুদামা কেন অভিশাপ দিলেন? ভৃত্য হয়ে সুদামা কেন নিজের ইষ্টদেবের পত্নী রাধাকে অভিশাপ দেন? শিব বললেন– রাধানাথ একদিন গোলোকে বৃন্দাবনে শতশৃঙ্গ পাহাড়ের এক পাশে বিরজা নামে এক গোপিনী যে কিনা সৌভাগ্যে রাধার সমান, তার সঙ্গে নানা অলংকারে সজ্জিত হয়ে খেলা করছিলেন। রত্ন দিয়ে তৈরী সেই রাসমন্ডলের চারদিকে রত্ন প্রদীপ জ্বলছিল। সখী পরিবৃতা হয়ে শ্রীরাধা প্রস্থে দশ যোজন ও দৈর্ঘ্যে শত যোজন পরিমিত ও অমূল্য রত্ন দিয়ে তৈরী দিব্য রথে চড়লেন। এটি অমূল্যরত্ন দিয়ে তৈরী। নানা আয়না, বহু মূল্য মণি ও ফুলের মালা সেখানে শোভা পাচ্ছিল। রাধার সঙ্গে

নিজের প্রেম ভঙ্গের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিরজাকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। বিরজা প্রাণত্যাগ করলেন। বিরজার সখীরা ভয়ে আকুল হয়ে বিরজার শরণাপন্ন হল। বিরজা তখন রাধার ভয়ে গোলোকে নদীরূপ ধরলেন। এ নদী দৈর্ঘ্যে শতকোটি যোজন আর প্রস্থে কোটি যোজন। যা গোলককে ঘিরে রাখল পরিখার মতো। শ্রীরাধা বৃষভানু মেয়ের দেহে নিজের ছায়া রেখে নিজেই অহিত হলেন। রাধার বিয়ে হয় রায়ানের সাথে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে কিছু কাল রাধার সঙ্গে বিহার করেছিলেন। পরমেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণ নিজে গোলোকে কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাসমন্ডলে শ্রীরাধার পূজা করেছিলেন।

.

পঞ্চাশতম অধ্যায়

পার্বতী এরপর সূযজ্ঞ রাজার কথা জানতে চাইল। কেন সে ব্রহ্মশাপ পেয়েছিল। রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা ও তাঁর পূজনীয়। সুতরাং মলমূত্রের আধার যুক্ত সাধারণ একজন মানুষ। তার আরাধনা করেছিলেন। যজ্ঞশেষে রাজা মহানন্দে মহাদেব বললেন–শতরূপার স্বামী হলেন তপস্বী স্বায়ম্ভর মনু। ইনি ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন। স্বায়ম্ভবের পুত্র উত্তানপাদ এবং উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব। ধ্রুবের পুত্র নারায়ণ ভক্ত উৎকল। ইনি পুষ্করে হাজার রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। রত্ন ও সকল সম্বৎ দান করেছিলেন। রত্ন দিয়ে শিং বাঁধিয়ে দশ লক্ষ গরু দক্ষিণার সঙ্গে সানন্দে ব্রাহ্মণদের দিয়েছিলেন। রাজা সুজজ্ঞ যজ্ঞ শেষ করে শ্রেষ্ঠরত্নে তৈরী, কোটি ছাতাযুক্ত সুন্দর সভায় রত্নসিংহাসনে বসলেন। এই সভা চন্দন-পল্লবে সুশোভিত, শাখাযুক্ত ভর্তি কলস ও কলাগাছে সুশোভিত, চন্দন অগরু-কস্তুরী ফল সিন্দুরযুক্ত। যেখানে শোভা পাচ্ছেন ইন্দ্র-চন্দ্র-রুদ্র-সূর্য ও অন্যান্য মুনিরা, নারদ মনু প্রভৃতি এবং সেখানে আসন গ্রহণ করেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। সেখানে ব্রহ্মা এসে হাজির। পরণে তার ছেঁড়া ও নোংরা কাপড়।

তিনি এসে রাজাকে আর্শীবাদ করলেন। তাঁকে দেখে সভাসদরা মুচকি হাসলেন। ব্রহ্মা রেগে গিয়ে রাজাকে শাপ দিলেন। তিনি রাজাকে বললেন–লক্ষ্মী ছাড়া হও, কুষ্ট রোগগ্রস্ত ও বুদ্ধিহীন হয়ে বিপন্ন হও। রাজা তার কাছে ক্ষমা চাইলেন। রাজা অনুতপ্ত হয়ে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণের পিছনে যেতে লাগলেন পুলহ, পুলস্ত্য, প্রচেতা, ভৃগু, অঙ্গিরা, মরীচি, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ক্রতু, শুক্র, বৃহস্পতি, দুর্বাসা, লোমশ, গৌতম, কণাদ, কন্থ, কাত্যায়ন, কঠর পাণিনি, জাবালি, ঋষ্যশৃঙ্গ, ভরদ্বাজ, আস্তীক, লাঙ্গলী, গর্গ, বৎস, বামদেব, বালখিল্য প্রভৃতি পতিবৃন্দ, শক্তি দক্ষ, কর্দম, প্রস্কন্ন, কপিল, বামদেব, বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য মুনিরা,

পিতৃগণ, অগ্নি ও হরিপ্রিয়া দেবতারা এবং দিকপালেরা সবাই সেই ব্রাহ্মণদের পিছনে যেতে লাগলেন। তাঁরা ব্রাহ্মণকে বুঝালেন ও সেখানে বসালেন। তারপর সেই সব নীতিশাস্ত্রজ্ঞ মুনিরা ব্রাহ্মণকে একথা বললেন।

.

একান্নতম অধ্যায়

পার্বতী ব্রহ্মার কাছে জানতে চাইলেন সেই ব্রাহ্মণকে কি বলেছিলেন? মহাদেব বললেন, তাঁরা ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করলেন ও বললেন– তুমি রাজাকে শাপ দিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার পেছনে লক্ষ্মী, কীর্তি, যশ রাজাকে ছেড়ে চলে গেছেন। তুমি রাজাকে ক্ষমা করে রাজভবনে এসে তা শুদ্ধ কর। দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন, অতিথি যে বাড়ী থেকে মন খারাপ করে চলে যায়, অনাদর করার জন্য কোন বস্তু না নিয়েই ফিরে যায়, তার বাড়ী থেকে সবকিছু চলে যায়। কশ্যপ বললেন, যে লোক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে দেখে অবজ্ঞা করে ও উপহাস করে, সেই পাপী বিষ্ণু পুজাহীন হয়। দুর্বাসা বললেন, গুরু ব্রাহ্মণ কিংবা দেবতার মুর্তি দেখে যে তোক প্রণাম না করে, সে পরজন্মে শূকর হয় ও মিথ্যা সাক্ষ্যদান ও বিশ্বসঘাতকরূপে পাপ কাজে লিপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ হত্যা করলে স্ত্রী হত্যার দ্বিগুণ পাপ হয়। সে কুম্ভীপাক নরকে বাস করে লক্ষ বছর। ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন– সামবেদে ষোল রকমের কৃতপ্নের কথা বলা হয়েছে। কৃতঘ্নদের ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম হয়। পরাশর বললেন, যে দুর্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ শূদ্রদের রান্নাবান্না করে, সেই ব্রাহ্মণ একাত্তর যুগ ধরে অসিপত্র নরকে বাস করে। ভরদ্বাজ বললেন–যে ব্রাহ্মণ শূদ্রদের মরা পোড়ায় সে কৃতঘ্ন। মার্কণ্ডেয় বললেন–ব্রাহ্মণ যদি শূদ্র স্ত্রী সঙ্গম করে তার যে দোষ হয় তা হল তাকে কৃতঘ্নদের মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্ট ও পাপী বলা হবে।

.

বাহান্নতম অধ্যায়

রাজা সুজজ্ঞ প্রশ্ন করলে এবার নারায়ণ বলতে লাগলেন- হে রাজা! যে লোক নিজের দেওয়া বা পরের দেওয়া ব্রহ্মবৃত্তি চুরি করে, সে কৃতঘ্ন। যমদূতরা ভীষণ মেরে তাকে গরম আগুন খাওয়ায় এবং মহাপাপের ফলে ষাট হাজার বছর বিষ্ঠা মধ্যে কৃমি রূপে বাস করে। আস্তিক

বললেন–মাতৃগমনের যে দোষ শুদ্রের ব্রাহ্মণ গমনেও সেই একই হয়। সেই দোষেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে শূদ্রের সঙ্গম হয়। চন্ডালরাও তাকে স্পর্শ করতে সঙ্কোচ বোধ করে। সে পাপী বিষ্ঠার মতই নিতান্ত অপবিত্র। মহাভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক প্রলয় হয় যাবার পর আবার সৃষ্টির আরম্ভে সেই পাপী সেই রকমই থাকে অথবা ষাট হাজার বছর বিষ্ঠ কৃমি হয়ে থাকে। যে ব্রাহ্মণকে যত্নের সঙ্গে পূজা করে তাড়াতাড়ি বনে গিয়ে তপস্যা করে তার আশীর্বাদে ব্রহ্মশাপ থেকে মুক্ত হয়ে আবার নিজ রাজ্যে ফিরবে।

.

তিপান্নতম অধ্যায়

মুনিরা চলে যাওয়ার পর রাজা ঘুমিয়ে পড়লেন। বশিষ্ট মুনির আদেশে ব্রাহ্মণের পায়ে শুয়ে পড়ে প্রণাম করলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের মঙ্গলের জন্য পরমাত্মা শ্রীহরির তপস্যা করেন। বর পেয়ে নারায়ণের কাছে এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ সন্তান লাভ করেন। সুযজ্ঞ রাজার যজ্ঞে সকল মুনিরা এসেছেন শুনে বিষ্ণুভক্তি লাভের জন্য পরমপূজ্য মুনিদের কৃপায় বিষ্ণুভক্তি পাওয়ার জন্য এখানে এসেছি। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির স্রষ্টা পরমাত্মা, এ কারণে ধ্যানেও তাকে পাওয়া যায় না। মহাবিষ্ণুর প্রাকৃতিক পুরুষ এক ডিমের থেকে উৎপন্ন হয়েছে যা আবার শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীরাধার গর্ভ থেকে উৎপন্ন। প্রকৃতি ও প্রাকৃতরা সবাই কালকে ভয় পান, কারণ কালের বলেই জরা জন্মগ্রহণ করেন ও মহাপ্রলয়ের সময় শ্রীকৃষ্ণে লীন হন।

.

চুয়ান্নতম অধ্যায়

রাজা সুজজ্ঞ জানতে চাইলেন, জগতের আধার বিষ্ণুর আধার কে? বিশ্বের উপর দিকে বা কোন লোক আছে? বা মুনি সুতপা বললেন, সকল বিশ্বের থেকেও বড় ও আকাশের মত সর্বব্যাপী গোলাকধাম সব সময় নিত্য লোক। যা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ডিমের আকারে উৎপন্ন হয়ে বিরাজ করছে। প্রথম সৃষ্টির সময় প্রকৃতির সঙ্গে সৃষ্টির খেলায় কিছুটা পরিশ্রান্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে ঘাম ঝরে পড়ে সেই জলে গোলকধাম পরিপূর্ণ। সেই গোলকধামই প্রকৃতির গর্ভজাত ডিমের থেকে উৎপন্ন সেই বিশ্বের আধার হচ্ছে মহাবিষ্ণুর অতি বিস্তৃত আধার। এই গোলোকধাম বৈকুণ্ঠধাম থেকে পঞ্চাশ কোটি যোজন উপরে অবস্থিত। বিরাজা নদীর ও শতশৃঙ্গ পর্বতের অর্ধেক পরিমাণ বৃন্দাবন দিয়ে এই গোলকধাম সুসজ্জিত। সেই

বৃন্দাবনের অর্ধেক পরিমাণ জায়গা বাসমন্ডল এবং সুন্দর গোলোক ধামের চারিদিক ঘেরা। বৈষ্ণবরা মহাশক্তি মহালক্ষীকে শ্রীরাধা বলে থাকেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের অর্ধাংশ স্বরূপ, নারায়ণের স্ত্রী মহালক্ষী কৃষ্ণ মন্ত্রের উপাসক, কৃষ্ণভক্তি পারায়ণা ও বিষ্ণুর নৈবেদ্য খান। তিনি শ্রেষ্ঠ, মহান ও পরম পবিত্র। শ্রীরাধা কৃষ্ণের বুকে অবস্থান করেন। রাধার সখীরা চামর দুলিয়ে বাতাস করে। আগে রাধার নামোচ্চারণ, পরে কৃষ্ণ ও মাধব এভাবে উচ্চারণ করার বেদজ্ঞ পন্ডিতরা কথা বলেন।

.

পঞ্চান্নতম অধ্যায়

সুযজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ সুতপাকে জিজ্ঞাসা করলেন –যে তিনি কার পূজা করবেন? সুতপা তাকে শ্রীরাধার ভজন করতে বললেন। আর বললেন—'ওঁ রাধায়ৈ স্বাহা' এই ছয় অক্ষরের মন্ত্র দান করলেন। রাজা মুনির দেখান ক্রমানুসারে উত্তম রাধামন্ত্র জপ করতে লাগলেন। চুলের খোঁপায় মালতী ফুলের মালা, যিনি রূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গজরাজের মত আস্তে চলেন যিনি। যিনি শ্রীকৃষ্ণের কাজে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রাসমন্ডলে রত্নসিংহাসনে যিনি বসেন ও রাসে যিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থাকেন সেই রাসেশ্বরী শ্রীরাধাকে ভজনা করি। আসন-বসন-পাদ্য-অর্ঘ্য-গন্ধ-অনুলেপন-ধূপ-দীপ-উত্তম-ফুল স্থানীয়-রত্ন অলংকার-নানা নৈবেদ্য-তাম্বুল– সুগন্ধি জল– মধুপর্ক এবং রত্নময় শয্যাশ্রীরাধার পূজোর ষোল উপাচার এগুলি। হে রাধা! আপনি অমূল্য রত্নে তৈরী বলাচূড় ইত্যাদি ও সুন্দর শঙ্খ ও ভূষণ নিন। সুন্দর কর্পূর মেশানো এই তাম্বুল নিন। এভাবে ভক্তি ভরে পূজা করে তাঁকে তিন বার পুস্পাঞ্জলি দিলেন। শ্রীরাধা পূজারূপ ব্রতে ব্রত পালনকারী ভক্ত রাজা সুযজ্ঞ রাধাকে যুথিকা, মালতী ও পদ্মামালা দান করবে। শ্রীরাধাকে কৃষ্ণও পূজা করেন। পুরাকালে বৃন্দাবনের মধ্যে রাসমন্ডলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার স্তব করে তার পূজা করেছিলেন। কাশ্যপ রাধার আরাধনা করে অদিতিকে লাভ করেছেন। যে দুর্ভাগা স্ত্রী হারিয়ে এক মাস ধরে রাজার স্তব শোনে, যে শীঘ্র সুন্দরী স্ত্রী লাভ করে। দক্ষের মেয়ে সতী মারা গেলে কৃষ্ণের আদেশে রাধাকে স্তব করে তাকে পেয়েছেন শিব। সাবিত্রীকে ব্রহ্মা লাভ করেছিলেন রাধার স্তব করে। দুর্বাসার শাপে যখন সকল দেবতারা শ্রীহীন হয়ে পড়েন তখন রাধার স্তবের দ্বারা তারা স্ত্রী ও দুর্লভ সম্পদ লাভ করে। যে ভক্তির সাথে শ্রীরাধার পূজা করে প্রতিদিন এই রাধা স্তব পড়বে, সে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গোলোকধামে যাবে।

.

ছাপান্নতম অধ্যায়

পার্বতী এরপর শ্রীরাধার কবচ শুনতে চাইলেন। এটি অত্যন্ত গোপনীয় মন্ত্রের মূর্তবিগ্রহের মত। যা ধারণ করে ও পাঠ করে ব্রহ্মা বেদমাতা সাবিত্রীকে লাভ করেছেন। এই কবচ ধারণ করে বিষ্ণু সমুদ্র কন্যাকে লাভ করে জগৎ পালন করেছেন। এই কবচ ধারণ করে মৃত্যু আলাদা হয়ে সকল প্রাণীদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এই কবচ ধারণ করে মহালক্ষ্মী সকল সম্পদ দান করেন। ও রাধায়ৈ স্বাহা' এই কল্পতরুর মত মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ নিজে উপাসনা করেছেন। পার্বতীকে শ্রীরাধা কবচ কথা বললেন। আকাশ থেকে শ্রেষ্ঠ বিস্তৃত আর কোন বস্তু নেই, সেইরকম বিষ্ণুভক্ত মহাদেব থেকে শ্রেষ্ঠ আর কোনো জ্ঞানী ও যোগী পুরুষ নেই। শিব সবসময় কৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন, শি শব্দের অর্থ মঙ্গল, 'ব' শব্দের দ্বারা যিনি দান করেন তাকে বোঝায়। যিনি মঙ্গল দান করেন তিনিই শিব।

.

সাতান্নতম অধ্যায়

নারদ ব্রহ্মাকে বললেন, তিনি দূর্গা দেবীর শ্রেষ্ঠ উপাখ্যান শুনতে চান। তিনি বললেন–দূর্গ শব্দের অর্থ–দৈত্য, মহাবিঘ্ন, সংসার বন্ধনের কাজ, নরক যমদন্ড এবং 'আ' শব্দের অর্থ হত্যা করা। যিনি এই সকল হনন করেন তিনিই দূর্গা। যিনি নারায়ণের এই শক্তি তিনি নারায়ণী। বিষ্ণু প্রথমে সৃষ্টির সময় মায়া সৃষ্টি করে তা দিয়ে সকল বিশ্ব মোহিত করে রেখেছিলেন। দূর্গাকে বলা হয় বিশ্বমায়া। শিবের প্রিয় হল 'শিবা'। যে দেবী সকলকে আনন্দ, সম্পদ ও কল্যাণ দান করেন তিনি সর্বমঙ্গলা। সৃষ্টির প্রথমে কৃষ্ণ গোলোকধামের অন্তর্গত বৃন্দাবনের রাসমণ্ডলে প্রথম পূজো করেন। ব্রহ্ম দ্বিতীয়বার মধু ও কৈটভ এর ভয়ে পূজা করেন। তৃতীয়বার মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে পুড়িয়ে মারার জন্য দুর্গার আরাধনা করেন। চতুর্থবার দূর্বাসার শাপে স্বর্গের অধিকার হারিয়ে ইন্দ্রভক্তির সঙ্গে ভগবতীর পূজা করেন। নদীতীরে সমাধি নামে একবৈশ্যও এই দেবীকে বিশেষভাবে পূজা করে মুক্তি লাভ করেছেন। রাজা সুরথ পুষ্কর তীর্থে দারুন কঠোর তপস্যা করেন। তার নাম হয় সাবর্ণি মনু। ব্রহ্মা নারদকে জিজ্ঞেস করল যে সে আর কি শুনতে চায়।

.

আটান্নতম অধ্যায়

এবার নারদ রাজা সুরথের সকল বৃত্তান্ত জানতে চাইল। নারায়ণ বললেন, ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র নিশাকর চন্দ্র। চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হন। বৃহস্পতির পত্নী তারার গর্ভে চন্দ্রের যে পুত্র হয় তার নাম বুধ। মহাকামুক চন্দ্র একদিন তারাকে গঙ্গাতীরে দেখলেন। বাতাসে তার নিচের দিকে কাপড় সরিয়ে দিচ্ছে। চন্দ্র তাকে দেখে কামাসক্ত হয়ে পড়লেন ও লজ্জা হারিয়ে ফেললেন। তিনি তারাকে বললেন, তিনি বেরসিক লোকের সঙ্গে কি সুখ পেয়েছেন। বৃহস্পতি সবসময়ই তপস্যা করে চলেছেন।

চন্দ্র তাকে বললেন–বাসন্তী ফুলের বিছানায় তুমি আমাকে নিয়ে রতিসুখ পাও । সুন্দর মলয় পর্বতের গুহায় চন্দনের গন্ধ চাপাবনে ঠান্ডা চাপা ফুলের গন্ধময় বায়ু বইছে। সেখানে বিহার করত। তারা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বললেন–ধিক্ চাঁদ তোমায়। ব্রহ্মার পুত্র অত্রির দুর্ভাগ্য যে তুমি তার ছেলে হয়েছে। ছিঃ লম্পট। যদি তুমি নিজের ভালো চাও তো আমাকে মা ভেবে ছেড়ে চলে যাও। চন্দ্র তাঁর কথা অগ্রাহ্য করে জোর করে তাঁকে পাশে বসিয়ে তাঁর সাথে রমণ করতে লাগলেন। এভাবে তাঁদের একশো বছর কেটে গেল। চন্দ্র বৃহস্পতির ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। গুরু বৃহস্পতির তাঁর মায়ের সমান। দেবতাদের বৃহস্পতির মত মারত্মক শত্রু আর নেই। যে রজোগুণের বশবর্তী হয়ে অপরের কীর্তিকে ম্লান করে, সে চন্দ্রের পাপে এক যুগ ধরে কুম্ভীপাক নরকে বাস করে। যে বেশ্যার অন্ন, পতিপুত্রহীন নারীর অন্ন, ঋতুমতী স্ত্রীর অন্ন খায়, চন্দ্রের পাপ অবশ্যই তার কাছে যাবে। দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য্য চন্দ্রকে শুদ্ধ করে তারা দেবীকে বললেন, হে সতী। তুমি চন্দ্রকে ছেড়ে স্বামীর কাছে যাও। তুমি পবিত্র কারণ যে নারীর কামনা থাকে না, তাকে কেউ বলাৎকার করে উপভোগ করলেও সে নারী নির্দোষ হয়।

.

ঊনষাটতম অধ্যায়

নারায়ণ এরপর নারদের প্রশ্নের উত্তরে বৃহস্পতি কি করেছিলেন বললেন–স্নান করে ফিরে আসতে তারার দেরী দেখে বৃহস্পতি তাকে খোঁজার জন্য এক শিষ্যকে মন্দাকিনী তীরে

পাঠান। তিনি তারার চুরি হয়ে যাবার খবর শুনে গুরুর কাছে এলেন। বৃহস্পতি তা শুনে মূর্ছা গেলেন। ' ' তিনি বললেন–যার স্ত্রীকে শত্রু চুরি করে নিয়ে গেছে, তার বনে যাওয়া উচিত। স্ত্রী হীন ব্যক্তির দৈব ও পিতৃকাজে অধিকার থাকে না সে অশুচি। বৃহস্পতি হাজার দূতকে নানা দিকে পাঠিয়ে দিলেন। বৃহস্পতি তাঁর মেজভাই উতথ্যের গর্ভবতী সতী স্ত্রীকে কামের তাড়নায় চুরি করেছিলেন। সে নিজের ভাই বৌ কে চুরি করে কাম চরিতার্থ করার জন্য তাঁর হাজার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়।

পূর্বে মিজ কর্ম দোষে অঙ্গিরার স্ত্রীর এক মরা ছেলে হল। সে শ্রীকৃষ্ণের ব্রতপালন করতে শুরু করে। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বর দেওয়াতে তার বরজ-বীর্যজ-ক্ষেত্রজ-পাল্য-বিদ্যাজ-মন্ত্রজ ও দত্তক এই সাত পুত্র হয়। জ্ঞানীশ্বর বৃহস্পতি শ্রীকৃষ্ণের বরপুত্র।

.

ষাটতম অধ্যায়

নারদ এরপর বললেন, যে শিবের কাছে গিয়ে বৃহস্পতি তাকে কি বলেছিলেন? নারায়ণ বললেন–লজ্জায় ম্লান বৃহস্পতি কৈলাসে গেলে শিব তাকে জিজ্ঞেস করলেন তার শোভাহীন অবস্থার কারণ কি? শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের কি নির্মলগুণ যে গুরু বৃহস্পতি নিজের স্ত্রী চুরির জন্য চাঁদকে এখনও অভিশাপ দেন নি। বৃহস্পতির কাছে সব শুনে একথা শিব বললেন। বৃহস্পতি নিশ্চয়ই তারাকে লাভ করবেন। দেবতারা স্তব করলে শুক্রাচার্য সন্তুষ্ট হবেন। সকল দেবতারা শুক্রের আশ্রমে যাক। একথা বলে বিষ্ণু চলে গেলেন। ব্রহ্মা মহাদেবের অনুমতি নিয়ে সেখানে মুনিদের ও দেবতাদের নীতি কথা বললেন–শোনো, আমি এই শিব বিষ্ণু ও সর্বসাক্ষী ধর্ম আমাদের এই স্নেহ দৈত্য ও দেবতা সবার উপরই সমান। রাতের দেবতা চাঁদ এখন দৈত্যদের গুরু শুক্রাচার্যের শরণাপন্ন হয়েছে। দেবতারা কখনও সেই শত্রুকে জয় করতে পারে না। দেবতারা শুক্রাচার্যকে বিশেষ সমাদর করে। তারাকে আনার জন্য শুক্রাচার্যের আশ্রমে যাচ্ছেন। সবাই বিষ্ণুর আদেশমত সমুদ্র তীরে যাও, একথা বলে ব্রহ্মা পুত্রের কাছে গেলেন। অন্যদিকে দেবতারা ও অন্যান্য ব্রাহ্মণরা সবাই সমুদ্র তীরে এলেন।

.

একষট্টিতম অধ্যায়

নরায়ণ বললেন– ব্রহ্মা মহাত্মা শুক্রের দৈত্যতে ভরা আশ্রমে গেলেন। সেখানে পঞ্চাশ কোটি ব্রহ্মবাদী শিষ্য ছিল। সেখানে সাতটা পরিখা ছিল। এই আশ্রমের দেওয়ালে পদ্মরাগমণি লাগান। শুক্রাচার্য ব্রহ্মাকে দেখে ভয়ে হাত জোড় করে তাঁকে প্রণাম করলেন। আর ষোল রকম উপকরণ দিয়ে তার পুজো করলেন। ব্রহ্মা বললেন–তুমি আমার পৌত্র, অনেকদিন তোমাকে না দেখায় উদ্বিগ্ন হয়ে তোমাকে দেখতে এসেছি। এরপর ব্রহ্মা চাঁদের সঙ্গে সহবাস করার জন্য, সতী নারী তারাকে গর্ভবতী অবস্থায় তাকে প্রণাম করতে দেখলেন। চাঁদকে মায়া বলে কোলে নিয়ে সেই মলিন ও কাতর তারাকে বললেন–হে মা তারা! কামনা করলেও যে অবলা স্ত্রীকে বলবান অন্যপুরুষ বলাৎকার করে, সেই স্ত্রীর দোষ হয়না। যখন নির্দয় চাঁদ তাকে ধরেছিল তখন সে ব্যাপারে সবাই সাক্ষী ছিলেন। চাঁদ ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন ও বৃহস্পতির হাতে সতী তারাকে সমর্পণ করলেন এবং দেবতাদের অভয় দিলেন। এবং ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। তারার গর্ভে চাঁদের ঔরসে বুধ জন্মায়। সে একদিন নন্দন কাননে চিত্রাকে একা পেল। সে ঘৃতাচীর গর্ভজাত। কুবের তাঁর পিতা বুধের ওরসে চিত্রার গর্ভে চৈত্র উৎপন্ন হন। সেই চৈত্রের ছেলে হল রাজা অধিরথ। তার ছেলে মহাজ্ঞানী সুরথ। ইনি মুনি শ্রেষ্ঠ মেধসের কাছে বিষ্ণুমায়ার উপাসনা করেছিলেন। রাজা সুরথ দেবর কৃপায় নিজের নিষ্কণ্টক রাজ্য ও মারা যাওয়ার পর বৈবস্বত মনুর পদ লাভ করেন।

.

বাষট্টিতম অধ্যায়

নারদ বলতে লাগলেন স্বায়ম্ভুব মনুর বংশজাত ধ্রুবর ছেলের ছেলে, উৎকলের রাজা নন্দী। সে সুরথের কোলনগরী আক্রমণ করে। রাজা সুরথ ব্রহ্মাকে বলেন তার জন্ম চৈত্রবংশে। বলবান নন্দী তাকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছে। তাকে নিজের বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছে। দয়ালু মুনি মেধস রাজা সুরথকে কবচ ও মন্ত্র দান করলেন। বৈশ্য সমাধি দুর্গার আরাধনা করে মুক্তি লাভ করলেন।

.

তেষট্টিতম অধ্যায়

নারদ একবার জানতে চাইলেন, সুরথ কেমন করে দুর্গার পূজা করেন। নারায়ণ বললেন– রাজা ও বৈশ্য- এঁরা দুজনেই মেধস মুনির কাছে দেবীর মন্ত্র, স্তব, কবচ, ধ্যান ও পুরশ্চরণ লাভ করলেন। পরে সারা বছর ধরে পুষ্কর তীর্থে তিনবার স্নান করে মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। আদি প্রকৃতি ঈশ্বরী তাদের দেখা দিলেন। বৈশ্য বলল– যা ব্রহ্মত্ব বা অমরত্ব আমি চাই না। আমাকে অবিনশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ বর দাও। অসাধু, পাপী যাদের এই বিষ্ণু ভক্তি থাকে না তাদের আয়ু সবসময় হরণ করেন। আর যিনি তগত সেইই বৈষ্ণব ভক্ত চিরজীবী হয়।

.

চৌষট্টিতম অধ্যায়

রাজা সুরথের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি দেবীর আরাধনার নিয়ম হল– মহারাজ স্নান শেষ করে আচমন, করে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস ও আট মন্ত্রে ন্যাস করে, ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম ও নিজের অঙ্গ শোধন করে দেবীর ধ্যান ও তাকে মাটির প্রতিমায় আবাহন করলেন। তারপর ভক্তি ভরে ধ্যান করে পুজো করলেন। পরম ধার্মিক সুরথ, দেবীর ডান দিকে লক্ষীকে স্থাপন করে, ভক্তি ভরে পুজো করে দেবীর সামনের ঘটে গণেশ, সূর্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব ও শিবা এই ছয় দেবতার নিয়ম মত আয়োজন করে ভক্তি ভরে পুজো করলেন ও মহাদেবীকে ধ্যান করলেন। দেবী দুর্গার একশো হাত। ইনি অসুরদেব ধ্বংস করেছেন। এর চোখের সৌন্দর্য দিনের বেলার পদ্মের শোভাকেও ম্লান করে দিয়েছে। হে দুর্গা! মহা মূল্যবান রত্নপাত্রের মধ্যে নির্মল গঙ্গার জল আপনার পা ধোওয়ার জন্য রাখা হয়েছে, আপনি তা নিন। অনাথ-নীরোগ বিবাহিত দীক্ষিত-পরস্ত্রীবিমুখ-অজার জাত-বিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠ সৎ শূদ্র যুবককে তার আত্মীয়দের কাজ থেকে অর্থ দিয়ে কিনে ধার্মিক ব্যক্তি তাকে স্নান করিয়ে, কাপড়, চন্দন, মালা, ধূপ, দিয়ে পূজা করে শেষে দুর্গাকে নিবেদন করবে।

.

পঁয়ষট্টিতম অধ্যায়

নারায়ণ বললেন– আদ্রা নক্ষত্রে দেবীর বোধন করবে ও মূলা নক্ষত্রে দেবীকে ঘরে প্রবেশ করাবে, উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে পুজো করে শ্রবণা নক্ষত্রে দেবীকে বিসর্জন দেবে। নবমী তিথিতে বোধন করে একপক্ষধরে দেবীর পুজো করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফল লাভ হয়। আর দশমীর দিন বিসর্জন। রাজা সুরথ সারা বছর ভক্তিভরে পুজো করে গলায় কবচ বেঁধে

পরমেশ্বরীকে স্তব করলেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সকলের ঈশ্বর একথাই পরম জ্ঞান, বেদ, ব্রত, তপস্যা, তীর্থ দেবতা পূণ্য এসমস্ত কিছুর সার হলেন শ্রীকৃষ্ণ।

.

ছেষট্টিতম অধ্যায়

পূর্বে গোলোকধামে রাসমন্ডলী বৈশাখে শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে দুর্গার প্রথম স্তব করেন, দ্বিতীয়বার বিষ্ণু করেন মধুকৈটভের সঙ্গে যুদ্ধের সময়, চতুর্থবার মহাদেব ও পঞ্চমবার বৃত্রাসুর বধের সময় ঘোর সঙ্কট উপস্থিত হলে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা করে।

শ্রীকৃষ্ণ দেবীকে বলেছিলেন–তুমিই সর্বজননী, প্রকৃতি ঈশ্বরী মূল সত্ত্ব। রজ ও তমো গুণময়ী হওয়া তোমার ইচ্ছাধীন। তুমি আত্মার নিদ্রা, তৃষ্ণা, লজ্জা, দয়া, মায়ময়ী শক্তি। তুমি বন্দনীয়, মোহরাত্রি, মোহিনীশক্তি। বন্ধ্যা, কাকবন্ধ্যা যক্ষারোগী, রাজদ্বারে, শ্মশানে, বনে হিংস্র জন্তুর সামনে এই স্তব শুনলে তার মুক্তি পায়। কোন দারুন গরীব ও মূর্খ এই স্তব পাঠ করলে বিদ্বান ও ধনী হয়। নারদ এরপর ব্রহ্মাণ্ড মোহন নামক কবচের কথা শুনতে চাইলেন। নারায়ণ বলতে শুরু করলেন। কৃষ্ণ কৃপা করে যে কবচ ব্রহ্মাকে দিয়েছিলেন, ব্রহ্মাও গঙ্গা তীরে সকল কবচ ধর্মকে বলেছিলেন। ধর্ম দয়া করে তাঁকে পুষ্কর তীরে এই কবচ দিয়েছিলেন। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ দুর্বাসা কবচ ধারণ করে শিবের সমান হয়েছেন। যে লোক সিদ্ধ কবচ ধারণ করে বিপদে অস্ত্রও তাকে বিদ্ধ করতে পারে না। জল, আগুন ও বিষ এদের কোনটাতেই তাদের মৃত্যু হয় না। ভগবান কৃষ্ণ নিজের অংশে গণেশরূপে উৎপন্ন হয়েছেন। মানুষ এই শ্রুতিমধুর অমৃতের সমান প্রকৃতিখন্ড শুনে দই ভাত খাইয়ে বক্তাকে সোনা দান করবে আর বাচ্চা সমেত সুন্দর গোরু ভক্তি ভরে দেবে। দেবীর অনুগ্রহে তার পুত্রপৌত্রাদির সংখ্যা বাড়বে।

গণেশ খন্ড

১.

নারায়ণ নারদকে এমন এক আশ্চর্য উপাখ্যান বললেন–যা সকল বিপদ, শোক, তাপ দূর করে। এই উপাখ্যান শুনলে মানুষের সবদিক দিয়ে মঙ্গল হয়। পুরা কালে সতী স্বামীর নিন্দায় যোগবলে শরীর ত্যাগ করেন। মেনকার গর্ভে জন্ম নিলেন। হিমালয় খুব আনন্দের সঙ্গে শিবকে নিজ কন্যা পার্বতীকে দান করলেন। মহাদেব নদীতীরে কোন এক ফুলের বাগানে ফুলে সাজানে চন্দন মাখানো রতির উদ্দীপক এক বিছানা তৈরী করে পার্বতীর সাথে রমন করেছিলেন। পার্বতী ও মহাদেব উভয়ের স্পর্শে কামাসক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের রতি দেখে দেবতারা চিন্তিত হয়েছিল। এবং ব্রহ্মাকে সামনে রেখে নারায়ণের কাছে এলেন। দেবতাদের প্রার্থনায় মহাদেব রতিক্রীড়া ছেড়ে দিতে চাইলেও পার্বতীর ভয়ে ছাড়তে পারলেন না। শেষে কণ্ঠলগ্ন পার্বতীকে ছাড়লেন। এবং লজ্জায় তাড়াতাড়ি উঠতে গেলে তার বীর্য মাটিতে পড়ল। তার থেকে জন্মান স্কন্ধ কার্তিক।

২.

দেবতারা পার্বতীর শাপের ভয়ে পালিয়ে গেল। মহাদেবও ভীত হলেন। দেবী দেবতাদের বীর্য নিষ্ফল হবার শাপ দিলেন। দেবীর রাগ দেখে দেবাদিদেব তাঁকে নিজের বুকের ওপর বসালেন এবং বললেন–তাঁর দোষ যেন দেবী ক্ষমা করে দেন। দেবী তখন ক্রুদ্ধ অথচ মিষ্ট ভাবে হরকে বললেন, যে মেয়েদের সকল সুখ ও সম্পদের মধ্যে প্রধান সুখ হল নির্জন স্থানে সৎ লোকের সাথে রমণ সুখ অনুভব করা। কিন্তু প্রথমে তার রতিভঙ্গ হওয়ার দুঃখ, দ্বিতীয়ত অন্যত্র বীর্যপাত হেতু গর্ভ না হওয়ার দুঃখ, তৃতীয়ত সন্তান না হওয়ার দুঃখ। সুপুত্র স্বামীর অংশ, সুতরাং স্বামীর মতই সুখ দেয়। স্বামী আপন স্ত্রীর গর্ভে নিজ অংশরূপে জন্মগ্রহণ করে। আমি পুত্র লাভের জন্য কি করব তা উপদেশ করুন।

৩.

হর তাঁকে বললেন–হরির নাম নিয়ে এক বছর পুণ্যক নাম ব্রত কর। নারীদের মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবতাদের মধ্যে হরি, প্রাণীর মধ্যে মানুষ, দৈত্যদের মধ্যে যেমন বলি, তেমন সকল বস্তুর সার হল এই পুণ্য ব্রত। যে লোক হরি ভক্ত সে নিজের ভাই, চাকর, বন্ধু, স্ত্রী প্রভৃতিদের উদ্ধার করে নিজে হরির চরণে লীন হয়। মহাদেব পার্বতীর সঙ্গে গঙ্গা তীরে গিয়ে আনন্দের সঙ্গে তাকে সুন্দর হরি মন্ত্র, স্তব ও কবচ দান করলেন এবং পুজা অনুষ্ঠানের নিয়মগুলি বলে দিলেন।

৪.

দেবী হরের কাছে থেকে ব্রতের সকল নিয়ম অনুষ্ঠান পদ্ধতি জানতে চাইলেন। কোন ফল আর কোন জিনিস ব্রতের উপযুক্ত। শ্রেষ্ঠ পুরোহিত, ফুল, তোলার ব্রাহ্মণ ও জিনিসপত্তর আনার জন্য একজন চাকর দিন। স্বামী তার প্রিয় স্ত্রীকে ছেলের হাতে ছেড়ে দিয়ে সুখ পায়। যে স্ত্রীকে এই তিনজন বন্ধু যাথাক্রমে পালন করে। ভক্তিভরে হরিকে অর্ঘ্য দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে আসবে। নিজের রূপের জন্য প্রতিদিন একশো আটটা পরিজাত ফুল বিঝুঁকে দান করবে। নিজের বর্ণের সৌন্দর্য লাভের জন্য ভগবান হরিকে ভক্তিভরে সুন্দর এবং অক্ষত এক লক্ষ সাদা চাপা ফুল দেবে। নখের সৌন্দর্যের জন্য এক লক্ষ সাদারঙের সবোকৃষ্ট মণি কৃষ্ণকে দান করবে। সুন্দর হাসির জন্য এক লক্ষ অক্ষত মালতী ফুল শ্রীকৃষ্ণকে দান করবে। সন্তান লাভের জন্য শ্রীহরিকে কুমড়ো, নারকেল, বাতাবি এবং শ্রীফল দেবে। ব্রতের সময় দিনরাত একশো রত্ন প্রদীপ ও আগুন জ্বালিয়ে রাখবে এবং রাতের বেলায় কুশাসনের উপর বসে জেগে

থাকবে। হরির উপর অচল ভক্তিতে এই ব্রতে পুত্র লাভ হয়, সৌন্দর্য, স্বামী সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য এবং বিপুল ধনসম্পদ লাভ হয়। প্রত্যেক জন্মে সমস্ত বাঞ্ছিত সিদ্ধির মূল কারণ লাভ করা যায়।

৫.

মহাদেব বললেন–মনুর পত্নী শতরূপা পুত্রসন্তান না হওয়ার জন্য দুঃখ পেয়ে ব্রহ্মার কাজে গেলেন এবং ব্রহ্মাকে বললেন–কিভাবে বন্ধ্যার পুত্র হয়। শক্তির স্ত্রী এই ব্রত করে পরাশর নামে পুত্র লাভ করেন। এই ব্রতের ফলে গোপীদের স্বামী ও সকল দেবতার ঈশ্বর নারায়ণ তোমার পুত্র হিসাবে জন্ম গ্রহণ করবেন।

৬.

নারায়ণ নারদকে বললেন–মহাদেব ব্রতের কথা ও নিয়ম বলে তপস্যা করতে চলে গেলেন। পার্বতী স্বামীর আদেশে কিঙ্কর ও ব্রাহ্মণদের ব্রতের কাজে নিযুক্ত করলেন। এই ব্রতের উপযুক্ত সকল জিনিস যোগাড় করে ভাল সময় দেখে ব্রত শুরু করলেন। ব্রহ্মার পুত্র ভগবান সনকুমার সেখানে এলেন। ব্রহ্মা স্ত্রীর সঙ্গে ব্রহ্মালোক থেকে এলেন। শিব শীঘ্র সেখানে উপস্থিত হলেন। চতুর্ভুজ, শ্যামবর্ণ ভগবান বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও অনুচর সহ সেখানে উপস্থিত হলেন। সে সময় শিব কৈলাসের সমস্ত লোককে পুজো করে ছিলেন আর খুব উঁচু সিংহাসনে বসেছিলেন। এই ব্রতে একশো লক্ষ অমৃতের কুম্ভ এবং মিষ্টি ও চিনির লক্ষ লক্ষ রাশি তৈরী হয়েছিল। লক্ষ্মী নিজে সমস্ত রান্না করলেন। নারায়ণ সকল দেবর্ষিদের নিয়ে খেতে বসলেন। একলক্ষ ব্রাহ্মণ তাদের পরিবেশন করলেন। এতে সকলে সন্তুষ্ট হলেন।

৭.

মহাদেবের আদেশে ভগবতী সন্তুষ্ট হয়ে সেই মঙ্গলকর ব্রতে মঙ্গলবাজনা বাজাতে বললেন। পার্বতী নানা রত্নে সজ্জিত হয়ে রত্নাসনে বসে রত্ন সিংহাসনে থাকা মুনিদের পুজো করলেন। মঙ্গলঘটে আরাধ্য কৃষ্ণকে আবাহন করে ভক্তি ভরে ষোল উপাচার দিয়ে পুজো করলেন। এক বছর ধরে সাবধানে সকল ব্রতের কাজ করলেন। শিব পার্বতীকে বললেন–হে দেবী! আমি ধর্মের কথা বলছি। ধর্মানুসারে কাজ করে নিজের ধর্ম রক্ষা কর। নিজ ধর্ম রক্ষা করলে সকলের ধর্মই রক্ষা করা হয়।

৮.

পার্বতীর স্তব শুনে ভগবান কৃষ্ণ সুদুর্লভ পার্বতীকে নিজের রূপ দেখিয়েছিলেন। যে মূর্তির পরনে ছিল আগুনের মত পবিত্র পীত বস্ত্র, হাতে বাঁশী, গলায় বনমালা, বিচিত্র তার বেশবাস। পার্বতী ফুল ও চন্দনে সুসজ্জিত হয়ে কস্তুরী ও কুঙ্কুম মেখে, শ্রেষ্ঠ রত্ন দুগ্ধকে ননির সুন্দর শয্যায় শুয়ে পড়লেন স্বামীর সঙ্গে। সুরসিক পার্বতী কৈলাস পর্বতের এক প্রান্তে স্বামীর সঙ্গে বিহার করেছিলেন। অনেকক্ষণ বিহারের পরে যখন বীর্যপাত ঘটবে সে সময়ে বিষ্ণু নিজের মায়ায় এক ব্রাহ্মণের রূপ ধরে সেই ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

এই ভারতবর্ষে যে লোক ভক্তিভরে অতিথির পুজো করে, তার পুজোর মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীকে সকল মহাদান করা হয়ে থাকে। সেই অতিথি যার বাড়িতে পুজো না পেয়ে ফিরে যায়, সেই বাড়ী থেকে দেবতারা ও পিতৃপুরুষরাও পুজো না নিয়ে চলে যান।

নিজের কামনার জন্যই লোকে কাজ করে এবং কর্মের থেকেই ভোগ হয়। ভোগ দুরকমের– শুভ ও অশুভ। তাই সুখ ও দুঃখের কারণ। নিজের কাজের ফলে সুখ ও দুঃখ আসে। যে হরিভক্ত সে চিরজীবী হয়। যার কানে গুরু মন্ত্র দিয়ে দেন, পুরাবিদরা তাকেই তীর্থপুত্র বলে থাকেন। যে লোক প্রকৃত ভক্ত তার সমস্ত তীর্থে যাওয়া ও সব যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার ফল লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ গণেশ হয়ে দেবীর সন্তান রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ঈশ্বর অদৃশ্য হয়েই বালকের রূপ ধরে ঘরের ভেতরে পার্বতীর বিছানায় চলে এলেন। শিবের বীর্য সঙ্গে সঙ্গে মিশে গিয়ে সদ্যজাত শিশুর মত ঘরের উপরের দিকে চাইতে লাগলেন। বাচ্চাটি বিছানায় শুয়ে হাত পা ছুঁড়তে লাগল।

৯.

হরি অদৃশ্য হয়ে গেলে পরে দুর্গা ও শিব সেই ব্রাহ্মণকে ঘরের চারদিকে খুঁজতে লাগলেন। অতিথি যদি বাড়ী থেকে পুজো না নিয়ে চলে যায় তবে সে গৃহস্থের জীবন বৃথা। যাঁকে বৈষ্ণবরা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতারা সবসময় ধ্যান করেন, ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্য দেহধারণ করেন, সেই মুক্তিদাতা পুরুষকে নিজের ছেলে হিসেবে প্রত্যক্ষ করুন। দুর্গা নিজের ঘরে এসে বাচ্চাটাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখলেন। দেখলেন বাচ্চাটা স্তন পান করার জন্য উমা উমা শব্দ করে কাঁদছে। শিব ঘরে ঢুকে বিছানায় উজ্জ্বল সোনার রং-এর ছেলেকে দেখলেন। দুর্গা বিছানা থেকে সেই ছেলেকে তুলে নিজের বুকের উপর রাখলেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাকে চুমা খেতে খেতে বললেন– বাছা, হঠাৎ শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ

করে গরীবের মন যেমন অপার আনন্দে ভরে ওঠে, সেরকম অমূল্য রত্ন স্বরূপ তোমায় পেয়ে আমার মনও আনন্দে ভরে উঠেছে। মারাত্মক বিপদে ভয়ঙ্কর সমুদ্রের মধ্যে পড়ে গেলে মানুষের যে অবস্থা হয় এবং সে অবস্থায় যদি নাবিক সমেত কোনো নৌকো সে পায়, সামনে দারুন খাবার দেখে অনেকদিনের উপোসীর মন যেমন পূর্ণ হয়। তেমন অবস্থা হয় এই শিশুকে দেখলে। শিব আনন্দের সঙ্গে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলেন এবং গালে চুমো খেয়ে বেদের ভাষায় আশীর্বাদ করলেন।

১০.

হর পার্বতী ছেলের মঙ্গল কামনায় নানা বস্তু ব্রাহ্মণদের দান করলেন। হিমালয় ব্রাহ্মণদের লক্ষ রত্ন, হাজার হাজার শ্রেষ্ঠ হাতী, তিন লক্ষ ঘোড়া, দশলক্ষ গোরু, পাঁচলক্ষ সোনা, শ্রেষ্ঠ মণিমুক্তো, মানিক্য ও অন্যান্য জিনিস, কাপড়, অলংকার আর ক্ষীর সমুদ্র থেকে যে রত্ন উঠেছিল তা সবই দান করলেন। সাগরকন্যা লক্ষ্মী আনন্দের সঙ্গে হাজার হাজার পরশ, রচক, কৌস্তুভ, হীরে, মানিক্য রত্ন, ব্রাহ্মণদের দান করলেন। সরস্বতী অসাধারণ সুন্দর এক হার দান করলেন। শিবের পুত্রোৎসবে সবাই ব্রাহ্মণদের নানা দান করলেন। সরস্বতী বললেন, হে পুত্র! তোমার আমার মত সুকবিত্ব, চিন্তাশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও বিবেচনাশক্তি হোক। পার্বতী বললেন, তুমি তোমার বাবার মত মহাযোগী সিদ্ধ সিদ্ধিদাতা, শুভ মৃত্যুঞ্জয়, ঐশ্বর্যসম্পন্ন ও সমস্ত শাস্ত্রে পন্ডিত হও। গণেশের বৃত্তান্ত শুনলে পুণ্য লাভ করা যায়। এই শুভ অধ্যায় যার ঘরে রাখা যাবে তার সব সময় ভাল হয়– এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যে লোক যাবার সময় বা কোন ভাল দিনে শান্ত হয়ে এই কাহিনী শোনে গণেশের দয়ায় সে তার মনের মত ফল পায় এতে কোন সন্দেহ নেই।

১১.

হরি তাঁকে আশীর্বাদ করে দেবতাদের মাঝে দেবতা ও মুনিদের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ রত্ন সিংহাসনে বসলেন। তার ডানে শিব, বাঁয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা। নর্তকীরা নাচ করতে লাগল, গন্ধর্ব ও কিন্নররা গান করতে লাগল। সকল বেদ তাদের মূল হরিকে বেদের শ্রেষ্ঠ কথায় স্তব করতে লাগলেন। শনি মাথা নিচু করে রত্ন সিংহাসনে বসা পার্বতীকে নমস্কার করলেন। পার্বতীকে তার পাঁচজন সখী অনবরত শ্বেতচামর দুলিয়ে বাতাস করছিল। গায়ে তাঁর দামী অলংকার। পার্বতীর প্রশ্নের উত্তরে শনি বললেন– সবাই ফল ভোগ করে নিজের কর্মের ফলে। কর্মের ফলে মানুষ ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও সুর্যের ঘরে জন্মায়। কর্ম ফলে সে স্বর্গে বা নরকে যায়। কর্মের ফলেই কেউ সুন্দর,

কেউ বা জরাগ্রস্থ হয়, কেউ অধিকারী হয় অসংখ্য ধনসম্পদের, দারুণ গরীব হয় অনেকে, কেউ নিঃসন্তান হয়। কেউ কুৎসিৎ শ্রী লাভ করে, শ্রী হীন হয় কেউ। শনি বললেন–তিনি ছেলেবেলা থেকেই কৃষ্ণভক্ত। সব সময় কৃষ্ণের ধ্যান করেন। তার স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত পতিব্রতা, তেজস্বী ও সবসময় ধ্যানমগ্ন। কোন সময় সেই মুনি মানসমোহিনী চঞ্চল নয়না, ঋতুস্নান করে সাজগোজ করে, নানা অলংকার পরে আমার কাছে এলেন। কিন্তু তার দিকে না তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকলে তিনি অভিশাপ দিলেন। সেই থেকে নিজের চোখ দিয়ে কোন কিছু দেখিনা এবং সেই দিন থেকে আমি প্রাণী হিংসার ভয়ে মাথা নীচু করে থাকি। হে মুনি! গ্রহরাজ শনির কথা শুনে পার্বতী হাসলেন। নর্তকীরাও হেসে উঠল।

১২.

দূর্গা শনিকে বললেন–তার ছেলের দিকে তাকাতে। পার্বতীর কথায় শনি ভাবলেন তিনি বাচ্চাকে দেখলে বাচ্চার ক্ষতি হবে। তাই তিনি ধর্মকে সাক্ষী করে ছেলেকে দেখতে চাইলেন। কিন্তু তার তালু সব শুকিয়ে গেল। শনি তাকাতেই শিশুর মাথা খসে পড়ে গেল। সেই মাথাহীন বালক পার্বতীর কোলে চলে গেল, আর মাথা শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করল। পার্বতী অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাঁকে মূর্ছা যেতে দেখে হরি গরুড়ের পিঠে চেপে উত্তর দিকে পুষ্পভদ্র নদীতে চলে গেলেন। নদীর তীরে বনের মধ্যে গজেন্দ্রকে হস্তিনীর সাথে শুয়ে থাকতে দেখলেন। হাতী নিজের বাচ্চাকে উত্তরে মাথা রেখে মহানন্দে সুরতশ্রমে অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। বিষ্ণু সুদর্শন দিয়ে তার মাথা কেটে তা নিয়ে গরুড়ে চেপে বসলেন। হস্তিনী সকলকে সান্ত্বনা দিল ও কাঁদতে লাগল। হস্তিনী হরির স্তব করতে লাগল। নারায়ণ ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে হাতাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন। হরি পার্বতীর কাছে এসে বাচ্চাকে নিজের বুকের ওপর রেখে সেই হাতীর মুন্ডুর রক্ত বার করে বালকের দেহের সঙ্গে যোগ করে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বাঁচিয়ে তুললেন।

ইন্দ্র নিজের কর্মবশে কীট যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং কীটত্ত আগের কর্মফলে ইন্দ্র হয়ে জন্মায়। ভাল কাজ করলে সুখ ও আনন্দ হয়। বাকি সবই পাপকাজের ফল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যে পুরুষের অংশস্বরূপ যার প্রত্যেক লোমকূপে এক একটা জগৎ বর্তমান। সেই মহাবিরাট তার অংশ স্বরূপ মাত্র, পার্বতী সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণকে প্রণাম করে বালককে স্তন দিলেন। বিষ্ণু শিশুর গলায় কৌস্তুভমণি পড়িয়ে দিলেন। ব্রহ্মা মুকুট আর ধর্ম অলংকার দান করলেন। ছেলেকে বেঁচে উঠতে দেখে হর পার্বতী ব্রাহ্মণদের দান করলেন কোটি রত্ন। পার্বতী শনিকে অঙ্গহীন হবার অভিশাপ দিলেন। এর ফলে সূর্য– কশ্যপ ও যম রেগে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে চাইলেন। তাদের ঠান্ডা করার জন্য বিষ্ণু ব্রহ্মাকে পাঠালেন। কশ্যপ বললেন, শনি দূর্গার

অনুমতি নিয়েই শিশুকে দেখেছিলেন। ব্রহ্মা বললেন, মাতৃ মমতায় দূর্গা শাপ দিয়ে ফেলেছেন। তিনি দূর্গাকে বললেন, যে শনি অতিথি তার অমর্যাদা না করতে, পার্বতী তখন তাকে চিরজীবী হওয়ার আশীর্বাদ দিলেন ও বললেন–যে, যেহেতু তিনি শাপ দিয়েছেন তাই শনি কিছুটা খোঁড়া হবে। শনি তখন সন্তুষ্ট হয়ে পার্বতীকে প্রণাম করে দেবতাদের কাছে চলে গেলেন।

১৩.

বিষ্ণু এসে গণেশকে উপহার দিয়ে পূজা করে গেলেন। তিনি নাম দিলেন– গণেশ, বিঘ্নেশ, হেরম্ব, গজানন, লম্বোদর। ধর্ম দিলেন সিদ্ধ আসন। ব্রহ্মা কমন্ডলু। ইন্দ্র দিলেন রত্নসিংহাসন। কুবের মুকুট দিলেন। শৈলেশ্বরী, শৈলরাজ, শৈলকন্যা, শিলরাজের পুত্র এবং শৈলরাজের প্রিয় মন্ত্রীরা হিমালয় কন্যার ছেলে গণেশের পূজা করলেন ও তাকে প্রণাম করলেন। যে লোক এক মনে বিষ্ণুর সৃষ্ট গণেশের স্তব সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় ভক্তি ভরে পাঠ করে, ভগবান গণেশ তার মনোবাসনা পূরণ করেন। স্বপ্ন দেখার পর এই স্তব করলে পরে ভালো স্বপ্ন দেখে। ভয়ঙ্কর গ্রহপীড়া নাশ হয়। নিত্য বিঘ্ন নাশ হয়। নিত্য সম্পদ বাড়ে, বংশ পরম্পরায় তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা থাকেন। ইহলোকে সবরকম ঐশ্বর্য লাভ করে। মরণের পরে বিষ্ণুর চরণে লীন হন। সে নিশ্চয়ই গণেশের অনুগ্রহে সকল তীর্থের সকল যজ্ঞের ও মহাদানের ফল পায়।

সংসার সমুদ্র থেকে উদ্ধারকারী কবচের কথা শুনতে চাইলেন নারদ। শনিদেব ভয়ে বিষ্ণুকে বললেন, তাঁর দুঃখমোচন করার জন্য। তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে বললেন, ও গণেশের কবচ ধারণ করতে চাইলেন। বিষ্ণু বললেন, গণেশের কবচ এই ত্রিভুবনে দুর্লভ। পুরাণগুলিতে এই কথা খুব গোপনভাবে বলা হয়েছে। দশ লক্ষ বার জপ করলে এই কবচ সিদ্ধ হয়। যার কবচ সিদ্ধ হয় সে মৃত্যুক জয় করতে পারে। কোন ক্রুর স্বভাবের লোক এই কবচ পরলে তার মৃত্যু হয়। এই কবচের ঋষি হলেন প্রজাপতি ছন্দ, বৃহতী ও স্বয়ং গণেশ দেবতা। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ হল এই কবচের বিনিয়োগ 'ওঁ গৌং সং শ্রীগণেশায় স্বাহা' মন্ত্রে আমার মাথা রক্ষা করুন আগের বত্রিশ অক্ষরের মন্ত্র আমার কপাল, ওঁ হীং ক্লীং শ্রীং' মন্ত্র আমার চোখ এবং বিঘ্ননাশকারী গণেশ আমার তালু রক্ষা করুন। ঠিকমত গুরু পূজা করে যে এই কবচ গলায় বা ডান হাতে বাধে, সে এক হয় বিষ্ণুর সাথে। হাজার অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞ এই কবচের ষোল কলার এক কলার যোগ্য নয়। এই কবচ না জেনে যে গণেশের ভজনা করে, একশো লক্ষবার জপ করলেও তার সে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না।

১৪.

বিষ্ণুর মহোৎসব দেখে সকল দেবতা গন্ধর্ব ও মুনিরা খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। দূর্গা সেই দেবতাদের মাঝে প্রণাম করে দেবেশ্বর বিষ্ণুকে বললেন– তাঁর স্বামীর আমোঘ বীর্য রক্ষা করতে পারেন নি। সেই বীর্য কেউ চুরি করেছে। বিষ্ণু যেন তা তদন্ত করেন। বিষ্ণু দেবতাদের বললেন–কে এই কাজ করেছে। দেবতারা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। মহাদেব বললেন–যে তার বীর্য গোপন করে রেখেছে তার পুজোর কোন অধিকার থাকবে না। একাদশী ব্রত থেকে বঞ্চিত হবে এই পাপ কাজকারী লোক। যম বললেন, যে এই বীর্য চোর তার পূর্ব কর্মের পাপ হবে। এই বীর্য চোর কারো ভরণ পোষণ করতে পারে না। যারা বীর্য চোর তার পুত্রহীন ও গরীব হোক। ধর্ম বলেন, শিব বীর্য রেখে গিয়ে যখন রতিক্রীড়া ছেড়ে ওঠেন, তখন তার বীর্য যে পৃথিবীতে পড়েছিল তা সকলে জানেন, পৃথিবী সেই মহাভার বীর্য ধারণ করতে না পেরে তা সে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে। অগ্নি বলল, সে তা শরবনে ছুঁড়ে ফেলে। বায়ু বললেন, শরবনে পড়ামাত্রই এক সুন্দর বালকে পরিণত হয়েছে। চাঁদ বললেন–সে সময় কৃত্তিকার দল সেপথ দিয়ে যাচ্ছিল তারা বাচ্চাটাকে কাঁদতে দেখে তাকে বদরিকাশ্রমে আপনার ঘরে নিয়ে গেছে। জল বললেন–সূর্য থেকে বেশী উজ্জ্বল জ্যোর্তিময় ঈশ্বরের সেই কান্না দেখে ছেলেকে এনে কৃত্তিকা স্তন দিয়ে বড় করেছে। সন্ধ্যা দুজন বললেন, সেই বালক কৃত্তিকার পোষ্য পুত্র হয়েছে। এজন্য তারা স্নেহ ভরে তার নাম রেখেছে কার্তিক। কৃত্তিকারা এখন সেই বালককে আর চোখের আড়াল করে না। এখন তাদের কাছে তাদের প্রাণের থেকেও প্রিয় হয়েছে। দিন বললেন– এই ত্রিভুবনে যে সব জিনিস দুর্লভ স্বাদু ও ভাল তারা সব জিনিস আনিয়ে তাকে খাওয়ায়। তারা সেখানে দেব সভায় আনন্দে হরিকে জানিয়ে বললেন, এবং মধুসূদন হরি সেকথায় সন্তুষ্ট হলেন। পার্বতী ছেলের খবর পেয়ে মহানন্দে ব্রাহ্মণদের কোটি রত্ন ও অসংখ্য ধনদান করলেন। লক্ষী, সরস্বতী, মেনকা, সাবিত্রী, স্ত্রীরা ওবিষ্ণুও প্রভৃতি দেবতারা ব্রাহ্মণদের ধন্যদান করলেন।

.

১৫.

বীরভদ্র, বিশালাক্ষ, শঙ্কুকর্ণ, কবন্ধক, নন্দীশ্বর, মহাকাল, বজ্রদন্ত ভনন্দন, প্রভৃতি দূতদের বিষ্ণু পাঠালেন তাদের সন্তানের খোঁজে। দূতেরা কৃত্তিকাদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল কৃত্তিকারা ভয় পেয়ে ব্রহ্মতেজে জলিত কার্ত্তিকেয়কে বলল, তখন কার্ত্তিক তাদের অভয় দিলেন। নন্দীকেশ্বর তাদের বললেন, যে তাকে হর পাঠিয়েছেন। তার সুখবর শুনুন। কৈলাস পর্বতে গণেশের জন্ম মঙ্গললাৎসব সব উপলক্ষ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতারা এক সঙ্গে

রয়েছেন। সেখানে পার্বতী জগতের পালক বিষ্ণুকে সম্মোধন করে তোমার খোঁজার ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। বিষ্ণু তখন তোমার খোঁজ পেয়ে আমাদের পাঠালেন। কৃত্তিকারা তোমাকে লাভ করেছে, তুমি আমাদের সঙ্গে এস। বিষ্ণু সকল দেবতাদের সঙ্গে তোমাকে সেনাপতি করবে। পন্ডিতই হোক আর বোকাই হোক, কর্মফলানুসারে যারা সেখানে বাস করে, বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হয়ে সেই স্থানকেও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। কার্ত্তিক নদিকেশ্বর বললেন–কৃত্তিকারা ও তার মা, পার্বতীও তার মা, তবে তিনি হিমালয় কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেনি। কৃত্তিকারা যেমন তার ধর্ম তাই ধর্ম সম্মত। বেদে বলা হয়েছে মানুষের ষোল রকম মায়ের কথা। এরা হলেন –স্তন দানকারী, গর্ভ ধারণকারী, যে খাওয়ায়, গুরুর স্ত্রী, ইষ্টদেবের স্ত্রী, বাবার স্ত্রী, মেয়ে, ছেলের বউ, মা, মায়ের মা, বাবার কোন ভাইয়ের বউ, মায়ের বোন ও মামার স্ত্রী। কৃত্তিকারা ত্রিলোক পূজনীয় ও ব্রহ্মার মেয়ে, এরা কোন মতেই সামান্য নয়। কার্ত্তিক নন্দীকেশ্বর এর সাথে যেতে রাজি হলেন কেননা তাকে মহাদেব পাঠিয়েছেন।

১৬.

কার্ত্তিক তখন কৃত্তিকাদের মা বলে তাদের নীতিকথা শোনালেন। তিনি বললেন–সকল জগৎ, ভাল কাজ, দৈব থেকে শক্তিশালী আর কেউ নেই। কৃষ্ণের অধীন সেই দৈব, একমাত্র কৃষ্ণই দৈবশক্তির বাইরে থাকেন। তাই জ্ঞানীরা সর্বদা জগদীশ্বর পরমাত্মা কৃষ্ণের ভজনা করে। কৃষ্ণ পারে দৈবের বল বাড়াতে ও কমাতে। অবলীলাক্রমে ভক্তও বশ হয় না দৈবের। যে সুখ ও মোক্ষ দান করে, জন্ম ও মৃত্যু দূর করে। আর দুঃখের কারণ মোহকে ছাড়া। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই হয়ে থাকে পরস্পরের যোগাযোগ। পণ্ডিতরা ব্রহ্মান্ডকে ঈশ্বরের অধীন ও এক বলে মনে করে। জলের বুদবুদের মত এই ত্রিভুবন অনিত্য, বোকারা মায়ার বশেই অনিত্য বস্তুকে মায়া করে মাত্র।

যাদের মন শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত তারা সংসারে বায়ুর মত নির্লেপ হয়ে অবস্থান করে। সুতরাং তাকে যেন মায়েরা বিদায় দেন। কার্তিক মনে মনে হরিকে স্মরণ করে শিবের অনুচরদের সাথে যাত্রা শুরু করলেন। সে সেখানে পার্বতীর পাঠানো ও শিবের অনুচরে ঘেরা একখানা সুন্দর রথ দেখতে পেলেন। শ্রেষ্ঠ রত্ন দিয়ে বিশ্বকর্মা সে রথ বানিয়েছে। এই রথের চাকা একশো আর এর গতি মনের মতো। এই রথে কার্তিককে চড়তে দেখে অজ্ঞান হয়ে গেল কৃত্তিকারা। এবং জ্ঞান ফিরে এলে কার্তিককে নিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন, কৃত্তিকারা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে পুত্র বিচ্ছেদ বেদনার কথা ভেবে পুনরায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

শেষে কার্তিক তাদের সঙ্গে নিয়েই রওনা হলেন। যাওয়ার সময় ভরা কলস, ব্রাহ্মণ, বেশ্যা, সাদাধান, আয়না, দই, ঘি, মধু, খই, ফুল, দুধ, আতপচাল, ষাঁড়, হাতী, ঘোড়া, জ্বলন্ত আগুন সোনা, পান, নানা পাকা ফল, স্বামী পুত্র সমেত স্ত্রী, প্রদীপ, মুক্তা, ফুলের মালা, সদ্যমড়া পশুর মাংস, চন্দন ইত্যাদি মঙ্গলময় বস্তু দেখলেন। বাঁয়ে শেয়াল, নেয়ুল, ভরা কলস, প্রভৃতি শুভ জিনিস আর ডানে রাজহংস, ময়ূর, ঘোড়া, শুক, কোকিল, পায়রা, শঙ্খচিল, চখা, কৃষ্ণসার, সুরভি, চমরী, সাদা চামর, বাচ্চা সমেত গরু, পতাকা, এইসব নানা জিনিস দেখলেন। তাছাড়া শুনলেন, মঙ্গল ধ্বনি, হরিনাম শাঁখ ও ঘণ্টার শব্দ। এভাবে শুভ জিনিস দেখে ও শুনে সেই রথে চড়ে কার্তিক বাবার বাড়ি গেলেন। তারপর কৈলাস পর্বতে গিয়ে অক্ষয় বটের মূলে আগে কৃত্তিকা ও পার্ষদদের সাথে কিছুকাল অতিবাহিত করলেন। পার্বতী পুরীর চারদিকে রাজপথ, পক্ষরাগ ও ইন্দ্রনীল মণি দিয়ে সাজিয়ে, পাটের সুতোর অখণ্ড পল্লবের মালা গেঁথে পূর্ণপত্র ও ফল দিয়ে ভর্তি করে চন্দনের জলে স্নান করে, রত্ন প্রদীপ ও মণি দিয়ে সাজিয়ে নর্তক ও বেশ্যাদের সঙ্গে নিয়ে এবং বন্দী ও ফুলদুর্বা হাতে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে এলেন।

সপুত্র সতীনারীরা ছিল তাঁর সঙ্গে। এদের সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা সাবিত্রী, তুলসী, রতি, অরুন্ধতী, অহল্যা, দিতি, তারা, মনোরমা, অদিতি, শতরূপা, শচী, সন্ধ্যা, রোহিনী, অনসূয়া, স্বাহা, সংজ্ঞা, বরুণের স্ত্রী, আকুতি, প্রসূতি, দেবভূতি, মেনকা, এক পটলা, একপর্ণা, মৈনাকের স্ত্রী, বসুন্ধরা ও মনসা। রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনকা, ঘৃতাচী, মোহিনী, ঊর্বশী, রত্নামালা, সুশিলা, ললিতা, কলা, কদম্ব, সুরমা, বর্ণমালা, সুন্দরী প্রভৃতি সব অপ্সরারা মনোরম সাজগোজ করে হাসিমুখে হাত তালি দিয়ে নীচগান করতে করতে মহানন্দে সেখানে গেল। সবাই মহানন্দে কুমারকে অভ্যর্থনা করার জন্য সেখানে গেল। মহাদেব নিজে বাদক নিয়ে নানা বাজনা বাজাতে বাজাতে রুদ্র, পাদ, ভৈরব ও ক্ষেত্রপালদের সঙ্গে গেলেন। কার্তিক পার্বতীকে কাছে দেখে খুব খুশি হয়ে রথ থেকে তাড়াতাড়ি নেমে মাথা দিয়ে মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। পার্বতী আদর করে মুনি স্ত্রীদের ভক্তি ভরে শিব প্রভৃতি দেবতার অনুমতি নিয়ে কার্তিকের মুখ দেখলেন ও কোলে করে চুমো খেলেন। সকলে একে একে কার্তিককে শুভ আশীর্বাদ করলেন।

কার্তিক মহাদেবের অনুচরদের সাথে তার বাড়িতে এসে সভার মধ্যে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকে দেখলেন। তিনি তখন রত্নলংকারে সজ্জিত হয়ে রাসনে উপবিষ্ট। তাকে ঘিরে রয়েছেন ধর্ম ব্রহ্ম ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতারা। ভক্তানুগ্রহকারী সেই দেবতার মুখ তখন মৃদু হাস্যযুক্ত, মুনীন্দ্র ও দেবেন্দ্ররা তার স্তব করছেন ও সাদা চামর দুলিয়ে তাঁকে বাতাস করছেন।

সেই জগন্নাথ বিষ্ণুকে দেখে ভক্তিতে তার কাধ নীচু হয়ে এল। সারা দেহে রোমাঞ্চও দেখা দিল। মাটিতে মাথা রেখে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর ব্রহ্ম, ধর্ম ও উপস্থিত অন্য দেবতা ও মুনিদের একে একে প্রণাম করে তাদের শুভ আশীর্বাদ নিলেন এবং সকলকে সাদর সম্ভাষণ করে সোনার সিংহাসনে বসলেন। শিব তখন পার্বতীর সঙ্গে ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধনদান করলেন।

১৭.

জগৎপতি বিষ্ণু মনের আনন্দে একটি ভাল সময় দেখে সুন্দর রত্নাসনে কার্তিককে বসালেন। তখন নানা বাজনা ও যন্ত্র বাজাতে বললেন–এবং বেদমন্ত্র পাঠ করে সকল তীর্থের জলে ভর্তি রত্নের তৈরি শত শত কলস দিয়ে তাঁকে স্নান করালেন। শ্রেষ্ঠ রত্নসারাংশ দিয়ে তৈরি মুকুট, চূড়া আর মূল্যবান রত্ন দিয়ে তৈরি নানা অলংকার, দৈব অগ্নির মত পবিত্র কাপড়, ক্ষীরোদসম্ভারের চমকে উৎপন্ন কৌস্তভ মণি বনমালা এবং চক্র মহানন্দে তাকে দান করলেন। ধর্ম দান করলেন উৎকৃষ্ট ধর্মমতি এবং সকল জীবে দয়া। মহাদেব দান করলেন শ্রেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান এবং সমস্ত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, নিত্যসুখের উপযুক্ত তত্ত্বজ্ঞান, যোগতত্ত্ব সিদ্ধি তত্ত্ব মহাদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান শূল, পিনাক, পরশু, শক্তি, পাশুপত, ধনু, প্রভৃতি সংহারকারক অস্ত্রের প্রয়োগ এবং ধ্বংস, জলের দেবতা বরুণ দিলেন শ্বেতছত্র ও রত্নমালা, ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ হাতী এবং সুধানিধি চন্দ্র তাকে সুধাকলম দান করলেন। সূর্য মনের গতি সম্পন্ন রথ ও মনোহর কবচ দান করলেন। যম যমদণ্ড ও অগ্নি মহাশক্তি দান করলেন। কামদেব দান করলেন কামশাস্ত্র। ক্ষীরোদসাগর অমূল্যরত্ন ও রত্ন নুপূর দান করলেন। আর পার্বতী হাস্যমুখে মহানন্দে মহাবিদ্যা, সুশীলা বিদ্যা, মেধা, দয়া, স্মৃতি, নির্মল বুদ্ধি, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, কৃতি অচলা হরিভক্তি, হরির দাসত্ব দান করলেন। পণ্ডিতরা যাকে শিশুপালিকা মহাষষ্ঠী বলে থাকে সেই সুন্দর বিনয়ী সচ্চবিত্র দেবসেনাকে রত্নালংকারে সাজিয়ে বেদমন্ত্র পড়ে তার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। সকল দেবতা, মুনি ও গন্ধর্বরা কার্তিকের অভিষেক শেষ করে জগৎপতি শিব প্রভৃতিকে প্রণাম করে যে যার নিজ স্থানে গেলেন। মহাদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণুও ধর্মের স্তব করলেন। এবং হিমালয় নিজের অনুচরদের নিয়ে নিজের জায়গায় চলে গেলেন। এরপর যে যেখান থেকে এসেছিল, সে সেখানে চলে গেল। শিব পার্বতীর সাথে কিছুকাল আনন্দে কাটিয়ে আবার সেই দেবতা মুনি প্রভৃতিদের নিজের কাজে ডাকিয়ে এনে পুষ্টির সঙ্গে মহাত্মা গণেশের খুব ধূমধামের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। এভাবে পার্বতী মহানন্দে তাঁর দুই ছেলে ও পরিবারের সাথে ভগবানের সেবা করে কাল কাটাতে লাগলেন। সুতরাং কার্তিকের অভিষেক বিয়ে ও পূজো ও গণেশের বিয়ে সবই বলা হল। পার্বতীর সন্তান লাভ ও দেবতাদের মিলিত হওয়ার কথাও বলা হল। এখন বল তুমি কি শুনতে চাও।

১৮.

নারদ জানতে চাইলে যে, গণেশ দেবতাদের অধিপতি মহাত্মা শঙ্করের পুত্র, নিজে স্বয়ং বিঘ্ন দূর করেন ও ঈশ্বরের অবতার, তার আবার বিঘ্ন কেন? পরিপূর্ণতম পরাৎপর পরমাত্মা গোলোকপতি আপনার অংশে পার্বতীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু কেন সাক্ষাৎ ভগবান শনির দৃষ্টিমাত্রই যে মাথা খসে পড়ল, তার কারণ জানতে চাইলেন। নারায়ণ বললেন–সূর্য কোন এক সময় মালী ও সুমালী নামে দুই শিব ভক্তকে হত্যা করতে গেলে ভক্তবৎসল শিব অত্যন্ত রেগে সূর্যকে শুলাঘাত করেন। সূর্যদেব তাতে আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে যান এবং রথ থেকে খসে পড়েন। কশ্যপ পুত্রকে এই অবস্থায় দেখে কাঁদতে লাগলেন। দেবতারা ভয়ে ঘন ঘন কান্না শুরু করলেন। সকল জগৎ অন্ধকারে ঢাকা পড়ে অন্ধের মত হল। কশ্যপ তখন ব্রহ্ম তেজে জ্বলছেন। তিনি শিবকে শাপ দিয়ে বললেন, তার ছেলের। মাথাও কাটা যাবে। হর তখন সূর্যকে বাঁচিয়ে দিলেন। সূর্য তাদেরকে প্রণাম করলেন। তারপর কশ্যপের শাপের কথা শুনে কশ্যপের উপর অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন–তিনি বিষয় সুখ চান না। ঈশ্বর বিনে সবই তুচ্ছ। পরমেশ্বরকে বাদ দিয়ে অশুভ বিষয় সুখ ভোগ করতে চায় না। ব্রহ্মা সূর্যর কাছে এসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বিষয়াসক্ত করে তুললেন। শিব, ব্রহ্মা এবং কশ্যপ সূর্যকে আশীর্বাদ করে মনের আনন্দে যে যার নিজ স্থানে চলে গেলেন, সূর্যও নিজ রাশিতে গেলেন। শ্বিত্র রোগে আক্রান্ত হল মালী ও সুমালী, সারা দেহ গলে পড়তে লাগল। তারা শক্তিহীন ও নিস্তেজ হল। সূর্যের কোপে যে তাদের এ অবস্থা ব্রহ্মা তা বললেন, ব্রহ্মা তাদের সূর্যের কবচ, স্তোত্র ও পূজার নিয়ম বলে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। তারপর তারা পুষ্কর তীর্থে গিয়ে তিনবার স্নান করে ভক্তি ভরে সূর্যের মন্ত্র জপ করে সূর্যের আরাধনা শুরু করল, পরে সূর্যের বর পেয়ে স্বাভাবিক যে রূপ ছিল তা ফিরে পেল। এবার নারায়ণ জানতে চাইলেন যে, নারদ আর কি শুনতে চায়।

১৯.

এবার নারদ সূর্যের স্তব ও বর দানের কথা বলেছিলেন। সব রকম পাপ ও রোগ যাতে ধুয়ে মুছে যায়, তার জন্য মালী, সুমালী শিব মন্ত্রের প্রসাদক ব্রহ্মাকে স্মরণ করল। ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠে গিয়ে কমলাপতি হরির সামনে বসে থাকা শিবের কাছে জানতে চাইলেন–কেন তারা রোগগ্রস্থ। বিষ্ণু বললেন–পুষ্কর তীর্থে একবছর ধরে আমার অংশস্বরূপ যে সূর্যদেব এবং যিনি সকল রোগ দূর করেন, তার সেবা করলেই রোগমুক্তি ঘটে। শিব ব্রহ্মাকে বললেন, তাদের ব্যাধিনাশক মহাত্মা সূর্যের কল্পতরুর অভিপ্রেত ফলদায়ক সর্বোৎকৃষ্ট স্তব কবচ ও মন্ত্র দান করতে, হরি নিজে সব কিছু দান করেন, সূর্য রোগ দূর করেন, যার যা বিষয়ে সে তাই করে।

তারপর সেই দৈত্যদের কাছে গেলেন ব্রহ্মা ও নারায়ণ শিবের অনুমতি নিয়ে। ব্রহ্মা তাদের গলিত অসাড় আহারশূন্য এবং পূর্য ও দুর্গন্ধময় দেহ দেখে বললেন–বাছারা, তোমরা আমার কবচ, স্তব মন্ত্র ও পূজোর নিয়ম জেনে পুষ্করে গিয়ে বিনীত ভাবে সূর্যের উপাসনা কর।

ব্রহ্মা বললেন–ত্রিসন্ধ্যা স্নান করে যে মন্ত্র বলছি সেই মন্ত্রে ভক্তিভরে সূর্যের সেবা করলে তোমরা নীরোগ হবে। সেই সূর্য কবচ আমি তোমাদের দিচ্ছি। অহল্যাকে চুরি করার পাপে। গৌতমের শাপে, ইন্দ্রের গায়ে হাজার ক্ষত চিহ্ন দেখা দিয়েছিল, তখন বৃহস্পতি সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্রকে এই কবচ দান করেছিলেন। যে কবচ ধারণ করে ভারতে মুনিরা পরম পবিত্র হয়ে জীবন্মুক্ত হয়েছেন, আমি সেই পরম অদ্ভুত কবচের কথা বলছি, সাপেরা যেমন ভয় পায় গরুড়কে তেমনই রোগও ভয় পায় কবচধারীকে। এই কবচ বিশুদ্ধভাবে গুরুভক্ত যারা তারা নিজের শিষ্যকেই শুধু দেবে। তার মৃত্যু ঘটবে যে দুষ্টু স্বভাবের অপরকে এই কবচ দেবে। এর নাম জগদ্বিলক্ষণ। এই কবচের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ গায়ত্রী এবং সূর্য দেবতা।

এর প্রয়োগ ঘটে সকল রোগ নিরাময় ও সৌন্দর্য লাভের জন্য। এটি ধারণের সাথে সাথেই পবিত্রতা লাভ হয়। যা সকল পাপ দূর করে। ওঁ ক্লীং থ্রীং ক্রীং শ্রীং সূর্যায় স্বাহা' এই মন্ত্র আমার মাথা রক্ষা করুক, আমার কপাল রক্ষা করুক–আঠারো অক্ষরের মন্ত্র। ওঁ থ্রীং ত্রীং শ্রীং সূর্যায় স্বাহা' এই মন্ত্র আমার নাক রক্ষা করুক, আমার চোখ রক্ষা করুক সূর্য। বিতগুণ চোখের তারা রক্ষা করুক, অধর রক্ষা করুন ভাস্কর, দাঁত রক্ষা করুক দিনকর, গলা ও কান রক্ষা করুন মাতন্ড ও প্রচণ্ড, মিহির কাধ, পূষণ জঙঘা দুটো, রক্ষা করুণক ও সূর্য নিজে সবসময় আমার নাভি রক্ষা করুন। সববেদনমস্কৃত সবসময় আমার কঙ্কাল, ব্রহ্মা হাত ও প্রভাকর পা রক্ষা করুন।

বিভাকর সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন। আগে পুষ্করতীর্থে পুলস্ত্য মনুকে এই কবচ দিয়েছিলেন। আমি তা তোমাকে দান করলাম। তুমি কাউকে এই কবচ দিও না। এতে কোন সন্দেহ নেই এই কবচের কল্যাণে তুমি নীরোগ ও শ্রীমান হবে। এতেও কোন সন্দেহ নেই যে লক্ষ বছর হবিষ্য পালনের ফল পাবে এই কবচ ধারণ করলে। যে বোকা এই কবচ না মেনে সূর্যের উপাসনা করে, দশ লক্ষ বার জপ করলেও তার মন্ত্র সিদ্ধ হয় না।

ব্রহ্মা বললেন–এই কবচ ধারণ করে সূর্যের স্তব করে নিশ্চয়ই রোগ মুক্ত হবে। সামবেদে বলা হয়েছে, সূর্য দেবের স্তব সব রোগ থেকে মুক্তি দেয়। এই স্তব দূর করে সকল পাপ। সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দ ও আরোগ্য দেয়। ব্রহ্মা বললেন, সেই ব্রহ্মজ্যোতি স্বরূপ সনাতন ও

ভক্তদের অনুগ্রহ কর। ত্রিলোকের চক্ষু স্বরূপ, লোকনাথ, পাপ দূর করে, তপস্যার ফলদান কর ও পাপিদের দুঃখ দাও। তুমি সর্বকর্মের বীজ ও দয়ার আধার। তুমি কর্ম ও ক্রিয়া স্বরূপ। তুমি সুখ, মোক্ষ, ভক্তি ও সকলের অভীষ্ট দান কর। তুমি সারাৎসার, সকলের ঈশ্বর, সর্বস্বরূপ ও সকলের কর্মের সাক্ষী।

২০.

তুমি সবার অতীন্দ্রীয়। তুমি রস সৃষ্টিকারী, রস দান কর, সিদ্ধি দান কর। সিদ্ধি স্বরূপ, সিদ্ধদের পরমগুরু। গোপন অপেক্ষাও গোপনতর। যে প্রত্যেকদিন ত্রিসন্ধ্যা এ স্তব পড়ে, সকল রোগ মুক্ত হয়। যার কুষ্ঠ হয়েছে, দেহ গলে পড়ছে, চোখ নেই, যার মুখে ব্রণ, যক্ষারোগী, মহাশূল রোগী ও নানা রোগগ্রস্থ লোকেরা যদি একমাস ধরে হবিষ্য পালন করে এই স্তব শোনে –তার রোগ মুক্তি ঘটবেই এবং সে সকল তীর্থ স্নানের ফল লাভ করে এতে সন্দেহ নেই। সুতরাং তোমরা তাড়াতাড়ি পুষ্কর তীর্থে যাও এবং সেখানে গিয়ে ভাস্করের উপাসনা কর। এরকম উপদেশ দিয়ে মনের আনন্দে চলে গেলেন ব্রহ্মা। দৈত্যরা সূর্যের উপাসনা করে নীরোগ হল।

নারদ জানতে চাইলেন, কেন গণেশের মাথায় হাতির মুখ লাগানো হল। নারায়ণ বললেন, এই কাহিনি সব মঙ্গলের মঙ্গল, সুখদায়ক, মোক্ষদায়ক এবং চতুর্বর্গ ফলদায়ক, লক্ষ্মীচরিত এই কাহিনির অর্ন্তগত। আমি পুরানো ইতিহাস বলছি যা পাদ্মকল্পে রহস্য যমের কাছ থেকে শোনা। ইন্দ্র একদিক কামার্ত হয়ে রাজলক্ষ্মীর মত সেজে পুঞ্জভদ্র তীরে গিয়েছিলেন। সেখানে এক সুন্দর ফুলের বাগান দেখলেন। জীবজন্তু শূন্য দুর্গম বনের মধ্যে চন্দ্রলোক থেকে সুরত কর্মের ও বিশ্রামের জন্য আসা কামদেবের অনুরাগিণী রম্ভাকে দেখেছিলেন। রম্ভা রতি ক্রীড়ার কথা চিন্তা করে কামদেবের ওপর একাগ্র চিত্ত হয়ে কামদেবের কাছে যাচ্ছিল। অপূর্ব সুন্দরী ও সুগঠিত শরীরের অধিকারীণি ছিল রম্ভা। পরন তার পবিত্র কাপড়, অলংকার, কপালে সিঁদুর, চোখ তার নীল পদ্মাভ, নয়নদ্বয় উজ্জ্বল কাজলে রাঙান। স্তন তার উঁচু ও কঠিন, তার পোশাক পরিচ্ছন্ন, সুন্দরী অপ্সরাদের মধ্যে রম্ভা অত্যন্ত সুন্দরী। সকলের মনোহারিণী। তাকে দেখে ইন্দ্র কামাতুর হলেন ও বলতে লাগলেন– তুমি কোথায় যাচ্ছ সুন্দরী? এখন কে তোমার প্রিয়পাত্র?

দুতের মুখে শুনে এখানে তোমায় খুঁজতে এসেছি। ভাল জল খেতে চেয়ে কেউ ঘোলা জল খায় না। যে চন্দন চায় সে কখনও পাঁক নেয় না। খারাপ খাবার যে কখন খেতে চায় না সে ভাল খাবার খায়। ভালো শয্যা ছেড়ে কণ্টক অস্ত্রশয্যায় কেউ শোয় না। পদ্ম ফুল ছেড়ে কেউ

শাপলা নেয় না। যে সবসময় পণ্ডিতদের সঙ্গে সময় কাটায় সে কখনও মুখের সঙ্গে থাকতে চায় না। রত্নলংকার ছেড়ে লোহার অলংকার পড়তে চায় না। এখন কে এমন বোকা যে তোমাকে আলিঙ্গন না করে অন্যের স্ত্রীকে পেতে চায়। কোন বুদ্ধিমান লোক গঙ্গা ছেড়ে অন্য নদীতে স্নান করতে চায় না, যারা সুখে কাটায় ইহকাল তারা ইন্দ্রিয়ের সুখ পুরণ করার বরই চায়।

রম্ভার সামনে এসে ইন্দ্র দাঁড়ালেন। রম্ভা আনন্দে অল্প হাসল। তার বিলোল কটাক্ষ, স্তন ও উরু দেখে এবং কামনায় উত্তেজক কথাবার্তায় ইন্দ্রের চৈতন্য লোপ পেল। রম্ভা বলল, তার যেখানে খুশি সেখানে যাচ্ছে। মিথ্যা কথা বলে সন্তুষ্ট কোরো না। ধূর্তদের কেবল যতক্ষণ চোখাচোখি ততক্ষণই বন্ধুত্ব। ফুলের মধু যেমন মৌমাছি খায় তেমনি মৌমাছির মত লম্পট লোকেরা যেখানে পায় সেখানে যায়। গাছের আই যেমন তার ডালপালা, সুপুরুষরা তেমন নারীদের অঙ্গ। কিন্তু কাক যেমন গাছের ফল খেয়ে উড়ে যায়, তেমন লম্পটরা স্ত্রীসঙ্গ লাভ করেই উড়ে যায়। সরোবরের জল শুকালে তেমন জীবরা আর আসে না, লম্পটরা যেমন কার্যসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করতেই থাকে।

দেবতাদের অধিপতি ইন্দ্র, নারীদের পরম প্রার্থিত বস্তু, রসিক স্ত্রী সর্বদা রসিক পুরুষকে পেতে চায়। কামিনীয় যুবক, রসিক, শান্ত, সুবেশ, সুন্দর, প্রিয় গুণীগণ ধনী ও পরিচ্ছন্ন স্বামী চায়। নারীরা বদ চরিত্র পুরুষ কখনই চায় না। রম্ভা বলল, সে তখন ইন্দ্রের অনুগত দাসী। কামশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ইন্দ্র মদন পীড়িত রম্ভার উদ্দেশ্য বুঝে ফুলের শয্যায় নিয়ে তার সঙ্গে বিহার করতে থাকলেন। রম্ভা তার ঠোঁটে চুম্বন করলে, ইন্দ্র, সুভগ, শ্রেষ্ট রম্ভার পাকা বিম্বফলের মতো স্তন দুটোতে চুমো খেতে লাগলেন। তারপর ইন্দ্র নিজেই শৃঙ্গারের রূপ ধরে নানাভাবে বিপরীত শৃঙ্গার করতে লাগলেন। তখন দুজনেই কামার্ত হয়ে একে অপরের কথা চিন্তা করতে করতে বাহ্য জ্ঞান হারালেন এবং তাদের কামনার ফলে কখন দিন রাত্রি হল বুঝতে পারলেন না।

তাঁরা জল বিহারের জন্য পুষ্পভদ্রার জলে নামলেন। বারবার স্থলে ও জলে বিহার করতে লাগলেন। মুনি দুর্বাসা সেসময় শিষ্যদের নিয়ে শিবের কাছে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে ইন্দ্র এসে প্রণাম করলে দুর্বাসা তাকে আর্শীবাদ করেন ও ইন্দ্রকে পারিজাত ফুলের মালা দেন এবং ফুলের অপূর্ব মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করতে থাকেন। এই ফুল সকল বিপদ দূর করে, তার জয় হয় সব জায়গায় যার মাথায় এই ফুল থাকে। মহালক্ষ্মী তার সঙ্গে সর্বদা থাকেন ছায়ার মতো। ইন্দ্র এরপর সেই ফুল মালা নিয়ে রম্ভার কাছে নিয়ে তার হাতী ঐরাবতের মাথায় রাখেন। অসতী স্ত্রী অত্যন্ত অধম ও চঞ্চল সে উপযুক্ত পুরুষকেই পেতে চায়। অতএব ইন্দ্রকে শ্রীহীন

দেখে স্বর্গে চলে গেলেন রম্ভা। আর ইন্দ্রকে ছুঁড়ে ফেলে মহাশক্তিশালী হাতী গভীর বনে চলে গেলো। এক হস্তিনীকে সকলে উপভোগ করতে লাগল। হস্তিনী তার বশে এল। কারণ স্ত্রী হাতি সুখ চায়। তাদের অনেক সন্তান হল ঐ বনে। তখন হরি তার মাথা কেটে বালকের কাঁধে জুড়লেন।

২১.

নারদের প্রশ্নের উত্তরে নারায়ণ বললেন–তা মন্দবুদ্ধি ইন্দ্র সম্পদ খুইয়ে অর্থাৎ ঐরাবত ও লক্ষ্মীকে হারিয়ে অমরাবতীতে এসে উপস্থিত হলেন। ইন্দ্র দেখলেন, সমস্ত স্বর্গপুরী আনন্দহীন, শত্রু আক্রান্ত, দারিদ্রগ্রস্ত ও বন্ধুশুন্য, পরে দূতের কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে মন্দিরে গিয়ে গুরু ও দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মলোকে এসে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মাকে প্রণাম করে ভক্তি ভরে বেদোক্ত স্তব করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তখন তাঁকে বললেন–তুমি লক্ষ্মীর মতো শচীর স্বামী। তবুও তোমার পরনারীতে লোভ। সেই ব্যক্তির শ্রী ও যশ নষ্ট হয়, যে পরস্ত্রী রমণ করে। রম্ভার প্রতি কামাসক্ত হওয়ায় তুমি দুর্বাসার দেওয়া ফুল ঐরাবতের মাথায় রেখেছ। এর ফলে তুমি লক্ষীহীন হয়েছ। এখন নারায়ণ ভজনা কর, লক্ষীকে পাওয়ার জন্য। ব্রহ্মা তখন ইন্দ্রকে কবচ ও স্তব মন্ত্র দান করলেন। ইন্দ্র গুরু ও দেবতাদের সঙ্গে আকাঙ্খিত মন্ত্র ও কবচ নিয়ে পুষ্কর তীর্থে গিয়ে হরিকে স্তব করলেন। লক্ষ্মীকে পাবার জন্য একবছর ধরে না খেয়ে কমলাকান্তকে সেবা করলেন ইন্দ্র। হরি প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রকে বর দান করলেন এবং লক্ষীকে জয় করে স্বর্গ লাভ করলেন। দেবতারাও নিজ জায়গায় ফিরলেন।

২২.

ইন্দ্র পুষ্কর তীর্থে তপস্যা করে সেখানে বিশ্রাম করছিলেন, সেখানে শ্রীহরি তাঁকে ক্লিষ্ট দেখে আবির্ভূত হয়ে বললেন–মনের মত বর চাও। ইন্দ্র তখন লক্ষ্মীকে চাইলেন। আনন্দিত চিত্তে ইন্দ্রকে বর দিলেন হরি। ইন্দ্রকে বললেন–তুমি সকল দুঃখ দূরকারী ও শনিধনকারী এই কবচ নাও, এই কবচ গ্রহণ করলে তোমার সকল সম্পদ লাভ ঘটবে। বিধাতা এই কবচ ধারণ করে জগতের শ্রেষ্ঠ ও সকল ঐশ্বর্য লাভ করেছেন। মুনিরা এর দ্বারা সমগ্র সম্পদ লাভ করেছেন। এই সম্পদদায়ক এই কবচের ঋষি বিধাতা, পংক্তি ছন্দ, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী। এই কবচের প্রয়োগ হয় সিদ্ধি, ঐশ্বর্য ও জয়ের জন্য। এই কবচ ধারণ করলে সর্বত্র জয় লাভ হয়। পদ্ম মাথা, হরিপ্রিয়া গলা, লক্ষ্মী নাক ও কমলা চোখ রক্ষা করুন। কেশবকান্তা চুল, কমলালয়া কপাল, জগৎ প্রসবিনী গাল ও সম্পদপ্রদা কাঁধ রক্ষা করুন। যে গুরুপুজো করে গলায় বা ডান হাতে

এই কবচ বাঁধে তার জয় সর্বত্র হয়। লক্ষ্মী তাঁর গৃহত্যাগ করে না। তার সাথে ছায়ার মত থাকেন প্রতি জন্মে। লক্ষ্মীকে না জেনে যে কেবল ভজনা করে তার সিদ্ধিলাভ হয় না। একশো বার লক্ষ্মী মন্ত্র জপ করলে ও তার সিদ্ধিলাভ হয় না।

জগৎপতি সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্রকে জগতের কল্যাণকর কবচ ও 'ওং হ্রীং ক্রীং শ্রীং ক্লীং নমো মহালক্ষৈহরি-প্রিয়ায়ৈ স্বাহা' মন্ত্র দান করলেন। সামবেদে বলা আছে মঙ্গলবার ধ্যানের কথা, শরৎ শশীর মত সৌন্দর্য ও সাদা চাপা ফুলের মতো তার রং, অগ্নিশুদ্ধ কাপড় তার পরনে, নানা রত্নালংকারে সজ্জিত ও সর্বদা খুশিময়। তাঁর শোভা বাড়াচ্ছিল উজ্জ্বল রত্ন কুন্ডল, মালতী ফুল তার খোঁপায়। তিনি উপবিষ্ট হাজার পাপড়িবিশিষ্ট পদ্মে। তিনি গুণান্বিত বিভিন্ন গুণে। তিনি মুগ্ধ করেন সকলের মনকে, সৃষ্টি করেন সমগ্র জগৎকে। তিনি হরিকান্তা লক্ষীকে ভজনা করবে ও মনহারিণী লক্ষীকে ধ্যান করে ষোল উপাচার দেবে। এই স্তবে তাঁকে প্রণাম করে বরলাভ করে সুখ পাবে। ইন্দ্রকে এবার তিনি গোপন ও সুখকর ত্রিলোকের স্তব বললেন। দুধের শিশুর কাছে তার মা ছাড়া সমস্ত বস্তু যেমন অবস্তু এবং মা থাকলে সকল বস্তু যথার্থ বলে মনে হয়, তেমন আপনি বিনা সকল জগৎ অবস্তু। আপনি বেদজ্ঞদের জননী। বিপন্ন হয়ে আপনার আশ্রয় নিলাম, প্রসন্ন হয়ে আপনি রক্ষা করুন। আপনি জ্ঞান, বুদ্ধি দান করেন। আপনি দান করেন হরিভক্তি, মুক্তিদান করেন ও সর্বজ্ঞদের সকল বস্তু দান করেন। কুপুত্র যদিবা হয় কুমাতা কখন নয়। পুত্রের দোষ কোন মা দেখেনা, তুমি আমাদের দেখা দাও দয়া করে। শুভ, সুখ ও মোক্ষদায়ক সারময় ও সম্পদকারী এই হল লক্ষ্মীর স্তব। এই মহাপুণ্যকর স্তব পূজা সময় যে পাঠ করে, লক্ষ্মী কখন তার ঘর ছাড়েন না, সেখানেই অদৃশ্য হলেন হরি, পরে ইন্দ্র তাঁর আদেশে ক্ষীরসাগরে গেলেন।

২৩.

কবচটা নিয়ে নিজের গলায় ঝোলালেন ইন্দ্র। লক্ষ্মীকে পাবার জন্য গেলেন ক্ষীরসাগরের তীরে। সকল দেবতারা ভক্তিভরে নত মস্তকে দেবী লক্ষ্মীর স্তব করতে লাগলেন। শরতের চাঁদ সম যার সৌন্দর্য এবং যাতে সকল জগৎ ব্যপ্ত, সেই লক্ষ্মী তাদের স্তব শুনে এসে উপযুক্ত সারগর্ভ ও হিতকর কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন–যে, ব্রহ্মশাপে শ্রীহীন আমি। কারণ আমি ভীত ব্রহ্মশাপে, তার প্রাণ ও পুত্রের থেকেও বেশি প্রিয় ব্রাহ্মণরা। আমাদের জীবন চলে ব্রাহ্মণদের দানে। সেই ব্রাহ্মণ ও তপস্বীরা আমাকে পুজো নাও করতে পারেন। দৈবাৎ দুর্ভাগ্যের অধিকারীরা ব্রাহ্মণ, গুরু, দেবতা ও ভিক্ষুর দ্বারা অভিশপ্ত হয়। সকলের কারণ সবার সনাতন, ভগবান নারায়ণ ও ব্রহ্মশাপকে ভয় পান।

এমন সময়ে ব্রহ্মতেজে উজ্জ্বল ব্রাহ্মণরা মনের আনন্দে হাসতে হাসতে সেখানে এলেন। অঙ্গিরা, প্রচেতা, ক্রতু, ভৃগু, পুলহ, পুলস্ত, মরীচি, অত্রি, সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, ভগবান কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ, দুর্বাসা, কশ্যপ, অগস্ত, গৌতম, এবং কণ, নর ও নারায়ণ, কাত্যায়ন, কণাদ, মার্কণ্ডেয়, লোমশ, বশিষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণরা নানা বস্তু দিয়ে সুরেশ্বরীকে পূজা করতে লাগলেন। মুনিরা ভক্তি ভরে তার স্তব করে মনের আনন্দে তার পূজা করলেন। সে মিথ্যাবাদী বলে ঈশ্বর নেই, যার নেই সত্ত্বগুণ, যার চরিত্র খারাপ তাদের ঘরেও যাবনা আমি। যে গচ্ছিত সম্পদ চুরি করে, মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়, বিশ্বাসঘাতক এবং কৃতঘ্ন তার ঘরে থাকি না, যে সর্বদা ভীত, অনেক শত্রু যার, যে অত্যন্ত পাপী, । ঋণী ও কৃপণ, সেই পাপীদের ঘরে যাব না। যার দীক্ষা হয়নি, সর্বদা শোকগ্রস্ত, যার বুদ্ধি মন্দ, স্ত্রৈণ্য যার স্ত্রী, বেশ্যা ও যার মা বেশ্যা — তাদের ঘরেও যাব না।

সে খারাপ কথা বলে, সর্বদা ঝগড়া করে, যে ঘরে স্ত্রী সর্বেসর্বা, তার ঘরে যাব না। যে হরি পুজা ও তার গুনকীর্তন করে না এবং হরির প্রশংসা করার কোন ইচ্ছে নেই তার ঘরে যাব না। যে কিপটে হয়, বাবা, মা, স্ত্রী, পুরুষ, গুরুজন, অনাথ বোন, মেয়ে ও আশ্রয় শূন্য বন্ধুদের ভরণপোষণ না করে টাকা পয়সা জমায় তাদের সেই নরকের ঘরে যাব না, পায়খানা কারী লোককে দেখে, যে ভেজা পায়ে শোয়, তার ঘরেও যাব না। যে পা না ধুয়ে শোয়, উলঙ্গ হয়ে শোয়, সন্ধ্যায় শোয়, দিনে শোয়, তার ঘরে যাব না। যে আগে মাথায় ও পরে শরীরে তেল মাখে, যে নখ দিয়ে ঘাস কাটে ও মাটি খোড়ে, যার গায়ে ও পায়ে ময়লা থাকে। যে জেনেশুনে নিজের দেওয়া বা পরের দেওয়া বৃত্তি চুরি করে তার ঘরে যাব না। যে মন্ত্র ও বিদ্যার বিনিময়ে জীবিকা রোজগার করে, যে গ্রাম বাজী ডাক্তার, রান্না করে এবং পুজারী ব্রাহ্মণ তার ঘরে যাব না। যে বিয়ে বা অন্য কোন ধর্মকাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, দিনের বেলায় মৈথুন করে তার ঘরে যাব না। এই বলে দেবী অদৃশ্য হলেন।

দেবতারাও মর্ত্যলোকের দিকে তাকালেন। দেবতারা প্রণাম করে মনের আনন্দে শত্রুশূন্য ও বন্ধুবান্ধবে ভর্তি ঘরে এলেন। স্বর্গে দুন্দুভি বাজল, ফুল ঝড়ল আকাশ হতে, দেবতারা সবাই নিজের রাজ্য ও লক্ষীলাভ করলেন। লক্ষীর এই সুখকর, মোক্ষদায়ক সারযুক্ত, উত্তম চরিত্র বললাম।

২৪.

নারায়ণ এরপর গণেশের একটা দাঁতের ব্যাপারে বলতে আরম্ভ করলেন। সমস্ত মঙ্গলের পুরোনো ইতিহাসের মত একটা মাত্র দাঁত থাকার কাহিনী। কার্ত্তবীর্য্য একসময় মৃগয়ায় গিয়ে অনেক হরিণ মেরে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে যান। অরণ্যে ইতিমধ্যে সন্ধ্যা নেমে আসে। রাজা সেই নিশীথে অরণ্য মধ্যে নির্গমনের পথ হারিয়ে ফেলেন। তারপর ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর রাজা লোকমুখে জানতে পারলেন কাছেই আছে জমদগ্নিমুনির আশ্রম। রাজা মুণিকে প্রণাম করে আশ্রয় ও খাদ্য প্রার্থনা করলেন। জগদগ্নিমুনির আশ্রমে ছিল কল্পতরু কামধেনু মা কপিলা। রাজার উপোসের কথা জেনে মুনি তাঁকে আশ্রমে নেমন্তন্ন করলেন। মুনি নিজের ঘরে গিয়ে মা কামধেনুকে ঘটনা বললেন, মা তাকে অভয় দিলেন।

কপিলা স্বর্ণ ও রোপ্য পাত্রে ভাল সুগন্ধি খাবার ভরে, অসংখ্য খাবার থালা ও রান্নার পাত্র দিলেন। নানা স্বাদু পাকা আম, নারকেল, রাশি রাশি লাড্ডু, আটার পিঠে, রান্না করা খাবার, পোলাও, দুধ, দই, ঘি দান করলেন। চিনির মিষ্টি, পিষ্টক, ভাল চালের ভাত, কর্পূরের তাম্বুল, কাপড় ও অলংকার দান করলেন। এই বিপুল খাদ্য সম্ভার, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাসন পাত্রের উজ্জ্বল্যে রাজা বিস্মিত হলেন। তার আদেশে মন্ত্রী সর্বত্যাগী মুনির ধনসম্পদের উৎস জানতে আগ্রহী হলেন। পুরো আশ্রম নিজ চক্ষে পরিদর্শন করে রাজাকে তিনি বললেন– মুনির ঘরে যে সব জিনিস দেখলাম –মুনির ঘর অগ্নিকুন্ড, যজ্ঞকাঠ, কুশ, ফুল, ফল, কৃষ্ণসার চামড়া, বহু যজ্ঞপাত্র ও শিষ্যতে ভর্তি। তার সোনার বাসন, শস্য, টাকা পয়সা নেই। তার স্ত্রীর কোন গয়না নেই, গাছের ছাল পরনে।

ছেলেদের পরনেও গাছের ছাল ও মাথায় জটা, যদিও ঘরের একপাশে লক্ষ্মীর মত সুন্দরী এক কপিলা আছে। চাঁদের মত রং, লালপদ্মের মত চোখ, নিজের তেজেই নিজে উজ্জ্বল, সকল সম্পদ ও গুণের আধার স্বরূপ। রাজা একথা শুনে সেই কপিলাগাভীকেই চাইলেন। সব লোক পুন্যের ফলে স্বর্গভোগের পর পবিত্র স্থানে জন্মগ্রহণ করেও পাপের ফলে নরকভোগের পর খারাপ জায়গায় জন্মায়। জীবের নিস্কৃতি চাই কর্ম বর্তমান থাকতে, তাই পন্ডিতরা শীঘ্র কর্মক্ষয় চান। তিনিই প্রকৃত গুরু, বন্ধু, বাবা, মা ও ছেলে। জীবের দারুণ রোগ হয় ভালমন্দ কর্মের ফলস্বরূপ। সেই রোগকে দূর করে বিষ্ণুভক্ত বৈদ্য তার কৃষ্ণভক্তি রূপ ওষুধ দিয়ে। যে প্রত্যেক জন্মে বুদ্ধিদাতা জগদ্ধাত্রী পরমা মায়াকে সেবা করে, মহামায়া তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে ভক্তকে মোহের কারণ মায়া দান না করে বিবেক দান করে ও বিষ্ণুভক্তি দান করেন।

মায়ায় মুগ্ধ রাজা যত্ন করে মুনিকে এনে ভক্তিভরে জোড়হাতে বিনয়ের সঙ্গে বললেন–ওহে ভক্ত শ্রেষ্ঠ, আপনি কল্পতরুর মত, ভক্তকে অনুগ্রহ করেন। আপনি আমাকে কামদাতা ঐ

কামধেনু ভিক্ষা দিন। কিছু নেই না দেওয়ার মত জগতে আপনার মত দাতাদের। দেবতাদের নিজের হাড় দান করে ছিলেন দধিচী মুনি। আপনি তপস্যায় রাশি স্বরূপ। অনেক কামধেনু সৃষ্টি করতে পারেন আপনি চোখের পলকে।

মুনি বললেন–তুমি প্রবঞ্চক। আমি ব্রাহ্মণ হয়ে ক্ষত্রিয়কে দান করব কিভাবে? ব্রহ্মাকে কামধেনু দান করেছিলেন গোলোকপতি কৃষ্ণ। ব্রহ্মা প্রিয় পুত্র ভৃগুকে দান করেন সেটি। ভৃগু আবার আমাকে দান করেন। এটি আমার কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। পরে জমদগ্নি কামধেনুর কাছে গিয়ে শোকে জ্ঞান হারিয়ে সকল ঘটনা ব্যক্ত করলেন ও দেখলেন যে লক্ষ্মী কাঁদছেন। পরস্পরের সম্বন্ধে কেবল কালই যোজনা করেছেন। যতক্ষণ পরস্পরের সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণই থাকে পরস্পরের ক্ষমতা। একথা কেবল মনই জানে সেই বস্তু বিচ্ছেদ মনে দুঃখ দেয় যতক্ষণ সে বস্তু নিজের অধিকারে থাকে। কামধেনু সূর্যের মত উজ্জ্বল, নানা অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য সৃষ্টি করতে লাগলেন। তিন কোটি পুরুষ তার মুখ থেকে খড়গ হাতে, নাক থেকে শূলাধারী পাঁচকোটি, কপাল থেকে দন্ত হাতে তিন কোটি, বুক থেকে তিনকোটি শক্তি অস্ত্রধারী সৈন্য ও পিঠ থেকে গদা হাতে একশোকোটি পুরুষ বেরিয়ে এল। হাজার বাদ্যযন্ত্রর আওয়াজ। বেরোল পায়ের তলা থেকে, তিনকোটি রাজপুত্র বেরোল জঙঘা থেকে। তিনকোটি ম্লেচ্ছ জাতির সৃষ্টি হল গুহ্যদেশ থেকে। সব প্রসব করে মুনিকে সৈন্য দিয়ে অভয় দিলেন ও বললেন–এ সকল সৈন্যরা যুদ্ধ করুক তুমি যেও না। এদেরকে পেয়ে মুনি সন্তুষ্ট হলেন। রাজা ব্যর্থকার্য হয়ে মনের দুঃখে নিজের দেশ থেকে দূত পাঠিয়ে আরও সৈন্য আনালেন।

২৫.

রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে হরিকে স্মরণ করে মুনির কাছে দূত পাঠালেন। দূত মুনির কাছে গিয়ে বলল–আমার প্রভুর আদেশ শুনুন, তিনি বলেছেন –আমি আপনার চাকর ও বিশেষ করে অতিথি। আমাকে আমার প্রার্থনামত কামধেনু দান করুন। মুনি দূতের কথা শুনে তাকে বললেন–রাজাকে ক্ষুধার্ত দেখে আমি তাকে যথাসাধ্য খাইয়েছি, কিন্তু রাজা আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় কপিলাকে নিয়ে যেতে চাইছে, তাই আমি যুদ্ধ করব।

দূত রাজাকে মুনির সব কথা বললেন। এদিকে কপিলাকে মুনি বললেন, কুশলী সেনাপতি ছাড়া সৈন্যদের অবস্থা মাঝি বিনে নৌকার মতো। কপিলা তখন মুনিকে নানা অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধের উপদেশ ও যুদ্ধের উপযুক্ত সন্ধান দিয়ে তাকে জয়ী হওয়ার আশীষ দিলেন এবং বললেন, অমোগ অস্ত্র বিনে তার মৃত্যু হবে না।

মুনি সমস্ত সৈন্য সাজিয়ে যুদ্ধে গেলেন। রাজাও মুনিকে প্রণাম করে যুদ্ধে এলেন। কপিলার সৈন্য অতি সহজেই রাজার বিচিত্র রথ ভেঙে ফেলল। রাজার ধনুক ও বর্ম কেটে ফেলল। রাজা কপিলসেনাদের জয় করতে পারলেন না। তারা তীরবৃষ্টি করে রাজাকে অস্ত্রশূন্য করে ফেলল। রাজা কাতর হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সৈন্যদের অনেকে মারা গেল। রাজাকে অজ্ঞান দেখে দয়াপরবশ হয়ে তার সৈন্যদের বিসর্জন করলেন, কপিলার কৃত্রিম সৈন্যরা কপিলার দেহে মিলিয়ে গেল। রাজাকে পায়ের ধুলো দিয়ে আর্শীবাদ করলেন। এবং তার জ্ঞান ফেরালেন কমুন্ডলের জল দিয়ে। রাজা তখন ভক্তিভরে মুনিকে প্রণাম করলেন। মুনি প্রসন্ন হয়ে আবার তাকে যত্ন করে স্নান করিয়ে খাওয়ালেন। রাজা মুনির আশ্রমে গিয়ে বললেন, আপনি আমার প্রার্থিত ধেনু দান করুন কিংবা যুদ্ধ করুন।

২৬.

নারায়ণ বললেন–মুনিশ্রেষ্ঠ জমদগ্নি, রাজার কথা শুনে হরিকে স্মরণ করে, ভাল, সত্য ও নীতিপূর্ণ কথা বললেন– রাজা তুমি ঘরে গিয়ে সনাতন ধর্ম রক্ষা কর। তার সকল সম্পদ সম্পত্তিও স্থিরভাবে থাকে, যার ধর্ম সর্বদা স্থির থাকে। তুমি অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে অসতের মত কথা বলছ। রাজা মুনির কথা শুনে তাকে বলল অন্য রথে চড়ে যুদ্ধ করতে। কপিলার দেওয়া অস্ত্রে রাজাকে নিরস্ত্র করলেন মুনি। রাজা পুনরায় জ্ঞান হারালেন এবং জেগে আবার যুদ্ধ শুরু করলেন। রাজা মুনিকে আগ্নেয়াস্ত্র ছুড়লেন মুনি বরুণাস্ত্র দিয়ে তা আটকালেন। রাজা রায়ব্য অস্ত্র দিয়ে বরুণাস্ত্র ঠেকালেন। মুনি গান্ধর্বণ দিয়ে রাজার বায়ব্য অস্ত্র আটকালেন। রাজার নাগপাশকে মুনি গরুড় অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেললেন। রাজা শৈব অস্ত্র দিয়ে দশদিক উজ্জ্বল করে ছুঁড়ে মারলে মুনি মহাশক্তিশালী বৈষ্ণব অস্ত্র দিয়ে তা নিবারণ করলেন। মুনি নারায়ণ অস্ত্র ছুঁড়লেন মন্ত্রচ্চারণ করে। রাজা তখন মুনির শরণাপন্ন হলেন, রাজাকে এ অবস্থায় দেখে অস্ত্র আকাশে ঘুরে অদৃশ্য হলো।

মুনি তখন জম্বনাস্ত্র ছুঁড়লেন যার প্রভাবে রাজা মরার মত নিশ্চল ভাবে পড়ে রইলেন। ঘুমন্ত রাজাকে মুনি অর্ধ চক্রবান দিয়ে রাজার সারথি, ধনুক, বাণ, মাথার মুকুট, ধারাল অস্ত্র দিয়ে ছাতা, কবচ ও অন্যান্য অস্ত্র দিয়ে যাবতীয় অস্ত্র, তুণীর ও ঘোড়াকে মেরে ফেললেন। মুনি নাগপাশ দিয়ে রাজার মন্ত্রীদের যুদ্ধক্ষেত্রে বেঁধে রাখলেন। মুনি নিজের মন্ত্রপ্রভাবে রাজার জ্ঞান ফিরিয়ে এনে তার মন্ত্রিরা বাঁধা পড়ে আছে –তা দেখালেন এবং তাঁদের বাঁধন খুলে দিয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন–যুদ্ধে কাজ নেই, বাড়ী যাও। ক্ষত্রিয় রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে উঠে

দাঁড়িয়ে রেগেমেগে শূলঅস্ত্র মুনির দিকে ছুঁড়ে মারলে মুনি তক্ষুনি শক্তি অস্ত্র দিয়ে রাজাকে আঘাত করলেন।

তখন ভগবান ব্রহ্মা যোগবলে রাজা ও মুনির যুদ্ধের ঘটনা জেনে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে নানা নীতি বলে রাজা ও মুনির মধ্যে সন্ধি ঘটিয়ে দিলেন, মুনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করে স্তুতি করলেন, রাজাও মুনি ও ব্রহ্মাকে নমস্কার করে নিজের বাড়ির দিকে চললেন। মুনি নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন এবং বিধাতাও দুজনের যুদ্ধ ক্ষান্ত করে নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন। নারায়ণ তোমার কাছে জমদগ্নি মুনি ও রাজা কার্ত্তবীর্যাজুনের যুদ্ধের কাহিনি বললাম।

২৭.

কার্ত্তবীর্য ঘরে গিয়ে ঋষির শক্তির কথা স্মরণ করে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থাকলেন, কিন্তু হেরে যাবার অপমান সহ্য করতে না পেরে হরিকে স্মরণ করে জমদগ্নি মুনির আশ্রমে আবার চললেন। চারলক্ষ রথ, দশ লক্ষ রথী, অসংখ্য ভাল ভাল ঘোড়া, বিরাট বিরাট সব হাতী, পদাতিক সৈন্য ও হাজার হাজার শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী সৈন্যদের নিয়ে ত্রিভুবন জয়ের ক্ষমতা অভিলাষে নিয়ে মহানন্দে জাঁকজমকের সঙ্গে জমদাগ্নি মুনির আশ্রম ঘিরে ধরলেন। রাজা কার্ত্তবীর্য রথে চড়ে নিজে আশ্রমের কাছে এলেন। কুবুদ্ধি লোকেরা আশ্রমের কুটীরে এসে আশ্রমের সামনে থাকা কপিলা কামধেনুকে চুরি করে নিয়ে যেতে লাগল। রাজা হরিকে স্মরণ করে দত্তাত্রেয় মুনিকে প্রণাম করে বর্ম না পরে তীর ধনুক হাতে নিয়ে একা যুদ্ধ করতে নির্ভীকভাবে এগিয়ে গেলেন। যাবার আগে আশ্রমের লোকেদের সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন, পরে মুনির আশীর্বাদ নিয়ে আনন্দে রথে চড়ে বসলেন। মুনির ছোঁড়া জৃম্ভন অস্ত্রে রাজা কার্ত্তবীর্য ও অন্যান্য রাজারা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। শোকে কাতর কপিলাকে আশ্বস্ত করে মুনি মনের আনন্দে আশ্রমের দিকে চলতে লাগলেন। হঠাৎ রাজা জ্ঞান ফিরে তীরধনুক নিয়ে মুনিকে যেতে বাধা দিলেন।

কপিলাও ভয়ে গোয়ালে চলে গেল। মুনি দিব্য অস্ত্র দিয়ে রাজার তীর ধনুক, রথ সারথী ও দুর্ভেদ্য কবচ ছিন্ন করে ফেললেন, রাজা রেগে গিয়ে একপুরুষনাশিনী শক্তিকে সামনে দেখতে পেলেন। দত্তাত্রেয় মুনিকে উৎসাহ দিয়ে শতশত সূর্যের মত তেজস্বী শক্তি নিয়ে ঘুরতে লাগলেন। নারায়ণ বলল–মন্ত্রচ্চারণ করে অস্ত্রের মধ্যে সমস্ত দেবতা-শিব-ব্রহ্মা ও বিষ্ণুমায়ার তেজ আবাহন করলেন। ভগবান বিষ্ণু কপিলাকে ব্রহ্মার কাছে দান করেন। ব্রহ্মা ভৃগুমুনিকে দান করেন আর মহর্ষি ভৃগু পুষ্কর তীর্থে কপিলাকে সন্তুষ্ট করে জমদগ্নি ঋষিকে দান

করেছিলেন। কপিলা কামধেনুদের নমস্কার করে দুঃখ পেয়ে গোলকধামে গেল, পুষ্কর তীর্থ থেকে যোগীশ্রেষ্ঠ ভার্গব পরশুরাম মনের গতিতে খুব তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে কার্ত্তবীর্যের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপার এবং মুনির শোকে কপিলা কামধেনুর গোলকধামে চলে যাওয়া শুনে– 'হায় মা, বাবা বলে দুঃখ করলেন। রেণুকা ও পরশুরামের কাছে পরলোকের পক্ষে উপকারী বেদের সব কথা তুলে বললেন–তুমি জন্মেছ আমার বংশে, কেন কাঁদছ? জ্ঞানী হয়েও স্থাবর বা অস্থাবর যা দেখছ এই সংসারে সবই বুদবুদের মত ক্ষণস্থায়ী, যথার্থ সত্যবস্তুর আধার সেই সনাতন বিষ্ণুকে চিন্তা কর।

প্রাণিদের ভাগ্যের থেকে যে সব কাজ হয় তা সত্য, তা কেউ আটকাতে পারে না। জগদীশ্বরের ঠিক করা ঘটনাও খণ্ডন করা যায় না, এই শরীর জগদীশ্বরের মায়া থেকে উৎপন্ন হয়েছ অজ্ঞানীদের পৃথিবীতে। শরীরের ক্ষিদে, ঘুম, দয়া, শান্তি, ক্ষমা, ক্লান্তি প্রাণ, মন, ও জ্ঞান– সব দেহের পরমাত্মা। জগতে কোন লোকই কারুর বাবা বা কারুর সন্তান নয়। প্রাণীরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এই দুস্তর সংসার সাগরে নিজের ভাল বা মন্দ কাজের মত ঢেউয়ে আন্দোলিত হয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেরাচ্ছে। কখনই কান্না করে না বুদ্ধিমান লোকেরা আত্মীয়স্বজনের বিরহে, মৃত ব্যক্তির অধঃপতন হয়, বউ ছেলে মেয়ের চোখের জল পড়লে, কেবল মোহের জন্য আত্মীয় মারা গেলে বন্ধুরা কান্না করে।

একশো বছর ধরে কাঁদলেও তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। দেহের মধ্য থেকে পরমাত্মা চলে গেলে দেহের মধ্যে পৃথিবীর অংশ, জলের অংশ, আকাশের অংশ, বায়ুর অংশ একে অপরে মিলে যায়। বন্ধুদের শোক আর কান্না শুনে তারা আর ফিরে আসেনা। বাবার পরলোকের সুখ চেয়ে শাস্ত্রের নিয়মমত ঔদ্ধদেহিক শ্রদ্ধাতর্পণ প্রভৃতি সকল কাজ কর। পরশুরাম ভৃগু মুনিরা সান্ত্বনাবাক্যে স্থির হয়ে 'এখন দুঃখ করা ঠিক না' এরকম মনে করে দুঃখ আর করলেন না। পতিব্রতা ধার্মিক রেণুকা ভৃগুমুনিকে জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করলেন।

২৮.

ভৃগুমুনি রেণুকাকে বললেন–তুমি আজই তোমার স্বামীর সঙ্গে যাও, মেয়েরা ঋতুর চারদিন নিজের স্বামীর ব্যাপারে সমস্ত কাজ করার অধিকারী হয়, তার প্রমাণ বলছি, শোন। মেয়েরা ঋতুর চারদিনের দিন যে কাজ করতে পারে না, পঞ্চম দিনে তার সেই কাজে অধিকার হয়। যেমন গর্ত থেকে সাপকে তুলে আনে সাপুড়েরা তেমন সতী নারীরাও স্বামীকে স্বর্গ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে। সতী নারীরা নিজেদের পুণ্যের দ্বারা পাপী স্বামীকেও স্বর্গে নিয়ে যেতে

পারে। রেণুকাকে মুনি বললেন–যে ছেলে বাবা মার উপর ভক্তিবান সেই প্রকৃত পুত্র, আর প্রকৃত নারী হলো পতিব্রতা নারী। যথার্থ বন্ধু হল যে অসময়ে দান করে জীবন রক্ষা করে, যে শিষ্য গুরুকে সেবা করে সেই প্রকৃত শিষ্য। যে লোককে বিপদে রক্ষা করে সেই অভীষ্ট দেবতা, প্রকৃত রাজা সেই যে যথার্থ প্রজাপালন করে।

প্রকৃত স্বামী সেই যে স্ত্রীকে ধর্ম বিষয়ে বুদ্ধি দেন, যে গুরু শিষ্যকে হরিভক্তি দান করেন প্রকৃত গুরু তিনিই। চার বেদ ও পুরাণগুলিতে এসকল লোকেদের প্রশংসা করা হয়েছে। রেণুকা জানতে চাইলেন ভারতের কোন্ কোন্ স্ত্রী স্বামীর সহগমন করতে পারে আর কেই বা পারে না। আমাকে ব্যাখ্যা করে বলুন তপস্বী। যে স্ত্রীর গর্ভ লক্ষণ হয়েছে, ঋতুকাল হয়নি, যে স্ত্রী ঋতুমতী, যে স্ত্রী ব্যভিচার করে, যে স্ত্রী আক্রান্ত কুষ্ঠ প্রভৃতি মহারোগে, স্বামীর সেবা করেনি যে স্ত্রী, যার স্বামীর প্রতি ভক্তি নেই, যে স্ত্রী সব সময় স্বামীকে কটু কথা বলে, এই স্ত্রীরা যদি কখনও খ্যাতি লাভ করার জন্য স্বামীর সহগমন করে, তবে তারা মারা গিয়েও মৃত স্বামীর কাছে যেতে পারে না।

চিতায় শায়িত স্বামীকে আগুন দিয়ে নিজেরা স্বামীর অনুগমন করে পুণ্যের ফলে প্রতি জন্মে নিজের স্বামীকে পায়, পতিব্রতা স্ত্রী যে কোন জায়গায় বিষ্ণুভক্ত নিজ স্বামীর সঙ্গে সহমরণ করলেই পরলোকে নিজের স্বামীর সঙ্গে বৈকুণ্ঠ ধামে গিয়ে গোলকপতি বিষ্ণুর কাছে থাকার অধিকার লাভ করে। মুক্তি ও ভক্তি লাভ করতে চেয়ে বিষ্ণুভক্তের যে কোন জায়গায় মৃত্যু হলে তার ফল সমান হয়। ভৃগু বললেন, যে লোক ভগবান নারায়ণের উপাসনা করে মহাপ্রলয়েও ঐ স্ত্রী ও পুরুষ বৈকুণ্ঠ থেকে চলে যায় না। ভৃগু এরপর পরশুরামকে সেই সময়ের উপযুক্ত বেদের ক্রিয়া বলতে শুরু করলেন। সজ্ঞানে এবং অজ্ঞানে পাপকাজ করে মৃত্যুর সময় উপস্থিত হওয়ায় পঞ্চভূতের এই মৃতদেহে পার্থক্য দেখা দিয়েছে, এ দেহ আশ্রয় করে জীব পুণ্য ও পাপ করেছে। এই দেহই লোভমোহ প্রভৃতি রিপুর বশে ছিল –আমি পুড়িয়ে দিচ্ছি সেই দেহের সমস্ত অংশ।

রেণুকা চিতায় শুয়ে পড়বার পরে পরশুরাম তার ভাইদের সাথে চিতার চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর ভাইয়েরা ও বাবার শিষ্যরা সবাই মিলে খুব কান্নাকাটি করলেন। রেণুকা ছেলের সামনেই পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন। রেণুকার মুখে রাম নাম শুনে বিষ্ণুর দূতরা সেখানে উপস্থিত হল। তাদের চার হাত, কালো গায়ের রং, হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। গলায় বনফুলের মালা, মুকুট মাথায়, কানে কুন্তল, পরণে কুশের পীত রংয়ের কাপড়, তারা রথে চড়ে জমদগ্নি মুনিকে নিয়ে বিষ্ণুর সামনে হাজির করল। পরশুরাম তার বাবা-মায়ের দাহ

কাজ শেষ করে ভৃগুমুনির কথামত ব্রাহ্মণের দেওয়া বিধানানুসারে বাবামায়ের শ্রাদ্ধশান্তি করে অসংখ্য ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধনদৌলত, গরু, সোনা, কাপড়, বিছানাপত্তর, সেই সঙ্গে চার রকম খাবার, ঠান্ডা জল, সুগন্ধি চন্দন, রত্নের দীপ, রূপোর পাহাড়, মূল্যবান সোনার আসন, সোনার পাত্রের সঙ্গে কর্পূর মেশানো তাম্বুল, ছাতা, খড়ম, নানা ফলমূল, ফুলের মালা, মিষ্টি খাবার দাবার ও দক্ষিণা বাবদ অনেক ধন দান করলেন।

তিনি শ্রাদ্ধকর্ম করার পর ব্রহ্মালোকে গেলেন। পরশুরাম দেখলেন সেখানে গিয়ে, ব্রহ্মলোক সোনায় ভর্তি, আর তার পাঁচিলের ইটগুলিও সব সোনা দিয়ে গাঁথা। দরজার বাইরে সোনার কলসি শোভা পাচ্ছে। আর দেখলেন ব্রহ্মা নিজের তেজে অসাধারণ শোভা ধারণ করে রত্ন সিংহাসনে বসে আছেন। ব্রহ্মার সারা গায়ে দামী অলংকার। তার চারপাশে সিদ্ধরা, দেবর্ষিরা ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা রয়েছেন। বিদ্যাধারীরা নাচছেন। আর ভগবান ব্রহ্মা তা দেখছেন। কিন্নরদের গান শুনছেন, চন্দন, অগরু, মৃগনাভি, প্রভৃতির সৌরভে সেই স্থান আমোদিত হচ্ছে।

যারা গোপন যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে জানতে চাইছেন তাদের কাছে সেসব উপদেশ দিচ্ছেন। তার কীর্তি অক্ষয় হয়। পূর্বজন্মের কর্মানুসারে মানুষ স্বামী, স্ত্রী গুরু এবং অভীষ্ট দেবতা লাভ করে, আগের জন্মে যার ঐসব থাকে। আবার পরের জন্মে সে তাই হয়ে নিজের থেকে এসে উপস্থিত হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই। মহাদেবের কাছ থেকে ত্রিলোক্য বিজয় কবচ নিয়ে এই পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয় শূন্য করতে পারবে। শ্রেষ্ঠ দাতা ভগবান শঙ্কর তোমাকে অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন পাশুপত অস্ত্র দান করবেন। তুমিও মহাদেবের দেওয়া মন্ত্র বলে ক্ষত্রিয়দের সংহার করতে পারবে।

২৯.

ভৃগু বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান পরশুরাম বিধাতার উপদেশ শুনে জগতের পিতা ব্রহ্মাকে নমস্কার করে তার কাছ থেকে বর লাভ করে খুব খুশি হয়ে শিবলোকে চললেন। শিবলোকের ডানদিকে বৈকুণ্ঠপুরী, বাঁদিকে গৌরীলোক এবং নীচে সব লোকের শ্রেষ্ঠ ধ্রুবলোক অবস্থিত। এই সকল লোকের উপর পঞ্চাশ কোটি যোজন জায়গা জুড়ে গোলোকপুরী, আর কোনো লোক নেই এই গোলোকের উপর। সেখানে গিয়ে এত সুন্দর ঐ লোক যে তার সঙ্গে আর কারুর তুলনা হয় না। সিদ্ধবিদ্যায় বিখ্যাত কোটি কাল ধরে তপস্যা করায় পবিক্রমন, পুণ্যবান শ্রেষ্ঠ যোগীরা চারদিকে রয়েছেন। এই শিবলোক অসংখ্য কামধেনু চারদিকে মৌমাছিদের মধুর গুঞ্জন ও কোকিলের স্বরে আমোদিত।

যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেব যোগবলে নিজের ইচ্ছায় সৃষ্টি করেছেন। এ এতই অসাধারণ লোক যে শিল্পীশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা স্বপ্নেও তা ভাবতে পারেন না। পদ্মফুল শোভা পাচ্ছে চার দিকে, আর আছে অসংখ্য সুন্দর সরোবর। পারিজাত ফুলের বাগানে সুসজ্জিত এই শিবলোক। সুন্দর রাজপথ আরো সুন্দর দেখাচ্ছে শিবলোকের ভেতর।পরশুরাম দেখলেন যে শিবলোকের মাঝে অত্যন্ত সুন্দর শঙ্করের মন্দির। যার চার পাশ সুন্দর মণিমানিক্যর পাঁচিলে ঘেরা। আকাশ ছোঁয়া সেসব ঘর। সাদা ক্ষীরের মত, মূল্যবান রত্নের তৈরি ষোল দরজা, রত্নময় সিঁড়ি, দরজা-জানলা, স্তম্ভ সবই। রত্নের মধ্যে শোভিত হীরে-মণি-মানিক্য, পরশুরাম দেখলেন হরের গৃহের সামনে রত্নে তৈরি কবাট সমেত সিংহদরজা।

ভয়ঙ্কর দুই দারোয়ান দরজা পাহারা দিচ্ছে। ব্রহ্মতেজে জ্বলন্ত এ দুজনকে দেখে ভীত পরশুরাম বিনয়ের সঙ্গে নিজের কথা বললেন। তাদের কাছ থেকে ঢোকার অনুমতি নিয়ে হরিনাম করতে করতে শিবালয়ে প্রবেশ করলেন। প্রথমেই দেখলেন পারিজাত ফুলের ভর্তি এক অসাধারণ সভা যা শ্রেষ্ঠ মহর্ষিতে ভর্তি ও সিদ্ধদ্বারা আবৃত। তিনি দেখলেন হর রত্নসিংহাসনে উপবীষ্ট। নানা দামী অলংকার তার গায়ে।

মাথায় তাঁর চাঁদ, হাতে ত্রিশূল ও পটিশ, তিনি মঙ্গলের নিদান ও আশ্রয়, তিনি নিজেই পরমাত্মা স্বরূপ। তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। তার কোটি সূর্যের মত তেজ। তাঁর মুখ সর্বদা প্রসন্ন অল্প হাসিতে। তার মাথায় স্ত্রী দক্ষকন্যা সতীর হাড় দিয়ে তৈরী মালা। তিনি ফলদান করেন মুনিদের তপস্যানুরূপ। নন্দী প্রভৃতি অনুচররা সাদা চামর দিয়ে তাকে বাতাস করছে। তিনি পরিপূর্ণতম, স্বেচ্ছাধীন, সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের অতীত, তিনি দূর করেন ভক্তদের জরাও মৃত্যুভয়। তিনি পরমানন্দরূপী, সকলের আদি ও প্রকৃতি থেকে অতিরিক্ত পরম ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করছেন। ধ্যান করার মহানন্দে তাঁর সমগ্র শরীর রোমাঞ্চিত। তিনি অজ্ঞান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের গুনগান করতে করতে। তার চোখ জলে ভরে যাচ্ছে। তার চারপাশে ঘিরে রয়েছে এগারো জন রুদ্র ও ক্ষেত্রপালরা। মহাদেবকে দেখামাত্র পরশুরাম মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে মহানন্দে তাকে প্রণাম করল।

তিনি দেখলেন মহাদেবের বাঁয়ে কার্তিক, ডানে সিদ্ধিদাতা গণেশ, সামনে নন্দীকেশর ও মহাকালরূপী বীরভদ্র, তার কোলের একদিকে রয়েছেন কালী ও অন্য দিকে হিমালয় কন্যা গৌরী। পরশুরাম মহানন্দে তাদের দেখামাত্র পরম ভক্তি ভরে মাথা নীচু করে নমস্কার করলেন। জমদগ্নি মুনির পুত্র পরশুরাম সকলের শ্রেষ্ঠ সারাৎসার মহাদেবকে দেখার পর স্তব করতে চাইলেন, কিন্তু মুখ থেকে কথা স্তব করতে লাগলেন গদগদ স্বরে। চোখ ভরে গেল

জলে। পরশুরাম অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে করুণস্বরে হাতজোড় করে শান্তভাবে বাবামায়ের শোকে দুঃখিত হয়ে মহাদেবের স্তব করতে লাগলেন।

চার বেদ যার স্তব করতে পারে না, সেই মহাদেবকে কে পারবে স্তব করতে? হে পরমেশ্বর! আপনি বুদ্ধি, বাক্ ও মনের অগোচর, এজগতের শ্রেষ্ঠ সার পদার্থ ও সমস্ত উৎকৃষ্ট পদার্থের মধ্যে উৎকৃষ্টতম। আপনি লোকের জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত। আপনার সেবা করছে সিদ্ধ লোকেরা সব সময়। আপনি সব জায়গা জুড়ে আছেন আকাশের মতো। আপনার আদি নেই, অন্ত নেই, বিনাশ নেই, নিজের ইচ্ছায় কখনও জগতের অধীন কখনও বা অধীনতা শূন্য, কখনও বা স্বাধীন। আপনিই তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি স্থান। আপনাকে ধ্যানের দ্বারা সাধনা করা হয়। আপনার আরাধনা করা অত্যন্ত কঠিন। অতি সাধনার দ্বারাই আপনার সাধনা করা যায়। আপনি কৃপা সমুদ্র। হে করুণাসাগর! হে দীনদুখী বন্ধু! আমি অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত, আমাকে উদ্ধার করুন। আজ সার্থক হল জন্ম ও আমার জীবনধারা। ভক্তরা যাঁকে স্বপ্নেও দেখতে সমর্থ হয় না, আমি মানুষের চোখ দিয়েই দেখলাম তাকে। ভাগ্যের আর কি আছে এর থেকে? হে দেব! যা মহাদেবের অংশ থেকে ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালেরা উৎপন্ন হয়েছেন এবং সকল চরাচর পৃথিবী যাঁর কলার অংশ, সেই জগদীশ্বর শিবকে নমস্কার করি আমি।

যে দেবাদিদেব মহাদেব ভাস্কর হিসাবে কাল বিভাগ করে জগতের মঙ্গল করছেন। চন্দ্ররূপে সুধাদান করছেন। অগ্নিরূপে রান্না প্রভৃতি কাজ করে জগতের উপকার করছেন, বায়ু হিসাবে সবার প্রাণ রক্ষা করছেন। সেই দেবকে নমস্কার। যে দেবতা নিজেই কখনও স্ত্রী, কখনও ক্লীব, কখনবা পুরুষ রূপ ধারণ করে সৃষ্টি বিস্তার করে চলেছেন, যিনি আধার স্বরূপ সকল বস্তুর এবং সকল বস্তুস্বরূপ হয়ে অবস্থান করেন, সেই মহাদেবকে নমস্কার, সকল লোকের কল্পতরু হয়ে যিনি সবাইকে তার মনের মত ফল দান করেন। যিনি ভক্তের কাছে অল্প সময়ের মধ্যেই সন্তুষ্ট হন। এবং ভক্তের প্রতি স্নেহপ্রবণ সবসময়ই, নমস্কার করি মহাদেবকে। আবার অল্প সময়ের মধ্যেই খুব সহজেই যিনি ভয়ঙ্কর কালাগ্নিরূপ ধারণ করে এই বিরাট পৃথিবী ধ্বংস করে থাকেন।

আমি-নমস্কার করি সেই মহেশ্বরকে, কালস্বরূপ যে দেবতা কালের কাল যিনি, যে দেবতার থেকে কালের চাকার চলার শুরু, কালের বীজস্বরূপ যিনি। যে দেবতা দৈত্যদের ধ্বংস করার জন্য নানারূপ ধরে আসেন এবং সকল কিছু জুড়ে রয়েছেন, প্রণাম সেই মহেশ্বরকে। পরশুরাম ভৃগু বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান, মহাদেবকে স্তব করে তার পায়ে পড়ে রইলেন। শঙ্কর

ভগবান পরশুরামের উপর সন্তুষ্ট হয়ে আর্শীবাদ দিলেন। ভক্তি ভরে যে লোক পরশুরামের করা মহাদেবের এই স্তব পড়ে, তার সমস্ত পাপ দূর হয় ও সে কৈলাসধামে যেতে পারে।

৩০.

মহাদেব পরশুরামের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে জানতে চাইলেন–তুমি কে, কার সন্তান, কেন আমার স্তব করছো, এখন সে কেন অভিলষিত কাজ করবে? মহাদেবের কথা শেষ হলে পার্বতী বলল –তোমাকে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত দেখছি, তুমি অন্য মনস্ক সবসময়ই, কেনই বা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে রয়েছ? তোমার যা বয়স দেখছি, অত্যন্ত বালক তুমি, তবু তুমি অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির, তুমি গুণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারণ তোমার অনেক গুণ রয়েছে।

হরপার্বতীর কথা শুনে পরশুরাম নিজের কথা বললেন। আমি জমদগ্নি মুনির ছেলে, ভৃগুবংশের জন্ম আমার, মহা পতিব্রতা রেণুকা দেবী আমার মা, আমার নাম পরশুরাম, আপনার দাস আমি, বিদ্যারূপ পণ্য বিক্রি করে আমাকে কিনুন। আমি আপনার শিষ্য হে দীনবৎসল! আপনার শরণাগত আমি। আমায় রক্ষা করুন, আমার কথা বলছি শুনুন– রাজা কার্ত্তবীর্যাজুন মৃগয়া করতে বনে গিয়ে কিছু খেতে না পেয়ে আমার বাবার আশ্রমে এলে, আমার বাবা নিজের কামধেনু কপিলার দেওয়া দুধ, ঘি দিয়ে ঐ রাজার সেবা করেন।

দুর্বুদ্ধি যুক্ত ঐ রাজা কপিলার লোভে মুগ্ধ হয়ে আমার বাবাকে যুদ্ধক্ষেত্রে মেরে ফেলেছে, কপিলাও বাবাকে মরে যেতে দেখে তাঁর শোকে অস্থির হয়ে গোলোকধামে চলে গেছে। আমার বাবাকে অনুগমন করেছেন মা সতীশ্রেষ্ঠ রেণুকা।

এখন আমি প্রভুশূন্য হয়ে পড়েছি। বাবা-মা কেউই না থাকাতে আমি বাবা-মায়ের শোকে বিহ্বল হয়ে আমি এমন এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছি যা কোনভাবেই আমার দ্বারা করা সম্ভব নয়। পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করব, আর সেই পিতৃহন্তা কার্ত্তবীর্যাজুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে মারব। ভগবান শিব ব্রাহ্মণ বালকের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে পার্বতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ নীচু করলেন, দারুণ চিন্তায় তার গলা, ঠোঁট ও তালু শুকনো হল। পার্বতী বললেন–ওহে ব্রাহ্মণবংশের তপস্বীবালক, তুমি রাগে জ্ঞানশূন্য ও ক্ষত্রিয়শূন্য করতে চাও পৃথিবীকে, দারুণ সাহস তোমার।

তোমার না আছে শস্ত্র না, অস্ত্র, তুমি তপস্বী, তবুও তুমি সেই রাজা কার্ত্তবীর্যাজুনকে অন্য হাজার হাজার রাজা সমেত বিনাশ করতে চাও। কার্ত্তবীর্যাজুন কেবল ভূভঙ্গী করেই রাজা

রাবণকে হারিয়ে দিয়েছে। দত্তাত্রেয় মুনির কাছে শ্রীহরির দেওয়া বর্ম ও অব্যর্থ শক্তি অস্ত্রলাভ করেছে এবং শক্তির আঘাতে তোমার বাবাকে হারিয়ে দিয়েছে। রাজা হরিমন্ত্র জপ করেন দিনরাত, হরির স্তব ও ধ্যানে নিমগ্ন রয়েছে। পৃথিবীতে এই সেই যোদ্ধা কে যে তাকে হারাবে। তুমি তপস্বী বালক কোন অস্ত্র নেই, কোন ক্ষমতা নেই তোমার। এমন কোন বীরই দেখছি না যে রাজাকে হারাতে পারে। তুমি ঘরে ফিরে যাও, এ ব্যাপারে কি করবেন মহাদেব, আমার অনুচর অন্য সব রাজারা, তাদের ভয় কি আমি থাকতে। ভদ্রকালী বললেন–ওহে বোকা ব্রাহ্মণ বালক! তুই এই পৃথিবীকে কি রাজাশূন্য করতে চাস, বামন হয়ে আকাশের চাঁদকে পেতে চাওয়ার মত অবস্থা, অতএব থাম। শঙ্করের সাহায্যে পরাস্ত করতে চাস আমার ভৃত্যদের, এরা নানারকম যাগযজ্ঞ এবং পুণ্যকর্ম করে। আর এরা মহাবলশালী। পরশুরাম পার্বতী ও ভদ্রকালীর কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে তক্ষুনি মহাদেবের সামনে প্রাণ ত্যাগ করার জন্য উদ্যত হলেন।

দয়ালু শিব ভক্তবৎসল, তিনি ব্রাহ্মণ বালকের কান্না দেখে অত্যন্ত সদয় হলেন। গৌরী ও ভদ্রকালীকে খুব রেগে যেতে দেখে খুব মিষ্টিমধুর কথায় তাদের দুজনের রাগ থামালেন, পরে তাঁদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে পরশুরামকে বলতে লাগলেন –আজ থেকে তুমি আমার পুত্রের মত হলে। এই জগতে সর্বতোভাবে গোপনীয় ও দুষ্প্রাপ্য যে মন্ত্র এবং আশ্চর্য কবচ, তা তোমায় দান করছি। তুমি আমার আশীবাদে অনায়াসে তাকে বধ করতে পারবে, আর পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় শূন্যও করতে পারবে একুশবার।

তোমার অদ্ভুত কাজ দেখে তোমার যশ ছড়িয়ে পড়বে এই জগতে। একথার পর হর এ জগতে দুষ্প্রাপ্য মন্ত্র, আশ্চর্য ত্রৈলোক্যবিজয় কবচ, অদ্ভুত স্রোত্র, পূজার নিয়মকানুন, পুরশ্চরন করার নিয়ম ও মন্ত্র সিদ্ধি করার প্রকরণ সব কিছু নিয়মমত পরশুরামকে শিখিয়ে দিলেন। ভগবান শঙ্কর মন্ত্রসিদ্ধির স্থল ও জায়গা পরশুরামকে নির্দেশ করে দিলেন। তাঁকে পাঠ করালেন চারবেদ ও তার ছয় অঙ্গ। যা অন্য লোকে পায় না এমন মহাদেব তাকে অস্ত্র দিলেন। যেমন নাগপাশ, শিব অস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, আগ্নেয় অস্ত্র, অসাধারণ শক্তিশালী শূল, অন্য নানারকম অস্ত্রশস্ত্র। এ সব অস্ত্র ছোঁড়ার নিয়ম ও মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে এমন এক অক্ষয় ধনু দিলেন যাতে সব বাণ যোজনা করা থাকে। আর শিখিয়ে দিলেন কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে। শেখালেন কিভাবে যুদ্ধে জিততে হয়। নানা মায়া যুদ্ধ, মন্ত্র পড়ে কোথায় হুঙ্কার দিয়ে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের হারিয়ে দিতে হবে, কিভাবে নিজের সৈন্যদের রক্ষা করতে হবে, কিভাবে ধ্বংস করতে হবে। যুদ্ধে বিপদ এলে কি করে যুদ্ধ করতে হবে — সে সকল কৌশল এবং জন্ম-মৃত্যুর ভয় দুরকারী জগৎসংসার মোহকারী নারায়ণী বিদ্যা পরশুরামকে শেখালেন।

পরশুরাম শিবলোকে মহাদেবের কাছে অনেক দিন থেকে তার দেওয়া অস্ত্র, মন্ত্রের নানা কৌশল স্তব, কবচ ও সকল বিদ্যা ভালভাবে শিখে, তীর্থে গিয়ে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে সেই সব অস্ত্রশস্ত্র ও মন্ত্রগুলোকে নমস্কার করে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন।

৩১.

অত্যন্ত অদ্ভুত ক্ষমতাবান ত্রৈলোক্য বিজয় নামের কবচ এবং মহাদেবের বিভূতি যোগ থেকে উৎপন্ন পবিত্র শ্রেষ্ঠ স্তব মহাদেব পরশুরামকে দিয়েছিলেন। স্বয়ংপ্রভা নদীর তীরে রত্ন পাহাড়ের উপত্যকায় পারিজাত গাছের বনের মধ্যে এক আশ্রমে গোলোকপতি কৃষ্ণের সামনে সকল বাঞ্ছা পূরণ কল্পতরু নামে যে বিখ্যাত মন্ত্র তাই মহাদেব পরশুরামকে দিয়েছিলেন। পরশুরামকে তিনি বললেন–ভৃগু বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান আমি তোমাকে পুত্রসম স্নেহ করি। এই কবচ তুমি নাও। পৃথিবীর সকল কবচের মধ্যে এই কবচ হচ্ছে অত্যন্ত আশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন কবচ। এর নাম ত্রৈলোক্যবিজয়। এর উপাস্য দেবতা কৃষ্ণ। এটি পাঠ করলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়।

কৃষ্ণ নিজে এই কবচ গোলোকের বৃন্দাবনে রাধার নিকুঞ্জ বনে রাসমণ্ডলে দিয়েছিলেন, এই তত্ত্ব অত্যন্ত গোপন, সকল মন্ত্রের মূর্তির মত এই কবচ। পবিত্র যত কবচ আছে তাদের মধ্যে সব থেকে পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে এই কবচ। এই কবচ তোমায় দিলাম কারণ তোমায় অত্যন্ত স্নেহ করি সেজন্য। এই কবচ ধারণ করে ও পাঠ করে পার্বতী যিনি মূল প্রকৃতি ও জগতের ঈশ্বরী, তিনি নিশুম্ভ, মহিষাসুর, রক্তবীজ প্রভৃতি অসুরদের নিধন করেছিলেন।

এই কবচ ধারণ করে আমি সকলের তত্ত্ব জানতে পেরেছি ও সংহারকর্তা হয়েছি। যে ত্রিপুরাসুরকে কেউ বধ করতে পারেনি তাকে বধ করেছি। ব্রহ্মাও এই কবচ ধারণ ও পাঠ করে জগতকে সৃষ্টি করতে পেরেছেন। ভগবান অনন্তদেবও পৃথিবীকে ঘিরে রাখতে পেরেছেন। এই কবচ ধারণ করে পৃথিবীর ভার সহজেই বহন করেছে কুর্মাবর্তার। সূর্যদেব তেজস্বী হয়ে ত্রিভুবন আলোকিত করেছেন। দেবী বসুন্ধরা স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি সকল পদার্থ ধারণ করতে পেরেছেন। ধার্মিক শ্রেষ্ঠ সবার ভালো মন্দ কাজের সাক্ষী হয়ে রয়েছেন। এই কবচ ধারণ করে দেবী সরস্বতী সকল বিদ্যার অধিপতি হয়েছেন। অগ্নি তেজস্বী রূপ ধারণ করে পবিত্রভাবে যজ্ঞের ঘি বহন করেছেন। যে মহাত্মা ও কৃষ্ণের ভক্ত, তাকেই এই কবচ দান করবে। প্রবঞ্চক বা অন্যের শিষ্যকে এই কবচ দান করলে সে মারা যাবে। ত্রৈলোক্যবিজয় নামে এই কবচের

ঋষি হলেন প্রজাপতি, ছন্দ গায়ত্রী, কৃষ্ণ এর দেবতা ও ত্রিলোকের বিজয় কামনাতে এর প্রয়োগ।

গোবিন্দ প্রত্যহ বায়ুকোণে আমায় রক্ষা করুন, রসিক শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ আমায় উত্তরে রক্ষা করুন, বলির দর্পচূর্ণকারী অত্যন্ত শক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণ আমায় সর্বদা রক্ষা করুন, আমার উপরের দিক রক্ষা করুন শ্রীকৃষ্ণ। নৃসিংহদেব, হিরণ্যকশিপু হত্যাকারী আমায় জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে রক্ষা করুন। সকল মন্ত্রের মূর্তিস্বরূপ আশ্চর্য ত্রৈলোক্যবিজয় নামক কবচ, শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে আমি শুনেছি। যে এই কবচ পূজো করে গলায় বা ডানহাতে ধারণ করে সে বিষ্ণুর সমান হয়।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী নিজেদের ঝগড়া ভুলে যায়। যেখানে এই কবচ ধারণকারী বাস করে, কোটি বছর কৃষ্ণ পূজায় যে ফল পাওয়া যায়, লোকে সেই ফল পায় এই কবচের ফলে। হাজার হাজার রাজসূয় যজ্ঞ শয়ে শয়ে বাজপেয় যজ্ঞ, লক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞ ও নরমেধ যজ্ঞ, অন্নমেরু প্রভৃতি নানা ধরনের মহাদান ও সসাগরা পৃথিবীকে ঘুরে আসলে যে ফল হয় এই কবচের ষোলো ভাগের একভাগও হতে পারে না।

চান্দ্রায়ণ ব্রত, একাদশীতে উপোস করা, নখ লোম ধারণ করা, বেদ অধ্যয়ন, মহাভারত পাঠ, তপস্যা ও সকল তীর্থে স্নান –কোনকিছুই এই কবচের যোগ্য হবে না। দশলক্ষবার এই কবচ পাঠ করলে সিদ্ধিলাভ হয়। যে সিদ্ধ কবচ ধারণ করবেন, সে সর্বজ্ঞ হবে। স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন লোক এই কবচ না জেনে কৃষ্ণের উপাসনা করে, কোটি কল্প ধরে জপ করলেও তার মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। পরশুরাম এই কবচ কাউকে দেবে না।

৩২.

নারদ এবার শ্রীকৃষ্ণের স্তব, মন্ত্র ও পূজোর নিয়ম জানতে চাইলেন। মহাদেব বললেন– ওঁ শ্রীং নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় পরিপূর্ণতময় স্বাহা’ এই মন্ত্রে গোপীদের ঈশ্বর জগৎপ্রভু কৃষ্ণের উপাসনা কর, সকল মন্ত্রের মধ্যে সতেরো অক্ষরের মন্ত্রই প্রধান। এর নাম মন্ত্ররাজ, পাঁচলক্ষ বার জপ, পঞ্চাশ হাজার বার হোম, পাঁচ হাজার তর্পণ, পাঁচশো বার অভিষেক, পাঁচশো ব্রাহ্মণ ভোজন করালে এই মন্ত্রের পুনশ্চরণ হয়। এর দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধি হয়। এই মন্ত্র যার সিদ্ধ সকল জগৎ সংসার তার হাতের মুঠোয়। সে খেয়ে ফেলতে পারে চার সমুদ্রের জল। সে এ জগত ধ্বংস করতে পারে ও সশরীরে স্বর্গে যেতে পারে। সামবেদ অনুযায়ী জগদীশ্বর কৃষ্ণের ধ্যানের

বিবরণ হল –ঐ ধ্যান দান করে ভক্তি ও মুক্তি। তার গায়ের রং নতুন মেঘের মত। নীল পদ্মের মত তার চোখ দুটো।

এই ধ্যানে সেই কৃষ্ণকে চিন্তা করে ষোলোরকম উপাচার দিয়ে ভক্তিভরে পূজো করলে সর্বজ্ঞ হতে পারে। যে দেবতা অংশের সাহায্যে বিভিন্ন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে চারমুখ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণরূপে জগতের সৃষ্টি করেছেন এবং চারহাত বিশিষ্ট বিষ্ণুরূপে জগতকে পালন করেছেন এবং পাঁচমুখবিশিষ্ট মহাদেব রূপে জগতকে ধ্বংস করেছেন।

যিনি তেজস্বী পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে তেজস্বী, যিনি সকল বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণের মতো, নক্ষত্রদের মধ্যে চাঁদের মত, যে রুদ্র-জ্ঞানী ও বৈষ্ণবদের মধ্যে মহাদেবের মত, সকল ঋতুর মধ্যে যিনি বসন্ত ঋতু, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ মাস এবং তিথির মধ্যে একাদশী তিথি, যিনি জলাশয়ের মধ্যে মহাসাগরের মত, পর্বতের মধ্যে হিমালয় পর্বতের মত, সেই সর্বরূপী নারায়ণকে আমি প্রণাম করি। যিনি সকল পাতার মধ্যে তুলসী পাতার মত, সকল কাঠের মধ্যে যিনি চন্দনকাঠের মত, গাছের মধ্যে যিনি কল্পতরু, সেই নারায়ণকে ভজনা করি। সকল ফুলের মধ্যে তিনি পারিজাত ফুলের মতো, শস্যের মধ্যে ধানের মত, খাদ্যের মধ্যে অমৃতের মত, তাঁকে আমার প্রণাম। সকল হাতির মধ্যে যিনি ঐরাবত, পাখির মধ্যে গরুড়, গরুর মধ্যে কামধেনু, সেই সর্বরূপী নারায়ণকে প্রণাম।

সকল ধাতুর মধ্যে যিনি সোনা, ধনসম্পদের মধ্যে ধান, পশুর মধ্যে সিংহ, সকল জাতির মধ্যে প্রধান, সেই নারায়ণকে প্রণাম, যে সকল শাস্ত্রের মধ্যে বেদস্মৃতি চার বেদস্বরূপ, শাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে সকল শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী এবং পনের অক্ষরের প্রথম অক্ষর অকার –যিনি উপাস্য দেবতাদের মধ্যে প্রধান সেই নারায়ণকে প্রণাম। শ্রেষ্ঠ মন্ত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুমন্ত্র, পৃথিবীর সকল তীর্থের মধ্যে ত্রিলোক উদ্ধারকারী ভাগীরথী গঙ্গা, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে প্রণাম। গরুজাত সকল পদার্থের মধ্যে যিনি দুধের মত, পবিত্র বস্তুর মধ্যে আগুনের জলের মত পুণ্য পদার্থের মধ্যে, সমস্ত ঘাসের মধ্যে কুশের মত, শত্রুর মধ্যে রোগের মত, মানুষের গুণের মধ্যে শান্তি গুণের মত, সেই নারায়ণকে প্রণাম।

দেবতা চারজন যাঁকে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন না, জ্ঞানীরা যাঁর স্তব করতে অপারগ, চার বেদ যাঁর স্তুতি করতে পারে না, বাগদেবী সরস্বতী যাঁর স্তব করতে গিয়ে নীরব হয়ে গেছেন, বাক্য ও মন যাঁর যথার্থ নিরূপণ করতে পারে না, তার স্তব কে করতে পারবে?

জ্যোতিঃস্বরূপ, সেই মেঘবরণ শ্রীকৃষ্ণকে আমার প্রণাম। দুই হাত বিশিষ্ট মুরলী বাদক, আনন্দময় কিশোর কৃষ্ণ ও সদা হাস্যময় হরিকে প্রণাম। যিনি কখনও শতশৃঙ্গ পাহাড়, কখনও গোলোকধামে, কখনও রত্ন পাহাড়ের কাছে এবং কখনও বিরজা নদীর তীরে অবস্থান করেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে প্রণাম। যিনি পরিপূর্ণতম ও শান্তিগুণের আধার, অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ রাধার প্রিয়তম। এ জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন সত্যরূপে। তিনি ব্রহ্মা থেকে অভিন্ন সেই কৃষ্ণকে প্রণাম, যে স্তব করে সে সিদ্ধি পায়। সব রকম শান্তি গুণ লাভ করে, মহাদেব বললেন– বাছা পরশুরাম! এবার তুমি পুষ্করতীর্থে গিয়ে মন্ত্রসিদ্ধি কর, তারপর তুমি মনের মতো বর পাবে।

৩৩.

শিব ও তার অনুচর দুজনকে প্রণাম করে মহানন্দে পুষ্কর তীর্থে গিয়ে মন্ত্রসিদ্ধি করলেন ভৃগু বংশের বংশধর পরশুরাম। ভক্তিভরে ধ্যান করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের পাদুটো একমাস উপোস করে বায়ুশুদ্ধি করলেন, তারপর চোখ মেললেন ও এক রত্নময় রথ দেখতে পেলেন। শ্রীহরি তাকে প্রার্থনা অনুসারে মনের মতো বর দিয়ে-অদৃশ্য হলেন। এরপর পরশুরাম বাড়ী ফিরে এসে সকলকে সমস্ত ঘটনা বলার পর তাদের সঙ্গে নানা শলাপরামর্শ করে যুদ্ধে যাবার এক ভালো সময় দেখে শিষ্য ও ভাইদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি জয়ের শুভ শব্দ শুনতে পেলেন। দৈববাণী হল –"ভৃগুকুমার তোমার জয় হবে। যেতে যেতে দেখতে পেলেন মৃতদেহ, শিয়াল, জলভরা কলস, ময়ূর, হাতী, গন্ডার, চাতক, বক, মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ, প্রবাল, দই, খই, সাদা ধান, নতুন পাতা, আয়না, বাছুর সমেত গরু, চিনি, মধু, এসব শুভ জিনিস ডানদিকে দেখলেন।

আর শুনতে পেলেন ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ। সূর্যাস্তের পর নর্মদানদীর তীরে গেলেন, সেখানে সৈন্যদের সাথে রাত কাটালেন। গাছের গোড়ায় পরশুরামকে তার দাসেরা সেবা করল এবং তিনি ফুলের শয্যায় শুলেন। শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নের মধ্যে দেখলেন মন্দিরের মধ্যে বসে ব্রাহ্মণ শিবের মূর্তি ও কৃষ্ণ মূর্তি পূজো করছেন এবং তোমার জয় হোক' এরকম আশীর্বাদ করছেন। দেখলেন পায়রা, শুকপাখী, চখাপাখী, বাঘ, সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছে সামনে। স্বপ্ন দেখার পর ভোর হয়েছে বুঝে হরিনাম স্মরণ করতে করতে জেগে উঠলেন। ভালস্বপ্ন দেখছেন বলে পরশুরাম মনের আনন্দে প্রাতঃকৃত্য সেরে মনে মনে ভাবলেন তিনি নিশ্চয় শত্রুদের হারাতে পারবেন।

৩৪.

তিনি এর পর রাজার কাছে দূত পাঠালেন। দূত রাজসভায় ঢুকে রাজাকে বলতে লাগল– নর্মদা নদীর তীরে অক্ষয় বটগাছের নীচে পরশুরাম তাঁর ভাই ও বন্ধুদের নিয়ে উপস্থিত। আপনিও সেখানে পৌঁছে তার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয় শূন্য করার প্রতিজ্ঞা করেছেন পরশুরাম। রাজা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী মনোরমা তাঁকে বারণ করতে লাগলেন। রাজা স্ত্রীকে বললেন–আমি ভীত, কারণ এক দারুণ খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। আমি স্বপ্নে দেখেছি তেলমাখা শরীরে জবাফুলের মালা পড়ে সারা শরীরে রক্তচন্দন মেখে লাল কাপড় পরিধান করে, লোহার অলংকার পরে নেভানো কয়লা দিয়ে খেলা করতে করতে হাসিমুখে গাধার পিঠের ওপর চড়ে বসেছি।

এ পৃথিবী জবাফুলের মালায় ঢাকা পরে ছাই চাপা পড়েছে, আকাশে চাঁদ, সূর্য নেই। এক বিধবা নারী পরনে লাল কাপড়, নাক কাটা গেছে, আলুথালু বেশে নাচ করছে, আর শ্মশানে চিতায় মরা আছে কিন্তু আগুন নেই। আবার দেখলেন ভস্ম বৃষ্টি হচ্ছে, রক্তবৃষ্টি হচ্ছে, অঙ্গারবৃষ্টি হচ্ছে। নিজের হাত থেকে ভরা কলস পড়ামাত্র ভেঙ্গে গেল। আকাশ থেকে চাঁদ খসে পড়ছে। সূর্য খসে পড়ছে। উল্কাপাত হচ্ছে। চাঁদ ও সূর্যের গ্রহণ হচ্ছে। আবার দেখলাম এক ভয়ঙ্কর উলঙ্গ পুরুষ মুখ হাঁ করে আমার সামনে আসছে।

কাপড় ও অলঙ্কারে সেজে বারো বছরের এক মেয়ে বেগে আমার ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আবার ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী গুরুজন সবাই মিলে অভিশাপ দিচ্ছে, ঘরের ভিটাতে অদ্ভুত রকমের পুতুলরা মনের আনন্দে নাচছে। শকুন, কাক ও মহিষরা অধীর হয়ে একে অন্যকে আঘাত করছে। ঘরে ঘরে শিয়াল কুকুর কাঁদছে। রাজার কথা শুনে মনোরমা কাঁদতে কাঁদতে ধরা গলায় রাজাকে বললেন– পরশুরাম মহাদেবের অংশে জন্মেছে ও অত্যন্ত শক্তিশালী। রাজা আপনি কি দত্তাত্রেয় মুনির দেওয়া উপদেশ ভুলে গেছেন? ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের দাস, বৈশ্যরা ক্ষত্রিয়দের দাস, আর ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেদের দাস হল শূদ্রজাতি। ব্রাহ্মণরা সন্তুষ্ট হলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন।

পতিব্রতা নারীর কাছে তাদের স্বামীর প্রতি স্নেহ ছেলের থেকেও একশো গুণ বেশি হয়। রাজা তখন রানিকে বললেন–মহাকাল ভীতু লোকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ জগতে সকল স্থাবর পদার্থ পাহাড় পর্বত স্থির ভাবে দার্ডান, আর চলমান পদার্থ বায়ু ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অকীর্তি লাভ করা থেকে মৃত্যুবরণ অনেক ভাল জানবে। বাজনাদারদের বাজনা বাজাতে বললেন, ও যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে যে সকল শুভ কাজ তা করতে শুরু করলেন। রাজা নিজে যুদ্ধের জন্য বর্ম পরে ধনুক হাতে নিয়ে যুদ্ধে যাচ্ছেন–এ

দেখে মনোরমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর নিজের স্বামীকে যুদ্ধ থেকে ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে শোবার ঘরে ঢুকে কার্তবীর্যকে কিছুক্ষণ বুকে ধরে তার মুখ দেখতে দেখতে বারবার চুমো খেতে লাগলেন।

৩৫.

মনোরমা নিজের ছেলেদের আত্মীয় স্বজন ও চাকরবাকরদের সামনে আনিয়ে হরির চরণকমল স্মরণ ও সংসারকে সারশূন্য করে যোগক্রিয়া অবলম্বন করে নিজের শরীরে ছয় চক্রভেদ করলেন। রাজা স্ত্রীকে মারা যেতে দেখে শোকে যুদ্ধের পোশাক খুলে তাকে বুকে ধরে বললেন– ওঠো প্রিয়া, আমি যুদ্ধে যাবো না। সুন্দরী চলো আমরা মলয় পর্বতে যাই। রাজার কান্না দেখে দৈববাণী হল–মনোরমা লক্ষ্মীর অংশ, তাই তিনি আবার লক্ষীতে বিলীন হয়েছেন। পরে মনের দুঃখে রাজা যুদ্ধে গেলেন।

পরশুরামের ভাইয়েরা তাঁর আদেশে ধারালো সব অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করলেন। তখন মঙ্গলময় অত্যন্ত শক্তিমান মৎস্যরাজও যুদ্ধ শুরু করলেন ও তাদের বাধা দিতে লাগলেন। রাজার গলায় দুর্বাসা মুনির দেওয়া দিব্যশিবকবচ যা না খুললে তাঁকে বধ করা যাবে না।

নারায়ণ এবার এই কবচ সম্বন্ধে বলবেন বললেন। অক্ষয় জয় মন্ত্র সমেত এই কবচ মৎস্যরাজকে দুর্বাসা মুনি দিয়েছিলেন। এই কবচ ধাবণ করে দুর্বাসা মুনি জগৎ শ্রেষ্ঠ ও পুজ্য হয়েছেন। এই অদ্ভুত কবচ তোমায় দিলাম, দশলক্ষ বার এই কবচ জপ করলে নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ হবে। আর যার এই কবচ সিদ্ধ, সে শিবের সমান হয়, তোমার প্রতি স্নেহ বশতঃ এই কবচ দিলাম। এই কবচের গূঢ় রহস্য না জেনে কোটিবার শিব মন্ত্র জপ করলেও সিদ্ধি হয় না।

৩৬.

পরশুরামের ভাইয়েরা ভয়ঙ্কর ধারালো অস্ত্র দিয়ে রাজার অক্ষৌহিনী সেনাদের আক্রমণ করলেন। পরশুরাম তিন দিন যুদ্ধ করে কুড়াল দিয়ে অক্ষৌহিনী সেনা ধ্বংস করলেন। মহারথী ভার্গব শিবের শূল দিয়ে লক্ষ রাজাকে হত্যা করলেন। কুড়াল দিয়ে বারো অক্ষৌহিনী সেনাকে ধ্বংস করলেন। যে লোক সংযমের সাথে পরশুরামের করা কালীর স্তব পাঠ করে, সে অনায়াসে ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে ও ত্রিলোকে পূজা পায়।

৩৭.

রাজা দশলক্ষ বার জপ করে মন্ত্র সিদ্ধ ও পাঁচ লক্ষবার জপ করে ঐ কবচ সিদ্ধ করলেন। সিদ্ধ কবচ নিয়ে অযোধ্যায় এলেন ও কবচের গুণে সবকিছু পৃথিবীর অধিকার করেন। পূবদিকে মহাকালী, অগ্নিকোণে রক্ত দণ্ডিকা, দক্ষিণে চামুন্ডা ও নৈঋত কোণে কালিকা পশ্চিমে শ্যামা, বায়ু কোণে চন্ডিকা, উত্তরে বিকটাস্য ও ঈশাণ কোণে অট্টহাসিনী আমায় রক্ষা করুন। এই কবচ থেকেই লোমশ ও প্রচেতা সিদ্ধ হয়েছিলেন। এই কবচ থেকেই সৌভরি ও পিপুলামন যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন। যে এই কবচের সিদ্ধ হবে, তার সব বিষয়ে সিদ্ধি হবে। সকল রকম মহাদান, তপস্যা ও ব্রত এই কবচের ষোলো ভাগের এক ভাগও না।

৩৮.

পরশুরামের ভাইরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। রাজা পুষ্কর তাঁদের বাণে আচ্ছন্ন করে ফেললেন। পরশুরাম পুষ্করকে বধ করার জন্য রাগের সঙ্গে কুড়াল ছুঁড়ে মারলেন। নারায়ণ এবার পরশুরামকে বললেন, যে পুষ্করাক্ষর-এর গলায় আছে মহালক্ষ্মী কবচ। আর তার ছেলের ডানহাতে আছে দূর্গার কবচ যার গুণেই বাবা ও ছেলে বিশ্বজয় করতে পারবে। বিষ্ণু ব্রহ্মাকে এই কবচ দিয়েছিলেন, ব্রহ্মা এই কবচ পেয়ে বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এই কাজের গুণে, দক্ষ প্রজাপতি হয়েছেন ধর্ম হয়েছেন, কর্মের সাক্ষী ও রক্ষাকর্তা, কশ্যপ এই কবচ ধারণ করে সেই ঐশ্বর্য যুক্ত হয়।

৩৯.

নারদ এবার দুর্গার কবচের কথা জানতে চাইলেন। এই কবচ গোলোকে ব্রহ্মাকে কৃষ্ণ দিয়েছিলেন। মহাদেব গৌতমকে, গৌতম পদ্মাকে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মা ঐ কবচ ধারণ ও পাঠ করে জ্ঞানী ও শক্তিমান হয়েছেন। এই কবচে ঋষি, প্রজাপতি, ছন্দ, গায়ত্রী, দেবী দুর্গা এই ব্রহ্মাণ্ডবিজয়তেই এই কবচের যথার্থ প্রয়োগ। যে লোক কাপড়, অলংকার ও চন্দন দিয়ে গুরুকে নিয়মিত পূজো করে গলায় বা ডানহাতে এই কবচ ধারণ করে সে সকল যজ্ঞে ও তীর্থে স্নানের ফল লাভ করে। অত্যন্ত গোপনীয় ও দুর্বল এই কবচ কাউকে দেবে না।

৪০.

রাজা পুষ্করা ও তার ছেলে কবচ ছাড়াই এক সপ্তাহ ধরে যুদ্ধ করার পর পরশুরামের ছোঁড়া ব্রহ্মাস্ত্রে মারা পড়লেন। পুষ্করাক্ষকে মারা যেতে দেখে মহাবীর কার্তবীর্য দুইলক্ষ অক্ষৌহিনী সৈন্য নিয়ে শ্রেষ্ঠ রত্ন ও সোনার রথে চড়ে নিজে যুদ্ধে এলেন ও চারিদিকে বাণ ছুঁড়তে

লাগলেন। রাজা কার্তবীর্য বরুণ অস্ত্র ছুঁড়লে পরশুরাম নাগাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। রাজা ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের স্তব করলেন। ভক্তবৎসল ভগবান ব্রহ্মা দত্তাত্রেয় শিষ্য রাজাকে রক্ষার জন্য সেখানে এলেন। তাঁকে দেখে পরশুরাম পাশুপত অস্ত্র ছুঁড়ে মারলেন। এমন সময় দৈববাণী হল যে-’দত্তাত্রেয়ের দেওয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কবচ শ্রেষ্ঠ রত্নগুটিকার মধ্যে করে রাজার ডান হাতে বাধা আছে।

মহাদেব ব্রাহ্মণদের রূপ ধরে ভিক্ষা করে ঐ কবচ চেয়ে এনে পরশুরামকে দিলেন। রাজা বললেন–মনোরমা ছিলেন তাঁর সতী সাধ্বী স্ত্রী, লক্ষীর অংশে তাঁর জন্ম। তাঁর প্রাণের সমান ছিলেন। তিনি ছিলেন যজ্ঞের ব্যাপারে পত্নী, স্নেহের ব্যাপারে মায়ের মত আর ক্রীড়ার ব্যাপারে সহচরী। তাঁকে ছাড়া এখন তিনি নির্বিষ সাপের মত প্রাণহীন হয়েছেন। আমার প্রথম, দ্বিতীয় ও শেষ দুঃখ ব্রাহ্মণের হাতে আমি মারা পড়লাম। এমন সময়ও আসে যখন সিংহ শিয়ালকে, শিয়াল সিংহকে, হরিণ বাঘ ও হাতাঁকে মাছি, মহিষকে ও সাপ গরুড়কে বধ করতে পারে। কোন সময় আবার কৃষ্ণ দেহে লীন হন প্রকৃতি দেবীও, কালে লয় প্রাপ্ত সকল কিছুই হয়। কিন্তু কালকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না।

কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণই কালের কাল, স্রষ্টারও স্রষ্টা, সংহারকেরও সংহর্ত্তা, পালকেরও পালক, মহান থেকেও মহান, স্কুল থেকেও স্থূলতম ও সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্মতম। তিনিই কালকে ভাগ করেন। তার প্রত্যেক লোমেই এক বিশ্বসংসার সৃষ্ট হয়, সেই বিরাট মহাপুরুষ কৃষ্ণের ষোলো ভাগের এক ভাগ হলো একটি পৃথিবী। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নিজে তার নাভিপদ্ম থেকে উৎপন্ন হয়ে ঐ নাভিপদ্মের দণ্ডের লক্ষ বছর ঘুরে শেষ খুঁজতে না পেয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেছেন। সেখানে লক্ষ বছর বায়ু খেয়ে তপস্যা করছেন। সৃষ্টি ধ্বংসকারী শিব ঐ স্রষ্টার কপাল থেকে উৎপন্ন হয়েছেন।

এই সৃষ্টির কারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত হয়ে সকল বিশ্বেই অবস্থান করছেন। দেবতারা সকলে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন। মহাবিরাটও উৎপন্ন প্রকৃতি থেকে। আদ্যা প্রকৃতি থেকেই সবাই উৎপন্ন হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণই প্রকৃতির অতীত, কুমোর যেমন মাটি ছাড়া ঘট, স্বর্ণকার যেমন সোনা ছাড়া কুন্তল তৈরী করতে পারে না, তেমন প্রকৃতি ছাড়াও সৃষ্টি হয় না।

সৃষ্টির সময় ঐ প্রকৃতি শক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে রাধা, লক্ষ্মী, সাবিত্রি, সরস্বতী ও দুর্গা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হন, যিনি মঙ্গলময় ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও পরমানন্দ রূপিণী তিনিই

লক্ষ্মী। যিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী যাকে পাওয়া পরমেশ্বরের পক্ষেও দুষ্কর, যিনি বেদ ও যোগশাস্ত্রে জননী তিনিই সাবিত্রী, নারীরা প্রকৃতির ও পুরুষেরা পুরুষের অংশজাত, সৃষ্টির সময় মায়া ছাড়া সংসার হয়নি। প্রত্যেক বিশ্বেই সবসময় ব্রহ্মা থেকেই সৃষ্টি হয়। বিষ্ণু তা পালন করেন ও মঙ্গলময় শিব তার ধ্বংসকর্তা। কার্তবীর্য এই কথা বলে পরশুরামকে নমস্কার করে তীর ধনুক নিয়ে হাসিমুখে রথে চড়লেন।

সারা জগতে পরশুরামের পুণ্যকীর্তি ছড়িয়ে পড়ল। সবাই পরশুরামকে শুয়ে পড়ে প্রণাম করলেন। তখন ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সবাই 'বাছা' বলে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। কান্তশাখায় যে সর্বসম্মত ও সম্পৎদায়ক সত্য কথা বলা হয়েছে তা বলছি। জন্মদান ও প্রতিপালন করার জন্য তাকে সকল পূজ্য ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ জনক ও পিতা বলা হয়। ইষ্টদেবতা রেগে গেলে গুরুদেব রক্ষা করেন, গুরুদেব রেগে গেলে কেউ রক্ষা করেনা। গুরুই হরিভক্তি দান করেন। আর যিনি হরিভক্তি দান করেন তার থেকে প্রিয় কে হতে পারে? যে লোক গুরুকে দরিদ্র, পতিত বা ক্ষুদ্র দেখে তার সঙ্গে মানুষের মত আচরণ করে, সে তীর্থে স্নান করলেও–অশুচি থাকে কোনও কাজে তার অধিকার থাকে না। প্রকৃতিদেবী লক্ষবার তপস্যা করার পর তার মনে সে কমনীয় ঈশ্বরকে প্রিয়পতি হিসাবে লাভ করেছেন। সেই দেহ শিবের শরণাগত হয়। কমলযোনি ব্রহ্মা একথা বলে মুনিদের সঙ্গে চলে গেলেন।

৪১.

হরির কবচ নিয়ে পরশুরাম পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করে গুরু মহাদেব ও গুরুপত্নী মাতা শিবাকে নমস্কার করে ও গুরুপুত্র কার্তিক, গণেশকে দেখার জন্য কৈলাসে গেলেন। এই দুই পুত্র গুণে নারায়ণের সমান। পরশুরাম সেখানে গিয়ে এক খুব সুন্দর শহর দেখতে পেলেন। শহরের কপাটগুলি মণি দিয়ে, সিঁড়ি গুলি মণি দিয়ে তৈরী, সেখানে দিব্য শতকোটি যক্ষভবন, ঐ সকল ঘরে রত্ন, সোনা, দিব্যসোনার কলসে ভর্তি। সেখানে যক্ষরা শ্বেতচামর হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে, সুন্দরীরা রত্নালংকারে সেজে, ছেলেমেয়েরা খেলার পুতুল নিয়ে সবসময় খেলা করছে। মন্দাকিনীর কূল পারিজাত গাছ ও ফুলের গন্ধে আমোদিত এই শহর। পুণ্যবান সিদ্ধরা কামধেনু ধন্য কল্পতরুর নীচে রয়েছেন। এই বনে রয়েছে অসংখ্য ডালপালা সমেত অক্ষয় বটগাছ যা তিনলক্ষ যোজন উঁচু, চওড়াও একশো যোজন। একশো কঁধওয়ালা পাখিরা সেখানে রয়েছে, খুব সুন্দর সুন্দর শব্দ হচ্ছে সেখানে, কখনও বা কাঁপছে, অসংখ্য ফল ধরে রয়েছে, সুগন্ধি বায়ু, হাজার ফুলের বাগান, একশো সরোবর ও লক্ষ মুনিদের সিদ্ধ শ্রেষ্ঠদের সেখানে রত্নের বাড়ি রয়েছে।

ঐ নগর দেখে পরশুরাম খুশী হলেন ও সামনে মহাদেবের আশ্রমও লক্ষ্য করলেন। ঐ আশ্রম বিশ্বকর্মা একশো পুরু সোনার রঙের রত্ন দিয়ে বানিয়েছেন। এর চওড়া চার যোজন, উচ্চতা পঞ্চাশ যোজন ও চারিদিক সমান। এর দেওয়াল সুন্দর ও চার কোণওয়ালা, নানা ছবি সমেত এর দরজা রত্ন দিয়ে তৈরি। দরজার দক্ষিণ দিকে ষাঁড়কে, বাঁয়ে সিংহকে ও নন্দীশ্বর কটা চোখ ভয়ঙ্কর মহাকালকে ও বিশালাক্ষ, বাণ, বিরুপাক্ষ, মহাবল, বিকটাক্ষ, ভাস্করাক্ষ, রক্তাক্ষ, বিকটোদর, সংহার ভৈরব, ভয়ঙ্কর, কাল ভৈরব, রুদ্র ভৈরব, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল, দানব, যোগীন্দ্র, জটাধারদের বিদ্যাধরদের ও কিন্নরদের দেখলেন। পরশুরাম তাদের সাথে কথা বলে নন্দিকেশ্বরের আদেশে মনের আনন্দে ভেতরে ঢুকে অমূল্য রত্ন তৈরি কলস, হীরের তৈরি কপাট, গোরোচনা যুক্ত, মনিময় হাজার স্তম্ভ, খনিখচিত সিঁড়ি দেখলেন। তার পাশে কার্তিক, ডানে গণেশ, আর প্রধান পার্ষদ ক্ষেত্রপালকে। রত্নালংকারে সজ্জিত অবস্থায় রত্ন সিংহাসনে বসে থাকতে দেখলেন।

পরশুরাম বললেন– হে ভাই, আমি ঈশ্বরকে প্রণাম করতে যাচ্ছি। তারপর মাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যাব। যার দয়ায় আমি পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেছি একুশবার। বধ করেছি কার্তবীর্য ও সুচন্দ্রকে। তার কাছে নানা বিদ্যা ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেছি। তিনি ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য দেহ ধারণ করেন, তিনি সত্য, সত্যস্বরূপা সনাতন ব্রহ্মজ্যোতি: ইচ্ছাধীন, দয়ার সাগর, দীনবন্ধু, মুনিদের ঈশ্বর। শিবের প্রশস্তি গেয়ে পরশুরাম গণেশের সামনে দাঁড়ালেন। তখন গণেশ মিষ্টি কথায় বললেন–হে ভাই, একটু অপেক্ষা কর। স্ত্রীর সঙ্গে নির্জনে আছে এমন কোন পুরুষকে দেখবে না।

জিতক্রোধ শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ গণেশ পরশুরামের কথা শুনে হেসে বললেন–যে লোকের জ্ঞান নেই, সে জ্ঞানীর কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে থাকে। যখন সত্ত্বগুণ ও তমোগুণের অতীত ঈশ্বর সংসার সৃষ্টি করতে চান না তখন তিনি শক্তিশূন্য হন, কিন্তু সেই নির্গুণ পুরুষ যখন সৃষ্টি করতে চান তখন তিনি শক্তি সম্পন্ন সগুণ হন। ভোগের উপযুক্ত যত দেহ আছে, কৃষ্ণের শরীর ছাড়া সবই প্রকৃতি থেকে। উৎপন্ন। যখন যোগিরা ঐ জ্যোতির্ময় বিভুর জ্যোতির মধ্যে দুই হাত বিশিষ্ট বংশীবদনরত হাসিমুখ পীতবস্ত্রধারী শ্রীকৃষ্ণকে অমূল্য রত্ন সহকারে সজ্জিত অবস্থায় দেখেন, তখন তাঁরা তাঁর ইচ্ছায় দাসে পরিণত হয়। তাই যোগ বা তপস্যা হরির দাসত্বের ষোলোভাগের এক ভাগেরও সমান হতে পারে না। যখন তিনি সৃষ্টি করতে চান, তখন তিনি আনন্দে প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন। পরে প্রকৃতির গর্ভে বীর্যাধান করেন।

শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে যে বিন্দু বেরিয়ে আসে, তা থেকে হরির সামনে হঠাৎ জলরাশির সৃষ্টি হয়। সেই জলে প্রকৃতির বীর্যের ডিম থেকে সহসা বিশ্বের আধার মহা বিরাটের আবির্ভাব হয়। তার গায়ে যত লোম আছে, তত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, ভগবান বায়ু, শ্রীহরির নিঃশ্বাস বায়ু থেকে উৎপন্ন মহাবিষ্ণুও তাঁর অংশ, তার থেকেই ক্ষুদ্র বিরাট হয়েছেন, তার নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা ও কপাল থেকে মহাদেবের আবির্ভাব ঘটেছে। সকল শক্তির আধার দুর্গা স্বভাবত পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছেন।

রাধা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতী এই পাঁচ প্রকার কৃষ্ণের প্রকৃতি। যিনি জ্ঞান প্রসূ, সকল শক্তিযুদ্ধ ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনিই দেবী দূর্গা, মহাদেবের প্রেয়সী। দেবতারা তার থেকে জন্মেছেন, মহাবিরাট তার ষোলো ভাগের এক ভাগমাত্র। তার থেকেই স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি সকল বিশ্ব উৎপন্ন হয়ে আবার তার মধ্যেই মিলে যায়। গোলোকধামে ঐ বৈকুণ্ঠে পঞ্চাশটি যোজন ঊর্ধ্বে, আর কোন লোক নেই তার ওপরে। কৃষ্ণ থেকে শ্রেষ্ঠ প্রভুও আর কেউ নেই। মহাদেব এখন সুরত কাজে উন্মুখ হয়ে আছেন।

৪৩.

নারায়ণ বলতে শুরু করলেন। গণেশের কথা শুনে নির্ভয়ে তাড়াতাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। পরশুরাম। গণেশ উঠে তাঁকে বিনয়ের সাথে বারণ করলেন, তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি হতে শুরু হল। পরশুরাম তাকে ফিরিয়ে দিলেন। পরশুরাম কুড়াল ছুঁড়ে মারতে উদ্যত হলে গণেশ তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, কেন তিনি গুরু সমান গুরুপুত্রকে বধ করার কথা ভাবছেন। পরশুরামের চোখে রাগ উদ্যত হয়ে উঠল। গণেশ তাঁকে কুড়ল ছুঁড়তে বাধা দিলে তিনি আবার গণেশকে লক্ষ্য করে কুড়ল ছুঁড়ে ফেললেন। গণেশ শান্তভাবে তাকে বারবার বোঝাতে লাগলেন। গণেশ বললেন, আপনি অতিথি, আমার ভাই ও ঈশ্বরের প্রিয় শিষ্য, তাই আমি সব সহ্য করছি। আপনি জানেন আমি বিশ্বম্ভরের পুত্র, আমি একটু বাদে আপনার সাথে ঈশ্বরের কাছে যাব। পরশুরাম তখন মহাদেব ও হরির উদ্দেশে কুড়াল ছুঁড়ে মারতে উদ্যত হলেন। তখন গণেশ আপন শুড়কে বড় করে একশো পাকে বেঁধে ফেললেন পরশুরামকে। তারপর উঁচুতে তুলে অল্প ক্ষণের মধ্যে সাতদ্বীপ, সাতসাগর, সাতপাহাড় ও সোনার নগর দেখালেন, গণেশ পরশুরামকে ক্রমশ ভূর্লোক, ভবলোক, স্বলোক, জনলোক, তপোলোক, ধ্রুবলোক, গৌরীলোক ও শঙ্কুলোক দেখালেন। ও নিজে সাত সাগরের জল খেয়ে ফেললেন।

সেই জল আবার জলচর প্রাণী সমেত উগরিয়ে ফেললেন ও সেই জলে পরশুরামকে ছুঁড়ে ফেললেন। পরে তাঁকে গোলোকধামে বিরজা নদী, বৃন্দাবন, শতশৃঙ্গ পাহাড়, রাসমণ্ডল ও গোপ গোপীদের সঙ্গে দুহাত বিশিষ্ট বংশীধারী শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে দেখালেন। পরশুরামকে বারবার ঘুরিয়ে তাঁর গর্ভ হত্যা প্রভৃতি সকল পাপ দূর করলেন। পাপের নাশ হয় না ভোগ ছাড়া। কিছুক্ষণ পরে পরশুরামের জ্ঞান ফিরল ও তার গণেশের করা স্তম্ভ দূর হল। পরশুরাম এরপর জগতগুরু মহাদেবকে স্মরণ করলেন ও তেজে মহাদেবের সমান ও গ্রীষ্মের দুপুরের সূর্য থেকেও একশো গুণ তেজস্বী বা অব্যর্থ পরজ অস্ত্র ছুঁড়ে মারলেন। গণেশ ঐ অস্ত্র বাঁ হাত দিয়ে নিলেন, বাবার দেওয়া বলে। গণেশ রক্তাক্ত দাঁত নিয়ে ঈষৎ লাল স্ফটিক পাহাড়ের মত শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাতে হর ও পার্বতীর ঘুম ভেঙে গেল। তখন দুজনেই গণেশকে দেখতে পেলেন। পার্বতী সব শুনে রাগে মহাদেবকে ডাকলেন।

৪৪.

পার্বতী বললেন, দুর্গা আপনার দাসী। ঘাস থেকে পাহাড় সবই ঈশ্বরের কাছে সমান। তাই আপনি বিচার করুন গণেশ না শিষ্য পরশুরাম কে দোষী। হরকে বললেন–যে, তিনি দুজনের দোষগুণ বুঝতে পারছেন। কিন্তু তাঁর স্পর্ধা নেই বিচার করার। সদবংশজাত পতিব্রতা নারীর কাছে স্বামীই হলেন শত পুত্রেরও বেশি। যে বাবা মায়ের দোষেই স্বামীকে অবহেলা করে সে দুশ্চরিত্রা ও অজ্ঞান। সদ্বংশজাত নারী স্বামী যেমনই হোক তাকে বিষ্ণুর মত মনে করে। সকুলের মেয়েদের কাছে বাবা, ছেলে, বন্ধু কেউ স্বামীর সমান নয়। এই কথা বলে পরশুরাম দুর্গা দেখলেন মহাদেবের পদসেবা করছেন। দুর্গা জানতে চাইলেন, তিনি এত সদবংশজাত হয়েও কি করে এমন উদ্ধত হলেন। তিনি বললেন–যে সে গণেশকে হারিয়ে তাদের সামনে রয়েছে, সেজন্য কল্যাণযুক্ত হয়ে ত্রিলোকে পুজো পাবেনা। অনেক কষ্টে দেবী গণেশকে পেয়েছেন তাই তিনি পরশুরামকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। পরশুরাম তখন কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। দেবী এক ব্রাহ্মণ বালককে দেখলেন, যাঁর তেজ কোটি সূর্যের মত। তার সাদা দাঁত, সাদা কাপড় ও পৈতা, তিনি হাসছেন বিভিন্ন রত্নে সজ্জিত হয়ে। তাঁর পায়ে নূপুর, মাথায় রত্ন মুকুট, গলায় কুণ্ডল। তাকে দেখে মহাদেব ছেলে ও চাকরদের সঙ্গে তাকে প্রণাম করলেন। ষোলো উপাচার দিয়ে মহাদেব তাঁকে পূজা করলেন। বললেন, হে ব্রহ্মা, আজ আমার জীবন

সফল ও সার্থক হল। তিনি পরিপূর্ণ কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ, লোককে উদ্ধারের জন্যই এই পূণ্যক্ষেত্র ভারতে অংশরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। অতিথিকে যে পুজো করে তার প্রতি ভগবান হরি সবসময় সন্তুষ্ট থাকেন। সকল তপস্যা ও প্রতিদিন নানা কাজ করার জন্য যে ফল হয় –তা ঐ অতিথি সেবার ফলের বোল ভাগের এক ভাগও না। যে ব্রাহ্মণ স্ত্রী হত্যা, গোহত্যা, ভ্রূণহত্যা করে, বা গুরুপত্নীতে গমন করে বা গুরুজনকে নিন্দা করে বা নরহত্যা করে, সন্ধ্যা জপ করেনা, অশ্বথ গাছ কাটে, সত্যকথা বলে না, হরিকে নিন্দা করে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, বন্ধুর অপকার করে, যে ব্রাহ্মণ বৃষকে বয়ে নিয়ে যায়, গ্রামে পুজো করে না, শূদ্র নারীর কাছে যায় বা শূদ্রের অন্ন বা শ্রাদ্ধের অন্ন খায়, কি শূদ্রের শ্রাদ্ধেই খায় বা কন্যাকে বিক্রি করে বা হরিনাম বিক্রি করে বা লাক্ষা, মাংস লোহা, রস, তিল ও লবণ এবং গরু, ঘোড়া বিক্রি করে কিম্বা যে ব্রাহ্মণ একাদশীর দিন কৃষ্ণ সেবা না করে, তাদের সবাই নিন্দা করে ও এরা মহাপাতকী হয়। এদের কালসূত্র নরকে থাকতে হয় ব্রহ্মার একশো বছর পর্যন্ত। মহাদেবের কথা শুনে জগৎপতি হরি সন্তুষ্ট হয়ে মেঘের মত গম্ভীর স্বরে বললেন–হে মহাদেব, আমি তোমাদের গন্ডগোল শুনে কৃষ্ণভক্ত পরশুরামকে রক্ষার জন্য শ্বেতদ্বীপ থেকে এখানে এসেছি। কখনও এরকম কৃষ্ণভক্তদের অমঙ্গল হয় না। যখন তার ওপর রেগে যান গুরুদেব কিন্তু তাকে রক্ষা করতে পারি না।

সকল পাপের থেকেও ভয়ানক গুরুর অপমান, যে তোক গুরুর সেবা না করে, তার মতো পাপী আর নেই। মানুষ জগৎ দেখে জন্মদাতার কল্যাণে তাই জনক সব থেকে বেশি মাননীয় ও পূজনীয়। তিনি জগৎকে জন্ম দেওয়ার জনক। যে বোকা বিদ্যা বা ধনের অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে গুরুকে ভজনা না করে, তার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। গুরু দরিদ্র, পতিত বা যত ছোট হোন না কেন যে তার সঙ্গে মানুষের মত আচরণ করে–সকল তীর্থে স্নান করলেও কাজে তার অধিকার হয় না, সে মহাপাপী, যে সক্ষম হয়েও ছলনা করে বাবা, মা স্ত্রী, গুরু ও গুরুপত্নীকে ভরণ পোষণ না করে। গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই শিব, গুরুই পরব্রহ্ম। তিনি সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ও অগ্নিস্বরূপ তিনিই স্বয়ং সর্বরূপ ভগবান পরমাত্মা। বেদের থেকে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র আর নেই, কৃষ্ণ থেকে কেউ শ্রেষ্ঠ নয়, সন্তানের থেকে প্রিয় কেউ না।

পার্বতী সতীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গণেশ শক্তিমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই গুরুর পুত্র ও স্ত্রীর প্রতি পরশুরাম যে অবহেলা করেছে সেই দোষ কাটাবার জন্য আমি তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি। হে ঈশ্বরী! সামবেদ তোমার পুত্রের করা স্তব আমি বলছি, মন দিয়ে শোন। গ শব্দের অর্থ জ্ঞান, ন শব্দের অর্থ মুক্তি — যিনি এই দুটো দিতে পারেন সেই গণেশকে প্রণাম। হে শব্দের অর্থ দীন, রম্ব মানে পালক, তাই তিনি দীনের পালক, বিঘ্ন মানে বিপদ, নাশক মানে

যিনি দূর করেন, সেই বিঘ্ননাশককে প্রণাম। তার মাথায় বিষ্ণুর ফুল রয়েছে। ইনি কার্তিকের আশ্রমে আবির্ভূত হয়েছেন বলেই সকল দেবতার আগে পুজো পান। অতএব গুহাগ্রজ, এঁকে প্রণাম, যে লোক অর্থসমেত এই আট নামের স্তব প্রতিদিন। যে সন্ধ্যায় পাঠ করে সে সুখী ও বিজয়ী হয়। যে স্ত্রী চায় সে সুন্দরী স্ত্রী ও অত্যন্ত জড়লোক ও এই বিদ্যার প্রভাবে কবিত্ব লাভ করে।

৪৫.

বিষ্ণু পার্বতী কে সান্ত্বনা দিয়ে পরশুরামকে হিতকর ও পরিণামে সুখকর গুণকথা বলতে লাগলেন। পরশুরামকে, গণেশের ও দুর্গার স্তব করতে বললেন। কৃষ্ণ রেগে গেলে বুদ্ধিশূন্য হবেন। ইনিই শক্তিস্বরূপ, এঁর থেকেই সকল জগৎ শক্তি পায়, কৃষ্ণও এঁর থেকে শক্তিমান হন। ব্রহ্মার সাহায্য ছাড়া এই শক্তি সৃষ্টি করতে পারেন না। আগে দেবতাদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অসুররা আক্রান্ত হলে এই সতী সকল দেবতাদের তেজে আবির্ভূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অসুরদের হত্যা করে দক্ষের তপস্যার বলে দক্ষপত্নীর গর্ভে জন্মালেন। ভগবান কৃষ্ণই পার্বতীর পুত্র হয়ে জন্মেছেন। সকল বিঘ্ন নাশন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কারণ বিষ্ণুর করা স্তবে দুর্গার স্তব করতে লাগলেন। কৃষ্ণ প্রাণাধিক রাধা হলেন কৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা তাকে সরস্বতী বলেন, তিনি রাসেশ্বর কৃষ্ণের কাছে রাধা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংসের যে তিনরকম শক্তি আছে সেই শক্তি তিনি। পরশুরাম তাঁকে জগৎ মাতা বলে সম্বোধন করে বললেন–সবদিক দিয়ে তুমি আমায় রক্ষা কর, ক্ষমা কর আমার অপরাধ, মা শিশুর অপরাধে কখনই রেগে যান না। তাঁকে প্রণাম করে কাঁদতে লাগলেন পরশুরাম। দুর্গা বললেন, মহাদেবের করুণায় সর্বত্র তোমার জয় হবে। পার্বতী সন্তুষ্ট হয়ে পরশুরামকে শুভ আর্শীবাদ দিয়ে অন্তঃপুরে গেলেন তখন হরিধ্বনি শোনা গেল। শত্রু যাকে আক্রমণ করেছে, মারাত্মক রোগে যে আক্রান্ত, সেই লোক এই স্তব স্মরণ করার সাথে সাথেই বিপদ থেকে মুক্ত হয়। সে তার মনের মত ফল লাভ করে এই স্তব স্মরণ করে। দুর্ভাগা নারী এই স্তব দুমাস শুনেই সৌভাগ্য লাভ করে, ভক্তি ভরে নমাস ধরে এই স্তব করলে কাকবন্ধ্যাও পুত্র লাভ করবে। যে নারীর পুত্র হয় না, কেবলই কন্যা সন্তান হয়, সে ঘটে দুর্গাকে পূজো করে এই স্তব পাঁচ মাস শুনলে নিশ্চয়ই পুত্র সন্তান লাভ করবে।

৪৬.

পরশুরাম নানা নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ, গন্ধ ও তুলসী ছাড়া অন্য ফুলাদি দিয়ে ভক্তিভরে গণেশের পূজা করলেন।

একদিন নবযৌবনা ভক্ত তুলসী তপস্যার জন্য নানা তীর্থে ঘুরে গঙ্গাতীরে অতীব সুন্দর যৌবনকান্তি গণেশকে দেখতে পেলেন। তিনি গণেশের মাথায় জল ছিটিয়ে তাঁকে আঙুল দিয়ে ঠেললেন। তখন গণেশের ধ্যান ভাঙল। গণেশ সম্মুখে তুলসীকে দেখে তাঁর কাছে জানতে চাইলেন– কে তুমি মা? কেন তুমি আমার ধ্যান ভাঙালে? তুমি জানো, তপস্বীদের ধ্যান ভঙ্গ করা মহাপাপ। তুলসী বললেন– আমি ধর্মধ্বজের কন্যা, যৌবনেই তপস্বী হয়েছি। স্বামীর জন্য তপস্যা করছি। তাই প্রভু যেন তার স্বামী হন। গণেশ বললেন, বিয়ে করলে কেবলই দুঃখ হয়, সুখ হয় না। তপস্যা নষ্ট করে, বারবার গর্ভধারনের কারণ, তত্ত্বজ্ঞান নষ্ট করে, সংসারের আধার, সাধুর দুস্ত্যজ, সকল মায়ার আধার ও হঠকারিতা প্রভৃতি নানা দোষের আশ্রয়। কামুকের সঙ্গে কামুকীর সঙ্গমে প্রশংসার হয়। সতী তুলসী, গণেশের কথায় রাগ করে, তাকে অভিশাপ দিয়ে বলেন –তোমার নিশ্চয়ই বিয়ে হবে। গণেশও তাঁকে শাপ দিয়ে বললেন–যে, কোন মহাজনের শাপে গাছ হয়ে যাবে। তুলসী একথা শুনে আবার কাঁদতে লাগলো, তখন গণেশ তাকে শান্ত করে বলল, হে সুন্দরী তুমি সকল ফুলের মধ্যে প্রধান।

কিন্তু আমি সবসময় তোমায় পরিত্যাগ করব। তুলসীও তখন পুষ্পতীর্থে গিয়ে না খেয়ে লক্ষ বছর তপস্যা করলেন। তুলসী পরে মুনীন্দ্র ও গণেশের শাপে বহুকাল ধরে শঙ্খচূড়ের পত্নী হিসাবে ছিলেন। শেষে তুলসী নারায়ণের প্রিয়া হলেন। পরশুরাম শিব ও পার্বতীকে প্রণাম করে গণেশ পূজো করে তপস্যা করতে বনে চলে গেলেন। মুনীন্দ্রদের ও দেবেন্দ্রর কাছ থেকে গণেশ হরপার্বতীর কাছে গেলেন। কোন মহাবন্ধ্যা নারী যদি কাপড়, অলংকার ও চন্দন দিয়ে গণেশ পূজো করে তবে তার পুত্র লাভ হয়। দুষ্ট নারীও নির্দোষ পুত্র লাভ করে। তোক বিপদ দূর করার জন্য যত্নের সঙ্গে গণেশখন্ড শুনে, পাঠক ব্রাহ্মণকে সোনা, যজ্ঞসূত্র, সাদাছাতা, মালা, ঘোড়া, স্বস্তিক, তিলের নাড়ু এবং নানাদেশ ও নানা সময়ের পাকা ফল দান করবে।

শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড

১.

নারায়ণ জানালেন, তিনি ব্রহ্মার কাছে এই সুন্দর উপাখ্যান শুনেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ খন্ড তিনি এবার শুনতে চান। এটি শুনলে জন্ম-মৃত্যু দুর হয়। এটি সর্বজ্ঞানের আলোর মত, হরিভক্তি দান করে, যা ভবসাগর পার হবার একমাত্র উপায়। সকল অংশে পূর্ণতম ঈশ্বর হলেন শ্রীকৃষ্ণ। ভারতে লোকে হরির সম্বন্ধে সবকথা শুনে জন্মসফল করে। যে হরিভক্ত তার বিপদ হয় না বা আয়ুক্ষয় হয় না। যমও তার কাছে আসতে পারে না। সুদর্শনচক্র তার প্রহরায় দিনরাত্রি ঘুরে বেড়ায়। মৃত্যু ভয়ে মৃত্যুও আসে না তার কাছে। যে লোক স্ত্রী, পুত্র সবাইকে মনেপ্রাণে হরির ভক্ত বলে মনে করে, তাকে ভক্ত বলেন পণ্ডিতরা। সেইই প্রকৃত ভক্ত ও জ্ঞানী যে মিষ্ট কিছু হরিকে নিবেদন করে আনন্দিত হয়ে ওঠে। বৈষ্ণবভক্ত সর্বদা নিজের আগের পুরুষ ও পরের সাতপুরুষ, মাতামহ, বোন, মা, স্ত্রী, কন্যা, বন্ধু, পিতা, দৌহিত্র, সকলকে উদ্ধার করে। বৈষ্ণবদের স্পর্শে সকল পাপ নষ্ট হয়। যারা পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের স্পর্শে মুক্ত হয় ও মধুসূদন তার পাপ নষ্ট করেন। এবার কৃষ্ণের জন্মলীলা বৃত্তান্ত বিবৃত করা হবে।

২.

কৃষ্ণের ব্রজে আসা, গোপবেশে যে কারণে রাধা গোপিকা, এখন সেই কৃষ্ণলীলা বলছি শোন। পূর্বে গোলোকধামে রাধিকার সঙ্গে শ্রীদামের ঝগড়া হয়। রাধার শাপে শ্রীদাম শঙ্খচূড়রূপে

জন্মায়, রাধাকে সেও শাপ দেয় যে-রাধা ব্রজে মানুষ হয়ে জন্মাবে। রাধা কৃষ্ণকে সে কথা জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে ভয় দূর করে বললেন–আমি বরাহ কল্পে পৃথিবীতে যাব। নারায়ণ শ্রীরাধার সাথে শ্রীদামের ঝগড়ার কারণ নারদকে জানালেন। নারায়ণ বললেন– একদিন হরি গোলকে নির্জন বনে রাসমন্ডলে বিহার করছিলেন। রাধা জানতে পারেনি কিন্তু কৃষ্ণের প্রিয়া বিরজা হরিকে দেখতে পেলেন।

তিনি নানা রত্নালংকারে সেজে পাতলা কাপড় পরে উদগ্রীব হয়ে আছেন। তার বয়স ষোলো। কামাতুর এই বিরজার সঙ্গে হরি ফুলের শয্যায় বিহার করলেন। রাধার কাছে সখীরা সেকথা জানালে, রাধা রেগে শুয়ে পড়লেন। রাধা সখীদের বললেন, তাঁকে বিরজার সাথে কৃষ্ণকে দেখাতে। রাধা রথে চড়ে তেষট্টিশোকোটি গোপীর সাথে বিরজার মণ্ডপে গেলেন, রত্ন বিছানা, রত্ন-পাত্র সমেত সোনার বেদীও কুঙ্কুমের মত লাল, রত্নের কোটি সিঁড়ি, যুথিকা ফুলের কোটিমালা, নানা সরোবর, কানন এবং শৃঙ্গারের উপযুক্ত এককোটি বিছানা। বিরজার মণ্ডপের দরজার গোড়ায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা শ্রীদামকে দেখলেন। রাধা তাকে দূর হতে বললেন। রাধার সখীরা শ্রীদামকে জোর করে মণ্ডপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। কৃষ্ণ ভয়ে পালিয়ে যাবার ফলে বিরজা দেহত্যাগ করলেন। তাঁর শরীর নদীতে পরিণত হল এবং তা নানা রত্নের আকার হল।

৩.

শ্রীকৃষ্ণ বিরজাকে নদী হতে দেখে কাঁদতে লাগলেন। বিরজা তখন রাধার মত সুন্দরী ও পীত কাপড় পরে এসে হরির সামনে হাজির হল। তিনি সুন্দরীদের মধ্যে ধন্য ও মান্য হলেন। তার হাতে রত্ন। কাকন, রত্নকেয়ূর ও সুন্দর শঙ্খ। হরিও তখন নানাভাবে বিপরীত শৃঙ্গার করলেন। বিরজা একদিন হরির সাথে আবার বিহার করছেন, তখন তাঁর ছোট ছেলে এসে আশ্রয় নিল মায়ের কোলে, হরি বিরজাকে ত্যাগ করলেন। বিরজা তখন নিজ ছেলেকে লবণ সমুদ্র হবার শাপ দিলেন। আর অন্য ছেলেদের শাপ দিলেন পৃথিবীতে যাবার। এরপর সাতভাই সাত দ্বীপে অবস্থান করতে লাগল। তারা হল– লবণ, আখ, সুরা, সাপ, দধি, দুগ্ধ ও জল। এদের জন্ম হল কেবলমাত্র শস্যের জন্য।

বিরজা পুত্রশোকে কান্না শুরু করলেন। হরি তাঁকে দেখা দিলে তিনি কামাতুর হয়ে হরিকে কোলে নিয়ে বিহার করতে লাগলেন। রাধা তখন হরিকে বললেন, বিরজা নদী হয়েছেন। নদীর সাথে নদকেই মানায়, তাই হরির নদ হওয়া উচিত। রাধা রাগে হরিকে কুবাক্য বললেন–শ্রীদাম

তাকে বললেন, মা তুমি কেন প্রভুকে খারাপ কথা বলছ? রাধা শ্রীদামের কথায় রেগে গিয়ে তাঁকে শাপ দিয়ে বললেন–যে–তুই অসুর হয়ে জন্মাবি। শ্রীদামও তখন রাধাকে শাপ দিল মানুষ হয়ে জন্মাবার জন্য এবং বললেন–হরির সাথে তার বিভেদ হবে একশো বছরের। পরে প্রভুকে পেয়ে গোলোকে আসবেন। শ্রীদাম কৃষ্ণকে সব জানালে, কৃষ্ণ তাঁকে বলে দিলে সে অসুরশ্রেষ্ঠ হবে। শঙ্করের শূলের আঘাতে তার মৃত্যু হবে। বরাহকল্পে রাধা হরির সঙ্গে পৃথিবীতে এলেন ও গোকুলে বৃষভানুর ঘরে জন্ম নিলেন।

৪.

বরাহকল্পে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হওয়ায় দেবতারা শোকার্ত হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয়ে তাঁরা ব্রহ্মাকে দেখলেন। তখন ঋষীন্দ্র, মুনীন্দ্র ও সিদ্ধেন্দ্ররা তাকে সেবা করছেন। দেবতারা ব্রহ্মাকে বললেন–যে, পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়েছে। ব্রহ্মা পৃথিবীকে সে কথা জিজ্ঞেস করলে পৃথিবী জানাল যে–অবলা স্ত্রীজাতিকে পিতা বা স্বামী বা পুত্ররা রক্ষা করে। আমি কৃষ্ণের নিন্দাকারীদের ভার বইতে অক্ষম। ঐকথা শুনে ব্রহ্ম অন্যান্য দেব বৈকুণ্ঠধামে গেলেন। হরি তাঁদের বললেন, তিনি গোকুলে যাবেন। দেবতারা সুন্দর রাসমণ্ডলকে দেখে বন থেকে বেড়িয়ে পড়লেন, এবং দেখতে পেলেন বৃন্দাবন। ঐ গোলোকধামের চারদিকে রত্ন পাঁচিল, চার দরজা, দরজা পাহারা দিচ্ছে। গোপালকরা। তারা তার কিছুদুর গিয়ে রাধার রমণীয় আশ্রম দেখলেন। এর সৌন্দর্য কথায় প্রকাশ করা যায় না। দেবতারা সেখানে সুন্দর নাচ দেখলেন ও গান শুনে মোহিত হয়ে গেলেন। এই গোলোক ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে এবং সর্বলোকের উপরে অবস্থিত। যার উপরে আর কোন লোক নেই। সেখানে কেউ যেতে পারে না। তার নীচে আছে জল আর অন্ধকার, সেটা দেখা যায় না।

৫.

এই গোলোকধাম দেখে দেবতারা রাধার আলয়ের মূল দরজায় গেলেন। সেখানে বীরভানু নামে একজন পাহারা দিচ্ছিল। নানা ছবি আঁকা সেই দরজায় এসে দেবতারা সেই ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। দেবতারা দ্বারীকে সম্ভাষণ জানিয়ে ভবনের দ্বিতীয় দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণের চাঁদের মত সুন্দর মুখ, শরৎকালের ফোঁটা পদ্মের মত সৌন্দর্য, ঠোঁটদুটো পাকা বিম্বফলের মতো। দেবতারা সেখানে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণের তেজে তেজোময় হয়ে স্তব করলেন। ব্রহ্মা, শিব ও ধর্মের করা শ্রেষ্ঠ স্তব হরির পুজোর সময় যে পড়ে সে হরির নিশ্চল ও দুর্লভ ভক্তি লাভ করে। দেবতা ও মুনিরা যা পায় না সেই হরির দুর্লভ

দাসত্ব প্রভৃতি চার রকম মুক্তি লাভ করে। তার যশে সকল জগৎ পূর্ণ হয়। সে পুত্র, কবিতা, বিদ্যা ও অক্ষয় সম্পদ লাভ করে, তার স্ত্রী সতী হয়। পুত্র-পৌত্রে সংসার পূর্ণ থাকে। সে কৃষ্ণের কাছে বাস করে মৃত্যুর পর।

৬.

কৃষ্ণের তেজের সামনে কিছুক্ষণ থেকে দেবতারা সেই তেজের মধ্যে অবস্থিত তার সুন্দর শরীর দেখতে পেলেন। তিনি সকলকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখলেন। দেবতারা সেখানে রাধাকেও দেখতে পেলেন। প্রত্যেকের মনের বাসনা পূরণ হল। দেবতারা তাদের যুগলের উদ্দেশে নানা স্তব করতে লাগলেন। শিব বললেন– মাছের মত আমার মন এই সংসার সমুদ্রে ডুবে সবসময়ই সংসার কূপে ঘুরছে। দয়া করে আপনি সৃষ্টি ধ্বংস রূপ এই সব নিন্দনীয় বিষয় থেকে আমাকে মুক্ত করে আপনার চরণপদ্মে ভক্তি দান করুন।

ব্রহ্মা হরির সামনে দাঁড়িয়ে খুব বিনয়ের সঙ্গে জোড় হাতে বললেন– কে কোথায় জন্মাবেন আদেশ করুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন–কামদেব রোহিণীর ছেলে হয়ে জন্ম নেবেন। রতি মায়াবতী নামে শঙ্করের ঘরে জন্ম নিয়ে ছায়ারূপে থাকবেন। তুমি মায়াবতীর গর্ভে রোহিনীর ছেলের ছেলে হয়ে জন্ম নেবে। নাম হবে অনিরুদ্ধ। ভারতী জন্ম নেবেন শোণিতপুরে বানের মেয়ের হয়ে। দেবকীর গর্ভে জন্ম নেবেন কৃষ্ণ, পরে তাঁর গর্ভ থেকে যোগমায়াকে আকর্ষণ করে নিজ গর্ভ রাখবেন। হরি দেবতাদের বললেন, যে যার কাজ করার জন্য নিজের ঘরে ফিরে যাও, পার্বতী ছেলে ও স্বামীকে নিয়ে কৈলাসে যাও।

তাঁর কথা অনুযায়ী গণেশ ছাড়া সকল দেবতাই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। স্বামীর নিরূপিত স্থান দেবতাদেরও দুর্লভ। কৃষ্ণ রাধাকে বললেন–আগে গোপ-গোপীদের সঙ্গে বৃষভাণুর ঘরে যাও। রাধা হরিকে সাতবার ঘুরে প্রণাম করে পৃথিবীতে আসবার জন্য প্রস্তুত হলেন। গোপীদের ডেকে তাদের নিজের কাজে নিযুক্ত করে জগন্নাথ মনের মত শীঘ্রগামী রথে চড়ে মথুরায় গেলেন। আগে বসুদেব ও দেবকীর যে ছয়জন সন্তান জন্মেছিল তাদের সবাইকে কংস বধ করেছিলেন। সপ্তমগর্ভ হরির আদেশে মায়া আকর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করেন।

৭.

যদুবংশের আহুকের পুত্র শ্রীসম্পন্ন জ্ঞানসিন্ধু দেবক নামে এক রাজা ছিলেন। তার মেয়ে হয়ে জন্মায় দেবকী। বাসুদেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ও তাঁর একে একে ছয় পুত্র জন্মায়, তাদের

কংসের হাতে তুলে দেন বসুদেব। কংস তাদের বধ করেন। এরপর দেবকী অষ্টমবার গর্ভবতী হন। তাঁর গর্ভ পূর্ণ হল বায়ুতে। তিনি মনে মনে হরিকে ডাকতে লাগলেন। রাতের দুই প্রহর কেটে গেলে সম্পূর্ণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, আটরকম বায়ু বইতে লাগল। দেবতারা সকলে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। যে ঘুম থেকে উঠে ভগবানের বত্রিশটি নাম পাঠ করে, তার হরির প্রতি অচলা ভক্তি ও কাঙ্খিত দাসত্ব লাভ হয়।

দেবকী তখন মাটিতে পড়ে গেলেন। তার গর্ভ থেকে সমস্ত বায়ু বেরিয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ দিব্যরূপ ধারণ করে দেবকীর হৃৎপদ্মকোষ থেকে আবির্ভূত হলেন।

কৃষ্ণ বললেন–কশ্যপের অংশে বসুদেবরূপে জন্ম নিয়ে তার পিতা হয়েছেন, দেবমাতা অদিতির অংশে দেবকীরূপে জন্ম নিয়েছেন। পূর্বে তিনি অদিতির গর্ভে বামন রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

৮.

জন্মাষ্টমী ব্রত হল, সপ্তমীর দিন সংযত হয়ে হবিষ্য করবে, পরের দিনও তাই। অষ্টমীতে সূর্য ওঠার সাথে সাথে বিছানা ছেড়ে প্রাতঃকৃত্য করে স্নান করে সঙ্কল্প করবে। ব্রত উপবাস কেবল কৃষ্ণের আনন্দের জন্য। মন্বন্তর দিনে স্নান ও হরি পূজা করে যে ফল খায়, ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথিতে স্নান ও পূজো করে সেই ব্যক্তি কোটিগুণ ফল পায়।

দেবকীর পুত্র রোহিণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিথি কেটে গেলে হরিকে স্মরণ করে পুজো করে পারণ করবে। যা অত্যন্ত পবিত্র এবং পুরুষদের সকল পাপ দূর করে। যা শুভ ফলদায়ক ও শুদ্ধির কারণ। যদি কোন লোক উপোস করতে না পারে, অন্তত একজন ব্রাহ্মণকে খাওয়াবে। অথবা অন্নের দ্বিগুণ পরিমান ধন ব্রাহ্মণকে দেবে।

৯.

শ্রীহরির এই লীলা কাহিনি অমৃতসমান। বৈকুণ্ঠে ও গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পরিপূর্ণতম। তিনিই বৈকুণ্ঠে রূপভেদে চারহাত বিশিষ্ট কমলাকান্ত।

একদিন দ্রোণ ও ধরা পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে গন্ধমাদন গোষ্ঠতমের আশ্রমের কাছে এসে সুপ্রভা নদীর তীরে কৃষ্ণের দেখা পাওয়ার জন্য অযুত বছর ধরে তপস্যা করলেন, তবুও কৃষ্ণের দর্শন

না পেয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে মরার জন্য তৈরি হলেন। আর সেই সময়ই দৈববাণী শুনে মনের আনন্দে বাড়ি চলে এলেন। পরে তাঁরা ভারতে জন্ম নিয়ে হরির দর্শন পেলেন।

কশ্যপ রুদ্রের সাথে ক্রীড়ায় আসক্ত হয়েছেন এবং সব সময় তাঁর বুকেই রয়েছেন, শুনে অদিতি স্বামীকে শাপ না দিয়ে রুদ্রকে অভিশাপ দিলেন, মানুষ হয়ে জন্মাবার।

১০.

দেবকীর সপ্তম গর্ভ প্রসব হয়নি, তা নষ্ট হয়েছে–একথা মিথ্যা। মায়া তাকে জঠরে রেখেছে। তাতে জন্ম হয়েছে বলদেবের। তারা দুজনে নন্দের গৃহে বড় হয়ে উঠছিল। কংস পুতনাকে পাঠালেন নন্দের বাড়ি। সেখানে পুতনা সুন্দরীর বেশে পৌঁছালো। মায়াবী পুতনা সেই নন্দ আলয়ে ঢুকে পড়ল। গোপীরা তাকে ঢুকতে দেখেও খারাপ কিছু মনে করল না। তারা ভাবল, লক্ষী কি দুর্গা কৃষ্ণকে দেখার জন্য এসেছে। পুতনা তাদের বলল, তিনি এক ব্রাহ্মণের পত্নী। সেই কথায় যশোদা আনন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকে কোলে দিলেন। পুতনা কৃষ্ণকে স্তন্য পান করাতে লাগল।

কিন্তু কৃষ্ণ সেই বিষাক্ত স্তনকে অমৃতের মত পান করতে লাগল। পুতনা বিকট চিৎকার করে মুখ থুবড়ে পড়ে মরে গেল। কংস তা শুনে অত্যন্ত অবাক হলো। যশোদা তখন বাচ্চাকে কোলে তুলে স্তন পান করালেন। পুতনার আসল পরিচয় হল সে বলিরাজার কন্যা যজ্ঞমালা। তার বাবার যজ্ঞের সময় বিষ্ণুর বামন অবতারের সুন্দর রূপ দেখে পুত্র স্নেহে কাতর হয়ে পড়ে, আর মনে ইচ্ছা প্রকাশ করে যদি এ আমার ছেলে হত তবে তাকে আমার স্তন পান করাতাম। এর ফলেই কৃষ্ণের আশীর্বাদে পুতনা তাকে স্তন্য পান করাল। পরে মুক্তি লাভ করল।

১১.

এরপর বায়ুরূপ তৃর্ণাবর্ত এলে হরি অত্যন্ত ভারী হলেন। যশোদা তাঁকে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন। অসুর হরিকে নিয়ে একশো যোজন দূরে নিয়ে চলে গেল ও গোকুলে অন্ধকার নেমে এল। এই অসুর আগে পান্ড্যদেশীয় রাজা ছিল, দুর্বাসার শাপে অসুর হয়েছিল। কৃষ্ণের পায়ের ছোঁয়ায় মুক্তি লাভ করল।

পান্ড্যদেশের রাজা কামনায় জর্জরিত হয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নির্জনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দুর্বাসা তাকে শাপ দেন তিনি যেন অসুর হয়ে জন্মান এবং হরির পাদস্পর্শে মুক্তি লাভ করে গোলকে যাবেন।

১২.

যশোদা একদিন কৃষ্ণকে স্তন্য দান করছিলেন। এমন সময় কয়েকজন গোপ বয়স্ক ও যুবতী নন্দের বাড়িতে এলে কৃষ্ণের স্তন্যপান পরিতৃপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও যশোদা মা অতিথি অপ্যায়নে সচেষ্ট হলেন। কৃষ্ণ খিদেয় কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পা বড় করে ফেললেন। আর যখনই তার পা পুরানো রথের ওপর পড়ল তখনি তা ভেঙে চুরমার হল। রথ ভেঙে কাঠের টুকরোগুলো নানা স্থানে পড়ল, আর রথের মধ্যে রাখা দুধ, দই, ঘি, ননী, মধুর মধ্যে পড়ে শিশুটি গড়াগড়ি খেতে লাগলো। যশোদা সেগুলি সরিয়ে তাঁকে বার করলেন।

যে বুদ্ধিমান লোক কৃষ্ণের দেওয়া কবচ সোনার গুটিকাতে করে গলায় ডানহাতে পরিধান করবেন তাঁকে জলে, স্থলে, আকাশে সেই কবচ রক্ষা করবে। অনন্ত এই কবচ ধারণ করে পৃথিবীকে ফুলের মত মাথায় করে রেখেছেন।

১৩.

একদিন এক ব্রাহ্মণ গোকুলে এলে যশোদা তাকে প্রণাম করলেন ও কৃষ্ণকে আশীর্বাদ করতে বললেন। সেই গর্গ মুনি নন্দ, যশোদা ও কৃষ্ণকে নিয়ে এক ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। গর্গ তাঁদের জানালেন বাসুদেব কী কারণে তাদের পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন–যে, এই পুত্রই বিষ্ণু তিনি কলিতে কৃষ্ণ বর্ণ নিয়ে জন্ম নিয়েছেন তখন কৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন গর্গ।

মুনি সব বলে কৃষ্ণকে নন্দর হাতে দিতে আজ্ঞা চাইলেন। নন্দ ও যশোদা বালককে বুকে করে সুখে, বাস করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে কৃষ্ণ ও বলরাম হাঁটতে শুরু করলেন।

১৪.

যশোদা একদিন স্নানে গেলে কৃষ্ণ মাখন, ননী প্রভৃতি দেখতে পেলেন। সে সব খেয়ে ফেললেন। যশোদা তা দেখে বেত হাতে ছেলের পেছনে দৌড়লেন। কিন্তু তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তখন কৃষ্ণ মায়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মা যশোদা এই হয়রানির জন্য বিরক্ত

হয়ে কৃষ্ণকে গাছের সাথে বেঁধে মারতে লাগলেন। সেই গাছ এক দিব্যরূপধারী গৌরবর্ণ কিশোর হয়ে রথে চড়ে স্বর্গে চলে গেল।

১৫.

কৃষ্ণের সঙ্গে নন্দ একদিন বৃন্দাবনের কাছে ভ্রান্তীর বনে গরু চরাতে গেলেন। গরুদের সেই সরোবরে সুস্বাদু জল খাওয়ালেন, আর নিজেও খেলেন। সেখানে দশদিক উজ্জ্বল করে দেবী রাধা এলেন। নন্দ তাঁকে দেখে অবাক হলেন। গর্গের কাছে শুনে নন্দ তাঁকে লক্ষী বলে চিনতে পারলেন।

ব্রহ্মা রাধার স্তব করলে রাধা তাকে বললেন–মনের মত বর চাইতে। ব্রহ্মা বললেন–আমার যেন আপনাদের দুজনের পাদপদ্মে অবিচল ভক্তি থাকে। রাধা বললেন–তবে তাই হোক। কৃষ্ণ রাধার হাত ধরে নিজের বুকে স্থাপন করে চার রকম চুমো খেয়ে তার কাপড় হাল্কা করে দিলেন। প্রিয় সঙ্গমে রাধার সকল অঙ্গ পুলকিত হল। কৃষ্ণ, আট প্রত্যঙ্গ দিয়ে রাধার প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গন করে আট রকম শৃঙ্গার করলেন। তার হাত ও নখ দিয়ে সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করলেন। রাধা প্রতিদিন রাসমণ্ডপে হরির সঙ্গে রতিক্রীড়া করতে লাগলেন।

১৬.

মাধব একদিন খাওয়াদাওয়া করে শিশুদের নিয়ে গোধন সমেত খেলার জন্য শ্রীবনে গেলেন। মধুবনে। গিয়ে তাঁরা জল খেলেন। তখন এক সাদা রঙের দৈত্য সেখানে হাজির হল। তার নাম বকাসুর। সে কৃষ্ণ সহ সবাইকে গিলে ফেলল। কৃষ্ণ তাঁর তেজে দৈত্যর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুড়িয়ে দিলে সে বমি করে মারা গেল। এরপর প্রলম্ব নামে এক অসুর ষাঁড়ের রূপ ধরে সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং হরিকে শিং-এ ধরে আকাশে ঘোরাতে লাগল। কৃষ্ণ তাকে বধ করে ভাণ্ডারী বনে গেলেন। সেখানে দৈত্যরাজ কেশী তাঁকে আক্রমণ করলে সে কৃষ্ণের তেজে পুড়ে মারা গেল।

১৭.

বৃন্দাবনে গোপ-গোপীরা রাতের বেলায় শুয়ে পড়লে কৃষ্ণ মায়ের বুকে শুয়ে পড়লেন। বৃন্দাবনে বিশ্বকর্মা এলেন সকলের জন্য সুন্দর গৃহ ও আশ্রম নির্মাণ করলেন। তিনি যত্ন

সহকারে কলাবতীর ঘর তৈরি করলেন। এই কলাবতী লক্ষীর অংশ স্বরূপ। রাজা ভালন্দনের মেয়ে তিনি, বৃষভানু তাঁর উপযুক্ত স্বামী।

নারায়ণ রাধার ষোলো নাম বললেন–রাধা, রাসেশ্বরী, রাসবাসিনী, রসিকেশ্বরী, কৃষ্ণপ্রাণাধিকা, কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণস্বরূপিনী, কৃষ্ণসমাংশস্তূতা, পরমানন্দরূপিনী, কৃষ্ণা, বৃন্দাবনী, বৃন্দা, বৃন্দাবন বিনোদিনী, চন্দ্রাবলী, চন্দ্রকান্তা, শতচন্দ্রনিভানো।

১৮.

নারায়ণ নারদের অনুরোধে পরমেশ্বরের অদ্ভুত চরিত লীলা বর্ণনা করলেন। কৃষ্ণ একদিন বলদেব ও বালকদের সাথে যমুনাতীরে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তাঁরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লে কৃষ্ণ তাঁদের বললেন, ব্রাহ্মণীদের কাছে খাবার চাইতে। তাঁর কথায় বালকরা ব্রাহ্মণীদের কাছে খাবার চাইলে তার বালকদের পরিচয় জানতে চাইল। ব্রাহ্মণীরা কৃষ্ণের কথা শুনে নানা থালায় নানা খাবার সাজিয়ে কৃষ্ণের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। ব্রাহ্মণীদের নিজের পায়ের ওপর পড়ে থাকতে দেখে কৃষ্ণ তাদেরকে বর চাইতে বললেন। তারা তখন বলল, তারা কোনো বর নেবে না, কেবল তারা বিষ্ণুর চরণপদ্মই প্রার্থনা করবে।

১৯.

কৃষ্ণ একদিন বলদেব ছাড়া অন্যান্য বালকদের সাথে যমুনাতীরে এসে উপস্থিত হলেন ও যমুনার জল পান করলেন। গরুগুলি বিষজল পান করে বিষের জ্বালায় অস্থির হয়ে তক্ষুনি মারা গেল। কৃষ্ণ তাদের বাঁচিয়ে তুলে একশোহাত উপরে লাফিয়ে কদম্বগাছে উঠে জলের মধ্যে সাপের ঘরে কঁপ দিলেন। জলের মধ্যে মানুষ দেখে কালীয় সাপ তাকে গিলে ফেলল। কিন্তু ব্রহ্মতেজে উদ্বিগ্ন হয়ে বমি করে আবার বের করে দিল। রক্ত বমি করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সাপের স্ত্রী সতী সুরলা হরির সামনে কাঁদতে লাগল। নাগেশ্বরী ভক্তিতে মাথা নীচু করে স্তব করে কৃষ্ণের পা জড়িয়ে ধরলো। যে তিন সন্ধ্যায় নাগপত্নীর করা স্তোত্র পাঠ করে, তার সকল পাপ নাশ হয়। সে মৃত্যুর পরে হরিমন্দিরে যায় এবং ইহকালে হরিভক্তি লাভ করে ও পরে হরির দাসত্ব লাভ করে।

হরি-নাগেশ্বরীকে ছেড়ে দিয়ে বর চাইতে বললেন। তিনি আদেশ করে বললেন–স্বামী ও পরিবারসহ সবাইকে নিয়ে সে যেন কালিন্দী হ্রদ ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। গরুড়কে ভয় না পেয়ে এই হ্রদ থেকে বেরিয়ে দ্রুত রমণক দ্বীপে যেতে হবে।

কালীয় নাগকে কৃষ্ণ বর চাইতে বলে বললেন, যে লোক তার বংশের কোন সাপকে হত্যা করবে তার ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ হবে। যে তার পাদপদ্মচিহ্ন লাঠির আঘাত করবে তার ব্রহ্মহত্যার দ্বিগুণ পাপ হবে। লক্ষ্মী তার ঘর ত্যাগ করবে। কালীয় তাকে বললে সে যেন জন্মে জন্মে তার চরণে স্মৃতি ও ভক্তিতে থাকে।

সকল সাপেরা প্রতি বছর কার্তিকী পূর্ণিমার দিন অনন্ত দেবতার আদেশে ভয়ে গরুড়ের পূজো করে। দুষ্কর মহাতীর্থে স্নান করে ভক্তিভরে ফুল ধূপ দ্বীপ নৈবেদ্য ও অন্য নানা উপাচার দিয়ে ঐ পূজো করবে।

একদিন বনের মধ্যে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল, তাতে সাধারণ গোকুলবাসী সমেত সবাই ঘেরাও হয়ে পড়ল। সবাই কৃষ্ণের স্তব করতে লাগল। কৃষ্ণের অমৃত দৃষ্টিতে দাবাগ্নি দূর হলো। এভাবে স্তোত্রপাঠ করে সকলে বিপদমুক্ত হল।

২০.

একদিন মাধব, বালক ও বলদেবের সাথে পানভোজন করে পরিতৃপ্ত হয়ে বৃন্দাবনে গেলেন। ভগবান তাঁদের সাথে খেলা করতে করতে কৃষ্ণের প্রভাব জানার জন্য বাছুর সমেত গরু ও বালকদের চুরি করলেন। কৃষ্ণ ব্রহ্মার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে, যোগবলে সকল কিছু সৃষ্টি করলেন। এভাবে শ্রীকৃষ্ণ এক বছর প্রতিদিন গরু, বলদেব ও বালকদের সাথে যাতায়াত করলে ব্রহ্মা তাঁর প্রভাব বুঝতে পেরে ভাণ্ডারী বনে এসে হরির দর্শন করলেন। তাঁকে বারবার দর্শন করে ব্রহ্মা বিস্মিত হয়ে প্রণাম করলেন। তিনি সবকিছু কৃষ্ণময় দেখে বিস্মিত হলেন ও তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। পরে যোগবলে যত্ন করে পড়া, সুষুম্মা, মেধ্য, পিঙ্গলা, নলিনী ও বুধা এই ছয় নাড়ী ও মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ছয়চক্রকে নিরুদ্ধ করলেন। পরে বায়ুকে এনে মেধার সঙ্গে যোগ করলেন।

কৃষ্ণের নেত্র ও হৃদয়ে যে রূপ দেখলেন, বাইরেও সেই পরমাশ্চর্য রূপ দেখে আগে হরি যে স্তোত্র দান করেছিলেন সেই স্তবেই কৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। নারায়ণ জানালেন জগৎকারণ ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে চলে গেলে পরমেশ্বর কৃষ্ণ বালকদের সঙ্গে নিজের মন্দিরে ফিরে এলেন। তখন সকল গরু, বাছুর ও বালকেরা একবছর পরে ঘরে ফিরেও কৃষ্ণের মায়ায় তা একদিনের বলে মনে করল। গোপগোপীরাও এ ব্যাপারে কোনই তর্ক করতে পারল না। কারণ, যোগীদের করা সকল পদার্থই নতুন বা পুরনো বলে ঠিক করা অসাধ্য। হে ব্রাহ্মণ! এই

তোমার কাছে সুখ, দ্বারা সৃষ্ট মোক্ষ ও পুণ্যদায়ক সকল মানুষের সুখের কারণ মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণচরিত বর্ণনা করলাম।

২১.

গোপরাজনন্দ একদিন ইন্দ্রযোগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে দুন্দুভি বাজালেন এবং বললেন–এই নগরে যত গোপগোপী, বালক-বালিকা এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যে যে আছে, সবাই যেন দই, ক্ষীর, ঘি, গুড় ও মধু দিয়ে ইন্দ্রের পূজা করে। বিশাল সুন্দর জায়গায় তিনি সানন্দে ইন্দ্রধ্বজ পুঁতলেন, সেই ধ্বজ সুন্দর মায়াজালে জড়িয়ে আছে। পরে স্নান শেষে ধোওয়া কাপড় পরে ও পা ধুয়ে ভক্তি ভরে আহ্নিক শেষ করে সোনার আসন পীঠে বসলেন। সেখানে যজ্ঞের পাত্র আনা হল, তখন নগরবাসীরা নানারকম উপাচার নিয়ে সেখানে এল। ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বেদবেদাঙ্গ, পারদর্শী শান্ত প্রকৃতির গর্গ, বাৎস্য, কাত্যায়ন, সৌভরি, বামদেব, যাজ্ঞবল্ক্য, পাণিনি, ঋষ্যশৃঙ্গ, গৌরমুখ, ভরদ্বাজ, বামন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শৃঙ্গী, সুমন্ত, জৈমিনি, কট, পরাশর, মৈত্রেয় ও বৈশম্পায়ন মুনিরা শিষ্যদের সাথে সেখানে এলেন। আর এলেন নানা ব্রাহ্মণ, ভিখারী, বন্দি, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্ররা। পরে পাকপ্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আদর করে ডেকে এনে রান্নার আদেশ দিলেন।

নানা ফুল, মালা, নৈবেদ্য, তিলের নাড়ু, স্বস্তিকপূর্ণ ভল্লক, হাজার কলস চিনি, ব্রাহ্মণের ঘি মাখা শ্রেষ্ঠ যব ও গমের আটা, লাড্ডভরা কলসী, গাছপাকা সুন্দর ফল, লক্ষ ক্ষীরের কলসী, লক্ষ দইয়ের কলস, একশো মধুর কলস, হাজার কলস ঘি, একশো কলস ননী, তিন লক্ষ কলস তক্র, পাঁচলক্ষ গুড়ের খই, তেলভর্তি হাজার কলস, আরও অনেক ভোগের জিনিসপত্র, নানা বাদ্যযন্ত্র আনা হল। সেই ধ্বজের কাছে সোনার সিংহাসন আনা হল। পৃথিবীতে ব্রাহ্মণরাই দেবতা এবং সবার পূজো থেকে ব্রাহ্মণের পূজোই ভাল। একথা বেদে বলা হয়েছে। জনার্দন সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী। বেদে বলা আছে পাপী ব্রাহ্মণের ছোঁয়ায় মুক্ত হয় এবং তার দেখা মাত্রই পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। ব্রাহ্মণ মাত্রই বিষ্ণুরূপী। যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ হরিকে অন্নদান করেন ও সেই অন্ন খান। তাঁর উচ্ছিষ্ট ভোজনে মানুষ হরির দাসত্ব লাভ করে। সেই খাদ্য মলমূত্রের সমান হয় যে হরিকে দান না করে খায়, হরিভক্ত শূদ্র যদি নৈবেদ্য খাবার জন্য আগ্রহী হয় তবে হরিকে সামান্য নিবেদন করে তা রান্না করে খাবে।

অন্য জীব অপেক্ষা মানুষকে দান করলে আট গুণ ফল লাভ হয় এবং তার থেকে বিশিষ্ট কোন শূদ্রকে দান করলে তার দ্বিগুণ ফল লাভ হয়। বৈশ্যকে দান করলে তার আটগুণ, ক্ষত্রিয়দের

দান করলে তার দ্বিগুণ, ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণকে অন্নদান করলে একশোগুণ ফল লাভ হয়ে থাকে। যে লোক গোস্পদের মাটি দিয়ে তিলক তৈরি করে, সে তক্ষুনি তীর্থস্নানের সমান পুণ্য অর্জন করে এবং প্রত্যেক পদে সে অভয় লাভ করে। ইন্দ্রের ছেচল্লিশ নাম জপ করলে সব শাপ নাশ হয়। যে কৌসুম শাখায় বলা এই সকল নাম প্রত্যহ পাঠ করে, ইন্দ্র তাকে মহাবিপদের সময় ও বর্জ হাতে রক্ষা করেন।

২২.

একদিন কৃষ্ণ বলদেব ও বালকদের সাথে তালবনে গেলেন। সেই কাননে প্রচুর পরিপক্ক সুমিষ্ট ফল ছিল। ঐ তালবনের রক্ষাকর্তা ছিল ধেনুক নামক এক দৈত্য। বালকরা তালবন দেখে আনন্দ পেল। বালকরা দৈত্যের ভয় পেলে কৃষ্ণ তাদের অভয় দান করেন। তিনি তাদের আদেশ দেন, গাছের মাথায় উঠে নানা মিষ্টি ফল পাড়তে। এমন সময় বিকট শব্দে দৈত্য এলে বালকেরা দৈত্যের ভয়ে হরিকে স্মরণ করলে, কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখে তাদের ভয় দূর হল। কৃষ্ণ বললেন, এই দানব বলিরাজার ছেলে, তার নাম সাহসিক, দুর্বাসার শাপে গর্দভের রূপ ধারণ করেছিল। দৈত্যরাজ কৃষ্ণকে গ্রাস করল। অতঃপর কৃষ্ণের তেজে পুড়ে গিয়ে বমি করে তাঁকে বার করে দিল। কৃষ্ণকে দেখামাত্র তার পূর্বজন্মের সবকথা মনে পড়ে গেল।

দৈত্যরাজ কৃষ্ণের স্তব করতে লাগল এবং শ্রীহরির সামনে দাঁড়িয়ে রইল। কৃষ্ণ তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। তিনি প্রতিদিন ভক্তিভরে দৈত্যরাজের করা স্তব পাঠ করে, সে সহজেই হরির সালোক্য, সার্ষ্টি ও সামনে থাকার সুযোগ পায়; ইহকালে তার হরিভক্তি, মৃত্যুর পর হরির দাসত্ব এবং বিদ্যা, স্ত্রী, সুকবিত্ব, পুত্র, পৌত্র ও যশলাভ করে থাকে।

২৩.

একদিন সাহসিক নামে মহাশক্তিমান বলিরাজের পুত্র নিজ শক্তিতে দেবতাদের পরাজিত করে গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হয়ে রত্নসিংহাসনে বসলেন। সেই সময়ে অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা তিলোত্তমা নানা বেশভূষা করে সেই পথে যাচ্ছিল। নবযৌবনা সেই কামিনীকে দর্শনমাত্র কামানলে জর্জরিত হয়ে পড়লেন সহায়িক। অপ্সরা চলেছেন আস্তে ধীরে। সেসময় যুবক সাহসিক, হঠাৎ বাতাসে তার কাপড় উড়তে থাকায় সেই অপ্সরার স্তন, উরু, চাঁদমুখ দেখে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তিলোত্তমাও সেই অসাধারণ সুন্দর, প্রফুল্লমালতীমালায় সজ্জিত, নব-যৌবনযুক্ত, শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের মত মুখমন্ডলযুক্ত ঈষৎ হাস্যময় বলিপুত্রকে দেখামাত্র কামার্ত হয়ে অল্প হেসে কটাক্ষ করতে লাগল।

সেই কামুকী খেলার জন্য চন্দ্রলোকে যাচ্ছিল। কিন্তু বলিপুত্রের সাথে শৃঙ্গারের জন্য কোন ছল করে সেখান সে রয়ে গেল। তখন সে হেসে বাঁকা চোখে বারবার তার মুখ দেখতে লাগল আর কাপড় দিয়ে নিজের বুক ঢাকতে লাগল। কামার্ত নারীর দেহ পুলকিত হল, সারা শরীরে ঘাম দেখা দিল। বলিপুত্রের প্রতি এতই আকৃষ্ট হল যে শশধরকে ভুলে গেল। যে লোক গণিকাকে বিশ্বাস করে সে বিধিবিড়ম্বিত, তার ধন ও যশ নষ্ট হয় সবংশে। মনের মত নতুন কাউকে পেলে গণিকার আর পুরোনোতে মন উঠে না। গণিকা নরঘাতীর থেকেও ভয়ঙ্কর, যতদিন চন্দ্র, সূর্য থাকবে ততদিন গণিকার কোন মুক্তি নেই। গণিকার রান্না করলে সেই খাদ্যেও সাথে সব পাপ এসে মেশে, সেই খাবার এবং তাদের প্রদত্ত জল পিতৃকার্য ও দৈবকার্যে ব্যবহার করা যায় না। বলিপুত্র জ্ঞান লাভ করে গণিকা তিলোত্তমাকে দেখে কামাতুর ও পাগল হয়ে তার কাছে গেলেন। তিলোত্তমা লজ্জায় কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকলেও কাপড়ের ফাঁক দিয়ে বলিপুত্রকে দেখতে লাগল। তুমি নির্জনে লতার মতো তোমার হাত দুটি দিয়ে জড়িয়ে ধর। তার সকল অঙ্গের দর্শন করতে চাইলেন বলিপুত্র। এই সাহসিকের কথা শুনে সে আপন মান হারিয়ে বলতে লাগল –আপনার মত পতিকে সকল কামিনীরাই মনে চায়।

আপনি ধার্মিক, রূপবান, গুণবান, শৃঙ্গার পটু, শান্ত ও কামশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। এরূপ ব্যক্তিকেই পতি হিসাবে পেতে চায় কামিনীরা, যে সুবেশ, সুন্দর, শান্ত, কমনীয়, দান্ত, আরোগী, গুণবান, যুবক, রসিক, দয়ালু, বলিষ্ঠ, সাধু, ক্ষমতাশালী ও অনুরক্ত। সেইসব গুণই আপনার মধ্যে অতি মাত্রায় বর্তমান। যে কামিনীরা আপনাকে চায় না তারা অবশ্যই বোকা ও বঞ্চিত। চন্দ্রগৃহ থেকে ফিরে এসে সে তার ইচ্ছা পূরণ করবে। চন্দ্রের জন্য আজ সে সাজ করেছে কারণ আজ সে চন্দ্রের কামিনী। যে নারীকে চাঁদ আলিঙ্গন করেনি সে বোকা, পুরুষরসে বঞ্চিত হয়ে মায়ের গর্ভেই লুকিয়ে থাকে। সে রতিকার্যে বঞ্চিত।

তার মন সবসময়ই তাদের লীলার কথা চিন্তা করে থাকে। এদের মধ্যে রতিকার্যে বিশেষ পারদর্শী কামদেবই। অমৃত অপেক্ষাও সঠিক মনোজ্ঞ চন্দ্রের আলিঙ্গন। আমার মন তাতেই পড়ে আছে কারণ আজ তার রতিদিন। বলিপুত্র তিলোত্তমার কথা শুনে হেসে পুলকিত ও কামাতুর হয়ে সেই নির্জন জায়গায় তাকে বললেন–হে তিলোত্তমা, ব্রহ্মা পরম কৌতুকে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তুমি অপ্সরাদের মধ্যে চতুর, বিধাতা সুন্দ ও উপসুন্দদৈত্যকে নাশ করার জন্য সব রকমের চেষ্টা করে তোমাকে সকল গুণের আধার হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সুরতকার্যে তুমি দারুণ অভিজ্ঞা, এখন ব্যক্ত কর তোমার মনের ইচ্ছা। সাহসিকের কথা শুনে তিলোত্তমা অল্প হেসে বাঁকা চোখে তার দিকে তাকিয়ে কাপড়ে মুখ ঢাকল। সে বলল –

পণ্ডিতরা বেদ বেদান্ত শাস্ত্রেরও শেষ জেনেছেন, কিন্তু তারা নারী মনের শেষ কথা জানতে পারেননি।

দুর্মূল্য রত্ন দিলেও নারীর কাছে তারা বিষের থেকে অপ্রিয় আর যুবক যদি সর্বস্বহারাও হয় তবুও সে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। সুন্দরযুবক দেখলে গণিকার যোনি ভিজে যায় ও চুলকাতে থাকে। সে কামানলে দগ্ধ হয়। নির্জনে তার প্রতি বাঁকা চোখে তাকায়। আপন অঙ্গ প্রদর্শন করে তাকে মনের ভাব বোঝায়। নায়ককে বশ করা দুঃসাধ্য জেনেও গণিকা আজীবন দুঃখ পায়। তারা সর্বদা নতুন নতুন পুরুষের কথা চিন্তা করে। গন্ধর্বদের মধ্যে কামশাস্ত্রে পারদর্শীও রতিতে নিপুণ কোন যুবক বিশেষ প্রিয় নয়। কামই বেশি প্রিয়। তার সমান প্রিয় আর কেউ হতে পারে না। চাঁদের কাছ থেকে ফিরে যে বলিপুত্রের বাসনা পূর্ণ করবে।

বলিপুত্র হাসলে সে তার সুন্দর পীনোন্নত গোল ও কোমল স্তন দুটি, সুন্দর শ্রোণিদেশ যা রম্ভাকেও হার মানায়, তা দেখাতে লাগল। তার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হল। বলিপুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে সূক্ষ্ম কাপড়ে মুখ ঢাকতে লাগল। কামুক বলিপুত্র তাকে বলল, নারীকে বলাৎকার করা ধার্মিকের উচিত নয়। তুমি রতিশূরের কাছে এসে শৃঙ্গার সুখ দান কর। তার কথা শুনে গণিকার গলা শুকিয়ে গেল। সে বলল, আপনাকে ফিরিয়ে চাঁদের কাছে যেতে পারব না। যে স্ত্রীকে অপমান করে চলে যায় সতী পার্বতী তার বিপদ ঘটায়। বলিপুত্র তখন তার হাত ধরে গাঢ় আলিঙ্গন করে সেই পদ্মের মত সুন্দর মুখে গভীর চুম্বন করলেন। গন্ধমাদনের গহ্বরে গিয়ে রমণের স্থান তৈরি করে শুয়ে পড়লেন। নানা শৃঙ্গার করলে তিলোত্তমা তাকে কামদেব অপেক্ষা বিচক্ষণ মনে করল।

তিলোত্তমা তাকে আপন স্তনে ধারণ করল এবং বলল আপনি আর কিছুক্ষণ থেকে আবার গাঢ় আলিঙ্গন করুন। এরপরই তারা আবার দারুণ সঙ্গমসুখে মূর্ছিত হল। দৈত্যরাজ কুলটার আলিঙ্গনে কামাতুর হলেন। তিনি আট রকম শৃঙ্গার ও নয় রকম চুমু খেলেন। চুড়ি ও নুপূরের শব্দ হতে থাকলে দুর্বাসার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। তারা কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি। দুর্বাসা চোখ খুলে তাদের কামাতুর অবস্থায় দেখলেন ও ক্রুদ্ধ হলেন। তার চোখ লাল হয়ে উঠল। তিনি রেগে বললেন– বলিরাজের পশুর সমান কুপুত্র। কেবলমাত্র পশুজাতিরই কোন লজ্জা নেই। পশুর মধ্যে খরজাতিরই কোন বিশেষ লজ্জা নেই। তুই খর যোনিতে জন্মা। আর তিলোত্তমাকে বললেন–দানব হয়ে জন্মাতে, তখন তাঁরা ভয়ে ও লজ্জায় তার স্তব করতে লাগলেন– –হে করুণানিধি, আপনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন, তিনিই সাধু যিনি কেবল লোকের অপরাধ ক্ষমা করেন।

দাঁতে ঘাস কাটতে কাটতে দৈত্যরাজ মুনির পায়ে পড়ে জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন। বিধাতার সৃষ্টি স্ত্রী জাতি অত্যন্ত বোকা, তার মধ্যে গণিকারা বেশি মত্ত ও কামুক। কামুকের নেই লজ্জা ও ভয়। এরকম শোনা যায় যে বিপদে না পড়লে জ্ঞান হয় না। তাদের কাতর প্রার্থনায় মুনির দয়া হলে তিনি বললেন–প্রাণীরা আচমকা কারো বর বা শাপ লাভ করে থাকে। সবকিছু নিশ্চয় পূর্বজন্মের কর্মফলে হয়। তুমি বলির পুত্র, সকুলে তোমার জন্ম। তোমার বাবার থেকেও তুমি বেশি বিষ্ণুভক্ত। পুত্রের মধ্যে পিতার স্বভাব বর্তমান থাকে। তার বড় প্রমাণ কালীয়নাগের মাথায় শ্রীকৃষ্ণের পায়ের ছাপ। তুমি গাধা হয়ে জন্মলাভ করে মুক্তি পাবে। পূর্বজন্মের করা পূজোর ফল অন্তকালে লোপ পায় না। এখন ব্রজের কাছে বৃন্দাবনের নলবনে যাও। পরে হরিচক্রে প্রাণত্যাগ করে মুক্তি লাভ করবে। আর তিলোত্তমাকে বললেন– তুমি নলরাজার কন্যা হয়ে জন্মে কৃষ্ণের পৌত্রের সাথে মিলিত হয়ে এখানে আসবে।

২৪.

দুর্বাসার কি করে স্ত্রী সংযোগ হয়েছিল নারদ তা জানতে চাইলেন। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরও খারাপ সংসর্গে খারাপ দোষ দেখা দেয়। মুনির মনে সুরতস্পৃহা জেগে উঠলে তিনি কামাসক্ত হয়ে তপস্যা ফেলে নারীর চিন্তা করতে লাগলেন। মহামুনি ঔর্ব তাঁর কন্যার সাথে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঐ কন্যা ঔর্বের জানু থেকে জন্মায় বলে তার নাম হয় জানুদ্ভবা। সে প্রার্থনা করে, দুর্বাসাকে, অন্য কাউকে তার প্রতিরূপে চাই না। তারা দুর্বাসার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঔর্ব দুর্বাসা আলিঙ্গন করে তাঁকে মেয়ের মনের কথা বললেন। এই মেয়ে অযোনিসম্ভবা ও সকল রূপ গুণের আধার। এমনকী ত্রৈলোক্যকেও মোহিত করে রাখতে পারে। কিন্তু এ অত্যন্ত ঝগড়াটে ও মুখরা। কিন্তু এতে তার সকল গুণ নষ্ট হয় না। দুর্বাসা আনন্দের সঙ্গে কন্যাকে দেখলেন। এমন অপরূপ সুন্দরী কন্যাকে দেখার সাথে সাথে দুর্বাসা কামাতুর হয়ে পড়লেন ও বললেন–নারীরা সকল পথে বাধাদায়ক। এটাই সবথেকে ভয়ংকর শিকল। শঙ্করাচার্যও তাকে ছেদন করতে পারে না। আবার স্ত্রী যদি ভাল হয়, স্বামী যতদিন স্ত্রীর সঙ্গে থাকে ততদিন তার জন্মের খন্ডন হয় না। পূর্ব জন্মের কোন কাজের ফলে যে হরির চরণ-কমল ধ্যান করার সময় আমার বিঘ্ন ঘটাল তা আমার জানা নেই।

গণিকার সাথে দৈত্যের শৃঙ্গার দেখে তাঁর মন কামাসক্ত হয়েছে। স্ত্রীর খারাপ কথা সহ্য করা নিন্দার ব্যাপার। যে স্ত্রীর পরাগত তাকে সাধুরা বেশি নিন্দা করেন। আপনার মেয়েকে আমি গ্রহণ করব। কোন গণিকাকে যদি ধর্মের ভয়ে কোন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ত্যাগ করে তবে তারও নরকে স্থান হয়।

পিতা কন্যাকে বললেন–একমাত্র নিজ স্বামীই ইহলোক ও পরকালের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। স্বামী থেকে প্রিয় ও পরম গুরু কেউ নেই কুলনারীদের কাছে। পতিভক্ত নারীর কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। ধার্মিক যে নারী স্বামীকে কটু কথা বলে তার সাত জন্মের পুত্র নষ্ট হয়ে যায়। ঔর্ব কন্যাদান করে সান্ত্বনা দিয়ে চলে গেলেন। দুর্বাসা স্ত্রীর সাথে সুখে বাস করতে লাগলেন। তিনি কামাসক্ত হয়ে সম্ভোগের ইচ্ছা করা মাত্রই কামিনীকে পেয়ে গেলেন।

দুর্বাসা রতিশয্যা তৈরি করে প্রিয়াকে নিয়ে শুয়ে পড়লেন ও নানা রূপ শৃঙ্গার করতে লাগলেন। নন্দিনী নতুন সঙ্গ মাত্রেই মূর্ছা গেল। তিনি মহানন্দে প্রত্যহ সঙ্গম করতে লাগলেন। মুনি ক্রমে তপস্যা ছেড়ে গৃহী হলেন। কন্দলি ঝগড়া করলে মুনি যুক্তি নীতি দিয়ে তাকে বোঝালেন। কন্দলি কথার প্রভাবে জগৎ ভয়ে কাঁপতে থাকে। মুনিও রাগে কাঁপতে থাকেন। কন্দলিকে সান্ত্বনা দিলেও সে শান্ত হয় না। এদিকে খারাপ কথা একশো ছাড়িয়ে গেল, তাঁর মন পুড়তে লাগল স্ত্রীর কথায়।

স্ত্রীর কাছে স্বামী প্রাণের থেকেও বেশি প্রিয়, আবার স্ত্রীও স্বামীর কাছে অধিক প্রিয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রুতা আরম্ভ হল। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্বাসার অভিশাপে কন্দলি ছাই হয়ে যায়। দুর্বাসা বুঝতে পারলেন, কর্মের ফলে যা হবার হয়েছে। মহামুনি দুঃখে জ্ঞান হারালেন। জ্ঞানী লোকেদের স্ত্রী বিচ্ছেদ সকল শোকের থেকে ভয়ংকর। মুনি যোগাসন করে প্রাণত্যাগ করতে যাবেন তখন সেখানে এক ব্রাহ্মণ বালক এসে হাজির হল। তার হাতে লাঠি, ছাতা, পরনে লাল চেলী ও কপালে তিলক। বৈদজ্ঞদের গুরু ও মহাজ্ঞানী এই অল্পবয়সী বালক। দুর্বাসা তাকে ভক্তি করে পুজো করলেন। এই বালকের আশীর্বাদে মুনির মনের সকল দুঃখ দূর হল। সে দুর্বাসাকে নীতির কথা বলল।

সে গুরু মন্ত্রের প্রভাবে সবকিছু জানতে পেরেছিল। তার কাছে কোন কিছু অজানা নেই। ব্রাহ্মণদের তপস্যাই একমাত্র ধর্ম। তপস্যার সাধ্য তিন জগত। আপনার স্ত্রী ছিল মুখরা। তাই অল্পকালের মধ্যেই অদৃশ্য হয়েছে। বসুদেবের মেয়ের নাম একনংশা, সম্পর্কে হরির বোন। তার জন্ম পার্বতীর অংশে, সে অত্যন্ত সুশীলা। সে আপনার পত্নী হবে। কন্দলী পৃথিবীতে গিয়ে কলা গাছ হয়ে জন্মাবে। একবার জন্ম লাভ করে কেউ শুভকল দান করতে পারে না।

কলি অন্য কল্পে আপনার পত্নী হবে। বেদে বলা আছে অতি গর্বিতের দমন হওয়াই উচিত। মুনি ভুল বুঝতে পেরে তপস্যায় মন দিলেন। দৈত্য তাল বনে গিয়ে গর্দভ আকার ধারণ করল। তিলোত্তমা বানের মেয়ে হয়ে জন্মালেন। দৈত্যরাজ বিষ্ণুর চক্রে প্রাণত্যাগ করে সেই শ্রীহরির

চরণ কমলে ঠাঁই পেলেন। যে হরির চরণ দুর্লভ ও মুনিরাও কামনা করে থাকেন। বাণের মেয়ে তিলোত্তমার কৃষ্ণের পৌত্রের আলিঙ্গন লাভের বাসনা পূর্ণ হয়ে গেলে আবার আগের মত তিলোত্তমা রূপ ধারণ করে সে নিজের জায়গায় ফিরে এলো।

২৫.

নারদ এবার জানতে চাইল যে, দুর্বাসার শাপে ঔবমুনির কন্যা মারা গেলে মুনি কিভাবে ঘটনাটি গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় সরস্বতীর তীরে তপস্যা রত ছিলেন মুনি। মাথায় কাপড় প্রবল বাতাসে মাটিতে পড়ে গেল, মুনি ধ্যানে ধ্যানস্থ হয়ে তপোবনে কন্যার বিপদ জানতে পারলেন। তিনি শোকাবিষ্ট হয়ে সত্ত্বর আশ্রমে গেলেন। বিপ্রবর ওর্বর, জামাইয়ের আশ্রমের কাছে গিয়ে আকুল হয়ে "কন্দলি কন্দলি' বলতে লাগলেন। দুর্বাসা তখন ভয়ে তাঁর পায়ে আছড়ে পড়লেন।

ঔর্ব বললেন, তোমার বাবা মহর্ষি জমদগ্নি অত্যন্ত গুণবান এবং তোমার মা তো সাধ্বী গুণবতী। তাদের পুত্র যে এরূপ নির্দয় রাগী হতে পারে তা আশ্চর্য। বেদ বোঝা মহা কঠিন। কর্কশভাষী স্ত্রীকে ত্যাগ করাই তার যোগ্য শাস্তি, কিন্তু তুমি অল্প দোষে একাজ করেছ, তোমার পরাজয় হল। দুর্বাসা বারবার প্রিয়াকে মনে করে কাঁদলেন ও পরে ভুল বুঝতে পেরে তপস্যায় মন দিলেন।

সূর্য বংশের এক রাজা অম্বরীষ সর্বদা কৃষ্ণের ধ্যান করতেন। তিনি একবার একাদশী ব্রত ও কৃষ্ণপূজায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি সকল কর্মের ফল কৃষ্ণকে দান করতেন। একদিন রাজা একাদশী ব্রত করে দ্বাদশীর দিন স্নান করে নিয়মমতো হরি পূজা করলেন যখন ও ব্রাহ্মণদের খাইয়ে। খেতে বসেছেন, ঠিক তখন ক্ষুধার্ত এক তপস্বী শুকনো গলায় উপস্থিত হলেন। তিনি স্বয়ং দুর্বাসা। রাজা তাঁকে পাদ্য অর্ঘ ও সোনার সিংহাসন দান করলেন।

দুর্বাসা তাঁর কাছে খাবার চাইলেন। কিন্তু রাজাকে অপেক্ষা করতে বলে অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। দ্বাদশী তিথি কেটে গেল ব্রতী যদি ত্রয়োদশী তিথিতে পারণ করেন, সেই পারণ উপাবসের ফলকে নষ্ট করে। এর পরিণামে একাদশীর উপবাসীর ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ হয়। তার সকল খাদ্য দ্রব্য মদের মত হয়। যদি কোন বোকা লোক অতিথিকে না খাইয়ে ক্ষুধার জ্বালায় নিজে খেয়ে নেয় সে কুম্ভী পাক নরকে গিয়ে চণ্ডাল হয়ে জন্মায়। প্রতি জন্মে দরিদ্র ও রোগী হয়। তাই রাজা তার শ্রীকৃষ্ণ অর্চনার চরণামৃত পান করে উপবাসের ফল রক্ষা

করলেন। জলপান করা উপপাসের সমাণ এতে কোন অতিথি সৎকারের ক্ষতি হবে না। রাজা কৃষ্ণের পাদপদ্মের ধ্যান করে চরণামৃত পান করলেন।

দুর্বাসা তপস্যা বলে সব জানতে পেরে খড়গ হাতে নিজে রাজাকে হত্যা করতে হাজির হলেন। হরি তখন কৃষ্ণভক্ত রাজাকে বাঁচাতে সুদর্শন চক্র দ্বারা ব্রাহ্মণকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। দুর্বাসা তখন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র থেকে বাঁচবার লক্ষ্যে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মার কাছে বাঁচাও, বাঁচাও বলে চিৎকার করতে লাগলেন।

ব্রহ্মা সব শুনে বললেন–তুমি কার তেজে হরির দাসকে বধ করতে গেলে? হে ব্রাহ্মণ! যে বোকা বিষ্ণুর প্রাণের সমান প্রিয় বৈষ্ণবদের হিংসা করে তাকে হরি সংহার করে থাকেন। হরি নিজের গুণাগুণ শুনে তৃপ্তি লাভের জন্য ভক্তদের সাথে ছায়ার মতো সব সময় ঘুরে বেড়ান। ব্রাহ্মণদের থেকেও ভক্তরা তাঁর কাছে বেশি প্রিয়।

হরির স্মরণ করলেই সকল বিপদ দূর হবে। শীঘ্র বৈকুণ্ঠে যাও, বৈকুণ্ঠই তোমার শরণ। হরি তোমাকে নিশ্চয়ই অভয় দেবেন। দয়ারসাগর শিব দুর্দান্ত চক্র দেখে পার্বতীর সাথে মনের আনন্দে ব্রাহ্মণকে আশীর্বাদ করলেন যেন ব্রাহ্মণ বিপদ থেকে উদ্ধার পায়।

দুর্বাশা পরে মনের গতিতে বৈকুণ্ঠ ভবনে গিয়ে সেখানেও তার পশ্চাৎ ধাবিত সুদর্শন চক্রকে দেখে দেখে হরির আশ্রমে ঢুকে পড়লেন এবং দেখলেন হরি রত্ন সিংহাসনে বসে আছেন। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ভক্তরা তাঁর নাম গান করছে, দুর্বাসা স্তব-স্তুতি করে বললেন– আপনি দীনজনশরণ্য আমাকে ত্রাণ করুন। আপনি বিপদ হরণকারী।

শ্রীহরি দুর্বাসা স্তোত্র শ্রবণে অমৃত তুল্য মধুর বচনে মুনিকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তোমাকে বর দিচ্ছি, তোমার কল্যাণ হবে। তিনি বললেন, হে মুনি! রাজা অম্বরীষ অহিংস্র করুণাময় সকল প্রাণীর প্রতি সদয় তাকে বধের অভিপ্রায়ে কেন নিমগ্ন হলে? তুমি অম্বরীষের আলয়ে যাও, সে ছাড়া কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

অম্বরীষের কাছে গিয়ে রাজার প্রতি প্রীতি উৎপাদন করুন। দুর্বাসা এক বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ালেন। রাজা তখনও সস্ত্রীক অনশনে দিন কাটাচ্ছেন।

স্তন্যপায়ী শিশু দেখলে মা যেমন আহার করে না, তেমন উপবাসী ভক্তের জন্য হরিও অনাহারে রয়েছেন। শ্রী দেবীও আগে ভক্তদের না দিয়ে আমায় কোন কিছু দিতে পারেন না। তুমি রাজগৃহে যাও।

মনের তুল্য দ্রুত বেগে হরিধাম ত্যাগ করে মুনি প্রস্থান করলেন। মুনিকে দেখে সিংহাসনের থেকে উঠে শ্রদ্ধা সহকারে তাকে প্রণাম করলেন রাজা অম্বরীষ।

মুনিকে মিষ্টি খাইয়ে উপবাস ভঙ্গ করলেন। মুনি প্রীত হয়ে নিজ নিকেতনে গমন করলেন।

২৬.

যত রকম ব্রত আছে তার মধ্যে দুষ্প্রাপ্য হলো এই একাদশী ব্রত। মঞ্জুরীর মধ্যে যেমন তুলসী, মাসের মধ্যে যেমন মার্গশীর্ষ, গন্ধর্বদের মধ্যে যেমন চিত্ররথ, রাক্ষসদের মধ্যে যেমন সুমালী, রূপসীদের মধ্যে যেমন অপ্সরা রম্ভা, সমুদয় ব্রতের মধ্যেও তেমনি একাদশী ব্রত সর্বোত্তম। যেহেতু এই ব্রত নিত্য সেহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র- এই চতুর্বর্ণের পালনীয়। আর সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের এই ব্রত অবশ্য পালনীয়।

কৃষ্ণব্রতের কালে ব্রহ্মাহত্যার মতো গর্হিত কর্মও অন্নকে আশ্রয় করে থাকে তাই একাদশীতে অন্নভোজন করলে ব্রহ্মহত্যা যদি হয় আর তার ফলে কুম্ভীপাক নামক নরকগামী হতে হয়। দ্বাদশী পালন না করলে যা দোষ হয় তা আগেই বলেছি।

দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী তিথির ব্রত যেদিন থাকে, সেই দিন আহার করে পরের দিন অনশনে থেকে ব্রত উদযাপন করা কর্তব্য। দ্বাদশীতে ব্রত এবং ত্রয়োদশীতে ব্রতজনিত উপসের পর প্রথম ভোজন করলে দ্বাদশী লঙঘন দোষ হয় না।

ব্রতচারী দিনমানের প্রথমাংশ অর্থাৎ মধ্যাহ্নের পূর্ববর্তী কালে আতপ চালের ভাত তৎসহ সিদ্ধ ব্যঞ্জন ও ঘৃত গ্রহণ করে, সেদিন আর জল পান না করে কুশতৃণের শয্যায় একলা শয়ন করবে। নিত্য পূজা সম্পন্ন হলে ব্রতের উপাদান সামগ্রী যথা- আসন, পরিধেয় বস্ত্র, গন্ধ, স্নানের উপকরণ ইত্যাদি, ষোড়শোপচারের সামগ্রী দিনেরবেলায় সংগ্রহ করে ব্রতী রাতে ব্রত করবে। যারা ভক্ত নয় তাদের কাছে এই জটিল দুজ্ঞেয় রহস্যময় ধ্যান বৃত্তান্ত গোপনীয়। এই ধ্যান ভক্তদের জীবনের তুল্য প্রিয়।

২৭.

গোপিনীরা অত্যন্ত কামবিষ্টা হয়ে, কার্তিক মাসে ব্রত শুরু করে সারামাস চিত সংযম করে, রকমারি ফল ও মণি-মুক্তো দ্বারা নানা ধরনের তরঙ্গ সৃষ্টি করে দেবীর পূজো করবে। এবং বলবে নন্দের নন্দনকে আমাদের স্বামীরূপে দান কর। প্রণত হয়ে বলবে সর্বমঙ্গলের মঙ্গল্যস্বরূপা শঙ্করপ্রিয়ে দেবী মনোবাঞ্ছা পূরণ করো।

একার্ণবকালে চন্দ্র সূর্যের অগোচরহেতু জগৎ যখন ঘন তমিস্রায় আচ্ছন্ন হয় এবং কাজল কালো জলরাশিতে প্লাবিত হয় তখন ভাসমান হরি ব্রহ্মাকে এই স্তব প্রদান করে জলে শায়িত হয়েছিলেন।

দুর্গার আটনাম নাভিকমলে স্থিত ব্রহ্মাকে দান করে নারায়ণ শায়িত হয়েছিলেন। মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে বধ করতে প্রবৃত্ত হলে ব্রহ্মা নিদ্রাস্তব করলে দূর্গা তাকে সর্বক্ষণ নামক স্বর্গীয় কৃষ্ণ কবচ দান করেছিলেন।

এই কবচ পেয়ে ব্রহ্মা নিভকি হয়েছিলেন। ত্রিপুরাসুরের সঙ্গে সংগ্রামরত মহাদেব রথসহ ভূপতিত হলে ব্রহ্মা প্রদত্ত এই দিব্য কবচ পাঠে শিবের পরিত্রাণ এবং তার জয় সুনিশ্চিত করার জন্য মহাশক্তি দুর্গার সঙ্গে বৃষরপে আবির্ভূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ রথসহ শিবকে মাথায় করে উত্তোলিত করে সাহস সঞ্চার করেছিলেন। অতঃপর শিব মহানিদ্রা ও শ্রীহরিকে স্মরণ করে কবচ প্রভাবে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে ত্রিপুরাসুরকে বধ করেন। সর্বমঙ্গলা স্তোত্র পাঠ করলে সমুদয় বিঘ্ন দূর হয়। স্থানচ্যুতি ও বিত্তনাশে, জাতি ভ্রষ্টে শোকে, মনোভঙ্গে কপট ব্যক্তির হাত থেকে পরিত্রাণে, সর্পের বিষক্রিয়ায় এই স্তবের স্মরণমাত্র মুক্তি লাভ হয়।

২৮.

নারদ বৃন্দাবন ও রাসলীলা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। নারায়ণ বললেন, চৈত্রমাসের শুক্ল ত্রয়োদশীর রাতে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠলে শ্রীহরি বৃন্দাবনে গিয়ে মুগ্ধ হলেন। ভ্রমরের গুঞ্জন, কোকিলের কুহুতান দারুণ পরিবেশ রচনা করেছে। রাস মণ্ডল রচনা হয়েছে। সেই রাসমণ্ডল প্রত্যক্ষ করে সস্মিত মধুসূদন কামাতুরা সম্ভোগ অভিলাষী হয়ে গোপিনীদের আকর্ষণের করার জন্য বাঁশি বাজান।

মন যখন কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে তন্ময় হয়ে পড়ে। তখন ক্রিয়াবিহীন হয়ে যায় অন্য চার ইন্দ্রিয়। বাঁশির সুরে রাধার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়েছিল, তিনি সুরের অনুসরণে ছুটে চললেন তাতে

অগণিত গোপালনরা যোগ দিলেন। তারা পূর্ণ যৌবনা। তারা কৃষ্ণের অনুগামিনী হল। দশ হাজার গোপিনী ললনার অনুগমন করল দশ হাজার গোপী।

রতির সঙ্গেও দশ হাজার গোপাঙ্গনা, চোদ্দ হাজার গোপিনী চন্দনার সঙ্গে গেল। তারা কেউ মালা হাতে, কেউ চন্দন নিয়ে, কেউ চামর হাতে, কেউ কস্তুরী হাতে, কেউ কুধুম হাতে, কেউ স্বর্ণ ও বস্ত্রাদি বয়ে নিয়ে এল। কৃষ্ণ সখী– পরিবৃতা রাধাকে দেখে অত্যন্ত প্রীত হলেন।

সালংকৃতা রাধা উত্তম পরিধেয় বস্ত্রে শোভিতা। তারা উভয়ের দর্শনে চেতনা হারালেন। চেতনা ফিরে এলে কামাতুর কৃষ্ণ রাধাকে চুম্বন করলেন। তাদের কামাসক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল। কৃষ্ণের চর্বনীয় তাম্বুল রাধা সানন্দে খেলেন। পরিশেষে রতিশয্যায় শায়িত হলেন।

রতিমন্দিরে কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে সঙ্গমলিপ্ত হলেন। — তাঁদের সম্ভোগেচ্ছা কিছুতেই মেটে না। হরিও নানা রূপ ধরে গোপিনীদের সাথে রাসমগুলে নৃত্য করেছেন। অবাধ উদ্দাম লীলায় তাদের দেহে শ্রান্তি ঘনিয়ে এল।

নিরাবরণ শরীরে তারা জল থেকে উঠে এসে আয়নায় নিজেদের মুখ দেখলেন ও বস্ত্র পরিধান করলেন। কৃষ্ণও কখনও কখনও গোপিনী বসন কেড়ে নিয়ে তাকে নগ্না করলেন।

রাধাকে মালতি মালা পরিয়ে চুম্বন করলেন। তিনি গোপিনীদের সাথে যৌনলীলায় মত্ত হলেন। কৃষ্ণ তাদের স্তনে, শ্রোণী দেশে গভীর নখক্ষত সৃষ্টি করলেন। রাসমগুলের যৌনলীলা দেখে দেবতাদের শরীরও রোমাঞ্চিত হল। মিলন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে স্মিতাননা সতীর দেহে কামনার সঞ্চার হলো, তারা সবাই যৌন কামনার চঞ্চল হলেন।

কৃষ্ণ অনাবৃত রাধিকাকে বুকে চেপে ধরলেন। কুপিতা রাধা তাঁর বাঁশি নিয়ে জলে ফেলে দিলেন। জলকেলী শেষ হয়ে উভয়ে বস্ত্র প্রার্থনা করলেন উভয়ের কাছে, তাঁরা বস্ত্র পরিধান করলেন। রাধাকে উষ্ণ আলিঙ্গনে ঘন ঘন চুম্বন করলেন কৃষ্ণ। পুনরায় কামাতুর হয়ে রাসমগুলে গমন করলেন। তাদের কামপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল। যৌবন মদমত্ত দেবীরা ভারতবর্ষীয় রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করলেন।

২৯.

পরিণতবয়স্কা গোপিণীদের আত্মসম্মান থাকলেও তাঁরা প্রত্যেকে কৃষ্ণকে পতিরূপে কামনা করেছিলেন। কেউ তাঁকে কোলে বসাতে বললেন, কেউ মালা বা কেউ টিপ পড়াতে বললেন।

আকারে ইঙ্গিতে তাঁরা কামোদ্বেগ প্রকাশ করলেন। গোপাঙ্গনাদের কামোত্মত্ততা অবলোকন করে কৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে নির্জন স্থানে গিয়ে সম্ভোগরত হলেন। কৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে সরোবরে স্নান করলেন।

কিছুটা দূরে গিয়ে কৃষ্ণ একটা বিরাট বটগাছ দেখলেন। সেখানে কেয়াবন রয়েছে। তিনি দেখলেন এক কৃষ্ণবর্ণ সর্বাবয়ব বক্র মুনি হরির অঙ্গরূপ লাবণ্য দেখে এগিয়ে আসছেন। তিনি অষ্টাবক্র মুনি। তিনি শ্রীহরির পাদপদ্মে প্রণত হলেন, তার দেহ থেকে বহ্নির তেজ নিঃসৃত হয়ে অতল, বিতল, সুতল, মহাতল, তলাতল, রসাতল, পাতালে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে সংকুচিত হয়ে কৃষ্ণের চরণকমলে লীন হয়ে গেল। যিনি ভোরে ঘুম থেকে উঠে অষ্টাবক্র স্তোত্র পাঠ করেন নিঃসংশয়েই তিনি মোক্ষলাভ করেন।

৩০.

মুনির মৃত্যুতে কৃষ্ণ সত্ত্বারের ব্যবস্থা করে শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন। মুনির শব থেকে ভস্ম নির্গত হল। কারণ তিনি ষাট হাজার বছর নিরঙ্কু উপবাস করায় জঠরানলে দগ্ধ হয়েছিলেন, ফলে তাঁর রক্তমাংস বলে কিছু ছিল না। তাঁর বাহ্য জ্ঞান লুপ্ত হয়েছিল।

এর কিছুকাল পরে বিধির পুত্র প্রচেতার অসিত নামে এক পুত্র জন্মাল। তিনি মুনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অসিত পত্নীর সঙ্গে হাজার বছর কঠোর তপস্যা করলেন। কিন্তু অসিত পুত্র-প্রাপ্তির পরম সুখে বঞ্চিত হলেন। তিনি প্রাণ বিজর্সন দিতে উদ্যোগী হলে দৈববাণী হল, শঙ্করের কাছে দীক্ষিত হয়ে যে মন্ত্র পাবে সেই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমার মনস্কামনা পূরণ করবেন।

দৈববাণী শুনে, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শিবলোকে গেলেন। ব্রহ্মকে প্রচেতা এবং প্রচেতা আত্মজ অসিতকে স্তোত্র প্রদান করলেন।

স্নেহশীল মহাদেব অসিতকে বললেন, অচিরেই সে রূপে গুণে তার অনুরূপ এক পুত্র লাভ করবে। শিবের অংশে অসিতের এক পুত্র জন্ম নিল। তার নাম দেবল, সুযজ্ঞরাজতনয়া পরমা সুন্দরী রত্নমালাবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

একদিন শয়নকালে তার সুতীব্র বৈরাগ্য জাগায় তিনি তপস্যার জন্য গন্ধমাদন পর্বতের গুহায় গমন করলেন। বিচ্ছেদ কাতর রত্নমালাবতী আহার ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করলেন। একদিন রম্ভা কামাতুর হয়ে মুনিকে আহ্বান করে বললেন–আমার কথা শোন। অসীম এই নির্জনতার

মাঝে আমার সঙ্গে যৌন সংসর্গে রত হও। সংযতেন্দ্রিয়ের যে ব্যাক্তি এহেন শান্ত নির্জন পার্বত্য ভূমিতে নারীর ললিত যৌবন উপভোগ করে না, সে কুম্ভীপাক নরক যন্ত্রণাভোগ করে। যে সঙ্গমে তাকে তৃপ্ত না করে বেশ্যা তাকে বধ করতেও কুণ্ঠিত হয়না। জনশূণ্য মনোরমা এই প্রদেশে আমার সঙ্গে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হয়ে স্বর্গসুখ লাভ কর। মুনি তখন ভীত হয়ে তাকে নীতি কথা বললেন– ব্রাহ্মণ গার্হস্থ্য আশ্রমে স্বীয় স্ত্রীর সঙ্গে রতিক্রীড়া রত হয় সে ইহলোকে এবং পরলোকে পূজ্য বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু পরস্ত্রী উপভোগে সে লক্ষীছাড়া হয় এবং একশো বছর নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

ব্রহ্মা স্ত্রী সংসর্গে রত হয়েছিলেন। তাই নারীর প্রতি বিতৃষ্ণা না জাগতে পারে কিন্তু আমি তপস্বী এবং সর্বতোভাবে রমণী সঙ্গত্যাগ করেছি–সে ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র আমি। আমাকে পরিত্যাগ করে তুমি মাতঃ কামাতুরা অন্য কোন কামাতুর যুবকের কাছে যাও।

রম্ভা তা শুনে রুষ্ট হয়ে বললেন। কামাতুরা অঙ্গরা তোমাকে ছাড়া কোনোভাবেই বাঁচতে পারবে না। আমাকে সম্ভোগের মধ্যে দিয়ে অবিলম্বে তৃপ্ত কর। তুমি আমার কামনার তেজ না মেটালে তোমায় শাস্তি দেব।

মুনি তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে পুনরায় ধ্যানমগ্ন হলে রম্ভা স্বরূপ শাস্তি বলেন, তুমি ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ হবে, তোমার সারা শরীর বেঁকে যাবে। তপস্যা লব্ধ ফল বিনষ্ট হবে।

রম্ভা অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহরির পাদপদ্ম তাঁর চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হল। শোকার্ত মত মুনি প্রাণ বিসর্জনে উদ্যত হলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বর দিলেন। তারপর মুনি শান্ত ও তৃপ্ত হলেন। এবং অষ্টাবক্র নাম নিলেন। বহুকাল পরে মুনি নিরাহারে থেকে কঠোর তপস্যা করেছিলেন বলে জঠরাগ্নিতে তাঁর দেহ দগ্ধ ও ভস্মাচ্ছাদিত হয়েছিল।

৩১.

ব্রহ্মা কোন গণিকা দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলে–নারদ তা শুনতে চাইল। সুচন্দ্র নামে রৈবত মন্বন্তর যুগে একজন রাজা ছিলেন। তিনি মলয় পর্বতে হাজার বছর ধরে হরির আরাধনা করেন। তার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হলো ও সর্বাঙ্গ বল্মীকাচ্ছদিত হলো। ব্রহ্ম তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে বর চাইতে বললেন।

রাজা বললেন–কৃষ্ণের ভক্ত ও দাস হয়ে থাকতে চান। ব্রহ্মাও তাঁকে তাঁর আকাঙিক্ষত বর দিলেন। ব্রহ্মাকে দেখে মোহিনী কামাতুরা হল। রম্ভা কামপীড়িতা সখীকে দেখে বললেন– ত্রিলোক তোমার রূপ যৌবনে মুগ্ধ যার সঙ্গে যৌন-মিলনের জন্য তুমি উন্মুক্ত হয়েছ সেও তোমাকে পাবার জন্য উন্মুক্ত। মোহিনী লজ্জিত হয়ে বলল–রম্য উদ্যানে ব্রহ্মাকে দেখে আমার এ অবস্থা।

এখন আমি কি প্রাণ বিসর্জন দেব? না লজ্জা ও সংকোচ ত্যাগ করে যৌন কামনা নিবৃত্তির জন্য প্রিয়গামিনী হব। রম্ভা তাকে বললেন, তুমি পুষ্কর তীর্থে গিয়ে কামদেবের পূজা কর। মোহিনী সেখানে গিয়ে তপস্যা করে বহুদিন পরে কামদেবের দেখা পেল। কামদেব তাকে নিয়ে ব্রহ্মলোকে গেলেন। মোহিনী নাচ ও গান শুরু করল। তাতে ব্রহ্মা সমাহিত হলো। নানা ভাবে মোহিনী তার লোভনীয় অঙ্গের সঙ্গে ব্রহ্মার পরিচয় সাধনে রত হলে পদ্মযোনি মোহিনীর অভিপ্রায় বুঝতে পেরে মাথা নত করলেন, এবং পরে শ্রীহরিকে স্মরণ করে মোহিনীর গান শ্রবণ থেকে বিরত হলেন।

৩২.

মোহিনীর স্তোত্রে প্রীত হয়ে পুষ্পকেতন ব্রহ্মার প্রতি মন্ত্রপুত অব্যর্থ শর নিক্ষেপ করলেন। ব্রহ্মাও কামাতুর হলেন। তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য হরির পাদপম স্মরণে শান্ত হলো। তিনি বুঝলেন এ সব মদনের কাজ। তিনি কামদেবকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, অচিরেই তোমার অহংকার ধূলায় লোটাবে, মোহিনীকে বললেন–তিনি– যে, পুরুষ পতিতার প্রতি অনুরক্ত তুমি তার কাছে যাও। বেশ্যার প্রতি যে আসক্ত হয় তার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। তুমি উপযুক্ত সুন্দরী; তাই উপযুক্ত পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনের আনন্দ উপভোগ কর। পৃথিবীতে তোমার মিলনযোগ্য পুরুষের অভাব নেই। নারায়ণ স্ত্রী জাতিকে প্রকৃতির অংশ রূপে সৃজন করেছেন। যাঁরা সতী তাঁরা সকলের শ্রদ্ধা অর্জনে সফলকাম হন আর অসতী কন্যা নিন্দাভাগিনী হয়। মোহিনী ছলে-বলে-কৌশলে আপন দেহের স্পর্শ কাতর অংশগুলি একে একে ব্রহ্মাকে দেখাতে শুরু করে কাম এসে ব্রহ্মাকে পঞ্চশর নিক্ষেপ করে। ব্রহ্মার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল ও সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হলো। কিন্তু তিনি হরিকে স্তব করে তাঁর চরণ স্মরণ করতে লাগল।

৩৩.

ব্রহ্মা হরির বরে কামকে বশ করলে মোহিনী তাকে ব্যঙ্গ করে বলে যে কাম পীড়িতা রমণীর ইঙ্গিতে সাড়া দিয়ে সম্ভোগে লিপ্ত হয় সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যে রমণীর দ্বারা প্রকাশ্যে প্রার্থিত হয়ে

অবশেষে যৌন মিলনে রত হয় সে মধ্যম পুরুষ, আর যে যে কামিনীকে পেয়েও ভোগ করে না সে ক্লীব। ব্রহ্মা বললেন–রমণীর সংকোচ পরিহার করা অনুচিত। তুমি কামনা তৃপ্তকারী পুরুষের সন্ধান কর।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন–নারীজাতি প্রকৃতিরই অংশ, তারা জগতের বীজস্বরূপা। কোন মিলনমদির কামিনীকে সংযেতন্দ্রিয় ব্যক্তি ত্যাগ করলে রমণী তাকে শাপ দেয়। কোন কামার্ত রমণী পুরুষের কাছে এলে তার সঙ্গে সঙ্গম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩৪.

বিষ্ণুর সভায় বৃষারূঢ় মহাদেব এলেন। শঙ্কর ব্রহ্মাকে প্রণাম করে প্রফুল্ল বদনে উপবিষ্ট হলেন। গঙ্গাধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁর ভবনে এলেন সুরগণের শরীর থেকে উদ্ভূত হওয়ার তার নাম হল সুরনিমঙ্গা। ভগীরথ গঙ্গাকে মর্তে এনেছিলেন, তাই গঙ্গার অপর নাম ভাগীরথী। জাহ্নমুনি একবার ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গাকে পান করেছিলেন এবং পরে মুনির জানু থেকে নির্গমণ হওয়ায় তাঁর নাম হয় জাহ্নবী।

তিনি ত্রিপথগামিনী তিনি স্বর্গগামিনী। তাঁর প্রধান ধারা স্বর্গে প্রবাহিত ও মন্দাকিনী নামে পরিচিত। মন্দাকিনী উচ্চ তরঙ্গ যুক্তা এবং নদীর জল পবিত্র, নির্মল। অসংখ্য মুনি-ঋষি গঙ্গার তীরে বাস করে।

দ্বিজাতির শবদেহের বাহক যদি শূদ্র হয় সেই দ্বিজাতিকে পদক্ষেপ পরিমিত বছর নরকবাসী হতে হয়। পরে গঙ্গা তাদের মুক্তি দেন। পাপী যদি অন্য কোন কাজে বেরিয়ে মূল বিষয়ের সঙ্গে গৌণ ভাবে সংশ্লিষ্ট গঙ্গায় অবগাহন করে, ও পুনরায় পাপে লিপ্ত না হয় তবে তার পাপমুক্তি হয়। পাতাল গামিনী গঙ্গার ধারা ভোগবতী নামে খ্যাত। অনেক মণি-মুক্তো এবং মহার্ঘ রত্ন সমূহের আকর গঙ্গার এই পবিত্র ধারা।

৩৫.

হরিকে প্রণাম করে ব্রহ্মা নির্জনে মোহিনীর সঙ্গে মিলনরত হলেন। অনেকক্ষণ ধরে সঙ্গমের অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে অবশেষে ব্রহ্মলোকে ফিরে এলেন। ব্রহ্মলোকের বাসিন্দারা দেখলেন পরমাসুন্দরী, গৌরবর্ণা ভারতী ব্রহ্মলোকে বিরাজ করছেন। তার নিতম্ব ও স্তনযুগল স্থূল এবং দৃষ্টি মনোরম। এখানে এসে ব্রহ্মা ভারতীর সঙ্গে দিনরাত সুখ সম্ভোগে মিলিত হলেন।

শ্রীরাধিকা নারায়ণকে বললেন–সকল ফলের দানকর্তা ব্রহ্মা স্বয়ং স্বেচ্ছায় দেহ দান করতে উপস্থিত বেশ্যাকে কেন প্রত্যাখান করলেন। কামতপ্ত কামিনীকে প্রত্যাখান করাও বিধেয় নয়।

ব্রহ্মতেজে দীপ্ত ব্রহ্মা মানসপুত্রদের সৃষ্টি করলেন। আনন্দের আতিশায্যে একটি পুত্র ও একটি কন্যা সৃষ্টি করলেন। পুত্রটি হলেন কামদেব, কন্যাটি ধীরে ধীরে বড় হল। কামদেব শরগুলির কার্যকারিতা বিষয় নিঃসংশয় হবার জন্য মনে মনে স্থির করলেন, ব্রহ্মা কামদেবের শর নিক্ষেপে কামাতুর হয়ে চেতনা হারালেন।

চেতনা ফিরে পেয়ে ব্রহ্মা দেখলেন তার সামনে ভরা যৌবনা কন্যা দন্ডায়মানা। কামনা নিবৃত্তিই তখন ব্রহ্মার পরমকাম্য নিজ কন্যার প্রতি আসক্ত হওয়ায় ব্রহ্মার পুত্ররা বললেন– বেদে বলা হয়েছে কন্যা মাতৃস্থানীয়া, আপনি বিশ্বের প্রভু হয়ে স্বীয় কন্যার সঙ্গে যৌন মিলন আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হয়ে উঠেছেন। পিতা বলে আপনাকে ক্ষমা করছি। না হলে ভস্ম করতাম।

দেব নির্দেশে ব্রহ্মা প্রাণ ত্যাগ করলেন এবং কন্যাও পিতাকে দেখে প্রাণ ত্যাগ করলেন। নারায়ণের বরে তারা প্রাণ ফিরে পেলেন। রমণীর নিতম্ব, স্তনযুগল ও মুখশ্রী কামদেবের আবাসস্থল, তাই ধর্মাত্মারা নারীদের দিকে তাকার না। পরস্ত্রীতে যাদের রতি, তাদের ধর্ম, সম্মান, প্রতিষ্ঠা সাধনা বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরকালে তাকে নরকযাতনা ভোগ করতে হয়।

দৈবক্রমে পরস্ত্রীর দর্শনে হরির পাদপদ্ম স্মরণ করা বিধেয়। যারা বেদবিহিত আচরণ করে তারা নিন্দ্য। সৎপথে যাদের বিচরণ তারা সকলের প্রশংসা অর্জন করে, যারা কুপথগামী ঘাতকেরাও তাদের ঘৃণা করে। পরদ্রব্যে ও পরস্ত্রীতে তোমার আসক্তি হবেনা হরির বরে। তোমার কন্যার নাম হবে রতি ও রতি কামদেবের পত্নী হবে।

৩৬.

ব্রহ্মার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে নারায়ণ তাকে বর দেন। সৃষ্টি কার্যে আত্মনিয়োগ করতে ও বিধাতা নামে অভিহিত হতে। নারায়ণ কেবলমাত্র ব্রহ্মার নয়, শিব-পার্বতী চন্দ্র-সূর্য অগ্নি-দুর্বাসা-ধন্বন্তরি প্রভৃতিরও গর্ব খর্ব করেছেন। অহংকারের সঞ্চার হলেই হরি তা দমন করেন। হরির সমান হবার জন্য শিব ষাট হাজার বছর কঠোর তপস্যা করে ছিলেন।

সাধনার তেজে তিনি উজ্জ্বল, কোটি সূর্যের মত তার প্রভা সততই প্রবহমান তিনি ভক্তের মনোবঞ্ছা পূরণ করলেন। তিনি নিজেকে ঈশ্বর মনে করে সকলকে তাদের অভীষ্ট প্রদান করতে লাগলেন। বৃক নামে এক দৈত্য এক বছর ধরে দিন রাত শিবের তপস্যা করলে শিব প্রীত হন এবং তাঁর কাঙ্খিত বর দান করার জন্য তাঁর সমীপে উপনীত হন। অসুর বর গ্রহণ করতে চায় না।

বৃকাসুর আন্তরিক ভক্তিতে শিবকে পূজো করে। শিব তাকে সকল ঐশ্বর্য দান করলেও সে শিবের চরণ ধ্যান করতে থাকে। আবেগপ্রবণ দেবাদিদেব তাঁর প্রতি নিষ্কাম প্রেম বিহ্বলতা লক্ষ্য করে অশ্রু মোচন করতে থাকেন। শঙ্করের রোদন ধ্বনিতে বৃকাসুরের ধ্যান ভেঙ্গে গেল। বৃক শিবকে সামনে দেখে বর চাইল যে, সে যার মাথায় হাত দেবে তৎক্ষণাৎ সে ভস্মীভূত হবে।

বর প্রদান করার পর শিব যেতে উদ্যত হলে বৃক তাকে অনুসরণ করল। শিবের মনে ভস্মীভূত হওয়ার ভয়ের সঞ্চার হওয়াতে তিনি দ্রুত যেতে গেলে তার ডুগডুগি ও বাঘছাল খসে পড়ল। দৈত্যের ভয়ে তিনি তখন নিরাবরণ দেহে দশ দিকে ধাবমান হলেন। শিব নিজেকে আশ্বাস দিতে পারলেন না। তিনি শ্রীহরিকে স্মরণ করতে লাগলেন। তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল।

হরি মায়া বিস্তার করলেন। ফলে নিজের মাথায় হাত দিয়ে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হল। এভাবে শিবের অহংচূর্ণ করলেন হরি। শিব একবার ত্রিপুরাসুরের বিনাশে প্রয়াসী হন। অসুরকে সামান্য ভেবে তিনি হরির দেওয়া শূল ও কবচ ফেলে তার সঙ্গে সংগ্রামে রত হন। কিন্তু শিব ত্রিপুরাসুরকে হারাতে পারলেন না। শিব তাঁর রথসহ ভুতলে পতিত হলে শঙ্কিত দেবতারা নিবিষ্টচিত্তে হরিকে আহ্বান করতে লাগলেন। হরি তখন বরাহরূপ ধারণ করে শৃঙ্গ দ্বারা শিবকে ধারণ করে আবার কবচ ও শূল তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

পরমাত্মাস্বরূপ শিব সতীদেহ কাঁধে নিয়ে এক বছর নগর পরিক্রমা করেছিলেন। সতীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে সকল পূতস্থানে পতিত হয়েছিল সেখানে এক একটি সিদ্ধপীঠ গড়ে উঠেছে। শবের অবিশষ্টাংশ বুকে নিয়ে শঙ্কর সংজ্ঞা হারিয়ে সিদ্ধপীঠে পতিত হয়েছিলেন। তখন ক্রোড়ে বসিয়ে হরি তাকে শান্ত করলেন ও পরবর্তীকালে অন্য মূর্তিতে সতীকেই লাভ করলেন।

তপস্যা করার সময় তিনি জটা ধারণ করেন যা আজও রয়েছে। যোগাভ্যাসের জন্য বসনে তাঁর আকর্ষণ লিপ্ত হয়েছে। গরুড়ের ভয়ে ভীত সাপেরা তাঁর স্মরণাগত হলে তাদের তিনি শরীরে ধারণ করেন। ত্রিপুরাসুরকে বধ করার সময় বৃষের উদ্ভব বলে বৃষই তার বাহন। ধুতরো

ফুল, বেল গাতা, বেলকাঠের প্রলেপ, নির্গন্ধ ফুল, বাঘছাল তার অত্যন্ত প্রিয়। জনশূন্য শ্মশানের নির্জনতা তাঁর ভীষণ প্রিয়। ব্রহ্মার পতন হলেও শিবের বিনাশ নেই। তাই পৃথিবীতে শঙ্করের চেয়ে একনিষ্ঠ ভক্ত আমার আর কেউ নেই।

৩৭.

একদিন সনকুমার গোলোকে গমন করে ভোজনরত নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি নারায়ণকে নত মস্তকে প্রণাম করে তার স্তব করতে লাগলেন। নারায়ণ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে উচ্ছিষ্ট প্রসাদরূপে দান করলেন। তিনি দুষ্প্রাপ্য প্রসাদ মিত্রদের জন্য কিছুটা রেখে দিলেন। সনৎকুমার সিদ্ধাশ্রমে গমন করলেন ও তাঁর পরম আরাধ্য গুরুদেব শম্ভুকে সেই দুর্লভ বস্তু দান করলেন।

তা খেয়ে দেবাদিদেব আনন্দে নাচতে লাগলেন। তার হাত থেকে খসে পড়ল ডমরু, কটিদেশ থেকে বাঘছাল। তিনি সংজ্ঞা হারালেন। সংজ্ঞা ফিরলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে পুনরায় ভূতলে পতিত হলেন। দুর্গা সেখানে এসে প্রভুর এইরূপ অবস্থার কারণ কী সনৎকুমারকে বলতে বললেন। তিনি কৃতাঞ্জলি পুটে ঘটনার আদ্যপ্রান্ত বিবরণ দিলেন। দুর্গা সব শুনে শিবের উপর ক্রুদ্ধ হলেন।

তিনি শংকরকে অভিসম্পাত দিতে উদ্যত হলেন। শম্ভু তখন দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য তার স্তব করতে লাগলেন। রুদ্র দেবীর ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। জগজ্জননী দুর্গার আয়তলোচন মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তপদ্মের মতো লাল হয়ে উঠলো।

দেবী বললেন–প্রভু, সুদীর্ঘ কঠোর তপস্যার দ্বারা আমি তোমাকে পতিরূপে লাভ করেছি। তুমি প্রসাদ আমাকে না দিয়ে ভক্ষণ করলে। পর্বতরাজ তনয়া পতির সন্মুখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। হর তার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। শিব তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন– হে চন্ডিকা, তুমি চিরন্তনী-অনুগ্রহ করে ক্রোধ সংবরণ কর। তুমি গোলোক পতির নিত্য সহচরী। তুমি সাকার ও নিরাকার। কৃষ্ণের শ্রীচরণে অচলাভক্তি তো তোমার কৃপার আপেক্ষিক, আমি কিভাবে তোমায় হরির নৈবেদ্য প্রদান করব। তুমি দেহত্যাগ করে সেই নিগুণের কাছে যাও।

কৃষ্ণ বললেন–সুন্দরী পার্বতী পতির অঙ্গীকার শ্রবণে সন্তোষ লাভ করে মন্দাকিনীতে স্নানের জন্য গমন করলেন। স্নান সেরে ইষ্ট দেবতার আরাধনা করলেন। শিবস্তোত্র উচ্চারণ করে তাকে প্রণাম করলেন।

৩৮.

দেবতাদের তেজে দেবী দুর্গা কামিনীর রূপ ধরে অসুর নিধন করে দেবকুলের ত্রাণ করে ছিলেন। সতী শিবের সাথে পিতৃগৃহে যেতে চাইলেন। পতিকে তিনি অনুনয় বিনয় করলেন, অনেক করে বোঝালেন। শিব সম্মত হলেন না। শিবের শাপে তার দর্পচূর্ণ হলো। দক্ষ সতীকে দেখে আর কোনো কথা বললেন না।

উমা নিজেকে সজ্জিত করলেন। দর্পণে তিনি আপন রূপমাধুরী দেখে সযতনে কপালে কস্তুরী ও সিদুরের টিপ দিলেন। ঈষৎ আয়তলোচনে কাজল পরলেন, তার দন্ডরাজি মুক্তোর মত ঝলমল করছিল। তার বুক থেকে তপ্ত কাঞ্চনের আভা ঠিকরে বেরোচ্ছিল।

৩৯.

শিবের যৌবন প্রত্যক্ষ করে কোনো কোনো রমণী কামাতুর হয়ে উঠল। কোনো কোনো কামিনী পতির নিন্দায় মুখর হয়ে উঠল। কামার্ত হয়ে কেউ বা অন্য স্ত্রীকে আলিঙ্গন করল। কেউ আবার মনে করল সংসারে আর কাজ নেই। পরকালে শিবকে পতিরূপে পাবার কামনা নিয়ে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জনই শ্রেয়। দুর্গার মত সুভাগা পুণ্যশীলা আর কেউ নেই মনে করে শিবের পরিষেবায় তারা তাকে দেবাদিদেবের কাছে পাঠাল।

পার্বতী সখীদের মধ্যে শিবকে দর্শন করে সাতবার তাঁকে প্রদক্ষিণ করে তাঁকে প্রণাম করলেন। শিব তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন– তুমি শ্রেষ্ঠ পতি লাভ কর, তুমি স্বামী এবং পুত্রে সৌভাগ্যবতী হবে। ত্রৈলোক্যে সর্বাগ্রে তোমার পুজা অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বে তুমিই শ্রেষ্ঠা রূপে প্রতিপন্ন হবে।

পার্বতী তার পিত্রালয়ে গমন না করে সখীদের অনুরোধ, নিষেধকে অগ্রাহ্য করে কঠোর তপস্যার জন্য বনগমন করলেন। গঙ্গাতীরে নিবিড় অরণ্যে বহুকাল তপস্যা করে শেষে তিনি চিরকাঙ্ক্ষিত শংকরকে পতিরূপে লাভ করে ধন্য হলেন।

৪০.

নারীরা আগুনের জ্বালা ও বিষের তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে, কিন্তু সইতে পারে না পতির বিচ্ছেদ। শিব অক্ষয় বটের মূলে তার তপস্যার স্থল ছেড়ে চলে গেলেন তখন হিমালয় মেনকার অনুরোধ উপেক্ষা করে পার্বতী দুশ্চর অরণ্যে সুকঠোর তপস্যার নিমিত্তে গমন করলেন। জগজ্জননী এক বছর ধরে শিবমন্ত্র জপ করে ধ্যান মগ্ন হলেন। প্রখর তপন তাপকে অগ্রাহ্য করে তিনি চারধারে আগুন জ্বালিয়ে, প্রাবৃটকালে শিলাবৃষ্টি ও অপরিচ্ছন্ন ধারাপাতে, শ্মশানে যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে, শীতে তুষারপাতে বিচলিত না হয়ে জলমধ্যে নিয়ত অবস্থান করলেন। শঙ্করের চিত্তে করুণার সঞ্চার হলে তিনি খর্বাকৃতি এক বালক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করলেন। হাতে তার ছত্র ও লাঠি, মাথা ভর্তি জটা, গলায় উপবীত এবং পরিধানে শুক্লবসন। নির্জন অরণ্যে ছেলেটিকে দেখে পার্বতীর মনে স্নেহের সঞ্চার হলো। তার মুখে হাসি ফুটল। শঙ্কর তখন বললেন– আমি তপস্বী। আমি অবাধে সর্বত্র বিচরণ করে থাকি।

দেবী তখন বললেন– পূর্ব জন্মে আমি ছিলাম দক্ষরাজ নন্দিনী। শিবের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল, পিতার মুখে পতির নিন্দা শুনে আমি যোগবলে দেহত্যাগ করেছিলাম। এইজন্মে আমি পিতৃগৃহ ত্যাগ করে এই অরণ্যে উপস্থিত হয়ে আমার প্রিয় দেবতার তপস্যায় মগ্ন হলাম। বেদে বলা হয়েছে, প্রতি নারীই অভিযাচিত পতির সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যদি জন্মগ্রহণে অভীক্ষু হয়, জন্ম জন্মান্তরে নারী একই পতিকে লাভ করে। শিব বললেন, তোমার তপস্যা লব্ধ শক্তির পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু তুমি বুদ্ধিহীনা।

আগুন তোমাকে দগ্ধ করতে পারল না, পতিকেও তুমি পেলেনা। সংহার কর্তাকে যে পতিরূপে কামনা করে বলতে বাধ্য হচ্ছি, সে নির্বোধ। তাকে লাভ করার জন্য তুমি যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে থাক, তবে তুমি লাভ করবে ভয়ংকর রুদ্রকে। তুমি গমন কর পর্বতরাজের আলয়ে। তোমার কঠিন তপস্যার ফলে আমার বরে তুমি অপ্রাপনীয় শংকরের দর্শন পাবে। হিমালয় অনিচ্ছাতেও কন্যা সম্প্রদান করে ভারতেই বিরাজ করুন আর না হলে মহেশ্বরকে কন্যাদান করে সারূপ্য মুক্তি লাভ করবেন। অতঃপর অরুন্ধতীসহ সপ্তর্ষিরা গিরিরাজের আলয়ে গিয়ে আশ্বাস দান করলেন। পার্বতীও শিববিনা অন্য কাউকে বিবাহ করবে না আর তাই যতই অনিচ্ছা থাক না কেন হিমালয় তাঁর কন্যাকে শিবের সঙ্গে বিবাহ দিতে বাধ্য হলেন।

৪১.

মহেশ্বরকে গিরিরাজ কন্যা দান করলে নিঃসন্দেহে তিনি মুক্তি লাভ করবেন। শংকর হাস্যোজ্জ্বল মুখে দেবতাদের আশ্বস্ত করলেন এবং শৈলরাজ গৃহে গমন করলেন। দেবতারা আনন্দে আপন গৃহে ফিরলেন, গিরিরাজ মিত্র ও পার্বতী সহ সভামধ্যে অত্যন্ত আনন্দে বিরাজ করতে লাগলেন।

সভায় ব্রাহ্মণদের বাক্য শ্রবণ করে মেনকা জল ভরা চোখে হিমালয়কে বললেন– তুমি বরং তোমার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে দেখ, শিবকে কন্যা সম্প্রদান করা শ্রেয় কিনা? অরুন্ধতী মেনকার কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি শোকে মূহ্যমান হয়ে মুছিতপ্রায় এবং মাটিতে শুয়ে আছেন। স্বর্ণপীঠে অরুন্ধতাঁকে বসিয়ে পাদ্য অর্ঘ্য দান পূর্বক মেনকা তাঁকে মিষ্টি দিলেন। অরুন্ধতী শিব ও পার্বতীর বিবাহ সম্পর্কে অনেক নীতি কথা বললেন। তারকাসুর বধের নিমিত্ত এই পরিণয়ও একান্ত কাম্য এবং ব্রহ্মা এ বিষয়ে তাকে অবহিত করিয়েছেন। পিতা যদি উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান না করেন তাকে একশো বছর ভোগ করতে হয় নরক যন্ত্রণা।

৪২.

অনরণ্য তনয়া পতিব্রতাপদ্মা এক দিন মন্দাকিনীতে স্নান করতে গিয়ে ছিলেন। মায়াবলে রাজার রূপধারী ধর্ম তাকে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন–আমি কামশাস্ত্রে নিপুণ, কামপীড়িত রমণীর যৌন কামনা মেটাতে আমার তুল্য আর কে আছে? ধর্ম রথ থেকে নেমে তাকে আলিঙ্গনে উদ্যত হলে পদ্মা তাঁকে বললেন– পাপী! এক পা এগোলেই তুমি ভস্ম হবে। পদ্মার শাপে ভীত হলেন ধর্ম। তিনি বললেন–তোমাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে আমি অভিশপ্ত হলাম। পদ্মা যখন জানলেন তিনি ধর্ম, তখন শ্রদ্ধাসহকারে তাকে বললেন–আপনাকে না জেনে সতীত্ব রক্ষার্থে ক্রোধের বশে শাপ দিয়েছি। সতীর শাপ কোনদিন ব্যর্থ হয় না। কিন্তু আপনার বিনাশ আমি কামনা করিনা।

আপনি সত্যযুগে পূর্ণিমার চাঁদের মত পূর্ণরূপে বিরাজ করবেন। ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে আপনার এক পাদ, দ্বিপাদ ও ত্রিপাদ ক্ষয় হয়ে কলির অন্তিমে আপনার এক পাদ সমাচ্ছন্ন হবে। সত্যযুগে আপনার অস্তিত্ব সর্বব্যাপী হবে এবং সত্যেতর যুগে আপনার মহিমা সর্বত্র প্রকাশমান না হয়ে কোনো কোনো স্থানে প্রকাশিত হবে। মন্দিরে, তীর্থে, সাধুর আলয়ে,

যেখানে বেদ বেদাঙ্গের আলোচনা হয় সেখানে, যেখানে কৃষ্ণের নাম গান হয় সেখানে, ব্রত, অর্চনা, ন্যায় ও যজ্ঞস্থলে আপনি নিয়ত অধিষ্ঠিত থাকবেন।

দীক্ষা, পরীক্ষা, অঙ্গীকার, গোস্পদ, গোশালা এবং গোষ্ঠে আপন বিরাজ করবেন। পতিতালয়ে, খুনির গৃহে, নীচ, অদক্ষ ও ক্রুর ব্যক্তিতে দেব-দ্বিজ-গুরু-পুণ্যবানদের সম্পত্তিহরণকারী চোরেদের, দূতাক্রীড়া স্থলে, রাজায় রাজায় যেখানে কলহ হয় সেখানে, যেখানে শালগ্রামশিলা সাধুসন্ন্যাসী, তীর্থ, পুরাণাদি নেই, দস্যু অধ্যুষিত অঞ্চলে, অহংকারী ব্যক্তিতে, অসিজীবী, পূজারী ব্রাহ্মণ, গ্রাম্য পুরোহিত, বৃষবাহক, স্বর্ণকার ব্যাধ, পতিনিন্দা পরায়ণা স্ত্রৈণ, বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, কন্যা, শালগ্রাম শিলা, দেবপ্রতিমা গ্রন্থ, ভূমি বিক্রেতা, মিত্রের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকা করে, শরণাগতকে যে আশ্রয় দান করে না সেই সব স্থলে আপনার ক্ষীণতা প্রকাশ পাবে।

এভাবে আপনার প্রতি আমার শাপের ভার হ্রাস পাবে। এখন আমি গৃহে ফিরছি পতিদেবতার সেবার উদ্দেশে, আপনি নিজ নিকেতনে গমন করুন। অনরণ্য তনয়া একথা বললে ধর্ম বললেন–তুমি সাধ্বী রমণী। আশীর্বাদ করি, তোমার কল্যাণ হোক। তুমি ত্রাণের পথ দেখিয়েছ, আমাকে বল কী বর চাও। আমি বর দিচ্ছি, তোমার স্বামী জরা ত্যাগ করে নবযৌবন সম্পন্ন মনোহর, কুবেরের মত ধনবান, মার্কণ্ডেয় তুল্য দীর্ঘজীবী, ইন্দ্র তুল্য ঐশ্বর্যশালী, শিবের মত বিষ্ণু ভক্ত, কপিলের তুল্য দীর্ঘজীবী হবেন। যাবজ্জীবন সৌভাগ্যবতী হবে স্বামীসহ, স্বামীর চোখে অধিকতর রূপগুণ সম্পন্ন পুত্রের জননী হবে তুমি।

পতিব্রতা পদ্মা ধর্মকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে ঘরে ফিরেলেন। তাঁকে আশীর্বাদ করে, ধর্মও গৃহাভিমুখী হলেন। সর্বত্রই তিনি সাধ্বী স্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। বাড়ি ফিরে পদ্মা দেখলেন, তার স্বামী স্থির যৌবনের অধিকারী হয়েছেন। তিনি পিপ্পলাদের সঙ্গে নির্জনে রতিক্রিয়ায় মিলিত হয়ে পুলকিত হলেন এবং জননী হলেন। যথাসময়ে রূপ গুণ সম্পন্ন বহু পুত্রের জননী হলেন। অনরণ্য তার মেয়েকে পিপ্লেলাদ মুনির হাতে সমর্পণ করে যেভাবে স্বীয় সম্পত্তি রক্ষা করেছিলেন অনুরূপ ভাবে তুমি ও দেবাদিদেবকে পার্বতী সম্প্রদান করে স্বীয় সম্পত্তি স্বজন ও মিত্রদের রক্ষা কর।

লগ্নের অধিপতিঐদিন লগ্নস্থ হবেন। আজ থেকে সাতদিন পরে চরম সুসময় আসবে। বুধের সঙ্গে চন্দ্রও লগ্নস্থ ও রোহিণীযুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ হবেন। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা বিশিষ্ট সোমবার সর্বকলঙ্ক মুক্ত অত্যন্ত শুভক্ষণ। ঐ দিনে পরিণীতা হলে কন্যা পুণ্যবান পতি ও

সৎপুত্র লাভ করে। এই লগ্নে জন্ম জন্মান্তর পত্নী সভর্তৃকা হয় এবং দম্পতির মাঝে গভীর প্রণয়ের সঞ্চার হয়। এই লগ্নে সকল দেবতার তেজঃস্বরূপ, ঈশ্বরী মূল প্রকৃতি কন্যাকে পরমেশ্বর শিবের উদ্দেশ্য প্রদান কর। দেবীর ব্যক্তিত্বে, ভয়ংকর প্রভাবে কেউ নগ্ন হয়ে ছিল, কেউ বিস্ময়াদি জড়ীভূত হয়েছিল, দেবীর দয়াতেই, দক্ষ তাঁর কন্যাকে শিবের হাতে সমর্পণ করেন।

দেবসভায় শিবের শ্বশুরের সঙ্গে দারুণ বিবাদ হয়। শিবকে যজ্ঞ ভাগ দান করলেন না দাম্ভিক দক্ষ, পিতার অশোভন আচরণে সতী খুব ক্রুদ্ধ হলে। সতী পিতার পরাজয়, যজ্ঞভঙ্গ, মুনি ও পর্বতদের পলায়ন, শিবের জয়, যোগবলে উদ্ভব, শিবের সঙ্গে তার পুনরায় পরিণয়ের পূর্বাভাস দিয়ে প্রসূতি এবং স্বীয় ভগিনীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে শোকাহত হয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ছিলেন। জাহ্নবী তীরে সকলের অলক্ষ্যে পরমা সতী স্নান করে হরের অর্চনা করে পতির চরণ স্মরণ করে দেহত্যাগ করলেন এবং গন্ধমাদন স্থিতা দেবীর শরীরে প্রবেশ করলেন। দেবতারা শোক কাতর হলেন। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে শিবের অনুচরেরা দুঃখে কাতর হয়ে শিবকে আনুপূর্বিক বিবরণ দিলেন। শংকর অজ্ঞান হলেন। জ্ঞান ফিরলে মন্দাকিনী তীরে গেলেন।

৪৩.

মন্দাকিনীর তীরে হর সতীর শায়িত দেহ দেখলেন। সতীকে দেখে শিব বিচ্ছেদে কাতর হলেন। সমুদয় তত্ত্বে অভিজ্ঞ যিনি তিনিও শোকে জ্ঞান হারালেন। সতীকে কি যেন বলতে গেলেন চেতনা ফিরে পেয়ে। তার মুখ দেখা মাত্রই সব ভুলে স্থাণুর মত নিশ্চল হয়ে সেখানে বিরাজ করতে লাগলেন। এবং বললেন– তুমি ছাড়া আমি শবতুল্য। তোমার শক্তিতে আমি শক্তিমান। যিনি জানেন না শক্তি কী, তিনিই পরিত্যাজ্য তিনিই শক্তির নিন্দা করে থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং আমি যখন তোমার সাধ্যভূত তখন সুস্মিত মুখে আমার দিকে তাকাও। অমৃত মধুর কণ্ঠে আমায় কিছু বল। আমার বিরহ জ্বালা দূর হতে পারে কেবল তোমার মধুর বাক্য ও দৃষ্টি নিক্ষেপে। তোমার বিরহে আমি কাঁদছি, তুমি দেখতে পাচ্ছনা। পরমেশ্বরী, তুমি যে প্রাণের আধার। একবারও কি নয়ন মেলে দেখবেনা ক্রন্দনরত শিবকে। রোদনপরায়ণ শিব মৃতদেহকে বুকে নিয়ে বার বার চুম্বন ও আলিঙ্গন করলেন। কিন্তু বারবার চুম্বন ও আলিঙ্গন করার পরও শিব পুনরায় মূর্ছিত হলেন। প্রজ্ঞাবানদের গুরুর গুরু স্থানীয় হলেও শংকর চন্দ্রাবিষ্টের মতো আচরণ করতে লাগলেন।

সেই সুবর্ণ প্রতিমাকে বুকে নিয়ে শিব সপ্তদ্বীপ, সাত সাগর, পুণ্য ভারতের পর্বতশৃঙ্গে, জম্মুদ্বীপের অক্ষয় বটমূলে, নদীতীরে ভ্রমণ করতে লাগলেন। নেত্র সরোবরের সৃষ্টি হল তার ত্রিলোচন নিঃসৃত অশ্রুতে। নেত্র সরোবরে মুনি-ঋষিরা নিয়তই তপস্যা করেন। এই সরোবরে বিস্তার চারক্রোশ। সেই সরোবরে স্নান করলে পুনর্জন্ম রহিত হওয়া যায়। মূহুর্তেই বিদূরিত হয় পূর্ব জন্মের পাপ। বিরহানলে দগ্ধ শকর একবছর ধরে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন। সতীর বিগলিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেখানে যেখানে পড়ল যেখানে সিদ্ধপীঠ গড়ে উঠল।

সতীদেহের অবশিষ্টাংশ শিব সৎকার করলেন। স্বীয় কণ্ঠে ধারণ করলেন অস্থিমালা। তিনি অঙ্গে লেপন করলেন সতীর চিতাভস্ম। তিনি পরমাত্মাকে পর্যন্ত ভুলে গেলেন। এক সময় সতীর বিরহে কাতর হলেন। শিবকে বটমূলে শুয়ে থাকতে দেখে বিস্ময়াবিষ্ট দেবতারা তার কাছে এলেন। যাঁর চরণ বন্দনা করেন লক্ষী দেবী সেই নারায়ণ রত্ননির্মিত রথে পরিষদ সমভিব্যহারে সেখানে আগমন করলেন। রত্নালঙ্কারে সম্যকরূপে অলংকৃত পীতাম্বর, চতুর্ভূজ নারায়ণের মুখ প্রসন্ন এবং সুস্মিত আনন। তিনি শোভিত ছিলেন বনমালায়।

হরি সংজ্ঞাহীন শংকরকে বুকে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, সাধারণ মানুষের মত কেন শোকে চঞ্চল হয়ে উঠেছ? মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর যা বলছি, তবেই দূর হবে তোমার শোক তাপ। তুমি সর্বজ্ঞ, অজানা নয় তোমার আধ্যাত্মবিদ্যা, তোমাকে তবুও বলছি আধ্যাত্মিকবিদ্যা অভ্রান্ত। কেন না সংকট কালে অজ্ঞান ব্যক্তিও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে উপদেশ পরামর্শ ও প্রবোধ দিয়ে থাকেন। বিপদে মানুষের দুঃখ সুখ উৎপন্ন হয় মায়ামিশ্রিত গুণগুলিতেই।

শক্তিশালী বিষ্ণুমায়া সবসময়ই গুণাশ্রিত মানুষকে নির্যাতন করে। যখন মানুষের দুর্দিন আসে তখন বিষাদ, শোক, দুঃখ, ভয় পীড়িত করে। দুর্দিনের মেঘ কেটে সুখ ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাই এসব স্বপ্নের মত মনে করেন। এগুলির উদয় ও বিলয় মূহুর্তেই, স্বপ্ন ছাড়া আর কীই বা হতে পারে এগুলি? শ্রীহরির বাক্য শুনে শিব চোখ মেলে তাকালেন। হরির নয়ন নির্গত অশ্রুধারায় সিক্ত হলেন শিব। হরি হরের অনীরে পুণ্য সলিল তীর্থের উদয় হল। অতঃপর শ্রীহরি দেবতা এবং মুনি ঋষিদের সামনে শিবকে পুনরায় অধ্যাত্মবিষয়ক উপদেশ দিলেন। তুমি জ্ঞান ভুলে গেছ শোকাধিক্য হেতু। সংসারে সুখ-দুঃখ ঘোরে চাকার মত আর তাই কখনও সুদিন, কখনও দুর্দিন আসে।

নিজের কর্ম থেকেই সুদিন দুর্দিনের উৎপত্তি হয়। সেই কর্ম তপঃসাধ্য আর মঙ্গল এবং অমঙ্গলজনক কার্যগুলি সেই কর্মসাধ্য, স্বভাবের দ্বারাই সাধ্য তপস্যা। মন হলো পাপ পুণ্যের

কারণ। মনের উৎপত্তি আমারই অংশে। আমি তুমি কিংবা ব্রহ্ম সকলের পিতা। ব্রহ্মা একমেবাদ্বিতীয়। গুন ও মূর্তিভেদে আখ্যাত হয়ে থাকেন। হে শিব, ব্রহ্মা স্বগুন এবং নির্গুণ। ভগবান স্বেচ্ছায় সবকিছু সৃজন করেন। তার ইচ্ছা শক্তি হলো প্রকৃতি। সমগ্র জগতের তিনি প্রসবিনী।

ব্রহ্মাকে কেউ শাশ্বত ব্রহ্মাজ্যোতিস্বরূপ মনে করেন। যাঁরা বলেন সর্বকারণ স্বরূপ ব্রহ্মা এক এবং অদ্বিতীয় তাদের মত ব্রহ্মা প্রভৃতি পুরুষের অতীত। ব্রহ্মা থেকেই প্রকৃতি পুরুষের সৃষ্টি হয়েছে। একই ঈশ্বর স্বইচ্ছার দ্বিবিধ হয়েছেন। সবকিছুর প্রসবিনী প্রকৃতি সেই শক্তি। পরমব্রহ্মা ইচ্ছাশক্তিতে সহলিপ্ত হলে সগুণ শরীরী ও প্রাকৃত বলে খ্যাত হন, নিষ্ঠুন স্বেচ্ছাচারী রূপে ব্যক্ত হন সংসক্ত না হলে। সবকিছুর আধার অবিনশ্বর সেই পরমাত্মা। তিনি সকল বিষয়ের ফলদাতা ও সকল স্থানেই তার অবস্থিতি। তাঁর নিত্য চিরস্থায়ী ও প্রাকৃত শরীর অচিরস্থায়ী।

বিনাশ নেই আমার ও তোমার শরীরের, আমাদের অংশজাত যারা তারা নাশশীল ও প্রাকৃত। তোমার অংশজাত দশ রুদ্র। বিষ্ণুরূপী পুরুষরা আমার অংশজাত। আমার রূপ দ্বিবিধ ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ। চতুর্ভুজরূপে লক্ষী এবং সভাষদদের সঙ্গে বৈকুণ্ঠ বাস করি আর দ্বিভূজরূপে গোলোকে অবস্থান করি। ব্রহ্মার উভয় রূপ যারা মেনে নেন তাঁদের মতে পুরুষ ও প্রকৃতি চিরঞ্জীব। তাঁরা এই জগতের জনক জননীর তুল্য ও সম্পৃক্ত। তারা স্বেচ্ছায় দেহধারণ করেন, আবার হয়ে থাকেন নিরাকারও। তাদের ইচ্ছার আপেক্ষিক নামারূপ ধারণ করাটা।

পুরুষ এবং প্রকৃতির স্তব আমি দুর্বাসাকে বলেছিলাম। কান্বশাখোক্ত স্তবে জগৎ-প্রসবিনী প্রকৃতির পূজা কর। আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি তোমার পত্নী বিয়োগ দুঃখ দূর হোক, মঙ্গল হোক তোমার সর্বাঙ্গীন। শ্রীহরি উপদেশ ও পরামর্শ দিলে মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্মাকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে প্রণাম করে প্রকৃতির স্তব করতে লাগলেন। ঈশ্বরী আনন্দ দায়িনী। ব্রহ্মাস্বরূপিণী দেবী আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও, দূর্গতিনাশিনী, তুমি অসুরনাশিনী, তুমি বিশ্বময়ী, বিশ্বরূপা, যোগেশ্বরী, তুষ্ট হও। ত্রিপুরের সঙ্গে যুদ্ধে আমি যখন আকাশ থেকে মাটিতে পতিত হই তখন তুমি বিষ্ণুর সঙ্গে মিলিতভাবে আমায় ত্রাণ করেছিলে।

এখন আমি তোমার বিচ্ছেদ বেদনায় সাতিশয় কাতর। শিব এই স্তোত্র সমাপ্ত করলেন তখন তিনি দেখলেন আকাশ থেকে মহার্ঘ রত্ন নির্মিত রথে দশভূজা উপস্থিত হলেন। দেবীকে প্রত্যক্ষ করে বিরহানলে দগ্ধ শংকর রোদন করতে করতে দুঃখের কথা জানালেন এবং পরে স্বীয়

অঙ্গের অস্থিমাল্য ও ভস্মালংকার দেখিয়ে পুনরায় তার স্তব করতে লাগলেন। সকলে মিলে দেবীর কাছে শিবের স্থৈর্য। এবং শান্তি কামনা করলেন। তারাও দেবীর স্তব করতে লাগলেন। সম্মিলিত সংগীতে তিনি সাতিশয় প্রসন্ন হয়ে শিবকে বললেন– প্রিয়তম, তুমি পরমাত্মা স্বরূপ, যোগীন্দ্র, তুমিই আমার স্বামী, হিমালয় পত্নী মেনকার গর্ভে পুনরায় জন্ম নিয়ে তোমার পত্নী হব। আর হাহাকার কোরোনা আমার বিরহে।

শিবকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি অন্তর্হিত হলেন। শিবকে আশ্বস্ত করে যে যাঁর আলয়ে ফিরে গেলেন। মহাদেব কৈলাসে সানন্দে প্রত্যাবর্তন করে অনুচরদের সঙ্গে মহানন্দে নৃত্যরত হলেন। যিনি শিবের এই প্রকৃতি স্তোত্র পাঠ করেন, জন্ম জন্মান্তরেও তাঁর স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটে না। সকল প্রকার ঐহিক সুখ ভোগ করে জীবন শেষে তিনি শিবলোকে স্থান পেয়ে ধন্য হন।

৪৪.

বশিষ্ঠের কথা শুনে সকলে অবাক হলেন, পার্বতীর মুখ রমণীয় হয়ে উঠল। ক্ষুধাতুর মেনকাকে অরুন্ধতী নানা খাদ্য খাওয়ালেন এবং নিজেও খেলেন। সানন্দে শুভানুষ্ঠানের আয়োজনে রত হলেন। গিরিরাজ পত্ররচনা করে দূরদূরান্তে পার্বতীর পরিণয়ের বার্তা পাঠালেন। শিবকে মঙ্গলপত্রিকা প্রেরণ করলেন। বিভিন্ন বাদ্য বাজানোর জন্য নিয়োজিত করলেন বিপুল সংখ্যার বাদকবৃন্দকে। মহিলারা পরিণয় সংস্কারানুযায়ী পার্বতীকে স্নান করিয়ে পতি মিলনের উপযোগী বস্ত্রে, রত্নাভারণে সাজালেন এবং তাঁর হাতে দিলেন দুর্বাক্ষতযুক্ত দর্পণ।

শৈলরমণীরা আলতা পরালেন পার্বতীর পায়ে। চোখে দিলেন কাজল, রমণীয় করে তুললেন কুন্তল নব মালতীর মালার। রত্ন রথে দেবতারা শিবকে নিয়ে গিরিরাজের আলয়ে উপস্থিত হলেন। শৈলরাজ দেবতাগণ বিপদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আত্মীয়দের প্রেরণ করলেন। নগর প্রাঙ্গনে কলাগাছ, ফল, পল্লব, সজ্জিত করা হল এবং চন্দন, অগরু, চারিদিকে শোভা পেতে লাগল। দেবতাদের প্রণাম করলেন হিমালয় এবং তাদের উপবেশনের নিমিত্ত ভৃত্যদের দ্বারা রত্ন সিংহাসন এনে দ্রুত আয়োজন করলেন। নারায়ণ এবং অন্যান্য দেবতাগণ সভাসদদের সঙ্গে সভায় গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। তাকে চামর দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন পারিষদেরা। তাঁর মুখ পদ্মের মত সুন্দর হয়ে উঠল।

সকলে প্রফুল্ল হয়ে হিমালয় গৃহে আসলেন। দেবকন্যা, ঋষিকন্যা, নাগতনয়া, গন্ধর্বকন্যা, শৈলনন্দিনী এবং রাজকন্যারাও সমবেত হলেন। মেনকা বরকে প্রত্যক্ষ করলেন। জামাতার

রূপ দেখে মেনকার শোক মুহূর্তেই নির্বাপিত হল এবং তার সকল মন আনন্দে ভরে উঠল। কোনো কোনো রমণী শিবের দিকে অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। কেউ মূর্ছিত হলেন তার রূপ দেখে।

৪৫.

শিব অগ্নি প্রস্তুত করে তার বামে পার্বতীকে রেখে যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করলেন। যজ্ঞ শেষে দ্বিজ জনকে একশত স্বর্ণমুদ্রা দান করলেন। কেউ বলল, পরস্পরকে খাইয়ে দাও। কেউ বলল দেবীর কেশ পরিচর্য্যা কর। রতিদেবী কাঁদতে লাগলেন এই বলে যে পার্বতীকে গ্রহণের সাথে সাথে আপনার ভাগ্য প্রসন্ন হলো, এখন বলুন, বিনা কারণে আমার পতিদেব তাকে ভস্মীভূত করেছিলেন কেন? তাকে পুনর্জীবন দান করে আমার বিরহানল প্রশমিত করুন।

বাসর জাগার পর দেবাদিদেব এবার শয্যা ত্যাগ করে স্ত্রীকে নিয়ে কৈলাস অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। মেনকা ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন, আমার মেয়ের সহস্র ত্রুটি মার্জনা কর। রোদনরতা পার্বতী মা বাবা ও গুরুদেবের চরণে প্রণত হলেন। দেবতারা দ্রুত গতিতে শিবালয়ে উপস্থিত হলেন। তারা হর-পার্বতীকে রত্ন সিংহাসনে বসালেন। দেব সতীকে বললেন, মনে পড়ে দেবী, এখান থেকেই তুমি পিত্রালয়ে যাত্রা করেছিলে। শিব দেবদের সাদরে ভোজন করালেন। হিমালয় ও মেনকা একদিন পুত্র মৈনকাকে ডেকে বললেন, তুমি কৈলাসে যাও ও শিব পার্বতীকে এখানে নিয়ে এস। পার্বতী আসলে সকলে মেয়ে জামাইকে অভিনন্দন জানালেন। পার্বতী গুরুজনদের প্রণাম করলেন। শিব স্বীয় পত্নীর সঙ্গে ষোড়শোপাচারে অর্চিত ও সম্মানিত হয়ে শ্বশুরালয়ে অবস্থান করলেন।

৪৬.

কামাতুর রতি পতিকে ফিরে পেয়ে বাসর ত্যাগ করে নিজ নিকেতনে উপনীত হলেন। যৌন মিলনের উদগ্র কামনায় সখীদের বললেন, তারা যেন সযত্নে তাদের মিলন সাজে সজ্জিত করে দেয়। তাঁরা মনোহর পরিবেশে মিলনের আনন্দে মেতে উঠলেন। তাঁরা যৌন লীলায় এতটুকুও ক্লান্তি অনুভব করলেন না। পারস্পরিক কামোত্তেজনায় নখের আঁচড়ে, দন্তের দংশনে, তাপে দেহ ক্ষত বিক্ষত হলো। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে নিয়ে চন্দন বনে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে এসে চিত্তচাঞ্চল্য জাগাটাই স্বাভাবিক, যৌনকামনায় রাধাকৃষ্ণ উভয়েই চঞ্চল হয়ে মিলিত হলেন। মিলনের শুরুতেই তাঁরা তৃপ্তিতে মূর্ছিত হলেন।

৪৭.

কৃষ্ণ বললেন–এরপর ইন্দ্রের দর্পচূর্ণের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করবেন। গুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে স্বয়ং দীক্ষা দেন। তিনি গুরুর শব্দের অধিকারী হন। ইন্দ্র একদিন গুরুকে দেখা সত্ত্বেও তাঁকে প্রণাম করলেন না। তখন বৃহস্পতি অত্যন্ত অপমানিত হলেন। ইন্দ্রের সভা ত্যাগ করে গৃহে ফিরলেন। ইন্দ্র গুরুপত্নী তারার স্মরণে গেলেন।পরে দেবরাজ স্বীয় পুত্রের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করে শচী ও রাজলক্ষীকে ত্যাগ করে বনে চলে গেলেন। শচীদেবী গুরুকে স্মরণ করলেন।

৪৮.

সূর্য একদিন উঠেই অস্ত গেল, মালী, সুমালী নামক দুই দৈত্য কিরণ দিতে উদ্যত হলো। দৈত্যদের। সূর্যদেব বধ করলেন। শিব ক্রুদ্ধ সূর্যকে নাশ করতে এগিয়ে এলেন। সূর্য ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। শ্রেষ্ঠ মুনি ঋষিরা আপনারই সেবায় তপস্যার ফল লাভ করেন। আপনিই তপস্যার ফলদান করেন, নিজেই তপস্যাস্বরূপ ও নিজে তপস্যার অতীত। ব্রহ্মা ভক্তিভরে সূর্যকে সঙ্গে নিয়ে ভক্তবৎসল শিবের কাছে হাজির হলেন। শিব সূর্যকে আশীর্বাদ ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করে হাসিমুখে নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন। যে লোক বিপদে বিধাতার করা এই স্তব পাঠ করে তার ভয় দূর হয়।

৪৯.

অগ্নিদেব কোন এক সময় শত সহস্র ভয়ানক শিখা বিস্তার করে একাই ত্রিভুবন ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন। তিনি অহঙ্কারে ভৃগুর শাপে রেগে গিয়েছিলেন। বিষ্ণু অগ্নির সামনে উপস্থিত হয়ে তার দাহিকা শক্তি হরণ করে নিলেন। মায়া বলে জনার্দন শিশুর রূপ ধরে ভক্তিতে মাথা নীচু করে বিনয়ের সাথে অগ্নিদেবকে বললেন, ভগবান আপনি কেন রাগ করছেন? ভৃগু আপনাকে শাপ দিয়েছে, আপনি তাঁকেই দমন করুন। আর যদি চান তো বিশ্বের রক্ষাকর্তা হরিকে জয় করুন। আগুন শুকনো শরপাতা দেখে যেমন লোলুব্ধ হয়, মেঘ যেমন চাঁদকে ঘিরে থাকে, সে রকম শিখা দিয়ে ব্রাহ্মণকে ঢেকে রাখলেন। কিন্তু শুকনো পাতার বা পিণ্ডুর একটি নোমও পুড়ল না দেখে তাঁর দর্পচূর্ণ হল।

৫০.

দুর্বাসা রুদ্রের অংশ। অম্বরীষ একদিন দ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করে বহু ব্রাহ্মণদের খাইয়ে সবেমাত্র উপবাস ভঙ্গ করে জল পান করতে চলেছেন, সেই মুহূর্তে দুর্বাসা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে সেখানে এসে বললেন, আমাকে খেতে দাও। তিনি খাবারে চুল পেলে আগুনের মতো ভয়ংকর পুরুষের রূপ ধারণ করে রাজাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। রাজা ভয়ে হরির শরণাপন্ন হলেন ও হরির কৃপায় তাঁর বিপদ দূর হল এবং তিনি হরির স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন। ভক্তদের রক্ষার্থে হরি এভাবেই সুদর্শন চক্রকে কাজে লাগান।

৫১.

ধন্বন্তরি হলেন স্বয়ং নারায়ণের অংশ ও মহান। পূর্বে সমুদ্র মন্থনের সময় তিনি উঠে আসেন। ধন্বন্তরি এক দাম্ভিক শিষ্য তক্ষককে ধ্বংস করে, এবং ধন্বন্তরি মনসার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। মনসা তাকে নাগদেশে ছাড়লে, ধন্বন্তরি গরুড়কে স্মরণ করে তাদের ঠোঁট দিয়ে খেয়ে ফেলল। ধনন্তরি পরাজিত হয়ে শঙ্করকন্যা মনসাকে প্রণাম করলেন। পরে সাপেরা মহানন্দে ফণা দুলিয়ে চলে গেল। পরে আস্তিক মুনি মাতাকে যথাবিধি ভক্তি করলেন, আর জগৎগৌরীও সেই মুনি পুত্রের উপর তুষ্ট হলেন। যে ভক্তি যুক্ত হয়ে মহাপুণ্য স্তোত্র পাঠ করে, তাদের বংশধরদের নিঃসন্দেহে সাপের ভয় থাকে না।

৫২.

কৃষ্ণ রাধাকে ছেড়ে যেতে উদ্যত হলে, রাধা বিরহিণীর মতো ক্রন্দনরতা হয়ে দেহত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। কামশাস্ত্র বিশারদ কৃষ্ণ কৌতুকবিষ্ট হয়ে কামিনী রাধার সাথে পুনরায় শৃঙ্গার ও ক্রীড়া করলেন।

৫৩.

কৃষ্ণ রাধার সাথে মিলিত হয়ে রাসমণ্ডলে রাসক্রীড়া করে সেখান থেকে যমুনার তীরে গেলেন। যমুনার নির্মল জলে স্নান করে এবং জল পান করে, গোপিনীদের সাথে জল ক্রীড়া করতে লাগলেন। ক্রীড়া সাঙ্গ হলে বাসন্তী বনে গিয়ে রমণ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে আসব মদ্য পান করলেন। তাম্বুল খেলেন ও পরক্ষণেই মনের আনন্দে ঘুমিয়ে পড়লেন।

৫৪.

কংস ধনমুখ নামক শঙ্কর যজ্ঞ আরম্ভ করে, ভগবানকে নিমন্ত্রণ করলে, ভগবান সেখানে যান। কৃষ্ণ কুজার সাথে শৃঙ্গার করে তাকে গোলোকে পাঠালেন এবং সুদামা মালাকারকে দয়া করে মুক্ত করলেন। পরে ভীষণ সংগ্রামে ভূমিপুত্র নরকাসুরকে হত্যা করে, ষোলো হাজার নারীকে বিয়ে করলেন। জগৎপতি আবার রাধার সাথে এসে রাসমণ্ডলে বাস করতে লাগলেন।

৫৫.

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের আত্মা ও সকল পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি সকলের আরাধ্য ও সুখদায়ক। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ধর্ম, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, দুর্বাসা ও কামদেবের দর্পচূর্ণ করেছেন।

৫৬.

শ্রীকৃষ্ণ চরিত অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। কবির মুখ থেকে শোনা গেলে তা আরো শ্রুতিমধুর হয়। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের ছেলের মৃত্যুতে, তার স্ত্রীদের হরণে ও কর্ণের সাথে যুদ্ধে অর্জুনের দর্প নাশ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উষা হরণের ব্যাপারে বাণ রাজার হাত কেটে দিয়ে তার দর্প চূর্ণ করেন এবং দক্ষযজ্ঞে ভৃগুর দর্পনাশ করেন। শিবপ্রিয়া মহানন্দে ত্রিভুবনের সকল দেবীদের মধ্যে পূজ্য বন্ধনীর দ্বারা স্তুত হন। স্ত্রীহীন ব্যক্তি এই স্তোত্রপাঠ করার ফলে বিনয়ী, সুসতী, সতী সুশীলা, কুলজা, কোমলা ও শ্রেষ্ঠ স্ত্রী লাভ করে থাকে।

৫৭.

সতী মহালক্ষ্মী দেবতাদের স্তব শুনে তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে কান্না থামিয়ে বললেন– আমি রাগ করে দেহ ত্যাগ করছি না। যে নারী স্বামীর প্রেম লাভ করতে পারে না তার জন্ম নিরর্থক। যে নারীর প্রিয় স্বামীতে ভক্তি থাকে না, সে অশুচি। ধর্মহীন কোন কাজে তার অধিকার থাকে না। স্ত্রীর কাছে স্বামী সকল দেবতা, স্বামীই দেবতুল্য শুচি। দেবতারা ভগবান জগদীশ্বরকে প্রণাম করে নিজেদের স্থানে চলে গেলেন।

৫৮.

নারদকে নারায়ণ বললেন, আগে তিনিই সবার আশ্রয় ছিলেন। পৃথিবীর একটা দর্প হয়েছিল। ভগবান পৃথুকে দিয়ে হরি তার সেই অহংকার চূর্ণ করেন। আবার দেবমাতা অদিতির যখন দর্প

হল হরি তখন অদিতির পুত্রদের অদৃশ্য করে তার দর্প চূর্ণ করেন। তিনি নির্বাণ দান করেন। গঙ্গার দর্প হল যখন, জহ্নু মুনিকে দিয়ে ব্রহ্মা সেই দর্প চূর্ণ করেছিলেন। দুর্গাকে দিয়ে চূর্ণ করান হয় মনসার দর্প। রাধা কৃষ্ণকে বিরজাতে উপগত জেনে রেগে তাকে ভৎর্সনা করেন এবং কৃষ্ণ ও যখন রাস ঘরে ঢুকেছিলেন, তখন সদর্পে গোপীদের দিয়ে বাধা দিয়ে ছিলেন আর দ্বারীদের দিয়ে বেতের আঘাত করিয়ে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের নিজের ভক্ত শ্রীদামের দ্বারা রাধাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

রাধা দৈবাৎ গোলোক থেকে এসে বৃষভাণুর স্ত্রী কলাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার অনুরোধে কংসের ভয়ে নন্দের মন্দিরে যান, এজন্যই তাকে নন্দ-নন্দন বলা হয়, পরে শ্রীদামের শাপে বিচ্ছেদ পালনের জন্য ব্রহ্মা আবার মথুরায় গিয়েছিলেন। একথা ব্রহ্মা বলেছেন। এছাড়া কৃষ্ণের অন্য উদ্দেশ্য আর কেউ জানে না। কৃষ্ণের জন্মকথা, মথুরা থেকে গোকুলে আসার কথা সবই বলা হয়েছে। এবার অন্য কাহিনি হল–নন্দনন্দন যখন নন্দের কাছ থেকে মথুরায় যান তখন নন্দ ও। যশোদা শোকাকুল হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপ, গোপী, গাভী প্রভৃতি সবাই বৃন্দার সঙ্গে বৃন্দাবনের বনে বন্য প্রাণীর কাছ থেকে যে রকম দুঃখ পেয়েছিলেন, বন্য জন্তুরা তার কিছুটা জানে। রাধাও তখন বন, বন্য ও বন্যপদ ত্যাগ করে এবং কখনও বনে কখনও শ্মশানে ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন। এভাবে কৃষ্ণের ওপর রাগ প্রকাশ করেন দুঃখী রাধা। কখনও রাগশূন্য হয়েছেন, কখনও সজ্ঞান, কখনও অজ্ঞান হয়েছেন, আবার কখনও পেতে চেয়েছেন কৃষ্ণকে। তার গভীর নিশ্বাস পড়ছিল। মাঝে মাঝে জ্ঞান হারাচ্ছিল। কখনও বিছানায় শুয়েছেন, কখনও বিপন্ন হয়ে বিছানা ছেড়ে কেবলই কেঁদেছেন।

৫৯.

এরপর ইন্দ্রের দর্প নাশের পুরো ব্যাপারটা বললেন–নারায়ণ। একদিন ইন্দ্র রত্নসিংহাসনে বসে আছেন, সেখানে সেসময় এলেন দেবগুরু বৃহস্পতি। তাঁকে দেখেও অহঙ্কার বশত ইন্দ্র প্রণাম এবং সম্মান প্রদর্শন করলেন না। অত্যন্ত, রুষ্ট হয়ে অপমানিত বোধ করে সেখান থেকে উঠে গেলেন গুরু বৃহস্পতি, তবুও ধার্মিক বৃহস্পতি তাকে স্নেহবশত কোন অভিশাপ দেননি। ইন্দ্রের কিন্তু দর্পনাশ হয়েছিলো। তিনি এটা নিশ্চিত, যে কোন ধার্মিক, যদি ভালবেসে সেই পাপীকে অভিসম্পাত না করে তাহলেও পাপীকে পাপের ফল ভোগ করতে হয়।

তাকে শাস্তি দেয় ধর্ম। হিংস্র অপরাধীকে ধার্মিক যদি রাগ করে অভিশাপ দেয় অপরাধীর তবে বিনাশ হয়। নষ্ট হয়ে থাকে ধার্মিকের ধর্মও। গুরুকে অপমান করার অপরাধে, অধর্মের জন্য ইন্দ্রের ব্রহ্মা হত্যাজনিত পাপ হয়। ইন্দ্র ভয়ে নিজের রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যান বিষ্ণু সরোবরে, পরে পদ্মসূত্রের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করতে লাগলেন। পবিত্র বিষ্ণু সরোবরে যেতে পারে না ব্রহ্ম হত্যাকারী। তপস্বীদের তপস্যার প্রধান স্থান ভারতবর্ষের বিষ্ণু সরোবর। অনেকে সেই স্থানকে পুষ্কর বলে থাকেন।

পুরাবিদ পণ্ডিতরা বলেন নহুষ নামক ধার্মিক হরিভক্ত কোন এক রাজা ইন্দ্রকে রাজ্যভ্রষ্ট হতে দেখে জোর করে চুরি করেন তাঁর রাজ্য। বরারোহা অনপাত্যা সুন্দরী শচীদেবী দুঃখিত মনে মন্দাকিনীতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় রাজেন্দ্র নতুন সেই নবযৌবনা। রত্নালংকার ভূষিতা ও সুকোমলাঙ্গী, যুবতী, ক্রন্দনরতা শচীকে দেখে কামাসক্ত হয়ে মূর্ছা গেলেন, পরে তার সামনে দাঁড়িয়ে চাকরের মত বিনীত ভাবে বলতে লাগলেন। জ্ঞানীরাও বুঝতে পারে না বিধাতার লীলা কি বিচিত্র। ইন্দ্র সর্বাঙ্গে যোনি চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছেন।

যার স্ত্রী এরকম সুন্দরী, তার মনও পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়! তাঁর কাছে রম্ভা, উর্বশী, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, রত্নমালা, কলাবতী, সুন্দরী, কালিকা, ভদ্রাবতী ও চম্পাবতী বা কে? এই সকল অপ্সররা তার ষোলো ভাগের এক ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নয়। দুর্মতি ইন্দ্র এরকম স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য নারীর কাছে কিভাবে গেলেন? আমাদের স্ত্রীরা তার চেড়ীর তুল্যও কিনা সন্দেহ, তুমি খুশি হয়ে আমার ভজনা কর, কারণ আমি তোমার দাস। কৃষ্ণের বুকে যেমন গোলাকবাসী রাধা রয়েছেন, লক্ষ্মী ও সরস্বতী যেমন বৈকুণ্ঠনাথের বুকে, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার বুকে যেমন ব্রাহ্মণী, শঙ্করী যেমন কৈলাসে শংকরের বুকে, সুন্দর, শ্বেতদ্বীপে ক্ষিরোদসাগরে বিষ্ণুর বুকে যেমন ভাগ্যবতী মর্তলক্ষ্মী সিন্ধুকন্যা, ধর্মের বুকে যেমন মহা সাধ্বী মূর্তিদেবী, অনন্তদেবের বুকে পাতাললক্ষ্মী বাসন্তী, পুষ্টি গনেশের বুকে, দেবসেনা কার্তিকের তাঁর প্রিয়া বুকে, বরুণানী বরুণের বুকে, স্বাহা অগ্নির বুকে, রতি কামদেবের বুকে, দিনেশ্বরের বুকে সংজ্ঞা, বায়ুর বুকে তাঁর স্ত্রী, চন্দ্রের বুকে রোহিনি, কশ্যপের বুকে দেবমাতা অদিতি, হিমালয়ের বুকে মেনকা, লোপামুদ্রা অগস্ত্যের বুকে, তাঁরা বৃহস্পতির বুকে।

দেবহূতি কর্দমের বুকে, অরুন্ধতি বশিষ্ঠের বুকে, মনুর বুকে শতরূপা ও নলের বুকে দময়ন্তী যেমন থাকেন, আমার বুকে থাকবে তেমনি তুমি। আমি অনায়াসে হাজার ইন্দ্রকে খণ্ড করতে পারি। স্বামী অপেক্ষা শক্তিশালী পুরুষকে উপপতি হিসাবে পেতে চায়। আমি দুর্গম অথচ নির্জন সুমেরু পর্বতের চূড়ার, চন্দন বায়ুতে সুরভিত সুন্দর কমনীয় মলয় পর্বতে কিম্বা

নন্দনকাননে এবং কখনও শত শৃঙ্গ যুক্ত পাহাড়ের ধারে, পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে, কখনও ঠান্ডা বায়ু বিশিষ্ট গোদাবরী নদীর তীরে জলের কাছে, কখনও শ্মশানে বা অতিশশ্মনে, কখন ও সুরম্য কখনও গঙ্গার তীরে সুন্দর চম্পক বনে আমার প্রিয়াকে পেতে চাই।

নির্জন পাহাড়ে পাহাড়ে, কখনও নির্জনে, বন্দরে বন্দরে, কখনও অতি দুর্গম দ্বীপে, কখনও নদীতে বা সমস্ত জন্তু পরিত্যক্ত সুন্দর সমুদ্র তীরে তোমার সাথে বিহার করব। নির্জন স্থানে সঙ্গম অত্যন্ত সুখের হয়ে থাকে। নিজে ফুল চন্দন চর্চিত হয়ে হে সুন্দরী তুমি নিজে ফুল চন্দন যুক্ত বিছানায় আমাকে নিয়ে রতি সুখ অনুভব কর। আমি ব্রহ্মার বরে জন্ম মৃত্যুহীন ও সুস্থির যৌবনযুক্ত ও সুবেশ সুন্দর, বীর ও কামশাস্ত্রবিশারদ, আমার মুখে শরতের পূর্ণ চাঁদের শোভা, কারণ আমার জন্ম চন্দ্র বংশে। অতএব সুন্দরী তুমি পতি হিসাবে আমাকে বরণ কর। উর্বশী আজ নিজে এসে আমাকে প্রার্থনা করে ছিলেন। আমার পরস্ত্রী সঙ্গমে কোন ইচ্ছা নেই বলে আমি তাকে পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু তোমাকে দেখা মাত্র আমার মন চঞ্চল হয়ে পড়েছে। আমার স্ত্রী যে রত্নাভূষণে সজ্জিত তাদের আমি পরিত্যাগ করব তোমার জন্য। তাদের তুমি দাসী করে রাখতে পার। আমি যুদ্ধে অত্যন্ত তেজ সম্পন্ন ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে বরুণকে জয় করে তার শ্রেষ্ঠ রত্নমালা তোমাকে দেব।

তুমি আদেশ দাও এই দাসকে, আজই দুর্বল অগ্নিকে পরাজিত করে বহ্নি শুদ্ধ কাপড় তোমাকে দেব। আমি আজই দেবজননী অদিতির শ্রেষ্ঠ মনি নির্মিত ঘরের আকারে কুন্ডল তোমাকে দেব। দুর্বল চন্দ্রকে হারিয়ে রোহিনীর অমূল্য রত্ন নির্মিত রত্নালংকার দুটি তোমাকে দেব। যক্ষারোগী অত্যন্ত রোগা চাঁদ ভয় পেয়ে বিনা যুদ্ধে তোমাকে তা দেবে। কৃপা করে দান ও করতে পারে আমার পূর্ব পুরুষ বলে। আমি ভিক্ষা করে তোমাকে দেব পার্বতীর পায়ের নুপূর। দুটি সেই আশুতোষ স্তবের বশীভূত, ভক্তদের প্রতি কৃপাময় ও সকল সম্পত্তির দাতা। তিনি পরম কল্পতরুস্বরূপ, সুতরাং আমার প্রার্থনা অবশ্যই পূরণ করবেন। আমি যুদ্ধ করে গঙ্গার অমূল্য রত্ন তৈরি দুর্লভ কেয়ুর দুটো তোমায় দেব। কামদেবকে পরাজিত করে কামের স্ত্রীর অমূল্য রত্নের পরিষ্কার আয়না এনে দেব।

নারায়ণের কাছে লক্ষ্মীর ক্রীড়া কমল চেয়ে এনে দেব। ব্রহ্মার তপস্যা করে এনে দেব সাবিত্রীর অতি দুর্লভ আংটিগুলি। বাণীর বীণায় আপনি মূছনা ও বেদের গীতালাপ হয়ে থাকে যে তা তোমার হাতে দেব। বিশ্বকর্মার স্ত্রীর পায়ের আঙ্গুলের অলংকার তোমায় দেব।

এইসব নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শচীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল নহুষ। শচীদেবীর তখন গেল গলা, ঠোঁট তালু শুকিয়ে। ভয় পেয়ে হরির ও গুরুদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করলেন। সেই রাজাকে বললেন–বৎস। মহারাজ! ভয় দূরকারী রাজা সবাইকে শাসন ও রক্ষা করে থাকেন। আপনি স্বর্গের রাজা হবেন। চন্দ্র এখন রাজ্যভ্রষ্ঠ। যে রাজা সেই প্রজাদের, পিতা, ও রক্ষাকর্তা এতে কোনো সন্দেহ নেই। গুরুপত্নী, রাজপত্নী, দেবপত্নী, ভৃত্যপত্নী পুত্রবধূ, মাসী, পিসি, পিতা, মাতা, বোন, শিষ্যপত্নী, ভাইয়ের স্ত্রী শাশুড়ী, বোন, কন্যা পুরুষের মা বলা হয়। গর্ভধারিণী ও ইষ্ট দেবী এই ষোল জনকে। যদি মাতৃ গমনের ইচ্ছা হয় তবে দেবমাতা অদিতির কাছে যাও। মাতৃগামীর কোন নিস্তার নেই।

ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্যন্ত তাদের কুম্ভীপাক নরকে অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হয়। পরে বহুকাল বেশ্যার যোনিকট হয়ে থেকে সাতকল্প কৃমি হয়। এরপর তারা এককল্প ব্রণকৃমি, সাতকল্প মাথার কৃমি ও এককল্প শস্যকৃমি হয়। তারপর জন্মায় কুষ্ঠ রোগী ও ছাগল হয়ে, শূকর হয়ে জন্মায় পরে।

প্রত্যেক জন্মে ক্লীব হয়ে জন্মায়। ব্রহ্মা নিজে বলেছেন তাদের কোন নিস্তার নেই।

৬০.

বৃহস্পতি বলেছেন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরও ব্রাহ্মণী গমনে এমন ফলভোগ করতে হয়। তাদের নিস্তারের কোন উপায় নেই। নিশ্চয়ই সংসারীদের স্বর্গ সম্পত্তি ভোগ সুখের হয়ে থাকে। কিন্তু মুমুক্ষুর মোক্ষ্য, তপস্বীর তপস্যা, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, মুনির মৌনতা, বৈদিকের বিদ্যাভ্যাস, কবির কাব্যবর্ণনা ও বৈষ্ণবের বিষ্ণুর দাসত্ব ও বিষ্ণুভক্তি রসই পরম পদার্থ।

ভক্তি ছাড়া মুক্তি পেতে চান না বিষ্ণুর ভক্তরা। চন্দ্র বংশীয় রাজা পদ্ম প্রকাশের জন্য অতি তেজস্বী, গ্রীষ্মের দুপুরে সূর্যের মতো আর্বিভূত হন। নিতান্ত কর্তব্য মহাদ্ব্যসির ধর্ম পালন করা। যশের মত সকল আশ্রমেই ধর্ম পালন করা। ত্রিসন্ধ্যা হরির অর্চনা, ও সুখাদিক হরির পাদোদক ও নৈবেদ্য খাওয়াই ব্রাহ্মণের নিজের ধর্ম। বিষ্ণুকে নিবেদন করা হয়নি যে অন্ন ও জল তা মূত্র স্বরূপ ব্রাহ্মণরা তা খেলে। শূকর হয়ে জন্মায়।

ব্রাহ্মণরা আজীবন হরিকে নিবেদন করা বস্তু খায়। একাদশী, কৃষ্ণের জন্মদিন, শিবরাত্রি, শ্রীরামনবমী ও অন্যান্য পূণ্যদিনে সযত্নে উপোস করা ব্রাহ্মণদের স্বধর্ম। পরমব্রত ও তপস্যা

পতিব্রতা নারীর ধর্ম। নারীর ধর্ম হল পরের স্বামীকে পুত্রের মতো দেখ। প্রজাদের নিজ পুত্রের মতো প্রতিপালন করা রাজাদের কর্তব্য।

ক্ষত্রিয়দের এই ধর্ম বলে নির্দেশ করেন ব্রহ্মা। বাণিজ্য করা বৈশ্যের ধর্ম, শূদ্রদের ব্রাহ্মণ সেবাই পরম ধর্ম। শ্রীকৃষ্ণের সকল কাজের ফল আত্মস্থ করাই সন্ন্যাসীর ধর্ম। একমাত্র লাল কাপড় পরবে সন্ন্যাসী, ধারণ করবে লাঠি ও কমল, ভিক্ষু ব্যক্তি দৈবাৎ কাউকে বিদ্যা মন্ত্র দান, থাকার জন্য বাসস্থান বা কোন বস্তু কামনা করবে না।

সন্ন্যাসী হবেন নির্মোহ নিঃসঙ্গ। খাবেন না কোন সুস্বাদু খাবার। দৈবক্রমেও কোন স্ত্রীর মুখ দেখবেন না। কোন সঞ্চিত বস্তু চাইবেন না গৃহস্থের কাছে। সবার কার্যের কথাই বলেছেন তিনি। শচী পথের মাঝে এই কথা বলে থামলে, রাজা নপুষ মাথা নীচু করে শচীকে বলল–হে দেবী! আমি তোমাকে বেদোক্ত কথা বলছি শোন।

স্বর্গ, পাতাল বা অন্য দ্বীপে অনুষ্ঠিত সকল কার্যের কাল ভোগ করতে হয় না,–এতো বেদ স্বীকৃত। হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত জায়গার নাম পুণ্যক্ষেত্র ভারত, যা মুনিদের তপস্যার ক্ষেত্র। যা সকল জায়গার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পুণ্যবান লোকেরা স্বর্গে গিয়ে স্বর্গকন্যাদের সাথে চিরকাল আনন্দ লাভ করে।

পুণ্যবান লোক মানুষের দেহ ত্যাগ করে স্বর্গে আসে। আমার পুণ্যবল দেখ, কারণ আমি এসেছি সশরীরেই। স্বর্গ ভোগের স্থান। সকল কিছু ভোগের পর নারী সম্ভোগ সার। ভোগের জায়গায় ভোগ্যবস্তু ছেড়ে দেওয়া প্রশংসার কাজ না।

তুমি ভোগীদের যথার্থ ভোগ্য, তুমি ভাবানুরক্ত ও রসিক। যে হেলায় ভোগ্যবস্তুকে ছেড়ে দেয় সে অস্বাভাবিক। তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে সেই অবিরাম সুখ ত্যাগী দুর্বোধ লোক যে পশু, তাতে সন্দেহ নেই। তোমায় ভিক্ষে করে এনে দেব লক্ষ্মীর বুকের অমূল্য রত্নমালা।

মহাদেবের মাথায় অলংকার, জন্ম, মৃত্যু ও রোগদূরকারী ও শিবের উৎকৃষ্ট ক্রীড়াকর বস্তু, ত্রিভুবনে দুষ্প্রাপ্য ও বিশ্বপূজ্য। ভক্তিভরে সূর্য ব্রতকরে তোমায় দেব ত্রিভুবন দুর্লভ সূর্যের শ্রেষ্ঠমণি স্যমন্তক। এই মণি প্রত্যহ আট ভরি সোনা প্রসব করে থাকে। মদন দেবের জন্মমৃত্যুহর এই অমূল্য রত্নলিখিত মধুপূর্ণ রত্নপাত্র তোমায় এনে দেব।

লক্ষ্মীর যে পদ্মাসন অমূল্য রত্নখচিত যাতে গোলাকার এবং শ্রেষ্ঠ মণি বসানো হয়েছে এবং লক্ষ হাত পরিমাণ যার পরিধি এবং যা তেজে সূর্যের সমান–লক্ষ্মীর প্রিয় সেই পদ্মাসন আমি তোমায় নিশ্চয় দেব। পথ আটকে দিয়ে রাজা নহুষ শচীর পায়ে বারবার পড়তে লাগল। শচী গুরুদেব ও হরিকে স্মরণ করে বলেন– মধুমাতাল ও মদমাতাল থেকে কামে উন্মত্ত লোক বেশি অজ্ঞান হয়।

কামনায় হতচেতন হলে মানুষ নিজের মৃত্যুকেও পরোয়া করে না। সত্য বলছি, আজ আমার ঋতুর প্রথম দিন। রজঃস্বলা স্ত্রীর, ঋতুর প্রথম দিন চণ্ডাল, দ্বিতীয় দিন ম্লেচ্ছ ও তৃতীয় দিন কেবল মাত্র নিজের স্বামীর কাছেই শুদ্ধ, কিন্তু দৈব ও পিতৃকার্যে সে অশুদ্ধ থাকে। অন্যের কাছে ঐ দিন শূদ্রের মতো অসৎ। রজঃস্বলা নারীর উপর উপগত হয় যে তার ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয়, সে লোকের পিতৃকার্যে অধিকার থাকে না।

দ্বিতীয় দিনের উপগত ব্যক্তির গো হত্যার পাপ হয়। তার আর ব্রাহ্মণদের ও দেবতাদের পূজোর কোন অধিকার থাকে না। সে হয় অমানুষ, অযশস্বী ও বিদ্যাহীন। শূদ্রের চুণ হত্যার পাপ হয়। তৃতীয় দিনের উপগত ব্যক্তি পতিত হয় সমাজে। চতুর্থ দিনে হয় অসৎ শূদ্রের সমান। সুতরাং কোন বুদ্ধিমান লোক তাতে উপগত হয় না। সেদিন তুমি আসতে পাবে যে দিন আমি ঋতুশূন্য হব।

দেবতাদের স্ত্রীর ঘুমানো, খাওয়া সব কাজ সব সময়ই পবিত্র, অপবিত্র হয় না কখনই। ঐ কর্মক্ষেত্রে ও বেদে বলা যে সব ভালমন্দ কথা বলা হয়েছে তাও ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত বৈষ্ণবদের পক্ষে ক্ষতিকর হয় না। জ্বলন্ত আগুনে যেমন সবকিছু পুড়ে, ছাই হয়ে যায় তেমনি, সকল অপবিত্রতা ভালো হয়ে যায় বৈষ্ণবের কাছে।

বৈষ্ণবরা তেজ আগুন সূর্য ও ব্রাহ্মণের থেকেও বেশি। তারা বিষ্ণুচক্রে রক্ষা পায়। নিজের পূর্ববর্তী সাত পুরুষকে পাপ থেকে রক্ষা করে। বৈষ্ণবদের কর্মফল বিচারে ও ভোগ করতে হয় না।

সামদেবের কৌথুম শাখায় বলা আছে এমন কথা। চন্দ্রবংশীয় বৈষ্ণবরা সেই সত্য জানে, তাই হরি ছাড়া অন্য কোন দেবতার উপাসনা করে না। বিষ্ণুমায়া থেকে বঞ্চিত হন স্বত্ত্ব গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়। তোমার কোন ক্ষতি হবে না। ঋতুর জন্য যদি ক্ষতি হয় তা আমারই হবে। রাজা নহুষ এই বলে হাসি মুখে রত্ননে করে নন্দনকাননে গেল। বৃহস্পতি কুশাসনে বসে

ছিলেন। বৃহস্পতি তারাদেবী তার পদসেবা করেছেন। তিনি পরমেশ্বর নিষ্ঠুন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জপ করছেন। শচী জল ভরা চোখে বৃহস্পতিকে মাথা নুইয়ে প্রণাম করলেন।

শচী পরে ব্রক্ষিষ্ট কৃপানিধির স্তব করতে লাগলেন। শচী বললেন, আমাকে রক্ষা করুন ও দাসকে নিজের জায়গায় এনে তাকে পদধুলি ও শুভ আর্শীবাদ করুন। জন্মদাতা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সকল গুরুর থেকে এবং যা তা অপেক্ষা আরো বেশি শ্রেষ্ঠ। মায়ের থেকে আবার বিদ্যদাতা, মন্ত্রদাতা, জ্ঞানদাতা ও হরিভক্তি দাতা, শতগুণে পূজ্য, বন্দনীয় ও সেবার যোগ্য। পণ্ডিতরা তাকে গুরু বলেন, যে মন্ত্র উচ্চারণ করে। যে জ্ঞান রূপ আলোর সাহায্যে অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন অনুব্যক্তির চোখ ফোঁটান সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি আমি।

কিছুতেই নিস্তার নেই অশিক্ষিত মুখের। তার অধিকার থাকে না কোন কাজেই। নরকই সেই পশুর স্থান। ঘোর সংসার থেকে নিস্তার পায় না জন্মদাতা, অন্নদাতা, মা, বা অন্য গুরুই, কেবল বিদ্যা মন্ত্র ও জ্ঞানদাতাই সংসার সাগর পার করে দিতে পারে।

শিষ্যকে উদ্ধার করতে পারে না অন্য কোন গুরু, গুরুই বিষ্ণু, ব্রহ্ম, দেব, মহেশ্বর, ধর্ম, অনন্তদেব, এবং সেই নির্গুণ সর্বাত্মা পরমেশ্বর সকল তীর্থ ও দেবতার আধার গুরু। সকল দেবতাস্বরূপ গুরু। গুরু রূপে বিরাজ করেন স্বয়ং হরি।

অভীষ্ঠ দেবতা রুষ্ট হলে গুরু রক্ষা করতে পারেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে অভীষ্টদেব রক্ষা করতে পারেন না। যার উপর গুরু রুষ্ট হবেন তার ওপর সকল গ্রহ, দেবতা ও ব্রাহ্মণরা রুষ্ট হন। গুরুসেবা অপেক্ষা তপস্যা সত্যও কোনরূপ পুন্যজনক কাজই শ্রেয় না। গুরুর থেকে বড় শাসনকর্তা বা বন্ধু আর কেউ না।

শিষ্যের কাছে গুরুই একমাত্র দেবতা। রাজা ও শাসনকর্তা, মন্ত্র ও বিদ্যা, গুরু ও দেবতা, পতি এরা প্রত্যেক জন্মেই অনুসৃত হয়। সবাই শ্রেষ্ঠ, পিতা রূপ গুরু যে জন্মে জন্ম দান সেই জন্মেই তিনি পুজ্য। এক জন্মে পূণ্য পিতা ও মাতা। প্রত্যেক জন্মেই পুণ্য কিন্তু মন্ত্রদাতা গুরু। আপনি ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপস্বীদের গুরু, সমস্ত ধার্মিকদের মধ্যে প্রধান এবং পরম ব্রাহ্মণ।

সকল দেবতারা তুষ্ঠ থাকবেন আপনি তুষ্ট থাকলে। শচীতে কাঁদতে দেখে তারাদেবীও কান্না শুরু করলেন। স্বামীর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন তারা। বৃহস্পতি বললেন, তারা ওঠ তাতে

শচীর মঙ্গল হবে। তাড়াতাড়ি স্বামীকে ফিরে পাবে শচী। বৃহস্পতি তারাকে বুকে ধরে নানা অধ্যাত্বিক কথা বলে স্বান্তনা দিলেন।

গুরু ও অভিষ্ট দেবতা প্রতিজন্মে তার উপর তুষ্ট থাকেন যে লোক পূজার সময় শচীর স্তব পাঠ করে। তুষ্ট থাকে বন্ধু বান্ধবরা সবাই। সে লোক যাবতীয় বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করে। কোন সময়ই তার দুঃখ হয় না। যে পুত্র যে স্ত্রী চায় সে গুণবতী পুত্রবতী স্ত্রী, যে রোগ থেকে মুক্তি চায় সে রোগ মুক্তি, ও যে বন্ধন থেকে মুক্তি চায় সে বন্ধন মুক্তি লাভ করে। যার যশ নেই সে যশ, ও যে মূর্খ সে মহাজ্ঞান লাভ করে, তার বন্ধু বিচ্ছেদ হয় না। এই স্তব পাঠ করলে সে সন্তান সন্ততি ও সম্পদ লাভ করে ইহকালে সকল সুখ ভোগ করার পর শেষে বৈকুণ্ঠে যায়। হরির দাসত্ব লাভ করে সে আর জন্ম নেয় না। কেবল সর্বদা শান্তিগুণ অবলম্বন করে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক ও দুঃখ দূর করে বিষ্ণু ভক্তি লাভ করে।

বৃহস্পতি শচীকে নির্ভয় হতে বললেন। কারণ তাঁর কাছে কচের স্ত্রী যেমন স্নেহ পায় শচীও তেমনই পায়। ব্রহ্মা বলেছেন পুত্র যেমন আগুন দান করে, শিষ্যও সেরকম আগুন দান করতে পারে। ব্রহ্মা বলেছেন বাবা-মা-গুরু-স্ত্রী-শিশুপুত্র ও অনাথ বান্ধব এদের সবাইকে পুরুষ অবশ্যই পালন করবে। শিব বলেছেন, সে মৃত্যুর পর অশুচি ও দৈব পিতৃকাজে তার কোন অধিকার থাকে না। যে লোক বাবা-মা ও গুরুকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁর সর্বত্রই অখ্যাতি ও পদে পদে বিপদ হয়, তার সর্বনাশ হয় যে লোক অল্প সময়ের মধ্যে ধন সম্পদে মত্ত হয়ে গুরুকে অপমান করে। ইন্দ্র তাকে সম্মান না দেওয়ার ফল তাড়াতাড়ি পেয়েছেন।

আমি তাকে বিপদ থেকে মুক্ত ও তোমাকে রক্ষা করব। তাকেই গুরু বলা উচিত, যিনি শাসন ও রক্ষা করতে পারেন। যে কখনই অসতী হয় না, যে নারীর মন পবিত্র, তার ধর্ম নষ্ট হয়, যার মনে সংশয় থাকে। হে সতী! তুমি রোহিনীর মত স্বামীর স্বাপেক্ষ, ভারতীর সমান পূজ্য ও সাবিত্রীর সমান পূজ্য পবিত্র ও নিরুপমা হবে। বৃহস্পতির কথার সময় নহুষ-এর দূত সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে বলল, দেবীকে নির্জন নন্দনকাননে ক্রীড়ার জন্য রাজা নহুষের কাছে যেতে। বৃহস্পতি চোখ লাল করে দূতকে বলে যে রাজাকে গিয়ে বলতে যে শচীকে উপভোগের বাসনা থাকলে যেন রাতে সুন্দর কোন রথে চড়ে আসে।

সুন্দর সাজ পোশাক পরে সপ্তর্ষিদের কাঁধে পালকি চাপিয়ে তাতে চড়ে আসাই তার যোগ্য কাজ। দূত নহুষকে সে কথা বললে রাজা হেসে তাকে বলে, তাড়াতাড়ি গিয়ে সপ্তর্ষিদের নিয়ে আসতে। দূতের কথায় সপ্তর্ষিরা সানন্দে রাজার কাছে এলেন। নারায়ণ বললেন, ব্রহ্মা বিষ্ণুর

প্রার্থনায় ত্রেতাযুগে দশরথের ঘরে মনের আনন্দে কৌশল্যার গর্ভে জন্মান এবং কৈকেয়ীর গর্ভে রামের মত গুণবান ভরত, আর সুমিত্রার গর্ভে গুণী লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্ম নেন। রাম বিশ্বামিত্রে উপদেশে সীতাকে নেওয়ার জন্য লক্ষ্মণের সাথে সুন্দর নগর মিথিলায় যান।

রাম বনের মধ্যে পাষাণ রূপী নারীকে দেখে বিশ্বামিত্রের কাছে তার কারণ জানতে চান। বিশ্বামিত্র রামের কথা শুনে তার কাছে গোপন সকল ব্যাপার বললেন। রাম সব শুনে পাদস্পর্শে পাষাণীকে পদ্মিনী করলেন। অহল্যা রামকে আশীর্বাদ করে স্বামীর কাছে ফিরে গেলে মহামুনি গৌতম স্ত্রীকে ফিরে পেয়ে রামকে শুভ আর্শীবাদ করলেন। পরে রাম মিথিলায় গিয়ে হরধনু ভঙ্গ করে। সীতাকে বিয়ে করলেন।

তাঁরা অযোধ্যায় ফিরলে নানা কৌতুক ও মঙ্গলচারণ হয়। রাজা দশরথ রামকে সিংহাসনে বসানোর জন্য সাত তীর্থের জল কলস ভরে এনে মুনি শ্রেষ্ঠদের রাজসভায় আনলেন। রামের অভিষেকের সময় কৈকেয়ী রাজাকে প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করালে রাজা শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। রাম তাদের দেখে প্রণাম করে বলেন, অপনারা ব্রহ্মার পুত্র, নারায়ণপরায়ণ ও শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপা ও নারায়ণের সমান শক্তিশালী।

এই বলে রাজ নহুষ তাদের প্রণাম করে কাঁদতে লাগল। রাজাকে কাতর দেখে পরমহিতৈষী ঋষিরা বললেন–যা তুমি চাও সবই আমরা দিতে পারি, আমাদের অসাধ্য কিছু নেই। আমরা তোমায় সব দান করে তপস্যা করতে যাবো। কৃষ্ণের ভজনা ছাড়া আমরা এক মুহূর্ত কাল অতিবাহিত করি না। তা আমাদের কাছে এক লক্ষ্য যুগ বলে মনে হয়। সেই দিনই দুর্দিন যে দিন হরির ধ্যান ও সেবা করা হয় না।

সে নিজের বিপদের জন্য অমৃত ছেড়ে বিষ পান করে যে হরির প্রার্থনা ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থণা করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ধর্ম, গনেশ সূর্য, অনন্ত ও সনক ঋষিরা দিনরাত যে হরির চরণ ধ্যান করেন এবং যাতে তাদের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি দূর হয় আমরা তারই অভিলাষী।

মায়ায় মুগ্ধ হয়ে রাজা ঋষিদের কথা শুনে লজ্জিত ভাবে মাথা নিচু করে বললে, ভক্তবৎসল ও সকল প্রাথিত বিষয় দান করতে পারেন, এখন শচী দান করে আমার বাসনা পূরণ করুন। শচী সপ্তর্ষি বাহন কাণ্ডের অভিলাষিণী, ঋষিরা নহুষের কথা শুনে কৌতুকভরে জোরে হেসে উঠলেন। মুনিরা নহুষের পালকি কাঁধে তুললেন, তাদের দেরী দেখে তাদের ভৎর্সনা করার জন্য অগ্রগামী দুর্বসা রেগে গিয়ে নহুষকে শাপ দিলেন।

তুমি বিশাল অজগর হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেবে ও পরে ধর্ম পুত্রের দর্শনে তোমার মুক্তি ঘটবে। ব্যর্থ হবে না তোমার কর্ম। সাপের দেহ ত্যাগ করে রত্নরথে চড়ে বৈকুণ্ঠে গিয়ে নারায়ণের সেবা করবে। শাপ দিয়ে মুনিরা হাসতে হাসতে চলে গেলেন। রাজাও দুর্বাসার অভিশাপে সাপ হয়ে গভীর বনে ঢুকে পড়ল। শচী ঘটনা শুনে গুরুদেবকে প্রণাম করে স্বর্গে চলে গেল। সরোবরের কাছে গিয়ে হাসি মুখে বৃহস্পতি ইন্দ্রকে ডেকে বললেন–আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই, নির্ভয়ে তুমি আমার কাছে এস। গুরুর গলার আওয়াজ চিনতে পেরে ইন্দ্র সূক্ষ্মরূপ ছেড়ে নিজের রূপ ধারণ করে ভক্তি করে গুরু দেবের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

ইন্দ্রকে ভীত দেখে বৃহস্পতি তাকে বুকে টেনে নিলেন। সোমযাগ করালেন প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য এবং সুন্দর রত্ন সিংহাসনে বসালেন। ইন্দ্রের সম্পত্তি চারগুণ বাড়িয়ে তুললেন তিনি। শচী ইন্দ্রকে ফিরে পেয়ে নিজের ঘরে ফুলের বিছানায় সুখে কাল কাটাতে লাগলেন। নারদ এবার সোমযোগের নিয়ম জানতে চাইলেন।

ব্রহ্মহত্যার–শান্তি সোমযাগের ফল। এই যজ্ঞ করলে যজমানকে মনের আনন্দে একবছর সোমলতার রস পান, ফল ও জল খেয়ে থাকতে হয়। এভাবে তিনবছর কাটালে ও ব্রত করলে সকল পাপ নাশ হয়। যে লোকের চাকর মাইনের তিন বছরের বা তার বেশি ধান সংগ্রহ করা থাকে, সে সোমরস পান করতে পারে। দেবতা বা মহারাজারাই কেবলমাত্র এই যজ্ঞ করতে পারে, এতে অনেক টাকা পয়সা ও দক্ষিণার প্রয়োজন।

৬১.

নারায়ণ বললেন–সমুদ্র মন্থনের পর দৈত্যদের পরাজিত করে অমৃত রস পান করে ইন্দ্রের অত্যন্ত দর্প হয়েছিল। কৃষ্ণ বালিরাজকে দিয়ে তার দর্পচূর্ণ করান। রাজ্যহারা হল ইন্দ্র সমেত সকল দেবতারা। বৃহস্পতির স্তবে ও অদিতির ব্রতে তুষ্ট হয়ে অদিতির গর্ভে বিষ্ণু বামন হিসাবে জন্ম গ্রহণ করেন।

পরে ছলনা করে বালিরাজার কাছে রাজ্য প্রার্থনা করে। ইন্দ্রের রাজ্য ফিরিয়ে দেন। দুর্বাসাকে দিয়ে ইন্দ্রের সম্পদ চুরি করিয়ে নেন। ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ হলে পরে কৃষ্ণ ইন্দ্রকে তা দান করেন।

ধন সম্পদে গর্বিত হয়ে ইন্দ্র গৌতমপ্রিয়াকে চুরি করেন। পরে গৌতম মুনির শাপে সকল দেহে হাজার যোনি চিহ্ন যন্ত্রণা ভোগ করেন। ইন্দ্র হাজার বছর সূর্যের আরাধনা করে তাঁর বরে গায়ের সেই হাজার যোনিচিহ্ন হাজার চোখে পরিণত হল। তার নাম হল সহস্রাক্ষ। তারা হরণ করার জন্য চাঁদের কলঙ্ক রেখার মত তার চোখগুলি কলঙ্কের মত রইল। যাকে পৃথিবীর সবাই পুজো করেন, যিনি জগতকে পবিত্র করেন, সেই নারায়ণ বললেন–অহল্যা একদিন তীর্থযাত্রা উপলক্ষে পুষ্করে আসেন। ইন্দ্র তখন তাঁকে দেখেন।

পীনোন্নত স্তন, হাসি খুশি সুদতীশান্ত অহল্যাকে দেখে ইন্দ্র অজ্ঞান হয়ে যান। পরদিন অহল্যা নগ্ন অবস্থায় মন্দাকিনীতে একাকী স্নান করছিলেন। অহল্যার বিশাল শ্রেণি ও স্তনদুটি দেখে ইন্দ্র কামনায় পীড়িত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কিছুপরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে অহল্যার কাছে গিয়ে খুব বিনীত ভাবে বললেন, হে সুন্দরী! তোমার অসাধারণ রূপ, অল্প বয়স! শরতের চাঁদ অপেক্ষা বেশি সুন্দর তোমার মুখ, সুন্দর কুটিল ভুভঙ্গিমা দেখামাত্রই মন আকৃষ্ট হয়।

পদ্মের সৌন্দর্যকেও হার মানাচ্ছে তোমার চোখ দুটি, তোমার গতি হার মানায় হাতি ও খঞ্জনার গতিকেও। তোমার লোভনীয় কথাবার্তা অমৃত অপেক্ষাও মিষ্টি ও দুর্লভ। মুনিদেরও মন হরণ করে তোমার বিশাল শ্রোণি। তাকে কামের আধার মনে হয়। তোমার স্তনদুটি ত্রিলোকে সবার মন হরণ করে, তা কঠিন সুন্দর বেলের মতো, গৌতম তপস্যা করেই এই সুন্দরী স্ত্রীকে লাভ করেছেন।

দুর্গা ও কমলার আরাধনা করে লক্ষ্মীর মত ঐরকম পদ্মমুখী সুকোমলাঙ্গী পবিত্র সুদতী শীতে সুখোষ্ণ এবং গরমে সুখ শীতল উজুল সোনার মত কঠিন স্তন বিশিষ্ট বিশাল নিতম্ব সরু কোমর বিশিষ্ঠ পদ্মিনী স্ত্রীকে লাভ করেছেন। কামশাস্ত্র বিশারদ কামদেব বা কামুক চাঁদ তোমার মত নারীকে কিভাবে রমণ করতে হয় তা তারা জানেন, কিন্তু গৌতম কি তা জানেন? শচীকে তোমার দাসী করে দেব হে সুন্দরী।

অহল্যার চরণে ইন্দ্র কামুক হয়ে লুটিয়ে পড়লে মহামতী অহল্যা তাঁকে উপযুক্ত বেদের কথা শোনাতে লাগলেন। বললেন, ইন্দ্র তুমি কশ্যপের কু সন্তান। তোমার দ্বারা কি তার পিতা মহামুনি মারীচি ও তার পিতা ভগবান ব্রহ্মারও দুর্ভাগ্য প্রকাশে পেয়েছে। নারীতে আকৃষ্ট হয় যার মন তার কাছে জপ, মৌনব্রত, দৈবপূজা ও তীর্থসেবা কিছুই ফলজনক হয় না। নারীর রূপ সকল মায়ার আধার বিশেষ, মানুষের কর্ম পথের বাধা, তপস্যায় বিঘ্নের কারণ ও সকল

দোষের আধার। কঠিন বন্ধনের মত তা সংসারে আবদ্ধ ব্যাক্তির কাছে, তাদের সকল কাজই নিষ্ফল হয় যাদের মন পরস্ত্রীতে আকৃষ্ট।

পরস্ত্রী ভোগকারী ইহকালে সুখ্যাতি ও পরকালে ঘোর নরকগামী হয়। মহামতী অহল্যা এই বলে কামুক ইন্দ্রকে ছেড়ে বাড়ি ফিরে এলেন। গৌতম মুনি ইন্দ্রের চরিত্রের কথা চিন্তা করে হাসতে লাগলেন। গৌতম শিবের কাছে গেলে ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধরে অহল্যাকে সম্ভোগ করলেন। সর্বজ্ঞ মুনি এদিকে সমস্ত কিছু জানতে পেরে হঠাৎ দরজার কাছে এলেন এবং ইন্দ্রকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে পীন শ্রেনি পায়ে ধরা অহল্যাকে নির্জনে মগ্ন হয়ে থাকতে দেখে রেগে গিয়ে ইন্দ্রকে 'ভগাঙ্গি হও' আর স্ত্রীকে কাঁদতে দেখে ও ভয় পেতে দেখে অভিশাপ দিলেন- "তুমি, এই বনের মধ্যে পাষাণ হয়ে থাক' বলে অভিশাপ দিলেন।

অহল্যা শোকার্ত হয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন কেন, তিনি তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। গৌতম বললেন, তুমি পতিব্রতা হওয়া সত্ত্বেও আমি তোমায় পরিত্যাগ করব কারণ তুমি অন্যের বীর্য গ্রহণ করেছ। অনিচ্ছায় শৃঙ্গার করলে উপপতির সঙ্গে সংসর্গ হওয়ার জন্য নারীর কোন দোষ হয় না। নিজের ইচ্ছায় অপরের ভোগ্য হলে সে দোষের ভাগী হয়। ইন্দ্রকে স্বামী বিবেচনা করে ইচ্ছা করে তার সঙ্গে সম্ভোগ করেছে, তখন তোমার নিশ্চয়ই দোষ হয়েছে। অহল্যা তুমি গভীর বনে গিয়ে পাষাণে পরিণত হও। পরে রামের ছোঁয়ায় পবিত্র হবে। সেই পুণ্যে আমাকে আবার ফিরে পাবে, এখন বনে যাও। মুনি তপস্যা করতে চলে গেলেন। তোমার কাছে ইন্দ্রের দর্পনাশের ব্যাপার এবং তিনি যে ভাবে গুরুর কৃপায় লক্ষ্মীকে পেয়েছিলেন তা বলিনি।

৬২.

রাম কিভাবে অহল্যাকে উদ্ধার করেছিল নারদ তা জানতে চাইলেন। সরোবর দানে তার বেশি ফল লাভ হয়, কান্তাদানে বেশি ফল লাভ হয় বাপীদানের থেকে, একবার যজ্ঞ করলে বেশি ফল লাভ হয়। কান্তাদানে বেশি ফল লাভ হয় বাপীদানের থাকে। একবার যজ্ঞ করলে বেশি ফল লাভ হয় দশকন্যা দানের থেকেও। সত্য অপেক্ষা বড় বন্ধু ও মিথ্যা থেকে নিকৃষ্ট পাতক,

গঙ্গার সমান তীর্থ ও কেশবের থেকে পরম দেবতা আর কেউ নেই, ধর্ম থেকে বড়, বন্ধু আর কেউ নেই। কোন কিছুই প্রিয় নয় ধর্ম অপেক্ষা ধন ও প্রিয়।

চেষ্টা করে নিজের ধর্মকে রক্ষা করুন। ধর্মকে রক্ষা করলে সর্বদা সব জায়গায় মঙ্গল যশ সুপ্রতিষ্ঠা। লাভ করে। সে পুজো পায় সর্বত্র। ঘরের সুখ ছেড়ে বনবাসী হয়ে বনে বনে থাকবে। আপনার সত্য পালন না করার জন্য চন্দ্র, সূর্য যতদিন থাকবে, ততদিন সে কুম্ভীপাক নরকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করার পর সাতজন্ম বোবা ও কুষ্ঠ রোগী হয়ে জন্মাতে হয়। রামচন্দ্র জটা ও বাকল পরে ও সীতাকে নিয়ে বনবাসে চললেন। রাজা দশরথ পুত্রশোকে প্রাণ ত্যাগ করলেন। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামও বনে বনে ঘুরতে লাগলেন। রাবণের বোন শূর্পনখা কিছুদিন পরে ভাইয়ের সাথে মনের আনন্দে ভয়ঙ্কর বনে বেড়াতে এসে রামকে দেখল। সে তখন রামের প্রতি কামাসক্ত ও পুলকিত হয়ে পড়ল। রামের কাছে গিয়ে বলল, তোমার প্রতি আমি আসক্ত হয়েছি, এই নির্জন বনে আমাকে তোমার স্ত্রী করে নাও, রাম তার কথা শুনে ধর্মকে স্মরণ করে অভিশাপের ভরে মিষ্টি ভাবে বলেন, মা! আমার স্ত্রী আছে, আমার ভাইয়ের স্ত্রী নেই তুমি তার কাছে যাও। রামের কথা শুনে রাক্ষসী মনের আনন্দে লক্ষণের কাছে গিয়ে মঙ্গল চিহ্ন সহ শান্ত লক্ষ্মণকে দেখে বলল, আমাকে গ্রহণ কর।

কিন্তু লক্ষ্মণ তাকে বলল, আমার স্ত্রী সীতার দাসী ও আমি নিজেও সীতার দাস। তুমি যাও রামের কাছে। তবেই তুমি হতে পারবে প্রভুর পত্নী। আমি সীতার পুত্র, তোমারও আমি পুত্র হব।

শূর্পনখা বলল–ওরে নির্বোধ! যদি আমাকে পরিত্যাগ কর, তবে তোমাদের সবারই বিপদ ঘটবে। মোহিনীকে ছেড়ে দেবার জন্য ব্রহ্মার শাপে। পৃথিবীর কোথাও দক্ষের পূজা হয় না। দক্ষের ব্রহ্মার শাপে ছাগলের মাথা হয়েছে।

উর্বশীর শাপে স্বর্গের বৈদ্যের যজ্ঞে কোন অংশ নেই। মেনকার শাপে কুবের হয়েছেন রূপহীন। মাধ্যন্দিন শাখায় বলা আছে যে, ধর্ম ভীরুর সামনে যদি নিজে থেকে কোন কামাসক্ত যৌবনবতী স্ত্রী আসে তবে তাকে পরিত্যাগ না করা উচিত।

এই অধর্ম আরো যে করে সেই বিপদগ্রস্ত ও দেহান্তে নরকগামী হয়। ধারালো অর্ধচন্দ্র ছুরিকা দিয়ে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাক কেটে দিল। তার দুই ভাই খড় ও দূষণ সৈন্য নিয়ে লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে এসে মারা পড়ল।

তখন শূর্পনখা রাবণকে সবকিছু বলল। নিজে পুষ্কর তীর্থে নিয়ে তপস্যারত অবস্থায় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে কুব্জা হয়ে জন্মাল। রাবণ এদিকে সীতাহরণ করল।

রাম সীতার অদর্শনে জ্ঞান হারালেন। অনেক অনুসন্ধানের পর সুগ্রীবের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হল। রাম প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য বালীকে হত্যা করে বন্ধু সুগ্রীবকে রাজ্য দান করেন।

সুগ্রীব চারিদিকে দূত পাঠাল দেবী সীতাকে খোঁজার জন্য। হনুমানকে নিজের আংটি দিয়ে রাম তার দেওয়া সংবাদ সীতাকে দেবার জন্য হনুমানকে লঙ্কায় পাঠলেন। সেখানে অশোক বনে ক্ষীনকায়া সীতাকে দেখে তাঁকে প্রণাম করে রামের রত্ন আংটি তাঁকে দিলেন।

হনুমান বললেন–মা! রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সাথে বাস করছেন। রাম আমার মুখে আপনার মঙ্গল সাগর বন্ধন করে শীঘ্র এসে পড়বেন। রাবণকে নাশ করে আপনাকে উদ্ধার করবেন। আমি লঙ্কাকে পুড়িয়ে ছাই করব। হনুমান বলল যে লঙ্কাকে বানরীর ডিমের মত, সমুদ্রকে মূত্রের মত ও পৃথিবীকে মরার মত মনে করে।

হনুমান সীতাকে আশ্বাস বাণী শুনিয়ে লঙ্কাপুরী পোড়ালেন। হনুমান এরপর সীতাকে সান্ত্বনা দিয়ে রামকে গিয়ে সমস্ত কথা বললেন।

রাম কাঁদতে লাগলেন, তা দেখে লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবসহ বানররাও কেঁদে উঠল। রাম সৈন্যদের সাহায্যে সমুদ্রে সেতু নির্মাণ করে লঙ্কায় এলেন। ভয়ংকর যুদ্ধ করে রাবণকে সবংশে নিহত করে শুভক্ষণে সীতা উদ্ধার করলেন। রাম সীতাকে পুষ্পক রথে বসিয়ে অযোধ্যায় নিয়ে এলেন এবং রাম সীতাকে বুকে নিয়ে মনের সুখে কাল কাটাতে লাগলেন।

দুজনের বিরহ জ্বালা দূর হল। সপ্তদীপের রাজা হলেন রাম। সমস্ত পৃথিবী অধিব্যাধি শূন্য হল। রামের লব কুশ নামক দুই ধার্মিক পুত্র জন্মাল। তাদের থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সূর্যবংশীয় রাজাদের। এই রামচরিত সকল কিছুর সার ও সংসার-সাগর পার হবার নৌকা স্বরূপ।

৬৩.

নারায়ণ জানালেন, এই দুঃস্বপ্ন দেখার পর কংস দারুণ ভয়ে খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করল। পরে পাত্র মিত্র, বন্ধু, ও বান্ধব ও পুরোহিতকে ডেকে তাঁর স্বপ্নের কথা শোনালেন। এক লোল জিহ্বা ভয়ংকর কালো রঙের এক বুড়ী নগরের মধ্যে নাচতে নাচতে চলেছে। তার পরনে রক্তবস্ত্র, তার দুহাতে ভয়ংকর তীক্ষ্ণ দুই খাঁড়া। এক এলোকেশী নাককাটা কালো রঙের বিধবা মহাশূদ্রী

যেন তাকে জড়িয়ে ধরতে চায়। অন্য আর এক মলিন শুকনোচুল নারী পরণে যার চেলী তার কপালে ও বুকে তিলক এঁকেছে। আর এক কুচেলধারী বিকটাকার রুক্ষক্ষেপ ম্লেচ্ছ যেন, ভোরে তাকে ছিন্নভিন্ন কাপড়ের টুকরো দান করছে। এক পতিপুত্রবতী নারী দারুণ রেগে বারবার শাপ দিয়ে আস্ত কলস ভেঙে ফেলেছে। এক ব্রাহ্মণও দারুণ রেগে তার রক্ত চন্দন মাখা জবাফুলের মালা দান করছে, তার নগরে থেকে থেকে ছাই বৃষ্টি হচ্ছে। বিকটাকারের বানর, কাক, কুকুর, ভালুক, শুয়োর, ও গাধারা ভয়ংকর চিৎকার করছে।

ভোরে সূর্য ওঠার সময় শুকনো কাঠের ছাই, কাজল কর্পর ও কাটা নখ, সবাই নজরে এল। এক সতী নারী রুষ্ট হয়ে তাকে শাপ দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তার পরণে ছিল পীতরঙা কাপড়। হাতে খেলার জন্য পদ্মফুল। আমার শহরে এলোকেশী বিকটাকারের উলঙ্গা নারীরা সব সময় সব ঘরে হাসিমুখে নাচছে, তা লক্ষ্য করেছি। ছিন্ননাক ভয়ংকর এক দিগম্বরী মহাশূদ্রী বিধবাকে দেখলাম আমার সারা গায়ে তেল মাখিয়ে দিতে।

খুব ভোরে নিভে যাওয়া কাঠের ছাইয়ে ভর্তি ভয়ংকর চিতা দেখেছি। ঐ চিতার পাশে লাল কাপড় পড়ে অবিন্যস্ত চুলে লোকেরা আনন্দে নাচ গান করছে। কেউ রক্ত বমি করছে, কেউ ভয়ংকর নাচ নাচছে। কেউ শুয়ে আছে। রাতে আকাশে রাহুগ্রস্ত চাঁদও সূর্যের পূর্ণগ্রাস দেখেছি। দেখলাম প্রবল বাতাসে গাছের ডাল পালা সব ভেঙে হাওয়ায় উড়ছে।

সকল পাহাড় যেন পৃথিবীতে ভেঙে পড়েছে। এক ভয়ংকর লোক যার মাথা নেই সে সব বাড়িতে নেচে চলেছে। পুরোহিত সত্যক এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চিত বুঝতে পারল যে কংসের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আর বোঝা মাত্র কংস জ্ঞান হারাল। তখন কংসের বাবা, মা ও পত্নীরা তাদের বিনাশ কাল উপস্থিত বুঝে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

৬৪.

শুক্রের বুদ্ধিমান শিষ্য পুরোহিত সত্যক বললেন, তিনি থাকতে কংসের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। এখন সকল শত্রু নাশী মহাদেবের যজ্ঞের আয়োজন করতে হবে। এই যজ্ঞে অনেক টাকা পয়সা ও দক্ষিণা প্রয়োজন। এই যজ্ঞে নাশ করে দুঃস্বপ্ন ও শত্রুভয়। এই যজ্ঞ দূর হয় ভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধিবৈজ্ঞানিক এই তিন বিপদ। এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করতে পারলে সকল সম্পদদাতা মহাদেব নিজে দেখা দেন ও জন্ম-মৃত্যু দূরকারী বর দেন। পূর্বে রাজা বান, পরশুরাম ও বলী ভল্ল এই যজ্ঞের আয়াজন করেছিলেন। মহাদেব নন্দীকে প্রথমে এই ধনুক দান করেন।

বাণরাজাকে নন্দী তা দান করেন। বাণ আগে তা পরশুরামকে দান করেন, পরশুরাম দয়া করে তা আপনাকে দান করেছেন। ঐ ধনুক মহাদেবের ইচ্ছানুসারে তৈরি হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য হাজার হাত ও প্রস্থ দশ হাত। মহাদেব দৈত্য সংহার করেন। এই ধনুকে দুর্দান্ত পাশুপত অস্ত্রযোগ করে। নারায়ণ ছাড়া কেউ ভাঙতে পারে না ঐ ধনুক।

ধনুক ও শিবের পূজো করতে হবে। এই যজ্ঞে যদি কোন ভাবে ধনুক ভাঙা যায় তবে নিশ্চয় যজমানের বিনাশ হবে। আর ধনুক ভাঙ্গা গেলে নিশ্চয়ই যজ্ঞও ভঙ্গ হবে। কাজ করা না গেলে ফলদান কে করবে। এই ধনুক গোড়ায় ব্রহ্মা এবং নারায়ণ নিজে, মধ্যে ও সামনে মহাশক্তিমান মহাদেব রয়েছেন, শ্রেষ্ঠ রত্নে তৈরি বিকারহীন ঐ ধনুক গ্রীষ্মকালের দুপুরের সূর্যের মত তেজকেও ম্লান করেছে। তাকে নত করতে পারেনি অনন্তদেব সূর্য ও কার্তিক। পূর্বে ত্রিপুরারি ঐ ধনুক দিয়েই ত্রিপুরাসুরকে নিহত করেছেন।

এখন নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে শুভ কাজ আরম্ভ করুন। যিনি চন্দ্র বংশকে বর্ধিত করেছেন সেই সত্যকের কথা শুনে রাজা কংস ভাল ভাল কথা সত্যককে বলতে লাগল। বলল, নন্দের ছেলে যে আমাকে বধ করবে সে এখন বসুদেবের ঘরে জন্ম নিয়ে সেখানে বড় হচ্ছে। সে পুতানাকে বধ করেছে। এক হাতে গোবর্ধন পাহাড় ধরে রেখে ইন্দ্রকেও হারিয়ে দিয়েছে। সে কৃত্রিম রাখাল ছেলে ও বাছুর প্রস্তুত করে সকল পৃথিবী ব্রহ্মময় দেখিয়েছে। এখন সেই শক্তিমান বালককে হত্যার বুদ্ধি দিন। সে ছাড়া আর কোন শত্রু নেই। যেসব রাজা রয়েছেন সবাই আমার বন্ধু আর ব্রহ্মা এবং স্বয়ং মহাদেব মহাতপস্বী ও সর্বাত্মা, সনাতন বিষ্ণু সব কিছুকেই সমান দেখেন। তাদের বিপক্ষ হওয়া সম্ভব না।

নন্দের সেই ছেলেকে মারতে পারলেই সকল ত্রিভুবনের সার্বভৌম রাজা হতে পারব। দুর্বল ইন্দ্রকে হারিয়ে নিজেই ইন্দ্র হব। সত্যক কংসের কথা শুনে সেই সময়ের উপযুক্ত সত্য ও হিতকর কথা বললেন। অক্রুর, উদ্ধব অথবা বসুদেবকে নন্দের ব্রজে পাঠান। কংস সত্যকের কথা শুনে বসুদেবকে ডাকল। বসুদেব বলল–আপনি নন্দের নন্দন কৃষ্ণের বাড়ি নিয়ে বৃষভানু; নন্দ, কৃষ্ণ, বলরামসহ সকল গোকুলবাসীদের বসুদেব শীঘ্র এই যজ্ঞস্থলে নিয়ে আসুন ও সকল দূত, রাজা ও মুনিদের জানানোর জন্য খবর নিয়ে চারিদিকে বেরিয়ে পড়ুন। রাজার কথায় বসুদেবের গলা, ঠোঁট ও তালু শুকিয়ে গেল।

সে বলল, এখন নন্দ ও নন্দের ছেলেকে জানানোর জন্য ব্রজে যাওয়া আমার ঠিক হবে না। নন্দের ছেলে এই মহোৎসবে এসে অবশ্যই তোমার সঙ্গে তার বিরোধ হবে। আর আমি তাকে

ডেকে এনে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেব তা তার পক্ষে ভাল হবে না। তা হলে হয় তোমার নয় তার বিপদ হবে। সকলে বলবে যে কৃষ্ণের বাবা কৃষ্ণকে ডেকে এনে তার ক্ষতি সাধন করল বা বসুদেব পুত্রকে দিয়ে রাজার মরণ ঘটাল।

এতে দুজনের মধ্যে একজন অবশ্যই মারা যাবে। বসুদেবের কথায় রাজা ক্রুদ্ধ হল। সে খঙ্গ দিয়ে বসুদেবকে মারতে উঠল। তখন মহা শক্তিশালী উগ্রসেন হাহাকার করে পুত্র কংসকে থামালেন। কংস আকুরকে ব্রজে পাঠাল।

তখন সনক, সনন্দ, পঞ্চ শিখ, কপিল, আসুরি পুলহ, পুলস্ত্য, ভৃগু অঙ্গিরা, মরীচি, কশ্যপ দক্ষ, অত্রি, ভরদ্বাজ, ব্যাস, গৌতম, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, উতথ্য, সৌভরি, পর্বত, দৈবল, জৈমিনী, বিশ্বামিত্র, শাকল জাজলি, লাঙ্গলি, শিলানিক জগকারু, দুর্বাসা, বামদেব, বিভন্তক, কবি, পথ, কৌশিক পাণিনি, বাল্মীকি, লোমশ, মার্কণ্ডেয়, পরশুরাম, অগস্ত্য ঋষি নর ও নারায়ণে ও অন্যান্য ব্রাহ্মণরাও এলেন। বিভিন্ন রাজারা এলেন, তখন সত্যক যজ্ঞের দিন ও শুভক্ষণ ঠিক করলেন।

৬৫.

অক্রুর কংসের কথা শুনে মনের আনন্দে উদ্ধবকে বলতে লাগলেন–আজ রাত কেটে গেছে, পরম শুভদিন এসে উপস্থিত। আজ আমার গুরু, ব্রাহ্মণ ও দেবতারা সবাই তুষ্ট হয়েছেন। আমার কর্মান্ধতা আজ ছিন্ন হোল, সংসার রূপ কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে আজ আমি বৈকুণ্ঠে যাব।

কংসের রাগ আজ আমার কাছে দেবতার আশীর্বাদের মতো হলো। আমি ব্রজরাজকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য ব্রজধামে গিয়ে নবশ্যাম কৃষ্ণকে দর্শন করব। হয়ত তিনি সারা গায়ে ননী মেখেছেন বা বাঁশি বাজিয়ে সবার মন চুরি করে নিয়েছেন, কিম্বা গরু চরাচ্ছেন বা শুয়ে আছেন, নিজের চোখে অন্যভাবে দেখব।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি দেবতারা কৃষ্ণের চরণ পদ্ম ধ্যান করেন, সরস্বতী নিজেই ভয়ে জড় হয়ে যান যার স্তব করতে গেলে।

যাঁর দাসীর কাজ করেন স্বয়ং মহালক্ষ্মী, যাঁর চরণকমল থেকে সত্ত্বসরূপিনী গঙ্গা দেবী আর্বিভূতা হয়েছেন, যাঁর দেখা ও ছোঁয়া পেলেই মানুষের জন্ম-ব্যাধি-মৃত্যুভয় দূর হয়, সকল

পাপতাপ, আর যে হরির চরণকমল, ত্রিলোকজননী দুর্গতিনাশিনী মূলপ্রকৃতি পরমেশ্বরী দুর্গা সর্বদা ধ্যান করেন ও স্থূল থেকে সুলতর মহাবিষ্ণুর লোমকূপে অসংখ্য বিশ্ব বিরাজ করছে–সে কৃষ্ণের ষোলো ভাগের একভাগ মাত্র–সেই কৃষ্ণকে দর্শন করতে যাব আমি। এই বলতে বলতে অক্রুরের সারা গায়ে তখন রোমাঞ্চ দেখা গেল, চোখ থেকে বেরোতে লাগল আনন্দ অশ্রু।

৬৬.

সেই রাসেশ্বর রাসেশ্বরীর সঙ্গে রমণ করতে ইচ্ছে করে রমণ করতে শুরু করলেন। রাধা ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এক দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে। বললেন, স্বামী আপনি তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসুন, আমি আপনাকে বুকে ধরি, রাধা এই বলে প্রিয়কে আপন বুকে ধরে দুঃস্বপ্নের কথা বলতে লাগলেন।

রাধা বললেন–হে স্বামী! আমি যে রত্নছবি ধরে সিংহাসনে বসে আছি, এমন সময় কোন এক ব্রাহ্মণ রেগে গিয়ে আমাকে অভিশাপ দিল। দুর্বল, বলে আমাকে ভয়ংকর গভীর সাগরে ছুঁড়ে ফেলল। সেই স্রোতে পড়ে শোকার্ত ও ব্যাকুল হয়ে বার বার মহাতরঙ্গ বেগে ভাসতে লাগলাম।

'বাঁচাও' বলে চিৎকার করেও যখন তোমার দেখতে পেলাম না, তখন দেবতাদের কাছে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করলাম। সেই ঢেউয়ের মধ্যে ডুবে গিয়ে দেখলাম চাঁদ আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে একশো টুকরো হয়ে গেল।

সূর্যেরও একই দশা হলো। আবার দেখলাম, চাঁদ ও সূর্যকে রাহু গিলে ফেলেছে ও সারা পৃথিবী অন্ধকারময় হয়ে যাচ্ছে। পরে দেখলাম দীপ্তিমান এক ব্রাহ্মণ ক্রোধভরে আমার কোলে রাখা অমৃতের ভাণ্ড ভেঙে ফেলল।

পরে সেই ব্রাহ্মণ দারুণ রেগে আমার চোখের সামনে কোনও একটা লোককে ধরে নিয়ে চলে গেল। হাত থেকে পড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল আমার হাতের ক্রীড়াকমল। শ্রেষ্ঠ রত্নে তৈরি আয়না হঠাৎ হাত থেকে পড়ে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

গলার হার ছিঁড়ে মলিন পদ্মরূপে মাটিতে পড়ল। দেখলাম সকল পুতুলগুলি কখনও নাচছে, কখনও হাসছে, কখনও চিৎকার করছে, কখনও গান করছে বা কাঁদছে। ভয়ঙ্কর এক কালোরঙের চক্র যেন সারা আকাশ জুড়ে মুহুর্মুহু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমার প্রাণধিষ্ঠাতা দেবতা যেন অন্তর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন–হে রাধা! আমায় বিদায় দাও। আমি চলে যাচ্ছি, আবার দেখলাম কালো কাপড় পরে কোনও এক নারী আমায় জড়িয়ে ধরে চুমো খেল। স্বপনে এর উল্টো ঘটনাও লক্ষ্য করেছি। আমার ডান চোখ নাচছে, প্রাণ কেঁপে উঠছে, সকল মন শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এই বলতে বলতে রাধার গলা, ঠোঁট, তালু শুকিয়ে গেল ও ভয়ে শোকগ্রস্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। জগন্নাথ কৃষ্ণ স্বপ্নের ঘটনা শুনে দেবীকে নিজের বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিলেন।

৬৭.

দুজনে ক্রীড়া সরোবরে গেলেন। চাঁদ যেমন নতুন মেঘে শোভা পায়, রাধাও তেমনি কৃষ্ণের বুকে শোভা পাচ্ছিলেন। রাধার সাথে তিনি বিহার করতে শুরু করলেন। সেই বিহার মন্দিরে শ্রেষ্ঠ রত্ননির্মিত রত্নপ্রদীপ জ্বলতে লাগল, তিনি সুন্দর রসসাগরের তৈরি শয্যাতে শুয়ে মনের আনন্দে রত্নালংকার সজ্জিত সাক্ষাৎ রত্ন স্বরূপ রাধার সাথে রমণ করতে লাগলেন।

তাঁদের সুরক্রীড়া থামলেও ইচ্ছা থামল না। রাধা তখন রাসমণ্ডলস্থ, শ্রীকৃষ্ণকে বলতে লাগলেন- হে কমলাকান্ত! আপনার অদর্শনে ও আমি ম্লান ও মৃতের মতো পড়ে ছিলাম। আপনার দর্শনে আমার তেমন অবস্থা হয় যেমন চন্দ্রের হয়। সূর্য অস্ত গেলে পৃথিবীতে যেমন গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে সেরকম আপনি চলে গেলে, চিন্তা আমায় গ্রাস করে। পাঁচ প্রাণবায়ুর সমান আপনি মার কাছে।

সনৎকুমার ও অনন্তদেবও অনেক কাল ধরে তপস্যা করে তার কাছে যোগের কিছুটা জানতে পেরেছেন। কৃষ্ণ রসিকা যোগিনী রাধাকে বুকে টেনে নিয়ে তাঁকে বললেন–হে জাতিস্মর; তুমি নিজেকে স্মরণ কর।

শ্রীদামের অভিশাপের জন্য তোমার সাথে আমার কিছু দিনের জন্য বিচ্ছেদ ঘটবে, কিন্তু পুনরায় মিলন হবে। আমি সকলের অন্তরাত্মা, সকল কার্যে উদাসীন ও সকল জীবের মধ্যে থেকেও সব জায়গায় অদৃশ্য ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বায়ু যেমন কোন কিছুতে লিপ্ত হয় না, সব জায়গায় সকল প্রাণীর মধ্যে থাকে, তেমন আমিও নির্লিপ্ত অথচ সকাল কাজের সাক্ষী। যে জীবাত্মা সব সময় সকল জীবের মধ্যে থাকে তা আমার ছায়া মাত্র।

সেই জীবাত্মাই সর্বদা কর্মের অনুষ্ঠান ও ভাল-মন্দ কাজের ফল ভোগ করে। চাঁদ-সূর্যের ছায়া, যেমন পড়ে জলভর্তি ঘটে আবার সেই ঘট ভেঙে গেলে সেই ছায়াও চাঁদ ও সূর্যে সংশ্লিষ্ট হয়।

দেহ বিনষ্ট হলে ছায়াস্বরূপ জীবও আমার মধ্যে বিলীন হয়। আমি ভাল করেই জানি, সকল কিছুই নশ্বর, কোথাও আমার আর্বিভাব কম, কোথাও বেশি। কোন কোন দেবতা কলার অংশের অংশ, কেউ আবার তারও অংশ। আমার অংশজাত সূক্ষ্ম প্রকৃতি দেবী। পাঁচ মূর্তিতে বিভক্ত এই প্রকৃতি দেবী।

যারা জন্মায় প্রকৃতি থেকে তারাই প্রাকৃতিক কল্পে নষ্ট হয়। যে বিরাট পুরুষের লোমকূপের মধ্যে সকল বিশ্ব রয়েছে, সৃষ্টির সময়ে আমিই সেই বিরাট পুরুষ হয়ে থাকি এবং তুমিও যে আমার অংশ থেকে সৃষ্ট।

যাঁর নাভি কমল থেকে সকল বিশ্বের সৃষ্টির কারণ ব্রহ্মা উদ্ভূত হয়েছেন, এই ক্ষুদ্র বিরাটও আমি এবং আমিই বিষ্ণু শিব–কারণ সকলেই আমার অংশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তুমিও নিজের অংশে সব সময় সেই ক্ষুদ্র বিরাটের মঙ্গলদাত্রী বিরাট শ্রীরূপা পত্নী হয়ে থাক।

প্রতেক বিশ্বেই এরকম আলাদা আলাদা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এরা আলাদাভাবে বর্তমান। চতুর্ভুজ মুর্তিতে আমি-ই বৈকুণ্ঠে ও তুমি মহালক্ষ্মী রূপে বিরাজ করছ। সেই বৈকুণ্ঠ গোলকের মত বিশ্বের বাইরের উপরে দিকে রয়েছে। শিবারূপিনী তুমিই দুর্গ নামক অসুরকে বধ করে সকল দুর্গতি নাশিনী দুর্গা নামে অভিহিত হয়েছে। পরে কৈলাসে পার্বতী নামে বিখ্যাত হও।

আবার তুমি নিজের অংশে সিন্ধুকন্যা হয়ে ক্ষীর সমুদ্রশায়িত বিষ্ণুর বুকে রয়েছ। তুমিই লক্ষ্মী শিবা, ধাত্রী ও গোলোকে রাসেশ্বরী রাধা, বৃন্দাবনে বৃন্দা, বিরজাতটে বিরজা–আলাদা রূপে প্রকাশ পেয়েছ।

শ্রীদামের শাপে এই ভারতবর্ষ ও বৃন্দাবন ধামকে পবিত্র করার জন্য ভারতে এসেও, সকল নারীরাই তোমার কালাংশের অংশ কলায় উৎপন্ন, আমি অংশ বিশেষে অগ্নিরূপী হলে তুমিও নিজের অংশে স্বাহা নামে দাহিকাশক্তিররূপে আমার প্রিয়া হয়েছ। তোমার বিহনে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।

আমি দীপ্তমানদের মধ্যে সূর্যরূপে প্রকাশিত হলে তুমিও প্রভারূপে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছ। তোমার মিলন ছাড়া আমি দীপ্তিমান হতে পারিনা। পূর্বে পদ্মকল্পে পদ্ম যেদিন, ব্রহ্মা পুষ্কর তীর্থে

একশো ইন্দ্রের পতন পর্যন্ত কঠোর তপস্যা করাতে করুণাসাগর কৃষ্ণ লক্ষ করলেন যে সে রোগা নিশ্চেষ্ট ও অস্থি চর্মসার হয়েছে। এই দেখে সাদরে সেই যোগের কিছু অংশ তার কাছে প্রকাশ করেন, পূর্বে করুণাসাগর ধর্মকেও সিংহক্ষেত্রে চৌদ্দজন ইন্দ্র পর্যন্ত তপস্যা করার জন্য রোগা হলে আমার কাছে কিছুটা বর্ণনা করেছেন।

সনকুমার ও অনন্তদের অনেক কাল তপস্যা করে তার কাছে ঐ যোগের কিছুটা জানাতে পেরেছেন ও ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, হিমালয়ে তপস্বী কপিল দেব ও পুষ্করে সূর্যদেব বহুঁকার ধরে তপস্যার জন্য তাদের কাছে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ ও পরম তপস্বী দুর্বাসা ও ভৃগুর কাছেও কিছুটা ব্যক্ত করেছেন। যোগীদের গুরু শ্রীকৃষ্ণ রসিকা যোগিনী নিয়ে তাঁর কাছে কিছুটা আধ্যাত্মিক বিষয় বললেন।

৬৮.

ক্রীড়া শেষে কৃষ্ণ ফুলশয্যা থেকে উঠে প্রাণাধিক প্রিয় রাধাকে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁর মুখ পরিষ্কার কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে শান্ত ভাবে মিষ্টি কথায় বললেন, যে হেতু তাকে বৃন্দাবনে যেতে হবে, সেহেতু সে রাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তার রাসমণ্ডলে থাকতে হবে। গ্রামে দেবতারা যে ভাবে থাকে সেভাবে থাকতে হবে।

কৃষ্ণ রাধার কাছে বিদায় চাইলেন। অকুরের আসার খবর জানতে পেরে কৃষ্ণ রাধাকে জড়িয়ে ধরে চলে যেতে প্রস্তুত হলেন রাধা। শ্রীকৃষ্ণকে চলে যেতে দেখে ব্যাকুল হয়ে বললেন, আমার ওপর আপনার ভালবাসা ও আমার সৌভাগ্য সব কি শেষ হয়ে গেছে? আপনি এই বিরহ কাতর দুঃখী অবলা কে গভীর শোক সাগরে ফেলে কোথায় যাবেন? আমি ঘরে যাব না আপনাকে ছেড়ে।

দিন রাত 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে আমি বনে সময় কাটাব। আমি আগে গর্গমুনির কাছে আপনার খবর শুনে আপনাকে জেনেও আপনার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ব্রহ্মার রোষানলে প্রেম বা ভক্তিভরে কোনো কথা বলতে পারিনি। আপনি আমায় ত্যাগ করলে আমার কলঙ্ক হবে। বিনাশ ঘটবে আপনার সন্তান সন্ততিদের। রাধা এই বলে শোকার্ত হয়ে মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারালেন।

দয়াময় কৃষ্ণ রাধাকে অজ্ঞান হতে দেখে তাকে চেতনা সম্পন্ন করলেন ও বুকে তুলে ধরলেন। দুঃখহারক যোগের কথা বলে তাকে নানা সান্তনা দান করলেও তার শোক দূর হল না। মানুষের সামান্য বস্তুর বিয়োগও শোকের কারণ হয়, তখন দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ কার ভাল

লাগে? কৃষ্ণ ব্রজে না গিয়ে রাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। রাধা তখন ফুল ও চন্দনে সেজে সেই নির্জনে চন্দনমাখা ফুলের বিছানায় স্বামীর অপেক্ষাতে বসে রইলেন।

৬৯.

কৃষ্ণ পুনরায় কামার্ত হয়ে বিদগ্ধ রাধার সাথে রমণে প্রবৃত্ত হলেন। পিতৃগণের মানসী কন্যা পাণ্ডুর প্রিয় শিষ্য ধন্য মান্য মালিনী, জ্ঞানী শতকল্পজীবী বেদ বেদাঙ্গ শাস্ত্রে নিপুণ, শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ যোগিনী, নানারূপধারী, প্রসিদ্ধ, সাধ্বী রাধামাতা কলাবতী যেমন চৌষট্টী কলায় আসক্ত, কামশাস্ত্রে নিপুণ, বিদগ্ধ, রসিকেশ্বরী স্থিরযৌবন তাঁর মেয়ে রাধার মধ্যেও সেইসব গুন বর্তমান এবং সব দিক থেকে মায়ের মত কামুকী ও সুশীলা।

বিহার সময়ে রাধাও স্বামীর প্রতি নানা কামভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ রাধার সাথে রাসে চৌষট্টি কলার সাহায্যে বিহার করতে লাগলেন। কৃষ্ণের নখের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হল রাধার শ্রোণি ও স্তন। সুখ সম্ভোগে নিমগ্ন নগ্না মূর্ছিতা রাধার দেহে পুলক সঞ্চারিত হল, রাধা ঘুমিয়ে পড়লেন।

কৃষ্ণ বুকে করে নিয়ে তাঁকে চুমো খেলেন। এবং অতি সূক্ষ্ম মূল্যবান দুর্লভ কাপড় পড়িয়ে খোলা চুল কবরীবদ্ধ করলেন। তাঁর গায়ে কুমকুম, চন্দন, গলায় অমূল্য রত্নহার ও সিঁদূর দিলেন। গলায় নানা চিত্রবিচিত্র পত্রাবলি রচনা করে পাদপদ্মে রঞ্জিত রত্ননূপুর পরিয়ে পায়ের আঙ্গুলের নখে আলতা মাখালেন।

মোহের বসে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। বিরহে কাতর হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বার বার চুমো খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ব্রহ্মা ও শিব সেখানে বসে এই প্রেমময় কার্যাবলি দেখে সামবেদোক্ত স্তব রলেন। ব্রহ্মা বললেন, আপনার চরণ প্রার্থনা করি। আপনি শরণাগতকে রক্ষা করেন ও ভক্তবৎসল বলে সব সময় ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্য ব্যস্ত থাকেন। জগৎপালক কৃষ্ণকে এ ভাবে স্তব করে ব্রহ্মা বারবার তাকে প্রণাম করে অত্যন্ত প্রেমবশতঃ মূর্ছিত হলেন। ব্রহ্মার করা স্তব যে এক মনে শোনে–তার মনের সকল বাসনা পূর্ণ হয়। পুত্র হীন পুত্র পায়, প্রিয়াহীন প্রিয়া পায়, ধনহীন ধন পায়। ব্রহ্মা আবার বলতে লাগলেন, হে দেবশ্রেষ্ঠ, পরমানন্দ নন্দনন্দন, হে নিত্যানন্দ, আপনাকে প্রণাম, আপনি একশো বছর ব্যাপী শ্রীদামের শাপ স্মরণ করে বৃন্দাবন ছেড়ে এখন নন্দের বাড়ী যান।

ভক্তের শাপের অনুরোধে একশো বছর প্রিয়াকে ত্যাগ করুন। পিতৃগৃহে গিয়ে মান্যগমণ্য পরম বৈষ্ণব অতিথি পিতৃব্য অক্রুরকে দান করুন। মধুপুরীতে গিয়ে মহাদেব ধনুক ও শত্রুদের নাশ করুন। দুরাত্মা ও কংসকে বধ করে পিতামাতাকে সান্ত্বনা দিন এবং দ্বারকাপুরী তৈরী ও পৃথিবীর ভার লাঘব করুন। আপনি পুড়িয়ে দিন মহাদেবের বারাণসী, ইন্দ্রকে দমন করুন, বান যুদ্ধে শিবের জম্ভন, বাণ রাজার হস্তছেদন, রুক্মিণীকে হরণ, নরকাসুরকে হত্যা ও ষোলো জন স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করুন। প্রাণপ্রিয়াকে ত্যাগ করে এখন ব্রজে চলুন। রাধা জাগার আগে আপনি যাত্রা করুন। আপনার মঙ্গল হবে।

এদিকে রাধা ঘুম থেকে উঠে হরির অদর্শনে 'নাথ, প্রাণবল্লভ' বলে কাঁদতে লাগলেন। পরে মালতী বনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভূমিতে মৃতবৎ পড়ে রইলেন। শত সহস্র গোপী পাখা বা চন্দনগোলা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। রাধার এক সখী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। জলসমেত পদ্ম পাঁকের উপর রেখে তার ওপর নিশ্চল রাধাকে স্থাপন করলেন। সখীরা সাদা চামরের বাতাস করতে লাগল। কৃষ্ণ শেষে রাধার কাছে এসে তাঁকে কোলে করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। রাধারও বিরহ, বেদনা দূর হল। নারীর বন্ধুদের মধ্যে বাবা, মা ও ভাই হল তার প্রিয়। তাদের থেকে বেশি প্রিয় পুত্র। তার চেয়েও বেশি প্রিয় হল স্বামী, সতী নারীর কাছে স্বামীই শ্রেষ্ঠ। বিদূষী নারীর কাছে স্বামী অপেক্ষা প্রিয় আর কেউ নেই। এই সংসারে দম্পতির প্রীতি ও সমতা হলেই পরম প্রেম ও সৌভাগ্য হয়।

আর সেখানে সম্প্রীতি নেই সেখানে লক্ষ্মী বাস করে না। মনের মত স্বামীর থেকে বিচ্ছেদ নারীর পক্ষে ভীষণ দুঃখজনক এবং তা শোক সন্তাপের কারণ। নারীর কি স্বপ্ন, কি জাগরণ, সকল অবস্থাতেই পতি-প্রাণস্বরূপ। রাধা জ্ঞান হারিয়ে ঘাসময় মাটিতে পড়েছিলেন। রাধার, সকল শরীর বিরহানলে দগ্ধ লৌহশলাকার মত উত্তপ্ত ও আগুনের মত অস্পৃশ্য হয়ে উঠল। পরে সজল পদ্মফুল পাঁকে বিন্যস্ত করে সেই শয্যায় বিরহ কাতর রাধাকে শোয়ান হলো। কিন্তু শ্রীদামের শাপে আমরা না চাইলেও অবশ্যই বিচ্ছেদ ঘটবে।

জেগে থাকা অবস্থায় আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে। কিন্তু আমার বরে ঘুমন্ত অবস্থায় সব সময় মিলন হবে। তাতেই তার শোক দূর হবে। এখন রাধাকে সান্তনা দেয়। তোমার মঙ্গল হবে।

কৃষ্ণ চলে গেলে সখীরা রাধাকে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন। কৃষ্ণ বাড়ি গিয়ে বাবাকে-মাকে প্রণাম করে মায়ের কোলে উঠে ননী খেয়ে বালচাপল্য দেখাবার জন্য মহা আনন্দে মায়ের দেওয়া তাম্বুল মাকে ফিরিয়ে দিলেন।

৭০.

অক্রুর নিজের বাড়িতে গিয়ে ভালো খাবার দাবার খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। পরে ঠান্ডা জল পান করে কর্পূর মিশ্রিত তাম্বুল খেয়ে মনের সুখে ঘুমিয়ে পড়লেন। অক্রুর শেষ রাতে এক সুস্বপ্ন দেখলেন।

তিনি দেখলেন শ্যামদেহ কিশোর এক ব্রাহ্মণ সন্তান। তার এক হাতে বাঁশী, পরণে পীত বসন, গলায় বনমালা, তার সকল দেহ চন্দন, মালতীমালা ও শ্রেষ্ঠ রত্নলংকারে তার শোভা বাড়িয়ে তুলেছে। মাথায় তার ময়ূর পেখম। এক সুন্দরী সতী নারীকে দেখতে পেলেন। তার পরণে পীতবসন, সকল দেহ রত্নলংকার, সেই মুখে ঈষৎ হাসি, তার এক হাতে প্রদীপ, অন্য হাতে সাদা ধান। পরে দেখলেন, এক সাদা সাপ ফণা তুলে দংশন করতে উদ্যত।

নিজে কখনও পাহাড়ে, কখনত্ত গাছে, কখনও হাতীতে, কখনও নৌকায় বা কখনও ঘোড়ায় উঠেছেন। পরে আপনি কখনও বীণা বাজাচ্ছেন, কখনও পায়েস খাচ্ছেন, কখনও বা দুধ ক্ষীর সমেত অন্ন পদ্ম পাতায় রেখে খাচ্ছেন। অঙ্কুর এই শুভ স্বপ্ন দেখে উঠে, আহ্নিক শেষ করে, উদ্ধবকে সকল ঘটনা বললেন।

উদ্ধবের আদেশে গরুকে অর্চনা করে, মনে কৃষ্ণের ধ্যান করে যাত্রা শুরু করলেন। পথে বেরিয়ে মঙ্গল জনক ইষ্টফলদায়ক সুন্দর সকল বিষয় লক্ষ্য করলেন। বাঁদিকে মরা, শিবা, পূর্ণ কলস, নকুল, চাতক পাখি দিব্য অলংকারে সজ্জিত পতিপুত্রবতী সতী নারী, সাদা ফুল ও তার মালা, ধান, খঞ্জনা পাখি, ডানদিকে জলন্ত আগুন, ব্রাহ্মণ, হাতী, সবৎসাগাভী, হরিণ, কৃষ্ণসার, ফল, খই, সাদা সরষে, শুক ও সারস প্রভৃতি লক্ষ্য করলেন।

শ্রীহরিকে স্মরণ করে পবিত্র বৃন্দাবনে ঢুকলেন ও রাসমণ্ডল দেখতে পেলেন। তার প্রবেশদ্বারে কলাগাছ রয়েছে। তার নীচে মঙ্গলঘটে সুতোয় বাঁধা বিচিত্র আমের পল্লব। সেখানে তিনকোটি রত্নমান্দির শোভা বিস্তার করেছে। বিশ্বকর্মা ঐ নন্দালয় শ্রেষ্ঠ মণি দিয়ে তৈরি করেছিলেন।

সেখানে ছিল রত্নস্তম্ভ, আর নানা বিচিত্র রত্নপ্রাচীর। অক্রুর নন্দের বাড়ির সামনে এসে হাজির হলেন। আসার খবর পেয়ে গোপরাজ নন্দ অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়ে কৃষ্ণ, বলরাম, বৃষভানু প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে পূর্ণ কলস, শ্রেষ্ঠ হাতী ও সাদা ধান দিয়ে ও কালো গরু, মধুপর্ক পাদ্য ও রত্নাসন প্রভৃতি নিয়ে সাদরে হাসিমুখে দরজায় এলেন।

নন্দ তাঁকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন এবং গোপিরা অক্রুরকে প্রণাম করে তাঁর আর্শীবাদ নিলেন। অক্রুর কিছুক্ষণ কৃষ্ণকে দেখলেন। পরক্ষণেই তিনি দেখলেন সেই কৃষ্ণ দেব ত্রিলোচন পঞ্চবক্ত শুদ্ধস্ফটিকসংকাশ নাগরাজ বিরাজিত পরম ব্রহ্ম দিগম্বররূপে তার কোলে রয়েছেন, তার দেহ ভস্ম মাখা। মাথায় জটা, তিনি জপমালা নিয়ে ধ্যান করছেন। অক্রুর তাকে দেখে প্রণাম ও স্তব করে বললেন। আপনি সকল দেবতাদের ঈশ্বর ও সকল দেবতাদের মত ও তাঁদের অধিদেবতা। আপনি রাধার আরাধ্য দেবতা। অক্রুর স্তুতি করে কৃষ্ণপ্রেমে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে হৃদয়ের মধ্যে ও বাইরে শ্যামরূপে বিরাজ করতে দেখলেন, ফলে সকল বিশ্বই তাঁর কাছে কৃষ্ণময় বলে মনে হল।

৭১.

গোপিনীরা ও রাধা সেই সুন্দর বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে রাত তিন প্রহর কেটে গেলে শুভ তারাও অমৃত যোগ সমন্বিত এক শুভক্ষণে ও শনৈশ্চরের দৃষ্টিসম্পন্ন পাপগ্রহের দৃষ্টিশূন্য বুধলগ্নে হরি নিজে গাত্রোত্থান করে যশোদাকে ডেকে তুলে মঙ্গলাচরণ করলেন। পরে কাপড় পরে পা ধুয়ে চন্দন মাখা জায়গায় বসলেন। পরে গুরুর দেওয়া মঙ্গলময় দুর্বাকাণ্ড, ফুল ও শুক্ল ধান নিয়ে নিজে মাথায় রাখলেন। তারপর সর্বত্র মঙ্গলময় মঙ্গলরূপ ধ্যান করে সুন্দর ডান পা মাটিতে রাখলেন। পরে ভগবান, মধ্যমা দিয়ে নাকের ডানফুটো দিয়ে ইষ্টবায়ু রেচন করলেন। নিত্যানন্দ মহানন্দে নন্দের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তিনি নিত্যবীজ নিতঙ্গ্যভূত, প্রেম নিত্য, নতুন ও প্রাপ্তি সৌভাগ্য নিত্য নতুন। তার বাক্য অমৃত থেকেও মিষ্ট। কৃষ্ণ অক্রুরও বান্ধবদের নিয়ে কিছুক্ষণ থাকার পর, যশোদা মায়ার বশে তাঁকে বাঁ দিকে আলিঙ্গন করলেন। পরে কৃষ্ণকে সানন্দে নন্দ বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বন্ধুরা মিষ্টি কথা বলল, বাবা, মা তাকে চুমো খেলেন।

৭২.

শ্রীকৃষ্ণ গুরুকে প্রণাম করে নন্দের গৃহ থেকে বেরিয়ে দিব্যযানে চড়ে মথুরার উদ্দেশে যেতে লাগলেন। অক্রুর ও স্বজনের সঙ্গে অমরাবতীর থেকে সুন্দর রমণীয় মথুরা পুরীতে গিয়ে

দেখলেন, বিশ্বকর্মার তৈরি ওই পুরীতে সাজানো রয়েছে অমূল্য রত্নময় কলস, সেখানে আছে শত শত রাজপথ। ঐ রাজপথের স্থানে স্থানে চন্দ্রের আকারের চন্দ্রকান্ত মণি শোভা পাচ্ছে। আর মধ্যে মধ্যে বণিকদের দোকানে শ্রেষ্ঠ মণি নির্মিত পণ্য সম্ভারে পূর্ণ। রতিবাস বিশারদ কামাসক্ত সেই নারীদের শ্রেণি ও স্তন অত্যন্ত মাংসল, কোমর সরু ও অঙ্গ অত্যন্ত কোমল। নগরীর ফুলের বাগান ফুলে পরিপূর্ণ।

দারুণ মনোরম হয়ে উঠেছে স্থানটি। সেখানে মৌমাছি যুগলরা সব ফুল উড়ে বেড়াচ্ছে। বিশ্বকর্মার তৈরি উৎকৃষ্ট বিচিত্র রত্ন তিন কোটি অট্টালিকা সেই নগরীর শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে। কমললোচন হঠাৎ মথুরার এই রকম শোভা দেখতে দেখতে যাওয়ার সময় পথে এক বৃদ্ধ কুজো মহিলাকে দেখলেন। চলার সময় তার গায়ের লাল চামড়া ঝুলে পড়ছে। বুড়ি হঠাৎ কৃষ্ণকে দেখে হাত জোড় করে ভক্তি ভরে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে কৃষ্ণের শ্যামদেহে, সেই সোনার পাত্রের চন্দন মাখিয়ে দিল। পরে তাঁর সাথীদের গায়েও ঐ রূপ চন্দন মাখিয়ে কৃষ্ণের চারিদিকে ঘুরে বারবার প্রণাম করতে লাগল। পরে সেই কুঁজোর দিকে কৃষ্ণের নজর পড়া মাত্র সে লক্ষ্মীর সমান রূপ লাভ করল। তখন সে অগ্নি শুদ্ধ কাপড় ও রত্নলংকারে সজ্জিত হয়ে সুন্দরী ধন্য বারো বছরের মেয়ের মত সৌন্দর্য ধারণ করল।

তার গলার শোভা পেল অমূল্য রত্নের হার, পায়ে রত্ন নুপূর, গতি হল গজরাজের মতো ধীর, খোঁপায় মালতী মালা শোভা পেল। রতি কাজে পারদর্শিনী কুঁজো বুড়ি রত্নদর্পণ হাতে নিয়ে দাঁড়াল তার চঞ্চল চোখের চাহনিতে কৃষ্ণের প্রীতি জন্মাল। কৃষ্ণ তাকে আশ্বাস দিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেল। কৃষ্ণ পথে এক সুন্দর মালাকারকে সুন্দর মালা নিয়ে রাজমন্দিরে যেতে দেখলেন। কৃষ্ণকে দেখে সে সকল মালা তাঁকে দান করল। এরপর কৃষ্ণ যৌবন মদমত্ত এক ধোপাকে দেখলেন। সে অনেক কাপড় নিয়ে যাচ্ছিল। কৃষ্ণ তার কাছে কাপড় চাইলে সে বহু কথা বলতে লাগল। সে বলল, এইসব কাপড় রাজাদের জন্য গোপালকদের জন্য নয়।

সদ্ গুণময় শ্রীকৃষ্ণ এক চড়ে সেই ধোপাকে বধ করে তার সকল কাপড় নিয়ে সাথীদের পরিয়ে দিলেন। সেই রজক স্থির যৌবনযুক্ত, জরা-মৃত্যু-শূণ্য, পীতবসনধারী সস্মিত শ্রেষ্ঠদিব্য দেহ ধারণ করে কৃষ্ণের সহচরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে গোলোকধামের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। সূর্য অস্ত গেলে অক্রুর নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন। কৃষ্ণ কুবিন্দ নামে কোনো এক বৈষ্ণবের ঘরে মহানন্দে নন্দ, বলদেব ও অন্যান্য রাখাল বালকদের সঙ্গে মিলিত হলেন। কুবিন্দ কৃষ্ণকে প্রণাম ও পূজা করলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ব্রহ্মা প্রভৃতিরও দুর্লভ নিজের দাস্য রূপ

বর দিলেন। সকলে খাওয়া দাওয়া করে পালঙ্কে শুয়ে ঘুমালে কৃষ্ণ সেখানে গিয়ে কুজীর ঘুম ভাঙলেন।

তিনি বললেন–যে, পূর্বজন্মে সে ছিল শূর্পনখা। তাই সে রামকে না পেলেও এখন যেন কৃষ্ণের প্রাপ্তির জন্য ভজনা করে। কৃষ্ণ তখন কুমারী কুঁজীকে বুকে ধরে নগ্ন করে শৃঙ্গার উপভোগ করতে লাগলেন। ক্ষতবিক্ষত হল তার স্তন, শ্রোণি ও ঠোঁট, কৃষ্ণ বীর্য দান করলে কুঁজী সম্ভোগ সুখে মূচ্ছা যায়। কুঁজী অগ্নিশুদ্ধ কাপড় পরে রত্ন ভূষণে সজ্জিত হয়ে গোলক থেকে আসা রত্ন রথে চড়ে গোলোকে যাত্রা করলেন। কংস এদিকে এক মৃত্যুসূচক দুঃস্বপ্ন দেখল। সে দেখল, সূর্য আকাশ থেকে নেমে চার টুকরো হয়ে মাটিতে পড়েছে, চাঁদ আকাশচ্যুত ও মাটিতে পড়ে দশ টুকরো হয়েছে, আর বিকট আকারের পুরুষরা বজ্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

এক উলঙ্গ নাকহীন শূদ্রপত্নী তার নজরে এল। যার জিভ লাল, হাতে খাঁড়া, পরনে সাদা কাপড়। পরে গাধা, মোষ, ষাড়, শুয়োর, ভাল্লুক, কাক, কুমীর, ছাইয়ের গাদা, শশ্মনের পোড়াকাঠ ও এক দুষ্ট লোক উলঙ্গ শূদ্রকে দেখল। তাছাড়া দেখল কোন কবন্ধ লাঠি নিয়ে দৌড়াচ্ছে, দেখল যেন গুরু ব্রাহ্মণ রেগে গিয়ে অভিশাপ দিচ্ছেন এবং ভিখারী যোগীও বৈষ্ণব পুরুষ তার উপর অত্যন্ত রেগে রয়েছেন। এমন দুঃস্বপ্ন দেখে কংস বিছানা ছাড়ল। সকলের কাছে স্বপ্নের ঘটনা প্রকাশ করল। তার স্ত্রী কাঁদতে লাগল। কংস সভায় মঞ্চ তৈরি করে, মূল হাতাঁকে দরজায় রেখে, যুদ্ধ অভিজ্ঞ মল্লযোদ্ধাদের মঙ্গলাচরণ ও ব্রাহ্মণদের দিয়ে মঙ্গলকর পুণ্য স্বস্ত্যয়ন করিয়ে সযত্নে উপযুক্ত পুরোহিতদের যজ্ঞে নিয়োগ করল।

ধারালো খড়গ নিয়ে মঞ্চে এসে পারদর্শী যোদ্ধাদের যুদ্ধে নিয়োগ করল। গোবিন্দ বলদেবের সঙ্গে সেখানে এসে ধনুগৃহে প্রবেশ করে সেই ধনুক ভেঙে ফেললেন। তার শব্দে মথুরার লোকেরা কালা হয়ে গেল। কৃষ্ণ দরজায় দাঁড়ানো হাতী ও মল্লযোদ্ধাকে হত্যা করে সভায় এসে উপস্থিত হলেন। তখন সকল যোগী পুরুষরা সেই পরমাত্মা কৃষ্ণকে হৃদয়ের মধ্যে ও বাইরে একরূপ দর্শন করতে লাগলেন।সবাই বাসুদেব ও দেবকীর সন্তানই বালককে দেখতে লাগলেন। কামিনীর রূপ কোটি কর্পের লাবণ্যের আধার রূপে তাকে দেখতে লাগল, কংস তাকে দেখল কালপুরুষ রূপে। কংসের বন্ধুরা তাঁকে দেখল শত্রুরূপে।

৭৩.

কৃষ্ণ বলরাম দুঃখে বাবা নন্দকে আধ্যাত্মিক প্রভৃতি দিব্যযোগ বলে সান্তনা দিতে লাগলেন। তাকে কাঁদতে দেখে কৃষ্ণ বললেন, শুনুন পিতা, আমি পূর্বে পুষ্কর তীর্থে ব্রহ্মা, অনন্ত, গণেশ,

কামদেব, সূর্য মুনীন্দ্র ও যোগীন্দ্রদের যে জ্ঞান দিয়েছি তারা তাদের কর্মফলের তারতম্যের জন্যই বিভিন্ন জায়গায় জ্ঞান লাভ করে। সকলে আমার মায়ার প্রভাবেই বিষয় ভোগে আনন্দ লাভ করে ও ধন সম্পদের হানিকে মৃত্যুর মতো মনে করে বিষাদগ্রস্ত হয়। কেবলমাত্র বোকারাই শোক পায়, আর যারা আমাকে ভজনা করে সজিতেন্দ্রিয়, তারা পবিত্র ভক্তিমান, তারা কোন সময়ই শোক তাপ পায় না। আমার ভয়ে বায়ু বয়ে চলেছে, চন্দ্র সূর্য ঠিক সময়ে কিরণ দিচ্ছে, বিভিন্ন সময়ে ইন্দ্র বৃষ্টি দান করেছেন, আগুন পোড়াচ্ছে, মৃত্যু বিচরণ করছে সকল জীবের মধ্যে।

সকল গ্রহের আধার আর ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া বৈকুণ্ঠ নিরাধার। সেই বৈকুণ্ঠের পঞ্চদশ কোটি যোজন উপরে শ্রেষ্ঠ রত্নে তৈরি নিরাধার গোলোকধাম অবস্থিত। সেখানে আছে সাত দরজা, সাত সাগর ও সাত পরিখা, লক্ষ পাঁচিল ও বিরজা নদী, তাকে ঘিরে আছে শত শৃঙ্গ নামে এক সুন্দর রত্ন পাহাড়।

ঐ পর্বতে অমূল্য রত্ন নির্মিত চাঁদের ছাওয়ার মতো গোল অযুত যোজন চওড়া রাসমণ্ডল আছে। সেখানে আছে একশো সুন্দর ফুলের বাগান।

সেখানে আছে তিন কোটি রত্নভবন, রত্নপ্রদীপ ও রত্নকলস। ঐ শিবিরে মোট ষোলোটি ঘর যার প্রত্যেক দরজায় ষোলো লক্ষ গোপিকা ইতস্ততঃ বেড়াচ্ছে। তাদের পরনে অগ্নিশুদ্ধ কাপড় ও সকল অঙ্গ রত্ন ভূষণে উজ্জ্বল।

ঐ প্রাঙ্গনে ফুল-ফল-পাতা সমেত রত্নময় মঙ্গলকলস রত্নবেদী শোভিত ঘর শোভা পাচ্ছে, কোথাও অমূল্য রত্ন-দর্পণ, কোথাও অমূল্য রত্নে তৈরি অলঙ্কার দেখা যাচ্ছে। রত্ন শোষকের সাজে সজ্জিত রাধাকে সখীরা সাদা চামর দুলিয়ে বাতাস করছে।

রাধা শ্রীদামের শাপে বৃষভানুর কন্যা হয়ে জন্মেছে এবং শাপের ফলেই আমার সাথে তার একশো বছর ধরে বিচ্ছেদ ঘটবে। এখন তোমার সাথে এবং যশোদা, গোপগোপী, বৃষভানু ও তার স্ত্রী কলাবতী ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সেই গোলোকে মিলব। প্রকৃতি আমার থেকে আলাদা অথবা আমিই সেই প্রকৃতি। সাদা রঙ আর দুধ-এর মধ্যে যেমন কোনো পার্থক্য নেই সে রকম আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, যেমন জল ও তার শীতলতার মধ্যে, পোড়বার ক্ষমতার মধ্যে আগুন, আকাশ ও শব্দের মধ্যে, সূর্য ও কিরণের মধ্যে এবং আত্মা ও জীবের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, সেইরূপ রাধা ও আমার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তুমি রাধার মধ্যে

গোপিকাবুদ্ধি ও আমার মধ্যে পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগ কর– কারণ আমি আদিপুরুষ ও রাধা সর্বেশ্বরী প্রকৃতি।

এখন সানন্দে আমার সেই সুখকর বিভূতির কথা শোন। আমি অক্ষরের মধ্যে অ-করে আবার বেদের মধ্যে সামবেদ। দিকের মধ্যে ঈশান। খাদ্যের মধ্যে অমৃত। গাব্যের মধ্যে ঘি। নদীর মধ্যে গঙ্গা। বিদ্যার মধ্যে বীজ। শস্যের মধ্যে ধান। বনস্পতির মধ্যে অশ্বত্থা। প্রজাপতিদের মধ্যে কশ্যপ।

শিল্পীর মধ্যে বিশ্বকর্মা। মৃগের মধ্যে মৃগরাজ। বৃষের মধ্যে শিবের বাহন, হাতীর মধ্যে ইন্দ্রের ঐরাবত, মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী, অপ্সরার মধ্যে ঊর্বসী, সমুদ্রের মধ্যে জলসমুদ্র, পর্বতের মধ্যে সুমেরু, দেবীর মধ্যে লক্ষ্মী। প্রিয়ার মধ্যে রাধা, সাধ্বী নারীর মধ্যে বেদমাতা সাবিত্রী, দৈত্যের মধ্যে প্রহ্লাদ। বানরের মধ্যে হনুমান, পাণ্ডবদের মধ্যে অর্জুন, নাগ কন্যার মধ্যে মনসা, বসুর মধ্যে দ্রোন, মেঘের মধে দ্রেনামেঘ, সুন্দরীদের মধ্যে রম্ভা, রাক্ষসের মধ্যে বিভীষণ, রুদ্রের মধ্যে কালগ্নিরুদ্র ও ভৈরবীদের মধ্যে সংহার ভৈরব, বলিষ্ঠদের মধ্যে রাজা বলি।

বনের মধ্যে বৃন্দাবন, শঙ্খের মধ্যে পাঞ্চজন্য, ইতিহাসের মধ্যে মহাভারত, নগরীর মধ্যে কাশী, বনের মধ্যে চন্দন বন, পার্ষদের মধ্যে শ্রীদাম ও বন্ধুর মধ্যে উদ্ভব।

আমি গাছের ক্ষেত্রে তার অঙ্কুরের মত। সকল বস্তুতেই তার আকার হিসাবে থাকি, আমিও সব সময় সকল বস্তুতে আমি ও আমাতেও সকল বস্তু বিদ্যমান। আমিই সকলের ঈশ্বর। আমিও সবাইকে পালন করে থাকি কিন্তু আমার পালনকারী কেউ নেই।

আমিই কারণ ও কার্য। মনীষীরা আমাকে সর্বেশ্বর সর্বজয়ী বলে থাকেন। সকল পাপীরা আমার মায়ায় এতই মোহিত হয়ে থাকে যে তারা আমাকে জানতেই পারে না। পাপীরা দুর্বুদ্ধিবশতই সকল জন্তুর অন্তরাত্মাস্বরূপ আমাকে আদর না করায় ফলত নিজের আত্মাকেই অনাদার করে থাকে।

যেখানে আমি থাকি ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি আমার যে সব শক্তি সেগুলিরও প্রকাশ সেখানেই হয়ে থাকে। ব্রজরাজ নন্দ কৃষ্ণের কাছে জ্ঞান লাভ করে, গোপালকদের সাথে ব্রজধামে গিয়ে নারীপ্রধান রাধা ও যশোদার কাছে সেই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বর্ণনা করলেন।

৭৪.

ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি পদার্থকে বেদে পঞ্চভূত বলা হয়েছে। সব জীবের দেহ এই পাঞ্চভৌতিক পদার্থ থেকে উদ্ভূত। তাই জীবদেহ হল পঞ্চভৌতিক। কর্মফলানুসারে কেউ স্বর্গে কেউ বা ব্রহ্মগৃহে, কেউ বা ব্রাহ্মণের ঘরে, কেউ ক্ষত্রিয়ের গর্ভে, কেউ বৈশ্যের ঘরে, কেউ শূদ্র জাতিতে জন্মায়। কেউ নিজের কর্মফলে নীচ যোনিতে বা পশু যোনিতে বা পাখি যোনিতে কেউ বা বিষ্ঠায় কৃমি হয়ে জন্মায়। যুগ হল চারিটি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। এক মনুর পতন হয় এমন পঁচিশ হাজার যুগের অবসান হলে। ব্রহ্মার একদিন হল চোদ্দজন ইন্দ্রের জীবনকাল। কাল ও বছর হয় দিনানুসারে, একশো বছর হয় ব্রহ্মার পরমায়ুর। কিন্তু আমার নিমেষমাত্রে ব্রহ্মার পতন হয়। ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে একটু টুকরো ঘাস পর্যন্ত সকল পদার্থেই মিথ্যা আর একমাত্র আমি ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্য শরীর ধারণ করেছি, এই সত্য। অমঙ্গল হয় না আমার ভক্তদের। তাদের সবদিক থেকে রক্ষা করে সুদর্শন চক্রই। এরপর কৃষ্ণ নন্দের কথা শুনে নিজে বেদাতীত আহ্নিকাকৃত্য বর্ণনা করতে লাগলেন।

৭৫.

মুক্তি পথের বাঁধা স্বরূপ ভ্রমমায়াময়ী কুলটা নারীকে কখনই বিশ্বাস করা উচিত নয়। হরিভক্তি বিনাশের মূল কথা। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার ভক্ত গৃহীরা বাসি কাপড় ছেড়ে গুরুদেবকে চিন্তা করে প্রাতঃকৃত্য সেরে পরিষ্কার জলে স্নান করবে। কোনো রকম সংকল্প করবে না। বুদ্ধিমান ভক্ত কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাইলে স্নান করে হরিচিন্তা করে সন্ধ্যা বন্দনা করে ঘরে ফিরে যাবে। হাত পা ধুয়ে কাঁচা কাপড় পরে ঘরে ঢুকবে। তারপর গোষ্ঠ বা চন্দনের তৈরি অর্কদল পদ্মে মুক্তির কারণ পরমাত্মা আমাকে পুজো করবে।

পরে সেই সাধক শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, বীরভানু ও শূরভানু এই পাঁচ গোপ, আর কার্তিক ও গণেশের পূজা করবে। বিঘ্ননাশের জন্য গণেশের, ব্যাধি নাশের জন্য সূর্যের, অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য বহ্নির মোক্ষের জন্য বিষ্ণুর, জ্ঞান লাভের জন্য শিবের ও বুদ্ধি মুক্তির জন্য পার্বতীর পূজো করবে। আত্মশুদ্ধির জন্য কর্তব্য কর্ম করবে, ব্যাধির কারণ স্বরূপ বিষ্টা ও ঘোর নরক কারণ ব্যাধিবীজ স্বরূপ মূত্র ও লিঙ্গ ও দুঃখ দরিদ্রের কারণ যোনি। নারীর উরু, মুখ ও স্তন কটাক্ষ ও হাসি দেখবে না জ্ঞানী লোক। বিপদের হেতু ও ধ্বংসের কারণ নারীর রূপও।

আকাশে এক তারা দেখলে চোখ ও কানের রোগ হয়, ব্রাহ্মণ গোরু ও বিশেষ বৈষ্ণবদের হিংসাকর বা কোন হানিকর কাজ করবে না, করলে সর্বনাশ হয়। যে লোক নিজের দেওয়া

অপরের দেওয়া ব্রহ্মার ধন চুরি করে, সে ষাট হাজার বছর বিষ্ঠার কৃমি হয়ে থাকে। ব্রহ্ম সম্পত্তি চুরি করার অপরাধে একশো জন্ম ভালুক, লক্ষ জন্ম শেয়াল ও বহুকাল জলের পোকা হয়ে থাকতে হয়। ব্রাহ্মণদের দিয়ে কাজ করিয়ে যদি কোনো দক্ষিণা না দেয় তবে একরাত পরে দ্বিগুণ দান করতে হয়। একমাস অতীত হলে একশো গুণ, দুমাস গত হলে হাজার গুণ, ও একশো বছরের মধ্যে না দিলে দাতা নরকগামী হয়। ব্রাহ্মণকে হিংসাকারী লোক বংশহানির শিকার হয় ও ভিখারী হয়ে দিন কাটায়। স্বামীকে হরি হিসাবে দেখে না যে নারী তার কুম্ভীপাক নরকে স্থান হয়। স্বামীর প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগকারী বানর হয়ে জন্মায়। খারাপ কথা বললে কুকুর ও খারাপ দৃষ্টিতে দেখলে অন্ধ হয়ে জন্মায়। পতিব্রতা নারী স্বামীর সাথে বৈকুণ্ঠে যায়। রৌরব নরকে স্থান মহামূর্খ নারীর। বাবা, মা, ছেলে, সতী স্ত্রী, গরু আর অনাথ মেয়েকে অন্ন না দিলে নরকে যায়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যাবতীয় লোকেদের যদি ব্রাহ্মণদের উপর ও হরির ওপর ভক্তি প্রবৃত্তি না থাকে তবে তারা নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে। কোন ব্রাহ্মণ যদি পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মাংস ভক্ষণ করে তবে সে অপবিত্র হয়ে যায় না। কিন্তু বৃথা মাংস ভোজন করলে তাকে যেতে হয় রৌরব নরকে।

কামের বশে মাছ খেলে ব্রাহ্মণের তিনরাত উপোস করার পর চাময় ব্রত পালন করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। সে সর্বদাই অশুচি যে জ্ঞান কম হওয়ার জন্য কামনার বশে মাছ খায়। তার পূর্বের সকল পুণ্য নষ্ট হয়ে যায়। যে লোক মাছ, মাংস ত্যাগ করে প্রতিদিন বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট খেয়ে থাকে তার নিশ্চয়ই প্রতিপদে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফল লাভ হয়। একশো জন্মের পাপ নাশ হয় যারা একাদশী ও কৃষ্ণা জন্মাষ্টমী ব্রত পালন করে। যে লোক শিবরাত্রি ও শ্রীরাম নবমীর দিন উপোস করে না সে মহারৌরব নরকে যায়। চতুর্দশী ও অষ্টমীতে তেল মাংস সেবন করা লোক চন্ডাল হয়ে জন্মায়। প্রত্যেকেরই অনুচিত রবিবারে মাছ, মাংস আদা, লালশাক খাওয়ার। সকলের অনুচিত কাঁসার থালায় আহার করা, করলে কুম্ভীপাক নরকে যেতে হবে।

রজঃস্বলার দেওয়া খাবার যে ব্রাহ্মণ ভোজন করে, বেশ্যার দেওয়া খাবার ও অবীরার অন্ন খায় সে নিশ্চয়ই বিষ্টা ভোজন করে এবং সে নিত্যই অশুচি। যাবজ্জীবন তার এই অশৌচ, প্রত্যেক দিন সমস্ত কাজ করেও কোন কিছুর ফল পায় না। কোনো নারী অন্য পুরুষের কাছে যায়, সে বেশ্যা। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের শ্রাদ্ধের দিন সেই শ্রাদ্ধের খাবার খায়, সে ব্রাহ্মণ পরমায়ু পর্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে যন্ত্রণা ভোগ করে। শূদ্রের শ্রাদ্ধের দিন শূদ্রের কথা অনুযায়ী অন্য জায়গায় খেলেও তাকে সকল ধর্ম থেকে বহিষ্কার করা হয়। কলম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে,

শূদ্রের শবদাহ করে ও যারা শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণ । তাদেরও শূদ্রের মত সকল ব্রাহ্মণের কাজ থেকে বহিস্কার করা উচিত।

সন্ধ্যাবন্দনা যে করে না, তার কোনো কাজে অধিকার থাকে না। ব্রাহ্মণ যদি বিষ্ণু পূজো না করে, চন্ডালের সমান হয় ও নারী মন্ত্রের উপাসনা করলে নরকগামী হয়। জ্ঞানী লোক নদীর বুকে, দেবতার কাছে, শস্যক্ষেত্রে মল ত্যাগ করবে না। যে দিনের বেলায় ও উভয় সন্ধ্যায় সময়ই ঘুমায়, বা স্ত্রী সম্ভোগ করে, সে সাতজন্ম গরীব হয়। যাদের আমি ভালবাসি তাদের মধ্যে সব থেকে প্রিয়। ব্রাহ্মণ, আর তার থেকেই বেশি প্রিয় হল রাধা। রাধার থেকেও ভক্ত এবং ভক্তের থেকে বেশি প্রিয় শিব। যারা মহাদেবের নাম উচ্চারণ করে, তাদের নাম শোনার জন্য আমি তাদের পিছু ছুটি, আমার মন ভক্তের কাছে, প্রাণ রাধার কাছে ও আত্মা শিবের কাছে থাকে।

যে আদ্যাশক্তি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটায়, যার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হয়েছে আমি সেই শক্তি শিবকে দান করেছি। বৈকুণ্ঠে তিনি মহাসতী লক্ষীরূপে, গোলকে সতী রূপে ও ক্ষীরোদ সাগরে মরু লক্ষীরূপে বিরাজ করছেন, দুর্গার স্বপ্নের লক্ষ্মী হয়ে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের ঘরে ঘরে রয়েছেন। দুর্গাই আমাদের রাজলক্ষ্মী, ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে তাদের লাভ ও সংসার সমুদ্র পারের তত্ত্ব ও জ্ঞানবানদের সদবুদ্ধি ও মেধাশক্তি। বেদের তিনি ব্যাখ্যা শক্তি ও দাতাদের দানের শক্তি। ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি ও সতীদের স্বামী ভক্তি। তোমার কাছে আমি সব বললাম এখন তুমি কোন্ বিষয়ে শুনতে চাও।

৭৬.

লোক যদি সৎ ব্রাহ্মণ তীর্থ, বৈষ্ণব, ও দেবতার প্রতিমার দেখে তবে তীর্থ স্নানের ফল লাভ করে, ভক্তি ভরে সূর্য, সতী, নারী, সিংহ, সাদা ঘোড়া, ময়ূর, সোনা, মণি, মুক্তো, হীরে, তুলসী ও সাদা ফুল দেখলে পাপ নাশ হয়। মানুষ যদি সাদা ধান, ফল, দই, ঘি, মধু, পূর্ণকলসী, সাদা ফুলের মালা দেখে তবে পুণ্য হয়। সরোবর ও ফুলময় বাগান দেখলেও পুণ্য হয়। পতাকা, দেবতাকে দেওয়া শুভ অক্ষয়বট গাছ, মন্দির ও দেবস্থান দেখলে মানুষের পুণ্য হয়। শাঁখ ও

দুন্দুভির শব্দ শুনলেও মানুষের পুণ্য হয়। তপস্বীদের স্নিগ্ধ মন্ত্র শোনা এবং সমুদ্র, কালোহরিণ দর্শনে মানুষের পুণ্য হয় পাকা শস্যের ক্ষেত্র দেখলেও পুণ্য হয়।

আশ্বিন মাসের শুক্লাপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দুর্গা প্রতিমা দর্শন করলেও পুনর্জন্ম হয় না। দ্বাদশীর দিন সকালে স্নান করে কাশীধামে অন্নপূর্ণা দর্শন করলে জন্ম নিতে হয় না। রামনবমীর দিন অযোধ্যার রামরূপীকে পূজা ও দর্শন করলেও পুনর্জন্ম হয় না। পুণ্য বৃন্দাবনে যে গোবিন্দরূপী আমাকে দুলতে দেখে তারও সংসার বন্ধন মুক্ত হয়। যে মাঘী পূর্ণিমাতে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে রাধামূর্তির সাথে আমার মূর্তি বসিয়ে দেখে তারও সংসার বন্ধন দূর হয়। স্বর্গের বিদ্যাধরীরা যেখানে এসে নাচে ও মহাদেবকে দেখার জন্য বিভীষণ আসেন ও কিন্নররা রাতে সুন্দর গান করে। যে লোক উপোস করে সকলে আমাকে পূজো করে ও দর্শন করে প্রণাম করে ও দই খেয়ে প্রণাম করে, তার শেষ হয় সংসার বন্ধন।

আমার ও পার্বতীর মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করে পূজা করলে পুনর্জন্ম হয় না। আর জন্ম নিতে হয় না। যে লোক ফুলের বাগান, সেতু, ঘাত, সরোবর স্থাপন করে, যে ব্রাহ্মণের জীবন ধারনের উপায় বলে দেন, সে জীবন্মুক্ত হন এবং ইহকালে অচলা শ্রী ও মৃত্যুর পর চার রকম মুক্তি পান। যে লোক অনাথ দরিদ্র সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের বিবাহ দেয়, তার মোক্ষ নিশ্চিত হয়। সাদা ঘোড়া দানের ফল আর হাতী দানের ফল সমান হয়। বস্ত্র দান করলে তার যত সুতো থাকে, তত বছর সে সুন্দর চন্দ্রলোকে ও বরুণ লোকে আনন্দ ভোগ করে। যে ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করে সে পুত্রপৌত্র বৃদ্ধিকারী অচলা সম্পদ লাভ করে। এখন ব্রজে যাও ও ব্রাহ্মণদের ভোজন করাও। সেখানে তোমার তাড়াতাড়ি যাওয়া কর্তব্য।

৭৭.

রাতের প্রথম প্রহরে স্বপ্ন দেখলে সারা বছরে, দ্বিতীয় প্রহরে দেখলে আট মাসে, তৃতীয় প্রহরে দেখলে তিনমাসে, চতুর্থ প্রহরে দেখলে অর্ধেক মাসে ও সূর্য ওঠার সময় স্বপ্ন দেখলে দশদিনের মধ্যে তার ফল পাওয়া যায়। আর সকালে স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলে তার ফল তখুনি পাওয়া যায়। মূত্র বা পুরীষে জড়ীভূত ভয়াকূল, উলঙ্গ বা মুক্তকেশ পুরুষের স্বপ্ন ফলে না। কশ্যপগোত্রের কারো কাছে স্বপ্নের বর্ণনা করলে তা ফলে না। স্বপ্ন দেখার পর ঘুমিয়ে পড়লে শোক ও পণ্ডিতদের কাছে বললে মনোমত ফল পাওয়া যায়। পণ্ডিত কাশ্যপগোত্রীয় হলে তার কাছে সুস্বপ্ন ব্যক্ত করা কঠিন।

মানুষ, গোরু, হাতী ঘোড়া, অট্টালিকা, পাহাড় ও গাছে চড়া ও খাওয়া, ক্রন্দন এমন স্বপ্ন দেখলে ধন লাভ হয়। বীণা নিচ্ছে এমন স্বপ্ন দেখলে শস্য পূর্ণ ভূমি লাভ হয়। অর্থ লাভ হয় কৃমি বিষ্টা ও রক্ত দেখলে। তার স্ত্রী লাভ হয় যে স্বপ্নের মধ্যে স্বর্গে গমন করে, যে মূত্রসিক্ত শুক্র পান করে, নগরে প্রবেশ করে বা রক্ত সমুদ্র বা সুধা পান করে সে বিপুল অর্থ ও ভাল খবর পায়। ক্ষীর ও ঘি দেখলে প্রার্থিত বস্তু ধন ও পুণ্য লাভ হয়। সে রাজা হবে যে দেখবে পদ্ম পাতায় পায়েস, দই, দুধ, ঘি, মধু ও মিষ্টান্ন খাচ্ছে সে। স্বপ্নে সমুদ্র, কুকুরী দেখলে তার স্ত্রী লাভ হয়। স্বপ্নে পীত মালা গলায় পীত কাপড় পরা নারীকে আলিঙ্গন করে তবে তার মঙ্গল হয়, যে লোক কোন দিব্য স্ত্রীকে ঘরে এসে মলত্যাগ করতে দেখে তার দরিদ্র দূর হয় ও অর্থ লাভ লাভ ঘটে।

৭৮.

জ্ঞানশূন্য দুর্বল মানুষই সব সময় মায়ায় মুগ্ধ হয়ে সকল কাজে লোভ, মোহ, কাম ও ক্রোধের শিকার হয়। চন্দ্র সপ্তমস্থ, জন্মস্থ, দ্বাদশস্থ ও দশমস্থ থাকলে রাহুগ্রস্ত চন্দ্র সূর্যকে পণ্ডিতরা দর্শন করবেন না এবং জন্ম নক্ষত্র বর নিধনক্ষেত্রে অবস্থান করলে ও চতুর্থ রাশিতে থাকলেও রাহু গ্রস্থ চন্দ্র-সূর্য অজর অদৃশ্য হবে। চন্দ্র অশুদ্ধি থাকে, ভাদ্র মাসের উভয় পক্ষের চতুর্থী তিথিতেই। তাই তা দেখেন না পণ্ডিতরা। মানুষ অনিচ্ছায় দৈবাৎ ঐ চাঁদ দেখে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রপূত জল খেয়ে নেবে, তবেই সে পবিত্র ও কলঙ্ক মুক্ত হয়ে পৃথিবীতে থাকতে পারবে।

৭৯.

কোনো সজ্জন ব্যক্তির ছিদ্র আর কারুরই গোপন কথা মনীষীরা বলেন না। নন্দ বললেন– তাকে বঞ্চনা করো না। রাহুগ্রস্থ হলে পুণ্য দায়ক চন্দ্র সূর্যের দর্শন নিষিদ্ধ হয়। একদিন মহাত্মা যমদগ্নি প্রিয়া রেণুকার সাথে কৌতূহল ভরে নর্মদা তীরে যান। সদ্য বিবাহিতা যুবতী সুন্দরী রেণুকার সাথে বিহার করতে থাকেন। রেণুকা স্তন ভারে ঈষৎ অবনতা, শ্রোনিভারে জড়। সুন্দরী তখন যমদাগ্নির প্রতি কটাক্ষ করতে লাগলেন। রেনুকা সতত সম্ভোগ সুখে রোমাঞ্চিত হয়ে মূর্ছা গেল। সেই নির্জন বনে কোকিলের কুহুস্বর, মৌমাছির গুঞ্জন মিলিয়ে সুন্দর পরিবেশ রচনা করেছিল। সূর্যদেব মুনিকে বললেন, বেদে দিনের বেলায় মৈথুন কাজ পরিত্যাজ্য। রেনুকাও লজ্জা পেয়ে কাপড় পড়ে নিলেন। মুনি তখন ক্রুদ্ধ হয়ে লজ্জায় মুখ লাল করে বলতে লাগলেন কে আপনি পন্ডিতাভিমানী। আপনার কি ধারণা আপনার মতো পণ্ডিত আর কেউ নেই? অজ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্বদা নিজের কাজে জড়িত থাকে। আর আগুনের কাছে যেমন

কোনো কিছুর দোষের না, তেমন তেজস্বী কোনো লোকের কোন কিছুই দোষের না। বাসুদেবের ভক্তদের কখনই অশুভ হয় না, হরির সুদর্শন চক্র সর্বদা বৈষ্ণবদের রক্ষা করে, ব্রহ্মা সূর্যদেবকে এরকম বলে শাপ পরাজিত লজ্জা ক্রোধ যুক্ত বিনয়ী যমদাগ্নিকে সান্তনা দিয়ে বললেন– তুমি এখন নিজরে ঘরে যাও। নিঃসন্দেহে তুমি হরির বংশজাত ক্ষত্রিয় কাত্তবীয্যার্জুন তোমাকে পরাজিত করবে ও তার হাতে মারা যাবে। পৃথিবীতে তোমার মৃত্যু ও যশের কারণ হবে। ব্রহ্মা এই বলে চলে গেলে যমদাগ্নি ও সূর্য যে যার জায়গায় চলে গেলেন। হে পিতা! এই আমি আপনার কাছে কোন কারণে রাহুগ্রস্ত সূর্য অদৃশ্য সে কথা বললাম।

৮০.

পূর্বে বৃহস্পতির যুবতী সতী স্ত্রী তারা সুন্দর পাতলা পোশাক ও রত্নলংকারে সজ্জিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নারীদের মধ্যে অতুলনীয়া। তিনি একদিন স্বর্গের মন্দাকিনী তীরে স্নান করে ভিজে কাপড়ে স্বামীর চিন্তায় বিভোর হয়ে ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। চন্দ্র তাঁকে দেখে কামার্ত হয়ে জ্ঞান হারালেন। চন্দ্র সেই কামুকীতে গাঢ় আলিঙ্গনে ও চুমো খেয়ে শৃঙ্গারে উদ্যত হলেন। তিনি বললেন, আমি ব্রাহ্মণী, তার উপর আবার তোমার গুরুপত্নী। তুমি পুত্র আমি মাতা, আর তুমি যদি আমাকে বল প্রয়োগ করে ভোগ করতে চাও তবে স্ত্রী হত্যার পাপ হবে। কামদেবকে চন্দ্র অভিশাপ দিয়ে বললেন, কোন তেজস্বী পুরুষ তোমাকে ভস্মীভুত করবেন। বৃহস্পতি ব্রহ্মার গোত্রে এবং দেবাদিদেবের গুরু পুত্র, তুমি তাই তাঁর হস্তে তারাকে অর্পণ কর। গুরুপত্নীতে গুরুর হাতে অর্পণ করে পাপমুক্ত হলেন। চন্দ্রকে বহ্নি পরিশুদ্ধ দুটি বস্ত্র, বরুণ রত্নমালা এবং পবনদেবের রত্নছত্র উপহার দিলেন। চন্দ্র তাঁকে প্রণামান্তে সবকিছু বললেন। এবং তাঁর শরণাগত হলেন।

৮১.

শুক্রাচার্য যুদ্ধের উপযোগী অস্ত্র ধারী দেবসেনাদের আকাশ পথ থেকে অবতরণ করতে দেখলেন। সেই দেবসেনাদের দর্শন করে শুক্রাচার্য একটুও ভয় পেলেন না। শুক্রাচার্য পুষ্করিণীর অক্ষয়বটের নীচে মঙ্গলময় পরম কারুণিক বৃষভারুঢ় শিবকে প্রত্যক্ষ করলেন। ব্রহ্মাকেও শুক্রাচার্য রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করালেন ও শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তাঁকে প্রণাম করলেন। তখন স্বর্গ-মর্ত-পাতালের বিধান কর্তা দৈত্যগুরুকে বললেন, চুন্দ্রের বেদ বিগর্হিত ক্রিয়া বর্ণনা করছি শোন। তাঁরা যখন স্নান করে সিক্ত বস্ত্রে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন দুর্নীতিপরায়ণ চন্দ্র তাকে অপহরণ করলেন, শিব বললেন–চাঁদকে এখানে আনন। আমি

ত্রিশুলে তার শিরচ্ছেদ করব। দেবাদিদেবের কথা শুনে শুক্রাচার্য বললেন–আপনি সর্বেশ্বর, আপনার সুর অসুর জ্ঞান থাকা উচিত নয়। আপনি গদা হাতে বলির দ্বারে অবস্থান করছেন। আমার যত পাপই হোক না কেন আশ্রিত চন্দ্রকে আমি ত্যাগ করতে অপারগ।

শিব ও ব্রহ্মার নির্দেশে চন্দ্র ক্ষীরোদ সাগর অবগাহন ও প্রায়শ্চিত্ত করে নিজেকে শুদ্ধ করলেন। মহাদেব চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করে অর্ধেক নিজ ললাটে স্থান কার দেবার জন্য তার অপর নাম চন্দ্রশেখর। ব্রহ্মা ও শিব চন্দ্রের অভিষেকে আত্মনিয়োগ করলেন। মহাদেব বললেন–শ্বশুরের পাপে তোমায় রাজযক্ষায় আক্রান্ত হতে হবে। সতীর শাপ ব্যর্থ হবার নয়। তুমি রোগ মুক্ত হবে আমার আশিষে। তারাকে বললেন, চন্দ্রের ঔরসে তুমি অন্তঃসত্ত্বা হলে গর্ভমোচন অন্তে স্বীয় পতির সঙ্গে মিলনে পরিশুদ্ধ হও। পতিব্রতা স্ত্রীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলাৎকার করলে সেই রমণীকে পাপ স্পর্শ করতে পারে না। যদি কামনার বশে পরপুরুষে সঙ্গম করে তবে নরকবাস করতে হয়। তাঁরা বললেন, তিনি গর্ভবতী। তা শুনে মুনিরা হাসলেন। মহাদেব বৃহস্পতির হাতে তারাকে সম্প্রদান করলেন। তারার গর্ভের পুত্রকে চন্দ্র সাদরে গ্রহণ করে ব্রহ্মা ও শিবের চরণে প্রণত হয়ে সে স্থল ত্যাগ করলেন। মনে আর কোনো দুঃখ স্থান না দিয়ে প্রফুল্ল মনে বাড়ি ফিরে যান।

৮২.

স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তি কালো কাপড় পরা কামিনীকে আলিঙ্গন করে তার মৃত্যু হয়। যে স্বপ্নে হরিণ, মৃত মানবকে দর্শন করে তার বিপদ হয়! ঘি, ক্ষীর, মধু, ঘোল-এর স্বপ্ন দেখলে রোগভোগ সুনিশ্চিত। মৃত নর-নারীর স্বপ্ন, কৃষ্ণকায়, যবনের দ্বারা আলিঙ্গন বদ্ধ হওয়ার স্বপ্নে মৃত্যু হয়। কোনো খল যার মাথা থেকে সবলে ছাতা ছিনিয়ে নিচ্ছে এহেন স্বপ্ন দেখে তার মহাগুরু নিপাত হয়। স্বপ্নে আবির্ভূত যমদূত বা যবন তাকে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে স্বপ্নদ্রষ্টার মৃত্যু ত্বরান্বিত। স্বপ্নে যেসব পুরুষ বিরোধিতা করে বা কাক, কুকুর, ভাল্লুক যার গায়ে এসে পড়ে তার মৃত্যু আসন্ন। পূর্বে মুখ করে পণ্ডিত ব্যাক্তির কাছে স্বপ্নের বিষয় বলতে হয়। কে কী স্বপ্ন দেখেছ তা অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করা অবিধেয়।

৮৩.

নন্দ বললেন–বৎস! তুমি চতুর্বেদ ও ব্রহ্মাদি দেবগণের হেতু। আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। বেদে বলা হয়েছে, দেবতার উদ্দেশে প্রসাদ নিবেদন করা হয় মাত্র কিন্তু গুরুকে

নিবেদিত আহার্য গুরু স্বয়ং গ্রহণ করেন। গঙ্গাজল অপেক্ষা শালগ্রাম স্নাত জল দশগুণ শ্রেষ্ঠ, বিপ্রয়াদি ঐ পুণ্যোদক পান করেন তবে ভববন্ধন মুক্ত হয়ে দেবতাদের সমগোত্রীয় হন।

সতীপত্নী স্বামীর সঙ্গে কখনও দুর্ব্যবহার করেনা। পতি ক্ষুধার্ত হলে স্ত্রী তাকে খেতে দেবে। স্বামীর সারাদেহ চন্দন লিপ্ত করে কণ্ঠে মালা পরিয়ে তাঁর আরাধনা করবেন। স্বামীর অনুমতি নিয়ে পতিব্রতা স্ত্রী আহার করবেন।

৮৪.

যে গৃহী অতিথি সেবা করে না, সে শুচিতা হারায়। তৃষিত যেমন তৃষ্ণা নিবারণে জলাশয়ের দিকে ধাবিত হয় তেমনি পিতৃ ও দেবতারা গৃহীর কাছে আসেন। যে মাতৃহীন ও যার স্ত্রী পরপুরুষগামিনী তার অরণ্যচারী হওয়া উচিত। অতিথি আশাহত হয়ে ফিরে গেলে দেবগণ এবং পিতৃগণ অতিথির সঙ্গে সে গৃহ ত্যাগ করেন। পতিব্রত্যে প্রোজ্জ্বল গৃহিণী ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠে স্বামী এবং দেবতাদের প্রণাম করে গৃহাঙ্গণে গোবর জল নিকিয়ে গৃহের কাজ কর্ম শেষে অবগাহন করবেন। পূজা শেষে স্বামীকে খেতে দেবেন। পিতা যদি পুত্রকে এবং গুরু যদি শিষ্যকে কোনো কাজ করতে বলেন তাহলে পুত্র এবং শিষ্য বিনা বাক্যব্যয়ে, নিদ্বিধায় সে কাজ করবে।

গোলোকধামের পাহাড় গুলি বড়ই মনোরম। কোটি যোজন সেগুলির উচ্চতা, দৈর্ঘ্যে শতগুণ, প্রস্থে পঞ্চাশ কোটি যোজন বিস্তৃত। শত শৃঙ্গ পর্বতগুলি এতই সুন্দর যে চতুর্বেদও সেগুলির বর্ণনা দিতে পারেন না। তা হীরকমাল্যে শোভিত। চন্দনতরু, কল্প ও মন্দার বৃক্ষে বেষ্টিত বৃন্দাবন যেন পটে আঁকা ছবি। ভ্রমরের গুঞ্জনে, কোকিলের কুহুতানে বনভূমি মুখরিত। সেখানের আরেকটি আকর্ষণ বহুযোজন বিস্তৃত অক্ষয় বট এবং গোপিণীদের অভীষ্ট ফলপদ কল্পতরু।

৮৫.

বেদে বলা হয়েছে মধুর সঙ্গে ঘি, তেল, গুড় এবং আদার সঙ্গে গুড় খেতে নেই। জ্ঞানী ব্যক্তি পীতাঙ্গ তলানি জল, মাঘমাসে মূলা, পুঁইশাক পরিহার করেন। রূপার পাত্রে রাখা কর্পূরও

পরিত্যাজ্য, পরিবেশনকারী যদি যে আহার করছে তাকে স্পর্শ করে তাহলে তার পরিবেশিত অন্ন নিঃসন্দহেই ত্যজ্য, বেদে বলা হয়েছে পিঁপড়ে ধরা মধু, গোজাত দ্রব্য, গূঢ় অভক্ষ্যা। শূদ্রের তৈরী ঘৃত ও তৈলপক্ক মিষ্টান্ন ব্রাহ্মণের খেতে নেই। স্বেচ্ছায় শুদ্র হত্যা করলে ব্রাহ্মণ যদি এক লক্ষ বার গায়ত্রী জপ করে তাহলে সে পাপ মুক্ত হয়।

শাস্ত্র জ্ঞানী দৈবজ্ঞ যদি লোভের বশে মিথ্যা বলে তবে তাকে দীর্ঘকাল টিকটিকি ও সাত জন্ম বাঁদর হয়ে কাটাতে হয়। পাপী অধার্মিক ব্যক্তি কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ হয়ে পুণ্যভারতে জন্ম নেয়। সব নদীর মধ্যে যেমন ভাগীরথী, পুণ্য তীর্থের মধ্যে যেমন পুষ্কর, পুরীর মধ্যে যেমন বারাণসী, প্রাজ্ঞের মধ্যে যেমন দেবাদিদেব, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, সাধনার মধ্যে শ্রীহরির আরাধনা, ব্রতের মধ্যে অনশন চতুর্বর্ণের মধ্যে তেমনই ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। কর্মবিপাক শ্রবণে ব্রাহ্মণ কে সোনা রুপো, গুড়, বস্ত্র ও পান দিলে আমি প্রীত হই।

৮৬.

সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মার পুত্র এক মনুর আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম স্বয়ম্ভব। তাঁর স্ত্রী শতরূপ নারীদের মধ্যে সুভগা এবং সন্মানাহা, উত্তানপাদের পুত্র হল ধ্রুব। ধ্রুবের পুত্রের নাম বৎসরাণের পুত্র বৎসরাণ। কেদার ছিলেন পরম ভক্ত বৈষ্ণব ও সপ্তদ্বীপের রাজা। কেদার রাজাকে সততই রক্ষা করত সুদর্শন চক্র। কেদার রাজার এক লক্ষ পাঁচক এবং দুলক্ষ পরিবেশন কারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্রাহ্মণ এবং গরীব দুঃখীদের ভোজন করানো হতো এবং ধন দান করা হোত। এক পাঁচক কেদার রাজাকে বলেছিল, ব্রাহ্মণদের আহার যোগানোর জন্য মাত্র একলক্ষ গাভী অবশিষ্ট আছে। রাজার যজ্ঞকুন্ড থেকে কমলার অংশ সম্ভূতা অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্র এবং অলংকার শোভনা এক কন্যা আবির্ভূত হয়। কামাতুরা কুমারী বলল, আমি আপনার তনয়া, তার নাম বৃন্দা। তার তপস্যার স্মৃতিবাহী বলে স্থানটির নাম হয় বৃন্দাবন। বৃন্দা তার পতিরূপে ব্রহ্মার কাছে আমাকে কামনা করেন। ব্রহ্মা তাকে বলেন, কিছুদিন পরে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবে। সুবেশ ধর্মরাজকে তিনি বৃন্দার কাছে পাঠালেন। কেদাররাজ তনয়া যুবা ধর্মকে দেখে বিস্মিত হলেন। ধর্মরূপী বিপ্র বললেন, লক্ষ্মী সরস্বতীই কেবল তার যোগ্য সহধর্মিনী হতে পারেন।

৮৭.

বেদে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, অনন্ত, মুনি ঋষি, সিদ্ধাচার্যেরা কেউ তোমায় পরিপূর্ণভাবে জানতে পারেননি। শ্রীকৃষ্ণ বসেছিলেন ঠিক মাঝে। তিনি সকলের সাথে কুশল

বিনিময় করলেন। সেই সনৎ কুমারের সৌন্দর্য, পাঁচ বছরের এক নিরাবরণ গৌরবর্ণ শিশুর মত পবিত্র। কৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা করা অবশ্য অর্থহীন কেন না তিনি সমুদয় শুভের বীজ স্বরূপ। সনৎকুমার বললেন, আমি গোলোকে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেলাম না। সেখানে চুতর্ভুজের দেখা পেলাম না। বিরাটাকার রাঘব নামক এক মাছ তাকে জল থেকে বিতাড়িত করেছে। কচ্ছপটিকে বললাম তুমি ধন্যা। সে তখন বলল, মহামুনি ধন্যবাদ আমার প্রাপ্য নয়–ক্ষীরোদ সাগরেরই প্রাপ্য।

বেদ নারায়ণ তুল্য, কেননা বেদের ব্যবস্থা হেতুই আমরা পূজা পেয়ে থাকি। বেদ থেকেই সকল শাস্ত্রগ্রন্থের উৎপত্তি। আমি ধর্মালয়ে তাঁকে দেখতে না পেয়ে তাকে দেখবার জন্য মথুরায় এলাম। ব্রহ্মাণকে সময়মতো দক্ষিনা না দিলে, এক রাত্রি হলে তার দ্বিগুন, একমাস অতিবাহিত হলে একগুন, দুইমাস অতীত হলে বিধিসম্মত দক্ষিনার সহস্র গুন অবশ্যই দেয় আর সারা বছর কেটে গেলে দাতাকে নিঃসন্দেহেই নরকগামী হতে হয়।

৮৮.

বিষ্ণুমায়া সকল প্রকার মোহের বিনাশ করে ও মুক্তি প্রদান করেন। ত্রিপুরাসুরের সঙ্গে মহাসমরে শিব ভয় পেয়ে মহামায়ার স্তব করে দুর্দান্ত অসুরকে হত্যা করেন। দেবাদিদেব মুহূর্তেই বিষ্ণু ও দুর্গাকে স্মরণ করে ত্রিপুরাসুরকে বধ করলেন। দেবতারা মহাদেবের স্তুতিতে মুখর হয়ে উঠলেন ও পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল। দৈত্যত্রাসে কম্পিত মহাদেবকে ওই স্তোত্র আমার আদেশক্রমে ব্রহ্মা দান করেছিলেন। সাধারণ মানুষ যদি এই স্তব কোটিবার জপ করে তাহলে স্তোত্রসিদ্ধির মধ্যে দিয়ে সে সর্বসিদ্ধি লাভ করে থাকে। স্তোত্রে সিদ্ধিলাভ করেছে এমন ব্যক্তি অগ্নি-জল-ভূমন-স্তম্ভাদি সাধনে তৎপর হয়। আমার প্রাণস্বরূপ এই মহাস্তোত্র আপনাকে অর্পণ করলাম। এখনই আপনি এবার এই স্তোত্র আবৃত্তি করুন। কৃষ্ণের কথায় নন্দ এই স্তোত্রে পার্বতীর স্তব করলে পার্বতী অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাকে তার কাঙ্খিত বরদান করলেন।

৮৯.

মাতা যশোদা, গোপিণী, গোপালক বিশেষ করে শ্রীরাধিকাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবেন। পরমসুখ ইহলোকে ভোগ করে অন্তে আপনাদের গোলক প্রাপ্তি হবে। তোমাদের যাত্রাকালে গোলক থেকে শত শত রত্ননির্মিত হীরক খচিত, মুক্তার মালায় সুশোভিত সুকান্ত আমার পারিষদেরা থাকবে। দিব্য দেহ ধারণ করে গোপ গোপিণী পরিবৃত হয়ে গোলোকধামে আপনাদের উত্তরণ হবে। আযোনিসম্ভবা শ্রীরাধিকার জননী কলাবতী একই রথে আপনাদের সহ্যাত্রিণী হবেন। কলাবতী, সীতা পার্বতীর জননী ধন্য, আপনাকে গোপনতত্ত্ব সমূহ জানিয়েছি, স্বয়ং পার্বতী আপনাকে বর দিয়েছেন। অতঃপর নন্দ শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে বললেন–চারযুগের সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে জানতে চাই, কলি যুগের শেষে পৃথিবীর ধর্ম এবং প্রাণীদের কি হবে, আমায় তা বল। নন্দের বাক্য শ্রবণ করে কৃষ্ণ শ্রুতিসুখকর বিচিত্র ইতিবৃত্ত বলতে শুরু করেন।

৯০.

পুরাণে বর্ণিত শ্রুতিমধুর মনোজ্ঞ কাহিনি– সত্যযুগে সত্যের পুনর্বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। তখন সকলেই ধর্মানুসরণ করে এবং সহৃদয়তা, সহমর্মিতার পরিচয় দেয় ও দয়ালু হয়। ব্রাহ্মণেরা নিয়ত বেদপাঠ ও তপস্যা করেন, তারা নারায়ণের প্রতি আসক্ত থাকেন। পুরুষেরা ঋতুকালে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়, কেউ বহুনারীগামী হয় না, পরস্ত্রীর প্রতি কোনো আকর্ষণ অনুভব করে না। কলির অন্তিমলগ্নে মানুষ লিঙ্গ ও উদর সর্বস্ব হয়ে ওঠে। মানুষের নিত্যসঙ্গী হয় অসুস্থতা, বিদায় নেয় সৌন্দর্য ও কমণীয়তা। দেশ আচ্ছন্ন হয় অরাজকতায় এবং দুর্নীতিতে। স্বামী-স্ত্রী নিয়তই কলহে লিপ্ত হয় তারা অত্যন্ত কুরূপ হয়, পুষ্করিণীতে পদ্ম ফোঁটানো নারীদের সন্তান ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত হ্রাস পায়। কলিযুগে ফল-অন্ন-জলে স্বাদুতা কমে আসে। জগজ্জননী যে জ্ঞান বিতরণ করেছেন সেই জ্ঞানবলে তুমি ।মোহমুক্ত হও। নন্দ বললেন, পুত্র! একবার বৃন্দাবন, মিলন মধুর মহোৎসব, গোকুল, রমণীয় যমুনাতীর ও গাভীদের কথা ভেবে দেখ। তোমার মনোরম রাসমন্ডল, গোপবালক, যশোদা, রোহিণীর কথা মনে পড়ছে কি? নন্দ কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে অদম্য এক কম্পোচ্ছ্বাসে। অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে চোখ দুটি, কৃষ্ণ ও অনির্বচনীয় আনন্দে নন্দকে পুনরায় বলা শুরু করলেন।

৯১.

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—-কর্মফল হেতু মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটে। এ রোধ করা যায় না। উদ্ধবকে শীঘ্রই বৃন্দাবনে পাঠাচ্ছি। আমার বৃন্দাবনে না যাওয়ার কারণ তার কাছ থেকেই জানতে পারবে। উদ্ধব, যশোদা রোহিণী রাধিকা গোপবালক গোপিণীদের সান্ত্বনা দেবে। এই বালকই তোমার ও আমার মধ্যে সুদৃঢ় সখ্যতার সেতু বন্ধন করেছে, অতঃপর গৃহে গমন কর মোহমুক্ত হয়ে। সে তোমারও পুত্র, খুব একটা বেশি না মথুরা ও গোলকের দুরত্ব। কৃষ্ণকে অবশ্যই কাছে পাবে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে। দৈবকী বললেন, নন্দরাজ! শোকে আপনি কেন এত অভিভূত হচ্ছেন। কৃষ্ণ কেবল আমাদের নয় আপনারও পুত্র। দীর্ঘ এগারো বছর তো সে আপনার আলয়ে বলদেবের সঙ্গে চরম সুখে কালতিপাত করেছে। আপনি বরং মথুরায় চলুন ও কৃষ্ণের সাথে কাল অতিবাহিত করুন। ভগবান বললেন, উদ্ধব হে! বিলম্ব না করে তুমি গোকুলে যাও। তুমি আনন্দের সঙ্গে সেখানে গিয়ে যশোদা, রোহিনী, রাধিকা, গোপিনীদের দুঃখ দূর কর। তাদের শোক প্রশমন কর আধ্যাত্মিক উপদেশ দান করে। মাতা যশোদাকে বলবে যে, মার আদেশে নন্দরাজ আমাদের আলয়ে কিছুদিন থাকবে। অতঃপর কৃষ্ণ! বাবা, মা, বলদেব ও অকুরের সঙ্গে স্বগৃহে, গমন করলেন। হে নারদ! উদ্ধব সে রাতটা মথুরাতেই থেকে গেলেন। সকাল হলে তিনি বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

৯২.

কৃষ্ণের বার্তাবহ উদ্ধব সিদ্ধিদাতা গণেশ, নারায়ণ, শিব, লক্ষ্মী দিবাপালদের প্রণাম করে শুভক্ষণে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে নিষ্ক্রান্ত হলেন। বিপদের আশীর্বাদে অভিস্নাত হয়ে উদ্ভব পথ চলছেন। শুভংকর দ্রব্য দেখতে দেখতে উদ্ভব কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃন্দাবনে পৌঁছে গেলেন। প্রথমেই অক্ষয় বট দেখলেন ঘেঁটু বনের মধ্যে। যার পাতা চিকন ও লালচে। সুশোভন বেশে রাখাল বালকদের দেখলেন। তারা শোককাতর কৃষ্ণবিরহে। ‘হাঁ কৃষ্ণ’, ‘হা বলরাম’, ধ্বনিতে তাদের আর্ত ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে বৃন্দাবনের আকাশ-বাতাস মথিত হচ্ছে। কিছুটা এগোতেই বিশ্বকর্মার শিল্পকীর্তির নিদর্শন, মনি ও রত্নময় নন্দশিবির দৃষ্ট হলো। শিবিরের দ্বারগুলি বৈচিত্র্যমন্ডিত। যশোদা ও রোহিনী ছুটে এলেন। উদ্ভবকে জল, গোরু ও মধুপর্ক প্রদান করে অভ্যর্থনা জানালেন। যশোদা ও রোহিনী উভয়ের একই প্রশ্ন। উদ্ভব সকলের মঙ্গল সংবাদ পরিবেশন করে বললেন–যে নন্দরাজ কৃষ্ণ এবং বলরামের সঙ্গে সুখেই অবস্থান করছেন। আমি মথুরায় গিয়ে আপনাদের শুভ সংবাদ দেব আর বলব, আমার কাছ থেকে আপনাদের শুভ সংবাদ শ্রবন করে যশোদা ও রোহিনী ব্রাহ্মনদের রত্ন, সোনা ও বস্ত্র প্রদান করেছেন।

আরও বলব যে আমাকে আপনারা নানা রকমের ভালো মিষ্টি খাইয়ে মনি-রত্ন দিয়েছেন। একে একে নানা মঙ্গলজনক অনুষ্ঠান শুরু হল। ব্রাহ্মন ভোজন, বেদপাঠ, অর্ঘ্য, কুসুমধূপ-দীপ-চন্দন নববস্ত্র, তাম্বুল-মধুপর্ক-ঘৃত প্রভৃতি উপাচারে দেবাদিবের অর্চনা। ষোড়শোপচারে ভবানী মার পূজা নানাবিধ বলি একশত মহিষ, একহাজার ছাগল, দশ হাজার ভেড়া নিয়ে উক্ত দেবীর আরাধনা ইত্যাদি। কৃষ্ণের কল্যাণ কামনায় ব্রাহ্মণদের শত সুবর্ণ এবং শত ধেনু দান করে তারা উদ্ধবকেও পূজা করলেন। উদ্ভভ যশোধা রোহিণী গোপিণীদের আশ্বস্ত করে চন্দ্র মন্ডলের মতো নয়নাভিরাম রাসমণ্ডলে গিয়ে দেখলেন সেখানে পটসূত্রে সচন্দন আম্রপল্লব এবং মালা ঝুলছে, কলাগাছগুলি স্তম্ভের মতো দাঁড়ানো, কৃষ্ণের লীলাভূমি দই খই ফল সিংহাসন ফুল দুর্বা চন্দন অগরু মৃগনাভি ও কুঙ্কুমে পুত। সেখানে মিলন মন্দির তিন লক্ষ রতিমন্দির অবস্থিত, তিন কোটি সুন্দরী গোপিনী সেই রতিমন্দির গুলিকে বেষ্টন করে আছেন। লক্ষ গোপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় সেখানে সমবেত হয়েছেন। তারপর উদ্ধব একে একে যমুনা, চন্দন-চাপা-কেয়া-মাধবী-বকুল-অশোক-পলাশ-সোঁদান বনে ঘুরলেন। তাল হিন্তাল বনসমূহও বাদ গেল না। আম-কাঁঠাল মন্দার বন বাঁ দিকে রেখে কুঞ্জবনে গেলেন। কুহুতান, ভ্রমরের গুঞ্জনে সেই বন মুখরিত হচ্ছে। মধুমন্দ বাতাসে বইছে ফুলের গন্ধ। রমণীয় সে অরণ্য অতিক্রম করে উদ্ধব রাজপথে এলেন। সহসা তার চোখে পড়ে লাল টুকটুকে একটি ফল। কলা বাগানে নীরব নিভৃত স্থানে পরিখা আর দুর্গঘেরা শ্রীরাধিকার আশ্রম। মিত্রদের কাছে অতি সুগম শত্রুদের কাছে সেটি দুর্গম। প্রাসাদ শীর্ষে বায়ুপ্রবাহে আন্দোলিত হচ্ছে পতাকা। সিংহদ্বারটিও রত্নখচিত, দ্বারে প্রবেশ করে উদ্ধব বৃন্দাবনের সেই প্রফুল্ল নীপ কানন দেখলেন। বেত হাতে লক্ষ লক্ষ রূপসী গোপিনী দ্বারে পাহারা দিচ্ছে, উদ্ধব একে একে প্রণাম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম দ্বার অতিক্রম করে ষষ্ঠ দ্বারে উপস্থিত হলেন। বিষ্ণুর দশাবতারের চিত্র দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। কত নিপুণ ভাবেই না বিশ্বকর্মা রাসমণ্ডল আর যমুনা নদীতে জলক্রীড়ার দ্যুতি এঁকেছেন।

গোপঙ্গনার সতর্ক প্রহরায় সে স্থান অতি সুরক্ষিত। তাদের পরিধেয় থেকে মণিমাণিক্যের দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। প্রধান মাধবী উদ্ধবের কাছ থেকে কুশলবার্তা শুনে অত্যন্ত খুশী হয়ে রাধিকার সখীদের আনন্দসংবাদ দিতে গেল। রাধার গৃহে নিয়ে গেল। তাঁর নিকেতন মহার্ঘ রত্নে নির্মিত। পদ্মপাতায় অমাবস্যার চাঁদের মতো কৃষ্ণ বিরহে কাতর মূর্ছিত প্রায় নিরাভরনা রাধা শুয়ে আছেন। অপরিচ্ছিন্ন ধারায় অনির্গত হওয়ায় তাঁর চোখ লাল হয়ে উঠেছে। তাঁর শ্রীঅঙ্গ কালো মলিন হয়েছে। তিনি নতমস্তকে শ্রীরাধিকাকে প্রণাম করে বললেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ বন্দিতা যে রাধার জয়কীর্তনে ত্রিভুবনে পবিত্র হয়ে ওঠে, আমি তাঁকে প্রণাম করে ধন্য হলাম।

আপনিই ধীশক্তি এবং প্রজ্ঞাপ্রদায়িনী, সত্যযুগে দেবতাদের ছিলেন তেজ, আপনিই প্রকৃতি আপনাকে প্রণাম। আপনি লজ্জা, ধৃতি এবং চেতনা রূপিণী আপনাকে প্রণাম। আপনিই সকলের শক্তি, জগজ্জননী, আপনি বহ্নির দাহিকা শক্তি, পূর্ণচন্দ্র স্বরূপা আপনাকে প্রণাম।

দেবী! দুগ্ধ এবং তার ধবলতায়, ভূমি এবং সৌরভে, জল এবং তার শৈত্যে, আকাশ এবং শব্দে, সূর্য এবং তার দীপ্তিতে কোনো ভেদ নেই। রাধা কৃষ্ণও অভিন্ন। আপনার মূর্ছা অপনোদিত হোক। আপনি আমার সঙ্গে কথা বলুন। রাধার এইরূপ স্তুতি করে উদ্ধব বার বার তাকে শ্রদ্ধানত চিত্তে প্রণাম করলেন। উদ্ধবের এই রাধা কীর্তন ভক্তিসহকারে যে পাঠ করে সে ঐহিক সুখলাভ করে মৃত্যুর পরে শ্রীহরির আলয়ে আশ্রয় পায়। সে রোগ-শোক মুক্ত হয়, জীবনে তার বন্ধুবিচ্ছেদ হয় না। যে স্ত্রী প্রবাসী স্বামীর বিরহে বেদনায় চঞ্চল সে এই স্তোত্র পাঠে অচিরেই পতির সঙ্গে মিলিত হয়। অনুরূপভাবে, স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদে যে স্বামী কষ্ট পাচ্ছে পত্নীর সঙ্গে তার মিলন হয়। এই স্তোত্র পাঠে নিঃসন্তান পুত্রের মুখ দেখে, দরিদ্র ধন লাভ করে, ভূমিহীন নিরাশ্রয় ব্যক্তি ভূমি ও আশ্রয় লাভ করে –নিয়ত, শঙ্কিত ব্যক্তি নিভকি হয়। বদ্ধ মুক্তিলাভ করে, কীর্তিহীন যশস্বী হয়।

৯৩.

উদ্ধবের স্তুতিতে শ্রীরাধিকার নয়ন উন্মীলিত হলো। দুঃখ ভারাক্রান্ত চিত্তে তিনি প্রশ্ন করলেন, বৎস! তুমি কে? কে, কেন, কোথা থেকে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে? শোককাতরা শ্রীরাধিকার কথা শুনে উদ্ধব বললেন, ।বরাঙ্গনা। আমি ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব উদ্ধব। আপনার ধারণা অভ্রান্ত, আমি শ্রীহরির পারিষদ। আমার মাধ্যমে তিনি তার কুশল সংবাদ প্রেরণ করেছেন আর সেই উদ্দেশ্যেই আমার আগমন।

কৃষ্ণ, বলরাম এবং নন্দ বর্তমানে মথুরায় সুখেই কালাতিপাত করছেন। রাধিকা বললেন, বৎস! সুনীল যমুনার অনুপম বেলাভূমি, সৌরভমন্থর বাতাস নীপবনে ছায়াবীথি, কোকিলের মধুর কূজন, মদনের নিয়ত আনাগোনা, রাসমন্ডলের সে উজ্জ্বল রত্নদীপ, মিলন মন্দির, গোপিণী, স্নিগ্ধ চন্দ্র কিরণ–সবই তো আগের মতোই রয়েছে।

আজও তো রয়েছে, চন্দন লিপ্ত কুসুম শয্যা, কর্পূর সুবাসিত তাম্বুল, মনোহর মালতীর মালা, নয়নের তৃপ্তিদায়ক শ্বেত চামর, দর্পণ, হীরক হারে বর্ণ বিকিরণ, আলো করে ফুটে ওঠা নানা বর্ণের ও গন্ধের অসংখ্য পুষ্প, পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম, কিন্তু আমার প্রিয়তম কোথায়? বিচ্ছেদ

কাতরা শ্রীরাধিকার মনোবেদনায় উদ্ধবও কষ্ট পেলেন। বিরহাতুরা রাধার দুঃখে কেউ বা কাঁদছে, কেউ বা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

সেই সেই বনতপ্তা কোনো গৌরবর্ণা গোপিনী কামনা মদির শ্রীরাধিকার সন্তাপ দূর করার জন্য স্নিগ্ধ পেলব পদ্মপত্রে শয্যা রচনা করে তাকে শুইয়ে দিচ্ছে। অসীম শক্তির আকার মূলা প্রকৃতি। শ্রীদামের অভিসম্পাতে, গোলোক কামিনী হয়ে আপনার মর্তে আগমন। বসুদেব চান কৃষ্ণের উপনয়ন পর্যন্ত নন্দ সেখানে থাকুন, শুভানুষ্ঠান শেষ হলে নন্দ, কৃষ্ণ এবং বলরাম পুনরায় গোকুলে ফিরে আসবেন।

কৃষ্ণ বৃন্দাবনে এসে প্রথমে তার যশোদা মাকে প্রণাম করেন। স্বর্ণচাপা চন্দনের গন্ধ ছড়িয়ে মণিমুক্তোয় নিজেকে অলংকৃত করে আপনি অতঃপর রত্নপালঙ্কে শয়ন করুন। সহেলীর শ্বেত চামর দিয়ে বাতাস করুক। সখীরা আপনার পদ সেবা করুক। সাজগোজ সেরে স্বচ্ছ দর্পণে একবার নিজের সুন্দর মুখটা দেখতে ভুলবেন না যেন। একথা বলে উদ্ধব রাধার শোভনীয় চরণমূলে প্রণত হলেন।

উদ্ধবের কথায় শ্রীরাধিকার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খুশি হয়ে তিনি উদ্ধবকে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা নির্মিত পীতবর্ণের রত্নখচিত দীপের মতো দীপ্ত মহামূল্যবান একটি অঙ্গুরীয় উপহার দিলেন। তাছাড়াও তিনি কুন্ডল অন্যান্য আভরণ, বরুণদেব কৃষ্ণকে যে রত্ন নির্মিত ক্রীড়াপদ্ম দিয়েছিলেন সেটি, দিমিনি কৃষ্ণকে যে স্যমন্তক মণি প্রদান করেছিলেন এবং দেবরাজ যে রত্নসিংহাসন দিয়েছিলেন সেগুলিও উদ্ধবকে উপহার করলেন।

উপরন্তু উদ্ভবের ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকায় তিনি রাধিকার কাছে থেকে ব্রহ্মা প্রদত্ত রাসমন্ডলের শ্রেষ্ঠ মুক্তা মাণিক্য হীরা খচিত হার, চিত্রকমল শোভিত রত্নদর্পণ, গোলোক রাসমন্ডলে শ্রীহরি যে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন সেই জ্ঞান সেই সঙ্গে তার অধস্তন শতপুরুষ পর্যন্ত বিদ্যা-ঐশ্বর্য-যশ-সিদ্ধি লাভ করে শ্রীহরির পাদপদ্মে অচলা অটুট থাকুক এইসব দুর্লভ বর প্রদান করলেন। উদ্ধবের কাছে কৃষ্ণের কুশল সংবাদে সখীরাও প্রীত হয়ে তাঁকে অনেক উপহার দিলেন।

রাধা চিন্তায় আকুল হলেন। উদ্ধবের কাছে জানতে চাইলেন, যে তাঁর বলা কথা সত্য কিনা। শত কূপের চেয়ে যেমন পুষ্করিণী, শত পুষ্করিণীর চেয়ে যজ্ঞ, শত যজ্ঞ থেকে পুত্র, ও সত্য শ্রেষ্ঠ। উদ্ভব বললেন, তিনি এক বর্ণও মিথ্যা বলেন নি। আপনি শীঘ্রই হরিমুখ দেখবেন। আপনি চিন্তা মুক্ত হোন। শাস্ত্রপাঠে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নারী চরিত্র সম্পর্কে সামান্যই অবগত হতে পারেন।

কখন সূর্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে, তা জানতেও পারছি না। তার কুশল বার্তা স্মরণ করে আমি চেতনা ফিরে পেলাম। মনের চোখে ভেসে উঠেছে তাঁর সুন্দর মুখ। কানে আসছে শ্রুতি মধুর বংশীধ্বনি। কুল-লাজ-ভয় ত্যাগ করে সতত হরির পাদপদ্ম স্মরণ করি। মায়ায় আচ্ছন্ন ছিলাম বলে তাঁকে পেয়েও তার স্বরূপ অবগত হতে পারিনি। যতদিন তিনি ছিলেন ততদিন আমি ভক্তি সহকারে তাঁর পাদপদ্মে সেবা করেছি।

তার গুণ-কীর্তনের মাঝে মগ্ন থেকেছি, মানসিক প্রশান্তিতে আমার আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি আজ অসহায় তার অনুপস্থিতিতে, আর কোনো আসক্তি নেই কোনো কিছুতে। হৃদয়ে প্রেমের উৎস গেছে শুকিয়ে, আমার সৌভাগ্য রবি অস্তমিত। যমুনানদীতে, ক্রীড়া- সরোবরে কৃষ্ণ এবং সখীদের সঙ্গে আর কি আমি সুখাবহ জলক্রীড়ার সুযোগ পাব? কোথায় আমার প্রাণের মাধব? উদ্ধবকে এসব কথা বলে রাধা কাঁদতে লাগলেন এবং পুনরায় সংজ্ঞা হারালেন।

৯৪.

নারায়ণ বললেন, সংজ্ঞাহীন রাধাকে দেখে উদ্ধব যুগপৎ ত্রস্ত এবং বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। রাধার জ্ঞান ফেরাতে প্রয়াসী হলেন। জ্ঞান ফিরে আসার পর উদ্ধব পুনরায় বলতে শুরু করলেন। জগজ্জননী রাধার চরণে শতকোটি প্রণাম। আপনি শীঘ্রই কৃষ্ণের দর্শন পাবেন। বেদ এবং সনক সব সময়ই আপনার জয়গান করেন। আপনি দান করেন হরিভক্তি, মঙ্গল প্রদান করেন, সকল বাধা বিঘ্ন দূর করেন। একজন গোপিনী উদ্ধবকে পিছন ফিরতে বলে সংজ্ঞাহীন। রাধার সামনে দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশ্যে। বললেন– তুমি কি কৃষ্ণের রূপ লাবণ্য, সুবেশ ও তার সাথে মিলিত হবার কথা মনে করছ। মনে রেখো ইনি একজন সামান্য গোপবালক। তাকে স্মরণ করে তুমি মিথ্যা কষ্ট ভোগ করছ। আত্মার চেয়ে প্রিয়তম কিছু নেই। তোমার কর্তব্য আত্মাকে রক্ষা করা। মালতী বলল, তোমার লজ্জা শরম নেই। তুমি ধুলায় মিলিয়ে দিচ্ছ নারী জাতির সম্মান। বিরত হও কৃষ্ণকে অন্তরে পতি রূপে বরণ করার ধারণা থেকে। যারা সাধু তারা কার্য ও কাল সম্পর্কে অবহিত হয়ে সবকিছু সম্পাদন করেন।

শত্রু প্রথমে ঐশ্বর্য হরণ করে, পরে পুরুষ বাক্য প্রয়োগে দুঃখ দিয়ে শেষে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। তার জন্য তুমি কুলত্যাগিণী হয়েছ। তিনি তোমায় শোকের সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর হয়ে মূচ্ছা যাচ্ছো। তুমি সত্যিই বোকা। তাই দুঃখ ভুলে আত্মরক্ষায় ব্রতী হও। বড়োই ক্ষণস্থায়ী কপটের প্রেম, বিদ্যুতের চমক ও জলের দাগ। খলকে বিশ্বাস করবে না শাস্ত্রে বলা আছে।

যমুনা তীরে কৃষ্ণ তোমায় কটাক্ষ করলেন আর তুমিও তার মুখ দেখে গুরুজনের ভয়, কুলমান সব জলাঞ্জলি দিয়ে কৃষ্ণানুরাগিণী হলে। কৃষ্ণ রয়েছেন মথুরায় আর তুমি রয়েছ গোকুলে তুমি প্রাণ বিসর্জন দিলেও। তিনি তোমার কাছে আসবেন না। চন্দ্রমুখী নামক অপর এক সখী বলল, কর্মফল হেতুই মানুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে। তাই কৃষ্ণ নিন্দায় কোনো ফল হবে না।

তাঁর স্তুতিতে আত্মনিয়োগ কর। তার নাম এবং স্তুতি শ্রবণেই রাধিকা সংজ্ঞা ফিরে পাবেন। লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁর স্বরূপ জানেন না। তুমি তাকে জানবে কেমন করে? তোমায় পূর্বের কথাই ঠিক। পৃথিবীর ভার মোচনের নিমিত্তই মোহন বেশে, মধুস্বরূপ সেই মন্দাকিনী ধারাকে রমণীয় রূপ ধারণ করে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন।

দেবাদিদেব তাঁর চরণকমলে মস্তক ধারণ করেছেন। জগৎ সংসারে অনাসক্ত ত্যাগী মহেশ্বর অসন বসন-ভূষণ ত্যাগ করে নৃত্যসহ পঞ্চমুখে সর্বদাই যাঁর নাম কীর্তনে মগ্ন থাকেন। তাকে জানা কি এতই সহজ? ব্রহ্মা তো শ্রী হরিকে সেবা করেই জন্ম দায় থেকে মুক্ত হয়েছেন। সুশীলা বললেন, সেই পরম পুরুষ তুলনা রহিত। কৃষ্ণের রূপের কাছে চন্দ্র এবং অশ্বিনকুমারদ্বয়ের সৌন্দর্যও ম্লান হয়ে যায়।

সীতা ও ধন্যা উভয়েই অযযানিসম্ভবা। দেবতাত্মা হিমালয়ের পত্নী দূর্গা-জননী মেনকাও দুর্গার মতোই অযযানি সম্ভবা, নিত্যই তিনি ব্রতানুষ্ঠানরতা। আমি বৃষভানুর স্ত্রী ও রাধার মা। রাধা ও আমি দুজনেই অযোনিজা। আমরা শ্রীদামের শাপে পৃথিবীতে এসেছি। ক্ষীরোদ সাগরে সুন্দর একটা শ্বেত দ্বীপ আছে –সেখানে বিষ্ণুর বাস। সেখানে আমরা তিন বোন বিষ্ণুকে দেখতে পাই।

একদিন যোগীশ্রেষ্ঠ সনৎকুমার সেখানে এলেন। তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিনি। তাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের মর্ত্যে জন্ম নেবার অভিশাপ দেন। তার ক্রোধ প্রশমনের চেষ্টা করলে তিনি শান্ত হলেন ও বরদান করে বললেন– মেনকা তুমি জ্যেষ্ঠা, ধরায় অবতীর্ণ হয়ে বিষ্ণুর অংশজাত গিরিরাজ হিমালয়ের পত্নী হবে, পার্বতী তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হবেন।

ধন্যা, তুমি যোগীন্দ্র জনকরাজার রানি হবে, লক্ষ্মীদেবী তোমার কন্যা সীতারূপে পরিচিত হবেন। কলাবতী তুমি ছোট। দুর্বাসা মুনির অনুগ্রহধন্য বৃষভানুর সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে। দ্বাপরের অন্তিম লগ্নে শ্রীদামের শাপে রাধা তোমার কন্যা রূপে জন্ম নেবে। তখন দেবাদিদেব ও অনন্তদেবের আরাধ্য কৃষ্ণও ভারতবর্ষে আবির্ভূত হবেন।

সেই শুভক্ষণে তোমরা কন্যাসহ জীবন্মুক্ত হয়ে পুনরায় পরমানন্দে নিজ স্থানে ফিরে যাবে। মানসী কন্যা আমরা আমাদের পিতৃগণের দ্বারা অনুগৃহীত। আমাদের কাল কেটেছে স্বর্গে স্বর্গীয় সুখে। দেবতারা যেমন সভায়, শিবের অনুগমন করেন, তেমনি জীবগণও পরমাত্মার শরনে সব সময়েই আত্মার অনুসরণ করে।

যোগীরা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তার ধ্যান করে থাকেন। কালিকা বললেন, আবালবৃদ্ধবনিতা দেবগণ সিদ্ধাচার্যেরা সকলেই তাকে জানেন। আর বিলম্ব না করে রাধিকার জ্ঞান ফেরানোর জন্য তৎপর হওয়া উচিত। উদ্ভব বললেন, আপনি চেতনা ফিরে পেয়ে চোখ মেলুন। মা! বলদ যেমন বাহকের দ্বারাই চালিত হয়, এ জগৎ সেইরকম তার ইচ্ছাতেই পরিচালিত হয়।

৯৫.

উদ্ধবের কথায় রাধার চেতনা ফিরল ও ধীরে ধীরে উঠে তিনি রত্নসিংহাসনে বসলেন। তখন সাতসুন্দরী গোপিনী চামর দিয়ে তাকে হাওয়া করতে লাগলেন। তিনি উদ্ধবকে মথুরা গমনের অনুমতি দিলেন। বললেন, আমার মানসিক ও শারীরিক অবস্থার কথা তাকে জানিয়ে আমার কাছে প্রেরণ কর। তার মতো পতিলাভ করেও বিচ্ছেদ হয়েছে– আমার মত হতভাগিনী আর কেউ নেই।

শোকের আমি তলিয়ে যাচ্ছি সাগরে। কোনোভাবে নিজেকে সংযত করতে পারছি না। আমার মত অসহায় ও অস্থির আর কেউই নেই। সকল যুবতীর মধ্যে আমি ছাড়া কেউ জানেনা হরির সাথে বিচ্ছেদের কথা। আমার মত হতভাগিনী রমণীকুলে কেউ নেই। আমার পাপের পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

আমি কল্পতরুসদৃশ পতিলাভ করেও বিধাতার নির্দয় বিধানে অনিঃশেষ যাতনা ভোগ করছি, আর বঞ্চিত হচ্ছি পতিসঙ্গ লাভে। যার রূপে স্বর্গ, মর্ত, পাতাল অভিভূত তাকে ভুলব কি করে। স্বপ্নেও যে একবার তাঁর অমেয় রূপরাশি প্রত্যক্ষ করেছে, সেও সকল বিষয় সম্পত্তির প্রতি অনাসক্ত হয়ে তার চরণে জীবন উৎসর্গ করে।

যার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, সূর্য কিরণ বিতরণ করছে, ইন্দ্র বৃষ্টিতে ধরণী সিক্ত করছে, বহ্নি সবকিছু দগ্ধ করছে, সর্বভূতের অন্তিম পরিণতিও যাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, যাঁর দাক্ষিণ্যে উপযুক্ত সময়ে বৃক্ষ পল্লবিত হচ্ছে, যিনি স্রষ্টারও স্রষ্টা, যিনি কারো অধীন নন।

তার বিচ্ছেদ বেদনা ভোলার ক্ষমতাই যখন নেই, তখন প্রবোধ দান নিরর্থক। আমাকে কেউ সান্ত্বনা দিতে পারবে না। স্থিতিরও গতি সম্ভব–কিন্তু যেখানে পথ নেই সেখানে গতির কথা অচিন্তনীয়। কালের গতিরোধ করা সম্ভব নয়। তুমি স্বচ্ছন্দে মথুরায় গমন কর। উদ্ধবের চোখও জলে ভরে উঠল।

৯৬.

উদ্ধব মথুরার উদ্দেশে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলে রোদনরতা প্রেমময়ী মাধবী বিরহিনী রাধার দুঃখে কাতর হয়ে উদ্ধবকে বললেন, অপেক্ষা কর। তোমাকে দুর্লভ জ্ঞানে জ্ঞানিত করতে চাই। কর্মফলহেতু প্রাণী জন্মগ্রহণ করে আর কর্মফল হেতুই তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। তাকে সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয় কর্মফল হেতুই।

প্রারব্ধ কর্মের অবশিষ্টাংশের ফলভোগের জন্য প্রাণীকে পুনর্বার জন্ম নিতে হয়। সুর-মনুষ্য পিতৃগণের ব্রহ্মালোক ও তার ঊর্ধ্বলোকের কালগতি সম্পর্কে আমি জানতে চাই। আমার অভীষ্ট, কালকে অতিক্রম করে হরির পাদপদ্ম লাভ। উদ্ধবের কথায় রাধার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কালের কাল জগৎপতির সাধনায় যাঁরা নিয়ত রত এবং সদাত্মা ব্যতিরেকে যাঁদের নাশশীল দেহ সদ্যপাতী হয়, তারা কৃষ্ণের সেবায় সমর্পিত প্রাণ হয়ে কালের গতি থেকে পরিত্রাণ লাভে সক্ষম হন।

সূর্য কৃষ্ণভক্ত ছাড়া অন্যসকলের আয়ু নাশ করেন। তাঁরা চিন্তা করে না বেদ-বেদাঙ্গের বিষয়, তাঁরা নিষ্পাপ ও হরির দাস হতে পেরে নিজেদের ধন্য বলে মনে করে। মৃকর পুত্র মাত্র দশ বৎসর আয়ু লাভ করে ব্রহ্মতেজে ভাস্বর হয়ে উঠেছিলেন পরে হরির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কেতু, পঞ্চশিখ, লোমক ও আসুরী শতকল্পান্তজীবী হয়েছেন কেবল মাত্র-হরিসেবায় আত্মনিয়োগ করে।

আবার দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ হরিবিদ্বেষী পিতার হরিভক্ত পুত্র হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। রোমকূপে যাঁর অগণিত বিশ্বের স্থিতি, সর্বধার, সর্বব্যাপী, স্থূলতম ও অন্যদিকে পরমায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্ম সেই পরমাণুই সকল কালের সূচনাত্মক ও পরমাণুদ্বয়ে দ্ব্যনুক, ত্রিদ্বনুকে ত্রিসরেণু আবার ত্রিত্রসরেণুতে এক ত্রুটি। একশতে ত্রুটিতে একবেধ, একালব হয় তিনবেধে তিনলবে এক নিমেষ, তিন নিমেষে একক্ষণ, পঞ্চক্ষণে এক কাষ্টা, দশ কাষ্ঠার এক লম্বু, পনের লম্বুতে একদন্ড, চার আঙুল মাপের চার স্বর্ণমাসের সরু ছিদ্র দিয়ে নিঃসৃত জলে ছয় পল পরিমান জলপাত্র পূরিত হলে এক দন্ড এবং দুই দন্ড মিলে এক মূহূর্ত হয়।

আট দন্ডে এক প্রহর, চার প্রহরে রাত ও দিন হয়। পঞ্চদশ তিথি হলো এক পক্ষ। শুক্ল ও কৃষ্ণ দুই পক্ষ। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয় ঋতু। বৎসর পাঁচ প্রকার। বারো মাসে এক অব্দ হয়, মাস হলো বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ন, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, ও চৈত্র, চৈত্র হল শেষ মাস।

প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা শুক্ল পক্ষ। পূর্ণিমা অন্তে অমাবস্যার শেষ পর্যন্ত গণনা করা হয়। কৃষ্ণপক্ষ। অনুরূপ পদ্ধতিতে এভাবে শুক্লপক্ষ গণনা করা হয়। চন্দ্রের সাতাশ জন স্ত্রী হলো– অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিনী, মৃগশিরা, আদ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব ফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যোষ্ঠমূলা, পূর্বষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়, শ্রবণা, অভিজিৎ, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তর ভাদ্রপদ ও রেবতী। অভিজিতের কোনো স্বতন্দ্র অস্তিত্ব নেই সে শ্রবণার ছায়া।

চন্দ্র একবার শ্রবণার সাথে দিনরাত মিলনানন্দে অতিবাহিত করায় চিত্রা ক্ষুব্ধ হয়ে, চাঁদকে ছায়ায় আবৃত করে পিতার কাছে গেল ও সেখানে নিয়ে এসে ভাগ করে দিল। মানুষের একমাসে পিতৃগণের এক দিন-রাত হয়– শুক্লপক্ষে হয় রাত, মানুষের এক বৎসরে দেবতাদের এক দিন-রাতে হয়। উত্তরায়ণে দিন ও দক্ষিণায়ণে রাত হয়। এক মন্বন্তর হলো পঁচিশ হাজার পাঁচশ ছয় যুগ। এক ইন্দ্রের পতন হয় এই সময়ে।

এই কালের ভিতর ইন্দ্র মনুর পতন সূচিত হয়। বৈকুণ্ঠের এক দিন, এক রাত্রি বিধাতার পতনের অপেক্ষিক। সে সময় বৈকুণ্ঠ ও গোলোকধামে সূর্য গতিহীন হয়ে পড়েন, তখন নিশ্চল হয়ে পড়ে চন্দ্র ও গ্রহগুলিও। শ্রীহরির এষনার পরিক্রমায় রাশিচক্রও স্তব্ধ হয়। তিনি নিজ নিকেতনে গমন করেন বলে নিষ্প্রভ হন। কালের স্রোত প্রবাহিত বিষ্ণুলোকেও।

বিধাতাই কাল স্বরূপ দিনরাতের অস্তিত্ব অনুভব করে পাতালবাসীরা আকারে ইঙ্গিতে, সাপের মাথার মণি জ্বললে দিন হয় ও দ্যুতিহীন হলে রাত হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চার যুগ। সত্যযুগের কাল পরিধি দেব পরিমাণে চার হাজার আটশ বছর। এক মনুষ্য পরিমাণে বারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বছর ধরে বিরাজ করে ত্রেতা যুগ। কাল সংখ্যা বিষয়ে যেমন শুনেছিলাম বললাম।

৯৭.

উদ্ধব মথুরার দিকে রওনা হলে রাধা বিষাদাচ্ছন্ন হল। যাত্রা শুভ হবার জন্য আয়না, পল্লব, ফল, গন্ধদ্রব্য, প্রদীপ, সোনা, রুপো তাকে দেখিয়ে বললেন– তুমি শ্রীহরির কাছে সম্যক জ্ঞান অর্জন কর। কৃষ্ণের সেবক হও ও তার প্রতি অচলা ভক্তি রাখ। সমগ্র বিশ্ব পরিক্রমা সকল তীর্থোদকে স্নান, নাম, যজ্ঞ ও ব্রতপালক, বেদ, বেদাঙ্গ পাঠ যা অপরকে দিয়ে পাঠ করানো আর্ত ব্যক্তির ত্রাণ, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বিতরণ, শরণাগতকে রক্ষা করা, পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, তাদের শ্রদ্ধার সাথে সকার, পুন্যার্জনের পথ প্রশস্ত করে।

দেবীকে প্রণাম করে উদ্ধবের চোখ অশ্রুসিক্ত হল। উদ্ধব বললেন– পৃথিবীতে সকল দ্বীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল জম্বুদ্বীপ। এটি ভারতবর্ষে অবস্থিত। পবিত্র ভারতেই রাধা-কৃষ্ণের দর্শন মানসে ব্রহ্মা পুষ্করে ষাট হাজার বছর কাঠোর তপস্যা করেছিলেন। পরম পরিতাপের বিষয় তিনি নিষ্ফল হলেন। বরাহ কল্পে ভারতের বৃন্দাবনে রাস উৎসবের পবিত্র মুহূর্তে রাসমন্ডলে স্থিত রাধা-কৃষ্ণেকে দেখতে পাবে।

ব্রহ্মা তপস্যা না করে গৃহাভিমুখী হলেন। তিনি যুগল মূর্তি দর্শন করে ধন্য হলেন এবং ভাবলেন গোপ-গোপীনীদের ভাগ্য কতই না সুপ্রসন্ন– কেননা নিয়তই তাঁরা রাধা-কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার দুর্লভ সুযোগ পায়। কৃষ্ণের প্রিয়তমা রাধিকাকে যারা অপবাদ দেয় তাদের বিষাক্ত এবং বীভৎস কীটে পরিপূর্ণ তমসাচ্ছন্ন উত্তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত হয়ে চুতদশ ইন্দ্রের আয়ত্তাধীন কাল পর্যন্ত সপ্ত পিতৃগণের সঙ্গে অবর্ননীয় যাতনার মাঝে বাস করে।

তারা একবার শূকর-যোনিতে জন্মায়, দিব্য সহস্র বৎসর বিষ্ঠা-কীটরূপ প্রাপ্ত হয়। উদ্ধবকে রাধা বললেন–মথুরায় গিয়ে তুমি মাধবকে সব কথা খুলে বলবে আর আমার যাতে পুনরায় তার শ্রীমুখের দর্শন সুখ থেকে বঞ্চিত না হই সেরূপ ব্যবস্থা করবে। রাধা আবার কাঁদতে কাঁদতে পুনরায় ভক্তিভরে প্রনাম করে যশোদা ভবনে গেলেন।

উদ্ধব চলে গেলে রাধা সংজ্ঞা হারালেন এবং অচৈতন্য অবস্থাতেও কৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন হলেন। গোপিনীরা অতঃপর স্নিগ্ধতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সপঙ্ক-সজল পদ্মের পর্ণশয্যায় তাকে শুইয়ে দিলেন। রাধার নয়ন থেকে তখন অবিরল ধারায় অশ্রু নির্গত হচ্ছিল। কৃষ্ণের বিরহ জ্বালায় এবং কামনায় তপ্ত রাধাকে সেই শয্যায় শোয়ানোর সাথে তা ভস্মে পরিণত হল। উদ্ধবের বিরহে রাধা শোকাহতা হয়েছিলেন। রাধা বলে উঠলেন, বৎস উদ্ধব! তুমি এবার মথুরায় গমন কর ও অসহনীয় কষ্টের কথা হরির পাদপদ্মে নিবেদন কর।

৯৮.

উদ্ধব যশোদাকে প্রণাম করে যমুনায় গেলেন। স্নান ও আহার সেরে মথুরায় গিয়ে বটগাছের নীচে কৃষ্ণকে দেখলেন। উদ্ধবকে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। উদ্ধবকে কৃষ্ণ নানা প্রশ্ন করলে তিনি বললেন–যে– ভারতে জন্মে সে নিজেকে ধন্য বলে মনে করে। আমি বৃন্দাবনের নয়নভিরাম রাসমন্ডলে গিয়েছি। গোলোকবাসিনী গোপিনীদের এবং গোপকন্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠা সকল সৌন্দর্যের সারভূতা শ্রীরাধিকাকে দর্শন করেও আমি পুণ্যসঞ্চয় করেছি।

রাধা অসন-বসন-ভূষণ ত্যাগ করে নিরিবিলি কদলীবনে চন্দন প্রলিপ্ত সপঞ্চ সজল শয্যায় শুয়ে আছেন। সখীরা তাঁকে শ্বেত চামরে বাতাস করছে। যে কামদেব দেবাদিদেবের ভয়ে সদা ত্রস্ত আপনি সেই শঙ্করেরও পূজিত কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার আপনাকে পতিরূপে লাভ করেও তিনি মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করছেন।

তাই কর্মের চেয়ে বড়ো আর কিছুই নেই এবং কর্ম অনিবারণীয়, বাসন্তিক জ্যোৎস্না রাধাকে দগ্ধ করছে, মৃদু মন্দ সমীরণ তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। তপ্ত কাঞ্চনের মতো তিনি উজ্জ্বল গৌরবর্ণা কিন্তু বিরহব্যথায় অধুনা তার বর্ণ কালিমায় লিপ্ত। তার কেশকলাপও পূর্বের সে সৌন্দর্য হারিয়েছে। বিধাতা, যোগীশ্রেষ্ঠদের পরমগুরু শঙ্কর, সনৎকুমার, গনেশ এবং অগণিত মুনি ঋষি আপনার ভক্ত, রাধার তুল্য আপনার একনিষ্ঠ ভক্ত আর কেউ নেই।

উদ্ধবের আকুতি শুনে শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হেসে তাকে বেদোক্তরাণী যা চিরকাল হিতসাধন করে থাকে, তা বললেন। উদ্ধবকে কৃষ্ণ বললেন, যে তিনি যখন তার প্রিয়তমাকে কথা দিয়ে এসেছে তাঁর অঙ্গীকার মিথ্যে হতে দেবেন না। উদ্ধব নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। হরি স্বপ্ন হয়ে সুপ্ত রাধার স্বপ্নে ভেসে উঠলেন ও তাকে আশ্বাস দিলেন। সুপ্ত যশোদাকে জাগ্রত করে স্তন্য পান করলেন।

৯৯.

গর্গবমুনি সিংহাসনে বসলে বসুদেব তাকে মধুপর্ক, কামধেনু, অগ্নিশুদ্ধ পরিধেয়, গন্ধদ্রব্য, পুষ্পমাল্য প্রদান করে তার আরাধনা করলেন। তাকে নানা মিষ্টান্ন, পিঠা ও পায়েস খাইয়ে তাঁকে সুরভিত তাম্বুল দিলেন। গর্গ কৃষ্ণকে স্মরণ মাত্র দর্শন করে মনে মনে তাকে প্রণাম করলেন। পরে তিনি বসুদেব ও দেবকীকে বলেন, কৃষ্ণ ও বলদেবের উপনয়নের সময় হয়েছে।

দুজনের মধ্যে কৃষ্ণ বয়সে ছোটো। আপনি যদুকুলের প্রণম্য পুরোহিত। তাদের উপনয়নের শুভ দিনক্ষণ স্থির করবেন আপনি। গর্গ বললেন, বসুদেব! ঐশ্বর্যে তুমি কুবেরের তুল্য। তোমার মিত্র পরিজনদের নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ কর। আজ থেকে তৃতীয় দিবসে চন্দ্র-তারা অত্যন্ত অনুকূল। এর চেয়ে শুভদিন আর নেই।

বসুদেব সেই উপনয়নে শ্রদ্ধাঘনচিত্তে সকলকে অভ্যর্থনা জানালেন। দেবতাদের স্তবগান করলেন। তিনি বললেন, আমার মতো নগণ্য এক ব্যক্তির আলয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর উপস্থিত হয়েছেন। সবচেয়ে সুন্দর যে সিংহাসন তাতে তিনি সিদ্ধি দাতা গণেশকে বসালেন। পঞ্চামৃত ও সাগরজলে যথাবিহিত মন্ত্রোচ্চারণে তিনি গনেশের পূজা করলেন। বসুদেব পারিজাতের মালা, মহার্ঘ রত্নালঙ্কার, বাহন, শ্বেতবস্ত্র, সচন্দন গন্ধ কুসুম এবং আংটি দিয়ে গণেশকে বরণ করলেন এবং সিদ্ধিদাতার স্তব করতে লাগলেন।

১০০.

এবার সকলে মিলে পার্বতীকে রত্নময় সিংহাসনে বসিয়ে তাকে মাল্য, বস্ত্র, রত্নালংকারে সজ্জিত করলেন। দৈবকী জগন্মাতার চরণে দেবরাজের আনা রমণীয় পারিজাত কুসুমের অঞ্জলি দিলেন। বিশ্বজননীর চরণ তিনি আলতায় রঞ্জিত করলেন এবং শুভ্র চামর ব্যঞ্জন করে তার সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

তিনি সুন্দরী রাজকন্যা-দেবকন্যা-নাগকন্যা-মুনিকন্যাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি মথুরা নগরীর গ্রাম্য দেবতা ভৈরবী এবং ষষ্ঠী মঙ্গলচন্ডী ও অন্যান্য দেবীদের ষড়োশোপচারে আরাধনা করলেন। বৈদিক ব্রাহ্মণদের বেদপাঠ করতে বললেন। কৃষ্ণ ও বলরাম রম্যবস্ত্র পরিধান করে এবং অলংকারে ভূষিত হয়ে দেবতা এবং মুনি-ঋষিরা অলংকৃত পবিত্র সভায় আগমন করলেন। সকল মুনি-ঋষিরা একে একে কৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। ব্রহ্মা বললেন–ভক্তদের প্রীতির উদ্দেশ্যে আপনি অবর্ণনীয় রূপ ধারণ করেন।

আপনার গুণকীর্তন করার শক্তি বেদেরও নেই। কোনো কিছুতেই আপনার কোনো আসক্তি নেই এবং আপনি সকল কর্মের সাক্ষী। নীরে শায়িত মহাবিষ্ণুর রোম বিবরে সংখ্যাগণনার অতীত কৃত্রিম ব্রহ্মান্ডের অবস্থান। আপনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপ। প্রতি বিশ্বে আপনার অংশসম্ভূত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করদি বেদগণ, পবিত্র তীর্থসমূহ সব মিলে ভারতের স্থিতি।

এক ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠিত শীর্ণ নাগরূপী আমাকে আপনি শ্রেষ্ঠ হস্তির উপর অতি ক্ষুদ্র একটি মশকের মতো অধিষ্ঠিত করেছেন। এ পৃথিবীতে পরমাণুর চেয়ে সূক্ষ্ম এবং মহাবিষ্ণুর চেয়ে বিরাট আর কিছু নেই বলে আমরা মনে করি। আপনি মহাবিষ্ণু অপেক্ষাও বিরাট এবং সূক্ষ্ম পরমাণুর চেয়েও, মহাবিষ্ণুর জলাধার, স্থাবর গোলকরূপেও জলের আধার। মহাবায়ু আপনার শ্বাস প্রশ্বাসজাত, আপনি সর্বাধার।

আমাকে কৃপাতিশয্যে আপনি অনেক সুখ দিয়েছেন। কিন্তু ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলেও আমি তা পারছি না, কেননা আপনি আমায় প্রজ্ঞা দেননি। অনন্তদেব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুও আপনার স্তুতি করতে অসমর্থ। আপনার স্তুতিতে আত্মনিয়োগ করলে সরস্বতীর জিহ্বাও জড়তা প্রাপ্ত হয় — সংযতেন্দ্রিয়, নির্মল হৃদয় যে ব্যক্তি এই পুণ্যাদায়ক স্তব পাঠ করেন তিনি কৃষ্ণের কৃপায় চতুবর্গ ফল লাভ করেন। এবং প্রয়াণোত্তর কালে রত্ননির্মিত রথ নেমে এসে তাঁকে গোলোকধামে নিয়ে যায়।

১০১.

মুনিরা নিবিড় ধ্যানযোগেও শ্রীকৃষ্ণের দেখা পেলেন না, নন্দের প্রাঙ্গনে পীতাম্বর কৃষ্ণের নয়নাভিরাম রূপ প্রত্যক্ষ করলেন। তার ললাটে মৃগনাভি সুরভিত গোলাকার চন্দনবিন্দু মেঘমালার মধ্যে অবস্থিত কলঙ্কচিহ্ন যুক্ত চন্দ্রের মতো শোভা পাচ্ছিল। শ্যামল শোভন কৃষ্ণের মুখে মৃদু হাসি। তার দেহধারণ ভক্তের কৃপার জন্যই। রত্ননির্মিত বাহুর অলংকার, বলয় এবং নুপূর প্রভৃতিতে অলংকৃত হয়ে বলদেবের সঙ্গে পিতার কোলে বসেছিলেন।

তিনি শ্রদ্ধায় সমাদরে বিপদের শত সুবর্ণ দান করলেন, দেবতা, মুনি এবং পুরোহিতদের প্রণাম করলেন, গণেশ-সূর্য-অগ্নি-বিষ্ণু-শিব ও পার্বতীকে ষোড়শপচারে পূজো করেন। বৈদিক মন্ত্রে পুত্রদ্বয়ের শুভকার্যের পূর্বে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কার সাধন করলেন। দেবতা, দিকপাল, নবগ্রহ এবং ষোড়শ মাতাদের পঞ্চোপচারে আরাধনা করে মাঙ্গলিক এবং বেদ নির্দেশিত শুভকর্মের পূর্বকৃত্য সম্পন্ন করলেন।

কালই মানুষের সুখ-দুঃখ, বিচ্ছেদ-মিলনের কারণ। পিতা নন্দকে আমি সুদুর্লভ তত্ত্বের কথা বলেছি। অতঃপর কৃষ্ণ বসুদেবের কাছে সন্দিপনি মুনির গৃহে যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। দেবকী নন্দকে মনি, মুক্তা, সোনা, হীরে সুন্দর পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করলেন। বিপ্রগণ, দেবকী প্রভৃতি রমণীরা, অক্রুর-উদ্ধব প্রভৃতি মিত্রেরা, নন্দ ও যশোদা সমভিব্যাহারে যাত্রা করেন।

১০২.

কৃষ্ণ বলদেব সহ সন্দীপন মুনির আলয়ে উপস্থিত হয়ে গুরুপত্নীকে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করলেন। গুরু ও গুরুপত্নীর আশীর্বাদ লাভে তাঁরা ধন্য হলেন। সন্দীপন কৃষ্ণের অর্চনা করলেন এবং তার অভিলষিত বিদ্যা প্রদানে আনন্দিত চিত্তে সম্মত হলেন। তিনি তাদের মধুপর্ক, চন্দন, সুরভিত বস্ত্র প্রদান করলেন। মিষ্টান্ন ভোজন করালেন ও তাম্বুল দিলেন।

মুনিপত্নী বললেন, মায়াবলে আপনি বালকের রূপ পরিগ্রহ করেছেন। পৃথিবীর ভার মোচনের উদ্দেশ্যেই আপনি আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি মায়াবশেই বালকরূপ ধারণ করে উপনয়নান্তে পতিদেবতার কাছে বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত আগমন করেছেন। আপনার কৃপায় নির্মোহ দূর হল। তিনি সজল নয়নে কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন এবং দেবকীর মতো পুত্র জ্ঞানে তাকে স্তন্য পান করালেন।

১০৩.

বলদেবের সঙ্গে কৃষ্ণ মথুরায় ফিরে এলেন।–বাবাকে প্রণাম করে বটগাছের তলায় গিয়ে গরুড়, লবণ-সাগর, কৌমোদকী, পাঞ্চজন্য, বৈকুণ্ঠধামের কথা মনে করলেন। গোপালকের বেশ বর্জন করে রাজার মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। কৃষ্ণের হস্তগত হলো সুদর্শন চক্র। কৃষ্ণ বললেন, হে সমুদ্র! শতযোজন পরিমিত স্থান দান কর। সুদর্শন চক্র কৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী হয়ে রয়ে গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মহামহিম, মহাশক্তিশালী কংসের জনক উগ্রসেনকে সেই পুরের রাজ সিংহাসনে বসালেন। যদুগণ ও তঁদের সেবকদের নিমিত্ত মরুগুলিও যেন উৎকৃষ্ট হয়। রাজা উগ্রসেনের রাজভবন। পুনরায় নির্মাণ করতে হবে আর পিতা বসুদেবের ভবনটি যেন সব দিক থেকে সুখপ্রদ হয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। শিবির নির্মাণের জন্য কোন কোন কাঠ ব্যবহার করব আমাকে অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রীকৃষ্ণ তখন বিশ্বকর্মাকে বললেন, হে দেবশিল্পী! গৃহাশ্রমের ঈশাণ কোণে নারকেল গাছ ধন বিতরণ করে, শিবিরের পূর্বদিকে রোপন করলে পুত্রপদ হয়ে থাকে। যে সব গাছ দেখতে সুন্দর সেগুলি যে কোনো স্থানেই পোঁতা যেতে পারে। দক্ষিণ এবং পশ্চিমে সুপারি গাছ আনন্দ দেয় আর ঈশাণ কোণে বা অন্যান্য দিকে প্রোথিত হলে হয়ে থাকে সুখদায়ী।

নগরের কিংবা গ্রামে কার্পাস, মুসুর এবং সরিষা গাছ বর্জনীয় নয়, আবার প্রশস্তও বলা যায় না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সূত্রধর, তৈলকার, স্বর্ণকার, হীরার ব্যবসায়ীদের বসতির কাছে গৃহ নির্মাণ করবেন না।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, সৎশূদ্র, বৈদর্তও, স্তুতিপাঠক, বৈদ্য ও মালাকাররা সেখানে অবস্থান করে–সেখানে বাস করাই শ্রেয়। শিবিরের চারিদিকে একশ হাত গভীর এবং প্রস্থেও একশ হাত পাঁচিল গাঁথা দরকার। পাঁচিল এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে বন্ধুরা সহজেই অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে, শত্রুরা অনেক চেষ্টা করেও ভেতরে আসতে পারে না।

পণ্ডিতরা বজ্রাহত বৃক্ষ লাগাতেও নিষেধ করেছেন। দ্বারাবতী রত্নাদি নির্মিত হবে তাই এ পুরী সম্পর্কে কাঠের প্রশ্ন অবান্তর। শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে গরুড়কে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বকর্মা সাগরের নিকটে রমণীয় বটমূলে গিয়ে রাতের বেলাটা সেখানেই ঘুমিয়ে কাটালেন। গরুড় নিশীথ রাতের স্বপ্নে দ্বারাবতী নগরীর সুন্দর স্বপ্ন দেখলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীর যেমন ছবি বিশ্বকর্মার মনে এঁকে দিচ্ছিলেন ঠিক সেইরকম গরুড় নগর প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হলেন। পুর নির্মাতা প্রথিতযশা শিল্পীরা বিশ্বকর্মাকে এবং সে অঞ্চলের পাখিরা গরুড়কে উপহাস করছে এদৃশ্যও তিনি ঘুমঘোরে দেখেছিলেন। ঘুম ভাঙতেই পক্ষীরাজ শতযোজন ব্যাপী মনোহর দ্বারকাপুরী নির্মাণ করে বিশ্বকর্মাকে স্তম্ভিত করলেন। ব্রহ্মলোকের সৌন্দর্যও দ্বারকার সৌন্দর্যের কাছে ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

১০৪.

সকলে নব নির্মিত দ্বারকাপুরী প্রত্যক্ষ করার জন্য বটমূলে সমবেত হলেন। যাঁরা আকাশে বাস করেন তারা বিমান থেকে দ্বারকাপুরীর সৌন্দর্য অবলোকন করে মুগ্ধ হলেন। বর্তুলাকারে শত যোজন ব্যাপী দ্বারকা মুক্তা-মাণিক্য হীরা দ্যুতিতে ভাস্বর হয়ে বিরাজ করছে। নগরকে ঘিরে রেখেছে সাত পরিখা। রাজপথগুলি অত্যন্ত প্রশস্ত, মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তি ভাস্বর রত্নের ঔজ্জ্বল্যে দ্বারকায় ঐশ্বর্যে রমণীয়তায় দেবতারা বিস্ময়ে অভিভূত হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকে অতঃপর দ্বারকাপুরীতে বাস করার নির্দেশ দিতেই ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি বললেন, মথুরা তার পৈতৃকভূমি। পিতার খোঁড়া গর্তের জলে স্নান করলেও গঙ্গাস্নানের ফল পাওয়া যায়। দেবতারা যেমন ইন্দ্রকে কর দেন, জম্বুদ্বীপের নৃপতিরাও তেমন আপনাকে রাজকর দেবেন।

উগ্রসেনের তুল্য রাজা পূর্বেও আবির্ভূত হননি, ভবিষ্যতে হবেনও না। উগ্রসেন পাঁচ লক্ষ সারথি শতকোটি সেবক পরিবেষ্টিত, রত্নবীথিতে ভাস্বর সুধর্মা সভায় প্রবেশ করতেই শাঁখ বেজে উঠল, বাদকেরা দুন্দুভি বাজাতে লাগল। কৃষ্ণ অপরাপর দেবতা, তপোবন গর্গ এবং মুনিদের আদেশে অমিত শক্তির অধিকারী উগ্রসেন রাজসিংহাসন অলংকৃত করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাজাকে বরুণ প্রদত্ত অগ্নিশুদ্ধ মনোহর দুইটি বস্ত্র দিলেন। বলদেব দিলেন পারিজাতের মালা, রত্নলংকার এবং রত্নছত্র। নন্দ সুরভিত কামধেনু দান করলেন। সাতজন কিঙ্কর সেবিত অক্রুর শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ও প্রভুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ উগ্রসেনের মাথায় রাজছত্র মেলে ধরলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট নৃপতি রত্নদর্পণ এবং সুখ ও সমৃদ্ধিশালী আদর্শ রাজ্য দর্শন করে ধন্য হলেন। দেবতারা ও ব্রাহ্মণরা তাকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। উগ্রসেনও শ্রদ্ধা সহকারে শত শত রত্নদান করলেন। শ্রীহরির সভাসদেরা বিদায় নিলেন।

১০৫.

ভীষ্মক বিদর্ভ দেশের নৃপতি ছিলেন। রাজার রমণীকুল শ্রেষ্ঠা মহালক্ষ্মী স্বরূপিণী অতিশয় সুন্দরী রুক্মিণী নামে এক কন্যা ছিলেন। তপ্তকাঞ্চন বর্না উদ্ভিন্ন যৌবনা রুক্মিণী অলংকৃত হওয়ায় মনে হচ্ছিল তার সারা শরীর দিয়ে যেন সৌন্দর্য ঠিকরে বেরচ্ছিল। রাজার মনে হল কাল বিলম্ব না করে রুক্মিণীর বিবাহ দেওয়া উচিত। তিনি রাজসভাশ্রিত পুরোহিত ও বিগণকে জিজ্ঞেস করলেন, কার সাথে তার পুত্রীর বিয়ে দেওয়া উচিত।

তাঁর কন্যা নব যৌবনের সৌন্দর্যে বিকশিত হচ্ছে। তাই বরণীয় পাত্রের জন্য আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছি। তাঁর কথা শুনে গৌতম মুনির সুযোগ্য পুত্র কুলপুরোহিত শতানন্দ বললেন– ব্রহ্মা, মহেশ্বর যাঁর স্তুতিতে সদা মুখর, প্রকৃতি নির্লিপ্ত পরমাত্মা, সকল কর্মের নীরব প্রত্যক্ষকারী। পৃথিবীর ভারমোচনের জন্য বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁকে কন্যা সম্প্রদান করে গোলোক যাত্রার পথ সুগম ও পুনর্জন্ম রোধ কর।

শ্রীকৃষ্ণকে আনার জন্য দ্বারকায় দূত প্রেরণ কর। ভক্তেরা অনন্যমনা হয়ে ধ্যানযোগে তার দর্শন পায় এবং পুনর্জন্ম রহিত হয়, কর্মফল মুক্ত হয়। চতুর্বেদ, দেবতারা, মুনীন্দ্র এবং সিদ্ধাচার্যেরাও তার স্বরূপ অবগত নন, দেবতারাও যাঁর স্তব করতে অসমর্থ, যোগীরাও যাঁকে ধ্যান যোগে জানতে পারেন না, আমি তো কোনো শিশু, আমি কিভাবে তাকে বর্ণনা করব?

উগ্রসেন আনন্দাতিশয্যে শতনন্দকে বুকে চেপে ধরলেন এবং বিবিধ রত্ন, সোনা, মূল্যবান পরিচ্ছদ, গজ, অশ্ব, মণিনির্মিত রথ, অপরিমেয় ঐশ্বর্য, নিরন্তর ব্যতীতই যে ভূমি শস্য উৎপাদন করে সেরূপ ভূমি, পবিত্র জমি, সুখ্যাতি আছে এমন গ্রাম দান করলেন। রুক্মিণী সব শুনে এবং প্রত্যক্ষ করে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন। তাঁর মুখ লাল হয়ে সারা শরীর ঘেমে উঠল।

কৃষ্ণ অত্যন্ত হীন, কেননা অন্যকে দিয়ে কালযবনকে হত্যা করে তার ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করেছেন। যবনের বিত্তে দ্বারকায় অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছে কৃষ্ণ। রুদ্রতুল্য বলশালী শিশুপালকে রুক্মিণী সম্প্রদান করুন। যোগ্য পাত্রেই কন্যা সম্প্রদান করা বিধেয়। দেশ বিদেশের রাজাদের, মুনি-ঋষিদের নিমন্ত্রণ লিপি প্রেরণ কর। পূর্ণিমায় গ্রাম্য দেবীর কাছে দশ লক্ষ ছাগল ও চল্লিশ লক্ষ ভেঁড়া বলি দেবার ব্যবস্থা করা হোক। এই মাংস এবং ব্যঞ্জনাদি দ্বারা অতিথি আপ্যায়ন করা হোক।

রাজা ভীস্মক পুত্রের কথা শুনে রাজপুরোহিতদের সঙ্গে নির্জন স্থানে মন্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করে বিশ্বস্ত এক ব্রাহ্মণকে দ্বারকায় পাঠালেন। শুভলগ্ন স্থির করে রাজা সত্ত্বর পরিণয়ের উপাদান সামগ্রী সংগ্রহ করলেন। নিমন্ত্রণ লিপি পাঠালেন পুত্রের অনুরোধে দেশ বিদেশের রাজাদের।

এদিকে ভীস্মকের প্রেরিত সেই ব্রাহ্মণ, সুধর্মা সভায় গিয়ে উগ্রসেনকে কল্যাণ পত্রিকাটি দিলেন। সেই পত্রের বিষয়বস্তু শুনে উগ্রসেন অতিশয় আনন্দিত হলেন ও বিপ্রদের শত শত সুবর্ণ দান করলেন। প্রীতিভোজের অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। দেবতারা, নৃপতিরা, রাজার আত্মীয় স্বজনেরা, বন্ধুরা, বৈতালিকেরা উগ্রসেন ত্রিলোকদুর্লভ বেশে শ্রীকৃষ্ণকে সজ্জিত করালেন এবং শুভলগ্ন সমাগত হলে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক তাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে পাঠালেন।

বলদেব, বসুদেব, উদ্ধব, নন্দ, অক্রুর, সাত্যকি, গোপালকেরা এবং যাদবেন্দ্রগণও রত্নেন গমন করলেন। রথে উঠলেন কুরু-পাণ্ডবেরা। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, শকুনি সকলেই খুব খুশী হয়েছেন। বরযাত্রায় অংশ নিলেন তিন কোটি চারণ, শত কোটি বিপ্র, হাজার সন্ন্যাসী ও রিপুজয়ী দু হাজার অবধূত! হাজার হাজার মালাকর পদ্ম ও আরও অনেক ফুল নিয়ে, বৈতালিকেরা স্তুতি করতে করতে, বাদকেরা বাজনা বাজাতে, নর্তকেরা নাচতে নাচতে, গায়কেরা গাইতে গাইতে কৃষ্ণের অনুগমন করল।

নারদ! তুমি সেকল্পে একজন গন্ধর্ব ছিলে আর তোমার নাম ছিল উপবর্হন, পঞ্চাশজন গোপিনীর সঙ্গে তুণি কৃষ্ণের সঙ্গী ছিলে। একলক্ষ বিদ্যাধরী অপ্সরা, তিনলক্ষ কিন্নরী এবং এক লক্ষ গন্ধর্ব অর্জিত বিদ্যার নৈপুণ্য দেখাতে দেখাতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যাত্রা করল।

১০৬.

বলবান কুকুদ্বানরাজ, স্বীয় তনয়ার জন্য যোগ্য পাত্রের সন্ধানে ব্রহ্মালোক থেকে সেখানে এলেন। চিরযৌবনা মূল্যবান পরিচ্ছদ-শোভিতা রেবতী নামে তাঁর কন্যার সঙ্গে বলদেবের বিবাহ সম্পন্ন হলো। রেবতীর বয়স সাতাশ সত্যযুগ অতিক্রান্ত হলেও তার রূপ যৌবনের ক্ষয় নেই। অতঃপর রাজা তাঁদের সঙ্গে রত্নরথে কুন্ডিনপুরে গমন করলেন।

বসুদেবের স্ত্রী ব্রাহ্মণদের সুস্বাদু আহার্য পরিবেশন করলেন। সানন্দে তাঁদের ধনরত্ন দান করলেন। দেবতা, মুনি ও নৃপতিগণ কুন্ডিননগরে গেলেন। সাত পরিখা প্রাচীর বেষ্টিত শতদ্বারে অলংকৃত বিশ্বকর্মা নির্মিত রত্নশোভিত সেই নগরী দেখে মুগ্ধ হলেন। বরযাত্রীরা বহ্নিগরী প্রত্যক্ষ করলেন।

রুক্মিণী মহাবল, দন্তবক্র, শাম্ব শ্রীকৃষ্ণের সৈন্য দেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে রনোন্মত্ত হয়ে উঠল। রুক্মিণী দেবতা মুনি ও রাজাদের অপমান করার জন্য কটু বাক্য প্রয়োগ করে। নন্দের নন্দন, রুক্মিণীকে গ্রহণ করতে দেব ও মুনিবেষ্টিত হয়ে অগ্রসর হচ্ছে যে গোপীদের উপপতি, রাখালদের উচ্ছিষ্ট ভোজী, যার বালাই নেই জাতপাতের নির্বিচারে যে যৌন মিলনে রত হয় সেই অজ্ঞ পুরুষটি আবার মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! বৈশ্যের অন্নভোজী বসুদেব তনয় ক্ষত্রিয় হয়ে।

সেই স্ত্রীকে অপহরণ করল যাকে বধ করলে পঞ্চবিধ মহাপাপ স্পর্শ করে বাল্যকালে। যৌন সহবাসে কুব্জাম্রকে বধ করে পরিচ্ছদের জন্য রজকের শিরচ্ছেদনেও কুণ্ঠিত হলো না কী দুঃসাহস। ব্রহ্মহত্যার পাপ ভোগ করতে হয় যে রাজাকে হত্যা করে। সে মথুরায় নিধন করেছেন ধর্মী কংসকে। রুক্মিণীর কথা যে মিথ্যা নয় তা শাম্ব বললেন।

রুক্মিণীর সাথে পরিণয়ে আবদ্ধ হতে চায় নন্দের রাখাল। শিশুপাল বিস্মিত হচ্ছে এই ভেবে যে, ব্রহ্মাদি দেবতারা, ব্রহ্মপুত্র ঋষিরা মানুষের আহ্বানে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। দন্তবক্র বলল, ব্রাহ্মণেরা লোভের বসে সব কাজ করে থাকে, দেবতারা, ভক্তবৎসল হন আর তাই

তাদের আগমনকে মেনে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু নন্দের নন্দনের আদেশে তারা কেন এখানে এলেন?

১০৭.

বলদেব উত্তেজিত হয়ে হলদ্বারা রুক্মিণীর রথ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন ও তাকে বিনাশ করার জন্য বেগে গমন করলেন। রুক্মিণী তীর ছুঁড়ে বলদেবকে নিবৃত্ত করে তাকে বন্ধন করবার জন্য নাগাস্ত্র প্রয়োগ করলে বলদেব গরুড়াস্ত্রপ্রয়োগ করে নাগস্ত্র নিবারণে সক্ষম হলেন। রুক্মিণী মাটিতে পড়ে ঘুমাতে থাকে শুকনো একটা গাছের মতো। শাম্ব তাকে ঘুমাতে দেখে শত শত বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন বৃষ্টির মতো।

ভীষ্মক শ্রীহরির সুবেশ রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি পুরোহিতদের বেদ মন্ত্র আবৃত্তির আদেশ দিলেন। ভাট, বিপ্র এবং ভিক্ষুকদের তিনি উপাদেয় আহার্য, মণিমানিক্য উপহার দিলেন। দেবতা-মুনি- ব্রাহ্মণ সমভিব্যহার কৃষ্ণ ভীষ্মকরাজের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হলেন। তার আত্মীয় স্বজন তাকে অনুসরণ করলেন।

সেখানে মৃদু মন্দ বাতাস বইছে। প্রদীপের প্রজ্বলিত শিখায় চারদিক অলোকিত ও ধূপের গন্ধ বিতরণ করছে। স্থানটিকে রমণীয় করে তুলছেন শিল্পী ও মালাকার। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যিনি সকল ঐশ্বর্য দান করে থাকেন, আমার মতো সাধারণ মানুষ স্বপ্নেও যাঁর চরণ-কমল দর্শনের উপযুক্ত নয়, আজ আমার কী অসীম সৌভাগ্য সেই পরমাত্মাকে আমার প্রাঙ্গণে প্রত্যক্ষ করছি।

মহাবিষ্ণুর চেয়ে স্কুল ও পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম আর কিছুই নেই। কর্মশীলের কর্মপ্রবাহের ও কারণকূটের আদি কারণ আপনি। সাগর পরমাত্মা ছাড়া কারুর অঙ্গ থেকে কি জ্যোতি নির্গত হয়! ইন্দ্র পারিজাত মাল্য পাঠিয়েছিলেন– তা জামাতার কণ্ঠে দিলেন ভীষ্মক। ভীষ্মক বস্ত্র ও ধূপদীপ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন।

১০৮.

রুক্মিণী সভায় এলেন। তাঁর কবরী মনোহর। তার দেহ চন্দন চর্চিত। গৌরবর্ণ দেহ চন্দন রাগে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তার কণ্ঠে মালতীর মালা। রুক্মিণী পতিদেবতাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে তাকে সচন্দন পল্লবদ্বারা শীতল জল সেচন করে প্রণাম করলেন। ভীষ্মক রাজ বেদোক্ত

মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণী সম্প্রদান করলেন। শিব যেমন পার্বতীকে গ্রহণ করেছিলেন, তেমন কৃষ্ণ রুক্মিণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। শুভকর্ম সম্পন্ন হলে ভীষ্মক কন্যাকে বুকে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কৃষ্ণের প্রতি কন্যার ভার সমর্পণ করে তিনি ধন্য হলেন।

১০৯.

শচী বললেন, যৌবনবতী রুক্মিণী তোমাকে কামনা করছেন। সাবিত্রী বললেন, বিধাতা গুণশালী বরের সাথেই গুণবতী কন্যার মিলন সাধন করেছেন। রুক্মিণী দূর থেকে যদি তাকে প্রণাম করেন তবে তিনি রুক্মিণীর সঙ্গে কথঞ্চিত তুলনীয় হবেন। রুক্মিণী সকলকে ভোজন করালেন। গান-বাজনায় চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল। সকাল হলে কর্মব্যস্ত ব্রহ্মা, মহেশ, অনন্ত দেবতারা নিজ নিজ যানে আরোহণ করলেন, উগ্রসেন ও বসুদেব রুক্মিণীর পতিগৃহে যাত্রার আয়োজনে প্রয়াসী হলেন।

রুক্মিণী জননী মেয়েকে বুকে চেপে ধরে আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় রোদন করতে লাগলেন। ভীষ্মকও উচ্চ স্বরে রোদন করতে লাগলেন। দেবকী, রোহিনী, যশোদা, অদিতি, দিতি এবং উদ্ভব বাসিনীরা মঙ্গলকর্ম সম্পাদনে তৎপর হলেন। খাওয়া– দাওয়া সেরে বৈতালিক বিপ্রগণ ধনরত্নের উপহার গ্রহণ করে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

১১০.

নন্দ যশোদাকে নিয়ে কদলীবনে গমন করলেন ও সেখানে সুপ্তিমগ্না, উপবাস কৃশ শুক্ল বস্ত্রপরিহিতা রাধাকে দেখতে পেলেন। তার সখীরা চামর দুলিয়ে তাকে বাতাস করছেন। বেত্রধারিণী শত কোটি গোপবালা তাঁর তত্ত্বাবধানে সতত নিযুক্ত।

রাধার এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে নন্দ ও তাঁর স্ত্রী বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। তারা ভক্তিসহ তাঁকে প্রণাম করলেন। গোপিরা যশোদাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কে? যশোদার কাছে শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলবার্তা শুনে রাধা লুপ্ত চেতনা ফিরে পেয়ে আনন্দিত হলেন। অতঃপর তিনি শ্রুতিসুখকর বাক্যে ভক্তিযোগের উপদেশ দিলেন।

১১১.

কুযোগের অধিকারী কোনো ব্যক্তি সাময়িকভাবে গোলোকধামে উপনীত হলেও তার অধঃপতন অনিবার্য। শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে না দেখে তাকে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করুন। কর্মের জাল

ছিন্ন হলে শত শত জন্মের পিতৃ ও পিতামহ সেই অক্ষয় ধান লাভ করবেন। কুযোগী পাপীদের 'নারা' শব্দটি বোধ জন্মাতে সহায়তা করে। বেদ ব্যতীত, অর্থেও 'মধুসূদন' শব্দটি সাধুরা প্রয়োগ করে থাকেন। 'মধু' শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। ফুলের মধু ও শুভাশুভ কর্ম বোঝাতেও শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

দেবতাদের নাম তিন হাজার বার উচ্চারণ করলে যে ফল হয় একবার কৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হলে সেই ফল প্রাপ্তি হয়ে থাকে। যারা বেদ পাঠ করেন মনোযোগ দিয়ে তার কাছে কৃষ্ণনামের চেয়ে উত্তম আর কিছুই হতে পারে না। মহাবিষ্ণু হলেন তিনি যাঁর প্রতিটি রোপকূপে বিরাট এ বিশ্ব শোভমান। বৃষভানু কৃষ্ণের সভাসদদের মধ্যে প্রধান। কলাবতী জনয়িতাগণের মানসী তনয়া। আমার জননী ও আমি অযোনিসম্ভবা, অন্তে লীন হবো হরিচরণে।

১১২

রুক্মিণী কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন, শুভ মুহূর্তে কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গমরত হলেন। রুক্মিণী দেহমিলনের আনন্দে সংজ্ঞা হারালেন। সহবাসের চরম পুলকের ক্ষণে মহাদেব কর্তৃক ভস্মীভূত মদন যেন পুনরাবির্ভূত হলেন, অসুরকে বধ করেই প্রেমময়ী রতির কামদেবের সঙ্গে পুনর্মিলন হয়েছিল। কৃষ্ণ উৎসবের আনন্দে মেতে উঠলেন। অতঃপর তিনি বেদ নির্দেশিত শুভদিনে কালিন্দী, সত্যভামা, সত্যা, নাগ্নজিতী, সতী, জাম্ববতী ও লক্ষণার সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে সহবাস করলেন, উক্ত রমণীদের প্রত্যেকের গর্ভে দশটি করে পুত্র জন্মাল।

১১৩

দুর্বাসা মহেশ্বরের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে দ্বারকাপুরী ছেড়ে কৈলাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেখানে তিনি ও তাঁর শিষ্যরা শ্রদ্ধা সহকারে শিব-দুর্গাকে প্রণাম করে হরি বৃত্তান্ত' নিবেদন করলেন। যে স্বামী তাঁর সদ্বংশজাত পত্নীকে ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে, বা যে ব্যক্তির ব্যবসার নিমিত্ত বা অন্য কোনো কারণে চিরদিনের জন্য বিদেশবাসী হয় সে মোক্ষলাভ করতে পারে না।

জ্ঞানেই হোক বা অজ্ঞানেই হোক, বাল্যে-কৌমার্যে-বার্ধক্যে, কৃত হরিনামে পাপ ধুয়ে মুছে যায়। তাঁর পদরেণুর স্পর্শেই কোনো স্থান তীর্থে পরিণত হয়। যে দ্বিজ কৃষ্ণের প্রসাদ পায় যে জল, অগ্নি ও বায়ুর চেয়ে পবিত্র তার সংস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হয়ে ওঠে। যে গুরু শিষ্যের

অন্তরিন্দ্রিয়ে কৃষ্ণভক্তি জাগাতে পারেন না তিনি তাঁর আশ্রিত শিষ্যের শত্রুস্বরূপ। চতুর্দশ মনু, সপ্তর্ষি চারিবেদ, সৃষ্টি দিকপাল, গ্রহেরা আপনার অংশ, কেউবা আপনার অংশে অংশ।

আপনি মন্ত্রী আর জগত প্রপঞ্চ আপনার মন্ত্র। হে মাধব! আমি নির্বোধ, পাপী, আমায় আপনার ক্ষমা দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করবেন না, শিশুপালের স্তুতিতে সমবেত সকলে জানতে পারলেন পূর্ণ ও চিরন্তন ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণই। রাজসূয় যজ্ঞ শেষে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ করালেন।

পৃথিবীর ভার কামানোর পর তিনি অনেকদিন হস্তিনাপুরে অবস্থান করলেন। তারপর শুভদিনে ধর্মপুত্রের মত নিয়ে দ্বারকায় গেলেন। জনৈক ব্রাহ্মণ পত্নীর প্রয়াত পুত্রদের পুনরুজ্জীবিত করলেন। এই আশ্চর্য ঘটনা দেখে দেবকী তার মৃত পুত্রদের জীবিত করতে বললেন। ভগবান তার ভক্ত সুদাম বিপ্রের চাউল কণামাত্র গ্রহণ করে অধঃস্তন সাত পুরুষ ভোগ করার মত ঐশ্বর্য দান করলেন। সেই দ্বিজ কুবের তুল্য ধনী হলেন এবং ইন্দ্রপুরীর মতো তাঁর রাজ্যও সমৃদ্ধ হলো। তাকে অচঞ্চল হরিভক্তি প্রদান করলেন কৃপানিধি কৃষ্ণ। ইন্দ্রের সৌরভজাত গর্ব খর্ব করলেন স্বর্গের পারিজাত অপহরণ করে। ভগবান সত্যাকে তার স্পৃহনীয় পুণ্যক ব্রত পালনে সহায়তা করলেন। পুণ্যকব্রতে সনৎকুমার তার প্রাপ্যরূপে আত্মদান করলেন।

উক্ত ব্রতে তিনি সানন্দে ব্রাহ্মণদের ভোজনে আপ্যায়িত এবং মহার্ঘ রত্নদান করলেন। কৃষ্ণ রুক্মিণী সহ অন্যান্য স্ত্রীদের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করলেন। চারদিকে বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদের প্রাত্যহিক পূজা জাঁকজমক সহকারে পালন হতে থাকল, উদ্ধবকে তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং পার্থকে কোটি হোম এবং শুভ ফলপ্রসূ কার্যে প্রাণিত করলেন।

তিনি পার্বতীর মনোরঞ্জনের বিবিধ নৈবেদ্যের আয়োজন করলেন। এবং নয়নলোভন রৈবত পর্বতে মহামূল্যবান রত্নদীপিত দেবালয়ে সিদ্ধিদাতা গণেশকে পূজো করে তাঁকে পাঁচ লক্ষ তিলের নাড়ু, নানা মিষ্টি ও অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্রের নৈবেদ্য দিলেন। হোম যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মন ভোজন করিয়ে গণেশকে পুজো করে তার স্তুতি করা হলো। সূর্যদেব তুষ্ট হয়ে শাম্বকে বর দিলেন।

১১৪

যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত অনিরুদ্ধ একদিন নিভৃত স্থানে সচন্দন পুষ্পলংকৃত পালঙ্কে শুয়ে ফুল শয্যায় শায়িতা সুস্মিতা নব যৌবনা এক সুন্দরীর স্বপ্ন দেখলেন। রত্নলংকারে রমণীর তার

লোভনীয় দেহ। যে চঞ্চল যৌন কামনায়। নিজের যৌবনবতী শরীরের দিকে তাকিয়ে সে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণে সচেষ্ট। তার চরণ রঞ্জিত কুঙ্কুম আর আলতায়।

কামাতুর অনিরুদ্ধ চম্পকবর্ণা নব বিবাহিতা কামনা লোলুপ সেই রমণীকে বললেন, কে তুমি? সে বলল, সে যৌন কামনায় চঞ্চল। কামাতুরাকে তৃপ্তি দিতে আমার জুড়ি নেই। কামকী, রমণাভিলাষী নীরোগ যুবককেই কামনা করে। অগ্নিসাক্ষী করে যে বিবাহ সংঘটিত হয় তা নিয়তই বরণীয়া। গুপ্ত প্রণয়িনীর সঙ্গে মিলন নিঃসন্দেহেই সুতীক্ষ্ণ আনন্দ বিতরণ করে, সে প্রণয়ান্তে নরকামনের পথ প্রশস্ত করে।

সে নিন্দনীয় যে একবার পাপ করার পর প্রায়শ্চিত্ত করে। সাধ্বী নারী কোনো অবস্থাতেই স্বাধীন নয়। উপযুক্ত পাত্রেই পিতা কন্যা দান করে থাকেন। লক্ষ্মীশাপে অভিশপ্ত হয় সেই পুরুষ যে কামাতুরা রমণীকে ত্যাগ করে। সকল দুঃখ দূর হয় দুর্গার ধ্যান করলে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে অনুক্ষণ সেই স্বপ্ন সুন্দরের চিন্তায় মগ্ন হলো।

অহংকারের বশবর্তী হয়ে যে অপরকে যাতনা দেয় সে যে চতুর্গুণ কষ্ট পেয়ে থাকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোনো কামিনী যৌবনোচ্ছল কোনো পুরুষকে দেখলে যৌন কামনায় অস্থির হয় ঠিকই, কিন্তু ধর্ম সংস্কার হেতু ইচ্ছা থাকলেও ভীত হয়ে কষ্ট পায়, কুলটা রমণী কোনো সুরূপ যুবককে দেখলে আহার, নিদ্রা, স্বামী, পুত্র, ঐশ্বর্য এমনকি গৃহত্যাগিনী হয়ে থাকে।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাই যুবতী স্ত্রীকে সযত্নে লালন পালন করে। এক প্রকার অসম্ভব নারীদের চরিত্র জানা। চিত্রলেখা কাল বিলম্ব না করে দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করুক। সেখান থেকে অনিরুদ্ধকে কৌশলে এখানে নিয়ে আসুক।

চিত্রলেখা সবার অলক্ষে দ্বারকাপুরীতে গিয়ে সুপ্তিমগ্ন অনিরুদ্ধকে রথে করে শোণিতপুরে উপনীত হলেন। অনিরুদ্ধকে না পেয়ে দ্বারকার নারীদের আর্তনাদের আকাশ মুখরিত করে তুলল। চিত্রলেখা আগে সেখানে পৌঁছে অনাহার শীর্ণা নিদ্রিতা ঊষাকে দেখল। ঊষাকে স্নান করিয়ে চন্দন, পুষ্পমালা, সিঁদুর এবং রত্নময় অলংকারে সজ্জিত করে মিলন ঘটাল অনিরুদ্ধের সঙ্গে।

১১৫

ঊষা স্বেচ্ছায় বিবাহ করেছেন শুনে বাণ দুঃখ পেলেন। গর্হিত সান্নিধ্য শোকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিণয়ে দূতী হলো চিত্রলেখা, রূপবান ঊষার স্বামী অতনুর চেয়েও। কামনা মদির উচ্ছল যুবক। দিবারাত্রি সম্ভোগরত ঊষা গর্ভবতী হলো হওয়ায়, মা তার ছেলেকে যেমন অহিত কার্য সাধনে বাধাদান করেন, তেমন কার্তিক, গণেশ, দুর্গা, ভৈরবী, ভদ্রকালী, যোগিনীর অষ্ট ভৈরব, একাদশ রুদ্র, ভূত-প্রেত, বেতাল, গ্রামদেবী বাণকে যুদ্ধ করতে বারণ করলেও তাকে নিবৃত্ত করা গেল না।

শম্ভু তাকে শুভফলপ্রদ উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন–তোমার পিতা যিনি দৈত্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনি বামনদেব কর্তৃক এক নিমেষেই সুতলে গৃহীত হয়েছিলেন। সেই বামন শ্রীহরির অংশ। সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। তাকে কে রক্ষা করে যাকে নারায়ণ বিনাশ করে। উত্তেজিত রোষিত রক্তচক্ষু বাণ শরাসন হাতে যমরাজের মতো বললেন, মা দুর্গা! পিতা দেবাদিদেবের! আমার বক্তব্য শুনুন। প্রারব্ধকে রোধ করার ক্ষমতা কারুর নেই। নারায়ন বললেন, মাতৃস্বরূপা কোট্টরীর কথায় ক্রুদ্ধ বাণ রথে চড়ে অনিরুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

একাদশ রুদ্র বাণের শুভ কামনায় তাকে আশীর্বাদ করলেন। ঊষা ভীত হয়ে দুর্গতিনাশিনীকে স্মরণ করলেন। শিশুপাল ও দন্তবক্র গোলোক কৃষ্ণের দৌবারিক জয় ও বিজয়। সনকুমারের অভিশাপে তারা তিন জন্মে মর্তে জন্ম নিচ্ছে। ভাল্লুকতনয়া জাম্ববতী শ্রীদুর্গারই অংশ। পরিস্যার বলে জাম্ববতাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছেন।

পতির আদেশে কুন্তীর ক্ষেত্রজ পুত্র হয়। অর্জুনকে শিব শানদে পাশুপত অস্ত্র উপহার দেন। ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের কারণ হলো অশ্বমেধ, দক্ষিণে মাতুল কন্যার সঙ্গে বিবাহ নিন্দনীয় নয়–কিন্তু অন্যত্র এরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ। স্বয়ং ব্রহ্মা একথা বলেছেন। শিবের বরেই পঞ্চপান্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর পরিণয় হয়।

১১৬

শ্রীরাম বললেন– হেমন্তে জল অনাবিল ও স্বাদু হয়, অন্নব্যঞ্জনও লোভনীয় হয়। অগ্নি রামের কাছে এসে ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে তার বিবরণ দিলেন। অগ্নি বললেন, শুনে তুমি দুঃখ পাবে–অপ্রিয় হলেও তোমাকে বুলি, সাত দিনের মধ্যেই রাবণ সীতাকে হরণ করবে। সীতার কায়া নয়, ছায়া আমার কাছে থাকুক।

রামের অবস্থা অনুযায়ী সীতা সদৃশ তার ছায়া তাঁর কাছে রইলেন। রাবণ ছায়া সদৃশ সীতাকে হরণ করল। দ্রৌপদী হলেন সীতা ছায়া। সত্যযুগে তিনি বেদবতী, ত্রেতায় ছায়া সীতা, দ্বাপরে দ্রৌপদী আর তাই তার একটি নাম ত্রৈকালিকা বা ত্রিহায়নী। শিবের বরে আর মায়ের আদেশে দ্রৌপদীর পাঁচজন স্বামী।

বিরহ-তাপিতা ছায়া-সীতা শিবের কাছে পাঁচবার স্বামীকে কামনা করে। চতুর্দশ ইন্দ্রের মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব হলেন পাঁচজন ইন্দ্র। মা রতি শিবকে তিরষ্কার করেন আর তাই মহাদেব তাঁকে শাপ দেন–রতি, আমার শাপ ব্যর্থ হবার নয়।

রণক্ষেত্রে সুভদ্র হত হলে বীর্যবাণ অনিরুদ্ধের দিকে একশটি তীর ছুঁড়ল। অগ্নিবাণ ব্যবহার করে প্রদ্যুম্ন তনয় সেই শত শরকে পুড়িয়ে ফেললেন। তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র বাণের ব্রহ্মাণকে নিষ্ক্রিয় করল। কার্তিকের গদার আঘাত মুহূর্তেই তা বিনাশপ্রাপ্ত হলে অনিরুদ্ধ আপন অপরিমেয় শক্তি প্রয়োগ করে দেবসেনাপতির গদা ছিনিয়ে নিলেন। অনিরুদ্ধকে কার্তিক তাঁর বলিষ্ঠ হাতে টেনে এনে মাটিতে ফেললেন। অনিরুদ্ধ মাটি থেকে উঠে পুনরায় আক্রমণে উদ্যোগী হবার পূর্বেই গণেশের হস্তক্ষেপে উভয়ের যুদ্ধ বন্ধ হলো। কার্তিক নিজ গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন আর অনিরুদ্ধও উষ্ণ ভবনে গেলেন।

১১৭

গণেশ শিবের কাছে গিয়ে বাণ অনিরুদ্ধ সমরের আনুপূর্বিক বিবরণ করলেন, সব শুনে দেবাদিবের রাখালের বেশে মনোহর। বিরজার নদীতটে গোপ-গোপী এবং কামধেনু পরিবৃত হয়ে বাঁশি হাতে ঘুরে বেড়ান।

বৈকুণ্ঠে এবং বৃন্দাবনে সমভাবেই বিরাজিত শ্রীরামও ছিলেন পরিপূর্ণতম কিন্তু ব্রহ্মশাপে তিনি যে কে তা ভুলে গেছেন। সেই পূর্ণের পৌত্র হলেন অনিরুদ্ধ। তার তুলনা মেলাই ভার শৌর্যে-বীর্যে। অনিরুদ্ধ বাণের যুদ্ধে আমি তাই কার্তিককে পাঠিয়েছিলাম। কার্তিক না থাকলে বাণ বেচারা মৃত্যুবরণ করত।

আবার কার্তিক অনিরুদ্ধের যুদ্ধ থামিয়েছে। অনিরুদ্ধের পরাক্রম এমনই যে অষ্টভৈরব, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু, সপার্ষদ, বাণ, প্রাণীগণ কেউই তাঁকে পরাজিত করতে পারবে না। তিনি ব্রহ্মা। প্রদ্যুম্ন, মঙ্গলময় ও সিদ্ধিদাতা।

১১৮

কোট্টরী সিংহাসনে থেকে উত্থিত হয়ে দেবাদিদেবকে প্রণাম করলেন। ভক্তদের প্রতি করুণাবশতঃ পরমাত্মা কৃষ্ণ দেহ ধারন করেছেন। কৃষ্ণের চেয়ে প্রিয় আমাদের কেউ নেই। কার্তিক গনেশের চেয়েও আপনাকে আমি ভালোবাসি। কৃষ্ণ আমার প্রিয়তম, সেবকদের মধ্যে বান প্রিয়। বৈকুণ্ঠে আমিই মহালক্ষ্মীই গোলোকে শ্রীরাধা, শিবলোকে শিবানী ও ব্রহ্মালোকে সরস্বতী।

পূর্বে দক্ষ তনয়া সতীরূপে আমি আপনার পানিগ্রহণ করেছিলাম। রক্তবীজ যুদ্ধে কালী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করি। আমি সাবিত্রী বেদমাতা, জনকতনয়া সীতা এবং দ্বারকানগরীতে ভীষ্মক রাজের কন্যা রুক্মিনী। শ্রীদামের শাপে বৃন্দাবনে রাধা হয়ে আবির্ভূত হই।

১১৯

বিশ্বমাতা পরমা প্রকৃতি ঈশ্বরী দুর্গাকে শিব বললেন, তুমি যা বললে সত্যের শুদ্ধিতে তা ভাস্বর ও বেদানুগত। বাণ তার কন্যা ঊষাকে অলংকারে সজ্জিত করে অনিরুদ্ধকে দান করুক, পরিণামে মঙ্গল হবে তবে। বৈষ্ণব বায়ু, অগ্নি ও সমুদয় তীর্থ অপেক্ষা পবিত্র। তাকে দেখে শঙ্কিত হন দেবতারাও। মহাবল বলি শিবের চরণে প্রণত হলেন ও প্রিয়পুত্রকে আশীর্বাদ করে যেখানে নররূপী পরমাত্মা বিরাজ করেন সেখানে গেলেন।

সামবেদে বর্ণিত স্তবে ভগবান কৃষ্ণের আরাধনা করে বললেন, অদিতির প্রার্থনায় ও ব্রত পালনের পর বামনের রূপ ধরে আপনি আমায় প্রবঞ্চিত করেছেন। অনিরুদ্ধ বাণকে বধ করতে গিয়েছিলেন। কার্তিকের মধ্যস্থতায় তিনি তাকে বধ করতে পারেন নি।

শত সূর্যের প্রভায় উজ্জ্বল আপনার সুদর্শন চক্রকে প্রতিহত করেন এমন কোনো দেবতাই নেই। আপনি পরমেশ্বর, আপনার অস্ত্রও তেমন আমোঘ। শিব ও বিষ্ণু সত্ত্বগুণের, ব্রহ্মা রজোগুণের, আর কালাগ্নি রুদ্র তমোগুণের আধার, যে ভগবান যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে ব্রহ্মাণ্ডে জলাশায়ী তিনি ‘বাসু’ নামে অভিহিত, তাই আপনি বাসুদেব।

কলাকমলাংশে তিনি স্থাবর ও জন্ম সকল জীব। তিনি বিনাশহীন, নির্লিপ্ত ও চিরন্তন। আপনি শ্রেষ্ঠতম কেমনে আপনার স্তুতিতে মুখর হব। আমি প্রাজ্ঞ নই ভক্তের ভগবান পরমাত্মা কৃষ্ণ

তখন বলিকে বললেন– বৎস! তুমি নিজ নিকেতনে প্রত্যাবর্তন কর। ব্রহ্মা সনৎকুমারকে সামবেদ নির্দেশিত স্তব করতে বলেছিলেন।

আবার করুণাময় শঙ্কর সূর্যগ্রহণের ক্ষণে পবিত্র তীর্থে সিদ্ধাশ্রমে প্রিয় শিষ্য গৌতমকে স্তব প্রদান করেছিলেন। বিরজা সৈকতে তিনি শিব ও ব্রহ্মাকে উক্ত স্তবের কথা বলেছিলেন। এই স্তব পাঠ করলে সকল সম্পদ লাভ করা যায়, গর্ভযন্ত্রণা দূর হয়, রোগ থাকে না। থাকে না কোনো বন্ধন। উপরন্তু যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করেন তার সমুদয় তীর্থ স্থানের ব্রতের ফললাভ হয়ে থাকে।

১২০

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব ও বলদেবের সাথে পরামর্শ শেষে ভদ্রকালী উগ্রচণ্ডা এবং কোট্টরীর কাছে দূত পাঠালেন। বাণ-ঊষা- অনিরুদ্ধ সহ তাঁর আশ্রয় কামনা করুন। দূতের কথা শুনে দুর্গা বললেন, বৎস বাণ! যথাসর্বস্ব যৌতুকসহ তোমার সুভাগা কন্যাকে সম্প্রদান করে ভগবান কৃষ্ণের শরণাগত হও। অনেকেই তাকে শান্ত ও নিরস্ত হতে বললেন। তার শরীর ক্রোধ ও উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

করুণাময় মহেশ্বর বাণ রাজাকে বুকে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। দেবাদিদেবের নয়ন থেকে নিঃসৃত অশ্রু এক জলাশয়ের সৃষ্টি করল। তিনি বাণের জ্ঞান ফিরিয়ে যেখানে কৃষ্ণ বিরাজ করছেন সেখানে তাকে নিয়ে গেলেন। ব্রহ্মা ও লক্ষ্মী যাঁর শ্রীচরণ সেবা করেন, মহেশ্বর বাণকে সেই চরণ কমলে স্থাপন করে বলিরাজ যে স্তোত্রে শ্রীহরিকে তুষ্ট করেছিলেন, সেই স্তব করতে লাগলেন।

দয়াময় শ্রীহরি বাণ রাজাকে মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান প্রদান করলেন এবং স্বীয় পাদপদ্ম তার গায়ে ঠেকিয়ে তাঁকে অমরত্ব দান করলেন। বাণ মনোহর সূক্ষ্ম অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্র, তাম্বুল পাত্র, মধুপাত্র ও স্বীয় তনয়াকে হরির পাদপদ্মে নিবেদন করে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করে রোদন করতে লাগলেন। শ্রীহরি বাণের সেই নবযৌবনা সুন্দরী বিবাহিতা কন্যাকে রুক্মিণী ও দৈবকীকে প্রদান করলেন। শুভকাজ সম্পন্ন হলে ব্রাহ্মণদের দান সামগ্রী উপহার দিলেন।

১২১

প্রতারক কৃষ্ণ সর্বদাই বলশালীদের সঙ্গে দুর্বলের বিবাদ বাধিয়ে দুর্বলদের বিনাশ করে। কৃষ্ণ নিজে শিশুপাল, সুর নামক অসুরকে ছলে বলে কৌশলে বধ করেছে। কৃষ্ণ শৈশব থেকেই শঠ। তিনি নাকি স্বয়ং নারায়ণ। কৃষ্ণ তার শরণাতীত না হলে নিমেষেই তিনি দ্বারকাপুরী ধ্বংস করবেন।

তিনি মুহূর্তেই সপার্ষদ কৃষ্ণ ও বলদেবকে বধ করতে পারেন। কৃষ্ণ চরিত্রহীন, কামুক, গোকুলে রাধার বশীভূত আর এখন সত্যভামা প্রমুখ রমণীদের ভৃত্যস্বরূপ। কৃষ্ণ অট্টহাস্য করে উঠলেন ব্রাহ্মণের মুখে এরূপ কথা শুনে। শ্রী হরি বললেন, আগে তুমি আমায় প্রহার কর আর তারপরে আমি তোমার সঙ্গে সংগ্রামরত হব। তুমি সহর্ষে গোলোকে বিষ্ণুধামে গমন কর।

শৃগালরাজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দশ বাণ নিক্ষেপ করল। সেই তীরগুলি কৃষ্ণকে প্রণাম জানিয়ে আকাশের মাঝে লীন হয়ে গেল। এবার শৃগাল প্রলয়াগ্নি সদৃশ গদা নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে স্পর্শ করেই তা টুকরো হয়ে গেল। কৃষ্ণের অশ্রু বিন্দুতে বিন্দু সরোবরের সৃষ্টি হলো। সেই সরোবরের পবিত্রোদকে স্নান করলে জীবন্মুক্ত হওয়া যায়, তার দেহ থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি ব্রহ্মাণ্ড লক্ষ্মী আরাধিত হরির পাদপদ্মে বিলীন হয়ে গেল।

১২২

ভগবান বললেন, পূর্বে ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে চন্দ্র তারাকে অপরহণ করে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতে তাকে পরিত্যাগ করলে গুরু তাঁকে বরণ করে নিলেন। তখন তিনি চন্দ্রের ঔরসে অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভবতী তারাকে গুরু তিরষ্কার করলেন। তারার কথা শুনে চাঁদ নারায়ণ সরোবরে গিয়ে অনন্যমনে নারায়ণের পূজা করলেন ও পাপমুক্ত হলেন। তিনি চাঁদকে বললেন, কলঙ্কের হাত থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে।

ভাদ্রমাসের শুক্ল এবং কৃষ্ণপক্ষের চুতর্থীতে সম্যকরূপে উদিত চন্দ্রকে দেখা অবিধেয়। এক সূর্যভক্ত ছিলেন সত্রাজিৎ নামে। তিনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন পুষ্করতীর্থে। তাই সূর্য তাঁকে, স্যমন্তক মণি দান করেন, যা প্রত্যহ স্বর্ণপ্রসব করত, সেটি কৃষ্ণকে দিতে গেলে ধূর্ত প্রসেন তা দিতে না দিয়ে নিজে নিয়ে বারাণসী গমন করেন।

ভাল্লুকরাজ জাম্ববান সিংহকে বধ করলে মণিটি তাঁর করায়ত্ত হয়। ব্রহ্মা বলেন, বেদের নিন্দাকারী যদি নষ্ট চন্দ্র প্রত্যক্ষ করে, তবে সে কলঙ্কী হয়। কৃষ্ণ সেই বালকের কাছ থেকে স্যমন্তক মণি নিয়ে নিলে ধাত্রী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভাল্লুককে গিয়ে বলল। জাম্ববান কৃষ্ণকে দেখে অত্যন্ত প্রীত হলো। কৃষ্ণ দ্বারকায় আনীত স্যমন্তক মণিটি যাদবদের দেখালেন ও তিনি কলঙ্ক মুক্ত হলেন।

১২৩

পুরানে বর্ণিত গণেশ পূজার চিত্তাকর্ষক ও দুষ্প্রাপ্য কাহিণী ব্রহ্মার মুখ থেকে অল্প কিছুটা শুনেছি। দ্বারকায় অধিবাসীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ গোপ সিদ্ধাশ্রমে এসেছিলেন। রাজেন্দ্র গণেশ পূজার জন্য সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। রাধা গণেশের ধ্যানরতা হয়ে স্বীয় মস্তকে ফুল দিয়ে অঙ্গ শোধন। করলেন।

কৃষ্ণের প্রাণাধিকা রাধিকা গণেশকে চব্য, চোষ্য, লেহ্য-পেয়, তিলের নাড়ু, গমের পিঠে, কলা, পায়েস নিবেদন করলেন। রাধা আত্যন্তিক শ্রদ্ধা সহকারে যখন গজানন স্তোত্র পাঠ করছিলেন। তখন তার সারা শরীর ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হচ্ছিল।

১২৪

গণপতি রাধার ভক্তিতে অত্যন্ত প্রীত হলেন। শ্রদ্ধা সহকারে ভক্তিমন্ত্র জপ করলেন আপনার পাদপদ্মে স্থিত হয়ে এবং তিনি মুহূর্তের জন্যও বৃথা কাল যাপন করেন না। পার্বতী রাধাকে বুকে চেপে ধরে বলল, রাধা তুমি সর্ববিধ শুভের আধার। তোমার ভক্তেরা যদি আমার নিন্দা করে আর আমার ভক্তেরা যদি তোমার নিন্দা করে, তবে তাদের কুম্ভীপাক নরকে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

শ্রীরাধা রাসেশ্বরী আর কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ রসিক। রসিক ও রসবতীর যৌন মিলনই সার্থক বলে বিবেচিত হয়। কৃষ্ণ বললেন, শ্রীদামের শাপে রাধার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটেছিল। তাই সে অনেক কিছুই বিস্মৃত হয়েছিল। কামিনী রাধা নিয়তই কৃষ্ণের চরণ-কমল ধ্যান করেন। তিনি ধন্যা প্রিয়তমের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিতে।

পুণ্যাতীর্থ ভারতে তিনি বৃষভাণুর কন্যারূপে পরিচিত। তার চরণ-কমল বন্দনা করেন মুনি ঋষিরাও। ব্রহ্মা পর্যন্ত পরমেশ্বরী রাধাকে প্রত্যক্ষ করে তার স্তব করেন। স্বচক্ষে কেন স্বপ্নেও তোমার চরণকমল লাভ করতে পারিনি।

এভাবে দেবতা, মুনি, ঋষি সকলেই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে রাধা স্তুতিতে আত্মনিয়োগ করলেন। রুক্মিণী প্রভৃতি রমণীরা লজ্জাবনতা হয়ে রত্নদর্পণে নিজের মুখ দেখতে লাগলেন এবং তাদের নিঃশ্বাসে আরশি কেবল ঝাপসা হয়ে গেল। কৃশোদরী, উপবাসকৃশ সত্যভামা মন থেকে অভিমান মুছে ফেললেন।

১২৫

এক ব্রহ্মা ও অষ্টশতাধিক দশলক্ষ ইন্দ্রের পতনে শ্রীহরির চোখের পাতা ফেলতে যে সময় লাগে, সেই অত্যল্পকাল হয়ে থাকে। বসুদেব শিবের আদেশে যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করে, শুভলগ্নে রাজসূয় যজ্ঞ করলেন। সনকুমারের মন্তব্যে এবং কৃষ্ণের নির্দেশে বসুদেব যথা সর্বস্ব দান করলেন।

রজনীর সর্বগ্রাসী আঁধারে সস্ত্রীক দেবতা ও মুনিরা সেখানে সঙ্গমানন্দে মত্ত হলেন। সকাল হলে কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে সকলে প্রস্থান করলেন। যাদবেরা রুক্মিণীকে প্রত্যক্ষ করে মূল্যবান রত্নের আকর কৃষ্ণের স্মৃতিধন্য দ্বারকার উদ্দেশ্য যাত্রা করলেন।

১২৬

শ্রীহরি ও গণপতির পুজো করে যাদবেরা সিদ্ধাশ্রমে রয়ে গেলেন। রাধা বললেন, আজ তার জন্ম সার্থক হলো। স্ত্রী পুরুষের বিরহ বাস্তবিক দুঃসহ। অতঃপর রাধা পরমেশ্বরের স্তব করে তাঁকে রত্নখচিত আসনে বসিয়ে তার পাদপদ্ম পূজা করলেন। সস্মিত কৃষ্ণ নিজের পাশে রাধাকে বসালেন।

রসিকা, কামাতুরা স্ত্রী সম্ভোগকালেই পতির পরিচয় হয়ে থাকে। শালি ধানের স্বাদ পায় ভোক্তা–ধান্যক্ষেত্র নয়। যে ঘ্রাণ নেয় একমাত্র সেই বোঝে চন্দনের সৌরভ, চন্দন পাত্র নয়। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ক্ষীরোদ আর শ্বেতদ্বীপে আমি চতুর্ভুজ ও মর্ত্যলক্ষ্মীর হৃদয় বল্লভ। আমি সিদ্ধিদাতা সতীপতি কপিল এবং ব্যক্তিভেদে আমি বিভিন্ন রূপ ধারণ করি।

গোলোকেও গোকুলে তুমি রাধা, আবার বৈকুণ্ঠে তুমি লক্ষ্মী ও সরস্বতী। তুমি ক্ষীরোদসমুদ্রে শায়িত ভগবানের প্রিয়তমা মর্ত্যলক্ষ্মী, ধর্ম তনয়ের কামিনী শ্রীরূপিনী শান্তি। পবিত্র ভারতবর্ষে তুমি কপিল প্রিয়া পতিব্রতা সতী ও দ্বারকাতে মহালক্ষ্মী।

রাবণ তোমাকে অপহরণ করেছিল। নিজ অংশে তুমি বিবিধ রূপে অধিকারিণী। শ্রীদামের অভিসম্পাতে তোমার-আমার বিচ্ছেদ ঘটেছিল। তুমি আমায় দেখতে পাওনি ঠিকই, তোমাকে সব সময়ই অবলোকন করেছি। দেবতাদের মধ্যে দেবদিদেবকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি আর দেবীদের মধ্যে তুমিই আমার প্রিয়তমা। সতী রাধা! সব গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তোমায় পরিবেশন করলাম।

১২৭

রাধা অপাঙ্গ দৃষ্টিতে কৃষ্ণের দিকে তাকালেন। কামনায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। প্রিয়তমকে জড়িয়ে ধরে তাঁর মুখ চুম্বন করতে লাগলেন। যৌন মিলনের তীব্র আনোন্দাচ্ছ্বাসে যুগবৎ রোমাঞ্চিত হয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। নিজের কোমল বাহুলতায় তাকে বেষ্টন করে বললেন, চল আমরা বৃন্দাবনের রাসমণ্ডলে যাই।

মাধব অনেক বুঝিয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। রথের চারদিকে ঝলমল করছে নানা মূল্যবান রত্ন। রয়েছে লক্ষ রথে রয়েছে লক্ষ গোপ পরিবেষ্টিত সচন্দন কুসুম শয্যা। শ্রীকৃষ্ণ আসছেন শুনে নন্দ যশোদা, বৃদ্ধ গোপ, বৃদ্ধা গোপীদের চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ল। কেবল ব্রহ্মনত্বের দ্যোতকরূপে গলায় একগাছি উপবীত থাকবে। পরে যজ্ঞসূত্রটি আর সমাবেশ অবশিষ্ট।

এমনকি উপপতির যারা মিত্র তাদের প্রতিও কামিনীদের ভালবাসা শতগুণ বর্ধিত হবে। উপপতিই তাদের রতি ও গতি। কলিকালে দশ হাজার বৎসর পর্যন্ত আমার পূজার প্রচলন থাকবে। তারপর আর কেউ আমায় পুজো করবে না। দুর্ভিক্ষ ও ঋণভারে জর্জরিত হয়ে লোকে বনবাসী হবে। ক্ষুধার তাড়নায় গৃহস্থেরা কুকুরের মতো হয়ে যাবে।

তারা চিত্র বিচিত্র রত্নশোভিত বিরজা নদী লঙঘন করে, নানা মণি দীপ্ত রাসমণ্ডল অতিক্রম করে, শতশৃঙ্গ পর্বতে উপস্থিত হলেন। বট বৃক্ষটির দৈর্ঘ্য ত্রিশতযোজন এবং প্রস্থ শতযোজন, রাধা রথ থেকে অবতরণ করলেন এবং রাধার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বৃন্দা স্বীয় গৃহে প্রবেশ করলেন।

কক্ষে শোভা পাচ্ছিল হীরক মালিকা সুশোভিত এক রত্ন সিংহাসন। সাতজন সখী চামর দিয়ে তাকে বাতাস করতে শুরু করে। বৃন্দা নন্দের জন্য পরমেশ্বরী রাধার জন্য পৃথক পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করলেন। রাধা গোপিনীর সঙ্গে অতিমনোরম নিজকক্ষে প্রবেশ করলেন।

১২৯

দেবাদিদেব বললেন, ভগবান অনন্ত, ধর্ম ও দুর্গতিনাশিনী দুর্গার সঙ্গে দেবাদিদেব ভাভীর বনে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মার প্রার্থনায় পৃথিবীর ভার মোচনের জন্য আপনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখন আপনি সস্থানের উদ্দেশ্যে প্রস্থানোন্মুখ, স্বর্গ-মর্ত-পাতালের মধ্যে পৃথিবী আপনার চরণ স্পর্শে কৃতার্থ হয়েছে।

সত্যভামা পঞ্চগোপাল গোলোকে গমন করলেন। অযযানিসম্ভূতা মহালক্ষ্মী রুক্মিণীর সশরীরে বিষ্ণুধাম গোলোকে উত্তরণ ঘটল, ভূতলে ও জাম্ববতী দুর্গতিনাশিনী বিশ্বমাতা পার্বতীর শরীরে অনুপ্রবেশ করলেন। পাপীরা তোমার পবিত্রোদকে অবগাহনে যে পাপ বিসর্জন করবে, বৈষ্ণবদের সান্নিধ্যে পাপসমূহ লয়প্রাপ্ত হবে।

১৩০

নারায়ণ বললেন, গতজন্মে তোমার পঞ্চাশজন পত্নী ছিল, তুমি একজন, গন্ধর্ব ছিলে। তোমার নাম ছিল উপবন। এখন তুমি ব্রহ্মার পুত্র। সনৎকুমার নারদকে আশীর্বাদ করে পরম পুরুষকে প্রত্যক্ষ করার জন্য গোলোকের উদ্দেশ্যে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

কৃতমালা নদীতটে তার সঙ্গে দেবাদিদেবের সাক্ষাৎ হলো। তিনি প্রণাম করলেন শঙ্করকে। পরমাত্মা কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠধামের রাসমণ্ডলে ব্রহ্মাকে, ধর্মকে এবং আমাকে পরম মন্ত্রদান করেছিলেন। মুনিবর নারদ অনন্য চিত্তে শ্রীহরিকে সাধনায় তুষ্ট করে দেহত্যাগ করলেন ও শ্রীহরির শ্রীচরণ পদ সেবা করলেন।

১৩১

শৌণক বললেন, বৈষ্ণব সান্নিধ্যে জন্ম সার্থক হয়। গণপতির জন্ম উপাখ্যান শ্রবণে গর্ভবাস ও কর্মাঙ্কুরের সমূলে বিনাশ সাধিত হয়, হরির শ্রীচরণে দাস্যভক্তি লাভ করা যায়। পারস্পরিক সম্বোধন ও কুশল বিনিময়ের পর তারা বিষ্ণুর সভায় সুরম্যরত্ন সিংহাসনে উপবেশন করলেন।

মধুসূদন বললেন, কামাতুর নর্তকীদের কঠিন শ্রোণী ও পীন স্তন দেখে ব্রহ্মার যে বীর্যপাত হয়েছিল, ব্রীড়াবনত ব্রহ্মা তা ক্ষীরোদ সাগরে নিক্ষেপ করেছিলেন। ব্রহ্মার রেত থেকেই বালকের উৎপত্তি তাই সে ব্রহ্মা তনয়। শিব যা বললেন, বিষ্ণু তা সানন্দে মেনে দিয়ে তাকে দগ্ধ করার শক্তি দান করলেন।

বরুণ বালকটিকে কোলে নিয়ে তাকে চুম্বন করে ব্রহ্মাকে সম্যকরূপে অর্পণ করলেন। অতঃপর তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে প্রণাম করে নিজের আলয়ে ফিরে গেলেন। একদিন দেবতারা ইন্দ্রের সভায় সমবেত হয়েছেন, অপ্সরারা নাচ গান করছিল।

রম্যশ্রোণী রম্ভাকে দেখে অগ্নি, যৌন কামনায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তারও বীর্যপাত হলে তিনি পরিধেয় বস্ত্রে তা আবৃত করেন। তার থেকেই উৎপন্ন উজ্জ্বল স্বর্ণ আবরণ ভেদ করে বর্ধিত হতে থাকে। কালে তা সুমেরু পর্বতের রূপ নেয়। আর তাই প্রাজ্ঞজনেরা অগ্নিকে ‘হিরণ্যরে বলে অভিহিত করেন। এখন বল তুমি আর কী শুনতে চাও?

১৩২

ব্রহ্মার আদেশ নারদের নারায়ণের আশ্রমে যাত্রা ইত্যাদি বিষয়ের আনুপূর্বিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাধা, সাবিত্রী প্রভৃতি অনেকের চরিতাবলী আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষত এই খণ্ডের উপাখ্যানগুলি আমাদের মুগ্ধ করে। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-বন্ধন মুক্তি প্রদর্শক, হরিদাস্য প্রদ, শ্রুতিসুখকর শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড বর্ণনা করছি শোন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মখন্ড বড়ই চিত্তহারী, চিরনূতন, উপাখ্যানে পূর্ণ। কৃষ্ণ জন্মখণ্ড বৈষ্ণবদের প্রাণস্বরূপ এই খণ্ডের সূচনায় নারদের নারায়ণের কাছে প্রশ্ন, নারায়ণের উত্তর, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবদের সাধুবাদ, শ্রীদাম ও রাধার দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক অভিশাপ প্রদান, বিরজার দেহত্যাগ, পরে নদীরূপে বিরজার আত্মপ্রকাশ, কৃষ্ণের সম্ভোগ ও সপ্ত সাগরের উৎপত্তি নানা বিষয়ে অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বৃন্দাবনে রাখাল বালকদের সঙ্গে ক্রীড়া, ব্রাহ্মণী প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ, বস্ত্রহরণ, স্বর্গের বিবরণ, গোপিণীদের কৃষ্ণের ও পার্বতীর বরদান, কাত্যায়ণী ব্রত, কৃষ্ণের তাল ভক্ষণ, কৃষ্ণ রাধিকার পরিণয় ও মিলন, রাসমণ্ডলে কৃষ্ণের সোড়শ প্রকারের মৈথুন, শ্রীরাধিকার সঙ্গে মলয় পর্বতে বিহার।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব, পরম পুরুষ কৃষ্ণকে অবলোকন করে গোপিণীদের উচ্ছ্বাস, রাসলীলা প্রত্যক্ষ করে দেবীদের অনির্বচনীয় আনন্দ, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন, রজক এ কালযবন বধ, কুজার সঙ্গে যৌন মিলন, কুবিন্দের প্রতি করুণা, মাতঙ্গ ও কংস নিধন এবং তাঁর পিতাকে রাজ্যদান।

নিরিবিলিতে রাধার গৃহে উদ্ধবের উপস্থিতি, কৃষ্ণের উপনয়ন, গুরুগৃহে শিক্ষা, জরাসন্ধ দমন। দ্বারকাপুরী নির্মাণ, বিশ্বকর্মার দর্পহরণ, উগ্রসেনের আক্ষেপ, রুক্মিণী ও ঊষা হরন। দেবলোক থেকে পারিজাত হরণ, কুরু-পাণ্ডবের মহাসমর, বাণরাজার ভুজচ্ছেদ, অনিরুদ্ধের বীরত্ব, রাধা-যশোদা কাহিনী, শৃগালের অদ্ভুত মুক্তি, গণেশ পূজা, শৌনক, ব্রহ্মের অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংস, পাণ্ডবদের ভববন্ধন থেকে নিষ্কৃতি।

শ্রীহরির নিজ নিকেতনে গমন, নারদ পরিণয়। অগ্নি ও স্বর্গের উদ্ভব, ইত্যাদির নাতিদীর্ঘ বিবরণ দিলাম। চারটি খণ্ডে বিভক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এইসব গূঢ় ও চিত্তরঞ্জিনী বিষয় সমূহের আলোচনা করা হয়েছে। এখন বল, তুমি আর কী শুনতে চাও।

১৩৩

শৌনক বললেন, আজ আমার জীবন সার্থক, কেননা পুণ্য ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের অমৃতোপম কাহিনী আমি শুনলাম। ভয় দূর করে আমায় রবাভয় দান কর। সূত বললেন, নির্ভীক হন। আপনার কী কী জ্ঞাতব্য আমায় তা জানান। শৌনক বললেন, বৎস! পুরাণের লক্ষণ, সংখ্যা এবং পুরাণ ফল সম্পর্কে আমি জানতে চাই।

সূত বললেন, হে মহামান্য। শাস্ত্রের আলোকে আমি পুরাণ, ইতিহাস, সংহিতা এবং পঞ্চরাত্র বিষয়ে আলোচনা করছি। পুরাণে সৃষ্টি, জগতের ধ্বংস, চন্দ্র এবং সূর্যাদি বংশের ক্রমানুযায়ী চতুর্দশ মনুর আধিপত্যের বর্ণনা অবশ্যই থাকবে। মহাপুরানের বিষয় হলো সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, প্রতিপালন, কর্ম, কামনা, চতুর্দশ মনুর নামকরণ, প্রলয়ের বিবরণ।

মুক্তি নির্ণয়, শ্রী হরির স্তুতি, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেবতাদের গুণকীর্তন এইসব লক্ষণ থাকবে। এবার আমি পুরাণে সংখ্যার উল্লেখ করছি। ব্রহ্মাপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, নারদ পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ এবং বরাহপুরাণে যথাক্রমে দশহাজার, পঞ্চাশ হাজার, চব্বিশ হাজার, আঠার হাজার কৃষ্ণের মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে। এটি গৌতম ও সনকুমার রচিত।

এই পুরাণে প্রাণীদের আত্মস্বরূপ, কর্মলিপ্ত মানুষের সকল প্রকারের কর্মের সাক্ষী হিসাবে পরম ব্রহ্মাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেবীদের মধ্যে যেমন দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, কৃষ্ণ সখীদের মধ্যে যেমন রাধা, ঈশ্বরীসমূহের মধ্যে যেমন লক্ষ্মী, বিদ্যাদায়িনীদের মধ্যে যেমন সরস্বতী, তেমনি পুরাণ সমূহের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণই শ্রেষ্ঠ। আর তাই এই পুরাণ সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে– যজ্ঞানুষ্ঠান, তীর্থ পরিক্রমা, তপস্যা, চতুর্বেদ পাঠ এবং গুরু সঙ্গে যে ফললাভ হয়, তার চেয়েও বেশি পুণ্যদায়ক এই পুরাণ পাঠ ও শ্রবণ, নিঃসন্তান ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে এই পুরাণ পাঠ করেন, তাহলে তিনি সুশীল, বিদ্যাবিশারদ বৈষ্ণব পুত্র লাভ করেন। অনন্যমনা হয়ে যিনি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রবণ করেন পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

আমি গুরুর কাছে যেমন শ্রবণ করেছি তোমায় তা বললাম। এখন আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নারায়ণের আশ্রয়ে গমন করব। ব্রাহ্মণদের দর্শন ও প্রণামের নিমিত্ত আমি এখানে এসেছিলাম আর আপনার অনুরোধে আমি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ শুনিয়েছি। কায়মনোবাক্যে নিয়ত শাশ্বত সত্য। পুরাণ স্রষ্টা বেদব্যাসকে প্রণাম, পরিশেষে দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবীকে প্রণাম। শৌনক! আপনাদের পূত চরণ কমলে প্রণাম জানিয়ে, এখন আমি গণপতি অধ্যুষিত সিদ্ধাশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছি।

শিব মহাপুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ

উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

দেবর্ষি নারদ ঢেঁকিতে চড়েন। ঢেঁকিতে চেপে চৌদ্দ ভুবন ঘুরে ঘুরে বেড়ান। বহু শিবলিঙ্গ দেখে পর পর পূজা করলেন। তারপর তার মনে মহাত্মা শিবের তত্ত্ব জানবার ইচ্ছা হলো। মহেশ্বরের রূপ মনে করতে করতে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে এবং মনোবাসনা নিবেদন করলে প্রজাপতি ব্রহ্মা পাপবিনাশকারী শিবতত্ত্ব প্রকাশ করলেন।

পরবর্তীকালে সেই তত্ত্ব দেবর্ষি নারদ তার শিষ্য মহামুনি বেদব্যাসকে শিক্ষা দেন। শিষ্য সূত মুনিকে তিনি সেই তত্ত্ব কথা অবগত করান। সূত মুনি পরবর্তীকালে নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণের প্রশ্নের উত্তরে দেবাদিদেব মহেশ্বরের সব বিচিত্র লীলা কীর্তন করেন।

জগতে কিরূপে নির্গুণ মহেশ্বর সগুণ হলেন? জগৎ সৃষ্টির আগে জগতের স্থিতিকালে আর প্রলয় হলে তিনি কিভাবে থাকেন? তিনি কিভাবে প্রসন্ন হন, প্রসন্ন হলে কেমন ফলদান করেন? এইসব প্রশ্নের উত্তর এবং নানা তত্ত্বকথা এই শিব পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

শিব কর্তৃক মদন ভস্ম

সতী প্রাণত্যাগ করেন পিতা দক্ষ রাজার যজ্ঞ সভায়। প্রাণপ্রিয়া পত্নীর আত্মাহুতির সংবাদে পত্নীবিরহ কাতর শিব উন্মত্ত হয়ে ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠেন। শিব উন্মত্ত হয়ে তারপরে বসে পড়েন তপস্যায়।

তারকাসুর এদিকে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, দাপিয়ে বেড়াচ্ছে স্বর্গমর্ত, রসাতল। তাকে কিছুতেই দেবতারা দমন করতে পারছেন না। ব্রহ্মা জানিয়ে দিয়েছেন যে একমাত্র শিবের পুত্র ছাড়া আর কেউ তারকাসুরকে বিনাশ করতে পারবে না।

দেবতারা চিন্তায় পড়ে গেলেন। সতী এখন নেই। শিবের পুত্র তাহলে হবে কী করে?

হিমালয়ের কন্যারূপে জন্ম নিয়েছেন। তার নাম পার্বতী। তিনি শিবকে স্বামীরূপে পাওয়ার জন্য তপস্যা করেছেন। তখন শিবও পরম ব্রহ্মের তপস্যায় মগ্ন।

তখন দেবতারা চিন্তা করলেন, শিবের ধ্যান যে করেই হোক ভাঙাতে হবে। কিন্তু কেমন করে? শিবের ধ্যান ভাঙলে তিনি যদি ক্রুদ্ধ হন তাহলে ত্রিভুবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র সব দেবতাকে বললেন– একমাত্র মদনই পারে এই কাজটি করতে।

দেবরাজ সঙ্গে সঙ্গে মদনকে স্মরণ করলেন। তখন মদন এবং তার স্ত্রী রতি স্বর্গসভায় এসে হাজির হলেন। হাত জোড় করলেন এবং ইন্দ্রের প্রতি বললেন–দেবরাজ, আমাকে স্মরণ করার কারণ কি? আমাকে কি করতে হবে?

মদনের কথায় ইন্দ্র খুব খুশি হন। মদনের বহু প্রশংসা করলেন এবং বললেন–মদন, আমার অনেক বন্ধু আছে কিন্তু তোমার মত কেউ নয়। পরমেশ্বর দুটি অস্ত্র তৈরি করেছেন, আমার জন্য একটি বজ্র, তার দ্বারা হিংসা প্রকাশ পায়। আর একটি অস্ত্র হলে তুমি, খুব সুখকর। তুমিই শ্রেষ্ঠ। বজ্র কখনো কখনো নিষ্ফল হয়, কিন্তু তুমি সর্বদাই সফল।

–শোন মদন অনেকদিন ধরে আমার মনে একটি দুঃখ আছে। সেই দুঃখ তুমি ছাড়া আর কেউ দূর করতে পারবে না। তাই তোমাকে ডাকলাম। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। আমার একার জন্য সেই কাজটি নয়, দেবতাদের মঙ্গলের জন্য ও ত্রিভুবনের সুখের জন্য সেই কাজ করবে।

দেবরাজের মুখে প্রশংসা বাক্য শুনলেন মদন। তাতে তার অহংকার একটু বেড়ে গেল। গর্ব করে বললেন–হে দেবরাজ, যদি কোনো দেবতা, দানব কিংবা কোনো ঋষি বা রাজা আপনার পদ অধিকারের জন্য ঘোর তপস্যা করে তাহলে আমার পত্নী রতি তাদের সেই তপস্যা ভঙ্গ করে দেবে। আর যদি কোনো মানুষকে পতিত করতে হয়, তার কাছে সেটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার। অন্যের কথা আর কি বলব, স্বয়ং মহাদেবেরও ধৈর্য্যচ্যুতি করতে পারি।

কামদেবের এইসব গর্বভরা কথা শুনে ইন্দ্র মনে মনে খুশি হন। তিনি মদনদেবকে বললেন–মদন, তুমি আমার মনের কথাই বলেছ। তোমাকে যে কাজের জন্য ডেকেছি তা শোন। ব্রহ্মার কাছে বর পেয়ে তারক নামে এক দৈত্য ত্রিভুবনকে কষ্ট দিচ্ছে। সাধারণ উপায়ে তার মৃত্যুও সেখানে সম্ভব নয়।

মহাদেবের পুত্রের হাতেই সেই অসুরের মৃত্যু হবে। কিন্তু মহাদেব এখন ধ্যানমগ্ন। দেবী পার্বতী তাকে স্বামীরূপে পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্যায় রত। পার্বতীর প্রতি শঙ্করের যাতে কামভাব জাগে তারই ব্যবস্থা করতে হবে। ত্রিভুবনে আপনার যশ ঘোষণা হবে, আপনি এই কাজে সফল হলে, আমাদের সবার দুঃখের অবসান হবে।

ইন্দ্রের কথা শুনে মদনদেব গর্ব করে বললেন, এটা কোনো ব্যাপারই না। আমি এক্ষুনিই যাচ্ছি সেই কাজ করতে। এই কথা বলে মদন চলে গেলেন। রতিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন হিমালয় শিখরে। সেখানে তপস্যা করছেন শিব। শিবের বাম পাশে মদন রতির সঙ্গে পুষ্প ধনুতে সম্মোহন বাণ যোগ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সেই সময় পার্বতী নানা ফুলের অলংকারে আভূষিত হয়ে তার দুই সখীর সঙ্গে শিবের কাছে। গেলেন তাকে পূজা করার জন্য।

মহেশ্বরের সামনে দেবীকে দেখেই মদন বাণ ছুঁড়ল। কি আশ্চর্য ব্যাপার যে, সেই বাণ পুনরায় তার নিজের কাছে চলে এল। তখন পার্বতী মহাদেবকে প্রণাম করলেন এবং পূজাও করলেন।

মহাদেব তখন ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। গৌরীকে সামনে দেখে আশ্চর্য হলেন। বললেন, একি! এমন সুন্দর রূপ কি কারোর হয়। এতে মুখ নয়, চাঁদ। এই চোখ তো চোখ নয়, পদ্মফুল। এই ভ্রূকুটি যেন কন্দর্পের ধনুক। অধর যেন পক্ক বিম্বফল। আর নাসিকা শুকপাখির ঠোঁটের মত। কোকিলের স্বরের মত এর কণ্ঠস্বর। এর গতি আর রূপের বর্ণনা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। এই পৃথিবীতে যতকিছু সুন্দর আছে তা সবই এই রমণীর সঙ্গে আছে।

এমন অপরূপ রূপ দেখে যাঁর ধ্যান ভেঙ্গে যায় তার কি ধ্যানে আর মন বসে? তখন তিনি পার্বতীর শাড়ির আঁচল ধরার জন্য হাত বাড়ালেন। পার্বথী লজ্জাবশতঃ একটু দূরে সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু অপ্সরারা নানা হাবভাব প্রকাশ করে মহাদেবের দিকে তাকালেন।

পার্বতীর অভিসন্ধি বুঝতে পারলেন শঙ্কর। তখন তিনি মোহগ্রস্থ হলেন। আর মনে মনে ভাবলেন–এই রমণীর আলিঙ্গন সুখ অনুভব করব কিভাবে?

এইরকম কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি ভাবলেন আমি কি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, আমি ঈশ্বর হয়ে পরনারী সঙ্গ কামনা করলাম? সাধারণ মানুষকে তাহলে কি আর দোষ দেবো?

চিন্তা করতে করতে মহাদেব আবার আসনে বসলেন। ধ্যান করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি তা করতে পারলেন না। তখন চিন্তা করতে লাগলেন এরকম হবার কারণ কি? এর কোনো কারণ নিশ্চয় আছে। কারণ ছাড়া কোনো কিছু ঘটতে পারে না। এই চিন্তা করে তিনি তার চারদিকে তাকাতে লাগলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন তাঁর বামপাশে মদনদেব তাঁকে উদ্দেশ করে সম্মোহন বাণ মারার চেষ্টা করছেন।

তাকে দেখে শঙ্কর ভীষণভাবে রেগে গেলেন। আমি এমন দুর্ধর্ষ হয়েও মদনের কাছে হেরে গেলাম।

তখন তার তৃতীয় নয়ন থেকে ভয়ঙ্কর আগুন বেরোতে লাগল। আর সেই আগুনে জ্বলতে লাগল রতি ও মদন।

সেদিন রতির সঙ্গে দেবতারাও এসেছিলেন। শিবের এই ক্রোধ দেখে তারা চিৎকার করে বলতে লাগলেন, ক্ষমা করুন, রক্ষা করুন। কিন্তু বলতে না বলতেই সব শেষ। মদনদেব পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন। মদনের মৃত্যু দেখে দেবতারা দুঃখী হলেন। মহেশ্বর সেই আশ্রম ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন। পার্বতীও তার সখীদের সঙ্গে পিত্রালয়ে চলে গেলেন।

রতি তার স্বামীকে পুড়তে দেখে অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর জ্ঞান ফিরতে তিনি কাঁদতে থাকেন এবং কি করবেন, কোথায় যাবেন ভাবতে থাকেন। দেবতা আমার স্বামীকে ডেকে এনে এ কি করলেন হে প্রিয়? তুমি কোথায়? একবার তুমি দেখা দাও, আমার সঙ্গে কথা বল। তোমাকে ছাড়া, আমি বাঁচব কি করে?

রুদ্ররোষ কামদেবের এই পরিণতিতে রতি কাঁদতে কাঁদতে নিজের মাথায় চুল ছিঁড়তে লাগলেন। তারপর বললেন, আমারই কর্মফলে ব্রহ্মা আমাদের স্ত্রী-পুরুষের যোগ সহ্য করতে পারলেন না। তারপর ভাবলেন এ সংসারে কেউ তোমাকে দুঃখ দিতে পারবে না। কেউ কাউকে সুখও দিতে পারবে না। সকলকেই নিজের নিজের কর্মফল ভোগ করতে হয়।

রতির কান্নায় দেবতারা কাতর হয়ে পড়লেন। এবং ভাবলেন তাঁদেরই বুদ্ধিদোষে মদনদেবের এই করুণ পরিণতি হয়েছে। রতির দুঃখ সহ্য করা যাচ্ছে না এই কথা বলে তারা শিবের কাছে গেলেন। সেখানে গিয়ে তারা বহু স্তব স্তুতি করলেন। তারপর বললেন, হে প্রভু, কামদেব তার নিজের জন্য এই কাজ করেননি। তারকাসুরকে বিনাশ করার জন্যই এমন কাজ সে করেছে। এবং আমরাই তাকে এই কাজ করতে বলেছি। এখন রতি বিলাপ করছেন। হে শঙ্কর, তার প্রতি আপনি প্রসন্ন হোন। সতী পরজন্মে হিমালয় কন্যা রূপে জন্মেছে। এই গিরিরাজের গৃহেই তো সকল দেবতার সকল তীর্থই তো। তুমি এখানেই তপস্যা কর। শিবের কাছে গিয়ে কি লাভ? তোমার দেহ খুব কোমল। আর তপস্যা বেশ কঠিন। তাই তুমি গৃহেই থাক এবং এখানে যা সুলভ তাই কর।

মাতা মেনকার সব কথা শুনলেন পার্বতী। এইসব কথা শুনে তিনি লজ্জাশীলা হয়ে কিছু বলতে পারলেন না।

শেষ পর্যন্ত মাতা তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে অনুমতি দিলেন। পার্বতী আনন্দে দুই সখীকে নিয়ে পিতা ও মাতাকে প্রণাম করলেন। তারপরে হিমালয়ের এক নির্জন শৃঙ্গে চলে গেলেন তপস্যা করতে। পার্বতী তখন সূতীবস্ত্র ছেড়ে মোটা কর্কশ গাছের ছাল পরলেন। তারপর কঠিন তপস্যা শুরু করলেন।

একদিকে যখন সূর্যের প্রখর উত্তাপ, তখন চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে সেই সূর্যের দিকে তাকিয়ে পার্বতী তপস্যা করতে লাগলেন। বর্ষার সময় মাটিতে বসে তপস্যা করলেন। শীতকালে জলের মধ্যে বসে তিনি কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন।

যখন তিনি তপস্যা করছিলেন, তখন তিনি মাটিতে কতগুলি গাছ লাগালেন এবং তপ্তদিনে তাতে জল দেন। ক্রমে ক্রমে সেই গাছুগলি বড় হল এবং তাতে ফলও হল। সেই ফল দিয়ে উমা অতিথিদের সেবা করতে লাগলেন। উমা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কোনো কিছুকেই গ্রাহ্য করলেন না। তিনি তার কঠোর তপস্যা চালিয়ে গেলেন।

উমার সেই কঠিন তপস্যার কথা শুনে মুনি-ঋষিগণ অবাক হলেন। উমা কেমন তপস্যা করছে দেখার জন্য তারা গেলেন উমার কাছে। সবকিছু দেখে বললেন, অন্যেরা যে তপস্যা করে তা এর কাছে। কিছুই নয়।

পার্বতীর আশ্রমে নানা হিংস্র পশু যেমন বাঘ সিংহ ছিল তারা তার তপস্যার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে হিংসা ভুলে যায়। তারা কেউ কাউকে কষ্ট দিত না। হিমালয়-এর শৃঙ্গটির নাম হল গৌরীতীর্থ।

দেবতাগণ ও দেবর্ষি নারদ মহাদেবের কাছে গেলেন। এবং নানা স্তব স্তুতি করতে লাগলেন। তারপর তাঁরা বললেন, হে মহাদেব, পার্বতী খুব কঠিন তপস্যা করছেন। সেই তপস্যা দেবদানবের দুর্লভ। আপনি সন্তুষ্ট হন এবং তপস্যার ফলদান করুন।

মহাদেব তখন বললেন, দেবতারাও কঠিন তপস্যা করে আমার দর্শন পান না। কিন্তু আমি পার্বতীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি। আপনাদের কথা আমি নিশ্চয় রাখবো। আপনারা এখন যান।

দেবতারা মহাদেবের কথা শুনলেন। তারপর প্রসন্নচিত্তে শঙ্কর বললেন–যা হবার তা হয়ে গেছে। তবে যতক্ষণ না রুক্মিণী পতি দ্বারকায় পুত্র উৎপাদন না করেন, ততকাল মদন অনাত্ম হয়ে থাকবে অর্থাৎ দেহহীন অবস্থায় থাকবে। তারপরে রুক্মিণীদেবীর গর্ভে মদন জন্মগ্রহণ করবে। তখন তার নাম হবে প্রদ্যুম্ন।

মারাসুর তাকে হরণ করে সমুদ্রের মাঝে এক নগরে নিয়ে যাবে। সেই নগরে রতি বাস করবেন। পরে কামদেবের সঙ্গে তার মিলন হবে। সাম্ব রাক্ষসকে বধ করে প্রদ্যুম্ন রতিকে নিয়ে ফিরে আসবে। শিব এই বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দেবতারা রতির কাছে এলেন এবং মহাদেবের ভবিষ্যৎবাণী শুনিয়ে

তাকে আশ্বস্ত করলেন। তারপর রতি নগরে গেলেন। স্বামীর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

পার্বতীর তপস্যা ও শিবের সাক্ষাৎলাভ

পিতা দক্ষের যজ্ঞসভায় সতী পতিনিন্দা শুনে সহ্য করতে পারেন নি। তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তারপর জন্মগ্রহণ করলেন হিমালয়ের কন্যারূপে। তার নাম হল পার্বতী। তিনি পুনরায় শিবকে পতিরূপে পাবার অভিলক্ষিত হলেন। এর কারণে তিনি সখীর সঙ্গে শিবের সেবার জন্য হিমালয়ে যান। সেখানে মদন দহন দেখে তিনি ফিরে আসেন পিত্রালয়ে।

তার এখন কিছুই ভাল লাগছে না। নিজের রূপকে ধিক্কার দিচ্ছেন। কোনো কাজেই আনন্দ পাচ্ছেন না। মুখে শুধু 'শিব' নাম উচ্চারণ করছেন।

সেই সময় নারদ ঋষি তার কাছে আসেন। শিবকে পাবার একমাত্র উপায় তপস্যা, তা তিনি জানিয়ে দেন। কঠোর তপস্যা ব্যতীত তাঁকে বশীভূত করার অন্য কোনো উপায় নেই।

পার্বতী তখন মহাদেবকে পাবার জন্য তপস্যা করবেন বলে ঠিক করেন। পিতা হিমালয়কে নিজের মুখে পতি বিষয়ক কথা বলতে তিনি লজ্জা পেলেন। তাই এই কথা বলতে তিনি দুজন সখীকে পাঠালেন পিতার কাছে।

সখীরা হিমালয়ের কাছে গেল এবং বলল, গিরিরাজ আপনার কন্যা পার্বতী শিবকে পতিরূপে পাবার জন্য তপস্যা করবেন বলে মনস্থির করেছেন, দেবর্ষি তাকে এমন উপদেশ দিয়েছেন, অন্য কোন উপায়ে দেবাদিদেবকে লাভ করা যাবে না। তাই আপনি পার্বতীকে তপস্যা করার অনুমতি দিন।

দুই সখীর কথা শুনলেন হিমালয়। বললেন, এতো পরম সৌভাগ্যের কথা। আমি খুব আনন্দিত হয়ে অনুমতি দিচ্ছি। তবে তার মা মেনকার অনুমতি নিলে ভাল হয়। যদি তিনিও অনুমতি দেন তাহলে আমাদের গোটা কুলই ধন্য হবে। এর চেয়ে মঙ্গলকর আর কি আছে?

তখন দুই সখী পিতা হিমালয় রাজের অনুমতি নিল এবং তারপরে তারা পার্বতীর মায়ের কাছে গিয়ে বলল–আপনার কন্যা দেবাদিদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য মহাদেবের তপস্যা করবেন বলে ঠিক করেছেন। এতে গিরিরাজ সম্মত হয়েছেন। এখন আপনিও যদি অনুমতি দেন তাহলে পার্বতীর মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

মেনকা সব শুনে দুঃখিত হলেন। কন্যা উমাকে ডেকে বললেন, তুমি পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা করেছিলে তাই তুমি আমাদের কন্যা। পার্বতীর তপস্যা শুরু হল। তখন শিব একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করেন। এবং তারপরে তিনি পার্বতীর আশ্রমে যান।

আশ্রমে অতিথিকে দেখে পার্বতী তাকে অভ্যর্থনা জানান এবং ফলাদি খেতে দেন। ফুল দিয়ে অতিথির পূজা করেন। তারপর তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

তখন শিব নিজের আসল পরিচয় গোপন করলেন। পার্বতীর কাছে জানতে চাইলেন, দেবী তোমার এ আশ্রমে জল-ফলাদি সবসময় পরিপূর্ণ থাকে দেখছি। কিন্তু তুমি কেন নবীন বয়সে তপস্যা করছো? তাই তোমাকে জিজ্ঞেসা করতে চাই, তুমি তো সব বরই পেতে পারো, তাহলে এমন কী বর আছে যা পাবার জন্য তপস্যা করছো?

লজ্জায় পার্বতী কিছু বলতে পারলেন না। তিনি হিমালয় নন্দিনী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জিজ্ঞাসার উত্তরে তাঁর প্রার্থিত অভিলাষ তার সখীদের দ্বারা ব্যক্ত করালেন। মহাদেবকে পাবার জন্যই এমন তপস্যা করছেন। এই গাছগুলি পার্বতী রোপণ করেছিলেন। সেগুলোই এখন ফল প্রদান করছে। কিন্তু আমার সখীর মনোবাসনার কোনো ফল দেখতে পাচ্ছি না।

আমার সখী প্রথমে তার রূপের পসরা নিয়ে শিবের তপস্যা করেন। কিন্তু শিবকে রূপ দ্বারা বশ করা যায় না। তারপরে দেবর্ষি পরামর্শ দেন তপস্যা করার, এবং এজন্যই তিনি তপস্যা করছেন।

সখীর মুখে সব কথা শুনলেন সেই ছদ্মবেশী মহাদেব। শুনে বললেন, এইসব কথা কি সত্য? নাকি পরিহাস? তখন পার্বতী বললেন, আমার সখী যা বলেছেন, তা সবই সত্য। আমি মনে মনে শিবকেই পতিরূপে বরণ করেছি। কোনো নারীর পক্ষে তাকে পতিরূপে পাওয়া পরম সৌভাগ্য।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পার্বতীর কথা শুনলেন। তিনি মনে মনে ভেবেছিলেন তার সঙ্গে মিত্রতা করবেন। কিন্তু এখন অন্যরকম মনে হচ্ছে। আমার সম্মান ও ভক্তির পাত্র হয়েছিলে তুমি। তোমার কথা শুনে সেই শ্রদ্ধা ভক্তি নষ্ট হয়ে গেল।

এই কথা বলে বৃদ্ধ আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। তখন পার্বতী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার মধ্যে কি বিপরীত ভাব দেখতে পেলেন, আমাকে বলুন। তখন বৃদ্ধ তাকে সব বললেন,

“তুমি তো সোনা ফেলে কাঁচের কদর করছো। চন্দন না মেখে কাদা মাখতে যাচ্ছো। হাতিকে বাদ দিয়ে বলদকে বাহন করতে চাইছ। গঙ্গার জল ফেলে দিয়ে কূপের জল পান করতে চাইছো। তুমি দেবতাদের বাদ দিয়ে দানব সহবাস চাইছো। তুমি দেবতাদের বাদ দিয়ে মহাদেবের প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। এটা কিন্তু লোকবিরুদ্ধ কাজ করছ।”

“হে কমলনয়না, তুমি কোথায় আর সেই শঙ্করই বা কোথায়? তোমার মুখ পূর্ণিমার চাঁদের মতো অতীব সুন্দর। আর শিব পাঁচমুখো, তোমার মাথার খোঁপা সৌন্দর্য আবর্তিত আর সেখানে শিবের মাথায় জটা। তোমার সারা গায়ে চন্দনের লেপন, কিন্তু শিব সারা গায়ে ছাই মেখে আছেন। তোমার গায়ে অলঙ্কার আর শিবের গলায় সাপ। এই দুয়ের কোন তুলনা হয়?”

“তোমার সব আত্মীয়রা দেবতা। আর অন্যদিকে মহাদেবের পরিজন হল ভূত, পিশাচের দল। তাই বলছি তোমার সঙ্গে শিবের কোনো তুলনা হয় না। এবং মহাদেবের কোনো সম্পত্তি নেই। তিনি তো শ্মশানে ঘুরে বেড়ান আর তুমি হলে গিরিরাজের কন্যা।”

তিনি সুন্দরী কন্যার পাত্র হবার কোন যোগ্যতা শিবের নেই। তাঁর কণ্ঠ বিষে পূর্ণ। তাকে সকলেই অনাদর করে। তাই তো তিনি বনে ঘুরে বেড়ান, তাঁর কোনো জাতের ঠিক নেই। কোন জ্ঞান বিদ্যাও তাঁর নেই। তাই তোমাকে বলছি তুমি তার সঙ্গে তোমার মনের যোগ ছিন্ন কর। অন্য কোন দেবতাকে পতিরূপে গ্রহণ করো।

এমন ব্রাহ্মণের মুখে শিবের নিন্দা শুনে পার্বতী ক্রোধে জ্বলতে থাকলেন। তিনি বললেন, ব্রাহ্মণ আপনি শিবের বিষয়ে কিছুই জানেন না। আমার মনে হচ্ছে আপনি কোন ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ। যাইহোক শিবের প্রকৃত গুণ আমার কাছ থেকে শুনে নিন।

শিব পরম মঙ্গলময়, নির্গুণ, কখনো কখনো কারণবশে সগুণ হন। তিনি তো সদাশিব। তাই সকল বিদ্যাই তাতে অধিষ্ঠান করে। তাই তিনি পরমাত্মা এবং এইজন্য তাঁর বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। তার থেকেই প্রকৃতির উদ্ভব। তাই তার শক্তির হিসাবের প্রয়োজন কি?

যে নিত্য শিবের আরাধনা করে তার শক্তির বিকাশ হয়। তার সেবা করে মানুষ নিশ্চিত মৃত্যুকে জয় করে। তাই তিনি মৃত্যুঞ্জয়। যারা পাপী হয় তারা শিবের আসল তত্ত্ব জানতে পারে না। যারা শিবের প্রকৃত তত্ত্ব না জেনে তার নিন্দা করেন তার সকল পুণ্য নষ্ট হয়ে যায়।–পার্বতী ক্ষোভের সঙ্গে এই কথাগুলি বললেন। তারপর তার সখীকে বললেন, এই শিব নিন্দুকের মুখ আমি দেখতে চাই না। শিবের যে নিন্দা করে, আর যে সেই নিন্দা শোনে তারও

পাপ হয়। আমার মনে হচ্ছে এই বিপ্র আবার শিবনিন্দা করবেন। তাই চলো, আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।

পার্বতী তাঁর সখীদের সাথে চলে যাবার উদ্যোগ নিচ্ছেন, তখনই ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ শিবমূর্তি ধারণ করলেন, এবং পার্বতীর হাত ধরে তাকে আটকালেন।

এতদিন পার্বতী যে মূর্তির ধ্যান করেছেন, সেই মূর্তি তিনি চোখের সামনে দেখে লজ্জা পেলেন। তখন শিব তাকে বললেন, প্রিয়ে, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবে? আমি তোমার তপস্যায় প্রসন্ন হয়েছি। এখন বর চাও। এখন আমি তোমার প্রেমের দাস হলাম। এবার তুমি লজ্জা ত্যাগ করো। চলো আমার গৃহে নিয়ে যাই।

তখন লজ্জাবনত পার্বতীর হয়ে তার সখীরা মনের কথা বললেন–এখন আপনার অনুমতিতে পিতৃগৃহে যাচ্ছি। কীর্তিমান পুরুষেরা যেমন বিবাহ করেন, ঠিক সেই রীতিতেই আপনি আমাকে বিবাহ করে ঘরে নিয়ে আসুন।

সখীর মুখে উমার মনের কথা জানতে পেরে শিব বললেন, তাই হবে।

এই কথা বলে শিব সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। তপস্যায় শিবের সাক্ষাৎ পেয়ে পার্বতী নিজের গৃহে তথা হিমালয়ে ফিরে গেলেন।

পার্বতীর মনের বাসনা পূর্ণ করার জন্য মহেশ্বর নিজের বিয়ের উদ্যোগ শুরু করে দিলেন। তিনি সাতজন ঋষিকে ডাকলেন। তারা শিবের আহ্বানে কৈলাসে এলেন। সেই সপ্তর্ষির সঙ্গে অরুন্ধতীও এসেছেন।

তারা সকলে মহেশ্বরকে প্রণাম জানালেন এবং বললেন, হে দেবাদিদেব মহেশ্বর, আমাদেরকে আপনি ডেকেছেন কেন? আপনি তো স্বয়ং পরিপূর্ণ, তবুও আমাদের সৌভাগ্য হেতু, যদি কৃপা করেন, তাহলে আমাদের আদেশ করুন।

ঋষিদের কথা শুনে শিব খুশি হলেন। এবং বললেন–ঋষিরা সবসময় পূজ্য, আমি বর্তমানে গিরিরাজের কন্যা পার্বতীকে বিবাহ করতে চাই। তাই আপনারা ঘটকরূপে গিরিরাজের কাছে যান।

শিবের ইচ্ছাতে সপ্তর্ষি ও অরুন্ধতী গিরিরাজের কাছে গেলেন। হিমালয় নিজের প্রাসাদ থেকে দেখলেন–যেন সাতটি সূর্য এক সঙ্গে তার গৃহের দিকে আসছেন। এমন জ্যোতিষ্মন সেই ঋষিগণ, তিনি তাঁর পত্নী মেনকাকে ডাকলেন, এবং বললেন, আমার জীবন আজ ধন্য হলো, আমরা গৃহস্থ, তাই এই অতিথিদের সেবার ব্যবস্থা কর। ব্যবস্থাতে যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়।

ঋষিগণ প্রাসাদ সম্মুখে এসে হাজির হলেন। তখন গিরিরাজ সস্ত্রীক সঙ্গে এসে প্রণাম জানিয়ে তাদের প্রাসাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। পবিত্র স্থানে বসতে দিলেন। বললেন, হে ঋষিগণ, আজ আমার গৃহ ধন্য মনে হয়। আমার এই গৃহটি পবিত্র করতেই আপনারা এসেছেন। এখন আপনারা আদেশ করুন, আমি আপনাদের জন্য কি করতে পারি?

মহেশ্বরকে স্মরণ করে ঋষিগণ বললেন, হে গিরিরাজ তুমি ধন্য, এবং ভাগ্যবানও বটে। শিব পরোপকারের জন্য সন্তান সৃষ্টি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমাদের দ্বারা স্বয়ং শঙ্কর তোমার কন্যা পার্বতীকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। শিব জগৎগুরু সেই শিবের অনুগ্রহে তোমার কন্যা জগজ্জননী হবেন। সেই শিবকে তুমি কন্যা দান কর। তাহলে তোমার জন্ম সার্থক হবে।

ঋষিদের মুখে শিবের মনোবাসনা জানতে পেরে গিরিরাজ খুশি হলেন। তিনি পার্বতীকে নানা অলংকারে শোভিতা করে তাদের সামনে আনলেন। বললেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ, আজ আমি এই কন্যাকে ভিক্ষা দেব।

গিরিরাজের কথা শুনে ঋষিগণ প্রসন্ন হলেন এবং তারা গিরিরাজকে, বললেন, তোমার দুয়ারে আমাদের মত ভিক্ষুক যখন উপস্থিত হয়েছে তখন তুমি নিজেই দাতা আর পার্বতীকে ভিক্ষার বস্তুরূপে কল্পনা করেছ, তাহলে এর থেকে উত্তম আর কি হতে পারে? তোমার শিখরগুলো যেমন উচ্চ তেমনি তোমার মনও খুব উঁচু।

তারপর ঋষিগণ কন্যার প্রতি আশীষ বাণী উচ্চারণ করলেন, এবং মঙ্গল কামনা করলেন। তারপর বললেন, তুমি মহাদেবকে সুখী কর।

মেনকা সব শুনে চোখের জল দমন করতে পারলেন না। তাই দেখে অরুন্ধতী বললেন, তুমি পরম সাধ্বী, তোমার কন্যা আপন গুণেই মহাদেবের মন হরণ করেছে।

এই বলে তিনি হলুদ ও কুমকুম দিয়ে মেনকার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

ঋষিগণ চতুর্থ দিনে বিবাহের লগ্ন স্থির করলেন। গিরিরাজের কাছে বিদায় নিয়ে শিবের কাছে চলে এলেন। শিবের কাছে সকল কথা জানালেন। তখন শিব বললেন, আপনারাই এই বিবাহে পৌরোহিত্য করবেন। আপনারা আপনাদের শিষ্যদেরও সঙ্গে আনবেন। তারপর ঋষিগণ শিবকে প্রণাম করলেন এবং তারা তাদের আশ্রমে চলে গেলেন।

এতক্ষণ মহেশ্বর মহাকাশীতে ছিলেন।

তিনি নিজের বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য কৈলাস পর্বতে এলেন। নারদকে ডেকে পাঠালেন, শীঘ্র উপস্থিত হলেন দেবর্ষি। সব শুনে খুব খুশি হলেন। মহাদেব দেবর্ষিকে ভার দিলেন সবাইকে নিমন্ত্রণের জন্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেবগণ, যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, সিদ্ধাদি কেউ যেন বাদ না পড়ে। তারপর তিনি বললেন, যারা আমার বিয়েতে আসবেন না তারা কেউ আমার আত্মীয় নন।

নারদ খুব আনন্দিত হলেন। ত্রিভুবনের সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন। এরপরে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণ শিবের জন্য বহু উপহার পাঠিয়ে দিলেন, অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ এসে গীত, বাদ্য ও নৃত্য করতে শুরু করলেন। শিবকে সাজানোর কাজে নিমগ্ন হলেন।

শিব তো সব সময় পরিপূর্ণ। তাই তার বেশভূষা স্বতঃসিদ্ধ, এইজন্য তাঁর বেশভূষার কোন প্রয়োজন ছিল না। চাঁদ হল তার মুকুট। কপালের তৃতীয় নয়নটি হল তিলক। কানের কুন্তলটি তো ছিলই। গায়ে চন্দন লেপন করলেন, তাঁর সর্প নানারকম মণিময় অলঙ্কারে পরিণত হলো। শিবের প্রভাবে প্রকৃত বস্তুগুলি কৃত্রিমরূপ ধারণ করল। এইসবের পরে তার রূপ এমন সুন্দর হল যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

শিবের অনুচরগণ নানারকম সাজসজ্জা করল ও বাদ্য বাজাতে লাগল। শিবের বিয়েতে বরযাত্রী হবার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রমুখ দেবতাগণ আর সকল ঋষিগণ কৈলাসে হাজির হলেন। গঙ্গা, সাগর, নদী, তাঁরাও দিব্যরূপ ধারণ করে কৈলাসে এলেন। গান্ধর্ব চারণ, সিদ্ধ, কিন্নর, যক্ষ সকলেরই আজ খুব আনন্দ, সকলেই অপূর্ব পোশাক পরে এসেছেন।

শুভলগ্ন উপস্থিত হতেই কৈলাস থেকে সবাই হিমালয়ের উদ্দেশে রওনা দিলেন। শিব দেবতাদের আগে আগে যেতে বললেন। তখন বিভিন্ন রকমের বাদ্য-বাজনা, নানা ধরনের আতসবাজি পোড়ানো হতে লাগল। সে সত্যিই একটি অপূর্ব দৃশ্য! এমন বরযাত্রীর শোভাযাত্রা এর আগে কেউ কখনো প্রত্যক্ষ করেনি।

এদিকে গিরিরাজ হিমালয় তার সকল আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করেছেন। তাদের সাহায্য নিয়ে বিধিমতো মণ্ডপাদি তৈরি করেছেন। মণ্ডপে সাজানো হয়েছে, বিচিত্র সব তোরণ রঙবেরঙের পতাকা, কত ধরনের ফুলের মালা এবং বহু ধরনের গাছের পাতা। সেই সময় হিমালয় গৃহের শোভা সত্যিই অবর্ণনীয়।

গিরিরাজ কন্যা উমাকে সম্প্রদানের জন্য স্নান করানো হলো, তাকে নানা অলংকারে সজ্জিত করা হলো। সব আয়োজন শেষে ভৃত্য ও গন্ধমাদন গেলেন শিবকে আনতে। শিবের প্রতীক্ষায় রইলেন। গিরিরাজ ও তার আত্মীয়স্বজনেরা।

এমন সময়ে দেবাদিদেব তাঁর সকল বরযাত্রীদের নিয়ে গিরিরাজের ভবনের কাছে এসে পৌঁছিলেন। সেই মহাশব্দ শুনে গিরিরাজ নিজেকে ধন্য মনে করলেন এবং তিনি তার আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে আদর ও অভ্যর্থনা জানাতে প্রাসাদের বাইরে শিবের কাছে উপস্থিত হলেন। শিবের দলবল দেখে হিমালয়বাসীরা অবাক হয়ে গেলেন। আবার গিরিরাজের দলবল দেখে দেবতারাও অবাক হলেন।

এইভাবে গিরিদল আর শিবদলের মিলন ঘটল। বরযাত্রীর দল ক্রমশ আসছে। যখন এগিয়ে প্রায় গিরিরাজের গৃহের কাছে উপস্থিত। তখন গিরিরাজের পত্নী মেনকা নারদকে নিয়ে ছাদে দাঁড়ালেন এটা দেখার জন্য যে, তার মেয়ে উমা যাকে পাবার জন্য এতো তপস্যা করলো তিনি কত সুন্দর!

শিব অন্তর্যামী তিনি মেনকার অভিসন্ধি জানতে পেরে তার যাতে বুদ্ধিভ্রম হয় তেমন রূপ দেখালেন।

মেনকা সুন্দর সাজে সজ্জিত দেবতাদের দেখে ভাবলেন শিব এঁদের অধিনায়ক, তাঁকে নিশ্চয়ই আরো সুন্দর দেখতে হবে।

এই শোভাযাত্রার সামনে সামনে চলেছেন গন্ধর্বগণ। তারা সকলে নানা অলঙ্কারে সজ্জিত। তারা নানা রকম বাহনে চড়ে আসছে। কত বাজনা বাজছে। নানা রকম নৃত্য হচ্ছে। সেই গন্ধবদের নায়ক বিশ্বাসুকে দেখে মেনকা খুব খুশি মনে তাকে শিব ভাবতে লাগলেন। তখন নারদ বললেন, ইনি দেবতাদের একজন গায়ক। দেবর্ষির কথা শুনলেন মেনকা, এবং ভাবলেন শিব নিশ্চয়ই এর থেকেও সুন্দর হবে।

তারপর এলেন যক্ষের দল। তাদের অধিপতি কুবের। তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মেনকা তাহে শঙ্কর মনে করলেন।

নারদ বললেন, ইনি যক্ষরাজ কুবের।

তারপর এলেন বরুণ। যিনি রূপে সবার থেকে অধিক সুন্দর। তার দলবলও ততোটাই সুন্দর। তখন মেনকা ভাবলেন, এই শিবকে পেলে উমার জীবন সত্যিই সার্থক হবে। কিন্তু নারদের কথায় তিনি অবাক হলেন।

তারপরে এলেন যমরাজ। বরুণের থেকেও যমের শোভা অতুলনীয়। কিন্তু তিনিও শিব নন, নারদের মুখে এই কথা শুনে মেনকা বিস্মিত হলেন।

এরপরে ক্রমে ক্রমে দ্বিগুণ সৌন্দর্য নিয়ে এলেন ইন্দ্র, সূর্যদেব, চন্দ্রদেব, এঁদের পেছনে এলেন ব্রহ্মা। মেনকা তাঁকেই রুদ্র মনে করলেন। নারদ উত্তর দিলেন, ইনি শিব নন।

এদের পরে এলেন বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কমললোচন লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু, কোটি মদনের সমতুল্য তার লাবণ্য।

তাকে দেখে মেনকা স্থির করলেন, ইনিই শিব, আমার কন্যা সত্যিই ভাগ্যবান, নারদ বললেন, ইনি নারায়ণ। মেনকা অবাক হলেন এবং বললেন, বরযাত্রীরা যদি এতো সুন্দর হয় তাহলে শিব তো অতীব সুন্দর হবে।

নারদ বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন, শিব এদের সবার থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দর।

তারপর মহা আনন্দে এলেন ভৃগু, আদি মুনিগণ, গঙ্গাদি তীর্থগণ। সবার মুখে মুখে বেদধ্বনি, এঁদের মধ্যে বৃহস্পতিকে দেখে মেনকা ভাবলেন, ইনিই শিব, কিন্তু নারদ বললেন, ইনি শিব নন।

মেনকা নারদের কথা শুনলেন, এবং মনে মনে ভাবলেন যিনি বৃহস্পতির থেকেও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শিব কেমন হবেন?

ঠিক সেই সময় রুদ্র এসে দাঁড়ালেন। নারদ বলে উঠলেন, ইনিই শিব। তখন নারদ অঙ্গুলি দিয়ে শিবের অনুচরদের দেখিয়ে দিলেন। এরা সব ভূত, প্রেত, পিশাচ, কারো মুখ ছিল বাঁকা,

কারো আবার কদাকার। এদের বর্ণ ছিল কৃষ্ণ, এরা কেউ খোঁড়া ছিল, কেউ উ পায়ে হাঁটছে। কেউ সারাক্ষণ বাজে কথা বলছে। কেউ করতালি দিচ্ছে, কেউ নিন্দা করছে, কেউ ডমরু বাজাচ্ছে। তারা এমন ব্যবহার করছিল যাতে মেনকা এদের দেখে ভয় পান।

এদেরকে দেখে মেনকা সত্যিই ভীত হলেন। তার মন অস্থির হয়ে পড়ল। তারপরে তিনি পাঁচমাথা, তিন চোখ, দশ হাত, ভস্মমাখা, বাঘছাল পরা, পিনাক হাতে শিবকে দেখতে পেলেন। তিনি একটি ষাঁড়ের উপর চড়ে আসছেন। তখন নারদ অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন, ইনিই শিব।

ঝড়ে যেমন করে গাছ উপড়ে পড়ে তেমনি করে নারদের মুখে এই কথা শোনার পর মেনকা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফিরল এবং তিনি বললেন, তুই একি করলি? তোকে ধিক্ আর আমাকেও ধিক্! তারপরে তিনি শিব ও নারদকে তিরস্কার করলেন এবং উমাকেও নিন্দা করলেন।

নারদকে তিনি দোষারোপ করলেন। তার কারণ নারদই উমাকে শিবকে পাবার জন্য তপস্যা করতে বলেছিলেন। আপনি উমাকে বঞ্চনা করেছেন। এতে কারোর কোন ক্ষতি হবে না। ক্ষতি হবে আমার কন্যার, আমার গৃহের মর্যাদার।

মেনকা তখন যে ঋষিগণ শিবের জন্য উমাকে চাইতে এসেছিলেন তাঁদের অনুসন্ধানে রত হলেন। ক্রোধান্বিত হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন, প্রত্যেকের গোঁফ দাড়ি ছিঁড়ে ফেলবো। আর সেই মুনিদের সঙ্গে যিনি এসেছিলেন, বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী, তিনি এখন কোথায়? না, না এদের দোষ কোথায়? সব দোষের মূল তো আমার কন্যা।

সেই তো দেবতাদের ত্যাগ করে শিবকে বেছে নিয়েছে! সোনা ছেড়ে কাঁচকে বেছে নিয়েছে, চন্দন ফেলে কাদা মাখলো, হাঁসকে ছেড়ে কাককে ধরলো, সূর্যকে বাদ দিয়ে জোনাকির আলোকে বেছে নিল। সিংহের সেবা না করে শৃগালের সেবা করল।

হায়রে আমার কপাল, পার্বতী ধিক্, তোর বুদ্ধিকেও ধিক! এমন সন্তান হবার চেয়ে আমি বন্ধ্যা হলাম না কেন? পার্বতী যখন বনে তপস্যা করতে গিয়েছিল তখন তাকে বাঘ ভাল্লুকে খেয়ে নিলে ভালো হত। আজ আমি নিজেই তাকে মেরে ফেলব।

কাঁদতে কাঁদতে মেনকা আবার অচেতন হয়ে পড়লেন। এমন সময় ব্রহ্মা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তার কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে মেনকার জ্ঞান ফেরালেন। তারপর বললেন–মেনকা, তুমি শিবের যথার্থ রূপ দেখনি। তিনি স্বয়ং লোককর্তা, তিনি সকলকে পালন করেন, এবং তিনিই অন্তিমে সকলকে বিনাশ করেন।

ব্রহ্মার কথা মেনকা বুঝতে পারলেন না। তিনি বললেন, আপনারা পার্বতীকে বিনাশ করুন, কিন্তু শিবকে কন্যাদান করতে বলবেন না। মেনকার কথা সেখানে উপস্থিত সকল দেবতারা শুনলেন এবং তারা বললেন, শিব হলেন দুঃখনাশক এবং পরম ভগবান, আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা শিবের সঙ্গে তোমার কন্যা পার্বতীর মিলন দেখতে পাব।

দেবতাদের কথা শুনেও মেনকা তার মত পরিবর্তন করলেন না। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা আমাকে মেরে ফেল, আমি কিছুতেই কুরূপা শিবের হাতে আমার কন্যাকে দেবো না।

ঠিক সেই সময়ে সপ্তর্ষিরা এলেন, তাঁরা বললেন–আমরাই ঘটকরূপে এখানে এসেছিলাম। আমরা কখনোই বিরুদ্ধ কাজ করি না। শঙ্করের দর্শন লাভই আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমাদের শিব বরবেশে তোমার গৃহে উপস্থিত হয়েছেন, এর থেকে মঙ্গলের কিছু হয় কি?

মেনকা তবুও নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। বললেন, আজ আমি নিজে অস্ত্র দিয়ে পার্বতীকে মেরে ফেলবো; কিন্তু শিবের সঙ্গে বিয়ে দেবো না।

তারপরে গিরিরাজ এলেন এবং তিনি মেনকাকে বোঝালেন। বললেন, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, ঋষিগণ কি আমাদের অমঙ্গল চান? সকলেই তারা আজ আমার ঘরে, তুমি শিবকে জানো না, তাকে আমি চিনি, তিনি জগতের পালক তিনি জগতের পূজনীয়। দুঃখ করো না, বিবাহের লগ্ন পেরিয়ে যাচ্ছে, বিবাহের আয়োজন করো।

মেনকা গিরিরাজুকে বললেন, ওই মেয়ের গলায় দড়ি বেঁধে পর্বত থেকে সাগরে ফেলে দিয়ে সুখী হব, তবু শিবকে দান করব না। এই আমার শেষ কথা। আর যদি আমার কথা না শুনে শিবকে কন্যাদান কর, তাহলে আমি নিজে প্রাণত্যাগ করবো।

এমন সময় পার্বতী সেখানে এলেন। তিনি মায়ের কথা শুনে বললেন, তোমাকে কুবুদ্ধি আশ্রয় করেছে। ওই শিবই জগতের কারণ, উনিই ঈশ্বর, উনিই আশ্রয়, উনিই পালক, উনিই দেব

সনাতন। এখানে যতজন দেবতা এসেছেন তাদের সকলের প্রভু উনিই। শিবের হাতে তোমার এই কন্যাকে তুলে দিয়ে জীবন সার্থক করো। আর দুঃখ করো না।

তুমি শিব ছাড়া যদি অন্য কোন দেবতার সঙ্গে আমার বিয়ে দাও তাহলে আমি বিবাহ করবো না। আমি কায়মনোবাক্যে সেই শিবকেই পতিরূপে বরণ করেছি। এই কথার কোন নড়চড় হবে না। এই আমি সত্যি করে বলছি।

উমার মুখে এই কথা শুনে মেনকা ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হলেন। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি উমাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন।

মেনকার কাছ থেকে পার্বতীকে নারদ ও ঋষিগণ সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তখন মেনকা পার্বতীকে তিরস্কার করে বললেন, এই মেয়েকে নিয়ে আমি কি করি? ওকে বিষ খাইয়ে মারব। ওকে অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলব। আর তা নাহলে আমি নিজেই কূপে ঝপ দিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করবো।

তারপরে মেনকার রাগ একটু স্তিমিত হলে তিনি বললেন, আপনারা দেখুন এই মেয়ে কেমন বরের জন্য পাগল। যার মাতা পিতা নেই, কুল গোত্র নেই, রূপ ঐশ্বর্য নেই; এমনকি ঘরও নেই। বিদ্যা নেই, ধন নেই, বয়স নেই এমন পাত্রের হাতে কেউ কি তার কন্যা দান করবে?

এমন সময় বিষ্ণু এসে মেনকাকে বললেন, তুমি পিতৃগণের মানসী কন্যা। তাতে আবার ব্রহ্মাকুলজাত হিমালয়ের পত্নী। এমন ধর্মাধারভূতা হয়ে তুমি কি করে ধর্মত্যাগ করতে চাইছো? ব্রহ্মা, আমি ও ঋষিগণ কি বিরুদ্ধ কথা বলছি? তুমি একাই কি ঠিক বলছো? আসলে তুমি শিবতত্ত্বের কিছুই জান না। এই ত্রিলোকে কেউ তার রূপ বর্ণনা করতে পারবেন না। তার কারণ তিনি অজেয়, অমর, তাঁর প্রকৃত স্বরূপ নেই।

শ্রীহরি আরও বহু তত্ত্ব কথা শোনালেন মেনকাকে, মেনকা শান্ত হলেন।

তারপরে নারদ শিবের কাছে অনুরোধ করলেন তাঁর মনোহর রূপ দেখানোর জন্য। তখন মহেশ্বর তার সেই রূপ মেনকাকে দেখালেন।

মেনকা দেখলেন কোটি সূর্যের মতো সেই রুদ্রের বর্ণ, তাঁর ত্রিনয়নের শোভা অতি সুন্দর, মস্তকে কিরীট। পরিধানে বিচিত্র বসন, বদনে মধুর হাসি। আর বাহন ষাঁড়েরও শোভা অবর্ণনীয়।

তার মাথায় ছাতা ধরেছেন স্বয়ং সূর্য, চন্দ্র চামর ব্যজন করছেন, নাচছে অষ্টসিদ্ধি, গঙ্গা যমুনাদি, তীর্থগণ চামর ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, শিবের জয়ধ্বনি করছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, গন্ধর্বাদিগণ গান গাইছেন, সকল অপ্সরাগণ নাচছেন।

মহেশ্বরের এই রূপ দেখে মেনকা হতবাক হয়ে গেলেন। তারপর নিজের কন্যার প্রশংসা করতে লাগলেন। দেবতারা শিবের যেমন বর্ণনা দিয়েছিলেন তা যথার্থই ছিল। তখন তিনি লজ্জিত হলেন। তারপরে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সেই সঙ্গে শিবের পূজা করলেন।

তখন হিমালয়ের ভবনে যত রমণী ছিলেন তারা সকলেই শিবকে দেখতে এলেন। সবাই তাদের কাজ ফেলে চলে এলেন শিবকে দেখবে বলে। শঙ্করের রূপ দেখে সবাই মুগ্ধ হলেন। সবাই বললেন, পার্বতী মহা ভাগ্যবতী। যিনি এমন রূপবান শিবকে পতিরূপে লাভ করেছেন। যে এই রূপ দেখবেন তার চক্ষু সার্থক হবে। তপস্যা ছাড়া এমন রূপবান শিবকে পতিরূপে লাভ করা অসম্ভব। পার্বতীর তপস্যা সার্থক হল।

রমণীগণরা চন্দনাদি দিয়ে শিবের পূজা করলেন। এরই মধ্যে মেনকা সুন্দর সাজে সজ্জিত হলেন। আনন্দের সঙ্গে শিবের সম্মুখে গেলেন এবং বিধিমতে পূজা করলেন।

তারপরে ব্রহ্মা ঋষিগণকে নিয়ে বিবাহের বেদীতে গেলেন। শিবকে সেই বেদীতে নিয়ে যাওয়া হল। গিরিরাজ মেনকাকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মার সঙ্গে ঋষিরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। তারা হর-পার্বতীর জয়গান গাইতে লাগলেন। তারপর হিমালয় শিবকে আহ্বান করে খাদ্যাদি সকল বিধিমত দান করলেন।

তারপর সেই বেদীতে আগুন জ্বালানো হলো এবং বিবাহের কাজ সুসম্পন্ন করা হলো। মালা বদল, অগ্নি প্রদক্ষিণ সকলই করা হলো, পরে শুভ স্বস্ত্যয়ণ করা হল সেই সময় সকল দেবতারা হর-পার্বতীকে নমস্কার করলেন এবং বললেন–হে ভগবান শিব, আপনিই জগতের পিতা আর আজ থেকে পার্বতী হলেন জগতের মাতা।

সেই সময় দেবতা, গন্ধর্ব, কিন্নর, অপ্সরাগণ পরম আনন্দে নাচ গান বাদ্য সহকারে মেতে উঠলেন। হিমালয় শিব সেনাগণকে বিধিমতে পূজা করলেন। পরে তিনি দেবতা ও ঋষিগণের সামনে এসে বললেন–আজ আমার জীবন সার্থক হল। এরপর মেনকাও এসে সকলের কাছে ক্ষমা চাইলেন। কারণ তিনি না বুঝেই শিবনিন্দা করেছিলেন। তিনিও বললেন–আমি ধন্যা,

আমার কন্যার জন্যই আমাদের কুল পবিত্র হল। যদি আমার এই কন্যা না জন্মাত, তাহলে আমার গৃহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ সহ দেবতারা আসতেন না। ধন্যা আমার কন্যা।

তারপরে মেনকা হাতজোড় করে বললেন–আমি যা করেছি, যা কুবাক্য বলেছি তার জন্য ক্ষমা করুন। গিরিরাজ ও তাঁর পত্নীর হাতে পূজা পেয়ে মহেশ্বর খুব খুশি হলেন এবং বললেন–হে গিরিরাজ, তুমি ধন্য, তোমার জীবন সফল হল। হে গিরিরাজ পত্নী তুমিও ধন্যা, যেহেতু তোমার গর্ভে পার্বতীরূপ রত্নের জন্ম হয়েছে।

তারপরে দেবতা ও ঋষিগণ সকলকে আশীর্বাদ করে বিদায় নিয়ে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন।

দেবী পার্বতী মহাদেবের সঙ্গে বৃষের পিঠে চড়ে কৈলাসের দিকে চললেন। গন্ধমাদন প্রভৃতি পর্বতগণ তাদের অনুগমন করলেন।

কালীর তপস্যা

শিব পার্বতীকে বিবাহ করে কৈলাসে আনলেন। পার্বতী রাজার কন্যা। শিবের নিজস্ব কোনো ঘর নেই। তিনি থাকবেন কোথায়? এতোদিন ঘরের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন ঘর না হলেই নয়, তাই বিশ্বকর্মাকে ডেকে ঘর নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হলো। তৈরি হল বিশাল প্রাসাদ। পার্বতী সেই প্রাসাদ দেখলেন এবং বললেন, মোটামুটি ঠিক আছে। তবে আমার বাবার প্রাসাদের থেকে সামান্য ছোটো। একেবারে নিরাশ্রয়ের থেকে এই ভাল। তিনি মহাদেবকে বললেন, যেদিন গৃহে প্রথম প্রবেশ করা হবে সেদিন যেন একটা যজ্ঞ করা হয়।

পার্বতীর কথা শুনে মহেশ্বর খুব খুশি হলেন। গৃহস্থদের মত তিনি যজ্ঞ করলেন। সেই যজ্ঞে ঋষিগণ, দেবতাগণ আর যতসব প্রমথগণও এলেন। মহা ধুমধামে যজ্ঞ ক্রিয়া শেষ হল, নানারকম ভক্ষ্য ভোজে সবাই খুশি হল।

উমা সেই গৃহে মহাদেবের সঙ্গে আনন্দে থাকতে লাগলেন। আগে শিব একা একা থাকতেন, 'বোম্ বোম্' করে ঘুরে বেড়াতেন। এখন তিনি পার্বতীকে নিয়ে গার্হস্থ জীবনযাপন করছেন। কারও কোনও কষ্ট নেই।

মহাদেব একদিন কথার ছলে পার্বতীকে 'কালী' বলে সম্বোধন করলেন। শিব একটু রসিকতা করেছিলেন কিন্তু উমা বুঝতে পারেন নি। তিনি মনে খুবই দুঃখ পেলেন। তখন তাঁর মনে দীনতা এলো। তিনি অভিমান করে বললেন–হে পরমেশ্বর, কোন গাছকে যদি কুঠার দিয়ে কেটে ফেলা হয় তখন কাটা জায়গা দিয়ে আবার কচি পাতা বের হয়। তারপর গাছটি বিশাল বৃক্ষের আকার ধারণ করে। কিন্তু কেউ যদি কটু কথা বলে কাউকে আঘাত করে তাহলে সেই মনোব্যথা দূর করা যায় না। মুখ থেকে যে বাক্যবাণ বেরোয় সেটা যখন আঘাত করে, আহত জন সব সময় মনোবেদনা ভোগ করে।

যিনি জ্ঞানবান হন, তিনি কখনও কটুবাক্য প্রয়োগ করেন না। হে নাথ, আজ তুমি ধর্ম অতিক্রম করলে আর কোনদিন যাতে তুমি আমাকে কালী' না বলতে পারো তার জন্য আমি তপস্যা করতে চাই। তুমি অনুমতি দাও।

এই বলে পার্বতী শিবের চরণে প্রণাম করলেন। তখন শিব কিছুক্ষণ চিন্তা করে উমাকে তপস্যার অনুমতি দিলেন।

স্বামীর অনুমতি পেয়ে উমা ব্যোমযানে উঠলেন। তারপর হিমালয়ে এক শৃঙ্গে একটি সুন্দর জায়গা পরিদর্শন করে সেখানে তপস্যায় বসলেন। তখন তিনি ভাবতে লাগলেন –একা তপস্যায় বসলে অনেক রকম বাধাবিঘ্ন আসতে পারে। তাই তিনি তাঁর চারজন সখীকে ডেকে পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, আর অপরাজিতা হাজির হলেন। খুব আনন্দের সঙ্গে তারা পার্বতীর সেবায় ব্রতী হলো।

একদিন শিবকে পাবার জন্য গিরিরাজের কন্যা একমনে কঠোর তপস্যায় মন দিলেন। পার্বতী যেমন তপস্যা করেছিলেন, এখন ঠিক তেমনি তপস্যা করলেন।

একদিন একটি বাঘ ঘুরতে ঘুরতে আশ্রমে ঢুকে পড়ল। সে দেখল একটি নারী একপায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করছে। তখন বাঘটি ভাবল–এই নারী তপস্বিনী, একে খাওয়া উচিত হবে না। তপস্যায় সিদ্ধ হলে এই নারী যখন বরলাভ করবে, তখন আমি একে খাইনি বলে আমিও বরলাভ করবো।

বাঘ যখন এই সমস্ত ভাবছে, তখন পার্বতীর চার সখী সেখানে ছিল না। সেই বাঘ তখন সেখানেই বসে রইলো। চার সখী আশ্রমে বাঘকে দেখে খুব ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু বাঘকে শান্ত থাকতে দেখে তারা যে যার কাজ করতে লাগলো।

বিধাতাকে প্রসন্ন করার জন্য পার্বতী কঠোর তপস্যা করছেন। এভাবে একশো বছর পার হয়ে গেল। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে উমার সামনে উপস্থিত হলেন।

ব্রহ্মা বললেন, আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট। এখন তুমি বল, কি প্রার্থনা তোমার?

ব্রহ্মার কথা শুনে দেবী পার্বতী খুব খুশি হলেন এবং বললেন, হে পদ্মাসন, আমাকে বর দেবার আগে এই বাঘটিকে বর দিন।

দেবীর কথা শুনে ব্রহ্মা সেই বাঘকে বর দিলেন–হে বাঘ, তুমি সানপত্য লাভ করবে। ভগবানে তোমার ভক্তি থাকবে আর সব জায়গাতেই তোমার জয় হবে।

বাঘকে ব্রহ্মা বরদান করার পর পার্বতীকে বললেন, এবার তুমি বর চাও। তুমি যা চাইবে আমি তাই দেবো।

তখন দেবী পার্বতী ব্রহ্মাকে বললেন, আমার গায়ের রঙ কালো, এই রঙকে আপনি সোনার বর্ণ করে দিন।

ব্রহ্মা বললেন–তাই হবে, এই বলে তিনি চলে গেলেন।

দেবী তখন কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি ত্যাগ করে সোনার প্রতিমার রূপ ধারণ করলেন। দেবী যে দেহটি পরিত্যাগ করলেন, সেখান থেকে আর একজন দেবীর উৎপত্তি হলো। সেখানে ইন্দ্র উপস্থিত হয়ে বললেন–হে দেবী, তোমার দেহকোষ থেকে উৎপন্ন এই দেবীর নাম হবে কৌশিকী, এই কৌশিকী আমার ভগ্নী হল। তাই আমি হলাম কৌশিক। হে পর্বত নন্দিনী, এই দেবীকে এখন আমাকে দাও।

পার্বতী ইন্দ্রের সব কথা শুনলেন, এবং তারপরে তিনি কৌশিকীকে ইন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন। ইন্দ্র তাকে নিয়ে আনন্দে বিন্ধ্যাচলে চলে গেলেন। বিন্ধ্যাচলের সৌন্দর্য দেখে দেবী খুব খুশি হলেন। বললেন–আমি এখানেই বাস করবো।

ইন্দ্র তখন দেবীকে সেখানেই স্থাপন করলেন। একটা সিংহকে এনে তার বাহন করে দিলেন। তারপর বললেন–হে দেবী, এই বিন্ধ্যপর্বত তোমার অধিষ্ঠানের জন্য ধন্য, আর পুণ্যক্ষেত্র রূপে পরিগণিত হবে। আর তুমি বিন্ধ্যবাসিনী নামে খ্যাত হবে। দেবতাগণ এখানে এসে যথাবিধিমতো তোমার পূজা করবে। সবার পূজা পেয়ে তুমি বিজয়িনী হবে। আর তুমি আমাদের শত্রুদের সংহার করবে।

এইভাবে দেবীকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করলেন ইন্দ্র এবং তারপরে তিনি নিজে ইন্দ্রপুরীতে ফিরে গেলেন।

পার্বতী এদিকে ব্রহ্মার বর লাভ করে খুব খুশি হয়েছেন। তিনি আনন্দে কৈলাসে গিয়ে মহেশ্বরের চরণে প্রণাম করলেন। পার্বতীকে দেখে শিব একেবারে অবাক। প্রেমপূর্ণভাবে তখন গৌরীকে আলিঙ্গন করলেন, পরিহাসছলে তিনি উমাকে কালো বলেছিলেন, আর সেইজন্যই আজ গৌরী স্বর্ণপ্রভা সমউজ্জ্বলা।

শিব পার্বতীর সঙ্গে কৈলাসে খুব আনন্দের সঙ্গে বাস করছেন। তাঁরা হাজার বছর ধরে রতিক্রিয়ায় রত হলেন, অগত্যা সবাই ছুটলেন ব্রহ্মার কাছে, সবার মুখে একই কথা, কেন এমন হল?

স্থির হয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন ব্রহ্মা। অন্তর্যামী দেখতে পেলেন হর- গৌরীর রতিক্রিয়ার ফলে এমন হচ্ছে দেবগণকে জানালেন সেই কথা। সেজন্য ত্রিভুবন আক্রান্ত।

ব্রহ্মা দেবতাদের এই কথা বলে চুপ করে গেলেন। শঙ্করের এই মোহ কীভাবে নাশ হবে তার উপায় তিনি বললেন–না। যতকাল শিবের এই মোহের সমাপ্তি না হয়, ততকাল তারা সেখানে অবস্থান করবেন বলে স্থির করেন।

শঙ্করের এই রতিক্রিয়া শেষ হলে নিশ্চয় তাঁর পুত্র হবে। হাজার বছর রতিক্রিয়ার ফলে যে পুত্র হবে, সে নিশ্চয় খুব তেজস্বী হবে।

এই সকল কথা ভেবে ইন্দ্র খুব ভয় পেয়ে গেলেন দেবতাদের এই আলোচনা শুনে। শঙ্করের পুত্র যদি খুব তেজীয়ান হয়, তাহলে সে যুদ্ধে ইন্দ্রকে হারিয়ে দিয়ে স্বর্গের সিংহাসন লাভ করবে। কাজেই আর দেরি করা উচিত নয়। সব দেবতাগণ চললেন কৈলাসের মন্দার পর্বতে কিন্তু শিবের প্রাসাদ ঘরে যেতে কেউ সাহস করছেন না। না জানি কি বিপদ ঘটবে।

সব দেবতারা ঠিক করলেন, তারা অগ্নিকে সেখানে পাঠাবেন। কারণ দেবতাদের মধ্যে সব থেকে ছোটো হল অগ্নি। সবাই তাকে ভৃত্যের মতো খাটায়।

সবার আজ্ঞায় অগ্নি ভয়ে ভয়ে শিবের দ্বারের কাছে গেলেন। সেখানে গিয়ে ভাবতে লাগলেন সেখানে তিনি ঢুকবেন কি করে, কারণ দ্বারদেশে দ্বারপালিনিরূপে নন্দী দাঁড়িয়ে আছেন, দেখে সবারই ভয় লাগে। বহু চিন্তা করলেন, কিন্তু তিনি কোনো উপায় বার করতে পারলেন না।

তিনি হঠাৎ করে দেখতে পেলেন একটি হাঁসের দল সেই দ্বারদেশ দিয়ে বাইরে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উপায় স্থির করে ফেললেন। ওই হাঁসগুলো সন্ধ্যায় যখন প্রসাদে ঢুকবে তখন তাদের সঙ্গে তিনিও হাঁসরূপে ঢুকে পড়বেন। সেই ভাবেই নন্দীকে ফাঁকি দিয়ে প্রাসাদে ঢুকে পড়লেন।

তারপরে হংস দেহে শঙ্করের মাথার কাছে গিয়ে বললেন–হে মহেশ্বর, আপনি কি করছেন? আপনার গৃহের দ্বারে কত দেবতা বসে আছেন, আপনি একবার গিয়ে দেখুন।

শঙ্কর এই কথা শুনে চমকে উঠলেন। তখন তিনি পার্বতীকে ছেড়ে অগ্নির সঙ্গে দ্বারের বাইরে এলেন। দেবতাদের দেখলেন। তিনি দেখলেন তার অপেক্ষায় সবাই দাঁড়িয়ে আছেন।

শিবকে দেখতে পেয়ে দেবতারা তাঁকে প্রণাম করলেন। মহেশ্বর তখন বললেন, আপনারা কিসের জন্য এসেছেন? যদি কোনো বরের প্রয়োজন থাকে, তাহলে আমি এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি।

তখন দেবতারা বললেন, হে ঈশ্বর, আপনি মহতি মৈথুন কাজে লিপ্ত আছেন। তা থেকে বিরত হোন।

মহেশ্বর বললেন, আপনারা যা চাইছেন তাই হবে। কিন্তু এই মৈথুনে এ পর্যন্ত যে রেতঃ সংগৃহীত হয়েছে, আপনাদের মধ্য থেকে কাউকে ধারণ করতে হবে।

শঙ্করের কথা শুনে দেবতারা একেবারে ভেঙে পড়লেন। মাথা নিচু করে সকলে উঠে পড়লেন। কারো মুখে কোনো কথা নেই। মহাবলবান শিব রেতঃ ধারণ করতে পারবে কে? তাই সবাই বিশেষ চিন্তাগ্রস্ত হলেন।

অগ্নিদেব সকল দেবতাদের অবস্থা নিরীক্ষণ করলেন। তিনি নিজে শিবের কাছে গিয়ে বললেন, হে মহেশ্বর, আপনার রেতঃ আমাকে দিতে পারেন।

শঙ্কর তার রেতঃ অগ্নিদেবকে দিলেন! অগ্নি তা পান করে পরিতৃপ্ত হলেন। তার পর শঙ্করকে সবাই প্রণাম করে যে যার গৃহে চলে গেলেন।

শিবের শুক্র পান করে ক্রমে ক্রমে অগ্নি হীনবল হয়ে পড়লেন। এইভাবে পাঁচ হাজার বছর কেটে যায়। অগ্নি আর সেই রেতঃ তেজ সহ্য করতে পারছেন না দেখে দেবতারা ভাবতে লাগলেন, কী করা যাবে। সবাই যুক্তি দিলেন পিতামহের কাছে যাবার।

অগ্নি ব্রহ্মলোকে চলেছেন। যেতে যেতে তাঁর কুটিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি সব ঘটনা বললেন–জলময় কুটিলাকে। তারপর অগ্নি অনুরোধ করলে কুটিলাকে বললেন, শিবের রেতঃ ধারণ কর। তুমি যদি এই কাজ কর তাহলে তোমার সুন্দর পুত্র হবে। সেই পুত্র সকলের কাছে প্রশংসা পাবে।

কুটিলা গিরিরাজের কন্যা, কুটিলা চিন্তা করে দেখল এমন সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। তখন অগ্নিকে কুটিলা বলল, শিবের রেতঃ তার জলে ফেলে দিতে।

কুটিলার কথা শুনে অগ্নি খুব খুশি হয়ে সেই রেতঃ ফেলে দিলেন কুটিলার জলে। কুটিলা আনন্দের সঙ্গে সেই রেতঃ ধরে রাখলেন।

অগ্নিদেব পাঁচ হাজার বছর ধরে রেখেছিলেন শিবের রেতঃ। তাই অগ্নির মাংস, মেদ, রক্ত, মজ্জা, রোম, চক্ষু, মাথার চুল, গোঁফ-দাঁড়ি পর্যন্ত সোনার মত হয়ে গেল। তখন থেকেই অগ্নিদেব 'হিরণ্যরেতা নামে খ্যাত হলেন।

কুটিলাও শিরেয় রেতঃ ধরে রাখলেন পাঁচ হাজার বছর ধরে। এতে তার গর্ভ পূর্ণ হল। কিন্তু তিনি এই গর্ভ ধরে রাখতে না পেরে ব্রহ্মার কাছে গেলেন, ব্রহ্মা তাকে দেখে বললেন, তোমার গর্ভ কে তৈরি করল?

কুটিলা তখন সব ঘটনা বলল। তিনি বললেন, আমি পাঁচ হাজার বছর ধরে আছি কিন্তু পুত্র প্রসব হচ্ছে না।

পিতামহ বললেন, তুমি উদয়াবনে যাও। সেখানে বিশাল শরবন আছে, সেখানে তুমি এই গর্ভ ত্যাগ কর, আরও দশ হাজার বছর পরে ওর থেকে পুত্রের জন্ম হবে।

ব্রহ্মা কথামতো কুটিলা উদয়াবনে গেল এবং সেখানে তিনি মুখ দিয়ে গর্ভ পরিত্যাগ করলেন।

এইভাবে দশ হাজার বছর কেটে গেল। সেই তেজের প্রভাবে উদয়াবনে বৃক্ষলতা, পশু-পক্ষী সবই সোনার মত রং হয়ে গেল। তারপরে সেই তেজঃ থেকে এক পুত্রের জন্ম হল। শিশুটি মুখে আঙুল দিয়ে 'উঙা উঙা' কাঁদতে লাগল।

বনের মধ্যে সেই সময় ছয়জন কৃত্তিকা ঘুরছিল। তারা শুনতে পেল একটি সদ্যোজাতের কান্না, তারা গিয়ে দেখল শিশুটি অপূর্ব সুন্দর, তারা ভাবল এমন জায়গায় সদ্যোজাত শিশু এল কেমন করে? কে ফেলে দিয়ে গেল? যাইহোক তারা সকলেই শিশুটিকে কোলে নিতে চাইল। সকলেই তাকে নিজের স্তনপান করাতে চাইল।

অগ্নিকে ডেকে ব্রহ্মা বললেন, গুহ নামে তোমার পুত্র হল সে কেমন হল। ব্রহ্মার কথা শুনে অগ্নি অবাক হলেন এবং ব্রহ্মাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি গুহ কাকে বলছেন? এই নামে আমি কাউকে চিনি না।

তখন ব্রহ্মা বললেন–তুমি যে শঙ্করের রেতঃপান করেছিলে এবং তুমি কুটিলাকে দিলে পরে কুটিলা তা শরবনে ফেলেছে, তা থেকেই পুত্র জন্মেছে, তারই নাম গুহ।

ব্রহ্মার কথা শুনে অগ্নি তাড়াতাড়ি শরবনের দিকে গেল। যেতে গিয়ে কুটিলার সঙ্গে দেখা হলো। কুটিলা জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোথায় যাচ্ছো?

অগ্নিদেব বললেন, শরবনে যাচ্ছি সেখানে আমার পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে।

কুটিলা শুনে বললেন, সে তো আমার পুত্র। তুমি তাকে ধরে রাখতে পারোনি বলে আমি তাকে ধরেছিলাম, কাজেই সে আমার পুত্র।

তুমি ঠিক বলেছো কিন্তু আমি যদি তোমাকে না দিতাম, তাহলে তুমি পেতে কেমন করে?

এইবারে দুজনে ঝগড়া করতে লাগলেন, তখন নারায়ণ জিজ্ঞেস করলেন কলহের কারণ।

অগ্নি বললেন–শঙ্করের তেজে শরবনে এক পুত্রের জন্ম হয়েছে, সেই পুত্র কার? এই নিয়েই আমাদের দ্বন্দ্ব।

নারায়ণ তখন তাদের শিবের কাছে যেতে বললেন। তিনিই বলতে পারবেন এই পুত্র কার।

দুজনেই তারা চলল শিবের কাছে। শিবকে প্রণাম জানিয়ে তাকে তারা জিজ্ঞেস করলেন, শরবনে যে পুত্রের জন্ম হয়েছে সেটি কার?

তাদের কথা শুনে শিব আনন্দে বললেন, আজ আমি পুত্রের মুখ দেখতে পাব।

পার্বতী সব শুনে বললেন, চলুন, আমরা এক্ষুনিই যাই সেই বালকের কাছে। সেই পুত্রকে দেখার জন্য আমার মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠেছে। আর বালকটিকে নিয়ে যখন এতো দ্বন্দ্ব তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে কে তার পিতা-মাতা।

উমার কথা শুনে শিব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন কুমারকে দেখার জন্য। সঙ্গে গেলেন গিরিজা, পাবক আর কুটিলা।

তাঁরা গিয়ে দেখলেন কুমার দুজন কৃত্তিকার কোলে শুয়ে আছেন। ছয়মুখ দিয়ে প্রত্যেকের স্তন্য পান করছে।

সেই কুমার তাদের প্রত্যেকের অভিসন্ধি বুঝতে পারলেন, তিনি কুমার মূর্তি দেখালেন শঙ্করকে। বিশাল দেহে দেখা দিলেন গিরিরাজকে। আর সুন্দর রূপ দেখালেন কুটিলাকে এবং

অগ্নিকে দেখালেন মহান রূপ। শঙ্কর, শঙ্করী, অগ্নি, কুটিলা সকলেই কুমারকে দেখে খুশি হলেন। কৃত্তিকাগণ তখন উপলব্ধি করলেন এই পুত্র শিবের।

শিব কৃত্তিকাগণকে বললেন, এই শিশু তোমাদের। তাই আমি এর নাম দিলাম কার্তিকেয়। আর এই শিশু কুটিলার কুমার, পার্বতীর স্কন্দ।–আর গুহ আর পাবকের মহাসেন। আর সে যেহেতু সারবনে জন্মেছে তাই তার নাম হবে সারস্বত।

নামকরণ করার পর শিব দেবতাদের এবং ব্রহ্মাকে স্মরণ করলেন। তারা সকলে এসে হর পার্বতীকে প্রণাম জানালেন। এবং তারা ছয় মুখ যুক্ত শিশুকে দেখে অবাক হলেন। তার দেহ থেকে সূর্যের জ্যোতি বের হচ্ছে।

অগ্নিকে সকল দেবতারা বললেন, হে পাবক, এই বালকের দেবকার্য অভিষেক কার্য সমাধা কর আমরা এখন কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী তীর্থে গিয়ে এই কুমারের অভিষেক করব। এই কুমারের জন্য আমরা বহুকাল প্রতীক্ষা করে আছি। এই কুমারের হাতেই মরবে তারকাসুর।

শিব দেবতাদের কথায় খুব খুশি হলেন। দেবতাগণ তখন কুমারকে নিয়ে কুরুক্ষেত্রে গেলেন। মহা ধূমধামে সেখানে ঋষি ও ব্রহ্মা অভিষেক করলেন কুমারের। তাঁকে অনেক বনৌষধি ও সাত সমুদ্রের জল ঢেলে স্নান করানো হলো। অভিষেক অনুষ্ঠানে সন্দর্য ও চারণগণ মধুর গীত গাইলেন এবং নানারকম বাদ্য বাজালেন।

উমা তার স্কন্দকে কোলে নিলেন এবং তাকে আদর করলেন এবং চুমু খেলেন। শিব, কুটিলা, অগ্নি সবাই খুব আনন্দিত হলেন। তারপর সেই কুমারকে দেবসেনাপতি পদে বরণ করা হলো। শিব, ব্রহ্মাদি এবং সকল দেবতারা সেই কুমারের সাহায্যের জন্য বহু বাণকে উপহার দিলেন। কার্তিকের বাহনের জন্য গরুড় তাঁর পুত্র ময়ূরকে দিলেন। তারপর সেই কুমার পিতা-মাতাকে প্রণাম করলেন। বিষ্ণু, ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে প্রণাম জানিয়ে ময়ূরের পিঠে চড়লেন এবং তারকাসুরকে বিনাশ করবার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

বিশ্বোৎপত্তি ও তার মাহাত্ম্য

বৈকুণ্ঠপুরীতে একদিন লক্ষ্মী নারায়ণ বসে আছেন সিংহাসনে। একসময় দেবী লক্ষ্মী নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলেন –তুমি আমাকে খুব ভালবাস, কিন্তু আমার চেয়েও কি তোমার কোনো প্রিয় ভক্ত আছে? এ জগতে তোমার সবচেয়ে প্রিয় কে?

দেবীর প্রশ্ন শুনে শ্রীহরি হাসলেন এবং বললেন, তুমি আমার প্রাণপ্রিয়া। কিন্তু যে জন ভক্তিভরে সর্বদাই আমার কথা চিন্তা করে সেই জনই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আমি তার হৃদয়ে সব সময় বিরাজ করি। যদি সে কখনো আমাকে ভুলে যায়, তবুও আমি তাকে ত্যাগ করি না। এমন ভক্তি একমাত্র শিবের আছে। তাই শিবই আমার সবচেয়ে প্রিয়।

আর যিনি শিবের পূজা করেন, তিনি আমার কাছে শিবের চেয়েও প্রিয়। যে শিবপূজা করে না তাকে আমি অতিশয় দুর্জন মনে করি। তার উপর সব সময় ক্রোধিত হয়ে থাকি। সে জপ, তপ, পূজা যাই করুক না কেন, সে কোনো কিছুতেই ফল পাবেনা। শিবকে পূজা করলে মঙ্গল হবে, তা না হলেই বিপদ আসবে।

হরির মুখে লক্ষ্মীদেবী সব কথা শুনলেন এবং তিনি নিজেকে অভাগিনী মনে করলেন। বললেন, আমার জীবন বিফলে গেল। আমি কখনই শিবকে পূজা করিনি। আমার বেঁচে থেকে লাভ কি?

শ্রীহরি দেবী লক্ষ্মীকে বললেন, দুঃখ করো না। এতে তোমার কোনো দোষ নেই। আমি তোমার কাছে কখনও শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন করিনি, তাহলে তুমি জানবে কি করে। এবার থেকে রোজ তুমি শিবের পূজা করো। যদি পদ্মফুল দিয়ে শিবের পূজা কর তাহলে শিব তুষ্ট হবেন। শিব তুষ্ট হলে অন্যান্য দেবতারাও তুষ্ট হবেন। শিবের অর্চনা করলে সবার অর্চনা করা হয়।

নারায়ণের কথামতো লক্ষ্মীদেবী প্রত্যেকদিন শিবের পূজা করলেন। তিনি একশো পদ্মফুল দিয়ে একবছর ধরে পূজা করবেন ঠিক করলেন। দেবী নিজে প্রত্যেকদিন শত পদ্ম গুণে আনেন এবং তা গঙ্গাজলে ধুয়ে নিয়ে তা দিয়ে ভক্তিভরে পূজা করেন। এইভাবে একদিন বছরের শেষ দিন এল। প্রত্যেকদিনের মত দেবী শত পদ্মফুল তিনবার ধরে গুণে নিয়ে গঙ্গাজলে ধুয়ে পূজায় বসলেন।

লক্ষ্মীদেবীকে পরীক্ষা করার জন্য ত্রিলোচন দুটি পদ্ম লুকিয়ে রাখলেন।

এদিকে এক একটি করে পদ্মফুল লক্ষ্মীদেবী শিবলিঙ্গের উপরে স্থাপন করে পূজা করছেন।

হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন দুটি ফুল কম পড়ছে। তখন তিনি মনে মনে ভাবলেন, কে আমার পূজার পদ্ম চুরি করে নিল? তাহলে কি আমি গোণার সময় অন্যমনস্ক ছিলাম। আমার এই পূজা বিফল হবে। এখন দুটো পদ্ম কোথায় পাব? আর যদি পাওয়া যায় তাহলে অন্যের দ্বারা আনাতে হবে। প্রত্যেকদিন আমি নিজের হাতে ফুল তুলেছি, আমাকে ব্রতের শেষ দিন অন্যের দ্বারা চয়নিত ফুল পূজায় ব্যবহার করব? আর আমি যদি আসন ছেড়ে উঠি, তাতে পূজায় বিঘ্ন হবে। তাহলে এখন কি করা যায়।

তারপরে লক্ষ্মীদেবীর একটা কথা মনে পড়ে গেল। একদিন শ্রীহরি বলেছিলেন, লক্ষ্মীদেবী যেন একটি ফুল্লসরোবর। আর এই সরোবরে তোমার দুটি স্তন যেন দুটি কমল। শ্রীহরি কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। কাজেই এই দুই স্তনপদ্মে আমি শিবের পূজা করব।

এই কথা ভেবে দেবী ছুরিকা নিলেন। সেই দৃশ্য দেখে স্তনদ্বয় যেন বলছে তব অঙ্গে জন্মে আমাদের জীবন ধন্য হয়েছে, আবার যদি আমাদের দিয়ে শিব পূজা কর তাহলেও আমাদের জীবন সার্থক হবে।

দেবী স্তনদ্বয়ের অন্তরের কথা শুনে বললেন–হরি আর শঙ্করের যেমন কোনো ভেদ নেই, তেমনি পদ্মের সঙ্গে তোমাদেরও কোনো পার্থক্য নেই।

এই বলে দেবী বামহাতে স্তন ধরলেন, এবং ডান হাতে ছুরি দিয়ে তা কেটে ফেললেন। এবং তা শিবলিঙ্গের উপর দিলেন। তিনি পঞ্চাশর মন্ত্র উচ্চারণ করে পূজা করলেন। তারপর অন্য স্তনটিও ছেদন করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখন অকস্মাৎ শিব দিব্যমূর্তি ধারণ করে সেই সোনার লিঙ্গের উপর দাঁড়িয়ে দর্শন দিলেন দেবীকে।

তাঁর সারা গায়ে ভস্ম মাখা, ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ শিবের জটাজুট, এবং সহাস্যবদন, কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম নাস-যজ্ঞ উপবীত, হাতে ত্রিশূল তুলে দেবী লক্ষ্মীকে তিনি বললেন–দেবী তুমি তোমার স্তন ছেদন করো না। তোমার অন্তরে যে আমার প্রতি ভক্তি আছে তা আমি আগেই বুঝেছি, তোমার ছেদন করা স্তনটি আবার আগের মত হয়ে যাবে। আর আমার লিঙ্গের উপর যে, স্তন দিয়ে তুমি পূজা করেছ, তা বৃক্ষরূপে জন্মাবে তার নাম হবে শ্রীফল। যতদিন ধরাতলে চন্দ্র সূর্য উদয় হবে, ততদিন ধরে গোটা জগৎবাসী তোমার গুণগান করবে।

শ্রীফল অর্থাৎ বিপত্রে আমার পূজা করলে আমি সন্তুষ্ট হব। আমার স্বর্ণলিঙ্গ তৈরি করে সোনা, রুপো, মুক্তো দ্বারা পূজা করলে আমি সন্তুষ্ট হব না। কিন্তু কেউ যদি বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করে তাহলে আমি তুষ্ট হবো। আমার লিঙ্গের উপর ভক্তিভরে কেউ যদি বিল্বপত্র দেয় এবং পূজা করে, তাহলে তাকে আমি মোক্ষ প্রদান করবো।

দেবী শঙ্করের স্তব-স্তুতি করলেন। শিব তখন দেবীকে বললেন, তোমার পূজায় আমি তুষ্ট এখন তুমি কি বর চাও বলো।

লক্ষ্মীদেবী শঙ্করকে বললেন, ভাগ্যবলে আপনার দেখা পেলাম, আর কোনো বরের প্রয়োজন নেই। আপনার কাছে একটি বর চাই, সারাজীবন আপনাতে যেন আমার ভক্তি অটুট থাকে।

শিব বললেন, তাই হবে। তিনি লক্ষ্মীদেবীর কাটা স্তনটি নিয়ে ত্রিশূলের দ্বারা মাটিতে পুঁতে দিলেন। তারপর সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।

স্তন পদ্মবীজ আস্তে আস্তে অঙ্কুরিত হল। সেটি ক্রমে বৃক্ষরূপ ধারণ করে। অপূর্ব সুন্দর তার পাতা, একটি বৃন্তে তিনটি পাতা।

সেই বৃক্ষকে দেখবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং সকল দেবতাগণ এলেন। সকলে সেই বিল্বপত্রকে প্রণাম করলেন।

নারায়ণ সকলকে বললেন, এই বিপত্রের উপরের পত্রটি স্বয়ং শিব, বামপত্রে ব্রহ্মা আর দক্ষিণ পত্রে আমার অধিষ্ঠান। এই বিপত্রে কেউ পা দিলে বা স্পর্শ বা লঙ্ঘন করলে তার মৃত্যু নিশ্চিত। সূর্য ও গণেশের পূজা এই পত্র দিয়ে করা যাবে না। যেখানে এই বৃক্ষ থাকবে তা বারাণসী সমান পুণ্যস্থান হবে। সেখানে মহেশ্বরের সঙ্গে উমা বিরাজ করবেন। বিল্বপত্র দিয়ে শিব পূজা করলে লক্ষ ধেনুদানের ফল পাওয়া যাবে। বিল্ববৃক্ষ কখনও ছেদন করা যাবে না বা একে পোড়ানো চলবেনা। চৈত্র থেকে চার মাস বিল্বপত্র এবং জল দান করলে পিতৃকুল পরিতৃপ্ত হয়।

বিপত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন জনার্দন। পরে ব্রহ্মা ও আদি দেবতাগণ সেই বিপত্রের দ্বারা মহেশ্বরের পূজা করলেন। তারপর যে যার নিজ স্থানে চলে গেলেন।

গণেশের বিবাহ

দেবতারা প্রত্যেকে খুব সুন্দর দেখতে, কিন্তু গণেশ হলেন গজানন। তাঁর হাতির মতো মুখ। তাই কার্তিকের থেকে এই পুত্রের প্রতি মা বাবার স্নেহ একটু বেশি। গণেশও চেষ্টা করেন তাঁর বাবা মাকে খুশি করতে। কার্তিকও মা-বাবার সেবায় সততই নিয়োজিত থাকে।

দেবী হৈমবতী শঙ্করকে বললেন, ছেলেরা যুবক হয়ে উঠেছে, এখন তাদের বিয়ে দেওয়া উচিত।

শিব বললেন, তুমি ঠিক বলেছো, দুই পুত্রই আমাদের কাছে সমান প্রিয়। তাহলে কার আগে বিয়ে দেব?

কার্তিক গণেশের চেয়ে বড়ো তাহলে কার্তিকেরই আগে বিয়ে দেওয়া উচিত। হরপার্বতী দুজনে মিলে একটা যুক্তি করলেন, এবং সেই মতো তাদের দুই ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। ছেলেরা দুজনেই হাজির হলেন তাদের সামনে এবং প্রণাম জানালেন।

মহেশ্বর পুত্রদের বললেন–তোমরা দুজনেই আমাদের কাছে সমান। আমরা ঠিক করেছি যে আগে পৃথিবী পরিক্রমা করে আসবে, তার আগে বিয়ে হবে।

বাবার কথা শুনে কার্তিক খুব আনন্দিত হলেন। তার ময়ূর বাহন আছে, তিনি চড়ে বসলেন ময়ুরের পিঠের উপর। উড়ে চলল ময়ূর। মনে তার বিশ্বাস ছিল যে তিনি এই পরীক্ষায় জয়ী হবেন। গণেশ এই পরীক্ষায় জয়ী হতে পারবেন না, কারণ তার বাহন মুষিক গণেশের ভার বহন করতে পারবে না, তো তাকে বয়ে নিয়ে যাবে কি করে? আর নিয়ে গেলেও কতটুকু নিয়ে যাবে?

গণেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, ভাবলেন বাবা-মার এই নিয়মে দাদারই জয় হবে। আমার-দ্বারা এই কাজ সম্ভব নয়। দাদাই জয়ী হবে তোক দাদার আগে বিয়ে আমি না হয় পরে বিয়ে করব। আমার বাহন

তো আমাকে নিয়ে চলতেই পারবে না; আর যদি হেঁটে যেতে যাই তাহলে তো হাঁপিয়ে পড়ব।

গণেশ এইসব ভেবে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তারপরে তার মনে পড়ল শাস্ত্রের কথা। পিতা-মাতার চরণ পূজা করে প্রদক্ষিণ করলে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল লাভ হয়।

এই কথা ভেবে তিনি মনে মনে প্রফুল্লিত হলেন। যথাবিধি স্নান করে পিতা-মাতাকে একটি পবিত্র আসনে বসিয়ে ভক্তিভরে আনন্দের সঙ্গে পূজা করলেন। তারপরে সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন। জোড়হাতে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

পুত্রের কীর্তি দেখে হর-পার্বতী খুব খুশি হলেন।

তারপরে গণেশ বললেন, হে পিতঃ, হে মাতঃ, আপনারা বলেছিলেন, যে আগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে তার আগে বিয়ে দেবেন। তাহলে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন।

শঙ্কর গণেশের সব কথা শুনলেন। বললেন, তুমি তো নিয়ম পালন করোনি। তাহলে কি করে তোমায় আগে বিয়ে দেবো? তুমি আগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এসো। কার্তিক চলে গেল সেই উদ্দেশ্যে আর তুমি তো শুরুই করলে না।

পিতার কথা শুনে গজানন বললেন, আমি তো সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলাম। এই যে আমি আপনাদের চরণ পূজা করে সাতবার প্রদক্ষিণ করলাম এতে কি আমার পৃথিবী প্রদক্ষিণ হল না? আর যে পিতা-মাতার পূজা না করে পুণ্যের আশায় তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে তার কি পৃথিবী প্রদক্ষিণ হয়? পুত্রের প্রধান তীর্থ পিতা-মাতার পাদপদ্ম। তেমনি স্বামীই পত্নীর পরম তীর্থক্ষেত্র। এখন আমি আপনাদের প্রদক্ষিণ করলাম। এতো পৃথিবী পরিক্রমা হল আর যদি না হয়ে থাকে তাহলে বেদবাক্যকে মিথ্যা বলতে হয়।

শিব-দুর্গা–গণেশের কথা শুনে অতীব বিস্মিত হলেন। তারা বললেন, গজানন তুমি ঠিক বলেছো, বেদবাক্য কখনও মিথ্যা হয় না।

শিব বিশ্বরূপের দুই কন্যা সিদ্ধি আর বুদ্ধির সঙ্গে গণেশের বিয়ে দিলেন। তারা দুজনেই ছিলেন সর্বসুলক্ষণা, মনোরমা, সুবদনী। শিব বিশ্বকর্মাকে ডেকে পাঠালেন। বিশ্বকর্মা এলেন, এবং শিবের ইচ্ছায় বিচিত্র রকমের ফুল, লতা-পাতা আর অলঙ্কার দিয়ে একটি সুন্দর সভাগৃহ সাজানো হল। সেই বিয়েতে এলেন দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, ঋষিগণ।

তারপরে সেখানে সিদ্ধি ও বুদ্ধিকে আনা হল শুভক্ষণে। সকল অতিথিরা আনন্দিত হলেন, গণেশও খুব খুশি হলেন। কিছুদিন পরে সিদ্ধির গর্ভে জন্ম নিল লক্ষ, এবং বুদ্ধির গর্ভে জন্ম নিল লাভ নামে পুত্র। গণেশের দুই পুত্রের জন্ম হল।

এইভাবে গজাননের সংসার-জীবন মহানন্দে কাটতে লাগলো। এদিকে সারা পৃথিবী ঘুরে কার্তিক এলেন কৈলাসে। কার্তিককে ডেকে নারদ জানালেন যে, গণেশের বিয়ে হয়ে গেছে। তোমাকে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ছলে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে তোমার বাবা মা তাদের প্রিয় পুত্র গণেশের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। বিশ্বরূপের দুই কন্যাকে গণেশ বিয়ে করে খুব সুখে আছে। বর্তমানে তার দুটি সন্তানও হয়েছে। আর তুমি এতো কষ্ট করে পৃথিবী ঘুরে এলে! বাবা মা অন্যায় করলে কি করবে নিজের? অন্যের কথা আর কি বলব, মা যদি ছেলের মুখে বিষ তুলে দেয়, বাবা যদি ছেলেকে বিক্রি করে আর রাজা যদি সব, চুরি করে নেয়, তাহলে কার কাছে গিয়ে প্রতিবাদ করবে?

দেখ ষড়ানন! যারা তোমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে তাদের মুখ দেখা উচিত নয়। আমি তোমাকে সব বললাম, এবার তোমার যা ইচ্ছা তাই করো।

নারদের কথা শুনে কার্তিক খুব দুঃখ পেলেন। তারপরে রেগে গিয়ে হর-পার্বতীকে প্রণাম করলেন এবং চলে গেলেন ক্রৌঞ্চ পর্বতের কাছে।

হর-গৌরী ছেলেকে চলে যেতে দেখে তারা ডাকতে লাগলেন, তুমি এইমাত্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এসেছ, এখন তোমার বিবাহ দেবো। কিন্তু তুমি আমাদের কিছু না বলে চলে যাচ্ছ কেন?

তখন কার্তিক রেগে গিয়ে বললেন, আমাকে আপনারা ছল করে পৃথিবী পরিক্রমা করতে পাঠিয়ে দিয়ে গণেশের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

এই কথা বলেই কার্তিক চলে গেলেন ক্রৌঞ্চ পর্বতে। সেখানেই রয়ে গেলেন। পিতা-মাতার উপর রাগ করে আর বিয়েই করলেন না। সেইজন্য তার আর এক নাম হলো ‘কুমার।

শাস্ত্রে আছে–কার্তিকী পূর্ণিমার কৃত্তিকা নক্ষত্রে কুমারকে দর্শন করলে সর্বপাপ নষ্ট হয় আর সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

অর্জুনের তপস্যা

দুর্যোধনের সঙ্গে পাশা খেলায় পরাজিত হন পঞ্চপাণ্ডব। তারা পরাজিত হয়ে রাজত্ব হারিয়ে দ্রৌপদীর সঙ্গে অরণ্যমধ্যে বাস করতে লাগলেন। পঞ্চপাণ্ডবের কুটিরে একদিন উপস্থিত হলেন ব্যাসদেব। তাকে দেখে পঞ্চপাণ্ডবরা খুশি হলেন এবং তার পূজা করলেন, এবং তাঁকে নিজেদের মনের কথা জানালেন। বললেন, আজ আমরা ধন্য হলাম। আজ আমাদের জন্ম সফল হল। দুর্যোধন আমাদের খুব কষ্ট দিয়েছে, এখন আপনার দর্শন পেয়ে আমাদের সকল কষ্টের অবসান হলো।

ব্যাসদেব বললেন, যারা সুজন ব্যক্তি তারা প্রাণান্তের পরও পবিত্র ধর্ম ত্যাগ করেন না। তোমাদের পিতার মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্র তোমাদেরকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন। কিন্তু পরে দুর্যোধনের প্ররোচনায় ধৃতরাষ্ট্র তোমাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। এই সংসারে যেপ্রকার বীজ বপন করা হয় তেমনই অঙ্কুর হয়। দুঃখ করো না, তোমাদের ভালোই হবে।

যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে বললেন, প্রভু আমাদের এই দুঃখ দূর করার জন্য কোনো উপদেশ দিন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন শঙ্করের আরাধনা করতে, কিন্তু আমরা করিনি। আপনি বলুন, এখন আমাদের কী করণীয়।

ব্যাসদেব বললেন, আমি সবসময় শিবের সেবা করি, তোমরাও শিবের সেবা কর। তারপরে ব্যাসদেব বিচার করে বললেন, তোমাদের মধ্যে অর্জুনই শিবপূজার যোগ্য ব্যক্তি। কারণ অর্জুন নবরূপী পুরাতন মুনি। হে অর্জুন, তুমি ইন্দ্রনীল পর্বতে গিয়ে শিবের তপস্যা কর।

ব্যাসদেবের উপদেশ মতো অর্জুন গেলেন ইন্দ্রনীল পর্বতে। সেখানে সুন্দর অশোকবনে শিবলিঙ্গ তৈরি করলেন। তারপর ব্যাসদেবের উপদেশমত ত্রিকালীন স্নান এবং নানারকম পূজা করলেন এবং তপস্যা শুরু করলেন। সেই তপের ফলে অর্জুনের মাথা থেকে তীক্ষ্ণশ্বর বেরোতে লাগল। দেবতাগণ তা দেখে ভয় পেলেন। তারা ইন্দ্রের কাছে গেলেন।

ইন্দ্র তার নিজের পুত্র অর্জুনের অভিপ্রায় জানতেন। তাই দেবতাদের কাছে তার পরিচয় গোপন করে এক আশ্চর্যরূপ ধারণ করে তিনি অর্জুনের কাছে গেলেন।

অতি বৃদ্ধ জরাজর্জর, জটাধারী হয়ে হাতে লাঠি ধরে টলতে টলতে ইন্দ্র অর্জুনের কাছে গেলেন। অর্জুন তাকে দেখতে পেয়ে বসতে দিলেন, এবং তার পূজা করলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন তার পরিচয়।

ইন্দ্র নিজের কোন পরিচয় দিলেন না। বললেন, তুমি এই নবীন বয়সে কেন তপস্যা করছ? তুমি নিশ্চয় সুন্দরীর আকাঙ্ক্ষায় তপস্যা করছ না, কাউকে নিশ্চয় জয় করতে চাইছো?

বৃদ্ধের জিজ্ঞাসা শুনে অর্জুন সব কথা খুলে বললেন। তখন ইন্দ্র অর্জুনের মনোরথ অবগত হয়ে বললেন, তুমি সুখের জন্য এই তপস্যা করছ। এটা কিন্তু তুমি ঠিক করনি, কারণ লৌকিক সুখ স্বপ্নতুল্য, বরং তুমি মুক্তির জন্য তপস্যা করতে চাইলে কর।

অর্জুন বৃদ্ধের কথা শুনে রেগে গিয়ে বললেন, আমি মুক্তি চাই না। আপনি কিজন্য আমার তপস্যায় বিঘ্ন করতে এসেছেন, এখন আপনি যেতে পারেন।

অর্জুনের কথা শুনে ইন্দ্র নিজের স্বরূপে দেখা দিলেন। অর্জুন তখন খুব লজ্জা পেলেন। তখন ইন্দ্র হেসে অর্জুনকে বললেন–তুমি ধন্য। তুমি কৃতার্থ, তোমার মন ও নিশ্চয় দেখছি। তাই তোমাকে বলছি–দুর্যোধনাদি শত্রুগণ অতীব বলিষ্ঠ, দ্রোণ, ভীষ্ম কর্ণাদি বীর জগতে অজেয়। তাদেরকে জয় করা আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়। শিব ছাড়া অন্য কেউই এদের জয় করতে পারবে না। তাই তুমি শিবেরই ভজনা কর। তবে তুমি সিদ্ধিলাভ করতে পারবে। খুব সাবধান হয়ে তপস্যা করবে। ইন্দ্রের নির্দেশে অর্জুন আবার ঘোরতর তপস্যা শুরু করলেন। পরম যোগীর মত এক পায়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে– তাকিয়ে বার বার মন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

অর্জুনের তপস্যা তেজ দেখে বিস্মিত হলেন দেবতারা, পরে দেবতারা শিবের কাছে গিয়ে বললেন, প্রভু, যে মানুষটি আপনার কৃপা লাভের জন্য এত কঠোর তপস্যা করছে, সে যা চাইছে তা আপনি দিচ্ছেন না কেন?

শিব দেবতাদের বললেন, চিন্তা করো না। আমি যথাসময়ে তাকে বর দেবো।

এমন সময় মূক নামে এক দৈত্য শূকরের রূপ ধরে অর্জুনের কাছে গেল। সেই মায়াবী দৈত্যকে দুরাত্মা দুর্যোধনই পাঠিয়েছিল। সেই শুকর তার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে এই চিন্তায় অর্জুন ধনুকে শর যোজনা করলেন। এদিকে অর্জুনকে রক্ষা ও পরীক্ষা করার জন্য

শিব এলেন ব্যাধের রূপ ধরে। তাঁর সঙ্গে এলেন তার ব্যাধগণ। তারাও সকলে ব্যাধের রূপ ধরল, ব্যাধরূপী শিব যেন তাদের রাজা।

শুকরটি ছুটে আসছে অর্জুনের দিকে। তার পিছন পিছন ছুটছেন শিব। শূকর যখন অর্জুনের কাছাকাছি তখন শিব ও অর্জুন একই সঙ্গে বাণ নিক্ষেপ করলেন শূকরকে। শিবের বাণ লাগল শূকরের পেছন দিকে, তারপর তার দেহ ভেদ করে মুখ দিয়ে বের হয়ে মাটিতে মিশে গেল। আর অর্জুনের বাণ শুকরের মুখে ঢুকে পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে পাশেই পড়ে গেল। এইভাবে উভয়ের বাণাঘাতে শূকর সেখানেই পড়ে গেল। সে ছটফট করতে করতে মারা গেল। সেই সময়েই শূক দৈত্যের আসল ভয়ঙ্কর রূপ দেখা গেল। তখন শিব আর অর্জুন দুজনে আনন্দিত হলেন।

শিব সেই বাণ আনার জন্য একজন ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিলেন। অর্জুনও সেখানে গেলেন, আর সেই শিবভৃত্যরূপী ব্যাধকে গালাগালি দিয়ে তার বাণটি নিয়ে নিলেন।

তাই দেখে শিবভৃত্য বলল, আমাদের বাণ তুমি কেন নিলে? কথা শুনে অর্জুন বললেন–ব্যাধ, তুমি মূর্খ, তাই না জেনে এমন কথা বলছ। এই বাণ দিয়ে এখুনি এই শূকরকে আমি বধ করলাম, তাহলে কিভাবে এই বাণ তোমার হবে? এই দেখ বাণের পেছনে ময়ূরপুচ্ছ আছে। আর আমার নামও লেখা আছে।

ব্যাধরূপী শিবভৃত্য অর্জুনের কথা শুনে হাসলো। তারপর বলল–ওরে, তুই শোন, তুই তপস্যা করছিস না, তপস্বীর বেশ ধরেছিস মাত্র। তপস্বীরা কি কখনো মিথ্যা কথা বলে? আমি একা নয় আমাদের সেনাপতি আছে। তুমি যে বাণটি এখুনি মাটি থেকে তুলে নিলে ওটি তার। কাজেই ওই বাণটি আমায় দাও। ওই বাণ দিয়ে প্রভু ওই শূকরটি মেরেছেন তোমাকে রক্ষা করবার জন্য। তবে তোমার যদি বাণটি দরকার থাকে, তাহলে আমার প্রভুর কাছ থেকে গিয়ে চেয়ে নিয়ে এস। তিনি তোমায় নিশ্চয় দেবেন।

তখন অর্জুন বললেন, ওরে ব্যাধ, তোর সব কথাই মিথ্যা। তারা চোর, ব্যাধ, তোদের প্রভু রাজা যতই হোক আমি তার কাছে ভিক্ষা চাইব কিভাবে? আমরা ক্ষত্রিয় কখনো কারুর কাছে ভিক্ষা চাই না। আমরা দাতা, আমার অনেক বাণ আছে। আমি ইচ্ছা করলে দান করতে পারি।

ব্যাধ অর্জুনের কথা শুনে বলল, তুমি অজ্ঞ, ক্ষত্রিয় নও। আমাদের প্রভুকে তুমি চেনো। তার সঙ্গে যুদ্ধে কেউ পারবে না। তাই বলছি, বাণটি ফেরৎ দাও। তা না হলে তোমার কপালে কষ্ট আছে।

ক্রোধান্বিত হয়ে অর্জুন বললেন, তোমাদের রাজা এলে তাকে যুদ্ধের দ্বারা উপযুক্ত শাস্তি দেবো। সিংহ ও শৃগালের যুদ্ধ উপহাস করে। কিন্তু সেই যুদ্ধই এখানে হবে।

তখন শিবভৃত্য অর্জুনের কথা শুনে ফিরে গেল শিবের কাছে, শিব সব কথা শুনে মহানন্দে তার সৈন্যদের নিয়ে অর্জুনের কাছে গেলেন আর অর্জুন তাদের দেখে এগিয়ে এলেন। শিব তার একজন ভৃত্যকে অর্জুনের কাছে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন যে, সৈন্যরাশি দেব আর বাণ ফেরৎ দাও। তুমি কিজন্য এই সামান্য জিনিসের জন্য মরতে চাইছো? তোমার ভাইরা দুঃখ পাবে।

শিবভৃত্য অর্জুনের কাছে গিয়ে সব বলল।

শিবের কথা শুনে অর্জুন ক্রুদ্ধভাবে বললেন, আমি এই বাণ কখনই দেব না, এটা আমার।

ভৃত্য গিয়ে শিবকে সব বলল। তারপর শুরু হলো শিব আর অর্জুনের যুদ্ধ। একা অর্জুন আর অন্য দিকে সৈন্যসহ শিব। সেনারা যত অস্ত্র মারে অর্জুন একাই সব বিনষ্ট করে দেন। তারপর সৈন্যগণ অর্জুনের বাণে পীড়িত হয়ে চারদিকে পালিয়ে যেতে লাগল। তখন শিব আর অর্জুনের মুখোমুখি যুদ্ধ শুরু হল। শিব অর্জুনের সব অস্ত্র বিনষ্ট করে দিলেন, তার ধনুকের জ্যা ছিঁড়ে গেল, তখন অর্জুনের কেবল শরীরটাই থাকল।

তারপর শুরু হল দুজনের মধ্যে মল্লযুদ্ধ। তাতে পৃথিবী কেঁপে উঠল। দেবতারাও খুব ভয় পেল। তখন শিব অর্জুনকে নিয়ে আকাশে উঠে যুদ্ধ করতে লাগলেন, শিব আপনাকে ভক্তের অধীন জানাবার জন্য এইভাবে করতে লাগলেন।

তারপর হঠাৎ অর্জুনের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে মহেশ্বর আপন রূপ দেখালেন তাকে।

তখন অর্জুন লজ্জা পেয়ে বললেন, আহা! আমি যাকে ঈশ্বররূপে পূজা করলাম সেই শিব আমার সামনে, হায়! আমি কি করলাম।

এই মনে ভেবে অর্জুন শিবের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। বললেন, হে প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন। শিব শুনে বললেন, ভক্ত, আমি তোমার পরীক্ষা নেওয়ার জন্যই এমন করেছি। কাজেই দুঃখ করো, আমি তোমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট, তুমি বর চাও। তুমি যে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছো আমায়, তা আমি পূজারূপে গ্রহণ করেছি। শত্রুদের কাছে তোমার যশ বিস্তারের জন্যই আমি এমন করেছি।

শিবের মুখে এই কথা শুনে অর্জুন হাতজোড় করে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। তাতে শিব খুশি হয়ে বললেন–হে পুত্র, তোমার ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট, বল এখন কি বর চাও।

তখন অর্জুন প্রণাম করে বললেন, হে প্রভু, শত্রু হতে আমাদের যে ভয় তা আপনার দর্শনে দূর হয়েছে। এখন যাতে ইহলোকে যশলাভ করতে পারি, আপনি তাই বর দান করুন। শিব তখন অর্জুনকে পাশুপত নামে একটি অস্ত্র দান করলেন। আর বললেন–তুমি এই পাশুপত অস্ত্র দিয়ে শত্রুগণকে নাশ করে শুভফল ভোগ কর। শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধের সময় তোমাদের সাহায্য করবেন। শিব অর্জুনের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। অর্জুন কাম্যকরণে ফিরে এলেন। ভ্রাতাদের সব ঘটনা বললেন। তারা সকলে খুশি হলেন। শত্রু জয় করতে আর কোন সন্দেহ নেই।

অজ্ঞানে শিবরাত্রি পালনের ফল

এক বনে এক হিংসুক ব্যাধ বাস করত, সে মৃগ হত্যা করত। আবার চুরিও করত। সে জীবনে কখনো ভালো কাজ করেনি। কেবল পাপ করেছে।

একদিন শিবচতুর্দশী মহাতিথি এল, ব্যাধ ওসবের কিছুই জানে না। সকাল হতেই সে বেরিয়ে পড়ল শিকারে। সেদিন তার ঘরে খাবার কিছুই ছিল না, তাই না খেয়ে বেরিয়ে গেল বনের ভেতরে। সেদিন তার ভাগ্যে একটাও শিকার জুটল না। বনে ঘুরে ঘুরে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল তখন তার খেয়াল হল যে সে সারাদিন ঘুরে একটাও শিকার পায় নি। ঘরে খাবার নেই তাই বাচ্চারা না খেতে পেয়ে কত কষ্ট পাচ্ছে! যত রাত্রি তোক শিকার করে তবেই সে ঘরে ফিরবে।

ঘুরতে ঘুরতে একটা জলাশয় দেখতে পেল। মনে ভাবল, হরিণ নিশ্চয়ই জল খেতে আসবে, তখনই শিকার করব। কিন্তু যদি বাঘ আক্রমণ করে, তাহলে কি করব? এই চিন্তা করে, যদি তেষ্টা পায়, তাই খানিকটা জল নিয়ে জলাশয়ের কাছাকাছি একটা বেলগাছে চড়ে বসল। সব সময় সে জলাশয়ের পাশে কোন জঙ্গলের মধ্যে বসে অপেক্ষা করাতে নিরাপদ বলে মনে করল না। তারপর ভাবল, অপেক্ষা করার সময় লক্ষ্য করছে কখন কোন্ প্রাণী আসছে। সারাদিন তার কোন খাবার জোটেনি, তবুও রাত্রিতে গাছে বসে থাকল।

হঠাৎ ব্যাধ দেখতে পেল একটা হরিণ লাফাতে লাফাতে সেই জলাশয়ের দিকে আসছে, তাকে দেখে ব্যাধ আনন্দে ধনুকে শর যোজনা করল। এই সময় নড়াচড়ার ফলে একটু জল নীচে পড়ল। সেই সাথে গাছের শুকনো পাতাও নীচে পড়ল। সেই গাছের নীচে ছিল শিবলিঙ্গ, সেই জল আর পাতা পড়ল শিবলিঙ্গের উপর। এইভাবে অজ্ঞাতসারে ব্যাধের দ্বারা প্রথম প্রহরের শিবপূজা সম্পন্ন হল। শিব সেই ব্যাধের সকল পাপ নাশ করলেন।

তখন সেই হরিণী দূর থেকে ব্যাধকে গাছের ডালে দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে গেল। আর ব্যাধকে বলল–হে ব্যাধ, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি আমায় বধ করবে? ব্যাধ হরিণীর মুখে মানুষের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। তারপর বলল–তুমি ঠিক বলছো। আমার বাড়িতে আজ সকলে ক্ষুধার্ত। তোমাকে মেরে ক্ষুধা নিবারণ করব।

তখন সেই হরিণী বলল, আজ আমার পরম সৌভাগ্য। আমার বৃথা এই মাংসে যদি কারুর ক্ষুধা নিবারণ হয় আমি ধন্য হব। ইহলোকে পরোপকারীর যে পুণ্য কোন লোক তা শত

বছরেও বলতে পারে না, কিন্তু আমার ঘরে অনেক বালক-সন্তান আছে, তাদেরকে আমার ভগ্নী ও স্বামীর কাছে রেখে আমি আবার এখানে ফিরে আসব, তখন তুমি আমায় বধ কোরো।

ব্যাধ বলল–বিপদে পড়লে এরকম কথা সকলে বলে। তখন হরিণী বলল–আমি সত্যই বলছি, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি যদি পুনর্বার এই স্থানে ফিরে না আসি তাহলে ব্রাহ্মণ বেদ বিক্রী করলে, ত্রিকালে সন্ধ্যা না করলে যে পাপ হয় সেই পাপ আমার হবে। স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করলে স্ত্রীর যে পাপ হয়, আপন কর্ম লঙ্ঘন করলে সে পাপ হয়। এই সব পাপে আমি লিপ্ত হব।

এসব শুনে ব্যাধ বলল, যাও তুমি ঘরে যাও কিন্তু ফিরে এসো।

তখন হরিণী আনন্দে জল খেয়ে ঘরে ফিরে গেল, কিছুক্ষণ পরে সেই হরিণীর ভগ্নী আর একটি হরিণী তার খোঁজ করতে সেখানে এল। ব্যাধ তাকে দেখে মনের আনন্দে ধনুক তির জুড়ল। তখন বেলগাছটা একটু নড়ল আর বেলপাতা সহ কিছু জল শিবের মাথায় পড়ল। এই ভাবে ব্যাধের দ্বিতীয়বার শিবপূজা করা হল।

সেই হরিণী ব্যাধকে দেখে বলল, তুমি কি করছ?

ব্যাধ আগের মতই উত্তর দিল। হরিণী বলল–আমি ধন্য হলাম, এতদিনে আমার জীবন সফল হল। সেও আগের হরিণীর মত জবাব দিয়ে বাড়ি যেতে চাইল।

এখন ব্যাধ বলল, আমি কিছুক্ষণ আগে এক হরিণীকে মারতে গেলে সেও একথা বলে পালিয়ে গেছে, তুমিও তেমন চেষ্টা করছ। কিন্তু আমি তোমায় ছাড়ব না, তোমাকে মারবই।

ব্যাধের কথা শুনে হরিণী বলল, যদি আমি ফিরে না আসি তাহলে যে পুরুষ পতিব্রতা স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হয়, তাতে যে পাপ হয় সে পাপ আমায় ধরবে। বেদবিহিত ধর্মত্যাগে যে পাপ, সেই পাপে লিপ্ত হব আমি। যে বিষ্ণুভক্ত হয়ে শিবকে নিন্দা করে তার যে পাপ হয়, যে মাতা-পিতার মৃত তিথিতে শ্রাদ্ধ না করে তাতে যে পাপ হয়, যে পরের সন্তান সৃষ্টি করে তাকে বঞ্চনা করে যে পাপ হয় সেই সমস্ত পাপ আমাকে আশ্রয় করবে। বিশেষ করে যার বাক্য লঙ্ঘন হয়, তার সকল পুণ্যও নষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবী তার পাপে বারবার কেঁপে ওঠে।

ব্যাধ তার কথা শুনে তাকে ঘরে গিয়ে আবার ফিরে আসতে বলল।

হরিণী জল খেয়ে চলে গেল। তারপর ব্যাধ চিন্তা করল–সেই হরিণী দুটো কোথায় গেল? কখন আসবে? এই চিন্তায় ব্যাধ না ঘুমিয়ে দ্বিতীয় প্রহর উপবাসে কাটাল।

তারপরে একটা হরিণ দুটো হরিণীকে খোঁজ করতে সেখানে এলে ব্যাধ আনন্দে নড়েচড়ে বসল। তখন আবার একটু জল আর বেলপাতা পড়ল শিবের মাথায়। এইভাবে তৃতীয় প্রহরে শিবের পূজা হল।

ব্যাধকে দেখে হরিণ জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি করছ? ব্যাধ আগের মত উত্তর দিল। আর হরিণটিও আগের হরিণীদের মত জবাব দিল।

তখন ব্যাধ বলল, আগের দুই হরিণী আমায় কথা দিয়েও ফিরে এল না। তারা আমাকে ঠকিয়েছে। তাই তোমাকে আমি ছাড়ছি না।

ব্যাধের কথা শুনে হরিণ বলল, আমি কখনও মিথ্যা বলি না, সমস্ত চরাচর সত্যের আশ্রয়েই চলেছে। হে ব্যাধ, আমি যদি তোমাকে বঞ্চনা করে পুনর্বার এখানে ফিরে না আসি, তাহলে সন্ধ্যার সময় মৈথুনকালে, শিবরাত্রির দিনে আহার করলে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে, গচ্ছিত ধন চুরি করলে যত পাপ হয়, সেইসব পাপ সকলই আমায় আশ্রয় করবে। দ্বিজগণ সন্ধ্যা না করলে যে পাপ হয়, শিব নাম উচ্চারণ না করলে যে পাপ হয়, সক্ষম হয়েও যে পরের উপকার না করে, ব্রতদিনে মৈথুনকারীর যে পাপ হয়, অখাদ্য খেলে যে পাপ হয় সে সকল পাপ আমার দেহেই আশ্রয় লাভ করবে।

ব্যাধ হরিণের কথা শুনে বলল, তুমি এখন যেতে পার। তবে আবার এসো। তখন হরিণ জল খেয়ে চলে গেল। তারপর দুই হরিণী আর একটা হরিণ ঘরে মিলিত হল, পরস্পর পরস্পরের কথা শুনল, পরে তারা বলল–যেহেতু আমরা সত্যপাশে আবদ্ধ আছি, তাই আমাদের ব্যাধের কাছে নিশ্চয় যাওয়া উচিত। এই ভেবে তারা সন্তানদের ছেড়ে যাওয়ার জন্য উদ্যত হল। এখন প্রথম হরিণী হরিণকে বলল–হে স্বামী, বালকেরা কেমন করে পিতামাতা হীন হয়ে বাঁচবে? যেহেতু আমি আগে প্রতিজ্ঞা করেছি সেজন্য আমিই যাব, তোমরা দুজনে এখানে থাক।

তখন দ্বিতীয় হরিণী বলল–আমি তোমাদের দাসী, অতএব তুমি থাক আমি যাই। তারপর হরিণটি বলল–আমি সন্তানের কিছুই জানি না, তোমরা দুজনে থাক, আমি যাই।

হরিণী দুজন হরিণের এই কথা শুনে বলল, বিধবার জীবনে ধিক!

তারপর তারা সন্তানদের আশ্বস্ত করে সহবাসীর কাছে রেখে ব্যাধের কাছে গেল। ব্যাধ এতক্ষণে তাদের অপেক্ষায় পথপানে চেয়েছিল। এমন সময় সেই তিন হরিণ আর হরিণীকে দেখে ব্যাধ আনন্দে ধনুক ধরে তাতে বাণ জুড়ে দিল। ব্যাধের নড়াচড়ায় বেলপাতা ও জল পড়ল। চতুর্থ প্রহরের পূজা সম্পন্ন হল। এদিকে হরিণ সন্তানরা তাদের কি হবে এই ভেবে তাদের পিছু পিছু চলল।

তারপর তারা বলল–হে ব্যাধ, তুমি আমাদেরকেও বধ করে আমাদের মাংস খেয়ে আমাদের জীবন সার্থক কর।

তখন ব্যাধ তাদের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। শিবপূজার ফলে তার দিব্যজ্ঞান জাগল। সে ভাবল–এই জ্ঞানহীন হরিণরাই ধন্য। এরা নিজেদের শরীর দিয়ে পরের উপকার করে আর আমি মানুষ হয়ে কি করলাম। আমি কেবল পরের শরীর নষ্ট করে নিজের দেহের পুষ্টি করি। আমি অন্যকে বহু কষ্ট দিয়ে আজও অন্যের ভরণপোষণ করছি। আমার কি হবে? জীবনের প্রতি ধিক্!

এইভেবে সে তির গুটিয়ে নিল। তারপর বলল–হে মৃগগণ, তোমরাই ধন্য। তোমাদের আমি হত্যা করব না, সন্তানদের নিয়ে নিজেদের ঘরে যাও।

মৃগদল চলে গেল। শিব সেই ব্যাধের প্রতি প্রসন্ন হয়ে দিব্য মূর্তিতে দর্শন দিল এবং বললেন–হে পুত্র, তোমার দ্বারা এই মহাব্রত পালিত হওয়ায় আমি সন্তুষ্ট। কি বর চাও?

ব্যাধ বলল, আমি আপনার দর্শন পেয়ে ধন্য, এই বলে প্রণাম করল।

এখন শিব বললেন–তুমি 'গৃহ' নামে প্রসিদ্ধ হবে। এখন মনের ইচ্ছামত সুখ ভোগ কর। মহারাজ দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র তোমার ঘরে আসবেন। তুমি সেই শ্রীরামের পূজা করে মুক্তিলাভ করবে। তোমার পুত্র, পৌত্রেরা আমার পূজা করে বলবান হবে।

এমন সময় মৃগদল শিবের দিব্যরূপ দর্শন করে মৃগযোনি ত্যাগ করে স্বর্গে চললেন।

অজ্ঞানত শিবের এই পুণ্যব্রত সাধন করে ব্যাধ শিবের সাযুজ্য মুক্তিলাভ করল। তাহলে ভক্তিভরে এই ব্রত করলে যে পরম পুণ্য হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অজ্ঞানতাবশতঃ শিবরাত্রি ব্রতের ফলে পাপী বেদনিধির মুক্তি

অবন্তীনগরে সদাচারী এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, নানান শুভকর্মে রত তিনি। পতিধর্মপরায়ণা তার স্ত্রী। তাদের ছিল দুই-পুত্র সুনিধি ও বেদনিধি, জ্যেষ্ঠ সুনিধি ছিল পিতা-মাতার মতই শাস্ত্রজ্ঞানী, সদাচারী পিতা-মাতার বশবর্তী। কিন্তু কনিষ্ঠ বেদনিধি শাস্ত্রজ্ঞ হলেও বেশ্যাসক্ত ছিল। বেশ্যাগৃহে বাস, বেশ্যার হাতে অন্ন খেত।

পিতা-মাতা পুত্রের এমন ব্যবহারে খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন। বহু বারণ সত্ত্বেও কোন লাভ হল না, বরং বাড়ির জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে সেই বেশ্যাকে দিত।

একবার সেই দেশের রাজা সেই ব্রাহ্মণের উপর খুশি হয়ে কিছু অলংকার দান করলেন। গরীব ব্রাহ্মণ, দামী দামী অলংকার রাখবেন কোথায়? স্ত্রীকে দিলেন লুকিয়ে রাখার জন্য, ব্রাহ্মণ পত্নী কোথায় রাখবে ভেবে অযত্নে ফেলে রাখা ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে সেগুলি লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু বেদনিধি সব দেখে ফেলল। লুকিয়ে লুকিয়ে রাত্রিবেলা চুপিসারে সেই গয়নাগুলো নিয়ে বেশ্যাকে দিল। বেশ্যার খুব আনন্দ। সে পরে পরে দেখল। আর বেদনিধির খুব নাম করল, সেই বেশ্যা ছিল নর্তকী, পরের দিন সে নাচ দেখাতে রাজার কাছে গেল, রাজা নর্তকীর গায়ে এই অলংকার দেখে চিনতে পারল।

তখন নর্তকীকে ডেকে রাজা জিজ্ঞেস করলেন সে এগুলো কোথায় পেয়েছে। নর্তকী মিথ্যা বললে রাজা তাকে ভর্ৎসনা করলেন। ফলে সে বলে ব্রাহ্মণপুত্র বেদনিধি তাকে সেগুলো দিয়েছে।

রাজা সব অলংকার নিয়ে নিলেন আর ব্রাহ্মণকে ডেকে পাঠালেন, জিজ্ঞাসা করলেন – গহণাগুলো কোথায়? খুব প্রয়োজন এখনই ফেরত দিতে হবে।

ব্রাহ্মণ বাড়িতে গিয়ে পত্নীর কাছে গহনা চাইলেন, ব্রাহ্মণী খুঁজে পেলেন না, তারা বড়ই গরীব, ব্রাহ্মণী দুঃখিত হয়ে কাঁদতে লাগল, ব্রাহ্মণ রাজার কাছে গিয়ে সব বলে। তারপর রাজা ব্রাহ্মণকে সকল ঘটনা বলে, তখন ঘরে ফিরে গিয়ে ব্রাহ্মণ ও তার পত্নী বেদনিধিকে ভর্ৎসনা করে বললেন–তুই আমাদের গৃহ হতে দূর হ, আমাদের কুলকে কলঙ্কিত করেছিস।

তাকে ভর্ৎসনা করে লাঠির ঘাও মারে।

অগত্যা বেদনিধি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বেশ্যার ঘরে গেল, কিন্তু সেখানে বেশ্যাও তাকে তিরস্কার করল। বেদনিধি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। সেই দিনটা ছিল শিবচতুর্দশী। এক ধনবান নানাবিধ পূজাদ্রব্য নিয়ে শিবমন্দিরে যাচ্ছিল। বেদনিধি তাকে দেখে মনে মনে ভাবল এত খাবার। যেভাবে হোক চুরি করে খাব। সে চলল তার পেছনে পেছনে। শেষে শিবমন্দিরে এসে হাজির হল। সেখানে অনেক লোকের সাথে বেদনিধি পূজা দেখল, এদিকে ক্ষুধার জ্বালা। সুযোগ খুঁজছে কখন চুরি করে খাবে।

প্রতি প্রহরে শিবের পূজা হল। চতুর্থ প্রহরের পূজার পর সকল ব্রতীরা ক্লান্ত হয়ে মন্দিরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

এই সুযোগে বেদনিধি মন্দিরে ঢুকলো, কিন্তু প্রদীপের আলো উজ্জ্বল না থাকায় সব কিছু ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না, তখন বেদনিধি মাথার পাগড়ির কাপড় একটু ছিঁড়ে প্রদীপের মধ্যে দিয়ে উজ্জ্বল করলো। আলোয় সব দেখা গেল। সে আনন্দে নৈবেদ্য নিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু শুয়ে থাকা একজনের গায়ে বেদনিধির পা লাগায় সে জেগে উঠল, এবং 'চোর চোর' বলে চিৎকার করতে শুরু করল। তখন সবাই জেগে উঠল, সবাই চিৎকার শুরু করলে বেদনিধি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

সেই সময় রাজার প্রহরীরা তার পিছু পিছু ছুটতে লাগল, তারপর তাকে লক্ষ্য করে বাণ ছুঁড়ল। তখন সেই বাণের আঘাতে বেদনিধির মৃত্যু হল।

এইভাবে শিবরাত্রি ব্রতের দিনে বেদনিধি সম্পূর্ণ উপবাসে রাত্রি জাগরণ করল, শিব পরম দয়ালু ঠাকুর। তাই ব্রাহ্মণের সমস্ত কাজই শুভপ্রদ হলো।

এরপর যমদূত আর শিবদূত এক সময়েই সেখানে উপস্থিত হলে বিবাদ শুরু হল।

শিবদূতরা যমদূতদের জিজ্ঞাসা করলেন–তোমরা কিজন্য এখানে দণ্ড হাতে এসেছে?

যমদূতেরা বলল–তোমরা ভগবান শিবের ভক্ত, তোমরাই বা এখানে কেন এসেছ? এই ব্রাহ্মণ জন্মের পর থেকে কেবলই পাপকর্ম করছে। সামান্যতম পুণ্যকর্মও নেই।

তখন শিবদূতগণ বললেন–এই ব্রাহ্মণের বহু পাপ ছিল, কিন্তু শিবের ব্রত ও শিবরাত্রি জাগরণের জন্য সব পাপ ধ্বংস হয়ে গেছে, যে শিবরাত্রি ব্রত ও রাত্রি জাগরণ করে, তার দেহে বিন্দুমাত্র পাপ থাকতে পারে না।

যমদূতেরা ফিরে গিয়ে যমপুরীতে সব বলল যমের কাছে। ধর্মরাজ বললেন–শিবদূতেরা যা বলেছেন তা সত্য। ব্রাহ্মণের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়েছে, তারপর তিনি নৈশবর্ণকে প্রণাম ও ব্রাহ্মণকে নমস্কার করে তাকে কলিঙ্গ দেশের অধিপতি করে দিলেন।

সেই বেদনিধি কলিঙ্গ দেশের অধিপতি হয়ে নিত্যই শিবপূজা করতে লাগলেন। আর যথাবিধি শিবরাত্রি ব্রত পালন করলেন, পরে তিনি তার রাজ্যের সকলকে শিবপূজা ও শিবের মন্দিরে দীপদান করে মুক্তিলাভ করলেন।

দুরাত্মা ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতসারেই শিবরাত্রি ব্রত উৎ্যাপন হল এবং তাতে যদি এমন ফল হয়, তাহলে ভক্তিসহকারে কোনো ব্যক্তি এই ব্রত পালন করলে তার যে মুক্তি হবে, তাতে আশ্চর্য কী?

ত্রিপুর নাশন

শিবপুত্র কার্তিকের দ্বারা তারকাসুরের বিনাশ হল, তারকের তিন পুত্র বিদ্যুশালী, তারকাক্ষ আর। বামলাক্ষ। তারা মহাধার্মিক, শক্তিতেও কম নয়। তারা মাটিতে এক পা আর উপরের দিকে এক পা রেখে হাজার বছর কেবল বাতাস খেয়েই কঠোর তপস্যা করল। ব্রহ্মা বর দিতে এলেন তাদের কাছে।

তিন অসুরই এক সঙ্গে বলল–আমরা কারো দ্বারা বধ হবনা, এই বর দিন।

ব্রহ্মা বললেন–তা কখনও হয় না, এমন বর দেওয়া যাবে না, অন্য বর চাও।

অসুররা বলল–সোনা, রূপা আর লোহার দ্বারা তৈরি তিনটি পুরী আমাদের দান করুন, আর সেই তিনটি পুরী কেবল একটি বাণের দ্বারাই বিনষ্ট হবে। ব্রহ্মা সেই বরই দিলেন। ব্রহ্মা ময়দানবের দ্বারা তিনটি পুরী তৈরি করালেন। তারপর স্বর্গপুরে রাখলেন সোনার পুরী, আকাশে রাখলেন রূপার পুরী আর পৃথিবীতে রাখলেন লোহার পুরী। প্রত্যেকটি পুরীই অপূর্ব সুন্দর। তারকাক্ষ নিল সোনার পুরী। বামলাক্ষ নিল রূপার পুরী আর বিদ্যুশালী বাস করল লোহার পুরীতে।

খাওয়া-দাওয়া, ঘুমান, নাচ-গানের আসর, পানশালা, সভাগৃহ কোনো কিছুরই অভাব নেই কোনো পুরীতে। গন্ধর্ব, চারণ, সিদ্ধ প্রভৃতি সকলেই সেথায় আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকল, আর যত প্রকারের ধর্ম আছে সবই সেই তিনপুরীতে।

এইভাবে সেই তিন দৈত্যের কারণে দেবতারা জ্বলেপুড়ে মরছে, ব্রহ্মার কাছে গিয়ে দুঃখের কথা জানালেন।

দেবতাদের কথা শুনে শিব বললেন–দেবতাগণ, তোমাদের দুঃখ আমি বুঝি, কিন্তু যাদের পুণ্য সবসময়েই বাড়ছে তাদেরকে বিনাশ করব কেমন করে? আর তা উচিতও নয়। তবে তোমরা শ্রীহরির কাছে যাও, তিনি কোনো উপায় বলে দিতে পারেন।

তখন দেবতাগণ শ্রীহরির কাছে গিয়ে সব কথা বলল, গোবিন্দ উত্তরে বললেন–সনাতন ধর্ম যেখানে থাকে, সেখানে দুঃখ কখনই স্থান পায় না।

শ্রীহরির কথা শুনে দেবতাগণ বিষণ্ণ হলেন। তারা বললেন–ত্রিপুর থাকলে আমরা কেমন করে বাস করব?

তখন শ্রীহরি বললেন–বহু পাপ করেও যদি কেউ শিবের পূজা করে তাহলে তার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। দৈত্যরা লিঙ্গ পূজা করে পাপহীন হয়ে ভোগী হয়েছে। তাদের ধর্ম বিঘ্ন না হলে, তাদেরকে ধ্বংস করা যাবে না, তাই আমি আমার মায়াবলে তাদের ধর্ম নাশ করে তিন দৈত্যকে বিনাশ করব।

হরির মুখে আশ্বাস পেয়ে দেবতাগণ ফিরে গেল যে যার নিজের স্থানে। শ্রীহরি দৈত্যদের বিনাশের জন্য মায়াময় মানব সৃষ্টি করলেন। তার মাথা নেড়া, গায়ে মলিন বসন। তারপর ভগবান তাকে মায়াময় শাস্ত্র শিক্ষা দিয়ে বললেন–তুমি ত্রিপুরে গিয়ে সবাইকে এই শাস্ত্র শিখাবে।

তখন সেই পুরুষ হরিকে প্রণাম করে চলে গেলেন ত্রিপুরে। একটি বনের ধারে গিয়ে তিনি বসলেন, সে তাকে দেখল এবং মায়ামুগ্ধ হয়ে গেল। সবাই তার কাছে দীক্ষা নিল। তারপর তারা বিদ্যুন্মালীর কাছে গিয়ে বলল–আমরা পূর্বে অনেক ধর্ম শুনেছি কিন্তু এমন সনাতন ধর্ম কখনো শুনিনি। এক ধর্মপরায়ণ সন্ন্যাসী এসেছেন, সেই ধর্ম প্রচার করতে। আমরা তার কাছে সকলেই দীক্ষা নিয়েছি। হে রাজা আপনিও তার কাছে দীক্ষা নিতে পারবেন।

তখন বিদ্যুন্মালী সেই পুরুষের কাছে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। দীক্ষাও নিতে চাইল। সেই পুরুষ তখন বললেন–হে দানব রাজ, আমি যা আদেশ করব, তোমাকে তা বিনা দ্বিধায় পালন করতে হবে। আগে বল, তা পারবে কিনা?

তখন দানবরাজ তার মায়ায় পড়ে স্বীকার করল, তার সকল কথাই পালন করবে। সেই সন্ন্যাসী তখন দানবকে নির্জনে নিয়ে গিয়ে যাতে তার ধর্ম নাশ হবে এই উপদেশ দিলেন। এইভাবে সেই পুরুষের কাছে সবাই দীক্ষিত হয়ে ধর্মচ্যুতি হল, শিবপূজা, যজ্ঞ, স্নান, দানাদি সকল কর্মই নাশ হল। তখন ত্রিপুরে অলক্ষী প্রভাব বিস্তার করল, আর লক্ষ্মী তাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন।

দানবগণ এইভাবে দুরাচারী হলে শ্রীহরি আনন্দে দেবতাগণকে সঙ্গে নিয়ে শিবের কাছে গিয়ে তার বহু স্তব স্তুতি করলেন। তখন মহেশ্বর খুব খুশি হয়ে শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করে বললেন–আমি ত্রিপুর নাশ করব। আর তোমাদের কোনো চিন্তা নাই, যে যার স্থানে ফিরে যাও।

তারপর শিব বিশ্বকর্মার দ্বারা এক দিব্যময় রথ সৃষ্টি করলেন। অপূর্ব সেই রথ। সোনার তৈরি। তার ডানদিকে সূর্যচক্র, বামদিকে চন্দ্রচক্র, সেই রথের সারথি হলেন স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা। তারপর মহেশ্বর নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অপূর্ব যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে সেই বিচিত্র রথে চড়ে বসলেন। ত্রিপুরের দিকে চললেন সবেগে। দেবতারাও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শিবের পেছনে পেছনে চললেন। তারপর সকলেই তুমুল হর্ষধ্বনি করলেন, তখন শিব তার পিনাক ধনুতে পাশুপাত অস্ত্র যোজনা করলেন, একমাত্র বাণেই ত্রিপুর ধ্বংস হয়ে গেল। যে দৈত্যগণ তখনও পর্যন্ত শিবের পূজা করছিল, তারা শিবের প্রভাবে গাণপত্য লাভ করল। তারপর ভক্তিভরে দেবতাগণ ত্রিপুরারি মহেশ্বরের স্তব-স্তুতি করলেন।

ধ্বনির মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বীরসেনের উপাখ্যান

সিন্ধুদেশের মহারাজ বীরসেন যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি বীর্যবান। গুরু আর গুরুজনগণের সেবা তার নিত্যকর্ম, সারা পৃথিবীতে যত রাজা, সকলেই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সেই রাজা বীরসেন রাজা শনির কোপে পড়ে খুব দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করলেন। গুপ্তভাবে তার শত্রুগণ তাকে আক্রমণ করে রাজত্বসহ সব কেড়ে নিল। তখন রাজা বীরসেন প্রাণভয়ে রাজসিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে গেলেন পাঞ্চালনগরে। পাঞ্চালরাজ প্রথমে তাকে চিনতেই পারলেন না, তারপর ভাল করে দেখে বললেন, কে মিত্র! তোমার এই বেশ কেন? অমিত বিক্রম বীরসেন ইন্দ্রতুল্য যাঁর খ্যাতি, তার কিনা এই অবস্থা!

বহুদিন পর বন্ধুকে দেখে খুব আদর আপ্যায়ন করলেন, তাঁর দুরাবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা বীরসেন অশ্রুসজল নয়নে বললেন–হে সখা, আমার দুর্ভাগ্যই আমাকে আজ এই অবস্থায় ফেলেছে। একদিন আমার শত্রুগণ আমার কাছে এল জীবিকার জন্য। গুপ্তভাবে এসেছে, আমি বুঝতেই পারিনি। তাদের গুণরাশি বিচার করে নানা পদে নিয়োগ করলাম।

তারপর তারা আমাকে নিরন্তরভাবে কুমন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করল, তাদের কথা শুনতে শুনতে আমার ন্যায়জ্ঞান হারালো, বিচারশক্তি হারিয়ে ফেললাম।

তখন আমার পূর্বের যেসব মন্ত্রী আর বন্ধুবর্গ ছিল তারা আমার ব্যবহার দেখে খুব দুঃখ পেতে লাগল। এইরূপ চিন্তা করে তারা অতি দুঃখে আমাকে ছেড়ে যে যার নিজের ঘরে চলে গেল। শত্রুদের মনোবাসনা পূর্ণ হল, আমার ধনৈশ্বর্য্য কেড়ে নিয়ে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দিল

আমাকে। তখন আমাকে রক্ষা করবার কেউ নেই, তাই রাত্রিবেলা গোপনে অতিকষ্টে তোমার কাছে। এলাম। এখন বন্ধু তুমিই আমাকে রক্ষা কর। বীরসেনের দুঃখের কাহিনি শুনে পাঞ্চালরাজ খুবই মর্মাহত হলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বন্ধুকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, সখা কালের বিচিত্র গতি। তুমি এখন বিপদে পড়েছ, একদিন অবশ্যই তোমার শুভদিন আসবে। তবে ততদিন ধৈর্য ধরে আমার এখানেই থাক।

পাঞ্চাল রাজ্যে বীরসেন রয়ে গেলেন, কিন্তু ভাগ্য তার প্রতিকূল, তার সুখ, শান্তি কখনও হবে না। একদিন এক স্বর্ণকার পাঞ্চাল রাজের কাছে একটি সুন্দর কারুকার্য করা রত্নহার নিয়ে এল। সেইদিন রাজসভায় যত সভাসদ ছিল সকলেই সেই হারের প্রশংসা করল। রাজা

বীরসেনও দেখলেন সেই হার। মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলেন। ইন্দ্রের সমান যাঁর ঐশ্বর্য ছিল–সে কিনা আজ দীন কাঙালের মত অন্যের আশ্রয়ে কালযাপন করছে। এদিকে পাঞ্চালরাজ বীরসেনকে বিষণ্ণভাবে বসে থাকতে দেখে নিজেই সিংহাসন থেকে উঠে তার কাজে গিয়ে তার হাত ধরে বললেন, সখা, এই হার তোমার গলায় সুন্দর মানাবে।

এই কথা বলে তিনি নিজে সেই রত্নহার পরিয়ে দিলেন সিন্ধুরাজ বীরসেনের গলায়। সভাসদগণ সবাই অবাক, পাঞ্চাল রাজের বহু প্রশংসা করল সকলেই, একেই বলে প্রকৃত সখ্যতা।

কিন্তু যারা অসৎ লোক, সিন্ধুরাজের সৌভাগ্য দেখে জ্বলতে লাগল –যে হার রানির জন্য আনা হল আর তার গলায় মানাবেও ভাল, তাকে না দিয়ে দেওয়া হল কিনা এক হতভাগ্যের গলায়! পাঞ্চাল রাজের এমন মিত্রতা দেখে সিন্ধুরাজও খুবই আশ্চর্য হলেন। তারপর বীরসেন বন্ধুকে বললেন–সখা, ত্রিভুবনে এমন বন্ধুপ্রীতি কখনও কোথাও শুনিনি। এবার আমার কথা রাখ–এই হার তুমি রানির গলায় পরাও, তাহলে আমি খুব খুশি হব।

তখন পাঞ্চালরাজ হাসতে হাসতে বললেন–সখা, তুমি একি বলছ? সামান্য একটা হার তোমাকে দিতে পারি না? তোমার জন্য আমি আমার সমগ্র রাজ্য দিতে পারি, যে হার তোমাকে দিলাম, তা আমি কখনও ফিরিয়ে নিতে পারি না। আমি তোমার জন্য বনেও যেতে পারি, এমনকি তোমার জন্য প্রাণও দিতে পারি।

এই কথা বলে পাঞ্চালরাজের সজল নয়নে অশ্রুধারা ঝরতে লাগল। সিন্ধুরাজ তাঁর বসন দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। এমন সময় সঞ্জয় নামে সিন্ধুরাজের এক ভৃত্য যে প্রভুর একান্ত অনুগত, তাঁরই সঙ্গে লুকিয়ে এসেছে পাঞ্চালরাজ্যে, সব সময় বীরসেনের কাছেই থাকত, সহসা এসে বলল–মহারাজ, এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল এইমাত্র। এখুনি আমাকে যে হারটা রাখতে দিলেন, সেটা আমি দেওয়ালে পোঁতা গজদন্তের উপর ঝুলিয়ে রাখলাম। আর তখনই সেই দেওয়ালে আঁকা একটি ময়ুর সহসা জীবন্ত হয়ে উঠল আর সেই হারটিকে খেয়ে নিল। তারপর যেমন ময়ুর মূর্তি, তেমনিই হয়ে গেল। হে মহারাজ, এ এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। আপনার চরণ ছুঁয়ে আমি শপথ করে সত্যই বলছি। সঞ্জয়ের কথা শুনে পাঞ্চালরাজ স্তম্ভিত হলেন। তারপর বীরসেনকে বললেন, হে সখা, এই যে অদ্ভুত কাণ্ড শুনলাম, এ বিষয়ে তোমার কি অভিমত বল। সঞ্জয় যা বলল তা যদি সত্যি হয়, তাহলে খেদ করার কিছুই নেই। তুমি দুঃখ কোরো না।

বন্ধুর কথা শুনে বীরসেন কাঁদতে কাঁদতে বললেন, এ বিষয়ে ভৃত্যের কোন দোষ নেই। আমার ভাগ্য এখন প্রতিকূলে তাই এমন সব ঘটনা ঘটেছে। কাল বিধিই ময়ূরের মূর্তি ধরে সেই রত্নহার গ্রাস করল। আমার এই ভৃত্য কখনই মিথ্যা কথা বলতে পারে না। মহা ধার্মিক এই ভৃত্য। বিধির বিড়ম্বনার জন্য এমন ঘটছে।

এইভাবে কথা বলে বীরসেন বিলাপ করতে লাগলেন। তখন পাঞ্চালরাজ বললেন, দুঃখ কোরো না বন্ধু, তুমি আমার কথা শোন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যারা অহং শঠতাকারে আমার সখার রাজ্য হরণ করল, সেই দূরাচারদের আমি বিনাশ করব।

তারপর তিনি সেনাপতিদের যুদ্ধের আয়োজন করার জন্য আদেশ করলেন। সহসা আশ্চর্যভাবে এক আকাশবাণী হল–শোন পাঞ্চালেশ্বর, তুমি প্রকৃত ক্ষত্রিয়, কিন্তু আমার একটি কথা শোন। আগামীকাল প্রভাতে তুমি মন্ত্রী-সেনাপতিদের নিয়ে মৃগয়া করবার জন্য বিন্ধ্যাগিরি বনে যাবে। সিন্ধুরাজও যাবে। সেখানে দেখতে পাবে কিরাত জাতির লোকজন আছে। তাদের মুখে শনির মাহাত্ম্য শুনবে, আর তার পূজা করবে। তাতে সিন্ধুরাজের কল্যাণ হবে। কিরাতরাজের সঙ্গে তার মিলন হবে। এইভাবে আমার আদেশ যদি পালন কর, তাহলে সিন্ধুরাজ তার রাজ্য ফিরে পাবে।

পরদিন আকাশবাণীর উপদেশমত সবাই বেরিয়ে পড়ল সৈন্য সামন্ত নিয়ে। বিন্ধ্যগিরি বনে শিবির পাতলেন, কিছু মৃগয়াও করলেন। রাজা ফিরে এলেন শিবিরে, শিপ্রা নদীর তীরে শিবির নির্মাণ করে বিশ্রাম করছেন। এমন সময় কিরাতরাজ কয়েকজন লোক সঙ্গে নিয়ে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াল হাতজোড় করে। দুই রাজা তো অবাক, কে ইনি? কিরাতরাজের এক অনুচর তার পরিচয় দিয়ে বললেন–ইনি কিরাতরাজ। ইনি পরম ধার্মিক মহাবীর, তখন পাঞ্চালরাজ ও সিন্ধুরাজ আসন ছেড়ে উঠে কিরাতরাজের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে আলিঙ্গন করলেন।

তারপর কিরাতরাজের কিছু অনুচর সিন্ধুরাজের দিকে তাকিয়ে, সহসা তাঁর চরণে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল–হে নাথ, আপনাকে বহুকাল পরে দেখতে পেলাম। আপনি আমাদেরকে পিতার সমান পালন করতেন। এই দাসগণকে ছেড়ে আর যাবেন না।

মহারাজ বীরসেন দেখলেন, তাঁরই সব সামন্তরাজগণ তাঁর পদতলে পড়ে এমনভাবে কাঁদছে। তখন তিনিও অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলেন। তারপর ধৈর্য্য ধরে বললেন, বড়ই আশ্চর্য দৈবগতি, আমরা তার কিছুই বুঝি না। ভাগ্যে আরও কী ঘটবে কে জানে। তোমরা আমার

সামন্তরাজা, সবাই মহাবীর, তথাপি কতই কষ্ট ভোগ করছ, জানি না আমার কপালে আর কি আছে, আমার যখন তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ হল তারপর তোমরা এতদিন কোথায় ছিলে? আমার যেসব দক্ষ সেনাপতি ছিল তারা এখন কোথায়? আমার প্রভুভক্ত যেসব সৈন্য ছিল তারাও এখন কোথায় আছে? তাদের জীবিকা কেমন করে চলছে?

এখন সব নানাবিধ প্রশ্ন করে মহারাজ বীরসেন কাঁদতে লাগলেন। তখন সেইসব সামন্ত রাজগণ সিন্ধুরাজকে বললেন, এই যে আপনার সামনে কিরাতরাজ, ইনি মহাবীর্যবান, পরম দয়ালু সত্যগন্ধ পরোপকারী।

হে মহারাজ, আপনি যখন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলেন, আমরা সৈন্য নিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে গেলাম কিন্তু যখন শুনলাম আপনার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আমরা ভগ্ন মনোরথে ফিরে এলাম, তারপর আমরা সিন্ধুদেশ ছেড়ে গোপনে বনে বাস করতে লাগলাম। তারপর ভাবলাম, সিন্ধুরাজ সাধারণ পুরুষ নয়, নিশ্চয় তিনি কোথাও আছেন, আমরা গোপনে খোঁজ করতে লাগলাম। বহু দেশ ঘুরতে ঘুরতে এলাম এই কিরাতনগরে, কিরাতরাজ আমাদের বিষণ্ণ দেখে আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন।

তারপর পরিচয় জেনে খুব যত্নে পুত্রবৎ আমাদের পালন করতে লাগলেন, আমরা খুব সুখে আছি। কিন্তু আপনার জন্য সবসময় চিন্তা হত। আর একটা কথা, আমরা যখন বনে পালিয়ে যাই, তখন পথে মহারানির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, তাকেও আমরা সঙ্গে করে নিয়ে এলাম এই কিরাতের ভবনে। তিনি আপনার বিরহে সর্বদা কাতর। আমরা আপনার পুত্রের সমান, রানিমাকে সবসময় সান্ত্বনা দিই, কিরাতপতি তাঁকে যত্নে রেখেছেন, তাকে মায়ের মতন শ্রদ্ধা করেন, আপনার দর্শন পাবেন এই আশাতেই রানিমা এখনও জীবনধারণ করে আছেন।

তারপর কিরাতরাজ হাতজোড় করে সিন্ধুরাজ ও পাঞ্চালরাজকে বললেন, আমি দুজনের শরণ নিলাম। এই অধীনের ঘরে আপনারা আসুন।

কিরাতরাজের কথা শুনে সিন্ধুরাজ বীরসেন আপন রানির চন্দ্রমুখ দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়লেন। রাজাকে নিয়ে কিরাতনগরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলল সকল সৈন্য সামন্ত।

তারপর কিরাতরাজ তার সেনাপতিকে আদেশ করলেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে। সৈন্যরা সকলে যেন উপস্থিত হন।

এদিকে বীরসেনের মহিষী দূতমুখে স্বামীর আসার খবর পেয়ে তাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। এমন সময় বীরসেন প্রবেশ করলেন। উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হল দীর্ঘকাল পরে। রাজরানির হৃদয়ে শান্তি দান করলেন।

তারপর রানি রাজাকে বললেন, হে মহারাজ, তুমি ভক্তিভরে শনিদেবের পূজা কর, মার্কণ্ডেয় মুনির মুখে আমি শনি পূজার বিধি শুনেছি।

এই বলে রানি রাজাকে পূজার বিধান জানিয়ে দিলেন। তখন মহারাজ বীরসেন একান্ত অন্তরে বিধি অনুসারে শনিবারে শনিদেবের পূজা করলেন, শনিদেবের অনেক স্তব স্তুতি করলেন।

সূর্যের পুত্র শনি সেই পূজায় তুষ্ট হয়ে দিব্যমূর্তি ধরে রাজাকে দেখা দিলেন। সেই মূর্তি দেখে রাজা আনন্দে মাটিতে পড়ে প্রণাম করলেন।

শনিদেব রাজা বীরসেনের পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিলেন। বীরসেন তুমি তোমার "হারানো রাজ্য ফিরে পাবে।" তারপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিরাতরাজ সিন্ধুরাজের বরলাভের বিষয় জেনে তাকে বললেন–গ্রহরাজ যখন সন্তুষ্ট হয়েছেন তাহলে আপনার মনোরথ নিশ্চয় সিদ্ধ হবে। এই বলে কিরাতরাজ নিজের সৈন্যদের নিয়ে পাঞ্চালরাজের সৈন্যদের সাথে মিলন করিয়ে দিলেন। এবং সিন্ধুনগরে উপনীত হলেন। রাজপুরী থেকে এক ক্রোশ দূরে তারা শিবির গঠন করলেন।

সিন্ধুরাজকে পরাজিত করে নিষ্ঠুর যবনরাজ সিংহাসন অধিকার করে বসেছিলেন। এখন চরমুখে খবর পেয়ে কিরাত ও পাঞ্চাল রাজের আক্রমণ রুখতে নিজেদের সৈন্যদলকে সংঘবদ্ধ করে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। শুরু হল যুদ্ধ। অগ্নিসম শত্রুগণ মহাতেজ ধরে সহস্র বছর রণক্ষেত্রে মহাবল ক্ষত্রিয়দান যবনগণকে নানাভাবে বিধ্বস্ত করল।

এমন সময় দিব্যরূপা ষোড়শী, মুক্তকেশী, নীলাম্বর পরিধান করে দানবদলনী চণ্ডী সেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। তারপর দিব্য ধনুকের সাহায্যে বাণ মেরে অসংখ্য যবন সৈন্যকে বিনাশ করলেন। তা দেখে যবন সৈন্যরা ক্রোধভরে দেবীকে বিনাশ করবার জন্য ঘন ঘন শর মারতে লাগল। তখন পাঞ্চাল আর কিরাত সৈন্যগণ যবন সৈন্য নাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ভীষণভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন। প্রলয়ে ধরণী যেমন কাপে সেইভাবে রণক্ষেত্র কাঁপতে লাগল এই যুদ্ধে। সেই পরমা সুন্দরী বদনা চণ্ডী আসলে কিরাতরাজের কন্যা, যুদ্ধক্ষেত্রে

রমণীকে দেখে যবনরাজ কামার্ত হয়ে বললেন, হে সুন্দরী, তোমাকে যোদ্ধার বেশে মানায় না। আমার প্রাসাদে অন্তঃপুরস্থ সব সুন্দরীর থেকে তুমি সুন্দরী, আমার কাছে। এস।

যবনরাজের কথা শুনে সিন্ধুরাজ বীরসেন ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দিকে বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। এখন সমস্ত যবন সৈন্য এক হয়ে সিন্ধুরাজকে বিনাশ করবার চেষ্টা করল।

এদিকে কিরাতকন্যা যবনরাজের কথা শুনে রাগে অপমানে বক্ষশির অস্ত্র ছুঁড়ে মারলেন তাঁর উপর। যবনরাজ সেই বাণের তেজে ভস্মীভূত হয়ে গেল।

যবনরাজের পতনের পর তার ভাই এল যুদ্ধক্ষেত্রে। ভ্রাতৃহত্যার রাগে কিরাতরাজের দিকে এগিয়ে নানা বাণ ছুঁড়ল। কিরাতরাজও রথ নিয়ে তার কাছে এলেন, তখন যবন একটা বিশাল গদা ছুঁড়ে মারলেন কিরাতরাজের দিকে, কিরাতরাজ অতি সহজেই সেই গদা হাতে ধরে নিলেন আর ছুঁড়ে মারলেন যবনের দিকে। যবনের সেনাপতি মরল সেই আঘাতে, কিন্তু যবনরাজের ভাই মরল না। দেখে কিরাতের কন্যা একটা শূল ধরে মন্ত্রপুত করে ছুঁড়ে দিলেন, মেঘের মত গর্জন করে সেই শূল পড়ল যবনের মাথায়, রক্তবমি করতে করতে মারা গেল সে, সিন্ধুরাজ রাগে খড়গ দিয়ে তার মাথাটা কেটে ফেললেন।

যবন সৈন্য অল্প কিছু বেঁচে ছিল, তারা এই অবস্থা দেখে যে যেদিকে পারল ছুটে পালিয়ে গেল। ক্ষত্রিয়গণ পিছু ধাওয়া করে সকলকেই মেরে ফেলল।

জয় হল সিন্ধুরাজের। কিরাতরাজকে আলিঙ্গন করলেন, তারপর পাঞ্চালরাজকেও আলিঙ্গন করলেন।

কিরাতরাজের কন্যা যুদ্ধক্ষেত্রে এমনভাবে যুদ্ধ করল যে কিরাতরাজ অবাক হয়ে গেলেন।

মেয়ে কোথায় শিখল এমন যুদ্ধ? গর্বিত পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, এমন যুদ্ধ তুমি কোথায় শিখলে? তোমার যুদ্ধ দেখে মনে হল এ কোন মানবীর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু একটা কথা বলি যখন সিন্ধুরাজ আমার অন্তঃপুরে আসেন রানিকে দেখবার জন্য, তখন তুমি তাকে দেখে অনুরক্তা হয়েছিলে, এখন আমার ইচ্ছা তোমাকে সেই সিন্ধুরাজের হাতে তুলে দিই।

কন্যা আর কি বলবে? লজ্জায় মাথা নত করে থাকল, তারপর কিরাতরাজ সিন্ধুরাজকে সব কথা জানিয়ে কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিলেন মহা ধুমধামে।

তারপর সিন্ধুরাজ দুই পত্নীকে নিয়ে সবার কাছে বিদায় নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। সকল সামন্তরাজাগণ নতশিরে তাঁকে রাজপদে বন্দনা করলেন, সিন্ধুনগরী আনন্দে মুখরিত হল।

সিন্ধুরাজ বীরসেন কুলগুরুর কাছে শনি মন্ত্র গ্রহণ করে প্রতি শনিবারে গ্রহরাজের পুজো করতে লাগলেন।

দেবীর দেহাভ্যন্তরে শিবের অদ্ভুত দর্শন

একদিন হর-পার্বতী নানা কথায় আনন্দ উপভোগ করছেন, মহাদেব একবার পার্বতীকে বললেন, দেবী, তোমাকে আমি আজও বুঝতে পারিনি, আমি কত দৈত্যকে সৃষ্টি করেছি। আবার তাদের দেখে ভয়ও পেয়েছি। এই তো কিছুদিন আগে এক দৈত্যকে সৃষ্টি করে তার তেজ দেখে ভয় পেয়ে আমি তোমার মধ্যে লুকিয়ে গেলাম। তোমার দেহের মধ্যে অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

আমি আগে কখনও এমন দেখিনি। কারো মুখে শুনিওনি। দেখলাম তোমার দেহের মধ্যে কোটি। কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করছে। কত ব্রহ্মা, কত বিষ্ণু, কত মহেশ্বর! আবার এক একজন ব্রহ্মার কোটি কোটি মাথা, অষ্টসিদ্ধির সঙ্গে কত যে মহেশ্বর তার সংখ্যা গণনা করা সম্ভব নয়। এইসব তোমার দেহের মধ্যে দেখে আমি তো ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লাম। আমি যে কে তাও ভুলে গেলাম; কি ছিলাম, কি হলাম তাও বুঝতে পারলাম না।

এইভাবে কোটি বছর ঘুরতে ঘুরতে তোমার হৃদয়ে উপনীত হলাম। সে হৃদয়পাশে অতি অপরূপ একটি পদ্মফুল দেখলাম। দিব্যতেজে আলোকিত, সেই আলোকে দেখলাম রসনার মাঝে সুন্দর রসপুঞ্জ। সেখানে ব্রহ্মজ্ঞানও দেখতে পাই। সর্বজ্ঞানময় সর্বপুণ্যময়, ব্রহ্মানন্দময় সবই দেখলাম। মনে খুব আনন্দ হল। অন্তরের মলিনতা দূর হল। তারপর ষটপুজোর মাঝে মনোহর সর্ববেদও দেখলাম। চারি বেদ পাঠ করলাম।

তারপর দেখলাম সনাতন কালীকে, তিনি ব্রহ্মাস্বরূপিণী। তার চারিদিকে যযাগিণীগণ আনন্দে নৃত্য করছে। তখন এক আশ্চর্য জিনিস দেখতে পেলাম। যোগিণীদের সাথে দেবীও নাচছেন, তার চিবুক থেকে দুইটি ঘামের বিন্দু ঝরে পড়ছে।

সেই দুই ঘর্মবিন্দু থেকে ব্রহ্মা আর হরির জন্ম হল। তারা জন্মে দেবীকে দেখে ভয়ে পালাবার চেষ্টা করলেন। ব্রহ্মা দেবীর পিলিতে আর হরি ঈড়াতে আটকে গেলেন। তখন দুজনেই কাঁদতে শুরু করলেন। তারপর আমি বিষ্ণুর পাশে গিয়ে জ্ঞানমন্ত্র দান করলাম, তাতে বিষ্ণু আমার মতই হয়ে গেলেন। ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাঁকে মন্ত্রও দিলাম। তিনিও আমার মত হলেন।

এখন হরি আমার বামদিকে আর ব্রহ্মা আমার ডান দিকে বসলেন।

এদিকে কালীর নাচ আর থামে না। এভাবে শতকোটি বছর কেটে গেল। চারদিকে যোগিণীরা আর, শিবগণও নাচছে। নানা বাদ্য বাজছে। তখন আমি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কালিকার বহু স্তব-স্তুতি করলাম। প্রথমে ব্রহ্মা এককোটি বছর স্তব করলেন। দেবী বললেন, হে বিধাতা, তুমি সর্বশাস্ত্র জেনেছ, কাজেই তুমি সৃষ্টিকর্তা হরে।

তারপর কোটি বছর ধরে বিষ্ণু স্তব করলেন। তখন দেবী বললেন, হে বিষ্ণু, আমার আদেশ তুমি বিশ্বকে পালন কর।

সবশেষে আমি বিশ কোটি বছর ধরে স্তব করলাম। দেবী বললেন, হে শিব, তুমি আমার আজ্ঞায় সংহার করো। তারপর আমি আবার পাঁচ কোটি বছর স্তব করবার পর দেবী সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে বললেন, হে সদাশিব, আমি তোমার স্তবে খুশি হয়েছি, তুমি বর চাও।

তখন আমি প্রার্থনা করলাম, হে দেবী, তোমার চরণে যেন আমার মতি থাকে।

আমার প্রার্থনা শুনে কালী বললেন, শুনুন সদাশিব, তোমার দেহ থেকে ঘোর দৈত্য জন্মাল, সেই দৈত্যকে আমি বধ করলাম। সেই দানব আমার সঙ্গে এমন যুদ্ধ করল, তার কোটি ভাগও আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে কারও শক্তি নেই।

সেই দৈত্য আবার মহিষরূপে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, তখন আমি ভদ্রকালীরূপে তাকে বিনাশ করব। তখন আমার বামাঙ্গুষ্ঠ তোমার হৃদয়ে রাখা থাকবে। তখন তুমি শবরূপ ধারণ করবে তোমার ওপরেই আমার আসন হবে।

দেবীর এমন কথা শুনে আমি তার পায়ের তলায় পড়ে গেলাম শবরূপে। এইভাবে লক্ষ বছর কেটে গেল। ব্রহ্মা আর বিষ্ণু নতশিরে সেই দেবীর বন্দনা করল। লক্ষ বছর পরে আমি যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন দেবীকে কোথাও দেখতে পেলাম না। আমি বিষাদগ্রস্ত হয়ে কাঁদতে লাগলাম পাঁচ লক্ষ বছর ধরে। তবুও যখন দেবীর দেখা পেলাম না, তখন আরও জোরে কাঁদতে লাগলাম।

সেই কান্না শুনে দেবী অদৃশ্য থেকে বললেন–তোমাদের কোনো ভয় নেই। আমি সবার কাছে সবসময়ই থাকি। পূর্বে আমার যে নির্মম রূপ দেখেছ, সেই রূপ হৃদয়মাঝে চিন্তা করে আমার মন্ত্র জপ করো। তাহলে সবার মঙ্গল হবে।

তারপর মহাদেবী বিষ্ণুকে বললেন–হে বিষ্ণু, তুমি এখন ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করো। যতক্ষণ জ্ঞান ক্রিয়াময়ী সৃষ্ট না হয় ততদিন তুমি সেখানে থাকবে।

তারপর মহাদেবী আমাকে বললেন–হে পশুপতি, তুমিও ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ কর। যতদিন ব্রহ্মার দেহে বিষ্ণু থাকবে, তুমিও থাকবে ততদিন। তারপর মহাদেবী আনন্দভরে তিনজনকে তিন শক্তি দিলেন। ইচ্ছাশক্তি দিলেন বিষ্ণুকে, ক্রিয়াশক্তি দিলেন ব্রহ্মাকে আর জ্ঞানশক্তি দিলেন আমাকে।

এইভাবে আমরা শক্তি লাভ করে খুব খুশি হলাম। দেবী তারপর মধুর বাক্যে বললেন, আমি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাব না। এমন কথা বলে দেবী তিনজনের দেহের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমি বিধাতার দেহে প্রবেশ করলাম। তখন বিধাতার জ্ঞান লাভ হল। বিষ্ণুও ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করলেন। তাতে ব্রহ্মাও জ্ঞানলাভে খুব আনন্দ পেলেন।

তারপর কালীর উদ্দেশ্যে বিধাতা হোম করলেন। পরে ব্রহ্মা চিন্তা করলেন–এবার কি করবে? তারপর মহা জলরাশি সৃষ্টি করলেন। সেই জলে ত্রিভুবন পরিব্যপ্ত হল। স্বর্ণবর্ণ বীর্য তাতে ফেলল। তা বুদ্বুদ আকারে উঠল। সেটাই হলো ব্রহ্মাণ্ড। এই রূপে আরও অনেক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হল। তখন আমি রুদ্রমূর্তি ধরে সেইসব ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করলাম। আবার আমিই সংহার করতে লাগলাম। হে দেবী, বিষ্ণু তোমার আদেশে ব্রহ্মাণ্ড পালন করলেন। আর বিধাতা প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে সৃজন কার্য শুরু করলেন।

হে পার্বতী, তুমিই আদ্যাশক্তি। এইসব ঘটনা ঘটেছে বহু পূর্বে এখন তোমাকে জানালাম। তোমার মায়াতেই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন আর সংহার, তুমি যার প্রতি তুষ্ট থাক, তার ভবের বন্ধন ঘুচে গিয়ে মোক্ষ লাভে গতি হয়।

শিবের অঙ্গে ভস্মলেপনের কারণ

কৈলাসে বসে হর-পার্বতী কথাবার্তা বলছেন। নানা কথা বলতে বলতে পার্বতী একসময় শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে নাথ, তুমি অঙ্গে ছাই মাখো কেন?

মহাদেব বললেন–হে দেবী, এ বিষয়ে একটি কাহিনি বলব, তুমি শোন। ভৃগুবংশে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন–নাম বিদ্যা, একবার তিনি ঘোরতর তপস্যা করলেন। শীতে জলের মধ্যে বসে, গ্রীষ্মকালে চারপাশে আগুন জ্বেলে, বর্ষায় বৃষ্টিতে ভিজে তপস্যা করলেন। প্রথম প্রথম অল্পমাত্র একবারই খেতেন। তারপর শুধু গাছের পাতা খেয়ে থাকতেন। তারপর বায়ু খেয়ে ঘোর তপস্যা করলেন।

তারপর হে দেবী, শোন এক আশ্চর্য ঘটনা। তাঁর আশ্রমে যত জন্তু-জানোয়ার ছিল যেমন ভাল্লুক, শৃগাল, সিংহ, বাঘ, হাতি প্রভৃতি সকলেই হিংসা ছেড়ে কেবলমাত্র ঘাস খেতে আরম্ভ করল। আরও আশ্চর্য ঘটনা–তারা বন থেকে ফলমূল এনে সেই ব্রাহ্মণকে দিত। যেন তাঁর চাকরের মতোই কাজ করছে তারা। মাংশাসী জন্তুরা তৃণভোজী হয়ে গেল। তাঁর তপের প্রভাবে। তারা যত ফলমূল এনে দিত, ব্রাহ্মণ তার সামান্য মাত্র নিয়ে বাকি সব তাদেরকেই বিলিয়ে দিত।

প্রথমদিকে সেই ব্রাহ্মণ ফলমূল আহার করত। তারপর কেবল পর্ণ খেয়েই থাকত, সেজন্য তার নাম হল পর্ণাদ। ক্রমে ক্রমে তাও ছেড়ে দিয়ে কেবল বায়ুই আহার করত। এইভাবে তপস্যা করছে সে, সবসময়ই আমার চিন্তা হয়। আমার রূপ সে তার হৃদয়েমাঝে চিন্তা করে। ক্রমে ক্রমে আত্মা পবিত্র হল, তার দেহ থেকে এক জ্যোতি বের হতে লাগল। জ্বলতে লাগল ত্রিভুবন। আমি বর দিতে গেলাম সন্তুষ্ট হয়ে।

যোগবলে ব্রাহ্মণের তখন একেবারে শুকনো শরীর। আমাকে দেখেই লুটিয়ে পড়ে চেতনা হারাল সে। আমার স্পর্শে চেতনা ফিরে পেল। তার তপস্যায় ধন পেয়ে আনন্দে স্তব করল আমার।

তখন আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বললাম, হে ব্রাহ্মণ, আমি তোমার স্তবে খুশি, বহু কষ্টে তপস্যা করলে, এখন বল কি চাই?

তারপর সেই বিপ্র ধীরে ধীরে উত্তর করল–হে দেব, আপনার যখন দেখা পেলাম, তাই আমার আর কোন চিন্তা নেই। কেবল একটাই মিনতি আমার, যেন অন্তিমে আপনার পাদপদ্মে ঠাঁই পাই। পুনরায় আর যেন ভবডোরে বন্দি না হই।

ব্রাহ্মণের এমন প্রার্থনা শুনে আমি বললাম, অতীব পবিত্র বর তুমি প্রার্থনা করলে, অবশ্যই তা পূর্ণ হবে। এখন নিজের ঘরে যাও।

এই কথা বলে আমি অদৃশ্য হয়ে গেলাম। তখন সেই ব্রাহ্মণ কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না, তারপর মনে মনে ভাবলো–ত্রিভুবনে আমার কীর্তি স্থাপন করব। তখন সে যোগাসনে বসে আবার তপস্যা শুরু করল।

তারপর হঠাৎ যোগের তেজ বের হয়ে তার সমস্ত দেহ পুড়িয়ে দিল। তখন তার অন্তরাত্মা আমার চরণে প্রবেশ করল। তার দেহ ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার পর তার থেকে অপূর্ব ভস্ম বের হল। সেই ভস্ম দেহে মেখে আমার খুব আনন্দ হল, সেই ভস্ম আমি হাতে করে নিলাম। সেই ভস্মের স্পর্শ আমার সর্বাঙ্গে মেখে নিলাম।

ভক্তের দেহের ভস্ম মেখে, আমার দেহের শোভা অপূর্ব হয়ে গেল।

হে দেবী, তারপর সে এক অপূর্ব ঘটনা। সেই বিপ্র যোগবলে দেহকে ভস্ম করার পর দিব্য দেহ ধরে আমার সামনে উপস্থিত। আমার চরণতলে প্রণাম জানিয়ে বহু স্তব স্তুতি করল। তখন আমি আমার রূপ দেখালাম।

তারপর আমি বললাম, ওহে বিপ্র, আমি তোমার স্তবে তুষ্ট। তুমি গণশ্রেষ্ঠ হয়ে নিত্যকাল আমার আমাতেই থাকবে। হে দেবী, আমার বরে সেই সাধু গণধীপ হয়ে কৈলাসে বাস করছে পরম আনন্দে।

দেবী, আমি যে কারণে ভক্তের সুগন্ধ ভস্ম অঙ্গে মাখি, তার কারণ তোমায় বললাম। প্রয়াগে পুষ্করাদি তীর্থে সেই ফললাভ হয়, ভস্মস্থানেও সেই ফল। গায়ে ভস্ম মেখে তপস্যা করলে সহজেই সিদ্ধিলাভ হয়। রাক্ষস পিশাচাদির থেকে ভয়ে দূরে যায়। যার গায়ে ভস্ম থাকে যম তার কাছে যেতে পারে না।

শিব-সতীর বিবাহ ও দক্ষযজ্ঞ

ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রজাপতি, সেই দক্ষের অসংখ্য কন্যা। তাদের মধ্যে সতী একজন। রূপে গুণে অতুলনীয়া। ব্রহ্মা চিন্তা করলেন–শিবের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন। ব্রহ্মা দক্ষকে বললেন–তার মনের কথা।

দক্ষ বললেন, হে পিতা, আপনি যখন বলছেন, তাহলে কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু পাত্রের গুণ, কুল, বিদ্যা, রূপ এসব তো দেখতে হবে? বিশেষ করে দাতা কি গ্রহীতার চরিত্র না দেখে কন্যা সমর্পণ করা যায় না। আপনি শঙ্করের পরিচয় আমার কাছে বলুন।

ব্রহ্মা বললেন, তিনি পঞ্চানন আবার তার সহস্র রূপ। সাধারণত ত্রিনেত্র। কখন কখন শত সহস্রও হয়। শশধরের মতো তার বর্ণ। কখনও নীলবর্ণ আবার কখনও কমলবর্ণও হয়, কখন কি যে ভাবেন বোঝা যায় না, তাঁর বিদ্যা জানতে এমন কেউ নেই সে তা জানতে পারে। চারিবেদ তার সীমা দিতে পারে না। তার গোত্রের কোনো ঠিক নেই। সবার ঈশ্বর তিনি, তিনি সিদ্ধিদাতা, মুক্তিদাতা, তিনি সৃষ্টি করেন আবার তিনি অন্তিম সংহার করেন। দিবানিশি শ্মশানে ঘোরেন।

শিবের চরিত্রের কিছু বললাম। আমি মনে করি সতীর উপযুক্ত হবেন।

ব্রহ্মার মুখে পাত্রের এমন পরিচয় পেয়ে দক্ষ বিস্মিত হয়ে বললেন–শিবের মধ্যে বর হবার কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। সতীর রূপের তুলনা হয় না। সব ক্রিয়াকাণ্ডের বাইরে শিব। তার হাতে কন্যা দান করা অসম্ভব। আমার কন্যা কখনই শ্মশানবাসী হতে পারবে না।

আমি রাজা আর আমার জামাই ভিখারী?

দক্ষের কথায় ব্রহ্মা দুঃখিত হয়ে বললেন, সকল জীবের পরম ঈশ্বর শিব, সকল দেবতার থেকে তিনি প্রবীণ, তিনি নির্গুণ হয়েও সগুণ, তার সমান পাত্র জগতে দ্বিতীয় কেউ নেই।

ব্রহ্মার মুখে এমন কথা শুনে দক্ষ বললেন–হে পিতা, আমি আমার সতীকে আপনার হাতেই তুলে দিলাম। তারপর আপনি আপনার ইচ্ছামতো যার হাতে তোক তুলে দিন।

এই কথা বলে দক্ষ সতীকে এনে ব্রহ্মার হাতে তুলে দিলেন। ব্রহ্মা সতীকে নিয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন। তারপর তিনি সকল দেবতাদের স্মরণ করতে সবাই উপস্থিত হলেন সেখানে। তারপর

গন্ধর্ব, চারণ, সিদ্ধগণ ও সপ্তর্ষিকেও স্মরণ করে আনা হল। সপ্তর্ষি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। ব্রহ্মা শিবের হাতে সতীকে সম্প্রদান করলেন। নৃত্য গীতে সবাই আনন্দ উপভোগ করলেন। দেবতারা শিব-সতীর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করলেন।

সকলকে প্রস্থান করিয়ে ব্রহ্মা আপন পুরীতে চলে গেলেন। দেবতারাও চলে গেলেন। শিবকে পতিরূপে পেয়ে সতীর খুব আনন্দ। একসময় ব্রহ্মা বিষ্ণু সহ সকল দেবতাগণ শিব-সতাঁকে দর্শনের জন্য গেলেন। দক্ষও গেলেন কন্যা-জামাতাকে দেখতে। সতী সবাইকে দেখে আনন্দিত হলেন এবং সবাইকে সমান সম্মান দিলেন।

সবাই খুশি, কিন্তু দক্ষ অপমানিত বোধ করলেন। তিনি শিবের শ্বশুর আর তাকেও কিনা সমান সম্মান।

দেবী সতী, পরমাত্মা স্বরূপিণী হন, তার দৃষ্টি সবার প্রতি সমান, দক্ষ শিবের তত্ত্ব না জেনে কন্যা জামাতা জ্ঞান করলেন। তাই অপমানিত বোধ করে চলে গেলেন।

একদিন দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করলেন, সেখানে সকল দেবতা এসে হাজির হলেন, কেবল শিব ও সতীকে তিনি ডাকলেন না।

মহাযজ্ঞের ধূম আকাশে উঠল, সতী বললেন, কে এই যজ্ঞ করছেন। শিবহীন যজ্ঞ হয়ে কেমন করে, আমার পিতা বড়ই মূর্খ।

শিব বললেন, সকল দেবতা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত, তাঁরা যজ্ঞাংশ ভক্ষণ করবেন, তাতেই আমি মুগ্ধ।

দেবী বললেন, পিতা-মাতার চরণ দর্শন করতে আমি পিতৃগৃহে যাব। তুমি অনুমতি দাও। বাবা কেন শিবহীন যজ্ঞ করেছেন আমি জানবো।

শিব বললেন, সতী বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়া উচিত নয়। আমাদের আমন্ত্রণ নেই। না যাওয়াই ভালো।

দেবী বললেন, মেয়ে বাপের বাড়ি যাবে সেখানে আমন্ত্রণের কি প্রয়োজন?

সতীর উৎসাহ দেখে শিব বললেন, দেবী আমার আদেশ উপেক্ষা কোরো না। বিনা নিমন্ত্রণে গেলে অপমানিত হতে হবে।

শিবের আপত্তি দেখে সতী খুব রেগে গিয়ে বললেন, আমি কেন যাব না? দেখে নাও আমি কে?

এই কথা বলে দেবী দশমহাবিদ্যা রূপ দেখালেন শিবকে। কালী, তারা, ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্থা, ধূমাবতী, গলামুখী, মাতঙ্গী ও বগলা।

শিব এই রূপ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। তার পর দেবী তার নিজরূপে ফিরে আসলে শিব বললেন,– আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। তুমি যজ্ঞে যাও তবে তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

দেবী গেলেন, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সবাই তার চরণ বন্দনা করলেন। কিন্তু দক্ষ অনাহুত সতীকে দেখে রাগে বলতে লাগলেন–শ্মশানবাসী শিবের ভার্য্যা এখানে এসেছে। যজ্ঞস্থল অপবিত্র হল। বিনা নিমন্ত্রণে এল, এর কি কোনো লজ্জা নেই?

দক্ষের এমন কথা শুনে ব্রহ্মা বললেন, তিষ্ঠ পাপিষ্ঠ দক্ষ, শিবের ঘরণী সতীকে তুমি চিনতে পারনি।

দেবী জগৎ-জননী আদ্যাশক্তি, এঁর থেকেই সৃষ্টি ত্রিভুবন। আর শিবকে চিনবে কেমন করে আমিও চিনতে পারিনি তাঁকে।

দধীচি বললেন, হে দক্ষ, ব্রহ্মা তোমার পিতা, তুমি পিতার কথা লঙ্ঘন করো না। তাতে ধর্মাবৃদ্ধি পাবে। শিব রেগে গেলে তোমার যজ্ঞ ধ্বংস হবে।

তাদের কথা শুনে দক্ষ বললেন, যে শ্মশানেমশানে ঘোরে, তাকে হবি দান করতে পারবো না, শিব রেগে গেলে কি ক্ষতি করবে আমার? আমার আজ্ঞাবহ দেবতাদের আমি হবি দান করব।

দধীচি মুনি রেগে আবার বললেন–ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর সকল দেবতাগণ এরা যতই থাকুক শিব রেগে গেলে এই যজ্ঞ কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তার থেকেই সৃষ্টি আর শেষ, যেজন শিব নিন্দা করবে তার জীবন সুখকর হবে না। হে দক্ষ, তুমি রুদ্রের উপর হিংসা করলে, তোমার মঙ্গল হবে না।

তারপর ব্রহ্মাও অনেক বোঝালেন দক্ষকে, কিন্তু দক্ষ রেগে শিব নিন্দা করতে ছাড়লেন না। বললেন, শিবের চরিত্র আমার জানা আছে, শ্মশানে-মশানে থাকে, ভাঙ ধুতরা খায়, লজ্জাহীন উলঙ্গ, গায়ে তেল নেই, ছাই মাখে, কোন বেশভূষা নেই, মাথা জটা আর তার অনুচররা সকলেই ভূত প্রেতের দল।

দক্ষের মুখে এমন শিবের নিন্দা শুনে উপস্থিত সকল দেবতাগণ দুঃখিত হয়ে কানে আঙ্গুল দিলেন।

সতী নিজের কানে পতি নিন্দা শুনে মহারুষ্ট হলেন, তিনি পিতাকে বললেন, আজ পর্যন্ত কেউ শিবের নিন্দা করেনি। তুমি তাই করলে। তুমি যেহেতু মহেশ্বরের বদনাম করলে, তাই তোমার কুল নষ্ট

এইভাবে দক্ষকে ভর্ৎসনা করলেন সতী এবং নিজের প্রাণবায়ু রোধ করে যজ্ঞস্থলে মৃত্যুবরণ করেন।

শিব অন্তর্যামী তাই তিনি কৈলাসে থেকেও সতীর দেহত্যাগের কথা জানতে পারলেন। তিনি মহাক্রুদ্ধ হলেন, তার চোখ দিয়ে আগুন বেরোতে লাগল। শঙ্করের গাত্ররোম থেকে অতি ভয়ঙ্কর এক মহাবীরের সৃষ্টি হল। তার হাজার হাজার হাত, হাজার হাজার চোখ, হাতে শূল, গদা, চক্র বজ্র, দগর করে আছে, সিংহের মতই তার বিক্রম।

শিবরোম জাত সেই বীর শিবকে বললেন, হে মহেশ্বর, আমাকে সৃষ্টি করলেন কেন? আমাকে কি করতে হবে।

শিব বললেন, যেহেতু তোমার জন্ম আমার ক্রোধ থেকে, তাই তোমার নাম বীরভদ্র। তুমি তাড়াতাড়ি দক্ষের যজ্ঞাগারে যাও, ধ্বংস করে এস যজ্ঞ। তোমার সাহায্যের জন্য যাকে খুশি সৃষ্টি করে নেবে।

রুদ্রের কৃপায় বীরভদ্র নিজের মনে ক্রোধের সৃষ্টি করে দেবী ভদ্রকালীকে সৃজন করলেন।

মহেশ্বর তখন দুজনকেই আশীর্বাদ করলেন।

তারা সঙ্গে নিলেন অসংখ্য প্রমথগণকে। তারপর তারা যজ্ঞাগারে উপস্থিত হল। হরিদ্বারের কাছে। কখল নামে এক স্থানে দক্ষের যজ্ঞস্থল, সেই যজ্ঞাগারের উত্তরদ্বারে দাঁড়াল বীরভদ্র আর দক্ষিণদ্বারে দাঁড়াল ভদ্রকালী।

তাদের দেখে দেবতারা বুঝতে পারেন, যজ্ঞস্থল এক্ষুনি ধ্বংস হবে। প্রমুখ ধর্মরাজ ও বীরভদ্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধল। ধর্মরাজকে পরাস্ত করে বীরভদ্র ঢুকলেন যজ্ঞাগারে। সকল দেবতাগণ তাকে বাধা, দেওয়ার চেষ্টা করেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধল, আহত হয়ে দেবতারা পিছু হঠতে বাধ্য হলেন। প্রমথগণ যেখানে যজ্ঞযুদ্ধে গচ্ছিত হচ্ছিল সেখানে গিয়ে উপদ্রব শুরু করল। তখন সেই যজ্ঞের পুরোহিতগণ ভয়ে পালাল এবং তারা নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন।

নারায়ণ যুদ্ধ করে বসেছিলেন, পরে তিনি উঠলেন অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে মারলেন বীরভদ্রের উপর। বীরভদ্রের গায়ে লেগে সব অস্ত্র মাটিতে পড়ে গেল। বহুক্ষণ যুদ্ধ করলেন নারায়ণ, যত অস্ত্র মারেন, শিবের প্রসাদে সব অস্ত্রই ব্যর্থ করে দেন বীরভদ্র। বীরভদ্রকে দমন করতে না পেরে হরি নাক দিয়ে বীরভদ্রকে ধারণ করে ভূমির উপর ফেলে বাহু আর উরুর দ্বারা শোষণ করতে লাগলেন। তার ফলে বীরভদ্র রক্তবমি করল। সেই রক্তের সনে একটি চক্র বের হল। শ্রীহরি সেই চক্রটি নিয়ে বীরভদ্রকে ছেড়ে দিলেন।

এমন সময় মহেশ্বর ক্রোধান্বিত হয়ে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। বীরভদ্র তাকে দেখে তার শরণ নিলেন। বীরভদ্রের রক্তমাখা শরীর দেখে মহাদেব ক্রুদ্ধ হন। তিনি নিজে যজ্ঞের মধ্যস্থলে গিয়ে সব লন্ডভন্ড করে দিলেন। রুদ্রের সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ভগবান শ্রীহরি ভয় পেয়ে সেই স্থান ছেড়ে কুজাম্রকাননে আশ্রয় নেন। দেবতারা ভয়ে, যেদিকে পারলেন চলে গেলেন।

এইসব দৃশ্য দেখে প্রজাপতি দক্ষ ভাবলেন। শিবকে অপমান করার জন্যই এইসব হল। অপমানিত হয়ে সকল নিমন্ত্রিতগণ চলে গেলেন। পুণ্যের জন্য যজ্ঞ করেছিলাম, পেলাম যা পাবার ছিল।

শিবের অনুচরেরা মহর্ষিগণকে মারতে লাগলেন, তখন মহর্ষিগণ বীরভদ্রের স্তব করলেন। তবুও বীরভদ্র শান্ত হল না। তিনি দক্ষের মাথায় আঘাত করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে দক্ষের মাথা ছিন্ন হয়ে গেল।

যারা যজ্ঞ করলেন তারাই মারা গেলেন। তাই সকলেই ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। দ্বারের কাছে ভদ্রকালী ও প্রমথেরা ছিল। যারা পালাতে চেষ্টা করছিল তাদেরকে তারা বধ

করেছিল। তখন উপায় না দেখে দেবতাগণ পাখির রূপ ধরে যজ্ঞস্থল ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। ব্রহ্মা মুক্ত রূপ ধরে পালাবার চেষ্টা করলে শিব তাঁকে ধরে ফেলেন। কোন উপায় না দেখে ব্রহ্মা রুদ্রের স্তব-স্তুতি করলেন। শিব তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মাকে বললেন, বল কি চাই?

ব্রহ্মা বললেন, দক্ষকে বাঁচিয়ে দিন এবং যাঁরা যাঁরা এই যুদ্ধে মারা গেছেন তাঁদের প্রত্যেকের প্রাণ দান করুন।

মহেশ্বর বললেন, এখানে যজ্ঞে যে পশুকে বলি প্রদত্ত করা হয়েছে, সেই পশুর মাথা দক্ষের কাঁধে যুক্ত করে দিলে সে বেঁচে উঠবে, আর হে ব্রহ্মা, তোমার কমণ্ডলুর জল সবার গায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলে সবাই প্রাণ ফিরে পাবে।

শিবের কথা তো ব্রহ্মা ছাগলের মস্তক দক্ষের কাঁধে যোগ করলেন। তারপর তিনি কমণ্ডুলর জল ছড়িয়ে দিলেন চারদিকে, সকলেই বেঁচে উঠলেন। দক্ষ তখন শিবকে বললেন, এই যজ্ঞে আপনাকে নিমন্ত্রণ না করার ফল আমি পেলাম। এই কথা বলে দক্ষ অর্কত্রের সঙ্গে শিবকে হবি দান করলেন।

সকল দেবতারা শিবের স্তব-স্তুতি করলেন, রুদ্রদেব বীরভদ্রকে সংবরণ করলেন।

দক্ষের যজ্ঞস্থল থেকে একে একে সবাই চলে গেলেন, থাকলেন কেবল মহেশ্বর। তিনি দেখলেন প্রাণহীন সতীর দেহ, ছুটে গিয়ে নিজের কোলে তুলে নিলেন সতীর দেহ এবং বিলাপ করলেন। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের দেবতা, তিনি এক শোকাহত বহুগণ বিনাশ করার পর তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরতে তিনি উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকেন। সতীকে অনেক করে ডাকতে থাকেন, উত্তর না পেয়ে তিনি অভিমান করেন। পাগলের মতো হয়ে গিয়ে তিনি সতীর দেহ কাঁধে তুলে নিয়ে চলতে লাগলেন পাহাড়, বন, জঙ্গল, মরু, নদ-নদী, নানা দেশ ছুটতে থাকলেন, কখনো নাচছেন, কখনো কাঁদছেন, তার পদভারে ভূতল কাঁদতে লাগল। তার তিনটি চোখের জলের ধারা দিয়ে সৃষ্টি এক সরোবর। যার নাম নেত্র সরোবর।

এক বছর পূর্ণ হল তবুও শিবের পাগলামি কাটল না। বুঝি সৃষ্টি নাশ হয়ে যাবে। সকলের ভয় কে এই ভয়ঙ্কর রুদ্রকে সামলাবে? সকলেই শ্রীহরিকে স্মরণ করলেন, বললেন, যতক্ষণ সতীর দেহ শিবের কাঁধে থাকবে, ততক্ষণ তিনি শান্ত হবেন না। আমি যাচ্ছি সতীর দেহকে বিনষ্ট করবার জন্য।

এই কথাগুলি বলে শ্রীহরি তাঁর সুদর্শন চক্র শিবের পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন। ফলে সতীর অঙ্গ কেটে কেটে পড়তে লাগল সব স্থানে। শিব এর কিছুই জানতে পারলেন না, কারণ তিনি তো তখন পাগলের মতো। সতীর সেই খণ্ডিত অংশগুলি যেখানে পড়ল, সেখানে এক-একটি করে মহাতীর্থ গড়ে উঠল। এভাবে একান্ন পীঠস্থান হল।

শিব দেবীর বাকী অংশ খণ্ডিত করেছিলেন। তার অস্থির মালা করে নিজের গলায় পরে নিলেন, এবং তার ভস্ম নিজের গায়ে মাখলেন।

পরমাত্মা শিব সতীর বিরহে সবকিছু ভুলে গেলেন। ব্রহ্মাদি সকল দেবতারা তার কাছে গেলেন।

শ্রীহরি শিবকে বোঝালেন তারপরে বললেন–হে দেব, তোমার সতী হিমালয়ের ঘরে জন্মাবে। পুনরায় তোমার প্রাণপ্রিয়া হবে। হরির কথায় শিব শান্ত হলেন। দেবতারা স্বর্গে ফিরে গেলেন। শিব কৈলাসে গেলেন।

হর গৌরীর রাসলীলা

একদিন শিব পার্বতীকে নিয়ে একাকাননে গেলেন। জায়গাটা দুজনের খুব ভালো লাগল।

পার্বতী শিবকে বললেন, এমন সুন্দর স্থান তিনি এর আগে দেখেননি। তিনি রাসলীলা করতে চাইছেন।

দেবীর কথা মহেশ্বর শুনে বললেন, দেবী, তোমার কথায় আমি খুশি। আমি নিশ্চয় তোমার মনের সাধ মেটাবো। একাম্রকানন আমার খুব প্রিয়। এখানেই রাসক্রীড়া করব। এবং এখানে আমি রাস করব, তাহলে দেবী রাসক্রীড়ায় জন্য অষ্টশক্তিকে সৃজন কর। আমিও অন্যমূর্তি ধরব। ষোলো জনে মিলে এই মহারাসলীলা করব।

শিবের কথামত পার্বতী বিমোহনী অষ্টশক্তি সৃষ্টি করলেন। সকলেরই রূপ অতি মনোহর, ঠোঁটগুলো লাল, বাৎসল্যে স্থুল স্তন, নাভিতে ত্রিবলী রেখা, সবার মুখমণ্ডল চাঁদের মতো। অঙ্গে নানা অলংকার। পরনে তাদের দিব্য বসন। সবার ললাটে তৃতীয় নয়ন, সেই অষ্টশক্তির নাম সুকপোলা, মায়িনী, বিন্ধ্যাগা, মোহিনী অমায়িনী উত্তরগা চন্দ্রমা আর শ্রীদ্বার যামিনী। সকলেই অপরূপা দিব্যামূর্তি ধারিণী।

অষ্টশক্তিকে দেখে এবার মহেশ্বর সৃষ্টি করলেন অষ্টমূর্তি, সবার মাথায় জটা, অর্ধচন্দ্র, তিনটি করে চোখ, পরনে বাঘছাল, নীলকণ্ঠ, গলায় ও হাতে রুদ্রাক্ষ, গায়ে ছাই মাখা, তাঁদের নাম রুদ্র, সূক্ষ্ম, বৈদ্যনাথ, একমূর্তি, শ্রীশিব, উত্তর কেদার ও ঈশান।

এই অষ্টমূর্তি দেখে দেবী খুব প্রসন্ন হলেন। তিনি বললেন–রাসক্রীড়ার জন্য একটি রাসমণ্ডপের প্রয়োজন, হে নাথ, তুমি তা এখনই সৃষ্টি কর।

মহেশ্বর দেবীকে বললেন, দেবী উতলা হয়ো না। অপেক্ষা কর, রাত্রিতেই রাসের মেলা শুরু হয়। পূর্ণিমার রাত হলে তো কথাই নেই তাই আগামী পূর্ণিমাতে হবে রাসের মেলা।

দেবী খুব আনন্দিত হলেন। শিবের কথায় কিন্তু মনে উৎকণ্ঠা হতে লাগলো যে, কখন সেই পূর্ণিমার তিথি আসবে।

কিছুকাল পরে পূর্ণিমার উদয় হলো। মনে হয় জ্যোৎস্নালোকে একাকানন সুন্দর হলো। দুজনেই খুব প্রসন্ন হলেন। হৃদয় অন্তর সদা করিছে তিন উভয়ের হৃদয়ে বাসের আবেল হল।

এর পরেই মহেশ্বর রাসমণ্ডল সৃষ্টি করলেন। সেই মণ্ডপের শোভা অবর্ণনীয়। সেই মণ্ডপ দেখে গৌরীও অভিভূত হলেন।

মহেশ্বর পার্বতীকে বললেন–এস প্রাণপ্রিয়ে, অষ্টম হরের সঙ্গে রাসমণ্ডল চন্দ্রের আলোকে অপরূপা হয়েছে। এখনই রাসক্রীড়ার উপযুক্ত সময়।

দেবী বললেন, হে দেব, আমার এই অষ্টশক্তির সঙ্গে রাসক্রীড়া করে জীবন সফল কর।

দেবীর কথায় ত্রিপুরারি শিব শক্তিগুণে, আর নিজ সৃষ্টি অষ্ট মূর্তিগণে সম্বোধন করে বললেন–এক দেবী, আর এক দেব এইভাবে বার বার দাঁড়িয়ে সুন্দর মণ্ডল রচনা কর।

শিবের কথামতো ষোলোজন দেবদেবী মণ্ডলাকারে দাঁড়ালেন। আর তাদের মাঝে শঙ্কর-শঙ্করী যেখানে থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। আমগাছের একটা শাখান্দে আশ্রয় করে তারা গুপ্তভাবে থাকলেন।

ষোলোজন দেব-দেবী এদিকে তাদেরকে দেখতে না পেয়ে ঘুমতে লাগলেন। কেবল চন্দ্রমা রয়ে গেলেন।

তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন–হে ত্রিপুরারি, তুমি কোথায় গেলে আমাকে ছেড়ে? তাড়াতাড়ি দেখা দাও, হে চন্দ্রবদন গৌরী তুমি কোথায় লুকিয়ে আছ? হে সুন্দরী, আমাকে দেখা দাও, আমি যেন তোমার পাদপদ্ম সবসময় দেখতে পাই। তোমাকে ছাড়া আমি যে থাকতে পারছি না।

চন্দ্রমাকে এই ভাবে কাঁদতে দেখে দেবী আর্বিভূতা হলেন এবং বললেন, তোমার ভক্তি দেখে আমি খুব খুশি। আমার সৃষ্ট অষ্টশক্তির মধ্যে তুমিই প্রধান। তুমি যেহেতু আমাকে গৌরী গৌরী নামে ডেকেছো তা হলে আমি গৌরী নামে ধরায় বিখ্যাত হব।

গৌরীদেবীর কথা শুনে চন্দ্রমা খুব খুশি হলেন। এ দিকে শঙ্কর যে অষ্টমূর্তি সৃজন করেছেন এক যোজন ব্যাপী সেই একাগ্রকানীন শক্তিগণের সঙ্গে মহানন্দ নৃত্য করতে করতে শিব শিবা যখন অন্ডহিত হলেন তখন সেই অষ্টমূর্তি তাদের অন্বেষণে চলে গেলেন। একমূর্তি রাসমণ্ডল ছেড়ে যাননি। এর মূর্তি একাই সেই বনে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে পথ হারিয়ে গেলেন। পরে দক্ষিণমুখী হয়ে বিপুদ্দর যেতেই তিনি একটা সুন্দর পর্বত দেখেন।

কিছুক্ষণ পরে কাঁদতে থাকেন একমূর্তি। হায় হায় নাথ মোরে বর্জন করে কোথায় লুকালে প্রভু দাও দরশন। আমি নিশ্চয় কোন অপরাধ করেছি, যার জন্য তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেছ। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না, এই পর্বত থেকে পড়ে প্রাণত্যাগ করব আমি।

এই বলে তিনি ঝাঁপ দিতে যাবে, তখন মহেশ্বর আবির্ভূত হন একমূর্তিকে রক্ষা করেন। তারপর বলেন তোমার মতো ভক্তি কারোর নেই। তুমি ক্লান্ত তাই এখানে থাক। এই পর্বত তোমাকে আনন্দ দিয়েছে, তাই এর নাম হবে নন্দন। রাসরঙ্গস্থল থেকে তুমি বাইরে গেলে বলে তোমার নাম হরিরঙ্গে স্বর।

এই কথা মহেশ্বর সকলের কাছে গিয়ে বললেন–দেবী ও চন্দ্রমার কথা সবাইকে বললেন, আবার শুরু হল মহানৃত্য সকলে নাচছেন, ক্রমে ক্রমে রাত্রি প্রভাত হল। রাসের মেলা তখন শেষ হল।

শিবপুরাণ মার্কণ্ডেয় মুনির অমরত্ব লাভ

মুকাণ্ডু নামে সত্যধর্মপরায়ণ এক ঋষি ছিলেন। তিনি জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, তার একটি দুঃখ ছিল তিনি পুত্রহীন। তিনি ঠিক করেন তপস্যা করবেন এবং ব্রহ্মার কাছ থেকে পুত্র প্রাপ্তির জন্য বর চেয়ে নেবেন।

একুশ হাজার বছর ধরে তিনি কঠোর তপস্যা করলেন, ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে তাকে বর দিতে এলেন। বললেন, "হে মুকাণ্ডু, তুমি পুত্র কামনায় তপস্যা করছ। তোমার অসংখ্য পুত্র হবে, কিন্তু তারা অধার্মিক হবে। আর যদি একটি পুত্র চাও তাহলে সে হবে ধার্মিক, তবে তার পরমায়ু হবে সাত বৎসর। এই দুটি বরের মধ্যে যে, কোন একটি নিতে পারো।"

মুকাণ্ডু ভেবে দেখলেন অধার্মিক অসংখ্য পুত্র বংশ ধ্বংসের কারণ হবে। তার চেয়ে পুত্রহীন থাকা ভাল। কিন্তু এক পুত্র যদি ধার্মিক হয় তাহলে বংশের গৌরব বাড়বে। সেই পুত্রের পিতারও গৌরব বাড়বে। হে ব্রহ্মা, আমি একটি পুত্র চাই।

ব্রহ্মা তখন তাকে বর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বর লাভ করে মুনি খুব খুশি হলেন। কিছুকাল পরে তার একটি অপূর্ব সুন্দর পুত্র হল। তিনি একদিকে আনন্দিত কিন্তু অন্যদিকে পুত্রের কম পরমায়ু নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন কি করে পুত্রের আয়ু বাড়ানো যায়। ভাবলেন পুনরায় তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে পুত্রের আয়ু বাড়ানো যেতে পারে।

এই ভাবনা নিয়ে তিনি তপস্যা শুরু করলেন। কখন উপর দিকে পা তুলে, কখনও চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে, কখনো গাছের ডালে ঝুলে, কখনও জলের মধ্যে ডুবে। না খেয়ে তপস্যা করলেন। তাঁর তপস্যার তেজে দেবতা স্থির থাকতে পারলেন না। ব্রহ্মাকে তারা সকল কথা মানিয়ে ঋচণ্ড ঋষির কাছে এলেন।

ব্রহ্মা বললেন, পুত্রের দীর্ঘ আয়ু ভিন্ন আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই। পুত্রে দীর্ঘ আয়ু ছাড়া অন্য যে-কোনো বর প্রার্থনা কর।

ঋষি বললেন, আমার বর প্রয়োজন নেই। আমি চাই আমার পুত্রের দীর্ঘ পরমায়ু।

ঋষির কথা শুনে ব্রহ্মা রেগে গেলেন। বললেন, তোমাকে আগেই বলেছিলাম ভেবে-চিন্তে বর চাইতে, এখন পাল্টাতে গেলে আগের বর মিথ্যা হয়ে যাবে।

বর না দিয়েই ব্রহ্মা চলে গেলেন। তখন মুকাণ্ড বিষ্ণুর আরাধনা করলেন।

শুরু হল বিষ্ণুর আরাধনা। তুষ্ট হলেন নারায়ণ। চতুর্ভুজ মূর্তিতে বর দিতে এলেন। অপরূপ মূর্তি দেখে ঋষি হাতজোড় করে প্রণাম জানালেন।

বিষ্ণু বললেন, হে ঋষি, তুমি কিজন্য তপস্যা করছ।

ঋষি বললেন, বিধাতার আশীর্বাদে আমি পুত্র লাভ করেছি কিন্তু তার পরমায়ু সাত বছর, আমি চাই আপনি আমার পুত্রকে দীর্ঘজীবী করুণ।

জনার্দন বিপাকে পড়লেন। তিনি কি করবেন বুঝতে পারলেন না। তিনি বললেন, আমি ঐ বর দিতে অক্ষম। বিধাতার বিধান অন্যথা করার আমার ক্ষমতা নেই।

বিষ্ণু চলে গেলেন। বিষণ্ণ মন নিয়ে ঋষি আশ্রমে ফিরে এলেন। পিতার এমন অবস্থা দেখে, পাঁচ বছরের সন্তান তার মাকে জিজ্ঞাসা করে, বাবা সবসময় কাঁদে কেন? কি হয়েছে বাবার?

মা পুত্রকে বললেন, সে কথা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। বহুকাল আমরা পুত্রহীন ছিলাম। তারপরে বিধাতার বরে তোমাকে পাই। তোমার পরমায়ু মাত্র সাত বছর। এই জন্য আমরা তোমাকে হারাবার কথা ভেবে বিষণ্ণ থাকি। তোমার আয়ু বাড়ানোর জন্য তোমার বাবা চেষ্টা করছেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন।

মায়ের কথা শুনে পুত্র বললেন, মাগো, মৃত্যু থেকে মুক্তি পেতে জগতে কেউ কি পেরেছে? যখন জীবের জন্ম হয়, তখন তার মৃত্যুর দিনও ঠিক করা হয়ে যায়, কর্মানুসারে অল্পায়ু দীর্ঘায়ু হয়। কর্মের দ্বারা মানুষ স্বর্গে যায়, আবার নরকেও যায়। আমি তপস্যা করার জন্য বনে যাই, আমাকে অনুমতি দাও।

পাঁচ বছর বয়সে পুত্রের মুখে এই কথা শুনে মা অবাক হয়ে যান এই বালক এখন শিশু সে তপস্যার কি মানে জানে? বোধ করি কোন দৈব ভর করেছে, যদি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে তো ভালো, না হলে যা হবার তাই হবে।

মা অনুমতি দিলেন। তাকে বিদায় দিতে গিয়ে মা কেঁদে উঠলেন। বালক চলল তপস্যায়। মহর্ষি পুলহের আশ্রম পুণ্যক্ষেত্র হরিক্ষেত্রে ঋষিপুত্র তার কাছে গেলেন এবং তাঁকে প্রণাম জানালেন।

এই শিশুটিকে দেখে মহর্ষি পুলহ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? তোমার নাম কি? তুমি কেন এসেছ? বালক উত্তরে বলল, আমার নাম মার্কণ্ডেয়, ঋষি মুকার পুত্র। বিধাতার বরে পিতা আমাকে পেয়েছেন, আমার পরমায়ু মাত্র সাত বছর হওয়ায় আমার পিতা-মাতা খুবই দুঃখিত। এখন পিতা মাতার দুঃখ দূর করার জন্য আমাকে উপায় বলে দিন, যাতে আমি চিরজীবী হতে পারি।

মহর্ষি পুলহ বললেন, জগতের গুরু মহেশ্বর। ভক্তি ভরে তার তপস্যা কর, তিনি যদি প্রসন্ন হন তাহলে তুমি চিরজীবী হবে, দক্ষিণ সাগর তীরে কুণ্ডু নামে একজন মুনি আছেন, তার কাছে যাও। এবং তার উপদেশ নাও। ভক্তি ভরে লিঙ্গপূজা কর। একমাত্র তবেই মহেশ্বরের কৃপায় মৃত্যুকে জয় করতে তুমি সমর্থ হবে।

মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে গিয়ে প্রণাম জানালেন। মুনির প্রশ্নের উত্তরে মার্কণ্ডেয় সব কথা বললেন।

শিশুটির কাছে সব জেনে কণ্ডু ঋষি মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র দান করলেন তাকে। মন্ত্র পেয়ে মার্কণ্ডেয় খুব খুশি হয়। গুরুর চরণ বন্দনা করে সে চলে যায় সাগর তীরে। মাটি দিয়ে তৈরি করে এক শিবলিঙ্গ। সে নানা রকমের বনফুল তুলে শিবের পূজা করল। তারপর প্রণাম করে গুরু দত্ত মন্ত্র জপ করতে লাগল।

এইভাবে দু-বছর কেটে গেল। মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল। ধর্মরাজ যম মৃত্যুকে তলব করলেন। বললেন–বিধির বিধানে মার্কণ্ডেয়ের কাল পূর্ণ হয়েছে। তাকে মৃত্যুপুরীতে নিয়ে আসতে হবে।

যমের আজ্ঞা পেয়ে যমদূতগণ চললেন, তাদের সবার মূর্তি ভয়ংকর। তখন সাত বছরের বালক তপস্যা করছে। কিন্তু মৃত্যুর অন্তরে কোন দয়া নেই। যখন তারা খড়গ তুলল, তার প্রাণ নেবার জন্য, তখন মৃত্যুর সামনে উপস্থিত হলেন পঞ্চানন। হাতে তার ত্রিশূল। সেই শঙ্করের তেজে মৃত্যু অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাদের জ্ঞান ফিরলে তারা আবার শিশুটিকে মারতে উদ্যত হল।

এই অবস্থায় মৃত্যুকে দেখে মহেশ্বর রেগে গেলেন, তিনি মৃত্যুর মাথায় আঘাত করলেন। সে আঘাতে মৃত্যুর শিরচ্ছেদ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

এইসব ঘটনাসমূহ দূরে দাঁড়িয়ে যমের এক দূত দেখছিল। মৃত্যুর মৃত্যু দেখে সে যমের কাছে চলে যায়, এবং সেখানে সব কথা বলে। সেসব ঘটনাবলি শুনে যম ভয় পেয়ে যায়। ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মাকে জানায় সকল কথা। নমস্কার করে বললেন– হে ব্রহ্মদেব, মার্কণ্ডেয়ের সাত বছর পরমায়ু যা আপনিই নির্ধারণ করেছেন, মৃত্যু তাকে আনতে গেলে তার নিজেরই মৃত্যু হয়েছে শিবের হাতে। আপনার আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে এই অবস্থা, এখন বলুন কি করব?

ব্রহ্মা সকল কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি সব দেবতাদের নিয়ে শিবের কাছে গেলেন। ব্রহ্মাদিসহ সমস্ত দেবতাগণ ত্রিশূল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা শিবকে প্রণাম জানালেন।

ব্রহ্মা করজোড়ে বললেন, হে ভগবান আপনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা, পূর্বে মুকাণ্ডু ঋষি ঘোর তপস্যা করলে আমি তাকে সপ্তবর্ষ পরমায়ু যুক্ত পুত্র বর দিই। এখন আমার বাক্য যাতে সত্য হয় সেই ব্যবস্থা করুন।

ব্রহ্মার কথা শুনে মহেশ্বর ক্রোধিত হয়ে বললেন, মুকাণ্ডু নন্দন আমার পরম ভক্ত, আমি তার প্রভু, তুমি কখনই তার প্রভু হতে পারবে না। নারায়ণও তার প্রভু হতে পারবে না। এখন শমন তার কাছে যেতেই পারবে না। তোমরা এখন সবাই ফিরে যাও নিজের স্থানে।

ব্রহ্মা শিবের কথা শুনে চুপ করে গেলেন। তারপরে তিনি শিবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বেদবাক্যে শিবের স্তব করলেন-হে দেব, তোমার বরে মুকাণ্ডু কুমার আয়ু লাভ করবে। তোমার রোষে মৃত্যুর মৃত্যু হল। তোমার মহিমা আমি হানতে পারি না। তাহলে মৃত্যু জানবে কি করে, তাই মৃত্যুকে বাঁচিয়ে দিন।

ব্রহ্মার স্তুতি শুনে শিব খুশি হলেন বললেন–হে ব্রহ্মা, তোমার কমণ্ডলুর জল মৃত্যুর দেহে ছিটিয়ে দাও, সে বেঁচে উঠবে।

এই কথা বলে শিব চলে গেলেন। ব্রহ্মা তার কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে মৃত্যুকে বাঁচালেন। যম একটা শিবলিঙ্গ নির্মাণ করে পূজা করলেন, যমের দ্বারা স্থাপনের জন্য নাম হল যমেশ্বর শিবলিঙ্গ। তারপর ব্রহ্মা ফিরে গেলেন ব্রহ্মলোকে। দেবতারাও ফিরে গেলেন দেবলোকে। যমরাজ ফিরে গেলেন যমপুরীতে।

শিবের বরে মার্কণ্ডেয় অমরত্ব লাভ করলেন।

স্কন্দপুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ
উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী
সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে স্কন্দ পুরাণ সুবৃহৎ। সাতটি খণ্ডে। এতে আছে প্রকাশিত এই পুরাণ মহেশ্বর খণ্ড, বিষ্ণু খণ্ড, ব্রহ্মা খণ্ড, কালী খণ্ড, অবন্ত্য খণ্ড, নাগর খণ্ড ও প্রভাস খণ্ড।

অষ্টাদশ মহাপুরাণে মোট চার লক্ষ শ্লোক। তার মধ্যে একমাত্র স্কন্দপুরাণেই একাশি হাজার একশো শ্লোক। কাজেই সকল পুরাণের মধ্যে স্কন্দ পুরাণই সুবৃহৎ। তাই বহু উপাখ্যান, বহু তীর্থের মাহাত্ম্য, বহু ভক্তিতত্ত্ব, বহু উপাসনাতত্ত্ব এই মহাপুরাণের মধ্যেই পাওয়া যায়।

এই মহাপুরাণের অধিকাংশ কাহিনীর বক্তা কার্তিকেয়। তাঁর আর এক নাম স্কন্দ। সে কারণেই বোধ হয় এই পুরাণের নামকরণ হয়েছে স্কন্দ পুরাণ। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে এই মহাপুরাণ তামসিক।

বিশ্বাসঘাতকতার ফল

মহারাজ ধর্মগুপ্ত পরম ধার্মিক, দাতা, প্রজাপালক, দণ্ডদাতা। তার শাসনে সকল প্রজাই নিজের ধর্মপালন করে। সবাই খুশি।

মহারাজ ধর্মগুপ্তের খুব মৃগয়ার সখ ছিল। একদিন তিনি একটি উত্তম অশ্বে চড়ে বনে গেলেন। অপূর্ব শোভা, বহু সুন্দর সুন্দর গাছ, সুন্দর পাতা, আর বহু তপস্বীদের বাস সেখানে। রাজা প্রায় সারাদিনই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন। কোনও শিকার মিলল না। সন্ধ্যা হয়ে এল। নিত্য দিনকার মত রাজা একস্থানে বসে সন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ করলেন।

তারপর দেখলেন ঘন অন্ধকার। এই অবস্থায় প্রাসাদে ফিরে যাওয়া যাবে না। গভীর অরণ্যে রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে আবার বাঘ-সিংহের ভয়, কি করা যায় এখন? উপস্থিত বুদ্ধিতে উঠে পড়লেন একটা গাছের উপর। রাতটা কোনো রকমে গাছের শাখায় কাটিয়ে দেবেন, সকাল হলে বাড়ি ফিরবেন।

কিন্তু তিনি গাছে উঠে দেখলেন– সেই গাছে পূর্ব থেকেই একটা ভাল্লুক আশ্রয় নিয়েছে। বুঝি ওই একই কারণ হবে। খুব ভয় পেয়ে গেলেন রাজা।

ভাল্লুক রাজাকে দেখে বলল- রাজা, আপনি ভয় পাবেন না। আমরা আজ রাতটা দুজনেই এই গাছেই কাটিয়ে দেব। ওই দেখুন একটা ভীষণ আকৃতির সিংহ এই দিকেই আসছে। সারাটা রাত না ঘুমিয়ে থাকা যায় না। আপনি রাত্রির প্রথম অর্ধেকটা সময় ঘুমিয়ে নিন। আমি আপনাকে রক্ষা করব। তারপর বাকী অর্ধেক রাত্রি আমি ঘুমাব। তখন আপনি আমায় রক্ষা করবেন।

রাজা ভাল্লুকের পরামর্শ মেনে ভাল্লুকের কোলে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সেই সিংহটি সেখানে এসে রাজাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে ভাল্লুককে বলল– রাজা এখন ঘুমাচ্ছে। ওকে নীচে ফেলে দাও। আমি খুব ক্ষুধার্ত। ওকে পেলে আমার পেটের জ্বালা মিটবে।

সিংহের কথায় ভাল্লুক বলল– হে পশুরাজ, তোমার ধর্মজ্ঞান নেই। ত্রিলোকে বিশ্বাসঘাতকতার মত পাপ আর হয় না। অযুত যজ্ঞ করলেও মিত্রদ্রোহীর পাপ নষ্ট হবে না। ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত থাকলেও বিশ্বাসঘাতক পাপীর পাপ কোটি জন্মেও নষ্ট হবে না।

ভাল্লুকের কথা শুনে সিংহ ভাবল– এ ভাল্লুকের যা যুক্তি একে বিপদগামী করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এখন অপেক্ষা করা যাক। ভাল্লুক যখন ঘুমাবে তখন রাজাকে বলব। যদি তার দয়া হয় ক্ষুধার্ত সিংহের ওপর।

মাঝরাত্রি হল। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজা জেগে উঠলেন। এবারে রাজার কোলে মাথা রেখে ভাল্লুক ঘুমালে আগের মত সিংহ রাজাকে বলল- হে রাজন, এই ভাল্লুক বড়ই হিংস্র। আপাততঃ ওর পেট ভর্তি ছিল তাই আপনি এতক্ষণ জীবিত। যখন ক্ষুধা পাবে নিশ্চই আপনাকে হত্যা করবে।

ওকে নীচে ফেলে দিন আমার পেটের জ্বালা মিটুক।

রাজা সিংহের কথা শুনে ভাবলেন- সিংহ ঠিক বলছে, তখন রাজা ঘুমন্ত ভাল্লুককে নীচে ফেলে দিলেন, কিন্তু ভাল্লুকটি গাছের ডাল ধরে কোনো রকমে আত্মরক্ষা করল। তারপর রাজার কাছে গিয়ে বলল- হে রাজন, আমি ভাল্লুক নই। আমি ভৃগুবংশজাত ধ্যানকাষ্ট। আমি ভাল্লুক রূপে আপনার কাছে এসেছি। আমি নিরপরাধ। তাছাড়া অর্ধেক রাত্রি আমি আপনাকে রক্ষা করেছি, তাহলে আপনি কেন আমাকে সিংহের মুখে ফেলে দিলেন? এখন আপনি আমার অভিশাপে উন্মত্ত হয়ে এই ধরাতলে বিচরণ করুন।

তারপর সেই ধ্যানকাষ্ঠ সিংহকে বললেন– হে যক্ষ, তুমিও সিংহ নও। পূর্বে কুবেরের সচিব ছিলে তুমি মহাযজ্ঞ। একদিন তুমি পত্নীর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে গেলে সেই সময় মুনিবর আশ্রমে ছিলেন না, তখন তুমি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে রতিক্রিয়া করলে মুনিবর তোমাকে বিবস্ত্র দেখে অভিশাপ দিলেন– আজ থেকে তুমি সিংহ রূপ ধারণ কর।

সেই অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার এই রূপ। আগে তোমার নাম ছিল ভদ্র, কুবেরের মন্ত্রী ছিলে তুমি, মাহাত্মা কুবের যেমন ধার্মিক তার অনুচরেরাও তেমন ধর্মশীল। আমি বনবাসী ঋষি, তুমি ধার্মিক হয়ে কেন আমাকে হিংসা করছ? আমি ধ্যানবলে সবই জেনেছি। ধ্যানকাষ্ঠের এমন কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সিংহ যক্ষরূপ ধারণ করলেন। তারপর হাতজোড় করে ধ্যানকাষ্ঠকে বললেন–আজ আমার সব কথাই মনে পড়েছে। মহর্ষি গৌতম আমাকে শাপ দেবার পর বলেছিলেন যখন কোন ভাল্লুক তোমাকে এই সংবাদ বলবে তখন তুমি আবার স্বর্গধামে যক্ষরূপে ফিরে আসবে।

তারপর, যক্ষ ভদ্র বিমানে চড়ে স্বর্গপানে চলে গেলেন। এদিকে উন্মত্ত রাজা নিজের রাজ্যে ফিরে গেলে সকল প্রজা ও মন্ত্রীরা বড় আশ্চর্য হল। এই উন্মত্ততা দূর করার কোনো উপায় কারোর জানা নেই। তাই মন্ত্রীগণ রাজাকে নিয়ে তার বাবার কাছে গেলেন। মহারাজ নন্দ পুত্র ধর্মগুপ্তের হাতে রাজ্য দিয়ে রেবানদীর তীরে তপস্যার জন্য আশ্রমে অবস্থান করেছিলেন।

নন্দ মুনি তখন পুত্র ধর্মগুপ্তকে উন্মত্ত দেখে চিন্তিত হলেন। তারপর তিনি মহাত্মা জৈমিনির কাছে গিয়ে পুত্রের সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। মহর্ষি জৈমিনি ধ্যানযোগে সব জেনে বললেন– ঋষি ধ্যানকাষ্ঠের অভিশাপে ধর্মগুপ্তের এমন অবস্থা। এখন এই উন্মত্ততা নিবারণের উপায় বলছি। সুবর্ণমুখরীর নামে এক মহাতীর্থ আছে। সেখানে তোমার পুত্রকে স্নান করাও, তাহলে তার উন্মত্ততা দূর হবে। মহর্ষি জৈমিনির উপদেশমত মুনি নন্দ তার পুত্র মহারাজ ধর্মগুপ্তকে মহাতীর্থে স্নান করালেন। তখন তাঁর উন্মত্ততা নষ্ট হল। নন্দমুনি সেই তীর্থে পুত্র সহ একরাত্রি বাস করলেন। তারপর তিনি পুত্রকে বহু উপদেশ দিয়ে ফিরে গেলেন নিজের আশ্রমে।

ধর্মগুপ্ত এখন শাপমুক্ত। ভক্তি সহকারে বেঙ্কটপতির উদ্দেশ্যে বহু ধন, ভূমি, গাভী প্রভৃতি দান করলেন ব্রাহ্মণকে। তারপর প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

মহাদেবের লিঙ্গ পূজা

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করার পর মহাদেব পাগলের মত সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। একসময়ে তিনি উলঙ্গ সন্ন্যাসীর বেশে দারুবনে প্রবেশ করলেন। ঋষিদের আশ্রমের পাশ দিয়ে গেলেন।

সেই সময় মুনিঋষিরা কেউ আশ্রমে ছিলেন না। ঋষি পত্নীরা শিবকে এভাবে দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, কে এই অপূর্ব দর্শন সন্ন্যাসী ভিক্ষুকরূপে এখানে এসেছেন? এঁকে ভিক্ষা দান করা উচিত। তখন তারা ভালো অশ্বাদি তার উদ্দেশে দান করলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ লজ্জা ত্যাগ করে বললেন– কে আপনি, ভিক্ষুক বেশে এখানে এসেছেন?

শিব বললেন– আমি ঈশ্বর, বর্তমানে সতীর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয়েছে, তাই আমি দিগম্বর হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সতী ছাড়া কোন রমণীতেই আমার রুচি নেই।

তারপর মহেশ্বর বহু ভিক্ষা গ্রহণ করে পাত্র পূর্ণ করে কৈলাসের পথে অগ্রসর হলে, সকল ঋষি পত্নীগণ মোহমুগ্ধ হয়ে তাঁরই পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন; পতি পুত্র-গৃহকার্যাদির কথা ভুলেই গেলেন।

এমন সময় মুনি ঋষিগণ নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে এসে দেখলেন আশ্রমে তাদের পত্নীগণ নেই। চারদিকে খোঁজ করে দেখতে পেলেন; তাঁরা সকলে শিবের পিছু নিয়েছেন খুব রেগে গেলেন ঋষিগণ। অভিশাপ দিলেন–তুমি দেবাদিদেব মহাদেব হয়ে আমাদের পত্নীগণকে হরণ করলেন, কাজেই তুমি ক্লীব হও।

মুনিগণ এমন শাপ দিলেন সঙ্গে সঙ্গেই শিবের লিঙ্গ মাটিতে পড়ে গেল। তারপর সেই লিঙ্গ বাড়তে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যে সপ্তপাতাল, সমগ্র পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষের সকল স্থানে সেটি বেড়ে চলল, তখন জগতের সব কিছুই সেই লিঙ্গে বিলীন হয়ে গেল। তখন মুনি ঋষিগণ তার নাম 'লিঙ্গ' রাখলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি লোকপাল সকলে সেই বর্ধিত লিঙ্গ দেখে অবাক হলেন। বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন–এই লিঙ্গের বিস্তার কত? এর শেষই বা কোথায়?

তারপর ব্রহ্মা সেই লিঙ্গের ঊর্ধ্বসীমা দেখার জন্য আর বিষ্ণু নিম্ন সীমা জানার জন্য চললেন। কিন্তু বহুদিন ধরে চেষ্টা করেও উভয়ে সেই লিঙ্গের শেষ দেখতে পেলেন না। তখন উভয়েই

ফিরে এলেন। ফিরে আসার সময় ব্রহ্মা মেরুপৃষ্ঠে নামলেন, সেখানে সুরভীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। সেই সুরভী তখন কেতকী গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল।

ব্রহ্মা সুরভীকে জিজ্ঞাসা করলেন- হে সুরভী, শিবের লিঙ্গ ত্রিভুবন বিস্তার করছে। তুমি কি দেখেছ? সেই লিঙ্গের ঊর্ব সীমা দেখবার জন্য আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু বহু খোঁজ করেও দেখতে পেলাম না। তাই ফিরে যাচ্ছি। দেবতারা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমি কি উত্তর দেব? এখন আমি যদি মিথ্যা কথা বলি, তারা বিশ্বাস করবে না। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি– তুমি যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দাও, তাহলে আমার সম্মান বাড়ে।

ব্রহ্মার কথায় সুরভী রাজি হলেন, সেই সঙ্গে কেতকীও। ব্রহ্মা তখন আনন্দে দেবতাদের কাছে গিয়ে বললেন– আমি লিঙ্গের উপর তল দেখে এসেছি। অপূর্ব সেই লিঙ্গের মস্তক। সেই লিঙ্গ বিশাল, বিমল, সুদৃশ্য। কিন্তু সেই লিঙ্গ ছাড়া আর কোনো কিছু আছে বলে মনে হয় না।

ব্রহ্মার কথা শুনে দেবতাগণ স্তম্ভিত। এদিকে পাতাল থেকে ফিরে এলেন বিষ্ণু। বললেন– অনেক জায়গা ঘুরলেন অতল, বিতল, সুতল, অনাতল, মহাতল, রসাতল, এমনকি পাতালেও গেলাম, তারপরে স্থান শূন্য বলে মনে হল আমার। কিন্তু সেই লিঙ্গের মূল মধ্য কিংবা শেষ কিছুই দেখতে পেলাম না। এখন আমি বুঝতে পেরেছি মহাদেবই লিঙ্গরূপী, তিনিই এই জগৎ ধারণ করে আছেন, তারই প্রসাদে দেবতা ও ঋষিগণের সৃষ্টি!

বিষ্ণুর মুখে লিঙ্গের কথা শুনে দেবতারা সেই তথ্যকেই সত্য বলে স্বীকার করলেন। তখন বিষ্ণু হাসতে হাসতে ব্রহ্মাকে বললেন– হে ব্রহ্মা, আপনি যদি লিঙ্গের মস্তক দেখে থাকেন তাহলে এই ব্যাপারে কেউ কি সত্য সাক্ষী দিতে পারবে? বিষ্ণুর জিজ্ঞাসার উত্তরে ব্রহ্মা ব্যগ্রভাবে বললেন– এ ব্যাপারে আমার সাক্ষী আছে সুরভী আর কেতকী।

তখন দেবতাগণ সত্য উদ্ঘাটনের জন্য সুরভী ও কেতকীকে ডাক দিলেন। তারা মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে বললেন, ব্রহ্মাদেব লিঙ্গের মস্তক দেখেছেন এবং কেতকী ফুলের দ্বারা লিঙ্গের পূজাও সম্পন্ন করেছেন।

সহসা সেখানে আকাশবাণী হল- হে দেবগণ, সুরভী ও কেতকী যা বলল, সব মিথ্যা কথা। ব্রহ্মা কখনই লিঙ্গের মস্তক দেখেনি। এই লিঙ্গের আদি বা অন্ত নেই।

তখন দেবতাগণ সুরভীকে অভিশাপ দিলেন– হে সুরভী, তুমি যে মুখে মিথ্যা কথা বলেছ, সেই মুখ সর্বদা অপবিত্র থাকবে, আর হে কেতকী, তোমার ফুল সুগন্ধ, কিন্তু আজ থেকে তোমাকে দিয়ে আর কেউ শিব পূজা করবে না।

তারপর সেই আকাশবাণী ব্রহ্মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন– হে ব্রহ্মদেব, তুমি কিসের জন্য মিথ্যা কথা বললে? এই অপরাধে কেউ তোমার পূজা করবে না।

দেবতাগণ সেই আকাশবাণী শুনে মনে করলেন স্বয়ং শিবই এই অভিশাপবাণী উচ্চারণ করলেন, তারপর সকলে তাঁর স্তব-স্তুতি করলেন এবং ভক্তিভরে লিঙ্গ পূজা করলেন।

শিবভক্ত শ্বেতরাজার কাহিনী

মহাত্মা শ্বেত পরম ধার্মিক, শিবভক্ত ও মহাবীর। রাজা হিসাবে তার প্রচুর খ্যাতি, তিনি শ্রেষ্ঠ প্রজাপালক। শিবের পূজা না করে জল গ্রহণ করেন না। মুখে সব সময় মহাদেবের কথা, শিবের প্রসাদে তার দেহে কোনো ব্যাধির সংস্রব নেই। তার রাজ্যের ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণ। প্রত্যেকই নিজ নিজ ধর্ম পালন করত। কেউ কখনও পুত্রের মৃত্যুজনিত দুঃখ পায়নি। অসময়ে কারও মৃত্যু হত না, গরীবও ছিল না কেউ, শিব পূজার ফলেই তাঁদের সকল কার্য সফল হত।

শ্বেতের বয়স হয়েছে। বৃদ্ধ দশা, কিন্তু তার নিত্য শিবপূজা করা চাই। অতঃপর পরমায়ু শেষ হল, যম পাঠালেন তার দূতগণকে, নিয়ে যাওয়ার জন্য।

দণ্ড হাতে নিয়ে দূতেরা চলল শ্বেতরাজার কাছে। রাজা তখন শিবমন্দিরে লিঙ্গ পূজা করছেন। দূতেরা তাঁর দিকে তাকিয়েই থাকল, ধর্মরাজের আজ্ঞা আর পালন করতে পারল না।

যমপুরীতে থেকে ধর্মরাজ সবই বুঝতে পারলেন। দণ্ড হাতে নিয়ে নিজেই এলেন রাজার কাছে। দেখলেন রাজা সেই একই অবস্থায়। পূজা যেন তার শেষ হতেই চায় না। কিছু করার উপায় নেই, প্রেতরাজ পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছেন।

এমন সময় হাতে খড়গ নিয়ে স্বয়ং কাল এলেন সেখানে। তিনি দেখলেন যমরাজ ভয়াতুর হয়ে শিবমন্দিরের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- ওহে, ধর্মরাজ, তুমি কিজন্য, রাজাকে নিয়ে যাচ্ছ না? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভয় পেয়েছে? তুমি আর কালবিলম্ব না করে নিয়ে যাও রাজাকে।

কালের কথা শুনে ধর্মরাজ বললেন– দেব, আমি আপনার আদেশ অবশ্যই পালন করব। কিন্তু শিবভক্তের কাছে যাব কেমন করে? শূলপাণির ভয়ে কিছুই করতে পারছি না।

যমের কথা শুনে কাল ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে বিনাশ করতে উদ্যত হলেন। অসংখ্য সূর্যের মতো উজ্জ্বল কাল যখন মন্দিরে প্রবেশ করলেন, তখন শূলপাণি ক্রোধভরে তার দিকে তাকালেন। শিবভক্ত শ্বেতরাজ ধ্যানস্থ হয়ে আত্মাকে পরমাত্মারূপে চিন্তা করছেন। তাকে বিনাশ করার জন্য দম্ভ ভরে উদ্যত হয়ে, শিবের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত দেখে তাঁরই দিকে ধাবিত হলেন।

তখন মহেশের তৃতীয় নয়ন জ্বলে উঠল, ভস্মীভূত হল কাল। উগ্রাকৃতি, প্রচণ্ড স্বভাব ও জগতের একমাত্র গ্রাসকর্তা কাল এভাবে দগ্ধ হলেন। তারপর শ্বেতরাজা বাহ্যজ্ঞান পেয়ে দেখলেন কাল তাকে বিনাশ করতে এসে রুদ্রের দ্বারা দগ্ধ হয়েছেন, তখন তিনি অতিশয় ব্যাগ্র হয়ে রুদ্রদেবের কাছে। প্রার্থনা করলেন- হে শম্ভু, আপনি কি করেছেন? কাকে দগ্ধ করলেন আমার সামনে? কে কি দুর্ব্যবহার করল, তা আমি জানি না।

রাজাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য শঙ্কর বললেন, মহারাজ, এই কাল সকল প্রাণীরাই ভক্ষক, এখন এই ক্রুদ্ধস্বভাব কাল আমারই সামনে তোমাকে গ্রাস করতে এসেছে। তাই তো পুড়িয়ে মারলাম ওকে। সবার মঙ্গলে ও তোমাকে রক্ষার জন্যই আমাকে এমন করতে হল। যারা পাপী, অধার্মিক লোক, বিনাশক ও পাষণ্ড তাদেরকে আমি বিনাশ করি।

মহারাজ শ্বেত বললেন, কাল বশেই লোক পুণ্যকাজ করে। কালেই ধার্মিষ্ট হয়, কেউ জ্ঞানী হয়, কেউ কেউ ভক্তিমান হয়, কেউ উপাসক, কেউ আবার মুক্ত হয়। কালই চরাচরের কর্তা আবার পালনকর্তা। তিনিই প্রাণীগণের প্রাণ স্বরূপ, তাই আপনি এই কালকে বাঁচিয়ে তুলুন। হে প্রভু, যদি সৃষ্টি রক্ষা করতে চান, তাহলে কালকে তাড়াতাড়ি জীবিত করুন। কাল ছাড়া এ জগতে কেউ বাঁচবে না।

রুদ্রদেব তখন ভক্তের বাসনা পূর্ণ করবার জন্য হাসতে হাসতে কালকে বাঁচিয়ে তুললেন। যমদূতগণ তখন কালকে আলিঙ্গন করলেন, আর কাল লজ্জিত হয়ে মহাদেবের বহু স্তবস্তুতি করলেন।

তারপর কাল শ্বেতরাজাকে উদ্দেশ করে বললেন– সমস্ত মানবজগতে আপনি বিনা আর কারও অস্তিত্ত্ব নাই। ত্রিভুবনের অজেয় দেবকে আপনি জয় করেছেন। আমি এই চরাচর বিশ্বকে বিনাশ করি।

হাসতে হাসতে বললেন– হে কাল, আপনি রুদ্রের পরমরূপ, আপনি সর্বপূজ্য। যাঁরা আত্মনিষ্ঠ কৃতিবান, তারা আপনারই ভয়ে শিবের শরণাপন্ন হন। তারপর যম ও মৃত্যু শ্বেতরাজার স্তব করলেন। তারপর দূতগণকে বললেন– যারা ত্রিপ, জটা বা রুদ্রাক্ষ ধারণ করে কিংবা যে জন ভয়ে বা জীবিকার জন্য শিব নাম কীর্তন করে, তারা শত পাপী বা দুরাচারী হলেও সাক্ষাৎ শিবজপধারী, তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই তাদেরকে কখনও আমার এই নরকে আনবেন না।

সেই অবিনশ্বর মহাদেব কালকে দগ্ধ করে যে মহারাজ শ্বেতকে অভয় দিয়েছিলেন, সেই শ্বেতরাজা দেহান্তে শিবের সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন।

শিব-দুর্গার পাশাখেলা

নারদ একদিন হর দ্বারে পৌঁছোনে শিব দর্শনে যাতারপর ধ্যানযোদ্ধবি ছিলেন

নারদ একদিন হর গৌরীকে দর্শনের অভিপ্রায়ে কৈলাসে গেলেন। গন্ধমাদনের অপূর্ব শোভা দেখতে দেখতে কৈলাসের দ্বারে পৌঁছোলেন। দ্বারে বিশ্বকর্মার তৈরি দুজন কৃত্রিম দ্বারপাল দাঁড়িয়ে ছিল।

দেবর্ষি নারদ বললেন– আমি শিব দর্শনে যাব, পথ ছেড়ে দাও। কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয় তারা কেউ কোনো উত্তর দিল না। ঋষি বিস্মৃত হলেন। তারপর ধ্যানযোগে সব বুঝতে পারলেন। তারপর কোনো কথা না বলে পুরীতে প্রবেশ করলেন। আরো অনেক মুনি ঋষি ছিলেন সেখানে। সবাই প্রণাম করলেন তাঁকে। আশ্চর্যবোধ করলেন তিনি। আরও এগিয়ে গেলেন।

দেখতে পেলেন একই আসনে শিব আর দুর্গা বসে আছেন। সর্পরাজ শঙ্খ শিবের পদসেবা করছেন। তক্ষাকাদি নাগগণ তার নানা সেবায় যুক্ত। বাসুকী তার কণ্ঠে অপূর্ব শোভা বিস্তার করছে। তার পাশে বসে আছেন শিবসীমন্তিনী সতী। মহাভক্ত নারদ প্রীতিভরে তাঁদের বন্দনা করলেন।

তারপর নারদের স্তবস্তুতি শুনে ভগবান শিব পরিতুষ্ট হয়ে বললেন—হে নারদ, তোমার কৈলাস পুরীতে কিসের জন্য আগমন? সার্বিক কুশল তো–এখন বল, তোমার জন্য আমাকে কি করতে হবে?

নারদ ঠাকুর বললেন– হে বিভো, আপনার দর্শন পেয়েই আমার হৃদয় পরিতুষ্ট। এখানে আমি এমনিই ক্রীড়ার জন্যই এলাম। কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নয়। দেবর্ষি নারদের কথা শুনে পার্বতী বললেন– হে মুনি, আপনি কেমন ক্রীড়ার পক্ষপাতী?

তখন নারদ বললেন– দেবী জগতে নানারকম স্নাতক্রীড়া দেখা যায়। দুজন ন্যূতক্রীড়ায় মত্ত থাকলে সর্বসুখ লাভ করতে পারে। জগতে এমন সুখ আর কোনো ভাবেই হয় না। দেবর্ষি নারদের কথা শুনে দেবী বললেন– দ্যুতক্রীড়া জ্ঞান বুদ্ধি ধননাশক, তাহলে হে মুনি, আপনি কেমন করে বলছেন ‘দূতক্রীড়া প্রসিদ্ধ সুখদায়ক।

দেবী বললেন– হে নারদ, আমি আপনার সামনেই নাথের সঙ্গে দূত খেলব, আপনি দেখতে থাকুন।

এই কথা বলে দেবী সখীদের সঙ্গে নিয়ে শিবের সঙ্গে পাশাখেলার সামগ্রী এনে খেলতে লাগলেন। নারদঠাকুর দেখে খুব আনন্দ পেলেন। দুতখেলার নিয়ম অনুসারে পণ রাখতে হয়। প্রথমবার শিব ছল করে দেবীকে পরাজিত করলেন, এরপর নারদ ও শিব দুজনে দেবীকে উপহাস করে কথা বললেন। এমন উপহাসে দেবী ভীষণভাবে কুপিতা হয়ে নারদকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন। তারপর শিবকে বললেন– আমি পণে হেরেছি, এবার বল তুমি কি পণ রাখবে?

শিব বললেন– আমার চন্দ্রলেখা, দুই কানের কুণ্ডল এই খেলায় পণ রাখলাম। দেবী তুমি আমাকে জয় করে এইসব স্বচ্ছন্দে নিতে পার।

আবার খেলা শুরু হল। এবার দেবীর জয় হল, শিবের প্রতি দেবী হাসতে হাসতে বললেন– নাথ, এবার আমি তোমাকে পরাজিত করেছি, কাজেই পণ অনুসারে ভূষণগুলো আমাকে দাও।

তখন শঙ্করও হাসতে হাসতে বললেন– দেবী তুমি বিচার করে দেখ, আমি কখনও হারি না। এ জগতে আমি অজেয়। কাজেই এমন কথা তুমি বলো না, আবার তুমি খেলতে শুরু কর, দেখবে আমিই জিতব। দেবী বললেন–আমি যে তোমাকে জয় করেছি, তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। আসলে আজ তোমারই জয় হয়েছে।

এইভাবে হর-পার্বতী উভয়েই হাসতে হাসতে বিবাদ করতে লাগলেন, এতক্ষণ নারদ দূরে দাঁড়িয়ে তাদের দ্বন্দ্ব শুনছিলেন, তারপর আর থাকতে না পেরে তাঁদের কাছে এগিয়ে গিয়ে হাসতে হাসতেই বললেন– আমার একটি শান্তিপূর্ণ কথা আপনারা শুনুন। হে দেবী, এই দেবশঙ্কর মহাভাগ্যশালীদের বরেণ্য। তাকে আপনি কখনই জয় করতে পারেন না। ইনি ত্রিভুবনের অজেয়, আপনি নারী জাতি, তাই শিবকে ঠিকঠাক ভাবে জানতে পারেন নি।

নারদের ওই কথা শুনে দেবী ভীষণভাবে কুপিতা হয়ে বললেন– হে ব্রহ্মার পুত্র, আপনাকে নমস্কার। আপনি চাপল্যবশে আর কিছু বলবেন না। আপনার কথায় আমি বড় ভীত, তাই আপনি চুপ করে থাকুন।

অগত্যা নারদ চুপ করলেন। কিন্তু ভৃঙ্গী এবার মুখ খুললেন– হে ভামিনি, আপনি পুনরায় এরূপ বাক্য আর বলবেন না, আমার প্রভু শিব অজেয়। আপনি পূর্বে মদনের সাহায্যে শঙ্করকে লাভ করেছেন, পূর্বে এই শূলপানি যা যা করেছেন, আপনার কি মনে নেই? ভৃঙ্গীর

কথায় ভবানী ভীষণভাবে রেগে গিয়ে বললেন– হে ভৃঙ্গী, তুমি অযৌক্তিক কথা বলছ। এটা তোমার পক্ষপাতিত্ব। কেমন করে তুমি আমাদের মধ্যে ভেদ দেখলে?

তখন ভৃঙ্গী বললেন– পিতা দক্ষের যজ্ঞে আপনি শিবনিন্দা শুনে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন, আর এখন কি বলছেন? এখন দেখছি শিবের প্রতি আপনার প্রেমভক্তি নাই। আপনি শিবপ্রিয়া, তাই আপনাকে এ সকল কথা বললাম। এখন আপনি শিবের সেবা করুন। শিব সর্বেশ্বর, ভৃঙ্গীর এমন কথা শুনে দেবী বললেন– ভৃঙ্গী তুমি চুপ কর। তা নাহলে এখান থেকে দূর হও। তোমার কোনো ভাল-মন্দ জ্ঞান নাই। পিশাচের মত কথা বলছ। আমি কে, আর এই শিব কে? তোমার ভেদবুদ্ধি দ্বারা সে তত্ত্ব জানতে পারবে না। আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি। তোমার দেহ মাংসহীন হবে।

দেবী ভবানী এই কথা বলে সকোপে শম্ভুর দেহ থেকে তাঁর অলঙ্কার সকল খুলে নিলেন। চন্দ্রকলা, উত্তম পেটিকা, কর্ণভূষণ, দুই কুণ্ডল, বাসুকা, হার প্রভৃতি সকল ভূষণই হাসতে হাসতে কেড়ে নিলেন। সবশেষে কৌপীণটুকুও রাখলেন না তিনি। তাই দেখে প্রমথগণ ও পার্বতীর সখীগণ লজ্জায় মুখ ফেরালেন।

তখন ভৃঙ্গী, চণ্ড, মুণ্ড, প্রভৃতি গণেরা খুব দুঃখিত হলেন। সেই অবস্থা দেখে শিব লজ্জিত ও ক্রোধিত হয়ে দেবীকে বললেন– হে দেবী, তুমি এ কি করলে? ঋষিগণ সকলেই উপহাস করছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সকলেই উপহাস প্রিয়। হে ভবানি, তুমি সদকুলে জন্মে আজ এমন কাজ কেন করলে? যদি সত্যিই আমাকে তুমি জয় করে থাক, তাহলে আমার সকল ভূষণ নিতে পার, কিন্তু কৌপীন ফিরিয়ে দাও।

মহেশের কথা শুনে দেবী হাসতে হাসতে বললেন– হে শম্ভু, তোমার কৌপীণে কি কাজ? তুমি তো দিগম্বর হয়ে দারুবনে ঘুরে বেড়িয়েছিলে, তা দেখে মুনি পত্নীগণ মোহিত হয়েছিলেন। তোমার কৌপীণ তখন কোথায় ছিল? তাই বলছি তুমি পাশাখেলায় যা হেরেছ, তাতে তোমার কোনো অধিকার নেই। দেবীর মুখে এই কথা শুনে মহেশ্বর রুদ্র মূর্তি ধারণ করে তৃতীয় নয়নে দেবীর দিকে তাকালেন। তখন প্রমথগণেরা সকলেই ভয় পেলেন, কিন্তু দেবী সবার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে মহেশ্বরকে বললেন– হে ভব, তুমি তৃতীয় নয়নে আমাকে এভাবে দেখছো কেন? আমাকে ভস্ম করবে? আমি কাল নই, ত্রিপুর বা অন্ধকও নই, তুমি এভাবে আমায় দেখলেও আমার কিছুই হবে না।

দেবী এইভাবে অনেক কথা বলার পর, শিব সেখান থেকে চলে যাওয়ার কথা ভাবতে লাগলেন। বাস্তবপক্ষে বিজন বনই আমার পক্ষে শুভ। যে একা সব ত্যাগ করে নির্জনে বাস করে সেই সুখী, সেই পণ্ডিত।

শিব এমন স্থির করে কোনো এক অদ্ভুত কথা বলে চলে গেলেন। তখন কৈলাসবাসী সকল প্রমথগণ তার পেছনে পেছনে চললেন, ভৃঙ্গী একটি ছাতা নিয়ে তার মাথায় উপর ধরে চলতে লাগলেন। নন্দীও চললেন চামর ব্যাজন করতে করতে। শঙ্করের বৃষ আগে আগে চলল।

এদিকে এসব দেখে দেবী পার্বতী অন্তঃপুরে খুব দুঃখ পেলেন। তিনি তখন অন্তরে মহেশ্বরের ধ্যান করতে লাগলেন। তাই দেখে সখী বিজয়া দেবীকে বললেন– হে সতি, তুমি বহু সাধনার পরে শিবকে লাভ করেছে। তাহলে তুমি তার সঙ্গে কেন পাশা খেলতে গেলে? তুমি নিশ্চয় জানো পাশাখেলা উচিত না। তার কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করো। যদি এমন না করো তাহলে পরে আরও দুঃখ পেতে হবে।

বিজয়ার কথা শুনে দেবী হাসতে হাসতে বললেন– ওই নির্লজ্জ মহাদেবকে আমিই বিভূতি-যোগে হরণ করেছি। এখন আমার কিছুই করার দরকার নেই। আমাকে ছাড়া ওনাকে বিরূপ হয়ে থাকতে হবে। আমি শিবকে রূপবান করেছি। তাই এখন আর অন্য কিছু বলল না। আমার সঙ্গে শিবের যোগ বা বিয়োগ কখনই ঘটে না। হে বিজয়া, এমন তুমি আমার খেলা দেখ।

দেবী এই কথা বলে এক শবরীর রূপ ধারণ করে শিবের উদ্দেশে চলে গেলেন। হাতে ধনুর্বান, তার চারদিকে অনেক সখী, মহেশ্বরের কাছাকাছি গিয়ে তাকে দেখতে লাগলেন।

দূর থেকে শিবও শবরীকে দেখলেন, কামে ব্যাকুল চিত্তে আসন ছেড়ে উঠে মহেশ এগিয়ে যেই তাঁর হাত ধরতে গেলেন তখনই দেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সবার যিনি ভ্রান্তি নাশ করেন, তিনিই আজ ভ্রান্তচিত্তে সেই অপূর্ব সুন্দরী শবরীর খোঁজ করছেন। যিনি স্বয়ং কামদেবকে ভস্ম করেন, আজ নিজেই কামাসক্ত হয়ে পড়লেন।

এইভাবে শিব যখন উন্মত্তপ্রায়, তখন দেবী আবার সেই রূপেই তাঁকে দেখা দিলেন। তখন শিব বললেন– হে সুন্দরী, তুমি আগে আমার কথা শোন, তারপর যা বুঝবে করবে। কে তুমি? তুমি কার? কিসের জন্য এই বনে এসেছ?

দেবী বললেন–আমি স্বতন্ত্র, পতির সন্ধানেই বেরিয়েছি।

দেবাদিদেব বললেন– আমিই তোমার পতি হতে চাই।

দেবী বললেন– হে দেব, মহা তপস্যা করে যে রমণী, তোমাকে পতিত্বে বরণ করেছে, তুমি তাকে ত্যাগ করেছ, বনে চলে এসেছ। তাই বুঝলাম, তুমি সদা সকল প্রাণীর দুরারাধ্য, অতএব তুমি এখন যা বললে, তা আর আমার কাছে বলল না।

শিব বললেন– হে শোভনে, তুমি এমন কথা বলো না, আমি সেই পত্নীকে ত্যাগ করিনি, আমি যদি তাকে ত্যাগই করব, তাহলে কি এমন কথা বলতে পারি?

তার উত্তরে দেবী বললেন– তুমি সন্ন্যাসী, তুমি সংসার বিরাগী। তুমি মদনকে দগ্ধ করেছ। তোমাকে আমি কিছুতেই পেতে পারি না, অতএব তুমি আমাকে পূর্বে যা বলেছ, আর বলো না।

শবরীরূপিণী শঙ্করীর এমন বাক্য শুনে শিব বললেন– তুমি আমার পত্নী হও।

এই কথা বলেই শিব শিবার হাত ধরলেন। তখন দেবী হাসতে হাসতে বললেন– আমাকে ছেড়ে দিন, আপনি মুনি, আপনার দ্বারা এমন কাজ মানায় না। আমার বাবা আছেন, তার কাছে গিয়ে আমাকে চেয়ে নিন।

শিব বললেন– তোমার বাবার বাড়ি কোথায়?

তখন দেবী শিবকে সঙ্গে নিয়ে পিতার ভবনে গিয়ে হিমালয়কে দেখিয়ে দিলেন, শিব তখন হিমালয়কে প্রণিপাত করে বললেন– হে মহামতে, আপনার কন্যাকে আমায় দান করুন। এরপর শম্ভুর প্রকৃত জ্ঞান লাভ হল, হাসলেন তিনি, তারপর বললেন– নারীগণের সঙ্গ মাত্রেই নরগণের পতন অবশ্যম্ভাবী। নারীর মোহে পড়ে আমি পিশাচবৎ আচরণ করছি। এই কথা বলে তিনি গন্ধমাদন পর্বত ছেড়ে বনে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। নারদাদি ঋষিগণ তার বহু স্তবস্তুতি করে পুনরায় তাকে গন্ধমাদন পর্বতে ফিরিয়ে আনলেন।

জগন্নাথ লীলা

অবন্তীনগরের মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন পরম ধার্মিক বিষ্ণু উপাসক ছিলেন। তিনি রাজসূয় ও শত অশ্বমেধ । যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁর রূপও যেমন গুণও তেমন।

একসময় তিনি এক তৈথিক ব্রাহ্মণের কাছে জানতে পারলেন যে দক্ষিণ দেশে সমুদ্রের তীরে শ্রীপুরুষোত্তম নামে একটি উত্তম ক্ষেত্র আছে। সেই ক্ষেত্রে নীলগিরি নামে এক পর্বত আছে। সেখানে বীনি নামে একটা কুণ্ড আছে। সেই কুণ্ডে স্নান করলে হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সেখানে সাক্ষাৎ জগন্নাথদেব শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করে বিরাজ করছেন। সেই দেবকে দর্শন করলেই

মুক্তিলাভ হয়। ' তৈথিক ব্রাহ্মণের মুখে এমন অপূর্ব কথা শুনে রাজার মন বিচলিত হল, তিনি মনস্থির করলেন অবন্তীনগরের বাস উঠিয়ে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই বাস করব। কাজেই বসবাসের উপযোগী স্থান নির্ণয় করা দরকার। কিন্তু এই দুরূহ কর্মের জন্য কাকে প্রেরণ করবেন?– মহারাজ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন।

তখন সেই ব্রাহ্মণ বললেন– আমার ভাই বিদ্যাপতি সেখানে যাওয়ার পথ চেনে। ওর সঙ্গে কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিন।

মহারাজ সেই ব্যবস্থা করলেন। বিদ্যাপতি চলছেন মনের আনন্দে। ভাবছেন আমার জন্ম সফল হল। আজ আমি নীলগিরি শৃঙ্গে শ্বেত পদ্মস্থিত মুক্তিদাতা চক্রধারী পুরুষকে দেখতে চলেছি। আজ আমার কি সৌভাগ্য!

এই রকম ভাবতে ভাবতে শ্রীবিষ্ণুর রূপ চিন্তা করতে করতে রথে চড়ে চলেছেন বিদ্যাপতি মহানদী পার হলেন। তারপর কিছুদূর গিয়ে বিদ্যাপতি এক গ্রামের সকল লোককেই চতুর্ভুজ রূপে দেখতে পেলেন। রথ থেকে নেমে তাঁদেরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। চোখে আনন্দ ধারার অবিরল নির্গমণের জন্য তিনি আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি হৃদয়ে ও বাইরে কেবল বিষ্ণুকেই দেখতে পেলেন।

এভাবে বিষ্ণুর ধ্যান, কখনও সাক্ষাৎ দর্শন, কখনও স্তব করতে করতে কতক্ষণ পরে নীলাচল পর্বত দেখতে পেলেন।

পর্বতের তলদেশে এসে রথ থেকে নামলেন। কিন্তু ওপরে ওঠার পথ খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি সেই মুকুন্দদেবের শরণ নিলেন।

এমন সময় সেই পর্বতের বিপরীত দিকে কয়েকজনের কথাবার্তা শুনতে পেলেন। তাঁরা ভগবৎ বিষয়ক কথাই বলছেন। তাঁদের কথাবার্তা অনুসরণ করে বিদ্যাপতি তাঁদের কাছে গেলেন। সেখানে ছিল শবর জাতির বাস। সেখানে চতুর্ভুজ বৈষ্ণববৃন্দকে দেখে পরম আনন্দ সহকারে প্রণাম করে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন বিদ্যাপতি।

তারপর বিশ্বাবসু নামে এক বৃদ্ধ শবর হরিপূজা করে সেখানে এলেন। তাঁর দ্বাদশ অঙ্গে তিলক, সর্বাঙ্গে হরিচন্দন লেপন করা। বিদ্যাপতি সেই শান্ত বৈষ্ণবকে দেখে মনে মনে ভাবছেন– এই মহাত্মার কাছে দুর্লভ বিষ্ণুর সংবাদ পাব।

এমন সময় সেই শবররাজ বিদ্যাপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন- হে বিপ্র, তুমি কোথা হতে এই দুর্গম বনে এলে? তোমাকে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর দেখছি। আগে তুমি আহারাদি করে সুস্থ হও। তারপর আলাপ করা যাবে। এখন বল, তোমাকে পাকান্ন দেব না ফল মূলাদি খাবে? আজ আমার পরম সৌভাগ্য, জীবনও সফল হল, যেহেতু সাক্ষাৎ দ্বিতীয় বিষ্ণু-স্বরূপ তোমাকে আমি আমার গৃহে পেলাম।

বিদ্যাপতি বললেন–আমার ফলে কিংবা পাকে প্রয়োজন নেই, আমি যে কারণে এখানে এসেছি, সেটি আগে সফল করতে চাই। আমি অবন্তীপুরের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার পুরোহিত, শ্রীবিষ্ণুর দর্শন লালসায় এখানে এসেছি। কোনো এক তীর্থযাত্রীর মুখে এই নীলমাধবের কথা রাজা শুনেছেন। তাই তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। যতদিন না আমি ফিরে যাব ততদিন তিনিও এ ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত চিত্তে থাকবেন। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই বিষ্ণুদর্শন করান।

বিদ্যাপতির মুখে এমন কথা শুনে শবররাজ বিশ্বাবসু বিশেষ চিন্তান্বিত হলেন। হায়! আমাদের দুর্দৈব উপস্থিত হল। এই নির্জনে বিষ্ণুকে ব্রাহ্মণকে দেখালে সকলের কাছে জানাজানি হবে। আর যদি দেখতে না দিই, তাহলে ব্রাহ্মণ আমাকে অভিশাপ দেবেন। ব্রাহ্মণ বর্ণ শ্রেষ্ঠ, বিশেষ করে আজ ইনি আমার অতিথি। এর অভিলাষ পূর্ণ করতে না পারলে আমার ইহলোক পরলোক-দুই নষ্ট হবে।

শবররাজ এমন চিন্তা করতে করতে সহসা মনে করলেন প্রাচীন এক জনপ্রবাদ। এইস্থানে নীলমাধব ভূমিতলে অন্তর্হিত হলে ইন্দ্রের মত পরাক্রমশালী ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা, যিনি মানবদেহেই ব্রহ্মলোকে পর্যন্ত যেতে পারেন। এই স্থানে এসে বিষ্ণুকে দারুমূর্তি রূপে স্থাপন করবেন। তাহলে এই ব্রাহ্মণকে ভগবান দর্শন করাই, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা, লোকের চেষ্টার দ্বারায় কিছুই হয় না। এমন চিন্তা করে বিশ্বাবসু অতিথি ব্রাহ্মণকে বললেন– ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক নরপতি এই স্থানে বাস করবেন– এ বৃত্তান্ত আমরা পূর্বেই শুনেছি। তুমি যখন তার পূর্বেই নীলমাধবকে দর্শন করতে এলে তখন তুমি নিশ্চয় আরও ভাগ্যবান। তাই হে ব্রাহ্মণ, এস, আমরা পর্বতের উপরে যাই।

এই কথা বলে বিশ্ববসু বিদ্যাপতির হাত ধরে একটি সরু রাস্তা দিয়ে যেতে থাকলেন, পাথর আর কাটায় ভরা সেই রাস্তা, কিছুদূর যাওয়ার পর একটি কুণ্ডের কাছে উপস্থিত হলেন।

শবররাজ ব্রাহ্মণকে বললেন– এই মহাকুণ্ডের নাম রীহিন, এতে স্নান করলে বৈকুণ্ঠে গতি হয়, আর এর পূর্বে যে বৃক্ষটি দেখা যাচ্ছে, ওটি অক্ষয় বটবৃক্ষ, ওর ছায়ার দ্বারা মানব ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকেও মুক্ত হতে পারে।

হে ব্রাহ্মণ, ওই দেখুন, এই কুণ্ডে নিকুঞ্জের মধ্যে সাক্ষাৎ জগন্নাথ বিরাজ করছেন। তাঁকে একবার দর্শন করতে পারলে সকল সঞ্চিত পাপ নষ্ট হয়ে যায়।

সেই জগন্নাথদেবকে দেখে আনন্দে বিদ্যাপতির সারা দেহে এক শিহরণ সৃষ্টি হল, তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বহু স্তবস্তুতি করলেন, তারপর বিনম্র চিত্তে প্রণবমন্ত্র জপ করে প্রসন্ন অন্তরে হাতজোড় করে বসলেন।

বিদ্যাপতিকে এই অবস্থায় দেখে বিশ্বাবসু বললেন– হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, প্রভুকে দর্শন করে, তুমি কৃতার্থ হয়েছে। এখন সূর্য ডুবছে। কাজেই এখানে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত নয়। বনের মধ্যে হিংস্র জন্তুদের বাস। সন্ধ্যার আগেই আমাদের গৃহে ফিরতে হবে। তাছাড়া এখনও তুমি কিছু খাওনি। চল, তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরে যাই।

এই কথা বলে বিশ্বাবসু বিদ্যাপতির হাত ধরে তাড়াতাড়ি নিজের গৃহে নিয়ে গেলেন। জগন্নাথের ধ্যানে মগ্ন থাকায় বিদ্যাপতি ক্ষুধা-তেষ্টা কিংবা পথ হাঁটার জন্য যে কষ্ট তা কিছুই বুঝতে পারেননি। তারপর বিদ্যাপতিকে আসনে বসিয়ে প্রসাদান্ন খেতে দিলেন। রাজযোগ্য উপাচার দেখে বিদ্যাপতি অবাক হয়ে গেলেন। শবরের বাড়িতে এসব জিনিস কোথায় ছিল? এই শবর

দুর্গম অরণ্যে বাস করে। প্রতিবেশীরাও সকলে বনবাসী, কেমন করে পেল এমন রাজন্ন দুর্লভ খাবার।

বিদ্যাপতিকে চিন্তিত দেখে শবররাজ বললেন– আমরা বনবাসী আর আপনারা শহরে বাস করেন, আপনাদের সেবা করবার যোগ্যতা আমাদের নেই। শহরবাসীদের আচার-ব্যবহারও আমাদের জানা নেই। আপনি আবার রাজপুরোহিত, আপনাকে তুষ্ট করার সাধ্য আমার নেই। শবররাজের কথা শুনে বিদ্যাপতি বললেন– হে শবররাজ, তুমি ভোজনের জন্য যে সকল সামগ্রী জোগাড় করেছ তা সাধারণ মানুষের তৈরি বলে মনে হচ্ছে না। রাজারাও এমন খাদ্য চোখে দেখেন না। হে মিত্র, এসব খাবার কোথা থেকে এল, আমার খুব জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। বিশ্বাবসু বললেন– এই বিষয় প্রকাশ করা উচিত নয়। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণ অতিথি, তাই গোপন রাখতেও পারছি না।

বিদ্যাপতি এই দুর্লভ প্রসাদের বিষয় জানতে পেরে রোমাঞ্চিত ও আনন্দলাভে চোখের জল আটকাতে পারলেন না। মনে মনে ভাবলেন, এই শবররাজ, ব্যাধবংশে জন্মেও প্রত্যহ ভগবানকে দর্শন আর তাঁর দিব্য নির্মাল্য ভোগ প্রসাদ রূপে লাভ করছেন। এমন ভাগ্যবান কাউকে দেখিনি, আমি আর আমার নিজের ঘরে ফিরে যেতে চাই না। এই শবরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এই বনেই থেকে যাই।

এই চিন্তা করে বিদ্যাপতি শবররাজকে বললেন– হে সাধক, আমার আর গৃহে ফিরে রাজসেবা করার কি প্রয়োজন? এখানে তোমার সঙ্গে থেকে জগন্নাথের উপাসনা করে দেহ বন্ধন যাতে ছিন্ন হয়, তার চেষ্টা করব। তুমি যদি আমার মিত্র হলে, তোমার সঙ্গে আমি প্রত্যহ ভগবানকে দেখতে পাব। আমি এখন অবন্তীনগরে ফিরে যাব। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এখানে আসবেন। বিশাল দেউল তৈরি করাবেন। আর বহুশত উপাচারে ঈশ্বরের পূজা করবেন।

এখন মিত্র, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এখানে এসে কোথায় দেউল নির্মাণ করবেন?

বিশ্বাবসু বললেন– আমি আগে পুরাতন কথা যে সব শুনেছি, তা তোমাকে বলছি শোন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন এখানে আসবেন, তখন তিনি নীলমাধবের রূপ দেখতে পাবেন না। প্রচুর বালিতে ঢাকা পড়ে যাবে। ভগবান রাজার কাছে অদৃশ্য হয়ে যাবেন।

হে মিত্র, তবে তুমি এই কথা রাজাকে বোল না, ভগবান স্বপ্নযোগে রাজাকে আজ্ঞা করবেন দেউল তৈরি করানোর জন্য। শ্রীহরি দারুমূর্তি হবেন। বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথ আর সুদর্শন– এই চার দারুমূর্তিকে পূজা করবার জন্য রাজা ব্রহ্মলোক থেকে ব্রহ্মাকে আনিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন।

বিশ্বাবসুর এই কথা শুনে বিদ্যাপতি মনের আনন্দে ভগবানের দিব্যপ্রসাদ খেলেন। তারপর দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে উঠে সমুদ্রে স্নান করলেন। ভক্তিভরে মাধব দর্শন করে প্রণাম জানালেন।

তারপর বিশ্বাবসু বিদ্যাপতিকে নিজের ঘরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলেন মাধবের মন্দিরে। পুর্বের মত পূজা করে স্তবস্তুতি করলেন, তারপর বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করলেন- হে নরহরি, এতদিন কৃপা করে আমার পূজা নিলে এবার থেকে ইন্দ্রদুম্ন মহারাজা এখানে এসে আপনার জন্য অপূর্ব পুরী নির্মাণ করবেন। দারুরূপে তুমি তার পূজা নেবে। এখন হে লক্ষ্মীপতি, আমার কি গতি হবে? আমার কীর্তি কেমন করে থাকে?

তখন শিলারূপী নারায়ণ বললেন–শুন হে শবররাজ, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা বহুকাল স্তব করেছেন আমাকে পাবার জন্য, এবার তিনি এখানে আসবেন। আজই রাত্রে আমি প্রচণ্ড ঝড়ের দ্বারা বালুকায় প্রবেশ করব। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের দ্বারা চারটি দারুমূর্তি নির্মিত হবে, বেশভূষা সকলই নতুন হবে, তারপর তোমার বংশধররা আমার পূজা করবে।

বিশ্বাবসু এই দৈববাণী শুনে মনের খুশিতে ফিরে গেলেন নিজের ঘরে, বিদ্যাপতির সঙ্গে মিলিত হলেন।

দিন শেষে রাত্রি নামল। দেবতাগণ এলেন মাধবের পূজা করবার জন্য। সেই সময় তীব্রবেগে বাতাস বইতে লাগল। বাতাসের সেই তীব্রগতিতে প্রচুর বালুকারাশি উড়ে এসে নীলমাধবকে ঢেকে দিল। প্রবল ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ সেই রজনীতে দেবতাগণ আর নীলমাধবের পূজা করতে পারলেন না। বিষণ্ণ চিত্তে তারা স্বর্গলোকে ফিরে গেলেন।

তখন সেখানে দৈববাণী হল– এখন আমার আর দেখা এখানে পাবে না। পুনরায় আমি এখানে অবতীর্ণ হব। এ বিষয়ে বিস্তৃত জানবার জন্য ব্রহ্মার কাছে যাও। তিনি তোমাদের সব জানাবেন। তখন দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গেলেন। সব বললেন। রাত্রির মধ্যেই সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল কেউ জানতে পারল না।

এভাবে বিদ্যাপতি বিশ্বাবসুর কাছে বিদায় নিয়ে অবন্তীনগরে ফিরে গেলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে সকল কথা বললেন। বিদ্যাপতিকে দেখে রাজা অবাক হলেন। নীলমাধব দর্শন করে পুরোহিতের দেহে অপূর্ব জ্যোতি বেরোচ্ছে। বুঝতে পারলেন, সবই নীলমাধবের প্রভাব।

তারপর রাজা সারা রাজ্যে ঘোষণা করলেন সকল প্রজাগণ রাজার সঙ্গে নীলাচলে যাবে। এমন সময়ে রাজদরবারে এলেন নারদ ঠাকুর। ভক্তির মহিমা ও বৈষ্ণবের লক্ষণাদি বর্ণনা করলেন রাজার কাছে। তারপর বললেন– পুরুষোত্তমের অপার মহিমাও!

মহারাজা নারদের মুখে সেই মহিমা শুনে বললেন, " হে মুনি, আপনি চতুর্দশ ভুবন ঘুরে ঘুরে বেড়ান, কাজেই আপনার অজানা কিছুই নেই, আপনিই আমাকে শ্রীপুরুষোত্তম দর্শন করান।

রাজার কথায় দেবর্ষি নারদ খুব খুশি হলেন। পরদিন সকালে রাজা তাঁর মন্ত্রী সেনাপতি তৎসহ চতুরঙ্গ সেনা, রাজপরিবারের সকলজন আর প্রজাদের নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। নর-নারী, বালক বৃদ্ধ পূর্ণ নীলাচলে চললেন নৃপতি। পথে যেতে এক চণ্ডীর প্রতিমা দেখে মুনির আদেশ নিয়ে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে প্রণাম করে বহু স্তবস্তুতি করলেন। তারপর কোটি লিঙ্গেশ্বরে গমন করে দর্শন করলেন, ভক্তিভরে পূজা করলেন। রাজার ভক্তি দেখে মহেশ্বর দিব্যমূর্তিতে সাক্ষাৎ দিলেন। বর দিলেন–রাজা তুমি পরম বৈষ্ণব, তোমার দুর্লভ কামনা অবশ্যই পূর্ণ হবে। বৈষ্ণবের আশা কখনই ব্যর্থ হয় না।

বরদান করে শিব অদৃশ্য হলেন। তারপর বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করে রাজা সবার সঙ্গে এলেন নীলাচলে। কিন্তু রাজা তাঁর অঙ্গে কিছু অমঙ্গল চিহ্ন অনুভব করলেন, তাঁর বাম চোখ, বাম বাহু ঘন ঘন নাচছে, নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন,–মুনিবর এর কারণ কি?

উত্তরে নারদ বললেন– হে রাজা, যাঁর দর্শনলাভের জন্য এত দূর এই নীলাচলে এলে সেই ভগবান এখন অন্তর্ধান করেছেন। তোমার পুরোহিত বিদ্যাপতি সেই মূর্তি দেখেছে। সেই মূর্তি এখন তুমি দেখতে পাবে না।

নারদের মুখে এমন বাণী শুনে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অচেতন হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন, বহু যত্নের দ্বারা রাজা চেতন পেলেন। কাঁদতে কাঁদতে দেবর্ষির চরণে পড়ে বললেন– কোন্ কর্মদোষে তিনি দেবদর্শনে বঞ্চিত হলেন?

দেবর্ষি নারদ রাজাকে বহু সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করলেন। তারপর রাজা বিরাট নরসিংহ মূর্তি বটবৃক্ষ ও মুক্তি ক্ষেত্র দেখলেন। নারদ বললেন–নীলমাধব পাষাণরূপ ছেড়ে দারুরূপে প্রকাশ হবেন। এই তত্ত্ব জেনে মহেশ্বর সদা এই ক্ষেত্রে বাস করছেন। রাজা এই কথা শুনে সেই নীলমাধবের বহু স্তবস্তুতি করলেন। তখন রাজার ভক্তি দেখে শুনে দেবগণ বললেন– হে রাজন, চিন্তা করো না। অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা বিষ্ণুকে প্রীত কর, যজ্ঞান্তে দেব গদাধর তোমাকে কৃপা করবেন।

দৈববাণী শুনে মহারাজ নারদকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে নারদ বললেন–নীলকণ্ঠ বিশ্বনাথের কাছে নরসিংহ মূর্তি স্থাপন করে তার সম্মুখে যজ্ঞ কর।

তখন রাজার আদেশে নৃসিংহের মন্দির গঠিত হল। দেবতাগণ শূন্য পথে নৃসিংহের মূর্তি আনালেন, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই মূর্তি মন্দিরে স্থাপন করলেন।

তারপর মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বিশ্বকর্মার পুত্রকে ডেকে দুই ক্রোশ ব্যাপী নগরের পত্তন করালেন। যজ্ঞকার্যে সুনিপুণ ব্রাহ্মণসহ ঋষি, রাজন্যবর্গ, সকল বর্ণের লোকদের নিমন্ত্রণ করে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। মহা ধুমধামে যজ্ঞ পূর্ণ হল। রাত্রিকালে জগন্নাথ স্বপ্নযোগে রাজাকে দেখা দিলেন। তাঁর শ্যামলসুন্দররূপ দেখে রাজা অভিভূত হলেন। রাজা হাতজোড় করে নানা স্তবস্তুতি করলেন। মহারাজ এখন স্থায়ীভাবে নীলাচলে বাস করতে লাগলেন। দক্ষিণ সমুদ্রতীরে কয়েকজন চর এক অদ্ভুত জ্যোতি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা রাজাকে জানাল–এক কাষ্ঠ চারিবর্ণ বিশিষ্ট দেখতে সুন্দর। শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত অতি মনোহর, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম তার গায়ে। সেই কাঠের জ্যোতি যেন শত সূর্যের মত। তার সুগন্ধে দশদিক আমোদিত।

তাদের কথা শুনে মহারাজ অতি বিস্মিত হলেন। রাজার প্রশ্নের উত্তরে নারদ বললেন– মহারাজ অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্যফল এতদিনে পেলে। এক হাজার যজ্ঞ পূর্ণ হতে আর বাকী একটি। তাই প্রভু তোমাকে সাক্ষাৎ দর্শন না দিয়ে স্বপ্নে দেখা দিলেন। বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করবার জন্য তুমি বহু জন্ম তপস্যা করেছ। তাই তিনি কৃপা করলেন। পরম ভক্ত বলে শবর নীলমাধব পূজা করতে পেরেছে। তুমি শবরের থেকে বড় ভক্ত। তাই তোমার দ্বারা প্রভু দারুমূর্তিরূপে প্রকাশিত হবেন। সেই দেব এখন কাষ্ঠরূপ ধারণ করলেন। তোমাকে কৃপা করবার জন্যই শ্বেতদ্বীপ হতে এই কাঠ এল, এতো আর সাধারণ কাঠ নয়। বিষ্ণুর পঞ্জর।

নারদের মুখে এমন কথা শুনে রাজা মনে পরমানন্দ। নানান মঙ্গল বাজনা বাজিয়ে নেচে নেচে চললেন সেই ব্রহ্মময় কাষ্ঠের কাছে। দারু দেখে সবার মনে অপার আনন্দ, সকলেই সেই দারুব্রহ্মের স্তুতি করলেন।

তারপর সোনা ও নানান রত্নে তৈরি এক বেদীর উপরে সেই দারুব্রহ্মকে স্থাপন করলেন। দেবর্ষির বাক্যে রাজা সেই দারুব্রহ্মাকে ভক্তি ভাবে পূজা করলেন।

এরপর মূর্তি গঠন ব্যাপারে নারদ মুনি এবং রাজা চিন্তা করছেন। এমন সময় দৈববাণী হল– বেদীর ওপর রাখা স্বর্গীয় চারবর্ণ বিশিষ্ট কাষ্ঠ থেকে স্বয়ংক্রিয় উপায়ে নীলমাধবের দারুমূর্তি নির্মিত হবে। একজন বৃদ্ধ শিল্পী মন্দিরের মধ্যে গোপনে মূর্তি গঠন করবে।

দৈববাণী শেষ হতেই এলেন এক বৃদ্ধ রাজার অনুমতি নিয়ে মূর্তি গড়তে চাইল। তারপর প্রবেশ করল মন্দিরের মধ্যে, তারপর পনেরো দিন ধরে কৃষ্ণ, বলরাম, সুভদ্রা এবং সুদর্শনের মূর্তি গড়া হল। জগন্নাথের বর্ণ মেঘের মত কালো। বলরামের বর্ণ শঙ্খের মত সাদা। সুদর্শন রক্তবর্ণ আর সুভদ্রা কুমকুম গৌরীবর্ণ।

দৈববাণী হল– প্রতি বৎসর নতুন করে অঙ্গরাগ করতে হবে। শবররাজ বিশ্বাবসু আর রাজপুরোহিত বিদ্যাপতির বংশধরগণ প্রত্যেক বৎসরেই দারুমূর্তির অঙ্গরাগ করবে।

নিজের কানে সেই দৈববাণী শুনে রাজার পরম আনন্দ আর ধরে না। নতুন বস্ত্র পরিহিত বেদীর উপরে চারমূর্তি দেখে মহা আনন্দ লাভ করলেন। সুভদ্রার দুইপাশে জগন্নাথদেব এবং বলভদ্রদেব প্রকাশিত হলেন। আর জগন্নাথের পাশে সুদর্শনদেব।

দেবর্ষি নারদ বললেন–হে রাজন, তোমার মতো ভাগ্যবান জগতে কে আছে? নিজের ভববন্ধন মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জগতের সকলেরও মুক্তিসাধনের উপায় করলেন।

তারপর মহারাজ বারবার দণ্ডবৎ প্রণাম করে নারদমুনি আর বিদ্যাপতির সঙ্গে নারায়ণের বহু স্তবস্তুতি করলেন। তারপর রাজা পুরোহিতের দ্বারা পূজার সকল উপাচার সংগ্রহ করে নারদের উপদেশে যথা বিধিমতে মূলমন্ত্রে জগন্নাথ, তারপর বলরাম, সুদর্শন ও সুভদ্রারও পূজা করলেন। কৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণগণে সোনা, রূপা, গাভী, প্রভৃতি দান করলেন।

দেবর্ষি নারদের অনুমতি নিয়ে রাজা তারপর মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ করলেন। বিভিন্ন স্থান থেকে পাথর ও রত্নাদি আনালেন। কিন্তু সুবিশাল মন্দির নির্মাণ করবে কে? কে এমন শিল্পী আছে? রাজা চললেন নারদকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মলোকে। ব্রহ্মার চরণে উভয়ে প্রণাম জানিয়ে মন্দির নির্মাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করলে ব্রহ্মা তখন বিশ্বকর্মাকে ডেকে জগন্নাথের মন্দির নির্মাণ করবার জন্য আদেশ করলেন।

বিশ্বকর্মা রাজী হলেন। সত্যধামে এসে শুরু করলেন মন্দির নির্মাণের কাজ। তারপর দেবতাগণকে ডেকে ব্রহ্মা বললেন– ভগবান দারুব্রহ্মরূপে নীলাচলে অবতীর্ণ হয়েছেন। আবার যে জন নীলাচলে বাস করবে, তারা ব্রহ্মপদও লাভ হবে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথের মন্দির তৈরি করবে, আমি নিজে প্রতিষ্ঠা করব।

ব্রহ্মার কথা শুনে সেখানে সকল দেবতাগণ মহানন্দে প্রভুর সেবার জন্য যেতে রাজি হলেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ফিরে গেলেন নীলাচলে, মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকল দ্রব্য আয়োজন করলেন।

তারপর তিনি শবররাজ বিশ্বাবসুর কাছে গিয়ে তার পায়ে প্রণাম ও স্তুতি করে বললেন–হে, শবররাজ, তোমার শবরকুলে জন্ম হলেও তুমি ধন্য। শ্রীহরি নীলমাধবরূপে তোমাকে কৃপা করলেন। এখন তুমি আমাকে কৃপা কর। তোমার যজ্ঞভূমির তলার গহ্বরে গিয়ে নির্জনে থাকলে নীলগিরি স্থির হবে। তোমার মাথার উপরেই প্রভুর মন্দির তৈরি হবে।

ইন্দ্রদ্যুম্নের কথা শুনে প্রভুর বাক্য স্মরণ করে নিজের ছেলেকে রাজার হাতে তুলে দিয়ে মনের আনন্দে বিশ্বাবসু নিজের তপস্যার জায়গায় চলে গেলেন। সেই গর্তের মধ্যে বসে জগন্নাথের ধ্যান করছেন। তখন চারপাশের বালুকায় ভর্তি হল গর্ত, বিশ্বাবসুর আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে লীন হয়ে গেল। বিশ্বকর্মা তাঁর পুত্রকে নিয়ে মন্দির গড়ার কাজ শুরু করলেন। হাজার হাজার লোক তাঁদের সাহায্য করলেন, বড় বড় পাথরের চাঁই বহন ও তুলবার জন্য। সেই মন্দিরটি লম্বায় একশো হাত, চওড়ায় বাইশ হাত আর উঁচু হাজার হাত। তিন দিনেই তৈরি হয়ে গেল এত বড় মন্দির। সাধারণ শিল্পী হলে শত বছরেও যা তৈরি করতে পারত না। চারদিকে প্রাচীর আর স্থানে স্থানে অন্যান্য ঘর তৈরি হল আর এক দিনে। সেই মন্দিরের চূড়া যেন আকাশকে ছুঁয়েছে। সেই চূড়ায় সোনার কলস বসানো হল। সেই মন্দিরের পূর্বদিকে সিংহদ্বার মন্দিরের মধ্যে গর্ভগৃহে রত্নবেদী তৈরি হল।

মন্দির নির্মাণ কাজ শেষ হবার পর বিশ্বকর্মা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জানালেন, তখন দেবতাগণ ও আপ্তবন্ধুগণের সঙ্গে মহারাজ সেই মন্দির দেখতে গেলেন। সবাই আশ্চর্যবোধ আর পরম আনন্দলাভ করলেন। ত্রিভুবনে এমন বিশাল ও সুন্দর মন্দির আগে কেউ কখনও দেখেনি। তারপর মহারাজ বিশ্বকর্মা বহু প্রশংসা করে জগন্নাথ দর্শনে গেলেন। প্রভুপদে প্রণতি জানিয়ে ভাবাবেশে আপ্লুত হলেন। দেবতাগণও প্রণাম করে স্তবস্তুতি করলেন।

তারপর বাইরে এসে নরসিংহ ক্ষেত্রে গিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে সবাই প্রণাম করলেন।

এসব প্রতিষ্ঠার পালা, স্বয়ং ব্রহ্মা আসবেন মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং স্থাপন করবার জন্য। শাস্ত্র অনুসারে যা কিছু প্রয়োজন নারদঠাকুর ফর্দ করে দিলেন। রাজা সেই ফর্দ দিলেন পদ্মনিধির হাতে সুন্দর করে মণ্ডপাদি সাজাতে বললেন। দেবতাদের থাকবার ঘর, ব্রহ্মার বসার ঘর, সিদ্ধ বিদ্যাধরাদি থাকবার ঘর তৈরি করা হল, ফর্দ অনুসারে সকল দ্রব্যই সংগ্রহ করা হল। ইন্দ্রদ্যুম্নের মনের মত করে সব তৈরি করলেন বিশ্বকর্মা আর পদ্মনিধি। আবার সোনা দিয়ে তিনখানি রথ তৈরি করলেন তাঁর নানাবিধ রত্ন অলঙ্কারে পূর্ণ সেই রথগুলি।

তারপর দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মা নীলাচলে এসে দারুমূর্তি দর্শন করে স্তুতি করলেন। রথে করে সেই দারুমূর্তি নীলাচলে আনা হল, মন্দিরের গর্ভগৃহে রত্নবেদীতে স্থাপন করা হল। তারপর ব্রহ্মা অভিষেক ও প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করলেন। মহা ধুমধামে নানা বাদ্য বাজনা নৃত্যগীত সহকারে সকল কিছু সুসম্পন্ন হল। মূর্তিমান ভগবান বেশে নীলাচলে, কলেবর মনোহর শোভে ক্ষিতি তলে। এইরূপে নীলাচলে দারু ব্রহ্মহরি, মান্যরূপে থাকেন রাজাকে কৃপা করি। ক্রমে ক্রমে কলির প্রভাব বাড়তে লাগল, তখন জগন্নাথদেব পুনরায় লীলা প্রকাশ করলেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন দারুমুর্তি স্থাপন করবার পর মহাপুজা, মহাসেবা আর মহাভোগ নিত্য দেওয়া হল, এইভাবে দ্বাদশ বৎসর গত হল। ত্রয়োদশ বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে নিত্যদিনের মত একদিন দেবতাগণ রাত্রিকালে এসে জগন্নাথেদেবের পূজাদি করে প্রসাদ খেয়ে ফিরে গেলেন।

তারপর সেই রাত্রিতেই জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চারমূর্তি এক হয়ে কাষ্ঠরূপে সমুদ্রের জলে ভাসতে লাগলেন। মন্দিরের মধ্যে যে দারুমূর্তি ছিল তার বেশভূষা সব ছিন্নভিন্ন অতি অপরূপ মুর্তি এখন প্রভাহীন হয়ে বিকৃত আকার হয়েছে।

রাত থেকে সকাল হল। মঙ্গল আরতি করবার জন্য পূজারী ঠাকুর মন্দিরের দ্বার খুলে প্রদীপ হাতে গর্ভগৃহে ঢুকলেন। পরিচারকগণ সকলে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। নানা শব্দে বাজনা

বাজছে। পূজারী দেখল ছিন্নভিন্ন জগন্নাথ, আর তিন মূর্তির একই অবস্থা। ভয়ে তার শরীর কাঠ হয়ে গেল। অন্তর শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সকল বাদককে বাজনা বাজাতে নিষেধ করলেন। রাজদূতের দ্বারা রাজার কাছে খবর পাঠালেন। ছুটে এলেন মহারাজ। মন্দিরে ঢুকে জগন্নাথের রুক্ষ, শুষ্ক জরাজীর্ণ দেহ দেখে আছাড় খেয়ে পড়লেন মেঝেতে। মূর্ছিত হলেন, সকলের সেবাযত্নে জ্ঞান ফিরে পেলেন।

কাঁদতে কাঁদতে রাজা বললেন– হে কৃপানিধি, আমার কোন অপরাধে প্রভু তুমি অপ্রকট হলে। তুমি বলেছিলে– এই স্থান ছেড়ে কখনও যাবে না। এখন আমার কি অপরাধ হল, বল প্রভু? বহু কষ্টে তোমাকে পেয়ে তোমার আরাধনা করছি। এমন আমাকে নিগ্রহ করছ? মহারাজের কান্না দেখে সবার চোখে জল। এমন সময় দেবর্ষি নারদ সেখানে এলেন। রাজা তার পায়ের তলায় পড়লেন। দেবর্ষি বললেন– হে রাজন, প্রভু কখনই এই নীলাচল ছেড়ে যাবেন না। এখন প্রভু নরবেশ ধারণ করবেন। বিশ্বাবসুর সন্তানরা প্রভুর অঙ্গরাগ করবেন। বিদ্যাপতির বংশের লোক প্রতিষ্ঠা করবেন। পূর্বে জগন্নাথ এমন দৈববাণী করেছেন। এখন সাগরের তীরে সেই কাঠ রয়েছে তা দিয়ে মূর্তি গড়াও। বিশ্বকর্মাকে স্মরণ কর।

মহারাজ নারদের মুখে এমন কথা শুনে স্বস্তি বোধ করলেন। সমুদ্রের কূলে গিয়ে দেখলেন শ্বেত, রক্ত, নীল তার পীতবর্ণের সুন্দর কাঠ। নানাবিধ বাদ্য বাজিয়ে সেই কাঠ আনা হল, নারদাদি মুনি ও বিপ্রগণ বেদধ্বনি করতে লাগলেন। রত্নবেদীর নীচে রাখা হল সেই কাঠ, বেদীর উপরে জরা মূর্তি।

তারপর নিয়মিত সেবার যেমন ব্যবস্থা আছে, তা সমাপন হলে রাজা যোগাসনে বসে বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করতে তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন রাজা তাঁকে প্রণাম জানিয়ে মূর্তি নির্মাণের জন্য অনুরোধ করলে তিনি মন্দিরের মধ্যে গিয়ে বেদীর নীচের কাঠ বাটালি দিয়ে পরীক্ষা করে বললেন–রাজা চিন্তা কোরো না এই আপাত অসম্ভব কর্ম প্রভু নীলমাধব নিজেই সম্পন্ন করবেন। মহারাজ, এ কাজ আমার দ্বারা করা সম্ভব নয়। বাটালির ঘা বসাতে পারছি না, তাতে মূর্তি গড়ব কেমন করে?

দেবশিল্পীর কথা শুনে সবাই অবাক। তাহলে মানবশিল্পী এখন কে আছে, যে এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করবে? কি জানি প্রভুর মনে কি আছে?

বিশ্বকর্মা ফিরে গেলেন। মহারাজ খুব চিন্তায় পড়লেন। দুঃখিত হয়ে নারদের কাছে সব নিবেদন করলেন। তখন ঋষি বললেন– রাজা চিন্তা কোরো না। এই আপাত অসম্ভব কর্ম প্রভু নীলমাধব নিজেই সম্পন্ন করবেন।

এমন সময় ভগবান হরি বৃদ্ধবেশে সেখানে উপস্থিত হলেন। হাতে কাঠ খোদাই করার নানা যন্ত্রপাতি, মাথায় পাকা চুল, গায়ের মাংস সব ঝুলে পড়ছে, দুর্বলতার জন্য শরীর কাঁপছে।

মহারাজ তাকে দেখে মনে মনে বুঝতে পারলেন। এই সেই ভগবান, বৃদ্ধের বেশে এসেছেন মূর্তি গড়ার জন্যই। তখন রাজা সেই বৃদ্ধের স্তুতি করে মূর্তি গড়ার জন্য তাকে অনুরোধ করলেন।

বৃদ্ধ বললেন– আগে কাঠ দেখি তারপর বলব, মূর্তি গড়তে পারব কিনা, তারপর পরীক্ষা করে । দেখে তিনি বললেন– কাঠ খুবই নরম। তিনদিন তিনরাত লাগবে মূর্তি তৈরি করতে। মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকবে। তিন দিন সেই সময় কেউ মন্দিরের মধ্যে ঢুকবে না। হে রাজন, তুমি নিজেই দ্বার রক্ষা করবে।

রাজা রাজি হলেন, হাতে খড়গ নিয়ে দ্বার রক্ষা করছেন! যখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হল স্বর্গ থেকে দেবতারা এলেন জগন্নাথ দেবকে পূজা করবার জন্য, মহারাজ হাতজোড় করে বললেন– তিনদিন দ্বার বন্ধ থাকবে, চতুর্থ দিবসে এসে পূজা করবেন।

রাজার বাক্যে দেবতারা খুশি হতে পারলেন না, তাঁরা ব্রহ্মার কাছে ফিরে গেলেন, গিয়ে সব বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। জগন্নাথদেবকে পূজা না করতে পেরে ক্ষোভ জানালেন। ব্রহ্মা তখন নানান সান্ত্বনা ব্যক্যে তাদের সকলকে শান্ত করলেন।

এদিকে মন্দিরের মধ্যে, নারায়ণ নিজেই নিজের দারুমূর্তি গঠন করছেন। বাইরে থেকে রাজা শুনতে পারছেন ঠুকঠাক শব্দ। মনে খুব আনন্দ, অন্তরে উৎকণ্ঠাও আছে। কখন দেখতে পাব পুনরায় জগন্নাথকে, দ্বিতীয় দিনের কাজ শেষ হল আর এক দিনের কাজ বাকী আছে।

এদিকে জগন্নাথ মনে মনে ভাবলেন আমি অঙ্গহীন মূর্তি ধারণ করব। অঙ্গহীন দেখে সবাই অশ্রদ্ধা করবে। সেই পাপে লোক সব নরকে পড়বে। আবার সেই অঙ্গে শ্রদ্ধাভরে যে ভজনা করবে, তার প্রতি প্রভু কৃপাবান হয়ে তাকে বৈকুণ্ঠে স্থান দেবেন।

এমন চিন্তা করে প্রভু মূর্তি গড়ার কাজ বন্ধ করলেন। ভেতরের কোন শব্দ শুনতে না পেয়ে রাজা ভাবলেন মূর্তি নির্মাণের কাজ সমাপন হয়েছে। তাড়াতাড়ি দ্বার খুলে ছুটে গেলেন মূর্তি দেখবার জন্য, কিন্তু একি! মুখের আকার আর নাসা কর্ণদ্বয়, মস্তক আকার কেশ পূর্ণ হয় না। তখন সেই বৃদ্ধ কারিগর চার মূর্তিকে দেখছেন, সকল মূর্তির চিহ্নগুলি মাত্র হয়েছে, রাজা খুব অবাক হয়ে গেলেন, শিল্পী বললেন– রাজা এ আপনি কি করলেন? এখনও একদিনের কাজ বাকি আছে। আপনি কপাট খুললেন কেন? ত্রিভুবনের মধ্যে শ্রীহরিরূপ সবচেয়ে সুন্দর তাই খুব সাবধানে এই মূর্তি গঠন করছি। এখনও কাজ পূর্ণ হয়নি, হাত পা আঙ্গুল তৈরি করতে বাকি আছে।

তখন রাজা হাতজোড় করে কারিগরকে বললেন– আমি ভুল করেছি, এখন আমি দ্বারের দরজা বন্ধ করে বাইরে যাচ্ছি, তুমি মূর্তি গঠনের বাকি কাজ করে দাও।

রাজার কথা শুনে বৃদ্ধ কারিগর হেসে বললেন– আমার দ্বারা আর এ কাজ হবে না। তুমি এই অঙ্গহীন মূর্তিই পূজা কর। আর এক গোপন কথা বলি পূর্বের জীবনে দারুমূর্তির নাভিতে ব্রহ্ম আত্মা আছে। সেই আত্মা নিয়ে এই নবনির্মিত মূর্তিতে স্থাপন কর। নতুন মূর্তির নাভিপদ্মে বাকলের মধ্যে সেই স্থান রয়েছে। কিন্তু মহারাজ এ কাজ তোমার দ্বারা হবে না। বিশ্বাবসু শবরের পুত্রের দ্বারা এ কাজ করতে হবে। সাত পার্টি, কাপড় চোখে বেঁধে এই কাজ করবে। ভুলেও যেন দেখে না ফেল, দেখলেই প্রাণে মারা যাবে। আর বিদ্যাপতি প্রতিষ্ঠা করবে। প্রতি বারো বছর অন্তর প্রভুর এমনি অসম্পূর্ণ মূর্তি গড়া হবে। এই শবরের বংশ আর বিদ্যাপতির বংশের লোকই ওই দুই কাজ করবে। অঙ্গহীন দেখে অবজ্ঞা না করে ভক্তিভরে পূজা কর।

এই কথা বলেই বৃদ্ধ কারিগর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাজা দেখে অবাক, রাজার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, স্বয়ং জগন্নাথই বৃদ্ধ শিল্পীর রূপ ধরে এই মূর্তি গড়ে গেলেন, তারপর বিশ্বাবসুর পুত্রকে এনে ব্রহ্মআত্মা যথাস্থানে স্থাপন করালেন।

তারপর নারদের সঙ্গে যুক্তি করে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মাকে এই অঙ্গহীন মূর্তির কারণ জিজ্ঞাসা করলে ব্রহ্মা বললেন– এই মূর্তি যে চিনবে সেই হবে ভাগ্যবান। কাল মহাঘোরে সে পাবে পরিত্রাণ, কলির মানুষেরা মাহপাপী হবে, জাতিভেদ থাকবে না। এই মূর্তি দেখে যার ভক্তি, হবে সে আর কভু এই মূর্তি দেখবে না। সে ভক্তিপদ লাভ করবে।

তারপর রাজা নীলাচলে ফিরে এলে সেইসব নির্মিত মূর্তি রত্নবেদীর উপরে প্রতিষ্ঠা করলেন।

গৃহপতিকে শিবের কৃপা

নর্মদা নদীর তীরে নর্মপুর নামে এক শহর ছিল, বিশ্বানর নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নী শুচিশ্মতাঁকে নিয়ে সেই নগরে বাস করতেন। বড় নিষ্ঠাবান, সকল কাজই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। শিবের পূজা করে তার সময় কাটে কিন্তু একটাই দুঃখ, তাঁর কোনো ছেলেপুলে নেই, ব্রাহ্মণীর বড় ইচ্ছা শিবের মত একটি পুত্র যেন তিনি লাভ করতে পারেন। স্বামীকে মনের কথা বলেন। ব্রাহ্মণও চান একটা পুত্র, ভাগ্যে থাকলে তবে তো।

বিশ্বানর একদিন চিন্তা করলেন শিবের মত পুত্র যদি পেতে হয় তাহলে শিবের আরাধনা করতে হবে। তিনি শিবের প্রিয় স্থান বারাণসীতে গেলেন, সেখানকার সাধু সজ্জনদের জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় পূজা করলে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যাবে। সবাই বিশ্বেশ্বর লিঙ্গের কথাই বললেন। তখন বিশ্বানর সেখানেই গেলেন। ভক্তিভরে গঙ্গার জল দিয়ে শিবলিঙ্গের পূজা করে স্থির মনে ধ্যানে বসলেন।

প্রথম প্রথম তিনি একবেলা আহার করতেন, পরে তিনি একেবারে অনাহারে তপস্যা শুরু করলেন। একবছর কেটে গেল, তারপর কিছুদিন পরে তিনি দেখতে পেলেন শিবলিঙ্গের উপরে একটি অপরূপ সুন্দর শিশু। চোখ দুটি টানা, ঠোঁট দুটি লাল, মাথায় জটা, আবার উলঙ্গ।

ব্রাহ্মণ বুঝতে পারলেন স্বয়ং মহাদেবই শিশুর রূপ ধরে দেখা দিলেন। আনন্দে আত্মহারা বিশ্বানর।

শিশুরূপী শিব বললেন– হে বিশ্বানর, তোমার আশা পূর্ণ হবে, ঘরে ফিরে যাও।

বিশ্বানর ফিরে এলেন নিজের ঘরে। কিছুদিন পরে তাদের ঘর আলো করে এক পুত্রের জন্ম হল। খবর পেয়ে ছুটে এল সবাই। শুধু পাড়া-প্রতিবেশী নয়, মুনি-ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নরাদি সকলেই, এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও এলেন। প্রত্যেকে বহু উপহার আনলেন, এত লোকের আগমনে সেই স্থান যেন এক তীর্থের আকার ধারণ করল। প্রচুর উপহার বিশ্বানর সবাইকে দান করে দিলেন। সেই নবজাতকের জাতকর্মাদি সবই করলেন স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা, শিশুর নাম দিলেন গৃহপতি। আর তারপর গৃহপতি বড় হতে লাগল। ব্রহ্মা তাকে শিক্ষা দিল। অল্পবয়সে গৃহপতি চারিবেদ শিখে মহাপণ্ডিত হয়ে গেল। একদিন গৃহপতি মা, বাবার সেবা করছেন, এমন সময় নারদ এলেন বীণা বাজিয়ে, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তার

সেবায়। চরণ ধুইয়ে আসনে বসতে দিলেন এবং ঘরে যা ফলমূল ছিল তা সাজিয়ে খেতে দিলেন, দেবর্ষি খুব সন্তুষ্ট হলেন। গৃহপতি তখন ন'বছরের বালক। মুনিবর তাকে ডাকলেন, গৃহপতি এগিয়ে গেল মুনির কাছে, মুনিবর তার হাত দেখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন বালকের মুখপানে। তারপর বিশ্বানরকে বললেন– তোমার এই ছেলে সাধারণ নয়, রাজাধিরাজ হবে, তোমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

এই কথা শুনে বাবা মা খুব খুশি হলেন।

কিছুক্ষণ মুনিবর চুপ থেকে আবার দুঃখের স্বরে বললেন–ছেলেটির সবই ভালো কিন্তু একটা খারাপ লক্ষণ সব ভালোকে শেষ করে দেবে।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সে কথা শুনে আঁৎকে উঠলেন, বললেন–কি খারাপ লক্ষণ দেখলেন আমাদের পুত্রের?

মুনি বললেন– এই শিশুর পরমায়ু যোগ খুবই অল্প। আর মাত্র চার বছর আয়ু আছে। মা বাবার মাথায় যেন বজ্রপাত হল।

নারদ বললেন–বজ্রপাতেই মৃত্যু হবে এই বালকের।

কথাটা শোনামাত্রই বাবা-মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বিশ্বানর একটু শান্ত হয়ে মুনির চরণ ধরে বললেন, কোনো ভাবেই কি এই বালকের আয়ু বাড়ানো যায় না?

কপালের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে না, আমি আর কি করব? এই কথা বলে নারদঠাকুর চলে

গেলেনর আর শুচিষ্মীতার মন গল্প পরমায়ু পুত্রকে দিলেবলেনি। দেবর্ষি চলে।

বিশ্বানর আর শুচিষ্মীতার মন খুবই খারাপ, কঠোর সাধনা করে শিবের বরে এমন সুন্দর মেধাবী পুত্র লাভ হল। কিন্তু মহাদেব এমন অল্প পরমায়ু পুত্রকে দিলেন কেন?

বালক গৃহপতি নারদের সব কথাই শুনেছে। কিন্তু তখন কিছু বলেনি। দেবর্ষি চলে যাওয়ার পর মা বাবাকে কাঁদতে দেখে বলল– মা, বাবা, তোমরা কাঁদছ কেন? আমি তোমাদের সেবা করব।

আর আমি শাস্ত্র পড়ে জেনেছি, যে পুত্র তার বাবা-মার সেবা করে তার কখনও কোনো বিপদ হয় না। যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে শাস্ত্রের কথা মিথ্যা, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু, আর সংহারকর্তা মহেশ্বর। আমি মহাদেবের তপস্যা করব। তিনি ইচ্ছা করলেই আমার অল্পবয়সের মৃত্যুযোগ খণ্ডাতে পারেন, তোমরা আমাকে অনুমতি দাও, তপস্যায় যাই।

মা-বাবা তো অবাক, এইটুকু ছেলে কি বলছে? তারপর বিশ্বানর ভাবলেন গৃহপতি যা বলছে তা যদি করতে পারে তাহলে শিব নিশ্চয়ই কৃপা করবেন। কিন্তু এইটুকু ছেলে কিভাবে কষ্ট সহ্য করবে, কিভাবে তপস্যা করবে? কিন্তু অনুমতি না দিলে তো অকালেই পুত্রকে হারাতে হবে।

গৃহপতি তার বাবা মাকে বলল– তোমরা আমার কষ্টের কথা ভাবছ? কিন্তু কষ্ট না করলে দুর্দৈব কাটবে কেমন করে?

মা বাবার আর কি বলার আছে? বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু অনুমতি দিলেন। বালক গৃহপতি মা বাবাকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ল, বেশ কিছুদিন হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছল কাশীধামে। গঙ্গার ধারে বসে পড়ল এক জায়গায়। নিজেই গঙ্গামাটি দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরি করলো। কাছাকাছি বন থেকে ফুল আর বেলপাতা সংগ্রহ করে পূজা করতে লাগল প্রত্যেকদিন, একমনে ধ্যান করল, খাওয়া দাওয়ার কথা তার মনেই নেই।

এক এক দিন পার হল, মাস যায় বছর পার হল। এই করে তিন বছর পার হল। গৃহপতির বারো বছর বয়স হলে তার মৃত্যুর দিন যে এগিয়ে আসছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই। নিত্য নিত্যই শিবকে গঙ্গাজলে স্নান করাচ্ছে। ফুলের মালা গেঁথে শিবলিঙ্গের উপর সাজিয়ে দিয়ে ধ্যান করছে গৃহপতি।

তারপর এল সেই মৃত্যুর দিন। বজ্র হাতে নিয়ে এলেন দেবরাজ ইন্দ্র। বললেন, গৃহপতি তুমি বালক হয়ে যেভাবে তপস্যা করছ তাতে আমি খুব খুশি, বল কি বর চাও?

গৃহপতি চোখ খুলে ইন্দ্রকে দেখে তার চরণে প্রণাম জানিয়ে বলল, আমি মহেশ্বরের উদ্দেশে তপস্যা করছি। আমি তো আপনার ধ্যান করিনি। তাহলে আপনি কেন বর দেবেন? শিব যদি তুষ্ট হয়ে বর দেন তাহলে আমি নেব।

বালকের মুখে এমন কথা শুনে ইন্দ্র চটে গেলেন, বললেন– এতটুকু বালকের এত বড় স্পর্ধা, আমাকে অবজ্ঞা করে। গৃহপতি আমি তোমাকে বর দিতে এসেছি, বর চাও।

বালক আবার বললো– আপনি রুষ্ট হবেন না। আমি শিবকে তুষ্ট করে তাঁর কাছে থেকে বর নিতে চাই। আপনার দেওয়া বর আমার প্রয়োজন নেই। দয়া করে আপনি আমাকে বিরক্ত করবেন না।

বালকের মুখে এমন কথা শুনে ইন্দ্র আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলেন না। বজ্র তুলে মারবার জন্য উদ্যত হলেন, কি ভয়ানক তেজ সেই বজ্রের, ঝলকে ঝলকে আগুন বেরোচ্ছে। তাকিয়ে থাকতে পারল না আর, গৃহপতি চোখ বন্ধ করে থাকল।

সহসা মনে পড়ল নারদ মুনি বলেছিলেন কপালের লিখন খণ্ডায় না, তাহলে কি শিব তুষ্ট হননি, বজ্রের আঘাতে তাকে মরতে হবে?

এই ভেবে গৃহপতি চেতনা হারাল, কিছুক্ষণ পরেই চেতনা ফিরে পেল। তার মনে হল কে যেন তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছেন। চোখ খুলে দেখলো, বাঘছাল পরা, মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল, গায়ে সাপ, মণিময় মালা গলায় আর মুখে মৃদু হাসিতে ভরা এক মোহময় মূর্তি। উঠে দাঁড়াল গৃহপতি, প্রণাম করল তার পায়ে।

শঙ্কর বললেন– আমি এসেছি, তোমার কোন ভয় নেই, আমি তোমার তপস্যায় তুষ্ট হয়েছি। তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্য ইন্দ্রের বেশে এসেছিলাম। তুমি তপস্যা করে অগ্নিকে জয় করেছ। তাই আমি তোমাকে আজ থেকে অগ্নির অধীশ্বর করলাম। এই ব্রহ্মাণ্ডে যত দেবতা আছে, মানুষ, মুনি, ঋষি সকলেই তোমার পূজা করবে, এখন বাবা মার কাছে ফিরে যাও। তোমার জন্য বিশ্বকর্মা নগর বানিয়েছেন তার নাম অর্চিষ্মতী, স্বর্গের পাশেই সেই নগর।

তারপর গৃহপতি মহাদেবের চরণে প্রণাম জানাল, নিজের দেশে ফিরে এল। মা, বাবা তাকে দেখে খুব আনন্দ পেল এবং সব কথা শুনে আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠল।

যথাকালে বাবা মাকে নিয়ে গৃহপতি অর্চিষ্মতী নগরে গিয়ে রাজরাজেশ্বর হলেন।

শুচিত্মানের কাহিনি

শিবভক্ত মহাযোগী কদম ঋষি, তার একমাত্র পুত্র নাম শুচিত্মান। বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে গেল নদীতে। সকলেই সাঁতার জানে, জল ছোঁড়াছুড়ি, নানান ভঙ্গিতে সাঁতার কাটা ডুব সাঁতার চিৎ সাঁতার কোন কিছু কারুরই জানা নেই। একসময় বন্ধুরা শুচিত্মানকে ধাওয়া করল, সে মাঝনদীতে চলে গেল। মাঝনদীতে এক শুশুক তাকে আক্রমণ করল। শুচিম্মান ডুবে গেল। বন্ধুরা ভাবল সে মারা গেছে।

সকলের মন খারাপ, দুঃখে তারা ফিরে গিয়ে কর্দম ঋষিকে সব জানাল।

তাদের কথা শুনে ঋষি কর্ম বললেন– শুচিত্মান তো ভালো সাঁতারু, তার তো ডুবে যাওয়ার কথা নয়। তিনি যোগাসনে বসলেন, কি হয়েছে জানতে স্পষ্ট দেখতে পেলেন শুশুক তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে জলের তলায়। এমন সময় জলদেবী এসে শুশুকের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে সাগরের কাছে রেখে দিলেন। সাগর নিয়ে যাচ্ছে শুচিত্মানকে। শিব এসে জিজ্ঞাসা করলেন তাকে– একে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে?

সাগর অবাক হলো, উত্তরে বলল– আমি এর পরিচয় জানি না। জলদেবী আমায় দিলেন।

শিব বললেন– এই ছেলেটি আমার একজন পরমভক্ত কদম ঋষির ছেলে। আমাকে দাও।

এই কথা শোনামাত্র শিবের আদেশ পালন তো করতেই হবে। শুচিত্মানকে জিজ্ঞাসা করে তারপর সেই শুশুককে ধরলেন, একটা জালে বেঁধে নিলেন সেই শুশুকটিকে। তারপর চললেন কর্দম ঋষির কাছে।

ঋষি ছেলেকে দেখে খুব খুশি হলেন, আর সামনে দেখলেন শুশুক, ঋষির ধ্যান ভাঙলে সমুদ্র তাকে করেছে ওকে ক্ষমা করে দিন।

ঋষি বললেন–আমার কোন কিছু অজানা নেই। এই বলে ছেড়ে দিলেন তাকে। এদিকে শুচিত্মানের গা দিয়ে জল ঝরছে, দেহটায় নীল শেওলা জমেছে।

বহুকাল পরে প্রায় হাজার বছরের পর যোগাসনে কদম ঋষি বসলেন, এতটা সময় পার হয়ে গেছে। বুঝতেই পারেননি। শুচিত্মান আর বালক নেই।

এখন শুচিস্মান তপস্যা করতে চায়, সেইজন্য বাবার কাছে অনুমতি চাইল। পুত্রের কথায় ঋষি কদম সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন।

শুচিস্মান পিতাকে প্রণাম করে বারাণসীতে শিবের আরাধনা করতে চলে গেল।

কঠোর তপস্যার পর মহাদেব দেখা দিয়ে বর দিতে চাইলেন, শুচিস্মান বলল– আমি জল আর জলজন্তুদের উপর আধিপত্য করব এই বর দিন।

শিব তথাস্তু বলে চলে গেলেন। তার শুচিত্মান জলের অধীশ্বর হলেন।

গরুড় কর্তৃক বিনতার দাসীত্ব মোচন

প্রজাপতি দক্ষের চৌষট্টিজন কন্যা, কশ্যপ তার মধ্যে তেরোজনকে বিয়ে করলেন। তাদের মধ্যে ক ও বিনতা দুইজন। কর একশো ছেলে সকলেই সাপ, বিনতার দুই ছেলে, অরুণ ও গরুড়। যার পুত্র সংখ্যায় বেশি তার জোর বেশি, অহঙ্কারও বেশি। কিন্তু বিনতার ছেলে গরুড় মহাশক্তিধর। কদ্রুর শতপুত্রের বলের থেকেও গরুড়ের শক্তি বেশি। গরুড়ের বড় ভাই অরুণ সূর্যের সারথি।

তাই কদ্রু মনে মনে চিন্তা করল, বিনতাকে যদি দাসী বানানো যায় তাহলে তার ছেলেদের দ্বারা বহু কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

সে সুযোগ খুঁজছে। তারপর একদিন সুযোগ এল। দেবতা ও অসুররা সমুদ্র মন্থন করছেন। বহুপ্রকার দ্রব্য তাতে উঠল, তার মধ্যে একটি সুন্দর অশ্বও উঠল। নাম তার উচ্চৈঃশ্রবা। কশ্যপের পত্নী অদিতির পুত্র ইন্দ্র, যিনি দেবরাজ, নিয়ে এলেন সেই অশ্বটি।

কদ্রু যুক্তি করে বিনতাকে ডেকে বলল, বলতো ইন্দ্রের ওই ঘোড়ার রং কি?

ঘোড়াটা অনেকটা দূরেই ছিল, বিনতা ভাল করে দেখে বলল—দুধের মত সাদা।

কদ্রু বলল, না, না তোর চোখ কানা, আমি তো ভালই দেখতে পাচ্ছি, ঘোড়াটা কালো। আমার মনে হয় তুই চোখের মাথা খেয়েছিস। কালোকে সাদা দেখছিস।

কদ্রুর কথায় বিনতা অবাক হয়ে বলল– না, দিদি, আমি বেশ ভালই দেখতে পাচ্ছি, ঘোড়াটা সাদা। তখন কদ্রু রেগে গিয়ে বলল– আচ্ছা বাজি ধর। যদি ঘোড়াটা সাদা হয় আমি তোর দাসী হব। আর যদি কালো হয়, তুই আমার দাসী হবি।

বিনতার ইচ্ছা নেই ঝগড়া করতে, তবু সতীনের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হল বাজি ধরতে।

এবার কদ্রু গোপনে তার ছেলেদের ডেকে বলল, তোরা সকলে শোন আমার কথা। আমি একটা বাজি ধরেছি। ইন্দ্রের উচ্চৈশ্রবা ঘোড়াটাকে কালো করে দিতে হবে।

সাপেরা বলল- কেন মা? এমন করলে কি হবে?

কদ্রু তখন সব ব্যাপার খুলে বলল।

সাপেরা বলল–না মা, এ অন্যায়। অন্যায় করবে তুমি আর দোষী হবে গরুড়ের মা, এমন করা উচিত নয়।

ছেলেদের কথায় কদ্রু খুব রেগে গিয়ে বলল– আমার আদেশ যে পালন করবি না, সে হবে বিষহীন। নিজেদের ছেলেদের ধরে ধরে খাবি, যে আমার হুকুম অমান্য করবে তাকে গরুড়ে খাবে। এই কথা শুনে সাপেদের বড় ভয় হল। সাপেরা বাধ্য হয়েই বলল– বল মা, আমাদের এখন কি করতে হবে?

কদ্রু বলল, এই ঘোড়ার সর্বাঙ্গ তোরা ঢেকে রাখবি। তোদের রঙ কালো, দূর থেকে ঘোড়াটা কালো দেখাবে। আমি বাজি জিতে যাব। বিনতা আমার দাসী হবে।

অগত্যা সাপেরা মায়ের কথামত তেমনি করল। কদ্রু বিনতাকে ডেকে বলল- দেখ, ঘোড়া কালো না সাদা।

বিনতা দেখল সত্য সত্যই ঘোড়া কালো। অবাক হল, কিন্তু বাজির কথামত তাকে কদ্রুর দাসী হতে হল। মনের আনন্দে কদ্রু নানা কাজের হুকুম করে, বিনতা সব আদেশ পালন করে।

একদিন কদ্রু তার ছেলেদের নিয়ে বিনতার পিঠে বহু দুর দেশে যেতে বলল, বিনতা বহু কষ্টে উড়তে লাগল, যত উপরে উঠে সুর্যের তাপ তত লাগে।

বিনতাকে কদ্রু বলল– গরম সহ্য করতে পারছি না, কোনো ঠান্ডা জায়গায় নিয়ে চল। কিন্তু বিনতা তখন মহাসাগরের উপরে ঠান্ডা জায়গা পাবে কোথায়? সাপেরা আর যাই হোক নিজের বোনপো তো বটে। তাদের সুখের জন্য বিনতা তখন সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা জানালো যাতে তাপ কম হয়।

তখন কোথা থেকে এক বিশাল মেঘ এসে সূর্যকে আড়াল করল। তাপ কমে গেল, সবাই স্বস্তি পেল।

বিনতা এভাবে রোজ রোজ বহু কষ্ট সয়ে যাচ্ছে। মুখে কিছু বলতে পারছে না। মনিবের আদেশ মানতে বাধ্য। একদিন গরুড় মা বিনতার কাছে জানতে চাইল, কেন সে কদ্রু আর তার ছেলেদের নিয়ে এত কষ্ট করে ঘুরে বেড়ায়।

বিনতা তখন সেই বাজির কথা বলল। গরুড় বলল, মা এর কি কোন প্রতিকার নেই? তুমি জিজ্ঞাসা কর, কি পেলে ওরা তোমাকে দাসীত্ব থেকে মুক্তি দেবে।

তখন বিনতা একদিন কদ্রুকে বলল। কদ্রু তার ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করে বলল– একটি মাত্র শর্তে দাসীত্ব হতে মুক্ত হতে পারবে। সেটা হল– স্বর্গ থেকে অমৃত এনে দিতে হবে।

বিনতা বুঝল তাকে সারাজীবন দাসীরূপেই থাকতে হবে। কারণ স্বর্গ থেকে অমৃত আনা সে কি এখনও সম্ভব হতে পারে? এ তো অসম্ভব ব্যাপার, দেবতারা কত কষ্টে অমৃত পেয়েছে, অসুরদেরকে তার ভাগ দেয়নি, যা খেলে মৃত্যু হবে না। সেই দুর্লভ অমৃতকে তো যেখানে সেখানে রাখবে না। কত যত্ন কত পাহারার মধ্যে রেখেছে, কার সাধ্য সেই সুধায় হাত দেয়।

দুঃখে শুধু চোখের জলের ভাসে বিনতা, গরুড় জিজ্ঞাসা করে, কেন কাঁদছ মা? তোমার দাসীত্ব মোচনের কি কোনো উপায় নেই?

বিনতা কাঁদতে কাঁদতে বলল– আছে বাবা কিন্তু তা অসম্ভব।

গরুড় বলল, কি এমন কাজ যা আমি পারব না, তুমি বল মা, আমি নিশ্চয় পারব।

বিনতা বলল, অমৃতের কথা। গরুড় শুনে বলল মা তুমি চিন্তা করো না, আমাকে আশীর্বাদ কর। আমি নিশ্চয় অমৃত এনে তোমার দাসত্ব মোচন করব।

এই বলে গরুড় মায়ের পায়ে প্রণাম করে দুটো বিশাল ডানা মেলে দেবলোকের দিকে উড়ল।

দেবতারা বুঝতে পারলেন, গরুড় আসছে অমৃত কলসের জন্য। যেমন করেই হোক তাকে রুখতেই হবে। প্রত্যেকেই যে যার অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এক জায়গায় সবাই মিলিত হলেন। গরুড়কে কিছুতেই স্বর্গলোকে প্রবেশ করতেই দেব না। মহা বলবান দানবেরা যা পারল না, তা কিনা একটা পাখি চায়? তা কখনই সম্ভব নয়। প্রত্যেককেই শক্তি দিয়েই রুখে দাঁড়াতে হবে।

গরুড় উড়তে উড়তে আসছে, তাই দেখে দেবতারা যে যার অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়তে লাগলেন, আর গরুড়ের কেবলমাত্র সম্বল দুটো বিশাল ডানা। সেই ডানা দুটো দিয়েই রক্ষা করতে লাগল নিজেকে। মাকে স্মরণ করে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে গেল গরুড়। আর ক্রমশঃ পিছোতে লাগলেন

দেবতারা, গরুড়ের ডানার ঝাঁপটায় দেবতাদের সব অস্ত্র ব্যর্থ হতে লাগল। অগত্যা দেবতারা রণে ভঙ্গ দিলেন।

.

দেবলোকে পৌঁছল গরুড়, যে ঘরে অমৃতের কলস আছে, সেখানে গিয়ে দেখল– দুজন ড্রাগন কলসটিকে রক্ষা করছে, তাদের চোখমুখ দিয়ে আগুনের ঝলকা বেরোচ্ছে। আর তাদের বাইরে ঘুরছে। এক ধারালো চক্র। যে কেউ সেখানে যাবে, তো সঙ্গে সঙ্গেই ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে যাবে। শুধু তাই নয়, তার বাইরে রাখা আছে এক জ্বলন্ত মালা। তারও বাইরে রয়েছে মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্রধারী যক্ষের দল। কারও সাধ্য নেই সেই অমৃতের কাছে যেতে। তাহলে এখন উপায়।

মনে মনে মাকে স্মরণ করে এগিয়ে গেল। তাই দেখে যক্ষের দল আক্রমণ করল তাকে যার কাছে সমস্ত, দেবতাদের মিলিত শক্তি ব্যর্থ সেখানে যক্ষের দল আর কি করবে? অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদেরকে নিরস্ত্র করে গরুড় এগিয়ে গেল। জ্বলন্ত মালাকে দুই বিশাল পক্ষ চাপা দিয়ে তারপর কৌশলে ঘুরন্ত চক্রটিকে নিষ্ক্রিয় করে ড্রাগনদের চোখে ধুলো দিয়ে অমৃতের কলস নিয়ে বেরিয়ে এল।

গরুড়ের শক্তি আর বুদ্ধি দেখে দেবতারা অবাক। স্বর্গলোক থেকে অমৃতের কলস চলে যাবে মর্তে। সবাই চললেন বিষ্ণুর কাছে। তারপর তাকে নিয়ে আবার সকলেই আক্রমণ করলেন গরুড়কে। গরুড়ের একটাই অস্ত্র আছে তা হল তার মায়ের আশীর্বাদ। তাই মাকে স্মরণ করে। ডানা দুটো দিয়ে। তাদের আক্রমণ থামাবার চেষ্টা করল। কিন্তু মাতৃভক্ত গরুড়ের কাছে সব অস্ত্র ব্যর্থ হতে লাগল। স্বয়ং বিষ্ণু পরাজিত হলেন। এখন উপায়? স্বর্গের অমৃত চলে যাবে মর্ত্যে?

তখন সকল দেবতা বিষ্ণুকে পাঠিয়ে দিলেন গরুড়ের কাছে। একটা কিছু বিহিত করবার জন্য একটা আপোস না করলেই নয়। সাপেরা যদি অমৃত খেয়ে শক্তিশালী হয়, তাহলে স্বর্গকে তছনছ করে ছাড়বে। তাই বিষ্ণু এগিয়ে গেলেন গরুড়ের কাছে। যুদ্ধ থেমে গেল।

বিষ্ণু বললেন, গরুড় তুমি একটি পাখি হয়ে কেবল ডানার সাহায্যে বীরত্বের সঙ্গে সব দেবতাদের জয় করলে, এতে আমি তাই সন্তুষ্ট, তাই আমি তোমাকে বর দিতে চাই, বল কি বর চাই তোমার? বিষ্ণুর কথা শুনে গরুড় বলল, হে বিষ্ণু, আমিও তোমার বীরত্ব দেখে খুব খুশি। আমি তোমাকে দুটো বর দিতে চাই, বল তোমার কী চাই।

চতুর বিষ্ণু বললেন– গরুড়, আমার প্রার্থনা তুমি আমার বাহন হও।

গরুড় বিষ্ণুকে জানত, সকল দেবতার অধিপতি তিনি। কাজেই তার বাহন হওয়া ভাগ্যের ব্যাপার, তাই সে রাজী হয়ে গেল।

বিষ্ণু বললেন, গরুড়, তুমি অমৃতের কলস দেখিয়ে তোমার মাকে মুক্ত করে নাও, কিন্তু সাপেদের অমৃত খেতে দেওয়া যাবে না।

বিষ্ণুর কথায় গরুড় চিন্তা করে বলল– তাই হবে কিন্তু সাপেরা যাতে অমৃত খাওয়ার সাহস না পায়, সে ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।

বিষ্ণু গরুড়ের কথায় রাজী হলেন। গরুড় চলল অমৃতের কলস নিয়ে, সেটা রেখে দিল সমুদ্রের তীরে একটা বিশাল কলাবনের মধ্যে। খবর দিল সাপেদের, তোমারা যা চেয়েছিলে সেই অমৃত আমি দেবলোক থেকে নিয়ে এসেছি। এখন তোমরা অমৃত খেয়ে অমর হও আর আমার মাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দাও।

কদ্রু ও তার ছেলেরা আনন্দে নেচে উঠল, তোমার মা মুক্ত, এই কথা বলে তারা কলসের দিকে যেতে লাগল।

গরুড় বলল– পবিত্র জিনিস পবিত্র হয়ে পান কর।

গরুড়ের কথায় সাপেরা ভাবল গরুড় কথাটা খারাপ বলেনি। তাহলে আগে সমুদ্রে স্নান করে আসি।

তারা স্নান করতে ছুটল। গরুড় মাকে পিঠে বসিয়ে উঠল আকাশে। বিষ্ণু সেই সুযোগে অমৃতের কলস নিয়ে সবার অলক্ষ্যে চলে গেলেন স্বর্গে।

এদিকে স্নান সেরে সাপের দল ছুটে এল অমৃতের কলসের কাছে, কিন্তু কলস কোথায়? দেখতে পাচ্ছি গরুড় আকাশে উঠে গেল, সে তো নিয়ে যায়নি তাহলে কে নিয়ে পালাল? হায় হায় করতে লাগল সকলে তাদের বহু আশা ছিল অমর হবে কিন্তু সে আসায় কে বাদ সাধল। যেখানে অমৃতের কলস ছিল, একটুকুও কি পড়ে যায়নি? দেখি চেটে; সকলে চাটতে লাগল কলাবন। কলাপাতার ধারে চিরে গেল তাদের জিভ, জোড়া আর কখনও লাগল না। আজও সকল সাপের তাই দুটো করে জিভ।

সূর্যের সংসার

দক্ষের কন্যা অদিতি, তাকে কশ্যপ বিয়ে করেন। অদিতির গর্ভে বারোজন পুত্রের জন্ম হয়, তাদের মধ্যে একজন সূর্য, তিনি বিবাহ করেন বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞাকে। সংজ্ঞার গর্ভে সূর্যের প্রথম পুত্র বৈবস্বত মনু। তারপরে জন্মাল যম, শেষে একটি কন্যা, নাম যমুনা।

সূর্যকে সংজ্ঞা বিয়ে করেছেন কিন্তু তিনি সূর্যের তেজ সহ্য করতে পারতেন না। দূরে দূরে থাকতেন।

কিন্তু কতক্ষণ দুরে থাকবেন একই গৃহবাসের মধ্যে? একদিন সংজ্ঞা চিন্তা করলেন আর এখানে নয়, স্বর্গের বাড়িতে গিয়ে থাকব, কিন্তু সূর্য কি রাজী হবেন? তিনি বড় বিপদে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন। কি করবেন? তারপর স্থির করলেন, অবিকল নিজের মত দেখতে এক নারী সৃষ্টি করে রেখে যাবেন সূর্যের কাছে। সূর্য তাকে দেখে আর সন্দেহ করবেন না।

তিনি নিজের মতো দেখতে আর এক নারীকে তৈরি করলেন। তার নাম দিলেন ছায়া। ছায়াকে বললেন– তুমি সূর্যের স্ত্রী হয়ে থাকবে। তোমার পরিচয় কখনও কাউকে বলবে না। ছায়া বলল– আমি নকল সংজ্ঞা, কখনও যদি ধরা পড়ে যাই শাপগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে সত্য প্রকাশ করব। এরপর সংজ্ঞা কোনো কথা না বলে, বাপের বাড়ি চলে যান বিশ্বকর্মার কাছে। বাবার পায়ে প্রণাম করে সংজ্ঞা বললেন– বাবা আমি তোমার জামাই-এর তেজ সহ্য করতে পারছি না। এতোদিন বহু কষ্টে সহ্য করেছি আর পারছি না। তাই তোমার ঘরে থাকব বলে চলে এলাম।

কন্যার কথা শুনে বিশ্বকর্মা তাকে ভর্ৎসনা করলেন–না সংজ্ঞা এটা তুমি ভালো করোনি। তুমি তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যাও।

তখন সংজ্ঞা চিন্তায় পড়লেন–স্ত্রীলোকের জীবন ধিক্! নারী জন্মই বৃথা! প্রথম জীবনে পিতার আশ্রিত, দ্বিতীয় জীবনে স্বামীর আশ্রিত, আর তৃতীয় জীবনে পুত্রের আশ্রিত হতে হয়। এখন আমি কি করি? যেতে পারব না সেখানে, আমার স্বর্ণা ছায়াকে রেখে এসেছি। গেলেই ধরা পড়তে হবে। আর সেই ছায়া ছাড়বে কেন? এখানে থাকলেও রোজ রোজ পিতার ভর্ৎসনা শুনতে হবে, তাহলে এখন আমার মঙ্গল হবে কেমন করে?

অতএব সংজ্ঞা তপস্যা করবেন বলে ঠিক করলেন, তিনি বরফের রূপ ধরে উত্তর মেরুতে গেলেন। সেখানে সর্বলোকের অজ্ঞানতা দূর করবেন। স্বামীর তেজ সহ্য করবার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র লতাপাতা খেয়ে কঠোর তপস্যা করতে শুরু করলেন।

সূর্যেদেব ছায়াকেই পত্নী মনে করলেন। ছায়ার গর্ভে শনি নামে পুত্র ও তপতী নামে কন্যাকে সৃষ্টি করেন।

এখন ছায়া সংজ্ঞার তিন ছেলে মেয়ে ও নিজের তিন ছেলে মেয়ে মোট ছয় জনকেই দেখাশোনা করছেন। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই নিজের সন্তানদের বেশি স্নেহ করেন। বৈবস্বত মায়ের আচরণ সহ্য করে নিতেন।

কিন্তু যম, খাদ্য সামগ্রী, অলংকারাদি আর লালন পালনাদি ব্যাপারে উত্তম শনি ও তপতীর প্রতি মায়ের বেশ অনুরাগ দেখে সহ্য করতে না পেরে বাল্যাবস্থায় ক্রোধবশে পা তুলে মায়ের প্রতি তর্জন করতে থাকেন।

তখন ছায়া যমকে শাপ দেয়, ওহে তুমি আমাকে আঘাত করবার জন্য যে পা তুলেছিলে, সেই পা তোমার খসে পড়বে।

শাপ শুনে যমের ভয় হল। ছুটে গেলেন বাবার কাছে, বললেন–বাবা মা আমাকে শাপ দিয়েছেন, মা তো সব ছেলেমেয়েকে সমান চোখে দেখবেন। কিন্তু তিনি তা না করে উত্তম শনি ও তপতীর প্রতি বেশি স্নেহ দেখান। তাই আমি রেগে গিয়ে পা তুলেছিলাম, পদাঘাত করিনি। তাতেই মা শাপ দিলেন। বাবা মায়ের শাপে আমার পা যাতে খসে না পড়ে ব্যবস্থা করুন।

সূর্য বললেন, ছেলে অপরাধ করলেও মা কখনো পুত্রকে শাপ দেন না। আমার মনে হয় তিনি যে তোমাকে শাপ দিয়েছেন, নিশ্চয় তার কোন কারণ থাকবে। কৃমিতে দংশন করবে তোমার ওই। পায়ে। সে জন্য পুঁজ হবে।

তারপর সূর্য অন্তঃপুরে পত্নীকে বললেন– হে ভামিনি, পুত্রেরা সকলেই সমান, তবুও তোমার স্নেহ কনিষ্ঠদের প্রতি বেশি কেন?

ছায়া কোন উত্তর দিলেন না, তখন সূর্য ধ্যানযোগে সবকিছু জেনে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন, তখন ছায়া সব কথা তাকে জানান।

ছায়া সত্য বলায় সূর্য তাকে অভিশাপ দিলেন না, ক্রোধ ভরে সংজ্ঞার সঙ্গে দেখা করতে বিশ্বকর্মার বাড়িতে গেলেন। সূর্যকে বিশ্বকর্মা নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেন–হে সূর্য, তোমার তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা উত্তর মেরুতে অশ্বিনী রূপে তপস্যা করছে। তার উদ্দেশ্য যাতে তোমার তেজ সে সহ্য করতে পারে। তারপর বিশ্বকর্মা সূর্যের অনুমতিক্রমে তাকে বুকে জড়িয়ে চেপে দিলেন, তাতে সূর্যের তেজ কম হল।

সূর্য উত্তর কুমেরুতে গিয়ে তপস্যারত এক ঘোটকীকে দেখতে পেলেন। সংজ্ঞাই ঘোটকী তা চিনতে পারলেন সূর্য, তখন তিনি এক সুন্দর ঘোটকের রূপ ধরে তার সঙ্গে সুখে সঙ্গম করলেন। অশ্বিনীরূপিণী সংজ্ঞা পরপুরুষের সঙ্গে মিলন জনিত পাপের আশঙ্কায় যেই সূর্যবীর্য নাসার দ্বারা বমন করলেন। তাতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হল। পরে এই অশ্বিনীকুমার দুজন স্বর্গবৈদ্য রূপে খ্যাতি লাভ করেন।

সংজ্ঞাকে তার নিজস্ব রূপে দেখতে পেয়ে সূর্য তখন আপন রূপে প্রকাশিত হলেন। সংজ্ঞা তখন সূর্যের কমনীয় রূপ দেখে আনন্দিত হলেন।

সুদর্শনের বেতালত্ব মোচন

পূর্বে গালব নামে এক মহর্ষি ছিলেন, সত্যবাদী, শুচিব্রত ব্রহ্মধ্যান যুক্ত মহর্ষি নিজের আশ্রমে বসেই তপঃসাধনা করতেন। তাঁর কন্যা কান্তমতী মহারূপবতী। সে বাবার কাছে থাকত, বাবার কাজে সে সাহায্য করত। ফুল তোলা, বেদীর মার্জনা, হোমের কাঠ সংগ্রহ করত, বাবার সেবাও করত।

একদিন কান্তমতী ফুল তুলতে বনে গেল। ফুল তুলে সে বাড়ি ফেরার সময় সুদর্শন আর সুকর্ণ নামে দুজন বিদ্যাধর কুমার বিমান থেকে সেই কান্তমতাঁকে দেখতে পেলেন।

তাঁরা মনে ভাবলেন, মদনের স্ত্রী রতির মতো সুন্দরী এই কন্যা দেখতে। সুদর্শন তাকে দেখে বিমান থেকে নেমে জিজ্ঞেস করল, তুমি কার কন্যা? তোমার রূপ দেখে আমি মোহিত হয়েছি। তোমাকে রতির মত দেখে কামানলে দগ্ধ হয়েছি। আমি সুকুণ্ঠ। বিদ্যাধরপতির পুত্র, নাম সুদর্শন। তুমি যদি আমাকে পতিরূপে গ্রহণ কর, তাহলে তুমি সকল ভোগই পাবে।

কান্তমতী বলল– আমি মহর্ষি গালবের কন্যা, পিতাকে সাহায্য করার জন্য আমি ফুল তুলতে এসেছিলাম, এখন সময় হয়ে গেছে। যদি আমি যেতে দেরি করি তাতে পূজার সময় অতীত হয়ে যাবে। তাতে আমার প্রতি পিতা কুপিত হবেন। কাজেই আমি এখনই ফিরে যাব। বর্তমানে আমি কুমারী, পিতার অধীন। যদি আমাকে একান্তই কামনা করেন, তাহলে আমার পিতার কাছে গিয়ে আমাকে প্রার্থনা করুন।

এই কথা বলে কান্তমতী আশ্রমের দিকে চলল, তখন সুদর্শন কামতাড়িত হয়ে পেছনে থেকে ছুটে এসে তার এলোকেশ ধরে টানলেন।

মুনিকন্যা কাঁদতে লাগল, — হে পিতা, এই বিদ্যাধরের পুত্রের হাত হতে আমাকে রক্ষা কর, এই দুরাত্মা আমাকে ধরেছে।

গন্ধমাদন পর্বতবাসী মুনিগণ মুনিকন্যার কান্না শুনে গালবকে জানালেন, তারপর সকলেই সেই কন্যার কাছে এলেন। দেখলেন কান্তমতীর হাত ধরে এক যুবক আর তার কিছুদূরে আর এক যুবক দাঁড়িয়ে আছেন। তখন মহর্ষি গালব কুপিত হয়ে বললেন– হে বিদ্যাধরাধম, তুই যখন এমন কুকর্ম করেছিস, তখন তুই মনুষ্যজন্ম লাভ করবি, তারপর বেতাল ভাব ধরে রক্ত মাংসাদি খাবি। রাক্ষস প্রায় বেতালমন সকলে নারীগণকে গ্রহণ করে, তুই তেমন বেতালবৎ

বাধ্য করেছিস, তাই তুই মানুষ হয়ে পরে বেতালত্ব লাভ করবি। আর তোর সঙ্গের এই যুবক তোকে যখন পাপ কর্ম করতে নিষেধ করেনি, একেও মানুষ জন্ম লাভ করতে হবে, তবে এর দ্বারা দুষ্কর্ম হয় নি। তাই একে বেতাল জন্ম নিতে হবে না।

দুই বিদ্যাধর কুমারকে অভিশাপ দিয়ে মহর্ষি কন্যাকে নিয়ে নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন। মুনির শাপ শুনে সুদর্শন ও সুকর্ণ অতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়লেন, এবং তাঁরা তাঁদের কর্তব্য স্থির করে যমুনা তীরে বসবাসকারী গোবিন্দস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিলেন। তাঁদের নাম হল বিজয় ও অশোক, ক্রমে ক্রমে তাঁরা যৌবন লাভ করলেন।

সেই সময় স্থানটিতে সারাবছর ধরে অনাবৃষ্টি চলে, এর ফলে দূর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন গোবিন্দস্বামী পত্নী ও পুত্রদের নিয়ে কাশীধামে গেলেন। পথে প্রয়াগে তারা এক সন্ন্যাসীকে দেখে প্রণাম করলেন। তখন সেই সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে আশীর্বাদ করে বললেন– হে ব্রাহ্মণ, তোমার এই জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়ের সঙ্গে তোমার বিয়োগ হবে।

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর কথায় খুব দুঃখ পেলেন। সন্ধ্যাকালে সান্ধ্যপসানাদি করলেন। তারপরে রাত্রিতে এক শূন্য দেবালয়ে শুয়ে থাকলেন। গোবিন্দস্বামীর স্ত্রী আর তার ছোট পুত্র অশোক পথশ্রমের জন্য মাটিতে একটা কাপড় বিছিয়েই তাঁরা শুয়ে পড়লেন। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন। বিজয়কে । গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে তার শীত দূর করার চেষ্টা করল তারা, কিন্তু বিজয় সুস্থবোধ করলেন না।

বিজয় তার বাবাকে জানান তার খুব শীত করছে। তার জন্য একটু আগুনের ব্যবস্থা করতে। তাই নিকটবর্তী গ্রামে গিয়ে গোবিন্দস্বামী আগুনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পেলেন না। শেষ পর্যন্ত ফিরে এসে পুত্রকে বললেন, আমি অনেক বাড়িতে গিয়েছিলাম কিন্তু এতো রাত্রিতে কেউ দরজা খুলল না।

বিজয় পিতার কথা শুনে বললেন– বাবা তুমি মিথ্যা কথা বলছ, ওই তো সমানে এক ভীষণ অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছে। ওখান থেকে তুমি আমার জন্য আগুন এনে দাও, এই ভীষণ শীত আমি সহ্য করতে পারছি না। গোবিন্দস্বামী পুত্রের কথা শুনে বললেন– বিজয় আমি মিথ্যা বলছি না। তুমি যে আগুন দেখতে পাচ্ছ সেটা মড়াপোড়ানোর আগুন, ওই চিতা থেকে আগুন নিলে আয়ুঃক্ষয় হয়, আমি সেই ভয়ে ওখান থেকে আগুন নিই নি।

বিজয় বললেন– ওই আগুন চিতার হোক বা যজ্ঞের তোক আমাকে বাঁচাবার জন্য তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন, আগুন ছাড়া আমি বাঁচব না।

গোবিন্দস্বামী কোন উপায় না দেখে ওই চিতার আগুন আনতে চললেন। বিজয়ও সঙ্গে গেলেন। চিতার কাছে গিয়ে বিজয় সেই চিতাকে আলিঙ্গন করতে গেলেন, কিন্তু সহসা কি এক কথা ভেবে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর বাবাকে বললেন–বাবা, এই আগুনের মধ্যে রক্তের কি একটা জিনিস খুব উজ্জ্বল ভাবে জ্বলছে।

বস্তুটি গোবিন্দস্বামী ভালোভাবে দেখে বললেন–ওটা একটা মানুষের মাথা, রক্ত মাংসে ভরা।

তখন বিজয় একটা কাঠ নিয়ে সেই নরকঙ্কালের উপর আঘাত করলেন, তখন সেই নরকঙ্কালের মাথাটি ফেটে গিয়ে তার থেকে রক্ত ছিটকে এসে বিজয়ের মুখে পড়ল। বিজয় সেই রক্ত জিভ দিয়ে চাটতে লাগলেন। তখন সে অতি ভয়ঙ্কর বিরাট আকার ধারণ করলেন। সেই রাত্রিতেই তাঁর দুটো দাঁত মুখের বাইরে বেরিয়ে এল। তিনি পিশাচ হয়ে গেলেন, তখন ভয়ঙ্কর শব্দে হাসতে লাগলেন। তারপর সে তার নিজের পিতাকেই আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন।

ঠিক সেই সময় আকাশবাণী হল–ওরে বেতাল তুই এমন কাজ করিস না।

তখন সেই বেতালরূপী বিজয় বাপকে ছেড়ে দেয়। এবং তারপরে আকাশ পথে চলে যায়। সেখানে গিয়ে অন্যান্য বেতালের সঙ্গে মিলিত হয়। নরকপাল ফাটিয়েই পিশাচ হয়েছিল বলে, সবাই তার নাম দিল কপালস্ফোটন। তারপরে অন্যান্য পিশাচরা তাকে নিশাপতি নরাস্থিভূষণের কাছে নিয়ে যায়। তাকে সেনাপতি পদে বরণ করে নেয়। একদিন এক যুদ্ধে গন্ধর্ব চিত্রসেন নরাস্থিভূষণকে বিনাশ করে। তখন পিশাচপতি হলেন কপালস্ফোটন।

এইভাবে বিদ্যাধরের পুত্র সুদর্শন মহর্ষি গালবের শাপে প্রথমে মনুষ্য জন্মলাভ করার পরে পিশাচত্ব লাভ করলেন।

দেবালয়ে ফিরে এসে গোবিন্দস্বামী তার স্ত্রী ও কনিষ্ঠ পুত্রকে সব কথা বললেন। এই ঘটনা শুনে সকলে কাঁদতে লাগলেন। তাদেরকে এভাবে কাঁদতে দেখে সমুদ্র দত্ত নামে এক বণিক তাদেরকে নিয়ে গেলেন এবং আশ্রয় দিলেন।

গোবিন্দস্বামীর কনিষ্ঠ পুত্র অশোক দত্ত নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠল। এবং বীর নামে খ্যাতি লাভ করল।

একদিন কাশিধামের অধিপতি প্রতাপমুকুটের কাছে এক মল্লবীর রাজা এলেন। সেই মল্লবীরকে পরাজিত করবার জন্য দ্বিজপুত্র অশোককে ডাক দিলেন। বললেন– মল্লযুদ্ধে তোমাকে দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী মল্লবীরকে হারাতে হবে। যদি তুমি তাকে পরাজিত করতে পারো তাহলে তুমি আশানুরূপ পুরস্কার পাবে।

রাজার কথামত অশোক দাক্ষিণাত্যের সেই মহামল্লরাজকে ভীষণভাবে আক্রমণ করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মল্লরাজ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার দেহ থেকে প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল। যে দক্ষতার সঙ্গে দ্বিজপুত্র মল্লযুদ্ধে জয়লাভ করল, তা দেবতাদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। এতে রাজা প্রতাপমুকুট খুব খুশি হলেন। তিনি অশোককে বহু ধন ও বহু গ্রাম দিলেন। একদিন অশোকের সঙ্গে রাজা প্রতাপমুকুট ঘোড়ায় চড়ে নির্জন অরণ্যের মধ্যে বেড়াতে বেরিয়েছেন। পথে তাঁরা শুনলেন, কে যেন বলছে- হে রাজা, আমি অল্প অপরাধ করেছি। আমার এক শত্রুর ইচ্ছায় এক নিষ্ঠুর দণ্ডপাল আমাকে শুলে চড়িয়েছে। আজ চারদিন হয়ে গেল, আমি শূলের উপরে আছি। কিন্তু এখনো আমার প্রাণ বেরোচ্ছে না। আসলে দুষ্কৃতীকারীদের প্রাণ কখনই সুখে বের হয় না।

আমার এখন খুব তৃষ্ণা পেয়েছে। আপনি আমার তৃষ্ণা মেটান।

এই কথা শুনে রাজা অশোককে বললেন–শূলের ওপরে কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তি তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছে, তুমি তাকে জল দাও। অশোক একপাত্র জল নিয়ে সেই তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির কাছে গেল। গিয়ে দেখতে পেল এক নব যুবতী শূলের নীচে বসে আছে। সেই যুবতাঁকে দেখে অশোক জিজ্ঞাসা করল– তুমি কে? এখানে এই নির্জন শ্মশানে বসে আছো কেন? তখন নারীটি বলল- এই পুরুষটি আমার স্বামী। রাজা একে শূলে চড়িয়েছেন। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাব। তাই এখানে বসে ওর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি। আমরা স্বামী শূলের উপর ঘাড় তুলে জল চাচ্ছে। কিন্তু আমি নীচে থেকে জল খাওয়াতে পারছি না।

অশোক নারীর কথা শুনে বলল– তুমি আমার কাঁধে চড়ো, এবং তারপরে তোমার স্বামীকে জল খাওয়াও।

অশোক ঘাড় নীচে করল। তখন সেই নারী তার কাঁধে চড়ে বসল। অশোক দেখতে পেল নতুন রক্ত মাটিতে পড়ছে। অবাক হয়ে উপরদিকে চেয়ে দেখল সেই নারী শূলে চড়ে লোকটিকে খাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অশোক সেই নারীর নূপুর পরা পা দুটিকে দেখে চেপে ধরল। তখনই সেই নারী নূপুর ছেড়ে পালিয়ে গেল। তারপর অশোক সেই একখানি নূপুর নিয়ে রাজার কাছে এলো, এবং শ্মশানের সব কথা রাজাকে জানাল। সেই নূপুরটি রাজার হাতে তুলে দিল।

অশোকের বীরত্বব্যঞ্জক কাজ দেখে রাজা খুব খুশি হলেন। তিনি নিজ কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন। একদিন রাজা প্রতাপমুকুট সেই দিব্য নুপুর দেখে ভাবছেন এই নূপুরের আর একগাছি কোথায় পাওয়া যাবে? রাজাকে চিন্তিত দেখে অশোক ভাবল, এই নূপুরটি শ্মশানে যার কাজ থেকে পাওয়া গেছে, দ্বিতীয়টিও তার কাছে পাওয়া যেতে পারে। তখন সে ঠিক করল শ্মশানে গিয়ে মাংস বিতরণ করলে তা খেতে ভূত, নিশাচর, বেতাল সবাই আসবে। তখন সেই রাক্ষসীকে দেখতে পাওয়া যাবে। আর সে রাক্ষস, পিশাচ, বেতালদের বিন্দুমাত্র ভয় পাই না।

এই কথা স্থির করে সে প্রচুর মাংস নিয়ে শ্মশানে গেল। রাক্ষস, পিশাচ, বেতালদি আনন্দে সেখানে এসে মাংস খেল, অনেক রাক্ষস কন্যাও এল তাদের মায়েদের সঙ্গে। তাদের মধ্যে এক রাক্ষসীকে দেখে সে চিনতে পারল, এই সেই রাক্ষসী যে কাঁধে চড়ে মাংস খেয়েছিল, যার একটা নূপুর নিয়েছিল। অশোক তাকে দেখে বলল- হে রাক্ষসী, তোমার অপর নূপুরটিও আমাকে দাও। সেই রাক্ষসীটির নাম ছিল বিদ্যুৎ, সে অপর নূপুরটাও দিয়ে দিল। সেই সঙ্গে নিজের কন্যা বিদ্যুৎপ্রভাকেও দান করল, বিদ্যুৎপ্রভা ছিল অতীব সুন্দরী, তাকে লাভ করে অশোক খুব আনন্দিত হল। বিদুৎকেশী আপন জামাতাকে একটি স্বর্ণপদ্মও দেয়।

অশোক নূপুর এবং স্বর্ণপদ্ম এবং বিদ্যুৎপ্রভাকে নিয়ে রাজার কাছে এল। রাজা নূপুর পেয়ে উৎফুল্লিত হলেন। এবং অশোকের প্রশংসা করলেন।

অশোক একদিন নির্জনে বিদ্যুৎ প্রভাকে জিজ্ঞাসা করল– তোমার মা এই স্বর্ণপদ্ম কোথায় পেল? আমার ইচ্ছা করছে এমন অনেক পদ্ম আমি সংগ্রহ করি। বিদ্যুৎপ্রভা বলল– কপালস্ফোটন নামে এক বেতালপতি আছে। তার একটি সরোবর আছে। সেই সরোবরে সোনার কমল ফোটে। আমার মা সেই সরোবরে জলক্রীড়া করতে করতে ওই পদ্মটি তুলে এনেছে।

অশোক তার কথায় খুব আনন্দিত হল। সে বলল তুমি আমাকে ওখানে নিয়ে চল। তখন অশোককে বিদ্যুৎপ্রভা সেই কাঞ্চন সরোবরে নিয়ে গেল। অশোক সেই সোনার পদ্মফুল

তোলার চেষ্টা করল। তখন সেখানকার বেতালরা তাকে বাধা দিল। তখন অশোক অস্ত্র দিয়ে তাদের সবাইকে বিনাশ করল। তারপর সেখানে এল বেতালপতি কপালস্ফোটন, তাকেও মারার জন্য অশোক উদ্যত হল, তখন আকাশবাণী হল- অশোক আকাশের দিকে তাকাল। সে দেখতে পেল বিমানের মধ্যে বিদ্যাধরপতি। তাঁকে দেখা মাত্রই অশোক শাপমুক্ত হল এবং সে মানুষের রূপ ছেড়ে দিব্যরূপ ধরল।

তখন সুকর্ণকে বিদ্যাধর নিজের বিমানে তুললেন। তাকে বললেন– সুকর্ণ, তোমার ভাই সুদর্শন মহর্ষি গালবের শাপে এই ভাবে বেতালরাজ হয়ে কাল যাপন করছে, আর তুমিও অপরাধের জন্য মানুষের ঘরে জন্মে ছিলে, কিন্তু সুদর্শন মুনি কন্যার কেশ ধরেছিল, তাই জন্য মুনিবর এর শাপমোচনের ব্যবস্থা করেননি। তাই চল আমরা স্বর্গে ফিরে যাই।

তখন সুকর্ণ বলল- না, আমি সুদর্শনকে ছেড়ে একা স্বর্গে সুখভোগ করতে চাই না। যেমন করেই হোক তাকে আমি উদ্ধার করে নিয়ে যাব। এখন আমাকে আপনি বলুন, কেমন করে ভাই-এর শাপমোচন হবে?

বিদ্যাধরপতি বললেন– এই মুনির শাপ কিন্তু দুর্নিবার। এ বিষয়ে বিশেষ কিছু আমি বলতে পারব না। এ কথা ব্রহ্মা পূর্বে ঘনকাদি মুনিগণকে বলেছিলেন। দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে চক্রতীর্থের কাছে এক মহৎ তীর্থ রয়েছে। সেই তীর্থ দর্শন করলে মহা পাপরাশি নষ্ট হয়। কিন্তু সেখানে স্নান করলে যে কত পুণ্য হয়, তা আমার জানা নেই। সুকর্ণ, তুমি যদি সুদর্শনকে ওই তীর্থে স্নান করাতে পার, তাহলে মহর্ষি গালবের শাপ নাশ হতে পারে।

সুকর্ণ তখন সেই বেতালপতি কপালস্ফোটনকে নিয়ে সেই তীর্থের জলে স্নান করাল, সঙ্গে সঙ্গে তার বেতালত্ব দূর হল এবং সে দিব্যরূপ লাভ করল। তারপর বিদ্যাধরপতি দুইপুত্রের সঙ্গে বিমানে চড়ে স্বর্গধামে চলে গেলেন। সেই তীর্থের নাম বেতালবরনদ তীর্থ।

পিঙ্গাক্ষ বনাম তারাক্ষ

বিন্ধ্য পর্বতে নিবন্ধ্যার নদীর তীরে গভীর অরণ্য ছিল। সেখানে শবরদের বাস ছিল। তাদের প্রধান জীবিকা ছিল শিকার। কিন্তু গভীর জঙ্গলের পথ ধরে কোন তীর্থ্যাত্রী কিংবা পথচারী গেলে তাদের সব লুটপাট করে নিয়ে পালাত। অনেক সময় তাদের প্রাণেও মেরে ফেলত।

এই শবররা এক সঙ্গে থাকত। তাদের মধ্যে পিঙ্গা নামে এক শবর ছিল ভয়ানক দুর্ধর্ষ। তার শক্তির কাছে কেউ এঁটে উঠতে পারত না। সেজন্য সকলে তার কথামত চলত।

একদিন সেই পিঙ্গাক্ষের মনে পরিবর্তন এল। লুঠতরাজ সে বন্ধ করে দিল। শিকার করতেও তার মন নেই। যদি মাঝে মাঝে শিকার করত তাও বেছে বেছে! সব পশুর ওপরে তার মায়া হতো। তারা নিরীহ সব জীব। কেমন মনের আনন্দে তারা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। তারা ও তাদের সন্তানদের আদর করে খাবার এনে খাওয়ায়। দুধ খাওয়ায়। কোন পশু হয়ত নদীতে জল খাচ্ছে তখন অন্য কোন ব্যাধ তাকে মরাবার চেষ্টা করলে পিঙ্গাক্ষ তাকে বাধা দেয়। বলে বেচারা তৃষ্ণার্ত জল খাচ্ছে, ওকে এই অবস্থায় মারা উচিত হবে না। কোন পশু হয়ত তার সন্তানকে স্তন দিচ্ছে। কেউ তাকে মারতে চাইলে তাকেও একই ভবে সে বাধা দিত। বলত দেখো কত সুন্দর দৃশ্য, বাচ্চাটা মায়ের কোলে বসে দুধ খাচ্ছে আর তার মা তাকে কত আদর করছে। আচ্ছা ওরা কি দোষ করেছে যে, আমরা ওদের মারব।

পিঙ্গাক্ষের এই পরিবর্তন দেখে সকল ব্যাধ অবাক হল। তারা বলে, এ আবার বলে কি? আমরা তো ব্যাধ। শিকার করা আমাদের পেশা। শিকার না করলে আমরা বাঁচব কেমন করে?

একদিন পিঙ্গাক্ষ সবাইকে ডেকে বলল– এই বন দিয়ে যত তীর্থযাত্রী কিংবা পথিক যাবে তাদের যেন কোন ক্ষতি না করা হয়, তারা যেন এখান দিয়ে নির্ভয়ে যেতে পারে। কেউ যদি আমার আদেশ না মানে তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে না।

পিঙ্গাক্ষের আদেশ শুনে সব ব্যাধ মুস্কিলে পড়ে গেল। সাহস করে কেউ তার প্রতিবাদ করতে পারল না। ব্যাধেরা আর আনন্দ করবার সুযোগ পেল না। তারা অন্যভাবে জীবনধারণ করার চেষ্টা করল।

তীর্থযাত্রীরা ধীরে ধীরে বুঝল ব্যাধরা আর নেই। তারা এখন ধার্মিক। অরণ্য অভ্যন্তরস্থ বনপথে আর কারো কোনো ভয় নেই। সবাই নির্ভয়ে চলতে লাগল। যদি কখনও কোন পশু

জন্তুদের দ্বারা বিপদ আসে, পিঙ্গাক্ষ ছুটে এসে তাদের বিপদমুক্ত করে দেয়। যাত্রীরা সন্তুষ্ট হলো। বেশির ভাগ ব্যাধ পিঙ্গাক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। তারা মানল না আর গোপনে তারা অন্য একটা দল গড়ল, সেই দলের নেতা হল তারা। সেই তারাক্ষ হল পিঙ্গক্ষের কাকা। ভাইপোকে সে কোনদিনই সহ্য করতে পারত না। সবাই তাকে মেনে চলত বলে। তাই এতোদিন সে চুপ করেছিলো। মনে মনে সে সবসময় ভাবত যেমন করেই হোক পিঙ্গাকে শেষ করে দিতে হবে।

তারা তাদের খুশিমতো পশু-পাখি শিকার করতে লাগল। কিন্তু তা যখন পিঙ্গাক্ষের নজরে আসত তখন সে ধমক দিত। তখন তারা একটু সাবধান হয়ে যেত। কিন্তু সেও যেই চলে যেত আবার যেই কে সেই।

একদিন এক শিবভক্ত তীর্থযাত্রীর দল কাশীধামে চলেছে, মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করে বাবা বিশ্বেশ্বরের পূজা দেওয়ার জন্য। তারা নির্বিন্ধ্য নদীর পাড় ধরে চলেছে। হঠাৎ তারাক্ষর দল তাদের উপর চড়াও হয়ে মারধর করতে লাগল। পিঙ্গাক্ষ অনেক দূরে ছিল কিন্তু তবু সে তাদের চিৎকার শুনতে পেয়েছিল। চিৎকার শুনে সে ছুটে এল। এসে দেখল তারাক্ষের দল তীর্থযাত্রীদের কাছে থেকে সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। মারধরও করেছে তাদের। পিঙ্গাক্ষ রেগে আগুন হয়ে গেল। গর্জন করে বলল– পিঙ্গাক্ষ এখনো মরেনি। যদি তোমরা ভাল চাও তো ওদের জিনিস ফিরিয়ে দাও। এবং বল যে আমরা আর এমন কাজ করব না। যদি না মানে তাহলে আমার হাত থেকে কেউ রক্ষা পাবে না।

পিঙ্গাক্ষের কথা শুনে তারাক্ষের দল ঘাবড়ে গেল। কিন্তু তারাক্ষ গর্জন করে বলতে লাগল, কে রে তুই? তোর কথা মানতে হবে। আমি এখানকার অধিপতি। আমরা যা ইচ্ছা তাই করব। তুই বলার কে? যদি ভাল চাস তো সরে পড়, তা না হলে তোকে আজ আমার হাতে প্রাণ হারাতে হবে। তারাক্ষের এই কথা শুনে পিঙ্গাক্ষ আরো আগুনের মতো জ্বলে উঠল। বলে আগে তোরা এই তীর্থযাত্রীদের জিনিসপত্র, টাকা-কড়ি ফিরিয়ে দে, তারপর আমি যাব। যদি না ফিরিয়ে দিস, তাহলে আমি জোর করে তোদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ওদেরকে দিয়ে দেব।

তারাও আর স্থির থাকতে পারল না। তার অনুচরদের আদেশ করল পিঙ্গাক্ষকে বিনাশ করতে। হুকুম পাওয়া মাত্র তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল পিঙ্গাক্ষের উপর। একদিকে পিঙ্গাক্ষ আর একদিকে তারাক্ষের দলের বহু লোক। তির ছোঁড়া শুরু হল। কিন্তু একা পিঙ্গাক্ষ কতক্ষণ লড়বে তাদের সঙ্গে। পিঙ্গাক্ষের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। তবু সে তীর্থ্যাত্রীদের আগলে রাখল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, পিঙ্গাক্ষ পিছু হটতে বাধ্য হল। সারা দেহ দিয়ে রক্ত ঝরছে। এদিকে পিঙ্গাক্ষের অস্ত্রে

ইতিমধ্যে তারাক্ষের দলের বেশ কয়েকজন মারা গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারাও আর এগোতে সাহস করল না।

রাত্রিতে পিঙ্গাক্ষের কুটিরে সব তীর্থযাত্রীরা থাকল। ভোর হতেই তারা আবার রওনা দিলেন কাশীর উদ্দেশ্যে।

পিঙ্গাক্ষ তখন প্রায় মৃত্যুশয্যায়। তখন সে মনে মনে ভাবছে আমি যদি সর্বশক্তিমান হতাম, তাহলে অধর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারতাম। পাপীদের শেষ করে দিতাম।

মরার সময় যে যেই ভাব নেয়, পরজন্মে সে সেই ভাব নিয়েই জন্মলাভ করে। শিবের প্রসাদে পিঙ্গা হল তাই। সেই ব্যাধ পিঙ্গাক্ষ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ অর্থাৎ নৈঋত কোণের অধিপতি হল পরজন্মে।

অনিচ্ছাকৃত শিবরাত্রি ব্রতের ফল

যজ্ঞদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মহাপণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাঁর বাস কাম্পিল্য নগরে। সকলের সঙ্গে রাজা তাকে খুব শ্রদ্ধা করত। খুশি হয়ে রাজা তাকে তার সভাপণ্ডিত করে দিলেন। যজ্ঞদত্তের এক পুত্র হল। তার নাম হল গুণনিধি। সে দেখতে সুন্দর। যথা সময়ে তার পিতা তাকে বিদ্যা অর্জনের জন্য পাঠালেন গুরুগৃহে। সে সকালে যায় বিকালে ফিরে আসে। যজ্ঞদত্ত রাজসভায় যান খুব সকালে, বাড়ি ফেরেন রাত্রিতে। তিনি যখন ফেরেন তখন ছেলে ঘুমিয়ে পড়ে। তাই সে ছেলেকে আদরও করতে পারে না কিংবা কথাও বলতে পারে না।

ধীরে ধীরে ছেলে বড় হল। সে বহু জ্ঞান অর্জন করে। কিন্তু তার সঙ্গী সাথীরা বড়ই খারাপ; বদ প্রকৃতির, তাদের কাজ হল জুয়া খেলা, নষ্টামী করা।

একদিন গুণনিধি তাদের সঙ্গে বসল জুয়া খেলতে, সর্বনাশা সেই খেলাতেই মজে যেতে লাগল সে। তার ফলে পড়াশোনা যা করেছিল অনভ্যাসের কারণে এবং অনুশীলনের অভাবে সব ভুলে যেতে লাগল। রাত দিন প্রায় সবসময়ই পড়ে থাকে জুয়ার আড্ডায়।

যজ্ঞদত্ত রাজসভায় যায় বলে সর্বদা সে তার ছেলের খোঁজ খবর নিতে পারে না। কেবল স্ত্রীর কাছে জেনে নেয়, ছেলে প্রত্যহ গুরুগৃহে যায় পড়তে। মন দিয়ে লেখাপড়া শিখছে এইটুকু শুনেই খুশি যজ্ঞদত্ত। ছেলে যে এদিকে জুয়াবাজ হয়েছে সে খবর তার মাও যানে না। আর বাবা জানবে কেমন করে।

গুণনিধি ধীরে ধীরে একজন বড় জুয়াড়ী হয়ে উঠল। জুয়া খেলতে হলে বাজি রাখতে হয়, তার জন্য টাকা পয়সা লাগে। তাই সে লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ির জিনিস নিয়ে যায়। একদিন সে মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেল। গুণনিধি স্বীকার করে নিল যে, জুয়াখেলার জন্য সে এইসব জিনিস নিয়ে যায়। পুত্র আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে গেছে জানতে পেরে মায়ের মাথায় যেন বজ্রপাত হল। তিনি বহু ভৎর্সনা করল ছেলেকে। কিন্তু ছেলের যা মতিগতি সে মায়ের কথা শুনবে কেন? সে বাড়ির গহনা নিয়ে চলল জুয়ার আড্ডায়। সে জিততে পারে না, শুধু হেরে যায়। যত হারে তত তার জেদ বাড়ে, ভাবে এর পরের খেলায় নিশ্চয়ই সে জিতবে।

ব্রাহ্মণী মুস্কিলে পড়লেন। তার একমাত্র ছেলে সে কিনা এমন জুখোর হল, স্বামীকে ভয়ে তিনি কিছু বলতে পারলেন না। যিদি তিনি রাগের বসে কিছু করে ফেলেন।

ব্রাহ্মণী মনে মনে ভাবল–যদি ছেলের বিয়ে দিই, তাহলে তার মতিগতি ফিরতে পারে। যজ্ঞদত্তকে সে ছেলের বিয়ের কথা বলল। তিনি রাজী হলেন। একটি সুন্দরী মেয়ে দেখে খুব ঘটা করে তিনি ছেলের বিয়ে দিলেন।

এতে করেও ছেলের স্বভাব বদলালো না। মায়ের মন আরও খারাপ হল। স্বামীকে বলবে বলবে করেও বলতে পারছে না।

একদিন রাজসভা থেকে যজ্ঞদত্ত বাড়ি ফিরছেন, তিনি দুরে দেখতে পেলেন দুই জুয়াড়িকে তারা কি যেন বলাবলি করছে। তিনি জুয়াখোরদের খুব ঘৃণা করতেন। তাই পথে তিনি জুয়াখোরদের দেখলে কিছু না বলে পাশ কাটিয়ে চলে যেতেন। সেদিনও পাশ কাটিয়ে যেতে যাবেন, হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন এক জুয়াড়ির হাতে একটা আংটি। তিনি সেই জুয়াড়িকে ডেকে বললেন–তোমার হাতে ওই আংটিটা দেখি। জুয়াড়ি হাত তুলে ধরল যজ্ঞদত্তের সামনে। যজ্ঞদত্ত চিনতে পারল– এ আংটিতে তাঁর নিজের। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন –কোথায় পেলি এটা?

জুয়াড়ি বলল- তোমার ছেলে জুয়ায় এটা হেরে গেছে। আমি এটা জিতেছি। জুয়াড়ির মুখে এমন কথা শুনে যজ্ঞদত্তের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। বললেন, আমার ছেলে গুণনিধি জুয়া খেলে?

জুয়ারি বলল– সে তো একজন মস্ত জুয়াখোর। কিন্তু আজ পর্যন্ত জিততে পারেনি। সব সময়ই হারে। কত দামী জিনিস যে হেরেছে তার সীমা নেই।

কোন কথা না বলেই যজ্ঞদত্ত চলে গেলেন নিজের ঘরে। পেটের খিদে ভুলেই গেলেন। ডাকলেন স্ত্রীকে, জিজ্ঞাসা করলেন –গুণনিধি কোথায়?

স্ত্রী বললেন– পড়তে গেছে। আর কিছু না বলে ব্রাহ্মণী ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন স্বামী ছেলের বিষয় জানতে পেরেছে। আজকেই তো বউ-এর গয়না খুলে নিতে গিয়ে এত ঝগড়াঝাটি। কেমন করে বলব ছেলের কাণ্ড, যজ্ঞদত্ত ছাড়ার পাত্র ছিলেন না।

আবার ডাকলেন। আমার কথাটা পুরো না শুনেই যে চলে গেলে ঘরের মধ্যে? বাইরে এসো বলছি, আমাদের বিয়ের সময় তোমাকে যে সোনার আংটিটা দিয়েছিলাম সেটা কোথায় রেখেছ? তাতে বহু দামী রত্ন বসানো ছিল।

ব্রাহ্মণী এবার বিপদে পড়ে গেলেন। বললেন– এখন আমার খিদে পেয়েছে। আগে খেয়ে নাও। তারপর ধীরেসুস্থে দেখাব। কোথায় রেখেছি খুঁজে দেখতে হবে।

ব্রাহ্মণ বললেন– তুমি কেন আমার কাছে লুকাচ্ছ? ঘরের জন্য আমি অনেক জিনিস এনেছিলাম। রাজকাজে ব্যস্ত থাকায় ওগুলোর খোঁজ নেওয়া হয়নি। তোমার কাছেই ছেলের খবর নিতাম। তোমার গুণনিধি যে সত্যিই গুণের নিধি হয়ে উঠেছে তা আমার কাছে গোপন করলে কেন?

ব্রাহ্মণী আর কী বললেন? তিনি ধরা পড়ে গেছেন স্বামীর কাছে। তিনি মাথা নিচু করে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। ব্রাহ্মণী তুমি আমাকে তো ভালোভাবেই চেনো, আমি মিথ্যাকে ভীষণ ভাবে ঘৃণা করি। অনাচার সহ্য করতে পারি না। আর তুমি আমাকে এতোদিন ধরে মিথ্যা কথা বলে আসছ। আমার বাড়িতেই এতোদিন ধরে অনাচার চলছে। তুমি সব জেনেশুনে এইসব প্রশ্রয় দিচ্ছ। ছেলেকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ব্রাহ্মণী চুপ করে থাকলেন। কেননা স্বামীতো ঠিক কথাই বলছেন। একটা মাত্র ছেলে কিছু বললে যদি সে কিছু অঘটন ঘটায় তাই তিনি স্বামীকে কিছু বলেনি। ফলে এখন তিনি স্বামীর কাছে মুখ তুলে কিছু বলতে পারলেন না।

ব্রাহ্মণী শোন আমার কথা। আজ থেকে ওই ছেলেকে আমি ত্যাগ করলাম। তুমি ওকে ঢুকতে দেবে না আমার গৃহে।

সন্ধ্যার সময় গুণনিধি ঘরে ফিরল। ব্রাহ্মণী স্বামীর কঠোর নির্দেশে তখন তাকে দূর করে দিল ঘর থেকে। সে যাবে কোথায়? কেউ তাকে আশ্রয় দিল না। সে পথে পথে ঘুরতে থাকে। ক্ষুধার জ্বালায় সে বুনো ফলমূল খায়। ভাবতে থাকে, হায় এ কি করলাম, মহাপণ্ডিতের ছেলে হয়ে শেষ পর্যন্ত জুয়াড়ি হলাম। বাড়ির দামি জিনিস সব জুয়ায় হারালাম। কিন্তু এখন আমি কোথায় যাই? কি করি? ক্ষুধায় কাতর হয়ে এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন আর সে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু সামনে কোন খাবার দেখতে পেল না। সে কি করবে ভাবছে? এমন সময় সে দেখতে পেল একজন ভক্ত নানা ধরনের নৈবেদ্য সাজিয়ে রাস্তা দিয়ে চলছে। সেই খাবার দেখে ক্ষুধার্থ গুণনিধি সেই লোকটির পিছু নিল।

সেদিন ছিল শিবরাত্রি, এক শিবভক্ত সেই সব নৈবেদ্য নিয়ে শিবালয়ে যাচ্ছিল। সে শিবের সামনে নৈবেদ্যর ডালা নিবেদন করল। গুণনিধি রাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল বাইরে, দেখল যে লোকটি শিবের পূজা করছে। নৈবেদ্যাদি নিবেদন করল শিবঠাকুকে। আরও অনেকে

এসেছে শিবের পূজা করতে, শিবরাত্রিতে সবাই মিলে নাচ-গান করল। গুণনিধি বাইরে দাঁড়িয়ে সব দেখল কিন্তু মাঝে মাঝে তার খিদের জ্বালা প্রবল হল, এতোই প্রবল হল যে সে সহ্য করতে পারল না।

প্রভাত হওয়ার পূর্বে সবাই ক্লান্ত হয়ে মন্দিরে একধারে সবাই ভূমিতলেই শুয়ে পড়ল। এই সুযোগে গুণনিধি ধীরে ধীরে মন্দিরে ঢুকল, এবং ঢুকেই নৈবেদ্যর থালা খুঁজতে লাগল। তখন টিম টিম করে প্রদীপ জ্বলছিল, তাই সবকিছু ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না। তখন সে প্রদীপের শিখা এগিয়ে দিতে উজ্জ্বল আলোতে ভরে গেল শিবালয়। সে নৈবেদ্যর থালা দেখতে পেল। তারপর থালাটা তুলে নিতে যাবে; তখনই এক ভক্তের গায়ে তার পা লাগল। সেই ভক্ত তখন জেগে উঠল। চোর, চোর বলে চিৎকার করতে শুরু করে দিল। সবাই উঠে পড়ল, এবং গুণনিধিকে সবাই মারতে লাগল। দিনের পর দিন অনাহারে থাকায় সে এমনিতেই দুর্বল ছিল। তারপর মার খেয়ে তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল। শিবরাত্রির দিন সে উপবাসে মরল। শিবালয়ে প্রদীপের বাতি উঁকিয়ে আলোর জ্যোতি পড়ল, অজ্ঞানতভাবেই তার ব্রত পালন করা হল। এতে তার সকল পাপ নষ্ট হল। শিবের দূতেরা এসে তাকে নিয়ে গেল শিবলোকে। কৈলাসে সে বহুদিন কাটালো। এর পর তার জন্ম হয় পৃথিবীতে কলিঙ্গ রাজার পুত্র রূপে। তারপর রাজার মৃত্যুর পর সে রাজা হল, এবং সে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগল ন্যায় নিষ্ঠাভাবে। রাজা হয়ে গেলেও সে শিবপূজা করতে ভোলেনি। সে নিত্য শিবপূজা না করে জলস্পর্শ করত না। যতদিন সে জীবিত ছিল ততদিন সে শিবাত্রির দিন উপবাস করত। নিত্য শিবালয়ে বাতি দিত। তারপর মৃত্যুর পর শিবের অনুগ্রহে অলকপুরীর রাজা হল সে, অজ্ঞানতঃ শিবরাত্রি ব্রত পালনের ফলে যদি এই ফল পাওয়া যায়, তাহলে জ্ঞানতঃ ভক্তিভরে যদি ঠিকমতো ব্রত পালন করা হয় তাহলে কি ফল হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

হরিকেশ কাশীর দণ্ডপানি

কাশীক্ষেত্র হলো মহাপুণ্যধাম। মহাদেব এখান থেকেই জগৎ শাসন করছেন। তার বহু অনুচর এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেন। তাঁদের মধ্যে সবার শ্রেষ্ঠ ছিলেন দণ্ডপানি। কাশীতে আগে দণ্ডপানির পূজা করা হয়। তারপরে বিশ্বেশ্বরের পূজা হয়। হরিকেশ বহু সাধনার পর এই দণ্ডপানিত্ব লাভ করেন। শিবের হয়েই তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন। তাই শিবপূজা করার আগে তাকে সম্মান জানান উচিত।

রত্নভদ্র নামে এক যক্ষ গন্ধমাদন পর্বতে বাস করতেন। তাঁর পুত্র পূর্ণভদ্র পিতার অবর্তমানে যক্ষরাজ হলেন। পূর্ণভদ্র যক্ষরাজ হওয়ার ফলে তার প্রচুর অর্থ হয়, ঐশ্বর্য হয় এবং তাঁর অসংখ্য স্ত্রীও হয়। তারা সবসময় পূর্ণভদ্রের সেবাতেই ব্যস্ত থাকে। তবু পূর্ণভদ্রের মনে শান্তি নেই। যাঁরা পুত্রহীন হন, তাঁদের দুঃখের সীমা থাকে না। একদিন যক্ষিণী কনককুণ্ডলাকে নিজের মনের দুঃখের কথা বললেন। তখন তিনি উপদেশ দেন কাশী গিয়ে শিবের উপাসনা করতে।

পূর্ণভদ্র খুব খুশি হলেন। কাশীতেও শুরু করলেন শিবপূজা, ধ্যান ও নাম জপ। বহুদিন পরে তুষ্ট শিব তাকে বর দিলেন। তাঁর পুত্রলাভ হবে। তখন মনের আনন্দে পূর্ণভদ্র বাড়ি ফিরে এলেন। যথাসময়ে এক পুত্র হল তাঁর। নাম রাখলেন তিনি হরিকেশ। হরিকেশ খুব আদরে বড় হতে থাকে। তার স্বভাব অন্য ছেলেদের মতো ছিল না। ছোটবেলায় সবাই খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু সে নির্জন জায়গায় চুপ করে বসে থাকে যেন সে কারোর চিন্তা করছে, কখনওবা সে মাটি দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরি করে তাতে ফুল-বেলপাতা দিয়ে পূজা করছে। ছেলের ব্যবহার দেখে বাবা-মাও খুশি হতে পারলেন না। তাঁদের মনে হল এত কষ্ট করে ছেলেকে পেলাম, ছেলে যদি বিবাগী হয়ে যায়? এই হরিকেশ আবার ঘুমতে ঘুমতে শিব নাম জপ করে।

পূর্ণভদ্র একদিন আদর করে ছেলেকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল—সবসময় 'শিব শিব' করিস কেন? এখন তো তুই ছোট, দেখ এই বয়সে তো পড়াশোনা করতে হয়। তারপর বিয়ে করে সংসারী হতে হয়। তারপরে তো ধর্মকর্ম করে। আমার কত ঐশ্বর্য তুমি জানো? এই সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী তুমিই। কাজেই এগুলো তুমি আগে ভোগ কর, তারপর না হয় ধর্মপথে যাবে। হরিকেশ পিতার কথায় কোন উত্তর দিল না। তার শিবভক্তি আরো বেড়ে চলল। একদিন পূর্ণভদ্র তাকে বকাবকি করলেন। সেই দিনেই রাত্রিবেলা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন, তখন হরিকেশ প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেল। পরের দিন সকালে বাড়ির লোকেরা

জানতে পারল। বহু লোকজন পাঠিয়ে তাকে খোঁজার চেষ্টা করা হল। কিন্তু লাভ হল না। মার আক্ষেপের শেষ থাকল না। যদি না বকতাম তাহলে হয়তো শিবভক্ত হয়ে সে ঘরেই থাকত। কিন্তু এখন দুঃখ করে কী হবে?

হরিকেশ ঘর ছেড়ে চলে এল বারাণসীতে। আনন্দকাননে বসে সে শিবের ধ্যান করে। শিব তখন পার্বতীকে নিয়ে এসেছেন আনন্দকাননে। সেই স্থানটি ছিল অতি মনোরম। মহাদেব পার্বতীকে সব ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছেন। হঠাই পার্বতীর চোখে পড়ল এক উই ঢিপি।

পার্বতী জিজ্ঞাসা করলেন –এই সুন্দর কাননে উই ঢিপি কেন?

শিব কোন উত্তর দিলেন না। এমন ভাব করলেন তিনি যেন পার্বতীর কথা শুনতেই পান নি। পার্বতী বুঝলেন নিশ্চয় এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। তাই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন – প্রভু, এখানে উই ঢিপি কেন?

শিব বললেন–আমার এক ভক্ত বাল্যকাল থেকে আমার ধ্যান করছে। তাই তার গায়ে উই টিপি হয়ে গেছে। পার্বতী অবাক হয়ে বললেন, বাল্যকাল থেকে তপস্যা করতে করতে তার গায়ে উই পোকা বাসা করেছে, সে নিশ্চয় কোন বরের জন্য এটা করেছে। তাহলে তুমি ওকে বর দিচ্ছো না কেন?

তখন শিব টিপিতে স্পর্শ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই ঢিপি উধাও হল। সেখানে থেকে এক সুন্দর যুবক উঠে এলো, সে সামনে হর-পার্বতীকে দেখে উৎফুল্ল হল। তাঁদের স্তবস্তুতি করল।

শিব তাকে বর দিলেন। বললেন– বাল্যকাল থেকে তুমি আমার তপস্যা করছ। তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। তাই তোমাকে এমন বর দেব যা আজ পর্যন্ত কাউকে দিইনি। কাশীধাম আমার খুব প্রিয় স্থান। সেই কাশীর শাসনভার তোমাকে দিলাম। এখানে আমার কোন অনুচর খারাপ কাজ করলে, অন্যায় করলে তুমি তাদের শাসন করবে। আমার প্রতিনিধিরূপে তুমি হলে কাশীর দণ্ডপানি।

এই তপস্যার ফলে হরিকেশ কাশীর দণ্ডপানি হয়ে বিশ্বেশ্বরের আগে পূজা পাচ্ছেন আজও।

প্রণবেশ্বরের সাধনার মুক্তি লাভ

দমন মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। নানা ধর্মগ্রন্থ পড়ে দমন জানতে পারল মায়ার সংসারে শান্তি নেই। তাই শান্তিলাভের জন্য বেরিয়ে পড়ল সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে। সে তীর্থে তীর্থে ঘুরতে লাগল। বেশ কিছুদিন তপস্যাও করল। সে কয়েকজন পণ্ডিতের কাছে অনেক উপদেশ পেল। কিন্তু হায় শান্তি কোথায়? ভাবতে লাগল শান্তিকে কিভাবে ধরব? শাস্ত্রের কথামত শান্তি নিশ্চয় আছে। যেমন করেই হোক তা লাভ করতে হবে। সে আবার তীর্থে তীর্থে ঘোরার জন্য বেরিয়ে পড়ল। একদিন পৌঁছে গেল অমরকন্টক তীর্থে। এক আচার্যকে ঘিরে সবাই বসে তার উপদেশ শুনছে। সবার গায়ে ভস্মমাখা, মাথায় জটা, তারা শিবভক্ত। যুবক দমন দূর থেকে আচার্যকে দেখে ভাবল ইনিই পারবেন তাকে শান্তির পথ দেখাতে। সেখানে ধীরে ধীরে তার কাছে গেল। এবং জোড়হাত করে তাঁকে প্রণাম জানাল। আমাকে এতক্ষণ গর্গাচার্য উপদেশ দিচ্ছিলেন শিষ্যদের। দমনকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন–কে তুমি বাবা? তোমার নাম কি? কি চাও তুমি? তোমাকে দেখে বিষণ্ণ মনে হচ্ছে।

দমন বলল– আমি ভরদ্বাজ মুনির ছেলে। প্রকৃত শান্তির সন্ধানে বেরিয়েছি, আজ পর্যন্ত অনেক তীর্থ ঘুরলাম, তপস্যা করলাম, কিন্তু শান্তি পেলাম না।

দমন আরো বলল– আমার মনে হচ্ছে, সংসারে মায়া না ছাড়লে শান্তি পাওয়া যায় না। আমার মুক্তিলাভের ইচ্ছা, তাই যদি আপনি সেই পথের নির্দেশ দেন। আচার্যদেব বললেন– দমন তুমি ঠিক কথা বলেছে। এত অল্প বয়সেই তুমি সংসারকে অসার বুঝেছ। সেজন্য আমি খুব খুশি হয়েছি, এই দেহের মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র মহেশ্বর। বারাণসী ধামে প্রণবেশ্বর লিঙ্গ নামে তিনি আছেন। মন প্রাণ দিয়ে সেই লিঙ্গের অর্চনা কর। তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

গর্গাচার্যের কথা শুনে দমনের মনে আশার আলো দেখা দিল।

আচার্য আবার বললেন– তোমাকে একটা আশ্চর্য কাহিনি বলি শোন। আচার্যরা স্বচক্ষে দেখেছে। প্রণবেশ্বর লিঙ্গের কাছে একটা ব্যাঙ থাকত। দিনেরবেলায় ভক্তরা শিবের পূজা করে যেত। তারা পূজা করত ফুল মালা আতপ চাল দিয়ে। তারা চলে যাওয়ার পর সেই ব্যাঙ এসে সেই সব খেত। এইভাবে সেই ব্যাঙটি একদিন মনের আনন্দে সেইসব খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। এমন সময় এক কাক এসে তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। এইভাবে ব্যাঙ গেল কাকের পেটে।

তারপর অনেকদিন কেটে গেল। একদিন এক সুন্দরী মেয়ে এল সেই প্রণবেশ্বর লিঙ্গের কাছে পূজা অর্চনার উদ্দেশ্যে। তার সব সুন্দর, মুখটা কেবল শকুনের মতো। ভাল নাচতে জানে সে, গাইতে পারে, কিন্তু মেয়েটির মুখ এমন হলো কেন? আচার্যরা ভাবতে লাগলেন। ধ্যানের দ্বারা জানতে পারলেন। এটা সেই ব্যাঙ, এক শিবভক্ত পুষ্পবন্ধুর কন্যারূপে সে জন্মেছে, নাম তার মাধবী। পূজার ফুল আর আতপ চাল খাওয়ার পাপে তার মুখটা হয়েছে শকুনের মত।

পূর্বজন্মের সংস্কার বশত শিবালয় মার্জনা করতে লাগল। আর নাচে-গানে শিবকে খুশি করত। প্রণবেশ্বর লিঙ্গই তার ধ্যান জ্ঞান। সব সময়ই শিবের নামগান গেয়ে শিবের পূজা করত। শিব-চতুর্দশী তিথিতে সারাদিন রাত উপবাসে থেকে লিঙ্গ পূজা করে নাচ-গানে কাটিয়ে দিল সারারাত। তারপর প্রভাতের আগেই সেই লিঙ্গ যেন হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আলোতে সবার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আচার্যগণ সকলেই চোখ বন্ধ করে দিলেন। তারপর চোখ খুলে কেউ মাধবীকে দেখতে পেলেন না।

পরবর্তী গর্গাচার্য এইভাবে একটা ব্যাঙ থেকে মাধবী ও তার জীবনের মুক্তিলাভের কাহিনি বর্ণনা করলেন। দমনকে বললেন– আমি বিশ্বাস করি, প্রণবেশ্বর শিব তোমার বাসনা পূর্ণ করবেন। তুমি বারাণসীতে গিয়ে সেই শিবলিঙ্গের উপাসনা কর। আমিও তোমার সঙ্গে যাব। তারপর তাঁরা দুজনেই চললেন বারাণসীর সেই প্রণবেশ্বর লিঙ্গের কাছে। লিঙ্গ দেখে দমন তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। তারপর গুরুদেব গর্গাচার্যের উপদেশ মতো সাধনা শুরু করল। অনেকদিন পর একদিন দমনও মাধবীর মত মুক্তি পেল।

অগস্ত্যযাত্রায় বিন্ধ্য পর্বতের সর্বনাশ

বিন্ধ্য পর্বত খুব বিশাল ও মনোরম। সেখানে নানা ধরনের বৃক্ষ, লতা ও মণিমানিক্যে ভরা। একদিন সেই পবর্তকে দেখতে গেলেন দেবর্ষি নারদ। তিনি দেখে খুব আনন্দিত হলেন।

বিন্ধ্যের মনে মনে খুব গর্ব। তার কারণ, তার মত সুন্দর পর্বত পৃথিবীতে নেই। এতো সম্পদ আর কোন পর্বতের নেই। কিন্তু পর্বতরাজ রূপে তার সম্মান নেই। এটাই তার একমাত্র দুঃখ।

এই প্রথম নারদের পদধূলি তার বুকে পড়ল। তাই বিন্ধ্য পর্বত খুব খুশি হল এবং দিব্যরূপ ধারণ করল। তারপর সে দেবর্ষিকে পূজ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করল। বসতে আসন দিল। তারপর বলল আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার পদধূলি আজ আমার বুকে পড়ল, সত্যিই ধন্য আমি। আপনি অন্ততঃ আমাকে পর্বতরাজরূপে সম্মান দিলেন। তাই আজ আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। এইভাবে বিন্ধ্যগিরি নিজেই নিজের প্রশংসা করে গেলেন। দেবর্ষি চুপ করে থাকলেন। আবার তিনি ভাবছেন এমন ঔদ্ধত্য সহ্যও করা যায় না। তাই তিনি হাসতে হাসতে বললেন– হে বিন্ধ্য, তুমি যা বলছ তা অনেকটাই ঠিক। হিমালয়, শ্রীশৈল, উদয়গিরি, মন্দার, হেমকূট, এরা মনে হয় না তোমার মতো হবে। আমার মনে হয় তোমার প্রতিদন্দ্বী হতে পারে একমাত্র সুমেরু।

বিন্ধ্য নারদ মুনির ইঙ্গিত বুঝতে পারল। সে বলল আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সুমেরু কোন দিক দিয়ে? সুমেরুর প্রচুর সোনা আছে। এবং তার উচ্চতাও অনেক বেশি। তাই নাকি ঋষিবর?

সেই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়েই চলে গেলেন দেবর্ষি।

দেবর্ষির কথা শুনে বিন্ধ্যের মাথা ঘুরতে লাগল। সুমেরু হবে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, তা আমি কখনই সহ্য করব না। যেমন করেই হোক, সুমেরুকে সরিয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠ হতেই হবে। কিন্তু কেমন করে? তারপর সে এই নিয়ে অনেক চিন্তা করতে লাগল। অনেক ভেবে সে স্থির করল পৃথিবীতে যত পর্বত আছে, সবার চেয়ে আমি মাথাটা উঁচু করে দাঁড়াব। এতে সূর্যের গতিপথ বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন চিন্তা সেই কাজ। সে তার মাথা উঁচু করল, আকাশে ঠেকল তার মাথা।

সূর্য প্রতিদিন পূর্বদিকে ওঠে আর সন্ধ্যার সময় পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। তার কাজ হল প্রতিদিন একবার সুমেরু পর্বতকে পরিক্রমা করা। নিত্য দিনের মতো সূর্য উঠল। কিন্তু পথ বন্ধ কেন? থমকে দাঁড়াল, সাত চাকার রথ থেমে গেল। সূর্য তার নিজের পথে যেতে পারছে না।

এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। যেখানে সূর্য দাঁড়ালেন সেখানকার সবই তাপে জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল। আর বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চিমদিকে রাত পোহাচ্ছে না। সূর্য না যাওয়ার কারণে অন্ধকার থেকেই যাচ্ছে। কাজেই বিপদে পড়ল সবাই। একদিকে সবসময় সূর্যের অসহ্য তাপ আর অন্যদিকে সব অন্ধকার। পশুপাখি থেকে আরম্ভ করে মানুষ পর্যন্ত সবাই ভয় পেয়ে গেল। স্বর্গলোক থেকে দেবতারা সব লক্ষ্য করলেন। মর্ত্যলোকে দিনরাত্রি হচ্ছে না, সূর্যের যাতায়াত বন্ধ, কিন্তু এখন উপায় কি?

এর একটা সমাধান বার করতে দেবতারা গেলেন ব্রহ্মার কাছে। জগতে কোথায় কি হচ্ছে সবই তার জানা। মুখ খুলে কিছু বলতে হল না। দেবতাদের দেখেই তিনি বললেন– এর সমাধান আমার কাছে নেই। তোমরা অগস্ত্য মুনির কাছে যাও। তিনি বিন্ধ্যের গুরু। তিনি যদি কোনো কৌশল করে বিন্ধ্যকে নিরস্ত করতে পারেন। দেবতারা ব্রহ্মাকে প্রণাম জানিয়ে কাশীতে ফিরে এলেন। দেবগুরু বৃহস্পতিকে অগ্রবর্তী করে চললেন অগস্ত্য মুনির আশ্রমে। মুনিবর তাঁর পত্নী লোপামুদ্রার সঙ্গে তপোবনে বসে আছেন। দেবতারা তাঁদের প্রণাম জানালেন। মুনিবর আনন্দে উঠে তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন–কি করতে হবে বলুন? আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনারা আমার আশ্রমে এসেছেন।

দেবতাদের প্রতিনিধি বৃহস্পতি বললেন– বিন্ধ্য পর্বতের কাণ্ড আপনার নিশ্চয় অজানা নেই, এখন সমগ্র পৃথিবীতে বিপদ, একমাত্র আপনিই এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। আপনিই এই বিন্ধ্যের দম্ভ ভাঙতে পারেন। এবং সৃষ্টিকে রক্ষা করতে পারেন।

কাশীধামের এমন সুন্দর আশ্রম ছেড়ে অন্য জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা নেই অগস্ত্য মুনির। কিন্তু দেবতারা অনুরোধ করছেন। আবার সৃষ্টিকে রক্ষা করার ব্যাপার! তাই না গেলেই নয়, তাই অগত্যা তিনি রাজী হলেন। দেবতারা তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

লোপামুদ্রাকে নিয়ে আকাশরথে চড়ে অগস্ত্য মুনি চললেন বিন্ধ্য পর্বতের কাছে। দূর থেকে মুনিবরকে দেখে বিন্ধ্য ভয়ে জড়সড়। মুনি খুব রাগী, তাই কি আদেশ করেন? কাছাকাছি আসতেই বিন্ধ্য মাথা নিচু করে প্রণাম জানাল। বলল গুরুদেব। আমি আপনার একজন সামান্য দাস। এই দাসের প্রতি এখন আপনার কি আজ্ঞা বলুন। বিন্ধ্য যেই মাথা নিচু করেছে, তখনই সূর্য যাওয়ার পথ পেয়ে যাওয়ায়, সাত ঘোড়ার রথ চালিয়ে চলে গেলেন। পৃথিবীতে আবার সব স্বাভাবিক হল। দিন রাত্রি যেমন হয় তেমনি চলতে থাকল।

বিন্ধ্যের নত শির দেখে অগস্ত্য মুনি মনে মনে খুব খুশি হলেন। তিনি শিষ্যকে একটা কথাই বললেন– শোন বিন্ধ্য, তুমি নিচু হওয়ায় আমার যাতায়াতের খুব সুবিধা হল, আমি দক্ষিণদেশে যাচ্ছি। খুব শীঘ্রই ফিরব, তুমি ততক্ষণ এইভাবে নত হয়ে থাক।

আর কিছু না বলেই মুনি দক্ষিণদিকে চলে গেলেন। বিন্ধ্যও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ভাবল গুরুদেব রেগে গিয়ে যে শাপ দেননি, সেটাই বড় কথা।

অগস্ত্য মুনি সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না। গুরুর আদেশ অমান্য করার সাহস নেই বিন্ধ্যের। সে সেইভাবে চিরকাল মাথা নিচু করে রাখল, পর্বতরাজ হওয়ার বাসনা তার ধুলায় মিশে গেল।

অমিত্রজিতের দানব সংহার

অমিত্রজিৎ পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। মহাবলশালী এবং কৃষ্ণভক্ত। তার শাসনে সকল প্রজারাই খুশি। রাজ্যে কোন চোর ডাকাত নেই। তাই সবাই শান্তিতে আছে।

একদিন রাজসভায় রাজা মন্ত্রীর সঙ্গে বসে রাজ্য নিয়ে আলোচনা করছেন। এমন সময় সেখানে নারদঠাকুর এসে হাজির হলেন। রাজা অমিত্রজিৎ সিংহাসন থেকে উঠে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে সেবা করলেন তাঁর। রাজার সেবায় নারদ খুব প্রসন্ন হলেন। রাজার বহু প্রশংসা করলেন। রাজা কিন্তু এমন প্রশংসা শুনে দেবর্ষিকে বললেন, না না আমি নই। সবই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা। আমরা নিজের ক্ষমতায় কিছু করতে পারি না কখনও, যাই হোক আপনার আসার কারণ কি? নারদ বললেন– রাজা, তুমি ঠিক বলেছ। তাঁর কৃপা ছাড়া কেউ কিছু করতে পারে না। বৃথাই মানুষ অহঙ্কার করে। এখন আমি এসেছি তার কারণ হল কঙ্কালকেতু নামে এক দানব মলয়গন্ধিনী নামে এক বিদ্যাধরী গন্ধর্ব কন্যাকে হরণ করে তাকে চম্পাবতী নগরে লুকিয়ে রেখেছে। তাকে উদ্ধার করে তুমি বিয়ে কর।

আমি পাতাল গিয়েছিলাম হঠকেশ্বর শিব দর্শনে, সেখানেই সেই মলয়গন্ধিনীর সঙ্গে দেখা হয় আমার। সে নিজেই বলল তার কাহিনি। একদিন সে গন্ধমাদন পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় দানব কঙ্কালকেতু তাকে মায়াবলে চুরি করে নিয়ে যায় তার চম্পকাবতী পুরীতে। সামনের তৃতীয়া তিথিতে তাকে বিয়ে করবে।

গন্ধর্বকন্যা হবে দানব-ঘরণী। সে দুঃখে কাঁদতে লাগল। দেবী ভগবতীর পূজা করল ভক্তিভরে। তারপর তার স্তব ও স্তুতি করলো। তখন দেবী তাকে সাক্ষাৎ দিয়ে বললেন–হে নন্দিনী, তোমার কোনো ভয় নেই। তোমার বিয়ে হবে এক কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গে। কঙ্কালকেতুকে সেই কৃষ্ণভক্ত রাজা বধ করবে।

এই কথা বলে দেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর আমি সেখানে যাই। তখন সেই মলয়গন্ধিনী আমাকে দেবীর আশীর্বাদের কথা বলল। তখন আমি ভাবলাম কৃষ্ণ ভক্ত যুবক রাজা পৃথিবীতে কে আছে? ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল তোমার কথা। তাই চলে এলাম তোমার কাছে। তুমিই পারবে সেই গন্ধর্ব কন্যাকে উদ্ধার করতে।

রাজা অমিত্রজিৎ বিস্ময়ে হতবাক। তারপর বললেন– হে দেবর্ষি, আমি তো চম্পকবতী চিনি না, তাহলে কেমন করে উদ্ধার করব সেই কন্যাকে। কেমন করেই বা মারব দানবকে?

দেবর্ষি রাজাকে পথের সন্ধান দিলেন–তুমি একটা পালতোলা নৌকায় করে সাগরে যাবে। দেখতে পাবে একটি সুন্দর রথ উঠবে সাগর থেকে। সেই রথে এক দিব্যকন্যা থাকবে, যার হাতে বীণা থাকবে, সে গান করবে, সেই গানটি হল–ভাল হোক মন্দ তোক কর্ম অনুসারে করিবে ফলের ভোগ ধরার মাঝারে।

এই গানটি যখন শেষ হয়ে যাবে, তখনই রথটি আবার সমুদ্রে ডুবে যাবে। তখন তুমি তোমার নৌকা থেকে সেই রথের উপরে ঝাঁপ দেবে, কিছুক্ষণ পরে দেখবে তুমি পৌঁছে গেছো চম্পকবতী নগরে। সেখানেই পাবে সেই মলয়গন্ধিনীর দেখা। তারপর তুমি তারই কথামত দানবকে মেরে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। এই বলে দেবর্ষি চলে গেলেন, তার নিজের বাহন ঢেঁকিতে চড়ে।

একটা পালতোলা নৌকা নিয়ে রাজা বেরিয়ে পড়লেন। মাঝ সমুদ্রে যখন তিনি উপস্থিত হলেন তখন একটা রথ সমুদ্রের ভিতর থেকে উঠে এল। রথের মধ্যে এক সুন্দরী গান ধরল ভাল হোক মন্দ হোক, কর্ম অনুসারে/ করিবে ফলের ভোগ ধরার মাঝারে।

গান শুনে রাজা বুঝলেন, দেবর্ষি যা বলেছিলেন তা সবই সত্য। গান শেষ হতেই রথ ডুবল সমুদ্রের জলে। রাজাও ঝাঁপ দিলেন তখন রথের ওপর, তারপর অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন চম্পকবতী নগর। দেখতে পেলেন এক বিরাট প্রাসাদ। দারোয়ান ও বহু লোক উপস্থিত সেই প্রাসাদে। কিন্তু দেবীর কৃপায় রাজাকে কেউ দেখতে পেল না। তারপর রাজা ঢুকে পড়লেন সেই ঘরে। সেখানে মলয়গন্ধিনী রয়েছে।

একটা খাটের উপর শুয়ে মলয়গন্ধিনী কাঁদছে। রাজা যেই সেই ঘরের মধ্যে ঢুকলেন তখন মলয়গন্ধিনী চমকে উঠলেন। অবাক হয়ে রাজাকে দেখলেন। সে বুঝতে পারল এই সেই কৃষ্ণভক্ত রাজা, যে তাকে উদ্ধার করতে এসেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল খাট থেকে। রাজার হাত ধরে নিয়ে গেল পাশের ঘরে, যেখানে কঙ্কালকেতুর অস্ত্রাগার। বলল– রাজপুত্র, এখানে দানব কঙ্কালকেতু এসে পড়লে কারোও রক্ষা থাকবে না, তার ত্রিশূলের ঘায়ে সবাই মরবে। তাই যে করেই হোক তার হাত থেকে ত্রিশূলটা নিতে হবে। তারপর ঐ ত্রিশূলের ঘায়েই মরবে ওই দানব। শিবের বরে অন্য কোন অস্ত্র দ্বারা ওই দানব মরবে না। এখন তুমি এখানে লুকিয়ে থাক। ওর আসার সময় হয়েছে।

এই কথা বলে মলয়গন্ধিনী নিজের ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে কঙ্কালকেতু এল অনেক সোনা, নানারকম রত্ন নিয়ে, ঢেলে দিল মলয়গন্ধিনীর পায়ের কাছে, বলল– এসব তোমার।

আমার এই প্রাসাদের যা কিছু আছে সবই তোমার হবে। বল, কি চাই? তুমি আমার রানি হবে, তাই তুমি যা চাও তাই এনে দেব।

মদ খেয়ে এসেছে দানব, তাই কথাগুলো সে তোলাতে তোলাতে বলল– তারপর নেশার ঘোরে আর কথা বলতে পারল না। শুয়ে পড়ল মেঝের উপরেই। তারপর সে নাক ডাকতে লাগল।

দানবকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে মলয়গন্ধিনী তার পাশে পড়ে থাকা ত্রিশূলটি নিয়ে নিল। এবং সেটি নিয়ে পাশের ঘরে যে রাজা লুকিয়ে ছিল তাঁর হাতে গিয়ে দিল। বলল– এই ত্রিশূলের আঘাতেই মারতে হবে দানবকে। অন্য কিছু দিয়ে মরবে না সে। এক্ষুনিই ঘুমন্ত দানবকে মেরে আমাকে উদ্ধার কর।

হাতে ত্রিশূলটি নিল অমিত্রজিৎ এবং চলল সেই ঘরে যেখানে দানব ঘুমিয়ে আছে। ত্রিশূলটা তুলল তাকে মারার জন্য। কিন্তু ভাবল উচিৎ হবে না, ওর সঙ্গে যুদ্ধ করেই ওকে মারব।

এই ভেবে রাজা দানবের গায়ে একটা লাথি মারল, ঘুম ভেঙে গেল দানবের। দানব উঠে দেখল সামনে এক রাজা যার হাতে ত্রিশূল। সে তখন নিজের ত্রিশূলের খোঁজ করল। কিন্তু পেল না। বুঝতে পারল তার ত্রিশূলটাই রাজার হাতে। ক্রোধে ফেটে পড়ল দানব বলল কে তুমি? এখানে এলে কেমন করে? আমার ত্রিশূল তোমার হাতে কেন? ফিরিয়ে দাও আমাকে। দানবের গর্জনে সমস্ত প্রাসাদ যেন কাঁপতে লাগল। কিন্তু রাজা অমিত্রজিৎ নির্ভীক, কারণ তাঁর হাতেই আছে দানবের মরণাস্ত্র।

দানব বুঝতে পারল এবার তার মৃত্যু আসন্ন। সে একদিন গন্ধর্বকন্যাকে বলেছিল যে, সে অমর, কারণ তার মৃত্যু হবে একমাত্র এই ত্রিশূলে। এই ত্রিশূলত সে পেয়েছে শিবের কাছ থেকে। যাতে কেউ এই ত্রিশূলটি নিতে না পারে, তাই সে সবসময় এটা নিজের কাছে রাখত। কিন্তু আজ ঘুমিয়ে পড়ার জন্য তার এই অস্ত্র হাতছাড়া হয়ে গেল। কাজেই তাকে মরতে হবে। কিন্তু বিনাযুদ্ধে মরবে কেন? তাই সে বলল—তুমি কে? আমার ত্রিশূল আমাকে ফিরিয়ে দাও।

রাজা বলল–তোমার অস্ত্রাগারে তো অস্ত্রের কোন অভাব নেই। সেখান থেকে যত খুশি অস্ত্র নিয়ে এসো।

দানব তখন ক্রোধে রাজার বুকে মারল এক ভয়ঙ্কর ঘুষি। কিন্তু মহাবীর অমিত্রজিৎ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকল, এমন ভাব করল যেন কিছুই হয়নি।

রাজা বলল– দানব তোমার ঘুষি সহ্য করার ক্ষমতা আমার আছে, তা তুমি নিজের চোখে দেখতে পেলে। এবার আমি একটু তোমাকে পরীক্ষা করে দেখি।

এই বলে রাজা এক চড় মারল দানবের গালে। চড় খেয়ে দানব ঘুরতে লাগল লাটুর মত। তারপর লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। সেই সুযোগে রাজা ত্রিশূল বসিয়ে দিল তার বুকের উপর। চিৎকার করতে করতে দানবের দানবলীলা শেষ হয়ে গেল। মলয়গন্ধিনী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দেবী ভগবতাঁকে প্রণাম জানাল। এমন সময় সেখানে নারদ মুনি এলেন এবং রাজাকে বললেন–সাবাস! আমি জানতাম তুমি এই কাজে সফল হবে। তুমি ছাড়া এই বীরত্বের কাজ কে পারবে? তাছাড়া কৃষ্ণের বলে বলীয়ান তুমি। এখন তোমরা চল, দেবী ভগবতীর ইচ্ছামত তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করি।

তারপর দেবর্ষি পুরোহিত হয়ে অমিত্রজিতের সঙ্গে মলয়গন্ধিনীর বিয়ে দিলেন। তারপর তাদের চম্পকবতী নগর থেকে বের করে আনলেন অমিত্রজিতের রাজ্যে। তারা নারদকে পূজা করলেন, তারপর নারদ ফিরে গেলেন। কঙ্কালকেতুর মৃত্যুতে দেবতা, গন্ধর্বআদি সকলেই খুব খুশি হলেন। রাজা অমিত্রজিৎকে সবাই আশীর্বাদ করলেন। কৃষ্ণ ভক্তের জয় সর্বত্রই।

রাজা দিবোদাসের কথা

সৃষ্টির রক্ষার জন্য আলো, বাতাস, জল এই তিনটি অবশ্যই চাই। কোন একটির অভাব যদি হয় তাহলে সৃষ্টি থাকবে না। একসময় পৃথিবীতে একটানা ষাট বছর ধরে চলল অনাবৃষ্টি। সব জলাশয় গেল শুকিয়ে। ফসল জন্মালো না। চারিদিকে দেখা দিল অনাহার মহামারী। এইসব দেখে চিন্তায় পড়লেন ব্রহ্মা, তাঁর সাধের সৃষ্টি এইভাবে বিলুপ্ত হবে। এর একটা সমাধান করতেই হবে। তিনি কি করবেন বুঝতে পারছেন না। সত্যলোক থেকে চলে এলেন পৃথিবীতে। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন সবকিছু। পৌঁছালেন কাশীতে। সেখানে রিপুঞ্জয় নামে এক রাজর্ষি তপস্যায় মগ্ন ছিলেন।

ব্রহ্মা তাঁর কাছে গিয়ে বললেন– হে রাজর্ষি, তুমি পৃথিবীর রাজা হও। রিপুঞ্জয় বললেন– না বিধাতা তা হয় না। রাজকার্য আমার ভালো লাগে না। তাই তো তপস্যায় বসেছি। দয়া করে আমাকে এই দায়িত্ব নিতে বলবেন না।

ব্রহ্মা বললেন– হে রাজন, তুমি একবার এই পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখ, চারিদিকে এত হাহাকার! তুমি পরম ধার্মিক। তুমি রাজা হলেই পৃথিবীতে আবার শান্তি ফিরে আসবে। পৃথিবী শস্য-শ্যামলা হবে। প্রজারা সুখে বাস করবে। তাই পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্যই তোমাকে এই কাজ করতে বলছি।

স্বয়ং ব্রহ্মা অনুরোধ করছেন। তাঁর বাক্য অমান্য করা উচিত নয়। রিপুঞ্জয় বললেন– হে বিধাতা, আমি আপনার আদেশ পালন করতে রাজী আছি। কিন্তু একটা শর্তে।

ব্রহ্মা কি শর্ত জানতে চাইলেন। রাজর্ষি বললেন– দেবতাগণকে ফিরে যেতে হবে স্বর্গে। আর যক্ষ, নাগ, গন্ধবআদি যার যেখানে বাস সবাই চলে যাবে সেখানে। পৃথিবীতে থাকবে কেবল মানুষ, অন্য কেউ নয়।

রাজর্ষির কথায় ব্রহ্মা স্বস্তি পেলেন না, তবুও সৃষ্টিকে রক্ষার জন্য রাজী হলেন রিপুঞ্জয়ের শর্তে।

দিবোদাস নাম নিয়ে রিপুঞ্জয় হলেন পৃথিবীর রাজা। তারপর তিনি ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করলেন–দেবতারা ফিরে যাবে দেবলোকে। যক্ষরা যক্ষলোকে, নাগেরা নাগলোকে, পৃথিবীতে থাকবে কেবল মানুষ। অন্য কারো থাকা চলবে না। দিবোদাসের শর্ত মেনেই ব্রহ্মা তাঁকে

পৃথিবীর সম্রাট করেছেন। কাজেই প্রতিবাদ করতে পারবেন না। এই ব্যাপার তিনি শিবের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইলেন। এইজন্য তিনি কাশীতে গেলেন, শিব তখন প্রাসাদ থেকে বেরিয়েছেন মন্দারকে বর দেবার জন্য। ব্রহ্মাকে দেখেই বললেন– আমি এক্ষুনি কুলদ্বীপ যাব, সঙ্গে পার্বতী, তুমিও চল আমার সঙ্গে। মন্দার কঠোর তপস্যা করছে, তাকে বর দিয়ে আসি।

ব্রহ্মা যে কথা বলতে এলেন সে কথা তার বলা হল না।

তিনজনেই পৌঁছলেন মন্দারের সামনে। মন্দার চোখ মেলে তাকাল, সামনে ব্রহ্মা আর হর-গৌরী। খুব খুশি হয়ে প্রণাম জানাল সে।

তখন মহাদেব বললেন– হে মন্দার, তুমি এমন কঠোর তপস্যা করছ কেন? কোন্ বর পেলে তুমি খুশি হবে।

মন্দার বলল– আপনি সপরিবারে আমার উপরেই বাস করুন। তাতেই আমি ধন্য হব। অন্য কোন ইচ্ছা আমার নেই।

মন্দারের প্রার্থনা শুনে মহাদেব মুস্কিলে পড়লেন। তাঁর সাধের কাশী, এমন সুন্দর স্থান ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে তার ইচ্ছা নেই। কিন্তু মন্দার যেভাবে কঠোর তপস্যা করেছে, তাকে বর দিতেই হবে।

ব্রহ্মা এতক্ষণ যে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছিলেন না, তা তিনি এবারে পেয়ে গেলেন। বললেন– দিবোদাসের কথা। শর্ত অনুসারে দেবতাদি সকলকেই পৃথিবী ছেড়ে থাকতে হবে। হে হর, মন্দারেরও অভিলাষ পূর্ণ হবে। আপনি মারেই বাস করুন। আপনি যদি মন্দারের বাসনা পূর্ণ না করেন, তাহলে দিবোদাসের কাছে আমি মিথ্যাবাদী হয়ে যাব। ব্রহ্মার কথা শুনে শিব বললেন– তাই হোক। তোমার কথা রক্ষা হবে, আর মন্দারের বাসনা পূর্ণ হবে।

সপরিবারে মহাদেব চললেন কুলদ্বীপে। দেবতারা চললেন স্বর্গে। নাগ-যক্ষ সবাই যে যার জায়গায় চলে গেলেন। দেবতারা স্বর্গে ফিরে সেখানকার ভোগসামগ্রী উপভোগ করছেন। কিন্তু তাঁদের মনে পড়ে আছে সেই পৃথিবীর দিকে। মন্দারে শিবের কোন কষ্ট নেই। তবুও যেন শান্তি নেই। সকলেই চিন্তা করেন দিবোদাস তো মানুষ। মানুষের পরমায়ু আর কত হবে একদিন তো মরবেই তখন যাওয়া যাবে পৃথিবীতে।

একের পর এক বছর কাটে। আশি হাজার বছর পার হয়ে যায়। তবু দিবোদাস জীবিত থাকে। মহাদেব কাশীতে ফিরতে পারছেন না। দেবতাদের মনেও স্বস্তি নেই। তাঁরা চিন্তা করছেন কিভাবে দিবোদাসের পতন হবে।

গুরু বৃহস্পতির কাছে জানতে চাইলেন, দেবতারা কেমন করে দিবোদাসের পতন হতে পারে। বৃহস্পতি বললেন– দেখতে হবে তার শাসন ঠিক ঠিক চলছে কিনা? যদি না চলে তবেই তার পতন ঘটানো সম্ভব। তখন গোপনে দেবতারা সারা পৃথিবী ঘুরে দেখল– না কোন অধর্মই নেই কোন অশান্তি নেই। তাহলে তাকে পতন করা যাবে কীভাবে? সবাই চিন্তায় পড়লেন। বৃহস্পতি বললেন– তোমরা পৃথিবী ছেড়ে চলে এসেছে। কিন্তু তোমাদের শক্তিকে রেখে এলে কেন? সেই শক্তিকেও যদি সরিয়ে নাও, তাহলে রাজা বিপদে পড়বে।

দেবতারা অবাক হয়ে বললেন– কি রকম, বৃহস্পতি বললেন– অগ্নি চলে এসেছে। কিন্তু তাঁর শক্তিতে অর্থাৎ অগ্নির সাহায্যে মানুষ রান্নাবান্না করছে। বরুণ চলে এসেছে। কিন্তু তাঁর শক্তি জল পৃথিবীর সর্বত্রই আছে। তাই তোমরা চলে এলেও তোমাদের শক্তিতে দিবোদাসের খুব সুবিধাই হচ্ছে। দেবতারা বৃহস্পতির কথা শুনে চিন্তা করলেন, সত্যি তো! আমরা এ কথাটা একবারও ভেবে দেখিনি।

তখন দেবতারা প্রত্যেকেই তাঁদের শক্তিকে আকর্ষণ করে নিলেন। পৃথিবীতে আর আগুন জ্বলে না। আর জলের অভাবে সব কাজ বন্ধ। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। শস্যক্ষেত্রে ফসল শুকিয়ে যাচ্ছে। সবাই ছুটে এল রাজদরবারে। দিবোদাসকে জানালো বিপদের কথা। শুধু প্রজাদের কষ্ট নয়, খোদ। রাজার প্রাসাদেই আগুনের অভাবে রান্নাবান্না বন্ধ। তখন দিবোদাস সবাইকে শান্ত করে বললেন–আমার একটু ভুলের জন্য সকলের এত কষ্ট হল। দেবতাদের পৃথিবী থেকে চলে যেতে বলায় তাঁরা চলে গেলেন। কিন্তু তাঁদের শক্তি সব ছিল। এখন তাঁরা আমাকে জব্দ করার জন্য তারা তাদের শক্তিকেও টেনে নিলেন। যাতে তোমরা সকলে আমার প্রতি বিদ্রোহ কর, প্রজাগণ তোমরা ভয় পেয়ো না। আমি একাই সব শক্তি সৃষ্টি করে তোমাদের সকল অভাব দূর করব।

তারপর মহাযোগী দিবোদাস কেবলমাত্র কুলদেবতা ভাস্করকে রেখে আর সকলকে বিদায় দিয়ে নিজেই যোগবলে সমস্ত শক্তি সৃষ্টি করে সকল প্রজাগণকে শান্তিতে রাখলেন।

পৃথিবীর রাজা বৃহস্পতির বুদ্ধিকে ব্যর্থ করে দিলেন। দেবতারা ভাবলেন তাহলে কি তাঁরা কখনও পৃথিবীতে আসতে পারবেন না? ওদিকে মহাদেবও দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন, মনে নেই কোন আনন্দ, মুখে নেই কথা, পার্বতী স্বামীর অবস্থা দেখে খুবই দুঃখ পান।

তখন পার্বতী শিবকে বললেন–একটা মানুষকে এত ভয়? হে মহেশ, আপনি ইচ্ছা করলেই দিবোদাসকে সরিয়ে দিতে পারেন। আর কাশীতেও বাস করতে যেতে পারেন। শিব বললেন– পার্বতী তুমি যা বলছ, তা তত সহজ নয়। যা ইচ্ছা করব, তাই করা যায় না। ধর্মের রক্ষক হয়ে অধার্মিকের মত আচরণ আমাদের সাজে না। দিবোদাস যতক্ষণ ধর্মপথে থাকবে, ততক্ষণ আমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারি না। আগে জানতে হবে তার দ্বারা কোন অধর্ম হচ্ছে কিনা?

মহাদেবের চেষ্টায় যোগিনীদের পাঠিয়ে দিলেন পৃথিবীতে তার অনুমতি নিয়েই, চলল তারা সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখল নানান বেশ ধরে, কেউ ভাল খায়, কেউ তুকতাক করে, লোকের মন ভোলাতে চেষ্টা করে, কিন্তু না, কেউ সফল হল না, পৃথিবীর প্রজারা সকলেই ধর্মপরায়ণ।

যোগিনীরা এখন কি করবে? ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলে হর-পার্বতী কথা শোনাবে। তারা ভাবল, তার চেয়ে কাশীধামেই থেকেই যাই।

থেকেই গেল তারা। যোগিনীরা ফিরল না দেখে শিব সূর্যকে ডেকে বললেন– হে আদিত্য, তুমি গিয়ে দেখ তো, পৃথিবীর মানুষেরা কি সকলেই ধর্মপথে রয়েছে? যদি থাকে, তাহলে তাদের কোন ক্ষতি করো না। আর যদি কোন অধর্ম দেখতে পাও, তাহলে আমাকে বলবে।

সুর্যদেব কাশীতে এলেন। নানা বেশ ধরে ঘুরতে লাগলেন সর্বত্র, কিন্তু কোথাও কোন অধর্মের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলেন না। কি বলবেন শিবকে? তাই ফিরে না গিয়ে স্যও রয়ে গেলেন কাশীতে। মহাদেব আর কাশী ছাড়া থাকতে পারবেন না, তাই ব্রহ্মাকে ডেকে বললেন– ব্রহ্মা তুমি দিবোদাসের শর্ত মেনে নিয়ে আমাকে ও সকল দেবতাগণকে এমন বিপাকে ফেলেছ যে, তার সীমা নেই। এখন কি যে করা যায়? তুমি একবার পৃথিবীতে গিয়ে দেখ না, যদি কোন অধর্মের চিহ্ন থাকে।

ব্রহ্মা কোন উত্তর না করেই কাশীতে এসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরলেন। উপস্থিত হলেন দিবোদাসের কাছে। রাজা ব্রহ্মাকে দেখেই সিংহাসনে ছেড়ে উঠে পড়লেন, প্রণাম জানালেন

ভক্তিভরে। আসনে বসিয়ে নানা সেবাযত্ন করলেন, তারপর হাতজোড় করে বললেন– হে ব্রাহ্মণ ঠাকুর, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?

ব্রাহ্মণবেশী ব্রহ্মা বললেন– এই কাশী এক পুণ্য ক্ষেত্র, এখানে আমি যজ্ঞ করতে চাই। আমি গরীব ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ করার অর্থ আমার নেই। তাই আমি এসেছি আপনার কাছে, আপনি যদি এই ব্যবস্থাটুকু করে দেন, তাহলে আমার কামনা পূর্ণ হয়। আপনি একজন মহান ধার্মিক রাজা, আপনার রাজ্যে সকল প্রজাই সুখে আছে। যদি আপনি আমার এই সুখের ব্যবস্থা করেন।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে দিবোদাস খুব খুশি হল। বললেন– হে ব্রাহ্মণ, আজ আমার পরম সৌভাগ্য, বহুদিন হল আমি রাজত্ব করছি। এমন প্রস্তাব নিয়ে কেউ আগে আসেনি। আমার রাজকোষে যত অর্থ সঞ্চিত রয়েছে, তার এক পয়সাও আমি আমার নিজের জন্য ব্যয় করিনি। সবই জমা আছে। আজ আমি সেইসব অর্থ আপনাকে দান করলাম যজ্ঞের জন্য, আপনি যজ্ঞ শুরু করুন।

ছদ্মবেশী ব্রহ্মা যজ্ঞ শুরু করলেন। সকল সামগ্রী সংগ্রহ করে দিলেন রাজা দিবোদাস। একান্ত অনুগত দাসের মত তিনি আনন্দের সঙ্গে সকল কাজে সহায়তা করলেন। এক এক করে দশটি যজ্ঞ করলেন ব্রহ্মা। রাজা তার ভাণ্ডার উজাড় করে দিলেন। দিবোদাস ধার্মিক রাজা ছিলেন। ব্রহ্মা কোন খুঁত পেলেন না। কাজেই তাই আর স্বর্গে ফিরে যাওয়া হল না। রয়ে গেলেন কাশীতে।

মহাদেব অস্থির হয়ে পড়লেন। পাঠালেন সেরা সেরা ছত্রিশজন অনুচরকে। সবাই চেষ্টা করল কোনো খুঁত ধরার জন্য। কিন্তু না সকলেই ব্যর্থ হল। রয়ে গেল তারা কাশীতে। মহাদেবের উৎকণ্ঠা আরো বাড়ল। যে যায় কাশীতে সে রয়ে যায়। ফিরে আসে না কেউ। ব্যাপারটা কি? কেউ ফিরছে না কেন? যাই হোক, আমি যেতে না পারি আমার আপনজন তো সকলেই যেখানে গিয়ে বাস করছে। তাদের থাকা মানে আমারই থাকা হল।

কিন্তু মহেশ্বরের মন মানল না। মনে পড়ল গণেশের কথা, ডাকলেন তাঁকে। বললেন–গণেশ, তুমি তো জানো, কাশী আমার প্রিয়। কি একটা সামান্য কারণে সেখানে যেতে পারছি না, অনেককেই পাঠালাম সেখানে, কেউই ফিরে এল না। আসলে ব্যাপারটা যে কি, তা বুঝতে পারছি না। তুমি একবার গিয়ে দেখতো, কোথাও কোন অশান্তি আছে কিনা?

পিতার আদেশে গণেশ চললেন কাশীধামে। দেখলেন– কোথাও কোনো অশান্তি নেই। দিবোদাস বললেন, এখন আর আমার ভালো লাগে না। এ থেকে আমি রেহাই পেতে চাই।

গণেশ বললেন–আপনার সব কিছুই আমি জানি। তবে আমি নিজে কিছু বলব না। আজ থেকে আঠারো দিন পরে আপনার কাছে এক ব্রাহ্মণ আসবেন, তিনিই সব বলবেন আপনাকে।

এই কথা বলে গণেশ চলে গেলেন কাশীতে। এদিকে গণেশ ফিরে না চাওয়ায় শিব বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। তখন বিষ্ণু লক্ষ্মীকে নিয়ে গরুড়ের পিঠে চড়ে এলেন কাশীতে। বিষ্ণু ধরলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশ। নাম ধরলেন পুণ্যকর্তা, লক্ষ্মী হলেন পরিব্রাজক আর গরুড় তাদের শিষ্য বিনয় কীর্তি।

এভাবে তারা নগরে ঢুকে বৌদ্ধশাস্ত্রের সহজিয়া পথ শেখাতে লাগলেন সবাইকে। কেউ এর প্রশ্ন করলে, সহজভাবে বুঝিয়ে দিলেন পুণ্যকীর্তি। বলতে লাগলেন–যাগযজ্ঞ, পূজামে, পশুবলির দ্বারা স্বর্গলাভ হয় না। মানুষের দেহটা বেশিদিন থাকতে পারে না। রোগ-জরা গ্রাস করবে। মুক্তি কথার অর্থ হল আনন্দ, তা যদি পেতে হয়, দেহের সামর্থ্য থাকতে থাকতেই করা উচিত।

সবাই পুণ্যকীর্তির কথা শুনে বুঝল ইনি ঠিক কথাই বলছেন, দেহটা যদি ঠিক না থাকে, তাহলে কিছুই ঠিক থাকে না। ভয়ে ভয়ে সবাই কাশী ছেড়ে চলে যেতে লাগল। এদিকে রাজঅন্তঃপুর থেকে রানিরাও শুনেছেন গুণমুগ্ধ রূপী গণেশের গণনার অকাট্য সত্যতা। তাই দূত মারফত তাঁকে গোপনে অন্দরমহলে আনিয়ে জানতে চাইলেন, তাদের ভবিষ্যতের কথা। গুণমুগ্ধ তাদের হাত না দেখেই এমন সব কথা বলতে লাগলেন, যা সেই রানিরা ছাড়া অন্য কেউই জানেন না। অবাক হয়ে গেলেন সকলে তার অদ্ভুত গণনায়। গজানন এইভাবে কৌশলে রানিদের মনও জয় করলেন।

একদিন কথায় কথায় রানি লীলাবতী রাজা দিবোদাসকে গণকের কথা বললেন। এমন একটা। গণনা ইতিপূর্বে কেউ কখনই শোনেনি। রাজার ইচ্ছা হল গণকঠাকুরের সঙ্গে দেখা করবেন। রানি দূতের দ্বারায় গুণমুগ্ধকে আনালেন রাজদরবারে। রাজা তাঁর পরিচয় নিয়ে সমাদর করে সেদিনের মতো বিদায় দিলেন।

রাজার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। পরদিন সকালেই আবার ডেকে পাঠালেন সেই গণকঠাকুরকে। রাজসভায় নয়, একেবারে অন্দরমহলে নিজের ঘরেই। বসবার আসন দিয়ে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন–আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, আপনি একটা সৎ পরামর্শ দিতে পারবেন। তাই ডেকে পাঠালাম আপনাকে। বহুদিন হল রাজ্যশাসন করছি, কিন্তু করার মতো কোন কিছুই লক্ষ্য পড়ল না তার তখন। বাবার কষ্টের কথা চিন্তা করে গণেশ একটা উপায় স্থির করলো। গণৎকারের বেশ ধরলেন। গুণমুগ্ধ নাম ধরলেন। সংসারের মানুষেরা ভাগ্যের ফলাফল জানতে খুব আগ্রহী। ঘুরতে লাগলেন প্রতি দ্বারে। প্রথম প্রথম কেউই তেমন আগ্রহ দেখাল না। কিন্তু গণেশ তাদের মুখ চোখ দেখেই বলতে লাগলেন। তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা।

নগরবাসীরা বুঝতে পারল, গণকঠাকুর যা বলেছে সবই সত্য, মোটেও তিনি কাউকে ঠকাচ্ছেন না। তখন অনেকেই তার শরণ নিল। এখন গণেশ বুঝলেন– তার ফাঁদে পা দিয়েছে অনেকেই এবার নতুন খেলা শুরু করা যাক। সবাইকে স্বপ্ন দেখালেন রাতে। পরের দিন সকালে তাদের কাছে গিয়ে স্বপ্নের কথা হুবহু বলে দিতে লাগলেন। তারপর বললেন–এই রাজ্যে অল্পদিনের মধ্যেই খুব ক্ষতি হবে। খুব সাবধানে থাকা দরকার। কিংবা যদি কাশী ছেড়ে অন্য কোনো স্থানে চলে যেতে পারো, তাহলে কিন্তু কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না।

এইভাবে গণেশ প্রায় প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে একই কথা বলতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে সবাই গুণমুগ্ধের কথায় বিশ্বাস করেছে। এখন তাই আর অবিশ্বাস করার কথা থাকে না। তখন আনন্দ পেয়েও কি হবে?

তখন মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ধর্মের নামে অনাচার শুরু করে দিল সবাই। গণেশ এতদিন সবাইকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিলেন তাই বিষ্ণুর দ্বারা এত সহজেই মানুষ অত্যাচারী হয়ে উঠল।

পুণ্যকীর্তি পুরুষদের আর পরিব্রাজিকা নারীদের উপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করল। দলে দলে প্রায় সকলেই আসতে লাগল। তাদের শিষ্য-শিষ্যা হল। জাতিভেদ কেউ আর মানল না, বর্ণভেদও লোপ পেয়ে গেল। অনাচারে ভরে গেল দেশ।

যত অনাচার বাড়তে লাগলো, তত কমল দিবোদাসের প্রভাব। গণকঠাকুর বলছেন আঠারো দিন পরে এক ব্রাহ্মণ এসে সব বলবেন রাজাকে। তাই রাজা নিত্যই গুণছেন সেই দিনটি কবে আসবে, চারিদিকে অশান্তি, অনাচার সব খবরই পান তিনি। তাই মনটা ছটফট করেছে সেই

ব্রাহ্মণের অপেক্ষায়। নির্দিষ্ট দিনে রাজার যেন সময় আর কাটতেই চায় না। এমন সময় এলেন সেই সুদর্শন ব্রাহ্মণ। রাজা দিবোদাস বুঝতেই পারলেন গণকঠাকুরের বলা সেই ব্রাহ্মণ এসে গেছেন। রাজা লুটিয়ে । পড়লেন তার চরণে, সিংহাসনে বসিয়ে পাদ্যাদি দিয়ে পূজা করলেন।

তারপর বললেন, আজ আমার পরম সৌভাগ্য দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবী শাসন করছি। প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখলাম। এখন আর পারছি না। এখন আপনি বলুন, আমি এর থেকে কেমন করে মুক্তি পেতে পারি। ব্রাহ্মণবেশী বিষ্ণু বুঝতে পারলেন– গণেশের দ্বারা কিভাবে পথ সব পরিষ্কার হয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলেন –আপনি তো সাধারণ রাজা নন রাজর্ষি, তাহলে আপনার মনে অশান্তির কারণ কি?

রাজা বললেন–কেন এমন হল? হয়তো দেবতাদের বিতাড়িত করে নিজেই সব দায়িত্ব নেওয়ার অপরাধে এমন হল। ব্রাহ্মণ বললেন–না না সেজন্য নয়, তাতে দেবতাদের তো কোন অপকার হয়নি। রাজা বললেন–তাহলে কেন আমি এত দুর্বল, বুঝতে পারছি না। এখন আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।

ব্রাহ্মণ বললেন–এই কাশীধাম হল দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় স্থান, আপনি তাকে এখান থেকে বের করে দিয়ে ভালো করেননি। আপনি তার আরাধনা করুন, সাতদিনের মধ্যেই আপনার অশান্তি কেটে যাবে।

দিবোদাস ব্রাহ্মণের কথামতো গঙ্গার তীরে নতুন এক প্রাসাদ তৈরি করলেন। এক শিবলিঙ্গ তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করে নিত্যদিন তার সেবা পূজা করলেন। একমনে ধ্যান করতে লাগলেন।

কাশীর পঞ্চনদের কাছে বিষ্ণু রয়ে গেলেন, গরুড়কে পাঠিয়ে দিলেন মন্দারে, দিবোদাসের সব খবর জানালেন শিবকে।

মাত্র সাতদিন শিব সাধনার পর দিবোদাস মুক্ত হয়ে চলে গেলেন স্বর্গে।

শিব ফিরে এলেন কাশীতে। কিন্তু সেই পুরোনো প্রাসাদে নয় নতুন প্রাসাদ তৈরি করে দিলেন বিশ্বকর্মা, বহু সোনা আর রত্নরাজি দিয়ে। সেই প্রাসাদে মহাদেব পুরো পরিবার নিয়ে আজও বাস করছেন।

দক্ষের পাপে চন্দ্রের ক্ষয় ও নিরোগ

ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি। তিন হাজার বছর কঠোর তপস্যা করলেন। তখন তার দুই চোখ থেকে আলোকরশ্মি দশ ভাগে বিভক্ত হয়ে বেরোতে লাগল। ব্রহ্মা সেখানে এসে সকল দিককে বললেন– সেই রশ্মিগুলোকে ধরে রাখতে। তখন তারা তা চেষ্টা করল কিন্তু সফল হল না। সেই রশ্মিগুলি সবদিক আলোকিত করে মাটিতে পড়তে লাগল। ব্রহ্মা তা নিজের রথে তুলে নিলেন। সেই রথে একুশ বার ধরা প্রদক্ষিণ করলেন। সেই রশ্মির তেজে পৃথিবীতে ঔষধির জন্ম হল। ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় তাকে বলে ঔষধি। তারপর ব্রহ্মা বীজৌষধি, বিপ্র ও মন্ত্র– এই তিনের রাজা করে সোমাক অভিষিক্ত করেন। তিনি অভিষিক্ত হয়ে নিজের কিরণ বিতরণ করে ত্রিজগতকে আলোকিত করছেন। প্রজাপতি দক্ষের চৌষট্টিজন কন্যা। তাদের মধ্যে রোহিণী আদি সাতাশ জন নক্ষত্র নামে বিদিতা, তাদেরকে বিয়ে করেন চন্দ্র। সোমদেব সাতাশজন পত্নীর মধ্যে রোহিনীকেই বেশি ভালোবাসতেন। সেই একজনই যেন তার বল্লভা, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া ও শ্রেষ্ঠা। অন্য ছাব্বিশজন পত্নীকে যেন দাসীর মতোই ভাবেন। রোহিণীকে নিয়ে নানা কানন দেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। চন্দ্রের এই ব্যবহার অন্য পত্নীরা সহ্য করতে পারল না। পিতা দক্ষের কাছে গিয়ে জানাল। বলল– বাবা, তোমার জন্যই সোমদেব আমাদের সকলকে ছেড়ে কেবল রোহিণীকে নিয়েই আমোদ-প্রমোদে মেতে আছেন। একটি রাত্রির জন্যও আমরা তাঁর সেবার সুযোগ পেলাম না। আমাদের কোন দোষ নেই। এখন আমাদের মরণ শ্রেয়। কন্যাগণের এমন দুঃখের কথা জেনে দক্ষ জামাতা চন্দ্রের কাছে গিয়ে বললেন– হে শশধর, তুমি আমার সাতাশটি কন্যাকে বিয়ে করেছ। কাজেই তোমার সকলের সঙ্গে সম ব্যবহার করাই উচিত। তা না হলে তুমি দোষভাগী হবে।

চন্দ্রদেব শ্বশুরের কথায় লজ্জা পেল। মাথা নিচু করেই বললেন– আমি শপথ করে বলছি, এবার থেকে সবার সঙ্গেই তুল্য ব্যবহারই করব।

চন্দ্রের কথায় দক্ষ খুশি হয়ে সকল কন্যাগণকে চন্দ্রের কাছে রেখে চলে গেলেন নিজের ভবনে। চন্দ্র কিন্তু ‘যথা পরং তথা পরং’, যেমন ছিল তেমনিই রইলেন। সেই রূপবতী রোহিণীতেই তাঁর মন, অন্য কাউকে চান না তিনি।

স্বামীর স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হল না দেখে, সেই ছাব্বিশজন দক্ষ কন্যা পুনরায় পিতা দক্ষের ভবনে উপস্থিত হল। তাদেরকে রুক্ষ, দীনা, কৃপা দেখে দক্ষ খুব দুঃখ ভরেই বলতে লাগলেন– তোমাদের এমন মলিন বেশ দেখছি কেন?

কন্যারা বলল– আমাদের স্বামী সেই আগের মতোই রয়েছে। রোহিণীকে নিয়েই তার সময় কাটে। সেই চন্দ্র, আপনার কাছে কথা দিলেন শপথ করে। কিন্তু সেই শপথের কথা ভুলে গিয়ে অর্থাৎ আপনাকে অবজ্ঞা করেই আমাদের সঙ্গ থেকে দূরে রয়েছেন। কন্যাদের মুখে এমন কথা শুনে দারুণভাবে কুপিত হলেন দক্ষ। তাড়াতাড়ি চন্দ্রের কাছে গিয়ে শাপ দিলেন। চন্দ্র তুই আমার বাক্যে অনাদর করে সকলকে বাদ দিয়ে কেবল রোহিণীতেই রত হলি। যক্ষা গ্রাস করবে তোকে, আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হবে না।

দক্ষের শাপে চন্দ্রের দেহে যক্ষা ব্যাধি প্রবেশ করল। দিন দিন ক্ষয় পেতে লাগলেন। দাঁড়িয়ে থাকবার মতো ক্ষমতাও হারিয়ে ফেললেন। পড়ে গেলেন ভূমিতে। রোহিণীকে বললেন– দেবী এখন আমি কি করব? তোমার বাবার শাপে আমি-ব্যাধিগ্রস্ত। রোহিণী কাঁদতে কাঁদতে বলল– প্রভু আপনাকে যিনি শাপ দিয়েছেন তারই শরণ নিন। তিনিই আপনার রোগমুক্তির ব্যবস্থা বলে দেবেন। তিনি যদি তুষ্ট হন তাহলে দেবদুলভ আবার সুন্দর দেহ লাভ করবেন।

রোহিণীর কথামতো চন্দ্র শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন– পিতা আপনি আমার প্রতি ক্রোধ ত্যাগ করে আমাকে কৃপা করুন, আমার রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করুন।

চন্দ্রের দুঃখ দেখতে না পেরে দক্ষ তখন বললেন–হে সোম, আমি শাপ দিলে দেবতারা তা রোধ করতে পারবে না। দেখ আয়ু, কম, বিঙ্গ, বিদ্যা ও নিধন– এ সকল পূর্ব নির্দিষ্ট। কারুরই ক্ষমতা নেই তাকে খণ্ডন করা। একমাত্র মহেশ্বর পারেন। তাঁর দয়ায় এই শাপ মুক্ত হতে পারে। দক্ষের উপদেশ শুনে চন্দ্র হাতজোড় করে, বললেন– আপনি যখন আমার প্রতি কৃপা করে এই উপদেশ দিলেন, এবার বলুন তিনি কোথায় বিরাজ করেন? কোথায় আমি তার দেখা পাব? দক্ষ বললেন– পশ্চিম সাগরে তীরে পরম লিঙ্গ বিরাজ করছেন। তা হাত দিয়ে ছোঁয়া যাবে। সেখানে তুমি গিয়ে কঠোর তপস্যা কর। শরীরকে তুষ্ট করে তুমি নির্মল হও, অজর দেহ লাভ কর। এইরূপ দক্ষের উপদেশ লাভ করে চন্দ্র প্রভাসতীর্থে উপনীত হলেন। সাগরের দক্ষিণ তীরে কৃতস্মর নামে সুন্দর একটা পর্বত দেখতে পেলেন। নানা বৃক্ষ শোভিত, নানা পক্ষীর কলরব মুখরিত, সেখানে বহুমুনি বাস করেন। চন্দ্র সেখানে গিয়ে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ দর্শন করে সাতবার প্রদিক্ষণ করলেন। তারপর প্রতিজ্ঞা করলেন, হয় মরণ, না হয় শিবের শরণ, এই নিশ্চয় করে ফলমূল খেয়ে এক হাজার বছর তপস্যা করলেন।

প্রসন্ন হলেন মহাদেব। বর দিতে এলেন– হে চন্দ্র, বল কি চাই তোমার? তুমি বল আমি নিশ্চয় তা পূরণ করব।

সবশেষে বললেন– প্রজাপতি পুত্র দক্ষ আমায় শাপ দিয়েছেন, তাই আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। এখন আপনি এই ক্ষয়রোগগ্রস্ত পাপ রোগীকে রক্ষা করুন।

দেবাদিদেব মহাদেব বললেন– হে চন্দ্র, তুমি দক্ষের যে সকল কন্যাকে বিবাহ করেছ সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার করবে। তুমি জ্ঞানবান হয়ে এ বিষয়ে আর শোক করো না। এই যে সাগরের তীরে একটি লিঙ্গ আছে। লিঙ্গের ন্যায় আমার আরো একটি লিঙ্গ ধরণীর গভীরে চলে গেছে। মুরগীর ডিমের মতো দেখতে, সর্পের খোলায় ঢাকা, এটা আমার পরম আদি তেজ। ওই সাগরের মধ্যে তিনশত ধনু নিম্নে ওই লিঙ্গ আদিকল্পে মহর্ষিগণের শাপে পতিত হয়েছিল। তুমি ওই লিঙ্গটি এনে স্পর্শ লিঙ্গের কাছে স্থাপন কর। বিশ্বকর্মার দ্বারা বিশেষভাবে তৈরি করে মহর্ষিগণের সঙ্গে ব্রহ্মাকে এনে যজ্ঞ করে ওই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করবে।

এই কথা বলে মহেশ্বর চন্দ্রের ক্ষরিত দেহ নিজ মস্তকে ধারণ করে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। চন্দ্রও শিবের বর লাভ করে আপন প্রভা লাভ করলেন বলে ওই স্থানের নাম প্রভাস। দক্ষের শাপ একেবারে বৃথা হল না, সেইজন্য চন্দ্রের গায়ে কলঙ্ক চিহ্ন আছে। চন্দ্র মহেশের কাছেই বর লাভ করে জগতে প্রভা দান করতে লাগলেন।

তারপর মহাদেবের উপদেশ অনুসারে চন্দ্র দেব যথাবিস্মিত সেই পতিত লিঙ্গ উদ্ধার করে বিশ্বকর্মার দ্বারা নবরূপে নির্মিত করে ব্রহ্মার দ্বারা যথাবিহিত যজ্ঞ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করলেন। চন্দ্র ব্রহ্মার সঙ্গে সেই প্রভাস ক্ষেত্রেই লিঙ্গ আরাধনা করলেন।

ঘনবাহনের সোমবার ব্রত

কৈলাশ পর্বতের উত্তরে নিষধ পর্বতের উপরে এক বিশালপুরী–নাম স্বয়ংপ্রভা। ইন্দ্রের অমরাবতীর মতই সুন্দর সেই পুরী। ঘনবাহন নামে এক গন্ধর্ব সেখানে বাস করেন। তিনি তার সুন্দরী পত্নীর গর্ভে আটটি পুত্র. ও সবশেষে একটি কন্যা সৃষ্টি করেন। সেই কন্যার রূপের তুলনা হয় না। নাম গন্ধর্বসেনা, যৌবনে সে সখীগণের সঙ্গে বনে বনে ঘুড়ে বেড়ায়, নানান খেলায় মেতে থাকে।

যুবতী কন্যা কুমারী অবস্থা থাকলে বাবা-মার চিন্তার শেষ থাকে না, এমন রূপসী কন্যার আবার রূপবান পাত্রের দরকার। তবু ঘনবাহন ভাবলেন, কন্যাকে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করি, সে কেমন স্বামী চায়?

একদিন কন্যাকে বললেন– সেইকথার উত্তরে গন্ধর্বসেনা নিজ রূপের গর্ব করে বলল –আমার রূপের কোটি অংশের অনুরূপ পুরুষ আছে কি? কন্যার এমন অহঙ্কার পূর্ণ কথা শুনে মা-বাবা সহ সকল বন্ধু-বান্ধবও খুব অবাক হলেন, দুঃখিতও হলেন। একদিন গন্ধর্বসেনা দোলায় চড়ে সখীদের সঙ্গে বনে আনন্দ উপভোগ করছেন। এমন সময় এক গণনায়ক বিমানে চড়ে আকাশ বিচরণ করার সময় গন্ধর্ব সেনাকে দেখতে পেলেন। কুমারীগণ সকলেই নাচ-গানে মত্ত, গণনায়ক সেখানে নামলেন বিমান থেকে।

তখন সেই গণনায়ককে দেখে গন্ধর্বসেনা তার সখীদের বলল– দেবতা, দানব গন্ধর্ব বা মানব কাউকে আমার রূপের কোটি অংশের একাংশেরও যোগ্য দেখতে পাই না।

গন্ধর্বসেনার এমন গর্বিত বাণী শুনে গণনায়ক রেগে গিয়ে পাপ দিলেন- হে সুন্দরী, পদ্মনয়নে তুমি আমাকে দেখে যে রূপ সৌভাগ্য গর্বে দেবতা, গন্ধর্বগণকেও নিন্দা করছ, সেজন্য তোমার সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ ব্যাধি হবে।

নিদারুণ শাপ শুনে গন্ধর্বসেনা ভয়ে কাঁপতে লাগল, সেই গণনায়কের পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল– আমাকে ক্ষমা করুন, আমি কখনই এমন কথা আর বলব না। এই দীনার প্রতি কৃপা করে শাপমোচনের ব্যাখ্যা করুন।

তখন গণনয়ক বললেন–দেখ গন্ধর্বসেনা, জাতি, রূপ, বিদ্যা ও সম্পর্কে মধ্যে যে-কোন একটা লাভ করে যে গর্বিত হয়, তার সেটি বিনষ্ট হয়, তাই গর্ব করা উচিত নয়, এখন শাপমোচনের

বিষয় বলি শোনো–হিমালয় পর্বতে গোশৃঙ্গে নামে এক ঋষিবর আছেন তিনি তোমাকে এ বিষয়ে উপদেশ দেবেন।

এই কথা বলে গণনায়ক চলে গেলেন। গন্ধর্বসেনাও কাঁদতে কাঁদতে বাবা-মার কাছে সব বলল। কন্যার এমন কথা শুনে গন্ধর্বরাজ ও তার পত্নী ভীষণভাবে শোকাহত হয়ে গোশৃঙ্গ ঋষির আশ্রমে গেলেন। তাঁকে প্রণাম ও তার বহু স্তবস্তুতি করে মেয়ের অভিশপ্তর বিষয় বললেন– হে ঋষি, এই অধীনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে যাতে আমার কন্যার কুষ্ঠ মোচন হয় এমন উপায় বলুন।

গোশৃঙ্গ ঋষি বললেন– সমুদ্রের তীরে সোমেশ্বর নামে এক বিখ্যাত শিবলিঙ্গ আছে, সর্বব্যাধি বিনাশ ও সকল সিদ্ধির জন্য নিয়ম করে একাহারে থেকে সোমেশ্বর লিঙ্গের পূজা করে, সসামবার ব্রত করে শিবের আরাধনা কর। তাহলে তোমার পুত্রীর শাপমোচন হবে।

তখন লিঙ্গ আরাধনার ইচ্ছা প্রকাশ করে ঘনবাহন জিজ্ঞাসা করলেন- হে ঋষি, সোমবার ব্রত কেমন করে করতে হয়? এর বিধি কি? কোন্ সময়ে করতে হয়?

গোশৃঙ্গ বললেন– চন্দ্র দক্ষের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে শম্ভুর আরাধনা নিয়ম করে রোগ মুক্ত হয়ে সোমেশ্বর লিঙ্গের পূজা করেন। এবার পূজার বিধি শোন- যে কোনো মাসের শুক্লপক্ষে সোমবার এই ব্রত করতে হয়। প্রভাতে গাত্রোত্থান করে দন্তমার্জনা ও স্নানে শৌচ করে নিত্যকর্ম সাধন করে সমতল ক্ষেত্রে সুশোভিত কুম্ভ স্থাপন করবে। কুম্ভের উপরে আম্রপল্লব, চন্দন, শ্বেতবস্ত্র ও আভরণ দেবে। অপরদিকে সোমনাথের অষ্টমূর্তির পূজা করবে। নানারকম ভক্ষ ভোজ্য ফলমূলাদি নিবেদন করবে। দিনে ও রাত্রিতে এইভাবে পূজা করে রাত্রিতে ফুলশয্যায়ে শয়ন করে ধ্যান করতে হবে।

তারপর ঋষিবর পূজার মন্ত্রও বলে দিলেন। পরবর্তী সোমবারগুলিতে যা যা করতে হবে তাও বলে দিলেন। ব্রাহ্মণগণকে দান করার বিধিও জানিয়ে দিলেন। তারপর এইভাবে ব্রত করলে অক্ষয়পুণ্য লাভ হয়। ধনধান্য বৃদ্ধি হয়। পুত্র লাভ হয়। অপুত্রক এই ব্রত করলে পুত্র লাভ করে। এই ব্রতে বন্ধ্যারও পুত্র হয়। এই ব্রত সাধক বা সাধিকা দেহত্যাগের পর শিবপদ লাভ করে। এই সোমবার ব্রত বিধি বললাম। এখন যেখানে সোমেশ্বর লিঙ্গ বিরাজ করছে সেখানে যাও। ঋষি গোশৃঙ্গের এমন উপদেশ পেয়ে ঘনবাহন পূজার সকল উপকরণ সংগ্রহ করে শম্ভুর সোমবার ব্রত গ্রহণ করলেন।

গন্ধর্বরাজ ঘনবাহন শিবের কাছে বর লাভ করে ভক্তি করে সোমেশ্বরের উত্তরে দন্তপাণির কাছে শিবলিঙ্গ স্থাপন করলেন। তার নাম হল গন্ধকেশ্বর।

বামন পুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ

উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

১

আমরা উচ্চারণ করি ‘নারায়ণ নরোত্তম নর দেবী সরস্বতী’ এবং ব্যাসদেবকে নমস্কার করি। আমরা সর্বদা নমস্কার করি সেই বামনের ছদ্মবেশ ধারণকারী বিষ্ণুকে যিনি বলিরাজের স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য গ্রহণ করে ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন।

নারদ পুলস্ত্য ঋষিকে একসময় বামন পুরাণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। মহর্ষি নারদ বললেন–হে ব্রাহ্মণ! আমার মনের সন্দেহ নিরুপণের জন্য আমার জিজ্ঞাসা– কেন ভগবান বিষ্ণু বামনরূপ ধারণ করেছিলেন? প্রহ্লাদ দৈত্যবংশে শ্রেষ্ঠ সন্তান হয়েও কেন দ্বিজশ্রেষ্ঠ? আমার সন্দেহ নিরুপণ করুন কারণ আপনি জানেন দক্ষরাজের প্রিয়তমা কন্যা নিজের শরীর ত্যাগ করে গিরিরাজ হিমালয়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করে পুনরায় দেবাদিদেব মহাদেবের পত্নীত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি আরও জানতে চান তীর্থস্থানগুলির স্থানমাহাত্ম্য, দানের ফল এবং বিভিন্ন ব্রতের বিধিনিয়ম। মুনিবর পুলস্ত্য নারদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন–তিনি বামন পুরাণের বিষয়বস্তু প্রথম থেকে শেষ অবধি বলবেন।

গ্রীষ্মকালের উপস্থিতি লক্ষ্য করে দেবী হৈমবতী মন্দার পর্বতে বসে মহেশ্বরকে বললেন– গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ বশতঃ এই স্থানে দিনযাপন করা যাবে না। এর উত্তরে মহাদেব বললেন– আমার কোনো আশ্রয় নেই। সব সময় বনে ঘুরে বেরিয়ে কাল কাটাই। এরপর গ্রীষ্মকালটা অতি সহজেই ব্রক্ষতলে কাটিয়ে দিলেন শঙ্কর সতী।

এরপর বর্ষাকাল উপস্থিত হল, ঘোর মেঘের অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন হল। এরপর সতী তাঁর অন্তরের ভয়ের সঞ্চারের কারণ স্বরূপ মহাদেবকে বললেন– বর্ষাকালের উপস্থিতিতে প্রবল ঝড় প্রবাহিত হচ্ছে, তাই আমার ভয় হয়।

এরপর বর্ষাকালের স্বরূপ বর্ণনায় তিনি বললেন– নীল মেঘগুলিতে ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ময়ূর কেকা শুরু করেছে, বৃষ্টির বিন্দুতে বক, হাঁসেরা মেঘের ভজনা করছে। বাতাসের আঘাতে কদম্ব, শাল, অর্জুন, কেতকী গাছের ফুলগুলি বাতাসের আঘাতে ঝরে পড়ছে। হাঁসেরা মেঘের ভয়ংকর গর্জন শুনে সরোবর পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। দুর্জন লোকের আচরণে সৎলোকেরা যেমন নিরাপদ নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে চলে যায়, দেখা যাচ্ছে হরিণেরা দ্রুত অন্যত্র চলে যাচ্ছে তাদের খেলা ত্যাগ করে।

মেঘেরা ক্রমশ খুশিতে বনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সবুজ ঘাসের চাদরের মতো আকাশ মেঘের চাদরে ঢাকা পড়ে আছে। ঘাসের ফুলের মতো সূর্য মেঘাচ্ছন্ন হয়ে মলিন ভাবে বিরাজ করছে আর সুর্যের প্রতি মমতা বশতঃ আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে, নদী দ্রুত ধাবিত হচ্ছে, শাল গাছে পরিপূর্ণ স্থান। দেবীর কথা এযেন দুর্জন লোকের চিত্র স্বরূপ। অসতী নীচ মনোবৃত্তির নারী অসদাচরণ করে মেঘের আঁধারের আড়ালে। শালফুল, কদমফুল, শ্রীফুল, নদীর জল সরোবরের পদ্মের পত্র এই পরিপূর্ণ বর্ষায় প্রধান হয়ে উঠল। দেবী তাই বলেন মন্দার পর্বতে ঘর তৈরি করুন, যাতে রোদের উত্তাপে কষ্টদায়ক ঋতুতে শান্তিতে বাস করা যায়।

সতীর মধুর বচন শুনেও মহাদেব বললেন–যে-ঘর নির্মাণের মতো সঞ্চিত ধন তাঁর কাছে নেই। এরপর তাঁর দুরাবস্থা বোঝাতে বেশভূষার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, বাঘছালে তিনি শরীর আচ্ছাদন করেন, সর্পরাজ তার উপবীত, পদ্ম ও বিঙ্গল নামক সাপ তাঁর কানের কুন্তল, কম্বল ও ধনঞ্জয় নামক সাপ তাঁর কেয়ূর রূপে শোভা পাচ্ছে। আর অশ্বতর ও তক্ষক নাগ তাঁর ডান ও বা হাতের কাঁকন। নীলাজ্ঞ পায়। এরপর সতী শঙ্কিত হয়ে পরেন পুলস্ত্যর কথা শুনে। এরপর সতী ক্রুদ্ধ হয়ে বিলাপ শুরু করেন এবং বেদনা, লজ্জা ও রাগে মুখ নিচু করে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। এরপর সতী মহাদেবের কাছে জানতে চান, তবে কি এই ব্রক্ষতলেই তাঁদের বর্ষাকাল অতিবাহিত করতে হবে? শঙ্কর এর উত্তরে বলেন যদি মেঘপুঞ্জের মধ্যে বাস করা যায় তাহলে আর শরীরে বৃষ্টির জল পড়বে না। পুলস্ত্য জানালেন, এরপর শঙ্কর সতীকে নিয়ে মেঘখণ্ডে আরোহণ করে বাস করতে শুরু করলেন এবং সেই থেকে তিনি ধরিত্রিবাসীর কাছে জীমূতকেতু নামে বিখ্যাত হলেন।

২

পুলস্ত্যের কথা অনুযায়ী, এরপর শরৎকালের আগমন হল। মেঘের ওপর বর্ষাকাল কাটানোর পর, শরৎকালের আগমনের সাথে সাথে আকাশের বাদলা মেঘ অদৃশ্য হল, গাছে মুকুলোদগম হল। নদীর তীরে দেখা দিল কাশফুল, জলাশয় পরিষ্কৃত হল, পদ্ম সুগন্ধীত হল, অগরু চন্দনের শীর্ষ সঞ্চার আরম্ভ হল, পদ্ম প্রস্ফুটিত হল, চন্দ্র কিরণের দীপ্তি বেড়ে উঠল, লতা ফুলে ভরে উঠল, গবাদি পশুরা আনন্দিত হল, সাধুরা সন্তুষ্ট মনে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সরোবরে পদ্ম, আকাশে তারারা, জলাশয়ের শুদ্ধতা, সাধুগণের হৃদয়ে মমতা সরলতা এবং জ্যোৎস্নার নির্মলতা বিরাজ করতে লাগল।

এই মনোরম সময়ে সতীকে মন্দার পর্বতে নিয়ে গেলেন মহাদেব। এরপর মহাদেব ও সতী মহা সুখে শরৎকাল অতিবাহিত করলেন সেই পর্বতের সমতল শিলাভূমিতে। শরৎ অতিবাহিত হবার পর প্রজাপতি দক্ষ ও বৈকুণ্ঠ অধিপতি বিষ্ণুর জাগরণের পর এক যজ্ঞের আয়োজন করে দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে ও কাশ্যপপ্রমুখ ঋষিদের আহ্বান করলেন এবং যজ্ঞ ক্রিয়ার কর্মে নিয়োগ করলেন। এছাড়াও অন্যান্য কাজে নিয়োগ করলেন যথাক্রমে অরুন্ধতীর সঙ্গে পারদর্শী বশিষ্টকে, অনসূয়ার সঙ্গে অত্রিকে। ধৃতির সঙ্গে কৌশিকাকে, অহল্যার সঙ্গে গৌতমকে, মায়ার সঙ্গে ভরদ্বাজকে, চন্দ্রার সঙ্গে অঙ্গিরস ঋষিকে এবং বেদ-বেদান্ত পারদর্শী ঋষিগণকে। চন্দ্রার সঙ্গে অঙ্গিরসকে নিযুক্ত করলেন অরিষ্টনিসিক যজ্ঞের কাঠ, মিষ্টান্ন এবং পানীয় দ্রব্য সংগ্রহের ব্যাপারে, মহাত্মা ভৃগু পারদর্শিতার দরুন নিযুক্ত হলেন যজ্ঞ সংস্কারের কাজে। শুচি সহকারে ধনাধিপতিত্বে দক্ষ বরণ করলেন রোহিণীর সঙ্গে চন্দ্রদেবকে।

প্রজাপতি সকল কন্যা ও জামাতাকে যজ্ঞে আমন্ত্রণ করলেন। কেবল গৌরী ও শঙ্করকে বাদ দিয়ে। এর কারণ নারদ দক্ষের কাছে জানতে চাইলেন, কেন তিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ দেব মহাদেবকে যজ্ঞে আমন্ত্রণ করলেন না। পুলস্ত্য এর উত্তরে জানালেন, দরিদ্র হবার দরুণ দক্ষ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ মহাদেবকে যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানাননি। পুনরায় নারদ জানতে চাইলেন, দেবরাজ নলপাণি ত্রিলোচন হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে কপালী হলেন?

পুলস্ত্য নারদকে জানালেন, যে তিনি একথা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার আদিপুরাণ অনুযায়ী বলছেন। নিমজ্জিত হবার দরুণ সংসার তখন ছিল ভাবাভাবরহিত বিচার বিবেচনা শক্তির অগম্য ও অবিজ্ঞেয়। বৃক্ষ, তৃণ ছিল জলমগ্ন। এই দুর্দিনে সব তমসাচ্ছন্ন ছিল। হাজার বছর ধরে এই অন্ধকারে অনন্ত জলরাশির মধ্যে ভগবান বিষ্ণু নিশাকাল শুয়েছিলেন। রাত্রি অবসানে লোকনাথ দ্বারা, ব্রহ্মা সৃষ্টি পেলেন এবং বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী অদ্ভুত দর্শন পঞ্চানন ব্রহ্মা প্রকাশিত হলেন। এরপর আবির্ভাব ঘটল তমাময় ত্রিলোচনের। তিনি ধারণ করলেন শূল, জটা ও অক্ষমালা। এরপর ব্রহ্মা ও শঙ্কর ভগবান বিষ্ণু সৃষ্ট অহঙ্কারের বশীভূত হলেন।

মহাদেব তখন অহঙ্কারে আবেশ হয়ে ব্রহ্মার কাছে জানতে চাইলেন, তিনি কে? কে তাকে এখানে এনেছে? কে তাকে সৃষ্টি করেছে? ব্রহ্মাও অহঙ্কারে উদ্ধত হয়ে জানতে চাইলেন মহাদেব কে? তার পিতা-মাতাই বা কে? পুলস্ত্য নারদকে জানালেন এইভাবেই উৎপত্তি নিয়ে ব্রহ্মা ও শঙ্করের মধ্যে বিবাদ দেখা দিয়েছিল। তিনি এও জানালেন সেই সময়ই নারদের

উৎপত্তি হয়। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর বীণা ধারণ করে কিল কিল শব্দ করতে করতে আকাশে উৎপত্তি হলেন এবং রাহুকবলিত চাঁদের মতো শঙ্কর ব্রহ্মার কাছে পরাজিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এর চক্রাধান্ধ পরাজিত রুদ্রকে ব্রহ্মা বললেন, তিনি তাকে চেনেন। তিনি তমোমূর্তি, ত্রিলোচন, দিগম্বর বৃক্ষরোহী ও লোকসংহারকর্তা। এরপর চোখ রাঙিয়ে শংকরব্রহ্মার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন যেন তিনি জগৎ দগ্ধ করে দিতে চান।

সেই সময় সাদা-নীল, নীল, মিশ্র ও সোনার মতো বর্ণে রঞ্জিত পাঁচটি বস্তুর উৎপত্তি হল ত্রিলোচন এবং তিনি বীভৎস আকৃতি ধারণ করলেন। এর ফলে ব্রহ্মা শঙ্করের পরাক্রম দেখাবার জন্য উদ্দিপ্ত করে তাঁকে জড়বুদ্ধিতে অভিভূত করলেন। এর ফলস্বরূপ ক্রুদ্ধ শঙ্কর নখের অগ্রভাগ দিয়ে ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করলেন। শঙ্কর তাঁর বাম করতলে সেই ছিন্ন মস্তককে সংলগ্ন করলেন। যা কখনই করতল বিচ্যুত হল না। ব্রহ্মা তখন ক্রোধান্বিত হয়ে এক বীরপুরুষের জন্ম দিলেন। যিনি কবচকুণ্ডল ও শরধারী, মহাবাহু, অক্ষয়ন বাণশক্তি ধর, চতুর্ভুজ মহাতুণী ও আদিত্যের মতো বীর্যবন্ত। বীরপুরুষ তখন মহাদেবকে বললেন–যে, তাকে তিনি হত্যা করবেন না কারণ তিনি পাপী, পাপীকে হত্যা তিনি করবেন না। পবিত্রসলিলা সরস্বতী নদী বয়ে চলেছে নারায়ণ স্থান বদরিকাশ্রমের পাশ দিয়ে সেই স্থানে পার্বতী ও মহেশ্বর চলে গেলেন বীর পুরুষের কথা শুনে। সেই স্থানে গিয়ে শঙ্কর ভগবান নারায়ণের কাছে ভিক্ষা চাইলে নারায়ণ মহেশ্বরকে বললেন, ত্রিশুল দিয়ে তাঁর বামহাতে আঘাত করতে।

এরপর ত্রিশূল দিয়ে মহেশ্বর নারায়ণের বাম হাতে আঘাত করলে তা থেকে তিনটি রক্ত ধারা প্রবাহিত হল যার একটি নক্ষত্ররাশি পরিবেষ্টিত আকাশে আশ্রয় গ্রহণ করল। দ্বিতীয় ধারা পৃথিবীতে ঋষিগণ গ্রহণ করলেন। যার থেকে অত্রি ঋষি ও দুর্বাসা ঋষি উদ্ভূত হলেন। তৃতীয় ধারা ভীষণ দর্শন মহেশ্বরের কপালে পতিত হল। যা থেকে এক যুবা বীরপুরুষ আবির্ভূত হল। কবচধারী এই বীরপুরুষ তখন ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে মেঘের মতো গর্জন করে বলল, কার কাধ থেকে তাল ফলের মতো মাথা বিচ্ছিন্ন করবো।

৩

শংকর সৃষ্ট এই বীরপুরুষ তখন ব্রহ্মার সৃষ্ট বীরপুরুষের পরিচয় দিয়ে বলল, এই পুরুষ শতসূর্যের মতো জাজ্বল্যমান এক দস্যুকে বিনাশ করো। সেই বীর সঙ্গে সঙ্গে তখন অক্ষয় বাণ নিয়ে প্রসিদ্ধ ধনুতে সংযোগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। এরপর এই দুই বীরপুরুষের মধ্যে সহস্র বৎসর ধরে ঘোরতর যুদ্ধ হল। এরপর শঙ্কর ব্রহ্মাকে জানালেন অসাধারণ বাণ

নিক্ষেপকারী আপনার পুত্র নারায়ণের বাহুজাত বীরপুরুষ মহাবাণের দ্বারা পরাজিত হয়েছেন। ব্রহ্মা তখন মহেশ্বরকে জানালেন, এই অজেয় বীরপুরুষ আমার বীরপুরুষের কাছে পরাজিত হয়েছে। এরপর ব্রহ্মা সূর্যমণ্ডলে ও শঙ্কর বীরপুরুষকে ধর্মপুত্র পরায়ণের বিগ্রহে নিক্ষেপ করলেন।

পুলস্ত্য জানালেন, এই দারুণ নরকপাল রুদ্রের করতলে লেগে থাকার ফলে তিনি চিন্তিত ও সন্তপ্ত হয়ে পড়লেন। তখন এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য নীলাচলের মতো বৃহৎ পিঙ্গল কেশধারী ব্রহ্মহন্তক শঙ্করের কাছে এলো। তখন এই ভয়ঙ্কর মূর্তিকে শঙ্কর বললেন, কেন তিনি তাঁর কাছে এসেছেন। তখন সেই মূর্তি জানালেন তিনি ব্রহ্মহত্যা এবং তিনি ত্রিশূল পানি রুদ্রদেবের শরীরে প্রবেশ করবেন। যমুনা নদীতে যখন চিন্তিত শোকাছন্ন মহাদেব স্নান করবার জন্য গেলেন তখন ধর্মপুত্র নারায়ণ ঋষির দেখা না পেয়ে তখন যমুনা নদীর জল শুকিয়ে গেল। তখন মহাদেব বৃষে আরোহণ করে সরস্বতী নদীতে স্নান করতে গেলেন। এরপর সরস্বতী নদী অদৃশ্য হলে পুরষ্কারারণ্য, মাগধারণ্য ও সৈন্ধবারণ্যে গিয়ে নিজের মনের মতো স্নান করলেন। এরপর তিনি ধারণ্যে ও নিমিষারণ্যে গিয়ে স্নান করলেন। তথাপি ব্রহ্মহত্যা তাকে ত্যাগ করল না। বিবিধ রকম ব্রত পালন, আশ্রম দেবালয়ে গিয়ে স্নান করেও ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে মুক্তি লাভ করলেন না। এরপর শঙ্কর হে দেবতা নাথ বলে কুরুজঙ্গল গিয়ে আকাশের মধ্যে শঙ্খচক্রগদাধারী পদ্মলোচন নারায়ণের স্তব করতে লাগলেন।

স্তব করতে করতে বললেন– আপনি সকলের আশ্রয় স্বরূপ ও অন্তর্যামী। আপনি গুণাতীত ও রজোগুণ সম্পন্ন। আপনি সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করেছেন। আপনি সত্ত্বগুণান্বিত ও তমোমূর্তি সম্পন্ন, আপনার ক্রোধাংশ অহংভাব উৎপন্ন করে। মহাদেব বলেন যে নারায়ণ পৃথিবী, অনল, সলিল ও আকাশ, বায়ু বুদ্ধি মন, ধর্ম যজ্ঞ তপস্যা, সত্য, অহিংসা, শৌচ সরলতা ক্ষমা দান, দয়া, লক্ষ্মী, ব্রহ্মচর্য এবং ঈশ্বর তিনি চতুর্বেদ ও বেদ। প্রতিপাদ্য বস্তু বেদ পারদর্শী ও উপবেদ, ঈশ্বর ও সমস্ত মহাদেব তাকে নমস্কার করে বলেন আপনি সংসারের সবার প্রতি দয়ালু আমাকে পাপ বন্ধন থেকে মুক্তি দিন। আমার অমঙ্গল নাশ করে ব্রহ্মহত্যা পাপজনিত অন্তর দহন থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

পুলস্ত্য জানালেন, নারায়ণ এরপর শঙ্করকে তার কথা মন দিয়ে শুনতে বললেন, তাহলেই তাকে ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে মুক্ত করবেন। তিনি এও বললেন–যে, তাঁর কথা অনুধাবন করলে মহাদেবের পাপ ক্ষয় হবে, পুণ্যকাল বাড়বে ও তাঁর কল্যাণ হবে। তিনি জানালেন প্রয়াগ

নামক পুণ্যক্ষেত্রে তাঁর দেহ উৎপন্ন এক অক্ষয় পুরুষ সর্বদা যোগনিদ্রায় শয়ন করেন যার ডান পা থেকে বরণা নদী নির্গত।

এই নদী সকল পাপের ক্ষয় করে মানুষের মঙ্গল বিধান করে। তাঁর বাম পা জাত আম নামক প্রসিদ্ধ নদী। এই উভয় নদীই সকলের কাছে পূজনীয়। এই দুই নদীর মধ্যেকার পাপ বিনাশক ত্রিলোক শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানে ভগবান যোগনিদ্রায় শয়ন করেন। ভগবান কেশব এই তীর্থের নিকটস্থ বারাণসী নামক পুণ্যধাম নগরে বাস করেন। এই স্থানে বিলাসিনী রমণীরা কাঞ্চীধ্বনির সাথে ব্রাহ্মণদের দেবগান স্বর মিশ্রিত মধুর রূপ উৎপন্ন হওয়ার দরুণ কুরুগণ বারবার হাসেন। এই স্থানে বাস করলে জনগণ আপনার মধ্যেই লীন হয়ে যায়, মহেশ্বরকে জানালেন একথা। এই স্থানের নারীদের আলতাচিহ্ন দেখে চাঁদও আশ্চর্য হয় স্থলপদ্ম বলে ভ্রম করে। এই স্থলে সূর্যরশ্মি বাধা পায় দিনের বাতাসে সঞ্চারিত সুদীর্ঘ পতাকাগুলিতে এবং রাত্রিতে চাঁদের কিরণ বাধা পায় উঁচু চুড়াতে। প্রলুব্ধ ভ্রমরেরা আকৃষ্ট হয় শ্বেতপদ্ম রূপে ভ্রমবশতঃ চাঁদের মতো সুন্দর অট্টালিকা দেখে।

এখানে জলাশয়ে জলকেলিরত পরীদের সাথে খেলাতে পরাজিত পুরুষরা ক্লান্ত তো হয়ই না বরং নারীদের কোন রূপ বিরূপ মন্তব্যও করে না, আসক্তিও প্রকাশ করে না। এখানে দেবালয়ের প্রবেশপথ বাতাসের সঞ্চালনে রুক্ষ হয় না। নারীদের প্রতি রতি প্রবৃত্তির সংযম হেতু কেউ অত্যাচার করে না। নারায়ণ এও বললেন–যে, এখানে বিলাসিনী রমণীরা মহাদেবের মতো মহানায়কের সঙ্গে মিলিত হয়ে চিকন শরীর লাভ করে। তিনি এও বললেন– যে, সুরশ্রেষ্ঠ মহাদেব এখানে গেলেই ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবেন। এরপর বৃষরোহী মহেশ্বর নারায়ণের কথা শুনে পাপ মুক্তির আশায় ভগবানকে প্রণাম করে গরুড়ের গতি নিয়ে বারাণসী যান এবং মহাদেব বারাণসীতে গিয়ে দশাশ্বমেধঘাট দেখেন ও তীর্থে স্নান করে ভগবান কেশবকে দেখার জন্য গেলেন ও তাকে হৃষিকেশ বলে সম্বোধন করলেন। তিনি জানলেন যে তাঁর অনুগ্রহেই মহাদেবের ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ ক্ষয় হয়েছে। তিনি মহাদেব কেশবের কাছে জানতে চাইলেন যে তথাপি তার হাত হতে কেন নরকপাল স্খলিত হচ্ছে না। এরপর কেশব তাঁকে সবিস্তারে জানালেন, তাঁর সমান পদ্মশোভিত দেবতা ও গন্ধবদের নিকট আদরণীয় পরম পবিত্র হ্রদে পুণ্য করলে তাঁর হাত হতে নরকপাল খসে পড়বে।

এর ফলে ঐ স্থান তীর্থস্থান বলে পরিগণিত হবে এবং রুদ্রদেব পৃথিবীতে কপালী নামে প্রসিদ্ধ হবেন। এরপর মহেশ্বর নরকপাল মুক্ত করার জন্য কেশবের কথানুযায়ী বেদ শাস্ত্রের

নিয়মানুযায়ী স্নান করলেন। এর ফল স্বরূপ মহেশ্বর নরকপাল মুক্ত হলেন এবং তীর্থস্থানটি কপাল মোচন নামে বিখ্যাত হল।

৪

পুলস্ত্য এরপর নারদকে বললেন, এইভাবে কপালী বলে পরিচিত হবার জন্য প্রজাপতি দক্ষ তাঁকে আমন্ত্রণ করেন নি। গৌতম কন্যা জরা যখন সতীর সাথে সাক্ষাতের জন্য মন্দার পর্বতে এলেন তখন সতী তাঁর কাছে জানতে চায় কেন বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা আসেননি? তখন জয়া জানায়, তাঁরা আমন্ত্রণ রক্ষার্থে গৃহস্বামীর গৃহে গেছে। অহল্যা ও গৌতমও গেছেন। সতী সেখানে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে কিনা তা জানতে জয়া এসেছে। জয়া জানতে চায় যে এই চতুর্দশ ভুবনের সমস্ত প্রাণী, ঋষি, ঋষিপত্নীগণ, দেবতারা এমনকি মাসীরা সকলে, চন্দ্রদেব ও তাঁর পত্নী ঐ যজ্ঞস্থলে গেছেন। তবু কেন তাঁরা আমন্ত্রণ পাননি? কেন মহেশ্বর নিমন্ত্রিত নন?

এইভাবে দেহ ত্যাগ করতে দেখে জয়া শোকে কাতর স্বরে কাঁদতে লাগল। এই ক্রন্দন শুনে শুলপানি মহাদেব জয়ার কাছে এলেন তার কান্নার কারণ জানতে। এসে দেখলেন কুঠারাঘাত ছিন্ন ভুলুণ্ঠিত লতার মতো সতীও ভুলুণ্ঠিত হয়ে আছে। সতীর এই দুর্দশার কথা জানতে চাইলে জয়া জানালেন যে, প্রজাপতির গৃহের যজ্ঞে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, আদিত্যগণ ত্রিভুবনের সকলে নিমন্ত্রিত। নারীরা সকলে তাদের স্বামীসহ নিমন্ত্রিত কেবল তারা নন, একথা শুনে সতীর শোকে এই দশা হয়েছে।

পুলস্ত্য নারদকে জানালেন, যে জয়ার কথা অনুধাবন করার সাথে সাথে মহেশ্বর রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। তাঁর সমস্ত শরীর থেকে আগুনের শিখা বেরোতে লাগল। তাঁর নোম থেকে বহু অনুচর ও তাদের দলপতিস্বরূপ সিংহ মুখাকৃতি বীরভদ্র নামক পুরুষ আবির্ভূত হল। অনুচরদের সাথে বীরভদ্র দক্ষ যজ্ঞে গেলেন। মন্দার পর্বত হতে হিমালয় ও কনখল থেকে তার নির্গত হয়ে যজ্ঞস্থানের উত্তরে দাঁড়ালেন।

যজ্ঞের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে গদা হাতে জয়া ও মহাদেব রুদ্রমূর্তি ধারণ করে যজ্ঞের মাঝে দাঁড়ালেন। তখন ঋষিগণ, গন্ধর্বগণ ও ইন্দ্রদেবগণ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ধর্মদেব এমতাবস্থায় তির ধনুক সহকারে সাপের মতো বীরভদ্রের দিকে ছুটলেন। বীরভদ্রও তখন চার হাতে

যথাক্রমে ত্রিশূল, ধনু, বাণ ও গদা গ্রহণ করে ধর্মরাজের দিকে ধাবিত হলেন। বর্ষাকালের বারিধারার মতো ধর্মরাজের দিকে অনর্গল শর বর্ষণ করলেন। ধর্মরাজও নানারূপ অস্ত্র খঙ্গ, গদা, পাশ, কুঠার, অঙ্কুশ, ধনু ও শর গ্রহণ করে বীরভদ্রকে বধকল্পে অবতীর্ণ হলেন, ক্রোধান্বিত এই দুই বীরপুরুষের রক্তাক্ত শির পলাশ ফুলসম হয়ে উঠল। ধর্মরাজ বীরভদ্রের কাছে পরাজিত হলেন এবং বীরভদ্র যজ্ঞস্থানে প্রবেশ করল। বীরভদ্রকে দেখে অষ্টবসু, সুদারান নবগ্রহ, দেবগণ, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, সিদ্ধ গন্ধর্ব পন্নগগণ, যক্ষগণ, কিম্পুরুষগণ, পক্ষীগণ, চক্রধরগণ, বিবস্বত বংশজাত রাজা, ধর্মকীর্তি, সোমবংশজাত মহাবাহু ভোজকীর্তি, দৈত্যগণ, দানবগণ ও অন্যান্য সকলে অস্ত্রসস্ত্র গ্রহণ করে ছুটে গেলেন।

বীরভদ্রও ধনুর্বাণ গ্রহণ করে সকলকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অস্ত্র নিক্ষেপ করে তাঁদের বিদ্ধ করতে লাগল। দেবতারা বীরভদ্র কর্তৃক শর বিদ্ধ হয়ে বারবার পরাজিত হয়ে জয়ের আশা পরিত্যাগ করে রণে ভঙ্গ দিলেন। এরপর বীরভদ্র যজ্ঞস্থানে গিয়ে ঋষিদের যজ্ঞে আগুনে ঘৃতাহুতিতে ব্যাঘাত ঘটালেন। তাকে দেখে বৈকুণ্ঠপতি মহর্ষিদের আশ্বস্ত করে বীরভদ্রকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র ধারণ করে সর্পসম তীব্র বাণ নিক্ষেপ করলেন।

শ্রীহরির এই বাণ বীরভদ্রর দেহ স্পর্শ করেই ভূপতিত হল। এরপর কেশব দিব্য অস্ত্রের দ্বারা বীরভদ্রকে বধ করতে উদ্যত হলেন। শূল, গদা ও শর দ্বারা বীরভদ্র গদাধরের প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রকে নিবারণ করলেন। এরপর মাধব গদা নিক্ষেপ করলেন। বীরভদ্র গদার অভিঘাত নিবারণ করলেন। এরপর শ্রীহরির লাঙ্গলকেও বীরভদ্র গদা দ্বারা নিবারণ করলেন। একে একে লাঙ্গল, মুষল ব্যর্থ হবার পর শহরি চক্র নিক্ষেপ করলেন। বিষ্ণু মৎস্য রূপ ধারণ করে মধু নামক দানবকে যেভাবে বধ করেছিলেন তেমনি শতসূর্যসম দীপ্তিময় চক্রকেও বীরভদ্র প্রতিহত করলেন।

চক্রর অবস্থা দেখে শ্রীহরি ক্রোধে রক্তাক্ত হয়ে উঠলেন। গণপতিকে ধরে মাটিতে পিষতে লাগলেন। শ্রীহরির বাহু ও উরুর পেষণে গণপতির মুখ থেকে রক্ত ও তার সাথে চক্র বেরিয়ে আসতে লাগল, যা দেখে শ্রীহরি তাকে পরিত্যাগ করলেন। পরাজিত বীরভদ্র এরপর মহেশ্বরের কাছে তার পরাজয়ের কথা জানালেন। রক্তে রাঙা গণপতিকে দেখে ক্রোধান্বিত মহেশ্বর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সাপের মত নিঃশ্বাস ফেলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। মহাদেব নিজে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করলেন বীরভদ্র ও ভদ্রকালীকে প্রবেশ করার আদেশ দিলেন। এরপর ঋষিগণের মনে ভয়ের সঞ্চার হল যখন তারা দেখল মহাদেব কর্তৃক দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে।

হরি এরপর কুজাম্ককাননে আশ্রয় নিলেন ক্রোধান্বিত রক্ত চক্ষু মহাদেবকে দেখে সীতা নামক এক পবিত্র নদীতে গেলেন। অষ্টবসুগণ সেখান থেকে পলায়ন করে। এরপর শঙ্করের মধ্যে বিলীন হলেন। বৃষারোহী ত্রিনয়ন রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধুগণ, মরুদগণ, অনল ও আদিত্যগণ পলায়ন করলেন। চন্দ্রদেব তখন যজ্ঞভূমি রাত্রির অন্ধকারে ঢেকে দিয়ে তারকাদের সাথে দ্রুত আকাশপথে আরোহণ করে নিজস্থানে চলে গেলেন। দুই হাতে ফুল নিয়ে কশ্যপ প্রভৃতি ঋষিগণ ভয়ে শতরুদ্রিয় মন্ত্র জপ করতে করতে প্রণামের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দক্ষপত্নীরা প্রবল, পরাক্রমশালী রুদ্রকে দেখে ইন্দ্র ও দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে বিলাপ করতে লাগলেন। শঙ্কর এরপর করতলের আঘাতে অনেক দেবসৈন্য বধ করলেন। মহাদেবের ত্রিশূলাঘাত ও পদাঘাতে দেবতাদের অনেকে মারা গেলেন। অনেকে তার দৃষ্টিপাতে ভস্মীভূত হল। শঙ্করের হাতে দেবতা ও ঋষিগণকে নিহত দেখে সূর্যদেব দুইহাত প্রসারিত করে ছুটে গেলেন। নিজের এক হাত দিয়ে মহাদেব পূষার দুই হাত চেপে ধরলেন। এই রূপ নিগ্রহের ফলে তার দুহাতের আঙুল দিয়ে রক্তধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। কিরণমালাধারী সূর্যদেবকে ধরে সিংহের হাতে মৃগশাবকের ন্যায় প্রবলবেগে চারিদিকে ঘোরালেন। এর ফলে তার স্নায়ু ছিঁড়ে গেল এবং হাত ছোট হয়ে গেল। তিনি রক্তস্নাত হয়ে গেলেন। মহেশ্বর তাঁকে ছেড়ে তখন অন্যত্র চলে গেলেন। এরপর পূষার পুনরায় তাকে অবজ্ঞা ভরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করলে তাঁর দুর্ব্যবহারে মহেশ্বর পূষার দাঁত ভেঙ্গে মাটিতে ফেলে দিলেন। পূষার দাঁত ভেঙ্গে যাবার পর তিনি জ্ঞান হারিয়ে রক্তরাঙা মুখে চৈতন্য লোপ পেয়ে বজ্রাহত পর্বতের মতো মাটিতে পড়ে গেলেন। ভগদেব পূষার এই অবস্থা দেখে রক্ত চোখে মহেশ্বরের দিকে তাকাতে লাগলেন। এর ফলে মহেশ্বর ভগদেবের চোখ উপড়ে ফেললেন।

এইরূপে সকলে রুদ্রের হাতে নিগৃহীত হয়ে ইন্দ্র প্রভৃতি আদিত্যগণ ভীত হয়ে দশদিকে পলায়ন করলেন। মরুৎগণ ও হুতাশনের সাথে সকলে পলায়ন করার পর প্রহ্লাদ ও হিতশ্বরগণ রুদ্রকে প্রণাম করে জোড়হাতে দাঁড়ালেন। রুদ্রদেব দেবতাদের দগ্ধ করার জন্য সেদিকে তাকালে অনেক বীরপুরুষ ভয়ে বিলীন হয়ে গেলেন। অনেকে প্রাণ ভিক্ষা চাইল, কেউ পালাল, তাঁর রুদ্র দৃষ্টিপথে পড়ে কেউ মারা গেল।

৫

অগ্নিগণ ত্রিলোচনের দৃষ্টির পথে পড়ার সাথে সাথেই ভস্মীভূত হলেন। নিজেদের খারাপ সময় উপস্থিত হয়েছে বুঝে অগ্নি বিনষ্ট হবার সাথে সাথেই যজ্ঞও জ্যোতির্ময় মৃগের রূপ ধরে দক্ষিণাসহ ধীরগতিতে আকাশপথে গমন করলেন। তখন ধনু হাতে নিয়ে সেই মৃগের পিছনে মহেশ্বর ছুটলেন তাতে পশুপত শর যোজনা করে। তাঁর দেহ তখন দুভাগ হয়ে গেল। এই দুই দেহের একটি যজ্ঞস্থলে জটাধর ও অপরটি আকাশপথ কালরূপী শব নামে খ্যাত করলেন। এরপর নারদ পুলস্ত্যের কাছে কালরূপী মহেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণগুলি জানতে চাইলেন। পুলস্ত্য তখন কালরূপী রুদ্রের লোক কল্যাণে আকাশপথ পরিব্যাপ্ত স্বরূপ বর্ণনা করলেন। কালরূপী শঙ্করের মস্তক বলে বিখ্যাত অশ্বিনী, ভরনী, ও কৃত্তিকার প্রভাবিত মেষরাশি অবস্থিত মঙ্গলের ক্ষেত্রে। শুক্রাচার্যের গৃহ কৃত্তিকার তিন পাদ এবং রোহিণী ও মৃগ শিরার পূর্বাধ বৃষরাশি যদিও এটি তার বদন রূপে খ্যাত। মহেশ্বরের দুটি হাত রূপে প্রসিদ্ধ মৃগশিরার শেষার্ধ আদ্রা ও পুনর্বাসুর তিন পাদ মিথুনরাশি, যা বুধের গৃহ। মহাদেবের শরীরের দুপাশ হল চন্দ্রের গৃহ রূপ, পুনর্বাসুর একপদে, পুষ্যা এবং অশ্লেষা লক্ষপদ কর্কটরাশি মহেশ্বরের হৃদয় হল সূর্যের গৃহ রূপ মঘা, পূর্বফাল্গুনী ও উত্তর ফাল্গুনীর একপাদ সিংহরাশি মহেশ্বর জঠর হল উত্তর ফাল্গুনীর তিন পদে, হস্তা ও চিত্রার অধিভাগ কন্যারাশি যা বুধের দ্বিতীয় কর্মস্থান, মহেশ্বর নাভি চিত্রার শেষার্ধ। স্বাতি এবং বিশাখার তিন পাদ তুলা রাশি বা শুক্রের দ্বিতীয় গৃহ। মহেশ্বর জননেন্দ্রিয় বিশাখার একপাদ অনুরাধা এবং জ্যোয় বৃশ্চিকরাশি এই রাশি দ্বিতীয় ভৌম গৃহ। তার দুটি উরু মূলা, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ার এক পাদ ধনুরাশি যা বৃহস্পতির গৃহ। শনির স্থান উত্তরাষায়ার তিন পাদ, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার প্রহসম্বা মকর রাশি শঙ্করের দুটি জানুরূপে বিদিত। শঙ্করের জঙ্ঘা হল ধনিষ্ঠার অপরাধ, শতভিষাও পূর্বভাদ্রপদের তিন পদ কুম্ভ রাশি যা শনির অপর গৃহ। পদদ্বয়রপে পরিচিত

এরপর ত্রিলোচনের ক্রোধভরা নিক্ষিপ্ত তির দ্বারা দক্ষযজ্ঞ বিধ্বস্ত হয়ে গেল, কিন্তু যজ্ঞ পুরুষ কিছুমাত্র বেদনা অনুভব করলেন না। শঙ্করের শরে বিদ্ধ হয়েও তার শরীর তারকারাশিতে পরিবেষ্টিত হল এবং তিনি আকাশপথে অবস্থান করতে লাগলেন।

নারদ এরপর পুলস্ত্যের কাছে এই বারোটি রাশির বিশদ প্রকৃত লক্ষণগুলি জানতে চাইলেন। পুলস্ত্য এরপর এই রাশিগুলির স্বরূপ বর্ণনা করে বললেন– প্রথম রাশি মেষ চর অর্থাৎ

বিচরণশীল ও গতিশীল, এটি মেষাকৃতি। এই রাশি নিত্য বিচরণ করে ধন, রত্নরাজি ও নতুন তৃণরাশি শোভিত মনোরম নদীতীরে আজও মেষের সাথে তার বাস। বৃষ স্থির রাশি বা নিজের মতো প্রকৃতি সম্পন্ন গবাদি প্রাণীর মধ্যে বিচরণ করে। এ কৃষিক্ষেত্রে বাস করে। শয্যাসন আশ্রয় রূপে গ্রহণ করে স্ত্রী পুরুষের অবস্থান বীণাবাদনে পটু, রতি ক্রীড়াতে অনুরক্ত, গীত, নৃত্য ও শিল্প ব্যাপারে এর স্থির ও

কাঁকড়ার মত আকৃতি কর্কট রাশির। এটি জলমধ্যে যাতায়াত করে। এ জমির আলে, পুকুর, নদীতীর ও নির্জন স্থানে বাস করে। সিংহ রাশি সিংহের রূপধারি। এর বসবাস পর্বত, বন, গুহা, দুর্গ, ব্যাধপল্লী, পর্বতগুহা ও গহ্বরে এর বসবাস। অলঙ্কার ও প্রদীপধারী কন্যার মতো দেখতে কন্যারাশি। এর স্থির ও বিচরণশীল দুটি রূপ আছে। এর বাস রমণীজনের রতিস্থানে ও নলখাগড়াতে।

তুলাদণ্ডধারী পুরুষের মতো তুলা রাশির আকৃতি যা বিচরণশীল। এর সঞ্চরণ ক্রয়-বিক্রয় স্থানে ও বাস রাজপথ ও গৃহে। বিছাকৃতি হল বৃশ্চিক রাশি যা স্থির। এর গমনস্থান উইপোকার গর্ত ও বাস বিষ, গোবর, কীট ও পাথরে। ধনুধারী ধনুরাশি স্থির ও বিচরণশীল, যার অর্ধেক শরীর মানুষের মতো, এর বাকিটা ঘোড়ার মতো। এর ঘোড়া, বীরপুরুষ ও অস্ত্রশস্ত্র বিষয়ে বিশেষ নিপুণ। এর বাস গতি ও রথের মধ্যে। মকর বিচরণশীল রাশি যা মৃগমুখী কাঁধ, বৃষের ন্যায়, চোখ হাতের ন্যায়, নদীতে এর সঞ্চরণ ও সমুদ্রে এর বাস। শূন্য কলসী কাঁধে জলমধ্যে অবস্থানকারী পুরুষের মতো আকৃতি কুম্ভরাশির। পাশাখেলাতে এর সঞ্চরণ এবং গুঁড়িখানাতে এর বসতি। মীনের আকৃতি মৎস্যযুগলের ন্যায়। এই রাশি স্থির ও বিচরণশীল রূপে আছে। এটি তীর্থস্থানে ও সমুদ্রের জলে সঞ্চরণ করে এবং পবিত্র স্থানে ও দেবতা ব্রাহ্মণদের গৃহে বাস করে। পুলস্ত্য বললেন, এই বারোরাশির সমস্ত লক্ষণ বললাম, এইসব কথা আর কারো কাছে বোলোনা। এই তত্ত্ব প্রাচীন ও গোপন। আমি ভগবান ত্রিলোচনের দক্ষযজ্ঞের ধ্বংসর কথা বললাম যা খুবই পুণ্যজনক ও প্রাচীন যা শুনলে সমস্ত পাপ দূর হয় বা কল্যাণ লাভ করা যায়।

৬

পুলস্ত্য এরপর নারদকে বললেন–প্রাচীনকালে বহচ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধর্মের অবতার ছিলেন তিনি। তাঁর ভার্য্যা অরিংসা যার গর্ভে ব্রাহ্মণের চার পুত্র জন্ম নেয়। হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ ও নর তাঁদের নাম। এদের মধ্যে নর ও নারায়ণ জগৎ কল্যাণের তপস্যা করলেন এবং হরি ও

কৃষ্ণযোগ সাধনা করতেন। নর নারায়ণ দিব্যদেহধারী পুরাণ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাদের উপযুক্ত আশ্রমরূপ পরিণত হল গঙ্গার প্রশস্তি তটে। হিমালয় পর্বতে অবস্থিত বদরিকাশ্রম। দেবরাজ ইন্দ্রকেও নর নারায়ণ তাদের কঠিন তপস্যার দ্বারা বিচলিত করে তুললেন। সুন্দরী অপসরা রম্ভাকে আশ্রমে পাঠানো হল তাদের মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য। অসীম রূপবান মদনদেব অপর হাতে দিলেন অস্ত্র ও সহচর রূপে এসেছিলেন বসন্ত। তিনি এলেন রম্ভার সাথে। এরপর বদিরাকাশ্রমে উভয়েই উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনজনেই নিজেদের খুশিমতো ক্রীড়াবিহার করতে লাগলেন।

লাল পলাশ ফুটে উঠল গাছে গাছে, বসন্ত ঋতুর আবির্ভাবে পলাশ ফুলের সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পেল। গাছের পাতা ঝরে পড়ার ফলে প্রকৃতির এই রূপ দেখে মনে হল বসন্তরূপ সিংহ পলাশপুরুষরূপ নখের দ্বারা হিমরূপ হাতিকে বিদীর্ণ করে প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে হাজির হল। লোদ্ধ ও কুন্দফুল বিকশিত হল। বসন্ত যেন হাসছিল। নিজেদের শুদ্ধতার শক্তিতে হিমরূপ হাতিকে বিধ্বস্ত করে। রাজার শরীরে বিরাজিত সোনার অলংকারের মতো শোভা পেতে লাগল কুসুমিত কণিকা ফুলের বনগুলি। প্রভুর পাশে ভৃত্যের সম্মান রাজপুত্রের মতো কণিকার ফুল ও কদম ফুলের আশেপাশে অবস্থান করছিল। অশোক বনগুলি এক মনোরম শোভা ধারণ করল। লাল রঙের উজ্জ্বল ফুল ফুটে ওঠাতে বসন্তরাজের নৃত্যগানের যুদ্ধে আহত হয়ে রক্তাক্ত দেহে ধারণের মত ছিল এই দৃশ্য। ভ্রমরেরা বাড়িতে আত্মীয় আগমনের আনন্দের মতো বসন্তের আগমনে গুঞ্জন করতে লাগল। বেতগাছেরা নদীর তীরে মুকুলিত হয়ে শোভা পাচ্ছিল। এই বেতগাছগুলি আঙ্গুল তুলে বলছিল, আমাদের মতো সুন্দর আর কোন গাছ নেই।

বসন্তলক্ষ্মী মানবশরীর ধারণ করে আর্বিভূত হল বদরিকাশ্রমে। বসন্তলক্ষ্মীর হাতের সৌন্দর্যবর্ধন করল রক্তবর্ণ অশোক ফুল, পদদ্বয় রূপে শোভা পেল পলাশফুল। মুখমণ্ডল হল প্রস্ফুটিত পদ্ম, দেহের শ্যাম শোভা সাধন করল নীল বর্ণের অশোক ফুল। নীলপদ্ম হল তার চোখ, বেলফল তার স্তন। দাঁত হল কুন্দফুল। পুষ্পমঞ্জরী তার হাতের শোভা হল। ঠোঁট তার গন্ধরাজ ফুল সাদা সিন্ধুবার তার নখ, তার গলার স্বর পুরুষ কোকিলের ধ্বনি তার বসন হল কঙ্কাল গাছ, মাথার অলংকার ময়ূরের পালক, সারসের স্বর তার নূপুরের আওয়াজ, প্রত্বিংশ যজ্ঞস্থানের নিকটে যজ্ঞের দ্রব্যগুলি রাখার জন্য পূর্বাভিমুখী যে গৃহ থাকে তাকে প্রজ্বংশ বলে এমনই তার চলার ভঙ্গী, মত্ত মরাল সম তার দেহ লোম পুত্রজীবের পুষ্প।

এইভাবে সজ্জিত বসন্তলক্ষ্মী বদরিকাশ্রমে বিরাজ করতে লাগল। উৎসুক হয়ে আশ্রমের রমণীয়তার দিকে তাকালেন নারায়ণ। অনঙ্গ মদনদেবকে দেখে নারায়ণ জানতে চাইলেন, তিনি কে? বর্ষ থেকে যে কন্দর্পের জন্ম হয় তাই কাম নামে অভিহিত হয়। একথা পুলস্ত্য জানতেন। শঙ্করের রোষানলে দগ্ধ হবার পর অনঙ্গ নামে পরিচিত হয়েছে। এরপর নারদ পুলস্ত্যর কাছে জানতে চাইলেন কেন শঙ্কর তাকে দগ্ধ করেছে? শঙ্কর দক্ষকন্যা সতীর মৃত্যুর পর ত্রিলোচন সতী বিরহে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করে একাকী নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। একথা পুলস্ত্য নারদকে জানালেন।

বিরহ জনিত শঙ্করকে দেখে উন্মাদ অস্ত্রে তার অঙ্গ বিদ্ধ করেন কন্দর্প এবং মদনদেবের মদন বাণের তাড়নায় উন্মত্ত হয়ে শঙ্কর সতীতে স্মরণ করে বন, সরোবরে ঘুরে বেড়তে লাগলেন। বাণ বিদ্ধ হাতির মতো অন্তরে কষ্ট অনুভব করতে লাগলেন। কোথাও শান্তি পেলেন না। কালিন্দী নদীর সমস্ত জল পুড়ে কালো হয়ে গেল শঙ্কর যখন সেখানে ডুব দিলেন, তথাপি তাঁর দেহ ঠান্ডা হল না। ভ্রমর ও কাজলসম রূপ হল কালিন্দীর জলের, সেই থেকে কবির চোখে কালিন্দী ধরিত্রীর কেশরাশি ও পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়ে প্রবাহিত হতে লাগল। এরপর শঙ্কর পবিত্র নদী, সুন্দর সরোবর ও রমণীর নদীর তীরভূমি, অরণ্য, পর্বতে বিচরণ করেও মনের সুখ শান্তি পেলেন না।

শঙ্কর তখন মহামোহিনী দক্ষ কন্যার ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে কখনও নিদ্রিত হলেন, কখনও স্বপ্ন দেখলেন, কখনও গান করলেন, কখনও কেঁদে আকুল হলেন। এরপর তিনি দক্ষ কন্যাকে দেখে আপন মনের সান্ত্বনার জন্য তাকে নিষ্ঠুর বললেন, তাকে প্রশ্ন করলেন, তাকে সতী কেন ত্যাগ করলেন, সে কি তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়েছে। কেন তাকে সতী কামানলে দগ্ধ করছে। সতী যদি সত্যিই রুষ্ট হয় তবে তার ক্রোধকে প্রশমিত করুক। মহাদেব এও বললেন–তিনি সতীর পদতলে প্রণত হচ্ছেন। এরপর শঙ্কর বললেন–যে তিনি সর্বদা সতীকে স্পর্শ করেন, তার কথা শোনেন, তাকে দেখেন, তাকে আলিঙ্গন করেন তবে কেন সতী তার সাথে কথা বলে না। তিনি তাঁর স্বামী তবে কেন স্বামীর বিলাপে তাঁর প্রাণ গলে না? কেন তাঁর মনে দয়া জাগে না?

শঙ্কর এবার অভিমানে বললেন, আমি জানি তোমার দয়ামায়া নেই। তিনি জানতে চাইলেন, একদিন সতী বলেছিল তাকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না। তবে এখন সেকথা কেন মিথ্যা হল। তিনি পুনরায় অনুরোধ করেন ও বলেন, সুলোচনা ফিরে এসে আমার কামতপ্ত দেহ আলিঙ্গন করো। আমার দেহের কাম উত্তাপ সতীর আলিঙ্গন বিনা কমবে না, একথা সত্যের নামে শপথ করে তিনি বললেন। এই সকল স্বপ্নে দেখে শঙ্কর জেগে উঠলেন এবং বনে গিয়ে বিলাপ

করতে লাগলেন। সন্তাপ নামক শর দ্বারা কন্দর্প পুনরায় শঙ্করকে বিদ্ধ করলেন তাঁর বিলাপ শুনে।

তাঁর সন্তাপে সমগ্র জগৎ সন্তপ্ত হয়ে উঠল। শঙ্করও দারুণভাবে সন্তপ্ত হয়ে উঠলেন। শঙ্কর এরপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। জৃম্ভনাস্ত্রে মদন তাঁকে পুনরায় বিদ্ধ করলেন। চারিদিকে ত্রিলোচন ছুটতে শুরু করলেন সৃম্ভন করতে করতে কামশরে দারুণ ভাবে নিপীড়ত হয়ে। আচমকা দেখতে পেলেন কুন্দনন্দনী পাঞ্চালিকাকে। তাকে দ্রাতব্য সম্বোধন করে শঙ্কর বললেন, তিনি তাকে চেনেন সে অসীম পরাক্রমশালী। তিনি যেন তাঁর কথা শুনে তাঁর কর্তব্য স্থির করেন। পাঞ্চালিক বললেন, কোনো দেবতার পক্ষে দুঃসাধ্য কাজও তিনি করতে পারবেন শঙ্করের কথায়। কারণ তিনি শঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও তার দাস। তার কাছে শঙ্করের পরাক্রম ও সাহসের কোন তুলনা নেই। তিনি মহাদেবকে এও বললেন–যে কোনরূপ দ্বিধা না করে যেন শঙ্কর তাঁকে আদেশ করেন।

শঙ্কর এরপর জানান তাঁর পত্নী অম্বিকা নেই, তাই তাঁর দিব্যদেহ সর্বদাই কামানলে দগ্ধ হচ্ছে। তিনি সর্বদাই সৃম্ভন করছেন। মদন বাণে বিদ্ধ হয়ে কিছুতেই তিনি ধৃতি, রতি, সুখশান্তি লাভ করতে পারছেন না। মদনদেব দ্বারা সৃষ্ট এই কামোন্মাদনা, এই সৃম্ভন তাঁর মতে পাঞ্চালিক ছাড়া কোন লোকই জগতে ধারণ করতে পারবে না। অতএব তিনি সব গ্রহণ করুন।

পুলস্ত্যের বাক্য অনুযায়ী পাঞ্চালিক বৃষধ্বজ, মহেশ্বরের কথায় রাজি হয়ে সমস্তই গ্রহণ করলেন। মহেশ্বর তখন তাকে পৃথিবীতে পূজা প্রচলনের বর দিয়ে বললেন, তুমি এই দুঃসহ জৃম্ভন আমার শরীর থেকে গ্রহণ করেছ, তাই জগতে যে ব্যক্তি চৈত্র মাসে ভক্তি ভরে তোমাকে স্পর্শ বা অর্চনা করবে, সে বৃদ্ধ, নাবালক, যুবক কিংবা নারী যেই হোক, তৎক্ষণাৎ উন্মত্ত হয়ে উঠবে। তারা ভবিষ্যতে রোগযুক্ত হবে, যার তার সামনে নাচ, গান, বাজনা বিভিন্ন রকম ক্রীড়া কৌতুক করবে এবং তার প্রতি একান্তরূপে অনুরক্ত হবে।

ধরাধামে তিনি পাঞ্চালেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হবেন এবং ত্রিলোচনের নামানুসারে তার পূজা প্রচলিত হবে। তার কৃপাতেই পাঞ্চালেরশ্বর পৃথিবীতে পূজনীয় হল। তাকে আরো বললেন, তিনি বর দেবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হলেন। ত্রিলোচনের আজ্ঞা পেয়েই যক্ষনন্দন স্থানত্যাগ করলেন। এরা বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করতে লাগলেন। তিনি এরপর সর্বত্র পূজা পেতে লাগলেন। হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ এবং কালাঞ্জর পর্বতের উত্তর দিকে অবস্থিত এক পবিত্র স্থানে বাস করার জন্য গেলেন। যতনয় চলে যাবার পর ভগবান ত্রিলোচনও স্বর্গ থেকে বিন্ধ্যাচলে চলে গেলেন।

এরপর মদন যখন পুনরায় তাকে দেখে পুষ্পশরে জর্জরিত করতে উদ্যত হন তখন শঙ্কর সে স্থানও পরিত্যাগ করলেন। এরপর গহন দারুবনে মহাদেব প্রবেশ করলেন। মদন সেখানেও তাঁকে অনুসরণ করলেন। দারুবনে বসবাসকারী ঋষি ও তাঁদের পত্নীরা শঙ্করকে দেখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর শঙ্কর এদের কাছে ভিক্ষা চাইলে সকলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভৃগু ও অত্রি মুনির পরিবারের রমণী যাঁরা পুণ্যাশ্রমে বাস করতেন তাঁদের চিত্তও চঞ্চল হয়ে উঠল মহেশ্বরকে পুণ্যাশ্রমে ঘুরতে দেখে। একমাত্র অরুন্ধতী ও অনসূয়া অটল থাকলেও বাকিরা অবশ হয়ে চারিদিকে ঢলে পড়লেন। অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করে তাঁরা নিজ নিজ স্বামীর সেবা শুশ্রূষায় নিবিষ্ট হলেন। এই দুই রমণীরা মহাদেবকে দেখে কাম তাড়নায় তাঁর দিকে ছুটে চললেন কারণ তাদের সকলেরই চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। আশ্রমগুলির চিন্তা পরিত্যাগ করে তা ফাঁকা রেখে তাঁরা মহাদেবের পিছু চললেন। এই দৃশ্য যেন মদ মত্ত হস্তীনির হস্তীর দিকে ছুটে যাবার মতো। এইরূপ ঘটনা দেখে ভৃগু ও অঙ্গিরা বংশীয় ঋষিরা মহাদেবের প্রতি ক্রোধিত হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন। তারা মহাদেবের লিঙ্গকে ভূমিতে পতিত হবার শাপ দিলেন। ভূমি বিদীর্ণ করে সেই দেবলিঙ্গ পতিত হল। তারা একথা উচ্চারণ করার সাথে সাথেই তখন শূলপানি শঙ্করের আর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না।

তখনই সেই শিবলিঙ্গ একদিকে পৃথিবীর ভেদ করে পাতালে প্রবেশ করল আর অপরদিক আকাশ বিদীর্ণ করে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করতে লাগল। সমগ্র জগৎ তখন চঞ্চল হয়ে উঠল। পাহাড়, নদী, বৃক্ষ, পাতালের তলদেশে, সমগ্র ধরাধাম বিচলিত হয়ে উঠল। ক্ষীরোদ নামক সাগরে অবস্থানকারী শ্রীহরির নিকটে পিতামহ ব্রহ্মা গেলেন এবং তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে জানতে চাইলেন, কেন সমগ্র জগৎ এইরূপ বিচলিত?

সমগ্র পৃথিবীর চাঞ্চলতার কারণ স্বরূপ শ্রীহরি জানালেন দারুবনে মুনিদের ক্রোধে শঙ্করের লিঙ্গ ভূতলে পতিত হবার দরুণ এই কাণ্ড ঘটছে। এরপর ব্রহ্মা ও হরি শিবলিঙ্গের সেই স্থানে দ্রুত উপস্থিত হলেন কারণ ব্রহ্মা হরির অদ্ভুত কথা শুনে সেই স্থানে যেতে চাইলেন। সেই স্থানে এসে শ্রীহরির লিঙ্গের শেষ দেখার জন্য গরুড়ের পিঠে চড়ে পাতালে প্রবেশ করলেন এবং ব্রহ্মা লিঙ্গের ঊর্ধ্বসীমা দেখার জন্য হাঁসের পিঠে আকাশে উঠে চললেন। কিন্তু ব্রহ্মা ঊর্ধ্বসীমা দেখতে না পেয়ে ফিরে এলেন। শ্রীহরিও ক্রমে সপ্তপাতালে গিয়েও শেষ দেখতে না পেয়ে ফিরে এলেন। তখন বিষ্ণু ও ব্রহ্মা স্তব করে বন্দনা করে শিবকে বললেন, তুমি শূলপানি বৃষবাহন, তুমি জীমূতবাহন, কবি, ত্রিলোচন মহেশ্বর তোমার প্রভাবে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস হয়েছে,

তুমি কালরূপে বিরাজ করছ, তুমি জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত, তোমাকে আমরা প্রণাম জানাই।

পুলস্ত্য বললেন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর স্তব শুনে মহাদেব আপন মূর্তিতে এসে জানতে চাইলেন কেন তারা তাঁর স্তব করছে। মহাদেব বললেন, তাঁর মন খুবই খারাপ, দেহ কামশরে জর্জরিত। তার এক পা চলার ক্ষমতা নেই। তখন হরি ও ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, পুনরায় এই লিঙ্গ হতে নিজ মূর্তি ধারণ করতে। কিন্তু মহাদেব জানালেন, দেবতারা তাঁর লিঙ্গের পূজা না করলে তিনি স্বরূপ গ্রহণ করবেন না। হরি এতে সম্মত হলেন। এবং ব্রহ্মা নিজে এই শিবলিঙ্গ পূজার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

চারটি বর্ণ সৃষ্টি হল লিঙ্গার্চনার জন্য। নানা সদুক্তি পরিপূর্ণ শাস্ত্রবাক্য এই সকল বর্ণের নিকট প্রমাণরূপে পরিগণিত হয়। এই বর্ণগুলির প্রথমটি বৈ, দ্বিতীয়টি পাশুপাত, তৃতীয়টি কালদমন এবং চতুর্থটি কাঁপালিক নামে অভিহিত। বশিষ্ঠের প্রিয় পুত্র শক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্বয়ং শিব শক্তির গোপায়ন নামে একটি শিষ্য ছিল। রাজা সোমেশ্বর মুনিবর ভরদ্বাজ মহাপাশুপতের শিষ্য ছিলেন। তপোধন আপস্তর হলেন সালদমন, ব্রক্রেশ্বর নামে তাঁর এক শিষ্য ছিল। চতুর্থ বর্ণ হল কাঁপালিক। কুবের হলেন মহাব্রতী। শুদ্র জাতের আগের ছিলেন তার এক বীর শিষ্য। ব্রহ্মা চারটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করলেন। শিব পূজার জন্য এবং নিজ গৃহে চলে গেলেন।

এরপর শিব পুনরায় বেড়াতে বেরোলেন। ব্রহ্মার গমনের পর নিজ লিঙ্গ শরীরে গ্রহণ করে চিত্রবান ক্ষুদ্র লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করে। এরপরও মদনদেব শিবের পিছু নিয়ে তাঁকে বাণের দ্বারা আঘাত করতে উদ্যত হলে শিব তাঁকে দেখে রাগে জ্বলে উঠলেন। মহাদেব এরপর ক্রুদ্ধ হয়ে রক্তনেত্রে মদনদেবের জ্যোর্তিময় শরীরের পা থেকে বগল পর্যন্ত পুড়িয়ে দিতে লাগলেন। মদনদেব তার শ্রেষ্ঠ ধনু দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। নিজের পা পুড়ে যেতে দেখে। ধনু পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত হল এবং মদনদেবের হাতের মুঠোতে ধরা স্বর্ণখচিত অংশটি চাপা গাছে পরিণত হল। এই ধনুর মধ্য ভাগ হীরাখচিত যা বকুল বৃক্ষে পরিণত হল। ইন্দ্রনীল মণিযুক্ত কটিদেশ পটল বৃক্ষ চন্দ্রকান্তমণি যুক্ত অংশ জাতী লতাতে এবং বিক্রমণিযুক্ত ছিলার অংশ মল্লী লতারূপে পরিণত হল। তার সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছিল বলে তার ধনুর শরের জাতিসূযী ও সব সুগন্ধ মনোরম ফুলগুলিকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তাঁর সংগৃহীত অংশ ও সুস্বাদু ফল, বনের গাছ শঙ্করের কৃপায় দেবভোগ্য হল। হিমালয় পর্বতে তপস্যা করতে গেলেন কামদেবকে দগ্ধ করে পুণ্যলাভের জন্য। পুষ্পধনু কাম দেবকে মহাত্মা শঙ্কর এভাবে দগ্ধ করেছিলেন।

৭

পুলস্ত্য জানালেন, দগ্ধ মদনদেবকে দেখে বদরিকাশ্রমে অবস্থানকারী নারায়ণ মুনি তাকে কন্দর্প বললেন। তাঁকে আহ্বান করার জন্য কামদেব নারায়ণ মুনির মনের এরূপ দৃঢ়তা দেখে অবাক হলেন। এরপর নারায়ণ মুনি অপ্সরাদের দেখে তাঁদের স্বাগত জানিয়ে বসন্তকেও স্বাগত জানালেন। এতে বসন্ত মনে মনে দারুণ ভাবে চিন্তিত হলেন। এই বলে ভগবান একা হেসে বসন্তকে সম্ভাষণ জানালেন, একগুচ্ছ ফুলের মুকুল তুলে তাঁর উরুদ্বয় থেকে এক সুন্দরী রমনী সৃষ্টি করলেন। প্রিয়তম রতি এসে হাজির হয়েছে বলে ভাবলেন কন্দর্প, রমণীর এই অশেষ সৌন্দর্য দেখে এই রমণীকে তার প্রিয়তমার মতো মনে হল কারণ তার কথা বলার ধরন, তাঁর নয়নদ্বয়, তার জ্রভঙ্গিমা, কেশরাশি, নাক, ঠোঁট, উন্নত স্তনদ্বয়, রেখাঙ্কিত আলতো কোমল পেট এসব তার প্রিয়তমার মতো। জঘনস্থল থেকে স্তনতটের দিকে বিস্তৃত হয়ে আছে এই রমণীর রোম রাশি। এ দেখে মনে হচ্ছে যেন ভ্রমরেরা এগিয়ে চলেছে তটভূমি থেকে পদ্মফুলে পরিপূর্ণ জলাশয়ের দিকে। মেখলার দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে আছে এই রমণীর জঘনদেশ। মেখলা পরিহিত রমণীকে ক্ষীরসমুদ্র মন্থনকালে বাসুকী নাগের দ্বারা মন্দারপর্বতকে যেমন দেখাচ্ছিল তেমন দেখতে লাগল। এই শরীর উরুযুগল বদলাস্তম্ভের গোড়ার অংশ উপরের দিকে ধরলে যেমন দেখায় সেইরূপ। রোমহীন তার জঙদুটি সুন্দর ও পা দুটি আলতায় শোভিত।

কামদেব এই নারীকে নিয়ে এরূপ নানা চিন্তা করতে লাগলেন। কামোদ্রেক হল কন্দর্পের অন্তরেও এই সুন্দর রমণীকে দেখে। সুতরাং অন্যলোকের কথা কিছু বলার নেই। ঊর্বশীকে দেখে বসন্তও চিন্তিত হলেন। মদনদেব ভাবলেন সূর্যকিরণের তাপে ভীত হয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে চন্দ্রের দিবাভাগের কোন : এক অজানা শান্তি। অপ্সরাদের ধরে ধ্যানমগ্ন মুনির মতো কিছুকাল দাঁড়িয়ে রইল বসন্ত। এই অবস্থায় কন্দর্প এবং বসন্তকে দেখে নারায়ণ মুনি জানালেন, তাঁর উরু থেকে জন্মেছে এই রমণী। তিনি বললেন, তোমরা একে দেবলোকে নিয়ে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে উপহার দান করো। উর্বশীকে নিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা দেবলোকে চলে গেলেন ঋষির মুখে এই আদেশ শুনে। বদরিকাশ্রমে অবস্থানকারী ধর্মজ্ঞানী তাপসের কার্যকলাপের এবং রূপযৌবনবতী উর্বশীর বিবরণ তারা দিলেন ইন্দ্রের কাছে গিয়ে। সকলে দারুণভাবে বিস্মিত হন। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে এরপর থেকেই নর-নারায়ণের চরিতকথা ছড়িয়ে পড়ল।

হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ রাজা হলেন তার দুবৃত্ত পিতা নিহত হবার পর। তার অশেষ শ্রদ্ধা ছিল দেবতা ও ব্রাহ্মণদের প্রতি। নৃপগণ যথাসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করতে লাগলেন তার সুশাসনের ফলে। ব্রাহ্মণরা নির্বিঘ্নে বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রগুলিতে ভ্রমণ করতে লাগলেন ও নির্বিঘ্নে তপস্যা করতে লাগলেন।

পশুপালনে রত হল বৈশ্যরা। ব্রাহ্মণদের সেবা শুশ্রূষা করতে লাগল শূদ্ররা। চতুবর্ণের লোকেরা এভাবে নিজ নিজ কাজে ব্রত হল। নিজ নিজ কাজে রত হল দেবতারাও। নর্মদা নদীর তীরে নকুলেশ্বর তীর্থে শিবমূর্তি দেখার পর একদিন ভৃগুবংশীয় মহা তপস্বী চ্যবন নামক ঋষি স্নান করার জন্য নর্মদা নদীর জলে নামলেন। নদীর জলে অবগাহন করার সময় এক লোহিতাকার সাপ তাকে গ্রাস করল। চ্যবন সর্পগ্রস্ত হয়ে হরিকে স্মরণ করলেন। শ্রীহরির কৃপায় সাপের সমস্ত বিষ দূর হয়ে গেল, তখন চ্যবনকে নিয়ে রসাতলে চলে গেল সেই বিশাল সাপ। যদিও বিশেষ কোন ক্ষতি তার হলো না, কারণ সাপের বিষ ছিল না।

সাপের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে চ্যবন রসাতলে নাগ কন্যাদের দ্বারা পূজিত হয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। এরপর দৈত্যপুরীতে এসে হাজির হলেন এবং দৈত্যরাজগণ দ্বারা সমাদৃত ও পূজিত হলেন। পরে প্রহাদের সাথে তার সাক্ষাত হল। প্রহাদ তাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখানোর পর। কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। তার সাথে সাক্ষাতের কারণ ব্যাখ্যা স্বরূপ চ্যবন জানালেন নর্মদা তীর্থে স্নান করতে নামার সাথে সাথে একটা সাপ তাকে সবলে গ্রাস করে তাকে পাতাল পুরে নিয়ে এসেছে। এই কথা শুনে প্রহাদ মহর্ষি চ্যবনের কাছে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও রসাতল তীর্থগুলির সংখ্যা জানতে চাইলেন। চ্যবন বললেন–তিন জায়গাতেই বিভিন্ন তীর্থের মধ্যে পৃথিবীতে নৈমিষ তীর্থ, অন্তরীক্ষে পুষ্কর এবং রসাতলে চক্রতীর্থ প্রসিদ্ধ। পুলস্ত্য এরপর নারদকে জানালেন, প্রহ্লাদ এই কথা শুনে দানবদের প্রতি আদেশ দিয়ে নৈমিষতীর্থে স্নানে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। কারণ সেখানে গিয়ে পুণ্ডরীকাক্ষের সাক্ষালাভ করতে পারবে দানবেরা। প্রহ্লাদের এই কথা শোনা মাত্র সমস্ত দৈত্যকুল পুষ্করতীর্থে যাবার জন্য বিরাট আয়োজন করল এবং অবিলম্বে রসাতল থেকে বেরিয়ে পড়ল। এরপর সকলে বিপুল আনন্দ সহকারে স্নান করল নৈমিষারণ্যে এসে। এরপর প্রহ্লাদ পবিত্র সরস্বতী নদীর সাক্ষাৎ পেলেন নৈমিষ. থেকে কিছুদূরে মৃগয়া ধরতে যাবার পর। এরপর কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তিনি বৃহদাকৃতি একটি শাল গাছ দেখতে পেলেন যার শাখা-প্রশাখা সকল অংশই বাণবিদ্ধ ছিল। এমনকি কতকগুলো বাণ ঐ গাছের গোড়ার কাছে পরস্পর সংলগ্ন ছিল।

এরপর আরো অগ্রসর হলেন কারণ সাপকে যজ্ঞোপবীত রূপে ব্যবহার করলে যেরূপ দেখতে হয় এই সমস্ত বাণগুলি সে রূপ দেখতে বলে। এরপর তিনি দুজন মুনির সাক্ষাৎ পেলেন। এই দুই মুনিই গভীর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। তাদের পরনে ছিল কালো হরিণ ছাল, মাথায় ছিল বিশাল জটা রাশি। তাদের সাথে ছিল দুটি দিব্য ধনু যার একটি হল শার্ঙ্গ ও অন্যটি অজগর। এছাড়াও অক্ষয় বাণে পরিপূর্ণ আরো দুটি তুণ দেখতে পেলেন। এই দেখে প্রহ্লাদের মনে হল এরা নিশ্চয়ই প্রকৃত তাপস নয়। এদের অন্তঃকরণ দাম্ভিকতায় পূর্ণ। তারা কেন ধর্মাচরণের পক্ষে ক্ষতিকর দাম্ভিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। প্রহ্লাদ মুনিদের কাছে তা জানতে চাইলেন। তিনি এও বললেন, যে তাদের জটাজুট ও তপস্যার সাথে এই দুই মহাধনুর কোনোরূপ মিল তিনি দেখতে পাচ্ছেন না।

দৈত্যেশ্বরের কোন ভাববার দরকার নেই, বললেন–নর ঋষি–সামর্থ থাকলে যে যা পারে, তার পক্ষে তাই সম্ভব হয়। দৈত্যগণের অধীশ্বর ও ধর্মসেতুর প্রবর্তক বলে নিজের পরিচয় দিলেন প্রহ্লাদে তাদের শক্তির কোন অর্থ নেই তিনি বর্তমান থাকতে, নর ঋষি জানালেন, তারা রীতিমত শক্তি অর্জন করেছেন। নরনারায়ণকে যুদ্ধে জয় করতে পারে এমন কেউ নেই।

একথা শুনে ক্রুদ্ধ হলেন দৈত্যরাজ। যুদ্ধে নর নারায়ণঋষিকে জয় করবার প্রতিজ্ঞা করলেন দৈত্যরাজ। দৈত্যশ্বর ধনুকের ছিলাঘাতে ভীষণ শব্দ করে অরণ্যর শেষে এক জায়গায় তাঁর সৈন্যদল সজ্জিত করলেন। নরঋষি অজগর ধনু দিয়ে অসংখ্য বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। যেসব বাণ দৈত্যপতিও প্রতিহত করে দিলেন। দৈত্যরাজের বাণ প্রতিহত করা দেখে নরঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে আরো বেশি করে বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। এইভাবে প্রহ্লাদ এক বাণ তো নরঋষি দুই বাণ। নরঋষি তিন বাণ মারল প্রহ্লাদ চার বাণ মারে। নরঋষি পাঁচ বাণ ছুঁড়লে প্রহ্লাদ ছয় বাণ। ফলে ক্রমশই দুজনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল এবং কেউ পিছু হঠতে চাইল না। নরঋষি আটটি বাণ ছুড়লে দৈত্যপতি নয় বাণ ছুঁড়লেন। এইভাবে নরঋষি যত বাণ মারেন দৈত্যপতি তার চেয়েও বেশি বাণ মারেন। ক্রমে নরঋষি একশো বাণ নিক্ষিপ্ত করলে দৈত্যপতি দুশো বাণ বর্ষণ করলেন। পরে নরঋষি দুশো ও প্রহ্লাদ দশশো এভাবে বাণ বর্ষণ বেড়েই চলল। নরঋষির অসংখ্য বাণে ভূমি দিক অন্তরীক্ষ ছেয়ে গেল দৈত্যপতিও তা ছিন্ন ভিন্ন করে ফেললেন তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণে।

উভয়ে বাণ বর্ষণ করতে করতে এক ভয়ংকর তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। এক ভীষণ শর হাতে নিলেন দৈত্যাধিপতি। মুহূর্তের মধ্যে তার ধনুতে ব্রহ্মাস্ত্র যোজিত হল। নর ঋষিও নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনিও সুতীক্ষ্ণ নারায়ণাস্ত্র যোজনা করলেন। আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করে দৈত্যপতি উভয়

অস্ত্রই প্রয়োগ করলেন। ঋষিবরও নারায়াণাস্ত্রের সাথে মাহেশ্বরাস্ত্র ছুঁড়ে মারলেন। ফলে দুজনের অস্ত্রই ব্যর্থ হল। দৈত্যরাজ ব্রহ্মাস্ত্র বিফল হবার দরুণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তখন তিনি রথ থেকে নেমে গদা হাতে ছুটে আসতে থাকেন। দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ গদা হাতে ছুটে এলেন তপস্যা আধার, অসীম বিক্রমশীল ও সমস্ত লোকের পালনকারী বিখ্যাত ঋষি নারায়ণের দিকে।

৮

দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের দিকে শাঙ্গ নামক ধনু হাতে নিয়ে নারায়ণ ঋষি ছুটে গেলেন। পুলস্ত্য একথা জানালেন। এরূপে নারায়ণের মাথায় গদার আঘাত করলেন প্রহ্লাদ যথাসাধ্য শক্তি দিয়ে হাতের গদা ঘোরাতে ঘোরাতে। নারায়ণের চোখ দিয়ে আগুনের শিখার মতো জলরাশি বেরিয়ে আসতে লাগল মাথায় আঘাত করার সাথে সাথে। প্রহাদের গদাঘাতে নারায়ণের তো কিছু হলই না তিনি বজ্রাহত পর্বত শিখরের মতো অটল থাকলেন, বরং গদাই শতভাগে টুকরো হয়ে গেল। রথে ফিরে এসে অবিলম্বে দৈত্যাধিপতি হাতে ধনু ধরে তাতে তূণ থেকে বাণ যোজনা করলেন। গাধপত্র বাণ যোজিত, হল তার ধনুতে। যথাশক্তি সেই বাণ নিক্ষেপ করলেন ক্রোধান্ধ হয়ে। নারায়ণ ঋষি অর্ধচন্দ্রের মতো বাণগুলিকে আসার সাথে সাথে অন্যবাণ ছুঁড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন এবং প্রহ্লাদকেও বাণ বিদ্ধ করলেন। দেবতারা আকাশপথে এসে হাজির হলেন দেব-দৈত্যের ঘোর যুদ্ধ দেখতে। দেবদুন্দুভি বেজে উঠল আকাশ ভয়ংকর শব্দ করে। অজস্র ধারায় পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল নারায়ণ ও দৈত্যরাজের উপরে। দুই মহাধনুচারণ ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হলেন আকাশের দেবতা ও ভূতলের দৈত্যদের সামনে। দর্শকরা যুদ্ধ দেখে প্রচুর আনন্দ পেল। সমস্ত আকাশ দিক্ বিদিক বাণে ছেয়ে ফেললেন দুই যোদ্ধা। নারায়ণ এক তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়ে প্রহ্লাদের অন্তঃকরণ ভেদ করলেন। তখন দৈত্যপতিও ক্রুদ্ধ হয়ে হৃদয়ে, বাহুদ্বয়ে ও মুখমণ্ডলে নারায়ণকে বিদ্ধ করলেন। অর্ধচন্দ্রাকৃতি এক বাণ নারায়ণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণের আঘাতে দৈত্যরাজের হাতের মুঠো থেকে ধনু ছিটকে পড়ে গেল। তখন তিনি ধনুতে জ্যা রোপণ করে শত শত বাণ ছুঁড়তে লাগলেন অন্য। নারায়ণও সেই বাণ ছিন্ন করে অন্য বাণ নিক্ষেপ করে দৈত্যরাজকে বিব্রত করে তুললেন। দৈত্যরাজের ধনু ছিন্ন করলেন ক্ষুরধার অস্ত্র দিয়ে, তখন আবার অন্য ধনু হাতে তুলে নিলেন দৈত্যপতি।

এভাবে দৈত্যপতির ধনু বারে বারে ছিন্ন করতে থাকেন নারায়ণ। যখন সমস্ত ধনু ছিন্ন হয়ে গেল তখন দৈত্যরাজ লোহার তৈরি মুগুর নিয়ে ঘোরাতে লাগলেন। এবং তা নারায়ণের দিকে

সবেগে ছুঁড়ে মারলেন। নারায়ণ দশটি বাণ দ্বারা সেই মুগুর ছিন্ন করলেন এবং মুগুর ভুলুণ্ঠিত হল। মুগুরের ব্যর্থতায় প্রহ্লাদ হাতে পাশ নিয়ে, তার দিকে নিক্ষেপ করলেন।

নারায়ণ তাও ছিন্ন করে দিলেন। দৈত্যপতি পাশের বিফলতার পর শক্তি গ্রহণ করে নিক্ষেপ করলেন। নারায়ণ এও প্রতিহত করলেন।

এইভাবে দৈত্যরাজের সমগ্র অস্ত্রশস্ত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তখন তিনি অন্য মহাধনু গ্রহণ করে বাণ বর্ষণে যুদ্ধক্ষেত্র আচ্ছন্ন করে ফেললেন। জগৎগুরু দৈত্যপতির হৃদয়ে আঘাত করলেন নারায়ণস্ত্রে নারায়ণ দৈত্যরাজ এই অস্ত্রের আঘাতে তার রথের ওপর পরে গেলেন। সারথি তাকে নিয়ে গমন করল। জ্ঞান ফেরবার পর সুদৃঢ় ধনুকে হাতে নিয়ে দৈত্যপতি পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। পরে আবার যুদ্ধ করবার কথা বলে নারায়ণ তাকে চলে যেতে বললেন এবং আহ্নিক করতে বললেন।

নৈমিষারণ্যে গিয়ে দৈত্যপতি আহ্নিক করলেন নারায়ণের কথামতো, কিভাবে দাম্ভিক তাপসকে পরাজিত করবেন একথা ভাবতে ভাবতে রাত্রি উপস্থিত হলে নারায়ণের রণকৌশল পরিকল্পনা করতে করতে। যথাসময়ে তাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধল। নারায়ণ ও প্রহ্লাদের দিব্য সহস্র বৎসর কেটে গেল এভাবে যুদ্ধ করতে করতে। কিন্তু তথাপি প্রহ্লাদ নারায়ণ ঋষিকে হারাতে পারল না। হাজার বছর পর পীতাম্বর বিষ্ণুর কাছে গিয়ে প্রহ্লাদ জানতে চাইলেন, কেন তিনি নারায়ণ ঋষিকে যুদ্ধে হারাতে পারছেন না? নারায়ণ দেবের উৎপত্তি হয়েছে ধর্ম থেকে একথা জানালেন বিষ্ণু। প্রহ্লাদ কখনই তাকে জয় করতে পারবে না কারণ তার অসীম শক্তি, সমস্ত দেবতা ও দানব একত্রিত হলেও তাকে জয় করা অসম্ভব। প্রহ্লাদ তখন বললেন, প্রকৃতই যদি তিনি অজেয় হন তাহলে তাঁর প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়ে যাবে। কি করে বেঁচে থাকা যায় প্রতিজ্ঞা পালনে ব্যর্থ হয়ে? অতএব তিনি বিষ্ণুর সামনে পড়ে থেকে না খেয়ে শুকিয়ে মরবেন।

বিষ্ণুর সামনে পুলস্ত্য জানালেন দৈত্যপতি প্রহ্লাদ সনাতন ব্রহ্মার উপাসনায় রত হলেন। পীতাম্বর তখন দৈত্যপতিকে বললেন, নারায়ণ ঋষিকে প্রহ্লাদ জয় করতে পারবে না, তাকে ভক্তি বলে জয় করতে হবে। আমার প্রতি আপনার কৃপা সত্ত্বেও কিভাবে আমি রেহাই পাব নারায়ণের ক্রোধ থেকেও প্রহ্লাদ জানতে চাইলেন। তিনি এও বললেন–যে তিনি ত্রিভুবন জয় করেছেন। দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁর কাছে পরাজিত তবু কোন ধর্মপুত্র দেবরাজকে জয় করতে পারলেন না। বিষ্ণু জানালেন তিনিই সেই তাপস তিনিই জগতের মঙ্গল কামনায় ধর্ম স্থাপন করার জন্য দয়া করে তপস্যা করছি।

তাই তিনি যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য তাঁরই আরাধনা করতে বললেন। তাকে জয় করা সম্ভব কেবল ভক্তির দ্বারাই। সুতরাং তাকে ধর্মনন্দন তাপসের সেবায় মন দিতে বললেন। সমস্ত দৈত্য দানবকে সেদিন থেকেই তাকে প্রতিপালন করতে বললেন–বিষ্ণু। মহাত্মা দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ সানন্দে সেই বিষ্ণুর বাক্য অসুরদের ডেকে বললেন, পুলস্ত্য একথা জানলেন। প্রহ্লাদের অনুরোধে অন্ধক তাঁর রাজ্যভার গ্রহণ করলেন এবং প্রহ্লাদে বদরিকাশ্রমে চলে গেলেন। হাত জোড় করে প্রণাম করলেন নারায়ণের দেখা পেয়ে। তাঁকে জয় না করে কেন প্রণাম করছে প্রহ্লাদ একথা নারায়ণ তাঁর কাছে জানতে চাইলেন। প্রহ্লাদ বললেন, কে তাকে জয় করবে? তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ পুরুষ তে নেই। তিনি বিষ্ণু, পুণ্ডরীকাক্ষ, অনন্ত, পীতাম্বর ও সাক্ষাৎ নারায়ণ ও শাঙ্গপানি নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। তিনি সনাতন, অক্ষয় ও মহেশ্বর। তিনি এও জানালেন যাজ্ঞিকরা তাঁর পূজা করেন। যোগীরা তাঁর ধ্যান করেন। মনীষীরা অর্চনা করেন ও স্নাতকেরা জপ করেন।

তাঁর অনেক নামের মধ্যে অচ্যুত, হৃষিকেশ, চক্রপানি, ধরাধর, মহাসীন, হয়গ্রীব তার নাম। হিরণ্যক্ষের শত্রু বললেন–তাঁকে। তিনি প্রয়োজনে শূকর রূপ ধারণ করতে পারেন। তিনি ঐশ্বর্য, বাণ, বশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছটি গুণের আধার, তার পিতাকে নরসিংহরূপে তিনিই বিনাশ করেছেন। এমনকি তিনি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, যম, সূর্য এমনকি চরাচরে তাঁর অপার মাহাত্ম্যের কথা। তিনি এই সমগ্র জগতে পরিব্যপ্ত করে আছেন ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, ব্যোম প্রভৃতি হাজার হাজার রূপে। সুতরাং কেউ তাকে জয় করতে পারবেন না। একমাত্র আপনাকে ভক্তিদ্বারা জয় করতে পারব শক্তি দ্বারা জয় করা সম্ভব না। ভগবান তাঁর এই স্তবে পরিতুষ্ট হলেন। তিনি পরাজিত হলেন প্রহ্লাদের অসাধারণ ভক্তি দ্বারা, পরাজিত হলেন বলে তিনি শাস্তি ভোগ করতে প্রস্তুত হলেন। সুতরাং শাস্তিস্বরূপ তিনি তাকে বর দান করলেন। এবং তাঁকে বললেন–যা ইচ্ছা প্রার্থনা করতে।

প্রহ্লাদ জানালেন, তিনি যা বর দেবেন তাতেই আমি প্রস্তুত। শুধু প্রহ্লাদ জানালেন যে তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে যে শারীরিক ও মানসিক পাপ তিনি করেছেন তা যেন, তাঁর দয়াতে দূর হয়। তিনি তাকে সেই বর দিতে বললেন–যাতে নরঋষির সাথে যুদ্ধজনিত পাপও যেন খণ্ডিত হয়। নারায়ণ তাঁর প্রার্থনা পূরণ করলেন এবং তার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে একথাও জানালেন। তিনি তাকে দ্বিতীয় কোনো বর প্রার্থনা করতে বললেন।

প্রহ্লাদ জানালেন, এমন বর যেন ভগবান তাঁকে দেন যাতে, তাঁর প্রতি সমস্ত মতি, আশ্রয়, অর্চনা, ধ্যান, মন সর্বদা নিবিষ্ট হয়। নারায়ণ বললেন, তবে তাই হোক। নারায়ণ এবার তাঁকে

আরো কিছু বর প্রার্থনা করতে বললেন। প্রহ্লাদ তখন জানালেন, যে কোনো কিছুই তাঁর অলব্ধ নেই, নারায়ণের দয়ায় তিনি সব কিছুই লাভ করেছেন। প্রহ্লাদ জানালেন যে কেবল চান যেন নারায়ণের চরণেই তাঁর সর্বদা ভক্তি থাকে। নারায়ণ জানালেন যে প্রহ্লাদ নিত্য অজর, অমর ও অক্ষয় থাকবে। তিনি বললেন–এবার যাও, ঘরে গিয়ে নিজের কাজ করো। দানব দিগকে সুশাসনে রেখে তিনি এও জানালেন তার কাজে কখনই বিঘ্ন ঘটবে না কারণ তার মন ভগবানের প্রতি অনুরক্ত। প্রহ্লাদ অনন্তকাল রাজত্ব করতে পারবে। নিজ জ্ঞাতির ধর্মাচরণে কখনও যেন বিরত না হয় একথাও বললেন।

পুলস্ত্য এরপর জানালেন যে, একথা শুনে প্রহ্লাদ বললেন, যে রাজ্য তিনি ত্যাগ করেছেন তা কেমন করে পুনরায় গ্রহণ করবেন? নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়ে ভগবান দৈত্য ও দানবদের সদুপদেশ দান করবার আদেশ দিলেন। নারায়ণকে প্রণাম করে সানন্দে দৈত্যপতি নিজ নগরে চলে গেলেন। তিনি নগরে পৌঁছনোর সাথে সাথে অন্ধক ও অন্যান্য দানবেরা তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। তাকে পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন সকলে। কিন্তু প্রহ্লাদ রাজ্যভার গ্রহণ না করে দৈত্যপতিদের সৎপথে পরিচালিত করতে লাগলেন। তার জীবনের ধ্যান জ্ঞান হলেন ভগবান কেশব। পূর্বকালে নারায়ণের কাছে পরাজিত হয়ে দৈত্যপতি প্রহ্লাদ নিজ রাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ করে মনকে ভগবানের ধ্যানে সর্বদা সসিদ্ধ রেখে বিশুদ্ধ শরীরে জীবনযাপন করছিলেন।

৯

নারদ পুলস্ত্যের কাছে জানতে চাইলেন, অন্ধকাসুর কিভাবে অন্ধজীবনের অভিশাপ থেকে মুক্ত হলেন? পুলস্ত্য জানালেন, হিরণক্ষের জীবদ্দশাতেই অন্ধকাসুর তার অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাই তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়। এরপর অন্ধকের রাজত্বকালে তার বরণীয় কাজ ও দেবতাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা নারদ জানতে চাইলেন পুলস্ত্যের কাছে। পুলস্ত্য জানালেন, অন্ধকাসুর রাজা হওয়ার পর শূলপানি শিবের আরাধনা শুরু করলেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিলেন।

শিবের থেকে প্রাপ্ত বর অনুযায়ী তিনি কখনও জলে ডুববেন না, আগুনে দগ্ধ হবেন না, দেবতা ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যকে রাজপুরোহিত হিসাবে নিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি সব রাজদের পরাজিত করে ও দেবতাদের আক্রমণ করে সসাগরা বসুন্ধরা ভোগ করার সংকল্প করলেন। দেরি হল না তার সংকল্পকে কাজে পরিণত করতে, সমস্ত রাজারা পরাজিত হয়ে খুব শীঘ্রই

তার অধীনতা বরণ করল। এরপর সুমেরু পর্বতে গেলেন অন্ধকাসুর। এই খবর শুনে ইন্দ্র চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তিনি যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে তুললেন সমস্ত দেবসৈন্যকে। অবিলম্বে সুব্যবস্থা হল অমরাবতী রক্ষার। তাঁর প্রসিদ্ধ বাহন ঐরাবতে চেপে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে গেলেন ইন্দ্র। অন্যান্য দেবতাগণ তাঁদের নিজ নিজ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিজ নিজ বাহনে চড়ে তার পিছু পিছু গেলেন। এইভাবে অতিবেগে সমস্ত দেবসেনা স্বর্গ থেকে বেরিয়ে গেল ইন্দ্রের পরিচালনায় হাতি, ঘোড়া ও রথ নিয়ে।

দ্বাদশ আদিত্য ছিল বিশাল দেববাহিনীর সামনে। স্বয়ং শিব ছিলেন পেছনে এবং মাঝে ছিলেন অষ্টবসু। বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুদ্গণ, নিজ নিজ বাহনে চেপে যক্ষ ও বিদ্যাধরেরাও দেবসেনার সাথে চললেন। নারদ পুলস্ত্যকে এই যুদ্ধের বিশদ বিবরণ বিস্তারিত ভাবে বলতে অনুরোধ করলেন। নারদ ইন্দ্র থেকে শুরু করে বাকি সব যোদ্ধার বাহনের কথা জানতে চাইলেন। পুলস্ত্য তখন সংক্ষেপে সকলের বাহনের সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত, এটির সাদা রং ও মহাশক্তিশালী। কালো রঙের পুন্দ্রক নামক মহিষ যমরাজের বাহন, এই মহিষ মনের মতো দ্রুতগামী ও রুদ্রতেজ থেকে উৎপন্ন। বরুণের বাহন জলধি নামক শিশুসার, এর আকৃতি শ্যামবর্ণ এবং এটি রুদ্রের কর্ণমূল জাত। নর কুবেরের বাহন, অম্বিকার পা থেকে এর জন্ম এবং রথের চাকার মতো এর চোখ। একাদশ রুদ্রের বাহনরূপে বিখ্যাত গন্ধর্ব সাপ ও শ্বেতবর্ণ বৃষগণ এছাড়া চন্দ্রমার বাহন রথ, অর্ধ সহস্র হাঁস, রবির বাহক। উট, রথ ও তিন প্রকার ঘোড়া আদিত্যগণের বাহন, হাতি বসুগণের বাহন। সাপ কিন্নরদের আর মানুষ যক্ষগণের বাহন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় অশ্বারোহী, সারঙ্গ মরুৎগণের বাহন, গন্ধর্বগণ পদচারী ও শুকবাহন অনর্থগণ। দেবতারা এভাবে যুদ্ধ করতে গেলেন যোদ্ধার বেশে সজ্জিত হয়ে, নারদ এরপর দৈত্যদের বাহন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলেন।

পুলস্ত্য তখন বলতে আরম্ভ করলেন যখন অন্ধকাসুর সমাসীন ছিলেন দিব্যরথে। এই রথের ঘোড়াগুলি ছিল উৎকৃষ্ট জাতীয় এবং দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ওই রথ ছিল এক ক্রোশের সিকি ভাগের মতো এবং রথটি ছিল বিশালাকার প্রহ্লাদের, এটি বাহিত ছিল আটটি চাঁদের শোভার মতো সুন্দর অশ্বে, এর একাংশ স্বর্ণবরণ, অপর অংশ শ্বেতবরণ। হাতি ছিল বিরোচনার বাহন, ঘোড়া কুজম্বের, দিব্য রথ ছিল কুজম্ভের শঙ্কর্ণের ছিল ঘোড়া এবং হাতি ছিল হয়গ্রীবের ময়দানবের রথ তার বাহনরূপে বিখ্যাত, ভীষণাকৃতি মাপ ছন্দুভির সিংহ। মুঙ্গর ও গদা ছিল অসুর সেনানী বলি ও বৃত্রের হাতে। দেবসৈন্যকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল এরা। কোনরূপ বাহন না নিয়ে পায়ে হেঁটেই এরূপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল দেব ও অসুর দুপক্ষই। অবশেষে আরম্ভ হল এক ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ। সমস্ত জায়গা ধুলো রাশিতে ছেয়ে গেল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সাথে

সাথে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ধূলিরাশি উত্থিত হয়ে। তখন পিতা পুত্রকে বা পুত্র পিতাকে চিনতে পারল না। পরস্পর পরস্পরকে বধ করতে লাগল নিজ নিজ দলভুক্ত যোদ্ধাদের মধ্যেই। গতিকে সামলাতে না পেরে দ্রুতগামী রথগুলি একে অপরের ওপর গিয়ে পড়ল। পদাতিক সৈন্যরা তীব্র ক্রোধে পরস্পর পরস্পরকে বধ করতে লাগল। মত্ত হস্তী মত্ত হস্তীর দিকে ছুটে চলল, অশ্বারোহীরা অপর অশ্বারোহীর দিকে ধাবিত হল।

এইভাবে সেই যুদ্ধক্ষেত্র এক ভীষণ নদীর আকার ধারণ করল যখন দেবতা ও অসুর সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ ভয়াবহ হয়ে উঠল। নিহত সৈন্যদের শোণিতে নদীর জলের মতো রক্তের ধারা বয়ে চলল। নদীর ঘূর্ণিস্রোত যেন রথগুলো, প্রবাহ যেন দ্রুতগামী যোদ্ধার দল। নদীর কচ্ছপ যেন হাতির কপালের গোলাকার অংশ, শরগুলো মাছ, কুমীর যেন তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্ররাশি, বিভিন্ন জলজন্তু সৈন্যদের অসিগুলো, শ্যাওলা অন্যান্য অস্ত্ররাশি, জলের গোলাতার পাতা, শকুনি, সারস প্রভৃতি প্রধান প্রধান হাঁস, চক্রবাক পাখি দেবতাদের ব্রজগুলো, বাঁকগুলি হল কাল হংস এবং মুনিজন হলেন পিশাচেরা। এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্র এক ভয়ংকর নদীর রূপ ধারণ করে বয়ে চলল। এই নদী সাধারণ লোকের পক্ষে এই নদী পার হওয়া খুবই কঠিন। একমাত্র রথ রূপ ভেলার সাহায্যে সাহসী যোদ্ধারা এই নদী সাঁতরে পেরিয়ে যেতে সমর্থ হবেন। এই ভয়ংকর নদীর যা মাঝখানে সাঁতার কাটতে লাগল যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী লাভের লালসায় যোদ্ধারা পরস্পরকে বধ করতে করতে।

ক্রমেই অতি বীভৎস হয়ে উঠল যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য, নিহত সৈন্যদের রক্ত পান করতে লাগল কাকেরা। শবগুলি ছিন্নভিন্ন করে মাংস খেতে লাগল, তারা মহানন্দে লাফালাফি ও চেঁচামেচি করতে লাগল পান ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়ে। কোথাও আহত যোদ্ধারা মাটিতে শুয়ে ক্ষতের জ্বালায় আর্তনাদ করছে। কোথাও শিয়ালেরা সোল্লাসে চিৎকার করছে। অস্ত্র থেকে ঝড়ে পরা রুধির কোথাও কোন আহত পিপাসার্ত যোদ্ধা পান করছে। ক্রমে এইভাবে যুদ্ধক্ষেত্র শ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত হল।

হাজার ঘোড়ায় টানা রথে চেপে ঐরাবত অবস্থানকারী ইন্দ্র দেবসেনাদের সামনে হাজির হল। আটটা ঘোড়া মিলে টানছিল প্রহ্লাদের রথ। সেই রথে চেপে উন্মুক্ত অস্ত্র নিয়ে মহিষারোহী যমরাজের সামনে তিনি গেলেন, এভাবে ক্রমে বিরোচন বর্ষণের, জন্ম কুবেরের, শতমঞ্চর বায়ু এবং মরদানব হতাশার সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। এছাড়া তুমুল যুদ্ধ শুরু করলেন অতি শক্তিশালী হয়গ্রীর প্রভৃতি দানবরা, আদিত্য, বসু, নাগরাজ প্রভৃতির সাথে। কেউ কেউ হাজার বাণ ছুঁড়তে লাগল, কেউ কেউ বৃহৎ ধনুর ছিলা টানতে লাগল, কেউ কেউ ভীষণ গর্জন

করতে লাগল। কেউ আবার প্রতিপক্ষকে সম্বোধন করে বললে তুমি কেন ভীত হয়ে পড়েছ? চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে এসে যুদ্ধ করো। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের নদী বয়ে গেল। শত শত সুতীক্ষ্ণ শরে যুদ্ধক্ষেত্র ছেয়ে গেল, কত সহস্র শত বীর হতাহত হল। মন্দাকিনীর বেগের চেয়েও বেগবান হয়ে উঠল এই রক্ত নদীর স্রোত, ত্রিলোক জয়ের লালসার প্রবলবেগে যুদ্ধে উন্মত্ত হয়ে উঠল দেব ও অসুর উভয় পক্ষই। নদীর পরপারে পৌঁছাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখল না কেউ। পরম পুষ্টিদায়ক হয়ে উঠল এই রক্তনদী পিশাচ ও রাক্ষসদের কাছে। রণ-দামামা বেজে চলল দেবতা ও দানবদের মধ্যে। আকাশ থেকে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে লাগল মুনি ও সিদ্ধগণ। অপ্সরাগণ সম্মুখ সমরে নিহত যোদ্ধাদের যুদ্ধস্থল থেকে স্বর্গে নিয়ে চলল।

১০

দেব-দানবের এক ঘোরতর যুদ্ধের বার্তা দিলেন পুলস্ত্য। বিশাল ধনু হাতে নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র তা থেকে অসংখ্য বাণ ছুঁড়তে আরম্ভ করলেন। অন্ধকাসুর এক বেগবান দীপ্ত ধনু নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে আহত করতে লাগল এই সকল বাণ-বর্ষণে। অন্ধকাসুরের দিকে বজ্র ছুঁড়ে মারলেন ইন্দ্র রেগে গিয়ে। দৈত্যরাজও অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র ও তির ছুঁড়ে চন্দ্রকে আহত করল। সাপ যেমন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তেমনি বাণগুলিও ভস্মীভূত হয়ে গেল। দৈত্যপতি কিছুতেই প্রতিহত করতে পারলেন না ইন্দ্রের বজ্রকে। দৈত্যরাজ এই বেগবান বজ্রকে আসতে দেখে দ্রুত রথ থেকে নেমে শুধু নিজের পায়ের উপর ভর দিয়েই মাটিতে দাঁড়িয়ে রইল।

অন্ধকাসুরের রথের পতাকা, ঘোড়া, সারথি ও রথের উপর বসার স্থানসহ সমস্ত রথ ভস্মীভূত করে দিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের বর্জ্য পুনরায় অন্ধকের দিকে ছুটে চললেন। ইন্দ্রের বজ্রকে আসতে দেখে অন্ধক সজোরে হাতের মুঠির আঘাতে ওই বজ্রকে মাটিতে ফেলে সিংহের মতো ভয়ংকর গর্জন করে উঠলেন। অন্ধককে গর্জন করতে দেখে ইন্দ্র তার দিকে তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়ে মারলেন। অন্ধক ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের মাথায় হাত দিয়ে সজোরে আঘাত করল ইন্দ্রের বাণ বর্ষণ ব্যর্থ করার জন্য।

অন্ধকাসুরের জানুর আঘাতে ঐরাবতের দাঁত ভেঙে গেল, ঐরাবতের শরীরের বাঁদিকে অন্ধক সাথে সাথে আঘাত করল। এভাবে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে ইন্দ্রের হাতি মাটিতে পড়ে গেল। ইন্দ্র তাঁর ঐরাবতের পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে গেলেন ঐরাবত মাটিতে পরার আগে এবং এরপর হাতে বজ্র নিয়ে নিজ রাজধানী অমরাবতীর দিকে পালিয়ে গেলেন।

ইন্দ্রের রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যাবার পর অন্ধকাসুর যাবতীয় দেবসৈন্যকে পদাঘাতে ও করাঘাতে দলিত মথিত করতে লাগল। যমরাজ তার হাতের দণ্ড চারিদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে এলেন দৈত্যবর প্রহ্লাদকে নিহত করার উদ্দেশ্যে। প্রহ্লাদও নিশ্চুপ থাকলেন না। প্রহ্লাদও যমরাজ আসা মাত্র সবেগে হাতে ধনু নিয়ে তাকে লক্ষ্য করে শত শত বাণ প্রেরণ করলেন এবং ঘোর গর্জন করতে লাগলেন। এই বাণ বৃষ্টি নিবারণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন যমরাজ তার হাতের দণ্ড দিয়ে। অবশেষে প্রহ্লাদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন এক ভয়ংকর দণ্ড। ত্রিভুবন দগ্ধ করতে উদ্যত কালাগ্নির মাথা প্রজ্বলিত হয়ে উঠল আকাশ পথে ছুটে আসা যমরাজের দণ্ড। দৈত্যগণ সকলে একযোগে 'হায় হায়' বলে চিৎকার করতে লাগল এই জাজ্বল্যমান যমদণ্ড প্রহ্লাদদের দিকে ছুটে আসতে দেখে। সকলেই ভাবলেন

এই আর্তনাদ শুনতে পেয়ে অন্ধকাসুর 'ভয় নেই, ভয় নেই' বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, তিনি বেঁচে থাকতে কোনো কিছুই তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। এই কথা বলতে বলতে খুব দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে যমরাজের দণ্ড ধরে ফেললেন। বর্ষাকালীন মেঘের মতো বারবার ভীষণ গর্জন করতে লাগল এবং অন্ধক এই যমদণ্ড হাতে নিয়ে সবেগে চারিদিকে ঘোরাতে লাগল। যমদণ্ডের আক্রমণ থেকে প্রহ্লাদের প্রাণ রক্ষা করবার জন্য দৈত্য ও দানব দলপতিগণ 'ধন্য ধন্য করতে লাগল। যমরাজের কাছে অন্ধকের যমদণ্ড ঘোরাবার দৃশ্য অসহ্য মনে হল অথচ এই যমদণ্ড অন্ধকের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতা তার ছিল না। তাই যমরাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে গেলেন। তিনি অসুরদের বেঁধে নিলেন যুদ্ধাস্ত্র দড়ি দিয়ে এবং গদাঘাতে জর্জরিত করে তুললেন। এই সময় বরুণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে তার কাছে এলো বীর বিরোচন। বরুণদেব জর্জরিত হয়ে পড়লেন বিরোচনের বজ্রের মতো সুকঠিন লৌহ নির্মিত শাবল জাতীয় অস্ত্র শক্তি নামক ক্ষেপণাস্ত্র, শর এবং মুগুরের আঘাতে। বিরোচন ভূপতিত হয়ে পড়ল বরুণদেবের গদার আঘাতে। বলবান বরুণ তৎক্ষণাৎ মত্ত হাতির মতো তাকে বেঁধে ফেললেন দড়ি দিয়ে। কিন্তু সেই বন্ধন শত শত খণ্ডে ছিঁড়ে ফেলেন বিরোচন প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে।

বিরোচনের হাতে বন্দি হলেন বরুণদেব এবং বিরোচনের মত্ত হস্তী দাঁত ও পা দিয়ে বরুণের শরীরে আঘাত করতে লাগল। চন্দ্রদেব বরুণদেবের করুণ অবস্থা দেখে তিনি তার শরীরভেদী বাণ ছুঁড়ে সেই হাতিকে বিদ্ধ করলেন। চন্দ্রদেবের বাণে ক্ষতবিক্ষত ও উন্মত্ত হয়ে উঠে সেই হস্তী বরুণদেবকে মাটিতে ফেলে দিয়ে পদাঘাতে তাঁকে পিষে ফেলতে লাগল। এইভাবে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে বরুণদেব হাতির দুটো পা বেশ দৃঢ়ভাবে ধরে ফেললেন।

তারপর তিনি মুহূর্ত মধ্যে হাতির সঙ্গে বিরোচনকে আকাশ পথে নিক্ষেপ করলেন এবং হাত পায়ের সাহায্যে মাটিতে ভর দিয়ে মাথা তুলে হাতির লেজ ধরে নিলেন।

বরুণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়ে বিরোচন ও তাঁর বাহন সেই হাতি ভূতলে পতিত হল। তখন মনে হল যেন স্বর্গ থেকে সূর্যদেব সুকেশিপুরকে ভূতলে ছুঁড়ে ফেললেন। এরপর বিরোচনকে বধ করতে ছুটে এলেন জলধিপতি বরুণ তার পাশ যুদ্ধাস্ত্র ও গদা হাতে নিয়ে। মেঘ গর্জনের মতো গভীর আর্তনাদ করে উঠল দৈত্য সেনারা। তারা সবাই 'হায় হায়' করে বলে উঠল, সেনাপতি এবার বরুণের হাতে মারা যাবেন। তারা বললেন, প্রহ্লাদ জম্ভ, কুজম্ভ সবাই অন্ধকের সাথে এসে বরুণের হাতে থেকে বিরোচনকে বাঁচান। তারা আরো বলল, তারা সকলে তাদের বাহন সহ বলবান বরুণের হাতে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে, যজ্ঞস্থলে পশুদের মহেন্দ্র যেমন নিহত করেন আমরাও তেমনি পাশ যুধাস্ত্র ও গদা দ্বারা বরুণদেব কর্তৃক নিহত হচ্ছি।

জম্ভ প্রভৃতি দানব সেনাপতিগণ দৈত্যপক্ষের এমন আর্তনাদ শুনে পতঙ্গ পালের আগুনের দিকে ধেয়ে যাবার মতো দ্রুতগতিতে বরুণের দিকে ধাবিত হল। বরুণ এসব দেখে বিরোচনকে ছেড়ে দিয়ে তার পাশ ও গদা নিয়ে জম্ভ প্রভৃতি দৈত্যদের দিকে ছুটে গেলেন ও অসংখ্য দৈত্যসেনা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল। বরুণ পাশাস্ত্রের আঘাতে ধরাশায়ী করলেন জম্ভকে, তার পদাঘাতে বৃত্র এক মুষ্টি নিক্ষেপ কুম্ভকে ধরাশায়ী করলেন। দৈত্যরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে যে যেদিকে পারল পালাল দেবশ্রেষ্ঠ বরুণ কর্তৃক বিমর্জিত হয়ে। বরুণের সাথে যুদ্ধ করবার জন্য অন্ধকাসুর তখন দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল। তখন বরুণ গদা দিয়ে তাকে দারুণ আঘাত করল এবং পাশাস্ত্রে বেঁধে ফেললেন। দৈত্যরাজ অনুকও বরুণের দিকে তারই নিক্ষেপিত গদা ও পাশ ছুঁড়ে মারল মুহূর্ত মধ্যে, বরুণ খুব তাড়াতাড়ি সমুদ্রের জলে গিয়ে লুকিয়ে পড়লেন নিজের অস্ত্র নিজের দিকেই ছুটে আসতে দেখে। সমস্ত দেবসেনা দলিত মথিত হতে লাগল অন্ধকাসুর দারুণভাবে ক্ষেপে ওঠায়।

অগ্নিকে পবনদেব যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন এবং অগ্নি সমস্ত দৈত্যসেনা দগ্ধ করতে লাগল। মহাপরাক্রমশালী ময়দানব অগ্নির দিকে ছুটে এল। শম্বুরাসুরময়কে সাহায্য করার জন্য পাশে এসে দাঁড়াল। শম্বর ও ময়দানবের গলায় আঘাত করে সবলে তাদের দুজনকে চেপে ধরলেন পবন সহচর বহ্নি। শম্বর ভূতলে পতিত হল শক্তিনামক যুদ্ধাস্ত্রের আঘাতে, শম্বরের দেহ বিদীর্ণ হয়ে গেল। অগ্নিসংযোগে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল শম্বর ও ময়ের সমস্ত শরীর। এই দৈত্য দুজন আগুনে দগ্ধ হয়ে ভীষণভাবে চিৎকার করতে লাগল, যেভাবে পশুরাজ সিংহর আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে হাতি বেদনার কাতরভাবে যেভাবে রোদন করে। দৈত্যপতি অন্ধক রেগে গিয়ে

চোখ লাল করে ফেলল শম্বরের সেই সকরুণ আর্তনাদে, তিনি জানতে চাইলেন শম্বর ও ময়দানবকে কে যুদ্ধে পরাজিত করল। অগ্নি শম্বরকে পুড়িয়ে মেরেছে একথা দৈত্যসেনারা তাকে জানালো এবং দৈত্যরাজকে অনুরোধ করল তাদের বাঁচানোর জন্য। তারা এই আগুনকে নিবারণ করতে পারছেন না। কিছুক্ষণের জন্য অগ্নিকে তার দহনকার্য বন্ধ রাখতে বললেন–হিরণ্যাক্ষনন্দন, অন্ধক সবেগে তার মুগুর হাতে তুলে অগ্নির দিকে ধাবিত হলেন।

হুতাশন আরো ক্রুদ্ধ হলেন অন্ধকের এই গর্বিত ও উদ্ধত বাক্যে। শম্বরকে অবিলম্বে ভূতলে ফেলে দিয়ে সজোরে মাটিতে পিষতে লাগলেন। এক বিশাল মুগুর দিয়ে হুতাশনের মাথায় আঘাত করলেন। অন্ধক প্রহারে আহত হয়ে শাম্বরকে পরিত্যাগ করে অন্ধকের দিকে ছুটে গেলেন। অন্ধক পুনরায় তাঁর মাথায় প্রবলবেগে আঘাত করল। অগ্নি মুগুর দিয়ে তাকে এভাবে ছুটে আসতে দেখে ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অগ্নি পলায়ন করল মাথায় বারবার আঘাত পেয়ে।

এরপর প্রবল পরাক্রম অন্ধকাসুর, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য, সাধ্যদেবগণ, বসুগণ কিংবা অশ্বিনী কুমারদ্বয় এইসব দেব যোদ্ধাদের বাণ নিক্ষেপ করে আঘাত করতে লাগল। তারা কালমাত্র দেরি না করে রণে ভঙ্গ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করল। এভাবে ইন্দ্র, রুদ্র, যম, সোম প্রভৃতি দেবসেনানী পরাজিত হলেন অন্ধকাসুরের কাছে। একারণে অন্ধকাসুরকে দানব দলপতিরা বিশেষভাবে সম্মানিত করল। মর্ত্যের সমস্ত রাজা তার বশীভূত হল। তিনি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে তাদের কর দানে বাধ্য করলেন। এভাবে সমস্ত চরাচর অন্ধকের কাছে অবনত হল। এরপর অন্ধক পাতালের প্রধান নগর অশ্মকে এসে সিদ্ধগণও সেখানে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

১১

এরপর প্রমথের উমা প্রসঙ্গের বিস্তৃত বর্ণনা নারদ জানতে চাইলেন। সূর্যদেব আকাশ থেকে সুকেশীকে ভূতলে ফেলে দেন। নারদ জানতে চাইলেন, সুকেশী কে? কেন তাঁর এরূপ অবস্থা হল? কে তাকে বর দিয়েছিল? পুলস্ত্য জানালেন, তিনি যতটা পুরাণ অনুযায়ী জানেন ততটাই তিনি নারদকে সবিস্তারে জানাবেন। তিনি জানালেন গুণবান সুকেশী ছিলেন বিখ্যাত রাক্ষস রাজ বিদ্যুৎকেশীর পুত্র। তাঁর গুণের ফলে শিব কর্তৃক তিনি বর প্রাপ্ত হন এবং তার ফলস্বরূপ তিনি আকাশ পুরী লাভ করেন এবং শত্রুগণের অবাধ্য হন।

সুকেশী সর্বদা বরলব্ধ গগনগামী পুরীতে রাক্ষসদের সাথে ঘুরে বেড়াত। এই সুকেশী একদিন মগধদেশের এক বনে গিয়ে মুনিদের অনেক আশ্রম দেখতে পেল। মুনিদের অভিবাদন করে সুকেশী তখন সেখানে মুনিদের কাছে তার একটি সন্দেহের কথা বলল। সে বলল, তাঁরা যেন তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে বাধিত করেন। এরপর তিনি প্রথমেই জানতে চাইলেন, ঐহিক ও পরলৌকিক মঙ্গল কি? কেমন করে সজ্জনদের কাছে পূজনীয় হয়ে ওঠা যায় এবং সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করা যায়। সুকেশীর প্রশ্ন শুনে মুনিগণও তাকে তার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য রাজী হলেন।

তারা প্রথমেই ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল বিষয়ের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। একমাত্র ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলকর ধর্ম। তাঁরা জানালেন ধর্মই মানুষকে পূজনীয় করে তোলে এবং সুখসমৃদ্ধি এনে দেয়। সুকেশী জিজ্ঞাসা করলেন –কেমন ধর্মাচরণ করলে কেউ দুঃখ পায় না? এবং সেটা কী ধর্ম? তখন তাঁরা জানালেন, দেবতাদের পরম ধর্ম হল সতত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, তত্ত্ববিজ্ঞান ও বিষ্ণুপুরাণ অনুরূপ দৈত্যদের ধর্ম হল বাহুবল। মাৎসর্য, যুদ্ধ, সৎকার্য, নীতিশাস্ত্র, অভিজ্ঞতা এবং শিবভক্তি, শিবের প্রতি ভক্তি, বিষ্ণুভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান, যোগসাধনা, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি সাধ্যগণের উৎকৃষ্ট ধর্ম, গন্ধবদের ধর্ম হল উত্তম উপাসনা, নৃত্য ও বাদ্যে দক্ষতা, সুরসতীর প্রতি অবিচল ভক্তি। বিদ্যাধরদের ধর্ম হল বিদ্যাভ্যাস, অসাধারণ বিজ্ঞানচর্চা, পুরুষকারে মনসংযোগ এবং ভগবতী ভবানীর প্রতি ভক্তি। কিন্নরদের ধর্ম হল গন্ধর্ব বিদ্যায় অভিজ্ঞতা, সূর্যদেবের প্রতি ভক্তি এবং সর্বশিল্পে নৈপুণ্য। ব্রহ্মচর্য, অনভিমান, যোগাভ্যাসে প্রগাঢ় অনুরাগ ও সর্বত্র স্বেচ্ছাভ্রমণ পৌত্রিক ধর্ম। ঋষি ধর্ম হল ব্রহ্মচর্য, সত্যভাষণ, জপ, জ্ঞান, নিয়ম ও ধর্ম বিষয়ে কুশলতা, মানব ধর্ম হল বেদাধ্যয়ন ব্রহ্মচর্য, দান, যজ্ঞ, অকার্পণ্য, দয়া, হিংসা, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুচিতা, মাঙ্গলিক আচার, শৃঙ্গার, সূর্য ভগবতীর প্রভৃতির প্রতি ভক্তি। গুহ্যবাদের ধর্ম ধনাধিপত্য, ভোগ, বেদাধ্যয়ন, শিবপূজা, দর্প। পরস্ত্রী গমন, পরার্থে লালসার, বেদনুশীলন ও শিবভক্তি রাক্ষসধর্ম, পিশাচধর্ম হল অবিবেক, অজ্ঞান, অশৌচ, সত্যাচরণ ও সর্বদা আমিষভক্ষণ এই বারো প্রকার ধর্ম ব্রহ্মা নির্দেশানুসারে মূল ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থল এবং ইহাই পবিত্র ও ভক্তিপ্রদ।

এরপর সুকেশী মানবধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলেন। তখন মুনিগণ জানালেন পৃথিবী সাতটি দ্বীপে বিভক্ত এবং সেখানকার বসবাসকারী মানুষদের সম্পর্কে তারা জানাবেন। পঞ্চাশ কোটি যোজনের এই পৃথিবী নদীবক্ষের ওপর অবস্থিত নৌকার মতো জলের ওপর ভাসমান হয়ে বিরাজিত ব্রহ্মা পৃথিবীপৃষ্ঠে এক অত্যুচ্চ মহাশৈল স্থাপন করেছেন। ব্রহ্মার জন্যই প্রাণী সমূহের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এই মহীমণ্ডলকে নানা দ্বীপে ভাগ করেছেন। লক্ষযোজন বিস্তৃত

জম্বুদ্বীপ নামক একটি দ্বীপ নির্মিত হয়েছে সমগ্র দ্বীপের মধ্যে। লবণসাগর এর চতুর্দিক পরিবেষ্টন করেছে। লবণসাগরের দ্বিগুণ মাপের দ্বীপের নাম পক্ষদ্বীপ।

এর বহির্ভাগে ইক্ষুসাগর বলয়াকারে বিরাজিত। এইভাবে ক্রমান্বয়ে শাল্মলি, কুশ ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর দ্বীপ বিরাজমান। প্রত্যেকটি দ্বীপ পূর্বের থেকে দ্বিগুণ এবং প্রত্যেকটি বহির্ভাগে এর দ্বিগুণ পরিমাণ বড়। সুরা, শপি, দধি, দুগ্ধ ও স্বাদুই নামে পরস্পর পাঁচটি সাগর বর্তমান। ভগবান হরি শেষ শয্যায় শুয়ে আছেন শাক্যদ্বীপে। দ্বীপগুলির মোট আয়তন চল্লিশ কোটি নব্বই লক্ষ পঞ্চ যোজন। জম্বুদ্বীপ থেকে আরম্ভ করে ক্ষীরসাগর পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগের আয়তন দু-লক্ষ পঞ্চাশ যোজন। পুষ্কর দ্বীপের পরিমাণও এইরূপ। অনন্ত মহাসাগর এরপরই অনন্ত কটাহে পরিব্যাপ্ত চারিদিক।

এই সমস্ত দ্বীপেই আলাদা আলাদা ধর্ম ও ক্রিয়াকলাপ দেখতে পাওয়া যায়। তারা এই দ্বীপগুলির সম্পর্কে যথাসম্ভব বলতে সম্মত হলেন। প্লক্ষ থেকে শাক দ্বীপ পর্যন্ত দ্বীপে চিরজীবী মানুষেরা বাস করে। তাদের কাল ও যুগের পরিবর্তন ঘটে না। এরা দেবতাদের মতো সদানন্দে বাস করে। এই দ্বীপের মানুষের কখন বিনাশ ঘটে না। একমাত্র কল্পান্তে কাল ভিন্ন আর কোনো সময় পুষ্কর দ্বীপে যারা বাস করে তারা ভীষণ দর্শন ভয়ংকর তাদের ধর্ম হল পৈশাচ, কর্মনাশ হলে তাদের বিনাশ ও সুনিশ্চিত।

সুকেশী তখন জানতে চাইল, তাঁরা কেন এমন ভীষণভাবে পুষ্করদ্বীপের বর্ণনা করলেন? কর্মক্ষয় হলে অপবিত্র হলে অধিবাসীদের বিনাশের কথাই বা কেন বললেন? ঋষিরা বললেন, উক্ত পুষ্করদ্বীপ ভয়ংকর বহুসংখ্যক নরক আছে। তাই এর বর্ণনা ভীষণ রূপ। সুকেশী তখন এই নরকে রৌরব সংখ্যা এবং তাদের প্রকৃতির কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ঋষিরা জানালেন, নরকের সংখ্যা একুশ। এদের মধ্যে প্রথম হল রৌরব নামক নরক, এর দৃশ্য অতি ভয়ংকর। এর বিস্তার দুই হাজার যোজন এবং সর্বত্র জ্বলন্ত আগুন পরিব্যাপ্ত, জ্বলন্ত আগুনের তাপে ভূমিভাগ তামাটে হয়ে যায়, দ্বিগুণ আকারের দ্বিতীয় নরকের নাম মহারৌরব তৃতীয় ও চতুর্থ নরকের নাম তমিস্র ও অন্ধতমিস্র। পঞ্চতম নরক ফলমূত্র। এরপর অপ্রতিষ্ঠিত এবং সপ্তম নরক ঘটীযন্ত্র এরপর বাহাত্তর হাজার যোজন বিস্তৃত অসি পত্রকা। তপ্তকুম্ভ ও কূটসকলী নবম ও দশম নরক। এর পরবর্তী নরকগুলির নাম হল করপত্র, ঋভোজন, সাদংশ, লৌহপিণ্ড, করম্ভসিবাতা, ক্ষারনদী, কীট ভোজন, বৈতরণী, শোণিত পূরঅঞ্জন, সুর ধার শানিত চক্র ও সংশোধন।

১২

সুকেশী জানতে চাইল, কি কাজ করলে মানুষের নরকে স্থান হয়? মানুষরা নিজের কর্মফলে ভোগ করে ও নরকে পতিত হয়। একথা ঋষিগণ তাকে জানালেন। দেব, বেদ ও ব্রাহ্মণদের যারা নিন্দা করে, পুরাণ ইতিহাসের সদুপদেশ ব্যাপারে যাদের শ্রদ্ধাভক্তি থাকে না, যারা গুরুর নিন্দা ও যজ্ঞকার্যে বাধা সৃষ্টি করে, দাতাকে দানের ব্যাপারে বাধা দেয় তারাই নরকে পতিত হয়। যমরাজের ভৃত্যরা তাদেরকে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়। যে নরাধমেরা বন্ধু, দম্পতি, সহোদর ভাই, প্রভু, ভৃত্য পিতাপুত্র এবং যজমান, অধ্যাপক প্রভৃতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, একজনকে কন্যা দান করে পরে আবার অন্য ব্যক্তির হাতে কন্যাকে সমর্পণ করে। যারা অন্যকে কষ্ট দেয়, চন্দন, কেনা ঘাসের মূল ও চামর চুরি করে তারা করম্ভাসকে ভীষণ নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি দেব কিংবা পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়ে অন্যের কাছে আহার করে নরকের পাখিরা তীক্ষ্ণ ঠোঁটে তাদের দুদিকে টানতে থাকে, যে ব্যক্তি সাধুদের অন্তরে আঘাত দেয় নরকের পাখিরা তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়।

নরকের কাকেরা সাধু সজ্জনের সাথে অসৎ ব্যবহারকারী লোকের জিভ ধরে টানে। নরকের মল মূত্র ও পুঁজের মধ্যে পতিত হয় পিতা, মাতা ও গুরুজনদের অবজ্ঞাকারীরা নরকের এত কদম পুঁজরস খায়, যারা অতিথি, দেবতা, ভৃত্য কিংবা বালক পিতা-মাতা ও ভগ্নী প্রভৃতির খাওয়া না হতেই নিজে খেয়ে নেয় তাদের শরীর পর্বতের মতো বিশাল হয়ে ওঠে। ক্ষুধার তাড়নায় তারা কাতর হয়ে ওঠে কিন্তু সূচের মতো ছিদ্র মুখ হওয়ায় তারা মুখ দিয়ে খাবার খেতে পারে না। বীত ভোজন নামক নরকে পতিত হয় সেইসব লোকেরা যারা একই পঙক্তিতে খেতে বসিয়ে খাবার দেওয়ার ব্যাপারে ব্যক্তি বিশেষের তারতম্য করে। যেসব ব্যবসায়ী নিজে সব নিয়ে নেয় ভাগাভাগি না করে তারা নরকের শ্লেষ্ম ভক্ষণ করে তাদের হাতে। অতি ভয়ংকর ফুটন্ত পাত্রে নিক্ষিপ্ত হতে হয় যারা এঁটো হাতে ইচ্ছে করে গরু, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি স্পর্শ করে। যমরাজের ভূত্যরা তাদের চোখে আগুন জ্বেলে দেয় যারা এঁটো অবস্থায় সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্রদের দেখে। নরকের অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে তারা যারা পত্নী, বন্ধু, মাতা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতা, পিতা, কোন গুরু কিংবা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পা দিয়ে স্পর্শ করে, যমের অনুচররা গরম করা লোহার

শিকল দিয়ে এইসব পাপীদের পা বেঁধে ভীষণ রৌরব নরকে ফেলে দেয় যাতে তাদের জানু অবধি পুড়ে যায়।

তাদের মুখের ভিতর গরম তপ্ত লোহা নিক্ষিপ্ত হয় নিন্দা যারা নিজ কানে শোনে। তাদের কানে তপ্ত লৌহ শলাকা ঢোকানো হয়। সেইসব পাপীরা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কাঁদতে থাকে যারা পরে পাশে জলপানের স্থান, দেবালয়, বিশ্রামালয়, ব্রাহ্মণ গৃহসভা, মঠ, পুকুর, কুয়ো প্রভৃতি ধ্বংস করে। তাদের শরীর থেকে ছুরি দিয়ে মাংস তুলে নেওয়া হয়। গুরু, ব্রাহ্মণ, সূর্য ও অগ্নির দিকে মুখ করে যারা মলমূত্র ত্যাগ করে নরকের বীভৎস কাকেরা মলদ্বার দিয়ে তাদের নাড়িভুঁড়ি ঠেলে বার করে আনে। নরকের কুকুরযোনি লাভ করতে হয় সেই ব্যক্তির যে স্বার্থচিন্তায় ব্যস্ত হয়ে দুর্ভিক্ষের মতো সঙ্গতিহীন পুত্র, ঠাকুর, স্ত্রী-আত্মীয়দের পরিত্যাগ করে। যমের অনুচররা তাদের মারতে মারতে যন্ত্রের উপর ফেলে দেয় যারা শরণাগতকে পরিত্যাগ করে ও অকারণে নিরীহ লোকদের বেঁধে রেখে কষ্ট দেয়। যেসব পাপাত্মা ব্রাহ্মণদের পূজার্চনার ব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি করে নরকে যমের ভৃত্যের তাদের শিলাতলে পিষে আগুনের তাপে ঝলসাতে থাকে।

যেসব পাপিষ্ঠরা অন্যের দ্রব্য আত্মসাৎ করে নেয়, তারা নরকে শৃঙ্খলবদ্ধ হয়ে কাল কাটায়। ক্ষুধার জ্বালায় তাদের প্রাণ শেষ হয়ে যাবার মতো হয়ে পড়ে। তালু ও ঠোঁট শুকিয়ে যায়। তাদেরকে বিছা কামড়াতে থাকে। আগুনের উত্তপ্ত শাল্মলী তরুকে আলিঙ্গন করতে হয় তাদের যারা উৎসবের দিনে মৈথুন করে। পরস্ত্রীর সাথে মিলিত হয়, যেসকল ছাত্ররা একজনকে অপমান করে অন্য অধ্যাপকের কাছে যায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করে এবং তাদের অধ্যাপকরা নরকে মাথায় করে পাথর বহন করে। নরকে মল-মূত্র ও দুর্গন্ধময় পুঁজে পতিত হয় তারা।

যারা জলে এইসব বর্জ্যপদার্থ ফেলে, যারা শ্রাদ্ধের দিন অতিথি সৎকারে বাধা দেয় তারা নরকে পরস্পরের মাংস খায়। যমরাজের ভৃত্যেরা তাদের পাহাড় থেকে ফেলে দেয়। যারা বেদ, অগ্নি, গুরু, মাতা ও পিতাকে পরিত্যাগ করে, যারা কন্যা সন্তানকে হত্যা করে বা গর্ভ নষ্ট করে তারা নরকে গিয়ে কৃমি ও পিপীলিকা খায়। বিভিন্ন নীচ জাতির কাছ থেকে ব্রাহ্মণ দক্ষিণা গ্রহণ করলে কৃমি কীট হয়ে কালযাপন করে। নরকে নেকড়ের মুখে পতিত হয় যারা কীটের মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে। মহারৌরব নরকে পতিত হয় তারা যারা সোনাচুরি করে ব্রাহ্মণ বধ করে সুরা পান করে, গুরুপত্নীর প্রতি আসক্ত হয় পরের জমি দখল করে, গুরু, স্ত্রী ও শিশু হত্যা করে এবং যে ব্রাহ্মণ, গরু, জল কিংবা বেদাস্ত্র অপরকে বিক্রয় করে প্রাত্যহিক আচরণগুলো নিয়মানুসারে পালন করে না, যে ব্রাহ্মণ শুচিতা পালন করে না ও মামলা

মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়; তাদের তামিস্ত্র অন্ধ তামিস্ত্র, ঘটীযন্ত্র ও তপ্তকুম্ভ জাতীয় ঘোর নরকে দশ হাজার বছর বাস করতে হয়।

১৩

যে পরের উপকার করতে অস্বীকার করে তার ক্ষতির চেষ্টা করে, সে লোকসমাজে নিন্দিত হয় এবং সকল নরক আগে ভোগ করতে হয়। দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু প্রধান,পর্বতের মধ্যে হিমালয়, অস্ত্রের মধ্যে সুদর্শন, পাখির মধ্যে গরুড়, সাপের মধ্যে অনন্ত, ভূতগণের মধ্যে নদী মধ্যে, গঙ্গা জলজ উদ্ভিদের মধ্যে পদ্ম, দৈত্যগণের মধ্যে শিবভক্ত ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে কুরুজঙ্গল, তীর্থের মধ্যে পৃথুদক, সরোবরের মধ্যে উত্তর মানস, পুণ্যকারীদের মধ্যে নন্দন, ত্রিভুবন মধ্যে ব্রহ্মভবন, ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে সত্যতা, যজ্ঞের মধ্যে অশ্বমেধ, সুখস্পর্শের মধ্যে পুত্র, তপস্বীদের মধ্যে অগস্ত্য, শাস্ত্র মধ্যে বেদ, পুরাণ, মধ্যে মাৎস্য সংহিতা মধ্যে ব্রহ্মশক্তি, পুঁথি মধ্যে মনুসংহিতা, তিথি মধ্যে বেদ, পুরাণ মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র তেজস্বীদের মধ্যে সূর্য, গ্রহনক্ষেত্রের মধ্যে চন্দ্র, হ্রদ মধ্যে জলধি, রাক্ষসদের মধ্যে সুকেশী, পাশ মধ্যে নাগপাশ, ধানের মধ্যে শালিধান, মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ, চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে গরু ও সিংহ কুলের মধ্যে জাতি, নগর মধ্যে কাঞ্চী, নারীর মধ্যে রম্ভা, চতুরাশ্রমের বসবাসকারীদের মধ্যে গৃহস্তপুর সমূহের মধ্যে কন্দ, ব্যাধি মধ্যে অজীর্ণ, সাদা জিনিসের মধ্যে দুধ, বস্ত্রের মধ্যে কার্পাস বস্ত্র, কলামধ্যে গণিত, জ্ঞান, বিজ্ঞান মধ্যে ইন্দ্রজাল, শাকের মধ্যে কাকমাচী, রসসমূহে লবণ, ফল মধ্যে তাল, সরোবর মধ্যে পদ্মা সরোবর, বনবাসীদের মধ্যে ঋক্ষ রাজ, গাছের মধ্যে বট, জ্ঞানীদের মধ্যে শিব, সতীমধ্যে পার্বতী, বৃষমধ্যে নীলবৃষ, দুর্গম স্থানের মধ্যে বৈতরণী, তেমনি যে ব্যক্তি পরের উপকার স্বীকার না করে সে। পাপীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পাপিষ্ঠ ব্রহ্মহত্যাকারী ও গোহত্যাকারীদেরও পরিত্রাণ হয় কিন্তু দুবৃত্ত কৃতঘ্নদের কোনো নিস্তার নেই। শত কোটি জন্মেও নরকযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। যে বন্ধুর উপকার অস্বীকার করে সে অনিষ্ট সাধন করে।

পুষ্কর দ্বীপের বিশদ বিবরণ শোনার পর সুকেশী জম্বুদ্বীপের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ঋষিরা তখন তাকে তা অবগত করলেন। তাঁরা বললেন–এই দ্বীপের বাসিন্দারা স্বর্গ ও মোক্ষলাভ করে। এই দ্বীপের মাঝখানে ইলা বৃত, পর্বে ভদ্রশ্য, পূর্ব ও দক্ষিণে হিরন্মান দক্ষিণে ভারতবর্ষ, দক্ষিণ পশ্চিমে হরিবর্ষ, পশ্চিমে কেতুমাল, পশ্চিম ও উত্তরে চম্পক, উত্তরে

কুরুবর্ষ। এর পূর্ব ও উত্তরে কিম্পুরুষ বর্ষ। এই সকল বর্ষগুলি মনোরম ও পবিত্র, ভারতবর্ষ ছাড়া বাকি আটটিবর্ষে কোনো কাল পরিবর্তন হয় না। এর অধিবাসীরা জরা মৃত্যু ভয়ে ভীত নয়। এরা নিরবিচ্ছিন্ন সুখে জীবন কাটায়। সুখের জন্য তাদের বিশেষ চেষ্টা করতে হয় না। এরা কখনও বিপদ-আপদে পড়ে না, এদের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও অধম এরূপ কোনো ভেদ নেই। ভারতবর্ষ নয়টি দ্বীপে বিভক্ত। এই সব দ্বীপই সাগর দিয়ে ঘেরা এবং একটি থেকে আরেকটিতে যাওয়া কঠিন। এর মধ্যে আটটি দ্বীপের নাম-ইন্দ্রদ্বীপ, কতোরুমা, তাম্রপর্ণ, গঙক্তিমান, নাগ দ্বীপ কাটাহ, সিংহল ও বারুণ, নবমদ্বীপের নাম কুমার। কুমারদ্বীপ দক্ষিণ ও উত্তরে অবস্থিত সাগরের দ্বারা পরিবৃত।

এই দ্বীপের পূর্বে কিরতি, পশ্চিমে যবন, দক্ষিণে অন্ধ ও তুরস্কদের বাস। এই দ্বীপের অধিবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যজ্ঞ, যুদ্ধ ও বাণিজ্য জাতীয় কাজ তারা নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সাথে পালন করে। তারা কৃতকার্যের ভালোমন্দ অনুসারে স্বর্গ, মোক্ষ, পুণ্য ও পাপ ভোগ করে। এই দ্বীপে মহেন্দ্র মলয় সহ্য শক্তিমান যক্ষবৃন্দ ও পারিপাত্র নামে সাতটি কুলপর্বত আছে।

এগুলি ছাড়াও বহুসংখ্যক পর্বত আছে। এগুলি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ও অত্যুচ্চ এর তলদেশ অতি রমণীয়। কতগুলি পর্বতের নাম কোলাহল, বৈত্রাজ, মন্দর, দুগ্ধর, কত ধর্ম, বৈদ্যুৎ, মৈনাক, সরস, তুঙ্গপ্রস্থ, নাগগিরি, গোবর্ধন, উজ্জয়নী, পুস্পগিরি, অবুদ রৈবত ঋষ্য মূক, গোমস্ত, চিত্রকূট, কৃতশ্মর, শ্রীপর্বত ও বোবাম। এছাড়াও শত শত পর্বত আছে। এই সব পাহাড় ঘেরা লোকালয়ে ম্লেচ্ছ প্রভৃতি নানা জাতি বাস করে। এই সব লোকালয়ের অধিবাসীরা যে নদীর জল পান করে তাদের নাম সরস্বতী, পঞ্চরূপা, কালিন্দী, হিরন্বতী, শতদ্রু, চান্দ্রিকা, নীলা, বিতস্তা, ইরাবতী, কুহু, মধুরা, হারারাবী, ইশীরা, ধাতুকীরকম। গোমতী ধুত পাপা, বাহুদা, দৃশ্যন্বতী, নিঃস্ববা, গন্তকী, চিত্রো কৌশিকী, বধূসরা, সরযূ ও লৌহিত্য এই সব নদী ও নদ হিমালয় পাদদেশে থেকে নির্গত হয়েছে।

পরিপত্র পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে বেদস্মৃতি, বেদসিনী, বৃত্রঘ্নী, সিন্ধু, পণাসা, নন্দিনী, পার্বানী, মহীশ্চরা, চর্বন্ধতী, উলুপী, বিদিশা, বেণুমতী, চিত্রা ও ঘবতী ও রম্যা। ঋক্ষ পর্বতের পাদদেশ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে শোন, মহানদী, নর্মদা, সুরসা, ক্রিরা, মন্দাকিনী, দশতনা। চিত্রকূটা, আহি বেদিকা, চিত্রোৎপলা তামস্যা, বারতোয়া, পিশাচিকা, শুক্তি মতী, চক্রিনী, ত্রিদিবাস এবং ফল্কবাহিনী, বিন্ধ্যপর্বত থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে শিবা, পয়েষ্ণী, নির্বিন্ধ্যা, তাপী, নিষধাবতী, কেনা বৈতরণী, সিনিবাহু কুমন্ধতী তোয়ারেবা, মহাগৌরী ও

দুর্গন্ধা। এদের জল পরস পবিত্র ও স্বচ্ছ। সহ্যাদ্রির পাদদেশ থেকে উৎপন্ন জাত নদীগুলি হল গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণা, বেন্থা, সরিন্ধতী বিশমন্ত্রী, সুপ্রয়োগ, বাহ্যাঁ, কাবেরী দুর্গন্ধ, নলিনী, বারিসেনা, কলস্বনা, শুকিমান পর্বত থেকে বেরিয়ে এসেছে কৃতমালা, তাম্রপণী কঞ্জুলা, উৎপলাবতী, শুনী ও সুদামা।

এরা প্রত্যেকে পবিত্র স্বচ্ছজল পূর্ণ। এই নদীর পুণ্যস্নানে পূণ্যি লাভ হয়। এরা প্রত্যেকে সাগর পত্নী। কুমারদ্বীপে আরো হাজার হাজার ক্ষুদ্র নদী আছে। এদের মধ্যে কিছু নদীতে সর্বদা জল থাকে না। আবার কিছু নদী বর্ষাকালে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর জল মধ্যদেশীয় লোকেরা ব্যবহার করে। মধ্য দেশীয়রা হলেন কুশূদ্র, কুন্তল, পঞ্চাল, কৌশিক এবং শক, বর্বর, কৌরব কলিঙ্গ অঙ্গবঙ্গ, মর্মক। উত্তরা পথের অধিবাসীরা হলেন আভীর, শাক্য ধান, বাহ্লীক, অভীর, অপরান্ত, শূদ্র, পল্লব ঘটক, গান্ধার যবন, সিন্ধু সৌবীর, ভদ্রক, শতদ্রব, ললিথা, পারাবত মূষিক, মাবর, কেকয়, দংশন ক্ষত্রিয়, প্রতিবেশত, শূদ্র কূল, কম্বোজ, দরদ, বর্বর, অঙ্গলৌকিক, বেন, তুষার, আত্রেয়, ভরদ্বাজ প্রস্থল, দাশেরক, লম্বক, স্তাবক আরাম, চুড়িব, তঙ্গন, অলস অলিভদ্র, কিরাত, কর্মপন্থী, তামস, গণক, সুপার্শ্ব, কুর্ত, কুহিক, চূর্ণ, তুণপাদী, কুবকুব, মান্তপাদীক্ষ পাণবীয়।

১৪

অঙ্গ, বঙ্গ, মদগুরু, মদংসদ, কলদন্তিক, ব্রহ্মোত্তর, বিজয়, ভাগর, অঙ্গেয়, মর্ষক, প্রাগজ্যোতিষ, পৃষ, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, মালা মগধ ও আনন্দ পূর্বদিকে অবস্থিত দাক্ষিণাত্য রুপে সুবেদিক পুণ্ড কেরল চৌড়, কুল্য, মহারাষ্ট্র, মহিষিক, কলিঙ্গ আভীড়, বেশকত, আরণ্য, শবর, বিন্ধ্য পর্বতের সন্নিকটে অবস্থিত পুলিন্দ, বিদর্ভ, দন্তক, পৌরিক, সরিক, ভোগবদন, অশ্মকনৈমিক, কুন্দন, আন্ধ, উলিদ উদ্ভিদ।

পশ্চিম দেশীয় অধিবাসীরা হলেন শূপারক, বারিধান, তাপস তামস, শারস্কর, দারুকৃচ্ছ, সমোদয় সারস্বত, শাৎসীয়, সুরাষ্ট্র অবাস্ত্য ও অবুদ, কারুষ, একলব্য, মেকল উৎকল, উত্তমর্ণ, দশার্ণ, গোল্ড কিবা রথ, শেল, ত্রৈপুর, খেল্লিশ, তুরগ, তুম্বর, নিষেধ, বহেল, অনুপ হস্তিকের, ধীত হোত্র, অবন্তি বিন্ধ্যা পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। ত্রিকগই কিরাত, তোমর, শশিখ, আদ্রিক, সুতরাং কুমার দ্বীপের বিবরণ ও ধর্মারণ সুকেশীকে মুনিরা বিশদভাবে শোনালেন।

ঋষিরা সুকেশীকে জানালেন অহিংসা, সততা, চুরি না করা, মন সংযম, ইন্দ্রিয় সংযম, দান, ক্ষমা, অকার্পণ্য, অশৌচ, তপস্যা দশটি বর্ণের সাধারণ ধর্ম। ব্রাহ্মণের জন্য চার প্রকার আশ্রমধর্ম নির্দিষ্ট আছে। এতেও সুকেশীর কৌতূহল নিবারণ হল না। তার আগ্রহ ক্রমশ বেড়ে চলল। এবার তিনি। চতুরাশ্রমের বিষয় বিশদভাবে জানতে চাইলেন। ঋষিরা বললেন, উপনয়নের পর ব্রাহ্মণরা চর্যানুযায়ী গুরুগৃহে বাস করে।

এই সময়কার ধর্মাচারণ হল গুরুগৃহে বাসকালে বেদাধ্যয়ন, অগ্নি পরিচর্যা, স্নান ও ভিক্ষাবৃত্তি পালন করবে। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গুরুকে দিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে খাবে। গুরুর কাজ সর্বদা করবে, গুরুকে খুশি রাখার চেষ্টা করবে। তার আদেশে বেদপাঠ করবে, অধ্যয়নের সময় অন্যত্র মন দেবে না। গুরুর কাছে সমস্ত বেদশাস্ত্র পড়ে ভালোভাবে শিক্ষালাভ করবে। গুরুর অনুমতি নিয়ে তাকে দক্ষিণা দেবে। ব্রহ্মচর্যের পর ব্রাহ্মণ গৃহস্থ হতে চাইলে গার্হস্থ্য শ্রম পালন করবে। এরপর সে নিজের ইচ্ছেমতো যে কোনো আশ্রম অবলম্বন করতে পারে, বা গুরুর গৃহে তার সেবা করেই জীবন কাটাতে পারে। কিন্তু গুরু কন্যার নিকট বাস করা উচিত নয়। মনের সব অহংকার ত্যাগ করে গুরুর সেবায় নিযুক্ত থেকে তার সেবা করলে ব্রাহ্মণ মৃত্যুঞ্জয়ী হতে পারে।

গুরুগৃহ থেকে ফিরে গার্হস্থ্যশ্রমে প্রবেশ করতে হলে কোন সগোত্র কন্যাকে বিবাহ করতে পারে। নিজ বর্ণের উপযোগী পেশা অবলম্বন করে ধন উপার্জন করবে। সদাচারী ব্রাহ্মণ পিতামাতা, দেবতা ও অতিথিদের খুশি করবার চেষ্টা করবে এই ধন দিয়ে। এরপর সুকেশী এই সদাচারের লক্ষণ জানতে চাইলেন। ঋষিরা এরপর সুকেশীর কৌতূহল নিবারণের ইচ্ছায় সদাচারের লক্ষণগুলি তাকে বললেন। গৃহস্থ ব্যক্তির সদাচার পালন করা উচিত। যে গৃহস্থর আচরণ মানে না তার ইহকাল, পরকাল মঙ্গল হয় না। যে যজ্ঞ, দান কিংবা তপস্যার লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছাচারে বশবর্তী হয় তার কল্যাণ হয় না। এরা ইহকাল ও পরকালে সুখ শান্তি পায় না। সুতরাং পুণ্যলাভ করার জন্য সর্বদা সদাচার স্বরূপ শুনতে বললেন। সদাচার গাছের মতো যার মূল হল ধর্ম, ধড় হল শাখা-প্রশাখা, কামনা ফুল ও মোক্ষ হল তার ফল। যে এই গাছের পরিচর‍্যা করে সে পুণ্য অর্জন করে, অতিপ্রত্যুষে উঠে দেবতা ও মুনি ঋষিদের স্মরণ করবে।

দেবাদিদেব শিব মঙ্গল গাথার মতই প্রাতঃকালীন মঙ্গল গাথা গাইবে। সুকেশী জানতে চান মানুষের পাপের মুক্তি লাভের কোনো প্রভাত গাথা কি মাহাত্ম গেয়েছেন। ঋষিরা বললেন, এই গীত শুনলে বা মনে মনে জপ করলে সমস্ত পাপ দূর হয়। শৃঙ্গারের এই প্রভাত গাথা ব্রহ্মা কৃষ্ণ

ও শিব, সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি গ্রহ সবাই আমার সুপ্রভাত বিধান করুন।

ভৃগু, বশিষ্ট, ক্রতু, আঙ্গিরা, পুলস্ত্য পুলহ গৌতম রৈভ্য, মরীচি, চ্যবন এবং রিভু সবাই আমার প্রভাতকালীন মঙ্গলসাধন করুন। সনৎ কুমার জনক সনন্দন সনাতন, সসুরি পিঙ্গল, সপ্তস্বর ও সপ্ত রসাতল, ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম, রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ ও মহান সকলেই আমার প্রভাতকালীন মঙ্গল বিধাতা হোন। সপ্তসাগর সপ্তকুলাচল সপ্তঋষি, সপ্তদ্বীপ এবং সপ্তলোক সকলেই তাঁর প্রাতঃকাল মঙ্গলময় করে তুলুন।

এভাবে ঈশ্বরের কৃপায় সুপ্রভাত নিশ্চয় হয়। প্রাতঃকালে ভক্তিভরে এই পরম পবিত্র প্রভাতগাথা পাঠ করবে। ধর্ম ও অর্থ বিষয়ের চিন্তা না করে, হরিকে স্মরণ করবে। এরপর মলমূত্র পরিত্যাগ করার জন্য ঘরের বাইরে যাবে। কখনো গোচরে পশ্চিম ও পূর্বদিকে দেবালয়ে গরু, ব্রাহ্মণ বা আগুনের কাছে, রাজপথে চৌরাস্তায় মলত্যাগ করবে না। তারপর শৌচক্রিয়া করার জন্য হাতে মাটি নিয়ে মলদ্বারে তিনবার, হাতের তালুতে দশবার, দুই পায়ে সাতবার ও লিঙ্গে একবার লেপন করতে হবে। এই মাটি ইঁদুরের গর্ত থেকে নেওয়া ঠিক নয়। অপরের ব্যবহৃত মাটি বা উই মাটি কখনও নেওয়া উচিত নয়। কিছু শুদ্ধ করবার জন্য অভিষ্ট ব্যক্তি প্রথমে পা ভালো করে ধুয়ে পূর্বদিকে মুখ করে মাটিতে বসবে। তারপর তিনবার মুখ ধুয়ে পরিষ্কার জলে আমচন করবে এবং হাত দিয়ে ক্রমে ক্রমে কান মাথা টিকি ধুয়ে সন্ধ্যাপসনা করবে।

দেবতা ও পিতৃ পুরুষদের পূজা করতে হয়, চুল আঁচড়ানো, দাঁতমাজা, আয়নায় মুখ দেখা, অবগাহন স্নান শেষ করে কাজের জন্য ঘরের বাইরে বেরোতে হয়, হোম শেষ করে শরীরে মঙ্গলসূচক তিলক চিহ্নাদি ধারণ করে। কোথাও যাবার সময় দুর্বাঘাস, দই, ঘি, জলভরা কলসী, বাছুর সমেত গাই, ষাঁড়, সোনা, মাটি, গোবর, ব্রজচিহ্ন, ধান, খই, মধু, ব্রাহ্মণ-কন্যা, সুন্দর সাদা ফুল, জ্বলন্ত আগুন, চন্দন সূর্যের দ্বারা অশ্বত্থ গাছ দেখলে মঙ্গল হয়।

নিজ ধর্ম ও পেশা অনুযায়ী নিজের দেশ, বংশ ও গোত্র অনুযায়ী যে ধর্মাচার চালু আছে তা পরিত্যাগ করতে নেই বরং এগুলি গুরুত্ব দিয়ে মেনে চলা উচিত। এগুলি মেনেই রোজগারের চেষ্টা করা উচিত। অসৎ উপায়ে মিথ্যা বলে রোজগার করা উচিত নয়। বেদ ও শাস্ত্রের অননুমোদিত কোনো নিষ্ঠুর কথা কাউকে বলা উচিত নয়। সজ্জন লোকের কাছে নিন্দনীয় হতে হয় এমন আচরণ কখনই করণীয় নয়। কখনও ধর্ম লঙ্ঘন করা উচিত নয় বা অসৎদের

সাথে মেলামেশা করা উচিত নয়। সন্ধ্যা বা দিনেরবেলা রতিক্রীড়া করা উচিত নয়। পরনারীর দিকে লোলুপ দৃষ্টি দেবে না, স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো রমণীতে গমন করবে না,রজঃস্বলা নারীর সাথে মিলিত হবে না। জলের মধ্যে মৈথুন করা নিষিদ্ধ। বৃথা ভ্রমণ, বৃথা দান, বৃথা পশুহত্যা বা বৃথা বিবাহ করা গৃহস্থের পক্ষে ঠিক নয়। বৃথা ভ্রমণে দেহের ক্ষতি হয়। অন্য স্ত্রী ও অন্যের ধর্মের প্রতি সচ্চরিত্ররা কুনজর দেবে না। অন্যের ধন হরণ করা নরকের হেতু। অন্যের পত্নীর দিকে কামার্ত দৃষ্টি দেওয়া হল মৃত্যুর কারণ। নগ্ন পরস্ত্রীকে দেখবে না। চোরের সাথে কোনো কথা বলবে না। ঋতুমতী নারীকে দেখা বা তার ছোঁয়া ও কথা বলা অনুচিত। পরনারী, নিজ বোন, কন্যা কিংবা বিমাতার সাথে একাসনে বসা অবৈধ। নগ্ন হয়ে কখন স্নান করা বা শুয়ে বা ঘুরে বেড়াতে নেই।

আসন বা বিছানা ছিঁড়লে বা পাত্র ভেঙ্গে গেলে বিশুদ্ধর জন্য পরিত্যাগ করবে। নন্দা তিথিতে গায়ে তেল মাখা, রিক্ততে ক্ষৌর কর্ম, চুল, দাড়ি, নখ, কঠিন এবং জয়ী তিথিতে মাংস পরিত্যাগ করা কর্তব্য। পূর্ণাতে নারী সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। এই নিষিদ্ধ কর্ম সবই ভদ্র তিথিকে করা উচিত। রবি ও মঙ্গলবার গায়ে তেল মাখা, শুক্রবারে ক্ষৌরকর্ম, শনিবারে মাংস খাওয়া এবং বুধে নারী সঙ্গমে অবৈধ। বাকি দিনে অবৈধ নয়। তেল চিত্রা হস্তা, শ্রবণাতে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। বিশাখা, অভিজিৎ নক্ষত্রে ক্ষৌরকর্ম এবং মূলা ও মৃগশিরা ও ভাদ্র পদে মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। স্ত্রী সঙ্গম করতে নেই সখ বৃন্তিকা ও উত্তরাদি নক্ষত্রে।

উত্তর ও পশ্চিম মুখে শয়ন করতে নেই। দক্ষিণ-পশ্চিমে মুখ করে করতে নেই। মন্দির শ্মশান, গাছ, চৌরাস্তা বা গুরুজনকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করতে হয়। অভিষ্ট ব্যক্তি অপর কারো মালা, খাবার, কাপড় ব্যবহার করবে না। প্রত্যহ মাথা ডুবিয়ে স্নান করা উচিত, কিন্তু গভীর রাতে উচিত নয়। নিষিদ্ধকালে স্নানের ব্যাপারে কোনো বাধা নেই যদি গ্রহণ উপস্থিত হয় বা আত্মীয় মৃত্যু ঘটে তেল মেখে কাউকে স্পর্শ করতে নেই। স্নানের পর চুল ঝাড়তে নেই। গা খালি হাতে মুছতে নেই। সেই দেশেই বাস করা উচিত যে দেশের রাজা প্রজাবৎসল ও জনগণ সবসময় ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ। যে দেশে লোকেদের অতি ক্রোধ বা পরশ্রীকাতরতা নেই, যে দেশের অধিবাসীরা ন্যায় পথে থাকে, সেখানে কৃষিকাজে নিপুণ ব্যক্তিরা বাস করে এবং ধান, গম সহজলভ্য সেখানে বাস করা উচিত। এবং ধনবান ও বেদান্ত ও ব্রাহ্মণের স্থানে যেখানে বিশুদ্ধ জল ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সুব্যবস্থা আছে সেখানে বাস করা উচিত। যে দেশের শাসক প্রজাপালনে বা সুবিচারে অক্ষম, অথচ শাস্তি বিধানে উদ্যত, সেখানে মানুষের মধ্যে সদ্ভাব নেই, একে অপরের ক্ষতিসাধনে সচেষ্ট, সেখানে বাস করা উচিত নয়। ধর্মপরায়ণ লোকের এই সকল কাজ করা উচিত।

তিনি খাদ্য সম্পর্কে বললেন—স্নেহ জাতীয় সুপক্ক, তৈলঘৃত খাবার খাওয়া উচিত; স্নেহজাতীর পদার্থহীন আতপচাল, দই খরগোশ, শজারু গোসাপ, মাছ, কচ্ছপ, কলাই, ডাল খাওয়া উচিত। মণি, বস্ত্র, প্রবাল, মুক্তফল, পাথর, কাঠের তৈরি জিনিস, মাংস, মূল ওষধি কুলা এবং স্তূপীকৃত ধান, কাপড় ও গাছের ছাল জল দিয়ে শুদ্ধ করা যায়। কার্পাস জলে ধুলে শুদ্ধ হয়। হাতির দাঁত, হাড় বেঁধা দিয়ে চঁছলেই বিশুদ্ধ হয়। মাটির পাত্র আগুনে পুড়লে বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র জিনিস হল অনেক দিনের আনা জিনিস হল রন্ধন শেষের পরের রন্ধনশালা স্তন্যপায়ী শিশু, রমণী ও পূজনীয় ব্রাহ্মণের মুখের থুথু ও গরম জলকণা। মাটি বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে খুঁড়লে, আগুনে পোড়ালে বা ধোয়া মোছা করলে, এমনকি জমিতে গরু চরলে, গৃহ পবিত্র হয় লেপা মোছা করলে, জল দিয়ে ধুলে বা ঝাট দিলে। ভাতে যদি পোকা পড়ে মুখ দেয়, মাছি বসে তবে মাটি, নুন বা জল দিয়ে শুদ্ধ করা হবে।

তামার পাত্র তেঁতুল দিয়ে, দস্তা বা টিন ও সীসার পাত্র ক্ষারে ও কাঁসা ছাই ও জলে বিশুদ্ধ হয়। কোনো বস্তুর নোংরা মাটি ও জল দিয়ে বিশুদ্ধ করা যায় ও দুর্গন্ধ দূর করা যায়, পুত্র শুচি হয় মাতার অঙ্গ থেকে অবিচ্ছিন্নকারে ঘাম পড়লে। পাখিরা শুচি হয় শাবক প্রসব করলে। রাস্তা, কাদা জল করা রাস্তার ঘাস এবং ইটের পাকাবাড়ি বাতাসের সংস্পর্শে বিশুদ্ধ হয়। তাতে নোংরা পড়লে ওপরের অংশ ফেলে জল ছিটিয়ে দিলে তা শুদ্ধ হয়ে যায়।

না জেনে অশুদ্ধ ভাত খেলে তিন রাত উপবাস করবে। জেনে খেলে শুদ্ধি ঘটবে না। শববাহন ব্যক্তি রজঃস্বলা নারী ও সূতিকাস্ত্রীকে স্পর্শ করলে স্নান করতে হয়। রস লাগা বস্তু স্পর্শ করলে কাপড় পড়া অবস্থায় স্নান করতে হয়। শুকনো হাড় স্পর্শ করলে আয়েন, গরু স্পর্শ করলে এবং সূর্য দর্পণ করলে শুদ্ধ হওয়া যায়। রক্ত বা মল ডিঙানো উচিত নয়। উচ্ছিষ্ট ফল, মূত্র পাড়ালে ভালোভাবে পা ধোওয়া উচিত। পরের জলাশয়ে পঞ্চত্ব পিণ্ড দান না করে স্নান করা উচিত নয়। প্রজ্ঞদের বিকেলে বাগানে বেড়াতে নেই। নিন্দিত চরিত্রের লোক ও রমণীর সাথে কথা বলতে নেই, যারা দেবতা, পিতৃপুরুষ ধর্মশাস্ত্র ও যাগযজ্ঞাদির নিন্দা করে তাদের স্পর্শ করলে সূর্যদর্শন করার পর পবিত্র হওয়া যায়। সতিফ, ষণ্ড, ঝিল ইঁদুর, কুকুই ও চণ্ডাল ও নগ্ন জাতিদের অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ।

সুকেশী এবার সূতিকাদের লক্ষণ সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। ঋষির কথায় ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণ যখন শেষত্ব প্রাপ্ত হন তখন তারা সূতিকা ভোজন করে তাদের অন্ন নিষিদ্ধ হয়। ষণ্ড নামে আহিত হয় তারা যার যথা সময়ে রনান, দান ও পূজার্চনা করে না। মার্জার নামে অভিহিত হয় তারা যারা দম্ভবশে জপ তপস্যা ও শাস্ত্র পড়াশোনা করে আখু হলেন। যে ব্যক্তি প্রচুর ধন

সম্পদ থাকা সত্ত্বেও নিজে ভোগ করে না অন্যকে দান করে না, যাগযজ্ঞাদিও করে না, এদের দেওয়া খাবার খেতে নেই। খেলেও বিশুদ্ধির জন্য কঠোর চান্দ্রায়ন করতে হয়। কুকুট বলা হয় তাকে যে সভ্যদের মধ্যে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হয়। এদের অন্ন গ্রহণ করতে নেই। পতিত ব্যক্তি হল যে বিপদ আপদের সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও যে নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করে পরের ধর্ম গ্রহণ করে, যে দেবতা পিতামাতা ও গুরুকে পরিত্যাগ করে, যে গরু স্ত্রী ও ব্রাহ্মণ বধ করে তাকে তপবিক্ষ বলা যায়। নগ্ন নামে অভিহিত তারা যারা বেদচর্চা শাস্ত্র পাঠ ও ধর্মীয় বিভিন্ন ব্রতপালন করে না। এদের অন্নও গ্রহণযোগ্য নয়। যারা দানের আশা নিয়েও দান করে না বা দাতাকে দানে নিষেধ করে এবং শরণাগতকে ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে, তারা অতি নরাধাম চণ্ডাল। কুন্তাশী বলা হয় তাদেরকে যারা, বন্ধু-বান্ধব, ব্রাহ্মণ ও সৎলোকের সম্পর্ক ত্যাগ করে। এদের দেওয়া খাবার খেলে চান্দ্রায়ন করতে হয়। যে ব্যক্তি এই আচরণ পালন করেন, তাদের অন্ন খেলে তিন রাত উপবাস করতে হয়। এবং শুদ্ধিলাভ করা যায়।

জন্ম ও মৃত্যুজনিত অশৌচের জন্য নৈমিত্তিক কার্য পালন বন্ধ করতে নেই। ভৃগুর মতে পিতা সেই কাপড়েই স্নান করতে হয় পুত্র জন্মাবার সাথে সাথেই। কেউ মারা গেলেও মৃত ব্যক্তির বন্ধুদের স্নান করা কর্তব্য। মৃতের জ্ঞাতিরা মৃতদেহকে গ্রামের বাইরে দাহ করে তার উদ্দেশ্যে জলদান করে। মৃত্যুর সপিণ্ডগণ অশুচি থাকবেন, জল দান করে প্রেত ক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। বিষ খেয়ে, গলায় দড়ি দিয়ে, অস্ত্রাঘাতে, আগুনে পুড়ে কিংবা পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে কারো মৃত্যু ঘটলে বা অল্প বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে অথবা অন্য দেশে গিয়ে মরলে সপিণ্ডদের সদ্য শৌচ হবে। ইহা চার প্রকারের।

অশৌচও এই প্রকার হয়। পূর্ণকালে মৃত্যু হলে অশৌচ বিধি স্বতন্ত্র, ব্রাহ্মণের একদিন ও রাত্রি, ক্ষত্রিয়ের তিন দিন ও বৈশ্যের ছয় দিন এবং শূদ্রের বারো দিন। ব্রাহ্মণদের পূর্ণ শৌচ ভিন্ন ভিন্ন। ব্রাহ্মণদের দশ, ক্ষত্রিয়ের বারো, বৈশ্যের পনেরো দিন ও শূদ্রের এক মাস।

সকল বর্ণের লোক নিজ নিজ বর্ণের উপযোগী কাজের অধিকারী হয় এবং নিয়মে অশৌচ পালন করলে, অশৌচের শেষে প্রেতের উদ্দেশ্যে যথাবিধি একোদ্দিষ্ট বা সংবাৎসারিক শ্রাদ্ধ করবে। এরপর প্রেতের সপিণ্ডীকরণ করতে হয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন বেদানুসারে তৃপ্তিবিধান করা উচিত, প্রেতেত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে পিতৃত্ব প্রাপ্ত হলে। পিতার উদ্দেশ্যে ভূমি ও ধনসম্পত্তি দান করে নিজে শ্রাদ্ধ করবে। এই শ্রাদ্ধ করার ফলে সন্তুষ্ট হয়ে পিতৃপুরুষেরা পিতৃলোকে গমন করে। ঘরের যাবতীয় প্রিয় বস্তু অক্ষয় ফলোভের প্রত্যাশায় পিতার উদ্দেশে গুণবান ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়। তিনটি বেদ প্রতিদিন পড়তে হয় প্রাজ্ঞ

ব্যক্তিকে। নিজের সাধ্যমতো যাগযজ্ঞ করবে, ধর্মপথে ধনসম্পত্তি রোজগার করে। এরূপ কাজ সকল লোকের করা উচিত যা বিদিত নয়। সাধুগণে করণীয় কাজ নির্দ্বিধায় অনুসরণ করা উচিত, ইহকাল ও পরকালে ধর্ম অর্থ কাম লাভ করবে যদি কোনো ব্যক্তি সৎগৃহস্থাশ্রমে এই সব সদাচর পালন করে। এরপর ঋষি বানপ্রস্থ আশ্রম সম্পর্কে বলবে ঠিক করলেন।

নিজের আত্মবুদ্ধির জন্য তিনি বানপ্রস্থ নামক আশ্রম অবলম্বন করবেন। যখন গৃহস্থ দেখবেন যে তাঁর পুত্র পৌত্র হয়েও নিজের শরীর ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এই আশ্রমে আসার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করবেন। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করবেন, মাটিতে শোবেন, পিতৃদেব ও অতিথিদের সেবাশুশ্রূষা করবেন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, জটা, বল্কল ধারণ ও হোম করবেন এবং বনজাত বস্তু উপভোগ করবেন। এই বিধি অনুসারে আশ্রমের বাইরের লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে হবে। ব্রহ্মচর্যে নিরহংকার ও ইন্দ্রিয় জয় একান্ত কর্তব্য। এক জায়গায় দীর্ঘদিন বাস করবে না। এই আশ্রমে ভিক্ষার অন্নে জীবনধারণ করতে হবে।

রাগী হবে না এবং আত্মজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা করবে। এইভাবে চতুরাশ্রম ব্রাহ্মণকে অবলম্বন করতে হবে। এবার পুলস্ত্য ঋষি বিভিন্ন বর্ণের ধর্ম সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন।

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিহিত গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থ আশ্রম। কেউ নিজের বর্ণাশ্রম ধর্ম পরিত্যাগ করবে না। দেবী সরস্বতী অন্তরে দুঃখ পান যদি কোনো ব্রাহ্মণ স্বধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন। এই ক্রোধের ফলে ধর্মত্যাগীর বংশনাশ হয় এবং তাঁর শরীর ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা সূর্যদেব সর্বদাই করেন। সুতরাং কখনই স্বধর্ম ত্যাগ করা যাবে না। কারণ ধর্ম ত্যাগ করার অর্থ নিজ বংশনাশের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া। সূর্যদেব দারুণ ভাবে অসন্তুষ্ট হয় স্বধর্ম ত্যাগীর প্রতি। এই সকল তথ্য শোনার পর সুকেশী তাদের প্রণাম করে আকাশপথে নিজ নগরে চলে গেলেন।

১৫

পুলস্ত্য আবার বলতে শুরু করলেন, যে সুকেশী নিজের নগরের সমস্ত রাক্ষসদের এক স্থানে ডেকে তাদের জানালেন মুনিরা তাকে বলেছেন অহিংসা, সত্য, চুরি না করা, সূচি পালন করা। ইন্দ্রিয় সংযম, দান, দয়া, ক্ষমা, ব্রহ্মচর্য নিরহংকার সত্য ও মধুর বাক্য, নিত্য সৎকার্যের অনুষ্ঠান ও সদাচার পালন–সবই পরলৌকিক মঙ্গলজনক ও পুরাতন পরম ধর্ম। তিনি রাক্ষসদের এই সব ধর্ম মেনে চলার আদেশ দিলেন। পুলস্ত্য জানালেন, এরপর সুকেশীর আজ্ঞায় রাক্ষসরা সবাই সানন্দে ত্রয়োদশী তিথিতে এই ধর্ম গ্রহণ করল। এই ধর্মাচরণের জন্য

তারা প্রসিদ্ধ হয়ে উঠল। রাক্ষস পুত্র ও পৌত্ররা এইসব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হল। তারা সকলে সদাচার পালন করতে লাগল। ধর্মাচারণের ফলে রাক্ষসরা অপূর্ব তেজ ধারণ করল, তাদের তেজস্বীতায় সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাশির তেজ কিছুটা কমে গেল। এই সময় রাক্ষস নগরী দিনেরবেলা সূর্যসম দিনে চন্দ্রসম শোভা পেতে লাগল। এইসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটল ত্রিভুবনে। সূর্যের গতি তখন কেউ উপলব্ধি করতে পারল না। চন্দ্র বলে সকলে ভুল করল চন্দ্রের মতো আলোকিত, রাক্ষস নগরী দেখে স্বয়ং সূর্য দেবও এই উজ্জ্বল নগরী দেখে রাত ভেবে আর উদিত হলেন না। কখন আবার পদ্মও সূর্যোদয় হয়েছে মনে করে রাত্রেই দিনকে রাত মনে করে ভুলে বেরিয়ে কাকেঁদের তাড়া খেতে লাগল। কখনো রাতকে দিন বলে ভুল করে তাপসরা স্নান করতে নদীতে এলেন এবং গলা পর্যন্ত জলে ডুবে জপ করতে লাগলেন।

রাক্ষস নগরী দেখে চক্রবাক চক্রবাকী আর বিরহ ব্যথা ভোগ করল না। তারা রাতকে দিন মনে করে পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে এই রূপ বলাবলি করতে লাগল–নিশ্চয়ই কোনো চক্রবাক প্রিয়বিরহে কাতরভাবে কাঁদতে কাঁদতে নদীর তীরে প্রাণ ত্যাগ করেছে। তাই দয়া করে সূর্যদেব নিজের অস্ত যাওয়া স্থগিত রেখে তীব্র কিরণে জগৎকে উত্তপ্ত করে রেখেছেন। আবার কিছু চক্রবাক ও চক্রবাকী আলোচনা করল, নিশ্চয়ই কোনো বিরহকাতর চক্রবাক মারা গেছে, তাই তার প্রিয়া চক্রবাকী প্রিয়তমের শোকে কাতর হয়ে অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেছে। সেজন্যে সূর্যদেব সাধকের সাধ পূরণ করার জন্যে চন্দ্রকে জয় করে নিজেই আজ বিরাজ করছেন, তিনি আর অস্ত যাবেন না, এইভাবে রাতকে দিন বলে ভুল করে যজ্ঞস্থানে গিয়ে যজ্ঞ করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন যাজ্ঞিকেরা।

বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের উপাসকরা ভক্তিভরে নিজেদের অভীষ্ট দেবতাদের দিন-রাতই পূজা করতে লাগলেন। রাত্রিকে দিন করে সবসময় জ্যোৎস্না আলোকিত করে রাখার জন্যে কামুকরা চন্দ্রদেবকে ধন্যবাদ দিলেন। অন্যেরা বলতে লাগলেন, আমরা শ্রাবণ থেকে চারমাস পর্যন্ত অশুশয়ন নামে দ্বাদশী তিথিতে লক্ষ্মী ও নারায়ণকে সুন্দর সুগন্ধ, কুসুমাঞ্জলি দিয়ে ভক্তি ভরে পূজা করেছি, তাই ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে রাত্রে তাদের এই উত্তম অশূন্যশয়ন দান করেছেন। আবার কেউ বলতে লাগল কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রদেবের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যেতে দেখে চন্দ্র প্রণয়িনী রোহিণী অক্ষয় অষ্টমী তিথিতে বেদবিধিমতে রুদ্রের জন্যে ঘোরতর তপস্যা করেন, এই তপস্যায় তুষ্ট হয়ে রোহিণীকে রুদ্র বর দিয়েছেন। তাই আকাশে চন্দ্রদেব অক্ষয় হয়ে শোভা পাচ্ছেন। আবার অনেকে বললেন–চন্দ্রদেব অখণ্ড ব্রতের হরির আরাধনা করেছেন তাই তিনি অখণ্ড রূপে সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত করে বিরাজ করছেন। কেউ বলেন। অমিত পরাক্রমশালী বিষ্ণুর পূজা করে নিশ্চয়ই চন্দ্রদেব আত্মরক্ষা করেছেন, তাই সূর্যের দীপ্তিতে

স্নান করে দিনেরবেলা সূর্যের মতো কিরণচ্ছটায় চারদিক আলোকিত করে আকাশে শোভা পাচ্ছেন।

এরূপ বিভিন্ন কারণে পরিষ্কার হয়ে গেল যে সূর্যের তেজ চন্দ্রদেবের কাছে অনেকটা ম্লান হয়ে পড়েছে। সত্যি সূর্যোদয় হয়েছে বলে আবার সরোবরে পদ্ম ফুটে উঠল, ভ্রমরেরা সেখানে গুন গুন রবে উড়ে বেড়াতে লাগল এবং পদ্মদলের সৌন্দর্য আরো বেড়ে গেল। কেউ মনে করল যে, সরোবরে যেহেতু শালুক ফুল ফুটেছে আকাশে তখন শোভা বিস্তার করেছেন চন্দ্রদেব। এই ভাবে জল্পনা কল্পনা করতে লাগল।

সূর্যদেব মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এসব কি হচ্ছে? ভগবান ভাস্কর এরূপ চিন্তা করলেন ধ্যানস্থ হয়ে ত্রিভুবনে রাক্ষসরা আধিপত্য করছে। তাঁর কাছে তাদেরই অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধির কারণ। তিনি বুঝলেন রাক্ষসেরা ধর্মপরায়ণ ও সদাচারী হয়ে উঠেছে। ভক্তি করে দেবতা ও ব্রাহ্মণদের পূজা করতে আরম্ভ করেছে। তখন তিনি ভাবলেন, কিভাবে আকাশ থেকে তাদের আধিপত্য নষ্ট করা যায়, কিভাবে তাদের ক্ষতি করা যায়। বহু চিন্তার পর তিনি চিন্তা করলেন ব্রাহ্মণরা স্বধর্ম ত্যাগ করে পর ধর্ম গ্রহণ করেছে।

সুতরাং এই অপরাধে তাদের ধর্মকর্ম সব ব্যর্থ হয়েছে। এই অধর্মের কথা ভেবে দিবাকর ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে তাদের নগরীর দিকে তাকালেন। রাক্ষস নগরী তখন আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গেল যেমন আকাশ থেকে জ্যোতিষ্ক খসে পড়ে, সুকেশী উচ্চৈঃ স্বরে শিবকে ডাকতে লাগলেন নগরের এই অবস্থা দেখে। আকাশের বিচরণকারী চারণরা সুকেশীর কান্না শুনে বলতে লাগল–হায় হায়, শিব ভক্তির একি বিপর্যয় ঘটল। ভগবান শঙ্কর ভাবলেন, কে এই রাক্ষস পুরীকে মাটিতে ফেলে দিল। তিনি জ্ঞাত হলেন সূর্যদেব ছাড়া একাজ অন্য কারো নয়। তখন মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে সূর্যদেবের দিকে ছুটে গেলেন এবং তাঁর দিকে তাকানোর সাথে সাথে সূর্যদেব মাটিতে খসে পড়লেন।

১৬

নিজের ভারসাম্য হারিয়ে বাতাসে ভাসতে ভাসতে পলাশের মতো অত্যুজ্জ্বল লাল রূপ ধারণ করে কিন্নরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে সূর্যদেব অন্তরীণ থেকে ভূতলে পতিত হলেন। বানরদের দ্বারা পরিবৃত তালগাছ থেকে খসে পড়া আধপাকা তালের মতো দেখাচ্ছিল কিরণছটা যুক্ত পরিবৃত সূর্যদেবকে।

এই সময় ভূতল থেকে রব উঠল–সূর্যদেব যদি মঙ্গল চাও, তবে হরিক্ষেত্রে গিয়ে পতিত হও। সূর্যদেব তখন মুনি ঋষিদের কাছে জানতে চাইলেন–হরিক্ষেত্র কোথায়? যোগশায়ী থেকে কেশব্দর্শন পর্যন্ত সমস্ত স্থানই হল পবিত্র হরিক্ষেত্র। শঙ্করের অধিষ্ঠিত স্থানই বর্তমানে হরিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এর নাম বারাণসী পুরী। বরুণা ও অসি নদীর মাঝখানে গিয়ে পতিত হলেন সূর্যদেব।

তারপর তিনি এই দুই নদীতে স্নান করতে লাগলেন। শঙ্করের কোপে সূর্যদেব যেভাবে দগ্ধ হচ্ছিলেন তা থেকে কোনোরূপেই তিনি স্বস্তিলাভ করতে পারলেন না। তিনি ঘুরতে লাগলেন জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে। এখন ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, বিদ্যাধরী অপ্সরা এবং সূর্যের রথের যাবতীয় ভূতপ্রেত সবাই একযোগে এ খবর জানানোর জন্য ব্রহ্মার কাছে গেল। দেবতাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ব্রহ্মা দেবতাদের সাথে নিয়ে শঙ্করের আবাসস্থল মন্দার পর্বতে হাজির হলেন। সেখানে মহাত্মা শৃঙ্গরের সাক্ষাৎ পেলেন। শঙ্কর প্রসন্ন হলেন ব্রহ্মার স্তবস্তুতি যুক্ত অনুরোধে। বারাণসী ধামে ব্রহ্মা তখন তাকে নিয়ে সূর্যকে ওই অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য গেলেন। শঙ্কর সূর্যকে হাত দিয়ে ধরে নিয়ে তাকে লোল নামে অভিহিত করলেন এবং নিজের রথে তুলে নিলেন।

তাঁর নগরকে পুনর্বার আকাশপথে স্থাপিত বন্ধু-বান্ধবকে সুকেশী এভাবে পুনরায় যথাস্থানে স্থাপিত হবার পর শৃঙ্গার ব্রহ্মাকে আলিঙ্গন করে ও বিষ্ণুকে প্রণাম করে নিজধামে চলে গেলেন। প্রাচীনকালে ভাস্কর এই রূপেই সুকেশীর বাসস্থান অন্তরীক্ষ থেকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন এবং তার পরিণামেই ভাস্করকে শৃঙ্গারের কোপে দগ্ধ হয়ে ভূপতিত হতে হয়। আবার সূর্যকে যথাস্থানে স্থাপন করেন এবং ব্রহ্মাণ্ড সুকেশী ও তার বাসস্থানকে পুনরায় অন্তরীক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

নারদ পুলস্ত্যকে জানালেন যে, রাক্ষস সুকেশীর নগরের জাজ্বল্যমান সৌন্দর্য দেখে ভোগবিলাসীরা এরূপ জল্পনা-কল্পনা করত যে, চন্দ্রদেব নিশ্চয়ই ভক্তিভরে বিষ্ণু ও শিবের আরাধনা করে ও তাঁদের সন্তুষ্ট করে সূর্যের ন্যায় কিরণচ্ছটায় সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত করছেন। পুনরায় সবিস্তারে সব শুনতে চাইলেন। পুলস্ত্য নারদকে বিষ্ণু ও শিবের আরাধনার কথা ও পুণ্যব্রতের বিশদ বিবরণ দিয়ে দেবাদিদেব বিষ্ণু নাগশয্যায় শয়ন করেন যখন সূর্য, উত্তরায়ণ থেকে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় যান। তার শয়নের পর ক্রমান্বয়ে গন্ধর্বরা গুহ্যরা ও দেবমাতারা শয়ন করে থাকেন।

এরপর নারদ দেবতাদের শয়নবিধি এবং বিষ্ণুর শয়নবিধি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। পুলস্ত্যর বললেন, সূর্য শুক্লাপক্ষীয় একাদশীতে যখন মিথুনরাশির অভিমুখী হয় তখন ভগবান পরমেশ্বর শয়ন করেন। ভগবান বিষ্ণুকে অনন্ত ভোগশয্যায় শয়ন করাতে হয় দ্বাদশী দিনে। বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণদের পবিত্র ভাবে ও ভক্তিভরে পূজা করতে হয় ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে।

কামদেব শয়ন করেন ত্রয়োদশীর দিন। তার শয়ন কদমফুলের মতো সুগন্ধী ও সুকোমল শয্যায়। মহাদেব স্বর্ণ পদ্মের সুখশীতল শয্যায় শয়ন করেন পূর্ণিমার দিন। তাঁর মাথায় জটা তখন চামড় দিয়ে বেঁধে রাখেন ও তাঁর শয্যা বাঘছালে ঢাকা থাকে। এরপর সূর্য কর্কট রাশিতে যান। দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হয়। এই সময় হল দেবতাদের রাত্রিকাল। এই সময় প্রতিপদ তিথিতে জগতের পথপ্রদর্শক ব্রহ্মা নীল পদ্মময় শয্যায় শয়ন করেন।

এরপর থেকে দ্বিতীয়ায় বিশ্বকর্মা, তৃতীয়ায় হিমালয় কন্যা উমা, চতুর্থীতে বিনায়ক পঞ্চমীতে ধর্মরাজ, ষষ্ঠীতে স্কন্দ, সপ্তমীতে ভাস্কর, অষ্টমীতে কাত্যায়নী, নবমীতে কমল, দশমীতে বায়ুভুক সর্পগণ এবং কৃষ্ণা একাদশীতে সাধুগণ শয়ন করেন। এই হল দেবতাদের শয়ন বিধি।

এরপর শুরু হয় বর্ষাকাল। এই সময় পাহাড়ে আশ্রয় নেয় বকরা, কাকেরা বাসা তৈরি করে এবং স্ত্রীরা গর্ভভারে অলস হয়ে শুয়ে থাকে। অতি পুণ্যজনক তিথি হল বিশ্বকর্মার শয়নকারী দ্বিতীয়া তিথি। গন্ধপুষ্প দিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভক্তিভরে এই পুণ্য তিথিতে পূজা করতে হয়। তারপর সুপক্ক ফল নিবেদন করে বিষ্ণুর শয্যায় সেগুলো রেখে বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা জানাতে হবে, তার সাথে লক্ষ্মীর কখনো যেন বিচ্ছেদ না ঘটে, তাঁর আশিষে যেন তাঁদের শয়নও অশুণ্য হয়। তাদের দাম্পত্য জীবনে যেন কোনো বিচ্ছেদ না আসে।

লক্ষ্মী যেমন তোমার দ্বারা, অশুন্য শয়ন যেন গার্হস্থ্য জীবনে কোনো ক্ষতি না করে, বিষ্ণুর কাছে বারবার মিনতি জানিয়ে তেল ও লবণ ছাড়া খাবার খাবে রাত্রিবেলা। শাস্ত্রেও ব্রাহ্মণকে ফল দান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় দিনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এই বলে ফল নিবেদন করবে।

এরূপ বিধানে চাতুর্মাস্য ব্রতের অনুষ্ঠান করতে হয় যে পর্যন্ত সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করে। তারপর ক্রমে ক্রমে দেবতারা জেগে ওঠেন। সে সময় দ্বিতীয়া তিথিতে বিষ্ণুর মূর্তি, শয্যা প্রভৃতি নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দান করে। এই প্রকারে ঋষি পুলস্ত্য ব্রতবিবরণ দিলেন। এই ব্রতপালনে কারো কখনও প্রিয়জনের সাথে বিচ্ছেদ ঘটে না।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী অতি পবিত্র তিথি। এই তিথি কালাষ্টমী নামেও অভিহিত হয়। এই তিথিতে মৃগশিরা নক্ষত্রের যোগ হলেও অক্ষয় ফল লাভ হয় এই সময় তার পূজা করলে। এই দিন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি গোমূত্র ও জলে শিবকে স্নান করাবে ও ধুতুরা ফুল দিয়ে তার পূজা করবে।

পূজার সময় নাগকেশর নামক গন্ধদ্রব্য থেকে তৈরি ধূপ, মধু ও ঘি প্রভৃতি নৈবেদ্য দান করে, দেবাদিদেব মহেশ্বর আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন–এই প্রার্থনা জানিয়ে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেবে। সোনা প্রভৃতি নৈবেদ্য পূজার পর ব্রাহ্মণদের বিতরণ করবে।

আশ্বিন মাসের নবমীর দিনে সংযম ও উপবাস করে শিবলিঙ্গকে গোবর দিয়ে স্নান করিয়ে পদ্মফুল দিয়ে পূজা করবে। মিষ্টান্ন প্রভৃতি নৈবেদ্য দেবে ধূপধুনো জ্বালিয়ে। নবমীর দিন স্নান করবে অষ্টমীর দিন উপবাস করে, তারপর মহাত্মা মহেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হোন' এই বলে তিল সহযোগে দক্ষিণা দেবে।

দেবদারু গাছের আঠা থেকে তৈরি ধূপ, মধু, ও ভাত নৈবেদ্য সহযোগে, করবী ফুল দিয়ে পূজা করবে কার্তিক মাসে শিবলিঙ্গকে দুধ দিয়ে স্নান করিয়ে। এই পূজায় ব্রাহ্মণকে রৌপ্য সহযোগে নৈবেদ্য দান করবে এবং ভগবান শিব আমার প্রতি প্রীত হোন'–এই বিনীত প্রার্থনা জানাবে। অগ্রহায়ণ মাসের অষ্টমীর দিন উপবাসী থেকে নবমীর দিন স্নান করে দই দিয়ে শিবের পূজা করতে হয়। বেল গাছের রস থেকে তৈরি ধূপ, মধু ও ভাত নৈবেদ্য দেবে এবং লাল সালিধান দক্ষিণা দেবে। পরে 'রুদ্রদেব আমার প্রতি প্রীত হোন'–এই কথা বলবে। সুন্দর টগর ফুল দিয়ে পূজা করবে পৌষমাসে শিবলিঙ্গকে ঘি দিয়ে স্নান করিয়ে। মহুয়ার রস থেকে তৈরি ধূপ, মধু ও ছাতু নৈবেদ্য দিয়ে সোনা বা রূপার টাকা দক্ষিণা দেবে, তারপর ত্রিলোচনকে নমস্কার করবে। মাঘমাসে শিবলিঙ্গকে কুশ ও গঙ্গাজলে স্নান । করিয়ে শালুক ফুল দিয়ে পূজা করবে। এই পূজার নৈবেদ্য হবে কদম গাছের রস থেকে তৈরি ধূপ, তিলসহ ভাত ও পায়েস এবং দক্ষিণা দেবে সোনা বা রূপা। 'উমাপতি মহাদেব আমার প্রতি প্রীত হোন'–এই প্রার্থনা জানাবে।

ক্রমান্বয়ে দু'মাস ধরে মহাদেবকে পূজা করে এই ব্রত পালন করবে। স্নান করে ত্রিলোচনের পূজা করা কর্তব্য। পার্বণ শেষে নিম্নোক্ত বিধান অনুযায়ী গোরেচনা মিশ্রিত গুড় দিয়ে শিবলিঙ্গকে স্নান করিয়ে পূজা করতে হয়। তারপর প্রার্থনা জানাবে এই বলে আমি এক দীন ব্যক্তি, আমার প্রতি প্রীত হোন ও আমার দুঃখ দূর করুন।

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর নিত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞকর্ম যথাবিধি পালন করে উপবাস করবে। চন্দনের ধূপ এবং তামার পাত্রে ঘি সহ গুড় ও অন্নসহ পূজার দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দান করতে

হবে এবং রুদ্রের উদ্দেশে নাম উল্লেখ করে তাকে এক জোড়া কাপড় দান করে তাকে সন্তুষ্ট করবে।

চৈত্র মাসে শিবলিঙ্গকে যজ্ঞডুমুর মিশ্রিত জলে স্নান করিয়ে স্বর্গীয় দেববৃক্ষ মন্দার ফুল দিয়ে পূজা করবে এবং হিং-এর ঘি সহ গুগুল, ধূপ ও মিষ্টান্ন দিয়ে নৈবেদ্য দেবে। তারপর ব্রাহ্মণকে নৈবেদ্য সহ মৃগচার্য দান করবে। তারপর নাগেশ্বরকে প্রণাম করে শ্রদ্ধা সহকারে শঙ্করকে প্রীত করবে। আমের মুকুল, ধূপ, ধূনা, ফল ও ঘি নৈবেদ্য রূপে দান করা কর্তব্য এই পূজায়। পরে জপ করবে রুদ্রদেবের– কালাগ্ন নাম। এই পূজায় ঐকান্তিক ভক্তি ভরে কলসী, বস্ত্র ও অন্নদান করা কর্তব্য।

জ্যৈষ্ঠ মাসে আমলকী ফলে মেশানো জলে স্নান করিয়ে আকন্দ ফুলে শিবের পূজা করা উচিত। ধূপ, ঘি, ছাতু এই পূজায় নৈবেদ্য দেবে। এরপর ভক্তিভরে নানারকম জিনিসপত্র দেবে। তারপর শঙ্করকে নমস্কার করে তাঁকে প্রীত করবে।

আষাঢ় মাসে বেল ফল মেশানো বিশুদ্ধ জলে স্নান করিয়ে। অগুরু, ধূপ ও ঘি মিশিয়ে পিঠে নৈবেদ্য দেবে। দক্ষিণা হিসাবে দেবে ঘি ও যব। তারপর প্রণাম করবে রুদ্রদেবকে। বেলফল ও বেলপাতা দিয়ে পুজো করবে শ্রাবণ মাসে 'ভৃঙ্গার' নামক এক জাতীয় শাক মেশানো জলে। এই পূজায় অগুরু, ধূপ, দই মেশানো ভাত, খিচুড়ি, পুলিপিঠে প্রভৃতি নৈবেদ্য দেবে। ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা রূপে দান করবে সাদা ষাঁড়, সাদা গাই, সোনা ও লাল কাপড়। শিবের নাম জপ করবে পূজার শেষে সাধ্যমতো।

বাকি ছয় মাসও এই নিয়মে ভক্তিভরে পালন করতে হবে। এই রূপে নিষ্ঠাভরে ব্রত পালন করলে স্বর্গলাভ হয়। সারা বছর ধরে শিবের পূজা করলে, সমস্ত পাপ দূর হয়। মানুষের কল্যাণ হয়। রুদ্রদেব নিজেই এই ব্রতের কথা বলেছেন। কোনোমতেই এর অন্যথা হবে না।

১৭

পুলস্ত্য বললেন, আশ্বিন মাসে প্রজাপতির নাভিদেশ থেকে পদ্ম নির্গত হয়েছিল। এর থেকে এক মনোরম উদ্যানে পরিণত হয়। এইভাবে অন্যান্য দেবতাদের দেহের অঙ্গ থেকে বিভিন্ন প্রকার গাছ উৎপন্ন হয়। সুন্দর কদম গাছ উৎপন্ন হয়েছিল মদনদেবের হাতের আগা থেকে, কদম ফুলের প্রতি, বটগাছের প্রতি তার বিশেষ প্রীতি দেখতে পাওয়া যায়। যক্ষদের অধিনায়ক মণি ভদ্রের ছাতি থেকে বটগাছের উৎপত্তি হয়েছিল।

মহাদেব-এর হৃদয় থেকে ধুতুরা গাছের উৎপত্তি হওয়ার ধুতুরা ফুল মহাদেবের বিশেষ প্রিয়। উজ্জ্বল খাদির গাছ তলাবির্ভূত হয়েছে ব্রহ্মার দেহের মাঝখান থেকে ময়বান মুনির মতো। বিশ্বকর্মার অঙ্গ থেকে অত্যধিক কাঁটাযুক্ত শিমুল, খেজুর প্রভৃতি গাছ, গিরিকন্যা উমার করতল থেকে কু-লতা, গম পতির কুম্ভ থেকে সিন্ধুবার, যমের শরীরের দক্ষিণ অংশ থেকে পলাশ ও উত্তর অংশ থেকে ডুমুর এবং স্কন্ধের দেহ থেকে বন্ধুজীব গাছের জন্ম হয়।

লক্ষ্মীর হাত থেকে বেল, নাগেদের মুখ থেকে গাছের কাত্যায়নী থেকে শর, সূর্য থেকে অশ্বথ গাছের সৃষ্টি হয়। বাসুকির লেজ থেকে দূর্বা ও সাধুদের হৃদয় থেকে হরিচন্দনের উৎপত্তি হয়। এভাবে যে গাছ যে দেবতার দেহ হতে উৎপন্ন হয়, সেই গাছের প্রতি সেই দেবতার বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়।

তারপর শুক্লপক্ষীয় একাদশীর আবির্ভাব হয়। এটি এক পরম পবিত্র লগ্ন। এই দিন বিষ্ণুপূজার পক্ষে প্রশস্ত এবং অখণ্ড নামে অভিহিত পাতা, ফুল, ফল, গন্ধ, বর্ণ, রস, নানান কর্ম ওষধি, ঘি, তেল, ধান, যব, সোনা, মণিমুক্তা, প্রবাল, কাপড় এবং তেঁতো, ঝাল, মিষ্টি প্রভৃতি রস ও নানারকম অখণ্ড সামগ্রী দিয়ে শরৎকাল আসা পর্যন্ত এই দিনে মহাত্মা বিষ্ণুর পূজা করতে হয়। এই পূজাব্রত অখণ্ড হয়ে থাকে সারা বছর ধরে।

এরূপ পূজা করলে সাবৎসর অখণ্ড হয় যখন, তখন দ্বিতীয় দিনে সংযম অবলম্বন করে উপবাস, বিষ্ণুকে স্নানের নানা রকম উপকরণ দিয়ে স্নান করানো হয়।

প্রথমে সাদা সরষে ও তিল দিয়ে ভালো করে বিষ্ণুর সারা শরীরে ঘষে দিয়ে পরে ঘি দিয়ে তাঁকে স্নান করাবে। সামর্থ্য অনুযায়ী হোম ও দান করা কর্তব্য। এরপর সোনা, রত্ন, কাপড় ও ফুল দিয়ে ভক্তিভরে বিষ্ণুর পূজা করে তার চারিদিকে ধূপ-ধুনো জ্বেলে দেবে। এই পূজায় চর্য্যচূষ্য জাতীয় হবিচান্না নিবেদন করবে। এভাবে যথাবিধি বিষ্ণুকে পূজা করার পর তাঁর কাছে এরূপ প্রার্থনা জানাবে–হে কেশব পদ্মনাভ, লক্ষ্মীধর, তোমার কৃপায় আমার ধর্ম, অর্থ, অখণ্ড হোক, তুমি যেমন সর্বত্র অখণ্ড, সেই সত্যবলে আমার ধর্ম, অর্থ প্রভৃতি অখণ্ড হোক।

সবরকম সামগ্রী দিয়ে এই ব্রতের পালন করতে হবে সারা বছর ধরে উপবাসী ও সংযমী হয়ে। সব দেবতাই পরিতুষ্ট হয়ে থাকে এই ব্রতের অনুষ্ঠানে। অক্ষয় হয়ে থাকে ধর্ম, অর্থ, বাণী।

পুলস্ত্য নারদকে ভোগ বিলাসীদের উল্লেখিত ব্রতের কথা বললেন। এবার শুভ বিষ্ণু প্রার্থনা সম্পর্কে তিনি বলবেন। তিনি বলতে শুরু করলেন হে দেবেশ বিষ্ণু, আমি তোমার শরণাপন্ন

হলাম। বারবার তোমাকে নমস্কার করলাম। আমার পূর্বদিকে তুমি সুদর্শনচক্র নিয়ে রক্ষা করো। আমার পশ্চিম দিকে তুমি রক্ষা কর কৌমুদকী গদা নিয়ে। উত্তর দিকে রক্ষা কর মুষল হাতে নিয়ে, শাঙ্গধনু ও নারায়ণাস্ত্র নিয়ে ঈশাণ কোণ রক্ষা করো।

অগ্নিকোণ রক্ষা করো মহাশঙ্খ, পাঞ্চজন্য ও পদ্ম নিয়ে। নৈঋতকোণে রক্ষা করো, শত সূর্যের মতো উজ্জ্বল ও বর্ম নিয়ে। বায়ুকোণে রক্ষা করো তোমার গলার হার, গলা থেকে জানু অবধি ঝোলালে পঞ্চবর্ণময়ী মালা ও তোমার বুকের নোম দিয়ে।

গরুড় তোমাকে নমস্কার করছি আমাকে অন্তরীক্ষে রক্ষা কোরো। রসাতলেও তুমি আমাকে রক্ষা কোরো, তুমি রক্ষা কোরো আমার হাত, পা, মাথা সব কিছুই। প্রাচীনকালে ভগবান মহাদেব কাত্যায়নী দুর্গাকে এই মহা বিষ্ণু সম্পর্কে বলেছিলেন, প্রার্থনা এর প্রভাবে কাত্যায়নী মহিষাসুর নামক, রক্তবীজ ও অন্যান্য দানবদের নিহত করেন।

নারদ জানতে চাইলেন, মহিষাসুর কে? রক্তবীজ ও অন্যান্য দৈত্যদের নিধনকারী কাত্যায়নীই বা কে? মহিষের প্রকৃত স্বরূপ জন্মস্থান, পিতৃ পরিচয় জানতে চাইলেন। পরিচয় ও নামের পরিচয় সবিস্তারে শুনতে চাইলেন।

পুলস্ত্য তখন সমস্ত ঘটনা বলতে লাগলেন। দুর্গা, সর্বদা বরদা হলেন কাত্যায়নী প্রাচীনকালে রম্ভ ও করম্ভ নামে অত্যন্ত পরাক্রমশালী দুজন অসুর ছিল। তারা ভয়ঙ্কর স্বভাবের ছিল। তাদের অত্যাচারে সমগ্র জগৎ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ল। এরা অপুত্রক ছিল। এরা পুত্রলাভের জন্য তপস্যা শুরু করে। এদের মধ্যে একজন পঞ্চনদের জলের তলায় নিমগ্ন রইল তপস্যাঁতে, পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপস্যায় নিরত হল আর একজন।

এরা দুজন পরস্পর সহোদর ছিল। এরা তপস্যা করছিল ফলবটাক্ষ যক্ষের নিকট। করম্ভ এদের মধ্যে জলের তলায় বসে থেকে তপস্যা করছিল। দেবরাজ ইন্দ্র কুমীরের রূপ ধরে এই জলের মধ্যে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। রম্ভ এভাবে ভাইয়ের হত্যায় ভীষণভাবে রেগে গেল। নিজের মাথা কেটে আগুনে আহুতি দিতে উদ্যত হল।

তপস্যাকে আরো কঠোর করতে আত্মহত্যা না করার কথা বলে অগ্নিদেব তাকে বিরত রাখলেন মুণ্ড ছেদন থেকে। অগ্নি বললেন, পরহত্যা জনিত পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় কিন্তু আত্মহত্যা জনিত পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না।

অতএব অগ্নিদেব তাকে বর দিতে প্রস্তুত হলেন। মৃত ব্যক্তির কোনো ইচ্ছা পূরণ হয় না, তার নামও বিলুপ্ত হয়ে যায়। রম্ভ বলে যদি আপনি আমাকে বর দেন তাহলে আমার এক ত্রিলোক জয়ী পুত্র হোক এবং সে যেন আপনার চেয়েও অধিক তেজস্বী হয়। দেবতাদের নিকট সে যেন কখনো পরাজিত না হয়। তার এই পুত্র যেন শক্তিশালী ও সবরকম অস্ত্রশস্ত্র চালনায় নিপুণ হয়। সে যেন ইচ্ছামত রূপ ধারণ করতে পারে। অগ্নি বললেন– তাই তোক। তুমি যার প্রতি মন সমর্পণ করে গৃহত্যাগ করবে, তারই গর্ভে তোমার এইরূপ পুত্র জন্মাবে।

যক্ষের দ্বারা পরিবৃত মালবটের সাথে দেখা যখন হল তখন অগ্নির কথা শুনে সে চলে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল পদ্মনিধি নামে এক যক্ষ সেখানে বাস করছেন। তার চারিদিকে হাতি, মহিষ, ঘোড়া, গরু ও ছাগল আছে।

পশুদের দেখে দানব রাজের মনে কামভাবের উদ্রেক হল। এক তিন বছরের মহিষী ছিল ওই পশুপালের মধ্যে। দানব রাজাকে দেখে সেও কামাতুরা হয়ে পড়ল, ওই মহিষী তারপর সত্য সত্যই রতি মিলনের ইচ্ছা নিয়ে দানবরাজের কাছে গেল। দুজনে ভবিতব্যের প্রেরণায় সঙ্গম করলেন। ফলে মহিষী গর্ভবতী হল।

তখন দৈত্যরাজ তাকে নিয়ে পাতালে নিজ নগরে চলে যান। অন্যান্য দানবেরা তার কাছে সব জেনে নিলেন। কিন্তু এই মহিষীকে গর্ভবতী করার মতো কুকাজ করার জন্য সকলে তাকে ত্যাগ করল। অগত্যা রম্ভ যক্ষের নগরে মহিষীকে নিয়ে পুনরায় ফিরে এল।

সেখানেই কিছুকাল পরে শ্যামাঙ্গিনী মহিষীর গর্ভ থেকে অরণ্য মধ্যে এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হল, তার দেহবর্ণ সাদা। শীঘ্রই সে আপন ইচ্ছানুযায়ী রূপধারণ করতে দক্ষ হয়ে উঠল, কিছুকাল পর মহিষী চরিত্র রক্ষার্থে দানবরাজের কাছে গেল। দৈত্যরাজ আপন খঙ্গ নিয়ে ওই মহিষকে মারতে গেল। কিন্তু মহিষের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারল না। মহিষ তার শিং দিয়ে দৈত্যের বুকে আঘাত করল। দৈত্যরাজ ছিন্নভিন্ন হয়ে মারা গেল। স্বামীর মৃত্যুর পর মহিষী যক্ষদের শরণাপন্ন হল। যক্ষ ও গুহ্যকরা মহিষকে তাড়িয়ে মহিষীকে রক্ষা করল। যক্ষের তাড়ায় কামাতুরা মহিষ সামনে এক দিব্য সরোবরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার মৃত্যু হল। এই মৃত মহিষ পরে নমর নামে এক বিখ্যাত দৈত্য হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

এদিকে মহিষী যক্ষদের আশ্রয়ে বনে বাস করতে থাকে। দৈত্যরাজের সৎকারে নালধনু প্রভৃতি যক্ষরা উদ্যোগী হল।

চিতা প্রস্তুত করে দৈত্যরাজের দেহ তার উপর চাপানো হল। মহিষী মৃত স্বামীর অনুগমন করল। চিতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলে আগুনের ভেতর থেকে বিশাল পুরুষ উঠে এল। সে ছিল অতি ভীষণ ও হাতে ছিল খঙ্গ। চিতা থেকে উঠে এসেই সে যক্ষদের তাড়িয়ে দিল। সেখানকার সকল মহিষ তার হাতে নিহত হল।

একমাত্র দানব রম্ভের পুত্র মহিষকে সে বধ করল না, কারণ সে তার রক্ষক। এই ভয়ঙ্কর দৈত্য পুরুষের নাম রক্তবীজ। ইন্দ্র, রুদ্র, সূর্য ও মারুত প্রভৃতি দেবতারা একসময় এই রক্তবীজের হাতে পরাজিত হয়েছিল। এদিকে মহিষাসুরও অসাধারণ পরাক্রমশালী হয়ে উঠল। তাকেই তাদের রাজা বলে মেনে নিল শম্বর, তারক প্রভৃতি দৈত্যরা। ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য প্রভৃতিরা প্রতিপত্তি বিস্তারে বাধা দিতে না পেরে নিজ নিজ জায়গা থেকে পালিয়ে গেল, তারা সবাই দূরদেশে গিয়ে কালাতিপাত করে দিন কাটাতে লাগল।

১৮

পুলস্ত্য জানালেন দেবতারা নিজ নিজ বাসস্থান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন মহিষাসুরের কাছে। পরাজিত হয়ে। তারা নিজেদের অস্ত্র ও বাহন নিয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলেন এবং ব্রহ্মাকে সকলের সামনে রেখে দেবতাগণ চক্রপানি নারায়ণের সাথে দেখা করতে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন শিব ও বিষ্ণু একই আসনে বসে আছেন। মহিষাসুরের কাছে তাঁদের পরাজয়ের কথা বললেন–এবং দুই দেবতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। তাঁরা জানালেন মহিষাসুরের অত্যাচারে তাঁরা অস্থির।

সকলকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে মর্তে নির্বাসিত করেছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, বরুণ ও ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবতাদের বাসস্থান মহিষাসুর আক্রমণ করেছে। এখন আমরা আপনাদের শরণাপন্ন। আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করুন। না হলে আমাদের রসাতলে আশ্রয় নিতে হবে। তখন বিষ্ণু ও শিব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শঙ্কর দাবানলের মতো জ্বলে উঠে ক্রোধ প্রকাশ করতে লাগলেন। এক জ্যোতির্ময় তেজ ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করসহ সমস্ত ক্রুদ্ধ দেবতাদের মুখমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এল।

এক বিশাল পর্বতশৃঙ্গের মতো আকৃতি নিল এই তেজোরাশি কাত্যায়ন মুনির মহাশ্রমে একত্রিত হলো।

মহর্ষী কাত্যায়ন নিজ তেজে তাকে আরো পরিপুষ্ট করলেন। এই তেজ তখন দেদীপ্যমান হয়ে সহস্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল আকার ধারণ করল। তখন কাত্যায়নীর আবির্ভাব ঘটল এই তেজ থেকে, মহেশ্বরের তেজ থেকে তার মুখ, অগ্নির তেজে তিনটি চোখ, যমের তেজে চুল, হরির তেজে আঠারোটি হাত, চন্দ্রের তেজে স্তন, ইন্দ্রের তেজে শরীরের মধ্যস্থান এবং বরুণের তেজে উরু, জঙ্ঘা, নিতম্ব নির্মিত হল, ব্রহ্মতেজে পা, সূর্য ও ইন্দ্রের তেজে কান এবং অশ্বিনীদ্বয়ের তেজে মদনবাণের মতো শান্তিময় দুটি → গঠিত হল। এদের তেজরাশি থেকে কাত্যায়নীর উৎপত্তি হল। তখন থেকেই তিনি কাত্যায়নী নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন।

দেবতারা এরপর সেই তেজঃপুঞ্জ থেকে সৃষ্ট দেবী কাত্যায়নীর হাতে অস্ত্র দিলেন। মহাদেব দিলেন ত্রিশূল, বিষ্ণু দিলেন চক্র, বরুণ দিলেন শঙ্খ, অগ্নি শক্তি, বায়ু ধনু, সূর্য তৃণ ও অক্ষয় শর, ইন্দ্র ঘন্টা সহ বজ্র, যম দণ্ড, কুবের গদা, ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, বাকল চর্ম ও অসি, চন্দ্র হার ও চামর, সমুদ্র মালা, হিমালয় সিংহ, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা মাথার মুকুটের মণি, কুণ্ডল ও অর্ধচন্দ্র ও কুঠার, গন্ধর্বরাজ পানপাত্র, নাগরাজ বাসুকি নাগহার এবং ঋতুগণ অন্যান্য ফুলের মালা দান করলেন।

এই ত্রিনয়নী তখন অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। তাঁর স্তব করতে লাগলেন বিষ্ণু, রুদ্র, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা। সকলে যোগশুদ্ধ দেহে বিরাজকারী সুর গরীয়সী দেবীকে নমস্কার করলেন। যিনি তৃষ্ণা, লজ্জা, ক্ষুধা, ভয়, শান্তি, স্মৃতি, পুষ্টি, ক্ষমা, ছায়া, শক্তি, কমলা, মেধা, ক্ষান্তি ও যা যা রূপে এই ত্রিলোকে বিরাজ করছেন, তাঁকে নমস্কার। দেবতারা এরূপ স্তব আরম্ভ করলেন।

এরপর অরণ্যবেষ্টিত বিন্ধ্যপর্বতে দেবী চলে গেলেন সিংহের পৃষ্ঠে আরোহণ করে। উঁচু চূড়া সম্পন্ন এই বিন্ধ্য পর্বত অতি বিশাল। অগস্ত্য মুনি চূড়াগুলোকে নিচু করে দিলেন।

কেন এই ঘটনা ঘটল? পুলস্ত্য বললেন, পুরাকালে আকাশচারী বিন্ধ্যাচল দিবাকরের গতি রোধ করে। অগস্ত্যের কাছে তখন সূর্য আসেন।

যজ্ঞকার্যরত অগস্ত্যের হোম শেষ হলে সূর্য বলে, সে দূর দেশ থেকে এসেছে। মুনিবরকে অনুরোধ করেন জগতের উদ্ধার সাধন করতে। তার প্রার্থনা পূরণ করতে অনুরোধ করে তার স্বর্গধামে অনায়াস যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে বললেন।

অগস্ত্য তখন জানালেন, তার কাছ থেকে প্রার্থী কখনো বিমুখ হয় না। তিনি তার প্রার্থনা পূরণ করবেন।

দিবাকর তখন জানালেন, বিন্ধ্যাচল আমার গতিরোধ করেছে। আপনি তাকে অবনত করে দিন।

দিবাকরের এই কথায় অগস্ত্য জানান, বিন্ধ্যকে তিনি অবনত করবেনই। শীঘ্র দিবাকর তার কিরণ-জালে এই পর্বর্তকে জয় করবেন।

তাছাড়া অগস্ত্য মুনির শরণ প্রার্থীর কষ্ট কি? এরপর অগস্ত্য ভক্তিভরে সূর্যের স্তব করলেন এবং তৎক্ষণাৎ দণ্ডকারণ্য পরিত্যাগ করে জরাক্রান্তদেহে বিন্ধ্যাচলে হাজির হলেন। সেখানে গিয়ে তিনি বিন্ধ্যপর্বতকে দক্ষিণ দিকের এক পরম পবিত্র তীর্থের কথা বললেন।

আমি বৃদ্ধ, তাই তোমাকে অতিক্রম করে যাবার ক্ষমতা নেই। তাই তুমি নিচু হও। মুনিবরের কথা শুনে বিন্ধ্যপর্বত মাথা নিচু করল। ঋষি অগস্ত্য বিন্ধ্যকে অতিক্রম করে অপরদিকে গিয়ে বললেন–আমি পুণ্যতীর্থ থেকে বিশুদ্ধ বীরের আশ্রমে না আসা পর্যন্ত সে যেন মাথা উঁচু না করে এবং এও বললেন–তাঁর কথা অমান্য করলে তিনি অভিশাপ দেবেন।

অগস্ত্য মুনি একথা বলে আকাশপথে দক্ষিণে চলে গেলেন। সেখানে এক রমণীয় আশ্রম তৈরি হল। আশ্রমের তোরণগুলি বিশুদ্ধ সোনায় শোভিত হল। মুনিবর সেখানে পত্নী লোপামুদ্রাকে নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। এছাড়াও আর একটি আশ্রম প্রস্তুত হল আকাশপথে। সেই আশ্রমে এসে প্রতি ঋতু ও পর্বদিনে বাস করতে লাগলেন।

বাকি সময়ে তিনি দণ্ডকারণ্যে তপস্যা করতে লাগলেন। বিন্ধ্য যখন দেখেন অন্তরীক্ষে মুনির আশ্রম তখন আর ভয়ে উঁচু হল না। সে বুঝল মুনি আর ফিরবেন না। তবুও সে আর উঁচু হল না।

নারদ পুলস্ত্যকে জানালেন, এভাবে মুনিবর বিন্ধ্যকে অবনত করেন। এই বিন্ধ্যের সুউচ্চ চূড়াতে দুর্গা দানব দলনের জন্য অবস্থান করেন। কাত্যায়নীকে সন্তুষ্ট করে সেখানে দেব, সিদ্ধ, নাগ, বিদ্যাধর, অপ্সরা ও অন্যান্য প্রাণীরা নিশ্চিন্তে বাস করতে লাগল।

১৯

পুলস্ত্য বললেন–কাত্যায়নী ওই শৃঙ্গে বাস করতে লাগলেন। চন্দ্র ও মুণ্ড নামে দুই দানব এই সময় তাকে দেখতে পেল। মহিষাসুরের দূত ছিল চণ্ড ও মুণ্ড। তারা এসেই মহিষাসুরকে জানাল যে বিন্ধ্যপর্বতে চলুন, সেখানে এক অপূর্ব দেবকন্যা আছেন। তাঁর অবর্ণনীয় সৌন্দর্য তার চুল মেঘকে জয় করেছে।

চন্দ্র ম্লান তার মুখমণ্ডলের কাছে। ত্রিনয়নে অগ্নি, কণ্ঠে শঙ্খ, স্তনদ্বয়ে গঞ্জকুম্ভ চির পরাজিত, মদনদেব নিজেকে সর্বজয়ী মনে করেই এই দেব কন্যার স্তনদ্বয় সুদৃঢ় দুর্গরূপে নির্মাণ করেছেন। তার হাত আঠারোটি, এবং সব হাত সশস্ত্র। সনদদের তার পরাক্রম বুঝেই নিজযন্ত্রের মতো হাতগুলি নির্মাণ করেছে। তার বুক থেকে নাভি পর্যন্ত ঢেউখেলানো সুশোভন রোমরাজি বিরাজিত, মনে হয় কামদেব নিজেই আরোহণের জন্য সিঁড়ি তৈরি করে রেখেছে। তার এই পরিপুষ্ট স্তন সংলগ্ন রোমরাজির দিকে তাকালে মনে হয় যেন আরোহণের ভয়ে ভীত ও ক্লান্ত হয়ে মদনদেবের শরীর থেকে ঘাম ঝরছে। তার দক্ষিণাবর্তভাবে বিরাজমান সুগভীর নাভিদেশ।

কন্দর্পরাজ যেন নিজ হাতে এই সৌন্দর্য ভাণ্ডারে বিশেষ কোনো চিহ্ন দিয়ে রেখেছে।

এই মৃগনয়নার মেখলা পরিবৃত কটিদেশ দেখলে মনে হয় এ যেন কন্দর্পরাজের প্রাচীর বেষ্টিত সুদুর্গম বাসভবন।

সেই দেবীর উরুদ্বয় সুগোল, সুকোমল ও রোমহীন, দেখলে মনে হয় কামদেবের বসবাসের জন্য যেন দুটি জনপদ তৈরি করে রাখা হয়েছে। তার জানুদ্বয় অতি উন্নত। দেখলে মনে হয় বিধাতা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন নির্মাণ করতে করতে এবং করতল দুটি স্থাপন করেছেন নির পণ করার জন্য। তার পা দুটো মনোরম শোভায় উদ্ভাসিত।

বিধাতা এই পা দুটি বিশেষ যত্ন নিয়ে তৈরি করেছেন। এই সুকুমারীর নখগুলি আকাশের নক্ষত্ররাশির মতো শোভাসম্পন্ন।

দেবকন্যার এই রূপ বর্ণনা দেওয়া হল। তা এতটুকুও বাড়িয়ে বলা হয়নি। এটিই তার প্রকৃত সৌন্দর্য। তবে এই রমণীর হাতে অনেক ভীষণ অস্ত্র আছে।

আমরা তাকে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেছি। কিন্তু সে কার কন্যা বা কামিনী তা জানতে পারিনি। এই দেবকন্যা কেন স্বর্গ ত্যাগ করে ধরাধামে হাজির হয়েছেন আপনি নিজেই বিন্ধ্যাচলে গিয়ে দেখুন। আপনার তারপর যা মন চায় তাই করবেন।

মহিষাসুরের মন দেবকন্যার প্রতি আকৃষ্ট হল তাঁর এই রূপের বর্ণনা শুনে। বিধাতা আগেই মানুষের ভাগ্য ঠিক করে রাখেন। বিধাতার প্রেরণাতেই মানুষ তার গন্তব্যপথ নিজে অনুসরণ করে। তারপর মহিষাসুর চন্দ্র, মুণ্ড, বিড়ালাক্ষ, কার্পল, বাষ্কল, উগ্রায়ুধ, মিথুবর, রক্তবীজ সকলকে বিন্ধ্যপর্বতে পাঠালেন।

এই সেনাপতিরা অবিলম্বে সুসজ্জিত হয়ে রণবাদ্য বাজাতে বাজাতে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে এল এবং বিন্ধ্যদেশের পাদদেশে শিবির স্থাপন করল এবং আকাশপথে মহিষাসুর দ্রুত পাঠালেন।

ময়দানবের পুত্র দুন্দুভি হল এই দূত। ভীষণ রণনিপুণ দুন্দুভি দানবসৈন্যের অধিনায়ক। তার গলার আওয়াজও ভয়ঙ্কর।

দুন্দুভি অন্তরীক্ষ থেকে দেবীকে বললেন, যুদ্ধে যার সমতুল্য দ্বিতীয় নেই, সে সেই রম্ভনন্দন মহিষাসুরের দূত।

কাত্যায়নী তাকে আমন্ত্রণ জানালো। তিনি জানতে চাইলেন, মহিষাসুর তাকে কি বলেছেন, দেবীর কথায় দুন্দুভি অন্তরীক্ষ থেকে নেমে এসে বলল, দৈত্যরাজ মহিষাসুর তাকে বুলতে বলেছে যে, হীনবল দেবতারা যুদ্ধে আমার কাছে পরাজিত হয়ে ভূতলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কি স্বর্গ, কি মর্ত্য, কি অন্তরীক্ষ, পাতাল, সবই আমার বশীভূত। সমস্ত রাজাই তার বশ্যতা স্বীকার করেছে। তিনি এখন রুদ্র, ইন্দ্র ও সূর্যের স্থানে অধিষ্ঠিত, ত্রিভুবনে তার নিরঙ্কুশ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ, স্বর্গ, মর্ত্য কি পাতাল’ এমন কোনো বীর নেই যে তার সাথে যুদ্ধ করতে পারে, তার আয়ত্তে ত্রিলোকের যাবতীয় ধন, রত্ন, নরোত্তম স্ত্রী, রত্নের জন্য এই পর্বতে আগমন। সুতরাং তিনি সকলের প্রভু তাই তিনি ভজনার যোগ্য।

ময়পুত্র দুন্দভি কাত্যায়নী সম্পর্কে কথা শুনে বললেন, তিনি স্বীকার করছেন পৃথিবীর প্রভু দৈত্যরাজ। সকল দেবতারা তার হাতে পরাজিত। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে এদেশে একটি প্রসিদ্ধ ধর্ম শুল্ক আছে।

দৈত্যরাজ পণ দিলে তিনি তক্ষুনি তাকে পতিরূপে বরণ করে নেবেন। দুন্দুভি এবার সেই বরপণের কথা জানতে চাইল। দুন্দুভি বলল, যে দৈত্যরাজ তার জন্য মাথা দান করতেও প্রস্তুত। আর এমন কি পণ আছে যা আপনি পাবেন না।

দুন্দুভির কথা শুনে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন কাত্যায়নী, এবং বললেন, আমাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষরা যে পণপ্রথা চালু করে গেছেন তা শোনো।

যে ব্যক্তি তাদের বংশের রমণীকে যুদ্ধে জয় করতে পারবে সেই তার পতি হবে। দুন্দুভি মহিষাসুরকে এই কথা বলল এবং মহিষাসুরও যাবতীয় দৈত্য যোদ্ধা নিয়ে বিন্ধ্যপর্বতে গেলেন এবং দৈত্যবর চিকুর সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত হল।

নমর ওপর ভার পড়ল দৈত্য বাহিনীর সম্মুখ ভাগ সামলানোর। নমর এই কাজে নিযুক্ত হয়ে চতুরঙ্গ সমন্বিত এক বিশাল দানব বাহিনীর একাংশ নিয়ে দুর্গাকে আক্রমণ করল। দেবীকে বর্ম পরার উপদেশ দিলেন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতারা। নমরকে ছুটে আসতে দেখেও কিন্তু দেবী বর্ম বা কবচ কিছুই পরলেন না।

দেবী বর্ম না পরায় তাঁকে রক্ষার জন্য বিষ্ণু পঞ্জর গঠিত হল।

দুর্গা ওই পঞ্জরে রক্ষিত হয়ে মহিষাসুরকে নিষ্পিষ্ট করে ফেললেন। শম্ভু কর্তৃক পুরাকালে এই রূপ বিষ্ণুপঞ্জর গঠিত হয়েছিল। দেবীও তখন পদাঘাতে নিহত করলেন মহিষাসুরকে। নারদকে পুলস্ত্য জানালেন যে, বিষ্ণু পঞ্জরের এমন প্রভাব যে সমস্ত রক্ষাকবচ বিশেষরূপে গঠিত হয়। তাঁর অধিষ্ঠানে সর্বদা যার অন্তরে, পৃথিবীতে কেউ তাঁর দর্পহানি করতে পারে না।

২০

নারদ পুলস্ত্যকে বললেন–মহিষাসুরকে কাত্যায়নী যেভাবে বধ করেছিলেন তা সবিস্তারে বলতে বারণ। তাঁর মনে সংশয় যে তিনি বিভিন্ন অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত হয়েও কেন তিনি দৈত্যরাজকে পদাঘাতে নিহত করলেন?

পুলস্ত্য জানালেন, এটি অতি প্রাচীন ও পবিত্র ঘটনা। সুতরাং মন দিয়ে ভক্তিভরে শুনতে হবে। কারণ এই কাহিনি শুনলে পাপ দূর হবে।

দানব বাহিনীর সম্মুখে দৈত্যবর নমর ক্রুদ্ধ হয়ে হাতি, ঘোড়া, রথ প্রভৃতি দলবলসহ দেবী দুর্গার সম্মুখীন হল।

দেবী তাকে ভালোভাবে দেখলেন। দৈত্যবর যুদ্ধ শুরু করলে দেবী বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। তখন মনে হল বিদ্যুৎগর্ভ মেঘে স্বর্ণময় পুষ্পরাশি শোভিত হল।

দেবীর বাণ বর্ষণে তখন অসংখ্য দৈত্যসেনা নিপীড়িত হল। গদা ও মুষলের আঘাতে অনেক দানব পতিত হল। দেবীর বাহন সিংহ দানব সৈন্যদের আক্রমণ করল। এই সিংহের আক্রমণে অসংখ্য দৈত্য সেনা মারা গেল। কেউ বজ্রাহত হল। কারো বুকে শক্তিশেল বিদ্ধ হল। কারো ঘাড় লাঙলে বিদীর্ণ হল। কেউ কুঠারের ঘায়ে দু'টুকরো হয়ে মারা গেল। কাজেই মাথা বিদীর্ণ হল দন্তের আঘাতে। কারো দেহ ছিন্নভিন্ন হল চক্রের আঘাতে, অনেক দানব এই হত্যাকাণ্ড দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল। কেউ মূর্ছিত হয়ে পড়ল, কেউ যুদ্ধে মেতে উঠল। কেউ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল।

এইসব দৈত্যদের সংহার করতে লাগলেন করাল বদনা দেবী। তাঁকে কালরাত্রি মনে করে অনেকে পালিয়ে গেল। তখন মত্ত হাতির ওপর থেকে দৈত্যবর নমর দেখল ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের। কিন্তু তথাপি দেবী যুদ্ধক্ষেত্রে অটল। তা দেখে দেবীর দিকে সবেগে নমর এগিয়ে গেল ও সিংহের দিকে ত্রিশূল ছুঁড়ে মারল।

সিংহের কোমরে আঘাত করল দৈত্য বাহন হাতি। কিন্তু সব আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গেল, দেবীর হুঙ্কারে তারা ভস্ম হয়ে গেল। সিংহ লাফিয়ে হাতির পিঠ থেকে মৃতপ্রায় নমরকে টেনে এনে দেবীর সামনে ফেলে দিল।

কাত্যায়নী তখন ক্রোধে নমরকে ডান হাতে ধরে চারিদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে জয়ঢাকের আওয়াজ করতে লাগলেন। তার মুখ থেকে অট্টহাসি বেরিয়ে এল। তাঁর হাসি থেকে তখন অনেক ভূতের উৎপত্তি ঘটল। তাদের মধ্যে কেউ বাঘের মুখের মতো, কেউ শিয়ালের মতো, কেউ ঘোড়া, কেউ মহিষ, আবার কেউ শুকরের মতো। আবার কিছুর মুখ ইঁদুর ও মোরগের মতো আর কারো মুখ হাতি ও ছাগলের মতো। আবার কিছু ভূতের মুখ চোখ ও পা নানা ধরনের ছিল এবং তাদের হাতে ছিল নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র।

এই ভূতরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে গান করতে লাগল। হাসতে লাগল, খেলতে লাগল, পরস্পর মিলিত ভাবে বাজনা বাজাতে লাগল। অম্বিকার স্তব করতে লাগল কিছু কিছু ভূত।

দেবী সে সময় এই ভূতদের সাথে নিয়ে দানব সৈন্য আক্রমণ করলেন, এবং বিদ্যুৎ যেভাবে তৃণরাশি পুড়িয়ে দেয়, ঠিক সেভাবে তিনি দানব সৈন্য বিদীর্ণ করতে লাগলেন।

সেনাপতি চিক্ষুর সেনাদল সাথে নিয়ে দেবতাদের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সেনানী নমর নিহত হলে মেঘ যেমন পৃথিবীর দিকে বারি বর্ষণ করে, সেনাপতি চিক্ষুর তেমনি তার ধনুক দ্বারা বিপক্ষ সৈন্যের দিকে বাণ বর্ষণ করতে লাগল। দেবী দুর্গা দানব সেনাপতির সেসব বাণ নিজের ধনুক থেকে বাণ ছুঁড়ে ছিন্ন করে দিয়ে পুনরায় গ্রহণ করলেন।

তারপর তিনি চারটি বাণে দানব সেনাপতির রথের চারটি ঘোড়া, একটি বাণে সারথি ও অপর একটি বাণে রথের পতাকা ছিন্ন করে দিলেন। দানবের বাণসহ ধনু ছিন্ন করে দিলেন একটি মাত্র তিরে।

বলশালী দানব সেনাপতি খঙ্গ ও চর্ম ধারণ করল। খঙ্গ ও চর্ম ছিন্ন হলো দেবীর চারটি বাণে।

দেবীর দিকে তখন হাতে শূল নিয়ে দৈত্য ছুটে গেল, যা দেখে মনে হল যেন বনে শিয়াল সিংহীর দিকে ছুটে যাচ্ছে।

দেবী দুর্গা তখন পাঁচটি বাণ ছুঁড়ে ছিন্ন করে দিলেন দৈত্যের হাত, পা ও মাথা। অসুর সেনানী তখন যুদ্ধক্ষেত্রে ভূপতিত হল নিহত হয়ে।

সবেগে রণক্ষেত্রে ছুটে এল মহাদানব উগ্রাস্য দৈত্য সেনার অধিনায়ক হয়ে। কারণ সেনাপতি তখন নিহত হয়ে গেছে। তার সাথে যুদ্ধে যোগ দিল আরো অনেক দানব যোদ্ধা। তাদের মধ্যে বাস্কল, উগ্রাকামুক, যুদ্ধর, দুর্মুখ ও বিড়লাক্ষ প্রধান।

কাত্যায়নীর সাথে এছাড়াও অনেক পরাক্রমশালী দানবসেনা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে এলো। তাদের দেখে হাতের বীণা নিয়ে হাসতে হাসতে দেবী বাজাতে লাগলেন, মাঝে মাঝে বাজাতে লাগলেন ডমরুও। ভূতেরা তার বাজনার সাথে তাল রেখে নাচতে ও হাসতে লাগল।

তখন দেবীর দিকে অসুররা অস্ত্র নিয়ে ছুটে এল। দেবী সিংহের পিঠ থেকে লাফ দিয়ে অবলীলা ক্রমে অসুরদের চুলের মুঠি ধরে তাদের পর্বতের তলদেশে নিয়ে এলেন। দেবীর প্রতাপে দানবদের দর্প চূর্ণ হল। তারা সবাই অস্ত্র, বস্ত্র এমন কি প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করল।

প্রধান প্রধান সেনাপতিদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখে নিজে দেবীর সাথে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল মহিষাসুর, এবং অবিলম্বে ক্ষুর, ঠোঁট ও লেজ প্রবল নিঃশ্বাসে দেবীর সহচর ভূতগুলোকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। তারপর ছুটলেন দেবীর বাহন সিংহকে বধ করার জন্য।

তখন দেবী ক্ষিপ্ত হয়ে মহিষাসুরকে বহু দূরে নিক্ষেপ করলেন। তখন মহিষাসুর দুর্গার দিকে ছুটে গেল সক্রোধে মাটি বিদীর্ণ করে সাগরে আলোড়ন তুলে এবং মেঘমণ্ডল বিধ্বস্ত করে। দেবী তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন। তখন মহিষাসুর এক মহাস্রাবী হাতির আকার ধারণ করল। তার দিকে শুল নিক্ষেপ করলেন দেবী।

কিন্তু তা ব্যর্থ হল। এবার দেবী হতাশ হয়ে শক্তি নিক্ষেপ করলেও তা পুনরায় ব্যর্থ হল। তখন দেবী ক্ষুব্ধ হয়ে হরির চক্র, কুবেরের গদা, বরুণের, পাশা, যমের দণ্ড, এবং ইন্দ্রের বস্ত্র সমস্তই মহিষাসুরকে ছুঁড়ে মারলেন, কিন্তু তার কিছুই হল না।

মহিষের শিং, ঠোঁট ও ক্ষুর প্রতিহত করল সকল অস্ত্রকে। তখন দেবী সিংহকে পরিত্যাগ করে মহিষাসুর-এর পিঠে চেপে বসলেন। সে সাথে সাথে চারিদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল।

দেবী তার পিঠের চামড়া মর্দিত করল তার কোমল পা দিয়ে। দেবীর পদমর্দনে এই অসুর ক্রমেই হীনবল হয়ে পড়ল। তখন দেবী তার গলা ভেদ করল শূলের আঘাতে। সেখান থেকে এক খঙ্গাধারী বীর পুরুষ বেরিয়ে এল।

দেবী সাথে সাথে তার বুকে শূল বিধিয়ে দিয়ে মুহূর্ত মধ্যে তরবারি দিয়ে মাথা কেটে দিলেন। তখন তুমুল হা হা ধ্বনি উঠল দৈত্য সেনাদের মধ্যে। এই ভীষণ দুর্ঘটনায় চন্দ্র, মুণ্ড, ময়, তার, অসিলোম প্রভৃতি দানব ভয় কাতর চোখে চারিদিকে তাকাতে লাগল।

তাদের ভীষণ ভাবে নির্যাতিত করল ভবানী অনুচর ভূতগুলো। তারা ভয়ে পাতালে আশ্রয় নিল।

দেবী যুদ্ধে জয়ী হলেন। দেখে দেবতারা সেই জগত্তারিণী নারায়ণী কাত্যায়নীর নানা স্তব করতে লাগলেন। সুর ও সিদ্ধগণ তার স্তব করতে আরম্ভ করলে কাত্যায়নী বললেন, দেবতাদের ইষ্ট সিদ্ধির জন্য আবার তিনি অবতীর্ণ হবেন। এই বলে তিনি তৎক্ষণাৎ দেবতাদের ত্যাগ করে শিবের পাদমূলে প্রবেশ করলেন।

২১

দেবীর পুনরাবির্ভাবের কথা নারদ পুলস্ত্যর কাছে জানতে চাইলেন। দেবী মাহাত্ম্য সম্পর্কে সবিস্তারে জানতে চাইলেন। পুলস্ত্য তখন বলতে শুরু করলেন। জগতের কল্যাণ কামনায় মহাসুর শুম্ভকে বধ করার জন্য পুনরায় দেবী দুর্গার আবির্ভাব হল।

শিব হিমালয় কন্যা উমাকে বিবাহ করেন। পরে তার কোষ থেকে যিনি উৎপত্তি হন তিনি কৌশিকী নামে পরিচিত হন। কৌশিকী বিন্ধ্যাচলে আশ্রয় নেন আবির্ভূত হবার পর। সেখানে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে তিনি বধ করেন। এরা দুজনেই ছিল মহা অসুর।

নারদ তখন বললেন–যে দক্ষকন্যা সতী দেহত্যাগ করার পর হিমালয় কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। পার্বতী কোষ থেকে কিভাবে উৎপন্ন হয়ে কৌশিকী নামে পরিচিত হন। কিভাবে তিনি শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করেন। তাদের এইসব কাহিনি জানতে চাইলেন।

নারদ দেবীর মাহাত্ম শুনেছেন। এবার দেবীর উৎপত্তির কাহিনি শুনতে চাইলেন।

পুলস্ত্য বলতে শুরু করলেন, তিনি পার্বতীর জন্ম কাহিনি বলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছেন। প্রথমে তিনি কার্তিকের জন্ম কাহিনি বলবেন। দক্ষ দুহিতার দেহ ত্যাগের পর কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন রুদ্রদেব। কোনো আশ্রমেই প্রবেশ করতে লাগলেন। দৈত্যদের দর্পচূর্ণ হয়েছিল এই সকল দেব সেনানায়কের হাতে, এই দেবসেনাপতি শিবের অনুগামী হয়ে দেবতাদের সেনাপত্য ত্যাগ করলেন। দেবতারা তখন দানব রাজা নিশুম্ভর কাছে পরাজিত হলেন। সমস্ত দেবতাগণ মিলিত হয়ে চক্রপাণি গদাধর বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা করার জন্য শ্বেতদ্বীপে গেলেন। এই দ্বীপে তিনি বিরাজ করতেন মহা হংস রূপে। তাঁরই শরণাপন্ন হলেন দেবতারা।

সব দেবতাদের তার কাছে আসতে দেখে তিনি মৃদু হেসে মেঘ গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইলেন, দেবতাগণ, কেন আপনারা সদলবলে আমার কাছে এসেছেন? দুরাত্মা নিশুম্ভ কি যুদ্ধে আপনাদের পরাজিত করেছে। পুনরায় তিনি বললেন–যদি বাস্তবে তাই হয় তবে আমি যা বলব তাই তোমরা কোরো। এতে তোমরা অবশ্যই জয়লাভ করবে।

পুণ্যবান কুরুক্ষেত্রে গিয়ে পৃথুদক তীর্থে পিতৃ-পুরুষদের অর্চনা করো। শিব পুত্রের হাতে শত্রুর পরাজয় ঘটাতে হলে মহাতিথি উপলক্ষে পুণ্য দিনে যা বললাম তা করো।

বাসুদেবের কথা শুনে সমবেত দেবতাগণ জানতে চাইলেন কুরুক্ষেত্র কোথায় এবং সেই পৃথুদক তীর্থের সমবেত দেবতাগণ উৎপত্তি বৃত্তান্ত কি রূপ?

সেই পবিত্র মহাতীর্থে যে দিন পিতৃপুরুষদের ভক্তিভরে জলাঞ্জলি দিয়ে অর্চনা করতে হয় সেই পবিত্র নির্দিষ্ট তিথি সম্পর্কে আমাদের অবগত করুন।

এরপর বিষ্ণু কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তির কথা এবং মহা তিথির স্বরূপ বলতে লাগলেন।

সত্যযুগের প্রারম্ভে চন্দ্রবংশে এক মহাবলশালী রাজা ছিলেন। তার সম্বরণ নামে এক পুত্র জন্মায় রাজা বাল্যকালেই পুত্রকে নিজরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

রাজা সম্বরণ বাল্যকাল থেকেই ধর্ম পরায়ণ ও বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন। সম্বরণের পুরোহিত ছিলেন বরুণ পুত্র বশিষ্ঠ। শাস্ত্রজ্ঞানী বশিষ্ঠ বেদসহ সমস্ত ধর্ম শাস্ত্রে পরিদর্শী ছিলেন।

রাজ্যের ভার পুরোহিত বশিষ্ঠের হাতে দিয়ে রাজা সম্বর মৃগয়া করতে গেলেন। কোনো একদিন শাস্ত্রপাঠ বন্ধ ছিল বলে বৈভ্রাজ নামে এক বনে ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সম্বরণ মনের ভুলে হাজির হলেন। সেখানে উপনীত হয়ে তিনি বড়ই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

সকল ঋতুর ফুলে এই অরণ্য পরিপূর্ণ। তিনি সেই অরণ্যের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ফুলের গন্ধ নিতে নিতে। এই বনে এখানে সেখানে কত যে সাদা, লাল, পদ্ম, শালুক ফুটে আছে তার ইয়ত্তা নেই। সেখানে খেলা করছে বহু অপ্সরা।

সম্বরণ সবচেয়ে সুন্দরী এক কন্যাকে দেখে কামাতুর ও কাতর হয়ে পড়লেন। কন্যাটিরও সেই একই অবস্থা হল। এমনকি রাজা মোহগ্রস্ত হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখন তার চোখে মুখে জল দিয়ে গন্ধর্বরা তার প্রাণ ফিরিয়ে আনলেন। ওই কন্যাটিকে তার সখীরা পিতৃগৃহে নিয়ে গিয়ে নানা মিষ্ট কথা বলে আশ্বস্ত করল। রাজা রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

এর কিছুদিন পর রাজা সুমেরু পর্বতে গিয়ে হাজির হলেন। এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সূর্য নন্দিনী তপতাঁকে দেখা মাত্র রাজা আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন। সর্বজ্ঞ বশিষ্ঠ সে সবই বুঝতে পারলেন।

তিনি বুঝলেন রাজা তপতাঁকে দেখে কামাতুরা হয়ে পড়েছেন। তখন তিনি মহাযোগ বলে আকাশে উঠে সূর্য মণ্ডলে প্রবেশ করে সূর্যের সাথে দেখা করলেন।

দুজনের সাক্ষাতের সাথে সাথে বশিষ্ঠ ও সূর্য পরস্পরকে প্রণাম করলেন। বশিষ্ঠের মাথার উজ্জ্বল জটাজাল দ্বিতীয় একটি সূর্যের মতো শোভা ধারণ করল।

সূর্যদেব তাঁকে ভক্তিভরে অর্চনা করে তাঁর আসার কারণ জানতে চাইলেন। বশিষ্ঠ জানালেন, রাজা সম্বরণের জন্য তার কন্যা তপতাঁকে তিনি চান। তাঁকে দান করতে অনুরোধ করলেন।

দিবাকর নির্দ্বিধায় তপতাঁকে বশিষ্ঠের হাতে তুলে দিলেন। বশিষ্ঠ তাকে নিয়ে পবিত্র আশ্রমে ফিরে এলেন। বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে তপতী জানায়, একসময় সখীদের সাথে খেলা করার সময় এক অপূর্ব সুন্দর রাজাকে তিনি দেখেছিলেন। যার রূপ কান্তি এখনও তার নজরে লেগে আছে। সে তার প্রতি অনুরক্ত। তাঁর পা দুটো সুন্দর। তাতে চক্র, অসি ও গদার চিহ্ন আছে। তার দুই জঙ্ সুশোভন।

দুই উরু হাতির শুড়ের মতো মনোরম, কোমর সিংহীর মতো সরু। শরীরের মধ্যভাগ রেখাঙ্কিত ও ক্ষীণ, ঘাড় শঙ্খের মতো। দু বাহু সুদৃঢ়, পদ্মকোরকের মতো কঠিন ও সুদীর্ঘ, মাথা দাতার মতো।

মাথার চুল কোঁকড়ানো, দু কাঁধ সমান সুন্দর, নাক সুশোভন, হাতের আঙুলগুলো সুদীর্ঘ ও সুদৃঢ় গাঁটযুক্ত এবং দাঁতগুলো সাদা।

তার দেহের ছয়টি স্থান উন্নত। তিনটি স্থান গভীর ও তিনটি স্থান প্রলম্বিত। তিনি উদার ও ধৈর্যশীল। তার দেহের সাতটি স্থান লাল, চারটি স্থান কালো, তিনটি স্থান নীচু, দুটি স্থানে সাদা এবং চারটি স্থান সুন্দর গন্ধযুক্ত।

আমি তাঁকেই পূর্বে পতিরূপে বরণ করে নিয়েছি। সুতরাং এই গুণবান গৌরবশালী পুরুষের হাতে আমাকে সমর্পণ করুন মুনিবর। সে অনুরোধ করল তাকে যেন অন্য কোনো ব্যক্তির হাতে সমর্পণ না করা হয়।

সূর্য তনয়ার কথার বশিষ্ঠ রাজি হলেন। পরে সম্বরণের যে তপতীর প্রতি প্রেমাসক্ত ধ্যান যোগে তা বুঝতে পেরে তপতাঁকে বললেন, যে রাজাকে তুমি বররূপে গ্রহণ করেছ, দেখো, সেই গুণবান রাজা আমার আশ্রমে আসছে।

একথা বলার সাথে সাথে রাজা সম্বরণ বশিষ্ঠের আশ্রমে হাজির হলেন। রাজা বশিষ্টকে প্রণাম করে তাঁর পাশে উপবিষ্ট তপতাঁকে দেখে অরণ্য মধ্যে দৃশ্যমান সেই রমণী বলে মনে করলেন।

কিন্তু পরে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে জানতে পারলেন ইনি সূর্য কন্যা তপতী। তিনি রাজার জন্যই তপতাঁকে সূর্যের কাছ থেকে চেয়ে এনেছেন। তাই সূর্যদেব তাকে কন্যা দান করে তিনি তপতাঁকে আশ্রমে নিয়ে আসেন।

সুতরাং এক্ষুণি তার তপতীর পানি গ্রহণ করা উচিত। এরপর তপতাঁকে রাজা সন্তুষ্ট চিত্তে বিবাহ করলেন। তপতীও ইন্দ্র সহ শচীর মতো রাজপ্রাসাদে মহাসুখে দিন কাটাতে লাগলেন ইন্দ্র সদৃশ স্বামী পেয়ে।

২২

কালক্রমে তপতীর গর্ভে রাজা সম্বরণের রাজলক্ষণযুক্ত এক পুত্র জন্মগ্রহণ করল। তার জাত ক্রিয়াদি যথাসময়ে সম্পন্ন হল। ধীরে ধীরে এই পুত্র বেড়ে উঠল। এই চুড়াকরণ প্রভৃতি সংস্কারগুলো শেষ করলেন বশিষ্টদেব স্বয়ং। পুত্রের নির্দিষ্ট ব্রতবন্দন করা হলে ন’বছর বয়সে গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করলেন রাজপুত্র। বেদসহ নানা শাস্ত্র ও নানা ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞাত হলেন।

দশ বছর বয়সেই তিনি সুযোগ্য রাজার মতো সর্বতোমুখী প্রতিভা ও জ্ঞানের আধার হয়ে উঠলেন। তিনি কুরু নামে প্রসিদ্ধ হলেন।

ষোলো বছর বয়স হলে সম্বরণ সদবংশে তার বিবাহ স্থির করলেন। সুদাম রাজার রূপবতী কন্যা সৌদামিনীর সঙ্গে রাজকুমার কুরুর বিয়ের কথাবার্তা শুরু হয়।

যথাসময়ে সুদাম রাজকন্যা দান করেন। কুরু রাজকুমারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে পরম সুখে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে লাগলেন। ইন্দ্র ও শচীর মতো তাঁদের পরস্পরের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা গম্ভীর হয়ে উঠল।

রাজা সম্বরণ তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। সবদিক দিয়ে পুত্র রাজ্য ভার বহনে উপযুক্ত হয়েছে মনে করে সম্বরণ বনবাস নিলেন। কুরু সযত্নে প্রজাপালন করতে লাগলেন। নিজের হাতে তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান কাজের ভার তুলে নিলেন। ভূমিজরিপ, কৃষিকাজে, পশুপালন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি নিজেই দেখাশুনা করতে লাগলেন।

দৈহিক বলের মতো বুদ্ধিবল অসাধারণ ছিল কুরু রাজের। জগতে একটা চিরস্থায়ী কীর্তি রেখে যাবার কথা তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন। তাঁকে এর জন্য দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে হবে, যতদিন না কোনো কীর্তি প্রতিষ্ঠিত করছেন।

সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন রাজা কীর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। একসময় নানা স্থান ভ্রমণ করতে করতে দ্বৈতবনে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি পুণ্যবতী সুদর্শনা জননী দেবী সরস্বতীর দেখা পেলেন। একটি হ্রদ খনন করে সন্তুষ্ট চিত্তে সেই হ্রদের জলে স্নান করলেন।

এরপর তিনি হাজির হলেন উত্তর ব্রহ্মবেদিতে। এই ব্রহ্মবেদি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মস্থান। পঞ্চক তীর্থ উত্তর ব্রহ্মাবেদি নামে পরিচিত। পাঁচ যোজন এর আয়তন।

দেবতারা তখন বিষ্ণুকে বললেন–আপনি সমস্ত পঞ্চককে ব্রহ্মার উত্তরবেদি বললেন। এখন ব্রহ্মার অন্য বেদির কথা বলুন। জগৎপতি ব্রহ্মার পাঁচটি বেদির কথা বিষ্ণু উল্লেখ করলেন।

সব কটিই প্রসিদ্ধ ধর্মস্থান। লোকনাথ শম্ভু উভয়ের কাছেই কাম্য এইসব বেদি। এগুলোর মধ্যে প্রয়াগধাম মধ্যবেদি, গয়াশির পূর্ববেদি, বিরজা ক্ষেত্র দক্ষিণ বেদি এবং পুষ্করতীর্থে পশ্চিম বেদি, সব বেদিতেই স্নান করলে অনন্তফল লাভ করা যায়।

তিনটি দেব জলাশয় আছে পুষ্কর বেদিতে। বিষ্ণু–বললেন, আগেই তিনি সমস্ত পঞ্চকের কথা তিনি বলেছেন। রাজর্ষি মনে মনে চিন্তা করলেন এই বেদিকেই তিনি মহা ফলদায়ী করে তুলবেন এবং যথেষ্ট রূপে কর্ষণ করে একে কাম্য বস্তুর আধার করে তুলবেন। তিনি একথা স্থির করে রথ থেকে নেমে পড়লেন এবং অতুলনীয় এক কীর্তি স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হলেন।

সোনার লাঙল তৈরি করে যমরাজের বাহন মহিষ এবং শিবের বাহন ষাঁড়কে যোজনা করে রাজা নিজে সেই স্থান কর্ষণ করতে লাগলেন।

ইন্দ্র তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, তিনি কি কাজ আরম্ভ করেছেন? রাজা জানালেন, আমি এই স্থান কর্ষণ করে তাতে সত্য, দয়া, ক্ষমা, শৌচ, দান যোগ ও ব্রহ্মচর্য এই আটটি বিষয় স্থাপন করব।

ইন্দ্র জানতে চাইলেন–আপনি কোথা থেকে কর্ষণের বীজ জোগাড় করছেন? রাজাকে উপহাস করার জন্যই যেন তিনি এমন প্রশ্ন করে সেখান থেকে সহসা চলে গেলেন। রাজা তখনও সে

জায়গা কর্ষণ করে যেতে লাগলেন। চারিদিকে প্রায় সাত ক্রোশের মতো জায়গা রাজা কর্ষণ করে ফেললেন।

এরপর বিষ্ণু সেখানে গিয়ে রাজাকে বললেন–এ আপনি কি করছেন? রাজা তার প্রশ্নের উত্তরে আটটি মহাধর্ম কর্ষণের কথা বললেন।

বিষ্ণুও জানতে চাইলেন–এই কর্ষণ করার বীজ আপনি কোথা থেকে পেলেন? রাজা জানালেন– তাঁর শরীরের মধ্যেই বীজ রয়েছে। তখন বিষ্ণু বললেন–আপনি বীজ দিন, আমি বীজ বপন করি। আর আপনি কর্ষণ করুন।

নৃপতি তখন তার দক্ষিণ বাহু বিষ্ণুর দিকে বাড়িয়ে দিলে চক্রের দ্বারা বিষ্ণু তাঁর বাহু টুকরো টুকরো করে দিলেন। রাজার তখন একটি বাহু রইল। কিন্তু সেই হাতও বাড়িয়ে দিলে বিষ্ণু তাও ছিন্ন করে দিলেন।

রাজা অন্য বর না চেয়ে বললেন, তিনি যতদূর অবধি কর্ষণ করেছেন তার সমস্ত স্পর্শই যেন ধর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। এখানে মরলে মানুষ যেন মোক্ষ লাভ করে এবং স্নান, দান, জপ, হোম, উপবাস প্রভৃতি শুভ কিংবা অশুভ কর্মের অনুষ্ঠান করলে যেন তা অক্ষয় হয়ে থাকে।

এই স্থান শ্রেষ্ঠ ধর্মক্ষেত্রে পরিণত হোক। এখানে যেন অনন্ত পুণ্যফল লাভ করা যায়। এই ক্ষেত্র যেন তার নামে প্রসিদ্ধ হয়। মহাদেব ও অন্য দেবতাদের সাথে তিনি যেন এখানে নিত্য বিরাজ করেন। রাজার প্রার্থনায় বিষ্ণু রাজি হলেন এবং ইহকালে তিনি আবার দিব্য দেহ ধারণ করলেন এবং মৃত্যুর পর বিষ্ণুর শরীরে লীন হয়ে গেলেন। তাঁর কীর্তি অনন্তকাল বিরাজ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং তিনি এখানে যাজক হবেন ও শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান করবেন।

পুলস্ত্য নারদকে জানালেন ভগবান বিষ্ণু রাজাকে এই কথা বলে ইন্দ্র নামে যক্ষ, বাসুকি নাগ, বিদ্যধর শঙ্কবার্ন, রাক্ষসরাজ, সুবেশ, রাজা অজাবান এবং দুই দেবতা মহাদেব ও অগ্নি এদের সকলকে এই ক্ষেত্র রক্ষার ভার দিলেন।

সেই থেকে এরাই রক্ষা করছেন সবসময় কুরু জঙ্গল।

এছাড়া এসব রক্ষকদের তাই হাজার ধনুর্ধারী মহা শক্তিশালী অনুচর আছে। তারা সবসময় এই ধর্ম ক্ষেত্রের পবিত্রতা রক্ষা করে চলেছে। পাপীদের সেখানে প্রবেশ বা স্নান করতে তারা

দেয় না। বহু পুণ্য পুণ্যজনক পৃথুদকতীর্থ এই ক্ষেত্রের মধ্যভাগে বিরাজমান। পূর্বদিকে বয়ে চলেছে এক পবিত্র নদী। এটি জলে পরিপূর্ণ। এখানে স্নান করলে পুণ্য লাভ হয় ও সমস্ত পাপ দূর হয়।

প্রাচীনকালে ব্রহ্মা অন্যান্য জীবের সাথে এই নদীও সৃষ্টি করে। অতি প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবী, জল, আগুন, বাতাস, আকাশ, প্রভৃতির মতো এই পৃথুদকতীর্থ বিরাজমান।

এ থেকেই ব্রহ্ম সময় নদী, হ্রদ, সরোবর সৃষ্টি করেছেন। এই নদীর জলে দেবতারা বিচরণ করে থাকেন।

পুরাণজ্ঞ মুনিবর লোমহর্ষণ একসময় সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী কুরুজঙ্গলক্ষেত্রে অবস্থান করেছিলেন।

ব্রাহ্মণরা সে সময় তাঁর কাছে গিয়ে বললেন–এই কুরুক্ষেত্রের তীর্থ, সরোবর ও বামনের আয়তন ও উৎপত্তি বৃত্তান্ত এবং দেবতাদের মাহাত্ম্য আমাদের বলুন। ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে লোমহর্ষণ বললেন–পরমেশ্বর ব্রহ্মা, লক্ষ্মীসহ বিষ্ণুকে এবং রুদ্রদেবকে প্রণাম জানিয়ে অন্যতম তীর্থক্ষেত্র ব্রহ্মসরোবর সম্পর্কে বিস্তারপূর্বক বলবেন।

পুরাকালে ব্রহ্ম স্বয়ং এই ব্রহ্মা সরোবরের বিস্তৃতি সম্পর্কে বলে গেছেন। দেববর বিশ্বেশ্বর থেকে হস্তিনাপুর ও কাণ্যকুজের যতদূর পর্যন্ত জলস্রোত আছে সে পর্যন্তই ব্রহ্মদোয়িনী সরস্বতী সরোবরের আবির্ভাব। দেববর বিশ্বেশ্বর কাছ থেকে জানা যায় এই সরোবর চারিদিক অর্ধ যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত। কুরুক্ষেত্রে এই সরোবর পথেই দেব ও ঋষিরা আসেন।

স্বর্গলাভের জন্য কেউ কেউ মুক্তি কামনায় এই সরোবরের জল পান করেন। পূর্বে যোগাবলম্বী ব্রহ্মা সৃষ্টি কামনায় এবং বিষ্ণু হরিরূপে সৃষ্টিকে রক্ষা করার মানসে এই সরোবরে অবস্থান করেছিলেন।

এই সরোবরে প্রবেশ করে রুদ্র স্থাণু হয়ে যান। ব্রহ্মার এটি আদি দেবী, এরপর রাম হ্রদ বিখ্যাত। এসব স্থান কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হল। কুরু রাজার দ্বারা কর্ষিত হয়ে রন্তক ও আরন্তুকের মধ্যবর্তী স্থান। এবং সামন্ত পঞ্চক ও রামহ্রদের মধ্যবর্তী স্থানই কুরুক্ষেত্রের সামন্ত পঞ্চম এবং এটিই ব্রহ্মার উত্তর বেদি নামে বিখ্যাত।

২৩

নারদ এরপর বামনদেবের উৎপত্তি, মাহাত্ম্য এবং বলিরাজকে কিভাবে দমন করে বামনদেব ইন্দ্রকে তিনি রাজ্য স্বর্গ দান করেছিলেন তা শুনতে চাইলেন।

লোমহর্ষণ বললেন–আমি ঋষিগণের কৌতূহল দূর করবার জন্য বামনদেবের উৎপত্তি, প্রভাব, কুরুজঙ্গল অবস্থান এবং দৈত্যদের বংশ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করছি।

দৈত্য বংশেই বলির উৎপত্তি হয়। তাঁর আদি পুরুষ হলেন হিরণ্যকশিপু। তাঁর পুত্র প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন এবং বিরোচনের পুত্র বলি। তার ন্যায়পূর্ণ শাসনকালে দৈত্যদের অধিকার সর্বত্র অক্ষুণ্ন ছিল।

হিরণ্যশিপু নিহত হবার পরেও সমস্ত স্থান থেকে দেবতাদের বিতাড়িত করে ত্রিভুবনে দৈত্য রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল। ত্রিলোকের সর্বত্র ঋষিগণ যাগযজ্ঞ করতে লাগলেন।

সর্বত্রই যুদ্ধে জয় করতে লাগলেন জয় ও শম্বর নামক দুই দানব সেনাপতি। ধর্ম কর্মের অবাধ অনুষ্ঠান হতে লাগল। দৈত্যদের নির্দিষ্ট পথে আকাশচারী সূর্যও চলতে লাগলেন। সমস্ত দিক সুরক্ষিত হল প্রহ্লাদ, শম্বর ও ময়ের তত্ত্বাবধানে।

অন্তরীক্ষপথও দৈত্যরা রক্ষণ করতে লাগল। বেদবিহিত বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হতে লাগল।

কোনো পাপের অস্তিত্ব রইল না। সকলে সৎপথে চলতে লাগল। কোথাও অধর্মের কোনো চিহ্ন রইল না। সর্বত্র ধর্মভাব পুরোমাত্রায় বিরাজ করল। রাজারা সকলে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠলেন ও প্রজাপালন করতে লাগলেন। সকলেই নিজ নিজ পেশা ও ধর্ম মেনে চলতে লাগলেন।

এমন অবস্থায় সকলে মিলে বলিকে দৈত্যরাজ রূপে অভিষিক্ত করলেন। পদ্মাসনা দেবী লক্ষ্মী পদ্ম হাতে তার শরীরে প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। বলি ইন্দ্রকে পরাজিত করেছেন, তাই দেবী তার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।

বলির এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখে দেবী বললেন–এরূপ অসাধারণ কাজ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়। কারণ তুমি হিরণ্যকশিপুরের বংশ জাত। তুমি প্রপিতামহের নাম উজ্জ্বল করেছ। একমাত্র তুমিই এই ত্রিভুবনের রাজা হবার যোগ্য।

তারপর লক্ষ্মী দেবী বলির দেহে প্রবেশ করলেন। লক্ষ্মীর প্রবেশের সাথে সব দেবই বলির প্রতি তুষ্ট হলেন। তখন স্ত্রী, কীর্তি, দ্যুতি, প্রভা, ধৃতি, ক্ষমা, শক্তি, ঋদ্ধি, শ্রুতি, বিদ্যা, স্মৃতি, শান্তি, পুষ্টি, ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্তই একে একে দৈত্য রাজকে আশ্রয় করলেন। নৃত্যগীত নিপুণ স্বর্গের অপ্সরারা তখন বলিরাজের করায়ত্ত হল। ব্রহ্মবাদী বলি রাজা হয়ে এইরূপে অতুল ঐশ্বর্য লাভ করলেন।

২৪

ঋষিরা জানতে চাইলেন–দৈত্যদের কাছে পরাজিত হয়ে তখন দেবতারা কি করছিলেন? তারা কেমন লোমহর্ষণ-এর কাছে যজ্ঞকারী ছিলেন এবং বিষ্ণু কিভাবে বামন রূপ ধারণ করলেন, সেই সকল কাহিনি আমাদের সবিস্তারে বলুন। লোমহর্ষণ কাহিনি বলতে শুরু করলেন।

ইন্দ্র যখন দেখলেন যে সমগ্র ত্রিভুবন বলির বশীভূত হয়েছে, দেবতাদের নিজেদের বলতে আর কিছু নেই, তখন ইন্দ্র সুমেরু পর্বতে মাতা অদিতির কাছে গেলেন। সেখানে গিয়ে দানবদের হাতে দেবতাদের পরাজয়ের কথা মাতাকে বললেন।

তখন অদিতি বললেন–একমাত্র নারায়ণই বলিরাজকে বধ করতে পারবেন। যদি তোমরা সকল দেবতা মিলে তাকে বধ করতে না পারো, তাকে নারায়ণ ভিন্ন কেউ বধ করতে পারবে না।

অতএব দৈত্যরাজ্যের বিনাশের স্বরূপ তোমাদের ব্রহ্মবাদী পিতা কাশ্যপ জানেন। তখন কশ্যপের কাছে দেবতারা সকলে মিলে গেলেন।

সেখানে গিয়ে দেবতাগণ তপোনিধি কশ্যপকে দেখতে পেলেন। ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান এই দেবগুরু। তিনি নিজ তেজে সূর্য ও অগ্নির মতো দীপ্যমান। তাঁর পরনে আছে হরিণের চামড়া ও বল্কল আর তাঁর পাশ আছে দণ্ড। নিজেই নিজের তেজে তিনি জ্বলজ্বল করছেন। তার সামনে থেকে যজ্ঞীয় ঘিয়ের গন্ধ আসছে। তাকে মূর্তিমান অগ্নির মতো লাগছে। তিনি বেদপাঠে মগ্ন আছেন।

এই চরাচরে সকলের গুরু ও প্রভু তিনি। সর্বলোকের স্রষ্টা, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাপতি ও আত্মভাবের বিশেষত্ব তৃতীয় প্রজাপতি রূপে বিরাজিত এই কাশ্যপকে প্রণাম করে দেবতারা তাকে বললেন–দেবতারা দৈত্যরাজা বলিকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারছেন না, অতএব দেবতাদের মঙ্গলকারী কোনো উপায় বলে দিন।

এরপর কাশ্যপ তাঁদের ব্রহ্মলোকে যাবার নির্দেশ দিলেন। বললেন, ব্রহ্মা তোমাদের উপায় বলবেন।

ব্রহ্মার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলে বলিকে জয় করা যাবে। তখন ইন্দ্রসহ দেবতারা সকলে মিলে কশ্যপের আশ্রম থেকে ব্রহ্মার কাছে রওনা হলেন। তাঁরা মুহূর্ত মধ্যে দ্রুতগামী বিমানে চেপে ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন।

সকলে সমুৎসুক্য হয়ে উঠলেন ব্রহ্মার সাথে দেখা করার জন্য, ক্রমে সকলে এগিয়ে গেলেন ব্রহ্মার সুবিস্তীর্ণ সভার দিকে। সেখানে গিয়ে এক অপূর্ব সভা দেখতে পেলেন।

এই সভায় ভ্রমরের মতো মধুর স্বরে সামবেদ পড়ছেন ঋষিরা, প্রধান প্রধান বিজ্ঞান বেদপাঠের নিয়ম অনুযায়ী ঋক্‌মন্ত্র উচ্চারণ করছে কোথাও যাগযজ্ঞ নিপুণ ব্রাহ্মণদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, কোথাও ব্রাহ্মণেরা সংযমী হয়ে কঠোর ব্রত পালন করছেন। আবার কোথাও ব্রাহ্মণরা জপ, হোম, প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত আছেন।

এই সভার মাঝে পিতামহ সমাসীন। অপূর্ব শোভায় তিনি সমুজ্জ্বল। যাবতীয় বেদ ও বিদ্যার প্রভাবে তাঁর উপাসনায় তৎপর প্রজাপতিরা, দক্ষ, প্রচেতা, পুলহ, মরীচি, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, গৌতম, নারদ, বিবিধ বিদ্যা অন্তরীক্ষ বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি সমস্ত বিকার, মহৎ কারণ সাঙ্গোপাঙ্গ চারবেদ, তপস্যা, শ্রুত, সঙ্কল্প এবং প্রাণ এছাড়া আরও বহু বিশিষ্ট পদার্থ ভগবান ব্রহ্মার উপাসনা করছেন।

সেখানে নিত্য বিরাজ করছেন ধর্ম, অর্থ, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ, শনি ও রাহু, প্রভৃতি গ্রহ, মরুদগণ বিশ্বকর্মা, অষ্টবসু, সূর্য, চন্দ্র, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ছয় ঋতু প্রভৃতি।

মহর্ষি কাশ্যপ ও দেবরাজ অন্যান্য দেবতাদের সাথে ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা পরিবৃত অপূর্ব তেজোময় সেই ব্রহ্ম সভায় প্রবেশ করলেন। তারা পরমাত্মা ব্রহ্মার চরণ স্পর্শ করে যাবতীয় পাপতাপ

থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। ব্রহ্মা তখন সকলকে আসতে দেখে তাদের ব্রহ্মলোকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

২৫

তিনি আগেই দেবতাদের আগমনের কারণ ভালোভাবে চিন্তা করে রেখেছেন। তিনি বললেন– আপনাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আমি বলিকে পরাজিত করতে সাহায্য করব। আমি কেবল দেব পুত্রদের পরাজিত করেছি তা নয় সমগ্র ত্রিভুবনেরও কল্যাণ সাধন করবো। যিনি সর্বলোকের প্রভু, যে সনাতন পুরুষকে জ্ঞানীরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদিদেব বলে থাকেন, সেই মহাত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি তো কেউ জানে না, কিন্তু কি বেদ, কি বিশ্ব চরাচর কোনো কিছুই সেই পুরুষোত্তমের অজানা নয়। দেবতাদের কিভাবে সেই মহাপুরুষের অনুগ্রহে সদগতি হবে তা বলবেন।

ভগবান বিশ্বস্রষ্টা বিরাজ করছেন উত্তর দিক্‌বর্তী ক্ষীর সাগরের উত্তর তীরে সেখানে যোগ ব্রত অবলম্বন করে যদি কঠোর তপস্যা করা যায় তাহলে দেবাদিদেবের মুখ থেকে মঙ্গলদায়ক স্বর্গীয় কিছু অমোঘ বাণী শোনা যাবে।

মেঘের মতো গম্ভীর এই বাণীর ধ্বনি। এই বাণী শুনলে সমস্ত পাপ দূর হয়, এই বাণী ব্রহ্মবাদীদের কাছে পরম সত্য স্বরূপ। এই মহাত্মার বাক্য ব্যর্থ হবে না।

দেবতাদের যোগ ব্রত তপো েশ্চর্য্যা শেষ হবার পর তিনি তাদের বলবেন, তিনি কশ্যপকে বরদান করবেন।

তখন অদিতি ও কশ্যপ ভগবানের পায়ে মাথা ছুঁইয়ে বর প্রার্থনা করবেন–হে ভগবান আপনি অনুগ্রহ করে, আমাদের পুত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করুন। এই প্রার্থনায় ভগবান রাজি হলেন। কশ্যপ ও অদিতির সাথে অন্য দেবতারাও প্রার্থনা করলেন। ভগবানও 'তথাস্তু' বলে সম্মত হয়ে থাকেন। অতএব তারা বর লাভ করে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন।

ব্রহ্মার কাছ থেকে উপদেশ পেয়ে তারা আশ্বস্ত হয়ে ব্রহ্মাকে নত মস্তকে প্রণাম করে শ্বেতদ্বীপের দিকে যাত্রা করলেন। দেবতারা শীঘ্রই ক্ষীরোদ সাগরে পৌঁছে গেলেন। সত্যবাদী

ব্রহ্মা যেমন বলে দিয়েছিলেন, সেই মত দেবতারা কত যে সাগর, পাহাড়, বন ও নদী অতিক্রম করলেন তার ইয়ত্তা নেই।

অবশেষে তাঁরা পৃথিবীর শেষ সীমায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। দেবতারা সেখানে দেখলেন ঘোর অন্ধকার–একটিও প্রাণী নেই। সেখানে কেবল অন্ধকারের আধিপত্য। সেখানে সূর্য ওঠে না।

কোনোরকম সীমারেখাও নেই। এরপর মহাত্মা কশ্যপ সহ দেবতারা অতি কষ্টে সেই পরম ধামে গিয়ে হাজির হলেন।

তখন সেই সুরপতি দেব নারায়ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য কশ্যপ যথা নিয়মে ব্রহ্মচর্য, মৌন বীরাসন প্রভৃতি ব্রত পালন করে দিব্য সহস্র বর্ষ পর্যন্ত তপশ্চর্যায় মগ্ন রইলেন।

ক্রমান্বয়ে দেবতারাও যোগ ব্রত অবলম্বন করে তপস্যা করতে লাগলেন। নারায়ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য কশ্যপও তার চরণ বন্দনা করতে লাগলেন।

২৬

এরপর কশ্যপ ভগবান নারায়ণকে অভিবাদন করে বললেন–হে একশৃঙ্গ, কৃপাসিন্ধু, বৃষাকপি সুরশ্রেষ্ঠ, কপিল, বিষ্কসেন, পদ্মনাভ তোমাকে নমস্কার করি। হে সূর্য প্রভু, সমুদ্রশায়ী, অজ, সহস্রশিরা, মহাপুরুষ, পুরুষোত্তম, সহস্রবাহু, সহস্রমূর্তি, সহস্রমুখ, শাস্ত্র জ্ঞানীদের কাছে তুমিই বিশ্বরূপে প্রকাশিত। তুমি পুষ্পহাস, চরম, যজ্ঞক্রিয়ায় তুমি শতধার, সহস্র ধার রূপে পরিচিত।

তুমি স্বর্গ, তুমি শাতরিশ্বা, তুমি ধর্ম ও দেবতা, হোতা, হন্তা, মন্তা ও নৈতা, ঋক মন্ত্রে তুমি পূজিত হও। তুমি সুমেধা। তুমি গতি, মতি, দাতা মোক্ষ ও যোগ–সমস্ত তুমি, তুমি স্রষ্টা, তুমি বিশ্বের রক্ষাকর্তা।

তুমি পবিত্র, হে বিশ্বম্ভর, দিবস্পতি, বাচস্পতি এবং বর প্রার্থীদের বরদান ফলে। তোমার উদ্দেশ্যে, চার চার, দুই, দুই, পাঁচ ও পুনরায় দুই দ্বারা হোম করা হয়। তোমাকে নমস্কার করি হোত্রাত্মা।

লোমহর্ষণ এরপর বললেন, ভগবান নারায়ণ দ্বিজশ্রেষ্ঠ কশ্যপের স্তব শুনে তুষ্ট হয়ে মেঘ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–তোমাদের মঙ্গল হোক, আমি তোমাদের বর দেব।

কশ্যপ তখন বললেন–আপনি যদি বর দিতে চান তবে দেবরাজ ইন্দ্রের ভাই হয়ে জন্মগ্রহণ করে আমাদের আনন্দ দান করুন।

আপনি অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করুন। অদিতিও পুত্র কামনায় তার কাছে বর চাইলেন। ভগবান বিষ্ণু যেন সমস্ত দেব সমাজের মঙ্গলের জন্য ত্রাতা, ভর্য্যা দাতা ও রক্ষিতা হোন।

এরপর দেবতাদের অভয় দিয়ে বিষ্ণু বললেন–যারা তোমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করবে, তারা মুহূর্ত মাত্রও আমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। আমি পরমেষ্ঠী কার্য দ্বারা অসুরদের বধ করে দেবতাদের যজ্ঞীয় হবি প্রভৃতি দ্রব্য এবং যজ্ঞের অগ্রভাগ ভোজী ও পিতৃপুরুষদের খাদ্যদ্রব্য দান করব। অতএব তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাও।

বিষ্ণু একথা বলার পর দেবতারা সানন্দে তার পূজা করলেন। এরপর কশ্যপসহ অদিতি ও অন্যান্য দেবতারা ভগবানকে নমস্কার করে পূর্বদিকে আশ্রমে এসে হাজির হলেন, কশ্যপের আশ্রম ছিল কুরুক্ষেত্রের সুবিশাল অরণ্যের মধ্যে।

দেবতারা সেখানে গিয়ে অদিতিকে তপস্যা করতে অনুরোধ করলেন। অযুত বৎসর ধরে সেই স্থানে অদিতি ঘোরতর তপস্যা করলেন। অদিতির নামে সেই অরণ্য বিখ্যাত হয়ে উঠল।

ভগবান বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্য অদিতি মৌন ব্রত পালন করে ও বাতাসা খেয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। দৈত্যদের অত্যাচারে ঋষিদের ভীত ও বিতাড়িত হতে দেখে এরূপ চিন্তা করতে করতে দুঃখভরা মন দিয়ে হরিকে প্রণাম করতে লাগলেন।

তারপর নতমস্তকে তপস্বিনী অদিতি ওই দেব দৈত্যরূপী ভক্ত বৎসল ভগবান বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করে বললেন–আমি নমস্কার করি। তাকে আমরা বারে বারে নমস্কার করি যিনি পদ্মমালাধারী, পরম মঙ্গলময় আদিদেব।

আমরা সেই পদ্মলোচন ও পদ্মনাভকে প্রণাম করি। প্রণাম করি যিনি স্বয়ম্ভ শ্রীপতি ও জিতেন্দ্রিয়কে। আমরা প্রণাম করি পদ্ম, চক্র ও কনক বসনধারীকে। যিনি আত্মজ্ঞান সম্পন্ন, যোগীদের চিন্তনীয়, যোগরত, গুণতীত ও ব্রহ্মরূপী, সমগ্র জগৎ যার মধ্যে বিরাজিত অথচ জগতের কেউ তাকে দেখতে পায় না।

আবার জগতের কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত না করলেও লোকে অন্তরে যার অস্তিত্ব অনুভব করে, জ্যোতির বহির্ভূত বলে যাঁকে চোখে দেখা যায় না, আবার জ্যোতির পরবর্তী রূপ বলে

যিনি দৃশ্যমান, এই নিখিল জগৎ যাঁর প্রভাবে পরিচালিত, যিনি সমগ্র জগতের একমাত্র পরিচালক, যিনি আদি প্রজাপতি ও সকলের একমাত্র পতি, সেই বিশুদ্ধ মূর্তি পরম পুরুষ বিষ্ণুকে যিনি যজ্ঞপুরুষ রূপে যজ্ঞে বিরাজ করেন এবং যজ্ঞের মাধ্যমে যাঁর উপাসনা হয় এবং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর জয়গান গায়।

যিনি একমাত্র গতি, যাঁর থেকে চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি, যিনি সূর্য রূপে বিরাজ করেন, অসুর রূপী মূর্তিমান রাতের অন্ধকার বিনাশ করেন। যিনি সকলের ঈশ্বর, যাঁর সম্পর্কে স্তব কোনোমতেই অতিরঞ্জিত বা অসত্য হবার নয়, সেই জন্ম-মৃত্যু হীন নির্মম চরাচর বিশ্বের নিয়ামক ভগবান বিষ্ণুকে নমস্কার করি।

হে ভগবান, তোমার স্তব ভক্তিভরে করার ফলে সকল মনোস্কামনা পূর্ণ হোক।

লোমহর্ষণ বললেন, অদিতির স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বাসুদেব যিনি কাউকে দেখা দেন না তিনি অদিতিকে দেখা দিয়ে বললেন–এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আমার আশীর্বাদে তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে। তুমি নিশ্চয় জানো যে ভক্ত তপস্যা বলে আমার দেখা পায় তার সাধনা কখনো বিফলে যায় না। তাই মনোমতো বর চাও।

যে ব্যক্তি এই বনে বাস করে তিন রাত্রি ব্রত পালন করে তার সব কামনা পূর্ণ হয়।

সুতরাং এই বনে বসবাসকারীর যে অভিষ্ট সিদ্ধি হবেই এতে আর না হওয়ার অবকাশ কোথায়। যে এই বনে বাস করে পাঁচজন, তিনজন অথবা দুজন ব্রাহ্মণকে খাওয়ায় তার স্বর্গলাভ ঘটে থাকে।

অদিতি ভগবান বিষ্ণুকে বললেন–আমার পুত্র যেন এই ত্রিভুবনের অধিপতি হয়। যদি আপনি আমার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে যে অসুররা ইন্দ্রের রাজ্য কেড়ে নিয়ে ইন্দ্রকে যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত করছে তারা যেন নিহত হয়। আমার পুত্র যেন এ সব আবার ফিরে পায়।

পুত্রের রাজ্য হারানোর জন্য আমার দুঃখ নেই, কিন্তু রাজ্যহারা হয়ে শরণাগতকে রক্ষা করার মহৎ কর্তব্য থেকে তার যে বিচ্যুতি ঘটেছে এটাই আমার কাছে বিশেষ দুঃখদায়ক।

ভগবান অদিতিকে বললেন–আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। আমি তোমার গর্ভে কশ্যপের ঔরস হিসাবে আবির্ভূত হব। তুমি নিশ্চিন্ত হও এবং বিষ্ণু সকল দেবশত্রুদের বিধ্বস্ত করবে।

এরপর দেবদেব কেশবকে অদিতি নমস্কার করে বলেন যে, তোমার থেকে বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে, তুমিই এই বিশ্বের সর্বময় ও ঈশ্বর এই চরাচর সমস্ত জগৎ তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। তখন অদিতি জানালেন, তিনি তাকে গর্ভে ধারণ করবেন।

ভগবান তখন বললেন–যে তিনি নিজেই নিজের ভার বহন করবেন অদিতিকে ধারণ করে। অদিতির কষ্ট হবার মতো কোনো কাজ তিনি করবেন না। তোমার মঙ্গল হোক এই বলে ভগবান চলে গেলেন।

তখন সমুদ্র আলোড়িত হয়ে উঠল, সুবিশাল পাহাড়গুলো কেঁপে উঠল, সমগ্র পৃথিবী বিচলিত হয়ে পড়ল কারণ ভগবান বিষ্ণু অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে গর্ভবতী করে তুললেন। এরপর অদিতির পায়ের ভারে সমগ্র পৃথিবী যেন বসে যেতে লাগল। পরম পুরুষের কথাই সত্য হল। বিষ্ণু অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হবার সাথে সাথে দৈত্যদের তেজ কমে গেল।

২৭

লোমহর্ষণ বললেন, পিতামহ প্রহ্লাদকে বলি জিজ্ঞেস করলেন–কোন্ কোন্ দৈত্যরা অগ্নিদগ্ধের মতো অথবা ব্রহ্মশাপ গ্রস্তের মতো নিস্তেজ হয়ে পড়লেন? এদেরকে বিনাশ করতে দেবতারা কোনো কারসাজি করছে কিনা, না কি তাদেরই কোনো দুরভিসন্ধি আছে?

লোমহর্ষণ বলে যেতে লাগলেন। পৌত্র বলির প্রশ্ন শুনে প্রহ্লাদ কিছুকাল চিন্তা করে বললেন– দেখো ধরিত্রী কিরকম বিচলিত হয়ে পড়েছে? পাহাড়গুলো সব কেঁপে উঠছে এবং দৈত্যগুলো সব নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। আর আকাশ পথে আগের মতো সূর্যোদয়ে গ্রহরা যাতায়াত করে না।

এসব দেখে মনে হচ্ছে দেবতারা আগের শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এই ঘটনাকে হাল্কা করে দেখা উচিত হবে না। অবিলম্বে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এর জন্য যা যা করা উচিত তা কর।

ভগবান হরিকে মনে মনে ভক্তি ভরে স্মরণ করে প্রহ্লাদ দৈত্যরাজ বলিকে এইসকল কথা বললেন। ভগবান জনার্দন কোথায়, কিভাবে বিরাজ করছেন তা তিনি ধ্যানযোগে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলেন।

জনার্দন যে অদিতির গর্ভে বিরাজ করছেন, প্রহ্লাদ তা অন্তদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন। তার অন্তরে বসু, রুদ্র, অশ্বিনী, রাক্ষস, বলি, জম্ভ, কুজম্ভ, নরক, বাম ও অন্যান্য অসুর, আত্মা, আকাশ,

মানুষ, পাখি, সরীসৃপ, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর সমস্ত, মুনি ও ঋষি ও প্রজাপতি সকলকেই তিনি বিরাজ করতে দেখলেন এইসব দৃশ্যাবলী দেখে তিনি চমৎকৃত হলেন।

কিছু পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে পৌত্র বলিকে জানালেন–দৈত্যদের হঠাৎ-ই তাদের নিস্তেজ হওয়ার কারণ আমি জানতে পেরেছি।

যিনি আদি জগত, যাঁর থেকে জগত উৎপত্তি, যার আদি ও জন্ম নেই, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং যিনি সপ্তলোকের গুরুরও গুরু, সেই জগন্নাথ জগতের সুস্থ অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য অদিতির গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তার স্বরূপ কেউ জানতে পারে না। রুদ্র, ব্রহ্মা, দেবাত্মারা যাকে পরমাত্মা বলে থাকেন, যিনি মানুষকে নানা সমস্যাকে থেকে মুক্ত করেন, যিনি ধরিত্রীকে ধারণ করে আছেন, সেই মহাত্মা বিষ্ণু পূর্ণরূপে অদিতির গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছেন।

প্রহ্লাদের কথা শুনে বলি জানতে চাইল–দৈত্যদের তেজ হরণকারী এই হরি কে? বলি বলল–বিষ্ণুর চেয়ে বেশি বলশালী শত শত দৈত্য দৈত্যকুলে আছে। এইসব মহাবলশালী ও বীর্যবান দানবরা হলেন শিবি, শম্ভু, জম্ভ, কুজম্ভ, বিচিত্তি, হয়গ্রীব, অশ্বশিরা, ভঙ্গাকর, মহানুনু, বাতাপি, প্রবল, দুর্জয় ও কুকুবাক্ষ। এদের মধ্যে কোনো একজনের সমান শক্তিও জনার্দনের নই।

লোমহর্ষণ বললেন, বলিকে এইরূপে হরির নিন্দা করতে শুনে, পৌত্র বলির প্রতি প্রহ্লাদ রুষ্ট হলেন। বললেন–তোমার মতো বিবেকহীন ব্যক্তি যাদের রাজা, সেই দৈত্য ও দানবরা শীঘ্রই ধ্বংস হবে।

তুমি যেসব দৈত্য ও দানবদের কথা বললে তারা ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা, তুমি, আমি, পাহাড়, নদী, গাছ, বন–এই ত্রিভুবন যার এক একটি অংশ থেকে উৎপন্ন, যিনি সবারই পরম পূজণীয়, কেউ তার সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারে না।

একমাত্র তুমি সেই সর্বনিয়ন্তা ভগবান সম্পর্কে এরূপ বললে।

তোমার মৃত্যু আসন্ন। গুরুজনদের উপদেশ তুমি শুনছে না। এবং বিবেক বুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলছো। তোমার অধম পিতার জন্ম হয়েছে আমার ঘরে তা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে আর তোমার মতো দেবদেবের অবজ্ঞাকারী ব্যক্তি সেই পিতার পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তি দেখালে এই পার্থিব দুঃখ যাতনা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, কথা সবাই জানে।

মহাত্মা কৃষ্ণের চেয়ে আমার দেহও যে আমার কাছে প্রিয় নয় এ কথা সবাই জানে, দৈত্যপতি তুমিও জানো।

আমার প্রাণের থেকে প্রিয় হরি একথা জেনেও তুমি হরির নিন্দা করছ। আমার কথা তুমি একটুও ভাবলে না।

যে বিরোচন তোমার গুরু, তার গুরু আমি আর নিখিল জগতের গুরু আমার হরি। তুমি এই পরম গুরু কৃষ্ণের নিন্দা করলে। তোমার ঐশ্বর্য নাশ হবে।

আমাকে তুমি একটুও সম্মান দিলে না, আমি তোমার পিতার পূজণীয় এবং আমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পূজণীয় জনার্দন।

জগৎ গুরুর তুমি নিন্দা করলে আমাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে। তোমাকে আমি অভিশাপ দিলাম, ভগবানের প্রতি তোমার নিন্দা আমার কাছে শিরচ্ছেদের চেয়েও গুরুতর।

অতএব তুমি রাজ্য হারিয়ে পতিত হবে। তোমাকে যেন শীঘ্রই রাজ্য ভ্রষ্ট হতে দেখি। কারণ আমি শ্রীহরি ছাড়া আর কাকেও ওই সংসার সাগরে পরিত্রাতা বলে মানি না।

২৮

পিতামহ প্রহ্লাদের এই অভিশাপের কথা শুনে তাকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করলেন বলি। বলি বললেন– আমি মোহগ্রস্ত। আমার প্রতি আপনি রাগ করবেন না। আপনি প্রসন্ন হোন।

মোহাবশে আমার বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আমাকে অভিশাপ দিয়ে আপনি ঠিকই করেছেন। আপনার শাপে আমার রাজ্য ও কীর্তি ধ্বংস হবে। কারণ আমি পাপাত্মা ও দুরাচার। আমার দুর্বিনীত ব্যবহারে আপনি আমার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয় এই ত্রিভুবনের আধিপত্য বা অন্য কোনো প্রিয় বস্তু লাভ করা। কিন্তু আপনার মতো গুরুজন অতি দুর্লভ সংসারে।

অতএব আপনি সন্তুষ্ট হোন, ক্রুদ্ধ হবেন না আমার প্রতি। আমি দিনরাত পরিতপ্ত হচ্ছি আপনার কোপানলে দগ্ধ হয়ে।

‘তোমার বিবেক বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছিল’–দারুণ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে প্রহ্লাদ বলিকে বললেন। আমি তোমাকে শাপ দিয়েছি। মোহের বশে হরিকে সম্যক জেনেও আমি কাকেও শাপ দিতে পারি না।

তবে আমার দেওয়া শাপের কখনোই অন্যথা হবে না। তবে তুমি দুঃখ কোরো না। এজন্য দেবদেব বিষ্ণুই তোমাকে রক্ষা করবেন। তার প্রতি তুমি ভক্তিমান হও।

আমি তোমাকে উপদেশ দিতে পারি যাতে তোমার মঙ্গল হয় সে ব্যাপারে। আমার কাছে শাপগ্রস্ত হয়েও তুমি যদি ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও, তাহলে তোমার মঙ্গল হবে।

লোমহর্ষণ বললেন, অদিতির গর্ভে হরি দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগলেন। অদিতির গর্ভে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান গোবিন্দ দশ মাস পরে বামনাকারে ভূমিষ্ঠ হলেন।

দেবাধিপতি জগন্নাথ ভূমিষ্ঠ হলে মনোরম বাতাস বইতে শুরু করল। অদিতি খুশি হলেন, সকলে ধর্মানুষ্ঠানে মন দিলেন, আকাশ মেঘমুক্ত হল।

সকলের মনে খুশির ভাব বিরাজ করতে লাগল। লোকের মনে উদ্বেগের লেশমাত্র রইল না। তিনি জন্মানোর সাথে সাথেই পিতামহ ব্রহ্মা তার জাত কর্মাদি আচরণগুলো শেষ করে স্তব করতে আরম্ভ করলেন।

ব্রহ্মা বললেন–তোমার জয় হোক। হে অধীশ, হে অজেয় অনন্ত সর্বগুরু জয়যুক্ত হও তুমি। কথায় প্রকাশ করা যায় না তোমার স্বরূপ।

তুমি সর্বজ্ঞ জ্ঞানরূপী, তুমি পরমার্থ স্বরূপ। হে সর্বান্তযামী, জগকর্তা, জগদীশ তুমি। জন্ম, মৃত্যু তোমার হাতেই সব। তুমি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও অতিন্দ্রিয়। তোমার ধ্যানে সর্বদা মগ্ন থাকে মুক্তিকামী যোগীরা। তুমি কেবলমাত্র একটি দাঁত দিয়ে এই বসুধা উদ্ধার করেছিলে। তুমি বধ করেছিলে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করে। তোমার ক্ষয় নেই, তোমার রূপের শেষ নেই।

তুমি চিরন্তন, তুমি অক্ষয়, অমর। তুমি এই জগতে ধর্ম স্থাপন করেছো। তোমার স্বরূপ কি তা ভালোভাবে জানে না ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা, সনৎ প্রভৃতি ঋষি যোগীরাও।

তোমার গুঢ় রহস্য একমাত্র সেই উদ্ধার করতে পারে যে তোমার আরাধনা করে। সে ভিন্ন অন্য কারো এই রহস্য জানার অধিকার নেই।

তোমার জয় হোক হে বিশাল নেত্র। তুমি প্রকৃতি ও আকৃতি স্বরূপ। তুমি এই বিশ্বের সর্বদা মঙ্গল বিধান করো।

লোমবর্ষণ বললেন, এভাবে হৃষীকেশের স্তব করতে লাগলেন ব্রহ্মা। আপনি, পূর্বে কশ্যপ ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের সাথে আমার স্তব করেছিলেন। বামনদেব অল্প হেসে ভাবগম্ভীর বাক্যে বললেন। তখন আমি ইন্দ্রকে এই ত্রিলোক ব্যাপী রাজ্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। পরে অদিতি স্তব করলে তাকেও আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, ইন্দ্রকে নিষ্কন্টক রাজ্যদান করার। এখন সেই সময় উপস্থিত। আমি সেই ব্যবস্থা করবো যাতে ইন্দ্র জগতের অধিপতি হতে পারে। আমি এই কথা আপনাদের কাছে দিলাম–এমন বললেন–বামন দেব।

এরপর ব্রহ্মা হৃষীকেশকে মৃগচর্ম দান করলেন। যজ্ঞোপবীত দিলেন তাকে ভগবান বৃহস্পতি। এরূপে ব্রহ্মপুত্র মরীচি দিলেন পলাশদণ্ড, বশিষ্ঠ কমণ্ডলু, অঙ্গিরা কুশখণ্ড, পুলহ আসন এবং পুলস্ত্য গেরুয়া বসন দান করলেন।

দেবতারা তখন নানা শাস্ত্র পাঠ করে বামনদেবের উপাসনা করতে লাগলেন। সেই সর্বদেবময় বামন জটা, দণ্ড, ছত্র ও কমণ্ডুল ধারণ করে বলিরাজের যজ্ঞস্থলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

বসুন্ধরা তাঁর ভার সহ্য করতে না পেরে বিদীর্ণ হল।

এরপর বামনদেব মধুর গতিতে যেতে লাগলেন, তথাপি ধরিত্রী বিচলিত হতে লাগল। তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন স্বয়ং বৃহস্পতি। বামনদেব এই স্বীয়গতি অবলম্বন করলেন জগতের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য।

তখন মহানাগ অনন্ত রসাতল থেকে বেরিয়ে এসে দেবদেব চক্রপানিকে সাহায্য করতে লাগলেন। এজন্য এ ঘটনা জগতে অতি বিখ্যাত, সর্পভয় দূর হয়ে যায় বামনদেবের দর্শনে।

২৯

লোমহর্ষণ বললেন, বলি যখন দেখল ধরিত্রী বিচলিত হয়ে উঠেছে, পাহাড়, পর্বত কঁপছে, বনজঙ্গল আন্দোলিত হচ্ছে, তখন সে কৃতাঞ্জলি হয়ে গুরু শুক্রাচার্যকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করল–কেন ধরিত্রী এরূপ বিচলিত? কেন অগ্নি অসুরদের দেওয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করছে না?

বলির প্রশ্ন শুনে মহামতি শুক্রাচার্য চিন্তা করে বললেন–তিনি নিশ্চয় তোমার যজ্ঞানুষ্ঠানে আসবেন। তার পদসঞ্চারে এই ধরিত্রী বিচলিত হয়ে উঠেছে। পাহাড় পর্বত কেঁপে উঠছে, সমুদ্র আলোড়িত হচ্ছে। ধরিত্রী দেবী বামনদেবের ভার বহনে অক্ষম।

অথচ এই বামন দেবই ধারণ করে আছেন দেব, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ যাবতীয় প্রাণী সহ সকলকে।

ভগবান বিষ্ণু বামন রূপে ধরণীতে আবির্ভূত হয়েছেন বলে দেবতারা তাদের নিজ নিজ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু গার্হপত্য, রাজকীয় ও দাক্ষিণ্য– এই তিন প্রকার অগ্নি এখনও পর্যন্ত তা গ্রহণ করছেন না।

শুক্রাচার্যের কথা শুনে দৈত্যরাজ বলি পুলকিত চিত্তে বললেন–আমি ধন্য, আমি পুণ্যবান। যেহেতু স্বয়ং যজ্ঞপতি আমার যজ্ঞভূমিতে আসবেন সুতরাং আমার চেয়ে পুণ্যবান ব্যক্তি আর কে আছে? কাজেই এখন কি করতে হবে আপনি আমায় বলে দিন।

শুক্রাচার্য বলিকে বললেন–বৈদিক প্রমাণাসুরে দেবতারাই যজ্ঞভোগ ভোজী, কিন্তু তুমি এখন দানবদেরই যজ্ঞভাগ ভোজী করেছ।

এই স্বত্বগুণাবলম্বী ভগবান স্থিতি ও পালন কর্তা। তিনি নিজেই সৃষ্টি করে আবার নিজেই সব গ্রাস করেন।

তুমি দেবতাদের বঞ্চিত করেছ। কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে, বিষ্ণু সর্বদাই স্থিতি স্থাপনে প্রস্তুত।

সুতরাং তুমি এসব চিন্তা করে যা ভালো বুঝবে তাই করবে। তুমি স্বল্পতম বস্তুও বামন দেবকে দান করবে বলে প্রতিজ্ঞা কোরো না। কেবল াঁকে তুষ্ট করো মিষ্টি কথায়, তাতেই কাজ হবে।

বিষ্ণু স্বভাবতই সকল ব্যাপারে সফলতা লাভ করে থাকেন। তবুও তিনি আবির্ভূত হয়েছেন দেবতাদের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য।

সুতরাং দেবতাদের কার্য উদ্ধারের জন্য তিনি যখনই কোনো প্রার্থনা করবেন, তুমি তখনই তাকে স্পষ্টভাবে বলবে, আপনার প্রার্থনা পূরণে আমি অসমর্থ। বলি বললেন–আমি এমন কথা কেমন করে বলব, যখন কোনো সাধারণ ব্যক্তিও কিছু চাইলেও আমি না বলতে পারি না।

সেখানে জগৎ বিধাতা সুরপতিকে আমি কি ভাবে একথা বলবে।

যে প্রভুকে লাভ করতে কঠোর সাধনায় নানা ব্রত উপবাস পালন করতে হয়, সেই সাক্ষাৎ গোবিন্দ যদি 'দেহি' বলে হাজির হন তাহলে তার চেয়ে গৌরবের আর কি, হতে পারে। তিনি যদি 'দেহি' বলে কিছু চাইবেন, যাঁকে তুষ্ট করার জন্য নানারকম যাগযজ্ঞ করা হয়, ভগবান স্বয়ং তা গ্রহণ করবেন যা আমি দান করব, এর চেয়ে বেশি পুণ্যজনক আর কি?

তার কাছে প্রার্থী হয়ে আসবেন ঈশ্বর স্বয়ং, বলি তাঁকে কেমন করে 'নাই' বলে প্রত্যাখ্যান করবেন। 'নাই' একথা কখনও বলতে পারবে না, তার চেয়ে বরং আমি প্রাণ ত্যাগ করবো। এই যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর জনার্দন যদি তার কাছে, কোনো কিছু চান, তাহলে নিশ্চয় তার অভিষ্ট সিদ্ধ হবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ হলেই দান করা পুণ্যজনক। তার রাজ্যে কেউ অসুখী নয়।

কোনো দরিদ্র বা আতুর ব্যক্তি নেই, কেউই উদ্বিগ্ন বা অপ্রসন্ন নয়, সবাই হৃষ্ট, পুষ্ট, তৃপ্ত ও তুষ্ট, তিনি আমার কথা বলবেন না। কারণ তিনি সর্বদাই সুখী।

এই সুখই দানবীজের বিশিষ্ট ফল। তিনি মনে করেন যা তিনি পুরো মাত্রায় পেয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সব বীজের সেরা দানবীজ যদি জনার্দন রূপ বিশিষ্ট ক্ষেত্রে পড়ে। তাহলে সকল ফল তিনি লাভ করবে, নিশ্চয়, কোনো বিশেষত্ব আছে তার এই দানের ব্যাপারে তাই তুষ্ট হয়েছেন দেবতারা। শতগুণ বেশি সুখকর দান উপভোগের চেয়েও।

তিনি হরির আরাধনা করেছেন যজ্ঞানুষ্ঠানে। তাই নিশ্চয় তিনি আসছেন তার উপকারের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে। অথবা তিনি তাদের বঞ্চিত করেন তাদের প্রাপ্য যজ্ঞভাগ থেকে।

সুতরাং গোবিন্দকে কিছু দান করেনে। তিনি তাকে বাধা দেবেন না জগদীশ।

লোমহর্ষণ বলতে লাগলেন, বলি যখন শুক্রাচার্যকে এসব বলছেন, তখন বৃহস্পতি ও অন্য দেবতাদের সঙ্গে বামনদেব বলির যজ্ঞ স্থলে উপস্থিত হলেন। বলি পুরোহিত শুক্রাচার্যকে ডেকে বললেন–যখন ভগবান হরি নিজে তার কুটিরে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তখন তাকে মনমতো কোনো বস্তু প্রার্থনা করতে দিন।

এই জনার্দন অন্তর্যামী ও সর্বদেহময়, ইনি মায়াবশে বামন রূপ ধারণ করেছেন।

তাকে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করতে দেখে অন্য অসুররা তার তেজের প্রভাবে নিষ্প্রভ হয়ে পড়লেন। এই মহাযজ্ঞে সমবেত মুনিরা কাঁপতে লাগলেন।

বামনদেবকে দেখে নিজ নিজ জন্ম সার্থক মনে করলেন বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গর্গ ও অন্যান্য মুনি ঋষিরা ও দৈত্যপতিগণ। সবার অন্তরে এক ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা উৎপন্ন হল। কেউ কোনো কথা বলতে পারলেন না তাকে। সকলেই তাকে পূজা করতে লাগলেন দেবজ্ঞানে।

বামন রূপী দেবদেব বিষ্ণু বলির সেই যজ্ঞ, যজমান, ঋত্বিক ও অগ্নি সবারই যথাযোগ্য স্তব করলেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রধান পুরোহিত অন্যান্য সদস্য ও যজ্ঞীয় দ্রব্য সম্ভারের তিনি যথেষ্ট প্রশংসা করলেন।

ব্রাহ্মণ ও সব সদস্যরা বামনদেবকে একবাক্যে ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন। পুলকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল বলিরাজের অন্তর। তিনি ভক্তিভরে গোবিন্দের পূজা করে তাকে বললেন–সোনা-দানা, বস্ত্র, অলঙ্কার, গরু-মহিষ, স্ত্রী সমগ্র পৃথিবী অথবা আপনার যা খুশি প্রার্থনা করুন, আমি আপনাকে তা দান করবো। যজ্ঞের অগ্নি রক্ষার জন্য আমার সমগ্র বস্তু আপনি আপনার বলে মনে করবেন।

'তিন পা জায়গা চাই'–বামনরূপী ভগবান দৈত্যপতির কাছে বললেন। সামান্য হেসে বললেন, যাঁরা সোনাদানা মূল্যবান রত্নরাজি চান, তাদের আপনি তা দান করুন।

বলি তখন বিষ্ণুকে বললেন–মাত্র তিন পা জায়গাতে আপনার কি হবে? আপনি শত শত হাজার হাজার পা জায়গা চান।

বামন বললেন–আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে এই তিন পা জায়গা পেলেই। তাদের আপনি অভিষ্ট বস্তু দান করুন যারা অন্য সকল প্রার্থী।

এরপর বলি তিন পা মাত্র জায়গা দান করলেন মহাত্মা বামনের প্রার্থনা অনুযায়ী। করতলে উৎসর্গ জল পড়ার সাথে সাথেই বামন বিরাট আকার ধারণ করলেন, তাঁর সর্বদেবময় রূপ প্রকাশ করলেন।

সকলের সামনে সবাই দেখলেন যে চন্দ্র ও সূর্য তার দুই চোখ, স্বর্গে তার মাথা, পৃথিবীতে তাঁর পা, পিশাচগণ পায়ের আঙুল এবং গুহ্যকগণ হাতের আঙুল, তার দুই জানু ও জঙ্ঘাতে যথাক্রমে বিদ্যাধর ও সাধ্যগণ বিরাজ করছেন।

তার অঙ্গ সমূহে দেবতা ও অপ্সরাগণ আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর কেশরাশি সূর্যের কিরণজাল, তারকারাজি তাঁর রোমকূপ এবং রোমসমূহে মহর্ষিদের বসবাস, ঈশাণ, বায়ু, নৈঋত ও অগ্নিকোণ এগুলো তার বাহু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁর কান, সত্য তাঁর বাণী, দেবী সরস্বতী তার জিভ, দেবমাতা অদিতি তার ঘাড়, বিদ্যাসমূহ তার বলিরাশি, ত্বষ্টা ও পূজা তার দুই ভুরু, সন্ধি সমূহে মরুম, বুকে রুদ্রগণ, পেটে গন্ধর্ব ও মরুদগণ বিরাজ করছেন, লক্ষ্মী, মেধা, ধৃতি, কান্তি ও সমস্ত বিদ্যা হন তার কোমর। এই বামনদেব সর্ব জ্যোতির্ময়। তিনি সর্বদেবের অধিদেবতা। তখন তাঁর এক অপূর্ব তেজ প্রকাশিত হল।

মহাবলশালী বলি অবাক হয়ে গেলেন বিষ্ণুর এই অপূর্ব দেবময় রূপ দেখে। যজ্ঞস্থলে উপস্থিত সকলের অবস্থা হল আগুন দেখলে পতঙ্গের যেমন অবস্থা হয় তেমন। চিকুর দাঁত দিয়ে বামন দেবের পায়ের আঙুল কামড়ে ধরল মহাদৈত্য। তার ঘাড়ে সজোরে আঘাত করে বামনদেব তাকে আহত করলেন।

এইভাবে তিনি সমস্ত ধরণী দখল করে নিলেন। অসুরদের হাত ও পায়ের আঘাতে দলিত মথিত করে দিয়ে এক বিশাল শরীর ধারণ করে নিলেন।

এরপর তিনি পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এমন কি আরো উর্দ্ধদেশে পরিক্রমা করতে লাগলেন।

সমগ্র ত্রিলোকের আধিপত্য ইন্দ্রকে দান করলেন। বিপুল পরাক্রমশালী বিষ্ণু অসুরদের পরাজিত করলেন। তারপর ভগবান বিষ্ণু বলিকে বসুধাতলের নীচে সুতল নামে পাতাল দান করলেন।

তোমার দেওয়া উৎসর্গ জল আমি করতলে গ্রহণ করেছি, তাই স্বল্পকাল পর্যন্ত তোমার আয়ু হবে এবং তোমার স্বাস্থ্যসুখ কখনো নষ্ট হবে না।

তিনি বলিকে বললেন–তুমি যখন ইন্দ্র হয়ে বিরাজ করবে, যখন বৈবস্বত মন্বন্তর শেষ হয়ে সাধনিক মন্বন্তর উপস্থিত হবে।

আমি ইন্দ্রকে এখন তোমার অধিকৃত সমস্ত ভুবন দান করলাম। চারটি যুগের ব্যাপ্তি একাত্তর বছরের বেশি। এই সময়ের মধ্যে যারা ইন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের আমি এভাবে নিগৃহীত করবো।

পূর্বে ইন্দ্র ভক্তি ভরে আমার আরাধনা করেছিল। তাই আমি তার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ করলাম। সুতল নামক পাতাল প্রদেশ গ্রহণ করে সেখানে গিয়ে বলিকে বাস করতে বললেন।

সুর ও অসুরদের বাস এই পাতাল পুরীতে। শত শত অট্টালিকায় পরিব্যপ্ত এই স্থান। সুন্দর পদ্মফুল ফুটে আছে সর্বদা সেখানকার সরোবরে। স্বচ্ছ ও পবিত্র জলে পরিপূর্ণ নদী সমূহ। তুমি সেখানে চন্দন, মালা ও সোনার অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে নাচে-গানে, সুখে কাল কাটাও। নানা সুখ সম্ভোগে কাল কাটাবে তুমি আমার আদেশে। কিন্তু যখনই তুমি দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সাথে বিরোধে লিপ্ত হবে, তখন এক ভয়ঙ্কর পুরুষ দড়ি জাতীয় পাশ নামক অস্ত্র দিয়ে তোমায় বেঁধে ফেলবে।

এরপর বলি জানতে চাইলেন–ওই স্থানে তাঁর ভোজ্য ও ভোগ্য সামগ্রী কি হবে? আমি যেন সর্বদা আপ্লুত হয়ে বামনদেবকে স্মরণ করতে পারি। ভগবান তখন বললেন–সদা দান, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণহীন শ্রাদ্ধ এবং অশ্রদ্ধাকৃত হোম এসব তোমায় ফলদান করবে।

ফলদায়ক হবে দক্ষিণাহীন যজ্ঞ, অবৈধ ক্রিয়া, ব্রতবিহীন অধ্যয়ন, জলহীন পূজা কুশবাস ও ঘি ছাড়া হোম। অসুরদের কোনো ভাগ থাকবে না যদি কেউ এখানে এসে কোনো সৎ কাজ করে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মহা পুণ্যজনক জ্যেষ্ঠাশ্রমে কিংবা এই বিষ্ণুপদ হ্রদে কোনো মহাত্মার যদি শ্রাদ্ধ বা ব্রত পালন জাতীয় সৎকার করেন, তবে সেসব যে অক্ষয় হয়ে যাবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে যদি কেউ উপোস করে দ্বাদশীতে বামনদেবকে দর্শন করে বিষ্ণুপদ হ্রদে স্নান ও যথাশক্তি দান করে, তাহলে তার স্বর্গলাভ হয়ে থাকে।

লোমহর্ষণ বললেন, শ্রীহরি বলিকে এরূপ বর ও ইন্দ্রকে সমগ্র ত্রিলোক ব্যাপী রাজ্য দান করে সেই বিশ্বব্যাপী বিশাল শরীরেই অন্তর্ধান করলেন।

তখন ইন্দ্র আবার সসম্মানে সমগ্র ত্রিভুবনের অধিপতি হয়ে বিরাজ করতে লাগলেন।

ভগবান বিষ্ণুর এই মাহাত্মকথা আমি তোমাদের বললাম। তার সমস্ত পাপ দূর হয় যে ব্যক্তি বামনদেবের কীর্তি মাহাত্ম ভক্তি ভরে শোনে। যারা বলি ও প্রহ্লাদের এই কাহিনি, বলি ও ইন্দ্রের মন্ত্রণা ব্যাপার এবং বলি ও বিষ্ণুর কথোপকথন স্মরণ করবে, তারা কখনো মোহগ্রস্ত হবে না এবং কোনোরূপ আদি ব্যাধি বা তার তাপ তাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

এসব কথা শুনলে রাজ্য ভ্রষ্ট ব্যক্তি রাজ্য ফিরে পাবে, ইষ্টলাভ হবে বিরহী ব্যক্তিদের, ব্রহ্মজ্ঞ হবেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় পৃথিবী জয় করতে পারবেন। বৈশ্য ধন সমৃদ্ধি লাভ করবেন এবং সুখ সৌভাগ্য লাভ করবেন বামন দেবের মাহাত্ম্য কাহিনি শ্রবণ করলে। কাউকে কোনোরূপ পাপ স্পর্শ করতে পারবে না।

৩০

ঋষিগণের মতে নদী সমূহের মধ্যে সরস্বতী একটি প্রাচীন নদী। কুরুক্ষেত্রের মাঝামাঝি ক্ষেত্র দিয়ে বয়ে গেছে এই নদী। এরপর সকলে লোমহর্ষণের কাছে জানতে চাইলেন, কি করে এই নদীর উৎপত্তি, কেমন করে ব্রহ্মা সরোবরে এসে এই নদী দৃশ্য ও অদৃশ্য গতিতে পশ্চিমদিকে বয়ে চলেছে, কিভাবে নদীর উভয়তীরে নানা তীর্থক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে।

লোমহর্ষণ বললেন, এই নদী আবির্ভূত হয়ে পাকুড় গাছ থেকে। এর মাহাত্ম্য কাহিনি বেশি আর বলবার নেই। সব পাপ ক্ষয় হয়ে যায় এই নদীকে স্মরণ করা মাত্রেই।

এরূপ শোনা যায় যে, এই পবিত্র মহানদী হাজার হাজার পর্বতমালা প্লাবিত করে দিয়ে দ্বৈত বনে এসে প্রবেশ করে। মহামুনি মার্কণ্ডেয় এই নদীর স্তব করতে আরম্ভ করেন। তিনি পাকুড় গাছে এই নদীকে বিরাজ করতে দেখে ছিলেন।

এই পবিত্র সরস্বতী নদীকে মহাঋষি মার্কণ্ডেয় বললেন–তুমি সকলের মাতা, বেদের অরণি এবং জগতের মঙ্গলবিধাত্রী, সাগরে যেমন জল থাকে, যা কিছু সৎ ও শুভ এবং মোক্ষলাভের সহায়ক, তা সবই তোমাতে প্রতিষ্ঠিত।

পরব্রহ্ম অবিনশ্বর এবং বিশ্বনশ্বর, কিন্তু এই ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ই তোমাতে অধিষ্ঠিত। যাতে সকল চরাচার প্রতিষ্ঠিত, সেই তিন মাত্রার ওঁকার এই অক্ষরের মধ্যে দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্তই বিরাজ করছে।

এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে তিন লোক, তিন বেদ, তিন ধাতু, তিন অবস্থা, আমি যদি আট সিদ্ধি, পিতৃগণ এই সমস্তই।

তোমার রূপ হল এই তিন মাত্রার কথা। ব্রহ্ম যা আদি ও সনাতন আবার ভিন্ন ভিন্ন। সোম সংস্থ, হরি সংস্থ, পাবকসংস্থ ও সনাতন, শুধু তোমার নাম উচ্চারণ করেই ব্রহ্মবাদিগণ এসব সাধনা করে থাকেন। তার স্বরূপ নির্দেশ করা অসম্ভব যে অর্ধমাত্রাস্থিত অপর এক পরম রূপ আছে।

বিকার নেই ঐ দিব্য রূপের এবং তা প্রকাশ করতে পারে না কোনো ব্যক্তি। তা উচ্চারণ করা যায় জিহ্বা, ওষ্ঠ বা তালু প্রভৃতির সাহায্যেও, ওই অর্ধ মাত্রাস্থিত রূপই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাত্মক এবং তাই সাক্ষাৎ চন্দ্র-সূর্যের জ্যোতি স্বরূপ।

এই রূপই বিশ্বাধার, বিশ্বরূপ বিশ্বাত্মা মহেশ্বর, সংখ্যা সিদ্ধান্ত, বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে তোমার ওই রূপই বর্ণনা করা আছে। এর আদি, মধ্য ও অন্ত নেই।

সর্বদা তিনি বিরাজিত সৎ ও অসঞ্রূপে। বিভিন্ন ভাব পরম্পরায় এটি এক হয়েও অনেক বিভক্ত। এর কোনো নাম নেই, ইহা আবার ষড়্গুণাঙ্ক ও বিবিধ আখ্যা যুক্ত এবং ত্রিগুণাশ্রিত, তত্ত্বগুণের আধার তোমার ওই রূপ, প্রকাশক ও জনক তোমার এই রূপ নানা শক্তির, সারা জগৎ জুড়ে বিরাজ করছ, তুমি এই রূপেই।

এইরূপে সারা জগৎ জুড়ে বিরাজ করছ যা অদ্বৈত রূপে অবস্থিত। ব্রহ্মকেও ব্যপ্ত করে বিরাজকারী তুমি। হে দেবী! তুমি সেসবের প্রকাশক, যেসব পদার্থ নিত্য ও বিনাশশালী, অথবা যে সমস্ত পদার্থ স্থূল, সূক্ষ ও নশ্বর, অথবা যেসব পদার্থ ভূতলে। তুমিই সে সবের প্রকাশক, যা অমূর্ত বা মূর্ত, যা কিছু ভৌতিক কর্ম অথবা যা কিছু দেবতাদের মধ্যে বা অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত, তা সবই তোমার মূর্তি, স্বর ও ব্যঞ্জনে সমৃদ্ধ।

মার্কণ্ডেয় মহামুনি মহাত্মা, তিনি স্তব করলে বিষ্ণুর জিহ্বারূপী দেবী সরস্বতী তাঁকে বললেন–যে, তিনি মহামুনিকে সেখানে নিয়ে যাবেন যেখানে শ্রীহরি থাকেন।

প্রথমে ব্রহ্ম সরোবরে, তারপর পবিত্র নাগহ্রদ ও তারপর কুরুক্ষেত্রে যাবার কথা বললেন–মার্কণ্ডেয়। সেই কুরুক্ষেত্রে পবিত্র জলরাশি নিয়ে নদীকে প্রবাহিত হতে বললেন।

৩১

লোমহর্ষণ বললেন, মার্কণ্ডেয় মুনির একথা শুনে দেবী সরস্বতী কুরুক্ষেত্রে প্রবাহিত হলেন। প্রথমে রন্তুক ও পরে কুরুক্ষেত্রকে পরিপ্লাবিত করে পশ্চিম দিকে বয়ে যেতে লাগলেন। অনেক তীর্থস্থান আছে সেদিকে। আমি পরমেশ্বরীর প্রসাদে সেই সব তীর্থের বিবরণ দেব।

অতি বড় পাপীও পুণ্য অর্জন করে এই তীর্থ স্মরণ করলে, দর্শন করলে এবং সেখানে স্নান করলে। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে তার শরীর ও মন বিশুদ্ধ হয় তা পবিত্র ও অপবিত্র যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন।

মানুষ সকল পাপ থেকে মুক্ত হয় যদি সে বলে আমি কুরুক্ষেত্রে গিয়ে সেখানে বাস করব। ব্রহ্মজ্ঞান, গয়াশ্রাদ্ধ, গো গৃহে মৃত্যু এবং কুরুক্ষেত্রে বসতি–এই চারটি মানুষের পক্ষে মুক্তি বলে কথিত আছে। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ ব্রহ্মাবর্ত দেশ নামে অভিহিত।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, সরস্বতী নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করলে ব্রহ্মময় জ্ঞান লাভ হবে।

দেবতা, ঋষি ও সিদ্ধগণ সর্বদা কুরুজঙ্গলের সেবা করেন। অন্তরে ব্রহ্মদর্শন করতে পারে সেই মানুষ যে ওই স্থানের সেবা করবে।

চঞ্চল মনুষ্য জন্ম লাভ করে যেসব মুমুক্ষু পুরুষ একমনে সেখানে তপস্যা করেন অথবা যেসব দুষ্কৃতকারী ব্যক্তি নিত্য সেই স্থানে বাস করে, তারা সবাই বহু জন্মের সঞ্চিত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে অন্তরে সনাতন দেবের দর্শন লাভ করে থাকে।

সাক্ষাৎ ব্রহ্মবেদী রূপে নির্দিষ্ট কুরুক্ষেত্র। এর নিকটবর্তী হল ব্রহ্ম সরোবর, সেখানে না গেলে মানুষের পক্ষে ব্রহ্মপদ লাভ করা সম্ভব নয়।

যদিও বা নক্ষত্র ও তারকা রাজির পতন ভয় আছে, কিন্তু এই স্থানের সেবা করলে অথবা কুরুক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটলে কখনো পতিত হতে হয় না।

সব বাসনা সিদ্ধ হয় কুরুক্ষেত্রে গিয়ে। সেখানে অবস্থিত হ্রদে ভক্তি করে স্নান করে নিয়ম সহযোগে ব্রহ্ম সরোবর প্রদক্ষিণ করে রন্তুক তীর্থে গিয়ে সরস্বতী নদীর জলে স্নান করে, তারপর সেখানে স্থিত যক্ষকে দর্শন ও প্রণাম করে এবং নৈবেদ্য নিবেদন করে তাকে একথা বলবে–তোমার প্রসাদে আমি, বন, নদী ও তীর্থ সমূহ পর্যটন করবো, তুমি সর্বদা আমার বাধা বিঘ্ন দূর করে দিও।

৩২

ঋষিগণ লোমহর্ষণের নিকট বিনীত অনুরোধ করে বললেন, আপনি অনুগ্রহ করে বিশদভাবে বলুন সাতটি বন, সাতটি নদী, সমগ্র তীর্থ ও সেই সেই তীর্থস্থানের ফল কিরূপ এবং যে যে বিধানে, যে যে তীর্থের ভ্রমণে যেরূপ ফললাভ হয় তার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করুন।

ময় দানব প্রভৃতি দৈত্যগণ নন্দীর আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যে যেদিকে পারল প্রাণ ভয়ে পালিয়ে গেল। তখন প্রচণ্ড প্রহারে নন্দীকে ধরাশায়ী করে দিল তারকাসুর। মহাদেবের সৈন্যদের রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যেতে দেখে শতরূপ ধারণ করলেন গিরিবালা। ফলে অন্ধক চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল এই দেবীদের দ্বারা। এদের মধ্যে গিরিবালা গৌরীকে তিনি চিনতেই পারলেন না। তিনি যে প্রকৃত দেবীকে দেখতে পেলেন না তার কারণ জান্ধ, মদোন্মত্ত ও লোভাক্রান্ত এই চার প্রকৃতির ব্যক্তির কোনো দৈব দর্শন শক্তি থাকে না।

সুতরাং অন্ধক গিরিবালাকে প্রাণপণ চেষ্টা করেও দেখতে পেল না। সমস্ত দেবীই তার কাছে যুবতী গৌরী বলে মনে হল। কিন্তু তাদের সে ধরতে পারল না। তখন অস্ত্রাঘাতে অন্ধককে ধরাশায়ী করে দিয়ে দেবী অন্তর্হিত হলেন। দানব দলপতিরা অন্ধকের অবস্থা দেখে গর্জন করতে করতে রণোন্মত্ত হয়ে ছুটে এল। দানবদের এই গভীর যুদ্ধ নিনাদ শুনে গণেশ্বর যুদ্ধ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিলেন। দানবরা তাঁর কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথেই ইন্দ্রের মতো বজ্রাঘাতে পরাজিত করলেন দানবসেনাদের, তারপর তিনি দেবী অম্বিকার চরণ বন্দনা করলেন।

তখন দেবী তার মূর্তিদের মর্ত্যলোকে চলে যেতে বললেন। যাতে তারা মর্তবাসীদের কাছে পূজা পায়। তাদের বাসস্থল নির্দিষ্ট হল উদ্যান, বন, বনস্পতি ও সর্বজাতীয় বৃক্ষে। তারা যেন

নিশ্চিন্ত চিত্তে সেখানে চলে যায়। তখন তারা দেবী অম্বিকাকে প্রণাম করে, নানা দিকে প্রস্থান করলেন। তাঁদের স্তব করতে লাগলেন কিন্নরগণ। অন্ধকাসুর সংজ্ঞা লাভ করে গিরিনন্দিনীকে দেখতে না পেয়ে তার অনুচরদের মতো নিজেও পাতালে পালিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে কামানলে জর্জরিত হয়ে দিনের আহার, রাতের নিদ্রা ছেড়ে দিল এবং গৌরীর অনুপম রূপের কথা সর্বক্ষণ চিন্তা করতে লাগল।

৩৩

নারদ পুলস্ত্যর কাছে জানতে চাইলেন, নন্দীকে নিয়ে অম্বিকা যখন মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ রত ছিলেন, তখন ভগবান শঙ্কর কোথায় ছিলেন? পুলস্ত্য জানালেন যে, ভব হাজার বছর ধরে মহামোহে নিমগ্ন থাকার ফলে নিস্তেজ ও হীনবল হয়ে পড়েন। মহেশ্বর নিজের তেজ কমে যাবার ফলে তপস্যা করতে উদ্যোগী হন। ভগবান তখন এক মহাব্রতের অনুষ্ঠান করলেন এবং দেবী অম্বিকাকে আশ্বস্ত করে ও পর্বত প্রভৃতিকে তাঁর রক্ষকরূপে নিযুক্ত করে ধরাতলে বিচরণ করতে লাগলেন। তিনি সেখানে মহামুদ্রার ভঙ্গিতে সমাসীন ছিলেন।

তাঁর গলদেশে জড়ানো ছিল মহাসর্প, মহাশঙ্কু মেখলা ছিল কোমরে। ডানহাতে ভিক্ষাপাত্র ও বাম হাতে কমণ্ডুল। তিনি বৃক্ষ, পর্বত, পর্বতের তলদেশ, নদ-নদী প্রভৃতি স্থানে একদিন করে বাস করতে লাগলেন। তিনি সমগ্র ত্রিভুবনেই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শুধুমাত্র ফল, মূল, জল ও বায়ু খেয়েই তিনি ন'শো বছর কাটিয়ে দিলেন। একদিন হিমালয় পর্বতের এক শিলাতলে বসে মহাদেব মুখের ভিতর এক খিলি পান ফেলে দিয়ে একেবারে নিরুদ্যম হয়ে পড়লেন। তারপর এই পানের খিলি পরমেশ্বর শঙ্করের মস্তক বিদীর্ণ করে বিশাল দুটা জালের মধ্যে থেকে মাটিতে পড়ে গেল। সেই স্থান তীর্থশ্রেষ্ঠ পবিত্র কেদার নামে বিখ্যাত হল।

এরপর মহাদেব কেদার তীর্থের উদ্দেশে এরূপ বরদান করলেন–যেসব ব্যক্তি সংযমী হয়ে ও মধু, মাংস ভক্ষণ থেকে বিরত হয়ে ব্রহ্মচারী হয়ে এবং পরানে পরান্মুখ হয়ে ছ'মাস পর্যন্ত ব্রত পালন করবে, তাদের হৃদয়মন্দিরে এই শিবলিঙ্গ নিশ্চিতই বিরাজ করবেন। পাপকাজে তার কখনও মতি হবে না যার হৃদয়ে শিবলিঙ্গ সর্বদা বিরাজ করবে। অক্ষয় হবে তার পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ। অক্ষয় হয়ে থাকবে এই কেদার তীর্থে স্নান, দান, তপস্যা, হোম কিংবা জপ বা যে কোনো সৎকার্যই। এখানে প্রাণ ত্যাগ করলে প্রাণীর পুনর্জন্ম হয় না।

এভাবে কেদার তীর্থ পবিত্র ও মোক্ষদায়ক হয়ে উঠেছে সাক্ষাৎ ত্রিলোচনের কাছ থেকে বর লাভ করে। এরপর ভানুনন্দিনী কালিন্দী নদীর জলে স্নান করতে গেলেন ভগবান হর। তিনি কালিন্দীর জলে দাঁড়িয়ে দ্রুপদাদি ও গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। হর এরপর সরস্বতীর জলে দেড় বছর নিমগ্ন হয়ে থাকলেন।

এতে ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে চতুর্দশ ভুবন ও সপ্ত সাগর পর্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। নক্ষত্র ও তারকারাজি পৃথিবীতে খসে পড়তে লাগল। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের আসন নড়ে উঠল। 'জগতের মঙ্গল হোক' বলে মহর্ষিরা জপ করতে লাগলেন। দেবতারা এই মহা আলোড়নের কারণ জানার জন্য ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা দেবতাদের বললেন, তিনিও এর কারণ বুঝতে পারছেন না। তখন সকলে মিলে বিষ্ণুর কাছে গেলেন এর কারণ জানতে।

এরপর নারদ, পুলস্ত্যর কাছে জানতে চাইলেন, মুরারি কে? তিনি দেব, যক্ষ, কিন্নর, দৈত্য, রাক্ষস কিংবা রাজা যেই হোন না কেন, তার কথা শুনতে চাই। পুলস্ত্য বললেন—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের আধার অথচ গুণবান হয়েও নির্গুণ, সর্বগামী, সর্বব্যাপী মধুসূদনই মুরারি। এবার নারদ জানতে চাইলেন মুর নামক দানব কার পুত্র ছিলেন এবং বিষ্ণু তাকে কিভাবে যুদ্ধে নিহত করেছিলেন? পুলস্ত্য তখন এই বিচিত্র পুণ্যপ্রদ ও পাপনাশক পুরাণকাহিনি বলতে শুরু করলেন।

একসময় নুর নামক দানব ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করতে কঠোর তপস্যায় রত হল। ব্রহ্ম তুষ্ট হয়ে তাকে বললেন,—বর চাইতে। তখন সেই দানব ব্রহ্মার কাছে এই বর চাইল যুদ্ধক্ষেত্রে যাকেই যে হাত দিয়ে স্পর্শ করব সে যেন অমর হলেও মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ব্রহ্মা তার প্রার্থনার সম্মত হলেন। এই বর পেয়ে মহাতেজস্বী মুর দেবলোকে এসে দেব, যক্ষ, কিন্নর সবাইকেই তার এই বরলাভের খবর জানিয়ে দিল।

ফলে কেউ তার সাথে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল না। মুর ইন্দ্র ভবনে গিয়ে বলল—আমার সাথে যুদ্ধ কর, নয়তো স্বর্গ ত্যাগ কর। ইন্দ্রও তখন স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করে ভূতলে চলে এলেন। ইন্দ্রের বজ্র ও ঐরাবত মুর-এর দখলে চলে গেল। ইন্দ্র কালিন্দী নদীর দক্ষিণ তীরে নগর প্রতিষ্ঠা করে পুত্র, স্ত্রী ও অন্য দেবতাদের সাথে সেখানে বাস করতে লাগলেন। ময় এবং অন্য প্রচণ্ডস্বভাব দানবেরা সে সময় মুর দৈত্যের শরণাপন্ন হয়ে স্বর্গবাসী হল এবং দেবতাদের মতো নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদে কাল কাটাতে লাগল।

মহাসুর পৃথিবীতে একাকী হাতির পিঠে চেপে সরযু নদীর তীরে সূর্যবংশীয় রঘুরাজাকে এক যজ্ঞের আয়োজন করতে দেখলেন। দৈত্যপতি সূর্যবংশীয় সেই রাজাকে তার সাথে যুদ্ধ করতে বললে, তিনি যুদ্ধ না করে যজ্ঞ করতে রত হলেন। মহামতি তপস্বী মিত্র বরুণ নন্দন বশিষ্ট তাই বললেন–মনুষ্য সমাজ তো তোমার কাছে পরাজিত হয়েই আছে। তাই তাদের জয় করবার প্রয়োজন নেই। যারা এখনও বশ্যতা স্বীকার করেনি তাদের জয় করো। একান্তই যুদ্ধ করতে চাইলে যমরাজাকে পরাজিত কর। তিনি বললেন–যম অতি বলবান। তিনি তোমার শাসন গ্রাহ্য করেন না। তাঁকে জয় করতে পারলে অন্য সবাই বশীভূত হবে।

বশিষ্ঠের কথা শুনে দৈত্যরাজ যমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করল। যম খবর পেয়ে মহিষের পিঠে চেপে কেশবের কাছে চলে গেলেন। তাকে অভিবাদন করে দৈত্যের কার্যকলাপ নিবেদন করলেন। কেশব ওই দৈত্যরাজকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে বললেন। যমরাজ বাসুদেবের কথা শুনে শীঘ্র চলে এলেন। যমরাজের নগরে মুর এসে হাজির হলেন। তাকে দেখে যম বললেন–তুমি আমার কাছে যা চাইবে তাই আমি দেব। মুর তখন যমকে প্রজাশাসন করা বন্ধ করতে বলল। তার আদেশ অমান্য করলে মস্তক ছেদন করে ভূতলে নিক্ষেপ করবেন।

যম তখন বললেন–মুর তুমি যদি প্রজা নিয়ন্ত্রণ ও তাদের রক্ষা করতে পারে তবে আমি আমার আদেশ পালন করবে। মুর তখন জানতে চাইল, তার চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে। যম বলল শঙ্খ-চক্র গদাধারী বিষ্ণু আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী। তিনিই প্রদানের নিয়ন্ত্রণ করেন। মুর তখন বিষ্ণুর অবস্থান জানতে চাইল।

যম তাকে ক্ষীরোদ সাগরে চলে যেতে বললেন। বিষ্ণু সেখানে আছেন বললেন। মুর বলল–যতদিন নত্রা আমি বিষ্ণুকে হত্যা করে প্রত্যাবর্তন করি, তত দিন যেন কেউ ধর্মনাদায়ন মানুষদের দমন না করে। একথা বলে ক্ষীরোদ সাগরের উদ্দেশ্যে মুর যাত্রা করল। নারদ এবার পুলস্ত্যর কাছে জানতে চাইল, বিষ্ণুকে চতুর্মূর্তি কেন বলা হয়।

পুলস্ত্য বললেন, বিষ্ণু সর্বত্রগামী, অব্যক্ত মূর্তি এক হলেও যে কারণে তাঁকে চতুর্মূর্তি বলা হয়। তাই বলছি শোনো, বাসুদেব-এর নাম পরমাগত, অব্যক্ত অতর্ক, আনন্দিত প্রভৃতি কিভাবে হয়েছে এবং বিষ্ণু সম্বন্ধীয় দ্বাদশ পত্রই বা কী? পুলস্ত্য বললেন, এ ব্যাপারে স্বয়ং ব্রহ্মর গূঢ় তত্ত্বকথা বর্ণনা করছি।

নারদ জানতে চাইলেন যে, এই সনকুমার কে? পুলস্ত্য তখন বললেন, অহিংসা ধর্মের পত্নীর নাম। অহিংসার চার পুত্র। তারা সকলে যোগাভ্যাস করতেন। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সনৎকুমার, দ্বিতীয় সনাতন, তৃতীয় সনক ও চতুর্থ সনন্দন।

যোগসাধনা ও তপস্যার আধার ছিলেন সাংখ্যবেত্তা কপিল। যোগসাধনায় পারদর্শিতা দেখে জ্যেষ্ঠ হয়েও কনিষ্ঠকে উচ্চাসন দান করেন। তিনি কপিলকে মৌন গুহ্য মহাযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। এক দিন সনকুমার ব্রহ্মার কাছে যোগজ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা তখন বললেন, তুমি সাংখ্যযোগসাধনা সম্বন্ধে ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করেও যদি আমার কাছে জ্ঞানতত্ত্ব শুনতে চাও, পুত্র রূপে তাহলে আমার কথা মতো কাজ করো। সনৎকুমার বললেন, –আমি তার পুত্রই, কারণ ব্রহ্মা আমার গুরু। গুরু ও শিষ্যের মধ্যেকার সম্পর্ক পিতা ও পুত্রের।

ব্রহ্মা বললেন–ধর্ম কর্মের আচরণ ভেদে শিষ্য ও পুত্রের মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে। পুন্নাম নরক থেকে ত্রাণ করে বলে তার নাম পুত্র আর শেষ অর্থাৎ পাপ হরণ করে বলে তার নাম শিষ্য। বেদে এইরূপই বলা আছে। সনকুমার ব্রহ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন-পুত্র যা থেকে পরিত্রাণ করে সেই পুন্নম নরক কী? যা হরণ করার জন্য শিষ্য নাম হয়েছে, সেই শেষ অর্থাৎ পাপ কাকে বলে? ব্রহ্মা তাকে সেই পরম পবিত্র পুরাতন কাহিনি বলতে বললেন। এই কাহিনি যোগাঙ্গ সম্পন্ন ও উৎকট ভয় বিনাশক এবং ভক্তিভরে তা শুনলে সমস্ত পাপ দূর হয়ে যায়।

৩৪

ব্রহ্মা বললেন–পরস্ত্রী গমন, পাপাত্মাদের সাথে সংসর্গ এবং সব প্রাণীর প্রতি কঠোর ব্যবহার প্রথম নরক। ফল অপহরণ, নিষ্ফল পর্যটন এবং বৃক্ষাদি ছেদন এগুলি দ্বিতীয় নরক। হেয় দ্রব্য গ্রহণ, অবধ্যের বন্ধন এবং বন্ধুবান্ধবের সাথে বিবাদ–এই সমস্ত তৃতীয় নরক নামে অভিহিত। অন্যের মনে অকারণ ভয় ঢুকিয়ে তার সংসার নষ্ট করা এবং স্বধর্ম ত্যাগ করা হল চতুর্থ নরক। হিংসা, বন্ধুদের মিথ্যা বলা হল পঞ্চম নরক। ফল জাতীয় জিনিস চুরি করা, ব্রাহ্মণদের নিন্দা করা ও লোকের ওপর অকারণ অত্যাচার করা, যোগসাধনে বাধা সৃষ্টি করা ষষ্ঠ নরক। মোহ বশে রাজভোগ হরণ, রাজপত্নীর গমন এবং রাজার ক্ষতি সাধন সপ্তম নরক। লোভ, লোলুপতা ও লব্ধ ধর্মার্থের নাশ অষ্টম নরক। ব্রাহ্মণদের ধনসম্পত্তি চুরি, ব্রাহ্মণদের নিন্দা এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সাথে ঝগড়া করা নবম নরক। শিষ্টাচার মেনে না চলা, শিষ্ট

লোকদের প্রতি হিংসা করা, শিশুকে শাস্ত্রচৌর্য ও ধর্মচৌর্য শিক্ষা এই সকল দশম নরক বলে প্রসিদ্ধ।

ষড়াঙ্গ সংহার ও ষাড়গুণ্য প্রতিষেধ–এই দুটি একাদশ নরক, সাধুজনের নিন্দা, সর্বদা চুরি প্রভৃতি অসৎ কাজ করা এবং সংস্কার মেনে না চলা দ্বাদশ নরক নামে অভিহিত। ধর্ম ও কর্মের অপচয় অপবর্গে অপক্ষয় ও সম্বিৎ সম্বোধন ত্রয়োদেশ নরক। ধর্মবর্জিত দান ও অগ্নি প্রদান চতুর্দশ নরক। এই নরক অত্যন্ত গর্হিত। অজ্ঞান, অসূয়া, অশৌচ এবং অসত্য বাক্য এগুলি পঞ্চদশ নরক। আলস্য, ক্রোধ, পরগৃহে অগ্নিদান, পরস্ত্রী বাসনা, শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা, অপরের প্রাণ নাশের চেষ্টা ও ঔদ্ধত্য এগুলি ষোড়শ নরক। এটি খুবই নিন্দিত নরক।

পুরুষ যদি উল্লিখিত পুন্নাম নরকে লিপ্ত হয়ে পুত্রের জন্মদান করেন এবং পরবর্তীকালে জগৎপতি জনার্দনকে সন্তুষ্ট করতে পারেন, তাহলে তিনি এই ঘোরতর পুন্নাম নরক বিনাশ করে থাকেন। এজন্যেই পুত্র এই নাম হয়েছে। এখন শেষ পাপের লক্ষণ বলছি। দেব, ঋষি, ভূত, নর ও পিতৃ পুরুষের উদ্দেশে যে দ্রব্য দান করা হয়েছে তার প্রতি লোভ, পরধনে লোভ, সর্ব বর্ণে একতা, ওঁকার থেকে নিবৃত্তি, পাপীদের সাথে সংসর্গ, এমন কি তাদের কথা মনে মনে চিন্তা করা, গুরুজনদের নিন্দা, গুরু পত্নীর প্রতি লোভ, ঘি-জাতীয় জিনিস বিক্রি, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্ন বর্ণের সাথে সংসর্গ, নিজের দোষ গোপন রেখে পরের দোষ প্রকাশ করা, নিষ্ঠুরতা, কুকথা, অধর্মবাহ নাম গ্রহণ, অধর্ম সেবা এই সকল । পাপ মানুষকে নরকের পথে নিয়ে যায়।

এই পাপ পরম্পরায় লিপ্ত হয়েও যদি জ্ঞানগুরু শঙ্করকে সন্তুষ্ট করা যায়, তবে শেষ পাপ সমূলে বিনষ্ট হয়ে থাকে। তাছাড়াও কায়িক, বাঁচিক ও মানসিক পাপ এবং পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু ও আশ্রিতজনের যাবতীয় ইহলোকের পাপ বিনষ্ট হয়। পুত্র ও শিষ্যের এই ধর্ম। সুতরাং শিষ্য লাভের জন্য সচেষ্ট হবেন গুরু যদিও শিষ্যও শেষ বা পাপ থেকে উদ্ধার করে, কিন্তু পুত্র সমস্ত পাপেরই পরিত্রাতা। পুত্র ও শিষ্যের এই অর্থ স্বীকার করলে শিষ্যের থেকেও পুত্রের স্থান অনেক ওপরে।

পুলস্ত্য বললেন, সনৎ কুমার ব্রহ্মার মুখে একথা শুনে বললেন–আমি তিন সত্য করে বলছি, আমি ব্রহ্মার পুত্র, সুতরাং যোগসাধনা সম্বন্ধে আপনি আমাকে উপদেশ দিন। ব্রহ্মা বললেন– আমি সনকুমারকে তবেই যোগ বিষয়ে উপদেশ দেব, যদি তোমার পিতা মাতা তোমাকে আমার হাতে দান করেন। কারণ তখনই তিনি ব্রহ্মার প্রকৃত পুত্র হবেন। সনৎকুমার তখন ব্রহ্মাকে পরিষ্কার অর্থবহ করে কথা বলতে বললেন। ব্রহ্মা তখন সহাস্য বদনে বললেন–এই

প্রকার পুত্রের কথা বলা হয়ে থাকে। যথা–ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গুড়োৎপন্ন, অপাপবিদ্ধ ঋণ, পিণ্ড, ধন, ক্রিয়া, গোত্রসাম্য, কোকিলবৃত্তি ও শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা–সমস্ত উক্ত প্রকার পুত্রের ওপরেই নির্দিষ্ট হয়েছে।

এছাড়া আরো পাঁচ-প্রকার পুত্র হল–কানীন সহায়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত ও পারশব। এই শেষোক্ত পুত্রদের সম্বন্ধে ঋণ, পিণ্ড প্রভৃতি কোনো কথারই উল্লেখ নেই। এরা কেবল গোত্র নাম ধারী ও কুলসম্মত। সনৎকুমার এই সকল পুত্রের কথা ব্রহ্মাকে সবিস্তারে বলতে বললেন। ব্রহ্মা বলতে

ক্লীব, উন্মত্ত কিংবা বাসনাসক্ত হয়, তাহলে তার অনুমতি নিয়ে পত্নী যদি অন্য কারো দ্বারা পুত্র উৎপাদন। করে তবে তার নাম ক্ষেত্রজ পুত্র হবে। পিতা-মাতা যদি অন্য কাউকে পুত্র দান করে তাহলে সেই পুত্র দত্তক নামে অভিহিত হয়। মিত্র দত্ত, মিত্র পুত্র কৃত্রিম পুত্র বলে অভিহিত হয়ে থাকে। যে গৃহজাত পুত্রের জন্ম দাতা অপরিজ্ঞাত, তার নাম গুড়োৎপন্ন।

আর বাইরে থেকে স্বয়ং আনীত পুত্রের নাম অপবিদ্ধ, কন্যা থাকাকালীন পুত্রের জন্ম হলে তার নাম কানীন। বিবাহিত স্বগর্ভা স্ত্রী গর্ভজাত পুত্র সহায়। এবং মূল্যদানে গৃহীত পুত্রের নাম ক্রীত। যে কন্যাকে একজনের সাথে বিবাহ দিয়ে আবার অন্য কারুর হাতে সম্প্রদান করা হয়, তার গর্ভজাত সন্তানের নাম পৌনর্ভব। দুর্ভিক্ষে, বাসনাকালে কিংবা অন্য কোনো কারণে যে ব্যক্তি আত্ম সমর্পণ করে তাকে স্বয়ং দত্ত পুত্র নামে অভিহিত করা হয়। বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত শূদ্রাণীর গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্তৃক যে পুত্র উৎপাদিত হয় তার নাম পারশব, এ কারণে তুমি নিজে নিজেকে দান করতে পারো না। অতএব তোমার পিতা মাতাকে ডেকে নিয়ে এসো।

ব্রহ্মার কথায় সনকুমার পিতা-মাতাকে স্মরণ করলেন। স্মরণ করা মাত্রই তারা পিতামহের দর্শন লাভ করার জন্যে সে স্থানে এসে হাজির হলেন। তারা পিতামহ ব্রহ্মাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে বললেন–আমাদের কী করতে হবে, বলুন। তখন সনৎ কুমার বাবা-মাকে বললেন–আমি যোগ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে ভগবান ব্রহ্মাকে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তিনি এজন্যে আমাকে তাঁর পুত্র হতে বলেন। অতএব পুত্ররূপে আপনারা আমাকে তার হাতে দান করুন। পুত্রের অনুরোধ অনুসারে তারা যোগ গুরু পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন–এই সনৎকুমার এতদিন পর্যন্ত আমাদের সন্তান ছিলেন, কিন্তু এখন আপনারই পুত্র হলেন। একথা বলেই তারা স্বর্গলোকে চলে গেলেন।

সনৎকুমারকে ব্রহ্মা দ্বাদশপত্রক যোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে বললেন–ওঁকার-এর শিক্ষা স্থিত, শেষ শিরোদেশে বিরাজিত। বৈশাখ মাস প্রথম পত্র, ন-কার সুখস্থিত, বৃষ এখানে বিরাজিত এবং জ্যৈষ্ঠ মাস তার দ্বিতীয় পত্র, ম-কার বহু যুগান, কর্কট তাতে অবস্থিত এবং শ্রাবণ মাস তার চতুর্থ পত্র নামে অভিহিত। গ-কার হৃদয়, সিংহ সেখানে অধিষ্ঠিত এবং আশ্বিন মাস তার ষষ্ঠ পত্র, ত-কার মন নামে খ্যাত, তুলা সেখানে বিরাজমান ও কার্তিক মাস তার সপ্তম পত্র নামে পরিচিত। ব-কার নাভিদেশ, বৃশ্চিক সেখানে অধিষ্ঠিত এবং অগ্রহায়ণ মাস অষ্টম পত্র নামে পরিচিত। সু-কার জখম স্থল, ধনুর সেখানে বিরাজিত এবং পৌষ মাস তার নবম পত্র। দ-কার পদযুগল, তিমির সেখানে অবস্থিত এবং বিখ্যাত মাঘ মাস তার দশম পত্র নামে পরিচিত।

ব-কার জানুযুগল, কুম্ভের তাতে অধিষ্ঠান এবং ফাল্গুন মাস একাদশ পত্র। য-কার পাদযুগল মীন। সেখানে অধিষ্ঠিত এবং চৈত্রমাস তার দ্বাদশ পত্র। কেশবের চক্র দ্বাদশ নেমি ও দ্বাদশ নাভিযুক্ত, পরমেশ্বর স্বয়ং ত্রিবাহু ও এক মূর্তি। উক্ত এই দ্বাদশ পত্র ভগবানের রূপ। এই রূপ পরিজ্ঞাত হলে পুনরায় আর মরণ হয় না। ভগবানের দ্বিতীয় মূর্তি সত্ত্বগুণময় চতুর্বর্ণ, চতুর্মুখ ও চতুবাহুযুক্ত এবং শ্রীবৎস চিহ্নে অঙ্কিত। এর অঙ্গ সমূহ উদার এবং কোনো সময়েই বিনষ্ট হয় না। তৃতীয় শেষমূর্তি তামস, এই মূর্তি সহস্র রূপে বিরাজিত ও সহস্রবদনে শোভিত। তাঁর শ্রীসম্মত অপূর্ব এবং সেটি প্রজাবর্গের ধ্বংসকারী।

চতুর্থ মূর্তি রজোগুণময়। তা রক্তবর্ণ, চতুর্মুখ, দ্বিভূজশালী ও বনমালায় বিভূষিত। এই মূর্তিই সৃষ্টিকর্তা আদি পুরুষ। এই ব্যক্ত তিন মূর্তিই অব্যক্ত থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। বিষ্ণুর এই অতি প্রাচীন চতুর্ভূজ রূপের বর্ণনা তোমাকে দিলাম। দুবৃত্ত মুর যমরাজের কথামতো বিষ্ণুর কাছে এল। মধুসূদন তাকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন–তুমি কেন আমার কাছে এসেছ?

মুর বলল–আমি তোমার সাথে আজ যুদ্ধ করব বলে এখানে এসেছি। বিষ্ণু বললেন–যদি তুমি আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্যেই এসে থাক, তবে তোমার বুক কাঁপছে কেন? জরাতুর ব্যক্তি যেমন বারবার কেঁপে কেঁপে ওঠে, তোমারও দেখছি সেই অবস্থাই হচ্ছে।

তোমার মতো ভয়ার্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুতরাং আমি যুদ্ধ করব না। এই শুনে মুর তৎক্ষণাৎ নিজের বুকে হাত রাখল এবং কে কোথায় কিভাবে ইত্যাদি বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হরি তখন চক্র নিক্ষেপ করে তার দেহ ছিন্ন করে দিলেন। মুর নিহত হলে দেবতারা দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুর চরণবন্দনা করতে লাগলেন। পুলস্ত্য নারদকে

বললেন, ভগবান শ্রীহরি কি করে মুরকে। বধ করেছিলেন তা শোনালাম। মুর বধের পর থেকেই বিষ্ণু নরসিংহ মুরারি নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন।

৩৫

পুলস্ত্য বললেন–তারপর দেবগণ বিষ্ণু মুরারি সদনে গিয়ে তার পাদবন্দনা করে জগৎ সংক্ষু হয়ে ওঠার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর তারা সকলে মিলে শিবের ভবনে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ শিবের পক্ষেই সবটা জানা সম্ভব। সকলে বাসুদেবের সাথে মন্দার পর্বতে হাজির হলেন। কিন্তু তারা সেখানে হর, পার্বতী, কার্তিকেয় দেখতে পেলেন না। তারা গিয়ে দেখলেন সেই পর্বত শূন্য। দেবতাদের বিমূঢ় অবস্থা দেখে ভগবান বিষ্ণু বললেন–তোমাদের সামনে দণ্ডায়মান মহেশ্বরকে তোমরা কি দেখতে পারছো না?

দেবতারা বললেন–আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত হচ্ছে কেন? আমরা সত্যই দেবকে দেখতে পারছি না। বিষ্ণু বললেন–তোমরা স্বার্থের জন্যে দেবীর গর্ভ নষ্ট করে মহা পাপ করেছে। তাই ভগবান শূলপানি তোমাদের বিবেক লুপ্ত করেছেন। অতএব, ভগবানের দর্শন পেতে হলে তপ্তকৃচ্ছ দ্বারা কায়াশোধন করে শুদ্ধি লাভ করতে হবে। প্রথমে একশো কলস ক্ষীর দিয়ে স্নান, পরে চৌষট্টি কলস দধি দিয়ে স্নান, বত্রিশ কলস হরি দিয়ে স্নান ও পঞ্চগব্যের জন্য ষোলটি কলস বিহিত হয়েছে।

আটটি মধুপূর্ণ কলস-এর দ্বিগুণ জল, কলস স্নানের জন্য উপকল্পিত করবে। পরে একশো আটটি কলস, রোচনা, কুঙ্কুম, চন্দন প্রভৃতি দিয়ে দেবকে ভক্তি ভরে অনুলিপ্ত করার পর বেলপাতা, পদ্ম, চন্দন, অগরু, কর্পূর, মন্দার, পারিজাত প্রভৃতি দিয়ে মহাদেবের অর্চনা করবে এবং রুদ্রের ঋকবেদীয় শতনাম জপ করবে। এসব অনুষ্ঠান যথাবিধি করলে দেবদেবের দর্শন লাভ করতে পারবে, নতুবা দর্শন লাভ অসম্ভব।

বাসুদেব একথা বলার পর দেবতারা তার কাছে জানতে চাইলেন–ভগবান, যে তপ্তকৃচ্ছ ব্রত পালন করলে সর্বকালীন দেহশুদ্ধি হয়ে থাকে, সেই তপ্তকৃচ্ছের বিধি নিয়ম কী? বাসুদেব বললেন–তিন দিন গরম জল, তিন দিন শুধু মাত্র গরম দুধ ও তিন দিন শুধুমাত্র গরম ঘি পান করতে হয় এবং পরবর্তী তিনদিন শুধুমাত্র বায়ু ভোজন করতে হবে। তাছাড়া এরপর প্রতিদিন চারপল জল, আট পল দুধ ও দুপল ঘি পান করা কর্তব্য। বাসুদেবের কাছে বিধি নিয়ম জেনে নিয়ে দেবতারা দেহশোধনের জন্য তপ্তকৃচ্ছ ব্রত আচরণ করলেন। এবং তারা পাপ মুক্ত হলেন।

ব্রত শেষ হবার পর দেবগণ নিষ্পাপ হয়ে বাসুদেবকে বললেন–ভগবান, মহাদেব কোথায় অবস্থান করছেন? আমরা তার অভিষেক ক্রিয়া সাধন করতে চাই দুধ প্রভৃতি, উপকরণ দিয়ে। বিষ্ণু জানালেন–মহাদেব আমার দেহে বিরাজমান, তিনি যোগবলে আমার দেহে প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেবতারা বললেন–আমরা, মহাদেবকে এখনও দেখতে পাচ্ছি না। তারা মহেশ্বর কোথায় আছে জানতে চাইলে, হরি তখন তাদের অন্তরঙ্গ শিবলিঙ্গ দেখালেন। দেবতারা তখন ঐ অবিচল অব্যয় শিবলিঙ্গ স্নান করাতে আরম্ভ করলেন দুধ দিয়ে। তারা লিঙ্গরূপী শিবের পূজা করলেন সুরভি চন্দনে লিপ্ত করে। পরে বেলপাতা ও পদ্ম দিয়ে। তারপর ভক্তি ভরে ধূপ, জলে শিবের অষ্টোত্তর শতনাম জপ করলেন।

নারদ পুনরায় জানতে চাইলেন–হরি ও শঙ্কর একদেহে কি করে বিরাজ করছিলেন? পুলস্ত্য বললেন, ভগবান তখন বিশ্বমূর্তি ধারণ করেছিলেন। তাঁর, তিন নয়ন, স্বর্ণ ও অহিকুণ্ডল জটা, গরুড়, বৃষভ, এবং হার ও ভূজঙ্গ দ্বারা ভূষিত, কটিদেশ পীত বসন ও আজিনে আচ্ছাদিত, তার হাতে চক্র, অসি, হল, শাঙ্গ, পিণাক, শূল, অজগরধনু, কর্পদ, ঘট, কপাল, ঘন্টা ও শঙ্খ বিরাজমান। দেবগণ সেই হরিহর মূর্তিকে ভক্তি ভরে প্রণাম করলেন। তাদের চিত্ত তখন হরির প্রতি একনিষ্ঠ হল। দেবতাদের চিত্তের একাগ্রতা লক্ষ করে তাদের নিয়ে নিজ আশ্রম কুরুক্ষেত্রে চলে গেলেন হরি। সেখানে তারা জলমধ্যে মহেশ্বরের স্থানুমূর্তি দর্শন করলেন। এবং স্থানুকে আমরা নমস্কার করি' বলে সেখানে বসে পড়লেন।

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন–হে জগন্নাথ, আপনি এসে আমাদের বর দান করুন। আপনি জলের ভেতর থেকে উঠে আসুন। কারণ সমস্ত জগৎ শুদ্ধ হয়েছে। দেবতাদের মধুর বাক্য শুনে তিনি জলের ভিতর থেকে উঠে এলেন। জগন্নাথও সকলকে প্রণাম করলেন। দেবতারাও তাকে প্রণাম করে বললেন– আপনি শীঘ্র আপনার মহাব্রত ত্যাগ করুন। কারণ ত্রিভুবন আপনার তেজে বিচলিত হয়ে উঠেছে। তখন তিনি সেই মহাব্রত ত্যাগ করলেন। দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে স্বর্গধামে গমন করলে রুদ্র ভাবলেন, ধরণী কেন কেঁপে উঠল?

মহাদেব মহর্ষি উশনাকে যবতী নদী তীরে তপস্যারত দেখতে পেলেন। তাঁকে তপস্যার কারণ জিজ্ঞেস করলেন এবং তাকে দ্রুত উত্তর দিতে বললেন। কারণ তার তপস্যার জগৎ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। উশনা বললেন–রুদ্রকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আমি তপস্যা করছি। আমি সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করতে চাই। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে যথাযথ সঞ্জীবনী বিদ্যা দান করলেন। উশনা বর পেয়ে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হলেন। কিন্তু তবুও সাগর, পর্বত, বৃক্ষরাজিসমূহ সমগ্র ধরিত্রী

বিচলিত হল। এবার মহাদেব সপ্ত সারস্বত তীর্থে গেলেন। দেখলেন মঙ্কনক নামক মহর্ষি বালকের মতো ভাবাবেগে পা ছুঁড়ে সবেগে নাচছেন। এতেই পৃথিবী কেঁপে উঠেছে।

মহাদেব তখন তাঁর দুই হাত ধরে সহাস্যবদনে বললেন–কেন তুমি এভাবে নৃত্য করছ? তার মনের আনন্দের কারণও জানতে চাইলেন। মহর্ষি মঙ্কনক তখন বললেন–আমি দেহশোধনের জন্য বহু বছর ধরে তপস্যা করছি। শম্ভু তখন সেই মহর্ষিকে দেখালেন আঘাতে তার ক্ষতস্থান থেকে সাদা ছাই বেরিয়ে আসছে। কিন্তু তথাপি তার কোনো আনন্দ হচ্ছে না। মহেশ্বর উচ্চারণ করলেনআপনি পাগলে পরিণত হয়েছেন। মঙ্কনক এবার সম্বিত ফিরে পেলেন। মহেশকে প্রণাম করে নাচা বন্ধ করে সবিনয়ে তার চরণ যুগল বন্দনা করলেন। মহেশ্বর তাকে দুর্লভ ব্রহ্মলোকে চলে যেতে বললেন–ব্রহ্মার সাথে, এই পৃথুদক তীর্থে।

মহেশ্বর বললেন–পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ও সুমহান ফলপ্রদ হবে এই পৃথুদক তীর্থ। এখানে সুর, অসুর, গন্ধর্বে, বিদ্যাধর ও কিন্নরদের সমাবেশ ঘটবে। যাবতীয় পাপ বিদূরিত হবে এই তীর্থ দর্শনে এবং এটি ধর্মের প্রধান আধার রূপে পরিণত হবে। সুপ্রভা, লক্ষ্মী, সুবেণী বিমলোদকা মহোদরা, ওখবতী, বিশাখা, সরস্বতী এই সপ্ত সরস্বতী এখানে নিত্য বিরাজ করবেন।

সকলকে সোমপানের ফল ও পরম পুণ্য দান করবে এই তীর্থ। আর আপনিও কুরুক্ষেত্রে গরীয়সী মূর্তি স্থাপন করে পরম পবিত্র আনন্দ ও দুর্লভ ব্রহ্মলো‌েকে উপনীত হবেন। মহেশ্বরের কথা শুনে মঙ্কনক কুরুক্ষেত্রে মহেশের লিঙ্গ মূর্তি স্থান করে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। তখন আবার পৃথিবী স্থির ও শান্ত হল। পবিত্র মন্দারচলে নিজ বাসভূমিতে এসে মহেশ উপনীত হলেন। এরপর পুলস্ত্য নারদকে বললেন, মহাদেব কেন তপস্যা করার জন্য নিজ বাসভূমি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং দেবীকে দেখার জন্য অন্ধকাসুর কেন শূন্য পর্বত ভূমিতে গিয়েছিল?

৩৬

নারদ এবার পুলস্ত্যর কাছে জানতে চাইলেন, অন্ধকাসুর পাতালে চলে গিয়ে কী করেছিল? অন্ধকাসুর কামানলে দগ্ধ হতে লাগল পাতালে গিয়েও। সন্তপ্ত হয়ে উঠল তার সর্বাঙ্গ। আমার, সকল দানবদের ডেকে বলল-যে ব্যক্তি সেই গিরিবালাকে নিয়ে এসে আমার হাতে তুলে দিতে পারবে, সেই আমার সুহৃৎ, বন্ধু ও মাতা-পিতা। দৈত্যরাজের কথা শুনে প্রহ্লাদ মেঘ গম্ভীর স্বরে বললেন–যে গিরিনন্দিনীর প্রতি তুমি কামাতুরা হয়েছ তিনি ধর্মত তোমার মাতা। এবং তার স্বামী তোমার পিতা। পুরাকালে তোমার ধর্মনিষ্ঠ পিতা হিরণ্যাক্ষ অপুত্রক অবস্থায় পুত্রলাভের

জন্য মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব তাকে বর দিয়ে বললেন–আমি যোগমগ্ন হলে আমার কন্যা কৌতূহল বশে আমার চোখ ঢেকে দেয়, তখন জগৎ সংসার সব অন্ধকার হয়ে যায়। সেই অন্ধকার থেকে যে বর্ষাকালীন মেঘের মতো গর্জনকারী ভয়ংকর জীবের আবির্ভাব হয়, সে তোমারই যোগ্য পুত্র। মহেশ তাকেই গ্রহণ করতে বলেন।

কিন্তু এই পুত্র যখন দেবতাদের সাথে শত্রুতা করবে বা ত্রিলোকজননীর প্রতি অভিলাষী হবে, অথবা কোনো ব্রাহ্মণকে অপমান করে বধ করবে তখন তিনি নিজে তার প্রাণ নাশ করবেন। একথা বলে শম্ভু মন্দার পর্বতে চলে গেলেন। তখন হিরণক্ষ্যও অন্ধককে নিয়ে পাতালে প্রবেশ করলেন। এ কারণেই উমা অন্ধকের জননী, তাছাড়া তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, অশেষ গুণবান এবং সকল যুক্তিজ্ঞানের আধার। সুতরাং তোমার মনে এরূপ পাপ সংকল্প পোেষণ করা উচিত নয়, গিরিনন্দিনী সর্ব লোকের প্রভুর সহধর্মিনী, সুতরাং তাকে কামনা করা বৃথা। তাকে পাওয়া অসম্ভব। প্রমথগণসহ মহাদেবকে পুরোপুরি পরাজিত না করতে পারলে এই বাসনা কখনই পূর্ণ হবে না।

যে শুধু হাতে সাগর অতিক্রম করতে পারবে, সূর্যকে আকাশ থেকে নামিয়ে আনতে পারবে, সেই ব্যক্তিই মহাদেবকে হারাতে পারবে। সুমেরু পর্বতকে উৎপাটিত করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারবে। তুমি কি এই অসম্ভব সাধন করতে পারবে? প্রহ্লাদ আরো জানালেন, যে রাজা দনবাও পরস্ত্রী বাসনায় মুগ্ধ হয়ে রাজ্য সহ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন দনুজ। দণ্ড নামে পূর্বে এক রাজা ছিলেন। তার প্রচুর বলবাহন ছিল। এই রাজা ভার্গব শুক্রকে পুরোহিত রূপে বরণ করেন ও বিবিধ যাগযজ্ঞ করেন। ভার্গব শুক্রের সরজা নামে এক কন্যা ছিল। অসুররাজ বৃস্পর্বা তার ভবনে কোনো এক সময় তাকে সাদরে আপ্যায়ন করেন। তিনি বহুদিন রাজগৃহে বাস করতে থাকেন।

সর্বাঙ্গ সুন্দরী শুক্রকন্যা সরজা নিজ গৃহে অগ্নির চর্চায় কালাতিপাত করেন। রাজা দণ্ড একদিন শুক্রের আশ্রমে এসে জানতে চাইলেন, শুক্রাচার্য কোথায় আছেন? আশ্রমের পারিচারিকাগণ বলল, ভগবান ভার্গব যাজন কার্যের জন্য বৃষপর্কর বাড়িতে গেছেন। রাজা জানতে চাইলেন, আশ্রমে কি কোনো রমণী আছে? তারা বলল–শুক্র নন্দিনী সরজা এখন আশ্রমে আছেন। দণ্ড শুক্র কন্যাকে দেখার জন্য আশ্রমে প্রবেশ করলেন এবং তাকে দেখা মাত্রই দণ্ড কামবাণে জর্জরিত হলেন। দণ্ড তখন নিজ অনুচর ও শুক্রের শিষ্য মণ্ডলীকেও বিদায় দিয়ে একাকী সরজার কাছে গেলেন।

ভ্রাতৃজ্ঞানে তার আদর আপ্যায়ন করলেন সরজা। তখন রাজা বললেন, তিনি কামানলে দগ্ধ হচ্ছেন এবং আলিঙ্গন রূপ জল সিঞ্চনে তার দেহের তাপ প্রকাশিত করতে বললেন। সরজা সবিনয়ে বললেন–যে আপনি তো জানেন যে আমার পিতা রাগী, তার অভিশাপে দেবতারাও দগ্ধ হয়। তাছাড়া ধর্মত আপনি আমার ভাই, আমি আপনার বোন। কারণ আপনি আমার পিতার শিষ্য। তখন দণ্ড বললেন–তোমার পিতার ক্রোধ অনলে হয়ত আমি ভবিষ্যতে দ্বগ্ধ হবো কিন্তু তোমার প্রতি কামানলে আমি এখনই দ্বগ্ধ হচ্ছি। তখন সরজা তাকে বলল–আপনি পিতাকে এ সম্বন্ধে বলুন, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে আপনার হাতে দান করবেন।

সরজার কথা শুনে দণ্ড বললেন–অপেক্ষার মতো অবস্থা তার নেই। কারণ এর পরেই হোমের সময় হবে। শুনে সরজা বলল, নারীরা কখনই স্বাধীন নয়। তাই তার একান্ত অনুরোধ যে আপনি আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সহ পিতার অভিশাপে নিজেকে বিপন্ন করে তুলবেন না। তখন দেবযুগে চিত্রাঙ্গদা কিরূপ আচরণ করেছিল তা শোনাতে লাগলেন দণ্ড! দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার চিত্রাঙ্গদা নামে এক সর্বাঙ্গ সুন্দরী যৌবনবতী কন্যা ছিলেন। একদিন নৈমিষারণ্যে স্নান করতে গেলেন সেই কমলা লোচনা তাঁর সখীদের নিয়ে। তিনি জলে নামার সাথে সাথেই সুদেব রাজার পুত্র সুরথ সেখানে এসে হাজির হলেন।

রাজকুমার যে মদনবাণে জর্জরিত হয়ে সেখানে গেছে চিত্রাঙ্গদা তা অনুমান করলেন। তাই তিনি কুমারকে আত্মদান করলেন। সখীগণ বললেন–তুমি বালিকা। তোমার পিতা ধর্মনিষ্ঠ ও সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী। সুতরাং স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে এই রাজনন্দনকে আত্মদান করা তোমার অনুচিত। রাজকুমার সুরথ মদনবাণে অভিভূত হয়ে চিত্রাঙ্গদার কাছে এসে তাকে বললেন–তোমাকে দেখেই আমি রূপে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। মদন তোমার দৃষ্টি বাণে আমায় দারুণভাবে আহত করেছে। আমি কামানলে ভস্মীভূত হয়ে যা, তোমার স্তন শয্যায় আমাকে স্থান না দিলে।

তখন সখীদের বারণ সত্ত্বেও চিত্রাঙ্গদা তাঁকে আত্মদান করলেন। পূর্বে এভাবেই এক নারী রাজকুমারকে রক্ষা করেছিলেন। শুক্রকন্যা সরজা তখন বললেন–এর পরিণামে চিত্রাঙ্গদার কি দশা ঘটেছিল আপনি তা জানেন না? আমি তা বলছি শুনুন। তাকে তার পিতা অশুচি কাজের জন্য অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন–তুমি স্ত্রী স্বভাব হেতু ধর্ম পরিত্যাগ করে আত্মদান করেছ, এর ফলে তোমার আর বিয়ে হবে না। তুমি স্বামী সুখ পাবে না। তোমার পুত্র লাভ ঘটবে না এবং তোমার স্বামীর বিপদে ঘটবে। এই অভিশাপ উচ্চারণের সাথে সাথে রাজনন্দনকে সরস্বতী তেরো যোজন দূরে নিয়ে গেলেন। চিত্রাঙ্গদা মোহে বশীভূত হয়ে পড়ল, রাজা সুরয দূরে চলে যাবার পর।

তখন সখীরা তাকে সরস্বতীর জলে স্নান করাল। নদীর শীতল জলে স্নান করে চিত্রাঙ্গদা মৃতপ্রায় হয়ে পড়ল। সখীরা ভাবল চিত্রাঙ্গদা মরে গেছে। কেউ কেউ বা আগুন জোগাড় করার জন্য ব্যস্ত হয়ে বনের অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করল। চিত্রাঙ্গদা এর মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করে চারিদিক দেখলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি সরস্বতীর জলে ঝাঁপ দিলেন। কাঞ্চনাক্ষী সরস্বতী তাকে বহন করে নিয়ে মহানদী গোমতীর তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ জলমধ্যে নিক্ষেপ করল। তারপর গোমতী তাকে বাঘ সিংহে ভরা এক মহারণ্যে নিক্ষেপ করল। চিত্রাঙ্গদার সেখানে কী হয়েছিল তাও আমি শুনেছি। সুতরাং আমি আত্মদানে বাধ্য নই। আমি সর্বতোভাবে রক্ষা করব নিজের চরিত্রের পবিত্রতা।

ইন্দ্রের সম পরাক্রমশালী দণ্ড এসব শুনে সহাস্য বদনে বললেন– অতঃপর চিত্রাঙ্গদার, তার পিতার ও রাজা সুরথের কি অবস্থা হয়েছিল, তা শোনেনা। সেই মহা অরণ্যে দিকভ্রান্ত চিত্রাঙ্গদাকে জনৈক গগনচারী গুহ্যক দেখতে পেলেন, তখন গুহ্যক তাকে বললেন–এসো, সুরথরাজার কাছে তোমায় নিয়ে যাই। তার সাথে তোমার নিশ্চয়ই মিলন হবে। গুহ্যকের কথা শুনে চিত্রাঙ্গদা সত্ত্বর কালিন্দী নদীর দক্ষিণ-উত্তর তীরে মহাদেবের মন্দিরে শঙ্করকে দর্শন ও কালিনদীর জলে তার অভিষেক করে নত মস্তকে দুপুর অবধি দাঁড়িয়ে থাকলেন। এই সময় মহর্ষি সামবেদ ঋতধ্বজ শিব লিঙ্গকে স্নান করানোর জন্য সেই মন্দিরে এলেন।

ঋতধ্বজ গভীর অরণ্য অবস্থিত ওই মন্দিরে চিত্রাঙ্গদা দেখে ভাবলেন, এই রমণী কে? চিত্রাঙ্গদা তার চরণ বন্দনা করল। তখন ঋতধ্বজ বললেন–তোমাকে দেখে দেবকন্যা বলে মনে হচ্ছে। তুমি কার কন্যা? কেন এই জনমানবহীন বনে এসেছ? চিত্রাঙ্গদা তখন সকল ঘটনা খুলে বলল। সব ঘটনা শুনে ঋষি ঋতধ্বজ ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বকর্মাকে বানর হয়ে জন্মাবার অভিশাপ দিলেন। এরূপ অভিশাপ দিয়ে মহাত্মা ঋতধ্বজ যথাবিধি পুনরায় স্নান ও সন্ধ্যাকালীন উপাসনা শেষ করে মহাদেবের অর্চনা করলেন। তারপর তিনি পতি মিলনে উৎসুক ক্রন্দনরতা সুন্দরী চিত্রাঙ্গদাকে বললেন–তুমি সপ্তগগাদাবরী তীর্থে গিয়ে হটকেশ্বর মহাদেবের উপাসনা করো।

এরপর দৈত্যরাজ কন্দর মালীর বেদবতী নামে কন্যা সে স্থানে আসবে। তাছাড়া অজ্জন নামে গুহ্যকের দময়ন্তী নামে এক সে কন্যাও সেখানে আসবে। এই তিন কন্যা সপ্তগোদাবরী তীর্থে মিলিত হলে তুমিও হটকেশ্বর মহাদেবের সাথে সম্মিলিত হতে পারবে। সেই মুনিবরের কথা মতো চিত্রাঙ্গদা অতি শীঘ্র সপ্তগোদাবরী তীর্থে গেলেন। সেই জ্ঞান প্রবীণ ঋষি মহাত্মা মহাদেবের কাছে এই মর্মে একটি শ্লোক লিখে পাঠালেন যে, দেবতা, অসুর, যক্ষ, মানুষ কিংবা

রাক্ষস এদের মধ্যে এমন কেউ কি নেই। যে নিজ পরাক্রমে এই মৃগ নয়না চিত্রাঙ্গদার দুঃখ দূর করতে পারেন? তারপর তিনি সর্ব ব্যাপী সর্ব পূজণীয় পুষ্করনাথের দর্শন লালসায় পাহোষ্ণী নদীতে গেলেন। যাবার সময় তিনি মনে মনে দুখিনী চিত্রাঙ্গদার কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

এই কাহিনী বিবৃত করে দণ্ড তখন শুক্রের কন্যা সরজাকে বললেন–চিত্রাঙ্গদা বীর সুরথের কথা চিন্তা করতে করতে সেই সপ্তগোদাবরী তীর্থে পরম সুখে অনেকদিন কাটিয়ে ছিলেন। বানর জন্ম লাভ করে বিশ্বকর্মা মেরুপর্বত থেকে ভূতলে নেমে এলেন। তারপর তিনি শালকুনী নদীর তীরে এক বিশাল পর্বতে বাস করতে লাগলেন। সেখানে ফলমূল খেয়ে তাঁর বহু বছর অতিবাহিত হল।

একদিন দৈত্যরাজ করমালী তার কন্যা বেদবতাঁকে নিয়ে সেখানে এলেন। বানর রূপী বিশ্বকর্মা বেদবতাঁকে দেখে তার হাত ধরে টানতে লাগলেন। বানরের এরূপ আচরণে দৈত্য কন্দর খঙ্গ নিয়ে তার দিকে ছুটে গেল তাকে হত্যা করত। তখন বেদবতাঁকে নিয়ে হিমালয়ে পালিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে জনশূন্য এক আশ্রম দেখতে গেলেন। বানর বেদবতাঁকে সেখানে রেখে কালিন্দী নদীর জলে ডুবে গেল। করমালী ভাবল বানর এবং বেদবতী দুজনেই ডুবে গেছে। তখন দৈত্যরাজ পাতালে স্বগৃহে ফিরে এল।

এদিকে কালিন্দীনদী ওই বানরকে শিব নামে এক প্রসিদ্ধ নগরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সেই নগরে প্রচুর লোকের বাস ছিল। বানর সবেগে নদী থেকে তীরে উঠে এল। তারপর সে কপিলারণ্যে বেদবতীর কাছে ফিরে যাবার জন্য উদ্যত হল। ঠিক তখনই বানররূপী বিশ্বকর্মা দেখলেন গুহ্যক অঞ্জন কন্যা দময়ন্তীকে নিয়ে সেদিকেই আসছে। তা দেখে বানর মনে করল, এই কন্যা নিশ্চয়ই কন্দর দুহিতা বেদবতী; সুতরাং নদীর জলে ডুবে তার সব পরিশ্রম ব্যর্থ হল। এই চিন্তা করে বানর সবেগে তার দিকে ছুটে গেল কিন্তু দময়ন্তী তখন ভয় পেয়ে হিরন্বতী নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অজ্ঞনও নিজ কন্যাকে নদীর জলে ডুবে যেতে দেখে দুঃখ শোকে সমাকুল হয়ে পর্বতে ফিরে এল এবং সেখানে এসে মৌনব্রত অবলম্বন করে তপস্যাচরণের মাধ্যমে বহু বছর কাটিয়ে দিল।

দময়ন্তী হিরন্বতী নদীর স্রেতের টানে পবিত্র কোশল দেশে এসে হাজির হল। তখন সে সানয়নে যেতে যেতে পথের ধারে একটি বটগাছ দেখতে পেল। এই বটবৃক্ষ প্রচুর শাখা ও ঝুরি দ্বারা পরিবৃত ছিল। তাই একে প্রথমদর্শনেই তার সাক্ষাৎ জটাধারী মহেশ্বর বলে মনে হল। দময়ন্তী সেই বটবৃক্ষের তলদেশে বসে বিশ্রাম করতে লাগল। তখন সে শুনতে পেল কেউ যেন বলছে–

এমনকি কেউ কোনোখানে নেই। যে গিয়ে মহর্ষি ঋতধ্বজকে বলেন যে, তোমার পুত্রকে কেউ বটগাছে বেঁধে রেখেছে। একথা শুনে দময়ন্তী সেই বটবৃক্ষের সর্বত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। এক উঁচু ডালে কে যেন পাঁচ বছরের এক শিশুকে সযত্নে পিঙ্গলবর্ণ জটাজালে বেঁধে রেখেছে।

তা দেখে দময়ন্তী অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে এই বালককে বললেন–বলো, কে তোমাকে এভাবে বেঁধে রেখেছে। তখন সেই বালক বলল–পুরাকালে মহেশ্বর মনুপুরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমার পিতা ঋতধ্বজ সেখানে বাস করতেন। আমার পিতা যখন তপস্যা মগ্ন ছিলেন, তখন আমি যোগ বলে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ হয়েই জন্মগ্রহণ করি। তখন আমার পিতা আমাকে জাবালি মনে করে নমস্কার করে বলেছিলেন–তুমি পাঁচ হাজার বছর পর্যন্ত বালক হয়ে থাকবে। আর দশ হাজার বছর পর্যন্ত কুমার হয়ে থাকবে।

তারপর বিশ হাজার বছর ধরে যৌবন দশা ভাগ করার পর এর দ্বিগুণ কাল বার্ধক্য যাপন করবে। এর মধ্যে পাঁচশো বছর ধরে বালকদশায় তোমাকে দৃঢ়বন্ধন ভোগ করতে হবে। এরপর কুমার দশ হাজার বছর ধরে কায়পীড়ন অনুভব করার পর যৌবনকালে দু-হাজার বছর পর্যন্ত মহাভোগ রাশি উপভোগ করবে। তারপর বৃদ্ধকালে চৌত্রিশশো বছর পর্যন্ত ভূশয্যায় শয়ন, কদন্ন ভোজনে দুঃখ ভোগ করতে হবে। পিতা এভাবে যখন ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে আমাকে বললেন, তখন আমার বয়স মাত্র পাঁচ বছর এবং সেই বছরেই আমি ঘুরতে ঘুরতে হিরন্বতী নদীতে স্নান করতে গেলাম।

সেখানে এক বানর আমাকে বলল–তুমি বেদবতাঁকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলে সে আমাকে এই অবস্থাতেই ধরে নিয়ে গিয়ে বটগাছের ডালে জটাজালে বেঁধে রাখল। দুর্বুদ্ধি বানর লতাপাতা দিয়ে এমন জাল তৈরি করে তার মধ্যে আমাকে রেখে দিল। এই মজবুত জালকে কোনো দিক থেকে ছিঁড়ে বেরোনোর কোনো উপায় ছিল না। সেই বানর এরপর অমর পর্বতে প্রস্থান করল। এবার বালক জাবালি দময়ন্তীর কাছে জানতে চাইল, কেন সে দিকভ্রষ্ট হয়ে এই মহারণ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

দময়ন্তী তখন জানাল, গুহ্যকরাজ অঞ্জন তার পিতা। জন্মকালে মহর্ষি মুদগল বলেছিলেন, এই বালিকা কালক্রমে রাজমহিষী হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণের সময় স্বর্গে দুন্দুভি বেজে উঠেছিল। কিন্তু তখন মঙ্গল ও অমঙ্গল দু-রকম বাদ্যধ্বনিই শোনা গিয়েছিল। তা শুনে ঋষি বলেছিলেন, এই বালিকাকে বাল্যকালে মহাসঙ্কটে পড়তে হবে। মহর্ষি মুদগল একথা বলেই দ্রুতপায়ে সেখান হতে প্রস্থান করেন। তখন পিতার সাথে

হিরন্বতীর তীর্থে এসে বানরকে নদীর তীরে দেখে ভয়ে হিরন্বতী নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। শেষে এই জনমানবশূন্য স্থানে এসে হাজির হয়েছি, নদীর স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে। বালক তার কথা শুনে দময়ন্তীকে বললেন–তুমি যমুনা তটে শ্রীকণ্ঠ শিবের কাছে যাও।

আমার পিতা দুপুরবেলা শিবার্চনার জন্য সেখানে যান। তুমি তার কাছে এই ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করলে তিনি তোমায় মঙ্গল লাভের উপায় বলে দেবেন। একথা শুনে দময়ন্তী বিন্দুমাত্র দেরি না করে হিমালয় পর্বকে যমুনা নদীর তীরে তপস্বী ঋতধ্বজের আশ্রমে চলে গেলেন। তারপর তিনি সেখানে কিছু অক্ষর লেখা আছে দেখতে পেলেন। এই সকল অক্ষর মিলিয়ে তিনি নিজে একটি শ্লোক লিখলেন। যথা–মুদগল বলেছেন, আমি রাজমহিষী হব। কিন্তু বালক জাবালির এই দুরাবস্থা থেকে কেউ কি আমায় পরিত্রাণ করতে পারেন? দময়ন্তী শিলা পটে এই কথা লিখে রেখে যমুনা নদীতে স্নান করতে গেলেন।

সেই সময় দময়ন্তী এক মত্ত কোকিল কুহরিত সুন্দর আশ্রম দেখতে পেলেন। এই আশ্রম দেখে তার মনে হল, নিশ্চয়ই সেই ঋষিবর ঋতধ্বজ এখন আশ্রমে আছেন। দময়ন্তী এরূপ চিন্তা করে সেই মহাশ্রমে প্রবেশ করলেন। সেখানে বেদবতাঁকে দেখে তার মনে হল মুখ শুকনো ও তার দুই চোখ ছিল অত্যন্ত চঞ্চল। পদ্ম মলিন ও বিবর্ণ হলে যেমন দেখায়, বেদবতাঁকে তখন সেরূপ দেখাচ্ছিল। যাইহোক, দময়ন্তীকে দেখে বেদবতী ভাবলেন, ইনি কে। এদিকে মুনিবর ঋতিধ্বজ ভগবান শ্রীকণ্ঠ মহাদেবকে পূজা করার জন্য আশ্রমে এসে দময়ন্তী কর্তৃক শিলাপটে লিখিত সেই শ্লোক রচনা দেখতে পেলেন। এবং তা পড়ে মুহূর্তকাল ধ্যানস্থ হয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পারলেন। তারপর তিনি দেবের অর্চনা শেষ করে রাজার সাথে দেখা করে তাকে বললেন–আপনার রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে একটা বানর আমার গুণবান ও সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পুত্রকে বেঁধে রেখেছে।

রাজন! একমাত্র আপনার পুত্র ছাড়া আর কারোর পক্ষে আমার পুত্রকে বন্ধনমুক্ত করে আনার ক্ষমতা নেই। আর তাকে মুক্ত করে আনতে হলে কি করতে হবে, তা আপনার পুত্র শকুনি ভালোভাবেই জানেন। ঋষির কথা শুনেই রাজা প্রিয় পুত্র শকুনিকে ঋষিপুত্রকে মুক্ত করে আনার জন্য আদেশ করলেন। পিতার আদেশে মহাশক্তিশালী শকুনি সহাস্য বদনে ঋষি ঋতধ্বজের সাথে সেই মহারণ্যে গিয়ে হাজির হলেন। তখন সেই অত্যুচ্চ বৃক্ষ তার দৃষ্টি গোচর হল। তারা দেখলেন, ঐ বটবৃক্ষের অতি উঁচু ডালে ঐ ঋষি পুত্রকে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার চারিদিকে সুদৃঢ় লতাজালও তিনি দেখতে পেলেন। তিনি তখন হাতে ধনু নিয়ে তাতে জ্যা রোপণ করলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে তীর ছুঁড়ে সেই লতাজাল ছিন্ন করে ফেললেন।

এরূপে পাঁচশো বছর পরে বানরের তৈরি সেই লতাজাল শরাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন মহর্ষি ঋতধ্বজ দ্রুতপায়ে সেই বটবৃক্ষে আরোহণ করলেন। জবালি নিজের পিতাকে আসতে দেখে বদ্ধ অবস্থাতেও সাদরে মাথা নেড়ে তাকে যথাযোগ্য সম্মান জানালেন। এখন ঋতধ্বজও পুত্রকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করে তাকে বন্ধন মুক্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেই বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ছিল বলে তিনি সহজে তা ছিঁড়তে পারলেন না।

তখন বলবান শকুনি হাতে তীর ধনু নিয়ে সেই জটাজাল ছিন্ন করার জন্যে ওই বৃক্ষে আরোহণ করলেন। কিন্তু তবুও তিনি জটাজাল ছিন্ন করতে সক্ষম হলেন না। তখন মহর্ষির সাথে গাছ থেকে তিনি নেমে এলেন এবং এক শর মণ্ডলী প্রস্তুত করে দুটি অর্ধচন্দ্রাকার বাণ ছুঁড়ে অতি সহজেই বটগাছের সেই ডাল তিনটুকরো করে দিলেন। শাখা ছিন্ন হওয়া মাত্রই তপোধন জবালি সেই শরসোপান পথে মাথার সেই তিন টুকরো ডাল নিয়েই গাছ থেকে নেমে এলেন! এরূপে নিজ পুত্র বন্ধন থেকে মুক্ত হলে ঋষি ঋতধ্বজ, ধনুধর রাজকুমার শকুনি ও পুত্র জবালিকে সাথে নিয়ে সূর্যনন্দিনী যমুনা নদীর দিকে যাত্রা করলেন।

৩৭

দণ্ড বলতে লাগলেন–এই সময় যক্ষনন্দিনী ও দৈত্যনন্দিনী দুজনে মিলে মহাদেব ও মহর্ষি ঋতধ্বজকে দেখার জন্যে ঋতধ্বজের আশ্রমে গেলেন। তারা দেখলেন, ঋতধ্বজ আশ্রম থেকে চলে যাওয়ায় বিভু মহাদেব ম্লান হয়ে পড়েছেন। যেসব ফুল দিয়ে তার পূজা করা হয়েছিল, সেগুলো শুকিয়ে গেছে। এই দুই তন্বী যথাবিধি তার অর্চনা করতে লাগলেন। এই দুই কন্যা যখন সেই আশ্রমে ছিলেন, তখন বিখ্যাত শ্রীকণ্ঠ মহাদেবকে দর্শন করার জন্যে মহর্ষি গালব আশ্রমে এলেন। তখন তিনি তাদের প্রথমে দেখে ভাবলেন, এরা কার কন্যা?

তারপর ঋষি গালব যমুনা নদীর জলে স্নান করে আশ্রমে গিয়ে ভগবান শ্রীকণ্ঠের অর্চনা করলেন। পূজার ক্ষণে দুই কন্যা মধুর কণ্ঠে গান করতে লাগলেন। মহর্ষি গালব সেই গান শুনে ভাবলেন, এরা নিশ্চয়ই গান্ধর্বকন্যা। তারপর তিনি যথাবিধি ঈশানের পূজা ও জপ করলেন। তখন সেই দুই কন্যা তাকে অভিবাদন করল। তিনি আসনে বসে তাদের বললেন–তোমরা দুজনেই বংশের অলঙ্কার। তোমাদের অশেষ ভক্তি আছে ভগবান শিবের প্রতি। তোমরা কার সন্তান বল? তখন সেই যক্ষ কন্যা ও অসুর কন্যা নিজ নিজ বৃত্তান্ত মুনিবর গালবকে বললেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শোনার পর তপস্বীপ্রবর গালব সে রাত্রি সেই আশ্রমেই থেকে

গেলেন এবং সকালে গৌরীপতি মহাদেবকে অর্চনা করে সেই কন্যা দুজনের কাছে গিয়ে বললেন–আমি সুপ্রসিদ্ধ পুষ্করারণ্যে যাবার জন্য মনস্থির করেছি।

তোমাদের তা জানালাম। তোমরা আমাকে অনুমতি দাও। দুই কন্যা বললেন–আপনার দেখা পাওয়া দুর্লভ। সহজে সবাই আপনার দর্শন লাভ করতে পারে না। কিন্তু আপনি এখন কেন পুষ্করণ্যে যেতে চাইছেন? গালব গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন-কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পুষ্করারণ্যে দর্শন করলে বিশেষ পুণ্য লাভ হয়। কন্যা দুজন বললেন–আপনি যেখানে যাবেন, আমরাও আপনার সাথে সেখানে যাব। আপনি না থাকলে আমাদেরও এখানে থাকার ইচ্ছে নেই। রাজি হলেন গালব তাদের কথায়। তারা পুষ্করারণ্যের পথে যাত্রা করলেন মহেশ্বরকে প্রণাম করে। তাদের সঙ্গে আরো হাজার হাজার ঋষি, রাজা ও পুণ্যকামী জনগণ পুষ্করারণ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। একমাত্র ঋতধ্বজ পুষ্করারণ্যে এলেন না।

তারপর যথাসময়ে কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথি এল। ঋষিগণ এবং নাভাগ, ইক্ষাকু ও অন্যান্য রাজারা স্নানের জন্য পুষ্কর হ্রদে নামলেন। পুষ্করের জলে গালবও দুই কন্যাকে নিয়ে নামলেন। জলে ডুব দিয়ে তিনি একটি মাছকে জলে শুয়ে থাকতে দেখলেন। অনেক মৎস্য কন্যারা তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছে। তখন ওই মাছ মৎস্য কন্যাদের স্বেচ্ছাচারী বলছে। একথা শুনে মৎস্যকন্যারা বলল–তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, ঐ তপস্বী গালব দুজন কন্যার সাথে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ধর্মাত্মা ও তপস্বী হয়েও যদি তার লোক অপবাদের ভয় না থাকে, তবে তুমি জলচারী হয়ে কেন লোক-অপবাদের ভয় পাচ্ছো? সেই মাছ তখন বলল–এই তপস্বী মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। সে জন্য ধর্মলোপ জেনেও ভয় করছেন না। জলচর প্রাণীদের এই কথোপকথন শুনে গালব জলের মধ্যে ডুবে রইলেন লজ্জায় আর জলে থেকে উঠলেন না। খুবই লজ্জিত হলেন মহর্ষি গালব। অন্যদিকে সেই দুই কন্যা স্নান সেরে উঠে গালব মুনির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ঋষি, রাজা ও অন্যান্য লোকেরা যে যার নিজ নিজ স্থানে ফিরে চলে গেল। পুষ্কর যাত্রা শেষ হয়ে গেল। বিশ্বকর্মা নন্দিনী সুন্দরী চিত্রাঙ্গদা একাকিনী সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে চারিদিকে তাকাতে লাগল। তখন সেই তীর্থক্ষেত্র জনশূন্য হয়ে গেছে। তখন গন্ধর্ব নন্দিনী বেদবতী সে স্থানে এল। তার পিতা ও মাতার নাম পর্জন্য ও ঘৃতাচী। পুষ্করের জলে স্নান করে বেদবতী কন্যা দুজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, সে তখন চিত্রাঙ্গদার পরিচয় জানতে চাইল।

চিত্রাঙ্গদা তখন জানাল, সে বিশ্বকর্মার কন্যা। সে নৈমিষারণ্য কাঞ্চনাক্ষী নামে পুণ্যতোয়া সরস্বতী নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। সেখানে বিভিরাজ সুরথ তাকে দেখে কামার্তচিত্তে তার শরণাগত হয়েছিল। কিন্তু সে তার সখীদের বারণ না শুনে আত্মসমর্পণ করেন। এর ফলে তার পিতা তাকে অভিশাপ দেন। এর ফলে, সুরথের সাথে তার চির বিচ্ছেদ ঘটে। এক গুহ্যক তাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধা দেন। তারপরই তিনি শ্রীকণ্ঠ মহেশ্বরের দর্শন লাভ করার জন্য গোদাবরী তীরে যান। কিন্তু এখনও সে স্বামীর দেখা পায়নি। যাই হোক এরপর নিজের পরিচয় দান করে চিত্রাঙ্গদা পুনরায় দময়ন্তীকে বললেন, পুষ্কর যাত্রার পুণ্য লাভের লগ্ন পেরিয়ে গেছে। তবে বেদবতী কেন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তাকে সমস্ত সত্য ঘটনা বলতে বললেন।

দময়ন্তী অঙ্গীকার করে বললেন, যে সমস্ত ঘটনা বলবেন। তিনি বললেন–তাঁর পিতা পর্জন্য এবং– তিনি ঘৃতাচীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি বললেন, এক বনে তার সাথে এক বানরের সাক্ষাৎ হয়। সেই বানর তাকে ভূতলস্থ আশ্রম থেকে এই মেরু পর্বতে নিয়ে এসেছে। সে বলেছিল যে, সে বেদবতী নয়, তথাপি বানর তার কথা শোনেনি এবং তার ফলে তিনি বানরের তাড়া খেয়ে এক গাছে উঠে পড়লে বানর সেই গাছ পদাঘাতে ভেঙে ফেলে। সে ভয়ে গাছের এক প্রকাণ্ড ডাল ধরলে বানর সেই পুরো গাছটা হিরন্বতী নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ফলে দময়ন্তীও নদীর জলে পড়ে যায়। এতে সকলে হাহাকার করে ওঠে।

মহর্ষি মুদগল নিজে বলেছিলেন, দময়ন্তী ইন্দ্রদ্যুম্মের মহিষী হবেন। যে মনুর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে হাজার হাজার যাগযজ্ঞ করবেন। ব্রহ্মা, সিদ্ধ ও গন্ধর্বদের এই কথা শুনে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন, তারপর মহারাজ নদীতে জলের স্রোতে দময়ন্তীর বাতাসের বেগে সে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। এরপর গন্ধর্বনন্দিনী দময়ন্তীর প্রস্তাবে চিত্রাঙ্গদা দুই কন্যার সাথে দেখা করে তার সমস্ত বৃত্তান্ত জানার জন্য উৎসুক হলেন, তারপর তিনজন একত্রিত হয়ে সপ্তগোদাবরীর জলে স্নান করবেন এবং ভক্তি ভরে হটকেশ্বর শিবের অর্চনা করে সপ্তগোদাবরীর তীরে অবস্থান করতে লাগলেন।

শকুনি, জাবালি ও ঋতধ্বজ তাদের খোঁজ করতে করতে বহু বছর কাটিয়ে দিলেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন শাবাল রাজ্যে বাস করছিলেন। তিনি পাদ্য ও অর্ঘ্য নিয়ে এসে জাবালি, ঋতধ্বজ ও শকুনিকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করলেন। তাকে সমস্ত পৃথিবীতেও খুঁজে পাননি। তারা ইন্দ্রদ্যুম্নের সাহায্য চাইলেন। তিনিও বললেন, তাঁরও একটি স্ত্রীর হারিয়ে গেছে। তিনিও তাকে খুঁজে বার করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। আকাশ থেকে যে গাছ নদীর জলে পড়েছিল

তাকে তিনি টুকরো করে দেন এবং গাছে যে সুন্দরী কন্যা ছিল তাকেও তিনি আলাদা করে দেন। কিন্তু তিনি জানেন না বরবর্ণিনী কন্যা এখন কোথায় আছেন।

তিনি আবার তাকে খোঁজার চেষ্টা করবেন, একথা বলে তিনি জাবালি, ঋতধ্বজ ও শকুনিকে একটি করে রথ দিলেন। তারা তখন রথে চড়ে সমগ্র বসুধা অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এভাবে তারা বদরিকা আশ্রমে এসে এক তপস্বীকে দেখলেন। তারা দেখলেন যে তপস্বী কৃশকায় ও দৈন্যগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তার মাথার জটাজাল খুবই মলিন ও নোংরা, তবে তিনি যুবক। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জানতে চাইলেন, কেন তিনি যুবক হয়ে এত কঠোর তপস্যা করছেন। তিনি জানালেন যে, তিনি দারুণ শোক ও দুঃখে এই তপস্যা করছেন। পরিচয় দানের পর অবশেষে তিনি ইন্দ্রদ্যুম্নের পরিচয় জানতে চাইলেন। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন জানালেন, তিনি শাকল পুরের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা, মনু তার পিতা ও ইক্ষাকু তার ভাই।

তারপর তাপস তার পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করলে রাজা তাকে বললেন, দুঃখভাবে দেহত্যাগ না করতে। কারণ এই তাপস তার ভ্রাতুস্পুত্র। তারা এবার দুজনে সেই সুন্দরী কন্যার খোঁজ করবেন। এরপর রাজা সেই তরুণ রথে করে শকুনি, ঋতধ্বজ ও জাবালির কাছে নিয়ে এলেন। তখন ঋতধ্বজ তাপসকে বললেন–যে তারা তাকে সাহায্য করবেন অভীষ্ট সাধনে। তিনি বললেন, তিনি চিত্রাঙ্গদাকে খুঁজছেন, তাকে তিনি দেখেছেন সপ্ত গোদাবরী তীরে। তিনি বললেন–সেখানে আরও তিনজন কন্যার সমাগম হবে। এরপর তারা রথে চেপে সেখানে গেলেন। ঘৃতাচী তখন শোকে কাতর হয়ে নিজের কন্যাকে খুঁজছিলেন উদয়াচলে। তখন সেখানে বানরের সাথে তার দেখা হয়। বানরের কাছে তিনি জানতে চাইলেন যে, তার কণ্যাকে সে দেখেছে কিনা। বানর তখন বলল, সে বেদবতাঁকে শ্রীকণ্ঠ আশ্রমে রেখে এসেছে। তখন ঘৃতাচী বলল, তার কন্যার নাম দময়ন্তী, বেদবতী নয়। ঘৃতাচীর কথায় বানর দ্রুত পদে কৌশিকী নদীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

এদিকে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ও সপুত্র ঋতধ্বজ ঘোড়ায় টানা পাঁচটি রথে চড়ে কৌশিকীর তীরে এসে নদীর জলে স্নান করতে গেলেন। ঘৃতাচীও কৌশিকীর পবিত্র জলে স্নান করতে নামলেন। বানর তাকে অনুসরণ করল। তখন জাবালি পিতা ঋতধ্বজ ও অন্যান্যদের বললেন–যে, সেই দুরাত্মা বানর এখানে এসেছে। এই বানরই তাকে বট গাছে বেঁধে রেখেছিল। জাবালির কথা শুনে শকুনি তাকে মারতে উদ্যত হলেন ধনুকে তীর যোছনা করে। মহর্ষি ঋতধ্বজ শকুনিকে বললেন, পূর্বজন্মের কর্মফলে এসব হয়। তাই কাউকে বধ করা উচিত নয়। তিনি বললেন–যে,

আমার পুত্র আজও মাথায় ডাল বহন করছে এবং বন্ধন খোলার ক্ষমতা আর কারো নেই। হাজার বছর ধরে এই ডাল সে বয়ে বেড়াচ্ছে। তখন বানর জাবালির জটাপাশ খুলে দিল।

ঋতধ্বজ তখন প্রীত হয়ে বানরকে বর দিতে উদ্যত হলেন। একথা শুনে বানর ঋষিকে বলল–আপনি যেন অনুগ্রহ করে অভিশাপ তুলে নিন। আপনি জানেন যে আমি বিশ্বকর্মা। চিত্রাঙ্গদা আমার কন্যা। কিন্তু বানরের স্বভাব দোষে অনেক পাপ করেছি। ঋতধ্বজ বললেন–আমার প্রদত্ত ওই শাপের তখনই অবসান হবে যখন তার ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে এক পুত্র জন্মাবে। এরপর বানর সন্তুষ্ট চিত্তে মহানদীতে স্নান করতে গেল। ক্রমে সকলে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করল। ঘৃতাচীও স্বর্গের দিকে যাত্রা করলেন। বানর তার পিছনে যেতে যেতে তার প্রতি কামাসক্ত হলে ঘৃতাচীও তার কাম প্রার্থনা করল। ফলে কোলাহল পর্বতে বানর তন্বী ঘৃতাচীর সাথে রমণ আরম্ভ করতে লাগল। তারা রমণে রত হয়ে এভাবে বিন্ধ্যাচলে হাজির হল।

অন্যান্যরা পিপাসার্ত ও শ্রান্ত হয়ে রথে করে সপ্তগোদাবরের তীর্থে হাজির হয়ে স্নান করতে গেলেন। সারথিগণ স্নান করে, ঘোড়াদের স্নান ও জল পান করালেন। তবে তারা ঘোড়াগুলিকে সুন্দর সবুজ জমিতে ছেড়ে দিল। পরে তারা তৃপ্ত হয়ে মহেশ্বর মন্দির অভিমুখে যাত্রা করলেন। আশ্রমের রমণীরা আশ্রমের ছাদে উঠে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন এবং দেখলেন কিছু লোককে মন্দির অভিমুখে আসতে। জটাধারী সেই নবীন তাপসকে দেখে চিত্রাঙ্গদা তাকে রাজা সুরথ বলে চিনতে পারল। সুরথকে দেখে চিত্রাঙ্গদা সখীদের বললেন–যে, ঐ দীর্ঘবাহু যুবাপুরুষকে আমি পূর্বেই পতিরূপে বরণ করে নিয়েছি।

আর জটাধারী বৃদ্ধ নিশ্চয়ই তপস্বিবর ঋতধ্বজ। এরপর দময়ন্তী হৃষ্ট চিত্তে সখীদের বললেন–এঁদের সাথে যে আর একটি পুরুষ, তিনি ঋতধ্বজের পুত্র। এরপর সকল কন্যারা হে শর্ব, শম্ভু, ত্রিনেত্র ইত্যাদি বলে শম্ভুর কাছে গিয়ে সুমধুর স্বরে তাদের স্তবগান করতে লাগলেন।

তিনি মহেশকে বলতে লাগলেন–ত্রিলোকনাথ, উমাপতি, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকারী মহাপুরুষ, সর্বসত্ত্ব, ভয়ঙ্কর, শুভঙ্কর, মহেশ্বর, ত্রিশূলধারী ও উগ্রমূর্তি, চন্দ্রশেখর, জটাধর। কপালমালা বিভূষিত, শিব, মহাদেব, ঈশান, শঙ্কর, ভীম, ভুব, বৃষভ, কর্টভ, পৌঢ়, অবিমুক্তক রুদ্র, রুদ্রেশ্বর, স্থানু, একলিঙ্গ, কালিন্দী প্রিয়, শ্রীকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ ও ও অপরাজিত, রিপু ভয়ঙ্কর সন্তোষপতি, বামদেব, অঘোর মহাঘোর, শান্ত, সরস্বতীকান্ত, সহস্রমূর্তি, মহোদ্ভব, বিষ্ণু, হর, মহীধ্ব প্রিয়, হংস, কামেশ্বর, কেদাধিপতি, কৃপান-পানি, বিদ্যারাজ, সোমরাজ, কামরাজ, সমুদ্রশাদী, গয়ামুখ, গোকর্ম, ব্রহ্মমণি, হাটেশ্বর তোমাকে প্রণাম করি।

স্তবগীতি শেষ হবার সাথে সাথেই ঋষিগণ ও নৃপতিগণ সকলেই ত্রিলোক বিধাতা হটকেশ্বর দর্শন করার জন্য সেখানে এলেন। তারা দেবদেবের কাছে সুন্দরী কন্যাদের সুমধুর স্বরে স্তবগান করতে দেখলেন। প্রণয়িনী চিত্রাঙ্গদাকে দেখে দারুণ খুশি হলেন রাজা সুরথ। মনে মনে আনন্দ অনুভব করলেন। ঋতধ্বজও ওই সুন্দরী কন্যাকে দেখে যোগবলে সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পারেন। এরপর সকলেই স্তব করে হটকেশ্বরকে পুজো করতে লাগলেন। চিত্রাঙ্গদা ও তার সখীরা ঋতধ্বজ ও অন্যান্যদের দেখে সকলে মিলে তাদের অভিনন্দন করতে লাগলেন। ঋতধ্বজও তখন হৃষ্টচিত্তে তাদের কাছে এলেন।

এই সময় ঘৃতাচী ও সেই বানর গোদাবরী তীর্থে স্নান করে হটকেশ্বরকে দেখার জন্য সেখানে এসে হাজির হলেন। বেদবতী জননী ঘৃতাচীকে দেখে খুশি হলেন এবং ঘৃতাচীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মহর্ষি ঋতধ্বজ তখন বানরকে বললেন–তুমি মহাত্মা গুহ্যককে আনার জন্য এখনই পর্বতে চলে যাও এবং পাতাল থেকে করমালীকেও স্বর্গ থেকে গন্ধর্বরাজ পর্জন্যকে অতি শীঘ্র এস্থানে নিয়ে এসো। বেদবতী বানরকে বললেন, সে যেন গালবমুনিকেও এখানে নিয়ে আসে।

তখন বানর নিমন্ত্রণের জন্য বেরিয়ে পড়ল। অঞ্জনকে নিমন্ত্রণ করে সে পর্জন্যের কাছে গেল। এরপর করমালীকে নিমন্ত্রণ জানাতে গেল সপ্তগোদাবর তীর্থ ও পাতালে। তপোধননিধি গালবের দেখা পেল। মহিষ্মতী নগরে গিয়ে। এরপর হাটেশ্বরের কাছে হাজির হল। যেখানে দময়ন্তী ও বেদবতাঁকে দেখতে পেল। অন্যান্য রাজারাও তপোনিধি গালবকে অভিনন্দন জানাল।

তারপর বানরের নিমন্ত্রণে যক্ষ, গন্ধর্ব ও দানবরা একে একে এসে হাজির হল। তখন ওই কন্যারা নিজ নিজ পিতাকে আলিঙ্গন করল। সকলকে পিতার সাথে মিলিত দেখে বিশ্বকর্মার কন্যা চিত্রাঙ্গদা সজল নয়না হয়ে উঠল। তখন ঋতধ্বজ তাকে জানালেন যে, এই বানরই তার পিতা। তখন লজ্জায় চিত্রাঙ্গদার চৈতন্য বিলুপ্ত হল এবং সে ভাবল পিতার এই দশা কি করে হল। তিনি নিজেকে কুপুত্রী মনে করলেন। সে ভাবল তার দেহত্যাগ করাই কর্তব্য। তিনি ঋতধ্বজকে বললেন, তিনি পিতৃঘাতিনী। তাই সে দেহত্যাগের অনুমতি চায়। মুনিবর তাকে দেহত্যাগ করতে নিষেধ করে বললেন–যে, তোমার পিতা দেবশিল্পী হবেন। ঘৃতাচীর গর্ভে সন্তান জন্মালেই তিনি আবার নিজ রূপ ফিরে পাবেন।

এরপর ঘৃতাচী চিত্রাঙ্গদাকে বললেন–তুমি শোক কোরো না। কারণ দশমাসের মধ্যে আমার তার গর্ভে একটি পুত্র জন্মাবে। একথা শুনে চিত্রাঙ্গদা আনন্দিত হয়ে নিজের বিবাহ ও পিতাকে

দেখার জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তার সখীরাও তার বিবাহ প্রতীক্ষায় রইল। দশ মাস পরে নল নামক এক পুত্র প্রসব করল ঘৃতাচী। এবং সাথে সাথে বিশ্বকর্মা নিজের রূপ ফিরে পেলেন। এবং তিনি কন্যাকে আলিঙ্গন করে বিভিন্ন ও সকল দেবগণ সহ ইন্দ্রকে স্মরণ করলেন। হাটক তীর্থে এসে হাজির হলেন অন্যান্য দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন করমালীর কন্যাকে জাবালির হাতে সম্প্রদানের প্রস্তাব করলেন জাবালির পিতা ঋষি ঋতধ্বজকে। দময়ন্তীর সাথে রূপবান শকুনির বিবাহ হোক। আর যথাবিধি অগ্নিসাক্ষী করে বেদবতী যেন তাকে বিয়ে করে। ইন্দ্রদ্যুম্নের এই কথায় সম্মত হলেন ঋতধ্বজ। গালব ও ঋত্বিকগণ সুষ্ট ভাবে এই বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ করলেন। অপ্সররা নাচ ও গন্ধর্বরা গান করতে আরম্ভ করলেন।

প্রথমে জাবালি পাণি-প্রথা করলেন, তারপর ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বেদবতীর। পরে শকুনি পানি গ্রহণ করলেন এবং সবশেষে সুরথ ও চিত্রাঙ্গদা এবং এরপর ঋতধ্বজ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ও দানবদের বললেন–বৈশাখ মাসে সপ্তগোদাবর তীর্থে অবস্থান করতে। এরপর দেবগণ, তথাস্তু বলে স্বর্গধামে প্রস্থান করলেন। রাজারা পরম সুখে কাল কাটাতে লাগলেন। দণ্ড সরজাকে চিত্রাঙ্গদার পূর্ববৃত্তান্ত শুনিয়ে বললেন–তাকে। বন্দনা করতে। ফলে সরজাও মৃদুবাক্যে উত্তর দিতে আরম্ভ করলেন।

সরজা দণ্ডকে বললেন–আমি কিছুতেই আত্মদান করতে পারব না। আত্মদান না করলে তবেই পিতার অভিশাপ থেকে রক্ষা পাব। প্রহ্লাদ বললেন, দণ্ড রাজা দুর্বুদ্ধিবশতঃ কামা হলে ভার্গব নন্দিনীকে সে জোর করে ধর্ষণ করে। এভাবে দুষ্ট রাজা সরজার চরিত্রকে কলঙ্কিত করে ভয়ে আশ্রম থেকে পালিয়ে যায়। ধর্ষিতা সরজা তখন আশ্রমের বাইরে নত মস্তকে মহাগ্রহণ গ্রস্ত চন্দ্র প্রণয়িনী রোহিনীর মতো কাঁদতে লাগলেন। বহুক্ষণ পরে শুক্রাচার্য নিজের আশ্রমে ফিরে এলেন যজ্ঞকার্য সমাপ্ত করে।

এসেই তিনি রজঃস্বলা অবস্থায় সরজাকে দেখতে পেলেন এবং জানতে চাইলেন কন্যা, তোমার এই দশা কে করেছে? কার এত স্পর্ধা যে বিষধর সাপ নিয়ে খেলা করে? কে সেই দুরাত্মা? সরজা তখন অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কম্পমান শরীরে বললেন–বহু বার বাধা দেওয়া সত্ত্বেও শুক্রাচার্যের শিষ্য দণ্ড আমাকে কলঙ্কিত করেছে। কন্যার কথা শুনে তার চক্ষু রক্তসম হয়ে উঠল। শুক্রাচার্য নিদারুণ ক্রোধে বললেন–দণ্ড কামান্ধ হয়ে আমার আদেশ, ভয় ও গৌরবকে তুচ্ছ করে দিয়ে সরজাকে ধর্মচ্যুত করেছে। এই দারুণ অপরাধে সে সাত রাত্রির মধ্যে রাজা,

ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনসহ ভস্মীভূত হবে। মুনিবর শুক্র দণ্ডকে অভিশাপ দিয়ে সরজাকে পাপ মুক্ত হবার জন্য তপস্যা করলেন এবং দানবপুরী পাতালে চলে গেলেন।

শুক্রাচার্যের অভিশাপ অনুযায়ী দণ্ডও সাত রাতের মধ্যে ভস্মীভূত হলেন। এর ফলে দেবতারা দণ্ডকারণ্য ছেড়ে চলে গেলেন এবং মহাদেব তাকে রাক্ষস বাস ভূমিতে পরিণত করে দিলেন। এভাবেই নীচ ও কামান্ধ লোকেদের সমূলে বিনাশ করে পরনারীরা। এই কাহিনি সবিস্তারে বর্ণনা করে প্রহ্লাদ অন্ধককে বললেন–অতএব বৎস, তুমি পরনারী উমার প্রতি কামান্ধ হয়ো না। সাধারণ নারীর যদি এই ক্ষমতা থাকে তবে গিরিকন্যার তো কথাই নেই। মহাদেব ভিন্ন, যার দর্শন লাভ করার স্বীকৃতি নেই তার সাথে রণক্ষেত্রে জয় লাভ করা একেবারেই অসম্ভব।

পুলস্ত্য নারদকে বললেন, প্রহ্লাদ এরূপ বললে দৈত্যরাজ অন্ধক রোষকম্পিত নেত্রে নিশ্বাস ফেলে সতেজে বললেন–মহাদেবের নিজস্ব কোনো ধর্ম নেই। তাঁর ভস্ম মাখা দেহধারণ-ই সার। আমাকে স্বয়ং ইন্দ্র ভয় করেন। তাই বৃষবাহন মহাদেবকেও আমার ভয় নেই। অন্ধকের কথাকে প্রহাদ ধর্মবিরুদ্ধ, অর্থহীন ও অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে বললেন–তোমাকে কোনোরূপেই ক্ষমা করা যায় না।

আগুন ও পতঙ্গ, সিংহ ও শৃগাল, হাতি ও মশা এবং সোনা ও পাষাণ-এর মধ্যে যতদূর পার্থক্য আছে মহাদেব ও তোমার মধ্যে তাও নেই। সুতরাং তুমি তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যেও না। এবার তিনি মহাত্মা মহর্ষি অসিতের কাহিনি বললেন। তিনি বলেছেন–যে ব্যক্তি ধর্মশীল এবং অভিমান ও ক্রোধের বশীভূত নন। যিনি বিদ্বান ও বিনয়ী, কাউকে দুঃখ বা কষ্ট দেন না। যিনি নিজ পত্নীতেই সন্তুষ্ট, এবং পরদারে যিনি পরাঙ্খ তাঁর মতো ব্যক্তির সংসারে কোনো ভয়ের কারণ নেই।

যে ধর্মহীন, কলহপ্রিয়, শাস্ত্র ও শ্রুতিহীন, পরদারে ও পরধনে লোভী এবং অবর্ণসঙ্গমকারী সেই ব্যক্তি কোথাও সুখ পায় না। এই কারণেই সূর্যদেব ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন না। বারুণ-মুনি রোষনারায়ণ নন, সূর্য-পুত্র মনু বিদ্যান্বিত ও শাস্ত্রজ্ঞানী হয়েছেন এবং অগস্ত্যমুনি সর্বদা নিজ পত্নীর প্রতি অনুরক্ত। এই মহাপুরুষরা সকলে তেজস্বী কারণ এরা কখনও পাপাসক্ত হন না, সর্বদা সৎ কাজ করেন। এঁরা সবাই শাপ ও বরদানে সক্ষম এবং সবাই দেবতা ও সিদ্ধগণের কাছে নিত্যপূজিত।

পূর্বে উদগমিত ও অধর্মসেবায় লিপ্ত ছিল। বিভু কলহপ্রিয় ছিল। দুরাত্মা নমুচি সর্বদা অপরকে দুঃখ দিত। রাজা সনক অত্যাধিক গর্বিত ছিল। হিরণক্ষ সর্বদা পরধনে লোভ করত। তার ছোট

ভাই মূর্খ ও অসৎ ছিল এবং উত্তমৌজা যদু সোনা চুরি করেছিল। এরা সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অতএব কখনো ধর্ম পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়। কি স্বর্গ, কি মর্ত–সর্বত্র ধর্মই একত্রে মানুষের উদ্ধারকর্তা। মানুষ পরকালে পতিত হয় অধর্ম কর্মের ফলেই। অপরের স্ত্রীর প্রতি লালসা থাকে না ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির। একমাত্র পরদারই একুশটি নরকে পতিত হবার মূল। পরদার পরিত্যাগই পবিত্র ধর্ম। পরধন ও পরদার লোভীকে বহু বৎসর রৌরব নরক ভোগ করতে হয়। এরূপ ধর্ম ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন দেবর্ষি অমিত পূর্বে গরুড় ও অরুণের জন্য। অজ্ঞ লোকেরা পরদারে আসক্ত হয়ে নরক ভোগ করে থাকে।

প্রহ্লাদের উপদেশের উত্তরে অন্ধক তাঁকে ধর্ম নিয়েই থাকতে বলল। অন্ধক ধর্মাচরণ করতে পারবে না। সে তখন শম্বরকে বলল–এখনই গিয়ে মন্দার পর্বতে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করতে যে কেন তিনি মন্দার পর্বত রক্ষা করছেন? তার অভিপ্রায় কী? দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্য দেবতারা যেখানে অন্ধকের আদেশ উল্লঙ্ঘন করে না, সেখানে শঙ্কর কি করে এমন কাজ করে? আর যদি মন্দার পর্বত মহাদেবের প্রিয় নিকেতন হয় তবে যেন তিনি তাঁর পত্নীকে আমার হাতে তুলে দেন। শম্বরাসুর তখন মন্দার পর্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। শম্বরের কথা শুনে ভবানীর সামনেই মহাদেব বললেন– শোনো, ধীমান ইন্দ্র আমাকে মন্দার দান করেছেন। তাই তার আদেশ ছাড়া আমি এই স্থান ত্যাগ করব না। আর গিরিবালার যদি যেতে ইচ্ছে করে তবে সে চলে যাক, তাকে আমি বাধা দেব না।

গিরিকন্যাও বললেন–তুমি গিয়ে আমার কথা মতো সেই দুরাত্মা অন্ধককে এই কথা বলবে। আমাকে বাজি রেখে অন্ধক এবং হর দুজনে প্রাণ রূপ দূতক্রীড়ায় লিপ্ত হয়ে যে জয় লাভ করতে সক্ষম হবে, সেই আমাকে লাভ করবে। শম্বর ফিরে এসে সব কথা অন্ধককে জানাল। তা শুনে অন্ধক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন–এখনই ওই উদ্ধত রমণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্য দুন্দুভি বাজাতে থাকো। অন্ধকের আদেশেই অসুরগণ রণবাদ্য বাজাতে লাগল। দৃঢ় তাড়নায় সেই রণভেরী ভৈরব রবে মুহুর্মুহু নিনাদ করতে লাগল। সেই দুন্দুভি ধ্বনি শুনে কি জন্যে এই রণভেরী বাজছে, পরস্পর এরূপ বলাবলি করতে করতে দানবেরা সকলে শীঘ্র অতি সভাক্ষেত্রে এসে হাজির হল।

সমবেত সকল দানবদের সমস্ত বৃত্তান্ত বলল অসুর সেনাপতি বলবান দুর্যোধন। প্রবল অসুরেরা যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে হাতি, ঘোড়া, উট ও রথে চেপে মহাদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য

বেরিয়ে পড়ল। তখন জম্ভ, কুজম্ভ, হন্ত, তুহুন্ত, শম্বর, বলি, বান, কার্তস্বর, হস্তী, সূর্যশ, মহোদয়, অয়ঃশঙ্কু, শিবি, শাল্ব, বৃষপর্বা, বিরোচন, হয়গ্রীব, কালনেমি, সংহ্রাদ, সরভ, কালনাশন, সবল, বৃত্র, দুর্যোধন, পাক, বিপাক, কাল এবং অন্যান্য বহু বলশালী দানব বিবিধ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্ধকাসুরের পেছনে চলল। দুরাত্মা দৈত্যপতি অন্ধক দুর্বুদ্ধিবশত কাল পাশে আবদ্ধ হয়েছিল, তাই সে মহাদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মন্দার পর্বতে গিয়ে হাজির হল।

৩৮

পুলস্ত্য নারদকে বললেন, মহাদেবও যুদ্ধ ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে নন্দীকে ডেকে বললেন– যাও নন্দী, তোমার সমস্ত অনুচরদের ডেকে নিয়ে এসো। মহেশ্বর আদেশ করার সাথে সাথে নন্দী সমস্ত গণ-নায়কদের স্মরণ করল। তাদের আগমন বার্তা নন্দী মহাদেবকে দিল। নন্দী মহাদেবের উদ্দেশ্যে বলল এই যে জটামণ্ডিত ত্রিলোচনসমূহকে আপনি দেখছেন, এঁরা সংখ্যায় এগারো কোটি, এঁরা রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ। এই বাঘের মতো শক্তিশালী বানরমুখো গণসমূহকে দেখছেন, এঁরা আগে যে গণসমূহের কথা বললাম, তাদের দ্বাররক্ষক। যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব হল দ্বাররক্ষকরা। এই ষড়ানন শিখিধ্বজ ও শক্তি নামে অস্ত্রধারী কুমাররা স্কন্দ নামে অভিহিত।

এই সব স্কন্দের সংখ্যা ছেষট্টি কোটি। শাখ নামক গণেরাও ছেষট্টি কোটি। বিশাখের সংখ্যাও একইরূপ। নৈগমেয় নামে গণ সমূহের সংখ্যা সাতশো কোটি। এদের প্রত্যেকের এরূপ সংখ্যাক মাতৃকা আছেন। এই শূলপাণি গণপতিগণের ত্রিনেত্র ও শরীর ভস্মভূষিত। তারা শৈব নামে বিখ্যাত। অন্যান্য পশুপতগণ সংখ্যায় অনেক এবং ভস্মই এঁদের প্রহরণ। আর পিণাকপানি রুদ্রমূর্তি জটাজালমণ্ডিত কালমুখ গণেরা আপনার পরম ভক্ত। রক্ত চন্দন চর্চিত মহাব্রতধারী গণপতিগণ সবাই বীর্যশালী এবং এদের প্রত্যেকের হাতেই আছে খট্টাঙ্গ নামে যুদ্ধাস্ত্র। এইসব দিগম্বর মূর্তি মুকুটধারী নিরাশ্রয় নামে গণ সমূহের প্রহরণ।

এই বৃষধ্বজি অব্যয় গণসকল পাখির উপর উপবিষ্ট। এঁরা সবাই ত্রিনয়ন ও পদ্মপলাশ লোচন, এঁদের সকলেরই বুকে শ্রীবৎস চিহ্ন আঁকা আছে। এখানে মহাপাশুপত নামে

গণসমূহও এসেছেন। এরা অভিন্নভাবে হরিহর উপাসনা করে থাকেন। এঁদের প্রত্যেকের হাতে চক্র ও শূল আছে। আপনার রোম থেকে উৎপন্ন বীরভদ্র প্রভৃতি গণপতিগণও এখানে এসেছেন। এঁদের মুখ সিংহের মতো এবং সকলের হাতে আছে শূল, বাণ ও ধনু। অনেক প্রমথও এসেছে, এদের সাহায্য করার জন্য। এবার আপনি এদের আদেশ করুন। নন্দীর পরিচয় দানের পর তারা সকলে মহাদেবকে প্রণাম করল। তাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানিয়ে মহাদেব সকলকে বসতে বললেন। এদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করলেন মহাদেব। এই ব্যাপারে সকল গণপতিরা ভীষণ বিস্মিত হল। তারা ভাবতে লাগল, মহেশ্বর কেন এরূপে তাদের আলিঙ্গন করলেন। নন্দী তখন মহাদেবকে বললেন–প্রভু আপনি পশুপতগণকে আলিঙ্গন করার ফলে সকলে বিস্মিত হয়েছে। সুতরাং আপনি অনুগ্রহ করে ত্রিভুবনের সমৃদ্ধি বিধায়ক জ্ঞান, রূপ ও বিবেকের বিষয়ে অন্যান্য গণপতিদের কাছে সবিস্তারে বলুন। প্রমথপতি নন্দীর কথা শুনে ভগবান মহেশ্বর সেই সমস্ত গণদের বলতে লাগলেন- তোমরা অহংকারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে বৈষ্ণবপদের নিন্দা করে থাকো। পরন্তু ভক্তি ও ভাবাবেশে হরের অর্চনা করো। প্রকৃত পক্ষে বিষ্ণু ও হরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। একই মূর্তি দুই রূপে অবস্থিত। ভক্তিমান নরশ্রেষ্ঠগণ হর ও বিষ্ণু উভয়কেই জানেন। তোমাদের বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন বলে তোমরা হরির নিন্দা করে থাক। হরিনিন্দার ফলে তোমাদের জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে, ফলে আমি তোমাদের আলিঙ্গন করিনি। তখন গণসমূহরা জিজ্ঞাসা করল–প্রভু আপনি কি করে হরির সাথে এক হয়ে আছেন?

মহাদেব তাদের কথা শুনে সহাস্য বদনে সেই তত্ত্বকথা তাদের বলতে লাগলেন। তাদের তিনি বললেন–সযত্নে ভক্তিশুদ্ধ দেহ ও মন নিয়ে তা শুনতে। দুধ, ঘি, কিংবা সুগন্ধি চন্দন দিয়ে স্নানের মতো আনন্দ উপভোগ হয় এই তত্ত্বকথা কাউকে শোনালে। আমার শরীর দ্বিখণ্ডিত করলে দেখা যাবে সেখানে বিষ্ণু বিরাজমান। এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে ব্যক্তি একাহারী এবং বিষ্ণুভক্ত তারা দুজনেই সমান। কোনো ব্যক্তিই এক্ষেত্রে কোনো ভেদ কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু জগন্নাথকে নিন্দা করার জন্য তোমাদের নরকে নিক্ষেপ করলাম না। ইনি ভগবান, ইনি সর্বদা সর্বমূর্তি, সর্বব্যাপী ও সর্বগণের ঈশ্বর। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই চরাচর জগতে। তিনি শ্বেত হলদে, লাল নানা বর্ণধারী।

এর চেয়ে পরম সত্য সংসারে আর কিছু নেই। সাত্ত্বিক, রজস, তমস ও মিশ্র এই চাররকম গুণই তার আছে। এই ভগবান সদাশিব ও সর্বপূজ্য। শঙ্করের কথা শুনে নন্দী প্রভৃতি প্রমথ পতিগণ তাকে বললেন–আমাদের কাছে আপনি সদাশিবের বিশেষণ বর্ণনা করুন। এরপর মহাদেব নিজের প্রসিদ্ধ শৈবরূপ তাদের দেখালেন। ঐ ঈশ্বর রূপের হাজার পা এবং হাত।

তিনি দণ্ডপানি দুর্নিরীক্ষ এবং ইতস্তত সর্বলোক পরিব্যাপ্ত। তাদের হাতের দণ্ডে সমস্ত দেবতাদের প্রহরণ দেখা যাচ্ছে। প্রমথগণ আবার শঙ্করকে একমুখশালী রূপে দেখল। তারা দেখল তার দেহ সহস্র শিব ও বিষ্ণু চিহ্নে বিভূষিত। তার শরীরে অর্ধেক বিষ্ণু ও অর্ধেক শিবরূপ। তাই তখন গরুড়ধ্বজ, বৃষারূঢ় ও গরুড়ারূঢ় বৃষধ্বজ প্রকাশ পেল। গুণশ্রেষ্ঠ ত্রিনয়ন এরূপে যে সে মূর্তি ধারণ করতে লাগলেন, তাতেই মহাপশুপতগণের আবির্ভাব হতে লাগল। তারপর শঙ্কর কখনো বহুরূপী হতে লাগলেন। এভাবে কখনো সাদা, লাল, হলদে, নীল, মিশ্রবর্ণ, বর্ণহীন, মহাপশুপত, রুদ্র, ইন্দ্র, শম্ভু কখনো সূর্যরূপ ধারণ করলেন। আবার কখনো শঙ্কর, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও সূর্যকে অভিন্ন বলে জানতে পারল এবং তাদের অভেদবোধ দেখে শম্ভু প্রীত চিত্তে বললেন–যে, তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। অতএব তিনি মনমতো বর চাইতে বললেন। তারা বলল, তারা যেন মহাপাপ থেকে মুক্তি পায়। ভগবান শিব তাদের সেই বর দান করলেন এবং তিনি তখন সেই নিষ্পাপ গণদের আলিঙ্গন করলেন। গণাধিপতিগণ ভগবান হরের সাথে মেঘের মতো গর্জন করতে করতে ঘোড়ায় টানা রথে চেপে, মন্দার পর্বতে হাজির হল। সেই প্রমথগণ চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ালে মহাদেবের পাদস্পর্শে শরৎকালের মেঘের মতো শ্বেতকায় ওই পর্বত বলবান হরবৃষভের মতো অত্যাধিক শোভাসম্পন্ন হল।

পুলস্ত্য নারদকে বললেন, এই সময় মন্দার পর্বতে অন্ধকাসুর সদলবলে এসে হাজির হল। এই পর্বতের গুহাতে প্রমথগণ আগে থেকেই আশ্রয় নিয়েছিল। দানবরা প্রমথগণকে দেখা মাত্রই ‘কিলা কিলা’ ধ্বনি করে উঠল। প্রমথরা তখন বহু দানবকে হত্যা করল ক্রুদ্ধ হয়ে। দানবের এই ‘কিলা কিলা’ ধ্বনিতে কেঁপে উঠল স্বর্গ, মর্ত। অন্তরীক্ষ থেকে তা শুনতে পেল বিঘ্ননাশ গণেশ। তিনি দারুণ রেগে পিতার সাথে দেখা করলেন মন্দার পর্বতে গিয়ে। মহেশ্বরকে বললেন–পিতা, আপনি যুদ্ধের জন্য উৎসুক হয়েছেন, অতএব গা ঝাড়া দিয়ে উঠুন। মহেশ্বর অম্বিকাকে বললেন–আমি অন্ধকাসুরকে বধ করতে যাব। পুত্র গণেশ তুমি সাবধানে থেকো। গিরিবালা স্বামীকে আলিঙ্গন করে প্রেমপূর্ণ নয়নে বললেন–আপনি যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাই করুন। অন্ধককে আপনি নিজে বধ করবেন যেন। শঙ্কর-এর চরণ বন্দনা করলেন গিরিবালা গৌরী। তখন শঙ্কর মালিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা প্রভৃতি গৌরীর সখীদের বললেন–তোমরা সাবধানে সুরক্ষিত ঘরে গিরিবালার সাথে থেকো এবং তাকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা কোরো। দেব এরপর বৃষের পিঠে চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

গণেরা তাকে অনুসরণ করল। গণপতিরা তার জয়ধ্বনি করতে করতে মন্দার পর্বতে হাজির হল। তার যুদ্ধযাত্রার সময় নানা শুভ লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। শিয়ালরা বাঁদিকে সুস্বরে শব্দ করতে করতে চলল। তৃষিত অথচ রক্ত লালসায় হৃষ্ট হয়ে মাংসাশী প্রাণীরা চলে গেল। তার

নখ পর্যন্ত দক্ষিণঅঙ্গ কেঁপে উঠল। পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে উঠে চলল, শকুন ও শুক পাখি। এই সকল লক্ষণ চিহ্নিত করল মহাদেবের বিজয়। নন্দী বলল–এতে কোনো সন্দেহ নেই যে দেবদেব শত্রুদের পরাস্ত করবেন। নন্দীর কথার পর রুদ্রগণকে মহাপাশুপতদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দিলেন। তখন তারা বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সবেগে ছুটে গিয়ে বজ্রপাতে বনস্পতির ভূপতিত হবার মতো দানবদের বিধ্বস্ত হবার মতো দানবদের বিধ্বস্ত করতে লাগল। এই যুদ্ধ দেখার জন্য ইন্দ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও সূর্য অন্তরীক্ষে এসে সমবেত হল। তখন আকাশপথে ঘোর দুন্দুভি শোনা গেল। মহাপাষণ্ড দানব সেখানে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্যদের দলিত মথিত করতে লাগল। শুরু হল গজাধিপতিদের আক্রমণ মহাদেবের দৈত্যদের চতুরঙ্গ বাহিনী বিনষ্ট হতে দেখে দণ্ড নামে এক দানব ক্রোধ ভরে এক ভীষণ লৌহ পরিখ হাতে নিয়ে তাদের আক্রমণ করল। এই পরিখ তখন ইন্দ্রধ্বজের মতো দেখাচ্ছিল। বলবান দানব দণ্ড সেই পরিখ চারিদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে রুদ্র, স্কন্দ প্রভৃতির যাবতীয় গণকেই আহত করতে লাগল। তারা ভয়াতুর হয়ে রণে ভঙ্গ দিল।

বিনায়ক নিজ সৈন্যদলকে পরাস্ত হয়ে পালাতে দেখে তুহুন্ত নামক দানবকে সরেগে আক্রমণ করলেন। দৈত্য গণপতিকে আসতে দেখে তাঁর পেটে পরিখ ছুঁড়ে মারল। ব্রজের মতো পরিখ শত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল। দানব সবলে গণপতিকে জড়িয়ে ধরে তার মাথায় মুগুরের আঘাত করতে লাগল। বিনায়ক দৈত্যবরকে কুঠার দিয়ে আঘাত করল। সে দু-টুকরো হয়ে গেল। দৈত্য কিন্তু তার বাহুপাশ পরিত্যাগ করল না। বিনায়ক তখন বাহু বন্ধন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু সফল হলেন না। মুষল দিয়ে দৈত্যের বাহুতে সজোরে আঘাত করলেন গণেশ্বর। কুন্তোদের রাহুর হৃদয় বিদীর্ণ করে দিলেন গণধিপতি কুশধ্বজ 'প্রাস' নামে অস্ত্রের আঘাতে। তুহুন্তকে নিহত হতে ও রাহুকে পালিয়ে যেতে দেখে গণধিপতিরা আরো তেজোদীপ্ত হয়ে উঠলেন। কালাগ্নির মতো জ্বলে উঠে পাঁচজন গণধিপতি কুড়িজন দানবসেনা সংহার করলেন। বলি দৈত্য সেনাদের পরাস্ত হতে দেখে গদা নিয়ে গণ নায়কদের পেটে ও হাতে সজোরে আঘাত করল। এতে কুন্তোদের হাত ভাঙল। মহোদরের মাথা গুঁড়ো হয়ে গেল। ঘটোদরের উরুসন্ধি ও কুশধ্বজের যাবতীয় সন্ধিবন্ধন আলগা হয়ে গেল, বলি তখন স্কন্দ বিশাখাদের সংহার করার জন্য তাদের দিকে ছুটে গেল।

বলিকে ছুটে আসতে দেখে হর নন্দীকে ডেকে তাকে বধ করতে বললেন। নন্দী চক্র নিয়ে বলির মাথায় আঘাত করলেন। বলি মূর্ছিত ও ধরাশায়ী হল। কুজম্ভ ভ্রাতুস্পুত্রকে মূর্ছিত দেখে নন্দীকে মুষল ছুঁড়ে মাড়ল। নন্দী সেই মুষল ধরে নিয়ে নিজে কুজম্ভকে আঘাত করলেন এবং কুজম্ভ মারা গেল। নন্দী বজ্রাঘাতে শত শত দৈত্যদের প্রাণ সংহার করলেন। তখন দৈত্যরা

সেনানায়ক দুর্যোধনের শরণাপন্ন হল। দুর্যোধন তখন এক পাশাস্ত্র হাতে নিয়ে সবেগে তা নন্দীর দিকে নিক্ষেপ করলেন। নন্দীও বজ্রপ্রহারে সেই পাশাস্ত্র ছিন্নভিন্ন করে দিল। এরপর দুর্যোধন ঘুষি পাকিয়ে নন্দীকে আক্রমণ করল। নন্দী তাল ফলের মতো তার মাথা কেটে ফেলল। তখন মুহূর্ত মধ্যে দৈত্য ধরাশায়ী হয়ে নিহত হল।

অন্যান্য দৈত্যরা পালিয়ে গেল। হস্তী দানব নিজ পুত্রকে নিহত দেখে নন্দীকে আক্রমণ করল এবং করাল বাণবর্ষণে তাকে বিদীর্ণ করল কার্তিকেয় এক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে। গণাধিনায়করা সাহস পেয়ে নন্দীকে সামনে রেখে সক্রোধে দানবদল সংহার করতে সমুদ্যত হলেন। দৈত্যরা প্রথমে পালিয়ে গেলেও পরে দল বেঁধে ফিরে এল। তাদের ফিরে আসতে দেখে নন্দিষেণ নামে এক বাঘমুখো গণনায়ক খটিশ হাতে নিয়ে আক্রমণ করতে এগিয়ে গেল। কান্তার নামে এক দানব গদা হাতে নিয়ে ভয়ংকর গর্জন করতে করতে তার দিকে ছুটে গেল। বিশাখাকে মুক্ত করার জন্যে একদিকে নৈগমেয় এবং অন্যদিকে শাখ সেই অয়ঃশিরাকে শক্তি প্রহারে বিধ্বস্ত করে ফেললেন। অয়ঃশিরা সেই তিন নায়কের হাতে নিপীড়িত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে শম্বরের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে বলল–আমাকে গণনায়কদের হাত থেকে আপনি বাঁচান। তখন শম্বরের চারপুত্রই শক্তি ও পাশ হাতে নিয়ে আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গণনায়কদের পালটা আক্রমণে তারা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল। শম্বর ভয়ে পালিয়ে গেল। শঙ্করের পুত্র ও অন্যান্য প্রমথদের হাতে দানব সেনাদল নিহত হতে লাগল। তারা ভয়ে বিবর্ণ ও বিহ্বল হয়ে রণস্থলের থেকে পালিয়ে গেল ও শুক্রাচার্যের শরণাপন্ন হল।

পুলস্ত্য নারদকে বললেন, প্রমথগণ কর্তৃক কুজম্ভ ও অন্যান্য বহু সৈন্য নিহত হলে মহারথ অন্ধক শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে বলল–যে তার দয়াতেই দেব, গন্ধর্ব ও কিন্নরদের পরাভূত করেছিলেন। কিন্তু এখন কুজম্ভ মারা গেছে। কুরুক্ষেত্রে প্রমথদের সংখ্যাও ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। অতএব আমাদের যুদ্ধ জয়ী হবার উপায় বলে দিন। অন্ধকের এই অনুরোধে শুক্রাচার্য বললেন, তিনি তীর্থে গিয়ে তার মঙ্গল বিধান করবেন। এই বলে শুচি ব্রতালম্বী শুক্র যথাবিধি সঞ্জীবনী বিদ্যা আবৃত্তি করলেন। এই বিদ্যা আবৃত্তির ফলে নিহত দৈত্যরা সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। কুজম্ভ প্রভৃতি দৈত্যরা পুনর্জীবিত হয়ে যুদ্ধের জন্য রণস্থলে এসে হাজির হতে দেখে নন্দী শঙ্করকে বললেন–প্রমথগণ যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব দৈত্যদের বধ করেছিল, শুক্রাচার্যের বিদ্যাপ্রভাবে তারা পুনর্জীবন লাভ করেছে। শুক্রাচার্যের বিদ্যাপ্রভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের জয় অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়েছে। নন্দীর কথা শুনে মহাদেব শুক্রাচার্যকে নিয়ে আসতে বললেন। তিনি যোগাবলম্বন করে তাকে সংযত রাখবেন।

নন্দী শুক্রকে বন্দী করার জন্য গেলেন। তখন এক ভয়ংকর দানব নন্দীর পথ অবরোধ করল। নন্দীও তাকে বজ্রের আঘাত করলে সে জ্ঞান হারিয়ে ধরাশায়ী হয়ে পড়ল। এরপর কুজম্ভ, জম্ভ, বল, বৃত্র, রাক্ষস, ময় হ্রাদ প্রভৃতি প্রধান দৈত্য সেনানায়কেরা নন্দীকে লক্ষ্য করে একযোগে বিবিধ অস্ত্র ছুঁড়তে লাগল, সকলে একসঙ্গে নন্দীকে আঘাত করলে ব্রহ্মা তা দেখতে পেয়ে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের বললেন, দেবদেব শম্ভকে সাহায্য করতে। ইন্দ্র ও অন্য দেবতারা অন্তরীক্ষ থেকে শিবসেনাদের মধ্যে নেমে এলেন। প্রমথদের সাথে মিলিত হয়ে দেবতারা প্রতিরোধ্য ও দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। দুই পক্ষের গোলমালের মধ্যে নন্দী মহাদেবের কাছে শুক্রকে ধরে নিয়ে গেল এবং তাকে রক্ষক দ্বারা পরিবৃত করে রেখে দিল। তাকে নিজের মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন মহাদেব।

তখন শুক্রাচার্য হরের স্তব করে বলতে লাগলেন–তুমি হর, শঙ্কর, বিশ্বেশ্বর, মহেশ, গুণশালী ও বরদাতা; সকলের জীবন ও সর্বলোকের নাথ, বামদেব সবিতা বিশ্বরূপ বামন সদগতি মহাদেব সর্বত্ত ঈশ্বর ত্রিনয়ন হর, ভব শঙ্কর, উমাপতি, শূলপানি, পশুপতি গোপতি, তৎপুরুষ ও সত্তম ইত্যাদি। তার স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে শুক্র বলল, তিনি যেন শঙ্করের পেট থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। তখন মহাদেব তাকে বেরিয়ে আসতে বললেন। একথা শুনে শুক্র মহাদেবের পেটের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং দেখলেন চরাচর নিখিল ভুবন, সমুদ্র ও পাতাল, সেখানে অধিষ্ঠিত আছে আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব যক্ষ, বিশ্ব পুরুষ, গন্ধর্ব ও অপ্সরা, সেখানে বিরাজিত যাবতীয় মণি, সাধ্য পিপীলিকা। পশু কীট বৃক্ষ গুল্ম সরীসৃপ ফলমূল ওষধি জলচর ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং নিখিল দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীদেরও তিনি সেখানে বিরাজিত দেখতে পেলেন। এসব দেখে তিনি কৌতূহলী হয়ে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে শুক্রর আত্মা শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি মহাদেবের পেট থেকে বেরোতে পারলেন না।

এরপর শুক্র মহাদেবকে বললেন, হে বিশ্বরূপ, মহারূপ, বিরূপাক্ষ, স্বরূপধর, সহস্রাক্ষ মহাদেব শঙ্কর, শর্ব, শম্ভু, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ ও ভুজঙ্গ ভূষণ আপনার পেটের মধ্যে সমস্ত বিশ্ব একত্রে বিরাজ করতে দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। শুক্রের কথা শুনে শম্ভু তাকে নিজের পুত্র বলে সম্বোধন করলেন। এবং তার জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে বেরিয়ে আসতে বললেন। শুক্র এরপর মুক্তি পেলেন। এরপর শুক্র দ্রুত মহাসুরের সেনাবাহিনীতে ফিরে এলেন এবং তাকে দেখে সকলে আহ্লাদিত হল। গণনায়করা দেবতাদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। এর ফলে দুই পক্ষের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ শুরু হল। অন্ধক নন্দীর সাথে, অয়ঃশিরা শঙ্কু কর্ণের সাথে, বলি কুশধ্বজের সাথে ও বিরোচন নন্দীসেনের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করল।

এরূপে অশ্বগ্রীব, বিশাখা, শাখ ও বৃত্র, নৈগমেয় ও বাণ, বল ও বিনায়ক যুদ্ধে লিপ্ত হল। দানব ও প্রমথদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হতে লাগল। এরূপে শ্রেষ্ঠ দানবগণ যুদ্ধে লিপ্ত হল। দানব শ্রেষ্ঠ তুহুন্ত বজ্রপানি ইন্দ্রের সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। কুজম্ভ বিষ্ণুকে আক্রমণের জন্য সেদিকে ছুটে গেল। সেল্কি দৈত্য ও যম, বরুণ ও পবন, এক্ক ও রণপ্রচণ্ড কালনেমির মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধল। বিদ্যুন্মালী একাদশ রুদ্রের সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। অশ্বিনী কুমারদ্বয় ও তারকাসুর, আদিত্যগণ ও শঙ্কর এবং নিবাত কবচ প্রভৃতি অসুরগণ ও সাধ্যরা জৃম্ভণ রূপিণী মরুদরা দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করল। এভাবে দুশো বছর পর্যন্ত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলল। দানবরা এরপর দেবতাদের গিলতে শুরু করল এবং এতে দ্রুত দেব সৈন্য নিঃশেষিত হয়ে পড়ল। যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত জায়গা দ্রুত শূন্য হয়ে গেল। রুদ্রদেব জন্তারুপিণী অম্বিকার সৃষ্টি করলেন। দানবরা তাঁর আক্রমণে অলস ও বিবশ হয়ে পড়ল। তারা আলস্য ভরে হাই তুলতে লাগল। তখন তাদের মুখ থেকে প্রমথ ও দেবগণ বেরিয়ে পড়তে লাগল। মহাত্মা দেবতারা তখন পুনরাবির্ভূত হয়ে যুদ্ধ করে শঙ্করের সাহায্যে দানবদের পরাজিত করতে লাগলেন।

এরপর সাত-আটশো বছর ধরে মহাদেব সান্ধ্য উপাসনায় রত হলেন। আঠারোটি হাত ধারণ করলেন সেই অব্যয় পুরুষ। সরস্বতী নদীর জলে হর স্নান করে কৃতার্থ হয়ে ভক্তি ভরে নিজের মাথায় পুস্পাঞ্জলি ছুঁইয়ে তা সরস্বতী নদীর জলে নিক্ষেপ করলেন। তারপর হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করে ভাবগম্ভীর ভাবে নাচতে লাগলেন। তারপর তিনি সান্ধ্য উপাসনা শেষ করে নাচ বন্ধ করে পুনরায় দানবদের সাথে যুদ্ধ করতে কৃত সংকল্প হলেন। ফলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল। দানবরা আবার সম্পূর্ণ পরাজিত হল। অন্ধকাসুর তখন তার ভাই সুন্দাসুরকে বললেন–শম্ভুকে আমরা কোনো মতেই জয় করতে পারছি না, অতএব পদ্মলোচনা গিরিবালা যেখানে আছে, চলো আমরাও সেখানে যাই। সেখানে গিয়ে শম্ভুরূপ ধারণপূর্বক গিরিবালাকে মোহিত করার চেষ্টা করব আর সুন্দর সুর তুমি নন্দীরূপে আমার পাশে থাকবে। তাকে উপভোগ করে পরে এই দেবতা ও প্রমথদের পরাজিত করব। তৎক্ষণাৎ অন্ধক শঙ্কর ও সুন্দাঘুর নন্দীর বেশ ধারণ করল। তারপর মন্দরাচলে হাজির হল। কিন্তু তাদের শরীরে যুদ্ধের ক্ষত চিহ্ন থেকে গেল। গিরি কন্যা উমা ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে জয়া বিজয়া মালিনী প্রভৃতি সখীদের বললেন–দেখো দেখো, দেবদেব, আমার জন্য যুদ্ধে গিয়ে কিভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। তাই অবিলম্বে পুরানো ঘি, কাপড়ের টুকরো দই ও নুন নিয়ে এস। কারণ আমি নিজেই পিনাকপাণির ক্ষতস্থান বেঁধে দেব।

সেইহেতু তিনি তখন মহাদেবের শরীরে আরো কোনো জায়গায় ক্ষতচিহ্ন আছে কিনা ভালো করে দেখতে লাগলেন এবং তিনি অন্ধকের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারলেন এবং তিনি সেই স্থান

থেকে অবিলম্বে পালিয়ে গেলেন। অন্ধকও তার পিছনে ছুটে গেল। অসুরের হাতে কলুষিত হবার ভয়ে তিনি সখীগণসহ গৃহ ত্যাগ করে উপবন মধ্যে আশ্রয় নিলেন। তথাপি তিনি তপস্যার পুণ্য ফল রক্ষার জন্য অভিশাপ দিলেন না। তিনি পবিত্র সাদা অর্ক ফুলের ভেতর প্রবিষ্ট হলেন। তার সখীরা লতা গুল্মে বিলীন হয়ে গেলেন। পার্বতীকে দেখতে না পেয়ে অন্ধক সুন্দকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করল। তার ফিরে আসার সাথে সাথে প্রবল যুদ্ধ শুরু হল। বিষ্ণু তখন শঙ্করের কল্যাণ কামনায় অসুরদের বিধ্বস্ত করতে লাগলেন। তিনি এক একবারে পাঁচ-সাতজন দৈত্যকে সেনানায়ককে তীর বিদ্ধ করলেন। কিছু দৈত্যকে গদাপ্রহারে, কাউকে চক্র নিক্ষেপ, কাউকে খঙ্গাঘাতে, কাউকে দৃষ্টিপাতে ভস্মীভূত করে নিপতিত করলেন।

কিছু দানব হলাকর্ষণে, কিছু মুষল প্রহারে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। গরুড়ও ঠোঁট ও পাখার আঘাতে বেশ কিছু দানব বিনষ্ট করল। পুরাণ-পুরুষ বিধাতা তার পদ্মজলে সকলকে অভিষিক্ত করলেন। এই ব্রহ্মসলিলে অভিষিক্ত হয়ে সকলে উদ্যম শক্তি ফিরে পেল। দানবরা এই বারি স্পর্শে বিনষ্ট হল। দেবতাদের সাহায্যের জন্য ইন্দ্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। ইন্দ্রকে দেখে বলাসুর তার দিকে ছুটে গেল। বলাসুরকে দেবতা ও দানব কেউ পরাজিত করতে পারে না। ইন্দ্র তার বজ দিয়ে বলাসুরের মাথায় সজোরে আঘাত করল। কিন্তু বজ্র টুকরো টুকরো হয়ে গেল বলাসুরের মাথায় পড়ে। এবার ইন্দ্র ভয় পেয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল। জম্ভ তাঁকে কটুক্তি করলেও ইন্দ্র ফিরে এলেন না। ইন্দ্র বিষ্ণুকে বললেন, যে তিনি নিরস্ত্র হয়ে পড়েছেন তাই, বিষ্ণু যেন তাকে অস্ত্র দান করেন। বিষ্ণু ইন্দ্রকে বললেন, তুমি গর্ব পরিত্যাগ করে আমার আশ্রয় নিয়েছ, তাই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি এবং এই বলে ইন্দ্রকে এক শক্তি দিলেন অগ্নি। অগ্নি প্রদত্ত এই দারুণ শক্তি নিয়ে জম্ভকে বধ করার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরলেন ইন্দ্র। ইন্দ্রকে দেখে জম্ভাসুর ঐরাবতকে সজোরে আঘাত করল। ঐরাবত ধরাশায়ী হয়ে পড়ল। ইন্দ্র তখন ভূতলে পালিয়ে এলেন। সিদ্ধ ও চারণগণ তাকে পালাতে মানা করলেন। ইন্দ্র তখন বললেন, তিনি বিনা বাহনে কেমন করে যুদ্ধ করবেন? তখন দেবতা ও গন্ধর্বরা তার জন্য জগৎ রথ পাঠিয়ে দিল। গান্ধর্বগণ তখন স্বস্তিক চিহ্ন সম্পন্ন এক বিশাল রথ পাঠালেন যা বানরধ্বজে বিভূষিত। বহু অশ্ববাহিত, কিঙ্কিনীজালে মণ্ডিত এইরথ বিশুদ্ধ স্বর্ণে নির্মিত। তখন ইন্দ্র কোনো সারথি না দেখে জানতে চাইলেন, কিভাবে তিনি যুদ্ধ করবেন ও ঘোড়াদের কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন। কিন্তু গন্ধর্বরা যখন বলল, যে এই রথ তাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তখন ইন্দ্র রথ ত্যাগ করে ধরাতলে পতিত হলেন।

ইন্দ্রকে পতিত দেখে ভূমিতল কেঁপে উঠল। পৃথিবীকে কম্পিত দেখে এক ব্রাহ্মণ মহিলা স্বামীকে বললেন–এই বালককে যথাসুখে ঘরের বাইরে রক্ষা করুন। ব্রাহ্মণ যখন জিজ্ঞাসা

করলেন, কেন বালকটিকে ঘরের বাইরে রাখবেন? তখন ব্রাহ্মণী বললেন–যে, ধরাতলে কেঁপে কেঁপে উঠল যে বস্তু ঘরের বাইরে রাখা যায় তাই দ্বিগুণ হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ নিঃশঙ্ক চিত্তে বালককে ঘরের বাইরে রেখে দিলেন এবং পুনরায় গাভী দুটি নিয়ে যাবার জন্য ঘরে ঢুকলেন। তখন ব্রাহ্মণী বললেন, গাভীদের বাইরে রাখলে আপনার অনিষ্ট হবে। ব্রাহ্মণীর কথায় সবেগে ঘরের বাইরে এসে দেখলেন দুটি বালক মাটিতে শুয়ে আছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে ব্রাহ্মণ প্রকৃত তত্ত্ব জানতে চাইলেন এবং জানতে চাইলেন অপর বালকটি কিরূপ গুণবান হবে এবং তার কাজই বা কি হবে? এ সম্বন্ধে মহর্ষি গালবের তত্ত্ব বলতে বললেন। ব্রাহ্মণী বললেন, যে তিনি আজ কিছুই বলবেন না। ব্রাহ্মণ বললেন–যে, তিনি না শুনে জলগ্রহণ করবেন না। তখন ব্রাহ্মণী বললেন–এই বালকটি ইন্দ্রের সারথি হবে। একথা শুনেই বালকটি ইন্দ্রের সাহায্যের জন্য যাত্রা করল। গন্ধর্বরা তাদের প্রভাব বলে বালককে আরো তেজস্বী করে তুললেন। সেই বালক তখন ইন্দ্রকে বলল, যে সে তার রথের সারথী।

ইন্দ্র তখন জানতে চাইলেন, সে কার পুত্র এবং কেমন করে ঘোড়াদের নিয়ন্ত্রণ করবে? বালক তখন বলল, সে শমীকের পুত্র এবং ভূতলে জন্মে গন্ধর্ব তেজে পরিপুষ্ট হয়েছে। ইন্দ্র একথা শুনে আকাশ পথে অধিষ্ঠিত হলেন। এই ব্রাহ্মণ তনয় তখন মাতলি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এবং শমীকনন্দন মাতলি ইন্দ্রের রথের সারথি হলেন। এই রথে চেপে মন্দার পর্বতে গেলেন এবং এক সুপ্রসিদ্ধ সুবিশাল শরসহ শরাসন দেখতে পেলেন। সুরপতি সেই ধনুক গ্রহণ করে স্বত্ত্ব, রজ ও তমোময় তিন দেবতাকে স্মরণ করে তাতে জ্যারাপন করে শর সন্ধান করলেন। সেই ধনুক থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ নামাঙ্কিত অত্যুগ্র শরসমূহ বেরিয়ে গিয়ে দানব বাহিনী বিমর্দিত করতে লাগলেন। শরজালে ইন্দ্র সমস্ত পৃথিবী ঢেকে দিলেন। রথের সারথি ঘোড়া শরবিদ্ধ হয় ভুলুণ্ঠিত হল। পদাতিক বাহিনী ধরাশায়ী হল। রণস্থল অসংখ্য হতাহত সৈন্যে ভরে গেল। জম্ভ ও কুজম্ভ ভীষণ গদা হাতে নিয়ে ইন্দ্রের দিকে ছুটে গেল। বিষ্ণু কুজম্ভকে চক্রের আঘাতে নিহত করলেন। কুজম্ভকে নিহত দেখে জম্ভ ক্রুদ্ধ হয়ে বিষ্ণুকে আক্রমণ করল, ইন্দ্রও তখন যমদণ্ডের মতো ভয়ঙ্কর এক শক্তি জম্ভকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। জম্ভাসুর গদা নিয়ে সেই শক্তিকে আঘাত করল। কিন্তু সেই শক্তি জম্ভের হৃদয় বিদীর্ণ করে দিল। তাকে নিহত হতে দেখে দৈত্যরা রণস্থল ছেড়ে পালাল। প্রমথগণ তখন হরির অর্চনা করে ইন্দ্রের বীর্যবলের প্রশংসা করতে লাগল।

পুলস্ত্য নারদকে বললেন, ইন্দ্র অসুররাজ অন্ধককে বললেন–মহাসুরেরা পালিয়ে গেছে। তিনি অন্ধককে মন্দার পর্বতে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন। অন্ধক তখন বলল, সে কখনই রণস্থল ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে যাবে না। আজ তার শক্তি ও পরাক্রমের পরীক্ষা হবে। তিনি দেব, দানব,

গন্ধর্ব, ইন্দ্র ও মহেশকে যুদ্ধে জয় করবেন। অন্ধক সারথিকে বলল, রথকে হরের কাছে নিয়ে যেতে। তিনি শর বর্ষণে সমগ্র প্রমথ বাহিনী মন্থিত করবেন। সারথি তখন বিশাল ঘোড়াদের হরের দিকে চালিত করল, ঘোড়াগুলি অবসাদ গ্রস্তের মতো এগিয়ে চলল। ক্রমে তারা প্রমথ বাহিনীর নিকটবর্তী হল। ঘোড়াগুলি বায়ুর ন্যায় বেগবান হলেও প্রমথ বাহিনীর সম্মুখবর্তী হতে তাদের সম্বৎসর পার হয়ে গেল। অন্ধক এবার তীর ছুঁড়ে ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও মহেশকে আঘাত করতে উদ্যত হল। জনার্দন তখন সুরবল বাণাচ্ছন্ন দেখে দেবতাদের বললেন, এভাবে নিহত হওয়া সমীচীন নয়। শত্রু অন্ধকের সারথি ঘোড়াদের উপযুক্ত শিক্ষা দাও, রথ ভেঙে তাদের রথহীন কর, তাকে শঙ্কর ভস্মীভূত করে ফেলবেন। দেবগুরু বললেন–উপস্থিত শত্রুকে উপেক্ষা করত নেই, বাসুদেব এভাবে সকলকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। তারা তখন ইন্দ্র, বিষ্ণুদের নিয়ে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হলেন। জনার্দন হাজার ঘোড়াকে বিধ্বস্ত করলেন গদাঘাতে, কার্তিকেয় অন্ধকের সারথির হৃদয় বিদীর্ণ করে দিলেন।

বিনায়ক, প্রমথ, ইন্দ্র ও দেবতাগণ অসুরদের রথ চুর্ণ-বিচুর্ণ করলেন। অন্ধক তখন গদা নিয়ে দেবতাদের আক্রমণ করল। আটজন দেব যোদ্ধাকে বধ করে অন্ধক মহাদেবকে বলল–তুমি দেব সৈন্যদের সহায়, তাই আমি অসহায় হয়ে পড়লেও তোমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করব। অন্ধকের কথায় মহেশ ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও যাবতীয় দৈব সৈন্যদের নিজ দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। তারপর অন্ধক এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে গদা নিয়ে সবেগে শঙ্করকে আক্রমণ করল। ভবা তার বৃষবাহন পরিত্যাগ করে হাতে শূল নিয়ে গিরিতটে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি অন্ধকের সাথে ভয়াবহ যুদ্ধ করে ভৈরবমূর্তি ধারণ করে অন্ধকের বক্ষস্থলে বিদীর্ণ করে দিলেন, তার বড় দাঁতগুলি করাল হয়ে উঠেছিল। তাকে কোটি সূর্যের মতো তেজস্বী দেখাচ্ছিল, তিনি সিংহবর্মে আচ্ছন্ন, জটাজালে মণ্ডিত, ভুজঙ্গহারে ধূষিত, মল পঙ্কে পরিলিপ্ত বাঘের মতো বাহু ও আগুনের মতো চক্ষুবিশিষ্ট হয়ে এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করলেন। এবং শূল প্রহারে শত্রুকূল সংহার করতে প্রবৃত্ত হলেন। সেই দানবও তখন শূলাঘাতে শম্ভর হৃদয় বিদীর্ণ করে দিয়ে দ্রুতবেগে এক ক্রোশ দূরে গিয়ে দাঁড়াল। শিব তখন শূলাঘাতে শত্রুকে বিমর্দিত করলেন। অন্ধক তখন মহাদেবের মাথায় সজোরে গদা দিয়ে আঘাত করল, প্রজাপতি পশুপতি সেই গদাঘাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না, কিন্তু তার ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্ত ঝরে পড়ল। এ রক্তের পূর্বধারা থেকে এক ভৈরবের আবির্ভাব হল। তার নাম বিদ্যারজ। সে আগুনের মতো বর্ণময় ও পদ্মমালা গলায় ভূষিত, অপর রক্তধারা থেকে রুদ্র নামক এক ভৈরবের উৎপত্তি হল। এই রুদ্র সর্বলোক পূজিত। রক্তের অন্যধারা থেকে আরও তেরজন ভৈরবের আবির্ভাব

হল। জনসমাচা তারা-চণ্ড বা পালাদি নামে বিখ্যাত হলেন। মাটিতে মেশা রক্তধারা থেকে ললিতরাজ নামক ভৈরবের উৎপত্তি হল। তার হাতে শূল ছিল।

এরূপ সাতজন ভৈরব ছাড়াও বিঘ্নরাজ নামক এক ভৈরবের উল্লেখ আছে। সর্বমোট আটজন ভৈরব।

মহাদেব মহাসুরকে হঠাৎ দারুণভাবে শূল বিদ্ধ করল। শূলভেদহেতু রক্তস্রাবে মহাদেবের মূর্তি আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে গেল। মহাদেবের কপাল হতে ঘাম ঝরে পড়তে লাগল। এই ঘাম থেকে এক রক্তাপ্লুত কন্যা জন্মগ্রহণ করল। ভূতলে পতিত ঘাম থেকে কয়লার মতো কালো এক বালক জন্মাল। সেই বালক তৃষ্ণাতুর হয়ে অন্ধকের রক্ত পান করতে লাগল। কন্যাটিও অন্ধকের রক্ত চেটে খেতে লাগল। মহাদেব প্রভাতকালীন সূর্যের মতো কান্তিমতী কন্যাকে বললেন– দেবগণ, মহর্ষিগণ, পিতৃগণ এবং যক্ষ, বিদ্যাধর ও মানুষেরা তোমাকে পূজা করবেন এবং তারা বলি, ফুল ও উপহার হাতে নিয়ে তোমার স্তুতি করবেন। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার। অন্ধকাসুরের রক্তচর্চিত হওয়ার জন্য তার নাম হবে বর্ধিকা। শঙ্কর একই কথা বললে বর্ধিক তখন বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গার অনুসরণে যাত্রা করলেন। তিনি মহীতলে বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করে পরে হিঙ্গুল পর্বতে পৌঁছলেন। মহাদেব কুজকে সর্বশ্রেষ্ঠ বরদান করে বললেন, গ্রহরাজ হয়ে জগতের শুভাশুভ বিধান করবে। অন্য গ্রহ তার অনিষ্ট করবে না। এরপর ভগবান অন্ধকের রক্ত পান করে তাকে অস্থিচর্মসার করে তুললেন। শম্ভুর বক্ষ থেকে উৎপন্ন আগুনের স্পর্শে অন্ধকের সকল পাপ দূরীভূত হল। অন্ধক এরপর আদিপুরুষের স্তব করে বলতে লাগল-তুমি ভীম মূর্তি ভৈরব, ত্রিলোকপিতা, সুতীক্ষ্ণ শূলধারী, বাসুকিহারভূষিত, কৃপালমি ও ত্রিনয়ন, সর্বেশ্বর, বিশ্বমূর্তি, সুরাসুরবন্দিত পাদপীঠ, ত্রিলোকের জনক জননী, বৃষকেতন, সকলের আশ্রয়দাতা আমি তোমার শরণাপন্ন হলাম। দেবগণ তোমায় শিব, সিদ্ধগণ হর, মহর্ষিগণ স্থানু, যক্ষগণ ভীম, মনুষ্যগণ মহেশ্বর, ভূতগণ ভূতাধিপ, নিশাচরের উগ্র, পবিত্রচেতা পিতৃগণ ভব নামে অভিহিত করে থাকেন। আমি তোমার দাস। আমার যাবতীয় পাপ দূর কর। তুমি ত্রিযুগ, ত্রিধর্মা, ত্রিপুষ্কার, ত্রিনেত্র সর্বব্যাপী, শ্রুতিরূপী ও অব্যয় পুরুষ। আমি তোমার শরণাগত, ত্রিপদ প্রতিষ্ঠ, ষড়ঙ্গবিভু, স্ত্রীপুরান্মুখ, ত্রিলোকীনাথ আমায় পবিত্র কর। আমি অপরাধী, আমি কাম রিপুর বশীভূত, এখন তোমার করুণাপ্রার্থী। আমি পাপী, পাপকর্মা, ও পাপাত্মা, আমার পাপ হরণ কর। তুমি কর্তা, ধাতা, জয় মহাজয়, মঙ্গল্য, ঈশাণ, ওঁকার, অব্যয় ও ধ্রুবস্বরূপ, ব্রহ্মা, সৃষ্টিকর্তা, সর্বরক্ষক বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বর্ষাকার, ধর্ম, সূক্ষ্ম, ব্যক্তরূপ, অব্যক্ত, ধীবর ও সচরাচরব্যাপী, আদি, মধ্য, অন্ত, সহস্রপাদ, বিজয়, সহস্রাক্ষ বিরূপাক্ষ, মহাভুজ, অনন্ত, সর্বগামী, সর্বব্যাপী, পরমাত্মা, পুণ্যাধিক, অব্যয়, সুরপতি, রুদ্র

পশুপতি, শিব, ত্রিবিদ্যার আধার, জিতক্রোধ, শত্রুজয়ী, জিতেন্দ্রিয়, জয় ও শূলপানি, আমি তোমার শরণাগত।

পশুপতি অন্ধকের স্তবে প্রীত হলেন এবং অন্ধককে তিনি বর দিতে চাইলে অন্ধক তাকে বলল, যেন তার যাবতীয় কায়িক ও মানসিক পাপ দূরীভূত হয়। দানব ভাব বিদূরিত হয় এবং যেন হরের প্রতি অবিচল ভক্তি থাকে। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে একে সকল পাপ থেকে মুক্ত করলেন। তিনি বললেন–দৈত্যভাব থেকে মুক্ত হয়ে ভৃঙ্গী নামে 'আমার গণপতি হও।' এই বর দানের পর অন্ধককে শূল মুক্ত করে তাকে সুস্থ করে তুললেন। তারপর নিজ দেহ থেকে সকল দেবতাকে বাইরে বার করে আনলেন। পরে নন্দী ও অন্যান্য গণসমূহকে ভৃঙ্গীকে দেখিয়ে বললেন–এই সেই অন্ধক। ভগবান এবার সকলকে নিজ নিজ স্থানে গিয়ে সুখভোগ করতে বললেন। ইন্দ্র মলয় পর্বতে চলে যান। এবং কাজ শেষ হলে স্বর্গলোকে চলে যাবেন। এবার ভব সুখাসীন হয়ে প্রমথদেরও বিদায় দিলেন। তারা নিজ নিজ বাহনে চেপে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করলেন। এই সকল স্থানে গোসমূহ কোম দোহন করে এবং হ্রদসমূহ পায়কর্দমে পরিপূর্ণ থাকে। নদীসমূহ অমৃতধারা বহন করে। মহেশ্বর এরপর অন্ধককে সাথে নিয়ে নন্দী শৈলে এলেন। দুহাজার বছর পরে ফিরে তিনি গিরিবালাকে সাদা অকফুলের মধ্যে দেখলেন। এবং মহেশকে দেখে তিনি ফুল থেকে বেরিয়ে এসে সখীদের ডাকলেন। দেবীর আহ্বানে জয়া বিজয়া এসে হাজির হলেন। তখন দেবী সখী পরিবৃত হরের অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরে মহাদেব অন্ধক, নন্দী ও গিরিজা তিনজনকেই আলিঙ্গন করলেন। তিনি দেবীকে জানালেন যে, তিনি অন্ধককে তার দাসত্বে নিয়োগ করেছেন। তুমি তাকে তোমার পুত্র রূপে দেখো। তিনি অন্ধককে জননীর শরণাপন্ন হতে বললেন। অন্ধক ভক্তি বিনম্র চিত্তে গৌরীর স্তব করতে লাগল। সে বলতে লাগল–যিনি দেবপ্রিয়া, শিবপ্রিয়া, লোকধাত্রী, জনায়িত্রী, স্কন্দজননী, মহাদেব প্রণয়িনী, চেতনা, ত্রিলোকমাতা, ধরিত্রী, দেবতা, মাতা শ্রুতি, স্মৃতি, দয়াস, লজ্জা, কামপ্রসবিনী, প্রীতিরূপিণী, সদাপার্বণী, দৈত্যসৈন্য সংহারকারিণী, মহামায়া, সুমায়া, বৈজয়ন্তী, শুভরূপিণী, কালরাত্রি গোবিন্দ প্রসবিনী, গিরিরাজ পুত্রী, সর্বদের বন্দিতা, বিদ্যা, সরস্বতী, ত্রিনেত্র মহিষী ও মৃড়ানী সেই দেবীকে প্রণাম করি। দেবী তুষ্ট হয়ে তাকে বর দিতে চাইলেন। ভৃঙ্গী তখন চাইল, তার সব পাপ যেন ক্ষয় হয়। গৌরী "তথাস্তু' বলে বর দান করলেন এবং বললেন, মহাদেবের পূজা করে গণসমূহের আধিপত্য লাভ কর। পুলস্ত্য এরপর নারদকে বললেন–যে, তিনি এক পবিত্র, পুণ্যদায়ী কাহিনি তাঁকে বর্ণনা করলেন।

৩৯

নারদ পুলস্ত্যর কাছে জানতে চাইলেন, মহেন্দ্র মলয়াচলে গিয়ে কী কাজ করলেন। পুলস্ত্য বললেন, তিনি তার বিবরণ দিচ্ছেন। ময় ও তার দানবরা পরাজিত হয়ে যখন পাতালে যেতে উদ্যত হল, তখন হঠাৎ তারা মলয়াচলের নয়নাভিরাম প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা দেখল সিদ্ধগণ পরিবৃত মলয় পর্বতের নানা স্থান লতাবিতানে আবৃত হয়ে আছে। সেখানে মদমত্ত প্রাণীগণ বিচরণ করছে, ভুজঙ্গবেষ্টিত কত শত সুশীতল চন্দন তরু বিরাজ করছে এবং সুগন্ধি ফুলের সৌরভ ভরে সেই স্থান সর্বদাই ভরে আছে। তারা সেখানে বাস করবে বলে মনস্থির করল। তারা দেবতাদের পতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করতে লাগল। শঙ্কর তখন ইন্দ্রকে মলয় পর্বতে পাঠালেন। ইন্দ্র পথে গোমাতা সুরভির দেখা পেয়ে তাকে প্রদক্ষিণ করে মলয় পর্বতের দিকে তাকালেন। তিনি দেখলেন দানবরা বেশ আনন্দেই সেখানে বাস করছে। ইন্দ্র তখন তাদের যুদ্ধের আহ্বান জানালেন। ইন্দ্রের ডাকে তারা তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসতে লাগল। ইন্দ্র শরবর্ষণে সেই দৈত্যদের সমচ্ছন্ন করে ফেললেন। ইন্দ্র তীর ছুঁড়ে পাক নামক দানবকে বধ করলেন। ইন্দ্র তখন ‘পাকশাসন’ নামে অভিহিত হলেন। তারপর তিনি পুরদানবকে নিহত করে পুরন্দর’ নামে প্রসিদ্ধ হলেন। ইন্দ্রের হাতে পরাজিত হয়ে দানবরা আবার রসাতলে আশ্রয় নিল। ত্রিলোচন এই কার্য সাধনের জন্য ইন্দ্রকে মলয় পর্বতে পাঠিয়ে ছিলেন। নারদ তারপর জানতে চাইলেন, ইন্দ্রকে গোত্রভিৎ বলা হয় কেন?

পুলস্ত্য বললেন, তিনি সব কাহিনি বলবেন। দিতি তার পুত্র নিহত হবার পর পতি কাশ্যপের কাছে। ইন্দ্রের হন্তাকারী পুত্র প্রার্থনা করল। দিতির প্রার্থনায় কশ্যপ বললেন, সহস্র দিব্য বৎসর ধরে শুদ্ধাচার পালন করলে ত্রিলোকনায়ক ইন্দ্রহন্তা পুত্র প্রসব করতে পারবে। দিতি তখনই শৌচাচার পালন করতে লাগলেন। কশ্যপ তার গর্ভধারণ করে দিয়ে উদয়াচলে চলে গেলেন। তিনি চলে যাবার পর ইন্দ্র দিতির সেবা করার জন্য সেখানে এলেন। নিয়তির প্রেরণায় দিতি ইন্দ্রকে সেবা করার অনুমতি দিলেন। ইন্দ্রও তার সেবা করতে লাগলেন ছিদ্রান্বেষী সাপের মতো। এভাবে দশ বছর পার হবার পর একদিন দিতি শোকার্ত হৃদয়ে স্নান করে চুল খুলে শুয়ে ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তখন দিতির নাকের ছিদ্র দিয়ে তার পেটের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন একটি বালক কোমরে হাত দিয়ে ঊর্ধ্বমুখে অবস্থান করছে। ইন্দ্র তার মুখমণ্ডল মাংসপেশী হাত দিয়ে ধরে পিষতে লাগলেন। তখন ওই মাংসপেশী কঠিন হয়ে উঠল। পরে তা উপরের দিকে অর্ধেক এবং নিচের দিকে অর্ধেক বেড়ে উঠল। তখন তা থেকে এক শতপর্ব বজ্র উৎপন্ন হল। ওই বজ্রের আঘাতে ইন্দ্র দিতির গর্ভকে সাত টুকরো করে দিলেন। গর্ভস্থ বালক উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল। দিতি ইন্দ্রের এই

বীভৎস কাজ ও বালকের কান্না শুনতে পেলেন। ইন্দ্র এরপর সপ্তখণ্ডিত গর্ভের প্রত্যেকটি খণ্ডকে সাত টুকরো করে দিলেন। সেই খণ্ড মরুৎ নামে ইন্দ্রের ভৃত্যরূপে আবির্ভূত হল। ইন্দ্র তখন গর্ভ থেকে বেরিয়ে ভীত হয়ে কৃতকার্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। দিতি তখন ইন্দ্রকে বললেন, এতে তোমার কোনো দোষ নেই এ আমার অদৃষ্টলিপি। পূর্বকালে ইন্দ্র এই ভাবে নিজ সহোদরদের বজ্রাঘাতে ছিন্ন করেন এবং গোত্রভি নামে খ্যাত হন। নারদ মহর্ষি পুলস্ত্যর কাছে জানতে চাইলেন, দিতি থেকে উৎপন্ন যে শ্রেষ্ঠ মরুৎগণের কথা আপনি বললেন, তার। কে এবং পূর্বেই বা কারা মরুৎ নামে প্রসিদ্ধ ছিল–সেসব কাহিনি আমাকে বলুন।

পুলস্ত্য বললেন, স্বয়ম্ভুব মন্বন্তর থেকে বর্তমান মন্বন্তর পর্যন্ত আগেকার মরুৎগণের উৎপত্তি কাহিনি বলছি শোনো। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত। তাঁর যবন নামক ত্রিলোক প্রসিদ্ধ পুত্র হয়েছিল। যবন অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। তখন তাঁর পত্নী সুবেদা শোক বিহ্বল হয়ে কাঁদতে থাকেন। তিনি তার পতির মৃতদেহ ধরে কাঁদতে থাকলে এই সময় অন্তরীক্ষ থেকে এক আকাশ বাণী আবির্ভূত হয়ে সুবেদাকে কাঁদতে কাঁদতে পতির চিতার আগুনে ঝাঁপ দিতে বলল। তখন রাজপত্নী বলল, এই রাজা নিঃসন্তান, বলেই তিনি কাঁদছেন নতুবা তার কান্নার কারণ নেই। তখন আকাশবাণী বলল ওই রাজার ঔরসে তোমার সাতপুত্র উৎপন্ন হবে। তুমি চিতার আগুনে ঝাঁপ দাও। সুবেদা তখন স্বামীর চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে অগ্নির ধ্যান করতে লাগলেন। তারপর তার স্বামী পূর্বশ্রী ফিরে পেয়ে পত্নী সনন্দিনীকে সাথে নিয়ে চিতা থেকে উঠে এসে অন্তরীক্ষে চলে গেলেন। কিছুদিন পরে মহিষী রজঃস্বলা হলে রাজা তার সাথে মিলিত হলেন। পরিণামে বলবীর্যশালী পুত্র জন্মাল। এই পুত্ররা সকলে সুবুদ্ধিসম্পন্ন, মহান ও অধিপতি হলেন। পাঁচদিন ধরে রাজা মহিষীর সাথে আকাশে অবস্থান করলেন। পরে ষষ্ঠ ঋতু ব্যর্থ হতে না দেবার অভিপ্রায়ে কামাচারী হয়ে তার সাথে রমণ করলেন। তখন অন্তরীক্ষ থেকে তার শুক্র স্খলিত হবার পর তিনি পত্নীসহ দিব্যজীবন লাভ করে ব্রহ্মলোকে চলে গলেন। অন্তরীক্ষ থেকে তার স্খলিত শুক্র এক পদ্মফুলের মধ্যে পড়ল। তখন চিত্রা, বিশালা, হরিতা, অনিলীনা প্রভৃতি মুনিপত্নীরা এই ঘটনা দেখতে পেলেন। তারা মুনিদের সে ব্যাপারে কোনো কথাই বললেন–না। তারা চিরস্থায়ী যৌবন লাভ করার ইচ্ছায় সেই শুক্র পান করলেন। অমনি তাদের ব্রহ্মতেজ নষ্ট হয়ে গেল। তারা কলুষিত হয়ে পড়লে তাদের পতিরা তাঁদের পরিত্যাগ করলেন।

তাদের গর্ভে সাতটি পুত্র উৎপন্ন হল এবং সেই বালকদের কান্নার শব্দে জগৎ বিচলিত হয়ে পড়ল। তখন ব্রহ্মা তাদের বললেন, তারা মরুৎ নামে বিখ্যাত হবে এবং তাদের বয়ঃকাল স্থির

থাকবে। ব্রহ্মা তাদের নিয়ে আকাশচারী মরুৎপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তারা আদি মরুৎ নামে পরিচিত হলেন।

পুলস্ত্য এবার মরুৎগণের কথা বলতে শুরু করলেন। স্বরোচিষের পুত্র ঋতধ্বজ। তার আবার সাত পুত্র। তারা সকলেই সূর্যসম পরাক্রমী ছিল। তারা তপস্যার জন্য মেরুপর্বতে যায়। সেখানে তারা ব্রহ্মার উপাসনা করতে লাগল। তাদের কঠোর তপস্যায় ভয় পেয়ে ইন্দ্র অপ্সরা পুতনাকে বললেন, মেরু পর্বতে চলে যেতে এবং ঋতধ্বজের পুত্রদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাতে। তারা যেন কিছুতেই সিদ্ধিলাভ করতে না পারে। আশ্রমের খুব কাছেই একটি ছোট নদী বয়ে যাচ্ছে। তন্বী পুতনা সেই নদীর জলে স্নান করতে লাগল। তা দেখে রাজকুমারদের মন বিচলিত হয়ে উঠল এবং তাদের বীর্য স্খলিত হল। এক জলচারিণী শঙ্খিনী সেই শুক্র পান করল। তাদের তপঃচ্যুতি ঘটায় তারা নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন। এর বহুকাল পরে সেই শঙ্খরূপিণী প্রেয়সী জেলেদের জালে ধরা পড়ল। জেলে ঋতধ্বজের পুত্রদের সেকথা বলল। তখন রাজকুমাররা সেই শঙ্খিনীকে দীঘির জলে ছেড়ে দিলেন। সেই শঙ্খিনী সাতটি শিশু সন্তান প্রসব করল। এরা ভূমিষ্ঠ হতেই মহাশঙ্খী মারা গেল। তখন এই অনাথ বালকরা দীঘির জলে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে স্তন্যপিপাসায় কাঁদতে লাগল। ব্রহ্মা তখন তাদের বললেন–তারা বায়ুস্কন্দ বিহারী হবে। ব্রহ্মা তাদের নিয়ে আকাশচারী মরুৎপদে প্রতিষ্ঠা করলেন। স্বারোচিষ মন্বন্তরে এভাবেই মরুৎগণের আবির্ভাব হয়েছিল।

এরপর পুলস্ত্য উত্তম মন্বন্তরীয় মরুৎগণের কথা বলতে লাগলেন। রাজা বমান নিষধরাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি সূর্যসম পরাক্রমশালী ছিলেন। তার পুত্রের নাম জ্যোতিষ্মন, তিনি গুণশালী ও ধার্মিক ছিলেন। তিনি পুত্রলাভের আশায় মন্দাকিনীর তীরে তপস্যা করেন। তার পত্নী তপস্যাকালীন তাঁকে সেবা শুশ্রূষা করেন। তিনি অতিথিদের যথাযোগ্য পরিচর্যা করতেন। এই পদ্মপলাশ লোচনা সুশ্রোণী এরূপে পতির সেবা করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়লেন। এ অবস্থাতেও তিনি তেজস্বিনী ও সৌন্দর্যশালিনী ছিলেন। সপ্তর্ষিগণ তাঁকে দেখতে পেয়ে তাদের তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাজপত্নী সুশ্রোণী বললেন, আমরা পুত্রকামনায় তপস্যা করছি। তখন সেই সাত ঋষি দ্বারা তারা বরপ্রাপ্ত হলেন যে, সাত পুত্রের জন্ম দেবেন। তখন রাজর্ষি জ্যোতিষ্মন পত্নীকে সাথে নিয়ে নগরে ফিরে গেলেন এবং মহিষী গর্ভধারণ করলেন রাজার সংসর্গে। তার গর্ভাবস্থাতেই রাজা মারা গেলেন। তখন পত্নী তার সাথে সহমরণে যেতে বাইলেন। অমাত্যদের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি নিজ প্রতিজ্ঞায় অটল রইলেন। তিনি চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়লে আগুন থেকে শীতল জল পড়তে লাগল। সেই শীতল

জলরাশিতে সিক্ত হয়ে রাজমহিষীর গর্ভ সাতভাগে বিভক্ত হয়ে গেল তা থেকেই মন্বন্তরীয় মরুৎগণের উৎপত্তি হয়েছিল।

পুলস্ত্য নারদকে বললেন, এরপর তিনি তামস মরুদগণের উৎপত্তির কাহিনি বলবেন। দন্তধ্বজ নামক তামস মনুর এক বিখ্যাত পুত্র ছিলেন। তিনি পুত্রকামনায় নিজ রক্ত মাংস আগুনে আহুতি দেন। সেই রাজা তার চুল, রোম, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, হোমানলে আহুতি দেন, এমনকি শুক্র পর্যন্ত তোমালনে আহুতি দিতে উদ্যত হলে, এইসময় হঠাৎই ‘শুক্র নিক্ষেপ কোরো না তুমি’–এরূপ বাক্য হোমানল থেকে শুনতে পাওয়া গেল। রাজা তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হল। তারপর সেই আগুন থেকে সাতটি তেজস্বী পুত্র আবির্ভূত হয়ে খুব জোরে কাঁদতে লাগল। তাদের কান্না শুনে ব্রহ্মা তাদের মরুৎগণের দেবতা করে দিলেন। এরাই তামস মন্বন্তরে মরুৎ দেবতা নামে বিখ্যাত হন। এরপর পুলস্ত্য রৈবত মন্বন্তরে যাঁরা মরুৎ হয়েছিলেন তাদের কথা বলতে শুরু করেন।

রৈবতের বংশে রিপুজিৎ নামে এক বলবান রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি পুত্র লাভের ইচ্ছায় সূর্যদেবের আরাধনা করেন। এর ফলে তিনি একটি কন্যা সন্তান লাভ করেন। পিতৃগৃহে বাস কালে এই কন্যার পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং কন্যা শোকে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। সপ্তঋষিরা তাকে প্রাণ ত্যাগ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু রাজকন্যা অবিলম্বে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিল। তখন সেই প্রজ্জ্বলিত আগুন থেকে সাতটি শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করল। এরা মাতৃবিয়োগে কাঁদতে থাকলে ব্রহ্মা তাদের মরুৎ নামের দেবতা করে দিলেন। এই ভাবেই রৈবত মন্বন্তরে মরুৎগণের উৎপত্তি হয়েছিল। মহিক নামে এক সত্যবাদী পবিত্র তপস্বী সপ্তসারস্বত তীর্থে কঠোর তপস্যা করেন। দেবতারা ভীত হয়ে তার তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফলে তার শুক্র স্খলিত হয়ে সপ্তসারস্বত তীর্থের জলে গিয়ে পড়ে। তখন মুনিরা তাকে শাপ দিয়ে বলেন, যজ্ঞ কর্মের প্রারম্ভে তোমার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ঋষিরা তাকে শাপ দিয়ে ফিরে এলেন। তারপর এই সপ্তসারস্বত থেকে সপ্ত মরূৎ অবতীর্ণ হল।

পুলস্ত্য জানালেন, একারণেই বলিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রহ্লাদ মন্ত্রী ও শুক্রাচার্য পুরোহিত হন। দানবরা তাকে দেখতে এলে বলি তাদের যথোচিত অর্চনা করে সেখানের অভিজ্ঞদের কাছে জানতে চাইলেন, কি করলে সকলের কল্যাণ হবে। তারা বললেন–যে তার প্রপিতামহ হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত শক্তিশালী, দানবদের পরিপালক, অদ্বিতীয় বীর ও ত্রিভুবনের ইন্দ্র ছিলেন। বিষ্ণু সিংহ রূপ ধারণ করে দৈত্যপতিকে সর্বজন সমক্ষেই বধ করেন। বিষ্ণু কুজমভাবাও বধ করেন। সুদর্শন, শঙ্খ ও পাক ইন্দ্রের হাতে নিহত হয়। পিতা বিরোচনও

দেবতাদের দ্বারা নিহত হন। বলি তখন ইন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। প্রধান সেনাপতিরা সৈন্যদের আগে চলল। মাঝে বলি, পিছনে কালনেমি, বাঁ দিকে শাম্ব ও ডান দিকে তারকাসুর, সৈন্যদের পরিচালনা করে নিয়ে যেতে লাগল। এভাবে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চলল বহু সহস্র, অযুত ও অবুদ দানব। ইন্দ্রও দেবতাদের নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। সমগ্র আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিদ্যাধর, গুহ্যক, যক্ষ, রাজর্ষি, সিদ্ধ ও ভূতগণ– কেউ রথে, ঘোড়ায়, হাতির পিঠে চেপে কেউ পক্ষিবাহিত বিমানে যেস্থানে দৈত্যসৈন্য সমবেত হয়েছিল সেখানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বিষ্ণু গরুড়ের পিঠে চেপে যাত্রা করলেন। ইন্দ্র তখন বিষ্ণুর বন্দনা করলেন। কার্তিকেয় দৈবসৈন্যদের সামনে থাকলেন। বিষ্ণু সৈন্যবুহ্যের পশ্চাদভাগে, ইন্দ্র মধ্যে, জয়ন্ত বাঁদিক এবং বলবান বরুণ ডানদিক রক্ষার ভার নিলেন। এভাবে দেবতারা শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদের আক্রমণ করল। উদয় পর্বতের পাদদেশে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। দেব সেনাপতি কার্তিকেয়র বাহুবলে পরিক্ষিত হয়ে দেবসেনা দানব সেনাদের সংহার করতে লাগলেন। ময়ের আধিপত্যে দানবরা দেবদেরও দলিত মথিত করতে লাগল। রথের চাকার ঘর্ষণে রণস্থল ধূলার অন্ধকার মেঘের মতো হয়ে উঠল।

ক্রমে যুদ্ধ ভয়ানক হয়ে উঠল। অল্প সময়ের মধ্যেই রক্তস্রোত বয়ে যেতে লাগল। তাতে ধূলারাশি সকল দূর হল, ধূলিজাল দূর হলে দেবতারা সুবিশাল দানবসেনাদের আক্রমণ করলেন। দেবতারা তখন অমৃত রসের আস্বাদে পরন্মুখ হয়েছিল। অবিলম্বে তারা দানব সেনার হাতে পরাজিত হয়েছিল। বিষ্ণু শরবর্ষণ করতে লাগলেন। বিষ্ণুর আক্রমণ থেকে বাঁচতে দৈত্যরা কালনেমির কাছে গেল। কালনেমি বিষ্ণুকে আক্রমণ করতে গেল। দেব, যক্ষ, কিন্নর, প্রভৃতি সকলকেই মুখের মধ্যে সে পুরে নিতে লাগল। নিজ অস্ত্রহীন হয়েও তিনি হাত, পা, ও নখের আঘাতে, ইন্দ্র, বরুণ সূর্য প্রভৃতি দেবসেনাদের বিমর্দিত করতে লাগল। কালনেমি ক্রমে বিশ্বসংসার পুড়িয়ে ছাই করে দেবার অভিপ্রায়ে পৃথিবী ও আকাশের উপর নিচ আশপাশ সমস্ত দিকই ব্যাপ্ত করে প্রলয় কালীন আগুনের মতো ভীষণ মূর্তি ধারণ করল। দেবতারা ভয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। দৈত্যরা তখন বিষ্ণুর দিকে অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে মারতে লাগল।

বিষ্ণুও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বজ্রকঠিন বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। ময়, বলি, কালনেমির আক্রমণে দেবতারা শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। বিষ্ণুর দৃষ্টিপাতে বলি, ময় শরজালে আচ্ছাদিত হয়ে কালনেমির শরণাপন্ন হল। কালনেমি কেশবকে আক্রমণে উদ্যত হল। কেশব তাকে গদা হাতে আসতে দেখে নিজে ধনুক রেখে চক্র হাতে তুলে নিলেন। কালনেমি কেশবকে দেখে হেসে বলল, এই ব্যক্তি যুদ্ধে তার বিঘ্নকারী। এর মতো ক্রুর লোক আর নেই। যদি বিষ্ণু ভয়ে পালিয়ে না যায় তবে এখুনি তাকে পিষ্ট ও ভস্মীভূত করে দেবে। কালনেমি গদা দিয়ে গরুড়কে

আঘাত করল। বিষ্ণু কালনেমির এই গদাকে চক্রাঘাতে ছিন্ন করে দিলেন। এবং কালনেমির দুই বাহু কেটে দিলেন। তারপর বিষ্ণু চক্র দিয়ে তার মাথাও কেটে ফেললেন। মস্তক ও বাহুহীন কালনেমি বুড়ো তালগাছ সম হল। গরুড় এরপর ঠোঁট দিয়ে। তার বুকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিল। কালনেমি নিহত হলে দেবতারা আক্রমণ করলে দানবরা ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাল কেবল বানাসুর ছাড়া।

৪০

পুলস্ত্য বললেন, বানাসুরকে নির্ভীক দেখে দানবরা পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। বিষ্ণু বানাসুরকে অজেয় জেনে দেবতাদের নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ করে যেতে বললেন–এবং যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে বিষ্ণু অন্তর্হিত হলেন। মাধবের অন্তর্হিত হবার কথা শুক্রাচার্য বলিকে জানালেন। তখন বলি শুক্রাচার্যের কথা অনুসারে দেবসেনাদের আক্রমণ করল। বহু দেবসেনা বধ করল। মায়াপুর বহু রূপ ধরে যুদ্ধ করতে লাগল। এই সময় দেবসৈন্যদের আক্রমণ করল বিদ্যাজি, পর, ভদ্র, বৃষপর্বা, অসিতাক্ষ, বিপাক, পিঙ্কুর প্রভৃতিরা। এদিকে জনার্দনকে যুদ্ধক্ষেত্রে না দেখে দেব সেনারা রণে ভঙ্গ দিল। বলি, বান তাদের পশ্চাতে ধাবন করল। ইন্দ্ররা স্বর্গধাম থেকে ব্রহ্মলোকে পালিয়ে গেল। বলি সকলের সাথে স্বর্গরাজ্য ভোগ করতে লাগলেন। বানাসুর যমের, ময় বরুণের, রাহু চন্দ্রের, স্বর্ভানু সূর্যের এবং শুক্র বৃহস্পতির স্থান দখল করলেন। অন্যান্য অসুররা দেবতাদের স্থান দখল করল। এই সময় ছিল পঞ্চম কলির আরম্ভ ও দ্বাপর যুগের অবসান লগ্ন। ক্রমে সপ্ত পাতাল, ত্রিভুবন বলি দখল করে নিলেন। বলি সুখে স্বর্গে বাস করতে লাগলেন। গান্ধর্ব গায়কদল তাদের মনোরঞ্জনে নিযুক্ত হল। অপ্সরা তাদের নৃত্যের দ্বারা দৈত্যদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করল। বলি এরপর পিতামহ প্রহ্লাদকে স্মরণ করার সাথে সাথে তিনি পাতাল থেকে স্বর্গে চলে এলেন। বলি তাঁর চরণ যুগল বন্দনা করলেন। এরপর বলি তাকে বললেন–আমার বাহুবলে বিজিত এই ত্রিভুবন ব্যাপী রাজ্য আপনি ভোগ করুন। আর আমি দাস হয়ে আপনার সেবা করবো। আপনার উচ্ছিষ্ট অন্নে জীবন যাপন করব।

বলির অনুরোধে প্রহাদ বললেন–নিষ্কন্টক রাজ্য শাসন, অন্তরঙ্গ বন্ধুর সম্মান, যথেষ্ট। তিনি এক সময় সংসার ধর্ম পালন করেছেন। এখন তিনি যোগ সাধনেই নিরত, তাই এই রাজ্যভার তিনি বলিকেই সমর্পিত করলেন এবং বলিকে ইন্দ্রের সিংহাসনে বসালেন। বলি তখন প্রহ্লাদের কাছে জানতে চাইলেন, চতুবর্গের কোন্‌টি তাঁর অবশ্য কর্তব্য। প্রহ্লাদ তখন বললেন, যা ভবিষ্যতে স্থিতিশীল তাই ত্রিভুবনে স্থিত। একমাত্র ধর্মনিষ্ঠ পথেই অর্থ উপার্জন করা উচিত।

ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সাধন করা উচিত। জনসমাজে সম্মান, যশ, কীর্তি পাওয়ার মতো কাজ করা উচিত। কুলব্য বিপন্ন সখা, আত্মীয় স্বজন পরিত্যক্ত, বৃদ্ধ জ্ঞাতি, গুণী ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মণ সসম্মানে যাতে সুখে বাস করতে পারেন তার ব্যবস্থা করলে তুমি যশস্বী হবে। সুতরাং দেবজ্ঞ ও ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা এ স্থানে বাস করুক, অধীনস্থ রাজারা তোমার আদেশে ধর্মকার্যে রত হোক, ব্রাহ্মণরা যাগযজ্ঞ করুন। যজ্ঞের আগুনের ধোঁয়াতেই রাজার শান্তি। শাস্ত্রজীবী ক্ষত্রিয়রা বেদপাঠ, যজ্ঞ ও দানধ্যানে সর্বদা নিরত থেকে প্রজা রঞ্জন করুন। বৈশ্যরা অধ্যয়ন ও কৃষিকাজ, এবং শূদ্ররা সেবা শুশ্রূষার কাজে নিযুক্ত হোন। বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা নিজেদের ধর্ম পালন করলে তবেই ধর্মের বৃদ্ধি ও রাজার শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। প্রহ্লাদের উপদেশ শুনে বলি বললেন–আপনার আদেশ শিরোধার্য করলাম। পুলস্ত্য জানালেন, এরপর বলি রাজধর্মানুসারে রাজ্য পালন করতে লাগলেন। বলি দেখল সত্যযুগের মতো জগতের সর্বত্র ধর্মভাব বিরাজ করেছে। নিয়ম বিরুদ্ধ ব্যাপার দেখে ব্রহ্মার কাছে গেল বলি। ব্রহ্মাকে বললেন–বলি তার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। ব্রহ্মা তখন জানালেন, যে কেবল তার নয় সমস্ত জগতেরই সে স্বভাব নষ্ট করে দিয়েছে–একমাত্র হরি ছাড়া আর কেউ নেই যিনি বলিকে শাস্তি দিতে পারেন।

ব্রহ্মার কথা শুনে অব্যয়ব বলি পুরুষ বিভীতক বনে গিয়ে আশ্রয় নিল এবং সত্যযুগ উপস্থিত হল। তপস্যা, অহিংসা, সত্য, শৌচ, ইন্দ্রিয়, সংযম, দয়া, দান, অনুসংসর্গ, শুত্রুয় ও যজ্ঞকর্ম এসব জগতের সর্বত্র যথাযথ অনুপ্রাণিত হতে লাগল। বলি এরূপে সত্যযুগের সন্তোষসাধন করলেন। সকল বর্ণই এখন নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে লাগলেন। রাজারা প্রজারঞ্জনে সচেষ্ট হলেন। ধর্মের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। ত্রিলোকলক্ষ্মী বলিতে আশ্রয় করলে বলি তাঁর পরিচয় জানতে চাইল। পদ্মমালিনী তখন বললেন–বিষ্ণু, দেবরাজকে পরিত্যাগ করেছেন তাই তিনি তাকে ছেড়ে এখানে এসেছেন।

একদা বিষ্ণু চারটি রূপবতী যুবতী সৃষ্টি করেন। তার মধ্যে কেউ সাদা কাপড় পরিহিতা। সাদা মালা। ও সাদা গন্ধদ্রব্যে বিভূষিত হয়ে সাদা হাতির উপর অধিষ্ঠিত। কেউ লাল পোশাক পরিচ্ছদ ও লাল মালায় অলঙ্কৃত হয়ে, লাল গন্ধদ্রব্যে অনুলিপ্ত হয়ে লাল ঘোড়ার অধিষ্ঠিত। এঁর সারা শরীর লাল রাজস গুণান্বিত। কেউ হলুদে সজ্জিত হয়ে সোনার রথে উপবিষ্ট এ-তামস গুণান্বিত। অন্য একজন নীলে সজ্জিত হয়ে নীল বৃষে অধিষ্ঠিত, এ সত্ত্ব, রজস ও তামস এই তিন গুণেই মণ্ডিত। যে শ্বেতাম্বরা সে ব্রহ্মা, চন্দ্র ও অনুবর্তীদের আশ্রয় করলেন। রক্তবর্ণাকে ইন্দ্র, মনু ও মনুপুত্রের হাতে সম্প্রদান করা হয়। পীতাম্বরী শুক্র ও প্রজাপতির হাতে সমর্পণ করা হয়। নীলাম্বরী দেব, নৈঋত, গুহ্য ও বিদ্যাধরকে আশ্রয় করলেন। ব্রাহ্মণরা

শ্বেত দেবীরূপকে সরস্বতী নামে অভিহিত করলেন। ক্ষত্রিয়রা রক্তবর্ণাকে জয়শ্রী নামে, পীত বসনকে বৈদ্যরা লক্ষ্মী নামে অভিহিত করেন। নীল বর্ণকে শূদ্ররা প্রিয়দেবী নামে স্তব করতে লাগলেন। বিষ্ণু এরূপে এই চার নারীকে স্থান দিয়েছেন।

সঙ্গ, বেদ, পুরাণ, ইতিহাস ও যাজ্ঞিক অদুক্তি–এই চার নারী স্বরূপের মধ্যেই নিহিত আছে। স্বর্ণ, রথ, রজত, ভূষণ, হাতি, ঘোড়া, রথ এবং পদ্মনিধি রক্তবর্ণা ললনার আশ্রিত। গো, মহিষ, উট, গাধা, স্বর্ণ, বস্ত্র, জমি, ওষধি পশুপাল ও মহানীলানিধি যুবতীর আশ্রিত। এইসব বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের আশ্রয় স্থান বলছি, মহাপদ্মাশ্রিত–পুরুষরা সত্য, শৌচ, বল, দান ও উৎসবে সর্বদা নিরত থাকে। পদ্মাশ্রিত মানবেরা দৈববিধান মতে যজ্ঞকারী, সৌভাগ্যশালী, দর্পিত, মাল্যবান, বহু দক্ষিণ প্রদারী ও সর্বসামান্য সুখের আধার হয়ে থাকে। মহানীলাশ্রিত মানবরা সত্য ও শিক্ষাবাদী, শরণাগত রক্ষক, যজ্ঞকারী এবং ন্যায় অন্যায়ে আসক্ত হয়ে থাকে।

লাল পোশাকে সজ্জিতা দেবী এলেন বলির নিকট। তিনি বললেন–জয়শ্রী আমি, তোমার কাছে এলাম। আমি সর্বদা শৌর্য ও পরাক্রমশালী পুরুষকে আশ্রয় করে থাকি, ক্লীব বা কাপুরুষ ব্যক্তিকে আমি কখনও আশ্রয় করি না। তুমি বলবান বলে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করায় আমি খুব খুশি। তোমার অতুলনীয় পরাক্রম দেখে আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি হিরণ্যকশিপুর বংশধর। তাই ইন্দ্রকে পরাজিত করা তোমার কাছে কিছুই নয়। জয়শ্রী এরপর বলির দেহে প্রবেশ করে তাকে উদ্ভাসিত করে তুললেন। তখন বলিকে আশ্রয় করে সুখে বাস করতে লাগলেন, স্ত্রী কীর্তি। দ্যুতি, ত্যাগ, গতি, ক্ষমা, ভূতি, বিদ্যা, নীতি, দয়া ও মতি এবং প্রতি, স্মৃতি, শক্তি, শান্তি, কৃতি, ক্রিয়া, পুষ্টি ও তুষ্টি বলেছিলেন সকলের রক্ষক। তার শাসনে কেউ ক্ষুধার্ত, মলিন বা হীনদীন হল না–স্বর্গচ্যুত ইন্দ্র এরপর ব্রহ্মাভবনে গেলে তিনি দেখলেন ব্রহ্মা কাশ্যপ ঋষিদের সাথে বসে আছেন। এরপর তিনি ব্রহ্মাকে বললেন–বলি স্বর্গ রাজ্য অধিগ্রহণ করে নিয়েছে। ব্রহ্মা বললেন–এসবই তোমার কৃতকর্মের ফল কারণ। তুমি বজ্র প্রয়োগে দিতির গর্ভ টুকরো করেছিলে, তাই জ্বণ হত্যাজনিত পাপ হয়েছে তোমার। ইন্দ্র বললেন–ওই পাপ মায়ের অশুচিতার ফলে হয়েছিল-কাশ্যপ বললেন–মায়ের দোষ হলেও তোমার বজ্রাঘাতেই ভ্রণহত্যা ঘটে। ইন্দ্র তখন জানতে চাইলেন–কি করলে আমার পাপ খণ্ডন হবে। ব্রহ্মা, বশিষ্ট ও কাশ্যপ বললেন–ইন্দ্রকে দেবাদিদেব মাধবের সাধনা করতে হবে।

ইন্দ্র ব্রহ্মা, মরীচি তনয় কাশ্যপও মিশ্রাবর্ণ নন্দন বশিষ্ঠকে নিয়ে সতীতলে এলেন। কালা পর্বতের উত্তরে, হিমালয়ের দক্ষিণে, কৃপাস্থদের পূর্ব এবং বসুপুরের পশ্চিমে এক পবিত্র ও প্রসিদ্ধ স্থান আছে, সেখানে রাজা নয় সাতশত অশ্বমেধের যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি সহস্র নরমেধ যজ্ঞ করে অসুর জয় করেন। এই স্থান মহামেধ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে শ্রুতিশাস্ত্রহীন ব্রাহ্মণরা পিতামহের সমকক্ষ হয়ে যাবেন। এখানে মহামেধ যজ্ঞের প্রসন্ন ফল লাভ হয়। ভবিষ্যতে প্রসন্ন হৃদয়ে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করলে তারা পাপমুক্ত হন। মহানদী এইস্থান দিয়েই হিমালয় থেকে নেমে এসে তাকে পাপমুক্ত করেন। ইন্দ্র সেখানে এক আশ্রম নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। তিনি একবেলা না খেয়ে মাটিতে শুয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। তপস্যার সময় ইন্দ্র তার সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করেছিলেন। এক বছরেরও বেশি সময় পার হল। অবশেষে গদাধর তার প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন–ইন্দ্র তুমি শীঘ্রই রাজত্ব ফিরে পাবে। একথা বলে তিনি ইন্দ্রকে মহানদীর জলে স্নান করতে বলে বিদায় নিলেন। ইন্দ্র নদীর জলে স্নান করলে তাঁর শরীর পাপ পুরুষ মুক্ত হল এবং পাপী পুরুষদের হিমালয় ও কালাঞ্জর পর্বতের মধ্যবর্তীস্থানে পুলিন্দ নামে স্থানে বাস করতে বললেন–ইন্দ্র।

ইন্দ্র এরপর ধর্মাশ্রমে গেলেন। সেখানে মাতা অদিতিকে নিজের পরিচয় দিলেন। অদিতি তাঁকে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ইন্দ্রের কাছে দৈত্যদের হাতে নিজের পুত্রদের পরাজিত হবার কথা শুনে অদিতি শোকগ্রস্ত হয়ে বিষ্ণুর শরণ নিলেন। নারদ জানতে চাইলে, পুলস্ত্য বললেন, শুক্লপক্ষে সূর্য সপ্তম দিবসে পূর্বাকাশে উদিত হলে দেবমাতা অদিতি উপবাস করে নিয়ত চিত্তে দেবাদিদেবকে স্তব করতে লাগলেন। অদিতি বললেন–হে পাপরাশি বিনাসক্ত সংসার বৃক্ষের কুঠারাশী, ভাস্কর, দিব্যমূর্তির, ত্রৈলোক্য লক্ষ্মী, পৈতি, নিখিল রোরের কারণ, স্বরূপ সর্বমূর্তি, জগৎপতি, জগন্ময়, সকলের রক্ষক ইত্যাদি হৃষীকেশের স্তব করে অদিতি মাতা রক্তচন্দন ধূপ, দীপ ও করবী ফুল দিয়ে পূজা করে ইন্দ্রের মঙ্গল কামনায় হরিকে নিবেদন করলেন।

উপবাসী হয়ে বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন। অদিতি স্নান সেরে সোনা, দই ও ঘি ব্রাহ্মণকে দান করে ভক্তি বিনম্রচিত্তে বিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন রইলেন। বাসুদেব তখন অদিতিকে দর্শন দিয়ে বললেন–আমি সন্তুষ্ট হয়েছি তোমার তপস্যায়। তিনি অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে দানবদের পরাভূত করবেন ও পুত্রদের বরদান করবেন। বাসুদেবের কথায় অদিতির শরীর কেঁপে উঠল। তিনি বাসুদেবকে বললেন–ত্রিভুবনের ধারক, সাত সমুদ্র, পাহাড় পর্বতের অধিপতি তাকে কিভাবে আমি গর্ভে ধারণ করবো। অতএব যাতে তার বৃথা ক্লেশ না হয় এবং ইন্দ্রও রাজ্য লাভ করে তার ব্যবস্থা করতে বললেন। বিষ্ণু বললেন, ক্লেশ সহ্য করেও তথাপি তিনি

অদিতির গর্ভে আসবেন এবং তিনি গর্ভে আসার সাথে সাথে দানবদল নিস্তেজ হয়ে পড়বে। একথা বলেই তিনি অদিতির উদরে প্রবেশ করলেন।

পুলস্ত্য বললেন, অদিতির গর্ভে বিষ্ণু আসার সাথে সাথে দানবরা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। দানবরাজ বলি পিতামহ প্রহ্লাদের কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। প্রহ্লাদ ধ্যান থেকে জানতে পারলেন, বাসুদেবের ভয়ে দৈত্যরা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এরপর প্রহ্লাদ ধ্যানযোগে শ্রীহরিকে সন্তানতাল, ভূতল, মেরু পর্বত, লোক পালদের বাসস্থান ও ব্রহ্মার বৈরাজপুরীতে খোঁজ করেও সন্ধান না পেয়ে অদিতির মহাপুণ্য জনক আশ্রমে সন্ধান করলেন এবং দেখলেন দেবতা বামনদেহে দেবমাতার উদরে বিরাজিত, তার হাতে শঙ্খ, গদা ও চক্র নেই।

তিনি সব জ্ঞাত হয়ে বলিকে বললেন–যে কি কারণে সকলে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। বলি প্রহ্লাদের কাছে সব শুনে রাগে তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। তিনি নিয়তির বশীভূত হয়ে–জানতে চাইলেন–এই হরি কে? তার অধীনে কত দৈত্য আছে? এরা বাসুদেবের চেয়েও শক্তিশালী। এই দৈত্যরা দেবতাদের বহুবার পরাজিত করেছে। বিপ্রচিত্ত তার মত যোদ্ধা, অস্ত্রচালনার পারদর্শী দৈত্যটি হলেন তামসন্ধু, শিবি, শঙ্কু, অসিলোমা বিরূপাক্ষ, তিসিরা, মকরাক্ষী, বৃষ পাশ, অসিতাক্ষ। বিষ্ণু এদের ষোলো ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নয়। শ্রীহরির অবমাননায় প্রহাদ পৌত্রের ওপর রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন এবং ধ্যানান্তে অভিশাপ দিতে লাগলেন। বললেন–তুমি সকলের কাছে নিন্দার পাত্র হবে। প্রহ্লাদ সক্রোধে বললেন–তোমার পিতারও দুর্ভাগ্য, তুমি তার পুত্র হয়ে সর্বশ্বের বিষ্ণুর নিন্দা করলে। তোমার পিতার পূজণীয় গুরু আমি এবং হরি আমার পূজণীয়, তুমি তার নিন্দা করেছে। এর ফলে তোমার রাজ্য নাশ হবে। তুমি রাজ্য ভ্রষ্ট হয়ে পতিত হবে। এই চতুর্দশ ভুবনে বাসুদেব ভিন্ন আর কোনো আশ্রয় নেই

প্রহ্লাদের অভিশাপে ভীত হয়ে বলি তাঁকে শান্ত হতে বললেন। বলি বললেন–আমি অভিশাপে ভীত নই। কিন্তু পিতামহের কাছে আমি অপরাধী। পিতামহ যেন আমাকে বালক, নীচ ভেবে ক্ষমা করেন। তখন প্রহ্লাদ বললেন–মোহবশতই আমার বিবেক লোপ পেয়েছিল। তাই হরিকে সর্বগামী জেনেও তোমাকে অভিশাপ দিয়েছি। যে কারণে বলির বিবেক লোপ পেয়েছে সে কারণেই আমারও বিবেক বোধ লোপ পেয়েছিল, কিন্তু রাজ্যভ্রষ্ট হবার জন্য দুঃখ কোরো না, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এসব কারণে দুঃখিত হয় না। তিনি তখন বলির কল্যাণের কথা বললেন, তিনি বললেন–বলিকে বাসুদেবের শরণাপন্ন হতে যারা হরির আশ্রয় নেয় তার সমস্ত বিপদ আপদ কাটিয়ে পরম শ্রান্তি লাভ করে থাকে। জনার্দন তোমার মঙ্গল বিধান করবে। তাই তার আশ্রয় গ্রহণ কর। প্রহ্লাদ বলিকে উপদেশ দান করে বিষ্ণুকে স্মরণ করে তীর্থে বেড়িয়ে পড়লেন।

৪১

নারদ পুলস্ত্যর কাছে জানতে চাইলেন, প্রহ্লাদ তীর্থে বেরিয়ে কোথায় কোথায় গেলেন? প্রহ্লাদ প্রথমে মন্দার পর্বতে গেলেন। তারপর মানস তীর্থে গিয়ে স্নান করে পিতৃপুরুষদের তর্পণ করে জগন্নাথের পূজা দিলেন। তারপর পাপনাশী কৌশিকীতীর্থে গিয়ে স্নান করে জগৎপতির পূজা করে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দিলেন। তারপর কৃষ্ণা নদীতে গিয়ে স্নান করে পিতৃপুরুষের তর্পণ করে হয়গ্রীবের পূজা করে হস্তিনাপুরে হাজির হলেন। এবং স্নান করে গোবিন্দের অর্চনা করলেন। অবশেষে যমুনা নদীতে স্নান করে ত্রিবিক্রমের দর্শন করলেন।

পুলস্ত্য এবার নারদকে পূর্বের কাহিনি বলতে আরম্ভ করলেন।

পুরাকালে কাশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভজাত ধনু নামে এক পরাক্রমশালী অসুর ছিল। সে ব্রহ্মার কাছে দেবগণের অবধ্য হবার বর চাইল। ব্রহ্মার বর লাভের পর সে স্বর্গে এসে হাজির হল। চতুর্থ কলির প্রারম্ভেই ধুন্দু ইন্দ্রকে পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য শাসন করতে লাগল। হিরণ্যকশিপু ও কুন্দু একত্রে প্রমোদবিহারে মন্দরাচলে গেলেন। দেবগণেরা দৈত্যদের উৎপাতে ব্রহ্মালোকে গিয়ে বাস করতে লাগলো, ধন্ধুর কানে সে কথা যাবার সাথে সাথে ব্রহ্মালোক দখল করার অভিপ্রায় সে দৈত্যদের বলল। তারা বলল–সে ভীষণ দুর্গম পথ, সেখানে যাওয়া বড়ো কঠিন। এর সহস্রযোজন দূরে এক মহালোক আছে যেখানে বহু মুনি ঋষি বাস করে। তাদের দৃষ্টিতে দৈত্যর জন্ম হয়। তার কোটি যোজন দূরে জনলোকের ধাম। তাদের বধ করার কেউ নেই। এই লোকের প্রায় কোটি যোজন দূরে সত্যালোকের সর্বদা সহস্র সূর্যকিরণ জড়িত হয়, সেখানে ভগবান সত্য বাস করেন।

তাই ব্রহ্মলোকে যাওয়া অসম্ভব। অনুচরদের নিষেধেও ধুন্ধুর মন থেকে ইন্দ্রকে জয়ের ইচ্ছা গেল না। তখন সে শুক্রাচার্যকে জিজ্ঞেস করল–কি করলে আমি ব্রহ্মালোকে, যেতে পারবে?

শুক্রাচার্য তখন ইন্দ্রের বীরত্ব কাহিনি বলতে শুরু করল। পূর্বে ইন্দ্র একশো কোটি যজ্ঞ করার দরুণ ব্রহ্মসভায় স্থান পান। তখন ধুন্দুও দক্ষিণা দান করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন ঠিক করলেন। এই যজ্ঞের মহত্ত্বের কথা চিন্তা করে তিনি দৈত্যদের বললেন–নিধি, ব্রাহ্মণ ও গার্হস্থ্যদের ডেকে আনতে, তারা সকলে মিলে দেবিকা, নদীর তীরে যাবেন, সেই নদী সর্বসিদ্ধির বিধাত্রী কত্রী বলে প্রসিদ্ধ হবে।

শুক্র এই প্রস্তাবে রাজি হলে সকলে দেবিকাতীর্থে গেল। শুক্রর কথা মতো ভৃগু ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য শিষ্যরা ঋত্বিক হিসাবে ব্রতী হলেন। যজ্ঞের কাজ আরম্ভ হলে ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হল। মহাসুরগণ ওই ঘোড়াকে অনুসরণ করে চলল, যজ্ঞের ধোঁয়ায় দিক বিদিত ভরে উঠল। এই উগ্র গন্ধ ব্রহ্ম লোকে এসে পৌঁছল। দেবতারা সব বুঝলেন এবং তারা জনার্দনের শরণাপন্ন হলেন এবং বললেন–ধুন্ধু সমগ্র ত্রিলোক দমন করে নিয়েছে। পিণাকপানি ভিন্ন কেউ নেই যে দেবতাদের রক্ষা করে। এখন আমরা স্বর্গলোক ত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে বাস করছি এবং এই স্থানও করায়ত্ত করার জন্য ধুন্ধু অশ্বমেধ যজ্ঞ করছে। আপনি তাকে দমন করে আমাদের চিন্তামুক্ত করুন।

জনার্দন দেবতাদের অভয় দিয়ে ধুন্ধুকে দমন করার ফন্দি করলেন। তিনি বামন রূপে দেবিকার জলে ভেসে চললেন এবং হাবুডুবু খেতে লাগলেন। ধুন্ধুও অন্যান্য, দৈত্য, ঋষিরা তখন তা দেখে তাকে উদ্ধার করতে যজ্ঞ ফেলে ছুটে গেলেন। সকলে তাকে তুলে এনে তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন–আমি জনক ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্র। তার দাদা নেপ্রাভ্যাস, পিতা কৌতুকবশে তার নাম রাখে গতিভ্যাস। পিতার মৃত্যুর পর দেহ সৎকার করে ঘরে ফিরে ঘরের ভাগ চাইলে দাদা তাকে বলে যে তার কোনো অধিকার নেই। কারণ ঘোড়া, ক্লীব, ঋতুকুষ্ঠ রোগী বা অন্ধরা সম্পত্তির ভাগ পায় না। শুধু মাত্র বাস ও গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়া যেতে পারে। তিনি প্রতিবাদ করলে তার দাদা তাকে এই নদীর জলে ফেলে দেন। সাঁতার না জানার জন্য সে হাবুডুবু খাচ্ছিল। এই অবস্থার একবছর কাটার পর তারা তাকে উদ্ধার করেছেন। এবার সে জানতে চাইল ইন্দ্রের মতন দেখতে ব্যক্তিটি কে?

ব্রাহ্মণরা তখন বললেন–ইনি দানব পতি, ইনি দাতা, ভোক্তা ও ভর্তা হয়ে সম্প্রতি যজ্ঞকর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। ব্রাহ্মণরা ধুন্ধুকে বললেন–বালককে সুন্দর বাসভবন, প্রচুর ধনরত্ন ও দাসদাসী দান কর। দৈত্যপতি দিতে রাজি হলে বালক বললেন–যেখানে ভাই কিছু দিল না, সেখানে আমাকে অল্প দান করে কি লাভ? ব্রাহ্মণ বালক তখন ধুন্দুর কাছে তিন পা পরিমাণ ভূমি চাইল। বামন ওই ভূমি ছাড়া আর কিছু নিতে চাইলেন না তখন তার প্রার্থনা শুনে হাসতে হাসতে দৈত্যপতি তাকে তিন পা জমি দান করলেন। বামন তখন ত্রিবিক্রম দেহ ধারণ করলেন প্রথম পা সমুদ্র পর্বত পরিবেষ্টিত সমগ্র পৃথিবী, দ্বিতীয় পা অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ দখল করে নিলেন। তৃতীয় পা ফেলার জায়গা পেলেন না ফলে তিনি রেগে গিয়ে দৈত্যপতির পিঠের উপর পা ফেলল। এর ফলে হাজার হাজার যোজন পরিমিত স্থান গর্ত হয়ে গেল। ভগবান শ্রীহরি ধুন্ধুকে দমন করার জন্য ত্রিবিক্রম মূর্তি ধারণ করেছিলেন। প্রহ্লাদ ঘুরতে ঘুরতে এই পবিত্র স্থানে এসে হাজির হলেন।

৪২

প্রহ্লাদ কালিন্দী নদীর জলে স্নান করে একরাত্রি উপবাস করে পরে লিঙ্গ পর্বতে গেলেন। সেখানেও একরাত্রি উপবাস করলেন। তারপর কেদার তীর্থে গেলেন। এই তীর্থে তিনি সাত রাত্রি কাটালেন। এরপর তিনি বদরিকাশ্রমে ও বরাহতীর্থে গেলেন। তিনি ভক্তি করে গুরুজি নারায়ণের আরাধনা করলেন। তারপর সেখানে গিয়ে তিনি ভগবান চন্দ্রকে পূজা করলেন। তারপর বিনাশতীর্থ দর্শন করে ইরাবতীতে গিয়ে জগন্নাথের দর্শন লাভ করলেন। সনাতন জগৎপতির আরাধনার ফলে প্রহ্লাদ ইরাবতী তীর্থে পুরুষোত্তম দিব্যরূপ লাভ করেছিলেন। ভৃগুও এই তীর্থে আরাধনা করে কুষ্ঠ রোগ থেকে মুক্ত হয়ে সন্তান লাভ করেন। নারদ জানতে চাইলেন পুরুষরা কিভাবে বিষ্ণুর উপাসনা করে নমনীয় রূপ লাভ করেন?

এই ঘটনা প্রাচীনকালে ত্রেতাযুগের প্রারম্ভের। এই কাহিনি শুনলে পাপ দূর হয়। মদ্র নামক দেশে প্রচুর ব্রাহ্মণ বাস করত। এখানে সকল নামক নগরে ধর্ম নামে এক বণিক বাস করত। একসময় সে সৌরাষ্ট্র যাবার পথে মরুভূমিতে রাত্রি হয়ে গেলে একদল দস্যু তাদের আক্রমণ করল। তারা সব লুঠ করে নিল। বণিক মনের দুঃখে একা মরুভূমিতে ঘুরতে লাগল দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে কালক্রমে বণিক এক অরণ্যে এসে উপস্থিত হল। সেই সময় প্রকাণ্ড শমীগাছ আপনা থেকে তার সামনে। আবির্ভূত হল। সেই গাছে কোনো পশুপাখি ছিল না। সে ওই গাছের নীচে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

দুপুরবেলা ঘুম ভাঙলে সে দেখল এক প্রেত নায়ক অপর এক প্রেত দ্বারা বাহিত হয়ে তার দিকে আসছে। প্রেত নায়ক তার পরিচয় জানতে চাইল। বণিক সংক্ষেপে সমস্ত কিছু বলল। তখন প্রেত নায়ক তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল–ভাগ্য প্রসন্ন হলে পুনরায় সে অনেক অর্থ উপার্জন করবে। প্রেতনায়ক তাকে এক অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে স্বীকার করল। এমন সময় আকাশ থেকে এক দইমাখা ভাতের থালা এসে উপস্থিত হল আর এল এক জলপাত্র। প্রেতনায়ক তাকে আহ্নিকে আহ্বান করল এবং আহ্নিক শেষে খাবারের অধিকাংশ বণিককে ও বাকিটা প্রেতদের মধ্যে ভাগ করে দিল। বণিকের খাওয়া শেষ হলেই পাত্র আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন বণিক এর রহস্য জানতে চাইলেন। শমীগাছ কে? প্রেতনায়কের কাছে জানতে চাইলেন।

প্রেতপতি তখন বলল–পূর্বে সে অরণ্যে বাস করত। তার নামও বহুলা, তার প্রতিবেশি ছিল ধনবান বণিক সোমবা সে ধনবান হলেও ছিল কদর্য স্বভাবের। সোমবা প্রতিদিন দরিদ্রকে দান করত, কিন্তু সে যদি ভুলে ভালো খাবার খেত তবে কেউ তাকে তিন গাছা লাঠি দিয়ে মারত

এবং দিন হবার আগেই সে রোগে আক্রান্ত হত। অতি কষ্টে তার সময় কাটত, কোনো মতে শাক খেয়ে বেঁচে ছিলো।

ভাদ্র দ্বাদশীতে প্রতিবেশী ইরাবতী নর্মদার সঙ্গমতীর্থে স্নান করতে গেলেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা তাকে অনুসরণ করল। তিনি সত্তর বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি জীবদ্দশায় কাপড়, ছাতা, জুতা, জলপাত্র, দই ভাত, মাটির থালা দান করার ফলে মৃত্যুর পরে প্রেত নায়ক হলেন। বাকিরা কিছু দান না করার ফলে প্রেত হল। তাই প্রতিদিন দুপুরে এই খাবার আপনা থেকেই উপস্থিত হয়। ছাতা দানের ফলে শমী গাছের উৎপত্তি, জুতা দানের জন্য প্রেত তার বাহন।

প্রেত এরপর বণিককে বলল–কি করলে উভয়েরই মঙ্গল হবে। বণিক যদি গয়াতে গিয়ে তার নামে পিণ্ড দেন, তাহলেই তিনি প্রেত দশা মুক্ত হবেন। এই পিণ্ড দানের উপযুক্ত সময় হল শ্রাবণ যুক্ত ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী, বণিককে একথা বলে সে গেল।

এরপর বণিক শূর সেন দেশে এলেন। এখানে অনেক অর্থ উপার্জন করে তিনি গয়াতীর্থে গেলেন। এইখানে এসে তিনি সকলের নামে পিণ্ড দান করলেন। পিণ্ড দানের ফলে সকলে প্রেতদশা মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোক লাভ করল। তারপর একসময় ঘরে ফেরার সময় বণিক মারা গেল এবং গন্ধর্ব লোকে স্থান লাভ করে দুর্লভ সুখভোগ করে। পরে পুনর্জন্ম লাভ করে সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হয়। পূর্বজন্মের কর্মফলে সে মৃত্যুর পর গুহ্যকলোক লাভ করে এবং যথেচ্ছ সুখ ভোগ করে–ক্ষত্রিয় রূপে মর্তে জন্মে শত্রুদের পরাজিত করে কালক্রমে তার দেহাবসান হলে ইন্দ্রোলোকে স্থান হয়। তার দীর্ঘকাল পরে অকাল নগরে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মায়। সে সুপণ্ডিত হলেও বিরাট ও কুৎসিত আকৃতি বিশিষ্ট হল। এক রূপবতী ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ হল। তার রূপের জন্য এর স্ত্রী তাকে অবজ্ঞা করত। ফলে সে সংসারে মোহ ত্যাগ করে ইরাবতী তীর্থে আশ্রম চলে গেল। প্রমাণ নক্ষত্র পুরুষ ব্রত পালন করে ও জলাশয়ের আরাধনা করে ব্রাহ্মণ সুন্দর চেহারা লাভ করে এবং পত্নীর সাথে সুখে কাল কাটতে লাগল। মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় পুরুরবা রূপে আবির্ভূত হন।

৪৩

নারদ জানতে চাইলেন, পুরুরবা কিভাবে শ্রীপতির আরাধনা করেছিলেন। পুলস্ত্য তখন বললেন, মূলা নক্ষত্র ভগবানের চরণ যুগল, রোহিনী ও অশ্বিনী তার উরুযুগল, শ্লেষা নিতম্ব, ফাল্গুনী গুহ্য, কৃত্তিকা কোমর, অনুরাধা উরু, ধনিষ্ঠা পিঠ, বিশাখা ভুজযুগল, হস্তকরযুগল,

পুনর্বাস গোড়ালি, পুষ্যা ঠোঁট, স্বাতী দাঁত, শতভিষা চোয়াল, চিত্রা নাক, প্রজাপতি চক্ষুযুগল, এবং ইন্দ্র মাথার চুল, এই হরির নক্ষত্রাঙ্গ। এবার সবাই ব্রতের নিয়ম চলতে লাগলেন।

যথাবিধি পূজা করলে ইঙ্গিত বস্তু দান করেন হরি। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে চন্দ্রদেব মূলা নক্ষত্রে অবস্থান করলে হরির চরণ যুগল পূজা করতে হয় এবং ব্রাহ্মণদের ভোগ্যবস্তু দান করা উচিত। ভক্তি ভরে ভগবানের পূজা করে ব্রাহ্মণদের হবিষান্ন দান করতে হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তি সকল গুহ্যদেশ পূজা করবেন। গরুর দুধ নৈবেদ্য রূপে দিতে হয় এবং ব্রাহ্মণদের নানা রকম ভোজ্য দ্রব্য দান করতে হয়।

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি হরির কটি দেশ পূজা করবেন। ভাদ্রপদ নক্ষত্রে যথাবিধি ভগবানের শরীরের পার্শ্বদ্বয় পূজা করে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে গুড়, মৌরি নৈবেদ্য দিতে হয়। রেবতী পেটের ডান ও বাম ভাগ পূজা ও মুগের মিঠাই-এর নৈবেদ্য দিতে হয়। অনুরাধা নক্ষত্রে বক্ষদেশের পূজা ও কেটে ধানের ভাতের নৈবেদ্য, ধনিষ্ঠায় পিঠের পূজা ও শালি ধানের ভাতের নৈবেদ্য, বিশাখায় ভুজ যুগলের পূজা ও পরমান্নের নৈবেদ্য দান করতে হয়। এভাবে হস্তা নক্ষত্রে দুই হাতের পূজায় যব, পুনর্বসু নক্ষত্রে পুজোয় তিল মেশানো মিঠাই, শ্রবণা নক্ষত্রে কানের পূজায় দই মাখা ভাত; পুষ্যা নক্ষত্রে মুখের পূজায় ঘি ও পায়েস, স্বাতী নক্ষত্রে দাঁতের পূজায় তিল, গন্ধদ্রব্য ও ব্রাহ্মণদের নানা ভোজ্যের, শতাভিষা নক্ষত্রে চোয়ালের পূজায় কামিনী ধানের ভাত, মঘা নক্ষত্রে নাকের পূজায় হরিণের মাংস, চিত্রা নক্ষত্রে কপালের পূজায় ও ভরণীতে মস্তক পূজায় উত্তম ভোজ্যবস্তু, আদ্রা নক্ষত্রে মাথার চুলের পূজায় গুড়ের মিঠাই নৈবেদ্য রূপে দান করবে।

যথাবিহিত পূজা সমাপ্ত করে দেবজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা, ছাতা, পশু, ধান, সোনা, দুগ্ধবতী গাভী প্রভৃতি দান করতে হয়। এই নক্ষত্র পুরুষ ব্রত সব ব্রতের সেরা। পূর্বে ভৃগু এই পাপহারী ব্রত পালন করেছিলেন। ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূজা করলে পূজকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সুশ্রী হয়ে থাকে এবং ভগবান হদ্দির কলি সংসর্গ থেকে জাত পূজকের সাত জন্মের পুরুষ ও পিতামাতার কর্ম হেতু যাবতীয় পাপ দূর করে দেন।

এই ব্রতপালনকারী সমস্ত ইষ্ট বস্তুই লাভ করে থাকেন। জনার্দন পূজকের সমস্ত মনোবাসনাই পূরণ করে। অরুন্ধতী এই পূজা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। অদিতি নক্ষত্র পুরুষের পূজা করে স্বয়ং হরিকেই পুত্র রূপে লাভ করেন। রম্ভা তার পূজা করেন রূপ লাভ করে এবং

পুরুরবা রাজ্য লাভ করেন। যথাযথ নিয়ম মেনে নক্ষত্র ব্রত পালন করলে কল্যাণ, পবিত্রতা, ফল ও আরোগ্য লাভ হয়ে থাকে।

প্রহ্লাদ ঋষি নন্দিনী তীর্থে গিয়ে চৈত্র মাসের অষ্টমী তিথিতে জনার্দনের পূজা করলেন এবং নক্ষত্র ব্রত পালন করে তিনি কুরুক্ষেত্রে গেলেন। ঐরাবত মন্ত্রচ্চারণ করে বেদবিধি অনুসারে চক্রতীর্থের পূজা করে স্নান করলেন এবং ভক্তি ভরে তিনি কারুধ্বজের পূজা করলেন। তারপর তিনি দেবিকা তীর্থে স্নান করে নৃসিংহ পূজা করলেন। পরে গোকর্ণ তীর্থে গেলেন এবং বিশ্বস্রষ্টার পূজা করলেন। বিষ্ণুর সাক্ষাৎ লাভের জন্য তিনি মহাসলিলে যান। এরপর তিনি পিতৃপুরুষদের তর্পণ করলেন এবং এই তীর্থে তিন রাত্রি বাস করলেন।

হংস পদে ভগবান হংসের দর্শন করে পয়োবতী তীর্থে গিয়ে অখণ্ড রূপী অচ্যুতের অর্চনা করলেন। এরপর তিনি বিতস্তায় গিয়ে কুমারিলের অর্চনা করেন। এই তীর্থ দর্শনের পর তিনি পাপহারী অ্যুত তীর্থে যান। জগত কল্যাণে নিজ কন্যা কল্যাণী কপিলাকে সৃষ্টি করেন। সেই দেবহ্রদে স্নান করে বিধাতার পূজা করলেন। এরপর মণিমান তীর্থে গিয়ে স্নান করে ব্রহ্মার দর্শন লাভ করলেন। এই তীর্থে ছয়রাত্রি বাস করলেন, তারপর তিনি মধুনন্দিনী তীর্থে হাজির হলেন। এখানে হর ও গোবিন্দের দর্শন লাভ করলেন।

নারদ জানতে চাইলেন, শম্ভু কেন সুদর্শন চক্র ও বাসুদেব কেন শূলধারণ করেছিলেন? পুলস্ত্য বললেন, কোনো এক সময়ে বিষ্ণু ধরাধামে অবতীর্ণ হবার কথা দেবতাদের বলেছিলেন। জলোদ্ভব নামে অসুর ব্রহ্মার আরাধনায় থেকে ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করে। ব্রহ্মা তাকে বর দিতে উদ্যত হন। ব্রহ্মার বরে জলোদ্ভব অসুর যুদ্ধে দেব দানবদের অজেয় হয়ে উঠল। অভিশাপেও তার অনিষ্ট করার ক্ষমতা কারো রইল না। এই মহাসুর ব্রহ্মার বলে অসীম প্রভাবশালী হয়ে সমস্ত দেবতা, মহর্ষি ও রাজাদের উপর অত্যাচার করতে লাগল। দানবের অত্যাচারে সকলের ক্রিয়াকর্মে লোপ পেতে বসল। দেবতারা ভূতলে চলে গেলেন। অবশেষে তারা হরির শরণাপন্ন হন। হরি তখন দেবতাদের সাথে নিয়ে হিমালয়ে ত্রিলোচন মহাদেবের কাছে গেলেন।

হরি ও হর দুজনে পরামর্শ করে দেবতা ও ঋষিদের কল্যাণ সাধনের জন্যে শত্রু নিধনে কৃত সংকল্প হলেন। তারা নানা স্থানে দানবের খোঁজ করতে লাগলেন। তখন জলোদ্ভব নামের মহাসুর হরি ও হরকে দেখে চি নদীর জলে লুকিয়ে পড়ল। তাঁরাও দানবকে অনুসরণ করে

নদীর তীরে এসে অদৃশ্য হলেন। অসুর তখন হিমালয় পর্বতে আশ্রয় নিল? বিষ্ণু ও শিব তা বুঝে সেই দানবের দেহ চক্র ও শূল ধারণ করে ছিন্ন করল। চক্রাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন সেই অসুর তখন পর্বতশৃঙ্গ থেকে ভূপতিত হল। এর কারণেই হরি ও হর চক্র ও শূল ধারণ করেছিলেন। প্রহ্লাদ এরপর বিশাল নদীর তীরে গিয়ে ভক্তিভরে স্তব করেন, পরে তিনি হরিহরের সাক্ষাৎ লাভ করার জন্য হিমালয়ে হাজির হন। সেখানে তিনি ব্রাহ্মণদের নানা দ্রব্য দান করেন। তারপর তিনি বিতস্তা ও হিমালয়ের মধ্যবর্তী ভৃগু পর্বতে যান, এখানেই শঙ্কর বিষ্ণুকে অন্যতম অস্ত্র চক্র দান করেন।

৪৪

নারদ জানতে চাইলেন, শঙ্কর কেন বিষ্ণুকে চক্র দান করেছিলেন? পুলস্ত্য তখন বললেন, পূর্বে বীতমুন্য নামে বেদবেদান্ত পারদর্শী গৃহাশ্রমী এক মহাব্রাহ্মণ ছিলেন। তার পত্নী আত্রেয়ী। বীতমনুর কোনো সন্তান ছিল না। তিনি এক সময় ঋতুকালে স্ত্রী সংসর্গ করলে তার একটি পুত্র সন্তান হয়। যার নাম উপমুন্য। গরীব ব্রাহ্মণী পিটুলী গোলা খাইয়ে তাকে পালন করতেন। বালক দুধের স্বাদ না পেয়ে পিটুলী গোলাকেই দুধ বলে মনে করত। সে একসময় এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে দুধ ও ক্ষীর মেশানো ভাত । খেয়ে পরের দিন বাড়িতে নিয়ে বালক আর পিটুলী গোলা খেলেন না। ক্ষীরের জন্য কাঁদতে লাগল। মা তখন বলল–শঙ্কর দয়া না করলে দুধ কোথায় পারো? তাই নিতান্ত দুধ খেতে হলে শূলপানির আরাধন করতে হবে।

উপমন্যু তখন এই আরাধ্য ব্যক্তির পরিচয় জানতে চাইলে তার মা তাকে বললেন–প্রাচীনকালে শ্রীদাম নামে প্রবল পরাক্রান্ত অসুররাজ ছিল। সে ত্রিলোককে আয়ত্ত্ব করা ফেলল। তারপর সে শ্রীবৎসকে হরণ করবে বলে মন স্থির করল। ভগবান বাসুদেব তাকে বধের জন্য মহেশ্বরের কাছে গেলেন। সে সময় হিমালয়ে অবস্থিত ছিলেন শঙ্কর যোগমূর্তি ধারণ করে ছিলেন। হরি আত্মা দিয়ে তাঁর আরাধনা করতে লাগলেন। তিনি পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে হাজার বছর কাটিয়ে ছিলেন।

ভগবান প্রীত হয়ে তাঁকে দর্শন দিয়ে পরম দিব্য চক্র দান করলেন এবং বললেন–এই চক্র অন্য সমস্ত অস্ত্রের প্রতিবেধন। এর বারোটি নেমি ও দুটি নাভি আছে। সকল দেবতারা রাশি, মাস ও চক্রে সন্নিহিত শিষ্টদের রক্ষা করার জন্য দুটি ঋতুও এই চক্রের মধ্যেই অধিষ্ঠিত আছে। এর বারো নেমিতে অগ্নি, সোম, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, বিশ্বদেব, গণ, প্রজাপতিগণ, বলবান বায়ু, দেবদৈব্য ধন্বন্তরি, তপস্যা ও তপ এই দেবতারা বিরাজ করছেন। এই অস্ত্রের সাহায্যে নিঃশঙ্ক

চিত্তে দেবশত্রু সংহার করতে পারবে। চৈত্র থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত সমস্ত মাসই এই চক্রে অধিষ্ঠিত।

এই চক্র শত্রু নিধনে অব্যর্থ। ইন্দ্রও এই চক্রের পূজা করেন, শম্ভুর কথা শুনে বিষ্ণু জানতে চাইলেন–এই শক্তি অব্যর্থ কিনা তা তিনি কি করে বুঝবেন? তাই তিনি চক্রের ক্ষমতা প্রমাণের জন্য শম্ভর ওপরেই তা প্রয়োগ করতে চাইলেন। এবং বিষ্ণুর চক্রের আঘাতেই শম্ভর দেহ তিন টুকরো হয়ে গেল।

হরি তখন মহাদেবের চরণে প্রণত হলেন। শম্ভ প্রীতচিত্তে বললো–আমি ব্রহ্মারূপী, বিকার প্রাকৃত, পরন্তু বিকৃত নয়। কারণ আমি অচ্ছেদ্য ও অসহ্য, ফলে তার তিন মন্ত্র থেকে হিরণ্যাক্ষ, সুবর্ণাক্ষ ও বিশ্বরূপাক্ষ প্রাদুর্ভূত হয়ে সমস্ত মানুষের কল্যাণ সাধন করবে। সুতরাং এবার তোমার শত্রু শ্রীদামকে গিয়ে বধ কর। মহাদেবের কথায় বিষ্ণু সুমেরু পর্বতে গিয়ে দানব শ্রীদামকে দেখতে পেলেন। তখন হরি সেই দৈত্যের দিকে চক্র নিক্ষেপ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে চক্র দৈত্যের মাথা কেটে ফেলল। বিষ্ণু এরপর চক্র নিয়ে নিজ ভবনে চলে গেলেন। জননীর কাছে এই কাহিনি শুনে উপমন্যু ত্রিলোচনের আরাধনা করে প্রচুর পরিমাণে ক্ষীর খেতে পেল।

৪৫

প্রহ্লাদ এখানে স্নান করে ত্রিলোচন দেবের সাক্ষাৎ লাভ করে সুবর্ণপক্ষদেবের অর্চনা করলেন। তারপর নৈমিষ তীর্থে গেলেন। গোমতী ও কন্বিতনাক্ষী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে ত্রিশ হাজার পরম পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্র আছে। সেখানে স্নান করে প্রহাদ দেবদেবের যথাবিধি আরাধনা করলেন। পরে গোপতির দর্শন পাবার জন্য গয়াধামে গেলেন এবং স্নান করে পিতৃ পুরুষগণ, বাসুদেব ও গদাধর ও গোপ মহাদেবের আরাধনা করলেন। সরযূ নদীতে স্নান করে এক রাত বাস করলেন। রজস্তু তীর্থে গিয়ে পিতৃ পূজা ও পিণ্ড দান করে অজিতের দর্শন লাভ করে ছয় রাত্রি বাস করলেন। তারপর যাত্রা করলেন মহেন্দ্র পর্বতের দক্ষিণ দিকে গিয়ে শম্ভু ও গোপালের সাক্ষাৎ পেলেন। তারপর সোমতীর্থে গিয়ে স্নান করলেন।

মহাপর্বতে গিয়ে মহাসিন্ধুতে স্নান করে ভক্তিভরে বৈকুণ্ঠের অর্চনা করলেন এবং তর্পণ করলেন। তারপর তিনি পরিত্র পর্বতে ভগবান অপরাজিতের পূজা করে সেখান থেকে সুমেরু দেশে গেলেন এবং বিশ্বরূপের সাক্ষাৎলাভ করলেন। সেখানে শম্ভু প্রমথদের দ্বারা পূজিত হয়ে বিশ্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। সেই পুণ্য জলে স্নান করে মহাত্মা প্রহাদ মহাদেবের অর্চনা

করেন। এরপর বিন্ধ্যাচলে চলে গেলেন। সেখানে বিশাখার জলে স্নান করে তিন রাত্রি বাস করলেন।

তারপর অবন্তী নগরে গিয়ে শিপ্রানদীর জলে স্নান করে বাসুদেবের পূজা করলেন। তারপর মহাদেবের সাক্ষাৎ লাভের আশায় যাত্রা করলেন। এইস্থানেই সর্বভূতহন্তা যমকে দগ্ধ করে রাজা শ্বেতকিকে রক্ষা করেছিলেন। এখানে দেবগণ সর্বদা মহাদেবের অর্চনা করেন। প্রমথগণ সর্বদা তাঁকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। এই শ্মশানবাসী মহাদেবের পূজা করে প্রহ্লাদ নিধি অভিমুখে গেলেন। এখানে অমরেশ্বরের পূজা করলেন। সশ্রদ্ধচিত্তে কান্যকুব্জে তিনি হয়গ্রীবের দর্শন পেলেন এবং পাঞ্চাল দেশে গেলেন। এখানে পঞ্চালিখের দর্শন লাভ করে প্রয়াগ তীর্থে গেলেন।

প্রয়াগে রুদ্র ও মাধবের পূজা করে সমগ্র মাস সেখানে থাকলেন। তারপর তিনি বারাণসী ধামে গিয়ে বিভিন্ন তীর্থে স্নান করে পিতৃদেবগণের অর্চনা করলেন এবং সমগ্র নগর প্রদক্ষিণ করে মাধবের পূজা করলেন। তারপর স্বয়ম্ভুর আরাধনা করলেন। এরপর মধুবনে গেলেন এবং সেখান থেকে এলেন পুষ্করারণ্যে। এখানে দেবতা ও পিতৃ পুরুষের পূজা করলেন। পুলস্ত এই কাহিনি বর্ণনা করেছিলেন।

৪৬

পুলস্ত্য বললেন–প্রহ্লাদ তীর্থ পর্যটনে বেরোলে বলি কুরুক্ষেত্র দর্শন করার জন্য যাত্রা করলেন। ওই পুণ্যতীর্থে মহাব্রাহ্মণদের আহ্বান জানালেন শুক্রাচার্য। তাঁর আমন্ত্রণে অত্রি, গৌতম, কুশিক ও অঙ্গিরার বংশধর ও তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ কুরু জঙ্গলের উত্তর দিকে শতদ্রুর তীরে সমবেত হয়ে স্নান করে বিভাস তীর্থে হাজির হলেন, তারপর–এরা কিরণ, বেগবতী, ঈশ্বরী, দেবিকা ও পয়োন্বিত নদীর জলে স্নান করে ও পরে এসে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে তারা বিস্মিত হলেন। তাঁরা স্নান করে পুস্করে ব্রহ্মার অর্চনা করে ত্রিলোক প্রসিদ্ধ সরস্বতী তীর্থে অবস্থিত কোটি তীর্থে গিয়ে বৃষধ্বজ রুদ্র কোটির দর্শন লাভ করলেন।

তখন নৈমিষ মগধ, সিন্ধু, ধর্মারণ্য, পুষ্কর, দণ্ডকারণ্য, মেনা, তারকাস্থ ও দেবিকা তীর্থে বাসকারী ব্রাহ্মণরা তার দর্শন পাবার জন্য সেখানে এলেন। এদের সংখ্যা সেইস্থানে দেবদেব এদের ব্যাকুলতা দেখে কোটি মূর্তি ধারণ করলেন এবং তাঁর নাম হল রুদ্রকোটি। প্রহাদ এই কোটি তীর্থে স্নান করে রুদ্রের আরাধনা করলেন। তারপর কুরু জঙ্গল তীর্থে গিয়ে সরস্বতী

নদীতে জলমগ্ন স্থানুর দর্শন পেলেন। পরে দশাশ্বমেধে স্নান করে তিনি দেবতা ও পিতৃগণের অর্চনা করে সহস্র লিঙ্গের পূজা করলেন।

সোমতীর্থে পর্যটন করে তিনি ক্ষীরীপ বাসে হাজির হলেন। প্রহ্লাদ ক্ষীরীতরু প্রদক্ষিণ করে বরুণের পুজা করলেন; পদ্মাক্ষী নগরে গিয়ে মিত্রাবরুণ ও সূর্যের অর্চনা করলে; কুমার ধারায় বিষ্ণুকে দর্শন করে কপিল ধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এখানে কার্তিকেয়র অর্চনা করে নর্মদাতীর্থে বাসুদেবের আরাধনা করে কোকা তীর্থে গেলেন। সেখানে বিষ্ণুর বরাহমূর্তির পূজা করে মধুদেশে প্রস্থান করলেন। নারীহ্রদে স্নান করে শান্তিবরের আরাধনা করলেন। কালাপ্রজ্ঞর পর্বতে গিয়ে নীলকণ্ঠের সাক্ষাৎ লাভ করলেন।

এরপর তিনি নীল তীর্থের জলে স্নান করে শুচিশুদ্ধ হয়ে প্রভাসে তীর্থে এলেন। এই তীর্থে সরস্বতী ও সাগরসঙ্গমে স্নান করে লোকপতি সোমেশ্বর মহাদেবের দর্শন লাভ করলেন। শঙ্কর ও বিষ্ণুর–উপাসনা করলেন। তারপর ভীমের অর্চনা করে দারুবনে গেলেন। এবং স্ত্রীলিঙ্গ দর্পণ ও পূজা করলেন। ব্রাহ্মণ তীর্থে ইন্দ্রের উপাসনা করে প্রাঞ্জতীর্থে এলেন এবং ভাবিতভাবে স্ত্রীনিবাণের অর্চনা করলেন। কুন্তি তীর্থ দর্শন করে মগধারণ্যে এসে বিশ্বেশ্বরের পূজা করলেন।

ঝলমল তীর্থে ভদ্রকালীশ্বর বীরভদ্রের উপাসনা করে গিরিব্রজে গেলেন। গিরিব্রজে মহেশ্বরের আরাধনা করলেন। কামরূপতীর্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেখানে দেবী দুর্গা ও শংকরের উপাসনা করলেন। মহাতীর্থে মহাদেবের পূজা করে ত্রিকূট পর্বতে গিয়ে চক্রপানি বিষ্ণুর দর্শন পেলেন। প্রহ্লাদ এখানে তিন মাস বাস করলেন এবং ব্রাহ্মণদের সোনা দান করলেন।

তারপর দণ্ডকারণ্যে এলেন এবং পুণ্ডরীকাক্ষের সাক্ষাৎ লাভ করে তার তলায় তিন রাত বাস করে সারস্বত স্তব পাঠ করলেন। সেখানে থেকে প্রহ্লাদ কানন শিব তীর্থ বরে গিয়ে হরিদর্শন করে দুটি স্তব গান করলেন। শূকরের মূর্তিধারী ও দুটি স্তব পাঠ করেছিলেন। এর পর প্রহ্লাদ শালগ্রাম তীর্থে গেলেন। বিষ্ণু এখানে স্থাবর স্তম্ভ সমূহে বিরাজ করছেন। পুলস্ত্য বললেন–যে প্রাদের তীর্থ যাত্রার বিবরণ শুনলে অকাল মৃত্যু থেকে মুক্তি ঘটে।

৪৭

নারদ জানতে চাইলেন প্রহ্লাদ ভগবানের প্রতি যে গজেন্দ্র মোক্ষণাদি মন্ত্র জপ করেছিলেন তা প্রথমে পুলস্ত্য গজেন্দ্র মোক্ষণ স্তব করলেন। পরে সারমৃত স্তব বলবেন। রত্নরাজি খচিত

শ্রিমান ত্রিকূট পর্বত আছে, এই পর্বত সূর্যের দ্যুতি সম্পন্ন সুমেরুর পুত্র। ক্ষীরোদ সাগরের তরঙ্গরাশি এই পর্বতে শিলাতলে আছড়ে পড়ছে। পার্বত্য পাদদেশে বিচরণ করছে এর গা বেয়ে ঝরণা নামছে। প্রমাণে বাস করে গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ, চরণ, গুহ্যক, বিদ্যধির, সংযমী তপস্বী এবং বাঘ, নাগকেশর, কর্ণিকার, বেল, আমলকী, পাইন, কদম ও আম চন্দন, শিমূল, শাল, তাল, তমাল, দেবদারু, অর্জুন, চাপা বৃক্ষরাজি এ স্থানের শোভা বাড়িয়ে তুলেছে। এর পাদদেশে হরিণ, বানর, ঘুরে বেড়ায়। চকোর ও ময়ূর নিনাদে এ স্থানে সর্বদা মুখরিত। এর সোনালি সুর্ভেঙ্গ সূর্যদেব বিরাজিত, রূপালীতে চন্দ্রদেব।

তৃতীয় শৃঙ্গে ব্রহ্মাভবন অধিষ্ঠিত। পাপী লোকেরা এই শৃঙ্গ দেখতে পায় না, এর উপর সরোবর আছে যার জলে এক ভয়ংকর কুমীর বাস করত। একদিন এক হাতি জল খেতে এলে কুমীর তার পা কামড়ে ধরল, অন্য সঙ্গী হাতিরা আর্তনাদ করে উঠল, উভয়ের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হল। যা সহস্র বছর ধরে চলল।

বারুণ পাশে হাতির গতি রুদ্ধ হল এবং হাতি তখন বিপন্ন বিলম্ব অবস্থায় হরিকে চিন্তা করতে লাগল। গজেন্দ্র বলল তিনি মূল প্রকৃতি, মহাত্মা, অজিত, অনাশ্রিত, নিস্পৃহ, আদি, অনন্ত এক ও অব্যক্ত গুহ্য গূঢ়, গুণ গুণবতী, অপ্রমেয় ও সতুল, শান্ত, নিশ্চিত, যশস্বী, সনাতন, পূর্ব-পুরুষ দেব, নির্গুণ ও গুণাতমা, গোবিন্দ, পদ্মনাভ সাংখ্য যেনোদ্ভব, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বদেব, হরি, নারায়ণ, পরমাত্মা, বামন, অমিত বিক্রম, ধনুর্ধর অসিধারী, বাসুকী, নৃসিংহ, দেবশ্রেষ্ঠ, অম্বর, অচিন্ত্য সয্যাসারী, যোগেশ্বর ব্রহ্মারণ, ত্রিদানয়ন, লোকায়ন, আত্মহিনায়ন, নারায়ন, আত্মবিতান বা যোগেশ্বর, অজ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞ, বরেণ্য, স্বয়ম্ভু, বাসুদেব, অদৃশ্য, অচিন্ত্য, অব্যস্ত, অব্যয়, হিরণ্যনাৎ, মহাবল, জনার্দন বিষ্ণু, পীতাম্বরধারী আদিত্য, রুদ্র, বসু অশ্বিনীদ্বয়ের প্রভাবগন্ডি ত্রিলোকেশ, সহস্র শিরা? ও মহাযুকে প্রণাম।

পুলস্ত্য বললেন, এই স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ সরোবরে এলেন কেশব কুমীর ও গজেন্দ্রকে জল থেকে টেনে তুলে আনলেন। মধুসূদন চক্রাঘাতে কুমীরকে বধ করে গজেন্দ্রকে মুক্ত করে দিলেন। হু হু দেবের শাপে ইনি কুমীর হয়ে জন্মেছিল, সে শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গত স্বর্গ লাভ করল। গজেন্দ্র বিষ্ণুর স্পর্শে দিব্যদেহ ধারণ করে পুরুর রূপে আবির্ভূত হল। তারা একসাথে ভক্তিভরে স্মরণাগত বিষ্ণুর আরাধনা করল।

ভগবান তখন গজেন্দ্রকে বললেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করবে তার দুঃসময় সুসময়ে পরিণত হবে। পাপ মুক্ত হবে। প্রভাতৎকালে উঠে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন

অবতারকে ভক্তি ভরে স্মরণ করলে হৃষিকেশ গজ ও গন্ধর্বকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন। ব্রহ্মা বললেন, যে এই গজেন্দ্রমোক্ষণ স্মরণ করবে যে সকল পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং গজবন্ধনের মতো যাবতীয় বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে।

৪৮

পুলস্ত্য নারদকে বললেন, জনৈক ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ক্ষত্রিয় ছিল। সে ছিল হিংস্র ও অত্যাচারী। ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা ও দেবতার উপাসনা করত না। মৃত্যুর পর এক ভয়ংকর রাক্ষস হয়ে জন্মাল। এভাবে পাপ কাজে আসক্ত থেকে একশো বছর কেটে গেল। কোনো ভালো কাজেই তার অভিরুচি ছিল না। এরপর এর শরীরে বার্ধক্য দেখা দিল। সে এক তপস্বীকে নদীতীরে তপস্যা করতে দেখল। তিনি সতর্কভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। চক্রপানি বিষ্ণু পূর্বদিক রক্ষা করুন। গদাপাণি বিষ্ণু দক্ষিণ দিক, খঙ্গধারী বিষ্ণু উত্তর দিকে, গাঙ্গধারী বিষ্ণু পশ্চিমদিক, ক্রোড়রূপী হরি ভূতলে। নরসিংহ অন্তরীক্ষে যেন তাকে রক্ষা করে। সুদর্শন চক্র প্রেত ও রাক্ষসদের সংহারক, শাঙ্গধনু মানুষ, প্রেত শত্রুদলকে বিনাশ করুক, খঙ্গাঘাতে আমার শত্রুরা নিস্তেজ হয়ে পড়ুক। নিষ্ঠুর মানুষ বিষ্ণুর শঙ্খচক্রে আহত হয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়ুক।

যে প্রমথগণ ভোগ সুখ নষ্ট করে দেয় বিষ্ণুর চক্রাঘাতে আহত হোক, বাসুদেবের নামে গানে বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয় সুস্বাস্থ্য লাভ করুক, আমার পিছনে, সামনে, দক্ষিণে, উত্তরে জনার্দন হরি অবস্থান করুন, তার নাম সংকীর্তনে কেউ যেন ক্লান্ত হয় না। আত্মরক্ষার জন্য বিষ্ণুর আরাধনা করে তাপস তপস্যামগ্ন হলেন।

রাক্ষস তাকে আক্রমণ করার জন্য ছুটে গেল। কিন্তু তার রক্ষাকবচ রাক্ষসের গতিরোধ করল। সে নিশ্চল হয়ে চারমাস দাঁড়িয়ে রইল, চারমাস পরে তাপসের তপস্যা ভঙ্গ হলে সে রাক্ষসকে দেখল। রাক্ষস তখন বলহীন হয়েছে দেখে তাপস দয়া করে তার কারণ জানতে চাইলে রাক্ষস সব বলে নিজ কৃতকর্মের জন্য তার কাছে ক্ষমা চাইল এবং তার পূর্ব পাপের মুক্তি কামনা করল। রাক্ষসের কথায় ব্রাহ্মণ জানতে চাইল তার হঠাৎ ধর্মে মতি হল কিরূপে? তখন রাক্ষস বলল, ব্রাহ্মণ তাপসের সংসর্গেই তার মনে পরিবর্তন হয়েছে। তার মতো পাপীর মনেও অনুতাপ হচ্ছে। রাক্ষস পাপের জন্য মুক্তি কামনা করায় বহুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, পাপরাশি থেকে যত শীঘ্র মুক্তি লাভ করা যায় ততই উপকার বা মঙ্গলের পথ প্রশস্ত হয়। অন্য কোনো ব্রাহ্মণের কাছে তুমি পাপ মুক্তির উপায় জেনে নাও, বলে তাপস প্রস্থান করল।

রাক্ষস খিদেয় কাতর হয়েও কোনো প্রাণীবধ করল না। বেঁচে থাকার জন্য কেবল একটি জন্তু বধ করে খেতে লাগল। একদিন দারুণ ক্ষুধার্ত হয়ে এক মুনিবালককে দেখে তাকে খাবার জন্য জাপটে ধরল। তখন মুনি বালক প্রাণের আশা ছেড়ে বলল, তোমার মঙ্গল হোক, রাক্ষস বলল, সে ভীষণ ক্ষুধার্ত তাই সে মুনি বালককে খেয়ে খিদে মেটাতে চায়।

মুনি বালক বলল, যে সে তার গুরুকে ফল দিয়ে ফিরে আসার পর যেন রাক্ষস তাকে খায়। রাক্ষস বলল, দিনের শেষে কেউ তার হাত থেকে অব্যহতি পায় না, কারণ এটাই তার জীবিকা। রাক্ষস এখন তার হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় স্বরূপ মুনি বালককে বললেন– বাল্যকাল থেকে তার মন পাপাসক্ত, ধর্মের প্রতি তার বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। তাই বাল্যকাল থেকে সমস্ত পাপের মুক্তির উপায় বলে দিতে হবে–মুনিপুত্র চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নিরুপায় হয়ে অগ্নির স্মরণাপন্ন হলেন এবং বললেন, তিনি পিতা-মাতা অপেক্ষা গুরুকে বেশি মানেন। ভগবান পাবক যেন তাকে রক্ষা করেন। তার প্রার্থনায় অগ্নির আদেশে দেবী সরস্বতী এসে বালককে বললেন, তিনি জিভের ডগায় অধিষ্ঠিত থেকে রাক্ষসের পাপ মুক্তির উপায় বলে দেবেন। একথা বলেই বেদী রাক্ষসকে দেখা না দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। তখন বালক বললেন, খুব ভোরে উঠে জপ এবং দুপুর ও বিকালে জপ করলে শান্তি ও পুষ্টি লাভ হবে।

হরিকে স্মরণ করলে হরি পাপ হরণ করেন। যোগীরা যে বাসুদেবের ধ্যান করে থাকেন সেই স্বর্গগামী সর্বাধার পরব্রহ্মের স্মরণ নিলাম। যার সাক্ষাৎ লাভে রোগীদের পুনর্জন্ম হয় না। যাঁদের সুখ পরম্পরা থেকে পরম পুরুষের আর্বিভাব হয়েছিল, যে ধারা ধারণ করেছেন, দৈত্যরা যার হাতে নিহত হয়েছে, যে দেবতাদের বিপদে রক্ষা করেন, যিনি পাতাল ও ভূতলের সব কিছু সংহার করেন। সকল সুর, অসুর ও পিতৃগণ যক্ষ, গান্ধর্ব ও রাক্ষসরা যাঁর অংশ স্বয়ম্ভু যে মহেশ্বর দেহে সমস্তই বিরাজিত, যিনি সর্ব অব্যয় অশান্ত, সমস্ত পদচর‍্যা যার মূর্তি যিনি জ্ঞানগম্য তার কীর্তনে।

সেসব অবিলম্বে বিনিষ্ট হোক। পরপত্নী ও পরদ্রব্যের অভিলাষ, অপরের প্রতি হিংসা পরপীড়া, পানভোজন জনিত পাপ যেন লবণের মতো নিঃশব্দে বিলীন হয়ে যায়। হরির সংকীর্তনে যেন সকল পাপ বিনষ্ট হয়। যে ভাবী নরকের পরিত্রাতা যাঁর হাতে কংস নিহত হয়েছে, যিনি অরিষ্ট, চান্ধর প্রভৃতি দেব শত্রুদের বধ করেন, যে বলিকে দমন করেন, যে দশাননকে স্বয়ং নিধন করেন, যে পুতনাকে বধ করেন, তাঁর জপ করলে সাত জন্মের জমা পাপ জলমগ্ন কাঁচা কলসীর মতো বিনষ্ট হবে।

যে ব্যক্তি প্রতিদিন তিলপূর্ণ ষোলো পাত্র দান করে তার ব্রহ্মচর্য অক্ষুণ্ণ হয়। এই সত্য বলে বালকের সর্বাঙ্গ রাক্ষস গ্রাস থেকে মুক্ত হবে। বালক তখন তাকে পবিত্র পাপ নাশক বিষ্ণুস্তোত্র বললেন। সরস্বতী এই স্তোত্রের প্রণেতা। এই স্তোত্র পাঠ করলে সমস্ত পাপ মুক্তি ঘটে। রাক্ষস তখন ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে তপস্যার জন্য সেখানে গিয়ে ঘোর তপস্যায় মগ্ন হল, সে পাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণু লোকে স্থান পেল। পুলস্ত্য তখন বললেন, যে এই স্তোত্র পাঠ করে সে সমস্ত দুঃখ ও পাপ থেকে মুক্তি পায়।

৪৯

পুলস্ত্য বললেন– হে জগৎপতি, বাসুদেব, বহুরূপ, একশৃঙ্গ, বৃষাকপি, শ্রীনিবাস ভূ-অভাবন, নারায়ণ, বৃষধ্বজ, যজ্ঞধ্বজ, তালধ্বজ, গরুড়ধ্বজ, বরণ্যে, বিষ্ণু, পুরুষোত্তম, জয়ন্ত, বিজয়, জয়, অনন্ত, বৃতাবর্ত, মহাবর্ত, মহাদেব, অনাদি, সৃষ্টি গর্ভ, হিরণ্যগর্ভ, পদ্মলোচন কালনেত্র, কালণাভ, মহানাভ, কৃষিওমূল মথমূল, মূলাবাস, ধর্মাবাস, জলাবাস, স্ত্রীনিবাস ধর্মধক্ষ্য, প্রজব্যিক্ষ, আবোধ্যক্ষস, সেনকি কালবিক্ষ, হে গদরিক শ্রুতিধর, ধক্রধর, বলমালবির, ধরণীধর, তথিতসেন, মহাসেন, পুরুকঠুত, মহাকল্প কল্পশামুখ, সপ্ত, বিভু, বিবিঞ্চিত, শ্বেত, কেশব, নীর, মহানীল, অনিরুদ্ধ, হরিকেশ মহাবেশ, গুড়াকেশ, মুক্তকেশ, ঋষিকেষ, স্কুল, মহাস্থূল, মহাসূষ্ম, ভয়ংকর, শ্বেত, পীতাম্বর, নীলবাস, হে কুশোশায়, পদ্মশায়, জলেশায়, গোবিন্দ, হংস, শাঙ্গধবজ, ব্রহ্মাশীষ, সহস্রনেত্র, অর্থবশিরা, মহাশীষ, ধর্মনেত্র, যজ্ঞবরাহ, বিস্বাতমা, বিশ্বাত্মাফর।

সাগ্নিক ব্রহ্মরা তোমার মুখ, ক্ষত্রিয়রা বাহু, বৈশ্যরা পিঠের দু'পাশ দুই, ঊরু থেকে ক্ষুদ্র জাতি, চোখ থেকে সূর্য, দুই পা থেকে পৃথিবী, কান থেকে দিবস সমূহ, নাভি থেকে অন্তরীক্ষ, মন থেকে চাঁদ, প্রাণ থেকে বায়ু, কাম থেকে ব্রহ্ম, ক্রোধ থেকে রুদ্র, মাথা থেকে স্বর্গ, স্বর্গ, উৎপন্ন হয়েছে। তুমি ব্রহ্মেস, শব্দব্রহ্ম বিদ্যা, বেধ্যরূপ, বন্দনীয়, বুদ্ধি, বোধ ও যোদ্ধা, হোতা, হোম, হয্য, হুয়মান, হব্যবাই, পুত ও পরকীয়া, নেতা নীতি, রক্ত পত্র,| উলুখন, যজমান, স্তক্ত্য যাচ্চ, উগাতা, জ্ঞেয়, যাজচ, মোক্ষ, যোগান্ত ঈশান, সর্পগামী, উগাকাস, দক্ষিণ, দীক্ষা, গন্থ, ধাতা পরম, নর-নারায়ণ, মাথাজন ও চন্দ্রের মতো রূপালী, শুভ, ভূতাদি, মহাভূত, অচ্যুত, দ্বিজ, উধ্ববাহু, এই স্তব করলে কোনো পাপ থাকে না।

৫০

পুলস্ত্য নারদকে দ্বিতীয় স্তব সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন। দেবেশ সূর্যকে নমস্কার করেন ত্রিবিক্রম, হয়শীর্ষ, গরুড়বাহন, জয়েশ, নরসিংহ রূপ ধর, কুরুধ্বজ, কামপাল, অমণ্ড ও ব্রাহ্মণপ্রিয়, অজিত, বিশ্বকর্মা পুন্ডরীক, শিব, বিষ্ণু, পীতাম্বর, শঙমী, পাপকিরণ স্থানু, ব্রহ্মপদী ভূষণ, কপদী, সাশী, সূর্য, হংস, হাঘকেশ্বর, মহাযোগী, ঈশ্বর, শ্রীনিবাস, পুরুষোত্তম, লকুড়েশ্বর, কুন্দমালী, পঙ্কিজাসন, শশিভ, উপেদ্র, অগস্ত্য, গরুড়, কপিল, ব্রহ্মব্রহ্মত্য পর, সুহাংসু, তপোময়, ধর্মরাজ, সর্বভূত, গন্ধ, শান্ত নির্মল, পাপনালকে প্রণাম করি, এই পাপ হন্তা দেবের শরণাপন্ন হলাম, অগস্ত এই স্ত্রোত্র পাঠ করেছিলেন।

পুলস্ত্য বললেন, প্রহ্লাদ তীর্থস্থানে বেরোলে বলি কুরুক্ষেত্র দর্শনে যাত্রা করলেন। সেখানে শুক্রাচার্যের নিমন্ত্রণ গৌতম, কৌশিক, অঙ্গিরস, শাস্ত্রজ্ঞ ঋষিরা কুরুজঙ্গলের উত্তরে শতদ্রু নদীর উত্তর তীরে হাজির হয়ে স্নান করে দেবগণের পূজা করলেন। মহর্ষিরা কিরণ, ঐরাবতী, ঐশ্বরী, দেবিকা ও পয়েষ্ণীতে নেমে ওপারে উঠে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে তার কারণ চিন্তা করে বিস্ময়ভরা মন নিয়ে চলে গেলেন।

দূরে এক বন খণ্ড তাদের নজরে পড়ল। যা নিবিড় মেঘের মত শ্যামল। সাদা ও লাল পদ্মে ভরা বন দেখে তারা আনন্দিত হলেন এবং বনে প্রবেশ করলেন। সেখানে তারা পুণ্যপদ্ম দেখতে পেলেন। যা-চার দিকপাল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। পূর্বদিকে অবস্থিত ধর্মাগ্রাম পলাশ গাছে আবৃত। পশ্চিমের অর্থাশ্রম চাপাগাছে, দক্ষিণের কল্যাশ্রম কদলী ও অশোক বৃক্ষে, উত্তরে যোজ্ঞাশ্রম, বিশুদ্ধ স্থানটি আবৃত, এ স্থানে গিয়ে তারা অখণ্ডদেবের প্রতি অনুরক্ত হলো। বিষ্ণু অখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ, ঋষিরা তার উপাসনা করে থাকেন। মহর্ষিরা শত্রুর সাথে অসুরদের ভয়ে এখানে বাস করতে লাগলেন। তখন ভৃগু ব্রাহ্মণদের ওপর প্রাত্যহিক যজ্ঞের কাজ দিয়ে শুক্রবলির মহাযজ্ঞে নিযুক্ত হলেন। ধাল সাদা কাণ্ড, মালা ও চন্দনে ভূষিত হলেন। বলি পত্নী বিদ্যাবলীও দীক্ষিত হলেন। চৈত্র মাসে এক সাদা ঘোড়া পৃথিবী প্রদক্ষিণের জন্য শুক্র ছেড়ে দিলেন। এভাবে ঘোড়া উৎসর্গের পর তিন মাস পার হয়ে গেল।

নারায়ণ ভূমিষ্ঠ হল দেব জননী অদিতির গর্ভ থেকে। সাথে সাথে ব্রহ্মা মহর্ষিদের সাথে নিয়ে তার স্তব করতে লাগলেন। ব্রহ্মা বললেন, হে পাপ দাবানল ভীষণ। যশোদার জগমূর্তি পীতবাস, স্ত্রীকাণ্ড অর্ধগামী, অনন্য পুরুষ সর্ববীধী বয়িরী, ধাতা, বিধাতা, সংহাস, মহেশ্বর, যোগীকে নমস্কার করি।

জগন্নাথ হরি ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে তার উপনয়ন সাধন করতে বললেন, সবাই বাহ্মণকে নানা দ্রব্য দান করলেন। পুলহ যজ্ঞোপীত, পুলস্ত্য দুটি সাদা কাপড়, অগস্ত্য হরিণ-চর্ম, ভরদ্বাজ মেখলা, ব্রহ্ম নন্দন মরীচি পালা দণ্ড, বারুণি জপমালা, অঙ্গিরা কুশাসন, দেবরাজ ছাতা, ভৃগু জুতা ও বৃহস্পতি কমুণ্ডল দান করেন। ভরদ্বাজ বামনকে সামবেদ পড়ালেন। তিনি জ্ঞান সাগর হয়ে লোকাঁচার করলেন। সে তারপর কুরুক্ষেত্র যাবার অনুমতি চাইল ভরদ্বাজের কাছে।

৫১

ভগবান বললেন, প্রথম মৎসরূপ মান হ্রদে অবস্থিত। যার চিন্তা করলেই সকল পাপক্ষয় হয়। কূর্মরূপ কৌশিকী নদীতে, কৃষ্ণার তীরে হয় শীর্ষ, হস্তিনাপুরে গোবিন্দ, ত্রিবিক্রম, কেদার মাধব, বদরিকাশ্রমে নারায়ণ, বরাহে গরুড়ধ্বজ, ভদ্রকর্ণে জয়েশ, বিপাশা তীরে দ্বিজপ্রিয়, কৃতগৌচে নৃসিংহ, প্রাচীনে কামপল, বিতস্তায় কুমারিলা, গয়ায় গোমতি, দক্ষিণাচলে গোপাল পাঞ্চালিতে পাঞ্চতানিষ্ক, মহোদয়ে হয়গ্রীব প্রয়াগে যোগাশরী।

বারাণসীতে কেশব, পদ্মাতীরে পদ্মকিরণ, সমুদ্রে বড়বামুশ, কুমার ধারে, বহনে কার্তিকেয়, ওজসে শম্ভু, নর্মদাতীরে স্ত্রীপত মূর্তি, মাহেশ্মতীরে ত্রিনয়ন, মহাকাশীতে হংসযুক্ত পাপ বিলাপাতে, কস্থার মধুসূদন মূর্তির দেবীকার তীরে ভুধর, শঙ্খদ্বারে শঙ্খী, হস্তি প্রদেশে বিশ্বামিত্র, কৈলাসে বৃষধ্বজ মাহেশ, মহিলা, সশিষ্য কামরূপ, সিংহাসনে উপেন্দ্র, সুতলে অচল কূর্ম, দ্বিতলে পঙ্ক পঙ্কজানন মহাতলে বৃষলেশ্বর, পাতালে যোগী অধিশ্বর, ধরাতলে কোকনদ, মেদিনীতে চক্রপানি, ভূলোকে গরুড়, জনলোকে কপিল, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, সেবে সনাতন, কুপাদ্বীপ কুসোসয়, প্লক্ষদ্বীপে গরুড় বাহনে ঐন্বেত্ত পদ্মলাভ, সাস্মলে বৃষভজ, সাকে সহস্র পুস্করে বামন মূর্তি বিরাজমান, তিনি বিরাজিত ফালি গ্রামে, জলে, স্থলে, পর্বতে তার মূর্তি স্মরণ ও দর্শন করলে পাপ প্রশমিত হয় ও মোক্ষলাভ করে। বিষ্ণু ভরদ্বাজকে এসব বলে কুরুজঙ্গনোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

৫২

পুলস্ত্য বললেন, সমগ্র পৃথিবী কেঁপে উঠল, বলির যজ্ঞ ব্যাকুল হয়ে উঠল। বামনকৃতি বাসুদেব গমনোদ্যত হলে দানবরাজ বলি এই ভয়ানক কাণ্ড দেখে শুক্রাচার্যকে জিজ্ঞেস করলেন, কি কারণবশত সমগ্র পৃথিবী এভাবে দুলে উঠেছে? সাগর কেন ক্ষুব্ধ হয়েছে?

নক্ষত্ররাজি কেন আকাশে শোভা পাচ্ছে না? তখন শুক্র বললেন, অগ্নি মহাসুরদের কাছ থেকে যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করছেন না। বাসুদেবের পদবিক্ষেপে এরূপ ঘটনা ঘটছে।

দিকসমুহে অন্ধকারে আবৃত হয়ে পড়েছে। সাগর উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তখন তার কি করণীয়-বলি, শুক্রর কাছে জানতে চাইল। তাকে কি সে মণিরত্ন দান করবেন? নাকি নিজের ও তার কল্যাণের কথা বলবেন? শুক্র তখন বললেন, যে বলি মহাসুরদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিধান অনুযায়ী তার ভাগীদার দেবগণ, তাই বাসুদেব এখানে আসছেন।

এবার শুক্রাচার্য বলির করণীয় কর্তব্যের কথা বললেন। তিনি বললেন, বলি যেন মনের ভুলেও কিছু দান না করেন এবং যেন তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বলেন, যে সমগ্র পৃথিবী ধারণ করে আছেন তাকে কিছু দান করার ক্ষমতা কার আছে? তখন বলি বললেন–যে, তিনি পথিককে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। তার ওপর তিনি স্বয়ং বাসুদেব। তখন শুক্রাচার্য বলিকে বোঝাবার জন্য প্রাচীনকালের মলয় প্রদেশের কোশাকার তনয়ের পৌরাণিক কাহিনি বলতে লাগলেন।

শুক্রাচার্য তখন কাহিনি শোনানোর জন্য কৌতূহল প্রকাশ করলেন। বলি বলল, তার পূর্বাভ্যাস বশে এই কাহিনি জানা। পূর্বে সমস্ত মহার্য মুদগলের বিখ্যাত পুত্র ছিল। সে জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তার পত্নী ব্যাৎসায়ন কন্যা ধর্মিষ্ঠা তার গর্ভে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্র ধর্মিষ্ঠা এই পুত্রকে সূতিকা গৃহের। দ্বার প্রান্ত ফেলে রাখলেন।

৫৩

সু-পক্ষী রাক্ষসীও তার রুগ্ন সন্তানকে সেখানে রেখে ব্রাহ্মণের পুত্রকে খাবার জন্য নিয়ে গেল, রাক্ষসীর অন্ধস্বামী ঘটোদর জানতে চাইল সে কি এনেছে? রাক্ষসী সব বললে ঘটোদর বলল, তার একাজ ঠিক হয়নি, কারণ বিজেন্দ্র কোশক ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেবেন। সে রাক্ষসীকে বলল এই পুত্রকে ফেরত দিয়ে অন্য কারো পুত্র নিয়ে আসতে। রাক্ষসী তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করল।

এদিকে রাক্ষস কিন্তু সুতিকা গৃহের বাইরে কেঁদে উঠলে ধর্মিষ্ঠা স্বামীকে তা জানালেন এবং দ্বার প্রান্তে এসে শিশুকে দেখলেন গাত্রবর্ণে সে তার সন্তানের মতই দেখতে ছিল। তখন কোশাকার হাসতে হাসতে বললেন–যে শিশুটিকে ভূতে ধরেছে, কেউ ছলনা করার জন্য শিশুর রূপ ধরেছে। তখন কোশাকার রাক্ষস শিশুকে সেখানে বেঁধে রাখলেন। রাক্ষসী তখন ব্রাহ্মণ

শিশুকে সবে ঘরে রাখলে কোশাকার তাকেও বেঁধে ফেলল। রাক্ষসী তার পুত্রকে নিতে পারল না। রাক্ষসী চলে গেলে কোশাকার পত্নী দুই শিশুকেই দুধ, দই, আমের রস খাইয়ে বড়ো করতে লাগল। ক্রমে তাদের বয়স সাত বছরের হলে পিতা নাম রাখলেন দিবাকর ও নিলাকর। রাক্ষস পূত্রের নাম দিবাকর। নিজ পুত্রের নাম নিলাকর।

দিবাকর বেদ পাঠ করতে লাগল। কিন্তু নিলাকর পারুল না, এর ফলে সকলে তার নিন্দা করতে লাগল। পিতা কোশাকার ক্রুদ্ধ হলেন, এবং তাকে এক জনশূন্য কূপে ফেলে তার ওপর পাথর চাপা দিলেন। সেখানে এলে কূপের মধ্যে এক আমলকী গাছের ফল খেয়ে সে বহু বছর কাটিয়ে দিল। এভাবে দশ বছর পর একদিন ধর্মিষ্ঠা পুত্র সেই কুয়ো থেকে চিৎকার করে বলতে লাগল, কে পাথর চাপা দিয়েছে। মায়ের গলা শুনে নিলাকর চিৎকার করে পিতার কথা বলতে ধর্মিষ্ঠা ভয়ে জানতে চাইল সে কে? সে নিজের পরিচয় দিলে ধর্মিষ্ঠা বলে তার একটি পুত্র নিলাকর। তখন সব ধর্মিষ্টা তা শুনে পাথর সরিয়ে দিলেন ও নিলাকর ভক্তিভরে মাকে প্রণাম করল। এরপর কোশাকারের কাছে সে এলে কোশাকার তার মূক, অজ্ঞ ও জড় হয়ে জন্মাবার কারণ জানতে চাইলেন। তখন নিলাকর বলল পূর্বে সে বৃন্দাকর নামক ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মেছিল। পিতা দৃশকপি ও মা মালা, সে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও মাহাজ্ঞানী ছিল কিন্তু সে নানা দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল। তাকে লোভ ও মোহ গ্রাস করল। ক্রমে সে পরস্ত্রীও হরণে মগ্ন হল এবং পাপের ফলে গলায় দড়ি দিয়ে মরল এবং মরার পর রৌরব নরকে পতিত হয়ে হাজার বছর পরে মুক্তি লাভ করে গভীর অরণ্যে বাঘ হয়ে জন্ম লাভ করল।

একদিন এক পরাক্রমশালী রাজা তাকে খাঁচায় পুরল। বাঘ হলেও তার শাস্ত্রজ্ঞান জাগ্রত ছিল। রাজা একদিন একটি কাপড় পড়ে বাইরে গেলে তার স্ত্রী চিতা বাঘের কাছে গেলে পূর্ব স্বভাববশত তার কাম উদ্বেগ হল। তখন জিতা বলল যে, কিভাবে সে বাঘের সাথে রতি মিলন করবে? জিজি তখন বাঘকে রাতে খাঁচা মুক্ত করবে বলল, কিন্তু বাঘের আর ধৈর্য্য ছিল না। ফলে রাজপত্নী খাঁচা খুলে দিলেন এবং রতি কামনার বাঘ জিতাকে গ্রহণ করল। কিন্তু রাজ পুরুষরা তাকে দেখতে পেয়ে মুগুরের আঘাত করে ও দড়ি শেকলে বেঁধে ফেলল এবং ভয়ংকর ভাবে মারলে তার মৃত্যু ঘটল এবং নরকে পতিত হল।

হাজার বছর পর সাদা গাধা হয়ে অগ্নিবস্য ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মাল। তখনও তার অন্তরে শাস্ত্র জ্ঞান জাগ্রত ছিল। ব্রাহ্মণ পত্নীরা তাকে বাহন করে নিলেন। একদিন তার বিমতি পত্নী পিতৃগৃহে যেতে চাইলে অগ্নিবস্য তাকে গাধার পিঠে যেতে বললেন– সেই তন্বী গাধার পিঠে চেপে যাত্রা করল। মাঝে এক নদীর জলে স্নান করতে গেল। স্নান শেষে সে ভিজা কাপড়ে

উঠে আসলে গাধা কামবশত তার দিকে ছুটে গিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তার অনুচররা লাঠি হাতে তাকে তাড়া করলে সে দক্ষিণে পালাল এবং দুরাত্মা গাধা শেষপর্যন্ত ফঁদে বাধা পড়ে মারা গেল।

দীর্ঘকাল নরক যন্ত্রণার পর শুকপাখি হয়ে জন্মাল। এক দুরাত্মা ব্যাধ তাকে বণিক পুত্রের কাছে বেচে দিল। বণিক তাকে যুবতীদের কাছে রেখে দিল। বণিক পত্নীরা তাকে ভাত ও পাকা ডালিম দিত। চন্দ্রাবতী নামক এক বণিক পত্নী খাঁচাখুলে শুককে একদিন বার করে তার সুপুষ্ট স্তনের উপর চেপে ধরল। তখন পাখির মনে কামভাব জাগল, কিন্তু বণিক পত্নী গলার হার পেঁচিয়ে শ্বাস রোধ হয়ে মারা গেল এবং শুক পুনরায় ঘোর নরকে নিমগ্ন হয়ে এক চণ্ডালের ঘরে ষাঁড় হয়ে জন্মাল।

একদিন চণ্ডাল তাকে গাড়িতে জুড়ে পত্নী সহ বনের দিকে চলল। চণ্ডাল পত্নী কিছুদূর যাবার পর গান গাইতে লাগল, ফলে ষাঁড় ভাবাবেগবশত পা পিছলে মাটিতে পড়ল এবং মারা গেল। এবার সে হাজার বছর নরক যন্ত্রণা ভোগ করল। তারপর সে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মাল এবং শাস্ত্রের পূর্বাভ্যাস বশে তার বা শক্তি ফিরে এসেছে। ফলে সে কথা দিল আর পাপ কাজ করবে না। এখন শাস্ত্র পাঠই তার জীবিকা। তাই সে পাপকাজ থেকে পুণ্য লাভের জন্য তপস্যা করে।

নিশাকর তখন পবিত্র মুরারি সদনবদরি আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সে পূর্ব জন্মের অভ্যাস ত্যাগ করতে প্রস্তুত হল। তাই দান না করলে অগ্নিদাহের মতো পাপ ঘটে। বলি নারায়ণের ধ্যানে শুক্রাচার্যকে একথা বলে ছিলেন।

৫৪

পুলস্ত্য বললেন, বামনাকৃতি বিষ্ণু বলির যজ্ঞস্থানে এসে উচ্চস্বরে বললেন–এই যজ্ঞের ঋত্বিকগণ ওঁকার যুক্ত বেদের প্রতিমূর্তি। অশ্বমেধ যজ্ঞ সব যজ্ঞের সেরা, তাই যা উচিত মনে করেন করুন। বলি তখন অর্ঘ্য পাত্র নিয়ে দেবের সামনে এসে দেবকে বললেন,আপনাকে কি দেব অনুগ্রহ করে বলুন। মধুসূদন ভরদ্বাজের দিকে তাকিয়ে বলিকে বললেন, যে তার পুরুর পুত্র যজ্ঞ করতে চান কিন্তু অবস্থান নেই তাই বলিও যেন তাকে ত্রিপদভূমি দান করে। এরপর স্ত্রী ও পুত্রের দিকে তাকিয়ে রাজা বলি বলল যে এ শুধু আকারে বামন নয়, এর প্রার্থনাও ছোট, তাই মাত্র ত্রিপদ ভূমি চাইছে। বলি আবার হরিকে বললেন, আমার হাতি, ঘোড়া, ভূমি, দাসী, সোনা প্রচুর পরিমাণ আছে, আপনি যা চান বলুন।

বলি তাকে বলল, রসাতল, পৃথিবী বা স্বর্গের মধ্যে যে কোন একটি চাইতে। কিন্তু বিষ্ণু তাকে কেবল তিন পা জমি দিতে বলল। বলি তখন জলপাত্র হাতে নিয়ে বিষ্ণুকে যেই তিন পা ভূমি দান করল সাথে সাথে বিষ্ণুর করতলে দান করা জল পড়ল এবং তিনি জগন্ময় মূর্তি ধারণ করলেন। এবং তার পায়ে ভূমি, অন্তরীক্ষ, জানুতে তপোলোক, উরুতে মেরু, কোমরে কিছু দেবগণ, বস্তি প্রদেশে ও মাথায় মরুৎগণ পিতৌ কামদেব, আস্তকোয়ে প্রজাপতি উদরে বামে সাত সমুদ্র, উঠবে সমগ্র লোক বুক থেকে নাভি মূল পর্যন্ত গোমে নদী, কাঁধে রুদ্র, বাহুতে দিক। হাতে অষ্টবসু, হৃদয়ে ব্রহ্মা, অস্থিতে বজ্র, ঘাসে দেবমতো অদিতি। মুখমণ্ডলে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ নিচের ঠোঁটে সকল সংস্কার ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সহ যাবতীয়। কপালে লক্ষ্মী, দুই কান অশ্বিন কুমারের চোখের পাতায় কৃত্তিকা ও রোম রজিতে মহর্ষিগণ বিরাজ করতে লাগলেন। বিষ্ণু একটি মাত্র পা-তে সমগ্র জগত দখল করে নিলেন।

দ্বিতীয় পদক্ষেপে দেশের দক্ষিণে ও সূর্য বারে বিরাজ করত তৃতীয় পায়ের অর্ধেকে স্বর্গলোকে মহালোক, জনলোক ও তপোলোকে অধিকার করে। বাকি অর্ধেকে নভঃস্তল আবৃত করে ফেললেন বিষ্ণু বিশাল আকার ধারণ করে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে নিরালোকে চলে এলেন। তার পদদেশ থেকে এক ভয়ংকর নদীতিপন্ন হয়। অপ্সরা তাকে বিষ্ণুপদী নামে স্তব করতে লাগলেন।

তৃতীয় পা সম্পূর্ণ না ফেলে সে বলিকে বাঁধবে বলল। তখন বলি পুত্র, বাণ তাকে বলল, আমার সৃষ্টি অনুযায়ী পিতা আপনাকে দান করেছে। তবে কেন আপনি পিতাকে বাকচাতুরিতে আবদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছেন। আমার পিতাকে আবদ্ধ করবেন না। কারণ আপনিই বলেছেন যোগ্য পাত্রে দান করলে কল্যাণ হয়। বিষ্ণুকে দান করলে তো অশেষ ফল লাভ অবশ্যাম্ভাবী। প্রথমে আপনি বামচরণে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করে এখন কেন বিশাল আকৃতি ধারণ করেছেন।

বলির পুত্রের কথা শুনে তার উত্তর দিলেন জনার্দন। প্রথমে তিনি তার সরীয় অনুসারে ত্রিপদ ভূমি দান করতে বলেছিলেন ও বলিও তাই করেছিলেন। কিন্তু বলি তো আমার দেহের পরিমাণ জানে তবে কেন অসংকোচে দেহপ্রমাণ ভুমি দান করে বসল? তবে তোমার পিতার কল্যাণে সে অবশিষ্ট পদদ্বয় দেবার ফলে সে কল্পকাল অবধি জীবিত থাকবেন। বিষ্ণু বানকে বললেন, সুতল নামক পাতালে গিয়ে নিরাময় দেহে বাস করতে। বলি বলল, সুতলে বাস করলে কোথা হতে ভোগরাশি আসবে। তখন বিষ্ণু তাকে ভোগ দ্রব্যের কথা বললেন– অবৈধ দান বেদান্ত রহিত, শ্রাদ্ধ ও ব্রত বিহীন অধ্যায়ন অনুষ্ঠান করলে, ফললাভ ঘটবে তাছাড়া ইন্দোৎসবে অনুষ্ঠানে তোমার উদ্দেশ্যে আচারকষ্টি মহোৎসব প্রবর্তিত হবে। এই উৎসব

দীনদান নামে বিখ্যাত হবে। জনগণ দ্বীপ জ্বেলে পুস্পার্ঘ্য দিয়ে সযত্নে অর্চনা করবে। তোমার রাজ্যের উৎসব স্বনামে খ্যাত হবে।

বিষ্ণু এরপর প্রস্থান করলেন ও ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য দান করলেন। দেবতারা যজ্ঞভাগ ভোজী হলেন। তিনি স্বর্গলোকে হাজির হলে সাশ্ব মহাসুরদের সঙ্গে অন্তরীক্ষে সৌৎ নামক প্রসিদ্ধ পুরী নির্মাণ করে যথেচ্ছ বিচরণ করতে লাগলেন। ময়দানব ধাতুনির্মিত ত্রিপুর নামে নগরে তারক প্রভৃতি অসুর ও আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে যথেচ্ছভাবে বিরাজ করতে লাগল। বাসুদেব স্বর্গে গেলেন, বলি রসাতলে বন্দি হল। বান এক সুদৃঢ় শোণিত নামক নগর নির্মাণ করে অসুরসহ বাস করতে লাগল। বিষ্ণু এভাবে বলিকে বন্দি করেছিলেন। এই কাহিনি শুনলে পাপক্ষয় হয় এবং পুণ্য লাভ হয়।

৫৫

নারদ বললেন, তিনি জানতে চান বিষ্ণু ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য দান করে কোথায় গেলেন? পুলস্ত্য বললেন। বিষ্ণু ব্রহ্মার কাছে গেলেন এবং ব্রহ্মা তাঁর দেরির কারণ জানতে চাইলেন। বিষ্ণু বললেন–তিনি বলিকে বন্দি করেছেন। ব্রহ্মা তখন তার অ্যুত যোজন বিস্তৃত আকৃতি দেখে নিজেও দীর্ঘ আকার ধারণ করে তাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে স্তব করতে লাগলেন- হে দেবাদিদেব, বৃষবলি, তালধ্বজ, মহাসেন, গুরুকেন, নীলা, স্থল, পীত, শ্বেত, প্রীতি বাস, কুশোয়, গোবিন্দ ওঁকার, বিশ্বদেবেন, বিস্বভূত, বিশ্বরূপ তোমা হতে উৎপন্ন, ব্রাহ্মণরা তোমার মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরুযুগল এবং শুদ্র তোমার চরণ কমল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তোমার নাভিতে অন্তরীক্ষ, তোমার ক্রোধ থেকে শিব, মাথা থেকে স্বর্গ, দুই কান থেকে দিকসমূহ সমুৎপন্ন, তুমি নক্ষত্র, হুতাসন, পবিত্রা, ত্রাতা, অরণিধ্যের, যজ্ঞ, গাহ্য, ধ্যাতা, মাধব, কালি, মিত্রবরণ, ভূতাদি মহাভূত, অন্তর্কতা তোমায় প্রণাম।

ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু তাকে বর চাইতে বললেন। তখন ব্রহ্মা বললেন, যে স্বয়ং বিষ্ণু যেন বামনরূপে চির দিন তাঁর ভবনে বিরাজ করেন। বিষ্ণুও তাই করলেন, এবং সকলে তার পূজা করলেন, –অপ্সরা নৃত্য ও দেবরমনীগণ গান করতে লাগলেন। বিষ্ণু স্বর্গে বামনরূপে সহস্রযোজন স্থান জুড়ে অবস্থান করলেন।

পুলস্ত্য বললেন, বলি রসাতলে গিয়ে নির্মাণ করলেন এমন একটি পুরী, বা নানা মণি-মাণিক্য খচিত ও বিশুদ্ধ স্ফটিকে নির্মিত। এর দ্বারদেশ মুক্তাজালে আবৃত। বলি এখানে পত্নীসহ সুখ ভোগ করতে লাগল। এই সময়ে বিষ্ণুর দৈত্যদেহ হরণকারী চক্র সেখানে এসে উপস্থিত হল

এবং দৈত্যরা ভীত হল। তখন এক ঘোর কোলাহল শব্দ শোনা গেল এবং তা শুনে বলি তাড়াতাড়ি খঙ্গ তুলে নিতে বিন্ধ্যাকারি তাকে খঙ্গ কোষবদ্ধ করতে অনুরোধ করলেন। তখন তিনি চক্রের কথা বলিকে বললেন–এবং এই চক্রের পূজা করতে বললেন।

বলি তখন করজোড়ে চক্রের স্তব করতে লাগলেন। হরিচক্র স্তব করে বললেন– হরিচক্র সুদর্শন, সহস্রাংসু ও সহস্রাভ, যার তুঙ্গে শূলপানি, আর মূলে হিমালয়, আর সমূহে ইন্দ্র, সূর্য অগ্নি, জীব, বায়ু, জল, বাতাস ও আকাশ, যার নেমির বহিভাগে বালমিল্যাদি মুনিগণ বিরাজিত সেই সুদর্শনকে প্রণাম করি। পিতৃ ও মাতৃকুলের পাপ হরণ করে নাও। তোমার নাম সংকীর্তনে আমার আপদ দূর হয়ে যাক। ব্যাধি বিনষ্ট হোক। বলির হাতে পূজা নিয়ে চক্র অসুর হরণ করে নিয়ে পাতালে চলে গেলেন। এবং বলি বিপদগ্রস্ত হয়ে প্রহ্লাদকে স্মরণ করলেন। প্রহ্লাদ এলে তাকে অর্চনা করে বলি বলল যে, ভয়ানক বিপদে পড়েছি, উদ্ধার করুন।

প্রহ্লাদ পৌত্রের সুমতিতে তাকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি তখন বিধানের কথা বললেন। যারা ভব সাগরে পতিত, সংসার জ্বালরূপ, বায়ুবেগে দিশেহারা, বিষম বিষয় সলিলে মগ্ন, তাদের পথে বিষ্ণুরূপ ভালোই আশ্রয়স্থল, যম তার দূতদের কাছে বলে যে মাধব যার প্রতি প্রসন্ন তাকে ত্যাগ কর। প্রতি ইক্ষবাবু ভক্তিভরে বলেছিলেন, বিষ্ণু ভক্তরা যমের অধিকার বহির্ভূত। শ্রীহরির চরণ কমল পূজা করার শক্তি যাদের নেই তাদের হাত হাত নয়।

যে রসনা হরির সংকীর্তনে বিমুখ তার রসনাই নয়। যারা ত্রিবিক্রমের মূর্তির পূজা করে তাদের পক্ষে দেবতাগণসহ সর্বলোকের পূজা করা হয়। চক্রপাণির গুণরাশি আসে। যাঁরা মহাত্মা ব্যক্তি, তারাই স্বর্গগামী, সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত বাসুদেবের দর্শন লাভ করে। বাসুদেবকে যথারীতি ধ্যান ও প্রণাম করলে পুণর্জন্ম হয় না, যে তার পূজা করে সে সংসার আবর্তে পতিত হয় না। যারা যথা সময়ে শয্যা ত্যাগ করে, তারা অতি বড় সঙ্কটে থেকেও পরিত্রাণ লাভ করে।

যারা কর্ণরূপ পত্রে হরিনাম রূপ সুধা পান করে তারা যাবতীয় সংকট থেকে মুক্তি লাভ করে 'নমো নারায়ণায়' সর্বার্থ সাধকমন্ত্র। বিষ্ণুর আশ্রয় প্রার্থীর পরাজয় নেই। বিষ্ণুর নামে গানে সকল বিঘ্ন দূর হয়। সকল তীর্থ দর্শন হয় তার নাম করলে। ত্রিসন্ধ্যা তার নাম করলে উপবাসের ফল লাভ হয়। শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিয়মে হরির অর্চনা করলে পরম সিদ্ধিলাভ হবে। যারা নারায়ণকে সর্বদা স্মরণ করে তারা সংসার-সমুদ্রে অতিক্রম করে, যারা জনার্দনের ধ্যান করে তাদের চিত্ত পাপমুক্ত হয়। তার নামকারীরা বিষ্ণুলোকে স্থান পায়। যারা জন্মবধি নানা পাপ

কাজ করেছে তারা হরির নাম ভক্তিভরে করলে পাপমুক্ত হয়ে অমৃত পানে তৃপ্ত হয়, শ্রদ্ধাশীল জনগণ সর্বদা তার ধ্যান ও নাম সংকীর্তন করবেন।

বলি বললেন, জনার্দনের আরাধনায় যে মোক্ষ লাভ হয় তা শুনলাম কিন্তু তার আরাধনা কিরূপে করবেন, কোন দান বিষ্ণুর পক্ষে প্রীতিকর ও কোন তিথিতে উপবাস করলে তিনি সন্তুষ্ট হন। প্রহ্লাদ বললেন, জনার্দনকে ভক্তিভরে যা দান করা যায়। তাই তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে, গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণদের পূজা করলেও জনার্দনের পূজা করা হয়। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ হোক বা না হোক তাকে অবমাননা করা উচিত নয়। ব্রাহ্মণই বিষ্ণু দিব্যসারীর তাই শ্রদ্ধাভরে তার অর্চনা করা উচিত।

তিথি বিষয়ে বিষ্ণু যাতে প্রীত হন– জাতী, কুন্দবান, চাপা, অশোক, করবী, যুথিকা, বকুল, পারিজাত, তিল, জবা, টগর ফুলের মধ্যে কেয়া ছাড়া অন্য সকল ফুল বিষ্ণুর পূজায় ব্যবহৃত হয়। নানা লতাপাতা, সাদা লাল পদ্ম, প্রবাল, দুর্বা, পত্রকোরক প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে বিষ্ণু পূজা করতে হয়। এছাড়া কুমকুম, চন্দন, ধুনো, নাগকেশার, জাতীয়ফল, প্রিয়, ঘি, যব, গম, তিল, মুগ, শাল, মাষ–ধান হরির প্রিয় বস্তু, পবিত্র গোদান ভূমিদান এবং বস্ত্র ও অন্নদানে প্রীত হন। ফাল্গুনে ধান, কাপড়, কৃষ্ণতিল, মাঘে তিল ও ধেনু, চৈত্রে বস্ত্র, শয্যা ও আসন, বৈশাখে, জলপূর্ণ কলস, ধেনু, চন্দন ও তালবৃন্ত দান করতে হয়। যারা বিষ্ণু ভক্ত তারা স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখে বাস করে। যে বিধি মতো বিষ্ণুপুজা করে তার পাপ দূর হয়, সে অশ্বমেধের ফল লাভ করে।

যে পুরুষ বা নারী বামন পুরাণের কথা শোনে সে পৃথিবীতে পুণ্যতম। তার স্বর্ণ, ভূমি, গো, ঘোড়া, হাতি, লাভ হয়, রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। বামন পুরাণ শুনলে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণে রত্নদান, বুভুক্ষু ব্রাহ্মণকে আত্মদান, পিতা, মাতাদের, জৈষ্ঠ্য ভ্রাতাকে গ্রহণ করলে যে ফল লাভ হয়, তা বামন পুরাণ পাঠের সমগোত্রীয়। আষাঢ়ে পাদুকা, ছাতা, লবণ, আমলকী ভাদ্রে পায়েস মধু, ঘি, লবণ ও গুড় মেশানেনা ভাত, আশ্বিনে উৎকৃষ্ট অশ্ব, বৃষ, দই তামা, লোহা, কার্তিকে রূপা, সোনা, দীপমণি ও মুক্তামালা। অগ্রহায়ণে খচ্চর, সাপ, দান ও চমর। পৌষে প্রাসাদ, নগর প্রভৃতি দান করবে, যে কেশবের জন্য মন্দির নির্মাণ করে সে সনাতন পবিত্র লোকে স্থান পায়, তার উদ্দেশ্যে ফুল ও ফল দান করলে ভোগরাশি উপভোগ হয়।

যে বিষ্ণু মন্দিরের যত্ন নেয় সে পাতকী, উপপতকী, মহা পাতকী হলেও পাপমুক্ত হবে এক বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। পরে বাসুদেবের মন্দিরে সোনার তৈরি দীপ, পাত্র, রূপার

পতাকা ও বহু সুসজ্জিত নির্মাণ করেন। এখানে চারপাশে ফুল, ফল, লতা, পাতায় যে ভরা দেবদারু গাছের রমণীয় বাগান তৈরি করলেন। ফুল বাগান সহ সরিষার তেলের দীপ দান করলে নরক উদ্ধার হয়। আশ্রয় বলি বললেন। হরি মন্দির তৈরি করে সযত্নে ব্রাহ্মণদের অর্চনা করতে, সদাচার পবিত্র চিত্তদের বস্ত্র, অলংকার, রত্ন, ভূমি দান করে। ভগবান জগৎপতিকে আশ্রয় করলে তোমার কল্যাণ হবে ও অবসাদ মুক্ত হবে।

পুলস্ত্য নারদকে বললেন–প্রহ্লাদ বলিকে উপদেশ দিয়ে নিজ নগরে ফিরে গেলেন। তারপর বলি দেবশিল্পীকে দিয়ে কেশব মন্দির নির্মাণ করলেন। তিনি ও তার স্ত্রী সেই মন্দির প্রত্যহ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতেন। প্রত্যহ নিজে দ্বীপে জ্বালিয়ে দিতেন এবং ধর্মীয় গান করতে লাগলেন। বলির ভক্তিকে জনার্দন সন্তুষ্ট হয়ে তাকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি দীপ্তমান মুষল নিয়ে বলির দ্বাররক্ষক হলেন। ফলে কোনো শত্রু প্রবেশ করতে পেল না। বলি নারায়ণের দ্বারদেশ দেখে তাঁকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে পূজা করতে লাগলেন। প্রতিদিন হরির পাদপদ্ম পূজা ও নামগান করে তার কাল কাটতে লাগল।

তার স্মৃতিপথ জাগরূক হল পিতামহ প্রহ্লাদের উপদেশে। এই উপদেশ ইহলোক ও পরলোকের পথ্য স্বরূপ, বয়োজ্যেষ্ঠদের উপদেশ আপাত মধুর না হলেও সুফল দান করে পরিণাম সুখে ও নির্বিঘ্নে তার কাল কাটে। যে ব্যক্তি বৃদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তা সর্ববিশেষ মুক্তির সমযুক্তি দেয় সোমরসের তৃপ্তির চেয়ে বৃদ্ধব্যক্তির উপদেশাবলি বেশি তৃপ্তিকর। যারা গুরুজনের উপদেশ অবহেলা করে তারা মরার মত বেঁচে থাকে। তারা স্বজনের করুণার পাত্র হয়, যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে গুরুজনের উপদেশ মানে তার সিদ্ধি লাভ ঘটে। এই বামন পুরাণ সবিস্তারে বললেন–পুলস্ত্য–যা শুনলে ব্যাধি, পাপদূর হয়। যে বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিবান হয়ে বামন পুরাণ শোনে তাকে গো, ভূমি ও সোনা দান করতে হয়। এব্যাপারে অন্যথা হলে পুরাণ শ্রবণ নিফল। যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা এই পুরাণ শুনবে বা পাঠ করবে তার যাবতীয় সম্পদ লাভ হবে।

ভাগবত পুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ

উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

প্রথম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

মহামুনি বেদব্যাস বিভিন্ন পুরাণ শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যেন তৃপ্ত হতে পারেননি। ঠিক সেইসময় মহান দেবর্ষি নারদের উপদেশ তিনি লাভ করলেন। যার দরুণ তিনি শ্রীমদ ভাগবত শাস্ত্র প্রণয়ন করতে চাইলেন। এই গ্রন্থে শ্রীভগবান-এর সমস্ত গুণ বর্ণনা করা হয়েছে।

এই শাস্ত্র তিনি যখন প্রণয়ন করতে চলেছেন, তখন তিনি এইরূপে মঙ্গলাচরণ করেছেন

যা থেকে এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে, যাতে স্থিতি ও লয়, তেজ, বারি এবং মৃত্তিকার মতো পদার্থের বিনিময়, সেই ধরনের যে ভাগবত স্বরূপে তম, রজ এবং সত্ত্ব গুণের কার্যাদি সত্যের মতোই পতিত হয়, যিনি স্বয়ং অভিজ্ঞ এবং স্বরাট, যে বেদে দৈবগণ স্বয়ং বিমোহিত হয়ে যান, যে বেদ যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয় পদ্মে প্রকাশ করেছিলেন, নিজের তেজের দ্বারা সবসময় যাতে কুহক নিরস্ত হয়ে রয়েছে, সেই সত্য স্বরূপ স্বয়ং পরমেশ্বরকে আমরা নিয়ত ধ্যান করে থাকি।

মহামুনি বেদব্যাস রচিত শ্রীমদভাগবত গ্রন্থে ঈর্ষাশূন্য সাধুদের ঈশ্বর আরাধনার সমস্ত ধর্ম নিরূপিত হয়েছে। এই বর্ণিত ঈশ্বর আরাধনা রূপ গ্রন্থে ধর্মের তিনটি দিক আছে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক। যা পরম মঙ্গল দান করে, সেই বাস্তব বস্তু এখান থেকে জানা যায়। শ্রীমদভাগবত যে গ্রন্থটি সেটি বেদরূপ কল্পবৃক্ষের গলিত ফল। সেই গলিত ফলই শুকদেবের মুখ থেকে পতিত হয়ে পড়েছে পৃথিবীতে। হে রসিক পাঠকগণ, আপনারা অমৃত দ্রব সংযুক্তা এই রসময় ফল রূপ বেদবারি শ্রবণের পরেও বারংবার পান করতে চাইবেন।

বিষ্ণুক্ষেত্র–যার নাম নৈমিষারণ্য, সেই অরণ্যে শৌণক প্রমুখ ঋষিরা সহস্র বছর যাবৎ একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে চলেছিলেন। এই রকমই যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলাকালীন একদিন শৌণক প্রভৃতি ঋষিরা প্রাতঃকালে নিত্য নৈমিত্তিক হোম সমাপণ করেছেন। এমন সময় সেখানে রোমহর্ষণের পুত্র সূত এলে ঋষিগণ তাঁকে বসতে আসন দিলেন। সেই ঋষিরা সূতকে সাদরে আপ্যায়ণ করে জিজ্ঞাসাও করলেন–হে সূত, তুমি পবিত্র মহাভারত আদি ইত্যাদি ইতিহাস ধর্মশাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করেছ। যে সমস্ত বেদ বিদ্রা রয়েছে, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান বেদব্যাস এবং অন্যান্য সগুণ ও নিগুর্ণ সমস্ত তত্ত্ববিদ মুনিরা যা জানেন, হে সৌম্য তুমি স্বয়ং

সেই তত্ত্ববিদ মুনিদের অনুগ্রহেই সব জানতে পেরেছ। কারণ হিসাবে বলা যায় সমস্ত গুরুরাই তাঁদের প্রিয় শিষ্যের কাছে সমস্ত গোপনীয় তত্ত্ব অনায়াসে ব্যক্ত করেন। হে আয়ুষ্মন, যে সমস্ত অর্থবোধক রাজ্য রয়েছে তাদের মধ্যে কলি ভাবাপন্ন মানুষের যে সমস্ত মঙ্গলময় বলে তুমি মনে করছ তার সব কিছুই আমাদের কাছে বল,

হে সভ্য তুমিতো জানোই বর্তমান এই কলিযুগে মানুষের আয়ু তো ক্রমশ কমেই আসছে। দিনে দিনে মানুষ ক্রমশ অলস এবং অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। ফল স্বরূপ নানা রোগ তাদেরকে দিনে দিনে আক্রমণ করে চলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন শাস্ত্র, বিভিন্ন কর্ম এবং তাদের শ্রবণের বিষয়েও বিবিধ কথা বলা হয়েছে। হে সুজন, আগে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যা সার বস্তু, সমস্ত মানুষদের কাছে যা কাঙ্খিত, তুমি তার সমস্ত কিছুই ব্যক্ত কর। হে সূত, ভগবান তোমার সদাই মঙ্গল করুক। সমস্ত ভক্তগণদের পালক পিতা স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু যে কাজ করবার জন্য বসুদেবের পত্নী এবং কংসের প্রিয় ভগিনী দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়।

এই মায়াময় ঘোর সংসার প্রবাহে পতিত সমস্ত মানুষ বিবশের বশীভূত হয়েও যার নাম উচ্চারণ করলে সমস্ত ভয় থেকে মুক্তি লাভ করে, যে ভগবানের পাদরূপ পদ্মশ্রিত প্রসন্নচেতা মুনিরা তাদের চরণ প্রান্তে উপনীত সমস্ত জনগণকে দর্শনমাত্র পবিত্র করেন, সঙ্গাদি পুণ্যবারিযুক্ত নদী তীর্থ বারবার স্নানের দ্বারা তাদের পবিত্র করে থাকেন, উচ্চারিত যত পুণ্য শ্লোকসমূহ, প্রশংসিত কর্ম সেই ভগবানের কলুষতা বিনাশক, যশ, শুদ্ধি, কাম সমূহ কোন্ ব্যক্তি না শ্রবণ, করতে ইচ্ছুক?

মানব সমাজের কল্যাণার্থে স্বেচ্ছায় যে ভগবান নারায়ণ অবতার মূর্তি ধারণ করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনি নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ কর্তৃক পরিগীত উদার কর্মসমূহ শুনতে শ্রদ্ধাশীল আমরা, আমাদের কাছে তুমি কর্মসমূহের বর্ণনা কর। হে ধীমান, যিনি নিজ মায়ারূপ লীলার দ্বারা নিজের ইচ্ছায় সৃষ্টাদি কর্ম এবং ভূ-ভার হরণরূপ লীলা করে থাকেন, সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় মৎস্যাদি দশটি অবতার সকলের কথাও আমাদের কাছে বর্ণনা কর। আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলা শ্রবণে কখনই উদাসীন হই না। এই শ্রীকৃষ্ণ লীলা শ্রবণে রসিককুলের অন্তরে ক্ষণে ক্ষণে মধুর থেকে মধুরতর অনুভূতির আবির্ভাব ঘটতে থাকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার বিভিন্ন অবতার লীলায় নিজেকে আত্মগোপন করে মানুষের দেহ ধারণ করেছেন। তিনি তার ভ্রাতা রূপে আবির্ভূত বলরামের সাথে অলৌকিক কার্য সমূহও সম্পাদন

করেছেন। তুমি তা আমাদের কাছে ব্যক্ত কর। কলিকাল আগত প্রায় জেনে তার ভয়ে দীর্ঘকাল সাধ্য যজ্ঞের ছলে ঐ বৈষ্ণব ক্ষেত্র যাতে আমরা কলির কথা শ্রবণ করার অবসর পেয়েছি। যারা মহাসমুদ্র পার করবার জন্য ইচ্ছুক বা প্রস্তুত সেই সব মানুষের কাছে এই শাস্ত্র মাঝির মতো, যা জীবদের বিচার করার বুদ্ধি বিনষ্ট করে সেই বিনষ্টকারী কলিরূপ দুস্তর সমুদ্র পার হতে আমরা ইচ্ছুক। তাই তো বোধ হয় তোমাকে কর্ণের ন্যায় বীর করে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। সমস্ত ব্রাহ্মণগণের পরিপালক, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের রক্ষক, সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর স্বরূপ শ্রীবিষ্ণু এক্ষণে স্বধামে গমন করেছেন। তাহলে এক্ষণে ধর্ম কাকে আশ্রয় করে আবর্তিত হচ্ছে? হে মহাত্মা, তুমি তা আমাদের সবার নিকট বর্ণনা কর।

.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভগবানদের কথন ও ভক্তির যে মাহাত্ম তার

সমস্ত ঋষিদের প্রশ্নে পরিতুষ্ট হয়ে রোমহর্ষণ পুত্র সূত তাদের সুবাক্যে অভিনন্দিত করে ঋষিগণকে বলতে শুরু করলেন–

এই পৃথিবীতে যার কোনও কর্ম নেই, যিনি পুত্রের বিরহে একাকী সন্ন্যাসী হয়ে অনবরত গমনরত, সেই ঋষি বিরহ কাতর কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ‘হা পুত্র’ বলে যে মুনির অনবরত অনুগমন করে চলেছেন, যিনি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণের হৃদয়ে অবস্থিতির জন্য বৃক্ষরূপ ধারণ করে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, যিনি সেই বক্তা মুনি শুকদেবকে আমি প্রণাম করছি। যে সমস্ত মানুষ গাঢ় অন্ধকারময় সংসার রূপ ভবসাগর পার হতে চায়, সেই সমস্ত উগ্রশ্রবা সংসারী জনগণের প্রতি কৃপা দেখিয়ে যে অতি গোপনীয় শ্রী ভগবত পুরাণ বলেছেন। মুনিদের মধ্যে মহামুনি, সমস্ত গুণীদের মধ্যে যিনি মহাগুণী, সেই শুকদেবকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। যে পবিত্র অমূল্য গ্রন্থ যা প্রভাব অতুলনীয়, অসাধারণ প্রভাবে যা পরিপূর্ণ, যা সমস্ত শ্রুতির সারবস্তু, যার তুলনীয় গ্রন্থ আর কিছু নাই, বলা যায় যা এক এবং অদ্বিতীয়, যা অধ্যাত্ম তত্ত্ব মূলক সমস্ত বিষয়ের প্রকাশক, সেই অমূল্য পবিত্র গ্রন্থ যিনি বর্তমানে আমি উচ্চারণ করব। হে নারায়ণ নর, সমস্ত নরদের মধ্যে উত্তম, দেবী, সরস্বতী মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার জানিয়ে এই মায়াময় সমস্ত বিশ্বসংসার জয় করতে পারা যায় এবং অন্ধকারত্বের মূল কারণ স্বরূপ সংসারের মায়াময় দুঃখ, সমস্ত কষ্ট হরণ করতে পারা যায় এমন পবিত্র অমূল্য বিশ্বজগতের এমন গ্রন্থ পাঠ করবেন।

হে মুনিগণ, আপনাদের এই সুন্দর শান্তিদায়ক পূর্ণ প্রশ্নে আমার চিত্ত সত্যিই বিমোহিত হয়েছে। আপনি আমাকে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রশ্ন করেছেন। কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারাই স্পর্শ যোগ্য নয় সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করাই সংসারের জীবমাত্রের সবার বা সমস্ত জীবের পরম ধর্ম, এই ভক্তিকে প্রতিহত করা যায় না, এরূপ ভগবানের প্রতি ভক্তির দ্বারাই আত্মার সম্যকভাবে প্রসন্নতা লাভ হয়। ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করলে জীব সমাজের বৈরাগ্য এবং অহেতুক জ্ঞানের সঞ্চার ঘটে। সমস্ত ধর্ম প্রথম থেকে সুষ্ঠরূপে অনুষ্ঠিত হলেও যদি কৃষ্ণের কথা শুনে ভক্তগণের ভক্তি উৎপন্ন না হয়ে থাকে, তাহলে সেটাকে বলা চলে পন্ডশ্রম। কোন কিছুর প্রতি প্রবৃত্তি এবং কোন কিছু থেকে নিবৃত্তিকে বলা যায় ধর্মের ফল। ভোগের ফল বলতে শুধু ইন্দ্রিয় সমূহকে চরিতার্থ করা বোঝায় না বা, সমস্ত ইন্দ্রিয় উপভূক্ত নয়। এক্ষেত্রে বলা যায়, যে বা যতটুকু ছাড়া জীবন ধারণ করা সম্ভব নয় ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে এর অতিরিক্ত অগ্রহণযোগ্য।

সমস্ত তত্ত্ববিদরা তাকেই তত্ত্ব বলে থাকেন, যা অদ্বিতীয় যা একক জ্ঞান। এই অদ্বয় জ্ঞানের স্বরূপকে ব্রহ্ম পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে। জগতের সমস্ত শ্রদ্ধাশীল মুনিরা বেদ সমূহের শেষভাগ যা বেদান্ত নামে পরিচিত তারা তা শ্রবণের দ্বারা পরম আনন্দরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। সেই পরমব্রহ্মরূপ আনন্দরূপ জ্ঞান লাভ করে মুনিরা বৈরাগ্যযুক্ত প্রেমলক্ষণ রূপ ভক্তি দ্বারা তাদের পবিত্র বা বিশুদ্ধ হৃদয় দ্বারা পরম শুদ্ধ পরম আত্মাকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

সমস্ত শ্রদ্ধেয় দ্বিজদের মধ্যে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ, বিভিন্ন বর্ণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন যে ধর্ম বিভিন্ন আশ্রম অনুসারে অনুষ্ঠিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের যে প্রয়োগ করেন তা হল কিন্তু আসলে কলির আরাধনা করা। পরম সংযমের দ্বারা মনকে একত্র করে সমস্ত জগত সংসারের ভক্তগণের প্রতিপালক ভগবানের কথাই শুধু শ্রবণ করুন। ভগবানের রূপ কীর্তন গানে সমস্ত জগতের বাতাস মুখরিত হোক। যে পরমদেব যার অনুধ্যান অর্থাৎ চিন্তামাত্র বিবেকীগণ অহংকারের দরুন উত্থিত কর্ম গ্রন্থি করে থাকেন, তাঁর কথা শুনতে কে না আগ্রহী, বলা বাহুল্য তার গুণ কীর্তন শুনতে সবাহ-ই আগ্রহী হন।

হে মহান আত্মারা, হে বিপ্রগণ, পুণ্য তীর্থে গমন করলে মহতের সেবা করার পরম সৌভাগ্য হয়, কিন্তু আবার মহৎ সেবার দ্বারা ভগবানের উপাসনায় শ্রদ্ধার জন্ম মানুষের শরীরে হয়ে থাকে। এই শ্রদ্ধার থেকে জন্ম নেয় ভাগবত কথা শ্রবণের ইচ্ছা এইভাবেই মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ যা সীমাহীন। সুতরাং ভগবানের গুণ কীর্তন ও তাঁর কথা শ্রবণ করাই হল আমাদের ন্যায় অজ্ঞানের কাছে পুণ্যের কাজ। সমস্ত জগতের সৎ যে মানুষজন

তাদের সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণ। তার আত্মকথা যারা শ্রবণ করে, তিনি সেই জনগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন। তিনি অকৃত বা কৃত সব অমঙ্গল বিধৌত করেন, নিত্য ভাগবত সেবার দ্বারা হৃদয়ের অদৃষ্ট পাপসমূহকে বিনষ্ট করা যায়। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা মূলক বা স্তবমূলক উত্তম শ্লোকগুলির উচ্চারণ মাত্র শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্তির উদয় করে। সত্ত্ব, রজ, তম প্রভৃতি গুণ সমূহ থেকে যে কামের উদ্বুদ্ধিকরণ ঘটে তার দ্বারা লোভে আবিষ্ট চিত্তকে আর আকড়ে ধরে রাখতে পারে না। চিত্ত স্বত্তগুণে স্থিত থেকে প্রসন্নিত হয়, এইরকমভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তি করতে করতে মন চিরকালীন আহ্লাদিত হয়। মানসিক সংযমের আবেশ ঘটে ফলস্বরূপ সকল বিষয়ের প্রতি সমস্ত রকম আসক্তি চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। সংযমের ফলে ত্যাগের ফলে পবিত্র সেই মানুষের ভগবত স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে। সেই পরমাত্মা ঈশ্বর যখন দৃষ্টি গোচর হয়ে যান তখন মানুষের হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থিসমূহের বিনাশ সাধন ঘটে। পরম আস্থা বা বিশ্বাসের আগমন ঘটার দরুন পাপ জনিত সকল সংশয়ের অবসান ঘটে। এতদিন পর্যন্ত ঘটে যাওয়া জীবের সকল কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং হে মনীষীগণ, ভগবান বাসুদেবের পরম পবিত্র শ্লোক উচ্চারণ করুন।

প্রকৃতিতে মোট তিনটি গুণ রয়েছে, সেগুলি হল, সত্ত্ব, তম এবং রজঃ। এই তিনটি গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরম পুরুষ এই বিশ্বের সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মাকে, স্থিতি রক্ষার জন্য বিষ্ণুর এবং প্রলয়ের জন্য মহেশ্বর-এর নাম ধারণ করেছেন। এই গুণ তিনটির মধ্যে সত্ত্ব গুণ শ্রী বাসুদেবের হাতেই সমর্পিত হয়েছে। শ্রীবিষ্ণু সকল জীবের মঙ্গল সাধন করে থাকেন। এই রূপ দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের জ্ঞান হয় যে, প্রবৃত্তিরূপ প্রকাশ যদি রহিত হয়, পার্থিব কার্যের থেকে ধূম শ্রেষ্ঠ হয়, ধূম থেকে প্রকাশ স্বভাব যে শ্রীময়, অগ্নি সে শ্রেষ্ঠ! কাঠের কিন্তু চলন শক্তিও নেই আবার তার প্রকাশ শক্তিও নেই। তাইতো গমনশীল ধর্মকে কাঠের থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কিন্তু আবার ধূম অপেক্ষা অগ্নি শ্রেষ্ঠ কেননা অগ্নি স্বভাবতই ঊর্ধ্বে গতিশীল ও প্রকাশ করা তার বৈশিষ্ট্য। সেই অগ্নির দ্বারাই আমরা বেদে উক্ত যজ্ঞাদি সমস্ত কার্যসমূহ সম্পাদন করে থাকি। প্রথমে উল্লিখিত দৃষ্টান্তের ন্যায় জয়শীল তমঃগুণের থেকে ক্রিয়াশীল রজঃগুণ শ্রেষ্ঠ। আবার এদের থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সত্ত্বগুণ। সব থেকে শ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণের দ্বারাই ব্রহ্মদর্শন মানুষের হয়ে থাকে।

অতীতে বিভিন্ন পুণ্যাত্মা মুনিরা বিশুদ্ধ যে সত্ত্ব মূর্তি অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব ভগবান বাসুদেবকেই ভজন করতেন। বর্তমান যুগে যে সমস্ত মানুষ সেই পুণ্যাত্মা মুনিদের পথকে অনুসরণ করে ভগবান বাসুদেবের ভজন করে থাকেন। যাঁরা মোক্ষ লাভ করতে চান। তারা নারায়ণের অবতার মূর্তিকেই চিরন্তন সেবা করবেন। তার মানে এই নয় যে বিষ্ণু বাদে অন্যান্য দেবতাদের

আপনারা নিন্দা করবেন। মানুষের মধ্যে যারা রজঃ এবং তমঃ প্রকৃতির তারা স্ত্রী ও পুত্র কামনায় এমনকি ঐশ্বর্যের কামনায় রজঃ ও তমঃ গুণের স্বভাব যুক্ত পিতৃলোক, ভূত ও প্রজাপতির সেবা করে থাকেন। সমস্ত বেদের উপর বাসুদেব প্রত্যক্ষ ভাবে এবং পরম্পরাগত ভাবে বাসুদেবকেই বোঝানো হয়েছে। এই সমস্ত যে যজ্ঞ যোগ নিত্য নৈমিত্তিক আদি ক্রিয়া রূপ যে জ্ঞান, যে সব তপস্যারূপ ধর্ম এবং তারপর কর্ম ফল এই সব কিছুর তাৎপর্য হলেন ভগবান বাসুদেব।

বাসুদেব স্বয়ং সমস্ত গুণের অতীত অর্থাৎ নিগুণ হয়েও এই বাসুদেব ভগবান সদ্ এবং অসদরূপ ত্রিগুণময়ী, নিজ মায়ার দ্বারা আগেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। ভগবান, তার নিজ মায়ার দ্বারা উদ্ভূত আকাশাদি কার্যে অন্তর্যামী রূপে প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। তাইত তাকে সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ যুক্ত বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে তিনি কোনরকমভাবেই গুণযুক্তা নন, কারণ, তিনি স্বীয় চিৎশক্তির দ্বারা সদাই সমস্ত বিশ্বে পরিপূর্ণ। একবার আগুন ধরানো হলে তা বিভিন্ন কাঠে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেলে তাকে আমরা বহু বলে মনেও করতে পারি, এক বিষাত্মা সকলের অন্তর্যামী পরমেশ্বর সকল প্রাণীতে অবস্থিত বলে তাকে বহু বলে মনে করে থাকি আমরা।

সে পরমাত্মা পবিত্র, সমস্ত বিশ্বের আধার রূপ সে ভগবান সূক্ষ্ম এবং স্থূল কারণাত্মক গুণময়। অর্থাৎ নিজে মায়ার দ্বারা রচিত ভাবের দ্বারা নিজের ইচ্ছায় সৃষ্ট চতুর্বিধ প্রাণীতে নিবিষ্ট হয়ে বৈষয়িক সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি তিনি ভাগ করে থাকেন। সেই ভগবান দেব, তির্যক এবং নরাদিদের লীলাবশত সেই সকল অপরূপ অদ্ভুত সব অবতার মূর্তি ধারণ করেন। সেই পরমাত্মা ভগবান সে সকল অবতার মূর্তিতে অনুরক্ত হয়ে সত্ত্বগুণের দ্বারা সমস্ত লোককে পালন করে থাকেন। কারণ তিনিই হলেন সমস্ত সংসার জগতের মূল। তথা তিনিই সমস্ত লোকের সৃষ্টিকর্তা।

.

তৃতীয় অধ্যায়

ভগবানের চতুর্বিংশতি অবতারের বর্ণনা

এর সঙ্গে সূত বিশ্বসৃষ্টির কারণ হিসাবে আরও বলে চললেন,– ভগবান প্রথমে বিশ্ব সৃষ্টি করতে গিয়ে প্রথম পুরুষরূপে বিরাট বিগ্রহ রূপ ধারণ করেছিলেন। এই বিরাট বিগ্রহ মূর্তি মহত্ব

অহংকার দ্বারা গঠিত। এই বিরাট মূর্তির একাদশটি ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূতের ষোলোটি অংশ ছিল। প্রলয়ের সময় সমুদ্রের গভীরে শয়ন করে যোগ নিদ্রায় সেই একাদশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট বিরাট পুরুষ নিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন। সেই বিরাট পুরুষের নাভিরূপ হ্রদে উৎপন্ন পদ্ম থেকে ব্রহ্মদেব আবির্ভূত হন। যিনি সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টিকর্তাদের অধিপতি। এই বিরাট পুরুষরূপ বিষ্ণুর চরণাদি সন্নিবেশের দ্বারা বিশ্ব প্রপঞ্চ নির্মিত হয়েছে। তার এই শায়িত বিরাট একাদশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট মূর্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণ বিশিষ্ট। অর্থাৎ তম এবং রজঃ গুণ থেকে সম্পর্ক শুন্য। এই পরম আশ্চর্য বিরাট পুরুষরূপ মূর্তিটিই হল ভগবানের আসল রূপ।

এই ভগবানের বিরাট পুরুষ রূপ দর্শন করা সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে সম্ভব নয়। এরজন্য জ্ঞান দৃষ্টি প্রয়োজন। আর মুনিগণ সেই জ্ঞান দৃষ্টি দ্বারা ভগবানের সেই বিরাট পুরুষ রূপ দর্শন করে থাকেন। এই মূর্তির অসংখ্য চরণ রয়েছে, উরু, আনন, মশুক, কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকা রয়েছে। এর সাথে মুকুট বস্ত্র ও কুন্ডলের সম্পর্ক আছে। ভগবানের এই বিরাট পুরুষ রূপ হল নারায়ণ ভগবানের আদিরূপ, এই একাদশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট বিরাট পুরুষ বিষ্ণুর নানা অবতারের আশ্রয় স্থান এবং অক্ষয় বীজ স্বরূপ। এই নারায়ণের বিরাট রূপী পুরুষ থেকেই বা তার অংশ থেকে সমস্ত দেবতা, তির্যক জাতি এবং মানুষের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম পুরুষ অবতারে কৌমার নামক সৃষ্টিতে ভগবান ব্রহ্মারূপ ধারণ পূর্বক অত্যন্ত দুষ্কর ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন।

দ্বিতীয় অবতার হল তার বরাহ অবতার। প্রলয় উপস্থিত হলে তিনি বরাহরূপ ধারণ করে পৃথিবীকে তার দন্তে স্থাপন করে রক্ষা করেছিলেন। তৃতীয় অবতার হয়ে ঋষিসর্গে দেবর্ষি নারদ হয়ে বৈষ্ণব তন্ত্রের বর্ণনা দেন। বৈষ্ণব তন্ত্র হল এমন একটি শাস্ত্র, যা পাঠ করলে সমস্ত মানুষ এই লোকের সমস্ত রকম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। চতুর্থ অবতারে তিনি ধর্মপত্নীর গর্ভে নর ও নারায়ণ নামে দুজন ঋষি হয়ে জন্মান এবং অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেন যা সবার পক্ষে দুষ্কর। সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কপিল রূপ হল ভগবান বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। এই অবতারে তিনি আসুরি নামক ব্রাহ্মণকে সাংখ্য শাস্ত্র বলেছিলেন। অত্রি পত্নী অনসূয়ার গর্ভে জন্ম হয় ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। তিনি অনসূয়ার প্রার্থনার হেতু তাঁর গর্ভজাত হন। এই অবতারে তিনি অলক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করেন। সপ্তম অবতারে তার নাম হয় যজ্ঞ। তিনি রুচির পত্নী আকুতির গর্ভ থেকে জন্ম নেন। তার পুত্র যম প্রভৃতি দেবগণের সাথে এই অবতারে তিনি মন্বন্তর পালন করেছিলেন অর্থাৎ তিনি নিজে ইন্দ্র হয়েছিলেন। অষ্টম অবতারে তার নাম হয় ভগবান ঋষভদেব। নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে

ঋষভদেব রূপে অবতীর্ণ হন। তিনি সমস্ত আশ্রম বাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ট পরমহংসের পথ দেখান। এটি সকলের দ্বারা সেবিত। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তার নবম অবতারে মহারাজ পৃথুরূপে অবতীর্ণ হন। মহারাজ পৃথু পৃথিবী থেকে সমস্ত ঔষধি সমূহ দোহন করেছিলেন। তার জন্য তিনি সবার কাছে পরম শ্রদ্ধেয়। তার দশম অবতার হল মৎস্য অবতার। সেই সময় চাক্ষুষ ভাবে মন্বন্তর যে ঘটেছিল তাতে সমস্ত সমুদ্র প্লাবিত হয়ে পড়ে, তিনি তখন জীব জগৎকে রক্ষার্থে পার্থিব নৌকাতে রৈবস্বত মনুকে স্থাপন করে রক্ষা করেন।

দেবতা ও অসুরেরা যখন সমুদ্র মন্থন করেছিলেন তখন ভগবান একাদশ অবতার রূপ গ্রহণ করেন। সেই অবতারের নাম হল কূর্ম অবতার। মন্থনের দরুণ মন্দার পর্বত যখন সমুদ্রতলে প্রায় নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি কূর্ম রূপ ধারণ করে মন্দার পাহাড়কে পিঠে ধারণ করেন। দ্বাদশ অবতারের নাম ধন্বন্তরি। এই ধন্বন্তরি অবতারে তিনি সমুদ্র থেকে অমৃত ভাণ্ড তুলে নিয়ে আসেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ত্রয়োদশ অবতারের নাম মোহিনী, অমৃত পান করা নিয়ে যখন অসুর ও দেবতাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের উপক্রম উপস্থিত হয়, তখন তিনি মোহিনী রূপ ধারণ করে অসুরদের বিমোহিত করে দেবতাদের অমৃত পান করান। চতুর্দশ অবতারের নাম হল নৃসিংহ অবতার। অদ্ভুত সেই রূপ সিংহের ন্যায় মুখ কিন্তু মানুষের ন্যায় শরীর। এই অবতারে ভক্ত প্রহ্লাদের বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ে হিরণ্যকশিপুকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করে নখের দ্বারা তার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর পঞ্চদশ অবতারে বামন রূপ ধারণ করে ত্রিপাদ বিশিষ্ট ভূমি প্রার্থনার ছলে স্বর্গরাজ্য কেড়ে নেবার জন্য বলির যজ্ঞে যান।

তার ষোড়শ অবতারটির নাম পরশুরাম। এই অবতারে তার অস্ত্র হল পরশু। এই অবতারে তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় শূন্য করেন। ক্ষত্রিয়দের নিধনের অন্তরালে ছিল রাজন্য বর্গের ব্রাহ্মণদ্বেষী মনোভাব। সপ্তদশ অবতারটি হলেন মহর্ষি ব্যাসদেব। মৎস কন্যা সত্যবতীর গর্ভে ঋষি পরাশরের ঔরসজাত ছিলেন এই বেদব্যাস। এই ব্যাসদেব বেদরূপ বৃক্ষের বহু শাখার উদ্ভাবন করেন। বলা বাহুল্য তিনি বেদকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অষ্টাদশ অবতারের নাম হল ভগবান রামচন্দ্র। তিনি ইক্ষাকু বংশীয় রাজা দশরথের পুত্র রূপে দেবতাদের কার্য সাধনের ইচ্ছায় রামচন্দ্র হিসাবে মর্তে আবির্ভূত হন।

একবিংশতি অবতারে ভগবান শ্রীবিষ্ণু যাদবকুলে বলরাম ও কৃষ্ণ নামে জন্ম গ্রহণ করেন। এর পরই উপস্থিত হয় কলিকাল। কলিযুগে সমস্ত দেবতা বিদ্বেষীদের দেবতার প্রতি বিশ্বাস আনার জন্য গয়া প্রদেশে অঞ্জন পুত্র বুদ্ধ নামে আবির্ভূত হন। কলিযুগের শেষাশেষি

রাজন্যবর্গ একেবারে ভালোবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে দস্যুবৃত্তিতে নেমে আসতে থাকে। সেই জন্য বিষ্ণু যশা নাম ব্রাহ্মণ থেকে ভগবান কল্কি নামে জন্ম গ্রহণ করেন জগৎকে পুনরায় রক্ষার জন্য।

ভগবান হরির অবতার অসংখ্য, যার কোন ক্ষয়ও নেই, পূর্ণ সরোবর থেকে যেমন-হাজার হাজার ক্ষুদ্র প্রবাহ, নির্গত হতে থাকে, তেমনই এই বিষ্ণু ভগবানের বিরাট রূপী মূর্তি থেকে অন্যান্য অবতারের আবির্ভাব ঘটে জগৎ-এর বিভিন্ন কারণ ও উদ্দেশ্যকে সফল করবার জন্য। ঋষি মনুদেব, মনুপুত্র দিকপাল লোকপাল এরা সকলেই হলেন ভগবান হরির অংশ। পূর্বোক্ত সব অবতাররা এবং যা এখনও উক্ত হয়নি সেই অবতাররা এই ভগবান শ্রীহরির বিরাট রূপী পুরুষের অংশ বা কলা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ তিনি কারও অবতার নন। তিনি ত অবতারী। তিনি বিভিন্ন অবতারে অসুরগণ কর্তৃক পীড়িত এই লোককে যুগে যুগে রক্ষা করে সুখী করে থাকেন। যে সকল ব্যক্তিরা শুদ্ধচিত্ত পবিত্র হয়ে এই সকল অবতারের অতি রহস্য জনক জন্মবৃত্তান্ত সন্ধান করে থাকে, তারা দুঃখ ও মায়াময় জগৎ সংসার থেকে মুক্তি পায়।

নিরাকার চৈতন্যময় ভগবানের এই স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণাত্মক এ জগৎ রূপ এবং মায়া গুণের দ্বারাই আত্মাকে রচিত করেছে। সমস্ত নির্বোধ মানুষ মেঘকে আকাশের এবং পার্থিব ধূলিকণাকে বাতাসের বর্ণ বলে মনে করে। দ্রষ্টা আত্মাকে দৃশ্য স্নেহ বলে মনে করে। দৃষ্ট এই স্থূল দেহ ছাড়া অন্য সূক্ষ্ম দেহে আছে, যেটা এখনও পরিণত হয় নি এবং মায়ার গুণের দ্বারা রচিত। এটি নিরাকার অর্থাৎ কোন আকারই এর নেই। প্রত্যক্ষের ন্যায় বা দৃষ্টি দ্বারা তাকে উপলব্ধি করা যায় না বা দেখাও যায় না। ইন্দ্রাদি দেবতাদের মতো তা শোনাও যায় না। এই সমস্ত কারণের জন্য জীবাত্মার নাম দেওয়া হয়েছে লিঙ্গশরীর। এই লিঙ্গশরীর, নিয়েই বার বার জীবের জন্ম হয়। স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীর অবিদ্যার দ্বারা আত্মাতেই কল্পিত রয়েছে। জীবের যে আত্মা পরম ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করে, তার ফলে তার দুটি দেহ সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর বিনষ্ট হলে, সেই জীব ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করে। সংসার চক্রে ভগবানের মায়া বিদ্যা রূপিণী হয়ে যদি ক্রিয়া থেকে নিবৃত্ত হয়, তাহলেই জীব পরমব্রহ্মকে লাভ করে। যে সমস্ত পণ্ডিতেরা তত্ত্বদর্শন করে থাকেন, ভগবান অবতার রূপে জন্ম লাভ করলেও তাঁর জন্ম ও কর্ম সবই দিব্য জীবদের ন্যায় প্রকৃত জন্ম কর্ম রহিত হয়ে থাকে। ভগবানের জন্ম ইত্যাদি, অবশ্যই মায়াচিত হয়ে থাকে। তত্ত্বজ্ঞানীরা একথা সব বলে থাকেন।

ঈশ্বর পরিদৃশ্যমান ঠিকই। তিনি সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি পরিচালনা করছেন, তিনি সমস্ত বিশ্বের স্থিতি বজায় রাখছেন এবং সমস্ত দুষ্ট আত্মাদের সংহার করে তিনি বিশ্বজগতকে রক্ষাও

করছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে, ঈশ্বর কিন্তু তাতে কোন ভাবেই আসক্ত হন না। ভগবান স্বাধীন তিনি কারও বশবর্তী নন। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সমুহের তিনি হলেন নিয়ন্ত্রা, তিনি প্রতিটি জীবে অন্তর্যামী রূপে অবস্থিত রয়েছেন। এই ভাবে প্রতিটি জীবে অবস্থিত থেকে তিনি দৃষ্টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়রূপ রস প্রভৃতিকে গন্ধের ন্যায় অনুভব করে চলেছেন। জীবজগৎ–এ যে সমস্ত মানুষেরা নির্বোধ তারা যেমন ভগবানের এই সমস্ত কার্যকলাপ বুঝতে পারে না, ঠিক তেমন ভাবেই দুষ্টবুদ্ধি বা কুবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা যাদের মধ্যে ভক্তির অভাব রয়েছে, তারা নিপুণ ভাবে যুক্তিতর্কের দ্বারা ভগবানের লীলা রূপ রহস্য ও অনুধাবন করতে পারে না। সম্পূর্ণ জগতের আধার এই ভগবান মনের দ্বারা বহুরূপ প্রকাশ করে থাকেন, এবং বাক্যের দ্বারা বহু নাম প্রকাশ করে থাকেন। যিনি বা যে সমস্ত নির্বোধ মানুষেরা এই দুরন্ত বীর্য চক্রধারী মহা ভগবানের লীলা রহস্য সব জানতে পারেন, তিনি আপ্লুত ভক্তির দ্বারা তার চরণ রূপ কমলে সৌরভের ন্যায় সেবা করেন। হে মুনিগণ, আপনার এই দুশ্চর সাধনায় সমবেত, এই আপনাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুরাগ যদি বর্ধিত হয় তাহলে এই সংসারের মোহ, যাতনা, দুঃখ প্রভৃতি থেকে মোক্ষ লাভ করবেন। বলা বাহুল্য যে, আর সংসার রূপ যাতনার পুনরাবর্তন ঘটবে না।

মোক্ষ লাভের আশায় সর্বজ্ঞ ঋষি বেদব্যাস ভাগবত পুরাণ রচনা করেন। মহর্ষি ব্যাসদেব রচিত ভাগবত পুরাণ গ্রন্থ বেদতুল্যই বটে, তার সঙ্গে মঙ্গলবহ এবং সব থেকে সেরা। যিনি আত্মবীর গণের শ্রেষ্ঠ তিনি নিজ পুত্রকে ভাগবত পুরাণ অধ্যয়ন করিয়েছেন। বেদব্যাস রচিত সম্পূর্ণ ভাগবত পুরাণে সমস্ত বেদ এবং ইতিহাসের সারবস্তু সংকলিত রয়েছে। সূত শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে ভগবত পুরাণ শ্রবণ করান। রাজা পরীক্ষিত তখন গঙ্গাতীরে অনশন করছিলেন এবং অনশন কৃত ঋষিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। হে মুনিগণ গঙ্গাতীরের সেই সভায় মহা তেজস্বী মহর্ষি শুকদেব ভাগবত কীর্তন করেছিলেন। আমি কিন্তু তাঁরই অনুগ্রহে ভাগবত পুরাণ শ্রবণ করেছি। সেই আমিই তেজস্বী শুকদেব থেকে যা যা অধ্যয়ন করেছি তা আপনাদের শোনাব। কৃষ্ণ তার বিভিন্ন অবতারে ধর্ম, জ্ঞান এবং ঐশ্বর্যের সাথে মিলিত হয়ে নিজের নিত্য লীলায় প্রবিষ্ট হয়েছেন, কিন্তু এই ধর্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান যাদের নেই, যারা বিবেক ও জ্ঞান রহিত, কলিযুগের সেই সব জনগণের জন্য ভাগবত পুরাণ রূপ সূর্যের উদয় প্রত্যক্ষ হচ্ছে।

.

চতুর্থ অধ্যায়

মহামুনি বেদবাস অপরিতুষ্টর কাছে দেবর্ষি নারদের আগমন

যে সমস্ত মুনিরা যজ্ঞকর্মাদি করেন, তাঁদের মধ্যে বয়ঃবৃদ্ধ কুলপতি শৌণক বললেন– হে সূত, তুমি তো ভাগ্যবান এবং বাগ্মী শ্রেষ্ঠ ভগবান শুকদেব যে তোমার কাছে ভাগবতের কথা ব্যক্ত করেছেন, তুমি সেই ভাগবত মূলক কথনগুলির আমাদের নিকট বর্ণনা কর। কোন্ যুগে কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার হেতু এবং কীভাবে তা প্রবৃত্ত হয়েছিল? কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই বিশাল এবং পবিত্র সমস্ত বেদের মূল স্বরূপ ভাগবত পুরাণ সংহিতা রচনায় নিবিষ্ট হন। তার পুত্র ছিলেন শুকদেব, যিনি মহাযোগী ব্রহ্মজ্ঞ ভেদ বুদ্ধির হিত স্থিত প্রাজ্ঞ এবং মায়া শয্যা থেকে উত্থিত হয়ে মড়ার মতো পতিত হলেন। একদিন ব্যাসদেবের নগ্নপুত্র শুকদেবের পিছনে গমনকারী ব্যাসদেব কিন্তু বসন পরিহিত ছিলেন, কিন্তু তবুও তাকে দেখে জলক্রিয়ায় ব্যস্ত অপ্সরারা লজ্জায় বস্ত্র পরিধান করল, কিন্তু আশ্চর্য এই যে তার আগেই উলঙ্গ হয়ে পুত্র গমনকালে কিন্তু অপ্সরার ওরূপ কাজ করেনি। এইরূপ অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আশ্চর্য চকিত হয়ে বেদব্যাস জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা এরূপ করলে, এর অর্থ কি হয়, উত্তরে অপ্সরারা বলেছিল– হে মুনি, তুমি বৃদ্ধ জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন ঋষি, সব থেকে বড় কথা এই যে, তোমার শ্রীপুরুষ, সেই ভেদ বুদ্ধি, বিচার ক্ষমতা তোমার মধ্যে আছে। কিন্তু তোমার পুত্র এতে শিশু তার ভেদবুদ্ধি হয় নি।

শুকদেব একদিন কুরু ও জঙ্গল প্রদেশ ভ্রমণ করতে উন্মত্ত গোবাহ জলের মতো বিচরণ করতে করতে হস্তিনাপুরে এসে প্রবেশ করলেন। পুরবাসীরা কি শুকদেবকে চিনতে পেরেছিল। হে বৎস্য আমাদেরকে তুমি বল যে এই শুকদেব মুনির সাথে কীভাবে পাণ্ডববংশীয় রাজর্ষি পরীক্ষিতের আলোচনা হয়েছিল, এবং যার দরুন ভাগবত সংহিতা পবিত্র হয়েছে। মহাভাগ্যবান শুকদেব গৃহস্থের গৃহ পবিত্র করার হেতু কিছুক্ষণ অপেক্ষায় রত থাকতেন। সূত, অভিমন্যু পুত্র পরীক্ষিতকে কেন ভক্তদের মধ্যে উত্তম ভক্ত বলা হয়, তার সমস্ত আশ্চর্য জন্ম এবং কর্মসমূহ আমাদের কাছে বিবৃত কর। পান্ডুবংশের রাজাধিরাজ মানবধর্ম পরীক্ষিতের কী এমন সময় উপস্থিত হয়েছিল যে তিনি তাঁর রাজ্যের উৎকৃষ্ট রাজ্য সম্পদ সমস্ত অনাদর করে গঙ্গাতীরে আমরণ অনশন ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। যে রাজলক্ষ্মীর চরণরূপ পদ্মে শত্রুরা পর্যন্ত নিজেদের মঙ্গলের আশায় নিজেদের সমস্ত ধনসম্পদ সমর্পণ করে প্রণাম করতেন, হে প্রিয়, সেই বীর রাজা পরীক্ষিত কী কারণে রাজলক্ষ্মী ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন, ভাগবত ভক্তগণ পর্যন্ত ও সমস্ত জনগণের মনোবল সমৃদ্ধির হেতু এবং ঐশ্বর্যের জন্য জীবিত থাকেন,

শুধু নিজের জন্য বাঁচেন না, তাহলে সেই মহরাজ কেন পরহিতে নিজের দেহ পরিত্যাগ করলেন। একথাও শুনতে আমরা উদগ্রীব। এছাড়া আরও নানা জ্ঞানমূলক আলোচনা তোমার কাছ থেকে জানতে আমরা আগ্রহী। তুমি শুধু বেদই নয়, সমস্ত শাস্ত্র পারদর্শী।

এই কথা শুনে সূত বলতে শুরু করলেন, তৃতীয়তম যুগ যার নাম দ্বাপর যুগ, এই যুগ উপস্থিত হলে পরাশর মুনির ঔরসে পশুকন্যা সত্যবতীর গর্ভে হরির সপ্তদশ অবতার রূপে ব্যাসদেবের জন্মলাভ ঘটে। কোন একদিন সূর্যোদয়ের পরবর্তী সময়ে সরস্বতী নদীর পবিত্র জলে স্নান করে বদরিকাশ্রমে বসেছিলেন এই সর্বজ্ঞ ব্যাসদেব মুনি, এবং ভাবতে থাকলেন, কালের প্রভাবের দরুণ পৃথিবীতে যুগে যুগে ধর্মের বিপর্যয় ঘটে যায়। পঞ্চভূত দিয়ে এই যে শরীর গঠিত, সেই শরীরের শক্তি ক্রমশ ক্ষয় হয়ে থাকে। গুরুবাক্যে যাদের বিশ্বাস নেই প্রায়, এমনকি শাস্ত্রাদিতেও পর্যন্ত যাদের বিশ্বাস রহিত সেই সমস্ত অল্প আয় বিশিষ্ট জনগণকে দেখে সর্বজ্ঞান সম্পন্ন এই ঋষি ব্যাসদেব বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের কথা, তাদের হিতের কথা চিন্তা করছিলেন। বৈদিক কর্ম ইত্যাদি সমস্ত প্রজাগণের শুদ্ধিকরণ করে বিচার করে তিনি বেদকে চারভাগে বিভক্ত করলেন। চারটি বেদ হল–ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। এই চার নামে বেদ উদ্‌গৃত হল। ইতিহাস মূলক পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলা হয়ে থাকে। ঋগ্বেদে যে সমস্ত মুনিরা রয়েছেন তাদের মধ্যে নিপুণ হলেন হৈম মুনি, সামবেদের মুনিদের মধ্যে প্রধান হলেন জৈমিনি, এবং বৈশুসম্পায়ন একাই ছিলেন যজুঃবেদের নিপুণ মুনি। এবং অথর্ব বেদের মুনি দিগের মধ্যে সুমন্ত মুনি প্রধান। তিনি আবার অঙ্গিরসেরও জ্ঞাতা ছিলেন। এই সমস্ত বেদের ঋষিরা নিজ নিজ বেদকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন। এই সমস্ত বেদের মুনিদের শিষ্য, প্রশিষ্য এমনকি তাদেরও শিষ্যদের দ্বারা বেদের বহুশাখা উৎপন্ন হয়।

জীবজগতের অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন পাঠকেরা যাতে বেদ অধ্যয়ন করার পর তার অর্থ অনুধাবন করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্য লাভ করার জন্যই দয়ালু ভগবান ব্যাসদেব বেদকে বিভক্ত করেন। স্ত্রী শুদ্ধ জাতি কিন্তু অধম, তাই ত স্ত্রী জাতিদের বেদ অধ্যয়ন করতে বা শ্রবণ করতে নেই। কিন্তু স্ত্রী জাতিদের বেদ শ্রবণ না করলে মঙ্গল হবে কি করে, তাই ত বেদব্যাস ভগবান কৃপাপূর্বক মহাভারত রচনা করেন স্ত্রীদের মঙ্গলের জন্য। হে ব্রাহ্মণরা এই রূপ ভাবে ভগবান ব্যাসদেব সর্ব সময় সর্বতোভাবে জীবনের কল্যাণ সাধন করার হেতু নিজেকে নিবৃত্ত রেখে তিনি সরস্বতী নদীর পবিত্র তটে নির্জনে বসে ভাবতে থাকলেন। ভগবান ব্যাসদেব চিরকাল ব্রহ্মচর্য পালন করে বেদ, গুরু, অগ্নি, যজ্ঞাদির পূজো করেছেন। এমনকি এই সমস্ত বিষয় সমূহের মধ্যে যে অনুশাসন রয়েছে তাও তিনি গ্রহণ করেছেন। মহাভারত রচনার দ্বারা বেদেরই অর্থ আসলে প্রকাশ পেয়েছে। ব্যাসদেবের দ্বারা লিখিত এই মহাভারতে স্ত্রী এবং

শুদ্রের আসল ধর্মের কথা বলা হয়েছে। তার দেহে স্থিত যে জীব সে পরিপূর্ণ হলেও কিন্তু সে সম্পূর্ণ নয়। বেদের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার দ্বারা তেজস্বী হলেও নিজেকে কিন্তু অসম্পূর্ণের মতোই মনে হচ্ছে। হে পরমহংস ভক্তদের প্রিয় ভাগবতে ধর্মের বিশেষ রূপের কথা বলা হয় নি এই ধর্ম ভগবানের অতি প্রিয়। বেদব্যাস তখন নিজেকে অত্যন্ত হীন মনে করে অত্যন্তভাবে দুঃখিত হয়েছিলেন। ঠিক তখন মহর্ষি বেদব্যাসের আশ্রমে দেবর্ষি নারদের আগমন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষি বেদব্যাস দেবপুরীতে নারদকে অভ্যর্থনা করেন।

.

পঞ্চম অধ্যায়

নারদ এবং মহর্ষি বেদব্যাসের মধ্যে বিভিন্ন আলাপচারিতা

দেবর্ষি নারদ বেদব্যাসের আশ্রমে প্রবেশ করে মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রশ্ন করলেন– হে পরাশর মুনি পুত্র মহাভাগ্যবান ব্যাস, তোমার শুদ্ধ আত্মা, পবিত্র শরীর ও মন প্রসন্ন তো? তুমি সমস্ত ধর্মসমূহ জ্ঞাত হয়েছ, আবার তুমিই পরিপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ মহাভারতও রচনা করেছ। সবার কাছে যেটা সনাতন ধর্ম, তা তুমি বিচার করেছ। এত কিছু করার পর নিজেকে কেন তুমি অকৃতার্থ মনে করে দুঃখ পাচ্ছো? এর কারণ আমাকে বল।

দেবর্ষি নারদের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বেদব্যাস বললেন– হে দেবর্ষি, তুমি আমার সম্পর্কে যা যা বললে তা যথার্থই। কিন্তু আমার আত্মা কিছুতেই পরিতুষ্ট হতে পারছে না। আমার এই অসন্তুষ্টির কারণ যে কী তা আমি কিছুতেই অনুধাবন করে উঠতে পারছি না। হে দেবর্ষি নারদ তুমি তো ব্রহ্মার পুত্র এবং তাঁর সঙ্গে অসীম জ্ঞান সম্পন্ন। তাই তো আমার অপরিতুষ্টতার কারণ হিসেবে যে প্রশ্ন তা তোমার কাছে উত্থাপন করছি। হে মুনি নারদ তোমার কাছ থেকে গোপনীয় তথ্য লুকানো নেই। তুমি পুরাণ পুরুষ উপাসনা করেছো। তুমি তো সূর্য যেমন ভ্রমণ করে চলেছে সর্বদা, ঠিক তেমনই তুমিও ত্রিভুবন ভ্রমণ করে সব কিছু দেখেছ, সেই তুমি বায়ুর মতন সবার অন্তরে প্রবেশ করে সবার অন্তরের ভাবগুলিকে দেখতে পাও। আমি যোগ রূপ বলের দ্বারা পরমব্রহ্ম লাভ করেছি এবং অধ্যায়নাদির দ্বারা বেদ বিষয়ে আমি নিপুণতাও পর্যন্ত লাভ করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার অন্তরভাগ কেন দুঃখে পরিপূর্ণ তার কারণ আমি বুঝতে পারছি না, তাই তার কারণ আমায় বল।

বেদব্যাসের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি নারদ বললেন– তুমি তো ভগবানের নির্মল যশ বলোনি, আর সেই যশ প্রকাশ করা ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞানের যে ভগবান তিনি পরিতুষ্ট হন না। হে মুনি শ্রেষ্ঠ বেদব্যাস, তুমি সমস্ত ধর্মের বর্ণনা এমন কি পুরুষার্থও বর্ণনা করেছ। কিন্তু বাসুদেবের মহিমা বর্ণনা করোনি। যে সমস্ত গ্রন্থে রস, অলঙ্কার সমূহ উপস্থিত রয়েছে, কিন্তু সমস্ত জগতের দেবতা, সমস্ত জগতকে পবিত্রকারী হরি যশকীর্তন না করা হয়ে থাকে, তা কিন্তু কাকতীর্থ তুল্য অর্থাৎ কোন ফলই লাভ হয় না সেই গ্রন্থ থেকে। মানস নামক সরোবর হংসতুল্য ভাগবত কিন্তু পরমহংসরা তাতে রমণ করবেন না উদাহরণস্বরূপ এই বলা চলে। অপার শব্দাদি যুক্ত হলেও যে বাক্যের প্রতি শ্লোক সমূহে ভগবানের মহিমান্বিত নাম যশ কীর্তিত হয়, তা কিন্তু সাধুরা শ্রবণও করে থাকেন, এবং তার সাথে কীর্তনও করে থাকেন। যে সমস্ত বাক্যে ভগবানের যশ ও নাম কীর্তন মূলক শ্লোকসমূহ রয়েছে সেই সব বাক্যের উচ্চারণে সবার পাপ বিনাশ করে। মোক্ষ লব্ধ যে সাধক অবিদ্যারূপ নিবর্তক জ্ঞান সমূহ ও যদি অচ্যুত, ভাবোত্থিত হয় তবে কিন্তু তা তার মতন সাধকের শোভা পায় না। নিরন্তর যা দুঃখ দিয়ে যাচ্ছে সেই কাম্য ধর্ম অথবা নিষ্কাম কর্ম যদি ভগবানকে অর্পণ না করা হয়, তা হলে কী সেই সাধকের তা শোভা পায়। হে পরাশর পুত্র মহাভাগ্যবান বেদব্যাস, তুমি অব্যর্থ জ্ঞান লাভ করেছো, সুতরাং তুমি শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত অপূর্ব লীলাবলী স্মরণ করে তার বর্ণনা কর।

এই বিশ্বজনীন জগতের ভগবান রূপ ভাগবত লীলা ব্যতীত অন্য বিষয়ে যদি তোমার লক্ষ্য হয় তাহলে সেই পৃথক দর্শন জনিত রূপ ও নামের দ্বারা তোমার মতি কিন্তু অস্থির হবে। বায়ুর দ্বারা তাড়িত নৌকার যেমন কোন স্থিরতা নেই, তেমনই তোমারও মন কখনও কোথাও স্থির হবে না। হে মহাভাগ্যবান ব্যাসদেব তুমি যে সমস্ত বিষয়ে আসক্ত, জনগণের কল্যাণের জন্য নিন্দিত কাম্য কর্মকে ধর্ম বলে উপদেশ করায় তোমার কিন্তু মহা অন্যায় হয়েছে। তোমার কথা মত সমস্ত অধর্ম রূপ কাম্য, কর্মকেই তারা মানে। সাধারণ মানুষ ধর্ম বলে স্থির করেছে। ফল স্বরূপ এখন তাদের নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা তা মানছে না। যে সমস্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি যারা নিয়তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বস্বরূপ আনন্দময় রূপ অনুভব করতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা আপ্ততত্ত্বে অনভিজ্ঞ দেহাত্মবাদী মায়া দ্বারা এমন সত্ত্ব, রজ ইত্যাদি গুণের দ্বারা পরিচালিত সেই সমস্ত মানুষদের জন্য তুমি ভগবানের আনন্দময় লীলা বর্ণনা কর। অধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে ধর্ম সঙ্গে হরির চরণরূপ কমল ভজনা করতে করতে অপরিপক্ক অবস্থায় যদি সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অথবা তার সাধন পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়, তাহলে কী তার মঙ্গল হবে না। ভাগবতের ভজনা করতে করতে কোন মানুষ যদি স্বধর্ম আচরণ করে, তা হলে তার কী লাভ বা ক্ষতি হবে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা বিবেকীজন তারা ভাগবত রূপ যে ভক্তি সুখ, তার জন্য যত্ন করবে, আর এই আনন্দময় সুখ কিন্তু ওপরে অবস্থিত সত্যলোক থেকে নীচে নরক পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। দুঃখ যেমন অনায়াসেই আসে ঠিক তেমনই কর্মফল রূপ যে সুখ তা সর্বতোভাবে পাওয়া যায়। হে মহাভাগ্যবান প্রিয় মুকুন্দসেবী যে সব মানুষ, তারা নিম্ন জাতিতে জন্ম নিলেও কর্মী সমস্ত জনের মত বিষয় সমূহে আকৃষ্ট চিত্ত হয়ে কখনই সংসারে আবিষ্ট হয় না।

এই বিশ্বচরাচর, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিন্তু ভগবানের থেকে পৃথক কিছু নয়, সব একই। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ভগবান জগৎ থেকে পৃথক। এই ভগবানের শক্তিতেই সৃষ্টি, স্থিতি, এবং লয় হয়ে থাকে। এ সমস্ত বিষয়ে তুমি ত অবজ্ঞাত, হে মহাভাগ্যবান অব্যর্থ দ্রষ্টা বেদব্যাস, তুমি স্বয়ং পরমাত্মা

পুরুষের অংশে জগতের কল্যাণের হেতু জন্মগ্রহণ করেছ। বিরাট রূপী পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমাশ্চর্য লীলা অধিকরূপে কীর্তন করে। এই আশ্চর্য লীলা বর্ণনাকারী উত্তম শ্লোক সমূহ ভগবানের গুণবর্ধনকারী। মানুষের তপস্যা শাস্ত্র শ্রবণ, আর সেই সমস্ত লোকসমূহের শোভনসমূহের শোভনযোগ্য অধ্যয়ন করা হলে জ্ঞানদানের অক্ষয় ফল লাভ হয়।

আমি পূর্বকল্প পূর্ব জন্মে এক ব্রাহ্মণের দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। বর্ষাকাল সমাগত হলে যে ব্রাহ্মণগৃহে আমি একত্র বাস করছিলাম, সেখানে সমস্ত গুণী জন সব মুনিদের সমাগম ঘটলে বাল্যকালে আমি সেই মুনিদের সেবার নিমিত্ত নিযুক্ত ছিলাম। সেই ব্রাহ্মণের গৃহে সমাগত সব মুনিরা ছিলেন সমদর্শী। কিন্তু সেই সময় আমি যে সব ক্রীড়া শান্তর আগমন ঘটায় তা পরিত্যাগ করে সেই মুনিদের আজ্ঞানুবর্তী হয়ে থাকি। সমাগত সেই সব সমদর্শী মুনিদের উচ্ছিষ্ট পাত্রের অবশিষ্ট অংশে একবার মাত্র ভোজন করতে পারতাম। যার দরুণ আমার সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়ে যায়। এবং তাদের ধর্ম হরি ভক্তিতেই আমার রুচি উৎপাদিত হতে থাকে ক্রমশ।

সেই সব ব্রাহ্মণরা প্রতিদিন কৃষ্ণ কথা গান করতেন, আর আমি অনুগ্রহ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি কথা শ্রদ্ধা পূর্বক শুনতাম। ঐ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ লীলা মূলক গানসমূহ শোনার ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার রতি জন্ম হয়। হে পরাশর পুত্র মহামতি বেদব্যাস সেই মধুর কীর্তিশালী ভগবানে আমার অবিহচ্যতিতে মতি হয়েছিল। সেই মতি দ্বারা আমি দর্শন করলাম,

এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী জগৎ সংসার, স এবং অসদরূপ যোগমায়ার দ্বারা কল্পিত হয়েছে। সেই রূপ আমাদের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর নিজের অবিদ্যার দ্বারাই নিত্য মুক্তস্বরূপ তার আত্মাতে কল্পিত হচ্ছে। বর্ষাকাল শরৎকালের প্রতি সন্ধ্যায় মহাত্মাগণেরা যে হরির অমল যশমূলক গান সংকীর্তন করতেন, তা আমি শ্রবণ করতাম। এই রকমভাবে হরির অমল অদ্ভুত সব যশমূলক সংকীর্তন শ্রবণ করার হেতু আমার রজঃ ও তমগুণের বিনাশ সাধন ঘটে এবং শ্রী হরির প্রতি ভক্তির উদয় হয়েছিল। সেই শ্রীহরির যশকীর্তন শুনতে শুনতে আমি শ্রীভগবানের অত্যন্ত অনুরক্ত বিনীত, শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠি এবং সমস্ত পাপেরও বিনাশ সাধন আমার ঘটেছিল। তার সঙ্গে আমি অত্যন্ত সংযত এবং সেই মুনিদের অনুগত হয়েছিলাম সেই জন্য সেই মুনিরা প্রত্যাগমনের সময় অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে কৃপাপূর্বক আমাকে গোপন জ্ঞান উপদেশ করেন। যা আমি ভগবান ব্রহ্মাকে বলেছিলাম। মুনিদের দ্বারা সৃষ্ট সেই জ্ঞানের দ্বারা আমি সমস্ত জগতের মায়া প্রবর্তক ভগবান বাসুদেবের প্রভাব জেনেছিলাম। আর এরই দ্বারা কিন্তু ভক্ত ভগবান ধর্মে গমন করে থাকেন। হে ব্রাহ্মণ, সবকিছুর নিয়ামক এই ভগবান যে সমস্ত কর্ম সমর্পণ বা যার দ্বারা কর্মসমূহ সম্পন্ন করা হয়, তা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক তাপত্রয় বিনাশক।

হে সুব্রত, যে দ্রব্যসমূহের দ্বারা বা ব্যবহারের হেতু প্রাণীদের দেহে রোগ জন্ম নেয়, সেই দ্রব্য দ্বারাই কিন্তু কখনও রোগের নিরাময় করা যায় না। কিন্তু দ্রব্যান্তরের দ্বারা মিশ্রিত হলে তা রোগ নিরাময়ের কারণ হয়। যে সমস্ত কর্ম সমূহ করলে মানুষের বন্ধনের উৎপত্তির কারণ হয়, অর্থাৎ সেসব কর্ম যদি পরমেশ্বরকে অর্পণ করা যায়, তাহলে কিন্তু তা তাদের মোক্ষের কারণ হয়ে থাকে। ভগবানকে প্রীতি দেওয়ার জন্য যে কর্মসমূহ করা হয় তা ভক্তিযোগে নিষ্কাম কর্মযোগে জ্ঞান দান করে থাকে যা ভক্তিযুক্ত ভগবানের শিক্ষা অনুসারে বারংবার কোন কাম ছাড়া কর্ম করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের গুণ স্মরণ হয়ে থাকে। যদি কোন মানুষ পূজা করার সময় তুমি ভগবান বাসুদেব, তোমাকে প্রণাম করি এই ভাবে যিনি মন্ত্রে নির্দিষ্ট মূর্তির নাম উল্লেখ করে যজ্ঞ করে থাকেন তিনি অবশ্যই ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেন। তার দেওয়া নিজের সেই উপদেশ আমি পালন করছি। সেই ভগবান বাসুদেব আমাকে জ্ঞান, ঐশ্বর্য এবং প্রেম দান করেছেন। তুমি মহাভাগ্যবান যে পরাশর পুত্র ও যশস্বী, তুমি ভগবানের বিশ্ব রূপ যশ বর্ণনা করো।

এই যশকীর্তিমূলক গ্রন্থ পাঠ করলে জ্ঞানী গণেরও জানার ইচ্ছার নিবৃত্তি হবে, নিরন্তর দুঃখের দ্বারা সৃষ্ট জনগণের লেশ নিবারণের আর অন্য কোনো উপায় নেই এই জগতে বলে বিবেকীগণ মনে করে থাকেন।

.

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারদের দ্বারা পূর্বজন্মে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন ও সৌভাগ্যের বর্ণনা

সূত বললেন– হে সমগ্র সন্ন্যাসী বৃন্দ, ব্রহ্মপুত্র দেবর্ষির এই জন্ম এবং কর্ম সমূহের বৃত্তান্ত শুনে ভগবান ব্যাসদেব আরও কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। মহাভাগ্যবান ব্যাসদেব জানতে চাইলেন সেই মুনিরা যখন বিদেশে গেলেন সেই বাল্যবয়সে তুমি কী করলে পরবর্তীকালে তোমার জীবন কীভাবে অতিবাহিত করলে।

একদিন রাতে গাভী দোহনের জন্য আমার মা পথে বেরিয়েছিলেন। তার পদপিষ্ট একটি সর্প কাল প্রেরিত হয়ে তাকে দংশন করে। মায়ের মৃত্যুকে ভগবানের অনুগ্রহ মনে করে আমি ওর দিকে গমন করলাম। সেখানে অনেক সমৃদ্ধ দেশের অবস্থান ছিল। নগর, গ্রাম, গোষ্ট বিভিন্ন রত্নের খনি ছিল। বন পর্বতে নানা ধাতুর দ্বারা শোভিত পর্বতশ্রেণী এবং তার গায়ের বৃক্ষসকল। যেতে যেতে আমি স্বচ্ছ জলপূর্ণ সরোবরের এবং নদীর সান্নিধ্যে এসেছিলাম। এই সরোবরের তীরে পক্ষীদের কলকাকলি ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ভ্রমররা গুঞ্জন করছে। আমি শেষপর্যন্ত একটা বিরাট অরণ্যের সামনে পৌঁছে গেলাম। সেই বনে নলবেণু গাছের ঝাড়, কুশ এবং বাঁশঝাড়ের অবস্থান। সেখানে বাঘের মতো হিংস্র জন্তুদের বসবাস। আমার ইন্দ্রিয় এবং দেহ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছিল। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আমি কাতর হয়েছিলাম। সেই নদীতে স্নান করলাম। সেই নদীর জল পান করে আমার ক্লান্তির অপনোদন ঘটে গেল।

নির্জন বনভূমিতে একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে বসে পরমাত্মাকে চিন্তা করতে থাকলাম। আমার দুটি চোখ জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। হরি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হলেন। আমার সর্ব অঙ্গে জাগল আলৌকিক শিহরণ একটু বাদে গভীর আনন্দে লীন হলাম। নিজেকে এবং পরমাত্মাকে আর দেখতে পেলাম না। ভগবানের রূপ দেখতে না পেয়ে আমি উন্মত্তের মত হয়ে উঠলাম। আবার তাঁকে দর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। এই ইচ্ছা ফলপ্রসূ হল না। অতৃপ্ত আত্মা আতুরের মতো ক্রন্দন করতে লাগল।

তখনই আকাশবাণী শুনতে পেলাম। –ওহে, এ জন্মে তুমি আমাকে আর দেখতে পাবে না। যাদের চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হয়নি, এই কুযোগীরা আমাকে কখনও দেখতে পায় না। একবার সেই রূপ আমি তোমাকে দেখালাম কারণ আমার প্রতি তোমার অনুরাগের কোনো

সীমা পরিসীমা নেই। আমার হৃদয়ের সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করে তুমি আমার পার্ষদত্ব লাভ করবে। আমাকে নিবদ্ধ তোমার এই শ্রদ্ধা কখনই বিনষ্ট হবে না। আমার অনুগ্রহে প্রাণীদের সৃষ্টি এবং প্রলয় হলেও তোমার স্মৃতি থাকবে।

এই কথা বলে পরমেশ্বরের কণ্ঠস্তব্ধ হয়ে গেল। তখনও তার মূর্তি আকাশে ছিল। অথচ অমূর্তি বলে আমি তাকে দেখতে পাই নি। আমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলাম।

লজ্জা ত্যাগ করে আমি ভগবানের নাম কীর্তন করতে করতে পৃথিবী পর্যটন করতে থাকলাম। শুরু হল আমার সীমাহীন প্রতীক্ষা। হে ব্রাহ্মণ, এইরূপে আমি উন্মাদ প্রায় হয়ে কৃষ্ণভক্তে পরিণত হলাম। মালাভর্তি বিদ্যুতের মতো আমার মৃত্যুর সময় এসে উপস্থিত হল। ভগবান পার্ষদরূপ শুদ্ধ স্বত্ত্বময় দেহের জন্য আমার ভৌতিক দেহের পতন হল। প্রলয় কাল উপস্থিত হল। ভগবান সমস্ত জগতকে প্রলয় করলেন। ব্রহ্মার নিশ্বাসের সঙ্গে আমি তাঁর দেহের মধ্যে প্রবেশ করলাম। সহস্র যুগ চলে গেল। নিদ্রা থেকে জেগে উঠে ব্রহ্মা সৃষ্টি করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তার ইন্দ্রিয় সকল থেকে মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের আবির্ভাব ঘটল এবং আমি জন্মগ্রহণ করলাম।

মহাবিষ্ণুর অনুরোধে ত্রিলোকের অন্তর ও বাইরে কোথাও বাধা না পেয়ে ভ্রমণ করতে করতে আমি হরিকথা গান করে বিচরণ করে থাকি। আমি যখন ভগবানের লীলা গান করে থাকি, তখন ভগবান যেন আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেন। যখন যেখানে তিনি গমন করেন, তাঁর পবিত্র চরণ স্পর্শে সেই স্থান তীর্থস্থানে পরিণত হয়ে যায়। বারবার বিষয় ভোগের বাসনায় আসক্ত সংসারীদের পক্ষে হোলিলীলা কীর্তন করা অবশ্য কর্তব্য। এটি আমার প্রত্যক্ষ অনুভব।

সূত বললেন– ভগবান নারদমুনি বেদব্যাসকে একথা বলে এবং তার অনুমতি নিয়ে বীণা বাজাতে বাজাতে অন্য কোথাও গমন করলেন।

.

সপ্তম অধ্যায়

অশ্বত্থামা দ্রৌপদী পুত্রদের বিনাশ এবং অর্জুনের জন্য প্রদান

শৌনক বললেন– হে সূত, নারদ বনে গেলে ভগবান তার অভিপ্রায় জেনে কি করেছিলেন?

সূত বললেন– ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিম তীরে শ্যামাপ্রস নামে একটি আশ্রম আছে। সেখানে ব্যাসদেব উপস্থিত হলেন। জলস্পর্শ করে সমাধির দ্বারা মন স্থির হল। ভগবান এবং তাঁর মায়াকে দেখলেন। এই মায়ার দ্বারা সম্মোহিত হয়ে জীব গুণাতীত হয়েও ত্রিগুণাত্ম মনে করে ভগবানে, ভক্তিযোগেই সাক্ষাৎ অনর্থপশম– এটা দেখে অজ্ঞ লোকের হিতের জন্য তিনি শ্রীমদ ভাগবত প্রস্তুত করলেন।

শৌণক বললেন– হে সূত। শুকদেব সংসারের প্রতি নিস্পৃহ ছিলেন। কোনো বস্তুর প্রতি তার বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। তিনি আত্মারাম হয়েও এই বৃহৎ সংহিতা কী ভাবে অভ্যাস করলেন।

সূত জবাব দিলেন– আত্মারাম বন্ধনরহিত মুনিরাও অহেতুক ভক্তি করে থাকেন। হরি এইজাতীয় গুণবিশিষ্ট, হরির গুণে ভগবান শুকদেব মহৎ ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন। হে শৌণক, এবার আমি রাজর্ষি জন্ম, কর্ম, মুক্তি এবং মহাপ্রস্থানের কথা বলব। এইভাবে কৃষ্ণ-কথার উদয় হবে।

কুরু-পাণ্ডবের ভয়ংকর যুদ্ধের অবসান ঘটে গেল। নিহত বীররা স্বর্গে গমন করলেন। ভীমের গদার আঘাতে দুর্যোধনের উরু'ভঙ্গ হল। দুর্যোধনের প্রিয় কার্য হয় মনে করে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নিদ্রিত দ্রৌপদীর শিশু পুত্রদের শিরচ্ছেদ করে দুর্যোধনকে উপহার দিলেন। এই নিন্দিত কর্মে সকলেই নিন্দা করে থাকেন। মাতা দ্রৌপদী শিশুদের নিকট বার্তা শুনে অশ্রু পরিপূর্ণ লোচনে কাঁদছিলেন। অর্জুন তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন–হে ভদ্রে, যখন আততায়ী ব্রাহ্মণ্যধর্ম অশ্বত্থামার মস্তক গাণ্ডীব থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের দ্বারা তোমাকে উপহার দেব তখন তোমার মনে আনন্দের উদ্রেক হবে। এই মিষ্ট বাক্যে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে অর্জুন গুরু পুত্র অশ্বত্থামার পেছনে ধাবিত হলেন। অশ্বত্থামা অর্জুনকে দূর থেকে আসতে দেখে রথে করে পালাতে লাগলেন।

যখন অশ্বত্থামা নিজেকে নিরাশ্রয় এবং অশ্বরা ক্লান্ত হয়েছে বুঝতে পারলেন তখন ব্রহ্মাস্ত্রকেই প্রাণরক্ষার উপায় বলে মনে করেন। সেই অস্ত্র থেকে প্রচণ্ড তেজ আবির্ভূত হল। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন– হে কৃষ্ণ, ভক্তদের অভয়পদ মহাবাহ, তুমি একমাত্র মুক্তি দাতা তুমি প্রকৃতির অতীত পুরুষ, তুমি কারণ, তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তুমি নিজ প্রভাবে মায়ার দ্বারা বিমোহিত চিত্ত জীবগণের ধর্মাদিরূপ মঙ্গল বিধান করো। এই তোমার অবতার রূপ পৃথিবীর

ভার অপনোদনের জন্য। এটা কী বা কোথা থেকে আসছে তা আমি বুঝতে পারছি না। এই তেজ সবদিক থেকে ধেয়ে আসছে।

শ্রী ভগবান বললেন–হে অর্জুন, এটা ব্রহ্মাস্ত্র। প্রাণ সংকট উপস্থিত হয়েছে বলে অশ্বত্থামা এটা প্রয়োগ করেছে। কিন্তু এই অস্ত্রের উপসংহার কৌশল সে জানে না। এই অস্ত্রের প্রতিস্পর্ধী অপর কোনো অস্ত্র নেই। তুমি অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ, নিজের প্রযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্র তেজের দ্বারা এই অস্ত্রের তেজ বিনাশ করো।

শত্রু নিহন্তা অর্জুন ভগবানের কথা শুনলেন। তিনি কৃষ্ণকে পরিক্রমা করে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। দুটি অস্ত্রের তেজ পরস্পরকে আক্রমণ করল। দ্যুলোক, ভূর্লোক, অন্তরীক্ষে তা ছড়িয়ে পড়ল। মনে হল প্রলয়কালে উপস্থিত হয়েছে। সূর্য এবং অগ্নি যেন আকাশে বর্ধিত হচ্ছে।

অর্জুন গৌতমীপুত্র অশ্বত্থামাকে ধরে রজ্জুর দ্বারা পশুর মতো বন্ধন করে শত্রুকে শিবিরে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন–হে পার্থ, একে রক্ষা করা উচিত নয়। এই হত্যাকারীদের বধ করো। যে রাত্রিবেলায় গুপ্তভাবে নিরপরাধ বালকদের বধ করেছে, সে যে নির্দয় খলব্যক্তি। পরপ্রাণের দ্বারা নিজের প্রাণ পরিপুষ্ট করে তাকে বধ করা মঙ্গলজনক এটাই তার প্রায়শ্চিত্ত, না হলে তাকে নরকে গমন করতে হবে। দ্রৌপদীর কাছে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে তোমার পুত্রহন্তারককে ছিন্ন মস্তক তাকে উপহার দেবে। এই আততায়ী আত্মীয় বন্ধুগণের পাপ স্বরূপ। এ কুলাঙ্গার শুধু তোমাদের নয়, নিজ প্রভু দুর্যোধনেরও অপ্রিয় আচরণ করেছে।

কৃষ্ণের দ্বারা উৎসাহিত হয়েও অর্জুন কিন্তু পুত্রহন্তা গুরুপুত্রকে বধ করতে চাইলেন না। তারপর দ্রৌপদীর কাছে অশ্বত্থামাকে সমর্পণ করলেন। পাঞ্চালী রজ্জবদ্ধ পশুর মতো আনীত গুরুপুত্রকে দেখে কৃপা পূর্বক প্রণাম করলেন। তারপর বললেন– হে ব্রাহ্মণ পূজনীয়, একে ছেড়ে দাও, তুমি যার অনুগ্রহে বিভিন্ন অস্ত্রের উপসংহার শিখেছো, সেই ভগবান দ্রোণাচার্য পুত্ররূপে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর পত্নী কৃপীও আছেন। বীর প্রসবিণীর জন্য পতি সহমরণ করেননি। হে ধর্মজ্ঞ, তুমি গুরুর বংশকে দুঃখিত করো না। মৃতবৎসা আমি যেমন অশ্রু মুখে রোদন করছি, পতিব্রতা এ জননী, গৌতমী যাতে ক্রন্দন না করেন, সেই ব্যবস্থা করো।

ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর যুক্তি পক্ষপাত শূন্য বাক্যের অনুমোদন করলেন। নকুল, সহদেব, সাত্যকি, অর্জুন, দেবকীপুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তথায় উপস্থিত অসংখ্য পুরুষ ও রমণীরাও এই বাক্যের অনুমোদন করলেন। ভীম এই বাক্যের বিরুদ্ধে গিয়ে বললেন– যে ব্যক্তি প্রভুর স্বার্থ দেখে না, সে যে শিশুদের বিনাশ করেছে, তাঁর বধই উত্তম। ভীম এবং দ্রৌপদীর কথা শুনে সখা অর্জুনের মুখের দিকে চেয়ে শ্রীকৃষ্ণ বললেন– হে অর্জুন ব্রাহ্মণ অধম হলেও বধের যোগ্য নয়, আততায়ী বধের যোগ্য। আমি এই দুজনকেই বলেছি, আমার এই উপায় অনুশাসন তুমি পালন করো। দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিতে তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তা যেন সত্যে পরিণত হয়। ভীমসেন, দ্রৌপদী এবং আমার যাতে ভীতি সঞ্চরন ঘটে তার ব্যবস্থা করো।

সূত বললেন– অর্জুন হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন। তিনি অশ্বত্থামার কেশের সঙ্গে যুক্ত শিরভুষণ মণি অসির দ্বারা ছেদন করলেন। শিশু হত্যার জন্য অশ্বত্থামা তখন বিষণ্ণ। এখন মণিহীন হওয়ায় নিস্তেজ অশ্বত্থামাকে আরো ভয় পাবার কোনো কারণ থাকলো না। তাকে রঞ্জুর বন্ধন মুক্ত করে শিবির থেকে বাইরে বের করে দেওয়া হল। মস্তক মুন্ডন, ধনু গ্রহণ, এবং বাসস্থান থেকে নির্বাসন– এই তিনটি হল ব্রাহ্মণদের কাছে বধতুল্য। এছাড়া তাদের কোন দন্ড নেই।

শোকাকুল পাণ্ডবরা মৃত জ্ঞাতিদের জন্য পরলৌকিক কার্য সম্পাদন করলেন।

.

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উত্তরার গর্ভস্থ পরীক্ষিতের রক্ষা, কুন্তিদেবীর স্তব এবং যুধিষ্ঠিরের অনুতাপ

পাণ্ডবরা মৃত ও জ্ঞাতিদের তর্পণ করার জন্য গঙ্গায় গেলেন। সেখানে তারা স্নান করে, তর্পণ করলেন। হরির পাদপদ্মে পরাগের পবিত্র গঙ্গাজলে অবগাহন করলেন। যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে কাতর গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী সকলে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মাধব বোঝালেন, প্রাণীগণের প্রতি কালের প্রভাব অনিবার্য, এর কোনো প্রতিকার নেই। ভগবান ধূর্ত দুর্যোধনাদির দ্বারা অপহৃত যুধিষ্ঠিরের পৌত্রিক রাজ্য তাকে প্রাপ্ত করালেন। দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ জনিত পাপে নৃপতিদের বিনাশ করলেন। উত্তম কল্পে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করালেন। ধর্মরাজ

যুধিষ্ঠিরের যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি যখন রথে আরোহণ করতে যাবেন, তখন উত্তরা তার সামনে ছুটে এলেন।

উত্তরা বললেন– হে মহাযোগী জগৎপতি আমাকে রক্ষা করো, যে জগতে পরস্পরের থেকে পরস্পরের মৃত্যু হয়, যেখানে একমাত্র তুমি অন্যকে নির্ভরতা প্রদান করতে পারো, হে বিভু, হে ঈশ, এই শর আমার দিকে ছুটে আসছে। এই শর আমাকে দগ্ধ করুক, তাতে আমার বিন্দু মাত্র অনুশোচনা নেই, কিন্তু আমার গর্ভস্থ পুত্রকে তা যেন বিনষ্ট করতে না পারে।

ভক্ত বৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার কথা শ্রবণ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র এখন শর রূপ ধারণ করেছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, পাণ্ডবরা নিজেদের দিকে দীপ্ত পাঁচটি শরকে আসতে দেখলেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র ধারণ করলেন। ভগবান পাণ্ডবদের বিপদ দেখে সুদর্শনের দ্বারা তাদের রক্ষা করলেন। তিনি উত্তরার গর্ভ রক্ষাও করলেন। মহাস্ত্রকে প্রতিহত করলেন। হে শৌণক, যদিও ব্রহ্মাস্ত্র অব্যর্থ এবং প্রতিকারহীন, বৈষ্ণব তেজে তা শান্ত হয়েছিল। যে কৃষ্ণ মায়ার দ্বারা ঐ জগতের সৃষ্টি, পালন এবং প্রলয় বিধান করে থাকেন, তিনি এই ব্রহ্মাস্ত্রের উপশম করে ছিলেন।

ব্রহ্মতেজ থেকে মুক্তি পেয়ে পুত্রগণ এবং দ্রৌপদীর সাথে কুন্তীদেবী দ্বারকায় গমনোদ্যত শ্রীকৃষ্ণকে বললেন– ভগবান তুমি সমস্ত প্রাণীর অন্তর জুড়ে অবস্থান করছ অথচ তোমাকে কেউ দেখতে পায় না। যেহেতু তুমি ঈশ্বর এবং সকল কিছুর নিয়ামক, তুমি আদি সনাতন পুরুষ, প্রকৃতির থেকে শ্রেষ্ঠ তুমি প্রকৃতির পরিচালক, তোমাকে আমি নমস্কার করি। নৃত্যগীত কলাবিশিষ্ট অভিনেতাকে দেখলেও সঙ্গীত শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ লোক যেমন তাকে বুঝতে পারে না, তেমনই মায়ার পর্দায় আচ্ছন্ন অতীন্দ্রিয় অব্যয় তোমাকে দেহাভিমানী পুরুষ দেখলেও জানতে পারে না। আমি অজ্ঞ, আমি তোমাকে প্রণাম করছি। তুমি কৃষ্ণ বাসুদেব, দেবকীপুত্র নন্দন। গোবিন্দ তোমাকে নমস্কার করছি। তোমার নাভিতে পদ্ম উৎপন্ন হয়েছে। তোমার গলদেশে পদ্মের মালা বিরাজমান। তোমার নেত্র এবং চরণ পদ্মতুল্য, তোমার উদ্দেশ্যে আমি প্রণিপাত জ্ঞাপন করছি।

হে হৃষিকেশ, কংসের দ্বারা কারারুদ্ধ এবং পুত্রশোকে আহত দেবকীকে তুমি মুক্ত করেছ। পুত্রদের সাথে আমি অনেক বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছি। হে হরি, বিষদান, জতুগৃহ দাহ, রাক্ষসের পীড়ন, অসৎ সভা, বনবাসের কষ্ট, মহারথীদের অস্ত্র, সম্প্রতি অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করেছ। হে জগৎগুরু, আমাদের সেই বিপদ নিরন্তর হোক তোমার

দর্শন প্রাপ্তির কারণ, তোমাকে দেখলে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। জন্ম, ঐশ্বর্য, বিদ্যা ও সম্পদের দ্বারা যে সব ব্যক্তি গঠিত, তারা তোমার নাম উচ্চারণ করার অধিকারী নয়। তুমি অকিঞ্চনের প্রাপ্য। যারা অকিঞ্চন অর্থাৎ যাদের কিছু নেই, তারাই তোমার নাম গান করতে পারে। তুমি আত্মারাম শান্ত মুক্তি প্রদাতা, তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তুমি প্রাণীদের পরস্পর বিদ্বেষ মুক্ত বিষয় সমদর্শী, তুমি নিয়ন্ত্রক এবং কালস্বরূপ অন্তর্যামী। হে ভগবান, তুমি মানুষের অনুকরণ মাত্র করে থাকো। তোমার অভিপ্রায় কেউ বুঝতে পারে না। প্রিয় বা বিদ্বেষের কোন পাত্র তোমার মধ্যে নেই। হে বিশ্বাত্মা, তোমার জন্ম নেই, তোমার মধ্যে কোনো কর্ম নেই, কারণ তুমি নিজেই আত্মা। তুমি বরাহদি তির্যক, রামচন্দ্রাধি মানুষ, নর-নারায়ণাদি ঋষি এবং মৎস্যের মতো জলচর প্রাণীতে তোমার জন্ম ও কর্ম কেবল বিড়ম্বনা অর্থাৎ অনুকর মাত্র। ভয় তোমার ভয়ে ভীত হয়, তুমি দধির ভাণ্ড ভঙ্গ করে অপরাধ করেছিলে। যশোদা রজ্জু এনেছিলেন। তখন তোমার কী অবস্থা হয়েছিল তা আমাকে বিমোহিত করেছে। তখন তোমার চোখের কাজল জলে ভিজে গিয়েছিল, তুমি ভয়ে ব্যাকুল মুখ নীচু করেছিলে।

কেউ কেউ বলে থাকেন তুমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কীর্তি বর্ধনের জন্য প্রিয় যদুবংশে জন্ম গ্রহণ করেছ। আবার কেউ বলে থাকেন, সুতপা ও কৃষ্টিরূপে প্রার্থিত হয়ে বিশ্বের মঙ্গল এবং অসুরদের বিনাশ করার জন্য বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছ। আবার কেউ বলেন, সমুদ্রে নৌকার মতো পৃথিবী পাপের ভারে অবসন্ন। পৃথিবীর ভার তুলে নেবার জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনায় তোমার আবির্ভাব। কেউ বলেন এই সংসারে অবিদ্যা অর্থাৎ আত্মস্বরূপের অজ্ঞানবশত অবিদ্যা নিবৃত্তির নিমিত্ত শ্রবণ এবং স্মরণযোগ্য কাজের জন্য তোমার আগমন। যে সব মানুষেরা তোমার চরিত্র নিরন্তর শ্রবণ। কীর্তন পাঠ স্মরণ ও অভিনন্দন জানায় তারা তোমার চরণ কমল দেখতে পায়। হে প্রভু, নিজ ভক্তদের জন্য তোমার সকল কাজ। আমার পুত্ররা যুদ্ধে অনেক রাজন্যকে দুঃখ দিয়েছে। তোমার চরণকমল ব্যতীত তাদের আর কোনো আশ্রয় নেই। তুমি আমাদের ত্যাগ করে কেন চলে যেতে চাও।

তোমার অদর্শনে খ্যাতি এবং সমৃদ্ধিযুক্ত যদুদের গঠন সম্ববান্বিত পাণ্ডবরা আমার কে? জীবাত্মার অদর্শনে ইন্দ্রিয়গণ অকিঞ্চিৎকর। তোমার অদর্শন হলো। হে গদাধর তুমি এখানে আছো, বলে এই স্থানটি শোভা যুক্ত, ধ্বজ তজাদি চিহ্নিত তোমার চরণ কমল এখানে অঙ্কিত হচ্ছে। তুমি চলে গেলে এই স্থান তার সকল শোভা হারাবে। তোমার দর্শনে চারপাশ পবিত্র হয়ে উঠেছে। হে বিশ্বের ঈশ্বর, বিশ্বাত্মা বিশ্বমুখী, তুমি কেন আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ? হে মধুপতি, গঙ্গা যেমন সমস্ত পথ অতিক্রান্ত করে সমুদ্রের প্রতি ধাবিত হয়, তেমনই আমার একনিষ্ঠ মতি যেন অবিচ্ছিন্ন ভাবে তোমাতেই প্রীতিলাভ করে। তুমি অর্জুনের সখা, বিষ্ণু

বংশের শ্রেষ্ঠ, বাতাস যেমন বনস্থ বংশের পরস্পর সংঘর্ষের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করে তার বিনাশ করে, তুমিও অত্যাচারী রাজন্যবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ঘটিয়ে তাদের বিনাশ করেছ। হে গোবিন্দ, গো ব্রাহ্মণ এবং দেবতাদিগের জন্য তুমি বিগ্রহ প্রকট করেছ। হে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার।

সূত বললেন– কুন্তি ভগবানের সমস্ত মহিমার স্তব করলেন, কৃষ্ণ তখন মৃদু মৃদু হাসছেন। কুন্তী দেবীর প্রার্থনা অঙ্গীকার করে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। সুভদ্রা প্রমুখ সমস্ত স্ত্রীদের সম্মতি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় যাবার উপক্রম করলেন। এবার যুধিষ্ঠির প্রেমপূর্বক তাঁকে নিষেধ করলেন। ভগবানের অভিপ্রায় না জানার জন্য ব্যাস প্রভৃতি মুনি গণের দ্বারা এবং অদ্ভুত কর্মা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা ইতিহাস উল্লেখ পূর্বক উপদেশ দিলেও শোকাকুল যুধিষ্ঠির তা বুঝতে পারলেন না।

তিনি আত্মীয় স্বজনের বধ চিন্তা করে বললেন– ওহে দুরাত্মা আমার হৃদয়ে আবির্ভূত অজ্ঞানতা দেখো। এই দেহের জন্য আমি বহু অক্ষোয়িণী সৈন্য হত্যা করেছি। বালক, বাহ্মণ, আত্মীয়, বন্ধু, পিতৃব্য ভ্রাতা ও গুরুজনদের বধ করেছি। বহু কাল নরকে থাকলেও আমার পাপ স্খলন হবে না। ধর্মযুদ্ধে অর্থাৎ অন্য রাজা রাজ্য আক্রমণ করলে প্রজাদের রক্ষার জন্য শত্রুদের বধ করা প্রজারক্ষক রাজার পক্ষে পাপকার্য নয়। এই শাস্ত্রের অনুশাসন আমি বুঝতে পারছি না। আমার দ্বারা নিহত আত্মীয়দের রমণীগণের যে বিদ্বেষ উত্থিত হয়েছে তা আমি নিবারণে করতে সক্ষম নয়। পঙ্কমিশ্রিত জল পঙ্কের দ্বারা শুদ্ধ করা যায় না। অল্প মদ্যপান জনিত অপরাধ প্রচুর মদ্যের দ্বারা শোধন করা যায় না, দৈবাৎ একটি প্রাণী হত্যা হয়ে গেলে ইচ্ছাকৃত হিংসা বহুল যজ্ঞের দ্বারা তা স্খলন হয় কি?

.

নবম অধ্যায়

ভীষ্মের কাছে যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্যদের গমন, বিবিধ ধর্মের উপদেশ, শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে করতে ভীষ্মের মহানির্বাণ

সূত বললেন– প্রাণী হত্যার ভয়ে ভীত যুধিষ্ঠির ভীষ্মের শরশয্যার অঞ্চলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন অন্যান্য ভ্রাতারা তাকে অনুসরণ করলেন। ব্যাসদেব ধৌম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা অশ্বযুক্ত স্বর্ণভূষিত রথে অনুগমন করলেন। ভগবান অর্জুনের সাথে রথে চড়ে বসলেন। রাজা

যুধিষ্ঠির তাদের পরিবেষ্টিত হয়ে কুবেরের মতো শোভিত হলেন। স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার মতো ভূমিতে পতিত ভীষ্মকে দেখে তারা সকলে প্রণাম করলেন। মহর্ষি, দেবর্ষি রাজর্ষিরা ভরত বংশ প্রধান ভীষ্মকে দেখার জন্য সেখানে সমাগত হলেন। এলেন পর্বত, নারদ, ধৌম্য, ভগবান ব্যাসদেব, বৃহস্মন ভরদ্বাজ এবং সশিব্য পরশুরাম, এলেন বশিষ্ঠ, ইন্দ্র, প্রমদ, ক্রীত, গৃৎসবাদ, অসিত, কাক্ষীবান, গৌতম, অত্রি, ঐবিশ্বামিত্র এবং সুদর্শন। এলেন কাশ্যপ, বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিগণ।

বসুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব সকলকে দেখে সম্মান করলেন। শ্রীকৃষ্ণকেও ভীষ্মদেব পূজো করলেন, বিনয় এবং অনুরাগে পরিপূর্ণ পাণ্ডবেরা তার কাছে বসেছিলেন। ভীষ্মদেব স্নেহাশ্রুতে আকুল নয়নে বললেন–হে ধর্মনন্দনগণ, তোমরা কষ্ট করে জীবিত থাকার যোগ্য নও। ব্রাহ্মণধর্ম এবং অচ্যুতের আশ্রয়ে থেকেও যে ক্লেশে তোমাদের কালাতিবাহিত করতে হল এটি খুবই কষ্টের বিষয়। বীর পাণ্ডুর মৃত্যুর পর কুন্তী বধু ছিলেন এবং তোমরাও ছিলে বালক, তোমাদের জন্য তিনি অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন বারবার। মেঘসকল, যেমন বাসুর অধীন, তেমনই লোকপালদের সাথে সমস্ত লোকই কালের অধীন। ধর্মপুত্ররাজ যুধিষ্টির, গদাধারী ভীম, ধনুর্দ্ধীর অর্জুন, গাণ্ডীব যার ধনু, যাদের বন্ধু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সেখানেও বিপদ উপস্থিত হয়েছে। এই কৃষ্ণের অভিপ্রায় কী তা কি আমরা জানতে পারি। হে ভরতশ্রেষ্ঠ, হে নাথ, হে প্রভু এই সব দুঃখ দৈবের অধীন। এই দেহ সেই কৃষ্ণ। তাঁর অনুবর্তী অনাথ প্রজাদের পালন করে।

এই যে কৃষ্ণকে দেখছ, ইনি স্বয়ং ভগবান আদি পুরুষ মহশ্রেষ্ঠ নারায়ণ, ইনি মায়ার দ্বারা লোককে বিমোহিত করেন। ইনি যদুবংশে বিচরণ করছেন। হে নৃপ, এই কৃষ্ণের গোষ্ঠনীয় প্রভাব ভগবান শিব দেবর্ষি নারদ সাক্ষাৎ ভগবান কপিল জানেন। যাঁকে তোমরা তোমাদের নতুন পুত্র আন্তরিক বন্ধু বলে মনে করছ তাকে তোমরা প্রীতিবশত মন্ত্রী, দূত আর রথের সারথি করেছ। হে মহারাজ, একান্ত ভক্তের প্রতি তার অনুকল্প দেখো। সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ মরণকালে নিজে এসেই উপস্থিত হয়েছেন। যতক্ষণ আমি এই দেহ ত্যাগ না করছি, ততক্ষণ চতুর্বাহু আমার ধ্যান পথের পথিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার সম্মুখে অপেক্ষা করবেন।

সূত বললেন– যুধিষ্ঠির তা শুনে মুনিদের সমক্ষে শর শয্যায় শায়িত ভীষ্মকে ধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করলেন –মানুষ মাত্র স্বভাবজনিত যে ধর্ম, বর্ণ এবং আশ্রম বিহিত যে ধর্ম সংসারে বিরহ এবং অনুরঞ্জনের বিদগ্ধ, নিবৃত্তি এ প্রবৃত্তি ধর্ম বদ্যধর্ম, দানধর্ম, মোক্ষধর্ম সংক্ষেপে এবং বিস্তার পূর্বক বললেন। ভীষ্মদেব নানা আখ্যানে ইতিহাসে বর্ণিত ধর্ম, কাম, মোক্ষ এবং তাদের প্রাপ্তির উপায়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করলেন। ধর্মের কথা বলতে বলতে ইচ্ছামৃত্যু যোগী ভীষ্মের বাঞ্ছিত উত্তরায়ণ কাল উপস্থিত হল। যুদ্ধে যিনি সহস্র রথীদের রক্ষা করতেন, সেই

ভীষ্ম কথা বলা বন্ধ করলেন। শূন্য পীতবসন পরিহিত আদিপুরুষ চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণের আসক্তি শূন্য মন নিযুক্ত করলেন। তাঁর অশুভগুলি বিনষ্ট হল ভগবানের কৃপা অবলোকনে। অস্ত্রাষ্টতের শতনা চলে গেলে ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য দূরীভূত হল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। যার প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি প্রবাহ হয় এবং যিনি লীলা খেলার জন্য কখনও নিজ প্রকৃতিকে স্বীকার করে থাকেন, সেই কৃষ্ণকে প্রণাম করি। ত্রিভুবনের মধ্যে কমনণীয় তমালের মতো কৃষ্ণবর্ণ সূর্যকিরণের মতো উজ্জ্বল বসন পরিহিত কেশদামে আবৃত নয়নকমল যার বিগ্রহ সেই অর্জুনের প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণে আমার নির্মল মতি হোক।

আমার শরের দ্বারা যার দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গাত্রাবরণ ছিন্ন বিছিন্ন হয়েছিল যুদ্ধ ক্ষেত্রে অশ্বখুরস্থিত ধুলির দ্বারা ধূসরবর্ণ এবং বিক্ষিপ্ত তেজ সমুহের সাথে সংলগ্ন কর্মে সুশোভিত আসন বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণে আমার মন যুক্ত হোক।

অর্জুনের কথা শুনে তৎক্ষণাৎ কুরু এবং পাণ্ডব রথ স্থাপন করে বললেন, যিনি কাল দৃষ্টির দ্বারা বিপক্ষ সৈন্যদের আয়ু হরণ করেছিলেন সেই অর্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার ব্রতী হোক, দূরস্থিত বিপক্ষ সৈন্যের প্রধানদের দোষ ও বুদ্ধিতে স্বজন বধ থেকে নিবৃত্ত অর্জুনের অজ্ঞানতা যিনি আত্মবিদ্যায় দূরীভূত করেছিলেন, সেই সর্বোত্তম কৃষ্ণের প্রতি আমার মন স্থাপিত হোক। যিনি নিজের প্রতিষ্ঠা বিসর্জন দিয়ে আমার প্রতিজ্ঞা সত্যে পরিণত করার জন্য রথ থেকে নেমে এসে রথচক্র ধারণ করেছিলেন, তার প্রতি আমার সমস্ত শ্রদ্ধা আপ্লুত হোক। যিনি স্খলিত উত্তরীয় হয়ে আমার দিকে ছুটে এসেছিলেন এবং আততায়ী আমার তীক্ষ্ম বাণের দ্বারা বিধ্বস্ত কবচ রক্ষাপুত আমাকে বধের জন্য বলপূর্বক আমার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেই ভগবান মুকুন্দ আমার গতি হোক। এই যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণ যাকে দেখে মুক্তিলাভ করেছিলেন, অর্জুনের রথকে যিনি কুটুম্বের মতো রক্ষা করে জল হাতে অশ্বতাড়নের জন্য চাবুক এবং ডানহাতে অশ্বের রজ্জ্ব ধারণ করে শোওমান হলে সেই ভগবানের। প্রতি আমার মতি হোক।

যাঁর সুন্দর গমন, মধুর হাবভাব, মৃদুমন্দ হাসি এবং প্রণয়পূর্বক অবলোকনের দ্বারা সম্মানিত গোপনাঙ্গ প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গোবর্ধন ধারণাদি কর্মের অনুকরণ করে কৃষ্ণের স্বরূপ লাভ করেছিলেন, সেই কৃষ্ণে আমার গতি হোক।

যিনি নিজ কল্পিত প্রাণীদের প্রতি হৃদয়ের অন্তর্যামী রূপে অধিষ্ঠিত, এক সূর্য যেমন প্রত্যেকের চক্ষুতে বহু বলে মনে হয়, এক অদ্বিতীয় এই আমার সামনে উপস্থিত সেই কৃষ্ণকে আমি লাভ করেছি।

সূত বললেন– ভীষ্ম মন, বাক্য এবং চক্ষু ক্রিয়ার দ্বারা ভগবান পরমাত্মা কৃষ্ণর সন্নিবিষ্ট হয়ে অন্তরের প্রাণের বায়ু বিলীন করে নিবৃত্ত হলেন। তার প্রাণবায়ু বহির্গত না হয়ে অন্তর আত্মা শ্রীকৃষ্ণে লীন হয়ে গেল।

দিবাবসানে পক্ষীগণের মতো সকলে নীরব হলেন। দেবতা এবং মানবের দ্বারা বাদিত হয়ে দুন্দুভি বেজে উঠল। রাজাদের মধ্যে যাঁরা অসূয়া শূন্য সাধু। তারা ভীষ্মের প্রশংসা করলেন। আকাশ থেকে পুষ্প বৃষ্টি হতে থাকলো। হে শৌণক, মোক্ষ প্রাপ্ত হলেও ভীষ্মের দেহাদি সংস্কার করায় যুধিষ্ঠির ক্ষণকাল দুঃখিত হলেন। মুনিরা আনন্দিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে গোপনীয় নামের দ্বারা স্তব করতে থাকলেন। তারপর নিজ নিজ আশ্রমে ফিরে গেলেন। কৃষ্ণের সাথে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র এবং তপস্বিনী গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি ক্রমে এবং কৃষ্ণের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে পিতৃ পিতামহের রাজ্য ধর্মানুসারে শাসন করতে থাকলেন।

.

দশম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা

শৌণক প্রশ্ন করলেন– ধার্মিক শ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির কিভাবে রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হলেন?

সূত জবাব দিলেন বিশ্বপালক এবং সর্বনিয়ামক শ্রীকৃষ্ণ কুরু বংশকে সঞ্জীবিত করে এবং যুধিষ্ঠিরকে নিজ রাজ্যে স্থাপন করে আনন্দিত হয়েছিলেন। ভীষ্ম এবং কৃষ্ণের জ্ঞানে ধর্ম-নন্দন যুধিষ্ঠিরের জ্ঞান উদয় ঘটে। তার ভ্রম বিলোপিত হয়। তিনি ইন্দ্রের মতো আসমুদ্র পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন। তার শাসনকালে মানুষেরা ইচ্ছানুসারে বৃষ্টি দান করত। পৃথিবীর সমস্ত অভীষ্ট বস্তু অনায়াসে উৎপাদিত হত। দুগ্ধবতী গাভীরা আনন্দে দুগ্ধের দ্বারা এক একটি গোষ্ঠকে পরিপ্লাবিত করত। যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছানুসারে নদী, সমুদ্র এবং পর্বত অনুকূল হয়েছিল। বৃক্ষলতা সর্বকালে ফল দিতে থাকে। যুধিষ্ঠিরের কোনো শত্রু ছিল না। তার অধীনস্থ

প্রজাগণের আধিদৈবিক আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্লেশ ছিল না। তারা মানবিক এবং শারীরিক যন্ত্রণাকে জয় করতে পেরেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের অনুমতি নিয়ে দ্বারকা যাবার জন্য রথে আরোহন করলেন। এর আগে তিনি হস্তিনাপুরে কয়েকমাস অতিবাহিত করেছিলেন। সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, বিরাট তনয়া উত্তরা, গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু, নকুল, সহদেব, ভীম এবং সত্যবতী প্রমুখেরা কৃষ্ণের বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারলেন না। পাণ্ডবরা কৃষ্ণের সাথে একত্রে উপবেশন, ভোজন, দর্শন স্পর্শ করেছেন, কৃষ্ণের প্রতি তাদের চিত্ত সমর্পণ করেছেন, তারা কী করে কৃষ্ণবিরহ সহ্য করবেন।

ব্যাকুল চিত্ত পাণ্ডবরা অনিমিখ নয়নে কৃষ্ণকে দেখতে দেখতে তাকে অনুসরণ করলেন। কৃষ্ণ তাদের গৃহ থেকে নির্গত হলেন। বন্ধু স্ত্রীরা নয়নের অশ্রু নয়নেই নিরুদ্ধ রাখলেন। যাতে কৃষ্ণের অমঙ্গল না হয়। মৃদঙ্গের আওয়াজ শোনা গেল, বেজে উঠল শঙ্খ, ভেরী, বীণা, গোমুখী, দুন্দুভি। অট্টালিকার ওপর আরোহণ করে কুলনারীরা কৃষ্ণকে দেখে পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন। তাদের হৃদয়ে প্রেম এবং লজ্জার জাগরণ ঘটে গিয়েছিল। তাদের মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্যের প্রতিচ্ছবি। জিতেন্দ্রিয় অর্জুন, বাসুদেবের মস্তকের ওপর শুভ্রছত্র ধারণ করলেন। সাতকী রমণীয় চাদর গ্রহণ করলেন। পথে কুসুম বর্ষিত হতে থাকল। ব্রাহ্মণগণ সত্য আশীষ বাণী উচ্চারণ করলেন। তার মধ্যে নিষ্ঠুন ব্রহ্মের অনুরূপ আশীষ ছিল। কোনো কোনো স্তোত্রের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করা হল।

পুররমণীদের পরস্পর আলাপ সকজনের শ্রুতিমধুর হয়েছিল। তারা কৃষ্ণকে সকল গুণের কার্যসৃষ্টির স্রষ্টা হিসাবে গ্রহণ করলেন। কৃষ্ণ প্রপঞ্চতীত, তিনি নিজ স্বরূপে একই বিদ্যমান। নাম এবং রূপবিহীন জীবন্মাতে দেবতা মানুষ ইত্যাদি নাম এবং রূপ সৃষ্টি করার জন্য তিনি বেদশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। প্রাণবায়ু জয় করে জিতেন্দ্রিয় সূক্ষ্মদর্শী ঋষিরা বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে যাঁর স্বরূপ দেখতে পান, তিনি হলেন পরম পুরুষ বাসুদেব।

হে সখী, যে ঈশ্বর স্বেচ্ছায় একাকী বিশ্বের সৃজন, পালন এবং সংহার করে থাকেন, অথচ বিশ্বের প্রতি বিন্দুমাত্র আসক্ত হন না, তিনিই হলেন শ্রীকৃষ্ণ। শাস্ত্রে তার এই গোপনীয় তত্ত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে ও জ্ঞানীরা তার পবিত্র কথা সদা সর্বদা কীর্তন করেন। অবিশুদ্ধ বুদ্ধির নৃপতিরা পর পীড়নের দ্বারা নিজেদের প্রাণ পোষণ করেন, তখন জগতের কল্যাণের জন্য বাসুদেব ছত্ররূপ ধারণ করেন। যুগে যুগে তিনি তম, সত্ত্ব, দয়া এবং যশ প্রকটিত করেন।

যদুবংশ অত্যন্ত প্রশংসনীয় মধুবন অর্থাৎ মথুরা ক্ষেত্র অত্যন্ত পুণ্যতম, পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ নিজের জন্ম এবং গমনের দ্বারা এই মৈত্রকে সন্মানিত করেছেন।

দ্বারকা স্বর্গের যশকে তিরস্কার করে পৃথিবীকে পূণ্যবতী এবং যশবতী করেছেন। সেখানকার প্রজারা শ্রীকৃষ্ণের প্রফুল্ল বদন দেখে থাকেন। হে সখি, যাঁকে লাভ করার জন্য ব্রজরমণীরা সন্মোহিত, শ্রীকৃষ্ণ যাঁদের পানি গ্রহণ করেছেন, তারা বহু ব্রত স্নান এবং হোমাগ্নির দ্বারা ঈশ্বররের অর্চনা করেছেন। তিনি শিশুপাল প্রমুখ রাজন্যবর্গকে পরাভূত করেছেন। যাঁরা প্রত্যুম্ন প্রভৃতি জননী এবং নরকাসুর বধে অপর সহস্র রমণীগণও যার দ্বারা আসীন হয়েছিলেন তিনিই কৃষ্ণ। স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা এবং পবিত্রতা না থাকলেও এই সকল স্ত্রীরা স্ত্রীত্বকে শোভিত করেছিলেন।

সূত আরও বললেন– পুর রমণীগণের এইসব বিচিত্র কথা শোনা গেল। তাদের অভিনন্দিত করে শ্রীকৃষ্ণ গমন করলেন। শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার জন্য চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীকে যুধিষ্ঠির প্রেরণ করেছিলেন। ভগবানের বীরত্বে কাতর পাণ্ডবগণকে তিনি নিবৃত্ত করেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব প্রমুখ যাদবদের সাথে। দ্বারকায় গমন করলেন। হে ভার্গব, শ্রীকৃষ্ণ কুরু, জাঙ্গল, পাতাল সুরলোক, দেশ। যমুনার নিকটবর্তী দেশ ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য সরস্বতী নদীর নিকটবর্তী দেশ, মরুভূমি, অল্প জলযুক্ত দেখা অতিক্রম করে গৌরীর ও অবীর দেশের পরবর্তী দ্বার প্রদেশে পৌঁছলেন।

সেই দেশে সেখানকার জনগণের দ্বারা নিবেদিত উপহারে পূজিত হলেন। তখন অস্তমিত হয়েছে।

.

একাদশ অধ্যায়

দ্বারকাবাসীগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সংবর্ধনা এবং নগরে প্রবেশ

সূত বললেন–ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় উপনীত হলেন। প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করার জন্য পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজালেন। তার করকমলে বর্তমান শুভ্র শঙ্খ শব্দ করতে করতে রক্তবর্ণ কমলসমূহের মধ্যে কলহংসের মতো শোভা পেতে লাগলো। প্রভুর দর্শন ইচ্ছায় প্রজা সকল তার নিকট এসে উপস্থিত হল। সুর্যের কোন আলোকের অপেক্ষা না থাকলেও লোকেরা

যেমন দিকদান করে থাকে তেমন ভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রজারা নানাবিধ উপহার প্রদান করল। বালকেরা যেমন গৃহস্থ পিতার কছে আবদার করে বসে তেমনই গন্ধ এবং রক্ষক শ্রীকৃষ্ণকে তারা গদগদ বাক্যে বলতে লাগল- হে নাথ, এ জগতের মঙ্গলকামী জনগণের একমাত্র আশ্রয় হলে তুমি। ব্রহ্মা, সনকাদি ঋষি এবং দেবতাদের দ্বারা তুমি পূজিত। তোমার চরণ কমলে আমরা প্রণত হই। ব্রহ্মাদির ওপর প্রভুত্ব কারী কালও তোমার চরণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তুমি আমাদের মঙ্গলের জন্য বিশ্বপালক হও, তুমি আমাদের মাতা, পিতা, সুহৃদ এবং পতি অর্থাৎ রক্ষক। তোমার অনুগমনের দ্বারা আমরা কৃতার্থ হয়েছি। তুমি আমাদের পরম দেবতা তোমার দ্বারা আমরা উপযুক্ত রক্ষকযুক্ত হয়েছি। তুমি স্নিগ্ধ দৃষ্টিপূর্ণ বদন কমলে বিরাজমান। হে পদ্মপলাশ লোচন, আমাদের ছেড়ে তুমি যখন হস্তিনাপুর অথবা মথুরা মণ্ডলে যাও, যখন সূর্য ব্যতীত চক্ষুর মতো চারপাশে অন্ধকার নেমে আসে, তোমার বিরহে হে অচ্যুত, ক্ষণকালকেও কোটি বছর বলে মনে হয়। হে নাথ, তুমি দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকলে আমরা কী করে জীবিত থাকব।

ভক্তবৎসল বাসুদেব প্রজাদের উচ্চারিত এইসকল শব্দ শ্রবণ করতে করতে দ্বারকাপুরে প্রবেশ করলেন। নাগরা যেভাবে ভোগবতী পরীকে রক্ষা করে, যেভাবে নিজের মতো বলশালী মধুপ বোঝ দশাট, কুকুর, অন্ধক, এবং বৃক্ষরা সে নগরী রক্ষা করত। সেই নগরীতে সমস্ত ঋতুর ফল এবং পুষ্পদি শোভা বিদ্যমানই, যেখানে পদ্ম উৎপাদনে সরোবর শোভা আছে। নগরীর প্রধান দ্বার, গৃহদ্বার এবং পথে পথে উৎসব জনিত তোড়ন নির্মাণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণের ধবজা উড়ছে। নগরীর প্রধান পথ, ছোট পথ, হাটবাজার পরিষ্কার করা হয়েছে। সুগন্ধ জলের দ্বারা নগরীকে সিক্ত করা হয়েছে। ফল, পুষ্প এবং যবের অঙ্কুর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি গৃহদ্বার দধি, আতপ চাল, ফল, ইক্ষুদণ্ড পূর্ণ কুম্ভ এবং পূজার উপকরণ রাখা হয়েছে।

এই সুশোভিত নগরীতে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন, শুনে উদারচিত্ত বসুদেব অক্রুর, উগ্রসেন, অদ্ভুত বিক্রম, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ এবং জাম্ববতী পুত্র শাম্ব হস্তীকে সামনে রেখে কাছে চলে এলেন। তারা মঙ্গলজয় পুষ্পহস্ত ব্রাহ্মণদের সাথে শঙ্খ, তুর্য এবং বেদধ্বনির দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ভগবানের কাছে গেলেন। শত শত শ্রেষ্ঠ বারঙ্গণারা কৃষ্ণদর্শনের লালসায়? মানে আরোহণপূর্বক তার কাছে গেলেন। নট, নর্তক, গায়ক, সুত, মগধ এবং বন্দীনিরা ভগবানের কার্যসকল গান করতে থাকল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিকটে এসে পৌঁছিলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে কাউকে হস্তধারণ দ্বারা সম্মানিত করলেন। আচন্ডাল সকলকে অভয় এবং অভিলষিত বস্তু দিয়ে বন্দিত করলেন। পিতা মহাদি গুরুবর্গ এবং সপত্নীক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। অন্যান্য বন্দিদের সন্মান লাভ করে নগরে প্রবেশ করলেন।

কৃষ্ণ রাজপথে এলে দ্বাররক্ষক কুলরমণীরা তার দর্শনে আহ্লাদিত হলেন। দ্বারকাবাসীরা নিত্য ভগবানকে দেখলেন, তাদের নয়নের তৃপ্তি সাধন হয়নি। কারণ শ্রী বিগ্রহ সকল শোভার আশ্রয় ছিল। যাঁর বক্ষস্থল মহালক্ষ্মীর নিবাসস্থল, সৌন্দর্য এবং অমৃত পূর্ণ মুখমণ্ডল সমস্ত প্রাণীর নয়নের পানপাত্র, যাঁর বাহু লোকপালদের আশ্রয়স্থল, যার চরণকমল ভক্তগণের বাসস্থান, তিনি হলেন কৃষ্ণ। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, ইন্দ্রধনু এবং বিদ্যুতের দ্বারা মেঘ যেমন শোভা পায়, শ্বেতবর্ণ ছত্র এবং চামরের দ্বারা মুণ্ডিত, চারদিকে থেকে পুষ্প বর্ষণে অভিবর্ষিত শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন এবং বনমালার দ্বারা পথে পথে শোভিত হয়ে ছিলেন। তিনি মাতা পিতার গৃহে প্রবেশ করলেন। মাতৃগণের দ্বারা আলিঙ্গিত হলেন। দেবকী প্রমুখ ষাটজন মাতাকে মস্তকের দ্বারা প্রণাম করলেন। তারা পুত্রকে কোলে করে আনন্দে বিহ্বল হয়ে চোখের জল বিসর্জন করলেন। পুত্র স্নেহে তাদের স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হচ্ছিল।

তারপর সমস্ত কাম্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ উত্তম নিজ ভবনে প্রবেশ করলেন। ষোলো হাজার পত্নী ও অট্টালিকা সেখানে ছিল। প্রিয়াগত পতিকে দূর থেকে দেখে পত্নীদের মনে মহান আনন্দ উপস্থিত হল। তারা লজ্জায় অবনতমুখী হয়ে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর অভিপ্রায় যুক্ত রমণীদের প্রথমে মনে মনে, তারপর দৃষ্টির দ্বারা, পরবর্তীকালে পুত্রের দ্বারা এবং পরিশেষে নিজেরা পতিকে আলিঙ্গন করলেন। লজ্জাশীলা সেই রমণীদের নেত্র থেকে নিরুদ্ধ হলেও কিছু অশ্রু বহির্গত হতে থাকল।

বাতাস যেমন বৃক্ষের সংঘর্ষের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করে যাদের ভস্ম করে দেয়, কৃষ্ণ সেইভাবে উদ্ধত প্রভাবশালী নৃপতিদের মধ্যে পরস্পর কলহ বাঁধিয়ে যুদ্ধ সংঘর্ষ করলেন। নিজে যোগমায়ার দ্বারা নরলোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রী রত্ন সমুহে অবস্থিত থেকে প্রাকৃত জনের মতো বিহার করতেন। যাদের উদ্দাম ভাব, নির্মলহাসি এবং লজ্জাযুক্ত চাউনির দ্বারা বিস্ময়ে বশীভূত প্রাকৃত মদন চাপ নিক্ষেপ করত, মোট সর্বোত্তম প্রমদাগণ কপট বিলাশের ভান করেও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে চাঞ্চল্য ঘটাতে পারেনি।

ভগবান প্রাকৃত গুণে অনাসক্ত থেকে নাশ কার্যে ব্যাপৃত থাকতেন। তত্ত্বজ্ঞ প্রকৃত সাধারণ লোক তাকেই নিজেদের মতো কামাসক্ত লোক বলে মনে করত। এটাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। তিনি প্রকৃতিতে থেকেও তার গুণের দ্বারা লিপ্ত হন না, বুদ্ধি যেভাবে আত্মাকে আশ্রয় করে থাকলে ও আত্মার আনন্দ প্রভৃতি গুণের দ্বারাও যুক্ত হয় না, সেইভাবে ভগবান আচরণ করে থাকতেন।

.

দ্বাদশ অধ্যায়

পরীক্ষিতের জন্মোৎসব

শৌণক বললেন– হে সূত, অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মসেনা নামক অস্ত্রে উত্তরার গর্ভ পীড়িত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ আবার তাঁকে পঞ্জীপূত করলেন। ভাগবত শ্রবণে শ্রদ্ধারূপ যার মহতী বৃদ্ধি এবং মহান ধৈর্যশীল সেই পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম এবং নিধন কীভাবে হয়েছিল, আমি এখন তা শুনতে ইচ্ছা করি। যদি তা বলার যোগ্য বলে মনে করো, আমাদের কাছে তা বিরত করো।

সূত বললেন– সংসাদিত বস্তু থেকে নিস্পৃহ হয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতার মতো প্রজাদের পালন করতে থাকলেন। সুস্পষ্ট যজ্ঞসমূহ থেকে অর্জিত স্বর্গলোকে মহিষী ভ্রাতৃগণ জম্বুদ্বীপে আধিপত্য স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ফনা যুধিষ্ঠিরকে আনন্দ দিতে পেরেছে। ক্ষুধিত ব্যক্তির খাদ্যবস্তু ছাড়া অন্য কিছুতে যেমন প্রীতি হয় না। কৃষ্ণনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণভক্তি ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে সুখলাভ করে নি।

হে ভৃগুনন্দন, মাতা উত্তরার গর্ভস্থ এবং ব্রাহ্মস্ত্রের তেজে বাহ্যমান পরীক্ষিত তখন সেই পুরুষকে দেখেছিলেন। সে পুরুষের মাথায় উজ্জ্বল সুবর্ণের কিরীট, মনোহর রূপ তার শ্যাম বর্ণ সম্পন্ন, বিদ্যুতের মতো বস্ত্র পরিহিত এবং তিনি নির্মল ও নির্বিকার। তার সুন্দর দীর্ঘ চারটি বাহু, তপ্ত কাঞ্চনের মতো উজ্জ্বল দুটি কুণ্ডল, চক্ষুদুটি রক্ত বর্ণের এবং হাতে গদা ছিল। তিনি উল্কার মতো গদা ঘোরাতে ঘোরাতে চারিদিকে ভ্রমণ করছিলেন। সূর্য যেমন নীহারকে বিনাশ করে, তেমনই তিনি নিজের গদার দ্বারা অস্ত্রের তেজ নিবারণ করে ছিলেন। পরীক্ষিত নিকট অবস্থিত, সেই পুরুষকে দেখে ভাবলেন, ইনি কে? এরূপ বিচার করেছিলেন মানুষের যুক্তি তর্ক বিচারের অতীত ধর্মের পালক সর্বময় সর্বেশ্বর্যময় পাপাদি অর্থাৎ সকল দুঃখের প্রশমনকারী হরি সেই অস্ত্র বিনাশ করেন। দশমহলের গর্ভস্থ শিশুর সামনে সেখানে অন্তর্হিত হয়ে যান।

দ্বিতীয় পাণ্ডবের মতো পাণ্ডুর বংশের পরীক্ষিতের জন্ম হল। সন্তুষ্ট চিত্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির সৌম্য, ধৌম্য, কৃপাচার্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গণের দ্বারা শ্রোতৃবাচন পূর্বক পৌত্রের জাত কর্ম করালেন। দানযজ্ঞ কালে রাজা যুধিষ্ঠির পৌত্র জন্মের জন্য ব্রাহ্মণদের সুবর্ণ গাভী, ভূমি, গ্রহ, অশ্ব, হস্তি এবং মিষ্টান্ন দান করলেন; তারপর পরিতুষ্ট ব্রাহ্মণ গণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে

বললেন– হে কুরু বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি, কুরু বংশীয় এই সূর্যবংশে দুর্বার দৈবকর্তৃক বিনাশ উপস্থিত হলে তোমাদের অনুগ্রহের নিমিত্ত বিষ্ণু একে দিয়েছেন। হে মহা ভগবান, এজন্য এই বালক বিষ্ণুরাত অর্থাৎ কর্তৃক নামে খ্যাত হবে। বংশ গুণে কথাভাগবতেও শ্রেষ্ঠ হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেনহে ব্রাহ্মণগণ যশ এবং কীর্তির দ্বারা এ বংশের মহাত্মা পূণ্য যশস্বী, রাজর্ষিদের অনুবর্তন করতে হবে।

ব্রাহ্মণগণ বললেন– হে যুধিষ্টির এ বিষয়ে তুমি বিন্দুমাত্র সংশয় প্রকাশ করো না। এ বালক মনুপুত্র ইক্ষাকুর মতো প্রজা রক্ষক হবে। দশরথ পুত্র রামচন্দ্রের মতো ব্রাহ্মণদের হিতৈষী এবং সত্য প্রতিজ্ঞা হবেন। কুশিনর দেশের রাজা শিবির মতো দাতা এবং শরণাগত পালক হবে। দুষ্মন্তের পুত্র রাজা ভরতের মতো জ্ঞাতিগণ এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে যশ বিস্তার করবে। ধনুর্ধারী বীরদের অগ্রণী এ বালক পাই এবং কার্তবীর্য অর্জুনের মতো হবে। সে হবে সমুদ্রের মতো গম্ভীর ও অগ্নির মতো দুর্ধর্ষ। ধরিত্রীর মতো ক্ষমাশীল, মাতা-পিতার মতো সহিষ্ণু, হিমালয়ের মতো সতত সিংহের বিক্রান্ত, সমদর্শিতায় পিতামহ ব্রহ্মার সমান হবে সে। প্রসন্নতায় শিবের সাথে তার তুলনা করা হবে। শ্রীপতি বিষ্ণুর মতো সে হবে সকল প্রাণীর আশ্রয়। এই বালকের মধ্যে সমস্ত সদগুণ কৃষ্ণের মতো মহিমান্বিত হবে। উদারতায় সে হবে রন্তিদেবের তুল্য। হবে যযাতির মতো ধার্মিক। ধৈর্যে মহারাজ বলির সমান। এবং প্রহ্লাদের মতো শ্রীকৃষ্ণের মতিযুক্ত। এই বালক বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে। বৃদ্ধাদের নিরন্তর সেবা করবে। অনেক রাজর্ষির পিতা হবে। হবে সে উৎপাদগামীদের শাসক। পৃথিবীর ধর্মরক্ষার জন্য কলিকে নিগৃহীত করবে। মুনি বালক শৃঙ্গী তাকে নিধনের জন্য তক্ষক সর্পকে প্রেরণ করবে। সব আসক্তি পরিত্যাগ করে সে শ্রী হরির চরণ কমল আশ্রয় করবে। হে মহারাজ, ব্যাসপুত্র শুকদেবের কাছে সে। আত্মজ্ঞান লাভ করবে। পরীক্ষিত পার্থিব দেহ গঙ্গা তীরে পরিত্যাগ করে শ্রীহরির চরণে আশ্রয় নেবে।

এই কথা বলে ব্রাহ্মণেরা যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে সন্মানিত হয়ে নিজ নিজ গৃহে গমন করলেন।

পরবর্তীকালে এই বালক পরীক্ষিত নামে খ্যাত হয়ে ছিলেন। জন্মগ্রহণের পর গর্ভে দৃষ্ট পুরুষকে ধারণ করে জনগণের মধ্যে পরীক্ষা করতেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতির দ্বারা লালিত হয়ে রাজপুত্র শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মতো বৃদ্ধি পেতে থাকলেন। বাল্যকালেই তিনি ধর্মাত্মা কৃষ্ণভক্ত সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতিযুক্ত হয়েছিলেন।

জ্ঞাতি দ্রোহ জনিত অধর্ম থেকে মুক্তি পাবার জন্যে রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে বাসনা করলেন। তিনি প্রজাদের কাছ থেকে কর এবং দণ্ড ছাড়া অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করতেন না। রাজকোষে প্রচুর অর্থ না থাকায় চিন্তান্বিত হলেন। তার অভিপ্রায় জেনে কৃষ্ণপ্রাণিত ভাইরা উত্তর দিকে মরু ও রজ্যের যজ্ঞে পড়ে থাকা সুবর্ণ পাত্রাদি অপহরণ করলেন। যুধিষ্ঠির তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরির অর্চনা করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের আহ্বান পেয়ে হস্তিনাপুরে এলেন, কয়েকমাস সেখানে থাকলেন। দ্রৌপদী এবং বন্ধুজনের সাথে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে অর্জুনের সঙ্গে যদুগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গেলেন।

.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিদুরের উপদেশ অনুসারে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর বনগমন

সূত বললেন– তীর্থ ভ্রমণে গিয়ে বিদুর ঋষি মৈত্রেয়ের কাছ থেকে নিজের গতি জেনে হস্তিনাপুরে গেলেন। বিদুর মৈত্রেয়মুনির কাছে কতকগুলি প্রশ্ন করেছিলেন। তার কয়েকটি উত্তর শুনেই অন্য প্রশ্ন করা থেকে বিরত হলেন। আত্মীয় বিদুরকে কাছে আসতে দেখে যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র যুযুৎসু সঞ্জয়, কৃপাচার্য, কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, কৃপাচার্যের ভগিণীরা তার কাছে এলেন। মুছাগত ব্যক্তির প্রাণ অবসন্ন হলে ইন্দ্রিয়গুলি নিস্পৃহ হয়ে পড়ে। প্রাণ ফিরে এলে ইন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়াশীল হয়। বিদুরের বিরহে আত্মীয়গণ তাকে পেয়ে আনন্দে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। আত্মীয়রা যথারীতি আলিঙ্গন অভিবাদন প্রভৃতির দ্বারা মিলিত হয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করলেন। বিদুর আসনে উপবিষ্ট হলেন। যুধিষ্টির তাকে সম্মানিত করলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন– পক্ষীগণ যেমন শাবকদের পক্ষছায়ায় রক্ষা করে তেমনই আপনার পক্ষপাত ছায়া বর্জিত আমাদের কথা কি আপনার মনে পড়ে। আপনার আশীর্বাদে আমরা বিষ, অগ্নি প্রভৃতি বিপদ থেকে রক্ষিত হয়েছি। এই পৃথিবীর তীর্থযাত্রার ভ্রমণ করতে করতে বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। মোক্ষ কোন্ তীর্থে পৌঁছে গেছেন। হে বিভু, আপনাদের মতো পরম ভাগবতগণ নিজেরাই তীর্থস্বরূপ শুদ্ধ। কারণ ভগবান আপনাদের হৃদয় থেকে গরল ধারণ করে তীর্থগুলি পবিত্র করে থাকেন। হে তাত, কৃষ্ণ যাদের দেবতা সেই যদুবংশের বন্ধুদের ও সুহৃদদের আপনি কী দেখেছেন? তাঁরা সুখে আছেন তো?

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন শুনে বিদুর যদুকুলের বিনাশ ছাড়া আর যা জানতেন সব বললেন। মানুষের দুর্দিন স্বগৃহে উপস্থিত হলে পাণ্ডব দ্বারা দেবতাদের মতো সন্মানিত হয়ে বিদুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেবার জন্য কিছুকাল সেখানে বাস করলেন। মান্ডব ঋষির অভিশাপে যম একশো বছর যাবৎ শুদ্র হয়েছিলেন। তখন সূর্য যমলোকে পাতকিদের যথাবিধি দণ্ড দিতেন। যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করে বংশধর পৌত্র পরীক্ষিৎকে দেখে ইন্দ্রাদি লোকপাল তুল্য ভাইদের সাথে পরম আনন্দিত হলেন।

গৃহে আসক্ত এবং গৃহকার্যে প্রমত্ত পাণ্ডবদের আয়ুর কাল অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করল। বিদুর তা বুঝতে পেরে ধৃতরাষ্ট্রকে অনতিবিলম্বে বললেন– ভয় অর্থাৎ কালে এসে উপস্থিত হয়েছে। হে প্রভু, এ জগতে কোনো স্থানে কোনো সময়ে যার প্রতিকার নেই, আমাদের সেই অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছে। যে মৃত্যুরূপ কালগ্রস্ত হয়ে মানুষ প্রিয়তম প্রাণ থেকেও বিযুক্ত হয় আর অন্য ধন প্রভৃতির কথা কী বলব? মহারাজ, আপনার পিতা, ভ্রাতা, সুহৃদ এবং পুত্রগণ সকলেই নিহত হয়েছেন। আপনার বয়সও হয়েছে। দেহ জরাগ্রস্ত। আর এখন পরের গৃহে বাস করছেন কেন? আপনি জন্ম থেকে অন্ধ এখন আবার বুধির এবং বুদ্ধিহীন হয়েছেন। আপনার দন্তগুলি শিথিল হয়েছে। অজীর্ণজনিত মন্দাগ্নি আপনাকে আক্রমণ করেছে। এখনও সানুরাগে কেন এখানে বাস করছেন। হায় জীবের জীবিত থাকার আশা কী ফলবতী? যে আশায় আপনি আপনার পুত্রহন্তা ভীমের প্রদত্ত অন্ন গৃহপাশ কুকুরের মত ভোজন করছেন। হে মহারাজ যাদের বিনাশ কামনায় অগ্নি নিক্ষেপ করেছেন, বিষ দিয়েছেন, পত্নীদের অপমানিত করেছেন, যাদের রাজ্য ও সম্পত্তি অপহরণ করেছেন, তাদের প্রদত্ত অন্নাদির দ্বারা প্রাণ ধারণের কী প্রয়োজন? এই রূপ দৈন্য অনুভব করেও জীবিত থাকতে ইচ্ছা করছেন। পুরাতন বস্ত্রের মতো আপনার অনিচ্ছাও এই দেহ জরায় জীর্ণ হয়ে ক্ষয় পাচ্ছে।

যিনি অসমর্থ হয়ে ধন পুত্রাদি এবং দেহাভিমানে পরিত্যাগ করে সকলের অগোচরে গৃহত্যাগ করেন, তিনি বীর বলে কথিত হন। যার দ্বারা যশ বা ধর্ম কোনো স্বার্থপুরণ হবে না, সেই মোহ জরাদি ব্যাকুল এই দেহকে যিনি ত্যাগ করেন, তিনিই বীর। নিজে থেকে অথবা পরের উপদেশে যিনি এ জন্মের নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে মনকে বশীভূত হয়ে শ্রীহরিতে ধারণ করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ মানব। আপনি আত্মীয়দের অগোচরে উত্তর দিক অর্থাৎ হিমালয় অভিমুখে চলে যান। এর পরেই গরমকাল এসে উপস্থিত হবে।

অনুজ বিদুর কর্তৃক প্রবোধিত হয়ে জন্মান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র চিত্তের দৃঢ়তা বশত আত্মীয় স্বজনের স্নেহ পাশ ছিন্ন করে গৃহ থেকে বহির্গত হলেন। সুবলরাজের কন্যা পতিব্রতা সুশীলা গান্ধারী পতির অনুগমন করলেন। হিমালয় দুর্গম হলেও তা তাদের কাছে আনন্দদায়ক হয়েছিল।

অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠির সন্ধ্যা বন্দনাদি করে ব্রাহ্মণদের তিল, গাভী, ভূমি, অন্ন দান করে গৃহে প্রবেশ করলেন। তিনি বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধরীকে দেখতে পেলেন না। সেখানে উপবিষ্ট সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলেন –হে সঞ্জয়, বৃদ্ধ অন্ধ আমাদের পিতা কোথায় গেলেন? পুত্রশোকে কাতর মাতা গান্ধারী এবং আমাদের হিতাকাঙ্খী পিতৃব্য বিদুরই বা কোথায় গেলেন? আমার কোনো পাপ কল্পনা করে দুঃখিত হয়ে ভার্যার সাথে ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গায় পতিত হলেন? আমাদের পিতা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ভ্রাতুস্পুত্র আমাদের বিপদ থেকে যারা রক্ষা করেছিলেন সেই দুজন পিতৃব্য বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র এখন কোথায় গেলেন।

সূত বললেন– নিজ গৃহে ধৃতরাষ্ট্রকে না দেখে সূত সঞ্জয় কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। তিনি দুহাত দিয়ে চোখের জল মুছে বুদ্ধির দ্বারা মনকে ঠিক করলেন। তিনি বললেন, হে কুল নন্দন তোমাদের পিতৃব্যদ্বয় এবং গান্ধারি কোনো কথাই জানি না। হে মহাবাহ, সেই মহাত্মাদের দ্বারা আমি বঞ্চিত হয়েছি।

এমন সময় খঞ্জনি হাতে ভগবান নারদ সেখানে নেমে এলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির অভিবাদন পূর্বক তাকে অর্চনা করলেন। যুধিষ্ঠির জানতে চাইলেন, হে ভগবান, আমি পিতৃব্যদ্বয়ের কোনো সংবাদ জানি না। এখান থেকে তারা কোথায় গেলেন? নিহত পুত্রের শোকে কাতর ও পস্বিনী মতো কোথায় গেলেন? আপনি আমাকে শোক সাগর থেকে উদ্ধার করুন।

মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান নারদ বললেন– হে মহারাজ, কারও জন্য শোক করো না। যেহেতু এ জগত ঈশ্বরের বশীভুত। দিকপাল গণের সাথে সমস্ত লোক তো ঈশ্বরে পূজা উপহার বহন করছে। সেই পরমেশ্বরই কর্মানুসারে প্রাণীদের সংযুক্ত করছেন। আবার তিনি তাদের বিযুক্ত করছেন। যেমন দড়ি দিয়ে নাসিকায় বদ্ধ পাখিরা দীর্ঘ রঞ্জু দিয়ে বন্ধ থাকে তেমনই বেদরূপ দড়িতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নামরূপ রঞ্জুতে বদ্ধ জীব সকল শাসন পালন করছে। ক্রীড়াকারীর ইচ্ছায় কাষ্ঠময় পশুপক্ষীর একত্র মিলন ও বিচ্ছেদ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীবগণের সংযোগ ও বিয়োগ হয়ে থাকে।

সন্ত্রস্ত ব্যক্তি যেমন পরকে রক্ষা করতে পারে না, কাম গুণের অধীনে পাঞ্চ ভৌতিক দেহ অন্যকে রক্ষা করবে কী করে? হে মহারাজ, এ জগৎ ভগবানই, তিনি এক সৎপ্রকাশক

জীবগণের অন্তর্যামী আত্মা। যিনি ভোক্তা রূপে দেহের অন্তরে এবং ভোগ্য রূপে বাইরে অবস্থান করেন। এটি মায়ার খেলা।

ধৃতরাষ্ট্র, ভ্রাতা বিদুর ও ভার্য্যা গান্ধারীর সাথে হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে ঋষিদের আশ্রমে গিয়েছেন।

সেখানে স্বধুনী গঙ্গার সাতজন ঋষির প্রতিনিমিত্ত পৃথক পৃথক সাতটি স্রোতে নিজেকে বিভক্ত করেছেন, তাই সেই তীর্থকে সপ্তস্রোত বলা হয়। সেই তীর্থে ত্রিকাল স্নান করে যথা বিধি অগ্নির হোম করে তিনি অবস্থান করছেন। এখন তার মনে কোনো বিষয় বাসনা নেই। তিনি আসন এবং শ্বাস জয় করে ছয়টি ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার করেছেন, হরির ভাবনার দ্বারা স্বত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের মালিন্য দূর করেছেন। অহংকারে অস্পদ মনকে বিজ্ঞানাত্মা সংঘবদ্ধ বুদ্ধিতে সংযুক্ত করেছেন। বুদ্ধি অঙ্ক থেকে বিচ্ছেদ করে এক্ষেত্র পাঁচকে এক করেছেন। ঘর ভেঙে গেলে তার উপস্থিত আকাশ যে মন মহাকাশে পরিণত হয়, তেমনই তিনি আত্মাকে পরমাত্মাকে এক করে দিয়েছেন।

হে মহারাজ, যিনি অখিল কর্মসন্ন্যাস করে কৃত্য হয়েছেন, সে ধৃতরাষ্ট্র শ্রেয় প্রতিবন্ধক বিঘ্ন তুমি করো না। আজ থেকে পরবর্তী পঞ্চম দিনে তিনি দেহ ত্যাগ করবেন। সেই দেহ আপনা থেকেই ভস্মীভূত হবে। পর্ণশালার সাথে পতির দেহ দগ্ধ হতে থাকলে পতিব্রতা গান্ধারী পতির উদ্দেশ্যে অগ্নিতে প্রবেশ করবেন। হে করুণানন্দন, বিদুর সেই আশ্চর্য ঘটনা দেখে একাধারে আনন্দিত এবং শোক সঞ্জাত হয়ে তীর্থসেবার জন্য সেখান থেকে চলে যাবেন।

এই কথা বলে নারদ স্বর্গে চলে গেলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর কথা শুনে শোক ত্যাগ করলেন।

.

চতুর্দশ অধ্যায়

অর্জুনের মুখ থেকে যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান বাক্যশ্রবণ

সূত বললেন– অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের আচরণ এবং অভিপ্রায় জানার জন্য দ্বারকাতে গেলেন। ইতিমধ্যে সাত মাস কেটে গেল অর্জুন দ্বারকা থেকে ফিরে এলেন না। যুধিষ্ঠির ভয়ানক দুর্লক্ষণ দেখতে পেলেন। কালের ভয়াবহ গতি এবং ঋতু ধর্মের বিপর্যয় ঘটে গেল। মানুষেরা ক্রোধ, লোভ এবং মিথ্যাযুক্ত হল, পাপ পথে তারাই জীবিকা নির্বাহ করতে থাকল। পিতা মাতা

বন্ধু ভাই পতি এবং পত্নীর মধ্যে নিরন্তর কলহ দেখা দিল। রাজা যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন– বন্ধুদের দেখার জন্য এবং পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের মনের বাসনা জানার জন্য অর্জুন দ্বারকাতে গিয়েছে। ভীম, সাত মাস বলে গেল। এখনও পর্যন্ত কেন অর্জুন ফিরে এল না, আমি তা বুঝতে পারছি না। দেবর্ষি নারদ যা বলেছিলেন, সেই সময় কি এখন উপস্থিত হল? ভগবান তাঁর লীলাসাধন করে দেহ পরিত্যাগ করার ইচ্ছা করবেন। তাঁর আনুকূল্যে আস্মদ আমাদের সম্পদ রাজ্য, পত্নী, প্রাণপজ এবং বংশ রক্ষা সম্ভব হয়েছে। হে ভীম, এই দৈহিক দৈবী এবং পার্থিব বিপর্যয় গুলি দেখো। আমার বাম উরু, চোখ এবং বাহু বারবার স্পন্দিত হচ্ছে। হৃদয় কম্পিত হচ্ছে, শৃগাল অগ্নি উদগীরণ করতে করতে সূর্যের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছে। কুকুর আমাকে লক্ষ্য করে নির্ভয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করে যাচ্ছে। শুভ পশু গাভী আমাকে বামদিকে রেখে চলেছে। অশুভ গদর্ভ আমার ডানদিকে প্রদক্ষিণ করছে। অশ্বগুলিকে ক্রন্দন করতে দেখছি। কপোত মৃত্যুদূতের মতো আমার মনকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। পেঁচা আর কাকের কুৎসিত শব্দ বিশ্বকে শূন্য করতে চাইছে।

হে ভীম, সুর্যের চারিদিকের বেষ্টন ধূম্রবর্ণ হয়েছে। পর্বতের সাথে সাথে পৃথিবীতে কম্পন দেখা দিয়েছে, বিনা মেঘে বজ্রপাতের শব্দ তুমি শুনতে পাচ্ছ না? সূর্য নিস্তেজ হচ্ছে, গ্রহগণের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে। প্রাণী আর ভূতের দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী যেন বলছে। মানুষের মনও আলোড়িত। এগুলি কী মঙ্গল বিধান করবে, এটা আমরা জানি না। বৎসগণ স্তন পান করছে না। গাভীগণ দুগ্ধ দিচ্ছে না, গোষ্ঠে গাভীগণ অশ্রুমুখে কান্না করছে। বৃষরা আনন্দিত হচ্ছে না। দেবপ্রতিমাগুলিও ক্রন্দন করছে। জনপদ গ্রাম নগর উদ্যান আকর এবং আশ্রমগুলি হতশ্রী হয়ে পড়েছে। তারা কী দুঃখ বহন করছে। আমি জানি না। আমার মনে হচ্ছে, শ্রী কৃষ্ণের ধ্বজ অঙ্কুশ বজ্রাদি চিহ্ন বিশিষ্ট বরণের সম্পর্কহীন হয়ে পৃথিবী আজ সৌভাগ্যহীনা হয়েছে।

অমঙ্গল চিহ্ন দেখে যুধিষ্ঠির অনিষ্ট চিন্তা করছিলেন। এমন সময় দ্বারকা থেকে অর্জুন এসে উপস্থিত হলেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের চরণে প্রণাম করে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর দুটি চোখ থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল। তাকে মলিন দেখে নারদের কথা মনে করে যুধিষ্ঠির সুহৃদদের মধ্যে বলতে শুরু করলেন।

তিনি বললেন– দ্বারকায় আমাদের আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব সবাই সুখে আছে তো? মাননীয় মাতামহ কুশলে আছেন তো? ভাইয়ের সাথে মাতুল বসুদেবের খবর কী? পরস্পর ভগিনী এবং আমাদের মাতুলানী দেবকী প্রভৃতি বসুদেবের পত্নীগণ পুত্রবধূদের সাথে সুখে আছেন তো? সুষেণ, চারুদেষ্ণ এবং জাম্ববতী নন্দন শাম্ব কুশলে আছেন তো? অপর কৃষ্ণ পুত্রদের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঋষভ প্রভৃতিদের পুত্রদের সাথে কুশলে আছেন তো? শ্রীকৃষ্ণের অনুচরগণ শ্রুতদেব, উদ্ধব প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সুখে আছেন তো?

ব্রাহ্মণদের হিতকারী এবং ভক্তবৎসল গোবিন্দ দ্বারকায় সুধর্ম সভায় সুখে আছেন তো? বলরামের সাথে সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ জনগণের মঙ্গলরক্ষা এবং সৃষ্টির জন্য বিরাজমান তো? সত্যভামা প্রভৃতি ষোলো হাজার মহিষীগণ যাঁর চরণকমল শুশ্রূষায় মোক্ষ ও কর্মবলে মনে করতেন, তিনি কেমন আছেন? যদুবংশের বীরগণ যার বাহুবলে অকুতোভয়ে হয়ে বলপূর্বক স্বর্গ থেকে আনীত দেবতাদের ব্যাবহারযোগ্য সুধর্মা সভাতে বারবার পায়ের দ্বারা স্পর্শ করেছেন, সেই গোবিন্দ কুশলে আছেন তো?

অর্জুন তোমার কোনো পীড়া হয়নি? তোমার শরীরের সেই তেজ কোথায় গেল? তুমি দীর্ঘকাল সেখানে ছিলে। কোনো কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা কি পূর্ণ করতে পারোনি? অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের বিরহে নিজেকে শূন্য বলে মনে করছ কি? এছাড়া তোমার এমন অবস্থা হতে পারে না।

.

পঞ্চদশ অধ্যায়

অর্জুনের মুখে যদুকুল সংহার শ্রবণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান বার্তা শুনে পাণ্ডবদের হিমালয়ের দিকে মহাপ্রয়াণ

সূত বললেন– মহারাজ যুধিষ্ঠির নানা আশংকা করে অর্জুনের বিষয়ে কল্পনা করছিলেন। অর্জুন কৃষ্ণবিরহে তখন কাতর হয়ে ওঠেন। শোকে তার বাক রুদ্ধ হয়েছে। তিনি নিষ্প্রভ হয়ে ভগবানের চিন্তা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে শোক সংবরণ করলেন। চোখের জল মুছে ফেললেন। কৃষ্ণের অদর্শনজনিত বিরহে কাতর হয়ে পড়লেন। বারবার কৃষ্ণের কথা অর্জুন বললেন– হে মহারাজ, বন্ধুরূপী হরির সঙ্গ দ্বারা আমি বঞ্চিত হয়েছি। দেবগণেরও আশ্চর্যকর আমার তেজ তিনি অপহরণ করেছেন। দেহ প্রাণহীন হলে তাকে মৃত বলা হয়। যার ক্ষণকাল বিয়োগে এই জগৎ অপ্রিয়দর্শন হয়, অর্থাৎ দেখতে আর ভালো লাগে না, যাঁর সম্যক আশ্রয়ে দ্রুপদ গিয়ে স্বয়ম্বর সভায় সমাগত কামোন্মত্ত নৃপতিদের প্রভাব অপহরণ করেছিলাম, এবং ধনুর দ্বারা মৎস্যকে নিপাতিত করে দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলাম, যার সন্নিধানে দেবগণের সাথে দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করে খাণ্ডব বন অগ্নিকে দিয়েছিলাম, সেই

খাণ্ডবদাহে ময়দানবকে রক্ষা করার অদ্ভুত শিল্পকলা মণ্ডিত সভা লাভ করেছিলাম, যাঁর কৃপায় আমরা পৃথিবীর রাজাদের পরাজিত করেছি, যাঁর তেজে অজাত অস্থিতুল্য বলবীর্য সম্পন্ন তোমার অনুজ ভীমসেন জরাসন্ধকে বধ করেছিলেন, দুঃশাসন প্রভৃতি দুর্বত্ত গণ রাজসভায় আপনার পত্নীর খোঁপা খুলে কেশ আকর্ষণ করেছিল, যে খোঁপা রাজসূয় যজ্ঞে মহাভিষেক করায় প্রশংসনীয় ও রম্য ছিল,সেই ঘটনা স্মরণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সভায় এসে উপস্থিত হন। তাঁর চরণে প্রণাম করার সময় দ্রৌপদী নয়না কৃষ্ণের চরণে পড়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীমের দ্বারা দুঃশাসন প্রভৃতির পত্নীদের বৈধব্য ঘটিয়েছেন, আমাদের বনবাসের সময় শত্রু দুর্যোধনের কৌশলে দশ হাজার শিষ্যের সাথে মুনি দুর্বাসা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। আমাদের পাক পাত্রে তখন অন্ন ছিল না। অভুক্ত ব্রাহ্মণদের অভিশাপের ভয়ে আমরা বিপন্ন হয়েছিলাম। এই সময় কৃষ্ণ এসে দ্রৌপদীর পাকপাত্র থেকে শাকান্ন ভক্ষণ করে আমাদের রক্ষা করেছিলেন। আহারের আগে স্নান করার সময় জলমগ্ন ঋষিরা পরিতৃপ্ত মনে করে বৃথা আহারের ব্যবস্থা করানো হল, ভেবে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

যাঁর তেজে দেবীর সাথে শূলপানি শিব যুদ্ধে বিস্মিত হয়ে আমাকে নিজের পাশুপৎ অস্ত্র দিয়েছিলেন। এই দেহেই স্বর্গলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের সাথে অর্ধাসন আমি লাভ করেছিলাম। সে স্বর্গে আমি যখন ক্রীড়া করছিলাম, ইন্দ্রের সাথে দেবগণ নিবাগ কবচ নামক অসুরদের বধের জন্য আমার গাণ্ডবী চিহ্নিত বাহু দণ্ড আশ্রয় করেছিলেন, কৃষ্ণের প্রভাবে তা অত্যন্ত শক্তিশালি হয়েছিল।

শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ মোক্ষের নিমিত্ত যাঁর চরণ কমল ভজন করেন মন্দমতি সেই ঈশ্বরকে আমি আমার সারথি হিসেবে লাভ করেছিলাম। হে নরদেব, কৃষ্ণের গম্ভীর মৃদু-মন্দ হাসির সাথে মনোজ্ঞ পরিহাস বাক্যগুলি এখনও আমার মনে পড়ছে। তিনি আমাকে পার্থ, অর্জুন, সখে, কুরুনন্দন ইত্যাদি হৃদয়গ্রাহী সম্বোধনের দ্বারা সম্বোধিত করতেন। শয্যা, উপবেশন, ভ্রমণ, প্রশংসা এবং ভোজনাদি কর্মে একত্রে অবস্থান করেছি। এর ব্যতিক্রম হলে হে বয়স্যা তিনি অত্যন্ত সত্যবাদী, এরুপ বক্তব্য তিনি করতেন। পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করে তেমনই কুমতি আমাদের সকল অপরাধ তিনি সহ্য করেছেন। হে মহারাজ, সেই কৃষ্ণের বিরহে এখন আমি শূন্য গৃহে অবস্থান করছি। শ্রীকৃষ্ণের ষোলো হাজার মহিষী রক্ষার ভার নিয়ে আমি দুর্বত্ত বহুগমের দ্বারা পরাজিত হয়েছি। আমার সেই গান্ডীব ধনুর শর, অশ্বরথ রক্ষার ভার নিয়ে আমি দুবৃত্ত বহুগমের দ্বারা পরাজিত হয়েছি।

আমার সেই গান্ডীব ধনু, শর, অশ্বরথি সবকিছু আজ শক্তিহীন।

মহারাজ, যাদের মঙ্গল চিন্তা করেছেন, তারা বিপ্রসাথে বিমূঢ় হয়ে অন্নময়ী মদিরা পান করে উন্মত্ত চিত্তে একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে চার পাঁচজন মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে। প্রাণীগণ যে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে বা পালন করে এটি ভগবান পরমেশ্বরের কাজ। জলচর মৎস্যাদির মধ্যে যারা বড়ো মাছ, তারা ছোটো মাছদের খেয়ে ফেলে। বলবান দুর্বলদের এবং বলশালী ব্যক্তি পরস্পর বলশালীদের বিনাশ করে থাকে। বলিষ্ঠ যদু এবং মহৎ পাণ্ডবদের দ্বারা দুর্বলদের বিনাশ করিয়ে ভগবান যদুদের দ্বারা পরস্পরকে হত্যা করিয়ে পৃথিবীর ভার হরণ করলেন।

সূত বললেন– শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল গভীর প্রেমে ধ্যান করতে করতে অর্জুনের চিত্ত বিযুক্ত হয়েছিল। বাসুদেবের চরণ কমলে চিন্তা করে সঞ্জাত ভক্তির দ্বারা বিষয় বাসনা নষ্ট হয়েছিল। যুদ্ধের আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছিলেন, অর্জুন তা ভুলে গিয়েছিলেন। এখন আবার সেই জ্ঞান তিনি লাভ করলেন, ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতির লয় হল। তিনি গুণাতীত হলেন, নাশ হল লিঙ্গ দেব। এবং সূক্ষ্ম দেহের অর্জুন সম্পূর্ণ শোক মুক্ত হলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের গতি এবং যদুকুলের নাশ চিন্তা করে স্বর্গপথে যাওয়ার কথা ভাবলেন। কুন্তীদেবীও অর্জুনের কথায় জীবনমুক্তা হলেন। লোকে যেমন পায়ে কাঁটা ফুটলে অপর কাঁটা দিয়ে তা তুলে উভয় কাঁটাকে পরিত্যাগ করে, ঠিক সেই ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে দেহে পৃথিবীর ভার হরণ করলেন সেই দেহ পরিত্যাগ করলেন।

ঈশ্বরের কাছে অবতার তনু ও ভূতার মুক্তি উভয়ই সমান। অভিনেতা যেমন নিজ রূপে থেকে নানারূপ ধারণ করে, এবং শেষ পর্যন্ত অন্তর্ধান করে, ভগবান নিজের স্বরূপে থেকে নানারূপ ধারণ করেন এবং ত্যাগ করেন।

যাঁর পবিত্র কথা সকলের শ্রবণ করা উচিত, সেই ভগবান মুকুন্দ নিজের দেহের সাথে পৃথিবী ত্যাগ করলেন। অজ্ঞান লোকের অমঙ্গলের জন্য কলি প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল। যুধিষ্ঠির সর্বত্র লোভ মিথ্যা হিংসা ছলনা ইত্যাদির প্রভাব দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর সুসংযত পৌত্র পরীক্ষিতকে সসগরা ধরিত্রী অর্পিত করলেন। স্বরাজ্য হস্তিনাপুরে তাকে অভিষিক্ত করা হল। রাজা যুধিষ্ঠির অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে মুথরার সুরসেন বংশের অধিপতি করলেন। নিজে প্রজাপতি দেবতার যজ্ঞ করলেন। তিনটি অগ্নিতে আত্মাকে সমর্পণ করলেন। রাজোচিত বস্ত্র, অলঙ্কার সবকিছু ত্যাগ করলেন, ক্ষমতা শূন্য এবং অহঙ্কার শূন্য হয়ে বন্ধন ছিন্ন করলেন। এবার বাক্যকে মনে, মনকে প্রাণে, প্রাণকে আপনার কার্য উৎসর্গের সাথে আপনাকে মৃত্যুতে

এবং মৃত্যুকে পঞ্চভূতের সমষ্টি দেহে লয় করলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি দেহকে স্বত্ত্ব, রজঃ এবং তম, এই গুণত্রয়ে লয় করেন এবং গুণত্রয়তে প্রভৃতিতে লয় করেন। এই সমস্ত কারণে প্রকৃতিতে জীবাত্মাতাতে এবং জীবাত্মাকে অব্যয় ব্রহ্মে লয় করেন। মলিন বসন পরিধান করলেন। নিরাহার ও মৌন হলেন। আলুয়ায়িত কেশে জড় উন্মত্ত পিচের মতো কারও অপেক্ষা না করে বধিরের মতো গৃহ থেকে বহির্গত হলেন। পরব্রহ্মকে ধ্যান করতে করতে উত্তর দিকে গমন করলেন। এই দিকে আগে যারা গেছেন, এবং সেখান থেকে আর কেউ ফিরে আসেন নি।

ভীম প্রভৃতি ভাইয়েরা অগ্রজের মতো গৃহ থেকে বহির্গত হলেন। যুধিষ্ঠির ধর্মাদি বারোটি পুরুষার্থক সম্যক রূপে নির্বাহ করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শ্রী কৃষ্ণের পাদ পদ্মেই তাঁর আশ্রয়। সকল ভাই ভগবানের ধ্যানচ্যুত ভক্তিতে পবিত্র বুদ্ধি লাভ করলেন।

বিদুরও কৃষ্ণের প্রতি মন অভিনিবিষ্ট করলেন। প্রভাত সূর্যে দেহত্যাগ করলেন। পিতৃগণের সাথে স্বস্থানে গমন করলেন। তখন দ্রৌপদীও ভগবান বাসুদেবের একান্ত মতি হয়ে তাঁকে লাভ করলেন।

.

ষোড়শ অধ্যায়

পরীক্ষিতের রাজ্যলাভ, দিগ্বিজয় এবং ধর্ম ও ধরার সংবাদ শ্রবণ

সূত আরও বললেন–হে ব্রাহ্মণ, মহাভাগবত পরীক্ষিত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের শিক্ষায় পৃথিবী পালন করতে থাকলেন। তাঁর জন্মের সময় জাতককে শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতেরা যেসব ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন একে একে তা সবই ফলতে লাগল। তিনি উত্তরের কন্যা ইরাবতাঁকে বিয়ে করলেন। জন্মেজয় প্রভৃতি চারটি পুত্রের জন্ম হল। কৃপাচার্যকে গুরুপদে বরণ করলেন। গঙ্গাতীরে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের অনেক দক্ষিণা দিলেন। এবার বীর রাজা পরীক্ষিত দিগ্বিজয়ে বের হলেন। কোনো একটি জায়গাতে গোমিথুনকে পায়ের দ্বারা আঘাত করতে রাজচিহ্ন ধারী শুভ্রকে দেখলেন। শুভ্ররূপী কলিকে প্রতাপের দ্বারা নিগৃহীত করেছিলেন।

শৌণক জানতে চাইলেন–হে সুত, রাজা পরীক্ষিত রাজ চিহ্নধারী শুদ্রকে কেবল নিগ্রহ করলেন, কিন্তু বধ করলেন না কেন? সেই কালিন গৃহ যদি বিষ্ণু কথাপ্রিয় হয়, তাহলে বিষ্ণুর চরণ কমলের মধু পানকারী সাধুদের কথাকে আশ্রয় করে থাকলে তবে তা ব্যাখ্যা করুন। অন্য অসৎ কথার আর কী প্রয়োজন?

সুত বললেন– কুরুজঙ্গলে বাস করার সময় যুদ্ধিনিপুণ দেশে কলি প্রবেশ করছে, এই অপ্রিয় কথা শুনতে পেলেন। তিনি ধনুর্বাণ গ্রহণ করলেন। নীলবর্ণ চারটি অশ্বযুক্ত এবং বিজয় সিংহ চিহ্নিত রথে উঠে বসলেন। রথ, অশ্ব, হস্তী এবং পদাতিক, এই চতুরঙ্গ সেনা পরিবৃত হয়ে দিগ্বিজয়ের জন্য নির্গত হলেন।

তিনি পূর্ব, পশ্চিমে, দক্ষিণ এবং উত্তর দিকের বিভিন্ন দেশ জয় করলেন। জয় করলেন ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ভারত, উত্তর কুড়ুল এবং দক্ষিণ কুড়ুল। মহাত্মা পরীক্ষিত জনপদের জনগণ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সূচক নিজ পূর্বপুরুষদের যশগান করছে তা শুনতে পেলেন। অশ্বত্থামার অস্ত্রের থেকে নিজ রক্ষার কথা যাদব ও পাণ্ডবদের পরস্পর বন্ধুত্বের কথা শুনলেন। তিনি পরম সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ধন, বস্ত্র এবং আহার দান করলেন। প্রত্যহ তিনি পূর্বপুরুষদের কাজের অনুসরণ করে চলতেন। শীঘ্রই তাঁর জীবনে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল।

এই সময় বিশ্বরূপধারী ধর্ম নিঃস্ব, বৎসহীনা জলধির মতো রোদনরতা গাভীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন –হে ভদ্রে, তোমার দেহের মঙ্গল তো? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, মনের পীড়ায় তুমি কষ্ট পাচ্ছো, তুমি নিস্তেজ, তোমার মুখে গ্লানিমা এসেছে। হে বৎস, তুমি কি দুরোচিত কোনো বস্তুর জন্য শোক করছ? এর পর শুদ্ধ উপায়ে রাজারা তোমাকে পালন করবে দেখে শোক করছ কি? অসুরগণ কর্তৃক যজ্ঞীয় ভাগ অপহৃত করার জন্য দেবতাদের জন্য শোক করছ। ইন্দ্র বর্ষণ না করায় প্রজাদের কষ্ট হচ্ছে ভেবে শোক প্রকাশ করছ।

হে পৃথিবী, অতীতের দ্বারা অরক্ষমান স্ত্রীদের জন্য শোক করছ? রাক্ষসকুল পিতৃগণ কর্তৃক অরক্ষিত বালকদের জন্য শোক প্রকাশ করছ?

হে বসুন্ধরা যে জন্য তুমি কৃশ হয়েছ, সেই মানসিক দুঃখের কারণ বলো, পৃথিবী বললেন– ধর্ম, আমাকে যা জিজ্ঞাসা করছ, তা তুমি নিজেই জানো। যে কারণে লোকের শোকাবহ চারটি পাদের দ্বারা তুমি অবস্থান করছিলে, এখন তা আছে কি? শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পরিত্যাক্ত জনগণের জন্য আমি শোক প্রকাশ করছি। সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষমা, ত্যাগ, সন্তোষ, সরলতা, মনের ধৈর্য্য, বহিরিন্দ্রের চিরতা, তপস্যা, সাম্য, পরের অপরাধ সহ্য করা, প্রাপ্তিতে উদাসীন্য, শাস্ত্র বিচার,

জ্ঞান, বিরক্ত, ঐশ্বর্য, শৌর্য, তেজ, বল, স্মৃতি, স্বাতন্ত্র, কৌশল, সৌন্দর্য, ধৈর্য, সফলতা, প্রতিভার আতিশয্য, বিনয়, সৎ স্বভাব, মনের শক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি, কর্মের শক্তি। ভোগের আস্পাদন-এর স্থৈর্য। শাস্ত্রের বিশ্বাস, যশ, সন্মান এবং গর্বেপর অভাব– এই একচল্লিশটি এবং মহত্ত্বের ইচ্ছাকারী জনগণের প্রার্থনীয় অন্যান্য গুণগুলি শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রলয়েও নষ্ট হয় না। সকল গুণের আধার এবং লক্ষ্মীর বাসস্থান সেই শ্রীকৃষ্ণ এই লোক পরিত্যাগ করেছেন। পাপ কলি পৃথিবীর ওপর দৃষ্টিপাত করছে। তাই আমি শোক প্রকাশ করছি।

— হে দেবশ্রেষ্ঠ নিজের জন্য, আপনার জন্য, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, সাধু সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের জন্য আমি শোক প্রকাশ করছি।

–যে স্বতন্ত্র যে হরি অসুর বংশের শত শত অক্ষয়িণী সৈন্য বিনাশ করেছেন, তিনটি চরণে হীন দুঃস্থ করিয়ে যদুদের রমণীয় মূর্তি ধারণ করেছেন, প্রেম পূর্বক অবলোকন, মধুর হাসি, এবং সুমিষ্ট বাক্যের দ্বারা সত্যভামা প্রমুখ মহিষীদের গর্বের সাথে পুরুষোত্তমের বিরহ সহ্য করে? পৃথিবী এবং ধর্ম যখন এই ধরনের কথা বলছিলেন, তখন রাজর্ষি পরীক্ষিত সরস্বতীর কাছে তাঁদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন।

.

সপ্তদশ অধ্যায়

পরীক্ষিত এবং ধর্মের সংলাপ ও পরীক্ষিতের কলিনিগ্রহ

সূত বললেন–রাজা পরীক্ষিত সরস্বতীর তীরে একটি শূদ্রকে দেখতে পেলেন। ওই শূদ্র গোমিথুনকে প্রহার করতে লাগল। মৃণালের মতো শুভ্রবর্ণ বৃষটি শূদ্রতাড়িত হয়ে কাঁপতে থাকল। শূদ্রের পদাহত বৎসহীন অবদন, কৃশ, তৃণ ভক্ষণে ইচ্ছুক একটি গাভীকে দেখা গেল। রাজা রথে আরোহণ করলেন। মেঘের মতো গম্ভীর স্বরে স্বর্ণখচিত বেশধারী কলিকে জিজ্ঞাসা করলেন –আমার পালিত এই দেশে বলবান দুর্বলদের আঘাত কেন করছ? নটের মতো রাজবেশ পরিধান করেছ? অথচ কর্মে শূদ্রের মতো, তুমি কে? তুমি বধের যোগ্য। মৃণালের মতো শুভ্র বর্ম তিনটি চরণে হীন হয়ে এক চরণে বিচরণ করছ।

কুরুরাজদের বাহুদণ্ডে সুরক্ষিত এই ভূতল তোমার অশ্রুব্যতীত অন্য কোনো প্রাণীর চোখ থেকে জল পড়েনি। হে, বৃষ, তুমি এখানে শোক করো না, এই শুভ্র থেকে তোমার ভয় দুর করো। হে মা, আমি জীবিত থাকতে তোমার মঙ্গল হবে। হে সাধ্বী, যার রাজ্যে দুবৃত্তের ভয়ে প্রজারা ভীত হয়, সেই প্রমত্ত রাজার কীর্তি, আয়ু, সৌভাগ্য এবং পরলোক সব নষ্ট হয়ে যায়। আর্তদের আর্তি হরণ করা রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অতএব এই দুবৃত্তকে আমি বধ করব। হে বৃষ, তোমার তিনটি পা কে ছেদন করেছে? হে বৃষ। নিরপরাধী, তোমার মঙ্গল হোক। পাণ্ডবদের কীর্তি বিনাশ হোক, কে তোমার অঙ্গ ছেদন করেছে তা নিঃসঙ্কোচে আমাকে বলো। নিরাপরাধকে যে দুঃখ দেয় তাকে আমি হত্যা করবই। অসাধুদের দমন করলে সাধুদের মঙ্গল হয়।

ধর্ম বললেন–পাণ্ডববংশোদ্ভূত তোমাদের এই আর্তদের অভয়প্রদবাক্য যুক্তি যাদের গুণসমুহে আকৃষ্ট হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যাদিকর্ম স্বীকার করেছিলেন। হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, যে পুরুষ থেকে প্রাণীদের দেহ উৎপন্ন হয় সে পুরুষকে আমরা জানি না। বিকল্প অর্থাৎ ভেদকে যারা আচ্ছাদন করেন, যোগীগণ বলেন, আত্মাই আমার সুখ এবং দুঃখের কারণ। আধার দৈবজ্ঞ গণ্য বলে থাকেন, গ্রহাদিগমই সুখ দুঃখের কারণ বলে থাকেন। যারা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন, তাঁরা বলে থাকেন বাক্য ও মনের অতীত পরমেশ্বর থেকেই সুখ দুঃখের সৃষ্টি হয়ে থাকে। হে রাজর্ষি এর মধ্যে যেটা তোমার গ্রহণযোগ্য, তা তুমি বিচার করে নাও।

সম্রাট পরীক্ষিত মোহশুন্য হয়ে সমাহিত চিত্তে ধর্মকে বললেন– হে ধর্মজ্ঞ, তুমি ধর্মের কথাই বলেছ। কৃষ্ণরূপধারী তুমিই হলে সাক্ষাৎ ধর্ম। পাপী জনগণের জন্য নরকের স্থান নির্ধারিত হয়েছে। সূচকের অর্থাৎ না জেনে নির্ণয় করলেও সেই গতি হয়। তুমি যে পাপীর নাম করছ না, তার কারণ হল পাপ করলে যে নরক গতি হয়, পাপীর নাম উল্লেখধারীরও সেই পাপ হয়। ভগবানের মায়ার গতি প্রাণীদের বাক্য এবং মনের অগোচর এটা সুনিশ্চিত। সত্যযুগে ধর্মের চারটি চরণ ছিল– তপস্যা, পবিত্রতা, দয়া, এবং সত্য। তার মধ্যে অধর্মের অংশ গর্ব বিষয়ের প্রতি আসক্তি এবং মদ্য পানাদির জন্য মত্ততার দ্বারা ধর্মের তিনটি অংশ নষ্ট হয়ে গেছে, হে ধর্ম, এখন সত্যরূপ অংশটুকু আছে। তা তুমি নিজের দ্বারা রক্ষা করতে পারবে। মিথ্যার দ্বারা বর্ধিত এই অধর্মরূপ কলি তাকেও গ্রহণ করতে চাইছে। ইনি হলেন পৃথিবী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং গুরুভার নষ্ট করেছেন। একদা তিনি নিজের চরণের স্পর্শে সবদিক দিয়ে পৃথিবীর মঙ্গল করেছিলেন। সাধ্বী এই অধর্মরূপ কলি তাকেও গ্রহণ করতে চাইছে।

ইনি হলেন পৃথিবী। সাধ্বী এই পৃথিবী কৃষ্ণ কর্তৃক পরিত্যক্তা। তিনি চোখের জল ফেলে শোক প্রকাশ করছেন। তিনি ভাবছেন, ভক্তিবিহীন রাজবেশধারী শূদ্ররা তাকে ভোগ করবে। ধর্ম এবং পৃথিবীকে সান্ত্বনা দিয়ে মহারথী পরীক্ষিত খড়্গ গ্রহণ করলেন। কলি রাজচিহ্ন পরিত্যাগ করলেন। ভয়ে কাতর হয়ে মহারাজ পরীক্ষিতের চরণমূলে পতিত হলেন। কীর্তিমান দীনবৎসল বীর পরীক্ষিত শরণাগত কলিকে বধ করলেন না। তিনি হাসতে হাসতে বললেন– অর্জুনের যশরথনে ব্যগ্র আমাদের কাছে তুমি কৃতাঞ্জলি হয়েছ। তোমার কোনো ভয় নেই। কিন্তু আমার রাজ্যে তুমি থাকতে পারবে না।

কারণ তুমি অধর্মের বন্ধু। তুমি রাজার দেহে বর্তমান থাকলেও তোমার সাথে সাথে অধর্ম আসবে। আসবে লোভ, মিথ্যা, চুরি, দৌজন্য, স্বধর্মত্যাগ, অলক্ষ্মী, কপটতা, কলহ, এবং অহঙ্কার অর্থাৎ হে অধর্মের বন্ধু কলি ব্রহ্মবর্তে তুমি থাকতে পারবে না। কারণ এদেশে যজ্ঞের কাজে দক্ষ ব্রাহ্মণরা যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞশ্বর হরির বন্দনা করে থাকেন।

সূত বললেন– পরীক্ষিত এই আদেশ করে বললেন, হে সার্বভৌম, আপনার আদেশে আমি যেখানেই বাস করি সেখানেই ধনুর্বাণধারী আপনাকে আমি দেখতে পাব। কারণ আপনি সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট। হে ধার্মিক শ্রেষ্ঠ, আপনি সেই স্থান নির্দিষ্ট করে দিন, আপনার আদেশ আমি পালন করতে পারব।

সূত বললেন– কলি এই ধরনের প্রার্থনা করলেন। মহারাজ পরীক্ষিত তাকে এই স্থান গুলি নির্দেশ করলেন–জুয়া খেলা, মদ্যপান, পরস্ত্রীর সখা এবং প্রাণী হিংসা। যে কাজে মিথ্যা, মত্ততা, সঙ্গ এবং শঠতা/ক্রুরতা এই বারো ধরনের অধর্ম থাকে। কলি আবার প্রার্থনা করলে, পরীক্ষিত স্বর্ণ রৌপ্যাদি তার বাসস্থান রূপে দিলেন। তার সাথে দিলেন মিথ্যা, মদ, কাম, রাজঃ, গুণব্যত হিংসা এবং শত্রুতা। অধর্মহেতু কলি পরীক্ষিতের আদেশে তার প্রদত্ত এই পাঁচটি স্থানে বাস করতে লাগলেন।

বৃষ রূপ ধর্মের তপস্যা, পবিত্রতা এবং দয়া, এই তিনটি ভগ্নপাদকে মহারাজ সংযুক্তা করালেন। পৃথিবীকে সান্ত্বনা দিলেন। এখন পরীক্ষিত রাজা উপযুক্ত আসনে আরোহণ করে প্রজাপালন করছেন।

.

অষ্টাদশ অধ্যায়

পরীক্ষিতের প্রতি মুনি বালকের শাপ প্রদান

সূত বললেন– পরীক্ষিত মাতৃ গর্ভে থাকাকালীন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে মৃত হননি। ব্যাসপুত্র শুকদেবের শিষ্য পরীক্ষিত আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানের তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেন। গঙ্গাতীরে নিজের দেহ ত্যাগ করেছিলেন। মহান সম্রাট অভিমন্যু পুত্র পরীক্ষিত যতদিন পৃথিবী পালন করেছিলেন ততদিন পর্যন্ত কলি প্রবিষ্ট হয়েও তার প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন। অধর্মের হেতু কলি এই জগতে প্রবেশ করল। মহারাজ পরীক্ষিত কলিকে বধ করেন নি। কারণ কলিকালে পুণ্য কর্মগুলি সংকল্প মাত্র ফল দান করে থাকে পাপকর্মগুলি অনুষ্ঠিত হলেও তার ফল দেয়।

পরীক্ষিত বিবেচনা করেছিলেন, কলি ধীর ব্যক্তির কাছে অত্যন্ত ভীরু, নিজে সাবধান হয়ে অসাবধনী এবং বালকদের ওপর বাঘের মতো আক্রমণ করে। সাবধান হলে এই কলির দ্বারা কোনো ক্ষতি সাধন হতে পারে না। ঋষিরা বললেন– হে সূত, তুমি অনন্তকাল জীবিত থাক, শুকদেব পরীক্ষিতকে যে শ্রীমদ ভাগবত রূপ আখ্যান বর্ণনা করেছেন, তা স্পষ্ট করে বলো।

সূত বললেন– অহো, আমরা বর্ণকঙ্কর জাতি। কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিদের সমাদর পেয়ে আমাদের জন্ম সফল হয়েছে। যার অনন্ত শক্তি এবং যিনি নিজেও অনন্ত, মহতের মধ্যে তারই গুণ বিকশিত হয়। তাই যে, মহালক্ষ্মী প্রার্থনাকারী ব্রহ্মাদিক পরিত্যাগ করে অনভিলাষী হরির চরণধূলির সেবা করেন। ব্রহ্মা ভগবানের চরণে অর্ঘ্যজল প্রদান করেছিলেন। ভগবানের চরণের নখ থেকে পতিত হয়ে গঙ্গা জল রূপে শিবের সাথে তা জগৎকে পবিত্র করেছে। মুকুন্দ ছাড়া অন্য কে ভগবত পদের অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

কোনো একদিন মহারাজ পরীক্ষিত বনে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন। তিনি ধনুর্বাণ নিয়ে একটি হরিণকে অনুসরণ করতে থাকেন। শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হয়ে একটি জলাশয়ের সামনে আসেন। তাঁর পাশে একটি পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করেন। সেখানে শমীক মুনিকে ধ্যান মুদ্রিত অবস্থায় দেখলেন। এই মুনি ইন্দিয় প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির ক্রিয়াকে প্রতিরোধ করে ছিলেন। জগত স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। মুনির ওপরে প্রক্ষিপ্ত জটা ছিল। পরিধানে মৃগবর্মের আচ্ছাদন। মহারাজ তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মুনির কাছেই জল চাইলেন। মুনি সমাধিস্থ থাকায় তার কাছ থেকে কোনো কিছু পাওয়া গেল না। রাজা পরীক্ষিত নিজেকে অপমানিত

মনে করলেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। –হে ব্রাহ্মণ, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর মহারাজের প্রতি আপনার এরূপ আচরণের অর্থ কী?

শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই মুনি ক্ষত্রিয়ের প্রতি অবজ্ঞাবশত কপট যোগস্থ হয়ে আছেন। ফিরে যাবার আগে ব্রহ্মশির স্কন্ধে ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে একটি মৃত সর্প অর্পণ করলেন।

ওই ঋষির অতি তেজস্বী একটি বালক পুত্র ছিল। সে মুনিবালকদের সঙ্গে খেলতে খেলতে দেখতে পেল, রাজা পরীক্ষিত তাঁর পিতার গলদেশে মৃত সর্প অর্পণ করেছেন। একথা শুনে বালক পুত্র বলল, রাজা প্রজাদের রক্ষক এবং ব্রাহ্মণদের দাস হয়ে প্রভুকে অপমানিত করছে। এটা কত বড়ো অধর্ম দেখো। দ্বাররক্ষক কুকুর বলিভূত কাকের মতো প্রভুর অন্নে পরিপুষ্ট হয়ে তারই অবমাননা করছে।

ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের তাদের গৃহরক্ষক নিযুক্ত করেছে। দ্বার পাল হয়ে গৃহ মধ্যে ভান্ডারস্থ খাদ্যবস্তু কী করে খাবার সাহস উৎপাদন করছে।

ক্রোধে রক্ত চক্ষু হয়ে ঋষিবালক শৃঙ্গি কৌশিক নদীর জলে আচমন করে বাক্য রূপ বজ্র নিক্ষেপ করলেন। অর্থাৎ অভিশাপ দিলেন। তিনি বললেন–যে কুলাঙ্গার আমার পিতাকে অপমান করে মর্যাদা লঙঘন করেছে, আজ থেকে সপ্তম দিবসে আমার আদেশ অনুসারে, তক্ষক নামে এক মহাসর্প তাকে দংশন করবে।

বালক আশ্রমে ফিরে এল। পিতার গলদেশে সর্পের দেহ দেখে বালক দুঃখিত হল। অঙ্গীরার বংশধর শমীক মুনি পুত্রের বিলাপ শুনে চক্ষু উন্মীলন করলেন। কাঁধে মৃত সর্প দেখে প্রশ্ন করলেন– এটা কে ফেলেছে? শৃঙ্গি সমস্ত ঘটনা বলল। শাপের অযোগ্য মহারাজ পরীক্ষিতকে শাপ দেওয়া হয়েছে তা শুনে শমীক মুনি পুত্রের প্রশংসা করলেন না।

তিনি বললেন– অহো, তুমি মহৎ পাপ করেছ। অল্প অপরাধে গুরুদণ্ড দিয়েছ। তোমার বুদ্ধি এখনও পরিপক্ক হয়নি। বিষ্ণুস্বরূপ নৃপতিদের সাথে সাধারণ মানুষকে সমানভাবে দেখা উচিত হয়নি। হে পুত্র, নারায়ণ রাজার মূর্তি ধরে থাকেন, তাঁর অবর্তমানে অনেক মানুষের দুর্দশা হবে। রাজার দ্বারা রক্ষিত না হয়ে অনেক মানুষের দুর্দশা হবে। রাজার দ্বারা রক্ষিত না হয়ে অনেক মানুষ মেষসমুহের মতো ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

রাজর্ষি পরীক্ষিত ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং পরিশ্রমে কাতর হয়ে আমাদের এখানে এসেছিলেন তিনি অভিশাপের যোগ্য নন। হে অপক্ক বুদ্ধির বালক, নিষ্পাপ সেবকের প্রতি যে পাপ করেছ, সর্বাত্মা ভগবান যেন তাকে ক্ষমা করেন।

.

ঊনবিংশ অধ্যায়

গঙ্গাতীরে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রয়োবেশন, ঋষি গণের সমাগম

সুত বললেন– মহারাজ পরীক্ষিত নিন্দিত কর্মের কথা চিন্তা করতে থাকলেন। তিনি ভাবলেন, গুপ্ত তেজ সম্পন্ন নিরাপরাধ ব্রাহ্মণের প্রতি তার আচরণ মুখের মতো হয়েছে। ব্রাহ্মণকে অবমাননার দ্বারা তিনি ভগবানকে অবজ্ঞা করেছেন। শীঘ্রই তার বিপদ আসবে। সেটা পাপ গণের প্রতি তাঁর পাপীয়সী বুদ্ধি না হয়।

যখন রাজা পরীক্ষিত এই কথা চিন্তা করছিলেন, তখন তক্ষকের কাছ থেকে নিজের মৃত্যুর কথা শুনলেন। তক্ষকের বিষনলকে উত্তম মনে করলেন, বিষয়াসক্ত তাঁর পক্ষে বৈরাগ্যের কারণ হবে। ইহলোক এবং পরলোক যে হেয়, তা তিনি স্থির করলেন। এখন উভয়কেই পরিত্যাগ করবেন। তিনি গঙ্গা তীরে আমরণ অনশনব্রত গ্রহণ করলেন। মুনিদের মতো প্রশান্ত এবং আসক্তি শূন্য হয়ে একান্ত মনে শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল ধ্যান করতে থাকলেন।

মুনিরা সশিষ্যে সেখানে আসতে থাকলেন। সাধুরা তীর্থ যাত্রার ছলে মলিন তীর্থ গুলিকে নিজেরাই পবিত্র করে থাকেন। এলেন অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শারদ্বান, অরিষ্ট, নেমি, ভৃগু, অঙ্গীরা পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, সুবাহ, মেধা, তিথি, দেবল, অষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, মৈত্রেয় প্রমুখ। মহারাজ পরীক্ষিত তাঁদের পুজো করলেন। তারা সকলে সুখে উপবেশন করলেন। মহারাজ আবার তাদের প্রণাম করলেন।

তার এই কাজ শাস্ত্র সম্মত কিনা তা জিজ্ঞাসা করলেন, সন্ন্যাসীবৃন্দ তার কাজ অনুমোদন করলেন। রাজা বললেন, আমি রাজদের মধ্যে অতি ধন্য, যেহেতু আমার কাজ মহাপুরুষদের অনুমোদন যোগ্য হয়েছে। আপনারা মহত্তম, তাই আমাকে অনুগ্রহ করেছেন। আমি পাপ করেছি। ব্রাহ্মণগণ, আপনারা আমাকে শরণাগত বলে জানবেন। দেবতারূপ গঙ্গাদেবী আমাকে তার শরণাগত বলে জানুক। আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আমার চিত্ত স্থাপন করলাম।

ব্রাহ্মণদের প্রেরিত কুহক বা তক্ষক আমাকে দংশন করুক। আপনারা বিষ্ণুর কথা কীর্তন করুন। আমি যে জন্মই লাভ করি, সে জন্মই যেন ভগবান হরিতে আমার মতি অক্ষুণ্ণ থাকে। আমি ব্রাহ্মণদের প্রণাম করছি।

রাজা পরীক্ষিত সপুত্র জন্মেজয়ের ওপর রাজ্যের ভার অর্পণ করলেন। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে উত্তর মুখ হয়ে কুশাসনে উপবেশন করলেন।

মহারাজ পরীক্ষিত এই ধরনের অনশন করলে স্বর্গের দেবতারা প্রশংসা করতে থাকলেন। পৃথিবীতে পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকল। দুন্দুভি গুলি বারবার বাজতে লাগল। লোকের অনুগ্রহ করা যাদের স্বভাব সেই জাতীয় শক্তিশালী সমাগত মহর্ষিরা রাজাকে সাধুবাদ দিলেন, শ্রীকৃষ্ণের গুমের কথা বলতে লাগলেন। তারা বললেন– হে রাজ্যশ্রী শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণের অনুগত আপনার পথে এই প্রায়োবেশন আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ যুধিষ্ঠির রাজ মুকুট যুক্ত গৌরবান্বিত সিংহাসন পরিত্যাগ করেছিলেন। আমরা গঙ্গাতীরে অপেক্ষা করব। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার দেহ লীন না হবে। ততক্ষণ আমরা এখানে থাকব। এখানে রজঃগুণ নেই এবং কোনো শোক নেই।

মহারাজ পরীক্ষিত বললেন– সত্যলোকে মূর্তিধারী দেবগণের মতো আপনারা নানা স্থান থেকে এখানে এসেছেন। পরের প্রতি অনুগ্রহ করাই আপনাদের স্বভাব। এছাড়া লোকে বা পরলোকে, আপনাদের কোনো প্রয়োজন নেই। হে ব্রাহ্মণগণ, আমি আমার দ্রষ্টব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করছি– মরণোন্মুখ ব্যক্তির কী বিশুদ্ধ কর্তব্য কর্ম করণীয় আপনারা তা বিচার করে বলুন।

ব্যাসপুত্র শুকদেব পৃথিবী পর্যটন করতে সেখানে এলেন। কোনো আশ্রমের চিহ্ন সেখানে দেখা যায়নি। তিনি আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। বালকরা চারদিক থেকে তাকে অবজ্ঞা সূচক বাক্য বলছিল। তার বেশ ছিল অবধূতের মতো। বয়স ষোলো বছর। হাত, পা উরু, বাহু, স্কন্ধ, কপোল এবং গাত্র মনোরম। চোখ দুটি সুন্দর এবং বিস্তৃত। নাসিকা, গুচ্ছ এবং কর্ণদ্বয় সমান। মুখমণ্ডল সুন্দর কণ্ঠে শঙ্খের মতো তিনটি রেখা, স্কন্ধলগ্ন অস্থিস্থল বিস্তীর্ণ ও উন্নতি নাভি। জলের ঘূর্ণির মতো গভীর তিনটি রেখার দ্বারা মনোরম উদর। তাঁর দিগম্বর কুঞ্চিত কেশগুলি মাথায় বিক্ষিপ্ত, অজানুলম্বিত বাহু। শ্যাম বর্ণ তার দেহখানি। নবযৌবনবশত দেহের শোভা ঠিকরে চিত্ত আকর্ষণ করছে। তার তেজ গুপ্ত কিন্তু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। মুনিরা তাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেবকে পূজা করলেন। যে সমস্ত স্ত্রী এবং অবোধ বালকরা তাঁকে ঘিরে এসেছিল, তারা নিবৃত্ত হয়ে চলে গেল। শুকদেব মহাসনে উপবেশন করলেন। শুকদেব সেই সভায় ব্রহ্মর্ষি এবং দেবর্ষিদের দ্বারা পরিবৃত হয়েছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিত শান্ত চিত্ত এবং সর্বজ্ঞ মুনি শুকদেবের কাছে এলেন। পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করলেন –হে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ধর্ম আমি আজ মহর্ষি হবার অধিকারী হলাম, আমার কী সৌভাগ্য আপনি কৃপা করে অতিথি হিসেবে আমাকে পবিত্র করলেন।

দ্বিতীয় স্কন্দ

প্রথম অধ্যায়

শুকদেবের উত্তর দান এবং ভগবানের বিরাট রূপ বর্ণনা

শুকদেব বললেন–মানুষের পক্ষে যাঁদের শ্রবণ এবং কীর্তনাদি করা উচিত, তাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তার সম্পর্কে তুমি জানতে চেয়েছ। এ অতি উত্তম প্রশ্ন। কারণ এর দ্বারা লোকের কল্যাণ হবে, হে মহারাজ যারা আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ নিজের স্বরূপ জানে না এবং স্ত্রী পুত্রাদিতে অনুরক্ত গৃহমোদী হয়, তাদের মঙ্গলের জন্য হাজার হাজার শুনবার মতো বিষয় আছে। তাদের রাত কাটে স্ত্রী সম্ভোগে, দিন কাটে অর্থ উপার্জনে এবং কুটুম্বের ভরণ পোষণে, নিজের সৈন্যের মতো দেহ স্ত্রী পুত্রাদি চিরস্থায়ী হয়

জেনেও তাতে আসক্ত থাকে তারা। তারা অবশম্ভাবী মৃত্যুকে অবলোকন করে না। হে পরীক্ষিত, সেজন্য পথে সকলের আত্মা ঈশ্বর এবং হরিকে সর্বদা শ্রবণ কীর্তণ স্মরণ করা উচিত। আত্মজ্ঞান, অষ্টাঙ্গ যোগ, নিজ বর্ণ ও আশ্রবিহিত ধর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারাই মনুষ্য জন্মের লাভের ফল পাওয়া যায়। মরণ সময়ে নারায়ণের শরণ হল শ্রেষ্ঠ ফল।

এই ভাগবত পুরাণ সকল বেদের সমকক্ষ। দ্বাপরের শেষ ভাগে পিতা বেদব্যাসের কাছে আমি তা অধ্যয়ন করেছি, হে রাজর্ষি, আমি নির্গুণ ব্রহ্মে পরিণিষ্ঠিত লীলা মৃতে আকৃষ্ঠ হয়ে ভাগবত প্রয়াণ অধ্যয়ন করি। তুমি পুরুষোত্তম বিষ্ণুর কৃপা লাভ করেছ। আমি তোমাকে ভাগবত পুরাণ বলব।

মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে মানুষ ভয় শূন্য হয়ে অনাসক্তির পুর শাস্ত্রের দ্বারা নিজের দেহ এবং দেহ সম্বন্ধীয় আশা ছিন্ন করবে। ধীর ব্রহ্মচর্যাদির দ্বারা সংযত পুরুষ গৃহ থেকে বহির্গত হবে। পবিত্র নির্জন স্থানে যথাবিধি কুশ ও মৃগচর্ম অর্থাৎ বস্ত্রা নির্মিত আসনে উপবিষ্ট হবে। অ-কার, উ-কার, এবং ম-কার, এই তিনটি অক্ষরে কথিত ব্রহ্মত্তর মন্ত্র মনে মনে অভ্যাস করবে। একে প্রণবমন্ত্র বলে। প্রণবমন্ত্র জপ করতে করতে প্রাণায়মের দ্বারা জিত শ্বাস হয়ে মনকে স্থির করবে। বুদ্ধিরূপ সারথির সাহায্যে মনের দ্বারা রূপাদি বিষয় থেকে চোখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করবে। কর্মের দ্বারা বিক্ষিপ্ত মনকে নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধির দ্বারা পরম মঙ্গলের কারণে ভগবানের রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন না করে ভগবানের চরণাদি এক-একটি অঙ্গের ধ্যান করবে।

মনকে বিষয় চিন্তা থেকে মুক্ত করবে। আত্মাকে সমাধিস্থ করবে। মন স্থির হলে আর কিছু চিন্তা থাকবে না। ধীরযোগী রজঃ এবং তম গুণের দ্বারা শান্ত এবং বিমূঢ় মনকে সংযত করবে।

রাজা বললেন–হে ব্রাহ্মণ, কী প্রকারে ধারণা করতে হয় এবং যাতে ধারণা করা সম্ভব তা আমাদের বুঝিয়ে বলুন।

শুকদেব বললেন–স্বস্তিকা দেব আসন এবং প্রাণায়ামের দ্বারা নিঃশ্বাস জয় করবে। আসক্তি রহিত এবং জিতেন্দ্রিয় হবে। ভগবান হরি স্থূল রূপে বুদ্ধির দ্বারা মনকে যুক্ত করবে। ভগবানের এই অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কার্য মাত্র বিশ্ব প্রকাশ পাচ্ছে। সপ্ত আরোহণ যুক্ত ব্রহ্মাণ্ডে জীবের অন্তর্যামী যে ভগবান রয়েছেন তিনি ধারণার বিষয়। এই বিরাট পুরুষের পাদের অধোভাগ রসাতল। মহাতল এই সৃষ্টি কর্তার পদের গুমখাদেশ এবং তলাতল তার দুটি জঙ্ঘা।

বিশ্বমূর্তি ভগবানের জ্ঞান দুটি শীতল এবং বিতাল ও অতল তার রূদ্বয়। পৃথিবী তার জঙ্ঘা বা কটিদেশ, নাভি আকাশ, তাঁর বক্ষস্থল জ্যোতিসমূহ, মর্ত্যলোক গ্রীবা, জনলোক তার বদন। তপলোকে আদিপুরুষ, হিরণ্যগর্ভে ললাট এবং সত্যলোক সহস্র শীর্ষা সেই ভগবানের মস্তক।

ইন্দ্রাদি দেবগণ তার বাহু, দশদিক তাঁর বাহু, দশদিক তাঁর কর্ণর, শব্দ তার চক্ষুর ইন্দ্রিয়, রাত্রি এবং দিন তার নেত্রলোম সত্যলোক অর্থাৎ ব্রহ্মপদ তার ভ্রূকুটি, জল দেবতা করুণ এই আদিপুরুষের তালু এবং রস তার জিহ্বা। বেদসমূহ তার ব্রহ্মরন্ধ্র, যম শ্রেষ্ঠ দন্ত, পুত্রাদির স্নেহলেশ তার দন্ত পংক্তি। জনগণের উন্মাদকারী মায়া তার হাসি, অপার সংসার তার কটাক্ষপাদ। লজ্জা, তার উর্দ্ধত্তষ্ঠ লোভ তার অধোরষ্ঠ ধর্ম তাঁর স্নেহ এবং অধর্মের পথ তার পৃষ্ঠ দেশ। প্রজাপতি তার লিঙ্গ বরুণ তার দুটি অন্তকোষ, সমুদ্র তার উদার এবং পর্বত সমূহ তার অস্থিপুঞ্জ।

নেনুপেন্দ্র, নদী তার নাড়ি, ব্রহ্ম তার লোম, অসীম শক্তিশালী বায়ু তার নিশ্বাস, কাল তার গতি এবং সংসার প্রবাহ তার ক্রীড়া। হে কুরশ্রেষ্ঠ অধিপতি মেঘগুলি ঈশ্বরের কেশরাশি, সন্ধ্যা সে ধূমাপুরুষে বদ্ধ, প্রকৃতি তার হৃদয় এবং চন্দ্র তার বিকারের আশ্রয়ভূত মন। মহৎ তত্ত্ব সেই সর্বাত্মার বিজ্ঞান শক্তি ক্ষুদ্র তাঁর অহংকাল। অশ্ব, অশ্বতর উষ্ট্র, এবং হাতী, তাঁর নখ। মৃগ এবং পশুগণ তার কটি দেশ।

মানুষ তার আশ্রয়স্থল, মন তার বুদ্ধি, পক্ষীগণ তাঁর শিল্পনৈপুণ্য, গন্ধর্ব বিদ্যাধর চারণ এবং অঙ্গরা তার স্বর ও স্মৃতি, অসুরসৈন্য তার বল। ব্রাহ্মণ, তাঁর মুখ ক্ষত্রিয় তাঁর বাহু বৈশ্য তার

উরু, শুদ্র তার চরণ তিনি বিভিন্ন নামধারী বসু এবং রুদ্র প্রভৃতি দেবগণে পরিবৃত। যজ্ঞ তার কাজ। হে মহারাজ ঈশ্বর শরীরের এই অবয়ব সংস্থানের কথা আমি তোমাকে বললাম। যোগীগণ তার নাম গান করে থাকে। জীব যেমন স্বপ্নে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনেক দেহকে প্রত্যক্ষ করে, তেমনই সকলের অন্তরাত্মা ঈশ্বর একাকী অনুভব করে থাকেন। ঈশ্বর ভিন্ন অন্যত্র মন আসক্ত হলে নিজের অধঃপতন হবে।

.

দ্বিতীয় অধ্যায়

যোগীদের উক্রমণ প্রকার বর্ণন এবং সদ্য মুক্তি ও অমুক্তি নিরূপণ

শুকদেব বললেন– প্রলয় অবসানে আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মা এই ধারণার দ্বারা ভগবান হরিকে তুষ্ট করেছিলেন। তিনি পূর্ব কল্পে সৃষ্টি স্থিতি লাভ করেছিলেন। প্রলয়ের আগে এই জগৎ যেমন ছিল আবার তেমনই সৃষ্টি করলেন। বেদ বিহিত কর্মমার্গ সুখমাত্র প্রদর্শন করিয়ে থাকে মানুষের বুদ্ধি সেই ব্যর্থ শর্তাদি সুখের কামনা করে বাসনার সাথে শয়ন করলে মিথ্যা স্বপ্নমাত্র দৃষ্টি হয়। মায়াময় সৃষ্টি হয় মায়াময় সংসারে পরিক্রমণ করে। সেই লোভ ও সুখ প্রাপ্ত হলেও মানুষ প্রকৃত সুখ না করতে পারে না। শরীর ধারণের জন্য যতটুকু দ্রব্যের প্রয়োজন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্রব্যের সেইটুকু অংশই গ্রহণ করেন। এতে যথার্থ সুখ নেই জেনে অনাসক্ত হবার চেষ্টা করবেন।

শরীর ধারণের উপযোগী দ্রব্যসকল বিনা চেষ্টাতেও লাভ করতে পারা যায়, তুমি যে সব জায়গাতে আছো। তাতে সুখে নিদ্রা হলে শয়নের জন্য কোমল শয্যার কী প্রয়োজন? স্বয়ংসিদ্ধ দুটি বাহু থাকতে মস্তক স্থাপনের জন্য বালিশের প্রয়োজন আছে কি? অঞ্জলিতে খাদ্যবস্তু রেখে আহার করতে পারা যায়, তবে বিবিধ অনুপাত্রের প্রয়োজন কী? যদি দিগম্বর হয়ে বা বল্কল পরিধান করে দেহ লজ্জা নিবারণ করা যায়, এর জন্যে পট্ট বস্ত্রের কী প্রয়োজন? পথে পথে কি বস্ত্রখণ্ড পড়ে থাকে না? বৃক্ষগুলি কি ফল আর ছায়া দান করে না? নদীসকল কি শুকিয়ে গেছে? পর্বত গুহাগুলির দুয়ার কি বন্ধ হয়েছে? শ্রীকৃষ্ণ তার শরণাগতকে সদা সর্বদা রক্ষা করেন।

কী জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্ধ জনগণের সেবা করবে? অতএব চিত্তের স্বত্ত্ব সিদ্ধ আত্মা প্রিয় সত্য ও অনন্ত রূপে যে ভগবান বিরাজমান, তারই সেবা করা কর্তব্য। বৈরাগ্যে নিশ্চল হয়ে পরম নিবৃত্তি লাভ করে ভগবানের ভজনে রত হলে সংসার হেতু অবিদ্যার বিনাশ হয়।

অতি বিরল কেউ কেউ নিজের দেহ মধ্যে হৃদয়ের যে আকাশ রয়েছে সেখানে অবস্থিত পদ্মচক্র শঙ্খ গদাধারী চতুর্ভুজ পুরুষের ধারণা স্মরণ করে থাকেন। ওই পুরুষের বদন প্রসন্ন। তার নয়নপদ্মের মতো সুবিস্তৃত। কটি দেশে কদম্ব পুষ্পের কেশরের মতো পীত বর্ণের বস্ত্রের আচ্ছাদন। তার চারটি বাহু মহারত্ন খচিত স্বর্ণ নির্মিত অলংকারের দ্বারা শোভিত। মস্তকে উজ্জ্বল রত্ন খচিত কিরীট স্থাপিত। দুটি কানে কুন্তল বিরাজিত। মহাযোগী বিকশিত হৃদপদ্ম মধ্যে পাদপল্লব স্থাপিত। বক্ষ স্থলের বাম দিকে লক্ষ্মী রেখা যুক্ত। গলদেশে কৌস্তুভ রত্নের হার। কটি দেশে মহামূল্য চন্দ্রহার। তার আঙুলে অঙ্গুরীয়চরণে নূপুর এবং মণিবন্ধে কঙ্কন। তার বদন ঈষৎ কুঞ্চিত, নির্মল নীলবর্ণ কুন্তলের অতিশয় শোভমান। তার মুখে হাসি অতি উত্তম আনন্দ পূর্ণ হাসি যুক্ত দৃষ্টিতে উল্লাসিত ভুরু ভঙ্গিতে ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল থেকে বদন পর্যন্ত এক একটি অঙ্গের ধ্যান মনে মনে করবে। যে সমস্ত অঙ্গের ধ্যান করা সহজে হয়ে যাবে, সেই অঙ্গের ধ্যান পরিত্যাগ করে অন্য অঙ্গের ধ্যান করবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যতদিন পর্যন্ত প্রেমভক্তির জন্ম না হবে ততদিন নিত্য নৈমিত্তিক কাজের শেষে যত্ন সহকারে বিরাট পুরুষের ধ্যান করা কর্তব্য। হে মহারাজ, সাধক যখন দেহত্যাগ করতে ইচ্ছে করবেন, তখন দেশ এবং কালের অপেক্ষা করবেন না। তিনি শক্তি প্রভৃতি সুখকর আসনে উপবেশন করবেন। প্রাণায়াম করে ইন্দ্রিয়গুলিকে মনের দ্বারা সংযত করবেন। নির্মল বুদ্ধির দ্বারা মনকে সংযত করবেন। বুদ্ধিকে জীবাত্মাতে সংলগ্ন করবেন। শুদ্ধ জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সংলগ্ন করে পরম শান্তি লাভ করবেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি যোগের কাছ থেকে নিবৃত্ত হবেন। এই জাতীয় পরমাত্মাতে সমাধিযুক্ত যোগীর প্রতি দেবতাগণের নিয়ামক কালও প্রভুত্ব করতে পারবে না, জগতের ওপর যারা প্রভুত্ব করেন সেই দেবতাদের কথা আর কী বলব?

এই যোগীর ওপর সত্ত্ব, রজ ও তম, গুণ এবং অহংকার, প্রভৃতি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু আত্মা ভিন্ন সমস্ত বস্তুকে উপেক্ষা করে আমিই ব্রহ্ম, এরূপ ধৃষ্টতা পরিহার করে, পরম পূজ্য শ্রী ভগবানের চরণ কমল আলিঙ্গন করে পরম আনন্দে তিনি মগ্ন থাকেন। দেহ অথবা

অন্য কোনো বস্তুর প্রতি তার আসক্তি থাকে না। এটাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আচার্যরা মনে করে থাকেন।

দেহ ত্যাগের প্রকার সম্পর্কে বলা হয়েছে –প্রথমে পাদমূলের দ্বারা মূলাধার নিযুক্ত করতে হবে। অক্লান্তভাবে প্রাণবায়ুকে উর্বদিকে নাভি প্রভৃতি ছয়টি স্থানে উত্তোলিত করতে হবে। নাভিতে মণিপুরচক্রে আনীত প্রাণবায়ুকে হৃদয়ে অনাহুত চক্রে আনতে হবে। উদানবায়ুর সাহায্যে কণ্ঠদেশের নীচে বিশুদ্ধ চক্রে তাকে নিয়ে যেতে হবে। এবার জিত চিত্ত মুনি বুদ্ধির দ্বারা বিকাশ করে সেই বায়ুকে তালু মূলে অর্থাৎ বিশুদ্ধ চক্রের অগ্রভাগে নিয়ে যাবেন। কান চোখ, নাসিকাদ্বয় এবং মুখ, এই সাতটি প্রাণ বায়ুর পথকে নিমুক্ত করবেন। অর্থাৎ অন্য কোনো লোকে যাবার ইচ্ছে না থাকলে প্রাণ মূল থেকে প্রাণবায়ুকে ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞা চক্রে নিয়ে যাবেন। কিছুক্ষণ থেকে অকুণ্ঠ দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে লাভ করবেন। ব্রহ্মার ভেদ করে দেহ এবং ইন্দ্রিয় ত্যাগ করবেন।

সদ্য মুক্তির কথা এইভাবে বলা হল। এবার ক্রম মুক্তির কথা এইভাবে বলা হয়েছে। হে রাজন, যদি কোনো যোগী ব্রহ্মপদ অথবা অণিমাদি আটটি ঐশ্বর্য যুক্ত সিদ্ধগণের বিহারভূমি কিংবা ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন, তা হলে মন এবং ইন্দ্রিয়গণের সাথেই ভ্রমণ করবেন। বায়ুর মধ্যে সূক্ষ্ম শরীর রেখে মহাযোগীরা ত্রিভুবনের বাইরে এবং ভেতরে ভ্রমণ করতে পারেন। যে সমস্ত যোগীরা উপাসনা, তপস্যা, যোগ এবং জ্ঞান সাধন করে থাকেন তারা এই গতি প্রাপ্ত হন। কর্মের দ্বারা এই গতি হয় না। যোগী ব্রহ্মালোকের পথে জ্যোতির্ময় সুষম্না নাড়ির দ্বারা আকাশ মার্গ দিয়ে অগ্নিলোকে প্রবেশ করবেন। নির্মল দেহ উদ্ধাস্থিত উঠে নারায়ণের অধিষ্ঠিত শিশুমায়ের মতো জ্যোতিষ চক্রে যাবেন, পরবর্তী পর্যায়ে যোগী বিশ্বের নাভিস্বরূপ বিষ্ণুর সম্বন্ধি শিশুমার চক্র নির্মল লিঙ্গ শরীর দ্বারা অতিক্রম করবেন। অন্যের নমস্কৃত এবং ব্রহ্মবিদ ঋষিগণের বাসস্থান মহললোকে গমন করবেন। সেখানে কল্পকালজীবি ভৃগুমহা আনন্দে অবস্থান করছেন। কল্পান্তে যোগী অনন্তদেবের মুখাগ্নিতে সমস্ত জগৎ দগ্ধ হতে দেখবেন। দ্বিপরাধব্যাপী স্থিত, সিদ্ধেশ্বরগণের মত্যলোকে গমন করবেন। যারা ভগবানের ধ্যানরূপ করতে পারেন না। তাঁদের বার বার মনুষ্য জন্মের কষ্ট স্বীকার করতে হয়। তাদের এই দুর্গতি দেখে ব্রহ্মলোক বাসী মহাপুরুষরা তাদের প্রতি শোক প্রকাশ করে থাকেন। এছাড়া সেখানে কোনো কারণেই শোক জরা মৃত্যু দুঃখ বা ভয় নেই।

এবার যোগী সূক্ষ্ম শরীর লাভ করেন। নির্ভয়ে পৃথিবীর জল এবং অগ্নিমূর্তি হয়ে বায়ুমূর্তি হন। তারপর আকাশ মূর্তি হন। ভোগ শেষ হলে পরমাত্মা মূর্তি হন। পরে যোগী ঘ্রাণেন্দ্রিয় অবলম্বন করে। গন্ধ, তন্মাত্র রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা ত্বগিন্দ্রেয়ের রস সৃষ্টির দ্বারা রূপ, ত্বগিন্দ্রেয়ের দ্বার বায়ু শ্রোত্রের দ্বারা শব্দ তন্মাত্র এবং প্রাণকে অবলম্বন করে সমস্ত কর্মকে পেয়ে থাকেন। যোগীর সূক্ষ্ম ভূত এবং ইন্দ্রিয় গণের লয়ের স্থান মনোময় ও দেবময় অহঙ্কারকে পেয়ে থাকেন। তাই তিনি অহংঙ্কারের সাথে মহৎ তত্ত্ব লাভ করেন। এখানে গুণ সকলের হয়। তিনি প্রকৃতি তত্ত্ব প্রাপ্ত হন। প্রকৃতি হয়ে হন আনন্দময়, উপাধি গুলি শেষ হলে নির্বিকার আনন্দরূপ পরমাত্মাকে লাভ করেন। হে মহারাজ, ওই যোগী আর কখনও জগতে ফিরে আসেন না। তিনি ভগবত গতি প্রাপ্ত হন।

হে মহারাজ সৃষ্টির প্রথম ব্রহ্মার আরাধনায় তুষ্ট হয়ে ভগবান নারায়ণ তাকে দুটি পথের কথা বলেছিলেন। এই দুটি পথ অর্থাৎ উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ণের কথা বেদে বলা হয়েছে। তুমি এ দুটি পথের কথা প্রশ্ন করেছিলে, দুটি পথ সনাতন অর্থাৎ নিত্য এ সংসারে ভ্রমণকারী জীবের এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। যার দ্বারা ভগবান বাসুদেবের প্রতি পরাশক্তি লাভ হয়ে থাকে।

ভগবান ব্রহ্মা একাগ্রে চিত্তে তিনবার বেদ পর্যালোচনা করে ভক্তিযোগের কথা বলেছেন। ভক্তিযোগের দ্বারা হরির প্রতি ভালোবাসা জন্মায়।

যদি বল অনুভূত পদার্থে রতি হয়, তাহলে অ-অনুভূত ভগবানে কী ধরনের আসক্তি জন্মাবে?

এর উত্তরে বলা হয়েছে –ক্ষেত্রজ্ঞ এবং অন্তর্যামী হিসেবে ভগবান হরি সমস্ত প্রাণীতে দৃষ্ট হতে পারেন। ব্রহ্মাদি দর্শন স্রষ্টা ব্যাতিরেকে হতে পারে না। বুদ্ধাদি করণ হেতু কর্তার অধীন। এই অনুপপত্রী এবং অনুমাপক বিবিধ লক্ষণ দ্বারা ঈশ্বর স্বতন্ত্র কর্তা। হে মহারাজ, সমস্ত লোকে সব জায়গায় সব সময় এবং সকল প্রকারে ভগবান হরিকে স্মরণ করা উচিত। হরির কথা শ্রবণ, কীর্তন ও আলোচনা করা উচিত। হে সকল সৌভাগ্যশালী জন সাধুগণের আত্মার মতো প্রিয় ভগবান হরির কথারূপ অমৃতপান করেন, তারা ভগবানের চরণ কমলের কাছে গিয়ে উপনীত হতে পারেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন কামনা পূর্তির জন্য নানা দেবতার উপাসনা বর্ণন

শ্রী শুকদেব বললেন–হে মহারাজ, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে যে, বিবেকী মানুষদের করণীয় কী? তার উত্তর দেওয়া দিচ্ছি গো। যিনি ব্রহ্মতেজ কামনা করেন, যিনি দেহের প্রচারক ব্রহ্মার উপাসনা করবেন। ইন্দ্রিয়ের শক্তি কামনাকারী ইন্দ্রের এবং পুত্রকামনাকারী প্রজাপতি দক্ষাদির উপাসনা করবেন। যিনি শরীরের সৌন্দর্য কামনা করবেন যিনি দেবী দুর্গার উপাসনা করবেন। তেজস্বী হবার কামনা থাকলে অগ্নির উপাসনা করতে হবে। ধনর্ষি হলে অষ্টবসুদের প্রার্থনা করতে হবে এবং প্রভুত্ব কামনায় রুদ্রদের উপাসনা করতে হবে। ভষ্য ও ভোজ্য কামনায় অদিতিকে, স্বর্গ কামনায় আদিত্যদের, রাজ্য কামনায় বিশ্বদেবগণের এবং প্রজাদের মঙ্গল কামনায় জনস্বার্থ গণের অর্চনা করবেন। যিনি আরোগ্য কামনা করেন, তাকে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের পূজা করতে হবে। পুষ্টিকাম ব্যক্তি ইলা, এবং পৃথিবী দেবীকে ও প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি লোকমাতা স্বর্গ ও পৃথিবীর ভজনা করবেন। সৌন্দর্যের প্রার্থী হলে গান্ধবদের পূজা করতে হবে। যজ্ঞপতি বিষ্ণু যশের কামনা পূরণ করেন। বরুণ অর্থের কামনা পূরণ করেন। বিদ্যার কামনা হলে শিবকে তুষ্টি করতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর সুখের কামনায় ভগবতী দেবীর উপাসনা করা উচিত। ধর্মর্ষিরা বিষ্ণুর, পুত্রকামী পিতৃ-পুরুষদের, রক্ষকামনায় যজ্ঞ এবং বলোভের কামনা থাকলে মরুগণের উপাসনা করা উচিত। রাজ্য কামীরা মনুকে প্রার্থনা করবেন, শত্রুবধ 'কামনায় রাক্ষসদের, বিষয় কামনায় চন্দ্রের এবং বৈরাগ্য কামনায় ভগবানের উপাসনা করবেন।

মহারাজ, যিনি উদার বুদ্ধি এবং ভগবানের একান্ত ভক্ত, তার কামনা থাকুক অথবা না থাকুক তিনি একাগ্রচিত্তে নারায়ণের ধ্যান করবেন। তিনি যে দেবতারই উপাসনা করুন না, যদি ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মায়, তবে তা হবে পরম পুরুষার্থ লাভ। হরিকথা শুনলে ভগবত তত্ত্বের জ্ঞান হয়। মন প্রসন্ন হয়। হরি কথা শুনলে বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মায়। এই বৈরাগ্য মোক্ষলাভের নিশ্চিত পথ। তারপর ভগবানের প্রতি গভীর ভক্তি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়।

শৌণক বললেন, মহারাজ পরীক্ষিত একথা শুনে ব্যাসপুত্র শুকদেবকে আর কী জিজ্ঞাসা করে ছিলেন। আমরা হরিকথা শুনতে ইচ্ছুক। ভাগবতগণের সভাতে যে কথাই হোক, তার ফল হরি কথাই হবে। পাণ্ডুবংশধর ভগবত ভক্তরাজা পরীক্ষিত ছোটো বেলায় খেলার সময় কৃষ্ণবিষয়ক খেলা খেলতেন। ভগবান ব্যাস দেবপুত্র শুকদেবও বাসুদেব পরায়ণ, তাদের

মিলনে শ্রী কৃষ্ণের গুণ কীর্তনই হবে। ভগবত কথায় যে সময় অতিবাহিত হয় তাই সার্থক। প্রতিদিন সূর্যোদয় এবং অস্ত, গমনের দ্বারা জীবের আয়ুরথ হরণ করে। বৃক্ষগুলি কি জীবিত থাকে না? কর্মকারের অগ্নি বায়ু সঞ্চারের যন্ত্র কি নিশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ করে না? গ্রাম্য পশু কুকুর বিড়াল তাহার ও স্ত্রীর সঙ্গ করে না? এই কাজগুলি করলে জীবন সার্থক হয় না।

শ্রী কৃষ্ণ নাম যার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করেনি, কুকুর, বিষ্ঠাভোজী –শুকর কন্টক ভোজী উট এবং ভারবাহী গর্দভের মতো। যে কান ভগবানের কথা শ্রবণ করে না, সে দুটি গর্ত মাত্র। হে সূত, যে জিভ ভগবানের নাম উচ্চারণ করেনা, তা ভেকের তুল্য, যে মাতা মুকুন্দের চরণ কমলে প্রণাম করে না, তা উষ্ণীষ ও মুকুটে শোভিত হলেও কেবল ভারমাত্র। যে দুটি হাত হরির পূজা করেনা, তা উজ্জল সূবর্ণ কঙ্কনে ভূষিত হলেও মৃত ব্যক্তির হাতের মতো। মানুষের দুটি চোখ যদি বিষ্ণুর মূর্তি দর্শন না করে তাহলে তা ময়ূর পুচ্ছের চোখের মতো। যে দুটি পা শ্রীহরির পূণ্য ক্ষেত্রে গমন করেনা, তা গাছের গুঁড়ির মতো ব্যর্থ।

যে মরণশীল মানুষ ভক্তের চরণধূলি কখনও নিজ অঙ্গে ধারণ করে না, সে বেঁচে থাকলেও শবতুল্য, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির মতো। যে হৃদয় পাষাণের মতো কঠিন, হরিনাম শ্রবণ কীর্তনেও সে হৃদয়ে বিকার হয় না। যদি বিকার হয়, তাহলে নয়নে অশ্রু এবং গায়ে শিহরণ দেখা দেবে। হে প্রিয়, তুমি আমাদের অনুকূল মনোরম কথা বলেই এখন বলল, আত্মবিদ্যা বিশারদ ব্যাস নন্দন কী বলেছিলেন।

.

চতুর্থ অধ্যায়

রাজার সৃষ্টি বিষয়ক প্রশ্নও শুকদেবের মঙ্গলাচরণ পূর্বক শ্রীমদ ভাগবত কথা শুরু করলেন। সূত বললেন– পরীক্ষিত, শুকদেবের আত্মতত্ত্ব নিয়ামক বাক্য শ্রবণ করলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অর্পণ করলেন। তিনি স্ত্রী-পুত্র গৃহ, গৃহ হস্তি, অশ্ব, ধন রত্ন বন্ধুবর্গ এবং রাজ্যের আসক্তি ত্যাগ করেছিলেন। হে মহাত্মাগণ, আপনারা আমাকে যা জিজ্ঞাসা করছেন, মহাত্মা পরীক্ষিতও সেই প্রশ্ন করেছিলেন। নিজের আসন্ন মৃত্যু জেনেও তিনি ভগবান বাসুদেবের প্রতি আসক্তি যুক্ত হয়েছিলেন।

পরীক্ষিত বললেন–হে নিষ্পাপ ব্রহ্মণ! অদ্ভুতকর্মা ভগবান হরির কাজ পণ্ডিতদেরও দুজ্ঞেয় বলে মনে হয়। এক ভগবান পুরুষ রূপে থেকেই একসঙ্গে ব্রহ্মাদি দেবতাদের জন্মগ্রহণ পূর্বক

বহুকর্ম করেছেন। ভগবানের সৃষ্টি লীলা সবিস্তারে বর্ণনা করে আমার সন্দেহ দূর করুন। আমি জানি, আপনি যেমন বেদাদি শাস্ত্রে কুশল তেমন ভাবেই পরব্রহ্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ।

সূত বললেন, মহারাজ পরীক্ষিত বিশেষ ভাবে অনুরোধ করায় শুকদেব ভগবানকে স্মরণ করে বলতে শুরু করলেন,

শ্রী শুকদেব বললেন–প্রপঞ্চ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় রূপ লীলা করার জন্য যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মূর্তি ধারণ করে রজঃ স্বত্ব ও তম গুণ সম্পন্ন হন, সেই ভগবানকে প্রণাম করি। তিনি সাধুদের পালক, কুযযাগীদের দুজ্ঞেয় অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করেন, যিনি অসাম্য এবং নিরতিশয় ঐশ্বর্যের দ্বারা আনন্দময় স্বরূপে বিহার করেন, তাঁকে প্রণাম। যাঁর নাম, রূপ, গুণ এবং লীলাবলীর কীর্তন শ্রবণ স্মরণে সকল জীবের পাপ সমূহ বিনষ্ট হয়, সেই সুমঙ্গল কীর্তি ভগবানকে নমস্কার, বিবেকী জনগণ যার চরণে সেবার দ্বারা ইহলোক ও পরলোকের মনে আসক্তি পরিত্যাগ করে তাকে প্রণাম। তপস্বী, জ্ঞানী, কখী দহনশীল, যশস্বী, মনস্বী যোগী মন্ত্রবিদগণ তাদের নিজ নিজ কর্ম যাকে সম্পূর্ণ না করে কোনো মঙ্গল লাভ করতে পারেন না, সেই সুমঙ্গল কীর্তির ভগবানকে নমস্কার।

কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুকস, আভীর, শুভ্র, যবন প্রভৃতি জন্মগত পাপী এবং অপর কর্ম বংশ পাপী যে ভগবানের চরণ আশ্রয় করে শুদ্ধ হয়েছেন, সেই ভগবানকে প্রণাম করছি। তিনি আত্মদর্শী, মহাপুরুষদের আত্মা, যিনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর তিনি বেদজ্ঞ কর্মকাণ্ড স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ধর্মকর্ম এবং উপাসনা কাণ্ডের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকেন। ব্রহ্মা, শঙ্কর প্রভৃতি দেবতাগণ যাঁর স্বরূপ নিশ্চিতরূপে নিরুপণ করতে পারেন না, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হোন। তিনি সর্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী মহালক্ষ্মী দেবীর পতি। তিনি যোগ্য পতি, অর্থাৎ সমস্ত সাধনের ফলদাতা। তিনি সকল লোকের প্রতি পালক তিনি অন্তর্যামী এবং ত্রিভুবনের পালক। তিনি পৃথিবীর পালক। অন্ধক, বিষ্ণুও সাত্ত্বিকদের পালক ও রক্ষক। ভক্তদের প্রতিপালক তার প্রতি আমার আস্থা অপরিসীম। মহাপুরুষরা যাঁর চরণে ধ্যানরূপ সমাধির দ্বারা পরিশীলিত বুদ্ধিতে আত্মতত্ত্ব দেখে থাকেন, সগুণ নিগুণ প্রকৃতির দ্বারা তাঁকে প্রকাশ করে থাকেন। উনি ভগবান মুকুন্দ অর্থাৎ মুক্তিদাতা। উনি যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হন। সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মার হৃদয়ে উনি সতীর স্মৃতি প্রকাশ করেছিলেন। ঐশ্বর্যপূর্ণা বেদরূপা সরস্বতী ব্রহ্মার বদন থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার দ্বারা ব্রহ্মার চতুর্মুখ থেকে বেদবাণী প্রকাশ পেয়েছিল। জ্ঞান প্রদাতা ঋষিদের আচার্য ভগবান আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

যে প্রভু আকাশ ইত্যাদি পঞ্চ মহাভূত দ্বারা প্রাণীদের শরীর সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে অন্তর্দেহী রূপে বাস করেন, তাকে প্রণাম। এই জন্য তাঁকে পুরুষ বলা হয়। তিনি একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চমহাবৃত স্বরূপ ষোড়শ কলার প্রকাশক হয়ে তাদের পালন করেন। সেই ভগবান আমার বাক্যকে অলঙ্কৃত করুন। ভক্তগণ যাঁর মুখপদ্মের জ্ঞানময় মধু পান করেছিলেন, সেই বেদব্যাসকে নমস্কার করছি। হে মহারাজ, দেবর্ষি নারদ, ব্রহ্মার কাছে প্রশ্ন করায়, তিনি এই কথাই নারদকে বলেছিলেন।

.

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রহ্মার সৃষ্টাদি বর্ণন ও হরিলীলা কীর্তন

ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণের কাহিনি শুনতে চাইলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বললেন–হে নারদ, যিনি সকলের স্রষ্টা, ঈশ্বর, নির্বিকার এবং অন্তর্যামী, যাঁর প্রকাশে চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, নক্ষত্র, গ্রহাদি জগৎ আলোকিত করে, সেই ভগবান নারায়ণ থেকে আমার সৃষ্টি। সেই পরমেশ্বরের কথাতেই প্রেরিত হয়ে তারই সৃষ্ট জগতের সৃষ্টি করে থাকি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণ তিনটির দ্বারা যার গতি নিরূপণ করা যায় না, সেই ভগবান হরি আমাদের সকলের প্রভু। মায়ার অধীশ্বর ভগবান মায়ার দ্বারা ইচ্ছা করে নিজেতে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত কালকে এবং জীবাত্মাতে সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত অদৃষ্ট ও স্বভাবকে স্বেচ্ছায় সৃষ্টির জন্য অঙ্গীকার করেছিলেন। সেই ভগবান কালে অধিষ্ঠিত হলেন কাল থেকে গুণ ক্ষোভ হয়। গুণের সাম্যভাব পরিত্যক্ত হলে সৃষ্টির জন্য উন্মুখতা জন্মায়। স্বভাবে অধিষ্ঠান করলে রূপান্তর এবং জীবের অদৃষ্টে অধিষ্ঠিত হলে মহতত্ত্বের উৎপত্তি হয়।

কাল ও স্বভাব দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হয়ে রজোগুণ ও সত্ত্বগুণে বর্ধিত হলে তা থেকে তমোগুণ লাভ হয়। তাকে বলে অহংকার তত্ত্ব, যা ভূত ইন্দ্রিয় ও দেবতা নামে চিহ্নিত। এই তত্ত্ব আবার রূপান্তরিত হয়ে বৈকারিক, তেজস ও তামসে পরিণত হয়েছে। পঞ্চভূতের তামস অহংকার বিকার প্রাপ্ত হয়ে আকাশের উৎপত্তি হয়েছে এবং এর ফলে সৃষ্টিকারী শব্দ আকাশের সূক্ষ্মরূপ গুণ; আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে প্রাণ, ওজঃ সহ এবং জল সৃষ্টি হয়েছে।

স্পর্শ ও শব্দ যুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়েছে অগ্নি। অগ্নি থেকে জলের সৃষ্টি এবং তা থেকে পৃথিবীর জন্ম।

সাত্ত্বিক অহংকার বিকার প্রাপ্ত হলে তা থেকে মন এবং বৈকারিক সাত্ত্বিক দশ ইন্দ্রিয়ের দশ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উৎপন্ন হয়েছে। ভগবানের শক্তি দ্বারা পঞ্চ মহাভূত ইন্দ্রিয় সকল মন ও গুণগুলি একত্রিত মিলিত হয়ে সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্বরূপ এই জগৎ সৃষ্টি হয়। বহু সহস্র বছর পরে কাল কর্ম ও স্বভাবে অধিষ্ঠিত হয়ে পরমেশ্বর অচেতন ব্রহ্মাণ্ডে চেতনা দান করেন।

সেই পরমেশ্বর অণ্ড থেকে বেরিয়ে হাজার মস্তক, হাজার বদন, হাজার চোখ, হাজার বাহু, হাজার উরু ও চরণ বিশিষ্ট হয়ে এই অণ্ড পৃথক করার অভিলাষ করেন। মনীষীগণ ধারণা করে থাকেন, তাঁর জঙঘা থেকে ঊধ্বাঙ্গ পর্যন্ত সাতটি উধ্বলোক এবং জঙঘা থেকে নিম্নাঙ্গ সাতটি অধোলোকের সৃষ্টি করেছে। পরমেশ্বরের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং চরণ থেকে শূদ্রের জন্ম।

পরমেশ্বরের চরণ থেকে কটি পর্যন্ত অবয়বে পাতাল থেকে ভূর্লোক পর্যন্ত সপ্তলোক নাভিতে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্গলোক, ব্রহ্মঃস্থলে মহলোক, গ্রীবাতে জনলোক, স্তনদ্বয়ে তোলোক, এবং মস্তক সকলে সত্যলোক –এইভাবে ত্রিলোকের কল্পনা করা হয়েছে।

.

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিরাট পুরুষের বিভূতির বর্ণন

সেই বিরাটরূপী ভগবানের মুখ থেকে তাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নির উৎপত্তি হল। তার ত্বক সাত ধাতু ও সাত ছন্দের সৃষ্টি করেছে। তার জিহ্বা থেকে তিন প্রকারের অন্ন, এবং তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণের উৎপত্তিস্থল। তার নাসিকাদ্বয় বায়ুর পরম আশ্রয়, যা সকল প্রাণীর প্রাণ। তার শরীর সমস্ত বস্তুর সারাংশ ও সৌভাগ্যের উৎপত্তি স্থান।

বিরাট পুরুষের রোমরাজি উদ্ভিদ জাতির আশ্রয়স্থল। তার চরণ শরণ ও সকল বরের আশ্রয় জল, শত্রু, বিশ্ব সৃষ্টি মেঘ ও প্রজাপতির উৎপত্তিস্থল লিঙ্গ। তার পৃষ্ঠদেশ পাপ ও অবিদ্যার জন্মস্থান।

তার হৃদয় সমস্ত প্রাণীর লিঙ্গদেহের আস্পদ।

বিরাট পুরুষের মন সকলের মনের জন্মদাতা। সেই পরম পুরুষ তার দেহ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ভেতর ও বাইরে সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করেছেন। তিনি অমৃত ও অভয়ের অধিশ্বর। তিনি নিজানন্দ অনুভব করে থাকেন, তাই তার মাহাত্ম অনুধাবন করা অত্যন্ত দুষ্কর। তিনি মহলোকের উপরিতল তিনলোকের মস্তক স্থানীয় জনলোকে অমৃত, তপোলোকে অভয় সুখ নিহিত রেখেছেন। প্রপঞ্চের বাইরে ভগবনের তিনটি পাদ অংশে নৈষ্ঠিক, ব্রহ্মচারী বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীদের বাসস্থান। আর ত্রিলোকের মধ্যে গৃহস্থদের বাস। কর্মের পথ দক্ষিণ এবং মোক্ষের পথ উত্তর– এই উভয় পথেই এই সর্বব্যাপী ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। বিচরণ করেন।

ভূত, ইন্দ্রিয় ও গুণাত্মক বিরাট দেহ থেকেই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, পরমেশ্বর নিজ ধামে থেকে জগতের ওপরে প্রভাব বিস্তার করেন।

ব্রহ্মা বললেন–শ্রীহরির নাভি কমল থেকে আমার উৎপত্তি। পরমেশ্বরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়া যজ্ঞের কোনো উপকরণ দেখতে পাইনি। তার দেহ থেকে যজ্ঞের উপকরণগুলি সংগ্রহ করে তাই দিয়েই ঐ যজ্ঞ পুরুষের উপাসনা করেছিলাম। তার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে আমি সৃষ্টি করি। তার বশীভূত হয়ে রুদ্র সংহার করেন এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়–এই তিনটির শক্তি যুক্ত পরমেশ্বরের বিষ্ণুরূপে পালন করেন।

কার্য ও কারণাত্মক যা কিছু সৃষ্টি করার আছে, তা ভগবান নারায়ণ থেকে পৃথক নয়।

আমি বেদময়, তপোময়, প্রজাপতিগণের অভিনন্দিত ও সমাহিত চিত্তে নিপুণ যোগের অনুষ্ঠান করেও আমার সৃষ্টি কর্তা ভগবান সেই পরম পুরুষকে জানতে পারিনি। আমি সৃষ্টি কর্তা, ব্রহ্মা রুদ্র যাঁর পারমার্থিক স্বরূপ জানতে পারিনি। অপর দেবতারা তা কী করে জানবে? আমরা সেই ভগবানের লীলাকীর্তন করি মাত্র। সেই ভগবানের চরণে প্রণাম নিবেদন করি।

তিনি বিশুদ্ধ, সত্য ও জ্ঞান স্বরূপ। তিনি সকলের অন্তর্যামী, সমস্ত সন্দেহের অতীত, তিনি নিগুর্ণ, তিনি জন্ম-মরণ রহিত। আমি ব্রহ্মা শিব, যজ্ঞ, বিষ্ণু এগুলি তার গুণাবতার। প্রজাপতিগণ, ঋষিগণ, দেবগণ, নৃপতিগণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, যক্ষ, ব্রহ্ম, পিতৃ শ্রেষ্ঠ, ঋষিশ্রেষ্ঠ, সিদ্ধে, দানবেন্দ্র, প্রেত পিশাচ, ভূত, জলচর প্রাণী, পশুপাখি সম্পত্তি, বীর্য বল তেজ ক্ষমা শোভা –সবই পরতত্ত্ব অর্থাৎ সেই ভগবানের বিভূতি বা অবতার।

.

সপ্তম অধ্যায়

ভগবানের অবতার লীলা কীর্তন সমুদ্র নিমগ্ন পৃথিবী উদ্ধারের জন্য ভগবান নারায়ণ বরাহ মূর্তি ধারণ করে তার প্রচণ্ড দন্তের আঘাতে দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন। তিনি ইন্দ্র হয়ে ত্রিলোকের মহতী, আর্তি হরণ করে হলেন হরি। অত্রিমুনির প্রতি প্রসন্ন হয়ে তার পুত্র রূপে 'দত্ত নাম নিয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। ঋষিপত্নী দেবহুতির গর্ভে 'কপিল' নামে জন্মে নিজ জননীকে তত্ত্ব-সংখ্যান-রূপ আত্মতত্ত্ব উপদেশ করেছিলেন। ধর্মের পত্নী দক্ষের কন্যা মূত্রি গর্ভে নিজের তপস্যার প্রভাব যুক্ত 'নর' ও 'নারায়ণ' –দুই মূর্তিতে জন্মগ্রহণ করেন।

পাঁচবছরের বালক ধ্রুবের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভগবান 'পৃশ্নিগভ' রূপে ধ্রুবকে ধ্রুবলোক দান করেছিলেন। মহারাজ বেন ব্রাহ্মণদের অভিশাপ মাথায় নিয়ে নরকগামী হলে ঋষিদের প্রার্থনায় ভগবান 'পৃথু' নামে তার গৃহে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ভগবান অগ্নীপ্র পুত্র মহারাজ নাভি হতে তার পত্নী সুদেবীর গর্ভে 'ঋষভ' রূপে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মা বললেন–আমার যজ্ঞে সুবর্ণবর্ণ, ছন্দোময়, যজ্ঞময়, সর্বদেবময়, যজ্ঞপুরুষ সেই ভগবান হয় শীর্ষ রূপে অবতীর্ণ হন এবং সেই সময় তার নিশ্বাস থেকে বেদসকলের সৃষ্টি হয়।

প্রলয়কালে ভগবান মৎস্য' রূপে পৃথিবীর প্রাণীসকলকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। অমৃত লাভের জন্য ক্ষীরসাগর মন্থনকারী দেবাসুরদের, মন্থনদণ্ড স্বরূপ মন্দর পর্বত, ভগবান কূর্ম' রূপে স্বীয় পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করে বলদপির্ত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে নিজের উরুদেশে রেখে নখের দ্বারা বিদীর্ণ করে বধ করেন। যজ্ঞাধিপতি বিষ্ণু বামন' রূপে মহারাজ বলির কাছ থেকে ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি প্রার্থনার ছলে ত্রিভুবন গ্রহণ করেছিলেন। ভগবান সর্বশক্তিমান হয়েও ধর্মের পথে বিচরণকারী জনকে যাঞ্জা ছাড়া ঐশ্বর্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এমন বিবেচনা করে মহারাজ বলির কাছে থেকে তিনি ত্রিলোক প্রার্থনা করেছিলেন।

হংস অবতারে ভগবান ভক্তিযোগ দিয়েছিলেন। আত্মজ্ঞান প্রকাশকে জ্ঞানের কথাও বলেছিলেন। পরমপুরুষ 'ধন্বন্তরি' রূপে অবতীর্ণ হয়ে মহারোগীদের রোগসকল নিজের নাম দ্বারাই বিনষ্ট করেছিলেন। সেই উগ্রবীর্য হরি 'পরশুরাম' রূপে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর ভারস্বরূপ ও দৈবকর্তৃক মৃত্যুর জন্য প্রেরিত ক্ষত্রিয়কুলকে একুশবার উৎপাটন করেন। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তিনি 'রামচন্দ্র' রূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন। নিপীড়িত পৃথিবীর ভার অপনোদনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কলিযুগের ক্ষেত্রে হরি 'কল্কিরূপে

আবির্ভূত হয়ে কলির শাসনকারী হবেন। জগতের সৃষ্টি কার্যে তপস্যা, আমি ব্রহ্মা, ঋষিগণ ও নয়জন প্রজাপতি এবং রক্ষা কাজে ধর্ম, যম, অর্থাৎ বিষ্ণু, মুনিগণ, দেবগণ নৃপতিগণ, অসুরগণ, অধর্ম, রুদ্র, ক্রোধ–সকলেই সর্বশক্তিমনে ভগবানের মায়ের বিভূতি।

যিনি সৎ, অসতের পরতত্ত্ব নিত্য সুখময়, সর্বদা প্রশান্ত, ভয় রহিত, জ্ঞান স্বরূপ, যাঁকে কোনো শব্দ দ্বারা জানতে পারা যায় না, মায়া যার সামনে দাঁড়াতে লজ্জা পায়, মুনিগণ যাঁকে ব্রহ্ম বলে মানেন, সেই নিত্য সুখরূপই পরম পুরুষ ভগবানের স্বরূপ। তিনি সকল কর্মের যশদাতা এবং সমস্ত কর্মের প্রবর্তক। যিনি ভগবানের মায়ার কার্য অর্থাৎ লীলা শ্রদ্ধা পূর্বক কীর্তন করেন, অনুমোদন ও শ্রবণ করেন তার মন কখনও মায়া দ্বারা আবিষ্ট হয় না।

.

অষ্টম অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন

মহারাজ পরীক্ষিত শুকদেবের কাছে জানতে চাইলেন –হে ব্রাহ্মণ, প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক শূণ্য জীবাত্মার পঞ্চভূত দ্বারা যে দেহের উৎপত্তি হয়, সেটা কি বিনা কারণে নাকি এর কোনো কারণ আছে?

পাপ বা পুণ্য কোন প্রকার বস্তু কীভাবে অনুষ্ঠিত হলে কোন্ অধিকারীর পথে দেবাদি– ভাব লাভ হতে পারে? মানুষের সাধারণ ধর্ম কী? তার জাতি বা বিশেষ ধর্ম বা কী? ভিন্ন ব্যবসায়ী রাজর্ষিদের ধর্ম কী?

ভগবানের আরাধনার বিধান কী এবং অধ্যাত্ম শাস্ত্রোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগের বিধানই বা কী?

মহাপ্রলয়ে যাঁদের উপাধি ঈশ্বরে বিলীন হয়ে যায়, সেই জীবগণ আবার কীভাবে সৃষ্ট হয়? জীবের বন্ধন, মুক্তি এবং স্বরূপ অবস্থিতি কীভাবে হয়?

.

নবম অধ্যায়

শ্রী শুকদেব কর্তৃক রাজার প্রশ্নের উত্তর দান

শ্রী শুকদেব বললেন–হে মহারাজ, হরির অনাদি-অবিদ্যাশক্তি নিজ মায়া দ্বারা অনুভবাত্মা জ্ঞান স্বরূপ জীবের দেহাদির সাথে সম্পর্ক অর্থাৎ জন্ম হয় না।

অব্যর্থ দৃষ্টি, মহাতপস্বী ব্রহ্মা কর্তৃক মন প্রাণ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় জয় করে দৈব পরিমাণে সহস্র বৎসর একাগ্র চিত্তে কঠোর তপস্যা তুষ্ট হয়ে ভগবান শ্রী হরি তাকে সর্বোৎকৃষ্ট নিজ ধাম বৈকুণ্ঠ লোক দর্শন করালেন। ব্রহ্মা সেই বৈকুণ্ঠে এসে নিখিল ভক্তজনের প্রতিপালক লক্ষ্মীদেবীর প্রিয়তম নারায়ণের দর্শন লাভ করলেন। তার চারটি বাহু, বক্ষস্থলে লক্ষ্মী দ্বারা অলংকৃত। পরনে পীতবসন, কর্ণে কুন্তল অরুণবর্ণ দুটি লোচন, আহ্লাদিত জাস্য যুক্ত, বদন। উত্তম আসনে তিনি বসে আছেন। তিনি উত্তম পাসদবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ভগবানের ঐ রূপ দেখে বিশ্বশ্রষ্ঠব ব্রহ্মার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হল। তিনি তাঁর চরণকমল বন্দনা করলেন।

ভগবান শ্রীহরি বললেন–হে বেদগর্ভ ব্রহ্মা, তোমার মঙ্গল হোক। আমার ইচ্ছার প্রভাবেই তুমি বৈকুণ্ঠ লোক দর্শন করলে। তুমি যখন জষ্ঠি করে বিমোহিত হয়েছিলে, তখন আমিই তোমাকে তপস্যা করতে আদেশ করেছিলাম। তপস্যা আমারই সাক্ষাৎ হৃদয়, আমিই তপস্যার স্বরূপ তপস্যার দ্বারা আমি এ জগৎ যেমন সৃষ্টি করি তেমন তপস্যার দ্বারাই তা সংহার করি। তপস্যার দ্বারা বিশ্বপালন করি। করি। তপস্যা আমার শক্তি যা সাধারণের পক্ষে বোঝা অত্যন্ত দুষ্কর।

সৃষ্টির পূর্বে আমি একাই ছিলাম, সৃষ্টির পরেও আমিই আছি। এই যে বিশ্ব সেটাও আমি মহাপ্রলয়ের পরে যা অবশিষ্ট থাকবে, তাও আমি। অর্থাৎ অক্ষদি, অনন্ত ও অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান আমিই একমাত্র তত্ত্বকার্যের পর কারণের গুণ কার্যে উপলব্ধি হয়, তার পূর্বে কিন্তু কারণরূপে তার বিদ্যমান থাকে, তেমনি আমিও ভূত, ভৌতিক পদার্থে প্রবিষ্ট এবং ঐ সকলে অপ্রবিষ্ট থাকি অর্থাৎ আমার সত্ত্বাই ঐরকম। যে বস্তু সব সময় সব অবস্থাতেই থাকতে পারে তাই আত্মা।

হে রাজন, ঐ বিরাট পুরুষ থেকে ঐ বিশ্বের যে রূপ সৃষ্টি এবং অন্যান্য যে সকল প্রশ্ন তুমি আমাকে করেছ ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করলে তার উত্তর পাবে।

.

দশম অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতের দশ লক্ষণ বর্ণনা

শ্রীমদ্ভাগবতে দশটি বস্তুর কথা বলা হয়েছে –সর্গ (সৃষ্টি), বিসর্গ (বিসৃষ্টি) স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশান, কথা, নিরোধ (প্রলয়), মুক্তি, আশ্রয়। পরমেশ্বর থেকে প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরিমাণ হেতু আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, মহত্তত্ত্ব ও অহংকারতত্ত্ব–এগুলির বিরাজরূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি, তার নাম (সর্গ, ব্রহ্মা থেকে যে স্থাবর। জঙ্গমাদির সৃষ্টি তা 'বিসর্গ। ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট বস্তু গুলির যথাযথ শৃঙ্খলা রক্ষা করে পালনে যে উৎকর্ষ তার নাম 'স্থিতি। ভক্তদের প্রতি ভগবানের অনুকম্পার নাম 'পোষণ'। কর্মের যে বাসনা তা 'উতি' মনু প্রভৃতি ভক্তগণের ধর্মের নাম 'মন্বন্তর। হরির অবতার বৃন্দের চরিত্র এবং তার অনুবর্তী ভক্তদের নানা আখ্যানযুক্ত পবিত্র কথাই 'ঈশান কথা। ভগবান হরি যোগনিদ্রা অবলম্বন করলে নিজ উপাধির সাথে জীবগণের ভগবানে যে লয় 'নিরোধ' অবিদ্যার দ্বারা অধ্যস্ত জীবের কতৃত্বাদি অভিনিবেশ পরিহার পূর্বক নিজস্বরূপে যে অবস্থান তা 'মুক্তি। যা হতে এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি এবং যাতে সব কিছু লয় প্রাপ্ত হয়, যাকে পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা বলা হয়, তার নামই আশ্রয়।

ভগবানের স্থূলরূপের বহির্ভাষা পৃথিবী, অপ, তেজ, মরুবায়ু, আকাশ, অহংকার, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি — আটটি আবরণের দ্বারা আবৃত রয়েছে। ভগবানের সূক্ষ্মরূপ লিঙ্গ শরীর স্থূল শরীরের কারণ স্বরূপ। তাই কোনো বিশেষণ নেই। তা উৎপত্তি স্থিতি ও লয়শূন্য এবং সর্বদা একরূপ অর্থাৎ অপক্ষয়াদিরহিত, এজন্য বাক্য ও মনের অগোচর।

তৃতীয় স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

বনবাসী বিদুরের সাথে উদ্ধবের কথোপকথন

মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন–মহারাজ সর্বৈশ্বর্য পরিপূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদের নিজের আত্মীয় বলে গ্রহণ করেছেন, যিনি সর্বদা দেবতা ও ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত, যিনি যদুবংশের প্রধান মহাবীর, সেই শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ হয়ে আপনি এখনও মূর্তিমান দোষস্বরূপ আপনার পুত্রকে পোষণ করছেন–এ আপনার অপত্য নয়, পতনের কারণ। আপনি কৃষ্ণ বিমুখ হওয়ায় লক্ষ্মী আপনার গৃহ থেকে বিদায় নিয়েছেন। যদি কুলের মঙ্গল চান তাহলে এখনই দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করুন।

একথা শুনে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে দুর্যোধন বিদুরকে পুরী থেকে নির্বাসন করলেন। পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য তিনি বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ করতে করতে হরিতোষণ ব্রত পালন করেছিলেন। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি ভারতের প্রভাসতীর্থে এসে হাজির হলেন। সেখানে এসে শুনলেন, পরস্পর কলহের ফলে কুরু-পাণ্ডবের বিনাশ হয়েছে। শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে যমুনার তীরে উপনীত হলেন বিন্দুর সেখানে পরম ভাগবত উদ্ধবের সঙ্গে দেখা হলো তার।

বাসুদেব অনুচর, বৃহস্পতির প্রসিদ্ধ পূর্ব শিষ্য উদ্ধবকে তিনি আলিঙ্গন করলেন। জানতে চাইলেন –বসুদেব কেমন আছেন? তার গৃহে অবস্থানরত শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম কেমন আছেন? যদুকুলের সেনাপতি মহাবীর প্রদ্যুম্ন ভালো আছেন কিনা? শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ তনয় শাম্ব কুশলে আছেন তো? ভগবানের শরণাগত নিষ্পাপ, বিদ্বান, অক্রুর কুশলে আছেন তো? ভক্তদের কামপূরক ভগবান অনিরুদ্ধ কুশলে আছেন তো? ধার্মিক যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাথে ধর্ম মেনে চলেছেন তো? বহুকাল সঞ্চিত ক্রোধ ভীম কি ত্যাগ করেছেন? গাণ্ডীবধারী অর্জুনের কুশল কেমন?

হে সৌম্য উদ্ধব, যিনি মৃত ভ্রাতা পাণ্ডুর পুত্রদের প্রতি দ্রোহ আচরণ করেছেন, যিনি দুর্জন দুর্যোধনাদির বশীভূত হয়ে জীবিত ভ্রাতা, সুহৃদ আমাকেও রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছেন, সেই অধোগামী ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আমার অনুশোচনা হয়।

যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপন ঐশ্বর্য গোপন করে মনুষ্য লীলার অনুকরণ করে মানবদের চিত্তে ভ্রম জন্মাচ্ছেন, আমি তার প্রসাদে তার মাহাত্ম–অনুসন্ধানে অন্যের অলক্ষিত ভাবে বিস্ময় ও দুঃখ পরিহার করে এই পৃথিবীতে সুখে ভ্রমণ করছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলা বর্ণনা

উদ্ধব বললেন– সমুদ্রের ভিতরে অবস্থিত মীনগণ যেমন চন্দ্রকে বুঝতে পারেননি, তারা যদুশ্রেষ্ঠ কৃষকে কেবল প্রাণীদের অন্তর্যামী রূপে মনে করত। ব্রজরমণীগণ হাতের কাজ ফেলে রেখে শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগরঞ্জিত হাসি, পরিহাস, লীলা অবলোকন করে হয়ে যান। বসুদেব গৃহে করে জন্ম লীলা করেন যে কৃষ্ণ, তিনিই আবার কংসের ভয়ে ব্রজেই অবস্থান করেন। সেই সর্বশক্তিমান ভগবান আবার দেবকী ও বসদেবকে উদ্ধার করে পাদবন্দনা করেন।

যিনি ত্রিভুবনের অধিপতি, নিজের সম্পত্তি চিদানন্দ রূপ রাজ্যলক্ষ্মীর দ্বারা সমস্ত ভোগ লাভ করবেন এবং ইন্দ্রাদি অপ্রাকৃত লোকপালগণ অপ্রাকৃত পুজোপহার আহরণ করে তাদের মস্তকাস্থিত মুকুটের অগ্রভাগ দিয়ে পাদপীঠ স্তুতি করবেন, তিনিই সেই শ্রীকৃষ্ণ।

স্তনে কালকূট বিষ মাখিয়ে সেই বিষমিশ্রিত স্তন্য দান করে শিশু শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে উদ্যত দুষ্টা পুতনাকে বধ করে তার প্রতিও তিনি কৃপা বর্ষণ করেন। যমুনাতীরে বাঁশি বাজিয়ে গোপবালকদের সাথে তিনি ক্রীড়া করেন। মথুরাপতি কংস প্রেরিত মায়াবী বকরাক্ষসকে বিনাশ করেন। কালিয়দহের বিষজল পান করে মৃত্যু মুখে পতিত অসংখ্যা গোকুলবাসী গোপবালক ও গাভীদের সঞ্জীবিত করে পুনরায় জীবনদান করেন এবং সপাধিপ কালিয় নাগকে নির্বাসিত করেন। বামহস্তে অঙ্গুলির দ্বারা গোবর্ধন পবর্তকে খেলার ছাতার মতো ধারণ করে তিনি প্রবল বারিবর্ষণের হাত থেকে ব্রজবাসীদের রক্ষা করে।

.

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রী কৃষ্ণের কংসবধাদি বর্ণনা

নরকাসুর নিজের শরীরের দ্বারা কৃষ্ণকে গ্রাস করতে গেলে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের চক্রে তার মৃত্যু হয়। তিনি নরকাসুরের গৃহে প্রবেশ করেন এবং নরকাসুরের মহিষীদের প্রত্যেকের গর্ভে আত্মতুল্য সর্বগুণযুক্ত দশ দশটি সন্তানের জন্ম দেন। কালয়বন, জরাসন্ধ, শাম্ব প্রভৃতি রাজাগণ মথুরাপুরী আক্রমণ করলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাদের বধ করেন।

স্নিগ্ধ, স্মিত অবলোকন ও অমৃততুল্য বাক্য নির্মল চরিত্র এবং লক্ষ্মীর নিকেতন স্বরূপ। নিজ দেহের দ্বারা এ লোক, স্বর্গলোক ও যদুগণকে আনন্দ দিতে লাগলেন। গোকুল নিবাসী কামিনীদের রাতে অতিশয় সৌহার্দ্য প্রদর্শন করতেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ বহু বছর ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত ছিলেন। পরে গৃহ, ধর্মে ও কামতভাগাদি সাধনে তাঁর বিরাগ উৎপন্ন হয়।

.

চতুর্থ অধ্যায়

মৈত্রেয়ের কাছে বিদুরের আগমন

ভগবান আত্ম মায়ায় অর্থাৎ নিজ সংকল্পরূপ গতি অবলোকন করে সরস্বতী নদীর জলে স্নান ও আচমনাদি সেরে, একটি কোমল অশ্বথ বৃক্ষে পৃষ্ঠদেশ রেখে বাম উরুর ওপর দক্ষিণ চরণ স্থাপন করে উপবেশন করেছিলেন। সেখানে তখন মহর্ষি বেদব্যাসের সুহৃদ এবং সখা পরাশরের শিষ্য মৈত্রেয় মুনি পৃথিবী পর্যটন করতে করতে এসে উপনীত হয়েছিলেন।

উদ্ধব সেই পরম পুরুষের কাছে অন্তরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের পরমাস্থিতি বিষয়ে উপদেশ দান করেছিলেন। তিনি সেই রাতে যমুনার তীরে অতিবাহিত করে পরদিন প্রাতে বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেখানে এসে বেদকর্তা ত্রিলোকের গুরু ভগবানের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে একাগ্রচিত্তে শ্রীহরির আরাধনা করতে লাগলেন।

এরপর কিছুদিন পর্যন্ত সেখানে মৈত্রেয় মুনি অবস্থান করছিলেন। নির্মল চরিত্র বিদুর সেই ভাগীরথী তীরে এসে উপনীত হলেন।

.

পঞ্চম অধ্যায়

ভগবানের লীলাবর্ণনা

জীবের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষী বিদুরের প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রেয় মুনি বললেন–তুমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন। তিনি বৈকুণ্ঠে যাবার সময় আমাকে আদেশ করে গেছেন, তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দেবার জন্য। বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়–এগুলি স্বয়ং ভগবানের লীলার বিষয়ীভূত। সৃষ্টির পূর্বে এই বিশ্ব একমাত্র ভগবত-স্বরূপ ছিল। তিনি মায়াশক্তির দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আত্ম-দেহস্থ বিশ্ব প্রকাশ করলেন। সাত্ত্বিক অহংকার বিকার প্রাপ্ত হলে তা থেকে মন উৎপন্ন হল। ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলে শব্দ-স্পর্শ-রূপ ও গন্ধ জন্ম নিল। রজস অহংকার বিকার প্রাপ্ত হয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের জন্ম দিল। তামস অহংকার বিকার প্রাপ্ত হয়ে যে শব্দ হল, তা থেকে আকাশের উৎপত্তি যা আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ শরীর। এরপর বায়ু তেজ ও জলের উৎপত্তি হল। আকাশের সাথে বায়ুর সম্বন্ধ থাকায় বায়ুতে স্পর্শ ও শব্দ দুটি গুণ আছে। তেজে আছে তিনটি গুণ — তাঁর নিজের গুণ গন্ধ এবং আকাশ, বাতাস, জল ও তেজ থেকে প্রাপ্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস আছে।

.

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিরাট পুরুষের বিভূতি বর্ণনা

মহদাদি নিজ শক্তিদের পরস্পর অমিলিত হওয়ায়, তারা বিশ্ব রচনায় অসমর্থ জেনে পরমেশ্বর কালাক্ষ শক্তি অবলম্বন করে প্রকৃতির সাথে অন্তর্যামী রূপে বিরাট দেহ ধারণ করলেন এবং তাতেই এই চরাচর লোকসকল অবস্থান করছে। ঐ বিরাট মূর্তি জ্ঞান-শক্তি ক্রিয়া-শক্তি, ও আত্ম শক্তি বিশিষ্ট হয়ে এক, দশ ও তিনপ্রকারে বিভক্ত হল। এই বিরাট পুরুষই সমস্ত প্রাণীর আত্মা এবং তিনি পরমাত্মার অংশ অর্থাৎ জীব। এই বিরাট মূর্তি প্রকাশিত হয়ে দেবতাদের কতপ্রকার আয়তন ভিন্ন ভিন্ন রূপ হল।

ঐ বিরাট পুরুষের মুখ পৃথকরূপে নির্ভেদ হলে অগ্নি প্রভৃতি লোকপাল সকল নিজ নিজ শক্তির সাথে আপনাদের স্থানস্বরূপ ঐ মুখে প্রবিষ্ট হল। ঐ বাক শক্তির দ্বারা জীবগণ শব্দাদি

উচ্চারণ করে থাকে। এই ভাবে ঐ বিরাট পুরুষের তালু, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ হতে গন্ধ, জ্ঞান, শব্দ, জ্ঞান, জীবনী গতিশক্তি জীব প্রাপ্ত হল। ঐ বিরাট পুরুষের মস্তক হল স্বর্গ, পদদ্বয় পৃথিবী এবং নাভি দেশ থেকে আকাশ উৎপন্ন হল। তার মুখ থেকে সৃষ্টি বেদ ও ব্রাহ্মণ কুল, তার বাহু হতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হতে বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হতে শূদ্র জাতির উদ্ভব হল।

কালক্রম ও স্বভাব সম্পন্ন তেজোময় ভগবানের বিরাট রূপের বর্ণনা কোনো ব্যক্তিই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে না। পুণ্যকীর্তি ভগবানের গুণকীর্তনই মানুষের বাগেন্দ্রিয়ের একান্তলাভ, না জেনেও ভগবানের পুণ্য কীর্তন বা শ্রবণ করলে অবশ্যই কৈবল্য লাভ হয়।

.

সপ্তম অধ্যায়

বিদুরের প্রশ্নে মৈত্রেয়র উত্তর দান

বিদুর মৈত্রেয় মুনির কাছে জানতে চাইলেন –নির্গুণ অধিকারী চিন্মাত্র ভগবানের লীলার দ্বারা কী করে গুণ ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ হল? যিনি ব্রহ্ম স্বরূপ, যাঁর বোধশক্তি বিলুপ্ত হয় না, তিনি কী করে অবিদ্যাযুক্ত হন? জীবগণে সংসারই বা কি প্রকারে হতে পারে?

মৈত্রেয় মুনি বললেন– বিমুক্ত স্বরূপ পরমেশ্বরের অবিদ্যার বন্ধন ও কার্পণ্য সবই তর্কের বিরোধ। ভগবানের মাথা অর্থাৎ অচিন্ত্য শক্তি। তাঁর ইচ্ছা বিনা কিছুই ঘটে না।

বিদুর বললেন–হে মুনি, এই পৃথিবীর উপরে ও নীচে যে সকল লোক আছে, তা কী ভাবে সন্নিবেশিত এবং তাদের পরিমাণ কত? এই ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়ের স্রষ্টা, ভগবানের উদার বিক্রমও বর্ণনা করুন। জীবের তত্ত্ব ও শিষ্যের প্রয়োজন কী? গুরু ও শিষ্যের প্রয়োজন কী? উপনিষদ সকলের স্থান সম্বন্ধেও জানতে আগ্রহী আমার মন।

.

অষ্টম অধ্যায়

ব্রহ্মার বিষ্ণু দর্শন

প্রলয়কালে জলনিমগ্ন চরাচরে ভগবান নারায়ণ সর্পশ্রেষ্ঠ অনন্তকে শয্যা করে নয়ন যুগল নিমীলিত রেখে শয়ন করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন ক্রিয়াশূন্য। প্রলয়কাল অবসান হলে তিনি আবার সৃষ্টি করার অভিলাষ করেন। কালানুসারে রজোগুণ দ্বারা ক্ষোভিত হয়ে তার নাভিদেশ থেকে পদ্মকোষের উৎপত্তি হল। গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন ঐ পদ্ম হতে বেদময় ব্রহ্মা উৎপন্ন হলেন। চোখ খুলেই তিনি চারদিকে ঘাড় ঘোরালেন। তার হল চারমুখ। আবির্ভাবের পরই তিনি চিন্তাচ্ছন্ন হলেন–আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে তার শত পরমায়ু অতিক্রান্ত হল। তিনি হৃদয়ে তাঁকে স্বয়ং প্রকাশমান দেখলেন। সলিলে মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ অথচ বিস্তীর্ণ অনন্তনাগের শরীর শয্যায় তিনি শয়ন করে আছেন। শেষনাগের ফণারূপ মস্তক সমূহ থেকে মণি কাঞ্চনের প্রভা ঐ জলরাশির অন্ধকার বিদূরিত করছে। ঐ পুরুষের অসীম লাবণ্য যা মরকত শিলাময় পবর্তকে লজ্জা দেয়। প্রচুর সুবর্ণ খচিত পর্বতের চূড়ার থেকেও সেই পুরুষের কিরীটস্থ রত্ন অধিক শোভা বিস্তীর্ণ করছিল। তার দেহ দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে অপরিমেয়। তাঁর মধ্যে ত্রিভুবন নিহিত পর্বতাদির মতো দেখে ব্রহ্মা স্থির করলেন ইনিই ভগবান শ্রীহরি।

.

নবম অধ্যায়

ভগবানের স্তুতি

ব্রহ্মা বললেন–হে ভগবান, তোমায় কৃপায় আমি তোমাকে জানতে সক্ষম হয়েছি। তোমার নাভিপদ্ম নিকেতন থেকে আমার সৃষ্টি। আমি তোমার আনন্দময়, ভেদশূন্য ও প্রকটিত মূর্তির আশ্রয় গ্রহণ করলাম।

হে উরুক্রম, যাঁরা বেদরূপ বায়ুর দ্বারা নীত, তোমার চরণ কমলের কোষ গন্ধ কর্ণবিবরের দ্বারা গ্রহণ করেছে এবং শ্রেষ্ঠ ভক্তির দ্বারা পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করেছে, তাদের কখনও তুমি বিস্মৃত হয়ো না। লোভ জর্জরিত জীব সকল কাম-সুখ-লোভের কামনায় নিরন্তর নিষিদ্ধ কর্মগুলি করে থাকে।

তোমার ভক্তগণ তাদের ইচ্ছামতো তোমার যে যে রূপ মনে ধ্যান করে, তুমি কৃপা করে সেই সেই রূপেই প্রকটিত হও। তুমি ভুবনরূপ বৃক্ষ। তুমি নিজে এর মূল। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের জন্য সৃষ্টি করেছ। আমাকে অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবকে। ঐ বৃক্ষ ত্রিপাদ হলেও প্রত্যেক পাদে মরীচি প্রভৃতি মুনি ও মনুগণ বহু শাখাপ্রশাখা রূপে অবস্থিত। জগৎ আকার বৃক্ষরূপ ভগবান তোমাকে প্রণাম নিবেদন করি।

.

দশম অধ্যায়

দশবিধ সৃষ্টি

আত্মস্বরূপ, ভগবানের প্রকাশ হতে যে গুণ সকলের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাকে মহৎ বলে, যা প্রথম সৃষ্টি। দ্বিতীয় সৃষ্টি — জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রকাশ হয় যাতে, সেই অহংকার। তৃতীয় সৃষ্টি — পৃথিব্যাদি, শব্দাদি, ভূত সূক্ষ্মের উদ্ভব। চতুর্থ সৃষ্টি — জ্ঞান ও কর্মের কারণে ইন্দ্রিয় বর্গের জন্ম। পঞ্চম সৃষ্টি –বৈকারিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিত্বতা দেব সকল ও মনের সৃষ্টি। ষষ্ঠ — পঞ্চ বৃত্তিস্বরূপা অবিদ্যার সৃষ্টি। সপ্তম –স্থাবর সৃষ্টি। ছয় প্রকারাদি স্থাবর সৃষ্টি, বনস্পতি, ঔষধি, লতা বংশবিবুধ ও বৃক্ষ। অষ্টম –তির্যক যোনিদের সৃষ্টি। নবম –মনুষ্যদের সৃষ্টি এবং জীব ও দেব গণ দ্বারা সৃষ্ট।

.

একাদশ অধ্যায়

কালপরিমাণ নিরূপণ

সংবৎসর পাঁচ প্রকার –সংবৎসর, পরিবৎসর, ইড়াবৎসর, অণুবৎসর এবং বৎসর। বৃহস্পতির দ্বাদশরাশি ভোগকালে পরিবৎসর। তিরিশ সৌরদিনে, যে শ্রাবণ মাস হয় তার বারো মাসে ইড়াবৎসর, চন্দ্রের দ্বাদশ রাশি ভোগাত্মক কালের নাম অণুবৎসর এবং যক্ষ-সম্বন্ধীয় মাসের দ্বাদশ মাসে হয় বৎসর।

সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের মধ্যবর্তীকালকে যুগ বলে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সাথে ঐ চারযুগের পরিমাণ –দিব্য পরিমাণে বারো হাজার বছর অর্থাৎ মানুষের পরিমাণে বিশ হাজার তেতাল্লিশ লক্ষ বর্ষে চতুর্যগ হয়।

ত্রিলোকের বাইরে মহলোক প্রভৃতি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত স্থানে চতুর্যুগ সহস্র বৎসরে এক দিন হয়। রাতের পরিমাণও দিনের মতো অর্থাৎ মনুষ্য পরিমাণে ৬৪ কোটি অষ্টপদ্ম পরিমিত বৎসরে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হয়। চতুর্দশ মনু যতকাল ব্যপ্ত থাকে, সেই কাল পর্যন্ত ব্রহ্মার দিন। মনুষ্য পরিমাণে যা তিরিশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ বিশহাজার বছর।

কাল দ্বারা সৃজৎ জীবগণের পরমায়ু পরিমাণ নির্দেশ করা হয়ে থাকে কিন্তু ভগবতত্ব কাল কৃত পরিচ্ছেদ শূণ্য। পরব্রহ্ম ভগবানের ওপর কাল কোনো প্রভুত্ব করতে পারে না।

.

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্রহ্মার সৃষ্টি বর্ণনা

তমঃ, মোহ, মহামোহ, তমিস্র, অন্ধ, তামিস্র –এইসব পাপিয়সী নরকবাসিনী সৃষ্টি দেখে অসন্তুষ্ট ব্রহ্মা সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামে মুনিদের সৃষ্টি করলেন এবং তাদের প্রজা সৃষ্টির আদেশ দিলেন। কুপিত ব্রহ্মার ভ্রুযুগলের মধ্যবর্তী স্থান থেকে রুদ্রের আবির্ভাব হল। সেই রুদ্র হতে যেসব রুদ্র সৃষ্ট হলেন তারা দলবদ্ধ হয়ে জগৎ গ্রাস করতে উদ্যত হলেন।

শঙ্কিত চিত্ত ব্রহ্মা ভগবানের শক্তি যুক্ত হয়ে সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ এবং নারদ নামে দশ পুত্র উৎপন্ন করলেন।

ব্রহ্মার ক্রোড় থেকে নারদ, অঙ্গুষ্ঠ–দক্ষ, প্রাণ–বশিষ্ঠ, ত্বক — ভৃগু, হস্ত –ক্রতু, নাভি –পুলহ, কর্ণদ্বয় –পুলস্ত্য, মুখ –অঙ্গিরা, চক্ষু –অত্রি, মন — মরীচি, দক্ষিণ হস্ত –ধর্ম ও হস্তের পৃষ্ঠ ভাগ — অধর্ম, হৃদয় — কাম, ভ্রূকুটি –ক্রোধ, পায়ুর থেকে পাপ উৎপন্ন হল।

ব্রহ্মার চারমুখ থেকে চার বেদ আবির্ভূত হল। পূর্বাদি মুখ থেকে চারটি আশ্রম সৃষ্টি করলেন। নিত্যই প্রজাসৃষ্টির ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও প্রজাগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে না চিন্তা মগ্ন হলেন

ব্রহ্মা। তিনি নিজেই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে স্ত্রী ও পুরুষ হলেন। পুরুষ মূর্তি স্বায়ম্ভুব মনু এবং স্ত্রীর নাম শতরূপা। তারপর তাদের মিথুন ধর্মে প্রজাসকল বৃদ্ধি পেতে লাগল।

.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জলনিমগ্ন ধরিত্রী উদ্ধার

পৃথিবীতে জলাপ্লুত হয়ে রসাতলে তলিয়ে যেতে দেখে ব্রহ্মা চিন্তা করতে লাগলেন –উদ্ধারের উপায়। তিনি ভগবানের দ্বারস্থ হলেন। সে সময় তার নাসাবিবর থেকে আঙুলপরিমাণ এবং সুক্ষ্ম বরাহ নির্গত হল। ক্ষণকালের মধ্যেই তা বিরাট আকার ধারণ করল। সেই বরাহরূপী ভগবান পৃথিবীকে উদ্ধার কল্পে জলের তলে প্রবেশ করলেন। তার পুচ্ছ আকাশ স্পর্শ করল। তার শুভ্র দন্ত, অতিশয় কঠিন শরীর কর্কশ রোমে ত্বক আচ্ছাদিত। তিনি সমুদ্রের জলে লাফিয়ে পড়লে জলরাশির আর্তধ্বনি শোনা গেল। বাণ সদৃশ ক্ষুর দিয়ে অপার সমুদ্রের কুল প্রদর্শন পূর্বক বিস্তীর্ণ জলরাশি বিদীর্ণ করতে করতে রসাতলে গিয়ে পৃথিবীকে দেখতে পেলেন। প্রলয়কালে যখন ভগবান শয়ন করতে ইচ্ছা করেছিলেন, তখন সকল জীবের আধার ভূতা এই পৃথিবীকে নিজের জঠরে ধারণ করেছিলেন। তিনি অনায়াসে স্বীয় দন্ত দ্বারা ধরণীকে ধারণ করে, রসাতল থেকে উত্থিত হলেন। যখন বরাহমুর্তি ভগবান হস্তির ন্যায় লীলা করতে করতে শুভ্র দন্তের অগ্রভাগ দিয়ে ধরণীকে ধারণ করে উধ্বদিকে উত্তোলন করেছিলেন, তখন তার শরীর তমালের ন্যায় নীল বর্ণ হয়েছিল।

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ ঋষিগণ, মনুগণ, ভগবানের স্বরূপ জানতে পেরে তার চরণ বন্দনা করলেন।

.

চতুর্দশ অধ্যায়

দিতির গর্ভোৎপত্তি

দক্ষের কন্যা দিতি একসময় সন্ধ্যাকালে কামতাড়িত হয়ে পুত্রকামনায় ঋষি মরীচির পুত্র নিজপতি কশ্যপের নিকট রতি প্রার্থনা করেন। কশ্যপ বললেন–তোমার অভিলাষ পূর্ণ করব,

তবে সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ পর্যন্ত অপেক্ষা করো। কিন্তু কামোন্মত্তা দিতি সময় দিতে চাইলেন না। কশ্যপ ভার্যার প্রার্থিত বিষয়ে একান্ত আগ্রহ জেনে নির্জন স্থানে তাঁকে নিয়ে চলে গেলেন। ভার্যার সাথে অবস্থান শেষ করে মুনি সমুদ্রে স্নান শেষ করে প্রাণায়াম করলেন। মৌনব্রত হয়ে সনাতন ব্রহ্ম জ্যোতি ধ্যান করে জপ করতে রত হলেন।

দিতি তার নিন্দিত কর্মের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। সন্ধ্যাকালীন নিয়মভঙ্গ হওয়ায় মহামুনি কশ্যপ অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিলেন। দিতি কম্পিত কণ্ঠে নিজ সন্তানের কল্যাণ কামনা করলে কাশ্যপ মুনি বললেন–তোমার উদরে অভদ্রস্বরূপ দুটি অধর্ম পুত্র জন্ম নেবে। তারা লোকপালনের সাথে তিনলোক বার বার পীড়িত করবে। ভগবান বিশ্বেশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে অবতার রূপে তাদের বিনাশ করবেন, তবে তোমার পৌত্র হবে শ্রীহরির।

.

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিষ্ণু ভক্তদ্বয়ের কাছে বিপু-শাপাদির বর্ণনা

প্রজাপতি কশ্যপ দিতির গর্ভে যে বীর্য নিহিত করলেন, তা দিতি শত বৎসর গর্ভে ধারণ করেন। সেই গর্ভের তেজে সূর্যাদি, চন্দ্রাদি, লোকপালগণ নিস্তেজ হয়ে দিক সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার কারণ জানতে চাইলেন।

ব্রহ্মা বললেন, এ আমার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ লোকমধ্যে বিগত স্পৃহ হয়ে সমস্ত লোক আকাশমার্গে বিচরণ কালে ভগবান বিষ্ণুর লোক বৈকুণ্ঠ ধামে গেলেন। সেখানে বসবাসকারী পুরুষগণ নিষ্কাম ধর্মে শ্রী হরির আরাধনা করে ভগবানের মূর্তির মতো মূর্তি লাভ করেছেন। সেখানে এসে মুনিগণ অতিশয় আনন্দ লাভ করলেন। তারা আত্মতত্ত্ববেত্তা ছিলেন। বৃদ্ধ হলেও তারা ছিলেন পাঁচ বৎসরের বালকের ন্যায় দেখতে। কিন্তু দ্বারপাল দুজন ছিলেন ভগবানের স্বভাবের প্রতিকূল। মুনিদের প্রভাবের অনাদর করে উপহাসপূর্বক বেত প্রহার ও বাজের দ্বারা পুরীতে প্রবেশ নিষেধ করলেন। উপস্থিত দেবগণ এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন।

মুনিগণ ঐ দ্বারপাল দুজনকে অভিশাপ দিলেন– তোমরা বৈকুণ্ঠলোক থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পাপীয়সী যোনিতে গিয়ে জন্মগ্রহণ করো। যেখানে কাম, ক্রোধ ও লোভ আছে।

ব্রহ্মশাপ বুঝতে পেরে দ্বারপাল দুজন মুনিদের পায়ে আছড়ে পড়ে অভিশাপ খণ্ডনের উপায় জানতে চাইলেন।

মহতের প্রতি ভৃত্যদের অপরাধ জেনে ভগবান স্বয়ং লক্ষ্মীর সাথে যেখানে মুনিগণ অবরুদ্ধ ছিলেন, সেখানে এসে হাজির হলেন। ভগবানের বিবিধ সৌন্দর্য দেখে সনকাদি কুমার দুই বললেন– হে ভগবান এর আগে আমাদের কোনো পাপ ছিল না। কিন্তু তোমার অনুচর দ্বয়কে অভিশাপ দেওয়ায় যে পাপ করলাম তার ফলে আমাদের নরক তুল্য নীচ যোনিতে জন্ম হলেও আপত্তি নেই।

তোমার অলৌকিক রূপ দেখে আমাদের নয়ন গুলি অতিশয় পরিতৃপ্ত হল। হে পরশ্বৈর্য ভগবান, তোমাকে আমরা বারে বারে প্রণাম করছি।

.

ষোড়শ অধ্যায়

বৈকুণ্ঠলোক দ্বারপালদ্বয়ের বিতাড়ণ

ভগবান শ্রীহরি বললেন– জয় ও বিজয় নামে আমার দুই পার্ষদ তোমাদের প্রতি যে অপরাধ করেছে, তাতে আমাকেই অবজ্ঞা করা হয়েছে। তোমাদের অবজ্ঞা করা হয়েছে। তোমাদের অপমানের দ্বারা আমাকেই তিরস্কার করা হয়েছে, কারণ ব্রাহ্মণই হল আমার শ্রেষ্ঠ সুখ।

ভগবান ঐ দুই দ্বারপালকে বললেন– তোমারা অসুরযোনি প্রাপ্ত হও। ভয় করো না, তোমাদের মঙ্গল হবে।

ভগবানের এই দুই পার্ষদই এখন কশ্যপের বীর্যে দিতির গর্ভে প্রবেশ করেছে। এই দুই যমজ অসুরের তেজে সূর্য এবং দিক সকল অন্ধকারময় এবং ম্রিয়মান হয়ে উঠেছে।

.

সপ্তদশ অধ্যায়

গর্ভাবস্থা থেকে হিরণ্যাক্ষ ইত্যাদি যমজ

অসুরের জন্ম এবং হিরণ্যাক্ষের দিগ্বিজয়ে গমন। শত বৎসর পূর্ণ হলে কশ্যপ-ভার্য্যা দিতি দুটি যমজ সন্তান প্রসব করলেন। সন্তান দুটি ভূমিষ্ঠ হলে স্বর্গ, মত ও অন্তরীক্ষে নানা অমঙ্গল সূচক উৎপাত দর্শনে লোকের হৃদয়ে মহা ভয় উপস্থিত হল। কশ্যপ পুত্রদ্বয়ের নামকরণ করলেন হিরণ্যকশিপু জ্যেষ্ঠ এবং হিরণ্যাক্ষ তার অনুজ।

হিরণ্যকশিপু নিজ বাহুবলে উদ্ধত এবং ব্রহ্মার বরে অমর হয়ে লোকপালদের সাথে ত্রিলোক অধিকার করলেন। ভাই হিরণ্যাক্ষ ছিল দাদার প্রিয় সহচর। যুদ্ধ বাসনায় সে একদিন স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে ইন্দ্রসহ দেবগণকে দেখতে না পেয়ে উন্মত্ত হয়ে বারবার গর্জন করতে লাগল। মহাবলশালী হস্তীর ন্যায় জলক্রীড়া করতে উৎসুক হয়ে গম্ভীর গর্জনকারী গভীর সমুদ্রকে বিলেড়িত করতে লাগল, পাতাল লোকের পালক ও জলজন্তুদের প্রধান বরুণদেবকে সে উপহাস করে যুদ্ধে আহ্বান জানাল।

নিজের ক্রোধ নিজ বুদ্ধির দ্বারা সংযত করে বরুণদেব বললেন– ওহে, অসুর শ্রেষ্ঠ অতই যদি যুদ্ধ করার বাসনা তাহলে যাও সেই পুরাতন পুরুষ ভগবানের কাছে। তিনিই তোমার রণবাসনা সন্তুষ্ট করতে পারেন।

.

অষ্টাদশ অধ্যায়

বরাহদেবের সাথে হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ

জলধিপতি বরুণের মুখে শ্রীহরির কথা শুনে এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীহরির ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞ, দুর্দম অসুর হিরণ্যাক্ষ নারদের কাছ থেকে হরির স্থিতির কথা জেনে দ্রুত রসাতলে প্রবেশ করল। সেখানে সর্বজয়ী প্রকাণ্ড পর্বতাকার দণ্ডের অগ্রভাগ দিয়ে পৃথিবীকে উর্ধ্বে তুলে ধরতেই ভগবান বরাহদেবকে দেখে সে উপহাস করতে লাগল। বরাহদেব তার ক্রুদ্ধ রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয়ের দৃষ্টিতে প্রথমে ঐ দৈত্যের তেজ হরণ করলেন।

শুরু হল দুজনের মধ্যে যুদ্ধ। তারা পরস্পরের উপর আঘাত করতে লাগলেন। গদার আঘাতে দুজনেই ক্ষত বিক্ষত হলেন। ঋষিগণ পরিবৃত হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন ব্রহ্মা। ভগবানের দিক থেকে বিক্রমের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই দেখে ব্রহ্মা আদি বরাহ নারায়ণের বন্দনা করলেন। বললেন– অভিজিৎ নামে মঙ্গলময় যোগে ঐ অসুরের বিনাশ না করতে পারলে সমূহ বিপদ। দয়া করে ত্রিভুবনের মঙ্গল বিধান করুন ভগবান।

.

ঊনবিংশ অধ্যায়

আদি বরাহ কর্তৃক হিরণ্যাক্ষ বধ

দেবতারা যাকে অধম দৈত্য বলে বিবেচনা করে ভীত হয়েছিলেন, তিনি বস্তুত ভগবানেরই এক পার্ষদ।

ভগবানের তীক্ষ্ণধার চক্র বারে বারে দৈত্যের মহাস্ত্র শূলকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। দৈত্য যোগমায়ার নিয়ন্তা ভগবান হরির ওপর বহু প্রকার মায়া বিস্তার করল। ঐ আসুরি মায়া বিনাশের জন্য ভগবান আদি বরাহ নিজের সুদর্শনাস্ত্র প্রয়োগ করলেন। তারপর নিজের হাত দিয়ে তাঁর কর্ণমূলে আঘাত করলেন। প্রচণ্ড বায়ুবেগে বৃক্ষ যেমন সুমূলে ভূমিতে ধরাশায়ী হয়, তেমনই ভাবে দৈত্য হিরণ্যাক্ষ ভূতলে পড়ে গেল। তারপর সে ভগবান হরির চরণ দ্বারা আহত হয়ে তাঁর মুখমণ্ডল দর্শন করতে করতে দেহত্যাগ করল।

দেবতাগণ আনন্দে উল্লসিত হয়ে ভগবান হরির প্রশস্তি কীর্তন করলেন।

জগতের কারণরূপ বরাহরূপী ভগবানের কর্তৃক এই মহান অসুর হিরণ্যাক্ষ বধ কাহিনি যে শোনে, গান করে এবং অনুমোদন করে, সে অনায়াসে ব্রহ্মপদ লাভ করে।

.

বিংশ অধ্যায়

স্বায়ম্ভব মনুর বংশানুসরণ

লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা ভাবময়ী তনু ত্যাগ করে নিজেকে কৃতকার্য মনে করলেন এবং মনের দ্বারা সর্বলোক পালক মনুদের সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মা নিজের সৃষ্ট পুরুষাকার শরীর তাদের সমর্পণ করলেন। যাঁরা আগে সৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরা ঐ মনুদের দেখে ব্রহ্মার প্রশংসা করতে লাগলেন। বললেন–হে জগস্রষ্টা, আপনি উত্তম কাজ করেছেন। মনু সৃষ্টি হওয়ার ফলে অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরাও এদের সাথে একত্রে সেই যজ্ঞের হবিভাগদি ভক্ষণ করতে পারব।

তপস্যা, উপাসনা, যোগ, বৈরাগ্য এবং অনিমাদি ঐশ্বর্য যুক্ত সমাধি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করলেন। পরে বেদষ্টা ব্রহ্মা নিজের অভিমত ঋষিদের সৃষ্টি করলেন।

.

একবিংশ অধ্যায়

কর্দম ঋষির সাথে মনুকন্যা দেবহুতির বিবাহ সম্বন্ধ।

ব্রহ্মার আদেশে প্রজাসৃষ্টি কল্পে ঋষি কর্দম সরস্বতী নদীর তীরে দশ হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন। তিনি ভক্তি সহকারে শরণাগতের বরদাতা ভগবান শ্রী হরির আরাধনা করতে লাগলেন।

ভগবান হরি প্রীত হয়ে বললেন– হে বিপ্র, ধনু রাজর্ষি মনু, মহিষী শতরূপার সাথে তাঁদের রূপ লাবণ্যবতী পরমা সুন্দরী কন্যার জন্য বিবাহ-সম্বন্ধ করতে আসবেন। তোমাকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করবে। ভার্যার জন্য তোমার হৃদয় বহুবৎসর ধরে সমাহিত হয়েছে। এবার সেই রাজকন্যা তোমার অভিপ্রায় পূরণ করবে। তোমার বীর্য ধারণ করে সেই কন্যা নয়টি কন্যার জন্ম দেবে। মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ সেই কন্যাদের গর্ভে পুত্রাধান করবেন।

উপদেশ দান করে ভগবান অন্তর্হিত হলেন। বিন্দু সরোবরের তীরে নিজ আশ্রমে ঋষি কর্ম অবস্থান করতে লাগলেন। এই সময় স্বায়ম্ভুব মনু, ভার্য্যা ও নিজ কন্যার সহিত আকাশযানে

পৃথিবী পর্যটন করতে করতে ভগবানের নির্দিষ্ট দিনে কর্দম মুনির আশ্রমে এলেন এবং তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

মহর্ষি কর্দম আদিরাজ মনুর জ্ঞান ও কর্মের উৎকর্ষ দেখে তাঁর প্রশংসা করলেন। সম্রাট মনু নিজের প্রশংসায় লজ্জিত হলেন। তারপর আগমনের হেতু জানিয়ে কন্যা দেবহূতিকে দেখিয়ে বললেন–আমার কন্যা অতীব গুণসম্পন্না। দেবর্ষি নারদের কাছে আপনার কুল, শীল, বিদ্যা ও রূপের প্রশংসা শুনে আপনাকে স্বামীত্বে বরণ করতে অভিলাষী। অতএব আমি শ্রদ্ধা সহকারে উপহার স্বরূপ এই কন্যা আপনাকে সম্প্রদান করতে চাই।

মুনি কদম বললেন– আমি এ বিবাহে রাজি। তবে যতকাল এই কন্যার সন্তানোৎপত্তি না হয় ততকাল আমি গার্হস্থ পালন করব। তারপর ভগবানের আদেশে আমি সন্ন্যাস ধর্ম পালন করতে চলে যাব।

অবশেষে রাজা মনু হৃষ্টমনে বহুগুণশালী সেই কদম ঋষিকে অনুরূপ গুণসম্পন্ন কন্যা সম্প্রদান করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ফিরে গেলেন মহিষ্মতী নামক পুরীতে। সেখানে স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সংযুক্তিতে বিবিধ বিষয় ভোগ করতে লাগলেন।

.

দ্বাবিংশ অধ্যায়

?

.

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

আকাশযোগে কর্দম ও দেবাহুতির রতিক্রীড়া

পতির অভিপ্রায় জেনে সাধ্বী দেবাহুতি ভবানীর ন্যায় ঋষি কর্দমের সেবা করতে লাগলেন। তিনি দেব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পতির কাছে পরামার্শীবাদ লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। ব্রতাচরণে তিনি ক্ষীণ হয়েছিলেন। তিনি স্বামীর কাছে পুত্রকামনা করলেন।

পত্নীর প্রার্থনা পূরণ করতে ঋষি কর্ম প্রিয়াকে নিয়ে দিব্য বিমানে উঠে বসলেন। তার আগে ঋষিপত্নী দেবাহুতিকে সরস্বতীর নির্মল জলে স্নান করে আসতে বললেন। জলে প্রবেশ করেই দেবাহুতি আশ্চর্য হলেন। দশশত তরুণ সুন্দরী কন্যা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তার দেবাহুতিকে স্নান করিয়ে নির্মল শুদ্ধ বস্ত্র পরিয়ে সালংকারা সাজে সাজিয়ে দিল।

দেবাহুতি নিজের প্রিয় পতিকে স্মরণ করলেন। দেখলেন– ঋষিশ্রেষ্ঠ কর্ম সহস্র কন্যা পরিবৃত হয়ে উপস্থিত রয়েছেন সেখানেই।

প্রেয়সীর রূপ দেখে মুনিবর হৃষ্টচিত্তে ভার্যার হাত ধরলেন। তারপর স্ত্রীগণ পরিবৃত হয়ে রমণ ক্রীড়া করলেন। দেবাহুতিও সেই বিমানে রতির উৎকৃষ্ট শয্যায় রমণরতা থাকতে থাকতে বহুকাল অতীত হলেও জানতে পারলেন না।

ঋষি কর্দম পত্নীকে গ্রহণ যোগ্যা চিন্তা করে নিজেকে নয় প্রকারে বিভক্ত করে পত্নী গর্ভে বীর্যদান করলেন। কারণ দেবাহুতির বহুসন্তানের বাসনা জেগেছিল। তারপর ঋষি কর্দম প্রবজ্যা আশ্রমে যেতে উদ্যত হলেন।

ঋষি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম নিয়ে অন্যত্র চলে যাবেন– এই ভাবনায় দেবাহুতি অন্তরে ব্যাকুল হলেন। কন্যাদের বিবাহ হলে তিনি একাকী হয়ে পড়বেন। নিঃসঙ্গতা অনুভব করবেন। তিনি তাই স্বামীর কাছে প্রার্থনা করলেন, তাঁর এই নিঃসঙ্গতা দূরীভূত করতে।

.

চতুর্বিংশ অধ্যায়

দেবাহুতির গর্ভে কপিলদেবের জন্ম

ভগবানের বাক্য স্মরণ করতে মুনিবর কর্দম বললেন– অমর অর্থাৎ বিনাশাদি শূন্য ভগবান অতি শীঘ্রই তোমার গর্ভে প্রবেশ করবেন। তোমার দ্বারা আরাধিত হয়ে সেই পরমবিশুদ্ধ ভগবান তোমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন এবং তোমার হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন করবেন।

মুনিবর কদম তার কন্যাদের ঋষিগণের হাতে সম্প্রদান করলেন। মরীচি-কলা, অত্রি-অনসূয়া, অণিরো-শ্রদ্ধা, পুলস্ত্য-হর্বিভূ, পুলহ-গতি, ক্রতু-ক্রিয়া, ভৃগু-খ্যাতি, বশিষ্ঠ-অরুন্ধতী সমর্পিত হল।

প্রজাপতি কর্দম দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে নিজগৃহে অবতীর্ণ জেনে তাঁর অনুজ্ঞাত হয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করতে বলে প্রজ্যা গমন করলেন।

তত্ত্ব সকলের সংখ্যা কর্তা অর্থাৎ সাংখ্য শাস্ত্র-প্রবর্তক ভগবান কপিল দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন।

.

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

মায়ের সামনে ভগবানের উৎকৃষ্ট ভক্তির লক্ষন বর্ণনা

একদিন দেবাহুতি পুত্রের নিকট গিয়ে বললেন– হে পুত্র, আমি অসৎ বাসনা পূরণ করতে অন্ধতম অজ্ঞান অন্ধকারে পতিত হয়েছিলাম। কিন্তু আজ ভগবানের কৃপায় তোমাকে লাভ করেছি। যে ভক্তির দ্বারা তোমার নির্বাণ অর্থাৎ মোক্ষাত্মক পদ প্রাপ্ত হতে পারি, সেই ভক্তিতত্ত্ব আমাকে বলল।

ভগবান কপিলদেব দেবাহুতির ঐ ধরনের সংখ্যা শ্রবণাত্মক অভিপ্রায় জেনে তাকে বললেন– মা, আমিই ভগবান। আমি প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বারা উৎপন্ন। আমি সকল প্রাণীর আত্মা, আমি ছাড়া অন্য কারো দ্বারা সংসার ভয় নিবৃত্ত হয় না। আমার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য তাপ দেয়, ইন্দ্র বারিবর্ষণ করে, অগ্নি দগ্ধ করে, মৃত্যু প্রাণীর প্রতি ধাবিত হয়। সকলেই নিজ নিজ কাজে সাবধান থাকে। যোগীগণ জ্ঞান বৈরাগ্যমূলক ভক্তি যোগ দ্বারা নিজ নিজ মঙ্গলের জন্য আমার অভয় পদ পাদমূলের সেবা করে যাবেন। দৃঢ় ভক্তিযোগের দ্বারা আমাতে মন অর্পিত হয়ে যদি সুস্থির হয়, তবে তাই জীবগণের পরম পুরুষার্থ।

.

ষড়বিংশ অধ্যায়

সাংখ্যযোগ কথা

মহদাদি সপ্ত পদার্থ পরস্পর মিলিত না হয়ে অবস্থান করলে জগতের আদি ভগবান কাল, কর্ম ও সত্ত্বাদি গুণযুক্ত হয়ে ঐ সপ্ত পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তার মধ্যে ঐ সকল পদার্থ

একাকার হয়ে পরস্পর মিলিত হল। সেই সকল হতে একটি অচেতন অণ্ড উৎপন্ন হল এবং তা ক্রমশ এক বিরাট পুরুষে রূপান্তরিত হল। দেবতারা আবির্ভূত হয়েও ঐ বিরাট পুরুষকে উত্থিত করতে পারলেন না। সমুদ্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণার দ্বারা উদর আশ্রয়ে করল। কিন্তু সেই বিরাট পুরুষ উঠলেন না। ব্রহ্মা বুদ্ধির দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করলেও তিনি উঠলেন না।

অভিমান ভরে রুদ্র সেই হৃদয়ে প্রবেশ করলেও তিনি উঠলেন না। অবশেষে ক্ষেত্রজ্ঞ চিত্ত দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করার পর সেই বিরাট পুরুষ সলিল হতে উত্থিত হলেন। প্রাণ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এরা যেমন চিত্তাধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর বাদে প্রসুপ্ত পুরুষকে জাগরিত করতে সমর্থ হয় না, তেমনই দেবতারা ক্ষেত্রজ্ঞ চিত্ত বাদে সেই বিরাট পুরুষকে ওঠাতে পারলেন না। অতএব যোগযুক্ত বুদ্ধি ভক্তি। বৈরাগ্য ও জ্ঞানের দ্বারা এই জীবাত্মাতে সেই পরমেশ্বরের বিবেচনা পূর্বক চিন্তা করা উচিত।

.

সপ্তবিংশ অধ্যায়

পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বারা মোক্ষলাভ বর্ণনা

পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে আশ্রয়-আশ্রিত ভাবে নিত্য সংযোগ রয়েছে। তবে কী প্রকারে প্রকৃতি মুক্তি পেতে পারে। কী ভাবে পুরুষ মুক্তি পেতে পারে? ভগবান কপিলদেব বললেন–নিষ্কাম কর্ম, নির্মল মন আমার কথা শ্রবণের দ্বারা পরিপুষ্ট মদ্বিষয়ক তীব্র ভক্তি যোগ, তত্ত্বজ্ঞান প্রবল বৈরাগ্য এবং তীব্র আত্মসমাধির দ্বারা প্রকৃতি অহর্নিশ করবার আত্তিভূয়মান হয়ে পুরুষের নিকট হতে তিরোহিত হতে পারে।

তখন প্রকৃতির ভোগ মুক্ত হয়েছে, এরূপ মনে করে পুরুষ সকল সময় তার দোষের প্রতি লক্ষ্য করতে থাকেন। এইভাবে প্রকৃতি পরিত্যক্ত হওয়ায়, নিজ মহিমায় অবস্থিত পুরুষের আর অশুভ জন্মাতে সমর্থ হয় না। পুরুষ যখন তত্ত্বজ্ঞ হয়ে আমার প্রতি মনসংযোগ করে আত্মারাম হন, তখন আর প্রকৃতি তার অপকার করতে পারে না। এই ভাবে বহু জন্মে আমার প্রসাদে আত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ পুরুষ কৈবল্যধামের আশাতেই আশ্রয় পায়।

.

অষ্টবিংশ অধ্যায়

সাংখ্যযোগের বিবরণ কথন

যে বিধির দ্বারা মন বিশুদ্ধ হয়ে সৎপথে অর্থাৎ সৎ-স্বরূপ ভগবানের পথে গমন করে স্থির হয়ে থাকে, তাই হল স্বাবলম্বন যোগ। হিতাসন হয়ে পবিত্র স্থানে উপবেশন করে প্রাণসংযমের জ্ঞান করতে হয়। চিত্তকে শুদ্ধি করবে। তারপর সর্বান্তযামী ভগবানের মূর্তি কল্পনা করে ধ্যান করবে। এইভাবে ধ্যান করার ফলে ভগবান হরির প্রতি যোগীর প্রেম জন্মায় এবং ভক্তিবশত হৃদয় বিগলিত হতে থাকে।

অঙ্গ পুলকিত হয়ে ওঠে। চিত্ত নির্বিষয় হলে আশ্রয় হীন হয়। তার মন তেমন যোগাভ্যাস জনিত অবিদ্যা বর্জিত চরম নিবৃত্তির দ্বারা সুখ-দুঃখাতীত ব্রহ্মরূপ মহিমায় নিষ্ঠালাভ করে। যোগী সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সকল ভূতকে অনন্যভাবে দেখে থাকেন। যোগী ব্যাক্তি আত্মপ্রাসাদ দ্বারা জীবের বন্ধকরণ ও বিষ্ণুর শক্তিরূপ সদসদাত্মিকা ঐ দুবিভাজ্য প্রকৃতিতে জয় করে ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিত হন।

.

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

বহুপ্রকার ভক্তিযোগ ও ঘোরর সংসার বর্ণনা

বিশেষ বিশেষ মার্গ দ্বারা ভক্তি যোগের প্রকার। স্বাভাবিক বৃত্তিভেদে পুরুষের ভক্তির ভেদ হয় যেমন–তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক। যাঁরা আমার সেবা ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করতে চান না। এই প্রকারের ভক্তি যোগ হল তাত্যেন্তিক। এর থেকে পরম পুরুষার্থ আর কিছু নেই। আমার প্রতিমাদির দর্শন, স্পর্শন, পূজা, স্তব, বন্দনা সবই শাস্ত্রবিধি অনুসারে করতে হবে।

সত্যের সঙ্গ নেবে অহংকার দূর করবে। সকল প্রাণীতে আমি বর্তমান। আমি সকলের আত্মা ও ঈশ্বর। যে ব্যক্তি মূর্খত বশতঃ আমাকে পরিত্যাগ করে প্রতিমা পূজা করে তার সবকিছু নিরর্থক হয়। অতএব পুরুষের কর্তব্য, আমাকে সর্বভূতের অন্তর্যামী এবং সকল প্রাণীতে অবস্থিত জেনে দান মান ও সকলের সাথে মিত্রতা ও সমদৃষ্টির দ্বারা সকলকে অর্চনা করা।

সর্বত্যাগী জ্ঞানী পুরুষ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলেও ধর্মের ও ফলোভের কোনো আকাঙ্ক্ষা তার থাকে না। যে ব্যক্তি যেমন, কর্ম, সেই কর্মের ফল ও দেহ আমাকে সমর্পণ করে যাবেন। তাই সে আমার সঙ্গে সর্বদা যুক্ত বলে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এই বিশ্ব চরাচর যাঁদের বশে রয়েছে সেই গুণাভিমানী ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁর ভয়ে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কাজ প্রতি কল্পে বারবার প্রবর্তিত হচ্ছেন। সেই কাল পিত্রাদির দ্বারা পুত্রাদি উৎপন্ন করে থাকেন। তিনি মৃত্যুর দ্বারা যমকেও বিনাশ করে যাবেন। তিনি সকলের অধিকর্তা। অনন্ত, অনাদি ও অব্যয়।

.

ত্রিংশ অধ্যায়

অধার্মিকদের তামসীগতি বর্ণনা

যে ব্যক্তি সৎসঙ্গরহিত এবং বৃদ্ধসেবায় পরাভুখ, কেবল সংসার, আত্মীয় পরিজনের প্রতি আসক্ত। ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করে না, সে তামসী গতি লাভ করে। তারা গুরুতর হিংসার বশবর্তী হয়। সংসার প্রতিপালনের জন্য নানা স্থান থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। পরের ধনে স্পৃহা জাগে। পুত্রকন্যাদির ভরণ পোষণ ইত্যাদি দুশ্চিন্তায় তার সর্বাঙ্গ দগ্ধ হয়। এবং সে বৃদ্ধ হলে সংসার প্রতিপালন করার ক্ষমতাও হারায়।

সংসারের কেউ তখন তাকে আগের মতো আদর করে না, কিন্তু তাতেও তার নির্বেদ হয় না। গৃহে অবস্থান কালে জরার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এক সময় তার মৃত্যু হয়। যমদূতরা এসে প্রহার করতে করতে তাকে নিয়ে যায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণায় সে কাতর হয়। মূর্ছা যায় ঘন ঘন। যমালয়ে আনা হলে মাংসাশী প্রাণীরা তার দেহের মাংস খুবলে খায়।

নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। কোথাও পর্বত হতে ফেলে দেওয়া হয়। কোথাও হাতির পায়ের তলায় ফেলে দলিত করা হয়। কখনও পরিপূর্ণ জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে সে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু যাদের জন্য সে পাপাঁচরণ করে তাদের নরক স্পর্শ করতে পারে না। কর্মফল ভোগ হলে পাপ ক্ষীণ হবে। তখন সে আবার জন্ম নেয়।

.

একত্রিংশ অধ্যায়

নরকযোনি প্রাপ্তিরূপ জাতির বর্ণনা

মাতৃগর্ভস্থ জীব পরমেশ্বরের স্তব করতে থাকে। সে বহির্গত হতে চায় না। কারণ বাইরে মাতৃজঠরের চেয়েও অন্ধকূপ রয়েছে। তখন প্রসবের মূল কারণ ভূতবায়ু তাকে অধোমুখে প্রসবের জন্য প্রেরণ করে, অতিকষ্টে নির্গত হয়। এই সময় তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ থাকে। ভূমিতে পড়ে রক্তাক্ত দেহে কৃমির মতো অঙ্গ সঞ্চালন করতে থাকে। জীব পাঁচ বছর কাল পর্যন্ত শৈশব দুঃখ ভোগ করে।

তারপর হয় অধ্যায় গতি দুঃখ। যৌবনকালে পদার্পণ করে অভীপ্সিত অর্থ লাভ না করায় তার মনে জন্ম নেয় অভিমান, ক্রোধ, শোক। কর্মে আবদ্ধ হয়ে সে সংসারী হয়। সৎপথে থেকেও যদি কোনো অসৎপুরুষের সংসর্গ করে তাহলে আবার নরকে প্রবেশ করতে হয়। আবার অসাধু লোকের সঙ্গ অপেক্ষা যোষিঙসঙ্গ এবং যোষিসঙ্গীর সঙ্গ অতীব অনিষ্টকর। জীবের উপাধি স্বরূপ একটি লিঙ্গদেহ আছে। সেই দেহের সাথে জীব একলোক হতে অন্য লোকে গমন করে এবং ফলভোগ করে নিরন্তর কর্মসমূহ তারপর অভিমান, তাহলে আসঙ্গ অত

.

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ঊর্ধ্বগতি ও পুনরাবৃত্তি বর্ণনা

অনন্তশায়ী শয্যায় শায়িত হরি সর্পশয্যায় শয়ন করলে গৃহ যোগিদের সমস্ত লোকই লয়প্রাপ্ত হয়ে যায়। সে সকল পুরুষ পরমেশ্বর বুদ্ধিতে হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করে। তারাও ক্রমে ক্রমে তৎ প্রাপ্তি হয়। সেই সঙ্গে পরমানন্দ স্বরূপ সর্বোৎকৃষ্ট পুরাণ পুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ভগবান সর্ব প্রাণীর হৃদয়ে বাস করেন। তাই ভক্তি ভাবে তারই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। সকলের অন্তর্যামী ভগবান বাসুদেব ভক্তি যোগ নিরন্তর অনুষ্ঠিত হলে শীঘ্রই বৈরাগ্য ও ব্রহ্মা-সাক্ষাৎকারক জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

যে ব্যক্তির মন সমাহিত এবং যিনি সঙ্গরহিত ও সংসারে বিরক্ত। তিনি শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং যোগ্যভ্যাস দ্বারা নিত্য ব্রহ্মাকে দেখতে পান, তাঁর ঐ প্রপঞ্চ মান হয় না, বিজ্ঞন জ্ঞান যোগ এবং সদ্বিষয়ব ভক্তিরূপ যে যোগ এই উভয়ের একই প্রয়োজন অর্থাৎ এই দুয়েতেই ভগবান লাভ করা যায়।

.

ত্রিত্রিংশ অধ্যায়

দেবাহুতির জ্ঞানলাভ

পুত্র ভগবান কপিলদেবের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে মাতা দেবাহুতির আত্মার অধ্যাস্বরূপ আবরণ বিদূরিত হল। তিনি সাংখ্যাজ্ঞান প্রবর্তক ভগবান কপিলকে প্রণাম করে স্তব করতে লগলেন।

–হে ভগবান, তোমার এই প্রকটিত বপু, সমস্ত, ভূত, ইন্দ্রিয়, আত্মা ও মন– এ সকল ব্যাপ্ত। তুমি এই মূর্তিতে আপন ইচ্ছায় অঙ্গীকার করছি। তোমারেই তেজে গুণ প্রবাহ বিনষ্ট হয়। প্রলয়কালে তোমার গর্ভে বেদসকল রক্ষিত ছিল। তুমিই কপিল নামধারী শ্রীবিষ্ণু। তোমাকে প্রণাম করি।

ভগবান কপিল বললেন–আপনি আমার ধর্মোপদেশ পালন করে সুখভোগ করুন। এর দ্বারা অচিরেই জীবমুক্তি প্রাপ্ত হবেন। আমার মত ব্রহ্মবাদী মুনিগণের অনুষ্ঠেয় কর্ম-করুন, যারা আমার মত বিদিত নয়, তারা আবার সংসারে পতিত হয়। এইভাবে কামনীয় আত্মা-লাভের উপায় প্রদর্শন করে ব্রহ্মবাদিনী অনুমতি নিয়ে ভগবান কপিলদেব ফিরে গেলেন নিজ ধামে।

ভক্তি প্রবাহরূপ যোগ ও প্রবল বৈরাগ্য, পরিমিত আহার– বিহারাদির অনুষ্ঠান এবং ব্রহ্মস্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান এই সকলদ্বারা বিশুদ্ধ মনে যাঁর মায়া গুন জনিত দেহাত্মবুদ্ধি তিরোহিত হয়। সর্বজ্ঞ সেই আত্মার ধ্যান করতে লাগলেন মুনি কর্দম পত্নী দেবাহুতি। এই ভাবে কপিলক্তো যোগ দ্বারা দেবাহুতি অচিরেই নিত্যমুক্ত পরমব্রহ্মা আত্মস্বরূপ সেই ভগবানকে লাভ করলেন।

চতুর্থ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

মনুকন্যাদের পৃথক পৃথক বংশ বর্ণনা

মৈত্রেয় বললেন– হে বিদুর। স্বায়ম্ভুব মনুর ভার্য্যা শতরূপার গর্ভে তিনটি কন্যার জন্ম হয়। তারা হলেন–আকৃতি, দেবাহুতি এবং প্রসূতি। এছাড়াও তাদের দুই পুত্রের জন্ম হয়।

মহারাজ মনু তার পত্নী শতরূপার সম্মতি নিয়ে আকূতিকে তার ভ্রাতা বর্তমানেও পুত্রিকা ধর্মের আশ্রয় নিয়ে রুচির হস্তে সমর্পণ করেন।

পুত্রিকা ধর্ম অনুসারে সমর্পণের অর্থ হল- আমার এ কন্যা ভ্রাতৃহীনা। একে সালঙ্কারে প্রদান করছি। এর গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হবে সে পুত্র আমার– এরকম শর্তপূর্বক সম্প্রদানই পুত্রিকা বর্ণ। এখানে মনু পুত্র-বাহুল্য কামনায় ভ্রাতৃমতী কন্যাকেও পত্রিকা নিয়মে সম্প্রদান করেন।

প্রজাপতি রুচি ছিলেন ব্রহ্মতেজের অধিকারী। তিনি পরমেশ্বরের ধ্যানের মাধ্যমে এই শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন।

তিনি আকৃতির গর্ভে মিথুন অর্থাৎ একটি পুত্র এবং এক কন্যার জন্ম দেন।

এই দুই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পুরুষটি হলেন সাক্ষাৎ বিষ্ণু। তিনি যজ্ঞমূর্তি ধারণ পূর্বক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। স্ত্রী অংশটি হলেন দক্ষিণা। তিনি লক্ষ্মীর অংশরূপা বিষ্ণুর নিত্যশক্তি। অতএব তাদের পরস্পর বিবাহ বিরুদ্ধ হয়নি।

স্বায়ম্ভব মনু অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আকূতি পুত্র অতীব তেজস্বী যজ্ঞকে স্বীয় গৃহে আনয়ন করলেন। প্রজাপতি রুচি কেবলমাত্র কন্যা দক্ষিণাকে নিয়ে সন্তষ্ট থাকলেন।

এরপর যজ্ঞ যিনি সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বরূপ তিনি দক্ষিণাকে বিবাহ করলেন। কারণ দক্ষিণা তাকেই বিবাহ করতে অভিলাষিণী ছিলেন।

অতঃপর যজ্ঞরূপী স্বীয় পত্নী ও অনুরাগবতী তুষ্টার দক্ষিণার গর্ভে দ্বাদশ সন্তানের জন্ম দেন। তাদের নাম হল–তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইদ্ম, কবি, বিভু, স্বাহ্ন, সুদেব ও রোদন।

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই দুইজন পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্রদের বংশ বিস্তারের মাধ্যমে ঐ মন্বন্তর ব্যপ্ত হয়েছিলেন।

প্রতিটি মন্বন্তরে এক মনু, দেবতা, ইন্দ্র, সপ্তর্ষি ও ভগবান বিষ্ণুর অবতার রূপ অংশ– এই ছয় প্রকার সৃষ্টি হয়।

বৎস বিদুর, মনু তার নিজ কন্যা দেবাহুতিকে ঋষি কর্দমের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। তাদের আখ্যানের প্রায় সমস্ত কাহিনিই তুমি শ্রুত হয়েছ। তবে দেবাহুতির বংশবিস্তার সম্পর্কে এখনও তোমায় কিছু বলিনি।

ভগবান মনু তার প্রসূতি নামক কনিষ্ঠা কন্যাকে ব্রহ্মপুত্র প্রজাপতি দক্ষের হাতে সম্প্রদান করেছিলেন। ঐ প্রসূতির কৃত সৃষ্টিই ত্রিভুবনে বিরাজ করছে। কর্দম ঋষির নয়জন কন্যার সঙ্গে নয়জন ব্রহ্মর্ষিক বর্ণনা পূর্বেই করেছি। এবার তাদের পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে বংশ বিস্তারের কথা বর্ণনা করছি, তুমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

কর্ম কন্যা যিনি, মরিচীর সঙ্গে বিবাহে সম্বন্ধিত হয়েছিলেন। তার গর্ভে কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছিল। তাদের বংশধরগণে জগৎ পরিপূর্ণ হয়েছিল।

হে বিদুর। পূর্ণিমা বিরজ এবং বিশ্বগ নামে দুইপুত্র এবং দেবকুল্যা নামে একটি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন। এই দেবকুল্যাই জন্মান্তরে শ্রীহরির পদ প্রক্ষালন থেকে জগতে পুণ্যসলিলা গঙ্গারূপে বহমানা হয়েছিলেন।

অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়া বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার অংশভূত মহাযশস্বী ও তেজস্বী–দত্ত, দুর্বাসা ও সোম নামক তিনটি পুত্র প্রসব করেছিলেন। বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন –হে গুরুদেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র তিন সুর শ্রেষ্ঠ বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের নিয়ন্তা। তারা কি অভিপ্রায়ে অত্রিগৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন।

মৈত্রেয় বললেন– প্রজা সৃষ্টির বিষয়ে ব্রহ্মার আদেশ পেয়ে ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অত্রিমুনি পত্নী অনসূয়ার সাথে ঋক্ষ নামক কুল পর্বতে গমন করে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

সেই ঋক্ষ পর্বতের এক প্রদেশে একটি মনোহর উদ্যান ছিল। সেখানে পলাশ ও অশোক বৃক্ষরাজিতে স্তবকে স্তবকে পুষ্প শোভিত ছিল। এর নিকটবর্তী বহমান নদীর নাম ছিল নির্বিন্ধ্যা। এই নদীর জল প্রবাহের মধুর শব্দে চতুর্দিক মুখরিত থাকত।

মুনিবর অত্রি সেই উদ্যানে তপস্যায় রত ছিলেন। তিনি প্রাণায়াম দ্বারা মনকে সংযত করে, মনে মনে উচ্চারণ করলেন"যিনি এই জগতের ঈশ্বর, সেই প্রভুর শরণ নিলাম। তিনি আমাকে আত্মতুল্য প্রজা দান করুন, এই চিন্তা মনে মনে করে শতবর্ষব্যাপী একপদে দণ্ডায়মান হয়ে তপস্যা করলেন। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার শীত-উষ্ণ-বর্ষা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব জনিত দুঃখ অনুভূত হয়নি। সেই সময় তিনি শুধুমাত্র বায়ুসেবন করে জীবন ধারণ করতেন।

অত্রিমুনির মস্তক থেকে নির্গত প্রাণায়াম রূপ ইন্ধনের যোগে উদ্দীপ্ত বহ্নিদ্বারা ত্রিভুবনে সন্তপ্ত হল। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে অপ্সরা, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও নাগ গণের সঙ্গে প্রথিত যশ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সে আশ্রমে গমন করলেন।

তাঁদের আর্বিভাব হওয়া মাত্রই মহর্ষি অত্রি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি পূর্বাবস্থায় অবস্থানরত হয়েই অর্থাৎ একপদে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সেই শ্রেষ্ঠ দেবগণকে দর্শন করতে থাকলেন। মহাদেব ছিলেন বৃষপৃষ্ঠে আরোহনকারী, তার হস্তে ত্রিশূল বর্তমান ছিল।

ব্রহ্মা ছিলেন হংসারুঢ়, তাঁর হস্তে ধৃত কমণ্ডলু ও শ্রীমুখে প্রসন্ন দৃষ্টি।

বিষ্ণু গরুড়ের স্কন্ধোপরি আরোহণ পূর্বক আগমন করেছিলেন। তার হস্তে শোভিত ছিল সুদর্শন চক্র। এই দেবত্রয়ীর প্রত্যেকের শ্রীমুখে ছিল করুণাপূর্ণ দৃষ্টি ও মৃদু হাসি।

তখন অত্রি ভূমিতে প্রণিপাত করে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন, দেবগণের সুতীব্র তেজে অত্রিমুনির নয়নদ্বয় মুদিত হল। তিনি মুদিত আঁখিতে তাঁদের প্রণাম করলেন। তাদের প্রতি একাগ্রভাবে মনঃ সংযোগ করে কৃতাঞ্জলি পুটে সর্বলোক পূজিত দেবত্রয়কে মধুর অথচ গভীর অর্থদ্যোতক বাক্য দ্বারা স্তব করতে লাগলেন।

অত্রি বললেন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, আমি আপনাদের প্রণাম জানাচ্ছি। আপনারা প্রতি কল্পে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিয়ন্তা। মায়া গুণ বিভাগ পূর্বক আপনারা এই পবিত্র দেহ ধারণ করেছেন।

আমি আপনাদের মধ্যে কাকে, আহ্বান করেছিলাম, তা আপনারা জ্ঞাত আছেন। আমি পুত্র লাভের নিমিত্তে বিবিধ পুজোপ্রকারে একমাত্র দেবশ্রেষ্ঠ ভগবানকে চিত্তমধ্যে স্মরণ করেছিলাম। দেহধারীগণের মনেরও অগোচর আপনারা ত্রয়ী এখানে কীসের নিমিত্ত আগমন

করলেন? একজনের চিন্তায় তিনজনের আগমন আমার হৃদয়ে পরম বিস্ময়ের উদ্রেক হয়েছে। এ বিষয়ে আপনাদের আগমনের কারণ বলুন।

মৈত্রেয় বললেন– বৎস বিদুর। অত্রিমুনির এরূপ নিষ্কপট বাক্যাবলী শুনে দেবশ্রেষ্ঠ ত্রয়ী তাঁকে সহাস্যবদনে উত্তর দিলেন। তাঁরা বললেন– হে ব্রাহ্মণ, তোমার সংকল্প অতি সৎ। তোমার সংকল্প অনুসারেই অভীষ্ট লাভ করবে। তার অন্যথা হবে না।

তুমি যে এক জগদীশ্বরাখ্য তত্ত্বের চিন্তা করছিলে– আমার ত্রয়ী সেই এক তত্ত্ব। আমাদের পরস্পরিক ভেদ নেই। হে মুনি, তোমার কল্যাণ হোক। আমাদের প্রত্যেকের অংশে তোমার বিখ্যাত তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। তাদের দ্বারা তোমার যশ ত্রিলোক ব্যাপ্ত হবে। এভাবে মুনির অভীষ্ট বর তারা প্রদান করলেন। মুনি পত্নী অনসূয়া তাদের ভক্তিভরে ও বিবিধ উপাচারে পূজা করলেন।

ঋষি দম্পতি দ্বারা সম্যকভাবে পূজিত হয়ে সুর ঈশ্বর ত্রয়ী সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। অত্রির পত্নী অনসূয়ার গর্ভে ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে যোগশাস্ত্রবেত্তা দত্ত ও শংকরের অংশে দুর্বাসা জন্মগ্রহণ করলেন।

এবারে তোমরা ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র অঙ্গিরা এবং কর্ম কন্যা শ্রদ্ধার কথা শ্রবণ কর। অঙ্গিরার পত্নী শ্রদ্ধা চারটি কন্যাসন্তান প্রসব করেন। তারা সিনীবালী (কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী অভিমানিনী) অনুমতি (শুক্ল পক্ষের চতুর্দশী অভিমানিনী), কুহু (অমাবস্যা অভিমানিনী) এবং রাকা হলেন (পৌর্ণ মাসীর অভিমানিনী)।

চার কন্যা ছাড়াও তাদের আরও দুই পুত্র ছিল। তারা হলেন সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার। স্বারোচিষ মন্বন্তরে তারা সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার উতথ্য ও ব্রহ্মজ্ঞ বৃহস্পতি নামে বিখ্যাত ছিলেন। কর্দম কন্যা হবির্ভু ও ঋষি পুলস্ত্যের দাম্পত্যে, অগস্ত্য নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। এই অগস্ত্যই অন্য জন্মে জঠরাগ্নি রূপে আর্বিভূত হন।

প্রজাপতির পুলস্ত্যের আর একটি পুত্র ছিল, তাঁর নাম ছিল বিশ্রবা। তিনি তপস্বী হিসাবে খ্যাত ছিলেন। বিশবার পত্নী ছিলেন ইলবিলা। তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন যক্ষপতি কুবের। বিশবার অপর পত্নীর নাম ছিল কেশিনী। তাঁর ছিল তিনটি পুত্র। তাদের নাম ছিল–রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। পুলহ ঋষির পত্নীর নাম ছিল গতি। তার তিন পুত্রের নাম ছিল কর্মশ্রেষ্ঠ, বরীয়ান ও সহিষ্ণু।

প্রজাপতি ক্রতুর পত্নীর নাম ছিল ক্রিয়া। তিনি ব্রহ্মতেজে বলীয়ান, বালখিল্য নামে ষাট হাজার ঋষির জন্মে দিয়েছিলেন।

হে শত্রুনাশন বিদুর, বশিষ্ঠের এক পত্নী ঊর্জা গর্ভে চিত্রকেতু প্রভৃতি সাত জন পুত্রের জন্ম হয়। তারা পবিত্রচিত্ত সপ্তর্ষি নামে পরিচিত। তাঁদের নাম হল–চিত্রকেতু, সুরোচি, বিরজা, মিত্র, উল্বণ, বসুভূদ্যান এবং দ্যুম্ন।

এছাড়াও বশিষ্ঠের অপর একজন পত্নীর গর্ভে শক্তি প্রভৃতি পুত্রাদির জন্ম হয়। অথবা ঋষির পত্নীর নাম ছিল চিত্তি। তার গর্ভে দধীচি নামক এক পুত্র জন্মায়। তার আর এক নাম ছিল অশ্বশিরা। তিনি তপস্যায় সিদ্ধ ছিলেন।

এরপর আমার কাছ থেকে ভৃগুমুনির বংশবিস্তার শোন, ভৃগু ঋষির ঔরসে তার পত্নী খ্যাতির সঙ্গে ধাতা ও বিধাতা নামে দুই পুত্র জন্মায়। তার একটি কন্যাও ছিল। তার নাম ছিল শ্রী। তিনি অত্যন্ত ভগবৎ পরায়ণা ছিলেন। ঐ কন্যা ভগবান নারায়ণকে পতিরূপে বরণ করেছিলেন। সুমেরু পর্বতাভিমনী দেবতা মেরু তার আয়তি ও নিয়তি নামক দুই কন্যাকে ধাতা ও বিধাতার হাতে সম্প্রদান করেন। ঐ দুই কন্যার গর্ভে ধাতা ও বিধাতার ঔরসে মৃক ও প্রাণ নামে দুটি পুত্রের জন্ম হয়। ঐ মৃকণ্ডের পুত্র। মার্কণ্ডেয় এবং প্রাণের সন্তান হল বেদশিরা। ভৃগুমুনির কবি নামে আর একটি পুত্রের জন্ম হয়। তার পুত্রের নাম হল ভগবান উশনা বা শুক্রাচার্য।

হে বিদুর। ঐ মুনিবৃন্দ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্তে বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। তোমার কাছে এতক্ষণ কর্ম ঋষির দৌহিত্র বংশের কীর্তন করলাম। শ্রদ্ধাপূর্বক ইহা শ্রবণ করলে সকল পাপের উপশম হয়।

ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ মনুর তৃতীয় কন্যা প্রসূতির সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি প্রসূতির গর্ভে ষোলোটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন নির্মল লোচনা। প্রজাপতি দক্ষ তাদের মধ্যে তেরোজনকে ধর্মের হাতে সমর্পণ করেন। এক মেয়েকে তিনি অগ্নির হাতে, একজনকে সম্মিলিত পিতৃগণকে, অপর কন্যাটিকে মহাদেবের হস্তে সমর্পণ করেন।

শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা স্ত্রী ও মূর্তি– এই ত্রয়োদশ কন্যা ধর্মের পত্নী ছিলেন। শ্রদ্ধার সন্তানের নাম ছিল শুভ। মৈত্রীর গর্ভে যে সন্তানের

জন্ম হয়, তাঁর নাম ছিল প্রসাদ। দয়ার গর্ভজাত সন্তানের নাম ছিল অভয়। শান্তির সন্তান ছিলেন সুখ। তুষ্টি যে সন্তানটি প্রসব করেন তার নাম ছিল হর্ষ।

পুষ্টি গর্ব নামক সন্তানের জন্ম দেন। ক্রিয়ার সন্তানের যোগ। উন্নতি জন্ম দিয়েছিলেন দর্পের। বুদ্ধি প্রসব করেছিলেন অর্থকে, মেধার গর্ভে জন্ম হয় স্মৃতির। তিতিক্ষার সন্তানের নাম ছিল মঙ্গল এবং হ্রী (লেজ্জা) সন্তান রূপে প্রসব করেন বিনয়কে।

সকল গুণের উৎপত্তি রূপিণী ছিলেন মুর্তি। তিনি নর ও নারায়ণ নামে দুজন ঋষিকে প্রসব করেছিলেন। এঁদের আবির্ভাবে সাধুগণের মন, দিক সমূহ, বায়ু, নদী পর্বতাদি প্রসন্ন হয়েছিল। সমগ্র বিশ্ব অত্যন্ত আনন্দমনে তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিল। স্বর্গ থেকে তখন তুর্যধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল। আর মুনিসকল হৃষ্ট চিত্তে স্তব করেছিলেন। গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ আনন্দিত মনে গান ধরেছিলেন। দেবরমণীকুল পরম কৌতুকে নৃত্যে রত হয়েছিলেন। সে সময় আকাশে বাতাসে প্রসন্ন ও কল্যাণময়। আবহ রচিত হয়েছিল।

হে বৎস, বেশি আর কি বলব। ব্রহ্মাদি দেবগণও নানাবিধ স্তবের দ্বারা ওই শিশুদ্বয়ের উপাসনায় ব্রতী হয়েছিলেন।

দেবতাগণ এভাবে স্তব করেছিলেন-গগনে খচিত গন্ধর্বগণের ন্যায় যিনি স্বয়ী মায়ার প্রভাবে এই বিশ্বকে নিজ অধিষ্ঠানে পরিণত করেছেন, সেই পরম পুরুষকে আমরা প্রণাম জানাই। তিনি নিজ আত্মপ্রকাশের নিমিত্তে অধুনা এই ধর্মসদনে ঋষিমূর্তিরূপে প্রকাশিত। তার অবিস্মরণীয় তত্ত্বাদি আমরাও প্রত্যক্ষ করতে পারি না। কেবল মাত্র শাস্ত্র দ্বারা অনুমান করতে পারি।

সেই পরমাত্মা ভগবান জগতের নিয়মাদিসমূহ যথাযথ ভাবে পালনের উদ্দেশ্যেই আমাদের সত্ত্বগুণের দ্বারা দেবতারূপে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নয়নযুগল অপরিসীম সৌন্দর্যের আবাসস্থল। তাঁর মনোহর শোভার কাছে কমলের সৌন্দর্যও ম্লান হয়ে যায়। সেই কৃপাপূর্ণ নয়নে তিনি আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

বৎস বিদুর, এভাবে দেবগণ কর্তৃক সম্যকভাবে স্তুত ও পূজিত হয়ে সেই নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয় গন্ধমাদন পর্বতাভিমুখে গমন করলেন। ভগবানের অংশদ্ভুত, দুই ঋষিই দ্বাপরযুগের শেষার্ধে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার নর অংশে অর্জুন ও নারায়ণ অংশে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূ ভার হরণের জন্য আর্বিভূত হয়েছিলেন।

বিদুর, এবার দক্ষের অপর তিন কন্যার নাম ও বংশের কথা বর্ণনা করছি, শ্রবণ কর।

অগ্নি অর্থাৎ অগ্ন্যাভিমানী দেবতার পত্নী হলেন স্বাহা। তাঁদের পুত্ররা হলেন–পাবক, পবমান ও শুচি। তারা সকলেই হুতভোগি। সেই পাবক পবমান ও শুচি নামক অগ্নি থেকে পয়তাল্লিশটি অগ্নির উৎপত্তি হয়। তাঁরা পিতৃত্রয় ও পিতামহ সহযোগে মোট উনপঞ্চাশটি অগ্নিরূপে বিরাজিত। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণেরা বৈতানিকে অর্থাৎ বেদ প্রতিবিহিত যজ্ঞাদি কার্যে এদের নাম উল্লেখপূর্বক আহুতি দান করেন।

অগ্নিদাত্ত, বর্হিষদ, সোমপ, আজ্যপ– এদের পিতৃগণ বলা হয়। এঁদের মধ্যে যাদের অগ্নিমধ্যে কর্মনিহিত আছে, অর্থাৎ যাঁদের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে হোম করা হয়। তাদের সাগ্নিক বলে বাকীদের অনগ্নি বলে অভিহিত করা হয়। দক্ষের পঞ্চদশ কন্যা স্বধা, এই সম্মিলিত পিতৃগণের পত্নী। তাদের ঔরসে স্পর্ধার গর্ভে বুয়না ও ধারিণী নামে দুটি কন্যার জন্ম হয়। এই দুই কন্যাই ব্রহ্মবাদিনী এবং জ্ঞান বিজ্ঞানে অতি পারদর্শিনী ছিলেন।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, দক্ষকন্যা সতী ছিলেন ভগবান মহাদেবের পত্নী। কিন্তু তিনি পিতা দক্ষের প্রতি রোষবশতঃ যৌবনে যোগবলে প্রাণত্যাগ করায় পুত্রহীনা ছিলেন। পিতা দক্ষ তুচ্ছ কারণে তার স্বামীকে অপমান করায় সতী প্রাণত্যাগ করেন।

.

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিব ও দক্ষের পরস্পর বিদ্বেষের সূত্রপাত

বিদুর বললেন– হে মৈত্রেয়। দুহিতাদের প্রতি স্নেহশীল দক্ষ, কেনই বা নিজ কন্যা সতী ও তাঁর পতি মহাদেবের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন? হে মুনি, ঐ দেব তো কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন না। তাঁর প্রতিও কারও কোনও ক্ষোভ থাকার নয়। কারণ তিনি এই মহাজগতের গুরু, মহান দেবতা। আত্মাতেই তাঁর রতি, তাই তার দেহ শান্তিময়।

তবে প্রজাপতি দক্ষ কেন কন্যার প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়েছিলেন? হে ব্রাহ্মণ, যে কারণে শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে বিদ্বেষ জন্ম নিয়েছিল, তার কারণ আমায় বলুন। এমন কী সেই বিদ্বেষের কারণের জন্য দক্ষকন্যা সতীকে প্রাণ পর্যন্ত দিতে হল?

মৈত্রেয় বললেন– প্রথম কল্পে স্বায়ম্ভুব মনুর মন্বন্তরে বিশ্ব সৃষ্টিকারী মরীচি প্রভৃতিদের যজ্ঞে বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি ঋষিগণেরা সমবেত হয়েছিলেন।

এছাড়াও নিজ নিজ অনুচরবর্গকে সঙ্গে নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণ মুনিগণ ও অগ্নিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রজাপতি দক্ষ সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল আলোক ও তেজরাশিতে দীপ্যমান হয়ে সভা মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন। দক্ষের অঙ্গপ্রভায় ঐ মহৎসভা অন্ধকার শূন্য হয়। তাঁকে সভা মধ্যে উপনীত হতে দেখে ব্রহ্মা ও মহাদেব ভিন্ন সমস্ত সভাসদেরা নিজ নিজ আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। কারণ দক্ষের উজ্জ্বল অঙ্গপ্রভার উদ্ভাস তাদের চিত্তকে আক্ষিপ্ত করেছিল। তারা যক্ষের যথার্থ সৎকার করার পরে তিনি লোক গুরু ব্রহ্মাকে প্রণাম করে তার অনুমতি পূর্বক আসনে উপবিষ্ট হলেন।

দক্ষের আসন গ্রহণের পূর্ব থেকেই ভগবান ভব নিজ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। দক্ষ বারংবার এই ব্যাপারে ভবের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেও মহাদেব যথাপূর্বক আসলে থেকে গাত্রোত্থান করে দক্ষকে সম্মান প্রদান করলেন না। দক্ষ এই অপমান সহ্য করতে না পেরে সভাস্থ দেবতা সহ সকলের উপস্থিতিতে ভবের উদ্দেশ্যে বিষেদাগার করতে উদ্যত হলেন–

আমি অজ্ঞানতা বা বিদ্বেষহেতু বলছি না, তবে এই শিব অতি লজ্জাহীন ও লোকপালদের যশ বিনাশ কারী। কারণ তিনি এ যথোচিত ক্রিয়া পালন না করে সাধুগণের আচরণীয় পথকে কলুষিত করেছেন। একে একভাবে আমরা শিষ্য বলা যেতে পারে কারণ এই মূঢ়, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি সাক্ষী রেখে আমার কন্যার পানি গ্রহণ করেছে। এই মর্কট লোচনের সঙ্গে দৈবক্রমে আমার কন্যার বিবাহ হয়েছে। সেহেতু আমাকে এর গাত্রোত্থান পূর্বক সম্মান প্রদর্শন কর্তব্য। কিন্তু এ তো সামান্য সম্মানজনক বাক্যেও আমায় শ্রদ্ধার্পণ করল না।

শূদ্রকে বেদবিদ্যা দান করার ন্যায় অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ব্রহ্মার আদেশে কন্যা সতীকে এই শিবের হাতে সম্প্রদান করেছি। এঅতি অপবিত্র, অভিমানী, ধর্মমহাত্ম ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে নেহাৎ অজ্ঞ। এই ব্যক্তি বিকীর্ণ কেশে বস্ত্রহীন অবস্থায় শ্মশানে শ্মশানে ভয়ংকর ভূতপ্রেতদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। আপন মনে কখনও হাসে কখনও কাঁদে। সর্বাঙ্গে চিতাভস্ম মেখে, মাথায়, গলায় মৃত মানুষের অস্থিকেই ভূষণরূপে পরিধান করে শ্মশানচারীর মতো জীবন কাটায়। নামে মাত্র শিব, বস্তুত এ নিজে অশিব। সততঃ মাদক সেবন করে দিগ্বিদিক

জ্ঞানশূন্য হয়ে থাকে। তমোগুণ স্বভাব প্রমথনাথদের পতি এই শিব। মাদক-সেবনে মত্তজনেরা এর অতি প্রিয় পাত্র।

হায়, হায়! আমি অত্যন্ত ভুল করেছি। ব্রহ্মার কথায় আমি অতি উন্মাদ, দুরাশয়, শৌচাচার বর্জনকারী, দুষ্টচিত্ত শিবের হাতে আমার পরম সাধ্বী কন্যাকে সমর্পণ করেছি। মৈত্রেয় বললেন– হে বিদুর, প্রতিকূল আচরণ শূন্য শিবকে স্থিরভাবে উপবেশনরত দেখে দক্ষ তাকে এভাবে নিন্দা করলেন। রাগে অন্ধ হয়ে তিনি শিবকে জলস্পর্শ করে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন।

দক্ষ অভিশাপ দিয়ে বললেন– "দেবতাগণের যজ্ঞকালীন সময়ে দেবগণের অধম এই শিব কখনই ইন্দ্রাদি দেবগণের সঙ্গে যজ্ঞের ভাগ পাবে না।

–হে কুরুশ্রেষ্ঠ। তখন সভামধ্যে উপস্থিত বিশিষ্ট সভাসদেরা দক্ষকে নানা প্রকারে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দক্ষ কারো নিষেধ না মেনে এভাবে অভিসম্পাত দিয়ে নিজে সভাস্থল পরিত্যাগ করলেন ও নিজ গৃহে গমন করলেন।

তারপর গিরীশ অনুচরদের অগ্রণী নন্দীশ্বর এই অভিশাপের বিষয়টি জ্ঞাত হলেন। প্রচণ্ড রাগে রক্তচক্ষু হয়ে তিনি দক্ষকে ও শিবনিন্দা সমর্থক সকল ব্রাহ্মণদের অভিশাপ দানে প্রবৃত্ত হলেন। নন্দীশ্বর বললেন–অজ্ঞ ও ভেদস্পর্শী ব্যক্তি এই দক্ষ-স্বশরীরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান পূর্বক ভগবান ভবের বিরোধিতা করলেন। কখনই তাঁর পরমার্থ লাভ হবে না। ভগবান মহাদেব কারও প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করেন না। তাই যাঁরা তাঁর প্রতি দ্রোহপূর্ণ আচরণ করবে তারা পরমার্থ থেকে পরিভ্রষ্ট হবে।

সেই অজ্ঞ ব্যক্তি বেদের অর্থবাদে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সুখের প্রত্যাশায় জটিল ধর্ময় গার্হস্থ্য ব্যাপারে অনুরক্ত হয়ে কর্মকাণ্ড বিস্তারে ব্যাপ্ত হোক। এই দক্ষ দেহাভিমান বশতঃ আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব বিস্মৃত হয়েছে। তাই এই ব্যক্তি নারী– কামী হোক, শীঘ্রই এর মুখ ছাগলের মতো হোক। এই এই দক্ষ কর্মময়ী অবিদ্যাকে তত্ত্ব বিদ্যা বলে মনে করেছে। অতএব এ প্রকৃতই ছাগ।

যে সকল ব্যক্তি শিবনিন্দাকারী দক্ষের আচরণ সমর্থন করেছে তারা বারে বারে এ সংসারে পতিত হয়ে জন্ম-মরণাদি দুঃখ ভোগ করুক। বেদ বর্ণিত কর্মকাণ্ডসকল বহুল পুষ্পলতার মতো আপাত ভাবে অতি মনোহরা। কিন্তু ঐ শ্রুতিবাক্যের মনোঃক্ষোভ উৎপাদক নানারকম

প্ররোচনা দ্বারা শিব-বিদ্বেষীরা বিবেকজ্ঞান শূন্য হোক। তারা কোনও রকম বিচার বিবেচনা না করে সর্বভোজী হোক। জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা বিদ্যাভ্যাস, তপস্যা ও ব্রত আচরণ করুক। তারা বিত্ত, দেহ ইন্দ্রিয়াদির সুখে আসক্ত হোক। যাচকরূপে তারা এই পৃথিবীতে বিচরণ করুক।

ব্রাহ্মণকুলের প্রতি নন্দীশ্বরের এরূপ অভিসম্পাত শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন মহর্ষি ভৃগু। তিনি ব্রহ্মদণ্ডরূপ দূরত্যয় প্রতিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। ভৃগু বললেন– "যারা শিবের ব্রত পালন করবে। বা তার অনুগমন করবে তারা সৎশাস্ত্রের প্রতি কুলচারী হয়ে পাষণ্ডী রূপে পরিচিত হবে। ঐ মূঢ় বুদ্ধি শিব ভক্তরা শৌচ-আচার করবে না। তারা জটা, ভস্ম ও অস্থি সকল ধারণ করবে। শিবদীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে সেখানে গৌড়ি পৈষ্টী ও মাধ্বী সুরা অর্থাৎ তালাদি জাত মদ্য পরম সমাদরে গৃহীত হবে।

অহো, ব্রাহ্মণগণ, তোমরা শাস্ত্রের মর্যাদাপূর্ণ ও বর্ণাশ্রমের আচরণ বিশিষ্ট পুরুষদের ধারণকারী বেদাদি ও বেদ প্রবর্তক ব্রাহ্মণগণের নিন্দায় রত হয়েছ, তাই তোমাদের পাষণ্ডাশ্রিত বললাম। প্রাচীন ঋষিগণ এই বেদকে অবলম্বন করেছেন। স্বয়ং ভগবান নারায়ণ এই বেদের মূলস্বরূপ। সেই বেদ সর্বলোকের চিরন্তন ও কল্যাণময় পথ। সাধুগণের পরম পবিত্র চিরন্তন পন্থাস্বরূপ সেই বেদকে তোমরা নিন্দা করছ। যে ধর্মে তোমাদের তামস ভূতপতির আধিপত্য আছে, সেই পাষণ্ডধর্মে তোমার দীক্ষিত হও।

মৈত্রেয় বললেন– মহর্ষি ভৃগু এরূপ অভিসম্পাত দানে প্রবৃত্ত হলে ভগবান মহাদেব একটু যেন বিমনা হয়ে সে স্থান ত্যাগ করলেন। তিনি ভাবলেন, এভাবে পরস্পর অভিশাপ পর্ব চলতে থাকলে তা উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। এ কারণেই তিনি নিজ অনুচরদের নিয়ে সেখান থেকে গমনোদ্যত হলেন।

বৎস বিদুর, তারপরে বিশ্বস্রষ্টাগণ সহস্র বৎসরব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন করলেন। এই যজ্ঞের মাধ্যমে ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করা হয়। তারপর তারা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে স্নান করে পবিত্র নির্মল হৃদয়ে স্বীয় গৃহে গমন করলেন। যজ্ঞ সমাপন অন্তে এই স্নানকে বলা হয় অবyথ। এর ফলে দেহ মন নির্মল ও শুচি হয়।

.

তৃতীয় অধ্যায়

সতীর দক্ষালয়ে গমন প্রার্থনা।

মৈত্রেয় বললেন– এভাবে পারস্পরিক বিদ্বেষরত হয়ে শ্বশুর ও জামাতা অর্থাৎ দক্ষ ও শিব বহুকাল কাটালেন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ইতিমধ্যে দক্ষকে সকল প্রজাপতির অধিপতি হিসেবে নির্বাচন করলেন। তখন দক্ষ মনে মনে অতি আনন্দিত ও গর্বিত বোধ করলেন।

দর্পিত দক্ষ এবারে শিব ও তৎপক্ষীয় ব্রহ্মিষ্ঠদের অপমান করে বাজপেয় যজ্ঞের সমাপন করে বৃহস্পতি নামক উৎকৃষ্ঠ যজ্ঞের সূচনা করলেন। দক্ষের আর সেই যজ্ঞে সকল ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি পিতৃ ও দেবগণ পূজিত হলেন। তৎসঙ্গে তদীয় পত্নীরাও যজ্ঞে আমন্ত্রিত ছিলেন। আকাশ পথে উড়তে পাখিরা এই যজ্ঞবিষয়ে আলাপচারিতা করতে লাগল। দক্ষকন্যা সতী তাদের মুখে নিজ পিতার এই বিপুল যজ্ঞোৎসবের কথা শুনলেন। তিনি আরও দেখতে পেলেন চতুর্দিক থেকে গন্ধর্বকন্যাদের নিজ নিজ পতির সমভিব্যাহারে বিমানে আরোহণ পূর্বক যজ্ঞস্থলে গমন করেছে। তাদের কণ্ঠে পদক শোভিত, পরিধানে সুবস্ত্র, তারা শোভন রূপে সজ্জিত। এসব দেখে সতীরও ঐ যজ্ঞাৎসবে যাওয়ার ইচ্ছে জাগল।

তিনি নিজ পতি ভূতনাথকে সম্বোধন করে বললেন– হে নাথ, আপনার শ্বশুর ও আমার পিতা প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞোৎসব সম্প্রতি শুরু হয়েছে। তা এখনও চলছে। কারণ ঐ যে দেখুন দেবগণ সেথায় গমন করছেন। আপনার যদি ইচ্ছা বা অনুমতি হয় তবে চলুন। আমরাও সেখানে গমন করি। নিশ্চয়ই সেখানে আমার ভগিনীরাও এতক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাদের পতিরাও নিশ্চয়ই উপস্থিত হয়েছেন। আমিও সেখানে উপস্থিত হতে ইচ্ছুক। তৎসঙ্গে মাতা পিতার প্রদত্ত অলংকারাদি গ্রহণের ইচ্ছাও আমার হয়েছে। সেখানে আমি উপস্থিত হলে ভর্তৃর্সহ ভগিনীদের এবং আমার স্নেহময়ী মাতার দর্শন পাব। হে প্রভু, ভগিনীদের তাদের দর্শনের জন্য বহুদিন আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। হে মৃঢ় (সর্বসুখদাতা), মহর্ষিগণ কর্তৃক প্রবর্তিত পিতৃযজ্ঞে যে ধ্বজা উত্থিত হয়ে থাকবে, তাও দেখার সুযোগ হবে।

হে অজ, ত্রিগুণ স্বরূপা, এই জগত সংসার আপনার নিজ মায়ার দ্বারা প্রকাশিত। জানি আপনার কাছে কিছুই বিস্ময়কর নয়, তবু আমি তো যোষিৎ। আমি স্বভাবতই কৌতূহল প্রবণ। আমি আপনার তত্ত্ব সম্পর্কেও জ্ঞাত নই। সুতরাং আমি জন্মভূমি দর্শন করার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হয়েছি। হে প্রভু, আপনি তো জন্মাদি রহিত। আত্মীয়-বন্ধু-বিচ্ছেদ যন্ত্রণা আপনি তো বুঝতে পারবেন না।

দেখুন, পিতা দক্ষের সঙ্গে সম্বন্ধহীন যোষিগণও অলংকারে সজ্জিত হয়ে নিজ নিজ পতির সঙ্গে আমার পিতৃগৃহে গমন করেছেন। দেখুন তাঁদের কলহংসতুল্য পাণ্ডুবর্ণ গতিশীল বিমানশ্রেণীতে আকাশ কেমন সুশোভিত! হে নীলকণ্ঠ, আপনি তো অপরের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ বিষও ভক্ষণ করেছেন, তাহলে পিতৃগৃহে গমনের জন্য আমাকে দয়া করে অনুমতি দিন প্রভু।

হে সুরশ্রেষ্ঠ, পিতার গৃহে উৎসবের সংবাদে কন্যার মন কি বিচলিত হয় না? যদি বলেন বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়া সমুচিত নয়। তাহলে বলি প্রভু বন্ধুজন, পতি, শ্বশুরাদি গুরুজন ও জন্মদাতা পিতার গৃহে বিনা আমন্ত্রণেও যাওয়া যায়। হে দেব, আমার প্রতি দয়া করুন। আপনি তো দয়াশীল। আমার এ অভিলাষ পূর্ণ করুন দেব। পরম জ্ঞানের অধিকারী হয়েও যখন আমাকে নিজ অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে স্বীকার করেছেন, আমার এ প্রার্থনা মঞ্জুর করুন প্রভু।

মৈত্রেয় বললেন– ভগবান গিরিত্র (গিরিশ) প্রিয়তমা পত্নীর এই আকুল প্রার্থনা শুনে মৃদু হাস্য করলেন। তার পিতা দক্ষ সমস্ত অভ্যাগত ঋষি, মুনি, দেবাদিগণের সম্মুখে শিবের প্রতি যে মর্মবিদারক তীব্র কটু বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন তা তিনি সতীকে মনে করিয়ে দিলেন। বললেন– হে শোভনে, অনাহূত হয়েও পিতৃগৃহে অনায়াসে গমন করা যায় একথা সত্য।

তবে সেই বন্ধুবর্গ যদি দেহাদিতে প্রবল অভিমানী ও ক্রোধের ফলে বৃথা দোষ দৃষ্টি সম্পন্ন না হয়। বিদ্যা, তপস্যা, ধন, দেহ, বয়স ও কুল এই ছয়টি সজ্জনগণের গুণ ঠিকই। কিন্তু এগুলিই অসাধুজনে প্রযুক্ত হলে দোষরূপে পরিণত হয়ে বিবেক নষ্ট করে। তখন তারা “আমি বিদ্বান” আমি তপস্বী, প্রভৃতি অভিমানে গর্বিত হয়ে এমন কী মহাত্মাদের স্বরূপ বুঝতে অক্ষম হয়।

এবিধ বন্ধুদের গৃহে যাওয়া তো দূরস্থান, তাদের গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও অনুচিত। তারা অতিশয় অব্যবস্থিত চিত্তের অধিকারী। তাঁদের গৃহে যখন কোনও ব্যক্তি উপস্থিত হয় তারা ভ্রুভঙ্গি সহযোগে রোষ কষায়িত নয়নে কুটিল মনে তাদের নিরীক্ষণ করতে থাকে।

হে প্রিয়ে, ঐ সকল কুটিলমনা আত্মীয় বন্ধুজনের কটূক্তি থেকে যে মর্মপীড়া অনুভূত হয়, তার জন্য প্রচুর মনঃস্তাপ ভোগ করতে হবে। শত্রু নিক্ষেপিত বাণ দ্বারা শরীরে আঘাতও সে তুলনায় অতি সামান্য। কারণ কিছুকাল পরেই সেই দৈহিক যাতনার উপশম হয়।

হে সুভ্র, প্রজাপতি দক্ষ অত্যন্ত মর্যাদার পাত্র। তুমিও তার সর্বাপেক্ষা স্নেহময়ী কন্যা, এ কথা সত্য। তবু জানিয়ে রাখি যেহেতু তুমি আমার পত্নী, সে কারণেই তুমি পিতার সমাদর পাবে না।

কারণ ব্রহ্মাকে আমার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হওয়ার কারণে পরিতাপ ভোগ করতে হয়েছে। শোনো প্রিয়ে, আমি কিন্তু তোমার পিতা দক্ষের কাছে কোনও অপরাধ করিনি। অহংশূন্য ব্যক্তিবর্গের সমৃদ্ধিতে তার হৃদয় অতি সন্তপ্ত হয়। তাই তিনি দুঃখিত বোধ করেছেন।

পুণ্যার্জনের দ্বারা বা সুকীর্তির দ্বারা তিনি কিন্তু কোন ভাবেই ঐ সকল মহত্তম ব্যক্তির সমতুল্য স্থান প্রাপ্ত হতে পারবেন না। অসুরাদি যেমন ভগবান শ্রীহরির চিরবিদ্বেষী, তোমার পিতাও তেমনি আমার প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেন।

হে সুমধ্যমে, লোকে যে পরস্পর প্রত্যুৎগমন, বিনয় প্রকাশ পূর্বক অভিবাদন করে থাকেন, কিন্তু জ্ঞানী পুরুষেরা সে সমস্ত ক্রিয়া মনে মনে অন্তর্যামী ভগবানের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করলেও দেহাভিমানী পুরুষের উদ্দেশ্যে করেন না।

আমি অন্তর্যামী দৃষ্টিতে ভগবান বাসুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্বক প্রত্যুত্থানাদি ক্রিয়া করেছিলাম। কাজেই বুঝতে পারছ দক্ষকে কোনও রূপ অবমাননা বা অপমান আমি করিনি। বাসুদেব শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণে পরম পুরুষ বাসুদেব প্রকাশমান। তাই শুদ্ধ সত্তরূপ কিন্তু ইন্দ্রিয়ের আগোচর ভগবান বাসুদেবকে আমি নিত্যই প্রণাম করি।

হে প্রিয়তমা, প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞস্থলে সমস্ত সভাসদদের সম্মুখে দক্ষ আমাকে তীব্র কটুবাক্যে তিরস্কার করেন। তাঁর কটুক্তিতে আমি অত্যন্ত অপমানিত হয়েছি। তাই তিনি আমার মিত্র বা সুহৃৎ নন। জানি তিনি তোমার জন্মদাতা, তোমার অতি প্রিয় শ্রদ্ধার জন। তবু তার বা তার প্রতি সমর্থনশীল ব্যক্তিগণের সমীপে গমন তোমার পক্ষে সমুচিত কাজ হবে না। যদি আমার উপদেশ লঙঘন করে সেখানে অভিগমন কর, তা হলে তোমার তো বটেই কারও পক্ষেই সুখকর হবে না।

সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির যদি কখনও স্বজন দ্বারা অপমানিত হতে হয়, তবে তা মৃত্যুর সমান। কারণ বলে কল্পনা করা যায়।

.

চতুর্থ অধ্যায়

সতীর দেবত্যাগ

মৈত্রেয় বললেন– ভগবান শঙ্কর মনে মনে ভাবলেন, উভয় ক্ষেত্রেই সতীর অঙ্গনাশের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পিত্রালয়ে গেলেও অমঙ্গল হবার আশঙ্কা আবার না গেলেও অকল্যাণের সম্ভাবনা। তাই তিনি সতীকে দক্ষালয়ে গমনে অনুমতি দিলেন না, বারণও করলেন না। উপরোক্ত উপদেশাবলী দিয়েই ক্ষান্ত হলেন।

এদিকে সতীও অস্থির হয়ে পড়লেন। এদিকে বন্ধু ও পিতা মাতার সন্দর্শনে যাবার বাসনায় ঘর থেকে বাইরে যান, আবার ভবের ভয়ে পুনরায় ঘরে প্রবেশ করেন। তাঁরও চিত্ত দুভাবে বিক্ষুব্ধ হল। বন্ধুবর্গের সঙ্গে মিলন বাসনা চরিতার্থ হল না দেখে অতি দুর্মনা ও ক্রন্দনশীল হয়ে উঠলেন তারপর অতুল্য পুরুষ ভগবান ভবকে যেন নয়নাযাগ্নিতে দগ্ধ করার বাসনায় তাঁর দিকে সক্রোধে কটাক্ষপাত করলেন। তখন রাগে উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর কম্পিত হচ্ছিল। সাধারণ রমণীর ন্যায় হিতাহিত বিবেচনারহিত হয়ে শোক ও ক্রোধে আকুল হলেন তিনি। তারপরে ক্রমাগত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে পিতৃগৃহের অভিমুখে গমনোদ্যত হলেন।

সতী একাকী দ্রুত পদক্ষেপে গমন করতে উদ্যত হলেন। তখন পার্ষদ ও যজ্ঞগণের সহিত সহস্রাধিক রুদ্রের অনুচরগণ তৎক্ষণাৎ শিবজায়া সঙ্গে নিয়ে তাঁর পশ্চাৎগমন করলেন। রুদ্রানুরদের মধ্যে মণিমান এবং মদ প্রভৃতিও ছিলেন।

তারা সতীকে ঐ বৃষরাজের পৃষ্ঠে আরোহণ করালেন। তাকে উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত করলেন। সারিকা, কন্দুক, দর্শন, পদ্ম, প্রভৃতি ক্রীড়া উপকরণ এবং শ্বেতছত্র, ব্যজন, মালা প্রভৃতি রাজোচিত বিভূতি সতীকে তারা প্রদান করলেন। তাছাড়া সঙ্গীতের নানাবিধ উপকরণ, শঙ্খ, দুন্দুভি, বাঁশি প্রভৃতিও তাঁর শোভা বৃদ্ধি করল। রুদ্র অনুচরেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সতীর দক্ষালয়ে গমন করতে লাগলেন।

তারপর সতী এসে উপস্থিত হলেন পিতার আলয়ে। তার মনে ক্ষোভ প্রশমিত হয়ে শুধু অপার তৃপ্তি, প্রগাঢ় আনন্দ। তিনি যজ্ঞস্থানে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিদের স্থানে স্থানে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। বেদ পাঠের মন্ত্রধ্বনির সঙ্গে যজ্ঞের পশুবধের কোলাহল মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছিল। সেই স্থানে মাটি, কাঁচ, লোহা, সোনা ও চর্মের বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন

আকৃতির পাত্র সজ্জিত ছিল। এগুলির মধ্যে যজ্ঞের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখা হয়েছিল। দক্ষ সতীকে যেন দেখেও দেখতে পেলেন না।

তিনি সতীকে কোনরকম আদর-আপ্যায়ন না করায় যজ্ঞস্থলে উপস্থিত অন্য কোনও ব্যক্তিই সতীর সমাদর করল না। কিন্তু তার জননী ও ভগিনীরা সতীকে দেখে অতি আনন্দিত হলেন। তাঁকে বক্ষলগ্ন করে আনন্দাশ্রুতে স্নান করিয়ে দিলেন। আবেগে তাঁদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সতীর হৃদয়ে ঘোর অসন্তোষ জাগ্রত হল। পিতা অবজ্ঞা করায় যে অপমান তার হল তা তিনি কিছুতেই বিস্মৃত হলেন না। সেই জ্বালার ক্ষতে মাতৃস্নেহ ও ভগ্নিপ্রেম প্রলেপ লাগাতে ব্যর্থ হল। মাতা ও মাতৃস্বসাদের প্রদত্ত অলংকারাদি তিনি প্রত্যাখান করলেন।

সতী বুঝতে পারলেন তাঁর পিতার আয়োজিত এই যজ্ঞে রুদ্রের কোনও স্থান নেই। মহাদেবকে এখানে আহ্বান না করে দক্ষ তাকে চূড়ান্ত অবজ্ঞা করেছেন। সতীও এখানে অনাদৃতা। এরূপ মনে করায় তাঁর কর্ণে মাতা ও ভগ্নীগণের কুশল প্রশ্নাদি ও প্রেমপূর্ণ বাক্য কিছুই প্রবেশ করল না। ক্রোধ যেন তাঁর সর্বশরীর দগ্ধ করতে লাগল। মনে হল তিনি যেন এই বিশ্ব সংসার নিমেষে ভস্ম করে ফেলবেন। তাঁর সেই তেজ থেকে আবির্ভূত ভতাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে সতী রোষপূর্ণ স্খলিত বাক্যে অতিথি অভ্যাগতদের সামনেই পিতা দক্ষের নিন্দা করতে শুরু করলেন। দক্ষ ছিলেন কর্ম মার্গে বহুধা পরিশ্রমী, দর্পিত ও শিব বিদ্বেষী।

সতী বলতে থাকেন– পিতা, ইহলোকে শিব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নেই। তাঁর প্রিয় বা অপ্রিয় বলেও কিছু নেই, তিনি আত্মাদির কারণ স্বরূপ। দেহধারীগণের অত্যন্ত প্রিয় হল এই আত্মা। তিনি মুক্ত এবং কারও প্রতি তিনি শত্রুতাভাবাপন্ন নন। অজাতশত্রু সেই ভগবান মহাদেবের প্রতি আপনি ব্যতীত আর কোনও ব্যক্তিই প্রতিকূল আচরণ করতে অক্ষম।

হে দ্বিজ, আপনার মতো কোনও কোনও ব্যক্তি অপরের চরিত্রে কেবল দোষ অনুসন্ধান করেন। তারা অসাধু কর্ম করেন না। তারা অন্যের যৎসামান্য গুণকেও সবিস্তারে কীর্তন করেন এবং স্বীকার করেন। আপনি তাদৃশ সর্বোত্তম ভবেরও দোষ অনুসন্ধান করেছেন।

একথা ঠিক, যারা এই জড়দেহকেই সারবস্তু বলে মনে করে তাদের পক্ষে ঈর্ষা পরায়ণ হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। দেহাত্মাভিমানী দুজন পুরুষের পক্ষে মহৎজনের নিন্দা কখনই আশ্চর্যের তো নয়ই। বরং তাদের পক্ষে অতি স্বাভাবিক কর্তব্য। কারণ সাধু ব্যক্তিরা নিজ নিন্দা সহ্য করলেও তাদের পাদরেণু তা সহ্য করে না।

নিজে অমঙ্গলস্বরূপ হয়ে আপনি কিনা তার প্রতি বিদ্রোহী হতে চাইছেন? আপনারা বোধ হয় শিব নামে সেই অশিব দেবের তত্ত্ব সম্পর্কেও অজ্ঞাত। যে শিব জটাধারণ পূর্বক, ভস্ম মেখে শ্মশানে-ঘাটে বিচরণ করেন, শিবের সেই চরণ–বিগলিত নির্মাল্য মাথায় ধারণ করে নিজেদের ধন্য মনে করেন ব্রহ্মাদি দেবগণ।

কোন ব্যক্তির যদি বিশেষ ক্ষমতা না থাকে, তাহলে স্বামীনিন্দা না শুনে সে স্থান থেকে প্রস্থান করা কর্তব্য। যদি সামর্থ্য থাকে তবে নিন্দাকারীর জিহ্বা বলপ্রয়োগ দ্বারা ছেদন করে আপনার প্রাণ বিসর্জন দেওয়া শ্রেয়। আপনি আমার পিতা, আমার স্বামী শিবের নিন্দাকারী। মোহবশতঃ কোনও নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত তা বমন করে দেওয়া, আপনার থেকে উৎপন্ন এই দেহ আমি ধারণ করব না। আমি প্রাণ বিসর্জন দেব।

যিনি আত্মাতেই রমমাণ ও সম্যকভাবে বিরক্ত, তার বুদ্ধি কখনও বেদ-প্রবর্তিত বিধিনিষেধের অনুগামী হয় না। দেব ও মনুষ্য উভয়ের গতি পৃথক। দেবতাদের আকাশে গতি মনুষ্য কুলের গতি পৃথিবীতে প্রবৃত্তি মার্গ বা নিবৃত্তি মার্গ যে দিকেই হোক না কেন, ভিন্ন ধর্মাস্থিত ব্যাক্তির কখনই অন্য ধর্ম ও ধর্মাশ্রিত পুরুষের নিন্দা সমীচিন নয়। বিশেষ বিবেচনাপূর্বক বেদে এই দুই প্রকার কর্মের বিধান দেওয়া আছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুই–ই সত্য। কিন্তু ঐ দুই কর্ম একই সময়ে। একই কর্তাতে প্রযুক্ত হলে তাকে নিষ্কর্ম বলা হয়। পরম ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান শঙ্করের তাই কোনো কর্মী উপস্থিত হয় না।

হে পিতা, আপনি মহাদেবের যে দোষগুলি উল্লেখ করেছেন যথা– চিতা ভস্মমর্দিত অঙ্গ, নগ্নতা প্রভৃতি কিন্তু তাঁর ভোগসম্পত্তির অভাব কি করে বললেন? আমাদের যে অনিমাদি ঐশ্বর্য আছে তা আপনি কখনও চোখেও দেখেন নি। আপনাদের যাবতীয় ঐশ্বর্য তো কেবল যজ্ঞশালাতে অবস্থিত। যজ্ঞের অন্নে যাদের পরিতুষ্ঠি হয়, কর্মকাণ্ড পথ আশ্রিত পুরুষেরা তা ভক্ষণ করে থাকে।

আমাদের ঐশ্বর্যাদি সে রূপ নয়, ইচ্ছামাত্র তা অব্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তার সেবা করে যাবেন। আপনি ভগবান মহাদেবের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন। তাই আপনার থেকে জন্ম হয়েছে বলে আমার অতিশয় লজ্জা বোধ। যে ব্যক্তি মহতের অভিপ্রায়কারী নয়, তাকে জন্মদাতা পিতা হিসাবে ভাবতে আমার মনের ধিক্কার জন্মাচ্ছে।

ভগবান মহাদেব যখন পরিহাসছলে আমাকে দাক্ষায়ণী নামে সম্বোধন করেন। আপনার সঙ্গে সম্বন্ধবাচক নাম শুনে আমার যাবতীয় হাস্য অন্তর্হিত হয়। মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত বোধ করি। সে কারণে আপনার অঙ্গজ এই দেহ আমি এখনই পরিত্যাগ করব।

মৈত্রেয় বললেন– হে বিদুর, যজ্ঞস্থলে পিতার উদ্দেশ্যে এরূপ ক্ষোভ ও নিন্দাবাক্য বলে সতী মৌনী হয়ে উত্তরমুখে ভূমিতে উপবেশন করলেন। তারপরে পীতবস্ত্রে নিজ দেহ আবৃত করে আচমণ করলেন। তারপর নয়ন মুদ্রিত করে যোগপথ অবলম্বন করলেন। অনিন্দনীয় চরিত্রের অধিকারীনী সতী সুস্থিত হয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গে বৃত্তি যুক্ত প্রাণ ও আপন বায়ুকে নাভিচক্রে সমান বা একরূপ করলেন। তারপর সেই নাভিচক্র থেকে উদান বায়ুকে উত্তোলন করে বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ে, অনাহত চক্রে স্থাপন করলেন।

এবার হৃদয়স্থ সেই বায়ুকে কণ্ঠনালী দ্বারা ক্রমশ ভ্রুযুগলের মধ্যে নিয়ে এলেন। মনস্বিনী সতী নিজ পিতার প্রতি অভিমানে ও ক্রোধে সর্বাঙ্গে বায়ু ও অগ্নির প্রাদুর্ভাব করতে লাগলেন। তারপর তিনি নিজ পতি জগৎগুরু মহাদেবের চরণপদ্মের মকরন্দ চিন্তা করতে লাগলেন। তখন ভজনানন্দ অনুভূত হওয়ায় তার দেহ থেকে সমস্ত কলুষ দূরীভূত হল। দক্ষকন্যা বলে তার মনে যে অভিমান রূপ কলুষ ছিল তা বিনাশিত হয়ে সমাধি সমুৎপন্ন বহ্নিতে প্রজ্জলিত হল। মহৎ দেবাদিগণের ও পরম পুজণীয় মহাদেবের অতি আদরিণী, সতী, নিজ দেহত্যাগ করলেন।

বৎস বিদুর– এইরূপ অভাবিত এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা দর্শনে আকাশে ও ভূ-তলে হাহাকার রব উঠল। সকলে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। হায় হায়! সর্বদেব শ্রেষ্ঠ শিবের প্রিয়তমা সতীকে আজ পিতা দক্ষ কর্তৃক প্রকোপিত হয়ে প্রাণত্যাগ করতে হল। হায় রে মহাদেবের ক্রোড় আজ একেবার শূন্য। বিশ্বচরাচরের পিতা দক্ষের দুর্বিনীত আচরণ দেখ। মনস্বিনী সতী তো তারই কন্যা। সর্বদা, সর্বত্র তিনি সমাদরণীয়া, তিনি কিনা নিজ পিতৃগৃহে পিতা দক্ষ কর্তৃক অপমানিত হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন।

এই দক্ষ অতি কঠিন প্রাণ। সে শিব বিদ্বেষী, ব্রহ্মদ্রোহী, এ ব্যক্তি জগতে অসকীর্তি ও পরলোকে নরকগামী হবে। তারই অপরাধে নিজকন্যা সতীকে প্রাণদানে উদ্যত দেখেও তিনি একবারের জন্যও তাকে নিবারণ করার চেষ্টা করলেন না।

সতীকে এভাবে প্রাণত্যাগ করতে দেখে উপস্থিত সকল লোক ‘হায় হায়’ করতে থাকেন। তখন সতীর পার্ষদেরা নিজ নিজ আয়ুধ উত্তোলন করে দক্ষকে বিনাশ করতে গেলেন। তাদের প্রবলবেগে ধাবমান দেখে ভীত হল উপস্থিত সকলে।

ভগবান ভৃগু তখন যজ্ঞবিনাশকারীদের বিনাশের উদ্দেশ্যে মন্ত্রাচ্চারণ করে দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দিলেন। ভৃগু ছিলেন অধ্বর্য অর্থাৎ তিনি যর্যর্বেদজ্ঞ হোতা ছিলেন। তার আহুতি প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই অতি আশ্চর্য ঘটনা গেল। ঋভু নামে যে দেবগণ তপস্যায় সিদ্ধ হয়ে সো◌েমলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তারা হাজারে হাজারে দলবদ্ধ হয়ে উত্থান করলেন।

তারা ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান ছিলেন। সেই ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান ঋভু দেবগণ যজ্ঞাগ্নি থেকে উত্থিত হয়ে যজ্ঞের জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে প্রমথ ও গুহ্যকদের প্রহারে উদ্যত হলেন। তার ফলে প্রথম ও গুহ্যকগণ হতমান হয়ে পলায়নে তৎপর হল। যজ্ঞক্ষেত্রে এক চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হল।

মৈত্রেয় বললেন– হে বিদুর, নারদ মহাদেবের কাছে গিয়ে বর্ণনা করলেন, দক্ষ কর্তৃক অপমানিত হয়ে সতী যজ্ঞভূমিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এও শ্রবণ করলেন যে দক্ষ আয়োজিত যজ্ঞাগ্নি থেকে ঋভু নামক দেবগণ উৎপন্ন হয়ে সতীর পার্ষদ সৈন্যদের বিতাড়ন করেছে।

তৎক্ষণাৎ মহেশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধ জন্মাল। ধূর্জটি প্রচন্ড ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের ওষ্ঠদ্বয় দংশন করতে করতে মস্তকের একটি জটা উৎপাটন করলেন। সেই জটা বিদ্যুৎ ও অগ্নিশিখার ন্যায় অত্যন্ত উগ্রভাবে দীপ্তমান হল। প্রায়ন্মেত্ত মহাদেব গাত্রোত্থান করে গম্ভীর শব্দে অট্টাহাস্য করে সেই জটা মাটিতে ফেলে দিলেন।

ভূমিক্ষিপ্ত সেই জটা থেকে মহাকায় দীর্ঘদেহী বীরভদ্রের উৎপত্তি হল। তার দেহ যেন আকাশ স্পর্শ করতে চাইছিল। তার সহস্র বাহু মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, প্রজ্জলিত ত্রিনয়ন যেন তিনটি প্রখর সূর্য, অতি করাল দন্ত ও মাথায় কেশগুলি অগ্নিশিখার মতো প্রজ্বলিত ছিল। তার গলায় নরকরোটির মালা ও হস্তে নানাবিধ অস্ত্র সজ্জিত ছিল।

বীরভদ্র কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন–প্রভু, আদেশ করুন। তখন ভগবান ভূতনাথ বললেন– ওহে রুদ্রভট, তুমি অতিশয় রণনিপুণ, আমার সৈন্যদের অগ্রণী হয়ে ঐ যজ্ঞের হোতা দক্ষকে বিনাশ কর। তুমি স্বীয় অংশ থেকে উদ্ভূত। ব্রহ্মতেজে দুর্জয় বলে ভীত হয়ো না। মহাক্রোধী ভগবানের

আদেশ শিরোধার্য করে, বীরভদ্র দেবাদিদেবকে প্রণতি করে, প্রদক্ষিণ করলেন। তখনি তার মধ্যে অপ্রতিহত বেগের সঞ্চার হলো। তিনি নিজেকে অতীব বলবান ব্যক্তির বল সহ্য করতে সমর্থ অনুভব করলেন।

.

পঞ্চম অধ্যায়

রুদ্রের রুদ্র লীলা

ভগবান রুদ্রের আদেশ অনুসারে তার পার্ষদেরাও সিংহনাদ করতে করতে বীরভদ্রের অনুগামী হল। বীরভদ্র নিজ শূল উত্তোলন করে ভয়ানক গর্জন করলেন। জগতের অন্তসাধক যমেরও অন্তকাল ঘটাতে পারে এই শূল। প্রবল বেগে তিনি যজ্ঞশালার দিকে গমনোদ্যত হলেন। তার চরণের নূপুরের শব্দ অতি ভীষণ শব্দে বেজে উঠল, চলার বেগে উড়ন্ত ধূলরাশিতে দিকসমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

তখন দক্ষ আয়োজিত যজ্ঞসভায় উপবিষ্ট ঋত্বিক, জজমান, দ্বিজ ও দ্বিজপত্নীগণ ও বাকী সভাসদেরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভাবতে থাকলেন, অকস্মাৎ এই আঁধারের কারণ কী? বুঝতে পারে ধূলারাশিতে সমাচ্ছন্ন হয়েছে উত্তরদিক। এত ধুলির আর্বিভাব হলো কোথা থেকে? এখন তো বায়ু প্রবল বেগে বইছে না। কেউ তো গণকে দ্রুতবেগে চারণ করাচ্ছে না। দস্যুদের আক্রমনেও ভয় এমন নেই কারণ উগ্রদন্ত রাজা প্রাচীনবর্হি এখনও জীবিত। তবে কী হলো? তবে কি মহা প্রলয়ের সূচনা হল?

দক্ষের পত্নী প্রসূতি তখন উদ্বেগ সহকারে বলতে থাকেন প্রজাপতি দক্ষ অন্য কন্যাদের সামনে সতীকে অবজ্ঞা করার জন্যই এটা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। অপমান যে শুধুমাত্র সতীকে করা হয়েছে। তাও নয়, ভগবান রুদ্রকেও অপমান করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। এই সমস্ত অমঙ্গলজনক ঘটনাবলী সেই পাপেরই ফল। প্রলয় কালে যে রুদ্রের জটাজাল বিকীর্ণ হয়ে তদীয় ত্রিশূলের অগ্রভাগে দিতেন্দ্রগণকে বিদ্ধ করেন। এটা তাকে অবজ্ঞা করার কুফল। সেই তিনি নানাবিধ অস্ত্রভূষিত বাহু বিস্তার করে প্রলয়নাচনে তাণ্ডবলীলায় মত্ত হন।

তাঁর প্রচণ্ড অট্টহাস্যে মেঘগর্জনের মতো দশদিক বিদীর্ণ হয়ে যায়। তিনি অসহ্য তেজের অধিকারী। তার ভ্রুকুটি নিরীক্ষণ সহ্য করা সাধ্যের অতীত কার্য। সহজেই তিনি রোষান্বিত হন।

যাঁর বিকট দর্শন নক্ষত্ররাজিকেও বিক্ষিপ্ত করে সেই ভগবান রুদ্রকে কুপিত করলে ব্রহ্মারও নিস্তার নেই। উদ্বেগ আশঙ্কায় বিহ্বল সভাস্থিত জনও এরূপ বাক্য বলতে থাকলেন। একইসঙ্গে আকাশে ও ভূতলে চতুর্দিক থেকে সহস্রাধিক উৎপাত অকল্যাণজনক ঘটতে শুরু করল। তখন অতি স্থিতধী প্রজাপতি দক্ষের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হলো।

বৎস বিদুর, এরূপ আশংকা ও উদ্বেগপূর্ণ পরিস্থিতিতে খর্বাকৃতি রুদ্রানুচরদের প্রবেশ ঘটাল যজ্ঞস্থলে। নিজ নিজ অস্ত্রধারণ পূর্বক তারা চতুর্দিক থেকে যজ্ঞস্থানটি ঘিরে ফেলল। তার মধ্যে কেউ অতি খর্বাকৃতি কেউ বা পিঙ্গলবর্ণ, কেউ কেউ পীতবর্ণ বিশিষ্ট, আবার কারও উদর এবং মুখ মকরের ন্যায়। তারা এসেই ঘোরতর তাণ্ডব শুরু করল। কেউ এসে যজ্ঞশালার প্রাক্কংশ অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিমে সংস্থাপিত কড়িকাঠ ভেঙে দিল। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ পশ্চিমে অবস্থিত পত্নীশালা ধ্বংস করল। এখানে যজমান পত্নীদের অবস্থান ছিল। যজ্ঞশালার সমুখস্থ মণ্ডপ একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেল।

একে একে মণ্ডপের অগ্রবর্তী হবিধান ও তার উত্তরে অগ্নিপ্রশালা, যজমানগৃহ, পাক ও ভোজনশালা বিধ্বংস হল। যজ্ঞপাত্র গুলি সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিনষ্ট হল। রুদ্রানুচরদের কেউ কেউ যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত করল। কেউ বা যজ্ঞকুণ্ডের সীমাসূত্র ছিঁড়ে দিল। কেউ বা যজ্ঞকুণ্ডে মূত্রত্যাগ করে তাকে অপবিত্র করে দিল। অপরাপর কেউ কেউ মুনিদের ওপরে আক্রমণ করল। রমণীদের ওপরেও ভীষণ তর্জন-গর্জন শুরু করল। কেউ পলায়ণরত নিকটস্থ দেবগণকে ধরতে গেল। মনিন ভৃগু মুনিকে বন্দী করলেন। বীরভদ্রের হাতে ধরা পড়লেন দক্ষ, চন্ডেশ সূর্যদেবকে বন্দি করলেন, নন্দীশ্বরের হাতে বন্দি হলেন ভগ।

এই চরম তাণ্ডবলীলা চলাকালীন সমস্ত বিষয় দেখে শুনে ঋত্বিকগণ, দেবগণ ও অন্যান্য সভাস্থ জনগণ যেমনভাবে সম্ভব পলায়ন করতে উদ্যত হলেন। রুদ্রানুচরণ তাদের উদ্দেশ্য প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করছিল। পূর্বে-প্রজাপতির যজ্ঞসভায় ভৃগু তার শ্মশ্রু দেখিয়ে মহাদেবকে পরিহাস করেছিলেন। তাই তিনি যখন সুব-নামক যজ্ঞপাত্র হাতে ধারণ পূর্বক হোম করেছিলেন। বীরভদ্র তার শ্মশ্রু উৎপাটন করলেন।

এরপরে বীরভদ্র ক্রোধান্বিত হয়ে ভগদেবকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে তার চোখ দুটি উৎপাটন করলেন। কারণ দক্ষ যখন পূর্বে শিবকে নিন্দা ও তিরস্কার করেছিলেন তখন তিনি অক্ষিকোণ দিয়ে সংকেত করেছিলেন। তারপরে বীরভদ্র পূষার দন্তসমূহ উৎপাটন করলেন। যে ভাবে বলরাম অনিরুদ্ধের বিবাহের সময়ে কলিঙ্গরাজ দন্তবক্রের দন্তসকল উৎপাটন করেন

সেরূপে। কারণ দক্ষ যখন ভগবান শংকরের নিন্দায় রত ছিলেন, তখন এই পূষা অর্থাৎ সূর্যদেব দন্তপ্রদর্শন করে হাস্য করেছিলেন।

সর্বশেষে রুদ্রের অংশোদ্ভুত বীরভদ্র দক্ষের বক্ষঃস্থলে আরোহণপূর্বক তার মস্ত ছেদনে উদ্যত হলেন। তীক্ষ্ণ খড়গ দ্বারা উপর্যুপরি তার মস্তকে আঘাত করতে লাগল। কিন্তু বারংবার আঘাত করে, ও শিরচ্ছেদন সম্ভব হল না।

রুদ্রের অনুচরগণের অগ্রণী বীরভদ্র এবারে বিস্মিত হলেন। নানাবিধ অস্ত্র ও শস্ত্র প্রয়োগ করেও দক্ষের ত্বক বিদীর্ণ হচ্ছে না। এবারে চিন্তারত অবস্থায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করে বীরভদ্র যজ্ঞক্ষেত্রে যেমন পশুবলি দেওয়া হয়, তেমন করে হাড়িকাঠের সাহায্যে যজমান দক্ষের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করল।

পশুতুল্য দক্ষ হত্যা দর্শন করে ভূত-প্রেত-পিশাচেরা 'সাধু-সাধু' রবে আনন্দ রোল করল। কিন্তু দক্ষের পক্ষপাতিগণ এতে বীরভদ্রের অতিশয় নিন্দা করল। এবারে দক্ষের ছিন্ন মস্তকটি বীরভদ্র দক্ষিণাগ্নিতে হোম করে যজ্ঞশালাকে দগ্ধ করলেন। তারপরে কিছুটা শান্ত হয়ে রুদ্রানুচরদিগের সঙ্গে কৈলাস পর্বতাভিমুখে গমন করলেন।

মৈত্রেয় বললেন– হে বিদুর, রুদ্রানুচরবর্গ দেবতাদের পরাস্ত করে শূল, পট্টিশ, নিস্ত্রিংশ গদা, পরিখ ও মুদগর দ্বারা তাদের সর্বাঙ্গে আঘাত করে ক্ষত বিক্ষত করে দিল। তখন দেবগণ ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে ঋত্বিক ও সদস্যদের সঙ্গে ব্রহ্মার নিকট গমন করলেন। তাকে সসম্মানে প্রণিপাত করে তারা দক্ষ যজ্ঞের সবিস্তার বিবরণ দিলেন। দক্ষযজ্ঞের এই পরিণতি সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত ছিলেন ভগবান পদ্মযোনি ও বিশ্বাত্মা নারায়ণ। তারা একারণে দক্ষ আয়োজিত যজ্ঞে গমন করেন নি। দেবগণের কাছ থেকে সমস্ত বিষয় শ্রুত হলেন ব্রহ্মা।

তিনি বললেন– যাঁর প্রতি অপরাধ করা হয়, সেই ব্যক্তি যদি অতি তেজস্বী হন তবে অপরাধকারীর বাঁচবার আশা প্রায়শই কল্যাণজনক হয় না। ভগবান মহাদেব যজ্ঞের অংশভাগের অধিকারী। তাঁকে বঞ্চনা করে প্রভূত অপরাধ সাধিত হয়েছে। তোমরা যেহেতু অপরাধী, তাই বিশুদ্ধ হৃদয়ে আশুতোষের পাদপদ্মে স্মরণ নিয়ে তাকে তুষ্ট কর।

যিনি ক্রুদ্ধ হলে লোকপালগণের সঙ্গে সকল লোকের বিনাশ হয়, তার হৃদয় দক্ষের কটুক্তিতে বিদ্ধ হয়েছে। তদুপরি, সম্প্রতি তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর প্রাণবিয়োগ ঘটেছে। এমত পরিস্থিতিতে অতি শীঘ্র তোমার যজ্ঞের পুনরুদ্ধার কামনা কর। সত্ত্বর তার নিকটে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

আমি (ব্রহ্মা), যজ্ঞরূপী ইন্দ্র, তোমরা সকল দেবগণ, মুনিগণ ও অন্যান্য দেহধারী জীব কেউ তাঁর তত্ত্ব ও বল বিক্রমের পরিসীমা জানি না। এ অবস্থায় সেই স্বতন্ত্র ভগবান ভবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ব্যাতীত অন্য কোনও উপায়ে প্রতিবিধান আশা করতে পারি না।

.

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রহ্মার কৈলাসে আগমন

ব্রহ্মা দেবগণকে এরূপ আদেশ দিলেন। তারপরে তিনি পিতৃ ও প্রজাপতিগণকে সঙ্গে নিয়ে স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ করে ত্রিপুরারি মহাদেবের অতিপ্রিয় বাসভূমি গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন করলেন। এই কৈলাস পর্বত ওষধি, তপস্যা, মন্ত্র ও যাগাদি বিষয়ে সিদ্ধ দেবগণের নিত্য আবাসভূমি। ঐ স্থানকে সর্বদা কিন্নর, গন্ধর্ব ও যোগাদি অপ্সরাগণ পরিবৃত করে রাখেন। ঐ পর্বতের শৃঙ্গ নানাবিধ মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ।

নানাবিধ ধাতুতে চিত্রিত ঐ পর্বতে নানান বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, মৃগ সকল শোভিত ছিল। ঐ পর্বতে বহুপ্রকার নির্মল প্রস্রবণ, বিবিধ গুহাকন্দর ও স্থান থাকার কারণে পতি সঙ্গে বিহার পরায়ণ সিদ্ধ পত্নীগণের কাছে অত্যন্ত রমণীয় ও রতিপ্রদ ছিল। সেখানকার পরিবেশ ময়ুরগণের কেকারবে, মধুমত্ত ভ্রমরের গুঞ্জনে, কোকিলের কুহুস্বরে ও অন্যান্য পক্ষীকুলের কাকলিতে মুখরিত ছিল।

সেই কৈলাস পর্বতে বহুসংখ্যক কল্পবৃক্ষ অবস্থান করায় তাদের শাখা-প্রশাখায় আন্দোলন যেন পর্বত হস্তচালনা করছে বলে প্রতীয়মান হত। পর্বতেই বুঝি সঞ্চারণশীল ঝরণার ছলছল কলধ্বনিতে মনে হত পর্বতই বুঝি কথা বলছে। পারিজাত, মন্দার, সরল, তমাল, মশাল, তাল, রক্ত কাঞ্চন, জীবক, অর্জুন প্রভৃতি বৃক্ষরাজিতে ঐ পর্বত অত্যন্ত সুশোভিত ছিল। এ ছাড়াও আ, কদম্ব, নাগ, নীপ, পুন্নাগ, চম্পক, পল, অশোক, বাবুল, কুন্দ, কুরুবক, স্বর্ণবর্ণশতপত্র, করবী, রেণুকে, যাঁতি কুজ্বক, মল্লিকা, মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতায় ঐ পর্বতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছিল।

পনস (কাঁঠাল), ডুমুর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, হিঙ্গু, ভুর্জ, মজার, আমড়া ইত্যাদিতে ঐ পর্বত শোভিত ছিল। বিবিধ ওষধি বৃক্ষ, পূগ, রাজপূগ, জম্বু, পিয়াল, মটুক, উজুদ, রেণু ও বীচক বৃক্ষ ঐ কৈলাসে বিরাজিত ছিল।

সরোবরস্থিত কুমুদ, উৎপল, কর, শতপত্রাদির সমারোহে সেখানে পাখীদের কলকাকলিতে মধুময় আবহধ্বনি সৃষ্টি হত। সেখানে মৃগ, ক্রোড় শুকর, সিংহ, হস্তী, ভল্লুক, শালক, বন্যগরু, রুরু, মৃগ, শরভ, ব্যাঘ্র, মহিষ, একপদ অশ্ব, নেকড়ে, কস্তুরী মৃগ, কর্নোন অর্থাৎ মনুষ্যাকৃতি বিশিষ্ট মৃগসকল বিচরণ করত। বৃক্ষশাখায় বানরকুলের বসবাস ছিল। কদলীবৃক্ষ দ্বারা সরোবরতীরস্থ ভূমি আবৃত ছিল।

নন্দা নামক নদী ঐ পর্বতের চতুর্দিক বেষ্টন করে প্রবাহিত ছিল। সতীর স্নানপুণ্যে তা অতি পবিত্র ছিল। ভগবান মহাদেবের ঐ মনোহর বাসস্থান কৈলাসগিরি দর্শন করে দেবগণ বিস্ময়ে হতবাক হলেন। ঐ পর্বতের উপরিস্থিত অলকাপুরী ও সৌগন্ধিক বনের দর্শন পেলেন।

ঐ অলকাপুরীর বহির্দিকে নন্দা ও অলকানন্দা নামে দুটি নদী বহমান। তার তীর্থপাদ ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্মরেণু দ্বারা অতি পবিত্র। বিদুর, দেব কন্যারা স্বীয় স্থান থেকে অবতরণ করে ঐ দুটি নদীতে অবগাহন করেন এবং কান্তগণের অঙ্গ জল সিঞ্চন করে প্রমোদক্রীড়ায় মেতে ওঠেন। দেবরমণীগণের স্নানের সময় তাঁদের গাত্রভ্রষ্ট নবকঙ্কুযেমের কারণে ঐ নদীর জল পীতাভ মধুর বর্ণ ধারণ করে।

হস্তিগণ হস্তিনীদের ঐ জল পান করানোর সময়ে নিজেরা পিপাসার্তক না হলেও ঐ জলপান করে। সৌগন্ধিক নামক বনানীতে সৌগন্ধিক নামে একটি বিশেষ পদ্ম প্রস্ফুটিত থাকে।

দেবতাগণ রৌপ্য, স্বর্ণ ও মহারত্নখচিত শতাধিক বিমানে এবং বিদ্যুৎ ও মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায়। যক্ষ রমনীগণে পরিবৃত যক্ষপুরী অতিক্রম করে সৌগন্ধিক বন দর্শন করলেন। ঐ বনে কামদুধ বৃক্ষসমূহে নানাবিধ পুষ্প ফল ও পত্রাদি শোভিত ছিল। সেখানে ভ্রমরের গুঞ্জন ও কোকিলের মধুর ধ্বনিতে বাতাস ভারী হয়েছিল। ঐ বনের জলাশয় সমূহে যে পদ্ম প্রস্ফুটিত থাকত তা রাজহংসগণের অতি প্রিয়। ঐ বনস্থিত চন্দন বৃক্ষ সমূহে হস্তী-হস্তিনীগণ গাত্র মার্জনা করায় অপূর্ব দ্রুম নির্গত হয়। তার সৌরভে সেখানে উপবিষ্ট যক্ষ রমণীদেরও মন-প্রাণ বারে বারে উন্মমিত হয়।

সেখানকার বাদীগণের সোপান শ্রেণী বৈদুর্যমণি দ্বারা বিরচিত ও তাতে পদ্মের মাল্য বিরাজিত। বিপুরুষগণ সেখানে বিলাসের নিমিত্ত অধিষ্ঠান করতেন। এরপরে দেবতাসকল একটি বিশাল বটবৃক্ষের দর্শন পেলেন। সেটির শত যোজন উচ্চতা, পঞ্চসপ্ততি যোজন বিস্তৃত শাখাসমূহ দ্বারা বিস্তৃত ছায়া দেখে দেবগণ বিস্মিত হলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই বৃক্ষে কোন পক্ষী ছিল না, এটি সর্বপ্রকার তাপশূন্য ছিল। দেবগণ সেখানে তার নিকট গমন করলেন। বিশাল সেই বটবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হয়ে তারা দেখলেন সেই তরুমূলে স্বয়ং ভগবান ভব অধ্যাসীন। মহাযোগী মহাদেবের ক্রোধ তখন শান্ত হয়ে এসেছিল, এতে দেবগণের বোধ হল যেন সাক্ষাৎ বৃত্তান্ত ক্রোধ ত্যাগ করে মুমূর্ষজনের আশ্রয়রূপে সেখানে উপস্থিত আছেন। সে সময় অতি প্রশান্ত মূর্তিতে শিব অধিষ্ঠিত ছিলেন। সনন্দন প্রভৃতি মহাসিদ্ধ ঋষিবৃন্দ ও যক্ষ অধিপতি কুবের তার সেবায় রত ছিলেন। উৎপত্তি স্থিত ও সংহার কর্তা, জগতের অধীশ্বর মহাদেব তখন উপাসনা, তপস্যা ও সমাধি আশ্রয় করে উপবেশন করেছিলেন। শংকর নিজে সমগ্র বিশ্বের সুহৃদ বলে স্নেহবশতঃ জগত কল্যাণার্থে তপস্যায় রত ছিলেন। সান্ধ্য মেঘের ন্যায় রক্তাভ গৌরবর্ণ দেহে ভস্ম, অজিন, জটা, দণ্ড, প্রভৃতি তপস্বীজনের অভিলাষ পূর্ণ চিহ্নাদি ও কপালে চন্দ্রলেখা অঙ্কিত ছিল।

তিনি যোগীগণের উপযুক্ত কুশাসনে উপবেশন করে ছিলেন। তাঁর সম্মুখে সনন্দনাদি সাধুজন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সম্মুখে তিনি জিজ্ঞাসু নারদকে সনাতন ব্রহ্ম বা বেদ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছিলেন।

বাম চরণপদ্ম ডান উরুতে ও বাম বাহু বাম জানুতে স্থাপন পূর্বক অবস্থান করেছিলেন। ডান বাহুর মণিবন্ধে, অক্ষমাল্য ধারণপূর্বক তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার অগ্রভাগদ্বয় সংযোজিত ছিল। অপর তিনটি আঙ্গুলি প্রসারণ করে তর্কমুদ্রা বিশিষ্ট হয়ে তিনি বীরাসনে অবস্থান করেছিলেন। ব্রহ্মানন্দে সমাধিস্থ ছিলেন অর্থাৎ একগ্রতা অবলম্বন করেছিলেন। তখন লোকপালগণের সঙ্গে মুনিগণ সেখানে গিয়ে ভগবান ভবনে কৃতাঞ্জলি পুটে প্রণিপাত করলেন।

দেব ও অসুরগণ যাঁর চরণ বন্দনা করেন সেই মহাদেব ব্রহ্মার আগমন বুঝতে পেরে আসন থেকে উত্থিত হলেন। ভগবান বিষ্ণু বামনরূপে যেমন প্রজাপতি কশ্যপকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। শংকর তেমনি মস্তক নত ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন। মহর্ষিদের সঙ্গে নারদ ও সিদ্ধ ঋষিগণ ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন। এইভাবে অভিবন্দিত হয়ে সহাস্যবদনে ব্রহ্মা প্রণত মহাদেবকে কিছু বলতে উদ্যত হলেন।

ব্রহ্মা বললেন– হে ভব, আপনি যদিও আমাকে নমস্কার জানাচ্ছেন, তবু আমি জানি আপনিই এ বিশ্বের নিয়ামক। এ জগতের যোনি ও বীজ। যে প্রকৃতি পুরুষ তাকে শিব ও শক্তি বলে। ঐ দুইয়ের কারণ যে নির্বিকার ব্রহ্ম তা আপনারই স্বরূপ।

হে ভগবান্ আপনিই ঊর্ণনাভির ন্যায় অবিভক্ত শিব ও শক্তিতে ক্রীড়াশীল হয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয়ের রূপ দর্শন করাচ্ছেন। ধর্ম ও তার্থপ্রদ বৈদিক কর্মপদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য আপনি নিজেই দক্ষকে সূত্র করে অবতারণা করেছিলেন। ইহলোকে ব্রাহ্মণগণ ব্রত ধারণপূর্বক শ্রদ্ধার সঙ্গে যে সব ধর্মাচরণ করে, আপনি স্বয়ং সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম-মর্যাদা নির্ধারণ করছেন।

হে মঙ্গলময়, আপনি শুভ কর্মফলযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য স্বর্গ অথবা মোক্ষের সন্ধান দেন কিন্তু অশুভ কর্মফল যুক্ত ব্যক্তিদের ঘোর নরকে নিক্ষিপ্ত করেন। কিন্তু দেব কোনও কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় কেন?

যে সকল ব্যক্তি আপনার শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করে সর্বভূতে নিজেকে উপলব্ধি করে তাদের প্রতি কখনই আপনার রোষ জন্মায় না। যারা ভেদদর্শী নয়, অভেদরূপে আপনাকে সকল প্রাণীতে উপলব্ধি করে, তাদের কখনই দক্ষের মতো পশুতুল্য অন্তদশায় পতিত হতে হয়না। যে সকল ব্যক্তিবর্গ ভেদদর্শী আশায় দুষ্ট, শুধুমাত্র কর্মে যারা আসক্ত, অপরের উন্নতিতে যাদের হৃদয়ে দুঃখবোধ হয়। বাক্য দ্বারা যারা অপরের মর্ম পীড়ার কারণ হয়। দেব তাদেরই দণ্ডবিধান করে। আপনার মতো সাধু ব্যক্তির তাদের বধ করা সমুচিত বলে মনে করেন না।

যে সকল মনুষ্যগণ ভগবান পদ্মনাভের দুরতায় মায়ায় বিমোহিত হন, সাধুগণ তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন। কোনো দেশে কোনো কালে ভেদ বুদ্ধি সম্পন্নতার কারণে যদি তারা সাধুদের প্রতি ভুলক্রমে অপরাধ্য সম্পন্ন করে পরদুঃখ সহিষ্ণুতার গুণে মহৎ ব্যক্তিবর্গ তাতে অনুকম্পা প্রকাশ করেন। দৈববশে সংঘটিত বিষয়ে নিজ পরাক্রম প্রকাশ করেন না।

হে প্রভু, আপনি পরম পুরুষ ভগবানের অচিন্ত্য প্রভাবশালী মায়ায় বিমোহিত হন । আপনি তো সর্বজ্ঞ। তাই যারা ঈশ্বরের মায়ায় প্রভাবিত হয়ে জড়কর্মেই আসক্ত। তাদের প্রতি তো আপনার অনুগ্রহ করাই সমুচিত কার্য।

হে প্রভু। আপনি যজ্ঞের ফলদাতা ও যজ্ঞভাগ ভোগী। কুৎসিৎ যাজ্ঞিকেরা আপনাকে যজ্ঞের প্রাপ্যভাগ থেকে বঞ্চিত করায় দক্ষের যজ্ঞ স্বাভাবিক ভাবেই বিনষ্ট হয়ে অসামপ্ত আছে। কৃপাপূর্বক আপনি সেই যজ্ঞ উদ্ধার করুন। ভগদেবের উৎপাটিত চক্ষুদ্বয় পুনরায় দান করুন, পূষার দণ্ড আবার উৎপন্ন হোক।

হে রুদ্র, আপনার অনুচরদের দ্বারা নিক্ষেপিত অজস্র প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে ভগ্নদেহী দেব ও পুরোহিতগণ শীঘ্র আরোগ্য লাভ করুক।

হে রুদ্র, এই আপনার অংশ রইল। এরপর যজ্ঞের অবশিষ্ট বস্তু সকলই আপনার হবে। হে যজ্ঞনাশক আপনার ভাগ গ্রহণ করে যজ্ঞকার্য সমাধা করুন।

মৈত্রেয় বললেন– হে মহাবাহু বিদুর, ব্রহ্মার এরূপ অনুনয়ে পরিতুষ্ট হলেন ভগবান ভব, তার প্রসন্ন বদনে স্মিত হাসির রেখা পরিস্ফুট হল। তিনি বললেন– হে প্রজেশ, আমি দেব মায়ায় বিমোহিত মূর্খ বালকদের কোন কর্তব্য বলে মনে করি না। তবে দক্ষ যজ্ঞের শুধুমাত্র ধর্মের মর্যাদা রক্ষার্থে দণ্ডের বিধান করেছি।

প্রজাপতি দক্ষের মস্তক দগ্ধ হয়েছে, তাকে ছাগের মুণ্ড প্রদান করা হোক। ভগদেব মিত্রদেবের . চক্ষুর সাহায্যে নিজ যজ্ঞ অংশ দর্শন করুন। পূষ পিষ্ট ভোজী হোক ও যজমানের দন্তর সাহায্যে ভক্ষণ করতে সক্ষম হোক। যে যে দেবতাগণ আমাকে যজ্ঞের অংশ প্রদান করেছে। তাদের ভগ্ন-অঙ্গাদি পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হোক। যে যে ঋত্বিকগণের অঙ্গ সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হয়েছে, তারা অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের বাহুর সাহায্যে অঙ্গযুক্ত হোক।

সূর্যের হস্ত দ্বারা তারা হস্তযুক্ত হোক। দূর্গের শ্মশ্রু ভৃগুর শ্মশ্রু হোক।

মৈত্রেয় বললেন– বিদুর, প্রণতজনের অভিষ্টদাতা মহাদেবের এরূপ বচন শ্রবণ করে, সকলে হৃষ্টচিত্তে 'সাধু সাধু' বলতে লাগলেন। তারপরে দেব ও ঋষিগণ মহাদেবকে আমন্ত্রণ করে তাঁকে যজ্ঞস্থলে নিয়ে গেলেন। যজ্ঞ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা ও মহাদেব দক্ষের অসম্পূর্ণ যজ্ঞসভার দিকে অগ্রসর হলেন।

ভগবান ভবের নির্দেশানুসারে সমস্ত কার্য সম্পন্ন করে যজ্ঞীয় ছাগ-পশুর মস্তক দক্ষের মুণ্ডহীন দেহে সংস্থাপন করলেন। তখন ভগবান রুদ্রদেব তার প্রতি দৃষ্টিপাত করামাত্র নিদ্রোত্থিত

ব্যক্তির মতো দক্ষ জেগে উঠলেন। চক্ষু উন্মিলিত করামাত্র তিনি সমুখে মহাদেবকে দর্শন করলেন।

.

সপ্তম অধ্যায়

দক্ষের অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা

পূর্বে শিবের নিন্দা করায় কুলষিত চিত্ত দক্ষের হৃদয় মহাদেবের কৃপাদৃষ্টিতে এখন নির্মল ও পবিত্র হল। তিনি মহাদেবকে স্তব করতে ইচ্ছুক হলেন। তখনই তার মৃতকন্যা সতী তাঁর মানসপটে উদিত হল। উৎকণ্ঠা ও অনুতাপে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে উঠল। প্রেমবশতঃ তার চিত্ত আকুল হওয়ায় তিনি মহাদেবের স্তব করতে অসমর্থ হলেন। অনেকক্ষণ পরে অতিকষ্টে নিজেকে সুস্থিত করে নিষ্কপট চিত্তে মহাদেবকে স্তব করতে লাগলেন।

দক্ষ বলতে থাকেন– হে ভগবান্ আপনাকে তিরস্কার করা সত্ত্বেও আপনি আমার প্রতি দণ্ডবিধান পূর্বক মহৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আপনি ও ভগবান বিষ্ণু তো অধার্মিক ব্রাহ্মণকেও উপেক্ষা করেন না। আমি তো যজ্ঞ প্রভৃতি ব্রতে দীক্ষিত, আপনি আমার মতো ব্যক্তিদের কীভাবে অবজ্ঞা করবেন?

হে প্রভু পরমেশ্বর। আপনি নিজতত্ত্ব রক্ষার্থে ব্রহ্মরূপে বিদ্যা, তপস্যা ও ব্রতসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের মুখমণ্ডল থেকে সৃষ্টি করছেন। পশুপালকেরা দণ্ড হাতে নিয়ে পশুদের রক্ষা করে। আপনিও তেমনি সর্ববিপদে ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করে থাকেন।

আমি আপনার তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম। সেজন্য সভামধ্যে আপনার উদ্দেশ্যে দুর্বাক্যবাণ প্রয়োগ করেছিলাম। আপনার ন্যায় পূজ্যতমের নিন্দা করার কারণে আমার চূড়ান্ত অধঃপতন হয়েছিল। সে কটুক্তি বিস্মৃত হয়ে আপনি আমাকে রক্ষা করলেন। হে ভগবান, নিজগুণে আপনি নিজেই সন্তুষ্ট হোন, আমার কোনো ক্ষমতা নেই।

মৈত্রেয় বললেন– প্রজাপতি দক্ষ এভাবে কামবর্ষী ভগবানের ক্ষমা উৎপাদন করলেন। তারপরে ব্রহ্মার আদেশে উপাধ্যায় ও ঋত্বিকগণের সাহায্যে যজ্ঞের পুনঃপ্রবর্তন করলেন। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞের বিস্তার করলেন। রুদ্র পার্ষদেরা প্রমথ প্রভৃতির সঙ্গে সংসর্গজনিত দোষ মুক্তি উদ্দেশ্যে বিষ্ণু সম্বন্ধীয় ত্রিকপাল হবির দ্বারা হোম করলেন।

হে বিদুর, যজমান দক্ষ যজ্ঞবেদজ্ঞ পুরোহিতের সাথে যজ্ঞের হবি গ্রহণ পূর্বক শুদ্ধি বুদ্ধি সহযোগে ধ্যান মগ্ন হলেন। তখন ভগবান নারায়ণ সেখানে আবির্ভূত হলেন। তিনি দশদিক উজ্জ্বলকারী স্বীয় তেজ দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণের তেজ বিনষ্ট করে গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করে সেখানে আবির্ভূত হলেন। বেদের বর্ণনা অনুযায়ী বৃহদখণ্ডের নামক স্তোত্র দুটিকে গরুড়ের পক্ষ বলে স্বীকার করা হয়। হরির সেই মূর্তির গাত্রবর্ণ শ্যামলা, কটিতটে হিরণ্যতুল্য রশনা বা স্বর্ণ কিঙ্কিনী, মস্তকস্থিত কিরীট সূর্যের মতো অতি উজ্জ্বল কুণ্ডল।

মুখ মণ্ডল ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কেশকলাপে পরিব্যাপ্ত। বাহুতে কেয়ুর প্রভৃতি স্বর্ণলঙ্কার সুশোভিত। ধাতুগুলিতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনু, শর, বাণ, মর্গ ও চর্ম শোভিত। তার বক্ষদেশে বিরাজিত লক্ষ্মীদেবী গলায় বনমালা প্রশান্ত হাস্য ও প্রসন্ন দৃষ্টিতে তিনি বিশ্বকে অবলোকন করছিলেন। উভয় পার্শ্বে ভ্রাম্যমান ব্যজন ও চামরের ন্যায় রাজহংস শোভিত ছিল। মস্তকের উপরে পূর্ণচন্দ্র বিরাজিত ছিল। সমগ্ররূপে তিনি অতিশয় সুন্দর শোভা বিস্তার করেছিলেন।

শ্রীহরিকে দর্শন করামাত্র ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মহাদেব প্রমুখ দেবগণের প্রভা স্তিমিত, ভয়ে চিত্ত ক্ষুব্ধ হলেও মাথায় হাত তুলে করজোড়ে তার স্তব করেছিলেন।

একথা সত্য যে ব্রহ্মাদি দেবগণের পক্ষে ভগবানের মহিমা অনুধাবন করা অসম্ভব। তবুও তারা স্বীয় বুদ্ধি অনুযায়ী ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য শ্রীহরির প্রকাশিত মূর্তির উদ্দেশ্য স্তব করতে লাগলেন।

প্রথমেই দক্ষ উত্তম পাত্রে, আসন প্রভৃতি পূজার উপকরণ গ্রহণ করে করজোড়ে হৃষ্টচিত্তে তার স্তব করতে লাগলেন। ভগবান বিষ্ণু তখন সুনন্দাদি অনুচরদিগের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। দক্ষ তার উদ্দেশ্য বললেন– হে প্রভু, আপনি নিজ স্বরূপেই অবস্থানরত। শুদ্ধ চৈতন্যঘন সেই স্বরূপে সকল বুদ্ধ্যবস্তাই নিবৃত্ত হয়েছে। আপনি এক অদ্বিতীয় এবং অভয়স্বরূপ। শুদ্ধ চৈতন্যরূপ, আপনি মায়াকে পরাভূত করে স্বীয় মায়ায় তার দ্বারাই আপনি নিজ ইচ্ছানুসারে মনুষ্যভাব ধারণ করেন। এর ফলে আপনি রাগ-দ্বেষাদি বিশিষ্ট যত মায়াতে অবস্থিত বলে প্রতীয়মান হয়ে যাবেন।

ঋত্বিকগণ বললেন– হে নিরঞ্জন, নন্দীশ্বরের অভিসম্পাতে আমাদের বুদ্ধি শুধুমাত্র কর্ম অনুষ্ঠানেই আসক্ত। আপনার প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। কিন্তু ধর্মের জনস্বরূপ

ধর্মোপেক্ষা বেদ প্রতিপাদ্য যজ্ঞ নামক মূর্তিটি আমরা অবগত হলাম। যে যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত আপনি ইন্দ্রাদি অধিদেবতারূপ বিশেষরূপ আশ্রয় করেছেন।

সদস্যগণ বললেন– হে আশ্রয়পদ, তুমি ভিন্ন এই সংসার পথে কোনো বিশ্রাম যোগ্য স্থান নেই। অবিদ্যা, অস্মিতরাগা দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ পথও ক্লেশকর। দুর্গম স্থানে পরিব্যপ্ত অন্তঃকরণ বিষধর সর্প সর্বদা একে লক্ষ্য করছে। ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, উষ্ণতা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহ এখানে। শর্তস্বরূপ। খলরূপী ব্যাঘ্রের ভয় এখানে অহরহ বিদ্যমান এবং শোকরূপ দাবানল এখানে নিয়ত প্রজ্বলিত রয়েছে। এই সংসারমার্গ পথে বর্তমান থেকে বিষয়-মরীচিকায় বিভ্রান্ত দেহ ও গৃহরূপ ভারে আক্রান্ত কামদগ্ধ ও জীবগণ আপনার চরণ কমলে আশ্রয় লাভ করতে সক্ষম হবে।

রুদ্রদেব তখন বললেন– হে বরদ, আপনার শ্রীচরণ সকাম জনগণের নিখিল কাঙ্খিত ফলপ্রদানে সমর্থ। নিষ্কাম মুনিবৃন্দ ও পরম আদরে তার অর্চনা করেন। আমার চিত্ত ঐ পাদপদ্মে নিবিষ্ট রয়েছে। এরফলে অজ্ঞ লোকেরা আমাকে আচার ভ্রষ্ট বলে কল্পনা করে তা আমি গন্য করি না, আপনার পরশ অনুগ্রহ করে মনে মনে তুষ্ট থাকি।

মহর্ষি ভৃগু বললেন– আপানার গহন মায়াজালে ব্রহ্মাদি সকল জীবগণই আত্মজ্ঞানে নিজের ও ভগবানের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়ে অজ্ঞানের তিমিরে শায়িত আছেন। আপনি তাঁদের অন্তরে অবস্থান। করলেও তারা আজও আপনার স্বরূপ অনুধাবন করতে পারে নি। আপনি প্রণতজনের আত্মা ও বন্ধু। আমি আপনাকে প্রণাম করছি। আপনি দয়া করে আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

ব্রহ্মা বললেন– সাধারণ লোকসকল পদার্থের ভেদগ্রাহক ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যা যা দর্শন করে তা আপনার প্রকৃত স্বরূপ নয়। আপনি অধিভূত, আধ্যত্ম ও অধিদৈবের আশ্রয় সত্য। তবে মায়াময় অধিভূত প্রভৃতি অসৎ পদার্থ থেকে আপনি ভিন্ন। ইন্দ্র বললেন– হে অচ্যুত, সুরবিদ্বেষী দৈত্যদের বিনাশক উদ্যত আয়ুধ দ্বারা সংযুক্ত আটটি ভূজদন্ডে শোভিত। আপনার এই শ্রীমূর্তি পরম সত্য বিশ্বপালক। মন ও আনন্দের প্রদায়ক এই মূর্তি।

ঋত্বিক পত্নীগণ বললেন– হে পদ্মনাভ! আপনার যজনের পূর্বে ব্রহ্মা এই যজ্ঞের সূচনা করেছিলেন। অদ্য ভগবান পশুপতি দক্ষের প্রতি রোষান্বিত হয়ে সেই যজ্ঞ বিনাশ করেছেন। তাতে যজ্ঞের উৎসব নিবৃত্ত হয়েছে। হে যজ্ঞমূর্তি, সম্প্রতি আপনার কৃপাবলোকন দ্বারা এই যজ্ঞ পবিত্র করুন।

ঋষিগণ বললেন– হে ভগবান, আপনার আচরণ সাধারণের বোধগম্য নয়। আপনি নিজে কর্ম করেও তাতে লিপ্ত হন না। অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যে সম্পদের নিমিত্ত ঈশ্বরীয় ভজনা করে সেই লক্ষীদেবী আপনার সেবায় সতত নিয়োজিত। তথাপি আপনি তাঁকে আদর করেন না। ভক্তজনের প্রতিই আপনার প্রেম সদা বর্ষিত হয়।

সিদ্ধগণেরা বললেন– হে ভগবান, ক্লেশরূপ দাবাগ্নিতে দগ্ধ ও বিষয় তৃষ্ণায় পীড়িত আমরা। আমাদের এই দুর্দমনীয় মন মাতঙ্গের ন্যায় আপনার কথারূপ বিশুদ্ধ অমৃত সাগরে অবগাহন করে পরব্রহ্মের সাথে ঐক্য প্রাপ্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করে। তার ফলে আমরা সংসারের দুঃখ-ক্লেশাদি আর অনুভব করি না এবং সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতেও চাই না।

দক্ষপত্নী প্রসূতি বললেন– হে ইশ, আপনার সুখে আগমন হয়েছে তো? মস্তকহীন কবন্ধ পুরুষ হস্ত-পদাদি অবয়ব যুক্ত হলেও শোভা পায় না। হে অধিশ্বর, তেমনি আপনাকে ছাড়া প্রজাদি অঙ্গযুক্ত হলেও যজ্ঞ শোভা পায় না। হে ঈশ্বর আপনাকে প্রণাম, আপনি আমাদের ওপর প্রসন্ন হোন। হে শ্রীনিবাস, নিজ কান্তা লক্ষীর সাথে আমাদের রক্ষা করুন।

লোকপালগণ বললেন– হে ভূষণ, এই অখিল ভুবনের স্রষ্টা হচ্ছেন আপনি। আপনিই সর্বজীবের সাক্ষীরূপ। আমাদের ইন্দ্রিয়সকল কেবলমাত্র মায়াময় বস্তু দর্শনে সমর্থ, এতদ্বারা প্রত্যাগাত্মা আপনার প্রকৃত স্বরূপ দ্রষ্ট হয় না। পঞ্চভূত থেকে পৃথক ষষ্ঠ স্বরূপে আপনার প্রকাশ আপনার এক মায়ামাত্র।

যোগেশ্বরগণ বললেন– যে ব্যক্তি বিশ্বাত্মা পরম ব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে নিজেকে অভেদরূপে দর্শন করে, সে ব্যক্তিই আপনার কৃপার পাত্র। তবুও ভক্তবৎসল মহাপ্রভু যে সকল ব্যক্তি নিজেদের ভৃত্যজ্ঞানে আপনাকে প্রভুজ্ঞানে ভজনা করে আপনি যেন তাদের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত না করেন এই কামনা করি। হে ভগবান, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় প্রভৃতি নিমিত্ত আপনার মায়ার গুণ জীবগণের ভাগ্যবশতঃ বহু প্রকার বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। সেই মায়ার গভীর প্রভাবে জীবের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি নানাবিধ ভেদবুদ্ধি হয় আবার কেবলমাত্র স্বরূপে অবস্থান পূর্বক তাদের ভেদবুদ্ধি ও তার কারণাদি নিবর্তিত করেন।

আপনাকে প্রণাম করি। শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ বললেন– আপনি সত্ত্বগুণ স্বীকার করে অবতার দেহ ধারণ করে ধর্ম প্রভৃতি উৎপন্ন করে থাকেন। আবার আপনি নিগুণও বটে। যদিও একই ব্যক্তিতে স্বত্তানত্ত্ব ও নিগুণত্ব অসম্ভব হলেও আপনার ক্ষেত্রে সবই সম্ভব। আমি আপনার তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞাত, ব্রহ্মাদি দেবগণও তা সম্পর্কে অজ্ঞ। অগ্নিদেব বললেন– তোমার তেজ দ্বারা

আমার তেজ সুষ্টরূপে প্রদীপ্ত হয়ে থাকে। তোমার প্রশান্ত মৃত্যুক্ত হবি দেবগণের উদ্দেশ্যে আমি বহন কুরে থাকি। যজ্ঞপালক যজ্ঞমূর্তি তুমি! তোমাকে নমস্কার। অগ্নিহোত্র, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য দর্শ ও পশু– সোম এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ তোমার স্বরূপ। এই পাঁচপ্রকার যজ্ঞীয় মন্ত্রে তুমিই সম্যক রূপে পূজিত হয়ে থাক।

দেবগণ বললেন– প্রলয়কালে আপনি কার্যসকল উদরের মধ্যে ধারণ করে জলধিমধ্যে অনন্তশয্যায় শায়িত ছিলেন। তখন জনলোকের অধিবাসী সিদ্ধপুরুষেরা আপনার আধ্যাত্মপদবী হৃদিমধ্যে চিন্তা করে থাকেন। সেই আদিপুরুষ আপনি আমাদের নয়নপথে বিচরণ করে চলেছেন, আমরা সবাই আপনার ভৃত্য, আপনি আমাদের রক্ষাকর্তা।

গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ বললেন– হে দেব, মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, রুদ্র প্রমুখ ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই আপনার অংশ। হে নাথ, চতুর্দশ ভুবনাত্মক বিশ্ব আপনার ক্রীড়ার সামগ্রী। আপনাকে প্রণাম।

বিদ্যাধরগণ বললেন– পুরুষার্থ সাধনার যোগ্য এই দেহ লাভ করে আপনার মায়াবশত এতে– দেহভিমানী হয়েও আপনার কথারূপ অমৃত পান করে, শুধুমাত্র তার পক্ষেই ঐ মোহ ত্যাগ সম্ভব হয়, অন্য কারও পক্ষে তা সম্ভব নয়। উৎপথগামী পুত্রাদি দ্বারা তিরস্কৃত হলেও কোন ব্যক্তির গুরুতর দুঃখ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও মোহভঙ্গ হয় না। কারণ অনিত্য বিষয়াদিতে তার মন প্রবিষ্ট থাকে।

ব্রাহ্মণগণ বললেন– হে ভগবান, আপনিই যজ্ঞ আপনিই হবি। আপনিই হুতাশন, আপনি মন্ত্র, সমিধ, যজ্ঞপাত্র, সদস্য, ঋত্বিক, যজমান– পত্নী, দেব, অগ্নিহোত্র, স্বহা, সোমরস, ঘৃত ও যজ্ঞীয় পশু সমস্ত কিছুই আপনার রূপ। হে বেদমূর্তি, পূর্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রথম ভাগে বরাহরূপে অবতীর্ণ হয়ে অবলীলায় আপনি ধরিত্রীকে রসাতল থেকে উদ্ধার করেছিলেন। হস্তিনী যেমন দন্তাগ্র দ্বারা পদ্মিনীতে জল থেকে উত্তোলন করে, তেমনি আপনি নিজ দন্তাগ্র দ্বারা উদ্ধার করেছিলেন। আপনার ঐ কার্য প্রত্যক্ষ করে যোগীপুরুষেরা আনন্দিত মনে স্তব করেছিলেন। যজ্ঞই আপনার কর্ম।

হে যজ্ঞেশ্বর, আমাদের যজ্ঞকার্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আপনার দর্শন লাভের জন্য উন্মুখ হয়েছিলাম। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। আমাদের যজ্ঞকার্যটি উদ্ধার করে দিন। আপনার নামকীর্তন করলে যজ্ঞবিঘ্নকারীরা সকল বিষয়ের বিনাশ হয়। আপনার চরনে আমরা প্রণিপাত করছি।

মৈত্রেয় বললেন– হে বিদুর, এইরূপে ভগবান নারায়ণের গুণকীর্তন করতে থাকলে, প্রজাপতি দক্ষ, রুদ্ররোষে বিনষ্ট যজ্ঞের পুনঃপ্রবর্তন করলেন।

হে অনঘ, ভগবান বিষ্ণু সকলের আত্মা– স্বরূপ। তিনি সততঃ আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত হলেও ঐ যজ্ঞে তার নিজ অংশ দিকপাল পুরোহিত গ্রহণ করে অতি আনন্দিত হলেন। তিনি মহানন্দে দক্ষকে সম্বোধন করে বললেন– আমি জগতের পরম কারণ আমিই আত্মা, ঈশ্বর ও সর্বজীবের সাক্ষী স্বরূপ। আমি স্বপ্রকাশ ও উপাধিশূন্য। সেই আমিই শংকর, আমাদের মধ্যে কখনও ভেদ দর্শন করে না।

হে দ্বিজ, আমিই ত্রিগুণময়ী মায়ার প্রভাবে এ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ স্বরূপ। আমি অদ্বিতীয় শুদ্ধ পরম ব্রহ্মস্বরূপ। অজ্ঞ ব্যক্তিরা আঘাতে ব্রহ্মা, রুদ্র ও সাধারণ জীবমাত্রকেই বিভিন্ন মনে করে। সাধারণ লোকে যেমন মস্তক, হস্ত প্রভৃতি নিজ নিজ অঙ্গ– প্রত্যঙ্গ কখনও পরকীয় বুদ্ধি করে না, তেমনি আমার প্রকৃত ভক্তজনেও চরচরাত্মক কোনও প্রাণীকে আমার অপেক্ষা ভিন্ন জ্ঞান করে না। আমাদের তিনজনের স্বরূপ এক ও অভিন্ন আমরা সর্বজীবের আত্মা। যে সকল ব্যক্তি আমাদের তিনজনের মধ্যে ভেদদর্শন না করে, সে পরম শান্তি লাভ করে।

মৈত্রেয় বললেন– বিদুর, ভগবান বিষ্ণুর উপদেশ শ্রবণ করে প্রজাপতি দক্ষ বিশেষ যজ্ঞ সহযোগে ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করলেন। তারপরে তিনি অঙ্গ ও প্রধান যজ্ঞের মাধ্যমে অন্য দেবগণের অর্চনা করলেন। পরে সমাহিত চিত্তে শিবে ভেদবুদ্ধিশূন্য হয়ে রুদ্রের অংশ তাকে সমর্পণ করে পূজা করলেন। যজ্ঞসমাপ্তি ক্রিয়া দ্বারা সোমপায়ী ও অন্য দেবতাদের পূজা করলেন।

সকল কর্মের সমাধা হলে দক্ষ ঋত্বিকগণের সঙ্গে শুভ স্নান করলেন। দক্ষের নিজ মাহাত্ম দ্বারা সিদ্ধি লাভ হলেও, দেবগণ তাঁকে ধর্মোপদেশ প্রদান করে স্বর্গযাত্রা করলেন।

হে বিদুর– আমরা এরূপ জানি যে, দাক্ষায়ণী সতী এভাবে পূর্ব কলেবর ত্যাগ করে হিমালয় পত্নী মেনকার গর্ভে পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রলয়কালীন সুপ্তশক্তি পুনর্বার ঈশ্বরকেই লাভ করে। তেমনি অম্বিকা পুনরায় প্রিয়তম শিবকেই পতিরূপে লাভ করেছিলেন।

অনন্যস্বভাবা ব্যক্তিবর্গের একমাত্র গতি ভগবান ভব। দক্ষযজ্ঞ বিধ্বংসকারী ভগবান রুদ্রের এই কর্মাবলী, আমি বৃহস্পতি শিষ্য উদ্ধবের নিকট শ্রবণ করেছি। হে কৌরব্য, ভগবান

মহেশ্বরের এই চরিত্র পরম পবিত্র, যশস্কর ও আয়ু বর্ধনকারী। ইহা শ্রবণ বা কীর্তনে সকল পাপের উপশম হয়। শ্রবণকারী ও কীর্তনকারীগণের সংসারে দুঃখ দূর হয়।

.

অষ্টম অধ্যায়

ধ্রুবের তপস্যা

মৈত্রেয় বললেন– বিদুর, সনকাদি এই চারজন এবং নারদ ঋভু, হংস অরুণি ও যতি এই পাঁচজন ব্রহ্মপুত্রেরা জন্মাবধি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। এঁরা কখনই গৃহাশ্রম আশ্রয় করেন নি। সেজন্য এঁদের কোন বংশ নেই।

হে শত্রুনাশন বিদুর, ব্রহ্মার পুত্র অধর্মের এক ভার্য্যা ছিলেন মিথ্যা। ঐ মিথ্যার গর্ভে দম্ভ ও মায়া নামক দুটি সন্তান জন্ম নেয়। নিখুঁতি নামক রাক্ষস নিঃসন্তান হওয়ার কারণে তাদের দত্তক গ্রহণ করে। সহোদর হওয়া সত্ত্বেও দম্ভ ও মায়া স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কযুক্ত ছিল।

হে মহামতি বিদুর, সেই দম্ভ ও মায়ার পুত্র ও কন্যার নাম ছিল লোভ ও নিকৃতি (শঠতা)। লোভ ও শঠতার পতি-পত্নীর মিলনের ফলে শঠতার গর্ভে ক্রোধ নামক পুত্র ও হিংসা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। অধর্মের বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে এরাও পতি-পত্নীরূপে মিলিত হয়। ক্রোধ ও হিংসার সন্তানদ্বয় হল কাল ও দুরুক্তি।

কাল ও দুরুক্তি প্রকৃতপক্ষে ভাই-বোন হলেও তারা স্ত্রী-পুরুষ রূপে সম্পর্কিত হয়। কাল তার ভগ্নী ও ভার্য্যা দুরুক্তির গর্ভে ভীতি নামক কন্যা ও মৃত্যু নামক পুত্রের জন্ম দেয়। তাদের উভয়ের দাম্পত্যের ফলে নরক নামে পুত্র ও যাতনা নামে এক কন্যার উৎপত্তি হয়। হে নির্দোষ বিদুর, আমি তোমার কাছে অধর্মের বংশ পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত করলাম। অধর্ম প্রলয়ের কারণ আবার ইহা পুণ্যেরও কারণ। অধর্ম বর্জনে পুণ্যলাভ সম্ভব হয়। যে সকল ব্যক্তিরা এ বৃত্তান্ত তিনবার শ্রবণ করবেন তাদের সকল পাপ দূরীভূত হবে।

হে কুরুবংশোদ্ভূত বিদুর, অনন্ত ভগবান হরির অংশাংশ থেকে জন্মগ্রহণ কারী স্বায়ম্ভুব, পবিত্র কীর্তি মনুর বংশ বিষয়ে আমি এবার বর্ণনা করছি, তুমি শ্রবণ করো।

স্বায়ম্ভুব মনুর স্ত্রী শতরূপার গর্ভে দুই পুত্রের জন্ম হয়। তাদের নাম ছির প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। এঁরা নারায়ণের অংশে জন্ম নিয়েছিলেন বলে জগতের রক্ষণকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের নাম ছিল সুনীতি ও সুরুচি। এঁদের মধ্যে সুরুচি, উত্তানপাদের, প্রিয়পাত্রী ছিলেন। কিন্তু সুনীতি পতির প্রিয়পাত্রী হতে পারেন নি। এই সুনীতির পুত্রের নাম ছিল ধ্রুব।

একদিন রাজা উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে বসিয়ে আদর করছিলেন এসময়ে ধ্রুব সেখানে এসে উপস্থিত হয়। সেও তখন পিতার কোলে উঠতে আগ্রহী হয়। কিন্তু রাজা উত্তানপাদ ধ্রুবকে কোলে নিলেন না, পাছে সুরুচির অভিমান হয়।

তখন সুরুচি, সপত্নী সুনীতির পুত্রকে কোলে উঠাতে ইচ্ছুক দেখে রাজার সামনেই তাকে ভৎর্সনা করতে লাগলেন– বৎস ধ্রুব, তুমি রাজার ছেলে হলেও, রাজার কোলে বা রাজাসনে ওঠবার যোগ্য তুমি নও। কারণ তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করো নি। তুমি নেহাৎই বালক। তাই তুমি হয়তো জানোনা, তুমি রাজার অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত, সেজন্যই এরূপ দুলর্ভ বিষয়ে তোমার ইচ্ছা হয়েছে। তুমি যদি রাজাসন লাভে ইচ্ছুক হও, তবে তপস্যার দ্বারা পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনা করো। তাঁর অনুগ্রহে তুমি আমার গর্ভে জন্ম নিতে পারবে। তবেই তোমার ঐ অভিলাষ সিদ্ধ হবে।

মৈত্রেয় বললেন– বিদুর, বিমাতার এরূপ দুর্বাক্যরূপ বাণ বিদ্ধ হয়ে দণ্ডাহত সাপের মতো বিষান্বিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে কাঁদতে লাগলেন বালক ধ্রুব। পিতার সামনেই সুরুচি তাঁকে এসব কথা বলেছিলেন। কিন্তু পিতা কোনও কথা বলেন নি। তাই সে পিতাকে পরিত্যাগ করে দৌড়ে মায়ের কাছে গেল। বালকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলছে এবং তার অধরোষ্ঠ তিরতির করে কাঁপছে দেখে সুনীতি ব্যস্ত হয়ে ধ্রুবকে কোলে তুলে নিলেন।

অন্তঃপুরস্থ লোকেদের মুখে সুরুচির দুর্বাক্য ও দুর্ব্যবহারের কথা শুনে অত্যন্ত ব্যথাতুর হলেন সুনীতি। দাবাগ্নি মধ্যগতা লতার ন্যায় শোকাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়ে সুনীতি ধৈর্য হারিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সপত্নীর বাক্যবাণ মনে পড়লেই, তাঁর পদ্মলোচন দুটি থেকে অশ্রুবারি বিগলিত হতে লাগল। দুঃখের পার দেখতে পেলেন না। সুনীতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুত্র ধ্রুবকেই সান্ত্বনা পূর্বক বলতে থাকলেন– বৎস, এ বিষয়ে অপরের কোনও দোষ মনে কর না, যে অপরকে কষ্ট দেয় সে নিজপ্রদত্ত সেই দুঃখই ভোগ করে থাকে। সুরুচি ঠিকই বলেছে, কারণ রাজা উত্তানপাদ আমাকে ভার্য্যা এমনকী দাসী বলে স্বীকার করতেও লজ্জিত হন। আমি এমনই

হতভাগ্য রমণী। তুমি আমার গর্ভে জন্মেছ এবং আমারই স্তন্যপানে বড় হয়েছ। তাই রাজাসনে আরোহণের ইচ্ছা তোমার পক্ষে অনুচিতই বটে।

হে বৎস, তোমার বিমাতা যে কথা তোমায় বলেছেন, তা অতি সত্য। তুমি যদি সত্যই রাজসিংহাসনে আরোহণ করতে চাও, তবে মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করো, কায়মনোবাক্যে ভগবান অর্ধেক্ষজের চরণকমলে আরাধনা কর।

বৎস জগতের প্রতিপালন করার জন্য যিনি সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান স্বীকার করেন তিনিই ভগবান নারায়ণ। যোগীপুরুষেরা মন-প্রাণ এক করে তার সাধনায় নিয়োজিত থাকেন। সেই ভগবান হরির পাদপদ্ম আরাধনা করেই ব্রহ্মা সর্বোত্কৃষ্ট ব্রহ্মপদ লাভ করেছেন। তোমার পিতামহ ভগবান মনু, প্রচুর দক্ষিণাপূর্ণ যজ্ঞের সাহায্যে একাগ্রমনে সেই হরির উপাসনা করেন। অন্যের দুর্লভ দিব্য ও ভৌম সুখ ও অন্তে অপবর্গ তিনি লাভ করেছিলেন।

হে বৎস, মুক্তিকামী পুরুষবর্গ যাঁর চরণপদ্ম লাভের পথ অন্বেষণ করেন, তুমিও তার ভজনা কর। অনন্যভাবে নিজ ভক্তি ধর্ম শোধিত হৃদয়ে ভক্তবৎসল হরিকে সংস্থাপতি করে, তাঁর উপাসনা কর।

হে বৎস ধ্রুব, ব্রহ্মাদি দেবগণ, লক্ষ্মীদেবীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী দীপতুল্য পদ্ম নিয়ে শ্রীহরির সেবায় রত থাকেন, তুমি সেই শ্রীহরির শরণ নাও। কারণ পদ্মপলাশ নয়ন শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কেউ তোমার দুঃখ-কষ্ট নিবারণ করতে পারবেন না।

মৈত্রেয় বলে চললেন– জননীর মুখে এরূপ বিলাপ ও উপদেশ শ্রবণ করে বালক ধ্রুব ধীরে ধীরে সংযত হলেন। বুদ্ধি দ্বারা মনকে সংযত করে তিনি পিতৃগৃহ থেকে বহির্গত হলেন। এদিকে যদৃচ্ছাক্রমে নারদ তা শ্রবণ করলেন। ধ্রুবের মনের অভিপ্রায় জানতে পেরে মনে মনে ভাবলেন- অহো, ক্ষাত্রতেজ কী বিষম! এরা সামান্য মানহানি সহ্য করতে পারে না। ধ্রুবের মস্তকোপরি তিনি নিজের পাপ বিনাশক হাত রাখলেন। এই ধ্রুব নিতান্ত বালক হলেও বিমাতার কটুবাক্য একে এখনও বিদ্ধ করছে।

নারদ বললেন– বৎস ধ্রুব, এখন তুমি নেহাতই বালক। তোমার এখন খেলাধুলোয় মত্ত থাকার সময়, এ সময়ে তোমার সন্মান বা অপমান কিছুই আমাদের লক্ষ্য হয় না। যদি একান্তই তোমার মান অপমান বোধ হয়ে থাকে তা হলেও লোকের মোহ ব্যাতীত অন্য কোনো অসন্তোষের কারণ নেই। কারণ এ জগতে সুখ বা দুঃখ নিজ নিজ কর্মফল অনুযায়ী প্রাপ্ত হয়।

বৎস, ঈশ্বরের আনুকূল্য ব্যাতীত কোনও উদ্যম ফলপ্রসূ হয় না। এটা ভেবে দৈব্যবশে যা উপস্থিত হয় বুদ্ধিমান ব্যক্তির তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

আর মায়ের উপদেশ শুনে তুমি অনন্তনারায়ণের প্রসাদ লাভে উদ্যোগী হয়েছ! কিন্তু তিনি সাধারণ মানুষের দুরারাধ্য। মুনিবৃন্দ সর্বপ্রকার সঙ্গ ত্যাগপূর্বক তীব্র যোগসমাধি অবলম্বন পূর্বক অনুসন্ধান করেও বহু বহু জন্মেও তার প্রকৃত পদবী জানতে সক্ষম হন না। তুমি তো বালক, তায় কামনা যুক্ত, তুমি কিভাবে তাকে উপলব্ধি করতে পারবে?

অতএব, তুমি এ নিষ্ফল আগ্রহ ত্যাগ কর। যখন বার্ধক্য উপস্থিত হবে, তখন এ বিষয়ে যত্ন করো। দৈব নির্দেশ অনুযায়ী সুখ ও দুঃখ যেভাবে আসে, তাতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকতে পারে, তার মুক্তি সম্ভব। অদৃষ্টবশতঃ সুখ এলে তাতে বুঝতে হবে পুণ্যক্ষয় হচ্ছে। অদৃষ্টবশতঃ দুঃখ এলে তাতে পাপক্ষয় হয়েছে বলে মনে করা উচিত। যে ব্যক্তি অধিক গুণবান পুরুষের প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন, গুনাধর্ম লোকের প্রতি কৃপাবান ও সমগুণসম্পন্ন ব্যক্তিতে মিত্রতা স্থাপন করে, সে সময় সুখের অধিকারী হয়।

ধ্রুব বললেন– হে মহাত্মা, সুখ-দুঃখে হতমান পুরুষদের প্রতি কৃপাপূর্বক যে চিত্ত বিক্ষেপ নিবৃত্তির উপায় অর্থাৎ শখ আপনি প্রদর্শন করলেন, তা আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে একান্ত দুজ্ঞেয়। ঘোর ক্ষত্রিয় স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় আমি অতি দুর্বিনীত। তদুপরি বিমাতার বাক্যবাণে আমার হৃদয় বিদ্ধ হয়েছে। সেই বিদ্ধ হৃদয়ে আপনার উপদেশ স্থানপ্রাপ্ত হচ্ছে না।

হে ব্রহ্মণ্! আমার পিতৃ-পিতামহগণ এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যে পদের সন্ধান পান নি, আমি সেই ত্রিভুবনের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সেই পদ জয় করতে ইচ্ছুক। আপনি কৃপা করে তার উপযোগী উত্তম পথ বলে দিন। আপনি ভগবান ব্রহ্মার পুত্র। তাই জগৎপাল বাসুদেবের পরম ভক্ত। জগতের কল্যাণার্থে বীণাবাদন করতে করতে আপনি সূর্যের ন্যায় ত্রিভুবন পরিক্রমা করেন।

মৈত্রেয় বললেন– ধ্রুবের এই প্রকার কথা শুনে দেবর্ষি নারদ পরম প্রীত হলেন। দয়া করে তাঁর মনোরথ সাধনের উপযোগী সাক্য বললেন। নারদ বললেন– তোমার জননী যেরূপ বলেছেন, তাই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির পথ। তুমি একাগ্রমনে সেই বাসুদেবের ভজনা কর। যে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ নিজের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি সে বিষয়ে শুধুমাত্র হরির পদসেবাই করবেন। কারণ ভগবানের চরণপদ্মের উপাসনা করলে সকলের সকল বাসনা পূর্ণ হয়। অতএব হে বৎস, তোমার কল্যাণ হোক। তুমি ভগবানের আরাধনার জন্য যমুনা তটস্থিত

পরম পবিত্র মধুবনে অভিগমন কর। সেখানে হরি নিত্যই অবস্থান করছেন। সেখানে গমন করে, তুমি কালিন্দীর পুণ্যশীতল সলিলে ত্রি-সন্ধ্যা অবগাহন করে, নিজ কর্তব্য দেবপ্রণাম করবে। তারপর কুশ, স্বস্তিকা প্রভৃতি দ্বারা আসন রচনা করে উপবেশন করবে। পরে পূরক, কুম্ভক ও রেচকযুক্ত প্রাণায়ামের সাহায্যে প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের মালিন্য দূর করে, স্থির চিত্তে ক্রমে ক্রমে পরমগুরু ভগবান শ্রী বিষ্ণুর ধ্যান করবে।

সেই হরি ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্যে সর্বদাই উদ্যত। তাঁর মুখমণ্ডল সদাপ্রসন্ন, দৃষ্টি প্রশান্ত। নাসিকা, ভ্রু ও গন্ডদেশ অতি রমণীয়, তিনি সর্বদা দেবগণের মধ্যে পরম সুন্দর। তিনি তরুণ। তার অঙ্গসকল রমণীয় ওষ্ঠদ্বয় ও চক্ষু লোহিত বর্ণ। তিনি দীনপ্রণতজনের পরম আশ্রয়। সকলের সুখকর শরণাগতের রক্ষক এবং দয়ার সাগর। তিনি শ্রীবৎস লাঞ্ছিত, নবদলশ্যামবর্ণ, পুরুষকার, বনমাল্যধারী, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম দ্বারা তাঁর চতুর্ভুজ-রূপ সুচারুরূপে অভিব্যক্ত। তার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বাহুতে কেয়ূর ও বলয়, গলদেশে কৌস্তুভমণি ও পরিধানে পীতকৌশেয় বস্ত্র। তার নিতম্বদেশে শোভিত মেখলা। চরণদ্বয়ে কাঞ্চননূপুরের নিক্কনে মধুর শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে। তিনি অতীব দিব্যকান্তি দর্শনীয় পুরুষ। তার প্রশান্তমূর্তি মন ও নয়ন আনন্দ-বর্ধন করে। ভক্তিভরে অর্চনাকারী ভক্তমণ্ডলীর হৃদপদ্মের মধ্যস্থলে তার অধিষ্ঠান। তাঁর পুণ্য চরণযুগল তার নিজ নামরূপ মণিসমূহে উদ্ভাসিত।

ভগবানের এই মধুর মূর্তি মনের মধ্যে ধারণ করে, সুস্থিত ও একাগ্রচিত্তে বরশ্রেষ্ঠ ভগবানের ধ্যান করবে। প্রসন্ন মনে ঈষৎ হাস্যমুখে ও অনুরাগযুক্ত হয়ে তার ধ্যান করাই বিধেয়। এভাবে ভগবানের কল্যাণময় রূপ ধ্যান করতে করতে তোমার চিত্ত শীঘ্রই শান্ত ও ধীর হবে। তার চরণ থেকে আর নিবৃত্ত হবে না।

হে রাজপুত্র ধ্রুব, তোমাকে আমি পরম গুহ্য মন্ত্র প্রদান করলাম। এই মন্ত্র সাতরাত্রি জপ করলে পুরুষ গগনচারী সিদ্ধপুরুষদের দর্শন লাভ করে। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়–এই সেই মন্ত্র।

দেশ ও কালের বিভাগ বেত্তা ব্যক্তি নানাবিধ উপচারের দ্বারা ভগবান বাসুদেবের পূজো করবে। এসময়ে তাঁকে পবিত্র জল, মাল্য, বন্য-ফলমূলাদি, প্রশস্ত দুর্বা, বন্যবসন অর্থাৎ ভূর্জত্বক ইত্যাদি দ্বারা তাঁর অর্চনা করা কর্তব্য। উপাসনাকালে ভগবানের সর্বাধিক প্রিয় তুলসী-পত্র দ্বারা অর্চনা অবশ্য কর্তব্য।

যদি দ্রব্যময়ী অর্চা অর্থাৎ শিলাদি নির্মিত প্রতিমা পাওয়া যায়, তবে তাতেই পূজো করবে। তার অভাবে মৃত্তিকা ও জলেও পূজা প্রশস্ত। অর্চনাকারীকে ধৃতচিত্ত মননশীল, সংযতবা এবং পরিমিত ফলমূলাহারী হওয়া প্রয়োজন। শ্রীধর-স্বামীপদ পরিমিত আহার বিষয়ে যা নিয়ম বলেছেন–তা হল, দুই-ভাগ অন্ন অর্থাৎ খাদ্য দ্বারা পূরণ, একভাগ জলের দ্বারা পূরণ ও চতুর্থভাগ বায়ুর প্রচারের জন্য খালি রাখা বাঞ্ছনীয়।

তারপর উত্তমশ্লোক ভগবান, নিজ অচিন্ত্য মায়াশক্তির অধিষ্ঠানে ইচ্ছাপূর্বক অবতার পরিগ্রহণ করে আচরণীয় বিষয়াদির চিন্তা করবে। ভগবানের যত-প্রকার পরিচর্য্যা পূর্বে কর্তব্যরূপে বিহিত হয়েছে, সে সকল উপচারাদি মনে মনে কল্পনা করে পূর্বোক্ত মহামন্ত্র দ্বারা অর্থাৎ দ্বাদশাক্ষক বাসুদেব মন্ত্র দিয়ে মন্ত্রমূর্তি ভগবানের পূজা করবে। এভাবে ভগবানের মনোগত করে, একমনে ভক্তিযুক্ত পরিচর্য্যা পূর্বক উপাসনা করবে। এতে ভগবান হরি সন্তুষ্ট হয়ে ভজনকারী জনগণের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতির মধ্যে সাধকের উপযোগী অভিমতই প্রদান করে থাকেন। যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ মুক্তিলাভের অভিলাষী তার পক্ষে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বিরক্তি পূর্বক প্রগাঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা নিরবিছিন্নভাবে ভজন করা আবশ্যক।

দেবর্ষি নারদের এই উপদেশাবলী শ্রবণপূর্বক রাজপুত্র ধ্রুব তাঁকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করলেন। এরপর শ্রীহরির চরণাঙ্কিত পুণ্যতম মধুবনে গমন করলেন। ধ্রুব প্রস্থান করলে, দেবর্ষি নারদ রাজা উত্তানপাদের অন্তঃপুরে প্রবেশিত হলেন। সেখানে রাজা তাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। অভ্যর্থনা গ্রহণ পূর্বক তিনি রাজাকে প্রশ্ন করলেন, হে রাজন, আপনি ম্লান মুখে দীর্ঘকাল যাবৎ কী চিন্তায় মগ্ন রয়েছেন, আপনার ধর্ম, অর্থ, কাম কিছু কি বিনষ্ট হয়েছে?

রাজা উত্তানপাদ বিমর্ষ বদনে উত্তর দিলেন– হে ব্রাহ্মণ, আমি অত্যন্ত অন্যায় করেছি। এক স্ত্রীর বশীভূত হয়ে নিষ্ঠুরের মতো নিজপুত্রের প্রতি অবজ্ঞা করেছি। মাত্র পঞ্চমবর্ষীয় সুবোধ বালক ধ্রুবকে, তার মায়ের সঙ্গে নির্বাসনে দিয়েছি। আহা, ক্লান্তিতে তার মুখটা এতক্ষণে শুষ্ক হয়ে গেছে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বৃক্ষতলে নিদ্রিত হয়ে পড়লে কী জানি কোন্ হিংস্র জন্তু তাকে আক্রমণ করে থাকবে, হায়, হায়! আমি স্ত্রীপরতন্ত্র, আমার দৌরাত্ম্য বিবেচনা করুন। সেই বালক শুধুমাত্র আমার কোলে উঠতে ইচ্ছুক ছিল। এমন পাষাণহৃদয় আমি তাকে একটু আদর পর্যন্ত করিনি।

নারদ বললেন– মহারাজ, দেবতাদের দ্বারা আপনার পুত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার যশ সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হবে। সে বিষয়ে অবগত না হয়ে কেন মিছে শোকগ্রস্ত হচ্ছেন, মহারাজ, আপনার পুত্র লোকপালগণেরও দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদন করে, আপনার কীর্তি বিস্তারপূর্বক অতি শীঘ্র আপনার কাছে ফিরে আসবে।

মৈত্রেয় বললেন–হে বিদুর, রাজা উত্তানপাদ দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে এ বৃত্তান্ত শ্রবণ করলেন। তিনি রাজ্যলক্ষ্মীকে অনাদর করে সমস্ত সময় শুধুমাত্র পুত্রের বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

এদিকে ধ্রুব মধুবনে গমন করলেন। সেখানে কালিন্দী নদীতে স্নান করে, পবিত্র সেই রাত্রি উপবাস করলেন। তারপর দেবর্ষির উপদেশ অনুযায়ী ভগবান পুরুষোত্তম হরির পরিচর্যায় প্রবৃত্ত হলেন। প্রতি তৃতীয় দিনে ধব কেবলমাত্র দেহরক্ষার্থে কপিঞ্জ্ব ও বদরীফল আহার করে, ঈশ্বরের আরাধনায় প্রথম মাস নির্বাহ কলেন, তারপরে দ্বিতীয় মাসে তিনি প্রতি ষষ্ঠ দিবসে শুষ্ক তৃণ-পত্রাদি আহার করতেন। প্রতি নবম দিবসে শুধুমাত্র জলগ্রহণ করে সমাধি অর্থাৎ তদগতচিত্ত হয়ে পুর্ণশ্লোক ভগবানের আরাধনায় রত হয়ে তৃতীয় মাস অতিবাহিত করলেন। তারপরে প্রতি দশ দিবসে শুধুমাত্র বায়ুভক্ষণ ও প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাস জয় করে ধ্যানযোগে ভগবানের চিন্তা করতে হয়ত চতুর্থ মাস অতিক্রান্ত হল। চতুর্থ মাসের পর ধ্রুব শ্বাসজয় করে পরব্রহ্মের চিন্তা করতে করতে একপদে স্থানুর মতো দণ্ডায়মান হয়ে রইলেন।

এরপর শব্দাদি বিষয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় মনকে সকল বিষয় থেকে আকর্ষণ করে হৃদিমধ্যে কেবল ভগবানের রূপ চিন্তা ধ্যান করতে লাগলেন। তখন অন্য কোনও পদার্থ তার দৃষ্টিগোচর হয় নি। এভাবে ধ্রুব মহদাদির আধার ও শ্রম প্রকৃতি– পুরুষের ঈশ্বর পরব্রহ্মের ধ্যান করতে শুরু করলেন।

ত্রিভুবন তাঁর তেজে থরথর করে কম্পিত হতে লাগল। রাজপুত্র ধ্রুব যখন একপদে দণ্ডায়মান হয়ে ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর পদভারে পৃথিবীর অর্ধাংশ নুইয়ে পড়েছিল। গজরাজি নৌকায় আরোহণ করলে তার বাম ও ডান প্রতি পদভারে নৌকা হেলে যায়। তেমনি রাজপুত্র তপস্বী ধ্রুবের পদাঙ্গুষ্ঠভারে পৃথিবী নত হল।

ধ্রুব তখন প্রাণ ও তার দ্বারা-বন্ধন পূর্বক নিজের সাথে অভেদরূপে বিশ্বমূর্তি নারায়ণের ধ্যানপরায়ণ হলেন। তখন সমস্ত লোক ও লোকপালগণ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অত্যন্ত পীড়িত হলেন। তারা উপায়ান্তর না দেখে ভগবান বিষ্ণুর শরণাগত হলেন।

দেবগণ বললেন– হে ভগবান, চরাচর সমস্ত প্রাণীর শরীরে, এই প্রকার শ্বাসরোধ কখনও দেখিনি। এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে আমাদের পরিত্রাণ করুণ, আপনি প্রণম্য, আমরা আপনার শরণাগত হলাম।

ভগবান বললেন– হে দেবগণ, তোমরা ভীত হয়ো না, যে বালকের তপস্যা জনিত কারণে তোমাদের প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয়েছে, সে হল রাজা উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব। ভয় নেই, দুষ্কর তপস্যা থেকে তাকে আমি নিবৃত্ত করছি। এখনি সে ধ্যানযোগে বিশ্বরূপ আমার সঙ্গে একতা লাভ করেছে। তোমরা নির্ভয়ে নিজ নিজ স্থানে গমন করো।

.

নবম অধ্যায়

বরলাভের পর ধ্রুবের প্রত্যাগমন ও পিতৃদত্ত রাজ্যপালন

মৈত্রেয় বললেন–ভগবানের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করে দেবতাগণ আশ্বস্ত হলেন। তাদের মনের যাবতীয় ভীতি দূরীভূত হল। তারা ভক্তি পূর্বক ভগবানকে প্রণাম করে স্বর্গে অভিগমন করলেন। অতঃপর সহস্রশীর্ষ ভগবান নিজ ভক্ত ধ্রুবকে দর্শন দানের উদ্দেশ্যে গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণপূর্বক মধুবনের উদ্দেশ্যে গমন করলেন।

এদিকে ধ্রুব তখন সুদৃঢ় ধ্যানযোগে নিশ্চল হয়েছিলেন। নিজ হৃদয়কমলাসনে অধিষ্ঠানরত ভগবানের বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় উজ্জ্বল মূর্তি দর্শন করছিলেন। আচম্বিতে সে মূর্তি তিরোহিত হল। ধ্রুব চক্ষু উন্মীলিত করলেন। বিস্মিত হয়ে তিনি দেখলেন, এতক্ষণ অন্তরমধ্যে যে রূপের ধ্যানে তিনি মগ্ন ছিলেন সেই শ্রীমূর্তি ভগবান তার সম্মুখে উপস্থিত। ভগবান দর্শনে ধ্রুব অভিভূত আনন্দে ভূমিষ্ঠ হয়ে সাষ্টাঙ্গে তাকে প্রণাম করলেন। ধ্রুব যেন দু'চোখ ভরে তার রূপসুধা পান করতে লাগলেন। মনে মনে তিনি ভগবানকে সহস্রবার চুম্বিত করলেন। তিনি যেন নিজ দু'বাহু দ্বারা ভগবানকে আলিঙ্গন করতে থাকলেন। এ সবই অন্তর্যামী ভগবান হরি বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ধ্রুব তার গুণে অভিভূত হয়ে স্তব করতে ইচ্ছুক। কিন্তু সে কিভাবে স্তব করতে হয়, তা জানে না। তাই সে পরম ভক্তিভাবে জোড়হাত করে দণ্ডায়মান। কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান বেদময় শঙ্খ দিয়ে তার দু'গাল স্পর্শ করলেন।

ভগবানের শঙ্খস্পৃষ্ট হওয়া মাত্রই ধ্রুবের ভগবৎ বিষয়িণী বাকশক্তির জন্ম হল। তার পরমাত্মা ও জীবের তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান জন্মিল। তখন ধ্রুব ধীরভাবে বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের স্তবকীর্তনে প্রবৃত্ত হলেন। বৎস বিদুর, এভাবেই ধ্রুব অখিললোক প্রাপ্ত হলেন।

ধ্রুব বললেন– অখিল শক্তির যিনি ধারক, সেই ভগবানকে আমি নমস্কার করি। তিনি আমার অন্তরমধ্যে প্রবেশিত হয়ে স্বীয় চিদশক্তি দ্বারা আমায় প্রসুপ্ত করেছেন। তিনিই আমার হস্ত, চরণ, শ্রবণ, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদি এবং প্রাণের সঞ্জীবনকারী সেই পরমারাধ্য পুরুষ ভগবানকে আমি প্রণাম করি।

হে ঈশ্বর, আপনিই নিজ শক্তি ত্রিগুণময়ী মায়ার সাহায্যে এই মহাদাদি অশেষ জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সেই মায়ার প্রভাবেই আবার অন্তর্যামীরূপে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন। অগ্নি বস্তুতঃ এক হওয়া সত্ত্বে কাঠের বিভিন্ন ধর্মের কারণে ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। তেমনি আপনি মূলত এক হলেও বিবিধরূপে প্রকাশিত হন। বস্তুতঃ আপনি ব্যতীত অপর কেউই জ্ঞান-ক্রিয়া শক্তিধারী নয়।

হে নাথ, স্বয়ং ব্রহ্মা আপনার প্রদত্ত জ্ঞানের সাহয্যে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় এই বিশ্ব দর্শন করেছিলেন। হে আর্তবন্ধু, আপনার চরণমূল মুক্ত পুরুষদেরও আশ্রয়স্থল। আপনার ভক্তজন ও উপকৃত জনেরা কখনই আপনার পাদপদ্ম বিস্মৃত হতে পারে না। আপনি জন্ম মৃত্যুর নিবারণতা। কল্পতরুর ন্যায় আপনি সবার বাসনা পূরণ করেন। যারা আপনার সেবা ব্যতীত কাম প্রভৃতি অন্যান্য ফলের আরাধনায় রত থাকেন, তারা নিশ্চয়ই আপনার মায়ার দ্বারা বিমোহিত প্রাণ। কারণ শবতুল্য। জড়দেহের ভোগ্য সুখ যা তাদের কাম্য, সেই বিষয় সম্বন্ধজনিত সুখ প্রাণীগণের নরকেও লভ্য হয়।

হে নাথ, আপনার পদযুগলের ধ্যানের দ্বারা দেহধারী জীবাদির যে আনন্দলাভ হয় আত্মানন্দরূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও সে সুখ লাভ হয় না। আপনার ভক্তজনের কথা শ্রবণ বা কীর্তনে যে আনন্দ লাভ হয়, তার সঙ্গে অপর কিছুই তুলনীয় নয়।

আর অন্তরের কালরূপ অসির আঘাতে কর্তিত হয়ে যে সকল লোক বিমান থেকে পতিত হয়, তাদের কথা আর কি বলার আছে? অতএব, ঐ জাতীয় লোকেদের সেই পরমানন্দ লাভের কোনও সম্ভাবনা নেই।

হে অনন্ত, আমার এই একমাত্র প্রার্থনা– আপনাতে নিরন্তর ভক্তিরত অমলাশয় মহৎ ব্যক্তিবর্গের প্রকৃষ্ট সান্নিধ্য যেন আমি লাভ করতে পারি। যে মহৎ ব্যক্তিদের হৃদয়ে বিষয়-বাসনা স্বরূপ মলমূল, তাদেরকেই অমলাশয় বলা হয়। যে মহৎজনের সঙ্গে আমি আপনার গুণগাথা শ্রবণপূর্বক অতি দুঃখময় এই ভয়ানক বিশ্ব-সাগর উত্তীর্ণ হতে পারি। হে ঈশ, হে পদ্মনাভ, আপনার পাদপদ্মের সৌরভে প্রলুব্ধ ভক্তজনের সঙ্গে, সঙ্গতকারী ব্যক্তিরা অতি ভাগ্যবান। কারণ তারা এই মর্তদেহ, ও দেহানুবর্তী গৃহ, বিত্ত, পুত্র, মিত্র, কলত্রাদি কিছুই স্মরণ করেন না।

হে অজ, তির্যক, নগ বিহগ, সরীসৃপ, দেব, দৈত্য, মর্ত্য ইত্যাদিতে ব্যাপ্ত, সৎ ও অসৎ বিশিষ্ট এই যে বিরাট রূপ সম্পর্কে আমি জ্ঞাত আছি। কিন্তু মহদাদি বস্তুসকল যার কারণ সেই বিরাট রূপ ব্যতীত ঈশ্বর — স্বরূপ সম্পর্কে আমি অবগত নই। এমনকি তার সন্ধানও আমার অজানা। যা আমার অভিমান নিবৃত্ত হয়নি। সেজন্য আমি শুধুমাত্র সৎসঙ্গের অভিলাষী। তেমনই যেন ধ্রুব ঈশ্বরের অনুকম্পায় অজ্ঞাত রূপ দুটি সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে প্রণাম করেছেন। কল্প-অন্তে পুরুষ অনন্ত– নাগ শয্যায় শয়ন করে এই নিখিল জগতকে নিজ উদরে ধারণ করে যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। তিনি আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে ঐ শেষনাগের অঙ্কররূপ পর্বঙ্কে শায়িত হন। তার নাভিসরোবরে উৎপন্ন স্বর্ণময়। লোকপদ্মের কর্ণিকায় অতীব তেজস্বী ব্রহ্মা উদ্ভূত হন। আমি সেই পরম পুরুষ ভগবানকে প্রণিপাত করছি।

আপনি নিত্যমুক্ত পুরুষ, অর্থাৎ অবিদ্যার বন্ধনরহিত। আপনি রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি মলহীন পরিশুদ্ধ, বিরুদ্ধ পুরুষ। আপনিই আদিপুরুষ ভগবান। সত্বগুণএর অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো এই ত্রিবিধ মায়াগুণের এবং ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান এই ত্রিকাল নিয়ন্তা।

আপনি স্বীয় অখণ্ডিত দৃষ্টির সাহায্যে বুদ্ধির সমস্ত অবস্থাকেই দর্শন করে থাকেন। তবুও আপনি এই বিশ্বকে প্রতিপালনার্থে যজ্ঞমূর্তি শ্রীনারায়ণ প্রকাশিত হন, সুতরাং আপনি সকল জীবের থেকে সর্বপ্রকারে বিভিন্ন।

জীব নিত্যমুক্ত নয়। সে আপনার প্রসন্নতা ব্যাতীত মুক্তিলাভ করতে পারে না। জীব শুদ্ধ নয়, সে মলিন। জীব অজ্ঞ, জড় ও বিকারগ্রস্ত জীবের কোনও ঐশ্বর্যাদি নেই, সে আদি বিশিষ্ট। জীব গুণত্রয়ের অধীন। এরূপ জীব ভগবানের অংশ থেকে উদ্ভূত হলেও তার থেকে ভিন্ন, অণু-চিৎ-কণা মাত্র।

আমি সেই পরমব্রহ্ম ভগবানের চরণে আশ্রয় প্রার্থী। তিনিই এ বিশ্বের কারণ, অখণ্ড, অনন্ত অনাদি, আনন্দময়। তাঁর কোনওরূপ বিকার হয় না, বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী শক্তি তার থেকে নিরন্তর উদ্ভূত হয়ে চলেছে।

হে ভগবান, আপনার মূর্তি পরম আনন্দস্বরূপ। যে সকল পুরুষেরা নিষ্কাম হয়ে আপনাকেই পুরুষার্থ জেনে ভজনা করে, তাদের কাছে আপনার পাদপদ্মই পরমার্থবোধক। তবুও হে স্বামীন, আপনি কৃপা করে আমার ন্যায় আর্ত সকাম ব্যক্তিদের রক্ষা করে থাকেন।

মৈত্রেয় বললেন– বিদুর, সৎসংকল্প ধীমান ধ্রুব কর্তৃক স্তুত হয়ে ভগবান অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে যা যা বলেছিলেন, তা শ্রবণ কর।

ভগবান বললেন–হে রাজনন্দন, তোমার মঙ্গল হোক। তোমার মনোবাসনা সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। তুমি যে সর্বোৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্তির অভিলাষী, তা অন্যের দুষ্প্রাপ্য হলেও, তোমার কুক্ষীগত হবে।

হে সুব্রত, সত্যই সে স্থান সদা দীপ্তিশালী নিত্যস্থায়ী সেখানে গ্রহ-নক্ষত্রাদি ও তারকাখচিত শিশুমার নামক জ্যোতিশ্চক্র সংযুক্ত রয়েছে। হে ভদ্র, পূর্বে সে স্থানে অপর কেহই অধিষ্ঠান করতে পারে নি, ধান মাড়াইয়ের জন্য গোরু ও মহিষ বাঁধবার মোধ-স্তম্ভে বদ্ধ বলীবদের মতো, কল্পের অন্তকাল পর্যন্ত জীবিত ব্যক্তিদের বিনাশ হলেও ঐ স্থান অক্ষত থাকবে। ধর্ম, অগ্নি, কশ্যপ, ইন্দ্র, এবং সপ্তর্ষি বর্গ তারকাগণের সঙ্গে নিরন্তর ঐ স্থানকে প্রদক্ষিণ পূর্বক ভ্রমণ করছেন।

যে স্থান তোমাকে প্রদান করলাম, তা তুমি রাজ্যভোগান্তের দ্বারা প্রাপ্ত হবে। সম্প্রতি তোমার পিতা তোমাকে রাজ্যভার অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী অর্পণ করবেন। তৎপরে তিনি বনে গমন করবেন। তুমি তখন অবশ্যই ধর্ম আশ্রয়ে থেকে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র বছর রাজ্যের প্রতিপালন করবে। এই দীর্ঘকাল সময়েও তোমার কোনও ইন্দ্রিয়ের কোনরূপ বৈকল্য দেখা দেবে না। তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ার্থে বনে বনে গিয়ে ধ্বংস হবে। তার অনুসন্ধানার্থে তোমার বিমাতা সুরুচি আনমনা হয়ে বনে বনে থাকাকালীন দাবাগ্নিতে দগ্ধ হবে। হে বৎস, তোমার ঐরূপ ক্ষতিসাধনের কোনো অভিপ্রায় নেই, তা আমি জানি, তবু আমার ভক্তগণের প্রতি দ্রোহ আচরণের এরূপ ফল অবশ্য ভোগ্য।

হে বৎস, যজ্ঞই আমার প্রিয় মূর্তি। তুমি প্রচুর দক্ষিণাসহযোগে যজ্ঞ দ্বারা আমার আরাধনা করবে। ইহলোকের সকল কাম্য বস্তু ভোগসাধনের পর আমাকে স্মরণ করবে। তারপর তুমি আমার ধামে গমন করবে। যে ধাম সর্বলোক পূজিত। সে ধাম ঋষিগণের অধিষ্ঠানস্থলেরও উপরে। ঐ স্থানে যতিগণ গমন করেন। সে স্থান থেকে আর পুনর্জন্ম হয় না।

মৈত্রেয় বললেন– এইভাবে ভগবান ধ্রুবকে নিজের পদযুগলের দর্শন দিলেন, বালক ধ্রুবের সামনেই তিনি গরুড়ে আরোহণ করে পুনরায় নিজ ধামের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। ধ্রুবও তারপর হরির পদসেবা পূর্বক সকল সংকল্পের সমাপ্তিরূপ মনোরথ লাভ করলেন। তিনি ধীরে ধীরে পিতার ভবনাভিমুখে গমন করতে লাগলেন। তবু তার মনে যেন কিসের অতৃপ্তি রয়ে গেল।

বিদুর মৈত্রেয়কে প্রশ্ন করলেন– ব্রাহ্মণ, ভগবান নারায়ণের পদযুগল, মায়াচ্ছন্ন বিষয়াবিষ্ট সকাম পুরুষের পক্ষে অতি দুর্লভ। তাঁর চরণারাধনা দ্বারাই তা উপার্জিত হতে পারে। কিন্তু, পুরুষার্থবেত্তা ধ্রুব এক জন্মেই ভগবানের সেই পরমপদ লাভ করেও কেন ভগ্ন মনোরথ প্রায় হয়েছিলেন?

মৈত্রেয় বললেন–বিমাতার বাক্যবাণ ধ্রুবের মনে বিদ্ধ হয়েছিল। তা স্মরণে থাকায় তিনি মুক্তিপ্রদ ভগবানের কাছে মুক্তি প্রার্থনা করেন নি। একথা অনুধাবন করে ধ্রুবের অত্যন্ত মনস্তাপ হয়েছিল। ধ্রুব তখন ব্যাকুল হয়ে অনুতাপ করতে লাগলেন। "হায়, হায়! কি কষ্ট! সনন্দ প্রমুখ উর্দ্ধরেতা মহর্ষিগণ বহু জন্মের অভ্যস্ত সমাধিতে যে পরমার্থ বা পরম পদ লাভ করেন, আমি তা ছয়মাসের মধ্যে জ্ঞাত হলাম। কিন্তু তার চরণচ্ছায়ায় উপস্থিত হয়েও ভেদদৃষ্টির কারণে আমি অধঃপতিত হলাম। আহা কতই না দুর্ভাগা আমি। আমি — সংসারছেদক শ্রীহরির পদতলে উপনীত হয়েও বিনশ্বর বস্তু কামনা করেছি।

বোধহয়, দেবতারা আমার বুদ্ধিনাশ করেছিলেন। তাদের অধিষ্ঠান ধাম থেকে ঊর্ধ্বে আমি অবস্থান করব, এই ভেবে হয়তো তারা অসহিষ্ণু হয়ে আমার বুদ্ধিকে অস্থির করে তুলেছিলেন। নতুবা আমার মতো অসত্ত্ব ব্যক্তির পক্ষে নারদের হিতকর বাক্যাবলী অগ্রাহ্য করা কিভাবে সম্ভব? নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নদর্শনের মতো আমিও বস্তুতঃ অভিন্ন নিজ ভ্রাতাকে শত্রু বোধ করেছি। দেবীমায়ার প্রভাবে আমার এই ভেদসৃষ্টির উদ্ভব হয়েছিল। হায়, হায়! তপস্যা দ্বারাও যাঁকে প্রসন্ন করা দুঃসাধ্য। সেই ভববন্ধন মোচনকারী জগদাত্মা পরমেশ্বরকে প্রসন্ন করেও দুর্ভাগা আমি, তার কাছে তুচ্ছ সংসার সুখ প্রার্থনা করেছি। গতায়ু ব্যক্তির চিকিৎসার মতো;

আমার প্রার্থিত বিষয়ও ব্যর্থ হয়েছে। নির্ধন ব্যক্তিরা রাজার কাছেও তুষযুক্ত তন্ডুলকণা প্রার্থনা করে। আমিও এতই পুণ্যহীন যে আত্মানন্দ প্রদানে উদ্যত ভগবানের কাছে মূঢ়তাবশতঃ উচ্চপদরূপ অভিমান প্রার্থনা করেছি।

মৈত্রেয় বললেন– বৎস বিদুর, তোমার মত যে ব্যক্তিসকল ভগবান মুকুন্দের পাদপদ্ম পরাগরেণুর সেবায় রত থাকেন, তার কেবলই ভগবানের সেবার অনুমতি চান। তার ইচ্ছায় যা লভ্য হয় তাতেই তারা পরম সন্তোষ লাভ করেন।

এদিকে রাজা উত্তানপাদ দূতের মুখে শ্রবণ করলেন, যে ধ্রুব প্রত্যাগমন করছে, কিন্তু মৃত ব্যক্তির আগমন সংবাদ যেমন কেউ বিশ্বাস করে না, তেমনি রাজাও ধ্রুবের আগমন সংবাদ বিশ্বাস করেন না। তার মনে হল, আমি অভদ্র। আমার মঙ্গল হবার কোনো আশা নেই। তৎক্ষণাৎ দেবর্ষি নারদের বাক্য স্মরণ করে রাজা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। খুশীতে তিনি সংবাদ-বাহককে একটি বহুমূল্য হার উপহার হিসেবে প্রদান করেন।

দীর্ঘ অদর্শনের পর রাজা পুত্রের দর্শনের ইচ্ছায় উন্মুখ হলেন। তিনি ব্রাহ্মণ কুলবৃদ্ধ ও অমাত্যবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে, উত্তম অশ্বযুক্ত স্বর্ণমণ্ডিত রথে আরোহণ করলেন। পুরবাসীগণ মঙ্গল শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। দুন্দুভি, বংশীধ্বনি ও ব্রাহ্মণগণের বেদপাঠের শুভ ধ্বনির সঙ্গে অতি ব্যগ্র হয়ে নগর থেকে বেরিয়ে ধ্রুব দর্শনে অভিগমন করলেন। রাজমহিষী সুনীতি ও সুরুচি বহুমূল্য অলংকারে ভূষিত হয়ে পুত্র উত্তমের সঙ্গে শিবিকায় আরোহণ করলেন।

তারপরে উপবনের দিক থেকে ধ্রুবকে অগ্রসর হতে দেখলেন। রাজা তাকে দর্শনমাত্রই স্নেহে বিগলিত হয়ে রথ থেকে অবতরণ করে, অতি দ্রুত তার কাছে গমন করলেন। ভগবানের পাদস্পর্শে সর্বপাপ মুক্ত ধ্রুবকে রাজা স্নেহভরে বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করলেন। তারপর পুত্র প্রাপ্তিরূপ মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় বারংবার তার মস্তক চুম্বন করলেন, যুগপৎ আনন্দ ও অনুতাপে তাঁর চক্ষু থেকে বিগলিত অশ্রুধারায় তিনি পুত্রকে স্নান করালেন।

ধ্রুব প্রথমে পিতার চরণদ্বয় বন্দনা করে তাঁকে প্রণাম করলেন। পিতা তাঁকে আশীর্বাদ ও সম্ভাষণ করলেন। তার পরে অতি সজ্জন ধ্রুব মাতা ও বিমাতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। সুরুচি নিজ চরণতলে প্রণত সেই বালককে স্নেহভরে ওঠালেন। তাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করে বাষ্প গদগদ বাক্যে বললেন–বৎস, চিরজীবি হও। সুরুচির এমত আচরণের কারণ এই যে, যাঁর মৈত্যাদি গুণে ভগবান হরি প্রসন্ন হন, জলের নিম্নগামী ধর্মের ন্যায় সমস্ত লোক তার নিকট অবনত থাকে।

তারপর দু'ভাই উত্তম এবং ধ্রুব আনন্দে, প্রেমে বিহ্বল হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। তাদের উভয়ের গাত্র আনন্দে কন্টকিত হল। তাদের দু'চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু বিগলিত হতে থাকল। তারপর ধ্রুব তাঁর মাতা সুনীতির কাছে গেলেন। সুনীতি প্রাণাধিক প্রিয় নিজ পুত্রকে ক্রোড়ে নিয়ে, তার অঙ্গস্পর্শে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করলেন। সুদীর্ঘকালের মনঃকষ্ট তার দূরীভূত হল।

হে বিদুর, তখন বীরপ্রসবিণী সুনীতির আনন্দাশ্রুতে তার স্তনযুগল সিক্ত হয়ে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে লাগল। প্রজাগণ সুনীতির উচ্চ প্রশংসা করতে লাগলেন। তারা বলতে লাগল–দীর্ঘকাল পর আপনার পুত্র আবার ফিরে এসেছে। ইনি আপনার দুঃখহরণ করবেন ও ভূ-মণ্ডলের রক্ষা করবেন।

যে ভগবানের ধ্যান করে বীর ব্যক্তিরা দুর্জয় মৃত্যুকেও জয় করতে সক্ষম হয়, আপনি নিশ্চয়ই তার আরাধনা করছিলেন। তিনি সত্যই প্রণতজনের আর্জি শোনেন। এভাবে পুরবাসীগণ ধ্রুবের প্রশংসা করতে লাগলেন। রাজা উত্তানপাদ একটি হস্তিনীর পৃষ্ঠে ভ্রাতা উত্তমের সঙ্গে ধ্রুবকে আরোহণ করিয়ে আনন্দিত মনে রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন। এখন জনগণ তার প্রশংসা করতে লাগলেন।

রাজপুরীতে প্রত্যেক দ্বারে দ্বারে ফল– মঞ্জরীযুক্ত কদলীস্তম্ভ ও নবীন স্তবকে শোভিত গুবাক বৃক্ষ স্থাপিত ছিল। মকরাকৃতি তোরণের উপরিভাগে পুস্পমালা সজ্জিত ছিল। আম্রপল্লব, নববস্ত্র, মাল্য ও লম্বিত মুক্তা-দাম, শোভিত প্রদীপ সহ জলপূর্ণ কলস দ্বারা প্রতিটি দ্বার সুশোভিত। সেই পুরীর প্রাচীর, গোপর (ফটক), ও আগার (পুরদ্বার), সমস্ত কাঞ্চনময় পরিচ্ছদে বিভূষিত ছিল। তাদেরকে সুন্দর বিমানশিখরের সঙ্গে তুলনীয় মনে হচ্ছিল। সেই পুরাঙ্গন রাজপথ, উচ্চ হর্মোপরি নির্মিত রম্য ভ্রমণস্থান ছিল, সেখানে সাত সমুদ্র মার্গসমূহ সম্মার্জিত ও চন্দনজলে সিক্ত ছিল। তাতে লাদ অর্থাৎ মৈ, অক্ষত অর্থাৎ যব ফল ও তর্ভুল ও নানাবিধ পূজার উপাচারে সুসজ্জিত ছিল। সাধ্বী পুরস্ত্রীগণ সেই সেই পথে ধ্রুবকে আসতে দেখলেন। তারা স্নেহভরে তাকে আশীর্বাদ করতে করতে শ্বেতসর্ষে, যব, দধি, ফল, ফুল ও দূর্বা প্রভৃতি উপহার নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তাদের মধুর সুরে গুণগান শুনতে শুনতে ধ্রুব রাজভবনে প্রবেশ করলেন।

দেবতারা যেমন স্বর্গে সুখে বসবাস করে থাকেন, ধ্রুব তেমনি রাজপুরীতে সুখে বাস করতে লাগলেন। সেখানে ধ্রুব মহামূল্যবান মণিমুক্ত খচিত উত্তম গৃহে পিতামাতা কর্তৃক লালিত-

পালিত হতে লাগলেন। সেখানে হস্তীদন্ত দ্বারা নির্মিত পালঙ্কে স্বর্ণ পরিচ্ছদে শোভিত দুগ্ধফেনতুল্য শয্যা রচিত ছিল। কাঞ্চনময় গৃহের উপকরণাদি ও মহামূল্য আসনসহ বিদ্যমান ছিল। স্ফটিক ও মরকতময় ভিত্তিতে মণিময় প্রদীপগুলি সুন্দরী রমণীদের করস্থিত অলংকারাদির সঙ্গে দীপ্যমান ছিল। সেই মনোরম পুরীতে উদ্যানগুলি বিভিন্ন অমল তরুতে অতি রমণীয় ছিল। সে সকল বৃক্ষের উপরে বিহঙ্গ-মিথুন সুমধুর স্বরে কূজন করছিল। মৌমাছি ও ভ্রমরাদি সেথায় গুণগুণ রবে গুঞ্জরিত হচ্ছিল।

উদ্যানে বাপীসকলে বৈদুর্যমণি নির্মিত সোপান ছিল, জলমধ্যে বিভিন্ন বর্ণের পদ্ম শোভিত ছিল। আর সেখানে হংস, কারক, চক্রবাক ও সারসাদি প্রভৃতি পক্ষীগণ জলক্রীড়ায় রত ছিল। রাজা উত্তানপাদ নিজ পুত্রের ঐরূপ প্রভাব দর্শন ও শ্রবণ করে পরম বিস্ময়ে আবিষ্ট হলেন।

তারপরে ধ্রুব ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যৌবনপ্রাপ্ত হলেন। প্রজা সকলে তার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। আমত্যবর্গেরও তিনি অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। উত্তানপাদ এসব দেখে অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি আমত্যগণের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ধ্রুবকে রাজ্যের অধীশ্বররূপে নির্বাচন করলেন। সমগ্র পৃথিবীর প্রতিপালক হিসেবে ধ্রুবর রাজ্যাভিষেক হল। রাজা উত্তানপাদ বেশ কিছুদিন পরে বুঝলেন তার বার্ধক্য উপস্থিত হয়েছে। তখন তিনি পরমাত্মা শ্রীহরিকে প্রাপ্তির পথের অনুসন্ধান করতে করতে বনে গমন করলেন। সেখানে তিনি বিষয়-সংসারে বিযুক্ত হয়ে শ্রীহরির কথা চিন্তা করতেন।

.

দশম অধ্যায়

যক্ষগণ কর্তৃক ভ্রাতা উত্তম নিহত হয়েছে শুনে ধ্রুবের একাকী অলকাপুরী গমন ও যক্ষদের সাথে তার যুদ্ধ বিক্রম বর্ণনা

মৈত্রেয় বললেন– বিদুর, ধ্রুব প্রজাপতি শিশুরমারের প্রসিদ্ধ কন্যা ভ্রমিকে বিবাহ করেছিলেন। তার গর্ভে কল্প ও বৎসর নামে দুটি পুত্রের জন্ম হয়। ধ্রুবের অপর পত্নীর নাম ছিল ইলা। তিনি ছিলেন বায়ুর কন্যা। ইলার গর্ভে উকল নামক পুত্র ও যোষিগণের মধ্যে রত্নস্বরূপাতি মনোহরা একটি কন্যার জন্ম হয়।

ইতিমধ্যে অকৃতদার উত্তম একদিন হিমাচলে মৃগয়া করতে গিয়ে কোনো বলবান যক্ষ কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। পুত্রহারা সুরুচি তাকে অনুসন্ধান করতে করতে ঐ পর্বতের কাছে এসে দাবানলে দগ্ধ হন। এদিকে উত্তমের মৃত্যুসংবাদ ধ্রুবের কানে পৌঁছাল। তিনি ক্রোধ, ক্ষোভ ও শোকে অভিভূত হলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি জয়শীল রথে আরোহণ করে যক্ষালয় বা অলকাপুরী অভিমুখে গমন করতে উদ্যত হলেন। ধ্রুব উত্তরাভিমুখে গমন করে রুদ্রানুচর ভূত, প্রেত ও পিশাচ অধিষ্ঠিত হিমালয়ের উপত্যকায় যক্ষগণ পরিব্যাপ্ত অলকাপুরী দেখতে পেলেন। সেখানে গিয়ে মহাবাহু ধ্রুব আকাশ ও দিক-সমূহ প্রতিধ্বনিত করে শঙ্খনাদ করলেন।

হে বিদুর, সেই উচ্চ শঙ্খনাদে যক্ষপত্নীগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হলেন। তারপরে মহাবলশালী যক্ষবীরগণ সেই আওয়াজে সচকিত হয়ে অস্ত্রধারণপূর্বক পুরীর থেকে বহির্গত হলেন। তাঁরা সকলে ধ্রুবের দিকে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন। মহাধনুর্ধর ধ্রুব সেই সব যক্ষদের এক একজনের প্রতি তিনটি বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এভাবেই সকলকে তিনি আহত করতে লাগলেন। ধ্রুব কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণে, সেসকল যক্ষ– বীরগণের ললাটবিদ্ধ হওয়ায় তারা নিজেদের পরাজিত মনে করলেন। ধ্রুবের বীরত্বের প্রশংসা করতে লাগলেন।

সর্প যেমন কারও পদাঘাত সহ্য করতে পারে না, যক্ষ সেনানীরাও তেমনি প্রবের ঐ বাণবর্ষণ সহ্য করতে পারে না। তারা দ্বিগুণ প্রতিশোধের ইচ্ছায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। সকলে ছটি করে বাণ দিয়ে ধ্রুবকে আঘাত করতে উদ্যত হল।

ধ্রুবের কর্মের প্রতিবিধান করার ইচ্ছায় তেরো অযুত যক্ষ সেনারা ক্রুদ্ধ হয়ে পুরিখ নিস্ত্রিংশ, প্রাস, শূল, কুঠার, শক্তি, যস্টি, ভুষন্ডী ও বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট বাণ দ্বারা ধ্রুবকে আঘাত করতে লাগল। প্রবলবেগে বারিপাতের সময় পর্বতও দৃষ্টিগোচর হতে পারে না, তেমনি ক্রমাগত শরবর্ষণে ধ্রুবও সাময়িক অদৃশ্য হলেন। আকাশমার্গে বিচরণ করে সিদ্ধপুরুষেরা এই যুদ্ধ দর্শন করছিলেন। তারা ধ্রুবের এই অবস্থা দেখে হাহাকার করতে শুরু করলেন। তারা এই বলে আক্ষেপ করতে লাগলেন যে, 'হায় হায়' সূর্যের মতো অতি তেজস্বী মানব ধ্রুব কিনা যক্ষসেনাদের প্রতিরোধে বিনষ্ট হল।

তখন যুদ্ধক্ষেত্রে যক্ষদের প্রবল জয়োল্লাস শোনা গেল। তখনই, নীহারবিদারী সূর্যদেবের মতো, ধ্রুবের রথ শত্রুর অস্ত্রজাল ছিন্ন করে পুনরায় দৃষ্টিগোচর হল। ধ্রুব তখন নিজ ধনুতে বাণ প্রযুক্ত করে শত্রুগণকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। বায়ু প্রবলবেগে বহমান হলে যেমন

মেঘরাশি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তেমনি ধ্রুবের বাণসমূহ যক্ষসেনাদের অস্ত্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল। ধ্রুবের ধনু থেকে নির্গত তীক্ষাগ্র শরসকল, যক্ষগণের বর্ম ভেদ করে তাদের দেহ বিদ্ধ করল। ইন্দ্রকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বর্জ্য যেমন সুকঠিন পর্বতকেও বিদীর্ণ করে দেয়, তেমনি এই শরাদি যক্ষদের বিদীর্ণ করছিল। হে বীর, ধ্রুবের ভল্ল–অস্ত্র দ্বারা যক্ষগণ আহত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তাদের মনোহর কুন্তলশোভিত মস্তক, স্বর্ণময় উরু, বলয় প্রভৃতিতে সজ্জিত বাহু, হার, কেয়ুর, মুকুট, উষ্ণীষ– সেই রণক্ষেত্রে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিল। এতে সেই যুদ্ধভূমি অতি উজ্জ্বল রূপে শোভিত হল। ক্ষাত্র শ্রেষ্ঠ ধ্রুব কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণে, প্রায় সব যক্ষসেনার অঙ্গাদি ছিন্নভিন্ন হল। বাকী আহত যক্ষবীরেরা সিংহ তাড়িত হস্তীর মতো রণক্ষেত্র থেকে অপসৃত হলেন।

তারপর মনুবংশের সর্বোত্তম ধ্রুব যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রপানি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন ধ্রুব প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও যক্ষপুরীর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করলেন। মায়ার খেলা সম্যক অনুধাবন করার ক্ষমতা কোনো মানুষেরই করায়ত্ত নয়। ধ্রুব নিজ সারথীর কাছে তা স্বীকার করলেন। তিনি বললেন– "মায়াবীগণের কার্য মনুষ্যের বোধগম্য নয়।" মনে মনে ধ্রুব যখন তখন শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের প্রতীক্ষা করছিলেন।

হঠাৎ সেসময় সমুদ্রগর্জনের ন্যায় ঘোরতর নির্ঘোষ শোনা গেল। প্রবল বায়ুপ্রবাহে চতুর্দিকে ধূলিতে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ক্ষণিকের অবকাশে, গগনে ঘন মেঘ সঞ্চারিত হ'ল। ঐ মেঘে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হচ্ছিল এবং ভয়ানক শব্দে বজ্রপাত মুহুর্মুহু হয়ে চলেছিল।

হে নিষ্পাপ বিদুর, তখনই ধ্রুবেরই চতুষ্পর্শে রক্ত, শ্লেষ্ম, পূ, বিষ্ঠা, মূত্র ও মেদ বর্ষণ হতে লাগল। ক্রমে আকাশতলে এক বিরাট পর্বতের উদ্ভব হল। সেই পর্বতগাত্র থেকে শিলা, গদা, পরিখ, নিস্ত্রিংশ ও মুষল বৃষ্টি হতে শুরু করল। চতুর্দিকে মস্তকহীন দেহসকল পতিত হতে লাগল। বহুসংখ্যক সর্প যেন হঠাৎ জাগ্রত হয়ে ভয়ংকর নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে রোষান্বিত নয়ন থেকে অগ্নি উদগীরণ করতে লাগল। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি উন্মত্ত হয়ে উঠল। তারা ইতস্ততঃ যুথে যুথে ধাবমান হল। সমুদ্রের তরঙ্গ ভয়ংকর রূপ ধারণ করল। প্রবল তরঙ্গের আকারে তা তটভূমি প্লাবিত করে ভূমিকে ছাপিয়ে গেল। প্রলয়কালীন জলোচ্ছ্বাসের মতো সমুদ্র যেন প্রচন্ড বেগে ধ্রুবকে গ্রাস করতে এগিয়ে এল।

হে বিদুর, যক্ষগণ ক্রুর চেষ্টায় আসুরী মায়া বিস্তার করেছিল। তার প্রভাবেই এসকল অমঙ্গলজনক ঘটনার প্রকাশ হয়েছিল। তবুও এসকল উৎপাতে যে কোনও অধীর ব্যক্তির মনেই আশংকার ছায়া ঘনিয়ে আসা সম্ভব।

যক্ষগণ ধ্রুবের প্রতি ঐরূপ আসুরী মায়া বিস্তার করেছিল। এ কথা জ্ঞাত হয়ে ঋষিগণ ধ্রুবের কাছে উপনীত হলেন। পরম শ্রদ্ধা ও প্রেমভরে তারা ধ্রুবকে আশ্বস্ত করলেন। তারা ধ্রুবকে বললেন–হে উত্তানপাদ নন্দন ধ্রুব, যাঁর নামোচ্চারণ বা শ্রবণেই মৃত্যুকে জয় করা যায়, তুমি তাঁর আশীর্বাদ ধন্য। প্রণতজনের আর্তিহরণকারী ভগবান শ্রীহরি তোমার শত্রুদের বিনাশ করুন। তোমার মঙ্গল হোক।

.

একাদশ অধ্যায়

স্বায়ম্ভুব মনুর তত্ত্বপোদেশ দ্বারা ধ্রুবের রণ হতে নিবৃত্তিকরণ

মৈত্রেয় বিদুরকে সেই ঘটনাবলীর বিবরণ দিতে লাগলেন। ঋষিগণের পূর্বোক্ত উপদেশাবলী স্মরণ করে ধ্রুব মনঃস্থির করলেন। প্রথমে আচমন দ্বারা নিজেকে শুদ্ধ করে নিজ ধনুতে নারায়ণাস্ত্র সন্ধান করলেন। হে বিদুর, জ্ঞানের উদয় হওয়া মাত্র যেমন রাগ ক্লেশ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়, তেমনি নারায়ণাস্ত্র সন্ধান করামাত্র গুহ্যক নির্মিত মায়াসমূহের বিনাশ হল। ধ্রুব শরাসনে নারায়ণাস্ত্র সন্ধান করার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে বহুসংখ্যক শর নিঃসৃত হল। ময়ুরগণ যেমন ভীষণ রবে. ডাকতে ডাকতে বনমধ্যে প্রবেশ করে, শরগুলি তেমনি যক্ষ সেনানীদের ব্যুহে প্রবেশ করতে লাগল।

ঐ শরগুলির রূপ ছিল অতি অপূর্ব। তাদের মুখের দুই প্রান্ত স্বর্ণমণ্ডিত তাদের পক্ষগুলি কলহংসের ডানার মতো মনোহর দর্শন, যুদ্ধভূমিতে সেই শরসমূহ যক্ষসেনাদের পীড়িত করায় তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সর্পসকল যেমন ফণা তুলে গরুড়কে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল তেমনি তারা স্বীয় অস্ত্র ধারণ করে ধ্রুবের দিকে ধাবিত হল।

ধ্রুব রণভূমিতে সেই যক্ষগণকে আক্রমণোদ্যত দেখে তাদের দিকে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর অবিরাম শরবর্ষণের দ্বারা যক্ষদের বাহু, উরু, গ্রীবা, উদর প্রভৃতি ছেদিত হল। ঊর্ধরেতা সন্ন্যাসীরা সূর্যমণ্ডল ভেদ করে যে লোকে গমন করেন সেই লোকে ধ্রুব কর্তৃক আক্রান্ত যক্ষগণ গমন করলেন।

মহাবীর ধ্রুব, অজস্র নিরপরাধ যক্ষকে বধ করতে উদ্যত হয়েছেন দেখে পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু দয়াপূর্বক সেখানে উপনীত হলেন। ঋষিগণের সাথে মনু সেখানে উপস্থিত হয়ে ধ্রুবকে বলতে

লাগলেন যে- ধ্রুব, তুমি অন্যায় ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নিরপরাধ যক্ষদের প্রতি অন্যায় করছ। এই ক্রোধ নরকের দ্বার-স্বরূপ ও পাপপূর্ণ। এই প্রকার ক্রোধ সদা বর্জনীয়। তুমি এ নিন্দিত কর্ম থেকে নিবৃত্ত হও।

বৎস ধ্রুব, তুমি এই যে নিরপরাধ যক্ষদের নিধন করতে শুরু করেছ এটা অতি নিন্দিত কর্ম। এটা আদপেই আমাদের কুলোচিত কর্ম নয়। ভ্রাতৃবৎসল ধ্রুব তোমার ভ্রাতার শোকে অভিতপ্ত হয়ে তুমি অধীর হয়েছ। একজন মাত্র যক্ষের অপরাধে, তার সঙ্গে বহু নিরপরাধ যক্ষের হত্যালীলায় মত্ত হয়েছ। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান দেহকে আত্মারূপে অনুভব করে পশুর ন্যায় পরস্পরের প্রতি দ্বেষমূলক। আচরণ লিপ্ত হয়েছ। তুমি এই যে প্রতিহিংসায় মেতে উঠেছ, তা কখনই ভগবান হৃষীকেশের অনুগামীদের কাম্য নয়।

তুমি সর্বভূতে আত্মজ্ঞান করত সবর্ভূতময় শ্রীহরির উপাসনা করেছ। তাতেই তুমি নিরন্তর শ্রীহরির ধ্যান করতে থাক। তুমি ভগবানের ভক্তগণেরও অতি প্রিয়পাত্র। সাধুগণের আচরণীয় পথের দিশা পেয়েছ। তবু এরূপ নিন্দিত কর্ম তোমার দ্বারা কিভাবে আচরিত হল?

বৎস, শত্রুর ঔদ্ধত্য সহ্য করা, নীচ ব্যক্তির প্রতি করুণা, সমান ব্যক্তির সঙ্গে মিত্রতা ও সকল প্রাণীতে সমান দর্শন- এই সকল গুণের অধিকারী ব্যক্তি ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করেন। ভগবান প্রসন্ন হলে জীবের প্রকৃত গুণত্রয় অর্থাৎ সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমো গুণের বিমোচন হয়। তিনি তখন গুণের কার্য-স্বরূপ লিঙ্গ শরীর থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে সুখরূপ ব্রহ্ম লাভ করেন। (তুমি যদি আত্মতত্ত্ব বিচার করতে পার দেখবে তোমার ভাইয়ের কোনও অস্তিত্বই নেই। সুতরাং, তাকে কেউ বধ করে তোমার ক্ষোভের কারণ হতে পারে না।)

এই পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত দেহাকারে পরিণত হয়ে স্ত্রী এবং পুরুষ রূপে সৃষ্টি হয়। একথা প্রচলিত যে, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের সহায়তায় এ সংসারে অপরাপর স্ত্রী ও পুরুষের জন্ম হয়। হে রাজন, এভাবে পরমাত্মার মায়ার প্রভাবে গুণসকলের বৈষম্যের কারণে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য প্রবর্তিত হয়। সত্ত্বগুণের আধিক্যহেতু, স্থিতি, রজগুণের অধিক্যের কারণে সৃষ্টি ও তমোগুণের আধিক্যজনিত কারণে সংহার ক্রিয়া সাধিত হয়। নির্গুণ ঈশ্বর এই সৃষ্টি প্রভৃতির কারণ স্বরূপ।

অয়স্কান্ত মণির প্রভাবে যেমন লৌহ ভ্রমণ করে, তেমনি ঈশ্বরকে নিমিত্ত করেই এই কার্য – কারণস্বরূপ বিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে। পরমপুরুষ ঈশ্বর কালশক্তির সাহায্যে গুণত্রয়কে ক্ষোভিত করেন। এভাবে তিনি সৃষ্টাদি শক্তিকে বিভক্ত করেন। অকর্তা হয়েও তিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি

কর্তা! আবার হন্তা না হয়েও তিনি হত্যাকারী। মহত্তম ভগবানের লীলা অর্থাৎ কালশক্তি অচিন্ত্যনীয়। (কালশক্তি কি কারণে একত্রে গুণসমূহকে ক্ষোভিত করেন না, তা অজ্ঞাত)। কালরূপী ভগবান অনাদি (জন্মরহিত), অব্যয় (ক্ষয়াদি রহিত) এবং অনন্ত (অবিনাশী)। তিনি পিত্রাদির পুত্র প্রভৃতির জন্ম দিয়ে থাকেন, তাই তিনি জন্মদাতা বা সৃষ্টিকর্তা। আবার রাজা প্রভৃতিকে দিয়ে তিনি দুর্জন ও চৌরাদির মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন তাই তিনি বিনাশকর্তা। তাঁহার দ্বারাই সৃষ্টি ও সংহার সাধিত হয়। তিনি পিত্রাদির দ্বারা উৎপন্ন করেন একথা সত্য হলেও তারাও আবার অন্য থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। অতএব, তাদের সৃষ্টি বিষয়ে কোনো স্বাতন্ত্র নেই। এই ভগবান মৃত্যুরূপে সমানভাবে সকল প্রাণীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হন। তার স্বপক্ষ বা বন্ধু কেউ নেই। আবার বিপক্ষ বা শত্রু বলেও কিছু নেই। প্রবাহমান বায়ুতে অনুগামী ধুলিরাশির ন্যায় সকল প্রাণী স্বীয় কর্মের অধীন থেকে নিজ নিজ কর্ম পরতন্ত্র হয়ে ঈশ্বরের অনুগামী হয়ে থাকে।

ঈশ্বর সর্বনিয়ন্তা, এ বিষয়ে সকলে একমত। কিন্তু তার বিষয়ে শুধুমাত্র নাম-মাত্রে বিবাদ বর্তমান। তাঁকে মীমাংসকগণ কর্ম বলে অভিহিত করেন। জ্যোতিষীরা তাকে গ্রহাদি দেবতা বলে ভক্তি করেন। বাৎসায়ণ প্রভৃতিরা তাঁকে কাম বা বাসনা বলে বর্ণনা করেন।

হে বৎস, ঈশ্বর অব্যক্ত, তাকে বল ও বুদ্ধি দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। তিনি অপ্রমেয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির ঊর্ধ্বে। তার থেকে নানাবিধ মহত্তত্ত্বাদি শক্তির উদয় হয়। তার ইচ্ছা সকলের অজ্ঞাত। সুতরাং স্বয়ম্ভ সেই ভগবানের ইয়ত্তা করতে কেউ পারে না।

হে বৎস ধ্রুব, এই কুবেরের অনুচরবৃন্দ তোমার ভ্রাতৃহত্যার কারণ নয়। বৎস, কর্মফলদাতা হলেন শ্রীভগবান। সেই পরমেশ্বরই জীবের সৃষ্টির কারণ। সেই ভগবানই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। তা সত্ত্বেও তার এ বিষয়ে কোনো অহংকার নেই। এজন্য তিনি সদা নির্লিপ্ত কারণ তিনি গুণ ও কর্মের দ্বারা লিপ্ত হন না। এই ভগবান সর্বভূতের অন্তর্যামী, সর্বভূতের নিয়ন্ত্রক ও সর্বভূতের প্রতিপালক। তিনি স্বীয় মায়াশক্তির প্রভাবে প্রাণীগণের সৃষ্টি পালন ও সংহার করে থাকেন। হে তাত, নাসিকাতে রজ্জবদ্ধ বলীবদের মতো বিশ্বস্রষ্টা মহাপুরুষেরাও তাঁর নিমিত্ত পুজোপহার বহন করেন। তিনিই ভক্তগণের নিকট অমৃত-স্বরূপ। আবার অভক্তদের মৃত্যুর কারণও তিনিই। তিনি পরমেশ্বর এবং বিশ্বের সকলের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়। অতএব তুমি সর্বান্তকরণে সেই ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ কর।

হে বৎস, তুমি মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে বিমাতার কুবাক্য শ্রবণে মর্মাহত হয়েছিল। তখনই তুমি নিজ জননীকেও পরিত্যাগ করে বনে গমন করেছিলে। তুমি কঠোর তপস্যা দ্বারাই ইন্দ্রিয়বৃত্তি জয় করেছ। সেভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করে তুমি ত্রিলোকের উপরিস্থিত স্থান লাভ করেছ। সেই তুমি আবার তাঁর স্মরণ গ্রহণ করো। বৎস ধ্রুব, এখন তুমি আত্মদর্শী হয়ে সেই নিষ্ঠুণ অবিনশ্বর আত্মার অন্বেষণ কর। তিনি সর্বদাই বিমুক্ত নির্বিরোধী অন্তঃকরণে সততই বিরাজ করেন। ভগবানের থেকে পৃথক কিছু নেই। ভেদজ্ঞানের কারণে তাতেই এই অসৎ বিশ্ব প্রতীয়মান হচ্ছে। হে তাত, এভাবে ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান সর্বজনের অন্তর্যামী, আনন্দরূপ ও অনন্ত ভগবানরূপে আরাধনা কর তার অসীম কৃপায় তোমার সুদৃঢ় অহংকার গ্রন্থিরূপ "আমি আমার এই ভাব দূর হয়ে যাবে।

ধ্রুব তুমি ক্রোধ সংবরণ কর। তোমার মঙ্গল হোক। হে রাজন, ঔষধ দ্বারা কঠিন ব্যাধিরও উপশম হয়। তুমি তেমনি প্রচুর উপদেশ বাক্য শ্রবণের মাধ্যমে কল্যাণের একান্ত প্রতিকূল বিষয়ের শান্তি কর। ক্রোধে অভিভূত ব্যক্তি জনগণের উদ্বেগের কারণ, নিজ কল্যাণকামী, জ্ঞানী ব্যক্তি তুমি। তুমি সেই ক্রোধের বশীভূত হতে যাবে কেন?

বৎস, ধনাধিপ কুবের হলেন ভগবান গিরিশের ভ্রাতা, তুমি তাকে অবজ্ঞা করছ। কারণ, তুমি বহুসংখ্যক নিরপরাধ যক্ষকে নিজ ভ্রাতৃহন্তা বোধ করে হনন করেছ। হে তাত, মহৎ ব্যক্তির তেজ অতীব ভয়ংকর, তার প্রবল তেজ আমাদের বংশকে অভিভূত করলে, সর্বনাশ হয়ে যাব। তার আগেই তুমি শীঘ্র ধনপতি কুবেরকে প্রণতিপূর্বক প্রসন্ন কর।

স্বায়ম্ভুব মনু, এভাবে নিজ পৌত্রকে উপদেশ প্রদান করলেন। ধ্রুব তাকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। তার দ্বারা অভিনন্দিত মনু, ঋষিগণের সাথে আনন্দিত মনে নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করলেন।

.

দ্বাদশ অধ্যায়

ধ্রুবের স্ব-পুরে প্রত্যাগমন যজ্ঞানুষ্ঠান ও সশরীরে হরিধামে গমন

মুনিবর মৈত্রেয় বললেন– বিদুর, ধনপতি কুবের যখন শ্রবণ করলেন যে ধ্রুব পিতামহ মনুর উপদেশে ক্রোধ পরিত্যাগ করেছে, তিনি অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি চারণ যক্ষ ও কিন্নরগণ

দ্বারা কুবে'র বললেন– হে নিষ্পাপ ক্ষাত্রকুমার, আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হয়েছি। কারণ তুমি শ্রদ্ধেয় ভগবান মনুর আদেশে দুস্ত্যজ বৈরীভাব ত্যাগ করেছ। হে বৎস, তুমি যেমন যক্ষদের বধ করোনি, যক্ষরাও তেমনি তোমার ভাইকে বধ করেনি। কারণ প্রাণীগণের জন্ম ও মৃত্যুর নিয়ন্তা কেবলমাত্র কাল। পুরুষের আত্মস্বরূপের অজ্ঞানবশত, আত্মব্যতিরিক্ত দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির ফলেই স্বপ্নকালীন, জ্ঞানের মতো 'আমি' 'তুমি' ভেদ হয়। ঐ ভেদবুদ্ধি দ্বারা দেহানুসন্ধান করার ফলেই কষ্ট ও দুঃখাদি লাভ হয়ে থাকে।

হে ধ্রুব, তোমার কল্যাণ হোক। তুমি প্রজা প্রতিপালনার্থে নিজ রাজ্যে গমন কর। তুমি সর্বভূতে পরমাত্মাদর্শন পূর্বক সংসারহারী ভগবানের ভজনা কর। তাঁর চরণপদ্ম জীবের একমাত্র আরাধনীয় বস্তু। তাই তিনি সংসারনিবর্তক। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তিনি কখনও শক্তিরূপা গুণময়ী আত্মমায়াতে যুক্ত হন। আবার কখনও বা বিরহিত হয়ে থাকেন।

হে উত্তানপাদ নন্দন, ধ্রুব! তোমার অন্তরের বাসনা কী? নিঃসঙ্কোচে আমার কাছে তা ব্যক্ত কর। তুমি বরলাভের উপযুক্ত। কারণ আমরা শ্রুত হয়েছি, যে তুমি ভগবান শ্রীহরির পদযুগলের অতি নিকট স্থান লাভ করেছ।

মৈত্রেয় বললেন– পরমভাগবত ধ্রুবকে কুবের বর প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করলেন। ধ্রুব তখন, ভগবান হরির প্রতি অচলা ভক্তি প্রার্থনা করলেন। কারণ ভগবানের করুণার সাহায্যে অনায়াসে, দুস্তর সংসার–সাগর অতিক্রম করা যায়।

তারপর কুবের প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ধ্রুবকে সেই বরদান করলেন। তারপর কুবের ধ্রুবের সম্মুখেই অন্তর্হিত হলেন।

ধ্রুব নিজ পুরীতে প্রস্থান করলেন। সেখানে তিনি বহু উপচারে প্রচুর দক্ষিণা সহযোগে যজ্ঞানুষ্ঠান করে শ্রীহরির অর্চনা করলেন। তিনি তখন সর্বজীবের আত্মা সর্বোপাধি বর্জিত শ্রীভগবানে মনপ্রাণ সমর্পণ করলেন। ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা ধ্রুব নিজ আত্মাতে ও সকল প্রাণীতে সেই বিভুকে দর্শন করতে লাগলেন।

বৎস বিদুর, ধ্রুবের এই শীলতা, দীনের প্রতি দাক্ষিণ্য, ধর্মানুচরণ দেখে প্রজাগণ তাঁকে পিতার ন্যায় মান্য করতেন। এভাবে ধ্রুব ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয় করলেন। তিনি অভোগ অর্থাৎ যজানুষ্ঠান ও ব্রত পালানাদির দ্বারা পাপসকল বিনাশ করে ত্রিশ হাজার বছর পৃথিবী শাসন

করলেন। সংযতপ্রাণ মহাত্মা ধ্রুব, বহু বৎসর ত্রিবর্গ সাধন করার পরে, সিংহাসনে নিজ পুত্রকে অভিষিক্ত করলেন।

সেসময় তার মনে হল, স্বপ্নে যেমন অবিদ্যা দ্বার গন্ধবনগর বিরচিত হয়, তেমনি এই দেহ প্রভৃতি ও সমগ্র জগৎ ঐশ্বরিক মায়ায় আত্মাতে বিরচিত হয়েছে। তখন ধ্রুবের দেহ, পুত্র, মিত্র –কলত্র, সমৃদ্ধ ধনাগার প্রভূত রাজ সম্পদের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য জন্মাল। তিনি আসমুদ্র হিমাচলের মায়ারচিত ও অনিত্য বিবেচনা করলেন। এরপরে তিনি তপস্যার জন্য বদরিকাশ্রমে গমন করলেন।

ধ্রুব, বদরিকাশ্রমের পুণ্যজলে স্নান করে শম–দমাদি দ্বারা বিশুদ্ধন্দ্রিয় হলেন। অতঃপর আসন রচনা করে তাতে উপবিষ্ট হলেন। প্রাণায়াম করে তিনি প্রাণবায়ুকে বশীভূত করলেন। মন দ্বারা ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে বিরাট মূর্তি ভগবানের স্থূলরূপে ঐ মনের ধারণা করলেন। তারপরে ধ্যানে নিবিষ্ট হলেন। ক্রমে তিনি ধাতৃধ্যেয় ভেদশূণ্য হয়ে সমাধিস্থ হলেন, তখন তার স্থলরূপের ধ্যান পরিত্যাগ হল। এই প্রকারে ধ্রুব ভগবান হরি প্রতি অবিচ্ছিন্ন ভক্তিভাব বহন করতে লাগলেন। তাঁর দু'চোখ দিয়ে ক্রমাগত আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি আত্মবিস্মৃত হলেন। (অর্থাৎ তিনি যে ধ্রুব, এরূপ বোধ আর রইল না।) তিনি অহংকারাদিস্বরূপ সাংসারিক অভিমান থেকে মুক্ত হয়েছেন।

তারপর ধ্রুব দেখলেন পূর্ণিমার চন্দ্রের মতো দশদিক আলোকিত করে আকাশপথ বেয়ে একটি রথ নীচে নেমে আসছে। তারপরেই তিনি রথে উপবিষ্ট দু'জন শ্রেষ্ঠ দেবতা দর্শন করলেন। তাঁদের উভয়ের গাত্রবর্ণ শ্যামলা, লোচন অরুণবর্ণ তারা চতুর্বাহু ও তরুণ। তারা গদা হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাদের অতি মনোহর বদন, উজ্জ্বল কুন্তলাবৃত অপূর্ব হার, অঙ্গদ ও কিরীটে সজ্জিত রূপে ধ্রুব বুঝতে পারলেন যে তারা ভগবানের কিঙ্কর। অতি ব্যগ্র হয়ে উত্থান করলেও যথবিধি পূজার্চনা করতে বিস্মৃত হলেন। তিনি শুধুমাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে করতে পার্ষদদ্বয়কে প্রণাম করলেন। তারা দুজন ছিলেন, পদ্মনাভের অতি প্রিয় দুজন সহচর, সুনন্দ ও নন্দ।

তারা দেখলেন ধ্রুবের চিত্ত সদাই শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে অভিনিবিষ্ট রয়েছে। তিনি আমাদের অভ্যর্থনার জন্যই– শুধুমাত্র কৃতাঞ্জলি ও বিনয়ে অবনত হয়ে দণ্ডায়মান রয়েছেন।

সুনন্দ ও নন্দ বললেন–হে রাজন, তোমার মঙ্গল হোক। তুমি সশরীরে বিষ্ণুপদে আরোহণ করবে। এখন আমাদের বাক্য শ্রবণ করো। আমরা অমিল জগতের নিয়ন্তা শার্ঙ্গন্ধ ভগবানের

কিঙ্করদ্বয়। যে ভগবান পঞ্চমবর্ষীয় বালক, তোমার সাধনায় তুষ্ট হয়েছিলেন, তোমাকে সেই ভগবানের ধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের এখানে আগমন।

হে ধ্রুব, তুমি দুর্জয় বিষ্ণুপদ জয় করেছ। তা সপ্তর্ষিগণেরও অগম্য। তারাও অধঃস্থলে অবস্থান করে, কেবল সেই ধাম দর্শন করে থাকেন। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রেরা যাকে অহরহ প্রদক্ষিণ করছে, তুমি সেস্থানে অধিষ্ঠান করবে।

হে অঙ্গ, তোমার পিতৃপুরুষ অথবা অপর কোনও ব্যক্তি এখনও পর্যন্ত সেখানে গমন করতে সক্ষম হননি। এজগতের পরম পূজনীয় বিষ্ণু পদেই তুমি অবস্থান করবে। হে আয়ুষ্মন, পুণ্যশ্লোক শিখামনি ভগবান তোমারই জন্য এই শ্রেষ্ঠ বিমানটি দিয়েছেন। তুমি সশরীরে আরোহণ কর বৎস।

মৈত্রেয় বললেন–হে বিদুর, ভগবানের অত্যন্ত আদরণীয় ধ্রুব, তার পার্ষদগণের কথা শ্রবণ করলেন। তিনি প্রথমে স্নান, নিত্যকর্ম সম্পন্ন করে মুনিদিগকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। তাঁদের নিকট থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করে প্রীত মনে বিমানের নিকট গমন করলেন। শ্রেষ্ঠ বিমানটিকে প্রদক্ষিণ ও বন্দনা করে ভগবানের পার্ষদদ্বয়কে অভিবাদন করলেন।

তারপরে ধ্রুব বিমানে আরোহণ করতে উদ্যত হলেন। তখনই তার শরীর হিরন্ময় অর্থাৎ তেজোময় হল। ধ্রুবের পূর্বের স্বাভাবিক রূপই শুধুমাত্র হিরন্ময় হয়ে গেল। তখন চতুষ্পর্শে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ-প্রভৃতি বাদ্য মঙ্গলরবে বাজতে লাগল। শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বগণ সংগীত গাইতে লাগলেন। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি শুরু হল।

বিষ্ণুলোকে আরোহণের পূর্বমুহূর্তে ধ্রুবের মাতা সুনীতির কথা স্মরণে এল। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, মাতাকে বিরহ যন্ত্রণা দিয়ে একাকী আমি কিভাবে এই দুর্লভ বিষ্ণুলোকে গমন করব। সুনন্দ ও নন্দ, ধ্রুবের মনোভাব বুঝতে পারলেন। মাতা সুনীতি যে আগেই বিমানে আরোহণ করে বিষুধামে গমন করছেন সে দৃশ্য তারা ধ্রুবকে দর্শন করালেন। গগনপথে পরিভ্রমণকালীন সময়ে, বৈমানিক দেবগণ ধ্রুবের প্রশংসা করে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ক্রমশঃ তিনি গ্রহাদি দর্শন করলেন।

ধ্রুব এইভাবে বিমানযোগে ত্রিলোক ও সপ্তর্ষিমণ্ডল অতিক্রম করলেন ক্রমশঃ তাদেরও ঊর্ধ্ববর্তী বিষ্ণুলোকে উপনীত হলেন। যে বিষ্ণুলোক স্বীয় জ্যোতিতে সদাই দীপ্যমান। তার প্রভাবেই এ ত্রিভুবন রচিত হয়েছে। জীবের প্রতি দয়াহীন লোকেরা, কখনই সে লোকে যেতে

সমর্থ হয় না। নিরন্তর মঙ্গলাচরণকারী লোকেরাই সেখানে যেতে সমর্থ হয়। যে সকল ব্যক্তিবর্গ শান্ত বা ভোগবাসনা রহিত, সর্বত্র সমদর্শী পবিত্র হৃদয় এবং ভগবান অচ্যুতের প্রিয়ভক্ত তারা অনায়াসে বিষ্ণুপদ লাভ করতে পারেন।

এভাবেই রাজা উত্তানপাদের পুত্র কৃষ্ণপরায়ণ ধ্রুব ত্রিলোকের নির্মল চূড়ামণির তুলনীয় ছিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর, ধ্রুব যে পরম আকাঙ্ক্ষিত স্থান লাভ করলেন, সেখানে জ্যোতিশ্চক্র নিরন্তর গগণের মেধি– ভ্রমণের ন্যায় ভ্রাম্যমান। ভগবান নারদ ঋষি কুবের মহিমায় আর্বিভূত হয়ে প্রচেতাদের ব্রহ্মযজ্ঞে বীণাবাদন করতঃ শ্লোক গান করেছিলেন। সেখানে তিনি ধ্রুবের মহিমা প্রতিপাদক তিনটি শ্লোকের গায়ন করেছিলেন।

দেবর্ষি নারদ বললেন– পতিনিষ্ঠা সুনীতির পুত্র ধ্রুব তপস্যাবলে যে ফল লাভ করেছে, তা অতি শ্লাঘনীয়। বেদবিদ ব্রহ্মর্ষিগণেরও তা সহজলভ্য নয়, রাজাদের কথা আর কি বলব? মাত্র পঞ্চবর্ষীয় বালক ধ্রুব, আমার আদেশে ভগবান হরির সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বিমাতার কুবাক্য তার হৃদয়ে যে বেতনার উদ্রেক ঘটায় তা উপশমার্ধে সে কঠোর তপস্যার ব্রতী হয়। অজিত ভগবান হরিকে সে প্রগাঢ় ভক্তিতে বশীভূত করেছিল।

ভগবান শুধুমাত্র নিজ ভক্তগণের গুণেই বশীভূত হন। অতি অল্প বয়সে, মাত্র ছয়মাসের তপস্যায় ধ্রুব বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীহরিকে তুষ্ট করে তার পদরেণু লাভ করতে পেরেছেন। সমগ্র পৃথিবীর অপর কোনো ক্ষত্রিয় পুরুষ বহু চেষ্টাতেও সেই পদে আরোহণের সংকল্প করতেও পারে না।

মৈত্রেয় বললেন–বিদুর, তুমি আমাকে যা যা প্রশ্ন করেছিলে আমি তোমাকে বললাম। হে কৌরব্য, পরম ভাগবত ধ্রুব অতি যশস্বী তার চরিত্র সাধুজনসম্মত। এই ধ্রুব চরিত্র ধন-সম্পদ প্রাপ্তির কারণ তার চরিত্র-কথা শ্রবণ যশোবর্ধক, আয়ুবর্ধক, পুণ্যসাধক, পাপনাশক ও মনঃশোধক। অচ্যুতপ্রিয় ধ্রুবের এই চরিতকথা শ্রবণে সকল ক্লেশের উপশম হয়। এই ধ্রুবচরিত্র মহত্ত্বকামীর মহত্ত্বপ্রাপ্তি। এই কাহিনি শ্রবণ বা বর্ণনে শীলাদি গুণের জন্ম হয়। তেজস্বী ব্যক্তিগণের সভায় পুণ্য শ্লোক ধ্রুবের এই মহৎ চরিত্র কীর্তন করবে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, কৃষ্ণচতুর্দশী, দ্বাদশী, শ্রবণানক্ষেত্র, ত্র্যহস্পর্শ, ব্যতিপাত যোগ, সংক্রান্তি ও রবিবারে এটি ভক্তিভাবে পাঠ করবে। নিষ্কাম ও ভগবানের চরণকমলে শরণাপন্ন হয়ে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের পাঠ করাবে। তাহলে আত্মাই আত্মার প্রতি প্রসন্ন হবেন। এভাবেই সিদ্ধিলাভ হবে।

তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে ভগবন্মার্গের অমৃতরূপ জ্ঞানপ্রদানকারী ব্যক্তিদের প্রতি দেবতাগণ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রকাশ করেন।

হে কৌরব্য বিদুর, যে ধ্রুব বাল্যকালে মাতৃস্নেহ ও ক্রীড়াপকরণ ত্যাগ করে ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আমি এতক্ষণ সেই মহৎ বিশুদ্ধকর্মা ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা করলাম।

.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধ্রুবের বংশে পৃথুর জন্মকথনার্থ বেন–পিতা অঙ্গের বৃত্তান্ত বর্ণন

সূত বললেন–মুনিবর মৈত্রেয়ের কাছে ধ্রুবের সশরীরে স্বর্গ গমনের কাহিনি শ্রবণ করলেন বিদুর। বিদুর পুনরায় অতি ভক্তিভরে ভগবান অবোজকে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন– হে সুব্রত, আপনি বললেন, দেবর্ষি নারদ প্রচেতাদের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে ধ্রুবের মহিমা–ব্যাঞ্জক তিনটি শ্লোকগান করেন, কিন্তু ঐ প্রচেতাগণ কারা? তারা কোন্ বংশে ও কাদের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে বিখ্যাত হন? তাদের জন্মস্থলই বা কোথায় অবস্থিত ছিল? হে মুনিবর, আমরা জানি দেবর্ষি নারদ হলেন মহাভাগবত। দেবতুল্য নারদের দর্শন অতীব পুণ্যকর। তিনি ভগবানের পরিচর্য্যা বিষয়ক ক্রিয়াযোগ পঞ্চরাত্রে বলেছিলেন।

আমরা শুনেছি যে, স্বধর্মশীল প্রচেতাগণ তাদের আয়োজিত যজ্ঞে ভগবান যজ্ঞমূর্তি নারায়ণের আরাধনা করেছিলেন। তৎকালে দেবর্ষি নারদ নম্র বিনীত বচনে ভগবানের স্তবগান করেছিলেন। হে মুনিবর, দেবর্ষি নারদ বর্ণিত ভগবকথা শুনতে আমার মন বড়ই উৎসুক হয়েছে। আপনি আমাকে দয়া করে সকল লীলাকথাই বর্ণনা করুন।

মৈত্রেয় বললেন– মহাত্মা ধ্রুবের পুত্র ছিলেন উকল। পিতার বনে গমনকালের পরে, সকল ভূমির আধিপত্য লাভ করলেন তিনি। রাজ্যশাসনের ভারও তার উপরে ন্যস্ত হল। তিনি আজন্ম শান্তচিত্ত নিঃসঙ্গ অর্থাৎ বিষয়ে নিরাসক্ত ছিলেন। সমস্ত প্রাণীকে তিনি নিজ আত্মায় অনুভব করতেন। আবার নিজ আত্মা অর্থাৎ ভগবানকে সকল প্রাণীর অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত জ্ঞান করতেন। নিজেকে তিনি নির্বিকার ব্রহ্মস্বরূপ দেহাভিমান রহিত, পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নরূপে উপলব্ধি করতেন। নিরন্তর যোগাগ্নির দ্বারা তার সকল বাসনারূপ কর্মফল দগ্ধ হয়েছিল।

তাই তিনি নিজেকে পরমপুরুষ পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করতেন। তিনি তখন ভগবান ব্যতীত অপর কিছু দর্শন করতে পারতেন না। অজ্ঞজনের কাছে তিনি জড় অন্ধ, মূক ও বধিররূপে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি তা ছিলেন না। তাঁর প্রকৃত সত্ত্বা ভস্মাচ্ছদিত অগ্নির ন্যায় অপ্রকাশিত ছিল।

রাজ্যের কুলবৃদ্ধ ও অমাত্যগণ উকলকে জড় ও উন্মত্ত বিবেচনা করে, তাকে রাজ সিংহাসনের অনুপযুক্ত বিবেচনা করলেন। তারা তখন ভূমির পুত্র বৎসরকে সিংহাসনে বসালেন। রাজা বৎসরের সর্বাপেক্ষা প্রিয় মহিষী ছিলেন সুবীথী। সুবীথীর গর্ভে তার ছয়টি সন্তানের জন্ম হয়। তাঁদের নাম ছিল পুষ্পর্ন, তিগ্নকেতু, হষ, ঊর্জ, বসু এবং জয়। পুষ্পর্নের আবার দুই পত্নী ছিলেন। তারা হলেন প্রভা ও দোষা– প্রভার তিনটি পুত্রের নাম ছিল –প্রাতঃস মধ্যন্দিন এবং সায়ং। দোষার তিন পুত্র ছিল–

প্রদোষ, নিশীথ ও বুষ্ট। বুষ্টের পত্নীর নাম ছিল পুষ্করিণী। তার একমাত্র পুত্রের নাম ছিল সর্বতেজা। সর্বতেজার পত্নী ছিলেন আকুতি। তার গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হয়, তার নাম ছিল চাক্ষুষ মনু। ঐ মনুর ঔরসে দ্বাদশ পুত্রের জন্ম হয়। তারা সকলেই নির্মল ও শুদ্ধচিত্ত সম্পন্ন ছিলেন। তাদের নাম হল পুর, কৃৎস্ন, ঋত, দ্যুম্ন, ত্রিত, সত্যবান, ব্রত, অগ্নিষ্টোর্ম, অতিরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি এবং উন্মুক। উন্মুকের পত্নী পুষ্করিনঈর গর্ভে দুটি পুত্রের জন্ম হয়। তারা হলেন — অঙ্গ, সুমনা, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয়।

অঙ্গের পত্নীর নাম সুনীথা। তার গর্ভজাত পুত্রের নাম বেন। বেন ছিলেন অতি উগ্র স্বভাবা ও দুশ্চরিত্র। তার দুঃশীলতায় পীড়িত হয়ে পিতা অঙ্গ রাজপুরী পরিত্যাগ করেন। বৎস বিদুর, মুনিগণের বাক্য বজ্রসম অমোঘ, মুণিদের অভিসম্পাতে বেন অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রাজ্য তখন রাজাহীন হয়ে পড়ল। দস্যুরা নিরীহ প্রজাদের ওপর পীড়ন করতে শুরু করল। তখন নিরূপায় দেখে মুনিগণ পুত্র উৎপাদনার্থে বেনের দক্ষিণ হস্ত মন্থন করলেন। তখন তাতে নারায়ণের অংশে আদিরাজ পৃথুর জন্ম হয়।

বিদুর প্রশ্ন করলেন, হে মুনিবর, অতিশয় সুশীল রাজা অঙ্গ, তিনি অতি মহান, সাধু ও ব্রাহ্মণগণের অনুবর্তী ছিলেন। তাঁর ঐরূপ কুসন্তান কিরূপে উৎপন্ন হল? যার জন্যে তিনি বনগমনে বাধ্য হলেন, আবার বেনও রাজা হয়ে স্বয়ং দণ্ডব্রত ধারণ করেছিলেন। তবু মুনিগণ তার ওপরে কুপিত হয়ে ব্রহ্মশাপ দিলেন কেন? প্রজাপালক রাজা যদি অপরাধীও হন, তবু তিনি প্রজাগণের অবজ্ঞেয় নন। কারণ স্বীয় শক্তির প্রভাবে রাজা ইন্দ্রাদি লোকপালগণের

তেজ ধারণ করেন। হে ব্রহ্মণ, আপনি সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর বেত্তাদের মধ্যে অন্যতম। আমাকে কৃপাপূর্বক আপনি সুনীথা পুত্র বেনের চরিত্র বর্ণনা করুন।

মৈত্রেয় বললেন– বিদুর, রাজর্ষি অঙ্গ মহাক্রতু অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। সেখানে ব্রহ্মবাদী ঋত্বিকগণ মন্ত্রপাঠ ও আরাধনা করেছিল। তাদের যথাবিধি পূজাতেও দেবগণ সেই যজ্ঞের হবি গ্রহণ করলেন না।

পুরোহিতরা তখন বিস্মিত হয়ে যজমানকে বলতে থাকেন, দেবগণ কেন এ যজ্ঞে আহুত হয়েও এলেন না, তা বুঝতে পারছি না। হে রাজন, আপনার যজ্ঞীয় হবির কোনও দোষ হয় নি। আপনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে সকল দ্রব্যই আহরণ করেছেন।

এই যজ্ঞে মন্ত্র প্রয়োগকর্তা ছিলেন ধৃতব্রত ঋত্বিকগণ। দেবগণের প্রতি কোনরূপ অবহেলা তো এখানে করা হয় নি স্বয়ং দেবতাগণই তো কর্মের সাক্ষী। তাঁরাই কর্মের দোষগুণের দ্রষ্টা তবু কেন তারা যজ্ঞস্থলে উপনীত হয়ে, নিজ ভাগ গ্রহণে অনিচ্ছুক, তা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।

মৈত্রেয় বললেন– বিদুর, ব্রাহ্মণদের এই কথা শুনে যজমান রাজা অঙ্গ অতি দুর্মনা হলেন। তিনি যজ্ঞকালীন মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু এরূপ ঘটনায় তার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটল। তিনি সমবেত সদস্যদের অনুমতি ক্রমে মৌনভঙ্গ করলেন।

হে সদস্যগণ দেবতাগণ যথাবিধিত পূজ্য ও আহুত হয়েও এই যজ্ঞে এলেন না। নিজ ভাগ, সোমপাত্র গ্রহণ করলেন না কেন–তা আপনারা বলুন। আমি কি অপরাধ করেছি, তা আপনারা বলুন।

সদস্যগণ বললেন– হে রাজন, এ জন্মে আপনার বিন্দুমাত্র অপরাধ নেই। তবে পূর্বজন্মের পাপের ফলে আপনি এ জন্মে ধর্মশীল হয়েও পুত্রহীন। আপনি পুত্রলাভের চেষ্টা করুন। তাতে আপনার মঙ্গল হবে। পুত্র প্রার্থী হয়ে আপনি যজ্ঞেশ্বর হরির উপাসনা করুন। তিনি নিশ্চয়ই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।

আপনি অপত্যনিমিত্ত যজ্ঞমূর্তি শ্রীনারায়ণকে বরণ করলে অন্যান্য দেবতারাও নিশ্চয়ই নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করবেন। উপাসক ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে যা যা কামনা করে, হরি সমস্ত প্রদান করেন। যে যে ভাবে হরি পূজিত হন সেই ভাব অনুসারে ফল লাভ হওয়া সম্ভব।

ঋষিগণ এভাবে মনস্থির করে অঙ্গের পুত্র লভ্যার্থে পূজা শুরু করলেন। তারা অপত্যনিমিত্ত শিপিবিষ্ট বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে পুরোজশ আহুতি প্রদান করলেন। তখনই সেই যজ্ঞাগ্নি থেকে একজন সুদর্শন পুরুষ উত্থিত হলেন। তার গলায় স্বর্ণমাল্য এবং হস্তে পায়েসপূর্ণ স্বর্ণপাত্র ধৃত ছিল। নির্মলকান্তি সেই পুরুষের কাছ থেকে অঙ্গ অঞ্জলি ভরে সেই সুপক্ক পায়েস গ্রহণ করলেন। আনন্দিত মনে তার আঘ্রাণ নিজে গ্রহণ করলেন। পরে ব্রাহ্মণদের অনুমতিক্রমে তা সুনীথাকে ভোজন করতে বললেন। পুত্রহীনা মহিষী সুনীথা সন্তানোৎপাদক ঐ পায়েস ভক্ষণ করে গর্ভধারণ করলেন। যথাসময়ে তিনি একটি পুত্র প্রসব করলেন। সুনীথা ছিলেন মৃত্যুর কন্যা। তার গর্ভজাত সন্তান ছেলেবেলা থেকেই মাতামহের অনুগামী ছিল। অঙ্গ ও সুনীথার পুত্রের নাম ছিল বেন। মাতামহ মৃত্যু, স্বয়ং অর্ধমাংশ প্রভব, তার অনুবর্তী হওয়ায় অঙ্গরাজ তনয় বেন ক্রমশঃ অধর্মের অনুসারী হয়ে উঠল।

অধার্মিক বেন বনমধ্যে অসহায় মৃগদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করত। বাল্যকালে খেলার সঙ্গীদের সে হঠাৎ অতি নির্দয়ভাবে খেলতে খেলতে মেরে ফেলত। তার নিষ্ঠুরতায় প্রজাসকল অত্যন্ত ভীত ছিল। তাকে দূর থেকে দেখতে পেলেই আতঙ্কিত হয়ে "ঐ বেন আসছে" বলে চিৎকার করত। মহারাজ অঙ্গ নানাভাবে শাসন করেও তাকে সংযত করতে পারলেন না। বেনের এরূপ নির্দয়তা, কলস্বভাব, রাজা অঙ্গকে অত্যন্ত বিমর্ষ করে তুলল। তার মনে হল, যে সকল গৃহস্থ পুত্রহীন ও যারা দুশ্চরিত্র পুত্রের অধিকারী নন, তারা অতি সৌভাগ্যবাণ। তারা নিশ্চয়ই ভক্তিভাবে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করেছেন।

কুপুত্র দ্বারা যেকোনো ব্যক্তির অশেষ মানসিক ব্যথা উৎপন্ন হয়। এর ফলে যাবতীয় পাপ, অধর্ম ও সকলের সঙ্গে বিরোধিতার সম্ভাবনা থাকে। যে কুপুত্র সংসারের সকল দুঃখের কারণ, তাকে আর কে ভালবাসতে পারে। সে নামেমাত্র পুত্র, প্রকৃতপক্ষে আত্মার বন্ধন মাত্র। এরূপ পুত্রের গৃহাশ্রম ক্লেশকর ভিন্ন সুখকর কখনও সম্ভব নয়।

তবে প্রেমাস্পদ সৎপুত্রের চেয়ে বরং কুপুত্র ভালো। কারণ কুপুত্রের কারণে সংসার– দুঃখ অনুভূত হয় বলে মনুষ্যগণ সংসারে নিরাসক্ত হয়। তাদের মনে বৈরাগ্যের জন্ম হয়।

এরূপে রাজা অঙ্গের নির্মোহ জন্মাল, রাত্রিকালে তাঁর ভালোভাবে নিদ্রা হত না। গভীর রাতে তিনি পত্নী সুনীথাকে নিদ্রামগ্ন দেখে শয্যা ত্যাগ করে রাজগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। অতুল ঐশ্বর্যাদি পরিত্যাগ পূর্বক বৈরাগ্য প্রাপ্ত রাজন অঙ্গ গৃহত্যাগ করলে, অমাত্য ও পুরোহিতগণ তাকে যত্রতত্র অনুসন্ধান করলেন। তিনি নিজপুরেই গূঢ়ভাবে অবস্থিত ছিলেন। তাই তারা

কেউই পৃথিবীর অন্য কোথাও তাকে খুঁজে পেলেন না। হতোদ্যম হয়ে তারা রাজপুরীতে প্রত্যাগমন করে সমবেত ঋষিদের রাজার নিরুদ্দেশ সংবাদ প্রদান করলেন। তখন সকলে অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

.

চতুর্দশ অধ্যায়

দ্বিজগণ কর্তৃক বেনের রাজ্যে অভিষেক ও রোষবশতঃ তার বধ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন– হে বিদুর, রাজ্য পরিত্যাগ করে মহারাজ অঙ্গ প্রবজ্যা গ্রহণ পূর্বক বনে গমন করলেন।

তখন লোকসকলের মঙ্গলকামী মুনিগণ বিবেচনা করে দেখলেন যে রাজাহীন রাজ্যে দস্যুদলের হাতে প্রজাগণের পীড়ন অবশম্ভাবী। তখন বেদবেত্তা ব্রাহ্মণগণ সুনীথাকে আহ্বান করলেন। তার নিকটে তারা বেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করার প্রস্তাব করলেন। অমাত্যগণের প্রবল অসম্মতি সত্ত্বেও অনুপযুক্ত বেন তখন সিংহাসনে আসীন হলেন। উগ্রস্বভাবা, প্রচণ্ডশাসন বেনের সিংহাসনে আরোহণের সংবাদে দস্যুগণ সর্পভয়ে ভীত হয়ে মুষিকের ন্যায় আত্মগোপন করল।

রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে বেনের ঔদ্ধত্য দিনে দিনে বর্ধিত হতে লাগল। লোকপালগণের কোষাদি অর্থ-ঐশ্বর্যের দ্বারা সমৃদ্ধ বেন, নিজেই নিজেকে প্রধান মনে করতে শুরু করল। “আমিই শূর, আমি পণ্ডিত” — এরূপ সত্ত্বেও সে পূজ্য ও মহৎ ব্যক্তিগণেরও অমর্যাদা শুরু করল।

এভাবে ঐশ্বর্য মদমত্ত বেন অন্ধ ও দর্পিতভাবে নিরঙ্কুশ হস্তীর ন্যায় রথে আরোহণ পূর্বক স্বর্গমর্ত কম্পিত করে বিচরণ করতে লাগল। তারপর চারদিকে ভেরী বাজিয়ে সে ঘোষণা করল ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞ, দান, হোম ও কোনও প্রকার ধর্মাচরণ রাজ্যে নিষিদ্ধ।

এসময়ে সত্র নামক এক যজ্ঞে মুণিগণ সমবেত হয়েছিলেন। তারা সকলে বেনের এরূপ অসদাচরণ লক্ষ করে অতিশয় চিন্তান্বিত হলেন।

লোকসকলের দুর্দশার কথা ভেবে তারা 'হায় হায়' করতে লাগলেন। তারা বলতে লাগলেন যে, কাষ্ঠমণ্ডের দুটি প্রান্তদেশে অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত হলে যেমন পিঁপড়েদের দুর্দশা হয়, তেমনি অবস্থা এই রাজ্যের প্রজাগণের। একদিকে দস্যুদলের ভয়, অপরদিকে স্বয়ং রাজার দ্বারাই তারা ভয়ানক বিপদের মধ্যে পতিত হয়েছে।

রাজাহীন রাজ্যের অরাজক অবস্থার কথা চিন্তা করে আমরাই বেনকে রাজাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলাম। কিন্তু সেদিক থেকেই অধিক বিপদ সমুপস্থিত হয়েছে। এখন প্রজাদের কল্যাণসাধন কিভাবে সম্ভব? দুগ্ধ কলা সহযোগে পুষ্ট সর্প তার পোষক ব্যক্তিরও অনিষ্ট করে তেমনি যে বেনকে আমরাই রাজা নিরূপণ করেছিলাম, সে এখন সমগ্র প্রজাদের বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছে, এই বেন স্বভাবত মল সুনীথার গর্ভজাত সন্তান। আমরা তবুও চেষ্টা করব তাকে সুযুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে সৎপথে নিয়ে আসার। তাতে যদি বেনকৃত পাপ আমাদের রেহাই দিতে পারে। কারণ আমরা তার অসততা জ্ঞাত হয়েও তাকেই রাজা নির্বাচন করেছিলাম। যদি– অধার্মিক বেন, আমাদের সদুপদেশ গ্রহণ করে তো ভাল, নতুবা লোকগণের ধিক্কারে অর্ধদগ্ধ বেনকে আমরাই স্বীয় তেজ দ্বারা দগ্ধ করব।

এই রূপে মনস্থির করে মুণিগণ নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করলেন। তারা বেনের কাছে উপনীত হয়ে বলতে লাগলেন –হে নৃপশ্রেষ্ঠ, আমাদের হিতোপদেশ শ্রবণ কর। এতে তোমার আয়ু, বল, ঐশ্বর্য ও যশ বৃদ্ধি পাবে। কায়মনোবাক্যে সম্পাদিত ধর্ম-কর্মের আচরণের ফলে মনুষ্যের স্বর্গলাভ হয়। নিষ্কাম কর্ম দ্বারা ভগবানের সাধর্ম বা মোক্ষলাভ হয়ে থাকে।

হে বীর, তোমার কাছে শ্রেষ্ঠ আচরণীয় ধর্ম হল প্রজাপালন। তা তুমি নষ্ট কোরো না, কারণ এই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে রাজা তার ঐশ্বর্য থেকে ভ্রষ্ট হয়। হে রাজন, যে নৃপতির শাসনে প্রজাগণ দুষ্ট অমাত্য ও দস্যুদের হাত থেকে রক্ষিত হন, তিনি ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভ করতে পারেন।

মহারাজ, যে রাজার রাজ্যে ও পুরমধ্যে প্রজাগণ নিজ নিজ আচরণীয় ধর্মদ্বারা ভগবানের অর্চনা করেন, সেই রাজার প্রতি স্বয়ং ভগবানও পরিতুষ্ট হন। ব্রহ্মাদিগণেরও ঈশ্বর ভগবান নারায়ণ পরিতুষ্ট হলে, সকল বস্তুই প্রাপ্য হয়। লোকপালাদির সঙ্গে সমস্ত লোক তার জন্যই পরমাদরে পুজোপ্রচার আহরণ করে।

হে রাজন, তিনি চতুর্দশ ভুবনাত্মক সকল লোক দেবগণ ও যজ্ঞসমূহের অধিষ্ঠাতা। তিনিই দেবাত্মক, যজ্ঞীয় দ্রব্যাত্মক ও তপস্যাত্মক। সেই ভগবান বিষ্ণুকে যারা নিজ নিজ ধর্মমতে

নানাবিধ যজ্ঞোপচারে আরাধনা করেন, প্রজাদের সেই সেই কর্মে প্রবৃত্ত করা তোমার কর্তব্য। এতে তোমারই কল্যাণ হবে। ব্রাহ্মণগণ তোমার রাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে নানাবিধ যজ্ঞ, হোম সহযোগে হরির অংশরূপ দেবতাদের অর্চনা করেন, তারা তুষ্ট হলে বাঞ্ছিত ফললাভ সম্ভব হয়। সেজন্য ব্রাহ্মণগণকে তুমি কখনও অবজ্ঞা কোরো না।

বেন তাচ্ছিল্যভরে বলল– ওহে তোমরা বড়ই মূর্খ। আমার ভজনা ত্যাগ করে তোমরা নারায়ণের আরাধনা করতে চলেছ। কুলটা নারীর মতো তোমাদের জীবিকাদ পতি আমাকে পরিত্যাগ করেছে। জরাতুল্য কম্পিত পতি শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় মেতে উঠেছ। নৃপরূপ ঈশ্বরকে যারা অবজ্ঞা করে, তারা ইহলোক বা পরলোক– কোথাও সুখী হয় না। প্রতিপ্রেমহীনা কুলটা রমণীগণের উপপতিতে অনুরাগের মতো, তোমাদের যার প্রতি এত ভক্তি সে কে? কে সেই যজ্ঞপুরুষ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য, কুবের, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি বরুণ ও অন্য দেবাদিগণ সকলেই এই রাজদেহে বর্তমান, অতএব রাজা সর্বদেবময়।

আমি ছাড়া অন্য অগ্রভুক পুরুষ কে থাকতে পারে? হে ব্রাহ্মণগণ মাৎসর্য ত্যাগ করে নিজ নিজ কর্ম দ্বারা আমার অর্চনা কর। আমার উদ্দেশ্যে পুজোপকরণ প্রদান করলেই তোমাদের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

মৈত্রেয় বললেন– এইরূপ ভ্রষ্ট বুদ্ধি, ধর্মচ্যুত, পাপাচারী বেন বারংবার ঋষিগণকে অবজ্ঞা করতে লাগল। তাঁদের সদুপদেশে কর্ণপাত না করে, উপর্যুপরি তাদের প্রত্যাখ্যান করল। এতে মুণিগণ অতীব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তারা বলতে লাগলেন –এই বেন পাপাত্মা, অতি দুরাচারী, অতি শীঘ্র একে বিনাশ করা প্রয়োজন। কারণ এই দুরাত্মা জীবিত থাকলে, এর পাপের আগুনে সমগ্র জগৎ বিধ্বংস হবে। এই বেন যজ্ঞেশ্বর হরির নিন্দায় প্রবৃত্ত। যে হরির কৃপায় সকল ঐশ্বর্য লাভ সম্ভব, একমাত্র অশুভবুদ্ধি বেন ছাড়া অপর কেউ তাকে অবজ্ঞা করতে পারে না। এই পাপাচারী, রাজাসনে আরোহণের যোগ্য নয়। মুণিগণ এতক্ষণ ক্রোধকে সম্বরণ করে ছিলেন। এবার তারা ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত করে ভয়ংকর হুঙ্কার দিয়ে বেনকে বধ করলেন। এই দুরাচারী বেন, ভগবান অচ্যুতের নিন্দায় আগেই হত ছিল। তারপর ঋষিগণ নিজ নিজ আশ্রমের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। পুত্র শোকগ্রস্তা জননী সুনীথা যোগবিদ্যা দ্বারা নিহত পুত্রের মৃতদেহ রক্ষা করে রইলেন।

একসময় ঐ মুনিসকলে সরস্বতী নদীতে অবগাহনপূর্বক যথানিয়মে অগ্নিহোমাদি করলেন। এরপর তারা নদীতটে সমবেত হয়ে ভগবৎ কথার আদান-প্রদানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, হঠাৎ

তারা দেখতে পেলেন, চতুর্দিকে কিছু অমঙ্গলজনক উৎপাত উপস্থিত হয়েছে। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন –রাজাহীন রাজ্য কি কোনও দস্যুর হস্তে নিপীড়িত?

এমন সময়ে তারা দেখলেন, সকল দিক থেকে ধাবমান ধনলুণ্ঠনকারী দস্যুদের পদক্ষেপে সমাচ্ছন্ন চারপাশ! রাজাহীন রাজ্যে নির্ভয়ে দস্যুরা গৃহস্থদের ধন লুণ্ঠনে ব্যস্ত। একে অন্যের প্রতি হিংসায় রত। জনপদকে দুর্বল ও দস্যুদের আক্রমণে ত্রস্ত হতে দেখেও ঋষিগণ কিছুই করলেন না। যদিও তারা এই প্রকার অরাজক অবস্থার প্রতিবিধানে সক্ষম, তবু এক্ষণে হিংসার আশ্রয় নেওয়া অনুচিত বিবেচনা করলেন।

তারপর তারা মনে মনে ভাবলেন যে, সমদর্শী, শান্ত ব্রাহ্মণেরা যদি বিপন্ন ব্যক্তিদের রক্ষার্থে সচেষ্ট না হন, তাহলে সমূহ বিপদ! এমনকি ছিদ্র পাত্র থেকে যেমন দুধ বেরিয়ে যায়, তেমনি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণগণের পবিত্র তপোবনও বিনষ্ট হতে পারে। তারা এও ভাবলেন যে, রাজর্ষি অঙ্গের বংশ একেবারে বিলুপ্ত হওয়া ঠিক নয়। বহু বীর ও ভগবদভক্ত ব্যক্তি এই বংশে জন্ম নিয়েছেন।

এরূপ বিবেচনা করে তারা মৃত বেনের ঊরু সবলে মন্থন করতে লাগলেন। সেখান থেকে এক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ খর্বকায় পুরুষ উত্থিত হল। তার অঙ্গাদি অতি হ্রস্ব এবং বাহুদ্বয় ক্ষুদ্র। তার কপালের দুই প্রান্তভাগ বৃহৎ, নিম্ন নাসা, লালবর্ণ চক্ষু ও তাম্রবর্ণ কেশ।

সে অতি দীনভাবে, নত হয়ে ঋষিগণকে প্রশ্ন করল–তার কী করণীয়? মুণিগণ তাকে বললেন–"নির্ষীদ"। অর্থাৎ বোসো, এই মাত্র বললেন। হে বিদুর, মুণিগণ নির্ষীদ বলায় উদ্ভূত ব্যক্তির নাম

"নিষাদ" হল। তার যে বংশ হল, তার নাম হল নৈষাদ। ঐ পুরুষ জন্মেই বেনের অতি উগ্র পাপসমূহ নিজ দেহে ধারণ করল। তার বংশধরগণ নিষাদজাতি হয়ে গিরি ও কাননে অর্থাৎ বনে-জঙ্গলে বসবাস করতে লাগল।

.

পঞ্চদশ অধ্যায়

পৃথুর উৎপত্তি ও রাজ্যভিষেক

মৈত্রেয় বললেন– বিদূর অনন্তর ব্রাহ্মণবর্গ মৃত ও অপুত্রক বেনের বাহুদ্বয় মন্থন করতে শুরু করলেন। এর ফলে একজন স্ত্রী ও একটি পুরুষের উদ্ভব হল। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ সেই জাত মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষকে অবলোকন করলেন। তখনি তারা বুঝতে পারলেন এরা স্বয়ং ভগবানের অংশ। মিথুনের মধ্যে এই পুরুষ ভগবান বিষ্ণুর ভুবনপালন অংণ ও স্ত্রী অংশ হলেন সহজাত লক্ষ্মীদেবীর অংশ। এই পুরুষ ক্রমে জগতের শ্রেষ্ঠ রাজা হিসেবে বিবেচিত হবেন। তাই ইনি বিপুলকীর্তি অর্থাৎ পৃথুশ্রবা পৃথু নামে পরিচিত হবেন। যে দেবীমূর্তি উদ্ভূত হলেন, তিনি শোভন দন্তযুক্তা ও ভূষণগণের মধ্যে ভূষণরূপা। এঁর নাম অর্চি। ইনি পৃথুকেই পতিরূপে বরণ করবেন।

এই ব্যক্তি সাক্ষাৎ ভগবৎ-অংশ হয়েও লোকপালনের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। স্ত্রী হলেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী। ইনি ভগবৎপরায়ণা অর্থাৎ ভগবান ছাড়া অন্য কোথাও তিনি অবস্থান করেন না। এজন্য তারা একসঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছেন।

মৈত্রেয় বললেন– বিদূর, ভগবানের অংশরূপী পৃথুর জন্মলগ্নে মঙ্গলজনক ঘটনাবলী ঘটতে লাগল। ব্রাহ্মণগণ তার স্তব করতে লাগলেন। আকাশ থেকে পুষ্প বৃষ্টি হতে লাগল। শঙ্খ, তুর্য, মৃদঙ্গ ও দুন্দুভি ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে উঠল। শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বগণ গীত গায়ন ও শ্রেষ্ঠ অপ্সরাগণ নৃত্যের মাধ্যমে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। দেবতা ঋষি ও পিতৃগণ সকলেই সেখানে উপস্থিত হলেন।– ইন্দ্রাদি দেবগণের সঙ্গে ব্রহ্মা সেখানে এলেন। তিনি বেনপুত্র পৃথুর দক্ষিণ করে চক্র ও চরণদ্বয়ে পদ্ম চিহ্ন দেখতে পেলেন। যাঁর চক্ররেখা রেখান্তরে প্রতিহত হয় না, তিনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের অংশ। এই বুঝে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তার অভিষেক-ক্রিয়া শুরু করলেন। তখন চতুর্দিক থেকে প্রজাগণ অভিষেকের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে আগমন করতে লাগল। নদী, সমুদ্র, পর্বত, নাগ, গো, পশু পক্ষী, স্বর্গ, পৃথিবীর ও অন্য সকল প্রাণীও নানাবিধ উপহার তাকে প্রদান করল। তারপর উত্তম বসন ভূষণে সজ্জিত হয়ে পৃথু সালঙ্কৃতা পত্নী অর্চিকে সঙ্গে নিয়ে রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। তিনি তখন দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান হলেন।

হে বীর বিদূর, ধনপতি কুবের তাঁকে কাঞ্চনময় উত্তম আসন প্রদান করলেন, জলাধিপতি বরুণ দিলেন সততঃ সলিল ক্ষরণকারী চন্দ্রবর্ণ ছত্র। বায়ু উপহার দিলেন দুটি ব্যজন। ধর্ম

দিলেন কীর্তিময়ী অম্লান পুষ্পহার। ইন্দ্র দিলেন উৎকৃষ্টতম কিরীট। ধর্মরাজ যম তাঁকে শাসনদণ্ড প্রদান করলেন। ব্রহ্মা তাকে দিলেন বেদময় বর্ম, সরস্বতী উত্তম হার, হরি দিলেন সুদর্শন চক্র এবং তার পত্নী লক্ষ্মী অক্ষয় সম্পদ প্রদান করলেন। ভগবান রুদ্র তাকে প্রদান করলেন দশটি চন্দ্রাকার প্রতিবিম্ব খচিত কেশযুক্ত অসি, অম্বিকা দিলেন শত চন্দ্র অঙ্কিত চর্ম।

চন্দ্র তাঁকে দিলেন বলবান অশ্রান্ত অশ্ব। সুন্দর একটি রথ পৃথু উপহার পেলেন বিশ্বকর্মার কাছ থেকে। অগ্নি তাকে দিলেন ছাগ ও গো-শৃঙ্গ নির্মিত ধনু। সূর্য দিলেন রশ্মিময় বাণ। ভূমি তাঁকে উপহার দিলেন যোগময়ী পাদুকা। স্বর্গ থেকে প্রতিদিন পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। আকাশচারী সিদ্ধ-গন্ধর্বগণ তাঁকে নাট্য, গীত, বাদ্য ও অন্তর্ধাণ বিদ্যা সমর্পণ করলেন। সমুদ্র তাঁকে দিলেন নিজের সলিলোৎপন্ন শঙ্খ। সমুদ্র, পর্বত ও নদীরা তার রথ চলাচলের জন্য পথ দিলেন। ঋষিগণ তাকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর সূত, মাগধ ও বন্দিগণ এই সমস্ত স্তবপাঠক স্তব করার জন্য এসে উপস্থিত হল।

মহাপ্রতাপান্বিত বেনপুত্র পৃথু তাদের স্তবপাঠে উদ্যত দেখে হাস্য করলেন। তিনি জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন–হে সৌম্য সূত, মাগধ ও বন্দিগণ, আমার কোননারূপ গুণই তো এখনও প্রকাশিত হয় নি। তোমরা কি অবলোকন করে আমার স্তব করবে? তোমাদের স্তুতিবাক্য মিথ্যায় পর্যবসিত হোক, এমন আমি চাই না। হে মধুরকণ্ঠী স্তবগায়কগণ, যথাকালে আমার গুণাবলী প্রকাশিত হবে। তখন আমার গুণগান কোরো। অথবা পবিত্র কীর্তি ভগবান হরির লীলাকথা থাকতে সভ্যগণ অতি অর্বাচীনের স্তব অর্থাৎ আমার স্তব করতে যাবেন না।

ভবিষ্যতে অপ্রকাশিত গুণাবলীর প্রকাশ সম্ভবনায় কে স্তাবকতা দ্বারা তার গুণকীর্তন করাতে যাবে? যে ব্যক্তি মিথ্যা গুণস্তবে শ্লাঘান্বিত হয়, সে অতি মূঢ়। সে লোকের উপহাস বুঝতেও অক্ষম। "শাস্ত্রাভ্যাস করলে তোমার বিদ্যা হত"–এই বাক্যেও সে স্তুত হয়। অতি উদারচেতা ব্যক্তিগণ বিত কীর্তি ও বহু গুণের আধার হলেও নিজ প্রশংসা শ্রবণে লজ্জিত হন। তারা নিজের স্তুতিবাদকে নিন্দিত পুরুষকারের মতো নিজের গুণকীর্তন করায় অনুমতি দিতে পারি?

.

ষোড়শ অধ্যায়

বন্দিজন-কৃত মহারাজ মৃধুর স্তুতি

মৈত্রেয় বললেন–হে বিদূর, পৃথুর এইমত বাক্যে সন্তুষ্ট হলেন সুতাদি গায়কগণ। মুনিগণের প্রেরণায় তারা পৃথুর স্তবগানে প্রবৃত্ত হলেন। সূতগণ বলতে লাগলেন — আপনি দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, স্বীয় মায়ার প্রভাবে দয়াপরবশ হয়ে এই অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণের মহিমা বর্ণনার ক্ষমতা আমাদের নেই। স্বয়ং ব্রহ্মাদিও আপনার গুণকীর্তনে অভিভূত হয়ে পড়েন। আমরা তা কিভাবে যথাযথরূপে ব্যাখ্যা করতে পারি? বেনরাজার অঙ্গজাত আপনার মহাত্ম্য বর্ণনায় আমরা অপরাগ।

তবুও মুনিদের দ্বারা প্রেরিত হয়েছি আমরা। তাদের উপদেশ মত আপনার প্রশংসীয় মুখ্য কর্মকথা বিস্তার করব। আপনি হরির বংশ, উদারকীর্তি পৃথুর কথামৃতের প্রতি আমরা অতিশয় আগ্রহী।

এই পৃথু ধর্মাচারী জনগণের অগ্রণীরূপে লোকসকলকে ধর্মের অনুবর্তী করবেন। তিনি ধর্মের সেতুসকলের রক্ষক এবং ধর্মদ্বেষীগণের বিরোধী হবেন। এক হরিহর পৃথুরূপে জন্ম নিয়ে নিজদেহে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের মূর্তি ধারণ করবেন। এভাবেই তিনি যথাসময়ে প্রজাপালনের মাধ্যমে স্বর্গ ও মর্ত্য–উভয়লোকেরই হিতসাধনে সক্ষম হবেন। যজ্ঞাদি প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি স্বর্গলোকের মঙ্গলসাধন করবেন। আবার ব্রহ্মাদি সম্পাদন করে তিনি মর্ত্যলোকের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হবেন।

এই মহাত্মা পৃথু সকল প্রাণীতে সমদর্শী ও রাগদ্বেষাদি বর্জিত হয়ে প্রভাব বিস্তার করবেন। সূর্য সবার প্রতি সমানভাবে তাপ বিতরণ করে আটমাস জল আকর্ষণ করেন। তারপর বর্ষাকালে তা প্রদান করেন। এই পৃথু তেমনি নিজ প্রতাপ বিস্তার করে প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করে অসময়ে তাদের রক্ষা করবেন।

তিনি সর্বংসহা। পৃথিবীর ন্যায় সবার অপরাধ তিনি মার্জনা করে থাকেন। যদি কোনও অপরাধী ব্যক্তিও তাঁর কাছে অনুগ্রহপ্রার্থী হয়, পৃথু তার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন। দয়ার্দ্র হৃদয়ে পৃথু সবার অপরাধ ক্ষমা করবেন। যথাসময়ে বর্ষণ না হলে তিনি ইন্দ্রের ন্যায় বর্ষণ করবেন। কারণ তিনি লোকহিতৈষী মানবদেহ ধারণকারী স্বয়ং শ্রীহরি।

মহারাজ পৃথু নিজের অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টি ও নির্মল হাস্যময় বদনের সাহায্যে সমস্ত লোকের মনোরঞ্জন করবেন। তিনি জলাধিপতি বরুণের ন্যায় দুর্জেয় গতি, গুপ্তকর্মা এবং গভীর উদ্দেশ্যে গুপ্তকর্মাবলী সম্পন্ন করবেন। তার ঐশ্বর্য সম্পদ সমস্ত অতি সুরক্ষিত থাকবে। সংযত মনা পৃথু ভগবানের গুণাবলীর আশ্রয়রূপে পরিচিত হবেন।

পৃথু কোরূপ কাষ্ঠ থেকে উৎপন্ন অগ্নিস্বরূপ। তার তেজ দুর্বিষহ। শত্রুরা কেবলমাত্র মনের দ্বারাও ইহাতে প্রাপ্ত হবেন না। ইনি নিকটস্থ হলেও দূরবর্তীর। কেউ তাকে পৌরুষ দ্বারা অভিভূত করতে পারবে না।

গুপ্তচরদের দ্বারা তিনি সকল প্রাণীর ভিতর ও বাইরের সকল কর্মের খোঁজখবর রাখবেন। প্রাণবায়ুর ন্যায় নির্লিপ্ত থেকে প্রভুর মতো আচরণ করবেন। স্বধর্মপথে এই পৃথু নিরপরাধীর প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন। আবার নিজপুত্র অপরাধী হলে তার প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধান করবেন। যতদূর পর্যন্ত ভগবানের সূর্যদেবের কিরণ উত্তাপ বিকীরিত হয়, ততদূর পর্যন্ত তার শাসন ব্যাপ্ত থাকবে। ইহার শাসন বা রথচক্রের প্রতি সে অঞ্চলে কখনও প্রতিহত হবে না। তাঁর মনোরঞ্জক কার্যাবলীতে সকল প্রজা তুষ্ট হয়ে তাকে রাজা বলে। তিনি দৃঢ়চেতা, সত্যনিষ্ঠ দীনদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি সকল প্রাণীর আশ্রয়স্বরূপ বিবেচিত হবেন। তিনি ব্রাহ্মণসহ সকলের প্রতি সম্মানজনক আচরণে ব্রতী থাকবেন।

ইনি পরস্ত্রীকে মাতৃসদৃশ ভক্তি করেন। নিজ পত্নীকে স্বীয় অঙ্গীভূত বলে অনুভব করেন। প্রজাগণের প্রতি তিনি পিতার ন্যায় স্নেহশীল, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রতি তার আচরণ সেবকের ন্যায় বিনত ও বিনম্র।

সকল দেহধারী প্রাণীর কাছে পৃথু আত্মতুল্য প্রিয়। বন্ধুগণের অনিন্দ বর্ধনে তিনি সহায়তা করবেন। তিনি বিষয়ে বিরক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গলাভে প্রয়াসী হবেন। দুষ্কৃতিকারীর প্রতি তিনি কঠিন দণ্ডবিধান করতে ভীত হবেন না।

তিনি ত্রিগুণের অধীশ্বর। নির্বিকার ও আত্মরূপ, ভগবানের অংশে অবতার রূপে তিনি অবতীর্ণ। অবিদ্যার নানাবিধ তত্ত্ব যথা দেব-মনুষ্যাদি প্রকারভেদে তার মধ্যে রচিত হয়ে প্রতীত হয়। তবে পণ্ডিতগণ তাকে অর্থশূন্য অবস্তুরূপে দর্শন করেন। এই রাজাধিরাজ পৃথু ধরাধামে অদ্বিতীয় বীররূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। এভাবে তিনি মনসাচল থেকে উদয়াচল অবধি বিস্তৃত ভূমণ্ডলের শাসনকর্তা হবেন। সেজন্য জয়শীল রথে আরোহণপূর্বক শর শরাসন গ্রহণ করে সমগ্র ভূমণ্ডলকে সূর্যের ন্যায় প্রদক্ষিণ করবেন। এখন পথিমধ্যে স্থানে স্থানে তাকে রাজন্যগণ

নানারূপ উপহার প্রদান করবেন। তাদের স্ত্রীগণ পৃথুকে চক্র ও অস্ত্রসমন্বিত দেখে তার যশোকীর্তনে অভিভূত হয়ে তাঁকে আদিরাজ রূপে মান্য করবেন।

প্রজাহিতৈষী মহারাজ পৃথু পৃথিবীকে দোহন করে প্রজাসকলের জীবিকা বিধান করবেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা পর্বত বিদীর্ণ করেছিলেন পৃথুও তেমনি নিজ ধনুকের সাহায্যে গোরূপধারী পৃথিবীকে বিদীর্ণ করে সমতল করবেন। পশুরাজ সিংহের দৃপ্ত সঞ্চারণে যেমন ক্ষুদ্র পশুরা ভীত হয়ে পলায়ন করে তেমনি বীরবর পৃথুও যখন নিজ অজগর ধনুর্বাণ (অজশৃঙ্গ ও গোশৃঙ্গ দ্বারা নির্মিত) উত্তোলন করে পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করবেন তখন অসৎ লোকেরা তার তেজে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে লুকিয়ে পড়তে উদ্যত হবে। মহারাজ পৃথু সরস্বতী নদীর উৎসস্থলে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রতী হবেন। কিন্তু যজ্ঞ শেষ হবার মুহূর্তে ইন্দ্র তার অশ্ব অপহরণ করবেন।

স্বীয় বাসস্থানের সন্নিকটস্থ উপবনে স্থিত হয়ে এই পৃথু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবেন। সেখানে তিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ভগবান সনৎকুমারের সঙ্গে একত্রে পরম ভক্তিভরে পরমাত্মার আরাধনা করবেন। তাতেই তার পরম ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে। এই প্রবল পরাক্রমী মহীপতি পৃথুর বিক্রম অতি বহুদূর পর্যন্ত বিখ্যাত হবে। দিক বিজয়কালে তিনি দেশে দেশে নিজ প্রশংসা ও নিজগুণ সম্বন্ধীয় কথকথা শ্রবণ করবেন। তার রথচক্রের গতি কোথাও, কখনও প্রতিহত হবে না। নিজ শক্তিবলে তিনি দিগ্বিজয়ী হয়ে পৃথিবীর কণ্টকরূপ দুষ্টদের পরাহত করবেন। সুর ও অসুরগণ তার মহিমা কীর্তন করবেন। এই পৃথু সমগ্র ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হবেন।

.

সপ্তদশ অধ্যায়

পৃথুর অভিষেক ও পৃথিবী কর্তৃক তার স্তব

মৈত্রেয় বললেন–এইভাবে সূতাদি কোপুত্র পৃথুর গুণকীর্তন করলেন। তারা পৃথুকে সুমধুর বাক্যে অভিনন্দিত করলেন। নানাবিধ মূল্যবান অলংকার ও পারিতোষিক প্রদান করে পৃথু তাদের সন্তুষ্ট করলেন। তারপর তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলকে এবং অমত্য, পুরোহিত ও ভৃত্যগণকে যথোচিত অভ্যর্থনা করলেন। পুরবাসী, দেশবাসী, তৈলিক, তম্বুল–বারসায়ী ও আপামর কর্মচারীগণকে আদর ও অভ্যর্থনায় সম্মানিত করলেন।

বিদূর জিজ্ঞাসা করলেন–হে ঋষিবর বহুরূপধারিণী পৃথিবীর গোরূপ ধারণের কারণ কী? একথা আমরা শুনেছি, মহারাজ পৃথু পৃথিবী দোহন করেছিলেন। সেই দোহনকালে দোহনপাত্র কী ছিল। তখন কেইবা বৎস হয়েছিল? পৃথিবী স্বভাবতঃ বৃষণপৃষ্ঠ বা অসমতল, পৃথু কেন তাকে সমতল করতে উদ্যত হয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র কী কারণে তার যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করেছিলেন? রাজর্ষি পৃথু ব্রহ্মবিত্তম ভগবান সনৎকুমারের কাছে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন? হে মুনে, ঐ বিষয়সকল আপনি আমাকে ব্যক্ত করুন। ভগবান বিষ্ণুর পৃথু অবতার রূপে কীর্তিত কাহিনী ও যশোকথা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। ব্রহ্মণ, আমি আপনার ও ভগবান অক্ষেজের ভক্ত। স্বয়ং ভগবান কোপুত্ররূপে এই পৃথিবীর দোহনকর্তা। তার বৃত্তান্ত শুনতে আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

সূত বললেন– হে শৌনক, বিদূরের অধীর আগ্রহ দেখে প্রীত হলেন মহামুনি মৈত্রেয়। তিনি হর্ষিত চিত্তে বিদুরের প্রশংসা করলেন।

মৈত্রেয় বললেন–হে বিদূর, ব্রাহ্মণগণ পৃথুকে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। তারা পৃথুকে। বললেন–'অদ্যাবধি আপনিই জনগণের রক্ষক ও প্রতিপালক।

তখন পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ক্ষুধার্ত প্রজাগণ দীর্ন শীর্ণ হয়ে পৃথুর কাছে উপনীত হল। তারা বলতে থাকে–হে রাজন, বৃক্ষাদি যেমন অভ্যন্তরস্থ অগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত হয়, তেমনি আমরাও জঠরাগ্নিতে সন্তপিত হচ্ছি। আপনিই আমাদের রক্ষক, তাই আমরা আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। ক্ষুধাক্লিষ্ট প্রজাগণের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করুন। আমরা যেন অন্নাভাবে বিধ্বংস না হয়ে যাই। হে নরদেব, দেব, আপনিই সকলের পালক। প্রভু আপনিই সকলের অন্নদাতা।

মৈত্রেয় বললেন–হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদূর, প্রজাদের এমত কাতর অনুনয়ে অত্যন্ত বিচলিত হলেন মহারাজ পৃথু। বহুক্ষণ চিন্তা করে তিনি অন্নাভাবের কারণ নির্ণয় করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে পৃথিবীর ওষধি বীজ গ্রাস করার ফলেই শস্যাদির ফলন হচ্ছে না।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি পৃথিবীকে লক্ষ্য করে ধনুকে বাণ যোজনা করলেন। অস্ত্রোদ্যত পৃথুকে দেখে পৃথিবী ব্যাধতাড়িত হরিণীর মতো গোরূপ ধারণ করে পলায়ন করতে লাগলেন। পলায়নপর পৃথিবীর প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করে পৃথুও ধনুর্বান হাতে তার পশ্চাৎগমন করলেন। পৃথিবী দিক্‌বিকি স্বর্গ, মর্ত্য, অন্তরীক্ষ সকল স্থানেই উদ্যতায়ুধ পৃথুকে দেখতে পেলেন। পৃথিবী

বুঝতে পারলেন যে মৃত্যু থেকে যেমন ভীত মনুষ্যগণের পরিত্রাণ নেই, তেমনি পৃথুর হাত থেকেও তার নিস্তার নেই। ভীত সন্ত্রস্ত পৃথিবী তখন পলায়নের চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হলেন।

তারপরে পৃথিবী পৃথুর উদ্দেশ্যে বললেন, হে মহাভাগ, আপনি আপত্রবৎসল, আপনি সকল প্রাণীর প্রতিপালক ও রক্ষাকর্তা। আপনি তবে আমাকেও রক্ষা করুন। আপনি কেন নিরপরাধীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন? ধর্মজ্ঞ আপনি, কী কারণে আমার ন্যায় আর্ত স্ত্রীলোককে হননেচ্ছা পোষণ করছেন? হে মহারাজ, সাধারণ লোকেরাও স্ত্রীলোকের অপরাধ মার্জনা করে তাদের প্রহার করেন না। আপনাদের মতো দয়াপরবশ ও কৃপাবৎসল ব্যক্তির কথা আর কি বলব? হে রাজন, আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের দৃঢ়তর তরণীস্বরূপ, আমার ওপরেই এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আমাকে বিনাশ করলে কেমনভাবে আপনি নিজেকে ও বিশ্বকে সলিলমধ্যে ধারণ করবেন।

মহারাজ পৃথু বললেন–হে বসুন্ধরে, তুমি দেবতারূপে যজ্ঞে নিজবাগ গ্রহণ সত্ত্বেও রাজ্যে ধান্যাদি শস্য উৎপাদন করছ, না। আমার আজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য আমি তোমার শাস্তি বিধান করব। যে গাভী প্রত্যক্ষ তৃণ ভক্ষণ করেও দুধ দেয় না, তার প্রতি দণ্ডবিধান করা রীতিসম্মত। ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টির সময়ে ওষধি বীজসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু আমার আদেশ অমান্য করে, তুমি সেই বীজসকল নিজের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছ। আমি তাই বাণের সাহায্যে তোমার দেহ খণ্ডবিখণ্ড করব। তোমার মাংস আমার প্রজাগণের মধ্যে আহাররূপে বিতরণ করব। ক্ষুধার্ত প্রজাগণের করুণ বিলাপ এতে প্রশমিত হবে। যে অধম ব্যক্তি প্রাণীগণের প্রতি নির্দয় হয়ে শুধুমাত্র নিজেকে পোষণ করে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তাকে হত্যা করা পাপ নয়। নৃপতিগণ সেইরূপ ব্যক্তিকে বধ করলে তাদের হত্যাজনিত পাপ স্পর্শ করে না। তুমি উদ্ধত-স্বভাব, অহংকারী। উপরন্তু তুমি কপট গোরূপধারিণী অর্থাৎ মায়াবিনী। আমি এখনই তোমার দেহ ছিন্নভিন্ন করে প্রজাদের বুভুক্ষা দূর করতে চাই।

কৃতান্তের ন্যায় পৃথুর রাগে অগ্নিশর্মা মূর্তি দর্শন করে ভয়ে কম্পিত হতে থাকল পৃথিবীর সমস্ত দেহ। ভীতস্বরে পৃথুকে প্রণাম করে সে বলতে থাকে–স্বীয় মায়ার প্রভাবে স্বেচ্ছায় বহুরূপধারী ত্রিগুণেশ্বর পরম পুরুষকে আমি নমস্কার করি। তাঁর সচ্চিদানন্দাতমক স্বরূপ অনুভবের কারণে দ্রব্য, ক্রিয়া ও কারকে অর্থাৎ অধিভূত, আধ্যাত্ম ও অধিদেবাদিতে অহংকার ও তন্নিমিত্ত রাগদ্বেষাদি কিছুই নেই। আপনি সেই ভগবান বিষ্ণু। আপনাকে আমি বারংবার প্রণাম করছি।

আপনিই আমাকে জীবাদির আধার রূপে নির্মাণ করেছেন। যাতে আমি ভূতসকল ধারণ করে আছি। সেই স্বতন্ত্র পুরুষ আপনিই যদি অস্ত্রোদ্যত হয়ে আমাকে বধ করতে চান তাহলে আমি কার শরণাপন্ন হতে পারি? আপনিই নিজ অচিন্ত্য মায়ার প্রভাবে এই বিশ্বের সৃজন করেছেন। সেই আপনিই আবার বিশ্ব রক্ষার্থে পৃথুরূপে জন্ম নিয়েছেন। তদ্রূপ ধর্মাত্মা পুরুষ আজ কীভাবে আমাকে বধ করতে ইচ্ছা করছেন?

ঈশ্বর স্বয়ং এক হলেও তিনি মায়ার দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন। তারপরে ব্রহ্মার সাহায্যে এই বিশ্বের নির্মাণ করেন। তার কার্যাবলী অনুধাবন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব কার্য। তিনি প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়, দেবতা, অন্তঃকরণ জীব প্রভৃতি নিজ শক্তির সাহায্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি কার্য্য সাধন করেন। তিনি সর্বশক্তির আধার ও এই বিশ্বের নিয়ামক। সেই অন্তর্যামী পরম পুরুষকে আমি প্রণিপাত করি। হে বিভু, আপনিই সেই বিশ্বচরাচরের সৃজনকর্তা, হে অজ, আপনি স্বনির্মিত ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণরূপী বিশ্বচরাচরকে আমার উপর স্থাপন করেছেন, এই কার্য্য সাধনের জন্য আপনি আদি বরাহমূর্তি ধারণ করে, জলময় রসাতল থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন।

আপনি সেই ধরাধর বরাহ, সলিল সাগরে তরণীরূপ আমাতে অধিষ্ঠানরত প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সম্প্রতি বীরমূর্তি পৃথুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। কী আশ্চর্য। সেই আপনি এখন আমার মধ্যে লুক্কায়িত ওষধি বীজ সকল উদ্ধারের জন্য আমাকে বধ করতে উদ্যত হয়েছেন।

হে প্রভু, আমাদের মতো জনগণের চিত্ত ঈশ্বরের গুণসৃষ্টিরূপী মায়ার দ্বারা বিমোহিত, তাই আমরা ভগবান ভক্তজনেরই চেষ্টা জানতে সমর্থ হই না। পরমেশ্বরের গূঢ় কর্মের রহস্য উদ্ঘাটন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব আমরা পরমেশ্বরের প্রণাম করি। তেমনি তার প্রতি ভক্তগণকেও প্রণিপাত করি। আপনি বীরগণের যশবিস্তারের নিয়ন্ত্রক। তাদের ফল বিস্তার করুন। আপনাকে প্রণাম জানাই।

.

অষ্টাদশ অধ্যায়

পৃথিবী দোহন

মৈত্রেয় বললেন–হে বিদুর, পৃথিবী কতৃক এভাবে স্তুত হয়েও ক্রোধে পৃথুর অধর কম্পিত হচ্ছিল। অতএব পৃথিবী আবার নিজেকে প্রস্তুত করে পৃথুর উদ্দেশ্যে নিজ কথা নিবেদন করতে উদ্যত হল। পৃথিবী বলতে থাকে–হে মহারাজ, ক্রোধ সংবরণ করুন। আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। পণ্ডিতগণ মধুকরের ন্যায় সকল বিষয় থেকেই সার সংগ্রহ করেন। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ মনুষ্যগণের শ্রেয়সিদ্ধির জন্য ইহলোক ও পরলোকের উপায়সমূহ প্রদর্শন করেছেন। আপনারা তা পালন করুন। অতি অর্বাচীন কোন ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে মুনিগণ প্রবর্তিত উপায়ে সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন তিনি অনায়াসে ইঙ্গিত ফললাভ করেন। কিন্তু মহাজ্ঞানী কোনো ব্যক্তিও যদি ঐ সকল উপায়ের অনাদর করেন, তাঁর কার্য্যের বারংবার চেষ্টা সত্ত্বেও বিফল হয়।

হে মহারাজ, সৃষ্টিসময়ে ব্রহ্মা আমার পৃষ্ঠে ব্রীহি, যবাদি, ওষধি সকল সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু আমি দেখলাম যে অসংযত দুষ্ট ব্যক্তিরাই তা ভোগ করছে। আপনাদের মত লোকপালকেরা তাদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করলেন না। এমনকি যজ্ঞাদি প্রবর্তন না করে আমার অনাদর করতে লাগলেন। পৃথিবীতে চোর-দস্যুদের প্রাদুর্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল। এজন্য আমি যজ্ঞ রক্ষার্থেই ওষধিসমূহ গ্রাস করেছিলাম। দীর্ঘদিন আমার মধ্যে সুপ্ত থাকার কারণে নিশ্চয়ই তারা ক্ষীণ হয়ে গেছে। যদি আপনি সেসব পেতে ইচ্ছুক হন, তবে তোক প্রসিদ্ধ উপায়ে অবলম্বন করুন। হে মহাভাবো, হে ভূতভাবন, আপনি যদি প্রাণীগণের ইঙ্গিত বলকারক অন্ন আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহলে আমায় দোহন করার ব্যবস্থা করুন, গোরূপিণী আমার অনুরূপ বৎস, দোহনপাত্র ও দোহকর্তার ব্যবস্থা করুন। তবেই আমি আপনার অভীষ্ট দুগ্ধরূপ ওষধিগুলি প্রদান করতে সক্ষম হব।

হে রাজন, বর্ষার আগমনেও যাতে আমার মধ্যে সর্বত্র সমানভাবে বৃষ্টির জল থাকতে পারে, তার ব্যবস্থা করুন। মহারাজ, আমাকে সমতল করুন, তবেই আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

মহারাজ পৃথু পৃথিবীর এইরূপ প্রিয় ও মধুর বচন স্বীকার করলেন, তিনি মনুকে বৎস করে নিজ হস্তরূপ পাত্রে ধান্যাদি ওষধিসমূহ দোহন করলেন। পৃথু ছিলেন সারগ্রাহী জ্ঞানী পুরুষ। এই প্রকার ব্যক্তিরা জগতের সকল বিষয়ের সারকেই গ্রহণ করে থাকেন। তারপর ঋষি প্রভৃতি

অন্যান্য সকলেই পৃথুর বশীভূত পৃথিবীকে নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে দোহন করতে শুরু করলেন।

বৃহস্পতিকে বৎস কল্পনা করে ঋষিগণ নিজ বাক্য, মন ও শ্রোত্রাদিরূপ পাত্রে বেদময় পবিত্র দুগ্ধ দোহন করলেন।

এরপরে দেবগণ ইন্দ্রকে বৎসরূপে কল্পনা করে হিরন্ময় পাত্রে অমৃত, মানসিক শক্তি, ইন্দ্রিয় শক্তি ও দেহশক্তিরূপ পয়ঃদোহন করলেন।

তারপরে দৈত্য ও দানবেরা লৌহময় পাত্রে সুরা ও তালদি মদ্য অর্থাৎ আসব দোহন করলেন। এসময় তারা অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে বৎস কল্পনা করেছিলেন।

গন্ধব ও অপ্সরাগণ বিশ্বাবসুকে বৎসরূপে কল্পনা করেন। তাঁর সাহায্যে গন্ধর্বরা গান্ধর্ব-বিদ্যায় (গীত, বাদ্য ও নৃত্য) মাধুর্য ও সৌন্দর্য দোহন করলেন।

হে মহাভাগ বিদুর, শ্রাদ্ধের অধিকর্তা পিতৃগণ সূযতকে বৎস করে, কাঁচা মৃৎপাত্রে বা আমপাত্রকে দোহন পাত্ররূপে স্থির করেন। এতদ্বারা ভক্তিপূর্ণ চিত্তে তারা পৃথিবী পিতৃপুরুষের অন্ন বা কব্যরূপ দুগ্ধ দোহন করলেন।

সিদ্ধগণ ভগবান কপিলকে বস করে সংকল্পময়ী সিদ্ধি দোহন করলেন।

বিদ্যাধররা ঐ কপিলকেই বৎস কল্পনা করে আকাশরূপ দোহনপাত্রে খেচরাদি বিদ্যারূপ দুগ্ধ দোহন করলেন।

কিম্পুরুষেরা এবং অন্য মায়াবীরা ময়দানবকে বৎস করলেন। যে মায়ার প্রভাবে ইচ্ছামাত্র অন্তর্ধান করা যায় ও বহুরূপ ধারণ করা সম্ভব, সেই মায়ারূপ দুগ্ধ দোহন করলেন।

যক্ষ, রক্ষ, ভূত ও পিশাচ প্রভৃতি মাংসভোজীগণ কর্তৃক রুদ্রদেব বৎসরূপে নিযুক্ত হন। এইভাবে নরকপালি পাত্রে রুধিররূপ মদ্য দোহন করা হল।

ফণাযুক্ত ও ফণাহীন সর্পকুল বৃশ্চিকাদি তক্ষককে বৎস করে নিজ নিজ মুখে বিষরূপ দুগ্ধ দোহন করলেন।

পশুগণ রুদ্রবাহন বৃষকে বস করেছিলেন। অরণ্যরূপ পাত্রে তারা পৃথিবী হতে তৃণরূপ দুগ্ধ দোহন করল।

বৃহৎ দন্তযুক্ত মাংসাশী প্রাণীরা সিংহকে বৎস করে নিজ নিজ দেহে মাংসরূপ দুগ্ধ দোহন করল।

পক্ষীগণ গরুড়কে বৎস কল্পনা করল। নিজ দেহরূপ পাত্রে তারা চর ও অচর অর্থাৎ কীটাদি ও বৃক্ষগণ বটবৃক্ষকে বৎস করে নিজ দেহে নানাবিধ রসরূপ দুগ্ধ পৃথিবী থেকে দোহন করল।

পর্বতাদি হিমালয়কে বৎস করে নিজেদের সানুদেশরূপ পাত্রে (স্বর্ণ, রৌপ্যাদি) নানারূপ ধাতু দোহন করল।

বিদূর, এভাবে অন্যান্য সকলেই নিজ নিজ জাতিপ্রধানকে বৎস কল্পনা করে পৃথুর বশীভূত এবং সর্বকামদায়িনী পৃথিবী থেকে অভীষ্ট বস্তু দোহন করল। এভাবে মোট পঞ্চদল জন পৃথিবীকে দোহন করেছিল।

হে কুরুবংশজাত বিদূর, পৃথু প্রভৃতি অন্নভোজীগণ এভাবে ভিন্ন ভিন্ন দোগ্ধা দোহনপাত্র ও বৎস কল্পনা করে পৃথিবী থেকে নানাবিধ অনুরূপ দুগ্ধ দোহন করলেন। যা কিছু ভক্ষণ করা যায়, তাকেই অন্ন বলা হয়েছে। এমনকি ছন্দ-বিদ্যাকেও অন্নের সাধন বলে অন্ন বলে গণ্য করা হয়েছে।

তারপর দুহত বৎসল মহারাজ পৃথু সর্বকামপ্রদা পৃথিবীকে নিজ কন্যারূপে গ্রহণ করলেন। কোপুত্র পৃথু ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা পর্বতের শৃঙ্খসমূহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেন।

তৎপরে প্রজাগণের জীবিকা প্রদানকারী মহাপরাক্রমী পৃথু সেখানে তাদের যথাযোগ্য বাসস্থান নিরূপণ করলেন।

সেখানে হট্টাদিশূন্য জনস্থান বা গ্রাম নির্মিত হল।

পুর অর্থাৎ হট্টাদি বিশিষ্ট লোকালয়, পত্তন বা বৃহৎ পুর, বিবিধ দুর্গ বা গড়, গোপজাতির বাসস্থান বা ঘোষ, গোসকলের নিবাসস্থান ব্রজ প্রভৃতি নির্মিত হল।

রাজাধিরাজ পৃথু এছাড়াও সৈন্যশিবির আকর অর্থাৎ স্বর্ণাদি ধাতুস্থল, কৃষক পল্লী বা ক্ষেত, পর্বত প্রান্তবর্তী গ্রাম অর্থাৎ খবট প্রতিষ্ঠা করলেন।

ভগবান পৃথুর আগে এই ভূমণ্ডলে এই প্রকার পুর গ্রামাদি সন্নিবেশ ছিল না। মহারাজ পৃথু এসকল সংস্থাপন করলেন।

এর ফলে প্রজাসাধারণ নির্ভয়ে নিজ নিজ স্থানে পরম সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

.

ঊনবিংশ অধ্যায়

যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ করাতে ইবধে উদ্যত পৃথুকে ব্রহ্মার নিবারণ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন–হে বিদূর, অনন্তর রাজর্ষি হয়ে পৃথু স্বায়ম্ভব মনুর ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্তে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের সংকল্প করলেন। সেই স্থলের পূর্বদিকে সরস্বতী নদী প্রবাহিত ছিল।

দেবরাজ ইন্দ্র ইতিপূর্বে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে শতক্রতু নামে পরিচিত হন।

স্বীয় কর্ম অপেক্ষাও পৃথুর কর্ম সংকল্প অধিক সমারোহ পূর্ণ জ্ঞাত হয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ইন্দ্র।

পৃথুর সেই মহাযজ্ঞে সর্বাত্মা, সর্বলোক পূজ্য, সর্বেশ্বর্য্য পূর্ণ শ্রীহরি সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচর হয়েছিলেন। ব্রহ্ম, রুদ্র ও লোকপালগণ তাদের অনুচরবৃন্দ পরিবৃত হয়ে ভগবান হরির সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

গন্ধর্ব, মুনি ও অপ্সরাবৃন্দ ভগবান বিষ্ণুর গুণগান করেছিলেন। সিদ্ধ, বিদ্যাধর দৈত্য, দানব, গুহ্যক প্রভৃতি সকলে সেই যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। নন্দ, সুনন্দ প্রভৃতি শ্রীহরির শ্রেষ্ঠ পর্ষদগণ ও কপিল, নারদ, দত্তাত্রেয়, সনকাদি যোগীশ্বর ও ভগবদ্ভক্ত সকলেই সেই যজ্ঞে ভগবানের সঙ্গে আগমন করেছিলেন।

হে বিদূর, ঐ যজ্ঞে সকল কামনা প্রদায়িণী পৃথিবী যজ্ঞীয় ঘৃত প্রদানকারিণী ধেনু রূপধারণপূর্বক যজ্ঞমান পৃথুর সকল অভিলাষিত বস্তু প্রদান করেছিলেন। বিবিধ প্রকারের

রস, দুগ্ধ, দধি, অন্ন, ঘৃত, ঘোল প্রভৃতি বহনকারী নদী সেখানে প্রবাহিত ছিল। বড় বড় বৃক্ষগুলি মধুবর্ষী হয়ে নানাপ্রকার ফল উৎপন্ন করেছিল।

সমুদ্র উপহার দিয়েছিলেন বিবিধ রত্নসমূহ।

পর্বতাদি দিয়েছিলেন ভক্ষ, ভোজ্য, লেহ্য ও চুষ্য এই চতুর্বিধ অন্ন।

লোকপালগণের সঙ্গে লোকসমূহ নানাবিধ উপহার প্রদান করে।

হে বিদূর, রাজর্ষি পৃথু ভগবান অধোক্ষজকে আশ্রয় করায় তার যজ্ঞকার্য্যের এরূপ অত্যাশ্চর্য বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ইন্দ্রর কাছে তা অসহ্য বলে প্রতীয়মান হল। তিনি তখন যজ্ঞকার্যে ব্যাঘাত ঘটাতে, উদ্যোগী হলেন। পৃথু যখন শেষ অশ্বটি দ্বারা শ্রীহরির উপাসনা করছেন, তখন ইন্দ্র সেই যজ্ঞীয় অশ্বটিকে সকলের অলক্ষ্যে অপহরণ করলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র যখন যজ্ঞীয় অশ্বশক্তি আকাশপথে ধাবমান, অত্রিমুনি তাকে চিনতে পারলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তখন লোকসমূহের মতিবিভ্রম ও অধর্মকে ধর্মপ্রদর্শনকারী রক্ষাকবচের ন্যায় পাষণ্ড বেশ ধারণ করেছিলেন।

অত্রিমুনি তখন পৃথুর পুত্রকে ইন্দ্রকে বধ করতে প্ররোচনা দিলেন। মুনির অত্রি প্রেরণায় পৃথুপুত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তার পশ্চাৎগমন করলেন এবং "চেতিষ্ঠ" "তিষ্ঠ" উচ্চারণ করলেন।

কিন্তু জটাধারী, সর্বাঙ্গে, ভস্মলেপিত ইন্দ্রকে তিনি সাক্ষাৎ ধর্মমূর্তি মনে করলেন। তাঁর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করলেন না। পৃথুপুত্রকে বিরত হতে দেখে অত্রিমুনি পুনরায় তাকে ইন্দ্রবধে প্ররোচিত করতে লাগলেন। অত্রিমুনি তাকে বললেন– হে বৎস, দেবাধম ইন্দ্র তোমার পিতার যজ্ঞবিনাশকারী, একে বধ করা তোমার কর্তব্য। পৃথুপুত্র এভাবে প্ররোচিত হয়ে অতীব ক্রুদ্ধ হলেন। গৃধরাজ জটায়ু যেমন রাক্ষসাধম রাবণের পশ্চাৎগমন করেছিলেন তেমনি তিনিও আকাশপথে ইন্দ্রের পশ্চাতে ধাবিত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তখন ভীত হয়ে সেই পাষণ্ডবেশ পরিত্যাগ করলেন। নিজরূপ ধারণ করে তিনি পৃথুপুত্রকে যজ্ঞীয় অশ্ব ফিরিয়ে দিলেন। বীরবর রাজপুত্র নিজ অশ্ব গ্রহণপূর্বক পিতার যজ্ঞস্থলে উপবিষ্ট হলেন। মহর্ষিগণ এই কর্ম দর্শন করে পৃথুপুত্রকে "বিজিতা' নাম প্রদান করলেন।

অতঃপর সেই অশ্বকে যূপবদ্ধ করা হল। কিন্তু দেবরাজ পুনরায় সে অশ্বকে অপহরণে উদ্যত হলেন। তিনি ঘোরতর আঁধার সৃষ্টি করে নিজেকে আচ্ছন্ন করলেন। এই অশ্বটি কাষ্ঠময়

কণ্টকযুক্ত যুপে, স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র শৃঙ্খল ছেদন করতে অসমর্থ হলেন। তিনি শৃঙ্খল সমেত অশ্বটিকে উত্থান করে আকাশপথে পলায়ন করলেন।

আকাশপথে শৃঙ্খলিত অশ্বসহ ইন্দ্রকে দেখতে পেলেন অত্রিমুনি। পূর্ববৎ তিনি পৃথুর পুত্রকে তা দেখালেন। ইন্দ্রকে নিরস্ত্র করে অশ্বটিকে আনয়নের জন্য অত্রি পৃথুর পুত্রকে অনুরোধ করলেন।

দেবরাজ তখন কপাল ও খটাঙ্গ ধারণপূর্বক গমন করছিলেন। পৃথুপুত্র তাকে আবার ধর্ম মনে করলেন। পুনরায় অত্রি বাক্যে তিনি বান নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন। তৎক্ষণাৎ ইন্দ্র অশ্বটিকে প্রত্যর্পণ করে ছদ্মবেশ ত্যাগ করে অন্তর্হিত হলেন। পৃথুপুত্র অশ্বটিকে নিয়ে যজ্ঞস্থলে প্রত্যাগমন করলেন। অজ্ঞজনেরা ইন্দ্রের সেই পাষণ্ডবেশ গ্রহণ করেছিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র পৃথুর যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রূপধারণ করেন। সেসকল রূপ বা বেশ পাপের ষণ্ড বা চিহ্নস্বরূপ।

(অন্যত্র কথাটি সমূহ-বাচক হলেও এখানে পাষণ্ড শব্দটি ষণ্ডশব্দ চিহ্নবাচক)।

মহারাজ পৃথুর যজ্ঞে বিঘসৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইন্দ্র অশ্ব অপহরণের পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে যে যে রূপ ধারণ ও পরিত্যাগ করেন তাকে উপধর্ম বলা যায়। কিন্তু বুদ্ধিবিভ্রম বশতঃ অজ্ঞব্যক্তিরা তাকেই ধর্ম মনে করে তাতে আসক্ত হয়ে পড়েন। জৈন, বৌদ্ধ ও কাঁপালিকগণের আচরণীয় এই সকল উপধর্ম আপাত রমণীয়। এই কারণেও বাকচাতুর্য হেতু এই সকল উপধর্ম অজ্ঞব্যক্তিগণের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়ে থাকে।

মহাবিক্রমশালী মহারাজ পৃথু যখন ইন্দ্রের অপহরণের সংবাদ জ্ঞাত হলেন, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। ধনুর্বাণ উত্তোলন করে তাতে বাণ যোজনা করলেন। ক্রোধে তখন তিনি উন্মত্ত হয়েছিলেন।

ঋত্বিক সকলে তখন পৃথুকে ঐ কার্য্য থেকে নিবৃত্ত হতে বললেন। তারা পৃথুকে বললেন–হে রাজন, এই যজ্ঞস্থলে শাস্ত্রবিহিত পশু ব্যতীত অপর কিছুই বধ্য নহে। যে ইন্দ্র আপনার কীর্তি প্রভাবে নিষ্প্রভ, তাকে আমরা এখানে আহ্বান করছি। তারপরে তাকে আমরাই যজ্ঞে আহুতি

দেব। এইভাবে ঋত্বিক সকলে পৃথুর ক্রোধ প্রশমিত করলেন। তারা স্বয়ং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মৃদু হস্তে হোম করতে উদ্যত হলেন। ব্রহ্মা তখন তাদের নিকটে আগমন করলেন।

ব্রহ্মা বললেন–হে ব্রাহ্মণ, আপনারা যাঁকে বধ করতে উদ্যত, তিনি তো আপনাদের বধ্য নহেন। তিনি ভগবান বিষ্ণুর অবতার এবং ইনি স্বয়ং যজ্ঞ নামে অভিহিত। যজ্ঞে পূজিত দেবগণ ইন্দ্রের দেহস্বরূপ, ঋত্বিকগণ, মহারাজ পৃথুর যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য ইন্দ্র কিভাবে নিন্দিত হচ্ছেন, তা আপনারা দর্শন করুন। তিনি ধর্মনাশক পাষণ্ড পথের প্রবর্তন করেছেন, সে তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। ইন্দ্র অতীব বলশালী, তার সঙ্গে মিত্রতাই সঠিক পন্থা, নতুবা তিনি আরও পাষণ্ড পথ সৃষ্টি করতে পারেন। অতএব মহাকীর্তিমান পৃথুর যজ্ঞই সম্পূর্ণ হয়েছে।

ব্রহ্মা অতঃপর পৃথুকে সম্বোধন করে বললেন–হে রাজা, মোক্ষধর্ম আপনি জানেন। আপনার এবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান বা সকাম কর্মের কোন প্রয়োজন নেই, আপনার কল্যাণ হোক। আপনি কেন ইন্দ্রের প্রতি রুষ্ট হচ্ছেন? আপনারা দুজনেই ভগবানের মূর্ত বিগ্রহ। হে মহারাজ, আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন বিষয়ে আর চিন্তা করবেন না। আমার কথা শ্রবণ করুন। যে কর্ম দেববলে বিনষ্ট হয়, তাকে স্বতন্ত্র করা অনুচিত। যে ব্যক্তি এই প্রচেষ্টা করে বা চিন্তা করে, তার মন অতীব ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোরতর মোহপথে প্রবেশিত হয়। হে মহারাজ, দেবরাজ ইন্দ্র দুষ্ট আগ্রহযুক্ত দেবতা, যজ্ঞ বিনাশার্থে তিনি, যে যে পাষণ্ড পথ প্রবর্তন করেছেন, তার ফলে ধর্মের গ্লানি হবে। অতএব এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হোক। হে রাজর্ষি, আপনার যজ্ঞবিনাশকারী ও অশ্ব অপহরণকারী ইন্দ্র কর্তৃক রচিত পাষণ্ড পথ লোকসকলকে ধর্মে বিমুখ করে তুলছে। হে মহারাজ, আপনি স্বয়ং নারায়ণের অংশ, আপনার পিতা বেনের অত্যাচারে লুপ্তপ্রায় ধর্ম রক্ষার্থে আপনাকে তার দেহ থেকে জন্ম দিয়েছেন। এই বিশ্বের মঙ্গলার্থে, যারা বেনের অঙ্গমন্থন করে আপনাকে আনয়ন করেছেন, সেই ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষির সংকল্প পরিপূর্ণ হোক, হে বীর, দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবর্তিত অধর্মের মূল এই পাষণ্ড পথ আপনি বিনাশ করুন।

মৈত্রেয় বললেন–জগতগুরু ব্রহ্মার বাক্যে পৃথুর ক্রোধ প্রশমিত হল, তিনি শতাশ্বমেধ যজ্ঞ অসমাপ্ত রাখলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সাথে তার সখ্যতা তৈরী হল। তারপর যজ্ঞান্তে অবভূত স্নান করে পৃথু উপবেশন করলেন। তার যজ্ঞে তর্পিত দেব ও ঋষিগণ স্বয়ং বরদরূপে তাকে বরদান করলেন।

হে বিদূর, ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ অব্যর্থ। তারা যজ্ঞে যথার্থভাবে পূজিত ও দক্ষিণাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তুষ্ট ব্রাহ্মণগণ পৃথুকে আশীর্বাদ করে বললেন–হে মহারাজ, আপনার যজ্ঞে দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও মানবকুল, সকলেই যথার্থভাবে সম্মানিত হয়েছেন।

.

বিংশ অধ্যায়

পৃথুকে ভগবান বিষ্ণুর সাক্ষাৎ উপদেশ প্রদান

মৈত্রেয় বললেন–যজ্ঞভুক যজ্ঞেশ্বর সর্বব্যাপী ভগবান বিষ্ণুও ইন্দ্রের সঙ্গে পৃথুর যজ্ঞেও আগমন করলেন। বিবিধ উপাচারে সুন্দররূপে পূজিত হলেন তিনি। তুষ্টচিত্তে তিনি পৃথুকে বললেন–হে রাজন, এই ইন্দ্র তোমার অশ্বমেধ যজ্ঞের বিনাশকারী, এখন তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করছেন।

হে নরদেব, এ জগতে সুবুদ্ধি লোকগণ প্রাণীদের প্রতি দ্রোহসুলভ আচরণ করেন না, কারণ শরীর যে আত্মা নয়, তারা এই মহাজ্ঞানের অধিকারী, তোমার ন্যায় বিবেচক পুরুষ যদি দেবমায়ায় বিমোহিত চিত্ত হয়ে হিংসাদি কার্যে উদ্যত হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে কোনও পুরুষার্থ লভ্য হয় না, বিজ্ঞজনেরা এই দেহকে অবিদ্যা অর্থাৎ স্বরূপের অজ্ঞান ও অজ্ঞানমূলকে কামনার দ্বারা আরব্ধ বলে জানেন। সুতরাং আত্মজ্ঞান হওয়ায় তাদের আর দেহে আসক্তি হয় না। শরীরের প্রতি আসক্তি পরিত্যাজ্য হলে তার দ্বারা উৎপন্ন গৃহ, সম্পদ ও পুত্রাদিতেও নিরাসক্তি জন্মায়।

আত্মা দেহ থেকে পৃথক, তিনি এক শুদ্ধ স্বপ্রকাশিত। তিনি নির্গুণ কারণ ভূতাদির আধার, সর্বগত ও সর্বত্র অনাবৃত সাক্ষীরূপ। দেহ কখনও এরূপ নহে। বলে যুবাদি ভেদে অনেক। দেহ মলিন ও স্বগুণ। কারণ ভূতগণের আশ্রত পরিচ্ছন্ন এবং গৃহাদি দ্বারা আবৃত এবং দৃশ্য। এপ্রকারে দেহস্থ আত্মাকে যিনি উপলব্ধি করেন, তিনি দৈহিক বিকারপ্রাপ্ত হন না। তিনি জানেন পরমেশ্বর তন্মধ্যে অবস্থিত। হে রাজন, যে ব্যক্তি মনস্কাম ও শ্রদ্ধান্বিত হয়ে স্বধর্মের অনুবর্তী হয়ে আমার ভজনা করেন, তার মন ক্রমে প্রসন্ন হয়, চিত্ত প্রসন্ন হলে সে সংসারে নিরাসক্ত হয়, তত্ত্বদর্শীরূপে তিনি আমার মধ্যে অবস্থানপূর্বক ভগবদ ভাব প্রাপ্ত হন। উদাসীনরূপে অবস্থিত সাক্ষীরূপ, নির্বিকার এই আত্মাকে যিনি দেহ, জ্ঞান, কর্মেন্দ্রিয় ও মনের নিয়ন্তারূপে জ্ঞাত হন, তিনি মোক্ষলাভের উপযুক্ত বলে গণ্য হন।

আত্মা, অবিনশ্বর, আত্মা থেকে ভিন্ন পঞ্চত্তভূতাদি ইন্দ্রিয়াদির সমবিধরূপ লিঙ্গদেহের গুণপ্রবাহ ঘটে। অর্থাৎ দেহের জন্ম মরণাদি বিকার ঘটলেও আত্মার কোনও ক্ষয় হয় না। জ্ঞানী পুরুষেরা এ বিষয়ে জ্ঞাত, তাই বিপদে, হর্ষশোকে তাদের বিকার হয় না। তারা আমার মধ্যে সৌহার্দ্যবদ্ধ করে নিস্পৃহ, থাকেন। হে বীর, তুমি দুঃখ-সুখে সমভাবাপন্ন হয়ে সকলের প্রতি সমবুদ্ধি ও সমদর্শী হয়ে ইন্দ্রিয় ও মন জয়পূর্বক প্রজাপালন কর। প্রজাপালন রাজার পালনীয় পরম মঙ্গলকার্য। পরলোকে প্রজাঅর্জিত পুণ্যের এক ষষ্ঠাংশের অধিকারী হন রাজা। যে রাজা প্রজাদের রক্ষক না হয়ে শুধুমাত্র কর গ্রহণ করেন সেই রাজা পরলোকে প্রজাদের পাপের অংশ ভোগ করেন।

হে পৃথু, এভাবে তুমি ব্রাহ্মণগণের অনুমোদিত রাজধর্মকে প্রধান পালনীয় রূপে গ্রহণ কর, অর্থ ও কামকে তার আনুষঙ্গিকরূপে গণ্য করে পৃথিবীর পালন কর। তাহলেই সর্বলোক তোমার প্রতি অনুরক্ত হবে। অতি শীঘ্র তুমি সনকাদি সিদ্ধ মহর্ষিদের নিজগৃহে দর্শন করবে। এই ধর্মপালনে তোমার অনায়াস মোক্ষলাভ হবে। হে নরদেব, আমি তোমার সমস্ত গুণ ও স্বভাবে তুষ্ট হয়েছি, আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। হে রাজন, আমি যজ্ঞ বা তপস্যা বা যোগ দ্বারা লব্ধ নই। সমচিত্ত লোকেদের মধ্যেই আমি বর্তমান।

মৈত্রেয় বললেন–হে বিদূর, বিশ্বজয়ী পৃথু লোকগুরু ভগবান নারায়ণের এরূপ বচনে আপ্লুত, হলেন। তিনি তার আদেশ শিরোধার্য করলেন। এমন সময়ে ইন্দ্র নিজ কর্মে লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে পৃথুর চরণদ্বয় স্পর্শ করলেন। তিনি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ইন্দ্রকে আলিঙ্গন করলেন ও তার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করলেন। তারপর মহারাজ পৃথু বিবিধ উপাচারে হরির পূজায় প্রবৃত্ত হলেন। উদ্বেলিত ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তিনি ভগবানের শ্রীচরণযুগল ধারণ করলেন। তখন বিশ্বাত্মা ভক্তবৎসল শ্রীহরি গমনেচ্ছু হলেও ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করে শীঘ্র গমন করতে পারলেন না। পদ্মপলাশ নয়নযুগল পৃথুর দিকে নিক্ষেপ করে তিনি অবস্থান করলেন। আদিরাজ পৃথু দর্শন ও স্তব করতে ইচ্ছুক হলেন। তিনি কৃতাঞ্জলি হয়ে মৌনভাবে হরিকে হৃদয়মধ্যে আলিঙ্গন করলেন। কারণ আনন্দাশ্রুতে তার নয়নযুগল পরিপূর্ণ ছিল। ফলে, তিনি হরিকে ভালোভাবে দর্শন করতে পারলেন না। প্রেমাবেগে তার কথা রুদ্ধ হওয়ায় তিনি স্তব করতে পারলেন না। এরপর স্থিত হয়ে নয়নজল মার্জনা করে হরিকে দর্শন করলেন। শ্রীহরি দয়াপরবশ হয়ে ভূমি স্পর্শ করলেন। দেবতারা কখনও ভূমি স্পর্শ করেন না একথা তিনি বিস্মৃত হলেন। পতনের আশঙ্কায় গরুড়ের স্কন্ধে নিজ করতল বিন্যস্ত করে রাখলেন।

এইভাবে ভগবান হরি পৃথুর দৃষ্টিগোচর হলেন। পৃথু অভিভূত হৃদয়ে বললেন–হে বিভু, আপনি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও বরপ্রদ। কিভাবে আপনার নিকট আমি বর প্রার্থনা করব? কোন বুদ্ধিমান লোকই দেহাভিমানীদের ভোগ্য বর প্রার্থনা করবে না। কারণ এ সকল ভোগ্য বস্তু নরকবাসী শরীরিরাও প্রাপ্ত হয়। হে ঈশ, আমি সেরূপ বর প্রার্থনা করি না। হে প্রভু, মহতের অন্তঃস্থল থেকে উত্থিত মুখনিঃসৃত আপনার চরণপদ্মের কীর্তিরূপ সূচীহীন বস্তু আমার প্রার্থিত নয়। আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে আপনার কীর্তন শোনার জন্য আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন। হে ভগবান, মহৎ-ব্যক্তিগণের মুখনিঃসৃত আপনার চরণযুগলের কীর্তিরূপ সুধাকনাবাহক বায়ু, তত্ত্ব-মার্গ বিস্মৃত কুযোগী আমাদের তত্ত্ব বিতরণ করে। অতএব আমার অন্য বরের প্রয়োজন নেই। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে যাতে আপনার লীলাকথা শ্রবণ করতে পারি আপনি তাই করুন। হে মঙ্গলকীর্তি, আপনার যশ পরম মঙ্গলস্বরূপ। সাধুসঙ্গ দ্বারা কোনও ব্যক্তি যদি একবার তা শ্রুত হয়, গুণজ্ঞ হলে আর তা থেকে বিরত হয় না। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী সকল পুরুষার্থ একত্র সংগ্রহেচ্ছায় আপনার লীলাশ্রবণকে বরণ করেছেন।

আমিও সেরূপ উৎসুক হয়ে অনন্ত গুণাধার আপনার সেবায় নিয়োজিত থাকব। একই কর্মে প্রবৃত্ত হলেও যেহেতু আমরা উভয়েই আপনার চরণে একাগ্রচিত্ত আমাদের বিরোধ ঘটবে না।

হে জগদীশ, তবে যদি আপনার সেবায় নিয়োজিত হওয়ার কারণে লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে আমার বিরোধ হয় তাও কাম্য, কারণ আপনি দীনবন্ধু, আমার সামান্য সেবাও আপনি গ্রহণ করবেন। আপনি স্বয়ং নিজ মহিমায় পরমানন্দ স্বরূপে প্রতিবিম্বিত। আপনি লক্ষ্মীদেবীকেও উপেক্ষা করেন। শরণাগত ভক্তকেই আদর করে থাকেন।

হে ভগবান, আপনি দীনবৎসল, মায়ার প্রভাব আপনাতে নেই। সেজন্য সাধুগণ জ্ঞানার্জনের পরেও আপনার উপাসনা করেন। সজ্জনগনেরা শুধুমাত্র চরণকমলের স্মরণপ্রার্থী। আপনার বরদারূপে জগতের সকল প্রাণীই মোহাবিষ্ট হয়। আপনার বেদবাক্যরূপ রঞ্জুতে আবদ্ধ জনগণ বারংবার ফলের প্রত্যাশায় মুগ্ধ হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

হে ঈশ্বর, আপনি সত্যস্বরূপ। লোকগণ আপনার মায়াবলে খণ্ডিত হয়ে নিজ হতে দূরে অবস্থান করে। আপনাকে না পেয়ে তারা পুত্রাদি ভিন্ন বস্তুর কামনা করে। পিতার ন্যায় নিজ হতে বালকের মঙ্গলচিন্তা করেন। আপনিও তেমনি প্রার্থিত না হয়েও আজও আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষা করবেন।

মৈত্রেয় বললেন–বিদুর, আদিরাজ পৃথুর দ্বারা এভাবে স্তুত হয়ে ভগবান তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন–হে রাজন, তোমার ভক্তি জাগ্রত হোক, যে ভক্তি দ্বারা আমার দুরাতিক্রম্য মায়া অনায়াসে অতিক্রম করা সম্ভব, তুমি সৌভাগ্যবলে তা অর্জন করেছ। হে নরপতি, তুমি বিষয়ে আসক্ত হয়ে আমার আজ্ঞা পালন কর। আমার আদেশ পালনকারী ব্যক্তি সর্ববিষয়ে মঙ্গললাভ করে। ভগবান হরি রাজর্ষি পৃথুর এইরূপ বচনের প্রশংসা করলেন। পৃথু কর্তৃক সম্যকভাবে পূজিত হয়ে তাকে আশীর্বাদ করে ভগবান প্রস্থান করলেন।

তৎপরে মহারাজ পৃথু দেব, ঋষি, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, অঙ্গরা, কিন্নর, নাগ, মানব, খেচর, প্রভৃতি সকল প্রাণীকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। যজ্ঞস্থলে আসীন ভগবানের পার্ষদগণকে ভগবৎ বুদ্ধিতে স্তব করে বসন-ভূষণ প্রদান করলেন। তারা সন্তুষ্ট হয়ে প্রস্থান করলেন।

ভগবান হরিও যেন পৃথুর চিত্ত হরণপূর্বক ঋত্বিকগণের সঙ্গে নিজ ধামে গমন করলেন। পৃথু করজোড়ে তাদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ভগবান শ্রীবিষ্ণু দৃষ্টির অতীত হলে পৃথু সেই দেবাদিদেব বাসুদেবকে প্রণাম করলেন। এরপর তিনি নিজ পুরীতে প্রত্যাগমন করলেন।

.

একবিংশ অধ্যায়

প্রজাগণের প্রতি পৃথুর অনুশাসন

মৈত্রেয় বললেন–হে বিদূর, যজ্ঞ সমাপ্ত করে পৃথু পুরমধ্যে প্রবেশ করলেন। সেই পুরীর বিভিন্ন জায়গা মুক্তো, ফুল-মালা বস্ত্র ও স্বর্গতোরণে সুশোভিত ছিল।

সেগুলি সুগন্ধী মহাধূপ দ্বারা সুবাসিত হয়েছিল। সেখানকার রাজপথ, প্রাঙ্গণ ও অভ্যন্তরস্থ পথগুলি চন্দন ও অগুরুমিশ্রিত জলে ধৌত হয়েছিল। ফল-পত্র সমন্বিত কলাগাছ, ও গুবাক গাছ এবং পল্লব মালা দিয়ে সমস্ত জায়গাগুলি অলঙ্কৃত করা হয়েছিল।

প্রজাগণ এবং উজ্জ্বল মণিকুন্তলে ভূষিতা কুমারীগণ দীপমালা, দই প্রভৃতি নানাবিধ উপহারসমূহ পৃথুকে অভ্যর্থনা করলেন।

শঙ্খ, দুন্দুভি-নাদ এবং ঋত্বিকগণের উচ্চারিত বেদধ্বনির দ্বারা স্তুত হয়ে পৃথু নিজ ভবনে প্রবেশ করলেন।

এবিধ বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেও পৃথুর কোনওরূপ অহঙ্কার ছিল না। নিজ গৃহে প্রত্যাগমনের সময়ে মহা যশস্বী মহারাজ পৃথু বিভিন্ন স্থানে পুরবাসীগণের দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন। এতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের মনোমত বর প্রদান করেন।

মহারাজ পৃথুর চেষ্টা পরম উৎকৃষ্ট, তিনি মহৎ। সেজন্য তিনি সকলের পূজ্যতম ছিলেন। তিনি পৃথিবীর দোহন প্রভৃতি বিবিধ কর্ম সম্পাদন করে, নিজ যশ বিস্তার করেন।

দীর্ঘদিন সুষ্ঠুভাবে ভূমণ্ডল শাসন করে তিনি পরমধামে গমন করেছিলেন।

সূত বললেন–হে সভাপতে শৌনক, পরম ভাগবত বিদুর, মহর্ষি মৈত্রেয় কর্তৃক আদিরাজ পৃথুর যশ ও কীর্তি শ্রুত হলেন। পৃথুর কাহিনী শ্রবণ করে মহামুনি মৈত্রেয়কে পূজা করলেন।

হে মুনিসত্তম, পৃথুর যশ অসামান্য। তা বিশেষ গুণ দ্বারা অর্জিত হয় এবং গুণশীল ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা সর্বদা তার সমাদর করেন।

তারপরে বিদুর মুনিবর মৈত্রেয়কে প্রশ্ন করলেন–হে মহামুনি, পৃথু মুনিগণ কর্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। যে বাহুদ্বয়ের শক্তিতে তিনি পৃথিবী দোহন করেছিলেন, সেই বাহুদ্বয়ে বিষ্ণুতেজ ধারণ করে সমগ্র দেবমণ্ডলীর নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন। এরপরে তিনি আর কি কি বিশেষ কাজ করেছিলেন?

যে মহান পুরুষের পৃথিবী দোহন রূপ বিক্রমের উচ্ছিষ্টতুল্য কাম উপলক্ষ্য করে বহু ভূপতি এবং লোকপালগণ আজও জীবনধারণ করছেন, তার কীর্তি আমায় বলুন।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে সে সকল বিশুদ্ধ কর্মকাণ্ডের কথা বিবৃত করুন।

মৈত্রেয় স্মিত হেসে বলতে শুরু করলেন। মহারাজ পৃথু তখন গঙ্গা ও যমুনা মধ্যবর্তী ভূভাগে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি ভোগ দ্বারা পুণ্য ক্ষয়ের উদ্দেশ্যে প্রাক্তন কর্মানুযায়ী বিষয় ভোগ করতে লাগলেন। সাতটি দ্বীপের মধ্যে একমাত্র তিনিই দণ্ডধর ছিলেন।

ব্রাহ্মণকুল, এবং ভগবান অচ্যুত যে ব্যক্তিগণের গোত্র প্রবর্তক-তুল্য, সে সকল বৈষ্ণবগণ ছাতা সর্বত্র পৃথুর আদেশ প্রচলিত ছিল।

কালক্রমে, একদিন মহারাজ পৃথু এক মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হলেন। সেই যজ্ঞে দেবতা, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ সমাগত হয়ে সভ্য হলেন।

যজ্ঞস্থলে সমবেত পূজনীয় সভাসদগণের যথাযোগ্য অর্চনা শেষে নক্ষত্র পরিবৃত শশধরের ন্যায় তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন।

তাঁর দেহ ছিল সমুন্নত ও গৌরবর্ণ, বাহুদ্বয় ছিল দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, সুগঠিত নাসিকা, সুস্পষ্ট স্কন্দদ্বয়। রক্তাভ লোচনে তার মুখশ্রী সুন্দর মৃদু হাস্যযুক্ত প্রশান্ত মূর্তিতে তিনি স্মিত নয়নে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

তাঁর বক্ষস্থল প্রশস্ত, কটিদেশ বিস্তীর্ণ, উদরে ত্রিবলি শোভিত ছিল। উদরের নিম্নাংশে অশ্ব পল্লবের মতো উপরের দিকে বিস্তৃত ও নিম্নাংশে সঙ্কুচিত ছিল। নাভিদেশ জলাবর্তের গর্তের ন্যায় গভীর, উরুদ্বয় কাঞ্চনতুল্য উজ্জ্বল ও চরণের অগ্রভাগ উন্নত ছিল।

তার কেশবেনি ছিল সূক্ষ্ম, কুটিল ও ঘনকালো সুস্নিগ্ধ। গলায় কম্বুর মতো তিনটি রেখা অঙ্কিত। মহামূল্যবান পট্টবসন তাঁর পরিধান ও উত্তরীয়। যজ্ঞের নিয়মানুসারে তিনি ভূষণ পরিত্যাগ করেছিলেন। এর ফলে তার স্বাভাবিক গাত্রশোভা প্রকাশিত হয়েছিল।

কৃষজিনধারী ও কুশ হস্তে তিনি যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন করছিলেন। সেসময় তাকে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত দেখাচ্ছিল।

তার চক্ষুতারকা ছিল স্নিগ্ধ ও সন্তাপহারিণী। চতুর্দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করে তিনি শ্রুতিমধুর বাক্যে বলতে লাগলেন।

তার বাচনভঙ্গী ছিল খুব সুন্দর। ভাষণের এক একটি পদ ছিল বিচিত্র, প্রশস্ত, শুদ্ধ, গম্ভীর, গূঢ় অর্থ ব্যাপক ও প্রাঞ্জল। সকলের মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যেই তিনি স্বীয় অনুভূত তত্ত্বগুলি আবার বলতে শুরু করলেন।

মহারাজ পৃথু বলতে শুরু করলেন, হে সভাবৃন্দ, এই স্থানে মহাত্মাদিগেরও আগমন হয়েছে। আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন, আপনাদের মঙ্গল হবে। ধর্মাগ্রহী ব্যক্তিদের উচিত,

সাধুদিগের কাছে নিজ নিজ চিন্তা ব্যক্ত করা। আমি প্রজাশাসনের ছলে আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি।

প্রজাগণের জীবিকা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জগদীশ্বর আমাকে দণ্ডধররূপে নিযুক্ত করেছেন। আপনাদের নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্মে নিযুক্ত করাই আমার কর্তব্য কর্ম।

প্রাক্তন কর্মসাক্ষী ভগবান শ্রীহরি যাঁদের প্রতি পরিতুষ্ট হন, ব্রহ্মবাদীরা যাদের গুণকীর্তন করেন, তারাই আমার এই লক্ষ্য। সেসব ব্যক্তিরা সামান্য নন, তাঁরা সর্বাভিলাষ পূর্ণ।

যে রাজা প্রজাদের স্ব-স্ব ধর্মশিক্ষা না দিয়ে কর গ্রহণ করেন, তিনি প্রজাগণের পাপের ভাগী হন। নিজ ঐশ্বর্য থেকে সেই রাজা ভ্রষ্ট হয়ে থাকেন।

অতএব প্রজাগণ! আমি তোমাদের প্রভু। আমার প্রজাগণের পাপের ভাগী হন।

নিজ ঐশ্বর্য থেকে সেই রাজা ভ্রষ্ট হয়ে থাকেন।

অতএব প্রজাগণ। আমার পিণ্ডদান ও নরলোকের মঙ্গলের জন্য তোমরা ভগবান হরিতে মতিস্থির কর। এভাবেই যদি তোমরা নিজ নিজ ধর্মাচারণ কর, তবেই আমাকে অনুগ্রহ করা হবে।

হে অম্লান চিত্ত পিতৃগণ, দেব ও ঋষিবৃন্দ, যদি আপনারা মনে করেন যে আমি সাধুবাক্য বলেছি, তাহলে তা অনুমোদন করুন। কারণ কর্মের কর্তা শিক্ষাদাতা অনুমোদনকারী–তিনজনেরই পরলোকে সেই ধর্মানুষ্ঠানের জন্য সমান ফল লাভ হয়।

হে পূজ্যতম বৃন্দ! কারও মতে যজ্ঞেশ্বর নাথ একজন পরমেশ্বর আছেন। আবার কারও কারও মতে ইহকাল ও পরকাল–উভয় কালেই ভোগের ভূমি শরীর সকল দৃশ্য হয়।

মহীমতি মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, প্রিয়ব্রত, রাজর্ষি অঙ্গ ও এরূপ ব্যক্তি এবং ব্রহ্মা, শিব, প্রহ্লাদ ও বন্দি সকলের মতে কর্মফল প্রদাতা পরমেশ্বর অবশ্যই আছেন। ধর্ম বিষয়ে বিমূঢ়, নিন্দনীয় মৃত্যুর দৌহিত্র বেণ প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া সবাই মনে করেন ভগবান আছেন। তিনিই ত্রিবর্গ, স্বর্গ ও মোক্ষের অদ্বিতীয় কারণ।

কর্ম জড়, তাই ফল প্রদানে অক্ষম। এমনকি দেবতারাও স্বাধীন নয়। তারাও ফলদানে সক্ষম নন। শ্রুতি বলেন, তাঁদেরও অন্তর্যামী আছেন। কর্ম কোথাও সিদ্ধ হয়, কোথাও অসিদ্ধ হয়। অতএব, সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান পরমেশ্বর অবশ্যই আছেন। তাতেই কর্মফল সিদ্ধি সম্ভব হয়।

হে প্রজাগণ, যাঁর পদাঙ্গুষ্ঠ বিনিঃসৃত গঙ্গার ন্যায় সর্বদা বৃদ্ধি পায়, তার ভজনা কর।

এভাবেই অন্তঃস্থলের বহু জন্ম সঞ্চিত মালিন্য বিনাশিত হয়। যাঁর চরণশূল আশ্রয় করলে পুরুষের মানসিক দীনতা দূরীভূত হয় এবং বৈরাগ্য দ্বারা বিজ্ঞান সাক্ষাৎকার হয়, তার উপাসনা কর।

যাতে সংসার ক্লেশে পুনর্বার জর্জরিত হতে না হয়। সেজন্য শ্রীহরির ভজনা কর। তাহলে নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী পুরষার্থ সিদ্ধি অবশ্যই হবে। এই বিশ্বাস নিয়ে তোমরা নিজ নিজ উপযোগী যজ্ঞাদি, কর্ম দ্বারা ভগবানকে বন্দনা কর।

ধ্যান, ঈশান, পূজা, সেবাদি দ্বারা এবং নিজ নিজ বৃত্তি দ্বারা ভগবান হরির ভজনা কর। তার পাদপদ্মে সব অভীষ্ট প্রদান করে।

ভগবান স্বরূপতঃ নিরপাধি, চৈতন্যঘন এবং নির্বিশেষে। কিন্তু তিনি কর্মমার্গে বিবিধ দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও মন্ত্রাদি দ্বারা প্রকাশিত হন। অর্থ, সংকল্প, লিঙ্গ, ও নাম দ্বারা নানান বিশেষণ বিশিষ্ট হয়ে কর্মমার্গে যজ্ঞরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

সুতরাং তাবৎ যাগযজ্ঞ ও তাদের অঙ্গাদিতে ভগবৎ দৃষ্টি রেখে কর্মসম্পাদনা আবশ্যিক। যাগযজ্ঞের মত ঐ সকলের ফলও ভগবানের স্বরূপ। তিনি বিভু। তিনি পরমানন্দ স্বরূপ হয়েও শরীরের অভ্যন্তরে বিষয়কারী বুদ্ধিপ্রাপ্ত হন।

আগুন যেমন কাঠের মধ্যে অবস্থান করে কাঠের ধর্ম দৈর্ঘ্য হ্রাস্বাদি বিশিষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয় তেমন ক্রিয়া ও ফলরূপে প্রতীয়মান হয়। এই দেহ প্রধান (অব্যক্ত), কান (ক্ষোভক), আশায় (বাসনা), ধর্ম (অদৃষ্ট) এই সকলের সাথে উৎপন্ন হয়েছে। এতে বিষয়কারী বুদ্ধি হওয়া বিচিত্র নয়।

অর্থাৎ ভগবান শরীর মধ্যে চেতনা-বুদ্ধিতে অধিষ্ঠান-পূর্বক কর্মফলরূপে প্রতীয়মান হন। যজ্ঞভাগী দেবগণের–অধীশ্বর সর্বপূজ্য ভগবান হরিকে পৃথিবীতে যে সকল একাগ্রচিত্তে

সাধুবৃন্দ স্বধর্ম পালন দ্বারা অবিরত আরাধনায় রত, তারা আমার প্রিয়লোক। তারা আমাকে সর্বদা অনুগ্রহ করেছেন।

ক্ষমা, সাধনা ও বিদ্যা এই বিবিধ মহাসম্পদের বলে বলীয়ান ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকুল স্বততঃ উজ্জ্বল। আমার প্রার্থনা এই যে কখনও কোনও রাজবংশ যেন এদের প্রতি প্রভাব বিস্তার না করে। ক্ষত্রিয়গণ যেন কখনোই ব্রাহ্মণগণ ও বৈষ্ণবদের প্রতি দণ্ডবিধান না করেন।

মহত্তমদের অগ্রণী পুরাতন পুরুষ ব্রাহ্মণদের শ্রীহরি নিত্য যাঁদের চরণ বন্দনা করেন, তারা ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণদের কৃপায় তিনি অচলা লক্ষ্মীকে অর্জন করেছেন। এঁদের কৃপায় তিনি জগতের পবিত্রকারী যশ লাভ করেছেন। তাদের সেবায় সর্বান্তযামী, স্বপ্রকাশ, বিপ্রপ্রিয় বিভু পরম প্রীতি লাভ করেন।

তোমার বিনীত ও লোকসংগ্রহ রূপ ভগবৎ ধর্মে তৎপর হয়ে সর্বান্তকরণে সেই ব্রাহ্মণ কুলের সেবা করবে। যে ব্রাহ্মণগণের নিত্য সেবার দ্বারা লোকের অনতিবিলম্ব স্বভাবতই চিত্তশুদ্ধি এবং জ্ঞানাভ্যাস ছাড়াই পরম শান্তি অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়।

ব্রাহ্মণ সেবা দ্বারা সমস্ত যজ্ঞ ও জ্ঞানের ফল সিদ্ধ হয়।

উপনিষদে যাঁকে জ্ঞানার্জন বলে উল্লেখ করা হয় তিনিই ভগবান অনন্ত।

তত্ত্ববেত্তা প্রভৃতি ইন্দ্রাদি দেবতার নামোচ্চারণ পূর্বর্তক শ্রদ্ধাসব ব্রাহ্মণ মুখে অর্পিত হরি শ্রীভগবান প্রসন্নমনে গ্রহণ করুন। অবচেতন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত বস্তু গ্রহণে তিনি সেভাবে প্রসন্ন হন না।

বেদে আদর্শের ন্যায় এই বিশ্ব প্রকাশিত। ব্রাহ্মণগণ, শ্রদ্ধা, তপস্যা, মঙ্গল, মৌন, ইন্দ্র, সংযম এ সমাধি দ্বারা সেই নিমতল সনাতন বেদকে প্রকৃত অর্থ গ্রহণার্থে নিত্য ধারণ করেন।

হে আর্যগণ, আমি যেন আজীবন সেই ব্রাহ্মণদের পদরেণু নিজ মুকুটে ধারণ করতে পারি। ব্রাহ্মণদের চরণধূলি যে পুরুষ নিত্য গ্রহণ করেন তার পাপ বিনষ্ট হয়।

সকল প্রকার গুণরাশি তাকে আশ্রয় করে। ব্রাহ্মণসেবী পুরুষ সুশীল, কৃতজ্ঞ, ও বৃদ্ধজনের আশ্রয় হয়, তাতে সম্পত্তি স্বয়ং তাকে বরণ করে। এজন্য আমি সর্বদা প্রার্থনা করি ব্রাহ্মণকুল, গোসকল ও অনুচরসহ ভগবান বিষ্ণু আমার প্রতি সততঃ প্রসন্ন হন।

মৈত্রেয় বললেন–বিদুর, নৃপতি পৃথুর এইরূপ ভাষণের পরে পিতৃ, দৈব ও ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য সাধু পুরুষগণ হৃষ্টমনে তাঁর সাধুবাদ করতে লাগলেন।

তারা পৃথুকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন–পুত্র দ্বারা পিতা উত্তম লোকসকল লাভ করে, এই শ্রুতি সত্য। ব্রহ্মাশাপদগ্ধ পাপিষ্ঠ বেনও অন্ধতম নরক অতিক্রম করল।

ভগবানের নিন্দা করে নরকে প্রবেশাম্মুখ হিরণ্যকশিপুও ভগবৎ ভক্ত নিজপুত্র প্রহ্লাদের প্রভাবে তার থেকে পরিত্রাণ পান।

হে বীরোত্তম, হে পৃথিবীর পিতৃরূপ রাজা পৃথু! তুমি শত শত বৎসর রাজত্ব করো। দীর্ঘজীবি হও। সর্বলোকের একমাত্র ভর্তা অচ্যুতের প্রতি তোমার এরকম একনিষ্ঠ ভক্তি, সাধু! সাধু!

হে পবিত্রকীর্তি মহারাজ, তুমি আমাদের নাথ। তোমাকে পেয়ে আমরা মুকুন্দনাথ হলাম। অর্থাৎ মুকুন্দকে নাথ হিসাবে লাভ করলাম। আমাদের মনে হচ্ছে তুমি ভগবান সুদৃঢ়ভাবে ভগবানকে নাথরূপে আশ্রয় করেছ। তাই তুমি ব্রহ্মণ্যদেরও উত্তম শ্লোক ভগবান বিষ্ণুর কথা এভাবে বিশ্লেষণ করতে পারছ।

হে নাথ, আমরা তোমার আশ্রিত। তুমি যে আমাদের এভাবে সদুপদেশ দেবে তাতে কিছুই আশ্চর্য নেই। দয়াশীল ব্যক্তিরা স্বভাবতই প্রজানুরঞ্জন করে থাকেন। হে প্রভু, আজ আমরা তোমার কৃপায় অন্ধকারের পার প্রাপ্ত হলাম।

এতকাল দৈব নামক প্রারব্ধ কর্ম দ্বারা নষ্ট চেতন হয়ে সংসারে বিবিধ যোনিতে ভ্রমণ করছিলাম। যিনি ক্ষত্রিয় জাতির রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাকে আমরা প্রণাম করি।

যিনি ক্ষত্রিয় জাতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে ব্রাহ্মণদের বন্দনা করে, সেই তিনিই উভয় জাতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে স্বমহিমায় ঐ বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাকে আমরা নমস্কার করি।

তিনিই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় মহীয়ান পুরুষ। তার কাছে আমরা প্রণত হই।

মৈত্রেয় বললেন–বৎস বিদুর, সভাসদবৃন্দ যখন প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ পৃথুর প্রশংসায় রত ছিলেন, তখন সূর্যতুল্য তেজস্বী চারজন মুনি সেখানে প্রবেশ করেন।

রাজা ও তাঁর অনুচরবৃন্দ দেখলেন যে, ঐ মুনিগণ স্বীয় জ্যোতি দ্বারা লোকসকলকে নিষ্পাপ করতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছেন। ঐ মুণিগণ হলেন সনকাদি ঋষি।

তাদের দর্শন পাওয়া মাত্র সদস্য ও অনুচরসহ পৃথু শশব্যস্ত হয়ে উত্থিত হলেন। ঋষিদের গৌরব স্মরণে তৎক্ষণাৎ বশীভূত রাজা পৃথু সবিনয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন।

এতদ্বারা এটাই প্রকাশিত হল তিনি স্বয়ং শীলবান ব্যক্তিদের আচার অনুসরণ করেন। ভগবান রুদ্রদেবের অগ্রজ সনকাদি-ঋষিগণ কুণ্ডমধ্যস্থ অগ্নির ন্যায় স্বর্ণময় আসনে উপবেশন করলেন। রাজা পৃথু তখন শ্রদ্ধা ও সংযমের সঙ্গে প্রীতমনে তাদের স্তুতি করতে শুরু করলেন।

পৃথু বলতে শুরু করলেন-হে মঙ্গলাস্পদ মুণিগণ, আহো, আমি নিশ্চয়ই কোনও মঙ্গলকর্ম করেছিলাম। সেজন্যই যোগিগণের দুর্দর্শ আপনাদের দর্শন লাভ করলাম।

যার প্রতি ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হোন, তার অপেক্ষা ভাগ্যবান আর কেউ নেই। সপরিষদ শিব ও বিষ্ণু যার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন। ইহলোকে ও পরলোকে তার দুর্লভ বস্তু কিছুই থাকে না। আপনারাও সকল ভুবন পর্যটন করলেও আপনাদের কোন ব্যক্তি দর্শন করতে পারে না।

পূজ্য ব্যক্তিগণ যাঁদের গৃহে উপস্থিত হয়ে জল, তৃণ, গৃহস্বামী ও ভৃত্যদের স্বীকার করেন, সেসকল সাধু গৃহস্থগণ নির্ধন হলেও ধন্য অর্থাৎ কৃতার্থ।

যে সকল গৃহ সাধু বৈষ্ণবদের পাদতীর্থে অর্থাৎ চরণোদকে বর্জিত, সেগুলি মূল্যহীন। সম্পদে পরিপূর্ণ হলেও তা সর্পকুলের আবাস–বৃক্ষের ন্যায় তুলনীয়।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আপনাদের আগমন সুখের হয়েছে তো? অবশ্য আপনাদের এরকম জিজ্ঞাসা করার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ আপনারা বাল্যকাল থেকেই ধীর এবং মুক্তির জন্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে মহৎ আচরণ করেছেন।

হে নাথগণ। এই সংসার সকল ব্যাপনের বপন ক্ষেত্র। আমরা স্বীয় কর্মবশতঃ এখানে পতিত হয়েছি, এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়াবলীকে পরম পুরুষার্থ বলে মনে করছি।

এখানে কি তোমাদের কোন কুশল সম্ভাবনা আছে? আপনাদের মত আত্মারামগণের কুশল ও অকুশলের বুদ্ধিবৃত্তি নেই। এজন্য আপনাদের কুশল জিজ্ঞাসা সঙ্গত নয়।

আমি আপনাদের কাছে আমার নিজের কুশলই জিজ্ঞাসা করি। এই সংসারে সহজে কল্যাণলাভ কিভাবে হতে পারে? আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আপনারা সংসার তপ্ত ব্যক্তিগণের পরম বন্ধু।

আপনারা বিশুদ্ধ মনের ব্যক্তিদের আত্মস্বরূপ, আত্মপ্রকাশকারী নিত্য সুন্দর ভগবান ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণের জন্য সিদ্ধরূপে ভুবনে বিচরণ করে থাকেন।

মৈত্রেয় বললেন–পৃথুর এইরূপ ন্যায়সঙ্গত, স্বল্পদৈর্ঘ্য শ্রুতিমধুর বাক্যে মুনিগণ অতীব প্রীত হলেন।

ব্রহ্মর্ষি সনত কুমার আনন্দিত মনে ঈষৎ হাস্য করলেন। তিনি স্মিত মুখে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন।

তিনি পৃথুকে বললেন–মহারাজ আপনি পরম জ্ঞানী হয়েও উত্তম প্রশ্ন করেছেন। প্রাণীদের মঙ্গল সাধনের জন্য সাধুগণের এরূপ মতিই হয়েই থাকে। সাধুসঙ্গ বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর। তাঁদের পরস্পরের প্রশ্নোত্তর শ্রবণে সবারই সুখলাভ হয়।

হে রাজন, ভগবান শ্রী –হরির গুণকীর্তন দ্বারা অন্তরাত্মার মালিন্য, কামনা ও কষায় প্রভৃতির নাশ হয়। এই দুর্লভ নৈতিক রীতি আপনার মধ্যে বর্তমান।

সকল শাস্ত্রের সম্যক্ বিচার করে এটাই নিশ্চিত হয়েছে যে, আত্মভিন্ন পদার্থে আসক্তি ত্যাগ ও নির্গুণ আত্মায় দৃঢ় রতিই লোকের যথার্থ মঙ্গলের কারণ। শ্রদ্ধা, ভগবৎ কর্মের আচরণ, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিক যোগনিষ্ঠা, যোগেশ্বরগণের উপাসনা এবং সর্বদা পুণ্যকীর্তি হরির পবিত্র কথা আলোচনা দ্বারা সেই রতি হয়ে থাকে।

যে ব্যক্তিগণ অর্থপ্রিয় তাপস এবং কামপ্রিয় রাজস, তাদের সংসর্গে বিতৃষ্ণা ও তাদের অভিমত অর্থ-কামাদি ভোগে নিবৃত্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।

সেখানে হরিগুণামৃত পানের সম্ভাবনা রয়েছে সেরকম নির্জন স্থানে অবস্থানের ইচ্ছা এবং আত্ম চিন্তায় পরিতৃপ্তি লাভ প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মরতি ও আত্মভিন্ন সঙ্গ ত্যাগের ইচ্ছা জন্মাতে পারে।

অহিংস, নিবৃত্তিপরায়ণতা, আত্মহিতানুসন্ধান, ইন্দ্রিয়দমন, কামশুন্যতা, শাস্ত্রীয় মার্গান্তরের অনিন্দ্য, এসকল বিষয়ের চর্চায় আত্মরতি জন্মায়।

হরিভক্তগণের কর্ণালঙ্কার স্বরূপ শ্রীহরির গুণগাথা বারংবার উচ্চারণ এবং পরিবর্তিত ভক্তি দ্বারা কার্যকারণাত্মক দেহাদির প্রতি বৈরাগ্য ও নিগুণ ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মায় প্রকৃষ্ট অনুরাগ অনায়াসে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

যখন পুরুষের পরব্রহ্ম নৈষ্ঠিকী রতির জন্ম হয়, তখন সে আচার্যবান হয়ে ব্রহ্মানিষ্ঠ গুরুকে লাভ করে।

আগুন যেমন নিজের উৎপত্তিস্থল অরণিকাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তেমনি জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বারা বাসনাশূন্য হৃদয়কে অর্থাৎ অহংকারাত্মক লিঙ্গ-শরীরকে দগ্ধ করে।

অহঙ্কার স্বরূপ লিঙ্গ শরীরই জীবের আবরক এবং পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত তার প্রধান অংশ।

পুরুষ স্বপ্নে বহু বিষয় দর্শন করলেও স্বপ্নভঙ্গে তার কিছু দেখতে পায় না। জীবের অহঙ্কার রূপ লিঙ্গ শরীর বিনষ্ট হলে, সে কতৃত্বাভিমান থেকে নিষ্কৃতি পায়।

তখন যে আত্মা ভিন্ন কোন বিষয়ই দেখতে পায় না। অন্তঃকরণরূপ উপাধি থাকাতেই পুরুষ জাগ্রত ও স্বপ্নবস্থানেতে আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের দর্শন পায়।– আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের কারণ যে অহঙ্কার, তাকে জীব এই সময়েই দেখতে পায়।

অন্য অবস্থায় অর্থাৎ সুষুপ্তি বা সমাধিকালে দেখতে পায় না। এক উপাধি বশতঃ আত্মাতে দৃশ্যাদিভেদ প্রতীয়মান হয়।

জল, দর্পণ প্রভৃতি ভেদের কারণ পদার্থ সকল থাকলেই পুরুষ আত্মার ও প্রতিবিম্বস্বরূপ অন্য একটির ভেদ দেখতে পায়।

কিন্তু জল, দর্পণের অনুপস্থিতি ঐরকম ভেদ দর্শন হয় না। অসঙ্গ ও আত্মরতির দ্বারা যে প্রকারে মুক্তি লাভ সম্ভব তা বর্ণনা করে, অনাত্ম বস্তুতে আসক্তির কারণে যেভাবে সংসার-বন্ধন ঘটে, তা বলছেন।

যে সকল পুরুষ বিষয়ের ধ্যান করে, তাদের ইন্দ্রিয় সেই বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হয়। সেই বিষয় অভিভূত ইন্দ্রিয় মনকে বিষয়ে আসক্ত করে তোলে।

নদী-হ্রদ তীরবর্তী কুশাদি স্তম্ভমূল দ্বারা নদী-হ্রদ থেকে জল আকর্ষণ করে। তেমনভাবে বিষয়াসক্ত মন, বুদ্ধির কাছ থেকে তার বিচারক্ষমতা অর্থাৎ তার ধর্ম, তার চেতনা হরণ করে নেয়।

অবিবেকী পুরুষ এসব কিছুই দেখতে পায় না। চেতনা অপহৃত হলে স্মৃতিও বিনষ্ট হয়। স্মৃতি নষ্ট হলে স্বরূপজ্ঞানেরও বিনাশ হয়। জ্ঞানের বিনাশকেই পণ্ডিতবৃন্দ আত্মকৃত আত্মবিলোপ বলে থাকেন।

শ্রুতিতে বলা হয়েছে, আত্মার নিমিত্ত সকল বস্তুই প্রিয় প্রতিপন্ন হয়। যে আত্মাকে আশ্রয় করে অন্যান্য বস্তুসমূহ প্রিয় হয়, সেই আত্মার আত্মস্বরূপ বিনষ্ট হলে তা জীবেরই পক্ষে সর্বাধিক ক্ষতিকর।

অর্থ ও ইন্দ্রিয়ভোগের ঐকান্তিক চিন্তার দ্বারাই মানুষের সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যায়। ঐ দুটি বিষয় চিন্তা করেই শোকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান থেকে বিচ্যুত হয়ে স্থাবরতা প্রাপ্ত হয়। যে সকল ব্যক্তি এ ঘোর সংসার সমুদ্র পার হতে ইচ্ছা করেন, তাদের পক্ষে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিঘাতক বস্তুতে আসক্তি করা অনুচিত।

হে মহারাজ, ধর্মাদি চতুষ্টয় পুরুষার্থ বলেও গণ্য হয়ে থাকে। ধর্মাদি ত্রিবর্গে সবসময়ই কালভয় আছে।

ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং আমরা সকলেই কালক্ষোভের পরে উৎপন্ন হয়েছি। কাল সবারই মঙ্গল বিনাশ করেছে, তাদের আর কল্যাণের সম্ভাবনা নেই।

হে নরেন্দ্র, যে ভগবান এইসকল স্থাবর, জঙ্গম ও দেহ, ইন্দ্রিয় প্রাণ বুদ্ধি ও অহঙ্কার আবৃত এবং এদের হৃদয়ে যে ভগবান সর্বত্র অন্তর্যামীরূপে প্রকাশিত সেই ভগবানকে 'আমি তদাত্মক' বলে জানুন। ভগবানই স্থাবর, জঙ্গম সকলের হৃদয়ে প্রকাশিত হন।

এরকম মনে করা উচিত নয়, যে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য বস্তু আছে, এবং তৎসম্বন্ধে ঈশ্বরেরও মালিন্য হতে পারে।

ভগবান সততস্বরূপ, সুতরাং পরিশুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। যে প্রকৃতি কর্ম দ্বারা মলিন তা তার নিকট অভিভূত হয়।

মাল্যতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তার মতো এই বিশ্ব, কার্য্যকারণভাবে সেই ভগবানেই প্রকাশ পাচ্ছেন। বিবেকের উদয় হলে, যেমন মালাতে সর্পভ্রম বিগত হয়, তেমন ভগবানের মধ্যে এই বিশ্বের প্রকাশও অপগত হয়।

কর্মমলিন প্রকৃতিকে যিনি অভিভূত করেন, সেই নিত্যমুক্ত নির্মল, বিশুদ্ধ-সত্ত্ব শ্রীভগবানের কারণাগত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গগুলিসমূহের শান্তি স্মরণ মাত্রেই তাঁর ভক্তগণের কর্ম দ্বারা গ্রথিত হৃদয় গ্রন্থি অনায়াসে ছেদিত হয়।

বিষয় নির্লিপ্ত জিতেন্দ্রিয় যতিগণ অতি স্বল্প আয়াসে ঐ কর্ম করতে সক্ষম হন না।

অতএব সেই পরম ও চরম শরণ্য ভগবান বাসুদেবের ভজনা কর। শ্রীহরির স্মরণ ব্যতীত যতিগণের পক্ষে এই ভবার্ণব উত্তীর্ণ হওয়া অতি ক্লেশসাধ্য। তাঁর কর্মগ্রন্থি ভেদ করে কামাদি ছয়টি কুম্ভীরসঙ্কুল ভবসাগর পার হতে চান, কিন্তু তা অতি কষ্টকর।

এজন্য তুমি ভগবান হরির ভজনীয় পাদপদ্মকে ভোলারূপে অবলম্বন করে দুস্তর উদকরূপ ব্যসন সকল উত্তীর্ণ হও।

মৈত্রেয় বললেন–হে কুরুশ্রেষ্ঠ বিদুর, ব্রহ্মপুত্র আত্মজ্ঞানী সনৎকুমার এভাবে আত্মস্থ সম্যক প্রকাশ করলেন।

মহারাজ পৃথু তখন তাঁকে স্তব করে বলতে লাগলেন–হে ব্রাহ্মণ, হে ভগবান, দীনার্তের প্রতি করুণাশীল ভগবান শ্রীহরি পূর্বেই আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, তাকে সম্পূর্ণ করতেই আপনাদের আগমন হয়েছে।

যেজন্য আপনারা আগমন করেছেন তা সমস্তই সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আমি আপনাদের কি গুরুদক্ষিণা দেব? আমার দেহ ও রাজ্যের প্রতি আমার কোনও সত্তাধিকার নেই।

কারণ সাধুপুরুষেরা সেগুলি যজ্ঞান্তে স্বীকার করে, উচ্ছিষ্টের ন্যায় তা আমাকে প্রদান করেছেন। তথাপি, ভৃত্য যেমন প্রভুকে তাম্বুলাদি অর্পণ করে তেমনি আমার প্রাণ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, রাজ্য, পৃথিবী, সৈন্য, রাজকোষ এসবই আপনাদের নিবেদন করলাম।

সেনাপতিত্ব, রাজ্য, দণ্ডদানের কর্তৃত্ব এবং সর্বলোকের উপর আধিপত্যের অধিকারী একমাত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা। ব্রাহ্মণগণ নিজেদের স্বত্ত্ব বিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন, পরিধান ও দান করে থাকেন। তাদের অনুগ্রহে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি লোকে অন্ন ভোজন মাত্র করিয়া থাকে।

তাদের দান করার স্বতন্ত্র অধিকার নেই।

আপনারা বেদবক্তা, অধ্যাত্মবিচার দ্বারা ভগবানের প্রতি ভক্তিই পরম গতি আমাদের তা বুঝিয়ে দিলেন।

আপনারা পরম দয়ালু, নিজেদের কর্ম দ্বারাই সব সময় তুষ্ট থাকেন। একমাত্র অঞ্জলি বন্ধন ছাড়া কোন্ ব্যক্তি আপনাদের কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করতে গিয়ে নিজেদের হাস্যাস্পদ করবে?

মৈত্রেয় বললেন–আদিরাজ পৃথু সেই চারজন আত্মজ্ঞানী মুনিগণের যথাবিধি পূজা করলেন। তারপরে তারা প্রীতমনে পৃথুর শীলতাগুণের প্রশংসা করতে করতে আকাশপথে গমন করলেন।

বেনপুত্র পৃথুও সাধুপুরুষদের অগ্রগণ্য ছিলেন। আধ্যাত্ম শিক্ষা দ্বারা তাঁর চিত্তের একাগ্রতা জন্মালে আত্মাতেই অবস্থিত হয়ে নিজেকে পূর্ণ মনোরথ বোধ করলেন।

দেশ, কাল, অনুযায়ী যে যে কর্ম করা সমীচিন, তাঁর যেমন বিত্ত, যেমন শক্তি এবং যেরকম অনুষ্ঠান করা উচিত, সেই অনুসারে পরব্রহ্মে সমর্পণ-পূর্বক সমুদয় কর্ম করতে লাগলেন।

তৎপরে, মহারাজ পৃথু রাজ-সম্পদযুক্ত হয়ে গৃহাশ্রমে থাকলেন। তবুও সঙ্গ-পরিত্যাগ করে সমাহিত হয়ে থাকতেন এবং সমস্ত কর্মফল পরব্রহ্মে সমর্পণ করতেন। অতএব, অহঙ্কার শূন্য ও সূর্যের মতো নির্মল প্রাণ হবার কারণে ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে তার কোনও আসক্তি হল না।

বৎস বিদূর এইপ্রকার আধ্যাত্মযুক্ত হয়ে পৃথু কর্ম করতে লাগলেন। কালক্রমে অর্চি নাম্নী পত্নীর গর্ভে পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। তাদের নাম হল যথাক্রমে বিজিতা, ধূম্রকেশ, হর্ষ, দুরিণ এবং বৃক।

মহারাজ পৃথু একাকী হওয়া সত্ত্বেও অচ্যুতাত্মা হওয়ায় জগতের রক্ষণাবেক্ষণের পৃথক পৃথক গুণ ধারণ করতেন।

উদার মন, প্রিয় বাক্য ও মনোহর মূর্তিধারী রাজা পৃথু, তার সর্বোত্তম গুণাবলী দ্বারা প্রজাদের মনোরঞ্জন করতেন।

এভাবে তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় “রাজা” নাম সার্থক করেছিলেন।

সূর্যদেব যেমন পৃথিবী থেকে রস গ্রহণ করেন, তারপরে পুনরায় বর্ষণ দ্বারা সে রস পৃথুও প্রজাদের কাছ থেকে সম্বৎসর কর গ্রহণ করতেন। আবার তাদের তা প্রত্যর্পণ করতেন। তিনি নিজ প্রতাপ দ্বারা অন্যদের তাঁর আজ্ঞা পালন করতে বাধ্য করতেন।

অগ্নির দুর্ধর্ষ তেজস্বী মহেন্দ্রর মতো দুর্জয় ছিলেন। মহারাজ পৃথুর সহিষ্ণুতা ছিল ধরণীর সঙ্গে তুলনীয়। মনুষ্যের বাঞ্ছিত ফল প্রদানে তিনি স্বর্গের ন্যায় দানশীল ছিলেন। তিনি মেঘের ন্যায় তৃপ্তি বিধান করে সকলের অনুরূপ ধর্ম প্রদান করতেন।

মহারাজ পৃথু ছিলেন সমুদ্রের ন্যায় দুর্বোধ এবং সুমেরুর মতো স্থিতধী। শিক্ষায় তিনি ধর্মরাজ সদৃশ ও বিস্ময় উৎপাদনে হিমালয়ের সমান ছিলেন।

পৃথুর ধনভাণ্ডার ছিল কুবেরের তুল্য এবং বরুণদেবের মতো আত্মগোপন করতেন। বায়ুর মতো তিনি সর্বত্র গমন করতে পারতেন। তাঁর ইন্দ্রিয় মন ও দৈহিক সামর্থ্য ছিল পবনতুল্য।

রাজা পৃথুর অত্যুগ্র-স্বভাবের জন্য তাকে সাক্ষাৎ ভগবান রুদ্র বলে মনে করা হত।

তিনি কন্দর্পের ন্যায় সৌন্দর্যবানে ও মৃগেন্দ্রর ন্যায় প্রশস্ত মনের অধিকারী ছিলেন।

মহারাজ পৃথু প্রজা– বাৎসল্যে মনুর মতো ছিলেন। তার মানুষের প্রতি প্রভুত্ব করার ক্ষমতায় তিনি স্বয়ং ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনীয় ছিলেন।

বেদবাদে তিনি ছিলেন বৃহস্পতি তুল্য এবং স্বয়ং শ্রীহরির জিতেন্দ্রিয়।

গো, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং বিষ্ণু ভক্তদের প্রতি ভক্তি, লজ্জা, বিনয়, সচ্চরিবতা এবং পরার্থপরতায় একমাত্র নিজের সঙ্গেই তুলনীয় ছিলেন।

ত্রিভুবনের সকল স্থানে পুরুষেরা তাঁর যশকীর্তন করত।

মহারাজ পৃথু নিজের কীর্তি দ্বারা সীতাপতি রামচন্দ্রের মতো সাধু ও কুলাঙ্গানাদের কর্ণকুহরে প্রবেশিত হতেন।

.

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পৃথুর বৈকুণ্ঠ গমন

মৈত্রেয় বলতে থাকেন– বেনপুত্র পৃথু সবসময়ে একনিষ্ঠ থাকতেন। তিনি অন্নাদি দান এবং পুর ও গ্রামাদির উৎসর্গ অশেষভাবে বাড়িয়ে তুলেছিলেন।

ক্রমে তার বয়স বাড়তে লাগল, এবং তিনি নিজেকে বয়ঃবৃদ্ধ ভাবতে শুরু করলেন। তখন তার মনে হল পৃথিবীর যাবতীয় স্থাবর এবং জঙ্গমের বৃত্তি বিধান ও সাধু পুরুষের ধর্ম প্রতিপালন সম্পন্ন হয়েছে।

যে প্রজাদের পালনার্থে জগদীশ্বর এই পৃথিবীতে আমার জন্ম দিয়েছেন, তার আদেশও সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে।

তখন তিনি নিজ পুত্রী স্বরূপ পৃথ্বীকে পুত্রের হাতে সমর্পণ করে নিজ ভার্য্যা অর্চিসহ তপোবনে গমন করলেন।

তার প্রস্থানে সমগ্র ধরণী অত্যন্ত শোকাগ্রস্ত ও বিমর্ষ হয়ে রোদন করতে লাগল। যখন পৃথু ভুবনের রাজা ছিলেন, তখন তিনি ধরামণ্ডল বিজয়ে অতি যত্নশীল ছিলেন।

এখন বাণপ্রস্থে গমন করে তিনি সেই সম্মত কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। কখনও তিনি কন্দমূল ও ফল আহার করতেন।

কখনও বা শুষ্ক পাতা খেয়ে কাটিয়ে দিতেন। এরপরে কিছুকাল শুধুমাত্র জলপান করতে লাগলেন। এরও পরবর্তী পর্যায়ে কেবল বায়ু সেবন করে দেহ ধারণ করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের যথোচিত আরাধনার জন্য তিনি মৌনব্রত পালন করতেন। আবার প্রচণ্ড শীতে আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত হয়ে অবস্থান করতেন এবং ভূমিতে শয়ন করতেন।

এভাবেই জিতেন্দ্রিয়, সহিষ্ণু, বাক্ সংযমী ও ঊর্দ্ধরেতা হয়ে নিজ প্রাণবায়ুকে সংযত করে তিনি অত্যুৎকৃষ্ট তপস্যা আচরণ করতে লাগলেন।

তপস্যাবলে তার সমস্ত ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে লাগল। তার চিত্ত ক্রমে নির্মল হয়ে উঠল। এরপরে তিনি প্রাণায়াম দ্বারা ষড়রিপুরে নিরুদ্ধ করে বাসনাবন্ধন থেকে নির্মুক্ত হলেন।

তারপরে পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথু ভগবান সনৎকুমার যে আধ্যাত্মিক ভক্তিযোগ উপদেশ করেছিলেন, তদনুসারে পরমপুরুষ শ্রীহরির উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

সাধু ও ভাগবৎনিষ্ঠ পৃথু পরম শ্রদ্ধা সহকারে যত্ন করার ফলে অচিরেই পরব্রহ্মা শ্রীভগবানে তাঁর ঐকান্তিক ভক্তির সৃষ্টি হল।

শ্রীহরির পরিচর্য্যা দ্বারা তার হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব হল।

শ্রীভগবানের অনুস্মরণে প্রাপ্ত ভক্তির প্রভাবে তাঁর চিত্তে জ্ঞান বৈরাগ্যের উদয় হল।

তীক্ষ্ম সেই জ্ঞানবলে পৃথু সংশয়ীভূত নিজ হৃদয়- গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সক্ষম হলেন।

তত্ত্ব জ্ঞানের সাহায্যে পৃথু এই হৃদয়-গ্রন্থির উচ্ছেদ করতে সমর্থ হলেন। দেহে আত্মবুদ্ধি রূপ মিথ্যাজ্ঞান সম্পন্ন হবার ফলে এবং ভগবৎ-স্বরূপের প্রকৃত অনুভূতি হবার কারণে তিনি সিদ্ধিতেই স্পৃহহীন হয়ে রইলেন। তখন তিনি পরম তত্ত্বজ্ঞানও পরিত্যাগ করলেন।

শ্রীহরির কথায় যতক্ষণ না রতি হয়, ততক্ষণ যোগপতি বিশিষ্ট যতির অপ্রমত্ত হওয়া সম্ভব নয়। এভাবে বীর প্রবর পৃথু পরমাত্মাতে আত্মা অর্থাৎ মন সংযুক্ত করে ব্রহ্মস্বরূপ হতে পেরেছিলেন। তারপরে নির্দিষ্ট কাল উপস্থিত হলে তিনি নিজ কলেবর পরিত্যাগ করলেন।

মৈত্রেয় এবারে পৃথুর দেহত্যাগ কিভাবে হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে লাগলেন।

পৃথু নিজ চরণযুগলের পাপিষ্ণ সাহায্যে গুহ্যদেশ নিপীড়িত করলেন। এবারে তিনি মূলাধার অর্থাৎ গুহ্য ও লিঙ্গ মধ্যবর্তী দু-অঙ্গুলি পরিমিত স্থান থেকে ওপরে উত্তোলন করে স্বাধিষ্ঠান চক্রে স্থাপন করলেন।

তারপরে ঐ বায়ুকে নাভিস্থানে অর্থাৎ মণিপুর চক্রে নিয়ে গেলেন।

তারপরে কোষ্ঠসমূহে অর্থাৎ হৃদয়ে অনাহতচক্র, বক্ষে বিশুদ্ধ চক্র, কণ্ঠের অধোভাগে বিশুদ্ধ চক্রের অগ্রদেশ কণ্ঠে ও দুটি ভুর মধ্যবর্তী আজ্ঞাচক্রে উত্তোলন পূর্বক স্থাপন করলেন।

এবারে সেই দেহস্থ বায়ুকে দেবের কঠিন অংশকে ক্ষিতিতে, দৈহিক তেজরাশিকে তেজ, দেহস্থ ইন্দ্রিয় ছিদ্রকে আকাশে এবং দেহের রসভাগকে জলে সংযোজিত করলেন।

এভাবে উদ্ভব ক্রমানুসারে তিনি তেজকে, বায়ুকে আকাশে মিশিয়ে দিলেন।

মনকে ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চইন্দ্রিয়কে পঞ্চতন্মাত্রে বিলীন করলেন। তারপর ভূতাদিকে ক্ষেপণ করে মহর্তত্ত্বে সংযুক্ত করলেন।

সর্বগুণের স্থিতিস্থান মহাতত্ত্বকে মায়াময় জীবে যোজিত করলেন। পৃথু পূর্বে অনুশয়যুক্ত অর্থাৎ লিঙ্গ শরীরাভিমানী জীব ছিলেন।

এক্ষণে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রভাবে স্বরূপে স্থিত হলেন। এভাবে তিনি অনুশয়োপধি জীবেরও পরিত্যাগ করলেন।

মৈত্রেয় বললেন– হে বিদূর, পৃথুর পত্নী মহারাণী অর্চি ছিলেন অতীব সুকুমারী। যে অর্চিতর কখনও চরণযুগল ভূমি –স্পর্শ করার যোগ্য নয়, সেই তিনি পত্নীর সঙ্গে বনে গমন করলেন।

স্বামীর প্রতি তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন। তাই স্বামীর ব্রতার্থে সহযোগী হয়ে স্বামীসেবা ও মুনিগণের উপযোগী জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন।

এর ফলে অত্যন্ত কৃশ হলেও তার ক্লেশ অনুভূত হত না। মহারাজ পৃথুর করস্পর্শ ও সঙ্গলাভেই তিনি পরমানন্দ লাভ করতেন।

রাজা পৃথুর দেহত্যাগের পর পতিব্রতা অর্চি যখন দেখলেন, পৃথুর দেহে চেতনাদি বিনষ্ট হয়েছে; তখন বিলাপ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বিলাপ করে, পরে পর্বতের সানুদেশে চিতা রচনা করে, স্বামীর দেহ তাতে আরোপণ করলেন।

তারপরে তৎকালোচিত অন্যান্য ক্রিয়াদি নির্বাহ করে, নদীর জলে স্নান করে পতির তর্পণ করলেন। তারপরে আকাশের দেবগণকে প্রণাম করে তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করলেন।

এরপরে তিনি পতির পদযুগলের ধ্যান করতে করতে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করলেন।

হে বিদুর, পতিব্রতা অর্চিকে বীরবর পৃথুর সঙ্গে সহমরণে গমনোদ্যত দেখে আকাশপথে দণ্ডায়মানা বহু বরদাত্রী দেবীগণ দেবগণের সাথে মিলিত হয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন।

এরপরে দেবগণের দুন্দুভি বেজে উঠল, দেব পত্নীগণ ঐ পর্বতের জানুদেশে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

তারা এও বলতে লাগলেন– আহা, এই বধূ অর্চি ধন্যা। যজ্ঞেশ্বর বধূ লক্ষ্মীর ন্যায় ভূপতিগণের পতি স্বীয় পতিকে সর্বান্তঃকরণে ভজনাপূর্বক দুর্বিভাব্য আত্মকর্ম দ্বারা ঊর্ধ্বলোকে গমন করছেন।

এই পৃথিবীতে চঞ্চল পরমায়ু প্রাপ্ত হয়েও যে ব্যক্তিগণ এমন দুষ্কর্ম সাধন করে, যাতে ভগবানকে পাওয়া যায়, তাদের পদ্মে কি দেবপদ দুর্লভ হতে পারে?

হায়, হায়, জন্ম-জন্মান্তরের বহুবিধ কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে সেসকল ব্যক্তি এই পৃথিবীতে মুক্তি সাধন যোগ্য মনুষ্য জন্মলাভ করেও অনিত্য বিষয়ে আসক্ত হতে পারে সে আত্মদ্রোহকারী ও বঞ্চিত বলে প্রতিপন্ন হয়।

মৈত্রেয় বললেন– বৎস বিদুর, অমর নারীগণ ঐরকম স্তব করতে লাগলেন। পৃথুপত্নী অর্চি পতিলোকে গিয়ে উপনীত হলেন। আত্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ অচ্যুতশ্রেয় কোপুত্র পৃথু যে পরমলোক প্রাপ্ত হোক, পত্নী অর্চিও সেই লোকে উপস্থিত হলেন।

বৎস মহাভাগবৎ পৃথু অতি মহানুভব ও উদ্দমচরিত্র, তাঁর চরিত্র এতক্ষণ তোমার কাছে বর্ণনা করলাম।

যে ব্যক্তি অবহিত হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক এই সুমহান আখ্যান পাঠ করে, সে পৃথুর পদবী লাভ করবে।

এই চরিত্র পাঠ করলে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হবে। ক্ষত্রিয়গণ পৃথিবীর প্রভুত্বপ্রাপ্ত হবে। বৈশ্য বংশের অধিনায়ক এবং শূদ্র সাধুশ্রেষ্ঠ হবে।

পুরুষ বা নারী শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে এই চরিত্র যদি তিনবার শ্রবণ করে, তা অতিশয় পূণ্যের কাজ।

তাহলে অপুত্রক পুত্রলাভ করে, নির্ধনের ধনলাভ হয়, কীর্তিহীন ব্যক্তি মহাকীর্তিমান হয় এবং মুখও পাণ্ডিত্য লাভ করে।

এই পবিত্র চরিত্র স্বস্ত্যয়ন রূপ সকল অমঙ্গল দূরীভূত করে। এটা ধন, কীর্তি ও স্বর্গলাভের সহায়ক। কলির যাবতীয় পাপনাশে তা সহায়তা করে।

ধর্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষের সম্যক্ সিদ্ধিকামী পুরুষের পক্ষে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে এই চরিতামৃত শ্রবণ অবশ্যকর্তব্য। কারণ ইহা চুতর্বর্গ সিদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

বিজয়কালে কোনও রাজা এই আখ্যান শ্রবণ করে, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন, তারা তাকে বহু কর ও উপহার প্রদান করবেন।

এই চরিত্রে বহুবিধ ফল লাভ হয়। অন্য সকল বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীহরির চরণে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে পৃথুর চরিত্রকথা শ্রবণ করবেন বা অপরকে শ্রবণ করাবেন এবং নিজে পাঠ করবেন।

মৈত্রেয় বললেন– হে বিচিত্রবীর্য বিদুর! আমি এতক্ষণ তোমার কাছে ভগবানের মাহাত্ম্যসূচক এই পৃথু চরিত্র বর্ণনা করলাম, এই চরিতামৃতে মনোনিবেশ করলে যে-কোনও মরণশীল মানব পৃথুর মতো গতি লাভ করতে সক্ষম হবে।

অন্য সঙ্গ পরিত্যাগ করে এই বিশুদ্ধ চরিত্র পৃথুর অমৃত কথা সাদরে প্রতিদিন শ্রবণ ও কীর্তন করা আবশ্যিক।

এর ফলে এই দুস্তর ভাবসমুদ্র থেকে নিস্তার লাভ সহজ হবে। এর ফলে ভবসাগর থেকে পরিত্রাণের ভেলাস্বরূপ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে নিশ্চলা রতি লাভ সম্ভব হবে।

.

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পৃথুর প্রপৌত্র প্রাচীনবর্হি হতে প্রচেতাদের উৎপত্তি ও তাদের নিমিত্ত রুদ্রগীত বর্ণন

মৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করে বললেন–হে বৎস! মহার্যশস্বী ভ্রাতৃবৎসল পৃথুপুত্র বিজিতা সমগ্র ভুবনের অধীশ্বর হলেন। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভাইদের এক একটি দিক প্রদান করলেন।

হর্ষক্ষকে বিজিতাশ্ব পূর্বদিক এবং বৃককে পশ্চিমদিক দান করলেন। ধূম্রকেশ দক্ষিণদিকের আধিপত্য লাভ করলেন, দ্রবিণ পেলেন উত্তরদিকের দায়িত্ব।

পিতা পৃথুর অশ্বমেধ যজ্ঞের জয়ের অবসরে বিজিতাশ্ব ইন্দ্রের কাছ থেকে অভ্যর্থনা বিদ্যা লাভ করেছিলেন। সেকারণে পরে বিজিতাশ্বের নাম হয়েছিল অন্তর্ধান।

বিজিতাশ্ব নিজ ভার্য্যা শিখণ্ডিনীর গর্ভে আত্মতুল্য তিন পুত্রের জন্ম দেন। বশিষ্ঠ প্রদত্ত পূর্বশাপগ্রস্ত হবার কারণে পাবক, পামান ও শুচি নামক অগ্নিত্রয় বিজিতাশ্বের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তারা আবার যোগপতি অর্থাৎ অগ্নিত্ব পুনপ্রাপ্ত হন।

ইন্দ্রকে পিতৃযজ্ঞের অশ্ব অপহরণকারীরূপে চিহ্নিত করলেও যিনি তাকে বধ করেন নি; সেই অন্তর্ধান, নভস্বতী নামে অপর স্ত্রীর গর্ভে হবির্ধান নামে পুত্রের জন্ম দেন।

অন্তর্ধান কর আদায়, দণ্ডবিধান ও শুল্কগ্রহণ প্রভৃতি রাজবৃত্তিকে পরপীড়নকারী মনে করতেন। সেজন্য সুদীর্ঘকাল ব্যাপী একটি যজ্ঞ করার অছিলায় ঐ রাজবৃত্তি পরিত্যাগ করেন।

সেই যজ্ঞে আত্মদর্শী হয়ে, ভক্তজন ক্লেশহারী পরম পুরুষ শ্রীহরির অর্চনা করতে করতে নিপুণ সমাধি দ্বারা বিষ্ণুলোক লাভ করলেন।

হে বিদূর, অন্তর্ধানের পুত্র হবির্ধানের ঔরসে তার পুত্র হরিধানী, বহিষদ, গয়, শুক্ল, সত্য ও জিতব্রত এই ছয়টি পুত্র প্রসব করেন।

হে কুরু বংশধর বিদূর হবির্ধান পুত্র বহিষদ মহা ভাগ্যবান ও প্রজাপালক ছিলেন। তিনি সবসময়ে বিভিন্ন ক্রিয়া কান্ত ও প্রাণায়ামাদি যোগে রত থাকতেন।

তিনি যেস্থানে একটি যজ্ঞ করতেন, তার নিকটবর্তী স্থানে পুনরায় যজ্ঞ করে বসুধাতলকে যজ্ঞবেদীময় করেছিলেন।

তার পূর্বাগ্র কুশ দ্বারা সমগ্র ধরণীতল আচ্ছাদিত হয়েছিল। এজন্য, লোকে এখনও তাকে "প্রাচীনবর্হি" বলে থাকে।

তিনি দেবাদিদেব ব্রহ্মার উপদেশে সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতিকে বিবাহ করেছিলেন। শতদ্রুতি ছিলেন সর্বাঙ্গ সুন্দরী কিশোরী।

সম্যক ভূষণে সজ্জিতা সেই অপরূপা তন্বী যখন বিবাহকালে অগ্নি শুকীর ন্যায় তাঁকে কামনা করেছিলেন।

এর পূর্বে সপ্তর্বিদের যজ্ঞে তাঁদের পত্নীদের দর্শন করামাত্র অগ্নি কামাতুরা হন। তখন অগ্নিপত্নী স্বাহা সপ্তর্ষি পত্নীদের রূপ ধারণ করে অগ্নিকে তুষ্ট করেন।

পরে তিনি শুকী-রূপিণী হয়ে অগ্নির রেত শারস্তম্ভে রেখে আসেন।

অগ্নি যেমন সপ্তর্ষি ভার্যা- ভ্রমে শুকীতে উপগত হন, তেমনি সত্রদ্রুতিতেও কামাতুর হয়েছিলেন।

নব বিবাহিতা বধূ শতদ্রুতি চতুর্দিকে নূপুরের নিক্কন ধ্বনিতে দেব, অসুর, গন্ধর্ব, মুনি, সিদ্ধ, নাগ ও নর সকলকেই ভস্মীভূত করেছিলেন।

কালক্রমে শতদ্রুতির গর্ভে প্রাচীনবর্হির দশ পুত্রের জন্ম হয়। তাদের সবার নাম প্রচেতা।

তারা সকলেই সমান ব্রতধারী এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন। পিতা কর্তৃক প্রজা সৃষ্টি করতে অদিষ্ট হয়ে তাঁরা তপস্যার্থে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হলেন।

দশ হাজার বছর তপস্যা দ্বারা তপঃ গতি ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন।

অতঃপর পথমধ্যে গিরিশের সাথে দর্শন লাভ হয়। গিরিশ প্রচেতাদের প্রসন্ন হয়ে যে যে উপদেশাবলী দিয়েছিলেন, সংযত দেহ মনে তারা তাঁর ধ্যান, তপ এবং তারই আরাধনা করতে লাগলেন।

বিদূর বললেন– হে ব্রাহ্মণ, পথিমধ্যে প্রচেতাগণের সাথে শিবের যেরূপ সাক্ষাৎকার হয়, তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তাদের যে সকল উপদেশ প্রদান করেন তা আমাদের বলুন।

হে বিপ্রর্ষে, মুনিগণ সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ করে অভীষ্ট শিবের ধ্যান করলেও তার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন না। এই সংসারে সেই শিবের সঙ্গে শরীরী পুরুষদের মিলন নিশ্চয়ই দুর্লভ, প্রচেতাগণ কিভাবে তার সাক্ষাৎ লাভ করলেন?

ভগবান শিব আত্মারাম হলেও আত্মকৃত লোক রচনার প্রতিপালনের জন্য সংহারময় মূর্তি ধারণ করে বিচরণ করেন।

মৈত্রেয় বললেন– সদাচার নিষ্ঠ প্রচেতাগণ পিতৃবাক্য শিরোধার্য করে তপস্যার জন্য পশ্চিমদিকে যাত্রা শুরু করলেন।

কিয়ৎ দূরে গিয়ে তারা সমুদ্রের নিকটে এক বিস্তীর্ণ সরোবর দেখতে পেলেন। ঐ সরোবরকে তাঁদের মহৎ হৃদয়ের ন্যায় নির্মল ও প্রসন্ন জলে পূর্ণ বলে মনে হল।

সেই সরোবরে নীলপদ্ম, রক্তপদ্ম, শ্বেতপদ্ম প্রস্ফুটিত ছিল। সেখানে হংস, সারস, চক্রবাক, কারন্তব প্রভৃতি পাখিরা বসবাস করায়, তাদের কাকলীতে ঐ স্থান মুখরিত হয়েছিল।

মৃদুমন্দ বাতাসে পদ্মপরাগ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ায়, এক সুন্দর মহোৎসবের পরিবেশ রচিত হয়েছিল। সেখানে ঐ প্রচেতাগণ মৃদঙ্গপণবাদি বাদ্যের পর মধুর গীত শ্রবণ করে বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন।

সেই সময়ে ভগবান গিরিশ নিজ পার্যদগণের সঙ্গে ঐ সরোবর থেকে উত্থান করছিলেন। তাঁর গাত্রবর্ণ তপ্ত কাঞ্চনতুল্য। কণ্ঠ নীলাভ এবং লালচে ত্রিলোচন শোভিত

দেবগণ তাঁর চতুর্দিকে বেষ্টন করে স্তব করছিলেন। প্রচেতাগণ সেই প্রসন্ন বদন রুদ্রদেবকে দর্শন করে অভিভূত হয়ে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করলেন।

ভগবান রুদ্র প্রপত্রজনের আর্তি হরণ করেন। প্রণেতাগণের প্রতি তুষ্ট হয়ে ধর্মবৎসল ভগবান ভব তাদেরকে আশীর্বাদ করলেন।

তিনি বললেন– হে বৎস্যগণ, তোমরা বহিষদের পুত্র। তোমরা অতি সুশীল, ধর্মজ্ঞ ও প্রতিমান। তোমাদের অভিপ্রায় আমার কাছে অবিদিত নেই।

তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য আমি এইরূপে দর্শন দিলাম। যে ব্যক্তি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা ভগবান বাসুদেবের শরণাগত, সেই ব্যক্তি আমার অতি প্রিয়।

স্বধর্মনিষ্ট পুরুষ বহুজন্মের সাধনায় ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। তারপরে আমাকে লাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবৎ ভক্ত, তাঁর দেহান্তেই প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ লাভ হয়।

এই ব্রহ্মাদি দেবগণ ও আমি, আমাদের অধিকার কাল গত হলে ঐ বৈষ্ণবপদের সন্ধান পাব। তোমরা পরম ভাগবৎ। ভগবান বাসুদেব যেমন আমার প্রিয়, তেমনি আমার প্রতি প্রীতি করবে, এটাই স্বাভাবিক।

অতএব মঙ্গলজনক, পরম পবিত্র ও মোক্ষপ্রদগণের কথা তোমাদের বলছি। এই জল অসংকীর্ণরূপে সাধন করতে হবে।

মৈত্রেয় বললেন– ভগবান রুদ্র এভাবে করুণাঘন চিত্তে তার সামনে প্রণত রাজপুত্রগণকে নারায়ণ পরবাক্য উপদেশ করলেন। রাজপুত্র অর্থাৎ প্রচেতাগণ কৃতজ্ঞলিবদ্ধ হয়ে সশ্রদ্ধ মনে তার বাক্যাবল শ্রবণ করলেন।

রুদ্রদেব স্তব করে বললেন– হে ভগবান, আত্মজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সানন্দলাভের জন্য তোমার উৎকর্ষ সাধিত হয়। অতএব আমার স্বানন্দ লাভ হোক।

তোমার সানন্দরূপতা নিত্য সিদ্ধ। তুমি সর্বদাই নিরতিশয় পরমানন্দ রূপে অবস্থান করছ। অতএব আত্মা এবং সর্ব স্বরূপ। তোমাকে আমরা প্রণাম করি।

হে ভগবান, তুমি পদ্মনাভ। তুমি পঞ্চভূতি পঞ্চত্র ও পঞ্চইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। তোমাকে নমস্কার করি।

হে প্রভু, তুমি নির্বিকার, শান্ত ও স্বপ্রকাশ, তোমায় আমরা প্রণাম জানাই।

তুমি অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সংকর্ষণ এবং অব্যক্ত, অনন্ত ও অন্তক অর্থাৎ মুখাগ্নি লোকদাহক। তোমাকে আমরা প্রণতি করি।

তুমি নিখিলের প্রকৃষ্ট জ্ঞানদাতা ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রদ্যুম্ন। তোমাকে আমরা প্রণিপাত করি।

হে ভগবান, তুমি অনিরুদ্ধ, তুমি ইন্দ্রিয় মনের স্বরূপ, তোমাকে প্রণাম করি।

তুমি পরমহংস অর্থাৎ সূর্যরূপী, তুমি পূর্ণ ও ক্ষয়বৃদ্ধিশূন্য।

তুমি স্বর্গমোক্ষের দুয়ারে পবিত্র হৃদয়ে নিত্য বিরাজিত। তোমাকে প্রণাম জানাই।

তুমি অগ্নিরূপী চতুহোত্র কর্মের সাধনভূত। তোমার থেকেই ঐ কর্মের বিস্তার সম্ভব হয়।

তুমিই পিতৃলোকের তন্নউর্জ। তুমিই দেবলোকের অন্ন– ঈষ।

তুমিই ভগবান সোমের স্বরূপ ও দেবলোক ও পিতৃলোকের অন্নরূপ ত্রয়ীপতি। তোমাকে প্রণাম জানাই।

তুমি জলরূপী! তাই সকল জীবের সরস –স্বরূপ তৃপ্তিদান করতে সক্ষম। হে ভগবান, তোমার চরণে প্রণিপাত করি।

হে ভগবান, তুমি পৃথিবীরূপ, তুমি বিরাট মূর্তিস্বরূপ। সমস্ত প্রাণীর আত্মসমূহের দেহরূপী। তুমি ত্রিভুবনপালনকারী। (প্রাণবায়ু-স্বরূপ) তোমাকে প্রণাম করি।

তুমি পিতৃলোক ও দেবলোক প্রাপ্তির নিয়ন্তা, অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কর্মের স্বরূপ, তুমি অধর্মের ফলরূপী দুঃখদায়ক মৃত্যুস্বরূপী, তোমাকে প্রণাম জানাই।

হে ঈশ, তুমি সর্বকর্মের ফলদাতা। তুমিই জ্ঞান ও কর্মের প্রবর্তক। তুমিই সর্বজ্ঞ মন্ত্রময়! তোমাকে প্রণাম করি।

হে প্রভু! পরম ধর্মাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, আকুণ্ঠ মেধাবী, পুরাণ পুরুষ এবং সাংখ্যযোগের অধিকর্তা, তোমাকে প্রণাম করি।

তুমি অহংকারীস্বরূপী রুদ্র। তুমি (সত্ত্ব, রজ ও তমঃ) এই ত্রিশক্তির সমন্বয়ের অধিকারী।

তুমিই জ্ঞান ও কর্মের প্রবর্তক। তুমিই বিবিধ বেদবাক্যের প্রকাশক ব্রহ্মরূপী। তোমাকে নমস্কার।

প্রভু, আমরা তোমার রূপ দর্শন করতে ইচ্ছুক। যে রূপ তোমার নিজ ভক্তগণের প্রিয়তম। তোমার যে রূপ ভাগবতগণের পূজিত, তোমার চতুর্বাহুযুক্ত মূর্তি আমাদের নয়নাগোচর হোক। হে ভগবান, তোমার সেই দিব্যকান্তি রূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হোক।

যেখানে পদ্মমধ্যস্থ পত্রতুল্য সুন্দর নয়নদ্বয় অবস্থিত। সুন্দর সু, সুন্দর গণ্ডদেশ, সমান কর্ণদ্বয় শোভিত অনিন্দ্যকান্তি রূপ আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হোক।

হে ভগবান, যে রূপ, অপাঙ্গে প্রীতি মধুর হ্যস্যযুক্ত এবং চাঁচর কেশে সুশোভিত তা আমাদের প্রত্যক্ষ হোক।

হে ভগবান, তোমার যে নয়নভিরাম মূর্তি উজ্জ্বল মুকুট, বলয়, হার, নূপুর ও মেখলা দ্বারা সুসজ্জিত এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মালা এবং মণিতে সুশোভিত তা আমাদের প্রত্যক্ষ হোক।

তোমার যে রূপে কণ্ঠদেশে সিংহ স্কন্ধতুল্য রমণীয় কান্তি ও কৌস্তভমণি সুশোভিত সেই রূপ আমাদের নয়ন সমুখে প্রকাশিত হোক।

তোমার যে রূপে তুমি লক্ষ্মীদেবীকে বক্ষঃস্থলে ধারণ কর, আমরা সেই পবিত্ররূপের দর্শন চাই।

তোমার যে রূপ, শ্বাস– প্রশ্বাসের গতিতে চঞ্চল বলিসমূহ দ্বারা রমণীয়, ও অশ্বত্থ পত্রতুল্য প্রকাশমান উদর ও গভীর আবর্তযুক্ত নাভি দ্বারা স্ব-সৃষ্ট বিশ্বকে যেন, অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বলে মনে হয়, সেই রূপ আমাদের দেখাও।

তোমার যে অনিন্দ্যসুন্দর শ্যামমূর্তি দীপ্তমান পীতবসনে আচ্ছাদিত ও স্বর্ণময় চন্দ্রহার দ্বারা সুশোভিত, সে রূপের প্রকাশ হোক। তোমার ভূবন মনোহর মূর্তি আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হোক, যেখানে সমাকৃতি চরণদ্বয়, উরু ও অনুন্নত ভানুদেশ বর্তমান।

হে গুরু! তুমি তমোগুণাবলম্বী অজ্ঞ ব্যক্তিদের পথ প্রদর্শক মহাগুরু। তোমার যে রূপ শরতের পদ্ম পাপড়ির মতো চরণদ্বয় দ্বারা শোভিত, যার নখের দীপ্তিতে আমাদের অন্তরের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায়, সেই রূপ আমাদের দেখাও।

যে চরণযুগল ভক্তজনের ভীতি দূর করে, সেই শ্রীচরণকমলের দর্শন দাও।

হে ঈশ, তোমার এই রূপ অতীব দুর্লভ। যে সকল ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির ইচ্ছা করেন, তাঁরা সমর্থ হলেও, প্রত্যক্ষ করতে পারেন না।

এই রূপের প্রতি ভক্তিযোগ থাকলে, স্বধর্ম অনুষ্ঠানকারী পুরুষদের অভয় লাভ হয়।

হে প্রভু, যে ব্যক্তি ভক্তিমান, সেই তোমাকে লাভ করতে সমর্থ। কিন্তু তুমি অন্যান্য সফল দেহীর পক্ষে অতি দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য। স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিও তোমার দর্শন লাভে উন্মুখ হয়ে থাকেন।

আবার যে মানব আত্মজ্ঞানী, তিনিও তোমার দর্শন অভিলাষী। সেজন্য আমি তোমার অর্চনা ছাড়া, কোনো কিছুর প্রাপ্তি আশা করি না।

বাস্তবিকই তুমি সাধুপুরুষদেরও দুরারাধ্য। একান্ত ভক্তির দ্বারা আরাধনা করলে কোনো ব্যক্তিই বা তোমার পদতল ছাড়া অন্য সুখাদি অভিলাষ করবে?

হে ভগবান্ ভগবদ্ভক্তের অতি ক্ষণিকের জন্য সঙ্গের সাথে স্বর্গ এমনকি মোক্ষেরও তুলনা করা অসমীচিন। সুতরাং মরণশীল, মানুষের আশীর্বাদ-রূপ রাজ্যাদি বিষয়ের কথা আর কি বলার আছে?

তোমার চরণদ্বয় সংসারের কারণে গঠিত সকল অনর্থের নিবারক। তোমার কীর্তি– যশ ক্ষরণ– কীর্তন করে, এবং তীর্থে স্নান করে পুরুষের অন্তর ও বাহিরের সকল পাপ বিধৌত হয়। সেইসব সাধুগণের সঙ্গে আমাদের দেখা হোক।

যে ব্যক্তিগণের হৃদয়ে দয়া, সরলতা, গুণ বর্তমান, যারা রাগহীন তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হোক। তাহলেই আমাদের প্রতি তোমার মহৎ অনুগ্রহ প্রকাশিত হবে।

প্রভু, তোমার ভক্তগণের প্রতি ভক্তির মাধ্যমে যার চিত্ত অনুগৃহীত ও বিশুদ্ধ হয়েছে, সে বাহ্যিক বিষয়ে অনুরক্ত বা বিভ্রান্ত হয় না। তার কখনোই তমো গর্তে পতিত হয় না। সেই মননশীল ভক্ত অনায়াসে তোমার স্বরূপ দর্শন করতে পারে।

যার মধ্যে এই দৃশ্যমান বিশ্ব প্রকাশিত এবং বিশ্বমধ্যে যিনি প্রকাশিত, তিনিই পরম ব্রহ্ম। যিনি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে সর্বত্র ব্যাপ্ত তিনিই পরম জ্যোতি স্বরূপ–তিনিই ব্রহ্ম–পরম তত্ত্ব।

হে ঈশ, যার মায়া অন্যান্য ব্যক্তিদের ভেদবুদ্ধির জন্ম দেয়, তোমাতে ভেদবুদ্ধি জননে অসমর্থ সেই বহুরূপী মায়ার দ্বারা তুমি অবিকৃত থেকেও সমগ্র বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে চলেছ। আমরা যেন তোমাকে সেই স্বাতন্ত্র পুরুষ বলে জানতে পারি। তুমিই এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার এই তিন কর্মের নিয়ন্ত্রক।

যোগীগণ শ্রদ্ধান্বিত হয়ে সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে ভজন– পূজন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়ায় রত থাকেন। তারা এভাবেই ভূত ইন্দ্রিয়াদি অন্তঃকরণ দ্বারা উপলক্ষিত তোমার সাকার রূপের সম্যক্ আরাধনা করে থাকেন।

বেদে ও তন্ত্রে বা আগমে তাঁরাই সুপণ্ডিত।

হে ভগবান্ তুমিই একমাত্র আদিপুরুষ। তোমারই সুপ্ত মায়াশক্তির প্রভাবে রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ– এই ত্রিগুণের বিভিন্নতা উপলব্ধ হয়।

ঐ গুণত্রয় হতে মহতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, দেব, ঋষি, ভূতাদি এবং সমুদাত্মক এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়ে থাকে। যিনি স্বীয় মায়াশক্তির সাহায্যে চতুর্বিধ শরীর সৃষ্টি করে নিজ অংশ দ্বারা জীব ও অন্তর্যামী এই বিবিধরূপে ঐ সকল মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন।

তাকে পুর অর্থাৎ শরীরের অভ্যন্তরে শয়ন হেতু পণ্ডিতগণ দ্বিবিধ পুরুষরূপে কল্পনা করেন। মৌমাছিরা যেমন নিজেদের সৃষ্ট মধুই পান করে থাকে, তেমনি অবিদ্যা আবৃত সংসারী জীব মধু সদৃশ ক্ষুদ্র বিষয়ক সুখ ভোগ করে।

অভোক্তা, সর্বজ্ঞ, ও জীবের সর্বক্রিয়া ও অক্রিয়ায় নিয়ন্তাকে ভগবান বলা হয়।

হে অধীশ, তুমি অলক্ষ্য, অসহ্য, ও প্রচণ্ড বেগশালী কালের ন্যায় ভূতাদি দ্বারা সকল ভূতগণকে সঞ্চালনা কর।

বায়ু যেমন প্রবলবেগে সঞ্চালিত হয়ে মেঘপুঞ্জকে বিচলিত করে, তুমিও এভাবে ভূতাদিকে সঞ্চালিত করে সংহার করে থাকো। লোকগণ বিষয়ের জন্য লোলুপ হয়ে থাকে। এজন্য বিষয় প্রাপ্ত হলেও তাদের ধর্ম লাভ বর্ধি হয় না।

বরং তারা ক্রমবর্ধিত হয়ে ওঠে। তাই তারা কর্মের প্রকার নিয়ে, অর্থাৎ এভাবে কর্ম করব, এই চিন্তায় প্রমত্ত থাকে।

ক্ষুধায় কাতর হয়ে লেলিহান জিহ্বাযুক্ত সর্প মূষিককে আক্রমণ করে, তুমিও স্বয়ং অপ্রমত্ত থেকে ঐ সকল লোভী বিষয়কৃষ্ট ব্যক্তিকে আক্রমণ করে থাকো।

তোমার প্রতি অনাদরে এই শরীর বৃথা ব্যয়িত হচ্ছে, এরকম যাঁর ধারণা আছে, তারা কখনোই তোমার চরণকমল ত্যাগ করবে না। তারা অতি সুপণ্ডিত, মহান ব্যক্তি।

কান দ্বারা বিনাশের আশঙ্কায় আমাদের পূজ্য ব্রহ্মা, তোমার পাদপদ্মের শরণ নিয়ে থাকেন। দৃঢ় বিশ্বাস করে চতুর্দশ মানবও তোমার অর্চনায় নিয়োজিত থাকেন।

হে ব্রাহ্মণ, এই বিশ্ব রুদ্রভয়ে বিনষ্ট হতে বসেছে। তুমি আমাদের গতি হও। হে পরমাত্মন, তুমি আমাদের আশ্রয় হলে অপর কোনো কিছু থেকেই আমাদের ভয়ের কোনো কারণ থাকবে না।

ভগবান রুদ্র এই প্রকারে উপাস্য বস্তুর বর্ণনা করলেন। অতঃপর তিনি স্থির করে এই স্তোত্র জপ করতে থাকেন। তোমাদের কল্যাণ হোক।

যে হরি সর্বভূতে অবস্থান করেন এবং তোমাদের হৃদয়েও অবস্থান করেন, তাকে নিরন্তর জপ, স্তুতি ও ধ্যান কর।

হে রাজপুত্রগণ, তোমাদের আমি এই “যোগাদেশ” নামক স্ত্রোত্র উপদেশ করলাম। এখন তোমরা একে মনোমধ্যে ধারণ করে একাগ্র চিত্তে অভ্যেস কর।

হে প্রচেতাগণ, আমি যে স্তোত্র তোমাদের কাছে উপদেশ করলাম, তা ব্রহ্মাকথিত, ভগবান ব্রহ্মা যখন সৃষ্টিকার্যে উৎসাহিত হয়েছিলেন, তখন আমাদের কাছে এবং সৃষ্টিকার্যে সমপরিমাণে

আগ্রহী ভৃগু প্রভৃতি সৃষ্টিকার্যে উৎসাহী হয়েছিলেন, তখন আমাদের কাছে এবং সৃষ্টিকার্য্যে সমপরিমাণে যোগাদেশ করেছিলেন।

সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত হয়ে বহুবিধ সকল প্রজাপতিবৃন্দ এই স্তোত্র পাঠ করেছিল। এর ফলে অজ্ঞানস্বরূপ অন্ধকার বিনাশিত হয়ে বহুবিধ প্রজার উৎপত্তি রয়েছে।

অতএব, বাসুদেব পরায়ণ এবং অবহিত হয়ে, একাগ্রচিত্তে এই স্তোত্র জপ করলে, অচিরেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা সম্ভব।

এই সংসারে সমস্ত শ্রেষ্ঠ বিষয়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরম মঙ্গলময় বিষয় হল জ্ঞান। যিনি জ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য লাভ করতে পেরেছেন, তিনি অনায়াসে সুখে দুরভিক্রম্য বিপদসঙ্কুল ভবসাগর থেকে উত্তীর্ণ হতে পারেন।

হে প্রচেতাগণ, আমার এই স্তোত্রগান, যে বা যারা শ্রদ্ধাপূর্ণ ভক্তি সহযোগে অধ্যয়ন করবে, তাদের এতেই বিষ্ণুর আরাধনা হবে।

আমি এই যে স্তোত্রগান করলাম, এতে ভগবান শ্রীহরি স্তুত হয়ে অতি প্রীত হন। সকল জাগতিক, মহাজাগতিক কল্যাণের একমাত্র কারণ তিনিই।

সেই ভগবানকে তুষ্ট করতে পারলে সকল ইঙ্গিত বস্তু লাভ করা সম্ভব হয়। যে ব্যক্তি ঊষাকালে নিদ্রাভঙ্গ মাত্র শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে এই স্তোত্র শ্রবণ বা কীর্তন করেন, তিনি বিনা অনায়াসে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন।

হে নরদেব –নন্দনেরা, পরম পুরুষ পরমাত্মার যে স্তব আমি কীর্তন করলাম, তোমরা তা একাগ্র চিত্তে জপ করে একাগ্র চিত্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে মহৎ তপস্যা আচরণ কর। সেই তপস্যা সমাপন হলে তোমাদের অভীষ্ট লাভ হবে।

.

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

পুরঞ্জনের কথাচ্ছলে বিবিধ সংসারের বর্ণনা

মৈত্রেয় বললেন–ভগবান রুদ্র এই প্রকারে উপদেশ করলে, প্রচেতাগণ তাকে প্রণাম করলেন। এরপরে তারা ভগবান রুদ্রকে যথাবিধি পূজা করলেন, তাদের আশীর্বাদ করে ভগবান ভব সেখানেই, তাদের চোখের সামনেই অন্তর্ধান করলেন।

তারপর সেই প্রচেতাগণ রুদ্রদেব কর্তৃক গীত ভগবৎ স্তোত্র জপ করতে লাগলেন। দীর্ঘ দশ বছর ধরে তারা এই মন্ত্র জপ করতে করতে জলমধ্যে নিমগ্ন হয়ে তপস্যা করতে লাগলেন।

বৎস বিদুর, এ সময়ে সেই প্রচেতাগণের পিতা প্রাচীনবর্হি যাগাজি-কর্মে আসক্ত ছিলেন। আত্মাত্মযোগ দেবর্ষি নারদ তখন তার কাছে উপস্থিত ছিলেন। দেবর্ষি মহারাজকে প্রবোধ দিয়ে তাকে কিছু প্রশ্ন করলেন।

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন-হে রাজন, এই কাম্য কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তুমি আত্মার কিরকম মঙ্গল কামনা করছে। দুঃখ নিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তি এই দুই-ই শ্রেয়। কিন্তু তোমার প্রবৃত্তিমার্গে এই কর্মের দ্বারা উহা কখনই লাভ করা সম্ভব নয়।

রাজা প্রাচীনবর্হি বললেন– হে মহাভাগ, আমার বুদ্ধি কর্ম দ্বারা, বিক্ষিপ্ত বলে আমি মুক্তিকে পরম শ্রেয় রূপে অনুভব করতে পারিনি। আমাকে আপনি নির্মল জ্ঞান উপদেশ করুন, যাতে কর্মসকল থেকে মুক্ত হতে পারি।

কুটিল ধর্মপূর্ণ গৃহে বাস করে জীব, স্ত্রী, পুত্র। ও দনাদিকেই পুরুষার্থ বলে মনে করবে, তাতে মূঢ় ব্যক্তি সংসার পথে ভ্রমণ করে বেড়ায়, পরমার্থ লাভ করতে পারে না।

এরপরে নারদ নিজ যোগবলে যজ্ঞে নিহত পশুদের জীবিত করে তুললেন। তাদের দেখিয়ে নারদ রাজাকে বললেন– হে রাজন, তুমি নিষ্ঠুরভাবে যজ্ঞভূমিতে যে সহস্রাধিক জীব হনন করেছ, এরাই তারা! এরা তোমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। তুমি মরলেই, এদের প্রতি তুমি যে হিংসা করেছ তা স্মরণ করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে। এদের লৌহময় শৃঙ্গের আঘাতে তোমার দেহ ছিন্নভিন্ন হবে। এই সংসার দুঃখ নিস্তারের উপায় বিষয়ে পুরঞ্জনের চরিত্রঘটিত একটি পুরাতন ইতিহাস তোমাকে বলছি, শ্রবণ করো।

হে রাজা, পুরঞ্জন নামে এক মহা যশস্বী রাজা ছিলেন। তার একজন সখা ছিলেন, যাঁর নাম ও কর্ম সকলের অজ্ঞাত ছিল।

পুরঞ্জন– নিজ কর্ম দ্বারা পুর ও শরীরের জন্ম দেন, তিন জীব।

সখা–যাঁর নাম ও কর্ম কেউ জানতে পারে না, তিনি ঈশ্বর।

সেই রাজ পুরঞ্জন উপযুক্ত বাসস্থান অন্বেষণ করতে সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন।

কিন্তু নিজের পছন্দমতো স্থান অন্বেষণে ব্যর্থ হলেন। এতে তার উদ্বেগ জন্মাল। সেই রাজা বিষয়ভোগের ইচ্ছা করে, সেই কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত পৃথিবীতে যত পুর দেখলেন, কোনওটিকেই তাঁর অভিলাষ সিদ্ধির উপযুক্ত বলে মনে করলেন না।

তারপরে পুনরায় ভ্রমণ করতে করতে একদিন হিমালয়ের সানুদেশে (কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে) সেই সেই বিষয়ভোগের উপযুক্ত চিহ্নবিশিষ্ট ন-টি দ্বারে শোভিত একটি পুর অর্থাৎ মনুষ্য শরীর দেখতে পেলেন।

ঐ পুরী, প্রাচীর, উপবন, অট্টালিকা, পরিখা, গবাক্ষ এবং বর্হিদ্বার মুক্ত। উহা, সর্বত্র স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহনির্মিত শিখরযুক্ত গৃহ সকলে পরিশোভিত ছিল।

ঐ পুরীর বহির্ভাগে একটি দিব্য বৃক্ষলতা-পূর্ণ উপবন ছিল। তার মধ্যে যে জলাশয় ছিল, তা জলচর-পক্ষীগণের কলরবে এবং ভ্রমর ফুলের গুঞ্জনে মুখরিত ছিল। জলাশয়ের তীরবর্তী বৃক্ষাদির শাখা ও পল্লব, শীতল সুরভিত বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছিল।

বিভিন্ন অরণ্য জন্তুসকল পরস্পর হিংসা পরিত্যাগ করে সেখানে অবস্থান করাতে, তাদের দ্বারা কোনো উপদ্রবের আশঙ্কা নির্মূল হয়েছিল। ঐ উপবনে কোকিলেরা তাদের কুহুরবে যেন পথিকদের সাদরে অভ্যর্থনা করত।

পুরঞ্জন সেই উপবনে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি স্বেচ্ছায় আগত এক উত্তমা প্রমদাকে দর্শন করলেন।

সেই প্রমদা ছিলেন বিষয়-বিবেকবর্তী বুদ্ধি-স্বরূপা। সেই যুবতীর সাথে দশজন জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয় রূপ ভৃত্য ছিল। তারা প্রত্যেকে শত শত বৃত্তিরূপী নায়িকার পতি।

ঐ প্রমদা ছিলেন যুবতী ও কামরূপিণী। পঞ্চমস্তকযুক্ত একটি প্রাণরূপ সর্প তার দ্বারপাল ছিল।

সে সর্বদা ঐ প্রমদার রক্ষণাবেক্ষণ করত। নিজ স্বামীকে অন্বেষণ করতে তিনি ঐ উপবনে আগমন করেছিলেন।

ঐ রমণীর নাসিকা ও দন্ত ছিল অতি সুন্দর। মনোহর কপোলদ্বয়ে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত বদনে সমাকৃতি দুটি কর্ণ দ্বারা তিনি কুন্তলের শোভা ধারণ করেছিলেন।

শ্যামাঙ্গী ঐ তন্বীর কটিদেশে পিঙ্গলবর্ণ বস্ত্র ছিল। সুশোভন নিতম্বের শোভা বৃদ্ধিতে তিনি স্বর্ণময় চন্দ্রহার পরিধান করেছিলেন। তার চরণদ্বয়ের সঞ্চারণে অপূর্ব নিক্কন ধ্বনি শ্রুত হচ্ছিল।

দেবাঙ্গনার ন্যায় তিনি ইতস্ততঃ উদ্যানে বিচরণ করেছিলেন। তার নবেদ্ভিন্ন স্তনদ্বয়ে যৌবনক্রম প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি লজ্জায় সমবৃত্ত ব্যবধানহীন দুটি স্তনকে বারবার আচ্ছাদিত করে ধীরে ধীরে বিচরণ করছিলেন।

ঐ রমণীর স্নিগ্ধ অপাঙ্গদৃষ্টিতে লাজুক স্মিত হাসিতে অপূর্ব শোভা উদ্ভাসিত হয়েছিল। রাজা পুরঞ্জন ঐ যুবতীর স্নিগ্ধ কটাক্ষবাণে বিদ্ধ হয়ে সুললিত হয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন।

রাজা বললেন– হে পদ্ম পলাশ-নয়না, হে সতী, কে তুমি? তুমি কার কন্যা? এখানে কোথা হতে তোমার আগমন হয়েছে? হে ভয়শীলে, এই পুরীর সমীপস্থ উপবনে কিসের প্রত্যাশায় তোমার আগমন?

হে সুন্দরী, তোমার সঙ্গে আগত এই একাদশ মহাবলীজন কারা? এই রমণীগণ এবং তোমার অগ্রবর্তী এই সর্প–এরাই বা কারা?

হে সাধ্বী– তুমি কে? তুমি কি লজ্জা? না কি ভবানী? না বাণী? না কি রমা? মুনিগণের ন্যায় সংযত মনে এই বনমধ্যে কি নিজ পতির অন্বেষণে তোমার আগমন হয়েছে? তোমার হস্তধৃত সেই লীলা কমল কোথায় গেল?

হে সুন্দরী! না, তুমি তো দেবরমণী নও। কারণ তোমার পদতল ভূমি স্পর্শ করে রয়েছে। দেবতারা তো কখনও ভূমি স্পর্শ করে থাকেন না। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর সঙ্গে অবস্থান করে বৈকুণ্ঠপুরীর শোভা বর্ধন করেছেন। তুমিও তেমনি আমার মত বিপুলকর্মা বীর শ্রেষ্ঠর সঙ্গে এই পুরীর উল্লাসিত ভ্রাম্যমাণ ভু-দ্বয় প্রেরিত কামদেব, আমাকে অত্যন্ত পীড়ন করছে।

অতএব আমার প্রতি করুণা কর। হে চারুবাসিনী, তোমার মুখমণ্ডল, শোভন ভুদ্বয়ে ভূষিত লোচনদ্বয় মনোহর কারুকার্য অলঙ্কৃত।

তোমার সুদীর্ঘ নীলবর্ণ কেশরাশি অপূর্ব মুখমণ্ডলের শোভা বর্ধন করছে। লজ্জাবনত সুন্দর আনন, আমার অভিমুখ হচ্ছে না, মুখ তুলে একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর।

পুরঞ্জন এভাবে অধীর হয়ে ঐ রমণীকে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তখন ঐ প্রমদা সহাস্যে বীরবর পুরঞ্জনকে সাদরে সম্ভাষণ করে বাক্যলাপ শুরু করলেন।

তিনি বলতে লাগলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমার ও অন্যের কর্তার সন্ধান আমি জানি না। নাম ও গোত্র বিষয়েও আমি কিছু জানি না।

হে বীর, আজ এখানে কোন আত্মা উপস্থিত তা আমার জানা নেই। আমার আশ্রয়স্বরূপ এই পুরীর নির্মাতা কে তাও আমার জানা নেই।

হে মানব, এই নরগণ আমার সখা, এই নারীগণ সকলে আমার সখী। আমার অগ্রভাগে যে পঞ্চশীর্ষ নাগ, সে এই পুরীর রক্ষাকর্তা। আমি যখন নিদ্রিত থাকি তখন এই সর্প জাগ্রত থাকে।

হে অরিন্দম, এ আমার অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে আপনি এখানে এসেছেন। আপনার কল্যাণ হোক। আপনি যে সকল গ্রাম্যভোগ অভিলাষ করেন, আমি, আমার সখা ও সখীগণের সাহায্যে সেগুলি সম্পাদন করব।

হে প্রভু, আপনি এই নটি দ্বারবিশিষ্ট পুরীতে শত বৎসর অধিষ্ঠান করুন। আমি আপনার অভীষ্ট বস্তু আহরণ করে দিচ্ছি, আপনি তা গ্রহণ করুন।

হে বীর, আমি তোমাকে রতিরসে অনভিজ্ঞ, শাস্ত্রবিহিত সুখভোগে বিমুখ, ইহকাল–পরকালের চিন্তাশূন্য অন্য কোন পশুকুল্য পুরুষের সাথে রমণ করব?

এই গৃহাস্থাশ্রমে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, পুত্রসুখ, যশ ও লোকশূন্য পবিত্র লোক সিদ্ধ হয়।

সন্ন্যাসীগণ সেসবের নামও জানে না। হে মানব, পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, সংসারে যে গৃহস্থাশ্রম, তা পিতৃ, দেব, ঋষি, মানব ও সকল প্রাণীদিগের ও আত্মার কল্যাণকর আশ্রয়।

হে বীর, এই গৃহাশ্রমে আমার মত যুবতীরা না আপনার মতো যশস্বী, মধুরভাষী, প্রিয়দর্শন, স্বয়ং উপস্থিত প্রিয় পুরুষকে পতিত্বে বরণ করতে সদাই আগ্রহী হবে।

হে মহাবাহু, আপনার স্মিত নয়ন কটাক্ষে নিরাশ্রিত ব্যক্তিদের মনের কষ্ট চিরতরে দূরীভূত হয়। একারণেই আপনি সদা ভ্রমণ করতে থাকেন।

নারদ বললেন– হে রাজন, এই প্রকারে সেই দম্পতি পরস্পরের প্রতি ইতিবাচক সঙ্কেত করে পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। সেখানে প্রবেশ করে তারা শত বৎসর আমোদ প্রমোদ করতে লাগলেন।

পুরীর স্থানে স্থানে গায়কের মনোরম গীত দ্বারা স্তুয়মান ও স্ত্রী– মনে পরিবৃত হয়ে ক্রীড়ারত পুরঞ্জন গ্রীষ্মকালে হ্রদিনী প্রবেশ করলেন।

বিভিন্ন বিষয় অনুভবের জন্য ঐ পুরীর ঊর্ধ্বভাগে সাতটি এবং অধোভাগে দুটি দ্বার আছে। পূর্বদিকে একত্রে দ্বার দুটির নাম খাদ্যোতা (অল্প প্রকাশযুক্ত বামনেত্র ও আবিমুখী বহু প্রকাশযুক্ত দক্ষিণনেত্র) এই দুটি দ্বার দিয়ে পুরঞ্জন জ্যমৎ নামক সখার সঙ্গে রূপ– বিষয়ক বিভ্রাজিত দেশে গমন করেন।

এইরূপ-নলিনী ও নালিনী নাম পূর্বদিকের অপর দুটি দ্বারও একত্রে সংলগ্ন। এই দ্বার দুটি প্রকৃতপক্ষে অল্প ছিদ্রবিশিষ্ট বাম নাসা, এবং অধিক ছিদ্রযুক্ত দক্ষিণ নাসা।

পুরঞ্জন এই দুটি দ্বার দিয়ে গন্ধ বিষয়ক দেশ সৌরভে গমন করেন। তার সঙ্গে থাকেন সখা বিধৃত, যিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয় সহায়ক জীব। ঐ পুরীর সম্মুখে অবস্থিত পূর্ব দিকের অপর দ্বারটি হল মুখ্যা বা মুখ। এটি প্রধান দ্বার। পুরীস্থিত জীব পুরঞ্জন, এখান দিয়ে আপন ও বহুদিন দেশে গমন করেন। তখন তার সঙ্গে থাকেন রসজ্ঞ ও বিপন। তারা যথাক্রমে রসনেন্দ্রিয় ও বাহিন্দ্রিয়র সহায়ক জীব।

হে নৃপ, ঐ পুরীর দক্ষিণে পিতৃহু বা দক্ষিণ কর্ণ নামে একটি দ্বার আছে। রাজা পুরঞ্জন শ্রুতধন বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহায়ক জীবের সঙ্গে ঐ দ্বার দিয়ে দক্ষিণ পচাল রাজ্য, কর্মকাণ্ডে গমন করেন। এই পুরীর পশ্চিমদিকের দ্বারের নাম আসুরী বা শিশ্ন। রাজা পুরঞ্জন, দুর্মদ নামক সখার সঙ্গে মিলিত হয়ে গ্রামক নামক দেশে গমন করেন। গ্রাম্য বিষয়, মৈথুন সুখ বিষয়ক

দেশই হল গ্রামক। আবার পশ্চিমদিকেই অবস্থিত অপর একটি দ্বারের নাম নির্ঘাতি বা গুহ্যদ্বার।

রাজা পুরঞ্জন লুব্ধক বা পায়ু নামক সখার সঙ্গে মিলিত হয়ে বৈশাস নাম দেশে গমন করেন। ঐ দ্বারযোগে মলত্যাগ হয়।

হে মহারাজ, এই পুরীমধ্যে যতদ্বার অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বর্তমান, তাদের মধ্যে হস্ত ও পদ দুটি অন্ধ। কারণ তাদের কোনও ছিদ্র বা জ্ঞানেন্দ্রিয় নেই। কিন্তু, ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতা পুরঞ্জন, ঐ দুই ইন্দ্রিয় দ্বারা গমন ও কার্য সম্পাদন করেন।

সেই পুরঞ্জন যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, তখন বিমুচীন নামক সখা তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মোহ, প্রসন্নতা, হর্ষ প্রাপ্ত হন। পুত্র ও কত্রের সঙ্গজনিত আসক্তি কামাসক্ত চিত্ত পুরঞ্জনকে অঞ্জের মতো প্রতারত জ্ঞান করে। তখন তিনি রাণীর অনুবর্তী হয়ে পড়েন।

রাণী যখন মদ্যপান করেন, তিনিও তখন তাই করতে থাকেন। রাণী ভোজন করলে, তিনি ভোজন করেন, কোথাও গমন করলে গমন করেন, কোথাও অবস্থান করলে, তিনিও অবস্থান করেন। ঐ মহিষী গান করলে রাজাও গান গাইতে থাকেন। তিনি হাস্য করলে রাজারও মনে পুলক জাগে, তিনি হাস্য করেন। আবার মহিষী রোদন করলে পুরঞ্জনও আকুল হয়ে রোদন করতে থাকেন। রাণী গল্প করলে রাজাও নিজে গল্প করতে থাকেন। তিনি অবস্থান করলে, রাজা অবস্থান করেন। তিনি শয্যাগ্রহণ করলে, রাজাও শয্যাগ্রহণ করেন। তিনি উপবেশন করলে, উপবেশন করেন, শ্রবণ করলে, শ্রবণ করেন, আঘ্রাণ করলে, আঘ্রাণ করেন, দর্শন করলে রাজাও দর্শন করেন।

রমণী শোকাকুল হলে রাজাও শোক করতে থাকেন। ভার্যার আনন্দে রাজার মনে আনন্দ হয়, তিনি মুদিতা হলে নিজে মুদিত হন। রাণীর এবিধ সকল কার্যে অনুবর্তী হয়ে পড়েন।

হে রাজন্ পুরঞ্জন এভাবে মহিষী কর্তৃক প্রতারিত হয়ে নিজের অসঙ্গত্বদি স্বভাব হারিয়ে ফেললেন। যদিও তার পরতন্ত্র হবার ইচ্ছা ছিল না, তবু তিনি ক্রীড়ামৃগ অর্থাৎ বানরের মতো নিজ পত্নীকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

জড় প্রকৃতিতে আসক্ত জীব নিজেকে প্রকৃতির গুণ ও কার্যের কর্তা ও ভোক্তা বোধ করে, সকল কর্মে নিয়োজিত হয়।

.

ষড়বিংশ অধ্যায়

পুরঞ্জনের মৃগায়চ্ছলে স্বপ্ন ও জাগ্রদাবস্থা কথনের দ্বারা সংসার বর্ণনা

নারদ বললেন– একদিন মহাধনুর্ধর পুরঞ্জন পাঁচটি অশ্বযুক্ত অতি দ্রুতগামী রথে আরোহণ করে বনের উদ্দেশ্যে গমন করলেন।

এই পাঁচটি অশ্ব ছিল পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং দ্রুতগামী রথ ছিল পুরঞ্জনের স্বপ্নদেহ। সেই রথের দুটি দণ্ড হল অহন্তা ও মমতা।

দুটি চক্র হল পাপ এবং পুণ্য একটি প্রধান তম। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি ধ্বজা ছিল।

পাঁচটি বন্ধন ছিল, যেগুলি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু। সেই রথের একটি মহরূপ লাগাম ছিল।

একজন সারথী ছিল– বুদ্ধি। রথীর উপবেশন স্থান ছিল রথী। দুটি যোগ বন্ধন স্থান ছিল শোক এবং মোহ।

পাঁচটি প্রক্ষিপ্ত বস্তু শব্দটি হল শব্দাদি। সাতটি চর্মময় আবরণ হল সপ্তধাতু এবং পাঁচ রকমের গতি অর্থাৎ পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ছিল।

পুরঞ্জন স্বর্ণালংকৃত রথে আরোহণ করে পাঁচটি সানুবিশিষ্ট বনে অর্থাৎ ভজনীর দেশে গমন করলেন। স্বর্ণধর্ম অর্থাৎ রজোগুণে দেহ আবৃত করে তিনি অক্ষয় তৃণীর গ্রহণ করেছিলেন। সে তুণীর সর্বদা বাণপূর্ণ বাসনাময় ছিল। তিনি অহংকারোপধি মনকে সেনাপতি করে বন গমন করেছিলেন।

সে সময় পুরঞ্জনের মৃগয়া বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তির জন্ম হয়েছিল। তখন তিনি অত্যন্ত দম্ভের সঙ্গে ধনুর্বান হাতে নিয়ে ত্যাগের অযোধ্যা পত্নী বিবেকবতী বুদ্ধিকেও পরিত্যাগ করে মৃগয়ায় লিপ্ত হলেন।

যেহেতু তিনি তখন আসুরী বৃত্তি আশ্রয় করেছিলেন, সেজন্য ভীষণ নিষ্ঠুরভাবে বনে বহু পশু হত্যা করলেন।

শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, রাজা মৃগয়াপ্রবৃত্তির বশীভূত হলে, বিশেষ বিশেষ শ্রাদ্ধ নিমিত্ত অরণ্যে যতটা আবশ্যক কেবলমাত্র তত পশু নিধন করতে পারবেন।

হে রাজন, ঐ বনে মৃগয়ার সময়ে পুরঞ্জন বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট শর দ্বারা অসংখ্য পশুদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিলেন।

তখন তারা কাতর হয়ে করুণ বিলাপ করতে শুরু করল। সেই নির্মম দৃশ্য দয়ালু ব্যক্তিদের কাছে অত্যন্ত হৃদয়বিদারক মনে হয়েছিল

এভাবে পুরঞ্জন শশক, শূকর, মহিষ, গরু, সজারু এবং বহু পশু হত্যা করেছিলেন। দীর্ঘসময় ধরে মত্ত অবস্থায় মৃগয়ায় লিপ্ত হওয়ায় এক সময়ে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তার শরীরে ক্লান্তি এল, ক্ষুধা তৃষ্ণায় তিনি কাতর হয়ে পড়লেন।

হে রাজন, তখন পুরঞ্জন শিকারে নিবৃত্ত হয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করলেন। সেখানে গিয়ে স্নান করে, আহার গ্রহণ করলেন।

এরপরে শয্যায় শায়িত হলেন। এরপরে ধূপ, গন্ধলেপন ও মাল্যাদি গ্রহণ করে নিজেকে সুসজ্জিত করলেন।

এভাবে হৃষ্টপুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়ে তার মন কামাতুরা হয়ে উঠেছিল।

তখন তিনি স্বীয় মহিষীকে স্মরণ করলেন। কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেলেন না। সাত্ত্বিকী বুদ্ধিস্বরূপা ভার্যাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে পুরঞ্জন অন্যমনস্ক হয়ে অন্তঃপুরবাসিনী সখীদের ডেকে পাঠালেন।

পুরঞ্জন তাদের প্রশ্ন করলেন– তোমাদের স্বামিনীর সঙ্গে তোমাদের সব কুশল তো? আমার পুরস্থিত সম্পদ আগের মতো রুচিকর মনে হচ্ছে না, কেন?

যে গৃহে মাতা বা পতিব্রতা স্ত্রী অবর্তমান, সেখানে কোনও পণ্ডিতই দীনভাবে বাস করতে চান না। সে গৃহ চক্রবিহীন রথের ন্যায় অচল।

যিনি প্রতি পদে স্বীয় বুদ্ধিতে আমাকে চালনা করতেন, আমি বিপদে পড়লে আমাকে চালনা করতেন তিনি কোথায়?

সেই বুদ্ধিমতী নিষ্ঠাবতী ললনাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? অন্তঃপুরবাসিনী বামাগণ উত্তর দিলেন– হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার প্রেয়সীর অভিপ্রায় আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না, হে রাজা! ঐ দেখুন তিনি ভূতলে নিতান্ত অনাদরে শায়িত আছেন।

নারদ বললেন– হে রাজন! পুরঞ্জন সেদিকে দৃষ্টিপাত করে নিজ মহিষীকে দর্শন করলেন। কিন্তু প্রিয়াকে দেহের প্রতি অনাদরে ভূমিতে শয়ান দেখে তার সঙ্গলাভের জন্য পুরঞ্জন অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠলেন।

তিনি পত্নীর নিকটে গমন করলেন। ব্যথিত চিত্তে মধুর বাক্য দ্বারা প্রেয়সীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

কিন্তু প্রণয়কোপের কোনো কারণ দেখতে পেলেন না।

তখন বীরপুঙ্গব পুরঞ্জন, ধীরে ধীরে অনুনয় করে প্রেয়সীর মানভঞ্জন করতে লাগলেন।

রাজা স্বীয় পত্নীর পাদস্পর্শ করলেন, পরে তাকে কোলে নিয়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন– হে শোভনে, অপরাধ করা যে সকল ভৃত্যকে প্রভু শাস্তি দেন না, আমার মনে হয় তারা অতি দুর্ভাগা। কারণ প্রভু নিশ্চয়ই তাদের নিজের লোক বলে মনে করেন না।

হে প্রিয়ে, ভৃত্যদের প্রতি প্রভুর দণ্ডবিধান তো দণ্ড নয়, তা পরম অনুগ্রহ। কিন্তু অবোধ ক্রোধী বালক তা বুঝতে পারেন না।

প্রভু যে পরমাত্মীয়ের কাজ করেছেন তা বুঝতে সে সক্ষম হয় না। হে সুদতি, হে মনস্বিনি, তুমি আমাদের প্রভু, আমরা তোমার আত্মীয়।

আমাদের প্রতি করুণা করে একবার তোমার বদনকমলের দর্শন দাও।

এখন তোমার লজ্জিত অনুরাগে আনিত বদনে সহাস্য দৃষ্টি ঝলসিত হচ্ছে। ঐ মুখকমলে অলকাদি অলির ন্যায় শোভিত হয়েছে। অনুগ্রহ করে তোমার সুন্দর নাসিকাযুক্ত, মধুর বাক্য প্রকাশনী ও মুখখানি আমার দিকে দেখাও।

হে সুন্দরী, একবার বলো, কে তোমার কাছে কি অপরাধ করেছে? সে যদি ব্রাহ্মণ ও ভগবান না। ষড় রিপুর দাস না হয়, তাহলে এখন তার দণ্ডবিধান করব।

কিন্তু ত্রিভুবন মধ্যে বা বাহিরে এমন তো কোনও নির্ভয় লোক দেখছি না, যে কিনা আমার দণ্ডের ভয় করে না। এমন কোনো ব্যক্তি আছে, যে, হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করতে পারে?

হে সুন্দরী, একবার বলো, কে তোমার কাছে কি অপরাধ করেছে? এরকম তো আগে কখনও দেখিনি। কেন তুমি এরকম তিলকহীন, কোপাবেশ, ভয়ঙ্কর হয়েছ? কেন তোমার এমন স্নেহহীন ও অনুজ্জ্বল রূপ লক্ষ্য করছি?

তোমার এই সুস্নাত স্তনদ্বয় অশ্রুতে সিক্ত কেন? হে সুন্দরী, তোমার এই বিম্বলাকৃতি অধর তাম্বুলারাগে রঞ্জিত করোনি কেন?

তোমাকে না জানিয়ে আমি মৃগয়ায় গিয়েছিলাম। আমি তোমার কাছে অপরাধী প্রিয়ে। তবু আমার প্রতি তুমি প্রসন্ন হও। আমি তোমার বন্ধু।

হে কান্তে, যে কান্ত বশবর্তী এবং অনঙ্গবাণে যার দৈর্ঘ্য বিধ্বংস হয়, সেরূপ স্বামীকে কোনো রমণী যথোচিত বিষয়ে ভজনা করে কি থাকতে পারে?

হে প্রিয়ে, অনুগ্রহ করে আমার প্রতি অভিমান পরিত্যাগ কর।

.

সপ্তবিংশ অধ্যায়

পুরঞ্জনের আত্মবিস্মরণ

নারদ বললেন–হে মহারাজ প্রাচীনবর্হি, সেই পুরঞ্জনী এভাবে হাবভাব বিলাস দ্বারা নিজ পতি পুরঞ্জনকে সম্যভাবে বশীভূত করে ফেললেন।

এভাবে তিনি রাজার সঙ্গে ক্রীড়ায় লিপ্ত হলেন।

হে রাজন, সুস্নাতা, মনোহর বসন পরিহিতা, কুমকু সিন্দুরাদি দ্বারা কৃতমঙ্গলা মহিষী রাজার কাছে উপস্থিত হলেন। পান-ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে মহিষীকে রাজা পুরঞ্জন তাঁকে সাদরে অভিনন্দিত করলেন।

রাজা পুরঞ্জন স্ত্রৈণের মতো মহিষীর স্কন্ধদেশ ধারণ করে, তার সঙ্গে রহস্য কথা বলতেন, এতে তার যাবতীয় বিবেকবুদ্ধি লোপ পেল। দুর্জয় কাল যে তার আয়ু হরণ করছে, দিনরাত চলে যাচ্ছে, তাও তিনি বুঝতে পারলেন না। যদিও পুরঞ্জন মহামনা ছিলেন, তবুও মান্ধ হওয়ায় মহার্ঘ শয্যায় স্ত্রীর ভূজে শায়িত হয়ে তাকেই পরম পুরষার্থ বলে মনে করতে লাগলেন।

এভাবে তিনি নিজ স্বরূপ, এমনকি পরমাত্মার স্বরূপও বিস্মৃত হলেন।

হে রাজেন্দ্র, এভাবে কামাসক্ত চিত্তে নিজ স্ত্রীর সাথে ক্রীড়ারত অবস্থায়, তার নবীন বয়স ক্ষণার্ধের ন্যায় অতিক্রান্ত হয়ে গেল। অতঃপর পুরঞ্জন নিজ মহিষীর গর্ভে একশো দশ পুত্রের জন্ম দিলেন। এতে তার পরমায়ুর অর্ধাংশ বিনষ্ট হল।

তারপরে পুরঞ্জনের একশো দশটি কন্যার জন্ম হল। পুরঞ্জনের কন্যা বলে তারা পৌরঞ্জিনী নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই সচ্চারিত্র ও উদার ছিলেন। তার পিতামাতার যশ বহুগুণে বর্ধিত করেছিলেন। সেই পাঞ্চালপতি পুরঞ্জন নিজ পুত্রদের উপযুক্ত ভার্যাদের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। পুরঞ্জন নিজ কন্যাদেরও উপযুক্ত পাত্র দেখে বিবাহ দিলেন।

হে রাজ, পুত্রদের প্রত্যেকের শত শত পুত্রের জন্ম হয়েছিল। এর ফলে পাঞ্চালরাজ্যে পুরঞ্জনের বংশবিস্তার হল।

হে রাজন, সেই পুত্র, পৌত্র, গৃহে ঐশ্বর্য ও পালিতগণের প্রতি পুরঞ্জনের প্রগাঢ় মায়ার জন্ম হল। সেই বিষয়ী মায়ার প্রভাবে পুরঞ্জন বিষয়ে আবদ্ধ হলেন।

তিনি তখন বিভিন্ন পশু হননকারী যজ্ঞে দীক্ষিত হলেন। এভাবেই পুরঞ্জন নানাবিধ কামনায় দেবতা, পিতৃ ও ভূপতিগণের আরাধনা করতে লাগলেন।

এইরকম কুটুম্বাসক্তচিত্ত পুরঞ্জন আত্মাহিত বিষয়ে অনবধান থাকা অবস্থায় তার বার্ধক্য উপনীত হল। এই বার্ধক্যকাল কর্মবীর ব্যক্তিদের অত্যন্ত অপ্রিয়।

হে রাজ, চণ্ডবেগ নাচন এক বিখ্যাত গন্ধর্বপতি আছেন। তাঁর তিনশো ষাট জন বলবান গন্ধর্ব। বা দিবস আছে। ঐ চণ্ডবেগের তিনশো ষাট জন গান্ধর্বীও আছে। যথাক্রমে তারা শুক্লবর্ণা ও কৃষ্ণবর্ণা। ঐ গন্ধর্বগণ মিথুন হয়ে অবস্থান করে এবং পরিভ্রমণ দ্বারা সকল কাম– সহ পুরী অর্থাৎ দেহকে অপরহণ করে।

হে রাজন, চণ্ডবেগের অনুচর ঐ গন্ধর্বগণ পুরঞ্জনের পুরী বা দেহ পূরণ করতে শুরু করল, সেখানে অধিষ্ঠিত প্রজাগণ সর্প, তাদের প্রতিহত করতে লাগল।

কিন্তু গন্ধর্ব ও তাদের ভার্যাদের মোট সংখ্যা হল সাতশো বিশ। তবু পুরঞ্জনের পুরী রক্ষক তাদের সঙ্গে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগল। সে এক শতবর্ষ পর্যন্ত সংগ্রাম করার পরে, শেষে ক্ষীণ হয়ে পড়ল।

পুরঞ্জন নিজ পুরাধ্যক্ষের প্রাণকে ক্ষীণ হতে দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি নিজে পুরী, রাষ্ট্র ও আত্মীয়দের চিন্তায় অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

পুরঞ্জন ছিলেন স্ত্রী পরায়ণ, তাই তিনি তুচ্ছ সুখে আবিষ্ট হয়ে সংগৃহীত বস্তুসকল নিজ পুরীতেই গ্রহণ করতেন। তিনি ভয় বলে কিছু জানতেন না।

হে বহির্মান, পূর্বে যে কালের কথা আপনাকে বলেছি, তার একটা কন্যা আছে। তার নাম জরা। সে নিজ পতির অন্বেষণে ত্রিলোক পরিভ্রমণ করেছিল। কিন্তু কেউ তাকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হয়নি।

এই দুর্ভাগ্যের কারণে সেই কন্যা লোকমধ্যে দুভার্গা', বলে পরিচিত হয়েছিল। পূর্বকালে রাজর্ষি পুরু তার পাণিগ্রহণে রাজী হয়েছিলেন। এতে জরা তুষ্ট হয়ে তাঁকে রাজ্য পাইয়ে দিয়েছিলেন।

একদিন ঐ কন্যা ভ্রমণ করতে করতে আমাকে দেখতে পেল। আমি যখন সদ্য ব্রহ্মলোক থেকে মর্ত্যলোকে আগমন করেছিলাম। আমাকে দেখেই সে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হিসাবে জানা সত্ত্বেও কামমোহিত হয়ে আমাকে বরণ করল।

আমি তাকে প্রত্যাখান করাতে সে আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিল। দুঃসহ বিরাট সে অভিশাপ। সে আমাকে বলল– "হে মুনিবর, তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পরাজুখ হলে, সেজন্য তুমি কোনদিন এক জায়গায় সুস্থির হয়ে থাকতে পারবে না।"

বিফল মনোরথ সেই কন্যাকে আমি যবনেশ্বর ভয়ের কাছে যেতে বললাম। যবনেশ্বরের কাছে গিয়ে সে বলল– হে বীর! তুমি যবনদের সর্বশ্রেষ্ঠ। বীর! তুমি আমার বাঞ্ছিত পতি। আমি তোমাকে বরণ করলাম, প্রাণীগণের কৃত সঙ্কল্প তোমাকে কখনও বিফল হবেনা। হে বীর! লোকে ও শাস্ত্রে যে বস্তু প্রদেয় ও গ্রাহ্য বলে না স্বীকৃত, প্রার্থনা করলে যে না দেয়, এবং কেউ

দিলে গ্রহণ না করে, সেই দুপ্রকার ব্যক্তিই অজ্ঞ। তাদের জন্যই লোকে শোক করে থাকে। অতএব হে ভদ্র, আমি আপনার পাণিগ্রাহী। দয়া করে আমাকে গ্রহণ করুন আর্ত ব্যক্তিকে অনুকম্পা করাই পুরুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য কর্ম।

হে রাজন, কালকন্যা জরার মুখে এই উক্তি শুনে যবনেশ্বর মৃত্যু তাকে স্বীকার করলেন। হাস্যমুখে প্রসন্ন হয়ে তিনি বললেন– আমি জন্মান দৃষ্টির সাহায্যে ইতিমধ্যেই তোমার ভোগস্থান নিরূপন করেছি।

তুমি সকলকে প্রার্থনা করছ বটে, কিন্তু কেউই তোমাকে গ্রহণ করতে রাজী নয়। তারা তোমাকে অভদ্রা ও অল্লতা বলে জানে। তুমি অদৃশ্যভাবে গমন করে কর্মফল লব্ধ লৌকগমকে উপভোগ করো। এভাবেই সকলকে তুমি পতিত্বে গ্রহণ করতে পারবে। তোমাকে প্রতিকুল্য দেখে লোকে বধ করবে, এরকম আশঙ্কা কোরো না।

বরং আমার অসংখ্য যবন সেনারা তোমার সঙ্গে যাবে। তারা হল আধি-ব্যাধি স্বরূপ। এই আধি– ব্যাধি রূপ যবন সৈন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তুমিই প্রজানাশ করে আসবে। এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।

এই দেখ, এই হলো আমার ভ্রাতা। তুমিও আজ থেকে আমার ভগ্নী হও, জরা! আমি স্বয়ং ভয়ঙ্কর যবন সৈন্যদল সঙ্গে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে যাব। সকলের অলক্ষ্যে মর্ত্যলোকে বিচরণ করতে থাকব।

.

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

পুরঞ্জনের স্ত্রীত্ব-প্রাপ্তি ও মুক্তিলাভ

নারদ বললেন–হে বর্হিষ্মণ, ভয় নামক যে সকল সেনা মৃত্যুর আদেশকারিণী, তারা প্রজ্বার ও কাল কন্যার সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করতে লাগল।

হে রাজন, ঐ সৈন্যগণ একদিন পার্থিব ভোগ্যবস্তু পূর্ণ পুরঞ্জনের পুরীতে আক্রমণ করল। তখন এ পুরী জীর্ণ সর্প দ্বারা রক্ষিত ছিল। কালকন্যা দ্বারা অভিভূত হলে পুরুষ নিঃসার হয়ে পড়ে। সেই কালকন্যা বল প্রয়োগ করে পুরঞ্জনের পুরী ভোগ করতে লাগল।

যবন সেনানীরা দ্বারসকল দিয়ে সর্বত্র প্রবেশ করে কালকন্যা দ্বারা উপভোগরত পুরীকে প্রচণ্ড, পীড়া দিতে লাগল। পুরীতে এই রকম পীড়া আরম্ভ হলে আত্মীয় –কুটুম্বাদির প্রতি মমতায় আকুল ও অভিমানী পুরঞ্জন নানাবিধ তাপ ভোগ করতে লাগলেন। পরে ঐ কালকন্যা গিয়ে পুরঞ্জনকে আলিঙ্গন করল।

তখন তার শরীরের শ্রী নষ্ট হয়ে গেল। তিনি অতি দীন –হীন হয়ে পড়লেন। তারপরে গন্ধর্ব ও যবনগণ বলপ্রয়োগ করে তার সমস্ত ঐশ্বর্য হরণ করে নিল। কিন্তু, তিনি উত্থান শক্তি রহিত হওয়ায় কোনও প্রতিকার করতে অসমর্থ হলেন।

তারপরে পুরঞ্জন নিজ পুরীকে বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন পুত্র, পৌত্র সকল অনুচরবৃন্দ ও অমাত্যগণ তাঁর প্রতি প্রতিকূল, অনাদরকারী পত্নী স্নেহবন্ধন ছিন্ন করেছে। স্বয়ং কালকন্যার কবলে পড়েছেন এবং পাঞ্চাল দেশও শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

এবিধ ঘটনাবলী দেখে তিনি দুস্তর চিন্তায় আচ্ছন্ন হলেন। কিন্তু এই দুঃখের প্রতিকারের কোনও উপায় দেখতে পেলেন না। জরাহত ক্ষুধামান্দ্যর কারণে ভোগ্যবস্তুর নিঃসার হওয়া সত্ত্বেও তাকেই কামনা করতে লাগলেন। যদিও আত্মার পারলৌকিক গতি ও ঐহিক পুত্রাদি সন্তান স্নেহ বিগত হয়েছিল, তবুও পুত্র কলের লালন পালনে তিনি ব্যস্ত হয়ে রইলেন।

তারপরে নিজ পুরীকে গন্ধর্ব ও যবন সেনার হাতে আক্রান্ত এবং জরার হাতে নিপীড়িত দেখে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ পুরী ত্যাগের উপক্রম করলেন। তখন ভয়ের অগ্রজ ভাই প্রজ্বার বা বৈষ্ণব জর তাঁর নিকটে আগমন করল। ভাইয়ের প্রিয়কার্য সম্পাদনের সঙ্গে পুরী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিল।

হে রাজন, ঐ পুরী দগ্ধ হতে থাকলে কুটুম্বাদির সঙ্গে ক্রীড়ারত পুরঞ্জন, পুরবাসী, ভৃত্যবর্গ, পুত্রাদি ও পত্নীর সঙ্গে অতি সন্তাপিত হলেন।

কালকন্যা জরা পুরঞ্জনের পুরীকে গ্রাস করলে, ঐ পুরীর পালক প্রাণ প্রজার কর্তৃক সংস্পৃষ্ট হয়ে সন্তপ্ত হতে লাগল।

যবনেরা তার আয়তন রুদ্ধ করে দেওয়ায় সে মহাসঙ্কটে পতিত হয়েছিল। ঐ পুরীর দ্বার–রক্ষকবৃন্দ অত্যন্ত কষ্ট ও গুরুতর কম্প প্রাপ্ত হল। তারা পুরী রক্ষা করতে সমর্থ হল না।

সর্প যেমন বৃক্ষ, কোটরে অগ্নি-সংযুক্ত হলে, সেস্থান পরিত্যাগ করে, তিনিও তেমনি পুরঞ্জনের পুরী ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলেন। এভাবে যখন গন্ধর্বগণ পুরঞ্জনের পৌরুষ হরণ করে নিল। তার অঙ্গাদি শিথিল হয়ে এল।

শত্রু যবন সেনারা তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ করল তখন তিনি রোদন করতে লাগলেন। তার সেই ক্রন্দন ধ্বনি ঘর ঘর ধ্বনির মতো শ্রুত হয়েছিল।

কুমতিগ্রস্ত পুরঞ্জন কন্যা, পুত্র, পৌত্র, পুত্রবধূ ও জামাতা পার্ষদগণ এবং অন্য বস্তুসামগ্রী যেমন, গৃহ, ধনাগার, পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে "আমি" ও "আমার" ইত্যাদিতে মমতাবশতঃ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

পরে প্রমদার সঙ্গে বিযোগ উপস্থিত হলে, নিতান্ত দীনভাবে চিন্তা করতে লাগলেন যে, তিনি লোকান্তর গমন করলে তার প্রিয়জনের কি দুর্দশা হবে!

নিজ পত্নীর বিষয়ে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন– আমি এই দেহত্যাগ করলে আমার স্ত্রী তো অনাথ হয়ে পড়বেন। পুত্রকন্যাদের দুরবস্থা দর্শন করে, তার শোকের অন্ত থাকবে না।

আহা, যে নারী আমার অগ্রে ভোজন করেননি, কোনদিন আমি ক্রুদ্ধ হলে তিনি ভীতা হতেন। যখন আমি ভর্ৎসনা করেছি, নীরব থেকেছেন, প্রত্যুত্তর করেননি। আমার বিবেক নষ্ট হলে, ইনি প্রবোধ দিতেন, আমি বিদেশে গেলে, আমার অদর্শনে কৃশাঙ্গী হয়ে পড়তেন; তিনি এখন বীর প্রসবিণী হয়েও আমার বিরহে কাতর হয়ে পড়বেন। তখন তিনি এবিধ গৃহকর্মে আর প্রবৃত্ত হবেন কি?

আমি মারা গেলে, আমার এই পুত্রকন্যাকণ পর-প্রত্যাশী হয়ে, কিভাবে জীবন-ধারণ করবেন? মাঝসমুদ্রে নৌকা বিপর্যস্ত হলে, মাঝির অভাবে আরোহীগণ যেমন বিপদগ্রস্থ হয়, তাদের সেরূপ অবস্থা হবে।

হে রাজন, পুরঞ্জনের পুরীমধ্যে যে ভুজঙ্গম আবদ্ধ ছিল, সে পুরী ত্যাগ করে চলে গেল। তখন ঐ

পুরী বিশীর্ণ হয়ে অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে গেল।

হে মহারাজ, বলবান যবন সেনারা যখন পুরঞ্জনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলেন।

সে সময় তিনি তার পূর্বসখা ও পরম হিতকারী পরমেশ্বরকে স্মরণ করতে পারেননি। তিনি নির্দয়ভাবে যজ্ঞস্থলে যে সমস্ত পশুকে হনন করেছিলেন, তারা অতি ক্রুদ্ধ হয়ে পুরঞ্জনকে আক্রমণ করল।

পুরঞ্জনের নিষ্ঠুরতা স্মরণ করে তারা কুঠার দিয়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল। স্ত্রী সঙ্গ দোষে– অসীম অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পুরঞ্জনের পূর্বস্মৃতি নষ্ট হয়ে গেল।

সে অবস্থায় তিনি বহু বছর যাতনা ভোগ করতে লাগলেন।

পুরঞ্জন স্ত্রী চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেছিলেন। সেজন্য যমালয়ে স্বীয় কৃতকর্মের যোগ্য ফল ভোগ করার পরে, তিনি বিদর্ভ- কাজের প্রমদা হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন।

তারপর পণ্ডাশোধিপতি শত্রুর পুরী বিজয় মলয় ধ্বজ যুদ্ধে সমবেত ক্ষত্রিয়দের পরাস্ত করে বীর্যশুল্কা বিদর্ভরাজকন্যাকে বিবাহ করেন।

মলয় ধ্বজ কথাটির অর্থ–মলয়োপলক্ষিত দক্ষিণদেশে ধ্বজতুল্য দর্শনীয় অর্থাৎ ঐ দেশ বিষ্ণুভক্তি প্রধান। সেই অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন মলয়ধ্বজ, তার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ছিল। সেজন্য পুরঞ্জন স্ত্রীজন্ম হওয়া সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তির সঙ্গলাভ করে, ভাগবত– সঙ্গলাভ করতে সমর্থ হলেন।

মহাভাগবত মলয়ধ্বজ এবং বিধর্ভ রাজকন্যার গর্ভে এক কন্যার জন্ম হল। সে কন্যা ছিলেন অসিতেমনা, অর্থাৎ তাহা হতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয়।

মলয়ধ্বজের পত্নীর গর্ভে সাত পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরা হলেন শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবন, অর্চন, বন্দন ও দাস্যরূপ এই সাত প্রকার ভক্তি। এই সাত পুত্র, সাতটি দ্রাবিড় দেশের অধিপতি হন।

হে রাজন, ইহা লোক প্রসিদ্ধ যে সপ্তভক্তির দ্বারাই দ্রাবিড় দেশটি সুরক্ষিত আছে।

হে রাজন, এই সাত পুত্রের প্রত্যেকের অবুদ অর্বুদ সন্তান হয়। তাঁদের বংশধরগণ নিখিল বিশ্বকে মন্বন্তরকাল এবং তার পরেও ভোগ করবে। শ্রবণাদি ভক্তির প্রকার থেকেই বিধি সম্প্রদায় প্রবৃত্ত হয়। তারা অবিদ্যা, কাম, কর্ম থেকে পৃথিবীর লোকসকলকে রক্ষা করবে।

অগস্ত্যমুনির সঙ্গে মলয়ধ্বজের প্রথমা কন্যার বিবাহ হয়। সেই কন্যার গর্ভে দৃঢ়চ্যুত নামে এক মুনির জন্ম হয়। তার থেকে আবার ইক্ষবাহু নামক সন্তানের জন্ম হয়।

অগস্ত্য শব্দের অর্থ হল মন। অতএব পুরঞ্জনের মন কৃষ্ণ সেবারুচিকে গ্রহণ করল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত হল।

অনন্তর রাজর্ষি মলয়ধ্বজ পুত্রগণকে রাজ্যবিভাগ করে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার বাসনায় কলাচলে গমন করলেন। অর্থাৎ তিনি শ্রবণাদি ভক্তিবেদ ব্যবস্থা করে ভগবৎ সেবার্থে যাত্রা করলেন।

স্ত্রী সুলোচনা বৈদভী, তাঁকে অনুগমন করলেন। জ্যোৎস্না যেমন সর্বদা চন্দ্রকে অনুসরণ করে, বৈদভীও তেমনি পন্ডদেশাধিপতি মলয়ধ্বজের অনুগমন করলেন।

হে রাজন, মলয়ধ্বজ তপস্যার জন্য একটি নির্জন স্থানে গমন করলেন। সেখানে চন্দ্ররসা, তাম্রপর্নী ও বটোদকা নামে তিনটি নদী প্রবাহিত ছিল।

তিনি ঐ পুণ্য নদীজলে প্রত্যহ স্নান করতেন। কন্দ, বীজ, ফল, মূল, পুষ্প, পত্র, তৃণ ও জল দ্বারা নিজ জীবনধারণ করতেন।

ধীরে ধীরে যাতে তাঁর শরীর ক্ষয় হতে পারে, তিনি এরূপ ব্যবস্থা তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন।

শৈত্য, উষ্ণতা, বাত, বর্ষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রিয়, অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ এই সমস্ত দ্বন্দ্বকে তিনি জয় করেছিলেন। সর্বত্র তার সমান দৃষ্টি ছিল।

তিনি তপস্যা, উপাসনা বিবিধ নিয়ম ও শদমাদির দ্বারা কামনা বাসনাকে দগ্ধ করলেন। ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনকে জয় করে পরমাত্মাতে তার চিত্ত সমাহিত হল।

তিনি স্থানের মতো একস্থানে স্থিরভাবে দিব্য শত বছর অবস্থান করলেন।

সেই সময় তিনি ভগবান বাসুদেব রতি নিযুক্ত করায়, তাঁর দেহাদি প্রভৃতি কোনো বিষয়ের জ্ঞান ছিল না।

স্বপ্নে শিরচ্ছেদ হলে যেমন আত্মাকে দেহ অপেক্ষা ভিন্ন বলে বোধ হয়, সে রকম পরমাত্মাকে দেহাদি-প্রকাশক এবং দেহাদি থেকে পৃথক বোধ করে তিনি অপর সমস্ত বৃত্তি থেকে বিরত হলেন।

সাক্ষাৎ ভগবান হরি, গুরুরূপে তাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান উপদেশ করাতে তার সেই জ্ঞান সর্বতোভাবে দীপ্তিমান হয়ে উঠল। মৃত্যুকালে তিনি পরব্রহ্মে নিজেকে এবং আপনাতে

পরব্রহ্মকে অবলোকন করে। এবং সংসার দর্শন পরিত্যাগ করলেন। সংসার থেকে মুক্তিলাভ করলেন।

তার স্ত্রী পতিব্রতা বৈদভী। তিনি যাবতীয় ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ করলেন এবং ভক্তিভরে পরম ধর্মজ্ঞ পতি মলয়ধ্বজের সেবা করছিলেন।

তিনি জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করেছিলেন। নানাবিধ ব্রত আচরণের ফলে তার শরীর কৃশ হয়েছিল। সংস্কার ও পরিমার্জনার অভাবে তার সুমধুর কেশ জটাবদ্ধ বেণীর মতো হয়েছিল। পতিব্রতা স্ত্রী, পরলোকগত স্বামীর পাশে প্রশান্ত অনলের পার্শ্ববর্তিনী শিখরের ন্যায় শোভিত হয়েছিলেন।

সুস্থির আসনে উপবিষ্ট পতিকে, প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ বৈদভী মৃত বলে বুঝতে পারেননি। ততক্ষণ তিনি স্বামীর কাছে অবস্থান করে নিষ্ঠাভরে সেবা– পরিচর্য়া করছিলেন। এভাবে বৈদভী পতির চরণ স্পর্শ করে উষ্ণতা অনুভব করতে পারলো না। তখন তিনি সূর্যভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি নিজেকে পতি-বিরহিত ও দীন জ্ঞান করে শোকগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। অশ্রুজলে তার স্তনদ্বয় সিক্ত হল।

সেই নির্জন বনে বৈদভী করুণ কাতর স্বরে বিলাপ করতে লাগলেন। তারপর বৈদভী বিলাপ করতে করতে বলতে লাগলেন– মহারাজ গাত্রোত্থান করুন দস্যু ও অধার্মিক ক্ষত্রিয় পুরুষের হাত থেকে স্ত্রস্ত সসাগরা ধরিত্রীকে রক্ষা করুন।

সেই নির্জন অরণ্যে পতির অনুগামিনী বৈদভী পতির জন্য এভাবে বিলাপ করতে লাগলেন। স্বামীর পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন।

তারপর তিনি কাঠদ্বারা চিতা রচনা করলেন। তার মধ্যে মৃত স্বামীর দেহ স্থাপন করে অগ্নি সংযোগ করেলেন। তারপর বিলাপ করতে করতে তিনি সহমরণে যাবার সংকল্প করতে লাগলেন।

হে রাজন, সেই স্থানে এক আত্মবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মলয়ধ্বজের সখা ছিলেন। সখার প্রিয়তম পত্নীকে সহমরণে উদ্যত হতে দেখে তিনি বৈদভীকে মধুর বচনে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। ব্রাহ্মণবেশী ভগবান বৈদভীর উদ্দেশ্যে বললেন– হে সুন্দরী! তুমি কে? কার কন্যা? কার জন্যই বা অশ্রু বিসর্জন করছ? হে মহীয়সী! আমাকে চেন কি? গতজন্মে তুমি আমার সঙ্গে সখ্যসুখ অনুভব করেছিলে। তারপর তিনি বৈদভীকে তার পুর্বতন পুরুষরূপ স্মরণ করিয়ে দিলেন।

তারপর সেভাবেই তাঁকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, সখে, তোমার নিজেকে কি মনে পড়ে? কোন ব্যক্তির সঙ্গে তোমার সখ্য ছিল, মনে পড়ছে?

তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে স্ব-উপযুক্ত স্থানের খোঁজে বেড়িয়ে সংসার-ভোগে রত হয়েছিলে। হে আর্য, আমরা দুজন তখন সরোবরে একত্রে দুটি হংসরূপে বাস করতাম। আমরা দুজনেই প্রাকৃত স্থুল শরীর বা গৃহ ব্যতিরেকেই সহস্র বছর অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে পর্যন্ত বাস করতাম।

তারপরে তুমি ভোগের অভিলাষী হয়ে আমাকে ভুলে গিয়ে প্রপঞ্চে গমন করলে। লিঙ্গ শরীরের উপযুক্ত কামনা পূরণের উপযুক্ত স্থূল শরীরের অন্বেষণ করতে করতে কোনো স্ত্রী বিনির্মিত পুরী দর্শন করেছিলে সেই বাসস্থানে পাঁচটি উপবন, নয়টি দ্বার, একটি রক্ষক, তিনটি কোষ্ঠ, ছয়টি ফুল ও পাঁচটি হাট আছে। মেনুলি পাঁচটি উপাদানে নির্মিত এবং বুদ্ধিরূপা এক স্ত্রী তার কত্রী ছিলেন।

হে সখে। মনুষ্যদেহই সেই বাসস্থান। পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শব্দাদি পঞ্চ–বিষয় উমার উপবন, নয়টি ইন্দ্রিয় ছিদ্র হল, নয়টি দ্বার। একমাত্র রক্ষাকর্তা হল প্রাণ। এর তিনটি প্রকোষ্ঠ হল পৃথিবী, জল এবং তেজ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন–এরা ছয়জন কুল অর্থাৎ অভিষ্ট বিষয় প্রাপক। পঞ্চ- কর্মেন্দ্রিয় উহার হাট, মহাভূত সমূহ অক্ষয় উপাদান এবং উহার অধীশ্বরী হল বুদ্ধি।

এই শক্তিরূপা বুদ্ধির বশীভূত হয়ে পুরুষ ঐ শরীরে প্রবেশ করে। নিজেকে ও আমাকে উপলব্ধি করতে পারে না। হে সখা, তুমি ঐ বুদ্ধিস্বরূপা নারী কর্তৃক অভিভূত হয়ে তার সাথে ভোগবিহারে মত্ত হয়েছিলে। সে সময়ে তুমি নিজ স্বরূপ অর্থাৎ তুমি যে ব্রহ্মার অংশ তা বিস্মৃত হয়েছিলে। ঐ নারী সঙ্গের কারণেই তোমার এমন পাপীয়সী দশা উপস্থিত হয়েছে।

হে সখা তুমি বিদর্ভরাজকন্যা নয়। গতজন্মে তুমি সে পুরঞ্জনীর দ্বারা নবদ্বার পুরীতে আবদ্ধ হয়েছিল, তুমি তারও পতি ছিলে না। সে জন্য তুমি গতজন্মে নিজেকে পুরুষ মনে করেছিলে এবং এজন্মে নিজেকে স্ত্রী বলে মনে করছ, তা আমারই সৃষ্ট মায়ার বিলাস।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই আমরা শুদ্ধ। আমাদের স্বরূপ বর্ণনা করি।

দর্শন কর তুমি আমরা স্বরূপ। আমার থেকে ভিন্ন নও। আমিও তোমারই স্বরূপ। ভালো করে বিবেচনা করে দেখ।

পণ্ডিতেরা আমাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রভেদ দেখতে পান না। পুরুষ যেরকম একদেহ থেকেই দর্পণ ও পরপুরুষের চোখে দুই দেহ দর্শন করে। সেরূপ আমাদেরও প্রভেদ জানবে।

এইরূপে সেই মানান হংস, (অসর্বঞ্জ জীন) অপর হংস (সর্বজ্ঞ ঈশ্বর) কর্তৃক প্ররোচিত হলেন তখন তিনি তাঁর স্বামী অর্থাৎ ঈশ্বরের বিয়োগেও সুস্থির হয়ে রইলেন। তাঁর পূর্বস্মৃতি উদিত হল।

হে রাজন, আমি পুরঞ্জনের কথার ছলে তোমাকে এই অধ্যাত্মজ্ঞান উপদেশ করলাম। যেহেতু ভগবান বিশ্ব-কারণ পরোক্ষ কথায় অতিশয় প্রীত হন।

.

উনত্রিংশ অধ্যায়

পুরঞ্জন-পুরের ব্যাখ্যা

রাজা প্রাচীনবর্হি বললেন—হে ভগবান, আপনার কথার প্রকৃত ব্যাখ্যা আমরা অনুধাবন করতে পারলাম না। সম্ভবতঃ বিবেকবলে পণ্ডিতগণই তা জানতে পারেন। আমরা সাধারণ কর্মাসক্ত লোক, তা বুঝতে পারছি না।

নারদ বললেন– হে রাজা, আমি যাকে পুরঞ্জন বলে বর্ণনা করলাম, তাকে পুরুষ অর্থাৎ জীব বলে ধরতে হবে। তিনি ঐ পুর বা দেহকে নিজকর্ম অনুসারে প্রকটিত করেন, এজন্য তার নাম পুরঞ্জন। ঐ পুর, একপদ, দ্বিপদ, ত্রিপদ, চতুষ্পদ, বহুপদ বা পদহীন হয়ে থাকে।

যাঁকে অবিজ্ঞাত বলে বর্ণনা করেছি, তিনি ঐ পুরুষের সখা– ঈশ্বর।

কোনও জীব তাকে নাম ক্রিয়া অথবা গুণের দ্বারা জানতে পারে না। তাই তিনি অবিজ্ঞাত।

জীব যখন প্রকৃতির গুণাবলী সমগ্রভাবে উপভোগ করতে ইচ্ছুক হয়, তখন পূর্বোক্ত দেহকালের মধ্যে নরদ্বার বিশিষ্ট দেহকে সর্বোত্তম বলে মনে করে। সেটি হল মনুষ্যদেহ। তার মধ্যে দুটি হস্ত ও দুটি পদ বর্তমান।

পুরঞ্জনের ‘প্রমদা’ হল বুদ্ধি। এই বুদ্ধি দ্বারাই জীবের আত্মাভিমান, অর্থাৎ “আমি ও আমার এই বোধ জন্মায়।

ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা জীব রূপ– রসাদি ভোগ করে থাকে।

সকল ইন্দ্রিয় তার সখা এবং ইন্দ্রিয়াদির বৃত্তি হল তার সখী। জ্ঞান ও কর্ম তাদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রাণ, আপন, সমান উদ্যায়া ও ব্যাস– এই পঞ্চবৃত্তি সম্পন্ন নাগ বলে বর্ণিত হয়েছে।

একাদশতম ব্যক্তিকে যে নায়ক বলা হয়েছে, তাকে জ্ঞান ও কর্ম এই দুই ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর মহাশক্তিশালী মন বলে বুঝতে হবে। পাঞ্চাল দেশ রূপ ও রসাদি পাঁচটি বিষয়, এবং ঐ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে নটি দ্বারযুক্ত পুর’ বর্তমান থাকে। নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, শিশ্ন ও পায়ু– এই নটি হয় নবধার ইন্দ্রিয় “নবদ্বার” রূপে বর্ণিত হয়। জীব ঐ সকল দ্বারের সাহায্যে বর্হিদেশে গমন করে অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শে আসে। এই নটি দ্বারের মধ্যে দুটি চক্ষু, দুটি নাসিকা বদ্ধ ও মুখাবিবর এই পাঁচটি পূর্বভাগে অবস্থিত দক্ষিণ কর্ণকে দক্ষিণ দ্বারা এবং বামকর্ণকে উত্তর দ্বার বলা হয়। পায়ু ও উপস্থ দুটি অধোদ্বার পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। খদ্যোতা ও আবর্মুখী এই দুটি দ্বার হল দুটি নয়ন।

“বিভ্রাজিত জনপদকে রূপ বলে জানতে হবে। জীব চোখের দ্বারা দর্শন করে থাকে। নলিনী’ ও ‘পালিনী’ এই দুটি দ্বার হলো নাসিকাদ্বয়। গন্ধকেই “সৌরভ” দেশ বলে বর্ণনা করা হয়।

ঘ্রানেন্দ্রিয়কে ‘অবধূত’ মুখকে মুখ্যদ্বার বাগিন্দ্রিয়কে “বিপন” ও রসেনেন্দ্রিয়কে ‘রসজ্ঞ” বলা হয়।

এই দেহে বাক্যপ্রয়োগ অর্থাৎ ভাষাই “আপন” দেশ। নানাবিধ অন্নকে “বহুদন দেশ বলা হয়।

কর্ণকে “পিতৃহু” এবং বামকর্ণকে “দেবহু” বলা হয়েছে।

প্রবৃত্তিশাস্ত্র কর্মকাণ্ডকে “দক্ষিণ পাঞ্চাল” নিবৃত্তিশাস্ত্রকে বা জ্ঞানকাণ্ডকে “উত্তর পাঞ্চাল” বলে।

শ্রুতিধর বলতে শ্রবণেন্দ্রিয়কে বোঝান হয়েছে।

জীব শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করে, কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, যথাক্রমে “পিতৃসান” ও “দেবযান” মার্গে গমন করে থাকে।

মহারাজ, পশ্চিমদিকের “আসুরী” দ্বারটি ‘স্মেট’ ইন্দ্রিয়ের স্থান।

গ্রামকে স্ত্রী অঙ্গ দুর্মদ’কে উপস্থি এবং নিঋতি শব্দের অর্থ পায়ু ইন্দ্রিয়।

‘বৈশম’কে নরক বলা হয়।

‘পায়ু’ ইন্দ্রিয়কে “লুব্ধক” বলা হয়েছে।

যে দুটি অন্ধ দ্বারের কথা বলা হয়েছে, তারা হস্ত ও পদ। এদের কোনো ছিদ্র নেই। এদের সাহায্যে পুরুষ গমন ও কর্ম করে থাকে।

হৃদয়কে “অন্তঃপুর” এবং মনকে “রিমুচিন” বলা হয়। জীব ঐ শরীরের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাহয্যে প্রাণতা আনন্দ ও মোহ প্রাপ্ত হয়।

পূর্বোক্ত প্রমদা হলেন বুদ্ধি। এই বুদ্ধি স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থায় নানাবিধ বিকারের কারণ হয়। বুদ্ধির গুণে লিপ্ত আত্মা তবে বৃত্তি সকলের উপদ্রষ্টা হয়ে তাকে অন্ধভাবে অনুকরণ করে থাকে।

মৃগয়া প্রসঙ্গে যে রথের কথা বলা হয়েছে, সেই দেহই হল রথ। উহার অশ্বস্বরূপ হল ইন্দ্রিয়াদি। সংবৎসরের বেগের মত তার বেগ। পাপ ও পুণ্য ঐ রথের চক্রস্বরূপ। গুণত্রয় তার ধ্বজা। ঐ রথের পাঁচটি বন্ধন হল পঞ্চবাণ। মন হল তার রশি, সারথি হল বুদ্ধি। হৃদয়ে সেই সারথির উপবেশন স্থান নিদিষ্ট। যুগবন্ধনের দুটি স্থান হল শোক ও মোহ।

ইন্দ্রিয়ের শব্দ স্পর্শাদি এই এই পঞ্চবিষয় প্রক্ষিপ্ত হয়। আর সাতটি ধাতু হল ঐ রথের সাতটি আবরণ পুরুষ ঐ রথে আরোহণ করে মৃগয়ায় গমন করে, পঞ্চকর্ণেন্দ্রিয় তার বিক্রম।

মৃগয়াকারী পুরুষের লোপ হল একাদশ ইন্দ্রিয়। তন্মধ্যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তিনি বিষয়াদির সেবা করেন। তাকেই মৃগয়া বলে।

'চণ্ডবেগ' নামক যে কালের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল সংবৎসর তার দিবসকাল হল 'গন্ধর্ব, এবং রাত্রিসকল গান্ধবী' তিনশো ষাট দিবস নিরন্তর ভ্রমণ করে পুরুষের পরমায়ু হরণ করে।

হে রাজন কালকন্যা জরাকে কেউ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে না। স্বয়ং যবনেশ্বর মৃত্যু সকল ক্ষয়ের জন্য তাকে ভগিনীরূপে গ্রহণ করেছে।

মানসিক ও দৈহিক পীড়া সমূহকেই যবনযোন বলা হয়। শীত ও উষ্ণবেদে দু'রকম জ্বরকে 'প্রজ্বার' বলা হয়। এই জ্বর প্রাণীগণের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে।

হে রাজন, দেহী অজ্ঞান আবৃত হওয়ায় এইভাবে ঐ দেহে বহু আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ক্লেশ ভোগ করে। এইভাবে শত শত বৎসর তাকে নিপীড়িত হতে হয়।

তার আত্মা নির্গুণ, তবুও মোহান্ধ হয়ে প্রাণ ও মনের ধর্ম আত্মাতে আরোপ করে সামান্য বিষয় সুখ অনুভব করে। প্রাণের ধর্ম–ক্ষুধা, পিপাসা এবং ইন্দ্রিয়ের ধর্ম হল–কামাদি। মনের ধর্ম সংকল্প।

জীব স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ স্বভাব। আত্মাকে ও পরম গুরু ভগবানকে জানতে না পারায় যে প্রকৃতির গুণসকলে আসক্ত হয়। তখন প্রকৃতির গুণে অভিমান হেতু সেই পুরুষ অবশ হয়ে কর্মে লিপ্ত হয়। এই কর্মসম্পাদনের সময়ে যেরূপ কর্ম হয় তদনুসারে পরজন্মে জন্মলাভ হয়। অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যে রকম কর্ম হয় সেরকম জন্ম হয়। তার সাত্ত্বিক কর্ম হলে প্রকাশবহুল দেবাদি লোকপ্রাপ্ত হয়।

রাজসিক হলে দুঃখ বহুল তোক ও তামসিক হলে উকট শোক ও মোহ প্রাপ্ত হয়। এভাবে অজ্ঞ জীব কখনও স্ত্রী, কখনও নপুংসক হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কর্ম ও গুণ অনুসারেই তার বিভিন্ন যোনিতে যেমন দেব, মনুষ্য বা তির্যক যোনিতে জন্ম হয়।

জীবের আশয় কামে ব্যাপ্ত হওয়ায় সে তদনুসারে উচ্চ ও নীচ পথে ভ্রমণ করে। তাতে কখনো ঊর্ধে, কখনো মধ্যে, কখনো বা অধোলোকে তার গতি হয়। এবং নিজ অদৃষ্ট অনুসারে প্রিয় বা অপ্রিয় (সুখ বা দুঃখ) ভোগ করে থাকে।

আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক– এই তিনরকম দুঃখের মধ্যে যদি সকলেরই প্রতিক্রিয়া থাকে, তবুও যে-কোনো একটির সঙ্গে জীবের একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে না। কারণ ঐ প্রতিকারও দুঃখ স্বরূপ। এজন্য কোনো না কোনো ক্লেশ তাকে ভোগ করতেই হয়।

পুরুষ মস্তক দ্বারা গুরুতর ভার বহন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে, স্কন্ধে স্থাপন করে। কিন্তু তাতে একেবারে দুঃখের প্রতিকার হয় না। অন্যান্য প্রতিক্রিয়াতেও দুঃখ আছে।

মহারাজ জ্ঞানরহিত কর্ম দ্বারা কখনও শবাসন কর্মাবলীর প্রতিকার হওয়া সম্ভব নয়। বাসনান্বিত ও জ্ঞানরহিত এই দুই প্রকার কর্মই অবিদ্যার দ্বারা সংঘটিত হয় এর ফলে পরস্পর নির্বত্য ও নিবর্তক কিভাবে হওয়া সম্ভব–স্বপ্নাবস্থায় যে স্বপ্ন দৃষ্ট হয় জাগরণ ভিন্ন কখনই তার সম্পূর্ণ প্রতিকার হতে পারে না।

বস্তু না থাকলেও সংসার নিবর্ত হয় না স্বপ্নে ভ্রমণকারী পুরুষের ন্যায় উপাধিকৃত মন দ্বারা উহা বর্তমান থাকে। আত্মতত্ত্ব উপদেশ দ্বারা দেহাত্মাভিমান নিবৃত্ত হলেও নানাবিধ বাসনার মূল ও সংসারের কারণ মনের অধীনে থাকলে জীবের সংসারে নিবৃত্তি হয় না।

যে মনের কারণে পুরুষার্থস্বরূপ জীবাত্মার অনর্থবহুল সংসার পরস্পরা চলছে, একমাত্র পরমগুরু বাসুদেব ভক্তির দ্বারা সেই মনকে উচ্ছেদ করা যেতে পারে।

ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তিযোগ প্রযোজিত হলে, তা বৈরাগ্য জ্ঞানের জন্ম দেয়।

হে রাজর্ষি, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে নিত্য শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণ ও অধ্যায়ন করে তার ভক্তিযোগের উৎপত্তি হয়।

হে রাজন, যে স্থানে নির্মল হৃদয়যুক্ত ভগবৎ– ভক্ত সাধুগণ ভগবানের সকল গুণাবলীর কথন ও শ্রবণের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হয় অবস্থান করেন, ঐ মহতের মুখ– নিঃসৃত মধুসূদনের চরিত্র কথা অমৃত বারির ন্যায় চতুর্দিকে প্রবাহিত হতে থাকে।

যাঁরা অসংবুদ্ধি-শুন্য হয়ে সমুৎসুকভাবে ঐ চরিত্রকথা শ্রবণ করেন, তাদের ক্ষুধা –তৃষ্ণা, শোক, ভয়, মোহ, স্পর্শ করতে পারে না।

মানুষের যদি সৎসঙ্গ লাভ না হয়। এবং নিজে ভগবৎ কথা চিন্তনে উৎসাহী না হয় তাহলে তারা নিত্য ক্ষুধা-তৃষ্ণাদির চিন্তায় নিত্য উৎপীড়িত হয়। এজন্য ভগবানের কথা রূপ সমুদ্রে তার রতি হয় না।

প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা, স্বয়ং ভগবান মহাদেব স্বায়ব মনু, দক্ষাদি প্রজাতিগণ, মনকাদি নৈষ্টিক ব্রহ্মচারীগণ, মরীচি, অত্রি, আঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ এবং আমিও এখনও পর্যন্ত সর্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে জানতে পারিনি।

কর্মীগণ অতি বিশাল ও দুষ্পর বেদভাগে অবস্থান করে এবং বেদের মন্ত্রানুযায়ী ইন্দ্রাদি দেবতাগণের ভজনা করে পরমেশ্বরের তত্ত্ব জানতে পারে না।

ভগবান বাসুদেব আত্মাতে ভাবিত হয়ে যখন যার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন লোকব্যবহারে ও কর্মমাগে তার পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধি ত্যক্ত হয়।

হে বর্হিষ্মান অজ্ঞানতাহেতু পরমার্থরূপে প্রতীয়মান শ্রুতিমধুর কিন্তু বাস্তবিক অন্তঃসারশূন্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কহীন কর্মে লিপ্ত না হওয়াই ভাল।

যে ব্যক্তিসকলের বুদ্ধি মলিন, তারাই বেদকে কর্মপর বলে। তারা বেদের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে অপারগ। ভগবান যে বৈকুণ্ঠলোকে বিরাজমান, তারা সেই বৈকুণ্ঠলোককে স্বরূপের প্রাপ্য লোক বলে জানতে পারে না।

হে রাজন, প্রগিগ্র কুশসমূহের দ্বারা ক্ষিতিমণ্ডল আস্তীর্ণ হয়েছে। তুমি বহু পশু হনন করে সততানুষ্ঠান করে নিজেকে মহাজ্ঞানী বলে অহংকার করছ। কর্মদ্বার প্রাপ্য লোকের সন্ধান জানলেও বিদ্যাস্বরূপ পরম বস্তুর সন্ধান পাওনি।

কর্ম ও বিদ্যা বলতে কি বোঝায়, আমি তোমায় বলছি, শ্রবণ কর। যার দ্বারা ভগবান, হরির পরিতুষ্টি হয়, তাই কর্ম।

যার দ্বারা ভগবানে মতি হয় তাই বিদ্যা।

ভগবান হরি দেহধারী সকল প্রাণীর আত্মা ও নিয়ন্তা তিনিই নিরপেক্ষভাবে সকল জগতের কারণ। এই সংসারে তাঁর পাদমূলই জীবগণের আশ্রয়।

শ্রীহরির চরণ আশ্রয়েই জীবের সকল মঙ্গল সাধিত হয়, অর্থাৎ কালাদি ভয়ের নিবৃত্তি হয়। ভগবান হরিই প্রিয়তম তিনিই আত্মা। তাঁর সম্পর্কে কোনো ভীতির কারণ নেই।

যে ব্যক্তিরই এই জ্ঞান আছে, তিনিই বিদ্বান। যিনি বিদ্বান তিনিই গুরু। এই গুরুকে শ্রীহরি থেকে অভিন্ন বলে জ্ঞান করা উচিত।

দেবর্ষি নারদ বললেন– হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমার জিজ্ঞাসার উত্তরে এইসব কথা বললাম। এখন একটি গূঢ় বিষয় বলছি শ্রবণ কর। একটি হরিণ একদিন ফুলের বাগানে, এক হরিণীর সঙ্গে ক্ষুদ্র সুখে ক্রীড়ামত্ত। তার কানে ভ্রমর গুঞ্জন ছাড়া কিছুই শ্রুত হচ্ছে না। বৃকগণ তাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। যে-কোনো সময়ে তার পিঠে ব্যাধের তির এসে প্রাণ কেড়ে নিতে পারে কিন্তু তবু সেই হরিণের কোনো দিকে হুঁশ নেই। তুমি সেই হরিণের কথা চিন্তা কর।

হে রাজন, — ব্যাধহস্তে নিহত মৃগের ন্যায় নির্ভিন্ন হৃদয় এই আত্মাকে দর্শন কর।

যিনি অগ্রে সুখদায়ক কিন্তু পরিণামে দুঃখপ্রদ পুষ্পের ন্যায় সমান ধর্মশালী ঘোষিৎ-গণের সঙ্গে গ্রহে কাম্য- কর্মদতে পুষ্প-মধুগন্ধের মতো অতি সামান্য কামজ সুখ অন্বেষণ করছেন। যিনি স্ত্রীর সঙ্গে মিথুন হয়ে একমাত্র তার প্রতি মনোনিবেশ করছেন।

পুত্র কলত্রাদির আলাপ কোলাহলে যার দুটি কান লুব্ধ, “কাল” যে তাঁর আয়ু হরণ করেছে এ বিষয়ে তার কোনও খেয়াল নেই।

তিনি কোনও বিষয়ে মনোযোগ না দিয়ে গৃহমধ্যে বিহার করছেন। আর কৃতান্ত যার পশ্চাতে বা পরোক্ষে অবস্থান করে দূর থেকে তার উদ্দেশ্যে শরসন্ধান করছেন, সেই মৃগের ন্যায় মরণোন্মুখ আত্মার বিষয় বিচার কর।

হে রাজন– তুমি নিজ হৃদয়ে আত্মার মৃগতুল্য চেষ্টার বিষয় বিচার করে হৃদয়ের মধ্যে চিত্তকে বন্ধ কর। বহিরিন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলিতে অন্তর্মুখী করে চিত্তমধ্যে নিরুদ্ধ কর।

কামুকগণের গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করে সফল জীবের আশ্রয় ঈশ্বরের চরণে সংস্থাপিত কর। ক্রমে ক্রমে সকল কর্ম থেকে বিরত হও।

মহারাজ প্রাচীনবর্হি বললেন– হে ব্রাহ্মণ, আপনি যা বললেন–আমি তার সম্যক্ বিচারের চেষ্টা করলাম। মনে হয় আমার উপদেশক উপাধ্যায়গণ এই বিষয়ে অজ্ঞাত ছিল।

হে ব্রাহ্মণ, এই আত্ম– তত্ত্ব– বিষয়ে উপাধ্যায়গণের বাক্যের সঙ্গে আমার বিরোধ হওয়ায় যে অসম্ভবনারূপ মহৎ সংশয় ছিল, আপনি তা ছিন্ন করলেন। কিন্তু, এখনও আমার ঐ বিষয়ে আরও সংশয় আছে।

এই আত্মতত্ত্বে ইন্দ্রিয় বৃত্তিসমূহের অপ্রবৃত্তিহেতু ঋষিগণও মুগ্ধ হয়ে থাকেন।

জীব যে দেহ দ্বারা ইহলোকে কর্মত্যাগ করে, সেই দেহ এখানেই পরিত্যাগ করে যায়। এই লোকে যে কর্ম করে তার ফলেই পরলোকে অপর দেহপ্রাপ্তি হয়। সেই দেহ দ্বারা বারংবার ঐ সকল কর্মের ফলভোগ করে। বেদবিদগণের এইরূপ বাক্য, তত্ত্বৎ প্রসঙ্গে শোনা যায়।

কিন্তু এটাই কি সংগত বলে মনে হয় কি? এক দেহের কৃতকর্ম, অপর দেহে ফলভোগ, ঐ আবার কেমন কথা? এর ফলে কৃত– নাশ এবং অকৃতের অভ্যাগম– রূপ দোষ হয়। আর লোকে বেদোক্ত যে কর্ম করে, পরক্ষণেই তা অদৃশ্য হয়। বিনষ্ট কর্মের ফল কিভাবে ভোগ করা সম্ভব?

নারদ বললেন, হে রাজন, জীব ইহলোকে যে মনঃপ্রধান লিঙ্গশরীর কার্যের কারণ হয়, পরলোকেও ঐ শরীর দ্বারা স্বর্গ নরকাদি ভোগ হয়। স্কুল দেহ বিনষ্ট হলেও, মনঃপ্রধান লিঙ্গ দেহের বিনাশ হয় না, অতএব তার দ্বারাই যে ফলভোগ হবে, এতে আশ্চর্যের কি আছে?

জাগ্রত অবস্থায় এই যে দেহ বর্তমান এতদভিমানী জীব শায়িত অবস্থায় স্বপ্নে জাগ্রতদেহ পরিত্যাগ করে মনোমধ্যে স্থিত কর্মসমূহকে স্বপ্নদেহ দ্বারা ভোগ করে। সে রকমই স্বপ্নদেহের মতো কর্মজন্য পশ্চাদি দেহ অথবা অন্য কোন দেহ- দ্বারা লোকান্তরে ফলভোগ করবে, এতে আশ্চর্যের কি আছে?

“এরা আমার পুত্র” “আমি ব্রাহ্মণ” “আমি ক্ষত্রিয়” এইরূপ অভিমান করে জীব মনস্ক প্রধান লিঙ্গ দেহ দ্বারা থেকে দেহপ্রাপ্ত হয়, সেই দেহ হতে সিদ্ধ কর্ম পুনঃপ্রাপ্ত হয়। সেই সমস্ত কর্ম অহংকার দ্বারা পরিগৃহীত হওয়ায় তার দ্বারাই পুনর্জন্ম হয়ে থাকে।

এতদ্বারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, যে মনোবিশিষ্ট অভিমানকারীই কর্তা, যে দেহ অভিমানের বিষয়, তা দ্বারা মাত্র।

কর্মসকল পরক্ষণেই নষ্ট হয়ে যায়, এতে পরকালে সে সকলের ভোগ কেমন করে সম্ভব সে বিষয়ে তুমি সংশয় প্রকাশ করছ।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে- যেমন ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞান ও কর্মরূপ দ্বিবিধ প্রবৃত্তি দ্বারা চিত্তের অনুমান করা হয়, তেমনি হৃদয়বৃত্তির সাহায্য পূর্বদেহ জন্য কর্মসমূহের অনুমান হয়ে থাকে। বর্তমান দেহের দ্বারা জীব কোথাও কখনও যে বস্তুর উপভোগ, দর্শন বা শ্রবণ করেনি, স্বপ্ন বা মনোরথ ইত্যাদিতে কদাচিত সেই ধরনের বস্তুর তদ্রূপ উপলব্ধি হয়।

অতএব বাসনাময় লিঙ্গ দেহাশ্রয়ী, জীবের উক্ত অনুভবাদি– যুক্ত পূর্বদেহের উৎপত্তি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন কর। কারণ কোনো বিষয় কদাচিত অনুভূত না হলে, তা কখনও চিত্তে স্ফুরিত হতে পারে না।

মনই, মানুষের ভবিষ্যতে উন্নতিপ্রাপ্তি বা নিচত্বপ্রাপ্তি হলে যেমন রূপ হবে, তা ঔদার্য ও কার্পণ্যাদি বৃত্তির দ্বারা জানিয়ে দেয়।

অতএব কারও ঔদার্য ও কার্পণ্যাদি দেখলেই লোকে বলে থাকে, এ ব্যক্তি পূর্বজন্মে এরূপ ছিল, পরেও এ প্রকার হবে।

অদৃষ্ট ও অশ্রুত বিষয় কখনো কখনো স্বপ্নবস্থায় মনে দেখা যায়, যেমন পবর্তাগ্রে সমুদ্র, দিবসে নক্ষত্র দর্শন, নিজের শিরচ্ছেদন তার কারণ, সুখ-দুঃখ জনিত প্রাচীন কর্মদ্বারা অথবা দেশ, কাল ও ক্রিয়াকে আশ্রয় করে, নিদ্রাদি দোষবশতঃ দৃষ্ট হয়ে থাকে।

সকল মানুষেরই মন আছে, সকল বস্তুই ক্রমানুসারে মন ও ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়। এই মনের দ্বারাই যে-কোনো অবস্থায়, যে-কোনো বস্তুর অনুভব হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

অতএব স্বপ্নে রাজা নিজেকে যেমন দরিদ্ররূপে দর্শন করতে পারেন, আবার দরিদ্র নিজেকে রাজারূপে দর্শন করতে পারেন।

রাহু চন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থাতেই দৃষ্ট হয় অন্য সময়ে তাকে দেখা যায় না। যোগী পুরুষদের সত্ত্বে কনিষ্ট ভগবৎ– ধ্যানপরায়ণ মনে এই জগৎ যেন সংযুক্ত হয়েই প্রকাশিত হয়। একথা প্রসিদ্ধ যে, শুদ্ধ মনের মধ্যে বিষয়ের যে স্ফুরণ ঘটে, তা যোগীদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, বিষয় পেঞ্চ তন্মাত্র্য ও গুণসকলের পরিণাম লিঙ্গদেহে যে পর্যন্ত বর্তমান থাকে, সে পর্যন্ত জীবের "আমি" "আমার" –এই অভিমান সদ্ভূত স্থূলদেহের সাথে লিঙ্গদেহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। অতএব কদাচিৎ কর্তৃক ভোক্তৃত্ব বিরহে মুক্তি প্রসঙ্গ হয়, এমন আশংকা কোরো না।

সুষুপ্তি, মূর্খ, ইষ্ট-বিয়োগজনিত দুঃখ, মৃত্যু ও উৎকট জুরাদির অবস্থায় "আমি মননকর্তা "আমি শ্রোতা" ইত্যাদি অভিমান ইন্দ্রিয় ব্যাপার একান্ত সঙ্কুচিত হওয়ায় উহা প্রকাশিত হয় না। কিন্তু অধ্যাসে নয়, মনের বৃত্তি সূক্ষ রূপে থাকে।

যুবাপুরুষের একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা লিঙ্গ-দেহ বা অহঙ্করণ যেমন সুব্যক্ত হয় গর্ভকালে বা বাল্যকালে সেই ইন্দ্রিয়াদি অসম্পূর্ণ থাকার কারণে প্রকাশিত না হলেও তার অধ্যাস থাকে।

যেমন স্বপ্নাবস্থায় বিষয়াদির অভাব থাকলেও বিষয় গ্রহণরূপ অনর্থের উদয় হয়, তেমনি জীবের যতক্ষণ দেহাভিমান থাকে, ততক্ষণ তার মুক্তি ঘটে না।

পঞ্চতন্মাত্র, ত্রিগুণ ও ষোড়শ বিকার বিস্তৃত এই লিঙ্গদেহ এইভাবে চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত হলে, তাকে জীব বলা হয়। এই লিঙ্গদেহ দ্বারাই পুরুষ স্থূলদেহ সকল গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে থাকে। এই লিঙ্গদেহ দ্বারাই পুরুষ হর্ষ, শোক, ভয়, দুঃখ, সুখ, অনুভূত হয়।

তৃণ জলৌকা বা জোঁক অন্য তৃণ অবলম্বন করেই পূর্বধৃত তৃণ পরিত্যাগ করে, তার আগে নয়। পুরুষ ম্রিয়মান হলে পূর্বদেহের আরম্ভক কর্মসকলের সমাপন দ্বারা অন্যদেহ অবলম্বন না করা যাবৎ, পূর্বদেহাভিমান পরিত্যাগ করে না।

হে নরনাথ, বস্তুত মনই প্রাণীসকলের সংসারের কারণ, ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা উপযুক্ত বিষয়সমূহের ধ্যান করেই পুরুষ পুণঃ পুণঃ কর্ম থাকলেই অবিদ্যা থাকে।

এই অবিদ্যার কারণেই দেহাদির কর্মে বন্ধন হয়। অতএব ঐ বিদ্যায় নিবারণার্থে সর্বান্তকরণে ভগবান হরির ভজনা কর। এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ তিনিই।

মৈত্রেয় বললেন, বৎস বিদুর, ভগবৎ– প্রধান ভগবান নারদ এইভাবে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ উপদেশ করে সিদ্ধলোকে গমন করলেন।

রাজর্ষি প্রাচীনবর্হিও মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বললেন– আমার পুত্রদের প্রজাসৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ করতে বলবে। একথা বলে তপস্যার জন্য কপিলাশ্রমে গমন করলেন।

সেই আশ্রমে সঙ্গ পরিত্যাগ করে একাগ্রচিত্ত হয়ে ভগবান গোবিন্দের চরণের আরাধনা করেছিলেন। তার প্রতি ভক্তি-প্রভাবে অচিরেই তাঁর ভাগবৎ সাম্য লাভ হল।

অর্থাৎ তিনি সারূপ্য মুক্তি লাভ করলেন। হে অনঘ, দেবর্ষি নারদ কর্তৃক ব্যথিত এই পরোক্ষ আধ্যাত্মতত্ত্ব শ্রবণ এবং কীর্তন করলে লিঙ্গ দেহ থেকে বিমুক্তি সম্ভব।

হে বৎস, দেবর্ষি নারদের মুখ– নিঃসৃত এই আধ্যাত্ম –তত্ত্ব ভগবান মুকুন্দের সঙ্গে ত্রিভুবন পবিত্র করে। ইহা চিত্তশুদ্ধিকর এবং পরমাত্মাপ্রদ প্রাপক।

মহগণের কীর্তমান এই আখ্যান যিনি হৃদয়ে ধারণ করেন, তিনি সকল বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেন। এই পুরঞ্জনের উপাখ্যান পরোক্ষভাবে বর্ণিত অদ্ভুত আধ্যায়তত্ত্ব। আমি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় লাভ করেছিলাম। এর দ্বারা বুদ্ধিযুক্ত আত্মার অহংকার ছিন্ন হয়।

.

ত্রিংশ অধ্যায়

প্রাচীনবর্হির পুত্রগণকে বিষ্ণুর বরদান

বিদুর প্রশ্ন করলেন– হে ব্রাহ্মণ আপনি রাজা প্রাচীনবহির যে পুত্রদের কথা বললেন, তারা রুদ্রগীত দ্বারা ভগবান হরিকে তুষ্ট করে কিভাবে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন?

হে বৃহস্পতি শিষ্য মৈত্রেয় ঐ প্রচেতাগণ অযাচিত ভাবে কৈবল্যনাথ প্রিয় দেবাদিবের মহাদেবের দর্শনপ্রাপ্ত হয়ে ও অনুগ্রহভাজন হয়ে নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে ইহলোকে ও পরলোকে কি কি লাভ করেছিলেন?

মৈত্রেয় বললেন– নিজ প্রজা সৃষ্টির কামনায় প্রচেতাগণ সমুদ্রমধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রুদ্রগীত জপ, যজ্ঞ ও তপস্যার দ্বার ভগবান শ্রীহরির তুষ্টি বিধান করেছিলেন।

দশ হাজার বছর পরে সনাতন পুরুষ ভগবান বিষ্ণু তাদের সামনে আবির্ভূত হলেন। ভগবান বিষ্ণুর অপরূপ কান্তি অবলোকন করা মাত্র তাদের তপঃক্লেশ নিমেষে দূরীভূত হয়ে গেল।

জলপূর্ণ কৃষ্ণমেঘ যেমন সুমেরু শৃঙ্গে আরোহণ করে, তেমনি তিনি গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর পরিধানে পীতবসন গলদেশে কৌস্তুভমণি ছিল। তাঁর অঙ্গের দীপ্তিতে সকল দিক উদ্ভাসিত হয়েছিল।

উজ্জ্বল কণকময় ভূষণ দ্বারা কপোলদেশ ও বদন শোভিত হয়েছিল মস্তকে কিরীট ও এবং অষ্টভূজে আট প্রকার আয়ুধ সকল শোভিত ছিল। মুনি ও দেবগণ তার সেবায় নিয়োজিত ছিল। গড়র কিন্নরের ন্যায় পক্ষের দ্বারা তাঁর গুণকীর্তন করছিল। তার বক্ষোস্থলে লক্ষ্মীদেবী অবস্থান করছিলেন।

এইপ্রকার ঐশ্বর্যশালী আদিপুরুষ শ্রীহরি সদয় দৃষ্টিপাত করলেন। জলদ গম্ভীর শান্ত স্বরে তিনি শরণাগত প্রচেতাগণের উদ্দেশ্যে আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন। তারা কৃতাঞ্জলী হয়ে তাঁর বাণী শ্রবণ করতে লাগলেন।

ভগবান বললেন– হে রাজনন্দনেরা পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য হেতু তোমরা একই ধর্মে অবস্থান করছ। তোমাদের সৌহার্দ্যে আমি পরিতুষ্ট হয়েছি। তোমাদের মঙ্গল হোক। আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।

যে মানব সন্ধ্যায় তোমাদের স্মরণ করবে ভ্রাতৃগণের প্রতি তার আত্মতুল্য স্নেহ ও সকল প্রাণীর প্রতি সৌহার্দ্য হবে। যারা সমাহত হয়ে সকাল সন্ধ্যা রুদ্রগীতির দ্বারা আমার স্তব করবে তাদের অভীষ্ট লাভ হবে। আমি তাদের নির্মল প্রজ্ঞা প্রদান করব।

যেহেতু তোমরা হৃষ্টচিত্তে পিতার আদেশ পালন করেছ, সেজন্য সমস্ত লোকে তোমাদের কীর্তি পরিব্যাপ্ত হবে। তোমাদের ব্রহ্মার তুল্য এক গুণবান পুত্রের জন্ম হবে। তবে সন্তানগণের সাহায্য এই ত্রিভুবন পরিপূর্ণ হবে।

হে রাজপুত্রেরা ইন্দ্রপ্রেরিতা এক অপ্সরা প্রম্লোচা, কুণ্ডু নামক ঋষির ঔরসে এক পদ্মলোচনা কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন। তারপর তিনি সেই কন্যাকে ত্যাগ করে চলে যান। তখন বৃক্ষরাজি

তাকে গ্রহণ করে। ঐ শিশুকন্যা যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে ক্রন্দন করছিল তখন বনস্পতি–অধিপতি চন্দ্র দয়াপরবশ হয়ে নিজ অমৃতবর্ষিনী অঙ্গুলী তর্জনী প্রদান করেছিলেন।

তোমাদের পিতা প্রাচীনবর্হি আমার অনুববৃত্তি করে তোমাদের প্রজা সন্তুষ্টি করতে আদেশ দিয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্য পালনের জন্য তোমরা অবিলম্বে প্রশ্লোচা কন্যার পাণিগ্রহণ করো। সকলেই তোমার সমধর্মা ও সমচরিত্র, অতএব ঐ কন্যাও তোমাদের সঙ্গে অভিন্ন ধর্ম ও চরিত্র আশ্রয় করে, তোমাদের প্রতি তুল্যরূপে অন্তঃকরণ স্থাপন করে তোমাদের পত্নী হবে। ধর্ম ও শীলের ঐক্য এবং আমার অনুমতির কারণে তোমাদের সকলের একপত্নী গ্রহণে কোনো দোষ হবে না।

আমার অনুগ্রহে তোমরা অপ্রতিহত বলশালী হয়ে দেবপরিমাণ হাজার বছর পার্থিব ও স্বর্গীয় ভোগ লাভ করবে। তারপরে আমার প্রতি তোমাদের অচলা ভক্তির উদয় হবে, তার সাহায্যে অন্তঃকরণে কামাদি মন দগ্ধ হবে। বৈরাগ্য জ্ঞান বলে এই নরকরূপ পার্থিব ও দিব্যভভাগে বিরক্ত হয়ে শেষে আমার ধামে আগমন করবে।

গৃহাস্থমে প্রবেশিত হলেই তোমাদের বন্ধন হবে, তাহলে ভক্তি ও নির্বেদ হবে না। এরূপ আশংকা অমূলক।

যাবতীয় কর্মফল আমাকে অর্পণ করে যারা কালযাপন করে, গৃহস্থাশ্রম তাদের পক্ষে বন্ধনের কারণ হয় না। আমার কথা শ্রবণ করলে, সর্বজ্ঞ আমি নব নব রূপে আবির্ভূত হয়ে থাকি। তাতে তাদের ব্রহ্মসাক্ষাৎ লাভ হয়।

মৈত্রেয় বললেন– প্রচেতাগণ শ্রী ভগবানের রূপ-দর্শনে তমোগুণ ও রজোগুণের মালিন্য থেকে মুক্তিলাভ করে ঐ প্রকার বাক্য প্রয়োগকারী ভগবান নারায়ণকে কৃতজ্ঞলীপুটে বিনীত বাক্যে স্তব করতে লাগলেন।

প্রচেতাগণ বললেন– হে ভগবান্ তুমি নিখিল ক্লেশ বিনাশক। তোমাকে নমস্কার করি। বেদ সকল তোমার উদার গুণ ও মহৎ নামকে পরম মঙ্গলজনক বলে মনে করেন।

তুমি মন ও বাক্যের অগোচর, ইন্দ্রিয়াদির পক্ষে তোমার গতিপথ অনুধাবন করা অসম্ভব।

হে ভগবান, তোমাকে প্রণাম। তুমি সদাই স্বরূপে অবস্থান কর। শুদ্ধ ও শান্তাভাবাপন্ন, তোমাকে নমস্কার জানাই। মন– নিমিত্ত বিস্ফুরিত এই প্রপঞ্চময় জগৎ তোমাতে ব্যর্থ হয়েছে।

তুমি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য, নিজ মায়াবলে ব্রহ্মাদি মূর্তি ধারণ কর। তোমার চরণে আমরা প্রণিপাত জানাই।

হে বিশুদ্ধ সত্ত্ব, তোমাকে জানতে পারলে, এই সংসার থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব, তোমাকে প্রণাম করি। তুমি বাসুদেব, তুমিই কৃষ্ণ, তুমি সকল ভক্তজনের পালক। তোমাকে নমস্কার জানাই।

হে প্রভু, তোমার নাভিদেশ থেকে উত্থিত হয়েছে পরমাশ্চর্য ব্রহ্মাণ্ডকল। গলদেশে কমলমাল্য শোভিত, চরণদ্বয় পদ্মকোমল।

হে পদ্মলোচন পদ্মনাভ, তোমাকে নমস্কার। হে পীতবসনধারী, তোমাকে প্রণাম জানাই।

তুমি সকল প্রাণীর নিবাসভূমি ও সর্বসাক্ষী, তোমাদের নমস্কার। তোমার এই রূপ হতে অশেষ ক্লেশের সংক্ষয় হয়, ক্লেশক্লিষ্ট আমাদের নিমিত্ত তুমি এই মূর্তি প্রকটিত করেছ, তাতেই আমাদের প্রতি তোমার দয়ার প্রকাশ ঘটেছে।

হে দুঃখ হরণ, দীন ব্যক্তিদের যদি সেবাকালে কিয়ৎক্ষণ নিজের বলে স্মরণ করেন, তাতেই যথেষ্ট অনুকম্পা প্রকাশ পায় কারণ ঐরূপ স্মরণ করলেই দীন ব্যক্তিগণের সুখলাভ হয়। তুমি ক্ষুদ্র– তুচ্ছ প্রাণীদের হৃদয়ে অন্তর্যামী– রূপে বিরাজমান।

হে প্রভু, আমরা তোমার সেবক। আমাদের প্রার্থিত মনোরথও তুমি অবশ্যই জান। তবু যদি বর প্রার্থনা করতেই হয়–

তোমার কাছে এটাই কামনা, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, তুমি আমাদের একমাত্র আশ্রয়। তুমিই মোক্ষপ্রদর্শক গুরু! তবুও পরাৎপর তোমার নিকট একটি বর প্রার্থনা করছি। তোমার ঐশ্বর্যের অন্ত নেই, তাই তুমি অনন্ত বলে কীর্তিত।

অনায়াসে পারিজাত লাভ হলে ভ্রমর অন্য কোনও ফুলগাছের প্রতি ধাবিত হয় না। তেমনি আমরাও তোমার পাদমূল প্রাপ্ত হয়ে, অন্য কি প্রার্থনা করব?

যতকাল আমরা তোমার মাথায় মোহিত হয়ে কর্মানুসারে এই সংসার-পথে ভ্রমণ করব ততকাল যেন তোমার ভক্তগণের সান্নিধ্য লাভ করি। কারণ অতি অল্পসময় ভগবভক্ত সাধুসঙ্গের কাছে স্বর্গ বা মোক্ষও অতি তুচ্ছ।

সাধুসঙ্গে যে পবিত্র কথার আলাপচারিতা হয়, তার ফলে বিষয় তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়, সকল জীবের প্রতি সমদৃষ্টি হয়।

মুক্তসঙ্গ সাধুগণের দ্বারা ঐ স্থানে সৎকথার অবসরে সন্নাসীদের একমাত্র গতি সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের কথা বারংবার কীর্তিত হয়।

হে প্রভু, তোমার ভক্তগণ দুষ্টজনের সংসর্গে অপবিত্র হয়ে যাওয়া তীর্থসমূহের পবিত্রসাধনের জন্য পদব্রজে তীর্থ ভ্রমণ করে থাকেন। তাদৃশ সাধুগণের সমাগম সংসার ভয়ে ভীত কোন্ ব্যক্তির রুচিকর না হবে?

হে ভগবন, সৎসঙ্গের ফল আমরাই অনুভব করছি। তোমার প্রিয়সখা ভগবান শঙ্করের সাথে ক্ষণকাল সঙ্গ হওয়ায়, আজ তোমাকে আমরা আশ্রয়রূপে পেয়েছি। আমরা উত্তমরূপে যে বেদ অধ্যয়ন করেছি, অনুবৃত্তি দ্বারা গুরু, বিপ্র ও বৃদ্ধদের প্রসন্ন করেছি। মান্যগণ সুখী ও ভ্রাতৃগণকে প্রণাম করেছি। অসূয়া পরিত্যাগ করে সন্তুষ্ট করেছি। নিরন্ন অবস্থায় বহু বৎসর জলমধ্যে নিমজ্জিত থেকে তপস্যার আচরণ করেছি।

এই সকল কর্ম, তোমার পরিতোষের জন্য গৃহীত হোক, এই প্রার্থনা করে; মনু, ব্রহ্মা, ভগবান মহাদেব, এবং অন্যান্য তপস্যা ও জ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধচেতা যোগীগণ তোমার অপার মহিমার সন্ধানার্থে স্বীয় শক্তি অনুযায়ী স্তব করে থাকেন।

অতএব, আমরাও যথাসাধ্য তোমার স্তব করলাম। তুমি সর্বত্র সমান এবং পরিশুদ্ধ পরম পুরুষ তোমাকে প্রণাম। হে ভগবান, তুমি সত্ত্বমূর্তি বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার করি।

মৈত্রেয় বললেন– হে বিদুর, প্রাচীনবহির পুত্র প্রচেতাগণের স্তব শুনে শরণাগত বৎসল ভগবান প্রীত হলেন।

তিনি বললেন–তোমরা যা প্রার্থনা করলে, তাই হোক। এই বলে তিনি সেই মুহূর্তে প্রচেতাগণের চোখের সামনে অন্তর্হিত হলেন।

অনন্তর প্রচেতাগণ জলতল থেকে উত্থান করলেন। তারা দেখলেন, রাজ্যে চূড়ান্ত অরাজক অবস্থা। কর্ষণাদির অভাবে সমস্ত ভূমি বিধি বৃক্ষে আচ্ছাদিত। এসকল বৃক্ষ উন্নত হয়ে স্বর্গরোধ করতে উদ্যত হয়েছে।

অতএব বৃক্ষরাজির প্রতি তাদের অতিশয় ক্রোধের জন্ম হল। প্রলয়কালীন কালাগ্নির মতো অনল দ্বারা ভূ-তলকে বৃক্ষহীন করার মানসে রোষাভরে তাদের মুখ থেকে অগ্নি, মরুৎ নির্গত হতে লাগল। তাতে পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ ভস্মসাৎ হতে লাগল।

পিতামহ ব্রহ্মা এই ঘটনায় স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি সত্ত্বর সেখানে এসে যুক্তিযুক্ত বাক্যদ্বারা প্রচেতাদের ক্রোধ প্রশমিত করলেন।

আক্রান্ত সেই বৃক্ষরাজির মধ্যে যেসকল বৃক্ষ অবশিষ্ট ছিল তারা ভীত হয়ে পড়ল।

ব্রহ্মার উপদেশে তারা প্রচেতাগণকে কমুনিজাত প্রম্লোচার গর্ভে উৎপন্ন কন্যাটিকে প্রচেতাদের হাতে সমর্পণ করল।

ব্রহ্মার আদেশে প্রচেতাগণ বৃক্ষপালিতা সান্ধি নাম্নী ঐ কন্যাকে বিবাহে সম্মত হল। দক্ষ, ব্রহ্মার পুত্র হলেও, পূর্বে মহাদেবকে অপমান করায়, ইহার গর্ভে তার জন্ম হয়েছিল।

চাক্ষুষ মন্বন্তরে কাল-প্রভাবে পূর্বদেহ বিনষ্ট হলে, যিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হয়ে প্রজাসৃষ্টি করেন, তিনিই এই দক্ষ।

তার প্রভাবে সমস্ত তেজস্বীর তেজ আচ্ছন্ন হয়েছিল। তার কর্মানুষ্ঠান দক্ষতার কারণে জনগণ তাকে দক্ষ বলে অবহিত করেছিল। এই দক্ষই ব্রহ্মা কর্তৃক অভিষিক্ত হয়ে, প্রজাসৃষ্টি রক্ষার বিষয়ে নিযুক্ত হন। দক্ষ আবার পরবর্তীকালে মরীচি প্রভৃতি অন্যান্যদের প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে নিযুক্ত করেন। সেজন্য তারা প্রমাপতরূপে পরিচিত হয়েছিলেন।

.

একত্রিংশ অধ্যায়

গৃহ হতে প্রব্রজিত প্রচেতাগণের নারদের উপদেশে মুক্তিলাভ

মৈত্রেয় বললেন–বৎস বিদুর, তারপর দেবপরিমাণ বহু সহস্র বছর অতীত হলে প্রচেতাগণের দিব্যজ্ঞানের উদয় হল। তারা তখন ভগবানের ধামে আমন্ত্রণের বাণী স্মরণ করে পুত্রের ওপরে পত্নীর ভার অর্পণ করলেন।

নিজেরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তারপরে তারা পশ্চিমদিক দেশে সমুদ্র উপকূলে জাজ্বলি ঋষির সিদ্ধস্থানে উপনীত হয়ে সর্বান্তর্যামী ভগবানের পরমতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য কৃতসংকল্প হয়ে সাধনে প্রবৃত্ত হলেন।

তারা সেখানে শান্ত মনে, ঋজুদেহে সিদ্ধাসনে উপবেশন করে প্রাণ, মন, বাক্য ও দৃষ্টি সংযম–পূর্বক জ্যোতিঃস্বরূপ পরব্রহ্মে চিত্ত সংস্থাপিত করলেন।

সেই অবস্থায় সুরাসুর বন্দিত দেবর্ষি নারদ তাদের দেখতে পেলেন। দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হলে, প্রচেতা আসন থেকে উত্থান করলেন। তারা নারদকে প্রণাম ও সাদরে সম্ভাষণ করলেন।

প্রচেতাগণের কাছ থেকে যথাবিধি পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে নারদ সুখাসনে উপবিষ্ট হয়ে বলতে শুরু করলেন।

প্রচেতাগণ বললেন– হে দেবর্ষি, আপনার শুভাগমন হয়েছে তো? সৌভাগ্যবশতঃ আজ আমরা আপনার দর্শন লাভ করতে সমর্থ হয়েছি।

হে ব্রাহ্মণ, সূর্য যেমন অন্ধকার বিদূরিত করতে করতে ভ্রমণ করে, তেমনি আপনি লোকগণের ভয়ে অভয়ের জন্য তাদের অজ্ঞান– মোহ বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে পর্যটন করে থাকেন।

হে প্রভো, ভগবান বিষ্ণু ও শিব আমাদের যে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেছিলেন, সংসার মোহে আসক্তচিত্ত আমরা তা প্রায় ভুলে গেছি। অতএব, ভগবৎ স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশক জ্ঞান উপদেশের দ্বারা আমাদের উজ্জীবিত করুন, যাতে আমরা অনায়াসে দুস্তর ভবসাগর পার হতে পারি।

মৈত্রেয় বললেন–বিদুর, প্রচেতাগণ এইরূপ বললে, ভগবান নারদ ঋষি পরমপুরুষ ভগবান শ্রীহরিতে মন সমাহিত করে রাখলেন।

দেবর্ষি নারদ বললেন–হে রাজকুমারগণ, মনুষ্যগণের সেই জন্মকে সার্থক জন্ম, সেই কর্মকেই যথার্থ কর্ম বলে ধরা হয় যার দ্বারা সর্বনিয়ন্তা ভগবান অবধিত হয়ে থাকেন। এই জগতে মনুষ্যগণের ত্রিবিধ জন্মের দ্বারাই বা কি লাভ? উচ্চকুলে প্রথম জন্ম হয় মাতা-পিতা থেকে, দ্বিতীয় জন্ম হয় উপনয়ন সংস্কার দ্বারা, তৃতীয় জন্ম হয় ব্রাহ্মী দীক্ষার সাহায্যে।

বেদবিহিত কর্মকরণে এবং দেবতাদের ন্যায় দীর্ঘায়ুতেই বা কি ফললাভ হয়?

যদি না এই সমস্ত দ্বারা শ্রীহরি আরাধিত হন; বেদান্ত, শ্রবণ তপস্যা, বাক্-বিভূতি, ক্ষুরধার বুদ্ধি, শারীরিক বল, ইন্দ্রিয়পটুতা-এসবের কোনো প্রয়োজন নেই, যতক্ষণ না এগুলি ভগবৎ সাধনার সহায়ক হতে পারে।

অষ্টাঙ্গ যোগ, আত্ম-অনাত্মার বিবেক-জ্ঞান, সন্ন্যাস, ব্রহ্মার্থে, ব্রতপালন এবং অন্যান্য পুণ্যকর্মের বা কি ফল, যদি না এগুলি দ্বারা আত্মপদ শ্রীহরি আরাধিত হন?

সর্বমঙ্গলের মধ্যে পরমাত্মাই, শ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্বরূপ। সমস্ত প্রাণীগণের আত্মাও শ্রীহরি। জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠানকারী এই আত্মাই সকলের প্রিয়।

বৃক্ষমূলে জল সিঞ্চন করলে তার শাখা-প্রশাখা সব পুষ্ট হয়। ভোজন করলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি ঘটিত হয়, তেমনি ভগবান অচ্যুতের অর্চনাতেই সকল দেবতার পুজো হয়ে থাকে।

জল বর্ষাকালে সূর্য থেকে উৎপন্ন হয়ে, গ্রীষ্মে আবার সেখানেই পুনঃপ্রবেশ করে। স্থাবর ও মঙ্গল ভূতাদি ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে আবার ভূমিতেই বিলীন হয়।

সৃষ্টিকালে ত্রিগুণান্বিত চেতন এবং অচৈতনাত্মক প্রপঞ্চ, শ্রীহরি থেকে উৎপন্ন হয়ে, প্রলয়কালে তাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। অতএব, ভগবানই সকলের মূল।

স্বরূপে সূর্যপ্রভার ন্যায় শ্রীহরি জগদাত্মক হয়েও ভিন্ন বলে বোধ হয়। জাগ্রত অবস্থায় যেমন ইন্দ্রিয়াদি সক্রিয় এবং সুষুপ্তি অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে। সৃষ্টিকালে জগত প্রকাশিত থাকে এবং প্রলয় কালে অপ্রকট হয়।

দ্রব্য, ক্রিয়া, জ্ঞান– এদের ভেদাত্মক ভ্রমের যেখানে বিলীন হয়, তিনিই ভগবান। অর্থাৎ দেহ–গেহপিতে, আমির আমিত্ব বোধ, কাম্য কর্মে পরম পুরুষার্থ বোধ, তর্কস্থলে নিজ সিদ্ধান্তকেই একমাত্র সত্যবোধ–এইরকম ভ্রান্ত ধারণার নিষ্পত্তি শুধুমাত্র শ্রীহরির আরাধনাতেই হওয়া সম্ভব।

হে রাজপুরুষগণ, আকাশে মেঘ, অন্ধকার, আলো, উৎপন্ন হয়ে আবার সেখানেই বিলীন হয়ে যায়। তেমনি পরব্রহ্ম থেকে রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব এই গুণত্রয়ের শক্তি সমূহও সৃষ্টি হয় আবার তাতেই লয়প্রাপ্ত হয়।

এই জগতের সৃষ্টি সংহারাদি প্রবাহের উৎপত্তি এবং লয়স্থানও তিনি, তিনিই সকল প্রাণীর আশ্রয়। তিনিই সকলের নিয়ন্ত্রণকর্তা, কলি, প্রকৃতি ও পুরুষরূপে তিনি বহুমধ্যে প্রকাশিত। তার মহিমায় জগতের সকল ভ্রম, সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়। তোমরা সেই অনন্ত শ্রীহরির অর্চনা কর।

সর্বভূতে দয়া, যদৃচ্ছলাভে সন্তোষ, সকল ইন্দ্রিয়ের দমন– এইসব কর্মের দ্বারা ভগবান জনার্দন সহজেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন।

চিদাকাশ যেমন কখনও হৃদয় অন্তর্হিত হয় না, তেমনি কামনাশূন্য সাধুগণের মন থেকেই ভগবান হরি কখনও অপসারণ করেন না।

পার্থিব ধনহীন হয়েও সশরা ভগবানকেই শ্রেষ্ঠ ধন মনে করেন সেই সকল সাধুব্যক্তিগণ শ্রীভগবানের অতি প্রিয়জন। তিনি ভক্তরসে সদাই তৃপ্ত থাকেন।

বিদ্যা, ধন, কুল এবং যজ্ঞাদি কর্ম অহংকারে মত্ত হয়ে যে সকল ব্যক্তি ভগবানের ভক্তদের প্রতি অসৎ আচরণ করে, তিনি তাদের পুজোও গ্রহণ করেন না।

শ্রীহরি স্বয়ং পূর্ণকাম, তার অনুবর্তিনী লক্ষীদেবী, ঐশ্বর্যপরায়ণ ব্যক্তি রাজন্যগণ এবং দেবতাদেরও বশ্যতা স্বীকার করেন না। তথাপি তিনি ভক্তদের অধীন। কৃতজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে এই হরিকে ত্যাগ করবেন?

মৈত্রেয় বললেন– বিদুর ব্রহ্মপুত্র নারদ এরূপ অমৃতকথা বিবৃত করে ব্রহ্মলোকে গমন করলেন। প্রচেতাগণ তাঁর মুখ-নিঃসৃত ভগবৎ কথা শ্রবণ করে তার পাদপদ্মের স্মরণ নিয়ে বিষ্ণুলোকে গমন। করলেন। হে বিদুর, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি প্রচেতাগণের কাছে নারদ কিভাবে শ্রীহরির গুপ্তকথা বর্ণনা করেছিলেন, তা শুনলাম।

শ্রী শুকদেব বললেন– হে পরীক্ষিৎ, স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদের বংশাবলী তোমাকে বললাম। এক্ষণে প্রিয়ব্রতের বংশাবলী বর্ণনা করছি, শ্রবণ কর :

প্রিয়ব্রত দেবর্ষি নারদের নিকট আত্মজ্ঞান অবগত হয়ে বেশ কিছুকাল রাজ-সুখ ভোগ করলেন। তারপর পুত্রগণকে রাজ্যসম্পদ ভাগ করে দিয়ে ভগবৎপদ লাভ করলেন।

হে মহারাজ, কুশারু-পুত্র মৈত্রেয় কর্তৃক বর্ণিত শ্রীবিষ্ণুর এই গুপ্তকথা শ্রবণ করে বিদুর ভাবাবেগে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তার দুচোখ দিয়ে অবিরাম অশ্রুপাত হতে লাগলো।

বিদুর মৈত্রের চরণে পতিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। মনে মনে তিনি শ্রীহরির চরণকমলের ধ্যান করতে লাগলেন।

তারপর বিদুর বললেন– হে মহাযোগী, করুণাত্মা আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের তমোগুণের পথ দর্শন করালেন, যেখানে অকিঞ্চন ভক্তদের একমাত্র গতি, ভগবান শ্রীহরি বর্তমান রয়েছেন।

শ্রী শুকদেব বললেন– হে মহারাজ, বিদুর এভাবে মৈত্রেয়মুনিকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে, জ্ঞাতিগণের দর্শন প্রত্যাশায় হস্তিনাপুরে গমন করলেন।

হে রাজন, ভগবান হরির চরণে সমর্পিতপ্রাণ প্রচেতাকে কাহিনী শ্রবণ ও কথনে আয়ু ধর্ম, ঐশ্বর্য, কল্যাণ ও সদগতি লাভ হয়।

পঞ্চম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

জ্ঞানী প্রিয়ব্রতের রাজ্য পালন ও জ্ঞাননিষ্ঠা

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন– হে মহামুনি, রাজা প্রিয়ব্রত বরণ ভগবৎ ভক্ত ও আত্মনিষ্ঠ ছিলেন।

সেই মহাজ্ঞানী জনের গৃহে আসক্তির কারণ কি? জীবের কর্মবন্ধন ও আত্মার স্বরূপ– জ্ঞান আবরণের মূল কারণই হল গ্রহ।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, গৃহাশ্রমে রতি ও সে বিষয়ে অভিনিবেশ দ্বারাই সম্ভব হয়। প্রিয়ব্রতের মতো মুক্তসঙ্গ ভগবৎগণের তো কখনও গৃহে অভিনিবেশ হতে পারে না।

মহৎ ব্যক্তিগণের চিত্ত উত্তম- শ্লোক ভগবানের চরণ যুগলের ছায়াতেই আবৃত থাকে। এর ফলে যেরকম পুরুষদের পুত্র কলত্রাদির প্রতি স্পৃহাযুক্ত মতি হবার সম্ভাবনা দেখতে পাই না।

হে ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, পুত্র ও গৃহ প্রভৃতিতে আসক্ত হয়েও রাজা প্রিয়ব্রত সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কিন্তু গৃহাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে কিভাবে সিদ্ধিলাভ এবং ভগবানে অচলা ভক্তি সম্ভব, যে বিষয়ে আমার মনে সংশয়ের উদ্রেক হয়েছে।

শ্রী শুকদেব বললেন– হে মহারাজ, ভগবদভক্ত মহাপুরুষদের চিত্ত কখনও গৃহ সংসারে অভিনিবেশিত হয় না, এটা তুমি ঠিকই বলেছ।

যেহেতু যাঁদের চিত্ত উত্তম শ্লোক ভগবানের শ্রীচরণপাদ পদ্মদ্বয়ের মধুরসে একবার আসক্ত হয়েছে, তারা ভাগবত পরমহংস ভিন্ন অপর কাউকে জানতে আগ্রহী হয় না।

ভগবান বাসুদেবের কথাতেই নিজের পরম মঙ্গলময় পথ মনে করে, এ পথ পরিত্যাগ করে না, সে পথে যত বাধা বিঘ্ন আসুক না কেন এ পথে তারা সর্বদাই একনিষ্ঠ থাকে।

হে মহারাজ, পরম ভাগবত রাজপুত্র প্রিয়ব্রত দেবর্ষি নারদের চরণসেবা করেছিলেন বলে অনায়াসে পরমার্থতত্ত্ব জ্ঞানলাভ করেছিলেন। এরপরে, তিনি যখন আধ্যাত্ম চিন্তায় নিজেকে নিযুক্ত করবেন বলে স্থির করলেন, তখন তাঁর পিতা মনু তাকে নিষেধ করলেন।

মনু, নিজ গুণবলে প্রিয়ব্রতকে ধরাধামে পালনের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু পিতৃআজ্ঞা প্রত্যাখ্যানের অযোগ্য হলেও, প্রিয়ব্রত প্রথমে তা অস্বীকার করেছিলেন।

কারণ, প্রথম থেকেই তার ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নিরন্তর সমাধিযোগ দ্বারা পরম ভগবান বাসুদেবের চরণে সমর্পিত ছিল।

এই অবস্থায় রাজপদ গ্রহণ করলে মিথ্যা রাজ্য প্রপঞ্চ থেকে আত্মার পরভেব অর্থাৎ নিত্য-সত্য পরমার্থ থেকে বিচ্যুতি ঘটবে, তখন এটাই তাঁর মনে হয়েছিল। তারপরে আদিদেব ভগবান ব্রহ্মা, ত্রিগুণময় সৃষ্টির পরিবর্ধনের বিষয়ে নিরন্তর বিবেচনা করতে লাগলেন।

নিখিল বিশ্বের প্রাণীকুলের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, মূর্তিমান অখিল বেদ ও মরীচি প্রমুখ নিজ জনে পরিবেষ্টিত হয়ে নিজভবন সত্যলোক থেকে ভূতলে অবতীর্ণ হলেন। অবতরণের সময় স্থানে স্থানে চন্দ্রের ন্যায় তার জ্যোতি প্রকাশিত হতে লাগল।

পথিমধ্যে বিমানচারী ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তার পূজা করতে লাগলেন। এই অবস্থায় জগদগুরু ব্রহ্মা স্বীয় দ্যুতিদ্বারা গন্ধমাদন পর্বতের গুহা উদ্ভাসিত করে, প্রিয়ব্রতের কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

দেবর্ষি নারদ নিজ পিতা ভগবান ব্রহ্মাকে দেখে ভক্তিচিত্তে উত্থিত হলেন।

তিনি তৎক্ষণাৎ পূজার বিবিধ উপকরণ নিয়ে মনু ও প্রিয়ব্রতের সঙ্গে কৃতাঞ্জালিপুটে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। নারদের কাছ থেকে যথা বিধি পূজা-উপহার প্রদত্ত হয়ে, অত্যন্ত প্রীত হলেন।

সবার দ্বারা মিষ্ট বাক্যে স্তুত হয়ে সাহয্যে অবলোকনে প্রিয়ব্রততে এরকম বলেছিলেন।

ব্রহ্মা স্নেহভরে বললেন–হে তাত, আমার বাক্য শ্রবণ কর। সত্যস্বরূপ অপ্রমেয় পরমেশ্বরের প্রতি দোষারোপ করে দর্শন করা উচিত হয় না।

শংকর, তোমার পিতা মনু, দেবর্ষি নারদ এবং আমি আমরা সকলেই বিবশ হয়ে তাঁর আজ্ঞা পালন করে থাকি।

প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ করলে, প্রিয়ব্রত তার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করতে পারে, এই আশঙ্কায় ব্রহ্মা নিজ কথাকে ভগবান শ্রীহরির আদেশরূপে প্রকাশ করে, উপদেশে প্রবৃত্ত হলেন।

এই পৃথিবীর কোনও দেহধারী জীবই তপস্যা, বিদ্যা, যোগ, বুদ্ধি, অর্থ, ধর্মের সাহায্যে ভগবান কৃত কার্যের বিনাশ করতে পারে না। স্বয়ং যা বলবান, তা অপরের আশ্রয় গ্রহণ করেও কোনো রূপেই সেই পরম দেবতা শ্রীবিষ্ণুর কৃতকার্যের বিনাশ করতে পারে সমর্থ হয় না।

জীবগণ জন্ম মৃত্যু, শোক, মোহ, ভয়, দুঃখ, সুখ–এই সব কিছুর জন্য কর্ম করতে সবসময়ই সেই অব্যক্ত পরম দেবতার বিধানুরূপ জন্মগ্রহণ করছে, তার অন্যথা করার ক্ষমতা কারও নেই।

হে বৎস, চতুষ্পদ গবাদি পশুরা রজ্জু দ্বারা নাসিকায় আবদ্ধ হয়ে, মানুষের অভিপ্রেত কার্যে নিযুক্ত হয়। আমরাও সকলে তেমনি পরমেশ্বরের বাক্যরূপ রজ্জুতে সত্ত্বাদি গুণপূর্বক কর্ম ও বিবিধ

বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে তাকেই পূজা করতে থাকি।

বদ্ধ বলীবদের ন্যায় আমরাও পরতন্ত্র। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তার জন্যই কর্মে নিবেদিত।

হে বৎস, ভোগ বিষয়ে কারও কোনও স্বাতন্ত্র নেই। যেমন চক্ষুষ্মন ব্যক্তিগণ নিজেদের ইচ্ছামতে অন্ধ ব্যক্তিগণকে ছায়া অথবা রৌদ্রযুক্ত স্থানে নিয়ে যায়। আমরাও তেমনি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পশু পক্ষী ইত্যাদি যে-কোনও দেহ যযাজিত করতে বাধ্য হই। সেই অনুসারে আমাদের সুখ ও দুঃখ ভোগ হয়ে থাকে।

এতে ঈশ্বরের কোনো বৈষম্য নেই, কারণ আমাদের গুণ ও কর্মের সম্বন্ধ অনুসারে তিনি তা প্রদান করেন। পশু-পক্ষীরা প্রভুদত্ত কনিশ বা শষ্যকণা ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। তাদের স্ব-ইচ্ছায় কিছুই সম্ভব নয়। আমরাও তেমনি ঈশ্বর প্রদত্ত সুখ-দুঃখ ভোগ করতে বাধ্য হই, আমাদের নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় না।

মানুষ নিদ্রাভঙ্গের পর অভিমানশূন্য হয়ে স্বপ্নে অনুভূত বস্তুগণের ওপর অনুভব করে।

জীবন্মুক্ত পুরুষেরাও তেমনি অভিমানশূন্য হয়ে প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ করার দেহ-ধারণ অর্থাৎ পুনর্জন্ম গ্রহণের উপযোগী গুণ বা বাসনা সমূহের অনুগত হন না।

ইন্দ্রিয় জয় করতে যে ব্যক্তি সক্ষম নয়, সে যদি গৃহে স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ ভয়ে সংসার ত্যাগ করে বনে গমন করে, তাহলে সেখানেও তার নিস্তার নেই। কারণ সেখানেও মন এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই ছটি রিপু তার সঙ্গেই থাকে।

কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞানী, ও জিতেন্দ্রিয় গৃহাশ্রম তার কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। যে ব্যক্তি ছটি রিপু জয় করতে ইচ্ছুক, তার উচিত প্রথমে গৃহাশ্রমে অবস্থান করে ইন্দ্রিয় জয়ের চেষ্টা করা উচিত।

কারণ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেই বুদ্ধিমান লোক শত্রুকে জয় করার চেষ্টা করে থাকে। শত্রুকূল দুর্বল হলে, পরে ইচ্ছানুসারে সর্বত্র বিচরণ করে থাকে।

হে রাজনন্দন, সাধারণ লোকের পক্ষেই এই গৃহ– দুর্গাশ্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু, তুমি তো আগেই ভগবান পদ্মনাভের চরণপদ্ম আশ্রয় করে পূর্বোক্ত ছটি শত্রুকে পরাজিত করেছ।

তুমি এখন ধরাধামে অবস্থান করে ঈশ্বরদত্ত ভোগ্যবস্তু ভোগ কর। পরে মুক্তসঙ্গ হয়ে নিরন্তর আত্মনিষ্ট হবে।

শ্রী শুকদেব বললেন– ভগবান ব্রহ্মা এরূপ বললে, মহাভাগবত প্রিয়ব্রত নিজেকে ক্ষুদ্রজ্ঞান করে ত্রিলোকগুরু ব্রহ্মার আদেশ নতমস্তকে শিরোধার্য করলেন। এরপরে মনু সন্তুষ্টমনে ব্রহ্মার পুজো করলেন। ব্রহ্মার তৎকালীন বাক্যে প্রিয়ব্রতর যোগহানি হল।

নারদের শিষ্যবিয়োগ হলেও তিনি পিতা ব্রহ্মাকে কিছু বললেন–না, কিন্তু ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতকে নিবৃত্তিমার্গ থেকে প্রবৃত্তিমার্গে প্রবর্তিত করে নিজ ব্যবহারেই বিষণ্ণ হলেন।

এই অবস্থায় তিনি বাক্যের অগোচর মনের কিঞ্চিত বিষয়ীভূত, ব্যবহারমার্গের অতীত এবং স্ব ব্রহ্মাত্মক স্বরূপের ধ্যান করতে করতে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। তারপরে, মনুও ব্রহ্মার কার্যে নিজ অভিষ্ট সাধিত হলে অত্যন্ত প্রীত হলেন।

দেবর্ষি নারদের অনুমতি নিয়ে পুত্র প্রিয়ব্রতকে অখিল ভূমণ্ডলের স্থিতি ও প্রতিপালনের জন্য রাজপদে অধিষ্ঠিত করলেন। এরপরে মনু দুস্তর বিষয়– বিষাক্ত স্বরূপ ভব সংসারের ভোগবাসনা থেকে উপরত হলেন।

যে ভগবান আদিপুরুষের অনুভব নিখিল বিশ্বের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হয়, সেই ভগবানের চরণাশ্রিত হওয়ায় প্রিয়ব্রত ছিলেন শুদ্ধিচিত্ত। তবুও ব্রহ্মার আদেশ পালনার্থে তিনি মহীতল শাসন করতে প্রবৃত্ত হলেন। হে মহারাজ, প্রিয়ব্রত নিবৃত্তিমার্গের পথিক হলেও শ্রীভগবানের ইচ্ছায় আবার তার কর্মধীকার প্রাপ্তি হল।

এর কিছুদিন পরে প্রিয়ব্রত বিশ্বকর্মার কন্যা বর্হিষ্মতীর পাণিগ্রহণ করলেন। নিজতুল্য শীল গুণ, কর্ম, রূপ ও বীর্য সম্পন্ন উদার মনোভাবাপন্ন দশ পুত্রের জন্ম হল।

প্রিয়ব্রতের একটি মাত্র কন্যা ছিল। সে অতি সুন্দরী। তার নাম ঊর্জস্বতী, অগ্নির নামেই প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের নামকরণ হয়েছিল। যেমন আগ্নীধ্র, হস্মৃজিত্ব, যজ্ঞবাহ, মহাবীর, হিরণ্যরেতাঃ, ঘৃতপৃষ্ঠ, সবন, মেধাতিথি, বীতহোত্র এবং কবি।

এই দশপুত্রের মধ্যে কবি, মহাবীর ও সবন– এই তিনজন ঊর্ধরেতাঃ ছিলেন। তারা বাল্যকাল থেকেই আত্মবিদ্যা অভ্যাস করে পরমহংস আশ্রমে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।

সন্ন্যাসাশ্রমেই তারা তিনজন উপশম শীল ও পরম ঋষি হয়ে ভগবান বাসুদেবের চরণে মনস্থিত করলেন। শ্রীভগবান অখিল জীবের আবাসস্থল ও ভবভীতজনের রক্ষাকর্তা।

সেই ভগবান বাসুদেবের চরণকমলে হৃদয়স্থাপন করে, অবিচলিত পরম ভক্তিভরে নিজ নিজ অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও পবিত্র করলেন। এর ফলে তাদের হৃদয়মধ্যে সর্বভূতাত্মা ভগবানের অধিষ্ঠান হল।

মহারাজ প্রিয়ব্রতের অপর ভার্যার গর্ভে উত্তম, তামস ও রৈবত নামক তিনটি পুত্রের জন্ম হয়। তারা মন্বন্তরাধিপতি রূপে পরিচিত হয়েছিলেন।

প্রিয়ব্রতের তিনপুত্র নিবৃত্তিমার্গের আশ্রয় নিলেও তিনি একাদশ অর্বুদ বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিলেন। তার বাহুদ্বয় ছিল মহাবলশালী, টঙ্কার ধ্বনিতেই ধর্মদ্বেষীরা নিরস্ত হত।

নিরন্তর ভার্য্যা বর্হিষ্মতীর ক্রমবর্ধমান প্রমোদ লাস্য, লজ্জা সঙ্কুচিত সহাসাৎ অঙ্গভঙ্গী কটাক্ষে প্রিয়ব্রতর বিবেক যেন পরাভূত হয়েছিল। এই রকম বিষয়াসক্তিতে তিনি যেন নিজেকে ভুলেই গিয়েছিলেন।

ভগবান সুর্যদেব সুমেরু পর্বত পরিক্রমাকালে ভূমণ্ডলের অর্ধাংশ আলোকিত হয়েছিল। এতে অসন্তুষ্ট হলেন প্রিয়ব্রত। তিনি ভগবানের উপাসনা বলে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

প্রিয়ব্রত স্থির করলেন যে রাতকে দিন করবেন। এই সঙ্কল্প করে, প্রিয়ব্রত নিজ জ্যোতির্ময় রথে আরোহণ করে প্রচণ্ড বেগে পরিভ্রমণ করতে শুরু করেন।

প্রিয়ব্রতর রথ ছিল সূর্যের রথের মতো অতি বেগবান। প্রিয়ব্রত রথে আরোহণ পূর্বক সূর্যের পশ্চাতে ভ্রমণ করতে শুরু করলেন। তিনি দ্বিতীয় সূর্যের মতো প্রতিভাত হয়েছিলেন। তখন ব্রহ্মা তার কাছে এসে বললেন– বৎস নিবৃত্ত হও! এই অধিকার তোমার নেই।

প্রিয়ব্রত পৃথিবী পরিভ্রমণের সময়ে রথচক্রের অগ্রভাগ দ্বারা যে সাতটি ঘাতে নির্মিত হয় ঐ সাতটি ঘাতই সপ্ত-সাগর রূপে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

এই সাত সমুদ্র দ্বারাই পৃথক পৃথক ভাবে পৃথিবীর সাতটি সমুদ্র দ্বীপ রচিত হয়েছে তাদের নাম– জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুস্কর।

সমুদ্র সকলের বহির্ভাগে এক একটি দ্বীপ অবস্থিত আবার ঐ দ্বীপকে বেষ্টন করে বাইরে এক একটি সমুদ্র অর্থাৎ লবণজল, ইক্ষুরসজল, সুরাজল, ঘৃতজল, দধিজল, দুগ্ধজল এবং শুদ্ধজল –এই সপ্তসমুদ্র, ঐ সপ্ত দ্বীপের পরিখার মতো হয়ে রয়েছে।

ঐ সমস্ত সাগরে বেষ্টিত যে দ্বীপসকল রয়েছে, তাদের মোট পরিমাণ, তাদের তুল্য পূর্ব সাগরের পরিমাণের সমান।

ঐ সাগর সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে বহির্ভাগেই ব্যাপ্ত রয়েছে, অভ্যন্তরে নেই। মহারাজ প্রিয়ব্রত নিজ অনুগত আগ্নিধ, হস্মজিত্ব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতাঃ, ঘৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি ও বীতয়েত্র নামক সাতপুত্রের এক একজনকে এক একটি দ্বীপের রাজা করে দিয়েছিলেন।

তিনি উজস্বতী নাম্নী নিজ কন্যাকে দৈত্যাচার্য শুক্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর গর্ভে শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর জন্ম হয়েছিল।

হে মহারাজ, ভগবানের পাদপদ্ম রেণুর সংস্পর্শে যাদের ইন্দ্রিয়জ সিদ্ধ হয়েছে, সেই ভাগবত সিদ্ধ পুরুষদের এরূপ পুরুষকারে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ, কোনো অন্ত্যজ ব্যক্তিও যদি মাত্র একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করে তাহলে সে তৎক্ষণাৎ সংসার বন্ধনের থেকে মুক্তিলাভ করে।

বন্ধুর মঞ্জিল মহারাজ প্রিয়ব্রত জগতে এরূপ অতুলনীয় বল ও পরাক্রমের অধিকারী ছিলেন।

বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পরে আত্মাকে যেন নিরানন্দ মনে করতে লাগলেন। তিনি একদিন ভাবতে লাগলেন– বিবেকবান পুরুষ হয়েও এ কী অন্যায় কার্য করে চলেছি, ইন্দ্রিয়াদি সমূহ আমাকে অবিদ্যাময় এই বিষয়রূপ অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছে। আমার এই বিষয় ভোগে আমার আর প্রবৃত্তি নেই। হায় হায়! আমি এই বণিতার ক্রীড়ামৃগ হয়েছি, ধিক্ আমাকে, এভাবে প্রিয়ব্রত আত্মনিন্দায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

হে রাজন, পরমপুরুষ ভগবান শ্রীহরির অনুগ্রহে প্রিয়ব্রতর বিবেক উপস্থিত হল। তিনি অনুগত পুত্রদের মধ্যে বিষয় ভাগ করে দিয়ে, মহর্ষি নারদ প্রদর্শিত পথেই গমন করলেন। সেই সময় তিনি সাম্রাজ্যলক্ষ্মী ও নিজ পত্নীকেও মৃত শরীরের মতো ত্যাগ করে এলেন।

সে সময়ে মহারাজ প্রিয়ব্রতের হৃদয়ে নির্বেদ ও ভগবান হরির চিন্তা উদিত হয়েছিল। এই চিন্তাবলে যে বিশেষ প্রভাব এসেছিল তার ফলে প্রিয়ব্রত সহজেই ভার্য্যা ও সম্পত্তি ত্যাগ করতে পেরেছিলেন।

তার মহিমা বর্ণনাকারী কিছু শ্লোক বহুদিন থেকে প্রসিদ্ধ আছে যেগুলি হল– প্রিয়ব্রত যে কর্ম করে গেলেন, তা ঈশ্বর ব্যতীত কোনো ব্যক্তি করতে সমর্থ হবে না।

তিনি পৃথিবীর অন্ধকার দূরীকরণের জন্য সূর্যের পশ্চাতে ভ্রমণের সময়, রথের চাকার সাহায্যে সাত-সমুদ্রের উৎপত্তি হয়।

তিনি বিভাগক্রমে দ্বীপ রচনা করলেন।

তিনি প্রাণীগণের অধিকার বিষয়ে বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত নদী, পর্বত ও অরণ্যানীর দ্বারা প্রতিটি দ্বীপের সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

তিনি পাতালজাত, অমর্ত, মর্তলোকস্থ সকল বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করতেন।

যোগবলে ও কর্মবলে অর্জিত সকল বৈভবকে তিনি নরকতুল্য বলে মনে করতেন। শুধুমাত্র ভগবদ্ভক্তগণই তার প্রিয়পাত্র ছিলেন।

.

দ্বিতীয় অধ্যায়

আগ্নীধ্র চরিত্র বর্ণন

শ্রী শুকদেব বললেন– হে রাজন, প্রিয়ব্রত যখন জ্যেষ্ঠ পুত্র আগ্নীকে রাজ্যের দায়িত্বভার অর্পণ করে প্রবজ্যা গমন করলেন, তখন আগ্নীব্র সেই দায়িত্ব পালনে প্রবৃত্ত হলেন। যথাবিধি ধর্মবিচার করে তিনি জম্বুদ্বীপবাসী প্রজাদের নিজ পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

কিয়ৎকাল রাজ্যশাসনের পর নিজ পুত্র কামনায় মন্দার পর্বতে গমন করলেন।

সেই মন্দার পর্বতে দেবরমণীরা ক্রীড়া– বিলাসে রত থাকতেন। তিনি সেখানে গিয়ে বিভিন্ন পুষ্প ও আরও বহুবিধ পূজাপকরণের সাহায্যে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি অধিপতি স্বয়ং ব্রহ্মার আরাধনায় নিমগ্ন হলেন।

আদিপুরুষ ভগবান ব্রহ্মা আগ্নীদ্রের তপস্যার কারণ অবগত হলেন। তখন তিনি স্বীয় সভার গায়িকা অপ্সরা "পূর্বচিত্তি" কে আগ্নীরে উপভোগার্থে প্রেরণ করলেন।

ভগবান ব্রহ্মার নির্দেশানুসারে পূর্বচিত্তি আগ্নীধ্রের মনোরম উপবনে এসে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে লাগলেন।

মন্দার পর্বত সংলগ্ন অঞ্চল আগ্নীধ্রের উপবন ছিল অতি রমণীয়। সেখানে নিবিড় সংবদ্ধ বৃক্ষজালে শোভিত ছিল। সেখানে উপবিষ্ট স্থলে ময়ুরাদি ও বিভিন্ন পক্ষীরা সুমধুর স্বরে গান করছিল।

কলকাকলিতে পরিবেশ মুখরিত হয়েছিল। পদ্মে পরিপূর্ণ নির্মল সরোবরগুলিকে প্রাণময় বলে মনে হচ্ছিল।

ঐ অপ্সরা পূর্বচিত্তি সেই মনোরম স্থানে সলাস্যে পদচারণ করছিলেন। তার পায়ের নূপুরের ধ্বনি শ্রবণ করে আগ্নীধ্রের সমাধিযোগ ভঙ্গ হল। তিনি নয়নদ্বয় ঈষৎ উন্মীলিত করে ধ্বনি অনুসরণ করে দৃষ্টিপাত করলেন।

সেই সময় ঐ অপ্সরা রাজা আগ্নীদ্রের কাছেই বিচরণ করছিলেন। তিনি ভ্রমরীর মতো ফুলের গন্ধ উপভোগ করতে করতে মনোরম বাক্যাবলী ও লাস্যময় বিভঙ্গে সর্বান্তকরণে কামদেবের উপযুক্ত প্রবেশদ্বার নির্মাণ করছিলেন।

তার মুখনিঃসৃত বাক্য যেন মদিরার মত মাদকতাময় অমৃতমধুর বলে শ্রুতিমধুর হয়েছিল। তাঁর সুগন্ধি নিঃশ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমর তার মুখের চারপাশে বিচরণ করছিল। আর তাদের ভয়ে ভীত হয়ে যখন পূর্বচিত্তি দ্রুত পদচালনা করছিলেন তখন তার স্তনযুগল, কেশবন্ধন এবং নিতম্ব চন্দ্রহার সুন্দর ভাবে কম্পিত হচ্ছিল।

সেই অবস্থায় আগ্নী তাকে দর্শন করলেন। কামদেব সেই সুযোগে রাজার অন্তরে প্রবেশ করলেন। রাজা কামাভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি তখন ঐ সুন্দরীকে বশীভূত করার অভিপ্রায়ে জড়তাগ্রস্ত অচেতন ব্যক্তির মতো কখনও পুরুষ কখনও বা স্ত্রী বলে সম্বোধন করতে লাগলেন।

হে মুনিবর তুমি কে? এই পর্বতস্থ উপবনে তুমি কেন বিহার করছ? তুমি কি মায়া, পূর্বচিত্তির ভ্রুযুগল দর্শন করে আগ্নীধ্র তাকে বললেন– হে সখে, জ্যাহীন এই দুটি ধনু তুমি কেন ধারণ করেছ? তা কি নিজের কোন কাজের জন্য অথবা এই বনমধ্যে মৃগতুল্য অজিতেন্দ্রিয় আমাদের মতো পুরুষদের বশীভূত করার জন্য?

অপ্সরা অপরূপ দুটি নেত্রকে আগ্নীপ্র বাণের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন– হে সখে, এই দুটি নেত্রবাণের অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ আর এর পশ্চাৎভাগ অতি সুন্দর ও বিলাস মন্থর। এই দুটি বাণ তুমি কার প্রতি নিক্ষেপ করতে চাও?

তবে তোমার এই বিক্রম আমাদের মতো ভীত, জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত হোক!

অপ্সরা পূর্বচিত্তির দেহসৌরভে আকৃষ্ট ভ্রমরাদি আগ্নীর্ধের হৃদয়ে বিহ্বলতা সঞ্চারিত করে তিনি বলছেন– হে ঈশ! তোমার এই শিষ্যরা তোমার চারিদিকে বেষ্টন করে সরহস্য সামবেদ পাঠ ও গান করছে নাকি? তোমার শিখা থেকে এই যে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, ঐ সকল ভ্রমরাদি বেদসেবনের মতো ঐ কুসুম সেবা করছে।

অতঃপর আগ্নীব্র ঐ সুন্দরীর নূপুরের ধ্বনি শ্রবণ করে বললেন– হে ব্রাহ্মণ। তোমার চরণ পিঞ্জরে আবদ্ধ পক্ষীকূলের শব্দ শুনলেও তাদের তো দেখতে পাচ্ছি না।

ঐ অপ্সরা পূর্বচিত্তির পরিধেয় বসন ছিল পীতবর্ণ। রাজা তাকে মনে করলেন সুন্দর নিতম্বদেশের উজ্জ্বল কান্তি। মেখলার দিকে তাকিয়ে বললেন– জ্বলন্ত অঙ্গারের রেখাযুক্ত ওটা কি? পরে বস্ত্র লক্ষ্য করতে না পেরে প্রশ্ন করলেন– –তোমার পরিধানের বল্কল কোথায় গেল?

অপ্সরা পূর্বচিত্তির উন্নত স্তনদ্বয় দেখে রাজা আগ্নীব্র লোলুপ দৃষ্টিতে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়লেন তিনি প্রশ্ন করলেন– হে দ্বিজ, তোমার ঐ মনোহর শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে কি এমন মধুময় বস্তু পরিপূর্ণ আছে? কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি, মধ্যভাগে কৃশা হয়ে অতি কষ্টে তুমি তা বহন করে চলেছ।

তারপরে স্তনযুগলের উপর কুমকুমের প্রলেপ দেখে প্রশ্ন করলেন- হে সুভদ্রে, তোমার শৃঙ্গ যুগলে এই অরুণবর্ণ লেপন কিভাবে এল? হে সুহৃত্তম, তোমার বাসস্থান কোথায়? আমাকে একবার দেখাও, সেখানকার বাসিন্দাদের বক্ষস্থলে ধৃত এরূপ দুটি আশ্চর্য অবয়ব দেখে আমার মতো লোকের মন অতিশয় বিহ্বল হয়।

হে সখে, তোমার দেহধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আহার কি? তুমি যে দ্রব্যবিশেষ চর্বণ করছ, সেখান থেকে সঞ্জীয় ঘৃতের মতো সৌরভ নির্গত হচ্ছে। আমার দৃঢ় ধারণা, তুমি নিশ্চয়ই বিষ্ণুর অংশ, কারণ তোমার কর্ণকুন্তল বিষ্ণুর ন্যায় মকরাকৃতি!

নিমেষাহত দুটি প্রশান্ত নয়ন, তোমার নির্মল মুখমণ্ডলে শোভিত হচ্ছে। তোমার চঞ্চল অক্ষিদ্বয়, হংসশ্রেণীর মতো দন্তপংক্তি ও কালো ভ্রমরের মতো কুঞ্চিত কেশকলাপ, আমার হৃদয়কে চঞ্চল করেছে।

তুমি স্বীয় করকমল দিয়ে যে পাদুকাটি চালনা করছ, তা চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে আমার দু'নয়নকেও চঞ্চল করে তুলছে। তোমার কুঞ্চিত কেশরাশি বন্ধনমুক্ত! ধূর্ত লম্পট বায়ু তোমার কটিবন্ধন হরণ করেছে, তুমি কি এটাও অনুভব করতে পারছ না।

হে তপস্বী, কোন্ কঠিন তপস্যাবলে তুমি তপোবিঘ্নকারী রূপ ধারণ করেছ?

হে মিত্র! তুমি অনুগ্রহ করে আমার এখানে তপস্যা কর। অথবা সৃষ্টি– বিস্তারকারী ভগবান ব্রাহ্মণ আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তোমাকে এখানে প্রেরণ করেছেন। আমি তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করব না।

আমার হৃদয় শুধুমাত্র তোমাতে সংলগ্ন হয়ে আর নিবৃত্ত হচ্ছে না। হে সুস্তনী! তোমার মন যেদিকে যায়, আমাকেও সেদিকে নিয়ে চল। তোমার সখীগণও অনুকূল হয়ে আমাকে অনুসরণ করুক।

শ্রী শুকদেব বললেন– হে রাজ, রাজা আগ্নী দেবতুল্য বুদ্ধির ছিলেন। ললনাগণের অনুনয় সম্বন্ধেও তার বিলক্ষণ নৈপূণ্য ছিল। এইরকম প্রেম– বিদগ্ধ আলাপচারিতার মাধ্যমে অপ্সরা পূর্বচিত্তির মনে সন্তোষ উৎপাদন করতে লাগলেন।

বীরগণের অধিনায়ক এ জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর মহারাজ আগ্নীর্ধের বিদ্যা, বুদ্ধি, বয়স, রূপ, ঔদার্য, প্রভৃতি চরিত্রগুণের লক্ষণ দেখে পূর্বচিত্তিও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তখন তিনি বহু অযুত বৎসর পরিমিত কাল তার সাথে দিব্য ও ভৌম ভোগে আকৃষ্ট হয়ে রইলেন।

কালক্রমে তার গর্ভে–নাভি, কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরন্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব এবং কেতুমাল নামে পুত্রদের জন্ম হল। এইভাবে পূর্বচিত্তি প্রতি বছর একটি করে পুত্র প্রসব

করলেন। এভাবে নটি পুত্র প্রসবের পর তাদের গৃহে রেখে, নিজে ব্রহ্মার সভায় গমন করলেন, সেখানে তিনি সঙ্গীত সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে ব্রহ্মার তপস্যা করতে লাগলেন।

মহীয়সী মাতার অনুগ্রহে আগ্নীধ্রের পুত্রগণ দৃঢ়াঙ্গ এবং বলশালী হয়ে ছিলেন। যথাকালে পিতা পৃথিবী ভাগ করে দিলেন। তখন আগ্নীধ্রের এই নয়জন পুত্র নিজ নিজ নামানুসারে বিভক্ত জম্বুদ্বীপের নটি বর্ষে রাজত্ব করেছিলেন।

রাজা আগ্নীধ্র বিষয়াদি ভোগ করেও পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। তিনি নিরন্তর সেই অপ্সরা পূর্বচিত্তির কথা স্মরণ করতেন। তাকেই সর্বোত্তম মনে করে, তার কথা ভাবতেন। যথাকালে বেদোক্ত কর্মপ্রক্রিয়ার দ্বারা তার দেহাবসান হল। দেহান্তে তিনি অপ্সরাগণের লোকেই গমন করলেন।

অপ্সরা লোক হল সেই লোক যেখানে পিতৃগণ সর্বদা আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। পিতা আগ্নীধ্রের পরলোকগমনের পরে, তাঁর নয় পুত্র রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। এরপর তারা মেরুর নয় কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন।

নাভির পত্নী হলেন মেরুদেবী, কিংপুরুষের ভার্য্যা হলেন প্রতিরূপা, হরিবর্ষের সঙ্গে উগ্রদংষ্ট্রী, ইলাবৃতের সঙ্গে লতা ও রম্যকের সঙ্গে রম্যার বিবাহ হল। মেরুকন্যা শ্যামার পতি হলেন হিরন্ময়। কুরুর ভার্য্যা হলেন নারী। মেরু তনয়া ভদ্রাকে পত্নীরূপে বরণ করলেন ভদ্রাশ্ব। কেতুমালের স্ত্রী হলেন দেবদীধিতি বা দেববীতি।

.

তৃতীয় অধ্যায়

নাভির চরিত্র বর্ণনা এবং তার পুত্ররূপে ভগবানের অবতরণ

শ্রী শুকদেব বললেন– হে মহারাজ, আগ্নীধ্র পুত্র নাভি ও মেরুদেবী ছিলেন নিঃসন্তান। অপত্য কামনায় তারা একাগ্রমনে যজ্ঞপুরুষ শ্রী ভগবান বিষ্ণুর উপাসনায় রত হলেন।

নাভি বিশুদ্ধ চিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞকর্মে রত ছিলেন। সে সময়ে প্রবর্গ নামক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান চলছিল। তখন ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং শোভনরূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

দ্রব্য, দেশ, কাল, মন্ত্র, ঋত্বিক, দক্ষিণা, বিধি- এই সাত প্রকার উপায়েও দর্শন করা দুষ্পপ্য বিষয়, তিনি ভাগবতজনের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

হে রাজন, ভগবানের স্বরূপে আত্মপ্রকাশের তাৎপর্য এই যে, তিনি ভক্তজনের একান্ত পরতন্ত্র।

ভক্তগণের অভিপ্রেত বিষয় তিনি সম্পন্ন করে দেবেন, এই বাসনাতেই ভগবানের চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছিল। নাভির সামনে তিনি নয়নসুখকর, মনোহর সুন্দর মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করলেন।

নিঃসহায়, হতদরিদ্র ব্যক্তিগণ উত্তম ধন লাভ করলে তার বহু সমাদর করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে তেমনি ঋত্বিক সদস্য এবং যজ্ঞে দীক্ষিত। গ্রহপতি রাজ্য লাভ প্রত্যেকেই সেই পুরুষোত্তমের প্রতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে প্রণিপাত করলেন।

চতুর্ভুজ তেজোময় সেই পুরুষকে বহু সমাদরে বিবিধ অর্ঘ্য সহকারে পূজার্চনা করলেন, তার পরিধানে কপিশবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন বিরাজমান ছিল।

তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বনামাল্য, কৌস্তুভ মণিতে শোভিত ছিলেন। তার মুকুট ছিল বহু তেজস্কর মাণিকে সজ্জিত। কুণ্ডল, কটক, কটিসূত্র, হার, কেয়ূর নূপুর প্রভৃতি সুন্দর অলংকার তিনি বিভূষিত ছিলেন।

ঋত্বিকগণ বললেন– হে পূজ্যতম, আমরা তোমার ভৃত্য। তুমি স্বয়ং পূর্ণ। তবু আমাদের পূজা স্বীকার করতে যোগ্য হও! হে প্রভু, তোমাকে স্তব করার সাধ্য আমাদের নেই। তোমার স্বরূপ অতি দুজ্ঞেয়।

সাধুগণের কাছ থেকে আমরা শুধুমাত্র নমঃ, নমঃ– এই মন্ত্র উচ্চারণের শিক্ষালাভ করেছি। যার বুদ্ধি প্রকৃতিজাত এই প্রপঞ্চকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এরকম কোনও অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে, তার পরিচিত প্রকৃত প্রপঞ্চের নাম, রূপ ও আকৃতি দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ধারণে সমান হতে পারে না।

বস্তুত, তোমার যে সকল গুণ জনগণের অয়ঃ, কলুষ বিনাশকারী, তার একদেশের কথন ছাড়া সংসারাসক্ত চিত্ত ব্যক্তিগণ বেশি কিছুই বর্ণনা করতে পারে না।

হে পরম, তবুও ভক্তমণ্ডলীর কণ্ঠে জয়ধ্বনি শুনেই তুমি তৃপ্ত হও। সামান্য জল, পুষ্প–পল্লব, তুলসী, দুর্ব্বা ও সবান্ধুর প্রভৃতি উপাচারে পুজোর অনুষ্ঠান করলেই তুমি সন্তুষ্ট হও। বিবিধ অঙ্গযুক্ত আমাদের কৃত যজ্ঞ দ্বারা তোমার কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না!

নিরন্তর সাক্ষাত্তাবে নিজ হতেই অনুগতরূপে যে সকল পুরুষার্থ সমাধিভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তাদের সমষ্টিই তোমার স্বরূপ। তুমি স্বরূপতঃ, সর্বপ্রকার পুরুষার্থবলে, যজ্ঞাদি দ্বারা তোমার কোনও প্রয়োজন সাধনের অপেক্ষা করে না।

হে প্রভু, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিজেদের শ্রেয়ঃ জানতে পারে না, দয়াবশত হয়ে তাদের তোমার মহিমারূপ মোক্ষপদ ও অন্যান্য কাঙ্খিত বস্তু দানার্থে এখানে তোমার আগমন হয়েছে।

কোনও যাগ– যজ্ঞ বা পূজায় অপেক্ষা তুমি করো না। সেজন্য বস্তুতঃ তুমি অপূজ্য। শুধুমাত্র সাধনের দৃষ্টিতে তোমাকে সাপেক্ষ দৃষ্টিতে অর্থাৎ পূজনীয় বা পূজা প্রার্থীর মতো দেখা যাচ্ছে।

হে পূজ্যতম, বর প্রদানকারীদের মধ্যে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই তুমি যে রাজর্ষি নাভির যজ্ঞে স্বরূপ ধারণ ফেরতঃ আমাদের মতো ভক্তগণের দৃষ্টিগোচর হয়েছ, এটাই আমাদের কাছে বর-স্বরূপ।

হে প্রভু, তোমার দর্শন অতি দুর্লভ। যে সকল আত্মাবাম মুনিগণের বৈরাগ্য তীক্ষিনকৃত জ্ঞানের আগুনে অশেষ বার দগ্ধ হয়েছে, তাঁদের পক্ষেও শুধুমাত্র তোমার গুণকথন অতি কল্যাণকর।

সেজন্য তারা অনবরত তোমার গুণকীর্তন ও স্তব করে থাকেন। হে ভগবান, তোমার দর্শনলাভে আমরা ধন্য হয়েছি, কৃতার্থ হয়েছি, তবুও তোমার কাছে একটি বর প্রার্থনা করি।

হে ভগবান, পথিমধ্যে গমনকালে অজানা কোনো স্থান থেকে পতন, অথবা কোনও সঙ্কটজনক অবস্থায় এমনকি জুরাদি বা মৃত্যুদশাতেও তোমার নাম যেন আমাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। স্মরণে অক্ষম হলেও সকল পাপনাশক তোমার পূর্ব-বিধৃত নামাবলী সততঃ যেন আমাদের ঘিরে থাকে।

দরিদ্র ব্যক্তিগণ অতি তুচ্ছ তুষকণার জন্যও ধনী লোকের দ্বারস্থ হয়। রাজর্ষি নাভি তেমনি তোমার তুল্য একটি পুত্র আকাঙ্ক্ষায় তোমার শরণাগত হয়েছে। তুমি ইহজগতের সমস্ত কাঙ্খিত বস্তুর অধীশ্বর।

হে প্রভু! মহাজনদের চরণসেবা ভিন্ন এ সংসারে পরাজিত হয়। তোমার পরাজিতা মায়ার গতিবিধি কেউই নির্ধারণ করতে পারে না। অতএব সকল ব্যক্তির মতি ও প্রকৃতি মায়া এবং বিষয় বিষে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

হে বহুকার্যকারি, আমরা তোমাকে অতি ক্ষুদ্র কার্যের জন্য আহ্বান করেছি। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা পুত্রকেই পরম পুরুষার্থ বোধ করেছি। হে দেব, আমাদের এই অবহেলন তুমি ক্ষমা কর। তুমি তো সর্বত্র সমদর্শী, সমবুদ্ধি, তাই আমার এই নির্যাতি করছি।

শ্রী শুকদেব বললেন– ভারতবর্ষের অধিপতি মহারাজ নাভি কর্তৃক বন্দিত ঋষিগণ এভাবে ভগবানকে গদগদ বাক্যে স্তুতি করলেন। ভগবান ঐ ঋষিদের স্তবে তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন– হে ঋষিগণ! তোমাদের প্রার্থিত বর অতি দুর্লভ!

কারণ তোমরা রাজর্ষি নাভির আমার সদৃশ পুত্রলাভ হোক এই কথা বলেছ। আমিই আমার সদৃশ, আমার তুল্য দ্বিতীয় কেউ নেই। কিন্তু তবুও, তোমরা ব্রাহ্মণ, তোমাদের প্রার্থিত বর না প্রদান করলে, তোমাদের বাক্য মিথ্যা হয়ে যাবে। কিন্তু তা হতে পারে না। যেহেতু ব্রাহ্মণই আমার মুখস্বরূপ। অতএব আত্মতুল্য কাউকে এখন দেখছি না বলে আমি স্বয়ং মহারাজ নাভির মধ্যে অংশত অবতীর্ণ হব।

শ্রীশুকদেব বললেন– ভগবান মেরুদেবীর শ্রুতিগোচরে মহারাজ নাভিকে এরকম বলে অন্তর্হিত হলেন। হে বিষ্ণুদত্ত মহারাজ, পরীক্ষিৎ ঐ যজ্ঞে মহিষীগণের দ্বারা প্রসাদিত ভগবান, নাভির প্রিয় সাধনার্থে তপস্বী জ্ঞানীও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মর্থেরত দিগবসন সাধুগণের ধর্ম শিক্ষাদানের কামনায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। নাভির অন্তঃপুরে তিনি মেরুদেবীর গর্ভে বিশুদ্ধ– সত্ত্ব মূর্তি ধারণ পূর্বক ঋষরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

.

চতুর্থ অধ্যায়

ঋষভদেবের অলৌকিক চরিত্র বর্ণনা

শ্রীশুকদেব বললেন– হে রাজ, জন্মলগ্ন থেকেই নাভির ঐ পুত্রের পায়ের তলদেশে ভগবৎ– লক্ষণ প্রকাশিত হতে লাগল।

দিনে দিনে সমদর্শিতা উপশম, বৈরাগ্য ঐশ্বর্য, মহৈশ্বর্যসহ তার প্রভাব বৃদ্ধি পেতে লাগল।

এইরূপ মঙ্গল লক্ষণ দর্শন করে অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও প্রজাদের মনে মনে এই বাসনার জন্ম হল– ইনিই যেন রাজা হয়ে এই ধরণীতল শাসন করেন।

কালক্রমে তিনি কবিগণের পদ্য-দ্বারা প্রশংসনীয় উত্তম শরীর, তেজ, শ্রী, কীর্তি, প্রভৃতি গুণের অধিকারী হলেন।

পিতা নাভি পুত্রের মধ্যে এতদ্ভিন্ন গুণের সমাহার দেখে তার নাম রাখলেন "ঋষভ"। একবার দেবরাজ ইন্দ্র স্পর্ধিত অহংকারে তার রাজ্যে বৃষ্টিপাত ঘটালেন না। যোগেশ্বর ভগবান ঋষভ তা

বুঝতে পেরে, স্মিত হাস্যে তার প্রতিবিধান করতে উদ্যত হলেন।

তিনি যোগমায়া বিস্তার করে নিজ রাজ্য অজনাভ বর্ষে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে ছিলেন। পুরাণপুরুষ ভগবান স্বেচ্ছায় মনুষ্যদেহ ধারণ করলে, মহারাজ নাভি ইঙ্গিত সুপুত্র লাভ করে অতি আনন্দিত হলেন।

তিনি অতিশয় আবেগে আনন্দে নিজ পুত্রকে অনুরাগ ভরে গদগদ বাক্যে "হে বৎস, হে তাত"– এই বলে সম্বোধন করতে লাগলেন। মহারাজ নাভি এইভাবে পুত্রের লালন পালন করে পরমানন্দ বোধ করতেন।

মহারাজ নাভি, পুরবাসী ও অন্যান্য প্রজাদেরই প্রমাণরূপে বিবেচনা করতেন। তিনি যখন জানতে পারলেন, তাঁর পুত্র ঋষভের প্রতি প্রজাগণ অনুরক্ত, তিনি ধর্মমর্যাদা ক্রমে তাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

পুত্র ঋষভকে অভিষেকের পর ব্রাহ্মণদের কাছে সমর্পণ করে, নিজ পত্নী মেরুদেবীকে সঙ্গে নিয়ে বদরিকা আশ্রমে গমন করেন।

সেখানে অপরের অনুদেহ- জনক কঠিন তপস্যা ও সমাধিযোগ অবলম্বন করে নর-নারায়ণ নামক ভগবান বাসুদেবের উপাসনা করে যথাসময়ে তাঁর পাদ মহিমাপ্রাপ্ত হলেন। এভাবে তিনি জীবন্মুক্তি লাভ করলেন।

হে পান্ডবেয়, তার সম্বন্ধে মহর্ষিগণ দুটি শ্লোক পাঠ করেন। অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন এই রাজা নাভি। তার তুল্য কর্ম পরে আর কোনো পুরুষ করতে পারে নি।

তাঁর শুদ্ধ কর্মে প্রসন্ন হয়ে স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি তার পুত্রত্ব স্বীকার করেছিলেন তার মঞ্চে আহুত ব্রাহ্মণাদি দক্ষিণা প্রভৃতিতে সম্মানিত হয়ে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির দর্শনপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

পিতা নাভির প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর ভগবান ঋষভদেব নিজ অজনাভ বর্ষকে কর্মক্ষেত্র জ্ঞান করলেন। অপরকে গুরুকুলবাদের প্রয়োজনীয়তা জানাবার জন্যই নিজে গুরুকুলে বসবাস করতে লাগলেন। পরে, দক্ষিণালব্ধ গুরুগণের আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক লোকেদের ধর্মশিক্ষা প্রদান ও শ্রুতিস্মৃতি উভয় প্রকার কর্মের আচরণ করতে লাগলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে জয়ন্তী নামক একটি কন্যাদান করেছিলেন। দেবদত্ত সেই ভার্যার গর্ভে

ঋষভদেব আত্মতুল্য গুণবান একশো সন্তানের জন্ম দিলেন।

হে রাজন, ঐ শতপুত্রের মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম। সেজন্য ঋষভদেবের রাজ্য পরে ভারতবর্ষ বলে পরিচিত হয়।

ঋষভদেবের অন্যান্য সন্তানদের অন্যতম ছিলেন কুশাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মবর্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রক ভরতের অনুগত ছিলেন।

এদের পরবর্তী নয়জন ছিলেন কবি, হবি, অন্তবীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আর্বিহোত্র, দ্রবিড়, চমস এবং করভাজন, এরা প্রত্যেকেই ভগবত ধর্মের প্রবর্তক ও মহাভাগবত ছিলেন। তাদের সুচরিত ভগবান মহিমায় সমৃদ্ধ এবং জনগণ তা থেকে বিষয় নিবৃত্তির শিক্ষা লাভ করতে পারে।

বাকি প্রত্যেক সন্তান পিতার আজ্ঞানুবর্তী অতি বিনীত, মহাশ্রোত্রিয়, যজ্ঞানুষ্ঠান অনুসারি, ও কর্মবিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ভগবান ঋষভদেব স্বয়ং সর্বদা অনর্থ, পরম্পরা অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু, ধর্ম-অধর্ম, সুখ-দুঃখাদি থেকে বিমুক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদা জ্ঞানানন্দময় স্বতন্দ্র ঈশ্বর –স্বরূপ ছিলেন।

তবুও তিনি স্বীয় আচরণের সাহায্যে অজ্ঞ ব্যক্তিদের শিক্ষার জন্য কর্মসকলের অনুষ্ঠান করতেন। এজন্য তিনি লোক-সমাজকে ধর্ম, অর্থ, যশ, সন্তান ভোগ ও মোক্ষ সংগ্রহ দ্বারা গার্হস্থাশ্রমে নিয়ন্ত্রিত করলেন।

তিনি স্বয়ং সর্বত্র সমদর্শী, সমভাবাপন্ন, উপশমযুক্ত, সর্বজীবে মৈত্রীপরায়ণ ও দয়াবান হয়ে অবস্থান করতেন।

যেহেতু, শ্রেষ্ঠ লোকেরা যে কর্মানুষ্ঠান করেন, অপরাপর লোকেরা তারই অনুসরণ করে থাকে, এজন্য ভগবান ঋষভদেব ঐরূপ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

ভগবান ঋষভদেব সর্বধর্ম প্রতিপাদক বেদরহস্য স্বয়ং অবগত ছিলেন, তবুও ব্রাহ্মণদের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেই সাম-দানাদি উপায়ের মাধ্যমে প্রজাগণকে শাসন করতেন।

তিনি যথাবিধি দেশ, কাল, যৌবন, শ্রদ্ধ, ঋত্বিক ও নানা দেবতার উদ্দেশরূপ সামগ্রীর সমাবেশে সুখসমৃদ্ধ সর্ববিধ যজ্ঞদ্বারা একশোবার যজ্ঞেশ্বরের পূজা করেছিলেন।

ভগবান ঋষভদেব এই অজনাভ বর্ষের অধীশ্বর হয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগলেন। এখানকার কোনো লোকের অন্যের কাছ থেকে আকাশকুসুম কিছুই প্রার্থনা করতে হয়নি।

প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। অপরের বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাতও করতেন না। বস্তুতঃ ঋষভদেবের রাজত্বকালে প্রজারা তাদের প্রভুর প্রতি স্নেহাতিশয় ছাড়া কিছুই কামনা করত না।

একসময় ভগবান ঋষভ দেব সমগ্র বিশ্ব পর্যটন করতে করতে ব্রহ্মাবর্ত দেশে এসে উপস্থিত হলেন।

সেখানে উপস্থিত ব্রহ্মর্ষিগণের সভায় প্রবেশ করে দেখলেন নিজ পুত্রেরা সেখানে অধিষ্ঠান করছে। তিনি প্রজাদের অনুশাসনের জন্য বলতে লাগলেন।

.

পঞ্চম অধ্যায়

পুত্রগণের প্রতি ঋষভদেবের জ্ঞানোপদেশ নিজের অবধূত বৃত্তি গ্রহণ

শ্রী ঋষভদেব বলতে লাগলেন– হে পুত্রগণ, এই মনুষ্যলোকে দেহধারী প্রাণীগণের মধ্যে যারা এ মানবজন্ম লাভ করে, তাদের ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্ত হওয়া উচিত নয়।

তুচ্ছ প্রাণী এমনকি বিষ্ঠাভোজী শূকরও একইরকম দুঃখ বিষয়াদি ভোগে প্রবৃত্ত হয়।

হে পুত্রগণ, তপস্যাই একমাত্র উৎকৃষ্ট বস্তু। কারণ তপস্যার ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং শুদ্ধসত্ত্ব থেকেই অনন্ত ব্রহ্মানন্দ লাভ করা সম্ভব হয়।

মনীষীগণ এবং যোষিগণের সাহচর্যকে সংসারের কারণ বলে থাকেন। যে সকল ব্যক্তি সদাচারী, সর্বত্র সমদর্শী, প্রশান্ত স্বভাবা, ক্রোধহীন, এবং সকল প্রাণীর সুহৃদ তারাই মহান ব্যক্তি বলে পরিচিত হন।

অপর দিকে যে ব্যক্তিগণ নিজেকে ঈশ্বর, নিজমধ্যে প্রীতিজ্ঞান করে পরম পুরুষার্থ বোধে তৃপ্তিলাভ করেন, তারাই মহান।

যারা বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের প্রতি পুত্র-কলত্রাদিতে আকৃষ্ট না হয়ে শুধুমাত্র দেহধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ধনলাভে সন্তুষ্ট হন, তারাই জগতে মহাত্মা বলে পরিচিত হন। মানুষ যখন দুঃখবশত ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টির জন্য ব্যাপ্ত, তখন প্রমত্ত হয়ে বিকর্ম বা পাপ কাজে রত হন।

একবার বিরুদ্ধ কর্মের কারণে আত্মার এই ক্লেশাদি দেহের উৎপত্তি হয়েছে, আবার সেই কর্ম করা কখনই উচিত নয়। আমি সেরকম আচরণ অনুচিত বলে মনে করি।

যে পর্যন্ত জীব আত্মতত্ত্বের স্বরূপের জিজ্ঞাসা না করে তাবৎ পর্যন্ত অজ্ঞানকৃত স্বরূপের পারভব হয়ে থাকে। আত্মার প্রকৃত রূপ তার কাছে সর্বদাই থেকে যায়। কারণ যে পর্যন্ত ক্রিয়া থাকে, ততদিন এই মন কর্মস্বভাব রূপে প্রকাশিত হয়।

এই কর্মাত্মক মন জীবের দেহবন্ধের কারণস্বরূপ। অবিদ্যার উপাধি দ্বারা আত্মার বাস্তব স্বরূপ আবৃত হলে, এইরূপ পূর্বকর্ম মনকে বশীভূত করে, কর্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত করে।

অতএব যে পর্যন্ত কামদেব-রূপী আমার মধ্যে জীবের প্রীতির জন্ম না হয় ততদিন দেহবন্ধন থেকে তার মুক্তি সম্ভব নয়।

এই বিবেকবুদ্ধির অভাবে যতকাল মানুষ স্বার্থসাধনে অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ-রূপ ভগবৎসাধনে অমনোযোগী হয়, ততদিন আত্মস্বরূপ উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদির চেষ্টাকে মিথ্যা বা আত্মসম্বন্ধশূন্য মনে না করে ততদিন সে অজ্ঞের মতো মৈথুন সুখপ্রধান গৃহকে আশ্রয় করে সন্তাপ ভোগ করে।

বিবেকীগণ বলে থাকেন, স্ত্রী ও পুরুষের যে মৈথুনভাব, এটাই তাদের পারস্পরিক হৃদয়ের গ্রন্থি স্বরূপ। স্ত্রী এবং পুরুষের প্রত্যেকের নিজস্ব একটি হৃদয় গ্রন্থি থাকে। তদুপরি স্ত্রী-পুরুষের এই যুগলস্বভাবের জন্য তন্মধ্যে আর একার্য স্থূল ও দুচ্ছেদ্য হৃদয়গ্রন্থি থাকে।

এই মিথুনভাব থেকেই জীবের গ্রহ, ক্ষেত্র, পুত্র, আত্মীয় ও ধন বিষয়ে মোহ জন্মায়।

যখন জীবের কর্ম দ্বারা অনুবদ্ধ দৃঢ়তর মনোরূপ প্রাপ্ত হৃদয়গ্রন্থি শিথিলতাপ্রাপ্ত হয় তখন সে অহংকার পরিত্যাগ-পূর্বক মুক্ত হয়ে পরমপদ লাভ করে।

এবারে অহংকার ত্যাগের পঁচিশটি উপায়ের কথা বলেছেন ভগবান ঋষভদেব। তিনি পুত্রদের উদ্দেশ্যে বলছেন– হে পুত্রগণ, হংসের ন্যায় বিবেকী ও শুদ্ধরূপ এবং গুরুস্বরূপ আমার মতো ভক্তি, একনিষ্ঠতা, ভোগ বিতৃষ্ণা সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করার ক্ষমতা, জীব সততঃ দুঃখ ভোগী –এরূপ নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন।

তোমরা সর্বদা তপস্যারত হবে। তোমাদের মনে তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ ঘটুক। কাম্যকর্মের প্রতি মোহহীন হয়ে সর্বদা আমার প্রতি কর্মানুষ্ঠান, আমার চরিত্রাদি কথনে প্রবৃত্ত হও।

সদা আমার ভক্ত অর্থাৎ ভগবৎ সঙ্গ, আমার গুণকীর্তন করবে। সর্বত্র তোমার সমদৃষ্টি হোক। আত্মদেহ এ গৃহাদিতে “আমি ও আমার”– এই রকম বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। নির্জনে অবস্থান পূর্বক প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি ও মনের বশীকরণ করে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রাভ্যাস করা প্রয়োজন।

উত্তম শ্রদ্ধা, কর্তব্য কর্মের অপরিত্যাগ, বাক-সংযম, সর্বত্র আমার ধ্যান-বিষয়ে নিপুণতা, বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভব-যুক্ত জ্ঞান ও সমাধি–এই সকলের দ্বারা ধৈর্য, যত্ন ও বিবেকবান হয়ে অহংকার ত্যাগ করবে।

এইভাবে অহংকারমুক্ত হয়ে কর্ম সকলের আধাররূপ হৃদয় গ্রন্থি বন্ধন, যা অবিদ্যার দ্বারা উপস্থিত হয়েছিল, প্রমাদশূন্য হয়ে এই সকল উপায়ের দ্বারা যেমন- উপদেশ করলাম, সেভাবে সম্যক করা প্রয়োজন, সর্বশেষে ঐ সকল উপায় থেকে বিরত হবে।

হে পুত্রগণ, আমার লোককামনার্থে, আমার অনুগ্রহরূপ প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে পিতা পুত্রকে, গুরু শিষ্যকে ও রাজা প্রজারগর্ভে ঐ শিক্ষাদান করবেন। কিন্তু উপদেশানুসারে কর্ম না করলেও, তাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত নয়। কিন্তু, সে সকল ব্যক্তি তত্ত্ব সম্পর্কে ভীত নয়, কর্মে মুগ্ধ হয় তাদের যেন পুনর্বার কর্মে নিযুক্ত না করা হয়।

যে ব্যক্তি মূঢ়বুদ্ধি, অন্ধলোককে কাম্য কার্যে নিযুক্ত করে, পরিণামে সংসারকূপে নিক্ষেপ করে, তার কোনো স্বার্থসিদ্ধি হয় না। সাধারণ লোক স্বয়ং পারমর্থিক কল্যাণের পথে অন্ধ বলে, অতিমাত্রায় কামনা পরবশ হয়ে শুধুমাত্র অর্থসংগ্রহের চেষ্টাই করে থাকে।

সে নিজের সুখলাভের জন্য পরস্পরের প্রতি বিবাদে লিপ্ত হয়। সে মূঢ়, পরিণামে সে নিজের দুঃখ হবে তাও জানতে পারে না। অবিদ্যার গহ্বরে অবস্থিত কুবুদ্ধি ব্যক্তিকে দেখে। স্বয়ং অভিজ্ঞ, বিদ্বান, দয়াশীল কোনও ব্যক্তি তাকে পুনরায় প্রবৃত্তিমার্গে নিযুক্ত করতে পারেন না।

বিপথগামী অন্ধলোককে দেখে কোনো দয়ালু বিজ্ঞজন তাকে সে পথে যেতে নির্দেশ করেন না। যিনি সংসারী ব্যক্তিকে ভক্তিমার্গের উপদেশ দানে মুক্ত না করেন তিনি স্বজন হলেও স্বজন নন। সে পিতা, পিতা নয়। সে মাতা, মাতা নয়। সে দেবতাও দেবতা নন।

হে পুত্রগণ, আমার এই মনুষ্যশরীর অপরিত্যক্ত অর্থাৎ আমার ইচ্ছায় অধীন। এই দেহ প্রাকৃত মনুষ্য-তুল্য নয়। আমার এই হৃদয় শুদ্ধ-সত্ত্ব- স্বরূপ, যাতে ধর্ম অধিষ্ঠিত রয়েছে।

যেহেতু, আমি ধর্মকে অনুসরণ করে, অধর্মকে দূরে নিক্ষেপ করি, সেজন্য, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাকে 'ঋষভ' উপাধি দান করেছেন। এই 'ঋষভ কথাটির অর্থ শ্রেষ্ঠ! তোমরা সকলেই আমার শুদ্ধ সত্ত্বযুক্ত হৃদয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

মাৎসর্য পরিত্যাগ করে স্থির বুদ্ধি হয়ে তোমাদের সহোদর এই মহোত্তম ভরতের উপাসনা কর। এতেই তোমাদের পিতৃসেবা ও প্রজাপালন সিদ্ধ হবে।

তিনি বললেন– ব্রাহ্মণগণের সেবা অবশ্য কর্তব্য কারণ তারা শ্রেষ্ঠ! হে পুত্রগণ কারণ, চেতন ও অচেতন পদার্থের মধ্যে স্থাবর পদার্থ শ্রেষ্ঠ! তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হল বুদ্ধিসংযুক্ত পশুরা। মানুষগণ তাদের থেকে শ্রেষ্ঠতর। মনুষ্যগণ অপেক্ষা ভূত– প্রেতাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা গন্ধর্বগণ শ্রেষ্ঠ। সিদ্ধগণ তাদের চেয়েও উন্নত। আবার দেব– অনুচর কিন্নরগণ সিদ্ধদের চেয়ে উন্নত। অসুরগণ তাদের চেয়ে উন্নত, অসুরগণ অপেক্ষা দেবগণ শ্রেষ্ঠ।

দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বা রাজা হলেন ইন্দ্র! ইন্দ্রের চেয়ে ব্রহ্মপুত্র দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ উন্নত। তদপেক্ষা শঙ্কর শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মা হলেন এই শংকরের উৎপত্তির কারণ। তাই তিনি শংকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই ব্রহ্মা অপেক্ষা আমি উন্নততর। ব্রাহ্মণগণ আমারও পুজ্য বলে আমারও শ্রদ্ধার যোগ্য। তাই তারা সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বপূজ্য। সর্বদা তাদের সেবা করবে।

তারপরে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধাসহকারে সম্বোধন করে বললেন– হে দ্বিজগণ, আমি আপনাদের তুল্য, কোনো প্রাণীই দেখছি না। তাই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কেউ শ্রেষ্ঠ নয়।

মানবগণ শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাহ্মণের মুখে অন্নাদি আহুতি দান করলে, আমি পরম পরিতৃপ্তিতে সব আহার করি। তার ফলে আমার যে তৃপ্তিলাভ হয় অগ্নিহোত্র যজ্ঞে প্রদত্ত আহুতিও সেভাবে পরিতৃপ্ত হয়ে ভোগ করি না।

যে ব্যক্তিগণ আমার পরম পূজণীয় রমণীয় বেদমূর্তি ধারণ করেছেন, যাদের মধ্যে পরম পবিত্র সত্ত্বগুণ এবং শম (অন্তঃকরণে নিগ্রহ), দাম, সত্য, অনুগ্রহ, তর্প, তিতিক্ষা, অনুভব –এই আটটি গুণ প্রতিষ্ঠিত– তারাই এ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ।

সেই ব্রাহ্মণ তুল্য কারওকে দেখতে পাই না আমি অনন্ত ও পরাৎপর তত্ত্ব এবং স্বর্গ অপবর্গের অধিপতি। আমার কাছেও তারা ভক্তি ভিন্ন অন্য কিছু প্রার্থনা করেন না। আমার প্রতি ভক্তিমান সেই অকিঞ্চন ব্রাহ্মণাদি রাজ্য প্রভৃতি অন্য পদার্থে আকৃষ্ট হন না।

হে পুত্রগণ, তোমরা শুদ্ধদৃষ্টি হয়ে স্থাবর-জঙ্গম সকলের মধ্যে আমার অধিষ্ঠান জেনে প্রতিপদে তাদের সম্মান করবে। সকল প্রাণীকে সম্মান ও সমদৃষ্টিতে দর্শন করাই আমাকে পূজা করার সমতুল। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সকল কর্মের সমর্পণই আমার আরাধনা। তা জীবের মন, বাক্য চক্ষু এবং ইন্দ্রিয় ব্যাপারের ফল স্বরূপ। আমার উপাসনা ব্যতীত কোনও পুরুষ মোহময় কৃতান্ত পাশ থেকে কখনও মুক্ত হতে পারে না।

শ্রী শুকদেব বললেন– হে মহারাজ, ঋষভদেবের নিজ পুত্রগণ স্বভাবত সুশিক্ষিত ছিলেন, সংযমী ছিলেন। তবুও লোক শিক্ষার্থে ঋষভদেব তাদের এইরূপ জ্ঞানপ্রদান করলেন। উপশম স্বভাব, কর্মনিবৃত্ত মহামুনিদের ও ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যে –রূপ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নিজের

শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ্য ভগবৎপরায়ণ পরমভাগবৎ ভরতকে পৃথিবী পরিচালনার জন্য রাজপদে অভিষিক্ত করলেন।

তারপরে, স্বয়ং কেবলমাত্র নিজ শরীরকে পরিজনরূপে স্বীকার করে উন্মাত্তের মতো নগ্ন ও বিক্ষিপ্ত কেশ হয়ে, হোমাগ্নিকে আত্মমধ্যে সংস্থাপিত করলেন।

সে সময় তিনি জড়, অন্ধ, মূক, বধির, পিশাচ ও উন্মত্তের মত নিকৃষ্ট বেশ-ধারণ করেছিলেন। তখন তিনি অবধূতের ন্যায় বেশ ধারণ করেছিলেন।

এভাবে তিনি একাকী বিশ্বভ্রমণ করতে শুরু করলেন। পুর, গ্রাম, আকার, ক্ষেত বা কৃষকদের গ্রাম, পুষ্পোদ্যান, পর্বত-প্রান্তে অবস্থিত গ্রাম, ঘটি, শিবির ব্রজ, ঘেষে বা গোপপল্লী, সার্থ বা যাত্রীনিবাস, পর্বত, বন, আশ্রম ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

মক্ষিকাকুল, মদস্রাবী বন্য হস্তীকে উৎপীড়ন করে, তেমনি তাঁর ভ্রমণকালে দুরাত্মা জনগণ তাঁর গায়ে প্রস্রাব ও শ্লেষ্মা নিক্ষেপ, প্রস্তর খণ্ড ও বিষ্ঠা, ধূলি প্রক্ষেপণ করে তাকে উৎপীড়ন করতে লাগলেন।

ভীতি প্রদর্শন ও দুর্বাক্য প্রয়োগ করেও তাঁকে কেউ ব্যাকুল করতে পারল না। তিনি সমস্ত বিষয় অগ্রাহ্য করে পথ চলতে লাগলেন।

ভ্রমণকালে তিনি সৎ ও অসৎ এই দুই তত্ত্বের অনুভব করে নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

বস্তুতঃ অনিত্য এই শরীরের প্রতি তার অহংকার লুপ্ত হয়েছিল। সেজন্য কোনোপ্রকার তাপমান, উৎপীড়নেই তাঁর কোনোপ্রকার চিত্তবিকার উৎপন্ন হয়নি।

তার দেহের প্রতিটা অঙ্গ যেমন-হাত, পা, বক্ষ প্রভৃতির বিন্যাস অতি সুগঠিত ও সুন্দর ছিল। প্রশান্ত, হাস্যময় মুখমণ্ডলে আনত নয়নদ্বয় সদ্যপ্রস্ফুটিত কমলের মতো রক্তাভ, আয়ত ও স্নিগ্ধ হয়ে তার সৌন্দর্যবর্ধন করছিল। তার গন্ডদেশ, কর্ণদ্বয়, কণ্ঠ ও নাসিকা সুন্দর ও সুগঠিত ছিল।

তাঁর গম্ভীর হাস্যময় মুখ পুরনারীদের চিত্তে কামের উদ্রেক করত।

তবে, যে সময় অগ্রদেশে কুটিল জটাযুক্ত কেশভার লম্বা হয়েছিল। তখন তাঁকে গ্রহগ্রস্ত উন্মাদের মতো মনে হতে লাগল।

ঋষভদেব অনুভব করলেন, লোকগণ তাঁর যোগানুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে, এবং তার এই ব্যাপারে প্রতিকার করতে যাওয়াও শোভন নয়।

তখন তিনি অজগর ব্রত অবলম্বন করলেন। অর্থাৎ এক জায়গায় অবস্থান করে শায়িত অবস্থায় ভোজন, চর্বন এমনকি মলমূত্র ত্যাগ করতেন।

এ সময় বিষ্ঠার উপরে লুণ্ঠিত থাকায়, তার দেহের স্থানে স্থানে বিষ্ঠা লিপ্ত হত। কিন্তু অত্যাশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ বিষ্ঠার দুর্গন্ধ ছিল না। বরং তা এত সুগন্ধি ছিল যে, তার সৌরভে আমোদিত বায়ু দশদিককে সুরভিত করে তুলত।

তিনি গোরু, হরিণ ও কাকের মতো চলমান অবস্থায়, কখনও দণ্ডায়মান বা শয়নরত অবস্থাতেই পান, ভোজন ও মূত্রত্যাগ করতেন।

হে মহারাজ– ঋষভদেব এ ভাবে লোকযাত্রা পরিহার করে, অর্থাৎ যোগীদের যে রকম আচরণ করা কর্তব্য, তা দেখাবার জন্য যোগচর্যার আচরণ করলেন।

প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি স্বয়ং ভগবান ও কৈবল্যপতি ছিলেন। পরমানন্দের স্বরূপ ছিলেন তিনিই।

সকল ভূতের আত্মা ভগবান বাসুদেবে উপাধিভাব পরিত্যাগ করে সতঃসিদ্ধ ফলে পরিপূর্ণ ছিলেন।

এজন্য আকাশগতি, মনের ন্যায় দৈহিক দ্রুতগতি, অন্তর্ধান, পরদেহে প্রবেশ প্রভৃতি যোগ ঐশ্বর্যও উপভোগ করতেন না।

.

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঋষভদেবের দেহত্যাগ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন– হে ভগবান, যে ব্যক্তিগণ আত্মারাম অর্থাৎ আত্মাতেই যাদের রতি, যৌগশ্বর্যসমূহ নিজের থেকেই তাঁদের কাছে ধরা দিলেও তাতে তাদের কোনরূপ আসক্তি জন্মায় না।

যোগবলে উদ্দীপ্ত তাদের কর্মবীজ রাগাদি দগ্ধ হয়। তাহলেও কেন ভগবান ঋষভদেব স্ব-ইচ্ছায় ঐ সব যৌগৈশ্বর্য গ্রহণ করলেন না?

শ্রী শুকদেব বললেন– হে রাজন, তুমি সত্য বলেছ। তবুও ব্যাধগণ মৃগকে জালে আবদ্ধ করেও বিশ্বাস করতে পারে না, অথবা মৃগেরাও ব্যাধকে কখনও বিশ্বাস করতে পারে না। তেমন ভাবেই কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি চঞ্চল মনকে কখনও বিশ্বাস করেন না।

এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলে থাকেন মন চঞ্চল থাকলে কখনও কারো সাথে সখ্য করবে না। ঐভাবে মনকে বিশ্বাস করায় স্বয়ং মহাদেবেরও বহুকালের সঞ্চিত তপস্যা বিষ্ণুর মোহিনীরূপ দর্শনে বিনষ্ট হয়েছিল। ব্যভিচারিণী স্ত্রী উপপতিকে আগমনের সুযোগ দিয়ে, পরে তার দ্বারাই নিজের প্রতি বিশ্বাসাসক্ত স্বামীকে হত্যা করায়।

তেমনি যে যোগীব্যক্তি মনের সাথে সখ্যতা করেন, তাঁর মন সর্বদা কাম ও কামানুগত ক্রোধাদি রিপুগণের আগমনের সুযোগ দিয়ে থাকে। পরিণামে সেই মনই কামাদি দ্বারা যোগীর সর্বনাশের কারণ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ বা গর্বমোহ, শোক, ভয়াদি, কর্মবন্ধ– এ সকল যার নিমিত্ত হয়, সেই মনকে কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের বশীভূত বলে স্বীকার করেন না।

যাই হোক ভগবান ঋষভদেব নিখিল লোকপালগণের ভূষণ– রূপ হলেও, সে সময় তাঁর কোনো অনুচর ছিল না। অবধুতের মত বিবিধ ভাষা ও বিভিন্ন বেশ –ভূষা অবলম্বন করার জন্য তন্নিষ্ঠ ভগবৎ প্রভাবও লক্ষিত হলো না।

তিনি ঐরূপে বেশ কিছুদিন ভ্রমণ করে কিভাবে দেহত্যাগ করতে হয়, তা যোগীদের শিক্ষা দেবার জন্য স্বীয় কলেবর ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলেন।

তিনি স্বীয় আত্মার মধ্যে অব্যবহিত রূপে বিরাজিত পরমাত্মাকে অভিন্নরূপে দর্শন করে, লিঙ্গ দেহগত আত্মাভিমান পরিত্যাগ করলেন।

যদিও তার ঐ প্রকারে দেহাভিমান পরিত্যক্ত হল, তবু মোহমায়ার বাসনার কারণে তার দেহটি ঘুরতে লাগল।

কুলালচক্র, যেমন সংস্কার বশতঃ কিছুক্ষণ স্বয়ং ঘুর্ণায়মান হয়, তেমনি সংস্কার বশতঃ পুনর্বার ভ্রমণ করতে করতে কোঙ্ক, বেঙ্কট, কটুক এবং দক্ষিণ কর্ণাটক দেশে যদৃচ্ছাক্রমে গিয়ে উপস্থিত হল।

সেখানে কূটকাঁচলের উপবনে গিয়ে তিনি কোনো বাসনার কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড নিয়ে নিজে মুখের মধ্যে দিলেন। পরে উন্মত্তের মতো মুক্তকেশ হয়ে নগ্নদেহেই বিচরণ করতে লাগলেন।

অনন্তর সেখানে বায়ুবেগে পরিচালিত বেণুবনে পরস্পর সংঘর্ষণে তীব্র দাবানলের উদ্ভব হলো। সেই দাবাগ্নি সর্বগ্রাসী হয়ে ঋষভদেব সহ সমগ্র অরণ্যানীকে ভস্মীভূত করল।

হে রাজন, ভগবান ঋষভদেব অবধূত বেশে ভ্রমণ করতে করতে যে রকম আচরণ করে ছিলেন, তা লোকমুখে চতুর্দিকে প্রচারিত হল।

এই আচরণের কথা জ্ঞাত হয়ে কোঙ্ক, বেঙ্কট কটক দেশের রাজা অর্থাৎ নিজে ঐরূপ শিক্ষা গ্রহণ করবেন।

অকুতোভয় নিজ ধর্মমত পরিত্যাগ করে নিজ বুদ্ধিবলে পাষণ্ডরূপ কুপথ প্রবর্তন করবেন। কলিযুগে অধর্মই প্রবল হয়ে উঠবে। অতএব ভবিতব্য অর্থাৎ প্রাণীগণের পূর্বসঞ্চিত পাপ ফলের দ্বারা ঐ রাজার মতি বিমোহিত হবে।

এই রাজা স্বয়ং অধর্মের প্রবর্তক হলে, কলিযুগে কুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ দেবমায়ায় বিমূঢ় হয়ে স্বধর্মসম্মত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করবে। ক্রমে তারা দেবগণকে অবজ্ঞা, অস্নান, অশৌচ, কেশ উৎপাটন রূপ অপব্রত স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে।

অধর্মবহুল কলিযুগে ঐ সকল ব্যক্তির বুদ্ধিনাশ হবে। তারা প্রায় সবসময়েই বেদ, যজ্ঞপুরুষ, এবং পরলোকের প্রতি দোষারোপ করতে থাকবে। ঐ লোকগণ অন্ধ বিশ্বাসে সেই অবেদমূলক স্বেচ্ছাচাররূপ নবীন মতবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেরাই মহাঘোর নরকে পতিত হবে।

রজঃ গুণে পীড়িত লোকগণের মুক্তিমার্গ শিক্ষাদানের জন্যই ভগবান ঋষভদেব– রূপে অবতীর্ণ হয়ে ছিলেন। মনীষীগণ তাঁর গুণানুরূপ এই সকল শ্লোকের কীর্তন করে থাকেন। অহো!– সাত সাগর পরিবেষ্টিত এই ভূমণ্ডলবর্তী দ্বীপের মধ্যে এই ভারতবর্ষ সমধিক পুণ্যভূমি।

এই ভারতবর্ষের জনগণ সর্বদা ভগবান শ্রীহরির অবতার যুক্ত মঙ্গলময় কর্মকাণ্ডের কীর্তন করে থাকেন। অহো, রাজা প্রিয়ব্রতের বংশ কীর্তির দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ করেছে। যেহেতু পুরাণপুরুষ ভগবান বিষ্ণু এই বংশে ঋষভদেব রূপে অবতীর্ণ হয়ে মোক্ষসাধক ধর্মের আচরণ করেছিলেন।

অজ অর্থাৎ জন্মরহিত ঋষভদেবের ঐ আচরণ, অন্য যোগীগণ মনোরথ দ্বারাও অনুসরণ করতে পারে না। কারণ তিনি তুচ্ছ বা অবস্তু বলে যে সকল যোগসিদ্ধিকে উপেক্ষা করেছেন অন্যান্য যোগীপুরুষেরা তা লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় নানাবিধ প্রচেষ্টা করে থাকেন।

হে রাজন, সকল বেদ, লোক, দেব, ব্রাহ্মণ ও গো-সমূহের পরম গুরু ঋষভদেবের যে আচরণ বর্ণিত হল, তা পুরুষগণের দুশ্চরিত্র অপরণ অপদারক। পরম আনন্দময়। মহৎ কল্যাণের আহ্বায়ক।

যে ব্যক্তি একাগ্রমনে নিয়ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রদ্ধাসহকারে এই চরিত্র কথা শ্রবণ বা বর্ণন করেন, ভগবান বাসুদেবের প্রতি তাদের প্রত্যেকরই ঐকান্তিক ভক্তির উদয় হয়।

বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সেই ভক্তিস্রোত বিবিধ পাপসঙ্কুল সংসার যন্ত্রণায় সন্তপ্ত আত্মাকে সতত স্নান করিয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করেন।

এজন্য মুক্তিরূপ আত্যন্তি পরম পুরুষার্থে– ভগবানের দানরূপে স্বয়ং উপস্থিত হলেও তারা তার সমাদর করেন না। কারণ পূর্বেই ভগবৎসম্বন্ধীয় হওয়ায় সর্বপ্রকার পুরুষার্থ পরিপূর্ণভাবে লাভ করেছেন।

হে মহারাজ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের অর্থাৎ পাণ্ডবদের এবং যাদবদের পালক। তিনিই তোমাদের গুরু, তিনিই দেব, তিনিই তোমাদের কুলপতি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রবিশেষে তিনি দৌত্যাদি কার্যে তোমাদের আজ্ঞাকারীও হয়েছেন। এরকম হলেও তিনি অন্য ভজনকারীদের মুক্তিই দান করেন। কখনই তিনি তাঁদের প্রেম বা ভক্তিযোগ দান করেন না।

আমি সেই পরমভাগবৎ ভগবান ঋষভদেবের চরণে প্রণিপাত করি। নিত্য যে আত্মস্বরূপ তিনি উপলব্ধি করতেন, তা লাভ করার ফলেই তার সকল তৃষ্ণা দূরীভূত হয়েছিল। দেহাদির নিমিত্ত

মনোরথের কারণে মঙ্গলজনক বিষয়ে যে ব্যক্তিগণের বুদ্ধি সুষুপ্ত ছিল, তিনি তাদের প্রতি করুণা প্রকাশ করেছিলেন।

তিনি তাদের একান্ত দয়া করে অভয়রূপ নিজলোক অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বা আত্মস্বরূপের উপদেশ দান করেছিলেন।

.

সপ্তম অধ্যায়

মহারাজ ভরতের উপখ্যান

শ্রী শুকদেব বললেন, — ভগবান ঋষভদেব পৃথিবী পালনার্থে পরম ভাগবৎ ভরতকে রাজারূপে নিযুক্ত করলেন। তখন তিনি ভগবানের নির্দেশ অনুসারে বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজননীকে বিবাহ করেছিলেন। অহংকার থেকে যেমন শব্দ– স্পর্শাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়, তেমনি ঐ ভার্যার গর্ভে ভরতের পঞ্চপুত্রের জন্ম হল। তাদের নাম সুমতি, রাষ্ট্রভৃৎ, সুদর্শন, আবরণ এবং ধূম্রকেতু।

এই অজনাভ বর্ষ মহারাজ ভরতের নাম থেকেই ভারতবর্ষ রূপে পরিচিত হয়েছে। সর্বজ্ঞ মহারাজ ভরত পিতৃ-পিতামহের ন্যায় স্বধর্মনিষ্ঠ হয়ে, নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত প্রজাদের বাৎসল্যজ্ঞানে প্রতিপালন করতে লাগলেন।

চাতুহোত্র বিধি অনুযায়ী নিজ অধিকার অনুসারে অগ্নিহোত্র দর্শ, পূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য পন্ডযোগ ও সোমযোগের সর্বাঙ্গযুক্ত অনুষ্ঠান এবং কখনও বিকলাঙ্গ বা অঙ্গহী রূপে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বহু যাগযজ্ঞ দ্বারা শ্রদ্ধাসহ ভগবান যজ্ঞমূর্তি ও ক্রতুরূপী শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন। যূপহীন যাগকে যজ্ঞ এবং যুপযুক্ত যাগকে ক্রতু বলা হয়।

হে মহারাজ, অঙ্গক্রিয়া-সমূহের অনুষ্ঠান যুক্ত বিবিধ যজ্ঞ শুরু হলে অধবর্য বা যজুর্বেদজ্ঞ ঋত্বিকেরা যখন আহুতি দানার্থে হবি গ্রহণ করতেন, তখন যজমান ভরত ঐ সকল ক্রিয়ার ফল ধর্ম নামক অপূর্ব বস্তুটিকে যজ্ঞপুরুষ-রূপী পরব্রহ্ম ভগবান বাসুদেবের মধ্যেই অবস্থিত বলে চিন্তা করতেন।

মহারাজ ভরতের ঐরূপ চিন্তাকৌশলের দ্বারা তাঁর চিত্তের রাগ-দ্বেষাদি দোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। মীমাংসা শাস্ত্রে অপূর্ব। অর্থাৎ ক্রিয়ার ফলধর্ম সম্পর্কিত দুটি মত প্রসিদ্ধ রয়েছে। একটি মতবাদে ক্রিয়ার ফলকে যজমানের আশ্রিত বলা হয়েছে। অপর মতানুসারে, ঐ ক্রিয়াকলকে যজ্ঞে আবাধ্য ইন্দ্রাদি দেবতাশ্রিত বলা হয়েছে।

এই অবস্থায় ভরত ঐ ক্রিয়াফলকে বাসুদেবের আশ্রিত রূপে চিন্তা করার কারণ এই যে– ভগবান বাসুদেবই সাক্ষাৎ যজ্ঞকতা। কারণ তিনিই অন্তর্যামীরূপে যজমানকে যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত করেন, বলে মুখ্য কর্তা।

আবার তিনিই যজ্ঞে পরম দেবতা, যেহেতু যজ্ঞে বিভিন্ন মন্ত্রের অর্ঘরূপে ইন্দ্র প্রভৃতি যে দেবতাগণ আমাদের বোধে উপস্থিত হন। ভগবান বাসুদেব তাদেরও নিয়ামক। এই কারণেই রাজা ভরত যজ্ঞের অংশভাগী সূর্যাদি অন্য দেবতাগণকে ভগবান বাসুদেবের চক্ষু প্রভৃতি ভবসরের মধ্যে অবস্থিত রূপে ধ্যান করেছিলেন।

তিনি তাদের ভগবান বাসুদেবের থেকে পৃথক অনুধ্যান করেননি এটাই মহারাজ ভরতের উপাসনার কৌশল। এইপ্রকার ভগবানে ফলাদি ভাবনারূপ বিশুদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মহারাজ ভরতের চিত্ত বিশুদ্ধ হল। তখন ভরতের শুদ্ধ হৃদয়পদ্মে ভগবান বাসুদেবের আবির্ভাব ঘটল।

পরমব্রহ্ম ভগবান বাসুদেব জীবের হৃদয়াকাশে বিরাজ করেন। তিনি শ্রী কৎসচিহ্ন, কৌস্তুভ মণি, বনমাল্য, শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি মাঙ্গলিক চিহ্নযুক্ত হয়ে ভরতের মনের মধ্যে প্রকাশিত হলেন।

তখন ভরতের মনে সেই পরমপুরুষের প্রতি প্রবল ভক্তিভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। মহারাজ ভরত এইভাবে অযুতবর্ষ রাজত্ব করলেন। অতঃপর তিনি মনে করলেন, এতদিনে তাঁর রাজত্বভোগের উপযোগী অদৃষ্টের অবসান ঘটেছে।

তিনি নিজে পিতৃ-পিতামহের যে ধনরাশি-সম্পদ ভোগ করছিলেন তা যথাযথ ভাবে নিজ পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

সেখান থেকে নিজের ভবন ত্যাগ করে পুলহাশ্রমে গমন করে সন্ন্যাস অবলম্বন করলেন। সেই পুলহাশ্রমে বিদ্যাধর কুণ্ডে ভগবান শ্রীহরি অদ্যাবধি নিজ ভক্তদের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে তাদের আকাঙিক্ষত মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন।

সেই স্থানে সরিৎশ্রেষ্ঠা গন্ডকী নদী শিলামধ্যগত চক্রদ্বারা আশ্রম স্থানসমূহে সর্বতোভাবে পবিত্র করেছে। সেই শিলাগঠন এমনই আশ্চর্য যে প্রতিটি শিলার উপরদিকে ও নিম্নভাগে একটি করে নাভি রয়েছে।

পুলহাশ্রমে স্থিত উপবনে মহাত্মা ভরত একাকী নির্জনে অবস্থান করতে লাগলেন। তিনি নানাবিধ পুষ্প, কিশলয়, তুলসী, জল এবং ফল, কল-মূল প্রভৃতি উপাচারে ভগবানের আরাধনা করতে করতে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হলেন।

তিনি সর্বদা শুদ্ধ হয়ে থাকতেন, এবং তার বিষয়াভিলাষ নিবৃত্ত ও শমগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল। পরম ভাগবৎ মহারাজ ভরত এইরূপে অবিরত পরমপুরুষের পরিচয়তায় রত হলে ভগবানের প্রতি তাঁর অনুরাগে অতিশয় বৃদ্ধি পেতে লাগল।

সেই অনুরাগের আতিশয্যে তার হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেল, তাতে আর কোনো উদ্যম অবশিষ্ট রইল না। হর্ষবশতঃ তার শরীরে রোমাঞ্চরাজির উদ্ভব হল।

ঔৎসুক্যের কারণে প্রেমা নির্গত হয়ে নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি নিরুদ্ধ করে দিল। ঐ প্রকার অবস্থায় তখন তিনি সেই ভাগবতসেবার কথাও আর স্মরণ করতে পারলেন না।

নিজের প্রেমদাতা সেই পরম দেবতার রক্তাভ চরণদ্বয়ের ধ্যান করার ফলে, তাঁর ভক্তিযোগ প্রগাঢ় হয়ে উঠল। তাতে হৃদয়রূপ প্রগাঢ় হয়ে উঠল। তাতে হৃদয়রূপ হ্রদের সর্বত্র পরম আনন্দ ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। সেই আনন্দে তার মন নিমগ্ন হয়ে রইল।

এইভাবে ভরত ভাগবত্রত ধারণপূর্বক মৃগচর্ম পরিধান করে থাকতেন। ত্রিসন্ধ্যা তিনি স্নান করতেন। বারংবার স্নানের ফলে তাঁর কুটিল ও কপিশবর্ণ জটারাশি আর্দ্র থাকার কারণে সমধিক শোভা বিস্তার করেছিল।

তিনি সূর্যমণ্ডলের উদয়কালে সূর্যবিষয়ক ঋকমন্ত্র দ্বারা সূর্যমণ্ডলস্থ ভগবান হিরন্ময় পুরুষের আরাধনা করতেন। তিনি বলতেন– প্রকৃতির পর ও শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ সূর্যদেবের সেই ভর্গ অর্থাৎ

তাঁর আত্মস্বরূপ তেজ, আমাদের কর্মফলের দাতা তাঁহার থেকেই মন দ্বারা আমাদের এই বিশ্বের সৃষ্টি।

তিনিই স্বসৃষ্টে জগতের সর্বত্র অন্তর্যামী রূপে প্রবেশ করে নিজস্ব চির্দ-শক্তি দ্বারা কামপুষ্পযুক্ত জীবদের প্রতিপালন করেন। তাদের বুদ্ধিবৃত্তির চালক হয়ে কর্মফল প্রদান করেন। আমরা সেই ভর্গেরই অর্থাৎ তেজোময় শক্তিরূপেণ পদার্থের শরণাগত হয়েছি।

.

অষ্টম অধ্যায়

ভরতের মৃত্ব প্রাপ্তি

শ্রী শুকদেব বললেন–হে মহারাজ, একদিন মহামতি ভরত গন্ডকী নদীতে স্নান ও নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াদি সমাপন করে প্রণামাদি মন্ত্র জপ করতে করতে তিনমুহূর্ত কাল ঐ গন্ডকী নদীর তীরে অধিষ্ঠান করেছিলেন।

সেই সময়ে একটি হরিণী জল পান করার ইচ্ছায় সেই নদীর তীরে উপস্থিত হল। হরিণীটি ছিল গর্ভবতী। সে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে জল পান করতে লাগল। এমন সময়ে অত্যন্ত কাছেই এক সিংহ গর্জন করে উঠল।

সিংহের গর্জন সেই নির্জন স্থানে অতি ভয়ংকর মহাশব্দরূপে শ্রুত হল। হরিণী সততই ব্যাকুল স্বভাবা। এই মহাগর্জন যুক্ত সিংহনাদে সে আরও ব্যাকুল হয়ে উঠল।

তখন সে দিভ্রান্ত হয়ে অর্ধপিপাসু অবস্থাতেই ভয়ে লাফ দিয়ে নদী পার হতে গেল। উল্লম্ফনের সময়ে হরিণীর গর্ভস্থ সন্তানটি স্থানচ্যুত হয়ে নদীর স্রোতে পতিত হল।

তখন সে হরিণী গর্ভপাত ও ভয়ে কাতর হয়ে পড়ল। একাকিনী, দলচ্যুতা সেই হরিণীর আর একটু পরেই মৃত্যু হল।

এদিকে সদ্যোজাত হরিণশাবকটি নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। তাকে দেখে ভরতের মনে করুণা সঞ্চারিত হল।

মাতৃহীন, বন্ধুহীন সেই হরিণ-শাবকটিকে তিনি নিজেই জল থেকে তুলে আনলেন। তার অন্য আশ্রয় না থাকায় নিজের আশ্রমে নিয়ে এলেন।

ক্রমে সেই হরিণশিশুর প্রতি ভরতের এক অত্যাশ্চর্য মায়ার উদ্রেক হল। তিনি সর্বদা তার প্রতি "এ আমার"–এরূপ অভিমান করতেন। সেজন্য রাজর্ষি ভরত তৃণাদি আহরণ করে তার পোষণ করতেন।

বৃক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু থেকে রক্ষণ ও যত্ননাদির সাহায্যে তার প্রীতি সম্পাদন করতেন। স্নেহ চুম্বনের দ্বারা ভরত ঐ মৃগশিশুটির লালন– পালনের অতীব আসক্ত হয়ে পড়লেন।

তার ফলস্বরূপ মহাত্মা ভরতের নিজের স্নানাদি নিয়ম, অহিংসা এমনকি ভগবানের পরিচর্য্যা প্রভৃতি ক্রিয়া এক এক করে বিচ্যুত হতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে হরিণশিশুর প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়লেন।

তার সর্বদা মনে হতো, অহো এই দীন হরিণশাবকটি কালচক্রের গতিবেগে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু– বান্ধব, থেকে পরিভ্রষ্ট হয়ে আমারই শরণ নিয়েছে। আমিই ওর একমাত্র আশ্রয়, আমিই ওর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও স্বজন।

আমার প্রতি এ অতি বিশ্বাসযুক্ত, আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে জানে না।

সুতরাং, এই শরণাগত হরিণশাবককে রক্ষা করা আমার কর্তব্য, এজন্য আমার কোনো অসূয়া থাকাও উচিত নয়। শরণাগতকে উপেক্ষা করা দোষণীয়।

দীনবন্ধু, নিবৃত্তিপরায়ণ আর্যসাধুবৃন্দ এইরূপ অবস্থায় নিজেদের গুরুতর স্বার্থে সকলের প্রতি নিশ্চয়ই উপেক্ষা করে থাকেন।

রাজর্ষি ভরত এইরকম আসক্তিযুক্ত হলে, উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, অবস্থান ও আহারাদি মৃগশিশুর সাথে নিবিড় স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ হল।

ভরতকে কুশ, পুষ্প, যজ্ঞকাষ্ঠ, পত্র, ফল, মূল ও জল আনার জন্য বনে যেতে হত। তখন তিনি ঐ মৃগশাবকটিকে সঙ্গে নিয়েই যেতেন, পাছে বৃক, কুকুরাদি এসে তাকে আক্রমণ করে এই আশংকায়।

হরিণশাবকটির প্রতি ভরতের হৃদয় স্নেহভরে পরিপূর্ণ হয়েছিল। বনপথে চলতে চলতে সে কণ্টকে আবদ্ধ হতো অথবা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ত, তখন তাকে কোলে– কাঁখে নিয়ে বহন করতেন। এভাবে কখনও বুকে জড়িয়ে আদর করে ভরত পরম আনন্দ লাভ করতে লাগলেন।

এমন কি নিজ কার্য ভগবৎ পরিচর্য্যা শুরু করেই, অসমাপ্ত রেখে মাঝে মাঝে এসে হরিণটিকে দেখে যেতেন। তাকে দেখে সুস্থ মনে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন–হে বৎস, তোমার কল্যাণ হোক।

দৈবাৎ তাকে দেখতে না পেলে ধর্মবিনাশে কৃপণ ব্যক্তি যেমন কাতর হয়, তেমনই অতি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। ভরত তখন হরিণ শাবকটির বিচ্ছেদ-আশংকায় বিহ্বল হয়ে পড়তেন।

অনুশোচনা করতে করতে বলতেন–হায়, হায়, এই মাতৃহীন হরিণশিশুটি অতি দীন। আমি মন্দভাগ্য, অনার্য। আমার চিত্ত ধূর্ত ও কীরাতের ন্যায় প্রবঞ্চনাপূর্ণ হৃদয়। এই অবস্থায় কি সে আমার কাছে ফিরে আসবে? সে অতি সুজন, তার শুদ্ধ চিত্তে সে আমার অপরাধ মার্জনা করে, আবার কি ফিরে আসবে?

দেবগণ কর্তৃক রক্ষিত সেই হরিণশিশু দৈবাৎ আমার কাছে এসে পড়েছে। এই আশ্রমের উপবনে সুকোমল তৃণরাশি ভক্ষণরত অবস্থায় তাকে আবার দেখতে পাব কি? কোনও হিংস্র জন্তু, নেকড়ে বাঘ, বন্য কুকুর, কিংবা যূথবদ্ধ শূকর প্রভৃতি তাকে ভক্ষণ করে নি তো?

যে সূর্যোদয়ে সকল জগতসংসারের কল্যাণ সাধিত হয়, তিনি এখন অস্তাচলে গমন করছেন। হায় হায়, ঐ মৃতা হরিণীর গচ্ছিতা ধনটি এখনও আমার কাছে ফিরে এল না। আহা সেই হরিণ শিশু কি আবার এখানে ফিরে এসে আমাকে সুখী করবে?

আমি তো কোনো পুণ্য করিনি। আমার ভাগ্যে কি এরকম ঘটবে? খেলার সময়ে আমি সমাধির অভিনয় করে নয়ন মুদ্রিত রাখলে সে প্রণয়কোপে মাঝে মাঝে এসে জলকণার ন্যায় সুকোমল শৃঙ্গ দিয়ে। আমাকে স্পর্শ করতো।

ভগবানের পরিচর্যার সময়ে আমি কুশের ওপর হোমের জন্য প্রয়োজনীয় ঘৃতাদি দ্রব্যাদি রাখতাম। সে খেলা করতে করতে চঞ্চল হয়ে কুশ আকর্ষণ করে যদি পবিত্র দ্রব্যাদি দূষিত

করে ফেলত, তখন আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতাম। আমার বিরক্তিস্বরে –"আহ! কি করলি" শুনলে সে ভীত হয়ে ঋষিকুমারদের মতো নিশ্চল হয়ে থাকতো।

এইরূপ স্বরে বিলাপ করতে করতে ভরত আশ্রমের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

সেখানে মৃগশিশুর পদচিহ্ন অঙ্কিত ভূমিভাগ দেখে বিলাপ করতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন– কী ভাগ্যবতী এই বসুন্ধরা। না জানি কোন্ তপস্যাবলে এখন সেই কৃজ্ঞসার মিথ্যা হয়ে যায়। তুমি যা যা বললে অ-মিথ্যা না হলেও অসঙ্গত নয় কি? তুমি আমাকে ভুলদেহ বললে এরকম কথা বিদ্বান ব্যক্তিরা কোনও চেতন পদার্থের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেন না। মূর্খ অজ্ঞান লোকেরাই এরূপ বাক্যের ব্যবহার করে থাকে। কারণ এরকম উপমা দেহের প্রতিই প্রযুক্ত হতে পারে আত্মার ওপরে প্রযুক্ত হয় না। বস্তুতঃ আমার দেহ স্থূল হতে পারে কিন্তু আমার আত্মা স্থল নয় অর্থাৎ আমি স্কুল নই।

হে মহারাজ, দেহাভিমান নিয়ে যার জন্ম হয়, তাঁরই স্থূলত্ব, কৃশত্ব ন-ব্যাধি, মনঃপীড়া, ক্ষুধা তৃষ্ণা, ভয়, কলহ, ইচ্ছা জরা, নিদ্রা, আসক্তি, ক্রোধ, অহংকার, গর্ব এবং শোধক সম্ভব। কিন্তু দেহাভিমান না থাকার কারণে আমার স্কুল ত্বাদি কিছুই নেই। তুমি এই যে আমাকে জবিত বললে এ বিষয়ে বলা যায় শুধু আমিই জীব নই। বিকারী অর্থাৎ পরিণাম শীল পদার্থ মাত্রেরই আদি ও অন্ত আছে। সেজন্য সকল রকম বস্তুই জীবমৃত বলে অনুভূত নয়। আবার এই যে বললে– স্বামী বা প্রভুর আদেশ অমান্য করছিস তার সম্বন্ধেও আমার কিছু বক্তব্য আছে। হে মান্যবর! যে স্থানে স্বত্ব– স্বার‍্যা ভাব অর্থাৎ প্রভু– ভৃত্যের সম্পর্ক– চিরস্থায়ী হয়, একমাত্র সেখানেই আদেশ ও তার অনুরূপ কর্ম স্থির থাকতে পারে। কিন্তু তোমার এই রাজ– অধিকার তো চিরস্থায়ী নয়! যদি তুমি রাজ্যভ্রষ্ট হও, আমি রাজা হই, তাহলে প্রভু– ভৃত্য সম্বন্ধেরও বিপর্যয় ঘটতে পারে। ভরত একটু থেমে আবার বলতে থাকেন অবশ্য তুমি বলতে পারো যতদিন রাজত্ব আছে ততদিন তুমি আমার প্রভু। তাও বলতে পারা যায় ব্যবহার ব্যতিরেকে রাজা ও ভৃত্য এই ভেদবুদ্ধির কোনও অবকাশ দেখা যায় না। বস্তুতঃ প্রভু কে? কার ওপরেই বা তার প্রভুত্ব? তবু যদি তোমার প্রভুত্বের অভিমান থাকে, তাহলে কোন কার্য করতে পারি?

তুমি আমাকে প্রমত্ত বলছ এজন্য তুমি আমার যথোচিত চিকিৎসা করবে বলেছ! এ বিষয়ে আমি বলছি– হে রাজন, আমি উন্মত্ত বা জড়বৎ ব্যবহার করলেও বস্তুতঃ আমি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েছি, তুমি চিকিৎসা কর বা শাস্তিই দাও, তার ফলে আমার অর্থ বা অনর্থ কিছুই হবে না।

আর তোমার কথার সূত্র ধরেই বলতে পারি, যদি আমি জড় বা প্রমত্তই হয়ে থাকি, তবে তোমার দণ্ড বা শিক্ষাদান ব্যর্থ হবে, কারণ প্রমত্ত বা জড় ব্যক্তিকে শিক্ষার দ্বারা কর্মপটু করা সম্ভব নয়।

শুকদেব বললেন– হে রাজন, সেই উপশমশীল ভরত এভাবে রাজার তিরস্কারের উত্তরে তাঁকে উত্তর দিলেন। উত্তর দানের পর আবার প্রবন্ধ কর্মক্ষয়ের জন্য আগের মতোই শিবিকা বহন করতে উদ্যত হলেন। দেহে আত্মবুদ্ধির কারণ যে অবিদ্যা, তা তাঁর নিবৃত্ত হয়েছিল। রাজার শিবিকা বহন করার জন্য তার ক্লেশ বা অপমান কিছুই অনুভূত হল না। হে পাণ্ডবেয়, সিন্ধু ও সৌরীর দেশের অধিপতি রহূগণ সম্যকশ্রদথার দ্বারা পূর্বেই তত্ত্বজিজ্ঞাসার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এখন হৃদয়গ্রন্থি বিমোচন ও বহুবিধ যোগগ্রস্থ সন্মত ভরতের এবিধ বচন শ্রুত হয়ে তিনি শিবিকা থেকে নেমে এলেন। নিজের রাজগরিমা বিসর্জন দিয়ে তিনি জড়বৎ ভরতের পায়ে মাথা রেখে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

নৃপতি রহূগণ বলতে লাগলেন- হে দেব! আপনি যজ্ঞসূত্র ধারণ করছেন, অতএব আপনি তো ব্রাহ্মণ! এমন গূঢ়ভাবে কেন বিচরণ করছেন? দত্তাত্রেয় প্রভৃতি অবধূতগণের কে আপনি? হে দেব! আপনি কার সন্তান? কোথায় বাস আপনার? এখানে আগমনের কারণ কি? আপনি যদি আমাদের কল্যাণার্থে এসে থাকেন, তাহলে আপনি কি স্বয়ং কপিলমুনি? হে ব্রাহ্মণ, আমি দেবরাজ ইন্দ্রের বর্জকে ভয় পাই না। ভগবান শূলপানির ত্রিশূলও আমার কাছে ভীতপ্রদ নয়। যমরাজের দণ্ডকে আমি ভয় পাই না। সেরকম অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য ও কুবেরের অস্ত্র থেকেও আমার ভয়ের কারণ কোনো দেখি না। কিন্তু, ব্রাহ্মণগণের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করলে যে মহাপাপ হয়, তাকে আমি ভয় করি। হে মহাপুরুষ, অজান্তে এই অপরাধ করে আমি অত্যন্ত ভীত। আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি দয়া করে নিজ পরিচয় উন্মোচন করুন। আপনি নিজ বিজ্ঞানরূপ প্রভাব প্রচ্ছন্ন রেখে সঙ্গ–ত্যাগ করে জড়বৎ বিচরণ করছেন। আমাদের কাছে আপনার অনন্ত মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। আপনি যোগগ্রথিত যে বাক্যসকল বললেন, আমরা তার তাৎপর্য অনুভব করতে পারি না, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী মনীষীগণও তা করতে পারেন না।

আমার গুরু হলেন আত্মতত্ত্বজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ কপিলদেব। তিনি জ্ঞানশক্তি দ্বারা অবতীর্ণ সাক্ষাৎ শ্রীহরির স্বরূপ। আমি এই শিবিকায় আরোহণ করে তাঁর সকাশে গমন করছিলাম। “এ সংসারে আশ্রয় কি?” আমার জিজ্ঞাস্য এটাই।

আপনি কি সেই কপিলদেব, লোকসমুদয় পরিদর্শনের জন্য ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করছেন? আমার মতো গৃহাসক্ত মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি, কিভাবে আপনাদের গতিপ্রকৃতি অবগত হতে পারি? হে প্রভু, আপনি আগে আমার যে সকল বাক্যের উত্তর দিলেন, তা আমার সঙ্গত বোধ হচ্ছে না। আপনি বললেন– "আমার শ্রম নেই"– তা কিভাবে সম্ভব? যে ব্যক্তির কোনো কর্মের কর্তা হয়, তাঁর কর্ম ও শ্রম অবশ্যই থাকা উচিত। যখন আমার নিজের প্রভুত্ব ও যুদ্ধাদি ক্রিয়ার কর্তৃত্ব সহজেই কর্ম ও শ্রম দেখছি, তখন সহজেই অনুমান করতে পারি, আপনারও ভার বহনে যথেষ্ট শ্রম হয়েছে।

আর আপনি যে বলছেন–একমাত্র ব্যবহার ভিন্ন অন্য কিছুরই পার্থক্য দেখছি না। তারও তো কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যা পাচ্ছি না। বস্তুতঃ ব্যবহারবস্তু অলীক, এমন বোধ হয় না। বরং সত্য বলেই অনুভূত হয়। যেহেতু ঘটাদি পদার্থ মিথ্যা হলে, তাতে কি জল আনয়ন প্রভৃতি ক্রিয়া ঘনমান হয়? ইহা মিথ্যা, সত্তাহীন হলে এর দ্বারা কোনো কার্য সাধন সম্ভব হয় না। ঘট যদি অসৎ অর্থাৎ সত্তাহীন পদার্থ হোত, তাহলে তা দিয়ে জল আনয়ন প্রভৃতি কার্য সম্ভবপর হতো কি?

আবার, আপনি যে বলছেন- "স্থূলাত্বাদি ভাবসমূহ দেহাদি উপাধির হয়, আমি আত্মা, আমার উহা নেই"– এককথাতেও আমার সংশয় হয় এই যে — ঐ সকল উপাধির ধর্ম হলেও তা সত্য হবে না হবার কি আছে?

অগ্নি দ্বারা যখন রন্ধনপাত্র উত্তপ্ত হয়, তখন তার মধ্যস্থ জলও উত্তপ্ত হয়। এই উত্তপ্ত জলের তাপে তন্ডুলের বহির্ভাগ তপ্ত হয় এবং তা থেকে তন্ডুলের পাক সম্পন্ন হয়। এরকম যখন দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত তখন পরপর সংক্রমণের ফলে পুরুষ অর্থাৎ আত্মারও সংসারভাব সম্ভবপর হয়। গ্রীষ্মকাশে যখন দেহ সন্তপ্ত হয়, তখন ইন্দ্রিয়াদি, প্রাণ, মনের সন্তাপও দৃষ্ট হয়। তখন দেহ যদি স্থূল হয়, আত্মাও কেন ভুল হবে না?

আবার আপনি যে বলছেন– "স্বত্ব স্বামীত্ব ভাব অনিত্য"– সে বিষয়েও আমার চিন্তা পৃথকতর, কারণ স্বত্ব স্বামীত্ব ভাব অস্থায়ী হলেও যখন যিনি রাজা হন, তখন তিনিই প্রজাদের শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।

আবার আপনি যে বললেন– "স্তব্ধ ব্যক্তিকে শিক্ষাদান বিফলশ্রম"– সে বিষয়েও আমার দ্বিমত আছে, কারণ, যে ব্যক্তি ভগবান অচ্যুতের দাস, সে কখনও নিষ্ফল কর্ম করতে পারে না। তার সকল কর্মই সদর্থক হতে বাধ্য।

স্তব্ধ বা জড় ব্যক্তিকে শিক্ষাদানের ফলে যদি প্রত্যেক ফল লাভ নাও হয়, অর্থাৎ তার জড়তা দূর নাও হয়, তবু পরমেশ্বরের আদেশ সম্পাদন করাতে সেই যত্ন বিফল হয় না।

পরমেশ্বরের আরাধনা করাই স্বধর্ম। রাজা ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে প্রজাগণের শাসনাদিরূপ নিজ ধর্ম পালন করলে, তাই হয় ভগবানের আরাধনা। এভাবেই তিনি পাপমুক্ত হতে পারেন।

হে আর্তবন্ধু! আমি নিজেকে রাজা বা প্রভু বলে অভিমান করে আপনাকে অবজ্ঞা করেছি। আপনার মতো মহাত্মা, সাধুপুরুষের প্রতি এমত অবমাননা, মত্ততারই নামান্তর মাত্র ব্যতীত আর কিছু নয়! হে মহৎ, আপনি আমার প্রতি দিব্যদৃষ্টি দান করুন। যার ফলে আমি সাধুপুরুষগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনজনিত মহাপাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারি।

হে প্রভু, আপনি এই নিখিল জগতসংসারের সুহৃদ ও সখা। সুতরাং, সর্বত্র তুল্য দর্শন নিমিত্ত নিজ দেহেও আপনার কোনো আত্মাভিমান নেই। এর ফলে, আমি যে আপনার অপমান করেছি, তাতে আপনার কোন বিকার নেই। তবুও আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, মহৎ ব্যক্তির প্রতি অবমাননার ফলে অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

.

ভাগবত পুরাণ (দুই)

পঞ্চম স্কন্ধ

একাদশ অধ্যায়

রহুগণের প্রতি জড়ভরতের জ্ঞানোপদেশ

জড়রূপী ভরত বললেন– হে মহারাজ, তুমি বিদ্বান লোক হয়েও অবিদ্বানের মতো কথা বলছ! এজন্য তুমি বিদ্বানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতে পারো না। এই যে তুমি, প্রভু-ভৃত্যের

সম্পর্ককে অর্থাৎ তাদের লৌকিক ব্যবহারকে সত্য বলছ, মনীষী ব্যক্তিগণ তত্ত্ব বিচারের সঙ্গে কখনও এরকম বলেন না। তত্ত্ববিচার না করলেই ব্যবহারও সত্য নয়। হে রাজন, গৃহস্থগণের জন্য যে সকল উত্তম যজ্ঞের বিধান রয়েছে, তাদের সুবিস্তৃত অনুষ্ঠান বিষয়ক বিদ্যাদির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল বেদ। সেই বেদবাক্য সমূহও প্রায়শই হিংসাদিশূন্য ও আসক্তিশুন্য এবং অযথার্থ, এখানে প্রায়শঃ বলার কারণ এই যে, বৈদিক কর্মবিদ সাধারণত হিংসাত্মক ও আসক্তিমূলক বলে শুভফল প্রদান না করলেও, হিংসাদিশূন্য যে সকল বৈদিক কর্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হয়, তা পরমার্থ ফল দান করে।

যে ব্যক্তি বেদান্তবাক্য শ্রবণ করছেন, এরূপ পুরুষেরও বৈদিক কর্মে প্রবৃত্তি দেখা যায়। অতএব বৈদিক কর্মবাদ অযথার্থ হবে কেন? এই আশংকার উত্তরে দ্বিজবর ভরত বলছেন– স্বপ্নলব্ধ সুখ মিথ্যা বলে হেয় প্রতিপন্ন হয়। তেমনি স্বপ্ন দৃষ্টান্ত অনুসারে গৃহস্থগণের প্রাপ্য ঐহিক ও পারলৌকিক সুখমাত্রকেই যে ব্যক্তি হেয় বলে অনুমান করতে পারে না, প্রধান প্রধান বেদবাক্য সকলও সে ব্যক্তির যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনে সমর্থ হয় না। রহূগণ রাজা প্রপঞ্চ-বিশ্বকে সত্য বলে মনে করেন। ভরত তাকে খন্ডন করে বলছেন– জীবের সংসার–ভাবও মনের কার্য। অতএব তা সত্য নয়। জীবের মন যতকাল সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বশীভূত থাকে, ততকাল সেই মন নিরঙ্কুশ হয়ে, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা পুরুষের ধর্ম অথবা অধর্ম বিস্তার করে।

ধর্মাধর্ম বাসনাযুক্ত আত্মা অর্থাৎ মনই বিষয়ের সম্বন্ধেহেতু সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা ইতস্ততঃ বলমান হয়ে কামাদি পরিণামযুক্ত হয়। ষোড়শ কলা অর্থাৎ পঞ্চভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, এবং মনের মধ্যে প্রধানতম হল মন।

সে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ পূর্বক সেই সেই দেহের উৎকৃষ্টত্ব ও নিকৃষ্টত্ব হেতু আত্মার উৎকৃষ্টত্ব বা নিকৃষ্টত্ব প্রকাশ করতে পারে। সংসার চক্রে প্রবঞ্চনাকারী এই মনই মায়ার দ্বারা জীবের উপাধির দেহ প্রভৃতি রচনা করে। মায়াই এই উপাধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দেহী অর্থাৎ জীবকে আলিঙ্গন করে কালপ্রাপ্ত সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ দুর্নিবার ফল প্রদান করে।

যতদিন মন ও জীবের সম্বন্ধ বলবৎ থাকে, ততদিন সর্বদা জাগ্রৎ ও স্বপ্নরূপ ব্যবহার প্রকাশিত হয়ে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের প্রত্যক্ষ হয়। তত্ত্বজ্ঞগণ এই মনকেই জীবের নিগুণত্ব ও সগুণত্বরূপ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট অবস্থার কারণ বলে বর্ণনা করে থাকেন।

হে রাজন, প্রাণীগণের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে তা বিপদের কারণ হয়। প্রদীপ যখন ঘিয়ের সলতে দগ্ধ করে, তখন ধূমযুক্ত শিখা ধারণ করে, কিন্তু অন্য সময়ে অর্থাৎ ঘি নিঃশেষ হলে, তা স্বীয় পদ অর্থাৎ শুক্লতাই ধারণ করে থাকে। মনও তেমনি গুণকর্মের সম্বন্ধযুক্ত হয়ে বিভিন্ন বৃত্তি আশ্রয় করে, আবার গুণকর্মের সম্বন্ধ হতে মুক্ত হলে যথার্থতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

হে বীর! মনের মোট বৃত্তি হল এগারো ধরনের। তার মধ্যে পাঁচটি ক্রিয়ারূপ, পাঁচটি জ্ঞানরূপ ও পাঁচটি অভিমান রূপ। তার মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গন্ধাদি অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ ইত্যাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের বিসর্গাদি অর্থাৎ বাক্যোচ্চারণ, গ্রহণ, গমন, মলমূত্রাদি ত্যাগ ও আনন্দ উৎপাদন ইত্যাদি পঞ্চ এবং অভিমানের (দেহ গেহাদি) এক– এই একাদশটি যথাক্রমে একাদশ প্রকার বৃত্তির বিষয়।

বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় নির্ণীত হয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ গন্ধ, রূপ, স্পর্শ, রস ও শব্দের দ্বারা। তেমনভাবে, মলমূত্রাদি ত্যাগ, রতি, গমন, বাক্যোচ্চারণ ও গ্রহণমূলক শিল্প সাহায্য কর্মকার বৃত্তির বিষয় হয়। একাদশ স্থানীয় দেহটি –'এটি আমার' –এই স্বীকৃতিহেতু অভিমানের বিষয়রূপে জ্ঞাতব্য। কোনও কোনও ব্যক্তি দেহকে বিবেকীগণের অভিমানের বিষয় বলে থাকেন, মূঢ়দের নয়। তারা বলে থাকেন, যে মূঢ়গণের অহংকার নামক দ্বাদশতম বৃত্তিটি শয্যা নাম গ্রহণ করে অহংকারের বিষয় হয়।

শরীরের অপর নাম হল পুর। তাতে জীব অহংকার দ্বারা শয়ন করাতে পুরুষ বলে পরিচিত হন। এজন্য জীবের শয্যারূপ দেহকে অহংকারের আশ্রয় বলে। উক্ত একাদশ বৃত্তিই মনের বিকারমাত্র। পরমেশ্বরের শক্তি অনন্ত। দ্রব্য, স্বভাব, সংস্কার, কর্ম ও কাল অনুযায়ী ঐ একাদশ বৃত্তিই শত, সহস্র, বা কোটি প্রকারের হয়ে থাকে। পারস্পরিক সহযোগিতায় বা নিজ থেকে তা হয় না।

মন অর্থাৎ মায়া রচিত জীব, অর্থাৎ অবিশুদ্ধ কর্তা, ঐ বৃত্তিসকল তার বিভূতি। ঐ সকল প্রবাহরূপে অবিচ্ছিন্ন। কখনও জাগ্রত, কখনও স্বপ্নবস্থায় তাদের আবির্ভাব ঘটে। কখনও বা সুষুপ্তি অবস্থায় তিরোহিত থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সাক্ষী এ কারণ সকল অবস্থাতেই ঐ সকলকে দেখতে পান।

মহারাজ, ক্ষেত্রজ্ঞ দুই, এক মুত্মদশব্দবাচ্য জীব, দ্বিতীয়টি তৎপদার্থের প্রতিপাদ্য, ঈশ্বর উভয়ের মধ্যে জীবের স্বরূপ পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখন দ্বিতীয় ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করা হচ্ছে।

ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তিনি জগৎ সংসারের আদি কারণ। তিনি পরিপূর্ণ স্বরূপ, অপরোক্ষ এবং স্বয়ং জ্যোতির্ময় বস্তু। তিনি স্বয়ম্ভু। তিনি ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের অধিপতি, ষড়ৈশ্বর্যশালী বাসুদেব এবং সর্বজীবের আশ্রয়। তিনি স্ব-অধীনস্থ মায়ার সাহায্যে সর্বজীবের নিয়ামকরূপে তাঁদের আত্মমধ্যে বিরাজ করেন। সর্বব্যাপী বয়ে প্রাণরূপে স্থাবর-জঙ্গম প্রতিটি পদার্থমধ্যে প্রবেশ করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। তেমনি ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পরমপুরুষ ভগবান বাসুদেব এই জগতমধ্যে অনুপ্রবেশ করে সকলের নিয়ন্ত্রণকর্তা রূপে বিরাজ করছেন।

হে মহারাজ, যতদিন পর্যন্ত জীবসকলের জ্ঞানের উন্মেষ না ঘটে, যতদিন পর্যন্ত এই মায়া দূরীভূত না হয়, ততদিন সে সংসারচক্রে আবর্তিত হয়। যখন সে সর্বসঙ্গবিমুক্ত হয় ও ষড়রিপু জয় করতে সক্ষম হয়, তখনই সে এই জগতসংসার থেকে মুক্তিলাভ করে। এই মনই শোক, মোহ, রোগ, আসক্তি, লোভ, শত্রুতা ও মমতার জন্ম দেয়। এই মনই আত্মার উপাধিরূপে বর্তমান থেকে জীবের সংসারতাপের ক্ষেত্ররূপ পরিগণিত হয়। যতদিন না জীবের এই আত্মোপলব্ধি হয়, ততদিন তাকে এই জগতসমুদ্রে বাস করতে হয়।

হে রাজন, এই মনরূপ শত্রু স্বভাবতই অতিশয় বীর্যশীল। বিশেষতঃ উপেক্ষা করলে আরও প্রবল হয়। বস্তুতঃ সে স্বয়ং মিথ্যা পদার্থ হয়েও আত্মা হরণকারী।

অতএব, সতর্কভাবে গুরুরূপী ভগবান শ্রীহরির চরণ আরাধনারূপ অস্ত্রের সাহায্যে এই মনরূপী বৈরীকে তুমি নিজেই বিনাশ করো।

.

দ্বাদশ অধ্যায়

রহূগণের সংশয় নিরসন

রহূগণ বললেন– হে যোগেশ্বর, আপনাকে প্রণাম করি। কেবলমাত্র লোকগণের রক্ষার্থে দেহধারণ করেও পরমানন্দময় নিজস্বরূপ প্রকাশ করার জন্য দেহকে তুচ্ছ জ্ঞান করছেন।

আপনি নিজের অগাধ নিত্যজ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন রেখে নিন্দিত ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করেছেন। আপনি মহান, তাই আপনি নিশ্চয়ই আমায় অজ্ঞানতা ক্ষমা করবেন। হে ব্রাহ্মণ, এই কুৎসিত দেহ-বিষয়ক অহংকাররূপ সর্প আমায় বিশেষভাবে দংশন করছে। এ অবস্থায় আপনার এই

বাক্য আমার কাছে অমৃতবৎ মহৌষধ। প্রখর গ্রীষ্মে সন্তপ্ত তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেমন সুশীতল জলে স্নিগ্ধ হয়, তেমনি আপনার বাক্য শ্রবণ করে, আমার অন্তরাত্মাও তৃপ্ত হয়েছে।

হে ব্রাহ্মণ, যে যে বিষয়ে আমার সংশয় বর্তমান, তা পরে আপনাকে জিজ্ঞাসা করব।

হে প্রভু, আপনি অধ্যাত্মযোগ বিস্তার করে যে বাক্যসমূহ বললেন, তা অমৃতবৎ হলেও অতি দুর্বোধ্য।

আমি বিশেষভাবে তা বুঝতে পারিনি। আপনি সরলভাবে এগুলি ব্যাখ্যা করুন। যাতে আমার কাছে তার মর্মার্থ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়, এই বিষয়ের নিমিত্ত আমার হৃদয় অতিশয় কৌতূহলী হয়ে উঠছে।

হে যোগেশ্বর, ভার বহন প্রভৃতি ক্রিয়া এবং তার ফল পরিশ্রম সাধারণভাবে বাস্তব ব্যবহারের তোরণরূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু, আপনি ঐ সকলকে তত্ত্ববিচারের অযোগ্য অর্থাৎ অবাস্তব বলছেন– এতে আমার মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিজবর ভরত বললেন– হে রাজন, পৃথিবীর বিকারস্বরূপ এই পদার্থ অর্থাৎ শরীরটি কোনও কারণে চলমান হলেই সে ভারবাহক বলে পরিচিত হয়। যে সকল পদার্থ পৃথিবীতে চলনশীল নয় তাদেরকে জড় বস্তু বলা হয়।

উভয়ের মধ্যে শুধুমাত্র এটুকু ভেদ দেখা যায়।

এই ভারবহনের কারণে শরীরের পরিশ্রম দেখা গেলেও, জড় বলে পাষাণাদির ভারবোধ বা পরিশ্রম নেই।

আবার বাস্তব বিচার করে দেখা যায়, এই শরীরটিরও দুটি পায়ের উপরে গুল্ফ, জঙঘা, জানু, ঊরুভাগ, মধ্যদেশ, বক্ষঃস্থল, গ্রীবা ও স্কন্ধ- এই সকল অবয়ব বর্তমান। এদের বাদ দিয়ে পরিশ্রমের আশ্রমরূপে কোনো অবয়বী পদার্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং পরিশ্রম কার উপর প্রযোজ্য হবে, তাই সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয় না।

জড়ভরতরূপী ব্রাহ্মণ বলতে লাগলেন– এভাবে আমাদের স্কন্ধে যে শিবিকা বাহিত হচ্ছে, তা শুধুমাত্র কতগুলি অবয়বের সমষ্টি এই অবয়বগুলিকে বাদ দিয়ে সেখানে কোনও ভিন্ন অবয়বী পদার্থের সত্তা অনুভূত হয় না।

এই শিবিকামধ্যে 'সৌরীররাজ' –এই নাম–মাত্র ধারণ করে যে পদ অর্থাৎ শরীরটি উপবিষ্ট রয়েছে তা পৃথিবীরই বিকারমাত্র।

তুমি অকারণে গর্বভরে অন্ধ হয়ে এই শরীরকেই আত্মা বলে মনে করছ।

'আমি সিন্ধুদেশের রাজা'- এই অভিমানে বদ্ধ হয়েছ। প্রকৃতপক্ষে এই শরীররূপী তোমার মধ্যেও কোনোও অবয়বী পদার্থ উপলব্ধি হয় না।

তুমি বিনা বেতনে এই বাহকদের দিয়ে কষ্টসাধ্য কাজ করিয়ে নিচ্ছ। এতে তুমি যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে চলেছ– এর পরে জনগণের রক্ষক হিসেবে তোমার আত্মশ্লাঘার কোনও অবকাশ নেই।

বস্তুতঃ তুমি অতি ধৃষ্ট। তোমার কোনো লাজ নেই। মহৎ ব্যক্তিগণের সভায় তোমার কোনও স্থান নেই।

হে রাজন, এই পৃথিবী থেকেই সকল চরাচর পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই পৃথিবীতেই তাদের লয় ঘটে। সেহেতু পৃথিবী ভিন্ন ঘট প্রভৃতি অন্য কোনও বিকার পদার্থ না থাকায়, ঘট প্রভৃতি পদার্থের ব্যবহারের কারণ।

ঘট প্রভৃতি পদার্থ কেবলমাত্র জল আনয়ন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারাই সৎ বলে অনুমান করা হয়, এটা তুমি অনুধাবন কর।

বস্তুতঃ মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট প্রভৃতির কোনো সত্তা থাকে না। এজন্য ব্যবহার ক্ষেত্রে ঘটাদিকে 'সৎ' বললেও, তা সৎ নয়।

এভাবে পৃথিবীও বিনাশকালে নিজ আকার স্বরূপ সূক্ষ্ম পরমাণু সমূহের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয় বলে, পরমাণু ব্যতীত পৃথিবী শব্দবাচ্য দৃশ্য পদার্থটির কোনো সত্তা নেই।

'তাহলে পরমাণু-সমূহকে সত্য বলা হোক'– এই কথার উত্তরে বলছেন, যাদের সমষ্টি দ্বারা পৃথিব্যাদি এক একটি স্থূল পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে, এই পরমাণু নামক সূক্ষ্ম পদার্থ।

যদিও তারা অদৃশ্য, তবুও তাদের স্বীকার না করলে পৃথিবী প্রভৃতি স্থূল কার্য পদার্থ সিদ্ধ হয় না বলেই বৈশেষিক প্রভৃতি বাদিগণ মন দিয়েই ওদের কল্পনা করেছেন।

বস্তুতঃ প্রপঞ্চ ভগবানের মায়ার বিলাসমাত্র বলে, পরমাণুসমূহও অজ্ঞানেরই কল্পনামাত্র, কিন্তু সত্য নয়।

হে রাজ, আত্মাতে কখন হ্রস্ব, কখন দীর্ঘ, কখন সূক্ষ্ম, কখন স্থূল করতে হয় তা সম্যক জ্ঞাত হতে হবে। ধর্ম দর্শনের ফলে যে দ্বৈত প্রতীয়মান হয়, তাও মিথ্যা। সবই মায়ার প্রভাব বলে জ্ঞান করবে।

এই মায়াই দ্রব্য, স্বভাব, কাল, আশয়, কর্ম ইত্যাদি বিবিধ নাম দ্বারা উপলক্ষিত হয়।

'তাহলে সত্য বস্তু কি'–এই প্রশ্নের উত্তরে তৃষ্ণা বলছেন। প্রকৃত পরমার্থ সত্য বস্তু হল জ্ঞান। তা বিশুদ্ধ, এক–স্বরূপ, বাহ্যাভ্যন্তর–রহিত, পরিপূর্ণ, বিষয়াকারে অপরিণত ও নির্বিকার, ঐশ্বর্যাদি ষড়্গুণবিশিষ্ট এই জ্ঞানকেই ভগবান বলা হয়।

তাকেই পণ্ডিতগণ বাসুদেব বলে থাকেন।

হে রহূগণ, মহাপুরুষদের চরণকমলরেণু দ্বারা নিজেকে অভিষিক্ত না করলে, কোনও লোকই তপস্যা, বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম, অন্নাদি বিতরণ, গৃহস্থা োচিত পরোপকার, বেদ অভ্যাস কিংবা জল, অগ্নি ও সূর্য-উপাসনা দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করতে পারে না।

হে নরেন্দ্র, সাধু ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বদা ভগবাদ উত্তমশ্লোকের গুণানুবাদেরই প্রস্তাব হয়ে থাকে, ওতে গ্রাম্যকথার সম্পর্কমাত্র নেই। সেই ভগবানের গুণকথন নিরন্তর সাদরে শ্রুত হলে, তাই ভগবান বাসুদেবের প্রতি মুমুক্ষুগণের সবুদ্ধি প্রদান করে।

হে রাজন, আমি পূর্বজন্মে রাজা ছিলাম। আমার নাম ছিল ভরত। মহৎ দর্শন ও শ্রবণের ফলে বন্ধনমুক্তির উদ্দেশ্যে ভগবানের আরাধনা করতাম।

পরে দৈববশত একটা মৃগের প্রতি আসক্ত হই। ফলে তার পরজন্মে আমার মৃগজন্মে শ্রীকৃষ্ণ সাধনার ফলে স্মৃতি অটুট ছিল। এজন্মেও আমি জনসঙ্গ থেকে ভীত হয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে আত্মগোপন করে পর্যটন করছি।

যেকোনো মানব ইহলোকেই নিঃসঙ্গ মহাপুরুষদের উত্তম সঙ্গ থেকে উৎপন্ন জ্ঞানের দ্বারাই মোহবন্ধন ছিন্ন করতে সক্ষম হতে পারে।

শ্রীহরির পুণ্যচরিত কথা একা ও কীর্তন করে যে স্মৃতিলাভ করা সম্ভব, তাতেও সংসার অতিক্রম করে শ্রীহরিকে লাভ করা সম্ভবপর হয়।

মহৎসঙ্গেই ভগবানের কর্মসকল দৃষ্ট ও শ্রুত হয়, তার ফলেই স্মৃতিলাভ হয়ে থাকে।

.

এয়োদশ অধ্যায়

ভরত কর্তৃক ভটাটবী বর্ণনা

জড়রূপী ভরত বললেন– হে রাজন, বণিকের দল অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে নানা স্থান ভ্রমণ করতে করতে বনের মধ্যে উপস্থিত হলে নানা বিপত্তি ভোগ করতে বাধ্য হয়।

তেমনি জীবেরাও সুখের আশায় মায়াচালিত হয়ে দুস্তর সংসারে প্রক্ষিপ্ত হয়। সেখানে রজঃ ও সত্ত্বগুণের দ্বারা বিভক্ত কর্ম সমূহকে কর্তব্যরূপে জ্ঞান করে ভ্রমণকালে সংসার অরণ্যে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেখানে কোনওরূপ সুখ লভ্য হয় না বরং বিপদগ্রস্ত হয়।

হে নরদেব, এই জগত–অরণ্যে ছয়টি দুর্দান্ত দস্যু আছে। তারা ইন্দ্রিয়রূপে কথিত হয়।

তারা ঐ বণিকস্বার্থের নায়ককে কুৎসিত বিবেচনা করে বা অযোগ্য দেখে বণিক দলের ধর্মার্জিত ধনরাশি লুণ্ঠন করতে প্রবৃত্ত হয়। সেখানে বহুসংখ্যক দারা–অপত্যাদি রূপ শৃগাল আছে, যারা বণিকদলের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের হরণ করে নিয়ে যায়।

ঐ বনে প্রচুর তৃণলতা ও গুল্মাচ্ছাদিত অতি দুর্গম গহ্বর আছে।

বণিকদল সেখানে উপস্থিত হয়ে তীব্র দংশন মশক দ্বারা উৎপীড়িত হয়। তারা অরণ্যমধ্যেই কোথাও গন্ধর্বপুর দেখতে পায়, আবার কোনো অতিশয় বেগবান উল্মুকাকার গ্রহ দেখে সুবর্ণ বোধ করে তার প্রতি পরম লোভনীয় দৃষ্টিতে অবলোকন করে তার জন্য স্পৃহা অনুভব করে।

কোনো স্থানে নিবাসস্থান, জল ও ধনের প্রতি মমতা পরবশ হয়ে তারা বনের মধ্যে ধাবিত হয়। যখন চক্রাকার বায়ুবেগে উত্থিত ধুলিরাশিতে দিকসকল সমাচ্ছন্ন হয়, তখন তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়।

ঐ বনমধ্যে কোনস্থানে ঝিল্লীর কঠোর ধ্বনিতে তাদের কর্ণপীড়া উপস্থিত হয়।

কোথাও বা পেচকের কুৎসিত ডাকে তাদের অন্তরে ব্যথার উদ্রেক হয়।

ঐ বণিকেরা যখন ক্ষিপ্র হয় ক্ষুধার্থ হয়, তখন তারা অপুণ্য বৃক্ষ সকলকে আশ্রয় করে। কোথাও বা মরীচিকা দর্শন করে, পিপাসার্ত হয়ে জলপানের জন্য সেদিকেই ধাবিত হয়।

তারা কোনস্থান জলহীন নদীর দিকে ধাবিত হয়। সেখানে পতিত হলে, জললাভ অপেক্ষা অর্থ হানির সম্ভাবনা যে বেশি, এ বিষয়ে তারা অবহিত থাকে না। কখনও তারা নিরন্ন হয়ে পরস্পরের কাছে অন্নাদি যাজ্ঞা করে, কখনও তারা দাবানলে পতিত হয় অগ্নিদগ্ধ হয়। কখনও যক্ষগণ তাদের মত রাজাদির দ্বারা প্রাণতুল্য ধন হরণ করার ফলে খেদগ্রস্ত হয়ে থাকে। কখনও বা বলবান ব্যক্তিগণ সর্বস্ব হরণ করলে তারা বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। সেজন্য শোক করতে মুছিত হয়ে পড়ে। কোথাও বা গন্ধর্বপুরে প্রবেশ করে পিতৃ পুত্রাদির সমাগমে মুহূর্তকাল আমোদ– প্রমোদে মত্ত হয়।

কখনও তারা পর্বতারোহণের জন্য পথ চলতে গিয়ে কন্টক ও শর্করাবিদ্ধ হলে বিক্ষুব্ধ হয়। বহু পোষ্যযুক্ত কোনও ব্যক্তি জঠরাগ্নির জ্বালায় পীড়িত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে অপরের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে।

হে রাজন, ঐ অরণ্যমধ্যে কোনও স্থানে, কোনও সময়, কোনও কোনও ব্যক্তি নিদ্রারূপ সর্প দ্বারা গিলিত হয়ে পরিত্যক্ত শবের ন্যায় পতিত থাকে। কখনও বা হিংস্র জন্তুরা তাদের দংশন করে। তখন তারা অন্ধ হয়ে অন্ধকূপে পড়ে অন্ধকারে নিমগ্ন হয়। কেউ কেউ ক্ষুদ্ররস অন্বেষণার্থে কারও কাছে। অবজ্ঞাত হয়ে অতিশয় ব্যথিত হয়। যদি কখনও অতি কষ্টে ঐ বিষয়ে মান লভ্য হয় অর্থাৎ ক্ষুদ্ররস লভ্য হয়, তবু তা ভোগ করতে পারে না। অপর কোনও ব্যক্তি এসে বা বলপূর্বক অপহরণ করে নেয়।

ঐ অরণ্যমধ্যে তারা শীত, তাপ, রৌদ্র, প্রবল বায়ু ও বর্ষার প্রতিকার করতে সমর্থ হয় না। কখনও প্রবঞ্চনা করতে গিয়ে অপরের বিরাগভাজন হয়ে থাকেন। কখনও নিজ ধন ক্ষয় হলে অপরের কাছে তা প্রার্থনা করে অপমানিত হয়। সেই অরণ্যপথে তারা পরস্পর ধন সম্পত্তির বিনিময় করতে গিয়ে চিরকালের জন্য প্রবল শত্রুতার সৃষ্টি হলেও পরস্পর বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। এই অরণ্যপথে চলতে গিয়ে তারা বহু কষ্ট, শ্রম, অর্থহানি ও বিদ্বেষাদি উপসর্গের ফলে মৃতবৎ হয়ে পড়ে।

হে বীর, সেই সেই বিপন্ন অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের পরিত্যাগ করে নূতন ব্যক্তিদের গ্রহণ করে যারা পথ চলতে শুরু করেছিল, তন্মধ্যে কোনও সমর্থ ব্যক্তিও অদ্যাবধি পূর্বস্থানে ফিরে আসেনি।

আর ঐ বণিক–স্বার্থ মধ্যে কোনো ব্যক্তি অদ্যাবধি ঐ পথের পরেও পায়নি। অর্থাৎ কেউ এখনও সেই পথের ধারে যাবার উপায়স্বরূপ ভক্তি বা জ্ঞানযোগ লাভ করতে পারেনি।

হে রাজন, যে ব্যক্তিগণ শূর এবং দিহস্তি সকলের জয়কারী, তারাও অভিমান বশত ঐ ভটাটবীতে আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে পরস্পর বৈরীভাবাপন্ন হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত হয়।

কিন্তু এতে তারা শ্রীভগবানের পরমপদ লাভ করতে পারে না।

হে রাজন, ভটাটবী ভ্রমণকারী জনগণের আরও বৃত্তান্ত তোমাকে বলছি- শ্রবণ করো।

কোনও কোনও ব্যক্তি লতাশাখা স্বরূপ স্ত্রীগণের বাহুকে আশ্রয় করে তথাস্থিত পক্ষীরূপ অপত্যাদির কলভাষণ শ্রবণার্থে সম্পৃক্ত হয়ে সেখানে আসক্ত হয়। কোনো স্থানে কখনও কখনও সিংহারূপ ভয়ানক কালচক্র থেকে ভীত হয়ে কঙ্ক, গৃধ্র, বক প্রভৃতির সঙ্গে সখ্যতা করে। তারা

প্রবঞ্চনা কালে সেই বণিকগণ হংসের দলে প্রবেশ করে।

কিন্তু, সেখানে আচারে অরুচি হলে, বানরগণের কাছে অর্থাৎ ভ্রষ্টাচারী শূদ্রগণের কাছে গমন করে। সেখানে বানরোচিত ক্রিয়ার ইন্দ্রিয়সুখ প্রাপ্ত হলে পরস্পরের মুখ সন্দর্শনেই তৃপ্তি লাভ করে। তখন তারা অন্তিম কাল বা মৃত্যুকালের কথা বিস্মৃত হয়।

কখনও বা ব্যক্তিগণ কেবল বৈষয়িক প্রয়োজনে গৃহাদিস্বরূপ বিষয়ে প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। তখন স্ত্রী-পুত্রের প্রতি বাৎসল্যযুক্ত ও সম্ভোগ ইচ্ছায় অতি কাতর হয়। নিজবন্ধনে বিবশ হয়ে কখনও তা ত্যাগ করতে সমর্থ হয় না। কোনো সময় অসাবধানতা বশতঃ রোগাদি– দুঃখরূপ পর্বত গহ্বরে পতিত হয়। সেখানে হস্তীরূপ মৃত্যুভয় লতা অর্থাৎ পূর্বকর্ম অবলম্বন করে অবস্থান করে। কোনোভাবে সেই বিপদ থেকে মুক্তি পেলে আবার নিজের দলেই অর্থাৎ প্রভৃত্তিমার্গে প্রবেশ করে। হে অরিন্দম, মায়া কর্তৃক এই অরণ্যপথে প্রেরিত হয়ে সেখানে ভ্রমণরত কোনও ব্যক্তিই অদ্যাবধি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান অবগত হতে পারেনি।

হে রহূগণ, তুমিও মায়ার পরিচালনায় এই সংসার অরণ্যে প্রবেশ করেছ। অতএব সম্প্রতি অহিংস ভাবে সকল প্রাণীর প্রতি মিত্রসুলভ মনোভাব পোষণ কর। নিরাসক্ত মনে ভগবান শ্রীহরির সেবার মাধ্যমে লব্ধ তীক্ষ্মীকৃত জ্ঞানরূপ ... ধারণ করে, এই ভাবারণ্য অতিক্রম করো।

রাজা রহূগণ বললেন– অহহ! সকল জন্মের মধ্যে এই মানবজন্মই শ্রেষ্ঠ! স্বর্গলোকে দেবতাদিরূপ অপরাপর শ্রেষ্ঠ। জন্মেরই বা কি প্রয়োজন? কারণ– ভগবান হৃষীকেশের যশ–শ্রবণে বিশুদ্ধচিত্ত মহাপুরুষদের সঙ্গলাভ স্বর্গে সম্ভব হয় না।

হে ব্রহ্মণ, আপনার পাদপথ রেণুর নিরন্তর সেবার দ্বারা যার পাপ বিনষ্ট হয়েছে, তার যে ভগবান হরির প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় হবে–তা বিচিত্র নয়। যেহেতু, মুহূর্তকাল আপনার সঙ্গলাভের ফলে আমার কুতর্কদ্বারা বদ্ধমূল অবিবেক দূরীভূত হয়েছে। ক্রীড়ারত বালক থেকে শুরু করে সকল মহৎ ব্যক্তিগণ, শিশু ও যুবকগণকে প্রণাম করে যাঁরা অবধূত বেশে পৃথিবী বিচরণ করছেন, সেই ব্রাহ্মণগণকে আমি প্রণাম করি। তাদের করুণাঘন অনুগ্রহে রাজাগণের সার্বিক কল্যাণ হোক!

শ্রী শুকদেব বললেন– হে উত্তরানন্দন পরীক্ষিৎ ব্রহ্মর্ষির পুত্র মহাপ্রভাবশালী ভরত নিজ অপমান অগ্রাহ্য করে, সিন্ধুদেশাধিপতি রহূগণকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করলেন। রহূগণ কাতরভাবে তার পাবন্দনা করলেন।

অনন্তর ভরত আবার এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে লাগলেন। সেসময় পরিপূর্ণ সাগরের ন্যায় তার চিত্তের ইন্দ্রিয়জাত বৃত্তিসমূহ সম্পূর্ণভাবে শান্ত ছিল। হে রাজ। সৌরীররাজ রহূগণও মহামতি ভরতের কাছে থেকে পরমাত্মার তত্ত্ব অবগত হয়ে তখনই অবিদ্যা কর্তৃক আরোপিত দেহাত্ম বুদ্ধি পরিত্যাগ করেছিলেন। ভগবানের আশ্রিত মহাপুরুষের চরণাশ্রিত ব্যক্তির প্রভাব এরূপ।

মহারাজ পরীক্ষিত এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে শুকদেবের কথা শ্রবণ করছিলেন।

তিনি এক্ষণে বললেন– হে ভাগবতোত্তম, আপনি বহুজ্ঞ। পরোক্ষ বচনের দ্বারা অর্থাৎ রূপকের মাধ্যমে আপনি জীবলোকের সংসার পথের বর্ণনা করলেন। কিন্তু, একমাত্র বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন র্যক্তিগণের পক্ষেই তার বিষয়সমূহ কল্পনা করা সম্ভবপর। কিন্তু, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে

তার বিষয়বস্তু নিরূপণ করা সম্ভবপর হয় না। অতএব, এই প্রার্থনা করি, আপনি দয়া করে তার অনুরূপ অর্থ কল্পনা করে ব্যাখ্যা করুন।

.

চতুর্দশ অধ্যায়

ভটাটবীর প্রকৃতার্থ কথন

শ্রী শুকদেব বললেন– পর্বে এই যে বলেছি, দুর্গম বত্মে মায়ার দ্বারা সংস্থাপিত বণিকসমূহ, তার অর্থ এই যে, এই সংসার বাটীতে জীবগণ অথোপার্জনরত বণিকদের মতো তারা ভগবানের মায়ায় শ্মশানসদৃশ অকল্যাণদায়ক সংসার অরণ্যে পতিত হয়েছে।

অতএব, গুরুরূপী যে ভগবান শ্রীহরি তার চরণপদ্মের মকরন্দ দেবী সেবকদের পদবী অর্থাৎ ভাগবতজনের অনুষ্ঠিত ভক্তিমার্গ এখনও একটি প্রাপ্ত হচ্ছে না সংসার–মার্গ সুগম নয়, যে সকল ব্যক্তি দেহে আত্মাভিমান করে, তার সত্তাদি বিশেষ গুণ দ্বারা বিভক্ত কর্মাদি কুশল অকুশল ও উভয় মিশ্রিত হয়। তাতে বিবিধ দেহাবলি নির্মিত হওয়ায়, তার দ্বারা সংযোগ বিয়োগাদি রূপ অনাদি সংসার হয়।

সেই সংসার অনুভূতির ছটি দ্বার হল ছয়টি ইন্দ্রিয়। তার ফলে ঐ সংসার মার্গ, দুর্গম মার্গের মতো অতি ক্লেশকর গম্য হয়েছে।

হে রাজন, ঐ দুর্গম পথের কেউই পথ চলতে প্রবৃত্ত হবে না, এমন নয়। ভগবান বিষ্ণুর মায়ায় মুগ্ধ হয়ে সবাই তাতে প্রেরিত হয়, স্ব স্ব দেহদ্বারা নিস্পাদিত কর্মের ফল ভোগ করে। কোনোসময়ে তাদের চেষ্টা সফল হয়, কখনও বহুবিধ বিঘ্ন দ্বারা বিফল হয়। হে রাজ, ঐ ভটাটবীতে যে বিভিন্ন রকম তাপ আছে, ভগবৎ চরণসেবীদের পদবী তার বিনাশ করতে অক্ষম নয়। কিন্তু, স্বয়ং শ্রীহরির মায়াপ্রভাবে জীবলোকে তা সহজলভ্য হতে পারে না।

এই সংসার অরণ্যে ইন্দ্রিয় নামে পরিচিত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন–এই ছয়টি দস্যুর মতো কর্ম করে বলে, এদের দস্যু বলা হয়। তস্করগণ বনমধ্যে কুনায়ক বণিকদের ধন লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়। ইন্দ্রিয়গণ তেমনি দস্যুর মতো, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের বহু কষ্টার্জিত ও পারলৌকিক কর্মের উপযোগী ধনাদি হরণ করে।

এই সংসাররূপ অরণ্যে স্ত্রী-পুত্রাদি প্রভৃতি পোষ্যবর্গই প্রকৃত পক্ষে নেকড়ে বাঘ ও শৃগাল তুল্য, এরাই অভিলোভী গৃহস্থের মেষশাবকের মতো সযত্নরক্ষিত বস্তু বলপূর্বক লুণ্ঠন করে।

এই ভটাটবীর মধ্যে প্রচুর তৃণ গুল্মচ্ছাদিত দুর্গম গহ্বর আছে,বলতে এটাই বোঝান হয়েছে যে শস্যক্ষেত্র প্রতি বছর কর্ষণ করলেও তার মধ্যে অবস্থিত তৃণাদির বীজ দগ্ধ হয় না। ফলে শস্য বপনের পর ঐ ক্ষেত্রটি গুল্ম, তৃণ ও লতায় আচ্ছন্ন হয়ে গহ্বরের মতো দেখায়। সে রকম, গৃহাশ্রমও কর্মক্ষেত্র বলে, এখানে কর্মসমূহ একেবারে উচ্ছেদ হয় না, কারণ, এই গৃহাশ্রমই হল সকল কামনার আধারস্বরূপ।

পাত্রস্থিত কর্পূরের ক্ষয় হলেও যেমন পাত্রে তার গন্ধ থেকে যায়, তেমনি এই গৃহাশ্রমেও বাসনার ক্ষয় হয় না। তাই কর্মপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকে। এই গৃহাশ্রমে যে পুরুষ রত হয়, তার বহিঃপ্রাণ অর্থাৎ ধনসম্পত্তি দংশ মশকতুল্য নীচ ব্যক্তির এবং শলভ, শহন্ত, তস্কর, মূষিক দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সংসারপথে চলতে গিয়ে মানুষের মন অজ্ঞানমূলক কামনা ও কর্ম দ্বারা রঞ্জিত হয়। তখন সেই অবাস্তব দৃষ্টিধারী ব্যক্তি গন্ধর্ব নগরের মতো অঘটমান অর্থাৎ বাস্তব সত্তাহীন নরলোককে সত্য বলে দর্শন করে। আবার, কোনও স্থানে পান, ভোজন ও স্ত্রী– সঙ্গাদি কাম– মূলক দোষে লোলুপ হয়ে মৃগতৃষ্ণার জলতুল্য বিষয়াদির প্রতি ধাবিত হয়।

'কোনও কোনও স্থানে উন্মুখাকার গ্রহ দেখে, তা উপাদেয় সুবর্ণ বোধে তার জন্য সম্পৃহ হয়'– এই কথার মর্মার্থ এই যে, জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো পিশাচ যখন অরণ্যপথে বিচরণ করে, তখন শীতার্ত ব্যক্তি অগ্নি ভ্রমে তার কাছে গমন করে।

তেমনি রক্তাভ রজঃগুণের দ্বারা পুরুষের বুদ্ধি সুবর্ণের জন্য প্রলোভিত হলে, সেই সকল দোষের আশ্রয় ও অগ্নির বিষ্ঠারূপ সুবর্ণ লাভ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু ঐ বস্তু অশেষ দোষের আস্পদ। অপবিত্র কারণ শ্রুতি অনুসারে অগ্নির পুরীকে পুরুষের তার প্রতি ধাবিত হবার কারণ, এই যে স্বর্ণতুল্য লোহিতবর্ণ রজঃগুণ, তার চিত্তকে অভিভূত করে ফেলে।

নিবাস, জন, ধন– ইত্যাদির তাৎপর্য এই যে কখনও বা মানুষ বাসস্থান, জল ও ধন প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্যে আসক্ত হয়ে সংসারে বিচরণ করে।

আবার 'রজঃব্যাপ্ত নেত্র হওয়ার কারণে বায়ুতে উত্থিত ধূলিকণার ধূম্রাদিক দর্শনে অক্ষম হয়' এই কথার অর্থ– চক্রাকারে প্রবাহিত ঘূর্ণীবার্তা মানুষকে বেষ্টন করে তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। এই সংসারেই তেমনি কোনও নারী পুরুষকে নিজে ক্রোড়ে আরোহণ করালে, সে তৎকালীন

অনুরাগে তমোময় হয়ে পড়ে। অর্থাৎ মাঝে মাঝে অন্ধ হয়ে সর্বপ্রকার মর্যাদা লঙঘন করে। রাত্রিকালীন ন্যায় দিদেবতাগণ তার অপকর্মের সাক্ষীস্বরূপ হয়ে বর্তমান থাকলেও ধূলিতে সমাচ্ছন্ন দৃষ্টি ব্যক্তির মতো সে তা জানতে পারে না।

কোন স্থানে সূর্যকিরণে জল রোধ করে, তার প্রতি ধাবমান হয়– ইত্যাদি যা বলেছি, তার অর্থ – সংসার মাঝে জীব কখনও কখনও বিষয় সমূহকে ব্যর্থ বলে নিশ্চিত করে জানলেও দেহাভিমানের কারণে অবিলম্বে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়। তখন মৃগতৃষ্ণ তার জল তুল্য সেই বিষয় সকলের জন্যই আবার কাতর হয়।

মহারাজ, কোন কোন স্থানে ঝিল্লী নামক কীট বিশেষের ধ্বনিতে কর্ণমুল–এই কথার তাৎপর্য হল এই, যে সংসার পথে কখনও শত্রুগণ বা রাজা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে পেচক ও ঝিল্লীর ন্যায় কঠোর ভর্ৎসনা করলে, মানুষের কর্ণকুহরে বা অন্তঃস্থলে বেদনা অনুভূত হয়।

যে সকল ছায়া পাপের কারণ– একথার মমার্থ এই যে, এই সংসারে পূর্ব-সঞ্চিত পুণ্যকর্মের ফলভোগ সমাপনের পর, মানুষ জীবন্ত হয়ে যায়। তখন অপুণ্য বিষতিদুকপাপলতা, কৃপতুল্য বিষময় স্থানে গমন করে। ঐহিক ও পারলৌকিক প্রয়োজনশূন্য ধনে পরিপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে ধনলাভের প্রত্যাশায় সে গমন করে।

হে রাজন, এই ভব –অরণ্যে বণিকগণ কখনও কখনও জলহীন নদীতে গমন করে'–এই উক্তির সারার্থ এই যে– সংসার মধ্যে কোন অসৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে পুরুষের বুদ্ধি লুপ্ত হয়। জলশূন্য নদীমধ্যে পতনের ফলে যেমন তখন অঙ্গহানির আশংকা থাকে। ফলতঃ সেই মুহূর্তে শুধু নয়, পরেও বহু কষ্ট পেতে হয়।

তেমনি পুরুষ পাষণ্ডের নিকট গমনের ফলে ব্যক্তিকে ইহকাল ও পরকালে দুঃখ পেতে হয়। 'কখনও নিরন্ন অবস্থায় অপরের কাছে অন্ন প্রার্থনা করে তার সারমর্ম এই যে সময়ে কোনো ব্যক্তি ভাগ্য দোষে বা শত্রুকৃত হয়ে অথবা কালকৃত ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ে তখন সে নিজের অন্ন অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। তখন তাকে নিজের দেহধারণের জন্য অপরের কাছে অন্নের জন্য প্রার্থনা করতে হয়।

'কখনও কখনও দাবানলে পতিত হয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়'–এই কথাটির অর্থ এই যে গৃহ হল অগ্নিকুণ্ড তুলনীয়। পুরুষ যখন এখানে আশ্রয় নেয়, সে শোকাগ্নিতে দগ্ধ হতে হতে খেদগ্রস্ত হয়।

‘কখনও কখনও যক্ষগণ প্রাণতুল্য ধন হরণ করাতে নির্বেদ প্রাপ্তি হয়’–তার অর্থ এই যে সংসার অরণ্যে কোনসময়ে রাজগণ কালপ্রভাবে প্রতিকুল হয়ে রাক্ষসের মতো ব্যবহার করে। সে তখন প্রিয়তম ধন মানুষের প্রাণ হরণ করতে উদ্যত হয়, তখন পুরুষকে মৃতেদের ন্যায় জীবনের আনন্দাদি লক্ষণে বঞ্চিত হয়ে থাকতে হয়।

‘কোথাও গন্ধর্বপুরে প্রবিষ্ট হয়ে নিবৃতিতুল্য হওয়ায় মুহূর্তকাল আমোদ-আহ্লাদ করে’–ইত্যাদির তাৎপর্য এই যে পুরুষ কখনও কখনও পিতৃপিতামহ প্রভৃতি অতীত ব্যক্তিদের চিন্তাযোগে প্রাপ্ত হয়। তখন তাদের জীবনের অস্তিত্ব স্মরণ করে যশকালের জন্য স্বপ্নতুল্য সুখ অনুভব করে।

‘কোথাও চলার পথে কন্টকাদি বিদ্ধ হওয়ায় পর্বতারোহণের বাসনায় বিমনস্কের ন্যায় হয়ে থাকে’–এই কথার অর্থ এই যে– গৃহাশ্রমে যে সকল কর্ম-বিধি অনুসৃত হয়, তা অতি দুরূহ। তাই তাদের পর্বর্ততুল্য দুর্গম বলা হয়েছে। অর্থাৎ অতি আড়ম্বরপূর্ণ যাগাদি কর্মসমূহ নিঃশেষভাবে অনুষ্ঠানের ইচ্ছা করে, বিবিধ লৌকিক বিপত্তি হেতু ক্ষুণ্ণ চিত্তে কন্টক ও শর্করা পূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবেশিত ব্যক্তির মতো অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোনোসময় সেই গৃহস্থ দুঃসহ জঠরানলে দগ্ধ হয়ে ধৈর্য্যহীন হয়ে পড়ে। তখন তার পোয্য বর্গের ও পরেই ক্রোধের প্রকাশ ঘটে।

আবার, ‘সংসারবাটীতে কোথাও অজগর সাপ কর্তৃক গিলিত হয়ে মৃতবৎ পতিত থাকে, কিছুই জানতে পারে না’– এই কথার সারার্থ এই যে, পুরুষ কোনও সময় নিদ্রারূপ অজগরের গ্রাসে পড়ে ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হয়। তখন সে শূন্যারণ্যে পরিত্যক্ত শবের ন্যায় শয়ন করে থাকে, কিছু জানতে পারে না।

হে রাজন, ‘ভটাটবীর কোনও কোনও স্থানে অন্ধলোকেরা অন্ধকূপে পতিত হয়ে নিমগ্ন থাকে’– এই কথার অর্থ হল, সংসার মধ্যে কখনও বা দুর্জনরূপ সর্পগণের আক্রমণে গর্বরূপ দণ্ড ভগ্ন হয়। সংসারী মানুষও নিদ্রার অবসর পায় না। তখন নিরবিচ্ছিন্ন চিত্তক্ষোভে তার বিবেকবুদ্ধির ক্ষয় হতে থাকে। এ অবস্থায় সে যেন অজ্ঞানান্ধ হয়ে অন্ধের মতো অন্ধকূপে পতিত হয়।

‘কখন কখন পুরুষ ক্ষুদ্ররসের অন্বেষণ করতে গিয়ে তার স্বামী বা মক্ষিকার নিকট অবজ্ঞাত হওয়ায় অতিশয় ব্যথিত হয়’– এই ভক্তির সারমর্ম এই যে, সংসারবর্গের কাম হল ক্ষুদ্র মধুকণার সঙ্গে তুলনীয়। পুরুষ কখনও মধুকণার ন্যায় ক্ষুদ্র কাম্য বস্তুর অন্বেষণ করতে গিয়ে সে সময় পরস্ত্রী বা পরদ্রব্য গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। তখনই রাজা বা ঐ সকল দ্রব্যের আধিকারিকগণ কর্তৃক নিহত হয়ে দুস্তর নরকে পতিত হয়।

অতএব পণ্ডিতেরা এই প্রবৃত্তিমার্গের কর্মকেই জীবের ঐহিক ও পারলৌকিক জন্মক্ষেত্র বলে থাকেন, অর্থাৎ কর্মই জীবের ও পারলৌকিক জন্মের কারণ স্বরূপ।

'ক্ষুদ্ররস লাভ করতে পারলেও ভোগ করতে পারে না, অন্য ব্যক্তি এসে বলপূর্বক কেড়ে নেয়'–এই কথার সারমর্ম এই যে, যদিও পরদ্রব্য লাভ করতে পারে তবু তা ভোগ করতে পারে না, অন্য কেউ তা কেড়ে নেয়। আবার তার কাছে থেকে অন্য কোনো ব্যক্তি এসে তা কেড়ে নেয়। উহা পরপর অপরের হস্তগত হতে থাকে।

হে রাজন, 'কোনো কোনো স্থানে কোনো কোনো লোক শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু, বর্ষা ইত্যাদির প্রতিকার করতে না পেরে অসহায় ভাবে অবস্থান করে'–এই উক্তির তাৎপর্য এই যে কখনও এই সংসারী পুরুষ শীত ঝঞ্ঝা প্রভৃতি নানারূপ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বিপত্তিসমূহের প্রতিকারে অসমর্থ হয়ে দুরন্ত চিন্তায় বিষণ্ণ হয়ে থাকে।

কখনও বা সংসারী ব্যক্তি পরস্পর কোনোরূপ আর্থিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়ে অপর লোকের কুড়িটি কড়ি বা তার চেয়েও কম বন আরোহণ করলেও, সে অপরের কাছে বিদ্বেষভাজন হয়ে থাকে।

মহারাজ, এই সংসার বক্রে অর্থকষ্টাদি প্রভৃতি নানা বিধ উপসর্গ নিত্যই বর্তমান। এছাড়া সুখ, দুঃখ, অনুরাগ, বিদ্বেষ, ভয়, অভিমান, অসাবধানতা, উন্মত্ততা, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য, নার্ষা, অপমান প্রভৃতি আরও উপসর্গ রয়েছে।

'কোথাও কোথাও অন্য ব্যক্তি লতাশাখা আশ্রয় করে'– ইত্যাদি যা বলেছি তার অর্থ হল এই সংসারে পথে কোথাও কোথাও পুরুষ দেবমায়ারূপিণী নারীর ভূজলতাবন্ধনে, আবদ্ধ হয়ে বিবেক জ্ঞান ভ্রষ্ট হয়।

সেই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ঐ নারীর বিলাস– গৃহ রচনার জন্য ব্যস্তচিত্ত হয়। পরে এই গৃহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত পুত্র, কন্যা, ঐ নারীর বাক্য, দৃষ্টিপাত ও বিবিধ আচরণে আকৃষ্ট চিত্ত হয়ে নিজেকে ঘোর নরকে নিক্ষিপ্ত করে।

'কোথাও কখন কখন হরিচক্র থেকে ভীত হয়ে কঙ্ক গৃভ্রাদির সঙ্গে সদ্য বিধান করে'–এই কথার সারবত্তা হল এই যে, হরিচক্র হল ভগবান বিষ্ণুর চক্র। ভগবান বিষ্ণুর চক্র অতি সূক্ষ্ম ক্ষণ থেকে আরম্ভ করে পরাব পরিমিত যে কাল, তৎ-স্বরূপে নিজ কার্যে সর্বদা জাগ্রত থাকে।

সেটি প্রান্ত বেগে পরিভ্রমণ করে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে তৃণসম প্রাণীদের বাল্যাদি যে কোনো বয়সে সংহার করে। কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার কোনোরূপ প্রতিকার করা সম্ভব নয়।

সংসারী পুরুষ কখনও বা সেই বিষ্ণুচক্র হতে ভীত হয়ে, কালচক্ররূপ অস্ত্রধারী সাক্ষাৎ নশ্বর স্বরূপ ভগবান যজ্ঞ পুরুষের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে। তার আশ্রয় না নিয়ে, বেদবিরুদ্ধ পাষণ্ডদের আশ্রয় করে।

'তাদের নিকট বঞ্চিত হয়'–এই উক্তির তাৎপর্য হল– পাষণ্ডগণ স্বয়ং অসৎপথে প্রবৃত্ত। তারা নিজেদের বঞ্চনা করছে। এই অবস্থায় অপর কোনো লোক, যে তাদের দ্বারা বঞ্চিত হবে তা বলাই বাহুল্য। ঐ পুরুষ যখন তাদের কাছে গিয়ে বঞ্চিত হয়, তখন ব্রাহ্মণদের মধ্যে আশ্রয় নেয়।

কিন্তু সেখানেও ব্রাহ্মণোচিত আচার-বিচার, বেদ ও শাস্ত্রোজ্ঞদের মতে, যজ্ঞপুরুষ ভগবানের আরাধনাদি, তার কাছে রুচিকর মনে হয় না, তখন সে শূদ্রকুলের আশ্রয় নেয়। বৈদিক আচারের অভাবে সেই শূদ্রকূল অশুদ্ধ বলে বানরের ন্যায় স্ত্রী সঙ্গ ও পোষ্যবর্গের পরিপোষণই তাদের কর্ম।

এই সকল ব্যক্তি শূদ্রতুল্য হওয়ায় প্রতিবন্ধকতা রহিত হয়ে স্বেচ্ছাবিহার করে থাকে। সে অতি মন্দবুদ্ধি হয়ে পরস্পর মুখ-সন্দর্শনাদি রূপ গ্রাম্য কর্মে এরূপ অনুরাগী হয় যে, তাতে নিজের মৃত্যুকালের কথা পর্যন্ত ভুলে যায়। স্ত্রী ও সন্তানাদির প্রতি বাৎসল্যযুক্ত বানর যেমন মৈথুনমত্ত হয়ে বৃক্ষশাখে অবস্থান করে, তেমনি সংসারী পুরুষগণও ঐহিক প্রয়োজনীয় গৃহে আসক্ত হয়ে স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি বাৎসল্যযুক্ত ও মৈথুনরত হয়ে, সংসারবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হয় না।

হে রাজন, কোন কোন ব্যক্তি গিরিকরে পতিত হয়ে তত্রস্থ হস্তি-ভয়ে লতা অবলম্বন-পূর্বক অবস্থান করে'–ইত্যাদি বাক্যের অভিপ্রায় এই যে পুরুষ সংসার মার্গে অবরুদ্ধ হওয়ায় মৃত্যুতুল্য হস্তীভয়ে ভীত হয়, তখন সে গিরিকর তুল্য ঘোর অন্ধকারে অর্থাৎ রোগ শোক প্রভৃতি আপদে পতিত হয়।

কখনও শীত, বাত প্রভৃতি আধিভৌতিক, ও আধ্যাত্মিক বিবিধ দুঃখ নিবারণে অসমর্থ হয়ে ক্লেশ ভোগ করে। এরা তখন দুস্তর বিষয়-বাসনায় বিষণ্ণতা অনুভব করে।

কোনোসময় পরস্পর ক্রয়-বিক্রয়াদি ব্যবহার করতে গিয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ ধন উপার্জন করলেও প্রবঞ্চনের জন্য অপরের বিদ্বেষ ভোগী হয়। কোনো কোনো সময়ে তার ধনক্ষয়ের কারণে উপভোগ্য বস্তু সকলের উপভোগ ব্যাহত হলে, সে অসদুপায়ে ঐ বস্তুসকল অপরের নিকট থেকে গ্রহণ করতে চায়। তখন সেই সকল ব্যক্তির নিকট তাকে অপমানিত হতে হয়। বিত্ত বিনিময়ে হেতু পরস্পর চিরস্থায়ী বৈরীভাব অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও পূর্ব বাসনার প্রেরণায় সে ব্যক্তি অপরের ধন লুণ্ঠন করতে উদ্যত হয়। কখনও বা বিবাহসূত্রে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক গঠন করে আবার তা ত্যাগও করে থাকে।

হে মহারাজ, ঐরূপ সংসারমার্গে নানাবিধ ক্লেশ ও বিভিন্ন উপসর্গের দ্বারা বাধিত হয়ে যে ব্যক্তি আপদগ্রস্ত বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আত্মীয়রূপে ব্যক্তিবর্গ তাকে সেখানেই পরিত্যাগ করে নবজাত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে কখনও শোক প্রকাশ করে, কখনও মুগ্ধ হয়, কখনও ভীত হয়। এভাবে সে ক্রমশঃ সংসারমধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সাধুপুরুষদের অনুগ্রহ ব্যতীত কেউই আজ এ পর্যন্ত ঐ সংসার বর্ত্মের পার উত্তীর্ণ হতে পারেনি। বণিকগণের মতো এই মানবকুল যে স্থান থেকে এই সংসার মার্গে চলতে আরম্ভ করেছে, অদ্যাবধি সাধুসঙ্গ ব্যতীত কেউ সে স্থানে প্রত্যাবর্তন করেনি। আর, পণ্ডিতগণই এই পারের উপায় উপদেশ করে থাকেন অর্থাৎ জীবগণ পরমেশ্বরের সম্বন্ধচ্যুত হয়েই তার নিকট হতে এই সংসারে এসেছে।

অতএব পরমেশ্বরই সংসারমার্গের পার প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। শুধুমাত্র সাধুসঙ্গ করলেই এই উপায় লাভ করা সম্ভব।

বাস্তবিকই, যোগানুষ্ঠানের দ্বারাও এই সংসারপথ অবরুদ্ধ করতে পারা যায় না। বিষয় নিবৃত্ত শান্ত স্বভাব দণ্ড ত্যাগী মুনিগণই এই সংসার মার্গের পথ প্রাপ্ত হন। যে সকল রাজর্ষি দিগবিজয়ী, সর্বদা যাগ-যজ্ঞ করেন, তাঁরাও এই মার্গ অবরুদ্ধ করতে অপারগ, তারা ভূমির ওপর অভিমান বশতঃ চিরকাল অপরের সঙ্গে শত্রুতা লিপ্ত হন। কিন্তু এর পরিণামে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন পূর্বক এই ভূমিসত্ত্ব ত্যাগ করে মৃত্যু বরণ করেন।

কোন কোনও ব্যক্তি কর্মরূপ লতা অবলম্বন করে নরকরূপ আপদ থেকে উদ্ধার পেলেও আবার সংসার পথে চলতে চলতে নরলোকে এসে উপস্থিত হয়। স্বর্গতঃ ব্যক্তিদেরও এই গতি হয়ে থাকে অর্থাৎ পুনরায় নরলোকে আসতে হয়ে থাকে।

যোগীবর শুকদেব উক্ত প্রকারে, ভরতবর্ণিত ভটাটবীর প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করে রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন পূর্বক বললেন– মহারাজ, মনীষীগণ ভরতের চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ শ্লোক

গান করেন। মক্ষিকা কখনও পক্ষীরাজ গরুড়ের গতিপথ অনুসরণ করতে পারেন না। তেমনি এই ধরাতলে অন্য কোনও রাজা মনের দ্বারাও ঋষভনন্দন রাজর্ষি মহাপুরুষের ভরতের অনুগামী হতে সমর্থ হবেন না। এই মহাত্মা ভরত উত্তমশ্লোক ভগবানের প্রাপ্তির ইচ্ছায় যৌবনেই স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ ও রাজ্যত্যাগ। করেছিলেন।

রাজর্ষি ভরত যে দুস্ত্যজ ভূ-সম্পত্তি, পুত্র, স্বজন সবাইকে ত্যাগ করেছিলেন– ইহা সঙ্গত। মহাত্মাদের যে চিত্ত ভগবান মধূসূদনের সেবায় অনুরক্ত, তাদের নিকট মোক্ষও অতি তুচ্ছ পদার্থ।

মহারাজ, ঐ রাজর্ষি ভরত মৃগদেহ পরিত্যাগের সময় যে ভগবান যজ্ঞরূপী নারায়ণের স্তব উচ্চস্বরে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিলেন, কেউ তার অনুগামী হতে পারবেন না।

রাজা ভরতের গুণ ও কর্ম অতি পবিত্র। ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি মাত্রেই উহার সমাদার করে থাকেন। অতএব ঐ মহাত্মার এই চরিত্র পরম মঙ্গলজনক পরমায়ু বর্ধক, শূন্য শস্য ও স্বর্গ ও মোক্ষের সাধক।

যে মানব ভক্তিভরে ইহা শ্রবণ, কীর্তন বা অভিনন্দন করবেন, তিনি নিজেই সমস্ত কল্যাণের অধিকারী হবে। অপরের কাছে তাকে পাণিপ্রার্থী হতে হবে না।

.

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভরতবংশ-জাত নৃপতিদের বর্ণনা

শ্রী শুকদেব বললেন–মহারাজ, ভরতের এক পুত্রের নাম ছিল সুমতি। তিনি ভগবান ঋষভদেবের মার্গ অনুসরণ করে জীবমৃত পুরুষের ন্যায় আচরণ করতেন।

কলিযুগে তার এইরূপ আচরণ দেখে কয়েকজন দুর্বুদ্ধি বেদাচার বিমুখ পাষণ্ড নিজেদের পাপবুদ্ধি অনুসারে তাকে বৈদিক দেবতারূপে কল্পনা করে। অর্থাৎ তাকে বুদ্ধের অবতার বলে প্রচার করে। সুমতির পত্নী ছিলেন বৃদ্ধসেনা। তার গর্ভে 'দেবজিৎ' নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। সেই 'দেবজিৎ এর আসুরী নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে 'দেবদ্যুন্ম' নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। সেই দেবদ্যুম্নের পত্নী ধেনুমতীর গর্ভে পরমেষ্ঠীর জন্ম হয়। পরমেষ্ঠীর পত্নী সুবর্চলার গর্ভে 'প্রতীহ'

নামক পুত্রের জন্ম হয়। এই প্রতীহ অপরকে আত্মবিদ্যার উপদেশ দিতেন। এর ফলে তিনি নিজে তাতে পবিত্র হয়ে সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুকে দর্শন করেছিলেন। প্রতীহের পত্নীর নাম ছিল সুর্বচলা। কলিযুগে মাতৃ নাম্নী কন্যাকে বিবাহ নিষিদ্ধ হলেও, পুরাকালে এ বিষয়ে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। প্রতীহের এই পত্নীর গর্ভে প্রতিহর্তা, প্রস্তোত্য এবং ‘উদগাতা’ নামক তিনটি পুত্রের জন্ম হয়। এই তিনজনই যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ে অতিশয় নিপুণ ছিলেন।

প্রতিহর্তার পত্নীর নাম ছিল স্তুতি। তার গর্ভে ‘অজ’ ও ‘ভূমা’ নামক দুটি পুত্রের জন্ম হয়। ভুমার দুই ভার্য্যা ছিল, তাদের নাম ঋষিকুল্যা ও দেবকুল্যা। ভূমা তার জেষ্ঠ পত্নী ঋষিকুল্যার গর্ভে উদগীথ নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। পরবর্তীকালে কনিষ্ঠা পত্নী দেবকুল্যার গর্ভে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়। এই সন্তানের নাম ছিল প্রস্তাব। প্রস্তাবের পত্নী বিরুসার গর্ভে ‘বিভু’ নামে এক পুত্রের জন্ম হয়।

ঐ বিভুর পত্নী রতির গর্ভে ‘পৃথুষেণ’ নামক সন্তানের জন্ম হয়। পৃথুষেণের পত্নী আকুতির গর্ভে ‘নক্তের’ জন্ম হয়। নক্ত, তার পত্নী ঋতির গর্ভে উদারকীর্তি রাজশ্রেষ্ঠ গয় নামক পুত্রের জন্ম দেন।

ইনি জগত রক্ষার কারণে সত্ত্বগুণাশ্রয়ী ভগবান বিষ্ণুর অংশাবতার। তিনি আত্মতত্ত্বাদি লক্ষণের দ্বারা মহাপুরুষত্ব লাভ করেছিলেন। মহারাজ গয় রাজপদে অভিষিক্ত হয়ে প্রজাগণের পালন, পোষণ, প্রীতি উৎপাদন, লালন ও শিক্ষাদান রূপ রাজধর্ম পালন করতেন। গৃহাশ্রমে থাকাকালীন তিনি যাগ যজ্ঞাদি ধর্মেরও আচরণ করতেন। তার ঐ দ্বিবিধ ধর্ম ভগবানের চরণে অর্পিত হওয়ায় পরমার্থ স্বরূপ হয়েছিল।

এভাবেই সর্বজীবাত্মা, পরাবর, ব্রহ্মাস্বরূপ ভগবান পরম-পুরুষ ও ব্রহ্মজ্ঞানের চরম সেবার দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়ায় তার দেহাদি বিষয়ে অহংভাবের অবসান হলো। তখন সেই বিশুদ্ধ চিত্তমধ্যে ব্রহ্ম বস্তুর স্বয়ং প্রকাশ ঘটল। তারপরে তিনি নিজ আত্মাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলে অবগত হলেন। তিনি এবিধ গুণের অধিকারী হয়েও নিরভিমান হয়েই পৃথিবী প্রতিপালন করতেন।

হে পাণ্ডবেয়, পুরাবৃত্তান্তজ্ঞ পণ্ডিতগণ মহারাজ, গয়ের সম্পর্কে এ সকল গাথা কীর্তন করে থাকেন। মহাত্মা গয় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠাতা। তিনি মনস্বী, বহুজ্ঞ, ধর্মরক্ষক, শ্রীমান, সৎসকলের সভাপতি এবং সাধু লোকদের সেবক ছিলেন।

ভগবানের অংশ ব্যতিরেকে অন্য কোনো নৃপতি তাকে অনুসরণ করতে পারেন না। যে সকল সাধ্বীগণের আশীর্বাদ অব্যর্থ সেই শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া প্রভৃতি দক্ষকন্যারা নদীসকলের সঙ্গে পরম আনন্দমনে তার অভিষেক ক্রিয়া করেছিলেন।

পৃথিবী যার গুণরূপ বৎস দ্বারা স্তন আকৃষ্ট হলে অযাচিতভাবেই তার প্রজাদের যাবতীয় কাম্যবস্তু বিতরণ করতেন। অন্য কোনও রাজা তার অনুকরণ করতে সমর্থ হবেন না। তিনি কল্যাণবিষয়ে। আকাঙ্ক্ষাহীন হলেও বেদ– সকল অথবা বেদরহিত কর্মসকল, তার জন্য স্বয়ং নানাবিধ কাম দোহন করে দিতেন। নৃপতিগণ সমরাঙ্গনে শর- দ্বারা প্রতিপূজিত হয়ে তাকে করদান করতেন। বিপ্রগণ পালন ও দক্ষিণা দ্বারা পূজিত হয়ে স্ব-স্ব ধর্মফলের ষষ্ঠাংশ তার জন্য আহরণ করতেন।

মহারাজ 'গয়' অনুষ্ঠিত যজ্ঞে প্রচুর সোমরস পানের ব্যবস্থা থাকায় দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় মত্ত হতেন। যজ্ঞমূর্তি ভগবান বিষ্ণু যাঁর শ্রদ্ধাপূত নিশ্চল ভক্তিযোগের দ্বারা সমর্পিত যজ্ঞফুলই পুজোর ন্যায় গ্রহণ করতেন। অন্য কোন্ রাজার পক্ষে তাকে অনুকরণ করা সম্ভব?

যে ভগবান। তুষ্ট হলে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, তির্যক প্রাণী, মানুষ তৃণ-লতা সকলেই প্রীতি অনুভব করে, সেই সর্বান্তর্যামী সাক্ষাৎ প্রীতি স্বরূপ ভগবান বিষ্ণু, 'গয়' রাজার যজ্ঞে 'তৃপ্তোহস্মি' অর্থাৎ তৃপ্ত হলাম, এই বলে প্রত্যক্ষভাবেই প্রতি প্রকাশ করেছিলেন।

অপর কোনো রাজা তাঁর অনুকরণ করতে সমর্থ হয় না।

'গয়' রাজার পত্নী গায়ভীর গর্ভে চিত্ররথ, সুগতি এবং অধিরোধন নামক তিনটি পুত্রের জন্ম হয়। চিত্ররথের ভার্য্যা ছিলেন উর্ণা। তার গর্ভে 'সম্রাট' নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। সম্রাটের পত্নী উৎকলার

গর্ভে মরীচির জন্ম হয়। মরীচির পত্নী বিন্দুমতীর গর্ভে 'বিন্দুমান' নামে এক পুত্রের জন্ম হয়।

'বিন্দুমান' তাঁর পত্নী সরমার গর্ভে 'মধু' নায়ক পুত্রের জন্ম দেন। মধু পরবর্তীকালে রাজা হয়েছিলেন। মধুর পত্নী ছিলেন সুমনাঃ। তার গর্ভে বীরব্রতের জন্ম হয়। ঐ বীরব্রত স্বীয় ভার্য্যা ভোজার গর্ভে 'মন্থ' ও 'প্রমন্থ' নামক দুই পুত্রের জন্ম দেন। মন্থ তার 'সত্যা নামক স্ত্রীর গর্ভে 'ভৌবন' নামক পুত্রের জন্ম দেন।

ভৌবন-পত্নী ভূষণার গর্ভে ‘তৃষ্টা’র জন্ম হয়। তৃষ্টা’র পত্নী বিরোচনার গর্ভে ‘বিরহ’ নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। এই বিরহ অতি মহাত্মা ছিলেন। তার পত্নী বিরহের শতপুত্র এবং একটি কন্যার জন্ম হয়। তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন জেষ্ঠ্যপুত্র শতজিৎ।

এ সম্পর্কে প্রচলিত শ্লোক –প্রিয়ব্রত বংশের শেষ রাজা বিরহ নিজ গুণ ও কীর্তির দ্বারা ঐ বংশকে ভূষিত করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু যেমন দেবলোককে অলংকৃত করেন, বিরজও তেমনি নিজ বংশকে অলংকৃত করেন।

.

ষোড়শ অধ্যায়

ভুবনকোশ– বর্ণনা

রাজা পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করলেন- হে ব্রাহ্মণ, সূর্য যত দূর পর্যন্ত আলোকদানে সক্ষম, ততদূর পর্যন্ত এই ভূ-মণ্ডলের বিস্তার এবং শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের যে যে স্থান পর্যন্ত চন্দ্র ও নক্ষত্রগণের প্রকাশ দেখা যায়, আপনি বললেন–ভুমণ্ডল ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

হে ভগবন, এই ভূমণ্ডলের মধ্যেও মহারাজ প্রিয়ব্রতের রথচক্রের সাতটি ঘাত দিয়ে সাত সাগরের উৎপত্তি হয়েছে। আপনি আগেই সংক্ষেপে বলেছেন যে, ঐ সাত সমুদ্র থেকেই পৃথিবীর সাতটি দ্বীপ বিশেষ রচিত হয়েছে। আমি এখন আপনার কাছে পরিমাণ ও লক্ষণ অনুসারে এই সকল দ্বীপের সমুদয় তত্ত্ব জানতে ইচ্ছা করছি।

হে গুরুদেব, এই ভূমণ্ডল ভগবানের গুণময় স্থলরূপ। এতে মন নিবিষ্ট করলে পরে সেই মনকে নির্গণ, আত্মজ্যোতি, স্বরূপঃ বাসুদেব নামক পরব্রহ্মেও নিবিষ্ট করা সম্ভব। অতএব, হে ভগবান, আপনি এই ভূমণ্ডল রূপ স্থূল রূপের বর্ণনা করুন।

শ্রী শুকদেব বললেন–মহারাজ, মানুষ যদি দেবতুল্য পরমায়ুও পায়, তথাপি বিশেষ বিশেষ স্থানের নাম দ্বারা ভগবানের মায়া– বিভূতির অন্ত, বাক্য ও মনের দ্বারাও অবগত হতে সক্ষম হবে না। অতএব, প্রধান প্রধান দ্বীপসমূহের নাম, সন্নিবেশ ও চিহ্ন বর্ণনা করেই তোমার কাছে ভূ-গোলস্থ স্থান বিষয়ে ব্যাখ্যা করছি।

হে রাজন, এই ভূমণ্ডল একটি প্রকাণ্ড পদ্মস্বরূপ। সপ্ত-দ্বীপ তার কোশ। এই সপ্ত– দ্বীপরূপ কোশমধ্যের অভ্যন্তর কোশ হল জম্বুদ্বীপ। এই দ্বীপ প্রক্ষল, তার দীর্ঘ নিযুত যোজন এবং বিস্তার লক্ষ যোজন। এই জম্বুদ্বীপ পদ্মপত্রের ন্যায় চারদিকে সমান বর্তুলাকার।

এই জম্বুদ্বীপে নয়টি বর্ষ অর্থাৎ দেশ আছে। তন্মধ্যে ভদ্রা ও কেতুমাল বর্ষ ব্যতীত প্রত্যেকের বিস্তার নয় হাজার যোজন। এই নটি বর্ষ আটটি সীমারক্ষক পর্বত দ্বারা পরস্পর সুন্দরভাবে বিভক্ত হয়ে আছে।

ইলাবৃত নামক বর্ষ এই নটি বর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এরা যথাক্রমে রম্য, হিরন্ময় ও কুরুবর্ষের সীমারূপে বিদ্যমান রয়েছে। এরা পূর্বদিকে দীর্ঘ। লবণসাগরে এদের সীমানা নির্দেশক রূপে পূর্ব– পশ্চিম দুদিকেই অবস্থিত। এদের প্রত্যেকেরই বিস্তার দুই হাজার যোজন, কিন্তু পূর্ব অপেক্ষা পর পরেরটি দৈর্ঘ্যে একাদশ অংশে নুন অর্থাৎ পূর্বদিকের অপেক্ষা পরটির দৈর্ঘ্য এগার ভাগের এক ভাগ কম। এভাবে ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে বিষধ, হেমকূট ও হিমালয় নামে তিনটি পর্বত আছে। এই তিনটি পর্বত নীল, শ্বেত ইত্যাদি পর্বতের মতো পূর্বদিকে আয়ত এবং প্রত্যেক দশ হাজার যোজন বিস্তৃত। এরা যথাক্রমে হরিবর্ষ, কিংপুরষবর্গ এবং ভারতবর্ষের সীমানারক্ষক।

এইরূপে ইলাবৃত বর্ষের পশ্চিম ও পূর্বদিকে মূল্যবান ও গন্ধমাদন–এই দুটি পর্বত উত্তর দিকে নীল এবং দক্ষিণ দিকে নিষধ পর্বত পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে দু'হাজার যোজন বিস্তৃতি লাভ করেছে। ওই দুটি পবর্তই কেতুমাল বর্ষ ও ভদ্রাশ্বর বর্ষের সীমা নির্দেশ করছে। মেরু পর্বতের চারদিকে অযূত যোজন বিস্তৃত ও উন্নত মন্দর, মেরুমন্দর, সুপাশ ও কুমুদ — এই চারটি, অষ্টরম্ভ পর্বত অবস্থিত। এই চারটি পর্বতের উপরিভাগের আম্র, জম্বু, কদম্ব ও বট এই চারটি মহাবৃক্ষ ধ্বজার মতো অবস্থান করছে। ওদের উচ্চতা ও চারদিকে শাখাসমূহের বিস্তৃত এগারোশত যোজন এবং ওদের বিস্তৃতি শতযোজন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ভক্ত, চারটি বৃক্ষের অদূরে চারটি হ্রদ আছে, তার মধ্যে একটি দুগ্ধ জল, দ্বিতীয়টি মধুজল, তৃতীয়টি ইক্ষুরস জল এবং চতুর্থটি শুদ্ধ জল। ঐ চারটি হ্রদের জল অতি চমৎকার। উপদেবগণ, তা সেবন করে স্বাভাবিক যোগৈশ্বর্য ধারণ করেছেন। ঐ স্থানে চারটি হ্রদ ব্যতিরেকেও চারটি উৎকৃষ্ট দেবোদ্যান আছে। তাদের নাম হল নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক এবং সর্বতোভদ্র। এই সব উদ্যানে শ্রেষ্ঠ দেবগণ, উপদেবতা কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে পরম রমণীয়া রমণীগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিহার করে থাকেন।

মন্দার পর্বতের ক্রোড়দেশে দেবত নামক একটি স্বর্গীয় আবৃক্ষ আছে। এগারো শত যোজন উচ্চ ঐ বৃক্ষের অগ্রভাগ থেকে সর্বদা প্রচুর অমৃতরূপ ফল পতিত হয়। এই ফলগুলি পর্বতশৃঙ্গের মতো। স্থল বিদীর্ণ হয়ে সেই ফল থেকে অতি সুগন্ধ, সুমধুর, রক্তবর্ণ রসরূপ জলধারা নির্গত হয়। ঐ জলধারায় পরিপূর্ণ অরুনোদ– নাম্নী একটি নদী মন্দর পর্বতের অগ্রভাগ থেকে নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়ে ইলাবৃত বর্ষের পূর্বভাগকে প্লাবিত করেছে। এই আসর যুক্ত নদীর জল সেবনের ফলে ভগবতী পার্বতীর অনুচরী যক্ষরমণীগণের দেহ সুরভিত হয়। তাদের অঙ্গস্পর্শে সংযুক্ত বায়ু সুরভিত হয়ে ওঠে।

এইরূপ জম্বুবৃক্ষের এক একটি ফল হস্তীর শরীরের ন্যায় বৃহৎ এবং তার বীজ অতি সুক্ষ্ম। অতি উচ্চস্থান থেকে পতনের ফলে উহার ফল বিদীর্ণ হয়ে অম্বুনদী নামক এক রসনদীর সৃষ্টি হয়েছে। সেই স্রোতস্বিনী নদী অযুতযোজন উচ্চ মেরুমন্দর পর্বতের অগ্রভাগ থেকে ভূমিতলে এসে দক্ষিণ দিক ইলাবৃত বর্ষ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। জম্বুনদীর উভয়তীরস্থ মৃত্তিকা তার জলারসে অনুবিদ্ধ হওয়ায় বায়ু ও সূর্য কিরণের সংযোগে বিশেষ পাক-প্রাপ্ত হয়ে সুবর্ণে পরিণত হয়েছে। দেবতাগণ এই সুবর্ণকে আভরণ রূপে ব্যবহার করেন, তারা স্ব-স্ব যুবতীগণের সঙ্গে মুকুট, বলয়, কটিসূত্র, কুণ্ডল প্রভৃতি আভরণ ধারণ করেন।

সুপার্শ্ব পর্বতের পাদদেশে যে মহাবৃক্ষটি অবস্থিত, তার নাম মহাকদম্ব। তার কোটর থেকে পঞ্চব্যাম পরিমিত, পাঁচটি মধু ধারা ঐ পর্বতের শিখর থেকে নিঃসৃত হয়েছে। সেটি নিজের পশ্চিমে ইলাবৃত বর্ষকে নিজস্ব সুগন্ধে আমোদিত করছে। ঐ পর্বতের মধুধারা পান করলে, মুখ, নির্বাসিত বাম শতযোজন পর্যন্ত সুবাসিত করে। এইরূপ কুমুদ পর্বতে শাতবশ নামে যে বটবৃক্ষ আছে, তার কাণ্ড সমুদয় থেকে নিম্নভিমুখে বিভিন্ন কাম্যবস্তু যেমন দুধ, ঘি, মধু, অন্ন গুড়, বস্ত্র অলংকারাদি ইচ্ছা অনুসারে নির্গত হয়। ঐ পর্বতের অগ্রভাগ থেকে উৎপন্ন হয়ে বহু নদ, যার উত্তরে ইলাবৃত বর্ষ বামে জনগণের পরম উপকার সাধন করে চলেছে। ঐ সকল বস্তু যারা উপভোগ করে সেই সকল লোকের কখনও বলী, পলিত, ক্লান্ত, ঘর্ম, রোগ, অপমৃত্যু, অন্যান্য উপসর্গমূলক সন্তাপ বিশেষ উৎপন্ন হয় না। তারা যাবজ্জীবন সুখেই বসবাস করে।

হে রাজন, কুরঙ্গ, কুবর, কুশুম্ভ, বৈকঙ্ক, ত্রিকুট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, শিতিবাস, কপিল, শঙ্খ, বৈদূর্য, জারুধি, হংস নাগ, কালঞ্চর প্রভৃতি সেনাসমূহ সুমেরুর মূল দেশের চতুর্দিকে বেষ্টন করে অবস্থান করে আছে। তাদের সুমেরু পর্বতের কেশরের ন্যায় প্রতীয়মান বোধ হয়। মেরুর পূর্বদিকে জঠর ও দেবকূট নামে দুটি পর্বত আছে।

তারা উত্তর ও দক্ষিণদিকে আঠারো হাজার যোজন দীর্ঘ, দু হাজার যোজন বিস্তৃত এবং সেই পরিমাণে উচ্চ। এইরকম পশ্চিমদিকে পবন ও পরিমাত্র নামক দুটি, পর্বত এবং দক্ষিণদিকে কৈলাস ও করবীর নামক দুটি পর্বত বিদ্যমান রয়েছে। এরা পূর্ব ও পশ্চিমদিকে দীর্ঘ।

উত্তরদিকে ত্রিশৃঙ্গ ও মকর পর্বত অবস্থিত, এইভাবে মূল থেকে হাজার যোজন পরিত্যাগ করে চারদিকে অগ্নির পরিধির ন্যায় ঐ আট পর্বতে বেষ্টিত হয়ে কাঞ্চনগিরি অর্থাৎ সুমেরু পর্বত সর্বতোভাবে শোভিত রয়েছে। ইতিবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলে থাকেন এই সুমেরুর মস্তকের উপরে ভগবান ব্রহ্মার পুরী বিরাজমান। তার বিস্তার সহস্র অযুতযোজন। ঐ পুরী সুবর্ণ দ্বারা নির্মিত এবং চতুর্দিকে সমচতুষ্কোণ।

ব্রহ্মার ঐ পবিত্র পুরীর চতুষ্পর্শে এবং চতুর্কোণে ইন্দ্র প্রভৃতি অষ্টলোকপালগণের আটটি পুরী কল্পিত রয়েছে। লোকপালগণের যার যে দিক এবং যেরূপ, বর্ণ তার পুরীটিও সেই রূপ বর্ণাবিশিষ্ট ও সেদিকেই অবস্থিত। এদের পরিমাণ ব্রহ্মার পুরীর চতুর্থাংশ অর্থাৎ তারাই হাজার যোজন। পূর্বদিকস্থ ইন্দ্রের পুরীর নাম অমরাবতী, অগ্নিকোণে স্থিত অগ্নিদেবের পুরীর নাম তেজোবতী, দক্ষিণদিকে যমরাজের পুরীর নাম সংযমনী, বায়ুকোণে বায়ুদেবতার গন্ধবতী পুরী, উত্তরদিকে ধনদেবের মহোদয়া পুরী এবং ঈশাণকোস্থিত ঈশাণদেবের পুরীটির নাম যশোবতী।

.

সপ্তদশ অধ্যায়

ইলাবৃত বর্ষের চারদিকে গঙ্গার গমন এবং রুদ্র কর্তৃক সংকর্ষণদেবের স্তব

শ্রী শুকদেব বললেন– হে মহারাজ, ভগবান বিষ্ণু বলিরাজের যজ্ঞক্ষেত্রে ত্রিবিক্রম মূর্তি ধারণ করেছিলেন। তিনি দক্ষিণ চরণ ভূমিতে স্পর্শ করিয়ে বামচরণ উধ্বদিকে উৎক্ষেপণ করছিলেন। সেই বামচরণের অঙ্গুষ্ঠ নখাগ্রের অন্তকটাহের উপরিভাগ বিদীর্ণ হয়েছিল। সেই ছিদ্রপথে ব্রহ্মাণ্ডের বাইরের জলধারা ভেতরে প্রবেশ করতে শুরু করে। ঐ সময় ভগবানের পাদপদ্ম প্রক্ষালন করায় ঐ বারিধারা পাদপদ্ম সংলগ্ন রক্তবর্ণ কুঙ্কুমরূপ কেশরের সংস্পর্শে রঞ্জিত হয়ে স্নানাদিরত প্রাণীমাত্রেরই সর্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট করেও স্বয়ং দূষিত হয়নি। তিনি পরম পবিত্র ছিলেন। তখন সেই জলধারা বিষ্ণুপদী নামে পরিচিত ছিল। তখন জাহ্নবী, ভাগীরথী ইত্যাদি নাম প্রকাশিত হয়নি। একের পর এক সহস্র যুগ পরিমিত সুদীর্ঘকালে মূল

স্থান হতে স্বর্গের মস্তকে অবতীর্ণ হল। পণ্ডিতেরা সেই অবতরণ ক্ষেত্রটিকে বিষ্ণুপদী বলে অভিহিত করেছেন।

দৃঢ়সংকল্প উত্তানপাদে তনয় পরম ভাগবত ধ্রুব ঐ বিষ্ণুপদে অবস্থান করেন। প্রতিদিন তিনি পরম ভক্তিভরে ভগবান হরির চরণোদক রূপে, এই জলধারায় মস্তক স্পর্শ করান। তখন তার ভগবদ্ভক্তিযোগ অতিশয় উৎকর্ষ লাভ করলে হৃদয়ের অভ্যন্তর ভাগ বিগলিত হয়। উকণ্ঠায় নয়নযুগল অবশ হয়ে পদ্মকলির ন্যায় অর্ধনিমীলিত হয়ে যায়। তার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চিত হয়।

হে মহারাজ, এরপর সপ্তর্ষিগণ গঙ্গাদেবীর প্রভাবে জ্ঞাত হয়– ইনিই তপস্যার পরমসিদ্ধি'। তখন সেই মুক্তিকামীগণ সমাগত মুক্তিকে যেমন সমাদরে গ্রহণ করেন, সেরূপ এই গঙ্গাকেও নিজ জটাধারে ধারণ করে আছেন। কারণ, তার সর্বাত্মা ভগবান বাসুদেবের প্রতি অক্ষয় ভক্তিযোগ লাভ করায় অন্য সর্বপ্রকার পুরুষার্থ এমনকি আত্মজ্ঞানকেও উপেক্ষা করেন।

এরপরে, বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা ঐ স্থান থেকে অনেক সহস্রকোটি বিমানসমূহ দ্বারা পরিব্যপ্ত আকাশ মার্গপথে অবতীর্ণ হয়ে চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করে প্রথমে মেরুপর্বতের উপরিস্থিতি ব্রহ্মার আলয়ে পতিত হন। সেখানে তিনি ভিন্ন ভিন্ন চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়ে, অবশেষে সমুদ্রে মিলিত হয়েছেন। এই চারটি ধারার নাম হলো–সীতা, অলকানন্দা, বংক্ষা ও ভদ্রা। তন্মধ্যে সীতা ব্রহ্মলোক থেকে কেশব পর্বতের আদিশৃঙ্গ সমূহ আশ্রয় করে ক্রমশ নিম্নভাগে অবতীর্ণ হয়ে গন্ধমাদন পর্বতের শৃঙ্গসমীহে পতিত হন। সেখান থেকে ভদ্রাশ্ব বর্ষের মধ্য দিয়ে পূর্বদিকে লবণ সাগরে প্রবেশ করেন। বংক্ষু মুল্যবান পর্বতের অগ্রভাগ হতে কেতুমাল বর্ষের দিকে প্রবাহিত হয়ে শান্তভাবে পশ্চিমদিকে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়েছে। ভদ্রা সুমেরু পর্বতের অগ্রভাগ থেকে উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়েছে। এই প্রবাহপথে এক পর্বতের ওপর থেকে অপর পর্বতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শৃঙ্গবান পর্বতের শৃঙ্গ থেকে নিম্নভাগে অবতরণ করে কুরুবর্ষের নিকট দিয়ে উত্তরদিকে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করেছে।

এইভাবে অলকানন্দা ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ সুমেরু পর্বত থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এই প্রবাহপথে বহু গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করে অতি তীব্রবেগে হেমকুট ও হিমকুটের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে দক্ষিণ দিকে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। এই অলকানন্দায় অবগাহন করলে অশ্বমেধ রাজসূয়াদি যজ্ঞের ফললাভ হয়।

হে মহারাজ, সুমেরু প্রভৃতি পর্বতসমূহ থেকে উৎপন্ন এরূপ আরও বহু নদনদী প্রতিটি বর্ষে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই বর্ষসমূহের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই হল কর্মক্ষেত্র। বাকি আটটি বর্ষকে পার্থিব স্বর্গ বলা হয়। এগুলি স্বর্গগত ব্যক্তিদের স্বর্গভোগের পর অবশিষ্ট পুণ্যাংশে উপভোগের স্থান।

এই আটটি বর্ষে বিষয়সুখের উৎকর্ষতার কারণে কাল ত্রেতা যুগের তুল্যরূপে প্রকটিত রয়েছে। সেখানকার অধিবাসী জনগণের পরমায়ু মানুষের কালের পরিমাণে অযুত বৎসর। এজন্য তাদের দেবতুল্য বলা হয়। তাদের বল অযুত হস্তীর তুল্য এবং শরীরও চিরকাল ব্রজের মতো সুদৃঢ় থাকে। এজন্য সেখানে স্ত্রী-পুরুষের মিলনোৎসব অতিসুখময় হয়ে থাকে। নিরন্তর এই রকম সম্ভোগ ক্রিয়ার পরে মাত্র এক বৎসর নিজ পরমায়ু অবশিষ্ট থাকাকালীন রমণীগণ গর্ভ ধারণ করে।

প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল বর্ষের লোকেরা দেবপতি। তারা সেই সেই স্থানে নিজ নিজ সেবকগণ কর্তৃক মহা মহাউপাচারে অর্চিত হয়। এভাবে তারা নিজ ইচ্ছায় আশ্রমস্থ আয়তনসমূহে গিরিগহ্বরে ও নির্মল সরোবরে পরম সুখে ক্রীড়ারত অবস্থায় অবস্থান করেন। সেখান সুরাঙ্গনাদের জলক্রীড়া ও অন্যান্য বিচিত্র ব্যাপার ও কামোন্মুক্ত সুন্দরীর বিচিত্র বিভঙ্গ ও লাস্য, পুরুষদের মনকে আকৃষ্ট করে। ঐ আশ্রমস্থিত বৃক্ষাদির শাখা, সমস্ত ঋতুর পুষ্পস্তবক, ফলাদি ও নবকিশলয়ের সমৃদ্ধিতে আনত। সেই শাখায় বহু পক্ষী আশ্রয় নিয়েছে, এজন্য ঐ বৃক্ষ সকলের অবস্থান হেতু আশ্রমের শোভা বৃদ্ধি পেয়েছে। জলাশয়ে প্রস্ফুটিত বিভিন্ন পুষ্পের সুগন্ধে এবং তথাস্থিত পাখিদের কলরবে ও ভ্রমরাদির গুঞ্জনধ্বনিতে সেই শোভা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

উক্ত নয়টি বর্ষেই মহাপুরুষ ভগবান নারায়ণ পুরুষদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য নিজ অভিন্ন মূর্তিসমূহ দ্বারা অদ্যাপি সন্নিহিত রয়েছেন। কিন্তু ইলাবৃত বর্ষে ভগবান ভবই একমাত্র পুরুষ! সেখানে অন্য কোন পুরুষ নেই। ভবানীর অভিশাপের তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত কোনও পুরুষ সেখানে প্রবেশ করেন না। অজান্তে প্রকাশিত হলে স্ত্রী– ভাব প্রাপ্তি ঘটে। সেখানে ভগবান শঙ্কর, ভবানী ও তার অনুগতা অযুত সহস্র সংখ্যক রমণী কর্তৃক সেবিত হয়ে, চতুর্মূর্তিধারী ভগবান সংকর্ষণ মূতিটি নিজ চিত্তমধ্যে স্থাপন পূর্বক উপাসনা করেন।

ভগবান শঙ্কর বলেন- আমি সেই ভগবান মহাপুরুষকে প্রণাম করি। সকল গুণের প্রকাশক সেই অনন্ত, অব্যক্ত, স্বরূপ ভগবানের চরণে আমি প্রণিপাত করি।

হে পরম পুরুষ, অতএব আপনাকেই ভজনা করি। আপনার পাদপদ্মে সকল জীবের একমাত্র অবলম্বন এবং ঐশ্বর্যাদি সমস্ত ষড়গুণের পরম আশ্রয়। আপনি ভক্তজনের কাছে নিজ স্বরূপ প্রকটিত করে তাদের সংসার ভয় বিনষ্ট করেন। কিন্তু অভক্তদের সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করে থাকেন।

হে দেব, ক্রোধবেগ জয় করতে সমর্থ হওয়ায় আমাদের দৃষ্টি যেমন মায়াময় বিষয়াদি দ্বারা লিপ্ত হয়, আপনি চরাচর সমূহের নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বদা দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু আপনার দৃষ্টি মায়াময় বিষয় ও চিত্তবৃত্তি দ্বারা তার অনুমাত্রও লিপ্ত হয় না। অতএব ইন্দ্রিয় জয়ে অভিলাসী কোন মুমূর্ষ ব্যক্তি আপনার সমাদর না করবেন? যিনি কুদৃষ্টিশালী ব্যক্তিগণের নিকট নিজ মায়ার দ্বারা মধু ও আসব পানে রক্ত চক্ষু মত্ত পুরুষের মত প্রতীয়মান হন এবং নাগবধূগণ চরণার্চনা সময়ে যাঁর পাদস্পর্শে মোহিতচিত্ত হয়ে লজ্জায় ভুদু প্রভৃতি অঙ্গের সেবা করতে সমর্থ হয় না, সেই আপনার রূপ না সমাদর করবেন?

বেদমন্ত্র সকল যাঁকে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কারণস্বরূপ, অথচ স্বরূপতঃ সৃষ্টি- স্থিতি সংহারহীন তিনিই পরমপুরুষ। তিনি নিজ সহস্র মস্তকরূপে আশ্রয়স্থানের যে কোন এক জায়গায় অবস্থিত এই পৃথিবীর কথা অনুভব করতে পারেন না। সুবিশাল মস্তক শ্রেণীর মধ্যে অতিক্ষুদ্র ভূমণ্ডলের সত্তা বুঝতে পারেন না– আমি সেই আপনাকে প্রণাম করি। সংকর্ষণ রূপে আপনার প্রথম সৃষ্টি ছিল মহত্ত্ব নাক গুণময় বিগ্রহ। উক্ত বিগ্রহই সত্ত্ব-গুণাশ্রিত হয়ে ভগবান ব্রহ্মারূপে পরিচিত হন। ব্রহ্মা পৃথকভাবে রজোগুণাশ্রিত হলেও বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর অভেদ জ্ঞাপনের জন্য সত্ত্বগুণাশ্রিত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আমি এই ব্রহ্মা থেকেই উদ্ভূত হয়ে নিজ নিজ বিভূতি স্বরূপ, অহংকার দ্বারা দেবতাবর্গ, ভূতবর্গ এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে সৃষ্টি করি। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির বিষয় স্পর্শাদির আধার আকাশ বায়ু, প্রভৃতি, ভূতাদি, ইন্দ্রিয়াদির অধিপতি দেবগণ ও ইন্দ্রিয়াদি প্রকটিত করে থাকি। " সূত্রে আবদ্ধ পক্ষীগণের মতো আমরা অর্থাৎ মহত্ত্ব, অহংকার, ভূতগণ ও ইন্দ্রিয়গণ যাঁর ক্রিয়াশক্তি দ্বারা আবদ্ধ থেকে, যাঁর বশীভূত হয়ে এবং যাঁর অনুগ্রহে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে চলেছি– আপনিই তিনি! আপনাকে প্রণাম করি। যে মায়ার দ্বারা জীবের কর্মগ্রন্থি রচিত হয়, জীব মায়াকেই শুধু জানতে সক্ষম। কিন্তু মায়ায় মোহিত হয়ে থাকার জন্য তা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার যথার্থ উপায় জানতে পারে না। ভগবান সংকর্ষণ দেব স্বয়ং সেই মায়ার উদয় ও লয়ের একমাত্র কারণস্বরূপ। আমি সেই সংকর্ষণরূপী দেব ভগবানকে প্রণাম করছি।

.

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিভিন্ন বর্ষসকলের এবং সেখানকার উপাসনাসমূহের বর্ণনা

শ্রী শুকদেব বললেন– ভদ্রাশ্ববর্ষে ধর্মপুত্র অধিপতি ভদ্র শ্রবা এবং তার প্রধান সেবকরা বাসুদেবের ধর্মময় প্রিয় মূর্তি হয়শীর্ষ'- দেবকে পরম সমাধিযোগে হৃদয়ে স্থাপন পূর্বক উপাসনা করেন। ভদ্রশ্রবা প্রভৃতি বললেন– আমরা সেই ভগবান ধর্মমূর্তিকে নমস্কার করি, যাঁহার হতে আত্মার সংশোধন সম্ভব হয়। অহো! ভগবানের কি বিচিত্র লীলা! মৃত্যু সকলকে গ্রাস করলেও এই জীবলোক তা দেখেও দেখে না। কখনও শিশু সন্তানসহ তার পিতা মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হলে তাদের দেহ দাহ করে এসে মধ্যবর্তী জন এই দুই মৃত ব্যক্তির ধনে জীবনধারণ করতে ইচ্ছা করে। তাতে ধর্মের সঞ্চয় না করে, অতি তুচ্ছ বিষয়ভোগের লালসায় পাপ– কার্যের চিন্তা মধ্যবর্তী জন ঐ দুই মৃত ব্যক্তির ধনে জীবনধারণ করতে ইচ্ছা করে। তাতে ধর্মের সঞ্চয় না করে, অতি তুচ্ছ বিষয়ভোগের লালসায় পাপ– কার্যের চিন্তা করে থাকে।

হে অজ, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা এই বিশ্বকে নশ্বর বলেন। মনীষীরাও সমাধিযোগে এই বিশ্বের নশ্বরত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন, তথাপি তারাও তোমার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে পড়েন। তোমার এই লীলা বস্তুতঃ অতি বিচিত্র।

অতএব, আমরা শাস্ত্রাদির অনুশীলনে বৃথা শ্রম না করে তোমাকেই প্রণাম করি।

হে দেব, তুমি সর্ববিধ আকর্ষণ মুক্ত ও অকর্তা হলেও, এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা বলে বেদে তোমায় বর্ণনা করা হয়েছে, তা যুক্তিযুক্ত। তোমাতে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। তুমি স্বীয় মায়ার দ্বারা সকলের আত্মস্বরূপ ও কার্যমাত্রের পালক, এতে তোমারই কর্তৃত্ব যুক্তযুক্ত। তুমি সকল হতে ভিন্ন বস্তুর স্বরূপ, এতে তোমার অকর্তৃত্ব ন্যায্য হতে পারে।

হে ভগবান, প্রলয়কালে তামস দৈত্যগণ কর্তৃক বেদসমূহ অপহৃত হয়েছিল। যিনি হয়শীর্ষমূর্তি অর্থাৎ অশ্বমস্তক ও মনুষ্যশরীর যুক্ত মূর্তি ধারণ করে রসাতল থেকে তা উদ্ধার করে ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে তাকেই প্রত্যর্পণ করেছিলেন, সেই সত্য-সংকল্প-স্বরূপ তোমাকে আমারা প্রণাম করি।

এইরকম হরিবংশেও ভগবান বিষ্ণু নৃসিংহ' রূপে বিরাজ করছেন। যার শীল ও আচার দৈত্য– দানবকুলকে পবিত্র করে, মহাপুরুষদের গুণভোগী পরমব্রত প্রহ্লাদ মহারাজ, হরিবর্ষ বাসী

জনগণের সাথে নিষ্কাম একনিষ্ঠ ভক্তিযোগের দ্বারা নিজের পরমপ্রিয় সেই নৃসিংহমূর্তির উপাসনা করছেন।

উপাসনাকালে, তিনি এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করে থাকেন– হে সখা, হে প্রভু! আপনি নৃসিংহরূপী ভগবান। আপনি তেজঃসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপ প্রতীয়মান হন।

হে বজ্রনখ, হে ব্রজংদংষ্ট্র, আমাদের কর্মবাসনা সকল দগ্ধ করে। অন্ধকার বিনাশ করুন। হে ভগবান আপনি আমাদের অভয় দান করুন। আপনাকে প্রণাম করি।

হে ঈশ! এ বিশ্বের কল্যাণ হোক। খল ব্যক্তিগণ ক্রুরতা ত্যাগ করুক। প্রাণীগণ পরস্পরের মঙ্গল চিন্তায় রত হোক। তাদের মন শান্ত হোক। আমাদের ও প্রাণীবর্গের চিত্ত নিষ্কাম হয়ে ইন্দ্রিয়মার্গের অতীত ভগবানে নিবিষ্ট হোক।

হে দেব, আমাদের সকল আসক্তি দূর হয়। যদি না হয়, তবে তা যেন গ্রহাদি, স্ত্রী-পুত্র পরিজনে লক্ষিত না হয়ে ভগবৎপ্রিয় জনের প্রতি হয়। কারণ অনাসক্ত বিবেকী পুরুষ দেহরক্ষার উপযোগী দ্রব্যাদি দ্বারা পরিতুষ্ট হয়ে যেমন সত্ত্বর সিদ্ধিলাভ করতে পারে। গৃহাদিতে আসক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির তেমন সিদ্ধিলাভ সক্ষম হয় না।

হে প্রভু, ভগবদ্ভক্তজনের সঙ্গ থেকে ভগবান মুকুন্দের বিক্রম অবগত হওয়া যায়। সেই বিক্রমের অসাধারণ প্রভাব যে সকল পুরুষ শ্রবণ করেন, শ্রী ভগবান তাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে মানবিক গ্লানি দূর করেন। বারংবার তীর্থাদির সেবা করলে দৈহিক মল– রূপ গ্লানি দুর হলেও চিত্তবাসনা দূর হয় না। অতএব ভগবদ্ভক্তজনের সেবা করা অবশ্য কর্তব্য।

যাঁর বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবান বাসুদেবের প্রতি নিষ্কাম ভক্তির উদ্রেক ঘটে, ভগবানের অনুগ্রহে সকল দেবগণ তার মধ্যে বাস করেন। গৃহাদি বিষয়াসক্ত হরি ভক্তিহীন, ব্যক্তি মনোরথ দ্বারা অতি তুচ্ছ বিষয়সুখের প্রতি ধাবিত হয়। এজন্য তাদের মধ্যে মহৎ ব্যক্তিসুলভ জ্ঞান-বৈরাগ্য-গুণের সম্ভাবনা নেই।

জলকে মৎস্যগণের অভিলষিত আত্মা বলা হয়, কারণ জল ছাড়া তাদের জীবনধারণ সম্ভব নয়। তেমনি ভগবান হরিই প্রতিটি প্রাণীর আত্মা।

কোনও মহৎ ব্যক্তি যদি হরি পরিত্যাগ করে গৃহাদিতে আসক্ত হন, তাহলে শুধুমাত্র বয়স দ্বারাই তার মহত্ত্ব নির্ণয় করা হয়, জ্ঞান দ্বারা নয়।

বস্তুতঃ জল ছাড়া যেমন জলচর মৎস্যাদি মারা যায়, হরিবিমুখ ব্যক্তিগণও তেমনি সর্বপ্রকার পুরুষার্থ থেকে বঞ্চিত হয়।

অতএব, হে দৈত্যগণ, তোমরা গৃহ ত্যাগ পূর্বক নির্ভয়ে নৃসিংহদেবের চরণের আরাধনা কর। গৃহাসক্তি হল তৃষ্ণা, রাগ-বিষাদ, মান, স্পৃহা, ভয়, দৈন্য প্রভৃতির মূল কারণ, এবং নিরবিচ্ছিনাদি জন্ম মরণাদি সংসারপ্রবাহের আশ্রয় স্বরূপ।

এইরূপ কেতুমালবর্ষেও ভগবান স্বয়ং কামদেব' রূপে লক্ষ্মীদেবী ও সংবৎসরূপ প্রজাপতির পুত্র কন্যাগণের প্রিয়কার্য সাধনের জন্য বিরাজ করছেন। প্রজাপতি পুত্রগণ অর্থাৎ দিবাসভমনী দেবগণ এবং কন্যাগণ অর্থাৎ রাত্রির অভিমানী দেবীগণ এরাই ঐ বর্ষের অধিপতি তাদের সংখ্যা ছত্রিশ হাজার।

হে রাজ, সংবত্রগণের প্রিয় সাধনের জন্য ভগবানের ইচ্ছায় বিশেষ কারণ এই যে, মহাপুরুষের চক্রের তেজঃপ্রভাবে প্রজাপতির সেই কন্যাদের সাথে এবং দিব্যভাগে ঐ সকল কন্যার স্বামীগণের অর্থাৎ দিবযাধিষ্ঠাতৃ দেবগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরম সমাধিযোগে ভগবানের এই মায়াময় রূপের উপাসনা করে থাকেন, এবং এরূপ মন্ত্রবাক্য উচ্চারণ করেন।

হে ভগবন্ মনোরম কামদেব স্বরূপ আপনাকে প্রণাম করি। আপনি হৃষীকেশ আপনার স্বরূপ বা মূর্তি সর্ব প্রকারের গুণবিশেষ দ্বারা বিলক্ষণই হয়।

আপনি কর্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়, সংকল্পাদি, চিত্তবিদ ও তৃতীয় বিষয় সমূহের অধিপতি। আপনি ষোড়শকলা, অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পাঁচটি বিষয় আপনার কলা বা অংশ। আপনি বৈদিক কর্মসমূহের প্রাপ্য বস্তু বলে বেদময়। আপনি অন্নাশয়বলে অন্নময় পরমানন্দের আবিষ্কারক বলে আনন্দময় এবং সকলের প্রাপ্য বলে সর্বময়। এইরূপ আপনি মনোবল, ইন্দ্রিয়বল ও শরীরবল এবং মনোরম। উভয়লোকে সর্বদা আপনাকে প্রণাম করে।

হে প্রভু, আপনি হৃষীকেশ, অর্থাৎ জীবের ইন্দ্রিয়াদির পতি। যে রমণীগণ বিবিধ ব্রত দ্বারা নিজ পতিকামনার্থে আপনার উপাসনা করে, সেই পতিগণ সন্তান, ধন, মান কিছুই রক্ষা করতে পারে না। যিনি স্বয়ং নির্ভয় এবং কালাদি ভয় থেকে কাতর জনকে সর্বতোতাবে রক্ষা করতে পারেন, আপনিই সেই যথার্থ পতি।

আত্মলাভেই সন্তুষ্ট বলে অপর কোনো বিষয় আপনার কাম্য হয় না, অতএব আপনি স্বাধীন। অন্যথায়, যাদের সুখ পরাধীন, তারা অস্বতন্ত্র ও বহু। এজন্য এক সম্রাটের অধীন সামন্ত রাজগণের ন্যায় তাদেরও পরস্পরের নিকট হতে ভয় থাকে।

হে ভগবন্, যে স্ত্রী স্বতন্ত্র পুরুষরূপী আপনারই পাদপদ্মের সেবা করেন, তিনি সমস্ত কাম অর্থাৎ সুখই লাভ করেন। যে স্ত্রী অন্য কোনো ফল কামনায় আপনার পুজো করে, আপনি তাকে অভীষ্ট বস্তুই দান করেন। সে সকল বস্তু অনিত্য বলে ভোগের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হলে, তাকে অনুতাপ করতে হয়। হে অজিত, ব্রহ্মা, শঙ্কর, দেব, অসুর প্রভৃতি সকলেই আমাকে লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। কিন্তু আপনার চরণামিশ্রিত ব্যক্তি ছাড়া কেউই আমাকে লাভ করতে পারে না। যেহেতু আপনাতেই আমার হৃদয় নিহিত রয়েছে, অতএব আমি আপনার অধীনা সেজন্য আপনার সেবকগণের প্রতিই আমি দৃষ্টিপাত করে থাকি। হে অচ্যুত, যাঁর ভজনা ছাড়া কোনো পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় না, আপনি সেই পুরুষ। আপনার যে করকমল হতে সকল কাম বর্ষিত হয়, এজন্য ভক্তগণ সর্বদা তার স্তব করে থাকেন। আপনি ভক্তগণের মস্তকে কৃপা করে যে হস্তকমল বিন্যস্ত করেন, অনুগ্রহ করে আমার মস্তকে তা সংস্থাপন করুন।

হে বরেণ্য, আমার প্রতি আপনার অনাদর লক্ষিত হয় না, কারণ আপনি শ্রীবৎস চিহ্নরূপ আমাকে নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করছেন। কিন্তু আমার প্রতি আদর থাকলেও ভক্তদের প্রতি আপনার অপার করুণা। আপনি ঈশ্বর, আপনার মায়ার চেষ্টা বোঝার সাধ্য কারও নেই।

এইরূপ রম্যক বর্ষে ভগবান নিজ প্রিয়তম মৎস্যাবতার' মূর্তিটি পূর্বে ঐ বর্ষের অধিপতি সত্যব্রত রাজা দর্শন করেন। এখানে তিনি শ্রাদ্ধদেব নামে মনুরূপে বর্তমান। সেই মনু এখনও পরম ভক্তিভরে তার আরাধনায় রত থাকেন। তিনি যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তা হল- সেই মহা-মৎস্যরূপী ভগবানকে প্রণাম করে। তিনি সত্ত্বপ্রধান এবং মুখ্যতম প্রাণ অর্থাৎ সূত্রাত্মা, সাহস, বল ও সামর্থ্য ইত্যাদির স্বরূপ, তাঁকে প্রণাম করি।

হে ভগবন্, আপনার সুমহান ধ্বনি বেদরূপে প্রকাশিত হয়েছে। আপনি প্রাণরূপে জগতের অন্তরে ও বাহিরে বিচরণ করছেন, কিন্তু লোকপালগণও আপনার রূপী দেখতে পান না। মানুষ যেমন কাষ্ঠনির্মিত পুতুলকে রজ্জবদ্ধ করে নাচিয়ে থাকে। তেমনিও আপনিও এই বিশ্বের সকল কার্য নিয়ন্ত্রণ করেন। হে ঈশ, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ মৎস্যরূপে জ্বরে অভিভূত, তারা পরের উৎকর্ষ সহ্য করতে পারেন না, যাঁকে পরিত্যাগ করে, তারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে অথবা

সকলের মিলিত প্রচেষ্টাতেও এ জগতে স্থাবর জঙ্গম কোন বস্তুই পালন করতে সমর্থ হন না, আপনিই সেই ঈশ্বর, আপনিই সকলের পালক, পরম ঈশ্বর।

হে অজ, আপনি আমার সহিত ওষধি এবং লতারাজির আধার স্বরূপ এই পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য মহাতরঙ্গায়িত প্রলয়ে সাগরে মহাপরাক্রমে বিচরণ করেছিলেন। আপনি এই জগতের প্রাণসমষ্টির নিয়ন্তা, আপনাকে নমস্কার।

এইভাবে, হিরন্ময় বর্ষেও ভগবান হরি 'কূর্মমূর্তি ধারণ করে বিরাজ করছেন। পিতৃগণের অধিপতি অর্যমা সেই বর্ষবাসী পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, ভগবানের সেই প্রিয়তম মূর্তির আরাধনা করেন। এই মন্ত্র তারা নিরন্তর জপ করতে থাকেন– আমরা ভগবান কূর্মদেবকে প্রণাম করি। হে প্রভু, সমস্ত সত্ত্বগুণ আপনার বিশেষণ অর্থাৎ আকার, আপনাকে প্রণাম।

জলচর বলে যাঁর স্থিতি লক্ষ্য করা যায় না, সেই আপনাকে প্রণাম করি। হে দেব, আপনি অতিশয়ে বর্ষীয়ান, কাল দ্বারা আপনার অবচ্ছেদ ঘটে না। হে প্রভু! আপনি সর্বগত, সকলের আধার, আপনাকে প্রণাম করি।

হে ভগবান, আপনি নিজে মায়ার দ্বারা যে আকৃতি প্রকাশ করেছেন, দৃশ্য-পৃথিব্যাদি পদার্থ-সমুহ এরই প্রকৃতি।

আপনার এই রূপ বিভিন্ন রূপ দ্বারা নিরূপিত হলেও তা মিথ্যা কল্পিত। হে প্রভু, আপনার আকারের বিশেষ কেউ নিরূপণ করতে পারে না। আপনি এক অদ্বিতীয় বস্তু–এই নিখিল বিশ্বে আপনি একমাত্র সার বস্তু। জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিদ, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূতগণ ইন্দ্রিয়াদি, স্থাবর, জঙ্গম, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি নাম আপনারই।

হে ভগবন্, আপনার রূপ, নাম ও আকৃতির প্রভেদ যে তা সংখ্যাতীত। তবুও, কপিল প্রভৃতি মনীষীগণ আপনার মধ্যে চতুর্বিংশত্যাদি তত্ত্ব সংখ্যা কল্পনা করেছেন। যে তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে ঐ সকল কাল্পনিক সংখ্যার নিরিখে হয়, সেই পরমার্থ জ্ঞানরূপী আপনাকে প্রণাম করি।

এই রূপ উত্তর কুরুবর্ষে ভগবান যজ্ঞপুরুষ 'বরাহমূর্তি ধারণ করে বিরাজ করছেন। এই পৃথিবীদেবী কুরুবর্ষবাসী জনগণের সাথে অস্থালিত ভক্তিযোগ দ্বারা তার সেবা করেন, এবং এই পরমা উপনিষদ আবৃত্তি করে থাকেন– আমরা শ্রী ভগবানকে প্রণাম করি। হে প্রভু,

আপনি মন্ত্রদ্বারা প্রকাশিত হন। দৃশ্যমান স্যুপ অজ্ঞ, অযুপ যজ্ঞ কর্মের দ্বারা শুদ্ধ, অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠাতা ও ত্রিযুগ স্বরূপ অর্থাৎ কলিকালে আপনার অবতার প্রচ্ছন্নরূপে প্রকাশ পায়।

হে দেব, আপনাকে প্রণাম করি।

হে ভগবন, অগ্নি যেমন কাষ্ঠমধ্যে অপ্রকাশিত অবস্থায় বিরাজ করে, আপনার স্বরূপও তেমনি দেহেন্দ্রিয়গণের মধ্যে নিহিত রয়েছে। নিপুণ পণ্ডিতগণ, বিবেক– সাধন, মন, কর্ম ও ফল দ্বারা আপনাকে দর্শনের ইচ্ছায় সতত অন্বেষণ করে থাকেন। এরূপ অন্বেষণে যাঁর স্বরূপ প্রকাশ পায়, সেই ভগবানকে আমি প্রণাম করি।

মায়ার কার্য যে বিষয়, ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দেহ, কাল, কর্ম– এই সমুদয় আপনার উপলক্ষণ মাত্র। এইসকল গৌণলক্ষণ দ্বারা যাঁকে বস্তুরূপে অবগত হওয়া যায়, আপনি সেই আত্মা, যম, নিয়ম প্রভৃতি যোগাঙ্গ সকলের দ্বারা যাদের বুদ্ধি তত্ত্ব নির্ণয়ে সক্ষম হন, বিচারের দ্বারা সেই তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষেরা আপনার মায়িক রূপের নিবাস করেন। সেই নির্গুণস্বরূপ আপনাকে প্রণাম করি।

যেমন, অয়স্কান্তমণির সন্নিকর্ষের কারণে লৌহ সেই অভিমুখে গমন করে, তার মতো মায়া– যে দ্রষ্টা পরমেশ্বরের লক্ষণ হেতু জীবের নিমিত্ত নিজের ইঙ্গিত না হলেও জীবের ইঙ্গিত এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেছেন, সেই গুণকর্ম এবং অদৃষ্টের সাক্ষীস্বরূপ ভগবানকে আমি নমস্কার করি।

যিনি জগতের কারণস্বরূপ বরাহমুর্তি প্রকট করেছেন, যিনি নিজ দন্তাগ্রে আমাকে ধারণ করে মত্ত হস্তীর মতো রসাতল থেকে উদ্ধার করেছেন, তাঁকে প্রণাম করি। তিনি প্রলয় সাগরতল থেকে আমাকে উদ্ধারের সময় প্রতিদ্বন্ধী হিরণক্ষ দৈত্যকে ধ্বংস করে ক্রীড়ারত ছিলেন যে এই ভগবান বিভুর চরণে আমি প্রণিপাত করি।

.

ঊনবিংশ অধ্যায়

কিম্পুরুষ কর্তৃক ভারতবর্ষের বর্ণনা এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্ব কথন

শ্রী শুকদেব বললেন–হে মহারাজ, ভগবান আদিপুরুষ সীতাপতি রামচন্দ্রের চরণস্পর্শ করে শ্রী হনুমান তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

তিনি রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তিযোগ অবলম্বন করে কিংবা কিংপুরুষ শ্রেষ্ঠ অষ্টিষেণের সঙ্গে শ্রীরামচরিত শ্রবণ ও গায়ন করছেন। তারা বলছেন- ভগবান উত্তমশ্লোকের নমস্কার করি।

তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিহ্নাদি, শীল ও ব্রত নিত্য বিরাজমান। তিনি সর্বদাই সংযত চিত্ত। সকল লোকের বিষয় তার জ্ঞাত। নিকষ প্রস্তরের ন্যায় সাধুত্ব প্রসিদ্ধির নির্ধারণ স্থান। সেই ব্রহ্মণ্যদেব মহাপুরুষ মহারাজ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র চরণে প্রণত হই। বেদান্ত শাস্ত্রসিদ্ধ অদ্বিতীয় তত্ত্ব সেই পরমাত্মাস্বরূপ শ্রী রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হই। তিনি স্বপ্রকাশ বলে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ তিন অবস্থা দূর করে প্রশান্ত ও বিশুদ্ধরূপে বিরাজিত।

তিনি নাম– রূপ বর্জিত হওয়ার কারণে নিখিল দৃশ্য পদার্থের অতিরিক্ত, জ্ঞানরূপ নিরহংকার বস্তু। এ অবস্থায় শুদ্ধচিত্তে সাধকপুরুষ তাকে ব্রহ্মরূপে অনুভব করতে পারেন। তিনি স্বরূপতঃ পরম ব্রহ্ম হয়েও রাবণের বধের জন্য মানুষরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কারণ ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত রাবণ, মনুষ্যভিন্ন অন্য সবার কাছে অবধ্য ছিলেন।

এছাড়াও সংসারে স্ত্রী সঙ্গজনিত কারণে দুঃখ প্রাপ্তি অনিবার্য এ বিষয়ে তিনি সংসারাশ্রয়ী লোককে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। নতুবা, জগতাত্মা ঈশ্বরের পক্ষে সীতা বিরহে দুঃখ প্রাপিত কখনও স্বাভাবিক

আচরণ নয়। অপরকে শিক্ষা দিতেই তিনি ঐ মায়ার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র মহাপুরুষগণের আত্মা এবং পরম সুহৃদ স্বরূপ। তিনি ত্রিভুবনের কোনো বিষয়েই আসক্ত নন। সেই পরমাত্মার পক্ষে স্ত্রী বিরহজনিত মোহ ও লক্ষ্মণ বর্জন কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

অপরদিকে মহকুলে জন্ম, অথবা সৌন্দর্য, কিংবা বাক্য অথবা বুদ্ধি, জাতি কিছুই থাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। শুধু মাত্র ভক্তিতেই তিনি তুষ্ট হন। আমরা বনচর বানর, শুধুমাত্র আতলান্তিক ভক্তিতে তাকে তুষ্ট করেছি। তিনি আমাদের তো সৌন্দর্য, মহৎগুণাদি কিছুই নেই।

সেজন্য সুর, অসুর, নর, বানর–সবারই সেই মনুষ্যরূপী শ্রীহরির সেবা করা কর্তব্য। তিনি অতি অল্পেই সন্তুষ্ট হন। তার উপাসনার এমনই মহিমা যে, তিনি অযোধ্যাবাসী সকলকেই নিজধাম বৈকুণ্ঠে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

এই ভারতবর্ষেও ভগবান নর-নারায়ণ' রূপে প্রলয়কাল পর্যন্ত তপস্যায় নিরত হয়েছেন, সেই তপস্যার ফলে ধর্ম, জ্ঞান ঐশ্বর্য, ইন্দ্রিয় সংযম বৃদ্ধি পেলে ও অহংকার লুপ্ত হয়ে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। তার আচরণ দুয়ে, তিনি করুণাপরবশ হয়ে আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু-ব্যক্তিদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণের জন্য তপস্যা করেছেন নতুবা তার কোনও নিজস্ব প্রয়োজন নেই।

দেবর্ষি নারদ, শ্রী ভগবান নর– নারায়ণের মুখ থেকে সংখ্যা ও যোগতত্ত্ব অবগত হয়ে সাবর্ণি মানুকে তা উপদেশ করতে ইচ্ছা করেন। সেজন্য সেখানে তিনি বর্ণাশ্রম আচার নিষ্ঠ ভারতীয় প্রজাদের সঙ্গে ভগবানের উপাসনা করছেন।

তিনি বলছেন– আমি ঋষিশ্রেষ্ঠ ভগবান নর-নারায়ণকে প্রণাম করি। যিনি উপশমশীল, নিরহংকার ও অকিঞ্চন পরমগুরু ও আত্মারাম জনের অধিপতি, তাঁকে প্রণাম করি। তিনি আরও বলেছেন– তিনি এই নিখিল বিশ্বের কর্তা হয়েও অভিমানহীন। তিনি দেহস্থিত হয়েও দেহধর্মাদি ক্ষুধা পিপাসায় অভিভূত হন না। দ্রষ্টা হয়েও তার দৃষ্টি দৃশ্য বিষয়ে আসক্ত হয় না।

তিনি সকলের সাক্ষী হয়েও সবার থেকে বিযুক্ত, সে যোগীপুরুষ জন্মাবধি ভক্তির অনুষ্ঠান করে, অন্তকালে অসৎদেহ অভিমান ত্যাগ করে তোমাতে মনঃসংযোগ করেন। এই যোগকৌশলকেই ভগবান হিরণ্যগর্ভ পুরুষযোগ বলেছেন।

ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয় সুখ-ভোগের ইচ্ছায় মূর্খ ব্যক্তি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ক্ষুদ্র বিষয়ের সংগ্রহ ও সংরক্ষণে চিহ্নিত হয়। তেমনি বিদ্বান ব্যক্তিও যদি ভয়কাতর হয় তাহলে তার শাস্ত্রপাঠ বৃথা শ্রম মাত্র।

হে অবোজ, আপনার প্রতি যে স্বাভাবিক অনুরাগ সেই অনুরাগময় যে যোগবলে আমরা এই অসৎ দেহবিষয়ে আপনার মায়াময় অহংকার ও মমতাময় দুচ্ছেদ্য বন্ধন ছেদন করতে পারি, আপনি সেই যোগের উপদেশ করুন।

হে রাজন, এই ভারতবর্ষে বহু নদী ও পর্বত আছে। যথা–মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকূট, ঋষভূ, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমূক, শ্রীশৈল, বিন্ধ্য, দ্রোণ, চিত্রকূট গোবর্ধন, রৈবর্তক প্রভৃতি।

এই পর্বতাদির পাদদেশ থেকে উৎপন্ন বহু নদ-নদী আছে।যার নামোচ্চারণেই লোকে পবিত্র হয়। ভারতবাসী জনগণ ঐ সকল নদ-নদীর জলে অবগাহন ও পানাদি ক্রিয়া সম্পাদনা করেন। তার মধ্যে গোদাবরী, যমুনা, গোমতী, সরস্বতী, তুঙ্গভদ্রা, আম্রপর্ণী, চন্দ্রবশা, কাবেরী, মন্দাকিনী, বিতস্তা প্রভৃতি মহানদী। ব্রহ্মপুত্র, শোন প্রধান দুইটি মহানদ বর্তমান।

কর্ম অনুযায়ী মানুষের সকল গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ নিজেদের অনুষ্ঠিত সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বর্মের দ্বারা স্বর্গীয় মানবীয় ও নারকীয় –এই তিন প্রকার গতি প্রাপ্ত হয়।

আবার ব্রাহ্মণাদি যে বর্ণের যে প্রকারে মুক্তির বিধান রয়েছে, সেই অনুসারে তাদের এখানে মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। যে সমান মহাপুরুষ শ্রীহরির ভক্তগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ সম্ভব হয়, তখনই বিভিন্ন সংসারগতির কারণস্বরূপ অবিদ্যাগ্রন্থির ছেদন হয়ে থাকে, এবং সে অবস্থায় রাগদোরহিত, বাক্যের অগোচর, নিরাধার ও সর্বজীবাত্মা পরম পুরুষ ভগবান বাসুদেবের প্রতি যে স্বাভাবিক ভক্তিযোগের উদয় হয়, তাই মুক্তির স্বরূপ।

অতএব, ভারতবর্ষে মানবজন্ম সকল পুরুষার্থের সাধন বলে, দেবতারাও গান করে থাকেন– অহহ! এই মানবগণের অনির্বচনীয় পুণ্য বলে ভগবান শ্রীহরি এদের সাধনা ছাড়াও এদের প্রতিপুষ্ট। এই ব্যক্তিগণ ভারতভুমির মধ্যে মানবকুলে মুকুন্দসেবার উপযোগী জন্ম লাভ করেছে। এদের পক্ষে ভগবান শ্রীহরির অনায়াস কৃপালাভ অসম্ভব নয়।

আমরা ভারতবর্ষে জন্মাবার আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করলেও, তা ভাগ্যে ঘটে না। আমাদের দুষ্কর যজ্ঞ, তপস্যাদি নিরর্থক কারণ স্বর্গে ভগবানের শ্রীচরণের স্মরণ হয় না। যদি বা কোনোভাবে তা সম্ভব হয়, তবু আমাদের ইন্দ্রিয়গণ প্রবলভভাগে আসক্ত থাকায়, তা লুপ্ত থেকে যায়। প্রলয়কাল পর্যন্ত পরামায়ুযুক্ত দেবগণের স্বর্গস্থান লাভ করার চেয়ে স্বল্পায়ু মানব হয়ে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করাই শ্রেয়।

কারণ চিরজীবী দেবগণেরই পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ভারতবাসী মরণশীল হওয়া সত্ত্বেও যশকালের মধ্যেই কৃতকর্মের পরিহার করে। শ্রীহরির অভয়পদ লাভ করতে পারে।

যেখানে শ্রীহরির কথারূপ অমৃতনদীর প্রবাহ নেই, যে স্থানে সাধু ভাগবতগণ অবস্থান করেন না। এবং যে স্থানে নৃত্যাদি মহোৎসব যুক্ত ভগবৎপূজার প্রবর্তন হয় না, সে স্থান ব্রহ্মলোক হলেও আশ্রয়যোগ্য হয় না।

যারা এই ভারতবর্ষে জ্ঞান, জ্ঞানের উপযোগী ক্রিয়া ও তার উপকরণে পরিপূর্ণ জন্ম লাভ করেও মুক্তির জন্য যত্ন করে না, তারা পুনরায় বন্ধনপ্রাপ্ত হয়।

জালবদ্ধ পাখীরা ব্যাধ কর্তৃক মুক্ত হয়েও আবার সেখানে বিহার করতে গেলে, অসাবধানতা বশতঃ বদ্ধ হয়। তেমনি এই ব্যক্তিগণ ভারতভূমিকে মোক্ষর্থ জন্মলাভে সক্ষম হয়েও নিজ নিজ কর্মদোষে আবার সংসারে আবদ্ধ হয়।

অহো, ভারতবাসীগণের কি অসীম সৌভাগ্য! তারা বিভিন্ন যজ্ঞে নানাবিধ মন্ত্র, বস্তু দ্বারা বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে দান করলেও, স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি সেগুলো গ্রহণ করেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলে সকল বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করা সম্ভব হলেও পরমার্থ লভ্য হয় না।

সেজন্য বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করলেও লোকে বারংবার প্রার্থনাই করতে থাকে। কিন্তু পরমার্থ লাভ করলে, জীবকে আর ভিন্ন কিছু প্রার্থনা করতে হত না।

যে ব্যক্তিগণ ভগবান শ্রীহরির কাছে প্রার্থনা করেন না, তিনি স্বয়ং তাদের সর্বকামনার পরিপূরক নিজ চরণপদ্ম দান করেন।

স্বর্গসুখ ভোগের পর যদি আমাদের পূর্বকৃত উত্তম শাগ শাস্ত্র পাঠ ও অন্যান্য সৎ কর্মের পুণ্য কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তা হলে ভগবান শ্রীহরিই একমাত্র আরাধ্য এজন্য কামনা করি, ভারতবর্ষে যেন আমরা জন্মলাভ করতে পারি। কারণ শ্রীহরিই সেবকদের পরম সুখ দান করেন।

শ্রী শুকদেব বলেন- হে মহারাজ, জম্বুদ্বীপে আটটি উপদ্বীপ আছে। কোনো কোনো পণ্ডিতগণ বলে থাকেন, সাগরের পুত্রগণ যজ্ঞীয় অশ্বের অন্বেষণ কালে পৃথিবীর চতুর্দিকে মনন করেছিলেন। তার ফলে উপদ্বীপ সকলের সৃষ্টি হয়েছিল।

ঐ দ্বীপ সকলের নাম– স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্ল, আবর্তন, রমণক, মন্দহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল ও লঙ্কা। এই ভারততত্তম, জম্বু –দ্বীপের বর্ষবিভাগ উপদেশানুসারে তোমার কাছে বর্ণনা করলাম।

.

বিংশ অধ্যায়

প্লক্ষাদি ছয়টি দ্বীপ ও লোকালোক পর্বতের বর্ণনা

শ্রী শুকদেব বললেন– মহারাজ, অনন্তর আমি প্লক্ষ প্রভৃতি ছয়টি দ্বীপের প্রমাণ, লক্ষণ ও আকৃতি অনুযায়ী তাদের বর্ষবিভাগ করব।

মেরুপর্বত যেমন জম্বুদ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেরূপ জম্বুদ্বীপও নিজের ন্যায় বিস্তৃতি যুক্ত (অর্থাৎ সেটি লক্ষযোজন বিস্তৃত) লবণসাগর দ্বারা বেষ্টিত। আবার পরিখা যেমন বাইরে উপবন দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তেমন লবণ সাগরও দ্বিগুণ বিস্তৃত প্লক্ষদ্বীপ দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে।

অর্থাৎ প্লক্ষদ্বীপ, জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তীর্ণ। জম্বুদ্বীপের জন্বু বৃক্ষটির যা পরিমাণ প্লদ্বীপেও সেরূপ পরিমাণ বিশিষ্ট একটি প্লক্ষবৃক্ষ বা পাকুড় আছে। এই গাছটির নাম অনুসারেই ঐ দ্বীপের নাম হয়েছে প্ল-দ্বীপ। তার নিকটেই সপ্ত জিহ্বাযুক্ত অগ্নি বিরাজমান। প্রিয়ব্রত তনয় ইমজিহ্ এই দ্বীপের অধিকারী তিনি এই দ্বীপকে সাতটি বর্ষে ভাগ করেছিলেন। ঐ বর্ষসকলের অনুরূপ নাম বিশিষ্ট নিজের সাত পুত্রকে অর্পণ করেছিলেন। তারপরে, তিনি স্বয়ং সমষ্টিযোগে দেহ নিবৃত্ত হয়েছিলেন।

ঐ বর্ষসকলের নাম– শিব, বয়স, সুভদ্র, শান্ত, ক্ষেম, অমৃত ও অভয়।

ঐ সপ্তবর্ষে সাতটি পর্বত ও সাতটি নদী অতি প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধতম সপ্ত পর্বতের নাম– মণিকুট, বজ্রকুট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মন, সুবর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব ও মেঘমাল। প্রসিদ্ধতম সপ্তনদীর নাম হল– অরুণা, নৃম্না, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতা, খাতম্ভরা, এবং সত্যম্ভরা। এই নদীর জলে স্নান আচমনাদি করলে রজঃ ও তমোগুণ নিবৃত্ত হয়।

হংস, পতঙ্গ, উদ্বায়ন ও সত্যাঙ্গ নামক ব্রাহ্মণ স্থানীয় সেই চারবর্ণের প্রজাগণ বেদবিদ্যার দ্বার স্বর্গের দ্বারসদৃশ জগতাত্মা বেদময় সূর্যদেবের উপাসনা করেন। তাঁদের পরমায়ু সহস্র বছর এবং রূপ ও প্রজনন ক্রিয়া দেবতুল্য। তাদের উপাসনা মন্ত্র হলো এরকম– আমরা পুরাণ পুরুষ ভগবান বিষ্ণুর মূর্তিস্বরূপ সূর্যদেবের শরণ গ্রহণ করছি। তিনি সত্য, ঘাত, দেব, শুভ, ও অশুভ ফলের অধিষ্ঠাতা।

প্লক্ষ প্রভৃতি পাঁচটি দ্বীপের প্রজাগণের আয়ু, ইন্দ্রিয়শক্তি, ওজঃ, সামর্থ্য, বল, বুদ্ধি, ও বিক্রম এই সকল জন্ম থেকে সিদ্ধ হয়ে একই ভাবে বর্তমান থাকে।

প্লক্ষদ্বীপ সমান পরিমাণ অর্থাৎ দুলক্ষ যোজন বিস্তৃত ইক্ষুরস সাগর দ্বারা বেষ্টিত। শাল্মল দ্বীপ তেমনি প্লক্ষ দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থাৎ চারলক্ষ যোজন পরিমাণ সুরারস সগর দ্বারা বেষ্টিত।

সেই দ্বীপে একটি বিরাট শাল্মলী বৃক্ষ আছে। যেখানে গরুড়ের আবাস স্থান বিদ্যমান। এই দ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রত তনয় যজ্ঞবাহু। তিনি এই দ্বীপটি নিজের সাত পুত্রের মধ্যে সাতটি বর্ষে ভাগ করে দেন। তাদের নাম হল– সুরোচন, সৌমনস্য, রমণক, দেববহ, পরিভদ্র, আপ্যায়ন ও অভিজ্ঞাত।

ঐ সকলবর্ষে সাতটি বর্ষপর্বত এবং সাতটি নদী প্রসিদ্ধতম। পর্বতাদির নাম– সুরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কুন্দ, কুমুদ, পুষ্পবর্ষ ও সহস্রশ্রুতি। নদীগণের নাম– অনুমতি, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহু, রজনী, নন্দা ও রাকা।

এই বর্ষসমূহের অধিবাসী শ্রুতিধর, বীর্যধর, বসুন্ধর, ইযুন্ধর নামক পুরুষেরা বেদমন্ত্রের দ্বারা জগতাত্মা বেদময় ভগবান সোমদেবকে আরাধনা করেন এবং এই মন্ত্রের স্তব করেন। যিনি কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষে নিজ রশ্মির সাহায্য পিতৃ ও দেবগণকে অন্নদান করেছেন। সেই রাজা সোম আমাদের সকল প্রজাদের অনুকূল হোন।

এইভাবে সুরাসাগরের বহির্ভাগে শাল্মল দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত আট লক্ষ যোজন পরিমিত কুশদ্বীপ বর্তমান।

উহা সমপরিমাণ ঘৃতোকে সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঐ দ্বীপে দেবনির্মিত একটি বিশাল কুশস্তম্ভ থাকতে উহার নাম 'কুশদ্বীপ' হয়েছে। সেই কুশস্তম্ভ দ্বিতীয় অনলের ন্যায় কোমল দীপ্তিতে দিক্ সমূহকে উদ্দীপিত করছে।

হে রাজন, উক্ত কুশদ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রত পুত্র হিরণ্যদেবতা। তিনিও নিজের সাত পুত্রের মধ্যে দ্বীপটিকে বিভক্ত করে, নিজে তপস্যায় রত হয়েছিলেন। তার এই সাত পুত্রের নাম– বসু, বসুদাম, দৃঢ়রচি, নাভিভপ্ত, সত্যব্রত, বিপ্রনাম ও দেবনাম। তাদের নামযুক্ত ঐ সকল বর্ষে সাতটি বর্ষে সীমাপর্বত ও সাতটি নদী প্রসিদ্ধ। ঐ সাত পর্বতের নাম– বভ্রু, চুতঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্রকুট, দেবানীক, উর্ধ্বরোমা ও দ্রাবণ।

নদীর নাম– রসকুল্যা, মধুকল্যা, মিরিন্দা, শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুতা ও যন্ত্রমালা।

কুশদ্বীপবাসী কুশল কোবিদ, অভিমুক্ত ও কুলক নামক প্রজাগণ এই নদীর জল সেবন করে বিশেষ আচারে ভগবান অগ্নিদেবের উপাসনা করেন। তারা বলেন- হে অগ্নে, তুমি সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের হব্য বহন কর। অতএব সেই পরমপুরুষের অঙ্গস্বরূপ দেবগণের যজ্ঞ দ্বারা অঙ্গীপুরুষ শ্রীহরির আরাধনা কর।

কুশদ্বীপের বহির্ভাগে ক্রৌঞ্চদ্বীপ অবস্থিত। এই দ্বীপ আবার কুশদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ আয়তনযুক্ত, ক্ষীরজল-সাগর দ্বারা বেষ্টিত। এই দ্বীপস্থিত প্রকাণ্ড পর্বত ক্রৌঞ্চের নাম অনুসারে, এই দ্বীপের নামকরণ হয়েছে। পুরাকালে কার্তিকের রাগে এই পর্বতের কিয়দংশ বিধ্বস্ত হলেও ক্ষীর সাগরের সংস্পর্শে ও জলদেব বরুণের দ্বারা এই দ্বীপ সর্বতোভাবে রক্ষিত হয়েছিল। প্রিয়ব্রত পুত্র জ্ঞানী ঘৃতপৃষ্ঠই এই দ্বীপের আধিপত্য লাভ করেন।

তিনিও পরে নিজ সাতপুত্রের মধ্যে এই দ্বীপটিকে ভাগ করে দেন। পরে তিনি নিজে জ্ঞানী রূপে ভগবান শ্রীহরির চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ঘৃত পৃষ্ঠের ঐ পুত্রগণের নাম হলো– আত্মা, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামা, ভ্রাজষ্ঠ, লোতিতার্ণ ও বনস্পতি। তাদের মধ্যে সাতটি পর্বত ও সাতটি নদী বিখ্যাত। পর্বতগণের নাম হল- শুক্ল, বর্ধমান, ভোজন, উপবহন নন্দ, নন্দন ও সর্বতোভদ্র।

নদীগণের নাম– অভয়া, অমৃতৌখা, আর্ষকা, তীর্থবতী, রূপবতী, পবিত্রবতী ও শুক্লা। ঐ নদীগুলের জল ব্যবহার করে ঐ সকল বর্ষের অধিবাসী পুরুষেরা জলময় ভগবানের অর্চনায় রত হন। তখন তারা এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করেন- হে জল সকল, তোমরা নিজ হতেই পাপ বিনাশক, বিশেষতঃ পরমেশ্বরের নিকট থেকে শক্তিলাভ করেছ।

অতএব, ভুলোক, ভুর্বলোক এবং স্বর্গলোকরূপ ত্রিভুবন পবিত্র করছ। আমরা তোমাদের স্পর্শ করছি, তোমরা আমাদের শরীর পবিত্র কর।

এইরকম ক্ষীরোদ সাগরের পর তার চতুর্দিকে বত্রিশলক্ষ যোজন বিস্তৃত শাকদ্বীপ অবস্থিত উহার সমপরিমাণ দধি সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত ঐ দ্বীপে শাক নামক একটি বিশাল তরু আছে, তার পত্রসকল অন্তরে ঘনস্পর্শ, বাহিরে মৃদুস্পর্শে সেই বৃক্ষের অবস্থিতির কারণে এই দ্বীপের নাম হয়েছে শাকদ্বীপ।

ঐ বৃক্ষের মনোরম সৌরভে সমগ্র দ্বীপটি সুবাসিত হয়ে থাকে।

প্রিয়ব্রতের আত্মজ মেধাতিথি ঐ দ্বীপের অধিপতি ছিলেন, তিনি নিজের সাত পুত্রের মধ্যে দ্বীপটিকে ভাগ করে দিয়েছিলেন। তাদের নাম ছিল– পুরোজব, মনোজব, বেপমান, ধূম্রানীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ ও বিশ্বাধার।

ঐ সকল বর্ষে সাতটি সীমাপর্বত ও সাতটি বিখ্যাত নদী আছে। তাদের নাম যথাক্রমে– ঈশাণ, উরুশৃঙ্গ, বনভদ্র, শতকেশর, সহস্রস্রোতা দেবপল ও মহানস।

নদীগুলির নাম– অনঘা, আয়ুদা, উভয় সৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চনদী, সহস্রসুতি ও নিজধৃতি সে সকলবর্ষে অধিবাসী শতকুত, সত্যব্রত, দানব্রত ও অনুব্রত নামক পুরুষেরা পরম সমাধিযোগে বায়ুরূপী ভগবানের পূজা করেননি। তাদের পূজার স্তুতিমন্ত্র এরকম– যিনি স্থাবর– জঙ্গমাত্মক সকল ভূতাদির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে নিজ প্রাণাদি বৃত্তি দ্বারা তাদের রক্ষা করেছেন এবং সমগ্র বিশ্ব যাঁর বশীভূত সেই অন্তর্যামী সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ বায়ু দেবতা আমাদের রক্ষা করুন।

এইরূপ দধিসমুদ্রের পর তার চতুর্দিকে শাকদ্বীপের দ্বিগুণ বিস্তার যুক্ত 'পুষ্কর দ্বীপ' বর্তমান। সেটি সমপরিমাণ স্বাদু জল সমুদ্রের দ্বারা বহির্ভাগে পরিবেষ্টিত। ঐ পুষ্কর দ্বীপে একটি অতিবৃহৎ পদ্মপুষ্প সরোবর ছিল। সেখানে অযুত-নিযুত পরিমাণ পদ্ম সুবর্ণময় ও অগ্নিশিখার মতো নির্মল। এই প্রকার পদ্মের উপরে স্বয়ং ব্রহ্মা উপবেশন করেন। ঐ দ্বীপে মানসোত্তর নামে একটি পর্বত আছে। তা পূর্ব ও পশ্চিবর্ষের সীমা-গিরি।

এই দ্বীপের চারদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের চারটি পুরী আছে। এর উপরিভাগে সূর্যদেবের রথের সংবৎসর রূপ চক্রটি মেরুপবর্ত পরিক্রমার সময়ে দেবগণের অহোরাত্র অর্থাৎ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ দ্বারা একবার পরিভ্রমণ করছে।

ঐ দ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতপুত্রে বীতিত্রোহ। পরে তিনি রমণক ও ধাতব নামক দুই আত্মজকে দুটি বর্ষের অধিপতিরূপে নিযুক্ত করেন। ব্রহ্মার সঙ্গে স্বর্ণলোকে উপবেশনের প্রত্যাশায় ঐ বর্ষদ্বয়ের অধিবাসীগণ ভগবানের আরাধনা করেন, তারা এই মন্ত্র বলেন–ব্রহ্মার উপাসক ও কর্মফলরূপী যে প্রসিদ্ধ তত্ত্বকে জনগণ ভেদরূপে অর্চনা করে, কিন্তু যা পরমেশ্বরেই, পরন্তু যা বস্তুত অদ্বৈত, আমরা সেই ভগবানকে প্রণাম করি।

এই শুদ্ধোদক সমুদ্রের পরে তোক ও অলোক নামে দুটি দেশ আছে, ঐ দুটি দেশের সীমানা রক্ষার্থে মধ্যে সর্বদিকে বিস্তৃত মালাকার পর্বত 'লোকালোক' বিদ্যমান, দুই পর্বতের মধ্যভাগে এক কোটি সাড়ে সাতান্ন লক্ষ যোজন পরিমিত ভূমি শুদ্ধোদক সমুদ্রের পরে অবস্থিত। এখানে বিভিন্ন প্রাণীদের বসতি রয়েছে। এরপরে দর্পণের মতো নির্মল স্বর্ণময় ভু-ভাগ বিরাজমান হয়। তার পরিমাণ আটকোটি উনচল্লিশ লক্ষ। তার মধ্যে কোন দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হলে, উহা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব, ঐ স্থানে কোনরূপ প্রাণীরই বসতি নেই।

হে রাজন, উক্ত বর্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী পর্বতের নাম লোকালোক, ঐ পর্বত মধ্যস্থলে বিরাজ করে সূর্যাদির আলোকবিশিষ্ট দেশ লোক এবং সূর্যের আলোকহীন দেশ আলোককে পৃথকভাবে ব্যবস্থাপিত করেছে।

পরমেশ্বর ত্রিলোকের প্রান্তভাগে সেই লোকলোক পর্বত সংস্থাপন করেছেন। এই পর্বতটির উচ্চতা ও বিস্তৃতি এরূপ যে সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি এই পর্বত দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে ত্রিলোকের বাইরে যেতে সমর্থ হয় না। পন্ডিতগণ পরিমাণ, লক্ষণ ও আকৃতি অনুসারে এ পর্যন্ত লোকস্থিতি বিচার করেছেন। এই ভূর্লোক পঞ্চাশ কোটি যোজন পরিমিত এবং এই লোকালোক পর্বতটি পরিমাণে তার এক চুতর্থাংশ অর্থাৎ আয়তনে সাড়ে বারো কোটি যোজন।

লোকালোক পর্বতের উধ্বভাগে জগদগুরু ব্রহ্মা চারটি দিকগজ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাদের নাম ঋষভ, পুষ্করচুড়, বামন ও অপরাজিত। এরা লোকসকলের স্থিতির কারণ। যে ভগবান মহাপুরুষ প্রাণীগণের অন্তর্যামী তিনি সকলের মঙ্গলার্থে ঐ পর্বতে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব, যাতে জ্ঞান, বৈরাগ্য অষ্টৈশ্বর্য ও অষ্ট মহাসিদ্ধি উপলক্ষিত আছে, তা প্রকাশ করেন। তার চারদিকে বিস্বক সেনাদি প্রধান প্রধান পার্ষদগণ বেষ্টন করে থাকেন। যদিও ভগবান ও গিরিতে অধিষ্ঠানপূর্বক বিশুদ্ধ সত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তবুও সে সময়ে তার হাতে বিভিন্ন দোর্দন্ড অস্ত্র শোভিত থাকে। অন্তর্যামী হওয়া সত্ত্বেও নিজ মায়াচরিত বিবিধ লোকমাত্রা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই তিনি লীলা দ্বারা এই মূর্তি ধারণ করেছেন।

হে মহারাজ, লোকালোক পর্বতের ন্যায় বর্হিভাগস্থিত আলোকের পরিমাণও সাড়ে বারো কোটি যোজন। এরপরে পণ্ডিতগণ যোগেশ্বর গণের বিশুদ্ধ গন্তব্য স্থলের কথা বলেন। দ্বিজপুত্রকে আনয়নের সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্থান অর্জুনকে দেখিয়েছিল এই কারণে এই স্থান অতি শুদ্ধ।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, পূর্বেবিস্তৃতিরূপ যে ব্রহ্মাণ্ডের বর্ণনা করেছি, এখন তার পরিমাণ বলছি, শোনো! সূর্য এবং ব্রহ্মাণ্ড গোলোকের মধ্যবর্তী স্থানের পরিমাণ সমগ্রভাবে পঁচিশ কোটি যোজন। যেহেতু, সূর্য বৈরাজরূপে এই অচেতন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছেন, তাই তার নাম মার্তণ্ড। তুমিই হিরণ্যগর্ভ, অর্থাৎ সমষ্টি জীবের সূক্ষ্ম উপাধি। কারণ তার থেকেই হিরন্ময় আণ্ডের অর্থাৎ তৃতীয় স্থলদেহের অস্তিত্ব সিদ্ধ হচ্ছে।

হে রাজন, সূর্য দ্বারাই দিসকল, আকাশ, পৃথিবী এবং অন্যান্য বিভাগ বিভক্ত হয়। ভোগস্থল, মোক্ষস্থল, নরক এবং আতনাদি এই সর্বপ্রকার লোকসকলেও সূর্য পরস্পর থেকে ভিন্ন করে বিভক্ত করেছেন। অতএব, সূর্যদেবের উপাসনা করা অবশ্য কর্তব্য। তিনি দেব, মনুষ্য সকলের আত্মরূপ, তিনি পশু, পক্ষী, লতা ও বীজসকলের আত্মা ও নেত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বর্ণাদি তাকে প্রণাম করি।

.

একবিংশ অধ্যায়

গোলক বিবরণ ও সূর্যের রথ ও তার গতি বর্ণনা

শ্রী শুকদেব বললেন–হে রাজা, আমি তোমাকে পরিমাণ ও লক্ষণ অনুসারে পৃথিবীর অবস্থান ব্যাখ্যা করলাম। যার বিস্তার পঞ্চাশ কোটি যোজন এবং উচ্চতায় পঁচিশ কোটি যোজন।

যে সকল ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানী তারা স্বর্গমণ্ডলের পরিমাণও এই ভূমণ্ডলের পরিমাণ দ্বারা ব্যক্ত করেন। যেমন দুটি দলের পরিমাণ সমান হয় তেমনি ভূ-মণ্ডল ও স্বর্গমণ্ডলের পরিমাণ সমান হয়।

উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থানকারী আকাশ, উভয়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। ভগবান সূর্য এই আকাশের মধ্যস্থলে বিরাজমান। তিনিই ত্রিলোককে রৌদ্রদান করে উত্তপ্ত রাখেন এবং স্বীয় দীপ্তিকে আলোকিত করেন। তিনিই উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও বিষুব নামক মন্দগতি, দ্রুত গতি এবং সমগতি দ্বারা যথাসময়ে আরোহণ, অবরোহণ এবং সমান স্থান প্রাপ্ত হন। এভাবেই তিনি

দ্বাদশ রাশিতে বিচরণ করেন। সেসময়ে বিভিন্ন রাশিতে অবস্থান কালে দিন ও রাত্রিকে দীর্ঘ, হ্রস্ব ও সমান করেন।

যে সময়ে সূর্যদেব তুলা ও মেষ রাশিতে অবস্থান করেন, তখন দিন ও রাতের পরিমাণ সমান সমান হয়। যে সময়ে তিনি বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ও কন্যারাশিতে অবস্থান করেন, সে সময়ে দিবাভাগ ক্রমবর্ধিত হয় এবং প্রতিমাসে রাত্রির এক ঘণ্টা করে হ্রাস পায়। সে সময়ে সূর্যদেব, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন- এই পাঁচটি রাশিতে ভ্রাম্যমান, সেসময়ে দিনের পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে এবং রাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যত কাল পর্যন্ত সূর্যের গতি দক্ষিণ দিকে থাকে, তত কাল পর্যন্ত দিনের পরিমাণ দীর্ঘ হয়। আবার যতসময় পর্যন্ত উত্তরদিকে গতি থাকে, তত সময় পর্যন্ত রাতের পরিমাণ দীর্ঘ হয়। পণ্ডিতগণের মতে, মানসোত্তর পর্যন্ত সূর্যের যাত্রাপথের পরিমাণ নয়কোটি পঞ্চাশ লক্ষ যোজন। মানসোত্তর পর্বতে সুমেরুর পূর্বদিকে দেবযানী নামক ইন্দ্রপুরী বর্তমান।

দক্ষিণে অবস্থানকারী যমপুরীর নাম সংযমনী। পশ্চিমদিকে নিম্লোচনী নামক বায়ুপুরী এবং উত্তরদিকে বিভাবরী নামক চন্দ্রপুরী বিদ্যমান। সুমেরুর চতুর্দিকে অবস্থানকারী পুরীগুলিতে বিশেষ বিশেষ সময়ে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, সায়ং-সন্ধ্যা, এবং অর্ধরাত্রি হয়ে থাকে।

সূর্যোদয়ের সময় অনুসারে প্রাণীগণ বিভিন্ন কাজে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত হয়। যারা মেরুর দক্ষিণদিকে অবস্থান করে তাদের পূর্বদিকে ও যারা উত্তরদিকে থাকে তাদের পশ্চিমদিকে থেকে পূর্বাদি দিকসকল পরিগণিত হয়। যারা পশ্চিমদিকে অবস্থানকারী তাদের দক্ষিণ দিক এবং যারা পূর্বদিকে অবস্থানরত তাদের উত্তরদিক থেকে পূর্বাদি দিক গণনা করা হয়।

সুমেরু পর্বতবাসীদের কাছে সূর্যের তাপ, দিনের মধ্যভাগেই পৌঁছে যায়। তাদের কাছে সূর্যদেব সবসময়ই দিনের মধ্যগতরূপে প্রকাশিত। সূর্যের গতি নক্ষত্রাভিমুখী তাই তিনি মেরুপর্বতকে বাঁদিকে রেখেই ভ্রমণ করেন। তবুও প্রবাহ নামক বায়ু দ্বারা জ্যোতিশ্চক্রের পরিভ্রমণের কারণে প্রত্যহ, সুমেরুকে দক্ষিণেই রেখে থাকেন। অর্থাৎ দক্ষিনাবর্তের প্রবাহ' নামক বায়ু জ্যোতিশ্চক্রকে ভ্রাম্যমান করানোর জন্য প্রতিদিন একবার করে দক্ষিণদিকে গমন করেন।

চক্রগতির কারণে অতি দূর থেকে সূর্যকে যখন ভূমি সংলগ্ন বলে প্রতীয়মান হয়, তাকেই সূর্যোদয় বলে। তাকে আকাশ রূঢ়ের ন্যায় দর্শন করাকে মধ্যাহ্ন বলে। ভূমি প্রবিষ্টরূপে সূর্যের অবস্থানকে সূর্যাস্ত বলা হয়। সূর্য সেখান থেকে যখন অতি দূরে গমন করেন তাকে অর্ধরাত্রি বলা হয়। বেদেরও সমুদ্রতীরস্থ দৃষ্টিক্রমে কথিত আছে, সূর্যদেব প্রত্যুষে জলমধ্য থেকে উদিত

হন। সায়ংকালে তিনি আবার জমধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন। বাস্তবে, এই কথন, শ্রুতির ব্যবহার মাত্র, সম্পূর্ণ সত্য নয়।

সূর্যদেব যেখানে উদিত হন, তার সমসূত্রপাত স্থানেই অস্তাচলে গমন করেন। যেস্থানে তিনি রৌদ্র দ্বারা প্রাণীদের সন্তাপ করেন, তারই সামসূত্রপাত স্থানের প্রাণীদের নিদ্রামগ্ন করেন। ঐ স্থানে তখন মধ্যরাত, যে সময়ে সূর্যদেব ইন্দ্রপুরী থেকে যাত্রা শুরু করেন, তার পঞ্চদশ ঘটিকায় দু'কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার যোজনে পথ অতিক্রমের পর যমপুরীতে উপস্থিত হন। এভাবে প্রদক্ষিণ করতে করতে তিনি ক্রমশঃ বরুণের পুরী এবং চন্দ্রের পুরীতে ভ্রমণ করে পুনরায় ইন্দ্রপুরীতে ফিরে আসেন।

চন্দ্রসহ অন্যান্য গ্রহাদিও নক্ষত্রাদির সঙ্গে একই সময়ে জ্যোতিশ্চক্রে উদিত হয়ে একই সময়ে অস্তমিত হন। এভাবেই বেদময় সূর্যরথ এক মুহূর্তে ইন্দ্রাদি চারটি পুরীর চতুর্দিকে চৌত্রিশ লক্ষ আটশো যোজন পথ ভ্রমণ করে। সূর্যরথের একমাত্র চাকার নাম সংবৎসর। এই চাকার বারোটি অরা অর্থাৎ মধ্যস্থিত শলাকাগুলি হল বারো মাস। ছটি ধাতু হলো এই চক্রের ছটি নেমি এবং তিনটি চাতুর্মাস্য হল এই চক্রের নাভি। এই চক্রর একটি প্রান্ত সুমেরুতে এবং অপর প্রান্তটি মানসসাত্তর পর্বতে সংলগ্ন। এভাবেই সূর্যের পথ চক্রটি তেলের খনির চাকার মতো মানসোত্তর পর্বতে পরিভ্রমণ করছে।

সূর্যরথের চাকাটির একটি প্রান্ত, অপর প্রান্তের নীচের দিকে সংযুক্ত। ঐ প্রান্তটির ঊর্ধ্বভাগ তৈলযন্ত্রের প্রান্তের মতো বায়ুপাশ দ্বারা ধ্রুবলোক সংযুক্ত আছে। প্রথম প্রান্তের পরিমান এক কোটি সাড়ে সাত লক্ষ যোজন এবং দ্বিতীয় প্রান্তের পরিমাণ তার এক চতুর্থাংশ। রথমধ্যে উপবেশনের জন্য নির্ধারিত স্থানের পরিমাণ ছত্রিশ লক্ষ যোজন। ঐ রথের যুগ অর্থাৎ জোয়ালি–যার সঙ্গে অশ্ব সংযুক্ত থাকে, তা নয় লক্ষ যোজন দীর্ঘ।

ঐ সূর্যরথে অরুণ কর্তৃক যোজিত গায়ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দ নামক সপ্তঘোড়া সূর্যদেবকে বহন করেছে। অরুণ ঐ রথে সূর্যের সারথিরূপে নিযুক্ত। তিনি বিপরীত মুখে অর্থাৎ পূর্বদিকে মুখ করে ঐ রথের অগ্রভাগে অধিষ্ঠিত।

এরকম অঙ্গুলির পর্বতপ্রমাণ ষাট হাজার ঋষি, সূর্যের স্তব করার জন্য সূর্যের সম্মুখভাগে অধিষ্ঠিত। তারা বালখিল্য নামে পরিচিত। সূর্যের সম্মুখভাগের উপবেশন করে তারা, সুমধুর ভাষায় সূর্যদেবের বন্দনা করে চলেছেন। এরকম ঋষি, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ, গ্রামণী, রাক্ষস ও দেবতারা বিভিন্ন উপায়ে সূর্যের উপাসনা করেন। তারা পৃথকভাবে চোদ্দটি গণে বিভাজিত

হয়েও দুই-দুই মিলে সাতটি দল গঠন করেন। বিভিন্ন নাম ধারণ করে। বিভিন্ন নামধারী সূর্যের উপাসনা করেন। তাদের কর্ম পন্থাও বিভিন্ন রকমের হয়।

হে মহারাজ, সূর্যদেব এভাবে ঋষিগণ পরিবৃত হয়ে ভূ-মণ্ডলের নয়কোটি একান্ন লক্ষ যোজন পরিমিত পরিধি ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের সময়ে প্রতিমুহূর্তে দুই হাজার যোজন দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করে থাকেন।

.

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বিভিন্ন গ্রহের স্থান ও গতি বর্ণনা

শ্রী শুকদেব বললেন–হে রাজ, স্বয়ং ভগবান নারায়ণ লোকের কামনা হেতু নিজের বেদময় বপুকে বারোভাগে ভাগ করেছেন। তিনি সূর্যরূপে বিরাজ করছেন। সূর্যদেবকেই ইন্দ্রাদি দেবতারূপে এবং অষ্টাঙ্গ যোগক্রিয়ার দ্বারা অন্তর্যামী রূপে, আরাধনা করা হয়। স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝে অবস্থিত আকাশমণ্ডলের কেন্দ্রে কালচক্রে দ্বাদশ মাস রয়েছে, বা সংবৎসরের অবয়ব।

মাসগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। ভগবান আদিত্য যতৎকালে সংবৎসরের ষষ্ঠভাগ বা দুইরাশি ভোগ করেন, সেই কালকে বলা হয় ঋতু। একইভাবে সূর্যদেব আকাশ মণ্ডলের অধভাগে ভ্রমণ। করার কালকে বলা হয় অয়ন কাল। সূর্য, স্বর্গ ও ভূমণ্ডলের সম্পূর্ণ ভোগ করার কাল হল সংবৎসর।

সূর্যমণ্ডল থেকে চন্দ্রের অবস্থান লক্ষ যোজন দূরে। চন্দ্রমণ্ডলের কালগুলি যখন বৃদ্ধিশীল হয়, তখন দেবগণের দিন ক্রমে ক্ষীণ হলে, তা হয় পিতৃলোকের দিন।

সোমগ্রহ তিরিশ মুহূর্তে এক নক্ষত্র ভোগ করেন। অন্নময় ও অমৃতময় এই গ্রহ সকল জীবের প্রাণস্বরূপ। অর্থাৎ ষোড়শ কলাবিশিষ্ট চন্দ্ররূপী ভগবান পরমপুরুষ মনোময়, অন্নময় ও অমৃতময়।

চন্দ্রমণ্ডলের দুই লক্ষ যোজন দূরে আছে নক্ষত্র মণ্ডল। এর দু'লক্ষ যোজন উপরে আছে শুক্রগ্রহের অবস্থান। এই সূর্যের মতো শীঘ্র, মন্দ, ও সমান গতি লাভ করে। শুক্রদেবের আনুকূল্যে বৃষ্টি হয়। তিনি বৃষ্টির প্রতিবন্ধক অন্য গ্রহের উপশম ঘটিয়ে থাকেন।

শুক্রগ্রহের দুই লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত বুধ গ্রহ সূর্যের অগ্র ও পশ্চাৎ অথবা একই সঙ্গে সঞ্চারণ করে থাকে। চন্দ্রপুত্র বুধ লোকেদের পক্ষে শুভ।

দুঃখসূচক মঙ্গল গ্রহ অবস্থান করছে বুধ গ্রহের দুই লক্ষ যোজন ওপরে।

ভগবান বৃহস্পতি অবস্থান করছেন মঙ্গলের দুই লক্ষ যোজন ওপরে। এই গ্রহ ব্রাহ্মণদের প্রতি অনুকূল হয়ে থাকেন।

অশান্তিকর শনি বিরাজ করছেন বৃহস্পতির থেকে দু'লক্ষ যোজন ওপরে।

এগারো লক্ষ যোজন উত্তরে অবস্থান করছেন সপ্তর্ষি মণ্ডল। জগতের সকল লোকের কল্যাণ চিন্তায় রত থেকে ধ্রুবলোকে প্রদক্ষিণ করছেন।

.

ত্রিবিংশ অধ্যায়

পরমপদ ও শিশুমার চক্র

ভগবান বিষ্ণুর পরমধাম সপ্তর্ষিলোকের ওপরে তেরো লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত। রাজা উত্তানপাদের পুত্র মহাভাগবত ধ্রুব সেখানে ভগবানের আরাধনায় রত, যিনি কল্পজীবী পুরুষদের আশ্রয়স্বরূপ। ধ্রুব আকাশমণ্ডলে ভগবান বিষ্ণুর স্তম্ভ স্বরূপ বিরাজ করছেন। গ্রহ, নক্ষত্র এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্ক কালচক্রের মধ্যভাগ ও বহির্ভাগে আবদ্ধ থেকে ধ্রুবকে অবলম্বন করে কল্পকাল পর্যন্ত আকাশমণ্ডলে নির্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করছে।

শিশুমার রূপে ভগবান বিষ্ণুর যোগধারায় জ্যোতিশ্চক্রের অবস্থান। অনেকে শিশুমার রূপে ভগবানের উপাসনা করে থাকেন। তার মস্তক নিম্নগামী, তাঁর পুচ্ছের অগ্রভাগ ধ্রুব, লাঙ্গুলের অগ্রভাগের প্রান্তদেশে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র ও ধর্ম, পুচ্ছস্থলে ধাতা ও বিধাতা এবং কটিদেশে সপ্তর্ষিগণ বিরাজিত। শিশুমারের কুণ্ডলাকৃতি দেহটি দক্ষিণাবর্ত অভিজিৎ থেকে পুনর্বসু

অর্থাৎ চোদ্দটি নক্ষত্র তাঁর দক্ষিণপাশে এবং দক্ষিণায়ণের মোট চোদ্দোটি নক্ষত্র বাঁ পাশে রয়েছে। শিশুমারের পৃষ্ঠভাগে রয়েছে দক্ষিণমার্গের প্রথমভাগ অর্থাৎ অজবীথী এবং আকাশগঙ্গাকে তার উদরে কল্পনা করা হয়েছে।

এই অবয়বের বামপার্শ্বের অস্থিসমূহে দক্ষিণায়নের আটটি নক্ষত্রকে ধরা হয়েছে। তার দক্ষিণ স্কন্ধে জ্যেষ্ঠাকে সংলগ্ন করা হয়েছে। এই শিশুমারকেই ভগবান বিষ্ণুর সর্বদেবতাময় রূপ বলে জানতে হবে এবং ত্রিসন্ধ্যায় তার মন্ত্র জপ করতে হয়। শিশুমাররূপী ভগবান বাসুদেব প্রসন্ন হয়ে সকল পাপের থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

.

চর্তুবিংশ অধ্যায়

রাহু আদির অবস্থান ও সপ্ত তলাদির বর্ণনা

সিংহিকার পুত্র রাহু অসুরেরও অধম হলেও ভগবান বিষ্ণুর কৃপায় অমরত্ব ও গ্রহত্ব লাভ করেছে। সূর্যমণ্ডল থেকে অযুত যোজন দূরে তার অবস্থান। দেবগণের অমৃত পানকালে রাহু ছলনা করে চন্দ্র ও সূর্যের মাঝে দেবতাদের পংক্তিতে উপবেশন করেন। পরে তারা ঐ কথা জানিয়ে দিলে রাহু ক্ষিপ্ত হয়ে চন্দ্র সূর্যকে আক্রমণ করার জন্য ধাবিত হয়। সাদা ঘূর্ণমান অতিশয় দুঃসহ তেজধারী সুদর্শন চক্র তার পথ রোধ করেন। রাহু নিবৃত্ত হয়।

রাহুগ্রহের বারো লক্ষ যোজন নীচে সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধরগণের অবস্থান। তার নীচে যে গ্রহ-নক্ষত্র বিহীন আকাশ আছে সেখানে ভূত-প্রেত, রাক্ষস, যক্ষের বাস। আকাশভাগের আধোভাগে শতযোজন দূরে পৃথিবীর অবস্থান। ভূর্লোক সীমার মধ্যে শ্যেন, হংস, ভাস প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ পাখিদের অবস্থান।

পৃথিবীর নিম্নভাগে সাতটি ভূ-বিবরের মধ্যে আছে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। অযুত ব্যবধানে প্রত্যেকটি তলের অবস্থান। এইসব ভোগস্থানে ইন্দ্র অপেক্ষাও সমধিক সুখের অধিপতি দৈত্যদানব ও নাগজাতীয় অধিবাসীর পরিবারবর্গের নিয়ে বসবাস করছে, এরা মায়াবলে নানা বিলাস বিস্তার করে থাকে। এই ভূ-বিবরের চন্দ্র-সূর্যের

উদয় হয় না, ফলে কাল বিভাগের কোনো অস্তিত্ব নেই। মহাসপ্রবর অনন্তের মধ্যস্থিত মণিরাজির প্রকাশের দ্বারাই অন্ধকার বিদূরিত হয়।

সপ্ততলের অধিবাসীরা ওষধিরস ও রসায়ন জাতীয় ওষুধ সেবন করে। নানারকমের অন্ন, পান ও স্নানাদির জন্য তাদের কোনো রোগ হয় না, ভগবানের তেজোময় সুদর্শন চক্র ছাড়া কেউ, এমনকি যমদেবও কর্তৃত্ব ফলাতে পারে না।

ময়দানবের পুত্র বলাসুরের অতল নামক ভূ-বিবরে বাস। তার হাই থেকে সৃষ্টি হয়েছে স্বৈরিণী, কামিনী ও পুংশ্চলী নামক তিন শ্রেণীর রমণী। কোনো পুরুষ সেখানে প্রবেশ করলে তারা তাকে হটিক অর্থাৎ ধুস্তর রস দিয়ে সম্ভোগ সমর্থ করে তোলে।

ভগবান হাটকেশ্বর শিব তার ভূত পার্ষদদের নিয়ে ভবানীর সাথে অতলের নিম্ন দিকে বিতলে অবস্থান করেন।

বিতলের নিচে সুতল মহাযশস্বী বিরোচন-পুত্র বলি এখানে অবস্থান করছেন। আত্মারাম ও পরমাত্মা-স্বরূপ বামনরূপী ভগবানের নিমিত্ত মহারাজ বলি শ্রদ্ধাপূর্বক সমাহিত চিত্তে সাদরে যে ভূমিদান করেন, তা সাক্ষাৎ মোক্ষের দ্বার স্বরূপ।

বলির পিতামহ প্রহ্লাদ ছিলেন ভগবানের চিরদাস্য। তিনি পিতা হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর পিতৃরাজ্য গ্রহণ করলেন না। কারণ ভৌগেশ্বর্য মায়াময় মাত্র তার দ্বারা জীব ভগবানের নাম স্মরণ করতে ভুলে যায়।

সুতলের নিম্নভাগে তলাতল-এ তিনটি পুরীর অধিপতি দানব রাজময় অবস্থান করছেন। ত্রিজগতের মঙ্গলকারী ভগবান শংকর তার তিনটি পুরী ধ্বংস করে দিলেও, পরে তা আবার রূপা করে ফিরিয়ে দেন। সুদর্শন চক্রের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে এবং মহাদেবের দ্বারা পরিরক্ষিত হয়ে ময়দানব তলাতলে সকলের পূজ্য।

তলাতলের নীচে যে মহাতল বিবর আছে, সেখানে কুহক, তক্ষক, কালিয়, সুষেণ ইত্যাদি নামের ফণাধারী ক্রোধপরবশ রুদ্রর সন্তানদের বসবাস। অতিশয় দীর্ঘ দেহধারী এই সব ফণাধারী সর্বদা ভগবানের বাহন গরুড়ের ভয়ে তটস্থ থাকে।

মহাতলের নীচে রসাতলে দেবতাদের চিরশত্রু দৈত্যদানব ও অসুরদের বিহার স্থান। তারা জন্ম থেকেই মহা প্রতাপত্তি প্রভাবশালী হলেও শ্রীহরির তেজের প্রভাবে তার বলদর্পহীন হয়ে নির্বিষ সাপের ন্যায় অবস্থান করছে।

মহাশয় মহাক্রোধী বাসুকী প্রমুখ শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খশ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল অশ্বতর ও দেবদত্ত প্রভৃতি নাগলোকের অধিপতিদের বাসভূমি রসাতলের নিম্নভাগ পাতালে সহস্র মস্তকযুক্ত সেই মহাসর্পগণের ফণাসমূহে বিরাজমান অতুজুল মহামণিরাজি নিজ দীপ্তির দ্বারা সপ্ত ভূ বিবরের অন্ধকার দূর করেছে।

.

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ভগবান সংকর্ষণ দেবের অবস্থান ও স্তুতি

পাতালের মূল দেশে তিরিশ হাজার যোজন দুরে ভগবান বাসুদেবের তমোময় কলা অনন্ত নামে বিরাহিত। তিনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যে উভয় পদার্থকে সম্যকরূপে আকর্ষণ করেন। তাই তিনি সংকর্ষণদেব। সহস্রমস্তক সেই ভগবান অনন্তদেবের একটি মস্তকে এই ভূমণ্ডল ধরা হয়েছে।

রজতস্তম্ভ সদৃশ এই অনন্ত মূর্তির ভূজযুগল সুবিশাল, সুনির্মল, ধবলবর্ণ, সুন্দর ও মনোরম। রাজকন্যারা নানা কল্যাণ কামনা করে এই ভূজ দুটিতে অগরু, চন্দন ও কুমকুম চর্চিত করে। তাকে স্পর্শ করে মনে মনে আবেশে আপ্লুত হয়, অনন্ত গুণরাশির আধার আদিদেব ভগবান, অনন্ত, অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধাবেগে সংবরণ করে জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য সেখানে অবস্থান করছেন।

তিনি সুলক্ষণ ও সুন্দর একটি হস্তলাঙ্গুলের পৃষ্ঠভাগে উপবিষ্ট, নীলবস্ত্র পরিহিত, কুণ্ডল শোভিত দুটি কর্ণ, ঘূর্ণিত ও বিহ্বল ভাবাপন্ন দুটি নয়ন, গলার বৈজয়ন্তী নামক বলমালা। অনন্তদেবের গুণ যে কীর্তন করে এবং যে শ্রবণ করে, তার মোক্ষলাভ হয়।

ব্রহ্মার মানসপুত্র মহাপ্রভাবশালী দেবর্ষি নারদ তুম্বুর নামক গন্ধর্বের সাথে ব্রহ্মার সভায় অনন্তদেবের মহিমাকীর্তন করেছেন। যাঁর কটাক্ষ মাত্রে জগতের স্থিতি, সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণস্বরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির সৃষ্টি, যার বাস্তব স্বরূপ অনাদিত অনন্ত যিনি সৎ ও অসৎ, যাবতীয় বস্তুমাত্র যার মধ্যে প্রকাশ পায়, যিনি আমাদের প্রতি কৃপাহেতু বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক মূর্তি ধারণ করেছেন, সেই শ্রী ভগবানে প্রণাম নিবেদন করি।

মহাপাপী ব্যক্তিও যদি শ্রী ভগবানের নামকীর্তন কারো মুখে শোনে বা, পরিহাস করে তার নাম একবার উচ্চারণ করে, তাহলে তখনই তার শুদ্ধিলাভ ঘটে।

প্রতাপশালী শ্রীভগবান অনন্তদেব দুরন্তবল, মহান, গুণ ও প্রভাব সমূহের অধিকারী হয়েও ভূ মণ্ডলের তলদেশে নিজেকে আধার করেই অবস্থান করছেন এবং লোকের স্থিতির জন্য এই পৃথিবীকে অনায়াসে নিজের মস্তকে ধারণ করেছেন।

.

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

পাপানুসারে নরকযন্ত্রণাভোগ

রাজা পরীক্ষিৎ জানতে চাইলেন- হে মহর্ষে, নরক কী? এর অবস্থান কোথায়? লোকে কেন ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ করে? এসব প্রশ্নের উত্তর শুনতে আমি আগ্রহী। আপনি দয়া করে তা বলুন।

শ্রী শুকদেব বললেন– হে রাজন, সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের তারতম্য হেতু কর্তা তিন প্রকার এবং তাদের শ্রদ্ধার বিভিন্নতায় কর্মর্সকলের ফলও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ কর্ম একরূপ হলেও শ্রদ্ধার ভেদহেতুই কর্ম হতে বিভিন্ন প্রকার গতি হয়ে থাকে।

ত্রিজগতের দক্ষিণদিকে ভুমির নীচে এবং জলের উপরিভাগে নরকের অবস্থিতি। সূর্যপুত্র যমরাজ সেখানকার অধিপতি। তিনি ভগবানের আজ্ঞাবহ দাস। নিজ অনুচরবৃন্দের সাহায্যে

তিনি যমালয়ে মৃত প্রাণীদের নিয়ে আসেন এবং তাদের কর্মদোষ যথাযথ বিচার করে দোষের অনুরূপ দণ্ডবিধান করেন।

তামিস্র, অন্ধতামিশ্র, রৌরব, মাহারৌরব, কুম্ভীপাক, বৈতরণী, প্রাণরোধ, বিশসন, তপ্তশূর্মি, অবীচি ইত্যাদি নামে একুশটি নরকগর্ভ আছে। অনেকে আঠাশ রকমের নরকের কথা বলে থাকেন।

পরধন, পরস্ত্রী ও পরের পুত্র অপহরণকারী তামিস্র নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই অতিশয় অন্ধকার গহ্বরে পড়ে তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় এবং যমদূতের প্রহারে চিৎকার করে।

অপরকে বঞ্চিত করে স্ত্রী ও ধনসম্পত্তি ভোগ করার ফলে অন্ধ– তামিস্র নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

হিংসাশ্রয়ী মানুষ পরলোকে গিয়ে রৌরব নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি, প্রাণী পীড়ন করে কেবল আত্মদেহের ভরণপোষণ করে, সে মহারৌরব নামক নরকে পতিত হয়। সেখানে মাংস ভোজী পশুরা তার মাংস খুবলে খায়। ব্যক্তি জীবন্ত পশুপাখিকে বধ করে পাক করে ভক্ষণ করার ফলে কুম্ভীপাক নরকে যায়। সেখানে যমের অনুচরেরা তাকে তপ্ততলে পাক করে থাকে।

ব্রাহ্মণদ্রোহী পাপী পুরুষ তাম্রময় উষ্ণ কাল সূত্র নামক নরক লাভ করে। লোমশ পশুর শরীরে লোকসংখ্যার সমান হাজার কাল সেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণায় শরীরের অভ্যন্তরে ও বাহ্যভাগে দগ্ধ হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

স্বধর্ম ত্যাগী ব্যক্তি অমিতপবন নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। সেখানে অসির ন্যায় ধারালো তালপাতা দিয়ে তাকে প্রহার করা হয়। তীব্র যন্ত্রণায় সে বারে বারে মুচ্ছা যায়।

বিনা দোষে দণ্ড দিলে বা ব্রাহ্মণজাতির ওপর দৈহিক নির্যাতন করলে রাজা বা রাজপুরুষ পরলোকে শূকর মুখ নরকে যায়। ইক্ষুদণ্ড দিয়ে তাকে প্রহার করা হয়। কাতর কণ্ঠে পাপী চিৎকার করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান শেষে দেবতা, পিতৃলোক, ব্রাহ্মণ, আত্মীয়স্বজনকে অন্ন দান না করে নিজে একাই সব খায়, সে মহাপাপী। তাকে যমের অনুচররা কৃমিভোজন নরকে

নিক্ষেপ করে। সহস্র যোজন ব্যাপী কৃমিকুণ্ডে সে কৃমি খায় এবং কৃমিরাও তাকে ভক্ষণ করে। যতদিন তার কর্মফল শেষ না হবে তাকে এই নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

জোর করে ব্রাহ্মণের অর্থ, গয়নাগাটি কেড়ে নেওয়ার ফলে পাপী সন্দশ নামক নরক প্রাপ্ত হয়। সেখানে আগুনে মতো গনগনে লাল তপ্ত শলাকা দিয়ে যমদূতেরা তার দেহে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

যে ব্যক্তি পশ্বাদি যোনিতে উপগত হয়, যমদূতরা তাকে বজ্রকন্টক শাল্মলী নরকে নিক্ষেপ করে। বজ্রতুল্য কন্টকময় শাল্মলী বৃক্ষে চড়িয়ে নীচের দিকে টানতে থাকে।

ধর্মমর্যাদা লঙঘনকারী ক্ষত্রিয় বা রাজপুরুষ পরলোকে বৈতরণী নামক নরকে পতিত হয়। হিংস্র জলজন্তুরা তাকে আক্রমণ করে। তাঁর বিষ্ঠা, মূত্র, রক্ত, পুঁজ, নখ, অস্থি, মেদ ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে।

ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নিয়ে যে ব্যক্তি কামমোহিত হয়ে স্ববর্ণ ভার্যাকে রেতঃপান করায়, যমকিঙ্করগণ সেই পাপাত্মাকে রেতঃপূর্ণ কৃত্রিম ক্ষুদ্র নদীতে নিক্ষেপ করে রেতঃপালন করিয়ে থাকে। এরা নরকের নামে লালাভক্ষ।

যমালয়ে শত শত নরক আছে। পাপকারী লোক পাপানুসারে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। ধর্মপালনকারী লোকেরা নিজ নিজ কর্মানুসারে স্বর্গ লাভ করে। যারা পরলোকে ধর্ম ও অধর্মের ফল ভোগ করে, তাদের ভোগ একেবারে শেষ হয় না। অবশিষ্ট ফলভোগ করার জন্য তাদের জীবনরূপে পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়।

মহাপুরুষরূপী সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের নিজ মায়াগুণময় স্থূলতর রূপ যে পাপ, কীর্তন বা শ্রবণ করে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি হেতু তার চিত্ত শুদ্ধ হয়। ভূতলাস্থিত দ্বীপ, বর্ষ, নদী, পর্বত, সমুদ্র, আকাশ, পাতাল, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী নরকসমষ্টি সবই ঈশ্বরের বিভিন্ন স্থূলদেহ এবং জীবজগতের পরম আশ্রয়।

ষষ্ঠ স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

অজামিলের উপাখ্যান, বিষ্ণুদূত ও যমদূতের সংবাদ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন– হে ব্রাহ্মণ, আপনি আগেই আমাকে নিবৃত্তিমার্গ সম্পর্কে বলেছেন। যে মার্গ অবলম্বন করে পুরুষ ক্রমে তোক অতিক্রম করে ব্রহ্মালোকে উপস্থিত হতে পারে। প্রবৃত্তিমার্গের বিভিন্ন ফলস্বরূপ লোকের স্বর্গাদি সুখের প্রাপ্তি ঘটে। ভগবৎ-অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতি বা মায়ার বিনাশ না ঘটায় সেখানে বারংবার বিষয়ভোগের জন্য দেহ প্রাপ্তি ঘটে। এই রকম ধর্মের ফলস্বরূপ নরকসকলের বর্ণনা এবং মন্বন্তরেরও ব্যাখ্যা করেছেন। যার মধ্যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর প্রথম। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপদের বংশ ও চরিত্রও বর্ণনা করেছেন। আর দ্বীপ,

বর্ষ, পর্বত, সমুদ্র, নদী, উদ্যান, বৃক্ষ এবং বিভাগ লক্ষণ ও পরিমাণ অনুসারে ভূমণ্ডল, জ্যোতিষ্কমণ্ডল এবং অধোলোকের সংস্থান প্রভৃতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

হে মহাভাগ, এখন আপনি মানুষ যেভাবে তীব্র বেদনাময় নরক গমন থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে, তা ব্যাখ্যা করুন।

শ্রী শুকদেব বললেন– হে রাজনন্দন, ইহলোকে অবস্থানকালীন যদি মানুষ মনবাক্য ও শরীর দ্বারা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করে তাহলে তার যন্ত্রণাময় নরকগমন অবশ্যম্ভাবী।

অভিজ্ঞ বৈদ্য রোগের মূল কারণ নিরূপণ করে চিকিৎসা করেন। তেমনি মানুষও মৃত্যুর পূর্বেই যদি সুস্থ দেহ মনে ইহলোককৃত পাপের নিষ্কৃতির জন্য গুরুত্ব অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহলে তার মুক্তিলাভ সম্ভব হয়।

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন– হে ভগবন্, ইহলোককৃত যে পাপের ফলে রাজদণ্ড এবং পরলোকে নরকবাস হবে এ বিষয়ে জ্ঞাত হয়েও, মানুষ বারংবার সেই কার্যে লিপ্ত হয়। পাপের বশীভূত হয়েই যেন সে আবার পাপাচারে লিপ্ত হয়। এই অবস্থায় তো তার পাপ নিবৃত্তির কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তাহলে এই রূপ প্রায়শ্চিত্তের কি প্রয়োজন?

হস্তী যেমন স্নান করে উঠেই আবার ধূলিতে নিজ সর্বাঙ্গ মলিন করে ফেলে তেমনই পুরুষও প্রায়শ্চিত্ত সমাপন করেই আবার নতুন করে পাপকার্যে লিপ্ত হয়। তাহলে তার আর প্রায়শ্চিত্তের কি প্রয়োজন?

শ্রী শুকদেব বললেন– হে রাজন, চান্দ্রয়াণাদি কর্মরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সম্পূর্ণ পাপমুক্তি সম্ভব নয়।

কারণ, যে সকল পুরুষ ঐ প্রায়শ্চিত্ত করেন, তারা অবিদ্বান, তাদের অবিদ্যার কারণে একবার পাপক্ষয় হলেও আবার অবিদ্যামুলক সংস্কারবশতঃ পুনরায় পাপকর্মে প্রবৃত্তি হয়। জ্ঞানই পাপের মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত। কারণ এই জ্ঞানের দ্বারাই অবিদ্যার মূলচ্ছেদন সম্ভব। একবার অবিদ্যার মূলচ্ছেদ ঘটালে আর পাপ প্রবৃত্তি জন্মাতে পারে না।

হে রাজ, যে ব্যক্তি হিতকর অন্নভোজন করে, তাকে যেমন রোগসমূহ বিব্রত করতে পারে না, সে ক্রমে ক্রমে নিরাময় হয়।

যে ব্যক্তি, নিয়মনিষ্ঠ, তিনিই ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞানরূপ পরম কল্যাণলাভে সমর্থ হন। অগ্নি যেমন বিশাল বাঁশবনকে দগ্ধ করে ফেলতে পারে, তেমনি জ্ঞানী, ধর্মজ্ঞ ও ধীর ব্যক্তিগণ, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য পালন শম — দানাদি ক্রিয়ার মাধ্যমে জপ ও অর্চনা করে ক্রমশঃ দেহার্জিত চরম পাপকেও বিনাশ করতে সক্ষম হন।

তবে জ্ঞানরূপ এই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত খুবই কষ্টকর। সেজন্য অপর একটি প্রায়শ্চিত্তের কথা বলছি। ভগবান সূর্যদেব যেমন কুঞ্ঝটিকা বিনাশে সক্ষম তেমনি বাসুদেব পরায়ণ ব্যক্তিরা অর্থাৎ ভগবান শ্রীহরির একান্ত শরণাগত ব্যক্তিগণ শুধুমাত্র ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারাই পাপবাসিকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করতে সক্ষম। এই ভক্তিমার্গ, জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা শ্রেয়তর পথ।

হে রাজন, ভগবদ্ভক্তের সেবার প্রভাবে যিনি ভগবান কক্ষে প্রাণ সমর্পণ করেছেন, পূর্বে মহাপাতকী হলেও তিনি পবিত্রতা প্রাপ্ত হন। হাজার তপস্যা করলেও পাপীর সেরকম শুদ্ধতা লাভ সম্ভব নয়। ইহলোকে এই ভক্তিমার্গ পরম কল্যাণকর ও সমীচীন পন্থা, কারণ এই পথে সহায়করূপে সুশীল, দয়ালু, নিষ্কাম সাধুগণ বর্তমান রয়েছেন। এই পথে কোনো বিঘ্ন ঘটার আশংকা নেই। শুধুমাত্র ভক্তিই অন্য নিরপেক্ষ হয়ে পবিত্র কর্ম করতে পারে। চান্দ্রায়াণাদি প্রায়শ্চিত্ত ভক্তি ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে শুদ্ধ করতে সক্ষম নয়।

যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মদ্বয়ে তদীয় গুণরূপী নিজ চিত্তকে মাত্র একবারও নিবিষ্ট করতে সমর্থ হয়েছেন, তাতে তাদের সেই চিত্ত ভগবানের লীলা অনুভব করতে সক্ষম হয়। যমপুরুষেরা স্বপ্নেও তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কারণ, একবার মাত্র ভগবান চরণপদ্মে মন সংস্থাপিত করার ফলেই তাদের সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।

হে রাজন, এ বিষয়ে প্রাচীন পণ্ডিতেরা বিষ্ণুদূত ও যমদূত সংবাদরূপ একটি পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তরূপে বর্ণনা করেন। সেই ইতিহাস আমি আপনার কাছে বিবৃত করছি, কান্যকুজ নগরে দাসীপতি অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ দাসীর সংসর্গে দূষিত হয়ে সদাচারহীন হয়েছিল। পণ রেখে পাশাখেলা, বঞ্চনা, চৌর্যবৃত্তি প্রভৃতি অবলম্বন করে সে কুটুম্বদের ভরণপোষণ করত।

হে রাজ, এভাবেই এবিধ দুষ্কর্ম সাধন করেই সে ঐ দাসীর গর্ভজাত দশ পুত্রের লালন পালন করতে লাগল। এভাবেই তার সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বছর অতিক্রান্ত হল। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ। সে তার পিতামাতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। বৃদ্ধ বয়সে ঐ ব্রাহ্মণ সেই কলাভাষী শিশুর প্রতি আসক্ত হয়েছিল। সর্বদা তার ক্রীড়া হাস্যতে আনন্দ অনুভব করত।

মায়ামোহিত চিত্ত অজামিল যখনই নিজে জলগ্রহণ বা খাদ্যগ্রহণ করত তখনই সে আগে পুত্র নারায়ণকে পান-ভোজন করাত।

এভাবে পুত্রের প্রতি নিরন্তর নিবিষ্ট মনোযোগী হওয়ায় কখন যে কালান্তক কাল তার শিয়রে এসে উপবিষ্ট হয়েছে, সে জানতে পারেনি।

অকস্মাৎ অজামিল নিজ শিয়রে ভয়ালদর্শন, বক্রমুখ, ঊর্ধরোম তিনজন পুরুষকে পাশহস্তে দণ্ডায়মান দেখে অত্যন্ত ভীত হয়। সে তখন কাতর হয়ে দূরে ক্রীড়ারত পুত্র নারায়ণের নাম ধরে উচ্চরবে ডাকতে থাকে। অজামিলের শিয়রে তিন জন যমদূতের আগমন হয়েছিল, কারণ সে কায়িক, বাঁচিক, মানসিক এই তিন প্রকার পাপকর্মে লিপ্ত হয়েছিল।

এদিকে মুমূর্ষ অজামিলের মুখে চতুরাক্ষর নারায়ণ-এর নাম শুনে ভগবানের পার্ষদেরা মনে করলেন, তিনি শ্রীভগবানকে স্মরণ করছেন। তারা সেই মুহূর্তে তার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। যমকিঙ্করেরা তখন অজামিলকে অর্থাৎ তার সূক্ষ্ম শরীরকে টেনে বের করার জন্য চেষ্টা করছিল। এ অবস্থায় শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদেরা তাদের জোর করে প্রতিরোধ করলেন।

বিষ্ণুপার্ষদের কাছে পরাহত হয়ে সরোষে যমদূতগণ প্রশ্ন করল– কে তোমরা? কেন তোমরা এই দুরাচারী পাপাত্মাকে যমালয়ে নিয়ে যাবার জন্য ধর্মরাজের আদেশ পালনে বাধা দিতে এসেছ? তোমরা কে? কোনও দেবতা, নাকি উপদেবতা? অথবা কোনও সিদ্ধ মহাপুরুষ?

তোমাদের আমরা চিনতে পারছি না। আমাদের এই প্রশ্নে তোমরা ক্রুদ্ধ হয়ো না। তোমাদের মনোহর রূপ দর্শন করছি। তোমাদের চারজনেরই চক্ষু পদ্ম পলাশের সঙ্গে তুলনীয়। পরিধানে পীতবস্ত্রাদি, গলায় মনোরম পদ্মমাল্য, মস্তকে কিরীট শোভিত রয়েছে। তোমরা সকলেই নবীন যুবা। চর্তুবাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধৃত। স্বীয়ঃ জ্যোতি প্রভাবে পাশ্বস্থ স্থানাদি আলোকোজ্জ্বল হয়েছে। আমরা ধর্মরাজের আজ্ঞাবাহক ভূমাত্র। তোমরা আমাদের কর্তব্যসাধনে বাধা দিচ্ছ কেন?

শ্রী শুকদেব বললেন– হে বান্, যমদূতদের এই কথা শুনে ঐ বিষ্ণুদূতগণ বিস্মিত হয়ে হাস্যযুক্ত জলদ-মন্ত্র স্বরে বলতে লাগলেন, তোমরা যদি ধর্মরাজের আজ্ঞাবাহী হও, তাহলে ধর্মের স্বরূপ ও প্রমাণ বিষয়ে আর কি প্রকারে দণ্ড ধারণ করা হয়, দণ্ডের বিষয়ই বা কি– এ বিষয়ে আমাদের বল।

কর্ম করে এমন সকলেই কি দণ্ডের যোগ্য? মানবগণের কি সবাই দণ্ডনীয়? নতুবা ভগবানের নামস্মরণকারী এই ব্যক্তির দণ্ডবিধান করতে গিয়ে তোমরাই দণ্ডিত হবে!

যমদূতগণ বললেন– যে সমস্ত কর্ম বেদবিহিত অর্থাৎ বেদ যে কর্ম আচরণের নির্দেশ আছে, তাদেরকে ধর্ম বলে। যে সকল কর্ম বেদে নিষিদ্ধ আছে, তাদের অধর্ম বলে। অতএব বিধিনিষেধ স্বরূপ ধর্ম –অধর্মের প্রমাণ হল বেদ। এখন যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, বেদ কি?

নারায়ণের নিশ্বাসের মতো অনায়াসে আবির্ভূত বলে বেদকে সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ এবং স্বয়ম্ভু বলা হয়।

যদি জানতে নারায়ণ কে? তবে শোনো।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রাণীগণ সততা প্রভৃতি গুণ, অধ্যয়ন প্রভৃতি ক্রিয়া, ব্রাহ্মণদি সংজ্ঞ ও বর্ণাশ্রম প্রভৃতি রূপ অনুযায়ী যার স্বরূপে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে, তিনিই নারায়ণ।

যদি আপনারা এই প্রশ্ন করেন, –এই ব্যক্তি যে অধর্ম করেছে, তার প্রমাণ কি?

তার উত্তরে বলি, চন্দ্র সূর্য, অগ্নি, আকাশ, বাতাস, দিবা– রাত্রি, দিক– সকল, জল, পৃথিবী এবং স্বয়ং ধর্মরাজ প্রতিটি প্রাণীর ধর্মাধর্ম, সকল কার্যের সাক্ষাৎ দর্শক।

এদের মাধ্যমেই এই ব্যক্তির কৃত অধর্মের কথা জানা গেছে।

অধর্মই হল দণ্ডের স্থান। কর্ম অনুসারে সকল অধর্মকারীর যথাযোগ্য দণ্ড প্রাপ্ত হয়। কর্মী পুরুষ মাত্রই সত্ত্ব প্রভৃতি গুণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। গুণ অনুসারে শুভ বা পুণ্য এবং অশুভ বা পাপ কার্য করে থাকে। দেহ ধারী জীব কখনই কর্মহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। কায়িক, মানসিক বা বাঁচিক যে কোনোও প্রকার কর্মে তারা সতত নিয়োজিত থাকে, সুতরাং যে কোন জীব মাত্রই কর্মী, কর্মী হলেই সে যথাবিধি দণ্ডের অধীন।

ইহলোকে যে ব্যক্তি যে প্রকারে যে পরিমাণ অধর্ম বা ধর্মাচরণ করে, পরলোকে সেভাবেই তার পরিণাম ভোগ করে থাকে।

হে দেবপ্রবরগণ, ইহলোকে প্রাণীদের মধ্যে গুণগত বৈচিত্রের কারণে যেমন বিভিন্ন ভাব দেখা যায়, পরলোকেও তেমনি ত্রিবিধ ভাবের অনুমান করা হয়। বর্তমান বসন্তাদি কাল যেমন অতীত অনাগত বসন্তাদি কালের গুণাবলীর জ্ঞাপক হয়, তেমনি বর্তমান জন্ম অতীত এবং ভবিষ্যতের কর্মাবলীর সংঘটন অনুমান করা সম্ভব।

ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ লোক এভাবেই বিচার করে থাকে।

কিন্তু স্বয়ং যমরাজ নিজ সংযম পুরীতে অবস্থানপূর্বক মনের দ্বারাই জীবের পূর্বরূপ অর্থাৎ দেবমনুষ্যাদি, ধর্ম– ধর্মাদিযুক্ত, পূর্ব– স্বরূপ বিশেষভাবে জানতে পারেন। তারপর তার অপূর্বরূপ অর্থাৎ ভাবীরূপ তার সম্বন্ধে যা যোগ্য, তা বিচার করে থাকেন। নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নপ্রকাশিত দেহাদি পদার্থকেই নিজ জ্ঞানে অনুসরণ করে, কিন্তু জাগরণ– কালীন দেহাদি বা পূর্ব-স্বপ্নদৃষ্ট দেহাদির অনুসন্ধান করে না, সেরূপ অবিদ্যাগ্রস্ত অজ্ঞ জীবও পূর্বজন্ম স্মৃতি নষ্ট হওয়ার ফলে, তার দ্বারা লব্ধ বর্তমান দেহকেই অহংজ্ঞানে উপাসনা করে। তারা পূর্ব দেহাদির সন্ধান করে না।

জীব বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ — এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা বাক্যোচ্চারণাদি এই পাঁচ প্রকার কাজ করে থাকে। তারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক– এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে

সংঘটন নির্ণয়ের ক্ষেনি সংযম পূর্ণ বিশেষত্বারে থাকেন। নিজিহাদি বা পুর্নতার দ্বারা লব্ধ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ অনুভব করতে পারে। পঞ্চ কর্মে পঞ্চবিষয় এদের অতিরিক্ত মন ষোড়শস্থানীয় এবং জীব সপ্তদশ স্থানীয়।

এই জীবের মনের সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং একাকীই কর্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের বিষয়াদি উপভোগ্য হয়।

সত্ত্বাদি ত্রিগুণের কার্য- স্বরূপ এই ষোড়শ অবয়ব যুক্ত অনাদি লিঙ্গ শরীর জীবের হর্ষ, শোক, ভয় ও পীড়াদায়ক সংসারচক্রের বিধান করে।

গুটিপোকা নিজের দেহনির্গত সুতো দ্বারা নিজের আবরণ নির্মাণ করে তার মধ্যে বদ্ধ হয়। সে তার থেকে বেরিয়ে আসার উপায় জানে না। কামাদি প্রভৃতি ছটি রিপুর বশীভুত জীবও তেমনি

লিঙ্গ শরীরের প্রেরণায় কর্মরত হয়ে স্ব-চরিত সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু সেখানে থেকে বন্ধন মুক্তির উপায় জানতে পারে না।

কোনো ব্যক্তিই এক মুহূর্তের জন্যও কর্মহীন অবস্থায় থাকতে পারে না, সকলেই অবশ হয়ে প্রাক্তন কর্মের সংস্কার থেকে উৎপন্ন গুণাদি দ্বারা কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তার ফলে যে অদৃষ্ট, তাই জীবের স্থুল অথবা সূক্ষ্ম শরীরের কারণ। সেই বাসনা অতিশয় বলবতী, তার দ্বারা জীবের পিতৃসদৃশ অথবা মাতৃসদৃশ দেহপ্রাপ্তি হয়।

প্রকৃতির সঙ্গবশতঃ পুরুষের বিচিত্র সংসারভার রূপ এই বিপর্যয় উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু, ভগবদ ভজনার কারণে অতি শীঘ্র তার এই বিপর্যয় বিলীন হয়ে যায়।

ব্রাহ্মণ কুলজাত এই অজামিল আগে শাস্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন শুদ্ধভাব, সদাচার ও ক্ষমাদি গুণের আধার, নিয়মনিষ্ঠ, মৃদুভাষী ছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়দমনশীল, অসুয়াহীন এবং নিরহংকারী ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। অতিথি, সাধু ও ব্রাহ্মণদের প্রতি তার ভক্তি ছিল সীমাহীন।

একদিন পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থে বনে গিয়ে ফল-মূল, সমিধ ও কুশ সংগ্রহ করে প্রত্যাবর্তনের

সময় পথের পাশে একজন আচারভ্রষ্ট শূদ্রকে এক দাসীর সঙ্গে মিলনরত অবস্থায় দর্শন করে।

ঐ দাসীটি তখন মৈরেয় নামক মদ্যের প্রভাবে মত্ত হয়েছিল। তার বস্ত্রবন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছিল। ঐ শূদ্র তখন তার কাছে ক্রীড়া, হাস্য করে তাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। অজামিল সেই শূদ্র কর্তৃক অঙ্গরাগলিপ্ত বাহু বেষ্টিত দেখে কামোন্মাদ হয়ে পড়ল।

নিজ ধৈর্য ও শাস্ত্র জ্ঞান অনুসারে নিজেকে সে সংযত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করল। কিন্তু কোনোভাবেই তা করতে সমর্থ হল না। তখন সে সর্বদা ঐ দাসীর কথা মনে মনে ভাবতে লাগল। এভাবে সে নিজ ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হল।

ঐ দাসীকে প্রসন্ন করার জন্য সমস্ত পৈতৃক ধনসম্পত্তি এবং গ্রামে উৎপন্ন নানাবিধ ভোগ্য বস্তু উপঢৌকন দিতে লাগল। সে ঐ পাপাত্মা স্বৈরিনীর কটাক্ষতে বশীভূত হয়ে নিজ পরিণীতা মহাবংশ জাতা ব্রাহ্মণকন্যা যুবতী ভার্যাকেও পরিত্যাগ করেছিল। নীচমতি এই অজামিল তখন ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে যেন-তেন-প্রকারণে ধন সংগ্রহ করত। সেই ধন দিয়ে এই দাসীরই কুটুম্বদের ভরণপোষণক করত।

যেহেতু অজামিল অশুচি, স্বেচ্ছাচরী, অতি নিন্দিত স্বভাবা, শূদ্রা নারীর অন্নরূপ অশুচি দ্রব্য ভোজন করেছিলেন, সেহেতু অজামিল পাপে লিপ্ত হয়েছিল। পূর্বে শাস্ত্রজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল শাস্ত্রবিধি লঙঘন করে জীবন অতিবাহিত করেছে। কৃতপাপের কোনও প্রায়শ্চিত্তও সে করেনি।

সেজন্য এই পাপিষ্ঠকে আমরা দণ্ডধারী কৃতান্ত যমরাজের কাছে নিয়ে যাব। সেখানে যথোচিত বিচারের পরে এই পাপী অজামিলের দণ্ড বিধান হবে, যাতে সে দণ্ডভোগের পর শুদ্ধতা লাভ করতে পারে।

.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষ্ণুদূতগণ কর্তৃক ভগবন্নাম-মাহাত্ম্য বর্ণন ও অজামিলের মুক্তি

শ্রী শুকদেব বললেন– হে মহারাজ, ন্যায়নিষ্ঠ ঐ বিষ্ণুদূতেরা যমদূতগণের কথা শুনে অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীবিষ্ণুদূতগণ বলতে লাগলেন– হায় হায়, এ কি দুঃখের কথা! ধর্মদর্শী সাধুদের সভাকে অধর্ম স্পর্শ করেছে। কারণ এই সভামধ্যে ধর্মদর্শীগণ এখন দণ্ডের অযোগ্য নিষ্পাপ ব্যক্তিদের প্রতি অকারণ দণ্ডবিধান করছে।

যে সাধুপুরুষেরা সর্বত্র সমদর্শী হয়ে প্রজাদের প্রতিপালন করেন, তারা যদি এরূপ বৈষম্য করেন, তাহলে প্রজারা কাদের চরণ গ্রহণ করবে? শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিসকলের আচরণ দেখে সাধারণ লোকও সেইমত আচরণ অনুসরণ করে থাকে। এ কি আশ্চর্য কথা! লোকে যার কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে শয়ন করে, সে নিজেই ধর্মাধর্ম সম্পর্কে অবহিত নয়। প্রাণীদের পরম বিশ্বাসভাজন সেই পুরুষ যদি দয়ালু না হন, তাহলে মিত্রভাবে আত্মসমর্পিত কোনো ব্যক্তিকে তিনি কিভাবে শাস্তিবিধান করতে পারেন?

এই অজামিল পাপী হলেও শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করেছে। সেজন্য তার কোটি কোটি জন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়েছে। এই হরিনাম শুধুমাত্র প্রায়শ্চিত্ত নয়, অধিকন্তু পরম স্বস্তায়ন অর্থাৎ মঙ্গলপর মোক্ষলাভের সাধন। এই ব্যক্তি পুত্রকে ভোজানাদির সময়ে স্মরণ করায়, তার ‘নারায়ণ’ নাম উচ্চারণ হয়েছে। এইরূপ আভাসেও অর্থাৎ ভগবানের নাম শুধুমাত্র উচ্চারণ করার ফলেই তার কৃত যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।

মদ্যপেয়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীহন্তা, রাজহন্তা, পিতৃহন্তা, গো-হন্তা প্রভৃতি মহাপাতকীর একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হল ভগবান বিষ্ণুর নামোচ্চারণ।

যে কোনো ব্যক্তির জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে, বিষ্ণুর নাম উচ্চারিত হলেই ভগবান বিষ্ণু তাকে নিজ আশ্রিত বলে মনে করেন। ভগবান শ্রীহরির নামোচ্চারিত হলে তার দ্বারা পাপী যেরূপ শুদ্ধি লাভ করে, মনু প্রভৃতি বেদবাদী ঋষিগণ কর্তৃক নির্ধারিত চান্দ্রায়ণাদি ব্রত–রূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেরকম শুদ্ধি লাভ সম্ভব নয়।

কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত শুধুমাত্র পাপক্ষয়টুকুই করায়, কিন্তু এই নামোচ্চারণ পাপনাশ ভিন্ন ভগবান শ্রীহরির গুণাবলীর উপলব্ধি করায়, এটাই এর পরম বৈশিষ্ট্য। চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের পরেও যদি মন আবার অসৎ পথে ধাবিত হয়, তাহলে তাহা ঐকান্তিক পাপশোধক বলে গণ্য হতে পারে না।

যে সকল ব্যক্তি পাপের আত্যন্তিক ক্ষয়ের ইচ্ছা করেন তাদের পক্ষে শ্রীহরির গুণকীর্তন অপেক্ষা উন্নততর প্রায়শ্চিত্ত কিছু হতে পারেন না। যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞান অবস্থায় ভগবানের নাম সম্যকরূপে গ্রহণ করেছিলেন, সেহেতু এর সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে, একে তোমরা নরকে নিয়ে যেও না।

অজামিলের মৃত্যুর সময়ে সে নিজের পুত্র নারায়ণকে ডেকেছিল, অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবানকে স্মরণ করেনি। কিন্তু, এই নামের মাহাত্ম্য এমন যে, পুত্রাদির সঙ্কেতেই হোক বা পরিহাসে বা নিতান্ত অবহেলাতেই হোক, তা উচ্চারণ করলেই অশেষ পাপ দূরীভূত হয়।

উচ্চ স্থান থেকে পতনের সময়, পথ মধ্যে স্থলন হলে, জ্বরাদি পীড়ায় সন্তপ্ত বা দণ্ডাদির দ্বারা আহত হয়েও যদি কোনও ব্যক্তি হরি নাম উচ্চারণ করে, তার নরকবাস থেকে মুক্তি হয়।

মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিচার পূর্বক গুরুপাপের গুরু প্রায়শ্চিত্ত এবং লঘু পাপের জন্য লঘু প্রায়শ্চিত্ত বর্ণনা করেছেন কিন্তু ভগবানের নাম সম্পর্কে এরূপ বিচার করা হয়নি, কারণ তার নাম উচ্চারণমাত্রই সকল পাপের বিনাশ হয়।

শাস্ত্রোক্ত বিভিন্ন তপস্যা, দান, ব্রত প্রভৃতি দ্বারা শুধুমাত্র বিভিন্ন পাপেরই ক্ষয় হয়, কিন্তু পাপকর্তার পাপজনিত চিত্তের মলিন্য নষ্ট হয় না। কিন্তু ভগবানের পদ সেবার দ্বারা অর্থাৎ তার নাম সংকীর্তনের দ্বারা চিত্তের মালিন্য মুক্তি ঘটে।

অগ্নি যেমন বালকাদির দ্বারা কাষ্ঠরাশির মধ্যে অজ্ঞানতাবশত নিক্ষিপ্ত হলেও নিঃশেষ ভাবে কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে, সেরূপ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে কোনোভাবেই ভগবানের নাম সংকীর্তন করলে, তা মানুষের পাপ নিঃশেষে দগ্ধ করে।

এ ব্যক্তি কোনো ভগবদ্ভক্ত সাধুর কাছে উপদেশ প্রাপ্ত হয়নি, এমনকী শ্রদ্ধাসহকারে ভগবানের নামও উচ্চারণ করেনি, তাই এই অজামিলের কোনও প্রায়শ্চিত্ত হয়নি, এরূপ আশঙ্কা অমূলক।

কারণ, যখন কোনো অজ্ঞান ব্যক্তি কিছু না জেনেও কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে ওষুধ সেবন করে, এবং ওষুধ তার নিজগুণ প্রকাশ করে। তেমনি ভগবানের নামও যেভাবে হোক যদি গ্রহণ করা হয়, তবে তা নিজের কার্য অবশ্যই করে।

শ্রী শুকদেব বললেন– মহারাজ, বিষ্ণুদূতগণ, এরূপ সুন্দরভাবে ভাগবত ধর্ম নিরূপণ করে, অজামিলকে যমদূতগণের পাশমুক্ত করলেন।

হে অরিন্দম, যমদূতেরা এভাবে নিরাকৃত হয়ে যমরাজের কাছে গিয়ে যথার্থভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করল।

এদিকে পাশবন্ধন মুক্ত হয়ে অজামিল নির্ভয় ও প্রকৃতিস্থ হয়ে বিষ্ণুদূতগণকে দর্শন করল। সে অতিশয় আনন্দিত হয়ে অবনত মস্তকে তাদের প্রণাম করল।

হে অনঘ, অজামিল কিছু বলতে ইচ্ছুক, এটা বুঝতে পেরে বিষ্ণুদূতগণ তখনি সেখান থেকে অন্তর্ধান করলেন। অজামিল যমদূত কথিত বেদত্রয়ের প্রতিপাদ্য সগুণ ধর্ম ও বিষ্ণুদূত কথিত বিশুদ্ধ ভাগবত ধর্ম কথা শ্রবণ করে, ভগবানে অতিশয় ভক্তিমান হল।

নিজের পূর্বকৃত অশুভ কর্ম কথা স্মরণ করে অতিশয় অনুতাপ করতে লাগল। সে খেদ করতে লাগল এই বলে যে হায় হায়! ইন্দ্রিয় জয় করতে না পারায় আমার এই কষ্ট।

শুদ্রার গর্ভে পুত্রের জন্ম দিয়ে আমি নিজের ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জন দিয়েছি। আমি যুবতী সতী ভার্যাকে পরিত্যাগ করে, মদ্যপায়িনী অসতী শূদ্রার সঙ্গ করেছি। আমি কুলাঙ্গার, আমাকে ধিক্। আমার পিতা –মাতা, অতি বৃদ্ধ অবস্থায় যখন, একমাত্র আমার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। আমি অতি অকৃতজ্ঞের মতো তাদের পরিত্যাগ করেছি।

আমার মতো ঘোরতর পাপাত্মার নরকবাস অনিবার্য। কিন্তু, এখন কি আমি স্বপ্ন দেখছি? নাকি জাগ্রত অবস্থায় এমন অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম? যারা, পাশহস্তে আমাকে আকর্ষণ করছিল, তারা এখন কোথায় গেল?

হঠাৎ যাঁরা এসে আমাকে সেই পাশবন্ধন থেকে মুক্ত করলেন, সেই চারজন মনোহর দর্শন সিদ্ধপুরুষগণই বা কোথায় গেলেন?

আমি এ জন্মে দুর্ভাগা পাপত্মা হলেও বোধহয় পূর্বজন্মের কোনও সুকৃতিবলে ঐ শ্রেষ্ঠ দেবগণের দর্শন লাভ করতে পেরেছি। সেজন্যই আমার আত্মা আজ প্রসন্নতা অনুভব করেছে। নতুবা, শূদ্রা নারীর পতি হয়ে অশুদ্ধচিত্ত এই আমি কখনও হরিনাম উচ্চারণে সমর্থ হতাম না। কোথায় আমি কিতব (বঞ্চক) নির্লজ্জ, পাপী, বিপ্রত্বনাশক।

ভগবানের পরম মঙ্গলময় এই 'নারায়ণ'–এই নামটিই বা কোথায়? পূর্বজন্মকৃত কোনও পুণ্য থাকলে, এই নাম কি এখনও আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হতে পারে?

যা হোক, আমি এখন থেকে মন, ইন্দ্রিয়সকল ও প্রাণবায়ুকে এভাবে সংযত করার চেষ্টা করব। তাহলে আত্মাকে আবার অন্ধকারময় ঘোর নরকে নিক্ষিপ্ত হতে হবে না।

এক্ষণে আমি অবিদ্যামূলক, কাজকর্মজনিত এই বন্ধন মুক্ত করে সকল প্রাণীর সুহৃৎ, শান্ত, মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু ও স্থিরচিত্ত হব, এবং এতকাল যে মায়া নীচমতি আমাকে যথেচ্ছভাবে খেলা করিয়েছে, আমি নিজেকে তার প্রভাব থেকে মুক্ত করব। এখন থেকে আমি শুধু, 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে ভগবানের নাম কীর্তনাদি দ্বারা শুদ্ধিপ্রাপ্ত চিত্তকে ভগবানেই ধারণ করব। অর্থাৎ নিরন্তর তারই ধ্যানে নিযুক্ত থাকব।

শ্রী শুকদেব বললেন– হে রাজন, মাত্র ক্ষণকালের সাধুসঙ্গের কারণেই অজামিলের এরূপ সুন্দর নির্বেদ জন্মাল। তারপরে, তিনি পুত্রাদি স্নেহরূপ সকল বন্ধন মুক্ত করে হরিদ্বারে গমন করলেন। তিনি সেই দেবভূমিতে উপবেশন পূর্বক যোগমার্গ অবলম্বন করে ইন্দ্রিয়াদি সকল বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে, নিজের মনকে আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত করলেন।

তারপরে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ থেকে আত্মাকে পৃথক করে চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা জ্ঞানময় পরম ব্রহ্মরূপ ভগবানে সংযোজিত করলেন।

যে সময়ে তার চিত্ত ভগবানের সেই স্বরূপে নিশ্চল হল, তখনই তিনি সামনে চারজন দণ্ডায়মান ব্যক্তির দর্শন লাভ করলেন। পূর্বে দৃষ্ট চারজন বিষ্ণুদূত হলেন ওই চার ব্যক্তি। তৎক্ষণাৎ তিনি তাদের অবনত হয়ে বন্দনা করলেন, তাঁদের দর্শনের পরেই অজামিল গঙ্গাতীর্থে দেহত্যাগ করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ভবিষ্যত পার্ষদগণের স্বরূপ ধারণ করলেন। তাদের সঙ্গে সুবর্ণময় বিমানে আরোহন-পূর্বক আকাশপথে-যেখানে নারায়ণ বিরাজমান, সেই বৈকুণ্ঠলোকে গমন করলেন।

হে মহারাজ, এভাবে সর্বপ্রকার ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধ্বংসকারী, সদব্রতত্যাগী পাপকর্মহেতু পতিত দাসীপতি আজমিল নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপক্রমে ভগবানের নাম উচ্চারণ করায়, তখনি পাপমুক্ত হয়েছিল।

মুমূর্ষ ব্যক্তিদের পক্ষে তীর্থপদ (অর্থাৎ যাঁর পাদপদ্ম থেকে গঙ্গাদেবীর উত্থান হয়েছে। সেই ভগবানের নামকীর্তন অপেক্ষা শ্রেয় কর্মবন্ধন ছেদক আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।

নাম-সংকীর্তনা দিতে আসক্ত পুরুষের চিত্ত– একান্তভাবে নির্মল হয়, আর পাপ কমে আসক্ত হয় না।

এছাড়া অন্যান্য প্রায়শ্চিত্ত সমূহের পরেও মন রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা মলিন হয়ে থাকে।

হে রাজন, যে ব্যক্তি পরম গুহ্য, পাপনাশক এই ইতিহাস শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করবেন, তিনি কখনই নরকে পতিত হন না। একইরকম সৌভাগ্য যে ব্যক্তিরও হয়ে থাকে, যিনি ভক্তি সহকারে এই কথামৃত কীর্তন করেন।

অধিকন্তু যমদুতেরা তার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপও করে না, সে ব্যক্তি যদি অতিশয় পাপিষ্ঠ হয়, তাহলেও সে বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়ে থাকে। অতিশয় পাপাত্মা অজামিল স্রিয়মান অবস্থায় পুত্রের নাম গ্রহণের কারণে গৌণভাবে শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করায় বৈকুণ্ঠধামে গমন করেছিলেন।

তাহলে, যখন কোনো ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে শ্রী ভগবানের নাম গ্রহণ করেন, ভগবৎ ধাম লাভের বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

.

তৃতীয় অধ্যায়

রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনে শ্রীশুকদেব বললেন– হে মহারাজ, বিষ্ণুদূতেরা যম কিঙ্করদের কর্তব্যকাজে বাধা দান করেছিল কীভাবে, সেই বৃত্তান্ত ধর্মরাজ যমকে তারা শুনিয়েছিল।

যমকিঙ্করগণ বলল- হে প্রভু। মানুষ কায়িক, বাঁচিক ও মানসিক ব্যাপারের দ্বারা কর্ম নিষ্পন্ন করে থাকে। তাদের কর্মফল প্রদাতা যদি অসংখ্য জন হয়ে থাকে তাহলে বিরোধ বাঁধতে পারে। যদি সকলের মতের মধ্যে ঐক্য থাকে, তাহলে সকল জীবই উভয়ের মত অনুযায়ী সুখ ও দুঃখ ভোগ করতে পারে। একজন মুখ্য শাসক, আর সকলে গৌণ শাসক।

শাসনকর্তার বহুত্ত্ব ঘটে না। তাই আপনিই আমাদের কাছে একমাত্র প্রাণীসমূহের অধীশ্বর। আমরা জানতাম, আপনি যা দণ্ড বিধান দেন, তাই-ই প্রথম ও শেষ কথা। কিন্তু আপনার বিহিত দণ্ড চারজন সিদ্ধ পুরুষ এসে লঙঘন করে গেলেন।

আপনার আদেশমতো একজন পাপাত্মাকে নরকে নিয়ে যাবার পথে বাধা পেলাম। হঠাৎ তারা এসে পাশবন্ধন ছিন্ন করে পাতকীকে মুক্ত করে দেন। পাপী 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা 'মাভৈঃ' বলে সেখানে হাজির হয়েছিলেন। প্রভু, তাদের পরিচয় আপনি আমাদের বলবেন কি?

যম বললেন– হে কিঙ্করগণ! আমি ছাড়া এই স্থাবর জঙ্গম বিশ্বে আর এক শাসন কর্তা আছেন। আমি তাঁরই দাস পাপীদের ঈশ্বর তিনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অধিষ্ঠাতা। তোক যেমন পৃথক পৃথক রঞ্জু দ্বারা আবদ্ধ বলীবদগণকে একটি বৃহৎ রজ্জুতে আবদ্ধ করে, তেমনই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণাদি নাম দ্বারা বেদবাক্য স্বরূপ নিজ সূত্রে লোক সকলকে আবদ্ধ করেছেন। তিনি অদৃশ্য তিনি সাকার ও নিরাকার। সমস্ত দেবতাগণ, মরুদগণ, রুদ্রগণ, সিদ্ধগণ যাঁকে চোখে দেখতে পান না। তিনি আমার সামনেও দৃশ্য হন না, তিনি সকলের প্রভু, সর্বোৎকৃষ্ট।

যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা ভগবান শ্রীহরির দূত, তাঁরই মতো রূপ, গুণ ও স্বভাববিশিষ্ট, তারা বিষ্ণু ভক্তদের সর্বদা রক্ষা করে থাকেন। যে ধর্মতত্ত্ব অবগত হয়ে জীব অমৃতপাদ লাভ করে সেই বিশুদ্ধ ও দুর্বোধ্য ভাগবত ধর্ম আমি জানি। ভগবানের নাম কীর্তনের মাধ্যমে তার প্রতি যে ভক্তিযোগের উদয় হয়, তাই হল পুরুষদের উৎকৃষ্ট ধর্ম। ভগবানের নামের মহিমা অপার। ওই নাম স্মরণ করে মহাপাপী অজামিলও মৃত্যুপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

ভগবানের নাম স্মরণ মাত্র অশেষ কলুষ, পাপক্ষয় হয়, তবুও দ্বাদশ বার্ষিক ইত্যাদি ব্রহ্মাদি প্রভৃতি দ্বাদশ মহাপুরুষ ছাড়া সাধারণত অন্য কোনো মহাজনও শ্রীভগবানের নাম সংকীর্তনাদি রূপ এই পরম ধর্মের তত্ত্ব অবগত হতে পারেননি। তাই ওই সমস্ত মহাজনগণ ভগবানের দেবী মায়ায় অতি মাত্রায় আকৃষ্ট হয়েছিল। তাদের আমি কখনোই দণ্ড দিতে পারি না, যদি কখনও কোনো পাপ করে থাকে, তা ভগবানের নামকীর্তনে খণ্ডন হয়।

হে দূতগণ, যারা কখনও ভগবানের নাম উচ্চারণ করে না, সে লোকের চিত্তে তাঁর পদচিহ্ন আঁকা হয় না। যে তার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে না। যারা হরিসেবাকে উপহাস করে সেই পাপীদের আমার কাছে নিয়ে আসবে।

যমরাজ এবার ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন–হে পুরাণ পুরুষ ভগবান নারায়ণ, আপনি সর্বজ্ঞ, অতি মহান। আমার অনুচররা যে অন্যায় কাজ করেছে, তার জন্য আপনার কাছে মাথা নত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

শ্রীশুকদেব এবার রাজা পরীক্ষিতের উদ্দেশ্যে বললেন–হে রাজন, বিষ্ণু নাম মঙ্গলদায়ক, এই নাম স্মরণে চিত্তে শুদ্ধি ঘটে। তার সেই শ্রীপাদপদ্মের অমৃত যে একবার আস্বাদন করেছে, সে ভোগ্য ও মোক্ষ লাভ করে, আর যে হরিপ্রেমে বিমুখ সে হল পাপী।

হে মহারাজ, মলয় পর্বতে ঋষি অগস্ত্যের কাছ থেকে আমি এই উপাখ্যান শুনেছিলাম। তাই বলব, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সন্দেহ প্রকাশের কোনও কারণ নেই।

পুরাণবক্তা সূত শৌণকাদি মুনিগণকে সম্বোধন করে বললেন–হে মহর্ষিগণ, শ্রী শুকদেব স্বয়ম্ভব মন্বন্তরে দেব, দৈত্য, নর, নাগ, পক্ষী, ইত্যাদি সৃষ্টির ব্যাপারে রাজা পরীক্ষিত যে উপাখ্যান সংক্ষেপে বিবৃত করেছিলেন তা তোমরা শ্রবণ করো।

শ্রীশুকদেব বললেন–প্রাচীন বহির প্রচেতা নামক দশজন পুত্র সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত হয়ে এই বসুন্ধরাকে বৃক্ষরাজিতে আবৃত দেখলেন। তখনই ক্রোধের জন্ম হল। তিনি মুখ থেকে বায়ু ও অগ্নির সৃষ্টি করে বৃক্ষরাজি ধ্বংস করে দিতে চাইলেন। বনস্পতিগণের রাজা চন্দ্রদেব প্রচেতাগণের ক্রোধের উপশম ঘটিয়ে বললেন– হে প্রচেতাগণ, তোমরা উদ্দীপ্ত ক্রোধ দমন করো, চোখের পাতা যেমন চোখের বন্ধু জ্ঞানী পণ্ডিত অজ্ঞজনের বন্ধু তেমনই প্রজাগণের জীবিকাস্বরূপ এইসব বৃক্ষদের বিনাশ ঘটানো উচিত নয়। ভগবান শ্রীহরিই নানা রকমের গাছপালা ও ধান্য শস্যাদি প্রজাগণের ভক্ষ অন্নরূপে সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত প্রাণীর চিত্তে

ভগবান শ্রীহরির অবস্থান। এই বিশ্বচরাচর তাঁরই আবাস স্বরূপ। তোমরা ধ্বংস বন্ধ করে প্রজাদের মঙ্গল সাধন করো। এই সুন্দরী কন্যাটিকে তোমরা গ্রহণ করো। এর নাম মারীয়া। বৃক্ষ সকল দ্বারা সে প্রতিপালিত হয়েছে।

এইভাবে ক্রোধকে সান্তনা দান করে সোমদেব ফিরে গেলেন নিজের বাসভবনে। প্রচেতাগণের ঔরসে সেই কন্যার গর্ভে প্রচেতস নামে দক্ষের জন্ম হল। এই দক্ষের মাধ্যমেই প্রজাগণ সৃষ্টি হয়েছে এবং সারা বিশ্বে তারা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রজাপতি দক্ষের মন থেকে সৃষ্টি হয় দেব, দৈত্য, মানুষ, খেচর, ভূচর ও জলচর জীবরা। তারপর তিনি প্রজা সৃষ্টি রহিত হতে দেখে চিন্তিত হলেন। বিন্ধ্য পর্বতের কাছে একটি ক্ষুদ্র পর্বতে গিয়ে তিনি ধ্যানে বসলেন। হংসগুহা মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীহরির প্রশস্তি গাইলেন– যিনি জীব ও মায়ার নিয়ামক, অসীম, স্বয়ংসিদ্ধ স্বপ্রকাশক, সেই পরমাত্মা চিৎশক্তিকে আমি প্রণাম করি। জীব যে সর্বজ্ঞ পুরুষকে জানতে পারে না, কেবল তার মূল গুণ সমূহ অবগত হতে পারে, আমি সেই ভগবান অনন্তদেবের চরণ বন্দনা করি, স্বরূপের জ্ঞানের দ্বারা যাঁর প্রতীতি হয় এবং যিনি বিশুদ্ধ চিত্তস্বরূপ, আমি সেই যথার্থ গুরুকে প্রণাম জানাই। অনন্ত বৈচিত্রময়ী মায়ার নিরাসহেতু নির্বাণ সুখের উদয়ে যাঁর অনুভব হয়, যিনি সকল নাম ও সকল রূপের আশ্রয়, তিনি আমার প্রতি তুষ্ট হোন। যিনি সকল কারণের কারণস্বরূপ, যাঁর ঐশ্বর্য অচিন্তনীয়, যিনি নাম ও জপ বর্জিত হয়েও তার চরণযুগল আশ্রয়কারী ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য নানারূপে ও নানা নামে আবির্ভূত হন, সেই পরমাত্মা আমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

শ্রী শুকদেব বললেন– প্রজাপতি দক্ষের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং ভগবান সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি গরুড়ের পিঠে উপবেশন করে আছেন। তাঁর আজানুলম্বিত আটটি বাহু, তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, অসি, চর্ম, ধনু, বাণ ও পাশধারী। তার বুকে শ্রীবৎস চিহ্ন আঁকা, মাথায় মণিমানিক্য খচিত কিরীট, গলায় বনমালা হাঁটুর নীচে পর্যন্ত নেমেছে। তিনি মহা মূল্যবান অলংকারে সজ্জিত। নারদ ও নন্দী তাঁর দুপাশে রয়েছে। লোকপালগণ ও সিদ্ধচারণগণ তাঁর মহিমা কীর্তন করছেন।

প্রজাপতি দক্ষ ভগবান জনার্দনের চরণে মাথা রাখলেন। তাঁর অনুগ্রহে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। ভগবান বললেন– হে প্রজানাথ, প্রাণী সকলের উদ্ভবের কারণে ব্রহ্মা শিবাদ্রি মনুগণ প্রভৃতির সৃষ্টি আমিই করেছি। প্রজাগণের সকল সম্পদ তুমি বৃদ্ধি করো। তপস্যা আমার হৃদয় বিদ্যা আমার দেহ, ধ্যানাদি বিষয়ক ক্রিয়াকর্ম আমার আকৃতি, যাগযজ্ঞ আমার অঙ্গ, আমার মন হল ধর্ম আর যজ্ঞ ভোক্তা, দেবগণ আমার প্রাণ। হে দক্ষ, সৃষ্টির পূর্বে এ জগতের সর্বত্র

অন্ধকারে ঢাকা ছিল। কেবল আমি ছাড়া আর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সৃষ্টির কারণে আমার অংশজাত ব্রহ্মার উৎপত্তি ঘটে। আমারই আজ্ঞায় ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা। কঠোর করে তিনি তোমাদের মতো নয়জন বিশ্বস্রষ্টাকে সৃষ্টি করলেন। তুমি পঞ্চজন নামক প্রজাপতির অসিল্লি নামের কন্যাকে পত্নী রূপে গ্রহণ কর। স্ত্রী পুরুষের মিলনে পৃথিবীতে প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি হবে।

এই কথা বলে শ্রীভগবান সেখান থেকে অদৃশ্য হলেন।

.

চতুর্থ অধ্যায়

শুকদেব বললেন– প্রজাপতি দক্ষের ঔরসে অসিক্লির গর্ভে হ্যাঁশ্বাদি অযুত পুত্র জন্ম লাভ করল। পিতা প্রজা সৃষ্টির কথা বললে তারা পুণ্যদায়ক মহাতীর্থ নারায়ণ সরোবরের তীরে এসে হাজির হলেন। এই তীর্থের জলে স্নান ও আচমনাদি করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চিত্ত থেকে লোভ, ক্রোধ, বিভিন্ন দোষ দূর হলো। পরমহংস ধর্মে মতি হলেও তারা পিতার আদেশে নিয়ন্ত্রিত হয়ে উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন।

এসময় সেখানে দেবর্ষি নারদ এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন– তোমরা শুদ্ধান্তঃকরণ হয়েও প্রজাসৃষ্টির জন্য তপস্যা করছ কেন? পৃথিবীর অন্ত কী জানা আছে? তোমাদের সর্বজ্ঞ পিতার কার্য কী? এসব প্রশ্নের জবাব জানা না থাকলে কখনোই সৃষ্টি কাজ শুরু করা ঠিক নয়।

হর্ষাদি দেবর্ষি নারদের কটু বাক্য শুনে সহজ বিচার শক্তি সম্পন্ন বুদ্ধির দ্বারা নিজেরাই বিচার করেছিলেন– ভূমির অন্ত না জেনে অর্থাৎ যা জীবসংজ্ঞক এই লিঙ্গ শরীর, যা আত্মার বন্ধনের কারণ, তাই ভূমি বা ক্ষেত্র, তার অন্ত না জেনে অর্থাৎ বিনাশ দর্শন না করে মোক্ষের অনুপযোগী অসৎ কর্মসকল করলে কোনো অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। এক পুরুষ বলতে সেই সর্বসাক্ষী ভগবান পরমেশ্বরের কথা বলা হয়েছে।

যা হতে কখনও কাকেও নির্গত হতে দেখা যায় না, সেরূপ বিল না দেখে– অর্থাৎ পুরুষ যেখানে গমন করলে আবার ফিরে আসতে পারে না, তা পরম জ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্ম।

পুংশ্চলীর পতি সেই পুরুষ, অর্থাৎ পূর্বোক্ত বুদ্ধির সঙ্গবশত শুভার্যযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় যার স্বাতন্ত্র লোপ পেয়েছে এবং যে জীব সেই বুদ্ধির সুখ– দুঃখাদিকে নিজের বলে মনে করে, তাই

হল জীব। সেই জীবতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ না করে এই অবিবেচনামূলক কর্মসমূহ কোন কাজে লাগবে। সৃষ্টির সংহার কারিনী মায়াই উভয় তীর বাহিনী নদী। যে পুরুষ সাধনার দ্বারা সংসার তরঙ্গকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যায়, সে মায়ানদী রূপ ক্রোধ, অহংকার ইত্যাদি খাড়া করে বাঁধা দানের চেষ্টা করে। নদীর তত্ত্ব যে জানে না, সে মায়িক কর্ম সমূহ দিয়ে কী করবে। যিনি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আশ্চর্য আশ্রয় যিনি কার্য-কারণ সংঘাতের অধিষ্ঠাতা, যিনি সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি যিনি প্রকৃতি জাত পদার্থসমূহ এবং জীব তাকে না অবগত হলে, এই সমস্ত কর্ম কোন কাজে লাগবে?

বিচিত্রকথা যুক্ত হংস অর্থাৎ ঈশ্বর প্রতিপাদক শাস্ত্রে চিৎ ও জড় রূপ বিশেষভাবে বিবেচিত হয়েছে। তাই তা হংসস্বরূপ এই শাস্ত্র না জেনে বহির্মুখ কর্মে কী লাভ? ক্ষুর ও বজ্রাদি দ্বারা নির্মিত স্বয়ং ভ্রমণশীল অর্থাৎ ক্ষুর ও বজ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও সর্বদা ভ্রমরি হয়ে কালক্র সমস্ত জগৎকে সংহার করে। এই কালনাশা জগতের অনিত্যতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন না করে এই সব তপস্যার কী প্রয়োজন?

তাছাড়া নারদ বলেছেন, স্বীয় পিতার অনুরূপ আদেশ সম্পর্কে অবগত না হয়ে সৃষ্টি করা কী সম্ভব? অর্থাৎ শাস্ত্র আমাদের পিতাস্বরূপ, তার আদেশ নিবর্তক। এই নিবর্তক আদেশ না জানলে সৃষ্টাদি কার্য কীভাবে করা সম্ভব?

নারদের বাক্য বিশ্লেষণ করে দক্ষপুত্রগণ খুশি মনে দেবর্ষিকে প্রণাম করলেন। তারপর তারা শোনমার্গের পথে যাত্রা করলেন। নারদের কাছ থেকে প্রজাপতি দক্ষ এ সংবাদ শুনে আক্ষেপ করে বললেন– সৎপুত্র লাভই শোকের কারণ। তিনি আবার সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হলেন। পাঞ্চজনীর গর্ভে সবলাশ্ব নামে এক হাজার পুত্রের জন্ম হল। পিতা তাদের প্রজাসৃষ্টির আদেশ দিলেন।

তারা নারায়ণ সরোবরে গেলেন। সরোবরের পুণ্যদায়ক জল স্পর্শ করা মাত্র তাদের সমস্ত পাপের বিনাশ হল। তারা কঠোর তপস্যা করলেন। সেখানে আগের ন্যায় দেবর্ষি নারদ এসে হাজির হলেন। এবং একই কটু বাক্য শোনালেন। তিনি বললেন– নিজেদের জৈষ্ঠ্য ভাইদের পদাঙ্ক যারা অনুসরণ করে তার হয় ধর্মজ্ঞ। পুণ্য হয় তাদের পরম বন্ধু। মহর্ষি নারদ সেখান থেকে চলে গেলেন। তাঁর অমোঘ দর্শনের ফলে দক্ষের সহস্র, পুত্রের মধ্যে ভাবান্তর ঘটে গেল। তাঁরা অগ্রজদের পথের পথিক হলেন।

চিত্তের অন্তর্মুখী বৃত্তি দ্বারা যা লাভ করা যায় এবং যা সংসারের একমাত্র প্রকৃষ্ট পথ, সেপথ থেকে দক্ষপুত্রগণ আর ফিরে আসেননি। প্রজাপতি দক্ষ যোগবলে সমস্ত কিছু অবগত হলেন। পুত্রদের স্বধর্ম দূত করার যন্ত্রণা দানের জন্য নারদের ওপর ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি তিরস্কার করে বললেন– হে অসাধো, তুমি আমার পুত্রদের স্বধর্ম ত্যাগ করার প্ররোচনা দিয়েছ। তোমার বাজে উপদেশ শুনে তারা মোক্ষ লাভের পথে অগ্রসর হয়েছে। তুমি দয়ামায়াহীন বালকদের পুত্রোৎপাদনদি ধর্মবিষয়ের বুদ্ধি নষ্ট করে দিয়েছ। তুমি শ্রীহরি ভগবানের যশ নাশ করছ। তুমি কী করে তার মুখ্য পার্ষদে পরিণত হলে? তুমি নির্লজ্জ? তাই লোকের সৌহার্দ বিনষ্ট করা এবং নির্বোধ লোকের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করে, তুমি কি জানো বৈরাগ্য ছাড়া উপশম হয় না। আর উপসম না হলে স্নেহ পাশ ছেদনই বা কী ভাবে সম্ভব? হে বংশনাশক মুখ, তোমাকে একবার আমি ক্ষমা করেছি। কিন্তু আর নয়, তোমাকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি কখনও কোথাও স্থিতি হবে না, চক্রের মতো কেবল তুমি ভ্রমণরত থাকবে।

মহর্ষি নারদ 'তথাস্তু' বলে এই অভিশাপ মাথা পেতে গ্রহণ করলেন।

.

পঞ্চম অধ্যায়

শুকদেব বললেন– পদ্মযোনি ব্রহ্মার অনুনয়ে প্রচেতাপুত্র দক্ষ পত্নী অসিক্লীর গর্ভে ষাটটি কন্যার জন্ম দিলেন। কন্যাদের মধ্যে দশটি ধর্মকে, তেরোটি কশ্যপকে, সাতাশটি চন্দ্রকে এবং ভূত,অঙ্গিরা ও কৃশাশ্ব নামক তিন মুনিকে দুটি করে এবং কশ্যপ তাকে চারটি কন্যা দান করলেন। ভানু, লম্বা, মামি, কুকুদ বিশ্বা, সাধ্যা, বসু, মুহূর্তা, মরুত্বতী এবং সংকল্পা–দশ ধর্মপত্নী।

দক্ষকন্যাদের সন্তান পরম্পরা ত্রিভুবন পরিপূর্ণ হয়েছেন। ভানুর পুত্র ঋষভ, তার পুত্র ইন্দ্রসেন। বিদ্যোত হলেন লম্বার পুত্র। তিনি মেঘগণের জন্মদাতা, স্বর্গর মামা, মামি এবং নন্দির পিতা স্বর্গ। সঙ্কটের মাতা কুকুদ, সঙ্কটের পুত্র কীট, পৃথিবী, দুর্গাভিমানী দেবতাগণের যিনি জন্ম দিয়েছিলেন, বিশ্বার পুত্রদের বিশ্বদেবগণ বলা হয়, সাধ্যার পুত্র সাধ্যগণ, তাদের পুত্র অর্থসিদ্ধি। বসুর পুত্ররা

অষ্টবসু নামে বিখ্যাত– দ্রোণ, প্রাণ, ধ্রুব, অর্ক, অগ্নি, দোষ, বাস্তু এবং বিভাবসু। দ্রোণপত্নী অভিমতির পুত্র হর্ষ শোক, ভয় ইত্যাদি। প্রাণভার্য্যা উর্ণস্বতীর পুত্র সহ, আয়ু ও পুরোজব। দ্রবের পত্নী ধরণী বিভিন্ন জুরীসমূহ অর্থাৎ পুরাভিমানী দেবতাদের জন্মদাত্রী।

অর্কের পত্নী বাসনা তর্ষ অর্থাৎ অভিলায়াদি পুত্রদের জন্ম দেন। অগ্নিবসুর স্ত্রী ধারার গর্ভে দ্রবিনক প্রভৃতি বহু পুত্র এবং নকন্দের জন্ম দিয়ে ছিলেন। দোষাসুর পত্নী শর্বরী শিশুমার জন্ম দিয়েছিলেন, যিনি ভগবান শ্রীহরির অংশ জাত। অঙ্গিরসী হলেন বাস্তু বসুর পত্নী। তাঁদের পুত্র বিশ্বকর্মা দেবশিল্পী নামে বিদিত।

বিভাবসুর স্ত্রী ঊষার গর্ভ হতে। রুষ্ট রোচিষ ও আতপ নামে তিন পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। ধর্মপত্নী মুহূর্তকালের অধিষ্ঠাত্রী। দেবতাগণের জন্ম দিয়েছিলেন। মরুস্থান ও জয়ন্ত নামে মরুত্বতীর দুই পুত্র। বাসুদেবের অংশে জয়ন্ত সৃষ্ট, তাই তিনি উপেন্দ্র। সংকল্পার গর্ভজাত পুত্র সংকল্প কামের উৎপত্তি করে।

।হে রাজন, কশ্যপ প্রজাপতির তেরোজন পত্নী– অদিতি, দিতি, দপু, সষ্ট্রা, অকিষ্টা, ইলা, সুরগ, মুনি, বেগবধশা, তাম্রা, তিমি, সুরভি এবং সবর্মা। সরমা হিংস্র জন্তুগণের মাতা। তিনি জলজন্তু দেব সুরভি, গোরুমোষ ইত্যাদি দুইক্ষুর বিশিষ্ট জন্তু, তাম্রাশ্যেন, গৃধ্র প্রভৃতি হিঙ্গ মুনি অপ্সরাদের ক্রোধবশত দশুক প্রভৃতি সাদের ইলা বৃক্ষলতাদি, সুরমা রাক্ষসদেব, অরিষ্ঠা গন্ধবদের এবং কাষ্টা একক্ষুর বিশিষ্ট জন্তুদের মাতা।

কশ্যপ পত্নী দুপুর একষট্টিটি সন্তানের মধ্যে দ্বিসুধা, শম্বর, অরিষ্ট, হয় গ্রীব, বিভাবসু, অয়োসুখ, শঙ্কুশিরা, স্বভানু, কপিল, অরুণ, পুলোমা, বৃষপূর্বা একচক্র, অনুতাপন, ধ্রুমুকেশ, বিরূপাক্ষ, বিপ্রচিত্ত ও দুর্জয় প্রধান। পুলোমা ও কালকা দানবকন্যা হলেও ব্রহ্মার আজ্ঞায় কশ্যপ তাদের পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। পুলোমার পুত্র পৌলোশ এবং কালকার পুত্র কালকেয়গণ যুদ্ধবাজ দানব নামে বিখ্যাত।

ষাট হাজার পৌলোম কালকে সর্বদা মুনি ঋষিদের যাগযজ্ঞ ভন্ডুল করে দিত। বিচিত্তি সিংহিকাট একশো একটি পুত্রের জননী হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন রাহু এবং বাকি একশোজন কেতু, যারা পরবর্তীকালে আকাশের গ্রহ হিসেবে বিরাজ করছেন।

ভগবান নারায়ণ নিজে অদিতি বংশে জন্ম নিয়েছিলেন। অদিতির পুত্রদের মধ্যে আছেন বিবস্বান, অমা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বরুণ, মিত্র, শুক্র এবং উরুম। বিবস্বান জাত সংজ্ঞা

পুত্ররূপে শ্রাদ্ধদেব নামে মনুকে এবং যম ও যমী নামক যমজ সন্তান প্রসব করেন। পরে তিনি ঘোটকী হয়ে দুই অশ্বিনীকুমারের জন্ম দিয়ে ছিলেন। এইভাবে বিবস্বান থেকে ছায়া, শনি ও সাবর্নি মনু নামে দুই পুত্র এবং তপতী নামে এক কন্যার জন্ম হয়েছিল। অর্যমা পত্নী মাতৃকা বহু জ্ঞানবান পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। দৈত্যকন্যা রচনা ছিলেন ত্বষ্টার পত্নী, সন্নিবেশ ও বিশ্বরূপ নামে দুই বীর্যবান পুত্রের জন্মদাত্রী রচনা।

দক্ষ প্রজাপতির দান করা ভূত নামক মুনির দুই পত্নী, তাদের মধ্যে স্বরূপা নামে কন্যা কোটি কোটি রুদ্রের জন্ম দেন। যাদের মধ্যে বৈরবত, অজ, ভব, ভাম, বাণ, উগ্র, অহিব্র ইত্যাদি অন্যতম। ভূতের অন্ধ স্ত্রী প্রেত ও বিনায়কগণের জন্ম দেয়।

স্বর্ধা ও সতী নামে মুনি অঙ্গিরার, দুই পত্নী পিতৃগণ ও অথর্বাঙ্গিরস নামক বেদের মাতা, কৃশাখের এক পত্নী অর্চিরগর্ভে ধূমকেতু এবং অন্য পত্নী বিষনরি গর্ভে বেদশিরা দেবল, যুয়ুন ও মনুর জন্ম হয়েছে। বিনতা, কঞ্র, পতঙ্গী ও যামিনী– তীর্থ কশ্যপের চার পত্নী। যথাক্রমে বিষ্ণুর বাহন গরুড়, বহু বহু সাপ বিভিন্ন ধরনের পাখি এবং ফড়িংদের জননী।

চন্দ্র তার সাতাশজন ভার্যার মধ্যে রোহিনীর প্রতি বেশি কামাসক্ত ছিলেন। ফলে অন্যান্য কন্যারা স্বামীর প্রতি রুষ্ট হন এবং পিতা দক্ষের কাছে অভিযোগ করেন। দক্ষ রেগে গিয়ে চন্দ্রকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। চন্দ্র ক্ষয় রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে তিনি হন নিঃসন্তান। হে রাজন। এই হল প্রজাপতি দক্ষের ষাট কন্যার বংশ পরিচয়।

.

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রী শুকদেব বললেন– আচার্য বৃহস্পতি কী কারণে ভক্ত দেবতাদের পরিত্যাগ করেছিলেন, তাঁর শিষ্যরা কী দোষে দুষ্ট ছিলেন, সেই আখ্যান বর্ণনা করছি শুনুন।

দেবরাজ ইন্দ্র তার প্রিয় পত্নী, শচীদেবীকে পাশে নিয়ে রত্নসিংহাসনে বসে আছেন। রুদ্র, বসু, আদিত্য, ঋতু, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ এবং অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত। গন্ধর্ব, চারণ, সিদ্ধ, মুনিগণ তার স্তব বন্দনা করছেন।

অপ্সরা ও বিদ্যাধরীরা তাঁকে নাচে গানে বিমোহিত করছে। এক ইন্দ্র ভক্ত তাঁর মাথায় শ্বেতবর্ণ ছাতা ধরে আছেন। অন্য দুজন পার্ষদ তাকে চামর ব্যজন করছে।

এমন সময় সেখানে ইন্দ্র এবং সমস্ত দেবতাদের পরম গুরু মুনিবর বৃহস্পতি সেই সভায় এসে উপস্থিত হলেন। ত্রিলোকের ঐশ্বর্যলাভে মদমত্ত ইন্দ্র আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আচার্যকে অভিনন্দিত করার প্রয়োজন মনে করলেন না। এমনকি তাঁকে আসন গ্রহণ করতেও বললেন–না। দেবরাজের এই নিকৃষ্ট ব্যবহারে গুরু বৃহস্পতি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সভা ত্যাগ করেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে ইন্দ্র নিজের দুর্ব্যবহারের কথা বিবেচনা করে হা-হুতাশ করতে থাকেন। নিজের ওপর নিন্দাবাক্য নিক্ষেপ করতে থাকেন। ধিক! আমার ঐশ্বর্য সম্পত্তি। সাত্ত্বিক দেবগণের ঈশ্বর হয়ে আমি সেই গৌরবে অসুর ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছি। রাজাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তি সর্বদা অতিথিকে সম্মান জানাবে। যারা তা অবজ্ঞা করে তারা তামস অধোগতি লাভ করে। তারা নরক যন্ত্রনা ভোগ করে। আমি এখন আমার আত্মগরিমা বিস্মৃত হয়ে সেই তারণগুরু বৃহস্পতির চরণযুগল নিজের মস্তক দ্বারা স্পর্শ করব। এইভাবে তাকে আমি প্রসন্ন করব।

সর্বজ্ঞ বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রের অভিলাষ জানতে পেরে ভবন থেকে অদৃশ্য হলেন। ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা তার সন্ধান করেও কোনো হদিস পেলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করতে লাগলেন।

এই সুযোগে অসুররাজ শুক্রাচার্যের অনুমতি নিয়ে অসুররা দেবরাজ্য আক্রমণ করল। অসুরদের অস্ত্রের আঘাতে দেবতারা ক্ষতবিক্ষত হলেন। যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন।

ব্রহ্মা তাদের শান্ত হতে বললেন–ঐশ্বর্য মদমত্তে মত্ত হয়ে তোমরা ব্রহ্মানিষ্ট ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিকে অসম্মান করেছ। যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। অসুররা গুরুর মর্যাদা লঙঘন করে এক সময় অত্যন্ত ক্ষীণবল হয়ে পড়েছিল। আবার তারা গুরুর পাদবন্দনা করে তাঁর কৃপা লাভ করে এবং পুরোনো শক্তি ফিরে পেয়েছে। শুক্রচার্যের শিষ্য সেইসব অসুররা অভেদ্য মন্ত্রে দীক্ষিত। তারা স্বর্গলোকে অত্যাচার চালাবেই। হে দেবতাগণ! তোমরা ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের স্মরণ নাও। তিনি জিতেন্দ্রিয়, তপস্বী ব্রাহ্মণ। যদি তোমরা তার অসুর পক্ষপাতিরূপ পূর্ব কার্যের কথা ভুলে গিয়ে তাঁকে পুজো করতে পারো, তা হলে নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের মনোস্কামনা পূরণ করবেন।

দেবতারা ত্বষ্টা পুত্র ঋষি বিশ্বরূপের স্তব করলেন।–হে বৎস। আজ আমরা অতিথি হয়ে তোমার আশ্রমে এসেছি। তোমার শুভ কামনা করি। আচার্য সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ ভ্রাতা মরুৎপতি ইন্দ্র

স্বরূপ। মাতা সাক্ষাৎ ধরিত্রী স্বরূপ, ভগিনী দয়াস্বরূপা, অভ্যাগত ব্যক্তি অগ্নিস্বরূপ, এবং নিখিল বিশ্বের প্রাণী সকল আত্মা অর্থাৎ বিষ্ণু নবরূপ।

অতএব হে তাত, তোমার এই পিতৃগণকে বিপক্ষ দলের উৎপাতের হাত থেকে রক্ষা করো। তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তোমাকে আমরা অধ্যক্ষ রূপে গ্রহণ করেছি। তোমার তেজঃজ্যোতির প্রভাবে সকল শত্রুর পরাস্ত হবে, আমরা জানি। তুমি আমাদের থেকে বয়সে ছোটো, কিন্তু প্রয়োজনে কনিষ্ঠদের পাবন্দনা করা নিন্দনীয় নয়, বেদজ্ঞরা বলে থাকেন, তুমি আমাদের জ্যেষ্ঠ এবং পূজ্য।

নিজের প্রশস্তি শুনে ঋষি বিশ্বরূপ সন্তুষ্ট হলেন। বললেন– হে দেবতাগণ। আপনারা আমার শিক্ষাগুরু। আমি আপনাদের শিষ্য। ধর্ম বলেছে, শিক্ষা দাতাদের প্রত্যাখান না করাই শিষ্যের স্বার্থ। আমার বিচারে পৌরোহিত্য একটি নিন্দনীয় বৃত্তি। তবুও আপনাদের প্রার্থিত বিষয় আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না।

এইভাবে মহাতপস্বী বিশ্বরূপ পৌরোহিত্য পদব্রতী হলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের বিদ্যার প্রভাবে অসুরদের লক্ষ্মী অচলা হলেও বিশ্বরূপ বৈষ্ণবী বিদ্যার সাহায্যে শ্রীলক্ষ্মীকে আকর্ষণ করেছিলেন। সেই নারায়ণ কবচ ইন্দ্রকে তিনি দান করেছিলেন। যার প্রভাবে দেবরাজ ইন্দ্র অসুরদের হাত থেকে স্বর্গলোক মুক্ত করেছিলেন।

.

সপ্তম অধ্যায়

নারায়ণ কবচ দেবরাজ ইন্দ্রকে দান করে বিশ্বরূপ তার ন্যাস সম্পর্কে বললেন– হে দেবরাজ। হস্ত পদ প্রক্ষালন করে উত্তরমুখো হয়ে কুশ হাতে নিয়ে আচমন করার নিয়ম। তারপর আট বা বারো অক্ষরের মন্ত্রোচ্চারণ করে অঙ্গন্যাস ও করণ্যস্ব করতে হবে। সংযত বাক ও শুদ্ধচিত্তে নারায়ণ কবচবন্ধন করবে। কবচ বন্ধন করার নিয়ম বলা হয়েছে– পা থেকে মাথা পর্যন্ত অর্থাৎ দুটি পা, দুটি জানু, দুটি উরু, উদর, হৃদয়, বক্ষস্থল মুখ ও মস্তক– প্রত্যেকটি অঙ্গের আট অক্ষরের মন্ত্রের দ্বারা বিন্যাস ঘটাতে হয়, বলতে হয় 'ওঁ' নমো নারায়ণায়, আবার বিপরীতভাবে অর্থাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত অক্ষর বিন্যাস করা যেতে পারে।

‘ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়’- এই দশ অক্ষরের মন্ত্রের সাহায্যে করন্যাস করতে হয়। এই মন্ত্রের প্রথম আটটি অক্ষর ডানহাতের তর্জনী, মধ্যামা, অনামিকা, কনিষ্ঠা এবং বাম হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনী আঙুলে বিন্যাস করতে হয়। বাকি চারটি অক্ষর দ্বারা দুই হাতের আঙ্গুলের আদি ও অন্তপর্বে বিন্যাস করবে। ষড়ঙ্গ ন্যাস হল ছয় অক্ষরের ‘ওঁ বিষ্ণবে নম’। সাধক তার হৃদয়ে ‘ওঁ’, ‘মস্তকে’ নি, দুই ভুর মাঝখানে য’ শিখায় ন, দুই চোখে ‘বে’, ‘ন’ সন্ধিস্থান সমূহে বিন্যস্ত করে থাকেন। ম কার হবে অস্ত্র। অস্ত্ররূপ ম কারের সঙ্গে বিসর্গ যুক্ত করে, শেষে কট যোগ করলে হবে ‘ম’ অস্ত্রায় কট এই মন্ত্রের সাহায্যে দিকগুলির বন্ধন করতে হয়, তারপর ঐশ্বর্যাদি ষট শক্তিসম্পন্ন ধ্যেয় পরমাত্মাকে ধ্যান করবে এবং বিদ্যা, তেজ ও তপস্যা যাঁর মূর্তি স্বরূপ, সেই নারায়ণ কবচ নামক মন্ত্রোচ্চারণ করবে।

শ্রী শুকদেব বললেন– হে রাজন, নারায়ণ কবচ মন্ত্র সম্পর্কে বিশ্বরূপ বলেছিলেন যিনি পক্ষীরাজ গরুড়ের পিঠে উপবিষ্ট, যিনি আটটি হাতে আটটি অস্ত্র ধারণ করে আছেন। সেই ভগবান শ্রীহরির চরণ বন্দনা করি। যিনি মৎস্য অবতার, বটুবামন, ও বিশ্বরূপ ত্রিবিক্রম মূর্তি হয়ে স্থল, জল, অন্তরীক্ষ রক্ষা করেছিলেন। তিনি আমাকে রক্ষা করুন। যিনি হিরণ্যকশিপুর সংহারকারী, যিনি নিজের দাঁত দিয়ে জলমগ্ন পৃথিবীকে তুলে এনেছিলেন, সেই প্রভুকে আমি প্রণাম করি। যিনি সমস্ত গুণ সমুহের ঈশ্বর ভগবান কপিল, যিনি কুর্মমূর্তি শ্রীহরি, তিনি আমাকে সমস্ত কর্মবন্ধন ও নরক থেকে রক্ষা করুন।

জিতেন্দ্রিয় ঋষভদের শীতোষ্ণোদি জনিত ভয় থেকে, যজ্ঞ মূর্তি ভগবান লোকাপবাদ হতে। বলদেব লোককৃত বাধা থেকে এবং নাগরাজ অনন্তদেব ক্রোধী সর্পগণ থেকে আমাকে উদ্ধার করুন।

হে দেবেন্দ্র, তারপর ভোরবেলা, দুপুরবেলা ছয়বার এবং সন্ধ্যাবেলা দুবার প্রার্থনা করবে– হে ভগবান কেশব- ভোরবেলা গদা দ্বারা আমাকে রক্ষা করুন। হে সুদর্শনধারী বিষ্ণু মধ্যাহ্নকালে আমাকে রক্ষা করুন। উগ্রধনুধারী ভগবান মধুসূদন অপরাহ্নকালে, ব্রহ্মাদি ত্রিমূর্তিধারী ভগবান মাধব সন্ধ্যাকালে, ভগবান হৃষীকেশ প্রদোষ সময়ে এবং ভগবান পদ্মনাভ অর্ধ রাত্র পর্যন্ত রক্ষা করুন। শ্রীবৎসধারী, ঈশ্বর রাত্রির শেষ ভাগ পর্যন্ত আমাকে রক্ষা করুন।

এবার অস্ত্র বন্দনা- হে গদা, শত্রুদের ধ্বংস করা হে চক্র, আমাদের শত্রুদের আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দাও। হে পাঞ্চজন্য শঙ্খ তোমার ভয়ংকর শব্দ দ্বারা শত্রদের হৃদয় কম্পিত করো। রাক্ষস, প্রেত, মাতৃকা, পিশাচ ব্রহ্মরাক্ষস, দুরাত্মা সকলকে নাশ করো, হে তীক্ষ্ণধার খড়গশ্রেষ্ঠ

তুমি ঈশ্বরের দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে সমস্ত শত্রুর মুণ্ড ছেদন করো। হে শতচন্দ্র ঢাল তুমি পাপী শত্রুদের চোখের দৃষ্টি কেড়ে নাও।

গ্রহ কেতু, নর, সরীসৃপ, হিংস্র জন্তু, ভূতপ্রেত এবং অন্যান্য পাপাত্মা- যারা আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করেছে, যারা আমাদের মঙ্গল লাভে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে, তারা ভগবানের নামকীর্তন ও রূপমহিমা বর্ণনের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হোক। যিনি বির্ষক সেনাররূপ যিনি বেদস্বরূপ, যিনি বৃহদ্রথস্তর প্রভৃতি সাম্যরূপ স্তোত্রের দ্বারা বন্দিত হয়ে থাকেন, সেই গরুড় আমাদের রক্ষা করুন।

যাঁরা সর্বত্র একাত্মতা অনুভব করেন, তাদের দৃষ্টিতে ভগবান ভেদরহিত হয়েও নিজ মায়াবলে ভূষণ, অস্ত্র ও চিহ্ন স্বরূপ বিধি শক্তি ধারণ করেছেন। তিনি সর্বজ্ঞ সর্বগত শ্রহরি। তিনি সর্বপ্রকার স্বরূপ দ্বারা আমাদের সর্বত্র রক্ষা করুন। ভগবান নৃসিংহদেব নিজ তেজের দ্বারা সমস্ত তেজ গ্রাস করে। নিজ গর্জনধ্বনির দ্বারা লোকভয় বিনাশ করুন, দিক, বিদিক, উর্দ্ধ, অধঃ, বাইরে, ভেতরে সর্বত্র তিনি বিরাজ থেকে আমাদের উদ্ধার করুন।

বিশ্বরূপ বললেন– হে দেবরাজ ইন্দ্র। নারায়ণ কবচের কীর্তন ও মহিমা আপনাকে বর্ণনা করলাম। এই কবচ যে ধারণ করে, লোকে তার চরণ স্পর্শ করার জন্য ব্যাকুল হয়, সেই ব্যক্তির সমস্ত ভয় দূরীভূত হয়। এই কবচ ধারণকারী ব্যক্তি সর্বদা যে কোনো ভয়, দস্যু, গ্রহাদি, রাজা বা ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হন না।

আপনি এই অপার মহিমান্বিত কবচ গ্রহণ করে অবশ্যই অসুরদের পরাস্ত করতে পারবেন।

পুরাকালে কৌশিক নামের এক ব্রাহ্মণ এই বিদ্যালাভ করে মরুভূমিতে যোগসাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। ওই কবচের প্রভাবে তিনি দেহ ছেড়ে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যে স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন, একসময় সেই স্থানের ওপর দিয়ে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে বিমানযোগে যাচ্ছিলেন। সেই স্থান অতিক্রম করা মাত্র তাঁর বিমান অধোমুখী হয়ে নীচে নামতে থাকে।

বিস্মিত গন্ধর্বরাজ পরে কিশোর মুনিদের কাছ থেকে এই সংক্রান্ত উপদেশ লাভ করেন, তখন চিত্ররথ ব্রাহ্মণের অস্থিসমূহ সংগ্রহ করে সরস্বতী নদীতে নামেন। সেই জলে ওগুলো নিক্ষেপ করেন। তারপর নিজে অবগাহন করে ফিরে আসেন।

শ্রী শুকদেব বললেন– দেবরাজ ইন্দ্র ওই নারায়ণ কবচ ধারণ করে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অসুররা সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়। ত্রিলোকের ঐশ্বর্য লাভ করে ইন্দ্র সুখী হয়েছিলেন।

.

অষ্টম অধ্যায়

শ্রী শুকদেব বললেন– বিশ্বরূপের সোমরস, সুরা ও অন্নভক্ষনকারী তিনটি মুখ ছিল, দেবতারা ছিলেন তাঁর পিতৃকুল, বিশেষ করে তিনি ছিলেন তাদের পুরোহিত। অথচ তার মা ছিলেন দৈত্যকন্যা। তাই তিনি উচ্চস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করে যজ্ঞ সুসম্পন্ন করতেন, এবং তার ভাগ দেবতা ও গোপনে অসুরদের মধ্যে প্রদান করতেন। যজ্ঞে একদিন এই অন্যায় আচরণ লক্ষ্য করে ইন্দ্র ভীষণ ক্ষিপ্ত হলেন। অসুরদের শক্তি বৃদ্ধির আশঙ্কায় তিনি ভীত হলেন এবং বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছেদন করলেন। তার একটি মাথা থেকে কপিজল, দ্বিতীয়টি থেকে চটক এবং তৃতীয়টি থেকে তিতির পাখির জন্ম হল।

ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ দেবরাজ ইন্দ্র একবছর ভোগ করলেন। শেষে নিজেকে শুদ্ধ করার জন্য ওই পাপকে চারভাগ করে ভূমি, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। সেইসঙ্গে প্রত্যেককে বর' প্রদান করলেন।

ভূমি একভাগ পাপ গ্রহণ করেও, ঘাতপুরণ বর লাভ করল, অর্থাৎ আপনা হতেই জমির ঘাতপূরণ হবে। জমির উষর ভাগ হল সেই পাপেরই চিহ্ন। বৃক্ষদের তিনি বরদান করলেন তোমাদের কর্তন করা হলেও তোমাদের বৃদ্ধি ঘটবে। গাছের গায়ে আঠা দেখা যায়, যা ইন্দ্রের একভাগ পাপের লক্ষণ।

ইন্দ্রের পাপ গ্রহণ করার ফলে রমণীরা প্রতি মাসে ঋতুমতী হয় এবং তার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। তারা সর্বদা সম্ভোগে অর্থাৎ গর্ভ ধারণ কালেও সম্ভোগ করতে পারে, কোনোরকম বিঘ্ন ঘটে না। ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা পাপের বাকি এক অংশ জলরাশি গ্রহণ করল। দুধ প্রভৃতি যে দ্রব্যের সাথে জল মেশানো হবে, জলে সেই দ্রব্যেরই আধিক্য ঘটবে। জলে যে বুদবুদ বা ফেনা দেখা যায়, তাহল ওই পাপের চিহ্ন। তাই জলের ফেনা বা বুদবুদ ফেলে দিয়ে জলপান করা বিধেয়।

বিশ্বরূপের মৃত্যু হলে তার পিতা ত্বষ্টা অত্যন্ত রেগে গেলেন। ইন্দ্রবিনাশের কামনা করে তিনি যজ্ঞ করতে শুরু করলেন। তিনি যজ্ঞে আহুতি দান করলেন হে ইন্দ্রশস্ত্রো অর্থাৎ ইন্দ্রের শত্রু সংহার করা। যজ্ঞকালে যজ্ঞের অগ্নির ডানদিক থেকে এক ঘোরাকৃতি পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু আহুতি দানকালে তিনি এমন ভাবে শব্দদুটি উচ্চারণ করেছিলেন, যার অর্থ হল হে ইন্দ্র, হে শত্রো — ফলে কাজ হল উল্টো। ওই বীভৎস চেহারার পুরুষ প্রতিদিন চারহাত পরিমাণ চুতর্দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তার গায়ের রং ছিল অগ্নিদগ্ধ পর্বতের ন্যায়। তার দেহের দীপ্তি যেন সন্ধ্যার মেঘমালা, তিনি শ্মশ্রুধারী, তাঁর নেত্রযুগল থেকে দুপুরের সূর্যের প্রখর তেজের প্রকাশ ঘটছে। তিনি তিনটি শিখাবিশিষ্ট শূলের অগ্রভাগে যেন স্বর্গ ও ভূতলকে আরো পিত করে নৃত্য ও উচ্চধ্বনি করতে করতে পা দিয়ে পৃথিবীকে চালনা করছিলেন। পর্বত গুহার মতো বিশাল তার মুখগহ্বর যেন আকাশকে গ্রাস করবে, তার মস্ত বড়ো জিভে নক্ষত্ররাজিকে লেহন করছে। ত্রিভুবনকে উদরস্থ করতে চাইছে, বারবার সেই বীভৎস চেহারার পুরুষ দাঁত বের করে হাই তুলছিল।

ত্বষ্টা সৃষ্ট এই পাপী পুরুষ ছিলেন তমোগুণ স্বরূপ। তিনি হলেন ত্বষ্টা পুত্র, ত্রিভুবন আবরণকারী। তাই তার নাম হল বৃত্র। তাকে দমন করার উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ দেবতারা নানা রকম শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাকে আক্রমণ করল।

কিন্তু ওই দৈত্যপুরুষ অনায়াসে সমস্ত অস্ত্র উদরস্থ করতে লাগল। এই অসুরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে বিস্মিত, বিষণ্ণ ও তেজহীন দেবতারা একাগ্রচিত্তে অন্তর্যামী আদি পুরুষের স্তব করতে শুরু করলেন।

দেবতারা বললেন– যে কালদেবতার পূজোপহার আমরা আহরণ করে থাকি, সেই কালদেবতা যাঁকে দেখে ভীত হন, সেই পরমেশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। যিনি নিরহংকার, রাগ-দ্বেষ শূন্য, উপাধিকৃত পরিচ্ছেদহীন, সেই পরমেশ্বরকে যে ত্যাগ করে অন্যকে আশ্রয় করে, সে অতিমূর্খ। কুকুরের লেজ ধরে সমুদ্র পার হওয়ার মতো ইচ্ছা সে প্রকাশ করে।

পুরাকালে সৃষ্টির প্রারম্ভে সমুদ্রের জলরাশি প্রবল বায়ুবেগে উত্থিত হলে, তরঙ্গরাজির শব্দ ভয়ংকর হলে, তখন সেই তরঙ্গের নাভিকমল হতে পিতামহ ব্রহ্মা যার দ্বারা ভয় হতে উত্তীর্ণ হন, তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন। হে অন্তর্যামী ঈশ্বর যাঁর মায়াবলে আমরা সৃষ্ট হয়েছি। যাঁর আজ্ঞায় আমরা বিশ্ব সৃষ্টি করে চলেছি, এবং নিজেদের পৃথক পৃথক ঈশ্বর জ্ঞান করি, কিন্তু

সেই পরমেশ্বরের রূপ পরিচয় আমাদের কাছে অজ্ঞাত, সেই পরম পুরুষের কাছে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

যিনি নিত্যবস্তু স্বরূপ, যিনি মায়াবলে দেবতা, ঋষি, তির্যক প্রাণী ও নরকুলের মধ্যে বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, যিনি সকলকে নিজ ভক্তজ্ঞানে আশ্রয় দান করেন, তিনি অবশ্যই আমাদের মঙ্গল করবেন।

শ্রী শুকদেব বললেন– দেবতাগণের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মধারী। শরৎকালের প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় তার চোখ দুটি প্রকাশিত। শ্রীবৎস ও কৌস্তভ ব্যতীত আরও যোলোজন পার্ষদ দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত।

দেবতারা সেই ভুবন ভুলানো মোহিনী মূর্তি দেখে আনন্দে বিহ্বল হলেন। তারা মাটিতে মাথা স্পর্শ করে তাকে প্রণাম জানালেন। বললেন– হে ঈশ্বর, আপনি স্বর্গাদি ফল উৎপাদনের জন্য অলৌকিক সামর্থ্য পূর্ণ পুরুষ। আপনি স্বয়ং ওই কলের পরিচ্ছেক কালরূপী। তা সত্ত্বেও যজ্ঞ নাশকারী অসুরদের আপনি অভেদ্য অস্ত্র ক্ষেপণ করে থাকেন। আপনাকে প্রণাম। হে ভগবান, আপনি সত্ত্ব, তমো ও রজঃ গুণের পরম অধিষ্ঠান। আপনি ত্রিগুণাতীত, নির্গণ স্বরূপ। আপনাকে প্রণাম পরমহংস পরিব্রাজকগণ অষ্টাঙ্গ যোগমার্গে চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা অনুশীলন করলে ভগবদ ভজনের উন্মেষ কারণে চিতরূপে দ্বারের কপাট খুলে যায়।

সেই চিত্তমাঝে, প্রত্যেক স্বরূপের অর্থাৎ অন্তর্যামী তত্ত্ব প্রকটতা লাভ করলে স্বয়ং আত্মার যে স্বরূপ সুখের উপলব্ধি ঘটে, আপনি সেই সুখেরই উপলব্ধি, আপনি সেই সুখেরই অনুভব স্বরূপ। আপনি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি নিরাশ্রয় দেহহীন ও নির্গণ হয়েও নিজেই নিজের আত্মার দ্বারা এই স্বগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কার্য সম্পাদন করছেন, অথচ আপনার আত্মা কখনও লীনপ্রাপ্ত হয় না।

এই গুণময় সংসারে জীবরূপে প্রবেশ করে, আপনি ভালো বা মন্দ কর্মের ফল ভোগ করার প্রত্যাশী হন না। চিৎশক্তির কোন চ্যুতি ঘটে না। আত্মারামত্ত উপশমশীল হয়ে সাক্ষীস্বরূপ বিরাজ করে, হে দেব, আপনার ঐশ্বর্য অচিন্তনীয়। আপনার মাহাত্ম্য যা কেউ কখনও বলে শেষ করতে পারে না। বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস ও কুতর্কে পরিপূর্ণ শাস্ত্রসমূহ নির্ধারণে অযোগ্য আপনি সকল সংসার ভাবের নিবৃত্তিস্থান। অকর্তৃত্বাদিই আপনার বাস্তব রূপ।

হে দেব, মানুষ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে আপনার মধ্যে সাম্য বা বৈষম্য দর্শন করে, আসলে আপনি উদাসীন, তাই কারোর প্রতি অনুগ্রহশীল বা নিগ্রহশীল হননি, আপনিই একমাত্র সৎ স্বরূপ। সকলের ঈশ্বর, নিখিল জগতের কারণসমূহের কারণ, প্রকাশক রূপে আপনার অস্তিত্ব অস্বীকার্য নয়।

হে মধুসূদন, যাঁরা আপনার মহিমারূপ সমুদ্রের অমৃত রস কণামাত্র আস্বাদন করেছেন। এবং নিজের মনের মধ্যে সেই প্রবাহমান আনন্দ রাশির অনুভব করেন, ক্ষুদ্র সুখের লেশমাত্র তারা বিস্মৃত হয়েছেন, তাঁদের কাছে আপনি প্রিয় এবং সুহৃৎ। আপনার সেবায় যারা সতত নিয়োজিত তাদের আর আর জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

হে বিধাতা, আপনি এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মা ও আবাসস্থল। সকল দৈত্য দানো আপনার বিভূতি প্রসূত, আপনিই ত্রিলোকের পালনকর্তা। ভক্তদের মঙ্গল বিধানে আপনি বারে বারে নানা অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

হে পিতা, বৃত্রাসুরকে বধ করে, দেবতাগণকে রক্ষা করুন। আমরা সর্বদা আপনার পাদপদ্মের ধ্যান করি। আপনাতেই আমাদের হৃদয় শৃঙ্খলাবদ্ধ। আপনি আপনার মধুর মনোহর বচনরূপ অমৃতে কলার দ্বারা আমাদের চিত্তের সন্তাপ বিদূরিত করুন।

হে হরে, হে সর্বজ্ঞ, আমাদের অভিলষণীয় বিষয় নতুন করে আর কি জানাব? যিনি নিখিল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারী, যিনি আপন মায়া দ্বারা ক্রীড়া করে চলেছেন। যিনি জীব সকলের অন্তরে ব্রহ্ম ও অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করছেন, যিনি প্রকৃতি রূপে দেশ, কাল, দেহ ও অবস্থাবিশেষের অনুকূল ভাবে তাদের উপাদান ও প্রকাশক রূপে সব কিছুই অনুভব করছেন, যে কামনায় পরমগুরু ভগবৎ স্বরূপ আপনার চরণছায়ায় আশ্রয় নিলাম, আপনি সেই কামনা পূরণ করুন, আপনি বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, পরমব্রহ্ম ও পরমাত্মা।

আপনি শুদ্ধ ও আর্তহারী আপনাকে প্রণাম জানাই। হে কৃষ্ণ, যে বৃত্রাসুর দেবগণের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। ত্রিভুবন গ্রাস করার খেলায় মেতে উঠছে, তাকে সংহার করুন।

শ্রী শুকদেব বললেন–দেবগণের স্তুতিবাক্যে স্বয়ং শ্রীহরি সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন– হে দেবগণ, এই স্তব যে করে সে জ্ঞানী হয় এবং আমার একান্ত ভক্ত হয়। আমাকে যে খুশি করতে পারে তার আর কী চাওয়ার আছে? তবুও যে আমার প্রতি ভক্তি সহকারে আত্মসমর্পণ করে, সেই তত্ত্ব ও ব্যক্তি আমাকে ছাড়া আর কিছু কামনা করে না।

দীন এবং মুখ জনই বিষয় সমূহকে যথার্থ বস্তু বলে মনে করে। সে লোক অজ্ঞ। আর, যে বিজ্ঞ অর্থাৎ শ্রীহরি সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে, সে কখনও অজ্ঞলোককে সংসার বন্ধনের কারণ স্বরূপ প্রবৃত্তি মার্গের উপদেশ দিতে পারে না।

হে সুর শ্রেষ্ঠগণ। তোমরা ঋষিশ্রেষ্ঠ দধীচির কাছে যাও। তাঁর দেহটি প্রার্থনা করো, যা বিদ্যা, ব্রত ও তপোবলে দৃঢ়। তিনি নিজে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে তা দান করে ছিলেন। অশ্বশির নামক ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে অশ্বিনী কুমারদ্বয় জীবন্মুক্ত হয়েছিলেন।

কথিত আছে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় অবগত ছিলেন যে, দধ্য মুনি প্রবগা ও ব্রহ্মবিদ্যায় দক্ষ। তারা এই বিদ্যা লাভের আশায় তার শরণাপন্ন হলেন। মুনি বললেন–আমি এখন অন্য কাজে ব্যস্ত আছি, তোমরা পরে এসো, বলে তাদের ফিরিয়ে দিলেন।

অশ্বিনীকুমার দুজন আশ্রম ত্যাগ করলেন। এমন সময় সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র এসে হাজির হলেন। তিনি বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ব্রহ্মবিদ্যা দান করতে বারণ করলেন, যদি তার আদেশ অমান্য করা হয়, তাহলে মুনির মুণ্ডচ্ছেদ ঘটবে। কিছুদিন পর অশ্বিনীকুমার স্বয়ং আশ্রমে এসে হাজির হলেন। দধীচি মুনি ইন্দ্র যা কিছু বলে গিয়েছিলেন, সব তাদের জানালেন।

অশ্বিনীপুত্র দুজন বললেন– হে ঋষিবর, আমরা আপনার মুণ্ড ছেদন করে সেখানে অশ্বের মুখ সংস্থাপন করব। আপনি অশ্বমুণ্ড দিয়েই আমাদের প্রবর্গ ও ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেবেন। ইন্দ্র এসে আপনার অশ্বমুণ্ড কেটে দেবেন। আমরা আবার আসল মুণ্ড কবন্ধে সংস্থাপন করব। এই কারণে এই বিদ্যা অশ্বশির নামে প্রসিদ্ধ।

হে দেবরাজ অর্থব বেদজ্ঞ দধীচিই ত্বষ্টাকে সদাত্মক অর্থাৎ নারায়ণবর্ম নামক অভেদ্য কবচ উপদেশ করেন। ত্বষ্টা নিজ পুত্র বিশ্বরূপকে তা বিতরণ করেন। বিশ্বরূপের কাছ থেকে তুমি সেই বিদ্যা লাভ করছে। নারায়ণ কবচের প্রভাবে এই মুনির গাত্র অত্যন্ত দৃঢ়। তোমরা তাঁর দেহ প্রার্থনা করলে শিষ্যবৎসল ঋষি তোমাদের কখনোই বিমুখ করবেন না।

দধীচির অস্থি দ্বারা বিশ্বকর্মা বজ্ররূপ উৎকৃষ্ট অস্ত্র তৈরি করবে, ওই অস্ত্র আমার তেজে তেজীয়ান হয়ে বৃত্রাসুরের মুণ্ড ছেদন করবে। তোমারা আবার নিজেদের তেজ, অস্ত্রশস্ত্র ও অধিকার ফিরে পাবে আমার চরণে যে আশ্রয় নেয়, কোনো বিপদ তাকে স্পর্শে করতে পারে না। তোমাদের মঙ্গল হোক। একথা বলে বিশ্বভাবন ভগবান শ্রীহরি সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

.

নবম অধ্যায়

শ্রী শুকদেব বললেন– হে রাজা, শ্রীহরির আদেশ অনুসারে দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে দধীচির আশ্রমে এলেন, তার দেহ প্রার্থনা করলেন।

মুনি দধীচি বললেন– হে দেবগণ। দেহধারী জীবগণ অনায়াসে দেহত্যাগ করতে চায় না। বিশেষ করে যারা ইহলোকে বেঁচে থাকতে চায়। তারা অতিশয় প্রিয় এই দেহের নাশ চায় না। দুঃসহ মৃত্যুযাতনা চেতনাকে বিনষ্ট করে। স্বয়ং বিষ্ণুও যদি দেহদান করতে আজ্ঞা করেন, তাহলে সে কি সহজে তা ত্যাগ করতে চাইবে?

দেবতারা বললেন– হে ঋষি, আপনি দয়ালু, জ্ঞানী এবং পরোপকারী। সর্বদা অন্য সকলের কর্মের প্রশংসা করে থাকেন। যাচক যদি পরের দুঃখ অনুধাবন করতে পারে, তাহলে সে যেমন প্রার্থনা করে না, তেমনই দানে সমর্থ পুরুষও অন্যের কষ্ট বুঝলে 'না' শব্দ বলতে পারে না।

অর্থাৎ আমরা স্বার্থপরের ন্যায় আপনার সংকটের কথা বুঝতে চাইছি না, তেমনই আপনি প্রত্যাখান করাতে আমাদের বিপদ সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন না।

দধীচি বললেন–তোমাদের কাছ থেকে ধর্মকথা শোনার অভিপ্রায়ে ও কথা বলেছিলাম, যে দেহ তোমরা চাইছ, তা অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষণভঙ্গুর। ধন, পুত্র, দেহ- এসবই পরবীয়, যা কুকুর শেয়াল ভক্ষণ করে, এইসবের দ্বারা যদি মরণশীল মানুষ পরের উপকার না করে, তাহলে তা হয় অত্যন্ত দৈন্য ও দুঃখের কথা। আমি আমার এই দেহ এখনই পরিত্যাগ করছি।

শ্রী শুকদেব, বললেন– মহারাজ, অথর্ব ঋষির পুত্র দধীচি একথা বলে নিজ আত্মাকে পরব্রহ্ম ভগবানে যুক্ত করলেন। উভয়ের মধ্যে ঐক্য সম্পাদিত হল। এইভাবে দধীচি দেহত্যাগ করলেন। ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধিবৃত্তির সংযম করে তিনি হয়েছিলেন তত্ত্বদর্শী, সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হয়ে পরম যোগদশা লাভ করেন। তাই তিনি নিজের দেহের পতন অনুভব করতে পারেননি।

মুনির অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা বজ্র নির্মাণ করলেন। সেই বজ্রাস্ত্র দেবরাজ ইন্দ্র ধারণ করে ভগবানের তেজে তেজীয়মান হয়ে উঠলেন। ঐরাবতের ওপর তিনি উপবেশন করলেন। সমস্ত দেবতারা তাকে বেষ্টন করলেন। মুনিরা তাঁর বন্দনা করতে লাগলেন। ত্রিভুবন আনন্দে

উল্লাসিত হল। অন্ধক নামে অসুরের সংহারের জন্য পুরাকালে ভগবান রুদ্র যেভাবে শত্রু অভিমুখে জীবিত হয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই দেবসৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র অসুররাজ বৃত্রের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। সত্যযুগের প্রান্ত ভাগে নর্মদা নদীর তীরে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ শুরু হল।

ইন্দ্র সেনাগণের মধ্যে ছিলেন রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিপতৃগণ, অগ্নিগণ, মরুদগণ, ঋতুগণ, সাধ্যন ও বিশ্বদেবগণ। বৃত্রাসুরের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল নমুচি, শাম্বর, দ্বিমূর্ধা, ঋষভ, অনধা, হয়গ্রীব শঙ্কুশিরা, প্রহেতি, হেতি, উল্কল, পুলোমা, সুমালি, মালি প্রভৃতি হাজার হাজার দৈত্য, দানো, যক্ষ ও রাক্ষসগণ সাক্ষাৎ যশ অপেক্ষাও দুর্ধর্ষ অসুরবাহিনী নির্ভীক চিত্তে সিংহনাদ করতে করতে দেবতাদের আক্রমন করল।

প্রাণ, মুখার, শূল পরশুখড়গ গদা, পরিখ, শতুঘী, বান ইত্যাদি অস্ত্র শাস্ত্রের দ্বারা দেব সৈন্যরা আচ্ছন্ন হল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে যেমন চন্দ্র-সূর্য গ্রহ তারা দেখা যায় না। তেমনই নিবিড় বানজালে দেবতারা আবদ্ধ হলেন। তাঁরা দৃষ্টিগোচর হলেন না। কিন্তু তারা নিজেদের অস্ত্র প্রয়োগ করে আকাশপথেই শদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের পতন ঘটালেন। ওই সব অস্ত্র দেবতাদের স্পর্শ করতেও পারল না। অসুররাজ বৃত্রাসুর ও দৃশ্য দেখে ক্রোধে উন্মুক্ত হয়ে পবর্তশৃঙ্গে, পাথরের খণ্ড বৃক্ষ ইত্যাদি শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করলেন।

তাকে লক্ষ্য করে সমগ্র, অসুরবাহিনী বৃক্ষ, প্রস্তর, পর্বত শৃঙ্গে সমূহ ক্রমাগত ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু ইন্দ্রসৈন্যরা প্রত্যেকটি অস্ত্রকে ফিরিয়ে দিলেন শত্রুর দিকে। অক্ষত ও সুখী ইন্দ্র সৈন্যদের দেখে অসুররাজ ও তার সেনারা অত্যন্ত ভীত হলেন।

শুকদেব বললেন– হে রাজা। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাদের সহায়, তাদের কোনো দুর্জন কোনো ক্ষতি করতে পারে না। অসুররা শ্রীহরির প্রতি বিমুখ ছিল। তারা ভগবানের নামে কুৎসা রটাত। কিন্তু দেবগণ ছিলেন হরিভক্ত। তাই অসুরদের বারবার চেষ্টা বিফলে গেল, এই অবস্থায় অসুরবাহিনী নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে অসুররাজ বৃত্রাসুরকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেল।

মহাভয়ে ভগ্ন ও পলায়নরত অসুর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে মহাবীর বৃত্রাসুর বলল- হে অসুর বীরগণ। জন্মশীল ব্যক্তির মৃত্যু কেউ খণ্ডাতে পারে না, এ তথ্য তোমাদের জানা আছে নিশ্চয়ই। আর সেই মৃত্যু যদি যশ ও স্বর্গলাভে সক্ষম হয়, তাহলে সেই মৃত্যুক কেন বরণ করে নেব না?

শাস্ত্রে দুই ধরনের অতিশয় দুষ্প্রাপ্য মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। যোগ ধারণাপূরক প্রাণ ইত্যাদি জয় করে শরীর পরিত্যাগ করা এক শ্রেণীর মৃত্যু। আবার রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে শত্রুর সঙ্গে নির্ভীক চিত্তে লড়াই করে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া, আর এক শ্রেণীর মৃত্যু। এই ধরনের মৃত্যু সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁরা এইভাবে মৃত্যুবরণ করেন, তারা সূর্যমণ্ডল ভেদ করে গমন করেন।

.

দশম অধ্যায়

শ্রী শুকদেব বললেন– মহারাজ, অসুররাজ বৃত্রাসুরের ধর্মোপদেশ অগ্রাহ্য করে অসুর সেনারা ভীত হয়ে পালিয়ে যেতে লাগল, সেনাদের ছত্রভঙ্গ হতে দেখে অসুরশ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুর অসহিষ্ণু হয়ে রাগে দুঃখে দেবতাদের উদ্দেশ্যে তিরষ্কার করে বললেন– যারা পালিয়ে যেতে গিয়ে পেছন দিক দিয়ে আহত হয়েছে, সেইসব অসুর নিজ মাতার পুরীষের ন্যায় হীন, তাদের বিতাড়িত করতে পেরে কেন তোমরা বৃথা উল্লাস করছ।

যারা বীরত্বের অভিমান করে তারা ভীত, শত্রুকে পদানত করে যশ ও স্বর্গলাভের কামনা করতে পারে না। ঠিক তোমাদের ক্ষুদ্রচিত্তকে, যদি যুদ্ধের প্রতি তোমাদের সামান্য শ্রদ্ধা থাকে, আর হৃদয়ে থাকে ধৈর্য, তাহলে এসে দাঁড়াও আমার সামনে।

দেবতাদের ভয় দেখাতে মহাবল হুঙ্কার দিলেন। তার গর্জনে বুঝি ত্রিভুবন অচেতন হয়ে পড়ার উপক্রম হল। অনেক দেবসৈন্য জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। পাগলা হাতি যেমন ঘাস মর্দন করে, ঠিক সেইভাবেই রণাঙ্গনে অভিমত্ত বৃত্রাসুর শূল উত্তোলন করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দুই পা দিয়ে ওইসব পড়ে থাকা দেবতাদের থেঁতলে পিষতে লাগল।

বজ্রধারী দেবরাজ ইন্দ্র তখন রাগে ফুঁসছেন। তার রোষানল প্রজ্বলিত হল। বৃত্রাসুর তখন তার দিকে ধাবিত হল। ইন্দ্র শত্রুকে লক্ষ্য করে মহতী গদা নিক্ষেপ করলেন। বৃত্রাসুর অনায়াসে সেই গদা বাঁ হাতে ধরে ফেলল। ঘোরতর গর্জন করতে করতে ওই গদাই ছুঁড়ে মারল। সেটি এসে পড়ল ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের কুম্ভস্থলে অর্থাৎ মস্তক স্থিত উন্নত পিণ্ড দুটিতে।

অসুরদের গদার আঘাতে মহেন্দ্রবাহন বজ্রাহত পর্বতের মতো পাক খেতে খেতে এবং রক্তবমি করতে করতে রণাঙ্গন থেকে আঠাশ হাত পেছনে গিয়ে পড়ল। প্রিয় বাহন ঐরাবতের মুমুর্ষ

অবস্থা দেখে দেবরাজ মনে মনে অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। তিনি ঐরাবতের কাছে এগিয়ে গেলেন। তার অমৃতস্রাবি কর দ্বারা বাহনের ক্ষতের ওপর ঝুলিয়ে দিতে থাকলেন।

বজ্রধারী ও ভ্রাতৃহন্তা দেবরাজের সকল পাপস্বরূপ ক্রুর কর্ম স্মরণ করে পরিহাস করে বৃত্রাসুর বললেন– হে মহাপাপিষ্ঠ, তুমি ব্রহ্মঘাতী, গুরু হত্যাকারী, আমার ভাইদের বিনাশ করেছ, তুমি আমার চরম শত্রু। তুমি আবার আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছ। তা আমার পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার, তুমি লজ্জাহীন, শ্রীহীন ও কীর্তিহীন, দানবরাও তোমাকে ঘেন্না করে, তোমার ওই পাথরের ন্যায় কঠিন বক্ষস্থল আমি এখুনি শূল দ্বারা বিদীর্ণ করে দেব।

তাহলেই আমি ভ্রাতৃঋণ থেকে মুক্তি পাব। তোমার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পাপিষ্ঠ দেহ চিল, শকুন, ছাড়া কেউ স্পর্শ করবে না, আর তোমার সাথে হাত মিলিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে যদি কেউ আসে তাহলে আমার এই ত্রিশূল তাদের গলদেশ ছেদন করে রক্তপাত ঘটাবে। আমি সেই রক্ত দ্বারা স্বগুণ ভূতনাথ ভৈরবগণের অর্চনা করব। তারপর যদি তোমার অস্ত্রে আমার মৃত্যু থাকে আমার কিছু যায় আসে না। আমি কর্মবন্ধন থেকে ছিন্ন হব। জ্ঞানীদের গতি প্রাপ্ত হব। হে মহেন্দ্র, তোমার গদা কেন। নিষ্ফল হয়ে বসে আছে? কিন্তু তোমার ওই বজ্র?

এর প্রতি কোনো বিরূপ সন্দেহ প্রকাশ করো না। ওই অস্ত্র ভগবান ও মহাঋষি দধীচির তপস্যার গুণ দ্বারা তেজীয়ান। ওই অশনি নিক্ষেপ কর, শত্রুকে ধ্বংস করো। তোমার পরাজয়ের কোনো আশঙ্কা নেই। কারণ স্বয়ং শ্রীহরি যার সহায়, তার মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

হে দেবরাজ, তুমি ভাবছ ওই বজ্রের আঘাত আমাকে যন্ত্রণা দেবে? না এরূপ চিন্তা করো না, আমার প্রভু সঙ্কর্ষণের কাছ থেকে আমি যে উপদেশ লাভ করেছি, তার দ্বারা গুরুর চরণে চিত্ত সমাহিত করে দেহত্যাগ করব। যোগীদের গতি লাভ করব। আমি ওই অস্ত্রের আঘাতে আমি বিষয়ভোগ রূপ গ্রাম্য পাশ ছিন্ন হয়ে ভগবান সঙ্কর্ষণের অনুচর হব। তিনি আমাকে স্বর্গাদি সম্পত্তি প্রদান করবেন– আশঙ্কাও ভুল।

আমার প্রভু কখনও এমন সম্পত্তি দান করেন না, যা থেকে দ্বেষ, উদ্বেগমত্ততা বিবাদ থেকে দুঃখ কষ্টের উৎপত্তি হয়। তিনি সেই ভগবান, যিনি ভক্তদের অর্থ, কাম, ধর্ম– এই ত্রিবর্গ বিষয়কে প্রয়াস দূর করেন, যা ধন-সম্পত্তি– ঐশ্বর্যের দ্বারা অনুমান করা যায় না, সেই দুর্লভ ভগবত প্রসাদ অকিঞ্চন ভিক্ষুজন অনায়াসে লাভ করে।

তারপর অসুরপতি বৃত্রাসুর ভগবান শ্রীহরির বন্দনা করলেন- হে ভগবান, যাঁরা তোমার পাদপদ্মযুগল আশ্রয় লাভ করে। আমি তাদের দাস, জন্ম জন্ম এই দাস হয়েই আমি থাকতে চাই। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ। তোমার গুণের কথা আমার মন যেন কখনও বিস্মৃত না হয়? আমার মুখ যেন তোমার নামকীর্তনে সদা মুখর থাকে, তোমারই কর্মে আমার শরীর সর্বদা ব্যাপৃত থাকে। হে ঈশ্বর তুমি সকল সৌভাগ্যের আধার।

তাই তুমি বিনা আমি অন্য কিছু কামনা করি না, ছোট্ট ক্ষুধার্ত শিশু যেমন, মাতৃদুগ্ধ পান করার জন্য স্পৃহান্বিত হয়, প্রোষিত ভর্তৃকা কাম সন্তপ্ত নারী যেমন প্রবাসস্থিত প্রিয়তমের জন্য আকুলি বিকুলি করে, তেমনই আমি, আমার মন তোমার দর্শন লাভের কামনায় ক্রন্দনরত। হে প্রভু, সংসার পুত্র, কন্যা, বিষয় আশয় প্রভৃতির আসক্তি থেকে আমার চিত্তকে বিমুক্ত করো। আমি তোমার দাম হতে চাই। আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিও না।

.

একাদশ অধ্যায়

মহর্ষি শুকদেব বললেন– প্রলয় সমুদ্র জলে ভগবান বিষ্ণুর প্রতি কৌভাসুর যেমনভাবে পতিত হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে বৃত্রাসুর দেবরাজের সামনে পতিত হল। সবেগে শূল ঘুরিয়ে সেটা নিক্ষেপ করল ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে। দানবরাজের ওই শূল উল্কার মতো বেগসম্পন্ন ছিল। আকাশ পথে শূলাস্ত্র ভেসে আসতে দেখে মহেন্দ্র বিন্দুমাত্র ভীত হলেন না। শত পর্ব সমন্বিত বজ্রের দ্বারা তিনি অনায়াসে সেই ত্রিশূল এবং স্থূল ও বিশাল বৃত্রাসুরের একটি বাহু ছেদন করলেন।

একটি বাহু হারিয়ে সিংহনাদে গর্জন করতে করতে বৃত্রাসুর ইন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়াল। পরিখ দিয়ে তার গালে আঘাত করল। ফলে, ইন্দ্রের হাত থেকে বজ্রাস্ত্রটি ভূমিতে পড়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে সুর, অসুর, সিদ্ধ, চারণ এবং গন্ধর্বগণ যেমন দানবদের ভূয়সী প্রশংসা করলেন, তেমনই ইন্দ্রের ভয়াবহ সঙ্কট দেখে উচ্চস্বরে হাহাকার করতে লাগলেন। হাত থেকে অস্ত্র পড়ে যাওয়ায় ইন্দ্র লজ্জা পেলেন এবং পুনরায় সেটি তুলে নেবার আগ্রহ দেখালেন না।

বৃত্রাসুর বলল- হে ইন্দ্র, তুমি কেন বৃথা বিষণ্ণ হচ্ছো? যিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অধীশ্বর, আমরা অর্থাৎ আমাদের দেহ এই সর্বজ্ঞ আদি পুরুষের অধীন। কালরূপী ভগবানই জয় পরাজয়ের কারণ, আমরা নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু সকলে তাকে জয়ের কারণ হিসেবে চিহ্নিত

করে না। জড়রূপে এই যে দেহ তাকেই কারণ বলে স্বীকার করে, কাষ্ঠনির্মিত নারী যেমন স্বতন্ত্র হয়ে কোনো কাজ করতে পারে না, তেমনই প্রাণীবর্গ সেই ভগবান ঈশের পরতন্ত্র। তার প্রেরণা ছাড়া প্রকৃতি, পুরুষ, ভূত, ইন্দ্রিয়, মন, মহতত্ত্ব ইত্যাদি জীবের সৃষ্টিতে সক্ষম হতে পারে না। ঈশ্বর যেমন পিতা প্রভৃতির দ্বারা পুত্র-পুত্রাদি সৃষ্টি করেন। তেমন বাঘ-সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদের দ্বারা তাদের সংহার করেন। তাই-বলছি সকলই যখন ঈশ্বরের অধীন, তখন কেন বৃথা জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ, এসব ধরে রাখতে চাইছ? সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ– এই তিনটি পদার্থ প্রকৃতির গুণ, আত্মার নয়। অনেকে ওই আত্মাকে ওই ত্রিগুণের সাক্ষী হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। তারা হর্ষ-আনন্দ ইত্যাদির দ্বারা আবদ্ধ। হন না।

হে দেবরাজ, তোমার অস্ত্রে আমি আঘাত প্রাপ্ত হয়েছি। আমার অস্ত্র তুমি নিষ্ফল করে দিয়েছ। তুমি আমাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছ, তবুও তোমাকে বধ করার ইচ্ছায় আমি যথাশক্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা করছি। দূতক্রীড়া তুল্য এই যুদ্ধে যোদ্ধা ও প্রতিযোদ্ধার প্রাণই হল প্রধান বাজি। বিভিন্ন অস্ত্র এর পাশ এবং অশ্ব, হস্তি ইত্যাদি ফলক স্বরূপ বিরাজ করে। সেই যুদ্ধরূপ পাশাখেলায় কে জিতবে, আর কে হারবে– আগে থেকে কেউ বলতে পারে না।

শ্রী শুকদেব বললেন– হে রাজন, বৃত্রাসুরের ওইসব নিষ্কপট কথা শুনে দেবরাজ মোহিত হলেন। কিন্তু তা প্রকাশ করলেন না, মাটি থেকে বজ্র তুলে নিলেন। হাসতে হাসতে বললেন– হে দানবেন্দ্র, তোমার বুদ্ধি প্রশংসনীয়। সকলের আত্মা ও সুহৃদ যে জগদীশ্বর তুমি মনপ্রাণ ঢেলে তাঁর সেবা করেছ। তোমার মধ্যে অসুর ভাবের পরিবর্তে মহাপুরুষ ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু ভগবান বাসুদেবের প্রতি তোমার এমন মতির কারণ কী? তা যাই হোক, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ক্ষুদ্র গর্তের জলের ন্যায় ঐশ্বর্যাদিতে তোমার প্রয়োজন নেই, তুমি এখন ঈশ্বরের ভক্তি সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছো?

হে রাজা, তারপর দুই বীর্যবানের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হল। মহাবল বৃত্র কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্মিত ঘোর পরিখবান হস্তে ধারণ করে নিক্ষেপ করল। সেটি আকাশপথে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ইন্দ্রের দিকে ধ্বংসধাবিত হল। পরক্ষণেই সেই অস্ত্র ইন্দ্রের শত গ্রন্থি বিশিষ্ট বজ্রের কাছে পরাভূত হল। সেটি এসে আঘাত করল বৃত্রাসুরের অন্য আর একটি হাতে। তখন দুই বাহুর ছিন্নমূলদেশ থেকে রুধির অনর্গল নির্গত হচ্ছে।

বৃত্রাসুর এবার নীচের চোয়াল ভূতলে এবং ওপরের চোয়াল স্বর্গলোকে সংলগ্ন করে সর্পের ন্যায় উগ্র জিহ্বা, আকাশের ন্যায় গম্ভীর মুখ গহ্বর এবং যমের ন্যায় ভয়ংকর তীক্ষ্ণ দন্তরাজি

দিয়ে ত্রিভুবনকে গ্রাস করতে চাইল। প্রথমে ঐরাবত সহ ইন্দ্রকে সে গ্রাস করল। এ দৃশ্য দেখে দেবতাগণ ও ঋষিগণ হায় হায় করে উঠলেন। বৃত্রাসুরের উদরস্থ হয়েও ইন্দ্রের কোনো ক্ষতি হল না। কারণ তার সঙ্গে ছিল নারায়ণ কবচ। ওই কবচের প্রভাবে এবং যোগ ও মায়াবলে তিনি অসুরজাতি বস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করলেন। সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে শত্রুর মস্তক কেটে দিলেন। বৃত্রাসুরের পতন ঘটাতে ইন্দ্রের দ্রুত বেগযুক্ত বজ্রের তিনশো ষাট দিন সময় লেগেছিল।

বৃত্রাসুর বধ হলে দেবতারা দুন্দুভি বাজালেন। দেবরাজ ইন্দ্রের ওপর পুষ্প বর্ষিত হল, গন্ধর্ব ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ তার বীর্য প্রকাশক মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রশস্তি কীর্তন করলেন। বৃত্রাসুরের পরিত্যক্ত দেহ থেকে একজ্যোতি নির্গত হয়ে লোকতীত ভগবানের কাছে চলে গেল।

.

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রী শুকদেব বললেন– হে মহাবদ্রনামা মহারাজ বৃত্রাসুরের সংহার পর্ব শেষ হলে ইন্দ্র বাদে সকলেই ঈর্ষান্বিত মনে নিজের নিজের বাসভবনে ফিরে গেলেন। কেন ইন্দ্র বিষণ্ণ হয়েছিলেন, এখন সেই বৃত্তান্ত বলছি। বৃত্রাসুরের পরাক্রমে উদ্বিগ্ন হয়ে দেবগণ ও ঋষিগণ তাকে বধ করার জন্য ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা জানালে তিনি ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ভীত হন।

কারণ এর আগে বিশ্বরূপকে বধ করে তিনি যে ব্রহ্ম হত্যার পাপের ভাগী হয়েছিলেন। তা ভূমি, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে ভাগ দিয়ে পাপমুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আবার যদি ব্রহ্মহত্যার পাপে পড়তে হয় তাহলে তা মার্জনা করবেন কী ভাবে?

ইন্দ্রের আশঙ্কার কথা শুনে ঋষিগণ বললেন, আমরা তোমাকে মহা অশ্বমেধ যজ্ঞ করাব, যার দ্বারা ব্রহ্মঘাতী, পিতৃঘাতী, গোহত্যাকারী, মাতৃঘাতী, গুরুহত্যাকারী পাপীও পবিত্র হয়। এমনকি নীচজাতি চন্ডালও যাঁরা নাম কীর্তন করে শুদ্ধ হয়, সেই ভগবান নারায়ণকে ভক্তিভরে অর্চনা করবে। এর ফলে দুষ্টু বৃত্রাসুর কেন, ব্রহ্মসহ চরাচর বিশ্ব সংহার করলেও তুমি পাপলিপ্ত হবে না।

ঋষিদের প্রবোধ বাক্য মতো দেবরাজ ইন্দ্র মহারিপু বৃত্র সংহার করলেন। কিন্তু তাদের স্তোকবাক্য মত ব্রহ্ম হত্যার পাপ তার পিছু ছাড়ল না। ফলে ইন্দ্র হলেন বিষণ্ণ, তিনি কিছুতেই

নিজেকে সন্তাপ মুক্ত করতে সমর্থ হলেন না। বহু গুণযুক্ত ব্যক্তি যেমন একটি নিন্দনীয় কর্ম করে লজ্জাবোধ করেন, ইন্দ্রও তেমনই ব্রহ্মহত্যা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না। ভীষণ ভয়াল মুর্তি ধারণ করে চন্ডালীর ন্যায় ব্রহ্মহত্যা তাকে তাড়া করে বেড়াল। সর্বক্ষণ চোখের সামনে সেই ভয়ংকর মূর্তি ভেসে উঠল জরাব্যাধিগ্রস্ত তার শরীর কাঁপছে। অতিশয় ক্ষয়রোগে দেহ নুয়ে পড়েছে, রক্তে রাঙা বসন পরিহিত তাম্রবর্ণের কেশরাশি। মরা মাছের ন্যায় তার নিশ্বাসে দুর্গন্ধ বিকীর্ণ করে, সে কেবল চিৎকার করছে– তিষ্ট, তিষ্ট অর্থাৎ দাঁড়াও দাঁড়াও। সহব্রহ্ম ইন্দ্র ওই ভয়াল জঘন্যরূপ দেখে ভীত হলেন।

পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষায় স্বর্গ চষে বেড়ালেন। না, কোনো উপযুক্ত স্থান পাওয়া গেল। শেষ পর্যন্ত পূর্বদিকে গমন করে মানস সরোবরে এসে আশ্রয় নিলেন। সেখানে পদ্মের মৃণাল সূত্রসমূহের মধ্যে হাজার বছর কাটিয়ে দিলেন।

ইন্দ্রের অনুপস্থিতিতে নহুষ দেব সিংহাসনে বসলেন। বিদ্যা, তপস্যা ও যোগবলে রাজা নহুষের স্বর্গ পালনের ক্ষমতা ছিল, কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যে তিনি হয়ে উঠলেন ঐশ্বর্যলাভে দাম্ভিক। হিতাহিত জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি একদিন ইন্দ্রপত্নী শচীকে কামনা করলেন। শচী ধর্মলোপ ভয়ে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে দেবগুরু বৃহস্পতির শরণাপন্ন হলে দেবগুরু তাকে নহুষের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় বলে দিলেন।

একদিন নহুষ শচীর কাছে এসে হাজির হলেন। আগের মতোই বললেন– আমিই এখন ইন্দ্র। তুমি আমার ইন্দ্রাণী। এসো, আমরা দুজনে নির্জনে বিহার করি। শচীদেবী দেবগুরুর পরামর্শমতো বললেন– রাজন, ব্রাহ্মণদের বাহক করে সেই শিবিকাতে চড়ে তুমি এলে তবেই আমি তোমার ভজনা করব।

বিপ্রগণকে বাহক করলে ব্রহ্মহত্যার শাপে যে পতন ঘটে, তা মনে হয় নহুষের জানা ছিল না। তিনি অগস্ত্য ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের শিবিকা বহনের জন্য নিযুক্ত করলেন। বাহকেরা দ্রুত পালকি নিয়ে ছুটছিল। কাম উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ঋষিগণকে দ্রুতগতিতে গমনের নির্দেশকালে স্বর্গপতি রাজা নহুষ পা দিয়ে ঋষি অগস্ত্যকে স্পর্শ করে বললেন–সর্প, সর্প। অর্থাৎ চল চল। ঋষি অগস্ত্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি অভিশাপ দিলেন- তুমিই সর্প। সঙ্গে সঙ্গে নহুষ মস্ত এক অজগর সাপে পরিণত হলেন।

ব্রাহ্মণদের আহ্বানে দেবরাজ ইন্দ্র, আবার ফিরে এলেন স্বর্গলোকে। সত্য পালক শ্রীহরির ভজনা করাতে তিনি ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। ভগবানের ধ্যান দ্বারা ইন্দ্র

পাপমুক্ত হলেও ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁকে দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করালেন। কারণ এই যজ্ঞে ভগবান শ্রীহরির আরাধনাই প্রধান কর্ম।

সর্বদেবময় পরমাত্মা পরমপুরুষ শ্রীহরির আরাধনা করার ফলে, সূর্য যেমন তার প্রবল তেজ ও তাপের দ্বারা ঝড়ঝঞ্ঝাকে বিতাড়িত করে, ঠিক তেমনই ভাবে শ্রীহরিই ইন্দ্রের বৃত্রহত্যামূলক পাপের উচ্ছেদ করেছিলেন। ফলে দেবরাজ ইন্দ্র হৃত মহত্ত্ব ফিরে পেয়েছিলেন। . হে রাজন, যে উপাখ্যানে ভগবান শ্রীহরি ও তাঁর ভক্তগণের চরিত্র এবং দেবরাজ ইন্দ্রের পাপমুক্তি

ও বিজয় বর্ণিত হয়েছে, সেই আখ্যান পণ্ডিতগণ সর্বদা পাঠ করেন। এতে ধন ও যশ লাভ হয়। পাপক্ষয় ও শত্রুজয়মূলক এই আখ্যান যে শ্রবণ করে বা পাঠ করে তার সকল কামনা পূরণ হয়, তার আয়ু বৃদ্ধি হয়।

.

এয়োদশ অধ্যায়

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন– হে মহামুনি, রাজাস্তমঃ প্রকৃতি পাপাত্মা বৃত্রাসুর ইন্দ্রের ভয়ে, ভগবানের আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন, একথা বলা যায় না। বরং তিনি রণাঙ্গনে এমন পীরুস্থর প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, যা স্বয়ং ইন্দ্রকে ভীত করে তুলেছিল। শুদ্ধসত্ত্ব দেবতাদের এবং নির্মল মনের ঋষিদেরও যাঁর পাদপদ্ম যুগলের প্রতি ভক্তি জন্মায় না, তাতে বৃত্রসুরের ভক্তির উদয় হল কীভাবে, কোটি কোটি ব্যক্তির মধ্যেও এমন পুরুষ অতি দুর্লভ, যে গৃহ সমাহতেচ যুক্ত হয়ে নারায়ণ পরায়ণ প্রশান্ত চিত্তের মানুষ হয়েছেন। এই অবস্থায় কিভাবে বৃত্রাসুরের ভগবান শ্রীহরির প্রতি ভক্তি জন্মেছিল তা শ্রবণ করার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। আপনি কৃপা করে সেই বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করুন।

শ্রী শূকদেব বললেন– পুরাকালে মহর্ষি ব্যাসদেব, শ্রীনারদ ও দেবলের কাছ থেকে আমি যা শুনেছিলাম, তোমাকে সেই কথাই বলছি। এখন সেই সময় শূরসেন অর্থাৎ মথুরা মন্ডপের রাজা ছিলেন চিত্রকেতু। তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সার্বভৌম নরপতি। রূপবতী, যুবতী, লাবন্যময়ী, বিদ্যাবতী, ঐশ্বর্যশালিনী এবং ঔদার্যপূর্ণ কোটি পত্নী থাকা সত্ত্বেও সেই রাজা ছিলেন সন্তানহীন। বন্ধ্যা পত্নীদের পতি হওয়ায় তিনি সর্বদা মনোদুঃখে ভুগতেন। সমস্ত সম্পদ ঐশ্বর্য, পত্নীগণ, রাজ্য সবকিছু তার কাছে। অবস্থিত মনে হল।

অঙ্গিরা ঋষি একবার ভ্রমণে বেরিয়ে এলোক সেলোক করতে করতে মথুরামন্ডলে এসে হাজির হলেন। ব্রহ্মপুত্র অঙ্গিরাকে দেখে রাজা চিত্রকেতু অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তিনি নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঋষিকে অভিনন্দিত করে সিংহাসনে বসতে বললেন। রাজা নিজে ভূমিতে আসন গ্রহণ করলেন। সম্ভাষণ পর্ব শেষ হলে ঋষি বললেন– তোমার খবর ভালো তো? তোমার রাজ্য এবং পত্নীগণ মঙ্গলে আছেন? যেমন সপ্ত প্রকৃতির দ্বারা জীব নিত্য রক্ষিত হয়, তেমনই রাজও সপ্তবিধ প্রকৃতির অর্থাৎ স্বামী, অমাত্য, রাজ্য দুর্গ, কোষ দন্ড এবং মিত্র দ্বারা সুরক্ষিত হয়। রাজা যেমন প্রকৃতি বর্গের কাছে আত্মসমর্পন করে রাজ্যসুখ ভোগ করে তেমনই প্রকৃতিবর্গ সেই রাজ প্রদত্ত কর্মভার প্রাপ্ত হয়ে ধনসমৃদ্ধি লাভ করে থাকে।

তোমার পত্নীগণ অমাত্য গণ, মন্ত্রীগণ, রাজ্যবাসীগণ সকলে তোমার বশবর্তী আছেন তো? হে রাজা, নিজের মনকে যে বশে রাখতে পারে না, সে কাউকে বশে রাখতে পারে না। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার চিত্তে ব্যাকুলতা জেগেছে। তোমার মুখ চিন্তাচ্ছন্ন, চেহারা বিবর্ণ, তুমি নিশ্চয়ই এমন কোনো কামনা পোষণ করেছ, যা থেকে তুমি বঞ্চিত।

প্রজাবৎসল রাজা বিনয়ে অবনত হয়ে বললেন– হে ভগবান, আপনি সর্বজ্ঞ কোনো কিছুই আপনার অজানা নয়। তবু আপনার আজ্ঞায় আমি আমার মানসিক চিন্তার কথা আপনাকে অবগত করছি। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তি, যেমন মালা চন্দনাদিতে সন্তুষ্ট হয় না, সে জল ও অন্ন আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনই এই বিশাল সাম্রাজ্য, অমাত্যবর্গ, ঐশ্বর্য, প্রজাবৃন্দ সন্তানহীন আমাকে আনন্দ দিতে পারছে না। হে মহাভাগ, আমি সন্তানের অভাবে পূর্বপুরুষগণের সাথে নরকপ্রাপ্তির ভয়ে শিউরে উঠেছি। আপনি আমাকে সন্তান দানে সাহায্য করুন। এই দুস্তর নরক কী ভাবে আমি অতিক্রম করব, আপনি আমাকে বলে দিন।

পরম কারুণিক অঙ্গিরা ত্বষ্ট দেবতার যজ্ঞ শুরু করলেন। চিত্রকেতুর মনস্কামনা জানিয়ে তাকে প্রার্থনা জানালেন। চরু তৈরি করে সেই যজ্ঞে আহুতি দিলেন। তারপর চরুর কিছুটা চিত্রকেতুর সর্বজ্যেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠা মহিষীকে দিলেন। মহিষী কৃতদ্যুতি সেই পরমান্ন ভক্ষণ করলেন।

মহর্ষি অঙ্গিরা বিদায়কালে বলে গেলেন হে রাজন, তুমি একটি মাত্র পুত্রের জনক হবে, যে তোমাকে একদিকে আনন্দ দান করবে, অপরদিকে শোক সাগরে ভাসাবে।

তারপর যথাসময়ে চিত্রভানুর ঔরসে কৃতদ্যুতির গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হল। রাজকুমারের জন্মের সুসংবাদ শুনে রাজ্যবাসী আনন্দে আত্মহারা হল। রাজা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের

ডেকে পাঠালেন। হাতজোড় করে নবজাতক পুত্রের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন, তারপর দানধ্যান শুরু করলেন, বস্ত্র, অলংকার গ্রাম, ঘোড়া, হাতি, দুগ্ধবতী গাভী-সব কিছু ব্রাহ্মণদের হাতে প্রদান করলেন। পুত্রের ধন, যশ ও আয়ু কামনা করে তিনি অকাতরে দান করেছিলেন। রাজা তখন পুত্রকে নিয়ে সদাব্যস্ত থাকেন, তার প্রতি সমস্ত আদর স্নেহ বর্ষণ করেন।

এদিকে মা কৃতদ্যুতিরও পুত্রের প্রতি মোহজনক স্নেহ উদয় হয়েছিল। কৃতদ্যুতি পুত্র লাভ করেছে কিন্তু তার সপত্নীদের পুত্রকামনায় মনস্তাপ জন্মাল অন্তরেও। তাছাড়া পুত্রবতী ভার্যার প্রতি রাজা চিত্রভানু বেশি নজর দিতে শুরু করেছেন। অন্যান্য পত্নীরা স্বামীর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

পুত্রসন্তানের অভাবজনিত দুঃখে এবং রাজার অনাদর হেতু তাদের অবস্থা এমন হল যে নিজেরাই নিজেদের, নিন্দায় মুখর হল। তারা ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে ছাই হতে লাগল। ওই নবজাতক কুমারের প্রতি তারা কোনো আকর্ষণ বোধ করল না। দিনে দিনে তাদের মনের তিক্ততা বেড়ে গেল। রাজার সুখের প্রতি নজর দেওয়াও অবঞ্চিত বলে মনে হল তাদের, তাদের চিত্তে নিষ্ঠুরতা দেখা দিল, তাঁদের বুদ্ধি নাশ হল। তারা বিষপ্রয়োগ করে ওই শিশুকুমারের প্রাণ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন।

সেদিন কুমার শয্যায় ঘুমিয়ে আছে। কৃতদ্যুতি ঘরে এসে ঢুকলেন। ছেলেকে নিদ্রিত দেখে তাকে আর জাগালেন না। নিজে ঘরের মধ্যেই পদচারণা করতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যাওয়ার পর রাজমহিষী বললেন– ধাত্রী ছেলেটাকে জাগিয়ে দাও, আমার কাছে নিয়ে এসো। ধাত্রী রাজমহিষীর আজ্ঞা অনুসারে বালকের বিছানার কাছে এল।

দেখল, ছেলেটি বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে। মণিদুটো নিশ্চল ও ওপরদিকে উঠে আছে। প্রাণহীন দেহটা ঘাটের ওপর শুয়ে আছে। সে আর্ত চিৎকার করে উঠল– হায় হত হলাম, পরক্ষণেই সে বুক চাপড়ে চিৎকার করে হাহাকার করে উঠল।

ধাত্রীর ক্রন্দনধ্বনি শুনে রাজমহিষী ছুটে এলেন। মৃত বালককে দেখে সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা গেলেন। তাঁর আলুলায়িত কেশরাশি ছড়িয়ে পড়ল। বস্ত্র হল অবিন্যস্ত। ততক্ষণে অন্তঃপুরে সকলে এসে হাজির হয়েছে। নিস্পন্দ, নিথর কুমারের দিকে তাকিয়ে সকলে চিৎকার করে কাঁদতে থাকলেন, অপরাধিনী সেই রাজপত্নীগণ কপট শোক বিলাপ করতে লাগল। সপত্নীদের নৃশংসতার বিষয়ে কৃতদ্যুতি কিছুই অবগত ছিলেন না।

পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে রাজা পুত্রের কক্ষের দিকে গমন করলেন। কী কারণে তার হঠাৎ মৃত্যু হল, তার হদিস পেলেন না। আকস্মিক শোক সংবাদে তার চোখ দুটি দৃষ্টি হারাল। ব্যগ্র হয়ে তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে পড়ে গেলেন। আবার উঠে দাঁড়ালেন। বারবার তিনি জ্ঞান হারালেন। পারিষদবর্গের সাহায্যে কোনোরকমে মৃতপুত্রের পায়ের সামনে এসে পড়লেন। তাঁর কেশদাম তখন অবিন্যস্ত, বসন আলু থালু। বাষ্পবিন্দু দ্বারা সংবৃত্ত হয়ে তাঁর কণ্ঠরোধ হল। কথা বলার ক্ষমতা নেই। কেবল চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল আর দীর্ঘনিশ্বাস।

মহিষী কৃতদ্যুতি আক্রোশে বিধাতাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বললেন– হে ভগবান। তোমাকে সবাই দয়ালু বলে জানে, কিন্তু আমি তোমাকে নিষ্ঠুর পাষাণ বলছি। বৃদ্ধ পিতাকে জীবিত রেখে ছোটো ছেলেকে তুমি মৃত্যু দিলে। এই কি জন্ম মৃত্যুর ক্রম। যদি তাই হয়, তাহলে কেন লোকে তোমার কর্মাধীন হবে। জীবগণ নিজ নিজ কর্মনুসারেই যে কোনো সময়ে জন্ম-মৃত্যু ঘটাবে। যে বৃদ্ধ সৃষ্টি ক্ষমতাহীন, তাকে বাঁচিয়ে রেখে শিশুপুত্রের প্রাণ ছিনিয়ে নিলে।

এভাবে চলতে থাকলে সৃষ্টিই বিনষ্ট হবে। তুমি হয়তো বলবে, ঈশ্বর ছাড়া কেবল কর্মদ্বারা জন্ম মৃত্যু সিদ্ধ হতে পারে না। তাহলে আমি বলব, তুমি নিজ সৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য যে স্নেহপাশ রচনা করেছ, নিজের কাজের মাধ্যমে নিজেই তা ধ্বংস করছ। এরকম ব্যবস্থা চলতে থাকলে কোনো পিতা-মাতা

পুত্রাদির প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করবে না।

তারপর মৃত শিশুপুত্রকে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে বিলাপ করতে লাগলেন– বাছা আমার, তোমার এই হতভাগিনী মাকে অনাথ করে দিয়ে যেও না। দেখো, তোমার বাবা তোমার শোকে সন্তপ্ত। চোখ মেলে তাকাও বৎস। দেখো, তোমার সঙ্গীরা তোমাকে ডাকছে। তুমি ওদের সঙ্গে খেলতে যাবে। আর কতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবে। এবার উঠে পড়ো।

হে রাজপুত্র, ওঠো, তোমার নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে। ওঠো স্তন্য পান করো। তোমার পদ্মমুখের মিষ্টি হাসি দেখার জন্য আমার অন্তর আকুল হয়ে উঠেছে। তোমার মধুর কথা আমি কেন শুনতে পাচ্ছি না? তোমার আঁখিপল্লব মুদ্রিত। তাহলে কালরূপী যম কি তোমাকে লোকান্তরে নিয়ে গেছে?

একদিকে মহিষীর বিচিত্র শব্দের বিলাপ, অন্যদিকে রাজা চিত্রকেতুর মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন দুই নারী পুরুষের শোক বিলাপ দেখে উপস্থিত সকলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। একসময় তাদের এমন অবস্থা হল যেন তারা পাথরের ন্যায় নির্বাক, প্রায় জ্ঞানশূন্য।

সর্বজ্ঞ ঋষি অঙ্গিরা রাজা চিত্রকেতুর বিপদের কথা জানতে পেরে নারদকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হলেন।

.

চতুর্দশ অধ্যায়

শুকদেব বললেন– শোক-সন্তপ্ত পিতা চিত্রকেতুকে মৃত পুত্রের সামনে প্রায় অচেতন হয়ে বসে থাকতে দেখে ঋষি অঙ্গিরা ও দেবর্ষি নারদ তাকে নানা সদবাক্যের দ্বারা প্রবোধ দিয়ে বললেন– হে রাজেন্দ্র। সকল বীজ থেকে কী গাছ উৎপন্ন হয়? কোনো কোনো বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটে তা ধীরে ধীরে বেড়ে বৃক্ষে পরিণত হয়, কোনো বীজ অঙ্কুরোদগম কালেই বিনষ্ট হয়।

তেমনই পিত্রাদি রূপ পরিচিত কোন জীব হতে পুত্রাদিরূপে কখনও অন্য জীবের উৎপত্তি হয়, কখনও হয় না, কখনও উৎপত্তি হলেও অকালেই তার বিনাশ ঘটে। আসলে সবই পরমেশ্বরের মায়া। যার কোনো সত্যতা নেই অর্থাৎ পিতৃ-পুত্রভাবের কোনো নিত্যতা নেই।

হে রাজন! বর্তমানে যা কিছু দেখছ, এখানে যারা আছে, প্রত্যেকের সাথেই তোমার কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে, কাল এদের মৃত্যু হলে এরা আর থাকবে না। অর্থাৎ এদের কোনো বাস্তব সত্তা নেই, ভূতগণের সৃষ্টি পূর্ণকাম বলে সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যের কালাকাঙ্খী তুলেও বালকের ন্যায় লীলাচ্ছলেই নিজস্ব মায়ার চিতপরতন্ত্র ভূতসমূহের দ্বারাই ভূত সকলের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। অর্থাৎ কারও দ্বারা কারও সৃষ্টি, কারও দ্বারা কারও পালন, কারও দ্বারা কারও সংহার করছেন, অকালে তার মায়াবলেই সবকিছু সাধিত হচ্ছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

হে রাজা, বীজ থেকে যেমন অপর বীজ উৎপন্ন হয়, সেরকমই পিতৃ প্রভৃতি দেহধারী ব্যক্তির দেহদ্বারা মাতৃপ্রকৃতি দেহধারী অপর ব্যক্তির দেহ থেকে পুত্রাদি দেহধারী দেহই উৎপন্ন হয়। বীজের উৎপত্তিস্থলে ভূমির যেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে না, তেমনই দেহী আত্মার কোনোরূপ

অবস্থান্তর হয় না। একমাত্র সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে মনুষত্বাদি জাতি এবং মনুষ্যাদিরূপ ব্যক্তির ভেদ যেরূপ অজ্ঞান বা মায়ারই কল্পনা মাত্র, সেরূপ ব্রহ্মবস্তুতেই দেহ ও দেহী এরূপ ভেদ অজ্ঞান কর্তৃকই অনাদিকাল হতে রয়েছে। সুতরাং অনাদি সিদ্ধ বস্তুতে কোনোরকম আশঙ্কার উদয় হতে পারে না।

শ্রী শুকদেব বললেন– হে মহারাজ, মহর্ষি অঙ্গিরা ও দেবর্ষি নারদের এহেন উপদেশে আশ্বস্ত হয়ে মনস্তাপে মালিন্যগ্রস্ত নিজ মুখমণ্ডল তুলে রাজা চিত্রকেতু বললেন– হে মহাশয়গণ, আপনাদের জ্ঞানবাক্য শ্রবণ করে আমার ধারণা, আপনারা কোনও মহীয়ান লোকেদের থেকেও মহত্তর। স্বরূপ গোপন করে এখানে এসেছেন। আমি অন্ধকারে নিমগ্ন, মূঢ়বুদ্ধি, গ্রাম্য পশুতুল্য। আপনারা দয়া করে আপনাদের জ্ঞান প্রদান করে আমার অজ্ঞতা দূর করুন।

অঙ্গিরা নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, ঋষি আমিই, তোমার পুত্র কামনা পূর্ণ করেছিলাম, আর ইনি হলেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ। তোমার মতো হরিদাসের পুত্রশোকে তমোম হওয়া উচিত নয়। পুত্রবান ব্যক্তিরা মনস্তাপে ভোগে। এই সংসারের যা কিছু স্ত্রী, গৃহ, ধন, বিবিধ ঐশ্বর্য ও সম্পদরাশি সন্তাপ দায়ক, ভৃত্য, অমাত্য রাজভাণ্ডার, শত্রু, মিত্র, প্রজাবৃন্দ– সকলই অস্থায়ী, এদের যেমন সৃষ্টি আছে, তেমনই বিনাশও ঘটে। এইসবই ইন্দ্রজাল, স্বপ্নের ন্যায়। এদের কোনো বাস্তবসত্তা নেই, সবই অপ্রতীতি মনের কল্পনাপ্রসূত মাত্র। অবশ্য শাস্ত্রে একেই পাপ ও পুণ্য কর্মের ফল বলা হয়েছে। তবুও পুরুষ মনের দ্বারা বিষয় সমূহের চিন্তা দূর করেই তা লাভ করার জন্য কর্মের অনুষ্ঠান করে এবং ফলরূপে স্বর্গাদি প্রাপ্ত হয়। ওই স্বর্গ ইত্যাদিও আসলে মনকল্পিত পদার্থ, তাই বলছি, তুমি স্থির চিত্তে আত্মতত্ত্ব বিচার করো এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিত্যাগ করে শান্তিমার্গে প্রবেশ করো।

.

পঞ্চদশ অধ্যায়

দেবর্ষি নারদ যোগবলে মৃত রাজপুত্রের আত্মাকে অনুশোচনারত জ্ঞাতিদের দেখিয়ে সেই আত্মাকে সম্বোধন করে বললেন–হে জীবাত্মন, তোমার মঙ্গল হোক। দেখো, তোমার বিরহে তোমার পিতামাতা, তোমার প্রিয়জনরা শোকসন্তপ্ত হয়েছেন। অপমৃত্যুর কারণে আয়ুষ্কাল পূর্ণ না হতেই তুমি দেহ পরিত্যাগ করেছ। তুমি আবার নিজ দেহে প্রবেশ করে সুহৃদদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আয়ুর অবশিষ্টকাল পিতৃপ্রদত্ত বিষয় ভোগ করো এবং রাজাসনে উপবেশন করো।

মৃত-শরীরে প্রবেশ করে জীব বলল– কর্মের ফলে আমি দেব, পশু ও মনুষ্যকুলে বারে বারে জন্ম নিয়েছি। জন্ম ভেদে সকল মানুষই সকলের পিতা-মাতা, বন্ধু, আত্মীয়, জ্ঞাতি ইত্যাদি সম্পর্ক হয়ে থাকে, ক্রয়-বিক্রয় যোগ্য দ্রব্য যেমন একের হাত থেকে অন্যের হাতে ঘুরে বেড়ায়, তেমনই মানবগণ একের কাছ থেকে অন্যের কাছে পুত্রাদি নানারূপে ভ্রমণ করে। যার সঙ্গে যতকাল সম্বন্ধ থাকে, ততকাল সে আমায় 'আমার' বলে আঁকড়ে রাখে। জীব আসলে নিত্য বস্তু। দেহের জন্ম মরণের দ্বারা তার জন্ম মৃত্যু ঘটে না। তাই আমি এর পুত্র– এরকম অভিমানও সে করে না। জীবের প্রিয়-অপ্রিয় কিছু নেই। দোষ, গুণ, ক্রিয়াকাল– কিছুই জীব গ্রহণ করে না। জীব কারণ ও কার্যের সাক্ষীমাত্র। আমরা সকলেই এই আত্মা। আমাদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। তাই আমার তোমাদের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নেই। তাই বৃথা শোক বা মোহগ্রস্থ হওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই কথা বলে জীব দেহ ত্যাগ করে চলে গেল।

শুকদেব বললেন– রাজা চিত্রকেতুর যেসব পত্নীরা বালককে বিষদানে হত্যা করেছিল তারা এবার লাঞ্ছিত হল। শিশু হত্যার পাপে পাপগ্রস্ত হল। তারা শিশু হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য যমুনাতীরে গমন করল।

নারদ ও অঙ্গিরার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করে রাজা চিত্রকেতু জীবাত্মা ও ভগবৎ স্বরূপ বুঝতে পারলেন। তিনি গৃহরূপ অন্ধকার থেকে নির্গত হয়ে যমুনার তীরে এলেন। স্নান ও তর্পণ সমাপ্ত করে মৌনী ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে ওই দুই ব্রহ্মপুত্র অঙ্গিরা ও নারদের চরণ বন্দনা করলেন। নারদ সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে মন্ত্র উপনিষদ প্রদান করলেন।

নারদ বললেন– হে মহারাজ! এই মন্ত্র ধারণ করে তুমি সাত রাতের মধ্যে সর্বব্যাপক ভগবান সংকর্ষণ দেবের দর্শন লাভ করতে পারবে। সেই সংকর্ষণ দেবের স্তব করবে– হে প্রভু, যিনি পরম আনন্দময়, যিনি আত্মারাম এবং শান্ত। যা থেকে দ্বৈত দৃষ্টি নিরস্ত হয়েছে, আমি সেই প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সংকর্ষণের প্রতি প্রণিপাত হই। যিনি স্বয়ং বিষয়, ইন্দ্রিয় সকলের ঈশ্বর, সেই মহানও অনন্ত মূর্তিধারী বাসুদেবকে প্রণাম জানাই। যিনি একাকী প্রকাশিত, যিনি নাম ও রূপহীন, যিনি চিন্ময় স্বরূপ কার্য ও কারণের কারণ, তিনি আমাকে রক্ষা করুন।

যা থেকে এই জগৎ প্রপঞ্চ আবির্ভূত হয়ে যাতে অবস্থান করে এবং অন্তে যাঁর মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয়, যিনি চরাচরের সকল পদার্থে অনুসৃত হয়ে আছেন, আমি সেই পরমব্রহ্মকে প্রণাম নিবেদন করি। প্রাণীগণ যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, মন, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা যাঁকে জানতে পারে না, যিনি আকাশের ন্যায় জগতের অন্তরের ও বাইরে বিরাজ করছেন, তিনিই

ব্রহ্ম। জীব স্রষ্টা হলেও সেই ব্রহ্ম বস্তুকে অবগত হতে পারে না। কারণ জাদ্রেদাদি কালে ব্রহ্মই দ্রষ্টা, এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় বলে, জীবন্ততা হতে ভিন্ন নয়। এ অবস্থায় একের মধ্যে কতৃত্ব ও কর্মত্ব উভয়ভাব অসম্ভব বলে, ব্রহ্ম ভিন্ন জীবের পক্ষে ব্রহ্মার গতি বা ব্রহ্মার প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় না। সেই মহাপুরুষ মহানুভব মহবিভূতি ভগবানকে প্রণাম জানাই।

দুর্লভ বিদ্যা দান করে দেবর্ষি নারদ ও ঋষি অঙ্গিরা সেখান থেকে অদৃশ্য হলেন। রাজা চিত্রকেতু ওই মন্ত্র জপ করতে শুরু করলেন। সামান্য জলপান করে সাত রাত কাটিয়ে দিলেন। ওই বিদ্যার প্রভাবে তিনি এক অভর্থ ফললাভ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ওই বিদ্যার বলে তার মন উদ্দীপ্ত হল। সেই মনের দ্বারা গতিশীল হয়ে তিনি দেবদেব ভগবান অনন্তদেবের চরণপ্রান্তে গমন করলেন।

সেখানে তিনি ভগবান সংকর্ষণকে প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি পার্ষদ পরিবেষ্টিত হয়ে রত্ন-সিংহাসনে আসীন। তিনি কিরীটি, কেয়ুর, কঙ্কন, আর কত কী অলংকারে সুশোভিত। তিনি শান্ত ও প্রসন্ন। অনন্তদেবকে দর্শন করে রাজা চিত্রকেতুর সমস্ত পাপ বিনষ্ট হল। তিনি শুদ্ধ হলেন মস্তক অবনত করলেন অনন্তদেবের পাদপদ্ম যুগলের ওপর। চোখের জলে অভিষিক্ত হল সেই চরণদ্বয়। চিত্রকেতু তখন ভগবান বন্দনা করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছেন। নিজের বুদ্ধি বলে মনকে সংযত করলেন। ইন্দ্রিয় সমূহের ব্যহ্যবৃত্তি অবরুদ্ধ করে বাকশক্তি ফিরে পেলেন। জগদগুরু ভগবানের উদ্দেশ্যে স্তব করলেন।

তিনি বললেন– হে ভগবান, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, প্রবেশ, নিয়মাদি, যা কিছু দৃষ্ট হয়, এসবই আপনার বৈভব, জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি ক্রিয়ার কর্তা বলে যাঁরা খ্যাত, সেই ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, প্রভৃতি আপনার অংশস্বরূপ। পুরুষের অংশমাত্র কামনা সহকারে ও নির্গণ স্বরূপ আপনার উপাসনা করলে, উপাসকের ক্রমশ নৈগুণ্য হতে পারে।

হে অজিত, অনিন্দনীয় ভাগবত ধর্মের উপদেশকালে আপনি সর্বপ্রকার জয়লাভ করেছেন। অন্য কাম্য ধর্মের ন্যায় ভাগবত ধর্মে ভেদবুদ্ধি নেই। যে ধর্ম নিজের এবং অন্যের পীড়ার কারণ হয়, সেই ধর্ম কারো কোনো মঙ্গল করতে পারে না। স্থাবর ভাঙ্গন সকল প্রাণীর প্রতি সমবুদ্ধি সম্পন্ন ভগবত ভক্তগণ ওই ভাগবত ধর্মের সেবা করে থাকেন।

হে ভগবান। আপনার নাম যে উচ্চারণ করে, তার সকল পাপ বিনষ্ট হয়, দেবর্ষি নারদের উপদেশেই আমি আপনার দর্শন লাভ করেছি। আমার মনের সমস্ত মলিনতা দূর হয়েছে। আমি পবিত্রতা লাভ করেছি।

হে প্রভু, আপনি অন্তর্যামী আপনি সর্বজ্ঞ, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অধীশ্বর। হে পরমহংস শ্রী, আপনাকে প্রণাম করি, যিনি সৃষ্টির ব্যাপারে উদ্যত হলে, তাঁরই আজ্ঞায় বিশ্বস্রষ্টা দেবগণ নিজ নিজ কাজে উদ্যম প্রকাশ করেন, যিনি আত্মপ্রকাশ দ্বারা জাগতিক প্রকাশ্য বস্তুসমূহের প্রকাশ করলেই ওই সব বিষয়ের প্রকাশে সমর্থ হয়, যার একটি মাত্র মস্তকের এক পাশে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুদ্রাকৃতি সরষের ন্যায় অবস্থান করে। সেই সহস্র শীর্ষ ভগবান অনন্তদেবের চরণে প্রণাম জানাই।

বিদ্যাধরপতি চিত্রকেতুর স্তব বন্দনায় ভগবান শ্রীহরি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। তিনি বললেন– হে রাজন, আমি ভূতসকলের প্রকাশক ও কারণ, আমিই সকল ভূতের আত্মা। অনেকে শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদকে প্রকাশক এবং পরব্রহ্মকে কারণ বলেছেন। এর মধ্যে কোনো মিথ্যা নেই। কারণ ওই শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম আমারই সনাতন মূর্তি। ভোক্তা এবং ভোগ্য উভয়েই কারণরূপী আমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত রয়েছে। আসলে তারা আমার মায়াবলে রচিত।

হে রাজন। সুষুপ্তব্যক্তি যে স্বরূপ দ্বারা সেই সময় নিজের গাঢ় নিদ্রা ও অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভব করে, আমাকেই জীবের সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা বলে জানবে। সুষুপ্তি ও জাগরণ– এই দুই অবস্থায় স্মরণকারী পুরুষের সুষুপ্তি ও জাগরণ অবস্থার প্রকাশরূপে যা নিয়ত বিদ্যমান, অথচ যা উক্ত, উভয় অবস্থা হতে পৃথক পদার্থ, সেই জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম বলে জানবে। এই ধরনের ব্রহ্মই হল আত্মা।

যে ব্যক্তি মনুষ্য জন্ম লাভ করে আত্মাকে অবগত না হয়, সে কোথাও মঙ্গল লাভ করতে পারে না। প্রবৃত্তিমার্গে কামনামূলক কর্মাদির অনুষ্ঠানে নানা রকম যন্ত্রণা ভোগ করে। অপরদিকে নিবৃত্তিমার্গে মোক্ষলাভ করে। সুখলাভে এবং দুঃখ ঘোচানোর জন্য সংসারে নারী পুরুষ নানারকম কাজ করে থাকে। কিন্তু তাতে দুঃখনিবৃত্তি বা সুখপ্রাপ্তি কিছুই হয় না। আত্মার জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত বিলক্ষণ সূক্ষ্মগত চিন্তা করে, মানুষ নিজ বিবেকবলে ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয় হতে বিমুক্ত এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে আমার ভক্ত হবে। তুমি ভক্তি সহকারে আমার এই উপদেশ স্মরণ কর, অচিরেই জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে সিদ্ধিলাভ করবে।

.

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রী শুকদেব বললেন– ভগবান অনন্তদেব অন্তর্ধান করলে বিদ্যাধর চিত্রকেতু সেদিকে তাকিয়ে তার উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। তারপর আকাশ পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বহু লক্ষ বছর অপ্রতিহত দৈহিক বল ও ইন্দ্রিয়শক্তির অধিকারী হয়ে মহাযোগী চিত্রকেতু সিদ্ধিক্ষেত্রে অবস্থান করলেন।

একদিন তিনি আকাশপথে বিমানে চড়ে উড়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন– ভগবান মহাদেব সিদ্ধ চারণগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ভগবতী পার্বতাঁকে কোলে তুলে নিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে বসে আছেন।

তিনি তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। উপহাস করে বললেন– যিনি লোকসকলের গুরু, সাক্ষাৎ ধর্মের বক্তা, জটাধারী, ব্রহ্মবাদী, সেই ভগবান শংকর নির্লজ্জের ন্যায় প্রকাশ্যে স্ত্রীকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। স্ত্রীর সাথে নির্জনে মিলিত হতে হয়, সম্ভবত এই জ্ঞানটুকু ওই দেবতার নেই।

শ্রী শুকদেব বললেন– মহারাজ, চিত্রকেতুর কটু বাক্য শ্রবণ করে গভীর বুদ্ধিধারী শঙ্কর কোনো প্রতিবাদ করলেন না। বরং মুখ টিপে হাসতে লাগলেন। কিন্তু দেবী পার্বতী জিতেন্দ্রিয় ভিমানী, তিনি ধৃষ্ট চিত্রকেতুকে অভিশাপ দিয়ে বললেন– যাঁর চরণপদ্ম ব্রহ্মাদি দেব বৃন্দ ধ্যেয় এবং যিনি স্বয়ং মঙ্গল সকলের মঙ্গল অর্থাৎ পরম ধর্মমূতি, এই ক্ষত্রিয়াধম ব্রহ্মাদি সকলকে অজ্ঞ মনে করে, স্বয়ং জগদগুরুকে শাসন করছে।

এই ধৃষ্টতা দণ্ডযোগ্য অপরাধ। যে তোক নিজেকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, সে হরিপাদমূলের সান্নিধ্য লাভের যোগ্য নয়। হে পুত্র, তোমায় দুর্মতি ভর করেছে। আমার অভিশাপে তুমি অসুর যোনিতে জন্ম নাও। মহাপুরুষদের সামনে ধৃষ্টতা দেখাবার সাহস আর হবে না।

চিত্রকেতু দেবী পার্বতাঁকে প্রসন্ন করে বলেছিলেন– হে দেবী অম্বিকা, আপনার প্রদত্ত অভিশাপ আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। এই সংসার মায়াময় গুণসকলের প্রবাহমাত্র, এখানে শাপ, আশীর্বাদ, সুখ, দুঃখ, নরক-স্বর্গ, সবই মূল্যহীন, স্বয়ং নিষ্কল পরমেশ্বরের নিজের মায়ার দ্বারা সকল প্রাণী ও তাদের বন্ধন, মোক্ষ, সুখ, দুঃখের সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিরন্ধন, তাই সর্বত্র সমভাবে বর্তমান। তার কাছে প্রিয়-অপ্রিয়, বন্ধু-মিত্র, নিকট-পর বলে কিছু নেই।

যেহেতু তার মায়ার দ্বারা সকল পাপ– পুণ্যাদি কর্ম হয়, তাই শরীরীদের সুখ-দুঃখ, হিত-অহিত, বন্ধ-মোক্ষ, জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার উৎপাদনে সমর্থ হয়। তাই বলছি আপনি বৃথা আমায় প্রতি কুপিত হবেন না। আপনি প্রসন্ন হোন। হে মাতা, আমি বস্তুত সাধু ভক্তিই করেছি, যদি আপনার কাছে তা অসাধু বলে মনে হয়, তাহলে ক্ষমা করে দেবেন।

চিত্রকেতুর ধর্মতত্ত্বজ্ঞান দেখে গিরি এবং গৌরী অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। বিমানে আরোহণ করে চিত্রকেতু ফিরে গেলে শংকর পার্বতাঁকে বললেন– হে প্রিয়তমে, নারায়ণের প্রতি যাঁরা ভক্তি প্রদর্শন করেন, তারা কখনও ভীত হন না। তারা ভগবানের একনিষ্ঠ ভক্ত। স্বর্গ, মুক্তি ও নরক–এই তিনটিতেই তারা তুল্য প্রয়োজন দর্শন করে থাকেন। পরমেশ্বরে লীলা করে থাকেন। পরমেশ্বরে লীলা দ্বারাই দেহীদের দেহসংযোগ ও তার দ্বারা দ্বন্দ্ব অনুষ্ঠিত হয়।

যে সকল ব্যক্তি ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তিভাব পোষণ করেন, তাঁরা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বীর্য সম্পন্ন, জগতের কোন পদার্থই তাদের আকৃষ্ট করতে পারে না। চিত্রকেতু ভগবান হরির দাস, তাই তার এমন উদারতার প্রকাশ, এ আশ্চর্য কিছু নয়। আমরা অর্থাৎ প্রধান প্রধান দেবতাগণ যাঁরা স্বয়ং শ্রীহরির অংশ, তারা তাঁর স্বরূপ জানতে পারি না। আর যেসব দেবগণ তাঁর অংশের অংশ, তারা কী করে তার স্বরূপ জানবে? তারা তাই নিজেদের পৃথক ঈশ্বর বলে গণ্য করে। ভগবান শ্রীহরিই সর্বভূতের আত্মা, তিনি সকলেরই প্রীতির একমাত্র বিষয়, মহাভাগ্যবান চিত্রকেতু যে হরির প্রিয় অনুচর, আমিও সেই অচ্যুত শ্রীহরিরই প্রিয়, অতএব, হে সুশ্রোণি, তুমি শান্ত হও।

শ্রী শুকদেব বললেন–চিত্রকেতু ছিলেন সাধুজন। দেবীকে অভিশাপ দানের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজে ভগবতীর অভিশাপ নিজ মস্তকে গ্রহণ করেছিলেন। এবং সেই শাপে তিনি দানবী যোনি প্রাপ্ত হয়ে ত্বষ্টার যজ্ঞে আবির্ভূত হন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন মহাপরাক্রমশালী অসুরপতি বৃত্রাসুর। হে রাজন, ভগবত মাহাত্মে পরিপূর্ণ চিত্রাসুরের এই পবিত্র আখ্যান যে শ্রবণ বা পাঠ করে সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়।

.

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রী শুকদেব বললেন– সবিতার পত্নীর নাম পৃশ্নি। তাদের সন্ততিদের নাম সাবিত্রী, ব্যাহৃতি, অগ্নিহোত্র, পশুগ, সোমবাগ, ত্রয়ী, চাতুর্যান্য যাগ এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞ। আদিত্য ভগের ঔরসে

স্ত্রী সিদ্ধির গর্ভে তিনটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হয়– মহিমা, বিভু ও প্রভু এবং কন্যা আশী। কুহ, মিনাবলী, অনুমতি ও রাকা, ধাতার চার পত্নী।

এরা যথাক্রমে সয়ং, দর্শ, পূর্ণমান ও প্রতিঃ–নামে চার সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। বিধাতার পত্নী ক্রিয়া ও পুরীষ্য নামক পাঁচজন অগ্নির জন্মদাত্রী। বরুণ পুত্র ভৃগুর মাতা চনী বল্মীক থেকে উৎপন্ন হয়ে যিনি মহাযোগী বাল্মিকী হয়েছিলেন। মিত্র ও বরুণ উভয়েই উর্বশীর সমক্ষে কুম্ভের মধ্যে বীর্যাধান করার ফলে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম হয়। মিত্রের ঔরসে, রেবতীর গর্ভে উৎসর্গ, অবিষ্ট ও পিমুল নামে তিন সন্তানের জন্ম হয়, প্রাচীনগণ বলে থাকেন, পৌলমী অর্থাৎ শচীর গর্ভে এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বীর্যে তিন পুত্রের জন্ম হয়- জয়ন্ত, ঋষভ এবং মীয়ুষ।

স্বেচ্ছায় বামনরূপ ধারী ভগবান উরুক্রম তাঁর ভার্য্যা কীর্তির গর্ভে বৃহৎশ্লোক নামে এক পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। কাশ্যপ পত্নী দিতি যেসব দৈত্যদের জন্ম দিয়েছিলেন তার মধ্যে ভগবান প্রহ্লাদ ও বলির নাম উল্লেখ্য। এছাড়া দিতি দুটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। তারা দৈত্য ও দানবদের দ্বারা পূজ্য।

দানবী জম্ভাসুরের কন্যা এবং হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী কয়াধু চারটি পুত্রের জননী হয়েছিলেন– সংহাদ, অনুদ, হ্রদ ও প্রহ্লাদ। বিপ্রচিত পত্নী এবং হিরণ্যকশিপুর কন্যা সিংহিকা এক পুত্র প্রসব করেন, তাঁর নাণ রাহু, দেবগণের সাথে অমৃত পান করার চেষ্টা করলে ভগবান শ্রীহরি সুদর্শন চক্র দ্বারা তার মুন্ড কর্তন করেন।

সংহ্রাদের পত্নীমতি পঞ্চজন, হ্রদের স্ত্রী ধমনি– বাতাপি ও ঈম্বল এবং অহুহ্রাদের পত্নী সূর্যা, বাস্কল ও মহিষ নামক পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। বিরোচনের পিতা ছিলেন প্রহ্লাদ।

বিরোচন ও দ্রবীর পুত্র বলি। বলি ও অশনা একশো পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র বান দিতির পুত্র, মরুদগণ নিঃসন্তান ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাদের দেবত্ব লাভ করান।

পরীক্ষিৎ জানতে চাইলেন- হে গুরুদেব, মরুদগণ কি এমন পুণ্যকর্ম করেছিলেন। যার দ্বারা তারা আসুরভাব পরিত্যাগ করে দেবত্ব প্রাপ্ত হন।

শ্রী শুকদেব বললেন– মহারাজ, বিষ্ণুর সহায়তা লাভ করে ইন্দ্র দিতির সমস্ত পুত্রদের হত্যা করলেন। দিতি পুত্রশোকে কাতর হয়ে হাহাকার করে উঠলেন। তিনি পুত্রশোকে জ্বলতে জ্বলতে প্রতিজ্ঞা করলেন আমি ওই সুখানক্ত, স্বভাব, কঠিন চিত্ত, ভ্রাতৃঘাতী পাপিষ্ঠ ইন্দ্রকে হত্যা করে

সুখে দিন কাটাব। ইন্দ্র এই দেহগুলিকে নিত্য জ্ঞান করে অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল হয়েছেন। এমন পুত্র জন্ম দেব, যে ইন্দ্রের গর্ব চূর্ণ করবে।

এইরকম শপথ নিয়ে দিতি স্বামী সেবায় ব্রতী হলেন। স্বামীর মনানুযায়ী চলতে লাগলেন। তার প্রতি পরম ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। মিষ্টি মিষ্টি কথা এবং মুচকি হেসে কটাক্ষ পাত করে পতির মন আকৃষ্ট করলেন। বিদ্বান কশ্যপ মনোরমা পত্নীর অধীন হলেন।

কশ্যপ তার পত্নীকে সম্বোধন করে বললেন– হে প্রিয়তমা, স্বামীকে যে নারী পরিতুষ্ট করে তার মনের বাসনা সর্বদা পূরণ হয়। বলো, তুমি কী বর আশা করো? নারীদের কাছে পতিই পরম দেবতা। তোমার ভক্তিপূর্ণ পূজো আমাকে সন্তুষ্ট করেছে। অতএব আমি তোমার সেই অভিলাষ সম্পাদন করব। যা অসতী রমণীদের পক্ষে দুর্লভ দিতি বললেন– হে ঋষি, আমি মৃত পুত্রা। ওই দাম্ভিক ইন্দ্র বিষ্ণুর সাহায্য নিয়ে আমার দুই পুত্রকে হত্যা করেছে। আমি ওই ইন্দ্রকে বিনষ্ট করতে চাই। আমাকে ইন্দ্র বিনাশকারী একটি অমর পুত্র দান করুন।

দিতির এই ভয়ংকর প্রার্থনা শুনে কশ্যপ মনে মনে কেঁপে উঠলেন। পরিতাপের সুরে স্বগোক্তি করলেন হায়, আজ আমার ধর্ম ধূলিসাৎ হতে চলেছে। কেন যে বিষয় ও ইন্দ্রিয়সুখে আকৃষ্ট হয়ে ওই রমণীর বশীভূত হলাম? আমার নিশ্চয়ই নরকবাস হবে। স্বভাবের অনুবর্তিণী রমণীর এই ধরনের বর প্রার্থনা ধিকৃত নয়। কিন্তু যেহেতু আমিই অজিতেন্দ্রিয়, অতএব, স্বার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞ আমাকেই ধিক।

স্বার্থসিদ্ধি পরায়ণা নারী যে কোনো কাজ অনায়াসে করতে পারে না। তারা প্রয়োজনে স্বামী-পুত্র ভাইকে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। কিন্তু শরতের পদ্মের মতো সুন্দর মুখোনি দেখে বোঝার উপায় থাকে না যে হৃদয় ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার।

যাই হোক কশ্যপ ভাবলেন, এমন উপায় বের করতে হবে, যার সাহায্যে দুটি কাজই সুসম্পন্ন হয়। অর্থাৎ দিতির কাছে মিথ্যেবাদী হতে হবে না, আবার ইন্দ্রও বধ হবে না। এইভাবে কশ্যপ নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করলেন, তারপর দিতিকে বললেন– হে কল্যাণী, ইন্দ্রের হত্যাকারী পুত্রলাভের জন্য নিয়ম ও নিষ্ঠা অনুসারে ব্রত পালন করতে হবে।

দিতি ব্রত ধারণ করতে রাজী হলে কশ্যপ বললেন– এই ব্রত কীভাবে পালন করবে, প্রথমে তা বলছি শোনো। প্রতিদিন ভোর বেলা শয্যা ত্যাগ করে স্নান করে শুদ্ধ কাপড় পরে মাঙ্গলিক দ্রব্যে সাজবে। পবিত্রভাবে, গো, ব্রাহ্মণ, সাক্ষী ও নারায়ণের ভজনা করবে। বীরবতী

রমণীদের উদ্দেশ্যে মালা, বস্ত্র, অলংকার ও গন্ধ নিবেদন করবে। পতির অর্চনা করবে। তিনি তোমার উদরে অবস্থান করছেন, এমন কল্পনা করে তার ধ্যান করবে।

হে দিতি, এবার শোনো গর্ভবস্থাকালীন একত্রিশটি নিষিদ্ধ কার্যের কথা। কাউকে শাপ দেবে না, প্রতিহিংসা পরায়ণ হবে না, নখ ও রোম ছেদন করা চলবে না, অশুভ বা অমঙ্গলজনক কোনো দ্রব্য স্পর্শ করবে না, মিথ্যাচারী হবে না, কখনও কুপিত হবে না, জলের মধ্যে ডুব দিয়ে কখনও স্নান করবে! অধৌত বসন পরিত্যাগ করবে, দুর্জনের সঙ্গে বাক্যালাপ করবে না। গ্রহণ করা মালা ধারণ করবে। আঞ্জলির দ্বারা জল পান করবে না, ভদ্রকালীর নিবেদিত অন্ন, উচ্ছিষ্ট অন্ন, আমিষযুক্ত অন্ন, শুদ্রের রান্না করা অন্ন, রজঃস্বলার দৃষ্ট অন্ন কখনও গ্রহণ করবে না।

সন্ধ্যাকালে চুল এলো করে রাখবে না। অনাবৃতা দেহে বাইরে যাবে না। অলংকারশূন্য হয়ে ও আচমন স্নান না করে গৃহের বাইরে পা দেবে না। পা দুটি অপ্রক্ষালিত বা আর্দ্রপদ হয়ে কখনও শয়ন করবে না। উত্তর বা পশ্চিমদিকে মাথা রেখে শয়ন করবে না। প্রাতঃকালে বা সান্ধ্যকালে অথবা নগ্ন অবস্থায় শয়ন করা নিষিদ্ধ। তুমি যদি এক বছরকাল এই পুংসবন ব্রত ধারণ করতে পারো তাহলে তুমি ইন্দ্রবিনাশকারী পুত্র লাভ করবে।

উদারমতি দিতি মাথা অবনত করে কশ্যপের উপদেশমতো সব করবেন বলে স্বীকার করলেন, কশ্যপ তার গর্ভে বীর্যাধান ঘটালেন। এরপর শুরু হল দিতির ইন্দ্রনাশকারী ব্রতানুষ্ঠান।

এদিকে দিতির মনের এই অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে ইন্দ্র তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি ছলনার আশ্রয় নিলেন। ব্যাধ যেমন হরিণদের ঠকানোর জন্য মাঝে মাঝে নিজে মৃগবেশ ধারণ করে, তেমনই কপট, সাধুবেশে ইন্দ্র দিতির পরিচর্যা করেছিলেন। বন থেকে ফুল, ফল, মূল, কুশ, পত্র, মৃত্তিকা সংগ্রহ করে এনে দিতেন আর দিতির ব্রতের খুঁত ধরার চেষ্টা করতেন। কিন্তু দিতি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ব্রত পালন করেছিলেন, কোনো একটি খুঁত না পেয়ে ইন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত চিন্তিত হলেন।

একদিন আচমন ও পা ধৌত না করেই শয়ন করলেন। যোগেশ্বর ইন্দ্র এই অবকাশে যোগমায়ার দ্বারা দিতির উদরে প্রবেশ করলেন। দিতি অচেতনে নিদ্রিত থাকায় কিছুই টের পেলেন না। ইন্দ্র দিতির উদর মধ্যস্থিত স্বর্ণপ্রভ গর্ভস্থশিশুকে বজ্রদ্বারা সাতভাগে ভাগ করলেন।

ওই সাত গর্ভখণ্ড কেঁদে উঠল। ইন্দ্র তাদের সান্ত্বনা দিয়ে আবার প্রত্যেকটি টুকরোকে সাতটি ভাগে ভাগ করলেন। এবার সব গর্ভ খণ্ডগুলি কঁদতে কাঁদতে বলে উঠল– হে ইন্দ্র, আমরা তোমার ভ্রাতা, আমরা মরুৎ। কেন ভ্রাতৃহত্যা করছ? ইন্দ্র সদ্ভাব সম্পন্ন সেই মরুৎগণকে বললেন– তোমরা ভীত হয়ো না। তোমরা আমারই ভাই।

–হে মহারাজ, মাতৃগর্ভে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ হয়েও ভগবান শ্রীহরির অনুকম্পায় তুমি যেমন বিনষ্ট হও নি, তেমনই শ্রীনিবাসের অনুগ্রহে দিতির গর্ভস্থ খণ্ডগুলি ইন্দ্রের বর্জ্যের দ্বারা মৃত্যুগ্রস্ত হল না। সেই ঊনপঞ্চাশ জন মরুৎ ইন্দ্রের সাথে মিলিত হয়ে পঞ্চাশজন দেবতা হলেন। ভগবান তাদের মাতৃদোষ অর্থাৎ অসুরভাব দূর করে তাঁদের সোমপানের অধিকার দিয়েছিলেন।

নিদ্রাভঙ্গ হলে ইন্দ্রের সাথে মিলিত অগ্নির ন্যায় তেজীয়ান পুত্রগণকে দেখে অনিন্দিতা দেবী দিতি অত্যন্ত তুষ্ট হলেন। তিনি ইন্দ্রকে সম্বোধন করে বললেন– হে বৎস, আমি অদিতির পুত্রদের ভয় উৎপাদক সন্তানলাভের ইচ্ছায় এক বছর সময় ধরে অত্যন্ত দুষ্কর ব্রত পালন করেছিলাম। আমি একটি মাত্র সন্তানের প্রার্থনা করেছিলাম। কিন্তু এমন দেখছি উনপঞ্চাশজন। এ কী করে সম্ভব হল?

তখন দেবরাজ ইন্দ্র অকপটে সমস্ত কিছু স্বীকার করলেন। বললেন– হে অম্বে, যাঁরা নিষ্কামভাবে ভগবানের আরাধনায় রত হয়ে মোক্ষপদ লাভ করার বাসনা প্রকাশ করে না, তারাই প্রকৃতপক্ষে স্বার্থকুশল।

ভক্তের নিকট আত্মস্বরূপ সমস্ত জগতের অধীশ্বর ভগবান হরির আরাধনা করে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিষয় ভোগরূপ তুচ্ছ ফলের প্রার্থনা করতে পারে? হে, মহীয়সী মাতা, আমি মূর্খ, আমার দুর্বলতা ক্ষমা করুন। আপনার গর্ভ মৃত হয়েও পুনরায় জাগ্রত হয়েছে আপনার সৌভাগ্যের কারণে।

ইন্দ্রের এই আন্তরিক শুদ্ধ বাক্যে দিতি অত্যন্ত তুষ্ট হলেন। দিতির অনুমতিক্রমে ইন্দ্র মরুৎগণকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গের পথে যাত্রা করলেন।

.

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রী শুকদেব এবার মহারাজ পরীক্ষিতের ইচ্ছানুসারে পুংসবন ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে শুরু করলেন।

তিনি বললেন– অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে এই ব্রত করার নিয়ম। ব্রত শুরু করার আগে নারী তাঁর স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করবে। ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে মরুৎগণের জন্মবৃত্তান্ত শুনবে। তারপর স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করবে। এই ব্রতে ভোরবেলা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পুজো করতে হয়। বিষ্ণুর স্তব করে বলবে– হে ভগবান, আপনি ঐশ্বর্যশালী লক্ষ্মীদেবীর পতি, আপনি পুণ্যকাম, আপনাকে প্রণাম জানাই।

হে ঈশ, আপনি কৃপা, ধৈর্য, তেজ, মহিমা ও সামর্থ্য এবং সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি অন্যান্য সকল প্রকার গুণরাশির দ্বারা যথাযথ সমৃদ্ধ। আপনি সকলের প্রভু। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। হে জন্মদাতা, হে মহাভাগে, আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হোন। আপনাকে প্রণতি জানাই– এইভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করতে হয়।

এ বার ধ্যান করবে মহানুভব ভগবান মহাপুরুষকে প্রণতি জানাই, মহাবিভূতির সহিত মহাবিভূতি অতি ভগবানের নিমিত্ত পুজোপহার আহরণ করছি। এবার পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয় বসন, ভূষণ, উপবীত, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ দীপাদি ইত্যাদি উপচার নিবেদন করতে হয়। এবার যজ্ঞ করে বারোবার ওইসব দ্রব্যসামগ্রীর অবশিষ্টাংশ আহুতি দেবে।

এই সময় মন্ত্র বলবে– ভগবান মহাপুরুষ মহাবিভূতি পাজক প্রণাম, স্বাহা। ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে পুজো শেষ করে ভূমিতে মাথা স্পর্শ করে প্রণাম করবে। দশবার মন্ত্র জপ করার নিয়ম।

পুংসবন ব্রতের স্তোত্র– হে দেব, হে দেবী, আপনারা এই বিশ্ব চরাচরের জনক-জননী। সূক্ষ্ম প্রকৃতির দূরত্যায়া মায়াশক্তি এই লক্ষীদেবীর আপনিই পরম অধীশ্বর, আপনি নিজে সকল প্রকার যজ্ঞ, আর লক্ষ্মীদেবী যজ্ঞ নিষ্পাদক ভাবনা রূপ বিশেষ।

লক্ষ্মীদেবী ক্রিয়া, আর আপনি সেই ক্রিয়াকালের ভোক্তা। সকল জীবের আত্মায় আপনি বিরাজিত, আর লক্ষ্মীদেবী দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণস্বরূপা। আপনি পরমেশ্বর আর লক্ষ্মীদেবী পরমেশ্বরী। আপনাদের অনুগ্রহে সকল প্রার্থীর কামনা পূরণ হয়। আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমাকে বরদান করুন।

ভগবানের স্তব শেষ করে নিবেদিত দ্রব্যসামগ্রী সেখান থেকে সরিয়ে ফেলবে। তারপর আচমন করবে এবং অর্চনা করবে। আবার ভক্তিসহকারে স্তব পাঠ করে পুজো করার নিয়ম।

পত্নী তার পতির ভজনা করবে। এবং পতিপ্রেম পরবশ হয়ে পত্নীর সকল কাজে আনুকূল্য প্রদর্শন করবে। এই ব্রত, পতি অথবা পত্নী যে কোনো একজন করতে পারে। কিন্তু ফল দুজনেই লাভ করে।

এই ব্রতের মাহাত্মে নারী সন্তানহীনা হয় না, ব্রাহ্মণ ও ত্রয়োস্ত্রীদের মালা, গন্ধ, স্বর্ণ ও অন্যান্য সামগ্রী দান করতে হয়। ভগবানের আরাধনা শেষ করে তাকে নিবেদিত ভোগ সামগ্রী প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করবে। এবার দেবতাকে নিজ বাস ভবনে প্রতিষ্ঠার জন্য বিসর্জন দেবে।

এইভাবে অগ্রহায়ণ থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত পূজো করতে হয়। ব্রত ভঙ্গের দিন উপবাসী থেকে ভোরবেলা স্নান সেরে আচমনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করবে। তারপর শ্রীহরির পুজো করবে। বারোবার ঘি যুক্ত খই হোমযজ্ঞে প্রদান ব্রাহ্মণদের প্রণাম করবে। তাদের অনুমতি নিয়ে আহার করবে।

এবার আচার্য ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে পতিদেবতা পত্নীর কাছে আসবে। অবশিষ্ট পত্নীর কাছে আসবে। অবশিষ্ট চরু যা সৎপুত্র ও সৌভাগ্যদায়ক, দুজনে মিলে তা সকলের মধ্যে দান করবে। যে পুরুষ এই বিষুব্রত ভক্তি ও নিষ্ঠাসহকারে পালন করে, শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় তার সকল অভিষ্ট পূরণ হয়। আর ব্রতকারী নারী সন্তানবতী হয়। এই সৌভাগ্যদায়ক ব্রত যশ ও গৃহদানে সমর্থ হয়। ঐশ্বর্য কামনা করে এই ব্রত করলে সে আশা পূরণ হয়। কুমারী কন্যা এই ব্রত পালন করলে সর্বসুলক্ষণ যুক্ত পতিলাভ করে আর বিধবা রমণী পুণ্যগতি প্রাপ্ত হয়। মৃতবৎসা স্ত্রী ওই ব্রতের কল্যাণে জীবিতপুত্রা ও ধনেশ্বরী হয়। দুর্ভাগা নারী সৌভাগ্যবতী এবং বিরূপা রমণী সুন্দরীতে পরিণত হয়। হে মহারাজ, এই ব্রত রোগমুক্ত করে। যজ্ঞ, পিতৃ-মাতৃর শ্রাদ্ধ-কর্ম বা যে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এই উপাখ্যান পাঠ করলে পিতৃ ও দেবতাগণ অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করেন।

হে ভারত রাজ পরীক্ষিৎ। এই মরুৎগণের পুণ্যজন্ম এবং দিতির মহৎ ব্রত- বৃত্তান্ত; যা সকল প্রকার কার্য ফল প্রদান করে।

সপ্তম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

নারদ ও যুধিষ্ঠিরের সংবাদ, জয় ও বিজয়ের দৈত্যজন্ম লাভ

পুরাণের দশটি লক্ষণের মধ্যে এই সপ্তম স্কন্ধে উতির বর্ণনা করা হয়েছে। উতি শব্দের অর্থ বাসনা। এই বাসনা জন্মান্তরীয় শুভ ও অশুভ কর্ম অনুসারে দুই প্রকার অর্থাৎ শুভ বাসনা ও অশুভ বাসনা, মহত্ব্যক্তিদের কোপে অশুভ বাসনা এবং মহতের অনুগ্রহে শুভ বাসনার উদয় হয়ে থাকে। যেমন সনকাদির কোপে বৈকুণ্ঠের দ্বারপালদ্বয় জয় ও বিজয়ের অশুভ বাসনা এবং দেবর্ষি নারদের অনুগ্রহে দানবীগর্ভস্থ প্রহ্লাদের ভগবান শ্রীনৃসিংহে সদ্ভাক্তির উদয় হয়।

আর ভক্ত প্রতিকুলাচারী হলেও শ্রীভগবান তাদের রক্ষা করেন। যেমন বৈকুণ্ঠবাসী দ্বারপালদ্বয়ের তৃতীয় জন্মে পুনরায় আত্মসাৎ করেন। অতএব মহতের অনুগ্রহ লাভের জন্য সকলেরই যত্ন করা কর্তব্য।

সপ্তম স্কন্ধের প্রথম দশটি অধ্যায়ে দৈত্য ও দৈত্যপুত্র প্রহাদের প্রতি মহতের কোপ ও অনুগ্রহ হেতু বাসনা ভেদ বর্ণিত হয়েছে। শুভ কর্ম দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরই সবাসনা সমুৎপন্ন হয়। অতি পর পাঁচটি অধ্যায়ে আশ্রয় ধর্মোক্ত কর্ম সকল বর্ণিত হবে।

পূর্ব স্কন্ধের শেষে ভগবান বিষ্ণুর সাহায্যে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক পুত্র বিনষ্ট হওয়ায় দিতি পরিতাপ, করছিলেন ঘটনাবলী শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন –হে ব্রাহ্মণ, ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং প্রাণিগণের হিতকারী বন্ধু, পক্ষপাতহীন ও প্রিয় হয়ে, বিষম (অর্থাৎ পক্ষপাতাদি –বিশিষ্ট) জীবের মত ইন্দ্রের স্বার্থে দৈত্যদের কী করে বধ করলেন? আর, হে মুনি, যার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধি হয়, সে তার পক্ষপাতী হয়ে থাকে এবং যা থেকে ভয়ের সম্ভাবনা হয়। বিদ্বেষ বশতঃ তাকে বধ করে থাকে — এটা ঠিক। কিন্তু এখানে পক্ষপাত অথবা ভয়ের কারণ কিছুই দৃষ্ট হয় না। যে ভগবান সাক্ষাৎ পরমানন্দস্বরূপ তার দেবগণ হতে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে? আর যিনি অগুণ, (অর্থাৎ প্রাকৃত গুণকার্য দৈদিতে আমি আমার –এরূপ অধ্যাস –রহিত) তাঁর অসুরগণের থেকে ভয়ের সম্ভাবনা কি? অপরপক্ষে, তার কারো সাথে দ্বেষভাবও নেই। তবে ইন্দ্রের সাহায্যের জন্য ভগবান এরূপ গর্হিত কর্ম কেন করলেন? হে মহাভাগ, নারায়ণের অনুগ্রহ– নিগ্রহাদি গুণের প্রতি আমাদের সুমহৎ সংশয় জন্মেছে। আপনি অনুগ্রহ করে সে সংশয় নিরসন করুন।

শ্রী শুকদেব বললেন– মহারাজ, ভগবান হরির অদ্ভুত চরিত্র সম্বন্ধে তুমি যা প্রশ্ন করেছ, তা অতি সুন্দর হয়েছে। যে চরিত্রে পরম পুণ্য (সকল পাপ –নিবর্তক) ও ভগবানের ভক্তিবর্ধক পরম ভাগবত প্রহ্লাদের মাহাত্ম্য নারদাদি ঋষিগণ কর্তৃক কীর্তিত হয়েছে।

অতএব মহামুনি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে নমস্কার করে শ্রীহরির কথা বলব ভগবান বিষ্ণু প্রকৃতির পর অর্থাৎ অতীত। অতএব নিগুণ, অজ ও অব্যক্ত অর্থাৎ রাগ– দ্বেষাদির নিমিত্ত ভূত দেহেন্দ্রিয়াদি রহিত। কিন্তু এরূপ হয়েও স্বীয় মায়ার গুণ যে সত্ত্বাদি তাতে অধিষ্ঠান করে বাধ্য ব্যক্তিদের প্রতি বাধ্যকতাপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন, অথবা দেব ও দানবদের পরস্পর যে বাধ্য-বাধকতা, তার হেতু হন। হে রাজন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ- এই তিনটি গুণ- মায়ার, আত্মার নহে। অতএব গুণসকল স্বকীয় না হওয়ার, ভগবানকে প্রাকৃত পুরুষের মত বিষম বলতে পারা যায়

না। হে মহারাজ, এই গুণসকলের একেবারে হ্রাস অথবা বৃদ্ধি হয় না। সত্ত্বগুণ নিজের বৃদ্ধি সময়ে দেব ও ঋষিগণকে ভজনা করে অর্থাৎ সেই দেহে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের বর্ধিত করে এইরূপ রজোগুণ নিজের বৃদ্ধিকালে অসুরদের এবং তমোগুণ নিজের উন্নতি সময়ে কালের অনুগুণ হয়ে যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতিকে অবলম্বন করে থাকে।

যদিও ভগবান সকলের প্রতি সম, তথাপি নিমিত্তভেদে তার বৈষম্য হতে পারে। যেমন কাষ্ঠাদিতে অগ্নি, পাত্রাদিত জল, ঘট –পটাদিতে আকাশ নানারূপে প্রকাশ পায়, তেমনি গুণভেদে সেই ভগবান নানারূপে প্রকাশ পান। দেবাদিব দেহ হতে পৃথকরূপে তিনি বিবেচিত হন না। তবে তিনি সকলকে আশ্রয় করে আছেন–ইহা কি করে জানা যাবে? উত্তর–নিপুণ ব্যক্তিরা স্বভাব ও কর্ম দ্বারা আত্মস্থ ঐ আত্মাকে মন্থন করে অর্থাৎ কার্যদর্শন লিঙ্গ–দ্বারা বিচার করে জানতে পারেন। যেমন সূর্যকান্ত মণি প্রভৃতির দাহ দেখে জ্যোতিঃ জানা যায়, তেমনি নিপুণ ব্যক্তিগণ–দেহে কার্য দেখে পরমাত্মার স্থিতি অনুমান করেন।

মায়ার গুণবশতঃ এরূপ পরমশ্বেরের স্বাভাবিক নয়। তথাপি গুণ–পরতন্ত্র বলে তাঁর অবিনশ্বরতা আকাঙ্ক্ষা করা যায় না। কারণ সেই পরমেশ্বর জীবের ভোগের জন্য যখন নিজের মায়ার দ্বারা পুর বা দেহ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন সাম্যাবস্থায় স্থিত রজোগুণকে পৃথক সৃষ্টি করেন। পরে ঐ সকল বিচিত্র দেহে ক্রীড়া করতে ইচ্ছা করে সত্ত্বগুণকে পৃথকরূপে সৃষ্টি করেন, তারপর শয়ন (অর্থাৎ সংহার) করতে ইচ্ছা হলে তমোগুণের সৃষ্টি করেন। হে নরদেব, সেই পরমাত্মা কালেরও পরতন্ত্র নহেন, কারণ তিনি ঈশ্বর। এবং সত্যকৃৎ অর্থাৎ অমোঘকর্তা। প্রকৃতি ও পুরুষ–এই দুইটির নিমিত্ত দ্বারা অর্থাৎ এদের সহাকারত্ব–হেতু আশ্রয়–রূপে বর্তমান যে কাল, তাকেও তিনিই সৃষ্টি করেন। অতএব কাল তার চেষ্টাস্বরূপ হওয়ার তিনি কালের অধীন নন। এই কাল সত্ত্বগুণকে বর্ধিত করে।

সেজন্য তাহা ঈশ্বর হয়েও সত্ত্ব প্রধান দেবতাদের বর্ধিত করে এবং তাদের প্রতিপক্ষ অসুর–সকলকে হিংসা করে থাকে। এই কারণে ঐ কালের যশঃ অতিশয় মহৎ। এই তাৎপর্য এই যে–কোন শক্তির দ্বারা গুণসকল স্ফুরিত হলে, তজ্জন্য যে বৈষম্য হয়, সেই বৈষম্য সন্নিধান–মাত্রে তার অধিষ্ঠাতায় স্ফূর্তি পেয়ে থাকে। (দেবতাগণ প্রায় ভক্ত বলে তাদের প্রতি ভক্তজনপ্রিয় ভগবানের এই বৈষম্য ভূষণই, দূষণ নয়। আবার কখন কখন অসুরগণের দ্বারা দেবতাদের পরাভব ঘটিয়ে, তাদের মত্ততা নিবারণ করে থাকেন। তিনি সর্বপ্রিয় ও সর্বসুহৃৎ–এজন্য পুতনাদির বধে তার ধাত্রীর উচিত গতিদান–ভগবানের মহৎ যশ ঘোষিত হয়েছে।))।

হে রাজন, রাজসূয় মহাযজ্ঞে দীক্ষিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসায় পূর্বে দেবর্ষি নারদ এই বিষয়েই একটি ইতিহাস দৃষ্টান্তরূপে বলেছিলেন। –হে রাজন, রাজসূয় মহাযজ্ঞে চেদিদেশোধিপতি শিশুপালের ভগবান বাসুদেবে অদ্ভুত সাযুজ্য দেখে পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির সেই মহাযজ্ঞে সমাসীন দেবর্ষি নারদকে সকল মুণিগণের সমক্ষে এই প্রশ্ন করেছিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন–অহো, পরমতত্ত্ব ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে যে সাযুজ্য লাভ ঐকান্তিক ভক্তগণেরও দুর্লভ, তা এই বিদ্বেষী শিশুপাল কি করে লাভ করল? ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য। হে মুনে, এ বিষয় জানার জন্য আমাদের সকলেরই ইচ্ছা হয়েছে। ও আপনি অনুগ্রহ করে বলুন। পূর্বে আপনার কাছে শুনেছি–ভগবানের নিন্দার ফলে বেণ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক নরকে পতিত হয়েছিল। এই দমঘোষের পুত্র শিশুপাল মহাপাপী। বাল্যকালে খল ভাষণ থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত গোবিন্দের প্রতি মৎসরী এবং দুর্মতি দন্তবক্রও সেরূপ। অব্যয় (অপক্ষয় শূন্য), পরমব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বার বার নিন্দাকারী এই দুইজনের জিহ্বায় শ্বেতকুষ্ঠ হল না, কিংবা এরা ঘোর অন্ধ নরকেও পতিত হল না। দুর্লভস্বরূপ সেই ভগবানে সাক্ষাৎ (সাধনাদি ব্যতীতই) সকল লোকের সামনেই লয় প্রাপ্ত হল। হে ব্রাহ্মণ, ইহা অতি অদ্ভুত, বায়ুর দ্বারা যেমন দীপশিখা অস্থির হয়, তেমনি আমার চিত্ত ব্যাকুল হয়েছে। আপনি সর্বজ্ঞ, অতএব এই আশ্চর্য বিষয়ের কারণ কি, বলুন।

শ্রীশুকদেব বললেন–সর্বজ্ঞ ঋষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরের ঐ সকল কথা শুনে অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং সভার সকলকে শুনিয়ে মহারাজকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন। নারদ বললেন–ভগবানের নিন্দাকারীর নরকপাত হওয়া উচিত ছিল–এটা বলার তোমার অভিপ্রায় কি? ভগবানের পীড়াকর বলে? অথবা সুরাপানাদির মত নিষিদ্ধ বলে? কিংবা নিন্দনীয় আচরণের জন্য? দেহাভিমানাদি থাকলেই নিন্দাদি হতে পারে। আর, ভগবানের পীড়াদিরও কোনো আশঙ্কা নেই। নিন্দন, স্তব, সৎকার, তিরস্কার–ইত্যাদি প্রকৃতি পুরুষের অবিবেকী অর্থাৎ দেহাভিমানী জীবদেরই দেহের প্রতি হয়ে থাকে। এই দেহের অভিমানবশতঃই অন্যান্য প্রাণিদের 'আমি, আমার" ইত্যাদির বৈষম্য এবং তাড়ণা ও নিন্দা এই দুটির কারণে হিংসা ও পীড়া হয়। যে দেহে এই অভিমান নিবদ্ধ তার বধে প্রাণিদের বধ হয়ে থাকে, কিন্তু পরমেশ্বরের দেহও নাই, তদভিমানও নাই। যেহেতু তিনি অদ্বিতীয়, সুতরাং তার অভিমন্তব্য নাই। আর তিনি সর্বাত্মা, এজন্য তার বৈষম্যও সম্ভবপর নয়। তবে যে দানবাদির বধ করেন, সেটি তাদের মঙ্গলের জন্য দণ্ডমাত্র, তাকে তার হিংসা বলা যায় না। (সকল প্রাণীর যেরূপ অনাত্মা দেহ এবং আত্মা জীব–এদুটি আছে, সেরূপ যদি কৃষ্ণেরও থাকত, তা হলে ভগবান কৃষ্ণেরও জীবের মত অবিদ্যাকৃত অভিমান থাকত। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ তদভিন্ন পরমাত্মাই,

সেই স্বরূপভূত দেহে 'আমি কৃষ্ণ' এই অভিমানও তন্ময়ই। তিনিই অখিলাত্মা, অতএব জীবদেহের মত তার কোন অভিমান নাই।) তিনিই পরতত্ত্ব অর্থাৎ মায়া, মায়িক বস্তু ও জীব প্রভৃতি থেকে ভিন্ন, অতএব অ– স্বরূপভূত বস্তুতে তার অভিমান নেই বলে তার দ্বেষই বা কে, আর তার দ্বেষ্টাই বা কে? পরমাত্মা স্বরূপ নিজ দেহে তার যে অভিমান, সেটা আমি পরমাত্মা'– এইরূপেই অভিমান। সেজন্য সেই পরমাত্মা কাকে বিদ্বেষ করবেন? আর তাকে পরমাত্মা জেনে কেই বা তাঁকে বিদ্বেষ করবে? তবে তিনি কিজন্য নিজ-বিদ্বেষ্টা শিশুপালাদির বিনাশ করেছেন? দণ্ডধর পরমেশ্বরের সে দণ্ডদান কার্য তাদের মঙ্গলের জন্যই, যেহেতু তিনি সকলের সুহৃৎ। ভগবানের-নিন্দাদি করার জন্য তার কোন বৈষম্য হয় না। অতএব যে কোন উপায়েই হোক, তার ধ্যান করলে নিন্দাদিকৃত পাপেরও বিনাশ এবং তার সাযুজ্য লাভ হতে পারে। ফলতঃ বৈরানুবন্ধ অথবা নির্বে অথবা নির্বের অর্থাৎ ভক্তিযোগ কিংবা ভয়, লোভ নেই কিংবা কাম ইত্যাদি যে কোনো কারণে হোক, কোনোরূপে ভগবানের প্রতি মনঃসংযোগ করা কর্তব্য। কোনো প্রকারে তাকে পৃথক দেখা উচিত নয়। হে রাজন, আমার বোধহয়, ঐ সকল উপায় মধ্যে বৈরানুবন্ধ শ্রেষ্ঠ কারণ বৈরানুবন্ধের (অর্থাৎ বৈরের মত চিত্তের অভিনিবেশের) দ্বারা মানবগণ যেরূপ অনায়াসে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, ভক্তিযোগের দ্বারা সেরূপ সহজে তন্ময়ত্ব পাওয়া যায় না–আমি আত্মবুদ্ধিতে এ বিষয় এক প্রকার নিশ্চয় করেছি। (জীবের মধ্যে প্রকাশমান অদৃশ বস্তুশক্তি যুক্ত ভগবদবিগ্রহের আভাসের কথা দূরে থাকুক প্রাকৃত জগতেও প্রাকৃতিক ভাবমাত্রেরও এরও চিন্তিত বস্তুর আবেশের মহৎ ফল দেখা যায়)। যেমন ভ্রমর কর্তৃক অবরুদ্ধ কীট (তেলাপোকা) ভিত্তির অভ্যন্তরস্থ গর্তে অবরুদ্ধ হয়ে দ্বেষ ও ভয়যোগ একাগ্রচিত্তে স্মরণ করতে করতে অচিরেই ভ্রমরের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এইরূপ যিনি কৃপাপূর্বক নিজ মায়াকে অবলম্বন করে নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে বদ্ধবের ব্যক্তিগণ বৈর দ্বারা তার.যে একান্ত চিন্তা করে তাতেই তাদের পাপরাশি পবিত্র হয়ে যায় এবং পরে তাঁর অনুধ্যানে তাকে লাভ করে থাকি।

বহু বহু ব্যক্তি ভক্তি অনুসারে কাম, ভয় অথবা স্নেহ হেতু ভগবান পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করে কামাদি নিমিত্ত তাপ পরিত্যাগপূর্বক তার গতি প্রাপ্ত হয়েছে। (ভদ্র ও অভদ্র, যে কোনো ভাবেই সকলেই তাকে লাভ করে কিন্তু সাধনের তারতম্যে ফলের তারতম্য অবশ্যই রয়েছে। এখানে দ্বেষশূন্য পাপ ভগবাদাবেশের দ্বারাই বিনষ্ট হওয়ায় ভগবৎ প্রাপ্ত হয়েছে। কাম ও সেই পাপ নহে তা শ্রীভগবানে প্রেম-বিশেষ। এজন্য গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কামের (প্রেমের) সর্বশাস্ত্রে প্রশংসা করা হয়েছে)। এর প্রমাণ স্বরূপ বলছেন– গোপীগণ কামহেতু কংস ভয় জন্য শিশুপালাদি নৃপতিগণ দ্বেষহেতু, যাদবগণ সম্বন্ধবশতঃ তোমরা স্নেহ প্রযুক্ত এবং আমরা

ভক্তির দ্বারা তার গতি প্রাপ্ত হয়েছি। যদি বল, বেনরাজ কিজন্য নরকে পতিত হয়েছিল? উত্তর, কামাদিহেতু যে পাঁচ প্রকার চিন্তার কথা বলা হয়েছে, বেন তাদের মধ্যে কোনোভাবেই ভগবানের চিন্তা করে নাই। এজন্যে তাঁর গতি প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব, হে রাজন, যে কোন উপায়েই হোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মন অভিনিবিষ্ট করতে হবে। হে পাণ্ডবে তোমাদের মাতৃস্বসার পুত্র শিশুপাল ও দন্দবক্র–এই দুই জনে পূর্বে ভগবান বিষ্ণুর প্রধান পার্ষদ ছিল, বিপ্র শাপে এরা বৈকুণ্ঠ থেকে পরিচ্যুত হয়েছে।

শ্রীযুধিষ্ঠির বললেন–হে দেবর্ষি, সেই শাপ কি প্রকার? কোন্ ব্রাহ্মণই বা শাপ দিয়েছিলেন? ঐ শাপ এরূপ যে হরিদাসদেরও অভিভূত করেছিল? যে সকল ব্যক্তি ভগবান হরির একান্ত ভক্ত, তাদের তো জন্মই হতে পারে না। অতএব আপনার ঐ কথা অনাদরের মত প্রকাশ পাচ্ছে। বস্তুতঃ প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণই জন্মের হেতু, হরিভক্তগণ বৈকুণ্ঠবাসী, তাদের দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়, তাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও প্রাণ নেই। ওই দুই জনের প্রাকৃত দেহ সম্বন্ধ সংক্রান্ত এই আখ্যান আপনি বর্ণনা করুন।

দেবর্ষি নারদ বললেন–হে রাজন, এক সময় ব্রহ্মার পুত্র সনন্দনাদি মহর্ষিগণ ত্রিভুবন পর্যটন করতে করতে যদৃচ্ছাক্রমে বিষ্ণুলোকে গমন করেছিলেন। তাঁর মরীচি প্রভৃতি পূর্বতন মহর্ষিগণেরও পূর্বজ, তথাপি তাদের পাঁচ বা ছয় বছরের বালকের মত দিগম্বর শিশু দেখে মনে করে, বৈকুণ্ঠপুরীর ঐ দুই দ্বার পালকে এরূপ অভিশাপ ছিলেন-"ওহে, ভগবান মধুসূদনের পাদমূল রজঃ ও তমো গুণের সম্পর্ক রহিত। অতএব তোমরা এখানে বাসেরই যোগ্য নও, আর তো তার সেবার কথা দূরে থাক, অতএব, হে মুখ তোমরা এখনই পাপীয়সী আসুরী যোনি প্রাপ্ত হও। হে রাজন, তারা এরূপ অভিশপ্ত হয়ে তখুনি বৈকুণ্ঠ হতে পতিত হয়েছিল। তখন কৃপালু সেই মুনি আবার বললেন–তিনি জন্মের পর তোমাদের আবার স্বস্থান প্রাপ্তি হবে। তারপর ঐ দুই ব্যক্তি দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে বিখ্যাত এবং দৈত্য-দানবদের বন্দিত হন।

হে যুধিষ্ঠির, ভগবান হরি নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করে ঐ হিরণ্যকশিপুর প্রাণসংহার করেন। আর, ধরার রসাতল থেকে উদ্ধারকালে ভগবান বরাহ মূর্তি ধারণ করেন, তখন হিরণ্যাক্ষ প্রতিঘাত করায় তার হস্তে নিহত হন। কেশবপ্রিয় ভগবদ্ভক্ত নিজ পুত্র প্রহ্লাদকে হত্যা করার জন্য হিরণ্যকশিপু নানা যাতনার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভগবানের তেজে ব্যাপ্ত প্রশান্ত রোগ–দ্বিষাদিশূন্য, সকল প্রাণীর আত্মতুল্য, সমদর্শন সর্বত্র যিনি ভগবানকে দর্শন করেন, সেই প্রহ্লাদকে শস্ত্রাদির দ্বারা চেষ্টা করেও বধ করতে পারেন নি। তারপর তারা দুইজন কেশিনীর

গর্ভে বিশবসের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে। ঐ দ্বিতীয় জন্মে তারা রাবণ ও কুম্ভকর্ণ নামে রাক্ষস হয়ে সকল লোকের সন্তাপ দিত। তারপর ভগবান বিষ্ণু রাঘবরূপে অবতীর্ণ হয়ে শাপ মোচনের জন্য তাদের বিনাশ করেন। হে মহারাজা, তুমি মার্কণ্ডেয় ঋষির মুখে রামচন্দ্রের শৌর্য-বীর্যের কথা শুনতে পাবে।

তারপর ঐ দুইজন তোমার মাতৃবস্বার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে দুর্ধর্ষ ক্ষত্রিয় হয়েছিল। এটি তাদের। তৃতীয় জন্ম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের চক্র প্রহারে হত করেন। তাতে তাদের পাপ ধ্বংস হওয়ায় এক্ষণে তারা শাপমুক্ত হল। বৈরানুবন্ধ জন্য তীব্র ধ্যানের দ্বারা ঐ দুই জন বিষ্ণুভক্ত হয়ে বিষ্ণুর পার্ষদ হওয়ায় আবার ভগবানের পার্শ্বে গমন করল। মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন —-হে ভগবান, মহাত্মা প্রিয় পুত্রের প্রতি হিরণ্যকশিপুর কি জন্য বিদ্বেষভাব হয়েছিল? আর যে কারণে প্রহ্লাদের ভগবান অচ্যুতে একচিত্ততা হয়, তাও কৃপাপূর্বক বলুন।

.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষ্ণুর প্রতি ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু সাধুদের প্রতি অত্যাচার করিতে নিজ দৈত্যদের আদেশ দান এবং তত্ত্বকথনের দ্বারা ভ্রাতৃপুত্রগণের শোকাপনোদন

শ্রী নারদ বললেন–ভগবানের প্রতি বিদ্বেষই প্রহ্লাদের প্রতি বিদ্বেষের কারণ –এটা বলার জন্য প্রথমতঃ হিরণ্যকশিপুর ভগবৎ বিদ্বেষের কারণ বলছেন) –হে মহারাজ, ভগবান বরাহমূর্তি ধারণ করে দেবতাদের প্রতি পক্ষপাতপূর্বক হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে নিহত করলে, হিরণ্যকশিপু শোকে ও রোষে অত্যন্ত সন্তপ্ত হলেন। ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে বারবার নিজের দন্তদ্বারা ওষ্ঠাধর দর্শন করতে লাগলেন। ক্রোধদীপ্ত দুই চক্ষুর দ্বারা রোষাগ্নির ধূমে ধূমায়িত আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। করালদন্ত, উগ্রদৃষ্টি, দুর্দম ভ্রুকূটিযুক্ত মুখে শূল উত্তোলন করে সভামধ্যে দানবগণকে বললেন–হে দৈত্য-দানব–সকল, অহে দ্বিমুর্ধ, ত্যক্ষ, শম্বর, শতবাণু, হয়গ্রীব, নমুচি, পাক, ইন্বল, বিচিত্তি, পুলোমা, শকুন প্রভৃতি দানবগণ, তোমরা আমার কথা শোন এবং যা কর্তব্য শীঘ্র কর, বিলম্ব করো না।

ক্ষুদ্র শত্রুগণ আমার প্রিয় ও পরম সুহৃৎ সহোদরকে বিনষ্ট করেছে। ভগবান হরি সর্বত্র সম বলে পরিচয় দেন বটে, কিন্তু তিনি উপাসনাকে নিমিত্ত করে লোভবশতঃ আমাদের শত্রু দেবতাদের সাহায্য করেছেন। হরির এখন আর সেই সমত্ব স্বভাব নেই। যদিও তিনি শুদ্ধ ও

তেজময় তথাপি মায়াবশতঃ বরাহরূপী হয়েছেন। (তিনি পরমাত্মা বলে প্রসিদ্ধ হলেও, পরমার্থ পরিত্যাগ করে পশু হয়েছেন।) এখন বালকের মত অব্যবস্থিত চিত্ত, যে কেউ তার উপাসনা করলে তিনি তার বশীভূত হন (যেমন বালক খণ্ড লড্ডুক প্রভৃতির লোভে বশীভূত হয়)। আমি এই নিজের শূল দিয়ে তার গ্রীবা বিভিন্ন করে তার রক্তে রক্তপ্রিয় ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের তর্পণ করব, তা হলে আমার মনোব্যথা দূর হবে। সেই কপট হরি আমার প্রতিপক্ষ, ঐ দুরাত্মা বিনষ্ট হলেই, ছিন্নমূল বৃক্ষের শাখা যেমন শুকিয়ে যায়, তেমনি দেবগণ উৎপাটিত হয়ে যাবে। কারণ ঐ হরিই দেবতাদের প্রাণ।

হে দৈত্যগণ, সম্প্রতি তোমরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা সম্বর্ধিত ভূমণ্ডলে যাও। সেখানে গিয়ে তপস্যা, যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন, ব্রত, ও দানাদিযুক্ত মানবদের সংহার করতে থাক। যদিও যজ্ঞাদি সম্পন্ন জনগণের কোন অপরাধ নেই, তথাপি দ্বিজগণের যজ্ঞাক্রিয়াই বিষ্ণুপ্রাপ্তির মূল কারণ। আর, বিষ্ণু স্বয়ং যজ্ঞ ও ধর্মময় এবং দেবর্ষি, পিতৃ, ভূতগণের ও ধর্মের পরম আশ্রয়। অতএব ঐ সকল ব্যক্তি, যজ্ঞমূর্তি বিষ্ণুর মূল। তারা আমাকে অনাদর করে বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অতএব আমার বধ্য। তাদের নাশে বিষ্ণু নিজেই বিনষ্ট হবে। ব্রাহ্মণগণের বিনাশে যজ্ঞক্রিয়া সমূহ লোপ হবে, তা হলে বিষ্ণুর মূল উৎখাত হবে। আর যজ্ঞ ও ধর্মের নাশে বিষ্ণুর স্বরূপই নষ্ট হবে। হে দানবগণ, এ বিষয়ে আমার একটি পরামর্শ শোন। যেখানে যেখানে গো, ব্রাহ্মণ্য, বেদ ও বেদবিহিত আশ্রমোচিত ক্রিয়া দেখবে, সেই সেই জনপদে গিয়ে তা জ্বালিয়ে দাও। তা হলে সেখানকার লোকদেরও বিনাশ হবে। আর, তাদের উপজীব্য বৃক্ষসকল ছেদন করে ফেল।

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, দৈত্যাধিপতি হিরণ্যকশিপু এই প্রকার আদেশ করলে কলহপ্রিয় দানবগণ তাঁর নির্দেশ মস্তকে গ্রহণ করে সাগ্রহে প্রজাদের নিগ্রহ করতে আরম্ভ করল। পুর (হেট্টাদিযুক্ত নগর), গ্রাম (হট্টাদিরহিত স্থান), ব্রজ (গো–সকলের বাসস্থান), উদ্যান, ধান্যাদি ক্ষেত্র, আরাম (অকৃত্রিম বর্ণ) ঋষিদের আশ্রম, রত্নাদির আকর খেট (কৃষকদের বাসস্থান), খর্ব (পাবতীয় উপত্যকাস্থ গ্রাম) ঘোষ (আভীরদের বাসস্থান) এবং পত্তন (রাজধানী)–এই সকল দগ্ধ করল। কেউ কেউ খনন যন্ত্রের দ্বারা সেতু, প্রাচীর, পুর বিদীর্ণ করে ফেলল, কেউ বা কুঠার দ্বারা উপজীব্য বৃক্ষসকল ছেদন করল। কোনো কোনো দানব জলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করে প্রজাদের গৃহগুলি দগ্ধ করতে লাগল। দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর অনুচরবর্গ এই প্রকারে পৃথিবীর লোকদের উপর উপদ্রব করতে থাকলে, যজ্ঞভাগের অভাবে দেবগণ স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করে পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

এইরূপ দৈত্যগণ প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে থাকলে, হিরণ্যকশিপু স্বর্গরাজ্যাদি কামনায় তপস্যা করতে অভিলাষ করে প্রথমতঃ মৃত ভ্রাতার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ–তর্পণাদি সম্পন্ন করলেন। পরে দেশকালজ্ঞ ও সকল লোকের প্রভু হিরণ্যকশিপু, ভ্রাতুস্পুত্র শুকনি, শম্বর, ধষ্টি, ভূতসন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্মশ্রু ও উৎকচকে বেং তাদের জননী, নিজের ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতা –পুত্রগণ, আমার বীর ভ্রাতার জন্য তোমাদের শোক করা উচিত নয়। বীর পুরুষদের শত্রুর অভিমুখে বধ শ্লাঘ্য, (বিশেষতঃ এ শত্রু স্বয়ং বিষ্ণু)। সকল বীরই ঐরূপ বধ কামনা করে থাকে। হে সুব্রতে, পানীয়শালায় যেমন প্রাণিসকল মিলিত হয়, তেমনি এই সংসারে জীবগণ প্রাচীন কর্মবশতঃ ঈশ্বর কর্তৃক একত্র সংযযাজিত হয়, আবার নিজ নিজ কর্মদ্বারা নিয়োজিত হয়।

হে ভদ্রে, আত্মার মৃত্যু নেই, আত্মা অব্যয় (অক্ষয় শূন্য), শুদ্ধ, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ এবং দেহাদি থেকে পৃথক। সেই আত্মা (জীবাত্মা) ভগবানের মায়ার (অবিদ্যা–শক্তির) দ্বারা মোহিত হয়ে সেই সেই বিষয় সম্পাদন করে তার জন্য লৌকিক ও অলৌকিক কর্মাদি করার জন্য লিঙ্গশরীর ধারণ করে অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণে 'আমি, আমার' –এইরূপ অধ্যাস করে থাকে। এই লিঙ্গ শরীরোপাধিই সংসার। জলসকল চঞ্চল হলে, তাতে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষগুলিও যেমন চঞ্চল হয়, আর চক্ষু ভ্রাম্যমান হলে যেমন ভূমি ভ্রমশীলের মত দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মায়ার সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা মন ভ্রাম্যমান হলে পরিপূর্ণ স্বরূপ পুরুষ (অর্থাৎ আত্মা) লিঙ্গদেহ বিহীন হয়েও লিঙ্গ–শরীরীর ন্যায় ঐ মনের সমান হয়ে থাকে। লিঙ্গ দেহ না থাকলেও লিঙ্গদেহের যে ভাবনা (লিঙ্গদেহাভিমান) এটাই আত্মার বিপর্যস (অর্থাৎ অন্যথাভাব), এর ফলেই প্রিয়ের সাথে বিয়োগ, অপ্রিয়ের সাথে সংযোগ, কর্ম ও সংসার অর্থাৎ নানা গর্ভে প্রবেশ হয়ে থাকে। আর, এই বিপর্যাস হতেই জন্ম, মৃত্যু, বিবিধ শোক, অবিবেক, চিন্তা ও বিবেকের অস্মরণ হয়।

শোকের হেতু না থাকায় তোমাদের এই শোক বৃথা, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ একটি পুরাতন ইতিহাস রচিত করেছে, তা আমার কাছ থেকে শোন। উশীনর দেশে সুযজ্ঞ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি যুদ্ধে শত্রুদের দ্বারা নিহত হলে, জ্ঞাতিগণ তার নিকট গিয়ে ঘিরে বসেছিলেন। তৎকালে তার রত্নময় কবচ, বিশীর্ণ এবং আভরণ ও মাল্য বিভ্রষ্ট হয়েছিল। আর তীক্ষ্ণ বাণে তাঁর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় রক্তাপ্লুত ছিল। কেশগুলি বিকীর্ণ, চক্ষুদ্বয় বিধ্বস্ত এবং ক্রোধভরে যে ওষ্ঠ দংশত করেছিলেন তা সেরূপেই ছিল। ধূলির দ্বারা মুখকমল আবৃত ছিল এবং আয়ুধ ও ভুজদ্বয় ছিন্নভিন্ন হয়েছিল। দৈববশতঃ উশীনরেন্দ্রকে ঐ ভাবে ধরাশায়ী দেখে তার মহিষীগণ অতিশয় দুঃখিত হয়ে, নিজ নিজ বক্ষঃস্থলে আঘাত করতে করতে 'হা নাথ, আমরা হত হলাম'–বলে তার পদতলে পতিত হলেন। কুচকুঙ্কুম–দ্বারা অরুণিত

অশ্রুজলে প্রিয় পতির পাদপদ্ম সিক্ত করতে উচ্চস্বরে রোদন করতঃ বিলাপ করতে লাগলেন। শোকে তাদের কেশ ও ভূষণ বিধ্বস্ত হয়েছিল। তাদের ক্রন্দন দেখে সচেতন প্রাণীমাত্রেরই হৃদয় শোকাকুল হল।

তাঁরা বিলাপ করতে করতে বললেন–অহো বিধাতা কি নির্দয়, হে প্রভো, তুমি পূর্বে এই উশীনরদের বৃত্তিপ্রদ পিতা ছিলেন, অকরুণ বিধি এখন তোমাকে আমাদের নয়নের অগোচর দশায় উপনীত করে আমাদের শোকবর্ধন করাচ্ছে। হে মহীপতে, তুমি কৃতজ্ঞ এবং আমাদের পরম সুহৃৎ, তোমাকে ছাড়া আমরা কিরূপে জীবন ধারণ করব? হে বীর, তুমি যেখানে গিয়েছ, সে পথ আমাদের বলে দাও, আমরাও তোমার অনুগমন করে তোমার পাদদ্বয়ের সেবা করব। ঐ রাজমহিষীগণ মৃত পতিকে বেষ্টন করে এই প্রকার বিলাপ করতে থাকল, তাদের ইচ্ছা হল না যে স্বামীর মৃতদেহ সকারের জন্য নিয়ে যায়। এর মধ্যে সূর্য অস্তাচলে চলে গেল। মৃত রাজার বন্ধুগণ ঐরূপ রোদনধ্বনি নিজপুরী হতে শ্রবণ করে, যমরাজ স্বয়ং বালকের রূপ ধরে সেখানে এলেন।

যমরাজ বললেন–অহো, এই সকল ব্যক্তি আমা অপেক্ষা বয়সে বড়, এরা লোকদের জন্ম-মরণ। ব্যাপার বার বার দেখছে, তবুও এদের কি মোহ! মানুষ যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই চলে গেছে, তার জন্য বৃথা শোক করে কেন? এরাও তো ঐ মৃত ব্যক্তির সমানধর্ম অর্থাৎ এদেরও একদিন মরতে হবে, তবে শোক করা কেন? কি আশ্চর্য আমরা বালক হলেও আমাদের যে প্রকার বিবেক রয়েছে এদের তাও দেখছি না। অতএব আমরাই ধন্য। যেহেতু আমরা মাতৃ-পিতৃ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছি, কখনও মনে এসব কথা চিন্তাও করি না। যখন অতি দুর্বল ছিলাম, তখন ব্যাঘ্রাদি, হিংস্রজন্তু আমাদের ভক্ষণ করে নাই। তার কারণ এই যে যিনি গর্ভে রক্ষা করেছেন, তিনি বিশ্বের রক্ষক এবং আমাদেরও রক্ষা করছেন। হে অবলা, যিনি ইচ্ছানুসারে এই বিশ্বের সৃষ্টি করছেন, যাঁর হাতে এর পালন হচ্ছে এবং প্রলয়কালে এই সকল সংহার করবেন; সেই অব্যয় পরমেশ্বরের এই চরাচর বিশ্ব ক্রীড়া-সাধনমাত্র। তিনিই সংহার ও পালনে প্রভু।

হে অবলাগণ, পথে পতিত ব্যক্তিও পরমেশ্বর কর্তৃক রক্ষিত হলে রক্ষা পায়, গৃহে স্থিত পুরুষও পরমেশ্বর কর্তৃক হত হলে বিনষ্ট হয়। আর, বনে অনাথ জনও তার দ্বারা রক্ষিত হলে বাঁচে, গৃহে সুরক্ষিত পুরুষও তাহা কর্তৃক উপেক্ষিত হলে বাঁচে না। জীবের জন্ম-মরণাদি ঈশ্বরের অধীন বলে শোক করা উচিত নয়। এখন দেহাদিরই জন্মাদি আত্মার নয়–এই বিষয়ে বলছেন। প্রাণীদের দেহ নিজ নিজ কারণীভূত যে লিঙ্গশরীর, তার নিমিত্তস্বরূপ কর্মবশতঃ উৎপন্ন হয়

এবং কালক্রমে বিনষ্ট হয়ে যায়। দেবাদি দেহেরও এইভাবে উৎপত্তি ও বিনাশ হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ দেহে অবস্থিত হয়েও আত্মা, দেহের ধর্ম যে জন্মাদি, তার সাথে মিলিত হয় না, কারণ আত্মা দেহ থেকে অত্যন্ত ভিন্ন। অর্থাৎ দেহে স্থিত হয়েও পরমাত্মা দেহের ধর্ম-জন্মাদির দ্বারা আবদ্ধ হন না, কেবল সেই দেহের দ্বারা অনুষ্ঠিত শুভ ও অশুভ কর্মের ফল নিজের সন্নিধান মাত্রে দিয়ে থাকেন–ইহাই তার অপেক্ষা ও উপেক্ষা।

এই শরীর অবিবেচক হেতু আত্মতত্ত্বরূপে জন্মেছে, অতএব অত্যন্ত অবিবেকীর কাছে গৃহ যেমন এ আত্মস্বরূপে (আমার গৃহ এরূপে) প্রতীয়মান হয়, তেমনি 'আমি কৃশ, আমি স্থূল' ইত্যাদি প্রয়োগস্থলে এই দেহ অবিবেকীর পক্ষে আত্মবৎ প্রতীত হয়, বস্তুতঃ উহা আত্মা হতে পৃথক; যেহেতু দেহ দৃশ্য ও পাঞ্চভৌতিক। যেমন জলীয় পরমাণু হতে উৎপন্ন বুদবুদ, পার্থিব পরমাণু হতে জাত ঘটাদি, এবং তৈজস পরমান্বর নির্মিত কুণ্ডলাদি কালবশতঃ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই তিন প্রকার পরমাণু হতে উৎপন্ন এই দেহই কালবৃশতঃ বিকৃত (অর্থাৎ পরিণত) হয়ে বিনষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। অগ্নি যেমন কাষ্ঠ সকলে অবস্থিত হয়েও দাহকত্ব ও প্রকাশকত্বরূপে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে প্রকাশ পায়, যেমন বায়ু দেহের অভ্যন্তরবর্তী হওয়ায় নাসাদি পৃথক স্থানে প্রকাশ পায় এবং আকাশ যেমন সর্বগত হয়েও কারও সঙ্গপ্রাপ্ত হয় না, তেমনি পুরুষ (আত্মা) সকল দেহ ও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় হয়েও পৃথকই থাকেন।

হে মূঢ়, তোমরা যার জন্য শোক করছ, তোমাদের পতি সুযোগ্য তো তোমাদের সামনে শয়ন করে আছে, তবে শোক করছ কেন? ইনি এখন শুনছেন না এবং কথাও বলছেন না এবং তোমরা একে দেখতে পাচ্ছ না বলে যদি শোক কর পুর্বেও তো দেখতে পাও নি, কারণ যিনি শ্রবণ করেন এবং প্রত্যুত্তর দেন তিনি এ সংসারে কোন কালেও দৃশ্য হ'ন না। দেহের মধ্যে সকল ইন্দ্রিয়ের চেষ্টাশালী যে মুখ্য প্রাণ আছে, তিনিও বক্তা বা শ্রোতা নন, এর মধ্যে যে আত্মা আছেন, তিনিই সকল ইন্দ্রিয়ের সাথে সেই বিনয়ের দ্রষ্ট। ঐ আত্মা অচেতন প্রাণ ও দেহ হতে ভিন্ন পদার্থ এবং চেতন–স্বরূপ, যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা লিঙ্গশরীর যুক্ত হয়ে তদভিমানী হন, ততক্ষণ পর্যন্তই কর্মসকল বন্ধের কারণ হয়। তারপর বিপর্যয় (অর্থাৎ দেহধর্ম) এবং ক্লেশ অনুবর্তমান হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ বিপর্যয়াদি মায়ামাত্র, বাস্তবিক নহে। গুণকার্য যে সুখাদি, তাতে পরমার্থবোধক যে দৃষ্টি এবং ঐরূপ যে বাক্য তা মিথ্যা অভিনিবেশ মাত্র; মনোরথ ও স্বপ্ন মিথ্যা, তেমনি ইন্দ্রিয়জাত সুখাদিও মিথ্যা। অতএব যে সকল ব্যক্তি নিত্য ও অনিত্য পদার্থ জানেন, তাঁরা নিত্য (আত্মা) অথবা অনিত্য (দেহাদি) বস্তুর জন্য শোক করেন না। তবে যে কখন কখন উপদেষ্টাদেরও শোক করতে দেখা যায়, তার কারণ এই যে–স্বভাবের অন্যথা করা অসাধ্য। অর্থাৎ জ্ঞানের দৃঢ়তা না থাকায় ঐরূপ শোককারীদের স্বভাব নিবৃত্ত হয় না।

হে অবলাগণ, তোমরা নিজেরাই মৃতের সমান ধর্ম হয়ে কেন শোক করছ–এই যা বলেছি সে বিষয়ে একটি ইতিহাস বলছি, শোন। কোনো ব্যাধ পরমেশ্বর কর্তৃক পক্ষিদের হন্তারকরূপে সৃষ্ট হয়ে যেখানে যেখানে পক্ষিরা থাকত, সেখানে গিয়ে জাল বিস্তার করে, লোভ দেখিয়ে তাদের ধরে নিয়ে যেত। এত সময় কুলিঙ্গন নামে কনভক্ষী এক জাতীয় পক্ষী, স্ত্রী পুরুষে বিচরণ করতে করতে ব্যাধের দৃষ্টিগোচর হল। তাদের মধ্যে পক্ষিণী প্রলুব্ধ হয়ে প্রথমে ব্যাধের জালে বদ্ধ হল। কুলিঙ্গ সেই স্ত্রী পক্ষীকে বিপদে পড়তে দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হল এবং স্নেহবশতঃ কাতর হয়ে স্ত্রীর জন্য বিলাপ করতে লাগল। অহো, আমার এই স্ত্রী দীনা হয়ে, কাতর আমার জন্য করুণা প্রকাশ-পূর্বক শোক করছে। নির্দয় বিধাতা আমার ভার্যাকে নিয়ে কি করবে? এই প্রেয়সী আমার দেহর তাতে বিরহিত হওয়ায় আমার অপর-দেহার্ধ অতিশয় দুঃখে থাকবে। দৈব’ আমাকে ত গ্রহণ করুক, আমার শাবকগুলির এখনও ডানা গজায় নি, তারা মাতৃহীন হল, এখন আমি কিরূপে তাদের পালন করব? এতক্ষণ হতভাগ্য শাবকগুলি নীড়–মধ্যে তাদের মায়ের প্রতীক্ষা করছে। কুলিঙ্গ পক্ষী প্রিয়ার বিয়োগে ঐ রূপ ব্যাকুল হয়ে ঐ প্রকার বিলাপ করতে থাকলে সেই পক্ষিহন্তা-ব্যাধ কালপ্রেরিত হয়েই যেন গোপনে বাণ দ্বারা তাকে বিদ্ধ করল। তোমরাও কুলিঙ্গ পক্ষির মত অবোধ, এই প্রকার শোকে তোমরা নিজেরাই যে বিনাশ হবে, তা দেখছ না। যদি শত শত বছর ধরেও শোক কর তবুও তোমাদের ঐ পতিকে আর জীবিত পাবে না, অতএব কেন শোক করছ?

হিরণ্যকশিপু বললেন–সেই বালক এরূপ বললে। জ্ঞাতিরা সকলেই বিক্ষিপ্তচিত্ত হবে এই মনে করতে লাগল। সকল বস্তুই অনিত্য এবং মিথ্যা আবির্ভূত হয়েছে বালকরূপী যম এই উপাখ্যান বলে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন। তারপর সুযজ্ঞ রাজার জ্ঞাতিগণ শোক পরিত্যাগ কল্লে রাজার পারলৌকিক কার্য সম্পন্ন করলেন। অতএব তোমাদেরও পরের অথবা নিজের জন্য শোক করা উচিত নয়। এই সংসারে আত্মাই বা কে? পরই বা কে? কোন ব্যক্তি নিজের। কোন ব্যক্তিই বা পরের? এ আত্মীয় এ পর এই অভিনিবেসই অজ্ঞান। এই অজ্ঞান ব্যতিরেকে আত্মীয় বা পর–এরূপ বিচার হতে পারে না। শ্রীনারদ বললেন–দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর এইরূপ কথা শুনে তুষার সহিত দিতি ক্ষণকালের মধ্যে পুত্রশোক ত্যাগ করে পরমাত্ম তত্ত্বে চিত্ত ধারণ করলেন।

.

তৃতীয় অধ্যায়

হিরণ্যকশিপুর তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি

শ্রী নারদ বললেন–হে মহারাজ যুধিষ্ঠির হিরণ্যকশিপু –নিজেকে অজেয়, অজর, অমর ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অদ্বিতীয় রাজা হবার কামনা করেছিলেন, এজন্যে তিনি মন্দার পর্বতের কন্দরে গিয়ে দারুণ তপস্যা আরম্ভ করলেন। তার ধ্যানে পাদাঙ্গুষ্ঠর দ্বারা ধরণী অবলম্বনপূর্বক ঊর্বাহু হয়ে আকাশে দৃষ্টি অর্পণ করে থাকতেন। প্রলয়কালীন সূর্য যেমন নিজের ভয়ংকর কিরণে বিরাজিত হয়, তার মত ঐ দৈত্য নিজের জঠরে কান্তির দ্বারা বিরাজিত হতে লাগলেন। হিরণ্যকশিপু তীব্র তপস্যা করতে আরম্ভ করলে, দেবগণ আবার স্বর্গরাজ্যে ফিরে এলেন। কিছুকাল পরে ঐ দৈত্যের মস্তক থেকে সমুদ্ভুত তপোময় সধূম অগ্নি-সর্বত্র প্রসূত হয়ে তির্যক ঊর্ধ্বে ও অধঃ লোকসকলকে সন্তপ্ত করতে আরম্ভ করল। তার তীব্র তপস্যার প্রভাবে নদ, নদী, সাগর ক্ষুভিত দ্বীপ সাথে পৃথিবী বিচলিত, গ্রহ, তারকাগণ পতিত এবং ব্রহ্মাকে জানালেন –হে দেবদেব, হে জগৎপতে দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর তপস্যায় তপ্ত হয়ে আমরা স্বর্গে থাকতে পারছি না। হে ভূমন, যদি আপনার অভিমত হয়, তবে তার শান্তি বিধান করুন, হে সর্বাধিপতে, আপনার করপ্রদ লোকসকল যাবৎ বিনষ্ট হয়, তার মধ্যেই শীঘ্র কোনো উপায় করুন।

হে প্রভো, দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হিরণ্যকশিপুর যা সংকল্প, তা আপনার বিদিত আছে, তবুও আমরা নিবেদন করছি, শুনুন। তার মনের অভিপ্রায়– যেমন পরমেষ্ঠ্য ব্রহ্মা বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি করে, তপস্যা ও যোগের দ্বারা সত্যলোকাধিষ্ঠান সাধন করব। (ব্রহ্মা দীর্ঘায়ু, দীর্ঘকাল তপস্যা করে যা করেছেন, তা অন্যের পক্ষে দুষ্কর। মানুষ অল্পায়ু, বারবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়।) তথাপি কালও নিত্য, আত্মাও নিত্য, এক জন্মে না হয় বহু বহু জন্মের তপস্যার দ্বারা তা সাধন করব। যদি সত্যলোক সাধন করতে না পারি, আমার সামর্থে পাপ-পুণ্যাদির ব্যত্যয় ঘটিয়ে এই জগৎকে বিপর্যস্ত করে ফেলব। অন্য ধ্রুবাদি পদের আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি সত্যলোকেরই সাধন করব। আপনার পদ হরণ করাই হিরণ্যকশিপুর নিবন্ধ–এটা আমরা শুনেছি। এই জন্যই সে উগ্র তপস্যায় অবস্থিত হয়েছে। আপনি স্বয়ং ত্রিভুবনের ঈশ্বর যা উপযুক্ত মনে করেন, অবিলম্বে তা বিধান করুন। হে ব্রাহ্মণ, আপনার স্থান ভ্রংশ হলে সাধুদের মহৎ অনিষ্ট হবে, কারণ আপনার এই পরমেষ্ঠ্য আসন থেকেই গো ও ব্রাহ্মণদের উদ্ভব, সুখ, ঐশ্বর্য, ক্ষেম (লব্ধবস্তুর পালন) এবং উৎকর্ষে হয়।

হে নৃপ, দেবগণ এই প্রকার জানালে, ভগবান আত্মযোনি (ব্রহ্মা) ভৃগু, দক্ষ প্রভৃতি মুনিবৃন্দে পরিবৃত হয়ে, দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুর আশ্রমে গমন করলেন। প্রথমে ব্রহ্মা তাকে দেখতে পাননি, কারণ সে বল্মীক, তৃণ ও কীচকে আচ্ছন্ন হয়েছিল, আর চারদিকে বহু পিপীলিকা তার

ত্বক, মাংস, মেদ ও রক্ত ভক্ষণ করছিল। অনেকক্ষণ পরে তাকে তপস্যার দ্বারা লোকসকল সন্তাপিত করতে দেখলেন। মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের মত তাকে দেখে বিস্মিত হয়ে হংসবাহন ব্রহ্মা হাস্য করতে করতে তাকে বললেন– ওহে, কশ্যপনন্দন, উঠ, উঠ, তোমার মঙ্গল হোক, তুমি তপস্যায় সিদ্ধ হয়েছ। আমি বর দিতে এসেছি, তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তোমার অতি আশ্চর্য ধৈর্য দেখলাম, দংশ–সকলে তোমার সমস্ত দেহ ভক্ষণ করছে, কেবল অস্থিতে প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রয়েছে বৎস, পূর্বে কোনো ঋষিগণ, এরূপ তপস্যা করতে পারেননি। পরেও কেউ পারবেন না। জল পর্যন্ত পরিত্যাগ করে দিব্য শত বছর প্রাণ ধারণ করা আর কারও পক্ষে সম্ভব? হে দিতিনন্দন, তোমার এই কার্য মনস্বীগণেরও অতি দুষ্কর, তোমার এই কর্ম আমাকে জয় করেছে, তপোনিষ্ঠার কথা কি তাতে তো জিতই হয়েছি। হে অসুরশ্রেষ্ঠ, তুমি মর্ত হলেও তোমাকে সকল কামনাই প্রদান করব। আমি অমর্ত্য, আমার দর্শন কখনও বিফল হয় না।

শ্রীনারদ বললেন–হে রাজা যুধিষ্ঠির, এই বলে আদিজন্মা ব্রহ্মা অমোঘবল দিব্য কমণ্ডলু হতে জল নিয়ে হিরণ্যকশিপুর পিপীলিকার দ্বারা ভক্ষিত অঙ্গে ছিটিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ দৈত্যপতি সর্বাবায়ব সম্পন্ন ও বর্জতুল্য দৃঢ়াঙ্গ হয়ে সামর্থ্য, বল ও তেজের সাথে সেই বল্মীক ও কীচকের মধ্য হতে উত্থিত হলেন। যেমন কাষ্ঠরাশি হতে অগ্নি উত্থিত হয়। পরে তপ্ত কাঞ্চনের তুল্য তার শরীরের প্রভা প্রকাশ পেতে লাগল। তিনি আকাশের দিকে চেয়ে হংসবাহন দেব ব্রহ্মাকে উপস্থিত দেখে আনন্দে উল্লসিত হয়ে ভূমিতে নতমস্তকে প্রণাম করলেন। তারপর উঠে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে নয়নের দ্বারা ঐ বিভুকে দেখতে দেখতে গদগদ বাক্যে তার স্তব করতে লাগলেন।

হিরণ্যকশিপু বললেন–যিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ কল্পান্তে প্রকৃতির গুণরূপ গাঢ়তমের দ্বারা আবৃত ওই জগৎকে নিজপ্রভাবে প্রকাশ করেছেন এবং যিনি ত্রিগুণ আত্মার দ্বারা ঐ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। করছেন, সেই রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের আশ্রয় অপরিচ্ছন্ন পরমেশ্বরকে প্রণাম করছি। হে স্বপ্রকাশত্ব, জগৎ প্রকাশকত্ব, তার কারণত্ব, সৃষ্টাদি কার্যের কর্তৃত্ব,মহত্ব ও পরমেশ্বরত্ব–(এই ছয় প্রকার বলে, তা বিকৃত করে প্রণাম করছেন)। সেই আদিপুরুষ জগতের বীজ (কারণ) জ্ঞান ও বিজ্ঞান যার মূর্তি, তাকে নমস্কার করি। প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি ইত্যাদি যে সমস্ত বিকার এবং সেই সকল রূপের দ্বারা যিনি কার্য–রূপ হয়ে থাকেন, তাঁকে নমস্কার করছি। প্রভো, আপনি মুখ্য, প্রাণস্বরূপ অর্থাৎ সূত্রাত্মরূপে এই সকল স্থাবর জঙ্গমের নিয়ন্তা, অতএব প্রজাদের পতি এবং তাদের চিত্তের, তৎপরিণাম স্বরূপ চেতনার মনের এবং তাদের

নিয়মও ইন্দ্রিয়সকলের পতি। আপনি মহান, আকাশাদি ভূত, শব্দাদি বিষয় ও তদ্বাসনাসকলের ঈশ্বর।

এখন যজ্ঞের প্রবর্তক ও অন্তর্যামীরূপে জগতের পালকত্ব বর্ণনা করছেন। আপনার বেদত্রয়রূপ যে মূর্তি, তাহা হোতৃ–চতুষ্টয়–যুক্তকর্ম বিষয়ক বিদ্যাস্বরূপ, সেই বেদময় শরীরের দ্বারা আপনি অগ্নিষ্টোমাদি বিবিধ যাগ যজ্ঞের বিস্তার করে থাকেন। আপনিই প্রাণীদের আত্মা, তাদের অন্তরাত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামীও আপনিই। যেহেতু আপনি সর্বজ্ঞ, অখণ্ড এবং অনাদি। আপনার কালবশতঃ অন্ত (বিনাশ) ও দেশতঃ পরিচ্ছদ নেই। আপনিই কালস্বরূপ, অতএব আপনি নিমেষশূন্য হয়ে ক্ষণকালাবধি অবয়ব দ্বারা জনগণের আয়ু ক্ষয় করে থাকেন। কিন্তু এরূপ সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব থাকলেও আপনি নির্বিকার, যেহেতু আপনি আত্মা (জ্ঞানরূপ), পরমেষ্ঠী (পরমেশ্বর)। অজ (জন্মশুন্য) এবং মহান (অপরিচ্ছিন্ন) এই জীবলোক কর্মবশতঃ বিকার প্রাপ্ত হয়, আপনি তার জীবনহেতু এবং তার আত্মা।

আপনা হতে পর (কারণ) ও অপর (কার্য) স্থাবর জঙ্গম কিছুই নেই। আপনি ছাড়া অন্য শব্দাদিও নেই, যেহেতু বেদ উপবেদ প্রভৃতি যে সকল কলা (বেদাঙ্গ) সে সকল আপনারই শরীর। আপনি হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যরূপ ব্রহ্মাণ্ড আপনার উদরে বর্তমান এবং আপনি ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির পৃষ্ঠে অবস্থিত, অতএব আপনিই বৃহৎ ব্রহ্মা। হে বিভো, এই ব্রহ্মাণ্ড আপনার স্থুল শরীর সত্য এবং এই শরীর দ্বারা আপনি ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের বিষয়সকল ভোগ করে থাকেন, এটাও সত্য, কিন্তু আপনি সর্বদা পরমেশ্বর স্বরূপে অবস্থিত আছেন। ঐরূপে অবস্থিত থেকেই ঐ সকল ভোগ করেন অতএব আপনি নিরুপাধি ব্রহ্ম এবং পুরাণ পুরুষ।

হে অনন্ত, আপনি মন ও বাক্যের অগোচর রূপের দ্বারা এই অখিল বিশ্ব ব্যাপ্ত করেছেন, সেই অনন্ত ঐশ্বর্যযুক্ত ভগবান আপনাকে নমস্কার। আপনি চিৎশক্তি (বিদ্যা) এবং অচিৎ শক্তি (মায়া) উভয়ে মিলিত। হে বরদোত্তম, আপনি যদি আমার অভিলাষিত বর দিতে চান, তবে এই বর দিন আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণী হতে যেন আমার মৃত্যু না হয়। আর, অভ্যন্তরে বা বহির্ভাগে, দিনে বা রাতে আপনার সৃষ্ট ভিন্ন অন্য হতেও যেন আমার মৃত্যু না হয়। সেরূপ নর কিংবা মৃগ (পশু) –দ্বারা। আমার যেন মৃত্যু না হয়। আমি যেন ভূমিতে বা আকাশেও না মরি, অপ্রাণ অথবা সপ্রাণ কিংবা দেবতা, অসুর, মহারথ–এ সকল হতেও যেন আমার মৃত্যু না হয়। নিজে অমর হতে ইচ্ছা করে আরও বর প্রার্থনা করছেন–যুদ্ধে প্রতিপক্ষ শূন্যত্ব এবং সকল দেহীর উপর একাধিপতিত্ব, সেরূপ সকল লোকপালের মাহাত্ম্য যা যা আপনার আছে,

আমাকে সে সকলও দিন। তপস্যা ও যোগের দ্বারা যাদের প্রভাব জন্মে তাদের যে অণিমাদি ঐশ্বর্য, যা কখনও বিনষ্ট হয় না, তাও কৃপাপূর্বক আমাকে প্রদান করুন।

.

চতুর্থ অধ্যায়

বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপু কর্তৃক লোকপালদের উপর অত্যাচার

শ্রীনারদ বললেন–হিরণ্যকশিপুর তীব্র তপস্যায় প্রীত হয়ে ব্রহ্মা তার প্রার্থনানুযায়ী দেবদুর্লভ বর প্রদান করলেন। ব্রহ্মা বললেন–তাত, তুমি আমার নিকট যে সকল বর প্রার্থনা করেছ, তা পুরুষদের দুর্লভ। হে দৈত্যেন্দ্র, যদিও ঐ সকল বর অত্যন্ত দুর্লভ, তথাপি আমি তোমাকে তা দিচ্ছি। ভগবান ব্রহ্মার অনুগ্রহ অমোঘ, তিনি ঐ প্রকার বর দিয়ে অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপুর দ্বারা পূজিত এবং প্রজেশ্বরগণের দ্বারা স্থূয়মান হয়ে নিজধামে গমন করলেন। এদিকে হিরণ্যকশিপু ঐ প্রকার বর পেয়ে স্বর্ণময় দেহ ধারণ করলেন এবং ভ্রাতৃবধ স্মরণ করে ভগবানের প্রতি দ্বেষ করতে আরম্ভ করলেন। ঐ মহান অসুর, সমস্ত দিক্, তিন লোক, দেবতা, অসুর, নরপতি, গন্ধর্ব গরুড়, উরগ, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর, ঋষি, পিতৃপতি, মনু, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচগণের ঈশ্বর, প্রেত পতি, ভূতপতি এবং অন্যান্য সকল প্রাণীর যে যে অধিপতি, তাদের জয় করে নিজের বশবর্তী করলেন। ঐ প্রকারে বিশ্বজয়ী হয়ে পরে তেজের সহিত লোকপালদের স্থান হরণ করে নিলেন।

তারপর হিরণ্যকশিপু দেবোদ্যানের শোভায় সুশোভিত স্বর্গে গিয়ে, বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মিত, ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীর পতি আশ্রয়স্থল ও সকল প্রকার সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ইন্দ্রভবনে বাস করতে লাগান। সেখানকার সোপানগুলি বিদ্রুম (প্রবাল) নির্মিত, ভূমি–মহামূল্য মরকত, ময় (পান্না), ভিত্তি সকল স্ফটিক–রচিত এবং স্তম্ভগুলি বৈদূর্যমনির দ্বারা নির্মিত। সেখানে বিচিত্র চন্দ্রাতপ, আসনগুলি পদ্মরাগ মণির দ্বারা রঞ্জিত, শয্যাসকল দুগ্ধফেনতুল্য এবং মুক্তাদাম তাদের পরিচ্ছদ। সেখানে শব্দায়মান নুপূরের দ্বারা শব্দ করত শোভনদশনা দেবরমণীগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করতে করতে রত্নস্থলীসকলে নিজেদের সুন্দর বদন দর্শন করে থাকেন। সেই মহেন্দ্র ভবনে মহাবলী হিরণ্যকশিপু ত্রিভুবন জয় করে একাধিপতি হয়ে বিহার করতে লাগলেন। দেব প্রভৃতি সকল প্রাণী তার প্রতাপে সন্ত্রস্ত হয়ে নিরন্তর তার পদযুগলের বন্দনায় নিযুক্ত ছিলেন, তথাপি তার প্রচণ্ড শাসন দিন দিন বেড়ে চলতে লাগল। হে রাজন, দৈত্যরাজ উগ্রগন্ধ সুরা পান করে সব সময় মত্ত হয়ে থাকতেন, এজন্য তার চোখ দুটি ঘূর্ণিত হয়ে থাকত। তিনি

তপস্যা,যোগবল ও সাহসের আশ্রয় হয়ে উঠেছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ব্যতীত সকল লোকপালগণ উপায়ন হস্তে তার উপাসনা করতে লাগলেন।

হে পাণ্ডব, হিরণ্যকশিপু নিজ বীর্যে ইন্দ্রাসনে অধ্যাসীন হলে, বিশ্বাবসু, তুম্বুরু, আমি (নারদ) প্রভৃতি সকল গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও অপ্সরাগণকে তার নিকট সঙ্গীত পরিবেশন করতে হত। আর, ঋষিগণ বার বার তার স্তব করতেন। সেই দৈত্য নিজের তেজে বর্ণশিষ্য-যুক্ত ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত বহু দক্ষিণ অযুক্ত যজ্ঞের হবির ভাগ গ্রহণ করতে লাগল। তার প্রভাবে সপ্তদ্বীপবতী ভূমি বিনা কর্ষণে বিবিধ শস্য প্রসব করতে লাগল। গাভীগণ তার অভিলাষ অনুসারে দুধ দিতে লাগল, আর আকাশ মণ্ডল নানা আশ্চর্যের আস্পদ হয়ে উঠল। লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দুগ্ধ এবং অমৃত জলযুক্ত রত্ন দ্রব্যসকল এবং তাদের পত্নী নদীসমূহ তরঙ্গের সাথে রাশি রাশি রত্ন বহন করে দিতে লাগল। গহ্বর-সহ পর্বতসকল তার ক্রীড়াস্থান হল এবং তরুগণ তার জন্য সকল ঋতুতে নিজ নিজ জুন (অর্থাৎ পুষ্প কলাদি) ধারণ করল। সে একাকীই সকল লোকপালদের গুণ (বর্ষণ, দহন ও শোষণাদি) ধারণ করল।

হে পাণ্ডবেয়, অজিতেন্দ্রিয় সেই দানব এই প্রকার সকল দিক্ জয় করে একাই ধনপতি হয়ে যদৃচ্ছাক্রমে ভোগ করেও পরিতৃপ্ত হতে পারেনি। এই প্রকারে শাস্ত্রমর্যাদা লঙঘনকারী ঐশ্বর্যমত্ত, গর্বিত (সনকাদি) ব্রাহ্মণজনের দ্বারা শাপগ্রস্ত সেই দৈত্যের সুমহৎ কাল অতিক্রান্ত হল। ঐ দানবের উগ্রদন্তে লোকপালের সহিত সমস্ত লোক উদ্বিগ্ন হয়ে অন্য কোনও আশ্রয় না পেয়ে ভগবান অচ্যুতের স্মরণ গ্রহণ করে প্রার্থনা করলেন। সেই দিকের প্রতি শত শত নমস্কার, যেখানে স্বয়ং আত্মা ঈশ্বরও বর্তমান। নির্মল শান্ত সন্ন্যাসিগণ যেখানে গিয়ে আর নিবৃত্ত হন না। এজন্য ঐ সকল নির্মল লোকপালগণ, সমাহিত চিত্ত ও সংযতাত্মা হয়ে নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক বায়ুক্ষেত্রে ভোজন করত সেই হৃষীকেশের উপাসনা করতে লাগলেন।

এইরূপে লোকপালগণ কিছু কাল ভগবানের উপাসনা করতে থাকলে, তাদের উদ্দেশে বক্তুরহিতা সোদর ধ্বনির মত অশরীরী ধ্বনী আবির্ভূত হল। ঐ ধ্বনি এরূপ গম্ভীর যে তার দ্বারা দিক্সকল প্রতিধ্বনিত হল এবং তা যেন সাধুদের অভয় দান করতে লাগল। ঐ বাণী এরূপ– হে বিপ্র শ্রেষ্ঠ, তোমরা ভীত হয়ো না, তোমাদের মঙ্গল হোক। যেহেতু আমার দর্শন সকল প্রকার কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। এই দৈত্যপতির দৌরাত্ম আমার জ্ঞাত, আমি তার শাস্তি বিধান করব, তোমরা কিছু কাল প্রতীক্ষা কর। যখন দেবে, বেদে, জোমকলে, ব্রাহ্মণে, সাধুতে ও আমার্তে কেশ ব্যক্তির বিদ্বেষ হয়। তখন সে শীঘ্রই বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। যদিও হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে তেজস্বী। তথাপি যখন সে নির্মল, প্রশান্ত, মহাত্মা, নিজপুত্র

প্রহ্লাদের প্রতি দ্রোহাচরণ করবে, তখন আমি তাকে বধ করব। (কারণ–আমি সব কিছু সহ্য করি, কিন্তু আমার ভক্তের প্রতি দ্রোহ কখনও সহ্য করি।)

শ্রীনারদ বললেন–লোকগুরু ভগবান এইরূপ বললেন, স্বর্গবাসী দেবগণ নিরুদ্দেশ হয়ে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন। তারা মনে করলেন–হিরণ্যকশিপুর বিনাশের আর বিলম্ব নেই, (কারণ ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদের প্রতি তার বিদ্বেষভাব প্রবৃত্ত হয়েছে)। হে রাজ, সেই দৈত্যপতির পরম অদ্ভুত চারটি পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে প্রহ্লাদ জ্ঞানের দ্বারা মহান ছিলেন। তিনি মহতের উপাসক, জিতেন্দ্রিয়, সুশীল, ব্রহ্মণ্য ও সত্য প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সকল প্রাণীর নিকট আত্মার মত অতিকায় প্রিয় ও সুহাত্তম ছিলেন। আর দাসের ন্যায় মান্যজনের প্রতি প্রণত হতেন এবং দীনজনে পিতার ন্যায় বাৎসল্য প্রকাশ করতেন। সমান ব্যক্তির প্রতি স্নেহ এবং (ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্ঠা) শ্রীগুরুদেবের প্রতি ঈশ্বর বুদ্ধি করতেন। তিনি বিদ্যা, ধন, রূপ ও আভিজাত্য সম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু তার জন্য অহংকার বা অভিমান করতেন না।

বিপদে তার চিত্ত উদ্বিগ্ন হত না, তিনি দৃষ্ট ও প্রভুত্ব এক বিষয়ে অরম্ভ দেখতেন (অর্থাৎ এসকল বিষয়ে তার কোন প্রয়োজন বৃদ্ধি ছিল না)। এজন্য ঐ সকল বিষয়ে কোন স্পৃহা ছিল না। তার শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধি সংযত এবং কামনা প্রশান্ত ছিল। যদিও তিনি অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তথাপি অসুর ভাব (মাৎসবাদি) ছিল না। হে রাজন, তাঁর মহৎগুণ সকল জ্ঞানীদের বার বার গ্রহণ করতেন। ভগবান ঈশ্বরে যেমন গুণ সকল নিত্য বর্তমান থাকে, তেমনি প্রহ্লাদে ঐ সকল গুণ আজও তিরোহিত হয় নি। হে নৃপ, শত্রু হয়েও দেবগণ নিজেদের সভায় সাধু-কথা প্রসঙ্গে প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন, আর তোমাদের মত লোকের কথা কি বলব? হে রাজন, ভগবান বাসুদেবের তাঁর স্বাভাবিক মতি, তার অসংখ্য জুক্ষের গণনা করে কার সাধ্য, আমি কেবল তার মাহাত্মের সূচনা করলাম।

হে মহারাজ, প্রহাদের ভগবানের প্রতি নৈর্সজেকী রতির নিদর্শন এই যে–তিনি বাল্যকালেই ব্রীড়া পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের একচিত্ত হয়ে জড়ের মত থাকতেন (অর্থাৎ লোকে তাকে জড় বলে মনে করত)। কৃষ্ণরূপ গ্রহের দ্বারা তার মন গৃহীত হওয়ায় জগৎ কিরূপ তা জানতেন না। (অর্থাৎ কোন গ্রহ যেমন লভ্য বস্তু গ্রহণ করে, তেমনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ভক্ত প্রহ্লাদের মন আকর্ষণ করে নিয়েছিলেন। কৃষ্ণমনা প্রহ্লাদ ব্যবহারময় জগৎ জানতেন না বটে, কিন্তু সর্বত্র কৃষ্ণময় জগৎ দেখতেন)। সব সময় গোবিন্দ কর্তৃক আলিঙ্গিত হওয়ায় (অর্থাৎ আত্মরূপী ভগবানের সাথে একীভূত থাকায়) তিনি উপবেশন, পর্যটন, ভোজন, পান ও কথা বলার সময়–ঐ সকল কর্মের কখনও অনুসন্ধান করতেন না। ভগবান বৈকুণ্ঠের চিন্তায় যখন তার

চিত্ত (বিরহে) ক্ষুব্ধ হত, তখন রোদন করতেন, আবার কখন ভগবানের চিন্তায় আনন্দে হাস্য করতেন, কখন বা গান করতেন। কখন মুক্ত কণ্ঠ হয়ে শব্দ করতেন, কখন বিলজ্জ হয়ে নৃত্য করতেন, আবার কখন ভগবানের ভাবনায় অতিনিবিষ্ট হওয়ায় তন্ময় হয়ে তার চেষ্টাদির (ভগবানের লীলার) অনুকরণ করতেন।

কখন ভগবানের ভাব প্রাপ্তির দ্বারা নির্বত ও পুলকিত হয়ে স্থির হয়ে থাকতেন। কখন স্থিরতর প্রমথ আনন্দ হেতু তার নয়নদ্বয় সজল হয়ে ঈষৎ নিমীলিত হত। প্রহ্লাদ অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্তজনের সঙ্গবশতঃ উত্তমঃ শ্লোক ভগবানের চরণকমলের সেবা লাভ করে। মুহুর্মুহু পরম আনন্দ বিস্তরাকরতঃ এইসঙ্গ অন্যান্য দীনজনেরও মন শান্ত করতেন। দূরসঙ্গী অন্যান্য খেলার সাথীদের মনকেও ভাবন্নিষ্ঠ করেছিলেন হে রাজন মহাভাগবৎ, মহাভাগ্যবান, মহাত্মা তাদৃশ নিজ পুত্র প্রহ্লাদের প্রতিও হিরণ্যকশিপু দ্রোহ আচরণ করতে লাগলেন।

শ্রী যুধিষ্ঠির বললেন–হে দেবর্ষে, হে সুব্রত, হিরণ্যকশিপু পাপী হয়ে, সেইরূপ শুদ্ধচিত্ত পুত্রের প্রতিও দ্রোহ করেছিল। এ আশ্চর্যের বিষয় আপনার নিকট হতে বিস্তৃত জানবার ইচ্ছা করি। পুত্র বৎসল পিতৃগণ উর্দ্ধপথ গামী পুত্রদের শিক্ষার জন্য তিরষ্কার করে থাকেন, কিন্তু শত্রুর মত কখনও অনিষ্ট চেষ্টা করেন না। যে সকল পুত্র প্রহ্লাদের মত অনুকূল (বশ্যতাপন্ন), সাধু, অগাধ বোধসম্পন্ন এবং যারা পিতাকে পরম দেবতা বোধ করেন, তাদের প্রতি পিতা অনিষ্ট চেষ্টা করবেন–এটা কি করে সম্ভবপর? হে ব্রহ্মণ, পুত্রের প্রতি পিতার এমন বিদ্বেষ হল, যা পুত্রের মরণের জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল। অথবা পুত্রের প্রতি বিদ্বেষ পিতার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল –এ বিষয়ে আমাদের মহৎ কৌতূহল আপনি নিবৃত্ত করুন।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রহ্লাদের বিষ্ণুস্তবে মতি দেখে হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ বধের প্রয়াস

শ্রীনারদ বললেন–হে রাজন, অসুরগণ ভগবান শুক্রাচার্যকে পৌরোহিত্য পদে বরণ করেছিল। তার শন্ত অমর্ক নাম্নে দুটি পুত্র দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর গৃহের নিকটে বাস করতেন। দৈত্যপতি তার শিশুপুত্র নীতিনিপুণ প্রহ্লাদকে দণ্ডনীতি প্রভৃতি শিক্ষার জন্য তাদের নিকট পাঠালেন। তারা প্রহ্লাদকে ও অন্যান্য বালকদের পাঠ্য বিষয়সমূহ পড়াতেন। গুরু যা শিক্ষা দিতেন, প্রহ্লাদ তা শুনতেন এবং তারপর তা পড়তেনও, কিন্তু ঐ সকল উপদেশের মধ্যে এ আত্মীয়, এর পর — এ সকল আশ্রয় করে থাকায়, তা উত্তম বলে মনে করতে পারলেন না। হে পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, একদিন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর নিজ পুত্র প্রহ্লাদকে কোলে

নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন–বৎস, বলত তুমি কি ভাল মনে কর? প্রহ্লাদ বললেন– হে অসুরবর্গ, 'আমি, আমার" ইত্যাদি মিথ্যা অভিনিবেশ হেতু মানুষ সব সময়। উদ্বিগ্ন। অতএব আত্মার অধঃপাতের নিমিত্ত রূপ, অন্ধকূপ তুল্য মোহবহ গৃহ পরিত্যাগ করে, বনে গিয়ে শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণই আমি উত্তম বলে মনে করি। দেবর্ষি নারদ বললেন–হে রাজন, হিরণ্যকশিপু নিজ পুত্রের মুখে নিজের শত্রু বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি প্রকাশক ঐ সকল কথা শুনে হাস্য করলেন। তারপর বললেন–এই প্রকারেই বালকদের বুদ্ধি পরবুদ্ধিতে নষ্ট হয়ে থাকে। এই বালককে এখন গুরুগৃহে নিয়ে যাক্। ব্রাহ্মণগণ যত্নপূর্বক এর রক্ষণাবেক্ষণ করুক যাতে ছদ্মবেশী বিষ্ণু পক্ষাশ্রিত কারোর বুদ্ধিভেদ জন্মাতে না পারে।

তারপর প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে নিয়ে গেলে, দৈত্যজনগণ প্রথমে তার প্রশংসা করে, পরে কোমল বচনে সান্ত্বনাপূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন। বৎস প্রহাদ, তোমার মঙ্গল হোক সত্য বল, মিথ্যা বলো না। এখানে যে সকল বালক রয়েছে তাদের অতিক্রম করে, তোমার এইরূপ বুদ্ধির বিপর্যয় কোথা হতে হল? তোমার এ বুদ্ধি ভেদ পরের দ্বারা হয়েছে। অথবা নিজে হতে জন্মেছে, হে কুলনন্দন, আমি তোমার গুরু, আমাদের এ বিষয়ে শুনতে ইচ্ছা হয়েছে, যথার্থ বল।

প্রহ্লাদ বললেন–যে ভগবানের মায়ার দ্বারা আত্মস্বরূপের বিস্মৃতিবশতঃ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির ফলে, যাদের বুদ্ধি বিমোহিত হয়ে নিজ এবং পর' এরূপ অসৎ বস্তুতে আগ্রহ জন্মে, সেই অচিন্ত্য মায়ার অধিশ্বর ভগবানকে নমস্কার করি। সেই ভগবান যখন কারও প্রতি অনুকূল হন, সাধারণ লোকেরই পশুবুদ্ধি (ভেদবুদ্ধি) দূর হয়ে যায়। সেই বুদ্ধি 'এটা অন্য আমি অন্য' এরূপ ভেদ জন্মায় বলে, তা মিথ্যা। নির্বুদ্ধি লোক সেই পরমাত্মাকেই আত্মীয় ও পর' বলে নিরূপণ করে থাকে। তাদের এরূপ করা অসঙ্গত নয়, যেহেতু ব্রহ্মাদিও তাঁকে জানতে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকেন। কারণ তার বর্ণন দুটি। হে ব্রহ্মণ, তিনিই আমার বুদ্ধিভেদ করছেন, তিনি নির্বিকার, কারও বুদ্ধিভেদ করেন না। তথাপি লৌহ যেমন অয়স্কান্ত খনির (চুম্বকের) সন্নিধানে স্বয়ং ভ্রমণ করে তেমনি চক্রপাণির যাদৃচ্ছিক সন্নিধানই আমার চিত্ত আপনা হতেই এরূপ ভেদ-প্রাপ্ত হয়েছে। (চুম্বকের স্বভাবই হল নিজের শক্তিতে লৌহকে আকর্ষণ করে সংযুক্ত করা। সেখানে কোন কারণ বা প্রয়োজন নাই। তেমনি ভগবান চক্রপাণির স্বভাবই হচ্ছে কৃপা পরবশ হয়ে নিজভক্তের চিত্তকে নিজেতে আকর্ষণ করা–এতে আমার কি স্বাতন্ত্র আছে?))।

নারদ বললেন–মহামতি প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণকে এরূপ বলে বিরত হলেন। তা শুনে সুদীন রাজসেবক (অর্থাৎ প্রহ্লাদের শিক্ষক) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে তিরস্কার করে বলতে লাগলেন। আর বেত আনত এ আমাদের নিন্দার কারণ, এ কুলাঙ্গার অতিশয় দুর্বুদ্ধি একর প্রতি (সাম, দান, ভেদ,

দণ্ড এই উপায়ের মধ্যে) চতুর্থ দণ্ডবিধানই একমাত্র উপায়। দানবরূপ চন্দনবনে এ একটি কন্টক-বৃক্ষ হয়ে জন্মেছে। প্রহ্লাদের আচার্য এইভাবে তর্জনাদি বিবিধ উপায়ে ভয় দেখিয়ে আবার কিছুকাল ধর্ম, অর্থ, কাম–এই ত্রিবর্গের প্রতিপালন শাস্ত্র পাঠ করালেন।

তারপর গুরু যখন জানতে পারলেন, এই বালকের সাম–দানদি জ্ঞাতব্য উপায় চতুষ্টয় জানা হয়েছে, তখন তাকে রাজগৃহে নিয়ে এলেন। সেখানে প্রহ্লাদের জননী স্নান করিয়ে অলংকৃত করে দিলে, দৈত্যপতির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ করালেন। পিতার নিকট গিয়ে প্রণামের জন্য চরণে পতিত হলে দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু আর্শীবাদ করে দুই বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করে আসঙ্গ অনুভব করলেন। তারপর কোলে তুলে নিয়ে শিরম্বনপূর্বক অশ্রুজলে অভিষেক করতে করতে প্রফুল্ল বদনে জিজ্ঞাসা করলেন–বৎস, এতদিনে গুরুগৃহে আচার্য যা যা শিক্ষা করালেন, তার মধ্যে যেটা উত্তম, তার কিছুটা শোনাও তো।

প্রহ্লাদ বললেন– পিতঃ, শ্রবণ, কীর্তন, বিষ্ণুর স্মরণ, পাদসেবন (পরিচর্যা), অর্চন (পূজা), বন্দন, দাস্য (কর্মাপন), সখ্য (তার বিশ্বাস উৎপাদন) এবং আত্মনিবেদন (দেহ সমর্পণ অর্থাৎ যেমন বিক্রিত গো, অশ্বাদি পশু ভরণ — পালনাদির চিন্তা করে না, সেরূপ ভগবান দেহাদি সমর্পণ করে ভরণ পোষণের চিন্তাও পরিত্যাগ কর্তব্য।) — এই নব লক্ষণ বিশিষ্ট ভক্তি অধীত ব্যক্তি যদি ভগবান বিষ্ণুতে সমর্পণপূর্বক অনুষ্ঠান করেন, আমরা মনে হয় তাহাই উত্তম অধ্যয়ন। কিন্তু আমাদের গুরুর নিকট সেরূপ অধ্যয়ন কিছুই নেই)। পুত্রের এরূপ কথা শুনে ক্রোধে কম্পিত অধর হয়ে হিরণ্যকশিপু গুরুপুত্রকে বললেন–ওহে দুর্মতি ব্রহ্মবন্ধন, এ কি? আমাকে অনাদর করে আমার বিপক্ষের পক্ষ আশ্রয় করতে এ বালককে শিক্ষা দিয়েছ? এ জগতে অনেক ছদ্ম বেশধারী অসাধু লোক মিত্রতার ভান করে থাকে। কালক্রমে যেমন পাতকিদের রোগ প্রকাশ পায়, তেমনি তাদের পাপকর্ম (বিদ্বেষাদি) কালে প্রকট হয়ে থাকে।

এই সকল কথা শুনে গুরুপুত্র ভয়ে কম্পিত কলেবর হয়ে নিবেদন করল– হে দৈত্যরাজ, আপনার পুত্র যে বাক্য বলল, তা আমরা শেখাই নি, কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিও শেখায় নি। এই বালকের স্বাভাবিক এরূপ বুদ্ধি। হে শত্রো, ক্রোধ সংবরণ করুন। আমাদের প্রতি অনর্থক দোষারোপ করবেন না। শ্রীনারদ বললেন–হিরণ্যকশিপু পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন —-এই অভদ্র মতি যদি গুরুপদেশে জন্মেনি, তবে কোথা থেকে ঐ বুদ্ধি পেয়েছ, বল।

প্রহ্লাদ বললেন–পিতঃ তোমাদের মত বিষয়াসক্ত ব্যক্তির কথা দূর থাক্, যে সকল ব্যক্তি গৃহাসক্ত, তাদের বুদ্ধি গুরু হতে অথবা আপনা হতে কিংবা পরস্পর হতে কোন প্রকারেই

কৃষ্ণোমতি সম্পন্ন হয় না। তারা অজিতেন্দ্রিয়, দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়ের আসক্তির ফলেই বারংবার সংসারে প্রবেশ করে। তাতে তাদের চর্বিত বিষয়েরই পুনরায় চর্বণ হয়ে থাকে। আর যে সকল ব্যক্তি দুরাশয় (অর্থাৎ যাদের চিত্ত বিষয়েই আসক্ত), তারা ভগবান বিষ্ণুকে জানতে পারে না। যাদের স্বার্থবুদ্ধি রয়েছে, তারাই কেবল ভগবানকে জানতে পারে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ গুরুপদেশ হতেও তাকে জানতে পারে না, অন্ধের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত অন্ধ যেমন পথ দেখতে পায় না, বরং বিপথে গিয়ে গর্তেই পতিত হয়, তার মত গুরুপদেশ দ্বারা বেদরূপ যে দীর্ঘরজু, যাতে ব্রাহ্মণাদি নাম রূপ বিস্তর বস্তু রয়েছে, তাতে ভুরি ভুরি কাম্য কর্মের দ্বারা বদ্ধই হয়ে থাকে। যদিও এক বিষ্ণু সকল প্রাণীতে গূঢ়, সর্বব্যাপী এবং সর্বভূতের অন্তর্যামী সত্য।

নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ বিষয়াভিমান শূন্য মহত্তম পুরুষদের পদধূলির দ্বারা যাবৎ অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ বেদবাক্যের দ্বারা ওইরূপ বিষ্ণু জ্ঞাত হলেও গৃহাসক্ত পুরুষের মতি ভগবানের চরণ স্পর্শ করতে পারে না। অধিকন্তু অসম্ভাবনাদির দ্বারা ব্যাহত হয়। অনর্থ অর্থাৎ সংসারের অপগমের জন্য যে চরণস্পর্শী মতির প্রয়োজন, তা মহতের অনুগ্রহের অভাব, তাদের তত্ত্ব নিশ্চয় কিংবা মোক্ষও হয় না। প্রহ্লাদ এই প্রকার বলে বিরত হলে, হিরণ্যকশিপু ক্রোধান্ত হয়ে ক্রোড় হতে তাকে ভূতলে ফেলে দিলেন। অসহ্য রোষে আবিষ্ট হওয়ায় দৈত্যপতির চোখ দুটি তাম্রবর্ণ হল। তিনি বললেন–ওহে অসুরগণ, এ বালক আমার বধের যোগ্য, একে শীঘ্রই বধ কর, এখুনি এখান থেকে দূর করে দাও। এ আমার সেই ভ্রাতৃহন্তা এর আত্মীয় ও সুহৃৎ। আমাদের পরিত্যাগ করে এ অধম পিতৃব্যহন্তা বিষ্ণুর চরণ (রাজপুত্র হয়ে) দাসের মতো অর্চন করে। অতএব এ দুষ্ট পিতৃব্যঘাতীর পক্ষপাতী হওয়ায় আমাদের বধ্য। কি আশ্চর্য, অবিশস্ত এ অধমকে বিষ্ণুই বা কি করে গ্রহণ করেছে? এ দুরাত্মা তারই বা কি ভালো করবে? যে পাঁচ বছর বয়সে মাতাপিতার দুস্ত্যজ স্নেহ পরিত্যাগ করেছে, এমন ব্যক্তি কি বিশ্বাসের যোগ্য হতে পারে? (যদি বল, ও তোমার পুত্র। এ কি করে বধ্য হতে পারে? তার উত্তরে বলছেন)–শত্রুও যদি ঔষধের মতো হিতকারী হয়, তাহলে সেই পুত্রের মতো, আর নিজের আত্মজ পুত্রও যদি অহিতকারী হয় তাকে মমতার কথা দূরে থাক, রোগের মতো সে পরিত্যজ্য। নিজের কর চরণাদি কোনো অঙ্গ যদি রোগাদির দ্বারা দূষিত হয় তার ছেদন করা কর্তব্য। কারণ তার পরিত্যাগে অবশিষ্ট অঙ্গসকল সুখে জীবন ধারণ করতে পারে। অতএব ভোজন, শয়ন ও আসনে বিষাদি প্রয়োগপূর্বক বিবিধ উপায়ের দ্বারা, এ পামরের বধের চেষ্টা কর। দুষ্ট ইন্দ্রিয় যেমন মুনিদের পরম শত্রু, এমনি সুহৃদের চিহ্নধারী এ দুষ্ট আমার শত্রু, অতএব একে উপেক্ষা করা যায় না।

ওই সকল অসুরের তীক্ষ্ণ দন্ত, করাল বদন, শ্মশ্রু ও কেশ তাম্রবর্ণ। তারা প্রভুর আদেশ পাওয়া মাত্র, শূল-হস্তে ভয়ংকর সিংহনাদ করতে করতে এবং মার মার, কাট কাট'–এরূপ বলতে বলতে উপবিষ্ট প্রহ্লাদের মর্মস্থলে শূল দিয়ে আঘাত করতে লাগল। কিন্তু প্রহ্লাদের মন ঈশ্বরে সমাহিত থাকায় তার উপর অসুরদের প্রহার বিফল হল। যেমন অপুণ্য ব্যক্তির সৎ ক্রিয়ার ফল নিষ্ফল হয়ে থাকে। কারণ ঈশ্বর নির্বিকার অনিদেশ্য অর্থাৎ শলাদির অগোচর, নিরতিশয় ঐশ্বর্যশালী এবং নিয়ন্তা, তাতে যাঁর চিত্ত সমাহিত থাকে তাকে অন্য বিষয় স্পর্শ করতে পারে না। হে যুধিষ্ঠির। সকলের ওই সকল প্রয়াস বিফল হলে, হিরণ্যকশিপুর অতিশয় শঙ্কা জন্মাল। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রহ্লাদের বধের জন্য বহু উপায় করতে প্রবৃত্ত হলেন।

দিগহস্তী, সর্প, অভিচারিক ক্রিয়া, পর্বতশৃঙ্গ হতে প্রক্ষেপ, মায়া, গর্তাদিতে নিক্ষেপ, বিষদান, অনাহারে রাখা, হিম, বায়ু, অগ্নি, জল, পর্বতে ক্ষেপণ–এ সকলও যখন সেই নিষ্পাপ পুত্রের প্রাণবধ করতে সমর্থ হল না এবং নিজেও কোনো প্রকারে তার বিনাশ করতে পারলেন না, তখন তার দীর্ঘ চিন্তা উপস্থিত হল। হিরণ্যকশিপু মনে মনে ভাবলেন, একে বহু কঠোর বাক্যে বলেছি এবং এর বধের জন্য বহু অসৎ উপায় অবলম্বন করেছি, কিন্তু এ নিজের তেজেই সকল দ্রোহাচরণ ও অপকার থেকে নিস্তার পেয়েছে। কি আশ্চর্য! আমার অদূরে বর্তমান থেকে এবং বালক হয়েও এরূপ নির্ভয় চিত্ত। এ কখন আমার শত্রুত্ব ভুলতে পারবে না, যেমন শুনঃশেফ তার মাতা-পিতার অপকার ভুলতে পারেনি। (অজগতের মধ্য পুত্র শুনঃশেফ মাতাপিতা কর্তৃক রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট বিক্রীত হয়ে, সে পিতার অপকার স্মরণ করে তার বিপক্ষ বিশ্বামিত্রের আশ্রয় নিয়ে গোত্রান্তর প্রাপ্ত হয়েছিল)। কিংবা শত্রুতাই এর স্বভাব। কুকুরের লেজের বক্রতার মতো স্বভাব দুষ্পরিহার্য। যা হোক এর অনুভব অপরিমেয়, কোথা থেকেও এর ভয় নেই এবং এ অমর-এর সঙ্গে বিরোধে আমারই মৃত্যু হবে না কি?

এ প্রকার দুশ্চিন্তায় দৈত্যপতি ম্লান ও অধোবদন হয়ে রইলেন। তারপর শুক্রাচার্যের নীতিজ্ঞ দুই পুত্র ও অমক তার নিকট এসে নির্জনে এরূপ বললেন– হে প্রভো, আপনি একাকী ত্রিভুবন জয় করেছেন। আপনার ভঙ্গি মাত্রে সমস্ত লোকপাল অতিশয় ত্রস্ত হয়। হে নাথ, আপনার এরূপ প্রভাব, আপনার চিন্তার বিষয় তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তবু এরূপ চিন্তিত রয়েছেন কেন? প্রহ্লাদের আচরণের জন্য চিন্তা করা উচিত হয় না। কারণ সে বালক, বালকদের ব্যবহার গুণ বা দোষের বিষয় হতে পারে না। গুরুদেব শুক্রাচার্যের ফিরে না আসা পর্যন্ত এ বালক যাতে ভীত হয়ে পলায়ন করতে না পারে, সেজন্য বরুণের পাশে বদ্ধ করে রেখে দিন। যেহেতু মানুষের বুদ্ধি বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহতের সেবার দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে থাকে,

গুরুপুত্রদের বাক্য অনুমোদন করে হিরণ্যকশিপু বললেন–বেশ, তাই হোক। ততদিন আপনারা একে গৃহস্থ রাজাদের ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দান করুন।

তারপর শণ্ডামর্ক প্রহ্লাদকে যথাক্রমে ধর্ম, অর্থ ও কাম উপদেশ দিতে থাকলেন, আর প্রহ্লাদও প্রশিত ও অবনত হয়ে তা গ্রহণ করতে লাগলেন। কিন্তু ত্রিবর্গ (ধর্ম, অর্থ ও কাম) যথাসময়ে গুরু সমীপে শিক্ষিত হলেও ওই সকল তার উত্তম বোধ হল না। কারণ ওই সকল যাঁরা উপদেশ দিতেন, তাঁদের চিত্ত রাগ–দ্বেষাদির দ্বারা আসক্ত ছিল। যা হোক, কিছুদিন পর আচার্য যখন গৃহমেধীয় কর্মে অন্যত্র গমন করলেন, তখন সমবয়স্ক বালকেরা অবকাশ পেয়ে প্রহ্লাদকে আহ্বান করল। মহাবুদ্ধিমান। প্রহ্লাদ সুমিষ্ট বাক্যে তাদের ডাকলেন এবং তাদের জন্ম-মরণাদিরূপ সংসার নিষ্ঠা অবগত হয়ে কৃপাপূর্বক সহাস্যে তাদের বললেন। সেই সকল বালক তার গৌরব ক্রীড়াদি পরিত্যাগ করল। তারা অতি অল্পবয়স্ক। সুখ-দুঃখে আসক্ত সংসারী মানুষের মতো তাদের বুদ্ধি দূষিত ছিল না। হে রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির। অসুর বালকগণ প্রহ্লাদের প্রতি আসক্ত হৃদয় এবং তার দিকে দৃষ্টি রেখে তাকে ঘিরে বসে থাকত। করুণ স্বভাব, হিতকারী মহাভাগবত অসুর বংশজাত প্রহ্লাদ তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন।

.

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রহ্লাদ কর্তৃক অসুর বালকদের প্রতি উপদেশ

প্রহ্লাদ বললেন–হে বন্ধুগণ, এই মনুষ্য জন্মে বিবেকী মাত্রেরই কৌমার বয়স থেকেই ভাগবত ধর্মের আচরণ করা উচিত। কারণ এ মনুষ্য জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ, তাতে আবার ক্ষণস্থায়ী কিন্তু পরমার্থ লাভের উপযোগী। এই মনুষ্য জন্মে সকল জীবেরই যে কোনো প্রকারই হোক, ভগবান বিষ্ণুর চরণ আশ্রয় করা কর্তব্য। যেহেতু তিনি সকল জীবেরই প্রিয়, আত্মা, বন্ধু এবং ঈশ্বর। হে দৈত্য বালকগণ। মনুষ্য জন্ম পেয়ে সুখভোগ লালসার জন্য উদ্যম করা উচিত নয়। এই ঐন্দ্রয়িক (ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ জাত) সুখ বা দুঃখ দেহধারী (পশু প্রভৃতির দেহেও) জীব মাত্রেরই দৈব অর্থাৎ প্রাচীন কর্মবশতঃ ভোগ করতে হয়। দুঃখ যেমন ইচ্ছা না থাকলেও বিনা চেষ্টাতেই আসে, তেমনি সুখেও বিনা চেষ্টাতেই জীবের ভোগ হয়, কারণ উভয়ই কর্মফল। অতএব তার জন্য প্রয়াস করা উচিত নয়। যেহেতু তার প্রয়াসে কেবল পরমায়ুর ক্ষয়ই হয়ে থাকে। মুকুন্দের চরণকমলের ভজনের দ্বারা যে পরম মঙ্গল (অশেষ দুঃখ নিবৃত্তিপূর্বক পরম আনন্দ অনুভব রূপ) লাভ হয়। বিষয়ের সুখ-লালসায় চেষ্টা করেও সেরূপ মঙ্গল লাভ হয় না। অতএব

বিবেকী পুরুষ সংসার দুঃখ থেকে ভীত হয়ে, যতদিন শরীরের শক্তি থাকে এবং মৃত্যু এসে গ্রাস না করে, তার মধ্যেই ভগবানের ভজনানন্দরূপ পুরুষার্থ লাভের চেষ্টা করবে।

সাধারণত মানুষের শত বছর পরমায়ু নির্দিষ্ট তার মধ্যে তার অর্ধেক অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর নিষ্ফলে চলে যায়। কারণ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি নিদ্রারূপ অজ্ঞান অন্ধকারে পতিত হয়ে রাত্রিতে শয়ন করে কাটায়। সেই অর্ধ পরমায়ুর মধ্যেও বাল্য ও কৈশোর মুগ্ধ হয়ে বিশ বছর ক্রীড়ায় চলে যায় এবং বৃদ্ধাবস্থায় দেহ জ্বরাগ্রস্ত হওয়ার অসমর্থ অবস্থায় আরও বিশ বছর গত হয়ে থাকে। অবশিষ্ট যে পরমায়ু থাকে, তা দুঃখে অপূর্ষর্মন কাম ও বলবান মোহের দ্বারা গৃহে আসক্ত প্রমত্ত (কর্তব্যসু সন্ধানশূন্য) ব্যক্তির বৃথাই অতিবাহিত হয়। (যদি বল যৌবনকালে গৃহাসক্ত হলেও পরে বিরক্ত হওয়ায় কৈবল্য লাভ হতে পারে তার উত্তরে তিনি বলছেন–তা অসম্ভব।)

অজিতেন্দ্রিয় কোন্ ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে আসক্ত ও দৃঢ় স্নেহপাশে বদ্ধ আত্মাকে (ভগবৎ কৃপা ব্যতীত) মোচন করতে উৎসাহী হয়েছে? আর কোন্ ব্যক্তিই বা ধন তৃষ্ণা পরিত্যাগ করেছে? ওই অর্থ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। তস্কর, সেবক এবং বণিক–সকলেই প্রাণহানি স্বীকার করেও অর্থ উপার্জন করছে। অনুকম্পিতা প্রিয়তমার সঙ্গে রহস্য ও মনোহর আলাপাদি স্মরণ করলে কোন্ ব্যক্তি তা ত্যাগ করতে পারে, বন্ধুজনের স্নেহপাশে বদ্ধ কোন্ ব্যক্তি তাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারে? আর শিশুদের মধুর কথায় যাদের চিত্ত অনুরক্ত, তারাই বা কেমন করে তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবে? আর পুত্র, শ্বশুরালয়ে স্থিত হৃদয়ঙ্গমা কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, অসহায় মাতা, পিতা, সুমহৎ মনোজ্ঞ পরিচ্ছদযুক্ত গৃহ, পরম্পরাগত জীবিকা, পশু, ভৃত্যবর্গ–এদের কোন ব্যক্তি ত্যাগ করতে পারে? কোনাকার কীট (গুটি পোকা) যেমন নিজের গৃহ নির্মাণ করে বাহির পথও অবশেষ রাখে না, তেমনি ওই সকলে আসক্তচিত্ত পুরুষ অতৃপ্ত কাম হয়ে লোভবশত কর্মই করতে থাকে। দোষ দর্শন দ্বারা কখনও বিরক্ত হয়ে ওই সকল ত্যাগ করবে তার সম্ভাবনা কোথায়? উপস্থ ও জিহ্বার জন্য সুখকেই যে ব্যক্তি বহু করে মানে, তার মোহ অতি দুরন্ত, সে কি করে বিরক্ত হবে? অপর, গৃহাসক্ত দুরন্ত মোহে এরূপ প্রমত্ত যে কুটুম্ব পোষণে নিজের পরমায়ু যে ক্ষয় হচ্ছে এবং সকল পুরুষার্থ বিনষ্ট হচ্ছে, তাও জানতে পারে না। অতএব তাপত্রয়ে (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) দুঃখিত চিত্ত হয়েও তার নির্বেদ আসে না (অর্থাৎ দুঃখ বোধই হয় না) সে নিজ কুটম্বতেই আসক্ত হয়ে থাকে। অজিতেন্দ্রিয় কুটুম্বী পুরুষের চিত্ত ধনাদির প্রতি এরূপ অভিনিবিষ্ট যে, পরস্ব হরণে পরলাকে নরক এবং ইহলোকে রাজদণ্ডাদিরূপ মহৎ দোষ জ্ঞানও অশান্ত কামনায় পর বিত্ত হরণ করে থাকে।

হে দৈত্যবালকগণ, এই প্রকারে বিদ্বান পুরুষও গৃহাদিতে আসক্ত হয়ে কুটুম্ব পোষণে প্রবৃত্ত হলে, ভগবানের পরম আনন্দ প্রাপ্তিতে কখনই সমর্থ হয় না। অধিকন্তু এটা আমার, এটা পরের–এরূপ বিভিন্ন ভাবনায় বিমূঢ় হয়ে অন্ধতম নরকাদি প্রাপ্ত হয়। হে বয়স্যগণ, ওই প্রকার গৃহাসক্ত পুরুষ কখন কোথাও নিজ আত্মাকে মোচন করতে সমর্থ হয় না। কারণ সে কামিনীদের ক্রীড়ামৃগ তুল্য অথবা তাদের বিহারের সাধন হয়ে শৃঙ্খলতুল্য পুত্র কন্যার বন্ধনে পতিত হয়। অতএব হে দৈত্যবালকগণ, বিষয়াসক্ত দৈত্যসকলের সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করে, আদিদেব নারায়ণের শরণাপন্ন হও। যেহেতু তার শরণেই মোক্ষ লাভ হয়। নিঃসঙ্গ মুনিগণও তাই যাঞ্ছা করে থাকেন। হে অসুরনন্দনগণ, আমরা বালক, নারায়ণের উপাসনায় সমর্থ হব না–এরূপ আশঙ্কা করো না, ভগবান অচ্যুত সকল প্রাণীর আত্মা এবং সর্বত্র প্রসিদ্ধ, তাকে প্রীত করা বহু প্রয়াসের কর্ম নয়।

স্থাবরাদি ব্রহ্ম পর্যন্ত ক্ষুদ্র-মৃহৎ যত জীব এবং ভৌতিক বিকার ঘটাদি যত অজীব ও আকাশাদি যত মহৎ ভূত, সত্ত্বাদি গুণ ওই সকলের মমত্বরূপ প্রকৃতি এবং গুণ ব্যতিকর মহত্তত্ত্বাদি যত আছে সব কিছুতেই ব্রহ্ম-স্বরূপ ভগবান ঈশ্বর এক আত্মা রূপ বর্তমান আছেন। ভগবানের মায়ার দ্বারাই দ্রষ্টা ও দৃশ্য, ভোক্তা ও ভোগ্য প্রকৃতি ভেদ দেখা যায়। এক পরমেশ্বরই প্রতিপাত্মা ও দৃশ্যরূপে, ব্যাপ্য ও ব্যাপকরূপে বিকল্পের অতীত হয়েও তিনি নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট রূপে প্রতিভাত হন। তিনি কেবল অবিমিশ্র অনুভাবাত্মক আনন্দ স্বরূপ। সর্বত্র তার সর্বজ্ঞত্বাদির অনুভব না হওয়ার কারণ, তিনি গুণময় সৃষ্টিকারিণী মায়ার দ্বারা নিজের ঐশ্বর্য অন্তর্হিত করে রাখেন।

অতএব হে অসুর বালকগণ, তোমরা আসুর ভাব পরিত্যাগ করে সর্বভূতে দয়া কর। সকল প্রাণীতে দয়া করলেই ভগবান আধোজ পরিতুষ্ট হবেন। তিনি তুষ্ট হলে কি অলভ্য থাকে? সব কিছুই লভ্য হয়। কিন্তু গুণ-পরিণাম হেতু দেববশত বিনা যত্নে যে সকল ধর্মাদি সিদ্ধ হয়, তাতে কি ফল? আর অগুণ মোক্ষের আকাঙ্ক্ষাই বা কেন? আমরা নিরন্তর তার নাম কীর্তন এবং তার চরণ কমলের সুধা পান করে থাকি, আমাদের মোক্ষেরই বা কি প্রয়োজন? ধর্ম, অর্থ, কাম–এই যে ত্রিবর্গ এবং তাদের অর্থ যে আত্মবিদ্যা, কর্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি এবং বিবিধ জীবিকা, এ সমস্ত ত্রিগুণবিষয়ক বেদ প্রতিপাদ্য, ইহা ভগবান সমর্পিত হলে সত্য, কিন্তু পরম পুরুষ যে আত্মার্পণ–উহাই পরম সত্য এবং নৈস্ত্রেগুণ্য লক্ষণ। হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদের আমি নূতন বিষয় বলছি না। পূর্বে নরসখা ভগবান নারায়ণ এই দুর্লভ অমর জ্ঞান নারদের উপদেশ করেছিলেন। তোমরা নারদের মতো শ্রোতা নও বলে নিজেদের অনধিকারী আশঙ্কা করো না, কারণ ভগবানের একান্ত ভক্ত অকিঞ্চন পুরুষদের চরণধূলিতে যে যে দেহী আপ্লুত হয়, তাদের

সকলেরই এই জ্ঞান লাভ হতে পারে। কেবল উত্তম পুরুষদেরই এই জ্ঞান হবে, এমন কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। অনুভব পর্যন্ত এই জ্ঞান এবং শুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম, আমিও পূর্বে দেবর্ষি নারদের নিকট শ্রবণ করেছিলাম। দৈত্যবালকগণ এ সমস্ত শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন–প্রহ্লাদ, এই দুই গুরুপুত্র (শামর্ক) ব্যতীত অন্য গুরু তুমিও জান না, আমরাও জানি না। এখানে আসবার পূর্বে তুমি নারদের কাছে গিয়েছিলে, ইহাও বোধ হয় না। কারণ আমরা সকলেই বালক প্রথম থেকে এই দুইজনকেই আমাদের নিয়ন্তা দেখছ, কবে তুমি অন্যত্র গেলে? দেবর্ষি নিজেই তোমার কাজে এসেছিলেন। এটাও সম্ভব নয়, কারণ বালকরা অন্তঃপুরে থাকে তাদের মহৎসঙ্গ দুর্ঘট। হে সৌম্য, এ বিষয়ে বিশ্বাসের কোনো হেতু থাকলে, তুমি আমাদের সংশয় ছেদন কর।

.

সপ্তম অধ্যায়

প্রহ্লাদ কর্তৃক মাতৃগর্ভ থেকে প্রাপ্ত নারদোপদেশের বর্ণন

শ্রীনারদ বললেন–এই প্রকার দৈত্য পুত্রদের দ্বারা পৃষ্ট হয়ে মহাভাগবত প্রহ্লাদ আমার (নারদের) পূর্ব উপদিষ্ট তত্ত্ব স্মরণ করে সহাস্যে তাদের বললেন। প্রহ্লাদ বললেন–আমাদের পিতা হিরণ্যকশিপু তপস্যার জন্য মন্দরাচলে গেলে, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ দানবদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর যুদ্ধের উদ্যম করতে লাগলেন। তখন তারা বলতে লাগলেন–পিপীলিকার দ্বারা যেমন মহাসর্প ভক্ষিত হয় তেমনি সকল লোকের সন্তাপকারী এই হিরণ্যকশিপু নিজের পাপেই বিনষ্ট হল। সে সময় অসুরদের যে সকল দলাধিপতি ছিল, দেবতাদের যুদ্ধোদ্যম দেখে এবং তাদের দ্বারা বধ্যমান হয়ে ভয়ে তারা পলায়ন করতে লাগল। তারা নিজ নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য এরূপ ব্যস্ত হয়েছিল যে স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধুব, সম্পদ, পশু, গৃহ ও গৃহহাপকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেও সময় পেল না। জয়াকাঙ্ক্ষী দেবগণ সর্বস্ব অপহরণপূর্বক দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর আবাসও বিনষ্ট করে ফেলল। আর দেবরাজ ইন্দ্র আমার জননী দৈত্যরাজ মহিষীকে গ্রহণ করলেন।

ইন্দ্র যখন ভয়োদ্বিগ্না কুররী পক্ষীর মতো রোরুদ্যমানা আমার মাতাকে নিয়ে যায়। তখন যদৃচ্ছাক্রমে পথে সমাগত দেবর্ষি নারদ সেখানে তাকে দেখতে পেলেন। দেবর্ষি দেবরাজকে সম্বোধন করে বললেন–হে সুরপতি, এ অবলার কোনো অপরাধ নেই। এঁকে নিয়ে যাওয়া তোমার যোগ্য নয়। ইনি পরমা সাধ্বী, পরস্ত্রী, এঁকে ত্যাগ কর। ইন্দ্র বললেন– এর জঠরে বেদশত্রু হিরণ্যকশিপুর দুঃসহ বীর্য আছে, যতদিন প্রসব না হয়, ততদিন তিনি আমার আবাসে

থাকুন। পুত্র জন্মালে তার প্রাণবধ করে, এঁকে পরিত্যাগ করব। নারদ বললেন–এর গর্ভস্থ সন্তান নিষ্পাপ মহাভাগবত, নিজের গুণেই অতিমহৎ এবং অনন্তের অনুচর। সুতরাং মহাবলী, তুমি কখনই তাকে বধ করতে পারবে না। দেবর্ষি এরূপ বললে, দেবরাজ ইন্দ্র তার বাক্য মান্য করে আমার জননীকে ছেড়ে দিলেন এবং ভগবান অনন্তের প্রিয় আমার প্রতি শ্রদ্ধায় তাকে প্রদক্ষিণ করে নিজস্থানে চলে গেলেন।

তারপর দেবর্ষি আমার মাতাকে নিজ আশ্রমে নিয়ে গিয়ে আশ্বাস প্রদান পূর্বক বললেন–বৎসে যতদিন তোমার ভর্তার আগমন না হয়, ততদিন ওই আশ্রমে অবস্থান করুন। তারপর তাই হোক'-এই বলে আমার জননীও যতদিন দৈত্যপতি ঘোর তপস্যা থেকে ফিরে না আসেন, ততদিন দেবর্ষির নিকটেই বাস করেছিলেন। আমার পতিব্রতা মাতার ইচ্ছা অনুসারে সন্তান প্রসব করার উদ্দেশ্য এবং গর্ভস্থায় সন্তানের মঙ্গল কামনায় পরম ভক্তির সহিত ঋষির শুশ্রূষা করতেন। দেবর্ষি অতিশয় সামর্থবান এবং পরম কারুণিক, এজন্য তিনি আমার জননীকে উভয় বরই (গর্ভের মঙ্গল ও ইচ্ছাপ্রসব) প্রদান করলেন। আর মাতার শোক-শান্তির জন্য আমাকে উদ্দেশ্য করে ভক্তিলক্ষণ ধর্মতত্ত্ব ও আত্ম-অনাত্মা বিবেক এই দুই নির্মল বস্তু উপদেশ করলেন। কিন্তু আমার মাতা স্ত্রীজাতি এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় তার ওই জ্ঞানবাণী তিরোহিত হয়েছে। আমার প্রতি ঋষির বিশেষ অনুগ্রহ থাকায় এখনও সেই স্মৃতি আমাকে পরিত্যাগ করেনি।

হে বন্ধুগণ, তোমরা যদি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান হও, আমার মতো তোমাদেরও এবং স্ত্রী, বালকদের ও বৈশারদী (অর্থাৎ দেহাদির অহংকার ছেদ নিপুণা) বুদ্ধির উদয় হতে পারে। বিকার সমর্থ। ঈশ্বরমূর্তিরূপ কালের দ্বারা, যেমন বৃক্ষ বর্তমান থাকলেও উৎপত্তি প্রভৃতি ছয়টি বিকার ফলেরই দেখা যায়, তেমনি দেহের জন্মাদি (উৎপত্তি, স্থিতি, বুদ্ধি, পরিণাম, অবক্ষয় এবং বিনাশ) ছয়টি বিকার দৃষ্ট হয়, আত্মার নয়। আত্মা (পরমাত্মা) নিত্য (অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশ রহিত) অব্যয় (অপক্ষয়শূন্য), শুদ্ধ, অদ্বিতীয়, বিজ্ঞাতা, সর্বশ্রয়, বিকারবর্জিত স্বপ্রকাশ, হেতু (কারণ), ব্যাপক, অসঙ্গী ও অনাবৃত। এই দ্বাদশটি আত্মার লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ দ্বারা বিদ্বান পুরুষ দেহাদিতে 'আমি আমার'–এই মোহজাত অসদ্ভাব (অর্থাৎ মিথ্যাবুদ্ধি) পরিত্যাগ করে থাকেন। হে বন্ধুগণ, যে সকল ক্ষেত্রে স্বর্ণের আকর আছে, তাতে স্বর্ণকণারূপ প্রস্তরে অগ্নি সংযোগদির দ্বারা সেই উপায়ভিজ্ঞ স্বর্ণকারগণ যেমন স্বর্ণপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তেমনি এই দেহে ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় আত্মযোগ দ্বারা অধ্যাত্মবিদ (অর্থাৎ আত্মাধিকৃত কার্যকারণ সমূহের জ্ঞাতা) পুরুষ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হতে পারেন।

অষ্টপ্রকৃতি (মূল প্রকৃতি, মহতত্ত্ব, অহংকার তত্ত্ব ও পঞ্চ তন্মাত্র) তার তিনটি গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) এবং ষোড়শ বিকার (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত), আর পরম পুরুষ আত্মা। যিনি সাক্ষীরূপে ওই সকলে বর্তমান–এই জন্য কপিলাদি আচার্যগণ যাঁকে এক বলেছেন। আর স্থাবর ও জঙ্গম–এই দুই প্রকারে দেহ, যা সকলের সংঘাত স্বরূপ। এই সর্বসংঘাতক দেহেই সেই পুরুষের অন্বেষণ করা কর্তব্য। এটা নয়, এটা নয়'–এইরূপে বিচার করে, অনাত্ম সমস্ত পদার্থ হতে পৃথক সেই পুরুষের উপলব্ধি হয়ে থাকে। মণিময় মালার মধ্যগত সূত্র যেমন সকল খনিতে অনুসূত এবং যেমন ওই সূত্রসকল মণি হতে ভিন্ন, তেমনি অন্বয় ব্যতিরেকে (অর্থাৎ প্রত্যগাত্মার অস্তিত্বে সংঘাতের স্থিতি–ইহা অন্বয় এবং প্রত্যগাত্মা হতে নির্গত হলে সংঘাতের বিনাশ–ইহা ব্যতিরেক)–বিবেচনা করলে যখন অন্তঃকরণ শুদ্ধ হবে। তখন অব্যগ্র হয়ে সেই অন্তঃকরণের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ বিচারপূর্বক সেই পুরুষের অন্বেষণ করা কর্তব্য।

হে বন্ধুগণ, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি–এগুলি বুদ্ধির বৃত্তি, এ সকল যাহা কর্তৃক অনুভূত হয়, তিনি পরম পুরুষ, তিনিই সাক্ষী। ওই বৃত্তিসকল বুদ্ধির পরিণাম মাত্র, আত্মার ধর্ম নহে। আর এ সকল বৃত্তি কর্মজন্য, অতএব ত্রিগুণাত্মক ও কর্মজন্য হওয়ায় বুদ্ধিরই জাগ্রতাদি অবস্থা জানবে। যেমন গন্ধ পুষ্পের ধর্ম, বায়ুর সাথে মিলিত হওয়ার বায়ুর ধর্ম বলে প্রকাশ পায়। তার মত আত্মা বুদ্ধির সাথে যুক্ত হওয়ায় বুদ্ধির অবস্থা জাগ্রতাদি বিশিষ্ট বলে বোধ হয়। বস্তুত আত্মার ওই সকল অবস্থা হয় না। এই প্রকারে পুষ্পধর্ম গন্ধ দ্বারা গন্ধাশ্রয় বায়ুর ন্যায় আত্মস্বরূপ অবগত হবে। (পুষ্পপাধিক বায়ুর গন্ধকে পৃথক জানালেও তার গন্ধ নিবৃত্তি হয় না। সেরূপ আত্মাকে গুণাতীত জানলেও সংসার নিবৃত্তি হতে পারে না–এরূপ শঙ্কা করো না, কারণ) সংসার কেবল বুদ্ধির দ্বারা হয়, বুদ্ধির গুণ ও কর্মই সংসারের বন্ধন এবং অজ্ঞানই তার মূল, সুতরাং তার স্বরূপ মিথ্যা হলেও স্বপ্নবৎ অর্পিত হয়ে থাকে। এইরূপে আত্মার সংসার নিবৃত্তি ঘটতে পারে, অতএব তোমরা গুণাত্মক কর্মসকলের বীজ যে অজ্ঞানতার দাহক যে তা, যাতে বুদ্ধির জাগ্রতাদি অবস্থা প্রবাহ বিনষ্ট হয়, সেই যোগ অনুষ্ঠান কর। হে বালকগণ, অধ্যাস নিবৃত্তির হাজার হাজার উপায়ের মধ্যে এই ভক্তিযোগ রূপ উপায় শ্রীভগবান নিজে বলেছেন। এই ধর্মানুধানের দ্বারা ভগবান ঈশ্বরে বর্ণানুসন্ধান রহিত হয়। সেই ভক্তির অন্তরঙ্গ ধর্ম বলছেন–গুরু শুশ্রূষা, গুরুভক্তি, গুরুর প্রতি লব্ধ বস্তু সমর্পণ। সাধু ও ভগবদ্ভক্তজনের সংসর্গ এবং ঈশ্বরের আরাধনা। আর ভগবানের কথায় শ্রদ্ধা, তার গুণ কর্মসমূহের কীর্তন, তাঁর চরণকমলের ধ্যান, তার মূর্তি সকলের দর্শন ও অর্চনাদি। সেরূপ ভগবান হরিকে সর্বভূতে বর্তমান জানা এবং সকল ভূতকে সাধু বলে গ্রহণ করা। এই সকল কর্মের দ্বারা ষড়বর্গ (অর্থাৎ

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসর্থ) জয় করে ভগবান বাসুদেবে ভক্তি করতে হয় এবং তার সবাই ভগবত বিষয়ে রতি লভ্য হয়।

(ভগবান রতি হলে সাধকের কি অবস্থা হয়, তা বলছেন)–যখন অতিশয় হর্ষোদয় হওয়ায় পুলকোদগম ও অশ্রুপাত হয়, তাতে গদগদ স্বরে ঊর্ধকণ্ঠ হয়ে কখন নৃত্য, গীত ও আনন্দধ্বনি করে। কখন গ্রহজম্ভের মতো হাস্য করে, কখন ক্রন্দন করে, কখন ধ্যান করে, কখন লোকের বন্দনা করে, কখন বা বারবার শ্বাস ত্যাগ করতে করতে নির্লজ্জ হয়ে "হে হরে, হে জগৎপতি, হে পরায়ণ"–এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করতে থাকে। তখন সমস্ত বন্ধন হতে মুক্ত হয় এবং ভগবানের চেষ্টাদি ভাবনায় পুরুষের মন ও শরীর তার অনুকৃত হতে থাকে। সে সময় গুরুতর ভক্তি হেতু সেই ব্যক্তির অজ্ঞান ও বাসনা নিদগ্ধ হয়ে যায়। অতএব সম্যক প্রকারে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। অর্ধেক্ষজের আশ্রয় গ্রহণই রাগাদি দূষিত আত্মবান পুরুষদের সংসার নাশের উপায় এবং তাই পরব্রহ্মে লয়রূপ মোক্ষ ও তাই মুখ্য বলে পণ্ডিতগণ বলে থাকেন। অতএব তোমরা হৃদয়ে অন্তর্যামী ঈশ্বরের উপাসনা কর।

হে অসুরবালকগণ, হরির উপাসনা করা খুব পরিশ্রমের কার্য নয়, ভগবান হরি হৃদয়মধ্যে আকাশের ন্যায় বর্তমান রয়েছেন, তিনি আত্মার সখা, তবে দেহধারী ব্যক্তি সাধারণ শূকরাদি জীবের মতো শুধু বিষয়ের প্রতি আসক্ত হবে কেন? ধন, কলত্র, পশু, পুত্রাদি, গৃহ, ভূমি, হস্তী, ধনাগার, ঐশ্বর, অর্থ, কাম–এ সমস্তই চঞ্চল। আর মানুষের পরমায়ু ক্ষণভঙ্গুর, কাজেই ওই সকল বস্তু তার কতটুকু প্রীতি সম্পাদন করতে পারে, আর স্বর্গাদি লোকসকল পুণ্য তারতম্যে অপেক্ষাকৃত উত্তম হলেও পরমার্থতঃ নির্মল নহে। ওই সকল লোক যাগাদির দ্বারা প্রাপ্য, সুতরাং ক্ষয়িষ্ণু, অতএব ওই সমস্ত লোকও সেবার যোগ্য নয়। ওই সকল পরিত্যাগ করে পূর্বোক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা ভগবান হরির আরাধনা কর, তাতে কোনো প্রকার দোষ দৃষ্ট হয় না, তার সেবায় আত্মলাভ হবে।

পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি এই সংসারে যে বৈষয়িক সুখলাভের জন্য বারবার লৌকিক ও অলৌকিক কর্ম করে, তার দুঃখাত্মক ফল অবশ্যই লাভ করে। এই কর্মমার্গে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তির জন্য কর্মী পুরুষের সংকল্প হয়। তাতে পূর্বে ক্রিয়ার অভাবহেতু সুখাকাঙ্ক্ষী যে পুরুষ, তাকে ক্রিয়া দ্বারা অসংশয় দুঃখ প্রাপ্ত হতে হয়। এ সংসারে পুরুষ দেহের নিমিত্ত কাম্য কর্মতভাগ প্রার্থনা করে, কিন্তু সেই দেহও পারক্য (অর্থাৎ কুকুর শৃগালদির ভক্ষ) ক্ষণভঙ্গুর এবং নিত্য নয়, কখন যায়, কখন আসে। যখন হস্তপদাদিযুক্ত দেহেরই এই অবস্থা, আর দেহের সম্বন্ধে সম্বন্ধান্বিত মমতাস্পদ পুত্র, কলত্র, গৃহ, ধন, জন, রাজ্য, কোষ, হস্তী, অমাত্য,

ভৃত্য আপ্ত প্রভৃতি যে পারক্য তার কথা আর কি বলব? এই সকল পদার্থ দেহের সাথে নশ্বর এবং অনর্থ অর্থের মতো প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু অতি তুচ্ছ। এ সকলের দ্বারা নিত্য আনন্দরসের সাগরস্বরূপ আত্মার কি উপকার হতে পারে? হে অসুরগণ, প্রাচীন কর্মবশত নিষেকাদি অবস্থাতেও যখন দেহীকে দৃশ্যমান দেখা যায়। তখন আবার কর্ম করলে, তার দ্বারা কি স্বার্থ হবে তা তোমরা নিজেরাই বিচার কর। কর্ম সমাপ্ত হলে যে ভোগের অবসর হবে, তারও সম্ভাবনা নেই। কারণ দেহী আত্মার অনুবর্তী দেহের দ্বারা কর্ম আরম্ভ করে, সেই কর্মের ফলে আবার দেহ ধারণ করে, এইরূপ অজ্ঞানের দ্বারা কর্ম ও দেহ উভয়েরই বিস্তার হয়ে থাকে। অতএব হে বন্ধুগণ, অর্থ, কাম ও ধর্ম–এই তিনটি যাঁর অধীন, তোমরা কামনা শূন্য হয়ে সেই নিরপেক্ষ হরির উপাসনা কর।

ভগবান হরি সকল ভূতের আত্মা, প্রিয় এবং ঈশ্বর। সমস্ত প্রাণী তার নিজকৃত মহৎ ভূত সকলের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে, অতএব তিনি অন্তর্যামী। আমরা অসুর, আমাদের ওই বিষয়ে অধিকার নেই–এরূপ আশঙ্কা করো না। সুর, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, অথবা গন্ধর্ব–যে কেউ হোক, ভগবান মুকুন্দের চরণকমল ভজন করলে সকলেই কল্যাণভাজন হয়। হে অসুর বালকগণ, দ্বিজত্ব অথবা দেবত্ব, কিংবা ঋষিত্ব অথবা সদ্বৃত্ত কিংবা বহুজ্ঞতা–কিছুই মুকুন্দের প্রীতির নিমিত্ত হতে পারে না। আর দান, তপস্যা যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত–এগুলিও ভগবানের প্রীতির কারণ নয়। কেবল নিষ্কাম ভক্তির দ্বারাই ভগবান প্রীত হন। ভক্তি ব্যতীত অন্য সবকিছু বিড়ম্বনা মাত্র (অর্থাৎ তিরস্কারের কারণ) হে দানবগণ, এইজন্য সর্বত্র আত্মতুল্য দর্শন করে সর্বভূতের আত্মা, ঈশ্বর, ভগবান হরিকেই ভক্তি কর। হে দৈত্যগণ, যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, ব্রজৌকাস (গবোপজীবী নীচজাতি আভীর) এবং পশু, পক্ষী প্রভৃতি বহু পাপী জীবও ভক্তিযোগের দ্বারা অচ্যুতত্ত্ব অর্থাৎ অচ্যুতের মতো চিন্ময় শরীরত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। হে ভ্রাতৃগণ, ভগবান গোবিন্দে একান্ত ভক্তি করে সর্বত্র তার নিরীক্ষণ করাই ইহলোকে জীবের পরম পুরুষার্থ।

.

অষ্টম অধ্যায়

নৃসিংহ দেবের আবির্ভাব। হিরণ্যকশিপুর বিনাশ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক ভগবানের স্তুতি

শ্রীনারদ বললেন–দৈত্যবালকেরা প্রহ্লাদের কথা শুনে উৎকৃষ্টবোধে তার উপদেশই গ্রহণ করল। গুরু (সন্ত ও অমর্ক) যা শিখিয়েছিলেন, তা গ্রহণ করল না। তারপর গুরুপুত্রদ্বয় যখন

দেখলেন–প্রহ্লাদের দোষে সকল বালকের বুদ্ধি ভগবান বিষ্ণুতে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েছে। তখন ভীত হয়ে সত্ত্বর রাজার নিকট গিয়ে সমস্ত নিবেদন করলেন। শোনামাত্রই রাজা হিরণ্যকশিপু কোপবিষ্ট হয়ে কম্পিত কলেবরে পুত্রকে হত্যা করতে সংকল্প করে কঠোর বাক্যে তাকে তিরস্কার করতে লাগলেন। যদিও প্রহ্লাদ তিরস্কারের অযোগ্য, তবুও স্বভাবত নিষ্ঠুর পদাহত সর্পের ন্যায় বারবার নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে প্রশ্রয়াবনত দন্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান পুত্রের প্রতি সরোষ বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক নিরীক্ষণ করে বলতে লাগলেন। হিরণ্যকশিপু বললেন–ওরে, দুর্বিনীত মন্দবুদ্ধি, তুই অধম, কুলভেদকারক, জড়, আমারও শাসন লঙ্ঘন করছিস, যাক আজই তোকে যম–সদনে পাঠিয়ে দেব। ওরে, মূঢ়, আমি ক্রুদ্ধ হলে লোকপালদের সাথে ত্রিভুবন ভয়ে কম্পিত হয়। সেই আমাকে কিছুমাত্র ভয় না করে, কার বলে বলীয়ান হয়ে আমার শাসন অতিক্রম করছিস?

প্রহ্লাদ বললেন–হে রাজন, তিনি কেবল আমারই বল নন, আপনারও এবং অন্যান্য বলশালীদেরও বল। আর যে সকল ব্রহ্মাদি স্থাবরজঙ্গম রয়েছে, সকলকেই তিনি নিজ বলে বশীভূত করেছেন। কারণ তিনিই ঈশ্বর, তিনিই কাল, তার পরাক্রম অসীম। তিনিই সামর্থ্য, সাহস, ধৈর্য এবং ইন্দ্রিয়স্বরূপ। সেই পরম পুরুষই নিজ শক্তির দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করছেন, যেহেতু তিনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের ঈশ্বর। হে রাজন, আপনি আপনার আসুরিক স্বভাব পরিত্যাগ করুন এবং মনকে সমানভাবে ধারণ করলে; আর কেউ আপনার বিদ্বেষ্টা থাকবে না। উৎপথগামী মন ব্যাতীত অন্য কোনো শত্রু নেই, আর সমত্বরূপে মন ধারণাই (অর্থাৎ শত্রু-মিত্রাদির অনুসন্ধানরহিত হয়ে সর্বত্র ভগবদ দর্শনই) ভগবানের মহৎ আরাধনা। পিতঃ, আপনার মতো কতকগুলি লোক, ছয় ইন্দ্রিয়স্বরূপ শত্রুগণ যাদের সর্বস্ব হরণ করেছে, প্রথমে তাদের জয় না করে, আমরা দশ দিক জয় করেছি'–বলে অভিমান করে থাকে। কিন্তু যিনি সাধু বিদ্বান, সকল দেহীতে সমবুদ্ধি এবং মনকে জয় করেছেন, তার অজ্ঞান কল্পিত শত্রু কোথা হতে হবে?

হিরণ্যকশিপু বললেন–ওরে মন্দবুদ্ধি, তুই অতিমাত্র নিন্দা আরম্ভ করলি, মনে হয় তোর মরবার ইচ্ছা হয়েছে কারণ মুমূর্য লোকদেরই বাক্য এরূপ অসংলগ্ন (বিপ্লব) হয়ে থাকে। আর মন্দভাগ্য, তুই যে বললি–আমি ছাড়া অন্য কেউ জগতের ঈশ্বর আছেন, আর দুর্বুদ্ধি, যদি থাকেন কোথায় আছেন? যদি সর্বত্র থাকেন, তবে এই স্তম্ভে কেন দেখা যাচ্ছে না? (প্রহ্লাদ স্তম্ভে ভগবানকে দেখে নমস্কার করে বললেন–দেখা যাচ্ছে।) কিন্তু হিরণ্যকশিপু (দেখতে না পেয়ে) অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন–তুই বৃথা গর্ব করছিস, এখনই তোর শরীর থেকে মস্তক হরণ করছি, দেখি তোর অভীপ্সিত হরি আজ তোকে রক্ষা করুক। (প্রহ্লাদ মস্তকোপরি অঞ্জলিবন্ধন

করে সেই স্তম্ভের দিকেই চেয়েছিলেন), দুরাত্মা হিরণ্যকশিপু ওই প্রকার দুর্বাক্যের দ্বারা বারবার মহাভাগবত পুত্রকে তর্জনপূর্বক খঙ্গগ্রহণ করে নিজ সিংহাসন হতে উঠলেন এবং প্রহ্লাদ যে স্তম্ভের দিকে চেয়েছিলেন, সেই স্তম্ভে অতি বলে মুষ্টির আঘাত করলেন।

নারদ বললেন–হে মহারাজ যুধিষ্ঠির। সেই মুষ্টির আঘাত করা মাত্রই সেই স্তম্ভ হতে এমন একটা ভয়ংকর শব্দ নির্গত হল, যেন ব্রহ্মাণ্ড–কটাহ স্ফুটিত হয়ে গেল। ব্রহ্মাদি দেবগণ নিজ নিজ ধামে বসে ওই অদ্ভুত ধ্বনি শুনে মনে করলেন যেন তাদের স্থান বিনষ্ট হল। হিরণ্যকশিপু পুত্রের বধ করতে ইচ্ছা করে বল–বিক্রম প্রকাশ করছিলেন, সেই অভূতপূর্ব ভয়ংকর ধ্বনি শুনে সভার দিকে চেয়ে দেখলেন, কিন্তু যে ধ্বনিতে দেবগণের শত্রু হয়েছিল, তার মূল আশ্রয় কি, তা দেখতে পেলেন না। তারপর ভগবান নিজভৃত্যের বাক্য (প্রহাদ যে বলেছিলেন-স্তম্ভে দেখা যাচ্ছে, তা) এবং ভগবান যে সমস্ত পদার্থে ব্যেপে আছেন, তাও সত্য করার জন্য দৈত্যঘাতক ঘোর রূপ ধারণ পূর্বক সভার মধ্যে সেই স্তম্ভেই দৃষ্ট হলেন, তাঁর সেই রূপ মৃগও (পশুও) নয়, মানুষও নয়, অতিশয় অদ্ভুত।

হিরণ্যকশিপু প্রথমত, ওই মূর্তি দেখতে পাননি। ওই ধ্বনি শুনে তার আশ্রয় কোনো প্রাণী ভেবে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। তখন স্তম্ভ হতে নির্গমনশীল মিশ্রিত নর-সিংহরূপ দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন–অহো, একি অদ্ভুত, এ মৃগও নয়, মানুষও নয়, এ কোন্ প্রাণী? পরে নিজেই মীমাংসা করলেনএটি নৃ-মৃগেন্দ্র রূপ (অর্থাৎ নৃসিংহ রূপ)। যখন হিরণ্যকশিপু সেই ভয়ানক, নৃসিংহ রূপের মীমাংসা করছিলেন, তখুনিই ভগবান নৃসিংহরূপী শ্রীহরি তার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তার লোচন প্রত্যপ্ত স্বর্ণের মতো পিঙ্গলবর্ণ, বদন দেদীপ্যমান জটা ও কণ্ঠলোমে অতিশয় বিজম্ভিত। আর করাল দন্ত করবাল (খ) তুল্য চঞ্চল ও ক্ষুরধার সদৃশ তীক্ষ্ণ জিহ্বা দৃষ্ট হচ্ছিল, আর জাকুটিযুক্ত মুখ ঘোরতর উত্থান (ভয়ংকর) বোধ হল। তার কর্ণদ্বয় উন্নত ও শঙ্কুর (গোঁজের) মত ঊর্ধ্ব এবং মুখ ও নাসিকা পর্বতের গহরতুল্য অদ্ভুতরূপে বিস্তীর্ণ। কপোলের দুই প্রান্তভাগ বিদীর্ণ হওয়ায় অতিশয় ভীষণ হয়েছিল। তার শরীর গগনস্পর্শী, গ্রীবা অদীর্ঘ অথচ স্থুল, বক্ষঃস্থল বিশাল কিন্তু উদর অতিশয় কৃশ। আর ওই শরীরে সকল অংশ চন্দ্রকিরণ সদৃশ গৌরবর্ণ লোমে ব্যাপ্ত ছিল এবং শত শত ভুজ সকল দিকে প্রসারিত হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি নিজ চক্র ও বজ্রাদি উত্তম আয়ুধের দ্বারা দৈত্য ও দানবদের বিতাড়িত করছিলেন।

হিরণ্যকশিপু ওই রূপ দেখে তার আবির্ভাবের প্রয়োজন বিচারপূর্বক বলতে লাগলেন–এতো মনে হচ্ছে, মহামায়াবী হরিই এই প্রকার আমার মৃত্যুর হেতু চিন্তা করে রেখেছেন। যা হোক,

এর উদ্যমে কি হতে পারে? দৈত্য কুঞ্জর (হিরণ্যকশিপু) এই কথা বলে গদা ধারণপূর্বক সিংহনাদ করতে করতে সেই নৃসিংহের প্রতি উৎপতিত হলেন। পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে পতিত হয়ে অদৃশ্য হয়, তেমনি সেই অসুর নৃসিংহের তেজোমধ্যে পতিত হয়েই অদৃশ্য হলেন। সত্ত্বপ্রকাশ সেই হরিতে পতিত তমোময় অসুরের অদর্শন হওয়া কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কারণ যে হরি সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়কালীন প্রগাঢ় অন্ধকার পান করেছিলেন। তারপর সেই মহাসুর শ্রীনৃসিংহকে আক্রমণ করে অত্যন্ত বেগে গদার দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। তা দেখে গরুড় যেমন মহাসর্প ধারণ করে, তেমনি ভগবান গদাধর হরি গদার সহিত ইতস্তত প্রহারকারী সেই দানবকে ধরলেন। হে ভারত, হিরণ্যকশিপু একবার নিজেকে নিযুক্ত করে গরুড়ের আক্রমণ হতে বিমুক্ত সর্পের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করতে লাগলেন। তা দেখে স্থানচ্যুত সকল লোকপালের সাথে ইন্দ্রাদি দেবগণ ভয়ে ভীত হয়ে মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত হলেন এবং তা অমঙ্গলজনক মনে করলেন। (কারণ একবার তারা স্থানভ্রষ্ট হয়েছেন, এবার যদি এ অসুর জীবিত থাকে, তবে তাদের প্রাণও হরণ করবে।) হে রাজন, হিরণ্যকশিপু যাঁর হস্ত হতে মুক্ত হলেন, পরে তাকেই নিজের ক্ষমতায় শঙ্কিত মনে করে যুদ্ধক্ষেত্রে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, খঙ্গ-চর্ম ধারণ পূর্বক আবার তাকে আক্রমণ করলেন। তিনি শ্যেণতুল্য বেগবান হয়ে খঙ্গ-চর্মের মার্গ দ্বারা নিচ্ছিদ্ররূপে উপরে ও নীচে ভ্রমণ করছিলেন। নৃসিংহরূপী ভগবান হরি তীক্ষ্ণ ও মহাশব্দে ভয়ংকর অট্টহাস্য করে বেগে তাকে গ্রহণ করলেন। সেই হাস্যজন্য ভয়ে ও ভগবান হরির প্রভাবে ওই অসুরের নয়নদ্বয় নির্মীলিত হতে লাগল।

সর্প মূষিককে ধরলে, সে যেমন পালাবার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করে তেমনি সেই অসুর নিঃসৃত হবার জন্য সর্বতোভাবে যত্ন করল। কিন্তু ধারণা মাত্রই বিবশ হয়ে পড়ল। পূর্বে যুদ্ধে ইন্দ্রের রজ নিক্ষেপেও যার গাত্রের ত্বক ক্ষত হয়নি, সেই হিরণ্যকশিপুকে ভগবান নৃসিংহ অবলীলাক্রমে তার সভামধ্যে নিজের ঊরুর উপরে নিপতিত করল গরুড় যেমন মহাবিষ বিষধরকে বিদারণ করে তেমনি নখ দ্বারা বিদীর্ণ করলেন। (ব্রহ্মার প্রদত্ত বর অনুসারে ভিতর ও বাইরে নয় সভাদ্বারে, ভূমিতে বা আকাশ নয় ঊরুর উপর, অস্ত্র নয়, প্রাণহীন বস্তু নখের দ্বারা, দিনেও নয়, রাতেও নয় সন্ধ্যাকালে ভগবান তাকে বধ করলেন।) সেই নৃসিংহের করাল লোচন ক্রোধে দুপ্রেক্ষ্য হয়েছিল এবং তিনি নিজ জিহ্বার দ্বারা বিস্তারিত বদনের প্রান্তভাগ বার বার অবলেহন করছিলেন। হস্তী বধ করে সিংহ যেমন শোণিতাক্ত হয়, তার মতো রক্তবিন্দুর দ্বারা তার কেশর ও আনন সিক্ত হয়ে অরুণবর্ণ হল এবং তিনি অস্ত্রের মালা গলদেশে ধারণ করেছিলেন।

নৃসিংহ নিজ নখাঙ্কুরের দ্বারা দৈত্যপতির হৃৎপদ্ম উৎপাটন করে তাকে পরিত্যাগ করলেন। পরে উদ্যতাস্ত্র দৈত্যের অনুচরদের এবং তাদের পক্ষপাতী অন্যান্য হাজার হাজার অসুরদের নখরাঘাতে নিহত করলেন। সে সময় ভগবান বহু-বহু বাহুদন্ত প্রকট করেছিলেন এবং সমস্ত হস্তেই নখরূপ প্রখর অস্ত্র দেদীপ্যমান ছিল। দৈত্যবধের জন্য ব্যগ্র হয়ে নৃসিংহদেবের ভয়ংকর আড়ম্বর বর্ণনা করছেন–মেঘসকল তার জটার স্পর্শে প্রকম্পিত হয়ে বিশীর্ণ, গ্রহগণের জ্যোতিঃ এঁর দৃষ্টির দ্বারা তিরস্কৃত, সাগর সকল নিঃশ্বাসপবনে আহত হয়ে ক্ষুধিত হয়েছিল এবং দিক-হস্তিসকল নিহ্রাদ শব্দে ভীত হয়ে কাতর ধ্বনি করছিল। আর তার জটার দ্বারা বিমানসকল এরূপে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছিল যে স্বর্গপুরী যেন বিমান সংকুলা হয়ে স্বস্থান হতে ঊর্ধ্বে গমন করছিল। পৃথিবী যেন তার পদাঘাতে পীড়িত হয়ে স্বস্থান হতে বিচলিত ও পর্বতসকল তার বেগে যেন উৎপতিত আর আকাশ ও দিকসকল যেন তার তেজে দীপ্তিশূন্য হল।

ওই প্রকারে নৃসিংহরূপ ভগবান অনুচরগণ সহ হিরণ্যকশিপুর বধ করে, পরে নিজভৃত্যের ঐশ্বর্য, আশ্চর্যের ন্যায় বোধ করত কৌতূহলে সেই অনুত্তম নৃপাসনে উপবেশন করলেন। কিন্তু ভয়ে কেউ তাঁর নিকট গিয়ে রাজবৎ সেবা করতে সমর্থ হলেন না। কারণ যদিও তিনি নিজের কোনো প্রতিযোদ্ধা দেখতে পাননি, তথাপি কোপে প্রজ্জ্বলিত হয়ে রইলেন। তাঁর তেজঃপূর্ণ বদন অতিশয় ভীষণ হয়েছিল। ত্রিভুবনের শিরঃপীড়া স্বরূপ দুঃসহ সেই আদিদৈত্য হিরণ্যকশিপু যুদ্ধে নৃসিংহ কর্তৃক নিহত হয়েছে দেখে হর্ষাবেদে দেবরমণীগণের বদন প্রফুল্ল হওয়ায় তারা সকালে তার উপর বারবার পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন। তখন দর্শনাভিলাষী দেবগণের বিমানসমূহে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হল। দেবতারা দুন্দুভি ও পটহ বাদ্য করলেন। আর গন্ধর্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করল এবং অপ্সরাগণ আহ্লাদে নৃত্য করতে লাগলেন।

তারপর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, গিরিশ প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধসঙ্, বিদ্যাধরগণ, মহা মহা উরগসমূহ, মুনিগণ, প্রজাপতিগণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, চারণ, যক্ষ, কিংপুরুষগণ, বেতাল, কিন্নর, সুনন্দ, কুমুদ প্রভৃতি বিষ্ণুপার্ষদগণ–এরা সকলে সেখান এসে নিজ নিজ মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে সিংহাসনে সমাসীন তীব্রতেজঃযুক্ত সেই নৃসিংহদেবের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে পৃথক পৃথকভাবে স্তব করতে লাগলেন। ব্রহ্মা বললেন–ভগবান অনন্তকে প্রসন্ন করার জন্য আমি তার চরণে প্রণত হই। তার শক্তি অতিশয় দুরন্ত, প্রভাব অতি বিচিত্র এবং কর্মসকল পরম পবিত্র। তিনি অবলীলাক্রমে গুণদ্বারা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করছেন, কিন্তু এরূপ হয়েও স্বয়ং অপ্রচ্যুত স্বরূপ। রুদ্র বললেন–হে ভগবান, সহস্র যুগান্ত আপনার কোপ কাল, এখন এই ক্ষুদ্র অসুর নিহত হল, এখন তো

আপনার কোপের সময় নয়। যদি ভক্তরক্ষার জন্য অকালে এই কোপ করে থাকেন, তবে তা সংহার করুন। এখন তার পুত্র আপনার শরণাগত ভক্ত প্রহ্লাদকে আপনি পালন করুন।

ইন্দ্র বললেন–হে পরম, আমাদের যজ্ঞভাগসকল দৈত্যগণ হরণ করে নিয়েছিল। আপনি আমাদের রক্ষা করে সে সকল আবার ফিরিয়ে আনলেন। হে প্রভো, ওই সকল ভাগ আপনারই, কারণ আপনি অন্তর্যামী ও যজ্ঞের ভোক্তা। হে বিভো, আমাদের এই হৃদয় কমল আপনারই গৃহ স্বরূপ, সেই গৃহ এতদিন পর্যন্ত ভয় হেতু আমাদের স্মৃতিপথে নিত্য অবস্থিত দৈত্যের দ্বারা আক্রান্ত ছিল, সম্প্রতি সেই ভয় দূর করে আপনি তা বিকশিত করলেন। হে নাথ, তোমার শুশ্রূষাকারী সেবকদের নিকট এই কালগ্রস্ত ত্রিলোকের ঐশ্বর্য কতটুকু, উহা অতি তুচ্ছ। হে নৃসিংহ, তোমায় যাঁরা সেবা করেন, তারা মুক্তিকে বহুজ্ঞান করেন না। অতএব যজ্ঞভাগ লাভ আমাদের পুরুষার্থ নয় আপনার পরিচর‍্যা লাভই আমাদের পুরুষার্থ। আপনার এই কোপ-প্রকাশে সেই কার্য সাধন হয়েছে, এক্ষণে এই ক্রোধ উপসংহার করুন।

ঋষিগণ বললেন–হে আদিপুরুষ, আপনি আপনার প্রভাবরূপ যে পরম (ধ্যান লক্ষণ) তপস্যা বলেছিলেন, যার দ্বারা আপনি আপনাতে লীন এই বিশ্ব সৃষ্টি করে থাকেন, সেই তপস্যা এতদিন এই দৈত্য কর্তৃক কুণ্ঠিত হয়েছিল। হে শরণ্যপালক, তা রক্ষার নিমিত্ত আপনি এই শরীর গ্রহণ করে আবার 'তপস্যা কর'-বলে আমাদের যে আদেশ করলেন, তাতে অনুগৃহীত হয়ে আমরা আপনাকে নমস্কার করছি। পিতৃপুরুষেরা বললেন–আমাদের পুত্রগণের দ্বারা প্রদত্ত শ্রদ্ধাযুক্ত পিন্ডাদি যে দুরাত্মা বলপূর্বক নিজে ভক্ষণ করত ও তীর্থাদিতে স্নানকালে তাদের প্রদত্ত তিনোদকও যে পান করত, আপনি প্রখর নখের দ্বারা তার উদর বিদীর্ণ করে ওই সকল আহরণ করে দিলেন। শ্রাদ্ধাদির উদ্ধারের দ্বারা আমাদের পরম উপকারী ও অখিল ধর্মের রক্ষক সেই নৃসিংহ দেবকে আমরা নমস্কার করি। সিদ্ধগণ বললেন–হে নৃসিংহ, আমাদের যোগসিদ্ধা অনিমাদি গতি, যে দুরাত্মা যোগতপোবলের দ্বারা হরণ করেছিল এবং ধনাভিজনাদি নানা দর্পে দর্পিত সেই দুষ্টকে আপনি নখের দ্বারা বিদীর্ণ করে আমাদের সেই সিদ্ধি পুনরায় উদ্ধার করলেন, সেই আপনাকে আমরা নমস্কার করি। বিদ্যাধরগণ বললেন–আমরা পৃথক পৃথক ধারণার দ্বারা অন্তর্ধানদিরূপ যে বিদ্যালাভ করেছিলাম, যে মূঢ় বলবীর্য দীপ্ত হয়ে তা নিষেধ করেছিল, তাকে যিনি যুদ্ধে পশুর মতো নিহত করলেন, সেই মায়া-নৃসিংহকে আমরা নিত্য প্রণাম করি। নাগগণ বললেন–যে পাপাত্মা আমাদের কণাস্থিত রত্নসমূহ ও উত্তম উত্তম রমণীগণকে বলপূর্বক হরণ করেছিল, তার বক্ষ বিদীর্ণ করে যিনি সেই স্ত্রীগণের আনন্দ দান করলেন, আমরা সেই নৃসিংহদেবকে নমস্কার করি। তারপর ভগবান নৃসিংহ মনুগণের প্রতি অবলোকন করলে তারা নিজ নিজ মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক বললেন–ভগবন আমরা মনু।

আপনার আদেশ পালনকারী ভৃত্য দুরাত্মা দৈত্য আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্মমর্যাদা উচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, আপনি ওই খলকে সংহার করে আবার ধর্মসেতু স্থাপন করলেন। প্রভো, আমরা আপনার কিঙ্কর, কি করব, আদেশ করুন। প্রজাপতিগণ বললেন–হে পরেশ, আমরা আপনার সৃষ্ট প্রজাপতি। যে দৈত্যের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে আমরা এতকাল প্রজা সৃষ্টি করিনি, সে এখন আপনার নখে বিদীর্ণ হয়ে মৃত অবস্থায় শয়ন করছে। এরপর আমরা সৃষ্টি করতে পারব। আপনি সত্ত্বমূর্তি, আপনার এই অবতার জগতের মঙ্গলের জন্য।

তারপর তিনি গন্ধর্বগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় তারা বললেন–হে বিভো, আমরা আপনার নট এবং নৃত্যকালীন শৌর্যবীর্য ও শক্তির দ্বারা প্রভাবশালী হয়ে আমাদের অধীন করেছিল, সম্প্রতি আপনি তার এই দশা প্রাপ্ত করলেন। এটা ঠিকই হয়েছে, যেহেতু উৎপথগামী কোন্ ব্যক্তি মঙ্গল লাভ করে থাকে? চারণগণ বললেন–হে হরে, সংসার নিবর্তক আপনার চরণ কমলের আমরা আশ্রয় গ্রহণ করলাম। এই দুরাত্মা সাধুগণের হৃদয়ে ভয়জনক হয়ে অবস্থান করত, আপনি এ অসুরের অন্তপ্রাপ্ত করালেন। যক্ষগণ বললেন–মনোজ্ঞ কর্মের দ্বারা আমরা আপনার অনুচরগণের মধ্যে প্রধান ছিলাম। এই দিতি পুত্র বলে আমাদের তার বাহক করেছিল। হে চতুর্বিংশ, তত্ত্বনিয়ামক ভগবন ওই দুরাত্মা কর্তৃক জনগণের পরিতাপ অবগত হয়ে আপনি নৃসিংহের রূপে তার পঞ্চত্ব প্রাপ্ত করলেন। আপনাকে নমস্কার।

কিংপুরুষগণ বললেন–আমরা কুৎসিত পুরুষ। আর আপনি পুরুষোত্তম সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর, আমরা আপনার কি স্তব করব? সাধুগণের নিন্দনীয় এই কুপুরুষ (দৈত্য) আপনার দ্বারা নিহত হয়েছে, অতএব তার বধ্যে কি মাহাত্ম্য বর্ণনীয়, বৈতালিকগণ বললেন–ভগবন, সভায় এবং যজ্ঞস্থলে আপনার অমল যশ গান করে, আমরা মহতী পূজা লাভ করতাম। যে দুর্জন দৈত্য ওই পূজা নিজের আয়ত্ত করে নিয়েছিল, ভাগ্যক্রমে রোগের ন্যায় সে আপনার দ্বারা নিহত হল। এক্ষণে আমরা পূর্বের মতো সর্পয়া লাভ করতে পারব। কিন্নরগণ বললেন–হে ঈশ, আমরা আপনার অনুগত কিন্নর, এই দৈত্য বিনা বেতনে আমাদের দ্বারা কর্ম করিয়ে নিত। সম্প্রতি সেই পাপ আপনা কর্তৃক অবসাদিত হল। হে নৃসিংহ, হে নাথ, এরপর আপনি আমাদের সমৃদ্ধির নিমিত্ত হোন। শ্রীবিষ্ণুপার্ষদগণ বললেন– হে আশ্রয়প্রদ, সকল লোকের সুখাবহ আপনার এই অদ্ভুত নৃসিংহরূপ আজই আমরা দেখলাম, পূর্বে কখন দেখিনি। এই দৈত্যও আপনারই কিঙ্কর, সনকাদি ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে সে দৈত্য হয়েছিল। এক্ষণে তার এই নিধন, তার প্রতি অনুগ্রহের (শাপমুক্তির ও নিজধাম প্রাপ্তির) নিমিত্ত বলে আমরা জানলাম।

.

নবম অধ্যায়

প্রহ্লাদ কর্তৃক নৃসিংহদেবের স্তব

নারদ বললেন–হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি সকল দেবগণ এই প্রকারে দূর থেকে স্তব করেও ক্রোধাবিষ্ট দুষ্প্রাপ্য ভগবানের নিকট যেতে সমর্থ হলেন না। তখন দেবগণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু তিনিও সেই ভগবানের অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব ভয়ংকর নৃসিংহরূপ দেখে ভীত হয়ে আর তার নিকটে গেলেন না। তারপর ব্রহ্মা নিকটে অবস্থিত প্রহ্লাদকে এই বলে প্রেরণ করলেন-হে তাত, নিকটে যাও। তোমার পিতার প্রতি কুপিত প্রভুকে প্রসন্ন কর। হে রাজন যুধিষ্ঠির, ব্রহ্মার বাক্য অঙ্গীকার করে মহাভাগবত বালক প্রহ্লাদ ধীরে ধীরে নৃসিংহদেবের নিকট গিয়ে মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হয়ে প্রণাম করলেন। তারপর নিজ পাদমূলে পতিত বালক প্রহ্লাদকে দেখে ভগবান নৃসিংহদেবের কৃপায় পরিপ্লুত হয়ে তাকে উঠিয়ে তার মস্তকে নিজ করকমল অর্পণ করলেন। এই করকমল কালরূপ সর্পের ভয়ে ভীত জনগণের অভয়প্রদ। ভগবান নৃসিংহ দেবের করকমলের স্পর্শে প্রহ্লাদের সমস্ত অশুভ দূরীভূত হল এবং তখুনিই ভগবানের অপরোক্ষ যথার্থ জ্ঞান তিনি লাভ করলেন। তিনি নিবৃত হয়ে হৃদয়মধ্যে ভগবানের পাদপদ্মে ধ্যান করতে লাগলেন। তখন তার শরীর রোমাঞ্চিত, হৃদয় বিগলিত এবং লোচনদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হল। তারপর তিনি সুসমাহিত হয়ে একাগ্রমনে সেই ভগবানে হৃদয় ও মন অর্পণ করে, প্রেম গদগদ বাক্যে হরির স্তব করতে লাগলেন।

প্রহ্লাদ বললেন–ব্রহ্মাদি দেবগণ, মননশীল মুনিগণ এবং জ্ঞানীসকল, যাঁদের মতি সত্ত্বগুণেই একতান (অনবচ্ছিন্ন), তারা বহুকাল ধরে এখন পর্যন্ত বাক্যপ্রবাহ ও বহু বহু গুণ দ্বারাও যাঁর আরাধনা করতে সমর্থ হননি, সেই হরি আমার স্তবে কি প্রকারে তুষ্ট হবেন? আমি ঘোর অসুর কুলে উৎপন্ন হয়েছি, হরির পরিতোষণে আমার যোগ্যতা কোথায়? আমার মনে হয়–ধন, সকুলে জন্ম, শরীরের সৌন্দর্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয় পটুত্ব তেজঃ (কান্তি), প্রতাপ, শারীরিক বল, পৌরুষ (উদ্দ্যম), প্রজ্ঞা, অষ্টাঙ্গ যোগ–এ সকল গুণও সেই পূর্ণানন্দ পরমপুরুষের আরাধনায় সমর্থ নয়, যেহেতু দেখা যাচ্ছে–সেই ভগবান কেবল ভক্তির দ্বারাই গজেন্দ্রের প্রতি পরিতুষ্ট হয়েছিলেন। আমার মনে হয়–পূর্বোক্ত দ্বাদশ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণও যদি অরবিন্দনাভ ভগবানের চরণকমলে বিমুখ হন, তবে তা অপেক্ষা চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, যার মন বাক্য

কর্ম ধন ও প্রাণ ভগবানেই অর্পিত হয়েছে। কারণ ওই প্রকার চণ্ডাল নিজবংশের সহিত নিজ আত্মাকে পবিত্র করতে পারে। ভূবি গর্বিত ব্রাহ্মণ নিজের আত্মাকেই পবিত্র করতে পারে না, আর কুলকে কি করে পবিত্র করবে? বস্তুত ভক্তিহীন ব্যক্তির গুণ কেবল গর্বের নিমিত্তই হয়ে থাকে, আত্মশোধনের জন্য হয় না, অতএব সে চণ্ডাল অপেক্ষাও হীন।

ভগবান হরি সর্বদা নিজের আনন্দস্বরূপেই পূর্ণ, তিনি নিজের জন্য অবিদ্বান ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের পূজা গ্রহণ করেন না, কিন্তু করুণাবশত ওই সকল ব্যক্তির কল্যাণের জন্য তা স্বীকার করেন। যেহেতু নিজের মুখে তিলকাদি শ্রী রচিত হলেই প্রতিবিম্বের শোভা হয়ে থাকে, প্রতিবিম্বে ওই শ্রী করতে পারা যায় না, তেমনি লোকে ধনাদির দ্বারা ভগবান যে সম্মান বিধান করে, তা নিজেদের সম্মানের নিমিত্তই হয়ে থাকে। অতএব আমি নীচ সর্বগুণহীন হলেও অনধিকারের শঙ্কাশূন্য হয়ে সর্বপ্রযত্নে যথাজ্ঞানে ঈশ্বরের মহিমা বর্ণন করি। কারণ ভগবানের মহিমা বর্ণন করলে, অবিদ্যাবশত সংসার প্রবিষ্ট পুরুষও পবিত্র হয়, এতে আমি অজ্ঞ হলেও তার স্তুতি করে শুদ্ধ হতে পারব। হে ঈশ, আমাদের মতো ভীত এই সকল ব্রহ্মাদি দেবগণ সত্ত্বমূর্তি আপনার আত্মাপালন কারী ভক্তই, অসুরজাত আমাদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন নয়। আপনার এই প্রকার বিবিধক্রীড়া বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, ভূতির জন্য ও নিজসুখের জন্য, কিন্তু ভয় উৎপাদনের জন্য নয়।

অতএব এখন আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। যার জন্য এই ক্রোধ সেই অসুর আপনার দ্বারা হত হয়েছে। অহো, বৃশ্চিক, সর্পাদির বিনাশ সাধুজনও যেমন আনন্দিত হন, তেমনি সকল লোক সুখপ্রাপ্ত হয়ে আপনার ক্রোধোপসংহারের প্রতীক্ষা করছে। হে নৃসিংহ, ভয়নিবৃত্তির জন্য জনগণ আপনার এই রূপের স্মরণ করবে। অর্থাৎ আপনার এই রূপ স্মরণ করলেই সকলের ভয় নিবৃত্তি হবে, অতএব আর ক্রোধ ধারণের প্রয়োজন নেই। হে অজিত, আপনার এই রূপ দেখে আমি ভীত নই। আপনার এই ভয়ংকর বদন, সূর্যসদৃশ নয়ন ও কুটি এবং ভয়ানক দন্ত, গলায় অস্ত্রমাল্য, কর্ণদ্বয় ও কেশর শোণিতাক্ত হয়ে উন্নত হয়েছে, আর আপনার গর্জনে দিগগজ সকল ভীত হয়ে পলায়ন করছে এবং এই শরীরের নখাগ্র দ্বারা শত্রুর হৃদয় নির্ভিন্ন হয়েছে, তবুও আমার ভয় হয় না। (আপনার এই উগ্ররূপ দর্শনে আমি ভীত নই, আমার ভয়ের কারণ, শুনুন)–উগ্র সংসারচক্রে যে দুঃসহ দুঃখ, তা থেকেই আমি ত্রস্ত হয়েছি। কারণ আমি নিজ কর্ম দ্বারা ওই সংসারচক্র হিংস্র জন্তুমধ্যে বদ্ধ হয়ে নিক্ষিপ্ত রয়েছি। হে কৃপা বৎসল, হে উশত্তম, আপনি কবে প্রীত হয়ে আপনার অপবর্গ–স্বরূপ চরণমূলে আমাকে আহ্বান করবেন?

হে দেব, আমি দেব, তির্যগ, মনুষ্যাদি সকল যোনিতেই প্রিয়জনের সাথে বিয়োগ ও অপ্রিয়জনের সাথে সংযোগ দেখে শোকানলে অতিশয় দগ্ধ হচ্ছি। ভগবান ওই বিষয়ে যে দুঃখ প্রাপ্ত হই, তার প্রতিকার করতেও আমার ইচ্ছা হয় না, যেহেতু দুঃখের প্রতিকারও দুঃখই। হে বিভো, এইরূপে দেহাদিতে অহংবুদ্ধি করে আত্মাভিমানে মুগ্ধ হয়ে আমি ভ্রমণ করছি। অতএব আপনি কৃপাপূর্বক আমার নিস্তারের উপায় আপনার দাস্যবেগে বলে দিন। হে নৃসিংহ, আমি আপনার দাস হলে, প্রিয়, পরম সুহৃৎ ও পরদেবতা আপনার লীলাকথা উচ্চারণ করত সুমহৎ দুঃখসকলও গণ্য করব না। তখন আপনার পদযুগলই যাঁদের আলয়, সেই সকল ভক্তস্বরূপ যে সমস্ত হংস (অর্থাৎ সারাসার–বিবেকী জ্ঞানী) তাদের সাথে সঙ্গ হওয়ায় নানাপ্রকার বিষয়াসক্তি হতে বিশেষরূপে পরিত্রাণ পাব। প্রভো, আপনার লীলাকথা অবগত হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে না, ব্রহ্মা ওই সকল কথা গান করেছিলেন। তাতে তা সম্প্রদায় প্রবৃত্ত হয়ে আসছে।

তপ্তজনের দুঃখের প্রতিকারক বলে যেগুলি এ জগতে প্রসিদ্ধ রয়েছে। সেগুলি তোমা কর্তৃক উপেক্ষিত দেহধারী প্রাণিদের কি সাক্ষাৎনিবর্তক হয়? না, তা হয় না। কারণ ইহলোক মাতা পিতা বালকের রক্ষক সত্য কিন্তু তাদের বর্তমানে, এমন কি কখন তাদের দ্বারাই বালকের মৃত্যু ঘটে থাকে, আর্ত রোগীর ঔষধ ব্যবহার করলেও মৃত্যু হতে দেখা যায়। আবার সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তির নৌকা শরণ নয়। কারণ নৌকার সহিত নিমজ্জিত হতে দেখা যায়। কখন কখন যে অপর রক্ষক দেখা যায়, সেখানে সেই সেই রূপে আপনিই রক্ষক–ইহাই প্রতিপাদন করছেন, ভগবান, পৃথক পৃথক স্বভাব বিশিষ্ট অপর কর্তা, অথবা পরকর্তা ব্রহ্মাদি যাহা কর্তৃক প্রেরিত হয়ে, যে অধিকরণে, যে নিমিত্ত হতে, যে কালে, যে হেতুতে, যার সম্বন্ধে যে অপাদান হতে, যার নিমিত্ত, যে প্রকারে, যে যে অভীপ্সিত বিষয় উৎপন্ন করেন অথবা রূপান্তর ঘটিয়ে থাকেন, সে সকল আপনারই স্বরূপ। হে ঈশ, আপনার অংশ পুরুষের ইক্ষণরূপ অনুগ্রহে কালবশত মায়ার গুণ ক্ষুব্ধ হলে, ওই মায়া মনঃপ্রধান লিঙ্গ শরীর সৃজন করেন। কর্তৃস্বরূপ ওই মন দুর্জয় বেদোক্ত কর্মময় (অর্থাৎ অনন্ত কর্মময় বাসনা-বাসিত), যাতে জীবের অবিদ্যা ভোগের জন্য ষোড়শ বিকার (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূতাত্মক অরবিশিষ্ট) অর্পণ করেছে। হে অচ্যুত, এইরূপ সংসারচক্রে পতিত কোন ব্যক্তি, মনকে পৃথক করে আপনার ভজনে নিযুক্ত না করে নিস্তার পেতে পারে?

হে ভগবন, আপনি সেই পুরুষ, যিনি চিৎশক্তির দ্বারা বুদ্ধির গুণসকলকে নিত্য জয় করেছেন। আর, যেহেতু আপনি কালস্বরূপ, অতএব কার্য ও কারণ সকলের শক্তি আপনার বশীভূত। হে ঈশ্বর, আমি এই ষোড়শচক্রে মায়া কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হওয়ায় ইক্ষুদণ্ডের মতো নিপীড়িত হচ্ছি।

আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে উদ্ধার করুন। আমি আপনারই প্রপন্ন, আমাকে কাছে টেনে নিন। লোকপালদের ঐশ্বর্যে অথবা পিতৃক রাজ্যে আমার প্রয়োজন নেই। লোকে স্বর্গে অখিল লোকপালদের যে যে আয়ু, সম্পদ এবং উদ্ভব প্রভৃতির অভিলাষ করে থাকে, আমি সে সকলের তত্ত্ব বেশ ভালোভাবেই দেখেছি। আমার পিতার কোপ, হাস্য ও বিকৃত ভঙ্গি মাত্রে অনেকের ওই সকল বিধ্বস্ত হয়েছিল। প্রভো, আমার সেই প্রভাবশালী পিতাও আপনার নিকট পরাভূত হয়েছে। আর, শরীরদের ওই সকল ভোগের পরিণাম আমি জানি। এই জন্য, আয়ুশ্রী, বিভব, কিংবা ব্রহ্মার ভোগ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সকল কিছুই বাঞ্ছা করি না। অনিমাদি সিদ্ধিতেও আমার স্পৃহা নেই। কারণ, মহাবিক্রমশালী কালরূপী আপনার দ্বারা ওই সকলও বিনষ্ট হয়ে যাবে। আমার এইমাত্র প্রার্থনা–আপনার নিজ সেবকগণের নিকটেই আমাকে স্থাপন করুন। ভগবন শ্রেয়ঃসকল শ্রবণমাত্রেই সুখজনক, কিন্তু ওই সকল মৃগতৃষ্ণার (মরীচিৎকার) ন্যায় মিথ্যা, অতএব সে সকল কোথায়, আর অশেষ রোগের উদ্ভব স্থান এই কলেবরেই বা কোথায়? এ সকল বিষয় সকলে জানালেও তা থেকে তারা বিযুক্ত হয় না। কারণ দুষ্পপ্য মধুতুল্য বৈষয়িক সুখলেশের দ্বারাই তারা নিজ নিজ অভিলাষরূপ অনল শান্ত করতে ব্যগ্র (অর্থাৎ অভিলাষানল শমনের জন্য ব্যগ্রতাবশতঃ তাদের নির্বেদেরও অবকাশ হয় না।) আপনার অনুকম্পাতেই আমার নির্বেদ এসেছে। হে ঈশ, রজোগুণ হতে যার উৎপত্তি এবং তমোগুণই যাতে প্রচুর, সেরূপ অসুরকুলে উৎপন্ন আমিই বা কোথায়? আর আপনার অনুকম্পাই বা কোথায়? পদ্মের মতো সকলের সন্তাপহারী আপনার যে করকমল আমার মস্তকে অর্পিত হল, এই অনুকম্পা ব্রহ্মা, ভব ও লক্ষ্মীদেবীও লাভ করেননি।

হে প্রভো, আপনি জগতের আত্মা ও সুহৃৎ, এজন্য প্রাকৃত জন্তুর মতো পরাবর মতি (অর্থাৎ পর ব্রহ্মাদি উত্তম এবং এ অসুর অবর নীচ এরূপ বুদ্ধি) নেই। সুতরাং আমার প্রতি আপনার এই অনুকম্পা বিচিত্র নয়। কল্পবৃক্ষের ন্যায় সেবানুরূপই আপনার প্রসাদ হয় এবং যে যেমন সেবা করে, তার সেই অনুসারে ধর্মাদির উদয় হয়ে থাকে (অর্থাৎ কল্পবৃক্ষ যেমন সেবকেরই সংকল্প অনুসারে ফল দান করে, কারও প্রতি বিষম হয় না, তেমনি সেবাই আপনার প্রসন্ন। তার কারণ, উত্তমত্ব অথবা অধিমত্ব তার কারণ নয়)। সর্বতোভাবে কামনার অভিলাষী হয়ে লোকে জন্মরূপ কালসর্পযুক্ত সংসার কূপে পতিত হচ্ছে, আমিও তাদের অনুসরণ করে তাদের সঙ্গবশত সেখানেই পতিত হয়েছিলাম। পূর্বে দেবর্ষিনারদ নিজ জ্ঞান দান করে এরূপ অনুকম্পা করেছিলেন এবং এক্ষণে আপনিও আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন। ভগবন, আমি এইরূপে অনুগৃহীত হওয়ায় আপনার ভৃত্যসেবা কি করে পরিত্যাগ করি? অতএব আমাকে নিজ ভৃত্যপার্শ্বে স্থান দিন।

হে অনন্ত, আমার এই যে প্রাণরক্ষা এবং আমাকে বধ করতে উদ্যত আমার পিতার প্রাণবধ–এই উভয়ই কেবল আপনার নিজভৃত্য ঋষির বাক্য সত্য করার নিমিত্ত, এ আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে। কেননা, আমার পিতা হিরণ্যকশিপু (তোমার ভক্ত, স্বপুত্র আমার বধরূপ) অযুক্ত কার্য করতে ইচ্ছুক হয়ে, খঙ্গ গ্রহণ পূর্বক বলেছিলেন, “মদ্ব্যতিরিক্ত অন্য ঈশ্বর আছে, বলছিস। যদি থাকে, তোকে রক্ষা করুক, এই আমি তো্র শিরচ্ছেদ করছি”। পক্ষপাতপূর্বক এইরূপ ভৃত্যরক্ষা ও দৈত্যহত্যা করা আপনার স্বাভাবিক নয়, উহা আপনার মায়াগুণের উপাধিমাত্র। কারণ এই অখিল জগৎ এক আপনারই স্বরূপ, যেহেতু এর প্রথমে ও চরমে আপনিই বিরাম করেন (অর্থাৎ কারণত্ব ও অবধিত্বরূপে বর্তমান থাকেন), অতএব মধ্যেও আপনি বর্তমান। হে ঈশ্বর, আপনিই নিজ মায়ার দ্বারা গুণপরিণাম স্বরূপ এই জগৎ সৃষ্টি করে এতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন। সুতরাং সেই সকল গুণের কারণ (নানারূপে অর্থাৎ কখন রক্ষক, কখন বা হন্তা) বলে আপনিই প্রতীত হয়ে থাকেন।

হে ঈশ, সৎ, অসৎ (অর্থাৎ কার্য-কারণাত্মক) এই জগৎ আপনিই। এ জগৎ আপনা থেকে পৃথক নয়। কিন্তু আপনি এ জগৎ থেকে ভিন্ন। যেহেতু প্রথমে ও শেষে আপনি পৃথক অবস্থান করেন। অতএব এ আত্মীয়, এ পর’–এই যে বুদ্ধি তা মিথ্যা মায়ামাত্র। প্রভো, এই জগতের যে প্রকাশ ও সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ–উহা বীজ ও বৃক্ষের, পৃথ্বী ও ভূতসূক্ষ্মের ন্যায়। (অর্থাৎ বৃক্ষ যেমন বস্তুতঃ পৃথ্বীময় বীজমাত্র এবং সেই বীজ যেরূপ ভূতসূক্ষ্ম মাত্র, তেমনি কার্য-কারণাত্মক সকল জগৎ, পরম কারণ যে আপনি, আপনারই স্বরূপ।) হে ভগবান, এই জগৎ নিজের দ্বারাই নিজেতে নিক্ষেপ করে, নিজসুখ অনুভব করতে আপনি নিষ্ক্রিয় হয়ে প্রলয় হলে শয়ন করে থাকেন। যোগের দ্বারা আপনার নয়নদ্বয় নিমীলিত এবং স্বরূপ প্রকাশ নিদ্রা নিপীতা (নিরস্তা) হয়, অতএব জীবের মতো আপনার তমোবৃত্তিরূপা নিদ্রা নেই। আর, আপনি (জাগ্রতাদি) অবস্থায়তিরিক্ত হয়ে স্বরূপে অবস্থিত, এজন্য সুষুপ্তের ন্যায় তমোগুণে সৃষ্ট নন এবং জাগ্রৎ-স্বপ্নের তুল্য বিষয়সকলও আপনার দৃষ্টিগোচর হয় না। ভগবন যে আপনি প্রলয়কালীন সমুদ্রজলে শয়ন করেন, এই জগৎ সেই আপনারই স্বরূপ। অন্যকারো নয়। নিজ কালশক্তির দ্বারা প্রকৃতির ধর্ম সত্ত্বাদিকে আপনি প্রেরণ করে থাকেন। হে ঈশ্বর, শেষরূপে শয়নকালে সমাধি হতে বিরত হবার সময় আপনার নাভি থেকে (একটি বোদকে) একটি মহাপদ্ম হয়েছিল তা আপনাতেই গুঢ়রূপে ছিল, সূক্ষ্ম বটবীজ হতে মহাবৃক্ষ যেমন হয়। তার ন্যায় ওই পদ্ম হতে এই সমস্ত লোক হয়েছে। সেই পদ্ম হতে উদ্ভূত ব্রহ্মালব্ভিন্ন অন্য কোনো বস্তু দেখতে পান নাই। যদিও উপাদান কারণরূপী আপনি তার দেহে ব্যপ্ত ছিলেন তথাপি আপনাকে জানতে পারেননি, শত বৎসর জলে নিমগ্ন ছিলেন।

ব্রহ্মা কি করে জানবেন, অঙ্কুর উৎপন্ন হলে কি কখন বীজ দৃষ্ট হয়? কিন্তু আপনার উপাসনায় কি হয়? পরে ব্রহ্মা বিস্মিত হয়ে সেই পদ্ম আশ্রয় করে দীর্ঘকাল তীব্র তপস্যা করলে শুদ্ধচিত্ত হয়ে যেমন ভূমিতে সূক্ষ্ম গন্ধ ব্যাপ্ত থাকে তেমনি ভূত ইন্দ্রিয় মায়াময় আত্মায় সন্মাত্র রূপে বর্তমান আপনাকে দেখতে পেলেন। "তখন আপনার সহস্র বদন, সহস্র চরণ, সহস্র হস্ত, সহস্র উরু, সহস্র নাসিকা, সহস্র কর্ণ এবং সহস্র নয়ন প্রকাশ পেয়েছিল। আপনি সহস্র সহস্র আভরণ ও অস্ত্রে সমৃদ্ধ ছিলেন। ওই রূপ আপনার মায়া প্রধান, যেহেতু পাতলাদি প্রত্যাহত দ্বারা পদাদি রচনা হয়েছিল। মহাপুরুষ আপনার এরূপ দর্শন করে ব্রহ্মার মহৎ আনন্দ হয়েছিল। হে ভগবান, তৎকালে আপনি ব্রহ্মার প্রতি বিস্তর অনুগ্রহ করেন, কেননা হয়গ্রীব মূর্তি ধারণ করে দেবদ্রোহী মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের বধ করে তাকে শ্রশ্বতিগণ ও রজঃ, তমঃ সমর্পণ করেন। ঋষিগণ বলেন সত্ত্বগুণ আপনার প্রিয়তম তনু। হে মহাপুরুষ, আপনি এই প্রকারে মনুষ্য, তির্যক, ঋষি। দেব, মৎস্যাদি–অবতার সমূহের দ্বারা লোক সকলের পালন এবং যারা জগতের প্রতিকূল, তাদের বিনাশ করেন। আর যুগে যুগে যে ধর্ম অনুবৃত্ত, তা রক্ষা করেন। কিন্তু কলিযুগে আপনি ছন্ন হয়েছিলেন, বস্তুত তিন যুগে আবির্ভূত হন, এজন্য আপনি ত্রিযুগ বলে প্রসিদ্ধ। (কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের নামরূপ আচ্ছন্ন করে গৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত হয়ে সংকীর্তন যজ্ঞের প্রকটন করেন। তা একাদশ স্কন্ধে নবযোগীন্দ্র সংবাদ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকষ্ণ ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণনা করবেন।)

হে বৈকুণ্ঠনাথ, আমার এই মন অধর্মে দূষিত। সদাই বহির্মুখে প্রবৃত্ত, দুর্ধর্ষ কামাতুর, নিরন্তর হর্ষ, শোক, ভয় এবং আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখে পীড়িত হয়েও আপনার কথায় প্রীত হয় না। এ প্রকার মন নিয়ে অতি দীন আমি কি করে আপনার তত্ত্ব বিচার করব? হে অচ্যুত, আমার অবিতৃপ্ত জিহ্বা মধুরাদি রসের দিকে আমাকে আকর্ষণ করছে। এইরূপ শিশ্ন অন্য দিকে, ত্বক আর এক দিকে আকর্ষণ করছে। আর, উদর ক্ষুধায় সন্তপ্ত হয়ে সদ্যই যে কোনো প্রকার আহারের প্রতি এবং শ্রবণ, ঘ্রাণ ও চঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের দিকে, সেরূপ কর্মন্দ্রিয়সকল অন্য কোনো স্থান, যেমন সপত্নীগণ গৃহপতিকে আকর্ষণ করে ব্যতিব্যস্ত করে, তেমনি আমাকে টেনে বিব্রত করছে। হে ভগবন, এইরূপ সংসাররূপ বৈতরণী মধ্যে নিজকর্মদোষে পতিত হয়েছি। বারবার জন্ম-মৃত্যুর ভয়ে ভীত জনকে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করে অনুগ্রহপূর্বক রক্ষা করুন। প্রভো, এ জন নিজের ও পরের বিগ্রহে যথাযথ বৈরী ও মিত্রতা করে। অতএব হে ভবনদীর পারে স্থির নিত্যমুক্ত এ ব্যক্তি অতি দীন ও অতি মূঢ়, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

হে ভগবন, আপনি অখিলের গুরু এবং এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণ, আপনার? আয়াস কি? অর্থাৎ সকল জনকে নিস্তার করা আপনার পক্ষে দুষ্কর কর্ম নয় আপনি আর্তজনের বন্ধু, মূঢ়জনেও আপনার মহৎ অনুগ্রহ। আমরা আপনার ভক্তজনের সেবক, আমাদের উদ্ধার তো আপনার অতি তুচ্ছ কর্ম। হে সর্বোত্তম, আপনার বীর্য-গানরূপ মহৎ অমৃতে আমার চিত্ত মগ্ন হয়েছে, তাতে আমি দুষ্পার সংসার বৈতরণীকেও ভয় করি না। কিন্তু আমার শোক হয় তাদের জন্য, যে সকল মূঢ় ওই মহামৃত হতে বিমুখ হয়ে বিষয় সুখের জন্য কুটুম্বাদির ভার বহন করছে। হে দেব, মুনিগণ প্রায় নিজ নিজ মুক্তি কামনা করে নির্জনে বিচরণ করে থাকেন, অন্যের জন্য তাদের কোনো যত্ন দেখতে পাই না। আমার এই সঙ্গী বালকগণ অতি দীন, এদের পরিত্যাগ করে একাকী মুক্ত হতে আমার ইচ্ছা হয় না। আপনি ছাড়া অন্য কাউকে পদ্মযোনিতে ভ্রমণরত জীবের পরিত্রাতা দেখতে পাই না, অতএব এদের উদ্ধারের জন্য আপনার নিকটই প্রার্থনা করছি।

গৃহাশ্রমে স্ত্রীসঙ্গাদির দ্বারা গৃহস্থ যে সুখ বোধ করে, তা অতি তুচ্ছ-করদ্বয়ের সংঘর্ষে যেমন দুঃখের পর দুঃখই আনয়ন করে এটা সেরূপ। এরূপ বহু দুঃখভোগী গৃহমেধী যে জন, সে সুখে তৃপ্তও হয় না, আবার তাদের নির্বেদও আসে না। আপনার প্রসাদে কেবল কোনো কোনো ধীর ব্যক্তি কন্তুরির ন্যায় কাম সহ্য করতে পারে। হে অন্তর্যামী, মৌন, ব্রত, শত্ত্বত, (উপদেশ শ্রবণ) তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম ব্যাখ্যা, নির্জনে বাস, জপ এবং সমাধি–এগুলি মোক্ষসাধনের উপায় বলে প্রসিদ্ধ, কিন্তু এগুলি প্রায় অজিতেন্দ্রিয় পুরুষদের বিষয়ভোগের জন্য জীবিকার উপায় বলে ব্যবহৃত হয়। দম্ভের ফল নিয়ত একরূপ নয়, এজন্য দাম্ভিক লোকদের পক্ষে ওই সকল মৌনাদি কখন জীবনোপায় হতে পারে, কখনও নাও হতে পারে। আপনার জ্ঞান-ভক্তি ব্যাতীত সকাম মৌনাদির দ্বারা কখনই হতে পারে না, তাই বলছি–হে দেব, বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় এই সৎ ও অসৎ (অর্থাৎ কারণ ও কার্য) আপনার রূপ বলে বেদে প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত আপনি প্রাকৃত রূপাদি শূন্য, এতে দেবদত্তাদির গৌরত্বাদি রূপের ন্যায় আপনার অন্যরূপ নেই। অতএব জিতেন্দ্রিয় জনগণ ভক্তিযোগের দ্বারা কাষ্ঠে বহ্নির প্রায় কার্য ও কারণ উভয়েই আপনাকে অনুগত দেখে থাকেন। অভক্ত জনগণ আপনাকে দেখতে পায় না। হে উরুগায়, এই উভয় (অর্থাৎ কার্য ও কারণ) প্রধান অথবা পরমাণু প্রভৃতি হতে কখন হতে পারে না, অতএব আপনিই সকলের কারণ, আপনি সকল বস্তুতে অনুস্ত হয়ে আছেন।

বস্তুত বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী আকাশ, জল পঞ্চতন্মাত্র, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত ও অহঙ্কার। এ সমস্তই আপনি। হে ভূমন, স্কুল, সূক্ষ্ম–এ সকলও আপনি, অধিক কি মন ও বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত কোনো বস্তুই আপনা থেকে ভিন্ন নয়। কিন্তু আপনি এই প্রকারে নিজেতে অনুগত

থাকলেও অভক্তগণ আপনাকে জানতে পারে না, তাই বলছেন–গুণসকল (গুণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা), গুণিগণ (ব্রহ্মাদি), মহাদাদি, মন প্রভৃতি এবং দেবতা, মনুষ্য–এরা সকলেই জড়োপাধি, আদি ও অন্তবিশিষ্ট সুতরাং নিরূপাধি আপনাকে জানতে পারে না। এই কারণে বিদ্বান ব্যক্তিগণ বিচার করে অধ্যয়নাদি ব্যাপার থেকে বিরত হয়ে থাকেন অর্থাৎ অধ্যয়নাদি বিসর্জন দিয়ে ভক্তিসমাধিযোগে আপনার উপাসনা করেন। অতএব হে পূজ্যতম, নমস্কার, স্তব, কামার্পণ, অর্চন, চরণ-স্মরণ ও কথা-শ্রবণ–এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতিরেকে, পরমহংসগমের প্রাপ্য আপনাতে কি প্রকারে ভক্তিলাভ করাব? প্রভো, এই প্রকারে যেহেতু ভক্তি ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না এবং বিনা সেবায় ভক্তি দুঃসাধ্য, অতএব আমি প্রথমে যে দাস্য প্রার্থনা করেছি, তাই আমাকে প্রদান করুন। . শ্রীনারদ বললেন–ভক্ত এই প্রকারে ভক্তিপূর্বক গুণ বর্ণন করলে, সেই নির্গুণ নৃসিংহ কোপ উপসংহার করে প্রীত হয়ে প্রণত প্রহ্লাদকে বলতে লাগলেন। ভগবান বললেন–হে ভক্ত প্রহ্লাদ, তুমি অসুরদের মধ্যে উত্তম, তোমার মঙ্গল হোক, আমি তোমার প্রতি প্রীত হয়েছি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমিই মানবদের কামনা পূর্ণ করে থাকি। হে আয়ুষ্মন, আমার প্রতি উৎপন্ন না করে, কেউ আমার দর্শন লাভ করতে পারে না। কিন্তু আমার দর্শন পেলে, অপূর্ণকাম বলে কোনো ব্যক্তিকে শোক করতে হয় না। অতএব হে মহাভাগ, ধীর সাধুগণ শ্রেয়স্কাম হয়ে সকল কল্যাণপতি আমার সর্বতোভাবে সন্তোষ জন্মিয়ে থাকেন। নারদ বললেন–যে সকল বরে সকল লোকেরই লোভ জন্মে, সেরূপ বহু বর দ্বারা প্রলোভিত হলেও একান্ত (নিরুপাধিক) ভক্ত অসুরোত্তম প্রহ্লাদ ওই সকলের কিছুই চাইলেন না।

.

দশম অধ্যায়

প্রহ্লাদের রাজ্যাভিষেক ও ত্রিপুর দহনের বৃত্তান্ত

নারদ বললেন–বালক প্রহ্লাদ ভগবানের কথিত বরগুলি ভক্তির অন্তরায় (প্রতিবন্ধক) মনে করে, বিস্মিত হয়ে নৃসিংহদেবকে বললেন। প্রহ্লাদ বললেন–ভগবন, আমি স্বভাবত কামাসক্ত আবার এই সকল বর দিয়ে কামনার প্রতি লোভ দেখাবেন না। আমি কামসঙ্গ থেকে ভীত হয়ে

নির্বিঘ্নচিত্তে মুক্তি বাসনায় আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমার মনে হয় ভৃত্যের লক্ষণ (অসাধারণ ধর্ম) লোকে জানানোর জন্য সংসারের বীজ এবং হৃদয়ের গ্রন্থির মতো বন্ধক কাম সকলে আমাকে প্রেরণ করছেন। আপনি অখিলগুরু (সর্বজনের হিতোপদেষ্টা), করুণাত্মা, আপনার এ প্রকার অনর্থসাধন প্রবৃত্তিদান সম্ভব নয়। দুর্লভ দর্শন আপনাকে লাভ করে, যে ব্যক্তি সাংসারিক মঙ্গল প্রার্থনা করে সে আপনার ভৃত্য নয়, সে ব্যবসায়ী বণিক। কামনা পূরণের দ্বারা সেবকদের যে স্বামী ভৃত্য ভাব লোকে প্রসিদ্ধ রয়েছে, তা সোপধিকমাত্র বাস্তবিক নয়। যেহেতু যে ব্যক্তি প্রভুর নিকট নিজের কল্যাণ অপেক্ষা করে সে ভৃত্য নয়, আর যিনি ভৃত্যের নিকট থেকে প্রভুত্ব ইচ্ছা করত তাকে অর্থাধি দেন। তিনিও প্রভু নন। আমাদের প্রভু-ভৃত্য ভাব সেরূপ সোপাধিক নয়, আমিও আপনার নিষ্কাম ভক্ত, আর আপনিও অনভিসন্ধি (অনন্য প্রয়োজন) স্বামী। অতএব রাজা ও সেবকের ন্যায় কাম ও অভিসন্ধিতে আমাদের প্রয়োজন নেই।

হে বরদর্ষভ, আপনার সন্তোষের জন্য যদি আমার অভিলষিত বর নিতান্তই দিতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনার কাজে এই বর প্রার্থনা করি–যেন আমার হৃদয়মধ্যে কামাঙ্কুরের উৎপত্তি না হয়। কামাঙ্কুরের উৎপত্তি মাত্রই ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, দেহ, ধর্ম, ধৈর্য, বুদ্ধি, লজ্জা, সম্পদ, তেজ, স্মৃতি এবং সত্য এ সকল নষ্ট হয়ে যায়। হে পুন্ডরিকাক্ষ যখন মানব মনস্থিত কামনাসকল পরিত্যাগ করে তখন আপনার মতো জ্ঞান ও ঐশ্বর্য লাভের যোগ্য হয়। তারপর ভগবান যেন নির্দোষ কামসকল দিতে ইচ্ছা করছেন–এটা মনে করে তা নিবারণের জন্য ভগবানকে প্রণাম করতে লাগলেন–"প্রভো আপনি ভগবান পরমপুরুষ মহাত্মা হরি, অদ্ভুত সিংহ, পরম ব্রহ্ম, পরমাত্মা আপনাকে নমস্কার।

শ্রীভগবান বললেন–বৎস, যদিও তোমার মতো একান্ত ভক্তগণ ইহকাল ও পরকালের কোনো কল্যাণ কখনই প্রার্থনা করে না, তবুও তুমি আমার আদেশে এই মন্বন্তর কাল পর্যন্ত এখানে থেকে দৈত্যেশ্বরগণের অধিপতি হয়ে তাদের ঐশ্বর্য ভোগ কর। এক অদ্বিতীয় সর্বভূতে অবস্থিত যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর আমাকে তোমার নিজচিত্তে নিবেশপূর্বক আমার প্রিয় কথা শ্রবণ করতঃ আমাতে অপর্ণরূপ যোগের দ্বারা কর্ম পরিত্যাগ করে যজ্ঞ কর। সুখানুভবের দ্বারা প্রারব্ধ পূণ্য, সুকৃত আচরণের দ্বারা পাপ এবং কালগতিতে কলেবর পরিহার করে মুক্তবন্ধ (গ্রীবন্মুক্ত) হয়ে আছো, এখন লোকের প্রতি অনুগ্রহের জন্য সুরলোকগীত বিশুদ্ধ কীর্তি বিস্তার করে আমাকে প্রাপ্ত হবে। (প্রহাদের প্রারব্ধ পাপ বা পুণ্য কিছুই নেই। ভগবানের দ্বারা কৃতার্থ হবার পর একথা বলছেন লোকসংগ্রহের জন্য। প্রহ্লাদ নারদাদির মতো অংশে সাধনসিদ্ধ এবং অংশে নিত্যসিদ্ধ জানতে হবে।) বৎস, তুমি আমার এই যে স্তব করলে, যে

ব্যক্তি তোমাকে, আমাকে এবং আমার এই চরিত্র স্মরণ করে, যথাকালে তোমার এই স্তব কীর্তন করবে, সেও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে, আর তোমার বন্ধনের আশঙ্কা কোথায়?

প্রহ্লাদ বললেন–হে মহেশ্বর, আপনি বর দিতে চেয়েছেন। বরদাতাগণের অধীশ্বর আপনার নিকট হতে অন্য বর চাইছি–আমার পিতা আপনার ঐশ্বরিক তেজ না জেনে আপনার নিন্দা করেছেন। ক্রোধযুক্ত চিত্ত হয়ে তুমি ভ্রাতৃহন্তা এই মিথ্যাদৃষ্টিবশতঃ আমার পিতা সর্বলোকগুরু পরম প্রভু আপনাকে যে কটুক্তি করেছেন এবং আমি তোমার ভক্ত বলে আমার প্রতি দ্রোহ করেছেন, এই সকল দুস্তর পাপ থেকে তিনি পবিত্র হোন। হে কৃপা বৎসল, আপনার অপাঙ্গদৃষ্টিতে তিনি নিশ্চর পবিত্র হয়েছেন, তবুও আমি অজ্ঞ বলে প্রার্থনা করলাম।

শ্রীভগবান বললেন–হে নিষ্পাপ, কেবল তোমার পিতাই পবিত্র হয়নি, যদি একবিংশতিবার তোমার পিতার জন্ম হয়, তবে তারাও পবিত্র হবে। যেহেতু তুমি তার কুলে জন্মগ্রহণ করেছ। হে সাধো, তুমিই তোমার মাতাপিতার কুলতারণ। যেখানে যেখানে সমদর্শী, প্রশান্ত, সাধু সদাচার–সম্পন্ন আমার ভক্তগণ থাকে, সেখানে কীটতুল্য হীন বংশীয়েরাও পবিত্র হয়। আমার ভক্তিহেতু যারা স্পৃহাশূন্য হয়েছে, ছোট-বড় কোনো প্রাণীকে হিংসা করে না, যারা তোমার মতো ভক্তগণের অনুব্রত, তারাই আমার ভক্ত। তুমি আমার ভক্তগণের উপমাস্থল অর্থাৎ তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ। হে তাত, আমার অঙ্গসংস্পর্শে তোমার পিতা সর্বতোভাবে পূত হয়েছে। এক্ষণে তুমি পুত্রের কর্তব্য প্রেতকৃত্যাদি (দাহ, শ্রাদ্ধ, অর্পণাদি) কর। তোমার পিতা সুপ্রজ্যাঃ (অর্থাৎ তোমার মতো পুত্র লাভ করেছেন) আমার অঙ্গ-স্পর্শের দ্বারা তার সদগতি হবে। তারপর তুমি পৈতৃকপদে (দানবদের অধিপতিরূপে রাজসিংহাসনে) অধিষ্ঠিত হয়ে মুনিগণের নির্দেশ অনুসারে আমাতে মনোনিবেশপূর্বক যৎপর হয়ে তদনুরূপ কর্ম করতে থাকে। নারদ বললেন–হে রাজন, ভগবানের আদেশ অনুসারে দ্বিজগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হয়ে প্রহ্লাদ পিতার পারলৌকিক কার্যাদি সম্পন্ন করলেন। তারপর প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই নৃসিংহরূপী হরিকে প্রসাদসুমুখ দর্শন করে, পবিত্র বাক্যে বহু স্তব করলেন, পরে দেবগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বলতে লাগলেন-হে দেবদেব, হে অখিলপাতি, হে ভূতভাবন, হে পূর্বজ, দুরাত্মা হিরণ্যকশিপু আমার কাছে বর নিয়েছিল আমার সৃষ্ট কোনো প্রাণীর দ্বারা বধ্য হবে না, আর তপস্যা যোগ ও শক্তিতে উদ্ধত হয়ে সমস্ত ধর্ম উচ্ছেদ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। লোকসন্তাপকারী ওই পাপ অসুর আপনার দ্বারা নিহত হলো, এটা পরম ভাগ্য। আর ঐ দৈত্যের পুত্র মহাভাগবত বালক প্রহ্লাদের যে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করলেন, ইহাও সুমহৎ ভাগ্য। ওই প্রহ্লাদ এক্ষণে যে আপনাকে প্রাপ্ত হলেন, ইহাও অতিশয় ভাগ্য, আপনি পরমাত্মা আপনার এই নৃসিংহরূপের ধ্যানকারী ব্যক্তি সমস্ত ভয় ও মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পাবে।

ভগবান বললেন–হে বিভো, হে পদ্মসম্ভব, অসুরগণ অতি ক্রুস্বভাব, সর্পদের দুগ্ধ দানের ন্যায়, আপনি তাদের এরূপ বর আর দেবেন না। নারদ বললেন–হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভগবান এই প্রকার পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার দ্বারা পূজিত হয়ে সকল প্রাণীর অদৃশ্য হয়ে অন্তর্হিত হলেন। তারপর প্রহ্লাদ ভগবানের অংশ ব্রহ্মা, মহেশ এবং প্রজাপতি প্রভৃতি সকল দেবগণের পূজা করে মস্তক দ্বারা বন্দনা করলেন। তারপর পদ্মযোনি ব্রহ্মা, শুক্রাদি মুনিগণের সাথে মিলিত হয়ে প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবদের অধিপতি করলেন। হে রাজন, তারপর ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রহ্লাদের প্রতি আহ্লাদ প্রকাশ ও আশীর্বাদ প্রয়োগ করে, তার পূজা গ্রহণপূর্বক নিজ নিজ ধামে গমন করলেন।

হে রাজন, বিষ্ণুর ওই দুইজন পার্ষদ এই প্রকারে দিতির পুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়ে পরে হৃদয়াস্থিত হরি কর্তৃক বৈরীভাবে নিহত হয়। তারাই আবার বিপ্রশাপে কুম্ভকর্ণ ও দশগ্রীব রাবণ রূপে দুই রাক্ষস হয়েছিল; শেষে রামচন্দ্রের বিক্রমে নিধনপ্রাপ্ত হয়। তারা রামচন্দ্রের বাণে যুদ্ধে নির্ভিন্নহৃদয় হয়ে ধরাশায়ী হলে, পূর্ব জন্মের মতো তার চিন্তা করতে করতে দেহ পরিত্যাগ করেছিল। হে যুধিষ্ঠির, সেই দুই ব্যক্তিই শিশুপাল ও দণ্ডবক্র নামে পুনরায় জন্মেছিল এবং তোমাদের চোখের সামনেই বৈরানুবন্ধের দ্বারা (যোগাদি সাধন ব্যতীতই) ভগবান সাযুজ্যে প্রাপ্ত হল। এইরূপে কৃষ্ণবৈরী রাজগণ শ্রীকৃষ্ণের নিন্দাদির দ্বারা পূর্ববৃত নিজ নিজ পাপের অনুধ্যান দ্বারা, ভ্রমর বিশেষের ধ্যানের দ্বারা কীটের তন্ময়ত্ব প্রাপ্তির ন্যায়, তন্ময় হয়ে আত্মদাহ ত্যাগ করেছিল। যেরূপ অভেদের দ্বারা জ্ঞানীভক্তগণ শ্রীহরির সারূপ্য লাভ করেন, শিশুপালাদি নৃপতিগণও তেমনি তার ধ্যানের আবেশের ফলেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। হে মহারাজ, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, সে সকল তোমাকে বললাম। দক্ষঘঘাষের পুত্রাদি যদিও হবির বিদ্বেষী ছিলেন, তবুও তারা ওই প্রকারে ভগবানের সাযুজ্য লাভ করেছিলেন। ব্রহ্মণ্যদেব মহাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পবিত্র কথা কথিত হল, যাতে দুইজন আদি দৈত্যের বধ-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। আর, মহাভাগবত প্রহ্লাদের চরিত্র, তার ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং কর্তৃক স্তুত সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ঈশ্বর ভগবান হরির গুণানুবর্ণন। আর দেব-দৈত্যাদির স্থান সকলের কাল কর্তৃক মহান বিপর্যাস (পরিবর্তন) নিরূপিত হয়েছে। যে ধর্মের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়, সেইরূপ ভাগবত ধর্মের কথা এবং আত্মা অনাত্মাদির অশেষ বিবরণ এতে বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণুর পরাক্রম পূর্ণ এই আখ্যান শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করে যে কীর্তন করবে, সে কর্মপাশ থেকে মুক্ত হবে। যে ব্যক্তি আদিপুরুষ বিষ্ণুর এই নৃসিংহ লীলা, দৈত্যাধিপতি হিরণ্যকশিপু ও যূথপতিদের বধ এবং ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দৈত্যাত্মজ প্রহ্লাদের অনুভব শ্রবণ করে সংযতভাবে পাঠ করবে, সে অকুতোভয় (যে স্থান থেকে কোনো ভয় নেই) বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত

হবে। হে রাজন, প্রহ্লাদ ভাগ্যবান, আমরা মন্দভাগ্য–এই বলে বিষণ্ণ হয়ো না। মনুষ্যলোকে তোমরাও অতিশয় ভাগ্যবান, কারণ যে সকল লোক ভুবন পবিত্র করেন, তারা সর্বদাই তোমাদের গৃহে গমনাগমন করেন। তাদের আগমনের কারণ–সেখানে শ্রীকৃষ্ণোম্য পরব্রহ্ম নরাকারে সাক্ষাৎ বাস করছেন। মহদগণের অন্বেষণীয় যে কৈবল্য নির্বাণসুখ অর্থাৎ নিরুপাধি পরমানন্দ তার অনুভবরূপ যে ব্রহ্ম, সেই এই শ্রীকৃষ্ণ তিনি তোমাদের প্রিয়, সুহৃৎ, মাতুলপুত্র, আত্মা, পূজণীয়, আজ্ঞাবহ এবং গুরু। যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব মহাদেব, ব্রহ্মা, প্রভৃতিও বুদ্ধির দ্বারাও যথার্থরূপে সাক্ষাৎ বর্ণনা করতে সমর্থ হন নাই, তিনিই তোমাদের প্রতি স্বয়ং প্রসন্ন। আমরা মৌনাদি সাধন দ্বারা তার প্রসন্নতা প্রার্থনা করে থাকি, এখনও প্রার্থনা করে থাকি, এখনও প্রার্থনা করছি। মৌনব্রত, ভক্তি এবং উপশম দ্বারা পূজিত হয়ে, সেই ভক্তগণের পালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। (ওহে যুধিষ্ঠির, প্রহ্লাদের গৃহে পরম ব্রহ্ম বাস করে নাই এবং মুনিগণও তাঁর দর্শনের জন্য তার গৃহে যান নাই। আর পরম ব্রহ্ম তার মাতুল পুত্রাদিরূপে বর্তমান থাকেন নাই, কিন্তু তোমাদের প্রতি ওই সকল করেছেন, অতএব তোমরা প্রহ্লাদ অপেক্ষা এবং আমাদের অপেক্ষাও মহাভাগ্যবান) হে রাজন, পূর্বে অনন্ত মায়াবী ময়দানব, দেবদেব রুদ্রের যশ বিনষ্ট করলে, সেই এই ভগবান পুনরায় তার কীর্তি বিস্তার করেন।

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন–ময়দানব কোন্ কার্যে জগতের ঈশ্বর মহাদেবের যশ বিনষ্ট করেছিল এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও কিভাবে তার কীর্তি বিস্তার করেন, তা বলুন। নারদ বললেন–রাজন, দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধের সময়ে, এই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সম্বর্ধিত হয়ে দেবগণ অসুরদের পরাজিত করলে, তারা মায়াগণের পরম আচার্য ময়দানবের শরণাপন্ন হয়। ওই ময়দানব স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহময় তিনটি পুরী নির্মাণ করে তাদের অর্পণ করেন। সেই পুরীতে তারা কখন যাতায়াত করত তা কেউ লক্ষ্য করতে পারত না। হে রাজন, সেই সকল বিমানতুল্য পুরীর দ্বারা অসুর সেনাপতিগণ অলক্ষিত ভাবে পূর্ব বৈরী স্মরণ করে লোকপালসহ লোকত্রয় বিনাশ করতে লাগলেন।

তারপর ইন্দ্রাদি লোকপালদের সাথে সমস্ত লোক ভগবান রুদ্রের নিকট গিয়ে প্রণত হয়ে সকাতরে বললেন–হে দেবদেব, আমরা আপনারই লোক, ত্রিপুরবাসী অসুরগণ আমাদের বিনাশ করছে, আপনি রক্ষা করুন। তাদের কাতর বচন শুনে ভগবান শংকর, “তোমরা ভয় করো না” এই কথা দেবতাদের বলে, নিজ ধনুতে শরসন্ধান পূর্বক ওই সকল পুরীর উদ্দেশে অভিমন্দ্রিত শর নিক্ষেপ করলেন। সূর্যমণ্ডল হতে যেমন রশ্মি সমূহ উৎপতিত হয়, তেমনি সেই বাণ হতে অগ্নিবর্ণ বাণসমূহ উৎপতিত হয়ে ওই তিনটি পুরী আচ্ছন্ন করল। এই তিনটি পুরীতে

যে সকল অসুরগণ বাস করত, তারা সেই বাণ দ্বারা সৃষ্ট হওয়া মাত্রই গতাসু হয়ে সেখান থেকে নিপতিত হল। ইহা দেখে মহামায়া ময়দানব ওই সকল মৃত দানবদের নিয়ে নিজের নির্মিত অমৃতময় কূপে নিক্ষেপ করল। সেই সিদ্ধ অমৃত রসে সংস্পৃষ্ট হওয়ায় অসুরগণ বজ্রের মতো দৃঢ়াঙ্গ ও বলশালী হয়ে মেঘভেদী বিদ্যুৎদ্রুপ বহ্নির ন্যায় পুনরায় উত্থিত হল।

এই ব্যাপারে সংকল্প ভঙ্গ হল বলে বিমনস্ক বৃষধ্বজকে দেখে ভগবান বিষ্ণু একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন। তখন তিনি ব্রহ্মাকে বৎস করে এবং নিজে গাভীরূপ ধারণপূর্বক মধ্যাহ্নকালে সেই ত্রিপুরমধ্যে প্রবেশ করে সেই অমৃতময় কূপের সমস্ত অমৃত পান করলেন। সেখানকার রক্ষক অসুরগণ তা স্বচক্ষে দেখেও ভগবত্সয়ায়, বিমোহিত হয়ে নিষেধ করল না। মহাযোগীময় তা জানতে পেরে, দৈবগতি স্মরণপূর্বক হাস্য করতে করতে রসপালকদের বলল–আপনার অথবা অন্যের, কিংবা আত্মপর উভয়ের প্রতি যা দৈব কর্তৃক উপকল্পিত হয়, তার অন্যথা করতে কি সুর, কি অসুর, কি নর, কি অন্য কোনো ব্যক্তি কারও সামর্থ্য নেই। তারপর ভগবান হরি নিজ শক্তি, ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যসম্পত্তি, তপস্যা বিদ্যা ও ক্রিয়াদির দ্বারা শম্ভর সংগ্রাম সাধন–রথ, সারথি, অশ্ব ধ্বজ, ধনুর্বাণ, বর্ম প্রভৃতি রচনা করে দিলেন। পরে মহেশ্বর বর্ম পরিধানপূর্বক ধনুর্বাণ গ্রহণ করলেন। হে নৃপ, ভগবান শংকর, ধনুতে বাণ সন্ধানপূর্বক অভিজিৎ মুহূর্তে (অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে) সেই দুর্ভেদ্য পুরত্রয় অনায়াসে দগ্ধ করে ফেললেন। এইভাবে ত্রিপুর দগ্ধ হলে শত শত বিমান আচ্ছন্ন আকাশে দুন্দুভির ধ্বনি হতে লাগল এবং দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ ও সিদ্ধেশ্বরগণ "জয়যুক্ত হও" বলে পুষ্প বর্ষণ করতে লাগল। আর গন্ধর্বগণ হৃষ্ট হয়ে গান এবং অপ্সরা সকল নৃত্য করতে আরম্ভ করল। হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভগবান ত্রিপুরারি এই প্রকারে তিনটি পুরী দগ্ধ করে, ব্রহ্মাদির দ্বারা স্তুত হয়ে নিজধামে প্রত্যাগমন করলেন। ভগবান হরির এই প্রকার কার্য, তিনি নিজ মায়ার দ্বারা আপনার নাকরের অনুকরণ করেন। জগদ্গুরু ভগবানের লোকপাবন সেই সকল লীলাবলী ঋষিগণ গান করেছেন। ওই সকল তোমার কাছে বললাম, আর কি বলব, বল।

.

একাদশ অধ্যায়

মনুষ্যধর্ম, বর্ণধর্ম ও স্ত্রীধর্মের বর্ণন

স্ত্রী শুকদেব বললেন–দৈত্যপতি প্রহ্লাদের মন সব সময় ভগবানেই অর্পিত থাকত, এজন্য তিনি মহত্তমগণের অগ্রগণ্য। সাধু সভায় সকৃত। তাঁর পবিত্র চরিত্র শ্রবণে মহারাজ যুধিষ্ঠির অতিশয়

আনন্দিত হয়ে ব্রহ্মতনয় নারদকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন–ভগবান ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমের আচার যুক্ত সনাতন (অনাদি পরম্পরাগত) মনুষ্যদের ধর্ম শুনতে ইচ্ছা করছি। যে ধর্মের দ্বারা মানবের জ্ঞান ও ভক্তি লাভ হয়। হে ব্রাহ্মণ, আপনি প্রজাপত ব্রহ্মার সাক্ষাৎ পুত্র এবং তপস্যা জ্ঞান ও সমাধির দ্বারা তার অন্য সকল পুত্রের সম্মত, অতএব আপনি সমস্তই জানেন। যদিও স্মৃতিকারেরা ধর্ম বলেছেন, তথাপি কৃপালু, সাধু, শান্ত, নারায়ণ-পরায়ণ আপনার মতো ব্রাহ্মণগণ যেরূপ উৎকৃষ্ট অতিশয় গুহ্য ধর্ম যেমন জানেন, অপারে সেরূপ জানেন না। অতএব আপনি কৃপাপূর্বক বলুন।

নারদ বললেন–লোকসকলের ধর্মের প্রবর্তক ভগবান নারায়ণকে প্রণাম করে তার শ্রীমুখ থেকে শক্ত সনাতন ধর্ম আমি বলছি। সেই ভগবান নিজের অংশের দ্বারা ধর্ম ও দাক্ষায়ণীর সন্তানরূপে অবতীর্ণ হয়ে লোক সকলের কল্যাণের জন্য বদরিকাশ্রমে বসে আজও তপস্যা করছেন। হে রাজন, সর্ববেদময় ভগবান হরিই সকল ধর্মের মূল (প্রমাণ)–ইহা বেদবেত্তাদের স্মৃত। যে ধর্মের দ্বারা আত্মা (পরমাত্মা) প্রসন্নতা লাভ করেন। (অর্থাৎ শ্রুত্বতি, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মার সন্তোষ–সব কিছুরই মূল প্রমাণ ভগবান হরি।) হে যুধিষ্ঠির, নরমাত্রের সাধারণ ধর্ম কি, প্রথমত বলছি। সত্য (যথার্থ ভাষণ), দয়া (স্বার্থাশূন্য) হয়ে পরের দুঃখনাশের ইচ্ছা, তপস্যা (একাদশ প্রভৃতি উপবাস), শৌচ (স্নানাদিজনিত পবিত্রতা) তিতিক্ষা (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, ঈক্ষা (যুক্তাযুক্ত-বিবেক), শম (মনের সংযম) দম (বাহ্যন্দ্রিয়ের জয়), হিংসা (পরপীড়ন করা বর্জন), ব্রহ্মচর্য (উপস্থ-সংযম) ত্যাগ (লোভ-রাহিত্য), স্বাধ্যায়, (ইষ্টমন্ত্র জপ) ও আর্জব (সরলতা)–এই একুশটি ভক্তির উপকরণীভূত ধর্ম।

আর, সন্তোষ (যদৃচ্ছালাভে যথেষ্ট বুদ্ধি), সমদৃক সেবা (সমদর্শী মহদগণের সেবা) প্রবৃত্তিমূলক কর্ম হতে নিবৃত্তি, মানুষের নিষ্ফল ক্রিয়ার পর্যালোচনা, মৌন (বৃথা আলাপ ত্যাগ) ও আত্মবিমর্শন (দেহতিরিক্ত আত্মার অনুসন্ধান)। অপর, যথাযোগ্যরূপে প্রাণিদের মধ্যে অন্নবস্ত্রাদির বিভাগ করে দেওয়া, সকল ভূতে আত্মা ও দেবতা জ্ঞান, অতএব সকল মানবের প্রতিও এইরূপ ভাব। এখন শ্রবণাদি নয়টি সাক্ষাৎ ভক্তির ধর্ম বলছেন। ভক্তগণের আশ্রয় স্বরূপ ভগবানের গুণ-কর্মের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেব্য, ধজ্যা (পূজা), অবনতি (নমস্কার), দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ। হে রাজন, এই ত্রিশটি মনুষ্যমাত্রের পরম ধর্ম বলে কথিত হয়েছে। এই ত্রিশটি লক্ষণ-বিশিষ্ট হলে এর দ্বারা সর্বাত্মা ভগবানের সন্তোষ সাধন হয়।

হে রাজন, বর্ণধর্ম সকল বলব, তার মধ্যে প্রথমে দ্বিজলক্ষণ বলছি। যে ব্যক্তির সমন্ত্রক গর্ভাধানাদি সংস্কারসকল অবিচ্ছিন্ন এবং ব্রহ্মা যার প্রতি এ প্রকার সংস্কারসকল বিধান

করেছেন, তিনিই দ্বিজ। আর ব্রহ্ম শূদ্রকে মন্ত্রবৎ সংস্কারযুক্ত করে বলেন নাই এবং তার উপনয়নের বিধান নেই–এজন্য শূদ্র দ্বিজ নহে। শুদ্ধ কুল ও শুদ্ধ আচারে পরিশুদ্ধ যে সকল দ্বিজাতি, তাদের যজন, অধ্যয়ন, দান এবং ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমোদিত ক্রিয়া আবশ্যক ধর্মা। ব্রাহ্মণের অধ্যয়নাদি অর্থাৎ অধ্যায়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন দান ও প্রতিগ্রহ–এই ছয়টি কর্ম বিহিত হয়েছে। ক্ষত্রিয় জাতির প্রতিগ্রহ ভিন্ন আর পাঁচটি কর্ম। কিন্তু যে ক্ষত্রিয় প্রজাপালনে অধিকৃত। তার ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল প্রজা হতে কর গ্রহণ ও দন্তশুল্কাদির দ্বারা জীবিকা বিহিত হয়েছে। বৈশ্য জাতির কৃষি বাণিজ্যাদি জীবিকা এবং সর্বদা ব্রাহ্মণকুলের অনুগত থাকা কর্তব্য কর্ম। শূদ্র জাতির প্রতি দ্বিজ শুশ্রূষা মাত্র বিহিত এবং দ্বিজ সেবার দ্বারাই তারা জীবিকা অর্জন করবেন।

হে রাজন, বিপ্র জাতির মুখ্য ও অনুকল্প ভেদে অপর বৃত্তির কথা বলছি। বিচিত্র বার্তা (অর্থাৎ কৃব্যাদি) শালীন (অযাচিত প্রাপ্তি) যাযাবর প্রত্যহ ধান্য যাঞ্চা) এবং শীল ও উঞ্ছ (অর্থাৎ শীল শব্দের অর্থ ধানক্ষেত্রাদিতে স্বামিত্যক্ত শস্যমঞ্জরী এবং ঊঞ্ছ শব্দের অর্থ দোকানের ধারে পরিত্যক্ত শস্যকণা সংগ্রহ)। ওই গুলির মধ্যে পরস্পর বৃত্তি উত্তম। নীচ জাতীয় মনুষ্যের বিপদকাল ব্যতীত অধ্যাপনাদি উত্তম বৃত্তি অবলম্বন করা বিধেয় নয়। কিন্তু আপকালে ক্ষত্রিয় ব্যতিরেকে সকল জাতিই সকল বৃত্তি অবলম্বন করতে পারে। ক্ষত্রিয় জাতি আপকালে প্রতিগ্রহ ভিন্ন অন্য সকল বৃত্তি গ্রহণ করবে। ব্রাহ্মণ জাতির যে চারটি বৃত্তি বলা হল তার মধ্যে ক্ষত ও অমৃতের দ্বারা অথবা মৃত/মৃতের দ্বারা কিংবা সত্যামৃত (বাণিজ্য) দ্বারা সকল জাতিই জীবন ধারণ করতে পারে, স্ববৃত্তির (নীচসেবার) দ্বারা কখন জীবিকা নির্বাহ কর্তব্য নয়। ঋত শব্দের অর্থ উঞ্জ ও শিল, অমৃতের অর্থ অযাচিত, ঘৃত শব্দের অর্থ নিত্য যাঞ্চা, প্রমৃতের অর্থ কৃষি, সত্যামৃতের অর্থ বাণিজ্য এবং স্ববৃত্তির অর্থ নীচে সেবা।

হে রাজন, স্ববৃত্তি (নীচ সেবা) অতিশয় নিন্দিত, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি সর্বদাই উহা পরিত্যাগ করবে। কারণ ব্রাহ্মণ সর্ব বেদময় এবং ক্ষত্রিয় সর্বদেব স্বরূপ। এক্ষণে বর্ণসকলের অভিব্যঞ্জক স্বরূপ ধর্ম বলছেন–শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, ঋজুতা, জ্ঞান, দয়া, বিষ্ণুপরত্ব এবং সত্য–এই সকল ব্রাহ্মণ জাতির লক্ষণ। শৌর্য (যুদ্ধোৎসাহ), ধৈর্য, তেজ, দান, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা এবং সত্য–এই সকল ক্ষত্রিয় জাতির লক্ষণ। দেব, গুরু এবং বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি, ধর্ম, অর্থ ও কাম–এই ত্রিবর্গের পরিপোষণ, আস্তিক্য, নিত্য উদ্যম এবং নৈপুণ্য–এই সকল বৈশ্য জাতির লক্ষণ। সাধু, বিপ্রাদির প্রতি প্রমাণ, শৌচ অকপটে প্রভুর সেবা, অমন্ত্রযজ্ঞ (অর্থাৎ নমস্কার মন্ত্র দ্বারা পঞ্চ-যজ্ঞানুষ্ঠান) অস্তেয় (চুরি না করা, সত্য এবং গো, ব্রাহ্মণের রক্ষা–এই সকল শূদ্রের লক্ষণ। এক্ষণে স্ত্রীধর্ম বলছেন–পতিশুশ্রষা, পতির

অনুকূলবর্তিনী হওয়া, পতিবন্ধুর (পতির পিতা, ভ্রাতা, প্রভৃতির) অনুবৃত্তি, নিত্য পতির নিয়ম ধারণ–এই চারটি পতিব্রতা রমণীগণের লক্ষণ ও ধর্ম। সাধ্বী স্ত্রী স্বয়ং মণ্ডিত হয়ে সম্মার্জন উপালপন, গৃহমণ্ডল, এবং গৃহসুগন্ধীকরণ। আর পতির কামনা অনুসারে বিনয়, দম, সত্য অথচ প্রিয়বাক্য এবং প্রেম–এই সকল দ্বারা সময়ে সময়ে পতির সেবা করবে এবং গৃহের উপকরণ সকল সর্বদা পরিষ্কার করে রাখবে। যথালাভে সন্তুষ্ট তন্মাত্র ভাগেও আলোগুলা, সর্বদা অলস্য শূন্যা ও ধর্মজ্ঞা হবে। সতত সত্য অথচ প্রিয় বাক্য বলবে। সকল বিষয়ে অপ্রমত্তা (সাবধানী) সব সময় শুচি ও স্নিগ্ধা হয়ে মহাপাতকশূন্য পতির ভজনা করবে। যে নারী লক্ষ্মীর ন্যায় তৎপরা হয়ে হরিভাবে পতির সেবা করেন, তিনি লক্ষ্মীর তুল্য হয়ে হরিস্বরূপ সেই পতির সাথে হরিলোকে আমোদিত হন।

এক্ষণে অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ জাতিগণের ধর্ম বলছি। আলাপ ও অচৌর সঙ্কর জাতিদের। অন্ত্যজ (রজক, চর্মকার, নট, বরুও, কৈবর্ত, মেদ ও ভিল্লাদি) এবং অন্ত্যেবসায়ি। (অর্থাৎ চণ্ডাল, পুষ্কশ, মাতঙ্গাদি) জাতিদের নিজ নিজ কুল পরম্পরা প্রাপ্ত বৃত্তিই বৃত্তি, (অপাপ ও অচৌর বলার তাৎপর্য হল–চৌর ও হিংসাদি তাদের পরম্পরা প্রাপ্ত বৃত্তি হলেও তা নিষেধ করছেন। কারণ তা ধর্মীয় বৃত্তি নয়।) হে যুধিষ্ঠির, মনুষ্যদের স্বভাব (অর্থাৎ সত্ত্বাদি প্রকৃতি) দ্বারা যুগে যুগে যে ধর্ম বিহিত হয়েছে, বেদদর্শীগণ বলেন–প্রায় সেই ধর্মই ইহকাল ও পরকালে তাদের সুখহেতু হয়ে থাকে। (প্রায় বলার তাৎপর্য–দুর্জাতিদের দুরাচারত্ব ত্যাগ তাদের অমঙ্গলজনক নহে।) স্বকর্মকারী যে ব্যক্তি স্বভাব অনুসারে বৃত্তি অবলম্বন করে জীবন যাপন করেন। তিনি নিজ স্বভাবজ কর্ম পরিত্যাগ করে ক্রমে ক্রমে নিগুণত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

হে রাজন, কাম্য কার্যকারী পুরুষের তকাল ভোগ তৎপরত্ব প্রযুক্ত নৈগুণ্য হয় না–এরূপ আশঙ্কা করো না। যেমন উর্বরা ক্ষেত্রে বার বার বীজ বপন করলে, তা নিজেই নির্বীর্য হয়ে পড়ে, আর শস্য উৎপাদন সমর্থ হয় না। বরং বপন করা বীজও বিনষ্ট হয়ে যায়, তেমনি যে চিত্তে কামরূপে বাসনা সকল অবস্থিতি করে, সেই চিত্ত কামসকলের অতিশয় সেবার দ্বারা যেরূপ বিরক্ত হতে পারে, কামবিন্দু সেবায় সেরূপ হয় না। অগ্নি যেমন অল্প ঘৃতবিন্দুর দ্বারা শান্তি হয় না। একেবারে অধিক দিলে নির্বাণ হয়, তার ন্যায় অল্প অল্প কামসেবার দ্বারা চিত্ত বিরক্ত হয় না। অধিক সেবা করলেই বিরক্ত হতে পারে। হে রাজন, যে পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ বললাম, যদি অন্য বর্ণে সেই লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়, তবে সেই ব্যক্তিকেও সেই লক্ষণ নিমিত্ত সেই বর্ণদ্বারা নির্দেশ করা উচিত। (অর্থাৎ শম, দমাদি লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার মুখ্য। কেবল জন্মমাত্র ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার প্রশস্ত নহে)।

.

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্রহ্মচারী ও বাণপ্রস্থর অসাধারণ ধর্ম এবং আশ্রম চতুষ্টয়ের সাধারণ ধর্ম কথন

নারদ বললেন–হে রাজন, ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করে ইন্দ্রিয়দমন ও গুরুতে দৃঢ় সৌহৃদ হয়ে দাসবৎ গুরুর হিত আচরণ করবে। আর গুরু, অগ্নি, সূর্য ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা এবং গায়ত্রী জপ করত ত্রিসন্ধ্যা-বন্দনা করবে। সকাল ও সন্ধ্যা উভয়কালে মৌনী হয়ে থাকবে। গুরু বদি আহ্বান করেন, তাঁর নিকট গিয়ে সংযত ভাবে বেদ অধ্যয়ন করবে। অধ্যয়নের আরম্ভে ও শেষে প্রত্যহ মস্তক দ্বারা পাদ স্পর্শপূর্বক গুরুকে প্রণাম করবে। আর কুশ হস্তে মেঘলা অজিন (মৃগচর্ম), বমন, জটা, দন্ড, কমন্ডুলু এবং উপনীত–উপনয়ন কালে যে প্রকার বিহিত আছে, সেই প্রকারে ওই সকল ধারণ করবে। সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে ভিক্ষা আচরণ করবে এবং ভিক্ষালব্ধা বস্তু গুরুকে নিবেদন করবে। গুরুর অনুজ্ঞা পেলে ভোজন করবে, নচেৎ উপবাস করবে। সুশীল, পরিমিত আহার, কার্যদক্ষ, শ্রদ্ধাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে স্ত্রীলোকদের এবং স্ত্রীজিত ব্যক্তিদের নিকট যতটুকু প্রয়োজন, কেবল ততটুকুই ব্যবহার করবে। তাদের কাছে বেশি সময় থাকবে না।)

হে রাজন, গৃহস্থ ভিন্ন ব্রহ্মচারী ও বৃহদ ব্রতধারী সকলের পক্ষে স্ত্রী প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ ইন্দ্রিয়গণ অত্যন্ত বলবান, যতি ব্যক্তিদেরও মন হরণ করে, যুবা ব্রহ্মচারী যুবতী গুরুপত্নীদের দ্বারা কখন কেশপ্রসাধন, গাত্রমর্দন, স্নান ও অভ্যঞ্জনাদি কর্ম করাবে না। (গুরুপত্নীগণ শিষ্যকে পুত্রের মতো বাৎসল্যে দেখে, যদি কেশপ্রসাদনাদি স্বেচ্ছায়ও করেন, তবুও তা করাবে না। কারণ যুবতী স্ত্রী অগ্নির সমান এবং পুরুষ ঘৃতকুম্ভ তুল্য, অতএব নির্জনে কন্যার সহিতও অবস্থান করবে না। আর অনির্জন স্থানে তার নিকট যতটুকু মাত্র প্রয়োজন, ততটুকু কালমাত্র অবস্থান করবে। যদিও স্ত্রী প্রভৃতি মিথ্যা ও পাপজনকত্ব হেতু স্বয়ং ত্যক্তপ্রায় হয় সত্য, তথাপি স্বরূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা ইন্দ্রিয়াদিকে আভাসমাত্র নিশ্চয় করে যতক্ষণ জীব স্বতন্ত্র না হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বৈত (অর্থাৎ আমি পুরুষ, ইনি স্ত্রী–এইরূপ ভেদ) বুদ্ধি বিরত হয় না। ওই দ্বৈতবুদ্ধি থেকেই এই বিপর্যয় (অর্থাৎ গুণধ্যাসে দ্বারা ভোজ্যতা বৃদ্ধি হয়ে থাকে) অতএব স্ত্রীলোকের সাথে অবস্থানাদি ত্যাগ করা অত্যন্ত আবশ্যক। ব্রহ্মচারীর পক্ষে সুশীলত্বাদি যে সকল বলা হল, উহা গৃহস্থ যতি ও সন্ন্যাসীদেরও পালনীয়। যে গৃহস্থ কেবল ঋতুকালে স্ত্রীর সহিত মিলিত হয়, সেটাই তার গুরুবৃত্তি অর্থাৎ গুরুর আনুগত্য ধর্ম।

যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য ব্রতশালী, তারা চোখে কাজল দেওয়া, মাথায় তেল মাখা, গাত্র মার্জন, স্ত্রীলোকের ছবি আঁকা, মৎস্য মাংসাদি ভোজন, মধু, মালা, গন্ধ, অনুলেপন এবং অলংকরণ–এই সকল পরিত্যাগ করবেন। ব্রহ্মচারী এই প্রকারে গুরুকুলে বাস করে, শিক্ষাদি অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত বেদত্রয় অধ্যায়নপূর্বক নিজের অধিকার অনুসারে যথাসামর্থ্য তার অর্থ বিচার করবেন। পরে যদি সমর্থ হয়, গুরু যা চান, সেরূপ দক্ষিণা দিয়ে তার অনুমতি নিয়ে যেমন ইচ্ছা–গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করবেন। অথবা বাণপ্রস্থ হবার জন্য বনে প্রবেশ করবেন, কিংবা পরিব্রাজক হওয়ার জন্য প্রবজ্যা গ্রহণ করবেন, অথবা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়ে গুরুকুলেই বাস করবেন। কিন্তু যে আশ্রমেই প্রবেশ করুন –অগ্নি, গুরু, আত্মা ও নিজের আশ্রয় জীবগণের সহিত ভগবান অধ্যক্ষজকে সর্বভূতে নিয়তৃত্বরূপে। (অপ্রবিষ্ট হলেও) প্রবিষ্টের মতো দর্শন করবেন। হে রাজন, ব্রহ্মচারী অথবা বাণপ্রস্থী কিংবা যতি অথবা গৃহী– সকলেই এই প্রকার আচরণ করতঃ বিজ্ঞের বস্তু জাত হয়ে পরম ব্রহ্ম অনুভব করবেন।

এরপর বাণপ্রস্থাশ্রমীর মুনি সম্মত নিয়ম সকল বলছি। যা অবলম্বন করে ওই ব্যক্তি যথাযথ মহল্লোক প্রাপ্ত হন। যে সকল শস্য ভূমি কর্ষণের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে পক্ক হয়ে (শালী ধান্যাদি) কিংবা বা অকালে (অর্থাৎ পরিপাক কালেই পূর্বেই) নিষ্পন্ন হয় ফলমূলাদি, যে সকল শস্য অগ্নিপক্ক এবং অপক্ক ফলাদি ভোজন করবে না। কেবল সূর্যপক্ক ফলাদি আহরণ করবে। আর বন্য নীবারাদি ধান্য দ্বারা নিত্য চরা ও পুরোত্তাশাদি নির্বাহ করবে। নূতন নূতন অন্নাদি লব্ধ হলে পূর্ব সঞ্চিত অন্নাদি পরিত্যাগ করবে। বাণপ্রস্থাশ্রমী কেবল অগ্নিস্থাপনের জন্যই গৃহ অথবা পর্ণকুটির অথবা গিরিগর আশ্রয় করে থাকবে। নিজে হিম, বায়ু, অগ্নি, বর্ষা ও সূর্যাতপ সহ্য করবে। আর কেশ, রোম, নখ আশ্রশ্রু ও জটা ধারণ করবে। শরীরের মলিনতা দূর করবে না। এবং কমন্ডুলু, অজিন (মৃগমর্চ) দণ্ড, বল্কল ও অগ্নিরক্ষার অনুকূল বস্ত্রাদি ধারণ করবে। কিন্তু তপস্যার ক্লেশে বুদ্ধি বিনষ্ট না হয়, এ বিষয়ে সাবধান থাকবে। যখন ব্যাধি অথবা জরাদিবশতঃ কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে কিংবা জ্ঞানাভ্যাসে অসমর্থ হবে তখন অনশনাদি ব্রতের দ্বারা দেহত্যাগ করবে।

অনশনাদির দ্বারা দেহত্যাগের প্রকার বলছেন–প্রথমে আত্মাতে অগ্নি সমারোপণ করে 'আমি, আমার" ইত্যাদি অভিমান পরিত্যাগপূর্বক দেহকে কথাযোগ্য নিজ নিজ কারণ আকাশদিতে বিলীন করাবে অর্থাৎ যেরূপ ক্রমে উৎপন্ন, সেই অনুসারে দেহগত ছিদ্র–সকলকে আকাশে, নিশ্বাস–সকলকে বায়ুতে, উষ্মাকে (দেহের তাপকে) তেজে, শত্রু, শোণিত এবং শ্লেষ্মাদিকে জলে, আর অস্থি মাংস প্রভৃতি দেহের কঠিন অংশকে পৃথিবীতে লয় করাবে। তারপর বাক্যের সহিত বাণিন্দ্রিয়কে অগ্নিতে, শিল্পের (আদানাদিরূপ ব্যাপারের) সাথে হস্তদ্বয়কে ইন্দ্রে, গতির

সহিত পদদ্বয়কে বিষ্ণুতে এবং রতির সহিত উপস্থাকে প্রজাপতিতে লয় করাবে। বিসর্গের (পুরীযোৎসর্গের) সহিত পশুকে মৃত্যুতে, শব্দসহিত শ্রোত্রকে দিকসকলে, স্পর্শ-সহ ত্বগিন্দ্রিয়কে বায়ুতে লয় করাবে। চক্ষুর সহিত রূপকে তেজে, বরুণের সহিত জিহ্বাকে জলে এবং অশ্বিনী কুমারের সহিত ঘ্রাণকে ভূমিতে বিলয় করাবে।

পরে মনোরথের সাথে মনকে চন্দ্রে, বোধ্য পদার্থের সহিত বুদ্ধিকে ব্রহ্মাতে অহংকার, সহ কর্মসকলকে রুদ্রে লয় করাবে, এই রুদ্র হতে 'আমি, আমার" ইত্যাদি জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়া হয়ে থাকে। তারপর চেতনার সহিত চিত্তকে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং গুণকার্য দেবগণের সাথে ভোক্তৃত্বাদি বিকারবান ক্ষেত্রজ্ঞকে (জীবকে) নির্বিকার ব্রহ্মে বিলয় করাবে। পরে পৃথিবীকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে আকাশ, আকাশকে কূটস্থ অহঙ্কার-তত্ত্বে, অহংকার-তত্ত্বকে মহতত্ত্বে, মহতত্ত্বকে প্রধান (প্রকৃতিতে) এবং প্রধানকে পরমাত্মাতে লয় করাবে, এই প্রকারে সকল উপাধির লয় হলে, অবশিষ্ট ত্রিন্মাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে অক্ষয়–স্বরূপে অবগত হয়ে দ্বৈতরহিত হওয়ায় দগ্ধ কাষ্ঠ অগ্নির ন্যায় সর্বতোভাবে বিরাম করবে।

.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যতির এবং অবধূতের ইতিহাস কথন

নারদ বললেন–হে রাজন, জ্ঞানাভ্যাসে সমর্থ ব্যক্তি ওই প্রকার চিন্তা করে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনপূর্বক দেহমাত্র অবশোষিত হবেন। তিনি যদি গ্রামে যান, তবে একরাত্রি মাত্র সেখানে অবস্থান। করবেন, নচেৎ নিরপেক্ষ (আকাঙ্ক্ষাবর্জিত) হয়ে পৃথিবী বিচরণ করবেন। যদি বসন ধারণ করেন তবে শুধুমাত্র কৌপীন আচ্ছাদিত হতে পারে, কৌষেয় বস্ত্র ধারণ করবেন। আর দণ্ডাদি চিহ্ন ছাড়া অন্য যা কিছু তিনি পরিত্যাগ করবেন বিপৎকাল ছাড়া আবার তা গ্রহণ করবেন না। ভিক্ষাজীবী হয়ে একাকী ভ্রমণ করবেন, কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করবেন না। নিজে আত্মারাম, সর্বভূতের সুহৃৎ, শান্ত ও নারায়ণ-পরায়ণ হয়ে থাকবেন। আর এই বিশ্বকে কার্য-

কারণ ব্যতিরিক্ত অব্যয় আত্মাতে দর্শন করবেন। এবং পরব্রহ্ম স্বরূপ আত্মাকেও কার্য কারণময় সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত দেখবেন। যোগী সুষুপ্তি ও জাগরণ–এই দুই অবস্থার সন্ধিসময়ে যখন তম অথবা বিক্ষেপ উভয়ই না থাকে, তখন আত্মাকে লক্ষ্য করে অবস্থিত হওয়ায় আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন। অতএব বন্ধ ও মোক্ষ মায়ামাত্র, কিছুই নয় ইহা বিবেচনা করে সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করবেন। দেহের মৃত্যু নিশ্চয় এবং জীবন অনিত্য–এটা জেনে সেই দেহের জন্য আনন্দিত হবেন না। যা থেকে প্রাণিসকলের উৎপত্তি ও বিনাশ, কেবল সেই কালেরই প্রতীক্ষা করে থাকবেন।

আত্মতত্ত্ব বর্ণনাময় গ্রন্থ ব্যতীত অন্য অসৎ শাস্ত্রে আসক্ত হবেন না। নক্ষত্র বিদ্যা (জ্যোতিষ) দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করবেন না। জন্ম বিতণ্ডাদি–নিষ্ঠ তর্কসকল পরিত্যাগ করবেন এবং অত্যন্ত কুকুজি সহকারে কোনও পক্ষে আশ্রয় করবেন না। প্রলোভনাদির দ্বারা কাউকে শিষ্য করবেন না। বহু গ্রন্থ অভ্যাস করবেন না। শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যাকে উপজীবিকা করবেন না এবং কোথাও মধ্যাদি নির্মাণ কার্য আরম্ভ করবেন না। শান্ত ও সমচিত্ত যে পরমহংস, তার আশ্রম প্রায় ধর্মের প্রয়োজনে হয় না। অতএব যতদিন পর্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, ততদিন সত্ত্বশুদ্ধির জন্য যম ও নিয়ম আচরণপূর্বক জ্ঞানোৎপত্তির বিষয়ে যত্ন করবেন। জ্ঞান উৎপন্ন হলে নিয়মাদির আবশ্যক নেই, তখন ইচ্ছে হলে লোকশিক্ষার জন্য নিয়মাদি ধারণ করলে, ইচ্ছা না হলে তা পরিত্যাগ করবেন। বাইরে কোনো আশ্রম চিহ্ন ধারণ করবেন না, কেবল নিজের প্রয়োজন অর্থাৎ আত্মানুসন্ধান ব্যক্ত হবে। আর তিনি মনীষী হয়েও নিজেকে উন্মত্ত বা বালকের মতো দেখাবেন। স্বয়ং পণ্ডিত হয়েও লোকের সামনে নিজেকে মূখের ন্যায় প্রকাশ করবেন (অর্থাৎ লোকে তাকে দেখে যাতে উন্মত্ত অথবা বালক কিম্বা বাগিন্দ্রিয় হীন মনে করে, সেই প্রকারে থাকবেন)।

হে রাজন, এ বিষয়ে প্রহ্লাদ ও অজগরব্রতী মুনির সংবাদে একটি প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। তা তোমার নিকট উদাহরণ স্বরূপ বলছি, শোন। একসময় অজগর ব্রতী এক মুনি কাবেরী নদীর ধারে সহ্য পর্বতের ভূপৃষ্ঠে শয়ন করেছিলেন। তার শরীরের অবয়ব সকল ধূলি ধূসরিত হওয়ায় তার আসল তেজ নিগূঢ় ছিল। সেই সময় ভগবানের প্রিয় ভক্ত প্রহ্লাদ কতিপয় অমাত্য পরিবৃত হয়ে লোকতত্ত্ব জানবার জন্য ভ্রমণ করতে করতে সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে ওই মুনিকে দেখতে পেলেন। কর্ম, আকৃতি, বাক্য এবং বর্ণাশ্রমাদির চিহ্ন দ্বারা লোকে যাঁকে ‘ইনি সেই কিনা’–এই বলে নিশ্চয় করতে পারে না, মহাভাগবত প্রহ্লাদ দেখামাত্র তাকে চিনতে পারলেন এবং নমস্কার করে যথাবিধি মস্তক দ্বারা তার চরণ স্পর্শ করত বিশেষ পরিজ্ঞানের জন্য জিজ্ঞাসা করলেন।

হে ব্রাহ্মণ, আপনি উদ্যম শীল ও ‘ভগবানের ন্যায় এই যে স্থূল শরীর ধারণ করছেন, এর কারণ কি? কর্ম নিয়ত উদ্যমশীল লোকেরই ধনসম্পদ, ধনবান লোকের ভোগ এবং ভগবানদের স্থূল দেহ হয়ে থাকে। বিনা ভোগে কখনো এরূপ স্থূল দেহ দেখা যায় না। হে ব্রাহ্মণ, আপনি নিরুদ্যম হয়ে শয়ন করে আছেন, এতে যে বিত্ত হতে ভোগ হয়, সে বিত্ত আপনার নেই–এটা আমার নিশ্চর বোধ হচ্ছে। বিনা ভোগে আপনার এই দেহ যে কারণে স্কুল হয়েছে, তা যদি আমার জানার যোগ্য হয়, কৃপা পূর্বক বলুন। আপনি বিদ্বান, দক্ষ, চতুর, লোক রঞ্জক কথা বলতে জানেন, লোকেরা কর্ম করছে–এটা স্বচক্ষে দেখেও স্বয়ং এরূপ হয়ে শয়ন করে আছেন কেন? (অর্থাৎ, এই সকল লোক বিত্ত অর্জনাদিতে অসমর্থ হয়েও তার জন্য কত উদ্যম করছে, আর আপনি সমর্থ হয়েও নিরুদ্যম হয়ে রয়েছেন কেন?)।

নারদ বললেন–দৈত্যপতি প্রহ্লাদ এরূপ বলল। অজগরব্রতী সেই মহামুনি (দত্তাত্রেয়) তার বাক্যরূপ অমৃতে বশীকৃত হয়ে ঈষৎ হাস্য করে উত্তর প্রদান করলেন। ব্রাহ্মণ বললেন–হে অসুর শ্রেষ্ঠ, তুমি জ্ঞানীগণের সম্মত, এতে অন্তদৃষ্টির দ্বারা মানবগণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সকল ফলই জানতে পারে, ভগবান নারায়ণদের কেবল ভক্তির দ্বারা তোমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে, সূর্য যেমন অন্ধকার বিনষ্ট করে, তেমনি অজ্ঞান সকলকে দূর করেছেন। এতে যদিও তোমার কিছুই জ্ঞাতব্য নেই, তথাপি কেমন শুনেছি, তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেছি। কারণ যে ব্যক্তি নিজের শুদ্ধি কামনা করে, তার পক্ষে তোমার সহিত সম্ভাষণ করা কর্তব্য কর্ম। রাজন, সংসার প্রবাহ কারিণী যে তৃষ্ণাকে যথোচিত বিষয় সকলের দ্বারাও পূরণ করতে পারা যায় না, সেই তৃষ্ণার দ্বারা কর্মর্সকালে প্রবর্তিত হয়ে আমি পূর্বে নানা যোনিতে প্রবিষ্ট হয়েছিলাম। পরে স্ত্রীর কর্মের দ্বারা ভ্রমণ করতে থাকলে সেই তৃষ্ণাই আমাকে যদৃচ্ছাক্রমে এই মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত করিয়েছে। এই দেহ ধর্মের দ্বারা স্বর্গের সাধন, অধর্মের দ্বারা কুকুর, শূকরাদি তির্যক যোনির দ্বারা। মিশ্রিত ধর্মাধর্মের দ্বারা মনুষ্যত্বের দ্বার এবং সর্ব নিবৃত্তির দ্বারা মোক্ষের দ্বার। কিন্তু এই মনুষ্যত্বের সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তির জন্য কর্মকারী স্ত্রী-পুরুষদের বিপর্যয় দেখে, আমি নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করেছি।

রাজন, জীবের স্বরূপই সুখ, যখন সকল ক্রিয়ার নিবৃত্তি হয়, তখন ওই সুখরূপ আপনা হতেই প্রকাশ পায়। আমি ভোগসকলকে মনোরথ মাত্র (অর্থাৎ অনিত্য) বিবেচনা করে। নিরুদ্যম হয়ে পারদমাত্র ভোগের জড়খ্ব শয়ন করে আছি। যদিও সুখই আত্মার স্বরূপ এবং সেই আত্মা নিজেতেই বর্তমান রয়েছে। তথাপি পুরুষার্থ বিস্মৃত হওয়ার, দ্বিত না থাকলেও পুরুষ ঘোরতর বিচিত্র সংসার প্রাপ্ত হয়ে থাকে। যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি জলজ তৃণশৈবালাদির দ্বারা আচ্ছন্ন জল পরিত্যাগ করে জল কামনার মতো-তৃষ্ণার প্রতি ধাবমান হয়, তেমনি আত্ম-স্বরূপ হতে অন্য

পদার্থে পুরুষার্থে দর্শনকারী পুরুষ সংসারপ্রাপ্ত হয়। দৈবজ্ঞান দেহাদির দ্বারা যে ব্যক্তি নিজের সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তির ইচ্ছা করে। সেই দৈবশূন্য ব্যক্তির প্রারদ্ধ সকল কর্মই বিরল হয়ে থাকে। যদিও ক্রিয়ার বল হয়, তথাপি সেই বল তার কোন উপকারে আসে না। কারণ যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিকাদি দুঃখে কোন প্রকারে মুক্ত হতে পারে না, সুতরাং ম্রিয়মান পুরুষের পক্ষে দুঃখোঁপার্জিত অর্থ বা কাম কি হতে পারে?

বিনা ক্লেশে অর্থ ভাল করেও দুঃখ পেতে হয়। কোন না লুব্ধ অজিত প্রিয় ঋণী ব্যক্তিরা প্রচুর অর্থ লোভেও ক্লেশ ভোগ করে। তারা ভয়ে রাতে নিদ্রা যেতে পারে না। সব সময় সকল দিক্ হতে তাদের শঙ্কা। প্রাণবাণ অর্থবান্ লোকদের রাজা হতে, চোর হতে, শত্রু হতে, স্বজন হতে, পশু-পক্ষী হতে, যাচকগণ হতে, কাল হতে এবং আপনা হতে সব সময় বিনাশ ভয় আছে। অতএব অর্থও প্রাণ-শোক, মোহ, ভয়, ক্রোধ, অনুরাগ, ক্লীবতা এবং শ্রমাদির মূল। সেই অর্থের প্রতি পণ্ডিত ব্যক্তির স্পৃহা পরিত্যাগ করা উচিত। ইহলোকে মধুমক্ষিকা ও অজগর সর্প আমাদের উত্তম গুরু, আমরা তাদের বৃত্তি পর্যালোচনা করেই এই বৈরাগ্য ও পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েছি। মুধমক্ষিকার নিকট আমি সর্বকাম বিষয়ে বিরাজ শিক্ষা করেছি। কারণ অন্যান্য ব্যক্তিরা বিত্ত পতিকে বধ করে মধুকরের ন্যায় তাদের কৃষ্ণলব্ধ বিত্ত হরণ করে থাকে। আর অজগয়ের নিকট শিক্ষা পেয়ে আমি নিশ্চেষ্ট ও যদৃচ্ছালাভে পরিতুষ্ট থাকি। যদি কখন কিছু না পাওয়া যায়, তবু অজগরের মত ধৈর্যবান হয়ে বহুদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকি।

কখনও অল্প, কখনও বেশি, যখন যেরূপ পাই ভোজন করি। কখনও সুস্বাদু অন্ন খাই, আবার কখনও বিষাক্তযুক্ত অন্ন খেয়ে, কখন বহুনযুক্ত অন্ন, কখনওবা পূর্ণহীন আহার মিলে। কখন কেউ শ্রদ্ধা করে অন্ন এনে দেয়, কখনও বা অপমান করে যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে থাকে। কোনদিন ভোজনের ভোজন আবার কোনও দিন উপবাসী থেকে রাতে অল্প কিছু পেয়ে সেটার দ্বারাই ক্ষুধার নিবৃত্তি করে থাকি। পরিধেয় সম্বন্ধেও কখন ক্ষৌম বসন, কখন দুকূল কখন বা মৃগচর্ম, কখন কৌপীন, কখন বল্কল, কখন বা অন্য যা কিছু পাই, তাই পরিধান করি। এইভাবে তুষ্টচিত্ত হয়ে সর্বদা প্রায় ভোজ করছি। শয়নেরও কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই–কোন সময় ভূমিতে, কখনও তৃণ বা শুষ্ক পাতার, অথবা পাথরের উপর কিংবা ছাই-এর উপর শুয়ে থাকি। আবার কেউ যত্ন করে অট্টালিকায় খাটের উপর নরম গদীতে শয়ন করালে, সেখানেই নিদ্রা যাই। ভ্রমণেরও কোন নিয়ম নেই–কখন উত্তম বস্তু, মাল্য চন্দনাদি অভিলিপ্ত হয়ে রথ, হস্তী বা অশ্বপৃষ্ঠে বেড়িয়ে থাকি, আবার কখনওঁ দিগম্বর হয়ে গ্রহের মত ঘুরে বেড়াই।

হে রাজন, যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ বিষম। আমি তার নিন্দাও করি না, স্তবও করি না, সকলেরই কল্যাণ কামনা করি এবং মহাত্মা বিষ্ণুতে আপনার ঐকাত্ম প্রার্থনা করে থাকি। এই প্রকারে অবস্থিত হবার উপায় বলছেন–ভেদগ্রাহক মনোবৃত্তিতে বিকল্পকে (অর্থাৎ, জাতিরূপাদি ভেদকে) হোম করবে অর্থাৎ ঐক্য ভাবনা করবে, পরে সেই মনোবৃত্তিকে যাতে অর্থরূপ বিভ্রম অর্থাৎ দেহাত্মাদি পদার্থের বিপর্যয়) আছে তাদৃশ মনে হোম করবে। তারপর সেই অহংকারকে মহত্ত্ব-দ্বারা মায়াতে হোম করবে। শেষে সত্যদর্শী ও মননশীল হয়ে মায়াকে আত্মানুভূতিতে হোম করবে। তারপর পরমাত্মায় অবস্থিত হয়ে আত্মানুভাবে নিরীহ (অর্থাৎ সকল ক্রিয়াশূন্য) হয়ে সমস্ত কার্য থেকে বিরত হবে।

হে রাজন, তুমি ভগবৎ প্রিয়–এই নিমিত্ত আমার এই আত্মবৃত্তান্ত অত্যন্ত গোপনীয় হলেও তোমার নিকট বর্ণনা করলাম। মন্দদৃষ্টিতে শ্লোক ও শাস্ত্রের বিধান হতে পৃথক মনে হলেও তত্ত্বদৃষ্টিতে ইহা সেরূপ নয়। নারদ বলালন-হে যুধিষ্ঠির, অসুরেশ্বর প্রহ্লাদ অজগরব্রতী মুনির নিকট ঐরূপ পরমহংস ধর্ম শ্রবণ করে তাকে পূজা করলেন। তারপর প্রীত হয়ে মুনির অনুমতি গ্রহণ পূর্বক নিজের গৃহাভিমুখে গমন করলেন।

.

চতুর্দশ অধ্যায়

গৃহস্থের উৎকৃষ ধর্ম এবং দেশ-কালভেদে বিশেষ ধর্মের বিবরণ

যুধিষ্ঠির বললেন–হে দেবর্ষি, গৃহস্থ ব্যক্তি যে বিধির দ্বারা এই পদবী (গতি) অনায়াসে লাভ করতে পারে অনুগ্রহপূর্বক তা বলুন। কারণ আমার মত জনের গৃহে অবস্থিত ব্যক্তি বাসুদেব সমর্পণপূর্বক যথোচিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে। যাকালে (অপরাহ্নাদি সময়ে) মহামুনিদের সেবা করবে। আর সর্বদা ভগবানের অবতার বলের কথামৃত অবহিত ও শ্রদ্ধান্বিত হয়ে শ্রবণ করবে এবং শান্ত-দান্ত জনগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকবে। ঐ প্রকার সাধুমনের সঙ্গহেতু ক্রমে ক্রমে নিজের দেহ, স্ত্রী ও পুত্রাদিতে স্নেহ ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন সুপ্তোত্থিত পুরুষ যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পুত্রাদির সঙ্গ ত্যাগ করে, তেমনি ঐ ব্যক্তি ঐ সকলের সঙ্গ ত্যাগ করে।

যে পরিমাণ অর্থের একান্ত প্রয়োজন, তা গ্রহণ করে, দেহ ও গৃহের প্রতি বিরক্ত হবে এবং বাহিরে লোকমধ্যে অসক্তের মত দেখাবে। কোথাও আগ্রহ না করে জ্ঞাতিজন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, সুহৃৎ এবং অন্যান্য ব্যক্তি যা ইচ্ছা করে, তাই নিজে অনাসক্ত হয়ে অনুমোদন করবে। আর দিব্য (বৃষ্টাদির দ্বারা জাত ধান্যাদি ভৌম (ভূমি ঘন্যা প্রাপ্ত নিবি প্রভৃতি), অন্তরীক্ষ (অকস্মাৎ লব্ধ ধন) এবং দৈবলব্ধ ধনাদির রক্ষণাবেক্ষণ করে পূর্বোক্ত সকল কর্ম করবে।

–যদি দৈবাৎ অধিক লাভ হয় তাতে অভিমান করবে না, কারণ যে পরিমাণ ধনাদিতে উদর পূর্তি হয়, ততটুকুই দেহিদের স্বত্ব। যে ব্যক্তি তার অধিক দ্রব্যের অভিযান করে, সে চোর, অতএব দণ্ড পাবার যোগ্য। মৃগ, উষ্ট্র, গর্দভ, মর্কট, ইঁদুর, সর্প, পক্ষী, মক্ষিকা ইত্যাদি যে কোন প্রাণ গৃহে অথবা ক্ষেত্রে প্রবেশ করে যদি শস্যাদি ভোজন করে, তাকে নিবারণ করবে না, বরং তাদের নিজের পুত্র সমান দেখবে। বস্তুতঃ পুত্রাদি হতে ঐ সকল মৃগাদির কতটুকু পার্থক্য? গৃহস্থ ব্যক্তি অতিকষ্টে ধর্ম, অর্থ, কাম–ওই ত্রিবর্গ উৎপন্ন করে সতত তার সেবা করবে না। কিন্তু যে স্থানে, যে কালে, দৈবাধীন যাবৎ লব্ধ হয়, তার সেবা করবে। আর কুকুর, পতিত এবং চণ্ডাল পর্যন্ত সকল প্রাণিকে যথাযোগ্য ভোজ্যবস্তু ভাগ করে দিবে। এমন কি নিজের শুশ্রূষার ব্যাঘাত হলেও নিজের একমাত্র ভার্যাকেও অতিথি সেবায় নিযুক্ত করবে।

হে রাজন, লোকে যে ভার্যার নিমিত্ত নিজের গ্রাম পর্যন্ত পরিত্যাগ করে এবং পিতা ও পুত্রকেও বধ করতে উদ্যত হয়, যে ব্যক্তি সেই ভার্যাতেও স্বত্বপরিত্যাগ করেন, তাহা কর্তৃক অজিত ঈশ্বরও বিজিত হন। যদিও ভার্যাতে স্বত্বাভিমান ত্যাগ করা কঠিন, তথাপি তত্ত্ববিচার দ্বারা অসাধ্য সাধন করতে পারা যায়। বস্তুতঃ এই দেহ অন্তে কৃমি, বিষ্ঠা অথবা ভস্মে পর্যবসিত হবে। তখন এই তুচ্ছ দেহই বা কোথায়? আর এই দেহে যার সঙ্গে রতি,সেই ভার্যাই বা কোথায়? আর যে আত্মা নিজ মহিমার দ্বারা গগনমণ্ডলকেও আচ্ছন্ন করেন, সেই আত্মাই বা কোথায়? এভাবে তত্ত্ববিচার করলে দেহ বা ভার্য্যা কোন পদার্থেই আসক্তি থাকবে না।

গৃহস্থ ব্যক্তি দৈবলব্ধ অর্থের দ্বারা পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, যা অবশিষ্ট থাকবে, তার দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহ করবে। এইভাবে জীবন দ্বারা করতঃ যিনি ব্যয়ের অবশিষ্ট অংশে নিজের স্বত্ব পরিত্যাগ করেন, তিনিই প্রাজ্ঞ, তিনি মহাজনদের নিবৃত্তিময় পথের অধিকারী হন। দেব, ঋষি, মনুষ্য, ভূত ও পিতৃগণ–এই সকল পঞ্চ যজ্ঞের দেবতার ও আত্মার নিজবিত্তের দ্বারা যথাবিধি অর্চনা করবে। এই প্রকার পৃথক প্রতিদিন অন্তর্যামির অর্চনা করবে। যদি নিজের অধিকারে সমস্ত যজ্ঞের সমপদ থাকে, তবে বৈতনিক (বিতান অর্থাৎ স্রোত কল্প সূত্রাদি রূপ যজ্ঞ গ্রন্থের) বিধান অনুসারে অগ্নি হোত্রাদির দ্বারা যজ্ঞ করবে।

হে রাজন্য, যজ্ঞের জন্য অতিশয় নিবন্ধ করার প্রয়োজন নেই। যৌথ সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ভগবান হরি ব্রাহ্মণমুখে হত অন্নাদির দ্বারা যেরূপ তুষ্ট হন, অগ্নিতে প্রদত্ত হবির দ্বারা সেরূপ হন না। অতএব ব্রাহ্মণ, দেব ও মানব প্রভৃতিতে যথাশক্তি সেই সেই ভোজ্যের দ্বারা ক্ষেত্র আত্মার যজ্ঞ করবে। (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) বৈভব অনুসারে ভাদ্র মাসে মাতা পিতার এবং বিত্তমান হলে তার বন্ধুদের ও অপর পক্ষী (অর্থাৎ মহালয়) শ্রাদ্ধ করবে। এরূপে অয়নদ্বয় (কর্কট সংক্রান্তি), ব্যতিপাত দিনে নিদনক্ষয় (ত্র্যহ স্পর্শ), চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ, দ্বাদশ তিথি এবং শ্রবণা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করবে।

এইরূপ বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের অক্ষয়তৃতীয়া, কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী, হেমন্ত ও শিশিরে (অর্থাৎ অগ্রহায়ণাদি চার মাসে) চারটি অষ্টকা শ্রাদ্ধ করবে মাসের শুক্লা পঞ্চমী মঘা নক্ষত্র ও পূর্ণিমায় সঘাতীর্থ (অর্থাৎ মঘা নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা) এবং যে যে নক্ষত্র হতে যে যে মাসের নাম হয় সেই সকল নক্ষত্র যখন সম্পূর্ণ চন্দ্রবিশিষ্ট পৌর্ণমাসির অথবা কিঞ্চিত নূন চন্দ্র যুক্ত অনুমতি তিথির সাথে মিলিত হয়, সেই সময় শ্রাদ্ধ করবে। যখন দ্বাদশ তিথিতে অনুরাধা, শ্রবণা এবং উত্তরফাল্গুনী। উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ এই তিন নক্ষত্রে যদি উপবাসের পর্যোতা, একাদশী হয় (অর্থাৎ, তিথিতে একাদশী ব্রত হলে পরদিন দ্বাদশীতে), জন্মনক্ষত্রের অথবা শ্রবণা নক্ষত্রের যোগযুক্ত দিন–এই সকল শ্রাদ্ধের কাল। এই সকল কাল কেবল শ্রাদ্ধের জন্যই প্রশস্ত নয়, ইহা মানবগণের শ্রেয়মাত্রের বর্ধক, অতএব এই সকল সময়ে সর্ব প্রযত্নে শ্রেয়স্কর সকল কার্যই করবে। এই সকল ধর্মীয় কর্ম করলেই পরমায়ুর সাফল্য হয়। এই সকল সময়ে স্নান, জপ, হোম, ব্রত এবং দেব, ব্রাহ্মণের যাহারা পূজা করে ও পিতৃদেব, মনুষ্য ও প্রাণীদের যাহা প্রদান করা তাহা অবীনশ্বর। হে রাজন, ভার্যার পুংসবনাদির সংস্কার কাল পুত্র, কন্যার জাত কর্মাদি, সময়, নিজের যজ্ঞ দীক্ষাদি সময়ে, প্রেতের দাহনাদিতে, মৃতা এবং অন্যান্য অভ্যুদায়িক কর্ম সময়ে শ্রেয়োজনক শ্রাদ্ধ আদি ক্রিয়া কর্তব্য।

এরপর যে যে দেশ ধর্মাদি শ্রেয়জনক তা বলছি শোন। যাঁতে এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব বর্তমান সেই ভগবানের প্রতিবিম্ব রূপ সৎপাত্র যে দেশে লাভ হয় সেই দেশ অতিশয় পুণ্যতম। আর, যেখানে তপস্যা, বিদ্যা ও দয়াতে বিভূষিত ব্রাহ্মণকুল থাকেন এবং যেখানে ভগবান হরির প্রতিমা রয়েছেন, সেই সকল দেশ মঙ্গলের নিকেতন। আর যেখানে পুরাণ প্রমিভূ গঙ্গাদি, সয়িত, পুষ্করাদি সরোবর এবং যে সকল ক্ষেত্র উত্তম জন কর্ত্তীক। আশ্রিত তথা কুরুক্ষেত্র, গরশীরঃ প্রয়াগ, পুলহ মুনির আশ্রম, নৈমিষ্যরাণ্য, ফনদী, সেতুবন্ধ, প্রভাসতীর্থ, কুশথিলী (দ্বারকা) বারাণসী, মধুপুরী, পদ্মা সরোবর, বিষ্ণু সরোবর, নারায়ণাশ্রম বদরিকাশ্রম) পদ্মা নদী এবং সীতা ও রামের আশ্রম প্রভৃতি স্থান সকল। হে রাজ, মহেন্দ্র, মলয়াদি সকল কুলীন

(শ্রেষ্ঠ পতি)–এই সকল দেশ পুণ্যতম, আর যে যে স্থানে হরির স্থির প্রতিমা (জগন্মাতাদি) অবস্থিত সে সকলও অতিশয় পবিত্র স্থান। হে রাজন, যে ব্যক্তি সর্বপ্রকারে শ্রেয়স্কামনা করেন, তিনি স্বত্বততঃ ঐ সকল স্থানের সেবা করবেন। কারণ ঐ সকল স্থানে কর্ম করলে, তা হতে পুরুষদের সহস্রপূর্ণ অধিক ফলোদয় হয়। হে পৃথিবী পতি, পাত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ একমাত্র তাকেই পূজ্যতম পাত্র বলে নির্ণয় করেছেন, যেহেতু এই চরাচর বিশ্ব তন্ময়। হে রাজন, তুমি যে রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলে তাতে দেবগণ তথাযোগাদি সিদ্ধ ব্রাহ্মণনাদন সনকাদি মহর্ষি উপস্থিত ছিলেন, তারা সম্মুখে থাকতেও অগ্রপূজায় ভগবান অচ্যুতেই পাত্ররূপে সম্মত হয়েছিলেন। তোমার যজ্ঞে তিনি কেন পাত্র বলে সম্মত হয় তার কারণ বলছি শোন–জীব রাশিতে ব্যপ্ত এই যে ব্রহ্মাণ্ড কোষরূপ মহান মহীরূহ, এয়ও মূল সেই ভগবান, অতএব তার অর্চনাই সকল জীবের আত্মা পরমতৃপ্ত হয়, সেই ভগবান, মনুষ্য, পশু, পক্ষী ঋষি ও দেবতারূপ শুরু (শরীর) প্রভৃতি সমস্ত সৃষ্টি করেছেন এবং নিজে সেই সকল শুনে (শরীরে) অন্তর্যামী রূপে ও প্রত্যাগতাংশে শয়ন করেন। এইজন্য তিনি পুরুষ বলে প্রসিদ্ধ। ভগবান সেই সকল পশু প্রভৃতিতে তারতম্যভাবে অবস্থান করেন এবং পুরুষে অধিকরূপে থাকেন বলে পুরুষকেই পাত্র বলা হয়েছে। তার মধ্যেও তপস্যা যোগাদির দ্বারা যেখানে তার যেরূপ অধিকাংশের বিকাশ সেখানে সেই পরিমাণ পুরুষের পাত্র তার যোগ্যতার অধিক।

হে রাজ, তৎপরে ঐ সকল মনুষ্যের পরস্পর অসম্মানকরণে বুদ্ধি হওয়ায় কবিগণ তাদের ভার দেখে। একাদি যুগে উপাক্ষণার জন্য ভগবানের প্রতিমায় শ্রেষ্ঠ পাত্র বলে নির্দেশ করেন। তারপর কিছু লোক শ্রদ্ধার সহিত প্রতিমার (অধা বিগ্রহে) শ্রীহরিকে অর্চনা করে থাকেন কিন্তু মানুষের প্রতি দ্বেষ করে বিগ্রহ উপাসনায় প্রদত্ত হলে, তাতে অভীষ্ঠ স্থির হয় না। সকল পুরুষের প্রতি দ্বেষশূন্য হয়ে অর্চনা করলে অতি নিম্নাধিকারীও পুরুষার্থ লাভ করতে পারে। হে রাজেন্দ্র, পুরুষগণের মধ্যে ব্রাহ্মণকেই সুপাত্র বলে জানবে। তাদের মধ্যে যিনি আস্যাবিদ্যা ও অসন্তোষ দ্বারা হরির মূর্তি বেদ ধারণ করণে তিনি অতিশয় উত্তম পাত্র, হে রাজন জগদত্মা ভগবান হরি ব্রাহ্মণগণের পদধূলির দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্র করেন। এতে ব্রাহ্মণগণ যে পরমপাত্র তাতে সংশয় কি?

.

পঞ্চদশ অধ্যায়

সকল প্রকার বর্ণাশ্রম ধর্মের সার বর্ণন ও মোক্ষের লক্ষণ-নিরূপণ

নারদ বললেন—হে রাজন, কতকগুলি ব্রাহ্মণ কর্মনিষ্ঠ, কেউ তপোনিষ্ঠ, কেউ সাধ্যায়ে বেদাধ্যয়কে নিরত, অন্য কতকগুলি প্রবচনে (বেদার্থ—ব্যাখ্যানে) নিপুণ, আর কতকগুলি জ্ঞান ও যোগে পরিনিষ্ট। ব্যক্তিদানের অনন্তফল ইচ্ছা করেন তার পক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠ বিপকে কব্য (অর্থাৎ পিতৃ উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধির দ্রব্য) ও হব্য (অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশ্যে দেয় দ্রব্য) দান করা উচিত। যদি ঐরূপ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়, তবে জ্ঞান-তারতম্য বিবেচনা করে অন্য ব্যক্তিদেরও হব্য ও কব্য দেওয়া যেতে পারে।

পিত্রাদির শ্রাদ্ধে দৈবপক্ষে দুজন এবং পিতৃপক্ষে তিনজন, অথবা উভয় স্থলেই এক একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে। অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হলেও শ্রাদ্ধে অধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে না। স্বজনের অনুরোধে অধিক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করে শ্রাদ্ধ অর্পণ করলে, দেশ-কালের অনুরূপ শ্রদ্ধা, দ্রব্য, পাত্র যে অর্চন—এ সকল প্রায় উত্তমরূপ হতে পারে না। উপযুক্ত দেশকাল প্রাপ্ত হলে মুন্ন্যন অর্থাৎ অরণ্যজাত নীবারাদি অথবা ন্যায়র্জিত যৎকিঞ্চিৎ অন্নাদি ভগবান হরিকে নিবেদন করে শ্রদ্ধাপূর্বক সৎপাত্রে অর্পণ করলে তাই অক্ষয় ও কাম ফলদায়ক হয়।

যা হোক, দেবতা ঋষি, পিতৃগণ এবং প্রাণীসকল সেরূপ আত্মা ও আত্মীয়দের প্রতি যথাযোগ্য অন্ন বিভাগ করে দিয়ে তাদের ঈশ্বরতুল্য দর্শন করবে। হে নৃপ, শ্রাদ্ধে মৎস্য মাংসাদি আমিষ দ্রব্য প্রদান করবে না এবং ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তা ভোজনও করবে না। কারণ নীবারাদির দ্বারা যেরূপ পরম প্রীতি হয়, পশুহিংসায় সেরূপ প্রীতি হতে পারে না। সদ্ধর্মাকাক্ষী মানবগণের জ্ঞায়, মন ও বাক্যের দ্বারা প্রাণীসকলের প্রতি হিংসা পরিত্যাগের মত আর পরম ধর্ম নাই (যেহেতু অহিংসাই পরমধর্ম। অতএব প্রধান প্রধান নিষ্কাম জ্ঞানীগণ জ্ঞানদীপিত আত্মসংযমন অগ্নিতে যজ্ঞ সকলের হোম করে থাকেন অর্থাৎ উত্তম অধিকারিদের প্রায় বাহ্য কর্ম সকল পরিত্যাগ হয়। হে রাজন, যে ব্যক্তি দ্রব্য যজ্ঞের দ্বারা যাগ করে, তাকে দেখে প্রাণীসকল ভয় পেয়ে থাকে। তারা মনে করে এ ব্যক্তি আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, কেবল প্রাণের তৃপ্তিকারী এর করুণা নেই, এ আমাদের বধ করবে, এতে সংশয় নেই। এইজন্য ধর্মজ্ঞজনের উচিত—সন্তুষ্ট হয়ে দৈবপ্রাপ্ত নীবাবাদির দ্বারাই অহরহঃ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করবে না।

হে নৃপ, ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি বিধর্ম, পরধর্ম, ধর্মাভ্যাস, উপধর্ম এবং ছল ধর্ম—এই পাঁচটি অধর্মশাখাকে অধর্মের ন্যায় (অর্থাৎ নিষিদ্ধবৎ জ্ঞান করে) পরিত্যাগ করবেন। ধর্মবৃদ্ধিতে ক্রিয়মান হলেও যাতে স্বধর্মের বাধ্য হয়, তা বিধর্ম, অন্যের উপদিষ্ট ধর্ম অন্যের নিকট পরধর্ম। যেমন ক্ষত্রিয়াদির বিহিত ধর্ম ব্রাহ্মণদের পক্ষে পরধর্ম পাষণ্ড বেদবিরুদ্ধ আগমুক্ত ধর্ম, অথবা পরের বঞ্চনায় দম্ভের জন্য যে কর্ম তা উপধর্ম এবং যা নামে ধর্ম, কাজে অন্য তা ছল ধর্ম।

আর পুরুষেরা নিজের ইচ্ছায় বা ধর্মবলে অনুষ্ঠান করে (অর্থাৎ স্বেচ্ছাবশতঃ কল্পিতদেব পূজাদি) তা ধর্মাভ্যাস, যেহেতু তা আশ্রয়ধর্ম হতে পৃথক। স্বভাব অনুসারে বিহিত যে ধর্ম কোন ব্যক্তির প্রশান্তি নিমিত্ত না হয়? অতএব স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে ধর্ম বাহুল্যের জন্য পরধর্ম আচরণ করা উচিত নয়।

নির্ধন ব্যক্তি ধর্মের জন্য অথবা দেব নির্বাহের জন্যও যদি অর্থ কামনা না করে ন্যায় তবে তার এই নিচেষ্টতাই মহাসর্পের জীবিকা সম্পন্ন করে দেয়। বস্তুতঃ সন্তুষ্ট আত্মারাম ব্যক্তি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে তার অন্তঃকরণে যে সুখ হয়, কামলোভে অর্থ চেষ্টায় দিকে দিকে ধাবমান লোকের সে মুখ কোথায়? যে ব্যক্তির মন সর্বদা স্পষ্ট, তার পক্ষে সকল দিক্ সর্বদাই মঙ্গলময়, যেমন যে ব্যক্তির পায়ে পাদুকা থাকে, তার শর্করা ও কণ্টকাদি হতে কল্যাণ হয়ে থাকে। হে রাজন, সন্তুষ্ট চিত্ত ব্যক্তি কোনরূপে একটু জল পেয়েও সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তির মন অসন্তুষ্ট, সে উপস্থ, জিহ্বা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত করে কুকুরের মত ব্যবহার করে। অসন্তুষ্ট বিপ্রের ইন্দ্রিয়–লোলুপতায় তেজ, বিদ্যা, তপস্যা, যশ সমস্ত কিছুই বিনষ্ট হয় এবং জ্ঞানও চলে যায়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার পূর্তির দ্বারা কামের অন্ত হতে পারে। ক্রোধের ফল যে হিংসা, তার নিষ্পত্তির দ্বারা ক্রোধেরও শান্তি হতে পারে, কিন্তু সকল দিক্ জয় ও পৃথিবী ভোগ করেও লোভের কখনও শেষ হয় না। হে মহারাজ, বহুজ্ঞ এবং সংশয়চ্ছেত্তা বহু বহু পণ্ডিত, আর সভাপতি বলে গণ্য অনেক মহাজন অসন্তোষের জন্য অধঃপতিত হয়ে থাকেন।

এখন কামাদি জয়ের উপায় বলছেন–সংকল্প পরিত্যাগ করে কাম জয় করবে। কাম-বিসর্জনের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে। অর্থ নানাপ্রকার অনর্থের মূল–এ বিবেচনা করে লোভ জয় করবে। আর তত্ত্বাবমর্শনের (অর্থাৎ প্রারব্ধ ফল অবশ্যই ভোক্তব্য–এজন্য কে কার দুঃখের হেতু এইরূপ, অথবা সকলেই পরমেশ্বরের অধীন, তাঁর কৃপায় অদ্বৈত অনুসন্ধানের দ্বারা) ভয়কে জয় করবে। আর, আত্মা ও অনাত্ম বিবেকের দ্বারা শোক ও মোহকে দূর করবে। মহতের সেবার দ্বারা দম্ভকে নিরস্ত করবে। মৌন অবলম্বনের দ্বারা যোগের প্রতিবন্ধক লোকবাতাদি পরিত্যাগ করবে এবং কামাদি বিষয়ের চেষ্টা পরিত্যাগ করে হিংসা জয় করবে।

ভূতজ দুঃখ অর্থাৎ কোনো প্রাণী হতে দুঃখ উৎপন্ন হলে তাদের প্রতি কৃপা অর্থাৎ তাদের হিত আচরণ করে তজ্জনিত দুঃখ দূর করবে। দৈবোপসর্গজনিত দুঃখ (অর্থাৎ বৃথা মনঃপীড়াদি), সমাধির (অর্থাৎ ভগবানে চিত্তের একাগ্রতার) দ্বারা পরিত্যাগ করবে। আত্মজন্য দুঃখ (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ক্লেশাকে) প্রাণায়ামাদি যোগবলে জয় করবে এবং নিদ্রাকে সত্ত্বগুণের সেবার দ্বারা (অর্থাৎ সাত্ত্বিক অল্প আহার অথবা প্রাণীমাত্রের পরিচর্যার দ্বারা) দূর করবে। আর ঐ

সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণকে জয় করবে এবং সেই সত্ত্বকে উপশমের দ্বারা জয় করবে। হে রাজন, গুরুর প্রতি ভক্তি থাকলে পুরুষ ঐ সকলকেই যথার্থরূপে জয় করতে সমর্থ হয়।

হে রাজন, জ্ঞানদীপদ গুরু সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ, "যে ব্যক্তি তাঁকে মনুষ্য"–এইরূপ দুবুদ্ধি করে, তার সমুদয় শাস্ত্রশ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয়। গুরুর পিতা, পুত্রাদি এবং প্রতিবেশীগণ সকলেই তাকে মানুষ বলে মনে করে। অতএব কি করে একমাত্র শিষ্যই তাকে পরমেশ্বর বলে মনে করবে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রামচন্দ্রকেও অবতারকালে সেই সময়ের জাত লোকেরা মানুষ বলেই মনে করত, কিন্তু তাদের মনে করার জন্যই কি ভগবানের পরমেশ্বরত্ব নষ্ট হয়েছে? সেইরূপ লোকে মনে করলেই কি গুরু ভগবান হবেন না? তাই বলছেন)–হে যুধিষ্ঠির ঐ গুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর যোগীশ্বরগণ সেই শ্রীকৃষ্ণেরই চরণ অন্বেষণ করে বেড়ান, লোকেরা তাকে মনুষ্য বলে গণ্য করে, তা তাদের ভ্রান্তি মাত্র।

এইপ্রকারে সমস্ত উপায়ের দ্বারা কামাদিবেগ জয় করে, সংযতেন্দ্রিয় হয়ে ধ্যানপর হবে; নতুবা তার শাস্ত্রাদি অনুশীলন বিফল হবে। তাই বলছেন–ইষ্টাপূজাদি যত বিধি আছে, কেবল ষড়বর্গের (অর্থাৎ ছয় ইন্দ্রিয়ের) সংযমেই তাদের পযবসান (অর্থাৎ সকল বিধিই কেবল ষড়বর্গ অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন) বশীকারের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু ঐ সকল বিধি ষড়বর্গ-সংযমপর হয়েও যদি যোগ অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি সাধন করতে না পারে, তা হলে কেবল পরিশ্রম মাত্র। যেমন কৃষি কার্যের ফল, যোগসাধনের ফল যে মোক্ষ, তা দান করতে পারে না, তেমনি বহির্মুখ–প্রবৃত্ত ব্যক্তির ইষ্টাপূজাদি কর্ম মোক্ষসাধক হতে পারে না, বরং সংসার–প্রবর্তক হয়ে থাকে। যোগরত হয়েও যদি কোনো ব্যক্তির কুটুম্বাদির সঙ্গবশতঃ চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, তার কর্তব্য কি বলছেন–যে ব্যক্তি চিত্ত-বিজয়ের উদ্যোগী তিনি গৃহাদি পরিত্যাগপূর্বক নিঃসঙ্গ হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন এবং একাকী নির্জনে বাস ও ভিক্ষালব্ধ পরিমিত আহার করে দেহযাত্রা নির্বাহ করবেন।

পবিত্র সমান প্রদেশে নিজের সুখবোধ্য আসন স্থাপন করে স্থির ও সমানভাবে উপবেশন করবেন। তখন নিজের শরীর ঋজু অর্থাৎ সমান হবে এবং মুখ "ওঁ"–এই প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করবেন। পরে পূরক, কুম্ভক, রেচক–ওই সকল প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুকে বিরুদ্ধ করে থাকবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত মন সকল কামনা (শব্দাদি সমস্ত বিষয়) ত্যাগ না করে, ততক্ষণ নিজের নাসাগ্রে নিরীক্ষণ করে থাকবেন। কামমত ভ্রমণশীল মন যে যে স্থান হতে নিঃসৃত হয়ে

যায়, সেই সেই স্থান হতে তাকে ধারণ করে ক্রমে ক্রমে হৃদয় মধ্যে নিরুদ্ধ করে রাখবেন। যিনি নিরন্তর এই প্রকার অভ্যাস করেন, অল্প কালের মধ্যেই সেই ব্যক্তির চিত্ত কাষ্ঠহীন অগ্নির ন্যায় নির্বাণ (শান্তি) প্রাপ্ত হয়। যে চিত্ত কামাদির দ্বারা ক্ষুব্ধ হয় না, তা আর কখনও উদ্বিগ্ন (অর্থাৎ বিক্ষুব্ধ) হয় না। কারণ ব্রহ্মসুখে (অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপ–পরমানন্দে) সংস্পৃষ্ট হওয়ায় চিত্তের সমস্ত বৃত্তি প্রশান্ত হয়ে যায়।

গৃহাশ্রম ধর্ম, অর্থ, কাম–এই ত্রিবর্ণের বপন স্থান, সেই গৃহাশ্রম হতে প্রব্রজিত হয়ে, যদি কেউ আবার সংসারের সেবা করেন, তা হলে সে ব্যক্তি বান্তাশী (অর্থাৎ আগে বমি করে আবার তার ভক্ষণকারী ঘৃণিত কুকুরের মত) ও নির্লজ্জ। প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করে আবার গৃহী হওয়া অসম্ভব মনে করো না। যে সকল ব্যক্তি অতিশয় অসৎ, তারা একবার নিজ দেহকে অনাত্মা, জড় ও মরণধর্মশীল, অন্তে কৃমি, বিষ্ঠা বা ভস্মের সমান মনে করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, আবার এই দেহকেই সার আত্মা মনে করে এবং সংসারে প্রবেশ করে। গৃহস্থ ব্যক্তির ক্রিয়াত্যাগ, ব্রহ্মচারীর ব্রত ত্যাগ, তপস্বীর গ্রামে বাস এবং ভিক্ষুর ইন্দ্রিয়চাপল্য–এই সকল আশ্রম-বিড়ম্বনা। অতএব ঐ সকল ব্যক্তি আমাধম। তারা পরামেশ্বরের মায়ার বিমূঢ়, অতএব অনুকম্পা করে তাদের প্রতি উপেক্ষা করা কর্তব্য। আত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয়চাপল্য কি দোষ–একথা বলতে পারো না–কারণ, আত্মা যে পরব্রহ্ম এটা যিনি জানতে পারেন, তার সমস্ত বাসনা নিরস্ত হয়ে যায়। তবে তিনি কি অভিলাষে এবং কিসের জন্যই বা লোলুপ হয়ে দেহ পোষণ করবেন? অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়চাপল্য কোনরূপেই সম্ভবপর নয়। হে রাজন, পণ্ডিতগণ এই শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং চিত্তকে দেহব্যাপী বন্ধন বলে বলেছেন। ঐ বন্ধন ঈশসৃষ্ট অর্থাৎ ঐ বন্ধনের কর্তা পরমেশ্বর। এইরূপ প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান–এই পাঁচটি এবং নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়–এই পাঁচটি সমুদায় দশবিধ প্রাণকে ঐ রথের অক্ষ (স্মল) ধর্ম ও অধর্মকে চক্র এবং অহংকারের সাথে বর্তমান জীবকে রথী বলেছেন। আর প্রণব ঐ রথের ধনু শুদ্ধ জীব তার শর এবং পরব্রহ্মই তার লক্ষ্য। অর্থাৎ যেমন ধনুর দ্বারা শর লক্ষ্যে নিপাতিত হয়, তেমনি প্রণব কর্তৃক জীব ব্রহ্মে নিপাতিত হন। রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ, শোক ভয়, মদ, মান, অবমান, অসূয়া, মায়া, হিংসা, মাৎসর্য, অভিনিবেশ, অনবধানতা, ক্ষুধা ও নিদ্রা–এই সকল এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয়সকল জীবের শত্রু। তারা কোথাও রজঃ ও তমঃ প্রকৃতির হয়, কোথাও সত্ত্ব প্রকৃতিরও হয়। (রাজাদিকে জয় করতে হবে। রজঃ অর্থ অভিনিবেশ) কিন্তু সত্ত্ব প্রকৃতি হলেও আরূঢ় সমাধি যতির পক্ষে পরোপকারাদি প্রবৃত্তি শত্রুস্বরূপ, অতএব তারও ঐ সকলকে জয় করা কর্তব্য।

হে যুধিষ্ঠির, ইন্দ্রিয় সকল ওই মানবদেহস্বরূপ রথের উপকরণ, ঐ সকলকে নিজের বশীভূত করে যতদিন এই রথ (দেহ) ধারণ করবে, ততদিন পর্যন্ত পূজনীয় জনগণের চরণ সেবার দ্বারা অপেক্ষাকৃত জ্ঞান রূপ খঙ্গ ধারণপূর্বক ভগবান অচ্যুতকে আশ্রয় করে শত্রু জয় করতঃ উপশান্ত হবে। পরে আনন্দ অনুভবে সন্তুষ্ট হয়ে ঐ রথাদিকে উপেক্ষা করবে। ভগবান অচ্যুতের আশ্রয় না করলে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ ও সারথি সেই প্রমত্ত ব্যক্তিকে মার্গে) নিয়ে গিয়ে বিষয় নামক বিষয় দস্যুর মধ্যে নিঃক্ষেপ করবে। তারপর সেই দস্যুগণ অশ্ব ও সারথির সাথে সেই ব্যক্তিকে যেখানে গুরুতর মৃত্যুভয় রয়েছে। সেই অন্ধকারময় সংসার-কূপে নিক্ষেপ করবে।

হে রাজ, বেদবিহিত ইষ্টাপূর্বাদি কর্মকারী পুরুষের এইরূপ অর্থ হবার কারণ শোন- বেদোক্ত কর্ম দুই প্রকার প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। প্রবৃত্ত কর্মে তৎপর হলে তার দ্বারা পুনরাবৃত্তি হয়। আর নিবৃত্ত কর্মের অনুষ্ঠানে অমৃত (মুক্তি) ভোগ করে। দ্রব্যময় কাম্য কর্ম অগ্নিহোত্রাদি, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য পশুগ–এই সকল অত্যন্ত আসক্তিযুক্ত, এ সমুদয় হতে শান্তি হতে পারে না। বৈশ্যদেব ও বলিহরণ ইত্যাদি কর্ম ইষ্ট-পদ বাচ্য, কিন্তু এ সকল যদি কাম্য হয় তবে অশান্তিপ্রদ ও প্রবৃত্তাস্য। আর, দেবালয়, উপবন, কূপ, পানীয়শালা নির্মাণ ইত্যাদি কর্ম পূর্ত্ত।

প্রবৃত্ত কর্মের দ্বারা যে প্রকারে আরোহণ ও অবরোহণ–ক্রমে সংসারে আবৃত্তি হয়, তা বলছেন– এ জন্মে যে যাগ-যজ্ঞ করে চরু ও পুরোত্তাশ (হবিবিশেষ) ইত্যাদি আহুতি দেওয়া হয়, তার সূক্ষ্ম পরিণাম (মৃত্যুর পর যা দেহান্তরের আরম্ভক হয়), আর ধূম (অর্থাৎ ধূমাভিমানী দেবতা) রাত্রি (রাত্যাভিমানী দেবতা) কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন এবং চন্দ্রলোক–এই সকল যথাক্রমে মরণের পর জীব আরূঢ় হয়ে থাকে। (অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্বকৃত চরু পুরোজাশাদি সূক্ষ্ম পরিণাম হতে আদৌ জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি হয়। তারপর যথাক্রমে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ এবং দক্ষিণায়ন–এই সকলের অভিমানী দেবতা কর্তৃক চন্দলোকে নীত হয়, সেখানে যথাক্রমে ভোগ হয়ে থাকে।) চন্দ্রলোকে ভোগের অবসান হলে, জীবের ঐ দেহ লয় প্রাপ্ত হয়, তাতে আদৌ অদর্শন হয়ে পরে বৃষ্টির দ্বারা যথাক্রমে ওষধি লতা, শস্য, ও শুক্র হয়ে পরিণত হয়; এইরূপে প্রবৃত্তি কর্মমার্গ পুনর্ভবের হেতু। ফলতঃ চন্দ্রলোকে ভোগাবসানে প্রথমতঃ দেহ বিনাশে অদর্শন হয়, তারপর ক্রমে বৃষ্ট্যাদির দ্বারা ওষধি প্রভৃতির প্রত্যেকের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়ে এই পৃথিবীতে আবার উৎপন্ন হয়ে থাকে। তারপর নিষেকাদি শ্মশাসান্ত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হলে তাকে দ্বিজ বলা হয়।

কিন্তু নিবৃত্ত কর্মনিষ্ঠদের ঐ প্রকারে আবৃত্তি হয় না, তাদের অর্চিরাদি মার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। নিবৃত্তি পথের সঠিক জীবনকালেই জ্ঞানদীপিত ইন্দ্রিয়সকলে ক্রিয়াসকলকে হোম করেন,

(অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যাপার যে ইষ্টাপূর্তাদি, সে সকলকে একমাত্র ইন্দ্রিয় রূপে চিন্তা করে থাকেন)। পরে সে সকলকে দর্শনাদি সংকল্পরূপে মনে এবং বিকারযুক্ত সেই মনকে বিধ্যাদি লক্ষণ বাক্যে হোম করেন। কারণ বিদ্যোদিলক্ষণ বাক্য দ্বারাই মন কর্তৃত্বাদি বিকারপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। সেই বাক্য বর্ণ-সমুদায় বিশেষ–স্বরূপ। এজন্য সেই বাক্যকে বর্ণ–সমুদায়ে হোম করে, তারপর সেই বর্ণ-সমুদায়কে আকারাদি (অ, উ, ম)–স্বরত্রয় স্বরূপ ওঙ্কারে হোম করেন। পরে সেই ওঙ্কারকে বিন্দুকে এবং বিন্দুকে সূত্রাত্মা প্রাণে হোম করতঃ সেই সূত্রাত্মাকে ব্রহ্মে হোম করে থাকেন।

নিবৃত্ত কর্মে রত পুরুষ যথাক্রমে অগ্নি, সূর্য, দিবস, প্রাহ্ন (দিবসের অন্ত), শুক্লপক্ষ, রাকা (শুক্লপক্ষের অন্ত) উত্তরায়ণ এবং ব্রহ্মা-এই সকলের অভিমানিনী দেবতা প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ প্রথমতঃ) অগ্ন্যাভিমানী দেবতার নিকট নীত হয়ে পরে সূর্যাদ্যিভিমানী দেবসন্নিধানে নীত হয়ে থাকেন)। এই প্রকারে ব্রহ্মলোকে প্রাপ্ত ব্যক্তির ভোগাবসানে অগ্রে স্থলোপাধি বিশ্ব হয়। তারপর সেই স্কুলকে সূক্ষ্ম লয় করায়ে সূক্ষোপাধি তৈজস হয়। পরে সেই সূক্ষ্মকে কারণে লয় করায়ে কারণোপাধি প্রাপ্ত হয়, তারপর (সর্বত্র সাক্ষিস্বরূপ অন্বয়হেতু) সেই কারণকে সাক্ষিস্বরূপে লয় করায়ে তুরীয় হয়। পরিশেষে সেই সাক্ষিত্বের বিলয়ে শুদ্ধ আত্মস্বরূপ হয়। এই বর্ঝকে পণ্ডিতগণ দেবযান বলেছেন। প্রবৃত্ত পথে পুরুষ যেমন ক্রমে অগ্রসর হয়েও জন্মগ্রহণ করতে আবার ফিরে আসে, নিবৃত্ত পথে দেবযানে সেরূপ হয় না। আত্মরাজী উপান্তাত্মা আত্মস্থ পুরুষ উক্তপ্রকারে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়ে তদ্রপ আর নিবৃত্ত হন না।

হে রাজন, পিতৃযান ও দেবযান নামে দুই ধবত্ম বেদনির্মিত (অর্থাৎ বেদে প্রকাশিত), যে ব্যক্তি ঐ দুই অয়ন (পথ) শাস্ত্র চক্ষুর দ্বারা অবগত হন, তিনি দেহস্থ হয়েও মুগ্ধ হন না। কারণ–দেহারম্ভের পূর্বে কারণরূপে পরে সর্বশেষ অবধি (সীমারূপে) যে সস্তু বর্তমান থাকেন, তাকে অবলম্বন করে ভোগ্য ও ভোক্তা, উচ্চ ও নীচ, অপ্রকাশ ও প্রকাশ, নাম ও রূপ–সে সকলই বাসুদেব ভিন্ন আর কিছুই নয়, অতএব কার মোহ হবে? যেমন যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধ হলেও প্রতিবিম্বকেও বস্তু বলে বলা হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়সমূহাত্মক দেহ ও তৎসম্বন্ধ–বিষয়সমূহকে পদার্থবলে কল্পনা করা হয় বটে, বস্তুতঃ পরমার্থ বিচারে উহারা পদার্থ নয়, কারণ উহা দুর্ঘট (অর্থাৎ যুক্তি বিরুদ্ধ)।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম–এই পঞ্চভূতের ছায়া (ঐক্যবদ্ধ্যাবলম্বন) অর্থাৎ এরা একত্র হয়ে এই দেহ তৈরী করেছে। অথবা এদের কোনও পরিণত অবস্থায় দেহ হয়েছে–এরূপ মনে হতে পারে। কিন্তু এই দুই প্রকারের একটিও নয়। যেরূপ বৃক্ষ-সকলের সংঘাতে বড়, সেরূপ

পঞ্চভূতের সংঘাতে দেহ নহে, কারণ দেহের একদেশের আকর্ষণে সকলের আকর্ষণ দেখা যাইতেছে। কিন্তু একটা বৃক্ষের আকর্ষণে সকল বন আকৃষ্ট হয় না। এইরূপ পঞ্চভূতের বিকার এই দেহ, তাও বলা যায় না। কারণ অবয়ব দেহের অংশবিশেষ এবং অবয়বী দেহধারী অত্যন্ত পৃথকও নয়। কারও সহিত কেহ অন্বিতও থাকে না; সুতরাং মিথ্যা পদার্থই জানবে। দেহাদি যেরূপ মিথ্যা, সে সকলের হেতুস্বরূপ পৃথিব্যাদিও সেরূপ মিথ্যা, কারণ পঞ্চভূতের ধাতু অর্থাৎ সূক্ষ্ম তন্মাত্র ভিন্ন পঞ্চভূত মিথ্যা। পঞ্চভূত অবয়বী, আর সূক্ষ্ম তন্মাত্র অবয়ব। অবয়বী মিথ্যা হলে, অবয়বও অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা হয়ে পড়ল।

যদি বল অবয়বীর অসত্তা স্বীকার করলে আগমাপারি বাল্যাদি অবস্থায় 'ইনি সেই দেবদত্ত'– এইরূপ প্রত্যাভিজ্ঞান কিরূপে হবে? উত্তর–অবিদ্যার বিকল্প থাকাতে পূর্ব পূর্ব আরোপ– সাদৃশ্য-হেতু 'ইনি সেই'–এই প্রকার ভ্রমণ হতে পারে, কিন্তু যাবৎ পর্যন্ত অবিদ্যা নিবৃত্তি না হয়, তাবৎ পর্যন্তই ঐ ভ্রম থাকে। যদি সকলই মিথ্যা হয়, তবে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ কি প্রকারে থাকতে পারে? এরূপ আশংকার উত্তরে বলছেন–স্বপ্নের মধ্যেও যেমন জাগ্রত ও নিদ্রাবস্থার স্বপ্ন দেখা যায়, শাস্ত্রের বিধি-নিষেধও তেমনি অজ্ঞান অবিদ্যার অবস্থায় হতে পারে। অতএব মননশীল যোগী ভাবনার অদ্বৈত ক্রিয়ার অদ্বৈত এবং দ্রব্যের অদ্বৈত আলোচনা করে, আত্মতত্ত্বের অনুভবের দ্বারা জাগ্রত প্রভৃতি অবস্থাত্রয় নিবারণ করে থাকেন।

ভাবনার অদ্বৈত কাকে বলে? তা বলছেন — বিকল্প (অর্থাৎ ভেদ) অবস্তু, এই হেতু বস্ত্র ও সূত্রের ন্যায় কার্য ও কারণকে যে এক বস্তুরূপে আলোচনা করা, তাকেই ভাবনাদ্বৈত বলা হয়। আর মন, বাক্য এবং কার্যের দ্বারা সাক্ষাৎ পরব্রহ্মে যে সমস্ত কর্ম সমর্পণ, তার নাম ক্রিয়াদ্বৈত। আর, নিজের সঙ্গে পুত্র, কলত্র, বা অন্যান্য দেহধারীর অভিন্নতা আলোচনা করে, ধন, সম্পদ বা কামনার যে ঐক্য দর্শন, তার নাম দ্রব্যাদ্বৈত। হে রাজন, যে দ্রব্য যে উপায়ে যে স্থানে যাহা হতে যে মনুষ্যের পক্ষে অনিষিদ্ধ হয় সেই মনুষ্য সেই দ্রব্যের দ্বারা কার্যের চেষ্টা করবে, অনোপকালে তদ্ব্যতীত অন্যদ্বারা কোন কর্ম করবে না। এই সকল এবং বেদবিহিত অন্যান্য বিধান অনুসারে স্বকর্ম অনুশীলন করে ভক্তিমান গৃহস্থও ভগবানের গতি লাভ করতে পারে।

হে নরদেব, তোমরা যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হতে বহু বহু দুস্ত্যজ আপদ উত্তীর্ণ হয়েছ এবং তার পাদপদ্ম সেবার দ্বারা দিগগজ জয়পূর্বক ভূরি ভূরি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছ। তেমনি সেই আত্মস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অন্যেও এই সংসার হতেও উত্তীর্ণ হতে পারে। হে রাজ, মহাজনের অবজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণসেবা হতে ভ্রষ্ট হয় এবং তাদের কৃপায় তাহা সিদ্ধ হয়ে থাকে।

আমার পূর্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, তাতেই এ বিষয়ের প্রমাণ পাবে। পূর্বকালে অতীতকল্পে আমি উপবহন নামে গন্ধর্ব হয়েছিলাম। সকল গন্ধর্ব আমাকে মানগন্য করত। সৌন্দর্য, মাধুর্য, সৌকুমার্য, সৌগন্ধ ইত্যাদির দ্বারা আমি সকলের অতিশয় প্রিয়দর্শন ছিলাম। সকল যুবতীই আমাকে ভালবাসত। আমি সব সময় মদন্ত ও লম্পট হয়ে স্বপ্নের মধ্যে কালযাপন করতাম।

একসময় দেবতাদের যজ্ঞে হরিগাথা গানের নিমিত্ত বিশ্বস্রষ্টাদের দ্বারা গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ আহূত হল। ঐ আহ্বান জানতে পেরে আমিও উন্মত্ত হয়ে গাইতে গাইতে স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত হয়ে সেখানে গেলাম। আমার এই ধৃষ্টতা দেখে বিশ্বস্রষ্টাগণ ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেদের প্রভাব দ্বারা আমার প্রতি এই অভিশাপ দিলেন—'যেহেতু আমাদের অবহেলা করছ, অতএব শীঘ্র নষ্টশী হয়ে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হও।' এরূপ অভিশপ্ত হয়ে আমি দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। সেই শূদ্র জন্মেও ব্রহ্মবাদী মুনিগণের সেবা ও সঙ্গলাভ করে পুনরায় ব্রহ্মার পুত্র হয়ে জন্মলাভ করেছি। হে রাজ, তোমার নিকট গৃহস্থগণের ধর্ম বর্ণনা করলাম, ঐ ধর্ম পাপনাশক, গৃহী ব্যক্তি ঐ ধর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা সন্ন্যাসীদের পদবী প্রাপ্ত হতে পারে।

হে রাজেন্দ্র, এই দ্যুলোকে তোমরা অতিশয় ভাগ্যবান, যেহেতু লোকপাবনকারী মুনিগণ তোমাদের গৃহে আগমন করছেন। আর তোমাদের আলয়ে মনুষ্যচিহ্নধারা সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম গূঢ়রূপে অবস্থান করছেন। মহব্যক্তিগণের পরম অন্বেষণীয়, কৈবল্য নির্বাণসুখের অনুভূতি স্বরূপ। সেই পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের প্রিয়, সুহৃৎ, মাতুলপুত্র, পূজ্য, বিধিকৃৎ (আজ্ঞানুবর্তী) এবং গুরু। তোমাদের সমান ভাগ্যবান কে আছে? হে রাজন, সাক্ষাৎ শিব ও ব্রহ্মাদি দেবগণ নিজ নিজ বুদ্ধির দ্বারা যার রূপ যথার্থরূপে বর্ণন করতে পারেন নাই, আমি তার কি বর্ণনা করব? সেই সাত্বতগণের পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৌন, ভক্তি এবং উপশমের দ্বারা পূজিত হয়ে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে ভরতশ্রেষ্ঠ, রাজা যুধিষ্ঠির দেবর্ষি প্রাক্ত ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করে অতিশয় প্রীত হলেন এবং প্রেমে বিহ্বল হয়ে নারদ ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। তারপর পূজিত মুনি (নারদ) শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের সহিত সম্ভাষণ করে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। 'শ্রীকৃষ্ণ পরম ব্রহ্ম'–এই বাক্য নারদের মুখে শুনে যুধিষ্ঠির পরম বিস্মিত হলেন। হে পরীক্ষিৎ, তোমার নিকট দাক্ষায়ণীদের (দক্ষকন্যাদের) পৃথক পৃথক্ বংশের কথা বর্ণনা করলাম। ঐ বংশে দেবতা, অসুর, মনুষ্য প্রভৃতি এবং সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ সৃষ্ট হয়েছে।

অষ্টম স্কন্ধ

প্রথম অধ্যায়

মন্বন্তরাণু বর্ণন ও যজ্ঞাবতার কথন

শ্রী পরীক্ষিৎ বললেন–হে গুরুদেব, আপনার নিকট হতে স্বায়ম্ভুব মনু বংশ বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করলাম। ঐ বংশেই মনুকন্যা সকলে বিশ্বস্রষ্টা মরীচি প্রভৃতির পুত্র পৌত্রাদির উৎপত্তি হয়েছে। এক্ষণে অন্যান্য মনুর বংশ–বিবরণ বর্ণনা করুন। হে ব্রাহ্মণ, যে যে মন্বন্তরে অতি মহান ভগবান হরির জন্ম ও কর্মসমূহ পণ্ডিতগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমরা শ্রবণেচ্ছুক আমাদের নিকট সে সকল বর্ণনা করুন। বিশ্বভাবন (জগৎ কর্মা) ভগবান অতীত মন্বন্তরে যা যা করেছেন, আগামী ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে যা যা করবেন এবং বর্তমান মন্বন্তরে যা যা–করছেন এবং সর্বক্ষণ মন্বন্তরে যা যা করছেন এ সমস্তই আপনি বর্ণনা করুন। ঋষিবর শুকদেব বললেন–

রাজ, এই কল্পে স্বয়ম্ভুবাদী ছয় মনু অতীত হয়েছে তার মধ্যে স্বয়ম্ভুর মনু প্রথম। আমি তার কথা এবং ঐ মন্বন্তরের দেবতা প্রভৃতির উৎপত্তির কথা তোমার নিকট বলেছি। ভগবান শ্রীহরি ধর্ম ও জ্ঞানের উপদেশ দানের জন্য স্বায়ম্ভু মনুর দুহিতা–আকৃতি ও দেবহুতির গর্ভে যথাক্রমে যজ্ঞ ও কপিলরূপে আবির্ভূত হয়ে তাদের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হে কুলনন্দন, ভগবান কপিলের বৃত্তান্ত পূর্বে (তৃতীয় স্কন্ধে) বর্ণনা করেছি, সম্প্রতি ভগবান যজ্ঞ যা যা করেছিলেন তা বলব। শতরূপার প্রতি স্বায়ম্ভুব মনু বিষয়াভাগে বিরক্ত হয়ে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক পত্নীর সহিত তপস্যার জন্য বনে গমন করেছিলেন। হে ভরতনন্দন, তিনি সুনন্দা নদীর তীরে একপদে ভূমি স্পর্শ করে শত বৎসর দুশ্চর তপস্যা করতে করতে বিস্মিতের ন্যায় এরূপ বাক্য বলেছিলেন।

মনু বললেন–স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপ বলে যিনি এই বিশ্বকে চৈতন্যযুক্ত করেন কিন্তু যাঁকে এই বিশ্বচেতন করতে পারে না। আর এই ব্যক্তি (জীব) শয়ান হলে, যিনি জাগ্রত (অর্থাৎ সাক্ষী স্বরূপে বর্তমান) থাকেন বলে তাকে এই জনগণ জানে না–কিন্তু তিনি সকলকে জানেন। এ জগতে যা কিছু স্থাবর, জঙ্গমাত্মক বস্তু রয়েছে–সে সকলই ঈশ্বরের সত্ত্বা ও চৈতন্য দ্বারা ব্যপ্ত। অতএব ঈশ্বর যা কিছু দান করেন তা দিয়েই ভোগ্যবস্তুর ভোগ করবে। (অথবা ভোগ্য বস্তু মাত্রই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে অর্পণ করে ভোগ করবে)। নিজের ভোগের জন্য অপর কারই বা ধন আছে যে, তা আকাঙ্ক্ষা করবে? তিনি সকলকে দেখছেন কিন্তু কোন লোক অথবা করোর চক্ষু তাকে দেখতে পায় না কারণ তিনি চক্ষুরাদির বিষয় নন। যাঁর জ্ঞান কখনও বিনষ্ট হয় না। (অর্থাৎ ঘটাদি নাস দেবদত্তাদির তত্ত্ববিষয়ক চাক্ষুস জ্ঞান বিনাসের ন্যায় দর্শনকারী সেই ঈশ্বরের চাক্ষুস জ্ঞান বিনষ্ট হয় না, অর্থাৎ তত্ত্বৎ আকারে উৎপন্ন বৃত্তিরই নাশ হয়ে থাকে। স্বতঃজ্ঞানের বিনাশ হয় না। কারণ প্রকাশ্যে স্বয়ম্ভু নাশে সূর্যের প্রকাশ কখনও বিনষ্ট হয় না)। অতএব সকল ভূতের অন্তর্যামী প্রসঙ্গ সেই ঈশ্বরের ভজন কর।

যাঁর আদি, অন্ত, মধ্য এবং আত্মীয়-পর এবং অন্তর বা বাহির কিছুই নেই, কিন্তু বিশ্বের ঐ সকল আদি, অন্ত প্রভৃতি যাঁহা হতে হচ্ছে এবং এই বিশ্ব যার স্বরূপ, তিনি সত্য ও পরিপূর্ণ ব্রহ্ম, তিনি জগতের ঈশ্বর জন্মরহিত, সত্য, স্বপ্রকাশ ও নির্বিকার স্বরূপ। এই বিশ্ব তার শরীর এবং তার অনেক নাম। তিনি নিজশক্তি মায়ার দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতি সাধন করেন এবং তিনিই নিজের নিত্যসিদ্ধ। বিদ্যার (অর্থাৎ জ্ঞানের) দ্বারা মায়াকে নিরস্ত করে নিষ্ক্রিয়ভাবে বিরাজ করছেন। এইরূপে ঈশ্বর কর্ম করে পরে পরিত্যাগপূর্বক নিষ্কর্মা থাকাতে ঋষিগণও অকর্মার্থ (অর্থাৎ মুক্তির নিমিত্ত, কিংবা কর্মনাশের জন্য) অগ্রে কর্ম করেন। যেহেতু কর্ম চেষ্টারত পুরুষই প্রায় কর্মে অনিশ্চেষ্টতা লাভ করেন। (চেষ্টাকারী পুরুষ কর্মসকল দ্বারা

অবগুণ্ঠিত হয়ে কোষকার কীটের ন্যায় বদ্ধ হয়, এরূপ আশঙ্কা করতে পারা যায়, যেহেতু ভগবান ঈশ্বর চেষ্টা করে থাকেন। অথচ তাতে আসক্ত হন না। যে সকল ব্যক্তি তার অনুবৃত্তি করেন, তাঁরাও আত্মলাভ দ্বারা চরিতার্থ হবেন। কখন আসক্ত হবে না। যিনি নিখল ধর্মের প্রবর্তক বলে রাম, কৃষ্ণাদি নানা অবতারের অনুরূপ নিজবক্রে সম্যকরূপে অবস্থিত হয়ে, নিজ আচরণ দ্বারা মানবগণের শিক্ষা দানের জন্যই বেদোক্ত কর্মের আচরণ করেন এবং যিনি জ্ঞানময় বলে অহংকার সম্পর্কশূন্য যিনি পূর্ণ (সর্বদা আত্মলাভে পরিপূর্ণ) বলে নিষ্কাম ও যিনি প্রভু বলে অন্য কর্তৃক অপরিচালিত, আমি সেই ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করছি। শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, স্বায়ম্ভুব মনু সমাধিমগ্ন হয়ে এরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন বলে অসুরগণ তাকে বিবশ মনে করে ক্ষুধাবশতঃ ভক্ষণ করার জন্য তার দিকে ধাবিত হল। সেই অসুর ও রাক্ষসদের ঐরূপ উদ্যোগ যজ্ঞরূপী দেখে সর্বগত শ্রীহরি নিজ পুত্র যাম নামক দেবগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তাদের ধত্র করেন এবং স্বয়ং ইন্দ্র হয়ে স্বর্গ পালন করতে লাগলেন। দ্বিতীয় মনুর নাম স্বারোচিষ তিনি অগ্নির পুত্র। দুমান, সুষেণ, রোচিস্ম্য প্রভৃতি তাঁর পুত্র। ঐ মন্বন্তরে রোচন নামক ইন্দ্র, তুষিত প্রভৃতি দেবতা এবং ঊর্জ ও স্মভপ প্রভৃতি সাতজন ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন। বেদশিরা ঋষির তুষিতা নামে পত্নী ছিলেন, তার গর্ভে ঐ ঋষির বিভু নামে বিখ্যাত দেব উৎপন্ন হন।

..ঐ বিভুর অসাধারণ চরিত্র, তিনি কৌমার ব্রহ্মচারী হওয়ায় অস্পাস্পীতি সহস্র ধৃতব্রত মুনি তার নিকট ব্রত শিক্ষা করেন। তৃতীয় মনুর নাম উত্তম, তিনি প্রিয়ব্রতের সন্তান, তার তনয়গণ–পবন, সৃঞ্জয় এবং যজ্ঞহোত্রাদি; এই মন্বন্তর বশিষ্ঠ পুত্র প্রমদ প্রভৃতি সপ্তর্ষি হন এবং সত্য, বেদাত্ত্বত ভদ্রগণ দেবতা এবং সত্যজিৎ ইন্দ্র হয়েছিলেন। এই মন্বন্তরেই ভগবান শ্রীহরি ধর্মের ভার্য্যা সুনৃতার গর্ভে সত্যব্রত গণের সহিত উৎপন্ন হয়ে সত্যসেন নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এই সত্যসেন সত্যজিৎ নামক পূর্বোক্ত ইন্দ্রের সখা হয়ে মিথ্যারত, দুঃশীল, দুষ্ট যক্ষ ও রাক্ষসদের এবং নিরীহ প্রাণীগণের পীড়াদানকারী হিংস্র প্রাণীদের সংহার করেছিলেন।

চতুর্থ মনুর নাম তামস, তিনি তৃতীয় মনু উত্তমের ভ্রাতা, পৃথু, স্যতি, নর ও কেতু প্রভৃতি দশজন তাঁর পুত্র–এই তামস মন্বন্তরে সত্যক, হরি এবং বীরনামে দেবগণ, ত্রিস্মি ইন্দ্র এবং জ্যোতিধাম প্রভৃতি সপ্ত ঋষি হয়েছিলেন। হে মহারাজ, উক্ত মন্বন্তরে বিবৃতির পুত্র বৈধৃতিআশু দেবতা হয়েছিলেন এবং তারা কালক্রমে বিনষ্ট বেদসমূহকে নিজ নিজ তেজোবলে ধারণ করেছিলেন, এই মন্বন্তরকেই হরিমেধস হতে তার পত্নী হরিণীর গর্ভে ভগবান হরি আবির্ভূত হয়ে হরি’ নামে বিখ্যাত হন এবং ইনিই কুম্ভীরের গ্রাস হতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করেছিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিত বললেন–হে ব্যাসনন্দন মুনিবর, হরি যেরূপে কুম্ভীর গ্রস্ত গজেন্দ্রকে মুক্ত করেছিলেন, তা আমরা আপনার নিকট হতে শুনতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মণ, যে যে কথার উত্তমশ্লোক ভগবান হরি গীত হন, সে কথা অতিশয় পবিত্র ধন্য, শুভ এবং পরম মনোবর। শ্রীসূত বললেন–হে বিপ্র, ব্যসনন্দন শ্রীশুকদেব প্রয়োজনবশত মহারাজ পরীক্ষিত কর্তৃক–ভগবকথা বর্ণনে প্রার্থিত হয়ে, শ্রবণকারী মুনিগণের সভার হৃষ্টচিত্ত রাজার প্রতি অভিনন্দন প্রকাশ পূর্বক বলতে লাগলেন।

.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্ষীরোদ সমুদ্রের বর্ণনা

শ্রীশুকদেব বললেন–মহারাজ, চারিদিকে ক্ষীরোদ সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত, দশ সহস্র যোজন উন্নত ত্রিকূট নামে প্রসিদ্ধ একটি রমণীয় পর্বত আছে। ঐ পর্বতের চারিদিকেও দশ সহস্র যোজন বিস্তৃত এবং সেই পর্বত রৌপ্য, লৌহ ও সুবর্ণময় তিনটি প্রধান সূর্যের দ্বারা সাগর ও দিক সকলকে বেষ্টিত করে আছে, এই জন্যই তার নাম ত্রিকূট হয়েছে, ঐ পর্বতের অন্যান্য সৃষ্টি রত্ন ও ধাতুর দ্বারা চিত্রিত, সেই সরস শিখরও বিবিধ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম এবং নিঝর সমুদ্রের জলপতনের শব্দের দ্বারা আলো দিকের শোভা করছে।

ক্ষীরোদ সমুদ্রের তরঙ্গরাজির দ্বারা চারিদিক হতে সেই ত্রিকূটে পর্বতের পাদমূল ধৌত হচ্ছে এবং সেই পর্বতটি সবুজবর্ণ মরকত প্রস্তররাশির দ্বারা নিকটস্থ ভূমিভাগের শ্যামলতা সম্পাদন করছে, ক্রীড়ারত সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, মহাসর্ত; কিন্নর এবং অপ্সরাগণ–এই পর্বতের গুহা সমূহের সেবা করে থাকেন। উক্ত পর্বতের গুহাসমূহ কিন্নর প্রভৃতির সংগীতরবে প্রতিধ্বনিত হলে দৃপ্ত সিংহগণ ঐ সাদরে প্রতিপক্ষ সিংহের গর্জন মনে করে অসহিষ্ণুতাপ্রাপ্ত নিজেরাও গর্জন করতে থাকে।

নানাবিধ বন্য পশুগণের দ্বারা উত্তপ্ত পর্বতের সন্ধিস্থল সুশোভিত এবং উক্ত পর্বতে বিবিধ বিচিত্র বৃক্ষরাজি সম্বন্বিত ও দেবগণের বিহারযোগ্য উদ্যানসমূহে কলরবকারী পক্ষীদল অবস্থান করছে, সেই পর্বতটি স্বচ্ছ জলপূর্ণ নদী ও সরোবর সমূহ, মণিতুল্য উজ্জ্বল বালুকাময় এবং দেবরমণীগণের অবগাহনহেতু সৌরভময়। জলের ও বায়ুপ্রবাহ দ্বারা নিরন্তর যুক্ত রয়েছে, ঐ পর্বতের শ্রেণীতে মহাত্মা ভগবান বরুণের একটি উপবন আছে। তার নাম ঋতুমান,

ঐ উপবন দেবরমণীগণের ক্রীড়াস্থান, সেখানকার দিব্য দ্রব্যসকলে সবকালেই পুষ্প ফল ধরে থাকে, তার ঐ উদ্যান সব সময় সর্বতোভাবে শোভমান।

ঐ পর্বতে যে কত প্রকার বৃক্ষ আছে, তা বলা দুঃসাধ্য। মন্দার, পারিজাত, পারুল, অশোক, চুত, পিয়াল, আম্র, গুবাক, নারিকেল, মসুর দাড়িম্ব, মধুক্ত শাল, তাল, তমাল, পীত শালে, অর্জুন, অরিষ্ঠ (রিঠা, ডুমুর অশ্বত্থ, বট, পলাশ, চন্দন, নিম, বৃক্ষ) সরল, দেবদারু, দ্রাক্ষা, ইক্ষু, রম্ভা, জম্বু (জাম), বদরী, বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, বিশ্ব কপিন্থ (কয়েত বেল), হম্বীর, ভালাতক (ভলা) প্রভৃতি অসংখ্য তরুতে ঐ পর্বত পরিবৃত।

ঐ ত্রিকূট পর্বতে একটি সুবিশাল সরোবর আছে, তাতে কাঞ্চনবর্ণ পঙ্কজসকল সতত শোভামান। ঐ সরোবর কুমুদ, উৎপল, কহ্বার সমূহের শোভায় সুসমৃদ্ধ। মধুপানে মত্ত হয়ে ভ্রমরগণ সব সময় সেখানে গুঞ্জন করে। কলরবকারী বিবিধ পক্ষী, বিশেষতঃ-হংস, কারগুব, চক্রবাক, সারস, জলকুসুম টিট্রিভ ও সত্যুহ (ডাহুক) পক্ষীগণের শব্দে ঐ সরোবরটি সর্বদা মুখরিত, মৎস্য ও কচ্ছপগণের সন্তরণ হেতু চঞ্চল পদ্ম-পরাগ রাশির দ্বারা ঐ সরোবরের জলরাশি সবসময়ে পরিব্যপ্ত হয়ে থাকে। উক্ত সরোবরকে কদম্ব, কেস, নল, কলিগতম্ব ও চৈত্য-লতার দ্বারা পরিবেস্টিত এবং উহ্য কন্দ, কুরুবক, অশোক, শিরীষ, কুঞ্জ, ইহুদি, কুজকে, স্বর্ণযূথিকা, নাস, পুন্মগ, জাতি, মল্লিকা, শতপত্র, মাধবী, লতাঞ্জলি ও সকল ঋতুর নিত্য সমাবেশে ফলপুস্পমালী তার জাত অন্যান্য বৃক্ষরাজির দ্বারা সুশোভিত রয়েছে।

সেই ত্রিকুট পর্বতে একদিন ঐ পর্বতের অরণ্য প্রদেশবাসী এক হস্তি যুথ পতি হস্তিনীগণের সাথে বিচরণ করতে করতে কাটত (বংশবিশেষ), বেণু ও বেত্রবিশিষ্ট বাল্কক, বিশাল গুল্মরাজি এবং বৃক্ষসকল ভগ্ন করছিল, এটির গন্ধ মাত্রেই সিংহ, হস্তী, গণ্ডার, কীচক, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র পশু, গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ সরৎ এবং চমরীগণ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করতে লাগল। কিন্তু বৃক (নেকড়ে বাঘ), শূকর, মহিষ, ভাল্লুক, গোপুচ্ছ (মৃগবিশেষ), বন্য কুক্কর, বানর, হরিণ এবং শশক প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তুগণ তার অনুগ্রহে ঐ অরণ্যের অপরভাগে নির্ভয়ে বিচরণ করত। এক সময় নিদাঘসন্তপ্ত ঐ গজেন্দ্র বহু তৃষ্ণার্থ হস্তী ও হস্তিনীগণে পরিবেষ্টিত হয়ে সেই সরোবরের নিকট গমন করল। সে এমন গুরুতর দলবদ্ধ হয়ে নির্গত হচ্ছিল যে তার গাত্রভারে ত্রিকূট পর্বত যেন কম্পিত হয়ে উঠল। গজেন্দ্রের গণ্ডস্থল হতে মদবারি ক্ষরিত হওয়ায় মদজলরপায়ী অহিকূল তার সেবা করছিল–পদ্মরেণু যুক্ত ঐ সরোবরকে সুবাসিত বায়ুর আঘ্রাণ পেয়ে তার নয়নদ্বয় মদে বিহ্বল হয়েছিল।

তারপর সেই গজরাজ ঐ সরোবরে অবগাহন পূর্বক কাঞ্চন পদ্ম ও উৎপল রেণুরঞ্জিত নির্মল অমৃত জল শুণ্ড দ্বারা উদ্ধৃত করে যথেষ্ট নাম করল; পরে ঐ জল দ্বারা নিজেকে স্নান করিয়ে ক্লান্তি দূর করতে লাগল। তারপর সুদ্ধেত শীতল জল দ্বারা দয়ালু গৃহী পুরুষের ন্যায়, নিজের স্ত্রী ও সন্তানকে স্নান ও পান করাতে আরম্ভ করল। পরন্তু ভগবানের মায়ায় মোহিত হয়ে দুর্মদ গজরাজ নিজের উপস্থিত দুঃখ লক্ষ্য করতে পারল না।

হে মহারাজ, ঐ সরোবরে এক মহাবলশালী কুম্ভীর দৈব প্রেরিত হয়েই সক্রোধে সেই গজরাজের পদ আক্রমণ করল। তখন মহাবলবান গজরাজ অকস্মাৎ এরূপ বিপদগ্রস্ত হয়ে নিজ শক্তি অনুসারে বিক্রম প্রকাশ করতে লাগল। বলবান কুম্ভীর কর্তৃক বেগভরে আকৃষ্ট ও কাতর গজরাজকে লক্ষ্য করে হস্তিনীগণ দীনচিত্তে কেবল চিৎকার করতে লাগল। আর অন্যান্য হস্তিগণ তার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করেও তাকে উদ্ধার করতে সমর্থ হল না।

হে রাজন, এইরূপে গজেন্দ্র ও কুম্ভীরের তুমুলযুদ্ধ হতে লাগল। এতে অপরকে যথাক্রমে জলের বাইরে ও ভেতরে আকর্ষণ করতে করতে এক সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হল। এই সুদীর্ঘ কালমধ্যে কারও প্রাণবিয়োগ ঘটল না। এ দেখে দেবগণ অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ করেছিলেন। অনন্তর কুম্ভীর কর্তৃক দীর্ঘকাল জলমধ্যে আকর্ষণহেতু গজরাজ অবসন্ন হয়ে পড়লে, তার উৎসাহ শক্তি, দেহবল ও ইন্দ্রিয়শক্তির প্রভূত ক্ষয় হয়েছিল। অপরদিকে, জলবাসী কুম্ভীরের উৎসাহ শক্তি, দেহবল, ও ইন্দ্রিয়শক্তি অতিশয় বৃদ্ধি পেতে লাগল।

সেই যূথপতি দেহধারী, এই হেতু ঐ প্রকারে যখন প্রাণের সঙ্কট উপস্থিত হল, কোন প্রকারে নিজেকে মুক্ত করতে পারল না, তখন সে অনেকক্ষণ চিন্তাকুল হয়ে রইল। তারপর তার এইরূপ মতি উদিত হল। –আমি অতিশয় আতুর হয়ে পড়েছি, আমার জ্ঞাতি এই সকল হস্তিগণ আমাকে মুক্ত করতে পারল না, আমি নিজেও সমর্থ হলাম না, এতে এই হস্তিনীগণ উদ্ধার করতে পারবে সম্ভাবনা কি? আমি গ্রহরূপ বিধাতার পাশে আবৃত হয়েছি এতে যদিও কেউই এ হতে আমাকে উদ্ধার করতে সমর্থ হবে না, তথাপি যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের আশ্রয়, সেই শুদ্ধ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই, যে অনির্বচনীয় পরমেশ্বর অতিশয় ধাবমান প্রচণ্ড বেগশালী কালরূপ সর্পের কবল হতে ভীত শরণাগত জীবকে রক্ষা করেন এবং স্বত মৃত্যুও যাঁর ভয়ে পলায়ন করে; আমি তারই আশ্রয় গ্রহণ করছি।

ব্যাসনন্দন শুকদেব বললেন,–হে মহারাজ, বুদ্ধির দ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করে সেই গজেন্দ্র হৃদয় মধ্যে মনকে সমাহিত করল এবং (ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক নিজের) পূর্বজন্মের শিক্ষিত

জপযোগ্য এই উত্তম স্তোত্র জপ করতে লাগল। যাহা হতে এই দেহ প্রভৃতি সচেতন হয়, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষস্বরূপ, যিনি দেহাদি পুরীমধ্যে কারণরূপে প্রবিষ্ট এবং স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, সেই ভগবানকে প্রণাম ও ধ্যান করি। যাঁহাতে এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত, যাঁহা হতে ইহা উৎপন্ন, যাঁহা কর্তৃক ইহা সৃষ্ট এবং যিনি স্বয়ং এই বিশ্বের স্বরূপ, অথচ যিনি এই কার্য- নিয়ামক ও তার কারণ পদার্থ হতে ভিন্ন; আমি সেই স্বতঃসিদ্ধ বিভুর শরণ গ্রহণ করছি, যিনি নিজের মধ্যে নিজমায়া কর্তৃক অর্পিত (স্বয়ংকল্প মাত্রে বিরচিত), অথচ সৃষ্টিকালে অভিব্যক্ত ও প্রলয় কালে (সূক্ষ্মকারণরূপে) বিলীন প্রাপ্ত, সেই কার্যকারণাত্মক এই বিশ্বকে শক্তিরূপে দর্শন করছেন, যাঁর দৃষ্টি কখনও লুপ্ত হয় না, সেই স্বপ্রকাশ পরাৎপর (অর্থাৎ যিনি চক্ষু প্রভৃতি প্রকাশক পদার্থ সমূহেরও প্রকাশক), পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করুন।

কালক্রমে এই লোকসমূহ, লোকপালগণ এবং কারণ বস্তুসমুদয় সম্পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হলে, যে দুর্ভেদ্য অল্প অন্ধকাররাশি বিদ্যমান থাকে, সেই অন্ধকারের পরপারে যিনি বিভুরূপে বিরাজ করেন, যিনি নটের ন্যায় নানা আকারে লীলা করেন বলে দেবতা ও ঋষিগণও যাঁর স্বরূপ জানতে পারেন না সুতরাং অর্বাচীন মনুষ্যাদি কোন প্রাণীই যাঁর স্বরূপ জানতে বা বর্ণনা করতে সমর্থ হয় না, সেই দুজ্ঞেয় চরিত্র পরমেশ্বর আমাদের রক্ষা করুন, সকল প্রাণীতে আত্মদর্শী ও সকলের সুহৃদ, বিষয়াসক্তিরহিত পরম সাধু-মুনিগণ যাঁর সুমঙ্গল পদ (স্বরূপ) দর্শন বাসনায় বনবাসী হয়ে অক্ষুণ্ণরূপে ব্রহ্মর্যোদি ব্রত পালন করেন, সেই পরমাত্মা আমার মত হউন। যাঁর জন্ম-কর্ম নেই, নাম-রূপ নেই, গুণ-দোষ নেই, তথাপি লোকসমূহের উৎপত্তি ও বিন্যাসের জন্য নিজ মায়ার দ্বারা জন্মাদি স্বীকার করেন, আমি তাকে নমস্কার করি। যাঁর কর্মসমূহ আশ্চর্যজনক বলে, যিনি প্রাকৃত রূপরহিত হয়েও বহু রূপে বিরাজমান। অনন্ত শক্তিশালী সেই পরমেশ্বর ব্রহ্মবস্তুকে আমি প্রণাম করি।

যিনি সাক্ষী অর্থাৎ স্বপ্রকাশ বলে তার প্রকাশকরণে অন্য কোন বস্তু নেই এবং যিনি পরমাত্মা অর্থাৎ জীবের নিয়ন্তা, তাকে নমস্কার। যিনি বাক্য, মন ও চিত্তবৃত্তির অপ্রাপ্য, তাঁকে নমস্কার করি বিদ্বান ব্যক্তি সন্ন্যাস ও বিশুদ্ধ সত্ত্বগণ (অথবা বিশুদ্ধ চিত্ত) দ্বারা তাকে প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করে থাকেনি, সেই মোক্ষনন্দানুব স্বরূপ কৈবল্যৎ (অর্থাৎ প্রকৃতিসম্বন্ধ রহিত মোক্ষ দাতাকে) আমি প্রণাম করি। যিনি শান্ত, ঘোর ও মূঢ়রূপে যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অনুকরণ করেন, অথচ বস্তুতঃ সর্বদা নির্বিশেষ, সম্ভাবনার জ্ঞানমভ স্বরূপ, তাকে নমস্কার করি।

.

তৃতীয় অধ্যায়

প্রভুর বন্দনা সূচক নিবেদন

হে দেব, আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা, মক্ষি ও সর্বাধ্যক্ষ, আপনি সকলের অন্তরে পূর্ণরূপে বিরাজমান বলে জীবগণের মূল কারণ ও বিশ্বপ্রকৃতির উৎপত্তির হেতু, আপনাকে নমস্কার করি : আপনি সকল ইন্দ্রিয়ের ও তার গুণ বিষয়সমূহের একটা, ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহই জগতের অনেকেরই আত্মা জ্ঞাপক হয় (অর্থাৎ চেতনার অধিষ্ঠান ব্যতীত জড় ইন্দ্রিয়–বৃত্তি সমূহের প্রবণতা হতে পারে না। এই যুক্তিবলেই ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহ তাদের অধিষ্ঠাতা প্রকাশরূপে সর্বলোকের অগোচরে আপনার সত্য জ্ঞাপন করে), প্রতিবিম্ব যেরূপ অসৎ হলেও তার দ্বারা তার মূলীভূত সৎ বিম্ব পদার্থের অস্তিত্ব জানা যায়, সেরূপ জাগতিক অহংকার প্রভৃতি অসৎ পদার্থের দ্বারা আপনার তত্ত্ব সূচিত হয়ে থাকে। কারণ, অসৎ বিষয়সমূহের মধ্যে আপনার সংরূপ আভাস বিদ্যমান থাকে, আপনাকে প্রণাম করি।

হে প্রভু, আপনি সকল জগতের কারণ-স্বরূপ অথচ আপনার কোন কারণ নেই। কিন্তু আপনি কারণ হলেও মৃত্তিকাদির ন্যায় আপনার বিকার নেই, অর্থাৎ আপনি অদ্ভুত কারণ, আপনাকে নমস্কার। নদীসমূহের যেরূপ সমুদ্রে পরিসমাপ্তি ঘটে, সেরূপ পঞ্চরাপ্রাদি সমস্ত আগমশাস্ত্র এবং নিমিল আপনাতেই পরিসমাপ্ত হয় অর্থাৎ আপনার তত্ত্ব প্রতিপাদ নেই তাদের পরিসমাপ্তি ঘটে। আপনি মোক্ষ স্বরূপ এবং ব্রহ্মাদি উত্তম পুরুষগণের ও একমাত্র আশ্রয়, আপনাকে প্রণাম করি। আপনি চৈতন্যময় অগ্নিস্বরূপ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ–এই ত্রিগুণস্বরূপ অরণির (অর্থাৎ মন্থন কাষ্ঠের) মধ্যে আপনার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রয়েছে; গুণসমূহ সৃষ্টি কার্যে উন্মুখ হলে আপনার চিত্ত ও বহির্মুখ হয় (অর্থাৎ বহুরূপ ধারণের সংক্রান্ত গ্রহণ করে)। আর যাঁরা আত্মতত্ত্বের ভাবনাহেতু বিধি নিষেধরূপ-শাস্ত্র-নির্দেশ অতিক্রম করেছেন, তাদের নিকট আপনি স্বপ্রকাশ অর্থাৎ স্বয়ম্ভুই প্রকাশিত হন। এরূপ আপনাকে নমস্কার করি।

প্রভু, আপনি প্রভূত করুণাশালী, স্বয়ং মুক্ত ও করুণাবিতরণ বিষয়ে আপনার কোনো আলস্য নেই বলে আমার মত শরণাগত পশুর পাস (অবিদ্যরূপে বন্ধন) ছেদন করতে সমর্থ হন, আপনাকে প্রণাম করি। আপনি অন্তর্যামীরূপ নিজ অংশ দ্বারা সকল প্রাণীগণের চিত্তে জ্ঞানরূপে প্রতীত হলেও আপনি পরিচ্ছিন্ন নহেন, স্বরূপতঃ অপরিচ্ছন্ন ও সকল প্রাণীর নিয়ন্ত্রণে সমর্থ, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সকলের অন্তর্যামী হলেও গুণাসক্তিরহিত

বলে দেহ, পুত্র, আত্মীয়, গৃহ ও পরিজনবর্গ প্রতি আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিগণের নিকট (আপনি) দুর্লভ কিন্তু যাঁদের চিত্ত দেহাদিতে অনাসক্ত, তারাই আপনার চিন্তা করে থাকেন।

আপনি জ্ঞানাত্মা (সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ) ভগবান ও ঈশ্বর, আপনাকে নমস্কার করি। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তিকামী পুরুষগণ যাঁর ভজন করে কেবল নিজ নিজ অভিলাষিত ধর্মাদিই প্রাপ্ত হন না, তাদের প্রার্থনার অতিরিক্ত অন্যান্য অতিশয় এবং অব্যয় দেহও হয় (নিত্য শরীর) যিনি স্বয়ং প্রদান করে থাকেন, সেই দয়াবান্ (অর্থাৎ প্রভূত করুণাময়) ভগবান আমাকে কেবল মাত্র করে দিন, আমি অধিক প্রার্থনা করি না।

আমি ভক্তি সুখে অনভিজ্ঞ এজন্য এরূপ প্রার্থনা করলাম, কিন্তু যারা তার একান্ত ভক্ত, মুক্ত পুরুষদের সেবা করে নিষ্কাম হয়েছেন, অতএব ভগবানের অদ্ভুত সুমঙ্গল চরিত্র গান করে আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন থাকেন ও তারা ভগবানের নিকট কোন বস্তুই প্রার্থনা করেন না। সেই পরমেশ্বর অক্ষয়, পরমব্রহ্ম, আধ্যাত্মিক যোগের দ্বারা লভ্য, সূক্ষ্মপদার্থ অতীন্দ্রিয়, বাহ্য দৃষ্টিতে সকলের অতি দূর অনন্ত, আদ্য ও পরিপূর্ণ স্বরূপ। আমি তার স্তব করছি। যাঁর অত্যল্প অংশ মাত্রের দ্বারা বিবিধ নাম ও বিবিধরূপ বিভাগযুক্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ, বেদরাশি এবং চরাচর লোকসমূহ রচিত হয়েছে।

যেমন অগ্নি হতে শিখা ও সূর্য হতে কিরণসমূহ উদগত এবং তাতেই লীন হয়, তেমনি যাঁরা হতে গুণপ্রবাহ (অর্থাৎ বুদ্ধি, মন এবং শরীর সকল) নির্গত এবং যাতে বিলীন হচ্ছে। তিনি দেব নহেন, দানব নহেন, তির্যক (পশুপক্ষী) নহেন, স্ত্রী নন, পুরুষ নন, নপুংসক নয় এবং নিষ্ক্রিয় শূন্য প্রাণিমাত্রও নন, অপর গুণ নন, কর্ম নন, সৎ নন, অসৎ নন, সকল পদার্থে নিষেধের অবধত্বরূপে–অর্থাৎ নেতি নেতি বিচারক্রমে পূর্বোক্ত (সর্বভাবের সীমারূপে) যা অবশিষ্ট থাকে, তাই তিনি, পরন্তু মায়ার দ্বারা আহুত হয়ে থাকেন, সেই ভগবান আমার দুঃখ মোচনের জন্য আবির্ভূত হন।

আমি কেবলমাত্র এই কুম্ভীরের গ্রাস হতে মুক্ত হয়েই বেঁচে থাকতে চাই না, কারণ অন্তরে ও বাইরে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন এই হস্তি জন্মের কি প্রয়োজন? পরন্তু আমি আত্মা প্রকারের আবরনস্বরূপ অজ্ঞানেরই মোচন (ধ্বংস) ইচ্ছা করি, যেহেতু (সেটাই জীবের মোক্ষ)–তার আর নাশ নেই। যাঁর কাছে এই প্রার্থনা করছি, আমি তাকে জানি না। তিনি বিশ্বের আত্মা, অজ, ব্রহ্ম ও পরমপদস্বরূপ, আমি কেবল তাঁকে প্রণাম করছি।

এসব ধর্মরূপ যোগ দ্বারা যাঁদের সকল কর্ম দগ্ধ হয়েছে এরূপ যোগীগণ যোগ বিভাবিত হৃদয় মধ্যে যাঁকে দর্শন করেন, আমি সেই যোগেশ্বরকে নমস্কার করছি; হে ভগবন্ শক্তিস্বভবা, অথচ বাইরে যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের গুণরূপে প্রতীয়মান হন এবং যাদের ইন্দ্রিয়বর্গ কুৎসিত (অর্থাৎ বিষয়াভিমুখী যাদের ইন্দ্রিয়বর্গ), তারা যাঁর পথ জানতে পারে না, দুরন্ত শক্তিশালী, শরণাগত সেই আমাকে প্রণাম করি। যাঁর মায়াবশতঃ অহংবুদ্ধির দ্বারা আবৃত হয়ে তোকসমূহ নিজ আত্মাকে জানতে পারে না, দুরতিক্রম মহাত্মাশালী সেই ভগবানের আমি শরণাগত হয়েছি।

শ্রী শুকদেব বললেন,–গজরাজ এইরূপ নির্বিশেষভাবে (অর্থাৎ কোনরূপ মূর্তি বিশেষের উল্লেখ করে) পরমাত্মতত্ত্বের বর্ণনা করায়, বিভিন্ন মূর্তিবিশিষ্টরূপে আত্মভিমানী ব্রহ্মাদি দেবগণ যখন তাকে উদ্ধারের জন্য এলেন না, তখন অখিলের আত্মা সর্বদেবময় ভগবান হরিই স্বয়ং সেখানে আবির্ভূত হলেন। জগন্নিবাস (জগতের আধার) সুদর্শনচক্রধারী ভগবান শ্রীহরি গজেন্দ্রকে এরূপ পীড়িত লক্ষ্য করে তার কৃত স্তব শুনে গরুড়ে আরোহণপূর্বক স্তুতিকারী দেবগণের সাথে গজরাজের নিকট উপস্থিত হলেন। গজেন্দ্র সরোবরের অভ্যন্তরে মহাবল গ্রাহ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় অতিশয় আর্ত হয়েছিল, আকাশে গরুড়ের পৃষ্ঠে চক্রধারী শ্রীহরিকে দর্শন করে, পদপুষ্পবীর শুন্ডটি ঊর্ধ্বদিকে প্রসারণপূর্বক অতিকষ্টে- হে নারায়ণ, হে অখিল গুরু, হে ভগবান, আপনাকে নমস্কার—এরূপ বাক্য উচ্চারণ করেছিল।

ভগবান তাকে অত্যন্ত পীড়িত দেখে দয়ার্দ্র হওয়ায় মন করলে, গরুড় মন্দগতি শীঘ্র যেতে পারবে না। অতএব গরুড়ের পৃষ্ঠ হতে সহসা অবতীর্ণ হয়ে, মহাবেগে গজেন্দ্রের নিকট গমন করে, বাম করে শুন্ড ধরে চক্রের সাথেই তাকে সরোবর হতে উদ্ধার করলেন। তারপর দর্শনকারী দেবগণ সমক্ষে দক্ষিণ করে চক্র দ্বারা সেই গ্রহের বদন বিদারিত করতঃ গজেন্দ্রকে মুক্ত করলেন।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, সে সময় ব্রহ্মা, মহেশ প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্বগণ শ্রীহরির সেই অদ্ভুত কর্মের প্রশংসা করতে করতে কুসুমবর্ষণ করলেন। স্বর্গে দুন্দুভি বাদ্য হল, গন্ধর্বগণ নৃত্যসহকারে গান করছিলেন, এবং ঋষি, চারণ ও সিদ্ধগণ সেই পুরুষোত্তমের স্তব করতে লাগলেন। সে সময়ে সেই কুম্ভীরও তৎক্ষণাৎ দেবল ঋষির সাপ মুক্ত হয়ে পরম আশ্চর্য রূপ ধারণ করল। সে পূর্বে হূহূ নামক শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব ছিল। (এক সময় ঐ হুহু-গন্ধর্ব স্ত্রীগণের সাথে সরোবরের মধ্যে ক্রীড়া করছিলেন। এমন সময় দেবল ঋষি ঐ সরোবরে স্নান করতে নামলে, গন্ধর্বরাজ আমোদহেতু ঐ ঋষিবরের চরণ ধরে জলের মধ্যে আকর্ষণ করতে

লাগলেন। তাতে মুনিবর কুপিত হয়ে শাপ প্রদানপূর্বক বললেন–”আরে দুষ্ট’, গ্রহ হয়ে জন্মগ্রহণ কর।’ এ শুনে ঐ গন্ধর্ব মুনিকে প্রসন্ন-করলে পরে মুনি বললেন–তুমি গজেন্দ্রের চরণ ধারণ করো, ভগবান শ্রীহরি গজেন্দ্রের উদ্ধার করার সময় তোমাকেও মুক্ত করবেন)

এখন ঐ গ্রহে (কুম্ভীর) শাপ থেমে মুক্ত হয়ে নিজ আশ্চর্য গন্ধর্বরূপ ধারণ করতঃ উত্তম-শ্লোক অব্যয় অধীশ্বর ভগবানকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করে, তার গুণগান করতে লাগলেন। ভগবান বিষ্ণু পরম যশের আশ্রয়, অতএব তার গুণী কীর্তনীয় এবং তার কর্মসকল উকৃষ্ট কাহিনীর। তারপর পরমেশ্বর শ্রীহরির অনুকম্পা লাভ করে সেই গন্ধর্ব শাপমুক্ত হয়ে ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে, সকল লোকের দৃষ্টির সম্মুখেই নিজ গন্ধর্বলোকে গমন করল।

আর, সেই গজেন্দ্র স্পর্শে অজ্ঞানরূপ বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে পীতবসন ও চতুর্ভুজ ধারণ পূর্বক ভগবানের শারণ্য (সমান রূপে) প্রাপ্ত হল। রাজন, ঐ গজেন্দ্র পূর্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত প্রান্তদেশীয় রাজা ছিলেন, সেই নরপতি বিষ্ণু-পরায়ণ হয়ে কালযাপন করতেন। তিনি জিতেন্দ্রিয় মৌনব্রত, জটাধর তাপস হয়ে মলয়াচলে গিয়ে সেখানে আশ্রম নির্মাণ করলেন। একদিন আরাধনার সময় স্নান করে ভগবান হরির পূজা করতে বসলেন। . সেই সময় যদৃচ্ছাক্রমে মহাভাগ অগস্ত্যমুনি শিষ্যগণের সাথে তার আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু রাজা ঐ প্রকার ভগবৎ আরাধনার নিমগ্ন থাকায় অগস্ত্য মুনির অভ্যর্থনাদি কিছুই করলেন না, নির্জনে উপবেশনপূর্বক যেমন মৌনব্রতী ছিলেন, তেমনিই থাকলেন। এ দেখে তাঁর প্রতি ঋষি অগস্ত্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন। অনন্তর ঋষির অগস্ত্য তাকে এরূপ অভিশাপ প্রদান করলেন– অশিক্ষিত বুদ্ধি ও ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী এই অসাধু দুরাত্মা নরকে প্রবেশ করুক। যেহেতু এই রাজা হস্তির ন্যায় জড়বুদ্ধি, অতএব হস্তীই হোক।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, ঋষি অগস্ত্য এরূপ অভিশাপ দিয়ে অনুচরগণের সাথে প্রস্থান করলেন। রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নও ঐ ঘটনাকে–দৈবপ্রাপ্তি মনে করে আত্মবিস্মৃতিজনক হস্তিজত্ম প্রাপ্ত হলেন বটে, কিন্তু শ্রীহরির আরাধনার প্রভাবে পূর্বজন্মের কথা তার স্মৃতিপথে জাগ্রত ছিল। ভগবান পদ্মনাভ এইরূপে গজরাজকে মুক্ত করে, তার নিজ পার্ষদত্ব প্রদান করলেন। তারপর গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও দেবতাগণ তার এই অদ্ভুত কর্মের প্রশংসা করতে আরম্ভ করলে, তিনি গরুড়ে–আরোহণপূর্বক সেই গজেন্দ্রের সাথে নিজ ধামে গমন করলেন। হে মহারাজ, এই গজেন্দ্রমোক্ষন নামে শ্রীকৃষ্ণানুভাব তোমার নিকট বর্ণনা করলাম। হে কুরুবর্ষ, যে সকল ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, তাদের স্বর্গ ও যশ লাভ হয় এবং কলিকলুষ ও দুঃস্বপ্ন নাশ হয়। মঙ্গলকামী দ্বিজাতিগণ দুঃস্বপ্নদির শান্তি নিমিত্ত প্রাতঃকালে শয্যা হতে উত্থিত ও

পবিত্র হয়ে যথাবিধি এটি পাঠ করে থাকেন, হে কুরুসত্তম, সর্বতময় ভগবান শ্রীহরি প্রীত হয়ে শ্রবণকারী সকল প্রাণীর সম্পর্কে গজেন্দ্রকে এরূপ বলেছিলেন।

শ্রীভগবানকে বললেন–হে গজেন্দ্র, যারা রাত্রিশেষে উত্থানপূর্বক সংযত হয়ে একাগ্রচিত্তে আমাকে, তোমাকে, এই সরোবর, পর্বত, গুহা ও অরণ্যকে, নেত্র ও বংশগুল্মরাজিকে এবং দেবতরুসমূহ, ব্রহ্মা, শংকর ও আমার অধিষ্ঠান এই পর্বত শৃঙ্গসমূহ, আমার প্রিয় আবাসস্থান ক্ষীরোদসাগর অত্যুজ্জ্বল শ্বেতদীপ, শ্রীবৎসর, কৌস্তুভ, বনমালা, আমার গজ-কৌমদকী, সুদর্শন চক্র, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, পক্ষিরাজ গরুড়, শেষনাগ ও আমার সূক্ষ্ম কালরাগিনী ও হৃদয়াপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, মহেশ, দেবর্ষি নারদ, প্রহ্লাদ, মৎস্যকূর্ম বরাহাদি অবতারে আমার অনুষ্ঠিত অনন্ত পুণ্যজনক কর্মসমূহ, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, প্রণব, সত্য, মায়া, গো-ব্রাহ্মণ, ভক্তিরূপ অক্ষয় ধর্ম, ধর্মপত্নী, সোম ও কাশ্যপের পত্নী দক্ষ কন্যাগণ, গঙ্গা, সরস্বতী, নন্দা, যমুনা, ঐরাবত হস্তী, ধ্রুব, সপ্ত ব্রহ্মর্ষি এবং পুণ্যকীর্তি মানবগণকে আমার বিভূতিরূপে স্মরণ করে, তারা সকল প্রকার পাপ মুক্ত হয়, হে বৎস, যারা রাত্রিশেষে জাগ্রত হয়ে এই বৃত্তান্ত পাঠ দ্বারা আমার স্তুতি করে, আমি তাদের মৃত্যুকালে উত্তম গতি দান করে থাকি।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, ভগবান ঋষিকেশ এই প্রকার আদেশ করে শঙ্খধ্বনি করলেন, পরে দেবতাগণকে-হর্ষোৎফুল্ল করে গরুড়ে আরোহণ করেছিলেন।

.

চতুর্থ অধ্যায়

রৈবত মন্বন্তরের কথা

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, আমি তোমার নিকট শ্রীহরি গজেন্দ্রমোণরূপ নানা শ্লোক ও পুণ্যজনক কর্ম বলেছি, এমন রৈবত মন্বন্তরের কথা শোন; পঞ্চম মনুর নাম 'বৈরত' তিনি চতুর্থ মনু তামসের সহোদর ভ্রাতা। অর্জুন, বলি, বিন্ধ্য প্রভৃতি তাঁর পুত্র উক্ত মন্বন্তরে বিভু, ইন্দ্র, ভূতক প্রভৃতি দেবতা এবং হিরণ্যগোমা, বেদশিরা ও ঊর্ধ্ববাহু প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। আর শুভ্রের বৈকুণ্ঠা নামে যে পক্ষী ছিলেন, তার গর্ভে শুভ্রের ঔরসে স্বধ্য ভগবান 'বৈকুণ্ঠ' বৈকুণ্ঠবাসী সুরগণের সাথে নিজ অংশে জন্মগ্রহণ করেন।

ঐ বৈকুণ্ঠই রমাদেবীর প্রার্থনায় তার প্রীতি সম্পাদনের জন্য লোকনমস্কৃত বৈকুণ্ঠলোক নির্মাণ করেন। তার প্রভাব (নিজ পার্ষদদ্বয়ের হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামক দৈত্যজন্ম প্রাপ্তি, বরাহ ও নৃসিংহরূপে তাদের সাথে যুদ্ধাদি) গুণ (ব্রাহ্মণ্যতাদি) ও মহা সমৃদ্ধি সমূহ তৃতীয় স্কন্ধান্ত কিছু বর্ণনা করেছি। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি তার গুণসমূহ বর্ণনা করতে পারে, সে পৃথিবীর ধূলিকণার সংখ্যা করতে সমর্থ হয় (অর্থাৎ তার গুণ বর্ণনা অসম্ভব)।

এক্ষণে ষষ্ঠ মনুর বিবরণ বলছি। চক্ষুর পুত্র 'চাক্ষুষ', ইনি ষষ্ঠ মনু হয়েছিলেন। পুরু, পুরুষ ও সুদ্যুম্ন প্রভৃতি তাঁর পুত্র। ঐ মন্বন্তরে মন্ত্রম ইন্দ্র, আপ্য প্রভৃতি দেবতা এবং হর্য্যম্মান ও বীরক প্রভৃতি সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। ঐ মন্বন্তরেই বৈরাজের ঔরসে দেবসম্ভৃতির গর্ভে জগৎপতি ভগবান বিষ্ণু নিজ অংশে জন্মগ্রহণ করে 'অজিত' নামে বিখ্যাত হন। এই অভিজ্ঞ সমুদ্র অজিত মন্থন পূর্বক দেবতাদের জন্য সুধা সংগ্রহ করেছিলেন এবং মন্থনদণ্ড মন্দার পর্বত জলমধ্যে বিচলিত হলে তিনি কূর্মরূপে তাকে পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন,

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন–হে ব্রাহ্মণ, ভগবান বিষ্ণু যে প্রকারে ক্ষীরসাগর মন্থন করেন, যে কারণে কূর্মরূপে পৃষ্ঠে মন্দার পর্বত ধারণ করেছিলেন, দেবগণ যে প্রকারের অমৃত প্রাপ্ত হন এবং তৎকালে অন্য যা যা ঘটেছিল, আপনি–ভগবানের সে সকল পরমাশ্চর্য কর্ম আমাদের নিকট বলুন।

হে মুনিবর, আপনি জগৎপতি শ্রীহরির মহিমা সম্যকভাবে বর্ণনা করলেও উহার দ্বারা আমার চিরকালের সন্তাপ তাপিত চিত্ত কোনরূপেই পরিতৃপ্ত হচ্ছে না (বরং শ্রাবণের ইচ্ছা উত্তরোত্তর বর্ধিতই হচ্ছে), শ্রীসূত বললেন–হে ঋষিগণ দ্বৈপায়ন আর শুকদেব এই প্রকারে দ্বিজাতিগত হয়ে তার অভিনন্দনপূর্বক শ্রীহরির পরাক্রমসমূহ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, যখন দেবগণ যুদ্ধে অসুরগণ কর্তৃক তীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহের দ্বারা আহত হয়ে প্রাণত্যাগপূর্বক রণক্ষেত্রে পতিত হয়েছিল এবং তাদের অনেকেই আর পুনরায় উত্থিত হলো না, আর যে সময়ে দুর্বাসা স্মরিত অভিশাপে ইন্দ্রের সাথে ত্রিভুবন নিষ্প্রদীপ (লক্ষ্মীশূন্য) হল। তারপর তারা সকলে সুমেরু উপরিভাগে অবস্থিত ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হয়ে প্রণতিসহকারে ব্রহ্মার নিকটে সকল কথা নিবেদন করলেন।

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বায়ু, প্রভৃতি দেবগণকে বলহীন ও নিষ্প্রভ এবং লোকসকলকে প্রায়। আর অসুরদের বলবান ও ক্লান্তিযুক্ত লক্ষ্য করে, একাগ্রচিত্তে পরমপুরুষ শ্রীহরিকে স্মরণ করত উৎফুল্লবদনে সেই দেবতাদের বলতে লাগলেন–ওহে দেবগণ, আমি (ব্রহ্মা), ভগবান

ভব, তোমরা অসুর প্রভৃতি জীবগণ এবং মনুষ্য, তির্যক প্রাণী, বৃক্ষ ও স্বেদজ প্রাণীগণ এ সকল যাঁর অবতাররূপ পুরাণের ত্যাগ অব্যয় পরমেশ্বরেরই শরণাপন্ন হব। যদিও তার বধ্য বা রক্ষণীয়, উপেক্ষাযযাগ্য বা আদর যোগ্য কেউ নেই, তথাপি তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহাবের জন্য যথাসময়ে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ আশ্রয় করেন। দেহীগণের কল্যাণের জন্য সত্ত্বগুণধারী ভগবান হরির ইহা স্থিতি রক্ষার কাল বলে, আমরা সেই জগদ্গুরুর স্থান গ্রহণ করব। তিনি দেবতাপ্রিয় অতএব তার নিজ জন আমাদের মানসসাধন করবেন।

.

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রহ্মা কর্তৃক বিষ্ণুর স্তুতি

শ্রীশুকদেব বললেন,–হে শত্রুনাশন মহারাজ, ভগবান ব্রহ্মা দেবতাদের এরূপ বলে, তাদের সাথে তমোগুণের পরবর্তী যে স্থান হরির সাক্ষাৎ অধিষ্ঠানক্ষেত্র, সেই ক্ষীরোদ সাগরে গমন করলেন। ব্রহ্মা সেখানে উপনীত হয়ে সাবধানচিত্তে বৈদিক বাক্যে দ্বারা, অদৃষ্টরূপ কিন্তু শ্রুতপূর্ব ভগবান হরির স্তব করতে আরম্ভ করলেন। শ্রীব্রহ্মা বললেন–হে ভগবৎ, আপনি মন অপেক্ষা বেগবান বলে মন দ্বারা বিচারের অযোগ্য, উপাধিমুত বলে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট আদ্যন্তরহিত বলে নির্ধিদ্ধায়। অতএব যাদের অগোচর বরেণ্য শ্রেষ্ঠ দেবতা। আমরা আপনাকে প্রণাম করি।

যিনি প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার (অহংকারের বা দেহের) আপনাকে উদ্গাতা, যিনি বিষয় ও ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশিত হন। অথচ যিনি স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় অজ্ঞানরহিত আর যাঁর দেহ নেই, যিনি অক্ষয় ও আকাশের মত সর্বব্যাপী এবং যাঁতে জীবপশুপতিনী অবিদ্যা অথবা অগ্নিবর্তিকা বিদ্যা কিছুই থাকে না, তিনি তিন যুগেই আবির্ভূত হন, আমরা তার শরণাপন্ন হই। জীবের দেহাদি চক্রতুল্য, উহা মায়ার দ্বারা ঘূর্ণিত হচ্ছে। মন এই চক্রের প্রধান অংশ; দশ ইন্দ্রিয় ও পন্নত প্রাণ–এই পঞ্চদশটি ঐ চক্রের অরা (অর্থাৎ চক্রের মধ্যভাগে গ্রথিত ও চারদিকে প্রান্তভাগে সংলগ্ন এলাকা) সত্ত্বাদি তিনটি গুণ উহার নাভি (মধ্যভাগ, উহা বিদ্যুতের মত ছঞ্চল, প্রকৃতি, মহতত্ত্ব, অহংকার ও শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র–এই আটটি এই চক্রের নেমি (অর্থাৎ প্রান্তভাগের ন্যায় আবরন স্বরূপ)। যিনি এই চক্রের অক্ষ (অর্থাৎ অধিষ্ঠান বা অবলম্বন) সেই সত্যস্বরূপ পরাশ্বরের শরণাগত হচ্ছি।

তিনি ভক্তদের রক্ষার জন্য গরুড়ের উপর উপবিষ্ট, কিন্তু জ্ঞানৈক্যস্বরূপ ও প্রকৃতির পর, আরা যিনি অদৃশ্য ও অব্যক্ত এবং যাঁর পরিচ্ছেদ হয় না, বীরগণ যোগরূপ উপায়ের দ্বারা যার উপাসনা করেন, সেই পরমেশ্বরকে আমরা প্রণাম করি। কোন ব্যক্তি যার মায়াকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয় না, যে মায়ার প্রভাবে তোক নিজ স্বরূপকেও জানতে পারে না, অথচ যিনি আত্মশক্তি মায়া ও মায়িক গুণসমূহকে জয় করেছেন। সর্বভূতে সমানরূপে বিচরণশীল, আমরা সেই আপনাকে প্রণাম করি। আমরা এই দেবতা ও ঋষিগণ যাঁর প্রিয়মূর্তি সত্ত্বগুণ দ্বারা সৃষ্টি হয়েও, বাইরেও অন্তরে সত্তা ও প্রকাশ দ্বারা সাক্ষাৎ প্রকাশমান যাঁর সূক্ষ্ম গতি (অর্থাৎ নিরপাধি স্বরূপ) জানতে পারি না, রজঃ ও তমোগুণ প্রধান অসুরাদি জীবগণ কিরূপে তাকে জানতে পারব? অতএব আমরা তাকে প্রণাম করি।

যে পৃথিবীতে জরায়ুজ, অন্তজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ রূপ চার প্রকার প্রাণী সৃষ্টি হয়, নিজ রচিত সেই পৃথিবী যাঁর পদযুগল; মহাবিভূতিশালী অচ্যুত স্বরূপ সেই স্বতন্ত্র মহাপুরুষ ব্রহ্মা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, যে জল হতে অখিল নোক ও লোকপাল সকল উৎপন্ন, জীবন্ত বর্ধিত হয়, সেই উদার শক্তিযুক্ত জল, যাঁর রেতঃ স্বরূপ, সেই মহৈশ্বর্যাশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। যে সোম দেবতাদের আত্ম বল ও আয়ু স্বরূপ, আর যিনি বৃক্ষসকলের প্রকৃষ্ঠরূপে বৃদ্ধির কারণ, পণ্ডিতগণ সেই সোমকে যাঁর কর্ম বলে থাকেন,–সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন। যাহা হতে বেদরূপ ধন উৎপন্ন হয় এবং বেদপ্রতি পাদ্য যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য যাঁর জন্ম, আর যিনি সমুদ্রে বাড়বানল রূপে অবস্থানপূর্বক জল প্রভৃতির পাক মত করে। জীবের উদরে থেকে পরিপাকযোগ্য অন্নাদি পরিপাক করেন, সেই অগ্নি যাঁর মুখ স্বরূপ; সেই মহাবিভূতিনাশী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

যে সূর্য দেবযান অর্থাৎ অর্চিরাদি বত্মের দেবতা, ত্রয়ীময় (বেদত্রয় স্বরূপ), ব্রহ্মের উপাসনার স্থান (অর্থাৎ যার মধ্যে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়) এবং দেবযানত্বহেতু মুক্তির দ্বার স্বরূপ ও পুণ্যধাম বলে অমৃতময় ও কালরূপী বলে মৃত্যুরূপে গণ্য হন, সেই সূর্য যাঁর চক্ষুঃ, সেই মহা বিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। ভৃত্যগণ যেমন সম্রাটের অনুবর্তন করে, তেমনি বুদ্ধি প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা আমরা দেবতাগণ যে মুখ্য প্রাণের অনুবর্তন করছি, চর অচর-সকল ভূতের তেজঃ বল ও সামর্থ্যাদি ধর্মবিশিষ্ট সেই প্রাণবায়ু যাঁর প্রাণ হতে উৎপন্ন হয়েছে, সেই মহৈশ্বর্যশীল পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন।

যাঁর বল হতে ইন্দ্র, প্রসন্নতা হতে দেবগণ, ক্রোধ হতে রুদ্র, বুদ্ধি হতে ব্রহ্মা, দেহচ্ছিদ্র হতে বেদ ও ঋষিগণ এবং লিঙ্গ হতে প্রজাপতির উৎপত্তি হয়েছে, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর

আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোক। যাঁর বক্ষস্থল হতে মন্ত্রী (লক্ষ্মী), ছায়া হতে পিতৃগণ, স্তন হতে ধর্ম, পৃষ্ঠ হতে অধর্ম, মস্তক হতে স্বর্গ এবং জিহ্বা হতে অপ্সরাগণ উৎপন্ন হয়েছে। সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। যাঁর মুখ হতে বিপ্র ও পরমগুহ্য (অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়ার্থ অববোধক) বেদ, ভূজদ্বয় হতে ক্ষত্রিয় ও বল উরুযুগল হতে বৈরাগ্য ও নৈপুণ্য এবং চরণ হতে শুদ্র ও সুশ্রষার উৎপত্তি হয়েছে, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোক। যার অধর হতে লোভ, উত্তরোষ্ঠ হতে প্রীতি। নাসিকা হতে কান্তি, স্বর্গ হতে পশুদের হিতকর কাম, হৃদয় হতে যম এবং পক্ষম (চোখের পাতা) হতে কাল উৎপন্ন হয়েছে, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোক।

জ্ঞানীগণ বিচার দ্বারা যার বাস্তবত্ব নিরশন করে থাকেন অথচ বস্তুতঃ যা দুজ্ঞেয়। সেই পঞ্চভূত কাল, কর্ম গুণ ও এই ভৌতিক প্রশস্ত যাঁর যোগমায়ার মহিমারূপে বর্ণিত হয়, সেই বিভূতি স্বামী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন; যার মধ্যে মায়াশক্তি সমূহ উপশান্ত (অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়) রয়েছে, স্বরাজ্য লাভ হেতু যাঁর স্বরূপ পরিপূর্ণ। যিনি দর্শনাদি বৃত্তি দ্বারা মায়া বিরচিত গুণসকলে আসক্ত হন না এবং যাঁর শরীর বায়ুর ন্যায় অপ্রতিহত, আমরা তাকে নমস্কার করি। হে ভগবান, আমরা শরণাপন্ন হয়ে আলোর সম্মত মুখপদ্ম দর্শন করতে ইচ্ছা করছি। আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গোচর সেরূপে হয়, সেইরূপে আপনার নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করান। প্রভু, যে যে কর্ম আমাদের অনন্য, আপনি ভক্তজনের ইচ্ছানুবর্তী হয়ে কালে কালে স্বেচ্ছাকৃত বিভিন্ন অবতার রূপে নিজেই যে সকল কর্মসম্পন্ন করে থাকেন,–

হে ভগবন, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের বিষয়ানুসন্ধানমূলক কর্মসমূহে প্রচুর ক্লেশ এবং অতি অল্প ফলই জন্মে থাকে, আবার পরে ঐ সকল কর্ম সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল হয়। কিন্তু ভক্তগণের আপনাতে অর্পিত কর্ম সেরূপ কখনও হয় না (অর্থাৎ তা নিষ্ফল না হয়ে গরম মহাফলই প্রদান করে), অত্যল্প কর্মাভ্যাসও ঈশ্বরে অর্পিত হলে, তা কখনও বিফল হয় না, কারণ ঈশ্বরই জীবের আত্মা, প্রিয় ও হিতকারী। প্রিয় হিতকারী আত্মাতে যা অর্পণ করা যায়, তা কি নিষ্ফল হতে পারে? যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করলেই স্কন্দ সামা প্রভৃতি সকল অবয়বের মেনে করা হয়, তেমনি ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করলে সকল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রাণীগণের এবং (আরাধনাকারীর) নিজেরও আরাধনা হয়ে থাকে। হে ভগবান, আপনার স্বভাব ও কর্মসমূহ বিতর্কের (বিচারের) অযোগ্য। আপনি নির্গুণ গুণেশ্বর সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ও জ্বরাপতঃ অনন্ত (অর্থাৎ দেশ, কাল ও বস্তুর পরিচ্ছেদ রহিত)। আমৃত্যু সম্প্রতি আপনার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র প্রণতি জ্ঞাপন করছি।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, দেবগণের দ্বারা এরূপ স্তুত হয়ে, সহস্র সূর্যের উদয়ে যেরূপ দ্যুতি হয়, সেরূপ দ্যুতি সম্পন্ন ভগবান ঈশ্বর তার সমক্ষে আবির্ভূত হলেন। সেই দীপ্তির দ্বারা দেবতাদের দৃষ্টি প্রতিহত হলে, তারা আকাশ, দিক, পৃথিবী এবং নিজেদেরও দেখতে পেলেন না। আর সেই বিভুকে কিরূপে দেখতে সমর্থ হবেন? কিছুক্ষণ পর দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান ব্রহ্মা-অন্ধকারের সাথে সেই মূর্তি দর্শন করে, ভূতলে দন্ডবৎ প্রণত হয়ে অন্যান্য দেবগণের সহিত সেই পরমপুরুষের স্তুতি করেছিলেন। ভগবানের সেই মূর্তি সুনির্মল মরকত মুনির ন্যায় শ্যামবর্ণ, তার নয়নযুগল পদ্মপুঞ্জের অভ্যন্তরভাগের ন্যায়, সর্বাঙ্গ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় পীতবর্ণ, মনোহর কৌষেয় বস্ত্রেও দ্বারা আবৃত ছিল। তার অবয়বসমূহ প্রসন্ন ও সুন্দর, মুখমণ্ডল ও ভ্রুযুগল সুশোভন, মস্তক মহামণিয় মুকুটশোভিত, বাহুদ্বয় কেয়রমণ্ডিত, শ্রীমুখমণ্ডল কুণ্ডলযুগলের দ্বারা উদ্ভাসিত গণ্ডদ্বয়ের শোভায় রমণীয়, নানা অঙ্গ চন্দ্রহার, বলায়, হার ও নুপূর দ্বারা অলংকৃত এবং গলদেশ কৌস্তভমণি ও বনমালা দ্বারা বিভূষিত হয়েছিল। তিনি বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীদেবীকে ধারণ করেছিলেন এবং সুদর্শন প্রভৃতি নিজেরে অস্ত্রসমূহ–মূর্তিমান হয়ে তার উপাসনা করেছিলেন।

ব্রহ্মা বললেন–হে ভগবন্ শ্রীমূর্তির এ আবির্ভাব মাত্র, আমাদের মত আপনাকে জন্মদি নেই, কারণ আপনার জন্ম, স্থিতি ও বিনাশ–এ তিনটিই উৎপন্ন হয় না। তার হেতু আপনি নিগুণ, এই জগৎ-ও জ্ঞানীগণ আপনাকে নির্বাণসুখের সমুদ্র বলে থাকেন। আপনি ঐরূপ হলেও দুজ্ঞেয় বলে সূক্ষ্ম হতেও অতিসূক্ষ্ম, বস্তুতঃ আপনার মূর্তির ইয়ত্তা নেই। আপনার অনুভব অসত্য, অতএব আপনাকে বারবার প্রণাম করি। হে পুরুষোত্তম, আপনার এই মূর্তি শ্রেয়স্কামী পুরুষগণ কর্তৃক বৈদিক ও তান্ত্রিক ও তান্ত্রিক সাধনের দ্বারা চিরকাল পূজিত হয়ে আসছে, অতএব ইহা সনাতন। হে বিধাতঃ এই নিখিল বিশ্ব আপনার মধ্যে অবস্থিত বলে, আপনার মধ্যে আমরা ত্রিলোকসহ আমাদের সকলকেই দর্শন করছি, অতএব এই মূর্তি পরিচ্ছন্ন নহে।

হে ভগব আপনি আত্মতন্ত্র (অর্থাৎ সব কিছুর আশ্রস্বরূপ), এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আপনাতেই ছিল, মধ্যেও রয়েছে এবং অন্তেও আপনাতেই থাকবে। মৃত্তিকা যেমন ঘটের আদি, অন্ত ও মধ্য আপনিও তেমনি। এই জগতের আদি, অন্ত ও মধ্য কারণ আপনি প্রধান (প্রকৃতি) হতেও পর (শ্রেষ্ঠ)। আপনি নিজ অধীন মায়ার দ্বারা এই বিশ্ব নির্মাণ করে, তাতে প্রবিষ্ট হয়েছেন। শাস্ত্রজ্ঞ বিবেকী যোগীগণ মন দ্বারা; গুণসমূহের পরিণামের মধ্যেও আপনাকে অগুণরূপে (অর্থাৎ গুণ সম্পর্ক শূন্যরূপে) দর্শন করে থাকেন, মনুষ্যগণ–যেমন মন্থন দ্বারা কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি, দোহনাদির দ্বারা গাভীর মধ্যে ঘৃত, কর্ষণাদির দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে ধান্যাদি খাদ্য এবং

বাণিজ্যাদির দ্বারা পুরুষকারের মধ্যে জীবিকা প্রাপ্ত হয়, তেমনি মনীষীগণ বুদ্ধির দ্বারা গুণসমূহের মধ্যে আপনাকে লাভ করেন এবং উহা বলে থাকেন।

হে নাথ, হে পদ্মনাভ, দাবানল পীড়িত হস্তিগণ গঙ্গার জলরাশি প্রাপ্ত হয়ে যেরূপ শান্তি–লাভ করে, আমরাও আমাদের চিরকালের পরমপুরুষার্থরূপ আপনাকে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হতে দেখে সেরূপ শান্তি লাভ করছি। আমরা সমস্ত লোকপালগণ যে কাজের জন্য আপনার পাদমূলে সমবেত হয়েছি, আপনি তা সম্পাদন করুন–হে অন্তরাত্মান আপনি; জগতের সকল বিষয়ই প্রত্যক্ষ করছেন, আপনাকে অন্যে কি বিজ্ঞাতল করবে। হে ভগবান, আমি শংকর, ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ অগ্নির স্ফুলিঙ্গের আপনা হতে পৃথক হয়ে নিজেদের মঙ্গল কি রূপেই বা জানব? অতঃপর আপনিই ব্রাহ্মণ ও দেবগণের কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিন।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, এই প্রকারে ব্রহ্মাদি দেবগণ স্তব করলে ভগবান শ্রীহরি তাদের মনোগত অভিপ্রায় জানতে পেরে, কৃতাঞ্জলি হয়ে সম্মুখে অবস্থিত ও সংযতেন্দ্রিয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে মেঘগম্ভীর স্বরে এরূপ বলে ছিলেন। যদিও সকল দেবগণের অধীশ্বর।–ভগবান শ্রীহরি একাকীই দেবতাদের কার্যসাধনে সমর্থ, তথাপি সমুদ্র মন্থাদির দ্বারা বিহার করতে অভিলাষ করে তাদের এরূপ বলতে লাগলেন।

শ্রীভগবান বললেন–হে ব্রাহ্মণ-হে দেবগণ এবং গন্ধর্বগণ, তোমরা সকলে অবহিত হয়ে আমার কথা শোন। হে সুরসঙ্, যে প্রকারে তোমাদের মঙ্গল হবে, তা বলছি শোন। সম্প্রতি তোমরা যাও, যে পর্যন্ত নিজেদের বৃদ্ধিসাধন না হয়, ততকাল শুক্রাচার্যের অনুগ্রহপুষ্ঠ দানব ও দৈত্যগণের সাথে সন্ধি স্থাপন কর (অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে বিদ্রূপ করবে)। হে দেবগণ, কর্তব্য বিষয়ের গুরুত্ববোধে কার্য মার্গে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে কালসর্প ও মূষিকৈর ন্যায় (অর্থাৎ দৈবাৎ গোষ্ঠি পেটিকা মধ্যে নিবদ্ধ সর্প যেমন নির্গমদ্বার বিধানার্থ প্রথমে মুষিকের সঙ্গে সন্ধি করে, পরে ঐ মূষিককেই ভক্ষণ করে, সেরূপ)। শত্রুর সঙ্গেও সন্ধি করতে হয়। তোমরা দৈত্যদের সাথে সন্ধি করে, অমৃত উৎপাদনের জন্য যত্ন কর। কারণ অমৃত পান করলে মৃত্যুগ্রস্ত জীবও অমর হয়।

হে দেবগণ, তোমরা ক্ষীরোদ সাগরে তৃণলতা, গুল্ম ও ওষধিসমূহ নিক্ষেপপূর্বক মন্দর পর্বতকে মন্থন দণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করে আমার সাহায্যে সমুদ্র মন্থন কর। এতে দৈত্যগণ ক্লেশভোগী ও তোমরা ফলভোগী হবে। হে দেবগণ, বলবান সহকারীর দ্বারা কোনো প্রয়োজন সাধন

করতে হলে; তাদের অনুসরণ করা আবশ্যক। অতএব অনুসরণ যা যা ইচ্ছা করবে, তোমরা তাতেই সম্মত হবে। যেহেতু সাম মার্গের দ্বারা যেরূপ অনায়াসে সকল কার্য সুসিদ্ধ হয়, ক্রোধের দ্বার সেরূপ সিদ্ধ হয় না। সমুদ্র মন্থনে কালকূট বিষ উৎপন্ন হলে তাতে ভয় করো না। আর, মন্থন করতে করতে অন্যান্য যে সকল লোভ্য বস্তু উঠবে, তার জন্য লোভ ও কামনা, কিংবা তা না পেলে ক্রোধও করবে না।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজন, স্বচ্ছন্দগতি ঈশ্বর ভগবান পুরুষোত্তম দেবতাদের এই প্রকার আদেশ করে তাদের সম্মুখেই অন্তর্ধান করলেন। ভগবান অন্তর্হিত হলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও ভব ভগবানের উদ্দেশ্যে নমস্কার করে, নিজ নিজ ধামে চলে গেলেন এবং দেবগণ দৈত্যরাজ বলির নিকট গমন করলেন। তৎকালে শত্রু দেবতাদের যুদ্ধসজ্জাহীন দেখেও বলিরাজের সেনানায়কগণ আঘাত করতে উদ্যত হলে, সন্ধি ও বিগ্রহের সময় বিষয়ে অভিজ্ঞ যশস্বী বলি তাদের নিষেধ করেছিলেন। তারপর দেবগণ অসুর সেনাপতিগণ কর্তৃক সুরক্ষিত এবং পরম সমৃদ্ধিশালী ত্রিলোকবিজয়ী বলিরাজের নিকট গমন করলেন। তাদের মধ্যে মহামতি মহেন্দ্র মনোজ্ঞ বচনে সান্ত্বনা করে বলির নিকট সমুদ্র মন্থনাদি সেই সমস্ত বিষয়ের প্রস্তাব করলেন। ভগবান পুরুষোত্তম যা যা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সেই সকল বাক্য দৈত্যরাজ বলির এবং তথায় উপস্থিত শম্বর, অরিষ্টনেমি ও স্থিরবাসী সকল দৈত্যনায়কদেরই সম্মতি হয়েছিল।

হে শত্রুনাশন, তারপর শপথপূর্বক সৌহার্দবন্ধনে আবদ্ধ সেই দেবতা ও অসুরগণ অমৃত লাভের জন্য পরম উদ্যম প্রকাশ করতে লাগলেন। পরিখের ন্যায় বিশাল বাহু, শক্তিশালী সেই দুর্মদ দেবতা ও অসুরগণ মহাপরাক্রমে মন্দর পর্বত উৎপাটনপূর্বক সিংহনাদ করতে করতে তাকে সমুদ্রের দিকে নিয়ে চললেন। কিন্তু ইন্দ্র ও বলি প্রভৃতি দেবাসুরগণ দীর্ঘপথ সেই গুরুতর ভারবহনে শ্রান্ত ও বিবশ হয়ে আর ভার বহন করতে না পারায় পথিমধ্যেই উহা পরিত্যাগ করেছিলেন। সুবর্ণময় সেই মন্দর পর্বত যখন ভূতলে পতিত হল, তার গুরুতর ভারে বহু দেবতা ও দানবদের চূর্ণ করে ভূমিশায়ী করল।

তারপর ভগবান গরুড়ধ্বজ, দেব ও দানবদের ভগ্নবাহু ও ক্ষুণ্ণমনা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং পর্বত পতনে দেব ও দানবদের নিস্পেশিত নিরীক্ষণ করে, ঈক্ষন দ্বারা সুস্থ করতঃ পুনর্জীবিত করলেন। তারপর তিনি এক হস্ত দ্বারাই অনায়াসে পর্যতটিকে গরুড়ের উপর স্থাপন করে, নিজেও তার পৃষ্ঠে আরোহন করলে ভ্রষ্ট দেবতা ও অসুরগণ কর্তৃক বেষ্টিত হয়ে ক্ষীর সমুদ্রের নিকট যাত্রা করলেন। তারপর পক্ষিরাজ গরুড়

নিজ স্কন্ধ হতে সেই পর্বতটিকে নামিয়ে জলের প্রান্তভাগে স্থাপন করলে ভগবান তাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিলেন। (গরুড় সেখানে থাকলে বাসুকির আসা সম্ভব হবে না বলেই ভগবান শ্রীহরি তাকে বিদায় দিয়েছিলেন)।

.

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমুদ্র মন্থনের বর্ণনা

শ্রীশুকদেব বললেন–হে কুরুশ্রেষ্ঠ, "সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উৎপন্ন হবে, তাতে তোমারও ভাগ থাকবে"–এরূপ বলে দেবতা ও অসুরগণ বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করে মন্দর পর্বতে বেষ্টন করলেন। পরে অমৃত লাভের জন্য অতি যত্নে হর্ষ ভরে সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করলেন (বাসুকির মুখ বিষদন্তে অতিশয় তীব্র, এজন্য কৌশলে তাই অসুরদের গ্রহণ করবার ইচ্ছায়) ভগবান শ্রীহরি প্রথমে মন্থন রজ্জুর (বাসুকির) মুখের দিক ধারণ করলেন এবং অন্যান্য দেবগণও তাই ধারণ করলেন (তা দেখে দৈত্যপতি মনে করল–উহা পৌরুষের কাজ, অতএব তারা দেবতাদের মুখের দিক ধরতে দিতে চাইল না, তারা আপত্তি করে বলল)–আমরা বেদ অধ্যয়ন ও শাস্ত্র শ্রবণসম্পন্ন, জন্ম ও কর্ম দ্বারা সর্বত্র বিখ্যাত, সর্পের পুচ্ছভাগ অমঙ্গল, আমরা উহা গ্রহণ করব না, এ বলে তারা মৌনভাবে অবস্থান করল। দৈত্যদের ঐ সকল কথা শুনে পুরুষোত্তম শ্রীহরি মৃদু হাস্য করে, দেবগণের সাথে বাসুকির অগ্রভাগ পরিত্যাগ করে পুচ্ছভাগ ধারণ করলেন! এরূপে কশ্যপানন্দন দেবতা ও অসুরগণের স্থান বিভাগ হলে, তারা অমৃত লাভের জন্য অতিশয় যত্ন সহকারে সমুদ্র মন্থন করতে লাগলেন; হে পাণ্ডুনন্দন, এইরূপে সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হলে, সেই মন্দার পর্বতটি বলশালী দেবাসুরগণ কর্তৃক এইরূপ নিজেদের পৌরুষ বিনষ্ট হলে, দেবতা ও অসুরগণের চিত্ত অতিশয় বিষাদগ্রস্ত এবং মুখোনি মলিন হয়ে গেল। অপার শক্তিশালী সত্যবত্মকল্প ভগবান শ্রীহরি তৎকালে বিঘ্নেশ্বর কর্তৃক এরূপ বিঘ্ন লক্ষ্য করে অদ্ভুত ও বৃহৎ কচ্ছপ মূর্তি ধারণ করলেন এবং সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করে পৃষ্ঠ দ্বারা পর্বতটিকে উত্তোলন করেছিলেন।

তখন দেবতা ও অসুরগণ মন্দার পর্বতকে উত্থিত হতে দেখে পুনরায় মন্থন কার্যে উদ্যত হলেন এবং অপর একটি মহাদ্বীপের ন্যায় কূর্মরূপী ভগবান লক্ষ্যযোজন বিস্তৃত নিজ পৃষ্ঠদ্বারা মন্দর পর্বতকে ধারণ করে রইলেন, হে মহারাজ, অতুলনীয় প্রভাবশালী আদি কচ্ছপমূর্তি শ্রীহরি

তৎকালে শ্রেষ্ঠ দেবতা ও অসুরগণ কর্তৃক পরিচালিত ও ঘূর্ণনরত সেই মন্দরগিরি নিজ পৃষ্ঠ ধারণ করে, তার সেই ঘূর্ণনকে নিজ অঙ্গ-কন্‌য়নের ন্যায় মনে করছিলেন।

তৎকালে ভগবান শ্রীহরি অসুরদের বলবীর্য বর্ধন করার জন্য তাদের মধ্যে অসুররূপে, দেবতাদের মধ্যে দেবরূপে এবং বাসুকির মধ্যে অবোধরূপে আবিষ্ট হলেন, অর্থাৎ তাদের দেহে অদৃশ্যভাবে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। তারপর সহস্রবাহু ভগবান শ্রীহরি দ্বিতীয় মন্দর পর্বতের ন্যায় অবস্থিত হয়ে নিজ হস্ত উপরিভাগ আক্রমণ করে রইলেন। তা দেখে স্বর্গবাসী ব্রহ্মা, শঙ্কর ও ইন্দ্রাদি সকলে স্তব ও পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

ভগবান হরি উপরে, নীচে এবং আত্মাতে অর্থাৎ দেব ও দানব মধ্যে, পর্বতে ও মন্থনরজ্জু বাসুকিতে আবিষ্ট হলে, মদ্যোকষ্ট দেব ও দানবগণ সমেধিত হয়ে মহাদ্রি মন্দর দ্বারা বেগে এ প্রকার মন্থন আরম্ভ করলেন যে, ক্ষণকালের মধ্যে জল মধ্যস্থিত কুম্ভীরসমূহ অতিশয় আকুল হয়ে উঠল, তখন নাগরাজ বাসুকির অসংখ্য নেত্র, মুখ ও নিঃশ্বাস হতে অগ্নি ও ধূম নির্গত হতে থাকলে, তার দ্বারা পৌলোম, কালেয়, বলি, ইম্বল প্রভৃতি অসুরদের তেজ পরাহত হল।

অতএব তারা শীঘ্র দাবানল দগ্ধ সরল বৃক্ষ সমূহের ন্যায় নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। বাসুকির শ্বাসাগ্নি শিখায় দেবতারাও হতভ হলেন। তাদের আনন, ভূষণ, বস্ত্র-মাল্য বর্মাদি ধূমবর্ণ হলে, ভগবানের বশীভূত মেঘসমূহ তাদের উপর জল বর্ষণ করেছিল এবং সমুদ্রতরঙ্গজাত শীতল বায়ু তাদের অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছিল। এইরূপে শ্রেষ্ঠ দেবতা ও অসুরগণ সমুদ্রমন্থন করলেও যখন সুধার উৎপত্তি হল না, তখন ভগবান শ্রীহরি নিজেই মন্থন করতে লাগলেন। যার বর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যাম, পরিধানে পীত বসন, কর্ণদ্বয়ে বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল কুণ্ডলযুগল, মস্তকে আলুলায়িত কেশরাশি। গলদেশে বনমালা, নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ, সেই শ্রীহরি মন্দর পর্বত ধারণপূর্বক, জগতের অভয়দাতা, জয়শীল নিজ চতুর্বাহু দ্বারা মন্থন করতে করতে প্রতিদ্বন্দ্বী অপর একটি পর্বতের ন্যায় শোভিত হলেন। ঐ প্রকারে সমুদ্র মথ্যমান হতে থাকলে জলমধ্যে অবস্থিত মৎস্য, মকর, কচ্ছপ, সর্প প্রভৃতি উপরে ভেসে উঠল এবং সর্বত্র জলরাশি তিমি, জলহস্তী, কুম্ভীর ও তিমিগণের দ্বারা আন্দোলিত হতে লাগল।

তখন সমুদ্র হতে প্রথমে হলাহল নামে তীব্র বিষ উত্থিত হল। তৎকালে সমুদ্রের উপরিভাগে উত্থিত ও চারিদিকে বিস্তৃত, প্রতিকারের অযোগ্য ও অসহ্য সেই বিষ দর্শন করে, লোকপালদের সাথে ত্রিলোকবাসী সকলে ভীত হল, অন্য কাউকে রক্ষক দেখতে না পেয়ে ভগবান সদাশিবের শরণাপন্ন হলেন। তৎকালে দেবদেব সদাশিব ত্রিলোকের সমৃদ্ধির জন্য

দেবী ভগবতীর সহিত কৈলাস পর্বতে অধ্যাসীন হয়ে মুনিগণের মুক্তির জন্য তাঁদের অভিমত তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। এ অবস্থায় প্রজাপতিগণ তার নিকট গিয়ে স্তুতিসহ প্রণাম করলেন।

.

সপ্তম অধ্যায়

মহাদেবের গুণকীর্তন

প্রজাপতিগণ বললেন–হে দেবদেব, হে মহাদেব, হে ভূস্মন, হে ভূতপালক, ত্রিলোক দগ্ধকারী–এই বিষ হতে শরণাগত আমাদের রক্ষা করুন। আপনিই সকল জগতের বন্ধন ও মোচনের ঈশ্বর, নিপুণ জ্ঞানীগণ, শরণাগতের আর্তিহারী পরমগুরু, আপনারই অর্চনা করে থাকেন; হে বিভো, আপনি গুণময়ী নিজ সবিস্তর দ্বারা যেমন এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন, তখন স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানময় এক আপনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব–এই তিন নাম ধারণ করেন। বস্তুতঃ আলো ব্যতীত অন্য কোন সৃজ্য বস্তু নেই,–আত্মরূপী আপনিই নানা শক্তির দ্বারা জগঞ্জপে পরিণত হয়েছেন, অতএব আপনিই ঈশ্বর। (এখানে বিষ্ণুর মহিমার দ্বারা শিবকে স্তুতি করায় হরি ও হরের অভিন্নতা দেখানো হয়েছে)।

হে ভগবন্, আপনা হতেই বেদসমূহ উৎপন্ন হয়েছে বলে আপনার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। আপনি জগতের আদি অর্থাৎ মহত এবং আপনিই সাত্ত্বিক, রজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহংকার–যে অহংকারে গুণসমূদয় হতে প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়শক্তির সৃষ্টি হয়েছে। আপনিই স্বভাব, কাল ও সংকল্প এবং সত্য ও ঋতস্ব রূপ যে ধর্ম, তাও আপনি, যেহেতু ত্রিগুণাত্মক যে প্রধান (প্রকৃতি) জ্ঞানীগণ আপনাকে তার আশ্রয় বলে থাকেন (অর্থাৎ প্রকৃতিও আপনারই আশ্রিতা)।

হে লোকভাবন, অমিল দেবগণের আত্মা সর্বদেবতাস্বরূপ অগ্নি আপনার মুখ, ক্ষিতি আপনার পাদপদ্ম, কাল আপনার গমন, দিক্ সকল আপনার বল, বরুণ আপনার রসনা এবং আপনি সর্বদেবময়। হে ভগব–আকাশে আপনার নাভি, বায়ু আপনার নিঃশ্বাস, সূর্য আপনার চক্ষু এবং জল আপনার শুক্র। আপনার অহংকার উত্তম ও অধম সকল জীবের আশ্রয়, চন্দ্র আপনার মন এবং স্বর্গ আপনার মস্তক।

হে বেদমূর্তি ভগব; সমুদ্র আপনার কুক্ষি, পর্বতসকল আপনার অস্থিসমষ্টি, সর্বপ্রকার ওষধি ও । লতারাজি আপনার রোম, বেদসমূহ আপনার সপ্ত ধাতু এবং বেদোক্ত প্রসিদ্ধ ধর্মই আপনার

হৃদয়। হে ঈশ্বর, পঞ্চউপনিষদ, অর্থাৎ তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব ও ঈশান–এই পঞ্চপ্রকার মাত্রই আপনার পঞ্চমুখ এবং তা হতেই আটত্রিশটি মন্ত্র আবির্ভূত হয়েছে। হে দেব, শিব নামক স্ব-প্রকাশ যে পরমাত্মতত্ত্ব, উহাই আপনার শান্ত অবস্থা।

হে দেব, আপনার ছায়া অধর্মেরতরঙ্গরূপী দম্ভ, লোভ প্রভৃতিতে বর্তমান রয়েছে। এ তরঙ্গরাজির দ্বারা জগতের সংহার সাধিত হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ–এই তিনগুণ আপনার তিন নেত্র। আপনি শাস্ত্রকর্তা, সাংখ্য জ্ঞানই আপনার আত্মা বা স্বরূপ। বেদরূপ পুরান ঋষি আপনার ঈক্ষণ (অর্থাৎ সৃষ্টি শতরূপে প্রসিদ্ধ)। হে প্রভু যার মধ্যে রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব–এই গুণের সংসর্গ নেই, আপনার সেই পরমজ্যোতিঃ নিখিল লোকপাল, ব্রহ্ম বিষ্ণু ও ইন্দ্রেরও অগম্য, উহা নির্ভেদ পরব্রহ্ম স্বরূপ।

হে ভগবন্, আপনি কন্দর্প, দক্ষযজ্ঞ, ত্রিপুর কালকূট প্রভৃতি বিবিধ ভূজদ্রাহির বিনাশ করেছেন; সত্য কিন্তু এই সকল কর্ম আপনার পক্ষে অতি ক্ষুদ্র বলে, উহা আপনার স্তুতির কারণ হতে পারে না, যেহেতু প্রলয়কালে আপনার নয়নাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গের দ্বারা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান স্বরচিত এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ভস্মীভূত হলেও আপনি তা লক্ষ্য করেন না অর্থাৎ আলোচনা করেন না। (এখানে কালকূট ভক্ষণ অবশ্যম্ভাবী বলে, অতীত কার্যাবলীর মধ্যে ধরা হয়েছে বিশ্বরে। হিতোপদেশকারী আত্মারাম জ্ঞানীবর্গ আপনার পাদপদ্মযুগল হৃদয়ে ধ্যান করেন এবং আপনি নিজেও কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন রয়েছেন। এ অবস্থায় যারা উমাদেবীর সহিত বিচরণকারী, আপনাকে কামুক এবং সম্মানচারী, আপনাকে ক্রুর ও হিংস্র বলে প্রলাপ করেন, সেই নির্লজ্জগণ নিশ্চয়ই আপনার লীলা জানে না। (বস্তুতঃ আত্মারাম পুরুষগণ যাঁর পাদপদ্ম ধ্যান করেন, তার কামুকত্ব এবং যিনি স্বয়ং কঠোর অপস্যারত তার ক্রুরতা ও হিংস্রতা সম্ভবপর নয়।)

হে দেব, সৎ ও অসৎ হতে ভিন্ন এবং পরমপুরুষ যে আপনি, আপনার যথার্থ স্বরূপ জানতে ব্রহ্মাদি দেবগণও সমর্থ নহেন, এতে তারা আপনার স্তুতি করতে কিরূপে সমর্থ হবে? আর, আমরা ঐ ব্রহ্মাদির সৃষ্টিমধ্যে অত্যন্ত অর্বাচীন, আমরাই বা কি প্রকারে আপনার স্তুতিকার্যে সমর্থ হব, তথাপি এই যে স্তুতি করলাম, তা আমাদের নিজশক্তির পরিমাণ অনুসারেই রচিত হল। হে মহেশ্বর, আমরা কেবল আপনার এই দৃশ্যমান প্রকট রূপই দেখছি, এছাড়া আপনার অন্য (সর্বকারণভূত সূক্ষ্ম) স্বরূপ আমরা দেখতে পাই না। তথাপি এই মূর্তি দর্শনেই আমরা কৃতার্থ হয়েছি, যেহেতু আপনার কর্ম অব্যক্ত হলেও আপনার আবির্ভাব লোকসকলের সুখনিমিত্তেই হয়ে থাকে। শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, সকল ভূতের সুহৃৎ ভগবান

সদাশিব প্রজাগণের সেরূপ বিপদ দেখে কৃপাবশতঃ অতিশয় পীড়িত হয়ে প্রিয়া সতীকে এরূপে বললেন।

শ্রীশিব বললেন–হে ভবানী, হায় কি কষ্ট, ক্ষীরোদ সমুদ্রের মন্থনে উৎপন্ন কালকূট বিষ হতে প্রজাগণের যে মহাবিপদ উপস্থিত হয়েছে, তা দেখ। এই সকল প্রজা প্রাণরক্ষার ইচ্ছায় কাতর হয়েছে, এদের অভয়দান করা আমার অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু বিপন্ন দীনগণের রক্ষাই শক্তিমান পুরুষের একমাত্র কার্য। পরমাত্মার মায়ায় মুগ্ধ প্রাণীগণ পরস্পর বৈরভাবাপন্ন হলেও কৃপালু সাধুগণ নিজের ক্ষণভঙ্গুর প্রাণের দ্বারা প্রাণীদের রক্ষা করে থাকেন। হে কল্যাণী, কৃপাকারী পুরুষের প্রতি সর্বাত্মা ভগবান শ্রীহরি প্রীত হন এবং ভগবান হরি প্রসন্ন হলে চরাচরসহ আমি প্রীতি লাভ করে থাকি। অতএব আমি এই বিষ ভক্ষণ করব, আমার প্রজাদের মঙ্গল হোক।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মরাহাজ, বিশ্বপালক ভগবান শিব ভবানীকে এরূপ বলে কালকূট বিষ ভক্ষণে প্রবৃত্ত হলেন এবং দেবী ভবানীও তার প্রভাব জানেন বলে, তার বিষভক্ষণ অনুমোদন করলেন। তারপর ভূতপালক মহাদেব প্রাণীগণের প্রতি কৃপাপূর্বক সর্বত্র বিস্তৃত সেই কালকূট বিষ নিজ করতলে গ্রহণ করে ভক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু জলের পাপ কালকূট বিষও মহাদেবকে নিজের প্রভাব দেখিয়েছিল। যেহেতু তাতে শঙ্করের কণ্ঠদেশ তৎক্ষণাৎ নীলবর্ণ হল, কিন্তু তা করুণাময় ঈশ্বরের ভূষণস্বরূপ হয়েছে। সাধু পুরুষগণ প্রায় পরের দুঃখে পীড়িত হয়ে থাকেন, পরের দুঃখবোধে প্রাণের এই যে কাতরতা, ইহা সর্বাত্মা ভগবানের পরম আরাধনাস্বরূপ। দেবাদেব ভক্তের কামনাপূরক শম্ভুর সেই বিষপানরূপে অদ্ভুত কর্ম অবগত হয়ে প্রজাগণ, দাক্ষায়ণী (সতী) ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু সকলে প্রশংসা করেছিলেন। সেই কালকূট পান করার সময় মহাদেবের হস্ত হতে যে অত্যল্পমাত্র বিষ ভূতলে পতিত হয়েছিল, বৃশ্চিক, সর্প বিষময় ঔষধিসমূহ এবং অন্যান্য বিষধর প্রাণীগণ উহা গ্রহণ করেছিল। (এর দ্বারা ঐ বিষের তীব্রতা উক্ত হল)।

.

অষ্টম অধ্যায়

সমুদ্র হতে অন্যান্য রত্নসকলের উৎপত্তি, লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব ও বিষ্ণুকে বরণ। পরে অসুরগণ অমৃতকলস হরণ করলে শ্রীভগবানের মোহিনীরূপ ধারণ।

শ্রীশুকদেব বললেন–ভগবান শঙ্কর কালকূট বিষ পান করলে দেব ও দানবগণ অতিশয় প্রীত হয়ে আবার মহাবেগে মন্থন আরম্ভ করলেন। তাতে প্রথমতঃ যজ্ঞীয় হবির আধার সুরভিধেনু উত্থিত হল। হে মহারাজ, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ব্রহ্মলোক প্রাপক যজ্ঞের উপযোগী ঘৃতের জন্য অগ্নিহোত্র সম্পাদনকারিণী সেই ধেনুটিকে গ্রহণ করলেন। তারপর চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব উত্থিত হলে দৈত্যরাজ বলি উহা পাবার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু ভগবান হরির শিক্ষানুসারে দেবরাজ ইন্দ্র তার প্রতি অভিলাষ করলেন না। এরপর ঐরাবত নামক শ্বেতবর্ণ গজরাজ গিরিশৃঙ্গতুল্য চারটি দণ্ডের দ্বারা ভগবান শঙ্করের কৈলাসপর্বতের শোভা হরণ করে সমুদ্র মধ্য হতে বহির্গত হয়েছিল। হে নৃপ, তারপর ঐরাবতাদি আটটি দিগহন্তা এবং অভ্রমূ প্রভৃতি আটটি দিহস্তিনী উত্থিত হল। তারপর মহৌষধি হতে কৌস্তভ নামক পদ্মরাগমণি উত্থিত হলে, ভগবান শ্রীহরি নিজ বক্ষঃস্থলের অলংকার করার জন্য তার প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন।

এরপর স্বর্গের ভূষণস্বরূপ পারিজাত বৃক্ষ উত্থিত হল। হে মহারাজ, আপনি যেরূপ ধরাতলে অভীষ্ট অর্থদ্বারা প্রার্থীগণের মনোরথ পূর্ণ করেন, ঐ পারিজাতও সেরূপ প্রার্থিত বস্তুর দ্বারা সর্বদা প্রার্থিগণের বাসনা পূর্ণ করে। তারপর অপ্সরাগণ উত্থিত হল। তাদের কণ্ঠদেশে স্বর্ণপদক, পরিধানে শোভন বসন। তারা মনোহর গতিভঙ্গী, বিবিধ লীলা ও বৃষ্টিপাত দ্বারা স্বর্গবাসীদের অনুরাগ উৎপাদন করেছিল। এরপর সুদামা পর্বতে আবির্ভূত বিদ্যুতের ন্যায় নিজ কান্তিদ্বারা দশদিক্ উদ্ভাসিত করে ভগবৎপরায়ণা লক্ষ্মীদেবী সাক্ষাৎ আবির্ভূত হলেন। তৎকালে তার রূপ, ঔদার্য বয়স, বর্ণ ও মহিমা দর্শনে সুর, অসুর, গণের সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হল, সুতরাং সকলেই তাকে পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র লক্ষ্মীদেবীর অভিষেকের জন্য ব্যস্ত হয়ে অদ্ভুত আসন আনয়ন করলেন। প্রধান প্রধান নদীসকল মূর্তিমতী হয়ে স্বর্ণকলস দ্বারা পবিত্র জল আহরণ করল। ভূমি অভিষেকের যোগ্য ঔষধিসকল আনয়ন করে দিল। আর গাভীসকল পঞ্চগব্য এবং বসন্ত ঋতু চৈত্র-বৈশাখোদ্ভব ফল-পুষ্প আনয়ন করল। পরে ঋষিগণ যথাবিধি তার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করলেন। তৎকালে গন্ধর্বগণ, মঙ্গলগণ, নর্তকীগণ নৃত্যগীত এবং মেঘসমূহ তুমুল ধ্বনিযুক্ত মৃদঙ্গ, প্রণব, মুরবা, অনেক গোমুখ এবং শঙ্খ, বেণু ও বীণা বাজিয়েছিল। তারপর দিগহস্তিগণ পূর্ণ কলস এবং ব্রাহ্মণগণের উচ্চারিত সূক্ত বাক্য (বৈদিক মন্ত্র) সমূহের দ্বারা পদ্মহস্তা সতী লক্ষ্মীদেবীর অভিষেক করেছিল। এ সময়ে সমুদ্র তাকে পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্রদ্বয় (অধোবসন ও উত্তরীয়) বরুণ মধুমত্ত ভ্রমরগণের আশ্রয় বৈজয়ন্তী মালা, প্রজাপতি বিশ্বকর্মা

নানারূপ বিচিত্র অলংকার, সরস্বতী হার, ব্রহ্মা পদ্ম এবং নাগসকল দুটি কুণ্ডল উপহার দিলেন।

এইরূপে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পাদনের পর সেই লক্ষ্মীদেবী নিজ হস্তদ্বারা ভ্রমরগুঞ্জিত উৎপলমালা গ্রহণ করেন, গণ্ডদ্বয়ে কুণ্ডলযুগলের শোভাযুক্ত ও সলজ্জ হাস্য বিমণ্ডিত সুরম্য মুখমণ্ডলের শোভা বিস্তারপূর্বক চলতে আরম্ভ করলেন। তৎকালে অতিকৃশোদরী লক্ষ্মীদেবী ইতস্ততঃ চন্দন ও কুঙ্কুমলিপ্ত, সুগোল, পরস্পর সংলগ্ন স্তনযুগলের শোভা ধারণ করে, মনোরম নূপুরধ্বনি বিস্তারপূর্বক ইতস্ততঃ পাদবিক্ষেপ আরম্ভ করলে, চঞ্চলা হেমলতার ন্যায় তার শোভা হল। তৎপরে তিনি আপনার নিরবদ্য আশ্রয় নিমিত্ত চারদিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন, কিন্তু যাতে নিত্য সদগুণ সকল বিরাজমান, এতাদৃশ আশ্রয় কি গন্ধর্ব, সিদ্ধ, অসুর, যক্ষ, চারণ, কি স্বর্গবাসী দেবগণ–এ সকলের মধ্যে কাকে দেখতে পেলেন না, সকলেরই একটা না একটা দোষ প্রকাশ পেতে লাগল।

তিনি বিচার করে দেখলেন–কারও তপস্যা আছে, কিন্তু তিনি ক্রোধ জয় করতে পারেন নাই (যেমন–দুর্বাসা প্রভৃতি), কারও জ্ঞান আছে, কিন্তু সেই জ্ঞান আসক্তিশূন্য নহে (যেমন–বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য প্রভৃতি)। কেহ মহত্ত্বশালী, অথচ কামজয়ী নহেন (যেমন–ব্রহ্মা, চন্দ্র প্রভৃতি)। এইরূপ কেহ বা পরের আশ্রিত, অতএব তিনি কিরূপে ঈশ্বর হতে পারেন (যেমন–ইন্দ্রাদি দেবগণ। কারও মধ্যে ধর্মানুষ্ঠান আছে, অথচ তিনি প্রাণীগণের প্রতি দয়ালু নহেন (যেমন–পরশুরাম প্রভৃতি)। কারও মধ্যে ত্যাগ আছে, অথচ তা মুক্তির কারণ নহে (যেমন–শিব প্রভৃতির)। কারও মধ্যে বীরত্ব আছে, কিন্তু তা। কালের প্রভাব হতে মুক্ত (অর্থাৎ চিরস্থায়ী) নহে (যেমন-কার্তবীর্য প্রভৃতির)। এই যিনি প্রকৃত গুণের সংসর্গ থেকে মুক্ত, তিনিও সমাধিনিষ্ঠ বলে আমার সহচর হতে পারেন না (যেমন-সনকাদি)।

কোন্ কোন্ ব্যক্তি (যেমন–মার্কণ্ডেয়াদি) চিরজীবী সত্য, কিন্তু তাদের ইন্দ্রিয়াদমনশীলতা হেতু শীল ও মঙ্গল (অর্থাৎ (ভাগ) নেই, কোন কোন ব্যক্তিতে (হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিতে) শীল ও মঙ্গল আছে, কিন্তু বিষ্ণুবিদ্বেষহেতু আয়ুর স্থিরতা নেই। এক ব্যক্তিতে (রুদ্র) শীল ও মঙ্গল এবং আয়ুর স্থিরতা কিন্তু বিষ্ণুবিদ্বেষহেতু আয়ুপ্রভৃতি অমঙ্গল আচারণ যিনি স্বভাবতঃ সু

কিন্তু এরূপ এক পুরুষ আছেন, (অর্থাৎ শ্রীমুকুন্দ) যিনি স্বভাবতঃ সুমঙ্গল এবং সর্বদোষ হতে বিমুক্ত, অথচ আত্মারাম বলে আমার আকাঙ্ক্ষা করেন না। লক্ষ্মীদেবী এরূপ বিচার করে অবশেষে ধর্মজ্ঞান প্রভৃতি একনিষ্ঠ স্থায়ী গুণসমূহের সমাবেশ হেতু নিজের একমাত্র আশ্রয় ও

সর্বোত্তমরূপে গুণনীয়, প্রকৃত গুণাতীত শ্রীহরিকেই নিজের পতিরূপে বরণ করলেন। যদিও শ্রীহরি আত্মারাম বলে কারও অপেক্ষা করেন না, তথাপি অনিমাদি সিদ্ধিসমূহ তাকে বরণ করায় ইনি লক্ষ্মীদেবীরও ঈপ্সিত হয়েছিলেন। (লক্ষ্মীদেবী মনে করলেন–ইনি নিরপেক্ষ হয়েও যেহেতু অনিমাদি সিদ্ধিসমূহকে উপেক্ষা করেন না, আমি ইহাকে আশ্রয় করলে, তেমনি আমাকেও উপেক্ষা করবেন না, তাতে আমি ইহার সেবা করে কৃতার্থ হতে পারব, অন্য প্রাকৃত দেবাদিতে কি হবে?–এরূপ বিবেচনা করে নারায়ণকেই বরণ করলেন।)।

তারপর তিনি নিজ হস্তস্থিত মত্ত ভ্রমরগণের গুঞ্জনরবে মুখরিত নূতন পদ্মপুষ্পের মনোরম মালাটি শ্রীহরির স্কন্ধদেশে সমর্পণপূর্বক নিজের আশ্রয়স্বরূপে তদীয় বক্ষঃস্থল লাভের প্রতীক্ষায় সলজ্জ হাস্যমুক্ত উফুল্ল নয়নে মৌনভাবে নিকটে অবস্থান করতে লাগলেন। তারপর ত্রিজগতের জনক শ্রীহরিও নিজ বক্ষঃস্থলকে পরম বৈভবশালিনী ত্রিলোকজননী লক্ষ্মীদেবীর স্থিরতর বাসস্থান করে দিলেন। হে রাজন, ভগবানের বক্ষঃস্থলে স্থানপ্রাপ্ত হয়ে লক্ষ্মীদেবী সকরুণ নিরীক্ষণ দ্বারা স্বীয় প্রজা ও লোকপালসমূহ ত্রিলোককে বর্ধিত করতে লাগলেন। এ সময় দেবতাদের অনুচরগণ সস্ত্রীক নৃত্য, গীত আরম্ভ করলে, তাদের শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের তুমুল ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল। আর ব্রহ্মা, রুদ্র, অঙ্গিরা প্রভৃতি বিশ্বস্রষ্টা পুরুষগণ পুষ্পবর্ষণ করতে করতে বিষ্ণুর মহিমা প্রতিপাদক যথার্থ মন্ত্র উচ্চারণ করে ভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন। লক্ষ্মীদেবীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করে প্রজাপতিগণের সাথে সকল প্রজাগণ শীলাদি গুণসম্পন্ন হয়ে পরম সুখভাগী হলেন। কিন্তু লোলুপ দৈত্য ও দানবগণ লক্ষ্মী কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ায় নিঃসত্ত্ব ও নিরুদ্যম হতে লাগল।

তারপর সমুদ্র হতে বারুণী (অর্থাৎ বরুণদেবের ভোগ্য অন্নময়া সুরা) কমলনয়না দেবকন্যারূপে আবির্ভূত হলে শ্রীহরির অনুমতিক্রমে অসুরগণ তাকে গ্রহণ করল। অনন্তর অমৃতলাভের আকাঙ্ক্ষায় দেবতা ও দানবগণ আবার সমুদ্র মন্থন করতে থাকলে তথা হতে পরম অদ্ভুত এক পুরুষ আবির্ভূত হলেন। তাঁর বাহুযুগল দীর্ঘ ও স্থূল, গ্রীবা শঙ্খের নাভির ন্যায় রেখায়যুক্ত, নয়নযুগল অরুণবর্ণ, দেহকান্তি শ্যামল, তিনি বয়সে যুবা এবং মাল্য ও সর্বপ্রকার অলংকার বিভূষিত ছিলেন। তাঁর পরিধানে পীতবসন, বক্ষঃস্থল সুপ্রশস্ত ও কর্ণদ্বয় সুমার্জিত মণিকুন্তলে অলংকৃত। কেশের প্রান্তভাগ স্নিগ্ধ, কুঞ্চিত ও শোভাবর্ধক ছিল। তার বিক্রম সিংহের তুল্য তিনি বলয়ালংকৃত হয়ে অমৃতপূর্ণ কলস ধারণ করেছিলেন। তিনি ভগবান বিষ্ণুর অংশের অংশ হতে উদ্ভূত হয়ে ধন্বন্তরি নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ইনি আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বিশারদ এবং যজ্ঞসমূহের অংশভাগী।

তৎকালে অসুরগণ তাকে এবং তাঁর হস্তস্থিত সুধাপূর্ণ কলসটি দর্শন করে, অমৃতের সমস্ত ভাগ অধিকারের লোভে সত্বর ঐ কলসটি হরণ করল। অসুরগণ অমৃতপূর্ণ কলসটি নিয়ে গেলে, দেবগণ বিষঃচিত্তে শ্রীহরির শরণাপন্ন হলেন।

ভৃত্যবাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবান শ্রীহরি তাদের এই দৈন্যদশা লক্ষ্য করে বললেন–হে দেবগণ, তোমরা খেদ করো না, আমি নিজ মায়ার দ্বারা এদের পরস্পরের মধ্যে কলহ উৎপাদন করে তোমাদের অভীষ্ট সাধন করব। হে রাজন, তার পরেই অমৃতের জন্য তৃষ্ণার্তচিত্ত সেই অসুরদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হল। তখন তারা "আমি পূর্বে পান করব, আমি পূর্বে, তুমি নও, তুমি নও–এরূপ বলতে লাগল। দৈত্যদের মধ্যে যারা দুর্বল, তারা বলপূর্বক গ্রহণে অসমর্থ হলেও, যারা অমৃতকলস অধিকার করেছে, সেই বলবান অসুরদের প্রতি মাৎসর্যবশতঃ বারবার নিষেধ করতঃ এরূপ বলতে লাগল–"এই সমুদ্রমন্থন কার্যে দেবগণও সমান পরিশ্রম ও অর্থাদি ব্যয় করেছেন, সত্রযাগে যেরূপ সকলেই সমভাবে ফলভাগী হয়, সেরূপ এস্থলেও তাদের নিজ অংশের অধিকার রয়েছে এবং ইহাই সনাতন ধর্ম।"

হে মহারাজ, এই অবসরে সকল উপায়াভিজ্ঞ ঈশ্বর ভগবান বিষ্ণু পরম আশ্চর্য অবর্ণনীয় এক স্ত্রীরূপ ধারণ করলেন। ঐ স্ত্রীরূপ দর্শনীয় উৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তার সকল অবয়ব সুন্দর, কর্ণদ্বয় সমান ও মনোহর আভরণে ভূষিত, বদনে সুকোমল কপোলদ্বয় ও সুন্দর নাসিকা। নবযৌবনবশতঃ স্তনভারে উদর অতিশয় কৃশ হয়েছিল, মুখসৌরভ দ্বারা আকৃষ্ট ভ্রমরগণের ঝঙ্কারে লোচনদ্বয় যেমন সচিকত হয়ে রয়েছিল। আর, কেশকলাপে উৎফুল্ল মল্লিকার মালা, সুন্দর গ্রীবাদেশে কণ্ঠাভরণ এবং সুরম্য ভুজদ্বয় অঙ্গদ শোভা পেয়েছিল। তার নিতম্বরূপ দ্বীপ নির্মল বসনে আচ্ছাদিত, তাতে কমণীয় কাঞ্চি আর বিচরণশীল চরণদ্বয়ে নূপুর ছিল। সেই কামিনী সলজ্জ হাস্যসহ যে ভঙ্গি করছিলেন, তার বিলাসযুক্ত অবলোকন দ্বারা মুহুর্মুহুঃ প্রধান প্রধান দৈত্যগণের চিত্তে কামোদ্দীপন হতে লাগল।

নবম অধ্যায়

মোহিত দানবগণ কর্তৃক মোহিনীমূর্তির হস্তে অমৃতভাণ্ড অর্পণ এবং দানবদের বঞ্চনা করে দেবতাদের অমৃত দান

শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন, তৎকালে পরস্পর সৌহার্দ পরিত্যাগ করে দস্যধর্মী সেই অসুরগণ একে অন্যের নিকট হতে সুধাভাণ্ড হরণ এবং পরস্পরে নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করতে করতে নিজেদের অভিমুখে সেই স্ত্রীমূর্তিকে আসতে দেখল। তারপর সেই অসুরগণ কামাতুর

হয়ে–অহো, কি মনোহর রূপ, কি চমৎকার কান্তি, কি সুন্দর নবীন বয়স–এরূপ বলে তাঁর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল–হে পদ্মপলাশাক্ষি, তুমি কে? কোথা হতে এসেছ, কি করতে ইচ্ছা করছ? তুমি কার কন্যা,–এসকল বল। হে কমোরু, তুমি আমাদের মন ক্ষুব্ধ করছ? হে সুন্দরী, আমরা জানি যে–দেব, দানব, সিদ্ধ গন্ধর্ব, চারণ, অথবা লোকপালগণ কেউ তোমাকে পূর্বে স্পর্শ করেন নাই, অতএব মনুষ্যগণ স্পর্শের সম্ভাবনা কোথায়? হে শুভ্র করুণাময় বিধাতা প্রাণীগণের সকল ইন্দ্রিয় ও চিত্তের প্রীতিবিধানের জন্যই কি তোমাকে পাঠিয়েছেন, হে ভামিনি, হে সুমধ্যমে, আমরা জ্ঞাতিগণ সকলে একই বস্তু লাভের জন্য পরস্পর বিবাদ করতঃ বদ্ধবৈর হয়েছি, তুমি আমাদের বিবাদ মিটিয়ে দিয়ে কল্যাণ কর। আমরা সকলেই কশ্যপের পুত্র বলে পরস্পর ভ্রাতা এবং সকলেই এই অমৃত লাভের জন্য বিক্রম প্রকাশ করেছি। এই অমৃত কলস নিয়ে তুমি যথোচিতভাবে ভাগ করে দাও, যাতে আমাদের মধ্যে বিবাদ না হয়।

মায়ায় স্ত্রীমূর্তিধারী ভগবান শ্রীহরি দৈত্যগণ কর্তৃক এরূপ প্রার্থিত হয়ে হাস্য করলেন এবং মনোহর কটাক্ষে নিরীক্ষণ করতে করতে এরূপ বলতে লাগলেন। শ্রীভগবান বললেন–ওহে কশ্যপনন্দনগণ, আমি পুংশ্চলী (বেশ্যা)। আমাতে তোমরা কি প্রকারে বিশ্বস্ত হলে? পণ্ডিত ব্যক্তি কখন কামিনীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন না। হে অসুরগণ, বানর ও স্বৈরিণীগণের প্রণয়কে পণ্ডিতগণ অনিত্য বলে থাকেন, যেহেতু তারা প্রত্যহ নূতন নূতন প্রণয়ীর অন্বেষণ করে থাকে।

শ্রীশুকদেব বললেন–অসুরগণ সেই মোহিনী রমণীর ঐ প্রকার সশ্লেষ পরিহাস বচনে আশ্বস্তচিত্ত হয়ে, ভাবগম্ভীর হাস্য করত তাঁর হস্তে সুধাভাণ্ড অর্পণ করল। তখন মোহিনীরূপী হরি সেই অমৃতভাণ্ড হাতে নিয়ে মৃদুহাস্যে বললেন–"আমি যা করব, তা ভালই হোক বা মন্দই হোক–তোমরা যদি স্বীকার করে নিতে পার, তবেই আমি এই অমৃত ভাগ করে দিতে পারি।" শ্রেষ্ঠ অসুরগণও সেই মোহিনীমূর্তির লীলাদির ইয়ত্তা না জেনে তার সেই কথা শুনে তৎক্ষণাৎ "তাই হোক"-বলে সম্মত হল। তারপর অসুরেরা উপবাসপূর্বক স্নান ও হবির দ্বারা অগ্নিতে হোম, গো, ব্রাহ্মণ ও ভূতসকলকে নমস্কার করল। পরে ব্রাহ্মণগণ তাদের শুভার্থে স্বস্ত্যয়ন করলেন। এরপর সকলে নিজ নিজ রুচি অনুসারে নূতন বস্ত্র পরিধানপূর্বক যথাযথভাবে অলংকৃত হয়ে পূর্বাগ্র কুশরাশির উপর উপবেশন করল। হে রাজন, যে গৃহে অমৃত বন্টন হবে, সেই গৃহ ধূপাদিতে আমোদিত ও মাল্য দীপাদিতে অলংকৃত হয়েছিল। দেব ও দাবনগণ সেই গৃহমধ্যে পূর্বমুখ হয়ে উপবেশন করলেন। পরে সেই মোহিনীমূর্তি অমৃতকলস হস্তে করে তন্মধ্যে প্রবেশ করলেন। তার উরুদ্বয় করভ-সদৃশ, শ্রোণীতট কৌশেরবস্ত্রে আচ্ছাদিত, গমন

নিতম্বভারে সমন্দ, চক্ষুদ্বয় মদবিহব্বল এবং স্তনদ্বয় কুম্ভসমান। তিনি কনকময় নূপুরে সিঞ্চন ধ্বনি বিস্তার করছিলেন।

তৎকালে তার স্তনাবরণ বস্ত্রের প্রান্তভাগ স্থলিত হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় স্বর্ণময় কুণ্ডলযুগল, মনোহর কর্ণ, নাসিকা, গণ্ডযুগল ও বদনমণ্ডলের শোভাসম্পন্না এবং লক্ষ্মীদেবীর সখীরূপা পরম দেবতা লক্ষ্মীনাম্নী সেই মোহিনীকে দর্শন করে দেবতা ও অসুরগণ তার সাহস দৃষ্টিভঙ্গীতে অতিশয় মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন। তারপর শ্রীহরি, নৃশংসজাতি অসুরগণকে সুধাদান করা, সর্পগণকে দুগ্ধদান করার ন্যায় নীতিবিরুদ্ধ–এরূপ বিচার করে তাদের সুধার ভাগ দান করলেন না। তখন তিনি দেবতা ও অসুরদের পৃথক পৃথক পংক্তি রচনা করে তাদের নিজ নিজ পংক্তিতে উপবেশন করালেন। মোহিনীমূর্তি ভগবান শ্রীহরি এ অবস্থায় সুধাভাণ্ড নিয়ে, সমাদার ও প্রিয় বাক্যালাপাদির দ্বারা দৈত্যগণকে অতিক্রম করে দূরস্থিত দেবতাগণকে জরামৃত্যুনাশক অমৃত পান করালেন।

হে মহারাজ, তৎকালে সেই মোহিনীমূর্তি দৈত্যদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করছিলেন এজন্য, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের স্বার্থে বিবাদ করা নিন্দনীয় বলে, তারা পূর্বকৃত শপথ রক্ষা করা মৌনভাবেই অবস্থান করল। বস্তুতঃ দৈত্যগণ সেই মোহিনীমূর্তির প্রতি অতিশয় প্রণয়ী হওয়ায় প্রণয়ভঙ্গের আশঙ্কায় কাতর ছিল এবং মোহিনীমূর্তিও নানাপ্রকার সমাদর প্রকাশ করে তাদের অনুরক্ত করায় তারা কোনরূপ অপ্রিয় বাক্য বলে নাই। তৎকালে অসুর রাহু দেবতার চিহ্নদ্বারা নিজের স্বরূপ গোপন করে দেবগণের পঙক্তিতে চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে প্রবেশপূর্বক অমৃত পান করলে, চন্দ্র ও সূর্য তার স্বরূপ প্রকাশ করে দেন। তখন ভগবান শ্রীহরি অমৃতপানকারী রাহুর মস্তকটি নিজের তীক্ষ্ণধার চক্রের দ্বারা ছেদন করলে তার মুণ্ডুহীন দেহটি সুধাসিক্ত না হওয়ায় ভূতলে পতিত হল। কিন্তু ছিন্ন মস্তকটি অমৃতস্পৃষ্ট হওয়ায় তা অমরত্ব প্রাপ্ত হল। পরে ব্রহ্মা তাকে গ্রহত্ব প্রদান করলেন। ঐ রাহু বৈরবুদ্ধি করে আজও পর্বে পর্বে অর্থাৎ (অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়) চন্দ্র ও সূর্যের প্রতি ধাবিত হয়ে থাকে। যা হোক, দেবগণের অমৃতপান প্রায় শেষ হলে, লোকপালক ভগবান শ্রীহরি অসুরশ্রেষ্ঠদের দৃষ্টির সম্মুখেই পুনরায় নিজ রূপ ধারণ করলেন।

হে মহারাজ, সমুদ্রমন্থনকার্যে দেবতা ও অসুরগণ উভয়েরই দেশ, কাল, হেতু (মনদরাদ্রি), অর্থ (সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত লতা ঔষধাদি) কর্ম ও বুদ্ধি যদিও সমান ছিল, তথাপি ফলোভে উভয়ের মধ্যে বৈচিত্র্য ঘটল। অমধ্যে যাঁর পাদপদ্মের রেণুর আশ্রয়হেতু দেবগণ সমুদ্রমন্থনের ফল অমৃতভোগ করেছিলেন, পক্ষান্তরে অসুরগণ তা আশ্রয় না করায় অমৃতপানে বঞ্চিত হল।

অতএব সেই শ্রীহরিই সকলের সেবনীয়। হে মহারাজ, ধন, প্রাণ, কর্মত, মন এবং বাক্যের দ্বারা দেহ ও পুত্রাদির নিমিত্ত যা কিছু করে, ভেদাশ্রয়হেতু মূল ত্যাগ করে শাখা সেচনের ন্যায় তা অসৎ (অর্থাৎ ব্যর্থ) হয়, কিন্তু ঐ সকল ধনাদির দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যা অনুষ্ঠিত হয়, তা সৎ অর্থাৎ সার্থক হয়। কারণ ঈশ্বর সর্বগত বলে তার তর্পণের দ্বারা দেহাদি সকল পদার্থেরই তৃপ্তি হয়ে থাকে। যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করলে, উহা কাণ্ড শাখা প্রভৃতি সকল অবয়বকেই সিক্ত করে, তেমনি ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম করলে, তাতে অন্যেরও প্রীতি জন্মে থাকে। (কিন্তু কেবল কাণ্ড বা শাখায় জলসেচন করলে, বৃক্ষের সকল অংশের সেচন হয় না।)

.

দশম অধ্যায়

দেব ও দানবগণের যুদ্ধ, দানবগণের মায়া অবলম্বন এবং ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাব তার নিরসন

শ্রীশুকদেব বললেন– হে রাজ, দৈত্যগণ মন্থনকার্যে নিযুক্ত এবং যত্নবান হয়েও বাসুদেব পরাঙ্খ হওয়ায় অমৃতলাভে বঞ্চিত হল। ভগবান বিষ্ণু অনুগত দেবতাদের তা পান করিয়ে সকলের দৃষ্টির সম্মুখেই গরুড়বাহনে নিজ ধামে প্রস্থান করলেন। তখন সেই দৈত্যগণ শত্রুগণের পরম সমৃদ্ধিদর্শনে অসহিষ্ণু হয়ে, অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্বক দেবতাদের প্রতি যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন। তারপর সুধাপানে শক্তিসমৃদ্ধ এবং শ্রীহরির পদাশ্রিত সেই দেবগণ সকলে মিলিত হয়ে অস্ত্র-শস্ত্রদ্বারা অসুরদের বিরুদ্ধে সমরে প্রবৃত্ত হলেন। এইরূপে ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে উভয় পক্ষের মধ্যে রোমাঞ্চকর তুমুল সংগ্রাম হয়েছিল। ঐ যুদ্ধ “দেবাসুর যুদ্ধ নামে সুপ্রসিদ্ধ।” সেই যুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন ও ক্রুদ্ধচিত্ত দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর নিকটে গিয়ে খঙ্গ, বাণ ও অন্যান্য নানা অস্ত্রের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করতে লাগল। সেই স্থানে শঙ্খ, তুর্য, মৃদঙ্গ ভেরী এবং ডমরু বাদ্যে, তথা হস্তী অশ্ব, রথ ও পদাতির শব্দে অতিশয় কোলাহল হল। তারপর সেখানে রথীগণের সাথে, পদাতিকগণ পদাতিকগণের সাথে, অশ্বগণ অশ্বগণের সাথে এবং হস্তিগণ হস্তিগণের সাথে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিল।

হে মহারাজ, দেবতা ও অসুর ওই উভয়পক্ষের সৈন্যগণের মধ্যে কতক যোদ্ধা উষ্ট্র দ্বারা, কতক সেনা হস্তির দ্বারা, আবার অপর সৈন্য গর্দভ দ্বারা প্রতিযোদ্ধার দিকে ধাবমান হল। কোন কোন যোদ্ধা গৌরমুখ (বানর বিশেষ), কেহ কেহ ভল্লুক, কেহ কেহ ব্যাঘ্র, কেহ কেহ বানর, কেহ কেহ বা গৃধ্র কঙ্ক, বক, শ্যেন ও ভাস, কেহ কেহ তিমঙ্গিল (জলজন্তু বিশেষ), শরভ,

মহিষ, গণ্ডার, বৃষ, গবয়, শৃগাল, মূষিক, কৃকলাস, শশক, মানুষ, ছাগল, কৃষ্ণসার, হংস ও শূকর নিয়ে যুদ্ধ করেছিল। আবার কতগুলি যোদ্ধা জলচর ও স্থলচর পক্ষিগণ এবং বিকৃতদেহ অন্যান্য প্রাণীগণের সহিত উভয় পক্ষের সৈন্যগণের অগ্রভাগে প্রবেশ করেছিল।

হে মহারাজ, তৎকালে জলজন্তুগণের দ্বারা বিশেষ শোভাপ্রাপ্ত দুটি সমুদ্রের ন্যায় দেবতা ও অসুর পক্ষীর বাহিনী দুটি ও পতাকার বিচিত্র বস্ত্র, শুভ্র নির্মল ছত্র মহামূল্যে হীরক দন্ডযুক্ত ময়ূরপুচ্ছ– রচিত ও চমরীপুচ্ছ রচিত ব্যজন বায়সঞ্চালিত উত্তরীয় বস্ত্র, উষ্ণীয়, সূর্যকিরণ সংস্পর্শে সমুজ্জল বর্ণ, বিবিধ ভূষণ, সমুজ্জ্বল শাস্ত্রসমূহ এবং বীরগণের বিশেষ শোভা ধারণ করেছিল। হে রাজ, বিরোচনের পুত্র মহারাজ বলি ঐ সময় অসুরদের সেনাপতি ছিলেন, তিনি বৈহায়াস নামক আকাশযানে আরোহণ করেন। উদয়গিরির শিখরস্থ চন্দ্রের মত দীপ্তি পেতে লাগলেন। বলির ঐ যান ময়দানবের নির্মিত, উহা কামগ এবং সমগ্র সাংগ্রমিক সামগ্রী পরিপূর্ণ ছিল। সেই যান আশ্চর্যময়, উহা কি বস্তু, কেউ তর্কের দ্বার নিশ্চয় করতে পারত না, তা কখনো দৃশ্য, কখনো বা অদৃশ্য হত। বলিরাজ উক্ত বিমানে উপবিষ্ট হয়ে সেনাপতিগণ কর্তৃক পবিত্র অবস্থায় চামরব্যজন ও উত্তম রাজত্রে সুশোভিত হয়েছিলেন।

তৎকালে নমুচি, শম্বর, বান, বিপ্রচিত্ত, আয়োমুখ, দ্বিমূর্ধা, কালেনাভ, প্রহেতি, হেতি, ইশ্বল, শকুনি, ভূতসন্তাপ, বজ্রদংষ্ট্র, বিরোচন, হরগ্রীব, শহকুশিরা, কপিল, মেঘদুন্দুভি, তরিক, চন্দ্র, শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, উৎকল, আবিষ্ট, অরিষ্টন্মেময়, ত্রিপুরাধিপ এবং পেছলাম, কালেয় ও নিবাতকবচ প্রভৃতি অন্যান্য যুথাপতি অসুরগণ যথোচিত যানে আরোহণ করে বলিরাজের চারিদিকে অবস্থান করছিল। এরা সকলেই সমুদ্র মন্থনের ক্লেশতভাগ করেছিল, কিন্তু অমৃতের ভাগ পায় নি। এরা সংগ্রামের উপক্রমেই অনেক দেবতাদের পরাজিত করে সিংহনাদ সহকারে প্রচণ্ড শব্দযুক্ত শঙ্খবাদ্য করেছিল। এ সময় দেবরাজ ইন্দ্র ঐ সকল গর্বিত শত্রুদের দেখে অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি ঐরাবত নামক দিকুহস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করে প্রস্রবণ ধারাযুক্ত উদয় পর্বতের উপরিস্থিত সূর্যের ন্যায় শোভা পেতে লাগলেন। তখন বিবিধ বাহন, ধ্বজ ও অস্ত্রধারী দেবগণ এবং নিজ নিজ গণের সাথে বায়ু, অগ্নি ও বরুণ প্রভৃতি লোকপালগণ ইন্দ্রের চারদিকে অবস্থান করলেন। দ্বন্দ্বযোদ্ধা দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর অভিমুখী হয়ে নাম উচ্চারণপূর্বক পরস্পরকে আহ্বান ও তিরস্কার করতে করতে সম্মুখে গিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল।

ইন্দ্রের সহিত বলি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল, তারকাসুরের সঙ্গে কার্তিকেয়ের সমর হল, হেতির সহিত বরুণ যুদ্ধ করলেন, প্রহেতির সঙ্গে মিত্রের সংগ্রাম হল, এইরূপ কালনাভের সাথে যম, ময়ের

সাথে বিশ্বকর্মা, ত্বষ্টার সাথে শম্বর, বিরোচনের সাথে সবিতা, অপরাজিতের সাথে নমুচি, বৃস্পবার সাথে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বান প্রমুখ একশত বলিপুত্রের সহিত সূর্যদেব, রাহুর সাথে চন্দ্র, পুলোমার সাথে বায়ু, নিশুম্ভ ও শুম্ভের সাথে প্রচণ্ডবেগা দেবী ভদ্রকালী, জম্ভের সাথে বৃপি (বিষ্ণু), মহিষাসুরের সাথে অগ্নি, কামদেবের সাথে দুম, মাতৃগণের সাথে উৎকল, শুক্রাচার্যের সাথে বৃহস্পতি, নরকাসুরের সাথে শনি, নিবাতকবচগণের সাথে মরুদগণ, কালকেয়গণের সাথে বসুগণ, পৌলমগণের সাথে বিশ্বেদেবগণ এবং ক্রোধবশগণের সাথে রুদ্রগণ যুদ্ধ করেছিলেন।

এইরূপে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অসুর ও দেবগণ দ্বন্দভাবে অর্থাৎ দুজন দুজন মিলিত হয়ে যুদ্ধ করতে করতে জয়লাভের আকাঙ্ক্ষায় পরস্পরকে আক্রমণপূর্বক প্রবল শক্তি সহকারে তীক্ষ্ণ বাণ, খঙ্গ ও গদার দ্বারা আঘাত করতে লাগল। এরূপে তারা ভুশুন্ডি, চক্র, গদা, ঋষ্টি, পটিশ, শক্তি, উন্মুক, প্রাস, কুঠার, ত্রিস্ত্রিংশ, ভল্ল, পরিখ, মুদগর ও ভিন্দিপাল দ্বারা পরস্পর শিরচ্ছেদ করেছিল। হস্তী, অশ্বরথ, পদাতিক ও আরোহীগণের সাথে অন্যান্য বাহনগণ অস্ত্রাঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। উভয়পক্ষের বীরগণেরই বাহু, গ্রীবা ও পদ এবং ধ্বজ, ধনু, বর্ম ও ভূষণসমূহ ছিন্ন হয়েছিল। তৎকালে দেবতা ও অসুরদের পদাঘাত ও রথচক্র দ্বারা রণক্ষেত্রের মৃত্তিকা চূর্ণ-বিচূর্ণ হলে, সেখান থেকে উত্থিত রেণুসমূহ ক্রমশঃ দিগমণ্ডল, আকাশ ও সূর্যকে আচ্ছন্ন করে, পরে যোদ্ধৃগণের রক্তস্রাবে সিক্ত হওয়ায় উত্থানে বাধা পেয়ে নিবৃত্ত হয়েছিল। সেই রণভূমি ভূরি ভূরি যোদ্ধার ভূষণে ভূষিত, ছিন্ন ভুজে, করভসদৃশ ঊরুতে এবং সমুকুট মস্তকে আচ্ছন্ন হয়ে বিচিত্র আকার ধারণ করেছিল। ঐ সকল ছিন্ন মুণ্ডু তদবস্থায়ও দন্তসকল দ্বারা ওষ্ঠভাগ দংশন করছিল, তাদের নয়নে ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছিল এবং ঐ সকল মুণ্ডের মুকুট ও কুণ্ডল স্থানচ্যুত হয়েছিল। তারপর উভয়পক্ষের মৃত সৈন্যদের কবন্ধ (মস্তকহীন দেহসকল) ভূপতিত নিজ নিজ মুণ্ডস্থিত নেত্রদ্বারা দর্শন করতে করতে উদ্যত অস্ত্রদারী বিশাল বাহুসমূহ উত্তোলন পূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষের সৈন্যগণের প্রতি ধাবিত হতে লাগল।

তারপর দৈত্যরাজ বলি দশটি বাণে ইন্দ্রকে, তিনটি বাণে ঐরাবত হস্তীকে, চারটি বাণে ঐরাবতের পারক্ষক চারটিকে এবং একটি বাণে হস্তীর মাহুতকে বিদ্ধ করল। কিন্তু ঐ সকল বাণ লক্ষ্যস্থলে আসার পূর্বেই দেবরাজ ইন্দ্র তৎসংখ্যক (আঠারোটি) ভল্লাস্ত্রের দ্বারা ত্বরিতবিক্রমে আগমনপথেই ঐ বাণগুলিকে হাসতে হাসতে যেন ছেদন করেছিলেন। দেবেন্দ্রের এই প্রশংসনীয় কর্ম দেখে বলি ঈর্ষায় অসহিষ্ণু হলেন, তৎক্ষণাৎ ক্রোধে শক্তি গ্রহণ করলেন কিন্তু সেই শক্তি তার হস্তে থেকে মহতী উল্কার ন্যায় যখন জ্বলছিল, সেই সময়েই ইন্দ্র নিজ

শস্ত্রদ্বারা ছিন্ন করে ফেললেন। বলি তারপর শূল, ত্রাস, যষ্টি যা যা গ্রহণ করতে লাগল, দেবরাজ সে সকলই ছিন্ন করে ফেললেন। তারপর ঐ অসুর সহসা অন্তর্হিত হয় আসুরী মায়া সৃষ্টি করল, তাতে সুরসৈন্যদের উপরে হঠাৎ বৃহদাকার একটা পর্বত প্রাদুর্ভূত হল। তারপর দাবানলে প্রজ্বলিত বৃক্ষ সকল পড়তে লাগল এবং পাষাণছেদক অস্ত্রের ন্যায় তীক্ষাগ্র শিলাখণ্ড পতিত হয়ে দেবসৈন্যদের চূর্ণ করতে লাগল। এরপর মহাসর্প (অজগর প্রভৃতি), দন্দক (বিষধর সর্প), বৃশ্চিক, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ এবং বৃহৎ বৃহৎ হস্তিগণ এসে দেবসৈন্যদের বিদলিত করছিল। এরপর শত শত নগ্নমূর্তি রাক্ষস ও রাক্ষসী শূল হস্তে "মার মার, কাটু কাটু" এমন করতে করতে দেবতাদের নিকট উপস্থিত হল।

এরপর আকাশমণ্ডলে গম্ভীর ও কঠোর শব্দকারী অতি গাঢ় মেঘরাশি উদিত হয়ে বায়ুর আঘাতে অঙ্গাররাশি বর্ষণ করতে আরম্ভ করল। তারপর মহাসুর বলি মায়াযোগে যে অগ্নির সৃষ্টি করল যার সারথি বায়ু, তা প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় উগ্রমূর্তি ধারণ করে দেবসেনাদের দগ্ধ করতে লাগল। তারপর দেবসৈন্যগণের চারদিকে উদ্বেল সমুদ্রের আবির্ভাব হল এবং প্রবল বায়ুরাশির আঘাতে ক্ষুব্ধ, হয়ে তরঙ্গ ও আবর্ত (ঘূর্ণী) সমূহের দ্বারা ভয়ংকর রূপ ধারণ করল। এইরূপে রণক্ষেত্রে অলক্ষ্যগতি মহামায়াবী দৈত্যগণ বিবিধ মায়া সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলে দেবসৈন্যগণ বিষণ্ন হয়ে পড়ল। হে মহারাজ, ইন্দ্রাদি দেবগণ যখন চিন্তা করে এই সকল মায়ার কোনরূপ প্রতিকারের উপায় দেখতে পেলেন না, তখন বিশ্বপালক ভগবান শ্রীহরির ধ্যান করায় তিনি সেখানে প্রাদুর্ভূত হলেন।

তারপর যাঁর পরিধানে পীতবস্ত্র, নয়নযুগল নবপ্রস্ফুটিত কমলসদৃশ, বক্ষঃস্থলে উজ্জ্বল শ্রী ও কৌস্তভ মণি, মস্তকে মহামূল্য কিরীট, নিজ হস্তে অষ্ট প্রকার অস্ত্র ধারণপূর্বক সকলের দৃষ্টিগোচর হলেন। হে মহারাজ, জাগরণ অবস্থা উপস্থিত হলে, স্বপ্ন যেমন লয় হয়ে যায়, তেমনি মহাপ্রভাবশালী ভগবান শ্রীহরির রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র তার মহিমায় অসুরদের কূটমন্ত্রাদি জনিত সমস্ত মায়া বিনষ্ট হল। কারণ হরিস্মৃতিই সকল বিপদের বিনাশক। সিংহবাহন কলেনেমি গরুড়বাহন শ্রীহরিকে দেখেই একটি শূল ঘূর্ণিত করে তার দিকে নিক্ষেপ করল। ঐ শূলটি গরুড়ের মস্তকে পতনোন্মুখ হলে ত্রিগুণাধীশ ভগবান শ্রীহরি অবলীলাক্রমে তা ধারণ করে, তা দিয়েই বাহনের সঙ্গে শত্রু কালনেমির প্রাণসংহার করলেন। তারপর মহাবলশালী মালী ও সুমালী শ্রীহরির চক্রাঘাতে ছিন্নমুণ্ড হয় যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হলে, মাল্যবান, প্রচণ্ড গদার দ্বারা তাদেরকে করে গরুড়কে আঘাত করা মাত্রই আদিপুরুষ শ্রীহরি চক্রদ্বারা সেই গর্জনকারী শত্রুর মুণ্ডছেদন করলেন।

.

একাদশ অধ্যায়

দৈত্যরাজ বলির পরাজয়, দৈত্যদের বিনাশ, নারদের বাক্যে। যুদ্ধ সমাপ্তি এবং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য কর্তৃক মৃত দানবদের পুনর্জীবন

শ্রীশুকদেব বললেন–তারপর ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবগণ পরমপুরুষ ভগবানের অনুকম্পায় চৈতন্য লাভ করে, পূর্বে যারা তাদের যুদ্ধে আঘাত করেছিল, সেই সকল অসুরদের প্রচণ্ড আঘাত করতে লাগলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বিরোচনপুত্র বলির প্রতি বত্র উত্তোলন করলেন, তখন প্রত্যেকে হাহাকার করে উঠল। দৈত্যরাজ বলি অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হয়ে রণক্ষেত্রে বিচরণ করছিলেন। ইন্দ্র বজ্রহস্ত হয়ে সম্মুখস্থিত সেই শত্রুকে তিরস্কারপূর্বক এরূপ বলতে লাগলেন- হে মূঢ় কপটবৃত্তি দস্যু যেমন বালকদের চক্ষু আবদ্ধ করতঃ তাদের জয় করে তাদের ধন-সম্পত্তি হরণ করে, তেমনি তুমিও মায়াসমূহের দ্বারা মায়ার অধীশ্বর আমাদের জয় করতে ইচ্ছা করছ। আর, আমার প্রভাব শ্রবণ কর–যারা মায়ার দ্বারা স্বর্গে আরোহণ করতে ইচ্ছা করে, কিংবা স্বর্গ অতিক্রম করে মুক্তিপদ লাভে ইচ্ছুক হয়, আমি সেই মূঢ় দস্যগণকে তাদের পূর্বপদ অপেক্ষাও নিম্ন স্থানে নিক্ষেপ করে থাকি। হে দৈত্যপতিগণ, আমি সম্প্রতি শতপর্বযুক্ত এই বজ্রের দ্বারা তোমার শিরচ্ছেদ করছি, তুমি জ্ঞাতিগণের স্বার্থে এর প্রতিকারের চেষ্টা কর।

বলি বললেন– হে দেবরাজ, এত গর্ব করছ কেন? যে সকল ব্যক্তি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তারা কালপ্রেরিত, তাদেরই ক্রমানুসারে বিজয় ও কীর্তি এবং পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে থাকে। পণ্ডিতগণ এই জগৎকে কাল-নিয়ন্ত্রিত বলেই মনে করেন। অতএব তারা হর্ষ বা শোক করেন না, কিন্তু তোমরা এ বিষয়ে অজ্ঞ। এই জয়-পরাজয় বিষয়ে তোমরা নিজেকেই কারণ মনে করো বলে তোমরা বস্তুতই শোকের পাত্র, অতএব তোমাদের মর্মপীড়াজনক বাক্য আমি গ্রাহ্য করিনা। শ্রীশুকদেব বললেন– হে মহারাজ, বীরমদন বলি এভাবে দেবেন্দ্রকে তিরস্কার করে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করল। দেবরাজ তার তিরস্কারেই আহত হয়েছিলেন, নারাচ আঘাতে আবার আহত হলেন। যদিও দেবেন্দ্র ঐ প্রকারে যথার্থবাদী বৈরি কর্তৃক নিরাকৃত হলেন, তথাপি অঙ্কুশাহত হস্তীর মত ঐ দানবের তিরস্কার সহ্য করতে পারলেন না। তারপর শত্রুদমনকারী ইন্দ্র আমোঘ বজ্র দিয়ে তার উপর প্রহার করলেন, তাতে সেই দানব ছিন্নপক্ষ পর্বতের ন্যায় বিমানসহিত ভূমিতলে পতিত হল।

তখন বলির সখা ও সুহৃৎ জম্ভাসুর নিজ সখার পতন লক্ষ্য করে মৃত সখার সৌহাদ্য রক্ষার জন্য ইন্দ্রের দিকে অগ্রসর হল। তারপর সিংহবাহন মহাবল জম্ভাসুর নিকটে এসে মহাবেগে গদা উত্তোলনপূর্বক ইন্দ্র ও ঐরাবতের জত্রে (স্কন্ধ ও বক্ষের সন্ধিস্থলে) আঘাত করল। ঐরাবত ঐ গদার প্রহারে পীড়িত ও বিহ্বল হয়ে জানুদ্বয় দ্বারা ভূমি স্পর্শ করে অচেতন হল। তা দেখে ইন্দ্রসারথি মাতলি সহস্র অশ্বযুক্ত রথ নিয়ে এলে, ইন্দ্র ঐরাবতকে পরিত্যাগ করে রথে আরোহণ করলেন। দানবশ্রেষ্ঠ জম্ভ ইন্দ্রসারথির ঐ কর্ম দেখে প্রশংসা করতে লাগল, কিন্তু পরক্ষণেই গর্বপ্রকাশপূর্বক সমরক্ষেত্রে জ্বলন্ত শূলদ্বারা মাতলিকে প্রহার করল। মাতলি ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক সেই দুঃসহ পীড়া সহ্য করলে, ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বজ্রদ্বারা জম্ভাসুরের মুণ্ড কেটে ফেললেন।

তৎকালে জম্ভাসুরের জ্ঞাতি নমুচি, বল ও পাক নামক অসুরত্রয় দেবর্ষি নারদের মুখ হতে জম্ভাসুরের নিধনবার্তা শ্রবণ করে সত্বর সেখানে উপস্থিত হল। তারা কর্কশ বাক্যে প্রথমতঃ ইন্দ্রের মর্মস্থল পীড়িত করল, তারপর মেঘমালা যেমন বারিধারার দ্বারা পর্বতের চারদিক আচ্ছন্ন করে, তেমনি বাণ-বর্ষণের দ্বারা দেবরাজকে আচ্ছন্ন করল। তারপর বল নামক অসুর দ্রুতহস্তে একসহস্র বাণদ্বারা একসঙ্গেই যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রের রথের এক সহস্র অশ্বকে আহত করল। পাক নামক অসুর দুইশত বাণ একবারেই ধনুকে যোজনা ও নিক্ষেপপূর্বক পৃথকভাবে সারথি মাতলি এবং অবয়বসহ রথটিকে আঘাত করলে সংগ্রামে এই কার্যটি আশ্চর্যজনক হয়েছিল। এ সময়ে নমুচি পশ্চাদভাগে স্বর্ণবদ্ধ পনেরোটি বৃহৎ বাণ দ্বারা ইন্দ্রকে আহত করে রণক্ষেত্রে সজল মেঘের ন্যায় গর্জন করছিল। মেঘরাশি যেরূপ বর্ষাকালীন সূর্যকে চারদিকে আচ্ছন্ন করে, সেরূপ অসুরগণও বাণরাশির দ্বারা ইন্দ্র, তার সারথি মাতলি এবং তার রথকে আচ্ছাদিত করল।

সমুদ্রমধ্যে নৌকাভঙ্গ হলে বণিকগণ যেমন কাতর হয়, তেমনি দেবগণ ইন্দ্রকে দেখতে না পেয়ে অনুচরবর্গের সহিত বিহ্বল হয়ে চীৎকার করতে লাগলেন। তাদের মনে হল আমরা নায়কশূন্য হয়ে শত্রুহস্তে পড়লাম। তারপর ইন্দ্র অসুরদের বাণাবদ্ধ পঞ্জর হতে ধ্বজা, রথ, অশ্ব ও সারথির সাথে নির্গত হয়ে নিশাপগমে উদিত সূর্যের ন্যায় নিজ তেজদ্বারা দিগমণ্ডল, আকাশ ও পৃথিবী উজ্জ্বল করে শোভা পেতে লাগলেন। তৎকালে তিনি নিজ সেনাদলকে সংগ্রামে শত্রুগণ কর্তৃক পীড়িত দেখে শত্রুবধের জন্য ক্রোধে বজ্র উত্তোলন করলেন। হে রাজন, তারপর তিনি অষ্ট ধারামুক্ত সেই বজ্র দ্বারাই দর্শনকারী জ্ঞাতিগণের ভয় উৎপাদন পূর্বক তাদের সম্মুখেই বল ও পাক নামক অসুরদ্বয়ের শিরচ্ছেদন করলেন। তাদের বিনাশ দেখে দানব নমুচি শোক, অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধযুক্ত হয়ে ইন্দ্রকে বধের জন্য প্রতিজ্ঞা করে

অত্যন্ত যত্ন করতে লাগল। সে ঘণ্টাযুক্ত এবং হেমভূষণে ভূষিত লৌহময় শূল গ্রহণ করে ক্রোধভরে "আর হত হলি"–এরূপ বলে তর্জন করতে করতে দেবরাজের প্রতি সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করল।

হে নৃপ, তখন ত্রিদশধিপতি ইন্দ্র আকাশমার্গে আগত সেই মহাবেগবান্ শূলটিকে বাণ সমূহের দ্বারা সহস্রভাবে ছেদন করে ক্রোধভরে নমুচির শিরচ্ছেদের জন্য তার গ্রীবাদেশে বজ্রের দ্বারা আঘাত করলেন। কিন্তু ইন্দ্র কর্তৃক মহাবলে নিক্ষিপ্ত হয়েও সেই তেজস্বী বজ্র নমুচির চর্মমাত্রও ভেদ করতে পারল না। যে বজ্র অতিবীর্য বৃত্রাসুরকে বিদীর্ণ করে, তা যে নমুচির স্কন্ধের চর্মে কেন কুণ্ঠিত হল, এটা পরম আশ্চর্যের বিষয়। হে রাজ, বজ্র যার নিকট হতে প্রতিহত হয়ে আসত, দেবরাজ তাকে অতিশয় ভয় করতেন; অতএব ঐ ব্যাপার অবলোকন করে সুরপতি বিস্ময়চিত্তে নিজে নিজেই বলতে লাগলেন–দৈবযোগে লোকবিমোহন এ কি ঘটল? পুরাকালে পর্বতসমূহ পক্ষ দ্বারা বিচরণপূর্বক অতিশয় ভারের সহিত ভূতলে পতিত হলে অনেক প্রজানাশ হত বলে, আমি এই বজ্রদ্বারাই তাদের পক্ষচ্ছেদন করেছিলাম। ত্বষ্টার তপস্যার সারস্বরূপ বৃত্রাসুর যাতে বিপাটিত হয়েছে এবং অন্যান্য যে সকল বলবান শুরের চর্ম কোনপ্রকার শস্ত্রে ক্ষত হয় নাই, তারাও যার দ্বারা বিদারিত হয়েছে, সেই এই বজ্র, আজ এই ক্ষুদ্র অসুরের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিহত হল? অতএব আর লগুড়তুল্য নগণ্য এই বজ্র ধারণ করব না। অহো, সম্প্রতি দধীচির তেজ (অর্থাৎ সামর্থ্যও) নিষ্ফল হল।

ইন্দ্র ওইরূপে বিষাদগ্রস্থ হলে, তাঁকে লক্ষ্য করে এরূপ দৈববাণী উচ্চারিত হয়েছিল–হে দেবরাজ, এই দানব শুষ্ক অথবা আর্দ্র কোন বস্তুর দ্বারা বধযোগ্য নহে। কারণ আমি ইহাকে এরূপ বরদান করছি যে, আর্দ্র বা শুষ্ক পদার্থ দ্বারা এর মৃত্যু সংঘটিত হবে না। অতএব হে ইন্দ্র, এই শত্রুর বধের জন্য তোমাকে অন্য কোন উপায় চিন্তা করতে হবে। তখন ইন্দ্র সেই দৈববাণী শ্রবণ করে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করতে করতে ফেনাকেই অভীষ্ট উপায়রূপে প্রাপ্ত হলেন–যা কেবল আর্দ্র বা কেবল শুষ্ক না হয়ে আর্দ্র-শুষ্ক উভয়াত্মক। তারপর তিনি শুষ্কও নহে, আর্দ্রও নহে– এরূপ সমুদ্র ফেনার দ্বারা নমুচির শিরচ্ছেদ করলে, মুনিগণ তার স্তব করে পুষ্পবর্ষণ করেছিলেন। তখন বিশ্বাবসু ও পরাবসু নামে প্রধান গন্ধর্বদ্বয় গান করতে লাগল, দেবতাদের দুন্দুভি বাদিত হল এবং নর্তকীসকল আহ্লাদে নৃত্য আরম্ভ করল।

হে মহারাজ, সিংহগণ যেমন মৃগগণকে সংহার করে, তৎকালে বায়ু, অগ্নি ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণও তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরদের সংহারে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু সেই সময় ব্রহ্মার নির্দেশে দেবর্ষি নারদ দেবতাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং দানবক্ষয় দর্শন করে তাদের নিবারণ

করলেন। নারদ বললেন–অহে দেবেন্দ্র, তোমরা ভগবান নারায়ণের ভুজবল আশ্রয় করে অমৃত লাভ করেছ এবং সকলেই লক্ষ্মীদেবীর অনুগ্রহে সমৃদ্ধিশালী হয়েছ, অতএব যুদ্ধ হতে বিরত হও।

. শ্রীশুকদেব বললেন–দেবর্ষির বাক্য মান্য করে দেবগণ নিজ নিজ ক্রোধ সম্বরণ করলেন এবং অনুচরগণ কর্তৃক সংস্তুত হয়ে স্বর্গরাজ্যে গমন করলেন। রণক্ষেত্রে দানবদের যে সকল দৈত্য অবশিষ্ট ছিল, তারা নারদের অনুমতিক্রমে বিপন্ন বলিকে নিয়ে অস্ত পর্বতে প্রস্থান করলেন। হে রাজন, রণাঙ্গনে পতিত যে যে দানবের অবয়ব একেবারে বিনষ্ট হয় নাই এবং যাদের মস্তক বিদ্যমান ছিল, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য নিজ সঞ্জীবনী বিদ্যার দ্বারা তাদের পুনর্জীবিত করলেন। অসুররাজ বলিও শুক্রাচার্যের করস্পর্শে পুনরায় ইন্দ্রিয় ও স্মরণশক্তি প্রাপ্ত হলেন এবং তিনি লোকতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন বলে পরাজয় সত্ত্বেও বিষাদগ্রস্ত হন নাই।

.

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীহরির মোহিনীরূপ দেখে শঙ্করের মোহ

শ্রীশুকদেব, বললেন–হে মহারাজ, ভগবান শ্রীহরি রমণীমূর্তি ধারণপূর্বক দানবদের মোহিত করে দেবগণকে অমৃত পান করিয়েছিলেন–এই ঘটনা শ্রবণ করে বৃষধ্বজ মহাদেব বৃষে আরোহণ করতঃ নিজ অনুচরসকল ভূতগণে পরিবৃত হয়ে দেবীর সাথে সেখানে গেলেন, যেখানে ভগবান মধুসূদন অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান শ্রীহরি উমার সাথে শংকরকে সাদরে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলে,ভগবান শংকরও উপবেশনপূর্বক শ্রীহরির পূজা করে সহাস্যে এরূপ বলতে লাগলেন। শ্রীমহাদেব বললেন–হে দেবদেবী, হে বিশ্বব্যাপক, হে জগদীশ, হে জগন্ময়, আপনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল পদার্থের আত্মস্বরূপ (উপাদান), হেতু (নিমিত্তকরণ) এবং ঈশ্বর অর্থাৎ পালক, নিয়াকম ও সংহার কর্তা)। আপনি জগন্ময় হলেও জগতের ন্যায় অসত্য ও জড় বস্তু নহেন, যেহেতু– যে ব্রহ্ম হতে এই জগতের আদি, অন্ত ও মধ্য অবস্থা (অর্থাৎ সৃষ্টি, লয় ও স্থিতি) সাধিত হয়, অথচ যিনি অব্যয় বলে স্বয়ং সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়রহিত এবং যিনি “ইদং– শব্দের বাচ্য দৃশ্য প্রপঞ্চস্বরূপ হয়েও অহংকারের আশ্রয় দ্রষ্টা পদার্থ এবং যিনি বাহিরে ভোগ্য বস্তুরূপে প্রকাশমান, অথচ অন্তরে ভোক্তা বলে প্রসিদ্ধ, আপনি সেই সৎ

ও চিৎস্বরূপ, ব্রহ্ম। শ্রেয়স্কামী মুমুক্ষু মুনিগণ নিষ্কাম হয়ে ইহলোক ও পরলোকের আসক্তি পরিহারপূর্বক আপনারই পাদপদ্মের উপাসনা করেন।

হে ভগবান, যদিও আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, তথাপি উদাসীন নহেন। আপনি এই জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ এবং প্রপঞ্চোপধি জীবসকলের ঈশ্বর (অর্থাৎ তত্ত্ব ফলদাতা)। রাজা যেরূপ, প্রজাগণের নিকট হতে কর প্রভৃতি লাভের অপেক্ষা করেন, আপনি সেরূপ জীবগণের নিকট হতে কোন বস্তু লাভের অপেক্ষা করেন না, যেহেতু আপনি নিরপেক্ষ। জীবগণই বিভিন্ন ফলোভের জন্য আপনার অপেক্ষা করে, ইহাই আপনার ঈশ্বরত্বের সার্থকতা। বস্তুতঃ আপনি পূর্ণ, সুখস্বরূপ, নিত্য, আনন্দময়, অগুণ এবং অশোক। আপনা হতে অতিরিক্ত আর কোন পদার্থই নাই, অথচ আপনি সকল পদার্থ থেকে ভিন্ন। আপনি এতাদৃশ সুখাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং আপনার অন্য বস্তুতে অপেক্ষা নেই, আপনার ঐশ্বর্য কেবল ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্যই, নিজের জন্য নহে।

স্বর্ণ যেমন এক হয়েও কুণ্ডলাদি অলংকাররূপে অনেক হয়, তেমনি এক আপনিই কারণরূপে সৎ ও অদ্বিতীয় এবং কার্য জগরূপে অসৎ ও দ্বৈতভাবাপন্ন হন, এতে বস্তুগত কোন ভেদ নেই। আপনি স্বরূপতঃ উপাধিমুক্ত হলেও গুণসমূহ দ্বারাই ভেদ উপস্থাপিত হয়, সেজন্য জীবগণ অজ্ঞানবশতঃ আপনার ভেদ কল্পনা করে থাকে। হে ভগবান্, অজ্ঞানহেতু লোকে বহু প্রকারে আপনার বর্ণনা করে। কেউ তত্ত্ব অবগত নহে, কেহ (বৈদান্তিকগণ) আপনাকে ব্রহ্ম বলে মান্য করেন, কেহ কেহ (মীমাংসকগণ) ধর্ম বলেন; কতকগুলি ব্যক্তি (সাংখ্যবেত্তাগণ) প্রকৃতি পুরুষের পর পুরুষ বলে বর্ণনা করেন, অন্যেরা (পঞ্চরাত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা), নব শক্তিযুক্ত (বিমলা, উৎকর্ষিনী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রন্থ্রী, সত্যা, ঈগানা ও অনুগ্রহ) পরতত্ত্ব বলে নির্দেশ করেন, অপরেরা (পাতঞ্জমতাবলম্বীগণ) স্বতন্ত্র, অব্যয় পরম পুরুষ বলে থাকেন। হে ঈশ, আমি, ব্রহ্মা এবং মারীচি প্রভৃতি ঋষিগণ সত্ত্বগুণে সৃষ্ট হয়েও আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে আপনার স্বরূপ দূরের কথা আপনার রচিত এই বিশ্বের তত্ত্বই জানতে পারি না, এ অবস্থায় যাদের উৎপত্তি ও আচার সর্বদা রজঃ ও তমোগুণাশ্রিত, সেই দৈত্য ও মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণ যে, আপনার স্বরূপ জানতে পারে না, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি?

হে ভগবান, আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, নাশ, প্রাণীসকলের চেষ্টা এবং জগতের সংসার বন্ধন ও মোচন সকলই জানেন। বায়ু যেমন চর, অচর দেহসমূহ এবং আকাশের মধ্যে সর্বত্র প্রবিষ্ট রয়েছে, তেমনি আপনি আত্মতত্ত্বরূপে সমুদয় চরাচর ব্যপিত আছেন, আপনি জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং সকলের আত্মা। প্রভো, আপনি-গুণদ্বারা রমণ করতঃ যে যে অবতার গ্রহণ করেছেন,

আমি সে সকল পূর্বে দর্শন করেছি। সম্প্রতি আপনি যে স্ত্রীমূর্তি ধারণ করেছিলেন, তা দেখতে ইচ্ছা করি, যা মোহিনীরূপে দুর্মদ দৈত্যগণকে মোহিত করে, দেবতাদের অমৃত পান করালেন, সেই মূর্তি দর্শনে ইচ্ছুক হয়েই আমরা এখানে এসেছি। এ বিষয়ে আমাদের পরম কৌতূহল রয়েছে।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজন, শূলপানির এ প্রকার অভ্যর্থনায় ভগবান ভাবগম্ভীর হাস্য করে তাকে বললেন–হে দেবদেবী, অমৃতপাত্র অসুরদের হস্তগত হলে, আমি বিবেচনা করলাম, "যোষিবেশেই সুরকার্য হবে"– অর্থাৎ উন্মত্ত দৈত্যদের বঞ্চনা করে দেবতাদের অমৃত দিতে হবে। কিন্তু রূপান্তর আশ্রয় ব্যতিরেকে ঐরূপ বৈষম্য করা যেতে পারে না। অতএব দানবদের কৌতূহলের জন্য বঞ্চনমোহনাদির সার-স্বরূপ কামিনীরূপ ধারণ করেছিলাম। আপনি সম্প্রতি সেইরূপ দেখতে ইচ্ছা করছেন বলে আমি আপনাকে কামুকগণের আদরণীয় ও কামোদ্দীপক সেই রমণীরূপ দর্শন করাব।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, ভগবান শ্রীহরি একথা বলতে বলতে সেখানেই অন্তর্হিত হলেন। তখন মহাদেব উমার সঙ্গে সব দিকে চক্ষু সঞ্চারণ করতঃ সোৎসুক– চিত্ত হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর মহাদেব বিচিত্র কুসুম ও অরুণবর্ণ পল্লবশালী তরুরাজিমণ্ডিত উপবনে কন্দুকক্রীড়ারত এক পরমা সুন্দরী রমণীকে দেখতে পেলেন। তাঁর নিতম্বদেশে উজ্জ্বল কৈশেয় বসন এবং তদুপরি মেখলা শোভা পেতেছিল। ক্রীড়াকালে কন্দুকটির ঊর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি সহিত সেই রমণীও দেহটিকে একবার উন্নত ও অবনত করায় কম্পিত স্তনযুগল ও হারসমূহের গুরুভারে প্রতিপদক্ষেপেই দেহের মধ্যভাগ যেন ভগ্ন হতেছিল। এইরূপে তিনি চঞ্চল পল্লবের ন্যায় কোমল চরণ ইতস্ততঃ চালনা করছিলেন। তৎকালে ককটি চারদিকে চঞ্চলভাবে ভ্রমণ করায় তাঁর সুদীর্ঘ লোল লোচনদ্বয়ের তারকা-দুটিও উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হয়েছিল। তাঁর মুখমণ্ডল কর্ণস্থিত উজ্জ্বল কুণ্ডলযুগলের দীপ্তিযুক্ত গন্ডস্থল ও নীলবর্ণ অলকারাজির দ্বারা শোভিত হয়েছিল।

সেই রমণীমূর্তি শিথিল পরিধেয় বস্ত্র ও স্থলিত কেশবন্ধনটিকে মনোহর বাম হস্তদ্বারা আবদ্ধ করতে করতে দক্ষিণ হস্তদ্বারা ককক্ষেপণ সহকারে নিজ মায়ার দ্বারা জগতের মোহ উৎপাদন করছিলেন। এরূপ কন্দুকক্রীড়াজনিত ঈষৎ লজ্জাবশতঃ সেই রমণীমূর্তি পরিস্ফুট হাস্যসহকারে কটাক্ষপাত দ্বারা মহাদেবের চিত্ত হরণ করলেন। অতএব শ্রীশংকর তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বিনিময়ে সেই রমণীমূর্তিও তার প্রতি বার বার কটাক্ষ নিক্ষেপ করায় তিনি ব্যাকুলচিত্ত হয়ে নিজেকে এবং নিকটবর্তিনী উমাদেবী ও নিজ অনুচরগণকে পর্যন্ত ভুলে

গিয়েছিলেন। এক সময় সেই ককটি মোহিনীমূর্তির হস্ত হতে দূরে চলে গেলে কখন তিনি তা ধরার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটছিলেন, তখন মহাদেবের দৃষ্টির সম্মুখেই বায়ু সেই। সুন্দরীর সূক্ষ্ম বস্ত্রটি চন্দ্রহারের বন্ধনসহ হরণ করল। মহাদেব দণ্ডায়মান হয়ে অনিমেষ নয়নে তা দেখতে লাগলেন।

সে সময় সেই রমণী কুঞ্চিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করে মহাদেবকে নিরীক্ষণ করায় মহাদেব সেই সুদৃশ্যা মনোরমা সুনয়নার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেন। এইরূপে মোহিনীমূর্তি মহাদেবের জ্ঞান হরণ করলে, তিনি সেই সুন্দরী কর্তৃক উৎপাদিত কামাবেশে বিহ্বল হওয়ায় উমাদেবীর দৃষ্টির সম্মুখেই নির্লজ্জ হয়ে মোহিনীর নিকট গমন করলেন। মহাদেবকে নিকটে আসতে দেখে তখন সেই বিবস্ত্রা মোহিনীমূর্তি অতিশয় লজ্জিত হয়ে, হাসতে হাসতে বৃক্ষরাজির মধ্যে আত্মগোপন করার উদ্দেশ্যে আর সেখানে অপেক্ষা করলেন না। যূথপতি হস্তী কামপীড়িত হয়ে যেমন হস্তিনীর অনুগমন করে, মোহিনী কর্তৃক চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় মহাদেবও তেমনি কামবশ হয়ে ঐ সুন্দরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করতে লাগলেন। অনন্তর মহাদেব অতিবেগে তার দিকে ধাবিত হয়ে নিজ সঙ্গবিষয়ে অনভিলাষিনী সেই মোহিনীকে কেশগ্রহণপূর্বক নিকটে এনে দুটি বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করলেন।

হে মহারাজ, হস্তী কর্তৃক আলিঙ্গনাবদ্ধা হস্তীনীর ন্যায় তৎকালে ভগবান শংকর কর্তৃক আলিঙ্গিতা সেই মোহিনীমূর্তিও ইতস্ততঃ চলতে আরম্ভ করলেন, এ অবস্থায় তার কেশরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হতেছিল। তারপর দেবমায়া রচিতা বিশাল নিতম্বশালিনী সেই মোহিনীমূর্তি অতিশয় কষ্টে মহাদেবের ভুজবন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে পুনরায় দৌড়তে লাগলেন। তৎকালে মহাদেব নিজ শত্রু কন্দর্প কর্তৃক পরাভূত হয়েই যেন বিচিত্রকর্মা ভগবান বিষ্ণুর গতিপথের অনুসরণ করতে লাগলেন। ঋতুমতী হস্তিনীর অনুসরণকারী কামমত্ত হস্তীর মত মোহিনীর পশ্চাদ্ধাবনকারী অব্যর্থবীর্য মহাদেবের বীর্যস্খলন হয়েছিল। হে মহারাজ, মহাপ্রভাবশালী রুদ্রের বীর্য পৃথিবীর যে যে স্থানে পতিত হয়েছিল, সেই সেই স্থান রুদ্রের (পাঠান্তরে রৌপ্যের) এবং সুবর্ণের ক্ষেত্র হয়েছে। ভগবান হর ঐ প্রকারে মোহিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হওয়ায় নদী, সরোবর, শৈল, বর্ণ ও উপবন এবং অন্যান্য যে সকল স্থানে ঋষিগণ থাকেন, সর্বত্রই সন্নিহিত হয়েছেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ, শুক্র স্খলিত হওয়ার পর ভগবান শঙ্কর দেবমায়ার দ্বারা বশীকৃত নিজেকে লক্ষ্য করলেন এবং ঐ মোহ হতে নিবৃত্ত হলেন। তারপর তিনি দুয়ে মাহাত্ম্যশালী জগদাত্মা শ্রীহরির মাহাত্ম্য অবগত হয়ে নিজের তাদৃশ মোহ জড়তা আশ্চর্যজনক মনে করেন নাই। তৎকালে ভগবান শ্রীহরি মহাদেবের কোনরূপ বিহ্বলতা বা লজ্জা না দেখে পরমপ্রীত হয়ে নিজ পুরুষমূর্তি ধারণ পূর্বক এরূপ বলেছিলেন।

শ্রীভগবান বললেন–হে দেবশ্রেষ্ঠ, আপনি আমার স্ত্রীরূপা মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েও যে পুনরায় নিজের প্রকৃতি (স্বাভাবিক অবস্থা) প্রাপ্ত হলেন, তা পরম ভাগ্য। আপনি আত্মাতে অবস্থিত, কোন সন্দেহ নাই। হে দেব, আপনি ভিন্ন অপর কোন বিষয়াসক্ত পুরুষ, সংসারে অনির্বচনীয় ভাবসমূহের সৃষ্টিকর্ত্রী এবং অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের অলঙঘনীয়া আমার মায়াকে অতিক্রম করতে পারে? এই গুণময়ী মায়া সৃষ্টি প্রভৃতির কারণস্বরূপ কালরূপী আমার সহিত রজঃ প্রভৃতি অংশের দ্বারা মিলিত হয়ে আমারই অধীনা রয়েছে। তা আপনাকে আর কখনও অভিভূত করতে পারবে না।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজন, শ্রীবৎস ভগবান এই প্রকার সৎকার করলে, দেবদেব সম্ভাষণপূর্বক তাকে প্রদক্ষিণ করলেন, পরে নিজের অনুচরগণের সাথে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। তারপর ভগবান শংকর নিজের অংশরূপা এবং শ্রেষ্ঠ মুনিগণের পূজিতা মহামায়া ভবানীকে প্রীতি সহকারে এরূপ বলেছিলেন–হে প্রিয়ে, তুমি জন্মরহিত পরম দেবতা পরম পুরুষ শ্রীহরির মায়া দর্শন করলে তো? আমি ভগবানের অংশ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েও ঐ মায়ার বশে মুগ্ধ হয়েছিলাম, আর অন্য অস্বতন্ত্র পুরুষগণ যে তার দ্বারা মোহিত হবে, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? হে সতী, সহস্র বছর পরে আমি যোগ থেকে বিরত হলে, তুমি যাঁর কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, এই শ্রীহরিই সাক্ষাৎ সেই পুরাণপুরুষ। কাল তার ইয়ত্তা নির্ণয় করতে পারে না, কিংবা বেদশাস্ত্রও তার স্বরূপ বর্ণনে সমর্থ হয় না। শ্রীশুকদেব বললেন–হে তাত, যিনি সমুদ্র মন্থনের সময়ে নিজ পৃষ্ঠে মহাগিরি মন্দর ধারণ করেছিলেন, সেই ভগবান শ্রীহরির বিক্রমের কথা তোমার নিকট কথিত হল। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক এই বিষয় কীর্তন ও শ্রবণ করবে, তার কখনও উদ্যম ভঙ্গ হবে না, কারণ উত্তমঃ শ্লোক ভগবানের গুণানুকীর্তন সাংসারিক সমস্ত ক্লেশের বিনাশকারী। কপট যুবতী বেশধারী যিনি দানবদের মোহিত করে, অসজ্জনের অপ্রাপ্য ও ভক্তিলভ্য নিজ পাদপদ্মের শরণাগত শ্রেষ্ঠ দেবগণকে সমুদ্রমন্থনজাত অমৃত পান করিয়েছিলেন, আমি আশ্রিতজনের কামনা পূর্ণকারী সেই ভগবান শ্রীহরিকে প্রণাম করছি।

.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভবিষ্যৎ সপ্ত মন্বন্তরের পৃথক পৃথক বর্ণনা

শ্রীশুকদেব বললেন– হে মহারাজ, বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধের নামে বিখ্যাত সপ্তম মনু, যিনি বর্তমান কালে বিদ্যমান রয়েছেন, তার সন্তানদের বিবরণ বলছি, আমার নিকট শোন। ইক্ষাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, দ্বিষ্ট, বারণ, পৃষ ও বসুমান–ওই দশ জন বৈবস্বত মনুর পুত্র। হে শত্রুনাশন, ঐ মন্বন্তরে আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগন, মরুদগণ, অশ্বিনীকুমার দ্বয় এবং . ভৃগুগণ, দেবতা, পুরন্দর তাদের ইন্দ্র, আর কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র গৌতম, জমদগ্নি এবং ভরদ্বাজ–এই সপ্ত ঋষি। এই মন্বন্তরেও প্রজাপতি কশ্যপ হতে আদিতির গর্ভে ভগবান বিষ্ণু আবির্ভূত হন। বিবস্বান্, অর্যমা, পূষা ইত্যাদি দ্বাদশ আদিত্যগণের সর্বকনিষ্ঠ বামনরূপী বিষ্ণু। সপ্তম মন্বন্তরের বিবরণ পূর্বে সংক্ষেপে বলেছি, বিষ্ণুর অবতারযুক্ত ভবিষ্যৎ সাতটি মন্বন্তরের কথা পরে বলব।

হে মহারাজ, বিবস্বানের দুই পত্নী সংজ্ঞা ও ছায়া। দুই জনই বিশ্বকর্মার কন্যা। আমি পূর্বে তোমার নিকট এ দুজনের কথা বলেছি। কেউ কেউ সূর্যের বড়বা নামে তৃতীয় পত্নীর কথা বলেন। (কিন্তু সংজ্ঞাই এক সময় বড় হয়েছিলেন বলে তিনি সংজ্ঞা থেকে পৃথক নন।) সংজ্ঞার দুই পুত্র যম ও শ্রাদ্ধদেব এবং এক কন্যা যমী (যমুনা)। এরপর ছায়ার পুত্রগণের কথা বলছি, শোন। ছায়ার এক পুত্র, নাম সাবর্ণি, আর কন্যা তপতী, যিনি সংবরণের ভার্যা। শনিও ছায়ারই পুত্র– ইনি যম ও যমীর পর তৃতীয় সন্তান। বড়বা নামে বিবস্বানের ভার্যার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন।

হে নৃপ, অষ্টম মন্বন্তর উপস্থিত হলে, সূর্যপুত্র এই সাবর্ণি মনু হবেন। নির্মোক ও বিরজস্ক প্রভৃতি ঐ সাবর্ণির পুত্র। এই মন্বন্তরে সুতপা, বিরজা ও অমৃতপ্রভা– এই সকল দেবতা এবং বিরোচন–পুত্র বলি তাদের ইন্দ্র হবেন। ঐ বলি সামান্য নন, (সপ্তম মন্বন্তরে) ভগবান বিষ্ণু তার নিকট (বামন রূপে) গিয়ে ত্রিপাদ-মাত্র ভূমি যাঞ্চা করলে, তিনি সমগ্র পৃথিবী দান করেন এবং (অষ্টম মন্বন্তরে) ভগবানের প্রসাদে লব্ধ ইন্দ্রত্ব পদ পরিত্যাগ করে সিদ্ধি প্রাপ্ত হবেন। ভগবান, বামনরূপী বিষ্ণু সেই বলিকে পরাস্ত করেন, পরে প্রীত হয়ে পুনর্বার পাতালে স্থাপন করেছিলেন, তাতে বলি স্বর্গ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সেই স্থানে এক্ষণে স্বর্গাধিপতির ন্যায় বাস করছেন। এই মন্বন্তরে গালব, দীপ্তিমান, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং আমাদের পিতা ভগবান বাদরায়ণ (ব্যাস)– এই সাতজন ঋষি হবেন, তাঁরা এক্ষণে যোগবলম্বন করে স্ব স্ব আশ্রমে অবস্থান করছেন। হে মহারাজ, এই অষ্টম মন্বন্তরে ভগবান বিষ্ণু দেবগুহ্য হতে সরস্বতীর গর্ভে সার্বভৌম নামে আবির্ভূত হয়ে পুরন্দরের নিকট হতে ইন্দ্রত্ব হরণপূর্বক বলিকে ইন্দ্রপদ প্রদান করবেন।

এরপর নবম মনুর বিরবণ বলছি, শোন। নবম মন্বন্তরে, মরীচিগর্ভ প্রভৃতি দেবতা, উদ্ভূত তাদের ইন্দ্র এবং দ্যুতিমান প্রভৃতি সপ্তর্ষি হবেন। এই মন্বন্তরে আয়ুষ্মন হতে অম্বুধারার গর্ভে ভগবানের অংশস্বরূপ ঋষভদেবের আবির্ভাব হবে, যিনি তৎকালীন অদ্ভুত নামক ইন্দ্রকে সমৃদ্ধশালী ত্রিলোকের আধিপত্য ভোগ করাবেন। দশম মনুর নাম ব্রহ্মসাবর্ণি, তিনি উপশ্লোকের পুত্র। ভূরিষেণ প্রভৃতি ঐ মনুর সন্তান। ঐ মন্বন্তরে হবিষ্মন্ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ হবিষ্মন, সুকৃত সত্য, জয়, মূর্তি ইত্যাদি সপ্তর্ষি, সুবাসন ও বিরুদ্ধ প্রভৃতি দেবতা এবং তাদের প্রভু শম্ভু নামক ইন্দ্র, এই দশম মন্বন্তরে ভগবান্ বিভু বিশ্বসৃক বিপ্রের গৃহে বিসুচির গর্ভে অংশাংশে জন্মগ্রহণ করে বিষেষেণ নামে বিখ্যাত হবেন এবং তৎকালীন দেবরাজ শুম্ভুর সাথে তার সখ্য হবে।

মনস্বী ধর্মসাবর্ণি একাদশ মনু হবেন এবং সত্য, ধর্ম, প্রভৃতি দশ জন তাঁর পুত্র হবেন। ঐ মন্বন্তরে বিহঙ্গম, কালগম, নির্বানরুচি, প্রভৃতি দেবতা, বৈধৃত তাঁদের ইন্দ্র এবং অরুণ প্রভৃতি সপ্তর্ষি হবেন। তৎকালে শ্রীহরির অংশ হতে বৈধৃতার গর্ভে আবির্ভূত আর্যকপুত্র ধর্মসেতু ত্রিলোকের পরিপালন করবেন। হে মহারাজ, দ্বাদশ মনুর নাম রুদ্রসাবর্ণি। দেবগণ, উপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি তার পুত্র। উক্ত মন্বন্তরে ঋতধামা ইন্দ্র, হরিত প্রভৃতি দেবতা এবং তপোমূর্তি, তপস্বী ও আগ্নী প্রভৃতি সপ্তর্ষি হবেন। এ সময়ে সত্যসৃহা হতে সুনৃতার গর্ভে অংশতঃ অবতীর্ণ ভগবান শ্রীহরি স্বধামা নামে প্রসিদ্ধ হয়ে উক্ত মন্বন্তরকে সুসমৃদ্ধ করবেন।

মনস্বী দেবসাবর্ণি ভাবী ত্রয়োদশ মনু এবং চিত্রসেন, বিচিত্র, প্রভৃতি তার পুত্র। সেই মন্বন্তরে সুকর্মা, সুত্রামা প্রভৃতি দেবতা, দিবস্পতি নামক ইন্দ্র এবং নির্মোক ও তত্ত্বদর্শ প্রভৃতি সপ্তর্ষি হবেন। তৎকালে ভগবান শ্রীহরি এক অংশে বৃহতীর গর্ভে দেবহোত্রের পুত্র যোগেশ্বর নামে আবির্ভূত হয়ে ইন্দ্রের কার্য সম্পাদন করবেন। চতুর্দশ মনুর নাম ইন্দ্রাবর্ণি উরু, গম্ভীর, ধ্রুব (বুদ্ধি) প্রভৃতি তাঁর পুত্র। ঐ মন্বন্তরে পবিত্র, চাক্ষুষ প্রভৃতি দেবতা, শুচি নামক ইন্দ্র এবং অগ্নিবাহ, শুচি, শুদ্ধ, মগধ প্রভৃতি সপ্তর্ষি হবেন। তৎকালে ভগবান শ্রীহরি বিনতূর (বিতানার) গর্ভে সত্রায়ণের পুত্র বৃহদ্ভানু নামে আবির্ভূত হয়ে লোককল্যাণকর ক্রিয়াসমূহের বিস্তার করবেন। হে রাজন, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান,– এই কালয়ের অনুগত চতুর্দশ মনুর বিবরণ তোমার নিকট বর্ণন করলাম। এই চতুর্দশ মন্বন্তরে পরিমিত কল্পকালের পরিমাণ এক সহস্র যুগ।

.

চতুর্দশ অধ্যায়

মন্বদির পৃথক পৃথক কর্ম নিরূপণ

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন– হে ভগবান, এই মনুগণ নিজ নিজ মন্বন্তরে যে যে কর্ম যে প্রকারে যার দ্বারা নিযুক্ত হন, তা আমাকে বলুন। শ্রীশুকদেব বললেন– হে মহারাজ, মনুগণ, মনুপুত্রগণ, মুনিগণ, ইন্দ্রগণ ও দেবতাগণ সকলেই যজ্ঞাদি অবতাররূপী পরমপুরুষ বিষ্ণু কর্তৃক নিজ নিজ কার্যে নিয়োজিত হন। হে মহারাজ, আমি পূর্বে তোমার নিকট মহাপুরুষ বিষ্ণুর যজ্ঞাদি যে সকল মূর্তির কথা বলেছি, তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েই মনু প্রভৃতি সকলে জগতের কার্য নির্বাহ করেন। চতুর্যুগের অবসানে বেদসকল কালগ্রস্ত হলে, আবার সৃষ্টির প্রারম্ভে ঋষিগণ তপোবলে ঐ সকল দেবকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেন। সেই সমস্ত বেদ হতেই সনাতন ধর্ম পুনরায় প্রবর্তিত হয়। হে নৃপ, তারপর ভগবানের আদেশে মনুগণ নিজ নিজ কালে সংযত হয়ে পৃথিবীতে চতুষ্পদ ধর্ম প্রবর্তন করেন। এইরূপ প্রজাপালক মনুপুত্রগণ, যজ্ঞভাগভোগী দেবগণ এবং স্বর্গ ও পৃথিবীতে যজ্ঞকর্মের ফলভোগী মনুষ্যাদির সঙ্গে মিলিতভাবে সেই মন্বন্তরের অবসান কাল পর্যন্ত পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে এই ধর্ম পালন করে থাকেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের প্রদত্ত ত্রিলোকের মহাসম্পদ ভোগ করে ত্রিলোকের পরিপালন এবং লোকমধ্যে ইচ্ছানুরূপ বারিবর্ষণ করেন।

ভগবান হরি প্রতিটি যুগে সনকাদি সিদ্ধরূপ ধারণ করে জ্ঞানোপদেশ, যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিরূপ ধারণ করে কর্মোপদেশ এবং দত্তাত্রেয় প্রভৃতি যোগেশ্বররূপে যোগের উপদেশ করেন। এইরূপ তিনি মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিরূপে প্রজাসৃষ্টি, নরপতিরূপে দস্যুদের সংহার এবং শীতোষ্ণাদি বিবিধ গুণযুক্ত কালরূপে সৃষ্টির লয় করে থাকেন। লোকেরা নানা শাস্ত্রের দ্বারা সেই হরির তত্ত্বনিরূপণ করতে যত্ন করে, কিন্তু নামরূপাত্মিকা মায়ার দ্বারা বিমোহিতচিত্ত হওয়ায় বহুল যত্নেও তাকে দেখতে পায় না। হে মহারাজ, আমি এইরূপে তোমার নিকট কল্প ও অবান্তর কল্পের প্রমাণ উল্লেখ করলাম। পুরাতত্ত্বজ্ঞগণ এই কল্পকেই চতুর্দশ মন্বন্তর বলে থাকেন।

.

পঞ্চদশ অধ্যায়

দৈত্যরাজ বলির স্বর্গজয় এবং দেবগণের পলায়ন

মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন –হে ব্রাহ্মণ, ভগবান হরি সকল প্রাণীর ঈশ্বর হয়েও দীন ব্যক্তির মত বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি কি জন্য প্রার্থনা করেছিলেন? আর যাঞ্চিত অর্থ লাভ করেও কেনইবা তাকে কচ্ছন করলেন? পূর্ণ স্বরূপ ঈশ্বরের যাঞ্চা এবং নিরপরাধ বলির কছন–এটি অতিশয় আশ্চর্যজনক বলে আমরা এই রহস্য জানতে ইচ্ছা করি, যেহেতু এ বিষয় জানতে আমাদের মহৎ কৌতূহল হয়েছে। শ্রীশুকদেব বললেন– হে রাজন, যুদ্ধে বলির পরাজয় এবং ইন্দ্র হতে প্রাণনাশ হয়েছিলেন, কিন্তু শুক্রাচার্যের অনুগ্রহে তিনি পুনরায় জীবিত হন। তারপর উদারচিত্ত মহাত্মা বলি শিষ্য হয়ে সমস্ত অর্থ সমর্পণের দ্বারা সর্বতোভাবে শুক্রাচার্য প্রমুখ ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের উপাসনা করতেন। তারপর ভৃগুবংশীয় মহাপ্রভাবশালী ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হয়ে স্বর্গজয়ের অভিলাষী বলিকে মহাভিষেক বিধি (অর্থাৎ বহ্বৃচ ব্রহ্মণগ্রন্থে প্রসিদ্ধ ঐন্দ্রাভিষেক) অনুসারে অভিষিক্ত করে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করালেন।

তারপর যজ্ঞে হবির দ্বারা আহুত অগ্নির মধ্য হতে স্বর্ণময় পট্টবস্ত্র-ভূষিত রথ, ইন্দ্রের অশ্বের মত হরিদ্বর্ণ কতগুলি অশ্ব এবং সিংহ– চিহ্নিত একটি রথধ্বজ আবির্ভূত হন। এরূপে সেই অগ্নি হতেই স্বর্ণদ্ধ বিদ্যধনু, অক্ষয়বাণে পরিপূর্ণ দুটি তূণ (বাণাধার) এবং দিব্য কবচ উত্থিত হল। তারপর তার পিতামহ প্রহ্লাদ তাঁকে অম্লান পুষ্পমাল্য এবং শুক্রাচার্য একটি শঙ্খ প্রদান করলেন। ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ এই প্রকারে বলির যুদ্ধসামগ্রী সম্পাদন করে দিয়ে তার স্বস্ত্যয়ন (মঙ্গলবাচনাদি) করলেন। এরপর বলি প্রদক্ষিণ পূর্বক ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে, পিতামহ প্রহ্লাদকে সম্ভাষণ ও প্রণাম করলেন। তারপর মহারথ বলি ভৃগু-প্রদত্ত দিব্য রথে আরোহণ করে সুরম্য মাল্য, কবচ ধনুঃ খড়গ ও তূণযুগল ধারণ করলেন। তৎকালে তার ভূজযুগল স্বর্ণময় কেয়ুরদ্বয় এবং কর্ণদ্বয় মকরাকৃতি উজ্জ্বল কুন্তল যুগলে শোভিত ছিল। এ অবস্থায় বলি রথারূঢ় হয়ে কুন্ডস্থিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পেতে লাগলেন। তারপর বলির সমান ঐশ্বর্য, বল ও শোভাযুক্ত দৈত্যযূথপতিগণ নিজ নিজ যূথ-সহ দৃষ্টির দ্বারা যেন আকাশমণ্ডলকে পান করতে করতে এবং দিমণ্ডলকে দগ্ধ করতে করতে গিয়ে বলির সাথে মিলিত হল। বলি তাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে মহতী আসুরী সেনা আকর্ষণ পূর্বক সুসমৃদ্ধ ইন্দ্রপুরীর প্রতি যাত্রা করলেন। তাঁর গমনকালে স্বর্গ ও পৃথিবী যেন কম্পমান হতে লাগল।

ঐ ইন্দ্রপুরীতে নন্দনকানন প্রভৃতি সুরম্য উপবন ও উদ্যানসমূহ অতিশয় রমণীয়, সেই সকল উপবন ও উদ্যানে বিহঙ্গমিথুন কলরব এবং মত্ত ভ্রমরগণ সুস্বরে গান করছিল। সেখানে যে সকল অমর দ্রুম ছিল, তাদের শাখাসকল প্রবাল ও ফল– পুষ্পের গুরুভাবে নত হয়ে পড়েছিল। সেখানে সরোবর সকলে সুরসেবিত প্রমাদগুণ পরম কৌতুকে ক্রীড়া করছিল। ঐ সকল সরোবরে যে সমস্ত পদ্মিনী ছিল, হংস, সারস, চক্রবাক্ এবং কারন্ডব প্রভৃতি জলচর

পক্ষীসমূহে সে সকল আকুল হতেছিল। ইন্দ্রপুরী চারদিকে পরিখাতুল্য আকাশগঙ্গায় বেষ্টিত, তার চারপার্শ্বে অগ্নিবর্ণ, অতি উচ্চ প্রাচীর, সেই প্রাচীরের উপরে যুদ্ধস্থান সকল বিরচিত। ঐ পুরী বিশ্বকর্মার নির্মিত ও পৃথক পৃথক রাজপথে সুশোভিত। ঐ ইন্দ্রপুরীর গোপুর (পুরদ্বার) সমূহ স্ফটিকময় এবং দ্বারসকলের কপাট-সকল স্বর্ণময় পট্ট (পাল্লা) সংযুক্ত রয়েছে। উপবেশন স্থান, প্রাঙ্গণ উচ্চ পথ ও অসংখ্য বিমানের দ্বারা সুশোভিত সেই ইন্দ্রপুরীতে হীরক ও প্রবালের বেদিযুক্ত বেণুধ্বনি এবং গন্ধর্বাদি উপদেবতাগণের নৃত্য, গীত ও বাদ্য দ্বারা মনোরম হয়ে নিজ কান্তিদ্বারা কান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেও জয় করেছে। অধার্মিক, খল, প্রাণী হিংসক, শঠতামানী, কামী ও লোভী ব্যক্তিগণ সেই স্বর্গপুরে যেতে পারে না, কেবল ঐসকল দোষবর্জিত ব্যক্তিগণই গমন করেন।

সেনাপতি বলি সেই দেবপুরী গমন করে সৈন্য দ্বারা তার বহির্ভাগ সর্বতোভাবে রুদ্ধ করলেন এবং দেবাঙ্গনাদের ভয় উৎপাদন পূর্বক শুক্রাচার্যের প্রচণ্ড শব্দকারী শঙ্খের ধ্বনি করতে লাগলেন। বলির ঐ প্রকার পরম যুদ্ধোদ্যম অবগত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদের সাথে গুরু বৃহস্পতির নিকট গিয়ে নিবেদন করলেন। ভগবান, আমাদের পূর্বশত্রু বলির পুনরায় গুরুতর উদ্যম দেখছি, মনে হয়, মণিময় চতুষ্পথ সমূহ শোভা পেত।

সেই ইন্দ্রপুরীতে নিত্যরূপযৌবনশালিনী, সুনির্মল বসনা, রূপবতী শ্যামা রমণীগণ শিখাপ্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় বিরাজ করত। সেখানে সুরস্ত্রীগণের কেশভ্রষ্ট সুগন্ধি মাল্যের সৌরভ গ্রহণ করে বায়ু পথে পথে প্রবাহিত হত। সেই পুরীর পথসমূহ সুবর্ণ– খচিত গবাক্ষপথে নির্গত অগুরু গন্ধযুক্ত শুক্লবর্ণ ধূমরাশির দ্বারা আচ্ছন্ন হয় এবং অপ্সরাগণ সেই পথে বিচরণ করেন। সেই পুরী সর্বদা মুক্তাময় চন্দ্রাতপ, সুবর্ণ ও মণিময় ধ্বজা এবং বিচিত্র পতাকাযুক্ত বলভী সমূহের (গৃহের পুরোভাগে উপরে রচিত উপবেশন স্থান বিশেষের) দ্বারা পরিব্যাপ্ত রয়েছে। সাঙ্গীতিক রমণীগণের মধুর মাঙ্গলিক গীতে সেগুলি মুখর হয়ে থাকে। ঐ পুরী মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঢক্কা, দুন্দুভি, তালবাদ্য, বীণা, মৃদঙ্গ তার এই উদ্যম আমরা সহ্য করতে পারব না। সে আজ কোন্ তেজে এরূপ বলবান হয়েছে? সে যেন মুখদ্বারা এই বিশ্ব পান করছে, জিহ্বার দ্বারা যেন দশ দিক্ লেহন করছে এবং নেত্রদ্বারা দিমণ্ডল দগ্ধ করছে, বস্তুত সে যেন প্রলয়াগ্নির ন্যায় উত্থিত হয়েছে। আমার মনে হয়, সম্প্রতি কোনো ব্যক্তি কোনো উপায়ে তার প্রতিক্রিয়া করতে সমর্থ হবে না। গুরুদেব, আমাদের ঐ শত্রুর এরূপ দুর্ধর্ষ হবার কারণ কি বলুন। তার এ প্রকার সামর্থ, সাহস ও তেজ কিসে হল? সামর্থ্যাদির জন্যই এরূপ যুদ্ধোদ্যম হয়েছে, সন্দেহ নাই।

দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন– মহেন্দ্র, তোমার এই শত্রুর উন্নতির কারণ আমি জানি। ব্রহ্মবাদী ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ শিষ্য বলির মধ্যে এরূপ তেজ সঞ্চয় করেছেন। অতএব একমাত্র ঈশ্বর শ্রীহরি ব্যতীত, তুমি অথবা তোমার মত অপর কেউ সম্প্রতি তেজস্বী বলিকে জয় করতে সমর্থ হবে না। বলি এখন ব্রহ্মতেজে সমেধিত (সম্যকরূপে বর্ধিত) কে তাকে জয় করবে? জীবগণ যেমন যমের সম্মুখে থাকতে পারে না, তেমনি কেউ এখন এর সন্মুখে অবস্থান করতে সমর্থ হবে না। বলি এখন ব্রহ্মতেজে সমোধিত (সম্যকরূপে বর্ধিত), কে তাকে জয় করবে? জীবগণ যেমন যমের সম্মুখে থাকতে পারে না, তেমনি কেউ এখন বলির সম্মুখে অবস্থান করতে সমর্থ হবে না। অতএব তোমরা সকলে এখন স্বর্গপুরী ত্যাগ করে অন্যত্র লুক্কায়িত হও এবং যে পর্যন্ত শুক্রর বিপর্যয় দেখা না যায়, ততকাল অপেক্ষা কর। ব্রাহ্মণগণের বলেই এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটেছে এবং সেই জন্যই সে সম্প্রতি প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণদের অপমান করলে স্বয়ং সবংশে বিনষ্ট হবে, সন্দেহ নেই।

হে রাজন, কার্যদর্শী গুরু বৃহস্পতি এই প্রকারে কর্তব্য বিষয়ে সৎ পরামর্শ দিলে, কামরূপী (ইচ্ছানুরূপ মূর্তিধারী) দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র প্রস্থান করলেন। দেবগণ অদৃশ্য হলে বিরোচনপুত্র বলি ইন্দ্রপুরী অধিষ্ঠানপূর্বক জগ-ত্রয় বশীভূত করলেন। তৎকালে শিষ্যবৎসল ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ বিশ্ববিজয়ী অনুগত শিষ্য বলি রাজাকে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করালেন। সেই শতাশ্বমেধের প্রভাবে বলি দশ দিকে কীর্তি বিস্তার করতঃ নক্ষত্ররাজ চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করতে লাগলেন। তৎকালে মহামতি বলি নিজেকে কৃতার্থে ন্যায় মনে করে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রাপিত অতি সমৃদ্ধিশালী স্বর্গসম্পদ ভোগ করতে লাগলেন।

.

ষোড়শ অধ্যায়

দেবমাতা অদিতিকে মহামুনি কশ্যপের পয়োব্রত মহামুনি কশ্যপের পয়োব্রত উপদেশ।

শ্রীশুকদেব বললেন– হে মহারাজ, এইরূপে নিজপুত্র দেবগণ অদৃশ্য এবং দৈত্যগণ কর্তৃক স্বর্গরাজ্য হৃত হলে দেবমাতা অদিতি অনাথার ন্যায় নিরন্তর পরিতাপ করছিলেন। তাঁর পতি

প্রজাপতি কশ্যপ দীর্ঘকালের পর সমাধি থেকে বিরত হয়ে একদিন অদিতির নিরুৎসব ও নিরানন্দ আশ্রমে উপস্থিত হলেন। হে কুরুদেবহ, তিনি অদিতি কর্তৃক যথাবিধি পূজিত হয়ে আসনে উপবেশন পূর্বক ম্লানবদনা পত্নীকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন- হে ভদ্রে, সম্প্রতি লোকমধ্যে ব্রাহ্মণগণের কোন অমঙ্গল হয়নি তো? ধর্মেরও কোন অভদ্র হয়নি তো? আর মৃত্যুবশবর্তী জনগণের কোন অমঙ্গল হয়নি তো? হে গৃহধর্মপরায়ণে, অথবা যে গৃহস্থাশ্রমে যোগহীন ব্যক্তিগণেরও স্বীয় ধর্মের আচরণাদির দ্বারা যোগফল লাভ হয়, তোমার সেই গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম, অর্থ এবং কাম–এই ত্রিবর্গের কোন বিঘ্ন ঘটে নি তো? অথবা তুমি কখনও পোষ্যবর্গের পরিচর্যায় আসক্ত থাকাকালে অতিথিগণ এসে তোমার নিকট হতে অভ্যর্থনা না পেয়ে চলে যান নাই তো?

যে সকল গৃহে অতিথিগণ অন্ততঃ জলদ্বারাও অর্চিত না হয়ে ফিরে যায়, সে সকল গৃহ শৃগালরাজের বিবরতুল্য। হে সতী, তোমার বিমনস্কতার কারণ কি? আমি প্রবাসে থাকাকালে, চিত্তের উদ্বেগহেতু তুমি কি কোনদিন যথাকালে হবির দ্বারা অগ্নিয়ে হোম করতে বিস্মৃত হয়েছ? গৃহস্থ ব্যক্তি যাঁর পূজার দ্বারা পুণ্য লোকসমূহে গমন করে, সেই ব্রাহ্মণ ও অগ্নিই সর্বদেবময় বিষ্ণুর মুখ। হে মনস্বিনী, তোমার পুত্রদের সকলের কুশল তো? মুখমালিন্য প্রভৃতি লক্ষণের দ্বারা মনে হচ্ছে, তোমার অন্তঃকরণ যেন প্রকৃতিস্থ নয়।

অদিতি বললেন– হে ব্রাহ্মণ, গো, ব্রাহ্মণ, ধর্ম, এবং সকল লোকেরই মঙ্গল। হে গৃহমেকি যে গৃহ ধর্ম, অর্থ ও কাম– ত্রিবর্গের উদ্ভবস্থান তারও কুশল (অর্থাৎ ধর্মাদি ত্রিবর্গ যথাবৎ নির্বাহ হয়েছে।) হে ব্রাহ্মণ, আমি অনুক্ষণ আপনার ধ্যান করি বলেই অগ্নি, অতিথি, ভৃত্য, ভিক্ষুক অথবা অন্নাদিলিন্দু কারও যথোচিত সকার ক্ষুণ্ণ হয়নি। হে ভগবান প্রজাপতি আপনিই, যার ধর্মোপদেশক, সেই আমার মানসিক কোন কামনা অসম্পূর্ণ থাকতে পারে? হে মরীচি নন্দন, প্রজাসকল আপনারই মন ও শরীর হতে উৎপন্ন হয়ে সত্ত্ব, রজঃ অথবা তমোগুণ অবলম্বন করে। অসুরাদি সকল সন্তানের প্রতি যদিও আপনার সমান ভাব, তথাপি মহেশ্বর ভক্তগণের প্রতিই বিশেষ অনুগ্রহ করে থাকেন। হে প্রভো, আমি আপনারই ভজন করি, অতএব আপনি আমার কল্যাণ চিন্তা করুন। আমার সপত্নী-পুত্র দৈত্যগণ আমার পুত্রদের স্ত্রী ও স্থান অপহরণ করে নিয়েছে, আপনি তাদের রক্ষা করুন। আমি শত্রুগণ কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে বিপত্তি-সারে নিমগ্না হয়েছি, প্রবল শত্রুগণ আমার ঐশ্বর্য, যশ ও স্থান–সকলই হরণ করেছে। হে সাধো, হে কল্যাণকারীণ, আমার পুত্রগণ যাতে সেই হৃত ঐশ্বর্যাদি পুনরায় পেতে পারে, আপনি বুদ্ধি দ্বারা সেই কল্যাণ বিধান করুন।

শ্রীশুকদেব বললেন– হে মহারাজ, অদিতি কর্তৃক এরূপ অভ্যর্থিত হয়ে প্রজাপতি কশ্যপ যেন বিস্মিতের ন্যায় হয়ে বললেন– অহে, ভগবান বিষ্ণুর মায়া কি বলবো। কি আশ্চর্য– এই জগৎ স্নেহপাশে বদ্ধ হয়েছে। পঞ্চভৌতিক অনাত্মা এই দেহ কোথায়, আর প্রকৃতির অতীত আত্মাই বা কোথায়? এইরূপ কারাই বা কার, পতি-পুত্রাদি? মোহই এ সকলের একমাত্র কারণ। হে সতী, তুমি সকল জীবের হৃদয়গুহায় বিরাজমান জগদগুরু জনার্দন পরমপুরুষ ভগবান বাসুদেবের আরাধনা কর। দীনজনের প্রতি কৃপালু সেই শ্রীহরিই তোমার কামনাসহ পূর্ণ করবেন। ভগবানের সেবাই সর্বত্র অব্যর্থ, তাছাড়া অন্য কিছুই অব্যর্থ নহে–ইহাই আমার নিশ্চিত এটাই মতি।

অদিতি বললেন–ব্রাহ্মণ, কি প্রকার বিধির দ্বারা জগদগুরু ভগবানের উপাসনা করব? যেরূপে সত্যসংকল্প সেই হরি আমার মনোরথ পূর্ণ করেন এবং পুত্রদের সাথে অবসন্না আমার প্রতি আশু প্রীত হন, সেরূপ তার উপাসনার বিধি উপদেশ করুন। কশ্যপ বললেন– ভদ্রে, পূর্বে প্রজা কামনা করে আমি ভগবান পদ্মযোনিকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে কেশবতোষণ যে ব্রত উপদেশ করেন, তোমাকে সেই ব্রত বলছি। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে পরম ভক্তি সহকারে দ্বাদশ দিন পয়োব্রত অবলম্বন করে ভগবান কমললোচন শ্রীহরির অর্চনা করতে হবে। যদি পাওয়া যায়, তবে বন্য বরাহের দ্বারা উৎখাত মৃত্তিকার দ্বারা গাত্র লেপন করে অমাবস্যা তিথিতে স্রোতজলে স্নান করবে এবং স্নানকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করবে।

“হে দেবি মৃত্তিকে, স্থান ইচ্ছা করে আদিবরাহ তোমাকে রসাতল থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আমি তোমাকে নমস্কার করছি, আমার পাপ বিনাশ কর।” তারপর নিত্য নৈমিত্তিক নিয়ম সমাপন করে সমাহিত মনে প্রতিমায়, স্থন্তিলে (কুশাচ্ছাদিত ভূমিতে), সূর্যে, জলে অথবা অগ্নিতে, কিংবা গুরুতে ভগবান হরির অর্চনা করবে। প্রথমতঃ আবহনাদি ক্রিয়ার নয়টি মন্ত্র বলছেন–হে ভগবান্ বাসুদেব, মহত্তম পুরুষ, সকল প্রাণীর নিবাসস্থান, সর্বসাক্ষী, আপনাকে নমস্কার। হে দেব, আপনি ব্যক্ত (স্কুল) অথচ সূক্ষ্ম (অব্যক্ত), আপনি প্রধান পুরুষ (অর্থাৎ পুরুষোত্তম), অথবা সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ, আপনি চতুর্বিংশতি তত্ত্বজ্ঞ এবং সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তক-আপনাকে নমস্কার করি। আপনি যজ্ঞের ফলদাতা অথচ যজ্ঞস্বরূপ। যজ্ঞের আরম্ভকালীন কর্ম আপনার দুটি মস্তক, যজ্ঞকালীন তিনবার স্নান (ত্রিবসন)। আপনার তিনটি পদ, চারটি বেদ আপনার চারটি শৃঙ্গ সাতটি ছন্দ আপনার সাতটি হস্ত এবং আপনি মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কল্প–ত্রিবিধ শাস্ত্রে আবদ্ধ রয়েছেন, আপনাকে নমস্কার।

আপনি শিব, আপনিই রুদ্র, আপনিই শক্তিধর, সর্ববিদ্যার অধিপতি এবং ভূতপতি, আপনাকে প্রণাম করি। আপনি হিরণ্যগর্ভ, আপনিই জগতের সমষ্টিভূত প্রাণ এবং আপনিই জগতের আত্মা। যোগৈশ্বর্যই আপনার দেহ এবং আপনিই যোগের প্রবর্তক, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি আদিদেব, সকলের সাক্ষি-স্বরূপ, নর ও নারায়ণ দুই ঋষি এবং আপনিই শ্রীহরি, আপনাকে নমস্কার। আপনি কেশব, আপনার শরীর মরকতের ন্যায় শ্যামবর্ণ, আপনার বসন পীতবর্ণ, আপনি সকল সম্পদ বা লক্ষ্মীকে লাভ করেছেন, আপনাকে বারবার নমস্কার করি। হে বরেণ্য, হে বরদুশ্রেষ্ঠ, আপনি সকলের সর্ব বরদাতা, অতএব বিবেকিগণ শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির জন্য আপনার পাদরেণুর উপাসনা করেন। নিখিল দেবগণ এবং স্বয়ং লক্ষীদেবীও পাদপদ্মের সৌরভ স্পৃহা করে যাঁর অনুসরণ করে, সেই ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

এই নয়টি মন্ত্রের দ্বারা ভগবান হৃষীকেশের আবাহন করবে, শ্রদ্ধাসহকারে পাদ্য ও আচমনীয়দির দ্বারা অর্চনা করবে। তারপর গন্ধ ও মাল্যাদির দ্বারা পূজা করে দুগ্ধের সেই বিভুকে স্নান করাবে। পরে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, পাদ্য, আচমন, গন্ধ ও ধূপাদি দ্বারা অর্চনা করবে। যদি বিভব থাকে, তা হলে দুগ্ধে শাল্যন্ন পাক করে পায়েসের নৈবেদ্য করবে। পরে ঘৃত ও গুড়ের সহিত পায়েস নিবেদনপূর্বক মূলবিদ্যা অর্থাৎ দ্বাদশাক্ষের মন্ত্রের দ্বারা হোম করবে। এরপর আচমন দিয়ে অর্চনা পূর্বক তাম্বুল নিবেদন করতে হবে। তারপর অষ্টোত্তর শতবার (১০৮ বার) মূল মন্ত্র জপ ও স্তবসমূহের দ্বারা স্তুতি করে, প্রভুকে প্রদক্ষিণপূর্বক হৃষ্টচিত্তে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করবে। পরে নিজ মস্তকে নির্মাল্য ধারণ এবং দেবতাকে বিসর্জন দেবে। তারপর অন্ততঃ দুইজন ব্রাহ্মণকে পায়েস দ্বারা যথোচিত ভোজন করাবে।

এরপর পূজিত ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে নিজে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে শেষান্ন ভোজন করবে। সেদিন রাতে ব্রহ্মচারী থেকে পরবর্তী প্রথম দিনে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে যথাযথ বিধি অনুসারে সংযতচিত্তে আরাধ্য দেবতাকে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাবে। যতদিন ব্রত সমাপ্ত না হয়, ততদিন পর্যন্ত এরূপ আচরণ করতে হবে। হে দেবী, একমাত্র দুগ্ধ ভক্ষণ করতঃ বিষ্ণু পূজনে কৃতদার হয়ে ঐ প্রকারে ব্রত করবে এবং পূর্বের মত অগ্নিতে হোম ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে। এইরূপে দ্বাদশ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ পয়োব্রত করবে (অর্থাৎ দুগ্ধপান, শ্রীহরির আরাধনা, হোম, পূজা এবং ব্রাহ্মণগণের ভোজনাদির দ্বারা সন্তোষ বিধান করবে)। প্রতিপদ দিন হতে শুক্লা ত্রয়োদশী পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য ভূতলে শয়ন এবং প্রত্যহ তিনবার স্নান করতে হবে। এই ব্রতৎকালে একমাত্র ভগবান বাসুদেবে আত্মসম্পর্পণ করে হিংসা, অসদালাপ এবং বিবিধ ভোগ পরিত্যাগ করবে।

অনন্তর ত্রয়োদশী তিথিতে শাস্ত্রবিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে পঞ্চামৃত দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর স্নান করাবে। আর বিত্তসাধ্য বিসর্জন পূর্বক (অর্থাৎ বিত্ত থাকতে শঠতা হেতু তার ব্যয় বিষয়ে কুণ্ঠা না করে) উত্তমরূপে মহতী পূজা করবে। দুগ্ধে চরুপাক করে শিপিবিষ্ট (অর্থাৎ জীবগণের অন্তর্যামী) বিষ্ণুকে তা নিবেদন করবে এবং উত্তমরূপে সমাহিত হয়ে পূর্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা পরম পুরুষের অর্চনা করবে। অপরে যাতে পরমপুরুষের তুষ্টি হয়, তাদৃশ গুণবৎ অত্যুৎকৃষ্ট নৈবেদ্য প্রদান করবে। তারপর বস্ত্র, অলংকার ও ধেনু দিয়ে জ্ঞানবান আচার্য ও পুরোহিতদের সন্তুষ্ট করবে। হে সতী, ঐ সকলের সন্তোষ উৎপাদনই শ্রীহরির আরাধনা। অতএব ঐ সকল ব্যক্তিকে এবং তথায় সমাগত অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সকলকেই যথাশক্তি উত্তম গুণযুক্ত অন্ন দ্বারা ভোজন করাবে। তারপর আচার্য এবং ঋত্বিগণকে যথাযোগ্য দক্ষিণা দিবে। পরিশেষে সমাগত আচণ্ডাল সকল লোককে অন্নাদির দ্বারা তৃপ্ত করবে। দীন, অন্ধ ও দুর্গত প্রভৃতি সকলের ভোজন হলে তা বিষ্ণুর সন্তোষজনক মনে করে পশ্চাৎ বান্ধবগণের সহিত নিজে ভোজন করবে। এইরূপে ব্রতকালমধ্যে প্রতিদিনই নৃত্য, বাদ্য, গীত, স্বস্তিবাচন ও ভগবানের গুণকীর্তন দ্বারা তার পূজার অনুষ্ঠান করবে।

এই পয়োব্রত ভগবান বিষ্ণুর পরম আরাধনাস্বরূপ। পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে এইকথা বলেছিলেন, এখন আমি সেইবাক্য তোমার নিকট বর্ণনা করলাম। হে মহাভাগে, তুমি সংযতচিত্তে বিশুদ্ধভাবে যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত এই ব্রতের দ্বারা অব্যয় পুরুষ শ্রীহরির আরাধনা কর। হে ভদ্রে, এরই নাম সর্বজ্ঞ, এটাই সর্বব্রত, এটাই ঈশ্বরের তর্পণ বলে প্রসিদ্ধ। আর যাতে ভগবান অক্ষেজের সন্তোষ হয়, তাই নিয়ম, তাই উত্তম সংযম, তাই তপস্যা, তাই দান, তাই ব্রত এবং তাই যজ্ঞ। হে ভদ্রে, অতএব তুমি সংযতা হয়ে শ্রদ্ধাপূর্বক এই ব্রতের আচরণ কর। তা হলে ভগবান পরিতুষ্ট হয়ে শীঘ্রই তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করবেন।

.

সপ্তদশ অধ্যায়

অদিতির পয়োব্রত আচরণে তুষ্ট ভগবানের বরদান

শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজন, নিজ পতি কশ্যপের দ্বারা এরূপ উপদিষ্টা দেবমাতা অদিতি সংযতা হয়ে দ্বাদশ দিবস এই পয়োব্রতের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনি নিজ বুদ্ধিকে সারথি করে ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্ট অশ্ব- সকলকে নিগ্রহ করতঃ (অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে) একচিত্তে মহাপুরুষ ঈশ্বরের চিন্তায় প্রবৃত্ত হলেন এবং একাগ্রবুদ্ধির দ্বারা অখিলাত্মা ভগবান বাসুদেব মন স্থির করে পয়োব্রত করতে লাগলেন। হে তাত, অদিতির ব্রতচারণে ভগবান আদিপুরুষ পরিতুষ্ট হয়ে পীতবসন পরিধান এবং চার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণপূর্বক তার সামনে আবির্ভূত হলেন। সহসা তাকে নয়নের সামনে উপস্থিত দেখে গাত্রোত্থান করে, প্রীতিবিহ্বল হয়ে সাদরে দেহদ্বারা ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। তারপর ভূমিতল থেকে উত্থানপূর্বক স্তুতি করার জন্য বদ্ধাঞ্জলি সহকারে দণ্ডায়মান হয়েও নয়নযুগল আনন্দাশ্রু ধারায় প্লাবিত হওয়ায় তিনি স্তুতিবিধানে সমর্থ হলেন না, কিন্তু ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনহেতু অতিশয় হর্ষোৎসব বশতঃ সর্বাঙ্গে কম্প ও পুলকারাশির উদয় হলে, তিনি মৌনভাবে অবস্থান করতে লাগলেন। হে কুরুবর, সেই যজ্ঞপতি জগৎপতি রমাপতিকে নিরীক্ষণ করে দেবমাতা অদিতি চক্ষুদ্বারা যেন পান করতে করতে অনেকক্ষণ পরে প্রীতিভরে ধীরে ধীরে গদগদ বাক্যে তাঁর স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন।

অদিতি বললেন–হে যজ্ঞেশ্বর, হে যজ্ঞপুরুষ, হে অচ্যুত, হে জগদীশ্বর, হে ভগবান, আপনার পাদপদ্মে পুণ্যতীর্থ গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি হয়েছে। আপনার কীর্তি পরম পবিত্র, আপনার নাম শ্রবণেই জীবের মঙ্গল হয়। শরণাগত জনের পাপনাশের জন্যই আপনার আবির্ভাব হয়ে থাকে। আপনি দীননাথ, হে আদ্যা, হে ঈশ, সম্প্রতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। হে দেব, যদিও আপনি বিশ্বস্বরূপ এবং বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, স্বেচ্ছায় মহাশক্তি মায়ার গুণসমূহ গ্রহণ করেন, তথাপি আপনি স্বস্থ অর্থাৎ আপনার স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটে না। যেহেতু আপনি নিরন্তর প্রবৃদ্ধিশীল পরিপূর্ণ জ্ঞানবলে সর্বদাই নিজের নিকট হতে মায়াকে অপসারিত করে রেখেছে। শ্রীহরি রূপে বিরাজমান সেই আপনাকে আমি প্রণাম করি। হে অনন্ত, আপনি পরিতুষ্ট হলে আপনার নিকট হতে জীবের ব্রহ্মার তুল্য পরমায়ু, অভীষ্ট দেহ, স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাতলের অতুল্য লক্ষ্মী অনিমাদি যোগসিদ্ধিসকল, ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ এবং মোক্ষপ্রাপক কৈবল্য জ্ঞান পর্যন্ত লাভ হয়ে থাকে, শত্রু–জয়াদি বাসনা যে সিদ্ধি হবে, তার আর কথা কি?

শ্রীশুকদেব বললেন– হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ, অদিতি ঐপ্রকার স্তব করলে সর্বভূতের অন্তর্যামী ভগবান কমলনয়ন শ্রীহরি এরূপ বলেছিলেন। শ্রীভগবান বললেন–হে দেবমাতঃ, শত্রু দৈত্যগণ তোমার পুত্রদের সম্পদ হরণ করে তাদের নিজ স্থান স্বর্গপুরী থেকে বিতাড়িত

করায়, তাদের জন্য তুমি অনেক দিন হতে যা অভিলাষ করছ, তা আমি বিশেষ ভাবেই অবগত আছি। দুর্মদ সেই শ্রেষ্ঠ অসুরদের যুদ্ধে পরাজিত করে, তোমার পুত্রগণ বিজয় ও সম্পদ লাভ করলে। ইন্দ্র প্রভৃতি তোমার পুত্রগণ যুদ্ধে শত্রুদের বধ করলে, তাদের পত্নীগণ মৃত স্বামীর নিকট গিয়ে রোদন করবে–এটাও তুমি দেখতে চাও। আর, তোমার পুত্রগণ আবার নিজেদের যশ ও সম্পদ লাভ করে, সমৃদ্ধিশালী হয়ে স্বর্গরাজ্য অধিকারপূর্বক সেখানে বিহার করবে– ইহাও তুমি দেখতে ইচ্ছা করছ।

হে দেবী, আমার মনে হচ্ছে সম্প্রতি সেই অসুর-যুথপতিদের অতিক্রম করা প্রায় সম্ভব হবে না। কারণ অনুকুল কালের আশ্রয়ে ব্রাহ্মণগণ তাদের রক্ষা করছেন, সুতরাং সেখানে পরাক্রম প্রকাশ করতে গেলে, তা সুখের কারণ হবে না। তথাপি হে দেবী, তুমি ব্রতচারণ দ্বারা আমার সন্তোষ বিধান করেছ, আমি অবশ্য এ বিষয়ে কোনরূপে উপায় চিন্তা করব। আমার আরাধনা ভজনকারীর ইচ্ছানুরূপ ফল জন্মায় বলে, তোমার অনুষ্ঠিত এই আরাধনা কখনই বিফল হতে পারে না। তোমার পুত্রগণের রক্ষার জন্য তুমি পয়োব্রত দ্বারা আমার যে অর্চনা ও গুণানুরূপ স্তুতি করেছ, তাতে আমি পরিতুষ্ট হয়েছি। অতএব আমি কশ্যপের তপস্যা আশ্রয়পূর্বক নিজ অংশ দ্বারা তোমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়ে তোমার পুত্রদের রক্ষা করব। হে ভদ্রে, অতএব আমি তোমার পতির মধ্যে এই রূপে অবস্থান করছি–এই প্রকার চিন্তা করে তুমি নিজপতি নিষ্পাপ কশ্যপের ভজনা কর (অর্থাৎ তার নিকট হতে গর্ভধারণ কর)। হে দেবী, কেউ জিজ্ঞাসা করলেও কোনরূপেই তা অপরের নিকট বলবে না। কারণ দেবতাদের সকল রহস্য সম্যভাবে গুপ্ত হলেই সুসিদ্ধ হয়।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, অদিতিকে এই সকল কথা বলে, ভগবান শ্রীহরি সেখানেই অন্তর্হিত হলেন। অদিতিও নিজের মধ্যে ভগবান শ্রীহরির দুর্লভ জন্মের বরপ্রাপ্ত হয়ে, নিজেকে কৃতার্থের ন্যায় মনে করে পরম ভক্তিসহকারে, পতি কশ্যপের নিকট গমন করলেন। সত্যদর্শী কশ্যপও সমাধিযোগে জানতে পারলেন–নিজের মধ্যে শ্রীহরির অংশ প্রবিষ্ট হয়েছে। বায়ু যেমন বনের বৃক্ষসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে তন্মধ্যে বনদাহক অগ্নির সঞ্চার করে, তেমনি তিনিও একাগ্রচিত্তে অদিতির মধ্যে চির তপস্যা-সঞ্চিত বীর্য স্থাপন করলেন। অদিতির মধ্যে সনাতন ভগবান শ্রীহরি গর্ভরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছেন জানতে পেরে ভগবান ব্রহ্মা তার গোপনীয় নামসমূহের আরাধনা করতে আরম্ভ করলেন।

ব্রহ্মা বললেন–হে উরুগায়, আপনি জয়যুক্ত হোন। হে ভগবান উরুম, আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মণ্যদেব ও ত্রিগুণস্বরূপ (ত্রিযুগ-স্বরূপ), আপনাকে নমস্কার করি। হে ভগবান, এই

অদিতির নাম পূর্বজন্মে পৃশ্নি ছিল, আপনি তারা গর্ভে পুত্র হয়ে জন্মেছিলেন, আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো, আপনি বিধাতা, বেদসমূহ আপনা হতেই প্রকাশিত হয় এবং আপনার তত্ত্বও বেদসমূহেই প্রকাশিত রয়েছে, আপনাকে নমস্কার। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল–এই লোকত্রয় আপনার নাভিদেশে বর্তমান, আপনি ত্রিলোকের উপরে অবস্থিত এবং আপনি শাপবিষ্ট অর্থাৎ সকল জীবের অন্তর্যামী, তথাপি সর্বব্যাপী আপনাকে নমস্কার করি, হে ঈশ, আপনি এই ভুবনের আদি, অন্ত ও মধ্য, পন্ডিতগণ আপনাকে অনন্তশক্তি পুরুষ বলে থাকেন। গভীর স্রোত যেরূপ নিজের মধ্যে পতিত তৃণাদিকে আকর্ষণ করে, কালরূপী আপনিও সেরূপ এই বিশ্বকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করছেন। হে দেব, আপনি স্থাবর জঙ্গম সমুদায় প্রজা ও প্রজাপতিদেরও উৎপাদক, আপনার জন্মাদি নেই। জলনিমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে নৌকার ন্যায় আপনি স্বর্গচ্যুত দেবগণের পরম আশ্রয়। অতএব দেবকার্য সাধনের জন্য আপনার এই অবতার, আপনি সম্প্রতি স্বর্গচ্যুত দেবতাদের পুনরায় স্বর্গে স্থাপন করুন এই প্রার্থনা।

.

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীভগবান বামনদেবের আবির্ভাব ও বলির যজ্ঞশালায় গমন

শ্রীশুকদেব বললেন– হে রাজন, ব্রহ্মা এই প্রকারে ভগবানের কার্য ও প্রকারের স্তুতি করলে, জন্ম মৃত্যুরহিত, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী, পীতবসন, কমললোচন সেই শ্রীহরি অদিতির মধ্যে আবির্ভূত হলেন। তার বর্ণ শ্যাম অথচ উজ্জ্বল, মুখমল কর্ণস্থিত মকরাকৃতি কুণ্ডলযুগের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, তার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস চিহ্ন দ্বারা সুশোভিত এবং বলয়, কেয়ুর, মুকুট, চন্দ্রহার ও মনোরম নূপুর্যুগল দেহমধ্যে নিজ নিজ স্থানে উল্লাসিত হতেছিল। তার কণ্ঠদেশে কৌস্তভমণি শোভা পেতেছিল এবং তৎকালে শ্রীহরি মধুকরগণের গুঞ্জনযুক্ত নিজ বর্নমালার দ্বারা বিভূষিত হয়ে নিজ দীপ্তির দ্বারা প্রজাপতি কশ্যপের গৃহের অন্ধকার বিনাশ করছিলেন। শ্রীভগবানের প্রাদুর্ভাবকালে দিমণ্ডল ও। জলাশয় সমূহ প্রসন্ন প্রজাবর্গ প্রহৃষ্ট এবং সমুদয় ঋতু স্ব স্ব গুণে (ফল-পুষ্পদিতে) শোভিত হল, আর স্বর্গ, আকাশ, পৃথিবী, দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ, গোসল ও পর্বতগণ হর্ষযুক্ত হয়েছিল।

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে চন্দ্র শ্রবণের প্রথম অংশে অভিজিৎ নক্ষত্রে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন। তৎকালে অশ্বিনী প্রভৃতি সমস্ত নক্ষত্র এবং গুরু, শুক্রাদি সমুদায় গ্রহ অনুকূল থেকে তার জন্ম উদার করেছিল অর্থাৎ তার জন্ম-মুহূর্তে গ্রহ-নক্ষত্রাদি সকলই

শুভাবহ হয়েছিল। হে মহারাজ, যে দ্বাদশীতে ভগবান বামনদেবের আবির্ভাব হয়, সেই দ্বাদশী বিজয়া বলে প্রসিদ্ধ। ঐ তিথিতে যখন ভগবানের আবির্ভাব হয়েছিল, তখন সূর্য দিবসের মধ্যভাগে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে শঙ্খ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব, পটই এবং অন্যান্য বিচিত্র বাদ্য ও তুর্যসমূহের তুমুল ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল। তখন অপ্সরাগণ প্রীত হয়ে নৃত্য করতে লাগল, গন্ধর্বগণ সঙ্গীতে প্রবৃত্ত হল এবং মুনিগণ স্তব আরম্ভ করলেন। পরে দেববৃন্দ, মুনিবর্গ, পিতৃগণ, অগ্নিগণ ও দেবগণের অনুসরণক্রমে সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, কিরুষগণ, কিন্নরগণ, চারণগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, গরুড়াদি পক্ষীগণ ও শ্রেষ্ঠ নাগগণ নৃত্য, গীত ও স্তুতি সহকারে কুসুমবর্ষণের দ্বারা কশ্যপের আশ্রমপদ আচ্ছন্ন করলেন।

হে রাজন, নিজ গর্ভ-সম্ভূত সেই পরম পুরুষকে নিরীক্ষণ করে অদিতির বিস্ময় ও হর্ষ জন্মিল। কশ্যপ সেই ভগবানকে নিজ যোগমায়াবলে দেহ ধারণ করতে দেখে বিস্ময়ে– "আপনি জয়যুক্ত হোন" এরূপ বলেছিলেন। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে– অব্যক্ত, চৈতন্যস্বরূপ শ্রীহরি প্রথমতঃ তৎকালে সমুজ্জ্বল দীপ্তি, অলংকার ও অস্ত্র সহযোগে সুস্পষ্টরূপে যে মূর্তি ধারণ করেছিলেন, পরে অদিতি ও কশ্যপের দৃষ্টির সম্মুখেই বিচিত্র লীলাময় ভগবান সেই মূর্তি দ্বারাই নটের ন্যায় বামনাকৃতি ব্রাহ্মণকুমার হলেন। ঐ বামন বটুকে অবলোকন করে মহর্ষিগণ আনন্দ প্রকাশ করতে করতে প্রজাপতি কশ্যপের গৃহে এসে তাকে অগ্রবর্তী করে জাতকর্মাদি সংস্কার করালেন।

হে মহারাজ, ঐ বামন বটুর উপনয়নকালে ভগবান সূর্যদেব স্বয়ং সাবিত্রী (গায়ত্রী) বৃহস্পতি যজ্ঞসূত্র এবং কশ্যপ মেখলা পরিধান করিয়ে দিলেন। এইরূপে ধরিত্রী তাকে কৃষ্ণাজিন, বড় সকলের পতি সোমদন্ড এবং মাতা অদিতি কৌপীন আচ্ছাদন ও স্বর্গলোক সেই জগৎপতিকে ছত্র দান করলেন। হে মহারাজ, বেদগর্ভ ব্রহ্মা কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ কশু এবং সরস্বতী সেই অব্যয়াত্মা পুরুষকে অক্ষমালা প্রদান করলেন। এইরূপে উপনয়ন হলে যক্ষরাজ কুবের সেই উপনীত ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষাপাত্র এবং ভগবতী সতী অম্বিকা উমা সাক্ষভাবে তাকে ভিক্ষা দিলেন। এইরূপে সমাদৃত হয়ে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মচারী বামন বটু নিজ ব্রহ্মতেজ দ্বারা ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত সেই সভাক্ষেত্রকে জয় করে অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন। তারপর সেই উপনীত বামন বটু উপনয়নকালে স্থাপিত অগ্নিকে যথাযথ প্রদীপ্ত করে, পরিসমূহ ও পরিস্থরণ (ঋজু করে কশুশু আস্তরণ) কর্মের পর যথোচিত অর্চনা করতঃ সমিধরাশির দ্বারা হোম করলেন।

তারপর তিনি শুনলেন–ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদের উপকল্পিত (প্রবর্তিত) বহুতর অশ্বমেধ দ্বারা বলবান বলি যজ্ঞ করছেন। অতএব অখিল বলে সম্পূর্ণ হয়ে প্রতি পদক্ষেপে নিজ ভারে অবনীমণ্ডল অবনত করতঃ সেই বামনদেব বলির যজ্ঞস্থানে গমন করলেন। হে রাজন, নর্মদার উত্তর তটে ভৃগুকচ্ছ। নামক ক্ষেত্রে বলির যে সকল ভৃগুবংশীয় ঋত্বিক ঐ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের কার্য করছিলেন, তাঁরা নিকটে উদিত সূর্যের ন্যায় ঐ বামনদেবকে দেখতে পেলেন। হে মহারাজ, সে সময় ঋত্বিকল, যজমান বলি এবং সদস্যগণ সকলে বামনদেবের তেজে নিষ্প্রভ হয়ে বিচার করতে লাগলেন– যজ্ঞদর্শন বাসনায় কি। সূর্যদেব আসছেন? কিংবা অগ্নিদেব অথবা সনৎকুমারই কি আগমন করছেন? শিষ্যগণসহ ভৃগুবংশীয়গণ এরূপ নানা প্রকার বিতর্ক করছিলেন, এমন সময় ভগবান বামনদেব ছত্র, দণ্ড ও সজল কমণ্ডলু ধারণ করে অশ্বমেধ যজ্ঞশালায় প্রবেশ করলেন।

কটিদেশ মুঞ্জাতৃণ নির্মিত মেখলার দ্বারা বেষ্টিত এবং উপবীতের ন্যায় অহিনরূপ উত্তরীয়ধারী, মায়িক ব্রহ্মচারী, জটিল, বামনাকৃতি ব্রাহ্মবেশী শ্রীহরিকে যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ করতে দেখে, অগ্নিসহ সশিষ্য ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ সমকালে তাঁর তেজে অভিভূত হয়ে গাত্রোত্থানপূর্বক তার অভ্যর্থনা করলেন। যজমান বলিও প্রমূদিত হয়ে দর্শনীয় মনোহর রূপের অনুরূপ অবয়ব বিশিষ্ট সেই বামনদেবকে অবলোকন করামাত্র ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে আসন প্রদান করলেন। তারপর বলি স্বাগত প্রশ্ন দ্বারা অভিনন্দনপূর্বক ভগবানের পদযুগল ধৌত করে, মুক্তসঙ্গ মনোরম (সর্বতোভাবে বিরক্ত যোগীদের মনে ক্রীড়ারত) সেই, ভগবান বামনদেবের অর্চনে প্রবৃত্ত হলেন। হে মহারাজ, চন্দ্রমৌলি মহাদেব শঙ্কর পরম ভক্তিসহকারে (গঙ্গারূপে) যাহা নিজ মস্তকদ্বারা ধারণ করেছিলেন, ধর্মজ্ঞ বলি জীবের কলুষ নাশক ও পরম মঙ্গলজনক সেই ভগবৎ– পাদোদক মস্তকে ধারণ করলেন।

বলি বললেন– হে ব্রাহ্মণ, আপনার সুখে আগমন হয়েছে তো? আপনাকে নমস্কার করি, আপনার কোন্ কার্য করব, আদেশ করুন। হে আর্য, আমার মনে হচ্ছে আপনি ব্রহ্মর্ষিদের মূর্তিমান তপস্যা, আপনি আমার গৃহে এসে উপস্থিত হয়েছেন, আজ আমার পিতৃগণ তৃপ্ত হলেন, আজ আমার এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হল। আজ আমার অগ্নিসকল যথাবিধি হুত হলেন। হে দ্বিজনন্দন, আপনার পাদপ্রক্ষলন জলে আমার সমস্ত পাপ বিধূত এবং আপনার ক্ষুদ্র পদবিন্যাসে এই ধরণীও পবিত্র হয়েছে। হে বিপ্রনন্দন, আপনাকে প্রার্থী বলে মনে হচ্ছে, অতএব, আপনি যা যা ইচ্ছা করেন, আমার নিকট হতে তাই গ্রহণ করুন। হে পূজ্যতম, গো, সুবর্ণ, উত্তম গৃহ, সুমিষ্ট অন্ন, বিপ্রকন্যা, সমৃদ্ধিশালী গ্রামসমূহ অশ্ব, হস্তী অথবা রথ– যা আপনার অভিলষিত তাই গ্রহণ করুন।

.

ঊনবিংশ অধ্যায়

বলির নিকট বামনদেবের ত্রিপাদ ভূমি যাঞ্চা এবং

শ্রীশুকদেব বললেন– হে রাজন, বিরোচনপুত্র বলির ঐ প্রকার ধর্মযুক্ত সত্যপ্রিয় বচন শ্রবণ করে, ভগবান বামনদেব প্রীত হয়ে তাঁকে অভিনন্দনপূর্বক বললেন। শ্রীভগবান বললেন– হে জনদেব, তোমার এ সকল বাক্য অতিশয় সুনৃত, ধর্মযুক্ত, যশস্কর এবং তোমার কুলোচিত। তা হবার কার্যই বটে, "যেহেতু ঐহিক ব্যবহার বিষয়ে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ এবং পারলৌকিক ধর্ম বিষয়ে কুলবৃদ্ধ প্রশান্তচিত্ত প্রহ্লাদ মহারাজকে তুমি প্রমাণস্বরূপ পেয়েছ, (অর্থাৎ তাদের নির্দেশেই তোমার ধর্মকর্মাদি অনুষ্ঠিত হয়) । হে রাজন, তোমাদের এই বংশে এমন নিঃসত্ত্ব বা কৃপণ কোনও পুরুষ জন্মে নি, যিনি যাচক ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, কিংবা দিতে অঙ্গীকার করে পরে দান করেন নি। হে নৃপ, দানকালে যাচকের দান প্রার্থনায় কিংবা যুদ্ধকালে প্রতিপক্ষের যুদ্ধ-প্রার্থনায় পরাজুখ হয়, এমন হীনচিত্ত ব্যক্তি তোমাদের বংশে কেউ উৎপন্ন হয়নি। এর প্রমাণ দেখ, আকাশে যেমন নক্ষত্রপতি চন্দ্র দীপ্তি পায়, তেমনি তোমাদের এই বংশে নির্মল যশঃসম্পন্ন শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বিরাজ করছেন।

আর, তোমাদের এই বিখ্যাত বংশে মহাবীর হিরণ্যাক্ষ জন্মগ্রহণ করে গদা ধারণপূর্বক দিগ্‌বিজয়ের জন্য একাকী সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করে কোথাও কোন প্রতিযোদ্ধা লাভ করেননি। বরাহরূপী বিষ্ণু রসাতল হতে পৃথিবীর উদ্ধারকালে নিকটে আগত ঐ হিরণ্যাক্ষকে অতিকষ্টে পরাজিত (নিহত) করে, নিরন্তর তার প্রভূত বীর্যের কথা স্মরণ করতে করতে নিজেকে জয়ী মনে করেছিলেন। পুরাকালে হিরণ্যকশিপু ভ্রাতার নিধনবার্তা শ্রবণ করে ভ্রাতৃহন্তার প্রাণবধার্থ ক্রুদ্ধ হয়ে হবীর নিলয়ে গমন করেন। তিনি ভাবলেন, আমি যেখানে যেখানেই যাই এই দৈত্যও প্রাণীদের মৃত্যুর ন্যায় সেই সেই স্থানেই গমন করছে, অতএব আমি এখন বহির্দৃষ্টি সম্পন্ন এই দৈত্যের হৃদয় প্রবেশ করি। হে অসুররাজ, ভগবান হরি ঐরূপ নিশ্চয় করে, নিজের অভিমুখে দ্রুতবেগে নাসিকারন্ধ্রের দ্বারা তার শরীরমধ্যে প্রবেশপূর্বক নিজ অতিসূক্ষ্ম দেহটিকে তারই শ্বাসবায়ুর মধ্যে লুক্কায়িত রেখে উদ্বিগ্নচিত্তে অবস্থান করছিলেন।

তারপর হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর শূন্য নিবাসস্থান অন্বেষণপূর্বক তাকে দেখতে না পেয়ে ক্রোধভরে গর্জন করেছিল। এভাবে সে পৃথিবী, স্বর্গ, দশ-দিক্, আকাশ পাতালসমূহ এবং সমুদ্র সকল

অন্বেষণ করে কোথাও বিষ্ণুকে দেখতে পেল না। বিষ্ণুর দর্শন না পেয়ে হিরণ্যকশিপু এরূপ বলেছিল– আমি সমস্ত জগৎ অন্বেষণ করেছি, আমার নিশ্চয় বোধ হতেছে- আমার ভ্রাতৃহন্তা সেই স্থানে গিয়েছে, যে স্থান থেকে কোনো লোক আর ফিরে আসে না। যদিও হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুকে মৃত্যুলোকগত মনে করেই এরূপ বলেছিল, তথাপি তার কথার বাস্তব অর্থ সত্য, যেহেতু বিষ্ণু সর্বদা যে ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠিত, সেখান হতে কাউকে আর সংসারে প্রত্যাগমন করতে হয় না। দেহাভিমানী পুরুষদের ইহলোকে মৃত্যুপর্যন্ত বৈরানুবন্ধ (অর্থাৎ শত্রুতার স্থায়িত্ব) ঘটে থাকে। এইরূপ অজ্ঞানপ্রসূত ক্রোধও অহংকার দ্বারা বর্ধিত হয়ে তৎকালেই স্থায়ী হয়। (বস্তুতঃ অজ্ঞান নিবৃত্তির পূর্বে পৌরুষ ত্যাগ মূর্খত, মাত্র, এই কারণেই হিরণ্যকশিপু শত্রুর অনুসন্ধানে বিরত হয় নি।)

হে অসুররাজ, তোমার পিতা প্রত্যুদনন্দন বিরোচন এরূপ দ্বিজবৎসল ছিলেন যে– নিজ শত্রু দেবগণকে চিনতে পেরেও যাচিত হওয়ায় ব্রাহ্মণবেশধারী দেবতাদের নিজের পরমায়ু দান করেছিলেন। তুমিও গৃহধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ নিজ বংশের পূর্বজাত বীরগণ এবং অন্যান্য উদারকীর্তি পুরুষগণের অনুষ্ঠিত ধর্মসমূহ অবলম্বন করেছ। হে দৈত্যেন্দ্র, অতএব আমি শ্রেষ্ঠ বরদাতা তোমার নিকট কিঞ্চিৎ ভূমি প্রার্থনা করি। আমার পদের পরিমাণে তিন পদ মাত্র ভূমিই আমার প্রার্থনা। হে রাজন, তুমি অসামান্য বদান্য এবং এই জগতের ঈশ্বর সত্য, কিন্তু আমি তোমার নিকট এর অধিক আর কিছুই প্রার্থনা করি না। কারণ– বিদ্বান্ ব্যক্তি যাবৎ বিষয়ে প্রয়োজন, তাবন্মাত্র প্রতিগ্রহ করলে, তাতে পাপভাগী হন না।

এই সমস্ত শ্রবণে বলি বিস্ময় প্রকাশপূর্বক বলতে লাগলেন– কি আশ্চর্য, হে ব্রাহ্মণনন্দন, তোমার কথাগুলি বৃদ্ধজনের সম্মত বটে, কিন্তু তুমি বালক, তোমার বুদ্ধিও অজ্ঞের মত, স্বার্থ বিষয়ে, তোমার বোধমাত্র নাই। ত্রিলোকের অদ্বিতীয় অধিপতি এবং দ্বীপ-দানে সমর্থ আমাকে বাক্যদ্বারা প্রসন্ন করে, যে ব্যক্তি ত্রিপাদ ভূমিমাত্র প্রার্থনা করে, সে বস্তুতঃ বুদ্ধিমান নয়। কোন ব্যক্তিকেই আমার নিকট একবার যাত্রা করলে জীবনে আর যাত্রা করতে হয় না। অতএব হে ব্রহ্মচারি, তুমি আমার নিকট হতে যথেচ্ছ জীবিকার উপযোগী বিপুল ভূমি গ্রহণ কর।

শ্রীভগবান বললেন– হে রাজ, ত্রিলোকমধ্যে যত যত প্রীতিকর বিষয়সমূহ রয়েছে, সে সকল একত্র হয়েও অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। যে ব্যক্তি ত্রিপাদ পরিমিত ভূমিতে অসন্তুষ্ট, দ্বীপ পেলেও তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, কারণ একটা দ্বীপ লাভ করলে, নববর্ষ সমেত সপ্তদ্বীপ লাভের আকাঙ্ক্ষা হবে। আমরা শুনেছি, সপ্তদ্বীপের অধিপতি পৃথু, গয় প্রভৃতি নরপতিগণও যথেচ্ছ অর্থ ও কামের দ্বারা তৃষ্ণার অন্ত প্রাপ্ত হন নি। যিনি যদৃচ্ছালব্ধ

বিষয়ে সন্তুষ্ট তিনিই সুখে থাকেন, অসন্তুষ্ট অজিতাত্মা ব্যক্তি ত্রিভুবন লাভ করেও সুখী হতে পারে না। অর্থ ও কাম বিষয়ে অসন্তোষই পুরুষের সংসারের কারণ এবং যদৃচ্ছালব্ধ বিষয়ে সন্তোষই মুক্তির হেতু বলে কথিত হয়েছে। যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হলেই ব্রাহ্মণের তেজ বর্ধিত হয়, তা না হলে, জল দ্বারা যেমন অগ্নির বিনাশ হয়, তেমনি অসন্তোষে বিপ্রতেজ শান্ত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে থাকে। অতএব হে বরদর্ষভ, আমি ত্রিপাদ মাত্র ভূমিই তোমার নিকট প্রার্থনা করি, এতেই আমি কৃতার্থ হব। যেহেতু প্রয়োজনানুরূপ বিত্তই সুখজনক, অতিরিক্ত ধন ক্লেশের কারণ হয়ে থাকে।

শ্রীশুকদেব বললেন– এই প্রকার উক্ত হয়ে বলি হাসতে হাসতে বললেন– তবে, তোমার যা ইচ্ছা, তাই গ্রহণ কর। এই বলে বামনকে ভূমিদানের জন্য জলপাত্র গ্রহণ করলেন। অসুররাজ বলি ভগবান বিষ্ণুকে ভূমি দান করতে উদ্যত হলে, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য বিষ্ণুর অভিপ্রায় জানতে পেরে শিষ্য বলিকে এরূপ বললেন। শুক্রাচার্য বললেন– হে বিরোচন-নন্দন, এই বামন ব্রাহ্মণবালক সাক্ষাৎ অব্যয় ভগবান বিষ্ণু, ইনি দেবগণের কার্যসাধনের জন্য কশ্যপ হতে অদিতির গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। তুমি নিজের অনর্থ না বুঝে এর নিকট যে ভূমিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, উহা আমি সমীচীন বোধ করি না। কারণ তা দৈত্যগণের পক্ষে অতিশয় অন্যায় উপস্থিত হল। ইনি তোমার স্থান, ঐশ্বর্য, শ্রী, তেজ, যশ, বিদ্যা, সমুদয় কৌশলে হরণ করে ইন্দ্রকে প্রদান করবেন। ইনি মানব নহেন, ভগবান হরি, মায়াযোগে বামন হয়েছেন। তুমি ত্রিপাদমাত্র ভূমি দিতে প্রতিশ্রুত হলে সত্য, কিন্তু ইনি তিন পদেই সমুদায় লোক আক্রমণ করবেন। কারণ ইনি বিশ্বমূর্তি। (তারপর ক্রোধ প্রকাশ করে বলতে লাগলেন)– আরে মূঢ় বিষ্ণুকে সর্বস্ব দান করে নিজে কিরূপে জীবন ধারণ করবে?

বিশেষতঃ ইনি বিরাট দেহ দ্বারাই আকাশমণ্ডল পরিপূরণ করবেন, তারপর প্রথম পদবিন্যাস দ্বারা পৃথিবী ও দ্বিতীয় পদবিন্যাসদ্বারা স্বর্গলোক অধিকার করলে, তৃতীয় পদবিন্যাসের স্থানই বা কোথায় হবে? এইরূপে তুমি প্রতিশ্রুত ত্রিপাদ ভূমি প্রদান করতে অসমর্থ হবে, অতএব প্রতিশ্রুত বিষয় প্রদান না করার জন্য পরিমাণে তোমার নরকেই স্থিতি হবে– এই আমি মনে করি। যে দানের দ্বারা নিজের বৃত্তি বিপন্ন হয়, পণ্ডিতগণ সে দানের প্রশংসা করেন না; যেহেতু লোকে বৃত্তিশালী (জীবিকা-বিশিষ্ট) ব্যক্তিরই দান, যজ্ঞ, চিত্তের একাগ্রতা বা পূর্তাদি কর্ম সম্ভবপর হয়। যে ব্যক্তি ধর্ম, যশ, অর্থলাভ, সুখভোগ ও স্বজনগণের জন্য নিজ বিত্তকে পাঁচভাগে বিভাগ করেন, তিনিই ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হন। যা হোক, এখন প্রতিশ্রুত হয়ে কি প্রকারে মিথ্যা বলব, এ ভাবনা ত্যাগ কর। . হে অসুরপ্রবর, সত্য মিথ্যার ব্যবস্থা

বিষয়ে বোচ শ্রত্বতিতে যা উক্ত হয়েছে, তা আমার নিকট শোন। সাধারণতঃ "হ্যা" –এইরূপ অঙ্গীকারই সত্য এবং "না"–এইরূপ অস্বীকারই মিথ্যা বলে উক্ত হয়।

সত্যকে দেহরূপ বৃক্ষের পুষ্প ও ফলস্বরূপ জানবে, যেহেতু শ্রক্ষৃতিতে ঐরূপ উক্ত হয়েছে। কিন্তু দেহরূপ বৃক্ষ জীবিত না থাকলে, ঐ পুষ্প রূপ ফল কিসে হবে? (অর্থাৎ সত্যেরও উৎপত্তি বা স্থিতি সম্ভবপর নয়।) অতএব মিথ্যাই দেহবৃক্ষের মূল। (সর্বতোভাবে সত্যনিষ্ঠ হলে যে স্থলে জীবন রক্ষাই অসম্ভব হয়ে পড়ে, সেখানে জীবন রক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ অসত্যের আশ্রয় দোষাবহ নহে। ইহাই বাক্যের তাৎপর্য। এস্থলে অঙ্গীকৃত ত্রিপাদ ভূমি দান করতে গেলে বলির জীবিকা নির্বাহই সম্ভবপর হয় না)। বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হলে যেমন সেটি শুষ্ক হয়ে অচিরেই ভূপতিত হয়, তেমনি মিথ্যার নাশ হলে, দেহও শীঘ্রই শীর্ণ হয়ে পড়ে। দানের স্বীকৃতিরূপে "হ্যা"–এই অক্ষরটি দাতার অর্থকে দূরে নিয়ে যায়, সুতরাং পুরুষকে ধনশূন্য করে ফেলে অথবা দাতার অপূর্ণতা আনয়ন করে (অর্থাৎ যাচকের আশার অন্ত নাই, সুতরাং তা পূর্ণ করা যেতে পারে না। অতএব প্রার্থীর প্রতিদানের প্রতিশ্রুতিরূপে "হ্যাঁ"–এইরূপ বললে দাতা এর দ্বারা রিক্তই হয়ে থাকে। আর ভিক্ষুকের প্রতি সর্বদা "হ্যাঁ" বলতে গেলে দাতা নিজে ভোগ করতে সমর্থ হয় না।

অতএব "না"–এইরূপ মিথ্যা বচনই পূর্ণ (পূর্ণতর সাধক) এবং নিজের দিকে অপরের অর্থ আকর্ষণ করে, ওহে দৈত্য, আমার কথায় এরূপ মনে করো না যে অমৃতের মত সর্বদাই অমৃত সেবনীয়, কারণ যে ব্যক্তি সর্বদা "না"– এরূপ বলে, সে দুষ্কীর্তিভাগী ও মৃততুল্য বলেই গণ্য হয়। কতকগুলি বিষয়ে মিথ্যা দোষাবহ নহে- যেমন, স্ত্রীলোককে উৎসাহ দ্বারা বশীভূত করতে হলে, কিংবা পরিহাস ব্যাপারে, বিবাহ ব্যাপারে, জীবিকার জন্য, প্রাণসংকট উপস্থিত হলে, গো– ব্রাহ্মণের হিতার্থে, কিংবা দস্যু প্রভৃতির দ্বারা কারও হিংসা উপস্থিত হলে (তার রক্ষার জন্য) মিথ্যাভাষণ নিন্দনীয় হয় না।

.

বিংশ অধ্যায়

বলি কর্তৃক বামনদেবকে ত্রিপাদ ভূমি দান এবং শ্রীভগবানের বিরাটুরূপ গ্রহণ

শ্রীশুকদেব বললেন– হে মহারাজ, কুলগুরু শুক্রাচার্য এরূপ বললে, গৃহপতি যজমান বিরোচন পুত্র বলি ক্ষণকাল মৌন থেকে, পরে অবহিতচিত্তে গুরুকে এরূপ বলেছিলেন। বলি বললেন– হে গুরুদেব, আপনি সত্যই বলেছেন– যাতে কখনও অর্থ, কাম, যশ ও জীবিকার বাধা না হয়, তাই গৃহস্থগণের ধর্ম। আমি মহাত্মা প্রহ্লাদের পৌত্র তাই একবার "দিব"–বলে প্রতিশ্রুত হয়ে, সামান্য বিত্তলোভে কিতবের ন্যায় আবার কি প্রকারে, প্রত্যাখ্যান করব? এই পৃথিবী দেবীও বলেছেন–অসত্য অপেক্ষা গুরুতর অধর্ম আর নেই, মিথ্যাবাদী মানব ভিন্ন মরু–মন্দরাদি সব কিছুই আমি বহন করতে সমর্থ বলে মনে করি। মিথ্যা কথা বলে ব্রাহ্মণের প্রবঞ্চনা থেকে আমি যত ভয় পাই, নরক, অধন্য, দারিদ্র্য, দুঃখসমুদ্র, স্থানচ্যুতি এবং মৃত্যু হতেও তত ভয় পাই না। আর, এই পৃথিবীতে ভূমি প্রভৃতি যে সকল ধনসম্পদ রয়েছে, তা মৃত ব্যক্তিকে (অর্থাৎ মরণের পর আমাকে) অবশ্যই ত্যাগ করবে, অতএব জীবিত থেকে নিজেই তা দান করি না কেন? যদি বলেন, সর্বস্ব দানের পর নিজের জীবিকা-সঙ্কট হবে। এজন্য অর্ধেক দান বিচারসম্মত তা হলে বলছি, যা দান করলে ব্রাহ্মণের তুষ্টি হবে না, সেরূপ দানের ফল কি? দধীচি, শিব প্রভৃতি সাধুপুরুষেরা দুস্ত্যজ প্রাণী দিয়েও প্রাণীগণের উপকার করেছেন, তবে ভূমি প্রভৃতি সামান্য বিষয় পরিত্যাগের বিচার কি?

হে ব্রাহ্মণ, যুদ্ধে অপরাজুখ যে, সকল দৈত্য পূর্বে এই পৃথিবী ভোগ করেছেন, করাল কাল তাদের ইহলোক ও পরলোক উভয়ই গ্রাস করেছে। কিন্তু তারা এই ভূমণ্ডলে যে যশ অর্জন করেছেন, তা কালগ্রস্ত হয় নি, অতএব যশ সাধন করাই বিধেয়। হে বিপ্রর্ষে, যুদ্ধক্ষেত্র হতে পরাজুখ না হয়ে যুদ্ধে দেহত্যাগ করেছেন এরূপ লোকমধ্যে সুলভ। কিন্তু সৎপাত্র উপস্থিত হলে শ্রদ্ধার সহিত ধন ত্যাগ করেন– এরূপ পুরুষ সুলভ নয়। হে গুরুদেব, সামান্য যে, কোন প্রার্থীর অভিলাষ পূরণ করতে গিয়ে যদি দুর্গতি হয়, তা সদয় মনস্বী পুরুষের শ্রেয়ঃ এ অবস্থায় আপনাদের মত ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভিলাষ পূরণের যদি আমার দৈন্যদশা উপস্থিত হয়, তা শ্রেয়ঃ বলে গণ্য না হবার কি? অতএব আমি এই ব্রহ্মচারীর প্রার্থিত বস্তু নিশ্চয়ই দান করব। হে মুনিবর, বেদোক্ত বিধানে কুশল আপনারা সাদরে যাগযজ্ঞাদির দ্বারা যার অর্চনা করে থাকেন, ইনি যদি সেই বরদাতা বিষ্ণুই হন, অথবা আমার শত্রুই হন, তথাপি আমি তাকে প্রার্থিত ভূমি অবশ্যই দান করব। আমি নিরপরাধ, যদি তিনি অধর্মের আশ্রয় নিয়ে আমাকে বন্ধন করেন, তবুও আমি ভীত ব্রাহ্মণবেশধারী এই শত্রুকে হিংসা করব না। আর ইনি যদি সত্যই উত্তমঃ শ্লোক ভগবান বিষ্ণুই হন এবং যদি নিজের যশ ত্যাগ করতে ইচ্ছা না করেন, তা হলে যুদ্ধে আমাকে বধ করে এই ভূমি হরণ করবেন, অথবা আমার কর্তৃক নিহত হয়ে ভূমিশায়ী হবেন।

শ্রীশুকদেব বললেন– নিজ শিষ্য বলি এই প্রকারে অশ্রদ্ধ হয়ে আদেশ পালনে পরাজুখ হলে যেন দৈবপ্রেরিত হয়ে শুক্রাচার্য ক্রোধপূর্বক সত্যপ্রতিজ্ঞ উদারচিত্ত ঐ অসুর শ্রেষ্ঠকে এই বলে শাপ দিলেন- তুমি অজ্ঞ হয়েও নিজেকে পণ্ডিত বলে মনে করছ। আমাকে উপেক্ষা করায় নিজ গর্বেরও পরিচয় দিয়েছ। অতএব আমার আজ্ঞা লঙনহেতু তুমি অচিরেই শ্রীভষ্ট হবে। মহাত্মা বলি নিজ গুরু কর্তৃক ঐরূপ অভিশপ্ত হয়েও সত্য হতে বিচলিত হলেন না। বামনকে অর্চনা করে জল স্পর্শপূর্বক ভূমিদান করলেন। বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলী মুক্তাভরণ ও মাল্যে অলংকৃতা হয়ে তৎকালে সেখানে এসে পাদপ্রক্ষালনের উপযোগী জলপূর্ণ একটি স্বর্ণকুম্ভ আনয়ন করলেন। তারপর যজমান বলি সেই জল দিয়ে পরম হর্ষে স্বয়ং বামনদেবের পদযুগল প্রক্ষালনপূর্বক নিখিল বিশ্বের পবিত্রকারী সেই জল নিজ মস্তকে ধারণ করলেন।

হে রাজন, সেই সময় স্বর্গস্থিত দেবগণ এবং গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ সকলেই বলির সেই কর্ম ও সরলতার প্রশংসা করতঃ পরম হর্ষে তার উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। আর, সহস্র সহস্র দুন্দুভি মুহুর্মুহু বাদিত হতে লাগল। তখন গন্ধর্ব কিম্পুরুষ কিন্নরেরা এই বলে গান করলেন—"মনস্বী বলি অতি দুষ্কর কর্ম করলেন, যেহেতু জেনেও নিজের শত্রুকে ত্রিভুবন দান করলেন।" বলি অগ্রে "যাহা বাঞ্ছা হয়, গ্রহণ করুন"–এই কথা বলাতে, তারপর হরির ঐ বামনরূপ অদ্ভুতরূপে বর্ধিত হল। ঐ মূর্তির আত্মায় গুণত্রয় বর্তমান থাকায়, পৃথিবী, আকাশ, দিমণ্ডল, স্বর্গলোক বিষয়সমূহ (পাতাল প্রভৃতি), সমুদ্রসকল, তির্যক প্রাণীগণ, মনুষ্যগণ, দেবগণ ও ঋষিগণ– তাতে অবস্থিত ছিল। সে সময়ে ঋত্বি, আচার্য ও সদস্যগণের সাথে মহারাজ বলি, মহাবিভূতিশালী ভগবানের সেই গুণময় দেহমধ্যে আকাশাদি পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়বর্গ শব্দাদি বিষয়, অন্তঃকরণ ও জীবসহ এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব দেখতে পেলেন।

ইন্দ্রসেন (অর্থাৎ) ইন্দ্রসেনাই যাঁর সেনা, অথবা ইন্দ্রসেন বলি, মহারাজের একটি নাম। বলি বিশ্বমূর্তি হরির পদতলে রসাতল, চরণদ্বয়ে পৃথিবী, জঙ্ঘদ্বয়ে পর্বতরাজি, জানুদেশে পক্ষিগণ এবং ঊরুযুগলে মরুদগণ দর্শন করলেন। এইরূপ তিনি ঊরুক্রম ভগবানের বস্ত্রমধ্যে সন্ধ্যা, গুহ্যদেশে প্রজাপতিগণ, জঘনদেশে নিজসহ অসুরগণ, নাভিস্থলে আকাশ, কুক্ষিদেশে সপ্তসমুদ্র এবং বক্ষঃস্থলে নক্ষত্ররাশি দেখতে পেলেন। বলি সেই মুরারির হৃদয়ে ধর্ম, স্তনদ্বয়ে ঋত ও সত্য, মনোমধ্যে চন্দ্র, বক্ষঃস্থলে পদ্মহস্তা পদ্মা, কণ্ঠদেশে সামবেদ ও সমস্ত শব্দরাশি দর্শন করেছিলেন। এইরূপে বাহুসকলে ইন্দ্রাদি দেবগণ, কর্ণদ্বয়ে দিল, মস্তকে স্বর্গ, কেশরাশির মধ্যে মেঘমালা, নাসিকায় বায়ু, চক্ষুদ্বয়ে সূর্য, বদনে বহ্নি, বাক্যে ছন্দোরাশি, জিহ্বায় বরুণ, ভ্রূযুগলের মধ্যে বিধি ও নিষেধ, নেত্রলোমে দিবা ও রাত্রি, ললাটে ক্রোধ এবং অধরে লোভের অবস্থান লক্ষ্য করেছিলেন।

হে মহারাজ, এইরূপ তিনি সেই পরমপুরুষের স্পর্শে কাম, শুক্রমধ্যে জল, পৃষ্ঠদেশে অধম, পদবিন্যাসে যজ্ঞ, ছায়ামধ্যে মৃত্যু, হাস্যে মায়া, রোমরাজির মধ্যে ঔষধিসমূহ, নাড়ীসমূহে নদীসকল, নখসমূহে শিলারাশি, বুদ্ধিমধ্যে ব্রহ্মা, প্রাণমধ্যে দেবগণ ও ঋষিগণ এবং গাত্রদেশে স্থাবর-জঙ্গম ভূতসমষ্টি দেখতে পেলেন। হে রাজন, তৎকালে সকল অসুরগণ সর্বাত্ম সেই ভগবান বামনদেবের দেহে নিখিল ভুবন দর্শন করে ভীত হয়ে পড়ল। সে সময় অসহ্য তেজঃশালী সুদর্শন চক্র, মেঘের ন্যায় ধ্বনিযুক্ত শার্ঙ্গ নামক ধনুঃ, গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, বেগশালিনী কৌমুদীকী গদা, শতচন্দ্রযুক্ত বিদ্যাধর নামক অসি, অক্ষয় বাণপূর্ণ তূণযুগল এবং লোকপালগণের সহিত প্রধান পার্ষদগণ নিজ প্রভু ভগবানের চারদিক হতে স্তুতি করছিলেন। এ অবস্থায় ভগবান সমুজ্জ্বল কিরীট, অঙ্গদ, মকরাকৃতি কুণ্ডলযুগল, শ্রীবৎস চিহ্ন, কৌস্তভ রত্ন, মেখলা এবং মনোরম বস্ত্রে বিভূষিত হয়ে বিরাজ করছিলেন।

হে মহারাজ, তৎকালে ভগবান ঊরুম ভ্রমরপংক্তি শোভিত বর্ণমালায় আবৃত হয়ে অতিশয় শোভা পেতে লাগলেন। তারপর এক পদদ্বারা বলির অধিকৃত সমস্ত ভূভাগ, শরীর দ্বারা আকাশ মণ্ডল ও বাহুসমূহ দ্বারা দিমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করলেন। এরপর দ্বিতীয় পদবিন্যাস কালে স্বর্গলোক কোনরূপে তার স্থান হল বটে, কিন্তু তৃতীয় পদবিন্যাসের বলির আর অণুমাত্র স্থানও ছিল না। তখন উরুক্রম শ্রীহরির সেই পদ ক্রমশঃ ঊর্ধ্বভাগে মহলোক, জনতোক ও তপোলোকের উপরে সত্যলোকে গিয়ে উপনীত হল।

.

একবিংশ অধ্যায়

বলির বন্ধন এবং শ্রীভগবানের বাক্য

শ্রীশুকদেব বললেন– হে মহারাজ ভগবান ঊরুমের দ্বিতীয় চরণ সত্যলোকে উপস্থিত হলে তাঁর নখচন্দ্রের কিরণে ব্রহ্মার নিজ ধর্মের দীপ্তি অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন হলেন। তা দেখে পদ্মযোনি ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতি বৃহদুব্রতধারী ঋষিগণ এবং সনন্দনাদি যোগীগন সকলে তাঁর (চরণের নিকট গমন। করলেন।

তখন বেদ, উপবেদ, যম, নিয়ম, তর্ক, ইতিহাস, বেদাঙ্গ, পুরাণ ও সংহিতাসমূহ এবং যাদের যোগরূপ বায়ুর দ্বারা উদ্দীপিত জ্ঞানরূপ অগ্নি কর্তৃক কর্মফল ভস্মীভূত হয়েছে, তারা সকলে সেই পাদপদ্মের বন্দনা করেছিলেন তারা ভগবানের এই পাদপদ্মের স্মরণপ্রভাবেই কর্মদ্বারা

আজীবন এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তখন বিমলকীর্তি ব্রহ্মাও যাঁর নাভিকমল হতে উৎপন্ন হয়েছে, সেই বিষ্ণুর ঊর্ধ্বগত চরণে কমণ্ডলুর জল সমর্পণ করলেন এবং ভক্তিপূর্বক অর্চনা করে স্তব করতে লাগলেন।

হে নরেন্দ্র, তৎকালে ব্রহ্মার কমণ্ডলুর জল ঐ উরুক্রমের পাদস্থলনে পবিত্র হয়ে স্বর্গ গঙ্গারূপে পরিণত হয়েছিল এবং উহাই অদ্যাবধি আকাশমার্গে প্রবাহিত হয়ে ভগবানের নির্মল কীর্তির ন্যায় ত্রিভুবন পবিত্র করেছে।

তারপর অনুচরগণের সহিত ব্রহ্মাদি লোকপালগণ ত্রিবিক্রম মূর্তি সংক্ষেপ করে পূর্বের ন্যায় বামনরূপে অবস্থিত নিজ প্রভু শ্রীহরিকে সাদরে পুজোসহ আহরণ করলেন। শীত জল, সুন্দর মাল্যদিব্য গন্ধদ্রব্য ও বিবিধ অনুলেপন সুবসিত ধূপ ও দীপ এবং লাজ (খৈ), আতপ তণ্ডুল ও ফলরাশির দ্বারা অর্চনা করে স্তব এবং তার বীর্য ও মহিমাযুক্ত জয়ধ্বনি নৃত্যগীত, বাদ্য এবং শঙ্খ ও দুন্দুভি নিনাদ এই সমস্তের দ্বারা উৎসব করলেন। পরে মনের মত দ্রুতগামী ভল্লুকরাজ জাম্ববান্ ভেরীধ্বনি করে সকল দিকে ঐ বিজয় মহোৎসব ঘোষণা করতে লাগলেন।

বামনদেব ত্রিপাদ ভূমি যাঞ্জার ছল করে যজ্ঞ দীক্ষিত নিজ প্রভু বলির সমস্ত পৃথিবী হরণ করেছেন দেখে, তৎকালে অসুরগণ মহাক্রোধে এরূপ বলতে লাগল। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ-সন্তান নয়, কিন্তু মায়াবিগণের প্রধান বিষ্ণুই ব্রাহ্মণবেশে আত্মগোপন করে দেবতাদের কার্যসাধনের ইচ্ছা করছে। আমাদের প্রভু সম্প্রতি যজ্ঞকালে শাসনদণ্ডটি কুশের উপর রেখে দিয়েছেন (অর্থাৎ হিংসা থেকে বিরত হয়েছেন)।

সেই সুযোগেই বটুরূপী ও শত্রু ভিক্ষুক হয়ে আমাদের প্রভুর সর্বস্ব হরণ করেছে। সর্বদা সত্যনিষ্ঠ, বিশেষত সম্প্রতি যজ্ঞে দীক্ষিত ব্রাহ্মণহিতৈষী ও দয়াশীল প্রভুর পক্ষে মিথ্যা কথা (অর্থাৎ এই যাচককে প্রত্যাখান করা) সম্ভবপর নয়। অতএব এখন কপট এই ব্রাহ্মণ বেশধারী বিষ্ণু বধ করাই আমাদের ধর্ম এবং এর দ্বারা প্রভুর সেবা করতে হবে। এইরূপ বলে বলির অনুচর অসুরগণ অস্ত্রধারণ করল। হে মহারাজ, তৎকালে বলির অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই অসুরগণ সকলে ক্রুদ্ধ চিত্তে বামনদেবের বধের জন্য শূল ও পরিখ নামক অস্ত্র হাতে নিয়ে তার দিকে ধাবিত হল।

হে মহারাজ, সেই দৈত্য সেনাপতিদের বামনদেবের অভিমুখে ধাবিত দেখে, বিষ্ণুর অনুচরগণ হাস্য করতে করতে অস্ত্র উদ্যত করে তাদের বাধা দিতে লাগলেন। তৎকালে অযুত হস্তীর

তুল্য বলশালী নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয় প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিস্বকৃমেন গরুড়, জয়ন্ত, শত্রুদের পুষ্পদণ্ড ও সাত্বত এরা সকলে অসুর সৈন্যদের বধ করতে লাগলেন। কাল বিষুর অনুচরগণ কর্তৃক এইরূপে নিজ সৈন্যদের হত হতে দেখে শুক্রাচার্যের অভিশাপ স্মরণপূর্বক ক্রুদ্ধ দৈত্যদের, যে কাল সকল প্রাণীর সুখ দুঃখ প্রদানে প্রভু, কোন ব্যক্তিই পৌরুষ দ্বারা তাকে অতিক্রম করতে সমর্থ নয়। যে কালরূপী ভগবান পূর্বে আমাদের উন্নতি এবং দেবগণের অবনতির কারণ ছিল, সেই ভগবান এখন তার বিপরীত হয়ে উঠেছেন। আরও শোন অমাত্য, বল, বুদ্ধি, দুর্গ, মন্ত্র, ঔষধাদি ও সম্পাদি উপায় দ্বারা কিছুতেই লোকে কাল অতিক্রম করতে সমর্থ হয় না। হে দৈত্যগণ, পূর্বে তোমরা দৈববলে বলবান হয়ে শ্রীহরির এই অনুচরগণকে বহুবার যুদ্ধে পরাজিত করেছ, আর এখন তারাই যুদ্ধে আমাদের জয় করে গর্জন করছে। যদি দৈব পুনবায় আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন, তাহলে তখন আমরা এদের জয় করব। অতএব সময়ান্তরে যে কাল আমাদের অনুকূল হবে, তোমরা এখন সেই কালেরই অপেক্ষা করতে থাকুন।

শ্রীশুকদেব বললেন– হে রাজন, প্রভু বলির ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করে, সেই দৈত্য ও দানবগণের যুথাতিগণ বিষ্ণুর পার্ষদগণ কর্তৃক তাড়িত হয়ে রসাতলে প্রবেশ করেছিল। তারপর পক্ষীরাজ গরুড় ভগবানের গতি প্রায় অর্থাৎ প্রভু পূর্বে কলির সর্বস্ব হরণ করে এর মমতা দূর করেছেন, এখন দেহ গ্রহণ করে এর সহং করও ত্যাগ করিয়ে পরম অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করছেন, আর এর তুল্য অন্য কোন সত্যপ্রতিজ্ঞ বীর নেই–এই যশ ঘোষণা করতে চাইলে সোমাভিষবের দিন বাকল পাশদ্বারা বলিকে বন্ধন করলেন। প্রভাবশালী ভগবান বিষ্ণু অসুররাজ বলিকে এই রূপে বন্ধনপূর্বক নিগ্রহের উপক্রম করলে স্বর্গ ও মর্ত্যলোকে সকলদিকে অতিশয় হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হল।

হে মহারাজ, তৎকালে ভগবান বামনদেব বরুণপাশে আবদ্ধ, নষ্ট সম্পদ অথচ স্থিরবুদ্ধি সেই উদারকীর্তি বলিকে এরূপ বলেছিলেন–ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি দান করতে প্রতিশ্রুত হয়েছ, তার মধ্যে দুই পদে সমগ্র ভূমিভাগ অধিকার করেছি, এখন তৃতীয়পদ বিন্যাসের স্থান দাও।

ঐ সূর্য কিরণরাশির দ্বারা যতদূর পর্যন্ত তাপ দেয়, নক্ষত্রজনের সাথে চন্দ্র যতদূর এই রাশি পায় এবং যে পর্যন্ত মেঘ বারিবর্ষণ করে, সেই পর্যন্ত ভূমিসম্পদ তোমার। তার মধ্যে আমি এক নদে সমুদায় ভূর্লোক আক্রমণ করেছি। আমার শরীর দ্বারা আকাশ ও দিক সকল ব্যাপ্ত হয়েছে দেখ না তোমার দৃষ্টির সম্মুখেই দ্বিতীয় পদে স্বর্গলোক আক্রান্ত হল, এভাবে আমি তোমার সর্বস্ব অধিকার করেছি।

তৃতীয় পদবিন্যাসের তোমার কোন স্থান নেই। প্রতিশ্রুত বিষয় দান না করার জন্য তোমার নরকবাসই উচিত। অতএব তোমার গুরুর অনুমতি নিয়ে নরকে প্রবেশ কর। যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি বস্তু দান না করে যাচকারে বঞ্চনা করে, তার মনোরথ বৃথা, স্বর্গ তার অতিদূর, সে অধঃপতিত হয়। তুমি নিজেকে ঐশ্বর্যশালী বলে অভিমান কর, অথচ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তোমাকে প্রতারিত করলে, অতএব এই মিথ্যার ফলস্বরূপ কয়েক বৎসর নরক ভোগ কর।

.

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বলিকে ভূতলে পাঠিয়ে, ন্যূনতম বোধে বলির প্রতি বরদান পূর্বক ভগবানের দ্বারা অঙ্গীকার

শ্রীশুকদেব বললেন– হে রাজন, ভগবান বামনদেব এই প্রকার (বন্ধন ও বাক্যের দ্বারা) বলির অপকার করে, তাকে সত্যভ্রষ্ট করার উপক্রম করলেও অসুররাজ বলি অবিচলিত চিত্তে এরূপ অরিপু বাক্য বলেছিলেন। বলি বললেন– হে উত্তমঃশ্লোক, হে সুরবর্ষ, আমার কথিত বাক্য অসত্য নয়। আপনিই পূর্বে কপটতাপূর্বক বামনরূপে ভিক্ষা করে, এক্ষণে রূপান্তর প্রকাশ করেছেন। যা হোক, ঐ প্রকারেও যদি আপনি আমার কথা মিথ্যা বলে মনে করেন, তথাপি আমি নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করছি, আমার প্রতিশ্রুতি বাক্য ব্যঞ্জনাময় না থোক। আপনি দুই পদ পরিমিত স্থান পেয়েছেন, তৃতীয় পদের স্থান পান নি, ঐ চরণ আমার মস্তকে স্থাপন করুন। (দুই চরণে বিশ্ব আক্রমণকারী আপনার একটি চরণের পক্ষে আমার মস্তক পর্যাপ্ত হবে না– এটা মনে করবেন না, কারণ বিত্তের দ্বারাই যদি দুই চরণের স্থান হয়ে থাকে, তা হলে আমার মস্তক এক চরণের পক্ষে অধিক যেহেতু বিত্ত অপেক্ষা বিত্তবানেরই অধিকত্ব।)

হে ভগবান, আমি সম্প্রতি নিজ পদ হতে বিচ্যুত হয়েছি তবুও আমি অপকীর্তিতে যেরূপ ভয় করি, নরকপাশ বন্ধন দূরতিক্রমণীয় ব্যসন (বিপত্তি) অর্থকৃচ্ছ্বতা অথবা আপনার কৃত নিপীড়ন হতেও সেরূপ ভয় করি না। ব্রাহ্মণ, আপনার কৃত এই নিগ্রহ আমার অপকীর্তি জনক নয়, যেহেতু পরম পূজনীয় জন যে দণ্ড অর্জন করেন, তা পুরুষদের পক্ষে শ্লাঘ্যতম বলেই গণ্য হয়ে থাকে। বস্তুতঃ মাতা-পিতা-ভ্রাতা অথবা সুহৃদজনও ঐরূপ দণ্ড দিতে পারেন না, অতএব আপনি আমার হিতৈষী হয়ে এই নিগ্রহ করাতে আমি শ্লাঘ্যই হয়েছি। হে ভগবান, আপনি প্রভূত মদমত্ত আমাদের (অসুরগণের) মত্ততা বিনাশক জ্ঞানদৃষ্টি প্রদান করায় নিশ্চয়ই আপনি আমাদের পরোক্ষে পরম গুরু। অহো, যাঁর এত নিরবিচ্ছিন্ন বৈরীভাব পোষণ করে ইতঃপূর্বে বহু অসুর সিদ্ধিলাভ করেছে; যে সিদ্ধি কেবলমাত্র একনিষ্ঠ যোগীগণই লাভ করে থাকেন সেই

ভূরিকর্মা পরম গুরু আপনার কর্তৃক আমি নিগৃহীত ও করুণাপাশে বদ্ধ হয়েছি, এতে আমি লজ্জা বা ব্যথা বোধ করছি না।

ভগবান, আমার প্রতি আপনার দণ্ডরূপ এই যে অনুগ্রহ হল, এরও আমি পাত্র নহি, আপনি নিজ ভক্তের পৌত্র বলে এই অনুগ্রহ করলেন। আপনার নিজ জনগণ কর্তৃক সমাদৃত এবং তাদের নিকট হতে প্রশংসাপ্রাপ্ত আমার পিতামহ প্রহ্লাদ আপনার শত্রু নিজ পিতা হিরণ্যকশিপুর দ্বারা নানাভাবে উৎপীড়িত হয়েও একমাত্র আপনারই শরণাগত হয়েছিলেন।

আয়ুর অবসানে যে দেহ অবশ্যই জীবকে পরিত্যাগ করে মর্ত্য (মরণশীল) ব্যক্তির সেই দেহের আর কি প্রয়োজন? আর বিত্তহরণকারী স্বজন-সখায় পুত্রাদি দস্যুগণেরই বা কি প্রয়োজন? এইরূপ সংসার বন্ধনের কারণস্বরূপ আত্মীয় দ্বারাই বা কোন্ ইষ্টসিদ্ধি হতে পারে? আর, যে গৃহে কেবলমাত্র আয়ুক্ষয়ই হয়ে থাকে, সেরূপ গৃহেরই বা কি প্রয়োজন? হে সত্তম এইরূপ নিশ্চয় করে, অগাধবোধ সম্পন্ন আমার সেই মহান পিতামহ, যদিও আপনি তার নিজপক্ষের ক্ষয়কারী ছিলেন, তথাপি স্বজন হতে ভীত হওয়ায়, যাতে কোথা হতে ভয়ের সম্ভাবনা নাই এবং ধ্রুব সেরূপ আপনার পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

হে ভগবন্, আমিও সেই প্রহ্লাদ মহারাজের পুণ্যভাবেই নিজ শত্রু আপনার পদপ্রান্তে আনীত হয়েছি এবং পুরুষ যে সম্পদের মোহে মুগ্ধমতি হয়ে নিয়ত মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত নিজ জীবনকে কখনও অনিত্য মনে করতে পারে না, প্রহ্লাদ মহারাজের সৌভাগ্যই আমাকে সেই সম্পদ ত্যাগ করিয়েছে।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বলি যখন এরূপ বলেছিলেন, তখনই উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ভগবৎ প্রিয় শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন দৈত্যপতি বলি সৌন্দর্যশালী, পদ্মের মত বিশাল নেত্র, উন্নতকায় পিঙ্গল বসনধারী শ্যামবর্ণ সুদীর্ঘবাহু এবং সর্বলোকপ্রিয় নিজ পিতামহ প্রহ্লাদকে দেখতে পেলেন। কিন্তু বারুণনাশে বদ্ধ থাকায় পূর্বের মত উপহার দিয়ে পূজা করতে তার সামর্থ্য হল না, অশ্রুপূর্ণলোচনে কেবল মস্তক আনত দ্বারা প্রণাম করলেন।

পরে ভগবৎ সমীপে নিজের অহংকারাদি অপরাধ মনে পড়ায় লজ্জায় মুখ নত করে রইলেন। মহামতি প্রহ্লাদ সেখানে সুনন্দাদি পার্ষদগণের দ্বারা সেবিত সজ্জনপালক শ্রীহরিকে উপবিষ্ট দেখে পুলকও অশ্রুধারায় বিহ্বল হয়ে অবনত মস্তকে তাঁর নিকট গেলেন এবং মস্তকদ্বারা ভূতলে প্রণাম করলেন।

শ্রী প্রহ্লাদ বললেন–হে ভগব আপনিই বলিকে পূর্বে সমৃদ্ধিশালী ইন্দ্রপদ প্রদান করেছিলেন এবং অদ্য আপনিই তা হরণ করলেন। (বস্তুতঃ এর ইন্দ্রপদ আপনি হরণ করলেন না, নিজ পদই পুনরায় গ্রহণ করলেন।) বলির ভালই হয়েছে, আমি মনে করি, বলির প্রতি আপনার পরম অনুগ্রহ যেহেতু ঐশ্বর্য সম্পত্তি, আত্মার মোহজনক। যে সম্পদ লাভ করলে বিদ্বান্ এবং সংযত পুরুষও মুগ্ধ হন, সে সম্পদ বর্তমান থাকতে অপর কোন ব্যক্তিই তা যথাযথভাবে আত্মতত্ত্ব দর্শন করতে পারে? আপনি বলির সম্পত্তি হরণ করে তার প্রতি মহতী করুণা প্রকাশ করলেন। আপনি মহাকারুণিক, জগদীশ্বর, অখিল লোকের নাথ, নারায়ণ আপনাকে নমস্কার।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজন, অনন্তর হিরণ্যগর্ভ ভগবান ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হয়ে অবস্থিত সেই প্রহ্লাদের সমক্ষেই বামনরূপী মধুসূদনকে কিছু বলার উপক্রম করলেন। হে মহারাজ, সেই সময় বলির পত্নী সতী বিন্ধ্যাবলি পতিকে আবদ্ধ দেখে ভয় বিহ্বল ও কৃতাঞ্জলি হয়ে বামনদেবকে প্রণাম পূর্বক নতমস্তকে এরূপ বলেছিলেন। বিন্ধ্যাবলি বললেন– হে ঈশ, আপনি ক্রীড়ার্থে এই ত্রিজগৎ রচনা করেছেন, কিন্তু দুর্বুদ্ধি জনগণ এতে নিজ নিজ স্বামিত্ব কল্পনা করে থাকে। বস্তুতঃ আপনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারী বলে আপনি যাদের প্রতি কেবলমাত্র কর্তৃত্ববাদ আরোপ করেছেন, সেই নির্লজ্জ তাই আপনাকেই কোন বস্তু দান করতে পারে কি? (বিন্ধ্যাবলির রাজ্যের তাৎপর্য এই যে–আমার স্বামী, "তোমাকে লোকত্রয় অর্পণ করলাম, তৃতীয় চরণের জন্য দেহ অর্পণ করে প্রতিশ্রুতি সত্য করছি", এই প্রকারে দেহাদিতে স্বামিত্ব জ্ঞান করতঃ যা বললেন, তাতে তার নির্লজ্জতাই প্রকাশ পেয়েছে, যেহেতু আপনি সর্বব্যাপী। অতএব কৃপা করে মন্দবুদ্ধি এই ব্যক্তিকে শাপমোচন করে পালন করুন।)

শ্রীব্রহ্মা বললেন–হে ভূতভাবন (জগতের সৃষ্টিকর্তা), হে ভূতেশ, হে দেবদেব, হে জগন্ময়, আপনি হৃতসর্বস্ব এই বলিকে বন্ধনমুক্ত করুন। যেহেতু ইনি নিগ্রহের যোগ্য নহেন। ইনি আপনাকে সমগ্র ভূমি ও কর্মার্জিত মস্তক লোক দান করেছেন এবং অবশেষে 'অকাতর চিত্তে সর্বস্ব স্বরূপ আত্মাকে পর্যন্ত নিবেদন করেছেন। হে শুভ, লোকে শাঠ্য পরিত্যাগপূর্বক আপনার যে পাদপদ্মে জলমাত্র সমর্পণ এবং দুর্লভ বস্তুর দ্বারাও উত্তম পূজার অনুষ্ঠান করে পরম গতি লাভ করে, আর এই বলি আপনাকে অকাতরে ত্রিলোক দান করল, এতেও কি এ ব্যক্তি নিগ্রহ হবার যোগ্য? অর্থদ্বারা মত্ততা জন্মে? তাতে পুরুষ সমগ্র হয়ে সকল লোককে, এমনকি আমাকে পর্যন্ত অবজ্ঞা করে।

অতএব মদস্তম্ভ হেতু অর্থসকলের অপহরণই আমার অনুগ্রহ। জীবাত্মা সর্বদা পরতন্ত্র হয়ে নিজ কর্মদ্বারা কৃমি-কীটাদি নানা যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে সৌভাগ্যক্রমে কদাচিৎ পুরুষ

হয়ে জন্মগ্রহণ করে। সেই পুরুষজন্মে যদি জীবের উত্তমকুলে জন্ম, সৎকর্ম, যৌবন, সৌন্দর্য, বিদ্যা, প্রভুত্ব ও ধনাদির দ্বারা মত্ততার সৃষ্টি না হয়, তা হলে উহাই তার প্রতি আমার অনুগ্রহ বলে মনে করতে হবে। আমি স্বয়ং ধ্রুবাদিকে যে সম্পদ প্রদান করেছি, তার কারণ–যারা আমার ভক্ত, তারা সমগ্রতাদির নিমিত্ত ভূত ও সর্বপ্রকার শ্রেয়ের প্রতিকূল পূর্বোক্ত জন্মাদি সত্ত্বেও কখনও মুগ্ধ হয় না। অতএব আমি ভক্তের ইচ্ছায় সম্পদ প্রদান করি, অভক্ত জনসম্পদে মুগ্ধ হয়, এজন্য তাদের সম্পদ হরণ করে অনুগ্রহ করি।

হে ব্রাহ্মণ, এই বলি দৈত্য ও দানবের অগ্রণী এবং কীর্তিবর্ধন, এ ব্যক্তি দুর্জয় মায়া জয় করেছে, এজন্য অবসন্ন হয়েও মুগ্ধ হয়নি। এই বলি সম্প্রতি ধনহীন, স্থানভ্রষ্ট শত্রুগণ কর্তৃক তিরস্কৃত ও বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, আর এর জ্ঞাতিগণ একে পরিত্যাগ করে নানাপ্রকার যাতনা দিয়েছে। অধিকন্তু এর গুরু (শুক্রাচার্য) একে কত ভৎর্সনা করেছে, কত শাপ দিয়েছে, তথাপি এই ব্যক্তি নিজের সত্য পরিত্যাগ করেনি, আমি ছলপূর্বক যে ধর্মের কথা বলেছি, সত্যবাদী বলি যে ধর্মকেও লঙ্ঘন করে নাই। অতএব এই নিষ্ঠার জন্য আমি একে দেবগণের দুর্লভ স্থান দান করছি। সাবর্ণি মন্বন্তরে এই বলি ইন্দ্র হবে এবং তার পালক রূপে বিরাজ করবে।

উক্ত মনুপদ লাভের পূর্ব পর্যন্ত বলি বিশ্বকর্মার বিনির্মিত সুতলে গিয়ে বাস করুক। আমার দৃষ্টির প্রভাবে সুতলের অধিবাসীগণের মনঃপীড়া, ব্যাধি, ক্লান্তি, তন্দ্রা, পরাভাব অথবা কোনপ্রকার উপসর্গ হবার সম্ভাবনা নেই। ব্রহ্মাকে এরূপে বলে করুণাময় হরি সাক্ষাৎ বলির প্রতি বললেন– হে মহারাজ, ইন্দ্রসেন, তোমার মঙ্গল হোক। সম্প্রতি তুমি জ্ঞাতিজনের পরিবৃত হয়ে স্বর্গবাসিদেরও প্রার্থিত সুতলে গমন কর। লোকপালগণও তোমাকে পরাভূত করতে পারবে না, অপরের আর কথা কি? যে সকল দৈত্য তোমার আদেশ লঙ্ঘন করবে, আমার সুদর্শন চক্র তাদের বিনষ্ট করবে। হে বীর, আমি অনুচরবর্গ ও পরিচ্ছদ সহ সর্বত্র তোমায় রক্ষা করব এবং তুমি সেই সুতলপুরে সর্বদাই আমাকে সন্নিহিত দেখতে পাবে। সেখানে দৈত্যাদানবগণের সঙ্গ হেতু তোমার আসুরভাব উৎপন্ন হয়েও আমার প্রভাব দর্শনে তৎক্ষণাৎ তা কুণ্ঠিত হয়ে বিনষ্ট হবে।

.

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পিতামহ সহ বলির সুতলে গমন এবং স্বর্গলোকে উপেন্দ্রপদে বামনের অভিষেক

শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজন পুরাতন পুরুষ ভগবান বামনদেব ঐরূপ বললে, সাধুসম্মত মহানুভব বলির লোচনদ্বয় আনন্দাশ্রু কলায় আকুল হল। তিনি ভগববশতঃ হয়ে অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক গদগদ স্বরে বলতে লাগলেন। বলি বললেন–হে ভগবান, আপনার প্রতি প্রণামে কি আশ্চর্য মহিমা। আমি আপনার উদ্দেশ্যে প্রণাম না করে তার উপক্রম মাত্রই করেছিলাম, তথাপি সেই উপক্রমেই আমার মত অভক্তের সম্বন্ধেও শরণাগত ভক্তজনের প্রাপ্য বিষয় সম্পাদন করতে সদা তৎপর রয়েছ, সেহেতু আপনার প্রতি নমস্কারের উদ্যম এই অধম অসুরকে লোকপালগণের অলব্ধপূর্ব আপনার অনুগ্রহভাজন করল। হে ভগবান, আপনি পরমেশ্বর, আমি অতি ক্ষুদ্র, আমি আপনাকে ত্রিলোকে দান করব কী? আপনাকে সম্যকরূপে প্রণামও করি নাই। তার জন্য উদ্যমমাত্র করেছি, তারই এত মহিমা! কোটি কোটি তপোদানাদির দ্বারাও যে অনুগ্রহ লভ্য হয় না তাই সম্পাদিত হল। এটাই আপনার প্রণামের অত্যাশ্চর্য মাহাত্ম।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, বন্ধনমুক্ত বলি এইরূপ বলে শ্রীহরি, ব্রহ্মা ও শংকরকে প্রণাম করে সন্তুষ্টচিত্তে অসুরদের সাথে সুতলে প্রবেশ করেছিলেন। এইরূপে ভগবান হরি পুনরায় ইন্দ্রকে স্বর্গলোক সমর্পণপূর্বক অদিতির কামনা পূর্ণ করতঃ স্বয়ং উপেন্দ্ররূপে সকল জগৎ পালন করেছিলেন।

এদিকে নিজ বংশধর পৌত্র বলিকে বন্ধনমুক্ত এবং ভগবানের প্রসাদ লাভ করতে দেখে, ভক্তিনারায়ণ প্রহাদ মহারাজ ভগবানকে এরূপ বলেছিলেন। প্রহ্লাদ বললেন–হে ভগবান বিশ্বের বন্দনীয় পুরুষগণও যার পাদপদ্মের বন্দনা করেন, সেই আপনি, সর্বতোভাবে রক্ষা করব বলে আমাদের অসুরগণের যে দুর্গপালক হলেন, আপনার এ প্রসাদ অতি দুর্লভ। ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং লক্ষ্মী দেবীও এরূপ প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই, অপরের কথা কি বলব? হে শরণপদ, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁর পাদপদ্মের মধু পান করায় এববিধ ঐশ্বর্য ভোগ করেছেন, আমাদের মত দুবৃত্ত উগ্রজাতি অসুরগণ কিরূপে সেই আপনার উদার দৃষ্টিমার্গে উপনীত হল? ভগবন্, আপনার চেষ্টা অতি বিচিত্র। যেহেতু অচিন্ত্য যোগমায়ার দ্বারা অবলীলাক্রমে ত্রিভুবন সৃষ্টি করেছেন বলে আপনিই সর্বাত্মা এবং আপনি সর্বজ্ঞ বলে সমর্দশী, অথচ আপনার স্বভাব এরূপ বৈষম্যমুক্ত যে ভক্তগণই আপনার প্রিয় বলে আপনি কল্পতরুর ন্যায় কেবলমাত্র তাদেরই কামনা পূর্ণ করে থাকেন।

শ্রীভগবান বললেন–বৎস প্রহ্লাদ, তোমার কল্যাণ হোক। তুমি সুতলস্থ আলয়ে গমন কর এবং নিজ পৌত্র বলির সহিত হৃষ্টচিত্তে জ্ঞাতিগণের সুখবর্ধন কর। তুমি আমাকে সর্বদা সুতলে

গদাহস্তে অবস্থিত দেখতে পাবে এবং আমার দর্শনজনিত আনন্দে তোমার অজ্ঞানতা বিনষ্ট হবে। শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজন, তারপর বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও সকল অসুরসেনার অধিপতি প্রহ্লাদ বলির সহিত, তাই করছি' বলে ভগবানের আদেশ স্বীকার করলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুট হয়ে সেই আদি পুরুষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে, তার অনুমতিক্রমে মহাবলি সুতলে প্রবেশ করলেন। হে মহারাজ, তারপর ভগবান নারায়ণ শ্রীহরি অদূরে ব্রহ্মবাদিদের সভায় ঋত্বিকগণের মধ্যে অধ্যাসীন শুক্রাচার্যকে সম্বোধন করে বললেন–হে ব্রাহ্মণ, আপনার শিষ্য বলির যজ্ঞকর্মে যে ন্যূনতা ঘটেছে, সম্প্রতি আপনি তা পূর্ণ করুন। (যজমান উপস্থিত না থাকলেও) ব্রাহ্মণের দর্শন মাত্রেই কর্ম সমূহের বৈষম্য সমতাপ্রাপ্ত হয়।

শুক্রাচার্য বললেন–ভগবন্ সকল কর্মের প্রবর্তক মঙ্গলদাতা ও যজ্ঞময় পরমপুরুষ আপনি যকর্তৃক সর্বতোভাবে পূজিত হয়েছেন। তার আর কর্মবৈষম্য কোথা হতে হবে? কোন কর্মে মন্ত্র হতে (স্বৈরাদি ভ্রংশদ্বারা) তন্ত্র হতে (ক্রমঃ বৈপরীত্য দ্বারা) ও দেশ, কাল, পাত্র এবং বস্তু হতে (দক্ষিণাদি দ্বারা) যে যে ন্যূনতা হয়, আপনার নাম সংকীর্তন মাত্রই সে সকলকে পূর্ণ করে। হে ভূম, আপনি আদেশ করায় আমি অবশ্যই তা পালন করব। আপনার আজ্ঞা পালনই পুরুষদের পরম শ্রেয়ঃ। মহাপ্রভাবশালী শুক্রাচার্য এইরূপে হরির নির্দেশে উল্লাস প্রকাশ করে ঋষিবৃন্দের সহিত বলির যজ্ঞের ত্রুটি পূর্ণ করলেন।

শ্রী শুকদেব বললেন–হে রাজন, পরীক্ষিৎ ভগবান হরি বামনরূপে অবতীর্ণ হয়ে এইরূপে বলির নিকট হতে ভূমি ভিক্ষা করে শত্রুগণ কর্তৃক হৃত স্বর্গলোক ভ্রাতা ইন্দ্রকে আবার প্রদান করলেন। তারপর প্রজাপতিগণের অধিপতি ব্রহ্মা–দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, মনুগণ, দক্ষ, ভৃগু ও আঙ্গিরা প্রভৃতি এবং সনকুমার ও শঙ্করের সহিত মিলিত হয়ে, কশ্যপ ও অদিতির প্রীতি এবং সর্বশ্রেণির কল্যাণের নিমিত্ত ভগবান বামনদেবকে লোকসমূহ ও লোকপাল গণের অধিপতি করেছিলেন, (যদিও ইন্দ্রই লোকদের প্রতি তথাপি) সকল বেদ, সর্বদেব, ধর্ম, যশ এবং সর্বপ্রকার মঙ্গল ব্রত ইত্যাদির পালনে ধনপূর্ণ সেই বামনদের সর্ব প্রাণীর ঐশ্বর্যের জন্য উপেন্দ্র বলে বন্দিত হলেন। হে নৃপ, তখন সকল প্রাণীই অতিশয় আনন্দিত হয়েছিলেন।

তারপর ব্রহ্মার অনুমোদন ক্রমে লোকপালদের সাথে দেবরাজ ইন্দ্র বামনদেবকে বিমানযোগে স্বর্গলোকে নিয়ে গেলেন। এইরূপে উপেন্দ্রের ভূজবলে রক্ষিত ইন্দ্র ত্রিভুবন লাভ করে পরম ঐশ্বর্যশালী ও নির্ভয় হয়ে আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। হে মহারাজ, তারপর ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ পিতৃগণ নিখিল ভূতবর্গ সিদ্ধ ও বৈমানিকগণ সকলে ভগবান বিষ্ণুর ঐ অদ্ভুত সুমহৎ কর্মের প্রশংসা করতে করতে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করলেন এবং

তৎকালে তারা অদিতির প্রশংসা করেছিলেন, হে কুরুকুল নন্দন পরীক্ষিৎ উরুক্রম ভগবানের এই চরিত্র মোহগণের বিনাশক ইহা সম্পূর্ণরূপে তোমার নিকট বর্ণনা করলাম।

যে মানব পার্থিব ধূলিকণা সমূহ বর্ণনা করতে পারে, সে ব্যক্তিই অনন্ত বিক্রমশালী বিষ্ণুর মহিমার অন্ত নির্ণয় করতে পারে (অর্থাৎ পার্থিব রেণুসমূহ গণনা করা যেমন অসম্ভব, বিষ্ণুর গুণগানও তেমনি অসাধ্য) মন্ত্র ও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বশিষ্টও স্পষ্ট বলেছেন–জায়মান ও জাত মানবজাতির মধ্যে কোন্ ব্যক্তি পূর্ণস্বরূপ পুরুষের মহিমায় প্রাপ্ত হয়েছে? (অর্থাৎ কেহই তার মহিমার অন্তরায় নাই।) অদ্ভুত কর্ম দেবদেব ভগবান শ্রীহরির এই অবতার চরিত্র বর্ণনা যে ব্যক্তি শ্রবণ করেন, তার পরমগতি সে সকল কর্মই যথাযথ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

.

চতুর্বিংশ অধ্যায়

নৃপবর সত্যব্রতের উপাখ্যান

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন–হে মুনিবর আমি শুনতে ইচ্ছা করছি সেই অদ্ভুতকর্মা হরির আদি অবতারের কথা, যাতে মায়ার দ্বারা মৎস্য রূপের অনুকরণ নির্ণীত হয়েছে। স্বয়ং ঈশ্বর কলি কর্মাদির নিয়ন্তা হয়েও কর্মাধীন জীবের মত যেজন্য লোক নিন্দিত তমং প্রকৃতি ও দুঃসহ মৎস্য রূপ ধারণ করেছিলেন, এ সমস্ত বিষয় যথাযথ আমাদের নিকট বলুন। ভগবান উত্তম শ্লোকেরই সুখাবহ। সূত বললেন–মহারাজ পরীক্ষিতের দ্বারা এরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে ভগবান শুকদেব বিষ্ণু মৎস্যরূপে যা করেছিলেন, সেই চরিত্র বলতে আরম্ভ করলেন। শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, ভগবান স্বতন্ত্র হয়েও গো, বিপ্র, দেবতা, সাধুগণ বেদসমূহ এবং ধর্ম ও অর্থের রক্ষা করতে ইচ্ছুক হয়ে সময়ে সময়ে অবতার মূর্তি ধারণ করে থাকেন, ঈশ্বর স্বয়ং নির্গুণ বলে, মায়ার গুণযোগে দেবতা, মনুষ্য, তির্যক্ প্রভৃতি বিভিন্ন উৎকৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে অন্তর্যামীরূপে বায়ুর মত বিচরণ করেও বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হন না। (আর শুদ্ধ সত্ত্বময় মৎস্যাদি, রূপের উকৃষ্ট বা নিকৃষ্টত্বাদির শঙ্কা কোথায়?)

হে মহারাজ, অতীত কল্পের অবসানে ব্রহ্মার নিদ্রাকাল উপস্থিত হলে যে নৈমিত্তিক বলয় হয়, তৎকালে ভূবাদি সমস্ত লোক সাগরসলিলে নিমগ্ন হয়েছিলেন। যে সময় কালবেশে নিদ্রায় আরেশ হেতু ব্রহ্মা শয়নের ইচ্ছা করলে বলবান হয়গ্রীব তার মুখ নিঃসৃত বেদসমূহকে হরণ

করেছিল। দানবেন্দ্র হয়গ্রীবের ঐ বেদগ্রহণ রূপ কর্ম জানতে পেরে ভগবান জগদীশ্বর হরি শফুরী রূপ (মৎস্যমূর্তি) ধারণ করলেন। সে সময় সত্যব্রত নামে নারায়ণ ভক্ত কোন রাজর্ষি সলিলে উপবেশন পূর্বক ত্যাগ করছিলেন। সেই রাজর্ষি সত্যব্রতই এই মহাকল্পে সূর্যের পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত এবং তিনি হরি কর্তৃক মনুক্ষেত্রে স্থাপিত হয়েছেন।

একদিন রাজর্ষি সত্যব্রত কৃতমালা নদীতে জলের দ্বারা তর্পণ করছিলেন, এ অবস্থায় তার অঞ্জলিস্থিত জলের মধ্যে একটি শরী (পুঁটি মাছ) দৃষ্ট হল। হে মহারাজ, দ্রাবিড় দেশের অধিগতি সত্যব্রত তৎকালে অঞ্জলির মধ্যে প্রাপ্ত সেই শারীকে জলের সাথে নদীর জলেই নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন। তখন সেই শরী পরম দয়ালু নৃপতিকে অতি কাতর বাক্যে বলল-হে রাজ, হে দীনবৎসল, আমি জ্ঞাতি হিংসাপরায়ণ জলজন্তুগণ হতে ভীতা ও দীনা, অতএব আপনি আমাকে কীরূপে এই নদীর জলে ত্যাগ করছেন? ভগবান হরি তার নিজের প্রতিই প্রীতিবশতঃ অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য মৎস্যরূপ ধারণ করেছেন–এই সত্য না জেনে মহারাজ সত্যব্রত সেই শারীকে রক্ষার জন্য মনস্থির করলেন, সেই শরীর অতি কাতর বাক্য শুনে দয়ালু রাজর্ষি সত্যব্রত সেই শারীকে কমণ্ডলুর মধ্যে স্থাপন করে নিজের আশ্রমে নিয়ে আসলেন।

সেই শরী এক রাতেই এরূপ বৃদ্ধি পেল যে সেই কমণ্ডলুতে স্থান না পেয়ে রাজাকে এরূপ বলেছিল–হে মহারাজ, আমি আর এই কমণ্ডলুর মধ্যে অতি কষ্টে বাস করতে পারছি না। অতএব আমি যেখানে সুখে থাকতে পারি, সেরূপ একটা সুবৃহৎ স্থান নির্দিষ্ট করে দিন। তখন রাজা কমণ্ডলু থেকে তাকে নিয়ে একটা সুবৃহৎ জলাধারে রেখে দিলেন, কিন্তু সেখানেও সে মুহূর্তকাল মধ্যে তিন হাত বর্ধিত হল। তখন শরী আবার বলল–হে মহারাজ, এই জলাশয়টিও আমার সুখে বাস করার পক্ষে উপযুক্ত নয়, অতএব আমাকে আরও বৃহৎ স্থান দিন। যেহেতু আমি আপনার শরণাগত। হে রাজন, তারপর রাজা সত্যব্রত তাকে একটি সরোবরে নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু সেখানেও প্রক্ষিপ্ত হওয়া মাত্র সেই শ্যারী নিজ শরীর দ্বারা সরোবর আবৃত করতঃ মহামীনরূপে বর্ধিত হল, তখন সে পুনরায় রাজর্ষি সত্যব্রতকে বলল–হে মহারাজ, এই সরোবরের জল ও জলবাসী আমার পক্ষে সুখকর হচ্ছে না, অতএব আমার রক্ষার উপায় হয় সেরূপ কোন হ্রদে নিক্ষেপ করুন, যার জল কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। শরী এরূপ বললে, সত্যব্রত তাকে জলক্ষয় শূন্য অনেক বড় বড় হ্রদে নিয়ে গেলেন, কিন্তু সকল জলাশয়েই তার দেহ তদনুরূপ বর্ধিত হলে, অবশেষে তাকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন। এ অবস্থায় সেই মৎস্য রাজাকে বলল–হে বীর, আপনি আমাকে এই সমুদ্রজলে ত্যাগ করবেন না। এখানে অতি বলবান মকরাদি জলজন্তুগণ আমাকে খেয়ে ফেলবে।

তারপর মৎস্যের ঐরূপ মধুর বচনে রাজর্ষি সত্যব্রত অতিশয় মোহিত হয়ে বললেন–আপনি কে? মৎস্যরূপে আমাদের মোহিত করেছেন। আপনি একদিনেই শত যোজন পরিমিত সরোবরকে নিজ দেহদ্বারা ব্যাপ্ত করলেন, আমরা এরূপ জলচর কোনকালে কখন দেখিনি, বা তার কথা কখনও শুনতেও পাই নি। আমার বোধ হচ্ছে আপনি নিশ্চয়ই ভগবান নারায়ণ অব্যয় শ্রীহরি প্রাণীদের প্রতি অনুগ্রহদের জন্য এই জলচর (মৎস্য) রূপ ধারণ করেছেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার, আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অধীশ্বর। প্রভো, আপনি আমাদের শত শরণাগত ভক্তগণের বাস্তব আত্মা ও আশ্রয়। আপনার সকল লীলাবতারই প্রাণীদের মঙ্গলের কারণ হয়ে থাকে, অতএব আপনি যে প্রয়োজন সাধনের জন্য এই মৎস্যমূর্তি ধারণ করেছেন তা জানতে ইচ্ছা করি। হে অরবিন্দাক্ষ দেবাদিতে আত্মভিমানী অমর শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের পদাশ্রয় গ্রহণ যেরূপ ব্যর্থ হয়, সকল প্রাণীর সুহৃৎ প্রিয় ও আত্মরূপী আপনার পাদপদ্মের শরণাগত সেরূপ বিফল হয় না, যেহেতু আমি কেবল আপনার ভক্ত বলেই আপনি আমাদের এই অদ্ভুত মূর্তি দর্শন করালেন।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজন, নৃপবর সত্যব্রত এরূপ বললেন, যুগান্ত সময়ে প্রলয়ানীরে বিহাররত মৎস্যরূপধারী সেই জগৎপতি ভগবান শ্রীহরি জগতের প্রিয়কার্য সম্পাদনের ইচ্ছাহেতু সত্যব্রতকে এরূপ বলেছিলেন। কারণ একান্ত ভক্তজন তার অতিশয় প্রিয়পাত্র। শ্রীভগবান বললেন– হে রাজন, আজ থেকে সপ্তম দিবসে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্গ এই তিন লোক প্রলয় সমুদ্রে নিমগ্ন হবে। তৎকালে ত্রিলোক প্রলয় সমুদ্রে লীন হবার উপক্রম হলে, আমার প্রেরিত একটি বিশাল নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হবে। তুমি সপ্তর্ষিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত এবং সকল প্রাণীবর্গের সহিত মিলিত হয়ে সকল প্রকার ওষধি (ধ্যানাদি) ও ছোট বড় বিবিধ বীজসমূহ সঙ্গে নিয়ে সেই বিশাল নৌকায় আরোহণ করবে। তৎকালে প্রলয়সমুদ্রে আলোকশূন্য হবে সত্য, কিন্তু তুমি ঋষিদের দেহের আলোকের সাহায্যেই অকাতরে বিচরণ করতে সমর্থ হবে। তখন আমি নিকটে গিয়ে উপস্থিত হব। তখন রজ্জুতুল্য মহাসর্প বাসুকির দেহ দ্বারা নৌকাটিকে আমার শৃঙ্গে আবদ্ধ করবে। হে রাজন, যতকাল ব্রহ্মার রাত্রি থাকবে, আমি ততকাল সপ্তর্ষিগণের সহিত নৌকাসহ তোমাকে আকর্ষণ করে প্রলয় সমুদ্রে বিচরণ ০.ব। পরব্রহ্ম শব্দবাচ্য যে আমার মহিমা, তৎকালে তোমার প্রশ্নে আমি তা বিবৃত করব। তুমি আমার অনুগ্রহরূপে লব্ধ সেই মহিমা প্রত্যক্ষভাবে নিজের হৃদয়ে অনুভব করবে। ভগবান শ্রীহরি রাজাকে এরূপ আদেশ করে সেই স্থান হতে অন্তর্ধান হলেন।

তারপর ঐ রাজর্ষি অবহিত হয়ে সেই কালের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ভগবান যা আদেশ করেছিলেন, রাজর্ষি সত্যব্রত মৎস্যরূপী শ্রীহরির পদযুগল ধ্যান করতে করতে পূর্বাভিমুখে

কুশ সমূহ বিস্তৃত করে পূর্বোত্তর মুখ হয়ে তার উপর উপবেশন করলেন। তারপর দেখা গেল–সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করে চারদিকে পৃথিবীকে প্লাবিত করতে আরম্ভ করছে এবং মহামেঘরাশির জলবর্ষণে সেইজলরাশি ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে। রাজর্ষি সত্যব্রত ভগবানের আদেশ চিন্তা করতে করতে দেখতে পেলেন, একটি নৌকা নিকটে এসে উপস্থিত হল। মৎস্যমূর্তি ভগবানের নির্দেশ স্মরণ করে তিনি সকলপ্রকার ওষধি ও লতাদি গ্রহণপূর্বক সপ্তর্ষিগণের সাথে সেই নৌকায় আরোহণ করলেন। তখন সপ্তর্ষিগণ সন্তুষ্ট হয়ে সত্যব্রতকে বললেন–রাজন, ভগবান কেশবের ধ্যান কর, তিনি আমাদের এই সঙ্কট হতে উদ্ধার করে কল্যাণ বিধান করবেন। তারপর রাজা সত্যব্রত ভগবানের ধ্যান করলে তিনি একশৃঙ্গ বিশিষ্ট ও নিযুত যোজন পরিমিত স্বর্ণময় মৎস্যরূপে সেখানে আবির্ভূত হলেন। তখন সত্যব্রত শ্রীহরির পূর্ব নির্দেশ অনুসারে নৌকাটিকে রক্ষ্ম রূপী বাসুকির দেহদ্বারা উক্ত মৎস্যমূর্তির শৃঙ্গে আবদ্ধ করে, সন্তুষ্ট চিত্তে ভগবান মধুসূদনের স্তুতি করতে লাগলেন।

রাজা সত্যব্রত বললেন–ভগবন্, যে সকল ব্যক্তির আত্মসম্বিৎ (আত্ম তত্ত্বজ্ঞান) অনাদি অবিদ্যায় আবৃত, অতএব যারা অবিদ্যামূল সংসার পরিশ্রমে নিরন্তর কাতর, তারাও এই সংসারে যাঁর অনুগ্রহে শরণাগত হয়ে যাঁকে লাভ করে, আপনি আমাদের সেই মুক্তিদাতা পরম গুরু। এ সংসারে নিজ কার্যবন্ধনে আবদ্ধ, অজ্ঞ লোক সুখের ইচ্ছায় 'দুঃখজনক কার্যের আচরণ করে। কিন্তু যাঁর সেবার দ্বারা সেই সুখের ইচ্ছা পরিহার করতে পারা যায়, তিনিই আমাদের হৃদয়রূপ গ্রন্থি (অর্থাৎ দেহীব্যায়রূপ বন্ধন) ভেদ করুন, যেহেতু সেই ভগবানই আমাদের গুরু, অগ্নির সংস্পর্শে রৌপ্য ও স্বর্ণ যেরূপ নির্মল হয়ে স্বাভাবিক বর্ণপ্রাপ্ত হয়, সেরূপ যার সেবার দ্বারা জীব নিজ মল রূপ তামসভাব পরিত্যাগ পূর্বক নিজ স্বরূপ লাভ করে। সেই অব্যয় জগদীশ্বর আমাদের গুরু হোন, যেহেতু তিনি গুরুরও পরম গুরু। অন্যান্য দেবগণ, গুরুগণ এবং মহাজনগণ সকলে মিলিত হয়েও স্বতন্ত্রভাবে যাঁর অনুগ্রহের অযুত ভাগের লেশমাত্রও সম্পাদন করতে সমর্থ হন না, আমি জীবের ঈশ্বর সেই আপনারই শরণাপন্ন হলাম।

অন্ধের প্রথপ্রদর্শক অন্ধ যেমন, অজ্ঞজনের দক্ষ অর্বুদ গুরুও তেমনি হয়। কিন্তু আপনার জ্ঞান সূর্যের প্রকাশের মত স্বতঃসিদ্ধ বলে আপনি জীবগণের সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক, অতএব নিজ গতি জানতে ইচ্ছা করে, আমরা আপনাকেই গুরুরূপে বরণ করছি। প্রকৃত গুরু কেবল অনর্থের হেতু, তারা লোককে অর্থ-কামাদি–বিষয়ক উপদেশ করে, তাতে লোক দূরত্যয় সংসার প্রাপ্ত হয়, আর আপনি অক্ষয় অব্যর্থ জ্ঞানেরই উপদেশ করেন–যার দ্বারা লোক যথার্থরূপে সত্বর নিজপদ লাভ করতে পারে। হে দেব, যদিও আগনি সকল লোকেরই সুহৃৎ,

প্রিয়, ঈশ্বর আত্মা গুরুজ্ঞান ও অভীষ্ট সিদ্ধিস্বরূপ, তথাপি কামনাগ্রস্ত জীব বাহ্যবিষয়ে চিত্তের আসক্তি হেতু নিজ হৃদয়স্থিত আপনাকেও জানতে পারে না। আমি তত্ত্বজ্ঞান উপদেশের জন্য আপনার শরণাপন্ন হলাম। আপনি দেববর, বরেণ্য এবং ঈশ্বর। হে ভগবান আপনি পরমার্থ প্রকাশক বাক্য সকলের দ্বারা আমার হৃদয়োৎপন্ন অহংকারাদি গ্রন্থিকে ছেদন করে নিজ রূপ প্রকাশ করুন।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজন রাজর্ষি সত্যব্রত এইরূপ স্তব করলে আদিপুরুষ মৎস্যরূপী ভগবান প্রলয় মহাসাগরে বিহার করতে করতে তাকে তত্ত্ব উপদেশ দান করেছিলেন, তৎকালে সেই ভগবান রাজর্ষি সত্যব্রতকে সংখ্যা ও যোগক্রিয়ার উপদেশযুক্ত দিব্য মৎস্যপুরাণ এবং গোপনীয় আত্মতত্ত্বের উপদেশ করেছিলেন।

রাজা সত্যব্রত নৌকায় বসে সপ্তর্ষিগণের সহিত ভগবানের কথিত সনাতন ব্রহ্মসূত্র সেই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করছিলেন, তাতে তাদের সংশয়মাত্র জন্মে নাই। অতীত প্রলয়ের অবসানে ব্রহ্মা উত্থিত হলে, মৎস্যরূপী হরিহর গ্রীব অসুরের প্রাণ সংহার করে ব্রহ্মাকে পুনরায় বেদসকল প্রত্যর্পণ করেন। আর সেই রাজা সত্যব্রত ভগবানের প্রসাদে জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে বর্তমান কল্পে বৈবস্বত মনু হয়েছেন।

হে মহারাজ, যদি রাজর্ষি সত্যব্রত এবং মৎস্যরূপী ভগবান হরির সংসার রূপ মহৎ আখ্যান শ্রবণ করলে যেকোনো ব্যক্তি শাপ হয়ে মুক্ত হয়। যে মানব প্রত্যহ ভগবান শ্রীহরির এই মৎস্যাবতারের কথা কীর্তন করেন, তাঁর সংকল্প সিদ্ধি হয়, এবং জীবন অন্তে তিনি পরম গতি লাভ করেন। প্রলয়পবোধি জলে সুখমুক্ত অতএব শক্তিশূন্য ব্রহ্মার বদন হতে বিনির্গত বেদসকল যে দানব হরণ করে, যিনি মৎস্যরূপী হয়ে তাকে সংহার করতঃ সেই সমস্ত বেদ ও বেদ প্রতিপাদক পুরাণ সত্যব্রত ও সপ্তর্ষিদের উপদেশ করেছিলেন, সেই অখিলকারণ মায়ামৎস্যরূপী ভগবানকে প্রণাম করি।

নবম স্কন্দ

প্রথম অধ্যায়

সূর্যবংশের বর্ণনা

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন–হে ব্রাহ্মণ, আপনার বর্ণিত মন্বন্তর সকলের বিবরণ এবং সেই সকল মন্বন্তরে অনুষ্ঠিত অনন্তবীর্য ভগবান শ্রীহরির বীর্যময় চরিত সমূহের কথা আমি শুনেছি। দ্রাবিড় দেশের অধিপতি সত্যব্রত নামক যে রাজর্ষি অতীত কল্পের অবসানে ভগবান শ্রীহরির সেবার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন, তিনিই বিবস্বানের পুত্র মনু হয়েছেন। ইহাও আপনার

নিকট শুনেছি। ইক্ষাকু প্রভৃতি নরপতিগণ সেই বৈবস্বত মনুরই সন্তান–তাও আপনি বলেছেন, হে মহাভাগ ব্রাহ্মণ, সম্প্রতি আপনি সেই নৃপতিদের বংশ এবং বংশজাত ব্যক্তিগণের চরিতকথা পৃথক পৃথক বর্ণনা করুন, আমরা সর্বদা তা শ্রবণে ইচ্ছুক। ঐ সকল নরপতিগণের বংশে পূর্বে যাঁরা জন্মেছিলেন ভবিষ্যতে যাঁরা জন্মিবেন এবং সম্প্রতি যারা বর্তমান রয়েছেন, আপনি সেই সকল পুণ্যকীর্তি পুরুষগণের বিক্রমের কথা আমাদের নিকট বলুন।

শ্রীসূত বললেন–ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণের সভায় রাজা পরীক্ষিত কর্তৃক এইপ্রকার দৃষ্ট হয়ে পরম ধর্মজ্ঞ শুকদেব বলতে আরম্ভ করলেন। শুকদেব বললেন–হে শত্রুনাশক শতবর্ষেও মনুর বংশ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা যায় না, অতএব প্রাধান্যরূপে তা বর্ণনা করছি। শোন, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সকল প্রাণীর যিনি আত্মা (অর্থাৎ উপাদানভূত) প্রলয়কালে এই বিশ্বে একমাত্র, সেই পরম পুরুষেই লীন ছিল, অগ্রে কেবল তিনিই ছিলেন, কল্পনান্তে তত্ত্বতীত বিশ্ব বা অন্য কিছুই ছিল না। তখন সেই পরমপুরুষের নাভি হতে একটি হিরন্ময় পদ্মকোষ উদগত হয়, হে মহারাজ, এতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা আপনা হতেই উৎপন্ন হয়েছিলেন, ঐ ব্রহ্মার মন হতে মরীচির জন্ম হয়। তার পুত্র কশ্যপ, ঐ কশ্যপের পত্নী দক্ষকন্যা অদিতি, তার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে বিবস্বান্ (সূর্য) নামক পুত্রের উৎপত্তি হয়।

হে ভরতকুল নন্দন, বিবস্বান্ হতে পত্নীর সংজ্ঞার গর্ভে শ্রাদ্ধদেব নামক মনু জন্মগ্রহণ করেন। সংযতাত্মা মনু পত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঐ পুত্রগণের নাম ইক্ষবাকু, নৃগ, শর্যাতি, দিষ্ট, ধৃষ্ট, করূষ, নরিষ্যন্ত, পৃষধ, নভগ ও কবি। ইক্ষবাকু প্রভৃতির উৎপত্তির পূর্বে মনু যখন নিঃসন্তান ছিলেন, তৎকালে প্রভাবশালী মহর্ষি বশিষ্ঠ তার সন্তান লাভের জন্য মিত্র ও বরুণদেবের যজ্ঞ করেছিলেন, মনুর পত্নী শ্রদ্ধা, সেই যজ্ঞের অন্যতম যাজ্ঞিক হয়ে হোতার নিকট গিয়ে প্রণাম করে এই প্রার্থনা করেন–যে প্রকারে আমার কন্যা হয়, সেরূপ করে আপনারা হোম করুন। শ্রদ্ধার অভ্যর্থনায়, অধবর্য কর্তৃক প্রেরিত হয়ে হোতা হবিঃ গ্রহণ পূর্বক তাহা ত্যাগ করার পূর্বে একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধার প্রার্থনার অনুরূপ ধ্যান করতে করতে মুখে 'বষট'– এই শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন। হোতার এইরূপ ব্যভিচার (অর্থাৎ যজমানের সংকল্প থেকে বিপরীত সংকল্প রূপ হেতু ইলা নামে এক কন্যা জন্মাল)। তাকে দেখে মনু চিত্তে অতি সন্তুষ্ট না হয়ে গুরু বশিষ্ঠদেবকে এরূপ বললেন–হে ভগবান আপনাদের মত ব্রহ্মজ্ঞানের কর্মের এরূপ বিপর্যয় ঘটল, ইহা কি? হায় কি কষ্ট, মন্ত্রের ত কখনও ঘটতে পারে না। আপনারা ব্রহ্মজ্ঞ যোগী পুরুষ তপস্যার দ্বারা আপনাদের সকল কাম দগ্ধ হয়েছে, অতএব দেবতাদের মধ্যে মিথ্যার আবির্ভাবের ন্যায় কিরূপে আপনাদের সংকল্পের বৈষম্য হল?

আমার প্রপিতামহ ভগবান বশিষ্ঠদেব সেই বাক্য শ্রবণ করে হোতার ব্যতিক্রম জানতে পেরে, মনুকে এরূপ বলেছিলেন-হে মহাভাগ, তোমার হোতার ব্যভিচার–দোষেই যদিও এরূপ সংকল্প বৈষম্য ঘটেছে, তথাপি আমি নিজ ব্রহ্মতেজের প্রভাবে তোমাকে সুপুত্র যুক্ত (অর্থাৎ ঐ কন্যারই পুত্রত্ব) করব। হে রাজ, এইরূপ কৃতনিশ্চয় হয়ে মহা যশস্বী বশিষ্ঠ কন্যা ইলার পুরুষত্ব কামনায় আদিপুরুষ ভগবানের স্তব করেছিলেন। ভগবান ঈশ্বর শ্রীহরি সেই বশিষ্ঠের কামনা অনুসারে বর দিয়েছিলেন, তাতে ইলা সুন্ম নামে শ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে পরিণত হল। হে মহারাজ, একদিন মহাবীর সুদ্যুম্ন দুঃখ বোধ করতে লাগলেন। রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন–ভগবান্ ঐ স্থান ঐরূপ গুণযুক্ত কিরূপ হল এবং কোন্ ব্যক্তিই বা ঐ স্থানকে ঐরূপ করেছেন? আমাদের এ বিষয়ে মহৎ কৌতূহল জন্মেছে, আপনি আমাদের প্রশ্নের সমাধান করুন।

শ্রীশুকদেব বললেন–রাজন, একদিন উত্তম ব্রত পরায়ণ ঋষিগণ ভগবান শংকরকে দর্শন করার জন্য সেই বনে আগমন করেছিলেন। তাদের দীপ্তির দ্বারা দিক সকলের অন্ধকার এবং অন্য সকলের দীপ্তি নিরস্ত হয়েছিল। তৎকালে ভগবতী অম্বিকাঁদেবী বিবসনা ছিলেন, অতএব মুনিদের দেখে অতিশয় লজ্জিত হয়ে পতির ক্রোড় হতে উত্থানপূর্বক সত্বর কটিবসন পরিধান করলেন। এদিকে ঋষিগণও তাদের বিহার প্রসঙ্গ লক্ষ্য করে, সেখান থেকে নিবৃত্ত হয়ে নর-নারায়ণাশ্রমে গমন করলেন। তখন ভগবান শংকর প্রিয়ার প্রীতি কামনায় এরূপ বলেছিলেন–এরপর যে পুরুষ এখানে প্রবেশ করবে, সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রী হবে। এর পর হতে পুরুষগণ সেই বন পরিত্যাগ করেছে। এদিকে স্ত্রীমূর্তিধারী সুদ্যুম্ন স্ত্রীমূর্তিধারী অনুচরগণের সহিত বন হতে বনান্তরে বিচরণ করতে লাগলেন।

এক সময় ভগবান বুধ তাকে স্ত্রীগণে পরিবৃত হয়ে নিজ আশ্রম সমীপে ভ্রমণ করতে দেখলেন। দর্শন করামাত্রই বুধের কামোদ্ভব হল এবং সেই সুদ্যুম্ন যিনি মনোহর রূপিণী হয়েছিলেন, তিনিও চন্দ্রের পুত্র সেই বুধকে নাতিরূপে কামনা করলেন। অনন্তর বুধ তার গর্ভে পুরুরবা পুত্ররূপে উৎপাদন করেছিলেন। আমরা শুনেছিমনুপুত্র রাজা সুদ্যুম্ন এইরূপে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়ে কুলগুরু বশিষ্ঠকে স্মরণ করেছিলেন, তখন বশিষ্ঠদেব সুদ্যুম্নের এরূপ অবস্থা লক্ষ্য করে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে কৃপাবশতঃ তার পুরুষত্ব কামনাপূর্বক ভগবান শংকরের আরাধনা করেছিলেন। হে মহারাজ, তৎকালে ভগবান শংকর বশিষ্ঠদেবের প্রীতিসাধন ও নিজবাক্যের সত্যতা রক্ষা করে এরূপ বলেছিলেন–হে ঋষিপ্রবর, তোমার গোত্রজাত এই সুদ্যুম্ন এক মাস পুরুষ এবং একমাত্র স্ত্রী হবে, আর এরূপ ব্যবস্থা ক্রমেই সে ইচ্ছানুসারে এই পৃথিবী পালন করুক।

হে রাজন, ঐ প্রকারে কুলাচার্য বশিষ্ঠদেবের অনুগ্রহে সুন্ম পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করে ঐ ব্যবস্থাক্রমে পৃথিবী পালন করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হতেন, তখন লজ্জায় লুক্কায়িত থাকতেন বলে প্রজাগণ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয় নাই। যা হোক, হে মহারাজ সুদন্মের ধর্মপরায়ণ তিন পুত্র–উকল, ময় ও বিমল। তারা দক্ষিণাপথের রাজা হয়েছিলেন। তারপর বৃদ্ধবয়সে প্রতিষ্ঠানশুরের অধিপতি রানি সুদ্যুম্ন পুত্র পুরুরবাকে রাজ্য প্রদান করে বনে গমন করেছিলেন।

.

দ্বিতীয় অধ্যায়

পৃষধর, কবি প্রভৃতির বংশবিস্তার কথন

শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজ, নিজ পুত্র সুদ্যুম্ন ঐ প্রকারে বনে চলে গেলে, বৈবস্বত মনু পুত্র কামনা করে শত বছর যমুনার নিকটে তপস্যা করেছিলেন। তারপর মনু পুত্র লাভের জন্য প্রভু শ্রীহরির উপাসনা করে নিজের তুল্য ইক্ষবাকু প্রভৃতি দশটি পুত্র লাভ করেন। মনুর পৃষ নামে যে পুত্র হয়েছিল গুরু বশিষ্ঠ তাকে গোরক্ষায় নিযুক্ত করেছিলেন, অতএব সেই পুত্র বীরাসন (খড়হস্ত হয়ে রাত্রি জাগরণরূপ) ব্রত অবলম্বনপূর্বক রাত্রিকালে অবহিত হয়ে গো রক্ষা করতেন। একদিন রাতে বৃষ্টি হচ্ছিল, এমন সময় একটি বাঘ এসে গোষ্ঠে প্রবেশ করলে শয়নরত গো-সমূহ ভীত হয়ে গোষ্ঠের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে লাগল। তৎকালে বলবান ব্যাঘ্র একটি গাভীকে ক্ষমতাবলে গ্রহণ করে পলায়ন করতে থাকলে, সেই গাভী ভয়ে কাতর হয়ে চিৎকার করছিল। তখন পৃষ সেই চিৎকার শুনে সেই অনুগমন করল। রাত্রিতে সে সময় আকাশে তারাগণও মেঘে আচ্ছন্ন থাকায় খড়হস্তে দ্রুতগামী পৃষধ না জেনে ব্যাঘ্র মনে করে অজ্ঞানতঃ 'একটি কপিলা গাভীর মস্তক ছেদন করেছিলেন। তৎকালে খড়ের অগ্রভাগে আঘাতে সেই ব্যাঘ্রেরও একটি কর্ণ ছিন্ন হলে ব্যাঘ্র অতিশয় ভীত হয়ে রক্তপাত করতে করতে সেখানে থেকে পলায়ন করল। শত্রুনাশক পৃষ মনে করেছিলেন, ব্যাঘ্র নিহত হয়েছে, কিন্তু রাত্রি প্রভাত হলে দেখলেন কপিলা নিহত হয়েছে, অতএব তিনি দুঃখিত হলেন।

হে রাজ, যদিও রাজকুমার পৃষর্ধের ঐ অপরাধ অজ্ঞানকৃত, তথাপি কুলাচার্য ধেনু শোকে ব্যাকুল হয়ে তাকে এই বলে শাস্তি দিলেন–"ওরে পাপিষ্ঠ তুই ক্ষুত্রবন্ধু ও নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়ও হতে পারবি না, এই কর্মের জন্য শূদ্র হবি। আচার্য এরূপ অভিশাপ দিলে পৃষপ্র কৃতাঞ্জলিপুট হয়ে তাই স্বীকার করলেন এবং পরে ঊর্ধ্বরে মুনিদের প্রিয় ব্রত ধারণ করলেন। তারপর তিনি

সর্বাত্মা বিশুদ্ধস্বরূপ পরম পুরুষ ভগবান বাসুদেবের একনিষ্ঠ ভক্তি যোগ লাভ করে সকল প্রাণীর সুহৃদ ও সমভাবাপন্ন হলেন। এই রপে তিনি লোকসঙ্গ হতে বিমুক্ত শান্তচিত্ত সংযাতন্দ্রিয় পরিগ্রহশূন্য, জ্ঞানতৃপ্ত ও একাগ্রমনা হয়ে, যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্য দ্বারা নিজের জীবনধারণপূর্বক পরমাত্মায় চিত্ত সমর্পণ করে জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলেন। এরূপ আচরণ সম্পন্ন মুনিব্রতাবলম্বী পৃষপ্র এক সময় বনে গিয়ে প্রজ্জ্বলিত দাবানল দেখতে গেলেন এবং সেই অগ্নিতে প্রবেশ পূর্বক কলেবর ভস্মাৎ করে পরম ব্রহ্মপদ লাভ করেছিলেন।

মনুর কনিষ্ঠ পুত্র কবি বিষয়ে নিঃস্পৃহ হয়ে বন্ধু-বান্ধব সহ রাজ্য বিসর্জন করেন। পরে অন্তঃকরণ মধ্যে স্বপ্রকাশ পরম পুরুষকে ধারণপূর্বক কৈশোর বয়সেই অরণ্যে প্রবেশ করেছিলেন। সুতরাং তার বংশ বৃদ্ধি হয় নাই। মনুর পুত্র করূষ হতে কারুষ নামে বিখ্যাত ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তি হয়েছিল, তারা উত্তরাপথের রক্ষক, ব্রাহ্মণগণের হিতকারী ও ধর্মানুরাগী ছিলেন। এইরূপ ধৃষ্ট নামক মনুর নাম হতে ধাষ্ট বলে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয়।

এই ধাষ্টগণ পরে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। মনুর পুত্র নৃগের বংশে নৃগের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র ভূতজ্যোতি এবং ভূতজ্যোতির পুত্র বসু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বসুর সন্তান প্রতীক, তার পুত্র ওষবান্ ঐ ওষবানেরও ওখবা নামে এক পুত্র এবং ওঘবতী নামে এক কন্যা জন্মে। রাজা সুদর্শন ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

হে রাজ, নরিষ্যন্ত নামে যে মনুপুত্র তাঁর পুত্র চিত্রসেন? চিত্রসেনের পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের পুত্র মীঢ়বান, মীঢ়বানের পুত্র পূর্ণ এবং পূর্ণের পুত্র ইন্দ্র সেন, ইন্দ্রসেন হতে বীতিহোত্র, বীতিহোত্র হতে সত্যবা, সত্যশ্রবা হতে উরুবা, উরুবা হতে দেবদত্ত এবং দেবদত্ত হতে ভগবান অগ্নি স্বয়ং অগ্নিবেশ নামক পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। এই অগ্নিবেশ্যা হতেই অগ্নিবেশ্যায়ন নামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশের সৃষ্টি হয়েছিল। এইরূপে নরিষ্যন্তের বংশ বর্ণিত হল। এরপর দিষ্টের বংশ বলছি শোন।

দিষ্টের পুত্রের নাম নাভাগ, পরে যে নাভাগের কথা বলা হবে ইনি তা হতে ভিন্ন। ইনি কর্মদ্বারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন। ইহার পুত্র ভলন্দন এবং ভলন্দনের পুত্র বৎসপ্রীতি, বৎসপ্রীতির পুত্র প্রাংশু, প্রাংশুর পুত্র প্রমতি, প্রমতির পুত্র খনি, খনিত্রের পুত্র চাক্ষুস এবং চাক্ষুসের পুত্র চিত্রবংশতি। হে মহারাজ, বিবিংশতি পুত্র রম্ভ, রম্ভের পুত্র ধর্মাত্মা খনীনেত্র এবং খনীনেত্রের পুত্র রাজা করন্ধম।

করন্ধমের পুত্রের নাম অবিক্ষিৎ, অবিক্ষিতের পুত্র মরুত্ত সার্বভৌম নরপতি ছিলেন। মহাযোগী অঙ্গিরার পুত্র সংবর্ত এই মরুত্তকে যজ্ঞ করিয়েছিলেন। মরুত্তের যজ্ঞের মত আর যজ্ঞ হয়নি। যজ্ঞে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি সমস্ত কিছুই স্বর্ণময় ও সুশোভন ছিল। মরুত্তের যজ্ঞে দেবরাজ ইন্দ্র প্রচুর সোমরস এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ প্রচুর দক্ষিণালাভ করে অতিশয় হৃষ্ট হয়েছিলেন। মরুদগণ সেখানে পরিবেশক এবং বিশ্বদেবগণ সভাসদ ছিলেন।

মরুত্তের পুত্র দম, তার পুত্র রাজবর্ধন, তার পুত্র সুধৃতি, সুধৃতির তনয় নর, তার পুত্র কেবল, তার হতে ধুন্ধুমান উৎপন্ন হন। ধুন্ধুমানের তনয় বেগবান, তাঁর পুত্রবধূ এবং তার সন্তান রাজা তৃণবিন্দু নানা সগুণের আধার ছিলেন বলে শ্রেষ্ঠা অপ্সরা অলম্বষাদেবী তাঁর ভজনা করলে তার গর্ভে কয়েকটি পুত্র এবং ইয়বিলা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। পুলস্ত্যপুত্র যোগেশ্বর বিশ্রবা ঋষি পিতার নিকট হতে পরম বিদ্যা লাভ করে এই ইলবিলার গর্ভে কুবেরকে পুত্ররূপে জন্ম দিয়েছিলেন। অলম্বুষার গর্ভে তৃণবিন্দুর পুত্রগণের নাম-বিশাল, শূন্যকহু ও ধূম্রকেতু। এদের মধ্যে রাজা বিশালাই বংশরক্ষক ছিলেন এবং তিনিই বৈশালী পুরী নির্মাণ করেন। বিশালের পুত্র হেমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের পুত্র ধূম্রাক্ষ এবং ধূম্রাক্ষের পুত্র সংযম হতে কৃশাশ্ব ও দেবজ নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

কৃশাশ্বের পুত্রের নাম সোমদত্ত, ইনি অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞপতি পরমপুরুষ শ্রীহরির আরাধনা করে যোগীন্দ্র গণের প্রাপ্য উত্তম গতি লাভ করেছিলেন। সোমদত্তের পুত্র সুমতি এবং সুমতির পুত্র জনমেজয়। বিশালের বংশে উৎপন্ন এই সকল রাজা মহারাজা তৃণবিন্দুর যশ ধারণ করেছিলেন (অর্থাৎ তার মত যশস্বী হয়েছিলেন।)

.

তৃতীয় অধ্যায়

শর্যাতির কন্যা সুকন্যা এবং রেবতের পৌত্রী রেবতীর চরিত্র বর্ণনা

শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজন, মনুপুত্র শর্যাতি ব্রক্ষিষ্ঠ (অর্থাৎ বেদার্থ তত্ত্বজ্ঞ) রাজা ছিলেন। তিনি আঙ্গিরাদের সত্রে দ্বিতীয় দিবসের করণীয় কর্ম সমূহের উপদেশ করেন। তার সুকন্যা নামে একটি কমললোচনা কন্যা ছিল। একদিন রাজা শর্যাতি কন্যার সহিত বনে গিয়ে চ্যবন মুনির আশ্রমে প্রবেশ করলেন। রাজকন্যা সুকন্যা সখীগণে পরিবৃত হয়ে বৃক্ষ হতে দ্বারাপুদি চয়ন করতে করতে এক স্থানে বাল্মীকের ছিদ্র মধ্যে খদ্যোতের (জোনাকী পোকার) মত দুটি

জ্যোতি দেখতে পেলেন। তা দেখে রাজকন্যার অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। তারপর সেই কন্যা যেন দৈবপ্রেরিত হয়ে অজ্ঞানতা বশতঃ একটা পলাশ গ্রহণ করে ঐ জ্যোতিপুঞ্জ দুটি বিদ্ধ করলে, তা থেকে অবিশ্রান্ত রুধির নির্গত হতে লাগল।

তৎক্ষণাৎ রাজার সৈন্য সামন্তের মলমূত্র নিরুদ্ধ হল। রাজর্ষি শর্যাতি বিস্মিত হয়ে নিজের অনুচরগণকে জিজ্ঞাসা করলেনতোমরা কোনভাবে ভৃগু নন্দন মহর্ষি চ্যবনের নিকট কোন অপরাধ কর নাই তো? আমার মনে হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কেউ তার আশ্রম দূষিত করে থাকবে।

তখন সুকন্যা ভীত হয়ে পিতাকে বলল–পিতা আমি কিছু করেছি, না জেনে একটা কণ্টক দিয়ে দুটি জ্যোতিঃপদার্থ বিদ্ধ করেছি। কন্যার সেই কথা শুনে শর্যাতি ভীত হয়ে বাল্মীকের মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিত চ্যবন মুনিকে ধীরে ধীরে প্রসন্ন করেছিলেন। তখন মুনির অভিপ্রায় জেনে তার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করলেন। তারপর শর্যাতি বিপদ হতে মুক্ত হয়ে মুনিকে সম্ভাষণ পূর্বক তার অনুমতি নিয়ে নিজপুরে প্রত্যাগমন করলেন।

এদিকে সুকন্যা অতিকোপণ চ্যবনকে পতিরূপে লাভ করে, তার চিত্তের অভিপ্রায় জেনে অতি সাবধানে সর্বদা আনুগত্যের দ্বারা তার প্রতি উৎপাদনে প্রবৃত্ত হলেন। কোন এক সময় অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনমুনির আশ্রমে উপস্থিত হলে, মুনি তাদের যথোচিত পূজা করে বললেন–হে প্রভুদ্বয়, আপনারা আমাকে যৌবন দান করুন। যজ্ঞে আপনাদের সোমদানের ব্যবস্থা না থাকলেও আমি যজ্ঞে আপনাদের সোমপূর্ণ পাত্র প্রদান করব। প্রমাদাগণের অভিলষিত যে বয়স ও রূপ, তা আমায় প্রদান করুন।

বিপ্রবর চ্যবনের ঐ বাক্যে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাকে অভিনন্দন পূর্বক বললেন–তাই হবে, আপনি এই সিদ্ধ হ্রদে অবগাহন করবেন চলুন। এই বলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই জরাজীর্ণ শিরাজালে পরিব্যাপ্ত লোমচর্ম ও পক্ককেশ মুনিকে নিয়ে নিজেরাও সেই হ্রদে প্রবেশ করলেন। কিছু পরে সেই হ্রদ থেকে অতিকমনীয় রমণীগণের প্রিয় তিনটি পুরুষ উত্থিত হলেন। তিনজনেরই গলায় পদ্মমালা, কর্ণে কনককুন্তল এবং তিনজনই সুরূপ ও শোভন বসন পরিধান করেছিলেন। পতিব্রতা সুন্দরী সুকন্যা সূর্যের মত দীপ্তিশীল ও সমান রূপ বিশিষ্ট সেই তিনটি পুরুষকে দর্শন পূর্বক নিজ পতিকে চিনতে না পেরে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শরণাপন্ন হলেন। (অর্থাৎ আপনারা পৃথক হয়ে আমার পতিকে দেখিয়ে দিন–এই প্রার্থনা করলেন)।

তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় তার পতিব্রতে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে নিজ পতি দেখিয়ে দিলেন এবং পরে ঋষির অনুমতি লয়ে বিমানযোগে স্বর্গলোকে গমন করলেন।

হে রাজন, কিয়ৎকাল পরে রাজা শর্যাতি যজ্ঞ করবেন স্থির করে চ্যবন আশ্রমে গিয়ে দেখলেন কন্যার পার্শ্বে সূর্যতুল্য তেজস্বী এক পুরুষ বসে রয়েছেন। কন্যা পিতার পদবন্দনা করলে রাজা শর্যাতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন –কি করেছ? তোমার কি অভিপ্রায়? তুমি সর্বলোক পূজত নিজ পতি চ্যবন মুনিকে বঞ্চনা করেছ, যেহেতু তিনি জরাগ্রস্ত, তাই নিজ অপ্রিয় স্বামী ত্যাগ করে তুমি এই পতিকে উপপতিকে ভজনা করছ। তুমি সদবংশে জন্মগ্রহণ করেছ, অথচ তোমার বুদ্ধি কিরূপে বিপরীত ভাবে এরূপ জঘন্য কার্যে প্রবৃত্ত হল? তুমি এই যে উপপতি স্বীকার করেছ, এতে তোমার পিতৃকুল এবং স্বামীকুলকে নরকগামী করছ। পিতা এরূপ বলতে আরম্ভ করলে শুচিস্মিতা সুকন্যা ঈষৎ হাস্য করে বললেন–হে পিতঃ, ইনিই তোমার জামাতা সেই ভৃগুনন্দন মহামুনি চ্যবন। পরে তার যেরূপে রূপযৌবন লাভ হয়, সে সকল কথা পিতার নিকট বর্ণনা করলেন। তা শুনে রাজা শর্যাতি বিস্মিত ও প্রীত হয়ে কন্যাকে আলিঙ্গন করলেন।

তারপর মহর্ষি চ্যবন বীর শানতকে সোমথাগ করাতে প্রবৃত্ত, বিস্মিত ও প্রীত হয়ে কন্যাকে আলিঙ্গন করলেন।

তারপর মহর্ষি চ্যবন বীর শ্যাতিকে যজ্ঞ করাতে প্রবৃত্ত হয়ে, যজ্ঞে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সোমপানের ব্যবস্থা না থাকলেও নিজের তেজে তাদের সোমপাত্র প্রদান করলেন। কিন্তু ভৃগুনন্দ চ্যবন স্বীয় ব্রহ্মতেজে দেবরাজের বর্জ্য সহিত দক্ষিণ হস্ত স্তব্ধ করে দেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসার বলে পূর্বে সোমযোগ থেকে বহিষ্কৃত অর্থাৎ সোমপানের অনধিকারী থাকলেও, তখন হতে সকল দেবতা তাদের উভয়ের জন্য সোমপাত্র দানে সম্মত হলেন। শর্যাতি হতে উত্তানবর্হি, অনার্ত ও ভূরিষেন নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়। তাদের মধ্যে অনার্ত হতে রেবত নামক পুত্র উৎপন্ন হয়েছিলেন।

হে অরিন্দম, ঐ রেবত সমুদ্র গর্ভে কুশস্থলী পথে এক নগরী নির্মাণ করে তাতে অবস্থিতি পূর্বক আনর্তাদি দেশ পালন করেছিলেন। তার একশত পুত্র জন্মে, তাদের মধ্যে কুকুষ্মী জ্যেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। এক সময় কুকুষ্মী নিজ কন্যা রেবতাঁকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মাকে উপযুক্ত বরের কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য মুক্ত দ্বার (প্রতিবন্ধক রহিত) ব্রহ্মলোকে গমন করেছিলেন। সে সময় গন্ধর্বগণ তথায় সঙ্গীত আলপি না পেয়ে কুকুষ্মী ক্ষণকাল অপেক্ষা করলেন। পরে অবকাশ

পেয়ে প্রণাম পূর্বক নিজের অভিপ্রায় নিবেদন করলেন। ভগবান ব্রহ্মা তা শ্রবণ করে হাস্য সহকারে বললেন–হে রাজন, তুমি পৃথিবী স্থিত যে সকল ব্যক্তিকে মনে মনে কন্যার পর রূপে চিন্তা করেছিলে, কালবশে (কারণ তুমি এখানে আসার পর মনু লোকের পরিমাণে) সপ্তবিংশতি চতুযুগ পরিমিত কাল অতীত হয়েছে।

হে রাজন, সম্প্রতি দেবদেব ভগবানের অংশ মহাবল বলদেব যেখানে আছেন, সেখানে গমন কর এবং তুমি সেই নররত্নকে নিজের কন্যারত্ন প্রদান কর। যার নামাদি শ্রবণ ও কীর্তন পরম পুণ্যজনক সেই জগৎপতি ভগবান পৃথিবীর ভার হরণের জন্য নিজ অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্রহ্মা এরূপ আদেশ করলে রাজা কুকুষ্মী তাকে প্রণাম করে নিজ পুরীতে প্রত্যাগমন করলেন। তৎকালে তার ভ্রাতৃগণ যক্ষগণের ভয়ে সেই স্থান ত্যাগ করে নানা স্থানে বাস করছিলেন। তারপর রাজা কুকুষ্মী বলশালী বলদেবকে আনন্দময়ী মনোরমা নিজ কন্যা সম্প্রদান করে, তপস্যার জন্য নারায়ণ শ্রম বদরিকাক্ষেত্রে গমন করেছিলেন।

.

চতুর্থ অধ্যায়

নভাগচরিত কথন ও অম্বরীষের উপাখ্যান

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, মনুপুত্র নভগ, নভগের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নাভাগ। (তিনি দীর্ঘকাল গুরুকুলে বাস করায় তাকে নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী মনে করে তার সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ পিতার সম্পত্তি থেকে তাকে বাদ দিয়ে ভাগ করে নিয়েছিলেন)। দীর্ঘদিন পর ব্রহ্মচার্য সমাপন করে গুরুগৃহ হতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতঃ নাভাগ নিজের ভাগ চাইলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ জ্ঞানী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তার প্রাপ্য ভাগরূপে পিতাকেই দান করলেন। নাভাগ পিতার নিকট গিয়ে বললেন–পিতঃ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ আপনাকেই আমার ভাগরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। পিতা নভগ ইহা শুনে বললেন–পুত্র, তুমি তাদের প্রতারণা বাক্যে বিশ্বাস করো না, কারণ আমি সম্পত্তির মত ভোগ্যবস্তু নই। তথাপি তারা যেহেতু আমাকে তোমার

প্রাপ্য ভাগরূপে দান করেছে, অতএব আমি তোমার জীবিকার নির্দেশ করছি। হে বিদ্বান, অঙ্গিরার সন্তানগণ এখন যজ্ঞ করছেন।

তারা যদিও অতিশয় মেধাবী তা হলেও ছয়দিনে সম্পদনীয় বিভিন্ন যজ্ঞীয় কর্মের অনুষ্ঠানকালে মন্ত্র বিশেষ না জানায়, প্রতি কর্মের ষষ্ঠ দিবসীয় কর্মের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে তারা মুগ্ধ হচ্ছেন। তুমি গিয়ে সেই মহাত্মাদের বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় দুটি সূক্ত পাঠ করাও। কর্ম সমাপ্ত হলে যখন তারা স্বর্গে গমন করবেন, তখন যজ্ঞের অবশিষ্ট ধন অবশ্য তোমাকে দিয়ে যাবেন, তুমি এখনি তাঁদের নিকট গমন কর। নাভাগ পিতার উপদেশ অনুসারে সেরূপ কার্য করলেন, অঙ্গিরার সন্তানগণ যজ্ঞের অবশিষ্ট ধন তাকে দান করে স্বর্গলোকে গমন করলেন।

তারপর নাভাগ যখন সেই সমস্ত ধন গ্রহণ করতে উদ্যত হন, তখন কৃষ্ণকায় কোনও এক পুরুষ (শ্রীরুদ্র) উভয় দিক হতে এসে বললেন–এই যজ্ঞক্ষেত্রস্থিত ধন আমার। তখন নাভাগ বললেন–এ ধন আমার, এখুনি ঋষিগণ আমাকে দিয়ে গেলেন। তখন সেই পুরুষ (শ্রীরুদ্র) বললেন–আমাদের এ বিবাদে তোমার পিতাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এস, এ বস্তু কার?

তখন নাভাগ পিতার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। পিতা নভগ বললেন–হে বৎস! প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞকার্যে যে সকল বস্তু উদ্বৃত্ত হয়েছিল, ঋষিগণ যজ্ঞভূমিগত তৎসমুদায় ভগবান রুদ্রের ভাগ বলে নির্দিষ্ট করেছিলেন, বিশেষতঃ সেই রুদ্রদেবই জগতের সকল বস্তুর অধিকারী, এতে যজ্ঞবশিষ্ট কথা কি? তখন নাভাগ সেই পুরুষের (রুদ্রের) নিকট এসে প্রণাম করে বললেন– হে ইশ, যজ্ঞভূমিগত এ সমস্ত ধন আপনারই একথা আমার পিতা বললেন। হে ব্রহ্মণ, আমি মস্তক নত করে আপনাকে প্রসন্ন করতে ইচ্ছা করছি।

নাভাগের কথায় তুষ্ট হয়ে শ্রীরুদ্র বললেন– যেহেতু তোমার পিতা যথার্থ ধর্মের কথা বলেছেন এবং তুমিও সত্য কথা বলছ, সেইহেতু তুমি মন্ত্রদশী। তোমাকে জ্ঞানরূপ সনাতন ব্রহ্ম প্রদান করছি। আর এই যজ্ঞাবশিষ্ট এই ধন আমি তোমাকে দিলাম, তুমি গ্রহণ কর।

এই কথা বলে ধর্মবৎসল ভগবান রুদ্র অন্তর্হিত হলেন। হে মহারাজ, যিনি সকাল ও সন্ধ্যাকালে সংযত চিত্তে ইহা স্মরণ করবেন, তিনি জ্ঞানবান ও মন্ত্রজ্ঞ হয়ে আত্মার সদ্গতি লাভ করবেন।

যা হোক, নাভাগ হতে মহাভাগবত ও পরম নিপুণ অম্বরীষের জন্ম হয়। যে ব্রহ্মশাপ কখনও প্রতিহত হয় না তাও (অর্থাৎ ব্রহ্মকর্তৃক নির্মিত কৃত্যরূপ অনন্ত) তাকে স্পর্শ করতে পারে নাই।

রাজা পরীক্ষিৎ বললেন–হে ভগবন, দুল্য ব্রহ্মদণ্ড যাঁর প্রতি প্রযুক্ত হয়ে নিজ শক্তি প্রকাশে সমর্থ হয়নি, সেই ধীমান রাজর্ষি অম্বরীষের কথা শুনতে ইচ্ছা করি।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, মহাভাগ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপ যুক্ত পৃথিবী, অক্ষয় সম্পদ এবং লোকসমূহের অতি দুর্লভ অতুলনীয় ঐশ্বর্য লাভ করেও, বৈভবের নশ্বরতা জেনে, যে বিভব দ্বারা ও বিভবের নাশ হেতু মানুষ মোহগ্রস্ত হয়, সেই বিভব রাশিকে স্বপ্নের মত তুচ্ছজ্ঞান করেছিলেন।

তিনি ভগবান বাসুদেব এবং তাঁর ভক্ত সাধুগণের প্রতি পরম ভাব (ভক্তি) লাভ করেছিলেন। যার ফলে এই বিশ্ব তাঁর নিকট লোষ্ট্রের মত তুচ্ছ মনে হত। যাতে ভগবান শ্রীহরির ভক্তগণের প্রতি অনুরাগের ফলে উৎপন্ন হয়, মহারাজ অম্বরীষ সে ভাবেই নিজ চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে সমর্পণ করেছিলেন।

এইরূপে বৈকুণ্ঠ গুণাগুণবর্ণনে বাক্য সকলকে নিয়োগ করেছিলেন, শ্রীহরির মন্দির মার্জনাদি কার্যে করদ্বয় ব্যাপৃত করেছিলেন। আর নয়নদ্বয়কে শ্রীভগবদ বিগ্রহের অধিষ্ঠানক্ষেত্র সমূহের দর্শনে, আলিঙ্গন ক্রিয়াকে ভগবদ ভক্তজনের অঙ্গসঙ্গে, নাসিকাকে ভগবানের পাদপদ্মের সংসর্গহেতু সদগন্ধযুক্ত তুলসীর সৌরভগ্রহণে, জিহ্বাকে ভগবনের প্রতি নিবেদিত অন্নাদির আস্বাদনে তৎপর করেছিলেন। আর পদযুগলকে ভগবান হরির ক্ষেত্রে (ধর্মাদি ও মন্দিরাদি) পরিক্রমায়, মস্তককে তার শ্রীপাদ পদ্মের প্রণামকার্যে এবং কাম অর্থাৎ মাল্য চন্দনাদি সেবাকে ভগবানের প্রসাদিকৃত মাল্যচন্দনাদির গ্রহণেই নিযুক্ত করেছিলেন কিন্তু বিষয়ভোগের জন্য কামনা করেন নাই।

এইরূপে তিনি সর্বত্র আত্মচিন্তামূলক নিজ সকল কার্যই সর্বদা সর্বযজ্ঞের অধিষ্ঠাতা ও অধোক্ষজ (অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর) ভগবানে সম্পর্ক করে ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণগণের উপদেশ অনুসারে রাজ্য পালন করতেন। তিনি জনশূণ্য দেশে সরস্বতী নদীর স্রোতের প্রতিকূলে বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞাধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন।

বশিষ্ঠ, অসিত, গৌতম প্রভৃতি ঋষিগণের সাহায্যে সেই সকল সুবিস্তৃত যজ্ঞ সম্পাদিত করেছিলেন এবং যজ্ঞসমূহের অঙ্গীভূত ক্রিয়া-সমুদয় ও দক্ষিণা তার মহাবৈভব দ্বারা সংবর্ধিত হয়েছিল। তাঁরা যজ্ঞসমূহে মনোরম বস্ত্র বিভূষিত সদস্য ও ঋত্বিগণকে দেবগণের সাথে তুল্য রূপে. তাদের দেখা গিয়েছিল, দেবগণের চক্ষুর নিমেষ না থাকার জন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে সত্য, তথাপি এস্থলে ঋত্বিক ও সদস্যদের যজ্ঞ কর্মাদির দর্শনে চক্ষুর নিমেষ না থাকায় তারা সমরূপ

হয়েছিলেন (অর্থাৎ অনিমেষ নয়নে তাঁরা যজ্ঞাদি দর্শন করায়, তাদের দেবতা বলে মনে হচ্ছিল।

সব সময় উত্তমশ্লোক ভগবান শ্রীহরির লীলাদি শ্রবণ ও কীর্তনে রত থাকায় অম্বরীষ মহারাজের কোন নিজ জনও দেবতাগণের প্রিয় স্বর্গলোকের কামনা করত না, এতে অম্বরীষের যে স্বর্গ কামনা ছিল না তা আর বেশি কি? তিনি সর্বদা হৃদয় মধ্যে ভগবান শ্রীহরিকে প্রত্যক্ষ করতেন বলে, সিদ্ধগণের পক্ষেও দুর্লভ এবং স্বরূপ সুখ দ্বারা সংবর্ধিত বিষয় সমূহও তাদের আনন্দ দান করতে পারে নি।

যা হোক মহারাজ অম্বরীষ ঐ প্রকার ভক্তিযোগ ও তপস্যাযুক্ত স্বধর্মদ্বারা ভগবান হরির প্রীতি উৎপাদন করতঃ ক্রমে ক্রমে সমস্ত অভিলাষ পরিত্যাগ করেন। এইরূপে তার কলত্র, পুত্র, মিত্র, গৃহ, হস্তী, উত্তম, রথ, অশ্ব, অক্ষর্য্য, রত্ন, বসন, ভূষণাদি অন্ত ধনভাণ্ডারের প্রতি উপেক্ষা জন্মেছিল, ভগবান হরি তার একনিষ্ঠ ভক্তিভাবে প্রীত হয়ে তাঁকে ভক্তগণের রক্ষক ও প্রতিপক্ষ সৈন্যদের ভয়জনক সুদর্শনচক্র প্রদান করেছিলেন।

হে মহারাজ, সেই অম্বরীষ রাজা সর্বসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার বাসনায় তুল্যশীল স্বীয় মহিষীর সহিত মিলিত হয়ে সংবৎসর যাবৎ দ্বাদশী ব্রত ধারণ করেছিলেন। তিনি ব্রত সমাপ্তির পর কার্তিক মাসে ত্রিরাত্র উপবাসী থেকে একদিন যমুনায় স্নান করে মধুবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজায় প্রবৃত্ত হলেন।

মহভিষেকের বিধান অনুসারে সর্বপ্রকার উপচার দিয়ে অভিষেক করে; বসন, ভূষণ, গন্ধ ও মাল্যাদির দ্বারা একাগ্রমনে ভগবান কেশবের পূজা করলেন। তারপর যে সকল ব্রাহ্মণ আপ্তকাম বলে পূজা প্রার্থী নন, ভক্তিসহকারে সেইরূপ মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণগণেরও পূজা করলেন।

পরে তিনি সাধু ব্রাহ্মণদের স্বর্গশৃঙ্গ রৌপ্য খুর যুক্তা উত্তম বস্ত্রাচ্ছাদিতা এবং দুগ্ধ, চরিত্র, রূপ ও বয়স প্রভৃতি সম্পন্ন ষাট কোটি ধেনু দান করলেন। এরপর তিনি ব্রাহ্মণদের উৎকৃষ্ট সুস্বাদু অন্ন ভোজন করিয়ে তাদের অনুমতি গ্রহণপূর্বক নিজে জলপানের উপক্রম করলেন।

হে রাজন, রাজা অম্বরীষ পারণ করতে যাবেন, এমন সময় ভগবান দুর্বাসা ঋষি অতিথিরূপে তাঁর গৃহে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে রাজা পারণের উদ্যম পরিত্যাগ পূর্বক তৎক্ষণাৎ

সমাগত সেই অতিথিকে অভ্যর্থনা, আসন ও বিবিধ পূজা দ্রব্য দ্বারা পূজা করে তার পাদমূলে উপস্থিত হয়ে ভোজনের জন্য প্রার্থনা জানালেন।

মহর্ষি দুর্বাসা তার প্রার্থনায় সানন্দে সম্মতি প্রদানপূর্বক নিয়মানুযায়ী মাধ্যাহ্নিক কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রস্থান করলেন এবং যমুনায় গিয়ে ব্রহ্মচিন্তা করতঃ সেখানে পবিত্র জলমধ্যে নিমগ্ন হয়ে রইলেন।

এদিকে দ্বাদশী তিথির আর অর্ধ মুহূর্তমাত্র অবশিষ্ট আছে। এর মধ্যে পারণ না করলে ব্রতবৈগুণ্য হয়, ধর্মজ্ঞ রাজা অম্বরীষ ধর্মসংকটে পতিত হয়ে ব্রাহ্মণদের সহিত বিবেচনা করতে লাগলেন। তিনি তখন বিবেচনা করলেন ব্রাহ্মণকে লঙঘন করলে (অর্থাৎ অতিথিরূপে নিমন্ত্রিত দুর্বাসার ভোজন না করিয়ে নিজে ভোজন করলে) যেরূপ দোষ হয়, তার থেকে দ্বাদশীতে পারণ না করলেও সেরূপ দোষ ঘটে।

এ অবস্থায় যা করলে আমার কল্যাণ হয় এবং আমাকে কোন দোষ স্পর্শ না করে ব্রাহ্মণগণের সহিত এরূপ বিচারপূর্বক তিনি স্থির করলেন যে–আমি কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ জল দ্বারাই পান করব, যেহেতু জলমাত্র ভক্ষণকে বিপ্রগণ ভোজন ও অভোজন দুই বলেছেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি অম্বরীষ তখন মনে মনে ভগবান শ্রীহরির ধ্যান করতে করতে জল মাত্র পান করে দুর্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

তার পরেই দুর্বাসা ঋষি আবশ্যক কর্ম সমাপন পূর্বক যমুনার কূল হতে এসে উপস্থিত হলেন। যদিও রাজা তাঁকে দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং কৃতাঞ্জলী হয়ে সন্মুখে দণ্ডায়মান হলেন, তথাপি তার আচরণ (অর্থাৎ জলপান) দুর্বাসা নিজ বুদ্ধিবলে বুঝতে পারলেন। তখন ক্রোধে তাঁর সর্বশরীর কম্পিত হতে লাগল। নয়নযুগল ভ্রুকুটিহেতু কুটিল ভাব ধারণ করল, বিশেষতঃ তখন ক্ষুধার্ত অবস্থায় মহারাজ অম্বরীষ কৃতাঞ্জলী হলেও তিনি এরূপ বলতে লাগলেন–অহো, এ ব্যক্তি কি নৃশংস! ধনসম্পত্তির মদে অতিশয় মত্ত হয়েছে, এ আর এখন বিষ্ণুভক্ত নয়। নিজেকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলে মনে করে। এর ধর্মব্যতিক্রম দেখ। তারপর অম্বরীষকে লক্ষ্য করে বললেন–আমি অতিথিরূপে উপস্থিত হলে, আতিথ্য বিধান অনুসারে আমাকে নিমন্ত্রণ করেও তুমি আমাকে ভোজন না করিয়ে স্বয়ং অগ্রে ভোজন করেছ। অতএব আমি সত্যিই এর ফল তোমাক দেখাচ্ছি।

এইরূপ বলতে বলতেই ক্রোধোদ্দীপ্ত দুর্বাসা ঋষি মস্তক হতে একগাছি জটা উৎপাদন পূর্বক তাতে রাজার প্রতিকূলে কানাসতুল্য একটা কৃত্যা (মারণাত্মিকা দেবতা) নির্মাণ করলেন।

মহারাজ অম্বরীষ সেই কৃত্যাকে অসিহস্তে পদভরে ভূমিতল কম্পিত করে, জ্বলন্ত আকারে নিজের দিকে আসতে দেখেও নিজের স্থান হতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হলেন না। তারপর অগ্নি যেমন ক্রুদ্ধ সর্পকে দগ্ধ করে, তেমনি ।

মহাপুরুষ ভগবান শ্রীহরি কর্তৃক ভক্তের রক্ষার জন্য পূর্ব হতে নির্দিষ্ট সেই সুদর্শন চক্র ঐ কৃত্যাকে দগ্ধ করে ফেলল। তারপর ঋষি দুর্বাসা নিজের প্রয়াস নিষ্ফল হতে এবং সুদর্শন চক্রকে নিজের দিকে আসতে দেখে ভীত হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য চারদিকে ধাবিত হলেন।

প্রজ্বলিত শিখাবিশিষ্ট দাবানল যেরূপ সর্পকে গ্রাস করার জন্য তার দিকে অগ্রসর হয়, সেরূপ ভগবানের চক্র পলায়মান ঐ ঋষির পশ্চাৎ ধাবমান হল। আর দুর্বাসাও তাকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসতে দেখে গুহায় প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হয়ে সুমেরুর দিকে ধাবিত হলেন। এইরূপে তিনি দিমণ্ডল, আকাশ, পৃথিবী, পাতাল, সমুদ্র এবং লোকপাল সহ লোকসকলেও স্বর্গে গমন করলেন। কিন্তু যে যে স্থানে তিনি যান, সেই সেই স্থানেই চক্রকে দেখতে লাগলেন।

এইরূপ তিনি সন্ত্রস্তচিত্তে সর্বত্র আশ্রয় অন্বেষণ করেও যখন কোথাও নিজের রক্ষক কাউকে পেলেন না, তখন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন–হে বিধাতঃ, আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর তেজঃস্বরূপ এই সুদর্শন চক্র হতে আমাকে রক্ষা করুন।

শ্রীব্রহ্মা বললেন–ঋষি, দুই পরার্ধ সংবৎসর কাল পরে ক্রীড়ার অবসান হলে (অর্থাৎ বিশ্বের পালন লীলা সমাপ্ত হলে) যে, বিষ্ণু যখন কালরূপে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডদাহের ইচ্ছা করবেন, তখন তার ভুভঙ্গী মাত্রেই বিশ্বের সহিত আমার এই ব্রহ্মলোক অন্তর্হিত হবে। আর আমি (ব্রহ্মা) শংকর, দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি এবং প্রজাপতিগণ ভূতপতি গণ ও দেবেন্দ্র প্রমুখ আমরা সকলে যাঁর আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে, যেরূপে লোকহিত হয়; সেইরূপ নিজ নিজ মস্তক দ্বারা নিয়ম সকল বহন করছি, তুমি তাঁর ভক্তদ্রোহী, তোমাকে রক্ষা করতে আমার সামর্থ্য নেই। ব্রহ্মার নিকট হতে এরূপে প্রত্যাখ্যাত হয়ে, সুদর্শন চক্র দ্বারা পরিপীড়িত ঋষি দুর্বাসা কৈলাসবাসী ভগবান শংকরের শরণাপন্ন হলেন।

শ্রীশংকর বললেন–হে বৎস, আমরা লোক পালকত্বের অভিমানী হয়ে যে সকল ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করি, জীবরূপী ব্রহ্মার উপাধিস্বরূপ এরূপ আরও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ যাঁর মধ্যে যথাকালে উৎপন্ন ও বিলীন হয়, সেই ভূমা পুরুষ পরমেশ্বরের উপর আমাদের কোনরূপ প্রভুত্ব নাই। আমি (শংকর), সনকুমার, নারদ, ভগবান ব্রহ্মা, কপিল (যাঁর আন্তরিক তমঃ তপগত হয়েছে), ব্যাসদেব, দেবল, ধর্ম আসুরি এবং মরীচি প্রভৃতি অন্যান্য সিদ্ধেশরগণ-

আমরা সকলে সর্বজ্ঞ হয়েও যাঁর মায়া জানতে পারি নাই পরন্তু তার মায়ায় অভিভূত হয়ে রয়েছি, সেই বিশ্বেশ্বর শ্রীহরির এই সুদর্শন চক্র আমাদের নিকট অতি দুঃসহ, অতএব তুমি তারই শরণাগত হও, সেই শ্রীহরিই তোমার মঙ্গল করবেন।

রাজ, দুর্বাসা এই প্রকারে শংকরের নিকর্য ও নিরাশ হয়ে ভগবন্ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করলেন। সেখানে লক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীহরি–বিরাজ করছিলেন। ঐ ঋষি ভগবৎ পাদমূলে পতিত হয়ে কম্পিত কলেবরে বললেন–হে অচ্যুত, হে অনন্ত, হে সাধুজনের কাঙিক্ষত, প্রভো, আমি মহৎ অপরাধ করেছি, হে বিশ্বভাবন, আমাকে রক্ষা করুন। হে প্রভো, আপনার পরম অনুভব না জেনে, আপনার প্রিয় ভক্তগণের অনিষ্ট করেছি, হে বিধাতঃ আমার এই অপরাধের নিষ্কৃতি বিধান করুন। হে ভগবান, আপনার ভক্তাদোহীর নিষ্কৃতি নেই এরূপ বলতে পারেন না, কারণ, যাঁর নামমাত্র কীর্তনে নরকস্থ প্রাণীও মুক্তিলাভ করে, সেই আপনার পক্ষে কোন কার্যই অসাধ্য নয়।

শ্রীভগবান বললেন–হে দ্বিজ, আমি ভক্তের অধীন বলে স্বয়ং অস্বতন্ত্রের তুল্য উত্থান আমার প্রিয় এজন্য সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয় গ্রাস করেছে। হে ব্রহ্মণ, আমিই যাঁদের পরম গতি, সেই সমস্ত সাধু ভক্তজন ব্যতীত আমি নিজের আত্মাকে এবং আজন্তিকী শ্রীকেও (অর্থাৎ তা ব্যভিচারিণী লক্ষ্মীকেও) আকাঙ্ক্ষা করি না।

যে সকল ব্যক্তি পুত্র, কন্যা, গৃহ, স্বজন, ধন, প্রাণ এবং ইহলোক ও পরলোক সব কিছু পরিত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন আমি তাদের পরিত্যাগ করতে কি প্রকারে উৎসাহী হতে পারি? সতী রমণীগণ যেরূপ স্বামীদিগকে বশীভূত করে, আমার প্রতি আবদ্ধচিত্ত সমদর্শী সাধুগণও সেরূপ ভক্তির দ্বারা আমাকে বশীভূত করেন, আমার সেবার দ্বারা যারা পরিপূর্ণ (অর্থাৎ পরিতৃপ্ত), আমার সেই ভক্তগণ আমার সেবার ফলে ভাগবৎ মুক্তি চুতষ্ঠয় প্রাপ্ত হলেও তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন না, এ অবস্থায় যা কালনাশও (অর্থাৎ কালবশতঃ বিনশ্বর, সে রূপ স্বর্গাদি বিষয় তারা কিরূপে ইচ্ছা করতে পারেন, সাধুগণই আমার হৃদয় এবং আমিই সাধুগণের হৃদয় স্বরূপ, অতএব তারা আমা ভিন্ন কিছুই জানেন না এবং আমিও সাধুগণ ব্যতীত অপর কিছুমাত্র জানি না।

হে বিপ্র, আমি তোমায় উপায় বলছি, শোন। তোমার এই হিংসা যাঁহা হতে জন্মেছে তুমি সত্বর তারই শরণাগত হও। সাধুগণের প্রতি কোন তেজ প্রয়োগ করলে উহা প্রয়োগকারীই অমঙ্গল সাধন করে।

ব্রাহ্মণগণের তপস্যা ও বিদ্যা (জ্ঞান)–এই উভয়ই নিঃশ্রেয়স্বার (অর্থাৎ নিরতিশয় পুরুষার্থ – সাধন মুক্তিজনক) বটে, কিন্তু দুর্বিনীত বার্তার পক্ষে এ দুটিই বিপরীত ফল দান করে। হে ব্রহ্মণ, তুমি নাম্নী নাভাগ, রাজা অম্বরীষের নিকট গমন কর, তোমার মঙ্গল হোক। সেই মহাভাগ্যবান যাতে ক্ষমা করেন, তুমি তাই কর এবং তা হলেই তোমার শান্তিলাভ হবে।

.

পঞ্চম অধ্যায়

অম্বরীষের অনুগ্রহে দুর্বাসার দুঃখ নিবৃত্তি এবং দুর্বাসা কর্তৃক অম্বরীষের প্রশংসা

শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজন, ভগবান হরি এরূপ আদেশ করলে চক্রাপিত দুর্বাসা দুঃখিত হয়ে মহারাজ অম্বরীষের নিকট এসে তাঁর চরণ গ্রহণ করতে উদ্যত হলেন। দুর্বাসা কর্তৃক পাদস্পর্শহেতু অতিশয় লজ্জিত মহারাজ অম্বরীষ তাঁর এরূপ উদ্যম লক্ষ্য করে কৃপাতুর হয়ে শ্রীহরির অস্ত্র সুদর্শনের স্তুতি করতে লাগলেন।

অম্বরীশ বললেন–হে সুদর্শন, তুমি অগ্নি, তুমিই ভগবান সূর্য, তুমি নক্ষত্রসকলের পতি চন্দ্র, তুমিই জল, পৃথিবী, আকাশ বায়ু, পঞ্চতন্মত্র এবং ইন্দ্রিয় বর্গ স্বরূপ অর্থাৎ তোমার শক্তি দ্বারাই অগ্নি প্রভৃতি নিজ নিজ কার্য করছে। হে অচ্যুতপ্রিয় হে সর্বস্ত্র বিনাশক, হে পৃথিবী পালক, তোমাকে নমস্কার করছি, তুমি এই ব্রাহ্মণের রক্ষক হও।

তুমিই ধর্ম, ঋত (সুনৃতা বাণী), সত্য, যজ্ঞ, সর্বজ্ঞভভাক্তা, লোকপাল, সর্বাত্মা এবং তুমি মহাপুরুষ বিষ্ণুর পরম সামর্থ্য স্বরূপ। হে সুলভ, তুমি অদ্ভুতকর্মা, যেহেতু আসান ধর্মের সেতু স্বরূপ, অতএব তুমিই অধর্মরত অসুরদের ধুম্রকেতু অর্থাৎ দাহক, তুমিই ত্রিলোকের রক্ষক। তোমার তেজঃপুঞ্জ অত্যুজ্জ্বল, তুমি মনের তুল্য বেগবান, তোমার স্তব করতে কে সমর্থ হবে? অতএব আমি তোমার প্রতি কেবল নমঃ শব্দ প্রয়োগ করছি।

হে সুদর্শন, তোমার ধর্ম তেজের দ্বারা ভগবতের তমঃ (অন্ধকার বা অজ্ঞান) দূরীভূত হয়েছে এবং মহাত্মাদের দৃষ্টি প্রকাশিত হয়েছে হে বিষ্ণু তোমার মহিমা দুরত্যয়, সৎ-অসৎ পর-অপর ইত্যাদি, সমস্ত পদার্থ তোমারই স্বরূপ, কারণ সূর্যাদির প্রকাশও তোমা হতেই হয়ে থাকে।

হে অজিত, অঞ্জন ভগবান হরি কর্তৃক যখন তুমি বিমুক্ত হও, তখন দৈত্য দানব মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের বাহু, উদর, উরু, চরণ এবং জানুর সমরাঙ্গণে বিরাজ করে থাক।

হে জগতের রক্ষক তুমি সর্বসহ, উপবান গদাধর তোমাকে খল ব্যক্তিদের প্রহারের জন্যেই নিযুক্ত করেছেন। অতএব, আমাদের কুলের সৌভাগ্য লাভের জন্য এই বিপন্ন ব্রাহ্মণের মঙ্গল বিধান কর।

এতেই আমাদের প্রতি মহান অনুগ্রহ বিস্তার করা হবে। হে সুদর্শন, যদি আমার কোন দান অথবা যজ্ঞ জন্য সুকৃত থাকে, যদি আমি স্বধর্মের সুন্দররূপ অনুষ্ঠান করে থাকি, আর আমাদের কুলদেবতা যদি বিপ্র হন, তা হলে এই ব্রাহ্মণ সন্তান মুক্ত হউন। সকল প্রাণীগণের প্রতি আমাদের আত্মরৎ জ্ঞান থাকায়, সর্বগুণাধার অদ্বিতীয় ভগবান যদি আমাদের প্রতি প্রীত হয়ে থাকেন, তা হলে এই ব্রাহ্মণ সন্তাপযুক্ত হউক।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, রাজা অম্বরীষ এই প্রকার স্তুতি করলে, ভগবানের সুদর্শন চক্র যা বিপ্রবর দুর্বাসাকে সর্বতোভাবে দগ্ধ করছিলেন, রাজার প্রার্থনানুসারে শান্ত হলেন। তারপর মুনি দুর্বাসা অস্ত্রাগ্নির সন্তাপ হতে মুক্ত হয়ে স্বস্তিলাভ করলেন এবং মহারাজ অম্বরীষকে উত্তম আশীর্বাদ প্রদান পূর্বক তার প্রশংসা করতে লাগলেন।

দুর্বাসা বললেন–অহো, আন্দদাসদের অদ্ভুত মহত্ত্ব, আজ আমার দৃষ্টিগোচর হল। হে রাজন্ আমি তোমার প্রতি অপরাধ করেছি, তথাপি তুমি আমার মঙ্গলের চেষ্টা করলে অথবা যে সকল ব্যক্তি সাত্বতপতি ভগবান হরিকে বশীভূত করেছেন, সেই মহাত্মা সাধুপুরুষদের দুধার বা দুস্ত্যজ কি আছে? যাঁর নাম শ্রবণ মাত্রেই পুরুষ নির্মল (অর্থাৎ সবঅপাপমুক্ত) হয়, তীর্থপাদ যার পদে গঙ্গাতীর্থ বিরাজ করছে সেই ভগবান শ্রীহরির দাসগণের কোন কার্যই বা অবশিষ্ট থাকে? হে রাজন তুমি অতি করুণাত্মা, তোমা কর্তৃক আমি অনুগৃহীত হলাম, যেহেতু আমার অপরাধের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, আমার প্রাণ রক্ষা করলে।

মহারাজ অম্বরীষ দুর্বাসার প্রত্যাগমন আকাঙ্ক্ষা করে এতকাল অনাহারেই ছিলেন, এখন তার চরণযুগল ধারণপূর্বক তাকে প্রসন্ন করে আহার করালেন। তৎকালে দুর্বাসা ঋষি অতিথির যোগ্য ও সাদরে আনীত, সর্বঅভিলাষ পূরণকারী অন্নাদি ভোজন কর।

হে মহারাজ, আমি ভগবন্ধক্ত তোমার দর্শন স্পর্শ, আলাপ এবং আত্ম বুদ্ধিজনক অতিথি সকারের দ্বারা প্রীত ও অনুগৃহীত হয়েছি, স্বর্গরমণীগণ নিরন্তর তোমার এই বিশুদ্ধ কর্মের গান করবেন এবং এই পৃথিবীও তোমার পরম পবিত্রা কীর্তিকথা সর্বদা কীর্তন করবে।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে, রাজন পরীক্ষিৎ মহর্ষি দুর্বাসা পরিতুষ্টচিত্তে এই প্রকারে মাতার গুণকীর্তন করে, যথোচিত সম্ভাষণ পূর্বক আকাশমার্তো অহেতুক (শুষ্কতর্কাদি শুণ্য) ব্রহ্মলোকে গমন করলেন।

দুর্বাসা ঋষি (সুদর্শনাস্ত্রের তাড়নায় পলায়ন করে যে পর্যন্ত ফিরে আসেন নাই, সেই অবসর মধ্যে এক বৎসর অতীত হয়েছিল, রাজাও তাঁর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় জলমাত্র পান করেই ততকাল অতিবাহিত করেছিলেন।

দুর্বাসা ঋষি প্রস্থান করলে, মহারাজ অম্বরীষ ব্রাহ্মণের আহার হেতু অতিপবিত্র উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করলেন, এবং দুর্বাসার বিপদ বিপন্মুক্তি এবং নিজের তৎকালীন ধৈর্যাদি লক্ষ্য রূপে, এ সময় পরম পুরুষ ভগবানের প্রভাব বলেই তিনি মনে করেছিলেন, এরূপ বহুগুণ বিশিষ্ট মহারাজ অম্বরীষ বিবিধ ক্রিয়াকলাপের দ্বারা পরমাত্মা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী ভগবান বাসুদেবের প্রতিই ভক্তি ভাব ধারণ করেছিলেন। সেই ভক্তির প্রভাবে ব্রহ্মপদ সহিত সকল প্রকার ভোগ তার সমক্ষে নরকতুল্য জ্ঞান হত।

শ্রীশুকদেব বললেন–তারপর ঐ ধীর অম্বরীষ নিজের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট পুত্রগণকে রাজ্যভার সমর্পণ করে বনে প্রবেশ করলেন। তৎকালে তিনি পরমাত্মা বাসুদেবের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করেছিলেন এবং সেজন্য তার গুণত্রয়ের প্রবাহ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেই রাজন, অম্বরীষ মহারাজ্যের এই পবিত্র চরিত্র যে ব্যক্তি কীর্তন এবং সতত ধ্যান করেন, তিনি ভগবতভক্ত ভগবত হবেন। আর যে মানব ভক্তিপূর্বক মহাত্মা অম্বরীষের চরিত্র শ্রবণ করবেন তারা সকলেই বিষ্ণুর প্রসাদে অনায়াসে মুক্তিপদ লাভ করবেন।

.

ষষ্ঠ অধ্যায়

বংশ বর্ণন, মান্ধাতা, সৌভরির চরিত্র কহন

শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজন, রাজা অম্বরীষের তিন পুত্র–বিরূপ, বোতুর্মান ও শম্ভু। বিরূপের পুত্র পৃষদ, পৃষদশ্বের পুত্র রথাতি, রথাতির রথীতর, রথীতরের সন্তান না হওয়ায় তিনি মহর্ষি অঙ্গিরার নিকট সন্তান প্রার্থনা করলে অঙ্গিরা রথীতরের পত্নীর গর্ভে ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন কয়েকটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

অঙ্গিরা কর্তৃক উৎপাদিত এই পুত্রগণ রথীতরের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণহেতু রথীতর গোত্র হলেও অঙ্গিরার বীর্যে উৎপন্ন বলে অঙ্গিরস সংজ্ঞা দ্বারাও পরিচিত হয়েছিলেন এবং তারা ক্ষত্রিয় গোত্র ব্রাহ্মণ বলে রথীতরের সন্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মনু হাঁচির সময় তার নাসিকা হতে এক পুত্রের জন্ম হয় তার নাম ইক্ষবাকু। ইক্ষবাকুর একশত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিখি ও দত্তক– এই তিনজন জ্যেষ্ঠ। হে মহারাজ ইক্ষাবাকুর পুত্রগণের মধ্যে পঁচিশজন আর্যবর্তের পূর্বভাগে, পঁচিশজন পশ্চিমভাগে, তিনজন মধ্যভাগে এবং অপর পুত্রগণ আর্যাবর্তেরই দক্ষিণ ও উত্তরাদি নানা স্থানের রাজা হয়েছিলেন।

একদিন ইক্ষবাকু অষ্টকা শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে পুত্র অবকুক্ষিকে আদেশ করলেন–বৎস, শীঘ্র অরণ্যে গিয়ে শ্রাদ্ধের জন্য পবিত্র মাংস আহরণ কর। বিকুক্ষি 'তাই করছি' এই বলে বনগমন পূর্বক শ্রাদ্ধের উপযোগী বহুতর মৃগ বধ করলেন। তারপর শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হওয়ার ভ্রমবশত ঐ সকল পশুর মধ্য হতে একটি শশের (মৃগবিশেষের) মাংস ভক্ষণ করলেন।

তিনি অবশিষ্ট মাংস পিতার নিকট অর্পণ করলে পিতা কুলগুরু বশিষ্ট দেবকে ঐ মাংস ভক্ষণ (অর্থাৎ শ্রাদ্ধের উপযোগী সংদ্ধার) করার জন্য নিযুক্ত করলেন। তখন বশিষ্ঠ বললেন– এ মাংস দূষিত হয়েছে। ইহা কর্মযোগ্য হবে না। তারপর ইক্ষবাকু বশিষ্ট কর্তৃক কথিত পুত্রের কর্ম জানতে পেরে ক্রোধবশতঃ সদাচার ত্যাগী সেই পুত্রকে দেশ হতে বাহির করে দিলেন। তারপর ইক্ষাকু তত্ত্বোপবদেশক আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। পরিশেষে রাজ্যভোগে বিরক্ত হয়ে যোগী হলেন এবং যোগদ্বারা দেহত্যাগ করে ব্রহ্মপদ লাভ করলেন।

পিতার দেহত্যাগের পর বিকুক্ষি দেশে প্রত্যাবর্তন পূর্বক এই পৃথিবীর শাসনকার্য পরিচালনা করে বহু যজ্ঞ দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করেন। তিনি শশাদ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। সেই বিকুক্ষির পুত্র পুরঞ্জয় তিনিই ইন্দ্রহাব ও কুকুৎস্থ নামে অভিহিত হন। যে সকল কর্মের জন্য এই সকল নাম হয়েছিল, তা শোন।

পূর্বকালে দানবের সাথে দেবতাদের বিশ্ববিনাশন যুদ্ধ হয়েছিল, সে সময় দেবগণ দৈত্যগণ কর্তৃক পরাজিত হলে মহাবীর পুরঞ্জয়কে তাঁদের সাহায্যের দানী বরণ করেছিলেন। তখন তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে নিজের বাহন হবার জন্য প্রার্থনা করলে ইন্দ্র প্রথমত লজ্জিত হয়ে পরে বিশ্বাত্মা দেবাদেব প্রভু বিষ্ণুর বাক্যে স্বীকার করে পুরঞ্জয়ের বাহন হবার জন্য মহাবৃষৎ হয়েছিলেন।

এইরূপে ইন্দ্র বাহন হওয়ার পুরঞ্জয়ের ইন্দ্রবাহ এই নাম হয়েছিল। তারপর পুরঞ্জয় যুদ্ধের উপযোগী ধর্ম দিব্য ধন ও সুতীক্ষ বাণসমূহ, ধারণপূর্বক যুদ্ধের ইচ্ছাই মহাবৃক্ষ রূপী ইন্দ্রের উপর আরোহণ করে তার বাকুদে স্কেন্ধের উপরিস্থিত উন্নত স্থানে অবস্থান করলেন, তখন দেবগণ তাঁর স্তব করেছিলেন। এই রঙ্গে পরমপুরুষ মহাত্মা বিষ্ণুর তেজে বলবান রাজা পুরঞ্জয় দেবগণের সাথে মিলিত হয়ে পশ্চিম দিকে দৈত্যপুরী অবরোধ করলেন। তখন দৈত্যদের সাথে তার তুমুল সংগ্রাম হয়েছিল।

সে সকল দৈত্যসমরে তার সম্মুখীন হল, তাদের তিনি যম সন্দর্শনাথ প্রেরণ করলেন। তখন দৈত্যগণ যুদ্ধে আহত হয়ে প্রচণ্ড প্রলয়াগ্নিতুল্য তদীয় বানমতনের সম্মুখভাগ পরিত্যাগ পূর্বক সত্তীর নিজ নিজ আলয়ে পাতালে পলায়ন করলেন।

রাজর্ষি পুরঞ্জয় এইরূপে দৈত্যপুর জয় করে রমণীগণ সহ সমস্ত ধন দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান এ সকল কর্মের জন্য তিনি বিভিন্ন নামে কথিত হন। (অর্থাৎ দৈত্যপুর জয় করায় পুরঞ্জয় ইন্দ্রকে বাহন করায় ইন্দ্রবাহ এবং বৃষরূপী ইন্দ্রের বাকুলে অবস্থান করায় বাকুৎস্থ নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

পুরঞ্জয়ের, পুত্র অনেনা তাঁর পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র বিশ্বগন্ধি, তাঁর পুত্র চন্দ্র এবং চন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্রের নাম শ্রীবন্ত, তিনি শ্রীবস্তী পুরী নির্মাণ করেন। শ্রীবন্তের পুত্র বৃহদ এবং বৃহদশ্বের পুত্র কুবলয়া। তিনি উতঙ্ক ঋষির প্রীতি-সাধনের জন্য নিজ একবিংশতি সহস্র পুত্রগণের সহিত মিলিত হয়ে ধুন্ধু নামক অসুরকে বিনাশ করলে ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হন।

কিন্তু ধুন্ধুর মুখাগ্নির দ্বারা তাঁর পুত্রগণ দগ্ধ হন। তাদের মধ্যে কেবলমাত্র তিনটি পুত্র অবশিষ্ট ছিলেন। হে মহারাজ, সেই তিন পুত্র দৃঢ়শ্ব, বাদিলা এবং ভদ্রা নামে প্রসিদ্ধ। দৃঢ়শ্বের পুত্র হর্থশ্ব এবং হর্থশ্বের পুত্র নিকুম্ভ। নিকুম্ভের পুত্র বাহলাশ্ব, তা হতে কৃশাশ্ব উৎপন্ন হন। সেই কৃশাশ্বের তনয় সেনজিৎ, তার পুত্র যুবনাশ্ব।

যুবনাশ্বের একশত ভার্য্যা ছিল, তথাপি তিনি অনুগত্য জন্য নির্বিঘ্ন হয়ে ঐ একশত ভার্যার সহিত বনে গমন করেছিলেন। কৃপালু ঋষিগণ সুমমাহিত হয়ে তার পুত্র লাভের জন্য ইন্দ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করলেন। একদিন রাতে রাজা যুবনাশ্ব তৃষ্ণার্ত হয়ে জল পানের জন্য সেই যজ্ঞশালায় প্রবেশ করলেন। সেখানে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের নিদ্রিত দেখে নিজেই যজ্ঞ দ্বারা পুত কলসীতে রক্ষিত মন্ত্রপুত জল (অর্থাৎ রাজপত্নীদের পুত্রলাভের জন্য রক্ষিত মন্ত্রপূত জল) পান করলেন। হে মহারাজ তারপর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ জাগ্রত হয়ে কলসটি

জলশূণ্য দেখে জিজ্ঞাসা করলেনএই পুত্রসন্তান উৎপাদক পবিত্র জল কে পান করেছে? তারপর ঈশ্বরের প্রেরণায় রাজাই এই জল পান করেছেন জেনে সেই ব্রাহ্মণগণ বললেন, অহো, দৈববলই মুখ্যবল, লোকবল কিছুই নহে–এরূপ বলে ঈশ্বরের উদ্দেশে নমস্কার করলেন।

তারপর যথাকালে যুবনাশ্বের দক্ষিণ কুক্ষি লক্ষণ যুক্ত একটি পুত্র জন্মিল। তখন ব্রাহ্মণগণ। বললেন–এই কুমার স্তনপানের জন্য অত্যন্ত রোদন করছে। এখন শিশুটি কী পান করবে? তখন দেবরাজ ইন্দ্র-বৎস রোদন করো না, মাং ধাতা' মান্ধাতা (অর্থাৎ আমাকে পান করবে) এই বলে নিজের তর্জনী প্রদান করলেন। (এজন্য এ বালকের মান্ধাতা নাম হয়)। এই বালকের পিতা যুবনাশ্বের উদর বিদীর্ণ হলেও ব্রাহ্মণ ও দেবগণের অনুগ্রহে তিনি মৃত্যুগ্রস্ত হন নাই। তারপর যুবনাশ্ব সেখানেই তপস্যার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

হে মহারাজ, রাবণাদি দস্যুগণ এই মান্ধাতার ভয়ে সব সময় সন্ত্রস্ত থাকত। সেইজন্য দেবরাজ ইন্দ্র তার আর একটি নাম দেন–এসদ্দস্য। তারপর যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা রাজচক্রবর্তী হয়ে ভগবান শ্রীহরির প্রভাবে একাকী সপ্তদীপা পৃথিবীকে শাসন করেছিলেন।

তিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ হয়েও প্রকৃত দক্ষিণাযুক্ত যাগসমূহের দ্বারা সর্বাত্মক, অতীন্দ্রিয় সর্বদেবময় দেবতা বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন, যে বিষ্ণু স্বয়ং যজ্ঞের দ্রব্য মন্ত্র বিধি, যজ্ঞ যজমান, ঋত্বিক সমূহ, যজ্ঞফল, ধর্ম, যজ্ঞের দেশ ও কাল এই সমস্ত রূপে বিরাজমান যতদূর পর্যন্ত সূর্য উদিত হয় এবং যে পর্যন্ত অস্ত যায়, ততদূর পর্যন্ত সমস্ত স্থান যুবনাশ্বপুত্র মান্ধাতার ক্ষেত্র বলে কথিত হয়ে থাকে। যা হোক ঐ রাজা শশবিন্দুর কন্যা ইন্দুমতীর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ এবং যোগী মুচুকুন্দ– এই তিনটি তনয় উৎপন্ন করেন। ঐ তিন তনয়ের পঞ্চাশ জন ভগিনী (অর্থাৎ মান্ধাতার ঐ তিন পুত্র ব্যতীত আরও পঞ্চাশটি কন্যা) ছিল। তারা সকলেই ঋষি সৌভরিকে পতিত্বে বরণ করে।

সৌভরি ঋষি একসময় যমুনার জলে মগ্ন হয়ে কঠোর তপস্যায় রতকালীন মৈথুনরত একটি মৎস্যরাজের সুখ দেখে ঐ বিষয়ে তার স্পৃহা জন্মালে রাজা মান্ধাতার নিকট একটি কন্যা প্রার্থনা করলেন।

রাজা মান্ধাতা বললেন–হে ব্রাহ্মণ, আপনি কন্যাদের ইচ্ছাপূরণ পূর্বক স্বয়ংসভায় উপনীত হয়ে কন্যা গ্রহণ করুন। তখন সৌভরি ভাবলেন–আমি বৃদ্ধ, লোলচর্ম, পক্ককেশ এবং কম্পিত মস্তক এ সকল কারণে আমাকে রমণীগণের অপ্রিয় মনে করে এবং অন্যান্য কারণেও আমি

মনোমত নই বলে রাজা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অতএব আমি নিজ দেহটিকে এরূপ সুন্দর করব যাতে দেবরমণীগণও আমাকে কামনা করেন, আর রাজরমণীদের কথা কী? এই ভেবে সেরূপ কৃতনিশ্চয়ই হলেন তপস্যার প্রভাবে তার সেই অপরূপ রূপ হল।

তারপর প্রতিহারী সৌভরি ঋষিকে সমৃদ্ধিশালী কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করলে পঞ্চাশটি রাজকন্যাই সেই একজনকে পতিরূপে বরণ করলেন। তৎকালে রাজকন্যাগণের সকলেরই চিত্ত তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তাকে পাবার জন্য পরস্পর সৌহার্দ ত্যাগ করে সকলেই–ইনি আমার যোগ্য পতি, তোমাদের নয়—-এরূপ বিবাদ আরম্ভ করেছিলেন।

যা হোক, সৌভরি ঋষি মন্ত্রসামর্থ্যে সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর অপার তপঃশক্তিবলে তৎক্ষণাৎ প্রত্যেক ভবনে মহামূল্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত হল এবং নানাবিধ বন, উপবন সুশোভিত ও সরোবর — সকল সৌগন্ধি কার-কাননে সুসজ্জিত হয়ে উঠল। আর যাবতীয় গৃহে দাস-দাসী সকল সুন্দর রূপে অলংকৃত এবং সর্বত্র পক্ষী ভ্রমর ও স্তুতি পাঠকগণ মধুর স্বরে গান আরম্ভ কর। তিনি মহামূল্য শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ, স্নান ও অনুলেপন, আহার ও মাল্যসম্ভারে সমৃদ্ধশালী হয়ে সকল ভবন ও উপবনাদিতে সেসকল বণিতাগণের সাথে অহরহ বিহার করতে লাগলেন। হে রাজন, সৌভরির গার্হস্থ্য ধর্ম অবলোকন করে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি মান্ধাতারাও সুমহৎ বিস্ময় জন্মেছিল।

সাম্রাজ্য সম্পত্তি সম্পন্ন বলে তাঁর যে গর্ব ছিল, তা তিনি পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু সৌভরি ঋষি ঐপ্রকারে গৃহাশ্রমে অবিরত হয়ে যদিও বিবিধ সুখে বিষয় ভোগ করতে লাগলেন, তথাপি ঘৃতবিন্দুপাতে যেরূপ বহ্নির পরিতৃপ্তি হয় না, তার ন্যায় কিছুতেই তার তৃপ্তি বোধ হল না।

একসময় মন্ত্রজ্ঞ গণের আচার্য সেই সৌভরি ঋষি নির্জনে উপবিষ্ট হয়ে নিজের বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। তাতে মৎস্য সংসর্গে তার নিজের যে তপস্যার হানি হয়েছে, তা অনুভব করলেন। তখন তিনি অনুতপ্ত হয়ে এরূপ বলেছিলেন–অহো, আমি ব্রতনিষ্ঠ, সাধু তপস্বী ছিলাম, আজ আমার এই সর্বনাশ দেখ। আমি জলমধ্যে থেকে মৈথুনরত মৎস্যের সঙ্গহেতু চিরকালের সঞ্চিত তপোবল বিসর্জন দিয়েছি। (বস্তুতঃ ভগবদ পার্ষদ গরুড়ের প্রতি অপরাধের ফলেই মহামুনি সৌভরির এই গার্হস্থ্য যোগ)

মুক্তিকামী পুরুষ সর্বতোভাবে মৈথুনাসক্তগণের সঙ্গ ত্যাগ করবেন। ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহ্য বিষয়ে। লিপ্ত করবেন না এবং সর্বদা একাকী নির্জনে বিচরণ করে মনকে অনন্ত পরমেশ্বরে নিযুক্ত করবেন, আর যদি সঙ্গ করতে হয়, তাহলে যারা ভগবানের প্রীতির জন্যই ধর্মাচরণ

করেন, সেরূপ সাধুগণেরই সঙ্গ করবেন। আমি জলমধ্যে একাকী তপস্যায় রত ছিলাম, পরে সৎস্যের সঙ্গহেতু পঞ্চাশটি ভার্যার সম্বন্ধে এসে পঞ্চাশ হলাম।

এরপর প্রত্যেকের গর্ভে শত পুত্রের জন্মদান করে এখন পঞ্চাশ সহস্র হয়েছি। এ অবস্থায়ও আমি ঐহিক ও পারলৌকিক কর্মবিষয়ক বাসনা সমূহের অন্ত পাইনি। মায়িক গুণসমূহ আমার চিত্তকে হরণ করায় আমি সারিক বিষয় রাশিকেই পুরুষার্থ জ্ঞান করছি।

এইরূপ তিনি কিয়ৎকাল গৃহবাসের পর বিরক্ত হয়ে বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বনপূর্বক বনে গমন করলেন এবং তৎকালে পতিব্রতা পত্নীগণও তাকে অনুগমন করেছিলেন। আত্মজ্ঞ ঋষি সেই বন মধ্যে আত্মদর্শনের উপযোগী তীব্র আখ্যার অনুষ্ঠান করে, পশ্চাৎ গার্হস্থ্যাদি অগ্নিয়ের সহিত আত্মাকে পরমাত্মায় যুক্ত করেছিলেন (অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেছিলেন)।

হে মহারাজ, তৎকালে তার পত্নীগণ নিজ পতির ঐরূপে আধ্যাত্মিকগত অর্থাৎ পরব্রহ্মে বিলয় অবলোকন করে, অগ্নিশিখা যেমন নির্বাণপ্রাপ্তি অনলের সঙ্গে যায়, তার ন্যায় তদীয় এভাবে তাঁর সহগামিনী হলেন (অর্থাৎ তারাও মুক্তি লাভ করলেন।)।

.

সপ্তম অধ্যায়

ত্রিশুঙ্গ ও হরিশচন্দ্রের উপাখ্যান

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, আমি পূর্বে মান্ধাতার পুত্রশ্রেষ্ঠ যে অম্বরীষের কথা বলেছি, পিতামহ যুবনাশ্ব তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই অম্বরীষের পুত্র যৌবনাশ্ব ও হারী–এই দুই জন প্রধান। ভ্রাতা মদগণ ভগিনী নর্মদাকে পুরুবৎসের হস্তে সম্প্রদান করলে, নর্মদা পুরুবৎসকে নাগরাজের নিয়োগে রসাতলে নিয়ে যান।

পুরুবৎস সেখানে বিষ্ণুর শক্তি ধারণ করে বধযোগ্য অনেক গন্ধর্বের প্রাণ বিনাশ করলে, নাগরাজ তাকে বর দেন–যেসকল ব্যক্তি পুরুবৎসের চরিত স্মরণ করবে, তাদের সর্পভয় থাকবে না। পুরুবৎসের পুত্র এসদস্যু, ইনি অনরণ্যের জনক। অনরণ্যের পুত্র হর্য, হর্যশ্বের পুত্র প্রারুণ এবং প্রারুণের পুত্র ত্রিবন্ধন।

ত্রিবন্ধনের পুত্র সত্যব্রত, ইনি পরে ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন। তিনটি শঙ্কুর মত দুঃখ হেতুকদোষ যাঁর, তিনি ত্রিশঙ্কু। পিতার অসন্তোষ উৎপাদন, গুরুর দুগ্ধবতী ধেনুবধ এবং অপ্রোক্ষিত মদ্য সেবন এই তিনটি দোষ থাকায় তিনি ঐ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। পরে পরিণীয় ঘন বিপ্রকন্তা হরণের অপরাধে ক্রুদ্ধ পিতার অভিশাপে ইনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হলে, বিশ্বামিত্রের প্রভাবে সশরীরে স্বর্গে গমন। করেন।

এখনও ইহাকে আকাশে দেখা যায়। দেবতাগণ তাকে নীচের দিকে মাথা করে স্বর্গ হতে ফেলে দিলে, বিশ্বাসী এই তাঁকে নিজের শক্তিবলে আকাশে স্তম্ভিত করে রেখেছিলেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশচন্দ্র, এই হরিশচন্দ্রের জন্যই পক্ষীরূপধারী বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বহু বৎসর যুদ্ধ হয়েছিল। (বিশ্বামিত্র রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণার ছলে হরিশচন্দ্রের সর্বস্ব হনন করলে, বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে, বিশ্বামিত্রকে তুমি আড়ী লক্ষ্মী হও–এরূপ শাপ দিলে, তিনিও বশিষ্ঠকে শাপ দেন- তুমি বক পক্ষী হও। পরে আড়ী ও বকরূপী উভয়ের বহুকাল যুদ্ধ হয়)।

সন্তানহীন বিষঃচিত্ত রাজা হরিশচন্দ্র নারদের উপদেশে জলধিপতি বরুণের শরণাপন্ন হয়ে প্রার্থনা করলেন, হে প্রভো, আপনার অনুগ্রহে আমার পুত্র হোক। যদি আমার বীর পুত্র হয়, তা হলে তাকেই পশুরূপে উৎসর্গ করে আপনার যাগ করব। বরুণ বললেন–"তথাস্তু অর্থাৎ তাই হবে। এর পরই রাজা হরিশচন্দ্রের রোহিত নামে একটি পুত্র জন্মিল।

তখন বরুণদেব বললেন–হে রাজন, তোমার পুত্র হয়েছে, এর দ্বারা আমার যজ্ঞ কর। হরিশচন্দ্র বললেন–হে দেব, দশ দিন বয়ঃক্রম অতীত না হলে পশু পবিত্র ও যাগ যোগ্য হয় না। অতএব দশ দিন অতীত হোক। যাগ করব। দশ দিন অতিক্রান্ত হলে বরুণদেব পুনরায় এসে বললেন–রাজ এখন যাগ কর। রাজা বললেন–দন্ত উৎপন্ন হলেই পশু পবিত্র হয়। তারপর দন্ত জন্মিলেন বরুণদেব এসে বললেন–রাজন, তোমার পুত্রের দন্ত উৎপন্ন হয়েছে, এখন যাগ কর। তখন রাজা বললেন–এই দন্তগুলি যখন পতিত হবে, তখন যজ্ঞের যোগ্য হবে।

এরপর দন্ত সমূহের পতন হলে বরুণ বললেন–এখন যাগ কর। হরিশচন্দ্র বললেন–যখন পশুর দন্ত পতনের পর পুনরায় দন্ত উৎপন্ন হয়, তখনই পশু শুদ্ধ হয়। এরপর দন্তসমূহ পুনরায় উৎপন্ন হলে বরুণ এসে বললেন–এখন তোমার পুত্রের দ্বিতীয় বার দন্ত উৎপন্ন হয়েছে, অতএব যজ্ঞ কর। তখন হরিশচন্দ্র বললেন–হে বরুণরাজ, ক্ষত্রিয় পশু চর্ম পরিধানের যোগ্য হলেই পবিত্র হয়।

পুত্রের প্রতি বৎসল্য হেতু স্নেহানুবদ্ধ হৃদয় রাজা হরিশচন্দ্র বঞ্চনা করে যে যে সময়ের কথা বলেছিলেন, বরুণদেব সেই সেই সময়েরই প্রতীক্ষা করেছিলেন। তারপর রোহিতাশ্ব পিতার অভীপ্সিত কর্ম (অর্থাৎ তার দ্বারা বরুণের যজ্ঞ করবেন জানতে পেরে প্রাণরক্ষার জন্য ধনুর্ধারী হয়ে বনে প্রবেশ করলেন।

এরপর রোহিত শুনতে পেলেন পিতা বরুণ কর্তৃক ত্রস্ত হয়েছেন। (অর্থাৎ জলোদর রোগে আক্রান্ত হয়েছেন)। এটা জেনে বন থেকে গ্রামে আসবার উদ্যোগ করলে, ইন্দ্র তাকে বারণ করলেন। ইন্দ্র বলল–বিবিধ তীর্থক্ষেত্রের সেবা করে পৃথিবী পর্যটন করা পুণ্য কার্য। অতএব তুমি তাই কর। তখন রোহিত এক বছর বনেই বাস করলেন। এইরূপ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্রতি বর্ষেই ইন্দ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হয়ে তাঁকে গ্রাম গমনে নিষেধ করেছিলেন।

এইরূপে রোহিত ষষ্ঠ বৎসর পর্যন্ত অরণ্যে ভ্রমণ করেছিলেন, তারপর প্রত্যাগমন করতঃ যখন পুরীর নিকটে এলেন তখন অজীগর্তের নিকট হতে তার মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করে আনলেন এবং পিতাকে গিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর মহাযশাঃ হরিশচন্দ্র নরমেধ দ্বারা বরুণাদি দেবগণের যজ্ঞ করে জলোদর রোগ হতে মুক্ত হন। মহাজনগণের মধ্যে রাজা হরিশচন্দ্রের কথা প্রসিদ্ধ। সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, আত্মজ্ঞ জমদগ্নি অবব্যু, বশিষ্ঠ ব্রপক্ষ, এবং অয়াস্যমুনি উকাতা (অর্থাৎ মাঘগানকারী) হয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এই যজ্ঞে তুষ্ট হয়ে রাজা হরিশচন্দ্রকে স্বর্ণময় রথ প্রদান করেছিলেন।

শুনঃশেফের মাহাত্ম্য পরে (বিশ্বামিত্রের আখ্যান প্রসঙ্গে) বলা হবে। (মহাযশঃ হরিশচন্দ্রের এই নরমেধ কার্যে যদি অত্যন্ত বৈদিক কর্মপরতাই ধরা হয়, তবে তাতে ব্রহ্মকৈবল্য হবে, কিন্তু ভগবৎ সম্বন্ধে ধরা যেতে পারে না, ক্রমসন্দর্ভে শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী)।

হে মহারাজা পরীক্ষিত, সভার্য হরিশচন্দ্রের সত্য সামর্থ্য এবং ধৈর্য অবলোকন করে মহামুনি বিশ্বামিত্র অতিশয় প্রীত হয়ে তাকে অগাধ জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। এই জ্ঞান লাভের ফলে রাজা হরিশচন্দ্র মনকে পৃথিবীতে ধারণ (অর্থাৎ তার সহিত এক) করে, পৃথিবীকে জলের সাথে, জলকে তেজের সাথে, তেজকে বায়ুর সাথে, বায়ুকে আকাশের সাথে, আকাশকে অহংকারের সাথে, এবং অহংকারকে মহত্ত্তত্ত্বের সাথে এক করে তন্মধ্যে জ্ঞানকলা (অর্থাৎ জ্ঞানের অংশমাত্রের) ধ্যান করেছিলেন অর্থাৎ জ্ঞানের ঐ অংশকেই আত্মরূপে চিন্তা করেছিলেন। তারপর সেই আত্মকালে প্রকাশিত ধ্যানের বৃত্তিদ্বারা অজ্ঞানকে সম্পূর্ণ রূপে দগ্ধ

করে ফেললেন। পরে নির্বাণ দ্বারা জ্ঞানাংশ পরিত্যাগপূর্বক মুক্ত বন্ধন হয়ে অনির্দেশ ও অচিন্তনীয় স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

.

অষ্টম অধ্যায়

সাগর চরিত বর্ণনা

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, রোহিতের পুত্রের নাম হরিত, হরিতের পুত্রের নাম চম্প, এই চম্পই চম্পা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। চম্পের পুত্র সুদেব এবং সুদেবের পুত্র বিজয়। বিজয়ের পুত্র ভরুক, তার পুত্র বৃক এবং বৃকের পুত্র বাহুক। শত্রুগণ রাজ্য হরণ করলে বাহক নিজ ভার্যার সহিত বলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। রাজা বাহুক বৃদ্ধ বয়সে দেহত্যাগ করলে, তার মহিষী সহমরণের ইচ্ছা করায় মহর্ষি ঔব তাকে গর্ভবতী জেনে সহমরণ হতে নিবৃত্ত করলেন। ঐ মহিষীর সপত্নীগণ গর্ভের কথা জানতে পেরে তাকে অন্নের সাথে বিষ প্রদান করেন। সেই গরল অর্থাৎ বিষের সহিতই পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়ে সগর নামে প্রসিদ্ধ হন। সগর মহাযশস্বী সার্বভৌম রাজা ছিলেন এবং তার পুত্রগণই সাগরের সৃষ্টি করেন। সগর রাজা স্বীয় গুরু ঔর্ব ঋষির বাক্যে যবন, শক, হৈহয় এবং বর্বর এই সকল জাতীয়দের প্রাণবধ করেন নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বিকৃত বেশী করেছিলেন। কোন জাতিকে মুণ্ডিত মস্তক অথচ শ্মশ্রুধারী কোন জাতিকে মুক্ত কেশ অথচ অর্ধমুণ্ডিত কোন জাতিকে কেবলমাত্র বহির্বাসধারী এবং কোন জাতিকে বহির্বাসহীন কেবল কৌপীনধারী করেছিলেন।

সগর রাজা মহর্ষি উপদিষ্ট উপায় অনুসারে বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা সর্ববেদ ও সর্বদেবময় পরমাত্মা জগদীশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তার যজ্ঞে পশুরূপে উৎসর্গীকৃত একটি অশ্বকে হরণ করে নিয়ে যান। সগরের সুমতি ও কেশিনী নামে দুই ভার্য্যা ছিলেন। তন্মধ্যে সুমতির পুত্রগণ বলদৃপ্ত বলে পিতার আদেশ পালন করতে গিয়ে অশ্বের অনুসন্ধান করতে পৃথিবীর চারদিক খনন করেছিলেন। তারপর তারা পূর্বোত দিক মহামুনি কপিলদেবের নিকট সেই অশ্বটিকে দেখতে পেলেন–এবং এই ব্যক্তিই অশ্বাপহারী চোর, এখন চোখ বুজে বসে আছে, সুতরাং এই পাপিষ্ঠকে বধ কর, বধ কর–এই বলে সেই ষাট হাজার সগর-পুত্র অস্ত্র উদ্যত করে কপিল মুনির দিকে ধাবিত হলে, মুনিবর নয়নযুগল উন্মীলিত করলেন।

বস্তুতঃ দেবরাজ ইন্দ্রই-কপিল মুনি অশ্ব হরণ করেছেন—এই কথা বলে রাজপুত্রদের মতিভ্রম ঘটিয়েছিলেন। এইজন্যেই তারা কপিলকে বধ করতে উদ্যত হওয়ায় মহদ্ব্যাতিক্রম হেতুই (অর্থাৎ মহাপুরুষের প্রতি অনুচিত আচরণমূলক পাপের দ্বারা) হত হয়ে নিজ নিজ দেহের অগ্নির দ্বারাই ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মীভূত হয়েছিলেন।

হে রাজন, কেউ কেউ বলে থাকেন, সগর পুত্রগণ কপিলমুনির কোপাগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে, একথা সুসঙ্গত নয়। কারণ আকাশে যেরূপ পার্থিব ধূলরাশির অস্তিত্ব সম্ভাবনা করা যায় না, সেরূপ যাঁর আত্মা জগৎকে পবিত্র করে বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্তি সেই কপিল মুনির মধ্যে কীরূপে ক্রোধময় তামস ভাবের সম্ভাবনা করা যেতে পারে, আর যিনি ইহলোকে সাংখ্য রূপে সুদৃঢ় নৌকার প্রবর্তন করেছেন এবং সেই নৌকার সাহায্যে মুমুক্ষ ব্যক্তি, মৃত্যুর পথ স্বরূপ এই দুষ্পর সংসার সাগর পার হতেছেন। সেই সর্বত্র সমদর্শী সর্বজ্ঞ মহাপুরুষের শত্রু মিত্রাদি ভেদজ্ঞান কিরূপে হতে পারে?

সগর রাজা যে পুত্র অসমঞ্জস বলে উক্ত হতেন, বস্তুতঃ তিনি সগরের ঔরসে কোশিনীর গর্ভজাত সন্তান। অজ্ঞ লোকেরাই তাকে অসমঞ্জস বলতঃ বস্তুতঃ তিনি সমঞ্জস ছিলেন। সেই অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান তিনি পিতামহ সগরের সর্বদা হিতাচরণ করতেন। ঐ অসমঞ্জস পূর্বজন্মে যোগী ছিলেন। লোক সঙ্গবশতঃ যোগভ্রষ্ট হন। এই জন্মে জাতিস্মর হয়ে জন্মগ্রহণ করে লোকসঙ্গের ভয়েই নিজেকে অসামাজিক অসজ্জনের মত দেখাতেন।

তিনি লোকের উদ্বেগ জন্মিয়ে লোক গর্হিত আচার ও জ্ঞাতিগণের অপ্রিয় আচরণ করতেন। তিনি সর্বদা ক্রীড়ারত বালকদের সরযূর জলে নিক্ষেপ করতেন। পিতা সগর পুত্রস্নেহ বিসর্জন করতঃ এইরূপ আচরণকারী পুত্রকে পরিত্যাগ করেন। তখন তিনি নিজ যোগেশ্বর্য প্রভাবে নিহত বালকদের পুনর্জীবিত করে সকলকে দেখান। তারপর তিনি বনে চলে গেলেন। হে মহারাজ, তখন অযোধ্যাবাসী সকলেই বালকগণকে পুনরায় ফিরে আসতে দেখে বিস্মিত হয়েছিল এবং রাজা সগরও স্বয়ং অনুতাপ করেছিলেন।

তারপর অংশুমান রাজা সগর কর্তৃক অশ্বের অন্বেষণে প্রেরিত হয়ে পিতৃব্যগণের খাতের পথে। গমনপূর্বক ভস্মরাশির নিকট অশ্বটিকে দেখতে পেলেন। মহামতি অংশুমান, সেখানে কপিলমুনি রূপে অবতীর্ণ ভগবান বিষ্ণুকে উপবিষ্ট দেখে প্রণামপূর্বক কৃতজ্ঞলি হয়ে একাগ্রচিত্তে তার স্তুতি করতে লাগলেন। অংশুমান বললেন—হে ভগবন্, ব্রহ্মা জন্মরহিত হয়েও আজ পর্যন্ত নিজ অপেক্ষাপর পরমেশ্বর আপনাকে সমাধি দ্বারা দেখতে পেলেন না এবং

যুক্তির দ্বারাও জানতে পারলেন না। এ অবস্থায় যারা সেই ব্রহ্মার মন, দেহ ও বুদ্ধিদ্বারা দেবতা তির্যক প্রাণী ও মনুষ্য রূপে সৃষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে অজ্ঞ অর্বাচীন আমরা কিরূপে আপনাকে অবগত হব; যারা দেহধারী, বুদ্ধিই তাদের প্রধান বলে তারা বুদ্ধির চালনায় বাহ্য বিষয়েরই জ্ঞান আহরণ করে, বস্তুতঃ তাদের চিত্ত আপনার মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছে, আপনি তাদের হৃদয়ে বিরাজমান হলেও তারা আপনাকে জানতে পারে না। কিন্তু জাগরণ ও স্বপ্নকালে শব্দাদি বিষয়সমূহ এবং সুষুপ্তিকালে কেবলমাত্র তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞানই অনুভব করে।

ভগবান, যাঁদের মায়া গুণচরিত ভেদজ্ঞান ও মোহ স্বভাবতঃই বিনষ্ট হয়েছে, আপনি সেই সনন্দন প্রভৃতি মুনিগণেরই ধ্যেয় জ্ঞান ঘনস্বরূপ (অর্থাৎ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ)। মায়ামুগ্ধ আমি কিরূপে আপনার ধ্যানে সমর্থ হব? হে প্রশান্ত আপনি কার্যকারণ হতে বিমুক্ত এবং নাম রূপহীন। আপনার মধ্যে মায়াগুণ, সৃষ্টি প্রবৃত্তি কর্ম এবং ব্রহ্মাদি বিভিন্ন রূপ তিরোহিত হয়েছে। আপনি বস্তুতঃ পুরাণ পুরুষ, তথাপি জ্ঞানোপদেশ প্রদানের জন্য এই মূর্তি ধারণ করেছেন আমি আপনাকে কেবল প্রণাম করছি। হে বিভো, এই লোক আপনার মায়ায় বিরচিত হয়েছে। ইহাতে বস্তুবুদ্ধি করে কাম, লোভ, ঈর্ষা এবং মোহে ভ্রান্তচিত্ত মানবসকল গৃহাদিতে ভ্রমণ করে। কিন্তু হে ভগবান, আপনার কৃপায় আপনার দর্শন লাভ হওয়ায় আজ আমাদের কাম, কর্ম ও হৃদয়ের আশ্রয়রূপ দৃঢ়তর মোহাংশ ছিন্ন হয়ে আমরা কৃতার্থ হলাম।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, অংশুমান এরূপে ভগবান কপিলমুনির মাহাত্ম কীর্তন করলে তিনি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্বক তাঁকে এরূপ বলেছিলেন। শ্রীভগবান বললেন–বৎস তোমার পিতামহের পিও এই অশ্ব নিয়ে যাতব্যগণ নিজ উদ্ধারের জন্য কপিল মুনিকে নতষযজ্ঞ সম্পন্ন

আর তোমার এই দগ্ধ পিতৃব্যগণ নিজ উদ্ধারের জন্য একমাত্র গঙ্গাজল লাভেরই যোগ্য। অন্য কোন বস্তুতে এদের সদগতি হবে না। তারপর অংশুমান কপিল মুনিকে নত মস্তকে প্রণাম ও পরিক্রমার দ্বারা প্রসন্ন করে, অশ্বটিকে নিয়ে এলেন এবং সগর সেই পশুর দ্বারা অবশিষ্ট যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। এরপর মহারাজ সগর অংশুমানের উপর রাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক বিষয়স্পৃহাশুন্য ও বন্ধনমুক্ত হয়ে গুরু ঔবমুনির উপদিষ্ট সাধনমার্গে সর্বোত্তম গতি লাভ করেছিলেন।

.

নবম অধ্যায়

ভগীরথের গঙ্গাবতরণ ও সৌদাস চরিত্র বর্ণন

শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজন, যেমন সগর রাজা পৌত্র হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে তপস্যা করতে বনে গমন করেন, অংশুমানও তেমনি পুত্রকে রাজত্ব দিয়ে গঙ্গানয়ন কামনায় দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু গঙ্গা আনয়ন করতে সমর্থ হন নাই। কিছুকাল পরে কালবশতঃ তার মৃত্যু হয়। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, তিনিও পিতার ন্যায় গঙ্গানয়নে অসমর্থ হয়ে কালগ্রাসে পতিত হন। দিলীপের পুত্র ভগীরথ, তিনি গঙ্গার আনয়নের জন্য সুমহৎ তপস্যা করেছিলেন। তারপর গঙ্গাদেবী প্রসন্না হয়ে। তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন–হে বৎস, আমি তোমাকে বর দিতে এসেছি। তখন রাজা ভগীরথ অবনত হয়ে নিজের অভিপ্রায় (অর্থাৎ উদ্ধার) নিবেদন করলেন। গঙ্গাদেবী বললেন– রাজ, আমি যখন আকাশ হতে ভূতলে পতিত হব, তখন কাউকে আমার বেগ ধারণ করতে হবে, নতুবা আমি ভূতল ভেদ করে রসাতলে গিয়ে পড়ব। কে আমার বেগ ধারণ করবে? আর, আমি পৃথিবীতে যেতে ইচ্ছা করি না, কারণ মনুষ্যেরা আমাতে পাপ সকল প্রক্ষালন করবে, সেই পাপ আমি কোথায় মার্জনা করব, এ বিষয়ে উপায় চিন্তা কর।

শ্রীভগীরথ বললেন–দেবী ধরাতলে ব্রহ্মনিষ্ঠ, শান্তান্তা, লোকপাবন, সন্ন্যাসী, সাধুগণ আপনার জলে স্নান করার সময় তাদের গাত্রসঙ্গদ্বারা আপনার পাপ হরণ করবেন, যেহেতু তাদের মধ্যে সর্বপাপ নাশক শ্রীহরি বিরাজ করেন। মাতঃ সূত্রসমুহের মধ্যে যেমন বস্তুত ওতপ্রোত থাকে, তেমনি যাঁর মধ্যে এই বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রয়েছে, সকল প্রাণীর আত্মা সেই ভগবান রুদ্র আপনার বেগ ধারণ করবেন।

রাজা ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে এইপ্রকার বলে তপস্যার দ্বারা ভগবান শিবের সন্তোষ বিধানে তৎপর হলেন। তাঁর প্রতি আশুতোষের সন্তোষ জন্মিল। তারপর সর্বলোকের হিতকারী ভগবান শংকর ভগীরথের প্রার্থনায়, 'তথাস্তু', অর্থাৎ তাই হোক-বলে অঙ্গীকারপূর্বক শ্রীহরির পাদস্পর্শহেতু পবিত্র সলিলা গঙ্গাকে নিজ মস্তকে ধারণ করলেন। রাজর্ষি ভগীরথ যেস্থানে নিজ পিতৃপুরুষের দেহ ভস্মীভূত হয়ে ভূমিতে পড়েছিল, সেখানে ভুবনপাবণী গঙ্গাকে নিয়ে গেলেন। তিনি বায়ুর মত বেগগামী রথে আরোহণ করে আগে আগে চললেন, তার পেছনে পেছনে ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা ধাবমানা হয়ে সকল দেশ পবিত্র করতে ভস্মীভূত সগর সন্তানদের নিজ জল দ্বারা সিক্ত করলেন। হে রাজন, সগরপুত্রগণ ব্রাহ্মণের প্রতি আত্মকৃত দণ্ডে হত হয়েও কেবল দেহ ভস্মদ্বারা যার জল স্পর্শমাত্রে স্বর্গে গমন করল, আর শ্রদ্ধাপূর্বক তার সেবা করলে কি ফল হতে পারে চিন্তা কর। সগর পুত্রগণ ভস্মীভূত অঙ্গদ্বারা গঙ্গার সংস্পর্শ হেতুই

স্বর্গগামী হয়েছিলেন। এ অবস্থায় যাঁরা ব্রতনিষ্ঠ হয়ে শ্রদ্ধাসহকারে গঙ্গাদেবীর সেবা করেন, তাঁদের কথা আর কি বলব?

হে রাজন্ এস্থলে গঙ্গাদেবীর যে মাহাত্ম বর্ণিত হল, তা পরম আশ্চর্যজনক নয়, কারণ তিনি অনন্ত শ্রীহরির চরণপদ্ম প্রসূতা ও পাপ নাশিনী। হে কুরুবর্ষ, অমল মুনিগণ শ্রদ্ধাসহকারে যে অনন্তে মনোনিবেশ করে দেহ সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক সদ্যই তৃতীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হন, তার পাদপদ্ম প্রভাব অবশ্যই অনির্বচনীয়। যা হোক, রাজা ভগীরথের পুত্রের নাম শ্রুত, তাঁর পুত্র নাভ, নাভের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, তার পুত্র অযুতায়ুঃ, তার ঔরসে নলের সখা ঋতুপর্ণ নলকে অক্ষক্রীড়ার রহস্য শিক্ষা দিয়ে, তার নিকট হতে অশ্ববিদ্যা লাভ করেন। ঋতুপর্ণের পুত্রের নাম সর্বকাম। সর্বকামের পুত্র সুদাস। তার পুত্র সৌদাস, ইনি দয়ন্তীর স্বামী। তাঁকে "মিত্রসহ' এই নামে, কোথাও বা কল্মষ নামে উল্লেখ করা হয়। ইনি বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস এবং নিজকর্মবশতঃ নিঃসন্তান হয়েছিলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন –ব্রাহ্মণ, মহাত্মা সৌদাসের প্রতি গুরু বশিষ্ঠদেব কিজন্য শাপ দিয়েছিলেন, যদি তা গোপনীয় হয়, আমাদের বলুন, আমরা শুনতে ইচ্ছা করি। শ্রীশুকদেব বললেন–একদিন সৌদাস মৃগয়ায় গিয়ে একটি রাক্ষসকে বধ করেন, কিন্তু তার ভাইকে ছেড়ে দেন। তারপর সেই রাক্ষস ভ্রাতৃহত্যার প্রতিকার করতে ইচ্ছুক হয়ে রাজার অনিষ্ট চিন্তা করতে করতে পাঁচকরূপে রাজার গৃহে অবস্থান করতে লাগল। একদিন মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজগৃহে আগমনপূর্বক ভোজনেচ্ছা প্রকাশ করলে, সে নরমাংস পাক করে আনল। ঐ মাংস পরিবেশনের সময় ভগবান বশিষ্ঠদেব দিব্যদৃষ্টি বলে উহা অভক্ষ্য দ্রব্য জানতে পেরে ক্রুদ্ধচিত্তে রাজাকে অভিশাপ দিলেন– এরূপ নরমাংস ব্যবহার দোষে তুমি রাক্ষসভাব লাভ করবে, পরে বশিষ্ঠ ঋষি, রাক্ষসই ঐ নরমাংস দিয়েছে, রাজার কোন দোষ নেই জানতে পেরে ঐ শাপকে দ্বাদশ বর্ষমাত্র স্থায়ী করেছিলেন।

এদিকে রাজাও বিনা অপরাধে অভিশপ্ত হওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে জলগণ্ডুষ গ্রহণপূর্বক গুরুকে প্রতিশাপ দিতে উদ্যত হলে, পত্নী দয়মন্তী বারণ করায় তিনি দিসমূহ, আকাশ ও পৃথিবী সকলকেই জীবময় দেখে অর্থাৎ কোথাও সেই জল নিক্ষেপ করতে না পেরে, অবশেষে ক্রোধাগ্নিরূপে সেই জল নিজের পাদদ্বয়ে পরিত্যাগ করলেন। তারপরে রাজা সৌদাস রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হলেন এবং তার পদযুগল কল্মষ অর্থাৎ মিশ্রিত নানা বর্ণবিশিষ্ট হল। এইরূপে তিনি অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করতে করতে একদিন মৈথুনকর্মরত বনবাসী ব্রাহ্মণ-দম্পতাঁকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে আহারের জন্য ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণী অতি দীনের

মত বলতে লাগলেন–হে মহারাজ, আপনি রাক্ষস নন, কিন্তু সাক্ষাৎ ইক্ষবাকু বংশীয় রাজগণের মধ্যে একজন মহারথ। বিশেষতঃ আপনি দয়মন্তীর পতি বলে এরূপ অধর্ম করতে পারেন না। আমি পুত্রকামা, আমার পতিরও রতিক্রিয়া সমাপ্ত হয় নাই, অতএব আপনি আমাকে এই ব্রাহ্মণপতি প্রদান করুন। হে বীর, হে মহারাজ, এই মানবদেহে পুরুষদের অখিল পুরুষার্থ সাধন হয়, অতএব এই দেহের নাশকে সর্বার্থ নাশ বলা হয়েছে।

আর, এই ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ এবং শীল ও বিবিধ গুণযুক্ত। যিনি সকল ভূতগণের মধ্যে ভূতসমুদয়ের আত্মরূপে অবস্থিত, অথচ মায়াগুণ যোগে অন্তর্হিত, সেই মহাপুরুষ সংজ্ঞক ব্রহ্মবস্তুর ইনি আরাধনা করতে বাসনা রাখেন। হে ধর্মজ্ঞ, পুত্র যেমন পিতার বধযোগ্য হয় না, তেমনি ব্রহ্মর্ষি শ্রেষ্ঠ এই ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ আপনার বধ্য হতে পারে না। কর্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা সকল প্রাণীগণের প্রতি সৌহার্দ আচরণকেই বিদ্যে বিবেকসম্পন্ন পণ্ডিতগণ শীল বলে থাকেন। আপনি সজ্জন সম্মত রাজা, আর আমার পতি নিষ্পাপ, ব্রহ্মবাদী ও শ্রোত্রিয় সাধুপুরুষ। এ অবস্থায় গো-বধের ন্যায় ইহার বধ কিরূপে আপনার বিচারে সঙ্গত হতে পারে, আর যদি আপনি তাকে ভক্ষণই করেন, তা হলে আগে আমাকে ভক্ষণ করুন, যেহেতু আমি তার বিরহে মৃতপ্রায়া হয়ে ক্ষণকালও বেঁচে থাকতে পারব না। করুণভাষিণী ব্রাহ্মণী এরূপে অনাথার মত বিলাপ করতে থাকেন, পাপমোহিত সৌদাস তাঁর কথা আগ্রাহ্য করে–ব্যাঘ্র যেমন গবাদি পশু ভক্ষণ করে, তেমনি সেই ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করেছিলেন।

তখন ব্রাহ্মণী গর্ভদান কর্তা নিজ পতিকে রাক্ষসে ভক্ষণ করছে দেখে, নিজের জন্য শোক করতে করতে ক্রোধে রাজাকে এরূপ অভিশাপ দিলেন-হে পাপিষ্ঠ, হে নির্বোধ, যেহেতু তুমি কামপীড়িতা আমার স্বামীকে ভক্ষণ করেছ-সেইহেতু আমি বলছি–তোমারও মৈথুন নিমিত্ত মৃত্যু হবে। পতিলোক পরায়ণা ব্রাহ্মণী মিত্রসহকে (রাজা সৌদাসকে) এরূপ অভিশাপ দিয়ে ব্রাহ্মণের অস্থিসমূহ প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ পূর্বক নিজেও দেহত্যাগ করলেন (অর্থাৎ নিজেও অগ্নিতে প্রবেশ করে স্বামীর অনুগমন করলেন)। দ্বাদশ বৎসর অতীত হলে সৌদাস শাপমুক্ত হলেন। তারপর একদিন মৈথুনকর্মে উদ্যত হলে মহিষী দয়মন্তী ব্রাহ্মণীর অভিশাপের কথা জানিয়ে স্বামীকে নিবারণ করলেন। নিজ কর্মদোষে নিঃসন্তান রাজা সৌদাস এর পর হতে স্ত্রীসম্ভোগ সুখ ত্যাগ করলেন এবং বশিষ্ঠদেব তাঁরই নিয়োগক্রমে দয়মন্তীর গর্ভাধান করেন। দয়মন্তী সাত বৎসর সেই গর্ভ ধারণ করলেন, কিন্তু কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হল না। পরে বশিষ্ঠই অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তর দ্বারা দয়মন্তীর উদরে আঘাত করলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অক্ষ্ম দ্বারা আঘাতের ফলে জন্মহেতু তার অক্ষুক এই নাম হয়েছিল। সেই অক্ষুক হতে বালিকার জন্ম হয়। স্ত্রীলোকগণ বেষ্টন করে পরশুরামের কোপ হতে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। এই কারণে তিনি

নারীকবচ বলে কথিত হয়ে থাকেন। আবার পৃথিবী ক্ষত্রহীন বলে, ইনিই ক্ষত্রিয়কুলের মূল হওয়ায় 'মূলক' নামেও পরিচিত হয়েছিলেন। মূলকের পুত্রের নাম দশরথ, তাঁর পুত্র ঐড়বিড়ি, তার পুত্র রাজা বিশ্বসহ এবং তারই পুত্র রাজচক্রবর্তী খট্টাঙ্গ।

দুর্জয় মহাবীর রাজা খট্টাঙ্গ দেবগণের প্রার্থনায় যুদ্ধে দৈত্যদের সংহার করেন। তারপর মুহূর্তকালমাত্র আয়ুর অবশেষে জানতে পেরে নিজ পুরীতে আগমনপূর্বক পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করলেন। তৎকালে তিনি এরূপ নিশ্চয় করেছিলেন কুলদেবতা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রাণ, পুত্র, ধন সম্পত্তি, পৃথিবী, রাজত্ব এবং ভাষাও আর অধিক প্রিয় নহে, আমার মতি কখনও অল্পমাত্র অধর্মে রত হয়ে নাই এবং আমি উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরি ভিন্ন জগতে অন্য কোন বস্তুই দেখতে পাই নাই। ত্রিভুবনের অধিপতি দেবগণ আমাকে অভিলষিত বরদানে ইচ্ছুক হলেও, ভূতভাবন হরিতে আমার ভাবনা থাকায় আমি তাও বরণ করি নাই। যাঁদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত, সেই দেবতাগণও নিরন্তর নিজ হৃদয়ে অবস্থিত পরমপ্রিয় সেই আত্মাকে (ভগবানকে) অবগত হতে পারে না, এতে অপরে দেখবে সম্ভবনা কি? যাহা ভগবানেরই মায়ারচিত এবং গন্ধর্ব নারীর ন্যায় বাস্তব সত্তাহীন, তদৃশ ত্রিগুণময় জাগতিক বিষয়সমূহের সম্বন্ধে স্বভাবতঃই চিত্তে যে আসক্তি বদ্ধমূল রয়েছে, এরপর আমি বিশ্বকর্তা শ্রীহরির ভাবনাবলে, তা ছিন্ন করে সেই ভগবানেরই শরণাপন্ন হব।

তারপর রাজা খট্টাঙ্গ শ্রীনারায়ণাশ্রিতা বুদ্ধির দ্বারা এরূপে নিশ্চয় করে, দেহাদি বিষয়ে আত্মাভিমান রূপ অজ্ঞান পরিহারপূর্বক স্বীয়ভাবে অর্থাৎ নিজ স্বরূপে অবস্থান করেছিলেন। ভক্তগণ যাঁকে ভগবান বাসুদেব বলে থাকেন এবং যিনি বাক্যাদির অবষিয় বলে শূন্যরূপে কল্পিত হন, কিন্তু যিনি শূন্য না হয়ে পরিপূর্ণরূপেই বিরাজমান, সেই সূক্ষ্ম (নির্লেপ) পরব্রহ্মই জীবের স্বীয়ভাব অর্থাৎ নিজ স্বরূপ (রাজা খট্টাঙ্গ সেই স্বরূপেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন)।

.

দশম অধ্যায়

শ্রীরামচরিত বর্ণন

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, খট্টাঙ্গ রাজার পুত্র দীর্ঘবাহু তা হতে মহাযশস্বী রঘুর জন্ম হয়। রঘু হতে মহারাজ অজ এবং ঐ অজ হতে মহাত্মা দশরথ জন্মগ্রহণ করেন। সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ভগবান শ্রীহরি দেবগণের প্রার্থনায় রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন–এই চার ভাগে বিভক্ত

নিজ অংশাংশ দ্বারা রাজা দশরথের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হে রাজন, বাল্মীকি প্রভৃতি তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সীতাপতি ঐ রামচন্দ্রের চরিত্র সুবিস্তৃতরূপে বর্ণনা করেছেন। তুমিও বারবার শুনেছ, তথাপি সংক্ষেপে বলছি, শোন। যিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য রাজ্য পরিত্যাগ করে, প্রিয়তমার করস্পর্শ সহনেও অসমর্থ সুকোমল পদযুগল দ্বারা বনে বনে বিচরণ করলে কপিবর (হনুমান বা সুগ্রীব) এবং অনুজ লক্ষ্মণ যাঁর পথশ্রান্তি অপনয়ন করে দিতেন শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদনহেতু (রাবণ সীতা হরণ করলে) যিনি প্রিয়তমার বিরহ জনিত ক্রোধবশে ভ্রুভঙ্গী করায় সমুদ্র ভীত হলে, যিনি তার উপর সেতুবন্ধন করে রাবণাদি খলগণ রূপ বনের দাবানল হন। (অর্থাৎ তাদের সংহার করেছিলেন) সেই শ্রীরামচন্দ্র আমাদের রক্ষা করুন।

যিনি বিশ্বামিত্র ঋষির যজ্ঞে লক্ষ্মণের দৃষ্টির সম্মুখে (তারও অপেক্ষা না করে), মারীচ প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাক্ষসদের একাকী বধ করেছিলেন, (সেই অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্র আমাদের রক্ষা করুন)। তিনি সীতার স্বয়ংবর গৃহে বীরপুরুষসমূহের সমাজ মধ্যে মহাদেবের ধনু উক্ষুদণ্ডের মত গ্রহণ করে জ্যা আরোপণের পর আকর্ষণ ও মধ্যভাগে ভগ্ন করেন। সেই ধনু অতিশয় গুরুতর ছিল, তিন শতবাহকে তা আনয়ন করে দেয়, কিন্তু রামচন্দ্রের লীলা বালগজতুল্য অদ্ভুত, অতএব তিনি অবলীলাক্রমে তা ভগ্ন করেন। যে সীতাদেবী পূর্বে লক্ষ্মীরূপে বক্ষঃস্থলে থেকে আদর লাভ করতেন, নিজ অনুরূপ গুণ, শীল, বয়স ও অঙ্গকান্তিসম্পন্না সেই সীতাদেবীকে স্বয়ংবর সভায় জয় করে নিয়ে যাবার সময় পথে, যিনি একবিংশতিবার পৃথিবীর ক্ষত্রকুল সংহারকারী পরশুরামের দর্প চূর্ণ করেছিলেন, সেই শ্রীরামচন্দ্র আমাদের রক্ষা করুন।

(কোন সময় কৈকেয়ীর প্রতি তুষ্ট হয়ে রাজা দশরথ তাঁকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সময়ে দাসী মন্থরার কুপরামর্শে কৈকেয়ী ভরতের যৌবরাজ্য এবং রামের বনবাস প্রার্থনা করেন।) সত্যপাশে আবদ্ধ স্ত্রৈণ রাজার আদেশকেও যিনি অবনত মস্তকে স্বীকারপূর্বক যোগী পুরুষের প্রাণত্যাগের ন্যায় অনায়াসে রাজ্য সম্পদ অনুরাগী সুহৃদগণ ও গৃহ পরিত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন, সেই অযোধ্যারাজ শ্রীরামচন্দ্র আমাদের রক্ষা করুন। যিনি রাবণের ভগিনী কামাতুরা শূর্পণখার (নাসিকা কর্ণ ছেদন করতঃ) রূপ বিকৃত করে, নিজ হস্তে অসহনীয় ধনুর্বাণ ধারণপূর্বক তারই আত্মীয় খর দূষণ প্রভৃতি চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস বধ করেছিলেন, সেই কোশলেন্দ্র আমাদের রক্ষা করুন।

হে মহারাজ, সীতার সৌন্দর্যাদির কথা শুনে কামাতুর রাবণ সীতাহরণের অভিপ্রায়ে দুরাত্মা মারীচ নামক রাক্ষসকে নিযুক্ত করলে, মারীচ অদ্ভুত দর্শন স্বর্ণমৃগ রূপ ধারণপূর্বক রামচন্দ্রকে

আশ্রম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর ভগবান রুদ্র (বীরভদ্র) যেমন দক্ষকে বধ করেছিলেন, তেমনি শ্রীরামচন্দ্রও তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা সত্বর মারীচকে নিহত করেছিলেন। বনে রক্ষণহীন মেষকে যেমন বৃক (নেকড়ে বাঘ) হরণ করে, তেমনি শ্রীরামচন্দ্রের অনুপস্থিতিকালে রাক্ষসরাজ রাবণ, বিদেহ রাজ দুহিতা রাম বণিতাকে অপহরণ করলে, রামচন্দ্র প্রিয়তমা বিরহিত হয়ে স্ত্রী-সঙ্গীদের এরূপ দুর্গতি প্রচারের জন্যই নিজে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সাথে বনে বনে ভ্রমণ করতে লাগলেন। ব্রহ্মা ও শংকর যাঁর চরণপদ্ম অর্চনা করেন সেই মানবাকার ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করতে গিয়ে রাবণের হস্তে নিহত অকৃতদার জটায়ু পক্ষীকে পুত্রের মত শাস্ত্রবিধানে দাহনাদিপূর্বক সকার করলেন। পরে নিজেকে গ্রহণের জন্য প্রসারিত বাহু কবন্ধের প্রাণসংহার করেছিলেন। তারপর বানরগণের সাথে মিত্রতা করে বালি বধ করেন এবং তাদের সাহায্যে প্রিয়তমা সীতার লঙ্কায় অবস্থানের কথা জানতে পেরে বানর সৈন্যগণের সহিত সমুদ্রতীরে গমন করলেন।

সাগরতীরে ত্রিরাত্র উপবাসপূর্বক সমুদ্রের আগমন প্রতীক্ষা করলেও সমুদ্র উপস্থিত না হওয়ায়, শ্রীরামচন্দ্র ক্রোধলীলার অভিনয় করে বিস্তৃত কটাক্ষপাত করলে, সমুদ্র মধ্যস্থিত কুম্ভীর ও মকরাদি জলজন্তুগণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হল। সমুদ্রও তার গর্জন স্তব্ধ করে মূর্তিমান হয়ে মস্তকে অর্ঘ্যাদি পুজোপহার ধারণপূর্বক শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্মে উপনীত হয়ে বলতে লাগলেন–হে ভূমন, আমরা জড়মতি এজন্য এতকাল আপনাকে জানতে পারিনি। আপনি নির্বিকার আদিপুরুষ ও জগদীশ্বর। আর যাঁর বশবর্তী সত্ত্বগুণ হতে সুরগণ, রজোগুণ হতে প্রজাপতি সকল এবং তমোগুণ হতে ভূতপতি সকল উৎপন্ন হন, আপনি সেই গুণেশ্বর। হে বীর, আপনি স্বচ্ছন্দে আমার জল অতিক্রম করে গমন করুন। বিশ্রবামুনির পুরীষতুল্য ও ত্রিলোকের পীড়াদায়ক রাবণকে সংহার করে নিজ পত্নীকে লাভ করুন। যদিও আমার জল আপনার গমনের প্রতিবন্ধক নয়, তথাপি জগতে কীর্তি বিস্তারের জন্য আমার জলের উপর সেতু রচনা করুন, ভবিষ্যতে দিবিজয়ী নৃপতিগণ সে সেতুর নিকট এসে আপনার যশগান করবেন।

তারপর রামচন্দ্র বিবিধ পর্বতশৃঙ্গ দ্বারা সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করলেন। ঐ সকল পর্বতশৃঙ্গস্থিত বৃক্ষসমূহের শাখা প্রভৃতি অবয়ব সমুদয় বানর বীরগণের হস্ত দ্বারা কম্পিত হতেছিল। এরপর সেতুবন্ধ হলে বিভীষণের পরামর্শক্রমে সুগ্রীব, নীল, হনুমান প্রভৃতি সেনাগণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। যে লঙ্কা পূর্বেই (সীতান্বেষণ সময়ে) হনুমান কর্তৃক দগ্ধ হয়েছিল। গজসমূহের দ্বারা নদীর যেরূপ আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তৎকালে শ্রীরামচন্দ্রের প্রবেশহেতু লঙ্কারও সেরূপ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ বানর রাজগণের সৈন্যগণ সেখানকার ক্রীড়াস্থান ধ্যানাগারত কোম, গৃহাদির দ্বারক, রুদ্ধদ্বার সভা বলভী

(প্রসাদের উপরিস্থিত আচ্ছাদন ভাগ) এবং কপোতসমূহের আশ্রয়স্থান সকল রুদ্ধ করতে লাগল। আর বেদী, পতাকা, স্বর্ণকলস ও চতুষ্পথ, প্রভৃতি সমুদায় ভগ্ন করে দিল।

রাক্ষসরাজ রাবণ তা লক্ষ্য করে, নিকুম্ভ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, দুর্মখ, সুরান্তক ও নরান্তক প্রভৃতি সমস্ত অনুচর এবং ইন্দ্রজিৎ প্রহস্ত, অতিকায়, বিকম্পর্নাদি পুত্রদের পরে কুম্ভকর্ণকে প্রেরণ করলেন। যদিও ঐ সকল রাক্ষস সেনা অসি, শূল, ধনুঃ, প্রাস, ঋষ্টি, শক্তি, শর, তোমর, খাদি বিবিধ শাস্ত্র অতিশয় দুর্ধর্ষ ছিল, তথাপি রামচন্দ্র লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান, গন্ধমাদন, নীল, অঙ্গ, জম্বুবান এবং প্রণসাদি সেনাপতিগণের সহিত মিলিত হয়ে তাদের অভিমুখে যাত্রা করলেন। তারপর শ্রীরামচন্দ্রের সেনাধ্যক্ষ অঙ্গদ প্রভৃতি বীরগণ দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য হস্তী, পদাতিক, রথ ও অশ্ব সমন্বিত চতুরঙ্গ সেনাদের মধ্যে পতিত হয়ে, সীতাদেবীর দেহ স্পর্শহেতু ক্ষীণমঙ্গল রাবণের অধীন সেই রাক্ষসগণকে বৃক্ষ, পর্বত, গদা ও বামদ্বারা নিহত করতে আরম্ভ করল। রাক্ষসরাজ রাবণ নিজ সৈন্যদের বিনাশ দর্শনে ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ রথে আরোহণপূর্বক শ্রীরামচন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হল। ঐ সময় ইন্দ্রসারথি মাতুলি দীপ্তিশালী দেবেন্দ্রের রথ এনে উপস্থিত করলে শ্রীরামচন্দ্র তাতে আরোহণ করে বিরাজ করতে লাগলেন। রাবণ সুতীক্ষ্ম ক্ষুশর ক্ষেপণ পূর্বক আঘাত করল।

তৎকালে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বললেন–হে রাবণ, তুমি রাক্ষসদের মধ্যে বিষ্ঠাতুল্য। তুমি আমার আগোচরে যেহেতু কুকুরের ন্যায় আমার ভার্যাকে হরণ করেছ, সেইহেতু অলঙঘ্য প্রভাব কাল যেমন অধর্মকারী ব্যক্তিদের যথোচিত ফলদান করে, তেমনি আমিও আজ লজ্জাশূন্য তোমার নিন্দিত কর্মের সমুচিত ফল দান করছি। শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে এরূপ ভর্ৎসনা করে, ধনুকে বাণ যোজনাপূর্বক তার দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং ঐ বাণ বজ্রের মত তার হৃদয় ভেদ করল। তারপর মৃত্যু হলে সুকৃতী ব্যক্তি যেমন অধোলোক পতিত হয়, রাবণও তেমনি দশ মুখে রক্ত বমন করতে করতে পুষ্পক রথ হতে ভূপতিত হল। তা দেখে রাক্ষসগণ সকলে হাহাকার করতে লাগল।

রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরীর সহিত সহস্র সহস্র রাক্ষসী লঙ্কাপুরী হতে বাহির হয়ে রোদন করতে করতে যেখানে রাবণ পতিত হয়েছিলেন, সেখান উপস্থিত হলেন। তারা লক্ষ্মণের বাণদ্বারা নিহত নিজ নিজ পতিদের আলিঙ্গন করে, হস্তদ্বারা নিজ বক্ষঃ প্রভৃতি স্থানে আঘাত করতে করতে করুণ স্বরে রোদন করছিল। তারা বলতে লাগল–হে নাথ, হে লোভয়ংকর রাবণ, আমার হত হলাম, তোমার অভাবে শত্রুপীড়িতা এই লঙ্কাপুরী কাকে আশ্রয় করবে? হে মহাভাগ, তুমি কামপরবশ হয়ে সীতার তেজঃপ্রভাব জানতে পার নাই–যে তেজের প্রভাবে তুমি

এই মৃত্যুদশায় উপনীত হয়েছ, হে কুলনন্দন, তোমার হতেই এই লঙ্কা এবং আমরা পতিহীনা হলাম। তুমি আত্মদোষে নিজের দেহকে গৃগণের ভক্ষ্য ও আত্মাকে নরকভাগী করলে।

শ্রীশুকদেব বললেন–তারপর কোশলাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের অনুমোদনক্রমে বিভীষণ পিতৃযজ্ঞ বিধানক্রমে জ্ঞাতিদের ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করলেন। তারপর শ্রীরামচন্দ্র অশোকবনে শিংশপো বৃক্ষের মূলদেশে অবস্থিত নিজ বিরহসন্তাপ্তা, ক্ষীণদেহী সীতাদেবীকে দর্শন করলেন। তৎকালে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনজনিত আনন্দে সীতাদেবীর মুখপদ্ম উৎফুল্ল হলে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দৈন্যস্তা প্রিয়তমা ভার্যাকে দেখে তাঁর প্রতি কৃপা প্রকাশ করলেন। তারপর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে রাক্ষসগণের অধিপতি, লঙ্কাপুরী এবং কল্পকাল স্থায়ী পরমায়ু প্রদান করে, সীতাকে নিয়ে রথে আরোহণ করলেন। পরে হনুমান, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত নিজ পুষ্পক রথে আরোহণ করলেন। এবং বনবাস ব্রত সমাপ্ত হওয়ায় অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করলেন। (তৎকালে বিভীষণ ও তার সহযাত্রী হয়েছিলেন)। তার যাত্রাপথে লোকপালগণ তার উপর পুষ্পবর্ষণ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রীতিভরে তার চরিত কীর্তন করেছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র আসতে আসতে শুনলেন, ভ্রাতা ভরত অযোধ্যার বহির্ভাগে শিবির করে জটিল ও বল্কলধারী হয়ে আছেন, প্রাণীধারনার্থ গোমূত্র পক্ক যবান্নমাত্র ভোজন করেন। অতএব করুণাদ্র হৃদয়ে হয়ে তার জন্য সন্তাপ করতে লাগলেন। এদিকে ভরত রামচন্দ্রের উপস্থিতির কথা শুনতে পেয়ে তার পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণপূর্বক পৌরজন, অমাত্যবর্গ ও পুরোহিতগণের সহিত অগ্রজের দিকে অগ্রসর হলেন। তৎকালে ভরত নন্দিগ্রামস্থিত নিজ শিবির হতে গীতবাদ্য ধ্বনি সহযোগে, নিরন্তর উচ্চস্বরে বেদমন্ত্র পাঠরত দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যুর্গমনের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রাপ্তভাগে সুবর্ণর সে রঞ্জিত পতাকারাজি এবং বিবিধ ধ্বজাশোভিত উত্তম অশ্বমুক্ত, সুবর্ণময় পরিচ্ছদ মণ্ডিত স্বর্ণময় রথসমূহ, স্বর্ণমাকৃত সৈন্যসমুদয়, শ্রেণীবদ্ধ বহুবাহ বারাঙ্গানা এবং পদচারী ভৃত্যগণের সাথে রাজোচিত ছত্র চামরাদি ও বিবিধ পণ্যদ্রব্য নিয়ে ভরত শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গিয়ে তাঁর পদযুগলে পতিত হলেন।

তৎকালে তার নয়নযুগল ও বক্ষঃস্থলে প্রেমাবেগে অশ্রুসিক্ত হয়েছিল। ভরত পাদুকাযুগল সামনে রেখে বাষ্পকুলনেত্রে কৃতাঞ্জলি হয়ে অবস্থান করলে, শ্রীরামচন্দ্র বাহুযুগল দ্বারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাকে আলিঙ্গন করে নয়নজলে স্নান করালেন। পরে তিনি, সীতা ও লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণগণকে এবং পূজনীয় কুলবৃদ্ধগণকে প্রণাম করলেন এবং প্রজাগণ তাকে নমস্কার করল। তখন উত্তর কোশলস্থ অর্থাৎ অযোধ্যার সমস্ত প্রজাগণ তাঁকে নমস্কার করল। তখন উত্তর

কোশলস্থ অর্থাৎ অযোধ্যার সমস্ত প্রজাগণ। বহুকাল পর নিজেদের অধিপতিকে আগত দেখে আনন্দসাগরে মগ্ন হলেন। এবং নিজ নিজ উত্তরীয় বসন কম্পিত করত হর্ষে পুষ্পমালা বর্ষণ ও নৃত্য আরম্ভ করলেন। হে রাজন, রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রবিষ্ট হন, তৎকালে ভরত পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করলেন, বিভীষণ ও সুগ্রীব চামর ও ব্যাজন নিলেন, পবনতনয় হনুমান্ শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করলেন। শত্রুঘ্ন ধনুক ও তূণ সীতা তীর্থোদকের কমণ্ডলু, আর অঙ্গদ খঙ্গও ঋক্ষরাজ জাম্বুবান স্বর্ণময় করেছিলেন।

হে মহারাজ, তৎকালে পুষ্পক রথে অবস্থিতি রামচন্দ্রকে রমণীগণ স্তুতি ও বন্দিগণও বন্দনা করলে, তিনি গহনসহ উদিত চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করছিলেন। তারপর শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতা ভরত কর্তৃক অভিনন্দিত হয়ে উৎসবযুক্ত পুরীমধ্যে প্রবেশ করলেন। এবং রাজভবনে প্রবেশ করে নিজ মাতা কৌশল্যা কৈকেয়ী প্রভৃতি গুরুপত্নীগণ ও গুরুজনদের পূজা করলেন। পরে বয়স্য ও কনিষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারা পূজিত হয়ে তাদেরও যথোচিত সন্মান করলেন। প্রাণসঞ্চারে দেহ যেরূপ উত্থিত হয়, সেরূপ। তৎকালে মাতৃবর্গ নিজ নিজ সন্তানদের পেয়ে সহসা উত্থিত হলেন এবং তাদের ক্রোড়ে আরোপণ করে বাষ্পবারির দ্বারা অভিষেক করত শোক সন্তাপ পরিত্যাগ করলেন।

অনন্তর কুলগুরু বশিষ্ঠদেব কুলবৃদ্ধদের সহিত মিলিত হয়ে রামচন্দ্রের জটা মোচন করিয়ে, চতুঃসমুদ্রে জল প্রভৃতি অভিষেক দ্রব্যের দ্বারা ইন্দ্রের ন্যায় তার যথাবিধি, অভিষেক করলেন। এইরূপ শিরস্নানের পর শ্রীরামচন্দ্র মনোরম বস্ত্র, মাল্য ও বিবিধ অলংকারে শোভিত হয়ে, ভার্য্যা সীতাদেবী এবং বস্ত্রালংকারে ভূষিত ভ্রাতৃগণের সহিত অতিশয় দীপ্তি পেতে লাগলেন। তারপর ভ্রাতা ভরত প্রাণিপাতপূর্বক তাকে প্রসন্ন করালেন, তিনি রাজসিংহাসন গ্রহণ করলেন এবং স্বধর্মনিরত ও বর্ণাশ্রমগুণযুক্ত প্রজাদের পিতার মত পালন করতে প্রবৃত্ত হলেন। প্রজারাও তাকে পিতা বলে মান্য করতে থাকল। সর্বপ্রাণীর সুখাবহ ধর্মজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্রের রাজা হলে, ত্রেতাযুগ বিদ্যমান থাকলেও বস্তুতঃ সেই কাল সত্যযুগের তুল্য হয়েছিল।

হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ মহারাজ, তৎকালে বর্ণ, নদী, পর্বত, বর্ষ, দ্বীপ্য ও সাগরসমূহ সকলই প্রজাগণের অভীষ্ট পূরণ করেছিল। অর্ধেক্ষজ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বে প্রজাগণের অধিঃ (মনঃপীড়া) ব্যাধি (দৈহিক রোগ), জরা, গ্লানি, দুঃখ, শোক, ভয়, ক্লান্তি, এমনকি তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মৃত্যু ছিল না। একপত্নী ব্রতধারী ও, রাজর্ষির আচরণমুক্ত ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সর্বদা শুদ্ধভাবে থেকে, প্রজাগণের গৃহস্থেচিত ধর্ম, শিক্ষাদানের জন্যই নিজে উদার আচরণ

করতেন, তৎকালে স্বামীর অভিপ্রেত বিষয়ে অভিজ্ঞা সীতাদেবী বিনয়বনতা হয়ে প্রেম, আনুগত্য, শীল, বুদ্ধি ও লজ্জাদ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণ করেছিলেন।

.

একাদশ অধ্যায়

শ্রীরামচন্দ্রের বংশবর্ণন ও ভক্তগণের সহিত তার স্বপদবরাহণ

শ্রীশুকদেব বললেন–তারপর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আচার্য বশিষ্ঠদেবের উপদেশ অনুসারে যথাযথ, উত্তম উপকরণাদিযুক্ত সর্বাঙ্গ সম্পন্ন যজ্ঞসমূহের দ্বারা সর্বদেবময়, বিষ্ণুরূপী নিজেকেই নিজে অর্চনা করেছিলেন। তিনি যজ্ঞান্তে হোতাকে পূর্বদিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক, অধ্বযুকে পশ্চিম দিক্ এবং সামগানকারীকে উত্তর দিক্ দান করলেন। ঐ সকল দিকের মধ্যবর্তী যে সকল ভূমি ছিল, তা কোন নিঃস্পৃহ ব্রাহ্মণই পাবার যোগ্য–এরূপ বিবেচনা করে ঐ সকল ভূমিভাগ আচার্যকে দান করলেন। এইরূপ দানের পর শ্রীরামচন্দ্রের কেবলমাত্র বস্ত্র ও অলংকার এবং সীতাদেবীর কেবলমাত্রই মাঙ্গলিক অলংকারই অবশিষ্ট রইল। তৎকালে দানপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ বৎসল ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রশংসাযোগ্য ঐরূপ বাৎসল্য দর্শনে প্রীত ও স্নেহাচিত্ত হয়ে ঐ সকল লব্ধ দ্রব্য তাকে প্রত্যার্পণ করে এরূপ বলেছিলেন–হে ভগবান, হে ভুবনেশ্বর, আপনি আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ করেছেন। প্রভো, আপনি ব্রহ্মণ্যদেব, অকুণ্ঠমেধাবী, আপনাকে আমরা নমস্কার করি। আপনি উত্তমঃশ্লোকদের অগ্রগণ্য অহিংসাপরায়ণ মুনিগণও নিজ নিজ চিত্তে আপনার পাদপদ্ম সতত চিন্তা করেন।

এক সময়ে শ্রীরামচন্দ্র নিজের সম্বন্ধে প্রজাগণের অন্তরের ভাব জানতে ইচ্ছা করে রাত্রিকালে অপরের অলক্ষ্যে গূঢ়ভাবে ভ্রমণ করতে করতে কোন এক ব্যক্তির নিজের স্ত্রীর উদ্দেশ্যে কথিত বাক্য শ্রবণ করেছিলেন।-তুমি পরগৃহগামী দুষ্ট অসতী বলে আমি আর তোমার ভরণ-পোষণ করব না। স্ত্রৈণ রাম পরগৃহগতা সীতার ভরণ-পোষণ করতে পারেন, কিন্তু আমি তোমাকে আর গ্রহণ করতে পারি না। অজ্ঞ লোক না বুঝে নানারূপ অপপ্রচার করে, তারা দুরারাধ্য অর্থাৎ তাদের কোনরূপেই নিবৃত্ত করা যায় না। এ অবস্থায় লোকভয়ে ভীত পতি রামচন্দ্র সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করলে, তিনি বাল্মীকি মুনির আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সীতাদেবী তৎকালে গর্ভবতী ছিলেন এবং যথাকালে কুশ ও লব নামে খ্যাত যমজ পুত্র প্রসব করলে মহর্ষি বাল্মীকিই তাদের জাতকর্মাদি ক্রিয়াসমূহ সম্পাদন করলেন।

হে রাজন পরীক্ষিৎ, এদিকে অযোধ্যায় লক্ষ্মণের অঙ্গদ ও চিত্রকেতু নামে দুই পুত্র এবং ভরতের তক্ষ ও পুষ্কল নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শত্রুঘেরও দুটি পুত্র জন্মিল, যথা– সুবাহু ও শ্রুতসেন। ঐ সময় ভরত দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে কোটি কোটি গন্ধ নিহত করলেন এবং তাদের ধন এনে সমস্ত রাজাকে সমর্পণ করলেন। আর, শত্রুঘ্ন মধুপুত্র লবণ রাক্ষসের প্রাণসংহার করে মধুবণে মথুরাপুরী নির্মাণ করলেন। পতি কর্তৃক নির্বাসিতা সীতাদেবী মহর্ষি বাল্মীকির নিকট নিজ পুত্র দুটিকে সমর্পণ করে, শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগল ধ্যান করতে করতে পাতালে প্রবেশ করলেন।

সীতার পাতাল প্রবেশ শ্রবণ করে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নিজ বুদ্ধিবলে শোক সম্বরণ করতে চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর হয়েও প্রেয়সীর সুমহৎ গুণরাশি বারবার স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় একেবারে নিরোধ করতে সমর্থ হলেন না। হে কুরুপ্রবর, স্ত্রী ও পুরুষের প্রসঙ্গ সর্বত্রই এইরূপ ভীতিজনক হয়। ঈশ্বরগণেরও যখন এরূপ অবস্থা ঘটে, গৃহাসক্ত গ্রাম্যজনের কথা আর কি বলব? তারপর প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য ধারণ করে, ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করেছিলেন। এরপর তিনি স্মরণকারী ভক্তগণের হৃদয়ে দণ্ডকারণ্যের কণ্টকবিদ্ধ পদযুগল বিন্যস্ত করে (অর্থাৎ তাদের চিত্তে নিজ পদযুগলের স্মৃতি রেখে) নিজ জ্যোতির্ময় ধামে গমন করলেন।

হে রাজন, শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্রবন্ধন ও অস্ত্রসমূহ দ্বারা রাক্ষসবধ ইত্যাদি কার্য যদিও কবিগণ আশ্চর্য বলে বর্ণনা করেছেন, তথাপি তা তার যশঃস্তুতি বলে গণ্য হতে পারে না। কারণ যাঁর প্রভাব অপেক্ষা অধিক বা যাঁর তুল্য প্রভাব আর কারোরই নেই তার বৈরিবধে কপিগণ কি সাহায্য করবে? সুগ্রীবাদির নিকট শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ যেরূপ লীলামাত্র, রাক্ষসবধাদিও সেরূপ লীলামাত্র জানবে। হে মহারাজ, আমার একথা অযুক্ত মনে কোরো না, কারণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কেবলমাত্র দেবগণের প্রার্থনায় লীলার জন্যই ঐ অবতার স্বীকার করেছিলেন। যাঁর নির্মল যশোরাশি দিগন্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে দিগহস্তী সকলের আচ্ছাদন পট-স্বরূপ হয়েছে, মার্কণ্ডেয়াদি মুনিগণ এখনও যুধিষ্ঠিরদের নৃপতিগণের সভায় যাঁর নির্মল যশঃকীর্তন করে থাকেন এবং যাঁর পাদপদ্ম দেবতাগণ ও নরপতিগণের মুকুট-রূপে সেবিত হচ্ছে, আমরা সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ গ্রহণ করছি। অযোধ্যা-নিবাসী পুণ্যাত্মা যে সকল ব্যক্তি সেই রামচন্দ্রকে স্পর্শন অথবা দর্শন করেছিলেন, কিংবা যারা তাকে উপবেশন করিয়েছিলেন, অথবা যারা তার অনুগত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই যোগীগণ যে স্থানে যান, সেই পুণ্যলোকে গমন করেছিলেন।

হে মহারাজ, যে পুরুষ শ্রবণযোগে শ্রীরামচন্দ্রের এই উপাখ্যান ধারণ করবেন, তিনি উপশম-নিষ্ঠ হয়ে নিশ্চয় কর্মবন্ধন হতে বিমুক্ত হবেন।

তারপর রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন–ব্রাহ্মণ, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, স্বয়ং কি প্রকারে বর্তমান ছিলেন? নিজের অংশস্বরূপ ভ্রাতৃগণের প্রতিই বা কিরূপ আচরণ করতেন? আর সাক্ষাৎ পরমেশ্বর স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি সেই ভ্রাতৃগণ, প্রজাগণ এবং পুরবাসী সকলেই বা কিরূপ আচরণ করত? শ্রীশুকদেব বললেন–রাজন, রাজসিংহাসন গ্রহণের পর ত্রিলোকপতি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতৃগণকে দিবিজয়ের আদেশ দিয়েছিলেন এবং অনুচরগণের সহিত মিলিত হয়ে পুরজনদের দর্শন দানের জন্য পুরী দর্শন করতেন। তার পরিদর্শনের পূর্বেই পথসকল সুগন্ধি সলিলে ও হস্তীগণের মদজলে সিক্ত হত। ঐ পুরী নিজ স্বামীকে প্রাপ্ত হয়ে যেন অতিশয় হর্ষোন্মত্ততা প্রকাশ করত। তোরণ, পুরদ্বার, সভা, চৈত্য ও দেবমন্দির প্রভৃতি স্থানে সংস্থাপিত সুবর্ণ কলস ও পতাকারাজি সবদাই ঐ পুরীর শোভাবর্ধন করত। ঐ পুরীমধ্যে স্থানে স্থানে বৃন্তযুক্ত গুবাকগুচ্ছ, কদলীবৃক্ষ, মনোরম, বস্ত্রের পট্টিকা দর্পণ, বস্ত্র এবং মাল্য ইত্যাদির দ্বারা স্থানে স্থানে মঙ্গলবোরণ রচিত হত। পুরীদর্শনকালে তিনি যে যে স্থানে গমন করতেন, পুরবাসীগণ উপহারহস্তে তার নিকট এসে আশীর্বাদবাণী উচ্চারণ করতেন। হে দেব, আপনি পূর্বে বরাহরূপে এই পৃথিবী উদ্ধার করেছিলেন, এক্ষণে সেটা প্রতিপালন করুন।

অনন্তর নারী-পুরুষ সকল প্রজাগণ দীর্ঘকাল পর নিজেদের অধিপতি কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রকে সমাগত দেখে, তাকে দর্শন করার প্রবল আগ্রহে গৃহ পরিত্যাগ-পূর্বক প্রাসাদে আরোহণ করে, অতৃপ্ত নয়নে তার উপর পুষ্পবর্ষণ করতেন। তারপর তিনি নিজ পূর্বপুরুষ নরপতিগণের সেবিত, সর্বপ্রকার রত্নভাণ্ডারযুক্ত ও মহামূল্য প্রভৃতি পরিচ্ছদ শোভিত নিজগৃহে প্রবেশ করতেন। সেখানকার দ্বারের দেহলী (চৌকাঠ) সমূহ বিদ্রুম-মণিময়, স্তম্ভশ্রেণী বৈদূর্যময়, গৃহতল মরকতময় ও অতিস্বচ্ছ তার ভিত্তিসকল স্ফটিক ও অতিশয় উদ্দীপ্ত ছিল। এইরূপ সেই গৃহটি বিচিত্র পুষ্পমাল্য, উৎকৃষ্ট পট্টিকা, বসন ও রত্নসমূহের কিরণে উদ্দীপ্ত, আর চৈতন্যতুল্য উজ্জ্বল মুক্তাফলে ও কামনীয় ভোগসাধন দ্রব্যসমূহে সর্বতোভাবে মনোহর ছিল। সুগন্ধি ধূপদীপে সুবাসিত ও পুস্পমণ্ডলে মণ্ডিত এবং অলংকার স্বরূপে দেবতুল্য স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ছিল। আত্মারামগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সেই গৃহে প্রণয়াসক্তা নিজ অভীষ্টা প্রিয়তমা সীতার সহিত বিহার করতেন। এইরূপে তিনি বহু বৎসর ধর্মের অবরোধ যথাকালে বিবিধ ভোগ্য বিষয়সমূহ ভোগ করেছিলেন। তৎকালে মানবগণ নিরন্তর তার পাদপদ্মের ধ্যান করত।

.

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীরামতনয় কুশ ও ইক্ষবাকু পুত্র শশাদের বংশ বিবরণ

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, কুশের পুত্রের নাম অতিথি, তার পুত্র নিষেধ, তার পুত্র নভ, তার পুত্র পুণ্ডরীক এবং পুণ্ডরীকের পুত্র মেধন্বা। ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, তার পুত্র অনীহ (বা হীন), তার পুত্র পারিমাত্র, পারিমাত্রের পুত্র বলস্থল। তাঁর পুত্র বজ্রনাভ, ইনি সূর্যের অংশে উৎপন্ন হন। বজ্রনাভের পুত্র সুগন, তার পুত্র বিস্থৃতি। ঐ বিধৃতি হতে হিরণ্যনাভের উদ্ভব হয়। ইনি জৈমিনির শিষ্য এবং যোগাচার্য ছিলেন। কৌশল্য যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তার নিকট মহাসিদ্ধিদায়ক ও অহংকারনাশক অধ্যাত্মযোগ শিক্ষা করেছিলেন, হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প, তাঁর পুত্র ধ্রুবসন্ধি, তাঁর পুত্র সুদর্শন, তাঁর পুত্র অগ্নিবর্ণ, তার পুত্র শীঘ্র এবং শীঘ্রের পুত্র মরু। এই মরুযোগে সিদ্ধিলাভ করে সম্প্রতি কলাপগ্রামে বাস করছেন এবং কলিযুগের অবসানে বিনষ্ট সূর্যবংশকে পুনরায় প্রবর্তিত করবেন। মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত, তাঁর পুত্র সজি, তার পুত্র অমর্ষণ, তাঁর পুত্র মহস্বাণ এবং তার পুত্র বিশ্ববাহু। বিশ্ববাহুর পুত্র প্রসেনজিৎ, তার পুত্র বৃহদ্বল। তোমার পিতা অভিমন্যু এই বৃহদ্বলকে সংগ্রামে হত্যা করেছিলেন।

ইক্ষবাকু বংশীয় এই সকল রাজা অতীত হয়েছেন। সম্প্রতি ভবিষ্যৎ নরপতিগণের কথা শ্রবণ কর। বৃহদবনের ঔরসে বৃহণ নামক পুত্র উৎপন্ন হবেন। বৃহদরণ হতে উরুক্রিয়, তা হতে বৎসবৃদ্ধ, তা হতে প্রতিব্যোম, তা হতে ভানু এবং ভানু হতে সেনাধিপতি দিবাক জন্মগ্রহণ করবেন। দিবাক হতে সহদেব, তা হতে মহাবীর বৃহদশ্ব, তা হতে ভানুমান, তা হতে প্রতীকাশ্য এবং প্রতীকাশ্ব হতে সুপ্রতাঁকের জন্ম হবে। সুপ্রতীক হতে মরুদেব, তা হতে সুনক্ষত্র, তা হতে পুষ্কর, তা হতে অন্তরীক্ষ, তা হতে সুতপা এবং তা হতে অমিত্রজিতের উৎপত্তি হবে। অমিত্রজিৎ হতে বৃহদ্রাজ, তা হতে বর্হি, তা হতে কৃতঞ্জয়, তা হতে রণঞ্জয় এবং তা হতে সঞ্জয় জন্মলাভ করবেন। সঞ্জয় হতে শাক্য, তা হতে সুদ্ধোদ, তা হতে লাঙ্গল, তা হতে প্রসেণজিৎ এবং তা হতে ক্ষুদ্রকের জন্ম হবে। ক্ষুদ্রক হতে রণক, রণক হতে সুরথ এবং সুরথ হতে সুমিত্র জন্মগ্রহণ করবেন। এই সুমিত্র পর্যন্তই বংশ স্থায়ী হবে। ইহারা সকলেই বৃহদ্বলের বংশজাত। ইক্ষবাকুগণের এই বংশে সুমিত্রই শেষ রাজা হবেন। কারণ এই সুমিত্রের রাজত্বকালের পরই কলিযুগে বংশ লুপ্ত হবে।

.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নিমিবংশ কথন এবং নিমির দেহত্যাগাদি বর্ণন

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, ইক্ষবাকু তনয় নিমি কোনসময় যজ্ঞ আরম্ভ করে মহর্ষি বশিষ্ঠকে ঋত্বিক কর্মে বরণ করলে ঐ মুনি বললেন–হে রাজন, ইন্দ্র আমাকে পূর্বে তার যজ্ঞে ঋত্বিক পদে বরণ করেছেন। অতএব আমি ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন করে আসছি, ততকাল তুমি আমার প্রতীক্ষা কর। রাজা নিমি একথা শুনে মৌনী হয়ে থাকলেন। বশিষ্ঠও ইন্দ্রের যজ্ঞ করতে গেলেন। এদিকে আত্মবান্ নিমি জীবন অনিত্য মনে করে, কুলগুরু বশিষ্ঠের আগমনের পূর্বেই অন্য ঋত্বিকগণের দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। তারপর ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন করে বশিষ্ঠ মুনি ফিরে এসে, শিষ্যের আজ্ঞালঙঘনরূপ আচরণ লক্ষ্য করে অভিশাপ দিলেন—'পণ্ডিতাভিমানী নিমির এই দেহের পতন হোক। তখন নিমিও অন্যায়কারী গুরুকে অভিশাপ দিয়ে বললেন–লোভবশতঃ ধর্মজ্ঞানশূন্য আপনারও দেহের পতন হোক।' অধ্যাত্ম-তত্ত্বাজ্ঞ নিমি এই বলে নিজের দেহ ত্যাগ করলেন। সে সময় বশিষ্ঠ ঋষিরও শরীরপাত হল, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে যজ্ঞে উর্বশীর দর্শনে মিত্র ও বরুণের বীর্যস্খলিত হলে কুম্ভমধ্যে রক্ষিত ঐ বীর্য হতে আমার প্রপিতামহ বশিষ্ঠদেব জন্মলাভ করেন।

যজ্ঞের ঋত্বিকগণ নিমির ত্যক্ত দেহ গন্ধ বস্তুর মধ্যে রেখে যজ্ঞ সমাপন করলেন। যজ্ঞ-সমাপ্তির পরে যজ্ঞে সমাগত দেবগণকে তারা বললেন–হে দেবগণ, আপনারা বরদানে সমর্থ, যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে রাজার এই দেহ আবার জীবিত হোক। তখন দেবগণ 'তাই হোক' এরূপ বললেন। নিমি বললেন–আমার যেন আর দেহবন্ধন না হয়। শ্রীহরির প্রতি যাঁদের চিত্ত সমর্পিত, সেই মুনিগণ দেহের বিয়োগভয়ে কাতর হয়ে আর এই দেহপ্রাপ্তি কামনা করেন না, কিন্তু শ্রীহরির চরণকমলেরই ভজনা করেন। মৎস্যগণের যেরূপ জলেই মৃত্যু হয়, সেরূপ এই দেহেরও যেহেতু সর্বত্রই মরণ ঘটে, সেইহেতু আমি আর দুঃখ শোক–ভয়জনক এই দেহ ধারণ করতে ইচ্ছা করি না। দেবতাগণ বললেন–তা হলে এই নিমি বিদেহ (দেহহীন) হয়েই প্রাণীদের নয়নদ্বয়ে যথেচ্ছভাবে বাস করুক। এরপর হতেই নিমি প্রাণীগণের নেত্রের উন্মেষ ও নিমেষের প্রবর্তক রূপে লক্ষিত হতেছেন।

তারপর মহর্ষিগণ প্রজাগণের অরাজকতার ভয় বিবেচনা করে, নিমির দেহ মন্থন করলে এক কুমারের উৎপত্তি হল। অসামান্য জন্মহেতু সেই নিমি তনয়ের নাম জনক, বিদেহ নিমি হতে জন্ম হওয়ায় তার নাম বৈদেহ এবং মন্থন হতে জন্মহেতু তাঁর নাম মিথিল। ইনিই মিথিলা পুরী

নির্মাণ করেছিলেন। হে মহারাজ, সেই জনকের পুত্র উদাবসু, তার পুত্র নন্দিবর্ধন, তার পুত্র সুকেতু এবং সুকেতুর পুত্র দেবরাত। দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ, তাঁর পুত্র মহাবীর্য, তার পুত্র সুধৃতি, তাঁর পুত্র বৃষ্টকেতু, তাঁর পুত্র ধৃষ্টকেতু, তাঁর পুত্র হর্য্যশ্ব এবং হর্য্যশ্বের পুত্র মরু। মরুর পুত্র প্রতীপক, তা হতে কৃতরথ জন্মগ্রহণ করেন। হ্রস্বরোমার সন্তান সীরধ্বজ। তিনি এক সময় যজ্ঞের জন্য ভূমি কর্ষণে প্রবৃত্ত হলে, সীর অর্থাৎ লাঙ্গলের অগ্রভাগ হয়ে সীতাদেবীর আবির্ভাব হয়েছিল, এজন্য তিনি সীরধ্বজ নামে প্রসিদ্ধ হন। সীরধ্বজের পুত্র কুশধ্বজ, তাঁর পুত্র ধর্মধ্বজ এবং ধর্মধ্বজের দুই পুত্র কৃতধ্বজ ও মিতধ্বজ।

হে মহারাজ কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ এবং মিতধ্বজের পুত্র খাণ্ডিক্য। কেশিধ্বজ আত্মবিদ্যায় নিপুণ এবং খাণ্ডিক্য কর্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। এই খাণ্ডিক্য কোন কারণে কেশিধ্বজের ভয়ে গৃহ হতে পলায়ন করেন। কেশিধ্বজের পুত্র ভানুমান এবং ভানুমানের পুত্র শতদ্যুম্ন। শতদ্যুম্নের পুত্র শুচি, ঐ শুচি হতে সনদ্বাজ উৎপন্ন হন। সনদ্বাজের আত্মজ ঊর্জকেতু, তার পুত্র অজ এবং অজের পুত্র পুরুজিৎ। পুরুজিতের পুত্র অরিষ্টনেমি, তার পুত্র তায়, তার পুত্র সুপার্শ্বক, সুপার্শ্বকের, পুত্র চিত্ররথ এবং তার পুত্র মিথিলাধিপতি ক্ষেমাধি। ক্ষেমাধির পুত্র সমরথ (হেমরথ-পাঠান্তর), তার পুত্র সত্যরথ, তার পুত্র, উপগুরু এবং এই উপগুরু হতে অগ্নিদেবের অংশ-জাত উপগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন।

উপগুপ্তের পুত্র বস্বনান্ত, তার পুত্র যুযুধ, তাঁর পুত্র সুভাষণ, তাঁর পুত্র শ্রুত, তাঁর পুত্র জয়, তার পুত্র বিজয় এবং বিজয়ের পুত্র ঋত। ঋতের পুত্র শুনক, তার পুত্র রীতহব্য, তার পুত্র ধৃত, তার পুত্র যুযুধ, তার পুত্র সুভাষণ, তার পুত্র শ্রুত, তার পুত্র জয়, তার পুত্র ঋত। ঋতের পুত্র শুনক, তার পুত্র বীতহব্য, তার পুত্র ধৃত, তার পুত্র কৃতি এবং কৃতির পুত্র মহাবলী। হে মহারাজ, মিথিলার, এই নরপতিগণ সকলেই যাজ্ঞবল্ক্য-প্রমুখ যোগেশ্বরগণের অনুগ্রহে আত্মবিদ্যায় সুনিপুণ হয়ে গৃহে থেকেও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব বিমুক্ত ছিলেন।

.

চতুর্দশ অধ্যায়

চন্দ্রবংশ বর্ণন, বুধের জন্মবৃত্তান্ত এবং পুরুরবার উপাখ্যান

শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজ, সূর্যবংশ বর্ণনার পর এখন পবিত্র চন্দ্রবংশের কথা বলছি, শোন। চন্দ্রবংশে বিভিন্ন পুণ্যকীর্তি পরপতিগণের চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। সহস্রশীর্ষা পরম পুরুষ

ভগবানের নাভিরূপ হৃদস্থিত পদ্ম হতে, ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। সেই ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, তিনি সকল গুণে পিতৃতুল্য ছিলেন। সেই অত্রির আনন্দাশ্রু হতে সোম নামক এক অমৃতময় পুত্র উৎপন্ন হলে, ব্রহ্মা তাঁকে ব্রাহ্মণ ওষুধি ও নক্ষত্রগণের অধিপতি করেছিলেন। সেই সোম ত্রিভুবনের জয় করে রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। তারপর গর্ববশতঃ বৃহস্পতির পত্নী তারাকে বলপূর্বক হরণ করেন। দেবগুরু বৃহস্পতি বার বার সোমের নিকট প্রার্থনা করলেও সোম গর্ববশতঃ তাকে পরিত্যাগ না করায় দেবতা ও দানবদের মধ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হল। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বৃহস্পতির প্রতি বিদ্বেষবশতঃ অসুরগণের সহিত নক্ষত্রপতি সোমের পক্ষ অবলম্বন করলেন। আর ভগবান শঙ্কর পূর্বে অঙ্গিরার নিকট বিদ্যাগ্রহণ করায় স্নেহে সকল ভূতগণের সাথে মিলিত হয়ে গুরুপুত্র বৃহস্পতি, সহায় হয়েছিলেন আর সকল দেবগণের সাথে যুক্ত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির অনুগামী হলেন। তখন (বৃহস্পতির পত্নী) তারার জন্য দেবতা ও অসুরগণের সংহারাত্মক এক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হল।

তারপর অঙ্গিরা বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাকে সকল কথা নিবেদন করলে, তিনি সোমকে ভৎর্সনা করে তারাকে নিজ স্বামীর নিকট অর্পণ করলেন। তখন বৃহস্পতি তারাকে গর্ভবতী বলে জানতে পারলেন। তারপর বৃহস্পতি তারাকে বললেন–হে দুর্বুদ্ধি-পরায়ণে, তুমি আমার ক্ষেত্র হতে অপরের অর্পিত গর্ভ শীঘ্র ত্যাগ কর। হে অসিত, আমি সন্তানকামী, এজন্য নিজ স্ত্রী তোমাকে ভস্ম করব না, তখন তারা লজ্জিত হয়ে স্বর্ণকান্তি একটি কুমারকে গর্ভ হতে পরিত্যাগ করলে, ঐ কুমারের প্রতি বৃহস্পতি এবং চন্দ্র উভয়েই নিজ নিজ স্পৃহা অনুভব করেছিলেন।

উভয়েই "এই পুত্র আমার, তোমার নয়"–এরূপ বলে তুমুল বিবাদ আরম্ভ করলে, মুনিগণ ও দেবগণ তারাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তারা লজ্জায় কিছুই বললেন–না। তখন ঐ কুমার মাতার অলীক লজ্জায় ক্রুদ্ধ হয়ে বলল হে অসদাচারিণী, নিজের দোষ বলছ না কেন? শীঘ্রই আমার নিকট উহা প্রকাশ কর।

এরপর ব্রহ্মা তারাকে নির্জনে ডেকে নিয়ে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক জিজ্ঞাসা করলে, তারা ধীরে ধীরে বললেন—'এই পুত্র চন্দ্রেরই।' তখন চন্দ্র ঐ পুত্রকে গ্রহণ করেছিলেন। হে মহারাজ, ব্রহ্মা ঐ বালকের গম্ভীর বুদ্ধি দেখে "বুধ"–এই নাম রেখেছিলেন। চন্দ্র এই পুত্রলাভে অতিশয় হৃষ্ট হয়েছিলেন। বুধ হতে (সুদ্যুম্নরূপ ত্যাগ করে স্ত্রীরূপে অবস্থিত) ইলার গর্ভে পুরুরবার জন্ম হয়, একথা পূর্বে বলেছি। দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রের সভায় পুরুরবার রূপ, গুণ, উদারতাশীল, ধনসম্পত্তি ও বিক্রমের কথা বর্ণন করলে, অপ্সরা উর্বশী তা শুনে কামপীড়িত হয়ে তার নিকট গমন করেছিলেন। মিত্র ও বরুণের অভিশাপে মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হয়ে উর্বশী কন্দর্পের

মতো অতি সুন্দর পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবার দেখে কোনরূপে ধৈর্য ধারণ করে তার নিকট উপস্থিত হলেন। উর্বশীকে দেখে পুরূরবার নয়নযুগল হর্ষভরে উৎফুল্ল ও দেহ রোমাঞ্চিত হল এবং তিনি মধুর বাক্যে তাঁকে বললেন–হে বরারোহ, তোমার কি কারণে আগমন হয়েছে? এখানে উপবেশন কর? তোমার অভিলষিত আমি কি করতে পারি? তুমি আমার সাথে বিহার কর এবং আমাদের এই বিহার দীর্ঘকাল স্থায়ী হোক।

উর্বশী বললেন–হে সুন্দর, কোন্ রমণীর দৃষ্টি ও মন তোমাতে আসক্ত না হয়? যেহেতু তোমার বক্ষঃস্থল লাভ করে রমণেচ্ছায় রমণীকে বিবেক– ধৈর্যাদি সবকিছু বিচ্যুত হয়। হে রাজ, হে মানদ, আমার এই দুটি মেষ গচ্ছিত রাখ এবং তুমি এদের রক্ষা করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পুত্রের মতো পালিত মেষ-দুটিকে তুমি রক্ষা করবে, ততকাল আমি তোমার সাথে রমণ করব। যেহেতু রূপ ঔদার্য প্রভৃতি গুণে যিনি প্রশংসনীয় তিনিই আমাদের মতো অপ্সরাগণের বরণীয় পতি। হে বীর, আমি কেবলমাত্র ঘৃত (অমৃত) ভক্ষণ করব এবং মৈথুনকাল ব্যতীত, কোন সময়ে তোমাকে নগ্ন দেখব না। মহামতি পুরুরবা একথায় সম্মত হলেন এবং তিনি বললেন– সুন্দরী, তোমার আশ্চর্য রূপ ও ভাব দেখলেই নরলোকের মোহ হয়। আর, তুমি স্বর্গবাসিনী দেবী, স্বয়ং আগমন করেছ, কোন মনুষ্য তোমায় সেবা না করবে? তারপর পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরুরবা রতিদায়িনী উর্বশীর সহিত চৈত্ররথ প্রভৃতি স্বর্গীয় বিহারক্ষেত্র সমূহে যথাযোগ্য বিহার করেছিলেন। পদ্মকেশরের ন্যায় গন্ধযুক্তা দেবী উর্বশীর রতিলীলায় আসক্ত এবং তার মুখসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে রাজা পুরুরবা দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমোদ উপভোগ করলেন।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র সুরপুরে উর্বশীকে দেখতে না পেয়ে, আমার সভায় উর্বশী না থাকলে শোভা পায় না–এই বলে উর্বশীকে আনার জন্য গন্ধবদের প্রেরণ করলেন। গন্ধর্বগণ মধ্যরাত্রির অন্ধকারে পুরুরবার বাসভবনে গিয়ে রাজার নিকট গচ্ছিত উর্বশীর মেষ দুটিকে হরণ করেছিল। তখন নীয়মান পুত্রবৎ পালিত মেষ দুটির কাতর চিৎকার শ্রবণ করে দেবী উর্বশী বললেন– হায়, আমি এই বীরাভিমানী নপুংসক কুৎসিত পতির দ্বারা বিনষ্ট হলাম। এ বীর আমার পুত্র দুটিকে রক্ষা করবে– এ বিশ্বাস করে আমি বিনষ্টা হয়েছি এবং দস্যুগণ আমার পুত্র দুটিকে হরণ করল। ইনি রাতে নারীর ন্যায় সন্ত্রস্ত-চিত্তে শুয়ে থাকেন এবং দিনে পুরুষের ন্যায় আচরণ করেন। তারপর অঙ্কুশাহত হস্তীর ন্যায় উর্বশীর বাক্যবাণে আহত হয়ে রাজা সেই রাতেই খঙ্গা হাতে নিয়ে বিবস্ত্র হয়েই ক্রোধে দস্যগণের প্রতি ধাবিত হলেন। তখন সেই গন্ধর্বগণ মেষ দুটিকে পরিত্যাগ করে, বিশিষ্ট দ্যুতিশালী হয়ে দীপ্তি বিস্তার করছিল এবং উর্বশী সেই আলোকের মধ্যে মেষ দুটিকে নিয়ে নগ্ন স্বামীকে আসতে দেখলেন।

(রাজার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ উর্বশী চলে গেলে) রাজা পুরুরবা শয্যায় পত্নীকে না দেখে বিমনা হলেন এবং তাকে ছাড়া ব্যাকুলচিত্ত হয়ে শোক করতে করতে পৃথিবী ভ্রমণ করতে লাগলেন। তারপর এক সময় তিনি কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর তীরে পাঁচটি সখীর সহিত উর্বশীকে দেখতে পেয়ে হৃষ্টমুখে এরূপ সুশোভন বাক্য বলেছিলেন-হো জায়ে, তুমি থাক থাক। তুমি এখন আমার নিকট হতে সুখের চরম দশা প্রাপ্ত হওনি, অতএব ঘোর বিরহ দুঃখে আমাকে ত্যাগ করো না। এস, আমরা নানারূপ বাক্যালাপ করব। হে দেবী, তোমার জন্যই আমার এই কমনীয় দেহ দূরদেশে নীত হয়েছে, তুমি না থাকলে এ দেহের এখানেই পতন হবে। তোমার অনুগ্রহের বিষয় না হলে, এ দেহ বৃক ও গৃগণ ভক্ষণ করবে।

উর্বশী বললেন–হে রাজন, তুমি মৃত্যুকামনা করবে না, যেহেতু তুমি পুরুষ, অতএব ধৈর্য ধারণ কর। এই ইন্দ্রিয়রূপী বৃকগণ যেন তোমাকে ভক্ষণ না করে অর্থাৎ তুমি ইন্দ্রিয়পরবশ হয়ো না। স্ত্রীলোকদের হৃদয় বৃকের চিত্তের মতো নিষ্ঠুর, কারও প্রতি তাদের সখ্য হয় না। স্ত্রীলোকগণ করুণাশূন্য, কুর, অসহিষ্ণু এবং প্রিয় বস্তুর জন্য সর্বদাই সাহস করে (অর্থাৎ তাদের অভিলষিত বস্তু লাভের জন্য ইহলোক ও পরলোকের কোন বিচার না করেই তাতে প্রবৃত্ত হয়)। তাঁরা অত্যল্প বিষয়ের জন্যও বিশ্বস্ত পতি বা ভ্রাতাকে হত্যা করে থাকে। বিশেষতঃ স্বচ্ছন্দবিহারিণী কুলটা রমণীগণ অজ্ঞ লোকদের বিশ্বাস উৎপাদন করতঃ সৌহার্দ বিসর্জন দিয়ে নিত্য নূতন পুরুষকে পেতে ইচ্ছা করে। যা হোক, তুমি সংবৎসরান্তে একরাত্রি আমার সহিত বিহার করতে পারবে, তাতেই তোমার আরও সন্তান উৎপন্ন হবে। তারপর পুরুরবা উর্বশীকে গর্ভিণী দেখে নিজ পুরীতে গমন করলেন এবং সংবৎসরান্তে আবার সেখানে এসে বীরপুত্রের জননী উর্বশীকে লাভ করে হৃষ্টচিত্তে তার সহিত একরাত্রি বাস করেছিলেন। তারপর উর্বশী বিরহকাতর দীনভাবাপন্ন রাজাকে বললেন–হে রাজন, তুমি এই গন্ধবদের স্তুতি কর, তা হলে তারা আমাকে তোমার নিকট অর্পণ করবে।

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তখন তখন পুরুরবা গন্ধর্বগণের স্তুতি করলে তারা তুষ্ট হয়ে রাজাকে একটি অগ্নিস্থলী (যজ্ঞাদির জন্য অগ্নিরক্ষার পাত্র-বিশেষ দান করলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল–রাজা এই অগ্নি দ্বারা যথোচিত ক্রিয়া করলেই উর্বশীকে লাভ করবে।) কিন্তু রাজা ঐ অগ্নিস্থালীকেই উর্বশী মনে করে, তা নিয়েই রাতে বনে বিচরণ করতে করতে প্রাতঃকালে বুঝতে পারলেন–ইহা অগ্নিস্থালী উর্বশী নয়, এর পর তিনি সেই স্থালীটি বনে রেখে গৃহে গমন করলেন এবং প্রতিদিন রাতে উর্বশীর চিন্তা করতে লাগলেন। এইরূপে ত্রেতাযুগের প্রবর্তন হলে, তার মনে কর্মবোধক বেদত্রয় প্রাদুর্ভূত হল। তারপর রাজা বনে সেই অগ্নিস্থালীর নিকট গিয়ে দেখলেন–সেখানে শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ রয়েছে। তার দ্বারা দুটি

অরিণ (যে কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় অপর একটি কাষ্ঠখণ্ডের উপর রেখে ঘর্ষণ করলে মধ্যবর্তী কাষ্ঠখণ্ড হতে যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়) নির্মাণ করে উর্বশী লোক কামনায় নিম্নস্থিত অরণিকে উর্বশীরূপে উপরের অরণিকে নিজ আত্মারূপে এবং মধ্যস্থিত কাষ্ঠখণ্ডকে পুত্ররূপে মন্ত্রানুসারে ধ্যান করে মন্থন করেছিলেন।

তারপর সেই মন্থনক্রিয়া হতে যজমানের ভোগ্য ধনরূপ অগ্নি উৎপন্ন হলে, ত্রয়ীবিদ্যা-বিহিত আধান-সংস্কারের ফলে সেই অগ্নি ত্রিবৃৎ (অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবণীয় এই ত্রিবিধ) রূপে পরিণত হন।

ইনি পুণ্যলোক প্রাপক বলে রাজা ইহাকে পুত্ররূপে কল্পনা করেছিলেন, এরপর রাজা পুরুরবা সেই অগ্নির দ্বারা উর্বশীলোক কামনা করে। যজ্ঞেশ্বর সর্বদেবময় ভগবান অধ্যক্ষজ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেছিলেন। হে রাজন, পূর্বে সত্যযুগে সর্বপ্রকার বাক্যের বীজভূত প্রণবই একমাত্র বেদ, দেবতাও একমাত্র নারায়ণ, অগ্নিও একমাত্র লৌকিক এবং বর্ণও হংস নামে একমাত্রই ছিল। ত্রেতাযুগে পুরুরবা হতেই বেদ ত্রয়ীময় অর্থাৎ তিনভাগে বিভক্তরূপে প্রকাশিত হন। রাজা পুরুরবা পুত্ররূপ অগ্নির সাহায্যেই (অর্থাৎ তার দ্বারা যথোচিত যজ্ঞ সম্পাদন করেই) গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। (বস্তুতঃ সত্যযুগে সকল ব্যক্তিই সত্ত্বগুণ প্রধান ছিলেন, কাজেই প্রধান সকলেই ধ্যাননিষ্ট হয়ে থাকতেন। তারপর রজোগুণ প্রদান ত্রেতাযুগ বেদাদির বিভাগ দ্বারা কর্মমার্গ প্রকাশিত হয়েছে।)

.

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঋচীক, জমদগ্নি ও পরশুরামের চরিত্র বর্ণন

শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজন, উর্বশীর গর্ভে রাজা পুরুরবার ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাদের নাম– আয়ু, ঞতায়ু, সত্যায়ু, অয়, বিজয়, ও জয়। শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান, সত্যায়ুর পুত্র তঞ্জয়, অয়ের তনয়ের নাম এক। জয়ের সন্তান অমিত, বিজয়ের সুত ভীম। ভীমের পুত্র কাঞ্চন, তার পুত্র তোক। ঐ হোত্রক হতে সেই জহ্নুর জন্ম হয়। যিনি এক গণুষে গঙ্গা পান করেছিলেন। জহ্নুর পুত্র পুরু, পুরুর পুত্র বলাক এবং বলার্কের পুত্র অজক। অজুকের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র কুশাস্তু, তনয়, বসু ও কুশনাভ এই চারজন। কুশাম্বুর পুত্র গাধি। ঐ গাধির সত্যবতী নামে এক কন্যা হয় দ্বিজবর ঋচীক গাধির নিকট সেই কন্যা বিবাহের জন্য প্রার্থনা করলে, গাধি

কন্যার অনুরূপ বর নয় মনে করে ভৃগুবংশজাত ঋচীককে বললেন–হে ব্রাহ্মণ, যাদের একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ এবং দেহের কান্তি চন্দ্রতুল্য, এরূপ এক সহস্র অশ্ব কন্যার পণস্বরূপ দান করুন। আপনি ইহা যথেষ্ট বিবেচনা করবেন না, যেহেতু আমরা কুশিক বংশোদ্ভূত।

গাধি এরূপ বললে, ঋচীক তার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বরুণের নিকট গেলেন এবং তার নিকট হতে অনুরূপ এক সহস্র অশ্ব এনে তা শুল্করূপে প্রদানপূর্বক সত্যবতাঁকে বিবাহ করেছিলেন। কিছুকাল পরে ঋচীকের পত্নী ও শ্বশ্র পুত্রকামনা করে যথাবিধি চরু পাক করতে প্রার্থনা করলে, মুনি ঋচীক পত্নীর জন্য ব্রাহ্ম মন্ত্রে এবং শশার জন ক্ষাত্রমন্ত্রে চরু পাক করে স্নান করতে গেলেন। এই সময় সত্যবতীর জননী মনে করলেনভার্যার প্রতি ভর্তার সমধিক স্নেহ হয়ে থাকে, জামাতা আমার কন্যার জন্য যে চরু পাক করে গেলেন, তা অবশ্য আমার নিমিত্ত পাক করা চরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকবে, অতএব কন্যার নিকট ঐ চরু প্রার্থনা করলেন। সত্যবতী মাতার বাঞ্ছায় ব্রাহ্ম মন্ত্রভিমন্ত্রিত নিজের চরু তাঁকে প্রদান করে, নিজে ক্ষাত্র মন্ত্রভিমন্ত্রিত জননীর চরু ভোজন করলেন। পরে ঋচীক মুনি ইহা জানতে পেরে পত্নী সত্যবতাঁকে বললেন–তুমি অতিশয় নিন্দিত কর্ম করেছ–এর ফলে তোমার পুত্র উগ্র ও হিংসাপরায়ণ এবং তোমার ভ্রাতা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ হবে। তখন সত্যবতী “এরূপ না হোক”- বলে বিনয় সহকারে মুনিকে প্রসন্ন করলে, ভার্গব ঋচীক বললেন–তোমার পুত্র এরূপ না হলে, তোমার পৌত্র এরূপ হবে। তারপর সত্যবতী হতে শান্তস্বভাব পুত্র জমদগ্নির জন্ম হয়েছিল। সেই সত্যবতী লোকপাবনী মহাপুণ্য কৌশিকী নদী হয়েছিলেন।

জমদগ্নি রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। রেণুকার গর্ভে জমদগ্নি ঋষির বসুমান প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র ‘রাম (পরশুরাম) নামে বিখ্যাত। পণ্ডিতগণ তাঁকে ভগবান বাসুদেবের অংশজাত এবং হৈহঁয় কুলের নাশকারক বলে থাকেন। তিনি পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। তিনি অল্প অপরাধেই পৃথিবীর ভারস্বরূপ, রজঃ ও তমোগুণাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণবিরোধী দর্শান্ধ ক্ষত্রিয়কুলের সংহার করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন –হে ব্রাহ্মণ, অজিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ ভগবান রামের নিকট কি অপরাধ করেছিলেন, যার জন্য তিনি বারবার ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ করেছিলেন?

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, হৈহয়গণের অধিপতি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অর্জুন (কার্তবীর্যাজুন) ভগবান নারায়ণের অংশজাত দত্তাত্রেয় ঋষিকে পরিচর্যাদি কর্মের দ্বারা আরাধনা করে, তাঁর অনুগ্রহে সহস্র বাহু, শত্রুগণের দুর্ধর্ষত্ব ইন্দ্রিয়বর্গ ও ওজঃশক্তির অনিবার্য প্রভাব, সম্পদ, তেজ, বীর্য, যশ, বল, যোগেশ্বরত্ব এবং অনিমাদি গুণসমূহের আশ্রয়রূপ ঐশ্বর্য লাভ

করেছিলেন। এর ফলে তিনি বায়ুর মত অবাধ গতিতে লোকমধ্যে সর্বত্র বিচরণ করতেন। এক সময় তিনি বৈজয়ন্তী (নবরত্ন রচিত) মালা ধারণপূর্বক বহুসংখ্যক রমণীরত্নে পরিবৃত ও মদমত্ত হয়ে নর্মদার জলে ক্রীড়া করতে করতে বাহুসকলের দ্বারা জলপ্রবাহ রুদ্ধ করেছিলেন। ঐ সময় রাক্ষসরাজ রাবণ দিগবিজয়ে বহির্গত হয়ে নর্মদার তীরে শিবির স্থাপন পূর্বক সেখানে ইষ্ট দেবতার পূজা করেছিলেন। এ অবস্থায় বীরাভিমানী রাবণ স্রোতের প্রতিকূলে প্রবাদির নর্মদার জলরাশির দ্বারা নিজের শিবির প্লাবিত হতে দেখে অর্জুনের ঐরূপ বীর্য সহ্য করতে পারলেন না। তারপর রাবণ অর্জুনকে আক্রমণ করলে, অর্জুন রমণীগণের সন্মুখেই অপরাধকারী রাবণকে অনায়াসে বন্দী করে মহিষ্মতী পুরীতে বানরের মত কিছুকাল আবদ্ধ করে রাখলেন। এবং পরে স্বেচ্ছায় অবজ্ঞাভরে তাকে মুক্তি দিলেন।

সেই অর্জুন এক সময় মৃগয়ার জন্য নির্জন বনে ভ্রমণ করতে করতে যদৃচ্ছায় জমদগ্নির আশ্রমে প্রবেশ করলেন। তখন তপোধন জমদগ্নি একটিমাত্র কামধেনুর সাহায্যেই সৈন্য, অমাত্য ও বাহনসমূহের সহিত সমাগত রাজা অর্জুনের যথাযথ আতিথ্য সকার করলেন। রাজা অর্জুন নিজ ঐশ্বর্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কামধেনুরূপ সেই রত্নটি দেখে, তার প্রতি অভিলাষহেতু হৈহঁয়গণের সহিত স্বয়ং সেই আতিথ্য সৎকারের প্রতি সমাদর প্রকাশ করলেন না। তারপর রাজা অর্জুন ঋষির কামধেনুটি হরণ করার জন্য নিজ অনুচরদের আদেশ করলে, তারা বৎসসহ ক্রন্দনরতা ধেনুটিকে বলপূর্বক মহিষ্মতী পুরীতে নিয়ে গেল। রাজা চলে যাওয়ার পর রাম আশ্রমে এসে রাজার ঐরূপ দৌরাত্মের কথা শুনে আহত সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হলেন।

তারপর তিনি অসহিষ্ণু হয়ে ভীষণ কুঠার, বর্ম ও তৃণসহ ধনু ধারণপূর্বক সিংহ যেমন হস্তীর প্রতি ধাবিত হয়, তেমনি রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হলেন। রাজা অর্জুন নিজ মহিষ্মতী পুরীতে প্রবেশ করতে করতে দেখতে পেলেন–ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম কৃষ্ণাজিন পরিধানপূর্বক পরশু, বাণ প্রভৃতি, আয়ুন সহিত ধনুর্ধারণ করে মহাবেগে আগমন করছেন এবং সূর্যতুল্য দ্যুতিশালী তার জটাসমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এ দেখে অর্জুন ভীত হয়ে পরিত্রাণের জন্য হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক, গদা, অসি, বাণ, ঋষ্টি, শতঘ্নী ও শক্তির সহিত সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সেনাকে রামের অভিমুখে প্রেরণ করলে, ভগবান রাম একাকীই তাদের সকলকে বিনাশ করলেন। তৎকালে মন ও বায়ুর ন্যায় প্রবল বেগবান, শত্রুপক্ষ সংহারকারী রাম কুঠারের আঘাত করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে যে যে স্থানে গমন করেছিলেন, সেই সেই স্থানেই শত্রু সৈন্যগণের সারথি ও বাহন নিহত এবং নিজেদের হস্ত, উরু ও গ্রীবাদেশ ছিন্ন হলে, তারা ভূতলে পতিত হয়েছিল।

অনন্তর হৈহঁয়ধিপতি অর্জুন দেখলেন রণাঙ্গন রুধির ধারায় কর্মময় হয়ে উঠেছে এবং পরশুরামের কুঠার ও বাণপ্রহারে নিজ সৈন্যগণের বর্ম, ধ্বজ, ধনু ও দেহ খণ্ড বিখণ্ড হওয়ায়, প্রায় সকল সৈন্যই যুদ্ধে পতিত হয়েছে, অতএব ক্রোধে স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রসর হলেন। এরপর অর্জুন সহস্র বাহুদ্বারা এককালে রামের উদ্দেশ্যে পাঁচশত ধনুতে পাঁচশত বাণ যোজনা করলে, অস্ত্রধারীগণের শ্রেষ্ঠ রাম একটিমাত্র ধনুকে যোজিত বাণসমূহের দ্বারা এককালেই অর্জুনের সকল ধনুকবাণ ছেদন করলেন। তারপর অর্জুন নিজ সহস্র হস্তদ্বারা, পর্বত ও বৃক্ষরাশি উৎপাটিত করে রামের বধের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে তার দিকে ধাবিত হলে, রাম তীক্ষ্মধার কুঠার দ্বারা সর্পের ফণাসমূহের ন্যায় তার সহস্রবাহু সবলে ছেদন করলেন। তারপর রাম ছিন্নবাহু অর্জুনের গিরিশৃঙ্গ সদৃশ উন্নত মস্তকটিও দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। তখন অর্জুনের দশ সহস্র পুত্র ভয়ে পলায়ন করলেন।

এরপর শত্রু সৈন্য বিনাশক রাম বৎসসহ হোমের সহায়ক ধেনুটিকে নিয়ে আশ্রমে প্রত্যাগমনপূর্বক পরহস্ত গমনে ক্লেশযুক্তা সেই ধেনুটি পিতার নিকট অর্পণ করলেন। রাম নিজকৃত সকল কর্ম পিতা ও ভ্রাতৃগণের নিকট বর্ণনা করলে, তা শুনে জমদগ্নি বললেন–হে রাম, হে মহাভুজ রাম, তুমি পাপ কার্য করেছ, যেহেতু সর্বদেবময় রাজাকে বৃথা নিহত করেছ; হে বৎস, আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষমাগুণের দ্বারাই পূজ্য হয়েছি। এই ক্ষমা গুণের দ্বারাই সর্বলোকগুরু ব্রহ্মা পারমেষ্ঠিত্ব সর্বোৎকৃষ্ট পদও লাভ করেছে। আর এই ক্ষমাগুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণের শোভা সূর্যের দীপ্তির মত সমুজ্জ্বল হয় এবং ক্ষমাশীলগণের প্রতি ভগবান জগদীশ্বর শ্রীহরি শীঘ্রই প্রসন্ন হয়ে থাকেন। হে বৎস, অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজার বধ ব্রহ্মবধ থেকেও গুরুতর। অতএব তুমি ভগবান হরির চিন্তায় রত হয়ে তীর্থসেবার দ্বারা পাপ মোচন কর।

.

ষোড়শ অধ্যায়

জমদগ্নিবধ পরশুরাম কর্তৃক ক্ষত্রিয়গণের সংহার এবং বিশ্বামিত্র বংশ বর্ণন

শ্রীশুকদেব বললেন–হে কুরুনন্দন, পিতা কর্তৃক এরূপ আদিষ্ট হয়ে পরশুরাম, 'তাই করছি'– এই বলে স্বীকার করে, সংবৎসর কাল নানা তীর্থ পর্যটন করে আবার আশ্রমে ফিরে এলেন। কোন এক সময়ে রেণুকাঁদেবী জল আনতে গিয়ে গঙ্গায় অপ্সরাগণের সাথে ক্রীড়ারত পদ্মমাল্যধারী গন্ধর্বরাজ চিত্ররথকে দেখতে পেলেন। রেণুকা জল আনার জন্য গঙ্গায় গিয়ে ও ক্রীড়ারত চিত্ররথকে দেখে তার প্রতি ঈষৎ স্পৃহাবতী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, ওদিকে হোমবেলা

অতিক্রান্ত হতে লাগল, তাও স্মরণ করলেন না। তারপর নিজেই কালতিক্রম লক্ষ্য করে মুনি জমদগ্নির অভিশাপ ভয়ে ভীত হয়ে আশ্রমে ফিরে জলের কলসটি মুনির সম্মুখে রেখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করছিলেন। তারপর মুনি পত্নীর ঐরূপ অন্যায় আচরণ জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন–হে পুত্রগণ, তোমরা এই পাপীয়সীকে হত্যা কর। কিন্তু পুত্রগণ এরূপ আদিষ্ট হয়েও তা পালন করলেন না। পরশুরাম পিতা জমদগ্নি মুনির সমাধি ও তপস্যার প্রভাব সম্যরূপে জানতেন বলে, পিতার আদেশে তৎক্ষণাৎ মাতা ও ভ্রাতৃগণকে বধ করলেন। এতে সত্যবতীসুত জমদগ্নি সন্তুষ্ট হয়ে পরশুরামকে ইচ্ছানুরূপ বর দিতে চাইলে, তিনি নিহত ব্যক্তিদের পুনর্জীবন এবং এই হত্যাকাণ্ড বিষয়ে তাদের বিস্মৃতি–এই দুটি বর প্রার্থনা করলেন। তারপর বরের প্রভাবে নিহত ব্যক্তিগণ নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রত ব্যক্তিদের ন্যায় সত্বর গাত্রোত্থান করলেন। বস্তুতঃ পরশুরাম পিতার তপঃপ্রভাব বিশেষরূপে জানতেন বলেই তার আদেশে নির্বিচার সুহৃদগণকে বধ করেছিলেন।

হে মহারাজ, কার্তবীর্যাজুনের পুত্রগণ পরশুরামের বীর্যে পরাভূত হয়ে এবং তার দ্বারা নিজেদের পিতার বধের বৃত্তান্ত স্মরণ করে কোথাও শন্তি লাভ করতে পারল না। একদিন ভ্রাতৃগণের সহিত রাম আশ্রম হতে বনে গেলে, কার্তবীর্যাজুনের পুত্রগণ সুযোগ পেয়ে শত্রুতাসাধনের ইচ্ছায় জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হল। তৎকালে মুনি জমদগ্নি উত্তমঃশ্লোক ভগবান শ্রীহরিতে চিত্ত স্থির করে অগ্নিশালায় উপবিষ্ট ছিলেন। এ অবস্থায় তাকে দেখতে পেয়ে পাপকর্মে কৃতনিশ্চয় সেই অর্জুনের পুত্রগণ তাকে হত্যা করল। তখন পরশুরামের জননী রেণুকা অতি করুণভাবে পতির প্রাণরক্ষার জন্য প্রার্থনা করলেও অতি দারুণ সেই নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়গণ বলপূর্বক মুনির মস্তক ছেদন করে নিয়ে গেল। তারপর দুঃখ শোকে পীড়ি পতিব্রতা রেণুকা নিজ হস্তদ্বারা বক্ষঃস্থলে আঘাত করতে করতে “হা রাম, হা রাম, হা বৎস, এস, শীঘ্র এস”–উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন।

জমদগ্নির পুত্রগণ দূর হতে হা রাম, হা রাম–এইরূপ আর্তনাদ শুনতে পেয়ে শীঘ্র আশ্রমে এসে পিতাকে নিহত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তৎকালে তারা দুঃখ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, কাতরতা ও শোকাবেগে বিমোহিত হয়ে হাঃ পিত, হা সাবধা, হা ধর্মিষ্ঠ, আপনি আমাদের ত্যাগ করে স্বর্গে গমন করলেন, এইরূপ বিলাপ করতে লাগলেন। তারপর রাম পিতার দেহ ভ্রাতৃগণের নিকট রেখে কুঠার হস্তে ক্ষত্রিয়কুল বিনাশের জন্য কৃতসংকল্প হলেন। হে মহারাজ, তারপর রাম ব্রহ্মগতিগণের পাপে নষ্টশী মাহিষ্মতী পুরী গমন করে, তার মধ্যস্থলে কার্তবীর্যাজুনের পুত্রগণের ছিন্ন মস্তকরাশির দ্বারা একটি সুবৃহৎ পর্বত রচনা করলেন। আর তাদের রক্তে দ্বারা ব্রাহ্মণবিদ্বেষীগণের ভয়াবহ একটি ঘোরতর নদীর সৃষ্টি করলেন। তারপর ক্ষত্রিয়গণ অল্প

অন্যায় করলেই পিতার বধকে নিমিত্ত করে পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। সামন্তপঞ্চক ক্ষেত্রে তাদের রক্তজলে পরিপূর্ণ নয়টি হ্রদ নির্মাণ করেছিলেন। (পরশুরামের একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসের কারণ–পতির শোকে রেণুকা একুশবার নিজের বক্ষঃতাড়না করেছিলেন, এজন্য পরশুরাম ততবার ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করেছিলেন। এটা লোক প্রসিদ্ধি শ্রীধর স্বামীপাদ।))।

তারপর তিনি পিতার ছিন্ন মস্তক দেহের সহিত যুক্ত করে এবং ঐ দেহ কুশের উপর রেখে যজ্ঞসমূহ দ্বারা সর্বদেবময় অন্তর্যামী বিষ্ণুর অর্চনা করেছিলেন, তিনি যজ্ঞান্তে হোতাকে পূর্বদিক, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক, অধ্বর্যকে পশ্চিম দিক্, উন্নীতাকে উত্তর দিক অপর ঋত্বিক সকলকে কোণসমূহ, কশ্যপকে ঐ সকল দিকের মধ্যভাগ, উপদ্রষ্টাকে আর্যাবর্ত এবং সদস্যগণকে অবশিষ্ট ভূমিভাগ দান করেছিলেন। এর পর তিনি মহানদী সরস্বতীতে গিয়ে অবভৃত স্নান (যজ্ঞ সমাপ্তি কালীন স্নান করেন।

যারা অশেষ কলুষ প্রক্ষালণ-পূর্বক সূর্যের ন্যায় বিরাজ করছিলেন। তারপর রামকর্তৃক পূজিত জমদগ্নি স্মৃতিযুক্ত (অথবা চৈতন্যময়) নিজ দেহ লাভ করে সপ্তর্ষিমণ্ডলে সপ্তম ঋষি হয়েছিলেন। হে মহারাজ, জমদগ্নিতনয় কমললোচন ভগবান রামও আগামী মন্বন্তরে বেদপ্রবর্তক সপ্তর্ষিগণের অন্যতম হবেন। তিনি ন্যস্তদণ্ড (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বধাদি রূপ কার্য পরিত্যাগ করে) এবং প্রশান্ত চিত্ত হয়ে অদ্যাপি মহেন্দ্র পর্বতে অবস্থান করছেন। সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণগণ তাঁর বিচিত্র চরিত গান করছেন। এইরূপে ভগবান বিশ্বাত্মা শ্রীহরি ভৃগুবংশে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীর ভারস্বরূপ ক্ষত্রিয়গণকে বহুবার সংহার করেছেন।

মহারাজ গাধী হতে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র তপস্যার দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব পরিহার করে ব্রহ্মতেজ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব) লাভ করেছিলেন। এই বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র হয়, তাঁর মধ্যে কেবল মধ্যমের নাম মধুদুঃ, তথাপি সকল পুত্রই মধুদুলস্ নামে উক্ত হতেন। বিশ্বামিত্র অজীগর্তের পুত্র, ভৃগুবংশীয় "দেবরাত"–এই অপর নামধারী শুনঃশেফকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নিজ পুত্রদের বললেন–তোমরা ইহাকে জ্যেষ্ঠরূপে গণ্য করবে। অজীগর্ত হরিশচন্দ্রের যজ্ঞকালে পুত্র শুনঃশেফকে যজ্ঞীয় পশুরূপে হরিশচন্দ্রের নিকট বিক্রয় করেছিলেন। শুনঃশেফ (বিশ্বামিত্রের উপদিষ্ট মন্ত্রে) প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতাদের স্তুতি করে পাশবন্ধন হতে মুক্ত হয়েছিলেন। তাপস শুনঃশেফ ভৃগুবংশীয় হলেও হরিশচন্দ্রের বরুণযজ্ঞে দেবগণ কর্তৃক "রাত" অর্থাৎ প্রদত্ত হয়েছিলেন (অর্থাৎ দেবগণ তাঁর জীবন রক্ষা করেছিলেন। এজন্য তিনি "দেবরাত" নামে গাধি-বংশীয়গণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হন।)

মধুদুন্দসগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ উনপঞ্চাশগণ শুনঃশেফের জ্যেষ্ঠত্ব সঙ্গত মনে না করে তা স্বীকার করলেন না। এজন্য পিতা বিশ্বামিত্র ক্ষুব্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন-হে দুর্জনগণ, তোমরা ম্লেচ্ছ হও। তখন মধুছন্দাঃ কনিষ্ঠ পঞ্চাশ ভ্রাতার সহিত বললেন–হে পিতঃ, আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠত্ব বা কনিষ্ঠত্ব যা মনে করেন, আমরা তাই মান্য করব। তারপর তারা মন্ত্রদ্রষ্টা শুনঃশেফকে–"হে আর্য, আমরা আপনার অনুগামী"–এই বলে জেষ্ঠ্যেরূপে তাঁকে তখন গ্রহণ করলেন। তখন বিশ্বামিত্র পুত্রদের বললেন–তোমরা যারা আমার পূজনীয়ত্ব স্বীকার করে আমারে আদেশ পালন করে, আমাকে যথার্থই পুত্রবান করেছ–সেই তোমরা আমার বরে পুত্রবান হবে। হে কুশিকগণ, এই দেবরাত আমার পুত্র হল, তোমরা এর অনুগামী হবে।

হে মহারাজ, বিশ্বামিত্রের অষ্টক, হারী জয় ও ক্রতুমান্ প্রভৃতি আরও অনেক পুত্র ছিল। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ উনপঞ্চাশ জন অভিশপ্ত, কনিষ্ঠ পঞ্চাশ জন পিতার অনুগ্রহ- প্রাপ্ত এবং অপরের পুত্র দেবরাত পুত্ররূপে স্বীকৃত। এইরূপে কৌশিক গোত্র নানা প্রকার এবং অন্য প্রবর প্রাপ্ত হয়েছে। বস্তুতঃ দেবরাতের জ্যেষ্ঠত্ব হেতুই এরূপ হয়েছে।

.

সপ্তদশ অধ্যায়

ক্ষত্রবৃদ্ধ, রাজি, রম্ভ ও অনেনার বংশ বর্ণন।

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, পুরুরবার আয়ু নামে যে পুত্র ছিলেন, তাঁর পাঁচটি পুত্র হয়। তাঁদের নাম–নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রাজি, রম্ভ ও বীর্যবান অনেনা। সম্প্রতি ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র, তার তিন পুত্র–কাশ্য, কুশ ও গৃৎসমদ।

গৃৎসমদের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্র ঋগবেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ শৌণক ঋষি। কাশ্যের পুত্র কাশি, তাঁর পুত্র রাষ্ট্র, তার পুত্র দীর্ঘতমা এবং দীর্ঘতমার পুত্র আয়ুর্বেদের প্রবর্তক ধন্বন্তরি। ইনি ভগবান বাসুদেবের অংশজাত এবং যজ্ঞভাগের ভোক্তা। ইঁহার স্মরণমাত্রেই সকল রোগের উপশম হয়ে থাকে। ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান, তাঁর পুত্র ভীমরুথ, তার পুত্র দিবোদাস, তার পুত্র দ্যুমান। ইনি প্রতর্দন নামে প্রসিদ্ধ হন। এই প্রতর্দনই শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ এবং কুবলয়া– এই সকল নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর অলর্ক প্রভৃতি অনেক পুত্র হয়েছিল। হে মহারাজ, এই অলকব্যতীত অন্য কোন রাজা অক্ষুণ্ণ যৌবনের অধিকারী হয়ে ছেষট্টি (ছয় ষষ্টি) হাজার বছর পৃথিবীতে রাজত্ব ভোগ করেন নাই। অলর্কের পুত্র সন্ততি, তার পুত্র সুনীথ, তার পুত্র ধর্মকেতু,

তা হতে সত্যকেতু উৎপন্ন হন। সত্যকেতুর পুত্র ধৃষ্টকেতু, তাঁর পুত্র রাজা সুকুমার, তার পুত্র ভগ এবং তার পুত্র ভার্গভূমি।

হে মহারাজ, এই সকল রাজা সকলেই কাশির পুত্র-পৌত্রাদি রূপে উৎপন্ন এবং সকলেই কাশির প্রপিতামহ ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশগত। রম্ভের পুত্র রভস, তাঁর পুত্র গম্ভীর এবং গম্ভীরের পুত্র অক্রিয়। অক্রিয়ের সন্তান ব্রহ্মজ্ঞ হওয়ায় তার আর বংশবিস্তৃতি ঘটে নাই।

এরপর অনেনার বংশবিবরণ শোন। অনেনার পুত্র শুদ্ধ, তাঁর পুত্র শুচি, তা হতে ধর্মসারথি চিত্রকুর উৎপত্তি হয়। চিত্রকুর সন্তান শান্তরজা, ইনি কর্মমার্গ হতে নিবৃত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানী ছিলেন, এজন্য তার বংশবিস্তৃতি হয়নি। রাজির অতুলনীয় পরাক্রমশালী পাঁচশত পুত্র ছিলেন। এক সময় মহারাজ রাজি, দেবগণের প্রার্থনায় দৈত্যগণের বিনাশ করে ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করেন। ইন্দ্র রাজির পদযুগল ধারণপূর্বক তারই হস্তে স্বর্গরাজ্য প্রদান করে প্রহ্লাদ প্রভৃতি শত্রুগণের ভয়ে তার নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু রাজির মৃত্যুর পর ইন্দ্র, তার পুত্রগণের নিকট স্বর্গরাজ্য প্রার্থনা করলে, তারা ইন্দ্রকে তা না দিয়ে নিজেরাই স্বর্গের অধিপতিরূপে যজ্ঞভাগ পর্যন্ত গ্রহণ করতে লাগল।

তারপর দেবগুরু বৃহস্পতি রাজিপুত্রদের বুদ্ধিভ্রংশের জন্য অভিচার বিধান দ্বারা হোম আরম্ভ করলেন, তাতে তারা অচিরেই সন্মার্গ হতে ভ্রষ্ট হলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁদের বধ করলেন। একজনও অবশিষ্ট রইল না। হে মহারাজ, ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র কুশ, পুত্র প্রতি তার পুত্র জয়, তার পুত্র কৃত। কৃতের পুত্র রাজা হর্যবল, তার পুত্র সহদেব, তার তনয় হীন, হীনের সন্তান জয়সেন, তাঁর পুত্র সংকৃতি এবং সংস্কৃতির পুত্র ক্ষত্রধর্মনিষ্ঠ মহারথ জয়। এই সকল নরপতি ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশে উৎপন্ন হন। এর পর রাজা নহুষের বংশ বৃত্তান্ত বলছি শোন।

.

অষ্টাদশ অধ্যায়

যযাতির চরিত্র বর্ণন

শ্রীশুকদেব বললেন–হে রাজন, দেহধারী পুরুষের ছয়টি ইন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন) মত রাজা নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়তি, বিয়তি ও কৃতি নামক ছয়টি

পুত্র হয়েছিল। রাজাদি ভোগে প্রবিষ্ট হলে পুরুষ আত্মা ও পরমাত্মাকে জানতে পারে না এবং তাঁর পরিণাম নরকাদি দুঃখ এটা জেনে যতি, পিতা নহুষ রাজ্য দান করলেও রাজ্যভার গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন না। স্বর্গরাজ্য লাভ করে রাজা নহুষ শচীদেবীর প্রতি ধৃষ্টতার জন্য অগস্ত্যাদি মুনিগণ তাঁকে স্বর্গচ্যুত ও অজগরত্ব প্রাপ্ত করালে, যযাতি কনিষ্ঠ চার ভাইকে চারদিকের শাসনকার্যে নিযুক্ত করে, নিজে শুক্রাচার্য ও অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা দেবযানী ও শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করে পৃথিবী পালন করেছিলেন।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন-হে ব্রহ্মর্ষি, ভগবান শুক্রাচার্য ব্রহ্মর্ষি আর নহুষপুত্র যযাতি ক্ষত্রিয়–এ অবস্থায় ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের এই প্রকার প্রতিলোম বিবাহ কি করে হয়েছিল?

শ্রীশুকদেব বললেন–এত সময় দানবেন্দ্র বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা সহস্র সখী ও গুরুপুত্রী দেবযানীর সহিত মিলিত হয়ে পুরের নিকটস্থ উদ্যানে বিহার করতে গিয়েছিলেন। সেই মনোহর উপবনে তরুসকল পুষ্পভারে অবনত হয়েছিল এবং পদ্ম-পুষ্প শোভিত সরোবরে ভ্রমরগণ কলস্বরে গুঞ্জন করছিল। তৎকালে কমলনয়না সেই কন্যাগণ সরোবরের তীরে গিয়ে নিজ নিজ পরিহিত বস্ত্র উপরে রেখে জলে অবতরণপূর্বক পরস্পর জলসিঞ্চন করে বিহার করছিলেন। এই সময় দেবী পার্বতীর সহিত ভগবান শংকরকে বৃষে আরোহণ করে নিকটস্থ পথ দিয়ে গমন করতে দেখে কন্যাগণ লজ্জাবশতঃ সত্বর তীরে উঠে বস্ত্র পরিধান করেছিলেন। তখন ব্যস্ততাবশতঃ শর্মিষ্ঠ না জেনে গুরুকন্যার বস্ত্রকেই নিজ বস্ত্র মনে করে পরিধান করলে, দেবযানী ক্রুদ্ধ হয়ে এরূপ বললেন–অহো, তোমরা এই দাসীর অন্যায় কার্য লক্ষ্য কর। কুক্করীর যেরূপ যজ্ঞের হবিঃ গ্রহণ করে, এই দাসীও সেরূপ আমার পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করেছে।

দেবযানী আরও বললেন–যাঁরা তপস্যার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা পরম পুরুষ ভগবান বিষ্ণুর মুখ-স্বরূপ, যাঁরা স্বয়ং-প্রকাশ-রূপ জ্যোতির্ময় পরব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করেন, যাঁরা মঙ্গলময় বেদমার্গের প্রদর্শক, লোকপালশ্রেষ্ঠ দেবগণ এমনকি লোকপাবন বিশ্বাত্মা ভগবান শ্রীহরিও যাঁদের বন্দনা করেন, সেই ব্রাহ্মণগণ স্বভাবতঃই পূজ্য, তন্মধ্যে ভৃগুবংশীয় বলে আমরা বিশেষ সম্মানভাজন। এ দাসীর পিতা অসুর বৃষপর্বা আমাদের শিষ্য। এ অবস্থায় শুদ্রের বেদ-ধারণের ন্যায় এই অসতী আমাদের পরিধেয় বসন পরিধান করেছে। গুরুকন্যা দেবযানী এরূপ তিরস্কার করতে থাকলে, শর্মিষ্ঠা ক্রোধে আহতা ভুজঙ্গীর ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে করতে ওষ্ঠ দংশনপূর্বক দেবযানীকে এরূপ বলেছিল–ওরে ভিক্ষুকী। তুমি নিজের বৃত্তান্ত না জেনেই বহুভাবে আত্মপ্রশংসা করছ, কিন্তু তুমি কি কাকের

ন্যায় (জীবধারণের জন্য) আমাদের গৃহের প্রত্যাশা কর না? শর্মিষ্ঠা ক্রোধে এরূপ আরও কর্কশবাক্যে গুরুপুত্রী পূজ্য সতী দেবযানীকে তিরস্কার করে, তার বস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে কূপে ফেলে দিল।

তারপর শর্মিষ্ঠা নিজ গৃহে চলে গেলে রাজা যযাতি মৃগয়া করতে করতে দৈবাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন এবং জলপানের জন্য সেই জলশূন্য কূপের নিকট এসে দেবযানীকে দেখতে পেলেন। তখন দয়াপরবশ হয়ে রাজা বিবস্ত্রা দেবযানীকে নিজের উত্তরীয় বস্ত্র দিয়ে নিজ হস্তদ্বারা তার হস্তধারণ পূর্বক কূপ হতে উদ্ধার করলেন। নিজের উদ্ধারকারী বীর যযাতিকে শুক্রকন্যা দেবযানী প্রেমপূর্ণ বাক্যে বললেন–হে শুক্রপুরবিজয়ী মহারাজ। আপনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন। অতএব আপনি আমাকে গ্রহণ করায়, অপর কেউ যেন আমার পাণিগ্রহণ না করে। আমি কূপমগ্ন ছিলাম, তবুও যে আপনার দর্শন পেলাম, ইহা দৈবেরই ঘটনা, কোন মনুষ্যকৃত নহে। (আমাদের এই প্রতিলোম–বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ হলেও) আমাদের দুই জনের এই সম্বন্ধ নিশ্চয়ই পরমেশ্বর নির্বন্ধ করে রেখেছে, ইহা অন্য পুরুষকৃত নয়। হে মহাভুজ, আমি পূর্বে যাকে শাপ দিয়েছিলাম, বৃহস্পতির পুত্র সেই কচের অভিশাপে কোন ব্রাহ্মণ আমার পাণিগ্রহণ করবেন না। (পূর্বে বৃহস্পতির পুত্র শুক্রাচার্যের নিকট মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করেছিলেন, সেই সময় দেবযানী তাকে বিবাহ করতে চাইলে, কচ বলেছিলেন– তুমি আমার গুরুপুত্রী, পূজণীয়া, তোমাকে বিবাহ করতে পারি না। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে দেবযানী তাকে শাপ দিয়েছিলেন–তোমার অধীত বিদ্যা নিষ্ফল হবে। তাতে কচ দেবযানীর প্রতি শাপ দিয়েছিলেন– তোমার কোন ব্রাহ্মণ পতি হবে না। এরূপ বিবাহ অশাস্ত্রীয় বলে অনভিপ্রেত হলেও রাজা যযাতি উহা দৈব কর্তৃক প্রাপিত বলে মনে করলেন। বিশেষতঃ তাঁর আর্যচিত্ত কখনও অধর্মে প্রবর্তিত হয় না– এজন্য দেবযানীর প্রতি নিজের চিত্তের অনুরাগ উপলব্ধি করে, তার বাক্য গ্রহণ করলেন। (অর্থাৎ যদি তোমার পিতা সম্প্রদান করেন, তবে তোমাকে গ্রহণ করব–এরূপ বলেছিলেন।)

তারপর বীর যযাতি চলে গেলে, দেবযানী রোদন করতে করতে পিতার নিকট গিয়ে শর্মিষ্ঠার কৃত সকল আচরণের কথা নিবেদন করলেন। তা শুনে বিবেকী শুক্রাচার্য পৌরহিত্যের নিন্দা এবং উঞ্ছবৃত্তি নিন্দা করতে করতে কন্যার সহিত পুরী হতে নির্গত হলেন। তখন বৃষপর্বা বুঝতে পারলেন যে–শত্রু দেবগণের বিজয় সম্পাদনই এখন গুরুদেবের অভিপ্রায়, অতএব তাকে প্রসন্ন করার জন্য পথিমধ্যে অবনত মস্তকে শুক্রাচার্যের পদযুগলে পতিত হলেন। ভগবান শুক্রাচার্যের ক্রোধ ক্ষণার্ধ কালমাত্র স্থায়ী হওয়ায় তিনি শিষ্য বৃষপর্বাকে বললেন–হে রাজন, আমি কন্যাকে ত্যাগ করতে পারি না, অতএব তুমি এর অভিলাষ পূর্ণ কর। বৃষপর্বা তা

অঙ্গীকার করলে, দেবযানী নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করে বললেন–আমি পিতা কর্তৃক প্রদত্ত হয়ে যেখানে যাব, শর্মিষ্ঠাও নিজ সহচারীগণের সাথে সেখানে আমায় অনুগমন করবে। তখন বৃষপর্বা বিবেচনা করে দেখলেন– শুক্রাচার্য চলে গেলে আমাদের ঘোর সঙ্কট, আর তিনি এখানে থাকলে আমাদের গুরুতর কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা, অতএব তখনই গুরুপুত্রী দেবযানীর হস্তে সখীসমেত শর্মিষ্ঠাকে অর্পণ করলেন। পিতা কর্তৃক প্রদত্ত হওয়ায় রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা সহস্র সখীর সহিত দাসীর মত দেবযানীর পরিচর‍্যা করতে প্রবৃত্ত হলেন।

তারপর ভগবান শুক্রাচার্য শর্মিষ্ঠার সহিত নিজ কন্যা দেবযানীকে যযাতির হস্তে সম্প্রদান করে, বিশেষ করে তাকে বলে দিলেন–রাজন, তুমি কখনও শর্মিষ্ঠাকে নিজ শয্যায় স্থান দিতে পারবে না। হে মহারাজ, কিছুকাল পরে শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে পুত্রবতী দেখে, নিজ ঋতুকালে সখীর পতি যযাতিকেই পুত্রোৎপাদনে জন্য নির্জনে প্রার্থনা করলেন।

দৈত্যরাজ কন্যা শর্মিষ্ঠা সন্তান উৎপাদনের জন্য প্রার্থনা করলে, শুক্রচার্যের নিষেধ বাক্য স্মরণ করেও যযাতি ঐ প্রার্থনা পূর্ণ করা ধর্ম বলে বিবেচনা করায় যথাকালে সেই দৈবপ্রাপ্ত ঘটনা স্বীকার করেছিলেন। দেবযানী যদু ও তবসু পুত্রদ্বয় এবং শর্মিষ্ঠা দ্রুহ্য, অনু ও পুরু এই তিন পুত্র প্রসব করেছিলেন। মানিনী দেবযানী নিজ স্বামী হতে শর্মিষ্ঠার সন্তানোৎপত্তির কথা জানতে পেরে ক্রোধে

মূর্চ্ছিত প্রায় হয়ে তৎক্ষণাৎ পিতৃগৃহে গমন করলেন। কামুক যযাতি নানারূপে অনুনয় বাক্য পত্নীকে। সান্ত্বনা দিতে দিতে তার অনুগমন করলেন। কিন্তু পাদ-সংবহনাদির দ্বারাও তাকে প্রসন্ন করতে পারলেন না।

এদিকে কন্যার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হয়ে শুক্রাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে বললেন–হে স্ত্রী কামুক মিথ্যাচাররত, মূঢ়, মানবদের বিরূপকারিণী 'জরা তোমার শরীরে প্রবেশ করুক'। ইহা শ্রবণ করে যযাতি ক্ষিপ্লচিত্ত নিবেদন করলেন–হে ব্রাহ্মণ, আপনার কন্যার উপভোগ দ্বারা আমি এখনও কামতৃপ্ত হইনি। এ অভিশাপ আপনার কন্যাতেও ফলবে।

তা বুঝতে পেরে তখন শুক্রাচার্য বললেন–যে ব্যক্তি তোমার জরা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করবে, তুমি তার যৌবনের সঙ্গে যথেচ্ছরূপে নিজ জরার বিনিময় করতে পারবে। যযাতি এই প্রকারে জরা বিনিময়ের ব্যবস্থা লাভ করে জ্যেষ্ঠপুত্রকে আহ্বান করে বললেন–হে বৎস, তুমি আমার এই জরা গ্রহণ করে আমাকে নিজ যৌবন দান কর। হে বৎস, তোমার মাতামহ আমার এই

জরার সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আমি এখনও বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত নই। অতএব তোমার যৌবনদ্বারা আরও কিছু বছর বিষয়সুখ অনুভব করব।

যদু বললেন–হে পিতঃ, এই যৌবনকালে আপনার জরা গ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করছি না। কারণ পরিপূর্ণ সুখ অনুভব না করে মানুষের বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা আসতে পারে না। হে ভারত, তারপর যযাতি যথাক্রমে তুর্বসু, দ্রুহ্য এবং অনুকে জরা গ্রহণের কথা বললে অনিত্য যৌবন দিতে নিজ বুদ্ধিসম্পন্ন ও ধর্মজ্ঞান রহিত সেই সকল পিতার আদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এরপর যযাতি বয়সে কনিষ্ঠ অথচ অধিক গুণশালী পুত্র পুরুকে বললেন–হে বৎস, তুমি তোমার অগ্রজগণের মত আমার আদেশ প্রত্যাখ্যান করতে পার না। (বস্তুতঃ যযাতি পরধর্মবিৎ, জরাগ্রহণে ভগবাদারাধিনার বিঘ্ন হবে বলে তিনি জরা গ্রহণ করলেন না। দশম স্কন্ধে বললেন–ধর্মশীল যদু বংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এজন্য পারমার্থিক, ভগবৎসেবার জন্যই প্রকৃত ধর্ম লঙ্ঘন করেছিলেন, কিন্তু অপর পুত্রগণ অধার্মিক, কেবল বিষয়ভোগের কামনায় পিতার আদেশ উপেক্ষা করেছিলেন।))।

পুরু বললেন–হে মহারাজ, যাঁর প্রাসাদে মানুষ পরম পদ লাভ করতে পারে, ইহলোকে কোন্ ব্যক্তি সেই জন্মদাতা পিতার উপকারের প্রত্যুপকার করতে পারে? যে পুত্র পিতার চিন্তিত বিষয় নিজ হতেই সম্পাদন করে, তাকে উত্তম বলা হয়, আদিষ্ট হয়ে কার্যকরী পুত্র মধ্যম, কিন্তু যে পুত্র আদেশ পেয়েও তা পালন করে না, সে পিতার বিষ্ঠাতুল্য। হে মহারাজ, এই বলে পুরু আনন্দিত মনে পিতার জরা গ্রহণ করলেন এবং যযাতিও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের যৌবন দ্বারা যথোপযুক্ত বিষয়সমূহ ভোগ করতে লাগলেন। সপ্তদ্বীপের অধিপতি যযাতি পিতার মত প্রজাগণকে সম্যক্ পালন করে, অক্ষুণ্ণ ইন্দ্রিয়শক্তি সম্পন্ন হয়ে প্রীতির সহিত বিষয়ভোগ করতে লাগলেন। প্রেয়সী দেবযানীও মন, বাক্য, দেহ ও অন্যান্য ভোগ্য বস্তুর দ্বারা প্রতিদিন নির্জনে প্রিয়তমের পরম প্রীতি সম্পাদন করেছিলেন।

রাজা যযাতি প্রভূত দক্ষিণাযুক্ত বহু বহু যজ্ঞ করতঃ সর্বদেবময় সর্ববেদস্বরূপ যজ্ঞপুরুষ ভগবান হরির অর্চনা করেছিলেন। আকাশে (মেঘরাশির) ন্যায় যার মধ্যে এই বিশ্ব বিরচিত হয়ে, ইন্দ্রিয়সমূহের জাগরণকালে স্বপ্ন, মায়া ও মনোরথের মত ক্ষণকাল প্রকাশিত এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বিরামকালে অদৃশ্য হয়েছে, মহারাজ যযাতি নিস্পৃহ হয়ে সেই পরম সূক্ষ্ম, পরম গুহ্য বাসুদেবরূপী ভগবান নারায়ণকে নিজ হৃদয়ে স্থাপন করে তারই আরাধনা করেছিলেন। হে মহারাজ, এইরূপে সার্বভৌম নরপতি যযাতি মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সহস্র বৎসর বিষয়ভোগ করেও বহির্মুখ ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা পরিতৃপ্ত হতে পারেননি।

.

ঊনবিংশ অধ্যায়

যযাতির গৃহত্যাগ-কথন

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, স্ত্রৈণ রাজা যযাতি এরূপে বিষয় ভোগ করতে করতে একসময় নিজের আত্মপ্রবঞ্চনা বুঝতে পেরে চিন্তিত হয়ে প্রিয়তমা দেবযানীর নিকট এইরূপ ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন।–হে ভার্গবি, বনবাসী জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ আমার মত গৃহস্থের চরিত্র অনুভব করে, এদের কি করে মঙ্গল হবে ভেবে একটি ইতিহাস বলেছিলেন, তা শোন। (এখানে রাজা নিজেকে লক্ষ্য করে নিজেকে ছাগ এবং পত্নীকে লক্ষ্য করে ছাগী শব্দ ব্যবহার দিয়ে, নিজেদের ইতিহাসই বর্ণনা করেছেন।),

এক সময় একটি ছাগ (পুরুষ) বনমধ্যে (সংসারে) নিজের প্রিয় (বিষয়) অন্বেষণ করতে করতে হঠাৎ একটি ছাগীকে স্বকর্মবশতঃ কূপের মধ্যে পতিত দেখতে পেল। তারপর কামুক সেই ছাগ, ছাগীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করতে করতে শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা কূপের তীরভাগের মৃত্তিকাদি উত্তোলনপূর্বক নির্গমের পথ নির্মাণ করে দিল। ঐ পথে সেই সুন্দরী ছাগী উপরে উঠে সেই ছাগকেই পতিরূপে কামনা করল। তারপর সেই ছাগী তাকে পতিরূপে বরণ করেছে দেখে, আরও অন্যান্য ছাগী হৃষ্টপুষ্ট, শ্মশ্রুযুক্ত, রেতঃনিঃসরণকারী, রতিনিপুণ সেই অতিপ্রিয় ছাগটিকেই নিজ নিজ কান্তরূপে কামনা করেছিল। এরপর সেই লোভী ছাগ কামগ্রস্ত হয়ে একাকীই সেই বহু ছাগীর রতিবর্ধন করতে করতে নিজের আত্মাকে ভুলে গেল।

তারপর যে ছাগী পূর্বে কূপের মধ্যে পতিত হয়ে কষ্ট ভোগ করেছিল, সে নিজের প্রিয় ছাগকে অন্য প্রিয়তমা ছাগীর সাথে রমণ করতে দেখে ছাগের অনুচিত কর্ম সহ্য করতে পারল না। তখন সেই ছাগী সুহৃদরূপী দুষ্টচিত্ত, ক্ষণসুহৃদ, ইন্দ্রিয়াসক্ত ও কামুক সেই ছাগকে পরিত্যাগ করে, নিজের প্রভুর নিকট চলে গেল। তখন স্ত্রৈণ ও বিহরকাতর সেই ছাগও ছাগীকে প্রসন্ন করার জন্য নিজ জাতির উচিত শব্দ করতে করতে তাকে অনুগমন করল, কিন্তু পথে কোনপ্রকারেই, তাকে প্রসন্ন করতে পারল না। সেই ছাগীর প্রভু ছিলেন কোনও এক ব্রাহ্মণ। তিনি ক্রোধে সেই ছাগের লম্বমান অণ্ডদ্বয় ছেদন করে দিলেন এবং পরে নিজ কন্যারূপা ছাগীর কামোপভোগের জন্যই উপায়বিজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ ছাগের ছিন্ন অণ্ড আবার যুক্ত করে দিলেন। হে ভদ্রে, এই রূপে সেই ছাগ পুনরায় অণ্ড লাভ করে কূপতিত ছাগীর সাথে বহুকাল ভোগাসক্ত থেকেও অদ্যাবধি বিষয়ভোগে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। হে সুন্দরী, সেই ছাগের মত

আমিও তোমার প্রণয়পাশে বদ্ধ হয়ে অতিশয় কাতর হয়ে পড়েছি, তোমার মায়ায় মোহিত হয়ে, আমার আত্মবিস্মৃত ঘটেছে।

হে ভদ্রে, এই পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, স্বর্ণ, পশু ও রমণী রয়েছে, তাদের সমষ্টিও কামহাত পুরুষের মনের তৃপ্তি পূরণ করতে পারে না। কাম্য বিষয়সমূহের উপভোগের দ্বারা কখনও কামনার উপশম হয় না। কিন্তু ঘৃতের দ্বারা অগ্নি যেমন অত্যধিক প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমনি ভোগের দ্বারা কামনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হয়ে থাকে। যখন পুরুষ সকল প্রাণীতে অমঙ্গল ভাব (অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি বৈষম্য) পরিত্যাগ করে এবং সর্বত্র সমদৃষ্টি হয়, তখন তার সকল দিকই সুখপ্রদ হয়ে ওঠে, বিষয়লোলুপ দুর্মতিজনের পক্ষে যা অগ্রহণীয়, জরাজীর্ণ ব্যক্তির নিকটও যা জীর্ণ হয় না এবং দুঃখরাশি বহন করে, সুখার্থী পুরুষ সেই তৃষ্ণা সত্বর ত্যাগ করবেন। আর স্ত্রীলোকের সন্নিধান সর্বপ্রকারেই ত্যাগ করা উচিত। মাতা, ভগিনী কিংবা কন্যার সঙ্গেও নির্জনে একাসনে (অর্থাৎ সংলগ্নভাবে) অবস্থান করবে না যেহেতু, প্রবল ইন্দ্রিয়বর্গ জ্ঞানী ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে থাকে, নিরন্তর বিষয়রাশি উপভোগ করতে করতে আমার সহস্র বৎসর পূর্ণ হয়েছে, তথাপি সর্বক্ষণ সেই সকল বিষয়ের প্রতিই আমার তৃষ্ণা রয়েছে। অতএব আমি সম্প্রতি এই বিষয়তৃষ্ণা পরিত্যাগ-পূর্বক পরম ব্রহ্মে মন সমাহিত করে, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দরহিত ও নিরহংকার হয়ে মৃগদের সাথে বনে বিচরণ করব। হে প্রিয়ে, ঐহিক বা পারলৌকিক বিষয়ভোগের চিন্তা ও উপভোগে জীবের সংসার-বন্ধন ও আত্মার অধঃপতন হয়–তা জেনে ঐ সকল বিষয়কে অসৎ (অর্থাৎ অনিত্য) মনে করে যিনি উহার চিন্তা ও উপভোগ না করেন, তিনি যথার্থ সমদর্শী।

ভোগনিস্পৃহ নহুষতনয় যযাতি পত্নী দেবযানীকে এরূপ বলে, পুরুকে তার যৌবন প্রত্যার্পণ করে তার কাছ হতে নিজের জরা গ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি দ্রুহ্যকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের, যদুকে দক্ষিণ দিকের, তুর্বসুকে পশ্চিম দিকের এবং অনুকে উত্তর দিকের রাজা করলেন। তারপর তিনি অখিল ভূমণ্ডলের আধিপত্য ক্ষত্রিয়োত্তম প্রিয়তম পুত্র পুরুকে অভিষিক্ত করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে তার অধীনে রেখে স্বয়ং বনে গমন করেছিলেন। পক্ষদ্বয় উৎপন্ন হলে যেমন পক্ষিশাবক অল্পকালের মধ্যেই দীর্ঘকালের আশ্রিত নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করে, তেমনি যযাতিও বহু বৎসর বিষয়-সেবায় পরিচালিত নিজ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে ক্ষণকালের মধ্যেই উপেক্ষা করেছিলেন। তারপর প্রখ্যাত মহারাজ যযাতি বনমধ্যে আত্মানুভূতির দ্বারা সমস্ত সঙ্গ হতে বিমুক্ত হয়ে, গুণত্রয়জাত উপাধি পরিহার-পূর্বক পরম ব্রহ্ম বাসুদেব ভগবত গতি লাভ করেছিলেন।

যদিও পূর্বোক্ত গাথাটি পরিহাসের ন্যায় উক্ত হয়েছে, তথাপি স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ে প্রায়ই এরূপ গ্লানি ঘটে বলে, দেবযানী তা শ্রবণ করে, গাথাটি নিজের নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনের উৎসাহজনক মনে করেছিলেন। তারপর দেবযানী ঈশ্বরপরতন্ত্র জীবগণের সংসারে সুহৃদগণের সাথে মিলন পানীয়শালায় পথিকগণের মিলনের মত অনিত্য এবং ভগবান শ্রীহরিরই মায়া-রচিত মনে করে, স্বপ্নতুল্য জ্ঞানে সর্ব বিষয়ে আসক্তি পরিহার-পূর্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণেও চিত্ত সমর্পণ করতঃ নিজ দেহত্যাগ করেছিলেন।

"ভগবান আপনি বিধাতা, বাসুদেব, সর্বভূতের নিবাসভূমি, পরম শান্ত ও সর্বপেক্ষা বৃহৎ, আপনাকে নমস্কার করি।" (দেবযানী সবসময় এরূপ বলে ভগবানে মন সমাবেশিত করেছিলেন।) .

বিংশ অধ্যায়

পুরুবংশ–বর্ণন এবং দুষ্মন্ত ও ভরতের চরিত্র-কথন

শ্রীশুকদেব বললেন–হে ভরত, সম্প্রতি পুরুর বংশ অর্থাৎ যে বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ সেই বংশের বিবরণ বলছি শোন। এই পুরুবংশে অনেক রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি জন্মগ্রহণ করেছেন। পুরু হতে জন্মেজয়ের জন্ম হয়, তার পুত্র চিন্বান, চিন্বানের পুত্র প্রবীর, তার মনুস্য এবং মনুস্যর পুত্র চারুপদ। চারুপদের পুত্র সুদু, সুদুর পুত্র বহুগব, বহুগবের পুত্র সংযাতি, সংযাতির পুত্র অহংযাতি এবং অহংঘাতির পুত্র রৌদ্রাশ্ব। জগতের আত্মা মুখ্য প্রাণের বশীভূত দশটি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশটি পুত্র হয়েছিল।

তাঁদের নাম–ঋতেয়, কক্ষেয়ু, কুন্তিলেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্ততেয়ু, ধর্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু এবং সর্বকনিষ্ঠ বনেয়ু। হে নৃপ, ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনাব রন্তিনাবের তিন পুত্র–সুমতি, ধ্রুব ও অপ্রতিরথ। অপ্রতিরথের পুত্রের নাম কন্ব। কন্বের পুত্রের নাম মেধাতিথি। মেধাতিথি হতে প্রস্কন্ন প্রভৃতি দ্বিজাতি পুত্রগণের জন্ম হয়। সুমতির পুত্র রেভি এবং রেভির পুত্র দুষ্মন্ত। (দুষ্যন্ত–পাঠান্তর)।

কোন এক সময় রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া করতে গিয়ে কন্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তৎকালে তিনি কয়েকজন মাত্র সৈন্যদ্বারা পরিবৃত ছিলেন। তিনি সেখানে লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় নিজ কান্তির দ্বারা আশ্রমের শোভাবর্ধনকারী দেবমায়াতুল্য এক রমণীকে দেখে সেই সুন্দরীর সঙ্গে বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হলেন। তার দর্শনে তিনি অতিশয় হৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তার পরিশ্রম দূর

হয়েছিল। তিনি কামপীড়িত হয়ে হাসতে হাসতে মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন–হে কমলপত্রাক্ষি, তুমি কে? কার কন্যা? এই নির্জন বনে কি করতে বাসনা করেছ? হে সুমধ্যমে, তুমি যে ক্ষত্রিয় কন্যা–এটা আমি নিশ্চিতই অনুভব করেছি, কারণ পৌরবগণের চিত্ত কখনও অধর্মে প্রবৃত্ত হয় না। (অর্থাৎ তুমি ক্ষত্রিয় কন্যা এবং আমার বিবাহযোগ্যা না হলে, আমার আর্যচিত্ত কখনও তোমার প্রতি আসক্ত হত না।)

শকুন্তলা বললেন–হে বীর, আমি বিশ্বামিত্রের কন্যা এবং মাতা মেনকা বনমধ্যে আমাকে ত্যাগ করেছিলেন। এ সকল বৃত্তান্ত ভগবান কন্ব অবগত আছেন। সম্প্রতি আমি আপনার কি সেবা করব, বলুন। হে পদ্মনেত্র, আপনি উপবেশন করুন, আমাদের পূজা গ্রহণ করুন। আশ্রমমাচিত আহার্য রূপে প্রচুর নীবার ধান্য রয়েছে, তার অন্ন ভোজন করুন এবং যদি ইচ্ছা হয় এখানে বাস করুন।

দুষ্মন্ত বললেন–হে সু, তুমি কুশিকবংশে জন্মগ্রহণ করেছ, তোমার এরূপ আচরণ উপযুক্ত বটে।

যেহেতু রাজকন্যাগণ স্বয়ং যোগ্য বরকে বরণ করে থাকে, তখন শকুন্তলা তার বাক্যে সম্মতি দান। করলে, দেশ-কালের বিধানজ্ঞ ঐ রাজা গান্ধর্ব বিধির দ্বারা শকুন্তলাকে যথাধর্ম বিবাহ করেছিলেন। তারপর অব্যর্থবীর্য রাজা দুষ্মন্ত মহিষী শকুন্তলার গর্ভাধান করে, পরদিন নিজপুরে চলে গেলেন। তারপর যথাকালে শকুন্তলা একটি সন্তান প্রসব করলেন। মহর্ষি কন্ব বনমধ্যেই সেই নবজাত কুমারের জাতকর্মাদি ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন করেছিলেন। ঐ বালক শৈশবেই নিজ বলে বনের সিংহকে আবদ্ধ করে খেলা করত।

কিছুকাল পরে শকুন্তলা ভগবান হরির আশীর্বাদে উৎপন্ন সেই দুরন্ত বিক্রমশালী পুত্রকে নিয়ে স্বামীর নিকট গমন করলেন। যখন রাজা দুষ্মন্ত সেই অনিন্দিত ভার্যাকে কোনক্রমেই গ্রহণ করলেন না, তখন শ্রবণকারী সর্বপ্রাণীর সমক্ষে আকাশ হতে অশরীরী বাণী আবির্ভূত হয়ে এরূপ বলেছিল–হে দুষ্মন্ত, মাতা ভস্ত্রা (অর্থাৎ চর্মপাত্রের ন্যায় আধারমাত্র), বস্তুতঃ পুত্র পিতারই হয়, যেহেতু পিতাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। অতএব তুমি তোমার এই নিজ পুত্রকে ভরণ কর। আর শকুন্তলাকে অবজ্ঞা করো না। হে নরদেব, বংশরক্ষক পুত্রই পিতাকে যমালয় (নরক) হতে উদ্ধার করে। তুমিই এই গর্ভের উৎপাদক, শকুন্তলা সত্যই বলেছে। আকাশবাণী শোনার পর রাজা দুষ্মন্ত ভার্য্যা ও পুত্রকে গ্রহণ করেছিলেন।

কালান্তর পিতা দুষ্মন্ত গত হলে মহাযশস্বী সেই পুত্র ভরতই রাজ-চক্রবর্তী হয়েছিলেন। শ্রীহরির অংশজাত ভরতের মহিমা আজও পৃথিবীতে পরিগীত হয়। ভরতের দক্ষিণ হস্তে চক্রচিহ্ন এবং পদযুগলে পদ্মকোষের চিহ্ন (রেখা) ছিল। মহাসামর্থশালী ভরত মহা অভিষেক দ্বারা সম্রাট পদে অভিষিক্ত হয়ে, মমতার পুত্র দীর্ঘতমাকে পুরোহিত পদে বরণপূর্বক গঙ্গাতীরে যজ্ঞের উপযোগী পবিত্র স্থানে পঞ্চান্নটি অশ্বদ্বারা যজ্ঞ করেছিলেন। এইরূপে তিনি যমুনার তীরেও আটাত্তরটি যজ্ঞীয় অশ্বের দ্বারা যাগ করেছিলেন।

ঐ সকল যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধন দান করেছিলেন। দুষ্মন্ত তনয় ভরতের যজ্ঞীয় অগ্নি উত্তম গুণযুক্ত দেশে স্থাপিত হয়েছিল, সেখানে অগ্নি-স্থাপনকালে সহস্র ব্রাহ্মণ ভরত কর্তৃক প্রদত্ত ধেনুগণকে ভাগ করে নিয়েছিলেন। প্রত্যেকে তের হাজার চুরাশিটি গাভী গ্রহণ করেছিলেন। দুষ্মন্তপুত্র ভরত তেত্রিশ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পৃথিবীস্থিত নরপতিগণকে বিস্ময়ান্বিত করে, দেবতাদের বৈভবকেও অতিক্রম করেছিলেন। তিনি শ্রীহরির অংশজাত বলে দেহত্যাগের পর দেবতাদের গুরু ভগবান শ্রীহরিকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

মহারাজ ভরত কোন কর্মবিশেষে শ্বেতদন্ত কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট চতুর্দশ নিযুত শ্রেষ্ঠ হস্তী হিরণ্য পরিবৃত হয়ে দান করেছিলেন। ভরতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নরপতিগণ ভরতের অনুষ্ঠিত মহৎ কর্মসমূহের অনুরূপ কর্ম করতে পারেন নাই। ভরত দিগবিজয়কালে কিরাত, হূণ, যবন, পৌণ্ড্র, কঙ্ক, খশ, শক, ম্লেচ্ছ এবং ব্রাহ্মণবিরোধী নরপতিদের বধ করেছিলেন।

পূর্বে যে সকল অসুর দেবতাদের পরাজিত করে পাতালপুরে বাস করেছিল, সেই সকল বলবান অসুর দেবরমণীগণকেও পাতালে নিয়ে গিয়েছিল। মহারাজ ভরত সেই অসুরদের জয় করে দেবরমণীগণকে পুনরায় স্বর্গে দেবগণের নিকট আনয়ন করেন। মহারাজ ভরত তার রাজত্বকালে স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রজাগণের সকল অভিলাষ সর্বদা পূর্ণ করতেন। তিনি সাতাশ হাজার বছর রাজ্য শাসন করে পৃথিবীর সকল দিকে নিজের সৈন্য চালনা করেছিলেন। এইরূপে দীর্ঘকাল রাজ্যভোগের পর মহারাজ ভরত লোকপালগণ অপেক্ষাও সমধিক খ্যাতি সম্পন্ন এবং শৌর্যপ্রভাবে অলঙ্ঘনীয় রাজাদেশ সমস্তই মিথ্যা মনে করে সকল বিষয় হতে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি বনে গিয়ে ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করেছিলেন।

হে মহারাজ, ভরতের বিদর্ভদেশীয় তিনটি পত্নী ছিলেন। তাঁরা মনোমত হলেও রাজা ভরত তাদের পুত্রগণকে নিজের সদৃশ নয় বলায় তারা অনুমান করলেন নিজেদের সতীত্বের প্রতি ভরতের সন্দেহ হয়েছে, অতএব তিনি আমাদের ত্যাগ করতে পারেন–এই ভয়ে তারা জন্মের

পর সকল সন্তানকেই হত্যা করেছিলেন। এভাবে তারা বংশ রক্ষার্থে ব্যর্থ হলে বংশরক্ষার জন্য বায়ুগণের ও সোমের যাগ করেছিলেন মহারাজ ভরত, তাতে মরুদগণ প্রসন্ন হয়ে তার হস্তে ভরদ্বাজ নামক পুত্র সমর্পণ করেন। ভরদ্বাজের জন্ম ও সমর্পণ বৃত্তান্ত বলেছেন–ভ্রাতা উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভাবস্থায় একদিন বৃহস্পতি গোপনে তার সহিত রতিকর্মে প্রবৃত্ত হলে, গর্ভস্থ সন্তান এই অন্যায় কর্মে প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করায় তিনি তাকে "অন্ধ হও"–বলে শাপ দিয়ে বীর্য সেচন করেন। এরপর গর্ভস্থ সন্তান পায়ের গুল্ফ দেশের অধোভাগ দ্বারা ঐ বীর্যকে বাহির করে দিলে, তৎক্ষণাৎ ঐ বীর্য হতে এক পুত্র উৎপন্ন হয়।

মমতা বৃহস্পতির বীর্যজাত এই পুত্রকে পরিত্যাগের ইচ্ছা করলে, দেবগণ ঐ পুত্রের নামের অর্থ নিরূপণাত্মক একটি শ্লোক উচ্চারণ করেছিলেন। তা এইরূপে–মমতা সন্তান ত্যাগে উদ্যত হলে বৃহস্পতি বলেছিলেন-হে মূঢ়, এই পুত্র 'দ্বাজ' অর্থাৎ তোমার স্বামীর ক্ষেত্রে আমা হতে উৎপন্ন বলে উভয়েরই হয়, অতএব তুমি ইহার ভরণ কর। এতে মমতা উত্তর করেন–তুমিও ইহার পোষণ কর।

আমাদের দুজন হতে এ বালক উৎপন্ন হয়েছে, আমি একা কেন পোষণ করব–এ বলে তারা দুজন বিবাদ করতে করতে বালককে পরিত্যাগ করে যান, এই কারণে এই পুত্রের নাম "ভরদ্বাজ" হয়েছে। দেবগণ এরূপ বলতে আরম্ভ করলে মমতা, সেই পুত্রকে ব্যর্থ মনে পরিত্যাগ করেন এবং মরুদগণ তাকে পালন করে, পরে ভরতের বংশ ব্যর্থ হয় দেখে পুত্ররূপে ভরতের হস্তে অর্পণ করেছিলেন।

.

একবিংশ অধ্যায়

ভরতবংশ বর্ণন এবং রন্তিদেবের চরিত্র কথন

শ্রী শুকদেব বললেন–হে রাজন, ভরতের বংশ বিতথ (অর্থাৎ ব্যর্থ হলে ভরতের প্রতি মরুদগণ কর্তৃক ভরদ্বাজ প্রদত্ত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ হলেও দত্তক পুত্র বলে ভরদ্বাজের নাম বিতথ হয়েছিল। বিতথের পুত্র মনু, তা হতে বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য, নর এবং গর্গ–এই পাঁচ পুত্র জন্মে। তার মধ্যে নরের তনয় সংস্কৃতি। হে পাণ্ডুনন্দন, সংস্কৃতির পুত্র গুরু ও রন্তিদেব। রন্তিদেবের মহিমা ইহলোক ও পরলোকে সর্বদা কীর্তিত হয়ে থাকে। উদ্যম ব্যতীতই আকাশ

হতে যেন ভোগ্য বস্তুসকল তার নিকট উপস্থিত হত। তিনি যখন যা পেতেন, তাই দান করতেন বলে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় সপরিবারে অবসাদগ্রস্ত থাকতেন।

তিনি নিষ্কিঞ্চন ও ধীর পুরুষ ছিলেন। এক সময় তিনি জলমাত্রও পান না করে আটচল্লিশ দিন অতিবাহিত করার পর প্রাতে তার নিকট পায়েস ও পানীয় জল উপস্থিত হল। তৎকালে তাঁর পরিবারবর্গ অতিশয় কষ্টভোগ করছিলেন এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় তার শরীর কাঁপছিল। এ অবস্থায় তিনি ঐ সকল ভোজ্যবস্তু ভোজন করতে ইচ্ছুক হলে, এক ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে উপস্থিত হলেন। তখন রন্তিদেব সর্বভূতে শ্রীহরির জ্ঞান করে, শ্রদ্ধাসহকারে সমাদরপূর্বক সেই অন্ন অতিথি ব্রাহ্মণকে ভাগ করে : দিলেন। সে ব্রাহ্মণ তা ভোজন করে চলে গেলেন।

এরপর অবশিষ্ট অন্ন পরিবারের জন্য ভাগ করে, নিজে কিঞ্চিত আহারের উদ্যোগ করছেন, এমন সময় এক শূদ্র অতিথিরূপে উপস্থিত হলে, শ্রীহরির স্মরণ করে সেই শূদ্রকেও অন্ন ভাগ করে দিলেন। সেই শূদ্র ভোজন করে চলে গেলে, কুকুরগণের সাথে এক অতিথি এসে উপস্থিত হয়ে বলল–হে রাজন, আমি এই কুকুরগণের সহিত ক্ষুধায় কাতর হয়েছি, আমাকে অন্ন দান করুন। মহারাজ রন্তিদেব তখন যা অবশিষ্ট ছিল, সে সমস্তই সম্মান ও সাদরে কুকুরগণ ও তাদের পালককে দান করে নমস্কার করলেন। এরপর রন্তিদেব একজনের মাত্র তৃপ্তির যোগ্য যে জল অবশিষ্ট ছিল, তাই পান করতে উদ্যোগী হলে, এক চণ্ডাল এসে বলল–হে মহারাজ, এই অশুভ ব্যক্তিকে জল দান করুন। তখন রন্তিদেব সেই চণ্ডালের অতি কষ্টে উচ্চারিত করুণ বাক্য শ্রবণ করে, কৃপাবশতঃ অতিকাতর হয়ে এরূপ মধুর বাক্য বলেছিলেন।

আমি পরমেশ্বরের নিকট অষ্টৈশ্বর্য যুক্ত পরমগতি অথবা নির্বাণ মুক্তিও কামনা করি না, কিন্তু আমি জগতের সকল প্রাণীর অন্তরে থেকে তাদের সকল প্রকার দুঃখ নিজেই ভোগ করতে ইচ্ছা করছি, যাতে সকল দেহীর দুঃখ দূরীভূত হয়। এ ব্যক্তি অতি দীন, জীবনধারণের বাসনা করছে, এর জীবন রক্ষার জল অর্পণ করলেই আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পরিশ্রম, গাত্রঘূর্ণন, দৈন্য, ক্লান্তি, শোক, বিষাদ ও মোহ–সমস্তই নিবৃত্ত হবে। এইরূপ বলে স্বভাবতঃ দয়ালু মহারাজ রন্তিদেব স্বয়ং পিপাসায় ম্রিয়মান হয়েও সেই পুষ্কশকে (চণ্ডালকে) নিজের পানীয় জল প্রদান করেছিলেন।

বিভিন্ন ফলপ্রার্থী ব্যক্তিগণের ফলদাতা ত্রিভুবনের অধিপতি ব্রহ্মাদি দেবগণই রন্তিদেবের ধৈর্য পরীক্ষার জন্য ভগবান বিষ্ণুর মায়াবলে প্রথমতঃ শূদ্রাদিরূপে উপস্থিত হয়ে, পরে তাঁকে নিজ

নিজ মূর্তি দর্শন করিয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজ রন্তিদেব সেই সকল দেবতাকে নমস্কার করে, নিঃসঙ্গ ও নিস্পৃহ হয়ে কেবল বাসুদেবে চিত্ত সমর্পণ করেছিলেন। ঐ সকল দেবতাদের নিকট কিছুই প্রার্থনা করেননি। হে মহারাজ, রন্তিদেব ঈশ্বরাতিরিক্ত অন্য ফল আকাঙ্ক্ষা না করে মনকে ঈশ্বরের চিন্তায় নিযুক্ত করলে, ত্রিগুণাত্মিকা মায়া তাঁর নিকট লয়প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রন্তিদেবের অনুগত, ব্যক্তিগণ তার সঙ্গপ্রভাবে সকলেই ভগবৎপরায়ণ যোগী হয়েছিলেন।

মনুর অপর পুত্র গর্গ হতে শিনির জন্ম হয়। তাঁর পুত্র গার্গ। ইনি ক্ষত্রিয় হতে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। মনুর অপর পুত্র মহাবীর্য হতে পুরিতক্ষয় উৎপন্ন হয় এবং পুরিতক্ষয় হতে এয্যারুনি, কবি ও পুস্করারুণির জন্ম হয়। এয্যারুনি প্রভৃতি তিনজন ক্ষত্রবংশে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বৃহৎক্ষেত্রের পুত্র হস্তী, যিনি হস্তিনাপুর নির্মাণ করেন। অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়–এই তিনজন হস্তীর পুত্র। অজমীঢ়ের বংশজাত প্রিয়মেধ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। ঐ অজমীঢ় হতে বৃহদিষু নামে অন্য এক পুত্রও জন্মে, তার পুত্র বৃহদ্ধ, বৃহদ্ধনুর সন্তান বৃহৎকায়, তার তনয় জয়দ্রথ। জয়দ্রথের পুত্র বিশদ, তার পুত্র সেনজিৎ এবং সেনজিতের চারপুত্র-রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য ও বৎস। রুচিরাশ্বের পুত্র পার, তাঁর পুত্র পৃথুসেন। পারের অপর পুত্রের নাম নীপ। তার একশত পুত্র হয়েছিল। এই নীপই শুককন্যা কৃত্বীর গর্ভে ব্রহ্মদত্তকে উৎপন্ন করেন। ব্রহ্মদত্ত যোগী ছিলেন এবং তিনি ভার্য্যা সরস্বতীর গর্ভে বিশ্বকসেন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

বিশ্বকসেন জৈগীষব্যের উপদেশ যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। ঐ বিশ্বকসেন হতে উদকসেনের জন্ম হয়। উদকসেনের পুত্র ভল্লাট–ঐ সকল রাজা বৃহদিষুর বংশোদ্ভব। দ্বিমীঢ়ের পুত্রের নাম যবীনর, তাঁর পুত্র কৃতীমান, কৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি, তাঁর পুত্র দৃঢ়নেমি এবং দৃঢ়নেমির পুত্র সুপার্শ্ব। সুপার্শ্বের পুত্র সুমতি, তাঁর পুত্র সন্নতিমান, সন্নতিমানের পুত্র কৃতী, ইনি হিরণ্যাবের নিকট হতে যোগোপদেশ লাভ করে প্রাচ্য সামদেবের ছয়টি সংহিতা বিভাগ–পূর্বক অধ্যাপক করেছিলেন।

কৃতীয় পুত্র উগ্রায়ুধ নীপ, তার পুত্র সুবীর এবং সুবীরের পুত্র রিপুঞ্জয়। রিপুঞ্জয়ের পুত্র বহুরথ। হস্তীর পুত্র পুরমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধাদি ব্রাহ্মণ এবং বৃহদিষ্ণু প্রভৃতি ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হয়েছিলেন। ব্রহ্মণে অজমীঢ়ের অপর বংশ বলছেন। হে মহারাজ, অজমীঢ়ের নলিনী নাম্নী পত্নীর গর্ভে নীল নামক পুত্র হয়, নীলের পুত্র শান্তি। শান্তির পুত্র সুশান্তি। তাঁর পুত্র পুরুজ, তাঁর পুত্র অর্ক এবং অর্কের পুত্র ভাশ্ব। ভাশ্বের মুদগল প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মেছিল। তাদের নাম–মুদগল, যবীনর, বৃহবিশ্ব, কাম্পিল্য ও সঞ্চয়। তৎকালে ভর্ম্যাশ্ব

বলেছিলেন–আমার এই পাঁচ পুত্র পাঁচটি দেশ রক্ষা করতে সমর্থ। এজন্য তাদের “পঞ্চাল”–এই সংজ্ঞা হয়েছিল। মুদল হতে মৌদগল্য নামক ব্রাহ্মণ গোত্রের প্রবর্তন হয়।

ভর্ম্যাশ্ব পুত্র মুদগল হতে যমজ সন্তান হয়। তার মধ্যে দিবোদাস পুরুষ এবং অহল্যা কন্যা। অহল্যার গর্ভে গৌতমের ঔরসে শতানন্দের জন্ম হয়। শতানন্দের পুত্র ধনুর্বেদ-বিশারদ সত্যধৃতি এবং সত্যধৃতির পুত্র শরদ্বা। একসময় উর্বশীর দর্শণে শরগুচ্ছের উপর শরদ্বানের বীর্য পতিত হলে, তা হতে শুভলক্ষণযুক্ত যমজ সন্তানের উৎপত্তি হয়। রাজা শান্তনু মৃগয়া করতে গিয়ে তাদের দেখতে পান এবং কৃপাপরবশ হয়ে তাদের নিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে পুত্রটির নাম কৃপ এবং কন্যাটির নাম কৃপী। এই কৃপীই দ্রোণাচার্যের পত্নী হয়েছিলেন।

.

দ্বাবিংশ অধ্যায়

দিবোদাসাদির বংশ কথন এবং ঋক্ষবংশে পাণ্ডবাদি উৎপত্তি বর্ণন

শ্রীশুকদেব বললেন, হে মহারাজ–দিববাদাসের পুত্রের নাম মিত্রায়ু (মিত্রেয়ু–পাঠান্তর), তার পুত্র চব্যন, তাঁর পুত্র সুদাম, সুদামের পুত্র সহদেব। সহদেবের পুত্র সোমক, এই সোমক জন্তু নামক পুত্রের জনক। সোমকের একশত পুত্রের মধ্যে জন্তু জ্যেষ্ঠ এবং পৃষত কনিষ্ঠ। এই পৃষত হতে সর্বসম্পযুক্ত হতে দ্রুপদের জন্ম হয়েছিল। দ্রুপদ হতে দ্রৌপদী নামে এক কন্যা এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পুত্রগণের জন্ম হয়। এরা ভর্য্যাশ্বের বংশধর এবং পাঞ্চাল সংজ্ঞায় পরিচিত। হে রাজন, এরপর অজমীঢ়ের বংশান্তর বলছি, শোন।

আজমীঢ়ের অন্য তনয় যে ঋক্ষ, তার পুত্র সংবরণ, ঐ সংবরণ হতে সূর্য-তনয়া তপতীর গর্ভে কুরুক্ষেত্র পতি কুরু জন্মগ্রহণ করেন। সেই কুরুর চার সন্তান–পরীক্ষিৎ, সুধনু, জন্তু ও নিষধ। তার মধ্যে সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তাঁর পুত্র চ্যবন এবং চ্যবনের সন্তান কৃতী। কৃতীর পুত্র উপরিচর বসু, তা হতে বৃহদ্রথ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। অন্যান্য পুত্রদের নাম-কুশাম্বস, মৎস্য, প্রত্যগ্র এবং চেদিপ ইত্যাদি তারা সকলেই চেদিপ অর্থাৎ চেদিদের রাজা ছিলেন।

বৃহদ্রথ হতে কুশগ্রের জন্ম হয়, তার তনয় ঋষভ, তার পুত্র সত্যহিত, সত্যহিতের পুত্র পুষ্পবান্ এবং তাঁর পুত্র জহু। বৃহদ্রথের অন্য ভার্যার গর্ভে দেহের দুটি খণ্ড উৎপন্ন হলে মাতা তাদের বাইরে ফেলে দেন। পরে জরা নামক রাক্ষসী তা দেখতে পেয়ে খেলার ছলে ঐ দুই খণ্ড

সংযুক্ত করে, "জীবিত হও, জীবিত হও"–এরূপ বললে ঐ বালক সর্বাবয়ব সম্পন্ন হয়ে জরাসন্ধ নাম প্রাপ্ত হয়েছিল। ঐ জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, তার পুত্র সোমাপি, তাঁর হতে এবার জন্ম হয়। কুরুপুত্র পরীক্ষিৎ নিঃসন্তান ছিলেন। জহ্নুর পুত্রের নাম সুরথ। সুরথের পুত্র বিদূরথ, তাঁর পুত্র সার্বভৌম, তার পুত্র জয়সেন, জয়সেনের সন্তান রাখিক, তা হতে অযুতায়ুর উৎপত্তি হয়। অযুতায়ুর পুত্র আক্রোধন, তার পুত্র দেবাতিথি। তাঁর পুত্র ঋক্ষ, তার পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র প্রতীপ। ঐ প্রতীপের তিন পুত্র– দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লীক। তার মধ্যে দেবাপি পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করে অরণ্যে গমন করেছিলেন। অতএব মধ্যম পুত্র শান্তনু রাজা হন। তার পূর্ব জন্মের নাম ছিল মহাভিষ। তিনি জরাগ্রস্ত যাকে দুই হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন, সে সকল ব্যক্তিই পুনরায় যৌবনপ্রাপ্ত হত এবং উৎকৃষ্ট শান্তি লাভ করত। এই কর্মের দ্বারা তিনি শান্তনু নামে প্রসিদ্ধ হন। এক সময় তার রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বৃষ্টি না হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ তাকে বললেন–হে মহারাজ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করলে, সে যেমন পরিবেত্তা হয়ে দোষভাগী হয়, তেমনি। তুমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার পূর্বে স্বয়ং রাজ্য ভোগ করায় পরিবেত্তা হয়েছ। অতএব তুমি পুর ও রাষ্ট্রের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য সত্বর জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে রাজ্য দান কর। ব্রাহ্মণগণ এরূপ বললে, শান্তনু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপিকে রাজ্য গ্রহণের জন্য বহু অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু এর পূর্বেই শান্তনুর মন্ত্রী অশ্ববার (অথবা অশ্মরাত) দেবাপির নিকট কয়েকজন ব্রাহ্মণ পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা দেবাপিকে পাষণ্ডমত গ্রহণ করিয়ে বেদমার্গ হতে বিচ্যুত করায় দেবাপি বৈদিক মতের নিন্দাবাদ করেন, যার জন্য তার রাজত্ব গ্রহণের ইচ্ছা রইল না। বেদের নিন্দা করায় পাতিত্যদোষে দেবাপি রাজ্য গ্রহণের অযোগ্য হওয়ায়, শান্তনুর রাজ্যগ্রহণের কোন দোষ না থাকায় দেবগণ তুষ্ট হয়ে রাজ্যমধ্যে জলবর্ষণ করেছিলেন। সেই দেবাপি যোগ অবলম্বনপূর্বক এখনও কলাপগ্রামে বাস করছেন। কলিকালে চন্দ্রবংশ বিলুপ্ত হলে এই দেবাপি সত্যযুগের প্রারম্ভে পুনরায় ঐ বংশের প্রবর্তন করবেন। বাহ্লীক হতে সোমদত্ত, সোমদত্ত হতে ভূরি এবং ভূরি হতে ভূরিশ্রবা ও শল–নামেই দুই পুত্রের জন্ম হয়েছিল।

শান্তনু হতে গঙ্গার গর্ভে জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মদেবের জন্ম হয়। ইনি সকল ধর্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরম ভাগবত ও বিদ্বান ছিলেন। এই ভীষ্ম বীরসমূহের অগ্রণী ছিলেন এবং সংগ্রামে পরশুরামেরও সন্তোষ উৎপাদন করেছিলেন। দাসরাজ্যের কন্যা সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে রাজা শান্তনুর দুই পুত্র হয়। উপরিচর বসুর বীর্যে মৎস্যগর্ভে এক কন্যা জন্মেছিল, দাসেরা (ধীবরগণ) তাকে প্রতিপালন করে, এজন্য দাসকন্যা বলে প্রসিদ্ধ, বস্তুতঃ তার নাম সত্যবতী।

জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ, চিত্রাঙ্গদ-নামক গন্ধর্ব কর্তৃক নিহত হন। এই সত্যবতীর গর্ভে (বিবাহের পূর্বে) মহর্ষি পরাশর হতে সাক্ষাৎ ভগবান হরির অংশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি অবতীর্ণ হন। তিনি বেদ-বিভাগ করে বেদের রক্ষা করেন এবং তাঁর নিকট হতে আমি এই শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করি। সেই ভগবান বাদরায়ণ (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন) নিজ শিষ্য পৈল প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করে শান্তস্বভাব নিজ পুত্র আমাকে পরমগুহ্য এই ভাগবতশাস্ত্রের উপদেশ করেছিলেন।

যা হোক, বিচিত্রবীর্য কাশীরাজের দুই কন্যা অম্বিকা এবং অম্বালিকার পানিগ্রহণ করেন। মহাবল ভীষ্ম, স্বয়ম্বরসভা হতে তাঁদের বাহুবলে হরণ করেন। ঐ দুই পত্নীতে বিচিত্রবীর্য অত্যন্ত আসক্ত হওয়ায় অল্পকালের মধ্যে যক্ষারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাতার আজ্ঞায় ভগবান বাদরায়ণ নিঃসন্তান কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র এবং অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্মদান করেন। হে মহারাজ, ভার্য্যা গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তার মধ্যে দুর্যোধন জ্যেষ্ঠ। এছাড়া দুঃশলা নামে একটি কন্যারও জন্ম হয়।

মৃগরূপে মৈথুনরত এক মুনিকে মৃগয়াকালে বধ করায় তাঁর অভিশাপে পাণ্ডু মৈথুনক্রিয়া হতে নিবৃত্ত হওয়ায় তার প্রথমা পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের অনুগ্রহে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন এবং অপর পত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অনুগ্রহে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। ঐ পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী দ্রৌপদী। তার গর্ভে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব হতে পাঁচটি সন্তান হয়েছিল, তারা তোমার পিতৃব্য। সেই পাঁচ পুত্রের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেনের পুত্র শ্রুতসেন, অর্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্তি, নকুলের পুত্র শতানীক, এবং সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্মা।

হে মহারাজ, এছাড়াও যুধিষ্ঠির হতে পৌরবীর গর্ভে দেবক এবং ভীমসেন হতে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। ভীমসেনের অপর ভার্য্যা কালীর গর্ভে সর্বগত নামে এক পুত্রের জন্ম হয়েছিল। সহদেব হতে পর্বতকন্যা বিজয়ার গর্ভে সুহোত্রের জন্ম হয়। নকুল নিজ অপর পত্নী করেনুমতির গর্ভে নরমিত্র নামক পুত্র উৎপাদন করেন। অর্জুনও নিজ অপর পত্নী নাগকন্যা উলুপীর গর্ভে ইরাবন্ এবং অপর এক পত্নী মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্মদান করেন। (মণিপুররাজ অর্জুনের সহিত কন্যার বিবাহকালে বলেছিলেন–এই কন্যার পুত্র আমার হবে, এই জন্য) কন্যার পুত্র বভ্রুবাহন মণিপুররাজেরই পুত্ররূপে গণ্য হয়েছিলেন। অর্জুনের সুভদ্রা নামে আর এক ভার্য্যা ছিল, তা হতে তোমার পিতা অভিমুন্য উৎপন্ন হন, তিনি সমস্ত অতিরথ বীরের জয়কারী ও মহাবীর ছিলেন। তা হতে রাজকন্যা উত্তরার গর্ভে তোমার

জন্ম হয়। রাজন, অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র তেজে কুরুবংশ পরিক্ষীণ হতে হয়েছিল, তুমিও তাতে বিনষ্ট হওয়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই প্রভাবে মৃত্যুর মুখ হতে জীবন সহিত তুমি মুক্ত হয়েছ।

হে বৎস, সম্প্রতি তোমার পুত্ররূপে মহাবীর এই জনমেজয় শ্রুতসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন বর্তমান রয়েছে। এর মধ্যে জনমেজয় তক্ষক হতে তোমার মৃত্যুর বিবরণ অবগত হয়ে রোষবশতঃ সর্পযজ্ঞের কাবষেয় তুরকে পুরোহিত পদে বরণ পূর্বক অশ্বমেধ ও অন্যান্য বহু যজ্ঞ করবেন। (এরপর ভবিষ্যৎ রাজবৃত্তান্ত বলছেন)

হে মহারাজ, জনমেজয়ের পুত্র শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট হতে ঋগাদি ত্রয়ী বেদ পাঠ করে যাগাদি–জ্ঞান, কৃপাচার্যের নিকট হতে অস্ত্রজ্ঞান এবং শৌনক হতে কর্মবিদ্যা লাভ করবেন। শতানীকের পুত্র সহস্রানীক, তা হতে অসীমকৃষ্ণ, এবং তা হতে নেমিচক্রের জন্ম হবে। এঁর রাজত্বকালে হস্তিনাপুরকে গঙ্গানদী গ্রাস করলে, তিনি কৌশাম্বী নগরে বাস করবেন। ঐ নেমিচক্রের উপ্ত নামে সন্তান হবে, তার পুত্র চিত্ররথ,তা হতে শুচিরথ জন্মিবেন। শুচিরথের পুত্র বৃষ্টিমান, তাঁর পুত্র সুষেন নামে মহীপতি হবেন। সুষেনের সুনীথ নামে তনয় হবে। তার পুত্র নৃচক্ষু। নৃচক্ষু হতে সুখীনলের জন্ম হবে। সুখীনল হতে পরিপ্লব, পরিপ্লব হতে সুনয়, সুনয় হতে মেধাবী, মেধাবী হতে নৃপঞ্জয়, তা হতে দূর্ব এবং দূর্ব হতে তিমি নামক পুত্রের জন্ম হবে। শতানীকের পুত্র দুর্দমন, তার অপত্য মহীনর। মহীনরের তনয় দণ্ডপানি, তাঁর সন্তান নিমি, সেই নিমি হতে ক্ষেমক উৎপন্ন হবেন।

হে মহারাজ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়–জাতির উৎপত্তি–ক্ষেত্র এ দেবর্ষিগণের সমাদর প্রাপ্ত এই বংশ রাজা ক্ষেমকের পরেই কলিযুগে অবসান প্রাপ্ত হবে।

অনন্তর মগধবংশীয় যে সকল নরপতি হবেন, তাদের বিবরণ বলছি। বৃহদ্রথ তনয় জরাসন্ধের যে পুত্র হবে, তাঁর পুত্র মাজারি। (এই মার্জারির অপর নাম পূর্বোক্ত সোমাপি) সেই মার্জারি হতে শ্রুতবা জন্মগ্রহণ করবেন। তার পুত্র অযুতায়ু এবং তাঁর হতে নিরমিত্রের জন্ম হবে। নিরামিত্রের পুত্র সুনক্ষত্র, তাঁর হতে বৃহৎসেন, তাঁর হতে কর্মজিৎ, তাঁর হতে সুতঞ্জয়, তাঁর হতে বিপ্র এবং বিপ্র হতে শুচি জন্মগ্রহণ করবেন। শুচি হতে ক্ষেম তাঁর হতে সুব্রত হতে ধর্মসূত্র, সুব্রত হতে সম, সম হতে দুমৎসেন (দৃঢ়সেন) তাঁর হতে সুমতি এবং সুমতি হতে সুবলের জন্ম হবে। সুবলের পুত্র সুনীথ, তার সন্তান সত্যজিৎ, এবং তাঁর পুত্র বিশ্বজিৎ এবং বিশ্বজিৎ হতে রাজা রিপুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করবেন। হে মহারাজ বৃহদ্রথের বংশধর এই নরপতিগণ সহস্র বৎসর রাজত্ব করবেন। এর পরবর্তী রাজাগণের কথা দ্বাদশ স্কন্ধে বলা হবে।

.

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

অনু, দ্রুহ্য, তুবসু প্রভৃতির বংশ কথন

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, যযাতি–পুত্র অনুর তিন পুত্রসভানর, চক্ষুও পরেক্ষু। সভানর হতে কালনর এবং তার পুত্র সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয়, তার পুত্র মহাশীল (মহাশাল পাঠান্তর), তাঁর পুত্র মহামনা এবং মহামনার দুই পুত্র–উশীনর ও তিতিক্ষু। তার মধ্যে উশীনরের চার পুত্র–শিবি, বর, কৃমি ও দক্ষ। শিবি হতে বৃষাদর্ভ, সুবীর, মদ্র ও কেকয়–এই চার পুত্রের জন্ম হয়। তিতিক্ষুর পুত্র রুদ্রথ, তার পুত্র হোম, তার পুত্র সুতপা এবং সুতপা হতে বলি উৎপন্ন হন।

বলির ক্ষেত্রে (অর্থাৎ তার পত্নীর গর্ভে) দীর্ঘতমা হতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুভ্র, পুন্ড্র ও ওড্র এই ছয়জন প্রত্যেকেই যথাক্রমে পূর্বদিক স্থিত ছয়টি দেশকে নিজ নিজ নামে পরিচিত করেন। (অর্থাৎ ঐ ছয়টি দেশের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুভ্র, পুন্ড্র ও ওড্র (উত্কল)–এই সকল নামকরণ করেছিলেন। অঙ্গ হতে খলপান এবং খলপান হতে দিবিরথের জন্ম হয়। দিবিরথের পুত্র ধর্মরথ, তার পুত্র চিত্ররথ নিঃসন্তান ছিলেন এবং তিনি রোমপদ নামে বিখ্যাত হন। রোমপদের সখা রাজা দশরথ তাকে দত্তকরূপে নিজ কন্যা শান্তাকে দান করেছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এই শান্তাকে বিবাহ করেন। একসময় রোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হলে (ঋষ্যশৃঙ্গ এখানে এলে বৃষ্টি হবে– ব্রাহ্মণগণ এরূপ নিশ্চয় করে বললে) বারাঙ্গণাগণ নৃত্য, গীত, বাদ্য বিবিধ বিলাস, আলিঙ্গন ও নানারূপে সকার দ্বারা মোহিত করে, (বিভাণ্ডুক ঋষি হতে) হরিণীর গর্ভে উৎপন্ন মুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে তপোবন হতে রাজার পুরীতে আনয়ন করলে রাজ্যে বৃষ্টিপাত হয়।

তারপর তিনি নিঃসন্তান রাজার সন্তানলাভের জন্য মরুদযজ্ঞ করে রাজাকে সন্তান দান করেন। রাজা দশরথও এই ঋষ্যশৃঙ্গ কর্তৃক অনুষ্ঠিত পুত্রযাগের ফলেই চারপুত্র লাভ করেছিলেন। রোমপাদের পুত্র চতুরঙ্গ তার পুত্র পৃথুলাক্ষ। পৃথুলাক্ষ হতে বৃহদ্রথ, বৃহকর্মা ও বৃহদ্ভানু–এই তিন পুত্রের জন্ম হয়। তার মধ্যে বৃহদ্রথের পুত্র বৃহমনা এবং তার পুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথের ভার্যা সম্ভূতির গর্ভে বিজয়ের জন্ম হয়। বিজয়ের পুত্র ধৃতি,তার পুত্র সকর্ম এবং তাঁর পুত্র অধিরথ।

নিঃসন্তান অধিরথ একসময় গঙ্গাতীরে ক্রীড়া করতে করতে, কন্যা অবস্থায় কুন্তীর গর্ভজাত এবং তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত পেটিকার মধ্যে অবস্থিত শিশুকে প্রাপ্ত হয়ে নিজ সন্তানরূপে পালন

করেছিলেন। হে মহারাজ, সেই পালিত পুত্রের নাম কর্ণ এবং তার পুত্র বৃষসেন। যযাতি-পুত্র দ্রুহ্যুর তনয় বভ্রু এবং তার পুত্র সেতু।

সেতুর পুত্র আরদ্ধ তাঁর পুত্র গান্ধার, গান্ধারের পুত্র ধৃত, তাঁর পুত্র দুর্মদ, দুর্মদের পুত্র প্রচেতা। ঐ প্রচেতার একশত পুত্র উত্তরদিকে অবস্থিত হয়ে ম্লেচ্ছগণের অধিপতি হয়েছিলেন। তুসুর সন্তান বহ্নি, বহ্নির পুত্র ভর্গ এবং ভর্গের পুত্র ভানুমান্। ভানুমানের পুত্র ত্রিভানু, তার পুত্র মরুও, তিনি অপুত্রক বলে পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, কিন্তু সেই দুষ্মন্ত রাজ্যলোভে আবার পুরুবংশে আশ্রয় করেছিলেন।

হে নরশ্রেষ্ঠ, এখন যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশ বর্ণনা করছি। ঐ বংশ অতিশয় পবিত্র, মানবগণের সকল পাপনাশক। যদুবংশের কথা শ্রবণ করলে মনুষ্যমাত্রেই সকল প্রকার পাপ হতে মুক্ত হয়। এই যদুবংশে ভগবান পরমাত্মা শ্রীহরি নররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

যদুর চারপুত্র–সহস্রজিৎ, ক্রোষ্ট্র, নল ও রিপু। তার মধ্যে সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ, শতজিতের তিন পুত্র মহাহয়, রেণুহয় ও হৈহয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম,তার পুত্র নেত্র, তাঁর পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র সোহনিজ, তার পুত্র ভদ্রসেন। ভদ্রসেনের দুই সন্তান–দুর্মদ ও ধনক। ধনক কৃতবীর্যের জনক, এছাড়া কৃষাগ্নি কৃতবর্মা ও কৃতৌজা এই তিন জনও ধনকের পুত্র। তাদের মধ্যে কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন। ইনি সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হয়েছিলেন এবং ভগবান শ্রীহরির অংশজাত দত্তাত্রেয় হতে যোগসম্পদ লাভ করেছিলেন। পৃথিবীতে অন্য কোন রাজা যজ্ঞ, দান তপস্যা যোগ শাস্ত্রজ্ঞান, বীরত্ব ও দয়াদির দ্বারা কার্তবীর্যাজুনের স্থান লাভ করতে পারবেন না। কার্তবীর্যাজুনের নাম স্মরণ করলে কারও বিত্ত নষ্ট হয় না। অব্যাহত পরাক্রম কার্তবীর্যাজুন পঁচাশি হাজার বছর ছয় ইন্দ্রিয়ের ভোগ করেছিলেন।

পরশুরামের সহিত যুদ্ধকালে কার্তবীর্যাজুনের সহস্র পুত্রের মধ্যে পাঁচটি মাত্র পুত্রই অবশিষ্ট ছিলেন, তাদের নাম–জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষভ, মধু এবং ঊর্জিত। তার মধ্যে জয়ধ্বজের পুত্র তালজ। তালজঙ্ঘের একশত পুত্র হয়েছিল, তারা তালজঙ্ ক্ষত্রিয় নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজা সগর এদের সংহার করেন। তালজঙ্মের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বীতিহোত্র তাঁর পুত্র মধু, বৃষ্ণি ও যদুর বংশ বলেই এই মধুকুল বৃষ্ণিকুল ও যদুকুল নামে এবং এই বংশের সন্তানগণ মাধব, বাষ্ণেয় ও যাদব নামে খ্যাত। যদুর পুত্র ক্রোষ্ট্র হতে বৃজিহ্বান্ জন্মগ্রহণ করেন। বৃজিহ্বানের পুত্র স্বাহিত, তাঁর পুত্র চিত্তরথ এবং তা হতে মহাভাগ শশবিন্দুর উদ্ভব হয়। তিনি তৎ জাতির শ্রেষ্ঠ চতুর্দশ মহারত্নের অধীশ্বর এবং অপরাজিত রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। (বিভিন্ন জাতীয়

বস্তুগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুর নাম মহারত্ন)। চতুর্দশ মহারত্ন–সর্বশ্রেষ্ঠ হস্তী,অশ্ব, রথ রমণী, বাণ, নিধি, মাল্য, বস্ত্র, বৃক্ষ, শক্তি, পশিস, মনি, ছত্র ও বিমান। মহাকীর্তি শশবিন্দুর সহস্র পত্নী ছিলেন, তাদের প্রত্যেক পত্নীতে এক এক লক্ষ সন্তান হওয়ায় তাহা হতে দশ লক্ষ সহস্র সন্তান উৎপন্ন হয়। সেই সমস্ত পুত্রের মধ্যে পৃথুশ্রবা, পৃথুকীর্তি, পুণ্যযশা ইত্যাদি ছয়জন প্রধান ছিলেন। তাদের মধ্যে পৃথুশবার পুত্র ধর্ম, তার পুত্র উশনা, তিনি শতাশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। হে মহারাজ,উশনার পুত্র রুচক, তাঁর পাঁচ পুত্র ছিলেন,তাদের নাম শ্রবণ কর–পুরুজিৎ, রুক্ম, রুক্মেষ, পৃথু ও জ্যামঘ, শেবীর পতি জ্যামঘ, নিঃসন্তান হয়েও শৈবার ভয়ে অন্য কার পরিগ্রহ করে নাই।

এক সময় তিনি শত্রুদের জয় করে, তাদের গৃহ হতে একটি কন্যা হরণ করে আনলেন। শৈব্যা সেই কন্যাকে রথের উপর দেখেই ক্রোধে অসহিষ্ণু হয়ে স্বামীকে এরূপ বললেন–হে প্রবঞ্চক, কে এই কন্যা, যাকে রথে করে আমার নিকট নিয়ে এসেছ? জ্যামঘ ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উত্তর দিলেন, এ কন্যা তোমার পুত্রবধূ, তখন শৈব্যা সবিস্ময়ে পতিকে বললেন–আমি বন্ধ্যা আমার কোন সপত্নীও নেই এ অবস্থায় এ কন্যা কিরূপে আমার পুত্রবধূ হতে পারে? তখন জ্যামঘ বললেন– হে রাজ্ঞি, তুমি যে পুত্র প্রসব করবে, এই কন্যা তারই স্ত্রী হবে।

হে মহারাজ, বিশ্বদেবগণ ও পিতৃগণ জ্যামঘের বাক্যের অনুমোদন করেছিলেন। তারপর শৈব্যা গর্ভবতী হয়ে একটি সুলক্ষণ পুত্র প্রসব করেন। ঐ বিখ্যাত পুত্র বিদর্ভ নামে খ্যাত হন এবং পরে এক সাধ্বী কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন।

.

চতুর্বিংশ অধ্যায়

যুদবংশ কথন এবং সেই বংশে শ্রীকৃষ্ণাবতারের সূচনা

শ্রীশুকদেব বললেন–হে মহারাজ, বিদর্ভ সেই পত্নীর গর্ভে কুশ, ক্রথ এবং বিদর্ভকুলনন্দন রোমপাদের জন্মদান করেন। ঐ রোমপাদের পুত্র বভ্রু এবং বভ্রু হতে কৃতি জন্মগ্রহণ করেন। কৃতির তনয় উশিক এবং উশিক হতে চেদি ও দমঘোষ প্রভৃতি নরপতিগণের জন্ম হয়েছিল। ক্রথের পুত্র কুন্তি, তার পুত্র বৃষ্ণি, তাঁর পুত্র নিবৃতি, তাঁর পুত্র দশাহ, তার পুত্র জীমূত, তাঁর পুত্র বিকৃতি, তাঁর পুত্র ভীমরথ। তার পুত্র নররথ, এবং নররথের পুত্র দশরথ। দশরথের পুত্র শকুনি, তাঁর পুত্র করম্ভি তার পুত্র দেবারাত, তাঁর পুত্র দেবক্ষত্র, তার পুত্র মধ, তার পুত্র কুরুবংশ এবং

কুরবংশের পুত্র অনু। অনুর পুত্র পুরুহোত্র, তার পুত্র আয়ু তার পুত্র সত্বিত, সাত্বতের সাত পুত্র–ভগমান, ভঝি, দিব্য, বৃষ্ণ, দেবাবৃধ, অন্ধক ও মহাভোজ।

হে আর্য মহারাজ, ভগমানের এক পত্নীর গর্ভে নিম্লোচি, কিকিন ও ধষ্টি এই তিন পুত্র এবং অপর পত্নীর গর্ভে শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ–এই তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দেবাবৃধের পুত্র ব তাদের (পিতা-পুত্রের) সম্বন্ধে কবিগণ প্রশস্তি রূপে এরূপ দুটি শ্লোক পাঠ করে থাকেন–আমরা দূর হতে, যেরূপ, শুনতে পাই, নিকটে এসেও সেরূপই দেখতে পাই, মহাত্মা ব মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ আর দেবব্ধ দেবতাগণের সমান। তাদের বংশজাত পঞ্চষষ্টি এবং ষট সহস্র ও অষ্টম সংখ্যক পুরুষ ব ও দেবাবুধের উপদেশে মোক্ষ লাভ করেছিলেন। সাত্বতের সন্তান মহাভোজ অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। তাঁর বংশে ভোজগণের উৎপত্তি হয়।

হে পরন্তপ, বৃষ্ণির দুই পুত্র–সুমিত্র ও যুধাজিৎ। যুধাজিতের পুত্র শিনি ও অনমিত্র। তাঁদের মধ্যে অনমিত্রের তনয় নিম্ন তার দুই সন্তান–সত্রাজিৎ ও প্রসেন। অনিমিত্রের শিনি নামে অন্য এক পুত্র ছিল, তার আয় সত্যক। সত্যকের পুত্র যুযুধান, তাঁর পুত্র জয়, তার পুত্র কুনি এবং কুনির পুত্র যুগন্ধর। অনমিত্রের অপর পুত্র বৃষ্ণি, তাহা হতে শয্যল্ক ও চিত্ররথ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। শয্যল্ক হতে দুই পুত্রের জন্ম হয়।

শয্যল্ক হতে গান্ধিনীর গর্ভে অক্রুর ভিন্ন আরও দ্বাদশ জন বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাদের নাম–আসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুর, মৃদুবিৎ, গিরি, ধর্মবৃদ্ধ, সুকর্মা, ক্ষত্রোপেক্ষ, অরিমদন, শত্রুঘ্ন, গন্ধমাদ ও প্রতিবাহু, এদের সুচীরা (সুচারা) নামে এক ভগিনী ছিলেন। অকুরের দুই পুত্র দেবমান ও উপদেব। চিত্ররথের পুত্র পৃথু, তদ্ভিন্ন বিদূরথ প্রভৃতি আরও অনেক সন্তান তার হয়েছিল। তারা সকলেই বৃষ্ণিবংশের সন্তান।

কুকুর ভজমান, শুচি, ও কম্বল বহিষ–এই চারজন অন্ধকের পুত্র। কুকুরের পুত্র বহ্নি, তাঁর পুত্র বিলোমা। বিলোমার পুত্র কপোত রোমা, তার পুত্র অনু। তুম্বরু নামক অনুর সখা ছিলেন। অনুর পুত্র অন্ধক। অন্ধকের পুত্র দুন্দুভি, তার পুত্র অবিদ্য, এবং অবিদ্যের পুত্র পুনর্বসু। পুনর্বসুর পুত্র আহুক এবং কন্যা আহুকীর তার মধ্যে আহুকী দুই পুত্র-দেবক ও উগ্রসেন।

দেবকের চার পুত্র দেববান, উপদেব, সুদেব এবং দেববর্ধন। তাদের ধৃতদেবা প্রভৃতি সাত ভগিনী ছিলেন–ধৃতদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, গৃহদেব ও দেবকী। বসুদেব এই সাত ভগিনীকেই বিবাহ করেছিলেন। কংস, সুনামা, ন্যগ্রোব, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহু, রাষ্ট্রপাল, বৃষ্টি ও তুষ্টি–

এই নয়জন উগ্রসেনের পুত্র। আর কংসা, কংসাবতী, কঙ্গ, শূরভূ, রাষ্ট্রপলিকা–এই পাঁচজন, উগ্রসেনের কন্যা। তারা বসুদেবের দেবভাগাদি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের ভার্য্যা ছিলেন।

অন্ধকপুত্র ভজমানের সন্তান ছিলেন বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র শূর, শূরের পুত্র ওজমান, ওজমানের পুত্র শিনি, শিনির পুত্র ভোজ এবং ভোজের পুত্র হৃদীক। হৃদীকের চারপুত্র–দেববাহু, শতধনু, কৃতবর্মা দেবমীঢ়। দেবমীঢ়ের পুত্র শূর, তার পত্নীর নাম মারিষা। শূর মারিষার গর্ভে দশটি নিপাপ পুত্র উৎপন্ন করেন। তাদের নাম-বসুদেবস, দেবভাগ, দেবশ্রবা, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, বৎসক ও বৃৎসক ও বৃক। বসুদেবের জন্মকালে দেবতাদের দুন্দুভি ও ঢাকের শব্দ হয়েছিল। এজন্য শ্রীহরির অধিষ্ঠানস্বরূপ বসুদেবকে আনকদুন্দুভি বলা হয়। পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রতিকীর্তি, শ্রুতশবা ও রাজাধিদেবীশূরের এই পাঁচ কন্যা বসুদেবাদির ভগিনী। শূর নিজ সখা কুন্তিরাজকে অপুত্রক দেখে নিজ কন্যা পৃথাকে সন্তানরূপে দান করেছিলেন। কোন সময়ে এই পৃথা (কুন্তী) গৃহাগত অতিথি দুর্বাসাকে সেবার দ্বারা তুষ্ট করে, তার নিকট হতে দেবহুতি নামে এক বিদ্যা লাভ করেন। (এই বিদ্যার প্রভাবে যে কোন দেবতাকে আহ্বান করলে তিনি নিকটে আসেন।) এক সময় কুন্তী ঐ বিদ্যার প্রভাব জানার জন্য শুচি হয়ে সূর্যদেবকে আহ্বান করেছিলেন। সূর্যদেব তৎক্ষণাৎ এসে উপস্থিত হলেন, তা দেখে বিস্মিত চিত্তে কুন্তী বললেন–হে দেব, আমি কেবল বিশ্বাসের জন্য বিদ্যার প্রয়োগ করেছিলাম, আমাকে ক্ষমা করুন এবং নিজস্থানে প্রত্যাগমন করুন।

সূর্যদেব বললেন–হে দেবী, দেবদর্শন কখনও নিষ্ফল হয় না। আমি তোমার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করব এবং যাতে তোমার যোনি দূষিত না হয়ে যায় আমি সেরূপ ব্যবস্থা করব। এই বলে সূর্যদেব গর্ভধান করে স্বর্গলোকে গমন করলেন। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় একটি কুমার ভূমিষ্ঠ হল। পৃথা লোকভয়ে ভীত হয়ে অতিকষ্টে নদীর জলে (পেটিকার মধ্যে করে) সেই পুত্রকে ত্যাগ করেছিলেন। তোমার পিতামহ সত্যবিক্রম পাণ্ডু সেই কুন্তীকে বিবাহ করেছিলেন।

করুষ–নরপতি বৃদ্ধশর্মা শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন। ঋষির অভিশাপগ্রস্ত (ভগবানের দ্বারপাল বিজয়, দিতিপুত্র হিরণ্যাক্ষ এখন) দ্রন্তবক্র তার গর্ভজ সন্তান। কৈকয়–বংশীয় ধৃষ্টকেতু শ্রুতকীর্তির পাণিগ্রহণ করেছিলেন। তাতে সন্তর্দন প্রভৃতি পাঁচটি পুত্রের জন্মেছিল। তার কৈকয়রূপে পরিচিত। রাজা জয়সেন রাজাধিদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, তাতে বিন্দু ও অনুবিন্দু নামে দুই পুত্রের জন্মদান করেন। তাঁর পুত্র শিশুপাল যার উৎপত্তি বিবরণ পূর্বে বলা হয়েছে। এরপর বসুদেবের ভ্রাতাদের পত্নী ও পুত্রদের বিবরণ বলছেন। দেবভাগের ভার্য্যা কংসা, তার

গর্ভে চিত্রকেতু ও বৃহদ্বল নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। দেবশ্রবা হতে কংসাবতীর গর্ভে সুবীর ও ইমান জন্মগ্রহণ করেন। কঙ্ক হতে নিজ পত্নীর কঙ্গর গর্ভে (বক)–সত্যজিৎ ও পুরুজিতের জন্ম হয়। সঞ্জয় রাষ্ট্রপালীর গর্ভে বৃষ, দুমর্ষণ প্রভৃতি পুত্রগণের জন্মদান করেন। শ্যামক হতে শুরভূমির গর্ভে হরিকেশ ও হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়। বৎসক মিশ্রকাশী নাম্মী অপ্সরার গর্ভে বৃক প্রভৃতি পুত্রদের জন্মদান করেন। বৃক দুধাক্ষীর গর্ভে তক্ষ, পুস্কর, মালা প্রভৃতি পুত্রদের উৎপাদন করেছিলেন। সুদামনী শমীক হতে সুমিত্র, অজন ও পাল প্রভৃতি পুত্র প্রসব করেন। নিজভার্য্যা কণিকার গর্ভে ঋতধাম ও অজয় নামে পুত্রদ্বয় উৎপাদন করেছিলেন।

দেবকী প্রভৃতি সাত ভগিনী এবং পৌরবী, রোহিনী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা ও ইলা– ইহারা বসুদেবের পত্নী ছিলেন। বসুদেব রোহিনীর গর্ভে বলদেব গদ, সারণ, দুর্মদ, বিপুল ও ধ্রুব এবং কৃত প্রভৃতি পুত্রগণের জন্মদান করেন। সুভদ্র, ভদ্রাবাহু, দুর্মদ, ভদ্র ও ভূত প্রভৃতি দ্বাদশ জন পৌরবীর গর্ভজাত সন্তান। নন্দ, উপানন্দ, কৃত্তক ও শূর প্রভৃতি মদিরার পুত্র বাসুদেব– ভার্যা কৌশল্যা (ভদ্রা) কেশি নামে কুলনন্দন একমাত্র পুত্র প্রসব করেন। বসুদেব হতে রোচনার গর্ভে হস্ত, হেমাঙ্গদ প্রভৃতি এবং ইলার গর্ভে সদুকুল– শ্রেষ্ঠ উরুবল্ক প্রভৃতি পুত্রগণের উৎপত্তি হয়েছিল। হে মহারাজ, বসুদেব হতে ধৃতদেবার গর্ভে বিপৃষ্ঠ নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। শান্তিদেবার গর্ভে প্রশম প্রথিত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। রাজন্য, কল্প, বর্ষ প্রভৃতি দশ জন উপদেবার পুত্র। শ্রীদেবার গর্ভে বসু, হংস ও সুবংশ প্রভৃতি ছয়জন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দেবরক্ষিতা গদ প্রভৃতি নয় জন পুত্র লাভ করেন। ধর্ম যোদ্ধা অষ্টবসুর জন্মদান করেন। সেরূপ বসুদেবও সহদেবার গর্ভে প্রবরস, তমুখ্য প্রভৃতি আটটি পুত্রের উৎপাদন করেছিলেন।

এইরূপ উদারমতি বসুদেব দেবকীর গর্ভেও আটটি পুত্রের জন্মদান করেন। তাদের নাম কীর্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজু, সংমর্দন, ভদ্র এবং সপ্তম নাগরাজ সংকর্ষণ। হে মহারাজ, ভগবান স্বয়ং শ্রীহরিই শ্রীকৃষ্ণরূপে তাদের অষ্টম পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তোমরা পিতামহী মহাভাগা সুভদ্রাও তাদেরই কন্যা। হে রাজন, যে যে সময়ে ধর্মের ক্ষয় এবং পাপের বৃদ্ধি হয়, সেই সেই সময়ে ভগবান শ্রীহরি অবতাররূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। হে মহারাজ, ভগবান স্বয়ং মায়ার নিয়ন্তা, সর্বসঙ্গ–রহিত। সকলের সাক্ষী এবং সর্বব্যাপী। এ অবস্থায় একমাত্র মায়ার বিলাস ব্যতীত তার জন্ম বা কর্মের কোন হেতু থাকতে পারে না। ভগবানের মায়ার বিলাস জীবের প্রতি অনুগ্রহ–স্বরূপ, যেহেতু প্রলায়ান্তে জীবের দেহাদি সৃষ্টির দ্বারা ধর্মাদির প্রবর্তনের জন্যই মায়িক সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটে থাকে। আবার এই মায়ার বিলাস শ্রবণ করলে, জীবের দেবাদি সৃষ্টির নিবৃত্তিহেতু আত্মলাভ (মোক্ষপ্রাপ্তি) সম্ভব বলে, ইহা তাদের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ। (ভগবানের এই মায়ার বিলাস পৃথিবীর প্রতি অনুগহ-স্বরূপ)। হে

মহারাজ, অসংখ্য সেনাবৃন্দের অধিপতি রাজচিহ্নধারী অসুরগণের ভারে আক্রান্ত পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্যও তার এই উদ্যম জানবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত এই ধরাতলের যে সকল অপরিমেয় কর্মের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

তা সুরেশ্বরগণের মনের দ্বারাও বিচারের অযোগ্য। কলিযুগে যে সকল ভক্ত জন্মগ্রহণ করবেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের দুঃখ, শোক ও অজ্ঞান-নাশক স্বীয় পরম পবিত্র যশোরাশি বিস্তার করে গিয়ছেন। ঐ যশ সাধুপুরুষদের কর্ণামৃত ও শ্রেষ্ঠ তীর্থস্বরূপ, একমাত্র শ্রোত্ররূপ অঞ্জলির দ্বারা পান করলে মানুষ কর্মবাসনা পরিত্যাগ করতে সমর্থ হয়, হে মহারাজ, ভোজ, বৃষ্টি, অন্ধক, মধু, শূরসেন, দশাহ, কুরু, সৃঞ্জয় ও পানজুর বংশধরগণ নিরন্তর তাঁর চরিতাবলির প্রশংসা করে থাকেন। সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ, সুস্মিত দর্শন, উদার বচনা, বিক্রমলীলা এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর নিজ বিগ্রহ দ্বারা সমস্ত মনুষ্যলোককে আমোদিত করেছেন।

তার হাস্যবিলাসযুক্ত বদনমণ্ডল, মকরাকৃতি কুণ্ডল–যুগলের শোভায় মহোহর কর্ণযুগল ও সমুজ্জলগণ্ডযুগলের সমাবেশে, অতিসুন্দর বলে উহা সর্বদাই দর্শক মণ্ডলীর উৎসব বিস্তার করে। নর ও নারীগণ নয়নদ্বারা সানন্দে সেই বদনশোভা নিরন্তর পান করেও পরিতৃপ্ত হতে পারেন নাই, কিন্তু নিমেষহেতু দর্শনের বিঘ্ন ঘটায়, নিমেষ-সৃষ্টিকর্তা নিমির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। (সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণলীলা বলছেন)-হে রাজন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ নিজ, চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হয়ে পশ্চাৎ মানবাকৃতি ধারণপূর্বক পিতৃগৃহ হতে ব্রজে গমন করেন।

পরে ব্রজবাসীদের স্বার্থ সম্পাদন পূর্বক শত্রুগণকে বধ করে বহু রমণীকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের গর্ভে অসংখ্য পুত্র উৎপাদনপূর্বক সেই পরম পুরুষ লোকসমাজে স্বকীয় বেদমার্গ বিস্তারের জন্য যজ্ঞসমূহের দ্বারা, যজ্ঞেশ্বররূপী নিজেরই অর্চনা করেছিলেন। সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই পৃথিবীর গুরুতর ভার হরণের জন্য কুরুবংশীয় গণের পরস্পর সজ্ঞাত বিবাদমূলক যুদ্ধে কালরূপী নিজের দৃষ্টিমাত্র–দ্বারাই পৃথিবীস্থিত রাজগণের সেনা সমুদয় সংহার করে অর্জুনের বিজয়বার্তা ঘোষণা করেন। পরে লীলা অবসানে উদ্ধবের নিকট পরম তত্ত্ব, উপদেশ করে সেই নিজেরূপেই স্বধামে গমন করেছেন।

কূর্মপুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ

উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

বিষ্ণুকে নমস্কার করে ব্রহ্মার দ্বারা কথিত পুরাণের বিবরণ দেব। নারায়ণ, নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতাঁকে প্রণাম করে শুরু করছি কুর্ম পুরাণ।

নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিরা রোমহর্ষণ নামক পূতচরিত্র এক সূতস্তূতি পাঠককে পুরাণ-সংহিতার বিষয় প্রশ্ন করলেন– হে মহাবুদ্ধি সূত, তুমি ইতিহাস ও পুরাণ বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান ব্যাসকে সেবা করেছ। লোকে রোমহর্ষণ বলে কারণ দ্বৈপায়ন ঋষির বাক্য শুনে তাঁর শরীর রোমঞ্চিত হয়েছিল পুরাণ– সংহিতা বলবার জন্য, ব্রহ্মার যজ্ঞ শেষে পুরুষোত্তমের অংশে উৎপন্ন হয়েছিল। তুমি পুরাণ বিশেষজ্ঞ।

তখন সূত সত্যবতীর পুত্র ব্যাসকে প্রণাম করে বলা শুরু করলেন। তিনি বললে–এই পুরাণ কথা শুনলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। পাপিষ্ঠ পরম গতি লাভ করে, এই পবিত্র কথা নাস্তিকের কাছে বলতে নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণের মধ্যে যে সমস্ত ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে। যাঁরা শান্তি ও ধার্মিক তাদের কাছেই নারায়ণ মুখনিঃসৃত এই পুরাণ কথা বলতে হয়।

পুরাণ আঠারোটি– ব্রহ্মপুরাণ, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, ভবিষ্য, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড়, বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। কিছু উপপুরাণও আছে। প্রথমটি হল সনৎকুমার কথিত আদিপুরাণ, নরসিংহ পুরাণ, কুমার কথিত স্কন্দপুরাণ, শিব কথিত শিবপুরাণ, দুর্বাসা কথিত আশ্চর্য পুরাণ, নারদীয় পুরাণ, এছাড়া আছে কপিল ও বামন পুরাণ। উশান বলেছেন নবম পুরাণটি আর ব্রহ্মাণ্ড বরুণ কালিকা, মহেশ্বত শাম্ব, সবার্থ প্রকাশক সেরে, পরাশর, মারীচ ও ভার্গব পুরাণ, এই উপপুরাণও আঠারোটি।

পবিত্র কূর্মপুরাণ হল পঞ্চদশ পুরাণ। সংহিতার প্রভেদ হেতু এবং চার ভাগ ব্রাহ্মী ভগবতী, গৌরী, বৈষ্ণবী যা ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল দান করে। এতে ছয় হাজার শ্লোক সংকলিত। এতে আছে সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা, রাজা ও ঋষির বংশাবলী, কাল গণনা, রাজা ও ঋষিদের চরিত্রগাথা, দিব্য, পুণ্য প্রসঙ্গের কথা, এই কথাকে ধার্মিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণরাই ধারণ করতে পারেন। ব্যস কথিত পুরাকালের কথাই তিনি বললেন।

মন্দর পর্বতকে মন্থন দণ্ডরূপে গ্রহণ করে ক্ষীরসাগর মথিত করা হয়। অমৃত পাবার জন্য দেবতা ও দানবরা মিলিত হলে জনার্দন দেব হিতার্থে মন্দর পর্বতকে ধারণ করেন। এতে দেব ও মহর্ষিরা তুষ্ট হন। এরপর নারায়ণ বল্লভা দেবী উত্থিত হলে বিষ্ণু তাকে গ্রহণ করেন।

তার রূপচ্ছটায় সকলে মুগ্ধ হন। তখন দেবতারা এই বিশালাক্ষ্মী দেবীর পরিচয় জানাতে চাইলেন। তখন বিষ্ণু দেবতাদের জানালেন, এই দেবী তারই এক নিজরূপ। ইনি ব্রহ্ম রূপিণী পরমা শক্তি। ইনি তারই মায়া, প্রিয়া এবং অন্তহীনা। ইনি জগদ্ধাত্রী, এই দেবীর মায়ার সাহায্যেই বিষ্ণু দেবাসুর জগৎকে সংহার করে থাকেন।

এই বিপুল মায়াকে অতিক্রম করা যায় সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় আত্মা, এই সকল জ্ঞানের দ্বারা জেনে. ব্রহ্মা, ঈশাণ সকল দেবতারা শক্তিমান হয়েছেন এই মায়ার অংশে অধিষ্ঠান করে। ইনি সর্বশক্তি ও সর্বজগৎ প্রসূতি। পদ্মালয়া, শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, হস্তা, মাল্য শোভিতা, কোটি সূর্যদীপ্তা, কোন দেব তাঁর মায়া অতিক্রমে সমর্থ হন না।

বাসুদেবের কথা শুনে মুনিরা কালক্ষয়ের পরের ঘটনা জানতে চাইলেন। বিষ্ণু তখন বলতে শুরু করলেন–ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক এক বিখ্যাত দ্বিজবর যিনি পূর্বজন্মে রাজা ছিলেন। মহাদেব ও দেবতারাও তাকে পরাজিত করতে পারেননি। তিনি বিষ্ণুর স্মরণ নেন যখন জানতে পারেন সকল দেবতারা তাঁর শক্তিতে সংস্থিত। বিষ্ণু তাঁকে বলেন ব্রাহ্মণ রূপে জন্ম নিতে, ইন্দ্রদ্যুম্ন নিষ্পাপ তাই বিষ্ণু তাকে আদি গুহ্য তত্ত্ব প্রদান করবেন।

যা জেনে মৃত্যুর পর রাজা বিষ্ণুতে লীন হয়ে যাবেন। এরপর তিনি পৃথিবীতে বিষ্ণুর অন্য অংশে অবস্থিত হয়ে সুখে বাস করবেন। এরপর ইন্দ্রদ্যুম্ন কালধর্ম প্রাপ্ত হলেন, এরপর তিনি শ্বেতদ্বীপে বিষ্ণু ভক্তের যোগ্য দেব দুর্লভ বিবিধ সামগ্রী ভোগ করে পৃথিবী পালন করতে লাগলেন এবং ব্রাহ্মণ কুলে। জন্মগ্রহণ করলেন।

তিনি পরমেশ্বরের উপাসনা করতেন। ব্রত, উপবাস, নিয়ম, হোম এবং ব্রাহ্মণ সন্তুষ্টি বিধান করে, তিনি যোগীগণের অন্তরস্থিত মহাদেবের অর্চনা করতেন। পরমা কলা তাঁকে বিষ্ণু থেকে উদ্ভূত দিব্য আত্মরূপ প্রদর্শন করলেন। তিনি বিষ্ণু প্রিয়াকে বললেন–হে বিশালাক্ষ্মী, হে বিষ্ণু চিহ্নযুক্তা শুভময়ী দেবী আপনার প্রকৃত স্বরূপ বলুন। লক্ষ্মী তখন প্রিয় বিষ্ণুকে স্মরণ করে সহাস্যে ব্রাহ্মণকে বললেন– তিনি নারায়ণের সঙ্গে অভিন্না, তারই স্বরূপময়ী, পরমা মায়া। তাঁর সাথে নারায়ণের কোনো প্রভেদ নেই। তিনিই পরমব্রহ্ম ও পরমেশ্বর। তিনি তাদের ওপর প্রভুত্ব করেন না, যারা সংসারে জীবগণের আশ্রয় পুরুষোত্তমকে কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগের পথে উপাসনা করেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন এই কথা শুনে মাথা নত করে দেবীকে প্রণাম করে বললেন–সেই নিত্য নিষ্কল, অচ্যুত ভগবান ঈশ্বরকে জানব কী উপায়ে? ব্রাহ্মণের কথায় দেবী বললেন।

নারায়ণ স্বয়ং উপদেশ দেবেন। বিষ্ণুকে স্মরণ করবে। সেখান থেকে অদৃশ্য হলেন বিপ্রকে দু'হাতে স্পর্শ করে। ব্রাহ্মণ পরম সমাধি অবলম্বন করে বিষ্ণুর আরাধনা করতে লাগলেন।

জগন্ময় হরি দেখা দিলেন বহুকাল পরে ব্রাহ্মণের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে। তাকে দেখে ইন্দ্রদ্যুম্ন জানুতে বসে তার স্তব করতে লাগলেন। হে যজ্ঞেশ্বর অচ্যুত, গোবিন্দ, মাধব, অনন্ত, কেশব, বিষ্ণু, হৃষীকেশ ও জগতের আত্মা, বিশ্বমূর্তি সনাতন হরি সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয়ের বার্তা, ত্রিগুণময়, অখণ্ড স্বরূপ, বিশ্বরূপ, বাসুদেব তুমি জগতের কারণ, তোমার আদি মধ্য ও অন্ত নেই।

তুমি জ্ঞান দ্বারা লব্ধ তোমার বিকার, মায়া, ভেদ ও অভেদ নেই। তুমি আনন্দ স্বরূপ, পরিত্রাতা, শান্ত, অপ্রতিহত আত্মা, অরূপ পরমার্থ, মায়ার অতীত, পরমাত্মা পরমেশ্বর, ব্রহ্মস্বরূপ, তানুতর, মহান দেবতা, মঙ্গলময়, পরযেষ্ঠী পুরুষোত্তম, সৃষ্টির মূল জীবের পরমগতি, সর্বভূতের পিতামাতা, পরমজ্যোতি, চিৎস্বরূপ, অখণ্ড আকাশ, সকলের আশ্রয়, অপ্রকাশ, অন্ধকারের পারাপার অনন্ত, যোগীর জ্ঞানদ্বীপ, পরম পদ রূপ তোমাকে প্রণাম, তুমি সকলের ও আমার আশ্রয়।

তখন স্তুতিকারী ইন্দ্রদ্যুম্নকে দুহাতে স্পর্শ করলেন ভগবান। এবং তাতে সে পরমতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করলেন।

এরপর তিনি হর্ষচিত্তে পীতবাস জনার্দনকে প্রণাম করে বললেন–হে পুরুষোত্তম, তোমার কৃপায় ও অনুগ্রহে আমি গন্ধরূপ জ্ঞান লাভ করেছি, যার একমাত্র বিষয় ব্রহ্ম, তুমি বিধাতা, বাসুদেব ও জগন্ময় আমার কর্তব্য বল।

তাঁর কথায় বিষ্ণু অল্প হেসে বললেন–যে পুরুষরা বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করেন, তারা জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগের পথ ধরে মহাদেবকে অর্চনা করবেন। এর কোন অন্যথা যেন না হয়, মোক্ষলাভকারী ব্যক্তি এই পরম তত্ত্ব জেনে ঈশ্বরের আরাধনা করবেন। মায়াময় জগৎকে মনে করে অদ্বিতীয় আত্মাকেই ধ্যান কর। তবেই সাক্ষাৎ পাবে পরমেশ্বরের। এরপর তিনি তিন ভাবনার কথা বললেন। প্রথমটি হলো তাঁর সম্বন্ধে ভাবনা, দ্বিতীয়টি ব্যক্তি সম্বন্ধে ও তৃতীয়টি ব্রহ্ম সম্বন্ধে। যা সকল গুণের অতীত, জ্ঞানী ব্যক্তি যেকোন একটা ভাবনা অবলম্বন করে ধ্যান করবেন। সমস্ত প্রযত্নে এই বিষয়ে নিষ্ঠাবান হয়ে বিশ্বেশ্বরকে উপাসনা করলে মোক্ষলাভ হয়।

তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন জানতে চাইলেন–পরমতত্ত্ব কী, বিভূতিই কী, কার্য ও কারণ কী?

ভগবান উত্তরে বললেন, এক অবিকার্য ব্রহ্মই পরমতত্ত্ব। তিনি নিত্যানন্দময়, অন্ধকারের অতীত ও পরম জ্যোতিস্বরূপা। তার নিত্য বৈভবকে বিভূতি বলে। জগৎ তার কার্য এবং শুদ্ধ, অক্ষর, অব্যক্তই তার কারণ। তিনি সকল জীবের অন্তর্যামী, তাঁর ইচ্ছাবলে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়। যথাযথ ভাবে তত্ত্ব জেনে শাশ্বত ব্রহ্মকে সম্যকভাবে যেন ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাসনা করে। * ইন্দ্রদ্যুম্ন জানতে চাইলেন–পরমব্রহ্মর উপাসনা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম কি প্রকার? তিন ভাবনার স্বরূপ কি? পুরাকালে এর সৃষ্টি বা ধ্বংস কিভাবে হয়। বংশ ও মন্বন্তর, কয়টি পবিত্র, ব্রত, তীর্থ সূর্য ইত্যাদি, গ্রহের সন্নিবেশ এবং পৃথিবীর দৈর্ঘ্য বা বিস্তার কী পরিমাণ? দ্বীপ সমুদ্র, পর্বত নদ-নদী–এ সবের সংখ্যা কত?

কূর্ম তখন জানালেন, তিনি অনুকম্পাবশত ভক্তদের কাছে সব কিছুর বর্ণনা দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সব ব্যাখ্যা করেন ও অনুগৃহীত করে সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হন। ভক্তি ভরে পবিত্র চিত্তে বিধান অনুসারে পরমেশ্বরের আরধনা করেছিলেন। পুত্রের প্রতি স্নেহ বিসর্জন দিয়ে, সকল স্কন্ধ থেকে নিযুক্ত হয়ে, পরিগ্রহ ত্যাগ করে সকল কর্মকে সমর্পণ করেছিলেন।

তিনি এভাবেই বৈরাগ্য আশ্রয় করেছিলেন। নিজের মধ্যে সকল জগৎকে অনুভব করে তার অক্ষর পূর্বিক ব্রহ্মবিষয়ক চরম উপলব্ধি হল, যার দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আস্বাদ করা যায়। আলস্য ত্যাগ করে কুম্ভক পূরক প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর প্রভুত্ব লাভ করে যাঁর দর্শন পাবার জন্য ব্যাকুল হন।

আদিত্যের নির্দেশে মানস সরোবরের উত্তরে এক পর্বতে গমন করলেন যোগীন্দ্র। এক, অনুপম বিমানের আবির্ভাব হল যোগবিভূতির প্রভাবে। তার সূর্যসম দীপ্তি। পথের মাঝে যোগীন্দ্রকে দেখে অনুসরণ করলেন দেব, গন্ধর্ব, অপ্সরা সিদ্ধ আর ব্রহ্মর্ষিরা। এরপর যোগীন্দ্র দেববন্দিত এক স্থানে প্রবেশ করলেন। সেখান পরম পুরুষ স্বয়ং থাকেন। সেই স্থান উদ্ভাসিত অযুত সূর্যের জ্যোতিতে, তিনি দেব দুর্লভ অন্তভবনে প্রবেশ করলেন ও সর্বজীবের পরম আশ্রয় আদি অন্ত-হীন দেবদেব পিতামহকে ধ্যান করতে লাগলেন।

এক পরম অদ্ভুত জ্যোতির অবির্ভাব হল। বিপুল তেজঃরাশি স্বরূপ দেবতা। তাঁকে দেখতে পারেন না ব্রহ্মবিদ্বেষীরা। তার চার মুখ। তার শরীর অতি সুন্দর। তিনি প্রদীপ্ত প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায়, দেবতার আলিঙ্গনে আবদ্ধ সেই দ্বিজবরের শরীর থেকে বিপুল জ্যোতি বেরিয়ে এসে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করল। এর নাম হল ঋক, যজুঃ ও সাম।

যা পবিত্র নিষ্কলুষ পাদস্বরূপ, যোগীদের আদি দ্বার হল যেখানে হব্য এবং ভব্য, সেবী হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম রয়েছেন সেই স্থান, তা দীপ্তিমান ব্রহ্ম তেজে। তা মনীষীদের আশ্রয়স্থল ও মনোরম শোভিত। ভগবান ব্রহ্মা ঐ তেজোময় মুনির দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখতে পেলেন সেই ঐশ্বরিক তেজকে শান্ত। সর্বগামী, কল্যাণময়, আত্মস্বরূপ, অক্ষয়, শূন্যময় বিষ্ণুর পরম পদবিদ্যমান, আনন্দময় স্থির যা পরমেশ্বরের ব্রহ্মস্থান।

তিনি সমস্ত জীবের মধ্যস্থিত আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরম ঐশ্বর্য লাভ করেন। আত্মার পরম মুক্তি রূপ অক্ষয়লোক গমন করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত প্রযত্নের সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম মেনে অন্তিম ভাবকে আশ্রয় করলে মায়ালক্ষ্মীকে অতিক্রম করতে পারবেন।

পাতালবাসী কূর্মরূপ দেব জনার্দন বিষ্ণু নারদ প্রমুখ মহর্ষিদের জিজ্ঞাসায় দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে সর্বোৎকৃষ্ট যে কূর্মপুরাণ বর্জন করেছিলেন। পুরাণ পাঠ করা ও শ্রবণ করা অতি গৌরবের বিষয়। এর দ্বারা কীর্তিলাভ হয়, মানুষের মুক্তি আসে। পুরাণের এক অধ্যায় বা উপাখ্যান শুনলেও সকল পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, ব্রহ্মলোকে পূজো পাওয়া যায়। এই পুরাণ বলেছেন কূর্মরূপী দেবাদিদেব যাঁকে ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করা উচিত।

২

কূর্ম বললেন, আপনারা যা জিজ্ঞাসা করছেন তার বর্ণনা জগতের পক্ষে হিতকর, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের ঘটনার দ্বারা এই পুরাণের ঘটনাবলী শ্রবণ মানুষের পক্ষে পুণ্যদায়ক। এতে মোক্ষ ও ধর্মের কথা বলা হয়েছে।

স্বয়ং নারায়ণ পুরাকালে বিপুল নিদ্রা অবলম্বন করে সর্পশয্যায় শয়ান ছিলেন। তিনি সৃষ্টির কথা চিন্তা করলেন রাত্রি শেষে জেগে উঠে, এতে পুলকিত হয়ে জন্ম নিলেন রৌদ্রময়, ক্রোধময়, শূলহস্ত, ত্রিনেত্র, সূর্যের মতো দীপ্তিমান দেব মহেশ্বর। তিনি জন্ম নিলেন ত্রিভুবন দগ্ধ করে। দেবী লক্ষ্মী রূপে জগৎ আলো করে আমার পাশে এসে বসলেন। পদ্মের মতো তার চোখ দুটি সুন্দর তার মায়ায় মুগ্ধ সকল জীব। এই দেবী সুপ্রসন্না, কল্যাণময়ী তার স্বর্গীয় রূপ, এই দেবী মহামায়া অক্ষয়রূপ নারায়ণী।

ব্রহ্মা তাকে দেখে বললেন, সকল জীবের মোহ সৃষ্টির জন্য আত্মস্বরূপিণী দেবীকে নিয়োগ করতে। তার এই বিশাল সৃষ্টির বিস্তার ঘটবে যদি মাধব তা করে তবে। এরপর দেবী লক্ষ্মীকে আদেশ দিলেন দেব অসুর মানব সহ সকল জগৎকে মোহিত করতে জগতের পত্তন ঘটাতে।

কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের দিকে দৃষ্টি দিও না। যোগকারী আপন ব্রাহ্মণদের বাদ দিও। মহাযজ্ঞকারী ব্রাহ্মণদের দিকে তাকাবে না।

স্পর্শ করো না জপ, হোম, বেদপাঠ আর পূজাদির দ্বারা মহেশ্বরের উপাসনাকারীদের, প্রভাবিত করবেনা, সেইসব মানুষেদের যারা ঈশ্বরে সমর্পিত,প্রাণাময় ক্রিয়া অভ্যাসকারী, রুদ্র নাম জপকারী, তাদের কোন পাপ নেই। তাদের ওপর মোহজাল বিস্তার করো না যারা স্বধর্মের সেবায় ও ঈশ্বরের আরাধনায় রত রয়েছেন।

মহামায়া লক্ষ্মী এভাবে তার নির্দেশমতো কাজ করলেন। ভগবৎ পত্নী লক্ষ্মীর পুজো করলে অতুল বৈভব, ভোগ সামগ্রী, মেধা, যশ ও ফল প্রদান করেন।

লোক পিতামহ ব্রহ্মা তাঁর আজ্ঞায় পূর্বের ন্যায় চরাচর প্রাণী সৃষ্টি করলেন। যোগ বলে জন্ম দিলেন মারীচি, ভৃগু, আঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠের। ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক মরীচি প্রমুখ। পিতামহ তার মুখ থেকে ব্রাহ্মণদের, কাঁধ থেকে ক্ষত্রিয়দের, ঊরু থেকে বৈশ্য ও পা থেকে শূদ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন। শূদ্র ভিন্ন অন্য তিন বর্ণ ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল, এর জন্যই যজ্ঞ সম্পাদিত হতে পেরেছিল। ব্রহ্মা প্রথমে অনাদি, অনন্ত, বেদময়ী দিব্যবাণী সৃষ্টি করেছিলেন। সমস্ত প্রবৃত্তি উদ্ভূত হল তা থেকে। জ্ঞানী ব্যক্তিদের আসক্তি হয় না কারণ তার অনুশীলন করলে পাষণ্ডী করতে হয়। অনুষ্ঠান করতে হয় বেদজ্ঞ ঋষিরা পুরাকালে যা স্মরণ করেছিলেন। অন্য শাস্ত্রে মনোযোগী হওয়া উচিত নয়, বেদবহির্ভূত যে সকল স্মৃতি রয়েছে, যা কুতর্কপূর্ণ শাস্ত্র আছে, যা সবই পরকালে নিষ্ফল হয়। যা সব অন্ধকারে ভরা। পুরাকালে যে সকল প্রাণী জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাতে কোথাও কোন বাধা ছিল না। তাদের চিত্ত ছিল পবিত্র আর তারা স্বধর্মের অনুষ্ঠান করত। সে সবই পরকালে নিষ্ফল হয়।

পুরাকালে যে সকল প্রাণী জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাদের কোনও বাধা ছিল না। তাদের চিত্ত ছিল পবিত্র আর তারা স্বধর্মের অনুষ্ঠান করত, তাদের স্বধর্মের বাধাস্বরূপ আসক্তি দ্বেষ প্রভৃতি অধর্ম উৎপন্ন হল। অতি সহজ সিদ্ধি তারা লাভ করতে পারল না। অন্য একরকম এক সিদ্ধি লাভ হয়েছিল পরে সেই সিদ্ধি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আবার কালক্রমে কর্মজনিত হস্তসিদ্ধির সৃষ্টি করে। সর্বব্যাপী ব্রহ্মা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দেন। প্রজাপতির প্রত্যক্ষ মূর্তিরূপে যে ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন, সেই ভৃগু প্রমুখ ঋষিরা মনুর মুখ থেকে তা শুনে ধর্মের ব্যাখ্যা করলেন। নির্দিষ্ট হয়েছে ছয়টি কর্ম– যজন, যাজন, দান, পরিগ্রহ, অধ্যাপন ও

অধ্যায়ন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ধর্ম হিসেবে যদিও দান, অধ্যায়ন ও যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, দণ্ডধারণ এবং যুদ্ধ ক্ষত্রিদের পক্ষে আর কৃষিকার্য বৈশ্যদের পক্ষে প্রশস্ত, শূদ্ররা ধর্মলাভ করবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করে। এছাড়া কারুশিল্প আর পাকযজ্ঞ প্রভৃতি কাজও তারা করতে পারে।

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ, অগ্নিরক্ষা, অতিথিসেবা, যজ্ঞ, দান ও দেবপূজা গৃহস্থের সাধারণ ধর্ম। বনবাসী বা বানপ্রস্থের ধর্ম–হোম, ফলমূল ভক্ষণ, বেদপাঠ, তপস্যা এবং বিধি অনুসারে, সংবিভাগ, ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভক্ষণ, মৌনিত্ব, তপস্যা, ধ্যান, সম্যক জ্ঞান ও বৈরাগ্য, ভিক্ষুদান ধর্ম ভিক্ষাচারণ, গুরুর সেব করা, বেদ অধ্যায়ন সন্ধ্যাহ্নিক ও অগ্নিকার্য ব্রহ্মচারীদের ধর্ম। পদ্মসম্ভব ব্রহ্মা ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী, ভিক্ষা। তিন আশ্রমাবলম্বীর সাধারণ ধর্মই ব্রহ্মচর্য। অন্য রমণীর সঙ্গে বর্জন করে, নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই পর্বদিন ছাড়া অন্য দিন, ঋতুকালে সহবাস করতে হয়।

গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য, গর্ভসঞ্চার না হওয়া পর্যন্ত এই রকম করার বিধান হয়েছে। এই কর্তব্য করতে হয় সাবধানে। তা না হলে স্পর্শ করে জ্বণ হত্যার পাপ। প্রত্যহ বেদাভ্যাস করা পরম ধর্ম, গৃহস্থের অতিথির সেবা ও দেবতার আরাধনা করা উচিত। অগ্নিতে কাষ্ঠ প্রদান করতে হয় প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও প্রাতঃকালে। অন্য দেশে গৃহস্থ গেলে তার পুত্র, স্ত্রী অথবা ঋত্বিক এই কাজ করবে।

প্রধান তিন আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রম এটি বেশি উপজীব্য, বেদেও একেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এটিই ধর্মসাধনের একমাত্র উপায়, পরিত্যাগ করা উচিত অর্থ ও কামহীন ধর্মকে। যে ধর্ম সর্বলোকের বিরুদ্ধে আচরণও করা উচিত না। ধর্মই ইঙ্গিত বস্তু দান করে আর ধর্মই মোক্ষের কারণ, ধর্ম, অর্থ, কাম– এই ত্রিবর্গই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ বলে কথিত হয়েছে। সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করবেন যে, সকল পুরুষ, তারা গমন করেন ঊর্ধ্বলোকে।

রজোগুণকে আশ্রয় করেন যারা তারা মধ্যস্থানে ও তমোগুণের শরণকারীরা অধোদেশে পতিত হন। তিনি অর্থ ও কামকে ধর্মের সঙ্গে গ্রহণ করেন, তিনি ইহলোকে যেমন সুখী হন পরলোকেও আনন্দ লাভ করেন। অর্থ বাহ্যবস্তু দেয় ও ধর্ম থেকে মোক্ষ, অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হন। যিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মাহাত্মের কথা জানেন ও তার অনুষ্ঠান করেন; তিনি অর্থ ও কাম ত্যাগ করে ধর্মকে আশ্রয় করবেন।

এই স্থাবর ও জঙ্গম চরাচরকে ধরে আছে ধর্মই। ধর্মই আদি, অনন্ত ব্রহ্ম শক্তি, জ্ঞানমূলক কর্মের দ্বারা ধর্মলাভ হয়। কর্মের অবলম্বন করবে জ্ঞানের সঙ্গেই। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক দুপ্রকার বৈদিক ধর্ম। নিবৃত্তিমূলক কর্ম হল জ্ঞানপূর্বক কর্ম। প্রবৃত্তিমূলক কর্ম এর বিরুদ্ধ সব কিছু। পরমলোক প্রাপ্ত হল যে নিবৃত্তিমূলক কর্মের আশ্রয়, নিবৃত্তিমূলক কর্মকে অবলম্বন না করলে সংসারে প্রবেশ করতে হয়।

চতুর্বর্ণের সাধারণ ধর্মগুলি–ক্ষমা, সংযম, দয়া, দান, লোভশূন্যতা, ত্যাগ, সারল্য, ঈর্ষামুক্তি, তীর্থ ভ্রমণ, সত্যকথন, সন্তোষ, অস্তিক্য, শ্রদ্ধা, ইন্দ্রিয়দমন, দেবপূজা, বিশেষত ব্রাহ্মণদের হিংসা না করা, প্রিয় কথা বলা, কপটাচার না করা ও নিষ্পাপ থাকা। পরলোক প্রজাপত্য স্থান রাখা আছে। যাগাদিক্রিয়া সম্পাদনকারী ব্রাহ্মণের জন্য। ঐ স্থান আছে যুদ্ধ বিমুখ ক্ষত্রিয়দের জন্য। মরুস্থান বৈশ্যদের জন্য।

গান্ধর্ব স্থান শূদ্রদের জন্য। উর্দ্ধরেতা ঋষি যে স্থানে গমন করেন, গুরুকুলবাসীদের জন্য রাখা সেই স্থান।

সপ্তর্ষিস্থান, মনু বানপ্রস্থদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। প্রজাপত্য স্থান গৃহস্থদের জন্য সংযতাত্মা সর্বত্যাগী ঊর্দ্ধরেতা যোগীরা যেখানে গমন করে সেখানে একবার গেলে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না। পরম অক্ষয় ঐশ্বরিক আনন্দময় লোক লাভ করেন যোগীরা। যা সর্বোত্তম তাই পরমা গতি।

দৈত্যদলন হিরণ্যাক্ষরিপুকে চার আশ্রমের কথা বলা হল। আর পৃথক আশ্রমের কথা বলা হল যোগীদের জন্য কিন্তু এতে কি করে চার আশ্রম হল।

কূর্ম এর উত্তরে বললেন, ধ্রুব সমাধি আশ্রয় করেন সব কর্ম ত্যাগ করে। তিনি যোগী ও পঞ্চত্তমাশ্রমী সন্ন্যাসী বেদে বলা আছে আশ্রম দু'প্রকার। ব্রহ্মচারী দু'প্রকার উপকুলবান ও ব্রহ্মপরায়ণ নৈষ্ঠিক। উপকুলবান হলেন বেদ অধ্যায়ন করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশকারী। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হলেন আমরণ ব্রহ্মচর্য পালনকারীর। এরাও উদাসীন ও সাধক এই দু'প্রকারের। সাধক হলেন আত্মীয় পরিজনদের পালনকারী।

উদাসীন হলেন ধন-সম্পত্তি, স্ত্রী ত্যাগকারী। তাপস বানপ্রস্থকারী হলেন অরণ্যে তপস্যাকারী, অধ্যয়নে নিরত ব্যক্তি। সন্ন্যাসিক বানপ্রস্থকারী হলেন যিনি তীব্র তপস্যায় শীর্ণকায় হয়ে ধ্যানে নিমগ্ন হন। পারমোষ্ঠিক ভিক্ষু হলেন জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানমার্গ ধরে চলনকারী। যোগী ভিক্ষু

হলেন তিনি যিনি আপনাতে আপনি থাকতে ভালোবাসেন, যিনি সদা সন্তুষ্ট, অভ্রান্ত যাঁর দর্শন। তিন প্রকার পারমেষ্ঠিক ভিক্ষু। এঁদের মধ্যে কেউ কর্ম, জ্ঞান, বেদ সন্ন্যাসী। অন্ত্যাশ্রমীরা ভাবনা করেন পরমেশ্বরের চার প্রকার আশ্রমের কথা বলা হয়েছে। বেদশাস্ত্রে পঞ্চম কোনো আশ্রম নেই।

বিশ্বাত্মা দেবদেব নিরঞ্জন স্বরূপ এইরকম বর্ণ ও আশ্রম সৃষ্টি করে দক্ষ প্রমুখ ঋষিদের বললেন, নানারকম জীবের জন্ম দিতে। এভাবে সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত হয়ে ব্রহ্মা বললেন, তিনি পালন করবেন ও সংহার করবেন শঙ্কর।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিব এই তিন হল পরমেশ্বরের রূপ, এই তিন মূর্তি–পরস্পরে অনুরক্ত, আশ্রিত, পরস্পরে প্রণত। রুদ্রের মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মী, মহেশ্বরী ও অক্ষরা, দেব ব্রহ্মার মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় অক্ষর ভাবনা। স্বেচ্ছায় আত্মাকে বিভক্ত করে তিনি অবস্থান করছেন। দেব, অসুর ও মানব সমেত নিখিল জগৎ পরমাপুরুষ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মোক্ষরূপ পরম স্থান লাভ করতে চাইলে সমস্ত প্রযত্নের সঙ্গে এঁদের বন্দনা ও পূজা করতে হবে। ভক্তির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আজীবন পুজো করতে হবে বর্ণ ও ধর্মকে ভালোবেসে। দ্বিজগণের বলা চার আশ্রমের মধ্যে তিন প্রকার ভেদ করা যায়- বৈষ্ণবাশ্রম, ব্রহ্মাশ্রম ও হরাশ্রম।

নারায়ণের পরম পদে যিনি আশ্রয় নিয়েছেন তিনি সুগন্ধি জলের দ্বারা কপালে শূলচিহ্ন ধারণ করবেন। শিবের সমস্ত ভক্তরাই শম্ভর শ্রেষ্ঠ চিহ্ন ত্রিপুণ্ড্রক পবিত্র ভস্মের দ্বারা কপালে অঙ্কিত করবেন। যারা জগৎ কারণ পরলোকবাসী ব্রহ্মার শরণাগত তারা কপালে সর্বদা তিলকচিহ্ন ধারণ করবেন। এতে ধারণ করা হয়ে থাকে অনাদি কালাত্মাকেই উর্দ্ধ ও অধোভাবে যোগ থাকাই ত্রিপুণ্ড্রকের চিহ্ন।

কপালে ত্রিশূল চিহ্ন ধারণ করলে ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকেই ধারণ করা হয়। তিলক ধারণ করলে সেই ব্রহ্মাতেজোময়, ঐশ্বরিক উজ্জ্বল সূর্যমণ্ডলেই কৃত হয়ে থাকেন। আয়ু বৃদ্ধি হয় মঙ্গলময় তিলক ধারণ করলে, বর্ণ ও আশ্রমের নিয়ম জানা ব্যক্তি ইন্দ্রিয়কে দমন করে, শান্ত সংযত হয়ে, ক্রোধ ত্যাগ করে, পূজা ও হোম জপ করবেন। সারা জীবন সমাহিত চিহ্ন দেবতাদের পূজা করেন যিনি, অচিরেই অক্ষয় দেবস্থান লাভ করতে পারেন।

৩

ভগবানের চার বর্ণ ও আশ্রমের নিয়মগুলি যে ব্যক্তি জানেন, তিনি ইন্দ্রিয়কে দমন করে, শান্ত সংযত হয়ে, ক্রোধ ত্যাগ করে পুজো, হোম ও জপ করবেন। অচিরেই অক্ষয় সেই দেবস্থান লাভ করতে পারেন যারা সারা জীবন সমাহিত চিত্তে দেবতার পূজা করেন। কূর্ম বললেন– অনুকম্পার বশবর্তী হয়েই ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি–যথাক্রমে এই চার আশ্রমের কথা বলেছি। অন্য কারণে নয়। বৈরাগ্য থাকলেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। যথানিয়মে যজ্ঞ না করে, পুত্র উৎপাদন না করে, গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন না করে বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ কখনই সন্ন্যাস অবলম্বন করেন না।

ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠর বৈরাগ্যের তীব্রতা বেশি হলে তিনি আর গৃহে থাকতেই পারবেন না, তবে যজ্ঞ না করেই তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করবেন। বাইরে গিয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন করবেন, অরণ্যে গমন করে বিধি যজ্ঞ করবেন এবং তপস্যা করে তপো ফলের দ্বারা বৈরাগ্যমুক্ত হবেন। বানপ্রস্থে একবার গমন করলে গৃহে আর ফেরা যায় না। জ্ঞানী গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণ বেদের বিধান অনুসারে প্রজাপত্য অথবা আগ্নেয় যজ্ঞ সম্পাদন করে অরণ্যকে আশ্রয় করবেন, ও প্রজ্যা গ্রহণ করবেন। অন্ধ, পঙ্গু বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রবজ্যা গ্রহণ করতে না পারলে হোম ও যজ্ঞ করবেন। তবে সংসারে আসক্তি না থাকলে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। সন্ন্যাস গ্রহণ করা কর্তব্য বৈরাগ্য উপস্থিত হলে। বৈরাগ্য বিনা সন্ন্যাস গ্রহণ করলে পতিত হতে হয়।

মুক্তিলাভ ঘটে তার যে সারাজীবন একটি আশ্রমকে শ্রদ্ধার সাথে অবলম্বন করে থাকে। ন্যায়সঙ্গত উপায়ে ধন উপার্জন করেন ও সংযত ও ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ হয়ে নিত্য স্বধর্ম প্রতিপালন করেন, তিনি ব্রহ্মলাভ করতে পারেন। পরমপদ লাভের অধিকারী হন তিনি যিনি ব্রাহ্ম সব সমর্পণ করে কামনা বাসনা ত্যাগ করেন। ব্রহ্মতেই সব সমর্পিত এবং তিনিই সব দেন এই চিন্তা করাকে বলে ব্রহ্মার্পণ। নিত্য ভগবান তুষ্ট হন তত্ত্বদর্শী কর্মের দ্বারা। পরমেশ্বরকে যদি সমস্ত কর্মের ফল উৎসর্গ করা যায়, তাহলে হয় উৎকৃষ্ট ব্রহ্মার্পণ। মুক্তি প্রদান করে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি যখন কোন কর্মকে কর্তব্য মনে করে কর্ম সম্পাদন করেন তখন সেই ব্যক্তি সর্বতোভাবে কর্ম ত্যাগ করে কর্ম করবেন।

তাহলে বিলম্ব হলেও ব্রহ্মপদ লাভ করতে পারবেন। ইহজন্ম ও পূর্বজন্মের পাপকে ক্ষয় করে কর্ম। এতে মানুষের ব্রহ্ম ও জ্ঞান লাভ করে মন প্রসন্ন হয়। কর্ম জ্ঞানের সঙ্গে সম্পাদন করলে সম্যক যোগ উৎপন্ন হয়। দোষ স্পর্শ করে না কর্ম সঞ্চিত জ্ঞানকে। এই সকল প্রযত্নের সঙ্গে

যে কোন আশ্রমকে আশ্রয় করে ঈশ্বরের প্রতি উৎপাদনের জন্য কর্ম করবেন এবং নিষ্কর্মর্তা অবলম্বন করবেন। পরম জ্ঞান এবং নৈষ্কর্ম লাভ করে পরমেশ্বরের অনুগ্রহে যদি কেউ একাকী সমত্বশূন্য ও সংযত হয়ে থাকেন তাহলে জীবিত অবস্থাতেই তাঁর মুক্তি লাভ হয়। সদানন্দ, আভাস শূন্য আর নির্মল বুদ্ধি হয়ে সর্বদা পরমেশ্বরের তৃপ্তির জন্য কর্মের অনুষ্ঠান করলে পরমব্রহ্মে বিলীন হওয়া যায়। তবেই লাভ হয় নিত্যপদ।

এই চার আশ্রমের ধর্ম অতিক্রমনা করলে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।

৪

সূত বললেন, ঋষিরা সকল আশ্রম বিধির বিবরণ শুনে সন্তুষ্ট হয়ে হৃষীকেশকে নমস্কার পূর্বক সকল আশ্রম ধর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করতে অনুরোধ করলেন। কি করে জগৎ সৃষ্টি হল এ বিষয়ে শুনতে উৎসুক হলেন সকলে।

কূর্মরূপধারী নারায়ণ সারগর্ভ বাক্যে জীবগণের উৎপত্তি ও বিনয়ের তত্ত্ব বলতে শুরু করলেন। সর্বশক্তিমান ও মহান ঈশ্বরই সকলের নিয়ন্তা। তাঁর অন্ত ও পরিমাপ নেই। তিনি নিত্য ও অব্যক্ত। কারণ দার্শনিকদের মতে তিনি প্রকৃতি তিনিই পুরুষ। জগতের কারণ এই ব্রহ্ম বিপুল, সনাতন। পরব্রহ্ম সর্বজীবের শরীর। তিনি মহৎ আত্মাতে অধিষ্ঠিত তার আদি ও অন্ত নেই, জন্ম নেই, তিনি সূক্ষ্ম ও তার তিনটি গুণ রয়েছে। তিনি সবকিছুর উৎস। তিনি অব্যয় আর অসমপ্রত এই ব্রহ্মকে জানা যায় না।

প্রকৃত প্রলয় ঘটবে যখন আত্মা পুরুষে গুণ-সাম্য হবে। এই স্থিতি সৃষ্টির প্রাক মুহূর্ত পর্যন্ত। একে ব্রাহ্মী রাত্রি বলে। এই ব্রহ্মের দিন রাত্রি নেই। রাত্রি শেষে পরমেশ্বর জাগরিত হোন। মহেশ্বর পরম পরমেশ্বর প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের বিক্ষোভিত করেন। যেমন কামাবেশ ঘটে তরুণী নারীর মধ্যে, যেমন বসন্তকাল এলে মলয় বাতাস বইতে থাকে, সেরকম ভাবে সেই যোগমূর্তি ব্রহ্ম প্রকৃতি ও পুরুষকে আলোড়িত করার জন্য তাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন। পরমপুরুষ প্রলয় ও সৃষ্টির দ্বারা প্রধান হয়ে অবস্থান করেন। তাঁর ক্ষুব্ধ হওয়ার ফলেই মহাবীজের সৃষ্টি হয়েছিল। যার থেকে উৎপন্ন হয়েছিল মহান, আত্মা, মতি, ব্রহ্মা প্রবুদ্ধি খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, ধৃতি, স্মৃতি ও সংবিৎ। তিন প্রকার অহংকার আবির্ভূত হয়–বৈকারিক, তৈজস আর তামস। অহংকার সৃষ্টির কারণ তামস, আর অভিমান ও মননের বার্তা পরমাত্মা ও জীবাত্মা অহংকার।

অহংকার থেকে জন্ম নেয় পাঁচ ভূত, পাঁচ তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় ও দেবতাদের মন উৎপন্ন হয় অব্যক্ত থেকে। যা সকলের কর্তা ও পর্যবেক্ষণকারী, বৈকারিক সৃষ্টি হয়, তেজস অহংকার থেকে, ইন্দ্রিয় সমূহের জন্ম। ইন্দ্রিয়গুলির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উৎপন্ন হয় বৈকারক থেকে। উভয়াত্মক একাদশ মন উৎপন্ন হয় স্বকীয় গুণের দ্বারা। ভূত তন্মাত্রের সৃষ্টি হয়েছে ভূতাদি থেকে। শব্দমাত্রের জন্ম দিয়েছে ভূতাদি বিকারপ্রাপ্ত হয়ে। শূন্যময় আকাশের সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে। আকাশ সৃষ্টি করেছে স্পর্শ মাত্রকে। তার থেকে বায়ু তার গুণ স্পর্শ। বায়ু থেকে রূপ তন্মাত্র সৃষ্টি হয়েছে। তা থেকে উৎপন্ন হয়েছে জ্যোতিঃ যার গুণ রূপ রসতন্মাত্রকে সৃষ্টি করেছে জ্যোতিঃ আর রসের আধার তার থেকে উৎপন্ন জল। জল গন্ধ তন্মাত্রকে সৃষ্টি করেছে। আর সনাতনী পৃথিবী জন্ম নিয়েছে এর থেকেই। গন্ধ। হল পৃথিবীর গুণ।

স্পর্শমাত্রকে আবৃত করে আছে শব্দ মাত্র আকাশ, শব্দ ও স্পর্শ দুটি গুণ যুক্ত বায়ু তার দ্বারা সৃষ্ট। আবার শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ-ই রূপে অন্তর্ভুত হয় বলে, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, এই তিনটি গুণ-ই বহ্নির রয়েছে। এই তিন গুণ-ই আবার রসমাত্র প্রবেশ করে বলে রসস্বভাব জলের গুণ চারটি। পৃথিবীর গুণ পাঁচটি, পৃথিবীকে ভূতলের মধ্যে স্থলা নামে চিহ্নিত করা হয়। শান্ত, ঘোর, মূঢ় এবং বিশেষ নামে উক্ত এবং পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পরস্পরকে ধারণ করে থাকে।

সাত মহাত্মা সমবেত না হলে পরস্পরকে ধারণ করে থাকে। এর সমবেত না হলে, পরস্পরের আধারে জীব সৃষ্টি করতে পারেন না। পুরুষ অধিষ্ঠিত রয়েছেন বলেই অব্যক্তের অনুগ্রহে মহৎ থেকে শুরু করে বিশেষ পর্যন্ত সকলে অন্ত সৃষ্টি করে। বিশেষ থেকে উৎপন্ন জলবুদ্বুদের সঙ্গে একই সময়ে জলে ভাসমান বৃহৎ অন্ত জন্ম নিয়েছিল। প্রাকৃত অন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে ব্রহ্মার কার্যের কারণ তার মধ্যে স্বয়ংসিদ্ধ হল। ক্ষেত্রজ্ঞ ব্রহ্মা নাম হল এর। একে প্রথম পুরুষ বলা হয় ইনি প্রথম শরীরধারী বলে সৃষ্টির প্রথমে বর্তমান ছিলেন। জীবগণের আদি স্রষ্টা ব্রহ্মা। একেই পুরুষ, হংস, প্রধানের পরিস্থিতি, হিরণ্যগর্ভ কপিল, দুন্দুভিমূর্তি ও সনাতন বলা হয়। উল্বের সেই পরমাত্মাস্বরূপের সুমের পর্বতগুলি জরায়ুর আর সমুদ্রগুলি গর্ভোদিকের কাজ করেছিল।

বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল সেই অণ্ডে—দেব, অসুর, মানব, চন্দ্র, সূর্য নক্ষত্র, গ্রহ ও বায়ু। অণ্ডের বহির্দেশ আকৃত হয়েছিল দশ গুণ জল। দশ গুণ তেজ, আবার জলের বহির্ভাগকে আবৃত করেছিল দশ গুণ বায়ু তেজের বহির্ভাগকে আবৃত করেছিল। দশগুণ আকাশ বায়ুকে, আকাশকে ভূতাদি, মহৎ ভূতাদিকে এবং অব্যক্ত মহৎকে আবৃত করেছিল। এই সেই লোক

যেখানে মহাত্মাগণ আর তত্ত্বদশী পুরুষগণ আপনাতে আপনি যাবেন। তারা প্রভু, যোগধর্ম আর তত্ত্বচিত্তকে, রাজোগুণ নেই তাদের তারা সবাই আনন্দিত।

অণ্ড আবৃত এই প্রাকৃত সাত আবরণে। ভগবানের মায়াকে সহজে জানা যায় না। বীজ প্রধানের কার্য, প্রজাপতির পরমা মূর্তি। স্রষ্টার দ্বিতীয় শরীর সাতলোক বলযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড। সুবর্ণ অণ্ড থেকে জাত হিরণ্যগর্ভ ভগবান ব্রহ্মাই ভগবানের তৃতীয় রূপ–এ বেদার্থ দর্শীরা বলে থাকেন। সেই সর্বব্যাপী সত্তার রাজোগুণের আর এক চতুর্মুখ মূর্তি আছে, যিনি জগতের সৃষ্টি কার্যে ব্যাপৃত।

বিশ্বের আত্মা সর্বতোমুখ ভুবনেশ্বর বিষ্ণু স্বয়ং সত্ত্বগুণ যুক্ত হয়ে সৃষ্ট জগৎ পালন করেন। ও প্রলয় কালে সকলের আত্মা ভূত পরমেশ্বর রুদ্রদেব স্বয়ং তমোগুণ আশ্রয় করে জগৎ সংহার করেন। নির্গুন এবং নিরঞ্জন মহাদেব পাল ও সংহাররূপ কর্মদ্বারা তিনটি মুর্তিতে প্রকাশিত। গুণ–ভেদে তার মূর্তি ভেদ আছে। যোগাধীশ ভগবান স্বকীয় লীলার দ্বারা নানা রকম রূপ ও শরীর ধারণ করেন। কখনো শরীরকে বিকৃত করেন। আবার শরীরকে গ্রাসও করেন। তিনি অদ্বিতীয় বলে কথিত হন ত্রিজগতে।

প্রথমে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন ব্রহ্মা, তিনি আদিদেব, জন্মহীন বলে তিনি অজ। প্রজাপালন হেতু তিনি প্রজাপতি। তিনি মহাদেব বৃহৎ বলে ব্রহ্মা, সকলের পর বলে পরমেশ্বর, বশীভূত হন না বলে তিনি বিশ্রুত।

সর্বগমনকারী বলে ঋষি, সংহারক বলে হরি, উৎপত্তি হীন বলে স্বয়ম্ভু, নরগণের অয়ন বা আশ্রয় বলে নারায়ণ, সর্বজ্ঞাত বলে ভগবান, জ্ঞানের গোচর বলে সর্বজ্ঞ, সবেতে অনুসৃত বলে সর্ব। নির্মল বলে শিব। আর্তিনাশক বলে তারক, সমগ্র জগত ব্রহ্মময় নানা মূর্তি ধারণ করে পরমেশ্বর লীলা করেন।

৫

কূর্ম বললেন, বহু কর্মের দ্বারাও স্বায়ম্ভুব মনুর কাল গণনা করা যায় না। দুটি পরার্ধে পরিকল্পিত সমগ্র কালের সংখ্যা, যা পরকাল। স্বায়ম্ভুব মনুর একশো বছর আয়ু। পনেরো নিমেষে হয় এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত, ত্রিশ মুহূর্তে মানুষের একটি অহোরাত্র, ত্রিশ অহোরাত্রে দুই পক্ষ বিশিষ্ট মাস আর ছয় মাসে একটি অয়ন। অয়ন

আবার দক্ষিণায়ন ও আর উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন দেবতাদের রাত্রি, উত্তরায়ণ দেবতাদের দিন। বারো হাজার বছর সত্য দিব্য পরিমাণের দ্বারা চারটি যুগ হয়।

সত্যযুগ চার হাজার বছরে, চারশো বছরে সন্ধ্যাংশ ও সত্যযুগের সন্ধ্যা, তিনশো, দুশো এবং একশো বছরে হয় ত্রেতা প্রভৃতি যুগের সন্ধ্যা। সত্যযুগের সন্ধ্যাংশ ছাড়াও সন্ধ্যাংশ কাল ছয়শো। ত্রেতা দ্বাপর, কলিকাল হচ্ছে যথাক্রমে তিন, দুই ও এক হাজার বছর, সর্বমোট বারো হাজার বছর। মন্বন্তর হয় সত্তর গুণের কিছু বেশি কাল। চৌদ্দটি মন্বন্তরের সমান ব্রহ্মার একটি দিন। মনুই আদি স্বয়ম্ভুত্ব। সাবনিক প্রমুখ তার পরে। পর্বতাযুক্তা সপ্তদ্বীপ পৃথিবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ পূর্ণ সহস্র যুগ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করবেন। এ বিষয়ে সংশয় নেই। একটি মন্বন্তর কল্পে সকল অন্তর ব্যাঘাত হল।

এক কল্পে ব্রহ্মার এক রাত্রি ও দিন। চার হাজার যুগে হয় এক কল্প। কল্পজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে তিনশো ষাট কল্পে ব্রহ্মার এক বছর হয়। পরার্ধ বলা যায় সেই পরিমাণ কালের একশো গুণ কালকে। সকল জীবের স্বকীয় উৎপত্তির কারণ প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যায়। ব্রহ্মা বিষ্ণু–শিব তিনের প্রকৃতিতে লয় হয়। ব্রহ্মা সমস্ত ভূত, বাসুদেব, শঙ্কর সকলেই কালক্রমে সৃষ্টি ও সংহারে বশীভূত হয়ে থাকেন। ভগবান অনাদি, অনন্ত অজর, অমর, কাল সর্বত্রগামী, স্বতন্ত্র এবং সকলের আত্মস্বরূপ। তাই তিনি মহেশ্বর। বেদে বলা আছে পরমেশ্বর কালই বহু ব্রহ্মা, বহু রুদ্র ও বহু নারায়ণ রূপে প্রকাশিত হন, ব্রহ্মার দ্বিতীয় পরার্ধ তার অগ্রজ কল্প। পণ্ডিতরা পাদ্মকল্প বলেন অতীত হওয়াকে।

৬

এক সময় এ সবই ছিল বিপুল সমুদ্র। যা ঢাকা ছিল অন্ধকারে। অস্তিত্ব ছিল না বায়ুরও। পরে এই সমুদ্রের অবিচ্ছিন্নতা নাশ পেলে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতে জন্ম নিলেন সহস্র নেত্র ও সহস্রপাদ ব্রহ্মা। তার স্বর্ণ বর্ণ, সহস্র মাথা, সেই অতীন্দ্রিয় পুরুষ নারায়ণাখ্য ব্রহ্মা জলরাশিতে শয়ান ছিলেন। জগতের সৃষ্টি ও লয়ের বার্তা ব্রহ্মারূপী নারায়ণ সম্বন্ধে শ্লোকে বলা হয়ে থাকে।

“তপোনারা ইতি

থোক্তা আপো

বৈ নরসূনবঃ

অয়নং তস্য তা যস্মাৎ তেন

নারায়ণঃ স্মৃতিঃ”

নারা নামে খ্যাত অপ বা জল তার অয়ন বা আশ্রয়–

সহস্রযুগে নৈশকাল ভোগ করার পর রাত্রি শেষে সৃষ্টির জন্যে ব্রহ্মত্ব লাভ করলেন। পৃথিবী যখন জলমধ্যে নিমগ্ন, তখন তার উদ্ধার সাধনের জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি বরাহ রূপ ধরলেন। বরাহের রূপ জলক্রীড়ায় মনোরম। এর বাঙময় রূপ এর নাম ব্রহ্মা। পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য পাতালে প্রবেশ করে দণ্ড দ্বারা ধারিত্রীকে উদ্ধার করলেন। জনলোক স্থিত সিদ্ধ ও ব্রহ্মার্ষিগণ বিশ্রুতকীর্তি হরিকে স্তব করতে লাগলেন– দেবদেব, ব্রাহ্মণ, শশ্বত, অজরকে প্রণাম, স্বয়ম্ভু, সৃষ্টিকর্তা সব তুমি জানো। পঞ্চভূত, মূলপ্রকৃতি, মায়ারূপ, সঙ্কর্ষণ, তিন মূর্তি, তিন ধাম, দিব্য তেজা সিদ্ধের আরাধ্য, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, শরণ, তুমিই গতি।

সনক প্রমুখ ঋষিরা প্রভাতে স্তব করলে বিষ্ণু তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন। পৃথিবীকে তিনি সুসামঞ্জস্য ভাবে স্থাপন করলেন ও পূর্বে সৃষ্টির সময়ে যে সমস্ত পর্বত দগ্ধ হয়েছিল, এরপর তিনি মন দিলেন সৃষ্টির কার্যে।

৭

কূর্ম বললেন, তিনি পূর্বকল্পের মতো সৃষ্টি চিন্তা করলে এমন এক অন্ধকারময় সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হল যাকে জানাই যায় না। তম, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতমিস্র এই পাঁচ অবিদ্যা জন্ম নিল সেই মহাত্মা থেকে। সেই অভিমানী পুরুষ ধ্যান করলে অন্ধকারাবৃত বীজকুম্ভের মতো আচ্ছাদিত সৃষ্টি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। তার বহি ও অভ্যন্তর ভাগে প্রকাশ ছিল না। ছিল শুদ্ধ ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে মুখ্য বৃক্ষ ও পর্বত। যখন প্রভু দেখলেন যে এই সৃষ্টি কার্য সাধনের উপকারক নয়, তখন তিনি অন্য সৃষ্টির কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

এর ফলে বয়ে যেতে লাগল আকাবাঁকা স্রোত। একে বলে তির্যক স্রোত। হে দ্বিজগণ, এই সৃষ্টি উৎপথগ্রাহী পশ্যাদি নামে খ্যাতি লাভ করেছে। এই সৃষ্টিতে সুখ আর প্রীতির অভাব নেই। এই সৃষ্টির নাম হল দেব। সত্যচিন্তক ভগবান যখন ধ্যান করলেন তখন সৃষ্টি অধাক স্রোত, সাধক সর্গ। তমোগুণের উদ্ভব হয়েছে। রজোগুণে রয়েছে বহুল পরিমাণে, আর দুঃখ প্রকাশিত হয়েছে উকট ভাবে। আর তাতেই রয়েছে সত্বগুণও যার নাম মানুষ। ভূতাদি সর্গের উদ্ভব হল

আজ যখন সৃষ্টির কথা চিন্তা করল তখন সর্বদা বস্তুসমূহ সবলে হরণ করে ভূতগণ নিজেদের মধ্যে বিভেদ করে, তাদের শীল বলে কিছু নেই।

যে পাঁচ সর্গের কথা বলা হল তার মধ্যে প্রথম সর্গটি মহতের। দ্বিতীয়টি ভূতসর্গ। বৈকারিক ঐন্দ্রিয় তৃতীয় সর্গের নাম। প্রাকৃত সর্গ এই অবুদ্ধিপূর্বক সম্ভূত হয়েছে। চতুর্থটি মুখ্যসর্গ যার নাম স্থাবর। যা তির্যক স্রোত ও তির্যক যোনি, পঞ্চম সর্গ, ষষ্ঠ দেবসর্গ নামে উক্ত উর্ধ্বস্রোত, যেটি অবাক স্রোত, সেটি সপ্তম মানুষ সর্গ এবং অষ্টম ভূতাদি হল ভৌতিক সর্গ। নবমটি কৌমার সর্গ যা প্রাকৃত ও বৈকৃত দুপ্রকার, প্রথম তিন প্রসকৃত সর্গ অবুদ্ধি পূর্বক সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্য সৃষ্টিগুলি অবুদ্ধি পূর্বক কৃত হয়েছে।

প্রজাপতি ব্রহ্মা পুরাকালে নিজের তুল্য প্রভাবশালী সনক, সনাতন, সনন্দনভা ক্রতু, ও সনৎকুমারকে সৃষ্টি করেছিলেন। বিপ্রগণ পাঁচজনেই যোগী। পরম বৈরাগ্য আশ্রয় করে এঁরা ঈশ্বরেই মনোনিবেশ করলেন। মন দিলেন না সৃষ্টির দিকে। প্রজাপতি পরমেষ্ঠীর মায়ার মোহিত হলেন জগৎ সৃষ্টির বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখালেন। জগন্ময় মহামুনি মহাযোগী লোকপ্রিয় নারায়ণ তাকে যথাযথ ভাবে সান্ত্বনা দিলেন। তার উপদেশে বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা পরম তপস্যায় নিরত হলেন, কিন্তু কোন ফল লাভ হল না। দীর্ঘকাল কাটার পর চিত্তে ক্রোধ এল ফলে চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ল। ললাট থেকে তখন জন্ম নিলেন শরণাগতের ত্রাণকারী নীললোহিত মহাদেব। সনাতন ঈশ হলেন ভগবান। নিজের মধ্যে পরমেশ্বর রূপে প্রত্যক্ষ করেন জ্ঞানী ব্যক্তিরা। ব্রহ্মা ওঁঙ্কারকে স্মরণ করে প্রজা সৃষ্টি করতে যান বনে। শিব তখন মনে মনে রুদ্রগণকে সৃষ্টি করলেন। তারা হলেন শ্মশ্রুময়, নিরাতঙ্ক, ত্রিনয়ন আর নীললোহিত। ব্রহ্মা তাকে বললেন, জরা মরণশীল জীব সৃষ্টি করুন। ভগবান বললেন, জগৎপতি, জরা মরণশীল অমঙ্গলময় জীব সৃষ্টি করতে পারব না। রুদ্রকে নিষেধ করে পদ্মসম্ভব ব্রহ্মা স্থানাভিমানী ও বাক্য কথনশীল যে, সত্তা সমূহের সৃষ্টি করলেন তাদের কথা শোন।

প্রথমে সৃষ্টি করলেন অগ্নি, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, নদী, সমুদ্র, পর্বত, কালা, কাষ্ঠা, বৎসর, যুগ এবং স্থানাভিমানী পদার্থগুলিকে। তারপর মরীচি, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, দক্ষ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ধর্ম, সঙ্কল্প সাধকদের সৃষ্টি করলেন। প্রাণ থেকে দক্ষকে, নেত্রদ্বয় থেকে মরীচিকে, মস্তক থেকে অঙ্গিরাকে, হৃদয় থেকে ভৃগুকে, নেত্র থেকে অত্রিকে। ব্যবসায় থেকে ধর্মকে, সঙ্কল্প থেকে সঙ্কল্পকে, উদান থেকে পুলস্ত্যকে, ব্যান থেকে পুলহকে, সমান থেকে বশিষ্ঠকে সৃষ্টি করেছিলেন ব্রহ্মা। এঁরা ধর্ম প্রবর্তন করেছেন মানুষের রূপ ধরে।

দেব অসুর, পিতৃ ও মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন। আত্মা যোজিত করলে তিনি তাতে তমোগুণের আবির্ভাব হয়েছিল মুক্ত প্রজাপতির মধ্যে, অসুর জন্মায় তার জঘন দেশ থেকে। পুরুষোত্তম অসুর সৃষ্টি করে যে শরীর তা পরিত্যাগ করলেন, সেই পরিত্যাক্ত শরীর তৎক্ষণাৎ রাত্রিতে পরিণত হল। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে জীব ঘন নিদ্রা যায়। সত্ত্বগুণ রয়েছে এমন শরীর ধারণ করলেন প্রজাপতি। দেবগণ জন্ম নিলেন উজ্জ্বল মুখ থেকে। সত্ত্বগুণ দিন সৃষ্টি হল কার থেকে? ধর্মযুক্ত দেবতারা উপাসিত হন দিবাকালে। এরপর তিনি কেবলসত্ত্বগুণ যুক্ত আর এক শরীর ধারণ করলেন।

মাননীয় পিতৃগণ উৎপন্ন হলেন পিতৃবৎ থেকে। ব্রহ্মা শরীর ত্যাগ করলেন। বিশ্বদর্শী পিতৃগণকে সৃষ্টি করে, তৎক্ষণাৎ সন্ধ্যাতে পরিণত হল পরিত্যক্ত শরীর। দেবতাদের দিন ও রাত্রি অসুরদের। তাই দেব, অসুর, সকল মুনি, ও মানবগণ, যোগের সাহায্যে সেই রাত্রি ও দিনের মধ্যে শরীর রূপ সন্ধ্যার সময় উপাসনা করেন। একটি শরীর ধারণ করলেন রজোগুণ বিশিষ্ট প্রজাপতি, শীঘ্র সে শরীরও পরিত্যাগ করলেন।

জ্যোৎস্নাতে পরিণত হল তৎক্ষণাৎ। প্রাতঃ সন্ধ্যা বলা হয় একে। এরপর ভগবান ব্রহ্মা আবার তমোগুণ ও রজোগুণ বিশিষ্ট মূর্তি গ্রহণ করলেন। তা থেকে যে রাক্ষসরা জন্ম নিল তাদের ক্ষুধার উদ্রেক হয় অন্ধকারে। এদের মধ্যে তমোগুণ আর রজোগুণেরই প্রাধান্য। এরা বলশালী আর নিশাচর পুত্র। ব্রহ্মার এরপর জন্ম নিল তমোগুণ আচ্ছন্ন সর্ব, যক্ষ, ভূত ও গন্ধর্বেরা।

প্রভু এরপর সৃষ্টি করলেন পক্ষী, অবি, তাজা, গোল, অশ্ব, গর্দভ, মৃগ, উষ্ট্র, অশ্বতর ও মৃগ। রোম থেকে উৎপন্ন হল ওষধি ও ফলমূল। তার প্রথম মুখ থেকে গায়ত্রী ও অগ্নিস্ত্রোত্রের সৃষ্টি হল। দক্ষিণ ও পশ্চিম মুখ থেকে ত্রিষ্ঠুভ দুন্দ, পঞ্চদশ স্তোত্র, উপমা, সামসকল, জপতী ছন্দ, বৈরূপ ও অতিরাত্র, উত্তর মুখ থেকে সৃষ্টি হল অপ্তোমাস, অনুষ্ঠুভ এবং বৈরাগ ছন্দ।

সৃষ্টির পূর্বের কাজের মতই বারবার সৃষ্ট হয়েও সকল জীব তাদের করণীয় কাজই পেল। এর ফলে তারা বিভিন্ন রিপুর অধীন হয়। যা তাদের কাছে রুচিকর। বিধাতা মহাভূত রূপে নানা মুর্তি ধারণ করে ভূতগণকে নিয়োগ করেন।

৮

এভাবেই সৃষ্ট হল স্থাবর ও জঙ্গম জীব। এই জীবেদের বুদ্ধি না হওয়ায় ব্রহ্মা দুঃখিত হলেন। নিশ্চিত উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত বুদ্ধি অবলম্বন করলেন। তখন তিনি সত্ত্ব ও রজোগুণকে অবলম্বন করে তমোগুণকে পরিত্যাগ করলেন। তমঃ ক্ষয় পেলে একটি মিথুন উৎপন্ন হল- অধর্মাচরণ আর হিংসা। ব্রহ্মা তাঁর দেহকে ভাগ করে অর্ধনারীশ্বরের উৎপত্তি করলেন। যার নাম শতরূপা। তিনি সৃষ্ট হয়েই আকাশ ব্যাপ্ত করলেন। সেই সর্বগুণসম্পন্না আর অধর্মের থেকে জন্ম নিলেন বিরাট পুত্র। দেবী শতরূপা দুরূহ তপস্যা করে বিশ্রুতকীর্তি মনুকে স্বামী রূপে লাভ করলেন।

শতরূপার দুই পুত্র হল মনুর ঔরসে, নাম তাদের প্রিয়ব্রত ও জ্ঞানপাদ। তার দুই কন্যার মধ্যে প্রসূতিকে দিলেন দক্ষকে আর রুচি নিলেন আকূতিকে। আকূর্তির গর্ভে রুচির যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামক পুত্র ও কন্যা জন্মায়। দক্ষিণার গর্ভে বারোটি পুত্রের জন্ম হয়, যারা বামদেব বলে উল্লেখিত। প্রসূতির গর্ভে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, কৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ শান্তি, সিদ্ধি, কীর্তি, খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সমুতি, অনুসূয়া, উজ্জা, স্বাহা ও স্বধা নামক চব্বিশ কন্যা জন্মায়। ধর্ম বিবাহ করেন প্রথম তেরোজনকে। বাকি এগারোজনকে এগারোজন জ্ঞানী ঋষি বিবাহ করেন। শ্রদ্ধার পুত্রের নাম কাম আর লক্ষ্মীর পুত্রের নাম দর্প। ধৃতির নিয়ম, তুষ্টির সন্তোষ, পুষ্টির লাভ, মেধার শম, ক্রিয়ার দণ্ড ও নয় এবং বুদ্ধির বোধ ও অপ্রমাদ নামক পুত্র জন্মায়।

অধর্মের ঔরসজাত নিকৃতি ও অনৃত, তাদের মিলনে উৎপন্ন হয় ভয় ও নরক নামক দুই পুত্র। মায়া ও বেদনা নামক কন্যা। ভয় মায়ার গর্ভে ভূতনাশক মৃত্যু ও নরকের ঔরসে বেদনা দুঃখ নামে পুত্র লাভ করেন। এদের সকলের মধ্যে আছে অধর্মের লক্ষণ। এরা স্ত্রী, পুত্রহীন।

৯

সূতের কথা শুনে নারদ প্রমুখ মহর্ষিরা সংশয়াচ্ছন্ন হলেন তখন তাঁরা সংশয় অবসানকরণের কারণ স্বরূপ জানতে চাইলেন–ব্রহ্মা কি করে পদ্ম থেকে উৎপন্ন হলেন তা আমাদের কাছে ব্যক্ত করুন।

কূর্ম ঋষিদের বললেন–আপনারা সকলে শুনুন কিভাবে অমিতবীর্য বিষ্ণুর পুত্র হয়েছিলেন ব্রহ্মা।

অন্ধকারাচ্ছন্ন স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এক অতি ভয়ানক অক্ষ সমুদ্রের আকার ধারণ করেছিল। তখন কারোর অস্তিত্ব ছিল না। সেইসময় নারায়ণ সমুদ্র মধ্যে অনন্ত শয্যায় শায়িত ছিলেন। ইনি বিপুল বৈভব, যোগাত্মা, যোগীদের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ, তার নাভিদেশে ছিল একহাত যোজন বিস্তৃত নবোদিত সূর্য-দীপ্তময় ও সুন্দর গন্ধযুক্ত এক পদ্ম, এর মধ্যে ছিল কর্ণিকা ও কেশর।

হিরণ্যগর্ভ নারায়ণকে জাগ্রত করলেন, তার একাকী শয়নের কথা জানতে চাইলে তিনি বললেন, তিনি সকলের উৎপত্তি ও বিনাশের হেতু। তিনি একথা বলে হিরণ্যগর্ভর পরিচয় জানতে চাইলেন। ব্রহ্মা তখন অতি মধুর ভাবে বললেন–তিনি ধাতা ও বিধাতা, ও স্বয়ম্ভু, প্রপিতামহ, তার মধ্যে অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ড।

বিষ্ণু এরপর ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানে ত্রিভুবন দেখে অভিভূত হলেন। এবং মুখ থেকে নির্গত হয়ে মহাপিতাকে বললেন–তার উদরে প্রবেশ করে একই দৃশ্য দর্শন করতে। ব্রহ্মা তার উদরে ঢুকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করলেন, তবে তার শেষ পেলেন না। বিষ্ণু শরীরের সকল দ্বার রুদ্ধ করলে ব্রহ্মা তার নাভিদ্বার থেকে নির্গত হয়ে পদ্মের মধ্যে বিরাজ করতে লাগলেন। বিষ্ণুকে জানালেন, তিনি অজেয়, বিষ্ণু তখন বললেন–যে তিনি ইচ্ছাকৃত দ্বার রুদ্ধ করেননি, লীলাচ্ছলে করেছিলেন।

তখন প্রসন্ন হয়ে বললেন, তিনি পরমব্রহ্ম স্বরূপ, সনাতন, সকল, লোকের আত্মা স্বরূপ, তিনিই পরম পুরুষ। এহেন ব্রহ্মার কথায় বিষ্ণু বললেন–যে অহংকার করবে তার বিনাশ নেমে আসবে। তিনি কি প্রধান পুরুষের ঈশ্বর অব্যয় অধিপতি ব্রহ্মাকে দেখতে পাচ্ছেন না।

সংখ্যাশাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ যোগীরাও মহেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন না। ব্রহ্মা তখন বললেন–বিষ্ণুকে কল্যাণময়, মহাত্মার নিন্দা হয় এমন কথা বলবেন না। তিনি সবই জানেন। পরমেশ্বরের মায়ায় তিনি আচ্ছন্ন হয়েছেন। যে গুণেশ্বর বিষ্ণু নিজের আত্মাকে পরম তত্ত্ব বলে জেনেছিলেন তিনি। একথা বলে নীরব হবেন। মহাদেব তখন ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করবার জন্য অবির্ভূত হলেন।

তিনি জ্যোতির জ্যোতি। তার গলার মালাটি জ্ঞানের সূতো দিয়ে গাঁথা, চন্দ্র সূর্য তারকায় খচিত, পাদমূল পর্যন্ত লম্বিত আর চমৎকার।

ব্রহ্মা হরিকে বললেন, শূল হস্তে ত্রিনয়ন দীপ্তিমান, নীলবর্ণ পুরুষ কে? বিষ্ণু মহাদেব সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি বললেন–ইনি দেবাদিদেব মহাদেব ইনি প্রকৃত পুরুষ ঈশ্বর। এই অদ্বিতীয় অখণ্ড মহাদেবই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন ও পালন করেন, আবার সংহারও করেন। শঙ্করই বেদরাশি দান করেছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে ব্রহ্মা মহাদেবের শরণ নিলেন, ব্রহ্মার স্তুতিতে পরমেশ্বর মহাদেব তুষ্ট হয়ে বললেন, তিনি পুরকালে তোক সৃষ্টির জন্য অব্যয় রূপে তাকে উৎপন্ন করেছিলেন। তিনি তার দেহ সম্ভূত আদি পুরুষ। মহাদেব ব্রহ্মাকে বর চাইতে বললে ব্রহ্মা বললেন, হয় ভগবান তার পুত্র হোক অথবা তার যেন ভগবান সদৃশ এক পুত্র হয়।

ব্রহ্মার কথায় মহাদেব বললেন, তার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। ব্রহ্মা আদি কর্তারূপে নিয়োজিত হবেন। আর বিষ্ণু হবেন তার পরমা তনু ও তার যোগক্ষেম বহন করবেন। তখন বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু মহাদেবের কথায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হয়ে বললেন–যেন তিনি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন। তার মায়ায় মোহিত করে ভূতভেদকারী অমেয় শক্তি ভগবান অনাদি এই কথা বলে জন্ম বৃদ্ধি বিনাশশূন্য অব্যক্তলোকে ফিরে দেখলেন।

১০

পিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি থেকে উত্থিত বিশাল পদ্মে অবস্থান করতে লাগলেন। বিষ্ণুর কর্ণ থেকে জন্ম লাভ করে এসে উপস্থিত হল মধু ও কৈটভ নামক দুই অসুর। ব্রহ্মা তখন বললেন, এই দুই অসুরকে বিনাশ করা নারায়ণের কর্তব্য, ব্রহ্মা তখন জিষ্ণু ও বিষ্ণু নামক দুই পুরুষ সৃষ্টি করে মধু ও কৈটভকে বধ করার আদেশ দিলেন।

সেই দুই পুরুষ, নারায়ণের আদেশে মধু ও কৈটভের সাথে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। স্নেহাবিষ্ট হয়ে ব্রহ্মাকে হরি মধুর বাক্যে বললেন, তিনি ব্রহ্মাকে এতক্ষণ পর্যন্ত বহন করেছেন। আপনি এবার অবতীর্ণ হোন পদ্ম থেকে। আপনার ভার অতি গুরু। ব্রহ্মা তখন পদ্ম থেকে অবতীর্ণ হয়ে হরির দেহে প্রবেশ করলেন। এরপর উভয়ে বৈষ্ণবী নিদ্রায় জলমধ্যে শয়ন করলেন।

ব্রহ্মা দীর্ঘকাল ধরে অনাদি অনন্ত অদ্বৈত, স্বকীয় আত্মস্বরূপে ব্রহ্মার্ঘ পরমাত্মার আনন্দ অনুভব করলেন। ব্রহ্মা প্রথমে পূর্বজাত সনন্দ, সনক, ভৃগু, সনৎকুমার সনাতনদের সৃষ্টি করলেন। এদের মোহ ছিল না শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি বিষয়ে, এঁরা পরম বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করেছিলেন। এরা আশ্রয় করলেন জ্ঞান বিষয়িনী বুদ্ধিকে। পিতামহ ব্রহ্মা সনক প্রমুখকে নিরপেক্ষ দেখে পরমেশ্বরীর মায়ার দ্বারা লোক সৃষ্টি করার বিষয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন। ব্রহ্মাকে তখন বিষ্ণু জিজ্ঞেস করলেন তিনি মহাদেবকে ভুলে গেছেন কিনা?

ব্রহ্মা তখন অত্যন্ত দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করলেন প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছায়। তাতে ব্রহ্মার কোন ফল লাভ হল না। এতে ব্রহ্মার ক্রোধ উৎপন্ন হল। ব্রহ্মার চোখ বেয়ে ঝড়ে পড়া অশ্রুবিন্দু থেকে জন্ম দিল ভূত-প্রেতগণ। তাদের দেখে ব্রহ্মা নিজেই নিন্দা করতে লাগলেন এবং প্রাণত্যাগ করলেন, তার মুখ থেকে রুদ্রগণের প্রাদুর্ভাব হল। মহাদেব স্বয়ং তখন উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। ব্রহ্মা তখন তাকে কাঁদতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, রোদন করার জন্য তার নাম হবে রুদ্র। ব্রহ্মার দেওয়া তাঁর আরও সাতটি নাম হল– ভব, সর্ব, ঈশাণ, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব। তার আট পত্নীর নাম সুবর্চলা, উমা, বিকেশী, শিবা, স্বাহা, দিক, দীক্ষা আর রোহিণী, আট পুত্র হলেন– শনৈশ্বর, শুক্র, মঙ্গল, মনোজব, স্কন্দ, স্বর্গ, সন্তক আর বুধ।

প্রজা, ধর্ম, কাম ত্যাগ করে মহাদেব বৈরাগ্য আশ্রয় করলেন। তিনি আত্মাতে মুক্ত করে অক্ষর ব্রহ্মরূপ পরম অমৃত পান করে ঈশ্বর ভাব অবলম্বন করেছিলেন। ব্রহ্মা মহাদেবকে জীব সৃষ্টি করতে আদেশ দিলে মহাদেব মনের দ্বারা, নিজেরই মতো জটাজুটধারী, ভয়শূন্য, নীলকণ্ঠ, পিনাকপানি ত্রিশূল হস্ত, উদ্যমমুক্ত, সদানন্দময়, ত্রিনয়ন, অজর, অমর, বন্ধনহীন, মহাবৃষ ভাবন, নিস্পৃহ আর শতকোটি শত রুদ্র সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মা শিবকে বললেন, জরামরণহীন জীব সৃষ্টি না করতে। জন্ম-মৃত্যু যুক্ত জীব সৃষ্টি করতে বললেন। মহাদেব তখন তাকে বললেন, তিনি সেই রকম জীব সৃষ্টি করবেন না।

তিনি তখন পুত্রদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। একারণে তার নাম স্থানু। মহাদেবের দশটি বৈশিষ্ট্য হল–জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, দ্রষ্টত্ব, আত্মা, সম্বোধ ও অধিষ্ঠাতৃত্ব। ব্রহ্মা আনন্দিত হলেন মানসপুত্রদের সঙ্গে মহাদেবকে বিদ্যমান দেখে।

মহাদেবের বন্দনা করে ব্রহ্মা বলতে লাগলেন–তুমি পরমেশ্বর, কল্যাণময়, দেব ও ব্রহ্ম স্বরূপ, মহান ঈশ্বর, শান্ত, জগৎকারণ, প্রকৃত পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, মহাকাল, রুদ্র, শূলধারী, ত্রিনয়ন, ত্রিমূর্তি, বেদবিদ্যার অধীশ্বর, বেদান্ত মূর্তি ব্রহ্মাধিপতি, আদিদেব, তীর্থ, যোগ সিদ্ধির কারণ, দীপ্তিশূন্য মহেশ্বর, পরমেষ্ঠী, শান্ত, তুমি পুরুষ মহাকাল, অগ্নি বায়ু আকাশ, অহংকার স্বর্গ যার শীর্য পৃথিবী তোমার চরণ, আকাশ তোমার উদর, তুমি সকল জীব ধারণকারী, সকলের ক্রমানুসারে জীব সৃষ্টি করেছ, জ্যোতিঃ স্বরূপ যোগপুরুষ প্রণাম। যার প্রভাব দ্বারা এই অন্ধকারের পরিস্থিতি অদ্বিতীয় সবোকৃষ্টতত্ত্ব প্রকাশিত হচ্ছে, সেই পরমতত্ত্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই।

ব্রহ্মা এভাবে মহাদেবের স্তব করতে লাগলেন। ব্রহ্মাকে তখন মহাদেব দান করলেন দিব্য আর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বরযোগ, ব্রহ্মসত্ত্বভাব। প্রণত জনের আর্তনাশকারী মহাদেব তার সুন্দর দুটি করতল দিয়ে পিতামহ ব্রহ্মাকে ধারণ করে ঈষৎ হেসে বললেন, ব্রহ্মা তুমি বর চেয়েছিলে যেন আমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হও। এখন নানা রূপ জগৎ সৃষ্টি কর। সৃজন, পালন, সংহার–এই তিন গুণের দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর–তিন মূর্তিতে বিভিন্ন হয়েছি। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমার দক্ষিণ অঙ্গ থেকে তুমি নির্মিত। বিষ্ণু নির্মিত বাম অঙ্গ থেকে রুদ্র উৎপন্ন হয়েছে।

শম্ভুর হৃদয় থেকে, শ্রেষ্ঠ তনু এটি। অদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ শঙ্কর স্বেচ্ছায় সৃষ্টি পালন ও বিনাশের কারণ রূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন মূর্তিতে নিজ শরীর বিভক্ত করেছেন। অন্যান্য সব মূর্তি তার মায়ায় নির্মিত। মহাদেব এই সকল মূর্তির নিয়ন্তা স্বভাবতই অরূপ, অদ্বৈত, ও আত্মস্থ। তিনিই সেই মহেশ্বরী পরমা তনুর শ্রেষ্ঠ মূর্তি। জগৎকে ধ্বংস করেন মহাকাল রূপে। পিতা ব্রহ্মাকে এসব কথা বলে এবং তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে মহাদেব পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে সেই ক্ষণেই অন্তর্হিত হলেন। ভগবান প্রজাপতি যোগবলে পূর্বের মতো বিবিধ জগৎ সৃষ্টি করতে লাগলেন। ব্রহ্মা যোগের সাহায্যে মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি এবং বশিষ্ঠকে সৃজন করেছিলেন।

১১

কূর্ম বললেন, পিতামহ ব্রহ্মা মরীচি প্রমুখ ঋষিদের এইভাবে সৃষ্টি করে সমস্ত মানস পুত্রদের সঙ্গে তীব্র তপস্যায় রত হলেন। ব্রহ্মার মুখ থেকে কালাগ্নি উদ্ভূত, ত্রিশূলধারী, ত্রিনয়ন, অতি ভীষণাকৃতি অর্ধনারীশ্বরের রূপ ধরে রুদ্র প্রাদুর্ভূত হলেন। ব্রহ্মা ভীত হয়ে নিজেকে বিভক্ত করে ফেললেন। তার কথায় রুদ্র নিজেকে স্ত্রী ও পুরুষ রূপে দ্বিধা বিভক্ত করলেন।

রুদ্রকে আবার এগারো ভাগে ভাগ করলেন। যাঁরা একাদশ রুদ্র নামে পরিচিত। তারা নিয়োজিত ত্রিজগতের ঈশ্বর এবং দেবকার্যে নানা ভাগে ভাগ করলেন। প্রভু দেব নিজের সৌম্য অসৌম্য, শান্ত, অশান্ত, সিত, অসিত রূপের সঙ্গে নারী অংশকে। হে বিপ্রগণরুদ্রের অংশ স্বরূপ বিভূতিই লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তি নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত। ঈশ্বরী শঙ্করী এই সমস্ত শক্তির সাহায্যে বিশ্বকে ব্যাপ্ত করেছেন।

এভাবে বিভাগের পর ঈশ্বরী নিজের অংশকে পৃথক করলেন এবং মহাদেবের আদেশে মূর্তিকে পিতামহ ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা তাকে দক্ষের কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করতে বললেন।

ব্রহ্মার আদেশে তিনি দক্ষের ঔরসে জন্মালেন। রুদ্র দক্ষকন্যাকে গ্রহণ করলেন। কালক্রমে প্রজাপতির আদেশে হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে কন্যারূপে পরমেশ্বরীর জন্ম হল। পার্বতীকে রুদ্রের কাছে সমর্পণ করেছিলেন মহাদেব ত্রিভুবন ও নিজের মঙ্গল কামনায়। এই কারণে দেবাসুরের শ্রদ্ধেয়া শঙ্করের অর্ধাঙ্গিনী মহেশ্বরী হৈমবতী বলে খ্যাত।

১২

সূত বলতে লাগলেন, মুনিরা কূর্মরূপী বিষ্ণুর সকল কথা শুনে তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, যে শিবশক্তি প্রথমে দাক্ষায়নী সতী হয়ে পরে হিমালয় কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এই দেবীর বিষয়ে কী আর বৃত্তান্ত আমাদের বলুন।

মুনিদের কথা শুনে পুরুষোত্তম নিজ পরমপদ ধ্যান করে নিয়ে বলতে শুরু করলেন পুরাকালে অত্যন্ত মনোরম মেরুপৃষ্ঠে বসে পিতামহ ব্রহ্মা এই বৃত্তান্ত বলেছিলেন। এক অতি গুহ্য রহস্যতত্ত্ব। পরম সাংখ্য সাংখ্যশাস্ত্রাধ্যায়ীদের কাছে পরম সংখ্যা। তত্ত্ব মুক্তি দূত সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান আর সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন মানুষের কাছে এ তত্ত্ব মুক্তির দূত, হৈমবতী বলে জেনে জ্ঞান স্বরূপা, অতি লালসা, ব্যেমনাম্নী মাহেশ্বরী শক্তি, মঙ্গলময়ী সকল পদার্থে নিশ্চিতরূপে অনুসূতা, অনন্তা, ত্রিগুণাতীতা, অবয়বরহিতা, অদ্বিতীয়া অথচ তার বহু বিভাগ।

ব্রহ্ম, তেজোরূপে পরমব্রহ্মে সংস্থিতা। সূর্যের ভাস্বর দীপ্তির মতো তার স্বাভাবিক প্রভা। মাহেশ্বরী শক্তি এক হয়েও উপাধিবশত অনেক রূপে মহাদেবের কাছে লীলা করেন। জগৎ তারই কার্য। ঈশ্বরের কার্য-কারণ নেই পণ্ডিতরা বলেন। এই দেবীর চার শক্তিই রয়েছে অধিষ্ঠান বশে। এদের নাম শান্তি, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও নিবৃত্তি। চতুর্হ বলা হয় পরমেশ্বরকে। স্বকীয় আত্মানন্দ অনুভবের কারণ পরমেশ্বর এই প্রধানা চার দেবীর সংসর্গেই, চার বেদে মহাদেব চার ভাবে অবস্থিত।

অনাদি বলে সিদ্ধ দেবীর মহৎ অনুপম ঐশ্বর্য, তিনি অনন্তা নামে অভিহিত হন পরমাত্মা রুদ্রের সঙ্গে যোগ হলে। সকল জীবের প্রেরণাদাত্রী ও ঈশ্বরী সেই দেবী। মহেশ্বর মহাকাল ও পরিপ্রাণ বশতঃ প্রাণীকুল সৃষ্টি ও সংহার করেন। তাই কালের বশ সকলে। কালই প্রধান তত্ত্ব, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, আত্মা ও অহংকার। অন্য সকল তত্ত্ব অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন যোগী, জগতের ভ্রম উৎপাদন করে চলেছেন পুরুষোত্তম মায়াবী মহাদেব। সনাতনী, মায়ারূপিণী শক্তিই সর্বদা মায়াবী মহেশ্বরের বিশ্বরূপ প্রকাশ করছেন।

জ্ঞান, ক্রিয়া ও প্রাণ শক্তি নামে তিন মুখ্য শক্তি আছে দেবের। অনাদি ও অবিনশ্বর মায়া নিজে। মায়াকে অনিবারণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং তাকে বিনাশ করা যায় না। প্রভু মহাকাল সর্বশক্তি, ঈশ্বর মায়াবী ও প্রলয়কারী। সব কিছু সৃষ্টি করছেন, কালই সব কিছু ধ্বংস করছেন। আর কালই বিশ্বকে পালন করছেন। মায়া যখন অনন্ত জগদীশ্বর কাল স্বরূপ দেবদিদেব পরমেষ্ঠী প্রভু শম্ভর সান্নিধ্যে, আসেন তখনই তাদের প্রকৃতি ও পুরুষ এবং প্রভেদ হয়ে থাকে মায়া ও মায়াবী।

বস্তুত অখণ্ড মঙ্গলময়ী মায়াই অদ্বিতীয় হয়ে সকলের মধ্যে রয়েছেন, অনন্ত শিবই শক্তি, শিবই শক্তিমান বলে কীর্তিত হন। শিব শক্তি থেকেই উদ্ভূত হয়েছেন অন্য সকল শক্তির অধিষ্ঠাতা হিসেবে। পণ্ডিতরা সাধারণভাবে শক্তিমানকে অভিন্নরূপেই অনুভব করে থাকেন। ব্রহ্মবাদীরা পুরাণে বলেছেন যে, গিরিজা দেবী সর্বশক্তিস্বরূপা আর শঙ্কর সেই শক্তির আধার। ভোক্তা বলে কথিত আছে, পতি মহেশ্বরের প্রতি অনন্যচিত্তা বিশ্বেশ্বরী দেবী ভোগ্যা এবং নীললোহিত ভগবান বনে।

আবার ভগবানের মননের বিষয় তিনি সাধুগণের বিচারে, বিপ্রগণ, সর্ববেদেই তত্ত্বদর্শী মুনিদের প্রভাবে নিরুপম, করেছেন যেসব কিছুই শক্তি ও শক্তিমান সমস্ত দর্শনে মুনিরা মাহাত্ম্ম কীর্তন করেন এই দেবীর। সেই পরম পদের সন্ধান পেয়েছেন যোগীরা। দেবীর এই পরম পদকে যোগীরা আনন্দস্বরূপ অক্ষর, ব্রহ্মস্বরূপে, অদ্বিতীয় ও অখণ্ড রূপে দর্শন করেন, যা আত্মজ্ঞানের বিষয়, পরমানন্দের সন্ধান করেন, তিনি ধাত্রী ও বিধাত্রী। ঈশ্বরকে আশ্রয় করে থাকায় সমস্ত সংসারতাপকে বিনষ্ট করেন। বিমুক্তি লাভ করতে উৎসুক ব্যক্তি সর্বভূতাত্মা শিবাত্মিকা পার্বতীকে আশ্রয় করবেন। অতি কঠিন তপশ্চর্যার পর সর্বানীকে কন্যারূপে পেতে ও হিমবান মেনকার সঙ্গে পার্বতীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

যিনি উৎপন্ন হয়েছেন নিজ অভিলাষ থেকে। এই মনোরম পার্বতীকে দেখে হিমবানের পত্নী মেনকা। হিমবানকে বললেন, রাজা আমাদের তপস্যার ফলে সকল জীবের কল্যাণের জন্য উৎপন্ন পদ্মের মতো সুন্দরাননা কন্যাকে দেখুন। তখন হিমবান দেবীকে দেখলেন। নবোদিত সূর্যের মতো তার রূপ, জটামণ্ডিতা। তাঁর তিন চোখ, চার মুখ, স্পৃহা তার তীব্র, আয়তনয়না অষ্টভুজা এ দেবীও চন্দ্রকলায় সজ্জিতা। সকল গুণ থেকে নিমুক্ত, তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় সাক্ষাৎ গুণ-ময়ী রূপে। তার মধ্যে প্রকাশ নেই সৎ অথবা অসৎ কোনটিরই।

তাঁকে দেখে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করে হিমবান প্রণাম করলেন এবং তার তেজে অভিভূত ও ভক্তিযুক্ত হয়ে হাত জোড় করে পরমেশ্বরীকে বললেন–বিশালক্ষ্মী, অর্ধেন্দু ভূষিতে দেবী, তিনি কে? হিমবানের কথা শুনে দেবী বললেন, তিনি মহেশ্বরে সমাশ্রিতা পরমাশক্তি অনন্যা, অনশ্বরা, অদ্বিতীয়া, তিনি সর্বজীবের আত্মা, সর্বপ্রকার কল্যাণ তার মধ্যে রয়েছে। নিত্য ঈশ্বর বিষয়ক যে পরমজ্ঞান, আকার রূপ সকল কার্যের প্রেরণাদাত্রী। তার অনন্ত নেই মহিমার সীমা নেই। জীবগণকে তিনি সংসার সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেন। বিভূতিসম্পন্ন রূপ দেখতে বললেন।

হিমবানকে জ্ঞান দান করে দেবী নিজের দিব্যরূপ তাকে দেখালেন। কোনটি সূর্যের মতো সেই রূপের দীপ্তি, তা যেন তেজের বিম্বস্বরূপ। তাতে নিশ্চল হয়ে আছে অসংখ্য অগ্নিশিখা, এই দেবীর হাতে ত্রিশূল আর বরদামুদ্রা। তার মধ্যে আছে অনন্ত বিস্ময়। মস্তকে তার চন্দ্র শোভা পাচ্ছে। তার লাবণ্য চন্দ্র প্রভার মতো। তার পায়ে নূপুর, গলায় দিব্যমালা, পরনে দিব্যবস্ত্র। হিমবান দেবীর যে রূপ দর্শন করলেন তার সমস্ত দিক, হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক ও মুখ। দেবী সকল পদার্থ আবৃত করে রয়েছেন। এহেন মাহেশ্বরী রূপ দর্শন করে পর্বতরাজ ভীত পুলকিতচিত্তে পরমাত্মায় আত্মসংযোগ করলেন ও ওঙ্কার উচ্চারণ করে হাজার বছর তার নামে স্তব করতে লাগলেন।

হিমবান বললেন–শিবা, উমা, পরমাশক্তি, অনন্তা, শাশ্বতী, অচিন্ত্যা, অনন্তা, পরমাত্মা, অনাদি, অচ্যুতা, অমোঘা, নন্দা, বালাবারা প্রাণরূপা, সকলা, কার্যনিয়ন্ত্রী, মাতা আত্মসংশয়া, পরমাপনশিলী পুরাণা, চিন্ময়ী ত্রিতত্ত্ব, বক্তা, শুক্লা, ব্রহ্মগর্ভা, পদ্মনাভা, মহারূপা, মহানিদ্রা, অবিদ্যা, অনন্তস্থা। ব্রাহ্মা, মহতী, মানসী, তত্ত্বসম্ভবা, ঈশ্বরাণী, সর্বানী শঙ্করাধশরীরিণী, ভবানী, রুদ্রাণী, মহালক্ষ্মী, অম্বিকা, বিকাশনী, সাবিত্রী, সরোজনিলয়া, গঙ্গা, গুহ্যবিদ্যা, মেধা, স্বধা, ধৃতি, শ্রুতি, নীতি, পুজা, বিভাবতী, রম্য, সুন্দরী, পদ্মমালা, পাপহারা, বৃষাসনগতা, গৌরী, মহাকালী, অদিতি, নিয়তা, রৌদ্রী, পদ্মগর্ভা, বিবাহলা, লেলিহাল, বিভাবরী দ্রব্যা, ভবতা পবিনশিলী, দীক্ষা, নিরাময়া, কামধেনু, গতি, ভারতী, যোগমায়, মহামতী, ক্ষ্যান্তি, প্রজ্ঞা, চিতি, বিকৃতি, শঙ্করী, শিবানদা, দুর্বিনেয়া, গুহান্বিকা, ত্রিনেত্রা।

সংসার তারিণী, বিদ্যা, ভবারণী, শুদ্ধি, সহস্রাক্ষী, ব্যাপ্তা, দৈজসী, নলিনী, পদ্মবাসিনী, সদানন্দা, বাগদেবতা, ব্রহ্মবালা, বালাতীতা, জ্ঞানশক্তি, ভগবৎপত্নী, সবালা, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ভগিনী, সর্বদা সর্বতোভা, গুহারণী, যোগমাতা, গঙ্গা, বিশ্বেশ্বরেশ্বরী, বনপিলা, বামালাভা, বালান্তারা, ভূতিভূষণা, ভূতিদা, ধর্মোদয়া, ভানুমতী, যযাগিজ্ঞেয়া, মনোজবা,

মনোরমা, মনোরস্কা, তাপসী, দেবশক্তি, মাতা, মহাশক্তি, মনোময়ী, বিদ্যা, নন্দিনী, সুরভী, কিন্নরী, বন্দিবল্লভা, ভারতী, পরমানন্দা, সর্বপ্রহরণা, প্রেতা, কাম্যা, অচিন্ত্যা, ভূলেখা, বালকপ্রভা, কুস্মাণ্ডী, ধনরত্মাঢ্যা, সুগন্ধা, গন্ধদায়িনী, ত্রিবিক্রমপদ্ভুতা।

আদ্যা, গিরীশা, নিত্যাপুষ্টা, পদ্মনন্দা, দ্বষদ্বতী, পুষ্টি, শুদ্ধি, ধুন্বতী, মহেন্দ্রভগিনী, সৌম্যা, বরেণ্যা, কল্যাণী, কমলাবাসা, হিতা, ভদ্রকালী, মহাখনা, কামভেদা, বাচ্যা, বালিপ্রিয়া, জয়ন্তী, খ্যাবৃঢ়া, ভুক্তি মুক্তি, শিবা, অমৃতা, লোহিতা, মহাভূতি, পূর্ধা। সুপ্রভা, সৌরী, সরোজনয়না, সমা, অষ্টাদশী, ভূজা, স্থানেশ্বরী, অশেষদেবতামূর্তি, গণাম্বিকা, গুহ্যরূপা, গো, গীঃ, শাস্ত্রযোনি, নিরাশ্রয়া নির্বিকারা, দৈত্যদানব নির্মম্মী, কাশ্যপন, বালকনিকা, ক্রিয়ামূর্তি কৌমুদী, শানুকীনি, বলিতাভাবা পরাবরবিভূজিতা, পরাধ জাতমহিমা, বড়বা, বামলোচনা, সুভদ্রা, দেবকী, গীতা, মুন্যমাতা রিনুরন্ধ ও প্রিয়া, হিরণ্যরজনী, হৈমী, হেমাভরণ- ভূষিতা, আদ্রিজা, সত্যদেবতা, দীর্ঘ, বাকদ্মিনী, শান্তিদা, ঐন্দ্রী, পরমেশ্বরী, বৈষ্ণবী, দাত্রী, যুগ্নদৃষ্টি, ত্রিলোচনা, প্রচণ্ডা, বৃষাবেশ, হিমবপেরু নিলয়া, চানুর, হত্ তনয়া, কামরূপিণী, বেদবিদ্যা, বীরা, বিদ্যাধরী, প্রিয়া সিদ্ধা, আপ্যায়নী, হরী, পাবনী, পোষনীকলা, মাতৃকা, সেবিকা, সেব্যা, মিনীকলী, গুরুন্মতী, অরুন্ধুতি, মগাক্ষী, বসুপ্রদা, ধারা, শ্রীমতী, শ্রীশা, শ্রীনিবাসা, শ্রীধরী, শ্রীবারী, কন্যা, ধাত্রীশাস, ধনদপ্রিষা, মালা, নির্মলা, মাঙ্গলা, মঙল্যা, বর্ণিকার করা, দিবা, শত্রুসিনগতা, শার্জী, সধ্যা, বিশিষ্টা, শতরূপা, বিনতা, সুরভি, নিবৃত্তি, পারগা, ধর্মাহনা, ধর্মপূর্বা, কালমুর্তি, কলকলিত বিগ্রহ, ধনাবহা, ধর্মান্তরা,সর্বেশ্বরী, মরহারিণী, রসজ্ঞা, ইষ্টা, সূক্ষ্মজ্ঞান, স্বরূপিণী, কুশলা, বৈদেহী, প্রধান পুরুষেশেশা, শ্রীকলা, মহাদৈবিক, সঙ্গিনী, সদাশিবা, বিষয়মূর্তি, বেদমূর্তি, এবং অমূর্তিকা।

এইভাবে সহস্র নাম দ্বারা স্তব করে দেবীকে কৃতাঞ্জলীপুটে হিমবান বললেন, পরমেশ্বরীর ভয়ানক অপরূপ ঐশ্বর্য রূপ দেখে আমি ত্রস্ত হয়েছি, তুমি আমাকে অন্য রূপে দেখাও। পার্বতী নিজের ভয়ানক রূপ সংহার করলেন। এবং হিমবানকে অন্য এক রূপ দেখালেন। সুগন্ধ নীল পদ্মের মতো। এর দুটি নয়ন ও কৃষ্ণঘন কেশে সজ্ঞিত। এর পদ্মের মতো পা দুখানির তলদেশ রক্তবর্ণ, করতলও রক্তবর্ণ। এর ললাটে তিলক উজ্জ্বল, বিচিত্র।

অলংকারে এর দেহবল্লরী অতি পেলব ও সুন্দর অঙ্গ সজ্জিত। নুপূর ঝঙ্কৃত তার পদ্মের মতো সুন্দর চরণে। দেবীর রূপ স্বর্গীয় আর অনন্ত মহিমার আধার।

এই রূপ দেখে শৈলরাজ সকল আতঙ্ক ভুলে পুলকিত হয়ে পরমেশ্বরীকে বললেন, তার জন্ম সার্থক হল, কারণ দেবী অব্যক্ত হয়েও তার দৃষ্টি সম্মুখে দেখা দিলেন। তোমাতে অবস্থিত প্রকৃতি। তুমি পরমা শক্তি, পরম আনন্দ স্বরূপা, আনন্দদায়িনী, মহাকাশ, মহাজ্যোতিঃ–স্বরূপ, গুণাতীত, মঙ্গলময়, পরম ব্রহ্ম স্বরূপ, গার্হস্থ্য ও ঈশ্বরের মধ্যে মহেশ্বর, কল্পের সঙ্গে ঈশাণ কল্প, যুগের মধ্যে সত্যযুগ, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, জপনীয়ের মধ্যে সাবিত্রী। তোমার রূপকে প্রণাম। প্রণাম তোমার কূটস্থ অপ্রকাশিত শরীর পুরুষ নামক রূপকে, বিচিত্র, বৈরাগ্য ধর্ম রূপকে, সূর্যমণ্ডলে স্থির পরমেষ্ঠীকে।

প্রলয় কালীন অগ্নিস্বরূপ, সহস্রপনায় ভূষিত আরূঢ় নিদ্রিত শেষ রূপকে, দেবী তুমি, সকল জগতের মাতা। হে অমর ঈশাণী, মেনকার সঙ্গে আমাকে রক্ষা কর, তুমি মায়াবীর মধ্যে বিষ্ণু, সতীর মধ্যে অরুন্ধতি, সুক্তের মধ্যে পুরুষসূক্ত, অদ্বিতীয়া ঐশ্বর্য, জ্ঞানী, বৈরাগ্য,ভবিষ্যৎ, ও বর্তমানের কারণ, যার সহস্র শীর্ষ, যার শক্তির অন্ত নেই, নিদ্রিত, অপ্রতিহত বিভূতি, আনন্দ রসের জ্ঞাতা, স্বর্গে নৃত্যপর, রূপরহিত, মহাদেবী, ভগবতী ঈশাণী তোমাকে প্রণাম। জগতে তোমার সম কেউ নেই। কারণ জগৎ জননী হয়েও তুমি আমার কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করেছ। তুমি জগৎ মাতা, তোমার পাদপদ্মে প্রণাম আমার, আমি তোমার আশ্রিত, মহাদেবী আমার করণীয় কাজ কি?

হিমবানের কথা শুনে দেবী ঈষৎ হেসে বললেন, যাঁরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন সেই ব্রহ্মাবিদগণের দ্বারা আরাধিত, অতিগুহ্য, সকল শক্তির দ্বারা মণ্ডিত, প্রেরয়িতা স্বরূপ অতি আশ্চর্য এবং অনুত্তম রূপ নিজে প্রত্যক্ষ করেছ। শান্ত ও সমাহিত চিত্তে একনিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ হয়ে এই রূপের শরণ নাও। তবেই তুমি সংসার পাশ থেকে মুক্ত হবে। গিরিশ্রেষ্ট ধ্যান, কর্মযোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে আমাকে পাবে। ধর্ম থেকে ভক্তি আসে আর ভক্তিই পরমাত্মা তত্ত্বের দিকে নিয়ে যায়।

যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম ধর্মযাজক, এ ভিন্ন আর কোনো কিছুতে ধর্ম নেই। বেদেই প্রকাশ ঘটেছে ধর্মের। বেদকে আশ্রয় করবেন ধর্মকামী ইচ্ছুক ব্যক্তিরা মুক্তিলাভের জন্য। বেদই শ্রেষ্ঠা শক্তি, যা পুরতনী, সেই শক্তিই সৃষ্টির ঊষালগ্নে ঋক্, যজুঃ ও সামরূপে প্রকাশিত হয়েছে। বেদের রক্ষার জন্যই জন্মরহিত ভগবান ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণের সৃষ্টি করে তাদের নিজ কার্যে নিযুক্ত করেছেন। তাদের জন্যই কুৎসিত তামিস্র নরক সৃষ্টি হয়েছে। যারা বেদবিহিত এই ধর্মকে উপেক্ষা করে। বেদ ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্র নেই যেখানে ধর্মের কথা আলোচিত হয়েছে। দ্বিজগণ বাক্যালাপও করেনা তার সাথে যে অন্যশাস্ত্রে মনোযোগ দেয়। কপাল, ভৈরব,

দামাল, বাম, আহত, কপিল, পঞ্চরাত্র ও জ্ঞামর শাস্ত্রও মোহ উৎপাদন করে। অসুরদের মেহিত করার জন্য এইসব শাস্ত্র তৈরি হয়েছে।

তারাই প্রিয় হয় যারা বেদাবিদগণের দ্বারা করণীয় সব বৈদিক কর্ম যত্ন সহকারে সাধন করে।

মনু বিরাট পুরুষ স্বয়ং স্বায়ম্ভুব মনু পুরাকালে আমার আদেশেই সকল বর্ণের হিতের জন্য মুনিদের কাছে ধর্মের কথা বলেছিলেন। মহষিরা ব্রহ্মর আদেশে যুগে যুগে সকল ধর্মশাস্ত্র বারবার রচনা করবেন। আঠারোটি পুরাণ লিখেছেন বেদব্যাস ব্রহ্মার কথায়। তাঁর শিষ্যরা অনেক উপপুরাণও লিখেছেন। শাস্ত্রের সংখ্যা চতুর্দশ, যা হল শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, যা হল শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিশাস্ত্র, ন্যায়বিদ্যা, মীমাংসা, পুরাণ শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র এবং চারবেদ, ধর্মের স্বরূপ চিত্রিত হয় না।

এই সকল শাস্ত্র ছাড়া মনু, ব্যাস প্রমুখ মুনিগণ পিতামহের দ্বারা উক্ত উত্তম ধর্মকে মহাপ্রলয় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করে যাবেন। মহাপ্রলয় উপস্থিত হবে ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হয়ে গেলে। আত্ম সাক্ষাৎকারী মুনিরা ব্রহ্মার সঙ্গে পরব্রহ্মে লীন হয়ে যাবেন। তাই বেদকে আশ্রয় করবে যত রকম ভাবে সম্ভব। পরমব্রহ্ম প্রকাশিত হয়ে ধর্মের জ্ঞান মিলিত হলে তবেই আসক্তি যুক্ত ব্যক্তি আমার শরণাপন্ন হবে। সর্বদা কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির নিকট ঘোর অন্ধকার রূপে উদ্ভূত মায়াকে জ্ঞানের দ্বীপ জ্বেলে অচিরেই বিনাশ করে থাকি।

আমাতেই সমর্পিত প্রাণ, কাল নামক পরম পুরুষের শরণ নাও। ঐশ্বর্য রূপের ধ্যান করতে না পারলে আমার যে রূপ প্রত্যক্ষ হয় তাতে মনপ্রাণ অর্পণ করে সেই রূপের অর্চনা কর। পরমপদ স্বরূপ রূপকে কেবল অতি ক্লেশে লভ্য জ্ঞানের দ্বারা পাওয়া যায়। আমাতে প্রবেশ করতে সমর্থ কেবল আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিরা। শ্রেষ্ঠ ও নির্মল মোক্ষ লাভ করা যায় না আমাকে আশ্রয় না করলে। একভাবে বা পৃথক ভাবে আমার উপাসনা করলে পরম পদ লাভ করতে পারে। শুদ্ধস্বরূপ পরমতত্ত্বকে জানতে পারবে না আমাকে আশ্রয় না করলে। ব্রহ্মরূপ বা ঐশ্বর্যরূপের আরাধনা কর যত্ন করে।

অহংকার, মাৎসর্য, কাম, ক্রোধ, দান গ্রহণ এবং অধর্মে মনোযোগ পরিহার করে আর বৈরাগ্য অবলম্বন করে সকল প্রাণীকে নিজের মতো এবং নিজেকে সকল প্রাণীর মতো মনে করতে হয়। পরমব্রহ্মে অবস্থান করা যায় ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে, প্রসন্ন চিত্তে সর্বতোভূতকে অভয় দান করলে অনন্যাভবিনী ঈশ্বর বিজয়িনী পরম ভক্তি লাভ করা যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অখন্ড ব্রহ্ম স্বরূপ পরম তত্ত্ব দর্শন হয় এবং সংসারের সকল পাপ থেকে নিমুক্ত হয়ে পরমব্রহ্মে

অবস্থান করা যায়। কল্যাণময় মহেশ্বরই পরম ব্রহ্মের চরম পরিণতি। সংসারের সকল বন্ধন ত্যাগ করে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। হে পর্বতাধিরাজ, তোমার অভিলাষ পূর্ণ কর। আমাকে ঈশ্বরের সন্নিহিতা বলে জেনো, সর্বপ্রকার যত্নের সঙ্গে ঈশাণীকে পূজো করে তার শরণাপন্ন হও।

হিমবান নত মস্তকে দেবীকে প্রণাম করলেন ও পরম আত্মজ্ঞানের উপায় জানতে চাইলেন।

সূত বললেন, এই কথা শুনে দেবী পরমেশ্বরী তাকে সেই পরম জ্ঞানময় উত্তম আত্মযোগ ও তার উপায়গুলির কথা সবিস্তারে যথাযথ ভাবে বললেন। গিরিরাজ লোকমাতার মুখপদ্ম থেকে নিঃসৃত পরম জ্ঞানের কথা শুনে যোগের প্রতি আসক্ত হলেন।

দিব্যযোগ লাভ করে ব্রহ্মলোক পার হয়ে দেবীর পরম স্থান লাভ করে সেই ব্যক্তি যে পবিত্র ও তদগত চিত্তে শিবসন্নিধানে ভক্তির সঙ্গে দেবীর মাহাত্ম কীর্তন নামক অধ্যায় পাঠ করে, সে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হয়। ভক্তি যোগযুক্ত যে ব্রাহ্মণ দেবীর এক হাজার আট নাম জেনে সূর্যমণ্ডলের মধ্যে স্থিতা দেবীকে আবাহন করে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করে সে পরম ব্রহ্মে গমন করে। ব্রাহ্মণের পবিত্রকুলে জন্মে পূর্বজন্মের সকল সংস্কারের মাহাত্মে দেববিদ্যা লাভ করে পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় দিব্য পরম যোগ প্রাপ্ত হয়, এবং শান্ত সংযত হয়ে শিবের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। মহামারী কৃত দোষ ও গ্রহবৈগুণ্য থেকে মুক্ত হয় সে যে ত্রিসন্ধ্যা পরমেশ্বরীর প্রত্যেক নাম উচ্চারণ করে হোম করে; দ্বিজগণ সকল রকম যত্ন আশ্রয় করে সর্বপাপ নাশের জন্য দেবীর সহস্র নাম জপ করবে।

সূত বললেন–ব্রাহ্মণগণ, দেবীর অনুপম মাহাত্ম্যের কথা আপনাদের কাছে বললাম।

১৩

ভৃগুর স্ত্রী খ্যাতির গর্ভে নারায়ণ বল্লভা লক্ষ্মী জন্ম নিলেন। ধাতা ও বিধাতা মেরুর দুই জামাতা। কন্যা দুটির নাম আয়তি ও নিয়তি। তাদের মধ্যে আয়তির পুত্রের নাম প্রাণ ও নিয়তিটির নাম মৃকুণ্ডু, যার থেকে জন্ম নেয় মার্কণ্ডেয়। প্রাণের ঔরসে বেদশিরা নামক দীপ্তরূপ সম্পন্ন এক পুত্র জন্মায়, মারীচি পত্নী পূর্ণমস নামক এক পুত্র ও চার কন্যার জন্ম দেন। এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হল তুষ্টি। পূর্ণমাসের বিরজা ও পর্বত নামক দুই পুত্র। পুলহ পত্নী ক্ষমার তিন পুত্র-কদম, বরীয়ান ও সহিষ্ণু। সহিষ্ণু কনিষ্ঠ। অত্রি পত্নী অনুসূয়ার গর্ভে তিন পুত্র জন্মায়।

এর হল দুর্বাসা, সোম ও দত্তাত্রেয় অঙ্গিরা পত্নী স্মৃতি চার কন্যা প্রসব করেন- সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি। পুলস্ত্যের ঔরসে প্রীতির গর্ভে দত্তোলি জন্মায়। ইনি অগস্ত্য নামে পরিচিত ছিলেন। এর দেববাহু নামক এক কন্যা জন্মায়। ক্রতুর পত্নী সন্মতির গর্ভে ষাট হাজার পুত্র জন্মায়। এরা ঊর্ধ্বরতা ও বালখিল্য নামে পরিচিত। ঊর্জার গর্ভে সাত পুত্র ও কন্যা জন্মায়।

রুদ্র বহ্নি নামক খ্যাত ব্রহ্মার পুত্রের ভার্য্যা স্বহা পাবক, পবমান ও শুচি নামক তিন পুত্র প্রসব করেন। পিতৃগণ হলেন ব্রহ্মার পুত্র, এরা অগ্নিদ্বারা ও বহিষদ নামক দুটি ভাগে বিভক্ত। স্বধার গর্ভে এঁদের ঔরসে মেনকা ও ধারিনী নামক দুই কন্যার জন্ম হয়। যারা বেদ অধ্যয়ন ও যোগ আশ্রয় করেছিলেন, মেনকার গর্ভে মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ জন্মায়। ত্রিভুবনের মধ্যে অনুপমা, পাবয়িত্রী গঙ্গার জন্ম হয়। হিমবান দেবী মহেশ্বরীকে নিজ কন্যারূপে পান।

এই দেবী মাহাত্ম্যের কথা যথাক্রমে বললাম। দক্ষের কন্যা আর সন্তানদের কথাও শুনলেন। এখন মুনি সৃষ্টির কথা শুনুন।

১৪

স্বায়ম্ভব মনুর স্ত্রী ছিলেন শতরূপা। প্রিয়ব্রত ও জ্ঞানপাদ নামক ঈশ্বরত্ব দুই পুত্রের জন্ম হয় যাঁরা অত্যন্ত ধার্মিক ও বীর্যবান ছিলেন। জ্ঞানপাদের ধ্রুব নামক পুত্র নারায়ণের প্রতি ভক্তির ফলে প্রাপ্ত হয়। উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করে। তার আবার শিষ্টি ও ভব্য নামক দুই পুত্র। ভব্য থেকে শম্ভুর জন্ম। সুচ্ছায়া নামক পত্নী ছিল সৃষ্টির, তিনি শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুর আরাধনা করেন বশিষ্ঠের উপদেশে। তিনি পাঁচ পবিত্র পুত্রের জননী হন রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা নামে রিপুর মহিষী সর্বতেজোময় পুত্র প্রসব করেন, যার নাম চক্ষু।

সে আবার সুরূপ চাক্ষুষ মনুর জন্মদাতা। বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা পড়লার গর্ভে মহাতেজা মনুর অতিবীর্যবান দশ পুত্র হয়। ঊরু পত্নী আগ্নেয়ী বলবান ছয় পুত্র প্রসব করেন। অঙ্গ থেকে বেন এবং বেন থেকে বৈন্য জন্মায়, সেই নৃপতি পৃথু নামে বিখ্যাত। তিনি দেবেন্দ্রের সঙ্গে পুরাকালে প্রজা হিতকামনায় ব্রহ্মার আদেশে পৃথিবীকে দোহন করেন। এই মন্বন্তরে পুরাণ পুরু, হরি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের রূপ ধরে প্রসন্ন হয়ে আমাকে শিক্ষা দেন।

নৃপতি পৃথু জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তিনি একান্তভাবে স্বধর্মের অনুশীলন করতেন। বাল্যকাল থেকে নারায়ণের প্রতি পৃথুর ভক্তি ছিল। তিনি গোবর্ধন গিরিতে গিয়ে তপস্যা করেছিলেন।

হৃষিকেশ তাতে তুষ্ট হয়ে সর্বশাস্ত্রধারী পুত্রের জনক হবার আশীর্বাদ দিয়ে অন্তর্হিত হন। পৃথুও হরির নাম করে, তাঁর ভজনা করে রাজ্যশাসন করতে থাকেন।

শিখণ্ডী, হবিধান ও অন্তর্ধান নামক পুত্রদের প্রসব করলেন পৃথুর পবিত্র হাসিনী তন্বী স্ত্রী। সুশীল নামে শিখণ্ডীর এক পুত্র জন্মায়। সুশীল হিমালয় পৃষ্ঠে ধর্মপদ নামক এক অরণ্যে মন্দাকিনী নদীর দক্ষিণে যোগীদের আশ্রম দেখে। সেখানে গিয়ে মন্দাকিনীতে স্নান করে স্তব করতে লাগলেন।

মহাপশুপত, সর্বাঙ্গে ভস্ম ও কৌপীন পরিহিত এক মহামুনি তাঁর নজরে পড়ল। তাঁর গলায় রয়েছে। যজ্ঞোপবীত। সুশীল সান্তর স্তব শেষ করে আননন্দাপূর্ণ নয়নে মহামুনির চরণে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করলেন। মুনি মহাদেবের ধ্যানে রত হয়ে সর্ব সিদ্ধির জন্য নিয়মানুসারে সর্বপাপনাশক, বেদের পরাভূত, মোক্ষদায়ক, ঋষি প্রবর্তিত পুণ্যজনক অগ্নি মন্ত্রের উপদেশ করলেন।

পৃথুর পুত্র হবির্ধান পত্নী আগ্নেয়ীর গর্ভে প্রাচীন বহিঃ নামে ধনুবিদ্যা পারদর্শী এক পুত্র জন্মায়। সমুদ্র তনয়ার গর্ভের দশ পুত্রকে প্রচেত বল হয়। এরা সকলে বেদ অধ্যায়ন করেছিলেন। দক্ষ প্রজাপতির জন্ম হল পরিষার গর্ভে। যে পূর্ব জন্মে ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন।

একদিন ব্রহ্মার পুত্র দক্ষকে তাদের গৃহে সমাগত দেখে স্বয়ং মহাদেব তার পূজো করেছিলেন। তাঁর প্রাপ্যের অধিক পূজা হলেও তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হননি। সতী একদিন পিত্রালয়ে এলে দক্ষ সতীর কাছে মহাদেবের নামে নিন্দা করলেন। এবং তাঁর অন্য জামাতাদের শ্রেষ্ঠ বললেন। দেবী তখন পিতৃনিন্দা করলেন। যোগবলে নিজশরীর দগ্ধ করে ফেললেন। এরপই তিনি হিমবানের কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। হর সর্বজ্ঞাত হয়ে দক্ষের গৃহে গমন করে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাপ দিলেন ক্ষত্রিয় কুলে জন্মাবার এবং বললেন–তিনি নিজ কন্যার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবেন। স্বায়ম্ভুব দক্ষ ও প্রাচেতস হয়ে জন্মালেন।

১৫

সূতের কাছে ঋষিরা রাক্ষসদের উৎপত্তির কথা জানতে চাইলেন। দক্ষের পরিণতির কথাও শুনতে চাইলেন।

সূত বললেন, দক্ষ অভিশপ্ত হয়ে হরির যজ্ঞ করতে মনস্থ করলেন। হরির যজ্ঞে মহাদেব ছাড়া অন্য সব দেবতারা উপস্থিত ছিলেন। যারা যজ্ঞ দেখতে এসেছিলেন তারা সকল সূর্য বলে খ্যাত। এরা ছাড়া অন্য সূর্য নেই। সেখানে উপস্থিত মুনিরা কেউ মহাদেবকে দেখতে পেলেন না। দক্ষ ব্রহ্মার অন্তর্হিত হবার পর হরির শরণ নিলেন। দেবী যখন মহাদেবকে জানান যে তার পূর্ব জন্মের পিতা দক্ষ এই যজ্ঞ করছে ও তার রক্ষা করছেন হরি, তখন মহাদেব তা বিনষ্ট করার জন্য বীরভদ্র নামক এক রুদ্রের সৃষ্টি করলেন। যার সহস্র মস্তক, নেত্র, বাহু ও হস্ত। ইনি ধনুর্ধর ও ভস্মভূষিত।

মহেশ্বর তাকে বললেন– হে গণেশ্বর, তুমি দক্ষযজ্ঞ পণ্ড কর। বীরভদ্র তখন যজ্ঞ নাশ করলেন। পার্বতীও ভদ্রকালী নামে এক মহাকালীর সৃষ্টি করলেন। তার সঙ্গে বৃষে আরোহণ করে গমন করলেন বীরভদ্র। বীরভদ্র সৃষ্ট হাজার রুদ্র ও মহাকালী মিলিত হয়ে দক্ষের কাছে যজ্ঞের ভাগ চাইল। কিন্তু দক্ষ যজ্ঞ ভাগ দিতে নারাজ হলে, বীরভদ্র বাহিনী যজ্ঞ মণ্ডপ ছিন্নভিন্ন করতে লাগলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ব্রহ্মা এসে বীরভদ্রকে থামালেন ও তাকে তুষ্ট করলেন।

দক্ষ হাত জোর করে ভগবতীর স্তুতি করতে লাগলেন। তখন দেব তুষ্ট হয়ে দক্ষকে বললেন, দক্ষ যেন তাঁর ভক্তি করে, তবে হরের অনুগ্রহে কল্পের শেষে গণেশ্বর হবে। ব্রহ্মা তখন দক্ষকে আলস্য ত্যাগ করে হরের নির্দেশিত কর্ম করতে বললেন। শিবনিন্দা তোমার বিনাশের কারণ, তাই সযত্নে একে পরিহার কর। তার নিন্দাকারীর সব কার্যই দোষাবহ হয়। তারা অন্তিমকালে নরকে যায়, যারা বিষ্ণুকে মহাদেবের থেকে ভিন্ন বলে মনে করে।

দক্ষ ব্রহ্মার কথায় কৃত্তিবাসের শরণ নিলেন। পরে ব্রহ্ম বাক্যে এবং পূর্ব সংস্কারের মাহাত্মে শাপ মুক্ত হয়ে সূর্য সদৃশ রূপ লাভ পূর্বক ব্রহ্মার অনুমতি পেয়ে জগতের অধীশ্বর পরব্রহ্ম রূপ, মহেশের আরাধনা করে তারই প্রসাদে নিজেদের পূর্ব গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

এবার দক্ষ কন্যাদের সন্তান সন্ততির কথা বলছি, শোন।

১৬

দক্ষকে পুরাকালে ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করতে আদেশ করলে, তিনি ধর্ম সঙ্গত মৈথুন ক্রিয়ার দ্বারা প্রজা সৃষ্টি করতে লাগলেন। বীরণ নামে প্রজাপতির কন্যা ছিল অসিক্নী এক হাজার পুত্রের

জন্ম দিল দক্ষ। ধর্মনিরতা কন্যার গর্ভে দক্ষ, বীরন কন্যার গর্ভে ষাট কন্যার জন্ম দিলেন। নারদের মায়ায় পুত্রেরা বিনষ্ট হলে এর মধ্যে ধর্মকে দিলেন দশটি, কাশ্যপকে তেরোটি, চন্দ্রকে সাতাশটি, আরিষ্টমিনেকে বাহু পুত্র ও ধীমান কৃশাশ্বকে ও অঙ্গীরাকে দুটি করে দিলেন।

ধর্মের পত্নীদের নাম ছিল মরুত্বতী, রসু, যামী, লম্বা, ভানু, অরুন্ধতী সঙ্কল্পা, মুহুতা, সাধংসা ও ভামিনীবিশ্বা।

অষ্টবসু হলেন আপ, ধ্রু, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস। এই আটজন অষ্টবসু নামে বিখ্যাত আপের পুত্র বৈতন্ত্য, শ্রম, শান্ত ও ধ্বনি, ধ্রুবের পুত্র ভগবান কাল, সোমের পুত্র বর্চ, ধরের পুত্র দ্রবিণ, অনিলের পুত্র মনোজ ও অবিজ্ঞাত গতি অনলের পুত্র সেনাপতি কুমার দেবল প্রত্যুষের পুত্র, শিল্পকার প্রজাপতি বিশ্বকর্মা প্রভাসের পুত্র।

কাশ্যপপত্নী দক্ষকন্যাদের পুত্রদের নাম হল– অংশ, ধাতা, ভগ, ত্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, অর্যমা, বিবস্বনা, সতী, পূষা, অংশুমান ও বিষ্ণু পুরাকালে চাক্ষুস মন্বন্তরে তুষিত দেবতা নামে বিখ্যাত ছিল। পরে এদের নাম হল দ্বাদশ আদিত্য কাশ্যপের ঔরসে দিতির দুই পুত্র জন্মায়, তাঁদের নাম হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ।

হিরণ্যকশিপুর ছিল বিপুল বিক্রম, তিনি ব্রহ্মার তপস্যা করেছিলেন তাঁর বর লাভ করেছিলেন। বিষ্ণুকে দেখে কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর পাদমূলে মাথা নত করে প্রণাম করলেন এবং বললেন, আপনি সকল ভূতের গতি, আপনি অনন্ত মহাযোগী, সর্বব্যাপী, সনাতন সর্বভূতের আত্মা, পরা প্রকৃতি বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যে নিরত, জগতের স্রষ্টা, ভগবান পীতবসন বিষ্ণু ব্রহ্মার কথায় জাগ্রত হয়ে কমল নয়ন মেলে দেবতাদের কাছে জানতে চাইলেন কেন তারা প্রজাপতিকে নিয়ে এসেছেন। দেবতারা জানাল হিরণ্যকশিপু সকলকে উৎপাত করছে, হরি ছাড়া কেউ তাকে বধ করতে পারবে না। বিষ্ণু তখন এক ভয়ঙ্কর পুরুষের সৃষ্টি করলেন। তাকে বললেন–দৈত্যকে বধ করে ফিরে আসতে।

তাকে দেখে হিরণ্যকশিপু অস্ত্রধারী, প্রহ্লাদ প্রমুখ পুত্র ও দৈত্যদের সঙ্গে স্বয়ং গমন করলেন। সকলে ভাবল হয় এ নারায়ণ নতুবা তার পুত্র। তাকে লক্ষ্য করে দৈত্যরা শর নিক্ষেপ করল। হিরণ্যকশিপুর চারপুত্র তার সাথে যুদ্ধ করতে লাগল, তাকে কোনভাবে বিচলিত করা গেল না। সে দৈতরাজের পুত্রদের পা ধরে ঠেলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। হিরণ্যকশিপু তখন তার বক্ষে পদাঘাত করলেন।

সেই পুরুষ তখন গরুড়ে আরোহণ করে বিষ্ণুর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন বিষ্ণু অর্ধেক মানুষ ও অর্ধেক সিংহের রূপধারী নৃসিংহ অবতারে দৈত্যর সামনে হাজির হলেন এবং বহ্নির মতো ঘোর এবং করাল দ্রংষ্ট্রারূপ নিয়ে দৈত্য ও দানবদের বিহ্বল করে ফেললেন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে যেতে বললেন। প্রহ্লাদ যুদ্ধে পরাজিত হল। দৈত্যপতি তখন হিরণ্যাক্ষকে পাঠালেন। পশুপতি অস্ত্রও তার কোনো ক্ষতি করতে পারল না।

প্রহ্লাদ এই কাণ্ড দেখে তাকে বাসুদেব বলে চিনতে পারলেন। তিনি সমস্ত অস্ত্র ত্যাগ করে নারায়ণের স্তব করতে লাগলেন। হিরণ্যকশিপুর দুর্বুদ্ধির কোন অন্ত ছিল না। প্রহ্লাদকে বললেন, যেভাবে হোক একে বধ করতে, প্রহ্লাদ তখন বলল যে, ইনি বিষ্ণু এঁর ক্ষয় নেই। কারো সাধ্য নেই এঁকে বিনাশ করার।

কিন্তু হিরণ্যকশিপু অবুঝের মতো তার সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তখন বিষ্ণু তাকে বিদীর্ণ করলেন নখর দিয়ে। হিরণ্যাক্ষ এই কাণ্ড দেখে পলায়ন করল এবং বিষ্ণু নিজ রূপ ধারণ করলেন।

তখন নারায়ণ প্রহ্লাদকে সিংহাসনে বসালেন। হিরণ্যাক্ষ মহাদেবকে তুষ্ট করে অন্ধক নামক পুত্র লাভ করলেন। সে সকল দেবতাকে জয় করে পৃথিবীকে বন্ধন করল। দেবতারা তখন পাতালে গিয়ে বিষ্ণুকে সবকিছু জানালেন। নারায়ণ তখন তার বধের উপায় রূপে শুভ্র শূকর রূপ ধারণ করলেন এবং হিরণ্যাক্ষ হত্যা করে, পৃথিবীকে দন্ত দিয়ে উদ্ধার করলেন। হিরণ্যাক্ষ নিহত হলে প্রহ্লাদ তার স্বভাব ত্যাগ করে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। বিষ্ণুর প্রসাদে তার রাজ্য সবরকমভাবে শত্রু শূন্য হয়ে উঠল।

একদিন প্রহ্লাদ কোন এক তপস্বীর পূজা না করলে তিনি অপমানিত হয়ে শাপ দিলেন। বললেন, যে ব্রাহ্মণদের অবমাননা করে তার দিব্য বৈষ্ণবী শক্তি বিনষ্ট হবে। পাপের বলে প্রহ্লাদ নারায়ণের ভক্তি ত্যাগ করে ব্রাহ্মণদের অবমাননা করতে লাগলেন। তখন তাঁর ও বিষ্ণুর রোমহর্ষণ যুদ্ধ হল।

ভগবানের কাছে পরাজিত হয়ে প্রহ্লাদ তাঁরই শরণ নিলেন। এরপর প্রহাদ মহাযোগে নারায়ণপ্রাপ্ত হলেন। বিশাল রাজ্যের অধিকারী হল অন্ধক। সে কামনা করতে লাগল ভগবতী পার্বতীকে। হাজার হাজার গৃহমেধী মুনি পবিত্র দেবদারু বনে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য

দুশ্চর তপস্যা করেছিলেন। তারপর অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। এর ফলে প্রাণীদের মৃত্যু হচ্ছিল। ক্ষুধাত মুনিরা গৌতমের কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের অন্ন দেন।

এরপর বারো বছর কেটে গেলে বিপুল বৃষ্টি হল এবং জগৎপূর্বরূপ হয়ে উঠল। মুনিরা সকলে মিলে মহর্ষি গৌতমের কাছে তাঁকে বরণ করলেন। তাতে মুনিরা সকলে এক কৃষ্ণবর্ণ গাভী সৃষ্টি করে মাত্র সে মারা গেল। মুনিরা তখন বললেন, এই গোহত্যার পাপ যতদিন তার শরীরে থাকবে ততদিন তারা আর অস্ত্র গ্রহণ করতে পারবে না। এই বলে তারা পূর্বমত দেবদারু বনে তপস্যা করতে গেলেন।

গৌতম এই ছলনার কথা জানতে পেরে তাদের শাপ দিয়ে বললেন, তারা বেদ বহিষ্কৃত হবেন। বার বার জন্মাতে হবে তাঁদের। তাঁরা মহাদেবের শরণাপন্ন হলে, মহাদেব বিষ্ণুর কাছে জানতে চাইলেন, এঁদের কি গতি করা যায়।

বিষ্ণু বললেন, বেদ বহিষ্কৃত মানুষদের কোন পুণ্য থাকে না। কারণ বেদ বর্ণ থেকেই উৎপন্ন হয়। তথাপি বাৎসল্য বশত এদের রক্ষা করা কর্তব্য তাই তিনি এদের বিমোহিত করার জন্য শাস্ত্র রচনা করবেন। তখন বিষ্ণু শিব একত্রে সোম শাস্ত্র রচনা করলেন। মুনিদের বললেন, এই শাস্ত্রবিহিত কর্ম করতে ও সঙ্গতি লাভ করতে। তখন মুনিরা সকলে মিলে তাদের কথা মতো চলতে লাগলেন।

নিজে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন। ভৈরবকে নিযুক্ত করে নরমুন্ডের মালায় ও প্রেত ভস্মে সজ্জিত হলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ভিক্ষা করেছিলেন। দেবী পার্বতী তখন তাঁর পুত্রকে বিষ্ণুর হাতে সমর্পণ করেছিলেন। এবং দেবগণকে সেখানেই রেখে গিয়েছিলেন। মহাদেবের প্রস্থানের পর দেবতারা রমণীয় স্ত্রীমূর্তি ধারণ করে মহাদেবীকে সেবা করতে লাগলেন। নন্দীশ্বর পূর্বের ন্যায় দ্বার দেশেই অবস্থান করতে লাগলেন।

এই সময় দুর্মতি অন্ধক পার্বতীকে হরণ করার উদ্দেশে মন্দার পর্বতে গেল। শঙ্কর তাকে প্রবেশে বাধা দিলেন। তিনি দৈত্যের বুকে শূল বিদীর্ণ করে দিলেন। অন্ধক, তখন অনেক দৈত্য সৃষ্টি করল। তারা ভৈরবের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ করতে লাগল। মহাদেব তখন বিষ্ণুর শরণ নিলেন। বিষ্ণু তখন অসুর সংহার কল্পে একশো উত্তম দেবী সৃষ্টি করলেন। বিষ্ণুর মাহাত্ম্যে তারা সহস্র অন্ধককে হত্যা করলেন।

অন্ধক তখন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করল।

বারো বছর লীলা করে হরমন্দর পর্বতে গেলেন। গণেশ্বররা সকলে তাঁর উপাসনা করতে লাগলেন। মহাদেব ভৈরব নন্দী ও কেশবকে দেখতে পেলেন। তিনি নন্দীকে প্রীতি সম্ভাষণ জানালেন। নারায়ণকে আলিঙ্গন করলেন। দেবী শঙ্করকে জয়ের কথা জানালেন। তারপর সকল দেবতারা একত্রে ত্রিলোচনকে দেখবার জন্য মন্দর পর্বত গেলেন।

দেবীরা ভক্তিসহ তাকে প্রণাম করে সাগ্রহে গান করতে লাগলেন। ভগবতী গিরিজা ও দেবাসনে উপবিষ্ট ভগবান নারায়ণকেও তারা প্রণাম করলেন। তাঁরা দেবীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, সূর্য প্রভাব শালিনী, পদ্মায়তলোচন পুরুষটি কে, তাদের কথা শুনে অব্যয় ভূতেশ্বর বললেন–ইনি জগজ্জননী গৌরী। আর ঐ পুরুষ আত্মা ও ত্রাতা ও পরমপদ গৌরী, নিরঞ্জনা শক্তি এর মধ্যেই বিলীন হয়ে সকল জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। ইনিই সকল প্রাণীর যাবতীয় অবলম্বনের মধ্যে প্রধান।

দেবতা ও গণেশ্বররা সকল ভগবানের কথা শুনে মহাদেব, নারায়ণ ও ভগবতাঁকে প্রণাম করলেন, ও ভক্তি প্রার্থনা করলেন।

তখন সব কিছু ভীষণ অদ্ভুত বলে মনে হল। অন্ধক এই অবসরে মোহবশে পার্বতী হরণে সেখানে আগমন করলে শঙ্কর ও বিষ্ণু একত্রে দৈত্যদের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন। মহাদেব ত্রিশূল নিয়ে আগে যেতে লাগলেন। বিষ্ণু তার অনুগমন করলেন। তারা আকাশ পথে সহস্র আকৃতি ধারণ করলে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। অন্ধক বাহুবলে সকলকে পরাস্ত করে যুদ্ধ ক্ষেত্রের যে স্থানে অনন্ত জ্যোতি শম্ভু উদ্বিগ্ন চিত্তে সেখানে গমন করলেন।

ভৈরব অন্ধককে আসতে দেখে মহাদেবকে বললেন–তাঁকে হত্যা করতে। বাসুদেবের কথা শুনে হর, অন্ধকের বিনাশ করতে চাইলেন।

সাধুদের শরণ্য ঈশ্বর কালাগ্নির রুদ্র অন্ধককে ত্রিশূলের অগ্রভাগে বিদ্ধ করে নৃত্য করতে লাগলেন। অন্ধককে শূল বিদ্ধ দেখে ঈশ্বর ভৈরব দেবকে প্রণাম করতে লাগলেন। সুন্দরদেহী অপ্সরার আকাশ পথে নৃত্য করতে লাগল।

সমস্ত পাপ বিনষ্ট হল অন্ধকের ভগবানের শূলাগ্রে স্থাপিত হওয়ায়। সে পরমেশ্বরের স্তব করে বলতে লাগল– অনন্ত মূর্তি কালরূপ, পুণ্যস্বরূপ, কবি, জ্বলন্ত, সূর্যসদৃশ, নৃত্যপর রুদ্ররূপ, বিভাগ হীন অমল তত্ত্ব স্বরূপ, সকল জগতের আত্মা, পুরাণ পুরুষ অক্ষর ও পরম পবিত্র ব্রহ্মা, ওঁঙ্কার নির্মুক্তি স্বয়ম্ভুব, নারায়ণ, আদি জগত পিতামহ, বেদান্তগুহ্য, ত্রিশক্তির অতীত,

নিরঞ্জনা, ত্রিমূর্তি, জগত আশ্রয়, সহস্র চণ্ডাল, সহস্রমূর্তি, পরমতত্ত্ব, চরম সিদ্ধান্ত, জগতের উৎস, অম্বিকাপতি মূঢ়, গুহান্তর ত্রিকালতীত, পুণ্যজ্যোতি, মঙ্গলময়কে নমস্কার।

অন্ধকের স্তবে তুষ্ট হয়ে তাকে শূল মুক্ত করলেন মহেশ। এরপর তারা গণেশ্বরদের অধিপতি করে দিলেন এবং নন্দীশ্বরের অনুচর হয়ে দেবপূজিত হবার কথা বললেন।

অন্ধক দেবতাদের সামনেই ভাস্কর, ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ শূলপানি, গণেশ্বরে পরিণত হন। তাতে দেবতারা তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন। বিষ্ণু তখন বললেন, এই বিপুল, মাহাত্ম্য আপনার উপযুক্ত ভৈরবকে একথা বলে তিনি মহাদেবের কাছে গেলেন। মহাদেবও নিশ্চিন্ত হলেন। মহাদেব হিরণ্যাক্ষ তনয়কে পার্বতী যে বিমানে ছিলেন সেখানে নিয়ে গেলেন।

অন্ধক মাহেশ্বরী ও মহাদেবের চরণ পদে দণ্ডবৎ হয়ে তাঁদের প্রণাম করলেন। এবং স্তব করে বললেন, হিমালয় কন্যা, শিবপ্রিয়া, গিরীশ কন্যা, অজন্মা শৈলজকে প্রণাম এভাবে স্তব করলে দেবী তুষ্ট হয়ে তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ভৈরব তখন মহাদেবের অনুমতি নিয়ে মাতৃকাদের সঙ্গে পাতালে গমন করলেন। বিষ্ণু সেখানে নরসিংহ মূর্তিতে বিরাজিত।

ভগবান শেষনাগ দ্বারা পূজিত হয়ে নিজ আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত করলেন। সকল মাতৃকা ক্ষুধায় কাতর হয়ে ত্রিনয়ন মহাদেবকে বললেন–তারা ক্ষুধায় বড় কাতর হয়েছেন। তাঁরা সমগ্র ত্রিভুবন ভক্ষণের অনুমতি চাইলেন। তারা এই কথা বলেই সমগ্র ত্রৈলোক্য ভক্ষণ করতে লাগলেন। ভৈরবদের প্রণত হয়ে নারায়ণের ধ্যান করতে লাগলেন। হরি তার সামনে এলেন। ভৈরব হরিকে মাতৃকাদের কার কথা জানালেন। মাতৃকাদের বিষ্ণু স্মরণ করলে তারা এসে ভৈরবকে নিজেদের সমস্ত শক্তি দিয়ে দিলেন।

হৃষিকেশ এরপর শূলপানিকে বললেন–তার ভক্তদের তিনি সর্বদা রক্ষা করেন। মহেশ্বরের এই অনুপম মূর্তি তারই। এগুলি তার অবস্থাভেদে তামসী মূর্তি লোকমোহিনী নারায়ণী মূর্তি সমস্ত জগৎকে নিয়ত পালন করছে।

মাতৃকাদের এই কথা বুঝিয়ে বললে তারা মহাদেবেরই শরণ নিলেন।

১৭

অন্ধক নিগৃহীত হলে প্রহ্লাদ পুত্র বিরোচন রাজা হয়েছিলেন। তিনি অনেক বছর পর্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক ত্রিভুবন পালন করেছিলেন। একবার সনৎ কুমার বিষ্ণুর আদেশে অসুর রাজ্যের

প্রাসাদে এসেছিলেন। তাঁকে আসতে দেখে সিংহাসন ছেড়ে উঠে তার চরণে প্রণাম করে হাত জোড় করে বললেন, আমি ধন্য। কেন ব্রহ্মপুত্র এসেছেন জানতে চাইলেন সনকুমার বললেন, তিনি তাকে দেখতেই এসেছেন। ধর্মপথে চলা দৈত্যদের পক্ষে বেশ কঠিন। অসুররাজ বললেন, পরম ধর্মের কথা কি? দৈত্যপতিকে তখন তিনি গুহ্য ধর্মের উপদেশ দিলেন।

দৈত্যপতি গুরুদক্ষিণা দিলেন। পুত্রের কাছে রাজ্যভার দিয়ে নিজে যোগাভ্যাস করতে লাগলেন।

বিরোচনের পুত্র বলি যে খুব ধার্মিক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান। তিনি একসময়, যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন ইন্দ্রের সঙ্গে। ইন্দ্র পরাজিত হলে দেবী অদিতি দুঃখিত হলেন দৈত্য বধ করবে এমন এক পুত্র কামনা করে তপস্যা করতে লাগলেন ও বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। হরি প্রসন্ন হয়ে প্রকট হলেন। অদিতি বললেন, আপনি সকল দুঃখ নাশের হেতু, আপনার আদি, অন্ত নেই, আকাশকল্প আপনি, অমলানন্দ স্বরূপ নরসিংহ, শেষনাগ, সংহার বার্তা কলিরুদ্র বিশ্বমায়া সৃষ্টিকারী অদ্বিতীয় শিব আপনাকে বারংবার প্রণাম করি।

ভগবান দেবমাতার স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বর প্রার্থনা করতে বললেন। অদিতি উত্তম বর প্রার্থনা করলেন, এবং তাঁকেই পুত্ররূপে কামনা করলেন। ভগবান বর তথাস্তু বলে দিলেন এবং অন্তর্হিত হলেন। দেবমাতা তাকে গর্ভে ধারণ করলেন। দেবমাতা গর্ভবতী হলে বিরোচন নানা উৎপাত আরম্ভ করল। ভীত হয়ে পিতামহ প্রহ্লাদকে সব জানালেন। বলি বললেন, পিতামহ কেন আমাদের গৃহে এমন উৎপাত আরম্ভ হল।

তখন প্রহ্লাদরাজ বলিকে বললেন–যে দেবমাতা বিষ্ণুকে গর্ভে ধারণ করেছেন দেবতারা যার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। সেই বিষ্ণু স্বেচ্ছায় অদিতির দেহ আশ্রয় করেছেন। যার থেকে, সকল ভূত সৃষ্টি সেই হরি অদিতি গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছেন। বলি প্রহ্লাদের কথায় হরির স্মরণ নিলেন। এবং ধর্মানুসারে রাজ্য পালন করতে লাগলেন।

কাশ্যপের ঔরসে দেবমাতা অদিতি যথাকালে বিষ্ণুকে প্রসব করলেন। শ্রীবৎসচিহ্ন যাঁর বক্ষস্থলে, যাঁর কান্তি নীল মেঘবর্ণ দীপ্তিমান, হরি যথাকালে উপস্থিত হয়ে ভরদ্বাজ মুনির কাছে বেদসমূহ অধ্যায়ন করেছিলেন। এভাবেই সকলকে লৌকিক পথ দেখান প্রভু। তিনি যা করেন তাই লোকে অনুসরণ করে।

বলি কোন এক সময় স্বয়ং যজ্ঞ করে সর্বব্যাপী যজ্ঞাধীশ বিষ্ণুর অর্চনা করেছিলেন। তিনি এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধন দান করে পূজো করতে লাগলেন। বিষ্ণু ভরদ্বাজের আদেশে বামনরূপে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। তাঁর হস্তে ছিল পলাশ দণ্ড। হরি বেদগান করতে করতে ভিক্ষুক বেশে অসুররাজের কাছে উপস্থিত হয়ে তিন পদক্ষেপ সমান জমি প্রার্থনা করলেন।

সোনার ভৃঙ্গার দিয়ে বিষ্ণুর পাদপ্রক্ষালন করে দিলেন বলি এবং ত্রিপাদ ভূমি দান করলেন এবং. তার করাগ্র পল্লবে সুশীতল জল দান করলেন। তখন ভগবান তিনলোকে তিন পা নিক্ষেপ করলেন। তাঁর পা ব্রহ্মলোক পর্যন্ত চলে গেল সেখানে বাসকারী আদিত্য ও সিদ্ধগণ তার চরণে প্রণত হলেন। ভগবান উপাসনা করে নারায়ণকে প্রসন্ন করতে চাইলেন। কিন্তু সেই চরণ তার কপাল ভেদ করে পবিত্র জল পর্যন্ত চলে গেলেন। সেই জলকে নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা নামে অভিহিত করা হল, ভগবান বললেন, এই তিন লোক তাঁরই।

প্রহ্লাদ পুত্রের দান গ্রহণ করে হরি তাঁকে পাতালে প্রবেশ করতে বললেন–এবং সর্বদা ধ্যানে নিরত থাকতে বললেন। বিষ্ণু দৈত্যরাজকে একথা বলে ইন্দ্রকে ত্রিভুবন দান করলেন। তখন দেবতারা সকলে বাসুদেবের স্তব করতে লাগলেন। বিষ্ণু এই আশ্চর্য কর্ম সমাধা করে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।

বলি প্রহ্লাদের আদেশ নিয়ে অসুরদের সঙ্গে পাতালে প্রবেশ করলেন। বলিরাজ প্রণয়গতি কর্মযোগের সম্বন্ধে জেনে ভক্তির সঙ্গে শঙ্খ, চক্র, গদা, হস্ত, কমল নয়ন ভগবান বিষ্ণুর শরণ করেন।

১৮

বলিরাজের একশো পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে মুখ্য দ্যুতিমান বান যিনি শঙ্করের ভক্ত ছিলেন। তিনি রাজ্য শাসনকালে ইন্দ্রের ওপরেও অত্যাচার করেছিলেন। দেবতারা তখন মহাদেবের কাছে গিয়ে বলেন, বান তাদের পীড়ন করছে। মহেশ্বর তখন এক তীরে বানপুরী দগ্ধ করেছিলেন। বান তখন মস্তকে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে পুরীর বাইরে গিয়ে মহাদেবের স্তব করতে লাগলেন। শঙ্কর বানের স্তবে প্রসন্ন হয়ে স্নেহ করে গণপতির পদ দান করলেন।

দনুপুত্র প্রমুখও অন্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে শম্বর, কপিল, প্রধান, বলে খ্যাত সহস্র গন্ধর্বের জন্ম হয় সুরসারের গর্ভে। প্রমুখ মহানাগেরা ছিলেন কদ্রুর সন্তান। তামার গর্ভে জাত হয় ছয় কান্তা, গাভী তার মহিষীদের প্রসব করেন সুরভি, ইরা হলেন বৃক্ষ, লতা, পল্লী

আর তৃণ– জাতির। গরুড় ও অরুণ নামক পুত্রের জননী বিনতা, অরুণ তপস্যার দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করলে মহাদেব প্রসন্ন হয়ে তাকে সূর্যের সারথি পদ দান করেন।

এই সকল স্থাবর ও জঙ্গম কশ্যপ সন্ততিদের বিবরণ শুনলে পাপ নাশ হয়। চন্দ্র সাতাশ জন পত্নীর সাতাশ পুত্র হয়েছিল এবং অরিষ্টনেমির চার পত্নীর গর্ভে পুত্রের জন্ম হয়েছিল। ব্রহ্মাসংকৃত ঋষিরা অঙ্গিরার পুত্র, সহস্র যুগ শেষ হলে মন্বন্তরের সময় এঁরা নিজের নিজের কৃতকর্মের সাদৃশ্য অনুযায়ী নিজ নিজ নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকেন।

১৯

কাশ্যপমুনি প্রজাবৃদ্ধির জন্য সকল পুত্র উৎপাদন করে ঘোরতর তপস্যা শুরু করলেন। তার ফলে তার বৎসর আর অসিত নামে দুই ব্রহ্মবাদী পুত্রের আবির্ভাব হল। বৈভ্য আর নৈধ্রুপ শ্রেষ্ঠ শুদ্র নামক পুত্ররা রৈভ্য থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। নৈবের পত্নী চ্যবন কন্যা সুমেধার গর্ভে কুন্তপায়ী পুত্রদের জন্ম হয়। অসিত পত্নী একপর্ন জন্ম দিয়েছিলেন মহাতাপ। যোগাচার্য দেবল আর সর্ব শাস্ত্রবেত্তা পবিত্র শ্রীসমন্বিত শাণ্ডিল্য মহাদেবের প্রসাদে উত্তম যোগ লাভ করেছিলেন। কাশ্যপের পক্ষে ছিল শাণ্ডিল্য, নৈধ্রুব আর রৈভ্য।

এবার পুলস্ত্য পক্ষীয় নয়জন প্রধান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তৃণ-বিন্দু ঋষির এক কন্যা ছিল। তার নাম ইলাবিলা। তাকে পুলস্ত্য মুনির হাতে সমর্পণ করেছিলেন। তার গর্ভে জন্মায় ঐলবিল বিশ্রবা। ঋষির জন্ম হয়। বিশ্রবার চার পত্নী পুপোকাটা রাকা রৈকসী আর দেববর্ণিনী এরা সকলে রূপ লাবণ্যের অধিকারিণী ছিলেন। পুলস্ত্য বংশ বিস্তৃত করেছিলেন। এবার শুনুন এদের পুত্রের কথা।

সকলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন দেববর্ণিনী বিশ্রবার ঔরসে জন্মায় কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ, ও শূর্পণখা, মহোদর প্রশস্ত, মহাপার্থ খর এবং কুম্ভীনসী পুষ্পেকাটার সন্তান রাকার গর্ভে জন্ম নেয় ত্রিশিরা, দূষণ ও মহাবল বিদ্যুজিহ্ব পুলস্ত্য বংশীয় রাক্ষস বারণ প্রভৃতি দশজন, এরা রত নিষ্ঠুর কার্যে এরা অতি ভীষণ রুদ্রভক্ত ও উৎকৃষ্ট, তপোবল সম্পন্ন। মৃগ, ব্যাল, দ্রষ্ট্রীভূ, পিশাচ, ঋক্ষ্য, শূকর হল পুলহের পুত্ররা।

ক্রতু নিঃসন্তান ছিলেন। মারীচির পুত্র কশ্যপ মহাতপা বেদাধ্যায়নে এবং যোগে রত, হর ভক্ত, দীপ্তিমান দৈত্যগুরু শুক্র ভৃগুর পুত্র বহ্নি ও তার সহোদর কৃশাশ্ব পত্র নৈধ্রুপ ঘৃতাচীর গর্ভে

জন্মেছিলেন। নারদ উদ্ধরেতা হয়েছিলেন দক্ষের শাপে, দেবী অরুন্ধতাঁকে তাই বশিষ্ঠের হাতে তুলে দেন।

নারদের মায়ায় দক্ষের পুত্রেরা বিনষ্ট হলে দক্ষও ক্রোধে তাকে শাপ দেন নির্বংশ হবার। শক্তি নামে। এক পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন। বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর গর্ভে শক্তির পুত্র সুন্দর পরাশর সর্বজ্ঞ আর তপস্বী শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শুক নামে জন্ম নিয়েছিলেন শঙ্কর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে যে পরম পদ লাভ করেছিলেন, শুঁকের পাঁচ পুত্রই তপোনিষ্ঠ ছিলেন।

২০

অদিতির গর্ভে কাশ্যপের ঔরসে জন্মায় আদিত্য তাঁর ছিলেন চার ভার্যা। এঁদের পুত্রেরা হলেন তৃষ্টার গর্ভে জন্ম নেন, পুত্র পমু রাজ্ঞীর গর্ভে যম, যমুনা ও রেবন্ত ছায়ার গর্ভে সার্বনি, শনি, তপতী। বিনষ্ট ও প্রভার গর্ভে প্রভাত, মনুর জ্যেষ্ঠা কন্যা ইলার থেকে বিস্তার হয় চন্দ্রবংশের। তিনি চন্দ্রপুত্র বুধের সাথে মিলিত হয়ে তার ঔরসে পুরুবরা নামে এক উত্তম পুত্রের জন্ম দেন। তার আরও তিন পুত্র হয়। বীর, রাজা বিকুক্ষি ছিলেন ঈক্ষাকুর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

যুবনাশ্ব পুত্রলাভের আশায় গোকর্ণ তীর্থে গমন করেন। ধার্মিক পুত্র পাওয়া যায় কোন্ কর্মের দ্বারা? তিনি নিজে ছিলেন আদ্রকের পুত্র গৌতম তার উত্তরে বলেন অনাদি অনন্ত অনাময় আদি পুরুষ দেবের আরাধনা করলে ধার্মিক পুত্র লাভ হয়। গৌতমের কথা শুনে রাজা বাসুদেবের উপাসনা করতে লাগলেন ও শ্রাবস্তি নামে এক বিখ্যাত বীর পুত্র লাভ করলেন। শ্রাবস্তির তিন পুত্র- দৃঢ়াশ্ব, দত্তাশ্ব ও কপিলাশ্ব।

দৃঢ়াশ্বর পুত্র প্রমোদ, প্রমোদের পুত্র হর্য, হর্যশ্বের পুত্র নিকুম্ভ এবং তাঁর পুত্র সংহতাশ্ব, তাঁর আবার কৃতাশ্ব ও অরুনাশ্ব নামক দুই পুত্র। এর মধ্যে অরুনাশ্বের পুত্র যুবনাশ্ব। মান্ধাতা যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতার তিন পুত্র- পুরুকুৎস, অম্বরীষ, মুচকুন্দ। এরা ইন্দ্রতুল্য বীর, এদের মধ্যে অম্বরীষের যুবনাশ্ব নামক পুত্র হয়। তাঁর পুত্র হরিত পুরুকুৎসের সদস্যু নামক পুত্র হয়। তাঁর পুত্র সম্ভুতি, পুত্র আনরন্য। তার পুত্র বৃহদ, তার এক হ্য, তার এক ধার্মিক পুত্র হয় বসুমনা, তার আর ত্রিধা নামক এক পুত্র জন্মায়।

বসুমনা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। বশিষ্ঠ্য ও কাশ্যপ এসেছিলেন এই যজ্ঞে,বসুমনা তখন ঋষিদের কাছে জানতে চাইলেন, তপস্যা ও সন্ন্যাসের মধ্যে শ্রেয় কোনটি? যজ্ঞের দ্বারা বানপ্রস্থ অবলম্বনই শ্রেয়। পুলস্ত্য বললেন, সন্ন্যাস শ্রেয় পুলহ বললেন–তপস্যার দ্বারা

মোক্ষলাভ হয়, জমদগ্নির মতও তাই ভরদ্বাজ বললেন–সর্বদেবের অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে পূজা করবে। কাশ্যপ বললেন, শম্ভু তপস্যার দ্বারা পূজিত হলে প্রসন্ন হন। ক্রতুর মতে বেদ অধ্যয়ন শ্রেয়।

বসুমনা এতে আনন্দিত হলেন। যথাবিধি পূজা করে তাদের বিদায় দিলেন। তারপর পুত্র ত্রিধন্ধাকে বললেন, তপস্যার দ্বারা পূজা করতে। রাজা পুত্রের হাতে রাজ্য সমর্পণ করে শ্রেষ্ঠ তপস্যার জন্য অরণ্যে গমন করলেন।

হিমালয়ের চূড়ায় বসে দেবতাদের আরাধনা করতে লাগলেন। তার পাপ দগ্ধ হল। তিনি গায়ত্রী জপ করতে লাগলেন। এভাবে একশো বছর অতিক্রান্ত হবার পর ব্রহ্মা স্বয়ং এলেন তার কাছে। ব্রহ্মাকে দেখে রাজা প্রণাম করে তাঁকে বললেন, আপনি দেবাদিদেব, পরমাত্মা, সহস্র চক্ষু আপনাকে প্রণাম। আপনি বিজ্ঞান মূর্তি বিধাতা, ধাতা, ত্রিমূর্তি, স্রষ্টা, সার্থকদর্শী পুরাণ পুরুষ। যোগীগুরু ব্রহ্মা তাঁকে বর দিতে চাইলে তিনি বলেন, যে তিনি আরো একশো বছর গায়ত্রী জপ করতে চান। যেন এই সময় অবধি তার আয়ু থাকে। ব্রহ্মা তাকে 'তথাস্তু' বলে অন্তর্হিত হলেন। এভাবে অতিক্রান্ত হল একশো বছর। আবার সামনে উপস্থিত হলেন ভগবান। উগ্ররশ্মি ক্ষণিকের মধ্যে, তিনি দেখলেন সেই পরম পুরুষ অর্ধনারীশ্বর মহাদেব রূপে অবির্ভূত হয়েছেন। তখন রাজা তাঁর স্তব করতে আরম্ভ করলেন। তাঁকে নীলকণ্ঠ, কিরণময় পরমেষ্ঠী, ত্রয়ীময়, স্বয়ংরুদ্র ইত্যাদি বলে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারী, মিতহারী, ভস্মনিষ্ঠ আর সমাহিত চিত্ত হয়ে আমরণ জপ করে, সে পরমপদ লাভ করে। রুদ্র তখন রাজাকে আরো একশো বছর আয়ু দান করলেন ও অন্তর্হিত হলেন।

তপস্যারত অবস্থায় রাজা রুদ্র নাম জপ করতে লাগলেন। শরীরে ভস্ম লেপন করে এভাবে আরো একশো বছর কেটে গেল। এরপর পরমপদ প্রাপ্ত হলেন ও মহেশ্বের তত্ত্ব লাভ করলেন।

২১

রাজপুত্র ত্রিধন্ধা পৃথিবী পালন করছিলেন তাঁরও য্যারুন নামে এক বিদ্বান পুত্র ছিল। তাঁর পুত্র সত্যব্রত তাঁর ঔরসে সত্যধনার গর্ভে জন্মায় হরিশচন্দ্র, তাঁর পুত্র রোহিত ও তাঁর হরিত পুত্র, হরিতের পুত্র ধুন্ধ বিজয় ও বাসুদেব ধুন্ধর পুত্র। বিজয়ের পুত্র কারুক। কারুকের পুত্র বুক, বুকের পুত্র বাহু, বাহুর পুত্র রাজা সগর, প্রভা ও ভানুমতী তার মহিষী। ভানুমতীর অসমজ্ঞার নামক এক পুত্র ও প্রভাব ষাট হাজার পুত্র জন্মায়। অসমজ্ঞার পুত্র অংশুমানের পুত্র ভগীরথ

চন্দ্রশেখর মহাদেব ভগীরথের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গাকে নিজের শিরঃস্থিত চন্দ্রের উপরিভাগে ধারণ করেছিলেন।

ভগীরথের পুত্র শ্রুত ও শুতের পুত্র লভাগ, তাঁর পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, তার পুত্র অযুতায়ু মহাবর ঋতুপর্ণ। তাঁর আবার সুদাস নামক এক ধার্মিক পণ্ডিত পুত্র হয়। সুদাসের পুত্র সৌদাস। যার আরেক নাম কল্মষপাদ। মহাতেজা বশিষ্ঠের ঔরসে এই কল্মষপদ রাজার অশ্বক নামে এক ক্ষেত্রজ পুত্র হয়। ইনি ঈস্বা কুকুলের কেতন স্বরূপ। নকুল অশ্মকের পুত্র। তিনি পরশুরামের ভয়ে ক্লিষ্ট হয়ে বনে গমন করেছিলেন ও নারীরূপ কবচ ধারণ করেছিলেন।

শতরথ তাঁর পুত্র ইলবিলি, তাঁর পুত্র বৃহধ্বর্মা, বৃহধ্বর্মা পুত্র বিশ্বসহ খর্দ্বাঙ্গ, খর্দ্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু, রঘু দীর্ঘবাহুর পুত্র, রঘুর পুত্র অজ ও অজের পুত্র রাজা দশরথ। দশরথের চার পুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। পার্বতী জনকের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ত্রিভুবন বিখ্যাত কন্যা প্রদান করেন। ইনি রূপলাবণ্যময়ী ঔদার্যশীল জনক তনয়া সীতা, রামপত্নী।

করেন ত্রিভুবনে যে এই ধনুকে ছিলা পরাতে পারবে সেই তাঁর জামাই হবে। রাম তা জানতে পেরে জনকের প্রাসাদে গিয়ে সেই ধনুক উত্তোলন করে ভেঙে ফেললেন এবং সীতাকে বিয়ে করলেন।

এরপর রাজা দশরথ রামকে রাজা করতে চাইলেন। দশরথের দ্বিতীয় ভার্য্যা কৈকেয়ী অতীতকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে তখন নিজ পুত্র ভরতকে রাজা করতে বললেন। রাজা কৈকেয়ীর কথায় রাজি হলেন ও রাম মেনে নিলেন।

এরপর রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সাথে বনে চলে গেলেন। তারা চৌদ্দ বছর বনে কাটান। বনের মধ্যে একদিন লঙ্কারাজ রাবণ ভিক্ষুক বেশে সীতাকে হরণ করেন। এরপর শোকাতুর রামের সাথে সুগ্রীব ও অন্য বানরদের বন্ধুত্ব হল এবং রামের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠলেন হনুমান। তিনি সীতার সন্ধানে আসমুদ্র পৃথিবী ভ্রমণ করতে লাগলেন এবং ক্রমে লঙ্কায় গেলেন। সেখানে রাক্ষসী আবৃত সীতাকে দেখলেন।

হনুমান রামের দেওয়া আংটি তাঁকে দেখালেন, সীতা তা দেখে আনন্দিত হয়ে ভাবলেন রামচন্দ্রই বুঝি এসে গেছেন। হনুমান তখন তাঁকে লঙ্কা থেকে উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেলেন।

এরপর রাম ও লক্ষ্মণ, হনুমান ও অন্য বানররা একত্রিত হয়ে সমুদ্রের ওপর সেতু নির্মাণ করলেন লঙ্কায় যাবার জন্য। এরপর সেতু পার হয়ে রাক্ষস বধ করে সীতাকে নিয়ে এসেছিলেন রাম। এই সেতুর ওপর মহেশের লিঙ্গ স্থাপন করে রাম পুজো করলে মহেশ সেই পূজায় সন্তুষ্ট হন ও বর দেন যতদিন পর্যন্ত পৃথিবী থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই সেতু বর্তমান থাকবে এবং তিনিও এই স্থানে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন।

এরপর ভরত রামকে রাজ্য পালনের দায়িত্ব ফিরিয়ে দিলেন। রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করে শঙ্করের পূজা করেছিলেন। লব, কুশ রামের দুই পুত্র। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষক, নিষকের পুত্র নল এবং নলের পুত্র মহস্বান, তাঁর পুত্র চন্দ্রায়লোক, তারাপীড় তাঁর পুত্র চন্দ্রগিরি, ভানুচিত্ত ও ভানুচিত্তর পুত্র শ্রুতায়ু।

২২

ইলা পুত্র রাজ্য পালন করতে লাগলেন। পুরুরবার ঔরসে উর্বশীর গর্ভে তার ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী দিব্যপুত্র জন্মায়, আয়ু রাহুকন্যা প্রভার গর্ভে পাঁচ বীর পুত্রের জন্ম দিয়েছিল। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহুষ। বিরজার গর্ভে নহুষের পাঁচটি চন্দ্রতুল্য পুত্র হয়। এঁদের মধ্যে যযাতিই মহাবলী ও পরাক্রান্ত। তিনি শুক্রকন্যা দেবযানী ও অসুরপতি বৃষপবার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিয়ে করেন। দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার গর্ভে যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরুর জন্ম হয়। যযাতি জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, তুবসুকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, দ্রুহ্যকে পশ্চিম ও অনুকে উত্তরের আধিপত্য দেন। এবং তিনি স্ত্রীদের সঙ্গে বনে গমন করেন।

যদুর সহস্রজিৎ, ক্রেষ্টু, নীল, জিন ও রঘু নামের পাঁচ পুত্র হয়। সহস্রজিতের তিন পুত্র হয়েছিল। রাজা হৈহয়ের ধর্ম নামে বিখ্যাত এক পুত্র হয়েছিল। আর রাজা ধর্মেরও ধর্মনেত্র নামে এক প্রতাপান্বিত পুত্র হয়েছিল। ধর্মনেত্রের পুত্র কীর্তি, কীর্তির পুত্র সঞ্জিত, সঞ্জিতের পুত্র মহিস্মান, মহিস্মানের পুত্র ভদ্রশ্রেন্য, ভদ্রশ্রেন্যের পুত্র রাজা দুর্মদ, দুর্মদের পুত্র ধীমান ও বীর্যশালী অন্ধক। অন্ধকের আবার কৃতবীর্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্মা ও কৃতৌজা নামে চার পুত্র হয়। কৃতবীর্যের কার্তবীর্যাজুন নামে এক পুত্র হয়।

এর মৃত্যু হয় ভগবান জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের হাতে। তাঁর বহুশত পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে শূর, শূরসেন ইত্যাদি। পাঁচ পুত্র ছিল ধার্মিক ও মনস্বী। রাজা জয়ধ্বজ নারায়ণ ভক্ত ছিলেন এবং তার শূরসেন প্রমুখ প্রথিতবীর্য মহাত্মা চারজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুদ্রের প্রতি ভক্তিশীল হয়ে

মহাদেবের আরাধনা করতেন। জয়ধ্বজ হরির শরণ নিলে কার্তবীর্যাজুনের চারপুত্র তাকে বললেন, হে ভ্রাতা, এমন কাজ তোমার করা উচিত না।

জয়ধ্বজ উত্তর দিলেন, এই তার পরম ধর্ম। যখন বিষ্ণু জগৎ পালক, তখন রাজ্য পালনকারী রাজার পক্ষে বিষ্ণু পূজা করা অবশ্যই উচিত। রজঃগুণাশ্রয়ী ব্রহ্মা তার সৃষ্টি করেন আর তমোগুণাবলম্বী মহাদেব তার সংহার করেন রাজ্য পালনে নিযুক্ত রাজাদের পক্ষে ভগবান কেশি, নিমূদন কেশব বিষ্ণুরই অর্চনা করা কর্তব্য।

মুমূর্ষ পুরুষের পক্ষে সংহারকর্তা রুদ্রের পূজাই বিধেয়, বললেন–মনস্বী ভ্রাতাকারক রুদ্রি এই এই জগৎকে ধ্বংস করবেন। শূলপানি বিদ্যামূর্তির দ্বারা সংসারের লয় সাধন করেন।

জীবগণ মুক্তি পেয়ে থাকে সত্ত্বগুণের প্রভাবেই। সত্ত্বগুণের আধার ভগবান শ্রীহরি। সাত্ত্বিক ভাবে রুদ্রের পূজা করলে মহাদেব নিজে সত্ত্বগুণ যুক্ত হয়ে তাদের মুক্তিদান করেন। রাজপুত্র জয়ধ্বজ বললেন, মানুষ নিজের বিহিত ধর্ম আচরণের দ্বারা মুক্তি পেয়ে থাকে। মুনিরা বলেছেন মুক্তিলাভের আর কোন পথ নির্দিষ্ট নেই। বশিষ্ঠ মুনিরা রাজাদের বললেন, দেবতা যার অভীষ্ঠ, সেই দেবতাকেই তার উপাসনা করা উচিত।

বিষ্ণু ও ইন্দ্র রাজাদের দেবতা, অগ্নি, আদিত্য, ব্রহ্মা ও রুদ্র ব্রাহ্মণদের উপাস্য, বিষ্ণু দেবগণের, মহাদেব দানবদের, চন্দ্র যক্ষ আর গন্ধবদের উপাস্য দেবতা। সরস্বতী বিদ্যাধরদের, ভগবান হরি সিদ্ধাদের, ভগবান রুদ্র রক্ষোগণের, পার্বতী কিন্নরগণের দেবতা। ঋষিদের উপাস্য ভগবান ব্রহ্ম ও ত্রিশূলী মহাদেব। সমস্তলোকের আরাধ্য দেবতা ভগবান দেবদেব প্রজাপতি বিষ্ণুর আরাধনা করা কর্তব্য। রুদ্রের সঙ্গে হরিকে অভিন্ন জেনে তাঁর পূজা করা উচিত। হরি রাজাদের শত্রুনাশ করেন না।

ভক্তপ্রেমী ভগবান বাসুদেবের আদেশে অযুত সূর্যের দীপ্তি নিয়ে এক চক্র রাজার সামনে আবির্ভূত হল। সেই চক্র গ্রহণ করলেন নারায়ণকে স্মরণ করে। তারপর চক্র ছুঁড়ে মারলেন রাজার দেহের দিকে, এর ফলে তাঁর শির দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে গেল।

বিষ্ণু মহাদেবকে তপস্যা করা আরাধনা করে অসুর বিনাশের জন্য চক্র লাভ করেন। এই চক্র অপ্রতিহত হয় অসুর বংশ নিধনের জন্য।

বিশ্বমিত্র বললেন—যাঁর থেকে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়েছে সমস্ত পদার্থই যাতে নিহিত রয়েছে এবং ব্রহ্মাণ্ড যার থেকে হয়েছে তিনি সর্বভূতাত্মা বিষ্ণু।

ভগবান মহাতপা বিশ্বামিত্র এই পর্যন্ত বলে শূর প্রমুখ নৃপতিদের পূজা গ্রহণ করে নিজের আশ্রমে গমন করলেন। শূরাদি রাজগণ যজ্ঞের দ্বারা রুদ্রের আরাধনা করলেন। বিশ্বামিত্র ও শত্রু দমনকারী রাজা জয়ধ্বজকে দিয়ে ভূতস্রষ্টা আদিদেব জনার্দনের যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়ে ছিলেন। জয়ধ্বজ অচ্যুত বিষ্ণুকে রুদ্রের পরমামূর্তি বলে জেনে সযত্নে তার পূজা করেছিলেন। হরি নিজে সেই পূজাস্থলে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

২৩

জয়ধ্বজের পুত্র আলজঙ্খ। তাঁর আবার একশত পুত্র। তাঁরাও একই নামে বিখ্যাত। জ্যেষ্ঠো মহাতেজা বীতহোত্র রাজা হয়েছিলেন। বৃষ প্রমুখ পুণ্যধর্ম অন্য সব যাদব ছিলেন। বংশরক্ষা করেছিলেন বৃষই। তার এক পুত্র হয় মধু নামে। মধুর একশত পুত্র আছে। মধুর বংশ বজায় রেখেছিলেন বৃষণ। বীতহোত্রের পুত্র বিত, তার পুত্র অনন্ত, অনন্তের পুত্র দুর্জয়, তার পত্নী অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন এদিকে দুর্জয় ঊর্বশীকে দেখে বলেন তার সাথে দীর্ঘকাল বিহার করতে। ঊর্বশী দীর্ঘকাল দুর্জয়ের সাথে বিহার করতে গেলেন।

বহুদিন পরে রাজার চৈতন্য ফিরলে তিনি রাজপুরীতে ফিরে যেতে চাইলেন কিন্তু ঊর্বশী তার সাথে আরো এক বছর কাটাতে চাইলেন। রাজা তাঁকে আশ্বস্ত করে চলে গেলেন। নিজ পুরীতে ফিরে পতিব্রতা ভার্যাকে দেখে তিনি ভীত হয়ে উঠলেন। তাকে ভয়ে ভীত দেখে স্ত্রী তার কারণ জানতে চাইলেন এবং জ্ঞানচক্ষে সব অবলোকন করলেন।

তখন রাজা পাপক্ষয় হেতু কথের আশ্রমে এসে প্রায়শ্চিত্ত বিধি জেনে নিয়ে হিমালয় উদ্দেশে যাত্রা করলেন পথে। এক অতিসুন্দর মালা সজ্জিত গান্ধর্ব রাজাকে দেখে তার সাথে যুদ্ধে রত হলেন। তার কাছ থেকে মালা নিয়ে ঊর্বশীকে কালিন্দীর তীরে দিতে গেলেন কিন্তু সেখানে ঊর্বশীকে দেখতে পেলেন না। উর্বশীকে খুঁজতে খুঁজতে হেমকূটে গমন করলেন। সেখানে প্রধান অপ্সরারা রাজাকে দেখে কামার্ত হল, কিন্তু রাজা তাদের সাথে রমণ করলেন না। এরপর ঊর্বশীকে সেখানেও না পেয়ে মহামেরুতে গেলেন এবং ক্রমশ মানস সরোবরে উপস্থিত হলেন। সেখানে ঊর্বশীকে পেয়ে তাকে মালা দিলেন, মালা পরে ঊর্বশী জানতে চাইলেন যে, রাজা রাজ্যে পৌঁছে কি দেখলেন? সমস্ত কিছু শুনে ঊর্বশীকে যেখান থেকে আসা হয়েছিল সেখানেই তাকে ফিরে যেতে বলে। না হলে তাকে কন্বমুনির অভিশাপের কবলে

পড়তে হবে। রাজা সে সব কথা গ্রাহ্য না করায় তাঁকে ঊর্বশী এক ভয়াবহ লোমশ শারীরিক চেহারা দর্শায়। রাজার কথের কথা মনে আসে আর তাঁকে মনে করে নিজেকে তিরস্কার করে, তাঁর ধ্যানের মধ্যে দিয়ে তপস্যা শুরু করে। তারপর সে কণ্বের আশ্রমে পৌঁছলে মুনি তাকে দেখে খুবই খুশি হন এবং উপদেশ দেন– তাঁর অন্তরের যে পাপবোধ তার অন্ত ঘটাতে বারাণসী যাওয়া প্রয়োজন। সেখানেই শিব শঙ্করের প্রত্যক্ষতায় পাপের নিষ্পত্তি ঘটে আর ফল হিসাবে সুপ্রতীক নামে এক পুত্র সন্তানের জন্ম লাভ হয়। রাজার ঔরসে ঊর্বশী সাত পুত্রের গর্ভ ধারণ করে।

ক্রোধী রাজার পুত্রর নাম বৃজিনীবন। বৃজিনীবনের পুত্র খ্যাতি। খ্যাতির ছেলে কুশিক, কুশিকের ছেলে বলবান চিত্ররথ। ক্রমান্বয়ে তার ছেলে শশবিন্দু, শশবিন্দুর ছেলে পৃথুযশা, শৃথুযশার ছেলে পৃথুকার্মা, তার ছেলে পৃথুজয়, তার ছেলে পৃথুকীর্তি, তার ছেলে পুথুদান, তার ছেলে পৃথুবা, তার ছেলে পৃথুসাত্তম ও তার ছেলে উশনা, তার ছেলে শিতেষু, তার ছেলে রুক্মকবচ, তার পুত্র পরাবৃত্ত, তার পুত্র জামঘ, তার পুত্র বিদর্ভ, বিদর্ভের পুত্র ক্রথ, কৌশিক আর লোমপাদ তৃতীয় লোমপাদের ছেলে বক্ক, তার ছেলে ধৃতি, ধৃতির পুত্র শ্বেত, শ্বেতের পুত্র বলবান বিশ্বসহ, তার ছেলে মহাবীর্য, মহাবীর্যের কৌশিক আর সুমন্ত, তার পুত্র নল কৌশিকের পুত্রের নাম চেদি। তার আবার চেদ্য নামে বহু সন্তান আসে প্রধান যিনি দ্যুতিমান। দ্যুতিমানের বপুমান নামে এক ছেলের জন্ম হয় তার পুত্র বুহমেধা তার শ্রীদেব তার পুত্র বীতদথ। ক্রথের পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র ধৃষ্ঠি। তার নাধৃতি তরপুত্র দশাই তার ব্যোমা, তার পুত্র জীমত, তার পুত্র ভীমরথ, ও তারপুত্র নরম। ভারথ একদিন শিকার করার সুবাদে রাক্ষস রূপ দেখে ভীত স্থির হেসে পলায়ন করে।

২৪

সেই দৈত্যের সাতে যুদ্ধ করা সহজ নয়। রোজা সরস্বতী দেবীকে দৃশ্যগোচর হলে মাথা নিচু করে প্রণাম করে। দেবীর স্তবের দ্বারা দেবীকে আহ্বান করে দেবীকে রক্ষা করার অনুরোধ করে। বল প্রয়োগের দর্শন করিয়ে রাক্ষসরাজ সেখানে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তিন লোকের সন্তান সম্ভবা দেবী সরস্বতী সেখানে অবস্থান ঘটে সেই চন্দ্র সূর্য সন্নি জায়গায় রাজার মৃত্যু ঘটাতে ক্রোধভরে শূল হাতে ওঠায় আর প্রবেশ করে বিশালাকার ভূতের হাতে রাক্ষসকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। রেপরই রাজনকে তার ঘরে প্রত্যাবর্তন করতে বলেন। রাজা তার আপন নগরীতে সরস্বতাঁকে প্রতিস্থাপিত করে। নবরথের পুত্র দশরথও সরস্বতী ভক্ত হিসাবে পরিচিত ছিল। শকুনি তার পুত্র, তার পুত্র করম্ভ দেবরাত, এর দেবতত্ত নামে এক পুত্র জন্মায়। দেবতত্তের পুত্র

মধু, তার পুত্র কুরু, কুরুর পুত্র সুত্রমা ও অনু। সুত্রমা পুত্র পুরুকুৎস, তার পুত্র অংশু, তার পুত্র সাত্বত। কৌশল্যার গর্ভজাত ছিল সাত্বত, রাজার ধনুর্বেদ তার মাঝে শ্রেত্ব ভজমান। অন্ধক মহাভোজ বৃষিও ও রাজ দেবা বৃধ পাঁচ পুত্র জন্মায়। দেববৃধের পুত্র বস্তু ভজমানেরও পুত্রের সংখ্যা নেহাত কম নয়। বৃষিত্তর তিন পুত্র অনমিত্রের পুত্র নিম্ন পুত্র প্রসেন ও সত্রাজিৎ নামক দুই পুত্রের জন্ম ঘটে। কোনো একদিন সুবাহু নামধারী এক সন্ধর্ব সাক্ষাৎ লক্ষ্মী তুল্যা হীমতাঁকে সাথে করে পুরীতে নিয়ে যাওয়া হয়। হীমতীর পুত্র হিসাবে পৃথিবীতে আসেন সুতেজা জন্ধর্বের মুনে, বেন, সুগ্রীব সুভোগ আর নতবাহন নামক পাঁচ পুত্র হিসাবে পাওয়া যায়।

২৫

হৃষীকেশ পুত্র সন্তানের আশায় ভীষণ তপস্যা শুরু করেন। তিনি একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের ধ্যানে রত হত। উপমন্যুর আশ্রমে সেই তপস্যাকে কার্যকরী করতে উদোগী হন।

বিশ্বের আত্মা মাধব পাপহীন বনের বালকদের দেখে প্রণাম করে তার আরাধনা করে। দেবকী সন্তান যাদব তার ভক্তি মাধ্যমে সকল তীর্থে আচমন করে দেবতা ঋষি ও মুনি সকল লিঙ্গের আরাধনায় রত হয়।

মাধব তার ভক্তি বলে দেবের স্তবের মধ্যে দিয়ে সকল দেবদেবীর নিকট পায়ে নত হয়ে প্রণাম করে। তখন শিব জানতে চেয়েছিলেন, সে কেন তার জন্যে তপস্যা করছে? কৃষ্ণ তখন বৃষধ্বজকে বলেন যে, তিনি দেবাদিদেবের ন্যায় ও তাঁর প্রতি ভক্তিযুক্ত এক পুত্রের আশা করেছেন। দেবাদিদেব তাঁকে আশীর্বাদ দেয় যেন তার আশাপূর্ণ হয়। প্রসন্ন হৃদয়ে পার্বতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে কেশবকে বুকে জড়িয়ে ধরে। পার্বতী হৃষিকেশকে বলেন, যে দেবগণ কামনা করার ফলে দেবকীর পুত্র হিসাবে তার জন্মলাভ ঘটেছিল। কেশব আর আপনি আমার নিকট সর্বজ্ঞাত তত্ত্ব সম্পদ। পরম ঈশ্বরের সম্পর্কে জ্ঞান ঈশ্বরের প্রতি অটল ভক্তি আর সব শক্তি হল কাম্য আশীর্বাদ গ্রহণ করা। কৃষ্ণ দেবীর সব বক্তব্য শুনে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। মহেশ্বরও আশীর্বাদের বাণী উচ্চারণ করেন। অতঃপর কৃষ্ণের হস্ত নিজের হস্তে নিয়ে দেবীর সাথে কৈলাসের পথে এগিয়ে যান।

২৬

কৈলাসে পৌঁছে ভগবান মহেশ্বর দেবী ভগবতী আর কেশবের সাথে খেলায় যোগদান করেন। সেইসময় কেশবের বক্ষে ছিল এক অন্যান্য সুন্দর বৈজয়ন্তী হার। তাঁকে দেখতে খুবই অপূর্ব।

এই যুবা পুরুষের পদযুগল পদ্মের ন্যায়, চক্ষু দুইও পদ্মের ন্যায়। কৃষ্ণ একদিন লীলা করার সুবাদে গিরিগুহায় ভ্রমণ রত ছিলেন। সেখানে অপ্সরা ও গান্ধর্ব কন্যা সকল তাঁকে দেখে খুশিতে উচ্ছাসিত হয়ে ওঠে। তাদের সকলের বস্ত্রাদি ও শরীরের অলংকার সমূহ খসে পড়ে আর সকলে মনে মনে কেশবকে কামনা করে। মুগ্ধ কুরুঙ্গীক্ষ এক ললনা কামনায় আসক্ত হয়ে হরির মুখ চুম্বন করতে দেখা যায়। দ্বারকার অধিবাসী তাঁর বিরহে অত্যন্ত মুষড়ে পড়ে। গরুড়ও হিমালয়ে কৃষ্ণের দর্শন না হওয়ায় উপমন্যুকে মাথা নত করে প্রণামের শেষে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করে। মধুসূদন গরুড়ের পিঠে আরোহণ করে তার প্রতি নিষ্ঠাভরে পূজায় রত হয়। তারপর শঙ্খদির দ্বারা সজ্জিত হয়ে সুন্দর শুভ্র আসরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আসনে দেবীদের মাঝে জ্বলজ্বল করতে থাকে। দেবী উমার পাশে উপবিষ্ট দেবাদিদেবকে যেমন দেখা যায় তেমনি, নারায়ণকে দেখে ঐ রকম উপলব্ধি হয়ে থাকে।

এরপর সকলে মহাদেবের গুণগান করতে থাকে, মহাদেব তাতে খুশি হয়ে তাকে সামনে হাজির হয়। তাঁর রূপ তখন ত্রিশূলধারী ও পিনাকপানি রূপে, দুন্দুভির মতো তার গলার স্বর। তিনি তখন আশীর্বাদ দিতে আগত হলে হরি ও ব্রাহ্মণ মহাদেবের পদযুগল স্পর্শ করে প্রণাম জানায়। তাদের ভক্তি মহাদেবের প্রতি যেন অটল থাকে। মহেশ্বর নিজের মনে প্রশ্ন করে, যে বিষ্ণু নিজে মোহ ত্যাগ করে ব্রহ্মার প্রতি একাগ্র থাকে; এই ভগবানই তার পুত্র হিসাবে জন্ম নেবে আর সে নিজে সমস্ত রাগ পুত্ররূপে কল্পনার অন্তে-ঘোড়ার রূপে তার মুখগহ্বর থেকে নির্গত হওয়ার ঘটনা ঘটবে।

হরি বলেন, এরপরই মহেশ্বর অদৃশ্য হন। সেই থেকেই পৃথিবীতে শিবলিঙ্গকে পূজিত হতে দেখা যায়।

২৭

জাম্ববতীর গর্ভজাত সন্তান শাম্ব জন্মান, তিনি পরিচিতি লাভ করেন এক মহাত্মা রূপে। অনিরুদ্ধ নামে মহাবল পুত্র জন্মায় কৃষ্ণ তনয় প্রদ্যুম্নের। নারায়ণ হরি কংস, তারক ও অন্য যে সব অসুররা ছিল তাদের নিধন করেন অক্লেশে। শত্রু আর মহাসুর বান জন্মলাভ করে। সকল জগতের উদ্ধারে রত হয়ে বিশ্বজগতে সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে সাফল্য লাভ করে। তাই সকল মহৎ মহর্ষিরা ভৃগু রূপী সনাতনকে দেখার আগ্রহে দ্বারকায় পৌঁছান। ধীমান বলরামের সাথে ঋষিরা যে যার আসন গ্রহণ করলে বিশ্বাত্মা নারায়ণ প্রণাম ও পূজা সম্পন্ন করে জানায়, হে মুনিগণ, বর্তমানে আমি আমার বিষ্ণুধামে প্রত্যাবর্তন করবো। পরাৎপর ব্রহ্ম

প্রাপ্তি ঘটে নারায়ণ প্রতি নিষ্ঠাবান ভক্তদের। দক্ষযজ্ঞের সময় শিবের নিন্দা করার ফলে দধীচি মুনির অভিশাপে যারা জগতে জন্ম নেয় তাদের গ্রহণ করা হয় না।

২৮

ঋষিরা এরপর সূতের কাছে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের মহত্বের বাণী শুনতে চান। কৃষ্ণ পরমপদ লাভ হওয়ায় শত্রু সন্তাপকারী পরম ধার্মিক পৃথা পুত্র অর্জুন তাঁর সাকার ঘটায়। সেই শোকে আকুল হয়ে যায়। অর্জুন কোন দিন কৃষ্ণকে দেখে জানতে চান তিনি কিসের কারণে এখানে–কৃষ্ণকে নদীতীরে উপবিষ্ট দেখে অর্জুন জানায় যে বর্তমানে ঘোর কলি। তাই বারাণসীতে গমন ঘটে। এই কালে লোকে বর্ণাশ্রম ধর্ম ত্যাগের মধ্যে দিয়ে কলিতে জীবের বারাণসীতে ছাড়া প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নয়। যাতে পাপের নাশ হয়। বারাণসীর মানুষরা পরম ধর্মের অনুরাগী। এরপর কালের মহত্ব বর্ণনা মধ্যে দিয়ে সত্য যুগে ধ্যান ও তপস্যা ত্রেতা যুগে রবি দ্বাপরে বিষ্ণু ও কলিযুগে মহেশ্বর। সত্যযুগে সমস্ত জীব সম্প্রদায়ের জন্ম ঘটে। মিথুনরূপে কারোর মনে লোভের চিহ্ন দেখা যায় না। মনে শুধু আনন্দ সুখ, কারোর অবশ্য নিজস্ব কোনো বাসগৃহ ছিল না। তাদের বাস ছিল পর্বতে। তারা মনে মনে উৎফুল্ল ছিল।

ত্রেতা যুগে এসে সেই সুখের নাশ ঘটিয়ে অন্যেরা সেই সুখের ভোগী হল। এই যুগে সকলে জীবিকা নির্বাহ করে। এই সময় প্রজাদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। তাদের মনে রাগ ও লোভের জন্ম নেয়।

ত্রেতা যুগে বসে প্রজারা সবদিক দিয়ে রাগ ও লোভের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী সমস্ত কিছু অধিকারে নেয়। ব্রহ্মা তখন সকলের আচরণ বিধি নির্দিষ্ট করার মধ্যে দিয়ে ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করে। ত্রেতাযুগে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়।

দ্বাপরে চতুষ্পদ বেদ তিনভাগে বিভক্ত হয়। শাস্ত্রজ্ঞাত ঋষিরা স্ব-জ্ঞানের লক্ষণ অনুযায়ী কোন এক স্থলে সাধারণ অংশ রচনা করে ঋক, যজুঃ ও সামের সংহিতা সংকলন করেন। দোষ দেখা দেয় লোকের মধ্যে এবং দোষ দেখার ফলে দ্বাপরে সেই ধর্মের বিশৃঙ্খল দেখা যায় আর কলিযুগে তার নাশ হয়ে যায়।

২৯

কলিতে মানুষ তমো গুণে আবিষ্ট থাকে, তারা ছলনার দ্বারা সবকাজ সম্পদান করেন। কলিতে দেশে বিপ্লব ঘটে। এই যুগে জাতের পার্থক্যের অবসান ঘটে। একই সাথে শূদ্র ও ব্রাহ্মণরা সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে। জনপদে প্রাসাদের ওপর গৃহে শূলবিদ্ধ থাকে। রমণীদের চুলে লৌহ শলাকা বিদ্ধ দেখা যায়। শুদ্রের ওপর নির্ভরশীল ব্রাহ্মণরা বাহনে উপবেশন করে, শূদ্রের চারিপাশে দাঁড়িয়ে স্তব করে, সেবা করে। কলিতে মহাদেব রুদ্র মানুষের প্রধান দেবতা ছিল, অতএব কলিতে দেবতা ও মানুষের আরাধ্য দেবতারই শরণ করে। এই যুগে সকল পাপ ধুয়ে ফেলতে মানুষরা মহাদেবকে স্তব করে বলেহে দেবাদিদের রুদ্র, চন্দ্র, সাদমঙ্গলময়, স্থানু, বিরূপাক্ষ, ব্রহ্মচারী যোগাধিগম, পিনাকপানি, সংহারনাশক অতীত ও অনাগত তোমায় প্রণাম।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ স্বয়ং বিষ্ণু, তিনি ছাড়া অন্যের দ্বারা পরমেশ্বর রুদ্রের প্রকৃত স্বরূপ জানা অসম্ভব। মুনিরা বেদব্যাসকে প্রণাম করে।

৩০

কৃষ্ণ বারাণসীতে গিয়ে কি করেন, তা শোনা যাক। তিনি সেখানে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে মহাদেবের পুজো করেন। আর মহাদেবকে বলেন সকল জীবের ইন্দ্রিয়ের অতীত কামনাশন গভীর ও গভীরতম যে জ্ঞান সব ভক্তের উন্নতির জন্য বলে দিন। সকলে মহাদেবের দয়ায় অতিরিক্ত দ্রুতো লাভ করে। কাশীতে যেমন ভীষণ সুকৃতি লাভ করা সম্ভব, যেভাবে যজ্ঞ আর ব্রহ্ম বিদ্যার সাহায্যে লাভ করা সম্ভব নয়। কাশীই পরম জ্ঞান ও পরমপদ। বহু জগতেই কাশীতে গঙ্গাস্নানের পূর্ণতা লাভ হয় না বারাণসীতে দেবেশের ভক্ত হয়ে বাস করলে সেই মোক্ষ এবং জন্মই লাভ করা যায়, বারানসীকে ছেড়ে অন্য তপোবনে যাওয়া ঠিক নয়। নারায়ণের থেকে পরম দেবতা আর অন্য কেউ নেই। মহাদেব মহেশ্বরের চেয়ে পরম ঈশ্বর আর কেউ নেই। মুমূর্ষ ব্যক্তি বারাণসীতে সবসময়ে বসবাস করবে, তবেই জ্ঞান লাভ করার মধ্যে দিয়ে মুক্ত হবে।

যাদবের যে বুদ্ধি ছিল সেই বুদ্ধিকে কলিযুগের পাপেতে ঢেকে ফেলেছে। তারা দেখতে পায়না পরমেষ্ঠীর পদ। মহাকাল মহেশ্বর এখানে বসবাসকারী পাপীর পাপের নাশ করেন। এখানে মৃত্যু ঘটলে স্বর্ণ লাভ হয়। সংসার নামক সমুদ্রে পাপী ও পুণ্যবান সকলেই কালানুক্রমে এখানে বসবাস করে মানুষের কথায় বাবা মা কারো কথাতেই বারাণসী যাবার প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করা যায় না।

৩১

ধীমান গুরু দ্বৈপায়ণ মুনি শিষ্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মুক্তিদায়ক ওঙ্কার নামে বৃহৎ শিবলিঙ্গের নিকট যান। বেদব্যাস তাঁর শিষ্যদের সহিত উক্ত লিঙ্গের পূজা করেন। বিশ্বেশ্বর রুদ্র ও শিব বলে প্রচারিত যে তারা সবসময়ে এই কৃত্তি বাসেশ্বর লিঙ্গকে ঘিরে আছেন। বারাণসীতে যে শ্রেষ্ঠ মুনিরা থাকেন তাদের আরাধ্য যে শম্ভু এই রুদ্রকে স্তবের দ্বারা পূজা করেন, তাঁকেই তাঁরা প্রণাম জানান। আমি প্রণাম করছি সেই বিমল জ্যোতিকে যে আভাস পাওয়া যায় পুরাণ-পুরুষ স্থাণু গিরিশকে আশ্রয় করে, আর হৃদয় গভীরে যে রুদ্ররূপ আছে তাঁর স্মরণ করে। তিনিই বহুরূপধারণকারী মহাদেব।

৩২

শূলপানির অব্যয় বাপদীশ্বর লিঙ্গ দর্শনের উদ্দেশ্যে ধীমান বেদব্যাস তিনি পিশাচ মোচন তীর্থে স্নানের অতঃপর পিতৃগণের তর্পণ সমাধান ঘটিয়ে মহাদেবের আরাধনা করেন। সেখানে এক হরিণীকে খাদ্য হিসাবে ভোগ করার সুবাদে অতি দ্রুতবেগে আসে আর হত্যা করে। মৃগীকে সে বিদীর্ণ করে দেয়। হরিণী তখন ত্রিয় ধারণে তার আবির্ভাবে তার শক্তি তেজস্বতা প্রচুর আর তার মধ্যে সূর্যের মতো কিরণ ছটা দেখা যায়। রূপ বিশিষ্ট পুরুষরা তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যা গণেশ্বরের পরিণত হতে মুনিরা ব্যাসকে বাপদীশ্বরের মহত্বর কথা জিজ্ঞাসা করে।

ব্যাস তখন বলেন, বারাণসীতে বসবাস করে বাপদীশ্বরকে দর্শন করে আরাধনা করে স্তব করবে। পিশাচ মোচন কুণ্ডতে স্নান করে ব্রহ্ম হত্যার পাপ লয় পায়। তার পূর্বে শঙ্কুকর্ণ নামে এক তপস্বী মহাদেবের পূজা করেন। তার একদিন চোখে পড়ে একটি প্রেত ক্ষুধায় কাতর হয়ে লম্বা শ্বাস ত্যাগ করে এগিয়ে আসছে। তখন পিশাচ বলে, সে ছিল পূর্বের জন্মক্ষণে এক ব্রাহ্মণ। তার পুত্র পৌত্র ছিল। একদিন বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরকে প্রণামে স্পর্শ করেন ও তার কিছু পরেই মারা যান। এখন সে পিশাচী যোনি প্রাপ্ত হয়েছে। খিদে তেষ্টায় আক্রান্ত ও কাতর হয়ে দিকবিদিক্ জ্ঞান হারায়।

মুনি তাকে পুণ্যবান বলেন, তা শুনে সে ত্রিনেত্রকে মনে করে এক মনে স্নান করেন এবং সে রুদ্রের স্তব করে। যে মানুষ প্রত্যেক দিন মহাদেবের স্তব করে সে মহাদেবের সান্নিধ্য প্রাপ্তি ঘটে আর তার মুক্তিও ঘটে।

৩৩

বেদব্যাস বাপদীশ্বরের নিকট বহুদিন অতিবাহিত করে মধ্যমেশ্বর লিঙ্গ দর্শনে যান। সেখানেই মন্দাকিনীকে দেখে অত্যন্ত খুশি হন। সেখানে বাস ছিল কিছু পশুপতির তারা যখন তাকে দেখে মনে মনে উৎফুল্ল হয়। সেই উৎফুল্ল মনে ব্যাসদেবকে বলেন, আপনি পরমেষ্ঠী দেবের সুবাদে মহেশ্বর বিজ্ঞান লাভ করেন। আপনার মুখ থেকে সে কথা শুনে খুব তাড়াতাড়ি দেবকে দর্শন করেন। তিনি ঈশ্বরের ধ্যান ও পূজা করেন। ব্যাসদেব বলেন–যারা মন্দাকিনীতে স্নান করে শ্রেষ্ঠ মধ্যমেশ্বরের পূজা করেন তারা ধন্য বোধ করবে নিজেকে। এখানে কেউ যদি স্নান, দান, তপস্যা ও শ্রাদ্ধ করে তার সপ্তম কুল পর্যন্ত শুদ্ধ হয়। সূর্য রাহুগ্রস্ত হলে মানুষ সন্ধিক্ষণে স্নান করে যে ফল লাভ করে এখানে স্নান করলে তার দশগুণ ফল লাভ হয়। মহাযোগী একথা বলে মধ্যমেশ্বরে পূজা করে সেখানে বহু সময় কাটায়।

৩৪

বেদব্যাস এরপর অজানা, অচেনা তীর্থস্থানগুলিতে গমন করেন। তিনি যেসব তীর্থস্থানগুলিতে যান–সেগুলি হল– কাল তীর্থ, তীর্থ আকাশ, শ্রেষ্ঠ বায়তীর্থ, জ্ঞানতীর্থ, মহাপবিত্র সমতীর্থ, পরমতীর্থ, সংবর্তক। ঘটোৎকচ তীর্থ, শ্রীতীর্থ, ব্রহ্মতীর্থ। ব্রহ্মতীর্থে বিষ্ণু শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপরেই ভূতেশ্বর তীর্থ, শুশভ তীর্থ, প্রভাস, ভদ্রবার্ণ বৃষধ্বজ শিব, মহাতীর্থ ত্রিলোচন বেদব্যাস উপবাস করে এই সকল তীর্থে স্নান করে মহাদেবের পূজা করেন। তিনি যখন কাশীতে থাকতেন, সেই সময় ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করেন। ভিক্ষে পায় না আর সে বারাণসী নগরীকে পাপ দিতে চায় শিবপত্নী ছদ্মবেশ ধরে তাকে এই কাজে নিরত হতে বলেন। বেদব্যাস তাঁর পরিচয় জানার পর অনুমতি দেন, অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে সে যেন বারাণসীতে প্রবেশ করেন। ভগবতী আশীর্বাদ দিয়ে বলে যান। মানুষ মাত্রই প্রথমে বারাণসীতে বাস করা উচিত। যে কালীর মহত্ব শুনে তাকে পাঠ করে সে পরম গতি লাভ করে।

৩৫

এবার ঋষিরা প্রয়াগের মহত্বের কথা শ্রবণে ইচ্ছুক হলেন। সূত বলতে লাগলেন–মার্কণ্ডেয় মুনি মহাত্মা কুন্তী নন্দন যুধিষ্ঠিরকে যেভাবে বলেন সেই ভাবেই বলে থাকবেন। যুধিষ্ঠির তার ভাইদের সাথে মিলে সকল কৌরবদের বিনাশ ঘটায়, মার্কণ্ডেয় মুনি হস্তিনাপুরে আসায় যুধিষ্ঠির তাঁকে আহ্বান জানান। তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে আরতির দ্বারা তাঁর পূজা করেন এবং পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধজনিত পাপ মুক্তির পদ্ধতি জানার আগ্রহ দেখান। তার উত্তরে মুনি

বলেন, মানুষের পক্ষে প্রয়াগে যাওয়াই প্রকৃষ্ট পথ। ব্রহ্মা সেখানে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন। মুনি তখন প্রয়াগ স্নানের ফলাফল কি হয় তা বর্ণনা করেন যা প্রজাপতির ক্ষেত্র হিসাবে পরিচিত। এখানে স্নান করার মধ্যে দিয়ে পাপী ব্যক্তি পাপ নাশ পূর্বক স্বর্গে পৌঁছায়। প্রাণত্যাগের পর পুণর্জন্ম হয় না। প্রয়াগের আয়তন ষাট হাজার ধনু সেখানে গঙ্গা-যমুনা দুই বয়ে চলেছে। এর রক্ষক সপ্তবাহন সবিতা এখানে ইন্দ্র বাস করে থাকেন। প্রয়াগ যারা দর্শন করেন তাদের পাপত্ব স্খলন হয়। গঙ্গা দর্শনে মানুষের মঙ্গল হয়। গঙ্গাস্নান যারা করেন তারা দেবলোকের পূজা পাওয়ার অধিকারী হন। যে ব্যক্তি প্রয়াগ তীর্থ মনের গোচরে আনে তারা সেই স্মরণের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মলোকে পৌঁছায়। কোন ব্যক্তি প্রয়াগে গলায় চেলি পরিহিত হয়ে তার দ্বারা আবৃত করে কোন দান করে থাকে তবে সেই পুণ্যে সে সহস্র বছর রুদ্র লোকে বসবাস করে।

৩৬

মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে তীর্থযাত্রার নিয়মাবলি বলেন। যদি কোন ব্যক্তি ষাঁড়ের পিঠে উপবিষ্ট হয়ে প্রয়াগের পথে যাত্রা করেন তবে তাকে ভীষণ ভাবে নরকে বাস করতে হয়। পিতৃগণ এই ব্যক্তির জল গ্রহণ করে না, যিনি গঙ্গা যমুনা মিলনস্থলে বৈভব দিয়ে কন্যাকে দান করে থাকেন, তিনি নরক দর্শন থেকে নিজেকে অব্যাহতি দেন। তিনি রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন, তিনি প্রয়াগের বটমূলে প্রাণত্যাগ করে থাকেন। যে বিধি অনুযায়ী গঙ্গা যমুনার মিলনস্থলে স্নান করে থাকে তিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পেয়ে থাকে। যারা প্রয়াগ লাভ করতে পারে তারা তিন লোক থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। প্রয়াগ দর্শন কালে রাহুগ্রাস থেকে চন্দ্রের মতো সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি ঘটে। রমণীয় ঊর্বশী পুলিনে সুবিস্তৃত হংস পাণ্ডুর ক্ষেত্রে যে প্রাণ ত্যাগ করেন সে ষাট হাজার আর ষাট শত বৎসর পিতৃগণের সাথে স্বর্গে বাস করেন। যে কোটি তীর্থে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করে থাকে সে সহস্র কোটি বছর স্বর্গে বাস করেন। সর্বস্থানে গঙ্গাকে সেবা করবে। বিশেষ করে প্রয়াগে তো করবেই, ঔষধ নেই ভয়ানক কলিযুগের জন্য গঙ্গাতে যার জীবন ত্যাগ হয়। অনিচ্ছা বা ইচ্ছাতেই সে মরণের পর স্বর্গে পৌঁছে যায়। তাকে আর নরক দর্শন করতে হয় না।

৩৭

মার্কণ্ডেয় বলেন, শত সহস্র গাভী দানের মধ্যে দিয়ে যা, ফল লাভ করা যায়, মাঘ মাসের তিনটে দিন প্রয়াগে স্নান করার ভেতর দিয়েও সেই লাভ হয়ে থাকে। যেখানে গঙ্গা যমুনা দুইয়ের মিলন ঘটে সেখানে শীত এড়ানোর জন্য লোকে খুঁটের আগুন জ্বালায় তার দেহে যত

লোম আছে তত সহস্র বছর সে স্বর্গলোকে পুজো পেয়ে থাকেন। নিজের শরীরের অঙ্গ পক্ষীদের দান করলে পক্ষীরা তা ভক্ষণ করে থাকে আর তার ফলে সেই ব্যক্তি শত সহস্র বছর চন্দ্রলোকে পুজো পেয়ে থাকে। সেই স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে ধর্মশীল গুণবান সৌন্দর্যশালী বিদ্বান প্রিয়ভাষী রাজা হন। যমুনা নদীর উত্তর প্রান্তে প্রয়াগের দক্ষিণে ঋণ মুক্ত নামে এক পরম তীর্থের কথা বলা হয়েছে, সেখানে নাকি যে এক রাত বাস করে, স্নান করে, সে তিন ধরনের ঋণ থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে আর স্বর্গলোকে পৌঁছে সে ঋণ মুক্ত থাকে সবসময়ে।

৩৮

যমুনা নদী তীরে সূর্যকন্যা ত্রিলোক প্রতিমার আবির্ভাব ঘটেছিল। যার নামেতে সহস্র যোজন জুড়ে পাপের বিনাশ ঘটে। সেই যমুনার সুশীতল সলিলে স্নান করে তার জল পান করার মধ্যে দিয়ে সমস্ত পাপের থেকে মুক্তি হয় সপ্তম কুল পর্যন্ত স্বর্গলাভ হয়ে থাকে। এই গঙ্গাতীর্থেই মহর্ষিদের খুবই গোপন ও পাপ নাশ করার স্থান আছে, কৌরবরা যেন সে সমস্ত তীর্থে স্নান করেন। মার্কণ্ডেয় মুনি একথা বলেন। সূত বলেন, প্রভাতে উঠে গ্রহ ও জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর কথা জানা হলে, পাঠ করলে সমস্ত পাপের মুক্তি ঘটে, তারপর পাঠক রুদ্রলোক পৌঁছায়।

৩৯

সূত এবার ত্রিভুবনের কথা বললেন। যে সকল সাগরদ্বীপ বর্ষ পর্বত অরণ্য ও নদী রয়েছে, তার মধ্যে প্রভাবশালী অপ্রমেয় দেব বিষ্ণুকে প্রণাম করে তারই বলা সমস্ত কথা বলা হচ্ছে। মনুর প্রিয়ব্রত নামে পুত্র ছিল, তার প্রজাপতি তুল্য দশ পুত্র ছিল অগ্নি, অগ্নিবাহু, বাহুষ্মান, দ্যুতিমান, মেধা, মেধাপিঠ, ভব্য, সর্বম পুত্র এই নজন। মহাবল পরাক্রান্ত জ্যোতিষ্মন ছিলেন তাদের মধ্যে দশম। মহাভাগ মেধা অগ্নিবাহু আর পুত্র যোগনিষ্ঠ ও জাতিস্মর ছিলেন। সাত দ্বীপেতে তার সাত পুত্রকে অভিষেক করেন প্রিয়ব্রত। রাজা অগ্নিকে জম্বুদ্বীপে আর বপুষ্মনকে সান্মালি দ্বীপের অধিপতি নিযুক্ত করেন। প্রিয়ব্রত ভব্যকে শাক্যদ্বীপের রাজা করেন। সবনকে পুষ্কর দ্বীপের রাজা নিযুক্ত করেন। ভব্যের সাত পুত্র জন্ম লাভ করে তাঁরা হলেন- জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীচক, কুশেশুর, মোদাকি ও মহদ্রুম। ক্রোঞ্চ দ্বীপের রাজা মহামের যে সকল পুত্র জন্ম নেয় তাঁদের মধ্যে প্রথম কুশল, ক্রমানুসারে মনোহর, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকার, মুনি আর দুন্দুভি। প্লকদ্বীপের রাজা হলেন মেধাপিঠ, তাঁর সাত পুত্র জন্মলাভ করেন। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ্যের নাম শিশির, অন্যেনা সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ধ্রুব আর অনুজের।

জম্বুদ্বীপকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে নয় ভাগে বিভক্ত করে রাজা পুত্রদের দেন। নাভিকে পিতা দক্ষিণ দিকে হিমবর্ষ প্রদান করেন, কিম্পপুরুষকে হেমকূট বর্ষ দিলেন, তৃতীয় নৈষধ বর্ষ দান করেন। হরিকে নীলাচল বর্ষ দান করেন। ইলাবৃতকে কুরুকে উত্তরকুরু বর্ষ দান করেন। ভরতের সুমতি নামে এক পরম ধার্মিক পুত্র জন্মায়। সুমতির তৈজস নামে এক পুত্র জন্মায় তাঁর আবার পুত্রের নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন। ক্রমানুসারে তার পুত্র পরমেষ্ঠী, তার পুত্র প্রতিহার, তার পুত্র প্রতিহতা, তাঁর পুত্র ভব, তার পুত্র উদজীয়, তাঁর পুত্র প্রস্তাবি, তাঁর পুত্র পৃথু, তাঁর পুত্র নক্ত, তাঁর পুত্র গয়ু, তাঁর পুত্র কিই, তার পুত্র মহাবীর্য, মহাবীর্যের পুত্র ধীমান, তাঁর পুত্র মহান্ত, তার পুত্র শৌবন, তাঁর পুত্র তৃষ্টা, ত্বষ্ঠা বিরাজ, বিরাজের রজ, রজের শতজিৎ, শতজিতের শত পুত্র। বিশ্বজ্যোতি প্রধান যে ব্রহ্মার বরে ক্ষেমক নামে পুত্রের জন্ম দেয়।

৪০

সূত ত্রিভুবন পরিমাণ বর্ণনা করতে চান পুরাণে ভূর্লোক বলে বর্ণিত হয়ে সূর্য ও চন্দ্রে কিরণ জালে যত দূর উদ্ভাসিত হয় সেই সীমা পর্যন্ত ভূর্লোক। স্বর্গ লোকের সীমা সেই পর্যন্ত যেখানে থাকে আকাশ পথে উর্ধ্বদিকে ধ্রুব নক্ষত্র, বায়ুচক্র বিদ্যমান সেখানে। ভূমি থেকে লক্ষ যোজন দূরে সৌরমণ্ডলে তার অবস্থান। চন্দ্রের বিস্তারের ষোলো ভাগের এক ভাগ শুক্রের বিস্তার, বৃহস্পতি বিস্তৃত রয়েছে যা শুক্রের চেয়ে এক চতুর্থাংশ কম। আবার বৃহস্পতির চেয়ে এক চতুর্থাংশ কম হল শনি ও মঙ্গলের বিস্তার। নক্ষত্র মণ্ডল সর্বপেক্ষা ক্ষুদ্র, এর চেয়ে ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক আর নেই। হাজার যোজন এই রথের অক্ষরা পথ পঞ্চাশ লক্ষ সত্তর হাজার যোজন, তাতে নির্দিষ্ট নিযুক্ত চক্র। যার তিন নাভি পাঁচ আর ছয় নেমি, অক্ষ বা পথের যা পরিমাণ তা দুটি যুগার্ধেরও পরিমাণ। ব্রহ্মা গুরু জ্যোতিশ্চক্র নিয়ে দক্ষিণ দিকের বিচ্ছিন্ন তীরে ভ্রমণ করেন। মাঝ রাতে তিনি সামনের ভাগে অবস্থান করে থাকেন। সমস্ত যে কোন দিকেই সূর্যের উদয় ও অস্ত ঘটে। সূর্যই তিনলোকের পরম শেষ ও মূল দেবতা। গন্ধর্ব যক্ষ নাগ কিন্নর সকলে সহস্রাংশুকে প্রণাম করেন, শ্রেষ্ঠ মুনিরা নানা যজ্ঞ দ্বারা পুরাতন পুরুষ সূর্যের আরাধনা করেন।

৪১

সূর্যের রথে অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে আদিত্য মুনি গন্ধর্ব অঙ্গরা স্বর্প আর রাক্ষসরা দ্বাদশ আদিত্যদের সূর্য বসন্ত প্রভৃতি ঋতুতে এদের আশ্রয় করেন। রাক্ষসরা সূর্যের আগে এগিয়ে যায়। বাসুকি, কঙ্গ, নীল, তক্ষক সর্বশ্রেষ্ঠ; এলাপ শঙ্খ পাল, ঐরাবত ধনঞ্জয় দ্বাদশ সূর্যকে বয়ে নিয়ে যান। ঋতুস্থলা, পুঞ্জীকস্থলা মেনকা সহজন্যা প্রম্লোচা বিশ্বাচী উর্বশী–পূর্ণাচিত্তি বসন্ত

প্রভৃতি ঋতুতে বিভিন্ন ধরনের মৃত্যুর দ্বারা মহৎ সূর্যের তুষ্ট করে বিধান করে থাকে। মুনিরা রবির স্তব করে থাকে নিজের রচিত কথায়। রাক্ষসরা বালখিল্য মুনিরা রবিকে ঘিরে তাকে অস্তে গমন করায়। এর থেকে পাওয়া যায় তাপ, বৃষ্টি ও দীপ্তি, এদের দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে রক্ষা করে থাকেন। দিবা-রাত্রির বিভাগ হেতু এই প্রজাপতি সূর্য, দেবাদিদেব মহাদেব তার তেজযুক্ত দর্শনে মহেশ্বর নীলগ্রীব সনাতন সূর্যই দীপ্তি পেয়ে থাকেন। বেদজ্ঞরা একথা বলেন। প্রজাপতি আদিত্য মণ্ডলেই অবস্থিতি করেন।

৪২

কিরণ জালই সমস্ত লোককে প্রকাশিত করে থাকে। সম্পূর্ণ, হরিবেশ, বিশ্বকর্মা, বিশ্বশ্রবা, সংসদ বসু, অবাবসু আর স্বরক এই সাত রশ্মির আলো শ্রেষ্ঠ চন্দ্রকে পরিপুষ্ট করে সুষুন্ন নামে রশ্মি যা বক্রভাবে উর্ধ্বে দীপ্ত হন সূর্যকে আদিত্য বলা হয়ে থাকে দিব্য প্রার্থিব নৈশ, তম আর তেজ দান করে থাকে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা এইসব কিছু পাওয়া যায় সহস্র রশ্মি থেকে। বৃষ্টি জন্ম দিয়ে থাকে চন্দ্রবা, গাছ কাঞ্চন শতন ও অমৃত নামে নাড়ী, উষ্ণতার সৃষ্টি করে শুক্লা, কুকুমা ও বিশ্বভূত নামে নাড়ী এরা দ্যুতি দ্বারা পালনের মধ্যে দিয়ে দেবলোক পিতৃলোক ও মনুষ্যলোক তিন ধরনের পদার্থ দ্বারা জগৎ রক্ষা করে থাকেন সূর্যদেব। প্রভু সূর্য বসন্তে কপিল গ্রীষ্ম কাঞ্চন বর্ষায় শ্বেত শরৎকালে পাণ্ডু হেমন্তে তামার ও শীতে লোহা রঙের হয়ে থাকে। সূর্য ঔষধিতে রশ্মি দান করে থাকেন। পিতৃলোকে স্বধা আর দেবলোকে কলা অতএব অমৃত বিলিয়ে থাকেন, এভাবে তিন ধরনের পদার্থ দান করেন। বায়ু চক্র দিয়ে পাঠানো হয়ে থাকে। গ্রহগণ চক্রকারে আগুনের চক্রের মতো পৌঁছে থাকে। এদের নাম প্রবাহ, শুক্লপক্ষে সূর্য পরভাগে অতএব আলাদা আলাদা দিকে অবস্থান ঘটে থাকে বলে তার কিরণজালে চন্দ্রের অন্য ভাগে সব সময়ে সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। যা চন্দ্রের জ্যোৎস্না। পূর্ণিমায় সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ণিমায় চন্দ্রের অমৃতময়ী, পবিত্র শেষ কলাটি স্বধারূপিণী বলে খ্যাত দুই লব পরিমাণ কাল ধরে ভোজন করেন পিতৃগণ। চন্দ্রের বিনাশ হয় না। পান করা হয়ে থাকে তার সুধা।

আট অশ্বযোজিত বুধ গ্রহের রথেতে বৃহস্পতির সোনার দ্বারা নির্মাণ রথের অশ্বের সংখ্যা হল আট। শনির রথের অশ্ব সংখ্যাও আট, রাহু আর কেতুর ক্ষেত্রেও গ্রহের সংখ্যা এক। নক্ষত্র তারা সকলে ধ্রুব তারায় আটকে এইরকম করছেন ও করিয়েও থাকেন।

৪৩

জনলোক থেকে তপোলোক তিন কোটি যোজনের উপরে এই প্রজাপত্য লোক থেকে সত্য লোক ছয় কোটি যোজনেরও উপরে থেকে থাকে। অপুনমারক ব্রহ্মলোক বলা হয়ে থাকে। মায়াময় পরম যোগী হরি। যেখানে শয়নে থাকা অবস্থানে তার দর্শনকে বলে থাকে পুনর্জন্ম নিবারণকারী বিষ্ণুলোক বলে লোকের কাছে বিখ্যাত। মহাদেব ঋষিগণ ও শত সহস্র যোগীর মনের বিষয়বস্তু হয়ে থাকে, দেবীর সাথে বাস করে থাকে। সেই তলাতল সমস্ত শোভার সৌন্দর্যের আধার হিসাবে পরিচিত। সুতলে বাস করে থাকেন গরুড় প্রভৃতি পক্ষী ও কালনেমি প্রভৃতি অসুরগণ। বিতলকে তারক আর অগ্নিমুখ প্রভৃতি যোজন বিস্তৃত লাভ করে থাকে। বিতল, পাতাল, নাগ, জম্ভক প্রভৃতি অসুর প্রহ্লাদ নাগেদের শ্রেষ্ঠ সম্বল বলে থাকেন। সুন্দর গভীর পাতালে বীর মহাজম্ভ, ধীমান হয়গ্রীব, শঙ্ক বার্ণ ও নামুচি নামধারী অসুরগণ এবং এরকমনাগ বাস করে থাকেন। পাতালের নিম্নদেশ শেষ নামক স্থানে বিষ্ণুর মূর্তি আছে, যিনি কালাগ্নি রুদ্র যোগাত্মা নৃসিংহ মাধব, আনন্দদেব, নাগরূপী জনার্দন বলে খ্যাত, সব কিছুর আধার হলেও কালাগ্নিকে আশ্রয় করে অবস্থিত দেখা যায়। তিনি সহস্র মায়াযুক্ত–যার কোনো তুলনা নেই। শঙ্কর ভবই সংহারকর্তা তমোময়ী শম্ভু মূর্তিই কাল, তিনিই লোকের সংহার করে থাকেন।

৪৪

ব্রহ্মাকে চতুর্দশ প্রকারের বলা হয়েছে। ভুলোক, জম্বুদীপ থাকে প্রধানত সাতটি সাগর ঘিরে মহাদ্বীপ, একটা সাগর থেকে অন্যটি বেশি পরিমাণে বিস্তার করে আছে। সমুদ্রের নাম ক্ষীরোদক, ইক্ষুদক, সুরোদক, ঘুরোদক, দধ্যদক, স্বাদুদক, পৃথিবী বিস্তৃতি পঞ্চাশ কোটি। সবার মাঝে জম্বুদ্বীপ মেরুর উত্তরভাগে রক্ষক আর হিরন্ময় বর্ষ। এরা ভারতবর্ষেরই মতো। সুমেরু রূপ বৃত্তের উচ্চতা দশ হাজার যোজন। এই পর্বতগুলিতে ক্রমান্বয়ে কদম্ব পিপুল বটবৃক্ষ আছে আর জম্বুবৃক্ষ জম্বুদ্বীপের নামের জন্যই। এই গাছের যে ফল তার আয়তন এক বৃহৎ হাতির মতো, যার রস থেকে জম্বু নামক খ্যাতপূর্ণ নদীর উৎপত্তি ঘটে থাকে, সেখানকার বসবাসকারী মানুষ নদীর জল পান করে, যার ফলে জল পানকারী মানুষের জরা বা ইন্দ্রিয় ক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়। নদীর তীরবর্তী মৃত্তিকার রস বাতাসের দ্বারা শোষণ করার মধ্যে দিয়ে জাম্বুনদ নামধারী স্বর্ণে পরিণত হয়ে থাকে।

সিদ্ধগণের বাসভূমি বলে পরিচিত এই পর্বত। সরোবর অরুণোদয়-এর আগে যে কেশবাচল আছে, তাদের নাম- ত্রিকূট, শিকর, পতঙ্গ, রুচক, নিশত, বসুধার, কলিঙ্গ, ত্রিশিখ, কৈলাস আর পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমবান, সিদ্ধ আর গন্ধর্বেরা বসবাস করে থাকে ঐ সব পর্বতে। আসিগেদ সরোবরের পশ্চিমে যে কেশরাচলগুলি আছে তাদের নাম শঙ্খ, কূট, হংস, নাগ, মাল, কমল, ময়ূর, কপিল।

এখানে যারা বসবাস করে থাকেন, তারা হলেন- দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ। সুত বলেন, সুমেরুর উপরি ভাগে দেবদেব ব্রহ্মার চৌদ্দ হাজার যোজন বিস্তৃত বৃহৎ পুরী দেখা যায়। সেই স্থানে বিশ্বাত্মা বিশ্ব ভাবনাকারী ব্রহ্মার অধিষ্ঠান। এই যোগ মুক্ত অধিকারী হল ব্রহ্মা, সিদ্ধ, ঋষি, গন্ধর্ব আর দেবতাদের পূজা পেয়ে থাকে। পরম যোগামৃত পান করে অবস্থান করে থাকে। মহাদেব পার্বতীর সাথে শুদ্ধ আত্মা মুনিদের।

৪৫

পূজা মস্তক দ্বারা গ্রহণ করেন। সুমেরুর দক্ষিণে আছে সংযমানী নামে যমপুরী, সেখানে রাক্ষসরা নিঋতিদেবকে উপাসনা করে। পর্বত রাজার পশ্চিমে বিশাল পুরী এখানে থাকেন বরুণ রাজ। এর উত্তরে বায়ুর পবিত্র পুরী যার থেকে নিঃসৃত গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করে ব্রহ্মা পুরীর চারিদিকে ঝরে পড়েছে।

গঙ্গা সমগ্র পশ্চিম গিরিচয় অতিক্রম করে পশ্চিম দিকস্থিত কেতু মালবর্ষ দিয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছেন। মাল্যবান ও গন্ধমান পর্বত নীল ও নিষধ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই চরের মাঝে সুমেরু শোভা পাচ্ছে কর্ণিকার আকারে। পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত গন্ধমাদন আর কৈলাস, ত্রিপুষ্ট আর জারুটি নামে দুটি প্রত্যন্ত পর্বত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে সমুদ্র পর্যন্ত অবস্থিত।

কেতুমালা বর্ষের অধিবাসীরা কৃষ্ণকায়। এরা ভোজন করে কাঁঠাল, পদ্ম পত্রের মধু। রক্ষক বর্ষে যে সব নারী পুরুষ বিহার করে তাদের গাত্রবর্ণ রজতের মতো। হরিবর্ষে ধূসরবর্ণ নারীগণ ইক্ষুরস পান করে দশ হাজার বছর জীবিত থাকে। সেখানকার পরিজাত বনে বাসুদেবের এক প্রাসাদ আছে। যার সোপানগুলি সোনার, দিব্য সিংহাসন রয়েছে, এখানে শোভিত করে আছে স্বাদু পানীয় জলের সরোবর, ইলাবৃত বর্ষে পদ্মকান্তি নরনারীর জম্বু ফলের রস পান করে সহস্র বৎসর জীবিত থাকে।

তারা নানা দেবতার পূজা করে। তাদের কর্মও নানা প্রকার। এদের আয়ু একশত বৎসর। এই ভারতবর্ষে কর্মের জন্য জন্ম হয় অধিকারী ব্যক্তিদেরই। এই বর্ষের মধ্যগণে যারা বাস করে তারা যজ্ঞ, সংগ্রাম, বাণিজ্য আর উপজীবিকা ভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয়ে থাকে। হিমালয় পাদদেশ থেকে নিঃসৃত হয়েছে শতদ্রু, বিতস্তা, বিপাশা, গোমতী ও লোহিনী, সহ্যাদ্রি পর্বত থেকে নির্গত নদীগুলি স্ববান পর্বতের পাদদেশে থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই সকল নদী নির্গত শতশত উপনদী আছে। ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চার যুগের বিভাগ কিম্পুরুষ প্রভৃতি যে আট বর্ষ আছে। তাতে পরিশ্রম ক্ষুধার ভয় নেই।

সূত বললেন, ব্রহ্মার, মহাকূট নামে স্ফটিক নির্মিত এক সুন্দর বিমান আছে। দেব গিরিশ পিনাকী মহেশ্বর ভূতগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মহাদেবীর সঙ্গে যেখানে মনোরমা মন্দাকিনী প্রবাহিত যার জল পান করে দানব, রাক্ষস ও কিন্নরগণ। সেখানে প্রবাহিত আরও অন্য শত শত নদী দেব ব্রহ্মা ও নারায়ণের স্থান। এদের তীরে বসুধার পর্বতে রত্নমণ্ডিত পবিত্র অষ্টবসুর ভবন আছে। সেখানে দেবর্ষি ব্রহ্মা সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষি আর অন্য দেবদেব অঙ্গ পিতামহ ব্রহ্মাকে উপাসনা করেন।

এই পর্বতের শৃঙ্গে আছে এক বিশাল সরোবর, যা বহুল পদ্মে সেবিত। সেখানে আছে ভোগীষব্যের পুণ্যাঞ্চ। সেখানে সহস্র গুণের মতো উজ্জ্বল সুমেঘ নামে বাসবের স্থান আছে। সেখানে ভগবতী অধিষ্ঠান করেন। নানাপ্রকার ঋতু দ্বারা উজ্জ্বল সুশীল নামে গিরিশৃঙ্গে রাক্ষসদের অনেক নগরী আর সরোবর আছে। সেখানে বিশাল পর্বতে যক্ষদের শত শত নগরী আছে। বিচিত্র বৃক্ষশ্রেণীতে শোভিত পাণ্ডুর পর্বতের শিখরে আছে দিব্যাঙ্গ নদের দ্বারা ব্যাপ্ত শতশত গন্ধর্বপুরী। অঙ্গ গিরির শৃঙ্গে আছে একটি সুন্দর সুরম্য নগর সেখানে রতি সুম্ভে বাস করে থাকে রম্ভা প্রমুখ অপ্সরারা। পঞ্চ শৈলর শিখরে দানবদের তিন পুরী আছে। আর অল্পদূরে ধীমান দৈত্যাচার্য শুক্রের পুরী বিদ্যমান। সুগন্ধ পর্বতের শিখরে নদী তরঙ্গে মনোরম পুণ্যাশ্রম আছে। সেখানে ভগবান কর্দম ঋষি থাকেন। মুনিদের স্থাপিত আর সিদ্ধদের চিহ্নিত পুণ্য বনভূমি আর আশ্রমের সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না।

চারদিকে ক্ষীর সাগরকে ঘিরে আছে প্লক্ষ দ্বীপ। এই দ্বীপে সিদ্ধগণের দ্বারা সেবিত সাতকুল পর্বত আছে। সেখানে ঋষি, গন্ধর্ব আর সিদ্ধেরা ব্রহ্মাকে উপাসনা করে থাকেন। এখানে অতি পবিত্র সব জনপদ আছে। এখানকার নরনারীরা পাপকর্ম করেনা। এই সাতবর্ষ পর্বতে সাত নদী আছে সমুদ্রগামিনী। এছাড়া বহু ক্ষুদ্র নদী আর সরোবর আছে। এখানকার নর-নারীরা চিরজীবী। সেখানকার সকল অধিবাসীই ধর্মনিয়ত ও আনন্দচিত্ত।

প্লক্ষ দ্বীপের দ্বিগুণ সাল্মলি দ্বীপ, সেখানে সাত কুল পর্বত ও সাত নদী আছে। এই সকল বর্ষে লোভ, ক্রোধ বা যুগধর্ম নেই। লোক রোগশূন্য শরীরে জীবনযাপন করে। এখানে শূদ্ররা কৃষ্ণবর্ণ হয়। সাল্মলি দ্বীপের দ্বিগুণ হল কুশাদ্বীপ, এটির চারদিকে বেষ্টন করে আছে ক্ষীর সমুদ্রকে। এখানে সাত কুল পর্বত বর্তমান, সাত নদী প্রবাহিত, মণি তুল্য স্বচ্ছতোয়া নদীও প্রবাহিত সেখানে দেবতারা ব্রহ্মা ও ঈশ্বরকে উপাসনা করেন। মর্ত্যলোকে যারা জ্ঞান সম্পন্ন মৈত্রী গুণযুক্ত যারা কর্মানুষ্ঠান করেন সকল প্রাণীরা হিতকার্যে নিরত থাকেন এবং নানাপ্রকার যজ্ঞ দ্বারা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে উপাসনা করেন, তাদের ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি লাভ হয়।

শাকদ্বীপের বিস্তার ক্রৌঞ্চ দ্বীপের দ্বিগুণ, এটি চারদিকে বেষ্টন করে আছে দধি সমুদ্রকে। এখানেও সাতকুল পর্বত এবং সাত সমুদ্র আছে। এখনকার মানুষরা সূর্যের অর্চনা করে এবং তার প্রসাদে তাদের মুক্তি লাভ হয়ে থাকে। শাকদ্বীপকে বেষ্টন করে আছেন শ্বেত দ্বীপ। এখানে নারায়ণে সমর্পিত চিত্ত বিষ্ণু ভক্ত শ্বেতকায় মানবগুণ জন্মগ্রহণ করে।

এখানকার মানুষরা লালসাহীন সদানন্দময় নারায়ণ তুল্য। কেউ বা নিষ্ঠাসম্পন্ন আশ্রয় শূন্য ও মহাভাগ। সেস্থানের প্রাসাদ মালায় সজ্জিত সুবর্ণ প্রাচীর যুক্ত স্ফটিকময় উজ্জ্বল, নারায়ণ নামক সুন্দর পুরী আছে। নানা রত্ন ও গোপুর এই পুরীর সৌন্দর্যবর্ধন করেছে। তার মধ্যে কোথাও নদী ও সরোবর শোভা পাচ্ছে। সেই অতুল্য পুরীতে নানা সঙ্গীত বিশারদ অপ্সরারা স্থানে স্থানে নৃত্য করছে। এরা নানা প্রকার ভোগে ও রতির বিষয়ে অত্যন্ত অভিলাষী। এখানে ভগবান হরি শেষ নাগ শয্যায় শয়ন করছেন তাঁর পদমূলে অবস্থান করেছেন লক্ষ্মীদেবী। নারায়ণ থেকেই জগৎ উৎপন্ন তার মধ্যে মহাপ্রলয়ের সময় জগৎ প্রবেশ করবে, অতএব ইনিই একমাত্র পরমগতি।

পুস্কর দ্বীপের বিস্তার শাক দ্বীপের বিস্তারের দ্বিগুণ। এই দ্বীপে মানষেও নামে একটি পর্বত আছে পুস্কর দ্বীপকে বেষ্টন করে আছে একটি সুস্বাদু জলের সমুদ্র। দেবতাদের পূজিত একটি বিশাল বটবৃক্ষ আছে। তাতে বাস করেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মার তুল্য রূপবান প্রজারা সুস্থ, নীরোগ আর রাগ-দ্বেষ বিহীন।

সাত মহালোক আর পাতালের কথা বলা হল। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে চোদ্দটি করে ভুবন আছে। সাত অপ্সরা ব্রহ্মাণ্ডকে সব দিক থেকে ঘিরে রেখেছে, তিনি সর্বত্রগামী, সকল প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান, তিনি সর্বত্র পূজিত মহেশ্বর।

সূত বললেন, অতীত হয়েছে এ পর্যন্ত দুজন মনুর অধিকার। প্রথমে স্বায়ম্ভুব মনু ও স্বরোচিত উত্তম তামস, রৈবত ও চাক্ষুস এই দুজনে এই সময় কাল ঋষি উর্জ স্তম্ভ, প্রাণ, দম্ভেই বৃষর্ভ তিহির আর অচরীবান।

উত্তম নাম মনুর তৃতীয় মন্বন্তরে এত অশ্রুনাশক সুশনি নামে দেবরাজ পঞ্চম মন্বন্তর মনুর নাম রৈবত দেবরাজের নাম বিভু। রৈবত মন্বন্তরে সাতজন ঋষির নাম হিরণ্যরোণা, উর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুবাহু আর সুপর্দুন্য। এই মন্বন্তরে অতুলনীয় ও সত্ত্ব গুণাবলী বিষ্ণু শক্তি রক্ষার জন্য অবস্থিত। উত্তম মন্বন্তরে শ্রেষ্ঠ দৈব সত্যরূপ জনার্দন বিষ্ণু সতার গর্ভে সত্য নামে উৎপন্ন হন। তামস মন্বন্তর উপস্থিত হলে তিনি আবার হর্মার গর্ভে হরিরূপে উৎপন্ন হয়েছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হলে বিষ্ণু কাশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সাত মন্বন্তরে ভগবান সাতরকম শরীর ধারণ করেছিলেন। বৈষ্ণবী পরমা তনু প্রলয়কালে সকলের নিধন করে থাকে। বাসুদেবের চতুর্থ মূর্তিটি রাজোগুণশ্রিতা। বিষ্ণু নারয়ণ স্বয়ং হরিই স্বেচ্ছায় বিশুদ্ধচিত্ত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

সূত বললেন, এই মন্বন্তর কালে প্রথম দ্বাপর যুগে প্রভু মহাত্মা স্বায়ম্ভুব মনু, ব্যাস হন তিনি বেদকে বহুভাগে বিভক্ত করেন। অষ্টাদির দ্বাপরে কুবত, দ্বৈপায়ণ ব্যাস হয়েছেন। ইনি সবার দেব আর পুরাণ প্রদর্শন করেছেন, যজুর্বেদ এক ছিল তাদের চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তার দ্বারা চাতুহোত্র যজ্ঞ হয়েছে। ঋক মাত্র দ্বারা হয়েছে হোত্র। ব্যাস পুরাণকে ভাগ করলেন আঠাশ ভাগে সনাতন বাসুদেবকে একমাত্র বেদসমূহের দ্বারা জানা যায়। বেদনিষ্ঠ মুনিরা বেদকে বা বেদবিদ্যাকে জানেন। এই বেদবেদ্য ভগবান বেদমূর্তি মহেশ্বরই একমাত্র ধ্যেয় ও বেদস্বরূপ, তাকে আশ্রয় করলেই মুক্তি হয়।

দ্বাপর যুগে বেদব্যাসের অবতারের কথা বলা হল, কলিযুগের মহাদেবের অবতারদের কথা বলি শুনুন। দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কলি পর্যন্ত যথাক্রমে সুতার, মদন, সুহোত্র, কঙ্কণ যোগীন্দ্র আর লোকক্ষি মহাদেবের অবতার হয়েছিলেন, বৈবস্বত মন্বন্তর শেষ কলিযুগে কায়াক তীর্থে দেবতা নরকাস্বর মহাদেবের অবতার। এই অবতারদের দুন্দুভি, সাতরূপ ঋচীকে কোতুমান, বিজ্ঞান, কুমার, সনক সনন্দ, সনাতন এরা তেজস্বী, গর্গ, ভার্গব, অজ সারস্বত মেঘ ঘমবাহ উগ্রাসান, কুমি কুকীরর কশ্যপ, কুমার সকলে নির্মল, ব্রহ্মভূমি স্থিত ও জ্ঞানযোগ পরায়ণ, এঁদের যারা স্মরণ ও নমস্কার করেন তাঁরা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করবেন। বৈবস্বত মন্বন্তরের কথা সবিস্তারে বললাম, ব্রাহ্মণ্যবর্ণ মন্বন্তর দশম মন্বন্তর এখানে মনুর নাম ভবিষ্যতে যে এই বিবরণ পাঠ করে তার সকল পাপ মুক্ত হয়।

ঈশ্বর গীতা

ঋষিরা বললেন–সুত তুমি আমাদের কাছে স্বায়ম্ভুব সৃষ্টির কথা বলেছ, এই ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার আর বিভিন্ন মনুর অধিকার কালের কথাও ব্যক্ত করেছ। তাতে যে ঈশ্বরস্বরূপ দেবকেই ধর্মনিষ্ঠা জ্ঞানযোগী ঋষিগণের আরাধনা করা উচিত সে কথাও বলা হয়ে গিয়েছে, আবার সমস্ত সংসারের অতিনাশক পরম তত্ত্বসমূহের কথাও তুমি বলেছ। এর সাহায্যে আমরা সেই ব্রহ্মবিষয়ক পরম জ্ঞান লাভ করতে পারি তার ফলে তুমি স্বাক্ষাৎ নারায়ণের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছ।

পুরাণতত্ত্বজ্ঞ সূত মুনিদের এই কথা শুনে প্রভু কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণকে স্মরণ করে বলবার উপক্রম করলেন, এমন সময়ে ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ ব্যাস স্বয়ং মুনিদের যজ্ঞস্থলীতে উপস্থিত হলেন। পুরাকালে কূর্মরূপী বিষ্ণু মুনিদের কাছে মোক্ষদায়ক দিব্যজ্ঞানের কথা বলেছিলেন- আপনিই যোগ্য তাই এঁদের কাছে প্রকৃত রূপে রুদ্রদেব মুনি ব্যাস সূতের কথা সূত বলতে শুরু করলেন।

পুরাকালে সনৎ কুমারদি শ্রেষ্ঠ যোগীদের জিজ্ঞাসার উত্তরে স্বয়ং মহাদেব যা বলেছিলেন সনক সনন্দন, রুদ্র, সনন্দ, কপিল মুনিরা পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করেও চিত্তের সংশয় নিরাময় করতে পারলেন না। ঘোর তপস্যা করলেন পুণ্যদায়ক বদরিকাশ্রমে। নারায়ণ মুনিদের মনোবাঞ্ছা জেনেও গম্ভীরবাক্যে প্রশ্ন করলেন, কেন তারা তপস্যা করছেন? মুনিরা তাঁকে বললেন, ব্রহ্মবাদী হলেও অত্যন্ত সংশয় আকুল হয়ে আপনার শরণ নিয়েছি। সনৎকুমার প্রমুখ মুনিগণ ত্রিনয়ন, চন্দ্রভূষণ মহেশকে দর্শন করে স্তব করে। হে ঈশ্বর মহাদেব, আপনার জয় হোক, আপনি সকল মুনিবৃন্দের ঈশ্বর, পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রহ্মবাদী মুনিরা বললেন– হে হর, একমাত্র আপনিই নিজের আত্মাকে বৃষধ্বজের দিকে দৃষ্টিপাত করে যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করুন। তারপর তিনি মুনিবরদের বললেন, শূলধারী শঙ্কর মহাদেবের দর্শন পেয়েছেন বলে আপনারা নিজেদের ধন্য মনে করুন। সনৎকুমার প্রমুখ মুনিরা বিষ্ণুর কথা শুনে বৃষধ্বজ মহেশ্বরকে প্রণাম করে তার কাছে নিজের প্রশ্ন রাখলেন। মহেশ্বর নিজ তেজে চারদিক আলো করে বিষ্ণুর সঙ্গে সেই আসনে উপবিষ্ট হয়ে শোভা পেতে লাগলেন। ব্রহ্মবাদী মুনিরা উজ্জ্বল আসনের উপর দেবাদিদেব শঙ্করের অপূর্ব দীপ্তি বিপুল তেজ, শান্ত শিবের থেকে প্রাণীদের উৎপত্তি হয়, প্রাণীরা বিলীন হয়ে যায়। সেই ভূতনাথ ঈশ্বরকেই মুনিরা আসনে উপবিষ্ট দেখলেন। পরম ঈশ্বর মহেশ্বরই বাসুদেবের সঙ্গে দৃষ্টিগোচর হয়েছিলেন। মহেশ্বর সনকুমার মুনিদের প্রশ্নে পুণ্ডরীকাক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করে যে শ্রেষ্ঠ সামযোগের কথা মুনিদের কাছে

বলেছিলেন, তাই আমি বলছি, হে মুনিগণ, আপনারা শান্ত মনে ঈশ্বরপ্রাপ্ত সেই জ্ঞানের কথা শুনুন।

দ্বিজাতিরা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, আত্মগুহ্য জ্ঞান লাভ করলে এই জ্ঞান গুহ্য থেকে গুহ্যতম, একে অতি যত্নে পালন করে রাখতে হয়। তোমরা অত্যন্ত ভক্তিমান ও ব্রহ্মবাদী– তাই তোমাদের এ কথা বলব।

আত্মা অন্তর্যামী। ইনি পুরুষ, প্রাণ, মহেশ্বর বেদ আর শ্রুতি বিশ্বের উৎপত্তি ও লয়। এই আত্মা থেকেই বেদবিদ্বানগণ বলেন, আত্মাই সবকিছুর স্বাক্ষী, প্রকৃতির পরিস্থিত, ভোক্তা, অক্ষর চেতন আর সর্বত্র অবস্থিত। অজ্ঞান বা অন্যরকম জ্ঞান থেকেই তত্ত্বগুণীর প্রকৃতির সঙ্গে মিলন ঘটে। যখন কেবল আত্মাকে পরমার্থ রূপে ও সকল জগৎকে মায়ামাত্র বলে উপলব্ধি করা যায় তখন আসে নিবৃত্তি। যোগ থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তেমনি আবার জ্ঞান থেকেও যোগ শুরু হতে পারে। যিনি সংখ্যা আর যোগকে এক বলে জানেন তিনিই তত্ত্বদর্শন নিপুণ নির্মল আত্মার হেতু স্বরূপ যে শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য, তাকে সূক্ষ্মদর্শী ঋষিরাই দেখতে পান।

প্রধান আর পরম পুরুষ অব্যক্ত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই সমগ্র জগৎকে যিনি জন্ম দিয়েছেন তিনিই প্রকৃতি। সকল জীবের মোহ সৃষ্টি করে প্রকৃতি। প্রকৃতির প্রথম বিস্তারকে মহান বলে। মহানই আত্মা, মন তার সাহায্যকারী। কালকে কিন্তু কেউ বশীভূত করতে পারে না তাই কালকেই ভগবান, প্রাণ, সর্বজ্ঞ আর পুরুষোত্তম বলা হয়েছে। একমাত্র মহেশ্বরই মায়াবী ও মায়া স্বরূপ কালের সঙ্গে সঙ্গত হয়ে সর্বদা সকল জগৎ সৃষ্টি করে। এই বেদের অনুশাসন।

বেদের মাহাত্ম কীর্তন প্রসঙ্গে, ঈশ্বর বললেন, সকল রকম তপস্যা, দান, যজ্ঞের দ্বারা তাকে জানা যায় না। একমাত্র অত্যুৎকৃষ্ট ভক্তির দ্বারা আমাকে জানা যায়। ব্রাহ্মণরা নানাপ্রকার বৈদিক যজ্ঞ দ্বারা আমার যজন করে, আমি সকল দেবতার শরীর হয়ে সকলের আত্মারূপে সর্বত্র অবস্থান করি। আমিই যোগীদের অব্যয় গুরু। আমার দ্বিতীয় বিতুল্য শক্তিই নারায়ণ, কেউ আমাকে ধ্যানে বা জ্ঞানে দর্শন করে। পণ্ডিতরা বর্ণনা করেছেন আমাকে যোগী আর মায়া বলে। এই সর্ব বেদবিনিশ্চিত গুহ্যতম জ্ঞান যাকে তাকে দান করতে নেই। পরমেশ্বর যোগীদের এই কথা বলে নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন। যার সহ্য মস্তক, আকার ও বাহুজটা জুটাধারী ব্যাঘ্রচর্মধারী বিশাল ভূজে ধৃত রয়েছে শূল, তিন নয়ন যাঁর তাঁকে ব্রহ্মবাদী মুনিরা নৃত্যরত দেখলেন। ব্রহ্মবাদী মুনিরা তাঁকে দেখে নিজেদের কৃতার্থ মনে করলেন। তাঁরা ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করে নিজ নিজ মস্তক অঞ্জলি বর্ধন করলেন, তাঁরা স্তব করে বললেন, পুরাণ

পুরুষ প্রাণেশ্বর রুদ্র, অনন্তযোগ, অচেতা, ব্রহ্মময়, প্রাণ পুরুষ সকলে বলে তুমি অদ্বিতীয়, পুরাণ পুরুষ আকাশ ব্রহ্মশূন্য তুমি রুদ্র আর কপদী।

বৃষবাহন কপদী ভব প্রীতি লাভ করে পরম রূপকে সঙ্কুচিত করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন।

ঈশ্বর বললেন, পরমেষ্ঠী ঈশ্বরের মাহাত্ম্য যথাযথ বর্ণনা করবেন। তিনি সকল বস্তুর অন্তর্যামী মহেশ্বর তিনি সর্বত্র অবস্থান করেন। তিনি সকল ভাব অন্তর্বর্তী হয়ে জগৎ চালনা করেন। তার আদি ও অন্ত নেই। হিরণ্যগর্ভ মূর্তিও তাঁর দেহ থেকে উদ্ভূত। ব্রহ্মা তাঁরই নিয়োগ অনুসারে দিব্য ঐশ্বর্য সর্বদা নিজের কাছে রাখেন। রুদ্র, বহ্নি, অগ্নি, বরুণ সকলে তাঁর আজ্ঞায় চলেন। মানুষের সত্র জীবন রূপ সোম তাঁর আদেশ প্রেরিত হয়ে বর্তমান রয়েছে। যাবতীয় ধনের অধ্যক্ষ কুবের তাঁর আদেশে সর্বদা অবস্থিত। আদিত্য বসু রুদ্র বায়ু অশ্বিনীকুমার অন্যান্য সকল দেবতা তার শাসনে অবস্থিত। পরম বিদ্যাও তাঁর আদেশেই অধিষ্ঠিত, সমস্ত জগৎ তাঁর শক্তি স্বরূপ, তিনিই একে সৃষ্টি করেছেন অন্তিম ওনাতেই বিলীন হয়ে যায়, তিনিই ভগবান, ঈশ্বর স্বয়ং জ্যোতি সনাতন, পরমাত্মা ও পরমব্রহ্ম।

এই পরমেষ্ঠীর প্রভাবের কথা শুনলে পুরুষ মুক্ত হয়। ব্রহ্মজ্ঞদের মধ্যে তিনি স্বয়ম্ভ আর বিশ্বতোমুখ ব্রহ্মা। যোগীদের মধ্যে শম্ভ, স্ত্রীদের মধ্যে পার্বতী, মন বুদ্ধি অহংকার, আকাশ, অগ্নি, জল, অনিল, পৃথিবী এই আট প্রকৃতি বা সবই বিকার। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ইতা পদার্থ প্রকৃতি তত্ত্ব আর যে সে অব্যক্ত প্রধান গুণলক্ষণ আদি মধ্য আর অন্তহীন জগতের পরম কারণ সে চতুর্বিংশ তত্ত্ব সত্ত্বরজঃ তম–তিন গুণ, অবিদ্যা সমতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ আত্মার বন্ধনের কারণ বলে এদের পাওয়া বলে সর্বজ্ঞ কর্মকর্তা পাবক সকলে আদ্যা ও পুরাণ পুরুষ বলে।

ঈশ্বর এরপর আদ্য একটি জ্ঞানের কথা বললেন–যা জানলে প্রাণীরা ঘোর সংসার সাগর পার হতে পারেন। ঈশ্বর বললেন। তিনি সাধন বিদ্যার ওঁঙ্কার মূর্তি ব্রহ্মা আর প্রজাপতি যে ঈশ্বরকে সকল পদার্থে সমানভাবে অবস্থিত বলে দর্শন করে। সেই প্রকৃতপক্ষে নিজে হিংসা করে না। সে পরমেশ্বরকে গুহ্যহিত পরম প্রভু পুরাণ পুরুষ বিশ্বরূপ আর হিরণ্ময় বলে জানে। সেই বুদ্ধিমানই বুদ্ধিকে অক্রিম করে পরুম পদে প্রতিষ্ঠা করে।

পরমেশ্বর যদি নিষ্ফল, নির্মল নিত্য আর নিষ্ক্রিয় হন তবে ঈশ্বর কি করে বিশ্বরূপী হবেন? ঈশ্বর বললেন, তিনি বিশ্বনম কিন্তু বিশ্বও তাকে ছাড়া থাকতে পারে না। তত্ত্বে স্বর্গমধ্যে যে

তেজ প্রকাশিত হয় ধীর তাকেই উজ্জ্বল নির্মল আকার ধাম বলে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি একমাত্র ক্রীড়াময় ও সকল ভূতেই সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত।

ঈশ্বর বললেন, পরমব্রহ্ম অনিষ্ঠ এক অব্যক্ত লিঙ্গ ধ্রুবই স্বয়ং জ্যোতি স্বরূপ, পরমতত্ত্ব ও পরম আকাশে অবস্থিত একমাত্র শিবই আদি, মধ্য ও অন্তশূন্য পরম বস্তু, ইনিই ঈশ্বর তিনি ক্রীড়াময় কেবলমাত্র শিবরূপে শোভিত হয়ে থাকেন।

ঈশ্বর এরপর আত্মাকে ঈশ্বর রূপে দান করার পরম দুর্লভ যোগের কথা বললেন। যে ব্যক্তির মধ্যে যোগ আর জ্ঞানের সমন্বয় তার প্রতি মহেশ্বর প্রসন্ন হন। ঈশ্বর অর্চনায় পাঁচ নিয়ম হল– তপস্যা, সন্তোষ, শৌচ, আসন তিন প্রকার স্বস্তিকাসন, পদ্মাসন ও অধাসন, সমস্ত সাধনের মধ্যে ঐ আসনই উত্তম সাধন। উত্তম পদ্মাসন হল উরুদ্বয়ের উপর নিজের পাদদ্বয় রেখে উপবেশন করা, স্বস্তিকাসন হল নিজের জানু ও ঊরুতে রেখে উপবেশেন করা পাদ তালু উরুতে বিন্যাস করে উপবেশন করা হল অর্ধাশন– এই তিন আসন করে চক্ষু ঈষৎ উন্মীলন পূর্বক নাসাগ্রে দৃষ্টি নিবন্ধ করে নির্ভয় ও শান্ত হয়ে মায়াময় জগৎকে পরিত্যাগ করে নিজের মধ্যে অবস্থিত দেব পরমেশ্বরকে চিন্তা করবে।

ধ্যানের ক্ষেত্রে উত্তম পথকে হৃদয়ে চিন্তা করে বহ্নিতুল্য জ্যোতি বিশিষ্ঠ কাণ্ডার স্বরূপ আত্মাকে চিন্তা করবে। আমরা সকল তত্ত্বকে প্রণব দ্বারা বিশোধন করে নির্মল পরমপদ স্বরূপ আমাতে আত্মা সংস্থাপন করবে। ব্যক্তি কোন প্রাণীরই হিংসা করে না, সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী প্রদর্শন করে, তাদের ওপর দয়াবান হয়, মমত্ত্বশূন্য ও অহংকার বর্জিত হয়, সেই ব্যক্তিই পরমেশ্বরের ভক্ত ও প্রিয়। যে ব্যক্তি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাশূন্য সকল প্রচেষ্টাকে যে ত্যাগ করেছে। যে সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট, যার গৃহ নেই ব্যক্তিস্থির বুদ্ধি সেই আমার ভক্ত, মরণের চেয়ে যে ব্যক্তি কাশীতে বাস করে সে ঈশ্বরের অনুগ্রহে পরমপদ লাভ করে। সেই কাশীতে মৃত্যুকালে সকল প্রাণী পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। নারায়ণ নামে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ মূর্তি হল সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ যা শান্ত ও অক্ষর রূপে সংস্থিত। ঈশ্বরের ও কারণগত ব্যক্তি মূর্খই হোক আর পণ্ডিতই হোক ব্রাহ্মণই হোক বা চণ্ডালই হোক নারায়ণকে চিন্তা করলেই তার মুক্তি ঘটে।

ভগবান নারায়ণ পরম শরীর ত্যাগ করে তাপসবেশে যোগীদের বললেন, সাক্ষ্য দেবস্বরূপ পরমেষ্ঠী মহাদেবের অনুগ্রহে সংসার নাশক নির্মল জ্ঞান লাভ করেছেন। ভক্তি মান্য শান্ত,

ধার্মিক অহিতাগ্নি ব্রাহ্মণকেই ঈশ্বর বিজ্ঞান সযত্নে দান করতে হয়। মহাযোগী নারায়ণ এই বলে অন্তর্হিত হলেন।

ব্যাস ঋষিগণ ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত প্রিয় কর্মযোগের কথা বললেন। পূর্বকালে দ্বিজগণের যজ্ঞ পবিত্রের জন্যই ব্রাহ্মণ কার্পাস তৈরি করেছিলেন। ব্রাহ্মণ সর্বদাই উপবীত ধারণ করে থাকবেন এবং শিখাবন্ধন করে রাখবেন। যার উপনয়ন হয়েছে এমন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী জগৎশব্দ উচ্চারণ করে ভিক্ষা আহোরণ করবে। স্বজাতীয় গৃহ থেকেই ভিক্ষা আহোরণ করবে। সবর্ণের কাছে ভিক্ষা করা যায়। কিছু পতিত ব্যক্তির কাছে কখনোই ভিক্ষা করতে নেই। প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন লোকের গৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করবে। অন্ন প্রতিদিন গ্রহণ করবে, অত্যন্ত আদরের সঙ্গে আমি ভোজন করবে। অন্ন নিন্দা করবে না। অতি ভোজন পরিত্যাগ করবে। উত্তর মুখো হয়ে ভোজন করবে না এই সমস্ত হল সনাতন বিধি।

ভোজন, পান, নিদ্রা ও স্নানের পর পথ গমনের পর লোমহীন ওষ্ঠ স্পর্শ করলে, বস্ত্র পরিধান করলে উঠানে গমন করলে ব্রাহ্মণকে পুনর্বার আচমন করতে হয়। নিদ্রার পরও আচমন করবে। স্ত্রীলোকের দেহের স্পর্শে নীলবস্ত্র পরিধান করলে এবং নিজ দেহ থেকে স্খলিত বেশ বা অধৌত বস্ত্র স্পর্শ করলে পৃথিবী বা তৃণ স্পর্শ করবে না।

অরণ্যে জলশূন্য স্থানে, রাত্রে, পথে প্রত্যহ যদি কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করে তবে দোষ হয় না। তৃণ দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন করে মলমূত্র ত্যাগ করতে হয়। কুল থেকে মৃত্তিকা আহরণ করে মলমূত্রের স্পর্শ ও গন্ধ দূর হয়। এমনভাবে অন্যান্য ত্যাগ করে মৃত্তিকা ও বিশুদ্ধ তেল জলের দ্বারা শৌচ করবে। আর্চনাদির পর বিধান অনুযায়ী নিত্য আচমন করবে।

শৌচাগার সমন্বিত ব্রহ্মচারীকে গুরু তাকালে তার গুরুমুখ নিরীক্ষণ করে অধ্যয়ন করা উচিত। গুরু চেয়ে শিষ্যের আসল ও শায্যা সর্বদা ক্রুদ্ধ হয়ে ঝরতে নেই। মনে মনে যখন গুরু ত্যাগ করব এমন চিন্তা করবে না। গুরু পুত্র বেদের অধ্যাপক হলে তিনি গুরুর মতো মাননীয় হন।

সে দ্বিজাতি বেদ অধ্যয়ন না করে অন্য শাস্ত্রাধ্যয়নে যত্ন করে সে অতিশয় সূচ ও বেদবহিষ্কৃত হয় সে বিধি পূর্বক বেদাধ্যয়ন করে ও বেদার্থ বিচার করে না, সে সর্বাঙ্গে শুদ্ধতুল্য হয় ও দান প্রভৃতির পত্ররূপে পরিণিত হয় না।

দ্বিজারি নিজ শামা অধ্যয়নের পর একবেদ দুই বেদ অধ্যয়ন করবে। গুরুকে ধন দ্বারা পরিতুষ্ট করে তার অঙ্গ গ্রহণপূর্বক সমাবর্তন স্নান করবেন। প্রত্যহ আলিস হয়ে বেদান্ত স্বকীয় কার্য করবে, না করলে শীঘ্রই পতিত হতে হয় ও দেহাবসানে ভীষণ নরকে বাস করতে হয়।

নিজের দুঃখের মতো পরের দুঃখে সুহৃদভাবে করুণা করার নাম দয়া। তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা শরীর ক্ষয়ের নাম ধন দেহ ভিন্ন মহাদেবকে লাভ করা যায় না। সকল প্রাণীর গতি হল দেবরূপী ভগবান। দেবতার নিন্দা করে তার সঙ্গে আলাপ করবে না। যে ব্রহ্ম সুচি হয়ে সর্বদা ধর্মাধ্যয় পর্ব করেন বা অন্যকে শ্রবণ করান, তিনি দেহান্তে ব্রাহ্মণকে তামা করে সমহিত হয়ে ব্রহ্মলোকে থাকেন।

কোনো প্রাণীদের হিংসা করবে না, মিথ্যা কথা বলবে না, চুরি করবেন। মুনিরা সর্পাদির মুখনিঃসৃত বিষকে বিষ বলেনি। কিন্তু ব্রহ্মত্ব ও দেবশ্বরকেই বিষ বলেছেন।

উদীয়মান বা অস্তগামী চন্দ্র বা সূর্যকে বিনা কারণে দর্শন করবে না। আকাশ মধ্যস্থ জলবিম্বে প্রতিগত বা রাহুগ্রস্থ চন্দ্র ও সূর্যকে আহরণে দর্শন করবে না। ভার্য্যা যখন প্রস্রাব করছে, হাঁচছে বা হাই তুলছে বা নিজের ইচ্ছামতো বসে আছে তখন তাকে দর্শন করবে না।

জ্ঞানী ব্যক্তি পদ দ্বারা পদ প্রক্ষালন করবেন না। অগ্নিতে নাদদ্বয় তপ্ত করিবেন না। প্রবণঞ্চন করবে না দেবতা গুরু, বিপ্র গো বায়ু, অগ্নি চন্দ্র ও সূর্যকে বাম হাতে জল তুলে পান করাবেন। উষ্ণ হয়ে পশুদের মতো মুখ দিয়ে জল পান করবে না। বিদ্বান ব্যক্তি অগ্নি লঙ্ঘন করবে না। জলে থাকবে না বেশিক্ষণ, সম্ভাষণ করবে না পরস্ত্রীর সঙ্গে। অগ্নি গো ও ব্রহ্মর মধ্যে দিয়ে কখনো গমন করবে না। তাদের ছায়া লঙ্ঘন করবে না। সম্পর্ক নায় ধুলা গায়ে লাগতে দেবেনা এবং জলের ছিটা গায়ে লাগতে দেবে না। শূদ্রের অন্ন ভোজ করবে না। যে শূদ্রান্ন ভোজন করে সে গ্রোযোনি প্রাপ্ত হবে। রাজার অন্ন, নর্তকের অন্ন, গত্রবিবের অন্ন, চর্মকারের অন্ন আনীত জন জন সমূহের অন্ন আর বেস্যার অন্ন সর্বদা পরিত্যাগ করবে।

রুরু হরিণের মাংস ব্রাহ্মণদের নিবেদন করে ভক্ষণ করবে না। পুল নন যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার পর আবিষ্ট থাকলে সেই সব প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করা যায়। কেউ অভক্ষ্য ভক্ষণ করলে বা অপেয় পান করলে প্রায়শ্চিত্ত করে যে যত দিন না পাপ মুক্ত হয় ততদিন তার কর্মে অধিকার থাকবে না। এর অন্যথা হলে নরকভোগী হবে।

ব্রাহ্মণরা প্রতিদিন নিদ্রা থেকে উঠে মনে মনে ঈশ্বরের চিন্তা করবে, কি করে ঈশ্বরের সেবা করা যায় তার চিন্তা করবে, সূর্যোদয়ের সময় হলে পণ্ডিত ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে শৌচ প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন করে পবিত্র নদীতে স্নান করবে। বিধানজ্ঞ ব্যক্তি নিন্দিব দন্তকাষ্ঠ সমূহ পরিত্যাগ করে শাস্ত্রক্ত দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করে অনিষিদ্ধ দিনে তারা দন্ত মার্জনা করবে।

ওঁ খঘোল্কায় গন্ডায়

কারণ এত হেতবে

নিবেদয়ানি আত্মানা;

নমস্তে বিশ্বরূপিনে

প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নে সর্বশ্রেষ্ঠ সূর্যহৃদয়স্তব পাঠ করে সূর্য প্রণাম করবে। গৃহে আগমন করে বিধি অনুসারে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে যথাবিধি অগ্নিতে হোম করবে। ওঙ্কার উচ্চারণ করে সূর্য দর্শন করবে, জলসহ ডুব দেবে ‘হংস্য শুচিস্য’ এই ঋক মন্ত্র দ্বারা সূর্য দর্শন করবে। গৃহে গিয়ে যজ্ঞ করবে। দেব, পিতৃ, ভূত, মনু আর ব্রহ্ম হল পঞ্চযজ্ঞ তর্পণে পূর্বে ব্রহ্মযজ্ঞ করা না হলে অতিথি সেবারূপে মনুষ্য যজ্ঞ সমাপন করে বেদ অধ্যয়ন বা ব্রহ্মযজ্ঞ করবে। অগ্নির পশ্চিম দিকে পশুপক্ষী প্রভৃতিকে অন্যাদি দানরূপ ভূতযজ্ঞ সমাধা করবে। পঞ্চযজ্ঞ মহুজ্ঞ করতে না পারলে প্রত্যহ দেব পূজা করবে।

ভূমিতে পদ সংলগ্ন করে শুদ্ধাসনে উপবেশ পূর্বক পূর্বমুখ হয়ে তবে ভোজন করতে হয়। তবু কামাধারী ব্যক্তি পূর্বমুখ করে ভোজন করবে। সত্যকাল কামাকারী ব্যক্তি উত্তরমুখ হয়ে ভোজন করে। উপবাসের অবসানে ভোজন হলে পাঁচ অঙ্গ প্রক্ষালন করে অন্নপাত্র ভূমিতে রেখে ভোজন করা। দুষ্টু বুদ্ধি ব্যক্তি আর ভোজন দেখছে এমন ক্ষুধার্ত মানুষকে না দিয়ে ভোজন করবে না। অর্ধরাত্র বা মধ্যাহ্নে ভোজন করবে না। অজীর্ণ হলে ভোজন করবে না। ভগ্নপাত্রে ভোজন করবে না। ভোজন করার সময় বেদ পাঠ করবেনা। শয়ন করে ভোজন করবেনা। বিলাপ করতে করতে ভোজন করবেনা।

উত্তর বা পশ্চিম দিকে মুখ করে শয়ন করবে না। বিবস্ত্র ও অসূচি হয়ে শয়ন করা উচিত নয়। ফাঁকা মাঠে শয়ন করবে না। জনশূন্য গৃহে শয়ন করবে না। ব্রাহ্মণদের প্রতিদিন কর্তব্য শেষকাল দান কর্মের কথা বলা হয়েছে সেই কারণে সে ব্রাহ্মণ এইসব বিধি পালন করে না, সে

দেহাবসানে ঘোরতর নরকে যায় ও তার কাক যোনিতে জন্ম হয়। নিজ আশ্রম বিধি ছাড়া অন্য কোন মুক্তির উপায় নেই। তাই পরমেষ্ঠী সন্তোষের জন্য যেসব কর্মের কথা বলা হয়েছে সেগুলি সযত্নে সম্পাদন করবে।

.

ব্রাহ্মণরা অমাবস্যা তিথিতে ভোগ মোক্ষ প্রদায়ক পিণ্ডান্বা কর্তৃক নামে শ্রাদ্ধ করবে। কৃষ্ণপক্ষের সকল তিথিতেই শ্রাদ্ধ করা যায়। কেবল চতুর্দশী ছাড়া চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ও আত্মীয়দের মৃত্যুর জন্য যে শ্রাদ্ধ হয় তা নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ সংক্রান্তি ও জন্মদিনে কৃত শ্রাদ্ধ অব্যয়কাল দান করে। রবিবারে শ্রাদ্ধ করলে আরোগ্য প্রাপ্তি হয়। সোমবারে সৌভাগ্য, মঙ্গল করে সর্বত্র বিজয়, বুধে সকল অভীষ্ঠ দ্রব্য লাভ হয়, বৃহস্পতিবারে বিদ্যা ও অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। শুক্রে করলে ধনলাভ হয়। শনিতে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ হয়।

প্রতিদিন কর্তব্য ও নিত্যশ্রাদ্ধ, কাম্যশ্রাদ্ধ, নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, পার্বণশ্রাদ্ধ–এই পাঁচ প্রকার শ্রাদ্ধের কথা মনু বলেছেন। ষষ্ঠ শ্রাদ্ধ হল তীর্থযাত্রার সপ্তম শ্রাদ্ধ। প্রায়শ্চিত্ত কালে কর্তব্য দৈবিক শ্রাদ্ধ অষ্টম শ্রাদ্ধ। সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে শ্রাদ্ধ করবে না।

বরাহ বা মহিষ মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে দশমাস আত্মা পরিতৃপ্ত থাকে না। কেঁদোদানের চাল, পালংশাক ও মরিচ শ্রাদ্ধে দান করবে না।

.

অমাবস্যা তিথিতে স্নান করে পিতৃগণের তর্পণ সমাধা করে ও শুচি হয়ে ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্তকরণে পিণ্ডাৰাতাবক শ্রাদ্ধ করবে। যোনী শান্ত ও তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকেই শ্রাদ্ধ ভোজন করাবে। এদের কাউকে না পেলে সঠিক গৃহস্থকে ভোজন করাবে। তাদের না পেলে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাবে। সাধুগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের তনুকল্প বলে জানবে।

শ্রাদ্ধে মিত্রকে ভোজন করাবে না। মিত্রতা সম্পাদন করবে। ধন দ্বারা মূর্খ ব্রাহ্মণ তৃণাগ্নির দ্বারা নিস্তেজ হয়ে পড়ে অতএব তাকে হব্যাদি দান করবেন না। এদের হব্যাদি দান করলে হব্যাদিদাতা ফল পায় না।

যেসব ব্যক্তি বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান না করে এবার নিন্দিত কর্মের অনুষ্ঠান করে তারা সকলেই শ্রাদ্ধ ভোজনের অযোগ্য।

.

গোময় জল দ্বারা সমাহিত চিত্তে ভূমি শোধন করে শ্রাদ্ধের পূর্বদিন ‘আগামি কাল আমি শ্রাদ্ধ করব। বলে পূর্বোক্ত লক্ষণ যুক্ত নিমন্ত্রণ যোগ্য ব্রাহ্মণদের পূজা করে সাধুলোকের দ্বারা নিমন্ত্রণ করবে।

শ্রাদ্ধের দিনেও নিমন্ত্রণ করা যেতে পারে। যে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হয়ে কলহ করে, তার পিতৃগণ সেই মাসে মল ভোজন করে। মোহবশত ভূমিতে শ্রাদ্ধ করলে ভূস্বামী শ্রাদ্ধের অন্ন প্রভৃতি দূষিত করে থাকেন।

শ্রাদ্ধকালে মৃত্তিকা নির্মিত পাত্রে ব্রাহ্মণদের ভোজন করালে দাতা, পুরোহিত ও ভোজনকারী তিন জনের ঘোর নরকপ্রাপ্তি হয়। শ্রাদ্ধে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ কিছু পরিত্যাগ করবেনা।

ব্রাহ্মণের সযত্নে শ্রাদ্ধ করবে সনাতন মহাদেবও সম্যকরূপে আরাধিত হবেন। মৃত তিথিতে বিধানানুসারে একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ করবে, বিচিত্র সলিলে প্রতিমার বা ব্রাহ্মণে ভক্তি সহকারে প্রথমে গণেশ আর ষোড়শ মৃত্তিকার পূজা করবে।

.

ব্রাহ্মণের দশদিন অশৌচ হয়। সপিন্ড করণে ব্রাহ্মণেরা শুষ্ক অন্ন বা ফল দ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নিতে হোম করবে। জাতাশৌচ সপিণ্ড প্রভৃতির স্পর্শ দোষ নেই। শিশু ও প্রসূতিকে স্পর্শ করতে পারবে না। দু’মাসের মধ্যে স্ত্রীদের গর্ভস্রাব হলে যত মাসের গর্ভ, ততদিনের অশৌচ হবে। স্ত্রীর দশ রাত্রি অশৌচ হবে। সুপণ্ডিতের সদ্য শৌচ হবে। যদি সপ্তম বা অষ্টম মাসে বালক জন্মে মারা যায়, তবে গর্ভ শ্রাবাশৌচের মতোই অশৌচ হবে।

মাতামহের মৃত্যু হলে দৌহিত্রের তিন রাত্রি অশৌচ হয়। সমালোচকের মৃত্যুতে ও জন্মে তিন রাত অশৌচ হয়। দত্তক কন্যার পিতৃগৃহে মৃত্যু হলে পিতার তিন রাত্রি অশৌচ হবে। শূদ্র সপিণ্ডের জন্ম বা মৃত্যুতে বৈশ্যের ছয় রাত্রি ক্ষত্রিয়ের তিন রাত্রি ও ব্রাহ্মণের এক রাত্রি অশৌচ। ব্রাহ্মণ সপিণ্ডের জন্ম বা মৃত্যুতে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের শুদ্ধি দশ দিনে হবে। অশৌচ ব্যক্তির সঙ্গে যে ব্যক্তি উপবেশন, শয়ন বা ভোজন ঘনিষ্ঠ ভাবে করবে সে বান্ধবই হোক বা পরই হোক দশ দিন অশৌচ পালনে করে শুদ্ধ হতে হবে।

পতিত ব্যক্তির মৃত্যুতে দাহ, অস্থিসঞ্চার বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিছুই নেই। অশ্রুপাত, পিণ্ডদান বা শ্রাদ্ধ কিছুই করতে নেই। প্রতিদিন গৃহের বহির্ভাগে ও প্রাতঃকালে প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করতে হবে।

স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর শুশ্রূষা ছাড়া অন্য কোন ধর্ম নেই। স্বধর্ম পরায়ণ ও সর্বদা ঈশ্বরে অর্পিত চিত্ত ব্যক্তিরাই বেদবাদীদের দ্বারা পোক্ত সেই উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়।

.

অগ্নিহোত্র হোম করবে স্বয়ংকালে ও প্রাতঃকালে, ঋতুর অন্তে চাতুর্মাল্য যজ্ঞ করবে। ব্রাহ্মণদের অগ্নিহোত্রের চেয়ে অন্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর কিছুই নেই। সোমলোকস্থিত মহেশ্বরকে সোমবোগ দ্বারা আরাধনা করবে। সোমযোগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যোগ আর নেই। তার সমান কোন যোগও নেই। তার শ্রেতি ও শ্রেয় দুই প্রকার ধর্মই বেদ নিঃসৃত তাই ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণকে শ্রদ্ধা করা পণ্ডিতদের কর্তব্য।

.

আশ্রমবাসী গৃহস্থ দ্বিজজাতিগণের এই পরম ধর্মের কথা বললেন–ব্যাস। এখন বৃত্তির কথা বলবেন। সাধক ও অসাধক দু প্রকার। সাধক অবলম্বন করে অধ্যাপনা পতিগ্রহ আর যাজন কুসীদ। কৃষিকর্ম ও বাণিজ্য করতে পারে, কুষীদ অতি পাপজনক জীবিকা তা পরিত্যাগ করাই ভালো। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি কর্ষন। এ বিষয়ে সংশয় নেই, বাণিজ্য কর্মে কৃষির চেয়ে দ্বিগুণ করে দেবেন ও কুসীদ কর্মে তিন গুণ। দেবেন। তবে এই সব কর্মে কোন দোষ হবে না।

গৃহস্থের বৃত্তি শিল ও উদ্ধৃত গৃহস্থের পোষণ করতে হয় বহু আত্মীয়। ঋত, অযাচিত ভেঘ্য কৃষি, বাণিজ্য এবং কুসীদ এই ছয় প্রকার ধর্ম দ্বারা তার জীবিকা নির্বাহ হয়। ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ অবাঞ্ছনীয়। যজ্ঞ ও সৎ পাত্রের অর্থ দান করবে ব্রাহ্মণ সঞ্চয় করে।

ফলপ্রসূ দান হয় শ্রদ্ধার সঙ্গে সৎপাত্রে অর্থ প্রদান করলে, নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য তিন প্রকার দান। বিমল হল চতুর্থ দান। নিত্য দান হল প্রত্যহ দেয় দান। গৃহস্থকে অল্প দান করলে মানুষের ফল হয় না। বৈশাখ মাসে পূর্ণিমায় জলপূর্ণ কুম্ভ ধর্ম রামের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের দান করলে ভয় মুক্তি হয়। জন্ম থেকে কৃত সকল পাপ থেকে নিস্তার পাওয়া যায় সাত বা পাঁচ

সাত পাত্রে ব্রাহ্মণকে দান করলে। যে স্নান করে মহাদেবের আরাধনা করে, কৃষ্ণ চর্তুদশীতে ব্রাহ্মণ ভোজন করায়, সে আর জন্মায়। না।

অল্প দান করলে অব্যয় দান লাভ হয়। নরক ও পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, হাতা ও পদ্ধেবন দান করলে। অক্ষয় ফলদান করে দেবালয়, নদ-নদীতে সৎ পাত্রে দান করলে। দান ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম জীবের আর নেই। তার পাপের বংশের সাত পুরুষ ধ্বংস হয় যে সন্নিহিত শ্রোত্রিয়কে অতিক্রম করে। তারা স্বর্গে যায় যারা অর্চি দান করে ও গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ চাইতে পারেন বৃত্তি সঙ্কোচ কিন্তু চাইবেন না। সম্পদের আধিক্য যেন ব্যক্তি গৃহধর্মানুসারে অর্চনা করে, সে পুনর্জন্ম পায় না।

.

গৃহস্থ ধর্মের পর অগ্নিও ভতার ভার্য্যা যাবে বাণপ্রস্থে। আহার করবে পবিত্র ফলমূল। দেবতা ও অতিথির পূজা করবে রোজ, বেদ অধ্যয়ন করবে। বারবেলা প্রাণী হিংসা, কলহ, হতে হবে ভয়শূন্য। ব্রত নষ্ট হয় তার যে ব্যক্তি বনে গমন করে কামাতুর হয়ে পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়, তাকে মাটিতে শুতে হবে, সাবিত্রী মন্ত্র জপ করবে। গৃহশূন্য হয়ে থাকবে। ধৈয্যশীল হয়ে গ্রীষ্ম উত্তাপে তপ্ত হবে, বর্ষায় বৃষ্টি ধারার মধ্যে দাঁড়াবে। হেমন্তে আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করবে, সংযমী হবে ফল-মূলের অভাব হলে ভিক্ষা করবে। ভিক্ষা না পেলে গ্রাম থেকে শাল পাতায় আনা খাবার এক গ্রাস মাত্র খাবে। ব্রাহ্মময় হয়ে অনশন ব্রত কিংবা অগ্নি প্রবেশরূপ মৃত্যুর উপায় অবলম্বন করবে।

.

সন্ন্যাস অবলম্বন করবে। সকল বস্তুতে বিতৃষ্ণা জন্মালে, জ্ঞানী সন্ন্যাসী যে সকল বস্তুতে আসক্তি রহিত। বেদ সন্ন্যাসী বলা হয় বিজিতেন্দ্রিয় মুক্তিকামীকে। যে অহিংসা ব্রহ্মচৌর্য, ক্ষমা, দয়া ও সন্তোষ ব্রত পালন করে তবে তা যোগীর কর্তব্য হবে। প্রত্যহ বেদমন্ত্র জলরূপ বেদাধ্যায়ন করতে হয়, গায়ত্রী জপ করতে হয়, উভয় সন্ধ্যায় পরমেশ্বরের ধ্যান করতে হয়। কমণ্ডলু ও ত্রিদণ্ড ধারণ করতে হয় এক বা দুই বস্ত্র পরিধান করে, পরম ব্রহ্ম লাভ হয় এসব করলে।

আশ্রম ধর্মে চিত্ত সমর্পণ করে সংযতাত্মা যোগীরা ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারা অথবা ফল-মূল দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে, সাত বাড়ি ভিক্ষা না পেলে আবার ভিক্ষা করবে। পাত্র ধুয়ে তাতে ভোজন করবে। নতুন পাত্রে প্রত্যহ ভক্ষণ করবে।

কামবশবত স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলিত হলে সান্তপণ প্রায়শ্চিত করতে হয়। ভিক্ষুদের ভিক্ষুর ভিক্ষা পাত্র ধরা উচিত না। শাস্ত্রে চুরির চেয়ে বড়ো অধর্ম নেই। চান্দ্রায়ন করবেন শাস্ত্রবিহিত বিধানানুসারে। পরম পদ প্রাপ্ত হবে সে যে নিজ আত্মাকে মহাদেব থেকে পৃথক দেখেন না।

.

ব্রাহ্মণ হিতের জন্য পাপ নাশের উপযোগী প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে। পাপ মুক্ত হয় প্রায়শ্চিত্ত করলে যে সজ্ঞানে টানা এক বছর পতিতের সঙ্গে এক যানে আরোহণ করে, শয্যায় উপবেশন করে সেও পতিত হয়, ব্রহ্ম হত্যাকারী যদি ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে নিষ্কৃতির জন্য, ব্রাহ্মণ বন্ধ, গোরুর কারণে প্রাণ ত্যাগ করে বা রোগগ্রস্থ ব্রাহ্মণকে রোগমুক্ত করে তবে ব্রহ্মহত্যা পাপ মুক্তি হয়। ব্রহ্মহত্যাকারী স্নান পূর্বক দেবতা ও পিতৃলোকের অর্চনা করলে পাপ মুক্ত হয়। এই পাপ থেকে মুক্তি হয় পিতৃলোকের তর্পণ করলে।

.

পাপবিনাশী পুণ্যকথা বলতে শুরু করলেন ব্রহ্মহত্যা প্রাণ নাশের জন্য পৃথিবীতে ব্রত প্রদর্শন করে সর্বদা ভিক্ষা করা ও দেব ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠা হয়।

কপর্দী বিশ্বেশ্বর বারাণসীতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মহত্যা হা হা শব্দে আর্তনাদ করে। ক্লিষ্ট হয়ে পাতালে প্রবেশ করে, যে জগৎকে অনিত্য বলে জেনে তীর্থে বাস করে সে পরমপদ লাভ করে।

অগ্নিবর্ণের সুরার দ্বারা শরীর দগ্ধ হলে পাপ মুক্ত হবে, কামাতুর হয়ে গুরুপত্নী গমন করলে লৌহস্ত্রী মূর্তি উত্তপ্ত করে আলিঙ্গন করবে। গুরুপত্নীগামী ব্যক্তি তিন বছর সর্বদা ব্রতী ও ব্রহ্মচারী হবে। অসতী স্ত্রী গমন করলে তিন রাত উপবাস করে শুদ্ধ হবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হত্যা করলে আট, ছয় ও তিন বছর ব্রহ্মহত্যা ব্রত করবে। ব্রাহ্মণকে যা তোক কিছু দান করবে, অস্থি যুক্ত প্রাণী বধ করলে চন্দ্রায়ন করবে বা পরাব্রত করবে গোহত্যা করলে।

.

চন্দ্রায়ন করলে শুদ্ধ হবে স্ত্রী হরণ, পুরুষ হরণ বা কূপে জল হরণ করলে, প্রজাপত্য করবে বিষ্ঠা, মূত্র, ও বীর্য ভক্ষণ করলেও, মহা সন্তাপন ব্রত করবে যে বাচ্চা মাংস খায়, ব্রাহ্মণ সুরা স্পর্শ করলে তিনবার প্রাণায়ম করে শুচি হবে। পেঁয়াজ ও রসুন ছুঁলে ঘৃত প্রাশন করলে শুচি হওয়া যায়। মানুষের অস্থি স্পর্শ করলে স্নান করে শুদ্ধ হবে।

পতিব্রতা স্ত্রীদের মাহাত্ম্য স্বরূপ রামায়ণ কাহিনি শ্রেয়। মহাদেব রাবণ বধের জন্যই সীতাকে সৃষ্টি করেন। সীতাকে রাম লক্ষণ রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করার পরও তাকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয় এবং অগ্নিতে দ্বগ্ধ হয়ে যখন সে ফিরে এলেন তখন রামকে অগ্নি বললেন–সীতা যে দেবীর প্রিয়া পতিব্রতা, সুশীলা, সে সেবাপরায়ণা, ইনি পাপ শূন্য।

পাপকারী মানুষ যদি পুণ্যতীর্থে নিজ দেহ পরিত্যাগ করে তবে সকল পাপ মুক্ত হয়। যে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানরূপ পরধর্ম স্থাপন করে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক ইহজগতে নেই।

.

রোমহর্ষণ বললেন, ব্রহ্মা প্রমুখ মুনিরা পুরাণে বিবিধ তীর্থের কথা বলেছন পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ তীর্থের নাম প্রয়াগ। যা সকল পাপ নাশক এখানে স্নান করে বিষ্ণু পূজা করলে ও তার পর ব্রাহ্মণদের পূজা করলে বিষ্ণু লোকপ্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা প্রমুখ দেবতারা যার সেবা করে সেই তীর্থের নাম হল সপ্ত গোদাবর। এখানে মহাদেবের পূজা করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। উৎপত্তি, বিনাশ রহিত তিন তত্ত্বই পরব্রহ্মে অবস্থিত, মার্কণ্ডেয় মুনি এই তীর্থেই ভক্তি সহ রুদ্রের আরধনা করেছিলেন। এখানে জ্ঞানবান ব্রাহ্মণকে সেবা করলে সকল পাপ মুক্ত হয়।

.

রুদ্রকোটি হল পরমেষ্ঠী রুদ্রের ত্রিভুবন বিখ্যাত ও পবিত্র তীর্থ। মহেশ একসময় কালকে হত্যা করেছিলেন। তাকে হত্যা করায় ব্রহ্মা রুদ্রের কাছে গিয়ে কালকে বাঁচাবার বর চাইলেন, ব্রহ্মা জানলেন : যে দেবই তাকে পাপ কাজে নিযুক্ত করেছিলেন তাই তার কোন দোষ নেই। মহেশ তখন কালকে বাঁচিয়ে দিলেন।

.

মহালয় তীর্থে ত্রিপুরারি রুদ্র নাস্তিকদের নিদর্শন রূপে শিলা তলে নাশ করেছিলেন। সেখানে স্নান করে মহাদেবের পূজা করলে গণপতি পদ লাভ করা যায়। মগধারণ্য তীর্থ স্বর্গলোক

প্রাপ্তি ঘটায়। শ্রীপর্বত হল তীর্থ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র তীর্থ। আর এক শ্রেষ্ঠ তীর্থ ব্রহ্মতীর্থ। উমাতুঙ্গ তীর্থ ও ভঙ্গতুঙ্গ তীর্থ আছে। যেসব নদী সমুদ্রে পড়েছে তারা আর সকল সমুদ্র বিশেষভাবে পুণ্যজনক যেখানে মহাতীর্থ আর দেবালয় সর্বদা উপস্থিত।

.

দেবদারু বনে দেবতা ও সিদ্ধরা বাস করেন। সেখানে পূর্বে হাজার হাজার মুনি স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে তপস্যা করেছিলেন।

ভগবান মহেশ নিজ মায়ায় জগৎ সৃষ্টি করে স্ত্রীবেশধারী হরির সাথে দেবদারু বনে বিচরণ করলেন, যে সব নারীরা মহাদেবের প্রতি মোহিত হল তারা পতিব্রতা বলে জ্ঞাত হল।

রুদ্রনারী ও কেশব পুত্রদের সেবিত করার জন্য মুনিরা ক্রুদ্ধ হল। তারা দণ্ড যষ্ঠি হাতে তাদের তাড়না করতে লাগলেন। মহাদেব তার লিঙ্গ স্খলন করলেন। পবিত্র অত্রি মুনির পত্নী অনুসয়া স্বপ্নে দেখলেন মহেশ নিজ তেজে বনকে উদ্দীপ্ত করছে। তখন মুনিরা ব্রহ্মাকে বললেন–এক সর্বাঙ্গ সুন্দরী ভার্যাকে নিয়ে এক উলঙ্গ পুরুষ দেবদারু বনে এসেছিল, তাদের তাঁরা বহু শাপ দেয় ও লিঙ্গ উৎপাটিত করেছেন।

ব্রহ্মা তখন তাদের মহাদেবের পরিচয় দিলেন। তখন মুনিরা ব্রহ্মার কাছে জানতে চাইলেন কিভাবে তারা আবার দেবের দর্শন পাবেন। ব্রহ্মা তাদের বললেন–কৃতঞ্জলি পুটে শূলপানির শরণাপন্ন হতে।

তারা কঠোর তপস্যা করলে ভগবান তাদের অনুগ্রহ করার জন্য জ্ঞান দান করলেন। এই রুদ্র মাহাত্ম্য পাঠ করে যে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।

.

যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে নর্মদার মাহাত্ম্য কথা শুনতে চাইলেন। মুনি বললেন–নর্মদা রুদ্রের দেহ থেকে নির্গত হয়েছে।

কমল তীর্থে গঙ্গা অতি পবিত্রা, কুরক্ষেত্রে সরস্বতী অতি পবিত্রা। এবং অরণ্য সর্বত্রই পবিত্রা। নর্মদার জল দর্শন করলেই পবিত্র হওয়া যায় রাজন, নিয়মানুসারে জিতেন্দ্রিয় হয়ে নর্মদায় স্নান ও একরাত্রি উপোস করলে শত কুল উদ্ধার হয়। শুদ্ধাচারী হয়ে যারা নর্মদায় প্রাণত্যাগ

করে তাদের পুণ্যফলের কথা মুনি বললেন। যে অপ্সরা আর দিব্যাঙ্গনাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এক লক্ষ বছর স্বর্গলোক সুখ ভোগ করে সে বিশেষ গন্ধে অনুলিপ্ত হয়ে সুখ ভোগ করে। যে ব্যক্তিকে সকল স্ত্রী লোক কামনা করে সে রাজরাজেশ্বর হয় ও সকল লোগ তার আয়ত্তে আসে।

নর্মদার দক্ষিণ কুলে অল্প দূরে অশ্বত্থ ও অর্জুন বৃক্ষে আচ্ছাদিত কপিলা মহানদ আছে। যা পবিত্র ও ত্রিলোক বিখ্যাত সেখানে একশো কোটির বেশি তীর্থ অবস্থিত নর্মদার জলের স্পর্শ পেয়ে পাপী পরম গতি লাভ করে। যে অমর কণ্টক পর্বতে প্রাণ ত্যাগ করে সে শতকোটি বর্ষের কিছু বেশি কাল রুদ্রলোকে বাস করে। কাবেরী নামে পাপনাশিনী বিখ্যাত নদী আছে তাতে স্নান করে মহাদেব বৃষকেতনের অর্চনা করবে। কাবেরী ও নর্মদার সঙ্গমে স্নান করলে রুদ্রলোক লাভ হয়।

.

শ্রেষ্ঠা ও সর্ব পাপ নাশিনী হল নর্মদা। নর্মদা উত্তরকুলে ভদ্রেশ্বর নামে শুভদায়ক পুণ্যতীর্থ আছে। সেখানে স্নান করলে মানুষ দেবসুখ প্রাপ্ত হয়। নর্মদায় শুক্লতীর্থের সমান আর কোন তীর্থ নেই। এই তীর্থক্ষেত্রে স্থিত বৃক্ষের অগ্রভাগ দর্শন করলে ব্রহ্মহত্যার পাপ নাশ হয়। মানুষ প্রথম বয়সে পাপ করে এই তীর্থে অহোরাত্র উপবাস করলে সকল পাপ নষ্ট হয়। এরপর ইল উত্তম সমতীর্থ। তারপর কেশ্বর তীর্থ ও তারপর নন্দী তীর্থ। এরপর আলবচ নামে শুভ তীর্থ। এখানে যে নিজ অস্থি নিক্ষেপ করে সে ইহলোকে ধনভোগ করে আর রূপবান হয়। এরপর গঙ্গেশ্বর তীর্থ। এখানে মানুষ কামনা নিয়ে স্নান করলে আজন্মকৃত পাপ মুক্ত হয়।

.

এরপরের শ্রেষ্ঠ তীর্থ হল ভৃগুতীর্থ, এই ক্ষেত্রে সকল পাপ নাশ করে। মানুষ উপবাস করে এই তীর্থে স্নান করলে কাঞ্চন বিমানে আরোহণ করে ব্রহ্মলোকে যায় ও পূজা পায়। এরপর হংস তীর্থ বরাহতীর্থ, পিতামহ তীর্থ, সবিত্রী তীর্থ, মনোহর তীর্থ, কল্প তীর্থ, স্বর্গ সঙ্গম তীর্থ। এরপর নর্মদা সাগরের সঙ্গম রূপে তীর্থে স্নান করলে মানুষ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। এরপর উত্তম অলকা তীর্থ। এখানে নিয়ম পালন করে ও পরিমিতাহারী হয়ে অহোরাত্র উপবাস করলে ব্রহ্মহত্যা পাপ মুক্ত হওয়া যায়।

তীর্থের সংখ্যা বিস্তৃত ভাবে বলা যায় না। পবিত্রা, বিপুল, ত্রিলোক বিখ্যাত ও মহাদেব প্রিয়া শ্রেষ্ঠা নদী নর্মদা এই বিষয়ে সংশয় নেই। নর্মদাকে মনে মনে স্মরণ করলে শত চান্দ্রায়নের বেশি ফল পাওয়া যায়। ঘোর নাস্তিক মানুষ ভয়ানক নরকে পতিত হয়। মহেশ্বর নর্মদাকে স্বয়ং নিত্য সেবা করে থাকেন।

.

ত্রিলোক বিখ্যাত নৈমিষ তীর্থ মহাদেবের খুবই প্রিয় এবং মহাপাতক নাশকারী। মহাদেবের দর্শনকারী মুনিরা এই তীর্থে তপস্যা করেছেন, মরিচী, অত্রি, বশিষ্ঠ, ক্রেতু, ভৃগু আর অঙ্গিরার বংশোদ্ভূত মহর্ষিরা

সূর্যাকালে সর্ব বরদাতা বিশ্বকর্তা চতুর্মূর্তি চতুর্মুখ কমলযোনি অব্যয় ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাকে প্রণাম করেন। অসংখ্য সিদ্ধ ও চারণগণ এখানে বাস করেন। এই নৈমিষ ক্ষেত্রে ভগবান শম্ভুর স্থান। এখানে পূর্বে সত্র উপাসনারত মহর্ষিদের কাছে ভগবান ব্রহ্মভাবিত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণটি বলেন। এখানে নর্মদা নদীর রুদ্রমন্ত্র জপ করেছিলেন ধর্মজ্ঞ ঋষি শিলাদ্ধ।

.

জাপেশ্বর তীর্থের কাছে সব পাপ নাশক অতি পবিত্র পঞ্চনদ নামক শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে। রুদ্রালোকে সম্মানিত হওয়া যায় এখানে ত্রিরাত্র উপবাস করে মহেশ্বরের পূজা করলে মহাপাপ নাশক নামক এক শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে অমিত তেজা শুক্রের মহাভৈরব নামে মানুষ ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। সেখানে দেহত্যাগ করলে রুদ্রলোকে যায় প্রাণ ত্যাগকারী ব্যক্তি। অতি গোপনীয় নকুলেশ্বর নামে বিখ্যাত একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে, সেখানে শ্রীমান ভগবান বাস করেন। এখানে দেবীর সাথে মহাদেব সর্বদা বিরাজ করেন। এখানে পূজা করলে ব্রহ্মহত্যা পাপ মুক্ত হওয়া যায়। চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমস্থলে পাপ নাশ হয়। কোটি অযুত তীর্থেরও বেশি ফলদায়ক। বারাণসী নামে দিব্যধাম এই সব প্রধান প্রধান তীর্থ মানুষের পাপহরা যে তীর্থ সেবা করে না, নিজ ধর্ম ত্যাগ করে, সে ইহলোক বা পরলোকে তীর্থ ফল লাভ করতে পারে না। ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে, পুত্রদের জীবন ঠিক করে দিয়ে, পুত্রদের ওপর স্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে তীর্থ সেবা করতে হয়। যে ব্যক্তি এই পাঠ ও শ্রবণ করে সে সব পাপ মুক্ত হয়।

.

পুরাণ শাস্ত্রে বলা আছে নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও অত্যন্তিক–এই চার রকম প্রলয়ের কথা। নিত্য প্রলয় হল ভূতের লয়। নৈমিত্তিক প্রলয় হল তিনলোকের প্রলয়। প্রাকৃত প্রলয় হল এটি তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার জন্য, যোগীরা যখন পরমাত্মায় লয় পান তখন হয় আত্যন্তিক প্রলয়। এ কথা কালচিন্তাপরায়ণ দ্বিজগণ বলেন।

প্রলয় কাল উপস্থিত হয় চার হাজার যুগ কেটে গেলে। প্রজাপতি তখন সকল প্রজাকে আত্মগত করতে চান। তারপর সকল ভূতের ক্ষয়কারী ও সকল জীবের ভয় উৎপাদক প্রবল অনাবৃষ্টি হয় একশো বছর ধরে। এরপর সূর্য ওঠেন, সাত রশ্মিকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করে সমস্ত রশ্মি চারা জল পান করেন। এই সময় তার তেজ কেউ সহ্য করতে পারে না। জল পান দ্বারা প্রদীপ্ত হয়ে সাত কিরণ সাত সূর্যের আকার পায়। তখন সাত কিরণ চারদিকের জল শুষে নিয়ে বহ্নির মতো চার লোককে দগ্ধ করতে থাকে। সমস্ত জগৎ সূর্যরশ্মির মালায় পূর্ণ হওয়ার জন্য অম্বরীয় অর্থাৎ ভাজবার খেলার মতো দেখায়। মাটিতে মিশে যায়। পাতাল আর মহাসমুদ্রে যে প্রাণীরা থাকে তারাও তখন সূর্যের আগুনে প্রনীল হয়। সমুদ্র, নদীতে ও পাতাল থেকে সব জল শুষে নিয়ে প্রদীপ্ত হয়ে অগ্নি পৃথিবীকে আশ্রয় করে জ্বলতে থাকে। পৃথিবীর আধোভাগ দগ্ধ করে তা ঊর্ধ্বদিকে আকাশ মণ্ডলকে দগ্ধ করতে প্রবৃত হয়। এই মহাবহ্নির শিখা অযুত যোজন উত্থিত হয়। ঘোর সংবর্তক মেঘসমূহ এই সময়ে বিদ্যুৎপুঞ্জেও অলকৃত হয়ে বিশাল হস্তীদের মতো গর্জন করতে করতে আকাশে আবির্ভূত হয়। এই মেঘগুলি সপ্ত সূর্যের অগ্নিকে শান্ত করে। অতিরিক্ত বর্ষণে অগ্নির বিনাশ হলে স্বয়ম্ভু প্রেরিত প্রলয়কালীন মেঘেরা বারি ধারায় জগৎকে পূর্ণ করে, সেই উপছে পয়ড়া জলে সমুদ্রের বেলাভূমির প্লাবিত হওয়ার মতো বিপুল বর্ষণে সকল জগৎ প্লাবিত হয়ে যায়। নিজেদের বেলাভূমিতে অতিক্রম করতে থাকে। তাতে সমগ্র পর্বত ও পৃথিবী জলমগ্ন হয়। স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হলে ভগবান জগৎপতি যোগনিদ্রা আশ্রয় করে ঘোরতর অর্ণবে শয়ন করেন। চার হাজার যুগ ব্যাপ্ত করে যে সময় তাকেই পণ্ডিতেরা কল্প বলেছেন। এমন চলেছে বরাহ কল্প বেদবিদ মুনিরা পুরাণে বলেছেন যে কল্প অসংখ্য এবং সে সবই ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মক। সাত্ত্বিক কল্প আছে সে সবেতেই বিষ্ণু মাহাত্ম্যই প্রধান। জগৎ একটি মাত্র সমুদ্রে পরিণত হলে একমাত্র মায়াময় তত্ত্ব অবলম্বন করে যোগনিদ্রায় মগ্ন হয়। মহেশ্বর নিদ্রার সময়ে সাত মহর্ষি জনলোকে বিদ্যমান থেকে যোগনেত্রে আমাকে দেখেন। তিনি আদিত্যবর্ণ ভুবনের রক্ষিভুক ও যোগমূর্তি, পুরুষ নারায়ণ যোগিরা যোগনিষ্ঠ হলে তবেই দেখতে পান, আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হলে তবেই তারা আমার এই রকম তত্ত্ব জানতে পারেন।

কূর্মদেবতা এবার প্রাকৃত প্রলয়ের কথা বললেন। ব্রহ্মার পরমায়ুর পূবাধ ও পরার্ধ কেটে গেলে সকল লোকের লয়কারী কালাগ্নি জগৎকে ভস্মসাৎ করতে প্রবৃত্ত হন। ভগবান সৌরমণ্ডলে প্রবেশ করে তাকে নানা রূপ ধারণ করেন এক সূর্য রূপ ধারণ করে লোক দগ্ধ করেন। বেদজ্ঞরা বলেছেন, সকল দেবতা দগ্ধ হয়ে গেলে কেবল দেবী পার্বতী সাক্ষী রূপে শম্ভুর কাছে বর্তমান থাকে। দেবী পতির পরম সঙ্গময় নৃত্যের অমৃত পান করে যোগ অবলম্বন পূর্বক দেব ত্রিশূলীর দেহে প্রবেশ করেন। ভগবান স্বেচ্ছায় নৃত্য পরিত্যাগ করে নিজ ভাবে ফিরে আসেন।

এভাবে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বিনষ্ট হলে পৃথিবী সকল গুণের সঙ্গে জলে বিলয় প্রাপ্ত হয়। জল নিজের গুণ নিয়ে অগ্নিতে লয় প্রাপ্ত হয়, অগ্নির কাছে বর্ণনা করা হয় কূর্মপুরাণ বলেছেন স্বয়ং কূর্মরূপী গদাধর। প্রজাপতিদের সৃষ্টি বর্ণ, ধর্ম, বর্ণের জীবিকা ধর্ম অর্থ, কাম মোক্ষের যথাবিধি লক্ষণ বলা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের একত্ব, পৃথকত্ব, তাদের বৈশিষ্ট ভক্তের লক্ষণ ও অনুষ্ঠান যোগ্য আচারের কথা বলা হয়েছে এবং বর্ণাশ্রমের লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে আদি সৃষ্টি, তারপর অন্তের মহৎ তত্ত্ব প্রভৃতি সাত আচরণের কথা ও হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টির কথা। কাল সংখ্যা, ঈশ্বর মাহাত্ম ব্রহ্মার জলে শয়ান ভগবানের নাম নির্বাচন, বিষ্ণু, বরাহমূর্তি ধারণ করে পৃথিবীর উদ্ধার সাধন, প্রথমে মুখ্য প্রভৃতি স্বর্গ তারপর মুনিস্বর্গ রুদ্রস্বর্গ, তাপস ঋষি, স্বর্গ এবং তামস স্বর্গের আগে ধর্মের প্রজা সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরস্পরের দেহ মধ্যে প্রবেশ ও ব্রহ্মা বিষ্ণুর বিবাহ পদ্ম থেকে ব্রহ্মর উৎপত্তি, ধীমান ব্রহ্মার মোহ ও মহেশ্বর দর্শন মহেশ্বরের কীর্তি ও মহাত্ম। বিষ্ণুর দ্বারা দিব্য দৃষ্টি প্রদান পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে তার কৃত দেবদেবের স্তব মহাদেবের প্রসাদ ও বরদান, বিষ্ণুর সঙ্গে শঙ্করের কথোপকথন, পিনাকীর বরদান ও অন্তর্ধান বর্ণিত হয়েছে। দেব মহেশ্বরের অন্তর্ধান, অন্ত থেকে জাত ব্রহ্মার তপস্যা, ও দেবদেবের দর্শন, মহাদেবের অর্ধনারীশ্বর রূপ, দেবীর সঙ্গে পিনাকীর বিভাগ ও দেবীর দক্ষকন্যারূপে উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। মুনিরা দেবীর হিমালয় কন্যারূপে জন্মগ্রহণ ও দেবী মাহাত্ম্য, মাতা ও পিতার দ্বারা দেবীর দিব্য ও বিশ্বরূপ দর্শন, দেবীর সহস্রনামে কথন, পিতা হিমালয়ের দ্বারা দেবীর উপদেশ ও বরদান বর্ণিত হয়েছে। হিমালয়ের প্রতি ভৃগু প্রভৃতির প্রজাসৃষ্টি ও রাজবংশ বিস্তার, প্রচেতাদের পুত্র রূপে দক্ষের জন্ম, দক্ষ যজ্ঞ নাশ, দধীচী ও দক্ষের শাপ সবকিছুর কথা বলা হয়েছে। রুদ্রের আগমন দক্ষের গৃহে প্রসন্নতা পিনাকীর অন্তর্ধান, এবং রক্ষণের জন্য দক্ষের প্রতি পিতামহের উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে অনন্তর দক্ষের প্রজাসৃষ্টি, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের নিধন, দেবদারু বনে বাসকারী মুনিদের প্রতি গৌতম ঋষির অভিশাপ। এরপর কথিত হয়েছে কালাগ্নি রুদ্রের দ্বারা অন্ধকের নিগ্রহ ও তাকে শ্রেষ্ঠ দানপত্য পদে নিয়োগ। বিষ্ণুর দ্বারা

প্রহ্লাদের নিগ্রহ, বলিবন্ধন, বামনের দ্বারা বানাসুরের নিগ্রহ, মহাদেবের দ্বারা শিবের প্রসন্নতা বর্ণিত হয়েছে তার প্রতি। তার পরে ঋষি বংশবিস্তার, রাজবংশ বিস্তার, বসুদেব থেকে ভগবান বিষ্ণুর স্বেচ্ছায় উৎপত্তি, কীর্তিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা উপমন্যুর দর্শন, তার উপদেশ, তপশ্চরণ, ত্রিলোচন মহাদেবের সাক্ষাৎ লাভ, জগদম্বার সঙ্গে বর লাভ। তাদের কাছে শার্ঙ্গধন্বা কৃষ্ণের কৈলাসে গমন, কৈলাসে বাস, দ্বারবতী নিবাসীদের ভয়, দ্বারবতীর রক্ষণ, মহাবল শত্রু দেব পরাজিত করে গরুড়ের দ্বারা–এসব কথাও বলা হয়েছে।

নারদের দ্বারকায় আগমন। গরুড়ের কৈলাস যাত্রা, কৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন, মুনিদের আগমন, বাসুদেবের নৈতিক বর্ণ ও শিবলিঙ্গের পূজা এবং মার্কণ্ডেয়র প্রশ্ন বর্ণিত হয়েছে। তারপর মার্কণ্ডেয়র প্রতি শ্রীকৃষ্ণের লিঙ্গার্চানার জন্য লিঙ্গী ও লিঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণনা, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর লিঙ্গ থেকে ভয় ও মোহ লিঙ্গের সীমা জানাবার জন্য ব্রহ্মার ঊর্ধ্ব গমন ও বিষ্ণুর নিম্নভাগে গমন, ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণুর দ্বারা মহাদেবের স্তব ও তাদের প্রতি ভগবানের প্রশ্ন এবং লিঙ্গের অন্তর্ধানের কথা বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণগণ, তারপর সম্বর উৎপত্তি অনিরুদ্ধর উৎপত্তি, কৃষ্ণের নিজ স্থানে গমনের ইচ্ছা, ঋষিদের দ্বারকায় আগমন ও তাদের প্রতি কৃষ্ণের অনুশাসন এবং মহাত্মদের প্রতি বরদান কীর্তিত হয়েছে। কৃষ্ণের পরম স্থানে গমন অর্জুনের কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ দর্শন, তার দ্বারা কথিত সনাতন যুগ ধর্মগুলির কথা এবং পার্থের প্রতি ব্যাসের অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে। বারাণসীতে পরাশর তনয়, অদ্ভুত কালরূপী ব্যাসের গমন, বারাণসী মাহাত্ম্য ও তীর্থ বর্ণনা, ব্যাসের তীর্থ যাত্রা, দেবী দর্শন, দেবীর দ্বারা বারাণসী থেকে ব্যাসের বাসস্থানের উচ্ছেদ, ব্যাসের প্রতি দেবীর বরদান এ কথাও বলা হয়েছে। যুধিষ্ঠিরের কাছে মার্কণ্ডেয় সেখানে স্থিত পুণ্যক্ষেত্রের বর্ণনা, তীর্থফল বর্ণনা এবং বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় প্রস্থানের কথা।

তারপর ভূবন স্বরূপ, গ্রহসন্নিবেশ, বর্ষ ও নদীর নির্ণয়। পর্বত সংস্থান, দেব বাসস্থান, দ্বীপ সমূহের বিভাগ শ্বেত দ্বীপের বর্ণনা, কেশবের শয়ন। অনন্ত শয্যার ভগবানের মাহাত্ম্য মনুদেব অধিকার, বিষ্ণুর মাহাত্ম্য এ সবও বলা হয়েছে। শ্রেষ্ঠ মুনিগণ বেদশাখা প্রণয়ন বৈবস্বত মনুর অধিকারে আটাশটি যুগে আটাশজন ব্যাসের বৃত্তান্ত কথিত হয়েছে ঈশ্বরের নানা গোপনীয় গীতা কীর্তিত হয়েছে, তারপর বর্ণাশ্রমের আচার প্রায়শ্চিত্য বিধি সেই প্রসঙ্গে রুদরের কাঁপালী হওয়ার বৃত্তান্ত ও তার ভিক্ষাচরণ পতিব্রতার কথা। তীর্থের নির্ণয় ও মহাদেবের দ্বারা মঙ্কনক মুনির নিগ্রহ কথিত হয়েছে সংক্ষেপে বলা হয়েছে শম্ভুর দ্বারা কালের নিধনের কথা তারপর যথাক্রমে বলা হয়েছে নৈমিত্তিক প্রলয় প্রাকৃত প্রলয় ও সবীজ যোগের বিষয় বস্তু এভাবে সংক্ষেপে জেনে যে ব্যক্তি পাঠ করে সে সব পাপ মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে বাস করে। নৈমিত্তিক

প্রলয়, প্রাকৃত প্রলয় ও সবীজ যোগের কথা বলা হয়েছে। কূর্ম পুরাণের বিষয়বস্তু এভাবে সংক্ষেপে জেনে যে ব্যক্তি এটি পাঠ করে সে সর্বপাপামুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে বাস করে।

ভগবান পুরুষোত্তম কূর্মরূপ ত্যাগ করে দেবী কমলাকে নিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন। সকল দেবতা আর মুনিরা পুরুষোত্তম দেবকে প্রণাম করে অমৃত গ্রহণ পূর্বক নিজ নিজ স্থানে ফিরলেন। ভগবান বিষ্ণু নিজে বলছেন, এই শ্রেষ্ঠ পুরাণ দেবদিদেব বিষ্ণুর উৎপত্তি স্থান, যে নিয়ম যুক্ত হয়ে ভক্তি সহকারে নিয়মিত পুরাণ পাঠ করে সে সকল পাপ মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে বাস করে। এই পুরাণ যে ব্যক্তি বৈশাখ বা কার্তিক মাসে লিপিবদ্ধ করে বেদবিদ ব্রাহ্মণকে দান করে তার পুণ্য কাহিনি হল– সেইসকল মানুষ পাপ মুক্ত ও সকল ঐশ্বর্য মণ্ডিত হয়ে মানুষ স্বর্গে মনোরম বিপুল সুখ অনুভব করে থাকে। তারপর স্বর্গভোগ শেষ হয়ে গেলে ঐ ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করে ও পূর্বের সংস্কার বশতঃ জ্ঞান লাভ করে সকল পাপ মুক্ত হয়। এই পুরাণের এক অধ্যায় পাঠ করলে তার পরম পাদলাভ করে, যে সম্যক ভাবে এর অর্থ বিচার করতে পারে যে ব্রাহ্মণগণ, মহাপাতকনাশী এই পবিত্র পুরাণ প্রতি পর্বদিকে ব্রাহ্মণদের পাঠ করা ও শ্রবণ করা উচিত। একদিকে সমস্ত পুরাণ আর ইতিহাস এবং অন্যদিকে কেবল এই কূর্মপুরাণ রাখলে এই কূর্মপূরাণের দিকটিই বেশি ভারী হয়। পুরাণ ছাড়া অন্য সাধন নেই। ধর্মনৈপুণ্যকামী এবং জ্ঞানা নৈপুণ্যকামী এই দু'প্রকার ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোন পুরাণে ভগবান নারায়ণ বিষ্ণুর কথা সেভাবে কীর্তন করা হয়েছে।

এই পৌরাণিক ব্রাহ্মী সংহিতা সর্বপাপনাশিনী কারণ এই সংহিতায় পর ব্রহ্মের কথা যথার্থ ভাবে বলা হয়েছে। এই ব্রাহ্মী সংহিতা তীর্থের মধ্যে পরম তীর্থ, তপস্যার মধ্যে পরম তপস্যা, জ্ঞানের মধ্যে পরম জ্ঞান ও ব্রতের মধ্যে পরমব্রত, এই শাস্ত্র পাঠ করা উচিত নয়। শূদ্রের সে বাহুকে নরকে গমন যে এইটি মোহগ্রস্থ হয়ে পাঠ করে। এটি শ্রবণ করবেন শ্রাদ্ধে বা দেবকার্যে দ্বিজগণ নিমন্ত্রিত ও ব্রাহ্মণদের যজ্ঞশেষেও এই সর্বদোষ নাশক শাস্ত্র শ্রবণ করানো উচিত। এই শাস্ত্র জেনে ব্যক্তি ভক্তিমান ব্রাহ্মণদের বিধানানুসারে শ্রবণ করান সে সকল পাপ মুক্ত হয়ে ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করেন। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধারহিত বা অধার্মিক পুরুষকে এই শাস্ত্র শ্রবণ করায়, সে পরলোকে নরকে যায়, তারপর পৃথিবীতে কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করে। জগৎযোনি সনাতন বিষ্ণু, হলি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নমস্কার করে এই পুরাণ শাস্ত্র অধ্যায়ন করতে হয়। এ হল অমিততেজি দেবদেব বিষ্ণুর আদেশ। পরাশর তনয় মহাত্মা ব্যাসেরও এই আদেশ। ভগবান নারদ ঋষি নারায়ণের মুখে এই পুরাণ শ্রবণ করে গৌতমকে দান করেছিলেন। গৌতমের কাছ থেকে এটি পরাশর পেয়েছিলেন। মুনিগণ, ভগবান পরাশর ধর্ম-অর্থ-কাম-ও মোক্ষ প্রদায়ক এই পুরাণ গঙ্গাদ্বারে মুনিদের কাছে বলেছিলেন।

ব্রহ্মা আপনি, সনক ও সনৎকুমারের কাছে বলেছিলেন সর্ব পাপনাশক পুরাণ সনকের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ যোগবিদ ভগবান দেবল মুনি আর দেবল মুনির কাছ থেকে এই শ্রেষ্ঠ পুরাণ পঞ্চাশতম মুনি জেনেছিলেন। সনৎকুমারের কাছ থেকে সত্যবতী পুত্র ভগবান বেদব্যাস মুনি ও সবার্থ সংগ্রহরূপ পরম পুরাণ লাভ করেছিলেন পরে বেদব্যাসর কাছে শ্রবণ করে এই পাপনাশক পুরাণ কীর্তন করলাম এই পুরান ধার্মিক বাক্তির কাছে প্রকাশ করবেন। নারায়ণাত্মা সমগুণের আস্পদ পরাশরনন্দন, সর্বজ্ঞ, মহর্ষি গুরু বেদব্যাসকে প্রণাম, যার থেকে সমগ্র জগতের উৎপত্তি যার মধ্যে সকল জগৎ বিলীন হয়ে যায়, সেই কূর্মরূপী পরমেশ্বর বিষ্ণুকেও প্রণাম।

নারদীয় পুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ

উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

অষ্টাদশ পুরাণের দুটি সাত্ত্বিক পুরাণ এর মধ্যে নারদীয় পুরাণ একটি। নৈমিষারণ্যে কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন শৌণকাদি মুণিগণ। তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল মুক্তি। সকল মুনিই ছিলেন জিতেন্দ্রিয়। ঈর্ষা অহঙ্কার এবং কামসেই মুনিরা ছিলেন প্রায় ছয় হাজার জন। । (ক্রোধশূন্য)- শৌণকাদি মুনিগণ লোমহর্ষণ সূত মুনিকে নারদীয় পুরাণ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি তাদের সবিস্তারে এই পুরাণটি বর্ণনা করেন। এই পুরাণে শ্রীহরির এবং শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বর্ণিত। একাদশী ব্রতকথা, দেবমালীর উপাখ্যান, যজ্ঞমালী ও সুমালীর উপাখ্যান, নানাবিধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, মোক্ষের উপায় প্রভৃতি বিভিন্ন কাহিনির মাধ্যমে হরিভক্তির কথাই বারবার সূচিত হয়েছে এই মহাপুরাণে।

মহামুনি মৃকুণ্ডের তপস্যা

প্রলয়কাল উপস্থিত হলে শ্রীহরি ছাড়া তখন আর কিছুর অস্তিত্ব থাকেনা। শ্রীহরির দয়াতেই সকলের আত্মা লীন হয়ে যায়। এ কথা সবাই জানে। কিন্তু মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের ব্যাপার আলাদা। কল্পকালে তার জন্ম হয় না, প্রলয়কালেও তার বিনাশ নেই। এই কথা শুনে শৌনকাদি মুনিগণ বিস্ময় প্রকাশ করলে তার উত্তরে মহর্ষি লোমহর্ষণ বললেন–মৃকণ্ডু নামে একজন মহা তপোধন শালগ্রামক্ষেত্রে গিয়ে অনাহারে ও অনিদ্রায় কঠোর তপস্যা করেন। এক এক করে দশ হাজার বছর কেটে গেল। ক্ষমাশীল, শান্ত, বিনীত, দয়াবান, মহাশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, মৃকুণ্ডুমুনি এত বছর তপস্যা করেও সিদ্ধিলাভ করতে পারলেন না। ইন্দ্রাদি তাঁর এই কঠোর তপস্যা দেখে ভয়ে ভীত হয়ে শ্রীহরির শরণাপন্ন হলেন। উত্তর ক্ষীরোদ সাগরে দেবতাদের স্তবে জাগ্রত হলেন শ্রীহরি। তিনি বললেন–তোমরা অযথা ভয়ে ভীত হচ্ছ। যে কারণে মৃকুণ্ডু মুনি তপস্যা করছেন, তাতে তোমাদের সুখে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না, তোমরা নিশ্চিন্তে থাক। প্রকৃত সজ্জন যাঁরা, তারা কখনই অন্যের সুখের অন্তরায় হন না, তোমরা নির্ভয়ে গমন কর।

এই কথা বলে শ্রীহরি অদৃশ্য হলেন। দেবতারা শ্রীহরিকে প্রণাম জানিয়ে দেবলোকে ফিরে গেলেন।

এদিকে মৃকুণ্ডু মুনির তপস্যায় তুষ্ট হয়ে সেখানে নারায়ণ এলেন। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানকে দেখে আনন্দে মুনিবর প্রণাম জানিয়ে বহু স্তবস্তুতি করলেন।

শ্রীহরি মৃকুণ্ডুর স্তুতিতে খুশি হয়ে তাকে আলিঙ্গন করে জানতে চাইলেন যে ঋষি কি বর প্রার্থনা করছে।

শ্রীহরির চরণতলে পতিত হয়ে ঋষি বললেন–আমি কৃতার্থ হলাম। আমার জীবন সফল হল। স্বল্প পুণ্যে আমি যে তোমার দেখা পেলাম এর থেকে সৌভাগ্যের আর কি আছে। তোমার পাদপদ্মে আমি কোটি কোটি নমস্কার জানাই।

শ্রীহরি ঋষির স্তুতিতে প্রীত হয়ে বললেন–তোমার বাক্যে আমি তুষ্ট। আমার দর্শন কখনো বিফল হবেনা, আমি তোমার পুত্ররূপে জন্ম নেব। দীর্ঘজীবী হবে সে পুত্র।

এই কথা বলে মৃকুণ্ডুর মাথায় হাত দিয়ে শ্রীহরি অদৃশ্য হলেন। বর লাভ করে মৃকুণ্ডু মুনি নিজের গৃহে ফিরলেন। শ্রীহরির আরাধনায় তিনি মগ্ন হলেন। এই ভাবে কিছুদিন কেটে যাবার পর একদিন তার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল। তার নাম দিলেন মার্কণ্ডেয়। হরিকে তুষ্ট করতে শান্ত, বিনীত, জ্ঞানী মার্কণ্ডেয় বনে গেলেন তপস্যা করতে। দীর্ঘকাল তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শ্রীহরি তাঁকে চিরজীবী হওয়ার বর দিলেন।

তারপর বিশ্ব যখন জলে মগ্ন হল স্থাবর জঙ্গম বলে কিছুই থাকলনা তখনও সেই জলের ওপর মার্কণ্ডেয় ভাসতে লাগলেন। প্রলয়কালব্যাপী হরি শয়ন করে থাকেন। মার্কণ্ডেয় তেমন থাকেন।

তিনশ পঁয়ষট্টি দিনে যখন মানবের এক বছর হয়, তখন দেবতাদের সেই সময় হয় এক দিনরাত্রি। এই পরিমাণ হাজার বছরে দিনে এক দৈববর্ষ। এইভাবে এক দিব্যযুগ হয় বারো হাজার বছরে। সত্যযুগের বয়স ১৭, ১৮,০০০ বছর, দ্বাপর যুগের বয়স ৮,৬৪,০০০ বছর, ত্রেতাযুগের বয়স ১২, ৯৬,০০০ বছর, এবার কলিযুগের ৪,৩২,০০০ বছর। এই চার যুগ একসাথে এক দিব্যযুগ হয়। এইভাবে এক হাজার দিব্যযুগে ব্রহ্মার একদিন হয়। তাকেই এক কল্প।

সকল জীবের সৃষ্টি হয় বহ্মার দিবসকালে, আবার সমান সময় ব্রহ্মার রাত্রিতে প্রলয় হয়। প্রলয় সবকিছু বিনষ্ট হলেও মার্কণ্ডেয় ঋষি জলের ওপর শয়ন করে থাকেন। আবার প্রলয়কাল শেষে ব্রহ্মা জাগ্রত হয়ে সৃষ্টি কাজে মন দেন, আর মার্কণ্ডেয় ঋষি নিদ্রাত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে শ্রীহরির চরণাপন্ন বন্দনা করে স্তুতি করলেন।

মার্কণ্ডেয় মুনির স্তব শুনে শ্রীপরি বললেন–যাঁরা হরিভক্ত হয়, তাদের উপর আমি সদাই সন্তুষ্ট থাকি। সকলের কাছে আমি প্রচ্ছন্ন থাকলেও, আমি কিন্তু ভক্তগণকে সবসময় রক্ষা করি।

ভদ্রশীলের কাহিনি

ভদ্রশীল ছিলেন গালব ঋষির পুত্র। শিশুকাল থেকেই ভদ্রশীল ছিলেন হরি-পরায়ণ। খেলাচ্ছলে তিনি মাটি দিয়ে বিষ্ণু মূর্তি গড়ে নানা রকম ফুল দিয়ে পূজা করে প্রার্থনা করতেন–হে নারায়ণ, তুমি সকলের মঙ্গল কর। গালব মুনি পুত্রের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন-তোমার এই পূজা দেখে আমি অবাক হয়েছি। তুমি যে নারায়ণের নিত্য পূজা কর, এসব কে শেখাল তোমাকে?

মুনির প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রশীল বলল–বাবা, পূর্বজন্মের কথা আমার সব মনে আছে। ধর্মরাজের কাছে আমি সব কিছু জেনেছি।

পুত্রে কথায় গালব মুনি অবাক হয়ে ভাবলেন, এইটুকু ছেলে, জাতিস্মর হয়ে পূর্বজন্মের কথা সব মনে রেখেছে। তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন-বল বৎস পূর্বজন্মে তুমি কে ছিলে?

ভদ্রশীল বলল-পূর্বজন্মে আমার চন্দ্রবংশে জন্ম হয়েছিল। আমার নাম বর্চকীর্তি। আমি ছিলাম সসাগর পৃথিবীর রাজা। এক লক্ষ বছর রাজত্বকালে আমি বহু ধর্ম ও অধর্মের কাজ করেছি। সেই পাপ কাজের ফলে আমার সব পুণ্য ক্ষয় হয়ে গেল, ক্রমে ক্রমে বেদমার্গ ত্যাগ করে, সকল যজ্ঞ নষ্ট করলাম। প্রজারাও আমার দুষ্কর্ম দেখে পাপ কাজে মেতে উঠল।

একদিন বহু সৈন্য সঙ্গে নিয়ে আমি বনে যাই মৃগয়ার জন্য। একসময় সৈন্যদের কাছ থেকে আমি বহু দূরে চলে গিয়েছিলাম। আমি তখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। ঘুরতে ঘুরতে নর্মদা নদীর তীরে ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের ছায়ায় এসে বসলাম। এরপর ক্রমশঃ অনুকার সমীভূত হল, সেই নির্জন অরণ্যে রাতে গম্ভীর হল। হঠাৎ এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম। একাদশী ব্রতের জন্য অনেক লোক এসে সেখানে জড়ো হল এবং তারা সরারাত জেগে রইল। আমিও তাদের সঙ্গে জেগে রইলাম। সারাদিনের পরিশ্রমের ফলে ক্লান্ত ছিলাম, সারাদিন কোন আহারও জোটেনি, ক্ষুধায় কাতর থাকলেও সারারাত্রি জেগে কাটালাম। ফলে অতি দুর্বলতার কারণে প্রাণবায়ু নির্গত হল।

হে পিতা, এর পরের আশ্চর্য ঘটনা শোন। তারপর বিশাল দাঁতওয়ালা, যমদূতেরা এসে ভীষণ কাঁটাযুক্ত পথে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়ে নিয়ে চলল যমপুরীতে। চিত্রগুপ্ত তার খাতা খুলে আমাকে আমার পাপ-পুণ্যের হিসাব দেখালেন।

চিত্রগুপ্ত বললেন–এই ভদ্রশীল অনেক পাপকর্ম করে মহাপাপী ছিল। কিন্তু একাদশী তিথিতে অনাহারে অনিদ্রায় থাকার জন্য এবং বিশেষ করে নর্মদা নদীর তীরে মৃত্যুর কারণে এর সকল পাপ খণ্ডন হয়েছে।

চিত্রগুপ্তর কথা শুনে যমরাজ আমাকে প্রণাম জানিয়ে দূতদের বললেন–পৃথিবীর যাঁরা ধার্মিক হবেন, যাঁরা একাদশী ব্রত করবেন, আমার এখানে তাদেরকে আনবে না, শ্রীহরির চরণতলে তারা ঠাঁই পাবেন। শ্রীহরির স্মরণ নেবার জন্য যারা শিক্ষা দেন তারা শুদ্ধচরিত্র। তাদের ওপর আমার কোনও অধিকার নেই। যাঁরা গুরুর সেবা করেন, নিজ ধর্ম পালন করেন, হরিকথা শোনেন, তাদের কাছে কখনো তোমরা যাবে না।

যাঁরা একাদশী ব্রত, জন্মাষ্টমী ব্রত পালন করে না, যারা অপরের নিন্দা করে, সাধুর দোষ দেখে, ব্রাহ্মণের সম্পদ হরণ করে তাদেরকেই বহু কষ্ট দিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসবে। হে পিতা, যমরাজের এমন কথা শুনে আমি অনুতাপে দগ্ধ হলাম। তাতেই আমার সব পাপ ক্ষয় হয়ে গেল। আমার দেহটি তখন শ্রীহরির পদযুগলের মত সুন্দর হয়ে গেল, আমার দেহ থেকে জ্যোতি বেরুতে লাগল।

তাই দেখে যমরাজ আমাকে প্রণাম করে নানান স্তুতি করলেন।

যমরাজ আমাকে এইভাবে সম্মান দেখানোর জন্য, যমদূতেরা অবাক হয়ে গেল।

তারপর ধর্মরাজ আমাকে বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে বহু কল্পকাল সুখে বাস করলাম। তারপর দীর্ঘকাল ইন্দ্রলোকে বাস করে, শেষে আপনার পুত্র রূপে জন্মালাম। হরির কৃপায় আমি জাতিস্মর হলাম, পূর্বকথা আমার সব মনে পড়ল। হে পিতা, এই কারণেই আমি শ্রীহরির পূজা করি আর একাদশী ব্রতও পালন করি।

পুত্রের কথা শুনে গালব ঋষি বললেন–হরিভক্তিপরায়ণ পুত্র লাভ করে আমি ধন্য, আমার বংশও পবিত্র হল।

দেবমালির সাধনায় সিদ্ধিলাভ

বেদমালি নামে একজন শ্রীহরির পূজক ব্রাহ্মণ ছিলেন, যিনি নিকৃষ্ট দান গ্রহণ করতেন ও কেনাবেচাও করতেন। যজ্ঞমালী সব সময় তার চিন্তা ছিল, যেমন করেই হোক অর্থ অর্জন করতে হবে। ক্রমে যজ্ঞমালি ও সুমালি নামে তার দুই পুত্র জন্মাল। পিতা দুজনকেই স্নেহ করেন।

একদিন মনে মনে বেদমালি ভাবলেন আমি তো জীবনে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছি,একবার সেগুলি গুণে দেখা দরকার। তিনি গোপনে সেই অর্থ গুণতে লাগলেন, কিন্তু গুণে যেন শেষ হয়না। আবার মনে মনে ভাবলেন বহু অন্যায় দান আমি গ্রহণ করেছি। জপ তপ ও নিষিদ্ধ জিনিস বিক্রি করেছি। এত সম্পদ তো পেলাম কিন্তু শান্তি তো পেলাম না। এত ধন সঞ্চয় তো করলাম তবু ধন সঞ্চয়ের নেশা তো আমার একটুও কমল না। ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের কোন কাজই করা হল না। যা সঞ্চিত ধন আছে তা দুই ছেলের পক্ষে যথেষ্ট। খুব সুখেই দিন কেটে যাবে ওদের। আর না, এবার অন্যায়ভাবে আর ধন সঞ্চয় করব না।

এই প্রকার নানা কথা চিন্তা করে একদিন দেবমালি দুই ছেলেকে ডেকে তার সমস্ত অর্থ চারভাগ করে দুভাগ নিজের কাছে রাখলেন আর দু’ভাগ দুই ছেলেকে দিলেন। অন্যায়ভাবে আর কোনও দান তিনি গ্রহণ করতেন না। যেসব মাদক দ্রব্য বিক্রি করতেন, তাও বন্ধ করে দিলেন, ধীরে ধীরে তার মন থেকে লোভ দূর হয়ে গেল।

তারপর ধর্মকর্মে মন দিলেন। দেবমন্দির নির্মাণ ও জলাশয় খনন করার জন্য তিনি অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন। দীন দুঃখীদের সাহায্য করলেন। এইভাবে পুণ্য কাজে তার সঞ্চিত ধন ব্যয় করলেন। পরে বাণপ্রস্থ আশ্রম পালন করার জন্য তিনি বনে চলে গেলেন। বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়ে তিনি একটি পোবন দেখতে পেলেন। তার মাঝে একটি বেদীতে একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন। চারপাশে অনেক যুবক ব্রহ্মচারী বসে তার কথা এক মনে শুনছেন তার নাম জ্ঞানঅস্তি।

দেবমালি এগিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীকে প্রণাম জানালেন। সেই সন্ন্যাসী তার দিকে তাকাতে দেবমালি সাহস করে এগিয়ে গিয়ে তাঁর চরণে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম জানালেন। তখন সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে দেবমালিকে আলিঙ্গন করলেন। তার পবিত্র শীতল স্পর্শে দেবমালির মনে হল তার সারা জীবনের জ্বালা এক মুহূর্তেই জুড়িয়ে গেল,মন আনন্দে ভরে উঠল।

হঠাৎ সন্ন্যাসী দেবমালিকে বললেন–মুখ দেখে মনে হচ্ছে সারাদিন তোমার কিছু খাওয়া হয়নি। আগে কিছু আহার্য সেবন কর, তারপর যে জন্য এসেছ, তা শুনব।

সন্ন্যাসীর কথায় তার শিষ্যরা দেবমালির সেবার ব্যবস্থা করল। ফলমূল জল খেয়ে বেশ তৃপ্তি লাভ করল দেবমালি।

তারপর সেই সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে প্রণাম করে বলল–সারাজীবন ধরে নানাভাবে আমি রোজগার করেছি। কোনো ভালো-মন্দ বিচার করিনি। কিন্তু মোহ যাচ্ছে না দেখে গভীর চিন্তায় সঞ্চিত অর্থের অর্ধেক দুই ছেলেকে দিয়ে বাকি অর্ধেক ধর্মকাজে ব্যয় করে সংসার ছেড়ে বনে চলে এসেছি। ঈশ্বরের করুণায় আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল।

মৃদু হেসে সন্ন্যাসী বললেন–সংসারে সুখ-দুঃখ দুই আছে। সংসারের মাঝে আসল জিনিসটি কি সেটা জানতে হবে। তার সন্ধান পেয়ে জোর করে তাকে ধরতে পারলেই হল। সুখ আপনা থেকেই আসবে। কিন্তু সবাই জানতে পারে না সেই আসলকে। তাই দুঃখের সাগরে ভাসে।

এই সংসারে বিষ্ণুর আরাধনাই হল আসল। তারই ইচ্ছায় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রভৃতি হয়। কিন্তু তিনি থেকেও নেই। কারণ সবার দৃষ্টিগোচরে তিনি আসেন না। দেবমালি তুমি হরি-সাধনা করলে তোমার মনের সকল জ্বালা দূর হবে।

জানন্তিকে গুরুদেব রূপে বরণ করে দেবমালি হরি সাধনায় বসলেন। বেশ কিছুদিন কেটে গেল হরিসাধনা করে। এখন মন শান্ত। কোনো লোভ, মায়া, মমতা, বিষয়-তৃষ্ণা কিছুই নেই। মনে চরম প্রশান্তি।

শ্রীহরিকে পাবার চিন্তার দেবমালির মন ব্যাকুল হল। একদিন ধ্যানে বসে শ্রীহরির রূপ চিন্তা করছেন। এমন সময় তার মনের মধ্যে কিছু প্রশ্নের উদয় হল-আমি কে? কোথা থেকে এলাম? পৃথিবীতে কেন মানুষ হয়ে জন্মালাম? এখন আমার কি কর্তব্য? প্রভৃতি প্রশ্ন তার মনে জাগল।

দেবমালি এইসব প্রশ্ন নিয়ে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন।

মুনি জানন্তি উত্তর দিলেন–আত্মজিজ্ঞাসার দ্বারা শান্তি লাভ করা যাবে। নিজেদের ইচ্ছায় আমরা সংসারে যাতায়াত করি না। ঈশ্বর তার জগৎ সৃষ্টির কারণে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কর্তব্য সকলের জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করা। আমি কে’-র উত্তর মানুষ

যেদিন খুঁজে পাবে, সেদিন তার সবকিছু জানা হয়ে যাবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার কাছে এক হয়ে যাবে। তখন সে বুঝবে আমিই সেই পরমব্রহ্মের অংশ, আমি অজয়, অমর, শাশ্বত, সনাতন। আমার ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই। তুমি আরো সাধনা কর দেবমালি। সব প্রশ্নের উত্তর পাবে।

গুরুদেবের উপদেশ মতো জগৎসংসার ভুলে দেবমালি সাধনায় বসলেন। কেটে গেল তার মনের সংশয়। যথার্থ, উত্তর পেয়ে অমৃতের আস্বাদন লাভ করলেন।

যজ্ঞমালি ও সুমালির কাহিনি

দেবমালির দুই পুত্র যজ্ঞমালি ও সুমালি উভয়ই বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন।

যজ্ঞমালি ছিলেন পরম ধার্মিক। বাবার কাছ থেকে তিনি যে অর্থ পেয়েছিলেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। শাস্ত্র পাঠ করে সদ্ভাবে জীবনযাপন করে আনন্দেই দিন কেটে যায় তার। কিন্তু সুমালির বিপরীত মতি ধরল। অপকর্ম দোষে তার মুখে চুনকালি পড়ল। দুষ্টলোকের সঙ্গে মেলামেশা, নেশা করা, চুরি করা তার কাজ হয়ে উঠল। পিতার সঞ্চিত অর্থ যা পেয়েছিল সব কিছু সে অপকর্ম করে শেষ করে দিল। এখন সংসার চালানোর জন্য চুরি করার পথই সে বেছে নিল। তার জ্বালায় দেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

নিজের ভাই এভাবে অধার্মিক হয়েছে দেখে যজ্ঞমালির খুব খারাপ লাগে। একদিন ভাইকে ডেকে সৎ উপদেশ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করাতে ফল হল উল্টো। দাদাকেই মারতে উঠল সে। সুমালির স্ত্রীও স্বামীকে বোঝাতে গিয়ে তার হাতে প্রহৃত হল।

যজ্ঞমালির মন খারাপ। কিভাবে ভাইকে সদ জীবনে ফিরিয়ে আনবে, ভাবতে পারছে না। একদিন গ্রামের বহু লোকজন সুমালির বাড়িতে এল তাকে শায়েস্তা করবার জন্য। হাত দিয়ে ও লাঠি দিয়ে তাকে সবাই মারতে লাগল। গালাগালিও দিল প্রচুর। যজ্ঞমালি ভাইয়ের হয়ে তাদের সবার কাছে ক্ষমা চাইলেন।

সবাই যজ্ঞমালির গুণের কথা জানে, তাই তার কথায় সে যাত্রায় সুমালি রক্ষা পেল। সবাই চলে গেলে ভাইকে পুনর্বার বোঝানোর চেষ্টা করলেন যজ্ঞমালি। বললেন–ব্রাহ্মণের সন্তান আমরা। বাবা আমাদের জন্য যে সম্পদ রেখে গেছেন, ঠিকমত চালালে তা কোনদিনই নিঃশেষিত না। কিন্তু তুই অসভাবে ব্যয় করে সব শেষ করে দিয়েছিস। বদমাইশিও তো অনেক করলি কিন্তু তাতে কি তুই শান্তি পেয়েছিস? যদি আজ তোকে আমি রক্ষা না করতাম, তাহলে হয়তো মরেই যেতিস।

এবার থেকে তুই সদ্ভাবে জীবনযাপন কর। বাবার দেওয়া সম্পদ আমি তো ঠিক রেখেছি। আমার সম্পদের থেকে অর্ধেক আমি তোকে দিচ্ছি। তাই দিয়ে তুই সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকার চেষ্টা কর। মন্দ কর্ম আর কখনো করিস না।

দাদার কথায় সুমালি কিছুটা শান্ত হল। বহু লোকের মারের চোটে গায়ে খুব ব্যাথা। তাই চুপচাপ কয়েকটা দিন কাটাল। কিন্তু চুরি করা যার স্বভাব, যে কি কোনদিন সকথা শুনবে? ‘চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। তাই দাদার দেওয়া অর্থে সে যেন শান্তি পেল না। কয়েক দিন পরে সে আবার রাতে বেরিয়ে পড়ল চুরি করার জন্য। পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আবার মিশে জুয়া খেলে নেশা করে যজ্ঞমালির দেওয়া সকল অর্থ শেষ করে ফেলল। তারপর সে ডাকাতি করা শুরু করল। একদিন রাজার প্রহরীদের হাতে ধরা পড়ল। বিচারে তার দেশান্তরের হুকুম হল। দেশ ছাড়ার হুকুম পেয়ে সুমালি তার দুষ্ট বন্ধুদের কাছে গেল, কিন্তু কেউ তাকে একদিনের জন্যও আশ্রয় দিল না। এখন কেউ তারা কেউ সুমালির বন্ধু নয়, সবাই শত্রু। মনের দুঃখে সুমালি বনে চলে গেল। শুরু করল বন্য-জীবনযাপন। যজ্ঞমালির প্রাণ ভাই-এর দুঃখে কেঁদে উঠল। কিন্তু তার আর কিছুই করার ছিল না।

এই ভাবে বহুকাল কেটে গেল। এখন বৃদ্ধ হয়েছেন যজ্ঞমালি। একদিন বিষ্ণুধ্যান করবার সময়ে তার মৃত্যু হল। বিষ্ণু দূতদের সঙ্গে তিনি বিষ্ণুলোকে চলেছেন।

বিধাতার লীলা বোঝা ভার। ঠিক সেই একই দিনে মৃত্যু হল সুমালির। তার মহা পাপের জন্য যমদূতেরা তাকে শাসন করতে করতে নিয়ে যাচ্ছে। চিৎকার করে কাঁদছে সে।

বিষ্ণুলোকে যেতে যেতে যজ্ঞমালি ভাই-এর সেই আর্তনাদ শুনলেন। সেই আর্তনাদে যজ্ঞমালির মন অস্থির হয়ে উঠল। তিনি বিষ্ণুদূতের জিজ্ঞাসা করলেন –এমনভাবে কষ্টে কে কাঁদছে? কারা তাকে কষ্ট দিচ্ছে?

বিষ্ণুর দূতগণ বললেন–তোমার ভাই সুমালি যমদূতের তাড়নায় এইভাবে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে যমালয়ে যাচ্ছে।

যজ্ঞমালি চমকে উঠলেন, হায়! ভগবান, এ কি কষ্ট? ভাই সুমালির এই কষ্ট আমি চোখে না দেখতে পেলেও কানে শুনে আর সহ্য করতে পারছি না। হে ভগবান, এই যন্ত্রণা থেকে আমার ভাইকে রক্ষা করবার কি কোন উপায় নেই?

বিষ্ণুদূতেরা বললেন–যাঁরা পুণ্যাত্মা হন, অপরের দুঃখে তাদের প্রাণ এইভাবেই কেঁদে ওঠে। তাই তোমার এই অবস্থা। কিন্তু তোমার ভাই সুমালি জীবনে কখনও কোন পুণ্যকাজ করেনি, উপরন্তু যতরকমের পাপ কাজ হয়, করেছে, তাই এখন তার ফল ভোগ করছে। পুণ্যের ফল যেমন সুখ ভোগ, পাপের ফল তেমন কষ্ট লোগ। তোমার ভাই সুমালি এখন যে কষ্ট পাচ্ছে, সে

আর কতটুকু! নরকে গিয়ে আরো কষ্ট পাবে। সে দৃশ্য পুণ্যাত্মারা কখনও দেখতে পান না। পাপের ফল ভোগ করে শাস্তি পেলেই হবে প্রায়শ্চিত্ত। তাই নরককে সংযমনী পুরী বলা হয়। কষ্ট ভোগে পাপ নাশ হবে।

যজ্ঞমালি বললেন–আমি জানি সুমালি জীবনে পাপ ছাড়া কোন পুণ্য কাজ করেনি, কিন্তু সে যে আমার ভাই। সে নরকে গিয়ে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে, আর আমি বিষ্ণুলোকে গিয়ে সুখ ভোগ করব–সে কি কখনও হয়, আমার জন্য বিষ্ণুলোকে সকল সুখের ব্যবস্থাই আমার কাছে কাটার মত লাগবে। মোটেই আমি শান্তি পাব না। ওকে যদি মুক্ত করবার কোন উপায় থাকে, তাহলে আমাকে ওর কাছে নিয়ে চলুন। আমি একবার চেষ্টা করে দেখি, আমাকে দেখলে সুমালি যদি একটুও শান্তি পায়, তাই ভাল।

বিষ্ণুদূতেরা বললেন–তা হয় না যজ্ঞমালি, পুণ্যাত্মাদের নরকে যাওয়া হবে না। একটা উপায় আছে–যদি তুমি তোমার পুণ্যের এক কণা তোমার ভাইকে দান করো, তাহলে তার নরক থেকে মুক্তি লাভ হবে।

তাদের কথা শুনে যজ্ঞমালি আর এক মুহূর্তও দেরী করলেন না। বললেন, আমি এখুনিই সেই পুণ্য দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ থেমে গেল। যমদূতেরা সুমালিকে ছেড়ে দিল। তখন সুমালিকে নিয়ে বিষ্ণুদূতগণ বিষ্ণুলোকে চলল। তখন দুই ভাই এক সাথে বিষ্ণুলোকে থাকল।

রাজা সুমতির উপাখ্যান – বিষ্ণুমন্দির ধ্বজারোপণের ফল

সোমবংশে সুমতি নামে এক ধার্মিক এবং মহা পুণ্যবান রাজা ছিলেন। শ্রীহরির পূজা ও অতিথির সেবা না করে তিনি জল গ্রহণও করতেন না। যেমন রাজা, তেমনি রানি। রাজকার্যে যাবার আগে রাজা নারায়ণ মন্দিরে ধ্বজা পুঁতে চারিদিক প্রদক্ষিণ করে, মন্দিরে প্রবেশ করে বিধিমত পূজা করতেন। তারপর রাজপ্রাসাদে এসে অতিথিদের সেবা করে সাধ্যমতো দান দিয়ে তাদের সম্মানের সঙ্গে বিদায় দিতেন।

সে দেশের প্রজারাও সদ, নির্মল চরিত্রের এবং হরিপরায়ণ। রাজার কথা শুনে বিভাণ্ডক মুনি অবাক হলেন। আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন–একজন রাজা হয়ে এমন বিষ্ণুভক্ত। দেখবার ইচ্ছায় একদিন তিনি সশিষ্য হাজির হলেন রাজা সুমতির কাছে।

রাজা দেখতে পেলেন সশিষ্য বিভাণ্ডক মুনি তাঁর সভায় এসেছেন। রাজা সিংহাসন থেকে উঠে এসে মুনির চরণস্পর্শ করে বললেন–আমার কি সৌভাগ্য। আপনি এসেছেন, আমার জীবন সার্থক হলো।

মুনিকে এবং তাঁর শিষ্যদের রাজা সমাদরে প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে এলেন। তাদের আহারের জন্য ফল-মূল দুগ্ধের ব্যবস্থা করলেন। বিশ্রামের জন্য সুসজ্জিত গৃহের ব্যবস্থা করলেন।

মহারাজের আচরণ দেখে শিষ্যসহ মুনি আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন–যিনি রাজা হবেন, তার গর্ব থাকবে। কিন্তু এ যে দেখছি বিপরীত। রাজার বিনয় দেখে তিনি খুশি হলেন।

সেই দিন মুনি রাজবাড়ির অতিথি হয়ে রয়ে গেলেন। পরদিন সকালে তিনি রাজা-রানির শ্রীবিষ্ণুর নিত্য দিনের মত মন্দিরে ধ্বজা পুঁতে পরিক্রমা ও পূজা দেখলেন। দেখে অভিভূত হলেন।

আতিথ্য গ্রহণ করে মুনিবর বিভাণ্ডক রাজসভায় এলেন রাজার সঙ্গে। সেখানে রাজা মুনিকে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে নিজে বসলেন তাঁর পায়ের কাছে।

রাজা বললেন–হে মুনিবর, আপনার আগমনে আমার প্রাসাদ আজ পবিত্র হল। আমার জীবন সার্থক হল। বলুন আমি আপনার কি সেবা করতে পারি?

বিভাণ্ডক মুনি বললেন–হে রাজন, আপনার ভক্তির তুলনা হয় না। আমার মনে একটা প্রশ্ন- নারায়ণ মন্দিরে গিয়ে আপনি রানির সঙ্গে মন্দিরে ধ্বজা পেতেন কেন? আর রানি নাচেন কেন?

রাজা বললেন–আমার চোখের সামনে যেন সেই সব ঘটনা ভাসছে।

মুনির সঙ্গে শিষ্যরা এবং সকল সভাসদগণ রাজার কথা অবাক হয়ে শুনতে লাগলেন।

রাজা বলতে লাগলেন–বহুকাল আগের কথা। মালী ছিল মা-বাবার একমাত্র ছেলে। একমাত্র ছেলে হওয়ায় মা-বাবা খুবই স্নেহ করতেন। কিন্তু ছেলে যত বড় হয়, ততই অনাচারী হয়ে ওঠে। বাবা-মার মনে অশান্তি, চোখে তাদের ঘুম নেই।

কুসঙ্গের ফলে মালী নানারকমের নেশা ধরল। চুরি করা, জুয়া খেলা, সব অপকর্মই করতে লাগল। তাকে সদ পথে ফিরিয়ে আনবার জন্য তার মা-বাবা অনেক চেষ্টা করলেন।

কিন্তু মালী তাদের কোনো কথাই কানে তুলল না। উল্টে তাদেরকেই লাঞ্ছনা করল। আজ এর বাড়ি, কাল অন্য কারোর বাড়ি গিয়ে চুরি করতে লাগল। গ্রামের মানুষরা অতিষ্ট হয়ে তার বাবা-মায়ের কাছে এসে সব জানাল। ছেলের জন্য তারা অপমানিত হলেন। ছেলেকে শোধরাবার বহু চেষ্টা করেও কোন ফল হল না।

ছেলেকে তখন তারা ঘর থেকে বের করে দিলেন। মালী তার বন্ধুদের কাছে গেল। কিন্তু বন্ধুরা তাকে পাত্তা দিল না। কেউ যখন আশ্রয় দিল না তখন মালী বনে চলে গেল। ভাবতে লাগল– হায়। এ কি করলাম আমি? মা-বাবার কথা না শুনে ভুল করেছি। এখন ক্ষিদের জ্বালা সহ্য করতে পারছি না। সামনে একটি হরিণ শিশুকে দেখতে পেয়ে তাকে ধরে, তার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে কাঁচা মাংস খেল।

তারপর সে চিন্তা করল–ফিরে গিয়ে লজ্জায় আর কারোকে মুখ দেখাতে পারবে না। তার চেয়ে এখানে থাকাই ভালো। শিকার করেই যতদিন বাঁচা যায়।

এই ভাবে সে গভীর বনের মধ্যে এগোতে লাগল–হঠাৎ সেখানে একটি জীর্ণ ধুলা-বালিতে ভরা মন্দির দেখতে পেল।

মালী সেই মন্দির পরিষ্কার করে সেখানেই থেকে গেল। সামান্য কিছু শিকার করে পেট ভরাতে লাগল; কিন্তু নেশা করার জন্য সে বহু গাছের রস খেয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। একটা গাছের সন্ধান পেয়ে গেল। আর কি? সবই হল, আহার জুটল, নেশাও হল, একটা আস্তানাও পেয়ে গেল।

মালী কুড়ি বছর একা একা সেই মহাবনে রয়ে গেল।

প্রতিদিনের মতো মালী মন্দির পরিষ্কার করছে–এমন সময়ে সেখানে একটি মেয়ে এল। পরনে ময়লা কাপড়। সেটির বহু জায়গা ছেঁড়া। শুকনো মুখ। মাথায় এক রাশ রুক্ষ চুল। এমন রোগা যেন গায়ে মাংস নেই। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। মালী তাকে দেখেই চমকে উঠল। একি কোন মানবী না পেত্নী।

মালী তাকে জিজ্ঞেস করল–কে তুই? এখানে কোথা থেকে এলি?

ধীরে ধীরে মেয়েটি বলল–আমি ব্যাধের মেয়ে, আমার নাম কোকিলিনী। আমার স্বামী আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তোমাকে এখানে দেখে চলে এলাম।

মালীর ভালোই লাগল মেয়েটির কথা শুনে। এতদিন একা একা ছিল। কথা বলার একটা লোকও তো পাওয়া গেল। মালী তাকে ঘরে বসিয়ে মাংস ও জল খাওয়াল। তারপর বলল, আচ্ছা কোকিলিনী, তোকে তাড়িয়ে দিল কেন?

কোকিলিনী বলল-কি আর বলব সে কথা, সবই আমার ভাগ্যের দোষ। আমি ছোটবেলা থেকেই খুব মুখরা ছিলাম। যাকে যা ইচ্ছা বলতাম। আমার মা-বাবা এক ব্যাধের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিল। স্বভাবের দোষ। সেই ব্যাধের সঙ্গে সব সময়েই আমার ঝগড়া লেগে থাকত। একদিন রাগের বশে সেই ব্যাধটাকে আমি খুন করলাম। তাই গ্রামের সবাই আমাকে মারতে মারতে তাড়িয়ে দিল। সেই থেকে বনে বনে ঘুরছি।

মালী মেয়েটির কথা শুনতে শুনতে ভাবল–পূর্বে আমি যেমন ছিলাম, এই মেয়েটিও তাই। আমার বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে তাড়িয়েছে, এও সবার দ্বারা বিতাড়িত হয়েছে।

মালী তখন তাকে বলল–এখানে তুই থেকে যা, আর কোথাও যেতে হবে না। এই বলে মালী তাকে বিয়ে করে নিজের কাছে রাখল। প্রথমে মেয়েটি খুব রোগা ছিল। কিন্তু এখন মালীর কাছে থেকে মাংস, রস খেয়ে বেশ ভালো চেহারা হয়েছে।

এইভাবে কিছুদিন কাটল। একদিন দুজনে প্রচুর রস খেয়ে ভীষণভাবে মাতাল হয়ে পড়ল। এমন সময় মালী নিজের পরনের ছেঁড়া কাপড়টি ছিঁড়ে একটা ধ্বজার মত করে নাচতে লাগল। তার দেখাদেখি–কোকিলিনীও নাচতে লাগল। নাচতে নাচতেই এক সময় তারা দুজনেই মারা গেল।

যমদূতেরা এল তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আষ্টেপৃষ্ঠে তাদের বেঁধে নিয়ে গেল যমপুরীতে। চিত্রগুপ্ত তাদের খাতা বের করল। যমরাজ বললেন–এদের পাপের পরিমাণ কত?

চিত্রগুপ্ত বললেন–দুজনেই মহাপাপী। এদের পাপের সীমা নেই। কিন্তু এদের মৃত্যুর সময়টা ভেবে দেখার আছে। এরা মৃত্যুর আগে হরিমন্দিরে ধ্বজা নিয়ে নেচে নেচে ক্লান্ত হয়েছিল।

যমরাজ বললেন–আর কোন কথা নয় চিত্রগুপ্ত। এদেরকে বিষ্ণুলোকে পাঠিয়ে দাও। ওদের বিচার করার কোন অধিকার আমার নেই।

মালী আর কোকিলিনী তো অবাক। সারা জীবন পাপ কাজ করে সামান্য ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোকে ধ্বজা করে নেচেছিল বলে, তার এই পরিণতি? শ্রীহরির জয়গান করতে করতে তারা বিষ্ণুলোকে চলে গেল। তারা বিষ্ণুলোকে বহুকাল সুখ ভোগ করল, তারপর এল ব্রহ্মলোকে। সেখান থেকে এল ইন্দ্রলোকে, সব দেবতাদের সম্মান লাভ করে বহুদিন পরে জন্মাল মর্ত্যভূমিতে, রাজার ঘরে। পরে হল। স্বয়ং রাজা রানি। সেই ধ্বজারোপণের পুণ্য প্রভাবে তারা আজ জাতিস্মর হয়ে জন্মেছে।

রাজা সুমতি তারপর বললেন–হে মুনিবর, সেই মালীই এখন সুমতি। আর সেই কোকিলিনী আমার মহিষী। আমাদের মনে সেই স্মৃতি আজও জাগ্রত। তাই নিত্য নিত্য ধ্বজা রোপণ, প্রদক্ষিণ, পূজা ও নৃত্য আমরা জীবনে কখনও ত্যাগ করতে পারব না।

রাজা সুমতির এই কাহিনী শুনে বিভান্তক মুনি মনের সংশয় দূর করে, শিষ্যদের নিয়ে নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

বহু রাজার অহঙ্কারের পরিণতি

অহঙ্কারের মত সর্বনেশে আর কিছু নেই, কথাতেই আছে অতি দর্পে হত লঙ্কা। রাবণ রাজার সবংশ বিনাশ হল অতি অহঙ্কারের ফলে।

বাহু হচ্ছেন সূর্য্যবংশের সুবিখ্যাত রাজা। ঐশ্বর্য, বীর্য্য, যশ, জ্ঞান–তার কোন কিছুরই অভাব নেই। প্রজারা তার সুশাসনে ছিল। কারো কোনো অভিযোগ ছিল না। সপ্তদীপা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দ্বীপেই তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করালেন। রাজাকে সবাই সম্মান করত, কারণ তাঁর রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ছিল না, কেউ অনাহারে মারা যায়নি। এমন প্রতাপশালী রাজারও একদিন পতন হল।

রাজা বাহু ঐশ্বর্য্য, বীর্য, জ্ঞানের গর্বে অহংকারী হয়ে উঠলেন। তার ফলে তিনি ভালো-মন্দ, শুভ-অশুভ বিচারের জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। রাজা প্রথমে প্রজাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ করতেন, যাতে প্রজাদের কোনোরকম অসুবিধা না হয়, সেটাই তার উদ্দেশ্য ছিল। মুনি-ঋষিদের ধ্যান, জপ, তপস্যার যাতে কোন বাধা-বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য তিনি তাদের সাহায্য করতেন।

সেই রাজার এখন বিপরীত ভাব। ভোগ-বিলাসে মেতে উঠলেন। কোন সৎ কাজ করেন না। প্রজাদের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা না করে বেশি করে করের বোঝা চাপালেন। যে কর দিতে পারে না তার সম্পদ কেড়ে নেওয়া হত।

রাজা আগে রাজ্য পরিচালনার জন্য জ্ঞানবৃদ্ধ মন্ত্রীদের পরামর্শ নিতেন, কিন্তু এখন তাদের কথা কানেই তুললেন না। দুষ্ট বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে রাজা সময় কাটাতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ, মুনি-ঋষিদেরও তিনি আর আগের মতো সম্মান করেন না। তাদের সুখ-সুবিধার কথাও ভাবেন না।

সবাই বুঝল রাজার পতন আসন্ন। রাজা বাহুকে যদুবংশ ও তালধ্বজ বংশের রাজারা কেউই পছন্দ করতেন না। কিন্তু বাহুবলে এঁটে উঠতে না পেরে এতদিন তার অধীনে সামন্ত রাজা হয়ে কাল কাটিয়েছে। কর দিয়েছে। কিন্তু এখন রাজার বাহুবল বিনষ্ট হয়েছে। যে রাজা নিজে আমোদ-স্ফুর্তিতে কাল কাটায়, তার কথা কে শুনবে?

সামন্ত রাজারা এই সুযোগের অপেক্ষায় এতদিন ছিল। বাহু রাজার প্রতি প্রজারা এখন বিমুখ হয়েছে। বাহু রাজার চতুরঙ্গ-সেনারাও রাজার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট। কাজেই রাজাকে এখন তারা আর কোনোভাবেই সাহায্য করবে না।

হৈহয় ও তালজঙ্ঘের রাজারা এই সুযোগে শক, হুণ, যবনদের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে একদিন প্রচুর সেনা নিয়ে বাহু রাজার ওপর আক্রমণ করল।

এতদিন রাজা বাহু তার সৈন্যদলের কোন খোঁজ রাখেন নি। অনেকেই এখন তার বিরুদ্ধে। তবু রাজা বাহু তার সৈন্যদের নিয়ে শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করার জন্য চেষ্টা করলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই হার হল রাজার। বহু সেনা মারা গেল। আত্মীয়-স্বজন সকলেই নিহত। তখন রাজা গোপনে রাত্রিবেলা রানিকে সঙ্গে নিয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য বনে চলে গেলেন।

বাহু রাজার কাল শেষ হওয়াতে প্রজারা খুব খুশী। কারোর মনে এতটুকু দুঃখ নেই তার জন্য। যে রাজা কোমল শয্যায় শয়ন করতেন, চব, চোষ্য, ভোজন করতেন, রথ ছাড়া যিনি কোথাও যেতেন না; সেই তিনি ঘাসের ওপর শয়ন করছেন, বনের ফল-মূল খাচ্ছেন, খালি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কাটার আঁচড়ে দেহ ক্ষতবিক্ষত। তিনি তবু চলেছেন রানির হাত ধরে। কিন্তু রানি গর্ভবতী থাকার কারণে চলতে পারছেন না।

একদিন একটি গাছের তলায় বসে রাজা চিন্তা করছেন যে কেন এমন হল। তার তো বাহুবল, অর্থবল জ্ঞানবল কোনোকিছুই অভাব ছিল না। তাহলে আজ তার এ অবস্থা হল কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দেবার কেউ নেই। রানি ছাড়া তার পাশে আর কেউ নেই। জ্ঞানী রাজা নিজের মনেই বিচার করলেনক্ষমতার গর্বে তিনি মোহগ্রস্ত হয়েছেন। এই মোহের কারণে অন্যায়ের পথে চলতে গিয়ে তার আজ এখন সর্বহারা ভিখারীর বেশ। যত কষ্টই হোক তাকে মেনে নিতে হবে।

ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লেন রাজা রানি। পথ আর চলতে পারছেন না। রাজা ভাবলেন এর থেকে মৃত্যু ভালো। আবার ভাবলেন তা করা মহাপাপ। তার উপর রানি গর্ভবতী, তিনি যদি আত্মহত্যা করেন তাহলে রানির কি হবে? তাহলে তাঁকেও তো অনাগত সন্তানসহ মরতে হবে।

রাজার আর তাই জন্য মরা হল না। কিন্তু রানি আর সহ্য করতে পারছেন না এই কষ্ট। তিনি ঠিক করলেন স্বামীর অসাক্ষাতে বিষফল খেয়ে মরবেন। সন্তান প্রসব হলে তাকে কি খেতে

দেবে, তাই মরার কথা চিন্তা করলেন। গোপনে একদিন সেই বিষ ফল খেলেন। কিন্তু তার মৃত্যু হল না। শুধুমাত্র অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বহু কষ্টে রাজা রানির জ্ঞান ফেরালেন। কষ্টে পথ চলতে চলতে একটি সুন্দর শীতল জলের সরোবর দেখতে পেলেন।

রাজা রানি ঐ সরোবরের জলে স্নান করলেন। ঐ জল পান করলেন। তখন তাদের উভয়েরই ক্লান্তি দূর হল। তারপর সেই সরোবরের তীরে একটি পাতার কুটির তৈরি করে তাতে বসবাস করতে লাগলেন।

এই অবস্থার জন্য রাজা মনে মনে অনুশোচনা করতে করতে একদিন মারা গেলেন। রানি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অনেক কষ্টে শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করে চিতা সাজিয়ে স্বামীর মৃতদেহে আগুন ধরালেন। নিজেকে রানি এবার ঐ চিতার আগুনে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হলেন।

হঠাৎ সেখানে ঔর্ব নামের এক ঋষি উপস্থিত হয়ে রানিকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনলেন।

রানি ঋষিকে প্রণাম করে বললেন–আমার স্বামী রাজ্যহারা হয়ে বহু কষ্টে এখানে দিন যাপন করছিলেন। আমি তার অবর্তমানে কি করে থাকব? তাছাড়া সতীর জীবনে এটাই তো পরম মঙ্গলের পথ।

ঋষি বললেন–রাজা বহু পাপ করেছিলেন জীবনে। তাই তার প্রায়শ্চিত্ত করে স্বর্গে গেলেন। অনুশোচনা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু মা, তুমি যদি নিজের আত্মাহুতি দাও, তাহলে তোমার গর্ভে যে সন্তানটি আছে, সেও মরবে। সেই সন্তান তো কোনো অন্যায় করেনি। তাকে মারবে কেন তুমি? এতে তো তোমার মহাপাপ হবে। এমন কোরো না মা, তোমার কোনো ভয় নেই মা, আমার আশ্রমেই তুমি থাকবে।

স্বামীর দাহের কাজ শেষ করে রানি ঔর্ব ঋষির সঙ্গে চলে গেলেন তার আশ্রমে। যথাসময়ে তার এক পুত্রের জন্ম হল। গর (বিষ) ফল খেয়ে যে শিশুর মৃত্যু হল না, সেই শিশুর নাম রাখা হল সগর।

কপিল মুনির অভিশাপে এই সগরের ষাট হাজার পুত্র ভস্মীভূত হলে, ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেছিলেন।

মন্দিরে দীপদানের মাহাত্ম দণ্ডকেতুর উপাখ্যান

রাজা যজ্ঞধ্বজ একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করে, তাতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বীতহোত্র নামে হরিভক্ত নিষ্ঠাবান একজন ব্রাহ্মণের হাতে পূজার ভার দিলেন।

পূজার ভার ব্রাহ্মণের উপর থাকলেও রাজা প্রতিদিন নিজের হাতে মন্দির পরিষ্কার করে, মন্দিরের চাতালের সামনে একটি প্রদীপ জ্বেলে দেন। তারপর ঠাকুরের পূজার কাজ করেন পুরোহিত বীতহোত্র।

একদিন পুরোহিত কৌতূহলী হয়ে রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন –যে কেন তিনি নিত্য এই দুটি কাজ করেন।

উত্তরে রাজা বললেন–এতে এক অপূর্ব রহস্য আছে। আপনাকে আমি বলবো। বহুদিন আগেকার কাহিনী।

রৈবত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পত্নীর নাম বন্ধুমতী। পাণ্ডিত্যের জন্য খুব খ্যাতি ছিল ব্রাহ্মণের কিন্তু তার লোভ ছিল খুব বেশি। লোভ বেশি থাকায় তিনি শাস্ত্র বিরোধী কাজ করতে বাধ্য হলেন। ধর্মাধর্মের কথা ভুলে তিনি মাদক দ্রব্যও বিক্রী করতে আরম্ভ করলেন।

এমন স্বামীর স্ত্রীও সঙ্গদোষে দুশ্চরিত্রা হয়ে গেলেন। রৈবতের বন্ধু-বান্ধবদের বহু চেষ্টাতেও তাদের স্বভাব পাল্টানো গেল না। রৈবতের পুত্রের নাম দণ্ডকেতু। সেও হল তার বাবা-মায়ের মত অসৎ স্বভাবের। বাবা লোভী এবং কৃপণ। দণ্ডকেতু বাবার কাছ থেকে নেশার খরচ না পেয়ে চুরি করতে আরম্ভ করল।– তারপর দণ্ডকেতু যখন যুবক হল তখন সে যুবতী মেয়েদের আকর্ষণ করতে লাগল। পাড়ার মেয়েরা তার ভয়ে আর ঘরের বার হতে পারত না। গ্রামের মানুষরা আর এইসব সহ্য করতে না পেরে ব্রাহ্মণ এবং তার ছেলে ও বউ-কেও গ্রামের বাইরে দূর করে দিল। তাদের এই অপকর্মের জন্য তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরাও বাড়িতে আশ্রয় দিল না।

তাঁরা নর্মদা নদীর তীরে এসে একটা কুঁড়েঘর তৈরি করে সেখানে বাস করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর বয়েস হয়েছে। তার ওপর রৈবতকে ক্ষয় রোগে ধরেছে। বৈদ্যের পরামর্শেও কোন ফল হল না। একদিন তার মৃত্যু হল। ব্রাহ্মণীর অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে লাগল।

দণ্ডকেতুর কোন পরোয়া নেই। বাবার গচ্ছিত ধন অনেক আগেই শেষ হয়েছে। এখন সংসার চালানোর জন্য সে চুরি করা শুরু করল।

একদিন দণ্ডকেতু একটি বিষ্ণুমন্দির দেখতে পেল। সে দেখল কয়েকজন নারী সেখানে নদীতে স্নান করে মন্দিরে পূজা করে চলে যাচ্ছে। তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। যখন মেয়েরা ফিরে যাচ্ছে, দণ্ডকেতু তখন তাদের সঙ্গে ভালোমানুষ সেজে আলাপ করতে গেল। নিজের পরিচয় দিল ব্রাহ্মণের ছেলে হিসাবে। সে এই মন্দিরে আসে কারণ সে বিষ্ণু দেবতাকে খুব ভালোবাসে বলে।

এইভাবে সে প্রায়দিনই মেয়েদের সাথে নানা কথা বলত। একদিন একটি মেয়েকে ডেকে সে বলল–প্রতিদিন দিনের বেলায় এসে তোমরা পূজা করে যাও। কিন্তু কোনোদিন কি দেখেছ যে, বিষ্ণু কিছু খেয়েছেন? নিশ্চয় দেখ নি। কিন্তু আমি পূজা করি রাতের বেলায়। তুমি রাতে এসে দেখবে ভগবান আমার পূজার উপকরণ গ্রহণ করেছেন। তুমি একাই আসবে কারণ বেশি লোক জানাজানি হয়ে গেল তিনি আসবেন না।

মেয়েটি দণ্ডকেতুর কথা শুনে মনে মনে ভাবল–এই যুবক যা বলছে নিশ্চয় তা সত্যি হতে পারে। রাত্রিবেলা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটি একাই চলে এল মন্দিরে।

এদিকে সেই মেয়েটির আসার অপেক্ষায় দণ্ডকেতু নির্জন মন্দিরে বসে আছে। মেয়েটিকে দেখে দণ্ডকেতু আনন্দিত হয়ে বলল–এস, এস, ভিতরে এস।

এই কথা বলে দণ্ডকেতু তার হাত ধরে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গেল। একটা প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছিল। দণ্ডকেতু তার নিজের কাপড়ের এক টুকরো দিয়ে বাতিটি বড় করে জ্বালাল। এখন বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মূর্তির সামনে পড়ে থাকা শুকনো পাতা নিজের কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করল। তারপর মেয়েটির সঙ্গে সে কুকর্ম করল। মেয়েটি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে চিৎকার করলেও কেউ তা । শুনতে পায় নি। তারপর শেষরাতে তারা দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল হয়ে গেলেও তাদের ঘুম ভাঙ্গে না। নিত্যদিনকার মত অন্যান্য মেয়েরা বিষ্ণুপূজা করতে এসে তাদের দেখতে পেল। গত রাত্রে এই মন্দিরের মধ্যে কি ঘটেছে, তা কারো বুঝতে বাকি রইল না।

তখন সেই মেয়েরা ফিরে গিয়ে গ্রামের লোকজনদের এই ঘটনার কথা বলল। ক্রোধে ফেটে পড়ল সবাই। মন্দিরের মধ্যে এমন অনাচার! লাঠি সোটা নিয়ে এসে তারা তাদের দুজনকে পেটাতে লাগল। লাঠির ঘায়ে প্রাণ বেরুল দুজনার।

যজ্ঞধ্বজের মুখে এমন কথা শুনে ব্রাহ্মণ বীতহোত্র আশ্চর্য হয়ে বললেন–ছি, ছি, মন্দিরের মধ্যে এমন অপকর্ম যে করে সে মানুষ না পাষণ্ড। উপযুক্ত শাস্তি হল তাদের। কিন্তু নরকে হবে তাদের আসল শাস্তি, সেখানে বহুকল্প কঠোর শাস্তি নিশ্চয় পাবে।

রাজা বললেন–যেভাবে মহাদোষে দোষী সে, তাতে নরকেই তার গতি হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু আসল কথা কি জানেন, সে তো বিষ্ণুলোকে।

ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে বললেন–সে কি কথা? এমন মহাপাপী বিষ্ণুলোকে গেল?

রাজা আবার বললেন–তাদের মৃত্যুর সময়ে যমদূতেরা তাদের যমপুরীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এল, কিন্তু বিষ্ণুর দূতেরা বাধা দিয়ে বলল–এরা গত রাতে বিষ্ণুমন্দিরে প্রদীপ জ্বালিয়েছে, মন্দির মার্জনা করেছে। তার ফলে সারা জীবনের পাপ রাশি পুড়ে ছাই হয়েছে। সেই মার্জনা ও প্রদীপ দানের প্রভাবে তারা বিষ্ণুলোকে গেল। তারপর তারা রাজা-রানি হয়ে পৃথিবীতে এল।

রাজার মুখে এমন কথা শুনে ব্রাহ্মণ চমকে উঠলেন। বুঝলেন যে দণ্ডকেতুই বর্তমানে রাজা যজ্ঞধ্বজ।

বিষ্ণুপাদোদকের মাহাত্মে কণিক ব্যাধের কাহিনী

শ্রীহরি আর তার নাম একমাত্র পারে কর্মপাশ ছেদন করতে। হরির পূজা যারা করেন না তারা শবের সমান। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণ বিদ্বেষী কিন্তু হরির পূজা করেন এমন লোকের পূজা বৃথা। যারা পরের সুখে বাধা দেবার জন্য হরিপূজা করে, কখনো তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না।

পাপ কাজে লিপ্ত হয়েও যদি কেউ হরিপূজা করে, তবে তাতে কোনো সুফল পাওয়া যায় না। কোটি কোটি জন্মে পুণ্য সঞ্চয় করলে, তবেই হৃদয়ে বিষ্ণুভক্তির উদয় হয়। বিষ্ণুভক্তিহীন চণ্ডাল যারা, তারাও হরিসেবা করে উদ্ধার পেতে পারে। শ্রীহরির পাপোদক অর্থাৎ পদধৌত জল যদি মাথায় কেউ ধারণ করে তাতে তার সর্ব তীর্থ জলে স্নানের ফল লাভ হয়।

এ বিষয়ে একটি কাহিনী আছে–সত্যযুগে কণিক নামে এক ব্যাধ ছিল। চুরি করা, পরস্ত্রীগমন ইত্যাদি নানা পাপ কাজে সে লিপ্ত ছিল।

একদিন সেই দুষ্ট ব্যাধ শুনল যে, সৌবীর রাজার রাজ্যে বহু সুন্দরী রমণী বাস করে। সেই রাজ্যে সকলে প্রচুর সম্পদের মালিক। কণিক মনে মনে ভাবল যে, ওখানে গিয়ে একবার দেখা যাক।

তারপর সৌবীর রাজার রাজ্যে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটি বিষ্ণুমন্দির দেখতে পেল। মন্দিরটির চূড়ায় সোনার কলস। নানান রত্নের কারুকার্য গায়ে।

কণিক মনে মনে ভাবল–এত যখন সোনা দানা হীরা মুক্তা, তাহলে দিনের বেলায় দেখে নিই, কোথায় কি কি আছে। রাতের বেলায় এসে চুরি করব।

এই চিন্তা করে মন্দিরের মধ্যে গিয়ে কণিক দেখতে পেল, একজন সাধু চুপচাপ বসে আছেন। আর কেউ কোথাও নেই। ওই সাধু যাতে তাকে দেখতে না পান, তাই সে কয়েক পা পিছিয়ে এসে আড়ালে দাঁড়াল। দেখল আর কেউ সেই মন্দিরে যাতায়াত করছে না। মনে মনে ভাবল ভালই হল। ওই সন্ন্যাসীকে মেরে মন্দিরের সব সোনা-দানা চুরি করে নিয়ে যাব। এখন যদি মারতে যাই তাহলে কেউ দেখে ফেলবে। এখন এখানে চুপচাপ বসে থাকি।

দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেল। বেশ অন্ধকার। এমন সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য, কোমরে গোঁজা ধারাল অস্ত্রটাকে নিয়ে ব্যাধ মন্দিরের ভেতর চলল।

মুনিবর উতঙ্ক পূজার আসনে বসেছিলেন। সামনে প্রদীপের ক্ষীণ আলোক ভয়ঙ্কররূপী সেই ব্যাধকে তিনি দেখতে পেলেন।

মহাজ্ঞানী মুনি-ঋষিরা জানেন যে জগতে যা কিছু ঘটছে, সবই বিষ্ণুর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। যেভাবে তিনি মুনির মৃত্যু নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তেমন ভাবেই হবে তার মৃত্যু। কাজেই একে দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

এমন ভয়ঙ্কর মূর্তির হাতে ধারালো অস্ত্র দেখেও তিনি বললেন–এসো, এসো ভাই।

ব্যাধ অবাক হয়ে গেল মুনির এই আপ্যায়ন দেখে। তারপর ভাবল–আমার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই মুনি এমন ব্যবহার করছে, কিন্তু আমি ওর কথায় ভুলছি না।

সে বলল–মুনি, তুমি ভেবেছ আমাকে এভাবে খাতির করলে আমি তোমায় ছেড়ে দেব? কখনই তা হবে না। আজ আমার হাত থেকে তোমার রেহাই নেই। আগে তোমাকে শেষ করব, তারপর এই মন্দিরের সোনাদানা সব চুরি করে নিয়ে যাব।

মুনি নির্ভয়ে বললেন–ভাই, ভগবান যার হাতে যার মৃত্যুর ব্যবস্থা করে রেখেছে, সে তো তারই হাতে মরবে। ভগবানের হিসাব কখনো নড়চড় হয় না। তোমার হাতে যদি আমার মৃত্যু লেখা থাকে, তবে নিশ্চয় মরব। আমি বৃদ্ধ। আমার কাছে কোনো অস্ত্র নেই। তোমার মত বলবান যুবকের সঙ্গে লড়বার ক্ষমতা আমার নেই। এখানে আমাকে রক্ষা করবার মতও কেউ নেই। নিশ্চিন্তে তুমি তোমার কাজ হাসিল করতে পারবে। তবে ভাই, মরবার আগে, আমি দুটো কথা বলে যেতে চাই তোমাকে। যদি শুনতে চাও তো বলি। আর যদি তা শুনতে না চাও, তবে এখুনিই আমাকে মেরে তুমি তোমার কাজ হাসিল করে নাও। কোন প্রতিবাদ করবো না।

তপস্বীর কথায় কণিকের মনটা দুলে উঠল। ভাবল–এখনো রাত অনেক বাকি আছে। প্রভাত হতে অনেকটা সময় আছে আর এখন এখানে কেউ আসবে বলে মনে হয় না। মুনি কি বলতে চায় একবার শুনেই দেখি না। তারপর যা হয় হবে।

এই চিন্তা করে কণিক বলল–আচ্ছা, বল, তুমি কি বলতে চাও। বেশি সময় দিতে পারব না। যা বলার তাড়াতাড়ি বল।

মুনি বললেন–এখানকার দামী দামী জিনিস নিয়ে যাবে বলে যখন এসেছ, তখন আমি বাধা দেব না। কারণ এসব আমার জিনিস নয়, আর এতে আমার কোনও লোভও নেই। অযথা

আমাকে মারার দরকার কি? তবে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি–এভাবে তুমি চুরি-ডাকাতি কেন কর? তোমার স্বাস্থ্য ভাল, কাজেই পরিশ্রম করে রোজগার করতে পার।

কণিক বলল–পেটের জ্বালায় আমি চুরি করি। আর আমি একা নই, ঘরে আমার বউ আছে, ছেলেপুলেও আছে। চুরি করে অল্প সময়ের মধ্যে আমি অনেক পাই, তাতেই আমার অনেকদিন চলে যায়। গায়ে গতরে খেটে রোজগার করতে হলে, প্রতিদিনই তা করতে হবে। তাই, আমি এই পথ বেছে নিয়েছি।

মুনি বললেন, না ভাই, তোমার হিসাবে একটু ভুল হয়ে যাচ্ছে। দশদিন চুরি করলে একদিন ধরা পড়বে। রাজার বিচারে তোমার শাস্তি হবে। কয়েদখানায় রাখবে, তখন তোমার ছেলে-বউকে কে দেখবে? তাদের কি হবে?

জীবন দিলেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখ, দেখবে ঠিক চলে যাবে, আহারও জুটবে। কোনদিন কোন বিপদও আসবে না।

এই দেখ, এই মন্দিরে বসে তারই পূজায় আমার সময় কেটে যায়। বনের ফলমূল হরিকে নিবেদন করে তারপর আমি খাই। আমার কোনদিন অভাব হয় না। এত সোনা-দানার মধ্যে বসে থেকেও কোন কিছুর প্রতি আমার একটুও লোভ জাগেনি। কি হবে ওসবে?

তুমি নিজের কথা একবার ভেবে দেখ। চুরি করে পাপ করছ কিন্তু সেই পাপের ভাগী কেউ হবে না। মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি, তখন একদিন মরতে হবে। মৃত্যুর পর আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচার হবে। যে পুণ্য করেছে, সে বহু সুখ ভোগ করবে। আর যে পাপ করেছে, সে নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে। হয়তো তুমি বলবে-নরক কে দেখেছে? আমি ওসব বিশ্বাস করিনা। ঠিক আছে, বিশ্বাস করার দরকার নেই। এই সংসারেই দেখ–কত লোক সুখে-শান্তিতে আছে, আবার কত লোক সারা জীবনই দুঃখ ভোগ করছে। সবই এই পাপ-পুণ্য কর্মের ফল।

তাই বলছিলাম, এসব জিনিস চুরি করে নিয়ে যাবার আগে একবার ভেবে দেখ।

তপস্বীর কথা শুনে ব্যাধের শরীরটা যেন অবশ হয়ে গেল। হাত থেকে অস্ত্রটা পড়ে গেল। মনে মনে ভাবল–সারা জীবনে আমি কত পাপ করেছি! কত লোকের উপর নির্যাতন করেছি। তার মনে হল, যাদের উপর সে নির্যাতন করেছে, তারা সকলেই যেন তাকে মারতে আসছে। ভয়

কাঁপতে কাঁপতে সে মুনির চরণে পড়ে গিয়ে বলল–ঠাকুর, জীবনে আমি বহু পাপ করেছি। তার ফলে আমাকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। হে গুরুদেব, আমাকে বাঁচান আপনি।

এই কথা বলার পর কণিক চুপ করল। তখন মুনি তাকে তুলবার চেষ্টা করে বুঝতে পারলেন যে ব্যাধ মারা গেছে।

তপস্বী তখন দুই হাত জোড় করে সামনের বিষ্ণু মূর্তির দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা জানালেন–হে প্রভু, এই ব্যাধ এ জীবনে কোন প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ পেল না। তোমার পাদোদক আমি এর মাথায় দিচ্ছি, একে তুমি ক্ষমা কর।

এই বলে তপস্বী ব্যাধের মাথায় বিষ্ণু পাদোদক ছড়িয়ে দিলেন।

সহসা তপস্বী দেখলেন–ব্যাধের দেহ থেকে এক দিব্যমূর্তি বেরিয়ে এসে মুনিকে বলল–হে তাপসবর, তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার জানাই। বিষ্ণু-পাদোদক দিলে বলে আমি বিষ্ণুপদ লাভ করলাম। জন্মে জন্মে আমি যেন তোমার দাস হয়ে থাকতে পারি। তুমি আমার যমবদ্ধ-পাশ ছিন্ন করলে।

তারপর সেই ব্যাধের দিব্যমূর্তি মুনিকে প্রণাম করে, শ্রীহরির নামগান করতে করতে বিষ্ণুলোক চলে গেল।

একদৃষ্টে উতঙ্ক মুনি তাকিয়ে রইলেন। আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, সারা জীবনভোর পাপ কর্ম করে, এক বিন্দু পাদোদকে সব স্খলন হয়ে গেল! দিব্যগতিও লাভ করল।

মুনি উতঙ্ক আর কিছু ভাবতে পারছেন না, দুই চোখে জল ভরে আসে। তারপর, ধ্যানে বসে বহু স্তব করে হরিকে তুষ্ট করলেন। শ্রীহরি বললেন–তোমার স্তব-স্তুতিতে আমি প্রীত হয়েছি। বল, তোমার কি অভিলাষ।

কাঁদতে কাঁদতে মুনি বললেন–আমাকে কর্মফলের জন্য যেখানেই আমার জন্ম হোক–মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, তোমাতে যেন আমার মতি থাকে। তোমাতেই যেন আমার ভক্তি অটুট থাকে, যদি কোনদিন অভিমান আসে আমার, তা যেন হয় প্রভু দাস অভিমান।

সে এক অপূর্ব দৃশ্য, ভক্ত কাঁদে–ভগবানও কাঁদেন।

ভগবান বললেন–যুগে যুগে তুমি আমার দাস হবে, এখন আমার সঙ্গে আমারই লোকে চল।

মৎস্য পুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ

উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

যখন প্রলয়কাল আসন্ন হল তখন ভগবান শ্রীহরি সূর্যপুত্র সত্যব্রত মনুকে কৃপা করে দর্শন দিলেন মৎস্যরূপে। শ্রীহরির নিদের্শমতো বিশাল এক নৌকোয় সপ্তর্ষি ও বিভিন্ন প্রকার বীজ সংগ্রহ করে সত্যব্রত তাতে উঠলেন। নৌকা যখন প্রলয়কালে ভীষণভাবে আন্দোলিত, মনুর প্রার্থনায় মৎস্যরূপে ভগবান আবার দেখা দিলেন নিযুত যোজন পরিমিত আকারে। আর তার ইচ্ছায় নৌকার বন্ধন রঞ্জু হিসাবে এল বাসুকী। সেই সর্পের লেজটিকে রাজা নৌকায় বাঁধলেন আর মুখের দিক মৎস্যের শিংএ বাঁধলেন। তারপর রাজর্ষি সত্যব্রতকে মৎস্যরূপী ভগবান - বহু তত্ত্ব উপদেশ দিলেন। সেই তত্ত্বকথা সমেত বিভিন্ন কাহিনীই মৎস্য পুরাণ নামে খ্যাত। সেই কাহিনী সংকলন করেন পরাশর নন্দন ব্যাসদেব। পরবর্তীকালে তারই শিষ্য সূত নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের কাছে কীর্তন করেন।

কচের সঞ্জীবনী বিদ্যালাভ

কশ্যপের পুত্র দেবতা ও দানব। তারা বৈমাত্রেয় ভাই। নানা কারণে তাদের মধ্যে লড়াই হয়। কখন দেবতা আবার কখন দানবেরা জয়ী হয়। মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি দেবতাদের গুরু। আর শুক্রাচার্য্য হলেন দানবদের গুরু। স্বভাবতই বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের মধ্যে একটা ঈর্ষান্বিত ভাব ছিল।

দেবাসুর যুদ্ধে যেসব দানবরা মারা যেত তাদের মন্ত্রবলে গুরু শুক্রাচার্য্য বাঁচিয়ে দিতেন। কিন্তু বৃহস্পতি নিহত দেবতাদের বাঁচাতে পারতেন না। বৃহস্পতি জানতেন না যে শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী মন্ত্র জানেন।

একদিন দেবতারা চিন্তা করলেন যে, যেভাবেই হোক শুক্রাচার্য্যের জানা ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে। কিন্তু কে সেই বিদ্যা অর্জন করতে পারবে? কে শুক্রাচার্য্যের জানা ঐ বিদ্যা নিতে পারবে?

অবশেষে দেবতারা যুক্তি করে বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠপুত্র কচের কাছে গিয়ে বললেন–আমরা বিপদে পড়েছি, হে কচ। অসুরদের দ্বারা আমাদের সৈন্য-সামন্তরা বেঁচে উঠতে পারছে না। কিন্তু শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রের প্রভাবে দানব-সৈন্য বেঁচে উঠছে। যেমন করেই হোক দৈত্যগুরুর কাছে গিয়ে তুমি ঐ বিদ্যাটি শিখে এস। এই কাজে তুমি সফল হলে আমাদের অংশভাগী তুমিও হবে। এখন বৃষপর্বার ঘরে শুক্রাচার্য্য অবস্থান করছেন। দানব ছাড়া অন্য কাউকে তিনি রক্ষা করেন না।

হে কচ, আমাদের একমাত্র গতি এখন তুমি। তুমি ছাড়া কেউ শুক্রাচার্য্যের আরাধনা করতে পারবে না। অপরূপ সুন্দর তুমি। শুক্রাচার্যের অতি প্রিয়তমা কন্যা দেবযানী। সেই সুন্দরীকে প্রসন্না করতে পারলে তার দ্বারা তুমি গুপ্তবিদ্যা লাভ করতে পারবে।

দেবতাদের এই আবেদন শুনে কচ তাদেরকে অবহেলা করতে পারলেন না। সঞ্জীবনী বিদ্যালাভ, সে তো আর যে সে কথা নয়। উৎসাহের সঙ্গে গিয়ে সে শুক্রাচার্যের সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করে বলল–আমি মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র, বৃহস্পতির পুত্র কচ। আপনার কাছে আমি বিদ্যার্জনের জন্য এসেছি। শিষ্যরূপে আপনি আমাকে গ্রহণ করুন। আপনারই আশ্রমে থেকে আমি সহস্র বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন করব।

শুক্রাচার্য্য কচের বিনয় ভাব দেখে তাকে শিষ্য করে নিলেন। তারই গৃহে ব্রহ্মচর্য্য সাধন করছেন কচ। কিন্তু গুরুকন্যা দেবযানীকে দেখে চোখ ফেরাতে পারছে না কচ। গুরুকন্যার সঙ্গেই ঘুরে বেড়ায় বন উপবন। দেবযানী কচের প্রতি খুবই অনুরক্ত। কচ ছাড়া কিছু ভালো লাগে না।

পঁচিশ বছর এইভাবে কেটে গেল। সত্যযুগে সাধারণ মানুষের গড় আয়ু ছিল এক লক্ষ বছর।

দানবেরা একদিন বুঝতে পারল গুরুদেব শুক্রাচার্যের কাছে কচ এসেছে সঞ্জীবনী বিদ্যালাভের জন্য। কচ যদি সেই বিদ্যালাভ করে, তাহলে আর দেবতাদের বিনাশ করা যাবে না। কচকেই তার চেয়ে বিনাশ করে দেওয়া ভাল। কচ একদিন শুক্রাচার্য্যের গোরু নিয়ে চরাতে গেলে সেই সময় অসুররা তাকে গোপনে হত্যা করল। ব্যাস কাজ হাসিল।

সন্ধ্যার সময় গোরুগুলি তাদের রক্ষক ছাড়াই গোশালায় ফিরে এল। কচকে দেখতে না পেয়ে দেবযানীর বুকটা কেঁপে উঠল।

পিতা ভার্গবের কাছে ছুটে গিয়ে বলল–বাবা, সূর্য্য অস্তাচলে, রক্ষকহীন অবস্থায় গোধনগুলি ফিরে এল। কিন্তু কচকে দেখছি না। আমার শঙ্কা হচ্ছে কেউ তাকে হত্যা করেছে। কচ ছাড়া আমি জীবনধারণ করতে পারব না বাবা।

শুক্রাচার্য্য ধ্যানযোগে অসুরদের চক্রান্ত জানতে পেরে সঞ্জীবনী বিদ্যার প্রভাবে কচকে বাঁচিয়ে দিলেন। কচ তার চরণে প্রণাম করে সব কথা জানিয়ে দিল, কিভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

গুরুদেবের এমন কাজে স্বস্তি না পেয়ে দানবেরা মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করল। কচ একদিন শাশ্বত বিদ্যাপাঠ করতে এলে, দানবেরা তাকে হত্যা করে পুড়িয়ে ছাই করে, সুরার সঙ্গে মিশিয়ে শুক্রাচার্য্যকে খাইয়ে দিলেন।

কচ না ফেরাতে দেবযানী চিন্তিত হয়ে পিতার কাছে গিয়ে বলল–বাবা, বহুক্ষণ হল কচ ফিরছে না। মনে হয় তাকে কেউ আবার হত্যা করেছে। তুমি কচকে ফিরিয়ে দাও বাবা, তা না হলে আমি বাঁচব না।

সেই কথা শুনে শুক্রাচার্য্য বললেন–হে কন্যা, একবার আমি বৃহস্পতির পুত্র কচকে বাঁচালাম। তার আবার মৃত্যু হল। আর আমি কি করতে পারি? তুমি আর কচের জন্য কেঁদ না।

দেবযানী বলল–যার মাতামহ অঙ্গিরা, পিতা যার বৃহস্পতি, ব্রহ্মচারী, তপোধর, কর্মদক্ষ, উন্নতিশীল, এমন যুবকের জন্য আমি কঁদব না–এ কি বলছ তুমি বাবা? যদি তুমি তাকে না বাঁচাও, তাহলে আমিও তার পথের পথিক হব। আজ থেকে জলগ্রহণও করব না।

স্নেহের কন্যার আবদার রক্ষা করতে শুক্রাচার্য বললেন–যে অসুরদের গুরু আমি, সেই অসুরেরাই আমাকে হিংসা করছে! প্রচণ্ড প্রকৃতির এরা, ব্রাহ্মণ বধ করা শুরু করেছে এরা। এদের খুব শীঘ্রই পতন হবে। কে কবে ব্রহ্মহত্যা করে রক্ষা পেয়েছে?

তারপর শুক্রাচার্য্য তাঁর অমোঘ বিদ্যার প্রভাবে কচকে বাঁচিয়ে তুলে তাকে ডাকতে লাগলে, কচ তারই পেটের মধ্য থেকে বলল–গুরুদেব, আমি আপনারই উদরে।

শুক্রাচার্য্য তখন জিজ্ঞাসা করলেন–আমার পেটের মধ্যে তুমি কেমন করে এলে?

কচ তখন সব ঘটনা বলাতে ভার্গব কন্যা দেবযানীকে বললেন–কচ যদি আমার উদর চিরে বেরিয়ে আসে, তাহলে আমাকে মরতে হবে। এখন আমি কি করি?

দেবযানী বলল-কচের বিনাশে আমার সুখ-শান্তি নেই। তোমার বিহনেও আমি বাঁচব না। যে ভাবেই হোক যাতে সবার মঙ্গল হয়, তুমি তেমন কর বাবা।

অগত্যা শুক্রাচার্য্য কচকে উদ্দেশ্য করে যেহেতু দেবযানী তোমার ভজনা করছে, যদি তুমি কচরূপী ইন্দ্র না হও, তাহলে, আমার সঞ্জীবনী বিদ্যা আজ তোমাকে দিলাম। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ আমার পেট থেকে জীবিত অবস্থায় বের হতে পারবে না। তাই তুমি সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করলে। তুমি আমার পুত্রের মত। তুমি বাইরে এসে আমাকে সেই বিদ্যাবলে বাঁচিয়ে তুলবে।

গুরুর আজ্ঞামত কচ বেরিয়ে এসে সেই মন্ত্রের প্রভাবে গুরুদেবকে সুস্থ করে তুলল।

তারপর শুক্রাচার্য্য ব্রাহ্মণদের হিতের জন্য বললেন–যে কোন অল্প বুদ্ধি ব্রাহ্মণ আজ থেকে অজ্ঞানবশতঃ সুরা পান করলে, সে ইহ-পরলোকে ধর্মভ্রষ্ট হবে। ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হবে, সবার কাছে। নিন্দিত হবে।

তারপর দানবগণের প্রতি তিনি বললেন–তোমরা অতি মূর্খ, যাকে তোমরা দু’বার বিনাশ করলে সে আমার শিষ্য কচ। সে আমার কাছে সঞ্জীবনী বিদা লাভ করল। আমারই তুল্য প্রভাবশালী হল সে।

এক হাজার বছর পাঠ করে কচ স্বর্গে ফিরে যাবার জন্য শুক্রাচার্যের কাছে অনুমতি নিতে এলেম, এভাবে কচকে চলে যেতে দেখে দেবযানী বলল–হে প্রিয়, তুমি কুল, শীল, বিদ্যা, তপ ও ইন্দ্রিয় সংযম করে মহাগুণমান। মহর্ষি অঙ্গিরা যেমন আমার পিতার মাননীয়, তেমনি আমার মাননীয় মহাভাগ বৃহস্পতিও। তোমার ব্রত নিয়মাদি পালনের সময় আমি তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি, তোমার ব্রত পালন শেষ হওয়াতে তোমার প্রতি অনুরক্তা আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নয়। তুমি এখন মন্ত্রপাঠ করে আমাকে বিয়ে কর।

দেবযানীর কথা শুনে কচ বলল–তোমার মুখে এমন কথা শোভা পায় না, কারণ, তোমার পিতা যেমন আমার পূজনীয়, তেমনি গুরুকন্যা হিসাবে তুমি আমার পূজনীয়া।

তখন দেবযানী বলল–অসুরগণ যখন তোমাকে বার বার হত্যা করল, তখন থেকেই তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা জন্মেছে। তা তোমার স্মরণ করা উচিত।

হে প্রিয়তম, তোমার প্রতি আমার যে অনুরাগ জন্মেছে তা তোমার অজানা নয়, তাই আমাকে উপেক্ষা করা উচিত নয় তোমার।

কচ আবার বলল–আমাকে ক্ষমা কর দেবযানী। যাঁর ঔরসে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, তার উদরে আমিও বাস করেছি। কাজেই ধর্মানুসারে তুমি আমার ভগিনী হও। এমন কথা আর বোলো না। ধর্মানুসারে কথা প্রসঙ্গে তুমি আমাকে স্মরণ কোরো। আর নিত্য আমার গুরুদেবের সেবা কোরো।

দেবযানী বল–হে কচ, দৈত্যদের দ্বারা যখন তুমি মারা গেলে, তখন তোমাকে আমি স্বামীর জ্ঞানেই রক্ষা করেছি। তারপর একটু রেগেই বলল দেবযানী–আমাকে বিয়ে না করে যদি তুমি চলে যাও, তাহলে তোমাকে এই অভিশাপ দিচ্ছি, তোমার বিদ্যা সিদ্ধ হবে না।

দুঃখিত হয়ে কচ বলল–দেবযানী, তোমাকে গুরুকন্যা রূপেই ত্যাগ করছি। গুরুর অনুমতি পেয়েছি আমি ফিরে যাবার। কেন আমাকে এমন অভিশাপ দিলে তুমি? ধর্মানুসারেই সব কথা

বলেছি আমি। তোমার উচিত হয়নি আমাকে শাপ দেওয়া। তুমি যেমন অন্যায়ভাবে আমাকে শাপ দিলে, তাই তোমারও কামনা সিদ্ধ হবে না। কোন ঋষিকুমার তোমাকে বিয়ে করবে না।

হে গুরুপুত্রি, আমার বিদ্যা তোমার শাপে সিদ্ধ না হলেও, যাকে আমি শিক্ষা দেব তার বিদ্যা সিদ্ধ হবে। এই কথা বলে কচ স্বর্গলোকে উপস্থিত হলে ইন্দ্রাদি দেবগণ মহানন্দে কচকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল–তুমি আমাদের মহামঙ্গলজনক কর্ম করেছ। তোমার এই কীর্তি অক্ষয় হবে। তুমি দেবগণের ফলভোগী হবে।

দেবগুরু বৃহস্পতির ছলনায় দানবদের পরাভব

দেবতা ও দানবদের মধ্যে যেন সাপে-নেউলে সম্পর্ক। তাদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ হয়। একবার দেবতাদের কাছে যুদ্ধে বিধ্বস্ত হলে, সবাই গিয়ে পড়ল গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের পায়ে।

হে গুরুদেব, দেবতারা যুদ্ধে আমাদের হারিয়ে যজ্ঞ করছে। আর সেই যজ্ঞে কিনা আপনি গিয়েছেন? আমরা আপনার অভাবে দিশাহারা। মর্ত্যভূমি ছেড়ে রসাতলে থাকতে হচ্ছে।

এই কথা শুনে শুক্রাচার্য্য তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–তোমাদের ভয় নেই, আমি তোমাদের রক্ষা করব। পৃথিবীতে যত রত্ন, মন্ত্র, ঔষধি আছে সবকিছুই আমার আয়ত্তে। দেবতাদের আছে মাত্র চার ভাগের এক ভাগ। তোমাদের সবকিছুই আমি দান করব।

এদিকে দেবতারা যুক্তি করলেনশুক্রাচার্য্য, আমাদের যা কিছু প্রভুত্ব আছে, তার সবকিছু বরণ করেছেন অসুরদের দেবার জন্য। যতক্ষণ তিনি সেই বিদ্যা দানবদের দিচ্ছেন না, তার মধ্যে গিয়ে আমরা তাদেরকে সংহার করব। আর যারা বেঁচে থাকবে, তাদেরকে পাতালে পাঠিয়ে দেব।

এই চিন্তা করে দেবতারা দানবদের আক্রমণ করলে, দানবরা ভয়ে শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হল। দেবতারা তখন তাদেরকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

ভার্গব দানবদের বললেন–এইসব ত্রৈলোক্য তোমাদের ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদের রূপ ধরে বিষ্ণু বলির কাছে প্রার্থী হয়ে ত্রিপাদে সব কিছু কেড়ে নিয়ে বন্দী করে পাতালে পাঠিয়ে দিল। তোমাদের মধ্যে যাঁরা প্রধান, তাদেরকেও দেবতারা বিনাশ করল। এখন অল্প কয়েকজন মাত্র আছ তোমরা। এখন তোমাদের যুদ্ধ করা উচিত নয়। মন্ত্র সাধনের জন্য আমি শিবের কাছে যাচ্ছি। সিদ্ধি লাভ করে দেবতাদের সঙ্গে লড়াই করব। আমার না ফেরা পর্যন্ত তোমরা আমার পিতার আশ্রয় থাকবে।

তারপর শুক্রাচার্য মহেশ্বরের কাছে গিয়ে প্রণাম জানিয়ে বললেন–হে দেব, যে সব মন্ত্র দেবগুরু বৃহস্পতির জানা নেই, দেবতাদের পরাজিত করবার জন্য সেসব মন্ত্র পাবার জন্য আমি আপনার কাছে এলাম।

মহাদেব বললেন–এই মন্ত্র পাবার জন্য তোমাকে একটা ব্রত করতে হবে। পুরো এক হাজার বছর নতশিরা হয়ে কেবল কনধূম পান করে যদি থাকতে পার, তাহলে এই দুর্লভ মন্ত্রগুলি লাভ করতে পারবে।

এই কথা শুনে শুক্রাচার্য্য রাজী হয়ে শিবের চরণ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে ব্রত সাধনের জন্যে চলে গেলেন। আর দানবরা তপস্বীর মতো হিংসা, দ্বেষ পরিত্যাগ করে ভৃগুমুনির আশ্রমে থাকল।

দেবতারা এখন সুযোগ পেয়ে ভূগুর আশ্রমে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করল।

অসুররা অবাক হয়ে ভাবল, আমাদের গুরুদেব এখানে নেই। তপস্বীর মত কালযাপন করছি আমরা অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করে। কি করা যায় চিন্তা করে তারা ভৃগুপত্নীর শরণাপন্ন হল।

শুক্রমাতা তাদের অভয় দিয়ে দেবতাদের বললেন–এ কি তোমাদের ব্যবহার? আমাদের আশ্রমে দানবরা শান্তভাবে আছে। তাদের নিরস্ত্র দেখে বাহাদুরি দেখাতে এসেছ?

কিন্তু একজন নারীর কথায় দেবতারা ভয় না পেয়ে অস্ত্র ছুঁড়তে লাগল। তাই দেখে ভৃগুপত্নী যোগপ্রভাব ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করে দিলেন–তারপর ভৃগুপত্নী বললেন–আমি ইন্দ্রকে বিনাশ করব। এই কথা শুনে দেবতারা সবাই পালিয়ে গেল। আর ইন্দ্র বিষ্ণুর পরামর্শ মতো তার দেহে প্রবেশ করলেন।

এই দেখে শুক্রমাতা রেগে গিয়ে বললেন–বিষ্ণুর সঙ্গে ইন্দ্রকে আমি পুড়িয়ে মারব।

মহাতপস্বিনীর এমন কথা শুনে ইন্দ্র ও বিষ্ণু খুব ভয় পেয়ে গেলেন। ইন্দ্র বিষ্ণুকে বললেন–আর কোনো উপায় নেই, ঐ মহাযোগিনীকে এক্ষুণি বধ করুন।

বিষ্ণু স্ত্রীহত্যার ভয়ে ভীত, কিন্তু আর কোনো উপায় না দেখে বিষ্ণু সুদর্শন চক্রের দ্বারা ভৃগুপত্নীর কণ্ঠ ছেদন করলেন।

ভৃগু সমাধিতে মগ্ন ছিলেন। ধ্যান ভঙ্গে এই স্ত্রী বধ দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বিষ্ণুকে অভিশাপ দিলেন–ধর্মতত্ত্ব জেনেও তুমি যখন অবধ্য ত্রীলোককে হত্যা করলে, তার ফলে তোমাকে সাতবার মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মাতে হবে।

তারপর ভৃগু যোগবলে মৃত স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তুললেন। এভাবে ভৃগুর প্রভাব দেখে ইন্দ্র ভীত ও দুঃখিত হয়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন।

একদিন ইন্দ্র তার মেয়ে জয়ন্তীকে বললেন–বর্তমানে খুব বিপদগ্রস্ত আমি। যদি আমার একটা কাজ করে দাও তুমি, তাহলে এই বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারি।

জয়ন্তী বলল–বল বাবা, আমাকে কি করতে হবে?

ইন্দ্র বললেন–শুক্রাচার্য্য দানবদের মঙ্গলের জন্য কঠোর তপস্যা করছে। তুমি তার কাছে গিয়ে তাকে নানাভাবে সেবা করবে। তিনি যাতে পরিতুষ্ট হন, সেভাবেই তুমি তার আরাধনা করবে। তার উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে দান করলাম।

ইন্দ্রে কথামতো জয়ন্তী শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে দেখল, শুক্রাচার্য্য অধোমুখ হয়ে ধুমপান করছেন। তার দেহ একেবারে কঙ্কালসার। তখন জয়ন্তী বহু স্তবস্তুতি করে তার সেবায় নিযুক্ত হল। তার সেই কঠোর ব্রতের সহায়ক সব কাজ করল। এইভাবে এক হাজার বছর পূর্ণ হলে শুক্রাচার্য্যের ধুমব্রত সাঙ্গ হল। মহাদেব তার ব্রত সাধনে তৃপ্ত হয়ে বললেন–হে দ্বিজ, একমাত্র তুমিই এই ব্রত সাধন করলে। তপস্যা, বুদ্ধি, বল, শাস্ত্র-জ্ঞান ও তেজের দ্বারা সমস্ত দেবতাকে একাকী তুমিই বিমোহিত করবে। ভৃগুনন্দন আর একটি কথা মনে রেখো। এই গোপন ব্যাপার কারও কাছে তুমি প্রকাশ করবে না। তুমি ধনবান ও অবধ্য হবে।

শিবের বরে শুক্রাচার্য মহা আনন্দিত হয়ে শিব সম্বন্ধীয় এক দিব্য স্তোত্র পাঠ করলেন। শিব আরও খুশি হয়ে তাঁর দিব্য রূপের দর্শন দিয়ে ভাগবকে স্পর্শ করে অন্তর্হিত হলেন।

তারপর শুক্রাচার্য্য অনুচরী জয়ন্তীকে পাশে দেখে বললেন–হে সুভাগ, কি তোমার পরিচয়? তুমি কিসের জন্য এমন কঠোর সাধনায় রয়েছ? কি অভিলাষে তুমি আমার এমন সেবা করছ? তোমার ভক্তি, বিনয়, ধৈর্য্য, সংযম ও স্নেহশীলতায় আমি খুব খুশী। মনে তোমার নিশ্চয় কোনো অভিলাষ আছে, আমার কাছে খুলে বল, যত দুষ্করই হোক না কেন, তোমাকে আমি দেব।

শুক্রাচার্যের কথায় ইন্দ্রকন্যা জয়ন্তী বিনয়ের সঙ্গে বলল–আমার অভিলাষ আপনি তপের দ্বারাই জানতে পারেন। আপনার কাছে কোনো কিছুই অজানা নয়।

তখন ভার্গব দিব্যনেত্র দ্বারা তার মনের ভাব জেনে বললেন–হে ভামিনি, আমার সঙ্গে তুমি দশ বছর বিহার করতে চাও। ঠিক আছে, তাহলে আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চল।

তারপর শুক্রাচার্য জয়ন্তীকে বিবাহ করে দশটি বছর ধরে মায়াবৃত হয়ে তার সঙ্গে বিহার করতে লাগলেন সবার অদৃশ্য হয়ে।

গুরু শুক্রাচার্য্য কঠোর ব্রত সাধনের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে ঘরে ফেরার সংবাদ পেয়ে দানবেরা আনন্দে তার দর্শন লাভের জন্য তার ঘরে গেল। কিন্তু তিনি মায়বৃত থাকায় কেউ তাকে দেখতে পেল না।

দেবগুরু বৃহস্পতি শুক্রাচার্য্য ও জয়ন্তীর বিষয়ে ধ্যানযোগে জেনে শুক্রাচার্য্যের রূপ ধরে দৈত্যদের কাছে গেলেন।

তাদের বৃহস্পতি বললেন–তোমাদের মঙ্গলের আমি এসেছি। শিবের কাছে আমি যে বিদ্যা লাভ করেছি, তা সবই তোমাদের দেব। এই বলে কপট ভাবে তিনি তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন।

এদিকে শুক্রাচার্য জয়ন্তীর সঙ্গে দশটি বছর বিহার করে শিষ্যগণকে দেখবার উদ্দেশ্যে দৈত্যদের গৃহে গিয়ে দেখলেন তারই বেশ ধরে বৃহস্পতি গুরুর আসনে বসে আছেন।

শুক্রাচার্য্য তখন দৈত্যদের উদ্দেশ্যে বললেন–ওরে মূঢ়গণ, বৃহস্পতির দ্বারা তোমরা প্রতারিত হচ্ছ। আমি তোমাদের গুরু শুক্রাচার্য্য।

তখন দানবরা বিভ্রান্ত হয়ে দুজনকে দেখতে লাগল। একজন গৃহের মধ্যে বসে পাঠ দিচ্ছেন। অন্যজন দাঁড়িয়ে। তারা বুঝতে পারল না কে আসল আর কে নকল।

তাদের এই অবস্থা দেখে ভার্গব বললেন–ওহে মূঢ়গণ, আমিই তোমাদের আচার্য্য। যার দ্বারা তোমরা বঞ্চিত হয়েছ–সে ঐ দেবগুরু বৃহস্পতি। তোমরা বৃহস্পতিকে ছেড়ে আমাকে অনুসরণ কর।

এই কথায় দানবগণ কিছুই স্থির করতে পারল না। বৃহস্পতি তখন বললেন–দৈত্যগণ, আমিই তোমাদের গুরু। আর উনি আমার রূপে বৃহস্পতি, তোমাদের সর্বনাশ করার জন্য এসেছেন।

তখন অসুররা বলল–ইনি আমাদের দশ বছর ধরে শিক্ষাদান করছেন, কাজেই আমাদের গুরু ইনি। তোমাকেই মনে হচ্ছে কপট। ইনি যেই হোন, ইনিই আমাদের গুরু। এখন এঁর আদেশই আমরা পালন করব। আপনি এখন আসতে পারেন।

শুক্রাচার্য্যের অনেক হিত কথা বলাতেও যখন অসুররা তা শুনল না তখন তিনি ভীষণ কুপিত হয়ে বললেন–অচিরেই তোদের পরাজয় হবে।

ভার্গব এই অভিশাপ দিয়ে চলে গেলেন। মনে মনে খুশী হলেন বৃহস্পতি। তারপর অসুরদের ভাবী বিনাশ বুঝতে পেরে নিজের রূপ ধরে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এই ঘটনায় অসুররা বিভ্রান্ত হয়ে বলাবলি করল–আমরা বঞ্চিত হলাম, আমাদের উভয় দিক দিয়েই বৃহস্পতি তাড়িত করলেন।

তারপর প্রহ্লাদকে সামনে নিয়ে দানবরা ভার্গবের কাছে গেলে, তিনি তাদের দেখে রেগে বললেন–আমি তোমাদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম, তখন তোমরা আমার কথা শুনলে না। আমার প্রতি অবমাননার ফলে তোমাদের অচিরেই পরাজয় ঘটবে।

এই কথা শুনে প্রহ্লাদ কাঁদতে কাঁদতে বলল–হে গুরু, আপনি আমাদের পরিত্যাগ করবেন না, আপনারই ভক্ত আমরা। আপনি আমাদের আশ্রয় না দিলে কোথায় যাব আমরা?

প্রহ্লাদের বিনীত বচন শুনে ভার্গব ঘটনা অনুধাবন করে ক্রোধ সম্বরণ করে বললেন–তোমরা ভয় কোরো না। দৈব অতি বলবান, যা ঘটার তা ঘটবেই। তোমরা দেবতাদের জয় করলেও একবার তোমাদের পাতালে গিয়ে থাকতে হবে।

গুরুদেবের এই উপদেশ মাথায় নিয়ে প্রহ্লাদের সঙ্গে দানবেরা সেখান থেকে পাতালে চলে গেল।

মিত্রবরুণ ও অগস্ত্যের কাহিনী

দেবতা কিম্বা দানব কেউই সাধারণতঃ মুনিঋষিদের প্রতি বিরূপ বা কোন রকম হিংসা করেন না। কিন্তু এক সময়ে দানবদের অত্যাচারে মুনি-ঋষিরা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

তখন ত্রিভুবনের রাজা ইন্দ্র, অগ্নিদেব আর বরুণদেবকে সেই দানবদের দমনের জন্য পাঠালেন। অগ্নি প্রলয়কারী রূপ ধরে আগে আগে চললেন আর তার পিছে পিছে পবনদেব প্রলয়বেগে চললেন। দানবপুরীর ঘরবাড়ি, বন-উপবন, সব কিছু সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। দানবরাও সেই আগুন থেকে রেহাই পেল না।

তখন তারক, বিরোচন, কমলাক্ষ প্রভৃতি প্রধান কয়েকজন অসুর প্রাণভয়ে ভীত হয়ে সমুদ্রে দুর্গ তৈরি করে বাস করতে লাগল।

তখন অসুরদের অত্যাচার থেকে মুনি-ঋষিরা বাঁচলেন আর দেবতারাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু অসুররা রাগে যখন তখন সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসে মুনি-ঋষিদের ওপর অত্যাচার চালাত। তারপর সমুদ্র দুর্গে আশ্রয় নিত। ইন্দ্র অসুরদের দমন করার চেষ্টা করেও বিফল হন।

এইভাবে বহুদিন কেটে যাবার পর, দানবদের অত্যাচার থামানোর জন্য আবার অগ্নি ও বায়ুকে পাঠালেন। বলে দিলেন–সমুদ্রের জল শুকিয়ে দিয়ে ওদের পুড়িয়ে মারবে। এই কথা শুনে অগ্নি ও বায়ু বুঝতে পারলেন যে এই কাজ করা সম্ভব নয়। তাদের চুপ থাকতে দেখে ইন্দ্র অবাক হয়ে বললেন–কি হল? তোমরা কেউ কিছু বলছ না কেন? আমার আদেশ অমান্য করতে চাও?

তখন অগ্নি ও পবন বললেন–হে দেবরাজ, আপনি সত্যিই কি আমাদেরকে সমুদ্র শুকিয়ে দেবার আদেশ করলেন? এই কথা শুনে ইন্দ্র রেগে গিয়ে বললেন–আমি কি তোমাদের ঠাট্টা-তামাসা করছি?

তখন পবন আর অগ্নি বললেন–দেবরাজ, আপনি কি ভেবে-চিন্তে আমাদের এই আদেশ দিলেন? বিশাল সমুদ্রের কোন কূল-কিনারা নেই। কত অসংখ্য প্রাণী সেখানে বাস করে। কয়েকজন অসুরকে মারবার জন্য, এই সব নির্দোষ প্রাণীদের হত্যা করার কোন প্রয়োজন আছে কি?

পবনদেব ও অগ্নির কথা শুনে ইন্দ্র রেগে গিয়ে বললেন–এত সাহস তোমাদের যে আমার কথার সমালোচনা কর। আমার আদেশ অমান্য করার জন্য যাও তোমরা মর্তে গিয়ে ঋষি হয়ে থাক। প্রাণীদের প্রতি তোমাদের যখন এত দয়া, রাজ আজ্ঞা অবমাননা করে অহিংসা ধর্মকে পালন করতে চাইছ। তাহলে যাও ঋষি হয়ে অহিংসা ধর্ম পালন কর। কিন্তু তোমাদের দেহ আলাদা হবে না। একই দেহে দুজনে থাকবে।

অগ্নি ও বরুণ দেবরাজের অভিশাপ মাথায় নিয়ে মর্ত্যে এলেন একই দেহে মিত্রাবরুণ নাম নিয়ে। এই মিত্রাবরুণের পুত্র হলেন অগস্ত্য মুনি। এক অদ্ভুত ভাবে জন্ম হয় এই অগস্ত্য মুনির।

ধর্মের ঔরসে নারায়ণ ঋষি নাম দিয়ে ভগবান বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহুকাল গন্ধমাদন পর্বতে কঠোর তপস্যা করেন। ইন্দ্র তার তপস্যা দেখে ভয় পেয়ে ভাবলেন তার সিংহাসনে কেড়ে নেবার জন্য বুঝি নারায়ণ ঋষি তপস্যা করছেন। ইন্দ্র তার তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য মদনদেবকে আদেশ করলেন।

রতিপতি মদন তার দলবল নিয়ে তপস্যা ভঙ্গ করবার বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। নারায়ণ ঋষি নির্বিকার থাকলেন। নারায়ণ ঋষি যখন জানতে পারলেন যে, এ সবই স্বয়ং দেবরাজের কীর্তি, তখন তিনি নিজের ঊরু থেকে অপূর্ব একটি রমণীরত্ন সৃষ্টি করে ইন্দ্রকে উপহার দিলেন। তার নাম রাখলেন ঊর্বশী। এই উর্বশীকে দেখে মদনদেবেরও মাথা ঘুরে গেল।

মিত্রাবরুণ এই সময়ে সেই গন্ধমাদন পর্বতে ছিলেন। মহান সংযমী সেই দুই ঋষিও উর্বশীকে দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। মিত্র আগে গিয়ে উর্বশীকে তার মনের কথা বললেন। উর্বশীর প্রতি নারায়ণ ঋষির আদেশ ছিল, যে ডাকবে তার কাছে সে যাবে, তাই উর্বশী মিত্রের ডাকে সাড়া দিল। তা দেখে বরুণ স্থির থাকতে না পেরে, তার আঁচল ধরে টানতে লাগলেন।

তখন উর্বশী বরুণকে বললেন–আমি আগে মিত্রের ডাক পেয়েছি। তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে তোমার কাছে ফিরে আসব। তখন বরুণ বাধ্য হয়ে উর্বশীকে বললেন–যাচ্ছ যাও, আমার কথা যেন ভুল না।

ঊর্বশী সম্মত হয়ে মিত্রের কাছে চলে গেল। কিন্তু উর্বশী বরুণকে এভাবে কথা দেবার জন্য মিত্রদেব ভীষণ রেগে গিয়ে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। কোন কথা না বলে চলে

গেলেন উর্বশী। কিন্তু তাকে কামনার ফলে যে শক্তি সঞ্চিত হয়েছিল, সেই শক্তি এক জলভর্তি কুম্ভের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

ঋষিদের বীর্য্য কখনও ব্যর্থ যায় না। তাতেই অগস্ত্যের জন্ম হল। কুম্ভের মধ্যে জন্মের কারণ তার এক নাম হল ‘কুম্ভজ’ বা ‘কুম্ভযোনি’। পরে এই অগস্ত্য সমুদ্রকে শোষণ করে অসুরদের সংহার করবার জন্য কঠোর তপস্যা করে মহাশক্তির অধিকারী হলেন।

এইভাবে সমুদ্র শোষণ হতেই অগ্নিদেব ও পবনদেব শাপমুক্ত হয়ে স্বর্গলোকে ফিরে গিয়ে নিজ নিজ পদ অলঙ্কৃত করলেন।

মহারাজা পুষ্পবাহনের কাহিনী

পুষ্কর দ্বীপের অধিপতি পুষ্পবাহনের তপস্যায় ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে একটি বিশাল স্বর্ণকমল দিয়ে বললেন–তুমি এই পদ্মেই বাস করবে। এই পদ্মকে যেমন তুমি নির্দেশ করবে, সেখানে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ এই পদ্মাই তোমার বাস ও বাহনের কাজ করবে। এবার পুষ্কর দ্বীপ তোমারই শাসনে থাকবে।

ব্রহ্মার কাছে এই বর লাভ করার জন্য তার নাম হল পুষ্পবাহন। ধর্মানুসারে প্রজাপালন করলেন। লীলাবতাঁকে বিয়ে করলেন। আর সেই পুষ্পবিমান চড়ে আত্মীয়-স্বজন ও মহিষীকে নিয়ে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে, এক লোক থেকে অন্য লোকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। মর্তবাসীরা আশ্চর্য হয়ে সোনার রঙের বিশাল পদ্মফুলের মত বিমানটিকে দেখত।

পুষ্পবাহন মাঝে মাঝে চিন্তা করেন জগতে কত মুনি-ঋষি, যোগী, রাজা, দৈত্য-দানবেরা তপস্যা করছেন কিন্তু তেমন কঠোর তপস্যা তিনি করেননি। তবুও ব্রহ্মা তাঁকে এমন দুর্লভ বিমান কেন দিলেন? এর মধ্যে কোন রহস্য কি থাকতে পারে?

তার কিছুতেই এই বিস্ময় দূর হয় না। একদিন তার রাজসভায় প্রচেতা মুনি এলেন। রাজা পুষ্পবাহন তাঁকে খুব খাতির করার পর বললেন–মুনিবর, ত্রিকালদর্শী আপনি, আপনার অজানা কিছুই নেই। একটি বড় বিস্ময় আমার মনে, সেটা জানার জন্য আমার মতো, সেটি জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি–কঠোর তপস্যা না করেও আমি কেমন করে এমন সৌভাগ্যবান হলাম? দয়া করে আপনি আমায় বলুন।

প্রচেতা মুনি কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে তারপর চোখ খুলে বললেন–হে রাজন, আপনি পূর্বজন্মে বহু সাধনা করেছিলেন, তাই এ জন্মে অল্পতেই সমস্ত তপস্যার ফল পেয়ে গেলেন। মুনির কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে রাজা বললেন–মুনিবর, এত সৌভাগ্য আমি কিন্তু চাইনি। আমার এতে কোনো মোহ নেই। আমার পূর্বজন্মের ইতিহাস জানতে ইচ্ছা করছে।

তখন প্রচেতা মুনি বললেন–এত সব লাভ করেও আপনি যে মোহগ্রস্ত হননি তা আমি জানি। পূর্বজন্মে আপনি ছিলেন এক ব্যাধ। বড় নিষ্ঠুর ছিলেন আপনি। নির্বিচারে পশু হত্যা করতেন। দেহের দিকে কোনো নজর নেই। দেহে ময়লা জমে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে তাতেও কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। শিকারের নেশা প্রবল থাকার অন্য কোন দিকে আপনি লক্ষ্য রাখতেন না।

একসময় সারাদেশ অনাবৃষ্টি দেখা দিল। খাদ্যের অভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ক্ষুধার জ্বালায় খাদ্যের জন্য বন থেকে বনান্তরে ছুটে বেড়াল সেই ব্যাধ। সঙ্গে ছিল তার বউ। একটু এগোতেই তারা একটি সুন্দর সরোবর দেখতে পেল। তাতে এখনও অনেক জল আছে। সেই সরোবরে ব্যাধ ও ব্যাধিনী স্নান করল ও সেই জল পান করল। সেই সরোবরে অনেক সুন্দর সুন্দর পদ্মফুল ফুটে আছে। ব্যাধ চিন্তা করল–যখন সর্বত্রই অনাবৃষ্টি তখন শহরেও ফুলের আকাল হবে। যদি আমি এই সরোবরের পদ্মফুল নিয়ে শহরে যাই নিশ্চয় লোকে তা কিনবে। আর সেই পয়সায় আমরা খাবার কিনে খেতে পারব।

এই চিন্তা করে ব্যাধ ও ব্যাধিনী পদ্মফুল তুলে নিয়ে বিদিশা নামে নগরে চলল। নগরের পথে পথে তারা ফুল নিয়ে ঘুরল কিন্তু কেউ কিনল না সেই ফুল। ক্রমে সন্ধ্যা নামলে তারা শহরের এক প্রান্তে ফিরে এল। একটা গাছতলায় বসে রইল তারা। অনাহারে কেটেছে সারাটা দিন। অনেক রাত্রি হয়েছে, এমন সময় তারা কাসর ঘন্টার শব্দ শুনতে পেল।

তারা ভাবল–নিশ্চয় কোথাও কোন দেবতার পূজা হচ্ছে। যাই গিয়ে দেখি। তখন তারা সেই শব্দ অনুসরণ করে গিয়ে একটি বিষ্ণুমন্দিরে উপস্থিত হয়ে দেখল-ভগবান বিষ্ণুর পূজা হচ্ছে সেখানে।

বিদিশা শহরের অনঙ্গবতী নামে এক বেশ্যা, বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ব্রত করে সে রাতে এসেছিল বিষ্ণুর পূজা দিতে ঐ মন্দিরে। বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দামী দামী জিনিস, এমনকি বিছানাপত্রও দেওয়া হয়েছিল। বিষ্ণু বিগ্রহকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল।

ব্যাধ ও ব্যাধিনী একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে সেই বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করছিল। তারপর অনঙ্গবতাঁকে ডেকে বলল–পূজার জন্য আমি এই পদ্মগুলো নিয়ে এসেছি, তুমি নাও। অনঙ্গবতী সেগুলো নিয়ে তার পূর্বের সংগৃহীত ফুলের সঙ্গে মিশিয়ে দিল।

ব্যাধ মনে মনে বলল–হে ঠাকুর, ফুলগুলো তুলেছিলাম আমি, বিক্রি করে কিছু কিনে খাব বলে। কিন্তু যখন কেউ এই ফুল কিনল না, তখন তোমাকেই দিচ্ছি, তুমিই নাও। আমার তো আর দেবার মত কিছুই নেই।

সারারাত ধরে মহা ধুমধামে পূজা করে অনঙ্গবতীর ব্রত শেষ হল। সেই নগরে যত ব্রাহ্মণ ছিল তাদের সবাইকে অনঙ্গবতী প্রসাদী খাবার আর শয্যাদান করে দক্ষিণা দিল। ব্যাধ ও ব্যাধিনীকে দিল বিষ্ণুর প্রসাদ। সারাদিন ও রাত্রি উপবাস করার পর তারা প্রসাদ খেল।

রাজা পুষ্পবাহনের স্ত্রী লীলাবতী কৌতূহলী হয়ে মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন-হে মুনিবর, বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অনঙ্গবতী যে ব্রত করেছিল, সেই ব্রতের নাম কি?

প্রচেতা মুনি বললেন–সেই ব্রতের নাম বিভূতি দ্বাদশী। শ্রীবিষ্ণুর প্রিয় এই ব্রত যে পালন করবে, তার পরম সৌভাগ্য লাভ হবে। অনঙ্গবতী যথাযথভাবে সেই ব্রত পালন করেছিল তাই তার সকল অভীষ্ট পূর্ণ হল। সেই ব্যাধ দম্পতি সারাদিন সারারাত্রি উপবাস করে কেবলমাত্র পদ্মফুল দিয়ে মনে মনে শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেছিল বলে, তাদেরও ব্রত পালন হল। তার ফলও তারা লাভ করল।

হে রাজন, সেই ব্যাধই এই জন্মে পুষ্কর–দ্বীপের রাজা, আর তার ব্যাধিনী বর্তমানে আপনার রানি লীলাবতী। মুনিবরকে রাজা পুষ্পবাহন ও রানি লীলাবতী প্রণাম জানালে তিনি তাদের আশীর্বাদ করে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

তারকাসুর বধ

অদিতির বারোজন ছেলেই অমৃত খেয়ে অমর। আর দিতির পুত্ররা মহাবীর্য্যশালী হয়েও সকলকে একদিন মরতে হল।

কাঁদতে কাঁদতে একদিন দিতি স্বামী প্রজাপতি কশ্যপকে বললেন–হে স্বামী, আপনার ঔরসজাত আমার পুত্রদের কেন এমন দশা হল? আপনি আমার গর্ভে এমন এক পুত্র সৃষ্টি করুন, যে হবে অজেয় বীর।

তখন মহামতি কশ্যপ দিতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন–যদি দশ বছর ধরে তুমি তপস্যা করতে পার, তাহলে তোমার যে পুত্র জন্মাবে, সেই পুত্রের সকল অঙ্গ হবে বজ্রসারময়। তাই বজ্রাদি কোন অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারাও সে বিনষ্ট হবে না।

তখন স্বামীর উপদেশমত দিতি বনে গিয়ে দশ বছর তপস্যা করলেন। তারপর লাভ করলেন এক দুর্জয় পুত্র। তার নাম রাখলেন বজ্রাঙ্গ। ক্রমে বজ্রাঙ্গ সব শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে মা দিতিকে প্রণাম করে জানতে চাইল যে, সে এবার কি করবে।

দিতি মনের আনন্দে বললেন–আমার বহু পুত্রকে ইন্দ্র বিনাশ করেছে, এখন তুমি তার প্রতিশোধ– নাও। সেই উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি।

সেই কথা শুনে বজ্রাঙ্গ স্বর্গলোকে গিয়ে পাশের দ্বারা ইন্দ্রকে বেঁধে মা দিতির কাছে নিয়ে এল। বজ্রাঙ্গের এমন ক্ষমতা দেখে ব্রহ্মা এবং তার পিতা কশ্যপ তার কাছে গিয়ে বললেন–পুত্র, এই যে ইন্দ্রকে তুমি বেঁধে নিয়ে এলে, তাতে তোমার কি লাভ হল? ছেড়ে দাও ওকে। সম্মানীয় অপমান মৃত্যুতুল্য। বিশেষ করে আমাদের অনুরোধে যাঁর মুক্তি হল, একরকম মৃতই তিনি।

এমন কথা শুনে দৈত্য বজ্রাঙ্গ তাদের বলল–ইন্দ্রে কোন প্রয়োজন নেই আমার। কেবলমাত্র মায়ের আজ্ঞা পালন করেছি। হে প্রপিতামহ, আমি আপনার বাক্য পালন করছি। ইন্দ্রকে মুক্ত করলাম, হে দেব, আমাকে একটি বর দিন, তপস্যায় আমার যেন মতি থাকে। আর তা যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

ব্রহ্মা বললেন–হে তাত, আমার নির্দেশ পালন করে তুমি তপস্যাই করলে। এই চিত্তশুদ্ধির দ্বারাই তোমার জন্মের পর্যাপ্ত ফল হয়েছে। .

এই কথা বলে ব্রহ্মা বরাঙ্গী নামে এক কন্যার সৃষ্টি করে বজ্রাঙ্গকে পত্নীরূপে দান করে সেখান থেকে অদৃশ্য হলেন।

তারপর তপস্যার জন্য বজ্রাঙ্গ পত্নী বরাঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে বনে গমন করলেন। হাজার বছর উপরদিকে হাত তুলে হাজার বছর নীচের দিকে মুখ রেখে, হাজার বছর পঞ্চাগ্নির মধ্যে থেকে অনাহারে ঘোর তপস্যা করল। তাতে রাশি রাশি পুণ্য সঞ্চয় হল তার। তারপর এক হাজার বছর জলের মধ্যে থেকে তপস্যা করল।

যখন তপস্যার জন্য সেই দৈত্য জলের মধ্যে প্রবেশ করল, তখন তার স্ত্রী বরাঙ্গী নির্বাক হয়ে অনাহারে তপস্যা করতে লাগল।

ইন্দ্র খুব ভয় পেয়ে বরাঙ্গীর কাছে গিয়ে নানান বিভীষিকা সৃষ্টি করে তার তপোভঙ্গ করার চেষ্টা করলেও দৈত্য পত্নীর কোন ক্ষতিই করতে পারলেন না। বানর, মেষ ও সাপের রূপ ধরে তার তপোবিঘ্নে অক্ষম হয়ে শেষে শৃগালের রূপ ধরে আশ্রমকে অপবিত্র করেন। তারপর মেঘের রূপ ধারণ করে মুষলধারে বৃষ্টিপাত শুরু করলেন। জলে ভাসিয়ে দিতে চান আশ্রমকে।

এভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে ব্যর্থ হয়েও ইন্দ্র নিবৃত্ত হলেন না। তখন বরাঙ্গী ইন্দ্রকে জানতে পেরে ক্রোধবশে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলে, তখন ইন্দ্র আপন রূপ ধরে দৈত্যপত্নীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

এদিকে বজ্রাঙ্গের জলের মধ্যে তপস্যার হাজার বছর পূর্ণ হল। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে তাকে বর দেওয়ার জন্য সেখানে এলেন।

বজ্রাঙ্গ ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বলল–আমাকে অক্ষয়লোক দান করুন। আমার অসুরভার দূর করুন।

ব্রহ্মা সেই ভাব দূর করে চলে গেলেন। তখন ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত দৈত্য নিজের আশ্রমে এসে দেখলেন শূন্য আশ্রম। তার পত্নী সেখানে নেই। ক্ষুধার জন্য ফলমূল সংগ্রহ আর পত্নীকে খোঁজ করার উদ্দেশ্যে সে বনে গেল। সহসা এক জায়গায় ক্রন্দনরতা বরাঙ্গীকে দেখতে পেল।

তখন দৈত্য তাকে জিজ্ঞাসা করল–কি হয়েছে তোমার? এভাবে কাঁদছ কেন তুমি? তোমাকে কেউ অপমান করেছে? বরাঙ্গী বলল–দেবরাজ ইন্দ্র বহু চেষ্টা করেছে আমার তপোবিঘ্নের

জন্য। সেই ভয়ে দুঃখে আমি প্রাণত্যাগের কথা চিন্তা করছি। হে স্বামী, তুমি আমায় এক পুত্র দান কর, যে আমার সব দুঃখ দূর করতে পারবে।

পত্নীর মুখে এই কথা শুনে বজ্রাঙ্গ রাগে ইন্দ্রের প্রতি প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হলেও আবার তপস্যা শুরু করল। তা দেখে ব্রহ্মা এসে বললেন–হে দৈত্য, হাজার বছর নিরাহারে থেকে যে ফল, উপশিত আহার ত্যাগ করে ক্ষণমাত্রেই তা লাভ হয়। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। তপস্যা করতে হবে না। বল, তোমার কি চাই?

বজ্রাঙ্গ ব্রহ্মার কথা শুনে তার স্ত্রীর উপর ইন্দ্রের অত্যাচারের কথা বলে, এক স্বর্গজয়ী পুত্রের কামনা করল। ব্রহ্মা প্রসন্নচিত্তে বললেন–বৎস, তারক নামে তোমার এক পুত্র লাভ হবে।

ব্রহ্মার কথায় দৈত্য খুশী হয়ে বরাঙ্গীকে গিয়ে সব বলল, যথাসময়ে এক হাজার পূর্ণ হয়ে এক ভয়ঙ্কর পুত্র জন্মাল। সেই পুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সসাগরা পৃথিবী কম্পিত হল। ভীষণ বায়ু বইতে লাগল। সেই মহাসুরের জন্মের খবর পেয়ে অসুরেরা আনন্দ-উৎসবে মাতোয়ারা হল। অন্যদিকে দেবতারা বিষণ্নভাবে দিন কাটাতে লাগলেন।

যথাসময়ে সেই তারককে অসুর রাজ্যে অভিষিক্ত করা হল।

পুরুষ যদি আগে উপায় স্থির করে নেয়, তারপরে সে স্থির লক্ষ্মী লাভ করতে পারে। চপল ব্যক্তি কখনই চঞ্চলা লক্ষ্মীকে লাভ করতে পারে না। এই চিন্তা করে তারক তপস্যায় মন দিল। কখন নিরাহারে, কখন গাছের পাতা খেয়ে বা শুধু জল খেয়ে তপস্যাচারণ করতে লাগল। তারপরে দেহ থেকে একটু একটু করে মাংস কেটে আগুনে আহুতি দিল। ক্রমে তার দেহ মাংসহীন হল। তখন সে বহু পুণ্য সঞ্চয় করল। তারকের তপস্যায় দেবতারা খুব ভয় পেয়ে গেল।

সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাকে বর দিতে এলেন। বললেন–বৎস তারক, আর তোমার তপস্যার প্রয়োজন নেই। তোমার অসাধ্য এমন কিছুই নেই। কি বর চাও তুমি?

তারক বলল–আমি সর্ব মহাস্ত্র ও সকল প্রাণীর অবাধ্য হব। এই বর চাই। অন্য কোন বরের প্রয়োজন নেই।

এই প্রার্থনা শুনে ব্রহ্মা বললেন–যখন জন্মেছ তখন একদিন না একদিন মরতেই হবে। তবে যার থেকে সহজে মৃত্যুর আশঙ্কা নেই, এমন কোন জনের হাতে তোমার মৃত্যু হবার বর চেয়ে নাও।

তখন তারক বলল–যখন আমার মৃত্যু হবেই, তাহলে সাত বছরের বালকের হাতে আমার মৃত্যু হোক। ব্রহ্মা সেই বরই দিলেন তাকে।

তারক নিজের রাজ্যে ফিরে এসে সিংহাসনে বসল। বড় বড় দানবরা তার সেবা করতে লাগল। বেশ কিছুদিন এভাবে কেটে গেল।

এতদিন দৈত্যরাজ তার মন্ত্রীদের বলল–যদি স্বর্গ জয় না করলাম আমি, তাহলে আমার এ রাজ্যে সুখ কোথায়? শত্রু নির্যাতন না করলে মনে স্বস্তি লাভ করতে পারছি না। এখনও স্বর্গে দেবতারা সুখভোগ করছে। আমার আট চাকার রথ সাজাও। দৈত্য সৈন্যদের সাজতে বল। শত্রুজয় করবার জন্য এক্ষুনি যাব।

আদেশ পাওয়া মাত্র যুদ্ধের জন্য সব দৈত্যসৈন্যরা বেরিয়ে পড়ল। ঐ বিশাল বাহিনীর নায়ক দশজন। তারা হলেন জম্ভ, কুজম্ভ, মহিষ, কুঞ্জওর, মেমস, কালা নেমি, নিমি, মথন, জম্ভক আর শুম্ভ।

গ্রসনকে সেনাপতি করা হল। একশ বাঘে টানা রথে সে চড়ল। জম্ভের রথ একশ সিংহে টানে। অসংখ্য পিশাচ কুজম্ভের রথ টেনে নিয়ে চলেছে। মহিষের রথ টানছে বহু উট। কালনেমির রথ টানছে অসংখ্য কুকুর।

মহাকোলাহল করে দানব-সৈন্যরা চলেছে। এক দেবদূত তাদের সমর সজ্জা দেখে কালবিলম্ব না করে স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রকে সেই খবর দিল।

তারক স্বর্গ জয় করতে আসছে শুনে ইন্দ্র ভয় পেলেন। ইন্দ্র জানেন তারক যুদ্ধে কারোর হাতে মরবে না। তখন ইন্দ্র গুরুদেব বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করলেন–আপনি বলুন গুরুদেব, আমাদের এখন কি কর্তব্য?

সবদিক বিবেচনা করে বৃহস্পতি বললেন–এমন দৈত্যদের আক্রমণ করাই উচিৎ।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র সকল অমরগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। যমরাজ মহিষের পিঠে চড়ে এগিয়ে চললেন। কুবের চললেন মানুষের কাঁধে চড়ে। পবনদেব মৃগে এবং অগ্নিদেব ছাগলের পিঠে চড়ে চললেন। সূর্য্য, চন্দ্র, বরুণ কেউই স্থির হয়ে বসে রইলেন না। সকলেই বহু কোটি সৈন্য নিয়ে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। স্বয়ং দেবরাজ রথে চড়ে সবার শেষে এলেন। রথ চালিয়ে নিয়ে চলল সারথি মাতলি।

যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব নাগরাও এল এই যুদ্ধে। দেব সৈন্যদের সংখ্যা হল সর্বমোট তেত্রিশ কোটি। সবার হাতে তির-ধনুক, গদা, চক্র, বজ, খঙ্গ, শূল, তলোয়ার, গরুড়াস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র। প্রত্যেকের একটাই উদ্দেশ্য যেমন করে থোক, তারকাসুরকে রুখতে হবে।

তারপর দেবতা ও অসুরদের মধ্যে শুরু হল তুমুল যুদ্ধ। রথীর সঙ্গে রথীর, পদাতিকের সঙ্গে পদাতিকের, অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহী। সেখানে জলধারার মত অস্ত্রের বর্ষণ শুরু হল। রক্তের স্রোত বয়ে যেতে লাগল।

যমরাজ গ্রসনের সঙ্গে যুদ্ধে মাতলেন। দুরন্ত সেই দানব গ্রসনের দাপটে যমসৈন্য কেউই স্থির থাকতে পারল না। যমরাজ গ্রসনের হাতে প্রহৃত হয়ে রাগে তার দণ্ড ছুঁড়লেন। তাতে গ্রসনের কিছু হল না কিন্তু বাঘগুলোর মৃত্যু হল। এমন যমরাজের গায়ে প্রচণ্ড আঘাত করলে, তিনি তাতে জ্ঞান। হারিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

এদিকে কুবের আর জম্ভাসুরের মধ্যে লড়াইতে, কুবেরের বিক্রম বেশিক্ষণ টিকল না। কুবের পরাজিত হলেন জম্ভাসুরের কাছে। পিশাচ অধিপতি নিঋতি ভীষণ যুদ্ধ করলেন কুজম্ভের সঙ্গে। কিন্তু তিনি হার স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

মহিষাসুর আর বরুণদেবের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে, কেউ কাউকে হারাতে পারছেন না। তখন মহিষাসুর হাঁ করে বরুণদেবকে গিলতে এল। চন্দ্র এই দেহে বহু অস্ত্র মারলেন মহিষের উপর। কিন্তু সবই ব্যর্থ হল। তখন চন্দ্র সোমাস্ত্র নামে নতুন অস্ত্র সৃষ্টি করে, সেটি অসুরদের উপর ছুঁড়ে মারলেন। তাতে ঠাণ্ডায় অসুরদের হাত-পা অবশ হয়ে গেলে, তারা আর স্থির হয়ে দাঁড়াতে না পেরে মাটিতে পড়ে যেতে লাগল। এই সুযোগে দেবসেনারা অসুরদের নির্বিচারে মেরে ফেলতে লাগল।

কালনেমি অসুরদের এমন অবস্থা দেখে আর স্থির থাকতে পারল না। মায়াধারী এই অসুর, মায়ার সাহায্যে নিজের শরীরটাকে বিশাল করে গোটা আকাশটাকে ছেয়ে ফেলল, তারপর

হাজার হাজার মায়া সূর্যের সৃষ্টি করল। সেই সব সূর্যের তাপে ঠাণ্ডা দূর হল। আবার দৈত্যসেনারা চাঙ্গা হয়ে উঠতে লাগল।

আবার অসুররা দেবসেনাদের মারতে লাগল। সূর্যদেব এতক্ষণ প্রায় চুপ করেই ছিলেন। কালনেমির এমন কাণ্ড দেখে এক মোক্ষম অদ্ভুত বাণ মারলেন। সেই বাণ রণস্থলের মধ্যে পড়ার পর দেব সেনারা হয়ে দানব সৈন্য আর দানবেরা হল দেবসৈন্য। এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু কালনেমি সূর্যের এমন ধাঁধা বুঝতে না পেরে দেবসেনা মনে করে দানব সৈন্যদের মারতে লাগল।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর খুব সন্দেহ হল কালনেমির। তখন সূর্যের এই তাজ্জব ব্যাপার কালনেমিকে জানাল। তখন কালনেমি সাবধান হয়ে বিপরীত পক্ষকে মারতে লাগল।

তা দেখে একটি মোক্ষম অগ্নিবাণ ছুঁড়লেন সূর্যদেব।

তার ফলে দানব সেনাদের গায়ে ভীষণ জ্বালা করতে লাগল। হস্তী ঘোড়ারাও ছটফট করতে লাগল সেই তাপ সহ্য করতে না পেরে।

কালনেমি দানবদের এই অবস্থা দেখে একটি শরের দ্বারা মেঘ আর বৃষ্টির সৃষ্টি করল। আর দেবতাদের সোমস্ত্রকে আরও উন্নত করে ছুঁড়ল তাদেরই দিকে।

এই অবস্থায় দেবতারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার দায়ে রণক্ষেত্র থেকে যুদ্ধ ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, কালনেমি তাদের ধারালো অস্ত্রের দ্বারা মারতে লাগল।

তাই দেখে কালনেমির ওপর অশ্বিনীকুমারদ্বয় চড়াও হয়ে বানের পর বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। তখন কালনেমি ক্রোধে গর্জন করতে করতে গদা দিয়ে তাদের ভীষণ মারল। সেই গদার আঘাতে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রথ চৌচির হয়ে ভেঙে গেল। তখন তারা অন্য একটি রথে চড়ে কালনেমির দিকে বজ্রাস্ত্র ছুঁড়ে মারলেন।

কিন্তু রণে মহাদক্ষ কালনেমি বজ্র দেখে নারায়ণাস্ত্র মারল। তার ফলে বজ্রের তেজ নষ্ট হয়ে গেল। তাই দেখে দেববৈদ্যরা ভয় পেয়ে ইন্দ্রের রথের কাছে এসে আশ্রয় নিল।

যত দক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নররা এসেছিল, দেবতাদের সাহায্য করতে, তারাও এই যুদ্ধে বিপর্যস্ত হল। অনেকেই ইন্দ্রের শরণাপন্ন হল। এই অবস্থা দেখে কালনেমি তার সৈন্যবল নিয়ে ইন্দ্রকে ঘিরে

ধরল। সকলের তখন ত্রাহি মুধুসূদন অবস্থা। ইন্দ্র সহ অন্যান্য দেবতারা তখন স্মরণ করলেন বিপদহারী মধুসূদনকে।

বিপদের বন্ধু মধুসূদন তখন বহু অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন।

বিষ্ণুকে দেখে দানবদের মধ্যে কোলাহল পড়ে গেল। ঐ কাপুরুষ ইন্দ্রের সঙ্গে না লড়াই করে বিষ্ণুর সঙ্গেই যুদ্ধ করা যাক।

বিষ্ণুকে তারা চারিদিক থেকে আক্রমণ করল। কেশবও পাল্টা আক্রমণ করলেন। দানবরা সবাই বিষ্ণুর আক্রমণে বিপর্যস্ত সেই সময় কালনেমি এক ভীষণ গদা ছুঁড়ল। সেই গদার আঘাতে গরুড় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাওয়াতে, তার পিঠে বসে থাকা নারায়ণও পড়ে যেতে বাধ্য হলেন। তখন নারায়ণকে লক্ষ্য করে জম্ভাসুর অস্ত্র নিক্ষেপ করাতে তিনিও জ্ঞান হারালেন।

তখন দানব সেনাদের উল্লাস শুরু হল। জ্ঞান ফিরে শ্রীহরি বুঝতে পারলেন–এই দুর্জয় অসুরদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি।

শ্রী হরিকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে ইন্দ্র ভীষণ ভয় পেয়ে ভাবল, কে তাহলে এখন তাদের সাহায্য করবে?

তখন অদৃশ্য ভাবে নারায়ণ বললেন–হে ইন্দ্র, গ্রসন আমার হাতে নিহত হয়েছে। একমাত্র জম্ভাসুরকে তুমি মারতে পার, তাতে আমি তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু আর কোনো অসুরই আমাদের হাতে বধ্য নয়।

দৈববাণী শুনে ইন্দ্র মনোবল ফিরে পেয়ে লড়াই শুরু করলেন জম্ভাসুরের সঙ্গে। কিন্তু রণে মহাদক্ষ জম্ভাসুর ইন্দ্রের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল।

ইন্দ্রের এই অবস্থা দেখে আবার নারায়ণ এলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। জম্ভাসুর ইন্দ্রকে উপেক্ষা করে চোখ বুজে নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা চিন্তা করছে। তখন নারায়ণের ইঙ্গিতে সেই সুযোগে ইন্দ্র জম্ভাসুরকে বধ করলেন।

এইভাবে যুদ্ধে গ্রসন ও জম্ভাসুরের নিহত হবার কথা তারকের কাছে পৌঁছোল, সে ক্রোধে অন্যান্য জীবিত দানব সৈন্যদের নিয়ে রণক্ষেত্রে হাজির হল।

শুরু হল আবার ভীষণ যুদ্ধ। ব্রহ্মার বলে বলীয়ান তারকাসুরের বিরুদ্ধে কেউ এগিয়ে এলেন না। তাকে সাহায্য করার জন্য নারায়ণ এলেন। অন্যান্য দেবতারাও এলেন এই যুদ্ধে। তারা সবাই অনেক অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন তারকের বিরুদ্ধে। কিন্তু সব অস্ত্রই ব্যর্থ হল। তারককে ছুঁতেও পারল না।

দানবদের অস্ত্রেই বিধ্বস্ত হতে লাগলেন দেবতারা। এমনকি, এই যুদ্ধে স্বয়ং হরিও পরাজিত হলেন। তারকের সঙ্গে।

জয় হল দানবদের। দানবরাজ তারক মহা উল্লাসে ফিরে গিয়ে সিংহাসনে বসল। কালনেমি এসে বলল–মহারাজ, এখানে কি নিয়ে আসব বন্দীদের? কিংবা অন্য কোথাও রাখব?

আনন্দের সঙ্গে তারক জিজ্ঞাসা করল– কে কে বন্দী হয়েছে?

উত্তরে কালনেমি বলল–ইন্দ্র সহ সব দেবতারাই বন্দী হয়েছেন, আর কেশবও আছেন। তারক বলল-এই ত্রিভুবন এখন আমার অধিকারে। কোথায় আর এদের বন্দী করবে। এদের ছেড়ে দাও। ঘুরে বেড়াক যেখানে খুশী। এর বাইরে তো আর কোথাও যেতে পারবে না।

দানবেন্দ্রের আদেশে সবাইকে ছেড়ে দিল কালনেমি। লজ্জায় দেবতারা আর মাথা তুলতে পারছেন না–কাঁদতে কাঁদতে ইন্দ্র নারায়ণকে বললেন–প্রভু, আপনি সঙ্গে থাকাতেও এই অবস্থা আমাদের কেমন করে হল?

তার উত্তরে নারায়ণ বললেন–বহু কঠোর তপস্যা করে তারক ব্রহ্মার বর পেয়েছে। তার মৃত্যু হবে সাত বছরের একটি ছেলের হাতে। তাহলে তাকে মারার সাধ্য কোথায় আমাদের?

ইন্দ্রসহ দেবতারা চিন্তা করতে লাগলেন, কে সেই বালক, যে হবে তারকের হত্যাকারী? তখন তারা ব্রহ্মার বহু স্তব স্তুতি করলে, ব্রহ্মা জানালেন-তারক এমন তপস্যা করল যে, ত্রিভুবন পুড়ে যাওয়ার উপক্রম হল, তাই আমি তখন বাধ্য হয়ে দেবতাগণের অবধ্য হওয়ার বর দিলাম তাকে। তবে আমি। তার মৃত্যুর ব্যবস্থার করে রেখেছি।

দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করেছেন। তাই শিব এখনও চঞ্চল। সেই সতী হিমালয়ের কন্যারূপে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন। নাম হবে তার পার্বতী। পার্বতী শিবের আরাধনা করে তাকেই বিয়ে করবেন। তখন পার্বতীর গর্ভে জন্মলাভ করবেন কার্তিক। আর সেই কার্তিকের হাতেই তারকের মৃত্যু হবে। কাজেই কিছুকাল তোমারা অপেক্ষা কর।

যথাসময়ে পার্বতীর জন্ম হল। তপস্যা করলেন। শিবের সঙ্গে বিয়ে হল। তারপর শিবের শক্তি বহুজনের হাত ঘুরে দুজন কীর্তিকার কাছে এল। তাদের কাছ থেকে পেলেন হর-পার্বতী। পুত্রে নাম রাখা হল কার্তিক। ব্রহ্মা তাঁকে সেনাপতি রূপে অভিষিক্ত করলেন।

কার্তিকের যখন সাত বছর বয়স তখন দেবতারা তাকে তারকের কথা শোনালে, কার্তিক বললেন–আপনারা নির্ভয়ে থাকুন। ব্রহ্মা যখন বলেছেন যে, সে আমার হাতে মরবে, তাহলে আর চিন্তা কিসের!

বালকের কথা শুনে দেবতাদের মনে আশার সঞ্চার হল, এবার তাহলে নিশ্চয় তারক মরবে।

তখন ইন্দ্র এক দূত পাঠালেন তারকের কাছে। সে তখন গিয়ে তারককে বলল–হে দানবেন্দ্র, এই ত্রিভুবন উৎপীড়ন করে তুমি যে পাপ করেছ, তার শাস্তি এখন পাবে।

দূতের মুখে ইন্দ্রের অস্পর্ধার কথা শুনে দেখে তারক অবাক হয়ে ভাবল বারে বারে যুদ্ধে পরাজিত হয়েও কি এতটুকু লজ্জাবোধ নেই ইন্দ্রের? দূত চলে যাওয়ার পর দানবেন্দ্র তারক চিন্তা করল–ইন্দ্রে এমন সাহস হল কেমন করে? নিশ্চয় কারো আশ্রয় পেয়েছে।

এমন সময়ে সেই অসুর দেখল–আকাশ থেকে রক্ত বৃষ্টি হচ্ছে। চোখ আর বাহু কাঁপছে। প্রাণীগণ অমঙ্গল সূচক রব করছে।

কয়েকদিন পরে তারকের দূত এসে খবর দিল–যুদ্ধের জন্য দেবতারা আসছে। তারক তাড়াতাড়ি প্রাসাদের ছাদে উঠে দেখল-ময়ূরের পিঠে একটি বালক, হাতে ধনুর্বাণ আর দেবসৈন্যরা তার চারিদিকে তারই জয়ধ্বনি দিতে দিতে আসছে।

সেই বালককে দেখে ব্রহ্মার কথা মনে পড়ল তারকের। সাত বছরের বালকের হাতে তার মৃত্যু হবে। তাহলে এই কি সেই মৃত্যুরূপী কাল তার?

দানব সেনাদের তৈরী হতে বলে নিজেই তারক এগিয়ে গেল সেই বালকের কাছে। তারপর বলল-বালক, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তোমার যুদ্ধ করবার ইচ্ছা হয়েছে। তুমি এমন বালক, খেলাধুলা করবে। তা ছেড়ে যুদ্ধের জন্য এসেছ? তুমি ভয়ঙ্কর দানবদের এখনও দেখনি।

দানবেন্দ্রের কথা শুনে কার্তিক হেসে বলল–আমাকে বালক দেখে অবজ্ঞা কোরো না। আমাকে যাচাই করতে চাও, দেখ তবে।

কার্তিকের এমন কথা শুনে দানবেন্দ্র তারক খুব রেগে গিয়ে তার দিকে একটা মুদগর ছুঁড়ে মারল। কুমার বর্জ্যের দ্বারা সেই মুদগরকে বিনষ্ট করে দিলেন। তার একটা ভিন্দিপাল ছুঁড়লে কার্তিক সেটাকে হাতে ধরে, তাকে মুগুর তুলে মারলেন। তারক বুঝতে পারল বালকের শক্তি কত। এ যে সে বালক নয়। নিশ্চয় ব্রহ্মার কথামতো সেই বালক, তার কাল।

ইতিমধ্যে শত শত দানবসেনারা আক্রমণ করলে, কার্তিক নানান অস্ত্র মারতে লাগলেন দানবদের উপর। অস্ত্রের আঘাত সহ্য করতে না পেরে দানবরা প্রাণ ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাল। এই দেখে তারকাসুর খুব রেগে গিয়ে একটা গদা ছুঁড়ে মারলো। তার আঘাতে কার্তিক আহত হলেন। তারপর তারক একটি ধারাল বাণ ছুঁড়লে, কুমারের বাহন ময়ূর বাণের আঘাতে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালান।

কুমার তখন একটি অস্ত্র নিয়ে তারককে উদ্দেশ্য করে বললেন–ওরে দানব, আজ আমার এই শক্তির প্রহারে তোমার বিনাশ হবে। যদি এই অস্ত্র নিবৃত্ত করার শিক্ষা তোমার জানা থাকে, তাহলে স্মরণ কর।

এই কথা বলে কার্তিক সেই শক্তি দানবের প্রতি প্রয়োগ করলেন। দানবের পাষাণময় হৃদয় বিদীর্ণ হল, তারকের প্রাণহীন দেহ ভূতলে লুটিয়ে পড়ল। দেবতারা আনন্দোৎসবে মেতে উঠলেন।

বায়ু পুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ

উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

প্রথম অধ্যায়

নারায়ণকে নমস্কারের পরে গুণী মানুষকে নমস্কার করা উচিত। এভাবেই বাগদেবী সরস্বতাঁকে নমস্কার করা উচিত। পরাশর পুত্র ব্যাসের জয় হোক। ব্যাসের মুখের বাণী সমস্ত জগত শ্রবণ করে। এখন জগৎপতি মহাদেবকে স্মরণ করছি। আর সেই সঙ্গে আমাদের এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন যিনি, সেই সর্বজ্ঞানী ব্রহ্মাকে স্মরণ করছি। ব্রহ্মাই যোগবলে জগতের সমস্ত প্রাণীকে সৃষ্টি করেছেন।

এবার ব্রহ্মা বায়ু, শিব ও জগতে অন্যান্য মুনিঋষিকে নমস্কার জানিয়ে বায়ু পুরাণের কথা শুরু করছি :

অসীমকৃষ্ণ নামে পৃথিবীতে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি যেমন দেখতে সুন্দর ছিলেন, তেমনই ছিলেন শক্তিশালী। একবার তিনি কুরুক্ষেত্রে দৃষ্যদ্বতী নদীর তীরে যজ্ঞ শুরু করলেন। এই যজ্ঞে পণ্ডিত সব ঋষিরা তপোবনে ভ্রমণ করেছিলেন। সূত নামে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সুন্দর কথা বলে ঋষিদের মন জয় করলেন। মুনিঋষিদের আনন্দ দান করার জন্য তার নাম হল লোমহর্ষণ। লোমহর্ষণ বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন। তিনি পুরাণ, বেদ, মহাভারত ইত্যাদি ছাড়া বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এই সূত যখন জ্ঞানী ঋষিদের কাছে এসে হাতজোড় করে প্রণাম জানালেন তখন ঋষিরা আনন্দিত হয়ে তার প্রশংসা করতে লাগলেন। লোমহর্ষণকে দেখেই তারা বুঝতে পেরেছিলেন ইনি পুরাণ শাস্ত্রে পণ্ডিত। তাই তাদের মনে পুরাণের গল্প শোনার আগ্রহ বেড়ে গেল। একজন বললেন–আপনি তো বেদব্যাসের মতোই পুরাণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য অনেক সাধনা করেছেন। আপনি এখন এই মুনিঋষিদের পুরাণের গল্প শোনান। এঁরা প্রত্যেকেই পুরাণের গল্প থেকে নিজেদের বংশের বিবরণ জেনে নিতে পারবেন। মুনিদের পুরাণের কথা শোনাবেন বলেই যজ্ঞের আগেই আপনাকে বরণ করেছিলাম।

সূতের ধর্মই হল বিখ্যাত রাজা দেবতা, মহাত্মা, ঋষিদের বংশ সম্পর্কে যথার্থ বিবরণ জানানো। ইতিহাস ও পুরাণেই সূতের অধিকার।

বেনের পুত্র পৃথুর যজ্ঞ থেকে সূতের উৎপত্তি। এই যজ্ঞে ইন্দ্রের আহুতির দ্রব্যের সঙ্গে বৃহস্পতির আহুতি দেওয়া দ্রব্য মিশে যায়। তাই এর থেকে বর্ণসংকর সূতের উৎপত্তি হয়। ব্রাহ্মণের থেকে নিচু জাতের গর্ভে সূতের জন্ম হয়।

আপনারা জ্ঞানী, আমার স্বধর্ম জিজ্ঞাসা করেছেন তাই আপনাদের পুরাণের কথা নিশ্চয়ই বলব। পিতার বাসবী নামে একটি কন্যা ছিল। সে মৎস্যগর্ভে জন্মায়। সর্ববিদ্যার অধিকারী বেদব্যাস এই মৎস্যকন্যার গর্ভে জন্ম নেন। তিনি সকল প্রকার বেশিক্ষা করেছিলেন। আমি সেই পুরাণপুরুষ বেদব্যাসকে স্মরণ করে পুরাণ কথা শুরু করব।

অনেকদিন আগে তপোবনবাসী মুনিঋষিরা বায়ুর কাছে পুরাণের কথা জানতে চাইলে, বায়ু তাদের এই পুরাণ বলেন। পরমপুরুষ, চতুর্ভুজ ব্রহ্মাই এই জগৎ তৈরী করেছেন। প্রথমে একটি সোনার ডিমের আবির্ভাব হয়। ডিমের ভিতরের আবরণ জল। তারপর বায়ু, আকাশ ইত্যাদি ছিল। এরপর পর্বত নদী ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে। এরপর প্রজাসৃষ্টি বর্ণাশ্রম, গাছপালা পশুপাখির উৎপত্তি হয়েছে। আর আছে ব্রহ্মার অবুদ্ধি থেকে নয় রকম সৃষ্টির কথা আর বুদ্ধিজনিত তিন রকম সৃষ্টির কথা। ব্রহ্মার শরীর থেকে ধর্মের উৎপত্তি। প্রিয়ব্রত উত্তানপাদ, প্রসূতি, আকুতি প্রভৃতি নিষ্পাপ ব্যক্তিদের বর্ণনা আছে। আকুতির গর্ভে প্রজাপতি, প্রসূতির গর্ভে দক্ষ কন্যাদের উৎপত্তি হয়। হিংসার গর্ভে যা কিছু অশুভ তার সৃষ্টি। সতীর গর্ভে মহেশ্বরের প্রজাসৃষ্টি। এখানে তিনটি বেদের কথা, ব্রহ্মা ও নারায়ণের মহেশ্বর-এর স্তব; ভৃগু বশিষ্ঠ ইত্যাদির গোত্রগুলির বর্ণনা, স্বাহার গর্ভে অগ্নির প্রজাসৃষ্টি ইত্যাদির বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এরপর রয়েছে বিভিন্ন দ্বীপ, সমুদ্র ও পর্বতের বর্ণনা। বৎসর, নদী তাদের ভেদ। হিমবান, হেমকূট, মেরু, নীল ইত্যাদির পর্বতগুলির বিবরণ ও পর্বর্তবাসীদের কথা বলা হয়েছে। এই সমস্ত নানান বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর অবস্থানের বর্ণনাও রয়েছে। মানসের উত্তর পাহাড়ের চূড়ায় মহেন্দ্রের পুণ্য সভার কথা বলা হয়েছে। গৃহী সন্ন্যাসীদের পথের কথাও বর্ণনা করা আছে।

স্বয়ং ব্রহ্মার সৃষ্ট এই সৌরমণ্ডলে সূর্য আকাশ পথে ভ্রমণ করছে। এরপর চন্দ্ররথের বিবরণ আছে। এতে দেবতা, আদিত্য, ঋষি, অপ্সরা, সাপ ইত্যাদি আছে। সূর্যের জন্য চাঁদের হ্রাসবৃদ্ধির কথা বলা আছে। ধ্রুব থেকে সূর্য প্রভৃতির বিবরণ শিশুমায়ের কথা বলা হয়েছে। সূর্যের কিরণের জন্য শীত ও গ্রীষ্ম পরপর আসে। সূর্যের কাছাকাছি আসা গ্রহগুলির গতি ও পরিণাম, বিষ খেয়ে শিবের নীলকণ্ঠ হওয়ার বর্ণনাও রয়েছে। শূলপাণির বিষপান, বিষ্ণুর মহেশ্বর বন্দনা, ঐল পুরূরবার মাহাত্ম্যের কথা, পিতৃপুরুষের তর্পণ বর্ণনার কথা ক্রম অনুসারে রয়েছে। ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগের সংক্ষেপে বর্ণনা। বর্ণ, ধর্ম, আশ্রমগুলির প্রবর্তনের কথা, যুগের প্রভাবে প্রাণীদের বিস্তার উন্নতির কথা, বিভিন্ন নির্দেশ ইত্যাদির কথা বলা আছে।

এরপর বেদ এবং বেদমন্ত্রগুলির কীর্তন, বেদের শাখাগুলির কথা, দেবতা, ঋষি মনু এবং পিতৃগণের বিস্তৃত উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে সংক্ষেপে। মনুর থেকে উৎপন্ন মন্বন্তর সংখ্যা নির্ণয়, বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যত মন্বন্তরগুলির বর্ণনা, মন্বন্তরের দেবতা ও প্রজাপতির নাম বর্ণনা, প্রজাপতি দক্ষের স্ত্রী, কন্যা এবং নাতি নাতনীদের বিবরণ স্থান পেয়েছে। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবের প্রজাসৃষ্টি, বেদের পুত্র পৃথুর পৃথিবী দুয়ে ফেলার বর্ণনা করা হয়েছে। সারিষার গর্ভে দশপ্রচেতা থেকে সোমের অংশে দক্ষ। প্রজাপতির জন্ম বর্ণনা ইত্যাদি রয়েছে।

আগামী মনুদের বহু আখ্যান কথা, বৈবস্বত মনুর সৃষ্টি যজ্ঞে মহাদেবের বারণী ধনু ধারণ বর্ণিত আছে। ব্রহ্মের শুক্র থেকে ভৃগু প্রভৃতির উৎপত্তি। ধ্যান যোগে দক্ষ প্রজাপতির প্রজাসৃষ্টির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। নিজের অভিশাপের জন্য ব্রহ্মার পুত্র বারদের মহাকর্ণ দক্ষপুত্রদের হত্যা, ধরিনার গর্ভে বিখ্যাত দক্ষ কন্যাদের উৎপত্তি বর্ণনা তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের একত্ব, পৃথকত্ব এবং বিশেষত্ব বর্ণনা, ব্রহ্মার দেবতাদের অভিশাপ দান, দিতির গর্ভে মরুঙ্গনের উদ্ভব, তাদের দেবত্বপ্রাপ্তি প্রভৃতির কথা আছে। এরপর পিতার কথামতো তাদের দেবত্ব ও বায়ুর কাঁধে আশ্রয়লাভ, দৈত্য, দানব গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস, পিশাচ; পশুপাখি লতা অপ্সরাদের উৎপত্তির কথা, সমুদ্র থেকে ঐরাবতের জন্ম, গরুড়ের উৎপত্তি ও অভিষেক বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, পুলস্ত্য প্রভৃতি মুনির সৃষ্ট প্রজাদের বর্ণনা। ইলা ও আদিত্যের বিস্তৃত বিবরণ। তারপর ইক্ষবাকু থেকে বৃহদ্বল পর্যন্ত সব রাজার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। রাজা যযাতির কথা। যদুবংশের কথা, হৈহয়ের বিবরণ স্থান পেয়েছে, এরপর জামসের মাহাত্ম্য, অনমিত্র বংশ কথা। বুদ্ধিমান বিবস্বানের মণিরত্ন পাওয়া, যুধাজিতের প্রজাসৃষ্টি, পরে দেবকীর গর্ভে বাসুদেব নামে বিষ্ণুর একান্তে জন্ম বৃত্তান্ত, বিষ্ণুর পরবর্তী প্রজাসৃষ্টি, দেবতা ও অসুরের সংঘর্ষে বিষ্ণুর স্ত্রীবধ এবং ইন্দ্রের জীবনরক্ষা, বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর অভিশাপ বর্ণিত আছে।

এরপর ভৃগুর শুক্রমাতার উত্থাপন, সুর ও অসুরদের সংগ্রাম, নরসিংহ প্রভৃতি অবতারের কথা শুক্রের তপস্যা মহাদেবের স্তুতি, শুক্রের জয়ন্তীর সঙ্গে মিলন, বৃহস্পতিকে অভিশাপ দেওয়া বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণনা ইত্যাদি। যযাতি থেকে শুরু করে যদু, তুর্বসু, অনু পুরু প্রভৃতির কথা। কীর্তিমান রাজাদের বিবরণ। সূর্য থেকে অনাবৃষ্টি, অনলের উৎপত্তির বর্ণনা আছে। ভূ ইত্যাদি সাতটি লোকের বর্ণনা তারপর প্রলয়ের সময় সব জীব যেখানে যায়, ব্রহ্মলোকের ওপর শিবের জায়গা নির্দেশ, সব প্রাণীর পরিণাম, প্রাণীদের সংহার কাহিনী আছে।

বায়ু পুরাণে প্রাণের আট রকম ত্যাগ ধর্ম ও অধর্মের আশ্রয়ে ঊর্ধ্ব ও অধোগতির বর্ণনা আছে। ব্রহ্মার অনিত্যত্ব, ভোগের দৌরাত্ম্য, দুঃখ, বৈরাগ্যের বশে সংসারের দোষ দেখা ব্রহ্মাকেই আশ্রয়রূপে দেখা ইত্যাদি আছে। জগতের সব রকম প্রলয়-এর কথা, বশিষ্ঠের প্রাদুর্ভাব, সৌদাসের নিগ্রহ, পরাশর এর উৎপত্তি, পরাশরের প্রতি বিশ্বামিত্রের দ্বেষ, বিশ্বামিত্রকে হত্যা করার জন্য বশিষ্ঠের আগুন সংরক্ষণ, ভগবান ব্যাসের বেদ বিভাগ স্থান পেয়েছে এই বায়ু পুরাণে।

ব্যাসের শিষ্যদের প্রশ্ন অনুসারে বেদের বিভিন্ন শাখার বর্ণনা আছে। বর্ণনায় আছে পবিত্র দেশ পাওয়ার ইচ্ছায় ধার্মিক মুনিঋষিরা ব্রহ্মার কাছে প্রশ্ন করেন, ব্রহ্মা তখন বলেন একটি অনুপম দিব্যরূপ চক্র আছে। এই ধর্মচক্রের পেছনে চলতে চলতে আপনারা যখন দেখবেন চাকার পরিধি অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে সেখানেই পাবেন পুণ্যদেশ। একথা বলে তিনি মিলিয়ে গেলেন।

এরপর এই পুরাণে রয়েছে গঙ্গার গর্ভধারণ। তপোবনে মুনিদের যজ্ঞারম্ভ, শরদ্বানের মৃত্যু, ঐড় রাজাকে সমগ্র পৃথিবীর রাজা হিসাবে মুনিঋষিদের বরণ। পরে যজ্ঞক্ষেত্রে মুনিদের সঙ্গে রাজার বিবাদ বাধে। পরে ঐড়ের পুত্র আয়ু যজ্ঞ সমাপন করে। এইসব বিবরণ এই পুরাণে যথাযথ রয়েছে। এই পুরাণ-এর কথা শ্রবণ ও কীর্তন করে পুণ্য লাভ করা যায়।

এ পুরাণ সংক্ষিপ্ত শুনলেও মহান অর্থ লাভ হয়ে থাকে। যিনি উপনিষৎ ও চারিটি বেদ পড়েছেন কিন্তু পুরাণ সম্পর্কে কিছু জানেন না সেইরকম লোক বিচক্ষণ হতে পারেন না। ইতিহাস ও পুরাণের সাহায্যে বেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হয়। সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু এই অধ্যায়ের বক্তা। এই অধ্যায় পাঠ করলে বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পুরাকালের কথা বলেই এর নাম হয়েছে পুরাণ। ভগবান নারায়ণ এই বিশ্বে বিরাজ করছেন। মহেশ্বর হলেন স্রষ্টার স্রষ্টা। তাই বলা যায় পুরাণের মূল বিষয় হল স্বয়ং মহেশ্বর। তিনি সৃষ্টির সময় সব সৃষ্টি করেন আবার ধ্বংসের সময় সব ধ্বংস করেন।

.

দ্বিতীয় অধ্যায়

শুক বললেন–তপোবনের ঋষিরা সূতকে জিজ্ঞাসা করলেন–হে সূত, কোথায় সেই যজ্ঞ হয়েছিল। প্রভঞ্জন কিভাবে পুরাণ ব্যাখ্যা করেছিলেন? এইসব বিষয়ে তুমি আমাদের জানাও।

সূত উত্তর দিলেন বিশ্ব সৃষ্টি করার জন্য হাজার বছর ধরে বিশ্বের স্রষ্টাগণ পবিত্র যজ্ঞ করে আসছিলেন। সেখানে যেভাবে যত যজ্ঞ হয়েছে তার কথা বলছি। যেমন যেখানে স্বয়ং ব্রহ্মা ব্রহ্মকাজে ব্রতী হয়েছিলেন, যেখানে ইলার পত্নীত্ব হয়। যেখানে বিবুধরা হাজার হাজার বছর ধরে যজ্ঞ করেছিলেন। যেখানে রোহিণী প্রসব করেন। বুধের জন্ম হয়। যেখানে অরুন্ধতীর গর্ভে একশ জন পুত্রের জন্ম হয়। যেখানে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের পরস্পর বিদ্বেষ দেখা দেয়, যেখানে পরাশয় মুনির জন্ম হল বশিষ্ঠের পরাজয় হল, সেখানে ব্রহ্মবাদী ঋষিরা যজ্ঞ করেছিলেন। নৈমিষারণ্য যজ্ঞ হয়েছিল বলে মুনিরা নৈমিষের নামে বিখ্যাত রাজা পুরুররা যখন পৃথিবী শাসন করেছিলেন, তখন মুনিদের বারো বছর ধরে যজ্ঞ চলে। স্বর্গের ঊর্বশী এই পুরুরবাকে কামনা করেছিল। রাজা পুরুরবা উর্বশীকে নিয়েই যজ্ঞ করেন। নৈমেষিয় মুনিরা পুরুরবার শাসনকালে যজ্ঞ শুরু করেছিলেন তা সোনার আকার নিয়েছিল। দেব বিশ্বকর্মা সেই সোনা দিয়েই যজ্ঞের বাট তৈরী করেছিলেন। সেই ঋষিদের যজ্ঞে দেবগুরু বৃহস্পতি এসেছিলেন।

রাজা পুরুরবা একদিন শিকারে এসে ঋষিদের সেই হিরন্ময় যজ্ঞভূমি দেখে লোভের বশে তা গ্রহণ করতে চাইলেন। তখন সেই নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মা মুনিরা রেগে গিয়ে তাকে কুশব্রজ দিয়ে আঘাত করলে পুরুরবা দেহত্যাগ করেন। তখন উর্বশীর গর্ভজাত পুত্রকে মুনিরা রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করলেন। নদুষপিতা নামে এই বিখ্যাত রাজা ধার্মিক ও মহাত্মা ছিলেন। তিনি মুনিদের যথাযযাগ্য সম্মান দিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিরা তার ধর্মবৃদ্ধির যজ্ঞ শুরু করেছিলেন। প্রাচীনকালের বিশ্বসৃষ্টির যজ্ঞের মতোই এই যজ্ঞ আশ্চর্যজনক। এই যজ্ঞে বৈশ্বানসেরা প্রিয় সখা বালখিল্যরা, মূর্খ, বৈশ্বানরপ্রভ অন্যান্য মুনিরা দেব, অপ্সরা, গন্ধর্ব, চারণেরা এসেছিলেন। ইন্দ্রের সভার মতোই এই যজ্ঞস্থল সম্পদে ভরে গিয়েছিল। সেখানে দেবগণের স্তুতি করে সম্মান জানানো হল, পিতৃপুরুষেদের অর্চনা করা হল। সমস্ত অতিথিরা সম্মান অনুসারে অর্চিত হলেন। তারপর সবশেষে যজ্ঞে উপস্থিত গন্ধর্বরা নামগান করলেন, অপ্সরারা নৃত্য করলেন। যুক্তিবাদী তার্কিকরা তর্কে অপরপক্ষকে পরাজিত করলেন। অনেক ন্যায়কোবিদ মুনিরা পরস্পর শাস্ত্রের অর্থ বিচার শুরু করলেন। সেখানে কোন ঘাতক রাক্ষস, দৈত্য বা যজ্ঞচোর অসুরেরা কোন বাধা দিতে পারে নি। যজ্ঞের কোন দোষই ঘটেনি। ঋষিরা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি নিষ্ঠা, জ্ঞান দিয়ে সুন্দরভাবে বারো বছর ধরে যজ্ঞ সমাপন করলেন।

ভৃগু প্রভৃতি ঋষিরা সেখানে আলাদা যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। যজ্ঞ শেষ হলে সমস্ত ঋষিরা অমিতাত্মা বায়ুর কাছে পুরাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। হে দ্বিজগণ, আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন, সেই ঋষিরাও বায়ুর কাছে একই প্রশ্ন করেন। ঋষিদের উত্তরে বায়ু তাদের পুরাণ

কথা বলতে শুরু করেন। এই বায়ু ভগবান স্বয়ম্ভর শিষ্য। ইনি সর্বদর্শী, জিতেন্দ্রিয় ও আটটি ঐশ্বর্যে মণ্ডিত। ইনি তির্যক যোনি প্রভৃতির ধর্মানুযায়ী সমস্ত লোক ধরে রয়েছেন। এক এক যোজনের পর সাত সাতটি গণে ভাগ হয়ে সবসময় বয়ে চলেন। এই বলশালী তিনটি ভূতের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করেন। ইনি তেজ থেকে উত্তাপ নিয়ে শরীরিদের পালন করেন। প্রাণ প্রভৃতি পাঁচটি বৃত্তির স্বরূপ এই বায়ু ইন্দ্রিয়বৃত্তি দিয়ে শরীরিদের ধারণ করেন। বায়ুই আকাশযোনি, এঁর গুণ শব্দ ও স্পর্শস্থিত। মনীষীরা এই বায়ুকে তিজস প্রকৃতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বায়ু শব্দশাস্ত্র বিশারদ ও পুরাণজ্ঞ তাই ভগবান বায়ু সুমধুর পুরাণ কথায় মুনিদের আনন্দ দান করেছিলেন।

.

তৃতীয় অধ্যায়

সূত বললেন–সহস্র সূর্য ও আগুনের মতো তেজস্বী, মহাধীর, ত্রিলোকের সংহর্তা, সুরশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরকে প্রণাম। প্রজাপতিগণ, রুদ্র স্বয়ম্ভু প্রভৃতি ঈশ্বরগণ, ভৃগু, মনু, মরীচি প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিরা যারা প্রজা সৃষ্টি করেছেন তাদের এবং বৃহস্পতি শুক্র প্রভৃতি দয়ালু ঋষিদের প্রণাম জানিয়ে বায়ু কথিত পুরাণের কথা বলছি। এতে দেবর্ষিদের বিবরণ আছে। প্রজাপতিদের তপস্যা ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ। শ্রুতিমধুর শব্দে পূর্ণ। এতে প্রকৃতিও পুরুষের প্রথম সৃষ্টির বিবরণ আছে। প্রকৃতি দেবীর আটটি মূর্তি থেকেই সৃষ্টি ও কর্ম। সাগর, পাহাড়, দেব, অসুর, রাক্ষস, প্রজাপতি ঋষি, মনু, পিতা, সূর্য, নক্ষত্র, মাস, ঋতু, বৎসর, রাত্রি, দিন, কাল, যুগ, পশু, অপ্সরা, লতা, ওষধি, মেঘ, বিহঙ্গ ইত্যাদি স্থূল, সূক্ষ্ম যেখানে যা কিছু পদার্থ আছে সেগুলি প্রকৃতি দেবীর পরিণতির আওতায়। ঋক, সাম, যজু, সাম যোগাদির নানারকম জীবিকা বর্ণনার সঙ্গে জগতের পূর্ণ বিবরণ পুরাণে রয়েছে। পুণ্যাত্মা দেব ঋষি ও মনু প্রভৃতির বিবরণ আছে। এছাড়া রুদ্রের অভিশাপে দক্ষের পৃথিবীতে আগমন, ভবদেবের ক্ষিতিতলে বাস, দ্বাপরযুগে ব্যাস হয়ে যারা বেদের বিস্তার করেছেন তাদের বর্ণনাও আছে এই পুরাণে। কশসংখ্যা, ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা, উদ্ভিজ্জ স্বেদজ ও জরায়ুদের বর্ণনা ও স্বর্গবাসী, ধর্মাত্মা, নরকগত জীব তাদের প্রমাণ বর্ণনা রয়েছে বায়ুপুরাণে। ধৃতিমান ঋষিরা যেমন যেমন বলেছেন, আমি সযত্নে শাস্ত্রের যুক্তি দিয়ে সেই সমস্ত বর্ণনা করছি, হে ব্রাহ্মণরা শুনুন।

.

চতুর্থ অধ্যায়

নৈমিষ্যারণ্যবাসী মহর্ষিরা বর্ণনা শুনে আশ্চর্য হয়ে অবাক চোখে সূতকে বললেন, আপনি ব্যাসের কাছে যেসব জাগতিক তত্ত্ব জেনেছেন, সে সকল বিবরণ বলুন। প্রজাপতি প্রথমে যে আর্য সৃষ্টি করেন তা বিচিত্র, আমাদের সেসব কথা জানতে ইচ্ছে, এই বলে মুনিরা লোমহর্ষণকে বারবার জিজ্ঞেস করলে সূত বলতে শুরু করলেন। হে মুনিগণ, আপনাদের অনুরোধ দিব্যসুন্দর, পাপনাশক, অনেকার্থযুক্ত সৃষ্টি বৃত্তান্ত বলছি। যে শুদ্ধ সংহত হয়ে তীর্থে বা মন্দিরে পুরাণাখ্যান শোনে বা আলোচনা করে সে দীর্ঘায়ু হয় ও স্বর্গলাভ করে। সেইসব কীর্তিমান পুণ্যাত্মাদের কথা যা শুনেছি তা বলছি। এটি যযাস্য, আয়ুস্য শত্রুনাশক, কীর্তিবর্ধক, স্বর্গপ্রাপক। আপনারা এবার মন দিয়ে শুনুন। পুরাণের পাঁচটি লক্ষ্য হল–স্বর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ মন্বন্তর ও বংশজাত জনগণের বিবরণ। প্রবোধ, প্রলয়, স্থিতি, উৎপত্তি এই চারটি বিবরণযুক্ত প্রক্রিয়া অনুষঙ্গ, উপপাদঘাত ও উপসংহার এই চারটি ভাগে এই মহাপুরাণ ভাগ করা হয়েছে। যিনি প্রথমে বিশিষ্ট পুরুষ, যিনি লোকতন্ত্রের প্রবর্তক, সেই প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রমাণ করে তত্ত্বান্ত, অধিকার, পুরুষাবিষ্টিত, পাঁচটি প্রমাণ, দুটি শ্বেত বিবরণ ও লক্ষণ নিয়ে প্রশংসনীয় আমি নিঃসংশয় হয়ে বলছি। সদসদাত্মক, নিত্য প্রধান প্রকৃতি ব্রহ্মই ছিলেন একমাত্র আর কিছুই ছিল না। এই ব্রহ্ম গন্ধবর্ণহীন, শব্দস্পর্শহীন, অক্ষয়, নিত্য, আত্মস্থ, সর্বভূতের মূল স্বরূপ অনাদি, অনন্ত, ত্রিগুণ, অসীম ও সকলের পরবর্তী। তার দ্বারাই সমস্তই ব্যাপ্ত তমোময় ছিল।

সৃষ্টিপূর্বে প্রকৃতির গুণগুলি সমভাবে ছিল। পরে তিনি গুণবৈষম্যের জন্যে আবির্ভূত হন। তিনি সূক্ষ্ম অব্যক্ত দিয়ে সম্যকরূপে আবৃত। সত্ত্বগুণযুক্ত সেই মহানই লিঙ্গমাত্র ইনি ধর্মাদিলোক তত্ত্বগুলির কারণ। এই মহানের নাম হয়েছে মন, মতি, ব্রহ্মা, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, চিতি ইত্যাদি। সেই বিভু পরিবর্তনশীল সমস্ত ভূতের চেষ্টাকালগুলি সূক্ষ্ম ভাবে সাধন করেন বলে তাকে মন বলা হয়। তিনি সমস্ত তত্ত্বগুলির অগ্রজ পরিমাণে অন্যান্য গুণের থেকে মহান। সবচেয়ে বড় এবং জলের মধ্যে থেকে ভাবগুলির পুষ্টিবিধান করেন এজন্য এঁকে ব্রহ্মা বলে। এঁনার করুণাতেই জীবেরা সর্বক্ষণ পরিপূরক হয় বলে ইনি পূর নামে খ্যাত। পুরুষেরা এঁকেই অবলম্বন করে সমস্ত হিতাহিত বুঝে নেন, আর ইনি সকলকে বুঝিয়ে দেন, এজন্য এনাকে বুদ্ধি বলা যায়। খ্যাতি ও ভোগগুলি ইনি প্রবর্তন করেছেন বলে ইনি খ্যাতিপদ বাচ্য। ইনি গুণগুলির জন্য নানান নাম রূপ যোগে খ্যাতি সম্পন্ন হয়েছেন বলে এনাকে খ্যাতি বলে। ঈশ্বর সাক্ষাত রূপে সবকিছু জেনে থাকেন, তা থেকে গ্রহগুলি জন্মেছে। এজন্য তাকে প্রজ্ঞা বলা যায়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সব কাজে মন করেন বলে তাঁকে স্মৃতি বলা হয়। সমস্ত ভোগের

আধার বলে তিনি সর্ববিদ। তিনি সর্বত্র রয়েছেন, সমস্ত প্রজ্ঞ তাতেই রয়েছে। তিনি জ্ঞান নিধি, জ্ঞান পদবাচ্য। তিনি সকলের নিয়ন্তা বলে ঈশ্বর। অব্যক্ত পুরে তিনি সর্বক্ষণ শুয়ে রয়েছেন তাই তিনি পুরুষ। কেউ তাকে সৃষ্টি করেন নি। তিনি স্বয়ম্ভু।

এই মহানই প্রকৃতি সৃষ্টির ইচ্ছাতে বিকারত্মক সৃষ্টির প্রবর্তন করেছেন। সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় তার বৃত্তি। সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিনটি গুণের মধ্যে রজোগুণ বৃদ্ধি পেলে অহঙ্কার জন্মে। তমঃপ্রধান অহঙ্কার বিকৃত হয়ে ভূত তন্মত্রের সৃষ্টি করে এজন্য তিনি ভূতাদি বলে খ্যাত। এই ভূতাদি থেকে শব্দ তন্মত্রের সৃষ্টি। এর থেকে শব্দ গুণযুক্ত আকাশের উৎপত্তি। এই আকাশকে ভূতাদি-আবৃত করে থাকে। পরে শব্দ তন্মাত্রত্মক-আকাশ থেকে স্পর্শ তন্মাত্রত্মক বায়ুর সৃষ্টি হয়। বায়ু বলবান স্পর্শগুণাত্মক। . বায়ুকে আবৃত করে আছে শব্দ তন্মাত্রত্মক আকাশ। বায়ু বিকারপ্রাপ্ত হয়ে রূপ তন্মাত্র জ্যোতিঃ সৃষ্টি করে। ঐ জ্যোতি পদার্থকে স্পর্শ তন্মাত্রত্মক বায়ু আবরণ করে। জ্যোতি বিকৃত হয়ে রস তন্মাত্রত্মক জল সৃষ্টি করে। সেই জল রূপ তন্মাত্রত্মক জ্যোতিঃ দিয়ে আবৃত।

সূত বললেন, ভূত তন্মাত্রত্মক সৃষ্টির বর্ণনা করছে। বিকারিত, সাত্বিক অহঙ্কার থেকে একসাথে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা দশটি। এঁরা বৈকারিত। মন একাদশ ঐন্দ্রিয়। কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা বুদ্ধিযুক্ত পাঁচটি ইন্দ্রিয় শব্দাদির বিষয় বোধক। পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, বাক্য এই পাঁচটি দিয়ে যথাক্রমে গতি, মনত্যাগ, আনন্দ, শিল্প, বাক্য ও কর্ম সাধন হয়। আকাশ স্পর্শ তন্মাত্রাত্মক বায়ুতে প্রবেশ করে বলে বায়ু শব্দ ও স্পর্শ এই দুটি গুণযুক্ত। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ তিনটি গুণ রয়েছে তেজে। জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস চারটি গুণ আছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, গন্ধ তন্মত্রে অনুপ্রবেশ করে গন্ধ তন্মাত্রত্মক সংঘাত শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণযুক্ত। এই সংঘাতেই পৃথিবীরূপে পরিবর্তন। পৃথিবী পাঁচটি গুণযুক্ত। এরা শান্ত, ঘোর, মূঢ় বলে এদের বিশেষ বলা হয়। এরা পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করে আছে। এরা মাটিতে লোকচক্ষুর আড়ালে গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এরপর ভূতেরা আগের ভূতের গুণ পায় বলে গুণের তারতম্য হয়। বায়ুর যে গন্ধ উপলব্ধি হয় তা পৃথিবীর গুণ, বায়ুর নয়। মহান থেকে বিশেষ পর্যন্ত সাতটি মহাবীর্য ভূত প্রজা সৃষ্টি করতে পারে না। পরে সকলের অব্যক্ত এর কৃপায় একটি অণ্ড সৃষ্টি করে। জল বুদ্বুদের মতো বিশাল অণ্ডটি ব্রহ্মার কার্যকারণ রূপ জলমধ্যে রয়েছে। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এই অণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মা হয়ে রইলেন। ইনিই শরীরধারী পুরুষ। আদিকর্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মা। ইনি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সবকিছু সৃষ্টি করেন আবার সংহার কালে সংহার করেন। হিরন্ময় মেরু তার জরায়ু, সমুদ্র তার গর্ভোদিক, আর পাহাড় অস্থি স্থানীয়। সেই অণ্ডের মধ্যে সাতটি লোক, সাতটি দ্বীপ,

সাতটি সমুদ্র, বিশাল পাহাড় নিয়ে পৃথিবী এর মাঝে রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, গ্রহ, বাতাস সব অণ্ডের মধ্যে দশগুণ জল দিয়ে বাইরে থেকে অণ্ডটি আবৃত। সেই জল দশগুণ তেজ দিয়ে আবৃত। সেই তেজ দশগুণ বায়ু দ্বারা বাইরে থেকে আবৃত। সেই বায়ু আবার দশগুণ আকাশ দিয়ে ঘেরা। সেই আকাশ ভূতাদি দ্বারা, ভূতাদি মহানের দ্বারা, আর মহান অব্যক্ত দ্বারা সমাবৃত হয়ে রয়েছে। সাতটি প্রাকৃত আবরণ দিয়ে অণ্ডটি ঘেরা। পরস্পর ঘিরে রয়েছে আটটি প্রকৃতি। লয়কালে এরা পরস্পরকে গ্রাস করে। এই বিকারগুলি অব্যক্তের ক্ষেত্র। ব্রহ্মাই হলেন ক্ষেত্রজ্ঞ। হিরণ্য গর্ভের এই জন্ম বিবরণ যিনি জেনেছেন তিনি দীর্ঘায়ু, কীর্তিবান, প্রজাবান শুদ্ধচিত্ত, নিষ্কাম পুরুষ পুরাণগুণে অন্ত সুখ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হন ও শেষে সঙ্গতি লাভ করেন।

.

পঞ্চম অধ্যায়

লোমহর্ষণ বললেন–হে ব্রাহ্মণরা! সৃষ্টির আগে আমি যে কালান্তরের কথা বলেছি, সেটা পরমেশ্বরের একটিদিন মাত্র। রাত্রির পরিমাণও এর মতো। সৃষ্টিকাল তার দিন প্রলয়কাল তাঁর রাত্রি। প্রজাপতি, প্রজা, ঋষি, মুনি, ব্রহ্ম সাযুজ্য পেয়েছেন এমন ব্যক্তিরা, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় বিষয় পঞ্চ মহাভূত তন্মাত্রা, বুদ্ধিমন–এ সমস্ত সেই পরমেশ্বর দিনের বেলাতেই থাকে। দিনের শেষে সমস্তই লয় পেয়ে যায়। আবার রাত্রি শেষে বিশ্বের উৎপত্তি। প্রকৃতি ও পুরুষ একই ধর্মযুক্ত হয়ে অবস্থান করে থাকেন। তখন তম ও সত্ত্বগুণ পরস্পর সমভাবে থাকে। গুণের সমতা হলে লয় হয়, বৈষম্য হলে সৃষ্টি হয়। তিলের মধ্যে যেমন তেল থাকে বা দুধে ঘি থাকে, তেমন অব্যক্তর আশ্রিত যে তমোগুণ তা সত্ত্ব ও তমোগুণের মধ্যে থাকে। সেই মাহেশ্বরী পরা রাত্রি অতিবাহিত করে প্রকৃতিস্থ পুরুষ রূপী পরমেশ্বর দিবাভাগে যোগ দ্বারা প্রকৃতি দেবীর ক্ষোভ জন্মান। প্রকৃতির রাগ থেকে রজঃ প্রবর্তিত হয়। তারপর রজোগুণ সমস্ত কাজের জন্ম দেয়। গুণক্ষোভ থেকেই তিন দেবতার উৎপত্তি। এরা সর্বজীবকে আশ্রয় করে রয়েছেন। রজঃ, ব্রহ্মা, তমঃ অগ্নি, সত্ত্ব বিষ্ণু। ব্রহ্মা স্রষ্টা রূপে, অগ্নি কালরূপে আর বিষ্ণু উদাসীনরূপে থাকেন। এঁরা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে থাকেন। এঁরা একে অপরের উপজীব্য হয়ে থাকেন। রজোগুণ যুক্ত ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেছেন। মহেশ্বরের অধিষ্ঠিত প্রকৃতি মহেশ্বরের প্রেরণাতেই সৃষ্টিরূপে প্রবৃত্ত হন। সৃষ্টির প্রথমে ঈশ্বরের অধিষ্ঠিত সদ সদাত্মক প্রকৃতির গুণবৈষম্য ছিল। তখন ব্রহ্মা ও বুদ্ধি এই মিথুন একসাথে সৃষ্টি হয়েছিলেন। এই তমোময় বিশ্বে অব্যক্ত রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ হলেন ব্রহ্মা। কার্যকারণের সমষ্টি, ধীমান ব্রহ্মাই তেজ দ্বারা প্রকাশিত হন। ইনি অনন্ত জ্ঞানের বিপুল ঐশ্বর্যের অশেষ ধর্মের ও বৈরাগ্যের সৃষ্টি করেন। সেই ঈশ্বরের জ্ঞান ও

বৈরাগ্যের শেষ নেই। ব্রহ্মার ধর্ম ও ঐশ্বর্য থেকে ব্রাহ্মী বুদ্ধি জন্মে। ইনি গুণ পরিণাম সাধক ও সুরদের ঈশ্বর। এজন্যে ইনি যা যা চেয়ে থাকেন, সেই সবই অব্যক্ত থেকে সৃষ্টি। ইনি স্রষ্টা রূপে চতুর্মুখ। কালরূপে অণ্ডক, বিষ্ণুরূপে সহস্রশীর্ষা পুরুষ। এই তিনটি স্বয়ম্ভুর অবস্থা তিনি ব্রহ্মারূপে সত্ত্ব ও রজঃগুণকে আশ্রয় করে থাকেন। কালরূপে রজঃ ও তম এবং পুরুষরূপে সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করেন। ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করেন, কালরূপে সবকিছু ধ্বংস করেন। আর পুরুষরূপে উদাসীন থাকেন। এই হল প্রজাপতির তিন অবস্থা। ব্রহ্মা পদ্মগর্ভ, কাল নীলাঞ্জনের মতো আর পুরুষ শ্বেত কমলপ্রভা। নিজের লীলান্তে নানারূপ আকৃতি বৃত্তি নিয়ে দেহ ধারণ করেন আবার ধ্বংস করে থাকেন। লোকেদের মাঝে তিনভাবে থাকেন বলে তাকে ত্রিগুণ আর চারভাগে বিভক্ত বলে চতুর্বহ বলা যায়। ইনি যা গ্রহণ করেন, পেয়ে থাকেন এবং যা খেয়ে থাকেন সবই তার নিত্যভাব, এজন্য এঁকে আত্মা বলে। সর্বভূতে রয়েছেন, তাই তিনি ঋষি। সর্বশরীর থেকে লয়কালে প্রয়াণ করেন, সর্বভূতে তার প্রভুত্ব রয়েছে আর সমস্ত ভূতের মধ্যে আছেন এজন্য তাঁকে বিষ্ণু বলা হয়।

তার ভগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য বীর্য ইত্যাদি রয়েছে বলে তিনি ভগবান, আর রাগগুলি সামনে রেখেছেন বলে রাগ বলা হয়। ইনি ওঁ শব্দবাচ্য, সর্বজ্ঞ, সমস্ত পদার্থে রয়েছেন বলে সর্ব। মানুষের অয়ন বা গম্যস্থান বলে তিনি নারায়ণ। তিনি ত্রিলোকে তার তিনটি রূপ দিয়ে সৃজন, সংহরণ ও উসানী ভাব দেখিয়ে থাকেন। ইনি সকলের প্রথম বা আদি বলে তিনি আদিদেব। প্রজাপালন করেন বলে প্রজাপতি, সমস্ত দেবতার মধ্যে মহান বলে মহাদেব। ইনি সর্বভূতের রূপে রয়েছেন এজন্য ইনি ভূত, বিভু। সকলের যজনীয় তাই ইনি যজ্ঞ। ইনি সব বর্ণকে পালন করেন বলে তিনি আদি, অগ্নিরূপ আছে তাই কপিল, ইনি হিরণ্যগর্ভ স্বরূপ। সৃষ্টিকর্তা পরমব্রহ্ম যতক্ষণ সৃষ্টি করে চলেন সেই সময়কে কল্প বলে।

সৃষ্টি থেকে নিরত হলেও তাঁর তত সময়ই পেরিয়ে যায়। তারপরে আবার সৃষ্টি শুরু হয়ে থাকে। হাজার কোটি কল্প অতীতে হয়ে তাতে লয় পেয়েছে। এই যে কল্প বর্তমানে রয়েছে একে বরাহকল্প বলা হয়। এই কল্পের প্রথম ভাগ চলছে।

এই কল্পে স্বয়ম্ভ প্রভৃতি চোদ্দজন মনু জন্মান। এঁদের কেউ অতীত, কেউ বর্তমান, কেউ ভবিষ্যতে জন্মাবেন। এইসব মহাত্মারা পৃথিবীতে প্রজা উৎপাদন ও তপস্যা দিয়ে সম্পূর্ণ হাজার যুগ ধরে পালন করেন। এক মন্বন্তর দিয়ে অন্য মন্বন্তর, এক কল্প থেকে অন্য কল্প, অতীত দিয়ে বর্তমান, ভবিষ্যত এভাবে আগের কারণ দিয়ে পরের ফলধীমান লোকেরা জেনে থাকেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সূত বললেন–অগ্নি থেকে জলের সৃষ্টি। উঁচু, নিচু পৃথিবী জলে পরিণত হলে অগ্নি নষ্ট হয়। তখন কিছুরই উপলব্ধি থাকে না। তখন ব্রহ্মা সহস্র মাথা, চোখ, পা, সোনার বর্ণ, অতীন্দ্রিয় নারায়ণ পুরুষমূর্তি নিয়ে জলরাশির মাঝে শুয়ে থাকেন। নারায়ণ শ্লোকে আছে জলীয় পরিমাণগুলির নাম নারা'। তিন হাজার যুগ শেষ হলে রাত্রির শেষে সৃষ্টি করার জন্য ব্রহ্মামূর্তি ধরেন। ক্রমে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হলে ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হয়ে সব জায়গা লোকশূন্য আর জলে পূর্ণ দেখে বাতাস হয়ে বর্ষার রাত্রিতে পাখির মতো উড়লেন। এরপর বুদ্ধিমান ব্রহ্মা জলের মধ্যে থেকে পৃথিবী উদ্ধারের জন্য ভাবতে শুরু করলেন। কি করে কোন মহরূপ ধারণ করে পৃথিবী উদ্ধার করতে পারবে? এভাবে চারিদিকের জল দেখে জলক্রীড়ায় অভিজ্ঞ বরাহরূপ স্মরণ করলেন। ঐ রূপ বাঙয়, এর নাম ধর্ম। এই মূর্তি চওড়া, উঁচু নীল মেঘের মতো। এঁর দেহ পর্বতের মতো, রং সাদা, মেঘ গর্জনের মতো স্বর, চোখ আগুনের মতো উজ্জ্বল, দেহের দ্যুতি আদিত্যের মতো। পতি সিংহের মতো। তারপর সেই হরি বিশাল বরাহ রূপ নিয়ে পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য রসাতলে প্রবেশ করলেন। তার চার পাচারবেদ, বুক–ক্রতু, মুখ-চিতি, জিব–অস্থি, রোম–কুশ, ব্রহ্মা-মস্তক, চোখ–দিনরাত, দেহকান্তি–সত্য ও ধর্ম, বিক্রমধর্ম, স্পৃহা-ঘি, গন্ধহবি, লিঙ্গ–হোম, আসন-গুহ্য উপনিষদগুলি, তার পত্নী ছায়া। সেই মহাসত্ত্বময় যোগী মণিশিখরের মতো উঁচু। সেই বিভু প্রজাপতি বরাহরূপ ধারণ করে জলের মধ্যে প্রবেশ করে পৃথিবীকে উদ্ধার করলেন। সেই জলরাশিকে ভাগ করে সমুদ্রের জল সমুদ্রে আর নদীর জল নদীতে গিয়ে জলমগ্না পৃথিবীকে মঙ্গল কামনায় দাঁত দিয়ে তুলে ধরলেন। জলের ওপর নৌকার মতো পৃথিবী ভেসে রইল। মন দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করেছিলেন, এবার জলের ওপর রাখলেন, কিন্তু পৃথিবী ভাগে মন দিলেন। পৃথিবীর সমভূমির মধ্যে পর্বতগুলো সৃষ্টি করলেন। আগের সৃষ্ট পর্বতগুলি আগুনে পুড়ে শীর্ণ হয়ে গেছিল। পরে বাতাসের দ্বারা জলরাশি জায়গায় জায়গায় দৃঢ় হয়ে পর্বত তৈরী হয়। এদের চলার ক্ষমতা নেই বলে অচল। আগের কল্পের সমুদ্র পাহাড় সব নষ্ট হয়। পরকল্পের শুরুতে বিশ্বকর্মা। সাতটি দ্বীপ, সমুদ্র ও পর্বত দিয়ে পৃথিবীকে ভাগ করেন। ভগবান স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আগের কল্পের মতোই সৃষ্টি কাজে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা শুরু করলে প্রথমে তমোময় সৃষ্টি হল। সবার প্রথম সৃষ্টি হল তমঃ, মোহ, মহামোহ, তমিস্র ও অন্বতা মিশ্র–এই পঞ্চপর্ব সবার প্রথমে সৃষ্টি হল। এরা ব্রহ্মকে পাঁচটি আবরণে ঢেকে রাখল।

এর ফলে তিনি বাইরে থেকে ঢাকা, অন্তরে শুদ্ধ, প্রকাশমান অথচ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। মোহ ইত্যাদি দিয়ে বুদ্ধি আর প্রধান ইন্দ্রিয়গুলি সমাবৃত হওয়াতে এদের সংবৃতাত্মা বলে এরাই

পর্বতের রূপ ধারণ করে। প্রথম সৃষ্টি ব্রহ্মার মনের মতো না হওয়াতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে আবার ভাবতে শুরু করলেন। তখন স্রোতগুলি কুটিলভাবে বয়ে চলার ফলে তা থেকে তির্যক জাতির সৃষ্টি হল। এদের তির্যক জাতি বলে। তমোগুণ আছে বলে এরা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন ধ্যান থেকে উৎপন্ন ধ্যানাভিমানী। এরা অহংকারী, অভিমানী, আঠারো প্রকার আত্মযুক্ত, এগারোটি ইন্দ্রিয় যুক্ত, নয় রকম উদয়বিশিষ্ট, আট প্রকার তারকা শক্তি সম্পন্ন। এদের অন্তরে এগুলি প্রকাশিত বাইরে নয়। তির্যক স্রোতের সৃষ্টি দেখে ঈশ্বর আনন্দিত হলেন। তখন তার মন সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হওয়াতে ঊর্ধ্বস্রোতের সৃষ্টি হল। এটি হল প্রজাপতির তৃতীয় সৃষ্টি। এটি সবচেয়ে উপরে রইল। ঊর্ধ্বস্রোত সৃষ্টিজাত জীবেরা সবাই অন্তরে ও বাইরে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত দেবতারাও প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত দেবতারাও ঊর্ধ্বস্রোতে সৃষ্টি হলে ব্রহ্মা কিছুটা খুশি হলেন। তখন আবার তিনি অন্য সৃষ্টির কথা চিন্তা শুরু করলেন। এরপর অবাক স্রোত সৃষ্টি হল। নীচের দিকে এদের প্রবৃত্তি বলে অবাকস্রোতঃ নম। এরা প্রকাশবহুল ও রজোগুণযুক্ত। এজন্য এরা প্রায়ই দুঃখে আক্রন্ত। অন্তর বাইরে প্রকাশিত এই মানুষ সৃষ্টি সাধক সৃষ্টি। এরা আট প্রকার লক্ষণযুক্ত। সিন্ধ ও গন্ধর্বরা এই মনুষ্য-সৃষ্টির প্রকার ভেদমাত্র।

বিপর্যয়, শক্তি, তুষ্টি, ঋদ্ধি–এই চারটে গুণ অনুগ্রহ সর্গ পঞ্চম সৃষ্টি। ভবিষ্যত ও বর্তমানের সমস্ত তত্ত্ব তাদের জানা। তামসজীব জাতি হল ষষ্ঠ সৃষ্টি। এরা ভোগাসক্ত, দুঃশীল। বিপর্যয়ের জন্য জড়ভাবাপন্ন। মহানের সৃষ্টি প্রথম, তন্মাত্র সৃষ্টি দ্বিতীয়, একে ভূত সৃষ্টি বলে। বৈকারিক সৃষ্টি হল তৃতীয় সৃষ্টি একে ইন্দ্রিয় সৃষ্টি বলে। এই কটি সৃষ্টি ব্রহ্মার অবুদ্ধিতেই হয়েছিল। স্থাবরদের মুখ্য বলে। মুখ্য সৃষ্টি হল চতুর্থ। তির্যক জাতির সৃষ্টি হল পঞ্চম। ঊর্ধ্বস্রোতে দেবসৃষ্টি হল ষষ্ঠ। অবাক বা মানুষ সৃষ্টি হল সপ্তম। তমঃ সত্ত্বযুক্ত অনুগ্রহ সৃষ্টি হল অষ্টম। প্রথম তিনটি হল প্রাকৃত সৃষ্টি ও শেষ পাঁচটি হল বৈকৃত সৃষ্টি। কোমার সৃষ্টি হল নবম, প্রাকৃত, বৈকৃত ও ভৌমার–এই তিনটি সৃষ্টির মাধে প্রাকৃত তিনটি সৃষ্টি ব্রহ্মার অবুদ্ধির ফল। আর বাকি ছয়টি বুদ্ধি পূর্বক হয়েছিল।

এবার অনুগ্রহ সর্গ বিস্তারিত বলছি। প্রাকৃত ও বৈকৃত ইত্যাদি সব মিলিয়ে নয়টি সৃষ্টি আবার নানাপ্রকার। প্রথমে ব্রহ্মা সনন্দন, সনক ও সনাতন–তিনটি মানস সন্তান সৃষ্টি করেন। এঁরা ব্রহ্ম জ্ঞানবান, তেজস্বী। এরা কোন প্রজাসৃষ্টি না করে নিবৃত্তির পথ ধরে মহাপ্রস্থান করেন। এনারা চলে গেলে ব্রহ্মা তখন অন্যান্য পুত্রদের সৃষ্টি করলেন। এঁরা হলেন জল, আগুন, পৃথিবী, বাতাস, আকাশ, দিক, স্বর্গ, দ্বীপ, সমুদ্র; মদ, শৈল, বনস্পতি–এ সকলের আত্মা, লব, কাষ্টা, কলা, মুহূর্ত, সন্ধি, রাত্রি, দিবা, অর্ধমাস, মাস, অয়ন, যুগ এরা সকলেই স্থানাভিমানী। সুতরাং স্থানপদবাচ্য। পরমপুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বুক থেকে ক্ষত্রিয়, দুই উরু থেকে বৈশ্য আর

দুই পা থেকে শূদ্র–এভাবে বর্ণ সৃষ্টি হয়েছে। অণ্ড থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি। এই ব্রহ্মা নিজেই সব লোক সৃষ্টি করেছেন। আমি সংক্ষেপে বায়ু পুরাণের সৃষ্টির কথা বললাম।

.

সপ্তম অধ্যায়

সূতের মুখে বায়ুপুরাণে প্রথমপাদে সৃষ্টির কথা শুনে খুশি হয়ে তাঁকে সম্বোধন করে বললেন–আপনি প্রাচীন কথা বলতে পারদর্শী, তাই আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। সূত বললেন–অতীত ও বর্তমান কল্পের প্রতিসন্ধ আমি আপনাদের বলছি। যে কল্পে যত মন্বন্তর বর্তমান বরাহ-র কল্পের পূর্ববর্তী কল্প এবং এদের অবস্থার বর্ণনা শুনুন। আগের কল্প চলে গেলে অন্য কল্প শুরু হয়। এই দুয়ের সন্ধিতে জনলোক থেকে অন্য সৃষ্টি শুরু হয়ে থাকে। সৃষ্টির ধারা সম্পূর্ণ নষ্ট হলে কল্পগুলোও বিচ্ছিন্ন হয়। সেগুলি পরের কল্পের অনুগামী হতে পারে না। বরং বিলুপ্ত হয়ে যায়। এজন্য এক কল্প থেকে অন্য কল্পের প্রতিসন্ধি কল্প বিবরণ বলছি। ছোট করে কল্পের বিবরণগুলো বলছি। আগে যে কল্প অতীত হয়ে গিয়েছে তা আগের পরাধের অন্তর্গত। আর পরপাঠের কালের কল্পগুলির মধ্যে বরাহকল্প প্রথম।

.

অষ্টম অধ্যায়

সেই পুরুষ সহস্রযুগ রাত্রি অতিবাহিত করে সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মমূর্তি ধরেন–একথা বলে সূত শুরু করলেন। সেই অন্ধকার জলে ভরা বিভাগহীন পৃথিবীতে ব্রহ্মা বাতাস হয়ে পাখির মতো আকাশে ঘুরতে ঘুরতে পথ সন্ধান করতে লাগলেন। ভূমি উদ্ধারের জন্য চিন্তা করে আগের কল্পের মতো অন্য শরীর ধরলেন। বরাহ বেশে জলে প্রবেশ করে পৃথিবী উদ্ধার করলেন।

আগের সৃষ্টিতে সংবর্তক আগুনে সমস্ত পৃথিবী পুড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবার শীতের প্রকোপে বায়ু দ্বারা কিছু জায়গায় কঠিন আকার হয়ে পর্বতে পরিণত হয়েছে। প্রভু প্রজাপতি জল থেকে পৃথিবী উদ্ধার করে সাত বর্ষ যুক্ত সাতটি দ্বীপে ভাগ করেন। সব দ্বীপের পর্বত সংখ্যা উনপঞ্চাশ।

সাতটি দ্বীপ ও সাতটি সমুদ্র পরস্পরকে, গোল করে ঘিরে রয়েছে সবার আগে সৃষ্ট হয় চাঁদ, সূর্য, গ্রহ তারা সহ ভূ ইত্যাদি চারটি লোক নির্মাণ করেন। কল্পের প্রথমে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন জল,

আগুন, পৃথিবী, বাতাস, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, দিক, সমুদ্র, নদী, পর্বত, ঔষধি, গাছ, লতা, কলা, মুহূর্ত, সন্ধি, রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর ইত্যাদি সৃষ্টি করে পরে যুগবস্থা নির্মাণ করেছিলেন।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি–এই হল চার যুগের নাম। কল্পের প্রথম ভাগে সত্যযুগে ব্রহ্মা প্রজাদের সৃষ্টি করেন। আগের কল্পে প্রজারা আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। যারা তাপলোকে না পৌঁছে জনলোকেই রয়ে গেছিলেন, তাঁরাই হলেন পরবর্তী সৃষ্টির বীজ। এঁরাই প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন। এভাবে প্রজা থেকে প্রজা বৃদ্ধি হতে থাকে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের সাধক এরাই। দেব, পিতৃ, ঋষি ও মনুরা তপস্যার দ্বারা স্থানগুলি পূর্ণ করার জন্য ব্রহ্মার মানসপুত্র রূপে জন্ম নেন আর যারা হিংসামূলক কাজ করেও স্বর্গে গেছিলেন সঙ্গগুণে, তারা যুগে যুগে এই সংসারে ফিরে আসেন। জনলোক থেকে শুভাশুভ ফলভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করেন। মাটিতে জন্ম নিয়ে কর্ম অনুযায়ী খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করে থাকে। আগের আগের কল্পে যিনি যেমন কাজ করেছেন, পরের জন্মেও সেই লোক সেরকম কর্মাচরণ করবেন। সেই বিষয়ে ভাবনাবশতঃ হিংস্র, অহিংস, মৃদু, কুর, সত্য, মিথ্যা, ধর্ম, অধর্ম সবকিছুই পূর্ব কল্পের জন্মের মতো হয়ে থাকে। আগের কল্পে যার যেমন রূপ ছিল, ভাবিকল্পেও জীবেরা প্রায়ই তা পেয়ে থাকে। তাই একই নামরূপ নিয়ে কল্প কল্পে জন্ম নিয়ে থাকেন। স্বয়ং ব্রহ্মা ধ্যান এর দ্বারা মুখ থেকে সহস্র মিথুন সৃষ্টি করেন। এই সমস্ত প্রজা সত্ত্বগুণসুক্ত আর প্রশস্তচিত্ত। তার বুক থেকে হাজার প্রজা সৃষ্টি করেন এরা রজগুণযুক্ত গর্ব আর উৎসাহ সম্পন্ন তিনি তার উরু থেকে রজঃ ও তমোযুক্ত আর এক হাজার প্রজার জন্ম দেন। এরা খুব বেশি স্পৃহাসম্পন্ন। তিনি তার দুই পা থেকে যে হাজার শূদ্র সৃষ্টি করেন তাদের তমোগুণ রয়েছে। এরা শ্রীহীন, বুদ্ধিহীন এইসব প্রজারা আনন্দে মিথুনে ব্রতী হলে, সেই থেকে পৃথিবীতে মিথুনোৎপত্তি প্রবৃত্তি ঘটে। মিথুনের ফলে মেয়েদের সন্তান হতো না। আয়ুর একদম শেষে একবার একসঙ্গে পুত্রকন্যার জন্ম দিতেন। এদের বৃদ্ধকালে যে কুবিবেচকরা জন্মেছে, তারাই মিথুন দ্বারা সন্তান জন্ম দিয়েছে। প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস প্রজাদের বংশের প্রজা দিয়েই জগত পরিপূর্ণ হচ্ছে।

আদিম যুগে শীত, বৃষ্টি, গরম অল্পই ছিল। প্রজারা তখন সরোবরে, পাহাড়ে, সমুদ্রে থাকতো। পৃথিবীর সজাত খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করতো। এদের ধর্ম অধর্ম ছিল না। আয়ু, রূপ, সুখ–সব বিষয়েই তারা এক ছিল। নিজ নিজ অধিকারে জীবনযাপন করত। সত্যযুগের পরিমাণ চার হাজার বছর। সেই সময়কার প্রজাদের শীত, গ্রীষ্মের কষ্ট ও অসুবিধে ছিল না। পর্বত সাগরের সেবা করে একান্ত সুখী ছিল। তাদের নির্দিষ্ট কোন থাকার জায়গা ছিল না।

তখন পশু, পাখি, সরীসৃপ ও উদ্ভিদ বা দুঃখী মানুষ ছিল না। সকলেই শোকহীন, সত্ত্বযুক্ত কামাচারী হয়ে আনন্দে ছিল। আকাশে সব সময় সূর্য ছিল। প্রজাদের স্থির যৌবন ছিল। তাদের বিশুদ্ধ সংকল্পে সন্তান জন্ম নিত। রূপ, আয়ু সকলেরই এক ছিল তাই ভালোমন্দের ভাব ছিল না। সত্যযুগে-দুঃখহীন প্রজাই জন্মাতো। তখন লাভ-অলাভ, বন্ধু-শত্রু। এসব ছিল না। তাদের ভালোবাসা বা অনুগ্রহ ছিল না। সত্য যুগে ধ্যান, ত্রেতার জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ আর কলিযুগে দাসই প্রশংসনীয় ছিল। সত্যযুগে সত্ত্ব, ত্রেতায় রজঃ, দ্বাপরে রজস্তমঃ আর কলিতে তমোগুণই প্রবল। যুগের ক্রিয়াগুলোয় তারতম্য বলেই গুণের তারতম্য হয়।

চার হাজার বছর হল সত্যযুগের পরিমাণ। তখনকার প্রজারা দুঃখকষ্ট হীন হয়ে এই আয়ুকাল পেরিয়ে যেত। সত্যযুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ শেষ হলে যুগ ধর্মের একপাদ শেষ হয়। যুগান্তকালে প্রজাদের মানসী সিদ্ধিগুলিও আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। সত্যযুগের সন্ধ্যাকালে যুগ ধর্মের এক পাদ এবং ত্রেতা আরম্ভে সেই সন্ধ্যাংশ কালীন ধর্মের একপাদ, এইভাবে আস্তে আস্তে তপস্যা, শাস্ত্রজ্ঞান বল ও আয়ুক্ষয় পেয়ে থাকে।

হে মুনিরা! সত্যযুগ সন্ধ্যাংশ শেষ হলে ত্রেতাযুগ শুরু হয়। তখন প্রজাদের আদিমযুগের মতো সিদ্ধি থাকে না। তখন আবার অন্য সিদ্ধি শুরু হয়। জলের সূক্ষ্মতা নষ্ট হওয়ায় গর্জনকারী মেঘরূপ পায়। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টি থেকেই গাছ জন্মায় আর প্রজারা প্রয়োজনের জিনিস পেতে থাকে। ত্রেতাযুগের প্রথমে এভাবেই প্রজারা জীবিকা নির্বাহ করত। এরপর পরিবর্তন আসে, আসক্তি থেকে লোভ তাদের আক্রান্ত করে। সত্যযুগের শোষণকারীরা গর্ভধারণে সক্ষম হয়। ত্রেতাযুগে সেভাব লুপ্ত হয়ে নারীরা মাসে মাসে ঋতুমতী হত। প্রতিমাসে সঙ্গমবশে অকালে গর্ভোৎপাদনের ফলে অসংখ্য সন্তানের জন্ম হত।

কালের পরিবর্তনে প্রজাদের বাসস্থলের আগে যে গাছগুলি জন্মেছিল সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এতে প্রজারা ব্যাকুল, বিভ্রান্ত হয়ে ধ্যানে বসে। তখন আবার গাছ জন্মায়। সেই সব গাছ থেকে বস্ত্র, আভরণ, ফল, মধু ইত্যাদি পাওয়া যেত। ত্রেতাযুগের প্রজারা তাই দিয়ে আনন্দে দিন কাটাত। এরপর এরা লোভের বশবর্তী হয়ে এইসব গাছ মধু ইত্যাদি জোর করে কেড়ে নিতে শুরু করে। তাদের এই অনাচারের জন্য সব গাছ নষ্ট হয়। তখনই প্রজাদের শীত গ্রীষ্মে কষ্ট শুরু হয়। তখন শীত গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা পেতে বস্ত্র ব্যবহার করতে থাকে। আর যেখানে সেখানে ভ্রমণ না করে বাসগৃহে আশ্রয় নেয়।

এভাবে নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করতে শুরু করে। নদী, পাহাড়, উঁচু নিচু জায়গায় কষ্ট নিবারণের জন্য দুর্গ বাড়ি বানাতে শুরু করে এইভাবে গ্রাম, পুর, অন্তঃপুর ইত্যাদি স্থাপিত হয়। সেই সবের হিসাব অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রভৃতির পরিমাণ করার জন্য আঙ্গুল দিয়ে নানারকম পরিমাণ সংজ্ঞা স্থির হয়। প্রদেশ, হস্ত, কিস্তু, ধন ইত্যাদি সংজ্ঞা তখন থেকেই প্রচলিত। দশ আঙ্গুলে এক প্রদেশ, অঙ্গুষ্ঠাবিধি তর্জনী পর্যন্তের ব্যাস পরিমাণ প্রাদেশ, মধ্যমা পর্যন্ত তাল, অনামিকায় গোকর্ণ, আর কনিষ্ঠায় এক বিতস্তি হয়। বিতস্তির পরিমাণ বারো আঙ্গুল। কুড়ি আঙ্গুলে এর রত্ন, চব্বিশ আঙ্গুলে এক হস্ত, চল্লিশ আঙ্গুলে এক কিন্ধু হয়। চার হাতে এক ধনু, দণ্ড নালিকা আর যুগ হয়। দুই হাজার ধনুতে এক গরূ্যতি। আট হাজার ধনুতে এক যোজন। এই যোজন পরিমাণ দিয়েই নিজ নিজ বাস সন্নিবেশ করে।

তারা চার রকম দুর্গ আশ্রয় করত। তার মধ্যে তিনটে দুর্গ স্বভাবজাত। চতুর্থ দুর্গটি কৃত্রিম। এটির বর্ণনা দিচ্ছি–সৌধগুলো উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, পরিখা–অনেক জলে ভরা। দ্বারদেশে–সেতু সংযুক্ত দরজা-স্বস্তি-কাম্য। ঐ দুর্গ কুমারীপুর বিশিষ্ট করা উচিত। পরিখা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে আট হাত ও দশ হাত হলেই ভাল হয়। ছোট গ্রাম, নগর, গ্রাম ও তিন রকমের দুর্গের পর্বত আর জল দিয়ে সীমারেখা থাকবে। তিনরকম দুর্গের মধ্যে যা বিষম্ভে পরিমাণ তাদের আয়তন পরিমাণ, তার অর্ধেকের বেশি আট অংশ। পুর নির্মাণ কাজে দৈর্ঘ্য থেকে বিস্তারের পরিমাণ অর্ধেক হলেই ভালো হয়। ছিদ্রকর্ণ, বিকর্ণ, বৃত্তাকার, খুব বড় খুব ছোট সাবকাশ পুর নিন্দনীয়।

পুর মধ্যবর্তী মূল বাসস্থানের বিষ্কম্ভ পরিমাণ আটশ কিস্কু ছোট গ্রামের পরিমাণ নগর পরিমাণের অর্ধেক। রাজপথ দশধনু বিস্তার, মানুষ, রথ, হাতি, ঘোড়া অনায়াসে চলাচল করতে পারে। সেই সময় শাখাপথগুলি চার ধনু প্রমাণ করতেন। গৃহপথ দুই ধনু, উপরথ এক ধনু, ঘণ্টা পথ চারপদে, আর গৃহ থেকে গৃহান্তর ত্রিপদ প্রমাণযুক্ত। জলপূর্ণ হওয়ায় পাথর পরিমাণ একপদ। আগে যেমন গাছের ছায়ায় কুটির বানিয়ে থাকত, এখন বাড়ি বানিয়ে থাকতে শুরু করল। গাছের শাখার মতো চারিদিকে বিস্তার লাভ করল এদের তৈরী বাড়িগুলি। শাখার আকারে তৈরী বলে বাড়িগুলি থালা' নামে প্রসিদ্ধ। প্রজারা তখন শীতগ্রীষ্মের কবল থেকে বাঁচবার উপায় বের করার পর জীবিকার সন্ধান করতে লাগল।

কল্পবৃক্ষগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ও মধু বিলুপ্ত হওয়ায় প্রজারা খিদে-তেষ্টায় ব্যাকুল হয়ে পড়ল। এরপর ত্রেতাযুগে সত্যযুগের মতো বৃষ্টিরূপে সিদ্ধির প্রাদুর্ভাব হয়। সে দ্বিতীয় বৃষ্টি জনহীন শুকনো জায়গাগুলো ভরে যায়। সেই জল থেকে পৃথিবী শস্যশ্যামলা হয়। তখন চোদ্দপ্রকার

ওষধির সৃষ্টি হয়। নানারকম ঋতুর বৈচিত্র্যময় ফল, ফুল, ত্রেতা যুগেরই সৃষ্টি। তারপর আবার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে প্রজাদের মনে লোভ, রাগ, হিংসা তৈরী হয়। তখন জোর করে তারা নদী, ক্ষেত, পাহাড়, গাছ, লতা, ঔষধিগুলো কেড়ে নিতে থাকে।

সত্যযুগের প্রথমে যে সিদ্ধাত্মাদের কথা বলেছি তারা ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি তারাই আবার ত্রেতাযুগে জন্ম নেন। শুভাশুভ কাজের গুরুত্ব অনুসারে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও তিন বর্ণের সেবাকারী শূদ্র-এ চার প্রকার প্রজার সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে যারা বলবান, সত্যবাদী, অহিংসক, নির্লোভ, জিতেন্দ্রিয় তারা সেই সমস্ত পুরগুলিকে বাস করত। যারা এদের থেকে দুর্বল তারা এদের কাছে বাসস্থান নির্মাণ করত। তার থেকেও দুর্বল যারা তারা এদের কাছে কাজ করে জীবন চালাত। আরও হীনবল মানুষরা এদের সেবা করে জীবনযাপন করত।

এইভাবে পরস্পর একসঙ্গে বাস করতে করতে তাদের লোভ দ্বারা সমস্ত ঔষধি হ্রাস পেয়ে বলির মতো নষ্ট হয়ে গেল। প্রজারা সব কিছু নষ্ট করার পর খিদে তেষ্টায় কাতর হয়ে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার কাছে এল। ত্রেতাযুগে ভগবান স্বয়ম্ভু অবস্থা দেখে আবার শস্য ইত্যাদি আবিষ্কার করলেন। সুমেরুকে বৎস্যরূপে কল্পনা করে পৃথিবী দোহন করলেন। তখন আবার ওষধি বীজগুলি জন্মায়। তখন সতেরো প্রকার ওষধি জন্মায়। যথা–ব্রীহি, যব, অনু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, উদারকরুষ, কলায়, মাষ, মুগ, মসুর, নিষ্পব, কুলথ এসব গ্রাম্য ঔষধি। ওষধি নয় এমন অনেক কিছু নিজে থেকেই ত্রেতা যুগে উৎপন্ন হয়েছিল।

এছাড়া নানারকম ফলে ফুলে প্রজাদের সুখ বৃদ্ধি হত। পৃথিবী দোহন করার পর বীজ থেকে বিভিন্ন ঋতুর ফল ফুল যুক্ত ওষধি জন্মায়, কিন্তু ওষধি পরে ঠিকমতো রোপণ করা হল না, তখন ব্রহ্মা প্রজাদের জীবিকাবৃত্তির কথা চিন্তা করলেন। প্রজাদের কাজের জন্য জমি কর্তন করে শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করলেন। তখন থেকেই শস্য উৎপাদন হতে লাগলো। প্রজাদের মধ্যে বিবাদ মেটানোর জন্য তিনি কতগুলি বিধি ব্যবস্থা নিলেন। যারা বলবান তারা জমির মালিক, ক্ষত্রিয়দের ইতর জনের রক্ষার কাজে নিযুক্ত করলেন। সেসব ক্ষত্রিয়ের কাছে যারা যেত তারা ভয়হীন, সত্যবাদী আর সর্বভূতে ব্রহ্মা জ্ঞানবান ছিলেন তাদের ব্রাহ্মণ বলা হতো। যারা এদের থেকে দুর্বল অথচ কুটিল হিংসুক সেই প্রজাদের বৈশ্য নাম দিয়ে সকলের বৃত্তি সাধন কাজে নিযুক্ত করলেন। অল্প বলশালী শূদ্রজাতিকে অন্য তিনবর্ণের সেবায় নিযুক্ত করলেন। যাতে তারা নিজ নিজ কর্তব্য করতে পারে। পরে আবার আস্তে আস্তে তারা এইসব নিয়মের অনাদর করে একে অপরের বিরুদ্ধে বিবাদে লিপ্ত হয়। ব্রহ্মা একথা জানতে পেরে ক্ষত্রিয়দের জন্য বল, যুদ্ধ ও শাসন–এই তিন জীবিকা নির্দিষ্ট করলেন। ব্রাহ্মণরা করবে যাজন,

অধ্যাপন, আর প্রতিগ্রহ। পশুপালন, ব্যবসা ও কৃষি দিলেন বৈশ্যের হাতে। আর শূদ্রদের জন্য শিল্প ও দাসত্ব–এ দুটি বৃত্তি নির্দিষ্ট হল। এসব কাজ ও জীবিকা বিধান করে প্রভু ব্রহ্মা সিদ্ধির ফলস্বরূপ কর্মান্তর-এর স্থান ঠিক করে দিলেন। যে ব্রাহ্মণরা কাজ করেন, তারা যাবেন প্রজাপত্য স্থানে, যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুকহীন ক্ষত্রিয় যাবে ঐন্দ্রস্থানে। স্বধর্মনিষ্ঠ বৈশ্যদের জন্য মারুত স্থান আর নিজেদের আচার যারা করেনি এমন শূদ্রেরা যাবে গন্ধব্য স্থানে। বর্ণের প্রতিষ্ঠার পর আশ্রমগুলির প্রতিষ্ঠা হল। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষুক–এই চার আশ্রমে তখন প্রথম প্রতির্ষ্ঠিত হয়। রাজাদের মধ্যে যখন অনেকে বর্ণধর্ম পালন করতে অবহেলা শুরু করল তখন ব্রহ্মা তাদের উৎসাহী করার জন্য চারটি আশ্রমের বিধান দিলেন। তাদের শিক্ষার জন্য নানারকম ধর্ম, আচার উপদেশ দিতে থাকেন।

গৃহস্থ আশ্রমই তিনটি আশ্রমের উৎপত্তির কারণ। এবার চারটি আশ্রমের কথা বলছি। গৃহস্থের প্রতিপাল্য ধর্ম হল বিবাহ, অগ্নি হোমের অনুষ্ঠান, অতিথি সেবা, যজ্ঞ-শ্রাদ্ধ করা ও সন্তানের জন্ম দেওয়া। দণ্ড, মেঘলা আর জটা রামা, মাটিতে শোয়া, গুরুসেবা, ভিক্ষা-বিদ্যালাভের জন্য ব্রহ্মচারীর এইসব বিধান পালন করা উচিত। গাছের ছাল, হরিণের চামড়া পরিধান, ফলমূল আর ধান খাওয়া, দুই সন্ধাতে স্নান করা ও হোম করা হল বাণপ্রস্থদের কাজ। সেই সময় ভিক্ষা, অস্তেয়, শৌচ, সাবধানতা, প্রাণীদের ওপর দয়া, ক্ষমা, অক্রোধে গুরুসেবা ও সত্য এই দশটি বিশেষ ধর্মের মধ্যে প্রথম পাঁচটি সন্ন্যাসীদের প্রধান ব্রত, আর পাঁচটি গৌণ ব্রত। এছাড়া সদাচার, বিনয়, শৌচ, বিলাসিতা ত্যাগ আর যথাযথ বিচার এই পাঁচটি হল উপব্রত। ব্রহ্ম বলেছেন, সমস্ত আশ্রমই জনগণের মঙ্গলদায়ক সত্য সরলতা, দয়া, ক্ষমা, যোগ, যাগ, দম, বেদ, বেদাঙ্গ, যজন, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি শ্রদ্ধাহীন লোকেদের কাজ দেয় না। হৃদয়ে যার শ্রদ্ধা নেই, বাইরে আড়ম্বর করলেও সিদ্ধিলাভ হয় না। কলুষিত মন নিয়ে সর্বস্ব দান করলেও ধার্মিক হয় না। ধর্ম লাভ বিষয়ে মানসিক লাভ কারণ। দেব, পিতা, ঋষি, মনু প্রভৃতি যেমন পরলোকে বাস করেন, সন্ন্যাসীরাও মরণের পরে পরলোকবাসী হন।

ঊর্ধরেত ঋষিরা যেখানে থাকেন, গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারীরাও সেখানে বাস করতে পারেন। সপ্তর্ষিরা যেখানে থাকেন সেটাই দেবতাদের থাকার জায়গা। গৃহস্থেরা প্রজাপতি লোকে থাকতে পারেন। সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মলোক পেয়ে থাকেন। যোগিদের অধ্যাত্মপদে স্থান হয়। কিন্তু নানা বুদ্ধি লোকেদের কোথাও স্থান নেই। আশ্রমবাসকারী ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য যেসব স্থান নির্দিষ্ট। দেবযান মহাপথের এই চারটি সাধারণ পথ। প্রজা সৃষ্টিতে ইচ্ছুক প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথম মন্বন্তরে দেবলোকের জন্য ভূমণ্ডলে এসব স ৃষ্টি করেন। রবি হল এই সব পথের দরজা। আর চন্দ্র হল পিতৃযান পথের দ্বার। বর্ণাশ্রম

বিভাগ প্রচলিত হলেও প্রজারা সেই ধর্ম পালনে অবহেলা করছে দেখে তিনি আবার কতগুলি মানসী প্রজা সৃষ্টি করলেন। এরা হলেন দেব, ঋষি, পিতৃ ও মনু। এরা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও জীবনযাত্রা এ সমস্তের সাধক। এই পুত্ররাই ধর্মানুসারে যুগে যুগে সন্তান উৎপাদন করে সৃষ্টি বিস্তার করেছেন। আগেই বলা হয়েছে অতীতকালে যারা জনলোকে ছিলেন তারাই এই কল্পে দেবাদিরূপে জন্ম নিয়েছেন। ব্রহ্মার ধ্যান থেকে এমন প্রজা সৃষ্টি হয়, এইসব সৃষ্ট প্রজা প্রতি মন্বন্তরে সুকর্ম, কুকর্ম, সুখ, দুঃখ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, রূপ, গুণ ইত্যাদি সব বিষয়ে একপ্রকার হয়ে থাকে। প্রাণীদের কর্মফল অবশিষ্ট থাকলেই জন্মগ্রহণ করতে হয়। তারা তখন দেব অসুর পিতৃ, পশু, পাখি, সরীসৃপ, গাছ, কীট, পতঙ্গ নানাভাবে জন্মায়। ভগবান ব্রহ্মা আত্মসৃষ্ট প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যেই এই সমস্ত ব্যবস্থা করলেন।

.

নবম অধ্যায়

সূত বললেন–ভগবান ব্রহ্মা ধ্যান করতে থাকলে তার মানসী প্রজারা উৎপন্ন হয়। তিনি দেব, পিতা, মানুষ ইত্যাদি প্রজা সৃষ্টির জন্য জলরাশির মধ্যে যোগে মগ্ন হন। তখন তার জঘন থেকে অসুরেরা জন্মে। বিপ্রেরা প্রাণকেই অসু বলেন। তার থেকে জন্ম নিয়েছে যারা তারা অসুর। অসুরদের জন্ম দেখে ব্রহ্মা শরীর ত্যাগ করলেন। তার সেই পরিত্যাগ করা শরীর রাত্রিরূপ পায়। তমোপূর্ণ বলে রাত্রিও ত্রিমাত্মিকা। সেজন্য প্রজারা রাত্রিতে তমোগুণ আবৃত হয়ে পড়ে। দেবতা ব্রহ্মা-অসুরদের দেখে অন্যমূর্তি ধারণ করেন। তিনি সেই মূর্তি গ্রহণ করে আনন্দিত হয়ে যোগ থেকে নিরস্ত হলেন। সেই আনন্দিত ব্রহ্মার মুখ থেকে দেবতারা উৎপন্ন হলেন।

দিব্ ধাতুর অর্থ ক্রীড়া বা খেলা। দেবনযুক্ত শরীরে জন্মের জন্য তারা দেবতা বলে বিখ্যাত। দেবতাদের সৃষ্টি করে ব্রহ্মা যখন অন্য দেহ ধারণ করলেন তখনই তা দিনে পরিণত হল। সেজন্য দেবগণ কাজের জন্য দিবের উপাসনা করেন। তারপর ব্রহ্মা অন্য শরীর নিয়ে পিতার মতো সস্নেহে পুত্রদের কথা চিন্তা করতে থাকেন। পরে দুটি পক্ষে সাথে দিনরাত্রির মাঝে পিতৃগণকে সৃষ্টি করলেন। সেজন্য সেই দেবদের পিতৃ এই নাম হল।

তারপর ব্রহ্ম যে শরীরে পিতৃগণকে সৃষ্টি করেছেন সেই শরীর পরিহার করলে তা সদ্যই সন্ধ্যারূপে প্রাপ্ত হল। তখন দিবা দেবদের, রাত্রি অসুরদের আর দুই-এর মাঝে সন্ধ্যা পিতৃদের আনন্দের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তখন থেকে দেব, অসুর, ঋষি, মনু সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রহ্মার

সেই তৃতীয় শরীরের উপাসনা করতে থাকেন। এরপর ব্রহ্মা রজোগুণ সম্পন্ন অন্য শরীর গ্রহণ করলেন। সেই রজোপূর্ণ দেহে অন্য কতগুলি মানস-সন্তান সৃষ্টি করলেন। মন থেকে জন্ম বলে সেই সব সন্তানরা মানস নামে পরিচিত। ব্রহ্মা এই সন্তানদের দেখে শরীর ত্যাগ করলেন তা তখনি জ্যোৎস্না রূপ পেল। সেজন্য প্রজারা জ্যোৎস্না দেখে আনন্দ পায়। জ্যোৎস্না সন্ধ্যা ও দিন–এই তিন সত্ত্বগুণসম্পন্ন। রাত্রি তমোগুণ সম্পন্ন ও ত্রিযামযুক্ত।

ব্রহ্মার দিব্য শরীরের মুখ থেকে উদ্ভব হওয়াতে দেবেরা সবসময় আনন্দ মনে থাকেন। দিনে তাদের জন্ম বলে দিনেই তারা বেশি শক্তিশালী আর রাত্রিকালে ব্রহ্মার জঘন হতে অসুরদের সৃষ্টি অসুররা রাত্রে বেশি শক্তিশালী ও অসহ্যবিক্রম। দেব, অসুর, পিতা, মনু প্রভৃতির ভূত ভবিষ্যত সব মন্বন্তরে এভাবে উৎপত্তি হয়। রাত্রি, দিন, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না এভাবেই এসে থাকে। ভা' ধাতু দীপ্তি বাচক। প্রজারা তা. যুক্ত হয়েছিল বলে এর নাম অম্ভঃ। মনীষীরা বলেন প্রজাপতি এমন নাম দিয়েছেন। এই অম্ভঃ দেখেই তিনি অন্যান্য নানারকম দেব, মানব, দানব, পিতাদের সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মা সেই শরীরও ত্যাগ করলেন এবং খিদে নিয়ে রজস্তমোযুক্ত মূর্তি নিয়ে আবার যাদের সৃষ্টি করলেন তারাও খিদে নিয়ে জন্মে ব্রহ্মাকে গ্রাস করতে চাইল। তার মধ্যে যারা বলল, এই জলরাশিকে রক্ষা করব সেই নিশাচর ক্রোধাত্মাকে রাক্ষস বলে।

আর যারা বলল জলকে খেয়ে ফেলব, তাদের বলে যজ্ঞ। বক্ষ ধাতু থেকে এসেছে রাক্ষস শব্দ আর ক্ষি ধাতু ক্ষয়ার্থক-এর থেকে যক্ষ শব্দ এসেছে। এই অপ্রিয় সৃষ্টি দর্শন করে ভগবান ব্রহ্মার চুল খসে পড়ে সাপের আকার নিয়ে তার গায়ে উঠতে থাকে। ব্রহ্মার মাথা থেকে এরা খসে গিয়েছিল বা অপসর্পতা হয়েছিল আর এরা খারাপ স্বভাব হেতুহীন। তাই এরা অহি, সর্প পৃথিবীর যেখানে চাঁদ বা সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না, সেখানে এদের থাকার জায়গা স্থির হল। ব্রহ্মার ভীষণ আগুনের মতো রাগ সাপেদের মধ্যে চলে যাওয়াতে এরা বিষযুক্ত হল। সাপেদের দেখে রেগে গিয়ে রাগী কপিলবর্ণ ভূত ও পিশাচ সৃষ্টি করলেন। এরা ভূমণ্ডল ঘিরে রয়েছে। এরা মাংস খায় বলে পিশাচ নামে অভিহিত। এরপর জন্মায় গন্ধর্বরা। এরা জন্মেই গো বা তেজ পান করতে থাকে বলে পানার্থক ধৈ ধাতু থেকে গন্ধর্ব শব্দটি এসেছে।

এই আট রকম দেবযানি সৃষ্টি হলে প্রভু ব্রহ্মা স্বচ্ছন্দ মনে বয়স থেকে বয়ঃসমূহ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মাশূন্য দেখে পাখিদের সৃজন করে। ব্রহ্মা পেটের দুপাশ থেকে গোরুদের সৃষ্টি করেন। তার দুপা থেকে ঘোড়া, হাতি, শরভ, হরিণ, উট, অশ্বতর প্রভৃতি পশুরা জন্মে। তার গায়ের রোম থেকে ওষধি ফল-মূলাদি জন্মায়। এভাবে ত্রেতাযুগে শুরুতে পশু ও ওষধি সৃষ্টি করে যজ্ঞের কাজে নিয়োগ করলেন। গোরু, অজ, পুরুষ, মোষ, ঘোড়া ইত্যাদি গ্রাম্য পশু। এবার অরণ্য

পশুরা হল স্বাপদ দ্বিখুর, হাতি, বানর, পাখি, উল্ক সরীসৃপ। পার এ বরুণ, ত্রিবৃত, সৌম্য, রথন্তর, অগ্নিষ্টোম এইসব শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ তার পূর্বমুখ থেকে সৃষ্টি হয়। ছন্দগুলো যেমন–ত্রৈষ্ঠুভ, কর্ম, স্তোম, পঞ্চদশ, বৃহৎসাম, উকম–এরা দক্ষিণ মুখ থেকে। সাম জগতী ছন্দে সতেরোটি প্রকারভেদ। বৈরূপ্য, অতিরাত্র–এরা পশ্চিম মুখ থেকে, আর একুশ প্রকার অথর্ব, অপ্তোষমি, অনুষ্ঠু ও বৈরাজ–এরা সব উওর মুখ থেকে সৃষ্টি।

প্রভু ব্রহ্মা কল্পের আদিতে বিদ্যুৎ অশনি, মেঘ নভোবৈচিত্র্য ইন্দ্রধনু–এইসব সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রহ্মার গা থেকে ছোট বড় প্রাণীরা জন্মায়। তিনি প্রথম দেব, অসুর, পিতা প্রভৃতি চার প্রকার প্রজা সৃষ্টি করে স্থাবর চর প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত উৎপাদন করেন। যজ্ঞ, পিশাচ, অপ্সরা, গন্ধর্ব, নর, কিন্নর, রক্ষঃ, পশু-পাখি, হরিণ, উবর্গ, অব্যয়, ব্যয়, স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত পদার্থই প্রথম সৃষ্টিতে যে যেমন কাজে নিযুক্ত ছিল, সে অন্যান্য জন্মে তেমন কাজে যুক্ত হয়। কাজ অনুযায়ী তাদের আলাদা আলাদা প্রবৃত্তি জন্মায়।

এজন্য তারা হিংস্র, অহিংস্র, ক্রুর, ধর্ম, অধর্ম, সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি নানা কাজে ব্রতী। হে বিপ্রেরা কোনো মানুষ কাজে, কেউ পুরুষকার, কেউবা দেব, অন্যরা স্বভাবকেই কাজের ফলদায়ক বলে নির্ণয় করেন। কিন্তু পুরুষকার, কর্ম, দেব-এরা প্রত্যেকেই স্বভাবশে ফলসাধক। এদের মধ্যে অল্প বা বেশি ভাব নেই। প্রত্যেকেই তুল্য প্রাধান্য সম্পন্ন। কোন কাজই এদের একের দ্বারা হচ্ছে এ কথা বলা যায় না। এজন্য সত্ত্বস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ লোকেরা বিষয়গুলি কর্মস্থ বলে নির্দেশ করেন। রাত্রির শেষে দিনের শুরুতে ভগবান ব্রহ্মা আগের দিনের বেদ বচনগুলি প্রকাশ করেন।

বিভিন্ন ঋতুর বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন নানাভাবে ব্যক্ত হয় সেরকম বিভিন্ন যুগে ভাবগুলো বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। রাত্রির শেষে ব্রহ্মা মানসী সিদ্ধিকে আশ্রয় করে প্রতিদিন সৃষ্টির কাজে ব্রতী হন। প্রতিদিনই তিনি স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করেন। পরে সেই সমস্ত প্রজা বৃদ্ধি পাচ্ছে না দেখে, তিনি ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ এই ক'জন মানস পুত্র সৃষ্টি করেন। এঁরা 'নবব্রাহ্মণ' নামে পুরাণে বিখ্যাত। এরা সকলেই ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মচর্য নিষ্ঠ হলেন। তখন রেগে গিয়ে ব্রহ্মা রুদ্রকে সৃষ্টি করলেন। এর সৃষ্টি হল ধর্ম ও সংকল্পের। ব্রহ্মা এর আগে সনন্দন, সনক, সনাতক, সনৎ কুমার নামে পুত্রদের উৎপাদন করেন। কিন্তু এঁরা সংসারে আসক্ত হলেন না।

তারা নিরপেক্ষ জিতেন্দ্রিয়, রাগহীন, বিমৎসর ও ভবিষ্যতজ্ঞান সম্পন্ন। হিরণ্যগর্ভ সেই পুত্রেরা নিরপেক্ষ ব্রহ্মবাদী হল। তাই দেখে ব্রহ্ম আবার রেগে গেলেন। তার রাগ থেকে তখন সূর্যের মতো তেজদীপ্ত দেহ, অর্থ, স্ত্রী, অর্ধপুরুষ মূর্তি আবির্ভূত হয়ে ব্রহ্মাকে বলল–সবকিছুই তেজময় হয়েছে। আদিত্যের মতো তেজস্বী আত্মাকে এবার ভাগ করো। এই বলে সেই মূর্তি মিলিয়ে গেল।

এই শুনে ভগবান ব্রহ্মা নিজেকে দুভাগে ভাগ করে একস্ত্রী ও একপুরুষ রূপ নিলেন। অর্ধেক পুরুষ মূর্তিটির আবার সতেরো ভাগ করলেন। তাদের বললেন–তোমরা জগতের কল্যাণের জন্য সৃষ্টির বিস্তারের জন্য যত্নশীল হও। একথা শুনে তারা রোদন করতে করতে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। এজন্য এরা রুদ্র নামে পরিচিত। এই রুদ্রেরা সমস্ত চরাচর ব্যাপ্ত করে রয়েছেন। গণেশ্বর রুদ্রেরা সকলেই অন্যান্য সৃষ্টদের চেয়ে বেশি বলবান। আগে বলা হয়েছে যে–ব্রহ্মার মুখ থেকে দক্ষিণার্ধে শুক্লবর্ণা ও বামাঙ্গে শঙ্করার্ধ শরীনিনী এক মহাভাগ দেবী আবির্ভূত হলেন। ব্রহ্মার নির্দেশে সেই দেবী নিজদেহ দুভাগে বিভক্ত করলেন।

তার একমূর্তি শুক্ল আর একমূর্তি কালো। তাদের নাম হল–স্বাহা, স্বধা, মহাবিদ্যা, মেধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অপর্ণা, একপর্ণা, পাটলী, উমা, হেমবতী, ষষ্ঠী, কল্যাণী, খ্যাতি, প্রজ্ঞা, মহাভাগা ও গৌরী। এই আর্যদেবীই ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণ করে সৃষ্টি ব্যপ্ত করে আছেন। তার অন্য নামগুলি হল–প্রকৃতি, নিয়তি, রৌদ্রী, দুর্গা, ভদ্রা, প্রমথিনী, মহামায়া, রেবতী ইত্যাদি দ্বাপরযুগে দেবীদের কয়েকটি নাম হল–গৌতমী, কৌশিকী, আর্যা, চণ্ডী, কাত্যায়নী, সতী, কুমারী, যাদবী, বরদা, অপরাজিতা, সিংহবাহিনী, মহিষমর্দিনী প্রভৃতি। মানুষ ভদ্রকালীর এইসব নাম পাঠ করলে তার কখনো পরাজয় হয় না। অরণ্যে, প্রান্তরে, গৃহ, জলে, স্থলে, বাঘ, কুমীর ভূতাদির দ্বারা আক্রান্ত হলে মানুষ যদি দেবী নাম পাঠ করে তবে সবকিছু থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রজ্ঞা ও শ্রী এই দুটি দেবীর মূল মূর্তি, এই মূর্তি দুটি থেকেই সহস্র সহস্র মূর্তির আবির্ভাব হয়ে জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্রহ্মার মন থেকে রুচি নামে এক পুত্র জন্মে ও প্রাণ থেকে দক্ষ, দুচোখ থেকে মরীচি, হৃদয় থেকে ভৃগু, মাথা থেকে অঙ্গিরা, কাল থেকে অত্রি, উদান থেকে পুলস্ত্য, ধ্যান থেকে পুলহ, সমান থেকে বশিষ্ঠ, অপান থেকে ক্রতু ও অভিমান থেকে নীললোহিত রুদ্রকে উৎপাদন করে। এদের ভৃগু প্রভৃতি নয়জন পুরাতন গৃহস্থ। এরাই প্রথম ধর্মকে প্রবর্তন করেন। রুদ্রের সাথে এই বারোজন মানুষের কল্যাণের জন্য সবসময় ব্যস্ত। ঋভু ও সনৎ কুমার এই দুই মহাত্মা ও আত্মতেজ ও সংযমের দ্বারা বৈরাজ লোকে গিয়েছিলেন। তারা যেমন জন্মেছেন, তেমনই আছেন বলে তাদেরকে কুমার ও সনকুমার বলা যায়। এই বারোজন ব্রহ্মতনয়ের বংশবৃদ্ধি পেয়ে দেব গুণান্বিত প্রজা বৃদ্ধি পেল। ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য থেকে প্রাকৃত

বিকারগুলো চাঁদ, সূর্য, আলো, অন্ধকার, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, সমুদ্র, পাহাড় নানা আকারের পুর ওজন পদাদির সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মা সেই ব্রহ্মবর্ণের মধ্যে রাত্রি যাপন করে থাকেন। সেই ব্রহ্মবৃক্ষ অব্যক্ত বীজের থেকে উৎপন্ন। বুদ্ধি এর কাঁধ, ইন্দ্রিয়েরা এর কোটর, মহাভূত এর শাখাপ্রশাখা, বিশেষ তত্ত্বগুলো এর পাতা, ধর্ম ও অধর্ম এর ফুল আর সুখ-দুঃখ এর ফল। এই সনাতন ব্রহ্মই সর্বভূতের উপজীব্য। ব্রহ্মবৃক্ষ পূর্ণ ব্রহ্ম বনের কারণ অব্যক্ত। সেই ব্রহ্মবক্ষে একই রকম দেখতে, একই স্বভাবের দুটি পাখি থাকে। তাদের একজন বৃক্ষতত্ত্ব জানে, অন্যজন কোন তত্ত্ব জানে না। ব্রাহ্মণের ঊর্ধ্বলোককে যার মাথা, নভোমণ্ডলকে নাভি, চাঁদ সূর্যকে চোখ ও দিক সকলকে দু-কান, ভূমিকে দু-পা বলে বর্ণনা করেন, সেই অচিন্তাত্মা ভগবানের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও দু-পা থেকে শূদ্রের জন্ম। তাঁর পাত্র থেকে সমস্ত রঙের সৃষ্টি। অব্যক্ত থেকে অণ্ডের উৎপত্তি। অণ্ড থেকে ব্রহ্মার জন্ম। ব্রহ্মাই এই চরাচর ত্রিলোকের স্রষ্টা।

.

দশম অধ্যায়

সূত বললেন–লোককর্তা ব্রহ্মা এই প্রকার সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করলেও সেই প্রজারা বিধি নির্দিষ্ট পথে থাকলেন না। ব্রহ্মা তাই তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে দুঃখিত মনে চিন্তা করতে করতে নিজের মধ্যে তামসী শক্তি সৃষ্টি করলেন। পরে সেই তমোভাব পরিহার করে রজোগুণ অবলম্বন করে তমোগুণকে ঢেকে দিলেন। এই তমোগুণ থেকেই একটি মিথুন জন্মায়। ব্রহ্মার পা থেকে অধর্ম ও শোক থেকে হিংসা উৎপন্ন হল। ব্রহ্মা তখন খুশী হলেন। এরপর ব্রহ্মা সেই মলিন দেহ ত্যাগ করে, দেহের অর্ধেক অংশ দিয়ে পুরুষ ও অপর অর্ধাংশ দিয়ে নারীমূর্তি তৈরী করলেন। ইনি প্রকৃত ভূতধাত্রী শতরূপা। নিজের মহিমায় আকাশ বাতাস ব্যপ্ত করে আছেন।

সেই শতরূপা নিযুত বৎসর ধরে কঠিন তপস্যা করে মনুকে পতিরূপে বরণ করেন। মনু সেই অযোনিজা শতরূপাকে পত্নীরূপে পেয়ে তাতে রত হলেন। এজন্য শতরূপা হলেন রতি। এই প্রথম স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হল। মনু ও শতরূপার প্রিয়ব্রত, জ্ঞানপাদ নামে দুই পুত্র, 'আকুতি' প্রসূতি দুই কন্যা হয়। মনু প্রসূতিকে দক্ষের হাতে সম্প্রদান করলেন আর রুচিকে আকূতি নামের কন্যা দান করলেন। ব্রহ্মার মানসসন্তান রুচির গর্ভে যজ্ঞ দক্ষিণা একটি মিথুন উৎপন্ন হয়। দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের থাম নামে বিখ্যাত বারোজন পুত্র হয়। যজ্ঞের আরেক নাম যম। যমের ছেলে যাম। এরা অজিত ও শূক এই দুই নামে বিভক্ত। এদিকে দক্ষ, প্রসূতির গর্ভে

লোকমাতা চোদ্দটি কন্যার জন্ম দেন। এই মেয়েরা সবাই মহা ভাগ্যবতী, মনলোচনা, যোগমাতা। এঁরা হলেন-শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি ও কীর্তি। প্রভু ধর্ম এদের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, ঊর্জা, স্বাহা ও স্বধা–এই দশজন কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন যথাক্রমে-রুদ্র, ভৃগু, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, অত্রি, বশিষ্ঠ, পিতৃগণ ও অগ্নি। এই দক্ষ কন্যারা সবাই প্রলয়কাল পর্যন্ত সব মন্বন্তরে সদাচারগুলো পালন করে থাকেন। এঁদের সন্তানরা হলেন–শ্রদ্ধার পুত্র কাম, লক্ষ্মীর ছেলে দর্প, ধৃতির ছেলে নিয়ম, তুষ্টির পুত্র সন্তোষ, পুষ্টির ছেলে লাভ, মেধার পুত্র শ্রুত, ক্রিয়ার ছেলে জয়, দণ্ড ও সময়। বুদ্ধির পুত্র বোধ অপ্রসাদ, লজ্জার ছেলে বিনয়, বপুর পুত্র ব্যবসায়, শান্তির পুত্র ক্ষম, সিদ্ধির পুত্র সুখ ও কীর্তির ছেলে যশ–এরা ধর্মের সন্তান। রতির গর্ভে কামের হর্ষ নামে পুত্র জন্মায়। এখানে ধর্মের বংশ বিবরণ দেওয়া হল। হিংসার গর্ভে অধর্মের নিকৃতি নামে মেয়ে ও অনৃত নামে ছেলে হয়। এদের ভয় ও নরক নামে দুজন ছেলে আর মায়া ও বেদনা নামে দুই কন্যা হয়। ভয় ও মায়ার মিথুনে মৃত্যুর উৎপত্তি আর নরক ও বেদনার দুঃখ নামে পুত্র জন্মে। মৃত্যু থেকে ব্যাধির জরা, শোক, ক্রোধ, অসুয়া নামে সন্তান হয়।

এরা সবাই দুঃখময় ও অধর্ম লক্ষণযুক্ত। এদের স্ত্রীপুত্র কেউ নেই। এরা বিনাশহীন। ব্রহ্মা নীললোহিতকে প্রজা সৃষ্টি নির্দেশ দিলে, তিনি আত্মসম হাজার হাজার মানস সন্তানের জন্ম দিলেন। তারা সবাই রূপে, তেজে, জ্ঞান, বলে পিতৃতুল্য। সকলেই চামড়ার বসনধারী, পিঙ্গলবর্ণ, জটাবান, হরিত, কেশ, ক্রুরদৃষ্টি, ত্রিলোচন। তারা কেউ কেউ বহুরূপ, বিরূপ সুরূপ ও বিশ্বরূপ। কেউ কেউ শত বাহু, সহপ্রবাহ, স্কুলশীর্ষ ও আটটি দাঁতযুক্ত। কারওবা জিব নেই। কেউ অন্নভোজী, মাংসভোজী, ঘৃতপ্রায়ী, ভীষণ রাগী এবং নানান অস্ত্রধারী। কেউ কাজ করছে, কেউ বা বসে রয়েছে কেউ জপ, ধ্যান যোগ করছে। কেউ কেউ রাতে বিচরণ করেন, মহাযোগযুক্ত, স্থির যৌবন, মহাতেজস্বী।

এরা সবসময় শত সহস্র দলে কাঁদতে থাকেন বা ছোটাছুটি করতে থাকেন। ভগবান ব্রহ্মা এইরকম সমস্ত প্রজা দেখে নীললোহিতকে বললেন–তোমার মঙ্গল হোক, তুমি নিজের মতো এরকম প্রজা আর বেশি সৃষ্টি করো না। একথা শুনে নীললেহিত বললেন–আমি বিরত হলাম। এবার আপনি প্রজা সৃষ্টি করুন। আমি মরণশীল প্রজা সৃষ্টি করব না। আমি যে বিরূপ, আত্মতুল্য হাজার হাজার প্রজাসৃষ্টি করেছি। এরা পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ হবেন এবং দেবতাদের মধ্যে গণ্য হয়ে সমস্ত দেবযুগে দেবতাদের সঙ্গে যজ্ঞভোজী হবেন। প্রতি মন্বন্তরে ছন্দ থেকে যেসব যজ্ঞীয় দেবতা জন্মাবেন তাদের সাথে এরা পূজিত হবেন এবং

মহাপ্রলয় অবধি থাকবেন, মহাদেবের কথা শুনে ভীষণ হেসে ব্রহ্মা ভীমমূর্তি নীললোহিতকে বললেন–প্রভু আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

হে মুনিগণ–সব কালে সব কাজেই বিধাতার ইঙ্গিতে থাকে। সেই থেকে তিনি প্রজা সৃজনে বিরত। 'স্থিতোহস্মি' অর্থাৎ আমি বিরত হলাম এই বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন এইজন্য তিনি স্থানু' নামে প্রসিদ্ধ। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, সুষ্ঠুত্ব ও অধিষ্ঠাতৃত্ব এই দশটি গুণ সেই শঙ্করদেবে সব সময় রয়েছে। তিনি ঋষি, দেব অমর-মহা তেজস্বী মহাদেব নামে খ্যাত। তার ঐশ্বর্য দিয়ে দেবতারা, বল দিয়ে মহাসুরেরা, জ্ঞান দিয়ে মুনিরা, যোগ দিয়ে সমস্ত ভূত পরাজিত হয়েছে। ঋষিরা বললেন–হে মহামুনি সূত! আমাদের কাছে মহেশ্বর যোগ, তপস্যা ধর্ম ও জ্ঞানসাধন বিষয়ে বলুন।

যার অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণেরা গতি লাভ করেন, সেই সব মহেশ্বর যোগধর্ম শুনতে ইচ্ছা করি। বায়ু তখন বললেন–রুদ্রদেব পাঁচ রকম ধর্ম প্রচার করেছেন। পুরাণ এদের মাহেশ্বর ধর্ম বলে। অক্লিষ্ট কর্মা রুদ্রেরা সেইসব ধর্ম প্রতিপালন করে। আদিত্য, বসু, সাধ্য অশ্বিনীকুমার দুজন, মরুত, ভৃগুবংশীয়রা আর সুরপুরবাসী ইন্দ্র, যম, পিতৃ, কাল প্রভৃতি অনেকে এই ধর্ম পালন করেন। এই ধর্মের উপাসকরা বাসনাহীন নির্মল হন।

এই ধার্মিকরা গুরুর প্রিয় সাধনের জন্য মঙ্গল অনুষ্ঠানে রত হয়ে মানুষের জন্ম ত্যাগ করে দেবতাদের মতো বিহার করেন। মহেশ্বরের পাঁচরকম ধর্মের বিধানগুলি হল–প্রাণায়ম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা ও স্মরণ। শিবের দ্বারা এসবের লক্ষণ ও কারণ যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাহল–প্রাণের বিস্তার গতিকে প্রাণায়াম বলে। এটি মন্দ, মধ্যম, উত্তম এই তিন প্রকার আর প্রাণের নিরোধকেও প্রাণায়ম বলে। প্রাণায়মের প্রণাম দ্বাদশ মাত্রা, মন্দ প্রাণায়ম বারোমাত্রার। এতে বারোটি আঘাত, মধ্যম প্রাণায়ামে চোদ্দটি মাত্রা আছে, এতে দুটো আঘাত। উত্তম প্রাণায়াম ছত্রিশ মাত্রা। এর প্রমাণ ও লক্ষণ সংক্ষেপে বলছি–অরণ্যের কোনো দুরন্ত পশুকে ধরে বশে আনতে থাকলে সে যেমন ধীরে ধীরে মৃদুভাব অবলম্বন করে, প্রাণও তেমনি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে দমন করা যায় না। কিন্তু যোগ প্রভাবে বশীভূত হয়। সেই হিংস্র পশু যেমন আস্তে আস্তে দুর্বল ও বশীভূত হয়ে অহিংস হয়ে যায়, প্রাণও তেমনি আয়ত্তে আসে ধীরে ধীরে। যোগানুষ্ঠানের সময় প্রাণবায়ু যখন বশে থাকে তখন স্বচ্ছন্দে তাকে যেখানে সেখানে আনা নেওয়া যায়। সিংহ ও হাতি বশে এলে তাদের দিয়ে মানুষ যেমন সাধারণ পশুর ভয় দূর করে। শরীরগত বায়ু তেমনি অবরুদ্ধ বা অনবরুদ্ধ এই দুই অবস্থায় সমস্ত পাপনাশ করে। যে বিপ্র প্রাণায়াম করে তার সব দোষ দূর হয়। যত তপস্যা, যজ্ঞ, নিয়ম, ব্রত আছে।

সবার তুল্য প্রাণায়ম। একশ বছর ধরে, মাসে মাসে কুশাগ্র দিয়ে জলপান করলে যে ফল হয়, সেই ফলের সমান প্রাণায়াম। প্রাণায়াম দিয়ে দোষ, পাপ দূর করা যায়। তাই সকলকে যোগনিষ্ঠ প্রাণায়ম করতে হবে। প্রাণায়াম দিয়েই যোগীরা সমস্ত পাপমুক্ত হয়ে পরমব্রহ্ম লাভ করেন।

একাদশ অধ্যায়

বায়ু বললেন–মহাত্মা ঋষিরা একটি মহাদিবস, অহোরাত্র অর্ধেক মাস, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ বা মহাযুগ ধরে তপস্যা করে প্রাণের উপাসনা করেন। প্রাণায়ামের প্রয়োজন এবং ফল সম্পর্কে ভগবান যা বলেছেন তা বলছি। শান্তি, প্রশান্তি, দীপ্তি ও প্রমোদ–এই চারটে প্রাণায়মের প্রয়োজন। এরপর নিজের কর্মসংক্রান্ত বা পিতামাতা সংক্রান্ত অথবা জ্ঞান সংসর্গজনিত পাপগুলো যা দিয়ে বিনাশকর তাই শান্তি। তারপর লোভ অভিমান প্রভৃতি পাপগুলোকে সংযম তপ্যসাকে প্রশান্তি বলে। তপস্যারত যোগী যে অবস্থায় চাঁদ, সূর্য বিষয়ে বা অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে অথবা অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত এই তিনটি ফলের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ ফলে অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ পায় তাকে বলে দীপ্তি। ইন্দ্রিয়রা মন এবং পাঁচরকম বায়ু যে অবস্থায় প্রসন্ন হয় তাকেই প্রসাদ বলে। এই চার প্রাণায়াম-এর ফলে কালভয় নিবারণ হয়। প্রাণায়ামের যোগানুষ্ঠানযোগ্য আসনগুলোর কথা বলছি। ওঁকার উচ্চারণ করে চন্দ্রসূর্যের প্রণাম করবে। পরে স্বস্তিক, পদ্ম, অর্থ, সমজানু, একজানু, উত্তান, সুস্থি যে-কোন আসন করতে হবে। তমোগুণকে রজোগুণ দিয়ে আর রজোগুণকে সত্ত্বগুণ দিয়ে আচ্ছাদন করবে। পরে সত্ত্বগুণ থেকে সমাহিত মনে যোগানুষ্ঠান করবে।

ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহ পঞ্চবায়ু এদের বশে এনে প্রত্যাহার অভ্যেস করবে। কচ্ছপ যেমন তার অঙ্গগুলো গুটিয়ে দেহের মধ্যে লুকিয়ে রাখে যোগী মানুষ তেমনি বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে আত্মাতেই অবরুদ্ধ করবে। শুদ্ধ যোগীপুরুষ প্রাণায়ম করার সময় বায়ু আকণ্ঠ পান করে ছেড়ে দেবে। বারোমাত্রা কাল প্রাণায়মের জন্য নির্দিষ্ট। দ্বাদশ প্রাণায়ামে একটি ধারণা বা দুটি ধারণার একটি যোগ হয়। এই যোগানুষ্ঠান করলে তার ঐশ্বর্য লাভ হয়। তখন সে দীপ্যমান পরমাত্মার দর্শন পায়। প্রাণায়ামনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সমস্ত দোষ দূর হয় এবং সে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। মুনি ও মানুষ আহার সংযম করে, প্রাণায়ম-পরায়ণ হয়ে এক একটি ভূমি জয় করবে। প্রাণায়াম জনিত এক একটি অবস্থাকে সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করবে। আগের ভূমি জয় না করে যদি পরের ভূমিজয়ের চেষ্টা করে, তবে তাতে দোষ জন্মে। প্রাণায়াম অক্লান্ত ভাবে, যত্ন সহকারে করতে হয়। নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, বক্ষঃ, মুখ, নাসা, নেত্র, ভ্রমধ্য, মাথা

ও ব্রহ্মরন্ধ্র–এসব জায়গায় মনের ধারণা অভ্যেস করবে। বিষয় থেকে নিরত হওয়াকে প্রত্যাহার বলে। যোগসিদ্ধি লক্ষণ ধ্যান। ধ্যানী যোগী নিজেকে সূর্যচন্দ্রাদি রূপে চিন্তা করবেন। ধ্যানপরায়ণ যোগীরা আগুনের কাছে বনের মধ্যে শুকনো পাতার মধ্যে কৃমিকীটে ভরা অপরিচ্ছন্ন জায়গায়, শ্মশানে, তরুতলে নদী বা কুয়োর কাছে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিয়ে ব্যাকুল চিত্তে ধ্যানরত হবেন না। এই সব দোষ বিচার না করে যোগাসক্ত হলে তার দোষগুলো শরীরে পীড়া দেয়। জড়ত্ব, বধিরত্ব, অন্ধত্ব মূক ইত্যাদি জন্মে এবং স্মৃতিলোপ ঘটে।

এজন্য শান্ত সমাহিত মনে, শুদ্ধ জ্ঞানে বিশেষ বিবেচনা করে যোগানুষ্ঠান করতে হয়। স্নেহপদার্থ মিশ্রিত যবের মণ্ড ভোজনের পর সেখানেই থাকবে। এতে বাতগুল্ম নষ্ট হয়। উদাবর্ত প্রতিকারের জন্য দই কিংবা যবাগু ভোজনের পর বায়ুগ্রন্থি ভেদ করে উপরের দিকে পরিচালন করবে। এতে প্রতিকার না হলে মাথায় ধারণা করে সেবারত সত্ত্বস্থ যোগী এভাবে উদাবর্ত রোগের প্রতিকার করতে পারে। যোগীর সমস্ত গা কাঁপতে থাকলে এমন চিকিৎসা করলে শান্তি লাভ হয়। বক্ষোভ্রংশ ঘটলে বক্ষঃস্থলে ও কণ্ঠদেশে আগের মতো ধারণা করবে। বারোধ না হলে বাক্যে ও বধিরতায় কানে ধারণা করতে হয়। ক্ষয়, কুষ্ঠ ইত্যাদি বিকারে সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকী ধারণা করবে। যোগজ বিঘ্নের এভাবে চিকিৎসা করতে হয়। সংজ্ঞাহীন লোকের মাথায় হাত রেখে ধারণা করবে। তাতে জ্ঞান ফিরে আসে। যদি যোগীর শরীরে কোনো দোষ দেখা যায় তবে দোষকে মাথায় রেখে তিনি প্রাণায়াম অগ্নি দ্বারা পুড়িয়ে ফেলবেন। কৃষ্ণসর্পের বিষ শরীরে প্রবেশ করলে পেটে ও হৃদয়ে ধারণা করবে। বিষফল খেয়ে ফেলল বিশল্যা ধারণা করবে। মনের মধ্যে সমুদ্র, পর্বত ও গাছের সাথে পৃথিবী ও সমস্ত দেবতার ধারণা করবে। হাজার ঘট জল দিয়ে স্নান করবে। শরীর ক্ষীণ হলে অরপত্র পুটে বল্মকী মাটি খাবে। এতক্ষণ আমি যোগ রোগগুলোর হেতু বিচার ও সংক্ষেপে চিকিৎসাবিধির কথা বললাম। কোনো ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কাউকে যোগ সাধনের লক্ষণগুলো বলতে নেই। এসব তত্ত্ব সবাইকে বললে বিজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়। বর্ণপ্রভা, সৌম্যতা শুভগন্ধ, মূত্র ও পুরীষের অল্পতা, শরীরে যোগ প্রবৃত্তির প্রথম লক্ষণ। যখন নিজেকে এবং পৃথিবীকে জাজ্বল্যমান দেখবে এবং সৃষ্ট পদার্থগুলো অনিষ্ট হতে পারে যোগী মানবের তখনই সিদ্ধি এসেছে জানতে হবে।

.

দ্বাদশ অধ্যায়

সূত বললেন–তত্ত্বদৃষ্টি সম্পন্ন দেহীর যেসব উপসর্গ দেখা যায়, সেগুলো সব বলছি। যেমন–নানান কামনা, স্ত্রীসঙ্গের ইচ্ছা, পুত্রোৎপাদনের ইচ্ছা, বিদ্যাদান, হরিযজ্ঞ, কপটতা, ধনার্জন, স্বর্গস্পৃহা–এসব কাজে আসক্ত হলে যোগীপুরুষ অবিদ্যায় বশীভূত হয়। সবসময় ব্রহ্মপরায়ণ হয়ে যোগানুষ্ঠান করতে হয়। তাতে উপসর্গ জয় করা যায়। মানুষ শ্বাসজয় ও উপসর্গ জয় করলে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস উপসর্গ দেখা যায়। দূরতি শক্তি, দেবতা দর্শন, অল্পাল্প প্রেম–এসব সিদ্ধির লক্ষণ বলে জানতে হবে। যজ্ঞ, রাক্ষস, গন্ধর্ব দর্শন ও যোগীর উপসর্গ। যোগী চারিদিকে দেব, দানব, ঋষি ও পিতৃগণ দর্শন করে লাভ হয়ে উন্মত্ত হয়ে যায়।

ভ্রান্তযোগী যেমন ভ্রমবশতঃ নানা বিষয়ে অন্তরাত্মা দিয়ে ব্যাখ্যা পায় না তখন তার মনে আক্রান্ত হয়। তার বুদ্ধি বিনষ্ট হয়, সে তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এরকম হলে তখন মনে মনে শুভ্র আবরণ দিয়ে শরীর ঢেকে পরব্রহ্মের ধ্যান করবে। বুদ্ধিমান মানুষ সিদ্ধি লাভ করার জন্য আত্মদোষ ও উপসর্গগুলো ত্যাগ করবে। যোগী ব্যক্তি নিন্দা জয় করে মাথায় সূক্ষ্ম বিষয়ের ধারণা করবেন। প্রথম পৃথিবী ধারণা, তারপর যথাক্রমে জলের ধারণা, অগ্নির ধারণা, বায়ুর ধারণা, আকাশের ধারণা, মনের ধারণা ও বুদ্ধির ধারণা করতে হয়। পৃথিবী ধারণা করলে তার শরীর সূক্ষ্ম রূপে পৃথিবীময় মনে করেন, শরীরে সুগন্ধ উপলব্ধি করা যায়। জলের ধারণায় দেহে অমৃতের মতো সূক্ষ্ম রস প্রবাহিত হয়। তেজের ধারণা যোগীর শরীরকে তেজোময় বলে বোধ হয়। বায়ুর ধারণায় যোগী নিজেকে বায়ুময় বোধ হয় এবং বায়ুমণ্ডলে বিচরণ করতে পারেন। আকাশ ধারণায় যোগী শব্দসম্পন্ন হন তার সূক্ষ্মমণ্ডল দর্শন হয়ে থাকে।

মনের ধারণায় সূক্ষ্ম মনঃসঞ্চার হয়, এজন্য যোগী সর্বভূতের মনের মধ্যে আত্মা মনোনিবেশ করতে পারেন। বুদ্ধির ধারণা দিয়ে সমস্ত তত্ত্ব জানতে সক্ষম হন। যে যোগী এই সাতটি সূক্ষ্মতত্ত্ব জেনেও তুচ্ছবোধে ত্যাগ করেন তিনি পরমতত্ত্ব লাভ করেন। যোগী মানুষের ঐশ্বর্য-এর প্রতি আকর্ষণ জন্মালেই বিনাশ নিশ্চিত। দেখা গেছে দিব্যচক্ষু মহাত্মারাও দোষ পেয়েছেন। ঐশ্বর্য থেকে অনুরাগ জন্মে কিন্তু ব্রহ্মরাগহীন। তাকে পরমধন জ্ঞানে যোগ সাধনা করলে উপসর্গ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সকল যোগের দ্বারস্বরূপ হল মন। আদিত্যকেও যোগের দ্বাররূপে নির্দেশ করা যায়।

যোগী বিষয়াসক্তি ছেড়ে বিধিময় যোগানুষ্ঠান করলে রুদ্রলোকে সসম্মানে বাস করতে পারে। যোগী ব্রহ্মগুণে ব্রহ্মাকে সাধন করবেন। তবে যোগী সর্বগামী হতে পারেন।

.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এরপর বায়ু বললেন–যেসব কৌশল দিয়ে সর্বলোক অতিক্রম করা যায় সেগুলি হল যোগীদের আটটি ঐশ্বর্য। এবারে সেগুলির কথা বলছি শুনুন। অনিমা, লখিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসারিতা–এগুলি অষ্ট ঐশ্বর্য। এরা আবার সাবদ্য, নিরদ্য ও সূক্ষ্মভাবে প্ররর্তিত হয়। সাবদ্য নামে যে তত্ত্ব তা পঞ্চভূতোত্মক, নিরবদ্য নামে যে তত্ত্ব তা পঞ্চভূতাত্মক, স্থল ইন্দ্রিয়, মন ও অহঙ্কার, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, মনবুদ্ধি ও অহংকার–এই হল আটটি ঐশ্বর্যের তিনটি গতিধারা। প্রভু ব্রহ্মা যেমন বলেছেন, এই আট ঐশ্বর্য সম্পর্কে, আমি তাই বলছি। ত্রিলোকের যত জীবজন্তু আছে তাদের সকলেরই অনিমা যোগীর আয়ত্ত হয়।

দ্বিতীয় ঐশ্বর্য্য লখিমার সাহায্যে যোগী আকাশে দ্রুত চলতে পারেন। তৃতীয় ঐশ্বর্য মহিমা দিয়ে ত্রিলোকের সমস্ত পদার্থ লাভ করেন। প্রকাশ্য ঐশ্বর্য দিয়ে ইচ্ছা মতন ভোগ করেন। মহিমার দ্বারা

একস্থানে থেকেও ত্রিলোকের সঙ্গে সংযোগ রাখতে পারেন। ঈশিত্ব ঐশ্বর্যের প্রভাবে সর্বভূতের । সুখ-দুঃখের বিধানে সমর্থ হন। বশিত্ব দ্বারা সকল যোগী বশে থাকে। বশিত্ব ও কামাবসারিতা প্রভাবে যোগীর ইচ্ছানুসারে সর্বকাম লাভ ও প্রাণীদের বশ্যতা ঘটে। শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ, রূপ ও মন–এ সমস্তই যোগীর ইচ্ছানুসারে কখনো প্রবর্তিত হয় কখনো হয় না। সেই সব যোগীর জন্ম, মৃত্যু, ছেদ, ভেদ, দাহ, ক্ষয়, মেদ বিকার ইত্যাদি কিছুই নেই। বিষয় ভোগ করলেও বিষয়ে লিপ্ত হন না। পরম সূরে দান অপবর্গ লাভ হয়। সেই অপবর্গ খুব সূক্ষ্ম। পরম পুরুষ সূক্ষ্মভাবে ঐশ্বর্যে রয়েছেন।

.

চতুর্দশ অধ্যায়

বায়ু বললেন–পূর্বে আলোচনা ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান ছাড়া প্রাণীরা অজ্ঞান বশে রাজস ও তামস কাজগুলো করে ততগুণে সংযুক্ত হয়। সুকর্মের জন্য ব্যক্তি স্বর্গলাভ করে, আবার সেখানে ভ্রষ্ট হয়ে মানুষ জন্ম পায়। ব্রহ্মই চিরস্থায়ী পরম সুখ স্বরূপ এই ব্রহ্মেরই সেবা করবে। অনেক সময় বিপুল অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করে বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয় বটে, তবে আমরা মৃত্যু বশীভূত হতে হয়। তাই মোক্ষই পরম সুখ, বিশ্বরূপী প্রভু, সবসময় গতিমান, বরেণ্য, মহাত্মা,

সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম, স্কুল থেকে স্কুল, নিরিন্দ্রিয় দিব্য পুরুষকে যোগী ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষ দেখতে পান।

যোগীরা সেই নিত্য নির্গুণ, চিহ্নহীন পরম পুরুষকে স্বর্ণবর্ণ, সর্ব্বব্যাপী, সর্বত্র প্রকাশমান রূপে দর্শন করেন। এই সর্বজ্ঞানী সচেতন মহান পুরুষকেই সব থেকে আগের পরম পুরুষ বলে। যোগীরা তাকে ধ্যান যোগে চিত্তমধ্যে প্রত্যক্ষ করেন। তার হাত, পা, চোখ, কান, মাথা, মুখ– সব জায়গাতেই রয়েছে। ধ্যানের সাহায্যে মনের মধ্যে পরমপুরুষকে প্রত্যক্ষ করলে আর মোহবশবর্তী হতে হয় না। বায়ুর মতো তিনি সর্বভূতে বিচরণকারী, সমস্ত ভূতের হৃদয়াকাশ পুরে শুয়ে রয়েছেন বলে, তিনি পুরুষ। ধর্মহীন জীবেরা বারবার স্ত্রী-পুরুষরূপে জন্ম নিয়ে থাকে। চাকার মধ্যে কিছুটা মাটির মণ্ড ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে ঘট, সরা ইত্যাদি আকৃতি নেয়, আত্মা তেমন বায়ু পরিচালিত হয়ে অস্থিযুক্ত মনঃসম্পন্ন মানুষ রূপে উৎপন্ন হয়। বায়ু থেকে জলের উৎপত্তি, জল থেকে প্রাণ আর প্রাণ থেকে শুক্ত জন্মে। রক্ত শুক্ত একসাথে মিলে গর্ভাশয়ে সন্তানের শরীর তৈরী করে গর্ভের সেই জীবন-মাস ধরে অধোমুখে থাকে। তারপর প্রসব হয়। মরণের পর জীব পাপকাজের জন্য নরকবাসী হয়। নরকে ভয়ঙ্কর দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। জল যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাগ করলেও এক হয়ে যায়, তেমনি জীবও ছিন্ন ভিন্ন হয়েও এক শরীরেই যন্ত্রণা অনুভব করে।

এইভাবে নিজের কর্মফল হিসাবে জীব সুখ-দুঃখ ইত্যাদি ভোগ করে। একলাই মৃত্যুপারে যেতে হয়। একাই কর্মফল ভোগ করতে হয়। তাই সবার কর্তব্য সকর্ম করা। যখন ইহলোক ছেড়ে জীব চলে যায়, তখন অন্য কেউই সঙ্গে যেতে পারে না, শুধুমাত্র তার কর্মফল যায়। নরকে যমরাজ্যে গিয়ে পাপীরা ঘোর যন্ত্রণায় বেদনায় আর্তনাদ করে। কর্ম, মন, বাক্য দিয়ে সবসময় যেসব পাপ করা হয়, শেষকালে জোর করে পাপীকে তারাই শাস্তি দেয়। তাই সৎকাজ করাই কর্তব্য।

যে যেমন পাপাঁচরণ করে, পরে সেইরূপ ছরকম তামস-সংসার পেয়ে থাকে। মানুষ, পশু, মৃগ, পাখি, সরীসৃপ ও স্থাবর এভাবে পরপর নিকৃষ্ট জন্ম পেয়ে পাপী জীব আবার মনুষ্যত্ব পায়। ব্রহ্মাতে শুধু স্বত্ত্ব আর স্থাবরে শুধু তমঃ এই চোদ্দপ্রকার সৃষ্টির মধ্যবর্তী সৃষ্টিগুলো রজোগুণে ভরা। হে বিপ্রগণ! যেন দেহীদের বিষয়জনিত ক্লেশে ছিন্ন ভিন্ন হয়, তারা সবসময়ই দুঃখে মগ্ন থাকে। সুতরাং তারা নিজের থেকে সেই পরম ব্রহ্মকে স্মরণ করবে। কি করে? ধর্ম ভাবনার ফলে জীব মনুষ্যত্ব লাভ করে থাকে। তাই সমাধিলাভের জন্য যত্নপরায়ণ হতে হবে।

.

পঞ্চদশ অধ্যায়

তার কর্মফল যায়, নরকে যমরাজ্যে গিয়ে পাপীরা ঘোর যন্ত্রণায় বেদনায় আর্তনাদ করে। কর্ম, মন, বাক্য দিয়ে সবসময় যেসব পাপ করা হয়, শেষকালে জোর করে পাপীকে তারাই শাস্তি দেয়। তাই সকাজ করাই কর্তব্য। যে যেমন পাপাঁচরণ করে, পরে সেইরূপ ছরকম তামস সংসার পেয়ে থাকে। মানুষ, পশু, মৃগ, পাখি, সরীসৃপ ও স্থবির এভাবে পরপর নিকৃষ্ট জন্ম পেয়ে পাপী জীব আবার মনুষ্যত্ব পায়। ব্রহ্মাতে শুধু সত্ত্ব আর স্থাবরে শুধু তমঃ এই চোদ্দপ্রকার সৃষ্টির মধ্যবর্তী সৃষ্টিগুলো রজোগুণে। ভরা। হে বিপ্রগণ, যেন দেহীদরে বিষয়জনিত ক্লেশে ছিন্ন ভিন্ন হয়, তারা সবসময়ই দুঃখে মগ্ন থাকে। সুতরাং তারা নিজের থেকে সেই পরমব্রহ্মকে স্মরণ করবে কি করে? ধর্ম ভাবনার ফলে জীব মনুষত্ব। লাভ করে থাকে। তাই সমাধিলাভের জন্য যত্নপরায়ণ হতে হবে।

.

ষোড়শ অধ্যায়

বায়ু বললেন–সংসার ভয়ে ভীত মানুষ এই চোদ্দ প্রকার সংসারমণ্ডল জেনে সৎকাজে ইচ্ছুক হবে। ধ্যান সাধনে ব্রতী হবে। যত্নের সাথে ধ্যানাসক্ত হলে তাতে আত্মদর্শন হয়। এই আত্মাই আদ্য পরম জ্যোতিঃ এটিই সংসার পারে যাওয়ার সেতু। এই বিশ্বতোমুখ, অগ্নিস্বরূপ সেতুরূপী সর্বভূতের হৃদয়ে। আত্মাকে যোগী সম্যক উপাসনা করবেন। শুদ্ধ ও একাগ্রচিত্তে সাধক হৃদয়ের আগুনে যথাবিধি আট আহুতি হোম করে মৌন থেকে উপাসনা করবেন। প্রথমাহুতি ‘প্রাণায়’, দ্বিতীয়—‘আপনার’, তৃতীয়–’সমানায়’, চতুর্থ—’উদানায়’, পঞ্চম—‘জানায়’। এরপর স্বাহা’ উচ্চারণ করে আহুতি দিতে হবে। তারপর যথাসময়ে শেষান্ন খাবে। তার একবার জল পান করে, তিনবার আচমন করে হৃদয় স্পর্শ করবে আত্মাই প্রাণের গ্রন্থি, সর্বসংহারী রুদ্রদেরই আত্মস্বরূপ। তুমি দেবতাদের মধ্যে সবার বড়, তুমি উগ্র, তুমি চতুর এবং ধর্মরূপে বৃষবাহন, তুমি আমাদের মৃতুনাশক হও, এই তোমার উদ্দেশ্যে হোম করলাম। এভাবে হৃদয়স্পর্শ করে, ডান পায়ের আঙ্গুল দিয়ে ডান হাত ছুঁয়ে, নাভি-স্পর্শ করবে, পরে আবার আচমন করে আত্মা স্পর্শ করবে। প্রাণ ও অপ্রাণ এই দুরকম আত্মা। তার মধ্যে প্রাণ অন্তরাত্মা

আর অপ্রাণ বহিরাত্মা। অনুই প্রাণ, অন্নই জীবই, অন্নের অভাবই মৃত্যু। অন্নই ব্রহ্ম এবং প্রজা সৃষ্টির মূল। অন্নেই স্থিতি হয়, জীবেরা অন্ন দিয়েই বৃদ্ধি লাভ করে। অগ্নিতে সেই অন্ন আহুতি দিলে দেব, দানব গন্ধর্ব, যক্ষ, পিশাচ সকলেই তা আহার করে।

সপ্তদশ অধ্যায়

বায়ু বললেন–এরপর আমি শৌচাচার এর লক্ষণ বলছি। শৌচগুলোর মধ্যে জল দিয়ে শুচি বা শুদ্ধ হওয়াই ভালো। যে মুনি শৌচারের নিয়ম মানেন তিনি কখনো অবসাদগ্রস্থ হন না। মন হল অমৃত আর অপমান বিষ। মুনিকে এইসব বিষয়ে আশ্রমও থাকতে হবে। গুরুর কাছে উত্তম জ্ঞান ও গমনে অনুজ্ঞা পেয়ে এই পৃথিবীতে বাস করবেন। পবিত্র পথে গমন করবেন। পবিত্র জল পান করবেন আর সত্য কথা বলবেন। এটাই ধর্মের অনুশাসন যোগী কখনো শ্রাদ্ধে উপস্থিত হবেন না। গৃহস্থের বাড়িতে যখন রান্নার উনোন একেবারে নিভে যাবে, এতটুকু ছাই ও জ্বলবে না, বাড়িতে সকলের আহার সমাপ্ত হবে। তখনই সেই বাড়িতে ভিক্ষার জন্য যাবেন। কিন্তু রোজ ভিক্ষা করা অবৈধ। যোগীকে যেন কেউ অবহেলা বা তিরস্কার না করে। সাধুসম্মত ধর্ম মেনেই তিনি ভিক্ষা করবেন। প্রথমতঃ ভিক্ষার্থী যোগী সদাচারী গৃহস্থের বাড়িই ভিক্ষা করবেন। শালীন, শ্রদ্ধাশীল মহাত্মা গৃহস্থের কাছেই তিনি ভিক্ষা চাইতে পারেন। হীনবর্ণের গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষাবৃত্তি করা অনুচিত। ভিক্ষা পাওয়া বস্তুগুলি যেমন–যবাণু, দুধ, যব, ফলমূল বা অন্য যে-কোন কিছু যোগীর (ভোজ্য)–বস্তু বলে নির্দিষ্ট। ভিক্ষালব্ধ বস্তুই যোগীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ। যে যোগী মাসে কুশাগ্র জল পান করেন, অথবা যিনি ন্যায়তঃ ভিক্ষা করে থাকেন, তিনি আগের যোগী থেকে বিশিষ্ট। সব যোগীর পক্ষে চান্দ্রায়ন শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। অতএব শক্তি অনুসারে এক, দুই, তিন বা চারটি চান্দ্রায়ন করা যোগীর কর্তব্য। অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অলোভ, ত্যাগ, ব্রতচারণ, অহিংসা, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, অক্রোধ, গুরু শুশ্রূষা, শৌচ, অল্প আহার, নিত্য স্বাধ্যায়-এই নিয়ম ভিক্ষুর পক্ষে ভাল। অরণ্যের হাতির যেমন অঙ্কুশের আঘাতে শান্ত হয়ে মানুষের বশ্যতা মানে তেমনই কর্ম বীজ থেকে জাত গুণময় দেহ কর্মবদ্ধ জীব বিশুদ্ধ জ্ঞান যোগে দগ্ধ বীজ হয়ে নিষ্পাপ ও শান্ত হয়ে থাকে। যজ্ঞ মধ্যে জপযজ্ঞই জ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠ বলা হয়। জ্ঞান থেকে সঙ্গ, রাগ ছাড়া ধ্যানই যথেষ্ট। জ্ঞানীরা বলেন–শম, দম, সত্য, অকল্মষত্ব, সমস্ত জনে দয়া ও সারল্য–এগুলি অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের উপাসক। যারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, শুচি, সমাধিস্থ, জিতেন্দ্রিয়, আত্মরতি সাধুপুরুষ–তারাই এই বিমল যোগ পেয়ে থাকেন।

.

অষ্টাদশ অধ্যায়

বায়ু বললেন–সংবৎসরের শেষে গুরুর আদেশ নিয়ে তৃতীয় আশ্রম ত্যাগ করে চতুর্থ আশ্রম প্রবেশ করবেন। জ্ঞেয় সাধক সারভূত জ্ঞানের উপাসনা করবেন আচ্ছাদনহীন শূন্য জায়গায়। গুহায় বনে কিংবা নদীতে যোগানুষ্ঠান করবে। শাস্ত্রানুসারে শুভ কাজগুলো করলে, আবার তার জন্ম বা মৃত্যু হয়।

.

ঊনবিংশ অধ্যায়

বায়ু বললেন–এবার প্রায়শ্চিত্তের কথা বলছি। কামকৃত ও অকামকৃত দুরকম পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন পাপ তিন প্রকার–বাক্যজ, মনোজ, কায়জ। এই তিন পাপেই জগৎ আবদ্ধ। কর্মবদ্ধ সংসার সত্য নয়–এমন শ্রুতি আছে এটা সবসময়ে প্রযোজ্য নয়, কারণ জীবনকাল জীবদের কর্ম করার জন্যই। তাই সবসময় ধীর ও সাবধান হতে হবে। যোগই পরমবল। বীরজনেরা বিদ্যার সাহায্যে অবিদ্যাকে অতিক্রম করে অনুত্তম যোগঐশ্বর্য লাভ করেন। সন্ন্যাসীদের প্রতিপালনযোগ্য ব্রত ও উপব্রতগুলি কোন একটি যথাযথ প্রতিপালিত না হলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। স্ত্রীসঙ্গ করলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রাণায়ামের সাথে সান্তপণ আচরণ করলে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।

সেই প্রায়শ্চিত্ত করবার পর আবার নিজের আশ্রমে এসে ভিক্ষাচারণ করতে পারবে। পরিহাস করে মিথ্যা বললে দোষ হয় না–পণ্ডিতরা একথাই বলেন। কিন্তু মিথ্যা প্রসঙ্গ ভয়ঙ্কর। তাই তা ত্যাগ করা উচিত। দেবতা ও মুনিরা সাধনরূপে হিংসাকে সৃষ্টি করেছেন বটে। হিংসার থেকে বড় অধর্ম আর নেই। ধন, অর্থ–এগুলি লোকের প্রাণস্বরূপ তাই। তাই ধনচুরি করলে লোকের প্রাণই চুরি করা হয়। এইসব অপকর্ম করলে সেই দুষ্টচেতা ভিক্ষুক, ব্রতচ্যুত হয়। তখন তাকে শাস্ত্রবিধান মেনে চান্দ্রায়ন করা উচিত। এক বছর শেষে নিষ্পাপ হয়ে নিবেদযুক্ত চিত্তে আবার যথাবিধি আচার প্রতিপালন করবে। ভিক্ষু যদি অনিচ্ছায় পশুদের হিংসা করেন তবে চান্দ্রায়ন

অনুষ্ঠান করবেন। কোন স্ত্রীলোক দর্শন করে যদি ঘন ঘন বিচলিত হয় তবে ষোলোবার প্রাণায়াম করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণ যদি দিনেরবেলায় ইন্দ্রিয় দুর্বলতার শিকার হন তবে তিন রাত্রি উপোস ও প্রাণায়াম করতে হবে। আর রাত্রিকালে হলে স্নান করে দ্বাদশ প্রাণায়ামের সাহায্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। যোগীদের অভোজ্য খাবার খেলেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বাক্য, মন শরীরজনিত কোন পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তাহলে আর জন্ম হবে না।

বিংশ অধ্যায়

বায়ু বললেন–এবার শাস্ত্রে উক্ত মরণচিহ্ন সম্পর্কে বলছি–এটা জানা থাকলে মানুষ ভারী মৃত্যু কাল জানতে পারে। যে মানুষ অরুন্ধতী, ধ্রুব, সোমছায়া, মহাপথ–এ সমস্ত দেখতে পায় না সে একমাসের বেশি বাঁচে না। যদি কেউ জ্ঞানে বা স্বপ্নে, মুত্র, পুরীষ, সুবর্ণ বা রজতবমি করে সে দশমাস মাত্র বেঁচে থাকে। সামনে বা পেছনের দিকে ধুলোকাদাতে তার পায়ের ছাপ দ্বিখণ্ডিত দেখে সে সাতমাস পরে মারা যায়। যার মাথায় কাক, পায়রা, শকুন প্রভৃতি মাংসাশী পাখি বসে, সে দুমাসের বেশি বাঁচে না। যদি মেঘছাড়া দক্ষিণ দিকে বিদ্যুৎ বা জলের মধ্যে ইন্দ্রধনু দেখা যায় তবে দুতিন মাসেই কাল কবলিত হয়। যার গায়ে শবগন্ধ, সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। স্নানের পর যার হৃদয় ও পা শুকিয়ে যায়, কিংবা যার মাথা থেকে ধোঁয়া ওঠে সে দশদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পড়ে। বাতাসের আঘাতে যার ব্যথার স্থানগুলোতে যন্ত্রণা হয় আর জল স্পর্শ তৃপ্তি হয় না, তার মৃত্যু কাছেই জানবে। স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণা কামিনী যদি গান গাইতে গাইতে কারোকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যায়। তারও মৃত্যু কাছে। স্বপ্নে ভস্ম অঙ্গার কেশ, শুষ্ক নদী ও সাপ দেখলে জীবন দশরাত্র মাত্র। ভোরবেলায় সূর্য ওঠার পর যদি কারো সামনে দিয়ে শিয়াল চিৎকার করে চলে যায়। তবে তার আয়ু কমে এসেছে জানবে। দিনে বা রাত্রে, যে ব্যক্তি ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে কিংবা যে ব্যক্তি দীপ নিভে যাওয়ার গন্ধ পায় না, তারও মৃত্যু কাছে। যার এক চোখে সমানে জল পড়ে, নাক বেঁকে যায়, জিভ কর্কশ ও কালো, গাল দুটো চ্যাপ্টা রক্তাভ, তার মরণ খুব কাছে বুঝতে হবে। স্বপ্নে উট বা গাধা চালিত কোন রথে করে কারোকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাওয়া হয় তার আয়ু ও শেষ হয়েছে বুঝতে হবে।

কানে শব্দ শুনতে পাওয়া আর চোখে জ্যোতিঃ পদার্থ দেখতে না পাওয়া–এই দুটিই খুব খারাপ। স্বপ্নে কোন মানুষ গর্তে পড়ে গিয়ে বারবার উঠতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না–তার জীবনকাল শেষ হয়েছে বুঝতে হবে। যার দৃষ্টি উপর দিকে, রক্তবর্ণ, চঞ্চল, নিঃশ্বাস, উষ্ণ, নাভিছিদ্র গভীর, সেও মরণাপন্ন। স্বপ্নে আগুনে প্রবেশ করলে, স্মৃতিলোপ হয়েও মৃত্যু কাছে বুঝতে হবে। যদি নিজের জামাকাপড় সাদা হলেও সেটি স্বপ্নে লাল বা কালো দেখা যায় তবে

তার মৃত্যু খুব কাছে। বুদ্ধিমান মানুষ ভয় দুঃখ ছেড়ে যোগানুষ্ঠান করবে। পূর্ব বা উত্তর দিকে যম, স্থিরতর নির্জন, পবিত্র দেশে সুস্থ চিত্তে আচমন করে স্বস্তিকা মতো বসে মহেশ্বরকে প্রণাম করবে। প্রদীপের শিখার মত স্থির ও অচঞ্চল হয়ে থাকতে হয়। কাম, বিতর্ক, প্রীতি, সুখ, দুঃখ সর্ব সংযত করে শুক্লগুণ-ধ্যান করবে। প্রাণ, চোখ, ত্বক, কাল, মন, বুদ্ধি, মাথা, বুক–এসব জায়গায় ধারণ অবলম্বন করবে। এভাবে ধারণা দিয়ে বায়ুপ্রবৃত্তি রুদ্ধ করে সমাহিত মনে ওঁকার দিয়ে সমস্ত দেহ আহরণ করবে। এভাবে করলে সেই যোগী ওঁকারময় অক্ষয়ত্ব লাভ করেন।

একবিংশ অধ্যায়

বায়ু বললেন–এবার ওঁকার প্রাপ্তির লক্ষণ বর্ণনা করছি। এতে তিনটি মাত্রা আছে ও ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে। এর প্রথম মাত্রা বৈদ্যুতী, দ্বিতীয় মাত্রা তামসী, আর তৃতীয় মাত্রা নির্গুণা। এইসব মাত্রাযুক্ত ওঁকার প্রযুক্ত হয়ে মাথায় লয়প্রাপ্ত হলে যোগী ওঁকারময় হয়ে অক্ষয়ত্ব লাভ করেন। প্রণবস্বরূপ ধনুতে আত্মস্বরূপ শরযোজন করে ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যভেদ করতে হবে। তাই শরের মতো তন্ময়তা অবলম্বন করা দরকার। 'ওঁ' এই অক্ষরটি পরমপদ ব্রহ্মস্বরূপ। 'ওঁ' এটিই তিনবেদ, তিনলোক, তিনঅগ্নি, ঋক, সাম, যজু–এই তিনবেদ তিন বিক্রমের পদত্রয় স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে এই ওঁকারের চারটি 'উ' কারে স্বরিত এবং ম-কার প্লত। অ-কার ভূর্লোক, উ-কার ভূবলোক ও ব্যঞ্জন সাথে ম-কার স্বলোক। সুতরাং 'ওঁ'কার ত্রিলোকাত্মক। এর শিরো চন্দ্রবিন্দু ত্রিবিষ্টপ। চন্দ্র-রুদ্রালোকাত্মক, আর বিন্দু–শিবস্বরূপ এটি মাত্রাহীন। এইসব বিশেষত্ব মেনে তবে ধ্যানরত হবে। মহাত্মাযোগী যত্ন সহকারে ওঁকারের মাত্রাতত্ত্ব জেনে উপাসনা করবেন। এর প্রথম মাত্রা হ্রস্ব, দ্বিতীয় মাত্রা দীর্ঘ ও তৃতীয়মাত্রা প্লুত। তিনটি মাত্রা যথাযথভাবে ধারণা করবে। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা–এদের সাথে ঐ প্রবণকে আটমাত্রা যুক্ত করে সবসময় ধারণা অভ্যেস করবে। এই আটমাত্রার বিষয়ে উপদেশ লাভ করলে ফললাভ হয়।

এই মাত্রাজ্ঞানে যে ফল, তা একশ বছর ধরে অশ্বমেধযজ্ঞ করলেও তার তুল্য ফললাভ হয় না। প্রভুর জন্য জীবনপণ করে যুদ্ধ করলে যে ফল, মাত্রাজ্ঞানে সে ফল লাভ হয়। আবার উগ্রতপস্যা বা যজ্ঞ করেও মাত্রাজ্ঞানের ন্যায় ফল লাভ হয় না। সেই প্রণবর অর্ধমাত্রাও প্লুত মাত্রাটিই আবার গৃহস্থ যোগীদের বিশেষভাবে আশ্রয়স্থল। এটিই ঐশ্বর্য সাধন। হে দ্বিজগণ–সেই মাত্রাতত্ত্বের সাধনে সমাসক্ত হবেন। শুচি, দান্ত, জিতেন্দ্রিয় যোগী এই প্রণবসাধন দিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করে। ধ্যানপরায়ণ ব্রাহ্মণ যোগ সাহায্যে ঋক, সাম, যজু, সমগ্রবেদ ও উপনিষদ–এই সমসত্রে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। তিনি সর্বভূতের লয়স্থানে লীন হয়ে লয়স্থানে পরিণত হন, তার আবার জন্ম হয় না। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ এই চতুর্মুখী বিশ্বরূপ নামে প্রকৃতির

সাহায্যে ধ্যান বলে দিব্যচক্ষু দিয়ে সেই অজা, লোহিত, শুক্ল-কৃষ্ণা আত্মতুল্য বহু প্রজা সৃষ্টিকারী সর্বাদিভূতা প্রভৃতি দেবীকে জানতে পারেন, তারা অমৃততত্ত্ব প্রাপ্ত হন। সেই প্রকৃতি দেবীকে অজ জীব উপভোগ করে তৃপ্তিলাভ করে। কিন্তু অন্য অজ শিব তাকে ভুক্তা জেনে ত্যাগ করে থাকেন।

এই ওঁকার নামে অক্ষয় রূপী ব্রহ্মাকে যথাযথ জেনে যিনি ধ্যান করেন তিনি সমস্ত দায় থেকে মুক্ত হয়ে সংসার যাত্রায় দায় থেকে মুক্তি পেয়ে থাকেন। তিনি অচল নির্গুণ শিবস্থান প্রাপ্ত হন। এতে সন্দেহ নেই। এতক্ষণ আপনাদের ওঁকার প্রাপ্তির কথা বললাম।

সর্বলোকাভিজ্ঞ লোকেশ্বরকে প্রণাম। সেই মহানের উপাসনা করা উচিত! সেই ব্রহ্মাকে প্রণাম ।করাই মঙ্গলজনক। সর্বব্যাপী, নির্গুণ, ভক্ত যোগীদের ঐশ্বর্য প্রদাতা, জল সম্পৃক্ত পদ্মপাত্রর মতো বিশুদ্ধ উপাসনা করবে। সকল পবিত্র আশঙ্কা পবিত্র, পবিত্র পরিপূরিত, পবিত্রাশয়, হ্রস্ব-দীর্ঘ, প্লুত–এই তিনটি স্বরবিশিষ্ট যোগীশ্বরকে নমস্কার। যে তাকে নমস্কার করে অবিদ্যা তার ওপর প্রভুত্ব করতে পারে না। যিনি অন্তরাত্মাকে উন্নত ও ভূমিকে দৃঢ় করেছেন, যিনি স্বর্গকে শূন্যমার্গে স্তম্ভিত করেছেন, যিনি দেবতাদের হৃদয়স্বরূপ, সেই পরম পুরুষই বিশ্বরূপ। এই ওঁকার নামে বিশ্বরূপী রুদ্রই যজ্ঞ, বেদ-ও নমস্কারাদিরূপে পরিণত হয়েছেন।

বাতাস যেমন গাছ থেকে ফলকে বৃন্তচ্যুত করে পক্ক ফল স্থানান্তরিত করে, রুদ্রকে নমস্কার করলে পাপরাশি দূর হয়ে যায়। রুদ্র প্রণাম যেমন সমস্ত ধর্মফল লাভ হয়, অন্য কোন দেবতার প্রণামে সেরকম ফললাভ হয় না। সেই প্রভু সর্বকালে সর্বমূল ভূত ওঁকারে নিবিষ্ট আছেন। মহাযশস্বী বিষ্ণুই নমস্কার স্বরপ নমস্কারমূর্তি বিষ্ণুকে সেই প্রণব স্তব করেন, প্রণব যজ্ঞকে, যজ্ঞ মনকে এবং মন রুদ্রকে স্তব করে সুতরাং রুদ্রপদই পরম মঙ্গলাস্পদ আশ্রয়নীয়।

.

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সূত বললেন–নৈবিষারণ্যে অগ্নিকল্প ঋষিদের মধ্যে সাবর্ণি নামে শ্রুতিধর ঋষি ছিলেন। সেই বাক্য বিশারদ ঋষি বিনয়ের সাথে মহাদ্যুতি বায়ুকে জিজ্ঞাসা করলেন –প্রভু, আপনি সর্বদর্শী, আপনার কৃপায় আমরা পুরাণের কথা শুনতে ইচ্ছে করছি। ভগবান হিরণ্যগর্ভ নিজের কপাল থেকে অতি তেজস্বী নীললোহিত দেবকে কিভাবে পুত্ররূপে লাভ করলেন, কমলযোনি ব্রহ্মার উৎপত্তি হল কিভাবে? বিষ্ণুর রুদ্রের সাথে প্রীতিসঙটন হল কি করে? সব দেবতা বিষ্ণুময়

বিষ্ণু ছাড়া অন্য গতি নেই–দেবতারাই সবসময় এই করে থাকেন, তবে সেই বিষ্ণু, ভবদেবকে সবসময় প্রণাম করেন কেন? সূত বললেন–একথা শুনে ভগবান বায়ু, সাবর্ণিকে বললেন–হে সাধু, আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। ব্রহ্মার পুত্ররূপেই ভব-এর জন্ম। পদ্ম থেকে ব্রহ্মার উদ্ভব, শঙ্করের রুদ্রত্ব, বিষ্ণু ও ভবের পরস্পর প্রীতি, বিষ্ণু যে শঙ্করকে প্রণাম–তার কারণগুলো আমি বলছি। আপনারা শুনুন, ষষ্ঠকল্পে মনুর অধিকার কালের শেষে পদ্ম নামে সপ্তম কল্প শুরু হয়। বর্তমান কালে বরাহ কল্প চলছে। এক একটি কল্প কতকাল ধরে সম্পূর্ণ হয়? এর পরিমাণ বা কি? আমরা জানতে চাই। বায়ু বললেন–মন্বন্তর-এর কালসংখ্যা আমি যথাক্রমে বলছি–দুই হাজার আটশো কোটি, আর বাষট্টি কোটি আট নিযুত–এটি কল্পার্ধের পরিমাণ। এর পূর্ব ভাগ বর্ষ পরিমাণ। একশো আটাত্তর কোটি। দুই লক্ষ নব্বই নিযুত–এটি কল্পাধের পরিমাণ। এর পূর্ব ভাগ বর্ষ পরিমাণ। কল্পার্ধ মানের দ্বিগুণীভূত এই পরিমাণই কল্প পরিমাণ। আটান্ন নিযুত, আশী শত, চুরাশি প্রযুত কাল যাবত সপ্তর্ষি মনু ইন্দ্রাদি দেবতা–এরা বিদ্যমান থাকেন। এই কালই বট প্রমাণ। এই মন্বন্তর কালের শেষে মানুষদেরও অন্ত হয়। বর্তমান কল্প বরাহ কল্প নামে বিখ্যাত। এতে স্বয়ম্ভু প্রভৃতি চোদ্দজন মনু আবির্ভূত হন।

ঋষিরা জিজ্ঞেস করলেনএই কল্পের নাম বরাহ হল কেন? সেই দেব বিষ্ণুই বা বরাহ কীর্তিত হন। কেন? ভগবান বরাহ কে? তার স্বরূপ কি? কেমন করেই বা তিনি উৎপন্ন হলেন? বায়ু বললেন–যে জন্য, যেভাবে উৎপন্ন হলেন বরাহ, কল্পের স্বরূপ ও বিকৃতি–এ সমস্তই যেমন দেখেছি বা শুনেছি বর্ণনা করছি। সমস্ত সৃষ্টির প্রথম 'ভব' কল্প। সেই কল্পে আনন্দময় জ্ঞেয় ভগবান এবং দিব্যসম্ভব তার আধারভূত ব্রহ্মস্থান মাত্রের উপলব্ধি ছিল। দ্বিতীয় 'ভুব' কল্প, তৃতীয় তপঃ কুল্প, চতুর্থ ভাব' কল্প, পঞ্চম রম্ভ' কল্প, ষষ্ঠ 'ঋতু' কল্প, সপ্তম কুত' কল্প, অষ্টম বহি' কল্প, নবম 'হব্যবাহন' কল্প, দশম 'সাবিত্র' কল্প, দ্বাদশ 'ঔষিক' কল্প ত্রয়োদশ 'কুশিক' কল্প, চতুর্দশ 'গন্ধর্ব' কল্প, এই কল্পে গান্ধার স্বর উৎপন্ন হয়। গান্ধার স্বর থেকেই নাঙ্গ ও গন্ধর্বগণ সম্ভূত হয়। হে দ্বিজগণ! পঞ্চদশ কল্পের নাম ঋষভ। এই কল্পে দুজন প্রসিদ্ধ ঋষি ছিলেন তাদের নাম যথা–শিশির, বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা, শরত ও হেমন্ত। এরা ব্রহ্মার মানস সন্তান। ষোড়শ কল্পে এরা ষোড়শ থেকে উৎপন্ন হন। এই দুজনের জন্ম হওয়ায় সেই মহেশ্বরই যেন সদ্য জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য সেই সাগরম গম্ভীর স্বরের ষড়জ নাম কল্পিত হয়। এরপর সপ্তদশ কল্প মার্জালীয় নামে প্রসিদ্ধ। পরে মধ্যম নামক অষ্টাদশ কল্প। এতে মধ্যম নামে ধৈবত কর্ম সৃষ্ট হয়েছিল। তারপর বৈরাজ নামে উনিশকল্প ঐ কল্পে ব্রহ্মনন্দন ভগবান বৈরাজ মনু সমুদ্ভূত হন। বৈরাজ মনুর পুত্র দধীচি-প্রজাতি, অতিকায় ধার্মিক, তেজস্বী ও ত্রিদশগণের প্রধান ছিলেন। একদা তিনি যজ্ঞ করলে গায়ত্রী দেবী তাকে কামনা করেন।

তাতে সেই দধীচির পুত্ররূপে স্নিগ্ধ স্বরের সমুৎপত্তি হয়। প্রজাপতি সেই স্বয়ম্ভ সঞ্জাত স্বরকে দেখে প্রজা সৃষ্টিতে বিরত হলেন। নিষাদ তখন তপস্যা করতে প্রবৃত্ত হয়ে নিরাহারে থেকে জিতেন্দ্রিয় দিবসহস্র বৎসর অতিবাহিত করলেন। ব্রহ্মা সেই ঊর্ধ্ববাহু, তপঃকৃশ, দুঃখিত, ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত শান্ত। পুত্রকে নিষাদ অর্থাৎ উপবেশন কর–একথা বললেন। এজন্য সেই স্বর নিষাদ নামে বিখ্যাত হয়। হে দ্বিজগণ! একুশ গল্প পঞ্চম নামে খ্যাত। ঐ কল্পে ব্রহ্মার প্রাণ, অপ্রাণ, সমান, উজান ও ব্যজ, এই পঞ্চ মানস সন্তান সমুৎপন্ন হয়। এরা মধুর বাক্যে সেই মহেশ্বরের স্তব করেছিলেন। স্নিগ্ধ পঞ্চম স্বর উক্ত প্রাণাদি পঞ্চকের সাথে মিলে গান করেছিল বলে সেই কল্পের পঞ্চম নাম বিখ্যাত হয়েছে।

বাইশ কল্প মেঘবাহন নামে খ্যাত। ঐ কল্পে মহাবাহু বিষ্ণু মেঘাকার নিয়ে মহেশ্বর-কৃত্তিবাসকে দিব্য হাজার বছর ধরে বহন করেছিলেন। কশ্যপমন্থন বিষ্ণু ভারাক্রান্ত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে থাকলে তার মুখ থেকে লোক সংহারক মহাকাল সমদ্ভূত হন। তেইশ কল্পের নাম চিন্তক। এর সাথে চিতি নামে এক কন্যাও জন্মে। ব্রহ্মা যখন চিন্তান্বিত ছিলেন, সেই অবস্থায় এর জন্ম হয় বলে ঐ কল্প চিন্তক নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে। চব্বিশ কল্পের নাম আকূতি। ঐ কল্পে আকূত ও আকৃতি মিথুন:সমুদ্ভুত হয়। ব্রহ্মা সেই আকুতিকে প্রজা সৃষ্টি করতে বলেছিলেন। এইজন্য এই কল্প নামে খ্যাত। পঞ্চবিংশ কল্পে বিজ্ঞাত ও বিজ্ঞাতি নামে মিথুন জন্মে। ষড়বিংশ কল্প মন। এতে শঙ্করী দেবী একটি মিথুন উৎপন্ন করেন।

সাতাশ কল্প হল ভাব। এতে পৌর্ণমাসী দেবী মিথুন উৎপন্ন করেন। ব্রহ্মা পরমাত্মা ধ্যানে নিমগ্ন হলে সেই জ্যোতিমণ্ডল অগ্নিরূপে ভূর্লোক, দ্যুলোক আচ্ছন্ন করে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। সহস্র বৎসরের শেষে সেই জ্যোতিপুঞ্জ পূর্বমণ্ডলের আকার নিয়েছে। সেই সময় ভগবান সোম, ব্রহ্মার মনোমধ্যে পূর্ণরূপে প্রকট হয়েছিলেন বলে একে পৌর্ণমাসী বলা হয়। সব ব্রাহ্মণদের দর্শ ও পৌর্ণ মাসে নিজের মঙ্গল কামনায় যোগানুষ্ঠান করা উচিত, অগ্নিই সোম, কাল ও রুদ্র–এরকম শ্রুতি আছে। তাই যে জন অগ্নিতে প্রবেশ করেন, তার রুদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়ে থাকে। আঠাশ কল্পের নাম বৃহত। প্রজা উৎপাদনের ইচ্ছেতে ধ্যানপরায়ণ ব্রহ্মার অন্তরকরণ বৃহৎসাম ও রথন্তর প্রাদুর্ভূত হয়। ঐ কল্পে সর্বব্যাপী বৃহৎ উৎপন্ন হয়েছিল বলে ঐ কল্পকে বৃহৎ কল্প বলে। বৃহস্তব, সূর্যমণ্ডলের আয়তন অষ্টাশী হাজার যৌবনে পরিমাণ। এই জন্য সূর্যমণ্ডল ভেদ করা কঠিন। দৃঢ়চেতা যোগী একে এবং বৃহৎ সামকেও ভেদ করে চলে যান। আমি এতক্ষণ এই বিচিত্র অধ্যাত্মতত্ত্ব বর্ণনা করলাম। পুরাতন কাজের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ বিষয়ে সেই পুরাণ পুরুষ ছাড়া কোন গতি নেই।

.

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ বললেন—হে মহামুনি, আপনি মন্ত্র কল্পনা ও কল্পসমূহের অদ্ভুত বিবরণ বলেছেন। এবার কল্পসংখ্যা বৃত্তান্ত আমাদের সবিস্তারে বলুন। বায়ু বললেন—আমি ব্রহ্মার কল্পসংখ্যা যুগ, বর্ষসংখ্যা বলছি। এক হাজার কল্পে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়। আট হাজার ব্রহ্ম অব্দে ব্রহ্মার একযুগ হয়। এক হাজার যুগে সেই প্রজাপতি এক সবন হয়। দুহাজার সবনে এক ত্রিবৃত হয়। এটাই ব্রহ্মার স্থিতিকাল পরিমাণ। এবার আটাশ কল্পের বিবরণ শুনুন। রথন্তর কল্পের শেষে, সাম ও মন্ত্রগুলির উৎপত্তি ও নাম নিরুক্তি হয়। উনত্রিশ কল্পের নাম শ্বেতলোহিত। এই কল্পে ধ্যানপরায়ণ ব্রহ্মার পাবকের মত তেজস্বীকুমার প্রাদুর্ভূত হন। তিনি সাদা উষ্ণীব, সাদা মালা, সাদা বস্ত্রধারী, শিখাযুক্ত, দীপ্তমূর্তি। পিতামহ ব্রহ্মা, সেই ভীমাকার শ্বেতলোহিত পুরুষকে দেখে লোকধাতা, বিশ্বরূপ, পুরাণপুরুষ, বিশ্বাত্মা, যোগীবর ভেবে তাকে নমস্কার জানালেন। সেই জগতপতি শ্বেতদেব, ব্রহ্মার মনোভাব জানতে পেরে আনন্দের সাথে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

তখন কয়েকজন ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন মহাত্মা ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হলেন। তাদের নাম সনন্দ, নন্দক, বিশ্বনন্দ, নন্দন। এরা শ্বেতদেবের শিষ্য। তারপর ব্রহ্মার সামনে মহামুনির আবির্ভাব হয়। এই শ্বেতমুনি থেকেই নরঋষি উদ্ভব হয়, যে সব ব্রহ্মনিষ্ঠ, যোগমুক্ত বিপ্র, সেই সদ্যোজাত বিশ্বেশ্বর দেবের শরণাপন্ন হন, তাঁরা পাপহীন বিমল ব্রহ্ম তেজোময় হয়ে ব্রহ্মলোক অতিক্রম করে থাকেন। বায়ু বললেন—তারপর ত্রিশ কল্প এটি রক্ত নামে প্রসিদ্ধ। এই কল্পে ব্রহ্মা পুত্র কামনার্থে ধ্যানমগ্ন হলে রক্তবর্ণ, রক্তনেত্র, এক পুরুষ প্রাদুর্ভূত হন। ব্রহ্মা সেই রক্তকুমারকে দেখে বিশ্বেশ্বর-এর অবতার মনে করে বিনম্র হয়ে প্রাণায়াম করে বামদেবকে চিন্তা করতে লাগলেন। ধ্যানরত ব্রহ্মাকে দেখে মহাদেব খুশী হয়ে পিতামহকে বললেন—হে মহাতপা, সভম—তুমি পুত্র কামনায় ধ্যানস্থ হয়ে পরম ভক্তি সহকারে ধ্যানযোগে আমাকে দেখতে পেয়েছ। এজন্য কল্পে কল্পে পরম ধ্যানাবলম্বনে ঈশ্বররূপী আমাকে জানতে পারবে। ভগবান সর্ব এই বলে অট্টহাসি হাসলেন। তাতে শুদ্ধবুদ্ধি চার কুমার প্রাদুর্ভূত হলেন। তাদের নাম বিরজ, বিবাহ, বিশোক ও বিশ্বভাবনা। তারা বীর, অধ্যবসায়ী, ব্রহ্মপরায়ণ। সকলেরই রক্তবস্ত্র, রক্তমালা শোভিত, রক্তভস্মমাখা, রক্তমুখ, রক্তলোচন। এই মহাত্মারা তারপর হাজার বছর ধরে লোকানুগ্রহের ইচ্ছায় শিষ্যদের হিত সাধনের জন্য সহস্র শৈবধর্মের আদেশ করে আবার মহাদেব রুদ্র

অধ্যায়ে প্রবেশ করেছেন। সেই সব দ্বিজ শ্রেষ্ঠরা মহেশ্বর এর উপাসনাতে যোগানুষ্ঠান করে ঈশ্বর বামদেবের শরণাপন্ন হন। তারপর রুদ্রলোকে আবার জন্মহীন গতি পেয়ে থাকেন।

.

চতুর্বিংশ অধ্যায়

একত্রিশ কল্পের নাম পীতবামা। এই কল্পে মহাতেজা ব্রহ্মা পীতবর্ণ হয়েছিলেন। ব্রহ্মা যখন ধ্যান করছিলেন সেই সময় তার দেহ থেকে এক কুমার প্রাদুর্ভূত হন। ইনি পীতবস্ত্র ও পীতমালাধারী, অতি তেজস্বী এই কুমার–পীত উষ্ণীষধারী মহাভুজ। ধ্যানমগ্ন এই ব্রহ্মা কুমারকে দেখে লোকবিধাতা পরমেশ্বরকে বন্দনা করলেন। তারপর ধ্যাননিষ্ঠ ব্রহ্মা দেখলেন– মহেশ্বরী দেবী নিজের রূপ বিকৃত করে গোরূপে মহেশ্বর এর মুখ থেকে বিচ্যুত হলেন–এনার চার পা, চার মুখ, চার হাত প্রভৃতি। সর্বদেববন্দিত মহেশ্বর সেই মহেশ্বরী দেখে বললেন–হে দেবী। তুমিই মতি, তুমিই স্মৃতি, তুমি বুদ্ধি, তুমি এস। তুমি এই বিশ্বজুড়ে রয়েছে। যোগবলে সমস্ত জগৎ বশীভূত করো। আবার ভাবীকালে রুদ্রাণী হয়ে মহাদেবের সাথে বাস করতে হবে। এই বলে সেই চতুষ্পদী গোরূপিণী মহেশ্বরীকে ধ্যাননিষ্ঠ পুত্রপ্রার্থী ব্রহ্মার হাতে অর্পণ করলেন। ধ্যানযোগে সেই মহেশ্বরীকে জেনে তার শরণাপন্ন হলেন এবং তাকে গায়ত্রীজ্ঞানে ধ্যান করতে লাগলেন।

মহাদেবী গায়ত্রীর পর ধ্যানাসক্ত মনে মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। মহাদেব ব্রহ্মাকে দিব্যযোগ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানসম্পত্তি ও বৈরাগ্য দান করলেন। এরপর ঈশ্বর এক ভীষণ উজ্জ্বল অট্টহাসি হেসে উঠলেন। তাতে তার দেহ থেকে দীপ্তি সম্পন্ন অনেক কুমার প্রাদুর্ভূত হলেন। এই কুমারেরা সবাই পীতমালা ও বস্ত্রধারী, পীতকেশ, পীত উষ্ণীষধারী। এই বিশাল তেজসম্পন্ন কুমারেরা সহস্র বছর বাস করবার পর ঋষিদের যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে জগদীশ্বর রুদ্রের দেহে প্রবেশ করেন। বায়ু বললেন–এর পর ব্রহ্ম সেই পীতবর্ণের কল্পশেষ হলে, আবার সিত নামে অন্য কল্প শুরু হল। তখন প্রজাসৃষ্টির কামনাতে দুঃখিত মনে চিন্তা করতে লাগলেন। চিন্তিত বলে তার বর্ণ কালো হয়ে গেলো। এর ফলে যে কুমার উৎপন্ন হল, ঐ কুমার কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণ মালাধারী, কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিত, মাথায় কালো উষ্ণীষ। কুমারেরা সকলেই হুঙ্কার দিয়ে হেসে উঠলেন। তারপর সহস্র বছর পরে যোগবলে পরমেশ্বর পদের উপাসনা করে তাদের শিষ্যদের যোগরহস্য দান করলেন। তারপর বিশ্বেশ্বর এর নির্মল, নির্গুণ পদে আশ্রয় পেলেন, এভাবে

কৃষ্ণরূপ কল্প শেষ হলে বিশ্বরূপ নামে অন্য কল্প শুরু হয়। আবার চরাচর জগতের সৃষ্টি শুরু হল।

ব্রহ্মা আবার পুত্র কামনায় ধ্যান শুরু করেন। তখন মহানাদ শালী সরস্বতী প্রাদুর্ভূত হলেন। পিতামহ যোগাসক্ত মনে বিশ্বমাল্য, বিশ্ববসনধারী, বিশ্ব-উষ্ণীব কালী, মহাভুজ সর্বগামী ঈশানদেবকে মনে মনে ধ্যান করলেন। বললেন–হে ঈশান, তোমাকে নমস্কার, হে মহাদেব, তোমায় আমি নমস্কার করি। ধ্যানাসক্ত পিতামহকে দেখে ভগবান ঈশান বললেন–আমি খুশি হয়েছি। তোমার কি ইচ্ছে বল? ভগবান ব্রহ্মা প্রণত হয়ে মহেশ্বর এর স্তব করে খুশি হয়ে মহেশ্বরকে বললেন–দেব–আপনার বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ তা আমি জানতে চাই। কে এই পরমেশ্বর? আর সেই চতুস্পদা, চতুর্মুখী, চতুঃশৃঙ্গী, চতুর্স্তনী, চতুনেত্রা ভগবতী দেবী আসলে কে? মহেশ্বর বললেন–এটি সমস্ত মন্ত্রের রহস্য, পবিত্র পুষ্টিবর্ধন। এই যে বর্তমান কল্প, এর নাম বিশ্বরূপ। এই কল্পের ছত্রিশ মনু। যখন থেকে তুমি ব্রহ্মপদ পেয়েছে। সেই থেকে এই তেত্রিশতম কল্প চলে আসছে। হে দেবেশ, তোমার কাছেই যে শত শত সহস্র সহস্র স্বয়ম্ভু অতীত হয়েছেন, তাদের কথা শুনুন, আগে তুমি আনন্দ নামে পরিচিত ছিলে। তখন তুমি বহু তপস্যা করেছো। তুমি গালব্য গোত্রে জন্মেছিলে।

তারপর তপোবনে আমার পুত্রত্ব পেয়েছো। যোগ, সংখ্যা, তপস্যা, বিদ্যা, ক্রিয়া, ঋত, সত্য, অহিংসা, সন্ততি, ধ্যান, বপু, শান্তি, স্মৃতিক, লজ্জা, মেধা, শুদ্ধি, সরস্বতী ইত্যাদি তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই যিনি বত্রিশ অক্ষর, নামিকা, ছাব্বিশ গুণময়ী দেবী বিরাজিতা–হে ব্রাহ্মণ। এই মহেশ্বরী প্রকৃতিকেই তুমি তোমার প্রসূতি বলে জানবে। এই চতুর্মুখী জগৎযোনি, গোরুপিনী প্রকৃতি দেবী, ভগবতী তোমার প্রসূতি। এর জন্ম নেই, ইনি লোহিত শুক্ল কৃষ্ণতা, বিশ্ব সৃষ্টিকারিণী সুরূপা। এই গোরুপিণী গায়ত্রীকে দেখে আমি অজ ও বুদ্ধিসম্পন্ন হয়েছি। মহাদেব এই কথা বলে এক উচ হাসি হাসলেন। তারপর তার চারপাশ থেকে নানা রূপধারী কয়েকজন দিব্য কুমার প্রাদুর্ভূত হলেন। এই কুমারদের মধ্যে কেউ জটী, কেউ মুণ্ডী, কেই শিখণ্ডী ও অর্ধমুণ্ডী। এই মহা তেজস্বী কুমাররা পরে যথাবিহিত যোগানুষ্ঠান দিয়ে দিব্য হাজার বছর পর্যন্ত মহেশ্বর-এর উপাসনা করে ধর্মোপদেশ দান করে রুদ্রের দেহে প্রবেশ করলেন।

বায়ু বলতে লাগলেন, এরপর লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিস্মিত হয়ে ভক্তিযুক্ত মনে মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন এবং বললেন– হে বিভো, আপনার এই শ্বেতবর্ণ হল কিভাবে? ভগবান বললেন–যখন শ্বেতকল্প হয়, তখন আমি শ্বেত হয়েছিলাম। আমার মালা, উষ্ণীষ, বস্ত্র, অস্থি, মাংস, রোম, ত্বক, রক্তও শ্বেতবর্ণের ছিল। সেইহেতু শ্বেত নামে খ্যাত হই। আমার প্রসাদে

দেবাধিপ শ্বেতাঙ্গ, শ্বেতলোহিত এবং গায়ত্রীও শ্বেতবর্ণ হয়েছিলেন। হে দেবেশ, আমি যেহেতু আমিও আপনাদের সাথে গোপন রূপে ছিলাম, এজন্য আপনারা নিজের তপস্যার ফলে আমাকে সদ্যোজাত সনাতন পুরুষ বলেই জেনেছেন। আমার সদ্যোজাত মূর্তি গুহ্যব্রহ্ম বলে বিখ্যাত। যে ব্যক্তি আমার গুহ্যরূপ জানবেন, তিনি ব্রহ্মের কাছে যাবেন। এরপর তাদের আর জন্ম হবে না। যখন আমি লোহিত ছিলাম, তখন আমার নামে কল্পের নাম লোহিত হয়।

গোরূপিণী গায়ত্রীও তখন লোহিতাকার ছিলেন। তারপর বর্ণ বিপর্যয়ে আমার লোহিতত্ত্ব ও যোগের বামত্ব ঘটাতে আমি বাম দেবত্ব পেলাম। মহীতলে আমি বামদেব নামে খ্যাতি লাভ করলাম। যে পুণ্যবান ব্যক্তিরা আমার বামদেব স্বরূপ জানবেন, গায়ত্রী মাতার তত্ত্ব জানবেন, তারা সকলেই সব পাপ থেকে মুক্ত হবেন। তাদের আর পুনর্জন্ম হবে না। আমার দেহ যখন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয় তখন আমার কল্প কৃষ্ণ নামে অভিহিত হয়। হে ব্রাহ্মণ, তখন তুমি আমাকে ঘোর পরাক্রমী ঘোরাকৃতি বলেই জেনেছিলে। তাই মর্তে যারা আমাকে ঘোরাকারে জানবে, তাদের সম্বন্ধে সবসময়েই আমি অঘোর, অব্যয় ও শান্তরূপে থাকব। এভাবে ভূতলে যারা আমাকে বিশ্বরূপে দর্শন করবে তাদের প্রতি সবসময়ই আমি শিব ও সৌম্য হয়ে থাকব।

আমার বিশ্বরূপের জন্য এই কল্পের নাম বিশ্বরূপ। আমার তখন চারপুত্র উৎপন্ন হয়। মোক্ষ, ধর্ম, অর্থ, কাম–এরাই সেই চারপুত্র। এরা ধর্মের চতুষ্পদ স্বরূপ। চার রকম ভূতগ্রাম, চার আশ্রম, এরাও ধর্মের চতুষ্পদ স্বরূপ আমার চারপুত্র। সেই থেকে চরাচর জগৎ চারযুগে চারভাগে বিভক্ত। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জল, অপ ও সত্যলোক, তারপর রুদ্রলোক–এই আটটি লোক–এদের মধ্যে কোনো কোনো লোক ক্ষয়শীল। ভূর্লোক ও স্বলোক প্রভৃতি চারপাদ, তার মধ্যে ভূর্লোক, প্রথম পাদ, ভূবলোক দ্বিতীয়, স্বলোক তৃতীয় ও মহলোক চতুর্থ। এই লোকগুলির মধ্যে রুদ্রলোকই পরম স্থান। যিনি, নিরহঙ্কার, ধ্যাননিষ্ঠ যোগী পুরুষ তিনি সেই লোকপ্রাপ্ত হন।

হে ব্রাহ্মণ, সমস্ত প্রাণীর প্রাণস্বরূপ সোম আমার মুখ থেকে বিনির্গত হয়, জীবেরা তা স্তনমণ্ডলে ধারণ করে। যেহেতু আপনি এই সাবিত্রী মহেশ্বরীকে দ্বিপদ আকারে দেখেছেন, এজন্যে আপনি সৃষ্ট নরগণ সকলেই দ্বিপদ বিশিষ্ট হবে। যিনি পরমা, জন্মরহিতা, মহেশ্বরী দেবী, তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করছেন, এজন্য অজদের বিশ্বরূপত্ব হবে। মহাতেজা অজও বিশ্বরূপ হবেন। যে সকল দ্বিজ আমাকে শিবরূপে দর্শন করবেন, তারা রজঃ গুণ মুক্ত হবেন। ভগবান পিতামহ ব্রহ্মাকে রুদ্র এরকম বললে তিনি প্রণত হয়ে তাঁকে বললেন–হে দেব দেবেশ, হে ভগবান, আপনি বিশ্বরূপধারী মহেশ্বর! হে মহাদেব! আপনার এইসব দেহ লোকপুজ্য; কিন্তু

আমি জানতে ইচ্ছা করি- কোন্ কালে কোন্ যুগে দ্বিজাতিরা আপনাকে দেখতে পাবেন? কি রকম তত্ত্বযোগে বা ধ্যানে তারা আপনার দর্শন পাবেন? ভগবান বললেন–কি তপস্যা বা যোগ বা কি দান, ধর্ম, তীর্থ, সেবা, পূজা–একমাত্র ধ্যান ছাড়া কোনকিছুতেই মানুষ আমার সাক্ষাৎ পাবে না। ত্রিভুবনপতি বিষ্ণু নারায়ণই একমাত্র সাধনীয়। তিনি বরাহ নামে বিশ্রুত হবেন। তার চার হাত, চার পা, চারমুখ, চার চোখ হবে। তখন তিনি সম্বৎসর হয়ে যজ্ঞরূপী হবেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে তার চার পা-ও প্রত্যঙ্গ সকল, তার অঙ্গ চার বেদ, চার বাহু ঋতু ও ঋতুসন্ধি, তার মুখ দুই অয়ন মুখ, তাঁর চার চোখ পর্ব সকল ফাল্গুনী, আষাঢ়ী ও কৃত্তিকা এবং দিবা, অন্তরীক্ষ ও ভৌম এই তিন স্থান তাঁর তিনমস্তক এবং উৎপত্তি ও প্রলয় এই দুটি তার আশ্রম। এই নারায়ণই বরাহরূপে সকলের আরাধ্য হবেন। আপনি চতুরানন হবে। নারায়ণ ব্রহ্মলোকবাসীদের কাছে নমস্য হবেন, তারপর সেই কল্পে আপনি পদ্মজন্মা, পদ্মনাভ ইত্যাদি বিপুল খ্যাতি প্রাপ্ত হবে। পরে বরাহকল্পে মহাতেজা বিষ্ণু কাল হয়ে লোক সংহার করবেন। তারপর আপনার বৈবস্বত মনু নামে এক পুত্র জন্মাবেন। আমি তখন সেসময় শ্বেতনামক শিখাযুক্ত মহামুনি হব। হিমালয়ের শিখরে রম্য পর্বতে আমার চারজন শিষ্য হবেন।

তারা সকলেই শিব অনুরক্ত মহাত্মা। তাদের নাম শ্বেত, শ্বেতশিম, শেতাশ্ব, শ্বেতলোহিত। তারপর সেই চারজন ব্রহ্মনিষ্ঠ শিষ্য ব্রহ্মতত্ত্ব দেখে আমার কাছে আসবেন। এখানে আগমনের কারণে আর তাদের পুনর্জন্ম হবে না। আবার যখন আমার দ্বিতীয় দ্বাপর যুগে প্রভু প্রজাপতি সত্য নামে ব্যাস হবেন। তখন আমি আবির্ভূত হব, চারপুত্র জন্ম নেবে যথা–দুন্দুভি, শতরূপ, ঋচীক ও কেতু জন। এরা ব্রহ্মজ্ঞান পেয়ে সনাতন রুদ্রলোকে যাবে। সেখান থেকে সংসারে আর ফিরে আসতে হবে না। তৃতীয় দ্বাপরে ভার্গব ব্যস হবেন। তখন আমি দমন নামে বিখ্যাত হব। সে সময় বিশোক, বিকেশ, বিলাপ, পাপনাশন এই চারপুত্র জন্মাবে। এই পুত্ররাও যোগমার্গ অবলম্বন করে রুদ্রলোকে যাবে। চতুর্থ দ্বাপরে অঙ্গিরা যখন ব্যাস হবেন, তখন আমি সুহোত্রী নামে বিখ্যাত হব। তখন তপোবন, যোগাত্মা, দুব্রত ও দ্বিজপ্রধান এই চারপুত্র উৎপন্ন হবে। এদের নাম, সুমুখ, দুর্মুখ, দুর্দম, দুরতিক্রম। এরা যোগাবলম্বন করে রুদ্রলোকে যাবেন, পঞ্চম দ্বাপরে সবিতা যখন ব্যাস হবেন, তখন আমি কঙ্ক নামে মহাতপা হবেন। তখন গোত্মা, নিরহংকার চারপুত্র জন্ম নেবে। তাদের নাম–সন, সনন্দন, ঋভু ও সনৎকুমার, এরা সকলেই আমার কাছে আসবে। তাদের আর পুনর্জন্ম ঘটবে না। ষষ্ঠ দ্বাপরে মৃত্যু যখন ব্যাস হবেন, তখন আমি লেকাক্ষি নামে বিখ্যাত হব। সেই সময় আমার চারজন শিষ্য হবে। এরা হলো- সুধামা, বিরজা, শঙ্খপাত ও বর। তারা সকলেই যোগমার্গ অবলম্বন করে নিশ্চয়ই আমার লোকে যাবেন। আগে মহাতেজা বিভু শতক্রতু ছিলেন।

সপ্তম যুগ পরিবর্তনে সেই শতক্রতু যখন ব্যস হবেন তখনকার সেই যুগান্তে আমি যোগীশ্রেষ্ঠ জিগীষা নামে বিখ্যাত হব। সেই যুগে আমার চার পুত্রের নাম হবে–সারস্বত, সুমেধা, বসুরাজ, সুবাহন। এই মহাত্মা পুত্রেরা সবাই ধ্যানযোগ অবলম্বনে আগের মতো রুদ্রলোকে উপনীত হবেন। অষ্টম পরিবর্তনে বশিষ্ঠ ব্যাস হবেন, তখন কপিল, আসুরি, পঞ্চলিখ ও রাসকলি–এই চারজন মহাত্মা তাঁর শিষ্য হবেন। তখন কপিল প্রভৃতিরা ধ্যানবলে মহেশ্বর যোগ পেয়ে দগ্ধপাপা হবেন। নবম যুগ পরিবর্তনে সারস্বত ব্যাস হবেন, তখন আমি ঋষভ নামে বিখ্যাত হব। এরপর পরাশর, গার্গ, ভার্গব ও অঙ্গিরা নামে আমার চারজন মহাপ্রভব পুত্র হবে। এরা সকলেই বেদপারঙ্গম, তপঃপ্রভাবে উৎকৃষ্ট। এই তপস্বী পুত্রেরা সবাই যোগপত্র আশ্রয় করে রুদ্রলোকে গমন করবেন।

দশম দ্বাপরে ত্রিধামা ব্যাস হবেন। তখন আমি গিরিরাজ হিমালয়ের ভৃগু নামের তুঙ্গ ও রম্য শিখরে আবির্ভূত হব। তখন আবার আমার চারপুত্র জন্ম নেবে। তাদের নাম বলবন্ধু, নিরমিত্র, কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন। এরা তপস্যা করে পাপমুক্ত হয়ে দেবলোকে যাবে। এগারো দ্বাপরে ত্রিবৃত ব্যাস হবেন। তখন কলির প্রথমে আমি গঙ্গাদ্বারে আবির্ভূত হব। উগ্র নামের মহানাদশালী চার পুত্রের জন্ম হবে। এদের নাম–লম্বোদর, লম্ব ও লম্বাক্ষ ও লম্বকেশক। এরা সকলেই মাহেশ্বর যোগ লাভ করে রুদ্রলোকে যাবে। দ্বাদশ পরিবর্তনে মহামুনি শততেজা মহাকবি ব্যাস হবেন। তারপর ঐ যুগান্তে আমি অত্রি নামে বিখ্যাত হব। যোগ অবলম্বনে থৈমক বনে আশ্রয় নেব। তখন আমার চারপুত্র হবে। তাদের নাম সর্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্য ও সর্ব। আমার পুত্রেরা পূর্বের ন্যায় রুদ্রলোকে গমন করবে।

তারপর ত্রয়োদশ যুগান্ত পরিবর্তন ঘটলে ধর্মনারায়ণ যখন ব্যাস হবেন, তখন আমি গন্ধমাদন পর্বতে পবিত্র বালখিল্য আশ্রমে বলি নামে মহামুনি হয়ে আবির্ভূত হব। তখন আমার সুধামা, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও বিরজা নামে চার তপোধন পুত্র উৎপন্ন হবে। এরা উর্ধরেতা হবেন। রুদ্রলোকে গমন করবেন। চতুর্দশ পর্যায়ে সুরক্ষ যখন ব্যাস হবেন, সেই যুগান্তে আবার আমি, অঙ্গিরার বংশে গৌতম নামে শ্রেষ্ঠ যোগী উৎপন্ন হব। আমার আশ্রম পবিত্র গৌতমাশ্রম নামে পরিচিত হবে। পরে কলির শুরুতে আমার যে চারপুত্র হবে, তাদের নাম–অত্রি, উগ্রতপ, শ্রবণ, দ্রবিষ্টক। ঐ পুত্রেরাও ধ্যান নিষ্ঠ হয়ে আগের মতো যোগমার্গ অবলম্বন করে রুদ্রলোকে গিয়ে বাস করবে। এরপর পঞ্চদশ দ্বাপরে মহাত্মা আরুণি যখন ব্যাস হবেন, তখন আমি বেদশিরা নামে অস্ত্র আর বেদশীর্ষা নামে পর্বত হয়ে বিখ্যাত হব। সরস্বতী নদীর তীরে হিমালয়ের এক আশ্রমে আমি থাকব। তখন ভূমি, কুনির্বাহ, কুশরী ও কুনেত্র নামে চারপুত্র হবে। এরপর ষোড়শ পর্যায়ে মহাত্মা সঞ্জয় ব্যাস হবেন। আমি গোকর্ণ নামে বিখ্যাত হব। সেই সময় আমার

কশ্যপ, উশনা, জ্ঞান ও বৃহস্পতি নামে আমার চারজন মহাত্মাপুত্র উৎপন্ন হবে। এই পুত্রগণ পরমপদ লাভ করবেন।

এরপর সপ্তদশ যুগান্ত পরিবর্তনে দেব কৃতঞ্জয় ব্যাস হবেন, তখন আমি গৃহবাসী নামে বিখ্যাত হব। হিমালয় শিখরে আমার ক্ষেত্র মহালয় নামে বিখ্যাত হবে। সেখানে চারজন যোগবেদী পুত্র উৎপন্ন হবে। এরা উতথ্য, বামদেব, মহাকাল ও মহালয়। ঐ কল্পে আমার সমস্ত পুত্রই ধ্যানযোগী হবে। এরা অব্যয় শিব শরীরে প্রবেশ করবে। এছাড়া অন্য যেসব মহাত্মা, বিমল বিশুদ্ধ হয়ে পবিত্র মহালয়ে গিয়ে মহেশ্বর-এর পা দর্শন করবেন, তারা ঊর্ধ্ব এবং অধস্তন দশ দশ পুরুষ সংসারচক্র থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। আমার প্রসাদে তাদের রুদ্রলোক প্রাপ্তি হবে।

এরপর অষ্টাদশ যুগান্ত পরিবর্তনে যখন ঋতঞ্জয় ব্যাস হবেন তখন শিখণ্ডী নামে আবির্ভূত হব। তখন আমার বাচবা, ঋচীক, সাহায্য ও দৃঢ়ব্রত নামে চারপুত্র জন্মাবে। এরপর একুশতম যুগান্ত পরিবর্তনে ভরদ্বাজ ব্যাস হবেন। ঐ সময় হিমালয়ের আমি রম্য হিমাদ্রি শিখরে জটামালী নামে বিখ্যাত হব। আমার নামে জটায়ু পর্বত হবে। হিরণ্য, কৌশিল্য, কাক্ষীব, কুথুমি নামে আমার চারজন মহাতেজা পুত্র জন্মাবে। এরাও রুদ্রলোকে যাবে। বিংশতিতম যুগান্ত পরিবর্তনে সৃষ্টি বিস্তারে বাঁচাবশ্রবা ব্যাস হবেন। তখন আমার নাম হবে অট্টহাসী। সুমন্ত, বর্বরি, সুবন্দ ও কুশিকন্ধর নামে চারপুত্র জন্ম নেবে। জ্ঞাননিষ্ঠ, সত্যব্রত পুত্রেরা রুদ্রলোকে যাবে। একুশ পর্যায়ে বাচস্পতি ব্যাস হবেন। আমি দারুক নামে অবতীর্ণ হব। আমার প্লক্ষ, দাক্ষায়ণী, কেতুমালী ও বক নামে চারজন মহাপ্রভাব পুত্র হবে।

বাইশতম যুগান্ত পরিবর্তনে শুক্লায়ন যখন ব্যাস হবে তখন আমি বারাণসী ধামে লাঙ্গলী নামে এক মুনি হব। সেখানে আমার, তুল্যার্ধে মধুপিঙ্গাক্ষে ও শ্বেতকেতু নামে ধার্মিক পুত্র জন্মাবে। তারা মহেশ্বর এর যোগ পেয়ে রুদ্রলোক যাবে। তেইশতম যুগান্ত পরিবর্তনে তৃণবিন্দু ব্যাস হবেন। তখন আমি জন্মাব শ্বেত নামে মহামুনি হয়ে। উবিজ, বৃহদুকথ, দেবল ও কবি নামে মহাপ্রভাব পুত্র জন্ম নেবে। চব্বিশতম যুগান্ত পরিবর্তনে ঋক্ষ ব্যাস হবেন। আমি কলির শুরুতে শূলী নামে মহাযোগী হয়ে আবির্ভূত হব। তখন শালিহোত্র, অগ্নিবেশ্য, যুবনাশ্ব ও শরদ্বসুনামে চারপুত্র হবে। এই পুত্রেরা রুদ্রলাভ করবে। পঁচিশতম যুগান্ত পরিবর্তনে বশিষ্ট যখন ব্যাস হবেন তখন কোটিবর্ষ নগরে দণ্ডী মুণ্ডীশ্বর নামে প্রাদুর্ভূত হব। অর্নল, কুম্ভকবাশ্য, কুম্ভ ও প্রবাহক নামে চার পুত্র উৎপন্ন হবে। ছাব্বিশতম যুগান্ত পরিবর্তনে পরাশর ব্যাসের কালে তখন আমি সহিষ্ণু নামে বিখ্যাত হব। পবিত্র রুদ্রবনে আমার অবস্থান হবে, তখন

উলুক, বৈদ্যুত, সার্বক ও অশ্বলায়ন নামে চার পুত্র হবে। এরা পূর্ববর্তী পুত্রদের মতোই রুদ্রলোকে যাবে। সাতাশতম যুগান্ত পরিবর্তনে জাতুকণ্য ব্যাসের কালে মুনি সোমশর্মা নামে বিখ্যাত হব। প্রভাসতীর্থে আমার স্থান হবে। অক্ষপাদ, কণাদ, উলুক, বৎসা নামে চারপুত্র যোগাত্মা বিশুদ্ধ হবে।

আটাশতম যুগান্ত পরিবর্তনে শ্রীমান বিষ্ণু যখন দ্বৈপায়ণ ব্যাস হবেন, তখন কৃষ্ণ যদুশ্রেষ্ঠ বাসুদেব রূপে বসুদেব থেকে প্রাদুর্ভূত হবেন, আমি যোগাত্মা হয়ে ব্রহ্মচারী দেহে প্রাদুর্ভূত হব। আমার নাম হবে নকুলী। ঐ সময় আমার কুশিক, গার্গ, মিত্রক ও রুষ্ঠ নামে চারজন তপস্বী পুত্র জন্ম নেবে। এরা রুদ্রলোকে যাবে। আমি যথাক্রমে আঠাশটি যুগান্ত মনু আদিকৃষ্ণ পর্যন্ত যাবতীয় অবতার লক্ষণ ও স্মৃতিগুলোর বিভাগ ও ধর্মলক্ষণ বললাম।

.

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

বায়ু বলে চলেছেন — মুনিরা বলেন, ভারতবর্ষে চারটি যুগ আছে। যথা–সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। প্রত্যেক যুগের পরিমাণ দিব্য হাজার বছর। এই সহস্র বর্ষ ব্রহ্মার এক দিন। মন্বন্তর অতীত হলে প্রভাবশালী সমস্ত দেবই এভাবে ঊর্ধ্বগামী হন। সেখানে কল্পবাসী দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হন, দহন ও বর্ষণ দ্বারা যুগ ক্ষয় সংঘটিত হলে ব্রহ্মা সে সমস্ত সংহার করে আবার দেব, ঋষি ও দানবের সংস্থান করেন। সাতটি কল্প শেষে সপ্তসাগর একীভূত হয়ে এই বিশ্ব জগৎ ঘোর একার্ণব আকারে পরিণত হয়েছিল। কোথাও কোনও ভাগ ছিল না। সবই তমোময় ছিল।

শঙ্খ, চক্র, গদাধর নারায়ণের মুখ থেকে তার আবির্ভাব সেই অষ্টম পুরুষোত্তম, যোগবিদ হরি ঐ সমুদ্রে মায়াবলে সহস্র কণা সংকলিত অনন্ত শয্যায় শয়ন করলেন। সে সময় তার নাভিদেশ থেকে এক পদ্ম প্রাদুর্ভুত হল। ঐ পঙ্কজের বিস্তার একশ যোজন পর্যন্ত। বিষ্ণুর খেলাচ্ছলে উৎপন্ন পদ্ম দেখে আকর্ষিত হয়ে চতুরানন ব্রহ্মা কাছে এসে দেখলেন, শ্রীহরি সেই সুগন্ধ পদ্ম নিয়ে খেলা করছেন। ব্রহ্মা আরো কাছে এসে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন–কে তুমি? জলের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে শুয়ে আছো? ব্রহ্মার প্রশ্ন শুনে তিনি বললেন–এই ভূমি, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ–এসব কিছুর কার্য-কারণ আমি। আমিই প্রভু পরমপাদ ভগবান বিষ্ণুঃ।

তিনি আরো জিজ্ঞাসা করলেন –আপনি কে ভগবান?–আপনি কোথা থেকে আমার কাছে এলেন? কোথায় যাবেন, কে আপনি বিশ্ব মূর্তিধর? পিতামহ তার জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন–আপনার মত আমিও নারায়ণ। আদিকর্তা প্রজাপতি। এ কথা শুনে সবিস্ময়ে শ্রীহরি, কৌতূহলবশতঃ অনুমতি নিয়ে তার মুখমধ্যে প্রবেশ করলেন। মহাতেজা বিষ্ণু সেখানে প্রবেশ করে দেখলেন ব্রহ্মর উদারে পর্বত, সাগর নিয়ে আঠারোটি দ্বীপ, চার আশ্রমে বিভক্ত সাতটি সনাতন লোক রয়েছে। ব্রহ্মার উদরস্থ নানা লোক, আশ্রম দেখেও সীমা খুঁজে পেলেন না। হাজার বছর কেটে গেল।

ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়ে শ্রীহরি তাঁকে বললেন–আমি আদি-অনন্ত কিছুই উপলব্ধি করতে পারলাম না। এরপর শ্রীহরি পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন–এবার আমার উদরে প্রবেশ করুন। পিতামহ এবার শ্রীপতির কথা শুনে উৎফুল্ল মনে তার উদার প্রবেশ করলেন। উদরের ভিতর বহু ভ্রমণ করেও দেবতার আদি-অন্ত পেলেন না। এদিকে ভগবান বিষ্ণু তখন পিতামহ উদরে প্রবেশ করার পর সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার বন্ধ করে রাখলেন। অতঃপর পিতামহ বিষ্ণুর নাভিদেশ দিয়ে বাইরে এলেন। পদ্মগর্ভা ব্রহ্মা পদ্মের মধ্যে বিরাজ করতে লাগলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে এই কৌতুক লীলা চলতে লাগল। অতঃপর সেখানে তখন ভূতপতি শূলপাণি মহাদেব এলেন। তাঁর দুপায়ের আঘাতে অতি উষ্ণ ও অতি শীত স্থূল জলবিন্দুগুলি আকাশে উঠে গেল। প্রবল বাতাস বয়ে গেল। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বললেন–এক মহান আশ্চর্যের ব্যাপার! এই পদ্মও ভীষণ কাঁপছে। এর কি কারণ? আমার সংশয় দূর করুন।

শ্রীহরি ব্রহ্মার কথা শুনে বললেন–আমার নাভিদেশে কোন প্রাণী এসে আশ্রয় নিয়েছে? আপনি আমার সঙ্গে প্রিয়কথা বলছেন, এমন আমি কি উত্তম কাজ করেছি। ব্রহ্মা প্রত্যুত্তরে বললেন–আমি বহুপূর্বে আপনারই ইচ্ছায় আপনার উদরে প্রবেশ করেছিলাম। আমি আপনার ভেতর সমস্ত লোক দর্শন করেছি। কিন্তু সহস্র বছর পরও বার হতে পারিনি, আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার বন্ধ রেখেছিলেন। তাই আমি নাভিদেশে প্রবেশ করে, নাভি পঙ্কজের সূত্র পথে নির্গত হয়েছি। আমার এই কাজে আপনি আহত হবেন না।

বিষ্ণু বললেন–হে ব্রাহ্মণ, আমি আপনাকে বাধা দেবার জন্যই লীলাচ্ছলে একাজ করেছি। আপনার মঙ্গলের জন্যই একাজ করেছি। ব্রহ্মা বললেন–বিষ্ণো, আপনি বর গ্রহণ করুন। আমি পদ্ম থেকে নামছি। বিষ্ণু বললেন–হে অরিসূদন, আমার ইচ্ছে আপনি আমার পুত্র হন। আপনি শ্বেত উষ্ণীষ শোভাধারী পদ্মযোনি নামে বিখ্যাত হবেন। ভগবান ব্রহ্মা আনন্দের সাথে বললেন– আচ্ছা তাই হোক। তারপর বললেন– হে বিষ্ণু! কে ইনি প্রদীপ্ত তেজ পুঞ্জবৎ মূর্তিতে

চারদিক ও অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করে এদিকে আসছেন? বিষ্ণু উত্তরে বললেন–যাঁর পদক্ষেপে আকাশ, বাতাস, জল আলোড়িত হল, সেই জলের ঢেউ আপনাকে পর্যন্ত স্পর্শ করছে, নিঃশ্বাস বায়ুতে মহাপদ্ম পর্যন্ত কাঁপছে। তিনি সংহার কর্তা, দেবাদিদেব। এনাকে আমরা দুজন স্তোত্র পাঠ করে পূজা করব। ক্রুদ্ধ ব্রহ্মা বললেন– কে এই শঙ্কর? যাকে আপনি জগতের নিমিত্ত বলছেন? তার ক্রুদ্ধ বাক্য শুনে বিষ্ণু বললেন–এই দেব শঙ্কর লীলাচ্ছলে জীব নিয়ে খেলা করছেন। একমাত্র জ্যোতি রূপ প্রকাশমান। ইনি বীজি, আপনি বীজ, আমি সনাতন যোনি। ব্রহ্ম এর অর্থ জানতে চাইলেন। বিষ্ণু বললেন–ইনি মহেশ্বর, এর থেকে মহত্তম বস্তু আর কিছু নেই। মহেশ্বর পূর্বে একলিঙ্গ আদিস্বর্গীয় বীজরূপে বিভাত।

সেই বীজ আমার স্বরূপ যোনিতে সমাযুক্ত হয়েছিল। কালক্রমে তা থেকে একটি সোনার অণ্ড প্রাদুর্ভূত হয়। দশশত বছর জলের মধ্যে এই অণ্ড থাকে। পরে বায়ু দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত হয়। এর এক অর্ধে স্বর্গ, অন্য অর্ধে ক্ষিতির উৎপত্তি ঘটে। অণ্ডের সোনার আবরণটি সুমেরু রূপে প্রকাশ হয়। তারপর তা থেকে হিরণ্যগর্ভ আপনি, আমি চতুর্ভুজ বিষ্ণু–আবির্ভূত হই। আপনি দ্বিধাবিভক্ত অণ্ডকে শূন্য স্বরূপে অবলোকন করে 'এটি কি'–এই চিন্তায় নিবিষ্ট হলেন। আপনার কয়েকজন কুমার প্রাদুর্ভুত হল। তার মধ্যে শ্রীমান সনকুমার ও ঋভু- এরা ঊর্ধরেতাঃ। এছাড়া সনাতন, সনক, সনন্দন, এরাও একই সময়ে উৎপন্ন হয়। এরা উৎপন্ন হয়েই আত্মজ্ঞ হয়ে বলেন– আমরা কাজ শুরু করব না।

তিন তাপ থেকে মুক্ত থাকব। জীবনে অল্পই সুখ আছে, কিন্তু তা দুঃখ-কষ্টময়, জরা ও শোকপূর্ণ, মৃত্যু পুনর্জন্ম বড়ই দুঃখাবহ। স্বর্গসুখ স্বপ্নের মতো, নরকভোগই অনিবার্য, এইভাবে ঐ আত্মভারা ভবিতব্য জেনে থাকেন। ঋভু ও সনৎকুমার আপনার বশীভূত দেখে অন্য তিনজন নিবৃত্তমার্গ আশ্রয় করেন। তখন তুমি শঙ্করের মায়ায় মোহিত থাকেন। এভাবে কল্পে কল্পে আপনি সংজ্ঞা লোপ পায়। এ জগতে এটাই ঐশ্বরী মায়া বলে অভিহিত। আপনার আত্মা দিয়ে আত্মাকে দেখো জানো এবং আমি অম্বুজাক্ষ, আমাকে এবং মহাযোগী মহাদেবকে জানো। ইনি যদি তোমার আমার ওপর ক্রুদ্ধ হন নিশ্বাসেই আমাদের দগ্ধ করবেন।

আসুন, আগে ভূতপতিকে স্তব করি। সূত নির্বিশেষে পূজ্য, উপজীব্য, সত্যাসত্য, আপনাকে আমার নমস্কার। আপনি পিনাকী, প্রসিদ্ধ, স্ফীত, সুমেধা, অক্ষমালা, কৃতান্ত, প্রণব, মৃগব্যাধ, দক্ষযজ্ঞহর, ক্ষান্ত শান্ত, সর্বভূত–আপনাকে নমস্কার। আপনি জটী দণ্ডী বাদ্যনৃত্যপ্রিয় বিভীষণ, ভীম, নর্তনকারী, মুদ্রা মণিধর, স্তোক, তনু, গম্য ও গমন আপনাকে আমার নমস্কার। এই

লোক ধাত্রী, পৃথিবী আপনার সজ্জন সেবিত পদযুগল। নিখিল সিদ্ধ যোগীদের অধিষ্ঠান আপনার উদরে। তারা বিভূষিত অন্তরীক্ষ আপনার মধ্যদেশ।

তারা দল আপনার বক্ষস্থলে হারের মতো শোভা পাচ্ছে। দশ দিক আপনার দশ ভূজ স্বরূপ বিস্তীর্ণ, আকাশ আপনার হেমসূত্র কণ্ঠদেশ, পদ্মমালা শোভিত আপনার উষ্ণীষ। সূর্যমণ্ডলে দীপ্তি, চন্দ্রে বপু, পৃথিবীতে স্থৈর্য, অনিলে বল, অগ্নিতে তীক্ষ্ণতা, চন্দ্রে প্রভা, আকাশে শব্দ ও জলে শৈত্য রূপে আপনাকেই কীর্তন করি, হে দেব, আপনি জপ্য আপনিই মহাদেব মহেশ্বর, সুরেশ্বর, গৃহবাসী, খেচর, তপোনিধি, বিধাতা, ধনঞ্জয়, ছত্রী, পতাকী, পঙ্খী, পরভৃত, শূর। আপনাকে প্রসাদিত করে আমরা রনে শত্রু নিধন করেছিলাম। আপনি অগ্নিরূপে সমস্ত সাগর পান করেও তৃপ্ত হননি। হে মহাদেব, আপনি প্রীত হলে আমরা খুশী। আপনি ঈশ, অনাদি, তেজোরাশি, আপনি লোককর্তা, সাংখ্যা যোগীরা আপনাকে প্রকৃতি থেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। তাই মৃত্যুমুখে পতিত হন না। যোগীরা যোগবলে আপনাকে জানতে পেরে ভোগগুলি ত্যাগ করেন। যেসব মর্তে আপনার সাক্ষাত লাভ করে বিশুদ্ধ হয়েছে, তারা ইহলোকে দিব্য ভোগ করে। আপনি যেখানেই থাকুন; আমার স্তবে তুষ্ট হন, মঙ্গল বিধান করুন। আপনার তত্ত্ব জানা সাধ্যের অতীত|

.

ষড়বিংশ অধ্যায়

সূত বলতে লাগলেন–উমাপতি, দক্ষযজ্ঞ সংহারকারী, পিনাক পাণি, ত্রিলোচন, পিঙ্গল আয়তচোখে দৃষ্টিপাত করে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে পান করতে উদ্যত হচ্ছিলেন। কিন্তু নিজের স্তুতি শুনে তার বদন প্রসন্ন হল। দেবাদিদেব এঁদের স্বরূপ জানতে পেরেও জিজ্ঞাসা করলেন–কে তোমরা? পুণ্ডরীকাক্ষ মহাপুরুষ পরস্পরের জন্যে এই ভীষণ প্লাবনেও এক হয়ে রয়েছো? দুই মহাত্মা বললেন–একথার কি প্রয়োজন? আপনি ছাড়া আর কোথায় অনন্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আছে? তখন মহাদেব মধুর স্বরে বললেন–ওহে হিরণ্যগর্ভে, আপনাকে এবং ওহে কৃষ্ণ, আপনাকেও বলছি–আপনাদের সত্য বাক্য শুনে এবং ভক্তিতে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি। আপনারা দুজন আমারও মাননীয় ও পূজনীয়। কোন্ বর চান বলুন? ব্রহ্মা বললেন–আমি একজন যোগ্য পুত্র চাই। বিষ্ণু একথা শুনে বললেন–আপনি সুযোগ্য বীরপুত্র ইচ্ছে করছেন। আমার মতে এই মহেশ্বরকেই পুত্ররূপে প্রার্থনা করুন। পিতামহ তখন বিষ্ণুর সাথে একযোগে পুত্র কামনায় হাতজোড় করে বললেন–হে ভগবান! আমার প্রতি যদি আপনি প্রীত ।হয়ে

থাকেন তাহলে আমার সুযোগ্য পুত্ররূপে প্রতিভাত হন। ব্রহ্মার সেই প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে মহেশ্বর বললেন–আপনার যখন ক্রোধ জন্মাবে, তখন তখন আমি একাদশ রুদ্র হয়ে শূলপাণি রূপে আপনার ললাট থেকে প্রাদুর্ভূত হব। বিষ্ণুকে বললেন–আমি আপনাকে বর দেব।

বিষ্ণু একথা শুনে বললেন–আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হন, আপনার প্রতি আমার ভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, এই আমার প্রার্থনা। মহাদেব তাকে বললেন–শুনুন, আমি যেরূপে আপনার প্রতি প্রীত হয়েছি, এই ব্যক্ত-অব্যক্ত স্থাবর জঙ্গম যা কিছু পরিদৃশ্যমান হয় এসবই রুদ্র-নারায়ণত্মক। আমি অগ্নি, আপনি সোম, আপনি রাত্রি আমি দিন, আপনি ঋত, আমি সত্য, আপনি ক্রতু, আমি ফল, আপনি জ্ঞান, আমি জ্ঞেয়, এই জ্ঞেয় বস্তুর জপ করেই যোগীরা আমাতে প্রবেশ করে। আমরা দুজনে মিলিত গতি ছাড়া যুগয়ে অন্য গতি নেই। আপনি আপনার আত্মাকে প্রকৃতি এবং আমি শিব আমাকে পুরুষ বলেই জানবেন। আপনি আমার অধদেহ। আমিও আপনার তাই। আমি আপনার শ্যামল দক্ষিণদিক। তাই আমি নীললোহিত। হে বিষ্ণু, আপনি আমার হৃদয়। আর আমি আপনার হৃদয়ে অবস্থিত।

আপনি সমস্ত কাজের কর্তা আর আমি তার অধিদেবতা। এখন আপনার মঙ্গল হোক। আমি চললাম। এই বলে মহাদেব অন্তর্হিত হলেন। তিনি চলে যাবার পর শ্রীহরি আনন্দিত মনে আবার জলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নিজের অনন্ত শয্যার শয়ন করলেন। ব্রহ্মাও হৃষ্টমনে পদ্মগর্ভে আশ্রয় নিলেন। তারপর বহুকাল কেটে গেল। মধু ও কৈটভ নামে মহাবল মহাবীর্য দুই ভাই নির্ভয়ে হাসতে হাসতে পদ্মকে কাঁপিয়ে তুলল ও পদ্মগুলি ভেঙে ফেলল। ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। এইভাবে তারা সেখানে লুকিয়ে রইল। পদ্মযোনি ব্রহ্মা তাদের পরিচয় জানার জন্য উৎসুক হলেন। মধু কৈটভের গতিবিধি বুঝতে পারলেন না। রসাতলে গিয়ে বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ করে বললেন–আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ভগবান বিষ্ণু হেসে বললেন–সেই দুই দৈত্যকে তুমিই নাশ করবে, ভয় নেই।

তারপর ত্রিলোক সেই অযোনিজ সমাসীন ব্রহ্মদেবকে প্রদক্ষিণ করে তাতে প্রবেশ করল। তিনি অন্তর্ধান করলেন। এই সময় অনন্ত তার মুখ থেকে বিষ্ণু ও হিষ্ণু দুই ভাই উৎপাদন করে বললেন– তোমরা দুজনে ব্রহ্মাকে মধু কৈটভের হাত থেকে রক্ষা কর। তখন একদিকে মধু ও কৈটভ এবং অন্যদিকে বিষ্ণু ও জিষ্ণু স্বরূপ ধারণ করে ব্রহ্মাকে বলল– আমরা যুদ্ধ করব। আপনি আমাদের মধ্যে মধ্যস্থর কাজ করুন। তারপর তারা জলে প্রবেশ করে তুমুল যুদ্ধ করতে লাগলো। একশত বৎসর কেটে গেল, কিন্তু কেউ যুদ্ধ থামালো না।

ব্রহ্মা ব্যাকুল মনে ধ্যানস্থ হলেন। ধ্যানে দিব্য নেত্রে তাদের পার্থক্য বুঝতে পারলেন না। তিনি দৈত্য দুজনের নাভির ঊর্ধ্ব দিকে এক সূক্ষ্ম কবচ বন্ধন করলেন। তারপর মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। বিশ্বরূপী ব্রহ্ম জপ সাধনায় নিমগ্ন হলে তার মাথা থেকে এক পদ্ম ও ইন্দু বদনা প্রিয়দর্শনা কন্যার আবির্ভাব হয়। তাকে দেখে এই দৈত্য ভাইরা ভয়ে বিবর্ণ হল; না মধুর বাক্যে সেই কন্যাকে সম্বোধন করে বললেন–তোমাকে আমি কোন নামেন্ িজানব? তখন সেই কন্যা হাতজোড় করে বললেন–আমাকে আপনি বিষ্ণু আজ্ঞাকারিণী মোহিনী মায়া বলেই জানবেন। আপনার সংকীর্তনে আজ আমি তাড়াতাড়ি এসেছি। ব্রহ্মা বললেন–তুমি যখন এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন তুমি মহাব্যাহৃতি নাম প্রখ্যাত হবে। তুমি আমার শিরোভেদ করে উঠেছে। তাই সাবিত্রী নামও হল। তুমি অনেকাংশে এজন্য তোমার নাম একানাংশা। এগুলি তোমার গঠন নাম। তুমি অন্য অনেক নামে প্রসিদ্ধ হবে। এদিকে দুই দৈত্য যুদ্ধ করে আহত হল, বিষ্ণুর কাছে বর প্রার্থনা করল। যেন অনাবৃত স্থানে তাদের মৃত্যু হয়। বিষ্ণু তাড়াতাড়ি কৈটভকে যমের কাছে পাঠালেন এবং জিষ্ণু মধুকে নিহত করলেন, ব্রহ্মা খুশী হলেন।

ঈশ্বর যেরূপ পুত্ররূপে আত্মদান করেন, তা শুনুন। বিষ্ণু ও জিষ্ণুর সঙ্গে মধু কৈটভের যুদ্ধের মাপণের পর ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বললেন–আজ শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। এবার সময় উপস্থিত, আপনি এই ঘোরকল্প সংহার করে নিন। আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। প্রভু বিষ্ণুও ব্রহ্মার কথার কল্প সংহার করলেন। ব্রহ্মা আবার বললেন–হে গোবিন্দ, আপনার মঙ্গল হোক, আপনি জলধিকে আলোড়িত করেছেন এবার আমার দ্বারা আপনার যদি কিছু করণীয় থাকে তবে তা আমায় প্রকাশ করে বলুন। বিষ্ণু বললেন–হে পদ্ম যোনি। বাস্তবিকই আমার কথা শুনুন। আপনি পুত্র কামনায় ঈশ্বরের কাছ থেকে যে প্রসাদ লাভ করেছেন, তা সফল করে আমার কাছে অঋণী হন। আপনি চার রকম ভূতবৃদ্ধকে সৃজন ও বিসর্জন করুন। সূত বললেন, পদ্মযোনি পিতামহ ব্রহ্মা গোবিন্দের কথায় সংজ্ঞা লাভ করে প্রজা সৃষ্টি কামনায় কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। এরূপ তপস্যায় তার কোন কার্যসিদ্ধি হল না।

বহুকাল পরে অতি দুঃখে তাঁর ক্রোধ জন্মাল। তার রোষ নেত্র থেকে অনেক অশ্রুবিন্দু পড়ল। সেই সব অশ্রু বিন্দু থেকে বাত, পিত্ত, কফাত্মক মহা ফণাশালী, স্বস্তিকাদি, প্রকীর্ণকেশ, বিষধর সাপ প্রাদুর্ভূত হল। ব্রহ্মা নিজের নিন্দা করলেন। বললেন–তপস্যার ফল এই হলে আমি তপস্যাকে ধিক্কার দিই। এরকম বলতে বলতে তিনি ক্রোধে মুচ্ছা গেলেন সেই মূচ্ছার আঘাতে তার দেহত্যাগ ঘটল। তখন ব্রহ্মার দেহ থেকে সকরুণ ভাবে কাঁদতে কাঁদতে একাদশ রুদ্র প্রাদুর্ভুত হলেন। রোদন করতে করতে এলেন বলে তার নাম রুদ্র নামে খ্যাত হলেন। এই রুদ্রগণই দেহীদের হৃদয়ে প্রাণরূপে রয়েছে। নীললোহিত ত্রিশূলী আবার ব্রহ্মার প্রাণদান

করলেন। এভাবেই প্রভু রুদ্র আগে ব্রহ্মায় প্রাণদান করেন, পরে তার আত্মজ হন। তারপর রুদ্র ব্রহ্মাকে এই পরমবাক্য বললেন–যে–হে ব্রাহ্মণ! আত্মাকে স্মরণ কর। আমাকে পুত্ররূপে প্রার্থনা করো। জানবে আমিই তোমার আত্মজ রুদ্র।

–হে প্রভো! আমার প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করো পিতামহ রুদ্রের মুখে তার সেই মনোমত বাক্য শুনে প্রসন্ন হলেন। তার চোখ আনন্দে অম্বুজের মত প্রতিভাত হল। তারপর প্রাণপ্রাপ্ত শুদ্ধ স্বর্ণকান্তি ব্রহ্ম, স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে বললেন–"ওহে মহাভাগ। কে তুমি বিশ্ব জুড়ে একদশাত্মক রুদ্ররূপে অবস্থান করে আমার মনে আনন্দ উৎপাদন করছে। আমায় প্রকাশ করে বল। রুদ্র আত্মজ সাথে এক যোগে তাকে অভিবাদন করে প্রত্যুত্তরে বললেন–হে ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুর সাথে একযোগে আমার কাছে বর চেয়েছিলে যে, হে দেব তুমি আমার পুত্র হও অথবা তোমার তুল্য কোন সুযোগ্য পুত্র আমার হোক। হে দেবেশ, তুমি সে বর পেয়েছে, এখন বিষাদ পরিত্যাগ কর, লোক সৃষ্টির ব্যাপারে প্রবৃত্ত হও।

ভগবান ব্রহ্মা খুশী হয়ে নীললোহিত রুদ্রকে বললেন–আপনি আমায় সাহায্য করুন। আমার সাথে প্রজাসৃষ্টি করুন। আপনি সর্বভূতের বীজ। তাই আপনার সাহায্য চাই। শঙ্কর ব্রহ্মার প্রস্তাব স্বীকার করে নিলেন, তারপর ক্রমশঃ ভগবান ব্রহ্মা প্রথমে মনকে সৃজন করলেন, পরে ভূতসমূহের ধারণা ও সরস্বতী উৎপাদন করলেন। তারপর ভৃগু, অঙ্গীরা-দক্ষ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত মানসপুত্রকে সৃষ্টি করলেন। তারপর ওঙ্কার প্রভৃতি দেবগণ ও অভিমানিনী দেবতাগণ আর্বিভূত হলেন। এভাবে সৃষ্টির বিস্তার হলে, ব্রহ্মা দক্ষ প্রভৃতি মানস পুত্রদের বললেন–হে পুত্রগণ! তোমরা ধীমান রুদ্রের সাথে একযোগে প্রজা সৃষ্টি কর। তখন প্রজাপতিরা রুদ্রের অনুগামী হয়ে বললেন–হে দেব। আমরা আপনার সাথে প্রজা সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করি। হে মহেশ্বর, আপনার প্রতি ব্রহ্মার এটাই বার্তা।

প্রজাপতিদের একথায় ভগবান রুদ্র তাদেরকে বললেন–হে ব্রহ্মনন্দন! আপনাদের যিনি অগ্রজ, তিনি আমার কাছ থেকে প্রাণ সকল গ্রহণ করে, ব্রহ্মর শ্রেষ্ঠ পুত্রদের সাথে নিয়ে ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্যন্ত সপ্তলোক সৃজন করুন। আমার আদেশ আপনারা সকলেই সৃষ্টি কাজে নিযুক্ত হন। আপনাদের মঙ্গল হোক। প্রজাপতিরা বললেন–যেমন আজ্ঞা করলেন তাই হবে। মহাত্মা দক্ষ প্রজাপতিগণকে বললেন–আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি। আপনাকে অগ্রবর্তী করে আমরা প্রজা সৃষ্টি করতে ইচ্ছে করি। আপনার মঙ্গল হোক। দক্ষ প্রজাপতি সেই কথায় তাই হোক' বলে অনুমোদন করলেন। তারপর প্রজা কামনায় একযোগে প্রজাসৃষ্টি করতে লাগলেন। তাতে অতীত সপ্তম কল্পে ঋভু ও সনৎকুমার উৎপন্ন হন।

.

সপ্তবিংশ অধ্যায়

সূত বললেন–হে মহাভাগ! আপনি লোকহিতের জন্য যে সব আশ্চর্য গোপনীয় বিষয় আমাদের কাছে। যথাযথ বলেছেন, তার মধ্যে শূলীর অবতার বিষয়ে আমাদের সংশয় আছে। কিজন্যে তিনি পূর্বযুগ পরিত্যাগ করে কলিকালে অবতীর্ণ হলেন? ইহলোক বা পরলোক কিছুই আপনার অজানা নয়, তাই জানতে চাইছি। যদি আমাদের শোনাবার মত হয়, তবেই ভক্ত জনের উপদেশের জন্য প্রকাশ করুন। লোমশ বললেন–মহাতেজ ভগবান বায়ুকে একথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন–তুমি যা প্রশ্ন করলে তা খুবই গোপনীয়। আমি ক্রমশঃ বলছি, শোন। পূর্বে জগৎ দিব্য হাজার বছর ধরে জলের অভ্যন্তরে ছিল। প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তিত হলেন। তখন এক দিব্যগন্ধী যুধাপেক্ষী কুমার শ্রুতি উচ্চারণ করতে করতে তার সামনে এলেন। তিনি ঐ স্পর্শরূপা গন্ধ রস জর্জিতা শ্রুতি উচ্চারণ করলে ভগবান চতুর্মুখ তা লাভ করলেন। সে সময় তিনি বললেন–এই পুরুষ কে?

এই চিন্তার ফলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রহিত, রস, গন্ধ বর্জিত অক্ষর প্রাদুর্ভূত হল। তারপর ভগবান ব্রহ্মা সেই অনুত্তম অক্ষয় ও স্বীয় মূর্তি নিরীক্ষণ করলেন। ধ্যানাবস্থায় বার বার দেখলেন। ঐ দেবস্বরূপ অক্ষয় শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত ও পীত বর্ণস্থ এবং তা অস্ত্রী ও অনপুংসক ভাবে বিভাত। এভাবে তিনি অক্ষরের সমস্ত স্বরূপ জেনে চিন্তাপরায়ণ হলে তার কণ্ঠদেশ থেকে আবার এক মহাঘোষ শ্বেতবর্ণ ও সুনির্মল অক্ষর আবির্ভূত হল। ঐ অক্ষরই বেদ, ওঙ্কার এবং সাক্ষাৎ মহেশ্বর স্বরূপ। তারপর ভগবান স্বয়ম্ভু আবার অক্ষর বিষয়ক চিন্তা করলে এক রক্ত অক্ষর উদ্ভূত হল। ঐ রক্তাক্ষরই আদি দেবতা। ঐ অক্ষরই ঋকবেদ। ঋকের উৎপত্তি দেখে লোককৃত, ব্রহ্মায় আবার এটা কি? এরকম চিন্তা করতে থাকলেন। তখন দ্বিমাত্র অক্ষর রূপ মহেশ্বর আবির্ভূত হলেন। আবার তিনি ঐ দ্বিমাত্র অক্ষরের বিষয় চিন্তা করলে ঋকবেদ যুক্ত রক্তাক্ষরই প্রাদুর্ভূত হল। এর সংশ্লিষ্ট ঋই যজু। ব্রহ্মা আবার দ্বিমাত্র বেদ ও অক্ষর দেখে তারই বিষয়ে চিন্তা করলেন। এর ফলে ওঙ্কার আবির্ভূত হল। তিনি ওঙ্কার অক্ষরে ধ্যান করতে লাগলেন। তিনি আদিতে ওঙ্কার সৃষ্টি করেই স্বয়ম্ভু নামে প্রসিদ্ধ হন।

তার মুখ থেকে চতুর্দশ স্বর ও সেই দিব্য আদ্য অক্ষর আবির্ভূত হল। অ-কারই প্রথম স্বর। পূর্বে। চতুর্দশ স্বর থেকে মন্বন্তর অধিপতি দিব্য প্রধান চতুর্দশ মনু প্রাদুর্ভূত হন। এই রকমভাবে দ্বিতীয় মুখ থেকে আকার স্বরূপ মনুর আবির্ভাব হয়। ইনি পাণ্ডুর বর্ণ। তৃতীয় মুখ থেকে ই-

কার, ইনি যজুঃ, শ্রেষ্ঠ আদিত্য স্বরূপ ইকার–প্রতাপবান সাক্ষাৎ মনু স্বরূপ। ইনি রক্তবর্ণ চতুর্থ মুখ থেকে ঈ-কার' উৎপন্ন হয়, উকার' তাম্রবর্ণ ও তামস মনু বলে কথিত। পঞ্চম মুখ থেকে 'উ' কার আবির্ভূত। এটি পীতবর্ণ ও চরিষ্ণব মনু বলে বিখ্যাত। তারপর ষষ্ঠ মুখ থেকে কপিলবর্ণ ওঙ্কার উৎপন্ন। ইনি মহাতপা বরিষ্ঠ বিজয় মনু বলে প্রসিদ্ধ। সপ্তম মুখ থেকে 'ঋকার' রূপ বৈবস্বত মনুর জন্ম। ইনি কৃষ্ণবর্ণ। অষ্টম মুখ থেকে ঋকারাত্মক শ্যামবর্ণ সাবর্ণির আবির্ভাব। নবম মুখ থেকে ৯ কারের জন্ম।

এটি ধূম্রবর্ণ, ধূম্র মনু নামে বিখ্যাত। দশম মুখ থেকে '৯৯ কারের জন্ম। এটি সারণিক মনু। একাদশ থেকে 'এ কার' জন্মে। এটি পিঙ্গশ বর্ণ, পিঙ্গশী মনু নামে খ্যাত, ত্রয়োদশ মুখ থেকে পঞ্চবর্ণ সমাযুক্ত উত্তম বর্ণ ও কারের' উৎপত্তি। এটি উত্তম মনু। চতুর্দশ মুখ থেকে 'কবুরবর্ণ' 'ঔ কারের জন্ম, এটি সাবর্ণি নামে নিরূপিত। কল্পে কল্পে মনুগণ এভাবে স্বর ও বর্ণরূপে অবস্থিত। স্বর ও বর্ণানুসারে এদের বিবরণ যথাযথভাবে জানা যায়। কল্পকালে এরা সকলেই জন্মেছে। তখন একে সদৃশ বলা হয়। এ সংসারে প্রজাদের মধ্যে সকলেই সবর্ণ ও সর্বসন্ধি অর্থাৎ একটা না একটা স কযুক্ত।

.

অষ্টবিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ বললেন–হে সূত, আপনি এই কল্পের সাধক মুনিদের সাথে ভগবান রুদ্রের আবির্ভাব-এর কথা বললেন। সূত বললেন–আমি এবার আদি স্বর্গের উৎপত্তির বিবরণ সংক্ষেপে বলছি। অষ্টম কল্পে ভগবান পার্বতীপতি নিজের পত্নীসমূহের গর্ভে বহুপুত্র উৎপাদন করেন। প্রভু স্বয়ম্ভ কল্পাদিকালে আত্মতুল্য পুত্র কামনা করে ধ্যানস্থ হলে, নীললোহিত নামে এক কুমার আবির্ভূত হন। তাকে হঠাৎ কাঁদতে দেখে ব্রহ্মা বললেন–কুমার তুমি কঁদছ কেন? তখন কুমার বলল–হে পিতা, আপনি আমাকে প্রথম নাম প্রদান করুন। তখন স্বয়ম্ভ কুমারকে বললেন–হে দেব, তোমার প্রথম নাম হল রুদ্র। আবার কুমার কাঁদতে থাকলে, ব্রহ্মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন – কাঁদছ কিজন্য?

কুমার বলল–আমায় দ্বিতীয় নাম দিন। আবার পিতামহ বললেন–তোমার দ্বিতীয় নাম হবে ভব। এভাবে কুমার কাঁদতে কাঁদতে আটবার নিজের জন্য নাম প্রার্থনা করলেন। এবং যথাক্রমে রুদ্র, ভব, শর্য, পশুপতি, ঈশ, ভীম, উগ্র ও মহাদেব–এই আটটি নাম প্রাপ্ত হলেন। নীললোহিত পিতামহের কাছে এইসব নাম পেয়ে বললেন–আপনি আমার সমস্ত নামের

আকার মূর্তি নিরুপণ করে দিন। তখন স্বয়ম্ভু তার সূর্য, মহী, জল, বহ্নি, বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ও চন্দ্র–এই আট নামের আটটি মূর্তি সৃষ্টি করলেন। এই মূর্তি সকল ব্রহ্মধাতু। এইসব মূর্তিতে রুদ্রদেব পূজিত হলে তিনি পূজকদের আর হিংসা করেন না। তারপর ভগবান ব্রহ্মাদেব নীললোহিতকে বললেন–আমি যে তোমার 'ভব' এই দ্বিতীয় নাম প্রদান করেছি, জল–এই ভব দেবের তনু হবে। তোমার ভবমূর্তির অপর নাম হবে–জল। এই কথা বলে তার দেহস্থ রসাত্মক যে জল ছিল তাতে প্রবেশ করলেন। জলও ভবের মূর্তি হল।

জলকে নিখিল ভূতসম্ভব বলে। সমুদ্র জলের উৎপত্তি স্থান জলরাশি সমুদ্রকে কামনা করে। তাই জলের গতিরোধ করা কাম্য নয়। ভগবান বললেন–হে নীললোহিত, আপনাকে শর্ব এই তৃতীয় নাম দিয়েছি। ভগবতী এই নামের তনু। নীললোহিতকে ব্রহ্মা বললেন–আমি ঈশান এই চতুর্থ নাম তোমায় প্রদান করছি। বায়ু এই নামের তনু। তাই শরীরস্থ পঞ্চধা বিভক্ত যে প্রাণবায়ু, তাতে বায়ু প্রবেশ করে তা ঈশান বলে কীর্তিত। যে ব্যক্তি বায়ুর স্তুতি করে, ঈশান তাকে হিংসা করে না। ব্রহ্মা বললেন–হে নীললোহিত, আপনাকে পশুপতি এই পঞ্চম নাম দেওয়া হয়েছে। ঐ নামের তনু অগ্নি। তখন ঐ অগ্নি পশুপতি হলেন। চন্দ্রমা সোম নামে প্রসিদ্ধ। ওষধিরা তার আত্মা। এই কারণে মহেশের বন্দনা করা উচিত। আদিত্য দিবা ভাগে চন্দ্রমা রাত্রিভাগে প্রজাপালন করে থাকেন।

সূর্য ও চন্দ্রমা একসাথে রাত্রিতে থাকেন তখন অমাবস্যা বলে। অমাবস্যা তিথিতে পরমযোগী নীললোহিত বাস করেন। লোকেরা সূর্য প্রকাশ চোখে দেখতে পায়। শুক্লাত্ম রূপে রুদ্র সূর্যমধ্যে থেকে কিরণ দিয়ে জলশোষণ করেন। ভগবান দেবদেব যে তনু দিয়ে প্রজা ধারণ করেন তাই তার সার্বী, পৃথিবী তনু। আর যে তনু প্রাণবৃত্তি ভূতদের শরীরে অবস্থান করে, তাই তার বায়ুবাত্মিক ঈশানী তনু। যে মূর্তি জীবদের জঠরে পীত ও ভুক্ত দ্রব্য পাক করে থাকে, তাই তার পাচিকা শক্তিরূপিণী পাশুপতী মূর্তি। বৈতানদীক্ষিত ব্রহ্মবাদী যে বৃত্তি তাই তার পাচিকা শক্তিরূপিণী পাশুপতী মূর্তি ভগবান দেবদেবের যে সঙ্কল্প নিখিল প্রজায় সমভাবে বর্তমান। ঐ সঙ্কল্প তার প্রাণিস্থিত সোমরূপিণী মানসী তনু। ঐ অমৃতময় তনুই দেব ও পিতৃগণ কর্তৃক যথেচ্ছ নীত হয়, ভগবান মহাদেবই জলমা চন্দ্রমা। তার প্রথমা রৌদ্রী তনুর পত্নী সুবর্বলা। সুবর্বলার পুত্র শনেশ্বর। তার 'ভব' নামের দ্বিতীয় তনু জল, জলের পত্নী ঊষা, ঊষার পুত্র উশনা। মহাদেবের শর্ব নামের মূর্তি ভূমি, এই মহাদেবের পত্নী শিবা। শিবার পুত্র মনোজব। পাশুপতী মূর্তি অগ্নিপতি স্বাহা। স্বাহার পুত্র স্কন্দ।

তার ভীম এই নামের তনু আকাশ। আকাশের পত্নী দিকপুঞ্জ আর তার পুত্র স্বর্গ। তার 'উগ্র' নামের তনু দীক্ষিত অর্থাৎ যজমান। যজমানরূপী মহাদেবের পত্নী দীক্ষা আর তার সন্তান পুত্র। অষ্টম নামের তনু চন্দ্রমা, চন্দ্রমার পত্নী রোহিণী, তার পুত্র বুধ। ভগবান মহাদেবের এই আট প্রকার তনু সম্পর্কে বলা হল। যেসব মানব সূর্য, অপ, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, ব্যোম, দীক্ষিত ও চন্দ্রমা–এইসব হর তনুতে ভক্তি স্থাপন করে, তারা নিশ্চয়ই প্রজাবান হয় ও হর সাযুজ্য লাভ করে। এই আমি আপনাদের কাছে গুহ্য, যশস্য, হরতত্ত্ব বললাম। এর ফলে সমস্ত দ্বিপদ ও চতুষ্পদের মঙ্গল হোক। এই আমি দেব মহাদেবের তনু ও নামের বর্ণনা করলাম।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

সূত বললেন–ভৃগু থেকে খ্যাতির গর্ভে সুখ, দুঃখের প্রভু, প্রাণীমাত্রের শুভাশুভ, ধাতা ও বিধাতা নামে দুই দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীদেবী এদের বড় বোন। ইনি নারায়ণকে বিবাহ করেন। এই রমণীর গর্ভে নারায়ণের বল ও উৎসাহ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। যারা স্বর্গচারী ও যাঁরা পুণ্যকর্মা ও দেবগণের বিমান বহনকারী, তারা সকলেই ঐ দেবীর মানসপুত্র। ধাতা ও বিধাতার স্ত্রী আয়তি ও নিয়তি। তাদের পুত্ররা হলেন পাভূ ও মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডু থেকে মনস্বিনীর গর্ভে মার্কণ্ডেয় জন্মগ্রহণ করেন। তার পুত্র বেদশিরা, বেদশিরা মূর্দান্যার গর্ভে মার্কণ্ডেয় থেকে জন্ম নেন। পীবরীর গর্ভে তার বহু বংশধর জন্মে। তাঁরা সকলেই মার্কণ্ডেয় নামে পরিচিত। পুণ্ডরীকার গর্ভে পাণ্ডুর দ্যুতিমান, দ্যুতিমন্ত ও সৃজবান নামে তিনপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মনুর অধিকার কাল অতীত হলে ভগবান মরীচীর থেকে পূর্ণ মাস নামে একপুত্র ও কয়েকটি কন্যা প্রসব করেন, তাদের বিবরণ শুনুন।

ঐ কন্যাদের নাম কুষ্টি, পুষ্টি, ত্বিষা ও অপচিতি। পূর্ণবাস সরস্বতীর গর্ভে দুই পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। দুই পুত্রদের নাম বিরজ ও পর্যস। বিরজের পুত্র সুধামা। তার পুত্র ধার্মিক প্রতাপী বৈরাজ। পর্যম গৌরীর পুত্র। ইনি সুধার্মিক প্রতাপবান, লোকপাল হয়ে প্রমথদেব অন্যতম স্থান নিয়েছিলেন। পর্যম, পর্বসার গর্ভে দুই পুত্র যজ্ঞবাস ও কশ্যকা, অঙ্গীরার পত্নী স্মৃতি। স্মৃতির গর্ভে দুই পুত্র ও চারকন্যা জন্মে। এরা হলেন–সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি। আর ভরতাগ্নি ও কীর্তিমন্ত, এই দুজন পুত্র। অগ্নি থেকে প্রভু পর্জন্যকে প্রসব করেন। পর্জন্য মরীচীর গর্ভে একপুত্র উৎপাদন করেন। ধেনুকা ও কীর্তিমান থেকে বরিষ্ট ও ধৃতিমন্ত নামে দুই পুত্র জন্ম দেন। এঁদের আবার হাজার হাজার পুত্র পৌত্র অতীত হয়েছেন।

তাদের মধ্যে অনুসূয়া অত্রি থেকে পাঁচটি নিষ্পাপ পুত্র কন্যা প্রসব করেছিলেন। ঐ কন্যার নাম শ্রুতি। তিনি শঙ্খপদের মা ও কর্ম ঋষির পত্নী। অনসূয়া যে পাঁচটি পুত্র প্রসব করেন তাদের নাম– সত্যনেত্র, হব্যা, তপোমূর্তি, শনৈশ্বর ও সোম। পুলস্ত্য থেকে প্রীতির গর্ভে দত্তালি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই পূর্বজন্মে মনুর অধিকারে অগস্ত্য ছিলেন। পুলস্ত্যের মধ্যমপুত্র দেববাহু ও কনিষ্ঠ বিনীত, এদের ভগ্নী নাম সদ্বতী। পর্জন্য জননী শুভ্রা অগ্নির পত্নী, পৌলস্ত্য ঋষির জ্যেষ্ঠপুত্র ধীমান দত্তালি থেকে তার পত্নী সুজঙঘ প্রভৃতি বহু পুত্র প্রসব করেন। পুলহের পত্নী স্বাহা। তাদের অগ্নিতুল্য প্রখ্যাত পুত্রেরা হল– কর্দম, অম্বরীষ, সহিষ্ণু প্রভৃতি। এদের ভগ্নী হল পীবরী। কর্দমের পত্নী অত্রিনন্দিনী শ্রুতি শঙ্খপদ নামে এক পুত্র ও কাম্যা নামে এক কন্যা প্রসব করেন। শঙ্খপদ রাজা প্রিয়ব্রতের হাতে কন্যাকে দান করে দক্ষিণ দিকে বাস করেছিলেন। কাম্যা প্রিয়ব্রত থেকে দশটি পুত্র, দুটি কন্যা প্রসব করেন। এই পুত্রদের থেকেই ক্ষত্রকুল বর্ধিত হয়। ধনকপীবান সহিষ্ণু নামে বিখ্যাত, এর কামদেব নামে পুত্র হয়। ক্রতুর শুভ বংশবিস্তৃতি ঘটে। এদের স্ত্রী, পুত্র ছিল না। এরা উর্বরে। এরা সংখ্যায় ষাট হাজার। প্রলয় কাল পর্যন্ত এরা সূর্যের সাহচর্য করে থাকেন। এদের দু-বোনের নাম পুণ্যা ও আত্মযুমতী। এরা শর্বস-এর পুত্রবধূ। বশিষ্ঠের সাতপুত্র হয়। এদের এক বোনের নাম পুণ্ডরীকা। ইনি দ্যুতিমান-এর মা, পাণ্ডুর স্ত্রী। এর গর্ভের সাত বশিষ্ঠের জন্ম। এরা হল–রজ, পুত্র, অর্ধবাহ, সবন, অধন, সুতপা ও শুক্ল–এরাই সপ্তর্ষি।

.

ত্রিংশ অধ্যায়

মনুর অধিকারে অভিমানী হয়ে অগ্নি ব্রহ্মার মানস পুত্র রূপে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তার থেকেই স্বাহা তিন পুত্রের জন্ম দেন। ঐ পুত্রদের নাম পাবক, পবমান, শুচি। শুচি অগ্নি সৌর বলে বিখ্যাত। পবমানের আত্মজ-কব্যবাহন পাবক থেকে মহরক্ষ এবং শুচি থেকে হব্যবাহন জন্ম নেয়। হব্যবাহন দেবতাদের কব্যবাহন, পিতৃদেবের এবং মহরক্ষ অসুরদের অগ্নি বলে বিখ্যাত। এদের পুত্র পৌত্রাদি সংখ্যায় উনপঞ্চাশ। প্রথমতঃ ব্রহ্মার সন্তান লৌকিকাগ্নি বৈদ্যুত, তাঁর পুত্র ব্রহ্মো দনাগ্নি, তাঁর পুত্র ভরত। পুষ্কারোদধি মন্থন অমৃতোৎপত্তির পর অথবর্ণ অগ্নির উৎপত্তি। এই অথবর্ণ লৌকিকাগ্নির পুত্র দধ্যঙ্গ। অর্থ ভৃগু বলে বিদিত। এর পুত্র অঙ্গীরা, অঙ্গীরা থেকেই অথর্বার পুত্র দধ্যঙ্গ লৌকিকাগ্নি বলে অভিহিত। পবমান নামক অগ্নি কবিদের দ্বারা নির্মর্থ্য। এই অগ্নি গার্হপত্য নামে পরিচিত। এর দুই পুত্র। তার মধ্যে একের নাম শ্যস্য। ইনিই হব্যবাহন নামে পরিচিত। দ্বিতীয়ের নাম শুক্রাগ্নি শংস্যের দুই পুত্র–নাম সত্য ও আবসখ্য। দ্বিজগণ যে

হব্যবাহনকে অগ্নি বলে জানেন, তিনিই বিখ্যাত ষোড়শ নদীকে কামনা করেন। ঐ নদীসকলের নাম–কাবেরী, কৃষ্ণাবনী, নর্মদা, যমুনা, গোদাবরী, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা, কৌশিকী, শতদ্রু, সরফু, সীতা, সরস্বতী, হ্লাদিনী ও পাবনী। এই নদীগুলিতে নিজের শরীর ষোলোভাগে ভাগ করে হব্যবাহন, সকল আধারভূত নদীতে আসক্ত হলেন। অগ্নি নিজেও ধিষ্ণু, সেই সব সাধ্বী কিষ্ঠীর গর্ভে তার থেকে অনেক পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়। পুত্রেরা ধিষ্ণী নামে। নিরূপিত। এই সকল নদীনন্দন অগ্নির মধ্যে যারা পুজ্য, তাদের কথা বলছি।

ঋতু, প্রবাহন, অগ্নী, অপর অপর ধিষ্ণীগণ যজ্ঞদিবসে সবন ক্রমে সামনে সন্নিবেশিত হয়ে থাকেন। সে সব অগ্নির স্থান নির্দেশ হয়নি। অগ্নির সম্রাট কৃশানু উত্তর দিকের, যজ্ঞের দ্বিতীয় বেদি তার স্থান, অগ্নি আটরকম। দ্বিজগণ এদের পূজা করে থাকেন। পর্ষৎ হল অগ্নির মধ্যে দ্বিতীয়। নভ অগ্নির চতুর্দ্ধা ভাবনীয়। সমুদ্রাগ্নি ব্রহ্মস্থানে নিহিত। অজৈকপাদ অগ্নি পূজনীয়। শংস্যসূত ও অগ্নিপাদ ব্রাহ্মণের উপাস্য। ঋতু প্রবাহন ও অগ্নীব্র এদের নিয়ে ধিষ্ণীমান যজ্ঞদিনে যথাক্রমে ক্রীড়া করে থাকেন। হব্যবাহন নামে অগ্নি পৌত্রেয় বলে বিখ্যাত। শান্তি নামে অগ্নি প্রচেতা স্বরূপ। সত্য নামক অগ্নি দ্বিতীয় স্থানের, বিশ্বদেব নামে অগ্নি বক্ষস্থানে স্থাপনীয়। অচক্ষু ও আচ্ছাবাক অগ্নি ভূমিতে স্থাপনীয় বলে বিভাবিত। পাবক নামে অগ্নিই জলরাশির গর্ভ মনে করা হয়। যে অগ্নিকে জলে আবাহন করা হয় তাই অবyথ অগ্নি। এর পুত্রের হৃদয় অগ্নি। এই অগ্নিই প্রাণীদের জঠরে বাস করেন। এই জঠর অগ্নির পুত্র মন্যমান। এই অগ্নি ভূতগণের প্রভু ও পরস্পর উচ্ছিত। মনুমানের পুত্র ঘোর সংবর্তক। এই অগ্নি সমুদ্রে বড়বা মুখে বাস করে সমুদ্রবাসী অগ্নির পুত্র সহরক্ষ, তাঁর পুত্র ক্ষাম। ইনিই মানুষের গৃহদাহ করে থাকেন। তাঁর পুত্র ক্রব্যাদি অগ্নি, এই অগ্নি শবদেহ পুড়িয়ে ফেলেন। পাঁচকাগ্নির সব পুত্রদের কথা বলা হল। এরপর শুচির পুত্রদের কথা বলা হচ্ছে। শুচির পুত্র সৌরি অগ্নি। আয়ু নামে ভগবান অগ্নি পশু শরীরে রয়েছেন। আয়ুর পুত্র মহিমান। পাকযজ্ঞে অগ্নি সবন, সবনের পুত্র অদ্ভুত, তাঁর ছেলে বিবিচি। এই বিবিচি যজ্ঞের প্রায়শ্চিত্ত হবি ভোজন করেন। এঁর পুত্র অর্ক। অর্কের পুত্রেরা হলেন অনীকবান, বাস্থজবান, সুরভি প্রভৃতি। এঁরা শুচি অগ্নির সন্তান এবং সংখ্যায় চোদ্দ। এর আগে মন্বন্তর শেষ হলে প্রথম মনুর সময় মহাত্মা যাম দেবতাদের সঙ্গে ছিলেন। এইসব অতীত অনাগত অগ্নিদের কথা আমি বললাম।

একত্রিংশ অধ্যায়

সূত বললেন–আগের মন্বন্তরে ভগবান প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করলে তা থেকে প্রথমে জল ও পরে দেব, অসুর, মানুষ সৃষ্টি হয়। এরপর তিনি পিতৃগণের জন্ম দিলেন। ব্রহ্মা বললেন–দেব,

মানুষ, অসুর–সবার আমি পিতা। এই ভাবনা থেকে মধু প্রভৃতি দুটি ঋতুর জন্ম হল। বৈদিকী শ্রুতি আছে — ‘ঋতু সকল পিতৃদেব’। অতীত, অনাগত সব মন্বন্তরে এদের জন্ম। এঁদের নাম অগ্নিস্বাক্ত ও বহিষদ। অগ্নিব্যাক্ত নামে প্রসিদ্ধ পিতারাই অনাহিতাগ্নি আর যস্বা। সোমপীথী তাঁরা বহির্ষদ নামে অগ্নিহোত্রী বলে খ্যাত। চৈত্র-বৈশাখ-রস, জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়-অগ্নি, শ্রাবণ-ভাদ্র-জীব, আশ্বিন-কার্তিক-সুধা, অগ্রহায়ণ পৌষ-মনু এবং মাঘ-ফাল্গুন-ঘোর শিশিরস্বরূপ। এই ঋতুগুলি ব্রহ্মার অভিমানী ছেলে, মাসার্ধকালে ঋতু অতিব রূপ পান আর স্থান ছাড়া তারা অভিমানী হয়ে থাকেন। অহোরাত্র মাস, ঋতু, অয়ন ও সংবৎসর এইসব কালের রূপগুলি কালবিস্থাভিমানী, নিমেষ, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত, দিন ও রাত্রি ব্রতে যে সব কালের রূপ রয়েছে, তাদের কালাত্মক বলে–তাঁদের নাম কীর্তন করছি, শুনুন। পর্ব, তিথি, সন্ধ্যা, মাসার্ধ নামে পক্ষ, নিমেষ, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত, দিন, রাত্রি দুই অর্ধেক মাসে একমাস, দু’মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন, দক্ষিণ ও উত্তর নামে অয়নদ্বয় নিয়ে এক বছর। এক বৎসরকে সুমেক বলা হয়। ঋতুগুলি সুমেকপুত্র, এরা ছয় ও আটভাগে বিভক্ত। ঋতুদের পাঁচ ছেলে, তাদের আর্তব বলা হয়। আর্তব থেকে জাত স্থানু জঙ্গম সকলেই আর্তবেয়। আর্তব পিতাদের মত, ঋতুগুলো পিতামহের মত, আগে সবাই সুমেক থেকে উৎপন্ন হয়ে মারা যায়। সুমেক প্রজাদের পিতামহ। প্রজাপতি সম্বৎসর স্বরূপ আর সম্বৎসর অগ্নি ও ঋতুস্বরূপ। ঋতু থেকে ঋতুদের জন্ম। এজন্য এদের নাম ঋতু। মাসগুলো ষড়ঋতু বলে নির্দিষ্ট। পাঁচটি আর্তব ঐ ষড়ঋতুর সূতস্থানীয়। দ্বিপদ, চতুষ্পদ, পাখি, সাপ ও স্থাবরদের পুষ্পকেই কালার্তিব বলা হয়। ঋতু আর আর্তবদের পিতা বলা হয়।

সব মন্বন্তরেই অগ্নিত্তা ও বহিষদ নামে দুজন পিতৃপুরুষ রয়েছেন। এই দুই পিতা থেকে দুই কন্যা জন্মান। এঁরা হলেন মেনা ও ধারিণী। এঁরাই বিশ্ব পোষণ করেন। পিতারা ধর্মের জন্য এই দুই কন্যা প্রদান করেন। মেনা নামক কন্যাকে হিমবানের হাতে সম্প্রদান করে। মো ও হিমবানের পুত্র মৈনাক, সরিদ্বরা গঙ্গা লবণোদধির স্ত্রী। ক্রৌঞ্চি মৈনাকের ছোটভাই। এই ক্রৌঞ্চ থেকেই ক্রৌঞ্চ দ্বীপ। মেরুপত্নী ধারিণী মন্দর নামে পুত্র ও তিনটি কন্যার জন্ম দেন। তিন কন্যার নাম বেলা, নিয়তি আয়তি। ধাতা ও বিধাতা বিবাহ করেন, আয়তি ও নিয়তিকে। এদেরও সন্তান সন্ততি আছে। বেলা ও সাগরের এক অনিন্দিতা কন্যা হয়। সাবণী নিজের সামুদ্রী নামে কন্যাকে বর্হির হাতে সম্প্রদান করেন। তা থেকে দশজন পুত্র জন্মায়। এদের বলা হয় প্রাচেতন। চাক্ষুষ মনুর সময়ে ত্র্যম্বকের অভিশাপে দক্ষ তাদের পুত্র হয়ে জন্ম নিলেন।

একথা শুনে সূতকে জিজ্ঞাসা করলেনহে সূত, দক্ষ কিভাবে শাপভ্রষ্ট হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন? সূত বলতে লাগলেন–দক্ষ প্রজাপতির আট মেয়ে। কন্যাদের তিনি নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে সম্মান দিয়ে রেখে দিলেন। এঁদের মধ্যে অতীজ গজ্জননী ত্র্যম্বক–পত্নী। কিন্তু রুদ্রের ওপর রাগ করে সতীকে বাড়িতে আনলেন না। কারণ সতীর পতি কখনো দক্ষকে প্রণাম করতেন না। জামাই হয়েও শ্বশুরের ওপর দাপট দেখাতেন। সতীকে নিমন্ত্রণ করা না হলেও অন্য বোনেরা এসেছে শুনে তিনি পিত্রালয়ে এলেন। কিন্তু দক্ষ তাকে যথাযোগ্য সম্মান জানালেন না। সতী দুঃখ পেয়ে বললেন– আমার বোনেরা যা সম্মান পাচ্ছে, আমি বড় মেয়ে হয়েও সেই সম্মান পেলাম না কেন? দক্ষ বললেন–হে সতী, তুমি আমার বড় মেয়ে বটে, কিন্তু তুমি ছাড়া আমার অন্য মেয়ের জামাইরা আমার মনের মত। তারা তপোনিষ্ট, মহাযোগী, ধার্মিক, গুণী, বশিষ্ঠ, অত্রি, পুলহ, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, ক্রতু, ভৃগু ও মরীচি–এরা আমার শ্রেষ্ঠ জামাই। শিব আমার প্রতিকূল হলেও শিবের প্রতি তোমার অনুরাগ বেশি। তাই আমি তোমার পক্ষপাতী নই। দক্ষ যেন শাপগ্রস্থ হওয়ার জন্যই একথা বললেন।

সতী তখন বললেন–আপনি বিনা দোষে আমায় অপমানিত করলেন, এখন আমি এই কলুষিত দেহ ত্যাগ করব। সতী মনে মনে মহেশ্বরকে প্রণাম করে বললেন–আমি জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে আবার জন্ম নেব আর ভগবান ত্র্যম্বকের ধর্মপত্নী হব। তিনি মনে মনে অগ্নির ধারণা করা মাত্র, দেহ ভস্মীভূত হয়ে গেল তার। এদিকে শূলধারী শঙ্কর দেবীর নিধন সংবাদে ভীষণ রেগে বললেন–তুমি যেমন আমার সতীকে অপমানিত করে অন্য জামাইদের অপমানিত করেছে। এর ফলস্বরূপ বৈবস্বত যুগে তোমার অনুগত মহর্ষির মৃত্যুকবলিত হয়ে আবার দ্বিতীয় যজ্ঞে অযোনিজ হয়ে জন্ম নেবে। ভগবান ব্রহ্মা দক্ষযজ্ঞে হোম করেছিলেন তখন ঋষিদের একথা বলেন মহাদেব। তারপর দক্ষকে বলেন- প্রচেকতার পুত্র চাক্ষুষ নামে এক রাজা হবে। সে তোমাকে বৃক্ষনন্দিনীর মারিষ্যার গর্ভে জন্ম দেবে। দক্ষ রেগে গিয়ে বললেন–আমি সে জন্মেও তোমার সব কাজে বাধা দেব। আর যে সমস্ত ঋষিদের তুমি তিরস্কার করছ, তার ফল স্বরূপ ব্রাহ্মণরা দেবতাদের সঙ্গে তোমার পূজা করবে না। তারা আহুতি দিয়ে যজ্ঞকুণ্ডে জল ঢেলে দেবে। সুতরাং তোমাকে স্বর্গ ছেড়ে মর্তেই বাস করতে হবে।

রুদ্র বললেন–মূঢ়, ভূর্লোক সকলের শ্রেষ্ঠ। দেবতাদের চারবর্ণ আছে। তারা সকলে এক সাথে খেয়ে থাকে। আমি তাদের সঙ্গে ভোজন করি না। তারাই আমাকে আলাদা ভোজন করিয়ে থাকেন। পূজা বা হবিষ্যি আমি আলাদা ভাবে গ্রহণ করি। যাই হোক, দক্ষ রুদ্রের কাছে তিরস্কৃত হয়ে মানুষ জন্ম নিলেন এবং দেবতাদের সঙ্গে মহাযজ্ঞ শুরু করলেন। এদিকে সতী পরের জন্মে মেনকার গর্ভে উমাদেবী হিসেবে জন্ম নিলেন। একই দেবী আগে সতী পরে উমা।

যেমন দিতি মারীচ কাশ্যপকে, লক্ষ্মীনারায়ণকে, কীর্তি বিষ্ণুকে, রুচি সূর্যকে আর অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে যেমন কোনোভাবে ত্যাগ করেন না। এরা তেমনই কল্পে কল্পে আবার নিজ নিজ স্বামীর সাথে মিলিত হন। তেমনি সতী ভবের সহধর্মিণী। এরপর দক্ষ রুদ্রের শাপে দশ প্রচেতার পুত্র রূপে মার্ষার গর্ভে জন্ম নিলেন। ভৃগু প্রভৃতি ঋষিরা বৈবস্বত মনুর কালের আগে ত্রেতাযুগে বরুণের মতো রূপধারী দক্ষযজ্ঞে জন্ম নিলেন।

এইভাবে দক্ষ ও রুদ্রের বিবাদ জন্মান্তরেও চলতে থাকল। রাগ বা হিংসা করা উচিত নয়। কারণ তা জন্মান্তরেও লোপ পায় না। ঋষিরা বললেন–হে সূত! বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে কিভাবে দৃক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞ বিনষ্ট হল? বিধ্বস্ত যজ্ঞ কিভাবেই বা শেষ হল? কিভাবেইবা দক্ষ ক্ষুব্ধ রুদ্রকে খুশি করলেন? এসব আমরা জানতে চাই। সূত বললেন–আগে দেবাদিদেব সর্বরত্নবিভূষিত জ্যোতিষ্ক নামে মেরুশৃঙ্গে পালঙ্কে বসেছিলেন, সেখানে শৈলরাজের কন্যা সবসময় তার পাশে থাকতেন। সেই সময় আদিত্যরা, বসুরা, দুইজন অশ্বিনীকুমার, সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষি, গন্ধর্ব, নারদ, পর্বত, অপ্সরারা সকলে সেখানে এলেন। সেখানে সুগন্ধ যুক্ত বাতাস বইছে চিরদিন। সব ঋতুতেই ফুল ফলে ভরা। তপস্বীরা পশুপতির উপাসনা করতে থাকলেন আর রাক্ষস, ভূত, মহাকাল পিশাচেরা মহাদেবের অনুচরের কাজ করতে লাগল। ভগবান নন্দীশ্বর মহাদেবের কাছে থেকে তাঁর আদেশ পালন করতে থাকলেন।

স্বয়ং সতীর্থময়ী গঙ্গা দেবের আরাধনা করতে লাগলেন। প্রাচীন কালে দক্ষযজ্ঞ হিমালয়ে গঙ্গাতীরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই যজ্ঞে শোনা যায় অনলকান্তি, শতক্রতু দেবতারা জ্বলন্ত আগুনের মতো নিজস্ব বিমানে গঙ্গাদ্বারে এসেছিলেন। তখন পৃথিবীবাসী, অন্তরীক্ষবাসী ও স্বলোকবাসী সকলেই ধার্মিক দক্ষের প্রশংসা করে। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য ও মরুতরা সকলে দেব বিষ্ণুর সাথে যজ্ঞভাগ নেবার জন্য সেখানে এলেন। পিতা ব্রহ্মার সাথেও অনেকে এলেন। এছাড়া ভূত, বায়ুজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি প্রাণীরাও এসেছিল। নিজ নিজ পত্নীদের সঙ্গে দেবরা সেখানে বিরাজ করতে লাগলেন। সে সময় দধীচি সব দেখে প্রজাপতিকে বললেন–আপনি সর্বপূজনীয় দেব পশুপতিকে নিমন্ত্রণ করেননি কেন? দক্ষ বললেন–এগারো প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত শূলপাণি কপর্দী রুদ্র আমার আছে। অন্য মহেশ্বর আমি জানি না। দধীচি বললেন–শঙ্করের থেকে উৎকৃষ্ট দেবতা তো আমি আর দেখি না। তাকে ছাড়া কি যজ্ঞ হয়? দক্ষ বললেন–আমি এই যজ্ঞের সব উপকরণ সোনার পাত্র শ্রীবিষ্ণুকেই অর্পণ করব। দেবতারা সব দক্ষের যজ্ঞভূমিতে আসছে দেখে শৈলরাজ সুত হরকে জিজ্ঞাসা করলেনভগবান, এই দেবতার কোথায় যাচ্ছেন? মহেশ বললেন–দক্ষ নামে এক প্রজাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন, দেবতারা সেখানেই চলেছেন। দেবী বললেন–হে মহাজন, আপনার কেন এই যজ্ঞে যাওয়া হল

না? মহেশ্বর বললেন–দেবতারাই কোনও যজ্ঞে আমার ভাগ কল্পনা করেন না। যজ্ঞভাগ্ আমাকে দেন না।

দেবী বললেন–আপনি তো সবথেকে প্রভাশন অজয়, তেজ যশ সম্মানিত। এতগুণ থাকতেও আপনাকে যজ্ঞভাগ দেয় না শুনে আমি দুঃখিত, বিচলিত। এমন কোনও তপস্যা, দান বা নিয়ম আছে, যা করলে আপনি যজ্ঞের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অংশ লাভ করতে পারেন? দেবীকে দুঃখিত দেখে ভগবান দেবেশ হেসে বললেন–তুমি কি জানো না তোমার এমন কথা বলা সাজে না। আমার মোহে ত্রিলোকেই মুগ্ধ হয়েছে। দেখছো না যজ্ঞে আমারই স্তবগান হচ্ছে। ব্রাহ্মণরা আমাকে ব্রহ্মযজ্ঞে পুজো করে থাকেন। ভগবান বলেন–হে দেবী! আমি আত্মস্তুতি করছি না। তুমি আমার কাছে এসে দেখ, আমি যজ্ঞ লাভের জন্য এক ভূত সৃষ্টি করছি। তারপর তিনি নিজের মুখ থেকে ক্রোধাগ্নিযুক্ত এক ভূত সৃষ্টি করলেন। ঐ ভূত হল–হাজার মাথা, হাজার পা, হাজার শর হাতে, শঙ্খচক্র গদাপাণি তলোয়ার হাতে সাক্ষাৎ ভয়স্বরূপ।

সেই মহারৌদ্র, ঘোর রূপে দীপ্যমান, বাঘের চামড়া তার পরিধেয়, অর্ধচন্দ্র তার ভূষণ, সর্বাঙ্গে রক্তমাখা, লম্বো, লম্বকর্ণ, তেজে দীপ্ত কেশ, মহাবল, মহাতেজ, তীক্ষ্ণ দাঁতযুক্ত, অগ্নিজ্বালা বিশিষ্ট মুখ, মহাসর্প বেষ্টিত, রাগে উদ্ভ্রান্ত চোখ। সে নানা অঙ্গভঙ্গী করে নাচতে লাগলো। কখনো ধ্যান করতে লাগল, কখনো বা কাঁদতে লাগলো, তারপর জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্যা, ক্ষমা ধৃতি ইত্যাদি যুক্ত হয়ে দেব দেব মহেশ্বরকে বলল–হে দেব! আদেশ করুন আপনারা, কি কাজ আমি করব? তখন মহাদেব বললেন–তুমি প্রজাপতির যজ্ঞ ধ্বংস কর। তার পর সেই মহাবলী মহেশ্বরের পায়ে প্রণাম জানিয়ে খাঁচা থেকে ছাড়া পাওয়া সিংহের মতো ভীষণ রাগে দক্ষের যজ্ঞভূমির দিকে চলল। ঐ সময়েই দেবীর ক্রোধসম্ভূতা মহাভীমা মহেশ্বরী ভদ্রকালী বীরভদ্রের অনুসরণ করল। অত্যন্ত রাগী প্রেতাবাসী বীরভদ্র । তখন দেবীর রাগ কমানোর জন্য নিজের রোমকূপ থেকে রৌদ্র নামে অসংখ্য গণেশ্বরকে সৃষ্টি করলেন। ঐ সহচররা রুদ্রের মতোই মহাবলশালী ও রুদ্র রূপধারী, শত শত সহস্র সহস্র সংখ্যায় তারা যজ্ঞভূমি আক্রমণ করল। সমস্ত দেবেরা ভয় পেয়ে গেল। আকাশ বাতাস শব্দে ভরে গেল, বসুন্ধরা কাঁপতে লাগল। সাগর ফুঁসে উঠল, সূর্য যেন তেজহীন হয়ে পড়ল। তারারা সব নিভে গেল। সমস্ত জায়গা অন্ধকার হয়ে গেল। যজ্ঞে আমন্ত্রণ পাওয়া সমস্ত দেব, অসুর মহাত্মা ঋষিদের নির্দয়ভাবে মারধোর করতে লাগলো। যজ্ঞ পাত্রগুলি ভেঙে ফেলল এবং অন্ন, পানীয় ক্ষীর, পায়েস, ঘি, মধু, শর্করা, মাংস যথেচ্ছ ভাবে খেয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলল।

সমস্ত যজ্ঞভূমি লন্ডভন্ড করে দিল। তখন যজ্ঞপতি দক্ষ হরিণের ছদ্মবেশে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বীরভদ্র তা জানতে পেরে অন্তরীক্ষে গিয়ে দক্ষের মাথা কেটে ফেলেন। অচেতন দক্ষকে বীরভদ্র পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে গেলেন। তখন তেত্রিশ কোটি দেবতা বীরভদ্রের কাছে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন–প্রভু আপনি কে? আপনি তুষ্ট হন, আমাদের দয়া করুন। তখন বীরভদ্র বলেন–আমি এখানে খেতে আসিনি আমি দেবতা বা আদিত্য নই। আমি এসেছি শুধুমাত্র দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করার জন্য। আমি রুদ্রকোপজাত বীরভদ্র, আর সতীর ক্রোধ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন এই ভদ্রকালী দেবী। মহাদেব আমাদের যজ্ঞভূমিতে পাঠিয়েছেন। হে রাজেন্দ্র, আপনি উমাপতিকে স্মরণ করুন। ধার্মিক শ্রেষ্ঠ দক্ষ বীরভদ্রকে সম্মান জানিয়ে শূলপাণিকে সন্তুষ্ট করলেন। শূলপাণি বিনষ্ট যজ্ঞভূমি দেখলেন। সেখানে যে দ্বি-জাতিরা এসেছেন, তারা আক্রান্ত। পরিচারকরা কাঁদছেন ভীষণ আগুন নিভে গেছে। অট্টহাস্য করে শঙ্কর দক্ষকে বললেন–তোমার অজ্ঞানতার জন্যই এই যজ্ঞ নষ্ট হল।

কিন্তু তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট, তোমার জন্য কি করব বল। প্রজাপতি দক্ষ হরের কথা শুনে কেঁদে ফেললেন। কেঁদে ফেলে বললেন– সম্ভারগুলো আবার ফিরে পেতে চাই। যেগুলি অযথা সব নষ্ট হয়ে গেছে। ভগবান হর বললেন, ‘তাই হবে। তখন দক্ষ বর পেয়ে আট হাজার-এর বেশি বার তার নাম স্তব করতে লাগলেন। দক্ষ বললেন–হে দেব দেবেশ! আপনি দেবারিবলসূদন দেবেন্দ্র, অমরশ্রেষ্ঠ, সহস্রাক্ষ, বিরূপাক্ষ, সর্বতঃচক্ষু, শ্রুতিমান, আপনাকে নমস্কার। হে শঙ্কু, কর্ণ, অর্ণবালয়, গজেন্দ্রকর্ণ, গোকর্ণ আপনাকে নমস্কার। আপনি শতোদর, শতজিহ্বা, শতানন, আপনি দেবদানবের পালক, ব্রহ্ম, শতক্রতু, সমুদ্রের জলরাশি। আপনিই ক্রিয়া, কাজ, কারণ, কর্তা, সদসৎ প্রভব ও অব্যয়, আপনাকে নমস্কার। আপনি ভব, নাথ, রুদ্র পশুপতি। আপনাকে প্রণাম। আপনি ত্রিজট, ত্রিশীর্ষ, ত্রিগুণধারী, ত্রিনেত্র, চন্ড, মুনচ, নীল গ্রীব শিব।

আপনি সূর্য, সূর্যপতি, প্রমথনাথ, বৃষস্কন্ধ, হিরণ্যপতি, স্তুত, স্তত্য আপনাকে প্রণাম। আপনি সর্ব ভক্ষাভক্ষ, ভূতান্তরাত্মা, চলমান, নর্তনশীল, গীত বাদ্যরত, কল্প, ক্ষয়, উপক্ষয় ভীমাসন প্রিয়। আপনি উগ্র, দশবাহ, চিতাভস্মপ্রিয়, ভীষ্ম, বিভীষণ, মাংসলুব্ধ, বরকৃষ্ণ, বরদ, বর-গন্ধ-মাল্যবস্ত্র, বাত, ছায়া, শোভন, অক্ষমালী, বিভিন্ন, বিকট, অঘোর রূপরূপ, শিব, শান্ত, যদুনেত্র, একশীর্ষ, চণ্ড, ঘন্ট, প্রাণদণ্ড, হুঙ্কার আপনাকে নমস্কার। গিরিবৃক্ষফল, তারক যজ্ঞাধিপতি, দ্রুত, উপদ্রুত, তথ্য, তপন, তট, অন্নদ অন্নপতি, সহস্রশীর্ষ, সহস্রচরণ, সহস্রচোখ, বালরূপধর, শুদ্ধ বুদ্ধ অক্ষত, মুক্তকেশ, ত্রিকর্মনিরত, শ্বেতপিঙ্গল নেত্র, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সাংখ্য, যোগাধিপতি আপনাকে নমস্কার। হে সাংখ্য, বিরথ্য, আপনি চতুষ্পথ, ঈশান বজ্রসংহ,

হরিকেশ, কাম, কামদ, ধৃষ্ট, সর্ব, সর্বদ, মহাবল, মহাবাহু, মহাদ্যুতি, মহাকাল, বল্কল জিনধারী, তপোনিত্য, সভাবর্ত, চন্দাবর্ত, যুগাবর্ত, মেঘাবর্ত, অন্ন অন্নকর্তা, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ দেব দেবেশ। আপনি জল, বায়ু, জ্যোতি পদার্থের নিধি। ব্রহ্মবাদীরা আপনাকে ঋক, সাম, ওঙ্কার বলে। আপনি হোমের আহুতি, আপনি বাঙ্ময়, সমার্থকময়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র, ঋতু, মাস, মাসার্ধ, কলা, নিমেষ, নক্ষত্র, যুগ, গ্রহ, মৃগদের মধ্যে সিংহ, পক্ষীদের মধ্যে গরুড়, সাপেদের মধ্যে অনন্ত, যন্ত্রের মধ্যে ধনু, প্রহরণের মধ্যে বজ্র, হৃতদের মধ্যে সত্য।

ইচ্ছা, রাগ, মোহ, দম, ধৃতি, লোভ, ক্রোধ, কাম, জয়, অজয়, প্রহর্তা, নেতা, ইন্দ্র, সমুদ্র, সরিৎ, লতা বল্লী, তৃণ, ওষধি, পশু, আদি, অনন্ত, মধ্য, গায়ত্রী, ওঙ্কার, হরিত, লোহিত, কৃষ্ণ, নীল, পীত অরুণ, কপিল, কপোত সুবর্ণরেতা, সুবর্ণনামা, সুবর্ণ প্রিয়, ইন্দ্র যম, বরুণ অনল উৎফুল্ল চিত্রভানু, স্বর্ভানু, হোত্র, হোতা, হোম শতরুদ্রিয় পবিত্রের পবিত্র, মঙ্গলের মঙ্গল, গিরিস্তোক, বৃক্ষ, জীব, সত্ত্ব, রজ, তম, প্রজন, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, আপনি উন্মেষ, মেষ, লোহিতাঙ্গ, নদী, মহোদর, ঊর্ধ্বকেশ, ত্রিলোচন, গীতবাদনপ্রিয়, মৎস, জলা, জল, জল্য, জপ, কাল, ফণী, বিষাল, সুকাল, দুষ্কাল, মৃত্যু, ক্ষয়, অন্ত, হর, সংবর্তক, ঘট, ঘটিক, চূড়নিল, বল, বলী ব্রহ্মকাল, দণ্ডী, মুণ্ডী, চতুর্বেদ, চতুষ্পথ, চতুরাশ্রমবেত্তা, চতুবর্ণকার, ধূর্ত, অগণ্য গিরিশ, গিরিশপ্রিয়, শিল্পীশ, শিল্পীশ্রেষ্ঠ, সর্ব, চন্দ্র, পুষা, দণ্ডবিনাশন, গূঢ় প্রতিনিষেবিত তারণ; তারক, সর্বভূত, সুতারণ, ধাতা বিধাতা, ধারণ, ধর, তপ, সত্য, অর্জব, ভূতাত্মা, ভূতভব্য, তদুপভি, মহেশ্বর, ঈশাণ, বীক্ষণ, শান্ত, দুর্দান্ত, দন্তনাশন, সুরাবর্ত, কামাবর্ত, কাম-বিম্ব, নিহত, ভীমমুখ, দুর্মুখ, মুখ, চতুর্মুখ হিরণ্যগর্ভ, শকুনি, মহোদধি, বিরাট, অর্ধমহা, দণ্ডধার, রণপ্রিয়, গৌতম, গো বৃষেশ্বর বাহন, ধর্মকৃৎ, ধর্মস্রষ্টা, গোবিন্দ, মানদ, মান, তিষ্ঠ, স্থির, স্থান, নিষ্কম্প, দুঃসহ, দুরতিক্রম, দুর্জয়, শশ, শশাঙ্ক, আধি, ব্যাধি, যজ্ঞ, মৃগ, ব্যাধ, শিখণ্ডী, পুণ্ডরীকাক্ষ, দণ্ডধর, অমৃতপ, সুরাপ, ক্ষীর, মধুপ, মহাবল, বৃষভ লোচন, চন্দ্র, আদিত্য আপনার দুই চোখ, আর পিতামহ আপনার হৃদয়। অগ্নি, জল, ধর্মকর্ম, দেবগণ ব্রহ্ম, গোবিন্দ আর পুরাণ ঋষিরা কেউ আপনার মাহাত্ম্য কীর্তন করতে পারে না। আপনার যে অতিসূক্ষ্ম মূর্তিগুলো, তা আমাদের দৃষ্টি পথে আসে না।

এইসব মূর্তি দিয়ে আপনি পিতার মতো আমাকে রক্ষা করেছেন। আপনি আমায় দয়া করুন। আমি আপনার রক্ষণীয়। আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ভক্তানুকম্পী। আমি আপনার ভক্ত। আপনি বহু সহস্র পুরুষ আহরণ করে একা সমুদ্রগর্ভে থাকেন, আপনিই আমার পালনকর্তা। আপনি যোগাত্মা, আপনাকে নমস্কার। যুগান্তকাল এলে আপনি সমস্ত ভূত খেয়ে নিয়ে জলের মধ্যে শুয়ে থাকেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি রাত্রিতে রাহুমুখে ঢুকে তাকে

গ্রাস করেন এবং স্বর্ভাণু ও সোমাগ্নি হয়ে সূর্যকে কবলিত করেন। আপনি দেহীদের দেহস্থ অষ্ঠমাত্র পুরুষ, আপনি সবসময় আমায় রক্ষা করুন। যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ গর্ভ থেকে পড়ে যায় ও অধোগত হয় স্বাহা ও ঋধা তাদের রুচিকর হয়ে থাকে। তারা দেহস্থ অবস্থাতে কাঁদে না এবং প্রাণীদের কাদায় না বা আনন্দ দেয় না। তাদের নমস্কার। ঐ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সমুদ্রে নদীতে, দুর্গে, পর্বতে, গুহাতে, গাছের মূলে, গোঠে, গভীর বনে, চতুষ্পথে, রথে, চত্বরে, সভাভূমিতে, চাঁদ ও সূর্যের মাঝে রসাতলে ও অন্যান্য জায়গাতেও রয়েছেন, তারা স্থুল, সূক্ষ্ম, কৃশ, হ্রস্ব। আপনি তাদের স্বদেশ। তাই আমি তাদের সবসময় প্রণাম করি। আপনি নিখিল বস্তু, সর্বগ, সাধ, ভূতপতি, ভগবান, সর্বভূতাত্মারাত্মা, এই জন্যই আপনাকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করা হয়নি, ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞে আপনি বিধিমতো যজনীয় হন। আপনি সবার কর্তা, এজন্যই আপনি নিমন্ত্রিত হন নি।

হে দেব! হয়তো আপনিই আমাকে সূক্ষ্ম মায়া দিয়ে অভিভূত করেছেন, এজন্য আপনি নিমন্ত্রিত হননি। হে দেবেশ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, আপনি আমার একমাত্র শরণ্য। আপনি আমার গতি ও প্রতিষ্ঠা। আপনি ছাড়া আমার গতি নেই। প্রজাপতি দক্ষ এভাবে ভগবান মহেশ্বরের স্তব করলে মহেশ্বর খুশি হয়ে আবার দক্ষকে বললেন–হে সুব্রত! আমি তোমার বিরাট স্তবে তুষ্ট হয়েছি, এর বেশি তোমায় বলতে হবে না, তুমি আমার কাছে এসো। এই বলে ভগবান তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আশ্বস্ত করলেন। বললেন–হে দক্ষ! তুমি এই যজ্ঞে বাধায় কষ্ট পেয়ে রেগে যেও না। আমিই এ যজ্ঞ ধ্বংস করেছি। তুমি আমার কাছে আবার কোনও বর চাও। হে প্রজাপতি। তুমি আনন্দের সাথে শোন — তুমি হাজার অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফলভোগী হবে। তুমি ষড়ঙ্গ বেদ উদ্ধার করে সাংখ্যাযোগ ও বিপুল তপ স্মরণ করে গূঢ়, বিপরীত ভাবাপন্ন, সমবর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচার কর। এই পশুপাপ বিমোচন, পশুপত ব্রত আমি সর্বাশ্রেয়ীর কাছে প্রচার করব। এই ব্রত আচরণ করলে যে ফল হবে, তার সমস্ত ফলই তুমি পাবে। তুমি মানসকাল ত্যাগ কর। এই বলে মহেশ্বর সপত্নীক অনুচরদের সাথে অদৃশ্য হলেন। তিনি ব্রহ্ম পরিকল্পিত যজ্ঞভাগ লাভ করে সর্বভূতের শান্তির জন্য জ্বরকে অনেক ভাগে ভাগ করলেন। হে ব্রাহ্মণরা, আপনারা শুনুন, শ্বাপদের শীর্ষাভিতাপ, পর্বতগুলোর শিলাজনিত পীড়া, জলের নালিকা, পৃথিবীর উর্বরতা, হাতিদের প্রতি দৃষ্টি অবরোধন, ঘোড়াদের রন্ধ্রোদ্ভব, ময়ূরদের শিখোদ্ভোব আর কোকিলদের নেত্র রোগকে জ্বর বলে। এভাবে অজদের শিঙভেদ, শুকদের হিথিকা ও বাঘদের শ্রমকে জ্বর বলে। মানুষদের জ্বরকে জ্বরই বলে। এটি মানুষের জন্ম মৃত্যু বা মাঝেও হয়ে থাকে।

এই যে দারুণ জ্বর একে শাম্ভব তেজ বলে জানবেন, এই জ্বররূপী তেজ সমস্ত প্রাণীর নমস্য। যে মানুষ শান্তভাবে মন দিয়ে জ্বরের কারণ বর্ণনা পাঠ করেন, তিনি সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দের সাথে যা চায় তাই পায়। যে মানুষ স্তব পাঠ করেছিলেন, তা পড়েন বা শোনেন তার অমঙ্গল হয় না। সে দীর্ঘায়ু লাভ করে। যেমন সব দেবতার মধ্যে ভগবান হরই শ্রেষ্ঠ, তেমনি যাবতীয় স্তবের মধ্যে ব্রহ্মনির্মিত দক্ষ কথিত এই স্তব অতি মহনীয়। যারা যশ, রাজ্য সুখ, ঐশ্বর্য, বিত্ত, আয়ু এবং ধন পেতে চায়, তারা ভক্তি ভরে এই স্তব পাঠ করবে। আর যারা অসুস্থ, দুঃখিত, ভীত্ ও রাজকাজে যুক্ত তারাও এই স্তোত্র পাঠ করলে ভয় থেকে মুক্ত হয়। যেখানে ভগবান ভব স্তুত হন, সেখানে যক্ষ, পিশাচ, নাগ ও বিনায়কেরা কোনও বিঘ্ন ঘটাতে পারে না। যে ব্রহ্মচারিণী নারী ভক্তি করে এই স্তোত্র পাঠ করে বা শোনে, সেই নারী, পিতৃকুল, ভর্তৃকুল–দুকুল থেকে দেবের মত পূজা পায়। যে এই স্তব শোনে বা বারবার পড়ে তার সব কাজ নির্বিঘ্নে শেষ হয়। যা মনে মনে ভাবা যায় না, সবকিছু এই স্তব পাঠে সিদ্ধ হয়।

কার্তিকেয়সহ বিভব অনুসারে যে দেব ত্রিলোচন দেবী ও নন্দীশ্বরের বলি পূজাদি করে সে তার যা ইপ্সিত সেই বস্তু পায়, তার অভিলাষ পূর্ণ হয়। আর মারা গেলে স্ত্রী সহস্র পরিবৃত হয়ে স্বর্গে যায়। বিষয়ী বা পাতক যুক্ত সব মানুষ দক্ষের এই স্তব পাঠ করলে পাপ থেকে মুক্তি পায়। এই স্তোত্র কেউ সহসা প্রকাশ করবে না। শুনবেও না। পাপী, বৈশ্য, স্ত্রী ও শূদ্র যদি পরমগোপনে এই স্তব শোনে তাহলে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়।

.

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

সূত বললেন–পিতৃবংশ বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান ভব ও দক্ষ সম্বন্ধে আপনারা জেনেছেন। এখন পিতৃবংশের মতো দেববংশের বর্ণনা করছি। স্বায়ম্ভর মনুর অধিকার কালে ত্রেতাযুগের প্রথমে দেবগণ ‘যাম’ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আগে এরা যজ্ঞপুত্র নামেও বিখ্যাত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অজিতেরা ব্রহ্মার ছেলে এবং জিত, জিৎ এবং অজিত এঁরা মনুর শুক্র নামক মানস পুত্র। দেবদের মধ্যে তিনটি গণ আছে। বলা যায়। তার মধ্যে এই সব ছেলে তৃপ্তিমান গণ বলে খ্যাত। মনুর তেত্রিশ জন ছেলে ছন্দোগ নামে প্রসিদ্ধ। যদু, যযাতি, দীধর, সবস, মতি, বিভাস, ক্রতু, প্রজাপতি, বিশত, দ্যুতি বারস ও মঙ্গল– এই বারোজনকে যামদেব বলা হয় এবং অভিমন্যু, উগ্রদৃষ্টি, সময়, বিশ্বরূপ, সুপ, মধুপ, তুরীয়, সাধন অমৃতানন ইত্যাদি স্বয়ম্ভব অধিকারে সোমপায়ী ছিলেন।

এঁরা মহাবল ত্বিবিমন্ত শন বলে বিখ্যাত, বিশ্বভূত বিভু সবসময় এদের ইন্দ্র ছিলেন। তখন অসুর সুপর্ণ, যজ্ঞ, গন্ধর্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষস এই আটটি গণ তাদের জ্ঞাতি বন্ধু ছিলেন। তখন পিতৃগণের সাথে জামাতাগণও দেবযোনি ছিলেন। এঁদের রূপ-গুণসম্পন্ন আয়ুষ্মন সহস্র সন্তান-সন্ততি অতীত হয়েছেন। অতীত মনুর সৃষ্টি বিস্তার সাম্প্রতিক মনুর ন্যায়ে জানা যাবে, মনুর অধিকার কাল শেষ হলে বর্তমান বৈবস্বত মনুর দৃষ্টান্ত তখনকার স্বভাবগুলো দেখা যায়। আগের মন্বন্তরে যারা প্রজা, দেবতা, ঋষি, পিতৃগণের সাথে সপ্তর্ষি ছিলেন তাদের নাম বলছি শুনুন, অঙ্গিরা মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ। অগ্নী, অতিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, দ্যুতিমান, হব্য, সবন ও পুত্র জ্যোতিষ্মন–এই দশজন মহৌজা মনুর ছেলে। বায়ু বলেছেন এঁরাই মন্বন্তরের প্রথম রাজা ছিলেন। আর অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস, পিশাচ, মানুষদের সাথে বহু অপ্সরা সেই মন্বন্তরে ছিলেন। কিন্তু সংখ্যায় তারা এত বেশি যে তাদের আনুপূর্বিক নাম বলা অসম্ভব। মন্বন্তরে যে সব ব্রজকুল নামে প্রজা ছিল, বাহু অয়ন, অব্দ ও যুগ ক্রমে বহুকাল হল তারা অতীত হয়েছে।

ঋষিরা বললেন–হে সূত! ঐ সর্বভূতের অপহরক কাল কে? এঁর উৎপত্তি, আদি, তত্ত্বস্বরূপ চোখ, মূর্তি, অবয়ব, নাম ও দেহ কি তা বলুন। সূত বললেন–সূর্যযোনি নিমেষ প্রভৃতিকে কাল বলো সংখ্যা কালের চোখের মত। এই কালের মূর্তি অহোরাত্র নিমেষ ও কালাত্মক সংবৎসর তার নাম, ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান কালই স্বয়ং প্রজাপতি। এখন দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু ও অয়ন দিয়ে পাঁচ ভাগে বিভক্ত, কালের অবস্থাভেদ বলছি শুনুন–প্রথম সংবৎসর–দ্বিতীয় পরিবৎসর, তৃতীয় ইদ –বৎসর, চতুর্থ–অনুবৎসর এবং পঞ্চম বৎসরকে বলা হয় পরম বৎসর। এদের স্বরূপ বলছি। যে ঋতুকে অগ্নি বলা হয়, তা সংবৎসর আদিত্য যে কালভাগ করেন তা পরিবৎসর সোম ই বৎসর, এর শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই গতি, আর ইনি জলসারময় ও আকাশগামী। এটাই পুরাণ অনুমোদিত।

যিনি সাত সাতটি তনু দিয়ে এই লোকসকলকে তাপ দিয়ে সচেষ্ট করেন তিনিই বায়ু আর ঐ বায়ু অনুবৎসর। এঁদের যথার্থ তত্ত্ব বলছি শুনুন। কাল, আত্মা, প্রপিতামহ, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, যোগে ঋক সাম, যজুর নিদান, ও পঞ্চ কালের ঈশ্বর। তিনিই অগ্নি, যজু, সোম, ভূত ও প্রজাপতি। যিনি অগ্নি তিনিই সূর্য এবং সেই সূর্যই মনীষীদের মত সংবৎসর। এই সূর্য থেকেই কাল বিভাগ, মাস, ঋতু, অয়ন, গ্রহ, নক্ষত্র, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, আয়ু ও দিনের ভাগ হয়ে থাকে। এই প্রজাপতির দিন, মাস ও ঋতুর প্রবর্তক আর ইনিই পিতামহ স্বরূপ।

ইনিই আদিত্য, সবিতা, ভানু, জীবন ও ব্রহ্মস্যকৃত। ইনিই ভূতগণের উৎপত্তি বিনাশ সাধক বলে এঁকে ভাস্কর বলে। তৃতীয় পরিবৎসর তারাভিমান সোমেরা ওষধির পতি বলে তিনিও প্রপিতামহ ও সর্বভূতের যোগক্ষেমকারী, ইনি অংশু দিয়ে জগৎ পরিব্যপ্ত করেন। তিথি পর্বসন্ধি, পুর্ণিমা ও অমাবস্যায় ইনি যোনি। ইনি নিশাকর, অমতৃত্মা ও প্রজাপতি, এজন্য এই সোম পিতৃমান এবং ঋক্ ও যজু ছন্দোময়। ইনিই প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানাত্মক কারা দিয়ে সমস্ত প্রাণীর সব চেষ্টার প্রবর্তন করেন। ইনি প্রাণ অপান সমান বায়ুর প্রবর্তক। ইনিই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, স্মৃতি, রসের যথা সময়ের পুষ্টি সাধক। ইনি এঁদের ক্রিয়া সম্পাদক, ইনিই সর্বত্মা প্রভঞ্জন, সমস্ত জীবের জীব স্বরূপ বিখ্যাত। ইনিই জল, অগ্নি, ভূমি, রবি, চাঁদের উৎপত্তি স্থান তাই ইনি প্রজাপতি, লোকাত্ম ও প্রপিতামহ বলে বিখ্যাত। প্রজাপতি প্রভৃতি ইষ্ট লাভ-এর জন্য ত্রিকপাল ও অম্বক দিয়ে ভগবান রুদ্রের পূজা করেন। এজন্য তাঁর নাম এ্যম্বক হয়েছে। মনীষীরা এভাবে পঞ্চবর্ষকে একযুগ বলেন। দ্বিজরা এই যে পাঁচরকম সম্বৎসর এর কথা বলেছেন। এক এক বর্ষ, মধু প্রভৃতি ছয় ঋতু হয়ে আসে। ঋতু পুত্র আর্তবেরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। সংক্ষেপে একে কালসর্গ বলা হয়, বায়ু এভাবে বায়ু কাল রূপে প্রাণীদের জীবন ক্ষয় করে নদীর বেগের মত বয়ে চলেছে। এই কাল থেকে। অহোরাত্র হয়েছে। এই কালই এবার বায়ুমূর্তি ধরে। এরা সকলেই প্রজাপতির সর্বদেহীর প্রধান, সমস্ত লোকের পিতা ও লোকাত্মা বলে বিখ্যাত।

ভগবান ব্রহ্মা ধ্যানস্থ থাকলে ভগবান ভব তা থেকে আবির্ভূত হন। ইনি ঋষি, বিপ্র, মহাদেব রূপভূতাত্মা ও পিতামহ। ইনিই সকলের ঈশ্বর, প্রণবের জন্যই এঁর আবির্ভাব। ইনি আত্মরূপে প্রাণীদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ উৎপত্তির কারণ। ইনিই অগ্নি সংবৎসর, সূর্য, চাঁদ ও বাতাস, ইনি যুগাভিমানী, কালাত্মা নিত্য সংহারক এবং ইনি উন্মাদক অনুগ্রহ কর্তারূপে ইদ বৎসর বলে প্রসিদ্ধ। ইনিই রেগে গিয়ে নিজের 'তেজে এ জগতে প্রতিভাত হচ্ছেন, আলব তাঁরই প্রভাবে আবার লোকানুকূল সৃষ্টি হয়েছে এবং দেব, পিতা, কাল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পব ও উৎপন্ন ভূতেবা আবার তার পূজা করে। ভগবান ভব প্রদেশ, প্রজাপতি, পতির ও পতি, সর্বভূতের প্রভু ও ক্ষীণ ওষধিদের পুনঃ পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা। যিনি এই স্থির কীর্তি প্রজাপতিদের মহৎ বংশ বর্ণনা করেন, তিনি মহতী সিদ্ধি লাভ করেন।

.

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়

এরপর প্রণবের বিষয় বলছি শুনুন। ওঙ্কার অক্ষরটি ব্রহ্মস্বরূপ, ওঙ্কারের তিনটি বর্ণ রয়েছে। এটা মন্ত্রের প্রথমে যোগ হয়। ওঙ্কারস্থ বর্ণ থেকে ঋক, সাম, যজুঃ, বায়ু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতারা এসেছেন। দেবতাদের মধ্যে যে চোদ্দজন মহাত্মা, তাঁদের মধ্যে যিনি সর্বগ, সর্বগত ও সর্বযোগবিদ তিনিই লোকানুগ্রহের জন্য ওঙ্কারের আদি, মধ্য ও অন্তরূপে আর্বিভূত। সপ্তর্ষি, ইন্দ্র, দেবগণ, পিতৃগণ এঁরা সকলেই দেবদেব মহশ্বেরস্বরূপ ওঙ্কার অক্ষর থেকে আর্বিভূত হয়েছেন। মনীষীরা ঐ ওঙ্কার অক্ষরকে ইহলোক ওপরলোকের হিতকর পরমপদ বলেন। আগে আমি কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ এদের সাথে কালের বিষয় বলেছি। যুগগুলো চাকার মত ঘুরতে থাকলে দেবতারা কালের বশে, কালের ইয়ত্তা করতে পারলে না তখন মন্বন্তরের প্রথমে ইন্দ্র প্রভৃতি দেব, ঋষি ও তপোধনরা হাজার বছর ধরে তীব্র তপস্যাতে মন দিলেন। তখন কালভয়ে ভীত তারা ভগবান মহাদেবকে লাভ করেন।

তাঁরা বলেন–হে মহেশ্বর মহাদেব! এই দেবেশ কাল চারমূর্তি, চারমুখ এর তত্ত্বকে কে জানতে পারে। মহাদেব চতুর্মুখ কালকে দেখে দেবগণকে বললেন, তোমাদের ভয় নেই। আমি তোমাদের কোন্ ইচ্ছে পূর্ণ করব তা তোমরা বলো। তোমাদের বৃথা কষ্ট করতে হবে না। এই বলে কালরূপী দেবদের বলতে শুরু করলেন–এই চারটে জিহ্বাযুক্ত সাদা রঙের মুখ দেখছ, এটি কালের কৃত যুগের নামের প্রথম মুখ। আর এই মুখই দেবসুর শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা। আর ইনিই বৈবস্বত নামক মুখ। তারপরে লাল দুটো জিহ্বাযুক্ত লেলিহান দ্বিতীয় মুখ, এটাই ত্রেতাযুগ, এতেই মহেশ্বর থেকে যজ্ঞপ্রবৃত্তি হয়। এর থেকেই যজ্ঞ শুরু। এর তিন জিহ্বা তিন অগ্নিস্বরূপ। দুই জিহ্বাযুক্ত ভীষণ লাল মুখ, এই মুখই দ্বাপর যুগ, আর ঐ যে কালো রঙের লাল চোখ এক জিহ্বা লেলিহান স্থল চতুর্থ মুখ, এটাই কল্পমুখ স্বরূপ, সমস্ত লোক ভয়ঙ্কর ঘোর কলিযুগ। কলিযুগে মুখও নেই নির্বাণও নেই, সব প্রজাই কলিগ্রস্ত হয়ে থকে। কৃতযুগে ব্রহ্মাপূজ্য, ত্রেতার যজ্ঞ, দ্বাপরে বিষ্ণু আর আমি চারযুগে পূজ্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও যজ্ঞ–এরা কালের তিনটি অংশ মাত্র। আমি যুগের কর্তা পরম পরপরায়ণ। এজন্য আমি কলিযুগে লোকের মঙ্গল ও দেবগণের অভয়ের জন্য ভব্য ও পূজ্যই হয়ে থাকি। হে মহাত্মাগণ কলিকাল এলে আপনাদের ভয়ের কিছু নেই। দেব, ঋষি কালরূপী ভগবান এর কাছে এসব কথা শুনে তাকে মাথা নিচু করে প্রণাম করে আবার। বললেন– এই কাল চতুর্মুখ হলেন কিজন্যে? মহাদেব বললেন– এই চতুমূর্তি, চতুর্মুখ, চতুর্দংষ্ট্র কাল লোক রক্ষার জন্য সব কিছুকেই পেরিয়ে চলে। এই চরাচরে তার অসাধ্য কিছু নেই। তিনি সমস্ত সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আস্তে আস্তে ধ্বংস করেন। সবাই কালের বশবর্তী কিন্তু কাল কারোর বশে নেই। একাত্তর যুগে এক যুগান্তর হয়। একথা

বলে তিনি অন্তর্হিত হলেন। কালই দেব, ঋষি, দানবদের সৃষ্টি ও ধ্বংস করেছেন বার বার। কলিযুগে সকলের যত্ন সহকারে তপস্যা করা উচিত।

যিনি তপস্যায় মহাদেবকে লাভ করেন, তাঁর পুণ্যফল মহৎ। এজন্য ধর্মপরায়ণ দেব ও ঋষিরা কলিকালে অবতীর্ণ হয়েই তপস্যা করতে ইচ্ছে করেন, এজন্য যাঁরা কালের অতীত হয়েছেন, তারাও এই চারযুগে সপ্তর্ষিদের সাথে জন্মগ্রহণ করে। এরপর আমি স্বর্গত নৃপতিদের বিবরণ বর্ণনা করছি। শুনুন ওই বংশকে ইক্ষবাকু বংশের আদি বলা হয়। অনেক নৃপতি ওই বংশে জন্মে শত শত বংশ বিস্তার করেন, ভোজ বংশের রাজাদের এদের দ্বিগুণ বংশ। ভোজ বংশের চারটি অংশ আছে। এখানে বিস্তারিতভাবে অত বলা সম্ভব নয়। এরা সবাই প্রজাপালক নৃপতি।

.

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সূত বললেন–আগে মহর্ষির সৃষ্টি কথা বলা হয়েছে। এখন বিস্তৃতভাবে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশের কথা বলছি শুনুন। স্বায়ম্ভুব মনুর দশ পৌত্র। তারা সকলেই গুণবান, ধার্মিক। সত্য ও ত্রেতা যুগে তারা যোগ ও তপশ্চরণ দিয়ে সসমুদ্রা, সমস্ত পৃথিবীর কর গ্রহণ করতেন। বীর প্রিয়ব্রতের এক কন্যা জন্মায়। তিনি কর্দম প্রজাপতি স্ত্রী। এছাড়া তাঁর আবার দুইকন্যা এবং সম্রাট ও কুক্ষি প্রভৃতি একশো পুত্র জন্মান। এদের মধ্যে দশজন প্রবল বলশালী। প্রিয়ব্রত এদের সাতজনকে সাতটি দ্বীপে অভিষেক করলেন। যেমন অগ্নীকে জম্বদ্বীপ, মেধা তিথিকে প্লদ্বীপ, বপুষ্মনকে শাল্মলী দ্বীপের, জ্যোতিষ্মনকে কুশদ্বীপ, দ্যুতিমানকে ক্রৌঞ্চদ্বীপ-এর, হব্যকে শাকদ্বীপের ও সবনকে পুষ্করদ্বীপের রাজা করলেন। সবনের মহাবীত ও ধাতকীয় নামে পুত্র হয়। ক্রৌঞ্চ দ্বীপে কয়েকজন পুত্র হল দ্যুতিমানের কুশল, মনুগ প্রভৃতি। কুশদ্বীপে জ্যোতিষ্মনের সাত ছেলে জন্মায়-উদ্ভিদ, বেনুমান, লবণ প্রভৃতি। বপুষ্মানের সাত ছেলে, শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত প্রভৃতি। মেধাতিথির সাত ছেলে। এবার জম্বুদ্বীপের কথা বলছি। জম্বুদ্বীপের রাজা অগ্নীব্র। এর কয়েকটি পুত্র হয়, তাদের সবার বড় পুত্রের নাম নাভি, এর ছোট কিম্পুরুষ। তারপর হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য। হরিন্মান ভদ্রাশ্ব, কুরু, কেতুমাল, এঁদের পিতা নাভিকে দক্ষিণ বর্ষ, কিশুরুষকে হেমকূট, হরিবর্ষকে নৈবধবর্ষ, ইলাবৃতকে, সুমেরুর মধ্যদেশ, রম্যকে নীলবর্ষ, হরিন্মানকে শ্বেতবর্ষ, কুরুকে শৃঙ্গবানের উত্তরদেশ, ভাশ্বকে মাল্যবান বর্ষ ও কেতুমালকে অন্ধমাদন বর্ষ দান করেন। অগ্নী-এর পুত্রদের যে আটটি বর্ষের কথা বলা হয়।

সেখানে অধিবাসীরা ছিল সুখী, জরা, মৃত্যু, অধর্ম ইত্যাদি কিছুই ছিল না। নাভির যে বংশ, সেখানে ঋষভ নামে এক পুত্র জন্মায়। তার থেকেই ভরতের জন্ম। ঋষভ ভরতকে হিম নামে দক্ষিণ বর্ষে অভিষিক্ত করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

জায়গাটার নাম তাই হল ভারতবর্ষ। ভরতের পুত্র সুমতিকে ভারতবর্ষে অভিষিক্ত করে বানপ্রস্থে যান, সুমতির পুত্ররা–তৈজস, প্রজাপতি ও অমিত্রজিৎ। বিদ্বান ইন্দ্রদ্যুম্ন হলেন তৈজসের ছেলে, ইন্দ্রদ্যুম্ন-এর ছেলে প্রতিহার। তার ছেলের নাম প্রতিহর্তা। প্রতিহর্তার পুত্র উন্নেতা। তার ছেলে ভুব, তাঁর ছেলে উশীথ, তার ছেলে প্রতাবি–এইভাবে সকলে বংশপরম্পরায় প্রজা সংখ্যা বাড়িয়েছিলেন। এদের বংশের হাজার হাজার সন্তানরাই কৃত ও প্রেতাদি যুগক্রমে মন্বন্তর পর্যন্ত এই ধরা ভোগ করেছেন। অতীত যুগের অনেকেই এঁদের বংশজাত হয়েছেন। এভাবেই হাজার হাজার নৃপতি গত হয়েছেন। আর তাদের সৃষ্টি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

ঋষিরা এবারে সূতের কাছে পৃথিবীর আয়তন ও বিস্তার সম্বন্ধে আগ্রহপূর্বক জানতে চাইলেন। বললেন–প্রভু, পৃথিবীতে কত দ্বীপ, কত সমুদ্র, কত পর্বত, কত বর্ষ, আর সেই সব বর্ষে কত নদী রয়েছে? মহাভূতদের প্রমাণ কী? লোকালোক ও চন্দ্র সূর্যের পর্যায় পরিমাণই কেমন? আমাদের বর্ণনা করুন। সূত বললেন–সাতটি প্রধান দ্বীপের মাঝে যেসব ছোট ছোট হাজার হাজার দ্বীপের অস্তিত্ব রয়েছে তাদের বর্ণনা একশ বছরেও দেওয়া যাবে না। সুতরাং এখন চন্দ্র-সূর্য গ্রহগুলির সাথে প্রধানতঃ সাতটি দ্বীপের কথাই বলছি।

জম্বুদ্বীপের বিস্তার এক হাজার একশ যোজন পরিমাণ। অনেক জনপদযুক্ত, এখানে সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব ও অনেক পাহাড় আছে। সেই পর্বতে অনেক ধাতু ও শিলা রয়েছে। এখানে অনেক পাহাড়ী নদী রয়েছে। এটি নটি বিশাল বর্ষে পরিব্যাপ্ত। লবণ সাগর দিয়ে চারদিকে ঘেরা দুটি বর্ষ পর্বত আগে পরে রয়েছে। হিমপ্রায়, হিমবান, হেমময়, হেমকূট। বালুকি বর্ণের মতো হৈরণ্য, নিষধ, নীল ও মেরু– এই দুটি প্রসিদ্ধ বর্ষ পর্বত। এদের মধ্যে মেরু সবার চেয়ে উঁচু। এটি সুবর্ণময়, চতুরা উন্নত। এর পাশে নানা রঙের সমাবেশ। ব্রহ্মার নাভিপদ্ম থেকে এই মেরুগিরির উৎপত্তি। এর পূর্বদিক সাদা রঙের, দক্ষিণদিক পীত রঙের।

এর পশ্চিমদিক ভৃঙ্গপক্ষের মতো উত্তরদিক লাল রঙের, অর্থাৎ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শুদ্র, ক্ষত্রিয়-এর কথা ইঙ্গিত করে।

স্বভাব, বর্ণ ও পরিমাণ অনুসারে এই মেরুগিরির আসল রূপ বলা হল। নীলগিরি বৈদূর্যময় আর হৈরণ্য। নীলগিরির বর্ণ ময়ূরের মতো। এই সব পর্বত শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ ও চারণগানে সেবিত, ঐ পর্বতগুলোর মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ রয়েছে। ঐ পর্বতের মাঝখানে মহামেরু নিধূম পাবকের মতো রয়েছে। মেরুর দক্ষিণ দিকে এর বেদী ও উত্তরদিকে এর উত্তর ভাগ। এখানে সাতটি বর্ষ রয়েছে, তাদের বর্ষ পর্বতগুলো, প্রত্যেককে দুহাজার যোজন বিস্তীর্ণ। এদের মধ্যবর্তী নীল ও নিষ্ঠগিরি দুশো হাজার যোজন বিস্তৃত। শ্বেত, হেমকূট, হিমবাহ ও শৃঙ্গ বান এরা দুই পর্বতের থেকে ছোট। এই পর্বতগুলোর সমষ্টি বিরাশি হাজার বিরানব্বই যোজন আয়তন পরিমাণ। জনপদগুলি সাতটি বর্ষে ভাগ করা হয়েছে। এই সমস্ত বর্ষে নানাজাতের প্রাণী বাস করে। এটি ভারত নামে বিখ্যাত। এর পরের বর্ষ হেমকূট এবং তার পরের বর্ষকে কিম্পরূপ বর্ষ বলে। নিষেধ ও হেমকূট নিয়ে হরিবর্ষ নির্দিষ্ট। হরিবর্ষ ও মেরুর পরবর্তী ইলাবৃত বর্ষ। ইলাবৃতের পর রম্যক বর্ষ প্রসিদ্ধ। রম্যকের পরবর্তী বর্ষ শ্বেত, এটিকে হিরন্ময় বলে। হিরন্ময়ের পরে একে কুরুবর্ষ বলে। দক্ষিণোত্তর দিকের দুটি বর্ষ ধনুকের আকারে রয়েছে।

মাল্যবান নামে মহাগিরি উত্তরদিতে রয়েছে। এই গিরি নীল ও নিষধাচল থেকে হাজার যোজন উঁচু। মাল্যবানের পশ্চিম দিকে গন্ধমাদন। বিস্তারে মাল্যবানের সমান। এই মেরু বর্ত বর্ণশালী সুন্দর। এতে সমস্ত ঋতু ও জল অব্যক্ত ভাবে উৎপন্ন হয়েছে। অব্যক্ত থেকে পৃথিবী পদ্মের আবির্ভাব হয়েছে। এই মেরুগিরি ঐ পদ্মের কর্ণিকা স্থানীর। আগের অনেক কল্প সমন্বিত নানারকম পুণ্যের ফলে কৃতাত্মারা এখানে বাস করে থাকেন। যিনি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা পুরুষোত্তম, যাঁকে মহাদেব, মহাযোগী, জগৎ প্রধান মহেশ্বর বলা হয়, সেই সর্বলোকের মধ্যগত অনন্ত অশরীরী রূপে এই পথে আবির্ভূত হন। মাংস, মেদ, অস্থি সমন্বিত দেহ তারা নয়। ঐ সনাতন লোকপথ তারই জন্যে উৎপন্ন হয়। কল্পশেষের কালের গতি এমন হয় যিনি প্রজাপতি, জগৎপ্রভু, দেবদেব চতুর্মুখ ব্রহ্ম, তিনিই ঐ পদ্মে আবির্ভূত হন। ঐ পদ্মের বীজ সৃষ্ট, সত্যমূলক। ঐ পদ্ম বিষ্ণুর সৃষ্টি তার নাভি থেকে পদ্মর আর্বিভাব। পৃথিবীই পদ্ম আকারে যেন উৎপন্না হয়েছিল।

এই পৃথিবী চারটি দ্বীপ লোক, পদ্মের পাতার মতো, মহাবল মেরু এর কর্ণিকার মত। ঐ মেরুর পাদগুলো নানা বর্ণময়। এর পূর্বদিক সাদা, দক্ষিণ পীত, শৃঙ্গ কালো, উত্তরদিক লাল, এই মেরুগিরি রাজার মত শোভিত। এর আকার তরুণ তপনের মতো, এর বিস্তার চুরাশি হাজার যোজন। এই গিরি নীচের দিকে ষোলো যোজন। এর চারদিকের আয়তন বিস্তার থেকে তিনগুণ এখানে দিব্য ওষধি আছে। এই শৈলরাজির উপরিভাগ দেব, গন্ধর্ব, উরপ, রাক্ষস, সুন্দরী অপ্সরা প্রভৃতিরা থাকেন। এর নানাদিকে চারটি দেশ রয়েছে।

ঐ চারটি দেশের নাম ভদ্রাস্ব, ভারত, কেতুমাল ও উত্তর কুরু। উত্তরকুরু পুণ্যবান আশ্রয়স্থল। ভূপদ্মের বীজকোষ চারিদিকে ছিয়ানব্বই হাজার যোজন বলে বিখ্যাত। এর কেশরগুলো চারিদিকে বিস্তীর্ণ। আগে ভূপদ্মের যে চারটি পাতার কথা বলা হয়েছে, তাদের বিস্তার এর হাজার গুণ যোজন। এই পদ্মের কর্ণিকা বীজ কোষ, তাকে অত্রিমুনি বাতাস, ভৃগু ঋষি মহস্রা, সাবর্ণী অষ্টা ও ভাসুরি চতুরাশ্রাকারে এবং বাৎসায়ণী সমুদ্রাকরে, গালব বায়বালোয়ে, গাজি উর্ব্ববেণীর আকারে এবং ক্রোস্টুকি পরিমণ্ডুলাকারে একে জেনেছেন। ফলে যে ঋষি যেমন ভাবে এই পর্বতাধিপতির পার্শ্ব সম্বন্ধে জেনেছেন, এর পার্শ্ব বস্তুতঃ সেই রূপেই আছে। কিন্তু এর সমস্ত তত্ত্ব একমাত্র ব্রহ্মাই জানেন। নাগাত্তম মেরুগিরি নানা রকম মনিরত্ন ও নানা রকম বর্ণপ্রভাতে সমুজ্জ্বল। এর প্রভা সুবর্ণ ও সূর্যের মতো, এটি দেখতে রমণীয়, হাজার পর্ব, এখানে রয়েছে আর হাজার হাজার পদ্মপূর্ণ।

এখানে মণিরত্নখচিত অনেক স্তম্ভ আছে। মণিমণ্ডিত বেদী রয়েছে। এটি বহু বিক্রম তরণে অন্বিত। দেবগণের নিবাস আছে এখানে। ব্রহ্মবিদদের বরেণ্য দেবপ্রধান চতুর্মুখ ব্রহ্মা। এর উপরে রয়েছেন। এই গিরির নানাদিকে বহু সহস্র মহাপুর রয়েছে। এদের মধ্যে ব্রহ্মসভা অতি রমণীয়। এটি সমস্ত লোকে বিখ্যাত, সেখানে মহাবিমানে দেবদেব ঈশাণ-এর একটি আবাস আছে। এটি হাজার সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং নিজের মহিমায় দীপ্ত। সেখানে দেব, ঋষি এমনকি স্বয়ং চতুরানন সমসময় রয়েছেন। ঐ জায়গাটিতে আদিত্য সমতেজা, দেবরাজ মহেন্দ্রর একটি আবাসস্থান রয়েছে। ঐ ইন্দ্রলোক পরম সমৃদ্ধ। প্রধান প্রধান অমরদের সর্বক্ষণের সেবা পেয়ে ইন্দ্রলোক প্রজ্জ্বলিত। এর পূর্ব-দক্ষিণ দিকে অগ্নিদেবের এক ভাস্বর মহবিমান রয়েছে। সেটি বিচিত্র ধাতুতে তৈরী অতিতেজ সম্পন্ন। এখানে অনেক স্বর্ণ উদ্যান নামে মহাসভা আছে। এই বিভাবসু অগ্নিকে দেব ঋষিরা স্তুতি করেন ও তাকে আহুতি দিয়ে থাকেন। তিনিই সমস্ত তেজঃ সমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন ভোগ পেয়ে সেই একই তেজ বিভূরূপে বিরাজ করছেন।

মেরুর তৃতীয় অন্তরতটে এইরকম আর একটি মহাসভা আছে। এটি যমের সুসংযমা নামে মহাসভা লোকে বিখ্যাত। এরপর ধীমান বিরূপাক্ষের একটি সভা আছে, তার নাম কৃষ্ণাঙ্গনা। মেরুর পঞ্চম অন্ত তটে বৈবস্বতের শুভগতি নামে আরও একটি রমণীয় মহাসভা রয়েছে। মহাত্মা জলধিপতি বরুণের সতী নামক সভা সুবিখ্যাত। ঐ সভাপুরীর উত্তরে মেরুর সুরম্য ষষ্ঠ অন্তরতটে পবনদেবের নবতী নামক সভা সুপ্রসিদ্ধ। মেরুর সপ্তম অন্তরতটে নিশাপতির মহাদয়া নামে সভা আছে। এটি বিশুদ্ধ বৈদুর্য বেদীতে অলঙ্কৃত। মেরুর অষ্টমতটে মহাত্মা ঈশাণের যশোবর্তী নামে সভা রয়েছে। কাঞ্চনের মতো উজ্জ্বল সেই সভা। এখানে ইন্দ্র ইত্যাদি

আটটি বিমানের কথা বলা হল। এই গিরি চরেই দৈবলোক রয়েছে বলা হয়ে থাকে। নানা রকম যজ্ঞনিয়মে ও অনেক জন্মের বহু পুণ্যফলে মানুষ এই দেবলোক পায়।

.

ষষ্ঠত্রিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, আগে যে কর্ণিকা মূলের কথা বলেছি, তা সত্তর হাজার যোজন নীচের দিকে রয়েছে। এর মণ্ডল পরিমাণ আটচল্লিশ হাজার যোজন, ঐ মণ্ডল পাহাড় দিয়ে ঘেরা, আগের যে হাজার হাজার পর্বতের কথা বলেছি, তা নদী, ঝর্না, গুহা, নিকুঞ্জ, ইত্যাদিতে ঘেরা। ফুলে ফুলে ঢাকা এদের তট ও উঁচু উঁচু প্রাসাদ। এই সব পর্বত মাঝে অসংখ্য অনুপম কুঞ্জ আছে, মতবাত পাখির গান শোনা যায়। সিংহ, বাঘ, সরভ ইত্যাদি জন্তুতে পর্বত পরিপূর্ণ, এদের মধ্যে দশটি পর্বত খুব উঁচু। সূর্যের রথবাহী ঘোড়র ক্ষুরের আঘাত লাগে সেই পর্বত চূড়ায়। জঠর ও দেবকূট এই দুটো পর্বত পূর্বদিকে রয়েছে। এর দক্ষিণ-উত্তর ভাগের আয়তন নীল নিষধাচল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। দক্ষিণ কৈলাস ও হিমবান ও উত্তরদিকে। এর পূর্ব ও পশ্চিমে আয়তন এবং সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। হে দ্বিজগণ আপনাদের যে উঁচু কনকাঁচল সুমেরুর কথা বলেছি এবার তার কথা বলছি। মেরুর চারিদিকে চারটে মহান পাদ রয়েছে। ঐ চারটে পাদ এই সপ্তদ্বীপা মহীকে ধরে রাখে। তাই এটি কখনো টলে না। ঐ চারটে পাদের আয়াম দশ হাজার যোজন বলা হয়। এরা নানারত্নে শোভিত। দেব, গন্ধর্ব ও যক্ষদের বাসস্থল। ঐ সব পাদ থেকে অসংখ্য ঝরনার শব্দ শোনা যায়। অসংখ্য ফুলে বৃক্ষ দিয়ে পাদদেশগুলো সাজানো।

এদের স্থানে স্থানে অনেক রত্নখচিত নানা গুহা রয়েছে। তাদের কতস্থানে গৃহ, সুসজ্জিত তটদেশ। সুন্দর মনোরম আশ্রম রয়েছে সেখানে, পূর্বদিকে মন্থর, দক্ষিণে গন্ধমাদন পশ্চিমে বিপুল, উত্তরদিকে সুপার্শ্ব পর্বত রয়েছে। এদের শৃঙ্গের ওপরে চারটে মহাবৃক্ষ প্রদীপ্ত কেতুরূপে উৎপন্ন হয়ে রয়েছে। এইসব গাছের মূল দৃঢ়, এরা হাজার হাজার শাখা নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। এদের মূলে যেসব বেদী রয়েছে তারা হীরা, বৈদুর্যমণিতে তৈরী। গাছগুলোর স্নিগ্ধ পাতার ছায়ায় এই আশ্রমগুলি ফুলে ফলে পূর্ণ। যক্ষ, গন্ধব, সিদ্ধ ও চারণরা এইসব গাছের সেবা করেন। মন্দর গিরির শৃঙ্গে এক মহাবৃক্ষ আছে। এর শাখা প্রশাখার সামনের দিক ও কোটর, চারিদিকে ঝুলে রয়েছে। এইসব গাছে সমস্ত ঋতুতে ফুল ফোটে। তারা এক একটি মহাকুম্ভের সমান। বাতাসে এর সুগন্ধ চারিদিকের হাজার যোজন স্থান আমোদিত করে।

হে দ্বিজগণ, ভদ্রাস্ব নামে এক প্রধান কেতুস্থানীয় দেশ প্রসিদ্ধ আছে, যেখানে সাক্ষাৎ হৃষিকেশকে সিদ্ধ পুরুষরা পুজো করে। সেই দেশে এই গাছ আছে এর নাম ভদ্রকদম্ব। হরি পুরাণকালে একটি সাদা ঘোড়ায় চড়ে ঐ গাছের কাছে আসেন। তিনি সেখানে এসে সমস্ত দ্বীপ দেখেন। এজন্য ঘুরে তার নাম মিলিয়ে ঐ দেশের নাম হয় ভদ্রাস্ব। দক্ষিণ পর্বতের চূড়ায় একটি বিশাল জাম গাছ রয়েছে। এটি ফুলে ফলে শোভিত। এর ফল বৃহৎ, সুস্বাদু অমৃতের মতো। পাহাড় চূড়ায় বরফ পড়ে জম্বু নামে মধুবাহিনী নদীর সৃষ্টি হয়েছে। দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস প্রমুখরা অমৃতের মতো জন্ধুরস পান করে। এই জম্বু বৃক্ষের জন্য দ্বীপের নাম জম্বুদ্বীপ হয়েছে। পশ্চিম দিকে একটি অশ্বত্থ গাছ রয়েছে। পাহাড় চূড়ায় বহু পুরানো এই গাছ থেকে অনেক ঝুরি নেমেছে। গাছটির তলে সুবর্ণ মণিময় বেদী রয়েছে। এই গাছে বহু প্রাণী বাস করে, ফলগুলিও লোভনীয়। এটি কেতুমাল প্রদেশের কেতু নামে প্রসিদ্ধ।

হে বিপ্রগণ! কিজন্য কেতুমাল নাম হল তা বলছি শুনুন। পুরাকালে সমুদ্র মন্থনে দৈত্যপক্ষ পরাজিত হয়। ইন্দ্রদেব যুদ্ধ ক্ষেত্রে একটি মালা পরে ছিলেন। ওই প্রবল যুদ্ধের পরও সে মালাটি অবিকৃত হইল। ইন্দ্র তখন ঐ মালাটি অশ্বথগাছের গলায় নিজেই পরিয়ে দেন। তখন থেকে সিদ্ধ চারণরা সেই সৌভাগ্যবতী মালাকে পুজো করতে থাকেন। সেই কেতু স্বরূপ গাছের ওপর ঐ দেবদত্ত মালা সদাসর্বদা বিরাজ করত। হাওয়ার দোলায় এটি সুগন্ধ ছড়াত। এজন্য কেতু ও মালা এই দুই-এর নামে পশ্চিমদিকের এই দ্বীপটি কেতুমাল নামে বিখ্যাত হল স্বর্গে ও মর্তে। সাপাস্ব পর্বতের উত্তর চূড়ায় ন্যাগ্রোধ নামে এক মহাবৃক্ষ আছে। এটি বহু যোজন পর্যন্ত বিস্তৃত। সিদ্ধ ও চারণেরা এই গাছের সেবা করেন। এই গাছের শাখা-প্রশাখায় মধুফলের সমাহার। ঐ গাছ উত্তর কুরুদেশের কেতুরূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সনকুমার প্রভৃতি মহাভাগ সাত ব্রহ্মানন্দনদের নামে উত্তরকুরু বিখ্যাত। এই সব সুন্দর শশ্বেত দেশে পুণ্যকীর্তি জ্ঞানী ব্রহ্ম কুমাররা থাকতেন। সাত মহাত্মা মানস পুত্রের নামে ঐ দ্বীপ উত্তরকুরু নামে স্বর্গে ও মর্ত্যে বিখ্যাত।

.

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

সূত বললেন– আগে চারটে পর্বতের কথা বলেছি। সেগুলির রমণীয় সংস্থান-এর কথা বলছি। ঐ পর্বতে সমস্ত ঋতু ফল, ফুলে ভরা। এখানে স্থানে স্থানে ময়ূর, সারিকা, চপের মদ্যোকট সূক ও ভৃঙ্গ রাজেরা দলে দলে বিচরণ করে। কোকিল, বন্ধু, হেমক প্রভৃতি পাখির নিনাদে ও

অন্যান্য শব্দে ঐসব প্রদেশে সব সময়ই মুখরিত। কোথাও মৌমাছিদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। কখনও মৃদু হাওয়ায় সুন্দর পাতাগুলি দুলে দুলে ফুল ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে। প্রতিটি পর্বতের স্থানে স্থানে কতশত রমণীয় সুন্দর পাথর। দেব, দানব, গন্ধর্ব অপ্সরা, সিদ্ধ, যক্ষ ইত্যাদিরা ইচ্ছেমতন ঘুরে বেড়ায়। চারটে পর্বতের চারদিকে চারটে দেহবাদ্যান আছে, এদের নাম হল পূর্বে চিত্ররথ, দক্ষিণে মন্দন, পশ্চিমে বিভ্রাজ ও উত্তরে সবিতৃবন।

এই সব মহাবনের ভেতরে সুন্দর সুললিত পাখির কূজনে ভরা, সবিশাল মহাপুণ্য গাছেরা রয়েছে। এখানে মহানাগেরা থাকে আর থাকেন মহাত্মারা। সুনির্মল সুশীতল সব জলাশয় রয়েছে এসব বনের ভেতরে। সরোবরে পদ্ম ও অন্যান্য ফুলগুলি সুগন্ধযুক্ত, বড় বড় ছাতার মতো এদের আয়তন। এদের মধ্যে চারটে মহাসরোবরের নাম হল–পূর্বে অরুণোদ, দক্ষিণে মানস, পশ্চিমে শীতোদ ও উত্তরে । মহাভদ্র। মন্দর গিরির পূর্বদিকে অরুণোদ সরোবরের পাশে অনেক পাহাড় আছে। মানস সরোবরে দক্ষিণে অনেক পর্বত রয়েছে। যথা–শ্রী শিখের, শিশির, কলিঙ্গ, পতঙ্গ প্রভৃতি। শীতোদ সরোবরের পশ্চিম দিকের মহাপর্বতগুলি হল–বৈদুর্যগিরি, পরিজাত, মধুখান, অঞ্জন প্রভৃতি। মহাভদ্র সরোবরের উত্তরের পর্বতগুলি হল-হংসনাগ–কপিল, নীল, কনকশৃঙ্গ ইত্যাদি। এইসব পর্বতের মাঝে যে সরোবর আছে তাদের কথা এবার বলব।

.

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

সূত বললেন, পাহাড়ের মাঝখানে যে সব জলাশয় আছে তা পাখির কলরবে মুখরিত, সেখানে অনেক জলচর প্রাণীর বাস। ঐসব বনভূমি তিনশো যোজন আয়তন ও শতযোজন বিস্তৃত। এখানে একটি সরোবর আছে। তার জল নির্মল, স্বাদু, পম ও অন্যান্য ফুলে ভরা। এই পুণ্য সরোবরের কথা সবাই জানে। এর নাম শ্রীঘর। এই সরোবরের পদ্ম বনে একটি মহাপদ্ম রয়েছে। এর কোটি কোটি পাপড়ি সূর্যের মতো উজ্জ্বল, সবসময়ই ফুটে থাকে। কখনো শুকায় না বা ঝরে পড়ে না। কমল কুসুমে ঢাকা এই গাছের মধ্যে ভ্রমর গুনগুন করে। ঐ পদ্মে সাক্ষাৎ ভগবতী লক্ষ্মী বিরাজ করছেন।

ঐ সরোবরের পূর্ব দিকে এক বিরাট বিশ্ব বন রয়েছে। ফল, ফুলে পরিপূর্ণ সেই বন। এটি একশ যোজনে বিস্তৃত ও ত্রিশ যোজন আয়ত, হাজার হাজার মহাবৃক্ষ আছে। এইগুলি উচ্চতায় বিশাল ও অজস্র, শাখা-প্রশাখায় ভরা। সোনার মতো ফলগুলি সুস্বাদু অমৃতের

মতো। বনটির নাম শ্রীবন। এটি সর্বলোক সিদ্ধ। এই বিশ্ব বনে গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ রয়েছে। সিদ্ধজনেরা বিফলের আশায় সব সময়ে বনে বিচরণ করে। বিবিধ ভূতবৃন্দ সবসময়ই ঐ বনে থাকে। আর সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী এই বনে রয়েছেন, সিদ্ধরা সবসময় তাকে প্রণাম করেন।

বিকল্প ও মণিশৈলের একশ যোজন বিস্তীর্ণ ও দুইশো যোজন আয়ত এক বিপুল চম্পক বন রয়েছে। এখানে চারণ, সিদ্ধজনেরা আছেন, এই বনে অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় ভরা গাছ রয়েছে। এই গাছ গুলো দিয়ে চম্পক বন ঘেরা। সুগন্ধি যুক্ত সুন্দর ফুল দিয়ে সমস্ত চম্পক বন শোভিত।

দেব, দানব গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, অপ্সরী ও মহানাগেরা ঐ বনে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়ায়। সেখানে ভগবান কশ্যপ প্রজাপতির এক আশ্রম আছে। সিদ্ধজনেরা সেখানে থাকেন। বেদধ্বনিতে আশ্রম স্থানগুলি মুখরিত।

এই পর্বতের মধ্যে সুখা নামে একটি মহানদীর তীরে একটি অতি সুন্দর তালবন আছে। সেই বনের উচ্চতা অনেক আর দৈর্ঘ্য ত্রিশ যোজন আর প্রস্থে পঞ্চাশ যোজন। ঐ বনে বহু বৃক্ষ রয়েছে। এরা মহামূল বিশিষ্ট, স্থির। এই সবগাছের ফলগুলি সুগন্ধ ও সুরসযুক্ত। এই তালবন ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত এর বাসভূমি নামে বিখ্যাত। এ ছাড়া বেণুমণ্ড ও সুমেরু পর্বতের উত্তরে এক বন আছে। এটি একশো যোজন বিস্তৃত। এতে গাছ লতা কিছুই নেই, এখানে শুধু দূর্বাবন রয়েছে, কোন প্রাণী নেই। নিষধ ও দেব পর্বতের উত্তরে হাজার যোজন আয়ত বিস্তৃত ভূভাগ আছে। এতে গাছ, গুল্ম, লতা কিছুই নেই, শুধু পা ডুবে যায় এমন জলে ভূমিটি পরিপূর্ণ।

.

নবত্রিংশ অধ্যায়

সূত বললেন–যেসব সিদ্ধসেবিত পাহাড় দক্ষিণ দিকে আছে, তাদের বিবরণ বলছি শুনুন। বিশাল মহাপর্বত শিশির ও পতঙ্গ এই দুই পর্বতের মধ্যভাগে এক রমণীয় উদুম্বর বন রয়েছে। উঁচু উঁচু বিশাল শাখা-প্রশাখা যুক্ত নানারকম গাছে পূর্ণ আর সেখানে নানা জাতীয় পাখি রয়েছে। গাছের ফলগুলি আকারে বিশাল। মহামূল্য মণিরত্নের মতোই বর্ণোজ্জ্বল। এই সব সুন্দর ফলে যজ্ঞডুমুরের এই বন উজ্জ্বল। সিদ্ধ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, উরগ, বিদ্যাধরেরা

আনন্দিত হয়ে এই বনের সেবা করেন। বনের পুণ্য জলধারা নিয়ে নদী বয়ে চলেছে। মধ্যে মধ্যে চারিদিকে সরোবর। সেখানে ভগবান কদম প্রজাপতির আশ্রম।

এই আশ্রম রমণীয়, দেবতারা এই আশ্রমের সেবা করেন। সেই বনভূমির চারিদিকের মণ্ডল একশো যোজন বিস্তৃত। তাম্রপর্ণ ও পতঙ্গ পাহাড়ের মাঝে একশো যোজন চওড়া, দুশো যোজন লম্বা একটি মহাপুণ্য সরোবর আছে। হাজার হাজার পদ্মফুলে শোভিত। এই সরোবরে দেব দানব ও মহানাগেরা থাকেন। বনের ভেতর একটি একশো যোজন চওড়া আর ত্রিশ যোজন লম্বা লাল রঙের ধাতুমণিজাত জনপদ আছে। উঁচু উঁচু পাঁচিল যুক্ত, তোরণদ্বার যুক্ত প্রাসাদ আছে। সেখানে অনেক নরনারীর বাস ও ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। সেখানে জনপদের মাঝখানে এক সুসজ্জিত বিদ্যাধর পুরী। এই পুরীর ভিতর যেসব উঁচু উঁচু মহাভবন রয়েছে, সেগুলি নানারকম মণিখচিত, নানা ছবিতে অলঙ্কৃত। ঐ পুরীর মধ্যে বিখ্যাত বিদ্যাধরপতি শুলোমা বাস করেন। তিনি বিচিত্র বেশধারী মাল্যযুক্ত ও মহেন্দ্রের মতো দ্যুতিময়। সূর্যের মতো তেজময়, বিচিত্র বেশধারী, হাজার হাজার বিদ্যাধর নিয়ে তার রাজসভা। মহাপর্বত বিশাল ও পতঙ্গের মধ্যে তাম্রপর্ণ নামে সরোবরের পূর্বতীরে এক সুসমৃদ্ধ বিরাট আমবন রয়েছে। ঐ বন সুন্দর শাখাযুক্ত, নানাবর্ণে শোভিত ফল রয়েছে। গাছগুলোতে পাতার থেকে ফলের সংখ্যাই বেশি। ঐসব ফলের আকার, গন্ধ, স্বাদ সেই সুস্বাদু অমৃতের রস পান করে থাকে। মহাত্মারা এই রস পান করে আনন্দিত।

হে বিপ্রগণ! অচলেন্দ্র সমূলে ও বসুধারের মাঝে ত্রিশ যোজন বিস্তৃত আর পঞ্চাশ যোজন আয়তন পরিমাণ এক বিল্বন রয়েছে। ঐ বনে অনেক পাখি রয়েছে, বনটি সুমিষ্ট কলকাকলিতে পরিপূর্ণ। বনের গাছগুলি ফলভারানত। ঐসব ফল পেকে গাছের নীচে পড়লে সেখানকার বিস্তীর্ণ মাটি কাদা হয়ে যায়।

বিল্বফল প্রিয় যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, সিদ্ধ ও নাগেরা ঐ বনে আশ্রয় নিয়ে থাকে। বসুধায় ও রত্নধার পর্বতের আড়ালে ত্রিশ যোজন লম্বা একশো যোজন চওড়া এক সুগন্ধ পুষ্পবন আছে, এটি কিংশুক বন। ফলের বর্ণে ও শোভায় সমস্ত বন যেন আলোকিত হয়ে আছে। শত যোজনব্যাপী সেই পুষ্প-কানন সৌরভে পূর্ণ। সিদ্ধ ও চারণ ও অপ্সরাগণ এই জলাশয়ের ধারে সুরম্য কিংশুক বনে ঘুরে বেড়ান। প্রজাপতি, আদিত্যগণ প্রতিমাসে সেখানে নেমে আসেন। পঞ্চকূট ও কৈলাস পর্বতের মাঝখানে ছত্রিশ যোজন আয়ত ও একশো যোজন বিস্তৃত বনভূমি রয়েছে, এটি পার হওয়া যায় না। বনের সমস্ত জায়গা হাঁসের গায়ের রঙের মত সাদা, ছোট প্রাণী পর্যন্ত সে বনের কোথাও নেই।

এবার যেসব বনভূমি, পর্বত আছে তার বর্ণনা করছি। সুবক্ষ ও শিখি, পাহাড়ের আড়ালে চারিদিকে একশো যোজন বিস্তীর্ণ ভূমিময় শিলাতল রয়েছে। এটিকে স্পর্শ করা যায় না, প্রচণ্ড উত্তপ্ত। এটি ঈশ্বর এর পক্ষেও ভয়াবহ। সেই পাথরে বিশাল বেদীর মাঝখানে ত্রিশ যোজন জায়গা জুড়ে অগ্নিকুণ্ড রয়েছে। সবসময় সেখানে আগুন জ্বলছে। অগ্নির যে ভাব কল্পনা করা হয়েছে, সেই সংবর্তক অগ্নি সব সময় সেখানে জ্বলছে। দেবাপি ও জয়ের আড়ালে দশযোজন আয়ত এক মাতলঙ্গ স্থলী রয়েছে। পাকা, মধুময় ফলে শোভিত। সেখানে বৃহস্পতির এক আশ্রম আছে। সিদ্ধজনের এখানে বাস করেন।

কুমুদ ও অঞ্জন পাহাড়ের মাঝে বহু যোজন আয়ত কেসর নামে নিম্নভূমি রয়েছে। সেই বনে সমস্ত কালের ফুল ফুটে রয়েছে। সবসময় এখানে শত ভ্রমররা গুঞ্জন করে থাকে। ফুলগুলো চাঁদের কলার মত সাদা, মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট। সেখানে সুর গুরু বিষ্ণুর আবাস। এটি তিনলোকে বিখ্যাত ও নমস্কৃত।

কৃষ্ণ ও পাণ্ডু নামে শৈলরাশির মাঝখানে ত্রিশ যোজন বিস্তীর্ণ নব্বই যোজন আয়ত শিলাময় এক সুন্দর সমভূমি রয়েছে। সেখানে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করা যায়। এক রমণীয় সরোবরে হাজার হাজার পদ্ম শোভা পাচ্ছে। সুগন্ধযুক্ত বিশালকার পদ্মবন ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত। এখানে স্থলপদ্মের বন অনেক দূর বিস্তৃত। এর মাঝে একটি বিশাল বটগাছ রয়েছে, এই গাছটি পাঁচ যোজন জায়গা ঘিরে রয়েছে! এর অনেক শাখা-প্রশাখা, সেখানে ভগবান নীলাম্বর দেব রয়েছেন। তার আকার চাঁদের মতো সাদা। তিনি শ্রীহরি, পূর্ণচন্দ্রের মতো তাঁর মুখ, সহস্রবদন, তিনি দেবতাদের শত্রুনাশ করে থাকেন। সেই মহাভাগকে সেই পদ্মমালা শোভিত বনের মধ্যে যক্ষ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধরেরা পূজা করে থাকেন। এই জায়গাটি অনন্ত পদ নামে তিনলোকে বিখ্যাত।

হাজার শিখর ও কুমুদাচলের আড়ালে যে পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে সেখানে রয়েছে প্রচুর পাখি। এর চারদিকে ফলের গাছ। গাছগুলি প্রকাণ্ড সুমিষ্ট সুগন্ধযুক্ত ফলে ভরা। ঐ শিখরে পুণ্যকর্ম ভগবান শুক্রাচার্যের এর পুণ্যাশ্রম আছে। ঐ আশ্রম দেব ও ঋষিরা সেবা করে থাকেন। আশ্রমটি দেখতে অতি উজ্জ্বল। শঙ্খকূট ও বৃষভ পাহাড়ের আড়ালে অনেক দূর বিস্তৃত এক রমণীয় শব্দ যকস্থলী আছে। সেখানে বৃন্তচ্যুত পুরুষ ফলের রসে মাটি কাদা হয়ে যায়। ঐ সব পুরুষ্ঠ ফল বেলের মত সুগন্ধি, সুন্দর, মহা সুস্বাদু। কিন্নর, উরগভ, চারণেরা এই পুরুষ্ঠ ফলের রস পান করে থাকেন। কপিঞ্জল ও নাগপর্বতের আড়ালে এক বৃক্ষ বন বিভূষিত মহাস্থলী

আছে। অনেক রমণীয় দ্রাক্ষা বন, খেজুর বন, সুস্বাদু ডালিম, অতসী, তিলক, কলাবন চারিদিকে পরিপূর্ণ।

ঐসব বনের মধ্যে দিয়ে স্বাদু শীতল জলের নদীগুলি বয়ে গেছে। পুষ্কর ও মহামেষ নামে পাহাড়ের আড়ালে ছয় যোজন লম্বা ও একশো যোজন চওড়া এক বনভূমি আছে। এর নাম কানন স্থল। এই জায়গাটি কঠিন প্রান্তর। এতে গাছ, লতা, তৃণ কিছুই নেই। কোন প্রাণীও নেই। এই রকম কত যোজন যোজন বিস্তৃত মহাসরোবর, মহাবন, বনস্থলী ইত্যাদি আছে তার হিসাব নেই। এমন কত ঘোর বনভূমি আছে যেখানে দিনের বেলায় পর্যন্ত সূর্যালোক পৌঁছায় না।

.

চল্লিশতম অধ্যায়

সূত বললেন–এরপর যে যে পর্বতে বিভিন্ন দেবতাদের সুন্দর সুন্দর বাসস্থান রয়েছে সেই স্থানগুলির কথা বলব। ঐসব পাহাড়ের মাঝে শীতাস্ত নামে এক বহুদূর বিস্তৃত মহাপর্বত রয়েছে। ঐ পাহাড়ে অনেক রত্ন-মণি-মাণিক্য ইত্যাদি আছে। আর চারিদিকে ফুলের বন রয়েছে। গিরির চারধার ভ্রমর গুঞ্জনে গুঞ্জরিত। ফুলে ঢাকা সানুদেশ, লতায় ভরা। প্রস্রবণের মাঝে নিকুঞ্জবন আছে। পর্বতের স্থানে স্থানে গুহা আছে, সেখানে গন্ধর্ব ও যক্ষরা থাকেন। এই পাহাড় ঘন জঙ্গলে ভরা। এখানে দেবরাজের বিরাট পারিজাত বন, মলয় পবন সেই পারিজাত ফুলের গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে দিত। সেখানেও বহু সরোবর আছে। সরোবরের জলে সোনার মত দ্যুতিময় অনেক ফুল, ফল ও বিচিত্র পাখির কলকাকলি মুখর। এটি মহৎ ক্রীড়াবন বলে বিখ্যাত। এর ভেতরে বিচিত্র আকারের নানা বানর বা অন্যান্য প্রাণীরা ঘুরে বেড়ায়। এই ইন্দ্রবনে সুন্দর সুন্দর বিহারভূমি আছে। ঐসব ভূমি নানা রত্নময় শয্যা ও আসনে সাজানো। ঐ স্থানে সূর্য না অতি উষ্ণ না অতি শীত হয়ে সবসময় প্রকাশ পায়। বসন্তের বাতাস ফুলের গন্ধে সুবাসিত হয়ে বয়ে যায়। ঐ বাতাস সব সময়ই শ্রম ও ক্লান্তি কমিয়ে দেয়। ঐ পর্বতের পূর্বদিকে কুমুঞ্জ নামে এক শৈলেন্দ্র আছে, এটি খুব উঁচু, সেখানে অনেক ঝরনা ও গুহা রয়েছে। ঐ পর্বতের শৃঙ্গগুলোতে মহাত্মা দানবদের বহু বিস্তৃত আটটি পুরী আছে। তক পর্বতে রাক্ষসদের অনেক বাসস্থান আছে। ঐ আবাস ভবনগুলো বহু নর-নারীর আবাস। ঐ সব গৃহে নীলক নামে ভীষণ নিশাচরেরা সব সময় থাকে। এই সব নিশাচর ভীষণ বলবীর্যশালী।

শৈলেন্দ্র মহানীলের উপরিভাগে মহাত্মা কিন্নরদের পনেরোটি পুরী আছে। দেবসেন ও মহাবাহু প্রভৃতি পনেরো জন গর্বিত কিন্নররাজ ঐ সব পুরীর রাজা। সেখানে নগরের প্রাচীরগুলো প্রায়ই সোনা দিয়ে ঢাকা, ও অন্যান্য বর্ণে রঞ্জিত। ঐ সব নগরের ভেতরে শত শত ভীষণাকারে বিষধর সাপ বাস করে, মহাপর্বত সুনাগের ওপর হাজার হাজার-দৈত্যের বাসস্থান আছে। সুরম্য অট্টালিকা রয়েছে। সেখানে, নগরটি প্রাচীর ও তোরণে ঘেরা।

বেনুমন্ত পাহাড়ের উপরে তিনটি বিদ্যাধর পুরী আছে। উলুক, রোমশ ও মহান্ত্রে নামে তিনজন শক্তিশালী প্রধান বিদ্যাধর এই পুরের রাজা। বৈকুণ্ঠ নামে পাহাড় চূড়োর ভেতরে অনেক ঝরনা আছে। ঐ মহাউচ্চ রত্নধাতু যুক্ত চূড়াতে সুগ্রীব নামে এক বীর্যবান গারুড়ি আছে। এর গতিবেগ বাতাসের মতো। বিকল্ক পাহাড়ে মহাবলী, অতিকায় সব পাখি আছে। করঞ্জ পাহাড়ে সাক্ষাৎ ভূতপতি বৃষবাহন যোগীবর মহাদেব শঙ্কর সব সময় রয়েছেন। তার চারপাশে নানা বেশধারী দুর্ধর্ষ ভূত ও প্রমথরা রয়েছে। বসুধার পর্বতে আটজন মহাত্মা বসুদেব আছে। মহাপর্বত হেমশৃঙ্গ চতুরানন প্রজাপতির পুণ্য আশ্রম রয়েছে। গিরিবর রত্ন ধাতুর উপরিভাগে মহাত্মা সপ্তর্ষিদের সাতটি আশ্রম আছে। শৈলেন্দ্র সুমেধ নানা ধাতুরাগে রাঙ্গানো।

এটি দেখতে মেঘের মতো, এই পাহাড়ের চূড়ায় আদিত্যরা, বসুগণ, রুদ্রেরা, ও অশ্বিনীকুমার দ্বয় এর রমণীয় আশ্রমগুলো আছে। যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নরেরা এই সব আশ্রমে পুজার কাজ করে থাকে। হেমকক্ষে রয়েছে এক সুসমৃদ্ধ গন্ধর্ব নারী। বিশাল উঁচু প্রাচীর ও সুন্দর সুন্দর তোরণ দিয়ে এটি ঘেরা। যুদ্ধ বিদ্যাশালী গন্ধর্বরা ঐ পুরীতে থাকেন, রাজা কপিঞ্জল এদের অধিপতি। অনল পর্বতে রাক্ষসদের বাসস্থান ও পঞ্চকূট দানবদের বাসস্থান। শতশৃঙ্গ পর্বতে অমিত তেজা যক্ষদের একশোটি পুরী আছে। তাম্র শিখরে কদ্রু পুত্র তক্ষকের এক শ্রেষ্ঠ পুরী আছে। পর্বতশ্রেষ্ঠ নিশাচকে যক্ষ ও গন্ধর্বদের জন্ম হয়েছে। ঐ স্থানে কুবেরের মহাভবন, হরিকূট শৈলে সমস্ত জনের প্রণম্য বরিদের বাস। কৃষ্ণাচলে গন্ধবদের বিশাল পুরী। মহাগিরি সহস্রশৃঙ্গ কঠোর কর্ম দৈত্যদের এক সহস্র পুরী আছে। পুষ্পক পর্বতে মুনিরা সবসময়ই আনন্দিত মনে থাকেন। এই সমস্ত অসংখ্য পাহাড় এবং সুরম্য অট্টালিকা প্রসাদে বাস করে গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ। নানা সিদ্ধজনেরা সবসময়ই নিজেদের ইষ্টদেবের পুজো করেন।

একচল্লিশতম অধ্যায়

সূত বললেন–সাদা রঙের দেবকূট একটি মর্যাদা সম্পন্ন পর্বত। এই পাহাড়ের বিরাট চুড়াতে বিনতার ছেলে ধীমান সুপর্ণের জন্মস্থান, এই জায়গাটি চারিদিকে একশো যোজন বিস্তৃত ও এক মহাভবনে মণ্ডিত। শাল্মলী দ্বীপে বায়ুবেগী পক্ষিরাজের আদি ভবন। এটিকে তার স্বগোত্রী দ্রুতগামী পাখিরা ঘিরে রাখে। এই পাখিরা সকলেই সাপের শত্রু। চার চূড়াযুক্ত পাহাড়গুলোর দক্ষিণে সাতটি সুসমৃদ্ধ শৃঙ্গ দেখা যায়। তাতে সাতটি গান্ধর্ব নগর। এর প্রাচীর ও তোরণগুলি সোনার। দেবতাদের তৈরি নগরগুলোতে নানা নরনারীর বাস।

হে দ্বিজগণ শুনুন–এই মহাগিরি দেবকূটের উত্তরদিকের শৃঙ্গগুলোতে দেবদেবীদের বাস আছে। প্রাচীরগুলি রম্য ও হর্ম প্রসাদগুলো নানা প্রকারে সাজানো। প্রাচীর ও তোরণগুলি খুব উঁচু। জায়গাটিতে আছে অনেক সাপ। শত শত বাদ্যের আওয়াজ ঐ নগরের বনের ভেতর সব সময় মুখর। ঐ নগরটিকে শত্রুরা আক্রমণ করতে পারে না।

দ্বিতীয় মর্যাদা পর্বতে কালকেয় অসুরদের এক দুধর্ষ নগর আছে। ঐ নগরে নানা রঙে রঙিন, মণিখচিত অসংখ্য ভবন আছে। নগরটি নিত্যই আনন্দিত, সুরক্ষিত, এতে অনেক স্ত্রী-পুরুষ থাকে। এই অসুরনগর সুনীল নামে খ্যাত। এর দক্ষিণ তটে রাক্ষসদের মহাপুরী রয়েছে। ত্রিশ যোজন বিস্তৃত বাষট্টি যোজন আয়ত, এর প্রাচীর ও তোরণগুলি সোনার তৈরি। এগুলি হৃষ্টপুষ্ট গর্বিত রাক্ষসদের বাসস্থান। দেবকূট পর্বতের মাঝে মহাকূটে ভূতবট নামে একটি বিশাল গাছ আছে। এর অনেক শাখা-প্রশাখা স্কন্দ ও কাণ্ড রয়েছে। ঐ গাছটি দশ যোজন ধরে বিস্তারিত। গাছটি দেখতে রমণীয়। এর তলদেশ ছায়াতে ঢাকা, নানা ভূতজাতির আশ্রয়স্থল ও মহাত্মা মহাদেব ত্র্যম্বকের সর্বলোক খ্যাত উজ্জ্বল আয়তন। মহাদেবের পারিষদরা সব সময়ই সেখানে থাকে। এরা হল বরাহ, হাতি, সিংহ, ঋক্ষ, বাঘ ইত্যাদি মুখ বিশিষ্ট, কেউ কেউ শকুন উট-এর মত বিশাল মুখ যুক্ত। কেউ বিকটাকার, কেউ স্থূল, কারো লম্বা চুল ও লোম বিশিষ্ট। উগ্রাপরাক্রমশালী ঐসব ভূতেরা রোজ সেখানে ভূতনাথ-এর পুজো করে থাকে। পুজো শুরু হলে নানারকম বাদ্যযন্ত্রে, যেমন শাখ, ঘণ্টা, ঝাঁঝর, ভেরী ইত্যাদির শব্দে ও গর্জনে চারিদিক ভরে ওঠে। প্রমথরা আনন্দিত মনে সেখানে থাকে। সাক্ষাৎ মঙ্গলদায়ক মহাদেব, ঋষি, দেব, গন্ধর্ব, যক্ষের পূজা পেয়ে থাকেন।

.

বিয়াল্লিশতম অধ্যায়

সূত বললেন–কৈলাস নামে একটি পবিত্র পর্বত আছে। গিরিশিখরটি শঙ্খের মতো সাদা। অনেক পুণ্যাত্মা দেব ভক্তেরা ঐ কৈলাস পর্বতে বাস করেন। এর মাঝে কুন্দফুলের মতো সাদা শৃঙ্গতট আছে। এতে মহাত্মা কুবেরের একটি নগর আছে। ঐ নগর প্রচুর মণিমুক্তো ও ছবিতে সাজানো। অনেক বড় বড় প্রাসাদ এই নগরের অনেক দূর ছড়িয়ে আছে। অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ঐ নগরে কেউ ঢুকতে পারে না। এর মাঝে সোনার তৈরি একটি সভাগৃহ আছে, নাম বিরুলা। বিরাট স্তম্ভ তোরণ দিয়ে ঘেরা, সেখানে পুষ্পক নামে মহবিমান আছে। এটি নানা রত্নে সাজানো, খুব সুন্দর বিমানটি কুবেরের বাহন। ভগবান মহাদেবের সখা। তিনি প্রধান প্রধান যক্ষদের সাথে সর্বভূতের পুজো পেয়ে ঐ নগরে বাস করেন। মহাত্মা কুবের অপ্সরা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও চারণদের নিয়ে ঐ জায়গাতে সবসময় বাস করেন। কুবেরের সভায় পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, কুমুদ, শঙ্খ, নীল ও নিধিশ্রেষ্ঠ নন্দন আটটি আর দিব্য মহনিধি আছে, কৈলাস পাহাড়ে যক্ষের আবাসস্থলের কাছেই, ইন্দর, অগ্নি, যম প্রভৃতির বাসস্থান। পূর্বে যারা মহাত্মা যক্ষেশ্বর-এর উপাসনা করেছেন, তাঁরাই পরবর্তীকালে তার পরিচারকের পদ পেয়ে থাকেন। এর পাশ দিয়ে মন্দাকিনী বয়ে চলেছে। ঘাটের সিঁড়িগুলো সোনা, মণি মুক্তার গড়া, নানা রঙে নানা জাতের অতি সুন্দর সব মহাপদ্ম দিয়ে ঐ নদী সাজানো। যক্ষ গন্ধর্ব রমণী ও অপ্সরাদের স্থান যেটি এছাড়া অলকনন্দা ও নন্দী নামে আরও দুটো নদী বয়ে চলেছে। এই সব পুণ্য সলিলা নদীদের দেব ও ঋষিরা সেবা করে থাকেন।

কৈলাস পর্বতের পূর্বদিকের চূড়োতে পরম সমৃদ্ধিশালী দশটি গন্ধর্ব নগর রয়েছে। এই নগরগুলি দশ যোজন বিস্তৃত আর হাজার যোজন আয়ত। নগরটি নানা ভবনে শোভিত, সুবাহ, হরিকেশ, চিত্রসেন, জর প্রভৃতি দশজন পরাক্রান্ত গন্ধর্বরাজ ঐ নগর গুলোর রাজা, এই পাহাড়ের সুর সেবিত পশ্চিম চূড়োতে চাঁদের মত শুভ্রকান্তি এক একটি যক্ষভবন। মহাযক্ষদের ত্রিশটি বাসস্থল আছে। সমুদ্র, মণিবর প্রভৃতি ত্রিশজন যক্ষ রাজা এইসব ভবনে থাকেন। বায়ু ও অগ্নির মতোই এরা তেজস্বী। ঐ কৈলাশ পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে পর্বত শ্রেষ্ঠ হিমবান, হিমালয় পর্বত ও অসংখ্য নদী, ঝর্ণা, গুহা, বাড়ি ও তটভূমিতে পূর্ণ। এখানে কিন্নরদের প্রচুর ভবন রয়েছে। এগুলোতে সুখী, আনন্দিত স্ত্রী, পুরুষেরা বাস করেন। এখানে প্রতাপশালী কিন্নরদের রাজা হলেন, দ্রুম সুগ্রীব, সৈন্য ও ভগদও প্রভৃতি একশো রাজা। এই শৈল শিখরেই মহাদেবী উমার সাথে রুদ্রদেবের বিয়ে হয়েছিল। উমাদেবী এখানেই তপস্যা করেছিলেন। হর-পার্বতী এই পাহাড় থেকেই সমস্ত জম্বুদ্বীপ দেখতে পেতেন। শিবের ক্রীড়াভূমি হিমালয়, এ সুন্দর জায়গাটি ভূতগণে পরিবৃত আর ফলে শোভিত। অনেক প্রকারের ফুল, এখানে সুন্দরী সুনয়না, কৃশাঙ্গী কিন্নরীরা আনন্দিত মনে ঘুরে বেড়ায়। অপ্সরা গন্ধর্ব ঘুরে

বেড়ায়। এখানেই সর্বলোক প্রসিদ্ধ উমাবন আছে। শঙ্কর এখানেই অর্ধনর অর্ধনারী রূপ ধরেছিলেন।

শরবন নামে এখানে একটি বনে ষড়ানন জন্মেছিলেন। কার্তিকেয়-এর এখানে এক সিংহ রথ আছে। ঐ রথের ধ্বজা পতাকা ও কিঙ্কিনী জালে শোভিত। দৈত্য বৈদ্বেষী গুহ যিনি বারোটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল। তাকে দেবতারা সেনাপতি করেছিলেন। পাহাড়ের নানা জায়গায় কার্তিকেয়ের আবাস আছে। পাণ্ডুলিশা হল কার্তিকের ক্রীড়াভূমি। পাহাড়ের পূর্ব তটে বিখ্যাত সিদ্ধাবাস আছে। এর নাম কলাপ গ্রাম। বশিষ্ঠ, ভরত, নল, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি ঋষিদের অনেক আশ্রম আছে।

হিমালয় বহু আশ্রম ও সিদ্ধবাসে পরিপূর্ণ। এটি যক্ষ ও গন্ধবদের বিচরণ স্থান। এটি নানা রত্নের, আবার বহু প্রাণীর আশ্রয় ও বহু নদীর উৎপত্তি স্থান। বিপ্রগণ এবার পশ্চিম পাহাড়ের বর্ণনা করছি শুনুন। এই পাহাড়ের মাঝের চুড়ো খুব চওড়া ও সোনা দিয়ে মোড়া। সেখানে বিষ্ণুর এক উজ্জল আয়তন আছে। সেখানে গন্ধর্ব, যক্ষ, অপ্সরা, সিদ্ধজনেরা বাস করেন। সিদ্ধজনেরা সাক্ষাৎ মহাদেব ও পীতাম্বরধারী হরিকে পুজো করে থাকেন। এই পর্বতের ভেতর উজ্জ্বল ধাতুতে মোড়া কোমল শিলাময় তটে রাক্ষসদের আনন্দপুরী আছে। এর তোরণগুলো তপ্ত কাঞ্চনময় রূপা ও সোনার তৈরি। এখানে অনেক বাগান রয়েছে। শত্রুরা সেখানে ঢুকতে পারে না। এর দক্ষিণদিকে অনেক দৈত্য বাস করে। এর মধ্যে অনেক নগর আছে যেখানে সহজে প্রবেশ করা যায় না। গুহার মধ্যে দিয়ে নগরে ঢুকতে হয়। পশ্চিম চুড়ো পরিজাত ফুলে শোভিত। সেখানে দেব, দানব ও নাগের সমৃদ্ধ পুরী আছে।

উত্তর পাহাড়ে ব্রহ্ম পার্শ্বনামে এক স্থান আছে। এটি স্বর্গে ব্রহ্মার জায়গা বলে প্রসিদ্ধ। মহাত্মা স্বয়ম্ভকে সেখানে পুজো উপাসনা করেন সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্বগণেরা। এখানে অগ্নিরও একটি আয়তন আছে। সেখানে মূর্তিমান অগ্নিদেবকে সিদ্ধ ও চারণরা পুজো করে থাকেন। এভাবে উত্তর দিকে শ্রেষ্ঠ পর্বত ত্রিশৃঙ্গ, এটি ভূতেদের আশ্রয়স্থল। হেমচিত্র নামে ত্রিলোক বিখ্যাত পুরী আছে এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-এর, আবাসস্থল।

দৈত্য, দানব, যক্ষ ও মহেশ্বর-এর আবাসস্থল পুজো করে থাকেন। ত্রিশৃঙ্গ নামের পর্বতের জায়গায় জায়গায় যক্ষ, গন্ধর্ব ও নাগদের সুন্দর অট্টালিকা আছে। গিরির অষ্টম শৃঙ্গে ঋষি পরিবৃত রমণীয় স্থান আছে। সেখানে আনন্দজল নামে মহাপুণ্য জল সরোবর আছে। এখানে চণ্ড নামে এক নাগপতি তার একশোটি মাথা এবং বিষ্ণুর চক্র চিত্র আঁকা।

বহু প্রাসাদ, অট্টালিকা, অপূর্ব সরোবর, গুহা, নানা রকম বৃক্ষ, মণিময় শিলা, নদী আর বহু বিস্তৃত পাহাড় দিয়ে সমস্ত বসুমতী পরিব্যপ্ত। এছাড়া এই মহাপৃথিবীতে প্রচুর পাহাড় রয়েছে। পাহাড়গুলি পুণ্যবাণে ভরা। মেরু পর্বতের গিরিমালই সিদ্ধলোক বলে খ্যাত, এটি পুণ্যাত্মা মানুষের আবাসস্থল। ঐ সুমেরু গিরিকেই স্বর্গ বলে। চারটি মহাদ্বীপ পৃথিবীতে খ্যাত। ভদ্র, ভরত, কেতুমাল ও উত্তরকুরু, দ্বিজগণ! আমি সেই চারটে প্রধান দ্বীপ ও অনেক দ্বীপ সমন্বিত এই পৃথিবীর বর্ণনা করলাম। বিখ্যাত ব্রহ্মলোক, দেব অসুর ও মানুষলোক পর্যন্ত সমস্ত জায়গা প্রাণীদের কাছে ত্রিলোক আখ্যা পেয়ে থাকে। গন্ধর্ব, বর্ণ, রস, শব্দ ও স্পর্শ গুণ সমন্বিত এই জগৎলোক পদ্ম নামে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

.

তেতাল্লিশতম অধ্যায়

সূত বললেন– পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত যেসব সরোবর থেকে পূণ্য সলিলা নদী বয়ে এসেছে, তা আকাশগামী হয়ে সপ্তম বায়ুপথে বয়ে চলেছে। ঐ নদী জ্যোতিষ্ক মণ্ডল পর্যন্ত পৌঁছে কোটি কোটি তারার মাঝে বিস্তৃত হয়েছে। ইন্দ্রের ঐরাবত হাতি আকাশপথ ভ্রমণ করে এর জলের ভেতর খেলা করে। সিদ্ধজনেরা বিমানে উঠে নভোস্থলে এর পুণ্যজল স্পর্শ করে আসেন।

সূর্য যেমন প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়ে থাকেন, বায়ু প্রেরিত ঐ নদীও তেমনি নানা জায়গায় গিয়ে বার বার পরিবর্তনশীল হয়। ঐ নদী সুমেরু গিরিকেও প্রদক্ষিণ করেছে। ঐ নদী মেরুগিরির উত্তরদিকে। চারটি চূড়াতে পড়েছে। মেরুর শিখর থেকে এর জলরাশি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে ঐ নদী চার ভাগে ভাগ হয়ে বয়ে চলেছে। ঐ পুণ্য মহানদী এক ভাগে মন্দর পর্বতের পূর্বদিক থেকে পড়ে সুমেরুর সাথে সুর সিদ্ধদের আবাস মন্দার গিরির পাশ দিয়ে অরুণোদ সরোবরে সাথে মিলেছে। এরপর সরোবর থেকে ঝর্ণায় পরিণত হয়ে সিদ্ধনিবাস শৈলে পড়ছে। সীতা নামে এক মহাপুণ্যা নদী আছে। ঐ নদী সব নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পাহাড় জঙ্গলে বাধা পেয়ে বহুদিকে বয়ে চলেছে। প্রথমত ঐ নদী শীতান্ত শৈলের শিখর থেকে মুকুঞ্জ গিরিতে এসে পড়ে। তারপর সেখান থেকে মাল্যবান পর্বতে মাল্যবান থেকে বৈকন্ধে, বৈকন্ধ থেকে মণিশৈলে, সেখানে থেকে বহু কন্দরময় মহলে বৃষভাচলে এসে পড়ে।

এভাবে ঐ নদী হাজার হাজার পর্বত পেরিয়ে জঠর নামে মহাশৈলে পড়েছে। আবার সেই নদী জঠর থেকে বেরিয়ে মহাগিরি দেবকূটে গিয়ে সেখানকার ভেতর দিক প্লাবিত করে ক্রমশঃ পৃথিবীতে পড়েছে। এভাবে ঐ নদী হাজার হাজার ভূমি, শত শত পর্বত, বহু বিচিত্র বন,

সরোবরকে ভাসিয়ে প্রচুর নির্মল জল বয়ে অন্যান্য সহস্র সহস্র নদীর সাথে মিলে বয়ে চলেছে। ঐ নদী প্রধান প্রধান দ্বীপের সাথে ভদ্রাস্ববর্ষকে প্লাবিত করে পূর্বসাগরে মিলেছে। পূর্বদ্বীপে একে মহানদী বলে। দক্ষিণদিকের পাহাড়শ্রেষ্ঠ গন্ধমাদনে যে নদী এসেছে সেটি বিচিত্র প্রপাত দিয়ে বিমল জল বিকীর্ণ করে গন্ধমাদন পর্বতের দেবনন্দন, নন্দনবন প্রদক্ষিণ করে প্লাবিত হয়েছে।

এই নদীর নাম অলকানন্দা, এটি সর্বলোকেই প্রসিদ্ধ। ঐ অলকানন্দা প্রথমে দেবতাদের মানস সরোবরে প্রবেশ করে সেখান থেকে রমণীয় ত্রিকূটে, ত্রিকূট থেকে কলিঙ্গ শিখরে, সেখান থেকে রুচকাঁচলে, সেখান থেকে নিষধে, নিষধ থেকে তাম্রশিখরে, সেখান থেকে শ্বেতোদর পর্বতে, সেখান থেকে শৈলেন্দ্র সুমুখ ও রসুধার পর্বতে, সেখান থেকে হেমকূটে, হেমকূট থেকে দেবশৃঙ্গ, দেবশৃঙ্গ থেকে পিপাঁচকে। এখান থেকে পঞ্চকূটে, সেখান থেকে দেব নিবাস কৈলাস শৈলে পৌঁছে সকল দিক প্লাবিত করে গুহাপূর্ণ হিমালয় পর্বতে এসে পড়েছে। এভাবে এই নদী হাজার হাজার পাহাড়, শতশত ভূমি সহস্র সহস্র কানন, গুহা প্লাবিত করে দক্ষিণ সাগরে এসে মিশেছে। এই মহানদী গঙ্গা, ভীষণ পাপাচারীদেরও পার দূর করে। মহাদেব বা পুষ্করের অঙ্গ সংস্পর্শে দ্বিগুণ পবিত্র জলশালিনী হয়ে সর্বলোকে প্রসিদ্ধ। ঐ নদী হিমালয় পাহাড় থেকে চারিদিকে অনেক শাখায় বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে সহস্র সহস্র নদী রূপে বিখ্যাত। ঐ মহানদী নন্দা নামে প্রসিদ্ধ। একে সিদ্ধজনেরা সেবা করে থাকেন। যেসব দেশের ভেতর দিয়ে রুদ্র, সাধ্য, বায়ু ও আদিত্য প্রভৃতি দেবপুজ্য যশস্বিনী গঙ্গা বয়ে চলেছে, সেই দেশই ধন্য ও শ্রেয়।

এবারে মেরুর পশ্চিমদিকের সুবিস্তৃত প্রত্যন্ত পর্বতের কথা বলছি। পর্বতটিতে প্রচুর রত্ন আছে। এটি পুণ্যময়, পুণ্যকারীদের সেবিত, নানা গুহায় সাজানো। এর অভ্যন্তর দেশ পাহাড়ের গায়ে নানা ফুল দিয়ে মোড়া। বহুদেশে বহমান লতার মত ঘুরে মেরুগিরি শৃঙ্গতট থেকে পড়েছে। বহু প্রাণীর তৃষ্ণা মিটিয়ে, নানা অঞ্চল ঘুরে দেবভ্রার্জ বনে পড়েছে। এরপরে মহাভ্রাজ, বেভ্রাজ প্রভৃতি মহাবনগুলো প্রদক্ষিণ করে, ভাসিয়ে দিয়ে পশ্চিম দিকের বিমল জলপূর্ণ শীতোদ সরোবরে মিলেছে। সেখান থেকে বেরিয়ে সুপক্ষ পর্বতে, সেখান থেকে পুণ্যোদ সরোবর আবার সেই সরোবর থেকে কয়েকটি শৃঙ্গে ঘুরে শিখী পর্বতে এসে মিশেছে। শিখী পর্বত থেকে কক্ষ, কক্ষ থেকে বৈদূর্যে সেখান থেকে কপিলে, কপিল থেকে গন্ধমাদনে, সেখান থেকে পিঞ্জরাচলে। এইভাবে কুমুদাচল থেকে মুধুটাটলে। মুকুটাম্য পর্বতচূড়ো থেকে কৃষ্ণম্য মহাপর্বতে। কৃষ্ণ থেকে মহানাগ শ্বেত মহাশৈলে, শ্বেতশৈল থেকে শৈলেন্দ্র সহস্রশিখরে পড়েছে। এভাবে ঐ মহানদী হাজার পর্বতকে বিদীর্ণ করে পারিজাত নামে মহাপর্বতে পড়েছে।

এই পারিজাত পর্বতের গুহার ভিতর দিয়ে পর্বতগাত্রের অনেক ঝর্ণা রূপে বহু সংখ্যক পাথর খণ্ড ভাসিয়ে, অথবা বাধা পেয়ে পৃথিবীতে এসেছে। এবং ম্লেচ্ছপূর্ণ কেতুমাল বর্ষ প্লাবিত করে পশ্চিম সাগরে এসে মিশেছে। এই নদী যখন আকাশতলে পড়ে বিরাট আকারে বেড়ে বয়ে চলেছিল তখন ষাট হাজার যোজন প্রদেশ ধরে মালার মত বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়েছিল। এইভাবে এই দেবঋষি সেবিত নদী পর্বত শিখর থেকে পড়াতে এর জলরাশি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়। নানা ফুলের ভেলা বহন করে নানা রত্নময় দেশ, অরণ্য মহাবন প্রদক্ষিণ করে ভাসিয়ে দিয়ে মহাভদ্র নামে এক মহাসরোবরে মিলিত হয়েছে। মহাপুণ্য সলিলা এই সরোবর তটে অনেক সাধুরা থাকেন। সরোবর থেকে বেরিয়ে এই নদী ভদ্রসোমা নামে বিখ্যাত হয়েছে। এই ভদ্রসোমা প্রচণ্ড বেগবতী। এই নদী বহু ঝর্ণা, জলাশয় সৃষ্টি করে । শঙ্কুট নামে পাহাড়ে এসে পড়েছে। সেখান থেকে বৃষ পর্বতে, তারপর বৎস, নাগশৈল, পর্বত নীলাচল, নীলাচল থেকে কপিঞ্জল, সেখান থেকে ইন্দ্রনীলে, ইন্দ্রনীল থেকে নীচের মহানীল হেমশৃঙ্গে এসে পড়েছে। এরপর শ্বেতাচলে, আবার সেখান থেকে শতশৃঙ্গে।

শতশৃঙ্গ থেকে পুষ্পমণ্ডিত পুষ্করে, সেখান থেকে বরাহ পাহাড়ে, ময়ুরাচলে, গুহাযুক্ত জারুধি নামের পাহাড় চুড়োতে দ্রুতগতিতে পড়েছে। এভাবে এই মহানদী হাজার হাজার ভূমি প্রবাহিত করে ত্রিশৃঙ্গ নামে শৃঙ্গময় মর্যাদা পর্বতে এসে পড়েছে। তারপর ঐ মহাভাগা নদী ওখান থেকে হেমকূট হয়ে বীরুধ পর্বতে এসে পড়েছে। মেরুর উভয় দিকে সুপার্শ্ব নামে সুবর্ণময় প্রাণী সঙ্কুল বিশাল বিচিত্র পাদদেশে বিস্তৃত ভাবে পড়েছে। তারপর উত্তরকুরু দেশ প্লাবিত করে মহাদ্বীপের মধ্য দিয়ে উত্তর সাগরে মিলেছে। এভাবে বিমল জলে ভরা চারটে মহানদী মহাগিরি তট থেকে পড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। এভাবে বহু বিস্তৃত পৃথিবীর বর্ণনা করা হল।

.

চুয়াল্লিশতম অধ্যায়

সূত বললেন–গন্ধমাদন পর্বতের পাশে একটি বিশাল আকার গণ্ডশিলা আছে। দৈর্ঘ্য বত্রিশ যোজন। এটি পূর্ব-পশ্চিমে আয়ত, ওখানে কেতুমাল বর্ষের লোকেরা শুভ কাজ করে থাকেন। ওখানকার অধিবাসী লোকেদের গায়ের রঙ কালো, মহাবীর্য মহাবল সেখানকার স্ত্রী জাতির গায়ের রঙ। পদ্মপাতার মত দেখতে সুন্দরী ওখানে পনস নামে (কাঁঠাল) একটি মহাবৃক্ষ আছে। এই বৃক্ষ ব্রহ্মার পুত্রস্থানীয়। সেই গণ্ডশিলাবাসী নর-নারীরা এই গাছের ফলের রস পান করে দীর্ঘজীবি হয়। মাল্যবান পর্বতের পূর্বদিকে এক গণ্ডশিলা আছে, এটি পূর্ব গণ্ডিকা নামে

বিখ্যাত। ভদ্রাস্ববাসী জনগণ সেখানে সবসময় আনন্দ সহকারে বাস করেন। এখানে ভদ্র নামে একটি শালবন আছে। এখানে যে সব পুরুষ আছে, তাদের রঙ সাদা, স্ত্রীলোকেরা দেখতে সুন্দরী, কুমুদের মতো গায়ের বর্ণ। এখানকার স্ত্রী-পুরুষরা কালা ফলের রস পান করে, স্থির যৌবন সম্পন্ন এবং আয়ু দশ হাজার বছর।

ঋষিরা বললেন–হে সুত, তুমি এই চারটি দ্বীপের অধিবাসীদের সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত ভাবে বল। সূত বললেন–হে কীর্তিশালীগণ শুনুন, আমি বর্ণনা করছি। শৈবাল, বর্ণমালগ্র, কোরঞ্চ, শ্বেত ও নীলাচল এই পাঁচটি কুলপর্বত। এই পর্বতের জননী সদৃশ আরো হাজার হাজার, শত শত পর্বত আছে। এই সব পর্বতে কত জনপদ যে সৃষ্টি হয়েছে, সেই সব জনপদ নানা প্রাণীর আশ্রয়স্থল, নানা প্রকারে ভাগ করা। সেখানে নানা রাজবংশের বাস। এইসব জনপদ ও পাহাড়ের মাঝে উঁচুনিচু স্থানগুলো হল–সুমঙ্গল, শুদ্ধ, চন্দ্র, অনন্ত, সুনন্দ, বিজয়স্থল, মহাস্থাল, মহানেত্র, শৈবাল, কুমুদ। উত্তম হেমভৌম ইত্যাদি। ঐসব জনপদবাসীরা মহানদী মহাগঙ্গার জল পান করে, আরো অনেক নদী ঐসব জনপদের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে।

সেই নদীগুলি হল–হংসবসতি, মহাচক্রা, কাঞ্চী, সুরেসা, শাখাবতী, ইন্দ্রনদী, মেঘা, কাবেরী, পম্পা, পম্পাবতী, সুবর্ণা, মণিব, কৃষ্ণতায়া অরুণাবতী, ক্ষীরোদা মণিতটা, হিরণ্য বাহিনী প্রভৃতি। এরা সকলেই গঙ্গার মতো মহানদী। এছাড়া আরও অনেক নদী পূর্বদ্বীপের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলে গেছে। এরা সকলেই পুণ্যতোয়া মনে করা হয়। ঐ সব নদীর নাম স্মরণ করলেও মানুষেরও পুণ্য হয়। ভদ্রাস্ব বর্ষের রাষ্ট্রগুলো সুসমৃদ্ধ, স্ফীত ও নানা জনপদে পরিব্যপ্ত, নানা জন পরিবেষ্টিত। নরনারীরা এখানে আনন্দিত মনে বাস করে। এই সব দেশের পুরুষদের আকৃতি খুব সুন্দর ও তারা বলশালী। তাদের আয়ুষ্কাল দশ হাজার বছর। অহিংসা ও সত্য কথা তাদের স্বভাবজাত গুণ। রোজ তারা ভক্তি সহকারে দেবদেব শঙ্কর ও পরম বৈষ্ণবী গৌরী দেবীকে পূজা ও প্রণাম করে।

.

পয়তাল্লিশতম অধ্যায়

সূত বললেন–ভদ্রাস্ববাসীদের সাধারণ বিবরণ আমি দিলাম। এবার কেতুমাল বর্ষের বিস্তৃত বিবরণ শুনুন। পশ্চিম দিকের শ্রেষ্ঠ পাহাড় নিষেধের পশ্চিম দিকগুলোতে যে সাতটি কুলাচল, সেসব নদী ও বিশেষত জনপদের কথা বলছি তাদের নাম। বিশাল, কম্বল, কুঞ্চ, জয়ন্ত, হরি পর্বত, অশোক ও বর্তমান। এই সব কুলাচলের প্রসূতি স্থানীয় অন্য আরও কোটি কোটি,

হাজার হাজার, শত শত বিস্তৃত পর্বত আছে। সেইসব পর্বতের সাথে কত যে জনপদ মিশে আছে তার ইয়ত্তা নেই। বিভিন্ন রাজাদের দ্বারা পরিচালিত ঐসব জনপদ ও বিভিন্ন রাজ্যের নাম হল–সুখ ভ্রমর, অচল, কূটক, স্তবক, ত্রৈঞ্চ, কৃষ্ণঙ্গ, মণিপুঞ্চক, কুমুদাভ, মহানাশ, গজভূমিক, বঙ্গ রাজীব, কোকিল, বচাঙ্গ, মহাঙ্গ, পিত্তল, ইত্যাদি অসংখ্য জনপদে, বহু ধরনের প্রাণী ও মানুষ পরিপূর্ণ এগুলি।

এসব জনপদের বসবাসকারী নরনারীরা যে সমস্ত নদীর জল পান করে থাকে তারা হল– মহানদী, সুব, তামসী, শ্যামা, শিখিমালা, ভদ্রানদী, শাকবতী, চন্দ্রাবতী, সমুদ্রমালা, চঞ্চাবতী, নন্দিনী, কালিন্দী, ভারতী, শীতোদা, পতিকা, বিশালা, পীবরী ইত্যাদি অসংখ্য নদ নদী। এই নদীগুলি এবং অনেক সরোবরের জল জনপদবাসীরা পান করে। সমস্ত নদনদীগুলোই পুণ্য জলে পূর্ণ, ঋষি ও সিদ্ধজন সেবিত। কেতুমাল এরূপ জনপদে সমৃদ্ধ, রত্নে পরিপূর্ণ, সবসময় আনন্দিত ও মঙ্গলময়। ধনীরা সেখানে থাকে বলে ঐ মহাদ্বীপ বিশেষ সমৃদ্ধ। হে দ্বিজগণ আমি কেতুমাল বাসীদের সমস্ত বিবরণ জানালাম।

.

ছেচল্লিশতম অধ্যায়।

শাংপায়ন বললেন–হে প্রভু! আপনি পূর্ব ও পশ্চিমদিকের দুটি মহাদেশের বিবরণ বললেন। এবার উত্তর ও দক্ষিণ দিকের বর্ষগুলোর ও পর্বতবাসীদের বৃত্তান্ত বলুন। সূত বললেন–শ্বেত পর্বতের দক্ষিণে ও নীলাচলের উত্তরে রমণক নামে একটি বর্ষ আছে। সেখানে যেসব মানুষ জন্ম নেয়, তারা সব ঋতুতে সমান কামফল উপভোগ করে। তারা প্রিয়দর্শন, বিশুদ্ধ। তাদের জরা রোগ ইত্যাদি নেই। সেখানে একটি মহাবৃক্ষ আছে, নাম রোহিন। সেখানকার লোকেরা সেই গাছের ফলের রস পান করে বেঁচে থাকে ও দশহাজার দশ শত বছর বেঁচে থাকে। সেই সব মহাভাগ্যশালী লোকেরা সব সময়ই সন্তুষ্টচিত্ত। শ্বেতজলের উত্তরে ও শৃঙ্গাচলের দক্ষিণে হিরন্বত নামে এক বর্ষ আছে। ঐ দেশের মধ্যে দিয়ে হিরন্বতী নদী বয়ে চলে। এই দেশের সব মানুষ মহাবল, সুতেজী, ধনী ও প্রিয়দর্শন। এই সব মানুষের আয়ু এগারো হাজার একশো পঞ্চাশ।

ঐ দেশে লুকুচ নামে এক মহাবৃক্ষ আছে, এটি ছটি রসের আশ্রয়। তার ফলের রস পান করে ঐ বর্ষবাসী মানুষেরা জীবনধারণ করে থাকেন। এখানকার পর্বতের তিনটি মহান চুড়া রয়েছে।

একটি চুড়া মণিময়। আরেকটি চুড়া হিরন্ময় ও অন্যটি রত্নময়। নানা ভবন ও পুরীতে শেষ শৃঙ্গটি পূর্ণ।

উত্তর সমুদ্রের দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের কাছে পুণ্য কুরুবর্ষ আছে। এখানকার গাছগুলি সকল সময় ফুলে ফলে পরিপূর্ণ। ফলগুলি মধুময়। এই সব গাছগুলি থেকে নিত্য বস্ত্র ও অলংকার পাওয়া যায়। এই গাছগুলি উত্তম গন্ধ, বর্ণ ও রসে পূর্ণ। মধু এই গাছে জন্মায়। কতগুলো ক্ষীরিবৃক্ষ আছে, তারা দেখতে মনোহর সব সময় ক্ষীর ক্ষরণ করে থাকে। এখানকার ভূমি সমস্তই মণিময় বালুকার মতো। সোনার গুঁড়ো দিয়ে ঢাকা। এসব জায়গা নিষ্কলঙ্ক, ধুলি ময়লাহীন। দেবলোক থেকে এসে মানুষেরা এখানে জন্মগ্রহণ করে। মানুষেরা সবাই অভিজাত, ধনী ও স্থির যৌবনা। এখানকার রমণী মনোহারিণী। স্ত্রী পুরুষ সবাই ক্ষীরিগাছের অমৃত পান করে। নরনারী একসাথে জন্ম নেয়। এক সাথে বেড়ে ওঠে। তাদের রোগ নেই। শোক নেই। সেখানকার অধিবাসী পুরুষরা তেরো হাজার একশো পঞ্চাশ দিন জীবনধারণ করে। এরা কখনো পরস্ত্রী সম্ভোগ করে না।

এরপর উত্তর কুরুবর্ষের বিবরণ বলছি। এই দেশে দুটি খুব উঁচু পাহাড় আছে। এগুলোতে ছোট-বড় অনেক গুহা ও ঝর্ণা আছে। এখানে বহু কুঞ্জ, বন, চিত্র বিচিত্র ধাতুরাগে রঞ্জিত। বহু ধাতু অনেক ফল ফুল দিয়ে সাজানো। ঐ কুলাচল দুটোর নাম চন্দ্রকান্ত ও সূর্যকান্ত। দুই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ভদ্রসীমা নামে মহানদী বয়ে চলেছে।

এছাড়া অনেক নদী আছে। এসব নদীগুলো কুরুবর্ষবাসীদের স্নান, পান ও অবগাহনের জন্য, তারা পর্যাপ্ত জল বয়ে নিয়ে চলেছে। এদের মধ্যে কতগুলো নদী ক্ষীরবাহিনী, কতগুলি মধু ও মদ্যবাহিনী আর কতগুলি ঘৃতবাহিনী। এছাড়া ওখানে শত শত দধিদ, বহুসংখ্যাক সুস্বাদু অন্ন পর্বত ও অমৃতের মতো সুস্বাদু নানা রকম ফল রয়েছে। সেখানে হাজার হাজার ফুল। তমাল, অগুরু ও চন্দনের হাজার হাজার বনভূমি। ভ্রমর গুঞ্জনে মুখরিত গাছ, লতাপাতা যুক্ত সুন্দর বন পাখিদের কূজন মুখরিত পদ্ম সরোবর। সোনামণিরত্নযুক্ত দিয়ে সাজানো সুন্দর উদ্যান ও বহু শিলাগৃহ, লতাগৃহ ইত্যাদি আছে। সুন্দর মণিময় অট্টালিকা আছে, সেখানকার শত সহস্র কল্পবৃক্ষ ঐসব ফল প্রসব করে থাকে। ঐ বর্ষের সব জায়গাতে উদ্যান ও নগর রয়েছে। সমস্ত দ্বীপ নরনারী সমাকুল। স্বর্গচ্যুত মানুষেরাই এখানে জন্ম নেয়। সেই মনোহর জায়গাটিকে ভৌম স্বর্গ বলা হয়। পূর্বদেশ থেকে যে নরশ্রেষ্ঠরা এসেছেন, তাঁরা চাঁদের মতো কান্তিযুক্ত এবং অধিবাসী প্রজারা সূর্যের মতো কান্তিশালী। এরা যথাক্রমে শ্যামা ও শ্যাখাবদাত ও সবাই সুখভোগে নিমগ্ন। ঐসব দেশের নরগণ দেবতাদের মত পরাক্রান্ত, সুপ্রভ।

বালা, হার, কানের দুল এদের গয়না, মালা, মুকুটে সজ্জিত। এরা স্থির যৌবন, প্রিয়দর্শন। ঐ প্রজারা বহু হাজার হাজার বছর জীবনধারণ করে। এরা প্রসবধর্মী নয়, এদের বংশক্ষয় নেই। সেখানকার গাছগুলি থেকে যমজ নরনারী জন্মায়। এখানে ধর্ম বা অধর্ম কিছুই নেই। ব্যাধি, জরা ক্লান্তি সেখানে নেই। সময় শেষ হলে এখানে সকল জন বুদবুদের মতোই নষ্ট হয়ে যায়। সর্ব দুঃখ মুক্ত ও সুখভোগী উত্তর কুরুর দক্ষিণপাশে চন্দ্রদ্বীপ নামে এক বিখ্যাত সুরনিবাস আছে। সাগরের ঢেউ-এ ঘেরা, জল শব্দ মুখরিত। ঐ দ্বীপ নানা ফুলে ফলে ভরা, পরম সমৃদ্ধি সম্পন্ন।

এর বিস্তার হাজার যোজন আয়তন। এর মাঝে কুমুদ্রপ্রভ নামে এক সিদ্ধ চারণসেবিত পর্বত আছে। এটি চন্দ্রাভ, চন্দ্রাকার, সুলক্ষণযুক্ত, শ্বেতবর্ণ, কুমুদ দিয়ে চিত্রিত। এর ভেতরে নানা উদ্যান, ঝর্না, গুহা রয়েছে। ঐ পাহাড় থেকে চন্দ্রাবতী নামে একটি তরঙ্গময় উত্তম নদী বয়ে চলেছে। ঐ নদীর জল চাঁদের কিরণের মতো বিমল, এই নদী চন্দ্রমার প্রধান স্থান। গ্রহনেতা চন্দ্রমা ঐ নদীতে সবসময়ই নেমে থাকেন। ওখানে চন্দ্রমা নামে একটি মহাপর্বত এবং স্বর্গ-মর্ত্য দু জায়গাতেই মহাদ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ প্রকাশ পাচ্ছে। চাঁদের কান্তি সম্পন্ন, পূর্ণ চন্দ্রের মতা মুখমণ্ডলধারী ধার্মিক, প্রিয়দর্শন তারা সবাই সদাচারী এক হাজার বছর বেঁচে থাকে।

পশ্চিমদিকে নানা ফুলে ভরা একটি দ্বীপ আছে। এটি পশ্চিম দ্বীপ নামে খ্যাত, নাম ভদ্রাকর। ধনধান্যে ভরা এই দ্বীপের পালন ভার রাজাদের ওপর। এই দ্বীপে ভগবান বায়ুর একটি নানা রত্নময় ভদ্রাসন আছে। সেখানে পর্বে পর্বে মূর্তিমান বায়ু পূজিত হয়ে থাকেন। সেখানে যেসব রাজা বাস করেন, তাদের গাত্র বর্ণ সোনার মতো। সোনার অলংকারে সজ্জিত, দেবসদৃশ রাজাদের আয়ুর পরিমাণ পাঁচশো বছর। তারা ভাগ্যবান, সত্য প্রতিজ্ঞ।

ঋষিরা সূতকে বললেন–এই যে ভারতবর্ষ, যেখানে স্বয়ম্ভুবাদি, চোদ্দজন মনু প্রজাসৃষ্টির ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন, সেই ভারত বিষয়ে আমরা জানতে চাই। সূত বললেন–হিমালয়ের দক্ষিণ দিকের উঁচু দেশ পূর্ব ও পশ্চিম আয়ত। এর দক্ষিণ দিকে পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ। এটি বিচিত্র, শুভাশুভ ফলের উৎপাদন। সেখানকার প্রজারা ভারতী প্রজা নামে বিখ্যাত। মনু এখানকার প্রজাদের ভরণ ভারণের ফলে ভরত নামে অভিহিত হন। এই ভারতবর্ষেরই স্বর্গ, মোক্ষ বা মধ্য ও অন্তগতি লাভ করে থাকে। এই জায়গা ছাড়া অন্য কোন ভূমিতেই মর্ত্য বাসীদের কাজের ব্যবস্থা নেই। এই ভারতবর্ষের নটি বিভাগ আছে। ঐসব বিভাগ বা দ্বীপের মাঝে সমুদ্র আছে। সুতরাং সমুদ্র পার হয়ে অন্য দ্বীপে যাওয়া যায় না। ইন্দ্রদ্বীপে, কুমেরু,

তাম্রপানী, পতস্তিমান, নাগদ্বীপ, মোখ্য, গন্ধর্ব ও বারুন, এবং নবম। এটি কুমরিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত আয়ত ও নয় হাজার যোজন পর্যন্ত উত্তরদিকে তির্যক ভাবে বিস্তীর্ণ।

এর শেষ সীমাতে ম্লেচ্ছ জাতির বাস। পূর্ব দিকে কিরাতদের ও পশ্চিম দিকে যবনদের বাস। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র-এর মাঝে বিভাগ রয়েছে। এইসব বর্ণের পারস্পরিক ব্যবহার, ধর্ম, অর্থ ও কামযুক্ত। এই ভারতবর্ষেই পাঁচ আশ্রম যথাবিধি প্রতিপালিত হয়। এই ভারতবর্ষে সাতটি সুপর্ব বিশিষ্ট পর্বত বিখ্যাত। এদের নাম, মহেন্দ্র মলয় সহ্য সুক্তিমাম, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পরিযাত্র, এদের সঙ্গে আরও হাজার হাজার পর্বত আছে। এরা সমস্ত গুণের আকর, বিচিত্র সানুযুক্ত। এদের মধ্যে মন্দর, বৈহার, কোলাহল, সুরস, মৈনাক, বৈদ্যুত, পুষ্পগিরি, কৃষ্ণগিরি, রৈবতক, শ্রী পর্বত, করু ও কূট শৈল প্রভৃতি। এই পর্বতগুলো থেকে আরও ছোট ছোট পর্বত এসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদে এসে মিশেছে। আর্য ও ম্লেচ্ছ জাতিরা এই জনপদে বাস করে। তারা যেসব নদীর জল পান করে তাদের–নাম হল গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, ইরাবতী, সরযু, বিতস্তা, বৃহু, গোমতী, গণ্ডকী, কৌশিকী, ইক্ষু, লোহিত প্রভৃতি। এইসব নদী ও নদগুলো হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। বেদশ্রুতি, বেদবতী, বিদিশা, বন্দনা, সিন্ধু, শিপ্রা, অবন্তী–এই সব নদী পর্বত্র থেকে বেরিয়েছে। মহানদ শোল, নর্মদা, মন্দাকিনী, করতোয়া, তমসব–এসব নদী মণিনিভ এবং ঋক্ষপাদ হতে বয়ে চলেছে। তাপী, ভদ্রা, বৈতরণী, শিতিবাহু, মহাগৌরী, দুর্গা, অন্তরশীলা এইসব নদী বিন্ধ্যপর্বত থেকে বয়ে এসেছে।

গোদাবরী, ভীমরথা, কৃষ্ণা, বগুলা, তুঙ্গভদ্রা, কাবেরী এই দক্ষিণা পথ প্রবাহিণী নদী সহ্যপাদ থেকে এসেছে। কৃতমালা তাম্রবণী, পুষ্পজাতী ও উৎপলাবতী এই নদীগুলো মলয় পর্বতের পাদদেশ থেকে এসেছে। ত্রিযামা, ইক্ষলা, ত্রিদিবা, লাঙ্গুলিনী ও বরবাধরা এই নদীগুলো মহেন্দ্র পর্বত থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ঋচীকা, সুকুমারী, মন্দগা, মন্দবাহিনী, কৃপা ও পশিলী এই নদীগুলো শুক্তিমৎ প্রভবা এই গঙ্গা প্রভৃতি নদীগুলোকে পুণ্য জলশালিনী, সমুদ্রগামী বিশ্ব মাতৃকল্পা ও জগৎ পাপহরা বলে।

এদের শাখা-প্রশাখা থেকে শত সহস্র নদী উপনদী সৃষ্টি হয়েছে। ঐ নদী উপনদীর কতগুলো কুরুজঙ্গলে বয়ে চলেছে। এভাবে কতগুলি সম্বদেশে, কতগুলো জঙ্গলে, কতকগুলো শূরসেনে, কিছু ভদ্রাকারে, কিছু বোধ দেশে, কিছু বংশদেশে, কিছু নদী কুন্তরে, কিছু নদী মগধে আর কতগুলো মধ্যদেশে বয়ে চলেছে। সহ্যাদ্রির উত্তরদিক যেখানে গোদাবরী নদী বয়ে চলেছে, সেই জায়গাটি সমস্ত পৃথিবীর প্রদেশগুলোর মধ্যে মনোরম। এখানেই সুররাজ

গোবর্ধন নামে এক পুরী নির্মাণ করেন। ভগবান ভরদ্বাজ মুনি রামচন্দ্রের প্রিয় পর্বত, বৃক্ষ, ওষধি প্রভৃতি অবতারিত করেন। রামচন্দ্র অন্তঃপুরচারিণীরদের জন্য তৈরী করেন বাহ্লীক, আভীর, শুদ্র, চর্মিণ্ডিক, গাধার, যবন, শক, হ্রদ, রুদ্ধ কটক, আত্রেয় ইত্যাদি দেশগুলো উদীজ।

প্রাচ্যদেশীয় জনপদ হল অন্ধ্র, অন্তর্গিরি প্রবঙ্গ, বঙ্গেয়, ভার্গব, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, মাল, মগধ, ইত্যাদি। দক্ষিণা পথের জনপদগুলো পাণ্ড, কেরল, চৌল্য, কুল্য, সেতুক, মূষিক কুমন, বন বাসিক, মহারাষ্ট্র, বর, পুলিন্দ, বৈদর্ভ, দণ্ডক, পৌণিক, কুণ্ডল ইত্যাদি অন্য দক্ষিণাত্য দেশগুলি হল ভোলবর্ণ, দুর্গ, কালিতক, মুরাল, রূপস, তাপস, পরক্ষর, নাসক্য ইত্যাদি। নর্মদা নদীতীরে দেশগুলো হল ভানুকচ্ছ, শার্দ্ধত, কচ্ছীয়, নর্তন।

অবুদ ও সম্পরীত, এবার বিন্ধ্যাচলের দেশগুলোর নাম শুনুন–মানব, করুষ, রোকল, উত্তাল, উত্তমান, রসাণ, ভোজ, কিষ্কিন্ধ্যা, তোষণ, কোশল, ত্রৈপুর, বৈদিক, তুমুর, তুম্বুর, অষ্টসুর, নৈষধ, অনুপ, তুন্তিকের, বীতিহোত্র ও অবন্তী এই সব জনপদ বিন্ধ্যের ওপর রয়েছে। এবার পর্বতাশ্রয়ী দেশ গুলো হল নিগহর, হাংসমাগি, ক্ষুপন যশ, হূণ, কিরাত, মালব ইত্যাদি।

.

সাতচল্লিশতম অধ্যায়

ঋষিরা অন্যান্য বিষয়ে আরো শুনতে ইচ্ছা করলেন ও আনন্দের সাথে লোমহর্ষণকে জিজ্ঞাসা করলেন–হে সূত! যেমন ভারতবর্ষের কথা বললেন–সেই ভাবেই কিশুরুষ ও হরিবর্ষের কথা বলুন। সূত বললেন–হে বিপ্রগণ, আপনাদের যা শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে আমি তার বিস্তৃত বিবরণ বলছি, আপনারা আনন্দের সাথে তা শুনুন। কিম্পুরুষবর্ষে নন্দনের মতো সুমহান প্লক্ষখণ্ড রয়েছে। সেখানকার লোকেদের আয়ু দশহাজার বছর। লোকেদের গায়ের রং সোনার মত। স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী, সকলেই সেখানে শোকহীন, শুদ্ধচিত্ত ও তপ্ত কাঞ্চনের মত উজ্জ্বল তাদের শরীর। পবিত্র এই দেশে মধুস্রাবী সাদা ফুলের গাছ আছে। সবাই তার রস পান করে।

এবার হরিবর্ষের বিবরণ বলছি–এরা সবাই দেবাকৃতি সম্পন্ন। এরা মধুর ইক্ষুরস পান করে। মানুষের আয়ুর পরিমাণ এগারো হাজার বছর। এখানে কেউ জরা বা জীর্ণদশা ভোগ করে না। আমি যে মধ্যম বর্ষ ইলাবৃতের কথা বলেছি, সেখানে সূর্য তাপ দেয় না বা মানুষ কখনো জীর্ণ হয় না। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র সমস্তই ইলাবৃতে অপ্রকাশিত মানবেরা, সেখানে পদ্মপ্রভ, পদ্মবর্ণ,

পদ্মপত্রের মতো চোখ, তারা জমুফলরস পান করে থাকে। তাদের জরামৃত্যু নেই। তারা মনস্বী, ভোগ নিরত ও তারা দেবলোক থেকে এসেছে। সেখানে নরোত্তমেরা তেরো হাজার বছর জীবনধারণ করে। মেরুগিরির পূর্বদিকে নয় হাজার যোজন বিস্তৃত ভূভাগে ইলাবৃতবর্ষের লোকেরা বাস করে।

এই বর্ষটি ছাব্বিশ হাজার যোজন বিস্তৃত। মেরুর পশ্চিমভাগ নয় হাজার যোজন পরিমাণ, সেখানে চৌত্রিশ হাজার যোজন ধরে গন্ধমাদন পর্বত আছে। এটি উত্তর ও দক্ষিণ দিকে নীল ও নিষধাচল পর্যন্ত আয়ত। ভূপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতার পরিমাণ চল্লিশ হাজার যোজন, এটি ভূগর্ভে এক হাজার যোজন ঢুকে পড়েছে। এর পূর্ব দিকে মাল্যবান পর্বত। ঐ পাহাড়ের পরিমাণ গন্ধমাদনের মতোই বিশাল, দক্ষিণে নীলাচল, উত্তরে নিষ্ঠাচল আর ঐ গন্ধমাদন ও মাল্যবান এদের মধ্যে মহামেরু আছে।

নিষধাচলের উত্তরদিকে সুমেরুর দক্ষিণ পাশে এক জম্বুরসবতী নদী বয়ে গেছে। সেখানে সুদর্শন। নামে এক মহাজম্বুগাছ আছে। এটি ফুল ফলে সাজানো, সিদ্ধ ও চারণদের দ্বারা সেবিত। ঐ দ্বীপে অন্য এক মহান বনস্পতি আছে। ঐ বনস্পতি সাত হাজার যোজন বিস্তৃত, তত্ত্বদর্শী ঋষিরা বলেন, ঐ গাছের একটি ফলের পরিমাণ আটশো ষাট আরতি। ঐসব ফল মাটিতে পড়লে মহাশব্দ হয়। এদের রস প্রবাহ নদীর আকারে বয়ে চলেছে। আর মেরু গিরিকে প্রদক্ষিণ করে জম্বু গাছের নীচে প্রবেশ করেছে। সেখানে অধিবাসীরা আনন্দের সঙ্গে ঐ গাছের রস পান করে। কারণ এই গাছের রস পান করলে জরা, ব্যাধি, ক্রোধ বা মৃত্যুকে জয় করা যায়। সেখানে জন্ধুনদ নামে বিশুদ্ধ সোনা জন্মায়। সমস্ত বর্ষবৃক্ষের মধ্যে এই ফুলের রসই সুমধুর, রুক্ষ, পিশাচ, যক্ষ, হিমালয়বাসী গন্ধর্ব, অপ্সরা, শেষ বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি সমস্ত নাগ নিষধাচলে থাকে। তেত্রিশ সংখ্যক যাজ্ঞিক সুর মহামেরুর ওপরে ঘুরে বেড়ায়, বৈদূর্য্যময় নীলাচলে অনল, সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিরা রয়েছেন। শ্বেতগিরি দৈত্য ও দানবের বাসভূমি। শৃঙ্গবান পর্বত পিতাদের আবাসস্থান, বিভাগ ক্রমে যে ন-টি বর্ষ, সেখানে পতিশীল ভূতগণ সব সময় থাকে। চেষ্টা করেও তার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না।

.

আটচল্লিশতম অধ্যায়।

সূত বললেন–হিমালয়ের মাঝে কৈলাস নামক এক পর্বত আছে। সেখানে শ্রীমান কুবের রাক্ষসদের সাথে থাকেন, লঙ্কাপতি কৈলাসে অপ্সরাদের সাথে সব সময়ই আমোদ আহ্লাদ

করে থাকেন। কৈলাস পর্বতের পাদদেশ থেকে শরতের জলের মত পবিত্র, শীতল জল উৎপন্ন হয়। এখান থেকেই শুভ মন্দাকিনী নামের দিব্য নদী উৎপন্ন হয়েছে। নদীর তীরে একটি বিরাট নন্দন বন আছে। কৈলাস পর্বতের পূর্ব-উত্তর দিকে চন্দ্রপ্রভ নামে এক রত্ন সন্নিভ পর্বত আছে, ঐ পর্বতে দিব্য সত্ত্ব ও ঔষাধাদি যুক্ত নানা ঋতু রয়েছে। এর নীচের দিকে আচ্ছাদন নামে একটি পবিত্র নদী বয়ে গেছে। সেই নদীর তীরে চৈর রথ নামে প্রসিদ্ধ বন আছে। পূর্বে বলা হয়েছে যে চন্দ্রপ্রভ পর্বতের কথা সেখানে যক্ষসেনাপতি মণিভদ্র অনুচর সহচর নিয়ে বাস করেন।

কৈলাস পাহাড়ের দক্ষিণ-পূর্বে সূর্যপ্রভ নামে এক বিশাল পর্বত আছে। এটি দেখতে লোহিতাকার আর শৃঙ্গগুলো সোনা দিয়ে নির্ণীত। এই সূর্য প্রভ পর্বতের নীচের দিকে লোহিত নামে একটি মহৎ দিব্য সরোবর আছে। ঐ সরোবর থেকে লোহিত্য নামে এক পুণ্য মহানদী বয়ে চলেছে। তার তীরে বিশোক নামে এক মহাবন রয়েছে এই বন দেবতাদের লীলাস্থান। ঐ পর্বতের ওপরে মণিবর নামে এক যক্ষরাজ বাস করেন, সৌম্য, সুমিক গুহ্যকেরা তাকে ঘিরে থাকে। কৈলাস পর্বতের দক্ষিণ পাশে বৃত্রকায়ত থেকে জাত ক্রুর জন্তা ও ওষধিযুক্ত অজ্ঞানাচলের বিশাল বৈদ্যুৎপতি রয়েছে। তার পাশে পবিত্র মানস সরোবর। মানস থেকে সরয়ু নদী উদ্ভূত, এর তীরে বন আছে। ঐ বনে কুবেরের তীরে ব্রহ্মপাত নামে এক বিপুল বিক্রম রাক্ষস বাস করে। কৈলাসের পশ্চিমে, বিভিন্ন জন্তু ও ওষধি পরিপূর্ণ মেগাকার পাহাড় আছে।

এক নাম শ্রীবান পর্বত। স্বর্ণচূড়া নিয়ে পাহাড়টি যেন আকাশ ছুঁয়েছে। ঐ দুর্গম পর্বত সুবৃহৎ দেবভোগ্য ও হিমচিত, ঐ গিরির উপরিভাগে বাস করেন গিরিশ, এর পাদদেশ থেকে শৈলোদ নামে এর সরোবর উৎপন্ন হয়েছে। সেই সরোবর থেকে শৈলেদা নামে এক দিব্য নদী প্রবাহিত হয়েছে। ঐ নদী চক্ষু ও সীতা নদীর মধ্যে দিয়ে লবণ সাগরে প্রবেশ করেছে। এর তীরে রয়েছে সুরভি নামে বন। কৈলাস শৈলের উত্তরদিকে মঙ্গলময় প্রাণী ও ওষধিময় গৌর নামে পর্বত আছে। এটি হরিতালময়। এর নীচের দিকে সুন্দর স্বর্ণ বালুময় সরোবর আছে। এটি হরিতালময়। এর নীচের দিকে সুন্দর স্বর্ণ বালুকাময় সরোবর আছে। নাম বিন্দুসরা। রাজা ভাগীরথ সেখানে গিয়েছিলেন, এই রাজা গঙ্গার জন্য আরাধনা করেন। আমাদের পূর্বপুরুষরা গঙ্গাজলে প্লাবিত হয়ে স্বর্গ লাভ করবেন, এই ছিল তার সংকল্প।

দেবী ত্রিজথগা প্রথমে সেখানেই ছিলেন। এরপর তিনি সোমপাদ থেকে এসে সাতটি ভাগে ভাগ হয়ে সাতদিকে চলেন। ইন্দ্র সমস্ত দেবতাদের সাথে যজ্ঞ করে স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আকাশে

নক্ষত্র মণ্ডলের কাছে যে ছায়াপথ, তিনিই দেব ত্রিপথ গামিনী। স্বর্ণ অন্তরীক্ষ প্লাবিত করে ভূতলে এসেছেন। তিনি মহাদেবের মাথায় পতিত হয়ে বাঁধা পড়েন। মহাদেব রুষ্ট হলে মাটিতে যে কয়েক বিন্দু জল পড়েছিল, তাতেই সৃষ্ট বিন্দুমর।

দেবী গঙ্গা মহাদেবের কাছে বাঁধা পড়ে ভাবতে লাগলেন আমি কিভাবে মুক্তি পাব, তাহলে শঙ্করকে নিয়েই স্রোতের বেগে পাতাল প্রবেশ করি। মহাদেব এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে সতর্ক হলেন, নিজের মাথাতেই আটকে রাখলেন। তিনি দেখলেন রোগ জীর্ণ চেহারায় রাজা ভগীরথকে সামনে দাঁড়িয়ে দেখে বুঝলেন ভগীরথ গঙ্গার জন্য আমায় তুষ্ট করেছিলেন। তাই এঁকে বরদান করা উচিত। তখন গঙ্গাকে তিনি সতেজ ত্যাগ করলেন পরে সেই গঙ্গার ধারা সাতটি ভাগে ভাগ হয়। নলিনী, হ্রাদিনী ও পাবনী এই তিনধারা পূর্বদিকে, সীতা, চক্ষু সিন্ধু এই তিনটে ধারা পশ্চিম দিকে বয়ে গেছে।

এজন্যই গঙ্গা ভাগিরথী নামে পরিচিত হয়ে লবণ সাগরে প্রবেশ করেন। গঙ্গার এই সাতটি ধারাই বিস্তীর্ণ প্লাবিত করছে। বিন্দু সরোবর থেকে সাতটি নদী বেরিয়েছে। এরা নানা দেশ প্লাবিত করে বয়ে চলেছে। এই সাত নদী সিরীন্ধ্র কুন্তল, চীন, বর্বর, যবন দ্রুহ ও রুথান, কলিন্দ ও অঙ্গ লোকে উপস্থিত হয়েছে। গঙ্গার শীতল ধারা সিন্ধু ও অরুদেশকে দুভাগে ভাগ করে পশ্চিম সাগরে প্রবেশ করেছে। চম্বুনাথের ধারাটি চীন, অরু, তঙ্গন, অন্দ্র, তুষার প্রভৃতি অসংখ্য জনপদকে প্লাবিত করেছে। দরদ, কাশ্মীর, গান্ধার, বরক, হ্রদ, শিবগৌরী প্রভৃতি সিদ্ধচারণ সেবিত দেশগুলো ও কুরু, ভরত, পাঞ্চাল, কোশল, কাশী, মৎস্য, মগধ, উরগ, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত এই সবলোক ও জনপদগুলোকে গঙ্গানদী পবিত্র করেছে এবং বিন্ধ্যাচলে বাধা পেয়ে দক্ষিণ সাগরে প্রবেশ করেছে।

নলিনী ধারা সবেগে পূর্বদিকে বয়ে চলেছে। এই নদী তোমর, হংসমার্গ, হুহুক ও অন্যান্য পূর্বদেশগুলো প্লাবিত করেছে। এই ধারাই বহু পর্বতভেদ করেছে। গঙ্গার সাতধারা থেকে শত শত সহস্র নদী উপনদী বেরিয়ে তাদের সাথে মেঘেরা এসে মিলেছে। জম্বাক সাগর তীরে সুরভিত বন প্রদেশে হরিশৃঙ্গে বিদ্বান, কৌবেরক, জিতেন্দ্রিয় চারজন কুবেরের অনুচর বাস করেন। তারা হলেন যজ্ঞোপেত অমিতেজা সুমহান ও সুবিক্রম, এঁরা অগস্ত্য বংশীয় বিদ্বান, সকলেই কুবেরের সমকক্ষ, পর্বত বাসীদের সমৃদ্ধি ভাবে প্রসিদ্ধ। হেমকূটের আগে সায়ন নামে এক সরোবর আছে। ঐ সরোবর থেকে মনস্বিনী জ্যোতিষ্মতী নদী উৎপন্ন হয়েছে। নিষাধচলে বিষ্ণুপাদ নামে সরোবর আছে। মেরুর পেছনে চন্দ্রপ্রভ নামে একটি বিশাল হ্রদ আছে। তা থেকে পবিত্র জম্বুনদী প্রবাহিত। নীলাচলে পায়াদ নামে এক পদ্মফুল ভরা শুভ্র সরোবর আছে,

তা থেকে পুণ্ডরীকা ও পয়োদা নামে দুটি নদী নির্গত হয়েছে। শ্বেত পর্বত থেকে উত্তর মানস নামে পুণ্য সরোবর উৎপন্ন হয়েছে। জ্যোৎস্না ও মৃগকান্তা নামে এর দুটি শাখা। সেখানে পদ্ম, মাছ ও পাখিতে পূর্ণ আরো একটি সরোবর আছে। এটি মধু রসে ভরা, কল্পবৃক্ষ নিয়ে সব দিক থেকে সুখী। এর নাম রুদ্রকান্ত, স্বয়ং ভবদের সৃষ্টি করেছেন, এছাড়া পদ্ম, মাছ নানা পাখিতে পরিপূর্ণ আরো বিখ্যাত হ্রদ এখানে আছে। ঐসব হ্রদ জয় নামে অভিহিত। ঐসব হ্রদ থেকে শান্তি ও বাকী নামে দুটি নদী উৎপন্ন হয়েছে। কিশুরুষ ইত্যাদি বর্ষগুলোতে দেবতা বৃষ্টি বর্ষণ করেন না। সেখানে প্রধান প্রধান নদীগুলো সব উদ্বৃত্ত জলরাশি বয়ে নিয়ে চলে।

ঋষ্য, মহাগিরি, ধুম্র, চন্দ্রকল্ক প্রভৃতি পাহাড় দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরদিকের শেষ সীমা পর্যন্ত। প্রসারিত হয়ে ক্ষীরসাগরে মিশেছে। চক্র, মৈনাক প্রভৃতি দক্ষিণ সমুদ্রে মিশেছে। চন্দ্র ও মৈনাক পাহাড়ের মধ্যভাগে সম্বর্তক নামে এক অগ্নি আছে এই অগ্নিরই নামান্তর সদ্রপ, বড়বামুখ ও শ্রীমান ঔর্য। বারোটি পর্বত মহেন্দ্রের পাখা ছেদনের ভয়ে ভীত হয়ে তখন লবণ সাগরে প্রবেশ করেছিল। শুভ্রবর্ণ চাঁদের মধ্যে যে কালো রঙের শশকাকৃতি দেখা যায়, তাকে ভারতবর্ষেরই প্রতিবিম্ব বলে। অন্য জায়গায় উদিত হলে চাঁদের মধ্যে অন্যান্য দেশের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, নানা জাতীয় দেশগুলোতে বাস করছে।

.

ঊনপঞ্চাশতম অধ্যায়

সূত বললেন–ভারতবর্ষের দক্ষিণে অযুত যোজন দূরে একটি মহাসাগর রয়েছে। ঐ মহাসাগর তিন হাজার যোজন আয়ত, এর তিনভাগ বিস্তীর্ণ স্থানে নানা ফুল, ফল নিয়ে বিদ্যুত্বান্ নামে এক বিরাট পর্বতকুল পর্বত রূপে বিরাজ করছে। পর্বতের চূড়াগুলো দিয়ে দ্বীপটি সাজানো। ঐ দ্বীপে স্বচ্ছ ও স্বাদুজল নিয়ে হাজার হাজার নদী বয়ে চলেছে। বিদ্যুত্বা নামে কুল পর্বতের চারিদিকে বিস্তীর্ণ ও আয়ত গুহাগুলোতে নানা আকারযুক্ত সমৃদ্ধ ও আনন্দিত স্ত্রী পুরুষরা রয়েছে। ঐ পর্বতের নীচের দিকে ও মধ্যভাগে শত, সহস্র পুরী রয়েছে। এরা পরস্পর দ্বার বিশিষ্ট। সেখানে প্রজারা জন্মের সময় থেকে গোঁফ দাড়ি সম্পন্ন, তারা নীল মেঘের মত ও আশী বছর আয়ু সম্পন্ন। ঐ প্রজাদের কেউ কেউ ফল মূল, লতাপাতা খেয়ে থাকে। এরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুকে দ্বীপটি পরিপূর্ণ। এখন অন্তরদ্বীপের বিবরণ বলা হচ্ছে। অন্তরদ্বীপগুলো বিশাল আয়তন ও বহু প্রাণীপূর্ণ।

বর্হিনদ্বী বর্ষ হাজার হাজার ছোটো দ্বীপ ও নানা বস্তুর আকরা এমন আরও দুটি দ্বীপ আছে। তারা জম্বুদ্বীপ থেকে উন্নত। এখন যে দ্বীপের কথা বলা হচ্ছে সেই দ্বীপগুলো নানা রত্নের আকর, এই দ্বীপ বহু নদী ও শৈল বনে সাজানো এবং এটি লবণ জলধির মত। এখানে অনেক ঝর্না ও গুহা নিয়ে চক্রগিরিনামে এক পর্বত আছে। পর্বতের গুহায় অনেক জন্তুর বাস। দ্বীপগুলি হল অঙ্গদ্বীপ, যমদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, এর মধ্যে অঙ্গদ্বীপ বিরাট বড় ও সোনা প্রভৃতির আকর।

তাছাড়া যমদ্বীপেও নানা ধনরত্ন আছে। এখানে ধাতুমণ্ডিত দ্যুতিমান নামে পর্বত আছে। মলয় দ্বীপটিও খুব উঁচু, এটি সোনা, মণি, রত্ন ও চন্দনের আকর। দ্বীপটি নদী পাহাড় ভূষিত। এটি রজত সকলের আকর। এখানে মহামলয় নামেও আর একটি বিখ্যাত পর্বত আছে। দেবাসুর পুজ্য অগস্ত্য ঋষি এই পর্বতে বাস করেন। মলয়ের মতো আরও একটি পর্বত আছে তার নাম কাঞ্চন পাদ। ঐ পাহাড় ঘাসপাতা ও সোমলতা নিকুঞ্জ দিয়ে আশ্রম তৈরী হয়েছে। এটি নানা ফুল, ফলে স্বর্গ থেকে ও সুন্দর শ্রী ধারণ করেছে। এখানেই পতি পর্বে স্বর্গভূমি অবতরণ করে থাকে।

নানা ধাতুতে পূর্ণ ত্রিকূট পাহাড়। এই পাহাড় বহু যোজন বিস্তৃত। গুহাগুলি বিচিত্র। এই পাহাড়ে সোনার প্রাচীর ও তোরণ দিয়ে রমণীয় মনোহর সৌধ রয়েছে। এই সব প্রাসাদ একশো যোজন বিস্তৃত ত্রিশ যোজন আয়ত। এখানেই লঙ্কা নামে মহাপুরী আছে। এই পুরী কামরুপী বলদৃপ্ত মহাত্মা দেবদেবী রাক্ষসদের আবাসস্থল। মানুষের প্রবেশযোগ্য নয়। কেউ ওখানে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। ঐ লঙ্কা দ্বীপের পূর্বে সাগরতীরে গোকর্ণ শিবের প্রধান আবাসস্থল আছে।

শঙ্খদ্বীপে একটি রাজ্য আছে। এটি একশো যোজন বিস্তীর্ণ ও সেখানে প্রচুর ম্লেচ্ছ জাতির বাস। সেখানে শঙ্খের মতো শুভ্র নানা রত্নময় পর্বত আছে। এই শঙ্খগিরি থেকে শঙ্খনাগ নামে একটি পুণ্য নদী বয়ে চলেছে। শঙ্খ মুখ নামে নাগরাজ সেখানে বাসস্থান তৈরী করে রয়েছেন। এরপর কুমুদ নামে দ্বীপ রয়েছে। এখানে পুণ্যজনের বাস। সেখানে মহাভাগা কুমুদ নামে মহাদেবের বোন নিজের প্রভা নিয়ে সবার পূজ্য হয়েছেন।

এভাবে নানা অধিষ্ঠান নিয়ে সজ্জিত বহারদ্বীপেও নানান ম্লেচ্ছ ও অন্যান্য বহু জাতির বাসস্থান রয়েছে। এই দ্বীপটি উঁচু ও ধনধান্যে ভরা। সেখানে ধার্মিক লোকেরা বাস করে থাকেন। এখানে বরাহ নামে পর্বত রয়েছে। বিচিত্র নদী, দ্বীপ, পাহাড়, বন, অনেক ফুল ফল ও শিলাতে রমণীয় অনেক গুহা, নদী দিয়ে এটি সবসময় শোভিত, সরস জলে ভরা পবিত্র তীর্থ, তরঙ্গিনী

বরদা বারাহী নামে মহানদী এই বরাহ পর্বত থেকে উৎপত্তি হয়েছে। বরাহ-ই সর্বদেবময়। তাই বিপ্রেরা বরাহরূপী বিষ্ণুকে প্রণাম করে থাকেন। চারটি দ্বীপের কথা বললাম, ভারত দ্বীপ দক্ষিণে বহু বিস্তৃত। এই ভারতবর্ষেই অনেক দ্বীপ আছে। সমুদ্রজলে অনেক ভাগ হয়ে গেছে। চারটি দ্বীপ জম্বুদ্বীপের বিস্তার ও তার অনুদ্বীপের বর্ণনা, আমি আগেই ভালভাবে করেছি।

.

পঞ্চদশ অধ্যায়

সূত বললেন–হে দ্বিজোত্তম, এবার আমার যেমন জানা আছে সেভাবে প্লদ্বীপের বর্ণনা করছি। প্লক্ষদ্বীপের বিস্তার জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ। এবার এর চারদিকের বিশালতা তার থেকে দ্বিগুণ। এই দ্বীপই লবণ সাগরকে ঘিরে রেখেছে। জনপদগুলি খুব পবিত্র প্রজারা দীর্ঘায়ুযুক্ত। এখানে দুর্ভিক্ষ, জরা কিংবা ব্যাধি ভয় নেই। মণিময় সাতটি পর্বত ও নানা রত্নময় নদীগুলো রয়েছে। সাতটি দ্বীপের প্রত্যেক দিকেই সাতটি করে পর্বত রয়েছে। প্রথমটির নাম গোমেদক পর্বত। এটি মেঘের মত। দ্বিতীয়টির নাম চন্দ্রপর্বত। এই পর্বতে নাম ওষধি সবসময় রয়েছে। অমৃতের জন্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই পর্বতে ওষধি স্থাপন করেছেন। তৃতীয় নারদ পর্বত। এই পর্বতটি দুর্গশেল রূপে বিরাজ করছে। এটি খুব উঁচু নয়। এখানেই নারদ ও পর্বত ঋষি উদ্ভূত হয়েছিলেন। চতুর্থ দুন্দুভি প্রাচীন ছিলেন। এটি বহু অসুরদের বধ্যভূমি।

এবার বর্ষগুলোর কথা বলছি। গোমেদ পর্বতের বর্ষনাম পাণ্ডভয়, চন্দ্রের শিশির, নারদের সুখোদয়, দুন্দুভির আনন্দ, সোমকের শিব, ঋষভের সোমক এবং বেভ্রজে এর বর্চ ধ্রুব। এ সব জায়গাতে চারণদের সাথে দেব, গন্ধর্ব ও দ্বিজদের সব সময় বিহার করতে দেখা যায়। এদের প্রত্যেকের সাগরগামী একটি নদী আছে। সাত গঙ্গা হল–অনুতপ্তা, সুতপ্তা, বিপাশা, মুদিতা, ক্রতু, অমৃতা ও সুকৃতা। এরা আবার হাজার নদীর জননী। দেবরাজ এই সব বর্ষে সব সময় বর্ষণ করে থাকেন। প্রজারা এই সব নদীর জল পান করে থাকে। তারা সবল, নীরোগ, মানুষেরা আকাঙ্ক্ষা উঁচু বা নিচু নয়। প্লক্ষ প্রভৃতি দ্বীপে সবসময় যেন ত্রেতা যুগ, কাল মাহাত্মে এরা পাঁচ হাজার বছর বেঁচে থাকে। প্লক্ষ দ্বীপে ওষধিযুক্ত বনস্পতি রয়েছে। হাজার হাজার গ্রাম্য ও অরণ্য পশু আছে। এই দ্বীপে প্লক্ষ নামে এক মহাবৃক্ষ আছে। আমের রসের সাগর দিয়ে ঘেরা জনপদ বাসীর পূজ্য দেবতা স্থানু।

এবার সংক্ষেপে শাল্মলীদ্বীপের বর্ণনা শুনুন–শাল্মলদ্বীপ শ্রেষ্ঠতায় অন্যান্য দ্বীপগুলোর তৃতীয় ও আমের রসের সাগর দিয়ে বেষ্টিত। এর পরিধি প্লক্ষদ্বীপের বিস্তারের দ্বিগুণ। এখানে সাতটি

বর্ষ পর্বত আছে। এরা সব রত্নের আকর। ঐসব বর্ষ পর্বতের প্রথমটির নাম কুমুদ। এটি সূর্যের মতো প্রভাসম্পন্ন। এর শৃঙ্গমালা নানা ধাতুময় এবং তা থেকে আবার বহু শিলা বার হয়েছে।

দ্বিতীয় উন্নত পর্বত বিখ্যাত পর্বত। বরিতালময় শৃঙ্গগুলো স্বর্গ আবৃত করে রেখেছে।

তৃতীয় বিশ্রুত বলাহক, এই বলাহক ও অজ্ঞানময় শৃঙ্গ দিয়ে স্বর্গ আবৃত করে রেখেছে।

চতুর্থত দ্রোণ এখানে মৃত্যজ্জবণী ও বিশল্যকরণী আছে।

পঞ্চমত বাদ খুব উঁচু পর্বত, ফল ফুলে ভরা গাছ ও লতা রয়েছে।

ষষ্ঠত মহিষ পর্বত, মেঘের মতো আভাযুক্ত এখানে জল থেকে উৎপন্ন মহিষ নামে অগ্নি বিরাজ করে।

সপ্তমত কুকমাল, এখানে নানারকম রত্ন আছে। বিধাতা যখন প্রথম প্রজা সৃষ্টি করতে শুরু করেন, স্বয়ং বাসব তখন এখানে বৃষ্টিবর্ষণ করেছিলেন। এবার সাতটি পর্বতের সাতটি বর্ষের নাম বলছি কুমুদ পর্বতের বর্ষশ্বেত, উন্নতের লোহিত, বলাহকের জীমূত, দ্রোণের হরিত, কচ্ছের বৈদ্যুত, মহিষের মানস, ককুদের সুপ্রভ–এই সাতটি বর্ষ সাত ভাগে বিভক্ত। এবার নদীর নাম শুনুন। পানিতোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্রা, বিমোচনী, নিবৃত্তি প্রভৃতি। এসব নদীর কাছাকাছি অনেক নদী রয়েছে। তাদের সংখ্যা বলা অসাধ্য। পাল্মলের সন্নিবেশের কথা বলা হয়েছে। এটি প্লক্ষ বৃক্ষের জন্য বিখ্যাত। এর মধ্য দেশে শাল্মল দ্বীপ অবস্থিত। এর চারিদিকেই সাগর।

এবার চতুর্থ কুশদ্বীপের কথা বলছি। সুরোদ সাগর কুশ দ্বীপ দিয়ে ঘেরা। এখানেও সাতটি পর্বত রয়েছে। বিস্তার শাল্মল দ্বীপের দ্বিগুণ। এটাই এই দ্বীপের প্রথম পর্বত। এভাবে এই দ্বীপে দ্বিতীয় হেম পর্বত, তৃতীয় জীমূতের মত দুতিমান, চতুর্থ পুষ্পৰা, পঞ্চম কুশেবায়, ষষ্ঠ হরিগিরি ও সপ্তম বন্দর। মন্দ নামে জলের ভেদ করে এই পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। তাই পাহাড়ের নাম হয়েছে মন্দার। এবার এদের বর্ষ পর্যন্ত গুলো হল। প্রথম উদ্ভিদ, দ্বিতীয় রেণুমণ্ডল, তৃতীয় স্বৈরথাকার, চতুর্থ লবণ, পঞ্চম ধৃতিম, ষষ্ঠ প্রভাকর ও সপ্তম কপিল। এই সব পর্বতে ঐ শ্রীশক্তি সম্পন্ন দেব গন্ধবদের বিচরণ করতে দেখা যায়। ম্লেচ্ছ জাতি বা দস্যুভীতি নেই। এদের গায়ের রঙ ফর্সা। এদের পর্যায় ক্রমে মৃত্যু হয়। এসব জায়গার মাটি পবিত্র, বিস্তৃত, তেজোগর্ভ। এই কুশদ্বীপের বাইরের দিকটা সমুদ্র দিয়ে ঘেরা রয়েছে।

ক্রৌঞ্চ দ্বীপের বিস্তার কুশ দ্বীপের দ্বিগুণ। এটি ঘৃতোদ সাগরকে ঘিরে রয়েছে। এই দ্বীপে ক্রৌঞ্চ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও প্রথম, এর পর বা মনক, অন্ধকারক, দিবাকৃত, দিবিন্দ, পুণ্ডরীক ও দুন্দুভি নামক পর্বত প্রসিদ্ধ। ক্রৌঞ্চদ্বীপ-এর সাতটি পর্বর্তই রত্নময়, ফলবান গাছ ও নানা জাতীয় ফুল ও লতা দিয়ে সাজানো। এদের বর্ষ পর্বতগুলো পরস্পর নিজ নিজ বিষ্কম্ভ থেকে দ্বিগুণ। এবার এদের নাম ক্রৌঞ্চের বনাম, কুশলী, বামনের মনোনুগ, এর পর তৃতীয় বর্ষ। উষ্ণ, উষ্টেত্ত পর প্রবরকে এর পর অন্ধকারক, এরপর মুনিদের মুনিদেশের পরে দুন্দুভিস্বন, এখানে সিদ্ধ চারণেরা থাকেন, মানুষেরা সব গৌরবর্ণ। বর্ষগুলোতে একটি করে সাতটি নদী আছে। এরা সকলেই শুভ দায়িনী, গৌরি কুমুতী, সন্ধ্যা, রাত্রি মনোজবা খ্যাতি পুণ্ডরীকা ও গঙ্গা এই সাতটি হল বর্ষনদী, এই সব বর্ষনদীতে বিপুল ইন্দ্র সাগর গামিনী নদীগুলোর সাথে আবার ঐ সাতটি বর্ষনদী মিলেছে। দ্বীপের চারধারেই দধি সাগর দিয়ে ঘেরা। প্লক্ষ দ্বীপগুলোও ক্রৌঞ্চদ্বীপের তুল্য।

এর পর শাক দ্বীপের বিষয় বলছি শুনুন। এই শাক দ্বীপের বিস্তার ক্রৌঞ্চদ্বীপের দ্বিগুণ। দধিমণ্ডোদক সমুদ্রকে ঘিরে এই দ্বীপ রয়েছে। এখানকার জনপদগুলো পবিত্র, এখানকার প্রজারা দীর্ঘজীবি। এখানে দুর্ভিক্ষ, জরা ব্যাধি ভয় নেই। এই দ্বীপে মণিভূষিত সাতটি সাদা পর্বত ও নানারকম রত্নে ভরা সাতটি নদী আছে। আমার কাছে এদের নাম শুনুন। প্রথমে সাতটি পাহাড়ের নাম বলছি। প্রথমটির নাম মেরু, এই মেরুতে দেবর্ষি ও গন্ধর্বরা থাকেন। দ্বিতীয় উদয় পর্বত। এই পর্বত পূর্বদিকে চওড়া ও সোনার তৈরী। বৃষ্টির জন্য মেঘেরা এখানে জড়ো হয় এবং অন্য জায়গায় চলে যায়। এরপর বৃহৎ জলাধার মহাগিরি। এখানে অনেক প্রজা বাস করেন। এরপর রৈবতক–এখানে বেরতী নক্ষত্র সব সময় প্রতিষ্ঠিত এবং একেই স্বর্গ বলা হয়। পর্বতটি ব্রহ্মা নির্মাণ করেছেন। তারপর শ্যাম নামক মহাগিরি। এরপর আছে অস্তগিরি এই গিরি রজতময় তারপর অম্বিকেয় নামে পর্বত আছে, নাম কেশরী। এখান থেকে বাতাস বয়ে আসে।

এবার এদের বর্ষ পর্বতের নাম বলছি। উদয়ের বর্ষ পর্বত জলদ, এভাবে জলধারে রসুকুমার, রৈবতের কৌমার। শ্যামের মণিচক, অস্তের কুমুমোত্তর ও অম্বিকেয়ের মোদক। এই দেশে মোচকের কেশরযুক্ত বড় বড় গাছ রয়েছে। এই দ্বীপের পরিমাণ শাক দ্বীপের সমান। এদের মধ্যে এক বিখ্যাত বনস্পতি আছে, তার নাম শাক। সবাই এই মহাবৃক্ষের পূজা করে থাকে। এই দ্বীপে চারণ, দেব, গন্ধর্বরা বিচরণ করেন। এখানকার জনপদগুলি পবিত্র। এই দ্বীপের প্রতি বর্ষে এক একটি নদী আছে। তারা সকলেই সাগরে মিলেছে। এই সাত নদীকে সাত গঙ্গা বলে। এদের নাম হল–প্রথম সুকুমারী গঙ্গা, অনুতপ্তা, কুমারী বাসবী, নন্দা ও পার্বতী, চুতর্থ

শিবেতিকা বা ত্রিদিবা, তারপর ইক্ষু বা ক্রতু, ষষ্ঠ ধেনাকা বা মৃতা এভাবে সপ্তগঙ্গা প্রতি বর্ষেই বয়ে চলেছে। নদীগুলোর জল খুব মঙ্গলদায়ক। এরা শাকদ্বীপবাসী জনগণের সুখের বস্তু। এখান পর্বতগুলো নানা ধাতু দিয়ে চিত্রিত, মণিমুক্তা দিয়ে সাজানো, ফুল ফলে পূর্ণ, গাছ সেখানে রয়েছে। এগুলো উঁচু জনপদ, ক্ষীরোদ সাগর এর চারিদিকেই গোল করে ঘিরে থাকে। শাকদ্বীপের সমানই বড়। এখানকার বিভিন্ন জনপদগুলো পাহাড় দিয়ে বিভক্ত। এখানেও বর্ণাশ্রম ধর্ম আছে। ধর্মের ব্যাভিচার নেই। তাই প্রজারা সুখী। এখানে লোভ, মায়া, হিংসা, বিপর্যয় নেই। প্রজারা নিজ নিজ ধর্ম পালন করেন। আমি এইটুকু শাকদ্বীপবাসীদের বিবরণ বলতে পারছি।

এরপর সপ্তম দ্বীপ পুষ্করের কথা বলছি। এটিও ক্ষিরোদ সাগর দিয়ে বেষ্টিত। এখানে একটি সমৃদ্ধি সম্পন্ন পর্বত আছে। এর নাম হমশিল, ঐ মণিময় পর্বতে অন্যান্য বিচিত্র মণিময় শৈলশিখর আছে। এই দ্বীপের অর্ধেক পরিমাণ আয়তন নিয়ে উত্তম মানস পর্বত সাগর সৈকতের কাছে যেন চাঁদের মতো শোভা পাচ্ছে। এই দ্বীপের পেছনের দিকে পৃথ্বীধর মানস পর্বত আছে। এর একটি অংশ দুভাগে ভাগ হয়েছে। এই দ্বীপের মানস পর্বতের নীচে গোলাকার ভাবে ঘিরে রয়েছে দুটো জনপদ। মানসপর্বতের বাইরের দিকে মহাবীত নামে যে বর্ষ আছে তার মাঝে যাকে ধাতকীখণ্ড বলা হয়, সেখানকার মানুষেরা দশহাজার বছর বেঁচে থাকে। এখানকার জনপদবাসীরা নীরোগ ও সুখী হয়। তারা রূপে গুণে সমান। এখানে ঈর্ষা, লোভ, ভয়, চুরি, নিগ্রহ, দণ্ড, সত্য-মিথ্যা, ধর্ম-অধর্ম, বর্ণাশ্রম ব্যর্থতা, বাণিজ্য, পশুপালন কিছুই নেই।

স্বাদু জলের সাগর দিয়ে পুষ্কর দ্বীপ বেষ্টিত। সাত সাগর পরিবেষ্টিত এই সাত দ্বীপের পর এক একটি সমুদ্র আছে। অর্থাৎ সমুদ্রের পর বর্ষ, বর্ষের পর সমুদ্র, সমুদ্রগুলোর বিস্তার বর্ষগুলোর সমান।

ঋষিরা এই সকল বর্ষে থাকেন। ব্রাহ্মণ ইত্যাদি চার বর্ণের প্রজা থাকেন বলেই বর্ষগুলি সব সময় সুখপ্রদ। যেমন ঋষ ধাতু থেকে ঋষিপদ সাধিত হয় তেমনি শক্তি প্রবন্ধন অর্থে বৃষধাতু থেকে বর্ষপদ সাধিত হয়ে থাকে। শুক্লপক্ষে পূর্ণচন্দ্র থাকলে, সমুদ্র জলে পূর্ণ থাকে। অমাবস্যার আগে চাঁদ ক্ষয় হতে থাকলে সমুদ্রের জলে ভাটা আসে। চাঁদ উদয় বা অস্তে গেলে সেই অনুসারে জল বেড়ে যায় ও কমে যায়। শুক্লপক্ষে বা কৃষ্ণপক্ষেই চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। হ্রাস-বৃদ্ধি পর্বে পনেরোশো আঙ্গুল পরিমাণ ক্ষয়বৃদ্ধি হতে দেখা যায়। জলপ্রবাহের

মধ্যে বলে দ্বীপ নাম হয়েছে। উদয়ের আধার বলেই উদধি নাম হয়েছে, পর্বহীন বলে গিরি, পর্বযুক্ত বলে পর্বত।

প্লক্ষদ্বীপে গোমেদ মণি আছে বলে ঐ দ্বীপের পর্বতের নাম গোমদ। এভাবে শাল্মল বৃক্ষের জন্য শাল্মলদ্বীপ, কুশস্তন্ত দিয়ে কুশদ্বীপ শ্রেষ্ঠ, ক্রৌঞ্চ পর্বতের জন্য ক্রৌঞ্চ দ্বীপ এবং শাকনামক গাছের জন্য শাকদ্বীপ প্রসিদ্ধ। পুষ্কর দ্বীপে একটি বটগাছে আছে। সেখানকার লোকেরা ঐ বৃক্ষটিকে পূজা করেন। এখানে মহাদেব এবং ব্রহ্মার পূজা হয়।

যে পুষ্কর দ্বীপের কথা বলা হয়েছে, সেখানে তেত্রিশজন মহর্ষিদের সাথে দেবতা, সাধ্যদের সাথে প্রজাপতি ব্রহ্মা তপস্যা করেন। জম্বুদ্বীপে রত্ন জন্মায়, ওই দ্বীপগুলোতে সর্বজ্ঞ প্রজারা ব্রহ্মচর্যে থাকেন বলে নীরোগ এবং দীর্ঘায়ু হয়। পুষ্কর দ্বীপের প্রজারাও সাধু চরিত্রের এবং বিদ্বান। বিষ্ণু, শিব, সূর্য এবং এর সাথে স্বয়ং ব্রহ্মা এদের শাসন এবং পালন করেন। এই দ্বীপের চারিদিকে স্বাদু জলে বেষ্টিত সমুদ্র। এরপরে একটি কাঞ্চন পুরী আছে। এখানকার ভূমি যেন একটি মাত্র শিলা দ্বারা গঠিত। তারপর সীমান্তে একটি পর্বত আছে। পর্বতের একদিক প্রকাশ আবার অন্যদিকে অপ্রকাশ। এর একদিক আলোময় আর একদিক অন্ধকার। এটি দশ হাজার যোজন উঁচু, বিস্তারও সেই রকম।

এর চারিদিকের শীলারূপ জল দিয়ে ঘেরা। পর্বতের একদিকে আলোক অপর দিকে নিরালোক। নিরালোকের পর অপরাংশ ব্রহ্মাকে আবৃত করে রেখেছে। এই অন্ত মধ্যেই সপ্তদ্বীপা মেদিনী। এরপর ভূঃ, ভুব, স্বর্গ, মর্ত, জল, অপ, এবং সত্য– এই সাতটি লোক রয়েছে। এরপরই তার শেষ সীমা অর্থাৎ এরপর কিছুই নেই। শুক্লপক্ষের প্রথম প্রতিপদ তিথিতে পশ্চিমদিকে চাঁদ যেমন কুম্ভে থাকেন, অন্তের গঠনও তেমন। অব্যয় আত্মার কারণ স্বরূপ, তির্যক, উর্দ্ধ ও মধ্যদিক থেকে অন্তরগুলোর সংখ্যা এক হাজার কোটি। ঐ সপ্ত লোকের প্রতি লোকেরই এক একটি আকাশ আছে, এরা সাতটি প্রকৃত কারণ দিয়ে আবৃত। পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করে আছে। অণ্ডের ভিতরে গভীর জল। বাইরের দিকেও ঐ ঘন জলের তির্যক উঁচু মণ্ডল এভাবে রয়েছে, যেন তা তেজোদ্বার ধার্যমান হয়েই রয়েছে। বায়ু আকাশকে ধরে রয়েছে।

আকাশ ভূতাদি মহানকে, মহান আবার আকাশকে ধরে রয়েছে। সব মহান অব্যক্ত অনন্ত দিয়ে ঘেরা। এই অনন্ত দশ রকম সূক্ষ্ম, অনালম্ব, অকৃতাত্মা তমোভূত, দেবতাদেরও এবং শেষ সীমায় শিবের বিরাট আয়তন। এর সীমান্তে উঁদ সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত যেসব লোক

বিখ্যাত, তাদের জাগতিক লোক বলে। রসাতলের ওপরে ও নীচে সাত সাতটি তল বা স্তর আছে। ব্রহ্মনিবাস পর্যন্ত কর্তাদের সাতটি স্তর আছে। এর মধ্যে পাতাল থেকে স্বর্গ বাতাসের পাঁচটি গতি, এটাই জগতের প্রমাণ। এর নাম সংসার সাগর। বহুজাতির উদ্ভবভূমি এই অনাদি অনন্ত জগতে এমনই বলছে। এ জগতের অগ্নি, বায়ু, মহান, তম, দেব, ঈশ্বর ও অনন্ত। এদের ক্ষয় নেই এদের অস্ত হয় না। এটি অনন্ত নামেই পরিচিত। স্বয়ং শিব ভূমি, আকাশ, পবন, অনল, সমুদ্র এবং স্বর্গ সব জায়গাতেই পূজিত হয়ে থাকেন। তিনি তপস্যা রত, মহাদ্যুতি সম্পন্ন, প্রভু মহেশ্বর নিখিলে লোকেশ নামে পূজিত।

আধার ও আধেয় এইভাবে পরস্পর থেকে উৎপন্ন লোক সকল পরস্পরকে ধারণ করে আছে। এরা আগে অবিশেষ ভাবে ছিল। পরে পরস্পর সন্নিবেশের জন্য, এরাই বিশেষ ভাবে রয়েছে। পৃথিবীর আদি তেজ পর্যন্ত এদের তিনটে পরিচ্ছেদ রয়েছে। কিন্তু খুবই সূক্ষ্ম কল্পনা করা যায় না। নিখিল ভূতেয় পরবর্তী একটি নিরবচ্ছিন্ন আলোক রয়েছে। হে দ্বিজোত্তমেরা! যে পর্যন্ত প্রাণী আছে সে পর্যন্ত সৃষ্টি জানাবেন। স্থল ভূতদের সংস্কার প্রাণীদেরই আছে। পঞ্চভূত ছাড়া কার্য হয় না। যে সাতটি দ্বীপ ও সাত সমুদ্র যুক্ত মেদিনীর বিস্তার এর আগে বলা হয়েছে তা বিশ্বরূপের একাংশ মাত্র। এই সমস্ত জগৎ, জগৎ নির্মাণকারী ভগবানের অধিষ্ঠান। এবার তির্যক, উর্দ্ধ, মধ্যম প্রভৃতি বহু প্রকৃতি, তারার সমাবেশ, দিব্য মণ্ডল ইত্যাদির কথা বলছি।

একান্নতম অধ্যায়

সূত বললেন– এরপর পৃথিবীর উপরিভাগ ও নীচের ভাগের বর্ণনা শুনুন। এই ধরিত্রী, মাটি, আকাশ, বাতাস, জল, জ্যোতি পঞ্চভূতে পরিব্যাপ্ত। এরা অনন্ত জগতের ধারক। এই ধরাই সমস্ত প্রাণীর জননী। ধরিত্রীতে নানা জনপদ, অধিষ্ঠান, পত্তন, নদ, নদী, পাহাড় ও অনেক জাতি রয়েছে। এই পৃথিবী দেবী অনন্তা। এখানে নদ, নদী, সাগর, পর্বত ও আকাশের ভেতর ও অন্যান্য জায়গাতেও জল আছে। এজন্য জলরাশিকে অনন্ত বলা হয়। অগ্নি সকলেরই মধ্যে ব্যাপ্ত ও সমস্ত বস্তুর উৎপাদক, এজন্য এটি অনন্ত বলে কথিত। এছাড়া আকাশ নানা বস্তুর আশ্রয়, রমণীয়, বহু বিস্তৃত। সুতরাং অনন্ত আকাশ সজ্জাত বায়ুকে অনন্ত বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীর ওপর জল ও জলের উপর ধরিত্রী দেবী রয়েছেন। তার নীচে আকাশ আবার মাটি, তারপর আবার জল এইভাবে পরের পর এই অনন্ত সৃষ্টির অন্ত নাই। পণ্ডিতেরা তাই বলেন।

সপ্তম রসাতল পর্যন্ত প্রথমে মাটি, তারপর জল, তারপর আকাশ এভাবে পর্যায় ভাগ আছে। রসাতলের বিস্তার অযুত যোজন এবং তা সমানভূমি। এভাবে পণ্ডিতরা সাতটি তলের এক এক তলকে বহু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। অতল, সুতল, বিতল, গতস্তল মহাতল, শ্রীতল ও পাতাল পর পর এই সাতটি তল রয়েছে। এবার যথাক্রমে এদের ভূমি ভাগের বিষয় বলা হচ্ছে।

প্রথমটির মাটি কালো রঙের, দ্বিতীয়টির পাণ্ডুর, তৃতীয় লাল, চতুর্থ পীত, পঞ্চম শর্করার মতো। ষষ্ঠটি পাথরে ভরা, সপ্তটির সোনার রঙ। এসব তলের প্রথমে ভীমনদী ইন্দ্রশত্রু অসুরদের রাজা নমুচির বাসস্থান রয়েছে। কালোমাটির প্রথম তলে রয়েছে শঙ্কুকর্ণ, নিষ্কলাদ, ভীমনামে রাক্ষস, শুলদন্ত স্বাপদ, মহাত্মা ধনঞ্জয় কলম ও অন্যান্য নাগ ইত্যাদি। দ্বিতীয় তলের প্রথমেই বিশালবক্ষ দৈত্যেন্দ্র মহাজম্ভের নগর। এখানে কৃষ্ণ, জয়গ্রীব, নিকুম্ভ, শঙ্খ গোমুখ, নীল রাক্ষস, মেঘ, কম্বল নাগ। অশ্বতর কদ্রপুত্র, মহাত্মা তক্ষক এদের পুর ও নগর রয়েছে। এছাড়া নাগ, দানব ও রাক্ষসদের বহু হাজার পুর এই দ্বিতীয় পাণ্ডু ভূমিতলে রয়েছে।

তৃতীয় তলে মহাত্মা প্রহ্লাদ, তারক, ত্রিশিরা, শিশুমার–এদের পুরী রয়েছে। চ্যবণ রাক্ষস, রাক্ষসেন্দ্র কুম্ভিল, খর, ক্রুর ইত্যাদির বিশাল আবাসস্থল তৃতীয় তলে। পীতভূমিতে নাগ, দানব ও রাক্ষসদের আবাসস্থল, চতুর্থ তলের মহাত্মা দানবরাজ কালনেমী, গজকর্ণ, কুঞ্জর–এদের পুরী ও হাজার নগর আছে। শর্করা ভূমি পঞ্চমতলে অসুর সিংহ ধীমান বিরোচনের নগর। নাগদের পুরী আছে। এছাড়া দানব ও রাক্ষসদের হাজার হাজার বাসস্থান। ষষ্ঠতলে পুলেমা মহিষ, উৎক্রোশের পুরী আছে। কশ্যপ পুত্র নাগরাজ বাসুকীও এখানে রয়েছেন, সর্বপশ্চিমের সপ্তমতলে স্ত্রী পুরুষ নিয়ে বলির পুরী আছে। এই পুরী সবসময় আনন্দিত, থাকে এটি দেবসুরদের দ্বারা রক্ষিত।

এখানে সুরকুন্দের মহানগর আছে। এই তলটিতে দিতি সুতদের অনেক সংখ্যক পুরী, হাজার হাজার নাগ নগর, দৈত্য, দানব আর রাক্ষসদের বাসগৃহ আছে। এই পাতাল তলের পর বিস্তীর্ণ জায়গাতে শেষ নাগের আবাসভূমি আছে। এই নাগের চোখ রক্তপদ্মের মতো, শরীরের প্রভা শঙ্খের মতো স্বচ্ছ সাদা ও পরনে নীল বসন। ইনি মহাত্মা অজেয় অমর। ঐ বিশাল মহাভুজ দ্যুতিমান, চিত্রমালাধারী বলবান কুণ্ডলীর মুখ, যেন সোনার চূড়ার মতো নির্মল ও প্রদীপ্ত। হাজার মুখ নিয়ে শোভা পেয়ে থাকেন। ইনি শ্বেত পর্বতের শিরোদেশে বাস করে থাকেন। মহাবল, মহানাগের এই মহাতেজা মহানাগপতিকে উপাসনা করেন। নাগবংশের অধিপতি হল

এই শেষনাগ, দেব, অসুর, মহানাগ ও রাক্ষসদের নিয়ে এই ব্যবহারিক সাত রসাতলের বর্ণনা দেওয়া হল।

এই জায়গাটির পর যা কিছু আছে তা অদৃশ্য, ব্যবহার বর্জিত, অগম্য। এরপর প্রথমে যে পর্যন্ত সূর্য ও চাঁদ মণ্ডলাকারে প্রকাশ পেয়ে থাকে, চাঁদ ও সূর্যের সে সব গতির বর্ণনা করছি। সাতসমুদ্র ও সাত দ্বীপের যে পরিমাণ বিস্তার পৃথিবীর বিস্তারও ততদূর। চাঁদ ও সূর্য ঐ সাত দ্বীপ ও সাত সাগরের বাইরের পরিধি অর্থাৎ আকাশ মণ্ডলের পরিধি পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে থাকেন। সূর্য এই তিন লোক পরিভ্রমণ করেন, এজন্য একা-খ্য অবধাতু দ্বারা 'রবি' শব্দটি এসেছে। সূর্যমণ্ডল ভারতবর্ষের বিশাল বর্গ পরিমাণের সমান। সূর্যের বিস্তার নয় হাজার যোজন, চন্দ্রের পরিমাণ এর দ্বিগুণ। এরপর সাত দ্বীপ, সাত সাগর নিয়ে পৃথিবীর বিস্তার, দেবতারা এর পরিমাণ ঠিক করেছেন এবং এটি পুরাণুনুমোদিত। এই পৃথিবীর বিস্তার মেরু মধ্যে থেকে সবদিকেই এক কোটি যোজন এবং এর উচ্চতা মেরুর চারিদিকে ভূমির সমান। পৃথিবী চারদিকেই তিন কোটি এক লক্ষ হাজার যোজন বিস্তৃত। পৃথিবী বিস্তারের পরিমাণ এভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। আকাশ যে পরিমাণ ও যে পর্যন্ত তারার সন্নিবেশ দেখা যায় তাকেই আকাশ মণ্ডল এবং ভূতলের পরিধি মণ্ডলকে ভূমণ্ডল মান বলা হয়। আবার ভূতলের পরিমাণ দিয়েই আকাশ মান নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। সপ্ত লোকমণ্ডল একের এক এইভাবে সংস্থিত। যেখানে প্রাণীরা থাকে ঐ সপ্তলোক নিয়েই অন্তকটাই পরিসংখ্যাও হয়। এর মধ্যে সপ্তদ্বীপা মেদিনী এবং ভুভব, মহ, জন, তপ ও সত্য এই সপ্তলোক।

এ সপ্তলোক নিজের নিজের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হয়ে পৃথক পৃথকভাবে বিরাজ করে। বাইরের আবরণই পরস্পর দশগুণ বেশি। অন্তকণ্টাহের চারিদিকে ঘন জল রয়েছে। তা সমস্ত পৃথিবীর মনজলকে ঘন উদধি দিয়ে ধারণ করে রয়েছে। ঘনোদধির পরেই ঘনতেজ রয়েছে। ঘনতেজের চারিদিক দিয়ে ঘন বায়ু ঐ মণ্ডলকে ধরে রেখেছে। ঘন বায়ুর পরমাহকাশ মহাকাশ মহাভূত দিয়ে এবং মহাভূত আবার মহাকাশ দিয়ে ঢাকা। ঐ মহাকাশ অনন্ত দিয়ে আবৃত।

এবার বলছি গ্রহ নক্ষত্রাদির কথা এবং লোকপালদের পুরী ও নগরের কথা। মেরুর পূর্বদিকে মানস পর্বতের চূড়োতে নানা প্রকারের সোনার মতো পরিষ্কার পবিত্র ইন্দ্রপুরী এবং দক্ষিণ দিকে মেরুর মাথায় সংযমন পুর আছে। সূর্যপুত্র যম এই পুরীতে বাস করেন। এর পর উত্তর দিকে মেরুর মাথায় বরুণের রমণীয় পুরী আছে। এভাবে উত্তরদিকে তাদের বিভাবরী পুরী। এভাবে লোকপাল গণ মানস পাহাড়ের উত্তর-পূর্বে তোক রক্ষার জন্য নিজেরা বাসস্থান করছেন। সূর্য যখন দক্ষিণ দিকে চলেন, তখন তাঁর বানের মতো গতি।

সূর্য তখন জ্যোতিশ্চক্র আশ্রয় করে সব সময় চলতে থাকেন। যখন তিনি মধ্যস্থানের অমরাবতীতে এসে পড়েন তখন তাকে বৈবস্বত যমের সংযমন পুরে উদয় বুঝতে হবে। রবি সুখাপুরীর মধ্যে চলে গেলে তখন অর্ধেক রাত হয়, পরে ঐ সুখাপুরী থেকেই সূর্যকে উঠতে দেখা যায়। এরপর বিভাবরী পুরীতে যখন আসেন অর্ধরাত হয়। সূর্য ইন্দ্রপুরীতে গিয়ে অস্তমিত হন। সে সময় দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দেশে বিকেল, দক্ষিণ ও অপরাপর দেশে দুপুর, উত্তরাপথে যে সব লোক বাস করে তাদের শেষ রাত এবং উত্তর-পূর্ব কোণে যাদের বাস, তাদের প্রথম রাত।

এভাবে উত্তর ভারতেও সূর্য সুখানামের বরুণ পুরীতে গেলে দুপুর, চন্দ্রের বিভাবরী পুরীতে গেলে উদয়, অমরাবতীতে অর্ধেক রাত এবং সংযমনপুরে অস্ত যায়। আর যখন চন্দ্রের বিভাবরী পুরীতে মধ্যাহ্ন ও ইন্দ্রে অমরাবতীতে উদয় তখন সংযমনপুরে অর্ধরাত আর বরুণের সুখাপুরে অস্ত যায়। এভাবে সূর্য তাড়াতাড়ি চলতে থাকলে মনে হয় আকাশের নক্ষত্ররা চলেছে। এভাবে সূর্য দক্ষিণের শেষে চারটি দ্বীপে বিচরণ করে বারবার উদিত হয় ও অস্ত যায় এবং মধ্যাহ্নে নিজ রশ্মি দিয়ে পূর্বাধ ও পরার্থে স্বর্গীয় দ্বারগুলোতে এক সাথেই সূর্য তাপ দিয়ে থাকেন। উদয় থেকে দুপুর পর্যন্ত তাপের পরিমাণ ও তেজ বাড়তে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে ঐ কিরণ কমতে কমতে অস্তে চলে যান। সূর্য সমস্ত দিকেই তাপ দিয়ে থাকেন পূর্ব দিকে এর উদয় ও পশ্চিমে অস্তাচল। সকল লোকের উত্তরে মেরু ও দক্ষিণে লোকালোক পর্বত। রশ্মি কমে গেলে রাত্রিতে আর লোকালোক পর্বত দেখতে পাওয়া যায় না। বহুদূর থেকে উদয়ের সময়ের সূর্যকে রশ্মিহীন বলে মনে হয়। সৌরকিরণ সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় অগ্নিতে প্রবেশ করে, আবার সূর্য উদয় হলে অগ্নির তেজ তাতে প্রবেশ করে। দক্ষিণ ও উত্তর এই দুই ভূমিতে যখন সূর্য উদিত হয় তখন রাত্রি জলের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য জলের তামা রঙ হয়। আবার সূর্য অস্তমিত হলে দিন জলে প্রবেশ করে। দিন যখন জলে প্রবেশ করে তখন জলের রঙ সাদা হয়। সূর্যের উদয় ও অস্ত নিয়েই দিবা-রাত্রির ব্যবস্থা।

এভাবে সূর্য যখন পুষ্কর মধ্যে বিচরণ করেন, এক এক মুহূর্তে মেদিনীর এক এক অংশ অতিক্রম করে থাকেন। সূর্যকে মুহূর্তে একত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যোজন বলা হয়। যখন সূর্য ক্ষীরোদ সাগরে উত্তর দিক থেকে উদিত হয়ে বিচরণ করতে করতে দক্ষিণ দিকে বিষুব রেখায় আসেন, তখন বিষুব মণ্ডলের যোজন পরিমাণ হয় তিন কোটি একাশি লক্ষ যোজন। শাক দ্বীপের উত্তরদিকে উদিত হয়ে বিচরণ শ্রাবণ মাসে যখন সূর্য উত্তর কাষ্ঠা অবলম্বন করেন, সে সময় উত্তর কাষ্ঠাস্থিত মণ্ডল পরিমাণ হল এক কোটি আশি নিযুত আটান্ন লক্ষ যোজন।

সূর্যের উত্তর পথ নাগবীথি ও দক্ষিণ পথ অজবীথি নামে খ্যাত। মূলা পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরষাঢ়া এই তিন নক্ষত্রে অজবীথি এবং অভিজিৎ প্রভৃতি তিন নক্ষত্রে নাগবীথি নির্দিষ্ট রয়েছে। দক্ষিণাচলে সূর্য যতদূর বিচরণ করেন তার মনজল পরিমাণ এক যোজন উঁচু। এর পরিমাণ একত্রিশ হাজার দুশ একুশ যোজন। কুমোরের চাকার গতির মতো সূর্য তাড়াতাড়ি দক্ষিণায়নের পথ শেষ করেন, সূর্য এই সময়ে বারো মুহূর্তের মধ্যে দ্রুত গতিতে ভালো ভালো ভূমিগুলো এবং সাথে তেরোটি নক্ষত্র অল্প সময়ের জন্য পরিভ্রমণ করেন। আর রাত্রিতে বারো মুহূর্তে আঠেরোটি নক্ষত্র পরিভ্রমণ করে থাকেন। সূর্য যখন উত্তরায়ণে অল্প গতিতে ঘোরেন, তখন চোদ্দটি নক্ষত্রকে পরিভ্রমণ করে থাকেন।

এরপর চক্রের গতি কমে গেলে, চক্রের মাঝে মাটির পিণ্ডের মত আস্তে আস্তে তিনি ধ্রুব নক্ষত্রে ভ্রমণ করেন। ঐ ধ্রুব নক্ষত্রকে ত্রিশ মুহূর্তে এক অহোরাত্র ভ্রমণ করে দুই কাষ্ঠার মাঝের মণ্ডলগুলো পরিভ্রমণ করেন। মঙ্গল ভ্রমণ করতে করতে সূর্য যখন উভয় কাষ্ঠার মাঝে আসেন তখনই তাঁর দিবারাত্রির মত দ্রুতগতি ও মন্দগতি হয়।

চন্দ্র উত্তরদিকে গেলে দিন অল্পগতি হয়। তেমনি সূর্যের উত্তর গতিতে রাত্রি দ্রুতগতি হয়। চাঁদ দক্ষিণে গেলে দিন শীঘ্রগতি এবং সূর্যের দক্ষিণ দিকের গতিতে রাত্রি অল্পগতি হয়। লোকালোক পর্বতের চারদিকে যে সব দিকপাল আছেন, তাদের ওপর দিয়ে বিশেষ বেগে অগস্ত্যে নক্ষত্র বিচরণ করেন। এর বিশেষ গতি দিয়েও দিন রাত ভাগ হয়ে থাকে। লোকালোক পর্বতের পেছনে ও সামনে সূর্য তেজ প্রকাশিত হয়। এর উচ্চতা এক হাজার দশ যোজন। এর একদিকে প্রকাশমান সূর্য ও অন্যদিকে অন্ধকারময় এবং সবদিক পরিমণ্ডল তারাদের সাথে নক্ষত্র প্রহর্তা চাঁদ ও সূর্যরা অভ্যন্তর ভাগ থেকে আলো দিয়ে থাকেন। লোকালোক পর্বত প্রমথদের একাংশে প্রকাশিত অন্য অনেককাংশ অপ্রকাশ এভাবেই রয়েছে। দিন ও রাত্রির মাঝের সময়কে সন্ধ্যা বলে। এক সময় সন্ধ্যাকালে রাক্ষসেরা সূর্যকে গ্রাস করতে চাইল। সন্দেহ নামে বিখ্যাত দুরাত্মা ত্রিশকোটি রাক্ষস প্রতিদিন সূর্যকে খেতে চায়। তাই ভীষণ যুদ্ধ বাধে সুর্যের সঙ্গে রাক্ষসদের। তারপর শ্রেষ্ঠ দেবতারা ও ব্রাহ্মণরা সন্ধ্যাকে উপাসনা করে এক মহাজল নিক্ষেপ করেন। ঐ জল ওঙ্কার মন্ত্র ও গায়ত্রী মন্ত্রপুত, সেজন্য বজ্রের মতো দৈত্যদের পুড়িয়ে মারে। ব্রাহ্মণরা আকৃতি দান করলেন হাজার কিরণ সূর্য আরও প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন। এরপর মহাদ্যুতিময় পরাক্রমশালী সূর্য সহস্র যোজন ও পরে চলে যায়। এরপর ভগবান ব্রহ্মা, বালখিল্য ঋষি, মহর্ষি মরীচি ও ব্রাহ্মণেরা নিজের জায়গায় চলে যায়। পনেরো নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত, ত্রিশ মুহূর্তে এক অহোরাত্র গোনা হয়। দিনের ভাগ অনুসারে তা যথাক্রমে কমে বা বেড়ে গেলেও সন্ধ্যায় পলিত। সব

ভালোই এক মুহূর্ত থাকবে। দিনের হ্রাস বৃদ্ধিতে এর ব্যতিক্রম হবে না। আদিত্য যখন নিজের রেখাতে থাকেন, তখন থেকে তিন মুহূর্তকালের নাম প্রাতস্তন এবং তা দিনের পাঁচভাগের একভাগ। সেই প্রাতস্তন কাল থেকে মুহূর্ত এর সঙ্গব এবং সঙ্গব কালের পর তিন মুহূর্ত মধ্যাহ্ন। ঐ সায়াহ্ন সাধ পনেরো মুহূর্তের পর মুহূর্ত ত্রয়। পনেরো মুহূর্ত দিন ও রাত্রির সমান মধ্যস্থলে।

দিন ও রাত্রির পরিণাম সার্ধ পনেরো মুহূর্ত করে বলা হয়। কখনও দিন রাত্রিকে কখনও রাত্রি দিনকে গ্রাস করে। এজন্য দক্ষিণ ও উত্তরায়ণে দিন রাত্রির মানের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। শরৎ ও বসন্ত কালে এই দিন ও রাত্রি সমান হয়। এভাবে পনেরো দিনে এক পক্ষ, দুই পক্ষে এক মাস, এক বৎসর। একশো বিরাশি কলায় এক মাত্রা হয়। পণ্ডিতরা চল্লিশ হাজার আটশো সত্তর মাত্রায় বৈদ্যুতি পরিমাণ নির্ণয় করেন। চারশো বৈদ্যুতি পরিমাণে চরাংশ ও নালিকা হয়। সংবৎসর প্রভৃতির পাঁচ রকম বছরের চাররকম পরিমাণ বিশেষে আছে। কুড়িশত পর্ব পূর্ণ হলে রবির একযুগ হয়। এক অয়নে ষাট সৌরমাস।

শ্বেত পর্বতের উত্তরদিকে শৃঙ্গবনে পর্বতের তিনটি চূড়া আছে। পূর্বদিকে সোনার, দক্ষিণদিকে রূপার, উত্তর দিকে শৃঙ্গটি নানা ধাতু দিয়ে তৈরী। সূর্য যখন শরৎ ও বসন্ত কালে মধ্যম গতি অবলম্বন করে সেই পর্বতের বিষুবরেখার কাছের শৃঙ্গে চলে যান, তখন দিন ও রাত সমান হয়। সূর্যের রথে দিব্য ঘোড়াগুলো যুক্ত রয়েছে। এরা পদ্মরাগের কিরণে রাঙা, মেষ রাশি ও তুলা রাশিতে সূর্য থাকলে, দিন ও রাত্রি পনেরো মুহূর্ত হয়।

সূর্য যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথমাংশে থাকেন, চাঁদ তখন বিশাখা নক্ষত্রের চতুর্থ অংশের অবস্থান করেন। সূর্য যখন বিশাখার তৃতীয় অংশে অবস্থান করেন, চাঁদ তখন কৃত্তিকায় মাথায় বিরাজ করেন। মহর্ষিরা এই কালকে বিষুবকাল বলে বর্ণনা করেন। চাঁদ ও সূর্যের গতি দিয়েই কাল নির্ণীত হয়ে থাকে। বিষুবকালে রাত্রি ও দিন সমান হয়। এই সময়ে পিতাদের উদ্দেশ্যে দান করা উচিত। বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের দান করবে। কারণ ব্রাহ্মণ দেবতার মুখ স্বরূপ, কলা, কাঠা, মুহূর্ত প্রভৃতির তারতম্যে দিনরাত্রি ও অধিমাস হয়।

অনুমিতি ও রাকা দুটিই পূর্ণিমা। আর সিনীবালী ও কুহু এই দু-রকম অমাবস্যাও হয়ে থাকে। মাঘ ও ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এরা উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণ ও ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ এরা দক্ষিণায়ন বলে বিখ্যাত। সবার মিলনে এক বৎসর হয়। ব্রহ্মতনয় পাঁচ বৎসর এর কথা বলা হয়েছে। ঋতুগুলো এদেরই অংশ, দৈব ও পত্রিক কাজে

ঋতু থেকে অমাবস্যা এবং তা থেকেই বিষুবই প্রশস্ত লোকালোক পর্বত আলোকের শেষ ভাগে রয়েছে। লোকপালেরা এখানেই বাস করেন। বিরাজ, সুধামা, শঙ্খপাখ্য, কদম, হিরণ্যলোম, রজত ও কেতুমাল লোকলোক পর্বতের চারধারে থাকেন। এরা অনলস, পরিজন ছাড়া, নিরভিমান, অগস্ত্যের উত্তরে অজবীথির দক্ষিণ পথটি পিতৃবান বলা হয়। এখানে প্রজাবনে অগ্নিহোত্রী মুনিরা বাস করেন।

এঁদের আগের বংশধরের বাড়িতে পরবর্তী বংশধরের যেমন জন্ম হয়, তেমনি পরের বংশধরের বাড়িতেও আগের বংশধরের মরণের পর উৎপত্তি হয়ে থাকে। অষ্টাশি হাজার গৃহস্থ মুনি প্রজাবিস্তারের জন্য দক্ষিণপথ আশ্রয় করে চাঁদের স্থিতিকাল অবধি থাকেন। এরা লোক ব্যবহার, ইচ্ছা, দ্বেষ যুক্ত প্রভৃতি বিষয় ভোগ জনিত দোষে এই সিদ্ধগণ শ্মশান আশ্রয় করেন। দ্বাপর যুগে এরা প্রজা কামনায় জন্ম নেন। নাগবীথির উত্তরে সপ্তর্ষি মণ্ডলের দক্ষিণে সূর্যের উত্তরাপথ, এটি দেবযান নামে খ্যাত।

সেখানে যে ব্রহ্মচারীরা বাস করেন তারা গৃহস্থ নন। এঁরা মৃত্যুকে জয় করেছেন। এই ঊর্ধরেতা মুনিরা সংখ্যায় অষ্টাশি হাজার। এরা কল্পস্থিতিকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। এঁরা লোক প্রসঙ্গ বর্জন, ইচ্ছা, দ্বেষ, সংযম ইত্যাদি কারণে অমৃতত্ব লাভ করেছেন। এটি ত্রৈলোকের স্থিতিকাল ব্রহ্মহত্যাপাপী, অশ্বমেধ জনিত পুণ্যবান বা ঊর্ধরেতা। সবাই প্রলয়কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হন। সপ্তর্ষি মণ্ডলের ওপরে ধ্রুবের নিজের ভাগ পর্যন্ত বিষ্ণুপাদ, এখানে এসে আর ফিরতে হয় না। এই পাদ আশ্রয় করেই লোকসাধক ধ্রুব অবস্থান করেন।

.

বাহান্নতম অধ্যায়

সূত বললেন, স্বায়ম্ভর মন্বন্তর বর্ণনা প্রসঙ্গে অতীতে যা বলা হয়। এখন ভবিষ্যত বিবরণ বলছি। ঋষিরা একথা শুনে লোমহর্ষণ সূতকে চাঁদ ও সুর্যের গতির কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ঋষিরা জিজ্ঞাসা করলেন–এই সব জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী কিভাবে আকাশে পরস্পর সংখ্যাত ছাড়া ঘুরে চলেছে? এই বিচিত্র বৃত্তান্ত শুনতে ইচ্ছা হয়। সূত বললেন–এ বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ দেখা গেলেও প্রাণীরা মুগ্ধ হয়ে থাকে। নরমণ্ডলে উত্তানপুত্র ধ্রুব চাঁদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্রাদির সঙ্গে ভ্রমণ করেন। ধ্রুবের এই স্বাধীন পরিভ্রমণ দ্বারা চাঁদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্রাদি নিয়ন্ত্রিত হয়। এদের যোগভেদ, অস্ত, উদয়, দক্ষিণায়ন, উত্তরায়ণ বিষুব, গ্রহবর্ণ এই সমস্তই ধ্রুব থেকে ঘটে। জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী ধ্রুবের অধিকারে রয়েছে সূর্য শুধু নিজের তেজে ঢেকে ফেলেন মাত্র। হে

বিপ্রজন, সূর্য থেকে বায়ুযুক্ত নাড়ী দিয়ে কোনে সংক্রান্ত হয়ে থাকে। লোক থেকে যে জল আসে তা মেঘে থাকে পরে মেঘ থেকে বায়ুজনিত আঘাতে ঐ জল মাটিতে বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে। জলরাশি এভাবেই ওপরে উঠে মাটিতে পড়ে।

কিন্তু এর নাশ হয় না, পরিবর্তনই ঘটে থাকে। বিধাতা এই মায়া দিয়েই ভূতদের ধারণ করে থাকেন। ত্রিলোক এই মায়া দিয়েই আচ্ছন্ন। সূর্যদেবই সর্বলোক প্রভু, প্রজাপালক, সমস্ত লোকে যত জল আছে, তা চন্দ্র থেকে ঝরে পড়ছে। সূর্য থেকে গ্রীষ্ম আর লোম থেকে আসে শীত। হে দ্বিজোত্তম গণ! লোমপুত্র প্রভৃতিও নানা মহানদীরূপে পরিণত হয়েছেন। সর্বভূতের শরীরে জল রয়েছে। পুড়ে যাওয়ায় পর সেই জল ধোঁয়া হয়ে যায়। তাতেই অভ্রের উৎপত্তি, এতেই জলরাশি থাকে। মেঘ বায়ুজাত বজ্রধ্বনি আর অগ্নিজাত বিদ্যুত-এর প্রকাশ করে ছয় মাস বৃষ্টি দিয়ে থাকে।

কবিরা মেঘকে বলেন অভ্র, মেঘগুলো উৎপত্তি ভেদে তিন রকম! আগ্নেয়, ব্রহ্মজ ও পক্ষজ। আগ্নেয় মেঘ জলজাত। এই মেঘে শীত, বৃষ্টি, বাতাস এগুলো মিলে উপলব্ধি হয়। এরা মোষ, শূকর কিংবা মত্ত হাতির মতো পৃথিবীতে নেমে আসে। এদের নাম জীমূত। এদের দ্বারাই জীব সৃষ্টি রক্ষা পায়। এরা জল ধারাময়, শব্দহীন ও মহাকায় বৃক্ষ নিঃশ্বাসে উৎপন্ন বিদ্যুৎগুণ যুক্ত গর্জন প্রিয় মেঘেরা ব্রহ্মজ নামে বিখ্যাত। মাটি থেকে উঁচুতে পর্বত চূড়ায় এরা বর্ষণ ও গর্জন করে থাকে। ধরণী তাদের গর্জন শুনে আনন্দিত হয়। শস্যশ্যামলা সুন্দরী হয়ে ওঠে।

পক্ষজ মেঘদের নাম পুষ্করাবর্ত। আগে ইন্দ্র পক্ষধর বিরাট বিরাট পাহাড়দের অত্যাচার থেকে প্রাণীদের রক্ষা করার জন্য তাদের পাখাগুলো কেটে দেন। এই পাখাগুলো জলে ভরা মেঘ হয়ে যায়। এদের নাম পুরষ্করাবর্ত। তারা নানা রূপধারী ঘোরাকার। এরা কল্পের শেষে বর্ষণ ঘটায়। এই তৃতীয় শ্রেণীর মেঘেরা যুগান্তকালে বৃষ্টি দেয়। এরা কল্পপরিবর্তের কাজ করে। যে প্রকৃত হিরন্ময় অন্ত এর মধ্যে ব্রহ্মা উদ্ভুত হয়েছেন। সেই ঘোলা থেকেই মেঘদের সৃষ্টি। পর্জন্য ও দিগগজ নামে মেঘেরা হেমন্তকালে মাস্য বৃদ্ধির জন্য ঠান্ডা তুষার রাশি বর্ষণ করে পরিবহ নামে শ্রেষ্ঠ বায়ুদের আশ্রয়। এই বায়ু স্বর্গ পথে তিনটে ধারাতে পুণ্যা অমৃতশালিনী আকাশগঙ্গা বয়ে চলেছে।

হিমালয়ের উত্তরে সুমেরুর দক্ষিণে আর হেমকূট নামে পর্বতের মাঝে পুণ্ড্র নামে বিখ্যাত এক নগর আছে। সেই পর্বতে তুষার বৃষ্টি হলে পর আবহ বায়ু নিজের প্রভাব নিয়ে আবার সেই মহাগিরিতেই বর্ষণ করে। হেমকূট থেকে হিমালয় পর্যন্তই বৃষ্টি ছয়ান্য দেশে তেমন হয় না। তবে

অল্প অল্প যে বৃষ্টি তাতে ভূমির শস্য বৃদ্ধি হয়। সূর্যই প্রকৃতপক্ষে বৃষ্টির স্রষ্টা, সূর্য ও বায়ু আবার ধ্রুবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এরপর সূর্য রথের কথা বলা হচ্ছে। এর রথ একটি চক্র, পাঁচটি অর ও তিনটি নাভিযুক্ত, স্বর্ণময় ছয়রকম ভেদমুক্ত একটি চাকার প্রান্ত নিয়ে গঠিত। এটি পথের অন্ধকার দূর করে খুবই উজ্জ্বল ও মহাবেগশালী। এই রথে সূর্য বিচরণ করেন। এই রথের বিস্তার পরিমাণ দশ হাজার যোজন। ব্রহ্মা সোনার তৈরি, প্রচণ্ড বেগশালী অশ্বযুক্ত মহারথ তৈরি করেছিলেন। এই জ্যোতির্ময় রথে চড়ে সূর্য অন্তরীক্ষ পথে বিচরণ করে থাকেন। এই রথের নাভি দিবা, অরা ও নেমি ছয় ঋতু, রথমধ্য অব্দ, কুরদ্বয় দুই অয়ন বন্ধুর মুহূর্ত, যুগ ও অক্ষ কোটি অর্থ ও কাম, সোনা-কাষ্ঠা-ক্ষণ, অনুকর্ষ-নিমেষ, ঈর্ষা সব, উন্নত ধ্বজ-ধর্ম এবং এর বাহন সাতটি অশ্ব। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ, জগতী, পঙ্কিত, বৃহতী, উষ্ণীক–এই সাতটি ছন্দ। এর চক্র অক্ষে বাঁধা, অক্ষ ধ্রুবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এজন্য চক্রের সাথে অক্ষ ভ্রমণ করে। এই জ্যোতির্ময় রথে চড়ে নভোমণ্ডল পরিভ্রমণ করছেন সূর্য। ধ্রুবতারা আকাশপথে রথকে ঘুরিয়ে চলেছে।

.

তিপান্নতম অধ্যায়

সূত বললেন– সেই সূর্যরথে আদিত্য, দেবতা পনর্ধব, অপ্সরা গ্রামের নেতা, সর্প ও রাক্ষস, এরা পর্যায় ক্রমে দুমাস করে থাকে। চৈত্র ও বৈশাখ– এই দুমাস থাকে বাতাস্ত অর্যমা এই দুজন আদিত্য। পুলস্ত পুলহ এই দুজন ঋষি। বাসুকী সংকীর্ণ দুজন সর্প, তম্বুর ও নারদ এ দুজন গায়ক শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব, ক্রতু স্থলা, পুঞ্জিকাস্থলা ও দুজন অপ্সরা রথকৃচ্ছ ও উর্জ ও দুজন গ্রামণী হেবি ও প্রবেতি দুজন রাক্ষস। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এ দুমাস থাকে মিত্র ও বরুণ আদিত্য, অত্রি, বশিষ্ঠ ঋষি, তক্ষক ও রম্ভসর্প, মেনকা ও সহজন্য অপ্সরা, হাহা ও হু হু গন্ধর্ব, রথস্বন ও রথচক্র গ্রামের নেতা, পৌরুষেয় ও বধ-রাক্ষস শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ইন্দ্র বিবস্বান আদিত্য, অঙ্গিরা ও ভৃগুমুনি, এলাপত্র ও সঙ্খপাল সর্প, বিশ্বাবসু ও উগ্রসেন গন্ধর্ব প্রাতঃ অরুণ গ্রামণী, প্রয়োচ ও নিম্লোচ অপ্সরা, বাঘ ও শ্বেত রাক্ষক–এরা বাস করে।

শরতকালে শুভ্রদেব মুনিরা বাস করেন। পর্জন্ত ও পুষ্প আদিত্য, ভরদ্বাজ ও গৌতম মুনি, বিশ্বাবসু ও সুরভী গব্য বিশ্বাচী, ও ঘৃতাচী অপ্সরা ঐরাবত ও ধনঞ্জয় সর্প, লোহিত ও সুষেণ গ্রামের নেতা, আপত্তবতে রাক্ষস এরা, আশ্বিন ও কার্তিক এই দুই মাস সূর্যরথে বাস করে,

অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে অংশ ও ভগ আদিত্য, কশ্যপ ও ঋতুমুনি মহাপদ্ম, কর্কটক সর্প চিত্রকোণ ও ঊনায় গন্ধর্ব, ঊর্বশী ও বিচিত্তি অপ্সরা, তাক্ষ ও আবষ্টনেমি গ্রামের নেতা, বিদ্যুৎ ও স্ফুর্জ রাক্ষস এরা সূর্যরথে বাস করে। শীতকালে মাঘ ফাল্গুন এই দুই মাস সুষেণ ও বিষ্ণু আদিত্য জমগ্ন ও বিশ্বামিত্র মুনি, কম্বল ও অশ্বতর সর্প, ধৃতরাষ্ট্র সূর্যবর্চা গন্ধর্ব, তিলোত্তমা ও রম্ভা অপ্সরা, ঋতজিত ও সত্যজিৎ গ্রামের নেতা, বক্ষোপেত যজ্ঞোপেত রাক্ষস এরা সূর্যরথে থাকে। এঁরা আত্মতেজে সুর্যকে আপ্যায়িত করে থাকেন। মুনিরা রবির স্তব পাঠ করেন। গন্ধর্বরা নাচে গানে তাঁকে তৃপ্তি দেন। গ্রামের নেতারা রথের রশ্মি ধারণ করে থাকেন। সর্পেরা সূর্যকে বাহন করে থাকে। রাক্ষসরা রক্ষীরূপে সূর্যকে অনগমন করে। মুনিরা উদয় থেকে অস্ত অবধি বরিকে পরিচর‍্যা করেন। এই সমস্ত দেব, মুনি, গন্ধর্ব, পন্নগ, অপ্সরা, গ্রামের নেতা ও রাক্ষসরা সূর্যরথে ছমাস বাস করে তাপ, বৃষ্টি, প্রকাশ ও বাতাস ইত্যাদি প্রাণীদের শুভাশুভ উৎপাদন করে থাকেন। এঁরা কখনো নানা দেহের শুভ অবতরণ করে অশুভ বিধান করেন, কখনো পাপীদের পাপরাশি এরা বায়ুবেগী বিমানে চড়ে সূর্যের সাথে ভ্রমণ করে। মন্বন্তর কাল পর্যন্ত এরা বৃষ্টি ও রোদ দিয়ে প্রজাদের আনন্দ বিধান করে থাকেন।

অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব কালেই একই নিয়ম। চোদ্দ মন্বন্তর পর্যন্তই এঁরা এভাবে আবর্তিত হয়। সূর্যদেব রশ্মি পরিবর্তন করে দিনরাত্রি ভাগ করে গ্রীষ্মে তাপ, শীতে হিম এবং বর্ষাকালে বৃষ্টি দিয়ে পিতা ও মানুষদের তৃপ্তিসাধন করে থাকেন। চন্দ্র শুক্লপক্ষে সূর্যের তেজে পূর্ণ হলে, দেবতারা কৃষ্ণপক্ষে সেই অমৃত পান করেন। সূর্য থেকে সেই অমৃত, জলরাশি ও বৃষ্টি পেয়ে শস্য বেড়ে ওঠে। মর্তের লোকেরা তা অন্নরূপে ব্যবহার করে খিদে মেটায়। দেবতারা অমৃত দিয়ে অর্ধেক মাস ধরে তৃপ্তি লাভ করেন। মর্ত্যবাসীরা অন্ন খেয়েই জীবিত থাকে। এই অন্ন সূর্য কিরণেই পুষ্ট। সূর্য তার রশ্মি দিয়ে জল শুষে নেন। একচক্র ও সাত ঘোড়া যুক্ত রথে চড়ে দিনরাত সাতটি দ্বীপ ও সমুদ্রবেষ্টিত মহীমণ্ডলে ঘুরে বেড়ান। কল্পের প্রথমে একবার মাত্র যুক্ত হয়ে এই বেগবান মহাবলবান ঘোড়াগুলি কল্পের শেষ পর্যন্ত সূর্যরথ বহন করে থাকে।

.

চুয়ান্নতম অধ্যায়

এক বৎসর তারার ভেতরে ও বাইরে আশি শত মণ্ডল পথ পরিক্রমা করে। সূর্যের মতো চাঁদেরও রশ্মির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। চাঁদের রথ তিনটে চক্র যুক্ত। এর দুপাশে অশ্বেরা রয়েছে। এটি জলের মধ্যে থেকে উঠে এসেছিল। দশটি দ্রুতগামী ঘোড়া আদিকাল থেকে শঙ্খের মতো

সুন্দর শুভ্র কান্তিময় চন্দ্রকে কল্পের শেষ পর্যন্ত বহন করে থাকে। চাঁদের ঘোড়াগুলি হল–যখু, ত্রিখন, বৃষ, বাজী, বল, বাম, তুবণ্যহংস, বৈঠামী ও মৃগ। আবহমান কাল থেকে এই ঘোড়াগুলি চন্দ্র রথকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দেবতা ও পিতাদের নিয়ে চাঁদ চলাচল করে। সূর্য পনেরোদিন সুমুন্ন নামে রশ্মি দিয়ে প্রতিদিন চাঁদের এক ভাগ করে পূরণ করেন। তাই শুক্লপক্ষে চাঁদের কলাগুলি বাড়তে থাকে। এই সূর্যতেজে কলাবৃদ্ধি করে। চাঁদ একপক্ষ পূর্ণ হলে পূর্ণ মণ্ডল হিসেবে বিরাজ করে। দেবোর সেই চাঁদের সৌম্য মধু পান করেন।

কৃষ্ণ পক্ষে একরাত শুধু সমস্ত দেবতা, পিতা ও মহর্ষিরা মিলে সোমের অমৃত পান করেন। এরপর আস্তে আস্তে কলাক্ষয় হয়। পিতারা অমাবস্যাতেই আসেন। এরপর চাঁদের পনেরোটি ভাগের কলার কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকতে পিতারা অপরাহ্ন কালে অবশিষ্ট অংশ পানের জন্য উপস্থিত হন। সেই অবশিষ্ট কলা থেকে যে সুধামৃত পাওয়া যায়, তারা দ্বিকলাত্মক কালমাত্র পান করেন। তাতেই তাঁরা একমাত্র তৃপ্ত থাকেন। অমাবস্যায় পিতারা যতক্ষণ সোমের পনেরো কলা পান করে শেষ করেন। ততক্ষণ তার অন্তভাগ পরিপূরিত হতে থাকে। চাঁদের ষোলোকলা এভাবে বাড়ে আর পনেরোকলা এভাবে কমে যায়। সূর্যই এই ক্ষয়বৃদ্ধির কারণ।

এরপর রাহু তারা ও রথের বিবরণ বলছি। বুধের রথ জল তেজোময়। মেঘের মতো ধ্বজ পতাকা। যুক্ত। এই রথের বেগ বায়ুর মতো। আটটি ঘোড়া এই রথকে বয়ে নিয়ে চলে। এই রথে দিব্য সারথি রয়েছে। শুক্রের রথ সূর্যের মতো উজ্জ্বল ও সুন্দর। এর ঘোড়াগুলি নানা বর্ণের। সাদা, শিশঙ্গ, সারঙ্গ, নীল, পীত, লাল, কালো, সবুজ প্রভৃতি দশ রকম স্থূলকায় বায়ুবেগী ঘোড়া শুক্রের রথ বয়ে নিয়ে চলে। মঙ্গলের রথ আটটি ঘোড়া যুক্ত, ঘোড়াগুলি দেখতে সুন্দর। ঘোড়াগুলো লাল রঙের। এরা আগুন থেকে জন্মেছে, মঙ্গল সেই রথে চড়ে রাশিচক্রে সোজা পথে বিচরণ করেন। অঙ্গিরা পুত্র দেবাচার্য বৃহস্পতি বায়ুর মতো বেগবান কাঞ্চন রথে আরোহণ করে সব জায়গা ঘুরে বেড়ান। শঙ্খচরের রথ কালো ও লোহা নির্মিত। এর ঘোড়াগুলি ব্যোমজাত ও বর্ণ।

রাহুর রথ কালো রঙের আটটি ঘোড়াযুক্ত, রথ কৃষ্ণবর্ণ, অন্ধকারময়। রাহু পূর্ণিমার দিন সূর্য থেকে বেরিয়ে চাদে ঢোকে আর অমাবস্যার দিনে চাঁদ থেকে বেরিয়ে বয়ে নিয়ে চলে। রথ ও ঘোড়াগুলির বর্ণনা দেওয়া হল। চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহেরা সবাই বায়ুময় অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে ধ্রুবে নিয়ন্ত্রণে রাশিচক্রে ঘুরতে ঘুরতে যথাবেগে ভ্রমণ করছে। ফলে জ্যোতিরা সবসময়ই একাদশীতে ধ্রুবের অনুগমন করে। নদীজলে নৌকার মতো বায়ুমণ্ডলে দেবালয়গুলোর রয়েছে, তাই নভোমণ্ডলে দেবতাদের দেখা পাওয়া যায়, যত তারা, তত সংখ্যক বাতরশ্মি ধ্রুব

স্বয়ং ভ্রমণ করেন ও সমস্ত জ্যোতিমণ্ডলকে পরিক্রমিত করেন। জ্যোতিমণ্ডলকে বয়ে নিয়ে চলে বলে সেখানে বাতাসের নাম প্রবহ। সেই তারাময় পিণ্ডমায় নামে ধ্রুব আকাশমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। তাকে দেখলে পাপক্ষয় হয়। সেই ক্ষেত্রে মত তারা আছে দর্শনকারী মানুষ তত হাজার বছর বাঁচে। সেই শিশুমার সবসময়ই রয়েছেন। এঁর তত্ত্ব বিভাগ অনুযায়ী জানা উচিত। উত্তানপাদের উত্তর বণু বা চোয়াল, যজ্ঞ ঐ ঠোঁটে, ধর্মমাখা হৃদয় নারায়ণ দেব এবং মাধ্যে দেবগণ, পূর্ব দুপর্যায়ে দুজন অশ্বিনী কুমার। পশ্চিম দুপায়ে বরুণ ও অর্যমা, গুহ্যদেশে মিত্র বা পুচ্ছে বা পিছনের দিকে অগ্নি, মহেন্দ্র, মরীচি, কশ্যপ ও ধ্রুব এরা প্রতিষ্ঠিত। শিশুমার এর উদয় বা অস্ত নেই। নক্ষত্র, চাঁদ, সূর্য, তারা ও গ্রহেরা সবাই উন্মুখ, হয়ে চক্রাকারে গগন মণ্ডল আশ্রয় করে আছে এবং সবাই ধ্রুবকে ঘিরে রয়েছে, ধ্রুবই প্রধান। ধ্রুব একাই মেরু পর্বতের মাথায় অধোমুখে থেকে মেরুকে দেখতে দেখতে সবসময় পরিভ্রমণ করে এবং এর সাথে সমস্ত জ্যোতিষ্ককে আকর্ষণ করে থাকে।

.

পঞ্চান্নতম অধ্যায়

ঋষিরা বলেন–আপনি যে বিখ্যাত দেব গ্রহগুলোর উল্লেখ করলেন সেই দেব গ্রহগুলো কিভাবে রয়েছে? জ্যোতির্গণ সম্বন্ধে বিবরণ দিন। ঋষিদের অনুরোধ শুনে সমাহিত মনে সূত বললেন– মহাপ্রাজ্ঞরা এ সম্বন্ধে কী মত প্রকাশ করেছেন, আমি সে বৃত্তান্ত বলছি। তার আগে অগ্নির উৎপত্তি বৃত্তান্ত বলছি। ব্রাহ্ম রজনীর শেষে যখন চারটে ভূত মাত্র বাকি ছিল, যখন কোন পদার্থ সৃষ্টি হয়নি, ঘন অন্ধকারে সমস্ত আচ্ছন্ন তখন সবার প্রথমে যে অগ্নি দেখা যায় তাই পার্থিব অগ্নি। যে অগ্নি সূর্য থেকে তাপ দেয়, তার নাম শুচি অগ্নি। বিদ্যুৎ, জঠর ও সৌর-এ তিন অগ্নিই জলাগর্ভ। সেজন্য সূর্যকিরণ দিয়ে জলপান করে দীপ্তি পেয়ে থাকেন বৃক্ষাগ্নিতে যদি বৈদ্যুত অগ্নি সমষ্টি হয় তবে তা আর জ্বলে নিভে যায় না।

মানুষের জঠরের অগ্নি ও জলে শান্ত হয় না। জঠর অগ্নি খুব জ্যোতি সম্পন্ন। আর যা অগ্নি মণ্ডলাকারে বিরুদ্ধ ভাবে প্রকাশ পায় তা দিনের থেকে রাত্রিতে বেশি দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। কারণ সূর্য অস্ত গেলে একপাদ পরিমিত সৌরী প্রভা সেই অগ্নি মধ্যে ঢুকে পড়ে, তাবোর উদয়কালে পার্থিব অগ্নি একপাত্র প্রভা সূর্যের মধ্যে প্রবেশ করে। সেজন্য সূর্যদেব তাপিত করে থাকেন। উত্তর ভূমধ্যর্ধে বা এই দক্ষিণ ভূমধ্যর্ধে সূর্যোদয় হলে রাত্রি জনমধ্যে আবিষ্ট হয়। এজন্য দিনেরবেলা জল তামার মত রঙীন দেখায়। আবার সূর্য অস্ত গেলে দিন রাত্রির মধ্যে প্রবেশ

করে, এজন্য রাত্রিতে সাদা ভাস্বর দেখায়। যে অগ্নি, সূর্য থেকে কিরণ দিয়ে জলপান করে তা বিনিদ্র পার্থিব অগ্নি। একে দিব্যঅগ্নি বলা হয়। সেই অগ্নি সহস্রপথ, কুম্ভের মত গোলাকার, যে সহস্র রশ্মি দিয়ে চারদিক থেকে সমুদ্র, নদী, কুয়ো, বিল, স্থাবর জঙ্গম সব রকম জল আকর্ষণ করে। সূর্যের বিভিন্ন রকম কিরণ আছে, যেমন উষ্ণ, শীত, ও বর্ষণ ক্ষরণকারী। বর্ষণকারী পাঁচটি কিরণ আছে। এরা বন্দন, বন্দ্য, স্বর্তশ, নূতন ও অমৃত নামে বিখ্যাত।

এছাড়া দৃশ্য, মেধ্য বাহ্য, হ্লদন ও চন্দ্র ইত্যাদি তিনশো হিমবর্ষী কিরণ আছে। উত্তাপদানকারী তিনশো কিরণ আছে। সূর্য এইসব কিরণ দিয়ে পিতৃদেব ও মনুষ্যগণকে সমানভাবে পোষণ করে থাকেন। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে সূর্য তিনশো কিরণে তাপ দেন, বর্ষা ও শরৎ কালে চারশো কিরণে তাপ বর্ষণ করে ও হেমন্ত ও শিশিরকালে তিনশো কিরণে হিম সৃষ্টি করে। তারা, চাঁদ, গ্রহাদি সূর্য থেকে জন্মেছে। নক্ষত্রের অধিপতি হল সোম, গ্রহরাজ সূর্য। প্রথম পাঁচটি গ্রহ কামরূপী ও অসাধারণ সামর্থ্য এদের রয়েছে। অগ্নি, আদিত্য ও জলই চাঁদ।

অন্য কয়েকটি গ্রহের কথা বলছি এবার। স্কন্দদেবই মঙ্গলগ্রহ, নারায়ণই বুধ, রুদ্রদেবই সাক্ষাৎ ধর্মরাজরূপী যম। তিনিই শনৈশ্চর গ্রহের রূপ ধরে রয়েছেন। দেবগুরু ও অসুরগুরু হলেন যথাক্রমে শুক্র ও বৃহস্পতি। দেবাসুর মানুষ সমস্ত জগতই আদিত্যের। সমস্তই সূর্য থেকে জন্মায় আবার সূর্যেই লয় প্রাপ্ত হয়। জগতই গ্রহময়। ক্ষণ, মুহূর্ত, দিন, রাত, পক্ষ, মাস, সব, বৎসর, ঋতু, কাল ও যুগ– সমস্তই সূর্যে লয় ও উদয় হয়। আদিত্য ছাড়া কাল গণনা যায় না।

কাল জ্ঞান ছাড়া দীক্ষা আহ্নিক কিছুই সিদ্ধ হয় না। ঋতু বৈচিত্র্য না থাকলে ফুল ফল ইত্যাদি উৎপন্ন হবে কি করে? স্বর্গ মর্ত্য কোথাও সূর্য ছাড়া ব্যবহার নিষ্পত্তি হয় না। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ। দ্বাদশাত্মা প্রজাপতি সূর্যই কাল ও অগ্নিস্বরূপ, ত্রিলোকেই তিনি তাপ দান করেন। সূর্যের হাজার রশ্মির মধ্যে সাতটি রশ্মি প্রধান। এরাই গ্রহ সৃষ্টির আধার নামগুলি হল সুষুম্ন, হরিকেশ, বিশ্বকর্মা, বিশ্বশ্রবাঃ সংযদ্বসু, অর্ধাগবসু ও স্বরাট। সুষুম্ন রশ্মি ক্ষীণ চন্দ্রকে বাড়িয়ে তোলে। হরিকেশ রশ্মি পুরোভাগ বর্তী। এটি নক্ষত্রসেমী, বিশ্বকর্মা। রশ্মি দক্ষিণে থেকে বুধের বৃদ্ধি করে। বিশ্বশ্রবা রশ্মি পশ্চাদ ভাগের এটি শুক্রযোনি। সংষদ্বসু রশ্মি মঙ্গলের উৎপাদক, অর্ধাগবাসু রশ্মি, বৃহস্পতির শনি এবং আবাট নামে রশ্মি শানেশ্বরকে আপ্যায়ন করে থাকে।

এভাবে সূর্যের প্রভাবে গ্রহ নক্ষত্র তারকাদের বৃদ্ধি হয়। ক্ষয় পায় না বলে নক্ষত্র এই নাম হয়েছে। কিরণ দিয়ে নক্ষত্রদের মধ্যে আপতিত হন। গ্রহাশ্রয়ে থেকে জনগণের ত্রান সাধনে সহায়তা করে বলে এরা তারকা। শুক্ল তেজোময় বলে এদেরকে তারা বলা যায়। তেজ ও জল

ক্ষরণ করে বলে সূর্যের আরেক নাম সবিতা। চন্দ্রধাতু থেকে এবং শুক্লত্ব, অমৃতত্ত্ব ইত্যাদি বিবিধ অর্থে ব্যবহার বলে চাঁদ শব্দটি এসেছে। আকাশে চাঁদ ও সূর্যের দুটি মণ্ডল, জল তেজোময়, দিব্য ভাস্কর কুণ্ডের মতো গোলাকার। সূর্য ও চন্দ্র মণ্ডলে সব দেবতারাই প্রবেশ করেন। সব মন্বন্তরেই তারা চঁদ ও সূর্যের আশ্রয় থেকে প্রকাশমান হন। তাদের সেই আশ্রয়স্থানগুলো দেব গৃহ। সূর্য সৌরস্থান, সোম সৌম্যস্থল, এবং শনৈশ্চর স্থান আশ্রয় করে থাকেন। সূর্য মণ্ডলের তিস্ত পরিমাণ হাজার যোজন। সূর্যের বিস্তারের চেয়ে চাঁদের বিস্তার দ্বিগুণ।

রাহু অধোভাগে বিচরণ করে। পৃথিবীর ছায়া দিয়ে সেই মণ্ডলাকৃতি রাহু নির্মিত। এর বিরাট স্থান তমোময়। রাহু পূর্ণিমার দিন আদিত্য থেকে বেরিয়ে যেখানে প্রবেশ করে অমাবস্যার দিন আবার সোম থেকে আদিত্যে প্রবেশ করে। শুক্র চাঁদের ষোলোভাগ, বৃহস্পতি বিষ্কম্ভ পরিমাণ দিয়ে তা থেকে পাদহীন এবং যোজনাগ্রবর্তী মঙ্গল ও শনি, বৃহস্পতি থেকে একপাদহীন। অপেক্ষাকৃত বড় তারার বিস্তার বুধের সমান। এরা প্রায়ই চাঁদের কাছাকাছি। তারা নক্ষত্রগুলোয় পরস্পর পাঁচ, চার, তিন, দুই এক ও আধযোজন ব্যবধানে রয়েছে।

শনি, বৃহস্পতি ও মঙ্গল এরা সব গ্রহের উপরিভাগে আস্তে আস্তে বিচরণ করেন। এদের নীচে অন্য চারটি মহাগ্রহ–সূর্য, সোম, বুধ ও শুক্র, এরা তাড়াতাড়ি বিচরণ করে থাকেন। সাধারণত আকাশে যত তারা আছে ততগুলি নক্ষত্র রয়েছে। সংখ্যায় হাজার হাজার কোটি, নক্ষত্র পথ আছে। সেই পথ। দিয়েই সূর্য অয়ন অনুসারে চলাচল করে, পর্বকালে যখন চাঁদ উত্তরায়ণে থাকেন, তখন বুধ বুধের জায়গায়, রাহু ও নক্ষত্র যে যার স্থানে থাকে। এইসব স্থান পুণ্যাত্মা মানুষের জ্যোতি দিয়ে তৈরি। কল্পের শুরুতে ব্রহ্মা, এই সমস্ত নির্মাণ করেছিলেন। মহাপ্রলয় পর্যন্ত এটি স্থায়ী হয়। বৈবস্বত মন্বন্তরে অদিতি, পুত্র সূর্যদেব, ধর্মপুত্র বসুচন্দ্রদেব, অসুর, যাজক, ভার্গব ও শুক্রদেব, অঙ্গিরাপুত্র দেবগুরু বৃহস্পতি, ত্বিসি পুত্র বুধ, অগ্নি বিকল্প মঙ্গল ও সিংহিকা পুত্র ভূত সন্তাপন অসুর রাহু হন। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য গ্রহাদির, দেবতাদের স্থানগুলোর বর্ণনা করা হল। সহস্র কিরণ সূর্যের স্থান অগ্নিময় শুক্লবর্ণ, চাঁদের স্থান জলময় শ্বেতবর্ণ, বুধের স্থান বলময় শ্যামবর্ণ। বৃহস্পতির স্থান বিরাট সবুজ রঙের। আট রশ্মিযুক্ত শনির স্থান কালো ও জলময়। রাহুর স্থান তামস। তারকাগুলোও শ্রুত রশ্মি জলময়। অতিশুভ্রবর্ণ ও পুণ্য কীর্তিদের আশ্রয় বলা হয়।

তারকাগুলিকে বিধাতা কল্পের প্রথমে বেদের দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। সূর্য যখন দক্ষিণ পথে নাগবীথিতে বিচরণ করেন তখন ভূমিলেখা দিয়ে আবৃত হয়ে অমাবস্যা পূর্ণিমার যথাকালে

দেখা দেন এবং খুব তাড়াতাড়ি অস্তে যান। চাঁদ উত্তর পথে থাকলে দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণ পথে থাকলে নিয়ম অনুসারে কখনও দৃশ্য কখনও অদৃশ্য হন। জ্যোতিষ্কদের গতির নিয়ম আছে। সেই অনুসারে চাঁদ সূর্য নিয়মিত কালে বিষুবরেখায় উদয়-অস্ত হয়ে থাকে। কিন্তু উত্তর বীথিতে অমাবস্যা পূর্ণিমায় অস্ত ও উদয়ের পরে কালের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সূর্য যখন দক্ষিণায়ন পরবর্তী হন, তখন তিনিই সবগ্রহের নিম্নচারী। তার উপরে বিস্তীর্ণ মণ্ডল, চাঁদ, তার ওপরে নক্ষত্র মণ্ডল, তার ওপরে বুধ, তার ওপরে বৃহস্পতি এবং তারও ওপরে শনৈশ্চর, এর উপরে সপ্তর্ষি মণ্ডল আর সবচেয়ে ওপরে ধ্রুব চাঁদ সমস্ত গ্রহদের মধ্যে দিব্য তেজোময় আকাশে প্রতিদিন যথা নিয়মে নক্ষত্রগুলোর সাথে যুক্ত-বিযুক্ত হয়ে থাকেন।

এই সমস্ত গ্রহ পূর্বকালে নক্ষত্র গুলোতে উৎপন্ন হয়। গ্রহদের অগ্রগণ্য অদিতি পুত্র সূর্য, চাক্ষুষ মন্বন্তরে বিশাখা নক্ষত্রে জন্ম নেন। ধর্ম পুত্র ত্বিষিমাস, বিশ্বাবসু নেমে শীত, রশ্মি, নিশাকর কৃত্তিকাতে সমুৎপন্ন হন। শুক্র পুষ্যা নক্ষত্রে প্রাদুর্ভূত হন। জগৎগুরু বৃহস্পতি ফাল্গুনি নক্ষত্রে, প্রজাপতি সূত, মঙ্গল গ্রহ আষাঢ়া নক্ষত্রে জন্মলাভ করেন। রেবতী নক্ষত্রে শনৈশ্চর এবং রাহু ও কেতু এই দুই গ্রহে জন্ম নেন। ধ্রুব হলেন সমস্ত গ্রহের আদি। নক্ষত্রদের মধ্যে প্রবিষ্ঠা, অয়ন মধ্যে উত্তর, পাঁচ বছরের মধ্যে সংবৎসর ঋতুদের মধ্যে শিশির মাসগুলোর মধ্যে মাঘ, দুটো পক্ষের মধ্যে শুক্লপক্ষ, তিথিগুলোর মধ্যে প্রতিপদে দিন ও রাতের মধ্যে দিন, মুহূর্তের মধ্যে রৌদ্র মুহূর্ত এবং কালগুলির মধ্যে নিমেষাত্মক কালই আদি বলে কালবিদরা বলেন। সূর্যই কাল বিভাগের ও চার রকম ভূতের প্রবর্তক ও নিবর্তক। লোক ব্যবহারে সুশৃঙ্খলার জন্যই ঈশ্বর এই সুনিয়ন্ত্রিত জ্যোতিশ্চক্রকে বিন্যাস করেছেন। এটি বিরাট ও বৃত্তাকার। এই জ্যোতিষচক্র প্রকৃতির একটি অদ্ভুত পরিণাম। জ্যোতিষগুলির গতি সম্বন্ধে কোন মানুষই তার নিজের চোখে ঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবে না। জ্যোতিষ্ক তত্ত্ব নির্ণয় ব্যাপারে চোখ শাস্ত্র জল ও লিখিত গ্রন্থ ও গণিত বুদ্ধি সম্পর্কে এই পাঁচটি কারণ জানতে হবে।

.

ছাপান্নতম অধ্যায়

ঋষিরা বললেন– হে মহাভাগ! কোন্ দেশে, কোন কাজে ব্রহ্মপুরুগামীদের পুণ্য উত্তম ঘটনা ঘটেছিল, সে সমস্ত আমাদের জানান। সূত বললেন–নগরাজ হিমালয়ের উত্তরদিকে, সরোবর, নদী, হ্রদ, পবিত্র উদ্যান, তীর্থ দেবায়তন, গিরিশৃঙ্গ, প্রভৃতি জায়গায় দেবভক্ত মহাত্মা মুনিরা

বিধি অনুসারে দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব করেন। ঐ সব মুনি নাম, ঋক যর্জুবেদ ও নাচগান, পূজা, ওঙ্কার ও নমস্কার প্রভৃতি দিয়ে শিবকে সব সময় পূজা করতে থাকেন।

একবার সূর্য জ্যোতিষচক্রের মাঝে এলে সূর্যতাপে নিয়তাত্মা মুনিদের প্রাণান্তকর অবস্থা হয়। এই সময় বায়ু 'নীলকণ্ঠকে নমস্কার' এ কথাটি উচ্চারণ করেন। তখন অষ্টাশী হাজার বালখিল্য মুনি বায়ুকে বললেন– পবিত্র এই শব্দ সম্বন্ধে আপনার কাছে জানতে ইচ্ছা করি, যে যে কারণে অম্বিকাপতির কণ্ঠ নীল হয়েছে তা আমাদের জ্ঞাত করান। আপনার মুখ থেকে শোনার অন্য অর্থ আছে। কারণ আপনার থেকেই প্রথমে জ্ঞান, পরে উদ্যম, তারপর প্রবৃত্তি জন্মে, তারপর শেষে বর্ণ প্রবৃত্তি হয়। আপনার গিরি সর্বত্র, দেবতাদের মধ্যেও আপনি ছাড়া আর কেউ নেই এটিই জীবেরা সব সময় প্রত্যক্ষ করে থাকে। আপনাকেই বাচস্পতি ঈশ্বর ও নায়ক বলা হয়। তাই কিভাবে নীলকণ্ঠের গলা বিকৃত হয়েছে, তা বলুন।

ঋষিদের কথা শুনে লোকপূজ্য মহাতেজ বায়ু প্রত্যুত্তরে বললেন–পূর্বকালে সত্যযুগে ব্রহ্মার মানসপুত্র ধর্মাত্মা বশিষ্ঠ, ময়ূরবাহন কার্তিককে এমন প্রশ্ন করেছিলেন। পার্বতীর হৃদয়ের নন্দন কার্তিকেয়কে ভক্তিসহকারে বশিষ্ঠ এমন প্রশ্ন করলেন, হে হরনন্দন– উমা, অগ্নি ও গঙ্গা এই সবই আপনার উৎপত্তি স্থান; আপনাকে প্রণাম। হে কৃত্তিকাপুত্র আপনি শরবনে জন্মেছেন, আপনার ছটি মুখ, বারোটি চোখ, আপনার হাতে শক্তি শোভা পায় ও পতাকাতে দিব্য ঘণ্টা বাজছে, আপনাকে নমস্কার। এভাবে কার্তিকেয়ের স্তব পাঠ করে বশিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করলেন – কুন্দ ফুলের মতো সাদা শিবের কণ্ঠে, এই যে নীল রঙ দেখা যাচ্ছে তা কি কিভাবে হল? আমি এ বিষয়ে শ্রদ্ধা সম্পন্ন। মঙ্গলাবহ এই পবিত্র ঘটনা আপনি বলুন।

বশিষ্ঠের একথা শুনে মহাতেজা কার্তিক বললেন, মা উমার কোলে শুয়ে আমি যেমন শুনেছিলাম তা বলছি। প্রথমে আমি সেই কৈলাস পর্বতের কথা বলছি। নানা বৈচিত্র্যময় ধাতুতে শোভিত, তপ্ত কাঞ্চনের মতো এর প্রভা। পর্বতের শিলাতলে বজ্রস্ফটিকময় শিলা আছে। সিঁড়িগুলি সুবর্ণময় ধাতুতে গড়া। কোথাও ভ্রমরের গান শোনা যাচ্ছে, কোথাও কলকল শব্দে বৃষ্টি পড়ে, কোথাও বা কন্দর দেশ ময়ূর ও বকদের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত। অপ্সরা ও কিন্নর এর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কোথাও পাথরের সিঁড়িতে বাঘ এবং সিংহ মুখ, কোথাও গজ, অশ্ব, বিড়াল ও ভীষণ শিবা মুখের প্রমথরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের দেখতে কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা, কেউ রোগা, কেউ মোটা, কারো লম্বোদর, কারো হাত, উরু খর্বকার, কারো একটি পদ, কারো বহুপদ, কারো মাথা নেই,

কারো এক চোখ, মণিমুক্তো রত্নে ভরা সোনার শিলা তলে সুখী মহাযোগী ভূতপরিবৃত মহাদেবকে উমা বললেন, হে ভগবান! হে মহাদেব! আপনার গলাতে মেঘের মত নীল ও কি দেখা যাচ্ছে? হে ঈশ্বর এই নীলিমার কারণ কি? আমার মনে হয় এর বিশেষ কোনো কারণ আছে, আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে। এসব কথা আমাকে বলুন। দেবশঙ্কর বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, যখন দেবতারা অমৃতের জন্য সমুদ্রমন্থন করেন, তখন প্রথমেই কালো জলের মতো বিষ ওঠে। তখন দেবতাগণ ও দৈত্যরা ভয় পেয়ে স্বয়ং ব্রহ্মার কাছে যান। ব্রহ্মা বললেন, কি জন্যে আপনারা ভয় পাচ্ছেন? আপনাদের জন্য আমি আটগুণ ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছি। কেউ কি আপনাদের ঐশ্বর্য চুরি করেছে? আপনারা সবাই ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর, আপনারা স্বচ্ছন্দ বিহারী, আপনারা প্রজাদের সব কাজে প্রবৃত্ত করতে পারেন। আপনারা এতটা ভয় পাচ্ছেন কেন?

মহাত্মা ব্রহ্মার এমন কথা শুনে ঋষি প্রভৃতি দেব-দানবরা বলতে শুরু করলেন–মহাত্মা দেব ও অসুররা সমুদ্র মন্থন করলে, প্রলয়কালীন সংবর্তনামে আগুনের মতো কালো ত্রৈলোক্য বিনাশী ঐ বিষ চারিদিকে প্রদীপ্ত করে ওপরে উঠেছে। ঐ বিষে দগ্ধ হয়ে গৌরাঙ্গ জনার্দন বিষ্ণুও কালো হয়ে গিয়েছেন। বিষ্ণুকে দেখে ভয় পেয়ে আমরা আপনার শরণ নিচ্ছি। পিতামহ ব্রহ্মা একথা শুনে লোকহিতের জন্য বললেন–হে দেবগণ! হে তপোধন ঋষিরা, আপনারা শুনুন যে বিষ বিষ্ণুকেও কালো করে ফেলেছে, শঙ্কর ছাড়া এই বিষের বেগ কেউ সহ্য করতে পারে না। এই বলে লোক পিতামহ শঙ্করের স্তব শুরু করলেন। তিনি বললেন–হে বিরুপাক্ষ, তোমাকে প্রণাম। তোমার অনন্ত চোখ তোমার হাতে পিনাক ও বজ্র, তুমি ত্রিলোকের অধীশ্বর, সমস্ত প্রাণের পতি, তাপস ও ত্রিলোচন, তোমাকে নমস্কার। তোমার রাগেই মদনদেব ভস্ম হয়েছেন, তুমি কালেরও কাল, তুমি করাল, শঙ্কর, কপালী, বিরূপ, তুমি ত্রিপুর দাহ করেছ, তুমি বুদ্ধ, শুদ্ধ মুক্ত। তোমার দ্বিতীয় আর কেউ নেই।

তোমার দুহাত পদ্মের মতো নরম, দশদিক তোমার বদন, তুমি ত্রিলোকের বিধাতা তুমি, চন্দ্র ও বরুণ, তোমায় নমস্কার। তুমি উমার প্রিয়, সর্বদিন, পক্ষ, মাস, অর্ধমাস, সংবৎসর তোমার শরীর, তুমি কখনও বহুরূপ, কখনও মুণ্ডিত মস্তক, তোমার হাতে নরকপাল, শিরোদেশে তোমার চুড়া; তুমি ধ্বজ ও রথযুক্ত; তুমি ব্রহ্মচারী, তুমি ঋক, যজুর ও সামময়, তুমি পুরুষ ও ঈশ্বর, তোমায় নমস্কার। তুমি অনন্ত গুণে ভুষিত, তাই তোমাকে নমস্কার করি, ব্রহ্মা এভাবে স্তব ও প্রণাম করে আরও বললেন– যার শিরোদেশ গঙ্গাজলে আপ্লুত, সেই অতি সূক্ষ্ম ও যোগ দিয়ে দেবাদিদেব মহাদেব, আমার ভক্তি, জেনে আবির্ভূত হোন, কারণ চাঁদকে প্রত্যক্ষ করা গেলেও, তিনি কারোর ডাকে আসেন না। হে দেবী, তারপর নানা স্তুতিবাক্যের দ্বারা

ভগবান ব্রহ্মা, এভাবে স্তুতি করলে, খুশি হয়ে পিতামহ ব্রহ্মাকে বললাম–হে ভগবান! হে জগতপতি! আমি আপনার কি প্রিয় কাজ করব? প্রত্যুত্তরে ব্রহ্মা বললেন–হে ভগবান। হে পদ্মনেত্র শুনুন, সুরাসুর গণেরা সমুদ্র মন্থন করলে, সমুদ্র থেকে নীল মেঘের মতো রঙীন ভয়ংকর বিষ উঠেছে। ঐ বিষ প্রলয়কালীন আগুনের মতো আবির্ভূত হয়েছে। প্রথমেই এই কালানলের মত বিষকে উঠতে দেখে আমরা ভীষণ ভয় পেয়েছি। যখন যাই উৎপন্ন হোক না কেন, আপনিই তো সবার আগে ভোজন করে থাকেন। তাই হে মহাদেব, লোকহিতের জন্য আপনিই এই বিষ পান করুন। ত্রিভুবনে আপনি ছাড়া কোনও পুরুষ নেই যে এই বিষ পান করতে পারে। শঙ্কর বললেন–হে দেবী! আমি তখন ব্রহ্মার এরকম কথা শুনে বিষপানে সম্মতি দিয়ে সেই বিষপান করলাম। সেই ঘোর ভয়ংকর বিষপান করায় তখনই আমার কণ্ঠের রঙ কালো হয়ে গেল। হে গিরিরাজ নন্দিনী, আমি পরম ব্রহ্মার কথা শুনে, দেবতা, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব, সমস্ত প্রাণী, পিশাচ, রাক্ষস ইত্যাদির সামনে সেই বিষ পান করায় আমার কণ্ঠ নীল রং ধারণ করল। সেই কালকূট কণ্ঠে ধারণ করলে আমায় দেখে সুর অসুররা বিস্মিত হলেন। এরপর সকলে মিলে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বলতে শুরু করলেন–হে দেবাদিদেব, তোমার বীর্য, পরাক্রম ও যোগবল ধন্য। তোমার প্রভুত্বকেও ধন্যবাদ দিতে হয়। তুমিই সূর্য, চন্দ্র, ভূমি, জল, যজ্ঞ ও নিয়ম, তুমি বহ্নি, পবন, নিখিল চরাচরের কর্তা, প্রলয়কালে তুমি সব প্রাণীদের রক্ষাকর্তা। সকলে মাথা নত করে শিবের চরণবন্দনা করে নিজেদের আবাসস্থলে চলে গেলেন।

এই যে লোকবিশ্রুত বিখ্যাত নীলকণ্ঠ উপাখ্যান বললেন, এটি পরম পবিত্র, গোপনীয় স্বয়ং স্বয়ম্ভু এই পাপ প্রণাশিনীর কথা বলেছেন। যে ব্যক্তি সবসময় ব্রহ্মসঙ্কৃত কথা শোনেন, তাঁর বিপুল ফললাভ হয়। এই পবিত্র ব্যক্তির গায়ে স্থাবর জঙ্গম সে কোন বিষ নিক্ষিপ্ত হলেও এর প্রভাবে প্রশমিত হয়। এটি পুরুষকে রাজসভায় সম্মানিত করে, এই কথা এভাবে শ্রবণে জয়, পথ গমনে মঙ্গল, গৃহে সম্পদ প্রাপ্তি হয়ে থাকে, হে বরাননে। নীলকণ্ঠ, ত্রিশুলপানি, বৃষবাহন এই সব নাম যে ব্যক্তি শরীরে ধারণ করেন তার গতি শুনুন। আকাশপথে বাতাসের গতি যেমন সবসময় থাকে, তেমনি সেই ব্যক্তি আমার মতো বলশালী, শ্রীমান, পরাক্রমী হয়ে আমার আদেশে সমস্ত লোকে বিচরণ করতে সমর্থ। ভক্তিমান মানুষরা আমার চরিত্র কথা শুনলে তাদের সুগতি হয়। ব্রাহ্মণরা বেদজ্ঞান প্রাপ্ত হন, ক্ষত্রিয় পৃথিবী জয় করেন, বৈশ্য সম্পদ পান শূদ্র, সুখ লাভ করেন। রোগী রোগ থেকে মুক্তি পায়। গর্ভিনী পুত্র লাভ করে। শত সহস্র গরু দান করে সে পুণ্য হয়, বিভুর এই দিব্য কথা শুনেও সেই ফল লাভ হয়। এর একটি শ্লোকে বা অর্ধেক শ্লোক ধারণ করলে মানুষ রুদ্রলোকে যেতে পারে। হে পার্বতী! আমি

চতুরানন ব্রহ্মার প্রতি খুশি হয়ে এই ইতিহাস বলেছি। এখন এই পুণ্যফলযুক্ত কাহিনী তোমাকে বললাম। এরপর কার্তিক প্রিয় চন্দ্রশেখর দেবীর কাছে এইসব পুণ্য কথা বলে বৃষে চড়ে উমার সাথে কিসিন্ধ্য গুহাতে প্রবেশ করলেন। বায়ু মুনিদের কাছে এই কাহিনী ব্যক্ত করলেন।

.

সাতান্নতম অধ্যায়

ঋষিরা বললেন– গুণ, কর্ম এবং বীর্যবত্তায় কে শ্রেষ্ঠ এবং কবে গুণপরম্পরা সূত্রপাত তা আমরা শুনতে ইচ্ছা করি। সূত বললেন– প্রাচীনরা মহাদেবের মাহাত্ম্য ও ইতিহাস বর্ণনা করে থাকেন। আমি তা বলছি শুনুন। প্রাচীনকালে বিষ্ণু বলিকে বেঁধে দানবদের হত্যা করলে দেবরাজ ইন্দ্র খুশি হন। দেবরাজ বিষ্ণুকে তখন দর্শন করতে আসেন। বিশ্বরূপাত্মা বিষ্ণু ক্ষিরোদ সমুদ্রে শায়িত ছিলেন। সেখানে ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্বত, অপ্সরা, নাগ, দেবর্ষি, নদী ও পর্বত সকলে এসে পুরাণ পুরুষ মহাত্মা হরিকে স্তব করতে লাগলেন। বললেন– হে প্রভো! তুমি বিধাতা, তুমিই এই চরাচরের কর্তা, তোমার প্রসাদেই আমরা এই ত্রিভুবন ও কল্যাণ লাভ করেছি। তুমি অসুরদের জয় করেছ, বালিকে বেঁধেছো, পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে সিদ্ধ ঋষিগণ স্তবে তুষ্ট করে বললেন–হে প্রভু কালাত্মা, কালঙ্কয়, যিনি মায়া বিকাশ করে ব্রহ্মার সাথে লোকদের সৃষ্টি করেছেন, তারই প্রসাদে যুদ্ধে জয় হয়েছে। আগে ত্রিভুবন গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা ছিল, তার উদরের মধ্যে জীবরা অবস্থান করছিল। তিনি হাজার মস্তক, হাজার চোখ, হাজার পদ রূপে শঙ্খ, চক্র, গদা ধারণ করে স্বচ্ছ জলে শুয়েছিলেন।

সেই সময় দূর থেকে এক যোগী পুরুষকে দেখতে পেলাম। তিনি শত শত সূর্যের মতো তেজ ও দীপ্তিতে উজ্জ্বল, চতুরানন কমণ্ডলুধারী সেই পুরুষোত্তম ব্রহ্মা আমার কাছে এসে এখানে রয়েছেন, তা আমাকে বলুন। আমি আমার থেকেই জন্মেছি। আমি তোক সকলের স্রষ্টা। আমি তখন ব্রহ্মাকে বললাম আমি তোক সকলের কর্তা আমিই তা বারবার সংহার করছি। আমি ও তুলনা করে কথা বলছি তখন উত্তর দিকে একটি জ্বলন্ত, জ্যোতি দেখলাম আমরা বিস্ময়ে অবাক হবে। দেখলাম সেই তেজে সমস্ত জলরাশি জ্যোতির্ময় হল। আমরা সেই জ্যোতি দর্শন করবার জন্য শীঘ্র সেদিকে গেলাম, দেখলাম সেই জুলন্ত তেজ পৃথিবী ও স্বর্গ ছাড়িয়েও বিরাজ করছে। সেই জ্যোতি মণ্ডলের মধ্যে অব্যক্ত প্রভাবশালী এক লিঙ্গ দর্শন করলাম। ঐ লিঙ্গ মহাতেজা, ঘেরে রূপী সমস্ত প্রাণীর পক্ষে ভয়ঙ্কর।

তারপর ব্রহ্মা আমাকে বললেন–এই মহাত্মা লিঙ্গের অনন্ত আমি দেখব, আপনি অধোভাগে গমন করুন। এবং আমি অন্তসীমা খুঁজে পাওয়ার জন্য ঊর্ধ্বভাগে গমন করি। এভাবে হাজার বছর অর্ধোভাগে ভ্রমণ করে তার সীমা আবিষ্কার করতে পারলাম না, ব্রহ্মাও শেষ দর্শন করতে পারলেন না। মহা সলিলের কাছে আমাদের দেখা হল। আমরা সেই তেজোদীপ্ত লিঙ্গের মায়াতে জন্তুএর মতো হয়ে রইলাম। তখন ধ্যানের মধ্যে সেই মহাসলিলে সকল লোকের স্রষ্টা, সংহর্তা সর্বতোসুখ, অব্যয়, প্রভু ঈশ্বরকে দেখলাম। আমরা হাতজোড় করে সেই অব্যক্ত ভয়ংকর রূপী, ভীমনাদি শূলপানি, মহাদেবকে নমস্কার করলাম। বললাম–হে ভূতপতি, তোমাকে নমস্কার, তুমি পরব্রহ্মা, তুমি পরম অক্ষর এবং তুমিই পরম পদ, তুমি রুদ্র, তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি মঙ্গলময়, ওঙ্কার স্বরূপা।

তুমি ব্রত ও নিয়ম, তুমি বেদ, তুমি সুর এবং তুমিই এই দৃশ্যমান লোকসমূহ। তুমি আকাশের শব্দ স্বরূপ, ক্ষিতি গন্ধস্বরূপ, বায়ুব, অর্শস্বরুপ ও চন্দের আধার। তুমি জ্ঞান এবং তুমিই পণ্ডিত। নিখিল প্রাণীদের কর্তা, তুমি মৃত্যু, তুমি কাল, তুমি ত্রিলোক ধারণ করছো। তুমি পূর্বদিকবর্তী মুখ দিয়ে ইন্দ্রের কাজ করছে। দক্ষিণ মুখ দিয়ে লোক সকল ক্ষয় করছে। পশ্চিম মুখে বরুণদেবের কাজ সমাধা করছ। আদিত্য বসু, রুদ্রগণ দুই অশ্বিনীকুমার, সাধ্য, বিদ্যাধর তোমার সৃষ্ট।

হে দেবেশ, উমা, সীতা, গায়ত্রী, গুহ, লক্ষ্মী, বাগদেবী সরস্বতী, কীর্তি, ইতি, মেধা, লজ্জা, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, সন্ধ্যা এবং রাত্রি এ সবই তোমার থেকে উৎপন্ন। হে অযুত সূর্য প্রভাবশালী, হে সহস্র চাঁদের দীপ্তি বিশিষ্ট তোমাকে নমস্কার করি। হে পর্বত রূপীন, সর্বগুণাকর তোমাকে নমস্কার করি। হে রুদ্র পিনাকপানি, সায়ক ও সহস্র বাহু, পদ্মনাভ তোমাকে নমস্কার করি।

মহামতী, মহাযোগী দেব, পিনাকপানি, বৃষবাহন, বিবিধমালা চন্দনে সজ্জিত মহেশ্বর, মহাদেব তখন সহস্র কোটি মুখ হাঁ করে মেঘ গম্ভীর নাদে হেসে উঠলেন। মনে হল তিনি সমস্ত কিছুকে গ্রাস করবেন। মহাত্মা শঙ্করের হাসির শব্দে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। তখন মহাযোগী বললেন– তোমরা ভয় পেয়ো না। আমার দক্ষিণ হাত থেকে পিতামহ ব্রহ্মা পরে বামহাতে উদ্ভুত বিষ্ণু নিয়ত যুদ্ধে রত। তোমাদের প্রতি খুশি হয়েছি তোমাদের বর দেবো। " আমরা বা আবার প্রসন্ন চিত্তে তার চরণ নমস্কার করে বললাম–হে সুরেশ্বর! দেব যদি আমাদের প্রতি আপনার প্রসন্নতা থাকে, যদি আপনি আমাদের বর দেন তবে আপনাতে যেন সবসময় আমাদের ভক্তি থাকে। ভগবান বললেন–হে মহাভাগ, তাই হোক। তোমরা বিবিধ প্রজা সৃষ্টি ও পালন করো এ বলে তিনি অদৃশ্য হলেন। এই সেই যোগী পুরুষের কথা আপনাদের কাছে বললাম। তিনি

সমস্ত নিখিল বস্তু সৃষ্টি করেছেন, আমার শুধু বরের হেতু মাত্র। জ্ঞানীরাই একমাত্র অব্যক্ত অজ্ঞাত অচিন্ত্য ও অদৃশ্য যোগীপুরুষকে দর্শন করে থাকেন। দোধিপতি একই শঙ্করকে আপনারা নমস্কার করুন। সেই অচিন্ত্য ঈশ্বর একমাত্র জ্ঞানী জনেরই দর্শন লভ্য।

.

আটান্নতম অধ্যায়

শাংসপায়ন বললেন–হে সূত! ইলাপুত্র নরপতি পুরুষরা কিভাবে স্বর্গে গিয়েছিলেন এবং প্রতিমাসীয় অমাবস্যায় কিরূপেই বা পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করতেন? সূত উত্তর দিলেন–সেই মহাত্মা ইলাতনয়ের প্রভাব, চন্দ্রমায় সূর্যসংযোগ, কৃষ্ণপক্ষের হ্রাস-বৃদ্ধি, চন্দ্রের অমৃত প্রাপ্তি, পিতাদের তর্পণ, পুরুরবা কর্তৃক পিতাদের তৃপ্তিসাধন–এই সমস্ত কথাই বলছি। সে সময় চন্দ্র ও সূর্য এক রাশিতে ও সমান নক্ষত্র এবং একই মণ্ডলে মিলিত হয়, সেই সময়ের নাম অমাবস্যা। পুরুরবা প্রতি অমাবস্যাতে মাতামহ ও পিতামহরূপী সূর্য চন্দ্র দর্শনের জন্য যেতেন। ইলাপুত্র বিদ্বান পুরুরবা প্রতি অমাবস্যাতেই সোমের উপাসনা করতেন। তখন তার উপাসনায় চন্দ্র প্রসন্ন হলে পিতৃগণের জন্য অমৃত ক্ষরিত হত।

সেই উপাসক পুরুরবা সম্পূর্ণ অমাবস্যায় স্থিতি এবং ঐ অমাবস্যায় চতুর্দশী ও প্রতিপদ কালযুক্ত কাল ও লবদ্বয়, এই দুই কাল উপাসনা উপযুক্ত মনে করে অমাবস্যা ও কুহু কলার উপাসনা করতেন। পিতৃগণের মাস তৃপ্তির জন্য সূর্য শুক্লপক্ষে পনেরোটি কিরণধারা চন্দ্রের সুধামৃত পূরণ করেন। কৃষ্ণ পক্ষে আবার সুধামৃত গ্রহণ করে থাকেন।

সৌম্য, বহিষদ, কাব্য, ঋতু, অগ্নি প্রভৃতি এরা একটি সংবৎসর। সংবৎসর থেকে ঋতু হয়েছে, ঋতু থেকে অয়ন বৎসর থেকে উদ্ভূত ছয় মাসের অয়ন ও এক রূপ পিতৃগণ বৎসর থেকে জাত যে মাসদ্বয়াত্মক ঋতু তা পিতৃগণ ব্রাহ্মকল্পে দেবমানে যে পাঁচ বৎসর তা প্রপিতামহগণ। সোমপায়ীগণ থেকে সৌম্য পিতৃগণ। ভৃগুর তনয়েরা সোমপায়ী, সৌম্যদরকে উপহূত বলা যায়। কাব্য পিতৃগণ আদ্যাপানে পরিতৃপ্ত হন। উত্মাপা ও দিবাকীর্তি বলে যেসব পিতৃগণ আছেন, তারা প্রতিমাসে স্বর্গে সুধাপান করেন।

গগনতলবাসী এই সমস্ত দেবতারা প্রতিমাসে অমাবস্যাতে সুধা পান করেন। মহাত্মা পুরুরবা সেখানে থাকেন। তর্পণ দিয়ে তাদের তুষ্ট করেন। সোম থেকে মাসে মাসে ক্ষরিত হয় বলে একটি সুধা। তাইই সোমপায়ী পিতৃলোকের অমৃত। ছন্দোজাত তেত্রিশ দেবতা এভাবে

কৃষ্ণপক্ষের সোমের পনেরা কলাজাত জলময় সুধা অমৃত ও মধুপান করে মাসাপ্তে চতুর্দশীতে প্রস্থান করেন। পঞ্চদশী কলা সূর্যের সুষুম্না কিরণে আবার ক্রমশ আপ্যায়িত হতে থাকে। অমবস্যাঁতে পিতৃগণ দুই কলামাত্র কাল সেই সোমকলা পান করেন, তখন সূর্য আবার রশ্মি দ্বারা চাঁদকে পূরণ করেন। পিতৃগণ পান করে যেমন চন্দ্রকলা নিঃশেষ করেন। সূর্য আবার সুষুম্না দিয়ে তাকে পরিপূর্ণ করেন। এভাবে প্রতিদিন চাঁদের এক কলা করে বাড়ে।

কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীণ চাঁদের কলা শুক্লপক্ষে বেড়ে যায়, পৌর্ণমাসীতে চন্দ্র পূর্ণ শশী হিসেবে শোভা বাড়ায়। এই হল কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের চাঁদের হ্রাস বৃদ্ধির নিয়ম। এরপর পর্ব ও পর্বসন্ধিগুলোর উল্লেখ করছি। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে অর্ধেক মাসেও তেমনি কতকগুলো পর্ব আছে। ফলে অর্ধমাসে তৃতীয়াদি পর্বগুলো প্রসিদ্ধ। সায়াহ্নকালের অনুমতির দুই লব এবং অপরাহ্নকালে রাস্তার দুই সব কালক্রিয়া বলে নির্দিষ্ট। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ যদি অপরাহ্নকালের প্রবৃত হয় তবে সে কাল কৃষ্ণপক্ষ বলেই ধরা হবে। আবার সন্ধেবেলায় প্রতিপদের প্রবৃত্তি হলে সেই কাল পৌর্ণমাসিক বলে ধরতে হবে। চন্দ্র ও সূর্য যদি যুগমাত্র ব্যবধানে বিষুবরেখার উপরে সমসূত্রপাতে উদিত হয়ে পরস্পরকে দর্শন করে, তাহলে তার নাম যতীপাত। সূর্যকে অবলম্বন করেই কালের বিশেষ সংখ্যা কল্পনা করা হয়। কালের উৎকর্ষ অপকর্ষ সূর্য দিয়েই নিরূপণ করা হয়। যে রাত্রে চাঁদ পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হন, তাকে পূর্ণিমা বলে। আবার কোনো পূর্ণিমায় যদি এক কলা অপূর্ণ থাকে, সেই পূর্ণিমাকে ‘অনুনতি’ বলা হয়। পূর্ণমণ্ডলে চাঁদ যখন দীপ্তি প্রকাশ করে, তখন তাকে রাকা বলে। পঞ্চদশীর রাত্রিতে চন্দ্র ও সূর্য ‘অমা’ অর্থাৎ একত্র এক নক্ষত্রে বাস করেন। তাই এই তিথি হল অমাবস্যা। এরপর আবার চাঁদ, সূর্য পরস্পর পৃথক হয়ে যান। যে বিছিন্ন অমাবস্যাঁতে চাঁদ, সূর্য পরস্পর মিলিত হয়ে পরস্পরকে দর্শন করেন, তাকে দর্শ বলে। পর্বসিদ্ধি অমাবস্যা ও কুহু– এদের দুই লবপরিমিত কাল বিশেষ ক্রিয়াযোগ্য। মধ্যভাগে সূর্যের সাথে সঙ্গত হয়ে, অমাবস্যা চন্দ্রহীন হয়ে পড়ে। দিনের অর্ধেক পর্যন্ত চাঁদের সাথে থেকে রবি চন্দ্র মনজল থেকে সরে যান। শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে চাঁদ মণ্ডল থেকে বিমুক্ত হন।

চন্দ্র ও সূর্যের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার দ্বিলব কালই আহুতি ওষ্ঠ ক্রিয়াদির জন্য প্রশস্ত। এরই নাম ঋতুসুখ। এদের মধ্যে অমাবস্যাই প্রধান পর্ব চাঁদ, সূর্য অমাবস্যায় মিলিত ভাবে প্রকাশ পান। পরে চাঁদ আস্তে আস্তে সূর্যমণ্ডল থেকে সরে যায়। চন্দ্র দুই লবকাল মাত্র সূর্যমণ্ডল স্পর্শ করেন। সেই কালই অমাবস্যা নিমিত্তক আহুতি ও বষটু ক্রিয়ায় বিহিত। যে কালে কোকিল কুহু শব্দে ডেকে ওঠে, অমাবস্যাও সে কালের সমান গুণসম্পন্ন বলে গুহ নামে বিখ্যাত। যে অমাবস্যায় নিশাকর, সিনীবালী পরিমাণে সূর্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হন, তা সিনীবালী নামে প্রসিদ্ধ।

অনুমতি, রাকা, সিনীবালী ও কুহু এদের সকলেরই দুই লব মাত্র কাল প্রশস্ত। হে মুনিগণ! একে পর্বসন্ধি তাৎপর্য বলা হয়। চন্দ্র শুক্লপক্ষে পর্ব সন্ধিকালে রাত্রিতে সম্পূর্ণ মণ্ডলে প্রকাশিত হন। চাঁদ প্রতিদিন এক কলা করে বৃদ্ধি লাভ করে তাই চাঁদের ষোলকলা নয়, পনেরোটি কলা আছে। সোমপায়ী, সোমবর্ধনকারী আর্তব শিশুদের বিবরণ দিলাম। এরপর মাস শ্রাদ্ধভোজী পিতৃগণের আচার, সামর্থ্য ও শ্রাদ্ধ এ সবের বৃত্তান্ত বলছি। কঠোর তপস্যা করেও মৃত মানুষদের পরলৌকিক গতি বলতে পারা যায় না। লৌকিক পিতৃগণকেই শ্রাদ্ধদেব বলা হয়। তাঁরা সৌম্য, অযযানিজ, যাগশীল, পিতৃগণ, দেবশিশু মানুষপিতৃ এই কয় ভাগে বিভক্ত। মানুষ পিতৃগণ লৌকিক পিতৃপদবাচ্য পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ- এরা হল লৌকিক পিতৃগণ।

যাঁরা সোমযাগ করেন তারা সোমবন্ত নামে বিখ্যাত। যাঁরা সোমযাগের সহায়তা করেন তাঁরা বহির্ষদ নামে প্রসিদ্ধ। সেই সোমযাগে যাঁরা হোম করেন, তারা অগ্নিয়াও নামে খ্যাত। এরা এভাবে নানা কাজে যুক্ত থেকে পুনর্জন্ম পর্যন্ত সন্তুষ্ট মনে দিন কাটান। আশ্রমধর্ম পালনকারী, যাগ-যজ্ঞাদি করেন। যেসব ধর্ম নিষ্ঠ দ্বিজরা, তাঁরা মরণের পরে এই পিতৃগণের সাথে বিহার করেন। যাঁরা মৃত্যু পর্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, যজ্ঞ, শ্রদ্ধা, বিদ্যা ও দান এই সব করে থাকেন, তারা সোমপায়ী সূক্ষ্ম পিতৃগণের সাথে স্বর্গধামে আনন্দের সাথে পিতাদের উপাসনা করেন।

এঁরা সন্তানের জনক যদি হন তবে বংশধর তাদের শ্রাদ্ধ করে তৃপ্তি দান করে থাকেন। এই মানুষ পিতৃগণ মাসিক শ্রাদ্ধ খেয়ে থাকেন, এছাড়া যারা আশ্রম-এর নিয়ম পালন করেননি, সংকীর্ণ কর্ম দুরাত্মা ব্যক্তিরা মরণের পর যমালয়ে যন্ত্রণায় অনুশোচনা করে। দীর্ঘকাল ধরে ক্ষিদে তেষ্টায় কষ্ট পায়। শাল্মলী বৈতরণী, কুম্ভীপাক প্রভৃতি নরকে নিজ নিজ কাজের জন্য দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে সেই প্রেতস্থানের জীবদের উদ্দেশ্যে ভূতলে তিনটে পিণ্ড দেওয়া হলে নরক থেকে মুক্তি পায়। ভগবান সনতকুমার, দিব্য চোখ দিয়ে প্রেত ও শ্রাদ্ধাদির গতাগতি সম্যক জেনে এই সমস্ত বলেছেন। দেবতাদের পিতৃত্ব পিতৃগণের দেবত্ব এবং পিতৃগণের স্বতুত্ব আত্মবত্বাদি এভাবে বর্ণনা করা হল।

.

ঊনষাটতম অধ্যায়

ঋষিরা বললেন–স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যে চারটে যুগ ছিল, তাদের প্রকৃত তত্ত্ব ও অবস্থা বিস্তারিতভাবে শুনতে ইচ্ছা করি। সূত বললেন–পৃথিবীর বর্ণনার সাথে সাথে আমি চারটে যুগ সম্বন্ধে বলছি। এবার সবিস্তারে অন্য তত্ত্বগুলো বর্ণনা করছি। যুগ, যুগভেদ, যুগধর্ম, যুগসন্ধি, যুগাবংশ, সন্ধান এই ছ-প্রকার যুগতত্ত্ব বলছি। লৌকিক, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা ও মুহুর্তাদি পরিমাণ অনুযায়ী বছর অনুসারে চারযুগ সম্বন্ধে বলব। একটি ছোট্ট অক্ষর উচ্চারণের সময়কে নিমেষ বলে। পনেরো নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত, এবার ত্রিশ মুহূর্তে এক অহোরাত্র, তার মধ্যে কৃষ্ণপক্ষকে দিবা আর শুক্লপক্ষকে রাত্রি বলে। মানুষের হিসেবে ত্রিশমাসে পিতৃলোকের এক মাস এবং তিনশো ষাট মাসে পিতৃগণের এক বছর। মানুষ মানের একশো বছরে পিতাদের তিনবছর চার মাস হয়। লৌকিক মানের এক বছরে দৈব এক অহোরাত্র। তার মধ্যে উত্তরায়ণ দিবা এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। মানুষ মানের ত্রিশ বছরে এক দৈব মাস এবং একশো বছরে দিবা তিন মাস দশদিন হয়।

মানুষের তিনশো ষাট বছরে এক দিব্য সংবৎসর। গণিত বিশারদরা আরো অনেক সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। ভারতবর্ষে চারটে যুগ কল্পনা করা হয়েছে। প্রথমে কৃতযুগ, তারপর ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। কৃতযুগ চার হাজার বছর। এর সন্ধ্যা চারশো এবং সন্ধ্যাংশ চারশো বছর। অন্যসব যুগেরও সন্ধ্যাংশ যুগমন যত হাজার বছর তত শতবর্ষ। ত্রেতা যুগ তিন হাজার বছর। এর সন্ধ্যা তিনশো ও সন্ধ্যাংশ তিনশো বছর। দ্বাপর যুগ, দুহাজার সন্ধ্যা একশো এবং সন্ধ্যাংশ একশো বছর। চারযুগের মোট যোগফল পরিমাণ বারো হাজার বছর। এটা হল দিব্য পরিমাণ। চোদ্দ লক্ষ চল্লিশ হাজার বৎসর হল কলিকালের মানুষ পরিমাণ।

এছাড়া চারযুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশগুলির পরিমাণ তেতাল্লিশ নিযুত বিশ হাজার বছর। এভাবে চার যুগের মন্বন্তর কালগুলিও নির্দিষ্ট। মানুষমানের ত্রিশ কোটি সাতষট্টি নিযুত। বিশ হাজার বছরে এক মন্বন্তর।

ত্রেতাযুগের আদিমকালে ব্রহ্মার আদেশে মনু, সপ্তর্ষিরা ধর্ম প্রচার করেন। ঋক্, সাম্ যজুঃ অনুযায়ী দর পরিগ্রহ, অগ্নিহোত্রাদি ধর্মগুলো সপ্তর্ষিরা প্রচার করেন। বর্ণাশ্রম নিয়ম অনুযায়ী আচার প্রতিপালন ইত্যাদি ধর্ম মনুর দ্বারা প্রচারিত হয়। আদিকল্পে দেবতাদের মন্ত্রগুলো নিজেই প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। পরে হাজার হাজার মন্ত্র মনু ও সপ্তর্ষিদের অন্তঃকরণে আবার অভিব্যক্ত হয়। ঋক, সাম, যজঃ অথর্ব মন্ত্র– এ সমস্ত সপ্তর্ষি দ্বারা প্রচারিত। আর মনু বলেছেন মর্ত্যধর্ম। দ্বাপরদিকালে জনগণের আয়ু কমে গেলে সেই বেদকে ভাগ করা হয়। ব্রহ্মার দ্বারা পূর্বে সৃষ্ঠ দিব্য, ঋষি, তপস্বী ও দেবগণ দ্বাপরে ও কলিযুগে প্রাদুর্ভূত হন।

যুগে যুগে বেদ ও বেদাঙ্গগুলোর বিকার ঘটতে থাকে। ত্রেতা যুগে ক্ষত্রিয়রা উদ্যম যজ্ঞ, বৈশ্যরা হবির্যজ্ঞ, শুদ্রেরা পরিচর্য্যা যজ্ঞ এবং বিপ্রেরা জপ যজ্ঞনিষ্ঠ ছিলেন। তখন ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের, বৈশ্যরা ক্ষত্রিয়দের, শুদ্ররা বৈশ্যদের অনুগত ছিল। পরস্পর সকলেই সুখে আনন্দে দিন কাটাত। তারা সকার্য করত ও বর্ণাশ্রম ধর্ম মেনে চলত। ত্রেতাযুগে প্রজাদের সংকল্পে ও বাক্যে সব কাজ সিদ্ধ হত। তখন আয়ু, মেধা, বল, জপ, আরোগ্য ধর্ম জটিলতা এমন সর্বসাধারণের মধ্যেই ছিল। পরে কালবশে প্রজারা সেই ধর্মপালনে উদাসীন হয়, পরস্পর ধর্ম বিষয়ে বিবাদ করে মীমাংসার জন্য স্বয়ম্ভুর মুনির কাছে এলে, মনু সেই প্রজাদের দেখে অবসরে কারণ যথাযথ বিচার করে ধ্যানমগ্ন হয়ে শতরূপা নামে পত্নীর গর্ভের সন্তানের জন্ম দেন। মনুপুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্থানপাদ সবার প্রথম রাজা হন।

সেই থেকে শাসনকর্তা রাজাদের উৎপত্তি হয়। ধর্ম স্থাপনের বিধান করা হলেও জনগণ গোপনে পাপ করতে লাগলো। তখন তপস্যা, বর্ণ সকলের বিশেষ বিভাগ, সংহিতা। ও নানারকম মন্ত্র ঋষি ও ব্রাহ্মণেরা প্রণয়ন করলেন। তখন দেবতারা সমস্ত সম্ভারের সাথে যজ্ঞের প্রবর্তন করলেন। ত্রেতাযুগে সত্য, জপ, তপস্যা, দান ইত্যাদি ধর্ম প্রবর্তন করা হয়। ত্রেতাযুগের রাজারা যোগ্য দণ্ডদাতা ব্রহ্মজ্ঞ, যাগশীল, পদ্মপলাশ নেত্র, বিশাল বক্ষ, মহাধনুর্ধর, বক্র, রথ, মণি, ভাগ, নিধি, অশ্ব ও গজ এই সাতটি নৃপতিদের প্রধান রত্ন বলে গণ্য হত। চক্র, মণি, ধনু, রত্ন, কেতু ও নিধি সাতটি প্রাণহীন রত্ন। ভার্যা, পুরোহিত, সেনানী, রথকার, মন্ত্রী, অশ্ব, কলভ, এই সমস্ত প্রাণী রত্ন। এই চোদ্দ প্রকার রত্ন সমস্ত রাজারই প্রয়োজনীয়।

অতীত, অনাগত সব মন্বন্তরেই বিষ্ণুর অংশে ভূতলে চক্রবর্তী রাজাদের জন্ম হয়। নৃপতিরা পরস্পর বিবাদ বিরোধ না করে অদ্ভুত ভাবেই ধর্ম, বল, সুখ ও ধন এই চারটি বিষয় লাভ করতেন। তাঁরা বল ও তপস্যা দিয়ে দেব, মানুষ, দানবদের পরাজিত করতে পারতেন। তখনকার রাজাদের শরীরে অমানুষ লক্ষণগুলি দেখা যেত। কপালের উপরে চুলের, কিছু অংশ সুদৃশ্য। জিভ সুমার্জিত, ঠোঁট ও দাঁত তামা রঙের। তাদের আজানুলম্বিত বাহু, সিংহের মতো ঘাড়ের গঠন, সকলের দুপা চক্র মৎস্য আঁকা, হাতের তল দুটি শঙ্খ পদ্ম চিহ্ন শোভিত। তারা পঁচাশি হাজার বছর বেঁচে থাকতেন। তাদের গতিবিধি ছিল সর্বত্র আকাশে, সমুদ্রে, পর্বতে পাতালে। যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও সত্য এই চাররকম ধর্ম প্রবর্তিত ছিল। বর্ণাশ্রম ধর্ম তখনই শুরু হয়। দণ্ড বা শাস্তি দেওয়ার নীতি ও ত্রেতাযুগেই প্রবর্তিত হয়েছিল। তখন সব প্রজাই হৃষ্টপুষ্ট, নীরোগ পূর্ণকাম ছিল।

তখন মানুষের আয়ু তিনহাজার বছর, সকলেই পুত্র-পৌত্র ইত্যাদি সহ সুখে কাল কাটাতো। এগুলি হল ত্রেতাযুগের লক্ষণ। এবার ত্রেতা সন্ধির বিষয়ে বলছি। সন্ধ্যা স্বভাব ত্রেতাযুগের একপাদ। আর যুগস্বভাব, সন্ধ্যা স্বভাবের একপাদের সাথে প্রবর্তিত হয়।

শাংখ্যপায়ণ বললেন– স্বায়ম্ভব মন্বন্তরে কিভাবে যজ্ঞ শুরু হয়েছিল, সেই বর্ণনা করুন। তখন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা কিরূপ ছিল? সূত একথা শুনে বললেন–ত্রেতাযুগের শুরুতে যেমন যজ্ঞ শুরু হয়েছিল শুনুন–বর্ষণের পর শস্য উৎপন্ন হতে দেখে গৃহ, আশ্রম, পুর প্রভৃতিতে জীবিকা প্রতিষ্ঠিত হল । বিশ্বভূক নামে ইন্দ্র দেবতাদের সাথে মিলে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা, মন্ত্র সংহিতা প্রচার, সমস্ত রকম সামগ্রী সম্পন্ন যজ্ঞ প্রবর্তিত করেন। সে সময় অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ হলে মেধ্য, পশু দিয়ে যজ্ঞ হচ্ছে শুনে মহর্ষিরা এলেন। ব্রাহ্মণেরা সবাই কাজে ব্যস্ত, মধুরস্বরে গান হচ্ছে, মহাত্মারা যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছেন। যজ্ঞের সময় দেবতারা যজ্ঞভাগ ভোজী হন। এমন সময় যে মহর্ষিরা এসেছিলেন তারা পশুর আহুতি দেওয়া হচ্ছে দেখে পশুদের প্রতি দয়াবান হয়ে সকলে মিলে ইন্দ্রের কাছে বললেন–এ আপনার কেমন যজ্ঞবিধান? আপনি ধর্ম কামনায় হিংসা করছেন? হিংসা কখনো ধর্ম হতে পারে না। হে দেবরাজ! আপনি যদি শাস্ত্রমতে যজ্ঞ করতে চান যজ্ঞবীজ দিয়েও যজ্ঞ করতে পারেন, তাতে বিধি পালন হবে, ধর্ম লাভ হবে কিন্তু হিংসা হবে না কারণ পুরাকালে স্বয়ং ব্রহ্মা, তিনবছরের পুরনো, বীজ দিয়ে যজ্ঞের বিধান করেছেন।

এটি মহান ধর্ম। বিশ্বভুক মুনিদের এই কথা শুনে চিন্তা করতে লাগলেন মহর্ষিরা। ইন্দ্রের সঙ্গে বিবাদে বিরক্ত হয়ে মহর্ষিরা ইন্দ্রের মতানুসারে উপরিচর বসুকে মীমাংসা করতে বললেন। রাজা উপরিচর তাদের কথা না শুনে দোষ-গুণ বিচার না করে বলতে লাগলেন–শাস্ত্রের উপদেশ মতো মেধ্য পশু ও বীজ দিয়ে যজ্ঞ করবে। বেদবাক্য অনুসারে যজ্ঞে হিংসা স্বভাব প্রতিপন্ন হয়। অতিতাপস, যোগী মহর্ষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত মন্ত্রগুলো হিংসাত্মক। আমি এজন্যই একথা বললাম। আপনারা রাগ করবেন না। আমি মিথ্যা বলছি না। মহর্ষিরা বসুর এই কথা শুনে রেগে গিয়ে বললেন–রজো হয়ে তুমি মিথ্যা কথা বললে! তুমি রসাতলে প্রবেশ করো।

এই কথা বলা মাত্র বসু নিজ বাক্যদোষে ধরাতলবাসী হলেন। এর থেকে শিক্ষণীয় এই যে–বহু জ্ঞানী ব্যক্তিও কোনো বিতর্কিত বিষয়ে মতামত দেবেন না। কারণ বর্ণের সূক্ষ তত্ত্ব বোঝা খুবই কঠিন, এজন্য একমাত্র মনু ছাড়া দেব ঋষি কেউই সক্ষম নন। আগে সহস্র কোটি ঋষিরা নিজেদের তপস্যার বলেই স্বর্গগামী হয়েছেন। তাই তারা দান বা যজ্ঞ ইত্যাদিকে তেমন প্রশংসা করেন না। নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী ফলমূল শাক, জল ও পাত্র দান করেই তারা স্বর্গলোক

বাসী হয়েছেন। তপস্যা ব্রহ্মচর্য সত্য, অনৃশংসত, ক্ষমা, ধৃতি, এগুলিই সনাতন ধর্মের মূল কথা। যজ্ঞধর্ম মন্ত্রদ্বারা, সাধনা, করা হয় আর অনশন দ্বারা তপস্যা পালন করা হয়। যজ্ঞ দিয়ে দেবত্ব আর তপস্যা, দিয়ে বৈরাগ্য প্রাপ্তি হয়। জ্ঞান দিয়ে কেবল লাভ হয়। এইভাবে পুরাকালে যজ্ঞপ্রবর্তনের সময় ঋষিদের সাথে দেবতাদের সুমহান বিবাদ হয়েছিল। ঋষিরা হিংসাত্মক ধর্মাচরণ দেখে যজ্ঞভূমি ছেড়ে চলে যান। দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

শোনা যায়, প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, ধ্রুব, বিরাজ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বংশের অনেক মহাত্মা, বিখ্যাত রাজর্ষি তপস্যার প্রভাবেই স্বর্গগামী হয়েছেন। এজন্য যজ্ঞের থেকে তপস্যাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। তপস্যার প্রভাবেই ব্রহ্মা এই চরাচর জগত সৃষ্টি করেছেন। তপস্যাই জগতের মূল। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এভাবেই যজ্ঞ শুরু হয়েছিল। সেই থেকে প্রতিযুগে তা প্রচলিত রয়েছে।

.

ষাটতম অধ্যায়

সূত বললেন–এবার দ্বাপর যুগের বৃত্তান্ত বলছি। এই যুগে ত্রেতাযুগের সিদ্ধগুলি লোপ পায়। তখন আবার লোভ, অধৈর্য, বাণিজ্য, যুদ্ধ, পরস্পর ভেদাভেদ, পণ, দণ্ড, মদ, দম্ভ, দৌর্বল্য, এই সব রজঃ তমের বৃত্তির প্রকাশ হয়। দ্বাপরে নানারকম ধর্মের বৈকল্য ঘটে এবং কলিতে ধর্মের বিলুপ্তি ঘটে। দ্বাপর যুগে বর্ণ আশ্রম বিনষ্ট হতে থাকে। সব বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার জন্য কোনো মতেই বিশ্বাস থাকে না। ধর্মতত্ত্ব নিয়ে জনগণের মধ্যে সংশয় বাড়ে। প্রজাদের মতভেদ ঘটতে থাকে। বিভিন্ন মতবাদী জনগণ নানারকম শাস্ত্র প্রচার করেন। ত্রেতাযুগে বেদমাত্র ছিল।

ক্রমে আয়ুষ্কাল কমে যেতে থাকলে দ্বাপরাদি কালে সেই বেদকে বেদব্যাসেরা বিভক্ত করেন। কালক্রমে শ্রুতিধর ঋষিদের মন থেকে ঋক, যজুঃ, সাম সংহিতাগুলো কিছুটা বিলুপ্ত হতে থাকে। সেই সামান্য বৈকল্য থেকেই কল্পসূত্র, ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র প্রবচনগুলো সব বিস্মৃত হয়ে যায়। তখন অনেকে তীর্থাদিতে ভক্তিমান হয়। দ্বাপর যুগে আশ্রয় ধর্মের বিপর্যয় ঘটতে থাকে। দ্বাপরের ধর্মমত প্রবর্তিত হয়ে কলিতে আস্তে আস্তে বিনষ্ট হতে থাকে। প্রজাদের কাজের জন্য

দ্বাপর যুগে অনাবৃষ্টি, ব্যাধি ও উপদ্রব জন্মে। এতে প্রজাদের মধ্যে মৃত্যু প্রাদুর্ভাব হয়। পরে বাক্য-মন-কর্ম জনিত দুঃখে প্রজাদের মনে ক্রমশঃ দুঃখ মোক্ষ বিষয়ক বিচার উৎপাদন করে। সেই বিচার থেকে মনে আসে বৈরাগ্য। বৈরাগ্য থেকে দোষ দর্শন, দোষদর্শন থেকে প্রজাদের জ্ঞান উৎপত্তি হয়। আয়ুর্বেদ, বেদাঙ্গ, জ্যোতিষ, অর্থশাস্ত্র, অপরাপর সব শাস্ত্রই মতভেদ পূর্ণ হয়ে ওঠে। দ্বাপর যুগে কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতে হত। শ্রমজীবির সংখ্যাই ছিল বেশি।

লোভ, বাণিজ্য, যুদ্ধ, নানামত স্থাপন, বেদশাস্ত্র প্রণয়ন, ধর্মের ব্যভিচার, রাগ, হত্যা, বর্ণাশ্রম, লোভ, কাম, দ্বেষ এই সমস্ত সমুদ্ভুত হয়। দ্বাপরে জনগণের আয়ু দুই হাজার বছর।

দ্বাপর শেষ হলে সন্ধ্যা প্রবৃত্ত হয়। তখন দ্বাপরের গুণগুলো কিছুটা কমে। এর পর আসে কলিযুগ। হিংসা, মিথ্যা, ছলনা, তপস্বীদের হত্যা–এই সব কলিযুগের স্বভাব। এভাবে বেদ ধর্ম আস্তে আস্তে কমে যায়। কলিকালে রোগ, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, বিপর্যয় ইত্যাদি হতে থাকে। প্রজারা অধার্মিক, অনাচার, মূঢ়, ক্রোধী ও সবসময় মিথ্যাবাদী হয়। দুরাকাঙ্ক্ষা, কদাচার, অসদুপায়ে জীবিকার্জন প্রভৃতি দুষ্কর্মের জন্য প্রজাদের ভয় উপস্থিত হয়। হিংসা ছলনা, ঈর্ষা, ক্রোধ, অসূয়া, মিথ্যাবাদ, রাগ এবং লোভ; এগুলো কলিযুগে দেখা যায়। তখন দ্বিজদের বেদ অধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞ আর হয় না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি উৎসন্নে যায়।

ব্রাহ্মণরা শূদ্রাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংসর্গ করে। তখন ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি নানা কুকর্ম ঘটতে থাকে। প্রজাদের আয়ু, মেধা, বল, রূপ, সৌভাগ্য কমে অসতে থাকে, শূদ্ররা ব্রাহ্মণাচার ব্রাহ্মণরা শুদ্রাচার, রাজা রাজকাজে এবং চোর চৌকাজে ব্যস্ত থাকে। কলিকালে ভৃত্যরাও প্রভুভক্তি হারিয়ে ফেলে। কলিকালে মেয়েরা দুঃশীলা পতিব্রতহীনা, মায়াময়ী হয়। পশুবৃদ্ধি, গরুক্ষয় এবং সাধুদের তিরোধান এগুলোও কলিতে হয়। যুগান্তকালে পৃথিবী ক্রমে অল্পফলা হবে। রাজারা করগ্রহণ করবে। প্রজাদের রক্ষা করবে না, নিজ নিজ রক্ষায় ব্যস্ত থাকবে।

সেই অধর্মের যুগে সবাই ব্যবসায়ী হবে। শূদ্রেরা ব্রত গ্রহণ করে কৌপীনধারী ও তাপসচারী হবে। কলিযুগে সবাই পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হবে। বিক্রেতারা সবসময়ই খারাপ জিনিস দিয়ে ক্রেতাদের বঞ্চনা করবে। সেই যুগে পুরুষের সখ্যা কম, মেয়েদের সংখ্যা বেশি হবে। সকলেই মাংসভোজী, অসরল, হিংসুক হবে। উপকার করলেও তা স্বীকার করবে না, মানুষ নীচ কাজ করতে প্রবৃত্ত হবে টাকার লোভে। এটাই কলিযুগের লক্ষণ। পৃথিবী ক্রমশ নরশূন্য হবে। বসুমতী আস্তে আস্তে অল্পজলা ও অল্পফলা হবে। রাজারা যোগ্য শাসনও করবে না।

কলিকালে জনগণ পরধনরত্ন চুরি করবে। কামুক, দুরাত্মা, অধার্মিক ও দুঃসাহসী হবে। শূদ্রেরা তখন ধর্মানুষ্ঠান করবে। শস্যচোর, বস্ত্রচোরের আবির্ভাব হবে। শান্তি, আরোগ্য, সামর্থ্য দুর্লভ হয়ে উঠবে। কলিযুগের দুঃখিত মানুষের আয়ু একশো বছর মাত্র। গেরুয়াধারী বৈরাগী, কাঁপালিক, বেদ, বিক্রয়ী বর্ণাশ্রম ধ্বংসী পাষণ্ডদের উৎপত্তি হতে থাকবে। কেউ আর বেদপাঠ করবে না। কলিযুগে প্রজারা স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ও পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করে কোনমতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে। কলিতে প্রজারা ভ্রূণ হত্যা করবে। অধর্মের বশে যজ্ঞগুলো উৎসন্নে যাবে।

কলিকালে ধন্য জনগণই মন থেকে হিংসা বিদ্বেষ সরিয়ে শ্রুতিস্মৃতি বিহিত ধর্মানুষ্ঠান করে থাকে, কলিযুগের অবস্থা এই বললাম। এবার সন্ধ্যাংশের কথা শুনুন। যুগে যুগে সন্ধ্যাগুলোর এক এক পাদ হানি হয়। সন্ধ্যাতে যুগ স্বভাব একপাদ, এবং সন্ধ্যাংশে সন্ধ্যা স্বভাব একপাদ মাত্র থাকে। স্বয়ম্ভব মন্বন্তরে আদি কলিযুগের সন্ধ্যাংশকালে, বিষ্ণুর অংশে ভৃগু গোত্রে প্রমিতি নামে এক দুষ্টরাজাদের শাসনকর্তা জন্মায়। তিনি অস্ত্র নিয়ে শত সহস্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে ঘোড়া রথ হাতির সাথে প্রচুর সেনা নিয়ে কুড়ি বছর ধরে পৃথিবী পরিক্রমা করে প্রচুর ম্লেচ্ছ ও শুদ্র রাজাদের নিধন করেন। এইভাবে রাজা প্রমিতি পাষণ্ড ধ্বংস করেন।

বলবান, প্রমিতি, উদীচ্য, মধ্যদেশীয়, পার্বতীয়, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, বিন্ধ্যাচল গত, সীমান্তস্থ, দাক্ষিণাত্য, দ্রাবিড়, সিংহল, গান্ধার, যবন, বর্বর, চীন, কেত ও কিরাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছদের বিনষ্ট করেন। বীর্যবান প্রমিতি বত্রিশ বছর বয়সে সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করে শূদ্র, অধার্মিক ম্লেচ্ছ রাজাদের বধ করে সৈন্য ও অমাত্যদের সাথে গঙ্গা যমুনার মধ্যে দেহত্যাগ করেন। এরপরে জায়গায় জায়গায় যে অল্প প্রজারা ছিল তারা পরস্পর হিংসা করত।

সেই অরাজক অবস্থায় প্রজারা ভীত, ব্যাকুল, পরিশ্রান্ত হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য ছোটাছুটি করতে থাকে। তখন লোকেদের আকার আরো ছোটো হয়ে যায়, আয়ু হয় মাত্র পঁচিশ বছর। তারা অনাবৃষ্টিতে কষ্ট পেয়ে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে নিজের জায়গা ছেড়ে দূরের দেশগুলোতে গিয়ে বাস করতে শুরু করেন। তারা মধু, মূল, ফল ভক্ষণ করে অতিকষ্টে জীবন যাপন করে। আস্তে আস্তে জরা রোগ আর খিদেতে কষ্ট পেয়ে তাদের উপলব্ধি জন্মায়। এই উপলব্ধি থেকে ধর্মশীলতা জন্মাতে থাকে। কলির অবশিষ্ট সেই প্রজারা ধর্মপরায়ণ হলে অহোরাত্র মধ্যে যুগ পরিবর্তন হয়। তখন ভবিতব্য অনুসারে আবার সত্যযুগের প্রবর্তন হতে থাকে। সত্যযুগ শুরু হলে কলির প্রজাদের তখন সেই সত্যযুগের আদিম প্রজা বলা হত।

যেসব সিদ্ধজন তখন ছিলেন তারা এবং অপরাপর সপ্তর্ষিরা কলিকালের প্রজাদের সঙ্গে নির্বিশেষে মিলে রইলেন। প্রজারা তাঁদের উপদেশ অনুযায়ী ধর্মাচরণ করতে থাকে। বীজ থেকে যেমন অঙ্কুর জন্মে, তেমনি কলির শেষের প্রজাদের থেকেই সত্যযুগের প্রজাদের উৎপত্তি হয়ে থাকে। এভাবে একযুগ থেকে অন্যযুগে প্রজাবিস্তার হয়ে থাকে। সুখ, আয়ু, বল, রূপ, ধর্ম, অর্থ, কাম–এ সমস্ত যুগানুসারে একটু একটু করে ক্ষীণ হতে থাকে। হে দ্বিজগণ, চারযুগে যে তত্ত্ব জানা যায়, তা সবিস্তারে বললাম। এই চারযুগের এক হাজার বার আবর্তনে ব্রহ্মার এক দিবা এবং ব্রহ্মার রাত্রিও ততকাল বলে জানতে হবে। চারযুগের একটা বিশেষ লক্ষণ যে, ক্রমশ আয়ুক্ষয় হয় বলে প্রজারা অসবল ও জড়তা পূর্ণ হতে থাকে। এভাবে চারযুগের একাত্তর আবর্তনে এক জন্মান্তর শেষ হয়। কল্পযুগগুলোর পরস্পর লক্ষণ একই থাকে। মন্বন্তর-গুলোয় এটাই লক্ষণ। বুদ্ধিমান মানুষ অতীত মন্বন্তরের অভিজ্ঞতা দিয়ে আগামী মন্বন্তর সম্বন্ধে অনুমান করতে পারেন। বিধাতা যুগে যুগে যুগকার্য সাধনের জন্য এরকম সৃষ্টি প্রবর্তন করেন।

একষট্টিতম অধ্যায়

সূত বললেন–যুগগুলোতে যে সমস্ত প্রজার জন্ম হয় তাদের বিবরণ বলছি –অসুর, সাপ, গরু, পাখি, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি ও প্রজারা যে যুগে জন্মে ও যতকাল বেঁচে থাকে তা বলছি। পিশাচ, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষসদের হঠাৎ কেউ বধ না করলে তারা যুগমাত্র বেঁচে থাকে। মানুষ, পশু, পাখি ও স্থাবরস্পৃহ যুগের ধর্ম অনুযায়ী আয়ু নিয়ে বেঁচে থাকে। কলিতে মানুষের আয়ু একশ বছর মাত্র। এই যুগে মানুষের উচ্চতাও কমতে থাকে।

গরু, ঘোড়া, হাতি, মোষ প্রভৃতি স্থাবরদের যুগে যুগে পরিমাণগত হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায়। গরুদের কুঁজ অবধি উচ্চতা সাতাত্তর অঙ্গুলী, হাতিদের উচ্চতা আটশত অঙ্গুলি। ঘোড়ার উচ্চতা নয়শ ষাট অঙ্গুলি। বানরদের উচ্চতা পঞ্চাশ আঙুল। দেবদেহের থেকে মানুষ দেহের গুণ কিছুটা কম থাকে। দেবশরীর অধিক বুদ্ধি যুক্ত। গরু, ছাগল, মোষ, ঘোড়া, হাতি, পাখি ও সাপেরা যজ্ঞক্রিয়া সাধক যজ্ঞীয় বলে প্রসিদ্ধ। এরা দেবস্থানগুলোতে দেবতাদের যথেচ্ছ ভোগের জন্য জন্মে থাকে। এরপর আসছে সৎ ও সাধুর বর্ণনা। যাঁরা ব্রহ্মার সাথে অত্যন্ত একাত্মতা লাভ করেছেন, তাদেরই সৎ বলা হয়। যাঁরা দশরকম বিষয়ে ও আটরকম কারণে

ক্রুদ্ধ হন না বা আনন্দিত হন না, তারাই জিতাত্মা। গুরুহিতকারী ব্রহ্মচারী বিদ্যায় সাধন করেন বলে তাদের সাধু বলা হয়। ক্রিয়াসাধন করেন বলে গৃহস্থকেও সাধু বলে। এভাবে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থকারীরা, ভিক্ষুকরা, নিজেদের আশ্রমগুলোর ধর্ম সাধন করেন বলে তাদের সাধু বলা হয়।

দেব, পিতৃ, মুনি, মানব সকলেই জ্ঞানের ভেদাভেদের জন্য ধর্মতত্ত্ব নির্ণয় করতে পারেন না বলে, ধর্ম নিয়ে নানা প্রচার হয়। কুশল ও অকুশল অর্থাৎ ভালো ও মন্দ কাজ দিয়েই ধর্ম বা অধর্ম নির্ণয় করা হয়। ধারণকারী 'ধৃ' ধাতু থেকেই ধর্ম শব্দটি এসেছে। যার দ্বারা ইষ্ট লাভ করা যায় তাই ধর্ম। যারা লোভহীন, দম্ভহীন, জিতেন্দ্রিয়, সুশিক্ষিত, সরলমনা, তাঁরাই আচার্য পদবাচ্য। যিনি আচার্য, তিনি আচার পালন করেন। অপরকে আচারে নিষ্ঠ করেন। সপ্তর্ষিরা আদি কল্পীয় জনগণকে ঋক, যজুঃ, সাম, শ্রুতি ও বেদাঙ্গ সম্মত শ্রৌত ধর্ম বর্ণাশ্রম বিভাগজাত।

মন্বন্তরের শেষে যে সপ্তর্ষিরা থাকেন তারাই যুগে যুগে সৃষ্টি বিস্তারের জন্য, ধর্ম প্রচারের জন্য বারবার ধর্মাচার প্রবর্তিত করেন। দান, সত্য, তপস্যা, আলো, বিদ্যা, যজ্ঞ, সন্তান ও দয়া– এই আটরকম গুণ শিক্ষাচারের লক্ষণ। সর্ব মন্বন্তরেই অবশিষ্ট মনু ও সপ্তর্ষিরা এই ধর্মাচরণ করেন বলে এঁদের শিক্ষাচার্য বলে। শুনে যা জানা যায় তা হল সৌত, আর যাকে মনে করা হয়েছে তা স্মার্ত।

এরপর ধর্মের অন্য লক্ষণগুলো বলছি। যা কিছু দেখা যাক না কেন, জিজ্ঞাসা করলে গোপন না করে যথাযথ বলাই হচ্ছে সত্য। ব্রহ্মচর্য, জপ, মৌন ও অনাহার–এগুলি হল তপস্যার মূল কথা এটি খুবই দুঃসাধ্য, পশু, দ্রব্য, হবি, ঋক, সাম, যজু, ঋত্বিক ও দক্ষিণা, এই সমস্তের সংযোগকেই যজ্ঞ বলা হয়। হিত, অহিত সমস্ত কিছুতে সমান দৃষ্টি, দয়া, খারাপ কথা শুনে বা আঘাত পেয়েও খারাপ কথা না বলা, আঘাত না দেওয়া, বাক্য, মন্দ, কাজের যে সংযম তাই ক্ষমা, ইন্দ্রিয় সংযম করার নাম হল ব্রহ্মচর্য। নির্দোষভাবে ব্রহ্মচর্য পালনই দম'। নিজের কিংবা পরের মিথ্যা প্রবৃত্তি সংযমই হল 'শম। যে দ্রব্য প্রিয় এবং সৎপথে উপার্জন করা হয়েছে। তাই যোগ্য পাত্রে দান করতে হয়। এটাই দানের লক্ষণ। দান তিনরকম– জেষ্ঠা, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠা দান মুক্তি দায়ক, কনিষ্ঠ দান স্বার্থ সাধক, স্নেহবশে বন্ধুবান্ধব ইত্যাদিতে দানকে বলে মধ্যম কৃত ও অকৃত কাজ ত্যাগই 'সন্ন্যাস'। শুভাশুভ পরিত্যাগ করাই ত্যাগ। এই শব্দে বাচ্য, আগের স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরে ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা প্রত্যঙ্গ গুলোর এরকম লক্ষণ বলেছেন।

এবার মন্বন্তরের বিধানগুলোর কথা বলছি। প্রতি মন্বন্তরেই শ্রুতি আলাদাভাবে প্রবর্তিত হয়। ঋক, সাম, যজুঃ দেবতা শ্রোত্র, বিধি, স্তোত্র সমস্তই আগের মত প্রবর্তিত হতে থাকে। প্রতি মন্বন্তরে যেমন দেবতা তাদের সেরকম চাররকম স্তুতি ও ব্রহ্মা রচনা করেন, ঋক, যজুঃ ও সাম বেদের মন্ত্রগুলোও আলাদাভাবে প্রবর্তিত হয়। পূর্ব পূর্ব মন্বন্তরে কঠিন তপস্যাকারী মুনিদের মনে পরিতোষ, দুঃখ, সুখ, শোক থেকে এই পাঁচটি কারণে মন্ত্রগুলো প্রাদুর্ভূত হয়।

ঋষি পাঁচ প্রকার। সেই ঋষি ও আর্যদের লক্ষণ বলব। প্রলয়ের শেষে প্রকৃতির তিনটি গুণের সাম্য ছিল। তখন দেবতাদের কর্তা বা রাজা ছিল না। তারপর দেশকালহীন একটি চেতনার বিকাশ হয়। এর থেকে কাজের প্রবৃত্তি জন্মে, মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার এবং অহংকার থেকে পঞ্চমাত্র জন্মে। তা থেকে স্থান পঞ্চাভূত প্রাদুর্ভূত হয়। সহজসিদ্ধ কারণ সর্বদাই কার্য আকারে পরিবর্তিত হয়। জ্বলন্ত মশাল যেমন ওপর দিকে উঠে দশদিক আলো করে, শ্রোতজ্ঞ তেমনি কালধর্ম দিয়ে বিবর্তিত হয়ে একদা সমস্ত ব্যাপ্ত করে থাকে। মহত তত্ত্বের বিবরণ দেখবার জন্য সেই সর্বজ্ঞাসাধার সশরীরে আগে যেখানে ছিলেন সেখানেই আছেন। তিনি যেন তমোরূপ মহাগৃহের দ্বারে রয়েছেন। মহান তমোরাশির পায়ে রয়েছেন। মহান বিবর্তিত হলে তার জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ও ধর্ম এই চাররকম বুদ্ধি আবির্ভূত হয়। তার এই বুদ্ধি সহজ ও সর্বাধিক প্রভাত বিশিষ্ট। যিনি অব্যক্ত নামে পুরে শুয়ে থাকেন যিনি সেই অব্যক্ত পুরীর অধীশ্বর এবং যার ক্ষেত্র জ্ঞান রয়েছে, তাকে পুরুষ বলে। ক্ষেত্রবিজ্ঞানের তারণ তার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। ঋষি ঋতুগমন, শ্রুতি, সত্য ও তপস্যার্থক। যাঁরা এসব গুণে গুণী তাদেরকেই ঋষি বলে। আদিকালে যিনি উৎপন্ন তাকেও ঋষি বলে। যে ঋষি বুদ্ধি দিয়ে পরমতত্ত্ব জানতে পারেন, তাদের বলা হয় পরমর্ষি। যার পরিমাণের সীমা নেই, তাকে মহান বলা হয়। যে সমস্ত বুদ্ধি পারদর্শী বুদ্ধি দিয়ে মহানকে অবলম্বন করেন, তারা মহর্ষি পদবাচ্য। ঈশ্বরের সন্তানরা যারা অহংকার ও অজ্ঞান ত্যাগ করেছেন। তারাও ঋষিত্ব পেয়ে থাকেন। যাঁরা পঞ্চন্মাত্রে ও সত্যে সমাসক্ত, সেই সত্য দৃষ্টি সম্পন্ন ঋষিদের সপ্তর্ষি বলা হয়।

ঋষি জাতি পাঁচ প্রকার। ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, মনু, দক্ষ, বশিষ্ট –এরা ব্রহ্মার মানস পুত্র। মহান সেই সমস্ত ঋষিরূপে পরিণত হয়েছিলেন বলে তাদের মহর্ষি বলা হয়। এদের সন্তানদের বর্ণনা দেওয়া হল। কাব্য, বৃহস্পতি, উশনা, কশ্যপ, উতথ্য, বামদেব, অযোজষ, উষিজ, কর্ম, বিশ্রবা, শক্তি, বালখিল্য, এরা ঋষিপদবাচ্য ঋষিপুত্র। ঋষিদের বিবরণ শুনুন। বৎসর, নগ্নহু, ভরদ্বাজ, বৃহদুম, শরদ্বান অগস্ত্য, ঐষিজ, দীর্ঘতমা, বৃহদুকথ, শরদ্বত, বাজ৹বা সুখিও প্রভৃতি ঋষিকরা সত্য প্রভাবে ঋষিত্ব পেয়েছেন।

আরো অন্যান্য মুনিরা এবং এই সমস্ত ঋষিকরা মন্ত্র প্রণয়ন করেন। ভৃগু, কাব্য, প্রচেতা, জিতেন্দ্রিয় পৃথু ইত্যাদি এই রকম উনিশজন মন্ত্রবাদী ঋষি আছেন। অঙ্গিরা বংশের তেত্রিশজন মন্ত্র প্রবর্তক মুনি রয়েছে। কশ্যপ, বৎসর, বিভ্রম, রৈভ্য, অসিত, দেবল এই কয়জন রয়েছেন কশ্যপ বংশের দেবতা, এঁরা সকলেই ব্রহ্মবাদী। অত্রি, আর্চিষ্মান শ্যামাবান, ধীমান এঁরা হলেন অত্রি গোত্রজাত। বশিষ্ঠ, শক্তি পরাশর, ইন্দ্র, প্রমিতি, ভরদ্বাজ, মৈত্র–বরুণ, কুন্তিন, এই সাত মহর্ষি ব্রহ্মক্ষেত্র নিবাসী, ব্রহ্মাক্ষেত্র মহাতীর্থ ব্রহ্মা প্রাচীনকালে তা নির্মাণ করেন। একদা পিতামহ এখানে থাকতেন, সেই পুণ্যতম কুরুক্ষেত্রে দেবতা ও মুনিদের সমাগম হয়। ব্রহ্মা প্রশ্ন করলেন–আপনারা বায়ু দেবতাকে কোথায় দেখেছেন? ঋষিরা তার উত্তরে বললেন–আমরা বায়ু দেবতাকে দেখিনি, ঋষিরা এ-বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

এমন সময়ে একটা ছোট্ট অণুমাত্র পুর তাঁদের চোখের সামনে আস্তে আস্তে বড় হয়ে গেল। সেই পুর বায়ুপুর নামে প্রসিদ্ধ। সেই পুরে আঠারো হাজার ব্রাহ্মণ ও দ্বিগুণ পরিমাণে শূদ্রের আগমন হয়। বায়ু সেই ব্রাহ্মণদের বললেন–আপনারা আমাকে ভক্তি করে থাকেন, অতএব আমার নামই খ্যাত হোক। হে দ্বিজগণ! আপনারা প্রত্যেকে দু-দুজন ব্রাহ্মণের অনুগত হোন। আপনাদের এগারোটি গোত্রের প্রবর্তন হবে। আপনাদের বিয়ের সময় চত্বরের ওপর মঙ্গলস্নান হবে। বলবান মানুষরা তলোয়ার হাতে সেই জায়গা পাহারা দেবেন যাতে সেই স্থান কেউ না দেখতে পায়। এই নিয়মটি আপনাদের জন্য মঙ্গলজনক। সগোত্রা রমণীর জন্য একটি নৈবেদ্য তৈরি করতে হবে। চারজন রমণী কুণ্ডন কার্য করবেন। এই সরোবরে স্নান করলে ভবতাপ দূর হয়। এই সরোবরে আর কেউ স্নান করতে পারবে না। আমার নামে খ্যাত যে ছয়টি জায়গা আছে তা দর্শন করে মানুষ পবিত্র হয়। হে বিপ্রজন! যেখানে হনুমান রয়েছেন, সেই তীর্থ ভূতলে বিখ্যত তীর্থ। বায়ু ধর্ম রক্ষার জন্য তিন দেবতার আদেশে বিপদের স্থাপন করেছেন। রুদ্রদেব যেখানে বিরাজ করছেন। বায়ু সেখানে বাড়াদিত্য নামে সূর্যদেবের প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিলোকাধার সূর্যদেব সহস্রকিরণযুক্ত, সমস্ত অস্ত্রে ভূষিত ও রত্নদেবীর সাথে বিরাজ করছেন। যেখানে সূর্য, ব্রহ্ম, রুদ্র ও বিষ্ণু এই চারটি কুণ্ড রয়েছে। সেখানে নবদুর্গা রয়েছেন। দুটি বিষ্ণু, তিনটি শিব, চারটি যজ্ঞ সেখানে উপস্থিত। পৈতে, বিয়েতে এদের কর দেওয়া হয়। শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সংখ্যা এখন শূদ্রদের চেয়ে অনেক বেশি। সেই বায়ু স্থান মহাপুরে বাপী, কুয়ো, জলবায়ু, দেবমন্দির, ধর্মশালা, এসমস্ত প্রচুর ছিল। সেখানে রত্নাবতী নামে গঙ্গা বইছে। সেই গঙ্গাই কলিকালে মহাপাতকনাশিনী নদীরূপ নিয়েছে। বায়ু স্থাপিত এই রাজ্য পাপনাশক। আপনাদের কাছে সেই জায়গায় বর্ণনা সংক্ষেপে দিলাম।

বায়ু স্থাপিত বিপ্রের উপমাহীন। এরা বিধর্ম ধ্বংসকারী শাস্ত্র প্রণেতা। হিত ধাতু থেকে হেতু শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। প্রপূর্বক শংস ধাতু থেকে প্রশংসা এসেছে। এর অর্থ গুণবত্ত যা অনেক আগে ঘটেছে তাকে পুরাকল্প বলে। সেই সব পুরাকল্প শুদ্ধ মন্ত্র ব্রাহ্মণ কল্প নিগমাদি দিয়ে কল্পিত হয়নি অনিশ্চিত ভাবেই রচিত হয়েছিল। এ কল্প যেমন, সে কল্পও তেমনি ব্রাহ্মণদের পক্ষে এটা দশম উপদেশ।

.

বাষট্টিতম অধ্যায়

ঋষিরা সূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রাচীনকালে বেদগুলো কিভাবে রচিত হয়? স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে দ্বাপর যুগ উপস্থিত হলে ব্রহ্মা মনুকে বললেন–হে তাত! যুগ পরিবর্তন হওয়াতে দ্বিজাতীরা স্বল্পবীর্য হয়েছে, যুগের দোষে সবাই বীর্যহীন হয়ে পড়েছে। বীর্য, সত্য, তেজ, বাক্য সবই সত্যযুগ থেকে দশহাজার ভাগ ক্ষীণ হয়েছে। এটা আস্তে আস্তে একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই যাতে বেদ নষ্ট না হয়, সেজন্য বেদকে চারভাগে ভাগ করতে হবে। বেদ নষ্ট হলে যজ্ঞ লোপ পাবে। যজ্ঞলোপে দেবতা নাশ, তার ফলে সর্বনাশ। প্রভু মনু "তথাস্তু' বলে চতুষ্পদ বেদকে চারভাগে ভাগ করলেন। এখন আপনাদের যে বেদ আছে এটাই সেই ব্রহ্মার নির্দেশানুসারে লোকহিত কামনায় চারভাগে বিভক্ত বেদ, এই মন্বন্তরে দিয়ে অন্যান্য মন্বন্তরের বেদবিভাগ কর্তাদের কথা বলছি। হে দ্বিজোত্তম! আপনারা শুনুন।

এই যুগে বিষ্ণুর অংশ প্রসিদ্ধ পরাশর নন্দন দ্বৈপায়ণ ব্যাস পদবী লাভ করেছেন তিনি ব্রহ্মার আদেশে বেদ বিভাগ করেন। বেদ প্রচারের জন্য চারশিষ্য নিয়োগ করেন। তাদের নাম জৈমিনি, সমন্ত, বৈশম্পায়ন ও শৈল, লোমবর্ষণ তাঁর পঞ্চম শিষ্য।

শৈল ঋগবেদে, বৈশম্পায়ণ যর্জুবেদে, জৈমিনি সামবেদ এবং সুমন্ত অথর্ববেদ অভ্যাস করেন। আর ভগবান দ্বৈপায়ণ ইতিহাস, পুরাণে শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যর্জুবেদ একটি ছিল একে তিনি চারভাগে ভাগ করেছেন। যজ্ঞে যে ব্রহ্মকার্য করতে হয় তা অথর্ববেদের মত। দ্বৈপায়ণ ঋকগুলো উদ্ধার করে ঋকবেদ রচনা করেন। সাম সংগ্রহ করে সামবেদ রচনা করেন। আর অথর্ববেদ দিয়ে রাজাদের কি কি কর্তব্য আছে, সেই যা কাজের বিধান করেন। পুরাতত্ত্ব বিশারদ দ্বৈপায়ণ পুরাণ সংহিতাও রচনা করেন। বেদপরায়ণ অন্যান্য ঋষিদের সাথে আলোচনা করে যর্জুবেদ সংগ্রহ করেন। যর্জুবেদের অবশিষ্ট দিয়ে যজ্ঞের বিধান তৈরি হল। এই অনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রবর্তিত হয়। শৈলমুনি, ঋগুলো সংগ্রহ করে তাদের দুভাগে

ইন্দ্রপ্রমতি ও আর এক ভাগের শিক্ষা দিয়েছিলেন বাস্কলি মুনিকে। বাস্কলি চারটি সংহিতা রচনা করেন শিষ্য দ্বিতীয় শাখা অগ্নিধায়, তৃতীয় শাখা পরাশর, আর চতুর্থ শাখা মুনি শিক্ষা করেন। ইন্দ্রপ্রমতি মুনি একটি সংহিতা রচনা করে যশস্বী মার্কণ্ডেয় মুনিকে পড়িয়েছিলেন। মার্কণ্ডেয় তার পুত্র সত্যবাকে, সত্যশ্রবা সত্যহিতকে, সত্যহিত, তার মহাত্মা পুত্র সতীকে পড়িয়েছিলেন। বিদ্বান সতশ্রীর তিনশিষ্য হয়। তাদের প্রথম শাক্য, দ্বিতীয় রথীতর এবং তৃতীয় বাষ্কলি ভরদ্বাজ। এরা বিভিন্ন শাখা লিখেছিলেন। দেবামিত্র শাকল্য দ্বিজ, জ্ঞানের অহংকারী ছিলেন, তাই জনক রাজার যজ্ঞে এর বিনাশ হয়। শাংখ্যপায়ন বললেন, জ্ঞানগর্বিত এই মুনি কিভাবে বিনাশ হলেন? জনক রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞে কি ঘটেছিল? এ সমস্তই আমাদের দয়া করে বলুন।

সূত বললেন–জনক রাজার যজ্ঞে প্রচুর লোকের আগমন হয়। সেই বিখ্যাত যজ্ঞ দেখার জন্য নানা জায়গা থেকে অনেক মুনি সেখানে উপস্থিত হয়ে ছিলেন। এ সমস্ত মুনিদের মধ্যে জ্ঞানে পাণ্ডিত্যে কে শ্রেষ্ঠ? এ কথা জানবার জন্য রাজার খুব কৌতূহল হল। তিনি বুদ্ধি করে বললেন–আমি তিন হাজার গরু, হাজারের বেশি সোনা, বহু গ্রাম, দান-সামগ্রী ইত্যাদি আপনাদের দান করতে চাই। আপনাদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি এই দান গ্রহণ করুন। তখন এই বিশাল দান লোভে সবাই বিবাদ করতে শুরু করল। সকলেই মনে মনে ভাবল, এগুলি আমি পাওয়ার যোগ্য।

তার মধ্যে মহাতেজস্বী তপস্বী যাজ্ঞবল্ক্য নিজের শিষ্যকে বললেন–বৎস এই ধন নিয়ে বাড়ি চলে যাও। এই ধন আমারই। আমি সর্ববেদের অসাধারণ বক্তা ও পণ্ডিত। যদি কেউ আমার কথায় সন্তুষ্ট না হন, তবে আমার সঙ্গে বিতর্কে আসুন। যাজ্ঞবল্ক্যের এই কথায় মুনিরা সকলেই রেগে গেলেন। যাজ্ঞবল্ক্য হাসতে হাসতে বললেন–হে সত্যবাদী পণ্ডিতগণ, আপনারা রাগ করবেন না। আপনারা পরস্পর বিচার করুন। সম্পদের লোভে পণ্ডিতরা সগর্বে মহাবিচার করতে বসলেন। সমস্ত ঋষিরা একদিকে, আর যাজ্ঞবল্ক্য একদিকে। মুনিরা সবাই ধীমান, যাজ্ঞবল্ক্যের সাথে বিচারে উত্তর দিতে পারলেন না। ব্রহ্মতেজোরাশি মহাদ্যুতি যাজ্ঞবল্ক্য মুনিদের পরাজিত করে শাকল্য মুনিকে বললেন– তোমার পক্ষের কথা বল। মনে ভাবছো কেন? তুমি তো অজ্ঞান অভিমানে পরিপূর্ণ। যাজ্ঞবল্ক্যর কথায় মুনি শাক্য প্রচণ্ড রেগে গিয়ে কঠিন বাক্যে উত্তর দিলেন–তুমি আমাদের তৃণের মতো অবজ্ঞা করছ? এই মহা সার ধন তুমি নিজেই নিতে চাইছ। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বললেন–সৎ ব্রাহ্মণদের বিদ্যালব্ধ জ্ঞানই বল। আমি অর্থ কামনা করি।

বিপ্রদের কামনারূপ প্রশ্নটা হল ধন, আমরাও ইচ্ছা মতন প্রশ্ন করব। জনক রাজার তাই পন। এজন্য আমি ধন গ্রহণ করেছি, যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শুনে প্রচণ্ড রেগে শাক্য মুনি বললেন–এইবার আমি জিজ্ঞাসা করছি, তুমি প্রশ্নের উত্তর দাও। এইবলে তিনি প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। দুই পণ্ডিতে তর্ক শুরু হল, শাকল্য মুনির হাজার হাজার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে লাগলেন যাজ্ঞবল্ক্য। তখন শাকল্য নিরস্ত হয়ে চুপ করে গেলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন–তুমি আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। না পারলে মরণ অভিশাপ দেওয়া হবে, এই প্রতিজ্ঞা রইল। শাকল্য প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে পরাজিত হয়ে মারা পড়লেন।

এইভাবে মহামতি যাজ্ঞবল্ক্য মুনিদের শত সহস্র প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সমস্ত দান ধন গ্রহণ করে শিষ্যদের নিয়ে নিজ ভবনে ফিরে গেলেন। মহাত্মা শাকল্য পাঁচখানি সংহিতা রচনা করেন। তাঁর পাঁচ শিষ্য ছিলেন। শাকল্যের মৃত্যু হলে এই সমস্ত বা বিতণ্ডাকারী ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকেই ব্রহ্মহত্যা পাপগ্রস্ত হয়েছিলেন। সেজন্য তারা চিন্তিত হয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা তাদের মনের কথা জানতে পেরে বললেন–তোমরা বায়পুরে যাও, সেখানে গেলে তোমাদের পাপ নাশ হবে। তোমরা সেখানে গিয়ে দ্বাদশী বায়ু কেশ্বরকে এই এগারো রুদ্রকে এবং বিশেষতঃ বায়ু পুত্রদের নমস্কার চারকুণ্ডে স্নান করলে, ব্রহ্মহত্যা থেকে মুক্তি পাবে।

ব্রহ্মার উপদেশে সেইসব বিবাদকারী মুনিগণ তাড়াতাড়ি বায়ুপুরে গিয়ে বিধান অনুযায়ী স্নান সেরে দেবতাদের দর্শন করে উত্তরেশ্বরকে প্রণাম করলেন। তারপর তারা নিজেদের মহিমায় ব্রহ্মহত্যা পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সূর্যমণ্ডলে চলে গেলেন। সেই থেকে ঐ তীর্থগুলি পাপনাশক বলে খ্যাত হয়েছে। সেই সময় অঞ্জনার গর্ভের বায়ুপুত্র সত্যবিক্রম হনুমান প্রাদুর্ভূত হন। তখনই বায়ু সেই প্রশস্ত পবিত্র তীর্থ স্বরূপ পুরী নির্মাণ করেন। বায়ুপুরবাসী বিপ্রেরা, বাহুহীন লেখান করে শূদ্র বর্ণের জন্য কবর স্থাপন করলেন। তাঁদের রাজ্য এভাবে তৈরী হল।

ঋষিরা বললেন–ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, শালকি, ধীমান, নিগম বিশারদ, দ্বিজোত্তম, শতবলাক, বালকি এবং ভরদ্বাজ এরা প্রথমে তিনখানি সংহিতা রচনা করেন। রথীতর নিরুক্ত রচনা করেন। ঐ রথীতরের তিনজন শিষ্য ছিলেন। যাঁরা সংহিতা প্রবর্তন করেন, তাঁদের বহুবৃচ বলা হল। যিনি যজুর্বেদের উত্তম ষোলো সংহিতা প্রণয়ন করেছেন, সেই বৈশম্পায়ণই যর্জুবেদের প্রবর্তক। বৈশম্পায়ন একমাত্র মহাতপা। যাজ্ঞবল্ক্য ছাড়া অন্য সমস্ত শিষ্যকেই সংহিতা প্রদান করেন। বৈশম্পায়ন ছিয়াশী সংহিতার মধ্যে একটি বিশেষ রূপ কল্পনা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তিনটি ভেদ আছে। এর ওপরে আবার উদীচ্য, মধ্যদেশ ও প্রাচ্যদেশ ভেদে সংহিতাগুলো নয়প্রকার ভেদ সম্পন্ন হয়েছে। সংহিতাবাদী এইসব দ্বিজরা চরক নামে

অভিহিত হয়ে থাকেন। ঋষিরা দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন–এঁরা কি কারণে চরক হলেন? সূত তখন চরক উৎপত্তির কারণ বলতে লাগলেন। একবার ঋষিদের একটি কাজে আলোচনার প্রয়োজন হলে সবাই মিলে একটি সভায় বসলেন। ঠিক হল যিনি সাত রাত্রির মধ্যে ঐ সভায় যোগদান করবেন না, তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে পাপী হবেন। তারপর সেখানে বৈশম্পায়ন ছাড়া সব ঋষিই এলো, তাই আগের কথা অনুযায়ী বৈশম্পায়নের ব্রহ্মহত্যা দোষ হল। তিনি নিজের শিষ্যদের বললেন–হে দ্বিজগণ, তোমরা সকলে মিলে আমার হয়ে ব্রহ্মহত্যা ব্রত আচরণ কর।

বৈশম্পায়ন শিষ্যদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন–এটা উচিত কম নয়। তিনি আরো বললেন–যে অন্য মুনিরা বৈশম্পায়নের সঙ্গে থাকুন কিন্তু তিনি তপস্যা করে বলসঞ্চয়ের জন্য সেখান থেকে চলে যাবেন। তখন বৈশম্পায়ন রেগে গিয়ে বললেন–তুমি আমার কাছে যে সব বেদবিদ্যা শিখেছ, তা ফেরৎ দাও।

যাজ্ঞবল্ক্যকে বৈশম্পায়ন একথা বলার পরে যাজ্ঞবল্ক্য রক্তবমির দ্বারা সমস্ত যজুর্বেদ গুরুকে আবার ফেরৎ দিলেন। তারপর সূর্যদেবের আরাধনা করতে লাগলেন। সূর্য যত উপরে উঠতে লাগল, যজুর্বেদ। সকল তত ওপরে সৌরমণ্ডলে আশ্রয় নিল। তখন সূর্য সন্তুষ্ট হয়ে বেদগুলি আবার যাজ্ঞবল্ক্যকে দান করলেন। অশ্বরূপধারী যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্যরা যর্জুবেদ পাঠ করে বলে তারা অশ্বরূপ পেলেন।

যে সব বৈশ্বম্পায়ন শিষ্যরা তার ব্রহ্মহত্যা আচরণ করছিলেন তারাই চরক নামে খ্যাত হয়েছেন। এই হল চরক বিবরণ। যাজ্ঞবল্ক্যের যেসব শিষ্যরা অশ্বরূপ ধারণ করেছিলেন এরা হলেন কণ্ব, বৈধেয়শালী, মধ্যস্থিন, শাপেয়ী বিদিগ্ধ, সাপ্যাউদল, তাম্রবর্ণ, বাৎস্য, গোলক, শেষেরি, আটবী, এণী, বিস্বনী ও সপরাময়–এই পনেরোজন।

সমস্ত যজুর্বেদ একথাটির বিশেষ কল্পনা দেখা যায়। জৈমিনি নিজের ছেলে সুমন্তকে পড়িয়ে ছিলেন। সুমন্ত তার ছেলে সুত্বাকে এবং সুত্বা আবার তার ছেলে সুকর্মকে ঐ সব যজুর্বেদ পড়িয়েছিলেন। সুকর্ম আবার অল্প দিনের মধ্যে এগুলি পড়ে নিয়ে সহস্র শিষ্যকে এগুলি পাঠ করালেন। কিন্তু অধ্যয়নের দিনটি সঠিক ছিল না বলে শতক্রতু ইন্দ্র তার শিষ্যদের বিনাশ করলেন। তখন শিষ্যদের শোকে সুকর্ম নিজের মৃত্যু কামনায় উপবাস শুরু করলে শতক্রতু, সুকর্মকে দুটি বর দিলেন। ইন্দ্র বললেন–হে দ্বিজোত্তম, আপনি রাগ করবেন না। আপনার দুটি মহাভাগ, মহাবীর্য, অমলকান্তি সুপণ্ডিত শিষ্য হবে। এই দুই শিষ্য হাজার সংহিতা অধ্যয়ন

করবেন। এই বলে সুকর্মকে নিরস্ত করলেন। ইন্দ্রের বরে তার দুই শিষ্য হলেন–পোষ্যঞ্জী ও কৌশিল্য। উদীচ্য পৌষ্যঞ্জীর শিষ্য, আর কৌশিল্যের শিষ্য প্রাচ্য সামগন।

এই দুই শিষ্য তাঁদের শিষ্যদের পাঁচশো করে সংহিতা অধ্যয়ন করান। এখন পৌষ্যঞ্জী শিষ্য লোকাক্ষী, কুক্ষুমি, কুসীতা এবং মঙ্গলি এই চারজনের বিবরণ শুনুন। অন্ডিমুত্র, কমনীয়, সুবিদ্বান, মূলাচারী, কতিপুত্র ও সত্যপুত্র লোকাক্ষীর এই কয়েকজন শিষ্য। কুথুমির তিনপুত্র, ঔরস, রসপাসর এবং তেজস্বী ভগবিতি। এরা কৌথুম নামে অভিহিত। চেল, পতঞ্জলী প্রভৃতি কৌথুমেয় শিষ্য। এরা ছখানি সংহিতা প্রণয়ন করেছিলেন। ভালুকি, কামহানি, জৈমিনি, লোমগায়নি ইত্যাদি এরা লাঙ্গল নামে অভিহিত। এই লাঙ্গলি শিষ্যরা বহু সংহিতা প্রণয়ন করেছিলেন।

হিরণ্যনাভ নরশ্রেষ্ঠ রাজা চব্বিশটি সংহিতা প্রণয়ন করেন। সেসব শিষ্যগণ তা প্রণয়ন করেন, সে বিষয়ে বলছি। বাড়, সহবীর্য, বাহন, পঞ্চম, বৈশাখ, অঙ্গুলীয়, কৌশিক, পরাবার প্রভৃতি হিরণ্যনাভের শিষ্য। এরা সকলেই সামজ্ঞ। এই সামজ্ঞগণের মধ্যে পৌষ্যঞ্জী ও কৃতি এই দুজনেই শ্রেষ্ঠ। এরা সংহিতার প্রণেতা। সুমন্ত অর্থব বেদকে দুভাগ করে স্কন্ধকে দান করেছিলেন। কবন্ধ আবার দুভাগ করে পথ্যকে একভাগ ও বেদ পর্ষকে এক ভাগ দান করেন। বেদ পর্ষ আবার তাকে চারভাগ করে মোদ, ব্রহ্মবল, শিল্প বল ও শৌষ্কামুনি এই চার শিষ্যকে দান করেন। পথ্য সংহিতাকে তিনভাগে ভাগ করে কাজলি, কুমুদাদি এবং শৌনিক এই তিন শিষ্যকে দান করেন।

ধীমান শৌনিক আবার একে দুভাগে ভাগ করে। এক ভাগ বসুকে এবং অন্যভাগ সৈন্ধবায়নকে দান করেন। সৈন্ধব আবার তাকে দুভাগে ভাগ করে একভাগ মুঞ্জকেশকে দান করেন। এছাড়া নক্ষত্র কল্প ও তৃতীয় বৈতান কল্প, চতুর্থ অঙ্কিরা কল্প এবং পঞ্চম শান্তিকল্প প্রভৃতি সংহিতা বিধি আছে।

সংহিতাগুলোর মধ্যে অথর্ব বিকল্পই শ্রেষ্ঠ। আমিও ঐ সংহিতা দুভাগে ভাগ করে পুরাণরূপে প্রণয়ন করেছি। অত্রি বংশোদ্ভব ধীমান সুমতি, কশ্যপ, অকৃতব্রত অগ্নিতুল্য প্রভাবশালী ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, মিত্রায়ু, সোমদত্ত বংশোদ্ভব সার্বর্ণি ও শাংখ্যপায়ন বংশীয় সুকর্মা, আমার এই কজন শিষ্য, সংহিতা কর্তা কাশ্যপ, সার্বর্ণি ও শংসপায়ন, এরা তিনজনে প্রথমে তিনখানি সামবেদ সংহিতা প্রণয়ন করে। প্রত্যেকেই আবার তা তিনভাগে ভাগ করেন। এটাই পুরাণে সংহিতরে আদিরূপ।

অন্যদিকে যে সব বেদশাখা দেখা যায় ঐ সব নিয়ে এর সমষ্টি চার হাজার। এছাড়া আরও অনেক শংখ্যপায়নি শাখা আছে। সেগুলিও চার হাজারের বেশি। এই সব বেদ শাখার মধ্যে লোমহর্ষানিক শাখাই মূল। তারপর উত্তম কাশ্যপিকা শাখা, সাবর্নিকা তৃতীয় শাখা। এসব শাখা যজুর্বেদের এই সব সংহিতা, পনেরোটি বালখিল্য সংহিতা, কুড়িটি সাবণী সম্মত সংহিতা, আটহাজার সাম, চৌদ্দ হাজার সামমন্ত্র– এই সব গান করে থাকেন। এছাড়া ব্যাসদেব বারোহাজার ছন্দ রচনা করেছেন। তিনি অনেকগুলি সংহিতা রচনা করেন। রাজমনের সংহিতার দু-হাজার মন্ত্র ও চারগুণ ব্রাহ্মণ পরিসংখ্যা করেছেন। হে ঋষিগণ! এই যে যজুর্বেদের নিখিলমন্ত্র বলা হল, এগুলির সংখ্যা তারও বেশি।

এবার চারণ বিদ্যার কথা শুনুন। চারণ বিদ্যার ঋকসংখ্যা ছ-হাজার ছাব্বিশ। এগারো হাজার কুড়ি সংখ্যক যজুর্বেদের ঋক সংখ্যা দশ হাজার তিনশ আশিটি এবং ঋকমন্ত্র এক হাজার। আবার অথর্ব সংহিতার ঋকসংখ্যা পাঁচ হাজার। এভাবে সব মন্বন্তরে সমান রূপে সংখ্যা নির্দেশ শাখাবেদ, শাখাকর্তা, ভেদহেতু প্রভৃতি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রজাপতি শ্রুতিই নিত্য। এর কোনও ভেদ নেই।

এখন যেসব বেদের কথা হয় তাহলে বিকল্প ভেদ বা বিধান। দেবতাদের অনিত্যভাবের জন্যই বারবার মন্ত্রোৎপত্তি হয়। এই যে সব শ্রুতিভেদ রয়েছে। এগুলি দ্বাপর যুগেই ঘটেছে। ভগবান ব্যাস এভাবে বেদ বিভাগ করে শিষ্যদের তা দান করে তপস্যার জন্য অরণ্যে গেলেন। তার শিষ্য প্রশিষ্যরাই এভাবে শাখা ভেদ করেছেন।

শিক্ষা প্রভৃতি অঙ্গ শাস্ত্র ছয়, চার বেদ মীমাংসা ন্যায় বিস্তার, ধর্মশাস্ত্র এবং পুরাণ এই চোদ্দরকম বিদ্যা। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র– এই চারটে নিয়ে ঐ বিদ্যা আঠারো প্রকার। প্রথমে ব্রহ্মর্ষি তা থেকে দেবর্ষিরা, এভাবে ক্রমে রাজর্ষি, ঋষি প্রভৃতি এবং সেই সমস্ত থেকে তিন প্রকার ঋষি প্রভৃতি ও শংসিতব্রত মুনি এভাবে ক্রমিক বলা হয়। কাশ্যপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি– এই পাঁচ গোত্রেই ব্রহ্মবাদিরা জন্ম দেন। যাঁরা ব্রহ্মাকে জানতে পারেন তারাই ব্রহ্মর্ষি। ধর্ম, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রত্যুষ, প্রভাস, কাশ্যাপ-এদের ছেলেরাই দেবর্ষি। এদের নাম হল নর ও নারায়ণ ধর্মপুত্র, ক্রতুপুত্র বালখিল্য, পুলহপুত্র কদর্ম, পুলস্ত্য পুত্র কুবের। প্রত্যুষপুত্র অচল, কশ্যপ আত্মজ পর্বত ও নারদ। এঁরা দেবতাদের জানেন, তাই এঁরা দেবর্ষি। মনু প্রবর্তিত বিয় ও ঐশবংশে প্রভু প্রভৃতি সব রাজারা তারা রাজর্ষি। যাঁরা প্রজাদের খুশি করে তাদের মতিবুদ্ধি জানতে পারেন, তারাই রাজর্ষি। যাঁরা

ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠা পান, তারা ব্রহ্মর্ষি, আর কৌলিন্য, তপস্যা ও মন্ত্রষ বক্তৃতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন দিব্য দেবর্ষিদেরও ব্রহ্মর্ষি বলা হয়।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে যাঁদের জ্ঞান আছে, যারা সত্য কথা বলেন, যাঁদের গর্ভ থেকে জ্ঞান স্ফুরণ হয়, যাঁরা মন্ত্রবক্তা, যাঁরা স্বয়ংসম্পন্ন– তাদের ঋষি বলা হয়। দীর্ঘায়ুশকতা, মন্ত্রকারিতা, ঐশ্বর্য, দিব্যদৃষ্টি, জ্ঞানমানিতা, প্রত্যক্ষধর্ম সেবিতা, ঘাত গুণ যুক্ত ঋষি সপ্তর্ষি।

এই সপ্তর্ষিরা গোত্র প্রবর্তন করেন। সবসময় যজন্যজন প্রভৃতি ছ'রকম কাজ করেন। সত্য প্রভৃতি যুগে তাদের বংশে বীরেরা বারবার জন্ম নিয়ে থাকেন। পুত্র পিতা থেকে পিতা পুত্র থেকে জন্ম নেন। এভাবে যুগের শেষ অবধি সংসার বাড়তে পারে। এভাবে গৃহমেধীর সংখ্যা অষ্টাশী হাজার। যাঁরা দিবাকরে দক্ষিণায়নে পিতৃমাস আশ্রয় করেছেন, তারাই প্রজা সৃষ্টির জন্য ও অগ্নিহোত্র পরিগ্রহ করে থাকেন। এছাড়া যাঁরা শ্মশান আশ্রয় করে রয়েছেন, তাদের সংখ্যাও অষ্টাশী হাজার। সূর্যের উত্তরায়ণে সেসব ঋষি স্বর্গে আশ্রয় পেয়েছেন, তারাই মন্ত্রব্রাহ্মণ কর্তা হয়ে জন্ম নেন।

এভাবে দ্বাপরযুগে যখন ভাব বিদ্যা কমতে শুরু করে তখন ঐ শাস্ত্রকার ঋষিরা ভাষাবিদ্যা প্রবর্তন করেন। ত্রেতাদি যুগেও তারাই ঐ সব শাস্ত্রের বিবরণ প্রণয়ন করে থাকেন। ভবিষ্যৎ দ্বাপর যুগে তিনি বেদব্যাস রূপে অবতীর্ণ হয়ে তপস্যা দিয়ে অব্যয় ব্রহ্মপদ লাভ করেন। তপস্যা থেকে কর্মপ্রাপ্তি, কর্ম দিয়ে যশ, যশ দিয়ে সত্য, সত্য দিয়ে অব্যয়, অব্যয় থেকে অমৃত, অমৃত থেকে শুক্র এবং অমৃত থেকে সব কিছুই পাওয়া যায়। ব্রহ্মা বৃহৎ এবং তিনিই সমস্ত পোষণ করেন বলে তার নাম ব্রহ্মা হয়েছে। ঋক, যজুঃ অথর্ব, সাম রূপে যাঁর প্রকাশ সেই ব্রহ্মকে নমস্কার। যাঁর শেষ দেখা যায় না, যিনি ক্ষয়হীন, যা থেকে জগত সম্মোহিত হয়, যিনি অব্যক্ত অমৃত শাশ্বত প্রকৃতির ব্রহ্মা, যিনি প্রধান স্বয়ম্ভু, যাঁর ভাগ নেই সেই বহু বাচক পরম ব্রহ্মকে সবসময় নমস্কার ভগবান অব্যয় ব্রহ্ম। সমস্ত জ্ঞান, সবপ্রকার বেদ ও অসংখ্য সংহিতা কীর্তন করে দেবর্ষিদের যে জ্ঞান দিয়েছেন, ঐ জ্ঞানের অনুসন্ধান অন্য কেউ করতে পারে না। অন্যান্য শাস্ত্রকাররা যে জ্ঞান প্রদর্শন করেন, সে সবই ব্রহ্ম দ্বারা সম্মত ও তার দ্বারা দৃষ্ট পথ। সমস্ত কর্তারই তিনি আদি কর্তা। ব্রহ্মার পুত্র স্বয়ম্ভুব মনুই একমাত্র সমস্ত বিদ্যা জেনে ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে তা আবার বিতরণ করেন। তারপর এই সব বিদ্যা ঋষিরা জানার পর তারা সংহিতাগুলোর প্রবর্তন করেন। প্রায় অষ্ঠাশী হাজার বেদবিদ ঋষি যুগে যুগে এই সব সংহিতার প্রবর্তন করেছেন।

দ্বাপরে যে সব বেদবিদ ঋষি সংহিতার প্রবর্তন করে, তাদের গোত্রেই এই সব বিভিন্ন বেদজ্ঞানও বারবার প্রচলিত হয়ে আসছে। আবার যুগক্ষয় হলেও সেই শাখা ও শাখা কর্তার আবির্ভাব হয়। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ দিয়ে সর্বকালেই সমস্ত কাজ অতীত দিয়ে ভবিষ্যৎ এবং একরকম বলে বর্তমান দিয়ে অতীত, ভবিষ্যৎ পূর্বের ঘটনা স্থির করা হয়। এভাবে মন্বন্তর তত্ত্বও বুঝতে হয়। দেব, ঋষি, পিতা, মনু সবাই মন্ত্রের সাথে ঊর্ধ্বে যেতে পারেন। আবার মন্ত্রের সাথেই ইহলোকে আবর্তিত হন। তারা দোষমুক্ত হয়ে জন্ম নেন, যদি কোনো বিশিষ্ট দোষ দেখা যায় তখন তারা দশদেবযুগ যাতায়াত করে জনলোক থেকে তপোলোকে যান। তপোলোক থেকে তপধার ফিরে আসেন না। এভাবে হাজার হাজার দেবযুগ অতীত হয়েছে। সমস্ত বিনষ্ট হয়ে মুনিদের সাথে ব্রহ্মলোক লাভ করেছে। এই সবের সংখ্যা নির্দেশ সব সময় করা যায় না।

আগে যেমন পিতৃ মুনি দেবতা ও সপ্তর্ষিদের সাথে যুগকল্প ও মন্বন্তরগুলো অতীত হয়ে গেছে, আগামীকালে সেই নিয়মেই মন্বন্তরগুলো অতীত হবে। মন্বন্তরের শেষে সংহার, আর সংহারের শেষে আবার দেবতা ঋষি, মনু ও পিতাদের সৃষ্টি হয়।

এই সংহার বা সৃষ্টির যথাযথ সংখ্যা একশো বছরেও বলতে পারা যায় না। এবার মানুষ পরিমাণের মন্বন্তরের সংখ্যা বলছি। দেবতা ও ঋষিদের মধ্যে যারা সংখ্যা-তত্ত্বে পারদর্শী। তারা ত্রিশকোটি সাতষট্টি নিযুত কুড়ি হাজার বছর মন্বন্তরের পরিমাণ নির্দেশ করেন। দিব্য সংখ্যাতে আট লক্ষ বাহান্ন হাজারের বেশি বৎসর মন্বন্তর, পরিমাণ। এর চোদ্দগুণ করলে যুগসহস্রাত্মক ব্রাহ্মণদিগের পরিমাণ হয়। তখন সর্বভূতের প্রলয় ঘটে। মহেশ্বরই কল্পাদি কালে সর্বভূতের সৃষ্টি করেন।

আগে যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ইত্যাদি চারযুগের কথা বলা হয়েছে তারই একাত্তর আবর্তনে এক মানুষ অধিকার কাল শেষ হয়। প্রভু ভগবান এই রকমই ব্যবস্থা করেছেন। ভবিতব্য অনুসারে আগে যেমন ঋষি দেবাদির সাথে মন্বন্তর অতীত হয়েছে। পরে তেমনি হবে। সর্ব মন্বন্তরেই ঋষিদের পিতা ও মনুরা পুরো মন্বন্তরকাল ধরে সৃষ্টির ব্যাপারটি সম্পূর্ণ করে নিজেদের অবস্থান্তর বুঝতে পেরে মহালোকে চলে যেতেন। মন্বন্তরের দেবতারা এক সত্যযুগ ধরে বিদ্যমান থাকেন। তারপর ভবিষ্যতের দেবতা, পিতৃ, ঋষি ও মনুরা প্রাদুর্ভূত হন। কলিযুগের শেষে কলির অবশিষ্ট জনগণের মধ্যেই সত্যযুগ শুরু হয়ে থাকে। কলি কালের শেষে মনু সপ্তর্ষিরা আবার মন্বন্তর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির জন্য তপস্যায় সত্যযুগের আরম্ভের জন্য অপেক্ষা করেন। তখন আবার আগের মতো শস্য উৎপন্ন হয়, প্রজারা স্থানে স্থানে দলবদ্ধভাবে

থাকে, নিরাপদ ও বর্ণমাচার শূন্য হয়ে জীবিকার জন্য সচেষ্ট হয়। আগের মন্বন্তরের অবশিষ্ট ধার্মিক মনু ও সপ্তর্ষিরা সন্তানের জন্য পরম কঠিন তপস্যা করেন। তখন আবার দেব, অসুর, পিতা, মুনি, মানব, সর্প, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। মনু ও সপ্তর্ষিরা তখন আদিকালের মানুষ ও দেবতাদের সঙ্গে কাজে নিযুক্ত হয়।

ত্রেতাযুগের আরম্ভকালে দেবতা ও ধন সুপ্রতিষ্ঠিত হলে জনগণ ব্রহ্মচর্য দিয়ে ঋষি ঋণ, সন্তান উৎপাদন করে পিতৃঋণ এবং যজ্ঞ দিয়ে দেবঋণ থেকে মুক্ত হয়। তারা হাজার হাজার বছর বর্ণাশ্রম ধর্ম ঠিকমতো পালন করে স্বর্গে গেলেন। এই সব সিদ্ধি সম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় দেবতারা মন্বন্তরে পরিবর্তন দেখেন। এরা সকলে ভীত হলে শূন্য দেবস্থানগুলোতে অন্য দেবতারা আসেন। তারা সত্য, ব্রহ্মচর্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও তপস্যা করে সেইসব শূন্যস্থানগুলো পূরণ করেন। সপ্তর্ষি, মনু, পিতৃ ও দেবতাদের মধ্য যারা আগেকার তারা মারা যান। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে এটি মৃত্যু নয় একটা বিপদ মাত্র।

অতীত ও অনাগত মন্বন্তর এর প্রতিস্পর্ধী লক্ষণ, স্বয়ম্ভুব মনু এরূপ বলেছেন। এক মন্বন্তরের সঙ্গে অন্য মন্বন্তরের দীর্ঘ পার্থক্য, মহাপ্রলয় পর্যন্ত ঘটে। মন্বন্তরের পরিবর্তনে সকলেই মহান লোকবাসী জল, অপঃ ও সত্যলোক পেয়ে থাকে। আবার সৃষ্টির আগের কালে সত্যলোক ত্যাগ করে নারায়ণ দেবে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে।

দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের বিবরণ, ব্যাসপ্রণীত কিছুটা সবিস্তারে কিছুটা সংক্ষেপে বর্ণিত, ঈশ্বরদের পুণ্য। কথাতে ভরা পরম পবিত্র এই মহাপুরাণ পাঠ করলে সুঃস্বপ্ন শান্তি ও পরমায়ু প্রাপ্তি হয়, এই স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরের বৃত্তান্ত সবিস্তরে একে একে বর্ণনা করলাম।

.

তেষট্টিতম অধ্যায়

শাংখ্যপায়ন বললেন– মন্বন্তরের পর্যায়গুলি আর তখনকার দেবতাদের কথা জানতে ইচ্ছা করে। সূত বললেন–যেসব মন্বন্তর শেষ হয়েছে আর ভবিষ্যতে সেসব মন্বন্তর হবে সংক্ষেপে সেগুলি বলছি। প্রথমে স্বায়ম্ভব, তারপর স্বরোচিষ ও তারপর উত্তম, তামস রৈবত ও চাক্ষুষ এই ছটি মনু অতীত হয়েছে, এবার ভাবী আটজন মনুর বিষয়ে বলছি। সাবর্ণ, রোচ্য, ভৌত্য ও বৈবস্বত ইত্যাদি পরে আলোচনা করব। স্বায়ম্ভব–মন্বন্তরের কথা বলা হয়েছে, এবার মহাত্মা স্বারোচিষ মন্বন্তরের প্রজা সৃষ্টি সংক্ষেপে বলছি।

এই মন্বন্তরে দেবতা তুষিত ও বিদ্বান পারাবত। ঐ দেবতাদের দুটি গণ বলা হয়েছে। ক্রতুর থেকে তুষিতার গর্ভে দুই পুত্র হয় পারাবত ও পৃন্দোজ– এই দুটি গণের প্রত্যেকটি বারোটি করে, সব নিয়ে চব্বিশটি বলা হয়েছে। ধৈবশস্য, বানন্য, গোপ, দেবায়ত, দেবভগবান, অজ, মহাবল, দুরোস, মহাবাহ, আপ, বীর্যবান, মহাজা, চিক্বিত্বশ, নিভৃত এবং অংশ– এই বারোটি তুষিত। এরা ক্রতু পুত্র ও সোমাপায়ী, প্রচেতা, বিশ্বদেব, সমস্ত, বিশ্রুত, অজিক্ষ, অরিমর্দন, বিদ্বান, মহাবল ধবীয় প্রভৃতি স্বরোচিষ মন্বন্তরে এরা দেবতা। এই দেবতারা ভার্গব, দ্রোণ, ঋষভ ও অগ্নিরা–এরা হলেন সপ্তর্ষি। কেউ কেউ বলেন পৌলস্ত্য, দত্তাত্রি আত্রেয়, নিশ্চল, পুলহ ও রাবান এরাই এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। চৈত্র কবিরতে, বৃত্তান্ত আদি স্বরোচিষ মনু নয়, পুত্র এরা বংশকর বলে পুরাণে আখ্যাত।

প্রতি মন্বন্তরে সপ্তর্ষি মনু, দেবতা ও পিতৃগণ এর চারটে মূল। এরপর যেগুলি রয়েছে তা পূর্বোক্ত মূল চারটির অবান্তর প্রজা, কখনও ঋষিদের পুত্র দেবতা, কখন দেবতাদের পুত্র পিতৃগণ, আবার কখনও দেবপুত্রদের ঋষি, শাস্ত্রে এটাই বিশেষ করে বলা আছে। এভাবে মনু থেকে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইত্যাদি এবং সপ্তর্ষি থেকে দ্বিজরা উদ্ভূত হয়েছেন। স্বায়ম্ভুব মনুর যেমন প্রজা বিস্তার স্বারোচিষ মুনও তাই। বার বার প্রজা সৃষ্টির ফলে এটি এত বড় হয়েছে, বিস্তারিত বলা অসম্ভব।

এরপর অতীতের তৃতীয় মনু উত্তমের বিবরণ বলছি। এই মনুর শাসন সময়ে পাঁচজন দেবতার কথা বলা হয়েছে। সুধাম, দেব, প্রতদিন, শিব, সত্য–এই গণ পঞ্চকের সত্য, ধৃতি, দম, দান্ত, ক্ষম ইত্যাদি বারোজন দেবতা আছেন। সুধাম ইত্যাদি পাঁচজনের অনুজ আরো বারোজন দেবতা আছেন। তারা হলেন সহস্রাধার, বিশ্বাতামা, শতধার, রহত, বায়ু, বিশ্বপা, বিশ্বকর্মা ইত্যাদি। এরা বংশপ্রবর্তনক। দিন, ক্রতু সুধর্ম, ধৃতধর্মা, যশস্বী ও কেতুমান এরা প্রর্তদনের অনুজ। এরা সবাই সূর্যের উপাসক, সুদান, বসুদনা, সুখমঞ্জস বিষ, হতাশন ইত্যাদি বারোজন শিবের অনুজ। সত্যের অনুজরা হলেন- দিকপতি, বাক্‌পতি, বিশ্ব, মস্ত ইত্যাদি বারোজন।

উত্তম মনুর সময় এই সব দেবতারা উদ্ভূত হয়েছিলেন। উত্তম মনুর ছেলেরা হলেন– অজ, পরস্ত, দিব্য, দিব্যোষধি নয় বেদানুজ, অপ্রতিম, মহোৎসাহ, ঔশিজ ইত্যাদি। এদের থেকে ক্ষত্রিয় বংশ বিস্তারলাভ করেছে। এরপর তামস মনুর বিষয়ে জানা যায়। সত্য, স্বরূপ, সুধী, হরি, তামস মন্বন্তরের এই চার দেবতা। এদের এক একটি গণে পঁচিশজন দেবতা, এই মন্বন্তরে পুলস্ত্য নন্দন রাক্ষসদের প্রাদুর্ভাব হয়।

এবার এই মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের নাম বলছি। কাব্য, হর্ষ, কাশ্যপ, পৃথু, আত্রেয়, অগ্নি ও জ্যোতিধামা- এরা সপ্তর্ষি। এছাড়া ভাগর্ব পৌলহ, বশিষ্ঠ, গোত্রীয়, বর্ণপীঠ, চৈত্র এবং পৌল এরা ঋষি। এই ঋষিগণ জনঘট, স্বস্তি নর, স্যাতি, ভয়, প্রিয়ভৃত্য, অবক্ষিদের উদ্যমশীল পৃষ্ঠলোর, ঋত, ঋতকবু- এরা তামস মনুর পুত্র। স্বয়ম্ভর মন্বন্তরে স্বয়ম্ভুব মনুর আদেশে দক্ষ প্রজাপতি প্রথমে উত্তানপাদকে সৃষ্টি করেন। অত্রি ঐ উত্তানপাদকে পুত্র রূপে পান। ইনিই পৃথিবীর রাজা হয়েছিলেন। হে দ্বিজগণ। ধর্মের স্ত্রীর লক্ষ্মীর গর্ভে সুনৃতা নামে বিখ্যাত কন্যা জন্মে। রাজা উত্তম এই ধ্রুব কীর্তিমান, আয়ুষ্মন ও ধনবান ছিলেন। রাজা উত্তানপাদের মনস্বিনী ও স্বরা নামে দুই কন্যা জন্মে, এই দুই কন্যা পবিত্র চরিত্রের ছিলেন।

ত্রেতাযুগের প্রথম দিকে স্বয়ম্ভুব মনুর পৌত্র ধ্রুব অনাহারে কয়েক হাজার বছর তপস্যা করেন। তপস্যায় ব্রহ্মা খুশি হয়ে তাকে পরের প্রলয়কাল পর্যন্ত আকাশে সেখানে উদয় অস্ত কিছুই হয় না সেরকম একটি জ্যোতিষ্কমণ্ডলে সবচেয়ে ভালো জায়গায় স্থান দেন। ধ্রুবের তপস্যার প্রসিদ্ধি আর মাহাত্মের জন্য দৈত্য দানবদের আচার্য শুক্রাচার্য ধ্রুবের শ্রুতিগান করে একটি শ্লোক তৈরি করেন। সাক্ষাৎ ঈশ্বর এই ধ্রুব সপ্তর্ষিদেরকেও পশ্চাদে রেখে তাদের আরো অনেক ওপরে স্বর্গে বাস করতে পারবেন।

ভূমি ধ্রুব থেকে তুষ্টি ও ভব্য নামে দুজন রাজাকে প্রসব করেন। তুষ্টি তাঁর নিজের ছায়াকে বললেন– তুমি একটি নারীরূপ ধারণ কর। তক্ষুনি তার ছায়া সুন্দরী অলংকার পরিহিতা একটি স্ত্রীলোকে পরিণত হল। তুষ্টি ছায়ার গর্ভে পাঁচজন পুণ্যবান পুত্রের জন্ম দেন। এদের মধ্যে একজন হলেন প্রাচীন গর্ভ। এর পুত্র সুবর্চা, দারধী নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। এই উদারধী আগের জন্মেছিলেন ইন্দ্র। উদারধীর পুত্র দিবঞ্জয়। এর রিপু এবং রিপুঞ্জয় নামে দুই পুত্র জন্মায়। রিপুর পত্নী বুহতী গর্ভে বিদ্বান কর্মজ্ঞা পুত্র বিখ্যাত চাক্ষুষ মনু জন্মলাভ করেন। চাক্ষুষ মনুর ঔরসে নড়লরে গর্ভে ঊরু, পুরু ইত্যাদি দশজন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঊরু থেকে আগ্নেয়ীর গর্ভে ওলঙ্গ, অঙ্গিরা, ক্রতু, শিব প্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মায়। অঙ্গিরা পুত্র বেন। বেন রাজার অত্যাচারে রেগে গিয়ে ঋষিরা তার ডানহাত নষ্ট করে দেন। সেই বাহু থেকেই তার পুত্র পৃথুর জন্ম। জন্মেই তিনি প্রদীপ্ত আগুনের মতো শোভা ধারণ করেন। ক্ষত্রিয়দের অগ্রজ পৃথু প্রজা পালন করেছিলেন এবং তিনি রাজসূয় যজ্ঞের প্রবর্তক। মহারাজ পৃথুই প্রজাদের কাজের জন্য গরুরূপ ধারিণী পৃথিবীকে দোহন করলে ধরণী শস্য-শ্যামলা হয়ে ওঠে। পৃথিবীকে দোহন করা হলে পৃথিবী ক্ষীর দান করে। সেই ক্ষীর পান করেই ত্রিলোক প্রতিষ্ঠা হল। ঋষিরা জিজ্ঞাসা করলেন- হে মহামতি! দোহনের কথা বলুন।

পৃথু কিভাবে দেব, নাগ, যক্ষ, অপ্সরা, গন্ধর্বদের দিয়ে বসুধা দোহন করলেন, সেই বৃত্তান্ত এবং সেজন্য ঋষিরা বেন রাজার বাহু মথিত করেছিল–তা আমাদের বলুন। সূত বললেন–এটি এক গোপনীয় আখ্যান আপনারা তা শুনুন। রাজা বেন অত্রির মতো ধর্ম রক্ষাকর্তা ছিলেন। প্রজাপতি অঙ্গ, মৃত্যুর কন্যা সুনীথাকে বিয়ে করেন। তার গর্ভে জন্মায় বেন। তিনি ধর্মকে অবহেলা করে স্বেচ্ছাচারী হয়েছিলেন। তার শাসন সময়ে রাজ্য থেকে বেদের চর্চা লোপ পেয়েছিল। তিনি বলতেন কেউ যাগযজ্ঞ করো না, আহুতি দিওনা। তোমরা আমাকে পূজা করো। আমিই যজ্ঞ আমিই পূজ্য।

মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিরা দুর্বিনয়ী বেনকে বললেন–হে বেন, তুমি কোনো অধর্ম আচরণ কোরো না। তুমি যা করছে তা সনাতন ধর্ম নয়। তুমি প্রাচীনকালে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, প্রজাপালন করবে, কিন্তু তুমিই এখন প্রজাকুলের নিধনের চেষ্টা করছ। ব্রহ্মর্ষিরা তাকে এই কথা বললে, বেন হেসে তাঁদের কথার উত্তর দিলেন–আমি ছাড়া কে আর ধর্মের স্রষ্টা আছে। এ সংসারে বিদ্যায়, তপস্যায়, সত্যে আমার সমান কেউ নেই। আমি মহাত্মা, আমি কারোর থেকে কম নই। কর্ম আমার থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। আমি ইচ্ছে করলে এই পৃথিবীকে পুড়িয়ে দিতে পারি, আবার জল দিয়ে প্লাবিত করতেও পারি। এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করতে পারি, আবার নাশ করতেও পারি। তখন মহর্ষিরা এই প্রচণ্ড দাম্ভিক, অভিমানী বেনকে বাগে আনতে না পেরে, আগুনের মতো প্রদীপ্ত মহাবাহু বেনকে গ্রহণ করে তার বাহুগাত্র মন্থন করতে লাগলেন। ঋষিরা তার হাত মন্থন করতে থাকলে, বাহু থেকে একটি ছোটখাটো পুরুষ জন্ম নেয়। ঐ পুরুষ ভয় পেয়ে ঋষিদের উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে রইলে, ভয়ার্ত ঐ পুরুষকে দেখে ঋষিরা নিষীদ'–এ শব্দটি উচ্চরণ করলেন। তারপর এই পুরুষটি নিষাদদের বংশকর্তা হয়ে অনেক ধীবর সৃষ্টি করল। পরে ঐ পুরুষ বিন্ধ্যপর্বতে বাস করতে লাগল। মহর্ষিরা রেগে গিয়ে আবার বেনের ডানহাত মন্থন করলেন।

তখন বেনের ডানহাতের তালু থেকে আর এক পুরুষ জন্ম গ্রহণ করলেন। এর নাম পৃথু। এ পুরুষটি প্রজ্জ্বলিত আগুনের মতো শোভা পেতে লাগলেন। ইনি তির-ধনুক হাতে এবং মহা প্রভাবশালী কবচ ধারণ করে আবির্ভূত হলেন। এই মহাপুরুষ আবির্ভাব হলে সবাই খুশি হল। বেনও সৎপুত্র দান করে নরক থেকে পরিত্রাণ পেয়ে স্বর্গলাভ করল। এরপর পৃথুর রাজপদে অভিষেক হল। সবদিকের নদী ও সাগরগুলোর জল দিয়ে তার অভিষেক করা হল। অঙ্গিরা ইত্যাদি অন্যান্য মহাত্মাদের সাথে পিতামহ ব্রহ্মা নরশ্রেষ্ঠ পৃথুর অভিষেক ক্রিয়া সম্পূর্ণ করলেন।

মহারাজ পৃথু দেব ও অঙ্গিরার তনয়দের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে বিপুল পৃথিবীর শ্রী সম্পন্ন রাজা হলেন। পিতা বেন যে সব প্রজাদের উৎপীড়ন করেছিলেন, পুত্র পৃথু তাদের পালন করে, প্রজা অনুরাগী রাজা আখ্যা পেলেন আর পালন গুণে সমুদ্রের জলে পরিণত হল। পাহাড়গুলো উচ্চশৃঙ্গ হল। পৃথিবী প্রচুর শস্য দান করল। এ সময় পিতামহ ব্রহ্মা একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। সূতী থেকে উৎপন্ন হয়। ঐ যজ্ঞে সামগায়ক এক হোতা অন্যমনস্ক হয়ে, ইন্দ্রের হবির সাথে বৃহস্পতির হবি মিশিয়ে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে আহুতি দিলে মাগধ জন্ম নেন। এই ভুলের জন্য পাপ সঞ্চয় হয়েছিল। যজ্ঞের এই বিপরীত আচার এর জন্য এদের জাতি বিচ্যুতি ঘটেছিল। ক্ষত্রিয় থেকে যজ্ঞের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য লাভ করা যায়। সুতরাং ব্রহ্মাণ্য, ধর্ম এদের প্রথম ধর্ম বলে মনে করা হয়ে থাকে। ক্ষাত্রধর্ম দিয়ে জীবন ধারণ করা এদের মধ্যম ধর্ম। ঋষিরা রাজা পৃথুর স্তব করার জন্য এদেরকে আহ্বান করেন এবং বলেন– তোমরা এই রাজার স্তব কর– এই রকম আদেশ দেন। কিন্তু তারা বলল–নিজের নিজের কাজ দিয়ে দেবতা ও ঋষিদের প্রীত করি। তেজস্বী রাজা পৃথুর গুণ, তেজ, যশ এসব কিছুই আমরা জানি না। তাই কেমন করে স্তব করব? ঋষিরা বললেন–মহাবল পৃথুর কাজ ও চরিত্র সাথে মিলিয়ে স্তব কর।

তখন সূত ও মাগধ ঋষিদের কাছে আদেশ পেয়ে স্তব গান করলে, প্রজানাথ পৃথুকে দেখে খুব খুশি হলেন। প্রজাদের ডেকে বললেন– এই রাজা তোমাদের বৃতি দান করবেন। পৃথু তখন প্রজাদের মঙ্গলের জন্য ধনু-বাণ দিয়ে বসুধাকে অত্যাচার করতে থাকেন। পৃথিবীও পৃথুর ভয়ে গোরুর রূপ নিয়ে ছুটতে থাকেন। বেন পুত্র পৃথুর ভয়ে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু জ্বলন্ত আগুনের মত জ্যোতিসম্পন্ন মহাযোগী পৃথুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারই শরণাপন্ন হন। বসুন্ধরা দেবী বললেন– স্ত্রী-বধে অধর্ম হয়। আপনি আমাকে মেরে কিভাবে প্রজাপালন করবেন?

পৃথিবী বললেন–আমাতে সমস্ত লোক প্রতির্ষ্ঠিত রয়েছে। আমার অভাবে প্রজারা বিনাশ হবে। প্রজাদের মঙ্গল চাইলে, আমাকে বিনষ্ট করবেন না। শাস্ত্রকররা স্ত্রীলোকদের অবধ্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আপনি জেনেশুনে ধর্মত্যাগ করবেন না। ধর্মাত্মা রাজা পৃথু পৃথিবীর এইকথা শুনে রাগ কমিয়ে বললেন–অনেক লোকের মঙ্গলের জন্য একজনকে বধ করলে কোনো পাপ হয়না। তাই হে বসুন্ধরা, আমি প্রজা রক্ষার জন্য তোমাকে বধ করতে চাইছি। তুমি আমার কথার অনাদর করলে আমি তোমায় বধ করে, নিজের শরীর বিস্তার করে প্রজাদের ধারণ করব। তুমি আদেশ পালন কর। শাসন গ্রহণ কর, জীবন দান কর প্রজাদের, তুমি আমার কন্যাত্ব গ্রহণ কর। ধর্ম রক্ষার জন্য তোমায় বর দিলাম।

পৃথুর একথা শুনে পৃথিবী বললেন–হে রাজন, আমি আপনার এই নির্দেশ পালন করব, কিন্তু। আমার দোহনের জন্য একটি বাছুর দান করুন। যাকে দেখে আমার বাৎসল্য ভাব জাগে এবং অমৃত দান করতে পারি। আর আমার এই অসমান ভূমি শরীরকে এভাবে সমান করে দিন, যাতে সব জায়গায় সমান ভাবে সবাই ক্ষীর পেতে পারে।

রাজা পৃথু তখন সমস্ত জায়গা থেকে পাথর উঠিয়ে ফেললেন। কারণ আগের মন্বন্তরের শিলাগুলো অসমান ভাবে বেড়ে উঠেছিল। এইজন্য গ্রামগুলোর ভাগ, শস্য ও গোরক্ষা বণিকপথ কিছুই ছিল না। চাক্ষুষ মন্বন্তরে এরকম অবস্থা ছিল। তারপর বৈবস্তত মন্বন্তরে ঐ সবের সুব্যবস্থা হল। প্রজারা তখন ফল-মূল খেয়ে কোনোরকমে জীবনধারণ করত। তারপর বেনপুত্র পৃথুর রাজত্বে ত্রিলোক সবরকম বস্তুতে ভরে গেল। যে সময় প্রজারা অতিকষ্টে জীবনযাপন করত, সেসময় রাজা পৃথুকে চাক্ষুষ মুনিকে বৎস কল্পনা করে নিজের হাতে পৃথিবীর শস্য সমূহ দোহন করেন।

এই দোহনে শস্যগুলো হল দুধ, পৃথু রাজা দোহনকারী, বৎস-চাক্ষুষ মনুর দোহন পাত্র হল ভূমিতল। ঋষিরা বলেন, পরে আবার বসুন্ধরা পৃথিবীকে দোহন করতে। সেখানে দোহনকারী বৃহস্পতি। বৎস হল সোম, গায়ত্রী আদিপাত্র এবং সনাতন ব্রহ্মপ হল দুধ। এরপরে দেবতারা সোনার পাত্রে ধরিত্রীদেবীর যে সুধা দোহন করেন সেই সুধতন তাদের বৃত্তি হয়েছিল। এরপর নাগগণ পৃথিবীকে দোহন করে। এখানে বাসুকি দেহানকারী, ক্ষীর হল বিষ। এই বিষ দিয়েই সমস্ত সাপদের বৃত্তি নির্দিষ্ট হয়। এই বিষের প্রভাবে এরা বলশালী হয়ে ওঠে। বিষই এদের আশ্রয়।

পুণ্যবান যক্ষেরাও পৃথিবীকে দোহন করে। তারপর রাক্ষস, পিশাচেরও বসুমতাঁকে দোহন করে, এখানে দেহানকারী কুবেরক। বৎস বল বলবান রাক্ষস সুমালী আর দোহনের ফলে বেরিয়ে আসে রুধির বা রক্ত। রাক্ষসরা এই রক্ত দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। পিতারাও ধরিত্রীকে দোহন করেন, দোহনকারী অর্যমা, যম-বৎস্য, সুধা-অমৃত এই সুধা দিয়েই পিতাদের তৃপ্তিসাধন হয়ে থাকে। গন্ধর্বরাও পদ্মপাত্রে বসুমতাঁকে দোহন করে থাকে। এখানে দোহনকারী গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু, দোহন কাজে বৎস-চিত্ররথ। পবিত্রগন্ধ নিবহ ক্ষীর স্বরূপ।

এরপর হিমবানকে বৎস কল্পনা করে শৈলরাজিও মহীকে দোহন করেন। সুমেরু পর্বত দোহনকারী নাগ ঔষধি ও রত্ন হচ্ছে ক্ষীর। এরপর শোনা যায় বৃক্ষরাও পলাশপাত্রে ধরিত্রীকে

দোহন করেছিল। এইভাবে যশস্বিনী পৃথিবীকে দোহন করে প্রজাদের পালন করেছিলেন। এজন্য নাম হয়েছে। বসুন্ধরা।

.

চৌষট্টিতম অধ্যায়

সূত বললেনসাগরগামিনী এই ধরিত্রী দেবী প্রাচীনকালে মধু ও কৈটভের মেদে পরিপ্লতা হয়ে মেদিনী নামে খ্যাতি লাভ করেন। ধীমান রাজা পৃথুর কন্যারূপে এই মেদিনী আবার পৃথিবী নামে অভিহিতা।

এইভাবে পৃথু সমস্ত প্রাণীর নমস্য ও পূজ্য হয়েছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভে ইচ্ছুক যোদ্ধারাও তার নাম। করে যুদ্ধযাত্রা করতেন। যে যোদ্ধা রাজা পৃথুর নাম নিয়ে যুদ্ধে যায় সে ঘোর যুদ্ধে জয়লাভ করে। আমি আপনাদের পৃথিবী দোহন ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ বৎস দোহনকারী এবং পাত্র সব কিছুকেই নিয়ে বললাম। অন্য দোহন ক্রিয়ার কথা এবার শুনুন।

অতীতকালে প্রথমে মহাত্মা ব্রহ্মা বুকে বস করে এই বসুধাতলে বীজগুলো দোহন করেন, তারপর স্বয়ম্ভুর মন্বন্তরে অগ্নীধ ধরিত্রীকে দোহন করেন। এই দোহনে বৎস ছিলেন স্বয়ং স্বয়ম্ভুব মনু। তারপর স্বরোচিষ মন্বন্তরে ধীমান চৈত্র আবার মনুকে বৎস কল্প করে পৃথিবীর শস্য দোহন করে। উত্তম মন্বন্তরে উত্তম মনুকে বৎস কল্পনা করে পৃথিবী থেকে সবরকম শস্য দোহন করেন। ঐ দোহনে তামস মনু বৎস হয়েছিলেন। এই তামস মনুর একটি অন্তর মনু আছে, তার নাম চারিষ্ণব। এই যে অতীত যুগের দেবতা, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের দিয়ে পৃথিবী দেহানের কথা বলা হল। অতীত অনাগত সব মন্বন্তরের এমন হয় জানবেন।

এবার মন্বন্তরের দেবতা ও প্রজাদের কথা শুনুন। পৃথুর দুই পুত্র জন্মায়। অন্তর্ধী ও পালী তাদের নাম। এদের মধ্যে প্রাচীন বহি একজন শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি ছিলেন। ইনি বল, বেদবিদ্যা, ও তপস্যায় পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট। এই প্রভু প্রজাপতি সমুদ্র কন্যা সবর্ণাকে বিয়ে করেন। তাদের দশপুত্র হয়। এরা ধনুর্বেদে পারদর্শী ছিলেন। এরা সমুদ্রের জলে পড়ে একই ধর্ম আশ্রয় করে অযুত বছর ধরে মহা তপস্যা করেন। বিশাল বিশাল গাছেরা পৃথিবীকে ঘিরে ফেলে। ফলে বাতাস আর বইতে পারল না। প্রজারা দশ হাজার বছর নিশ্চেষ্ট করে বসে থাকল। তখন সাগরকন্যা ও বহির দশজন পুত্র রেগে গিয়ে মুখ থেকে বাতাস ও আগুন উদ্গার করতে লাগল। গাছগুলি পুড়ে গিয়ে পৃথিবী গাছহীন হল।

কিছু গাছ বেঁচে আছে দেখে রাজা সোম বলেন–হে সমুদ্র পুত্রগণ, আপনার রাগ ত্যাগ করুন। এই কন্যারত্নটি দেখছেন, একে আমি বড় করেছি। এই বৃক্ষ কন্যাকে আপনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করুন। কন্যাটির নাম মারিয়া। এর গর্ভে আপনাদের অর্ধেক ও আমার অর্ধেক তেজ নিয়ে বিদ্বান প্রজাপতি দক্ষ জন্মাবেন। তিনি তেজ ও অগ্নি দিয়ে পৃথিবীর প্রজাদের পালন করবেন।

এরপর সোমের কথায় প্রচেতারা গাছদের ওপর রাগ ত্যাগ করে মারিয়াকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন। ঐ দশ প্রচেতা বা সমুদ্রতান বলে মনের মারিয়ার গর্ভ সঞ্চার করলে মহাতেজা দক্ষের জন্ম হয়। তিনি তার মন দ্বারা প্রজা সৃষ্টি করতে লাগলেন। তিনি মন দিয়ে বর, আর দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সৃষ্টি করে অনেক স্ত্রী সৃষ্টি করলেন। দক্ষ তারপর এই সব স্ত্রীজাতির মধ্য থেকে ধর্মকে দশ, কশ্যপকে তেরো ও চাঁদকে নক্ষত্ররূপিণী সতেরো কন্যা দান করলেন। এরপর অরিষ্ঠনেমীকে চার, বাহু পুত্র দুই কন্যা দিলেন।.

এরপর অঙ্গিরাকে দুই এবং কৃশাস্বকে এক কন্যা দান করলেন। এবার এদের বংশধরদের কথা শুনুন। ষষ্ঠ চাক্ষুষ মনুর কাল শেষ হলে সপ্তম প্রজাপতি বৈবস্বত মনুর শাসন সময়ে ঐসব কন্যার, দেবতা, পাখী সাপ, দৈত্যদানব, গন্ধর্ব, অপ্সরা ও অন্যান্য অনেক জাতীয় সন্তান উৎপন্ন হয়। প্রাচীনকালে দর্শন অথবা চিন্তা থেকেই সৃষ্টি হত। ঋষিরা জিজ্ঞাসা করলেন-হে বাগ্মীপ্রবর, দেব, দানব, দেবর্ষি এবং মহাত্মা প্রজাপতি দক্ষের শুভ জন্ম বৃত্তান্ত আপনি আগেই বলেছেন। কিন্তু হে সূত! কি জন্য প্রজাপতি আবার প্রচেতাদের পুত্ররূপে পেলেন ও সোমের দৌহিত্র হয়ে দক্ষ কিভাবে আবার তাঁর শ্বশুর হলেন– এ বিষয়ে আমাদের সংশয় দূর করুন।

সূত উত্তর করলেনউৎপত্তি ও নির্বোধ প্রাণীদের নিত্যধর্ম। ঋষিজনেরাও এই নিয়মে চলেন। প্রাণীদের মধ্যে দেখা কনিষ্ঠ বিচার ছিল তা একমাত্র তপস্যা ছিল শ্রেষ্ঠ এবং তপস্যাই জন্মের কারণ। চাক্ষুষ মন্বন্তরে এই চরাচর প্রজা সৃষ্টি যিনি জানেন, তিনি সম্পূর্ণ আয়ুলাভ করে স্বর্গে যান।

.

পঁয়ষট্টিতম অধ্যায়

সূত বললেন–এখন মহাত্মা বৈবস্বত মনুর অধিকার চলছে। আমি সংক্ষেপে, এদের যথাযথ বর্ণনা করছি। হে ঋষিরা। সপ্তম বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে দধীচিপুত্র কশ্যপ থেকে দেবতারা জন্ম নিলেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বদেব, মরুত, ভৃগু এবং অঙ্গিরা এই হল

আট দেবতা। এদের মধ্যে কাশ্যপ পুত্র হল আদিত্য, মরুত ও রুদ্র। সাধ্য, বসু ও বিশ্বদেব এরা ধর্মপুত্র অত্রেয়। ভৃগু থেকে ভার্গব ও অঙ্গিরা থেকে অঙ্গিরা সের জন্মেছেন। বৈবস্বত মন্তন্তরে এই সব দেবতা ছন্দোগ বলে অভিহিত। এরা প্রলয়কাল পর্যন্ত থাকেন, এই সব দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র তেজস্বী মহাবল। সব মন্বন্তরেই এই ইন্দ্ররা রয়েছেন।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও সাম্প্রতিক কালভেদে ইন্দ্রেরা আলাদা আলাদা। শত শত গুণাধিক শত মেধা সম্পন্ন। এবার ভূত, ভবিষ্যত ও সাম্প্রতিক কালের প্রভুদের কথা বলছি শুনুন। দ্বিজগণ বলেন, ভুঃ, ভুব, স্বঃ এই তিনলোক। তারা ভূমিকে ভূর্লোক, অন্তরীক্ষকে ভূব এবং আকাশকে ভব্য স্বলোক বলেন। এসব কাল ও লোকেদের সাধন বলছি শুনুন।

পূর্বকালে ব্রহ্মা ধ্যান করতে করতে প্রথমে ভূঃ এই শব্দটি উচ্চারণ করেন। তখন ভূর্লোক উদ্ভব হয়। ভূ ধাতুর অর্থ সত্য বা বিদ্যমানতা। এই লোক দর্শনীয় ও ভূ-তত্ত্ব এতে রয়েছে। এটি প্রথমে উৎপন্ন হয় বলে একে প্রথম লোকও বলা হয়। তারপর ব্রহ্মা দ্বিতীয় বারে ভূবঃ –এই শব্দটি উচ্চারণ করেন। এই শব্দটি থেকে এসেছে ভূবলোক। এজন্য অন্তরীক্ষকে দ্বিতীয় লোক বলে। এবার ব্রহ্মা ভব্য শব্দটি উচ্চারণ করেন। এজন্য ভব্যলোক উৎপন্ন হল। এই লোককে স্বর্গলোক বলে। ভূমিই ভূর্লোক, অন্তরীক্ষ ভূব আর আকাশ স্বলোক– এই হল ত্রিলোক।

ইন্দ্র এই তিনলোক পালন করেন। দ্বিজেরা তাকে নাথ বলে। প্রতি মন্বন্তরের ইন্দ্রেরা নিজগুণে প্রধান হয়ে যজ্ঞভোজী হন। দেবতারা এবং নিখিল গন্ধর্ব রাক্ষস, পিশাচ, উরগ ও দানবদের উপর যে প্রভুত্ব করে থাকেন, এটিই ঐ দেবেন্দ্রদের মহিমা। দেবতারাই সকল প্রজাদের রক্ষক। এই হল সংক্ষেপে ইন্দ্রের, লক্ষণ। এবার যে সপ্তর্ষিরা স্বর্গে রয়েছেন তাদের কথা বলছি।

কুলিক বংশের থেকে গধিপুত্র মহাতপা বিশ্বামিত্র, ভৃগুকুলের উরুপ্তর জমদাগ্নি, বৃহস্পতিপুত্র ভরদ্বাজ, উতথ্যপুত্র শারস্বত, ধার্মিক গৌতম পঞ্চম স্বম্ভর পুত্র ভগবান অত্রি এবং ষষ্ঠ লোক বিশ্রুত বশিষ্ঠপুত্র বসুমান ও কশ্যপ তন্দক বৎসরে বর্তমান মন্বন্তরে এই সাধুসম্মত সাতজন সিদ্ধ সপ্তর্ষি বৈবস্বত মনুর নজন পুত্র সপ্তম মন্বন্তরীয় রাজাদের বিষয় আপনাদের বললাম।

.

ছেষট্টিতম অধ্যায়

দ্বিতীয় পদের বিবরণ শুনে শংসপায়ন মুনি আবার সূতকে বললেন–হে সূত আপনার কাছে অনুষঙ্গ নামে দ্বিতীয় পাদ শুনলাম। এবার উপোদ ঘতে নামে তৃতীয় পাদ বলুন। সূত বললেন–হে দ্বিজগণ! তৃতীয় পদের কথা বলছি। প্রথমতঃ বর্তমান মহাত্মা বৈবস্বত মনুর চরিত কথা আপনারা শুনুন। চাক্ষুষ মন্বন্তর শেষ হলে বৈবস্বত মন্বন্তর শুরু হয়। এই মন্বন্তর দক্ষ ও মহাত্মা মহাতেজা ভৃগু প্রভৃতি মহাবেদবিদদের অভিশাপে মহেশ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। সেই সপ্তর্ষিরা স্বয়ম্ভব সাত মানসপুত্র রূপে জন্মেছেন। সেই মহাত্মারাই আগের নিয়মনুযায়ী নতুন প্রজাদের সৃষ্টি করেছিলেন।

এই সমস্ত মহাত্মাদের বংশধরেরা গ্রহ নক্ষত্র ঘেরা চরাচর জগতে রয়েছেন। মহাব্রতধারী নৈমিষারণ্যের মুনিরা একথা শুনে সংশয় মনে সূতকে জিজ্ঞেস করলেন, আগের সপ্তর্ষিরা কিভাবে আর জন্মে স্বয়ম্ভব পুত্রত্ব লাভ করলেন, আমাদের কাছে তা বলুন। তখন পৌর নিকোত্তম সূত বললেন– এরা স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরে সতীর জন্য ভবদেব দ্বারা, অভিশাপ পেয়েছিলেন। সেজন্য প্রলয়কালে জনতোক থেকে তপস্যালোকে যেতে না পেরে পরম্পরা মিলে এই ঠিক করলেন- আমরা চাক্ষুষ মন্বন্তরে পিতামহের সন্তান হয়ে জন্মালে আমাদের মঙ্গল হবে।

অভিশপ্ত মহর্ষিরা জনলোক থেকে আবার ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হলেন। ব্রহ্মার হোমের আগুনের মধ্যে থেকে এই সন্তানের আবির্ভাব হল–এরা হল ভৃগু, অঙ্গিরা মরীচি, পুলস্ত, পুলহ, কুতু, অত্রি, বশিষ্ঠ। সেই যজ্ঞকালে সাম এবং অথর্ব–সমস্তই মূর্তিমান হয়ে সেখানে ছিলেন আর ছিলেন দিক বিদিক, ইলাদেবী, দেবকন্যা, দেবপত্নী, দেবমাতা ইত্যাদি রমণীরা। ব্রহ্মা এদের দেখে রেগে গেলেন। আগুনের মধ্যে শুক্র স্থলন হলে, সেই যজ্ঞের আগুন থেকে ভৃগু নামে পুত্র জন্মাল। মহাদেব তাকে দেখে বললেন–আমি পুত্র কামনায় দীক্ষা গ্রহণ করেছি, এই পুত্র আমার হোক। ব্রহ্মা অনুমোদন করলে মহাদেব তাকে পুত্রত্বে কল্পনা করলেন।

ব্রহ্মা দ্বিতীয় বার শুক্র দিয়ে অঙ্গার-এর মধ্যে আহুতি দিলেন। তার মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন অঙ্গিরার আবির্ভাব হল। অগ্নি তখন ব্রহ্মাকে বললেন– এ পুত্র আমার হোক, ব্রহ্মা তাই অনুমোদন করলেন। এর পর ব্রহ্মা আগুনে শুক্র হোম করলে তা থেকে ছজন ব্রাহ্মণ জন্মাল। কিরণ থেকে সমুৎপন্ন বলে মরীচি অন্য পুত্ররা ক্রতু, অত্রি, শানিত অস্ত্রের মতো চুল বলে পুরস্থ্য অন্য ছেলের চুল লম্বা বলে পুলহ, বসু অর্থাৎ আগুন থেকে উৎপন্ন তেজস্বীপুত্র বশিষ্ঠ। এরাই লোক সৃষ্টি করেন এদের দ্বারাই প্রজারা বিস্তারলাভ করেছে, তাই এরা প্রজাপতি।

এঁরাই আবার পিতৃগণ নামে সাত ঋষিকে উৎপাদন করেন। মারীচ, ভার্গব, অঙ্গিরা পৌলস্ত্য, পৌলহ, বশিষ্ঠ আত্রেয় এই সাত রকম পিতৃলোক বিখ্যাত। অন্য প্রজাপতিরা হলেন– কর্ম, কাশ্যপ, শেষ, বিক্রান্ত, সুশ্রবা বহুপুত্র কুমার, বিবস্বান, সূচিবা, প্রচেতসা, অরিষ্ঠনেমী ইত্যাদি অনেক প্রজাপতি ছিলেন। কুশসরগ্রহী বালখিল্যেরা পরমাধি পদলাভ করেন। স্বর্গগামী প্রজাপতিরা সার্বভৌম হয়েছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন বৈখানদ মুনিরা উড়ন্ত সর্পভস্ম থেকে প্রাদুর্ভূত হল। ব্রহ্মার কান থেকে রূপবান দুই অশ্বিনীকুমার এবং প্রধান প্রধান আরো কয়েকজন প্রজাপতি জন্ম নিয়েছিলেন। রোমকূপের স্বেদ বা ঘাম থেকেও অনেক ঋষির জন্ম হয়েছিল। ব্রহ্মার সেই দ্যুতি থেকে রুদ্র ও আদিত্যের জন্ম। বেদ এবং উৎপাদনে ব্রহ্মা এই সৃষ্টির মূল স্বরূপ।

মারীচ প্রভৃতি মহর্ষিরা মিলে সৃষ্টি কামনায় সেই সুরশ্রেষ্ঠের কাছে গিয়ে তাকে বললেন– আপনার প্রসাদে এই লোক সাধারণ প্রজাদের সৃষ্টি করে সাধনে ইচ্ছুক হয়েছেন। বেদবিদ ও রাজর্ষিরা সবাই দ্বন্দ্ব ভাবের পক্ষপাতী, যাতে এরা দ্বন্দ্বভাব নিয়ে প্রজা সৃষ্টি করতে পারে তার জন্য কন্যা দান করা উচিত। এরা সকলেই বেদমন্ত্রজ্ঞান প্রজাপতি গুণমুক্ত। এই সমস্ত মহাত্মারা, দেবতা ও অন্যান্য ঋষিদের সাথে প্রজা সৃষ্টি করবেন। একথা শুনে লোকগুরু বললেন–আমি এই সমস্ত বিবেচনা করেই প্রথমে দেবতাদের সৃষ্টি করেছি। কিন্তু সেই সব দেবতারা প্রজাপতি বংশেই জন্মাবেন। সেসব প্রজাপতিদের মধ্যে ভৃগুর বংশ সবিস্তারে বর্ণনা করছি।

ভৃগুর দুই স্ত্রী–হিরণ্যকশিপুর কন্যা পৌলমী। ভৃগুর পুত্র কাব্য শুক্রনামে খ্যাত। ইনি দেব অসুরদের আচার্য। শুক্রের চার ছেলে, গো নামে পত্নীর গর্ভেও শুক্রের চার ছেলে-স্বণ্ড, অমর্ক, ত্বষ্ঠা ও বরুত্রী–এরা ব্রহ্মার মতেও তেজস্বী বরুত্রীর কয়েকটি পুত্র ছিল। এরা যাগ, পূজা প্রভৃতি ধর্ম লোপ করে মনুর কাছে নিজেদের ইচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলেন। তাই দেখে ইন্দ্র বললেন, মনুকে এদেরই পপশ্য করে আমি তোমাকে দিয়ে যজ্ঞ করাবো। বরাত্রির পুত্ররা একথা শুনে পালিয়ে গেল। ইন্দ্র তাদের অনেক ধনরত্ন দিয়ে বশ করলেন, কিন্তু ইন্দ্রকে বিনাশ করবার জন্য যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হলে, ইন্দ্রই তাদের হত্যা করলেন।

শুক্রাচার্যের দেবসাথী নামে এক কন্যা ছিল। ভৃগু পুত্র ত্বষ্টারও কয়েকটি পুত্র হয়। ভৃগু বংশে বারোজন দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। পৌলমী অন্তসত্ত্বা হলেও আটমাসে ব্যাধি গ্রস্ত হয়ে বিচ্যুত হয়। সেই সন্তান প্রচেতস নামে খ্যাত হয়। এরপর চ্যবনের রাগে দম নামে রাক্ষসের উৎপত্তি হয়েছিল। চ্যবন সুকন্যার গর্ভে আত্মবান ও দধিচীকে উৎপাদন করেন। দধীচি থেকে সরস্বতীর

গর্ভে সারস্বত নামে পুত্র জন্মায়। আত্মবান স্ত্রী রুচির উরুভেদ করে মহাযশস্বী গর্ভে ঋচিক-এর জমদগ্নি নামে ছেলে হয়। জমদগ্নির শতপুত্র হয়। তাদের আবার হাজার হাজার পুত্র। সেই বিপুল ভৃগুবংশের অনেকে অপরাপর মুনিদের আনুগত্যের ফলে সেই সেই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন বৎস, বিশ্ব, অস্বী, যেন পাণ্ড পথ্য ও সৌনক, ভার্গবেরা, এই সাত গোত্র সাতভাগে বিভক্ত।

এবার অগ্নিপুত্র অঙ্গিরার কথা শুনুন। এঁর বংশে ভরদ্বাজ, গৌতম, ইষ্ণুমণ্ড নামে প্রখ্যাত মহাতেজা সচিরা জন্মেছিলেন। অঙ্গিরার অর্থবনের তিন পত্নী, সুরূপা, স্বরাট, পথ্যা। সুরূপার পুত্র বৃহস্পতি। স্বরাটও চার পুত্রের জন্ম দেন। পথ্যার গর্ভজ পুত্র বিষ্ণু। আর মানসপুত্র সংবর্ত ও বিচিত্ত।

বৃহস্পতির লোক বিখ্যাত পুত্র ভরদ্বাজ। ঔদর্য্য, আয়ু, দনু, দর্ভ, প্রাম, হরিপ্যান, হবিষ্ণু, ক্রতু ও সত্য এই দশজন অঙ্গিরা বংশীয় দেবতা। অঙ্গিরা বংশ অনেক বিস্তৃত।

এবার মরীচির উত্তমবংশ বিবরণ বলছি। এ বংশেই স্থাবর জঙ্গম জগত উৎপন্ন হয়। মরীচি প্রজা কামনায় চিন্তিত হয়ে জলকে কামনা করেন। তাঁর ধ্যানের মধ্যে জল তাঁর কাছে এলে তিনি জলমধ্যে বসে থেকে পুত্রহীনের গতি নেই–এই কথা চিন্তা করতে করতে ধ্যান বশতঃ তেজসম্পন্ন অরিষ্টনেমি নামে এক ছেলের জন্ম দেন। ইনি একজন প্রজাপতি। এর নামই কশ্যপ, কশ্যপ সূর্যের পিতা মরিচী সাত হাজার বছর জলমধ্যে থেকে সেই কথা ভেবেছিলেন। সেজন্য তার উৎপন্ন পুত্র জগতে অনুপম ব্রহ্মসম হন। কশ্যপ সূর্যের মতো প্রভাবশালী। সব মন্বন্তরেই ইনি ব্রহ্মার অংশে প্রাদুর্ভূত হন। জলের অন্য নাম কশ্য। কশ্যপানের জন্য তিনি কশ্যপ নামে বিখ্যাত হন। তিনি দক্ষের কাছে কন্যার জন্য তিরস্কৃত হয়ে রেগে গিয়ে ক্রুর বাক্য বলেন। সেই থেকে তিনি কশ্যপ নামে বিখ্যাত হন। ব্রহ্ম দক্ষকে আদেশ করলে দক্ষ তার কয়েকটি কন্যা কশ্যপকে সম্প্রদান করেন। তারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানবতী এবং লোকেদের মাতৃরূপিণী।

এই সব বৃত্তান্ত যিনি শোনেন তিনি পুণ্যবান, আয়ুস্মান, পাপ থেকে মুক্তি লাভ করেন। এর পর মুনিরা চাক্ষুষ মন্বন্তর শেষ হলে, বৈবস্বত মন্বন্তর কিভাবে শুরু হল সেই বিষয়ে রোমহর্ষণকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন। সূত উত্তরে বললেন– বৈবস্বত মন্বন্তরে ব্রহ্মা দক্ষকে 'প্রজা সৃষ্টি কর'– এমন আদেশ করলে দক্ষ স্থাবর, জঙ্গম নানা রকম প্রজা সৃষ্টি করলেন, দক্ষ প্রজাপতি, জরায়ুজ, অন্তজ স্বেদজ, উদ্ভিজ চার রকম প্রজা সৃষ্টি করতে শুরু করেন, প্রজাপতি দক্ষ দশ

হাজার বছর তপস্যা করে, যোগ সামর্থ্য দিয়ে আত্মাকে ভাগ করে মানুষ, উরগ, রাক্ষস দেব, অসুর, গন্ধর্ব ইত্যাদি ঐশ্বর্যশালী তেজরূপ নিজের মতো সন্তান উৎপাদন করেন।

তিনি মনে মনে কল্পনা করেই প্রজা সৃষ্টি করেন। তাঁর সৃষ্ট ঋষি, দেবতা, মানুষ, উরগ, রাক্ষস, পশু, পাখি ইত্যাদি আশানুরূপ বৃদ্ধি পেল না। তখন অসীক্লীকে পতীত্বে বরণ করলেন। অসীক্লীর তপস্যার ফলেই এই স্থাবর জঙ্গম জগত সৃষ্টি হয়েছে। হীরন কন্যা অসীক্লীর গর্ভে দক্ষের হাজার পুত্রের জন্ম হয়। ব্রহ্ম নন্দন, বিবাদ প্রিয় নারদ সেই পুত্রদের কুপরামর্শ দিতে লাগলেন, যাতে তারা অভিশাপ পেয়ে বিনষ্ট হয়। নারদ কশ্যপ প্রজাপতির মানস সন্তান। তিনি দক্ষ প্রজাপতির সন্তানদের সংসার বিরোধী উপদেশ দিয়ে বিনাশ করেন। দক্ষ প্রজাপতি নারদকে বিনাশের জন্য প্রস্তুত হলে, ব্রহ্ম তখন বললেন– আপনার কন্যার গর্ভে আমার সন্তানরূপে নারদ জন্মাবেন। তখন দক্ষ তাকে একটি কন্যা দান করেন। সেই কন্যার গর্ভে নারদ তখন শান্তমুনি রূপে উদ্ভূত হলেন।

একথা শুনে মুনিরা কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করলেনহে সূত! নারদ কিভাবে দক্ষ প্রজাপতির ছেলেদের বিনাশ করেন? সূত মুনিদের এই প্রশ্ন শুনে মধুর বাক্যে বললেন–দক্ষের পুত্রগণ প্রজাবৃদ্ধির জন্য মিলিত হলে, নারদ তাদের বললেন–তোমরা ভীষণ নির্বোধ, পৃথিবীর মর্ম তোমরা কিছু মাত্র জানো না। মেদিনীর ঊর্দ্ধঃ, অধঃ অন্ত প্রমাণ না জেনে কিভাবে প্রজা সৃষ্টি করতে চাইছ? এভাবে প্রজা সৃষ্টি করলে, তোমরা দোষী হবে। তারা নারদের এইরকম উপদেশ শুনে বিভ্রান্ত হয়ে নানাদিকে চলে গেল। বায়ব বশীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ভ্রমণ করতে লাগল। এইভাবে দক্ষের আত্মজদের বিনাশ ঘটলে, অসীক্লী আবার হাজার পুত্র উৎপাদন করেন। সেই দক্ষ তনয়রা শবর্নাস্ব নামে পরিচিত। এবার তারাও যখন প্রজা সৃজনে সচেষ্ট হলেন, তখন আগের মত নারদ তাদের কুপরামর্শ দিয়ে ভিন্ন বুদ্ধি করলেন। তারা তখন ভালোই হয়েছে ভাবল, আগে ভাইদের খুঁজে বার করা উচিত।

আমরা পৃথিবীর পরিমাণাদি জেনে তবেই প্রজা সৃষ্টি করব। এই ভেবে সবলাশ্বেরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেই থেকেই ভাই-এর অন্বেষণে গেলে আর ফেরে না। আজ পর্যন্ত তারা ফেরেনি। স্ববলা স্বর বিনষ্ট হয়ে গেলে প্রভু দক্ষ রেগে গিয়ে নারদকে অভিশাপ দিলেন– তুমি বিনষ্ট হয়ে, গর্ভবাস কর। পরে দক্ষ আবার ষাট জন কন্যা উৎপাদন করেন। প্রভু কশ্যপ, ধর্ম, ভগবান সেমে এবং অন্য মহর্ষিরা সেই দক্ষ কন্যাদের পত্নীরূপে বরণ করেন।

.

সাতষট্টিতম অধ্যায়

ঋষিরা বললেন–হে সূত! এবার বৈবস্বত মন্বন্তরীয় দেব, দানব ও দৈত্যদের উৎপত্তি বিবরণ বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করুন। সূত বললেন–প্রথমতঃ ধর্মের সভা বর্ণনা করছি। দক্ষ প্রজাপতি ধর্মকে অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুন্ধুতী, সঙ্কল্প, মুহুর্তাস, সাধ্যা ও বিশ্বা নামে এই দশ কন্যা সম্প্রদান করেন। ধর্মের এই দশ পত্নীর মধ্যে সাধ্যা থেকে বারোজন সাধ্য নামে দেবতা জন্মে। এরা অন্য দেবতাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। প্রজাকামী ব্রহ্মা, বৈবস্বত মন্বন্তরের মুখ থেকে জয় নামে দেবতাদের সৃষ্টি করেন। বারোজন জয় দেবতা ব্রহ্মশাপ বশে এরা স্বয়ম্ভুর মন্বন্তরে অজিত নামে, স্বরোচিষ মন্বন্তরে তুষিত নামে এবং উত্তম মন্বন্তরে সত্য নামে উদ্ভূত হন। ধর্মনন্দন বারোজন সাধ্যদের প্রখ্যাত হন। স্বারোচিষ মন্বন্তরে শেষভাগে তুষিত বলে দেবতারা সকলে মিলে কর্তব্য ঠিক করলেন, আমরা মহাভাগ সাধ্যর? ধর্ম থেকে প্রাদুর্ভূত হব। ধর্মের বারোজন সন্তানরূপে চাক্ষুস মন্বন্তরে প্রাদুর্ভূত হলেন। স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত দেবতাদের বিপশ্চিত নামে ইন্দ্র এবং সত্য নাচেবিষত, তখন নর-নারায়ণ নামে বিখ্যাত হন। সেই তুষিত দেবতারা সাধ্বত্বঃ লাভ করে মনঃ, অনুমন্তা, প্রাণনর, যান, চিত্তি, হয়, নয়, হংস, নারায়ণ প্রভব ও বিভূ নামে প্রখ্যাত হন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুষিত দেবতারা হলেন- প্রাণ, অপান, সমান, ইজাল, চক্ষু ইত্যাদি। ধর্মপত্নী বসুর গর্ভে অষ্টবসুর জন্ম। ধর, ধ্রুব, যৌন, আপ, অনল, অনিল, প্রত্যুষ ও প্রভাস –এরা হলেন অষ্টবসু। ধরের পুত্র দ্রাবিন ও হতহ ব্যবহ ধ্রুবের পুত্র এবং, ভাল নামে প্রখ্যাত। সোমের ছেলে বর্বা এবং গ্রহ প্রধান বুধ। আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, সম ও শান্ত। অনলের পুত্র হলেন কুমার স্কন্দ ও সনৎ কুমার দুজনেই অনলের তেজঃ পুঞ্জজাত। অনিলের স্ত্রীর নাম শিবা, এর দুইপুত্র। প্রত্যুষের পুত্র দেবল ঋষি। এর ক্ষমাবলে ঔমনস্বী নামে দুই পুত্র জন্মে। বৃহস্পতির বোন যোগস্নিগ্ধা ছিলেন। তিনি অষ্টম বসু প্রভাসের পত্নী হন। এর পুত্র বিশ্বকর্মা, তিনি দেবতাদের শিল্প কর্তা। সবরকম শিল্প ও ভূষণগুলির নির্মাতা।

বিশ্বার গর্ভে, ধর্মের দশপুত্র জন্মায়। এবার মুহূর্ত আর তিথিদের নামের উল্লেখ করে বিবরণ বলছি। রবির গতি তারতম্যের ফলে নানা ঋতুর প্রাদুর্ভাব হয়। সেই সমস্ত ঋতুতে অহোরাত্রের মত ছয়শো ভেদ আছে। এতে নানা মুহূর্ত আছে। বেদবিদেরা সেইসবে মুহূর্তের তারতম্য অনুসারে নানা তিথি নক্ষত্রের কল্পনা করে থাকেন। তিথিগুলির ভেদ অনুসারে বিভিন্ন ভাগে পিতৃদান প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। কতকগুলি দিন-মুহূর্ত আছে যেগুলি সূর্যের দ্বারা নির্মিত। আরো পনেরোটি মুহূর্ত আছে– ব্রহ্ম, সৌম্য, আদিত্য ইত্যাদি, এরা দণ্ড, প্রহর প্রভৃতির বোধ ও কালের অবস্থা বিশেষের পরিচায়ক। এদেরও দেবতা সমস্ত গ্রহেরই উত্তর ও মধ্য এই তিনটে জায়গা নির্দিষ্ট আছে। মধ্যস্থান জারদগব, উত্তর স্থান ঐরাবত এবং দক্ষিণস্থান

বৈস্বানর নামে প্রসিদ্ধ। অশ্বিনী, ভরনী ও কৃত্তিকা এই তিনটি নাগবীথি পুষ্যা, অশ্লেষা, পুনর্বসু—তিনটি ঐরাবতী বীথি।

জেষ্ঠা, বিশাখা ও অনুরাধা এরা জারদগবী বীথি, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী এরা বৈশ্বনরী বীথি। দক্ষ তাঁর সতেরোজন কন্যাকে চাঁদের হস্তে সম্প্রদান করেন। এরা জ্যোতিষ্ক শাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ। বাকি চোদ্দজন কন্যাকে কশ্যপ গ্রহণ করেন। সেই সব লোকমাতা দক্ষ কন্যাদের নাম– অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অরিষ্ঠা, সুরামা, সুরভি, ইরা প্রভৃতি, চরিষ্ণু মন্বন্তরে দেবতারা ঠিক করলেন বৈবস্বত মন্বন্তরে অদিতির পুত্ররূপে জন্ম নেবেন।

এই পরামর্শ করে মরীচির ছেলে কশ্যপের ছেলে হয়ে বারো ভাগে জন্ম নিলেন। শতক্রতু ও বিষ্ণু বৈবস্বত মন্বন্তরে নরনারায়ণ রূপে জন্ম নিলেন। এই সব দেবতাদের ও জন্ম মৃত্যু বিধান আছে। প্রজাপতি বিষ্ণুর ও শিবের আবির্ভাব ও তিরোভাব রয়েছে। বারোজেন আদিত্য হলেন- ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান, পূর্ব পর্জন্য ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। বিষ্ণু সবার ছোট হলেও প্রভাবে বড়। দক্ষ কন্যা সুরভি তপস্যা দিয়ে মহাদেবের অনুগ্রহে কশ্যপ থেকে বরোজন রুদ্র পুত্র । উৎপাদন করেন। সুরভীর দুটি কন্যাও জন্মে– রোহিণী ও গান্ধারী। রোহিণী চারজন কন্যার জন্ম দেন, হংসলীলা নামে কন্যাটি মহিষ ও মানুষ উৎপাদন করে। ভদ্র নামে কন্যার দ্রুতগামী গন্ধর্ব নামে অশ্বেরা জন্মায়। সেই ঘোড়াগুলো ছিল সাদা সবুজ ও হলুদ রঙের। আবার সুরভি থেকে দক্ষ নামে চাঁদের মতো কান্তিবলে নীলকণ্ঠ বৃষ জন্মায়। সুরভির অনুমতিতে মহাদেবের বাহনত্ব লাভ করে, এতক্ষণ কশ্যপ নন্দন রুদ্র, ধর্মনন্দন সাধ্য, বিশ্বদেবদের এবং বসুদেবের উৎপত্তি বর্ণনা করলাম।

অরিষ্টনেমির ছেলেদের ষোলোজন সন্তান হয়। বিদ্বান বহুপুত্রের চারজন সন্তান জন্মে, এরা বিদ্যুৎ নামে প্রসিদ্ধ। দেবর্ষি কৃশাস্ত্রের পুত্ররা দেবপ্রহরণ নামে প্রসিদ্ধ, এরা প্রতি হাজার যুগান্তে আবার জন্ম নেয়।

হে দ্বিজগণ! তেত্রিশ গণে বিভক্ত সমস্ত দেবতাই ছন্দোগজাত। তাদেরও সৃষ্টি প্রলয় দেখা যায়। দেবতাদের যুগে যুগে আবির্ভাব-তিরোভাব হয়ে থাকে। ঋষিরা জিজ্ঞাসা করলেন। সাধ্য, বসু, বিশ্বদেব, রুদ্র ও আদিত্য থেকে বিষ্ণু ও ভবদেবের আভিজাত্য, প্রভাব কতখানি? কে, কোন্ অংশ বিশিষ্ট অথবা প্রধান, সে সব আমরা জানতে চাইছি। সূত বললেন– হে মুনিগণ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের পরস্পর যে তফাৎ, তা আপনাদের বলছি শুনুন। ব্রহ্মার বিভিন্ন সময়ে রাজসী,

তামসী, ঋত্বিকী মূর্তি রয়েছে। এই সব মূর্তির তফাৎ বর্ণনা এরা যায় না। ব্রাহ্ম মূর্তি রাজসী, কালমূর্তি তামসী, এবং স্বাত্বিকী মূর্তি পৌরুষী বলে জানতে হবে।

রাজসী মূর্তি প্রজা সৃজন করেন। স্বাত্বিকী মূর্তি জন্ম থেকে পালন করেন এবং তামসী মূর্তি লয়কালে সমস্ত প্রজাদের গ্রাস করেন। ত্রিলোক-এর সৃষ্টি ও সংহার কাজে রত ব্রহ্মার এক এক রূপে এক এক কাব্যের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। স্বচ্ছ স্ফটিক মণি যেমন আশ্রয় অনুযায়ী নানা রঙ ধারণ করে যেমন লাল, হলদে ইত্যাদি রঙ ও নানা আকার তেমনই ভগবান স্বয়ম্ভব তেমনি গুণভেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র রূপে দেখা দেন। যখন তিনি কালরুপী হন। তখন তার ব্রহ্মমূর্তি থাকে না, যখন পুরুষরূপী হন তখন তার কালমূর্তি থাকে না। রাজসী মূর্তি ব্রহ্মা তা থেকে মরীচি ও মরীচি থেকে কশ্যপের জন্ম হয়, তামসী কালমূর্তি থেকে ভবের উদ্ভব হয়। আর সাত্বিকী পুরুষ মূর্তি থেকে বিষ্ণুর উৎপত্তি।

কালরূপী রুদ্র একমাত্র এই তিনমূর্তি নিয়ে সৃষ্টি পালন ও ধ্বংস করেন। এখানে ব্রহ্মার তিনটি মূর্তির কথা বলা হয়েছে। আর বেদ ও পুরাণ ধর্মশাস্ত্রে স্বয়ম্ভর একটি মূর্তির কথা উল্লেখ আছে, বিজ্ঞানহীন ভিন্নজ্ঞান সম্পন্ন প্রজারা এই নিয়ে বিতর্ক করে।

কেউ ব্রহ্মাকে, কেউ শিবকে, কেউ বিষ্ণুকেই প্রধান বলে নির্বাচন করে থাকে। একই ব্রহ্মা নানা কাজের জন্য নাস দেবতাকার পেয়েছেন। এই সব দেবতাদের এক জনের নিন্দে করলে সকলেরই নিন্দে করা হয়ে থাকে। ঈশ্বরের তত্ত্ব জানার সামর্থ্য কারো নেই। ঈশ্বরই একমাত্র আত্মা। তিনিই তিনমূর্তি গ্রহণ করে প্রজাদের সম্মোহন করছেন। অল্পজ্ঞানী মানুষই একটি প্রধান ও একটি অপ্রধান ইত্যাদি বিভেদ সৃষ্টি করছে।

মূর্তি তিনটির একটি উপাসনা করলে তিনটির উপাসনা করা হয়। সুতরাং এদের এক বা পৃথকের কোনও তফাৎ নেই। আর তারতম্য থাকলেই বা কে জানতে পারে? তিনি প্রজাদের সৃষ্টি করে, পালন করে, আবার ধ্বংস করেন।

পুনর্ভেদে ও কালভেদে তিনি এই কাজ করে থাকেন। তাই এঁকে এক বলা যায়। দ্বিজরা এই একদেবকে, রুদ্র, ব্রহ্মা, লোকপাল, ইন্দ্র, ঋষি, দানব ও নারয়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।

ব্রহ্মমূর্তির অংশে মরীচি এবং মরীচির অংশে কশ্যপ জন্ম গ্রহণ করেন। তামসী মূর্তিতে সংহারকারী রুদ্র প্রাদুর্ভুত হন। আর সাত্ত্বিকী পুরুষ মূর্তির অংশে বিষ্ণু জন্ম নিলেন।

রুদ্রদেব কালরূপে প্রজাদের সংহার সাধন করেন। তিনি কল্পের শেষে সূর্যমূর্তি নিয়ে তিনলোক পুড়িয়ে দেন। বিষ্ণু স্বয়ম্ভুর মন্বন্তরে মন থেকে আকৃতির গর্ভে প্রথম উৎপন্ন হন। স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষি দেবতাদের সাথে জন্ম গ্রহণ করেন। উত্তম মন্বন্তরে তিনি বসবতী, দেবতাদের সাথে জন্ম নিয়ে বসবর্তী নামে প্রসিদ্ধ হন। সেই হরি, সত্যা থেকে জন্মে বিষ্ণু নামে খ্যাত হন। অতীতের ঐসব মন্বন্তরে নানান মূর্তি নিয়ে তিনি প্রজাদের রক্ষা করেছেন।

যে যে দেবতার অংশে যার যার জন্ম হয়, তারা সেই দেবতার তেজ, জ্ঞান, বুদ্ধি ইত্যাদি পেয়ে থাকে। যা যা ঐশ্বর্যশালী, শ্রীমান বা প্রভাববান, সেই সমস্ত বিষ্ণুরই অংশ। তিনি এরকম অংশ অনুসারে জন্ম নিয়ে থাকেন। একমাত্র পরমেশ্বর নিজের প্রভুশক্তি দিয়ে নানা আকারে পরিণত হন এবং আবার এক হয়ে যান।

সেই আদিদেবের তেজ নিয়েই সমস্ত মন্বন্তরে স্থাবর জঙ্গম প্রজাদের একবার প্রথম থেকে লয়কাল পর্যন্ত থাকেন। প্রতি কল্পের অন্তে রুদ্রদেব প্রজাদের ধ্বংস করেন।

পরীক্ষা না করে গ্রহণ, পূর্বশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাস ও লৌকিক প্রবাদ এইসব কারণে জনগণ প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারে না। যিনি মহৎ সমস্ত কাজগুলির কর্তা এবং আভিজাত্যে সর্বপ্রধান, তিনিই ঈশ্বর। শ্লোকে বলা হয়েছে– ঈশ্বর যোগবল প্রভাবে সূর্য তেজের মতো নিজের প্রতিরূপ অন্য শত সহস্র মুর্তির আবির্ভাব ঘটিয়ে সেই সমস্ত মূর্তির সাথে নানা বিষয় ভোগ ও উগ্র তপস্যা করেন, পরে আবার সেই সমস্ত ধ্বংস করেন।

.

আটষট্টিতম অধ্যায়

নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিরা এই সব বৃত্তান্ত শুনে বললেন– হে লোমহর্ষণ, সপ্তম মন্বন্তরে, ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি মহাতেজা আদিত্য দেবতারা কিভাবে জন্মলাভ করিয়াছিলেন? এই বৃত্তান্ত আমাদের বলুন।

সূত বললেন–সব মন্বন্তরে প্রজা সৃষ্টিতে ইচ্ছুক ব্রহ্মার মুখ থেকে মন্ত্রময় শরীর বিশিষ্ট দেবতার সৃষ্ট হয়। দর্শ, পৌর্ণমাস বৃহৎ, রথন্তর, আকূত, আকুতি ইত্যাদি সব সন্তান বা ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি। ব্রহ্মা এঁদের বললেন– তোমরা দেবতা সৃষ্টি কর। স্ত্রী গ্রহণ কর। অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞোনুষ্ঠান শুরু করো। ব্রহ্মা একথা বলে অন্তর্হিত হলেন।

কিন্তু তাঁরা ব্রহ্মার কথায় মন না দিয়ে, মন দিয়ে কর্ম সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। কর্মগুলির ফল দেখে তারা সন্তান উৎপাদনে অবহেলা করেন। অর্থ, ধর্ম, কাম, ত্যাগ করে রক্ষজ্ঞানকে অবলম্বন করে আত্মঃ তেজ সংযত করে রইলেন।

ব্রহ্মা তাদের ওপর রাগ করে বললেন–তোমরা প্রজা সৃষ্টি করবে বলেই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি। অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নয়। বৈরাগ্য অবলম্বন করে নিজেদের জন্ম ব্যর্থ করেছে। তাই তোমরা সাতবার জন্মাবে।

দেবতারা ব্রহ্মার অভিশাপে দুঃখিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে অনুনয় করে বললেন–আমরা অজ্ঞানবশে যা করেছি, আপনি সেই অপরাধ ক্ষমা করুন। ব্রহ্মা তাদের বললেন–জগতে আমার আদেশ ছাড়া কেউই স্বতন্ত্রভাবে চলতে পারে না। আমাকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ কাজ করতে পারে না।

দেবতাদের পাপ দিয়ে তিনি বললেন–হে সুরোত্তমেরা, তোমরা নিজের ইচ্ছেমতই জগতে জন্ম নিয়ে দেবত্ব পাবে। তোমরা অবিদ্যা মোহাচ্ছন্ন হয়ে ছয় মন্বন্তরেই জন্মলাভ করবে।

ব্রহ্মা একটি শ্লোক বললেন, তার অর্থ হল–বেদবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য, সন্তানোৎপাদন, শ্রাদ্ধদান, যজ্ঞানুষ্ঠান এবং দান এই সমস্ত সৎকাজের ফলে তোমরা আবার আমার কাছে আসতে পারবে। আমার সাথে চিরস্থায়ী সিদ্ধিলাভ করবে।

ব্রহ্মা একথা বলে সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। তখন সেই ঐশ্বর্যশালী ও যোগবলযুক্ত জয় নামে দেবতারা যোগ্য মগ্ন হলেন। তাদের শরীরগুলো বিখ্যাত বারোটি হ্রদে পরিণত হল। তারপর তারা সেই বারোজন, স্বয়ম্ভর মন্বন্তরে অজিতার গর্ভে রুচি পুত্র হয়ে জন্ম নিয়ে অজিত নামে বিখ্যাত হন। বিধি, মুনয়, ক্ষেম, নন্দ, অব্যয়, প্রাণ, অপান, সুধামা ঋভু, শক্তি, ধ্রুব ও স্থিতি- এই হল বারোজন দেবতা। এরা সবাই মানস সন্তান। এরা দেবতাদের সাথে যজ্ঞ ভোগী হয়েছিলেন।

তারপর স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিতার গর্ভে স্বারোচিষ-এর পুত্র রূপে তুষিত নামে দেবতারা প্রাদুর্ভূত হন। তারপর উত্তম মন্বন্তরে উত্তম মনুর পুত্র রূপে হরি নামে প্রসিদ্ধ সেই হরি দেবতারা চরিফুর পুত্র রূপে জন্ম নিয়ে বৈকুণ্ঠ নামে বিখ্যাত হন। এই দেবতারা চাক্ষুস মন্বন্তরে সাধ্যা থেকে সাধ্য নামে খ্যাতি গ্রহণ করে দ্বাদশ আদিত্য নামে বিখ্যাত হন। এইভাবে ব্রহ্মার

অভিশাপে জয় দেবতারা সাতটি মন্বন্তরে জন্ম নিয়েছিলেন। এই সাত রকম জন্ম বৃত্তান্ত যে শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করে তাকে কোনো পাপ স্পর্শ করতে পারে না। এটাই দেবতাদের অনুশাসন।

ঋষিরা বললেন–হে সূত! এবার দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, পিশাচ, রাক্ষস সাপ, পশুপাখি, লতা ইত্যাদির উৎপত্তি ও বিনাশ কথা আমাদের কাছে সবিস্তারে বলুন। সূত তখন বললেন– কশ্যপ থেকে দিতির দুই হয়। কশ্যপের সব সন্তানের মধ্যে এই দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ। কশ্যপ একবার অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞের সময় তাঁর এক পুত্র হয়। দিতি গর্ভ থেকে সে একেবারে প্রধান পুরেহিতের উচ্চ আসনে গিয়ে বসেছিল। এইকারণে হিরণ্যকশিপু নামে খ্যাত হন। সূত ব্যাখ্যা করে বললেন– প্রাচীনকালে পুষ্কর ক্ষেত্রে কশ্যপ প্রজাপতির অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু হয়। সেই যজ্ঞে, ঋষি, দেবতারা ইত্যাদিরা এসেছিলেন। তখন বিধান অনুসারে পাঁচটি সোনার সিংহাসন, তিনটে কুর্চ ও কলস কল্পিত হয়েছিল। দিতি দেবী তখন দশ হাজার বছরকাল গর্ভবতী ছিলেন। মাতৃজঠর থেকে বেরিয়ে পুত্রটি প্রধান হোতার সোনার আসনে বসে বেদ পাঠ করতে লাগলেন। মুনিরা তাকে দেখে নাম রাখলেন, হিরণ্য কশিপু। তার ছোটোভাই হিরণাক্ষ।

তাদের একজন বোন জন্মায়,–সিংহিকা। সিংহিকা বিপ্রাহিত্তির স্ত্রী, রাহুর মা। দিতি নন্দন হিরণ্যকশিপু লক্ষ বছর ধরে তপস্যা করেন। ব্রহ্মা তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে হিরণ্যকশিপু, যোগ সামর্থে দেবতাদের পরাজিত করার মহেশ্বর্য বর প্রার্থনা করলেন। দিব্য বরদান করে ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন। হিরণ্যকশিপু সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বজ্ঞরা বলেন রাজা হিরণ্যকশিপু যেদিকে যেতেন, দেবতারা, মহর্ষিরা সেই সেই দিকের উদ্দেশ্যে নমস্কার করতেন। এইরকম ছিল তার প্রভাব।

আমরা শুনেছি, পুরাকালে নরসিংহদেব নখ দিয়ে তার বুক চিরে তাকে সংহার করেন। হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছ থেকে বর নিয়েছিলেন, কোন শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দিয়ে তাকে বিনাশ করা যাবে না। নরসিংহের নখগুলি আর্দ্রও ছিল না, শুষ্কও ছিল না।

হিরণ্যাক্ষের পাঁচটি মহাবল পুত্র ছিল–উকুর, সকুনি, কালনাভ, মহালাভ ও ভূত সন্তাপন। দেবতারাও এদের জয় করতে পারেনি। এদের হাজার হাজার পুত্র ও পৌত্র জন্মে। তারা 'বালেয়' নামে খ্যাত। তার পুত্র জন্মায়। প্রহ্লাদ সবার বড়। প্রহ্লাদ পুত্ররা হলো হ্রদ ও নিসুন্দ। নিপুন্দের সুন্দ ও উপসুন্দ । নামে দুই পুত্র হয়। সুন্দের তাড়কা নামের পত্নীকে ব্রহ্মাঘ, মূক, ও মারীচ এই তিনপুত্র হয়।

তাড়কাকে, বলবান রাঘব নিহত করেন। কিরাত যুদ্ধে অর্জুন কর্তৃক মূকদৈত্য মারা যায়। অনুহলাদের পুত্র বায়ু ও সিনীবালী। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন। অন্য পাঁচ ছেলে–পবেষ্টী, কালনেমি, জম, বাঞ্চল ও শম্ভ। পবোষ্টির তিন পুত্র। জম্ভের চার ছেলে। বাষ্কলের চারপুত্র। কালনেমিরও চারপুত্র। শম্ভুর ছয় পুত্র। বিরোচনের একমাত্র পুত্র প্রতাপ বান বলি। বলির একশো পুত্র। রাজা বলির শকুনি ও পুতনা নামে দুই কন্যা হয়। নষ্টপুত্রা হয়ে দিতি দেবী কশ্যপের সেবা করলেন।

কশ্যপ সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন। দিতি দেবী বললেন–আপনার আদিত্য পুত্রদের দ্বারা আমি হতপুত্রা হয়েছি। আমি দীর্ঘ তেজ সম্পন্ন ইন্দ্রহন্তা পুত্র কামনা করছি। মহাতেজা কশ্যপ দুঃখিত চিত্তা স্ত্রীর কথা শুনে বললেন–তুমি শুচি হয়ে থাক, তাহলে ইন্দ্র নিধন করতে পারবে, এমন পুত্র তুমি লাভ করতে সক্ষম হবে। ঋষি কশ্যপ চলে গেলে দিতি দেবী আনন্দিত হয়ে সুশীল নামে বনে গিয়ে ভীষণ তপস্যা করতে শুরু করেন।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র দিতিদেবীর যঞ্জের কাঠ, অগ্নি, কুশ, ফল ও মূল, যা কিছু প্রয়োজন সবকিছু জোগাড় করে দিলেন। দিতিদেবীকে নানা সেবায় তুষ্ট করলে, তিনি তুষ্ট হয়ে বললেন–আমি তোমার প্রতি খুশি হয়েছি। আর দশ বছর বাদে তোমার ভাইকে দেখতে পাবে। আমি তোমার মতো পুত্র লাভ করে ত্রৈলোক্য বিজয় করব। এই বলে দিতি দেবী দুই হাঁটুর মাঝে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন ইন্দ্র অবকাশ বুঝে দিতি দেবীর গর্ভে প্রবেশ করে, গর্ভকে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে সাত ভাগে ভাগ করলেন। সেই গর্ভ বার বার কেঁদে উঠল। ইন্দ্র তখন তাদের আরো সাত ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। দিতি দেবী, ঘুম ভেঙে 'মেরো না' 'মেরো না' বলে আর্তনাদ করলে ইন্দ্র গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে হাত জোড় করে বললেন, আপনি অশুচি ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এই সুযোগে আমি ইন্দ্রহন্তা গর্ভকে অনেক খণ্ড করে ফেলেছি। গর্ভ বিফল হওয়ায় দেবী দুঃখিত হয়ে বললেন–আমার দোষেই এমন হল। তোমায় কোনো দোষ দিচ্ছিনা। শত্রুবধে তো কোনো দোষ নেই। এবার তুমি আমার গর্ভের সাতটি গণে ভাগ হয়ে মরুত নামে বিখ্যাত হয়ে বিচরণ কর। এদের প্রথম স্কন্ধ পৃথিবীতে, দ্বিতীয় স্কন্ধ সূর্যমণ্ডলে, তৃতীয় স্কন্ধ সপ্তর্ষিমণ্ডলে এবং সপ্তম স্কন্দ ধ্রুবমণ্ডলে অবস্থিত হোক। আমার ছেলেরা সাতবাত স্কন্ধরূপে কালে কালে বিচরণ করুক।

পৃথিবীর প্রথম বাত স্কন্ধ মেঘ পর্যন্ত বিচরণকারী, তার নাম বহ। মেঘ থেকে সূর্যমণ্ডল অবধি দ্বিতীয় বাত স্কন্ধ রয়েছে। তা প্রবহ নামে খ্যাত। সূর্য থেকে চন্দ্রমণ্ডল অবধি তৃতীয় বাত স্কন্ধের স্থান, তার ঊর্ধ্বেই নামে প্রসিদ্ধ। তার উর্ধ্বেই সোনাবধি নক্ষত্রমণ্ডল পর্যন্ত সুবহ নামে চতুর্থ

বাত স্কন্ধ। এতে আমার পুত্রের বিচরণ করুন। গ্রহ মণ্ডল অবধি পঞ্চম বায়ুস্কন্ধ। এর নাম বিবহ। সপ্তর্ষিমণ্ডল অবধি যে বায়ুস্কন্ধ, তার নাম পরাবহ, এটি ষষ্ঠ বাতস্কন্ধ। সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে ধ্রুব পর্যন্ত সপ্তম বাত স্কন্ধ পরিবহ নামে খ্যাত। আমার আত্মজরা তোমার কাজ অনুযায়ী মরুত নামে বিখ্যাত তোক এবং কালে সেই সেই স্থানে বিচরণ করুন। দিতি দেবী ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে তার সন্তানদের মরুত এই নামকরণ করেছিলেন। সত্ত্বজ্যোতি, আদিত্য, সত্যজ্যোতি, তির্যকজ্যোতি, সজ্যোতি, জ্যোতিষ্মন ও হরিত এই হল, দিতির গর্ভের প্রথম সাতগণ, এদের আবার সাতটি করে ভাগ করা হলে উনপঞ্চাশজন মরুত সৃষ্টি হয়। দিতি এদের আলাদা নামকরণ করেছিলেন।

পরে দিতি ইন্দ্রকে বললেন– হে পুত্র! তোমার কুশল হোক, আমার এই পুত্রেরা দেবতাদের সাথে সাতটি বাতস্কন্ধে বিচরণ করুক। ইন্দ্র দিতির কথা শুনে হাতজোড় করে বললেন–মাত! তাই হোক। আপনি যা যা বললেন, সবই ঠিকমতো সম্পন্ন হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনার এই মহাত্মা সন্তানরা দেবতাদের মত হয়ে তাদের সাথে যজ্ঞভাগভোজী হবে। এরজন্য মরুতেরা দিতির পুত্র হয়েও দেবত্ব ও অমরত্ব পেয়েছেন।

এইভাবে মাতা দিতি ও পুত্র ইন্দ্র এভাবে নিয়ম নির্ধারণ করে আনন্দিত হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। ইন্দ্র তখন স্বর্গে চলে গেলেন। মরুতদের এই জন্মবৃত্তান্ত যে মানুষ পাঠ করে বা শোনে সে দীর্ঘায়ু হয়। কখনো তার অনাবৃষ্টির ভয় থাকে না।

সূত বললেন–এবার দনুপুত্রদের বংশ বিবরণ বলছি, আপনারা শুনুন। দনুপুত্রদের মধ্যে সবাই বলবান ছিলেন, এদের মধ্যে বিচিত্তি প্রধান। এরা একশোজন ও সকলেই প্রচণ্ড শক্তিমান। সকলেই তপস্যার দ্বারা বর লাভ করেছিলেন। সবাই সত্যবাদী, মহাবল, মায়াবী, ক্রুর ইত্যাদি এইসব নামে বিখ্যাত। এইসব দানবদের মধ্যে যারা প্রধান ছিল তাদের নাম বলছি– মহাবিশ্ব, গবেষ্টি, দুন্দুভি, সেজামুখ, ভগবান, শিল, বামনক, মারীচ, বিক্ষোভ প্রভৃতি। এদের মধ্যে সূর্য চন্দ্রও ছিল। এরা প্রথমে অসুরদের দেবতা ছিলেন। পরে দেবতাদের দলভুক্ত হয়েছেন। এইসব অসুর দৈত্য ও দানব আখ্যায় অভিহিত।

সন্তানু দিতির গর্ভজাত আর অনুভানু দনুর পুত্র। এছাড়া দনুর বংশধরেরা হল– একাক্ষ, ঋষভ, অরিষ্যট, প্রলম্ব, নরক, ইন্দ্রবাধন, কেশী, মেরু শম্ব, ধেনু, গবেষ্ঠী, গবাক্ষ ও বীর্যবান, তালকেতু। বিচিত্তির পুত্রেরা সিংহিকা গর্ভজাত মহাসুর। এরা সংখ্যায় চৌদ্দজন। রাহু এদের

সবার বড়। এরা প্রচণ্ড ধূর্ত, বলবান। এদের দেবতারাও বধ করতে পারে না। জমদগ্নি পুত্র বলবান ভার্গব এদের হত্যা করেন।

পুলোমা ও কালিকা বৈশ্বানরের কন্যা। মহুষ প্রভাব এবং জয়ন্ত শচীর পুত্র। শর্মিষ্ঠা পুরুকে আর উপদানবী জহ্মন্তকে প্রসব করেন। মারীচ, বৈশ্বানরের দুই কন্যা পুলোমা এবং কালিকাকে বিয়ে করেন। এদের ষাট হাজার দানব জন্মগ্রহণ করেন এই সব দানবেরা দেবতাদেরও অবধ্য ছিল। সব্যসাচী এদের হত্যা করেন। ময়দানবের পুত্ররা সবাই বীর। তাদের নাম দুন্দুভি, বৃষ, মহষি, বালিক, বজ্যসম। এছাড়া মন্দোদরী নামে ময়দানবের এক কন্যা ছিল। দৈত্য দানবদের সৃষ্টি সম্বন্ধে জানা গেল।

দনাযুষার পাঁচ ছেলে, পাঁচজনই মহাবল। অরুরু, বলিজন্ম, বিরক্ষ ও বিষ, অরুরুর পুত্র ধুন্ধু নামে মহাসুর। কুবলাম্ব একে হত্যা করেন। বলির পুত্র কুম্ভল ও চক্রধর্ম। এরা দুজন মহা বলশালী। আগের জন্মে এদের নাম ছিল কর্ণ।

বিরক্ষের দুই পুত্র নাম হল–কালক ও বর। বিষের চারপুত্র ছিল–শ্রদ্ধেহা, বদ্রহা, ব্রহ্মাহা, পশুহা। ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্রাসুরের যখন ঘোর যুদ্ধ হয় তখন বৃত্রের নিঃশ্বাস থেকে এরা জন্মগ্রহণ করে। এরা হল শত সহস্র মহাবল রাক্ষস। দৈত্যদের এবং দানবদের সৃষ্টি কথা বলা হল।

উনসত্তরতম অধ্যায়

সূত বললেন–পবিত্র অপ্সরা ও গণধররা মৌনেয় নামে খ্যাত ছিল। চিত্র সেন, উগ্র সেন, ঊনায়ু, অনয় ধৃতরাষ্ট্র, পুলোমা প্রভৃতি ষোলোজন দেব ও গন্ধর্বদের অধীনে ছিল চৌত্রিশজন সুন্দরী অপ্সরাগণ। ঐ অপ্সরারা হলেন অন্তার, সুরেওমা, চারুমুখী বরাননা, এদের মধ্যে সুম্মার পুত্র মহাবল যক্ষরী হল– কম্বল, হরিকেশ, কপিল, কাঞ্চন, মেঘমালী, সুষমা চারটি অপ্সরা কন্যা ছিল। বিশাখা, ভরতা, কৃশাগী, লোহেরী–এই চারজন অপ্সরা অনিন্দ্য সুন্দরী মহাত্মা বিশাল ঐ চারকন্যার–গর্ভে চার যক্ষ উৎপাদন করেন।

এইসব ভয়ঙ্কর মহাবলী যক্ষরা সমস্ত জগৎ বিছিয়ে রয়েছে। মহাত্মা বিক্রান্তের কালেয় নামে প্রসিদ্ধ বহু গন্ধর্ব সন্তান হয়। এছাড়া তার তিন কন্যা ছিল। অগ্নিকা, কম্বলা, বসুমতী। এই কন্যারা সৌন্দর্যে ও শক্তিতে অনুপমা। এদের গর্ভে গন্ধর্বরা জন্মে। বিশ্রবা এই কন্যাদের গর্ভে অনেক বিদ্যাকুশল সন্তান জন্মে। সেই মহাত্মা বিক্রান্ত থেকেই অশ্বমুখ কিন্নরদের উৎপত্তি হয়।

হরিষেন, সুষেন, বারিষেন, রুদ্রদত্ত, ইন্দ্রদত্ত, চন্দ্রম, মহাক্রম, বিন্দু ও বিন্দুসার- এরা হল নরমুখ চন্দ্রবংশীয় কিন্নর। এরাই শ্রেষ্ঠ কিন্নর। নাচ, গানে পটু, লোহেরীয় অনেকগুলি সন্তান ছিল। এর মেয়ের নাম খুববিন্দা।

সুতার কালভবন, নির্দেশক, ও বিদেশক ইত্যাদি ভূতগণমিচর ইত্যাদি ভূতগণ ভূমিচর বলে প্রসিদ্ধ। এরাই ভূতদের অধিনায়ক, ভূতেদের মধ্যে যারা ক্ষমতাশালী, তারা গাছের ডগা থেকে আকাশ পর্যন্ত বিচরণ করতে পারে।

দেব-গন্ধর্বরা যশস্বী ও দেবার্চনার রত। বরিষ্ঠের গর্ভে হংস, অন্য জাহা, ইহু বিশন, কসিরুচি, তুম্বুরু ও বিশ্বাবসু নামে আটজন গন্ধর্বের উৎপত্তি হয়। এদের আটজন অরিষ্ঠের পত্নী ছিল। তাদের নাম অনবদ্যা, অনবশা, অন্বিতা, মদন প্রিয়া প্রভৃতি। এরা আটজন অপ্সরা গর্ভজাত। নারায়ণের উরু থেকে যে সর্বাঙ্গ সুন্দরী অপ্সরার উৎপত্তি হয় তার নাম উর্বশী। এর মধ্যে শোভযন্ত গণ ব্রহ্মার মানসী কন্যা। আহুতগণ মনুর পুত্রী।

অপ্সরাদের মধ্যে তিলোত্তমা সবচেয়ে সুন্দরী ও ভাগ্যবতী অপ্সরা। বেদবতী চতুমুখের বেদী থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এভাবে বহু হাজার সুন্দরী অপ্সরা গণ দেব ও ঋষিদের পত্নী ও মা। ঐ সব চম্পক বর্ণা সুন্দরীরা প্রিয়জনেদের আনন্দ দান করতেন প্রাচীনকালে প্রজাপতি থেকে নারদ ও পর্বত উৎপন্ন হয়। তার তৃতীয় সন্তান হল অরুন্ধতী। বিনতার পুত্র অরুণ ও গরুড়। এদের ছত্তিশ জন বোন, এরা সবাই ছোট। রুদ্র অনেক নাগ প্রসব করেন। এদের মধ্যে শেষনাগ বাসুকি ও তক্ষকই প্রধান। এবার খণার সন্তানদের কথা বলছি। এদের নাম বিলোহিত ও বিকল। আর সন্তানগুলি হল– সর্বাঙ্গ কেশ, স্কুলাঙ্গ, তুঙ্গনাম, মহকেন, মনোরথ, দীর্ঘনাসিক প্রভৃতি ভীষণ পুত্রদেব প্রসব করেন। আরো অনেক পুত্র ছিল যেমন–ত্রিশীর্ষ, ত্রিহস্ত, ত্রিপাদ, কটিহীন।

এদের মধ্যে সবার বড় ভাই ক্ষুধার্ত হয়ে নিজের মাকে ভক্ষণ করতে গেলে। তখন সব থেকে ছোট ভাই বড় ভাইয়ের হাত থেকে মাকে মুক্ত করে বলল–ইনি আমাদের মা, একে খেয়ো না, রক্ষা করো। সেইসময় পিতা কশ্যপ সেখানে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন–ছেলেরা কি বিরূপ ব্যবহার করেছে আমাকে বল। মেজো ছেলে মায়ের স্বভাব পেয়ে থাকে। মেয়ে বাবার যেমন রূপ হয় তেমনি জলের রূপ হয়। মার স্বভাব দোষে বা স্বভাবগুণে নানা প্রকার সন্তান জন্মে থাকে। আমার মতে, হে দেবী তুমিও রাগী। ভগবান কশ্যপ এই সকল কথা স্ত্রীকে বলে ছেলেদের কাছে ডাকলেন আর উপদেশ দিয়ে জাতি নির্দেশ করলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মাকে ভক্ষণ

করতে গিয়েছিল বলে নাম হল যক্ষ আর কনিষ্ঠ মাকে রক্ষা করতে গিয়েছিল বলে নাম হল রক্ষ। তাদের ক্ষুধিত দেখে বর দিলেন–তোমরা রাত্রে খাবে ও ঘুরে বেড়াবে। তখন তোমাদের শক্তিও বেড়ে যাবে। তোমরা মাকে রক্ষা করো। এই বলে কশ্যপ চলে গেলেন।

কিন্তু পিতা চলে যাবার পরই তারা প্রাণী ধ্বংসকারী অতিকায় মূর্তি নিয়ে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ালো আর দেব, ঋষি, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, মানুষ, পশু ও অনেক পাখিদের ধ্বংস করল, অত্যাচার করল। যক্ষ একবার মহাকল পিশাচকে খাবার জন্য নিজের দুই পিশাচ কন্যার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দুই কামচারিণী কন্যার সঙ্গে দুই পিশাচ মহাবল রাক্ষসকে সামনে দেখল। তখন দুই পিশাচ নিজে দুই কন্যাকে বললো, রাক্ষসটিকে ধরে নিয়ে এসো। পিতা একথা বললে দুই কন্যা রাক্ষসকে ধরে নিয়ে এল। পিশাচরা তাদের জিজ্ঞাসা করল–তুই কে? কার ছেলে? রাক্ষস তখন সব বৃত্তান্ত বলল। তখন সবশুনে পিশাচরা নিজেদের দুই কন্যাকে রাক্ষসের হাতে সম্প্রদান করল। পিশাচ দুজনের নাম অজ্ঞ ও খণ্ড। অজ বলল আমার এই সর্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যারদের নাম ব্রহ্মধনা। এই কন্যা নোমশূন্য। খণ্ডের কন্যা জন্তুধনা।

জন্তুধনার খাদ্য হল জন্তু। এর সর্বাঙ্গে লোম। এই ব্রহ্মধনা ব্রহ্মণ নামে পুত্র ও তত্ত্বলা নামে কন্যা প্রসব করে। এবার এই পিশাচ দম্পতির প্রজাসৃষ্টির কথা বলছি। হেতু, হেতু, উগ্র, পৌরষেয়, বধ, ব্যাঘ্র ও সর্প। এইসব রাক্ষসেরা সবাই সূর্যের অনুচর ও সবসময়ে সূর্যের সাথে ভ্রমণ করে থাকে। এদের মধ্যে হেতুর পুত্র লন্ধু। লন্ধুর দুই ছেলে মাল্যবান ও সুমালী। বধের দুই পুত্র বিঘ্ন ও শমন। দুজনেই দুরাচারী।

ব্যাঘ্রের পুত্র নিকুম্ভ। এই নিকুম্ভ জন্তুদের বিঘ্নকারক। এরা সকলেই পরাক্রান্ত রাক্ষস। যাতুধানদের কথা বলা হল। এবার ব্রহ্মধনদের বিবরণ শুনুন। যজ্ঞ, পিতা, মুনি, ক্ষেম, ব্রহ্মা, পাপ, যথা, স্বাকোটক কালি ও সর্প এই দশজন ব্রহ্মধনার গর্ভজাত। ব্রহ্ম রাক্ষসরা এদেরই বংশে উৎপন্ন।

এরপর রয়েছে যক্ষ পুত্রদের কথা। যক্ষ ক্রতুস্থলী নামে অপ্সরাকে লাভ করার জন্য নন্দন বনে এসে দেখল অন্য অপ্সরাদের নিয়ে খেলছে। নিজের রূপ নিয়ে অপ্সরার কাছে যেতে সাহস না পেয়ে গন্ধর্বের প্রণয়ী বসুরুচি রূপ ধারণ করল এবং তখন অপ্সরা ক্রতুস্থলী ভাবাবেশে তার সঙ্গে মিলিত হল। ঐ মিলনের পরে তাদের এক পুত্র জন্মাল। ঐ পুত্র তখনই বিশাল আকার ধারণ করে পরিণত বয়স্কের মতো হয়ে উঠল। ঐ সদ্যোজাত পুত্র নিজের পিতাকে বলল– আমি রাজা। আমার নাম নাভি। পিতা যক্ষ তাকে অভয় দিয়ে বলল তোমার ভয়ের

কারণ নেই। তুমি মায়ের রূপ পাবে আর আমার বীর্য। যক্ষ তখন নিজের রূপ ধারণ করল আর হাসিমুখে অপ্সরাকে বলল– সুন্দরী এবার নিজের ছেলের সাথে আমার ঘরে চলো। হঠাৎ তার রূপ পরিবর্তন দেখে অন্য অপ্সরাগণ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। ক্রতুস্থলীকে তার পুত্র সান্ত্বনা দিয়ে অপ্সরা সমাজে ফিরিয়ে দিলো আর সে তার পিতা যক্ষের সঙ্গে ফিরে গেল। বটগাছই যক্ষদের বাসস্থল। সেখানে গুহ্যকেরা বাস করছিলো। যক্ষ রজতাভ গুহ্যকদের পিতামহ। ঐ রজতাভ দৈত্য কন্যা ভদ্রাকে বিয়ে করে।

ভদ্রার পুত্রদের নাম মণিবর ও মনিদ্র। পুণ্যজনী, দেবজনী এদের স্ত্রী। পুণ্যজনী ও মনিদ্রের পুত্ররা হল–সিদ্ধার্থ, সূর্যতেজ, সুমন্ত, নন্দন, কন্যক, ববির্ক, মণিদত্ত, বসু, সর্বানেভূত, শঙ্খ ইত্যাদি চব্বিশজন সন্তান। দেবজনী ও মনিবরের কয়েকজন পুত্র হল– পুণ্যভদ্র, সুনেত্র, যম, বক, কুমুদ, হিরণ্যাক্ষ, সুরূপ ইত্যাদি।

খসার অনেক রাক্ষসপুত্র ছিল। যেমন- মধু, সুকর, পরশুনাভ, নিশাচর প্রভৃতি। খশার আরও সাতজন কন্যা ছিল। এই সাতবোন আবার ছিল হিংসুক, দুর্মদ, প্রচণ্ড সব রাক্ষসের জননী। রাক্ষসদের মধ্যে কেউ কেউ প্রায়ই ভগবান শঙ্করের আরাধনা করে থাকে। কম্পন নামে যক্ষ কেশিনীর গর্ভে কয়েকজন ভীষণ অসুর জন্মায়। এদের নাম- দংষ্ট্রাকরাল, বিকৃত, মহাকর্ণ, মহোদন্ত হারক প্রভৃতি সব নীচ রাক্ষস। এরা আবার নানা আকার নিয়ে অদৃশ্যভাবে বিচরণ করে। এদের সংখ্যা শত সহস্র এরা পৃথিবীর সর্বত্রই বিরাজ করে। সমস্ত রাক্ষসদের আটমাতা ও আটভাগ আছে। ভদ্রক, নিকর এদের এক ভাগ। এরা মর্ত্যে বিচরণশীল। এভাবে পুতনা প্রভৃতিকে নিয়ে একটি বিভাগ। এরা মনুষ্য জগতে বালকদের অনিষ্ট করে। স্বন্ধ গ্রহাদি কয়েকটি রাক্ষস আছে। এরাও শিশুদের ক্ষতি করে। অগস্ত্য, পৌলস্ত্য, বিশ্বামিত্র নামে যেসব রাক্ষস আছে তাদের রাজা হল কুবের।

এইসব যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের মধ্যে যারা দেবতাদের সমকক্ষ, ভাস্বর, বলবান, সর্বলোক নমস্কৃত, যজ্ঞকারী এবং দেবতাদের তুল্য, তাদের অসুর বলে। সমস্ত রাক্ষসই যক্ষদের মতো প্রভাব। পিশাচগণ যক্ষ অপেক্ষা ঐশ্বর্যে ত্রিগুণহীন। এইভাবে গন্ধর্ব থেকে পিশাচ পর্যন্ত চার জাতীয় দেবযোনী ধন, রূপ, আয়ু, বল, ঐশ্বর্য, বুদ্ধিতে দেবতা ও অসুর থেকে দ্বিপাদহীন। এবার ক্রুর স্বভাবের রাক্ষসদের কথা বলা হচ্ছে। ক্রোধার বারো কন্যা এরা সবাই পুলহের পত্নী। এদের নাম- মৃগী, মৃগনন্দা, ইরাবতী, ভূতা, কার্পস দ্রষ্টা, নিশা, তির্যা, শ্বেতা, সুসা, স্বরা। এদের মধ্যে মৃগীর পুত্র হরিণ, শরভ শশক, রুরা ইত্যাদি। মৃগনন্দার সন্তান মগরাজ, মহিষ, উষ্ট্র, বরাহ, খঙ্গ ও গৌরমুখ। হরিভদ্রার সন্তান সিংহ, গো, লাঙ্গুল, বানর, কিন্নর, ব্যাঘ্র ইত্যাদি।

ইরাবতীর গর্ভে হাতির জন্ম হয়, নাম ঐরাবত। এর রং সাদা, চারটি দাঁত, এটি দেবরাজের বাহন।

ঐরাবতের বংশে ভদ্র নামে এক হাতি ছিল। ঐ হাতি জলজাত, সোনার মত রং, ছটি দাঁত। বলাসুর একে বাহন করেছিল। ঐরাবতের পুত্র অঞ্জন, সুপ্রতীক, বামন ও পদ্ম শ্বেতা ও কয়েকটি ক্ষিপ্রগামী হতি প্রসব করেছিল। তারা হল- ভদ্র, মৃগ, মন্দ, সংকীর্ণ। সংকীর্ণ ও অঞ্জন–এরা যমের বাহন। ভদ্র ও সুপ্রতীক বরুণের, পদ্ম ও মন্দ কুবেরের, মৃগ নাম হাতি পাবকের বাহন। পদ্মগজের উগ্র স্বভাবের সন্তানরা মাতঙ্গজ নামে পরিচিত। এছাড়া স্থল, শূল প্রভৃতি বলবীর্যশালী হাতি আছে। এদের নোম ও নখ সাদা। বামদেব নামে হাতি ঘন কালো গায়ের রঙ। সাম থেকে বামন নামে হাতি জন্মে। এরা ভীষণ দ্রুতগামী। এদের বংশ সম্ভুত বিকৃত গজননই মানুষের হাতে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সপ্রতীক খুব সুন্দর প্রহারী, সম্পাতী ও পৃথুজিত নামে এর তিন ছেলে। এই বংশে অঞ্জন থেকে অঞ্জনা আর সাম থেকে অঞ্জনাবতীর জন্ম হয়।

সাম ও চন্দ্রমা থেকে কুমুদদ্যুতি ও পিঙ্গলা নামে দুই হস্তিনী জন্মে। পিঙ্গলার পুত্র মহাপদ্ম ও ঊর্মিমালী। এই বংশের নাগগণ অতি প্রচণ্ড, হস্তীযুদ্ধে সুনিপুণ। দেবতারা দেবত্মর যুদ্ধে জয়লাভের জন্য এই নাগগণকে বলরূপে গ্রহণ করেছিলেন। দুটি দাঁত থাকার জন্য দ্বিরাগ, হাত বা শুড় থাকার জন্য বলে হস্তী। দাঁত থাকার জন্য দন্তী। গর্জন করে বলে গজ। কুঞ্জচারী বলে কুঞ্জর। অগ্নির শাপে এরা কথা বলতে পার না। এভাবেই এদের সম্বন্ধে জানা যায়। সমুদ্র থেকে কৌশিকী ও গঙ্গার মাঝে যে স্থান তা অঞ্জন নামে হাতির ও তার বংশের অন্যদের বন। বিন্ধ্যাচলের উত্তর ও গঙ্গার দক্ষিণ দিকের গঙ্গদ্ভেদ থেকে রুরুষ দেশ পর্যন্ত বামন হাতির বন।

সিন্ধু পর্যন্ত পশ্চিম দিকের পর্বতের কাছের জায়গাটি হল যমের বন। ভূতি রুদ্রের অনুচর ভূত প্রসব করে। এরা কেউ মোটা, কেউ রোগা, কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ কেউ লম্বকর্ণ কারো জিব বা পেট নেই। এরা সব নদী ও সমুদ্রে বাস করে। কেউ কালো, কেউ লাল, কেউবা আবার ধোঁয়ার মত রং। কারো অনেক চোখ, অনেক মাথা, কারো বা মাথা নেই। কেউ বা চন্ত, বিকট, অন্ধ, জটিল। কুঁজো ও বামন কেউ মহাযোগী, কামরূপী কুশহস্ত শবাহারী, কেউ মুগুরধারী, কেউ অসিধারী, কারো মুখ আগুনের মত, কারো মুখ-চোখ দিয়ে আগুন বার হচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ সন্ধ্যাবেলা ও রাতে ঘুরে বেড়ায়। যারা রাতে বিচরণ করে, তারা ভয়ানক।

এরা সাধারণত ভবদেবকেই পূজা করে থাকে। এদের স্ত্রী-পুত্র নেই। এই শত সহস্র ভূত সম্প্রদায় ভূতির সন্তান কশিশা। কম্মুণ্ডী থেকে কুম্মারা জন্মগ্রহণ করে। ষোলোটি কুম্মাণ্ডদের কুল বা বংশ আছে। পিশাচদেরও ষোলোটি গড় আছে। ছাগল-ছাগলী, বক-বকী, কুম্ভমাত্র কুম্ভী ইত্যাদি। পিশাচদের বিকৃতকার অসংখ্য পৌত্র ও পুত্র আছে। এই পিশাচদের, কারো সারা গা লোমে ভরা, কারো চোখ গোলাকার, কারো দাঁত, নখ বড়, কেউ কেউ মানুষ ভক্ষণ করে। কারোর মাথায় চুল নেই। গায়ে লোম নেই। এরা কুণ্ডিকা নামে পিশাচ। তিল ও আমিষ এদের খাদ্য। আর আছে নিতুল্ক পিশাচ, অলকমর্ক পিশাচ, পাংশু পিশাচ, শ্মশানে বাস কারী শুষ্ক, দাড়িগোঁফ রয়েছে, ছেঁড়া কাপড়, এদের নাম, উপচচীর। আরো পিশাচ আছে। হাতির মত মুখ, উটের মত কুঁজ, নাম কুম্ভপাত্র। কোনও পিশাচ অদৃশ্য ভাবে ঘুরে বেড়ায়। এদের বিরাট বড় হাঁ, কানও লম্বা। এরা শূন্যবাড়িতে বাস করে। আবার কিছু পিশাচের হাত-পা খুবই ছোট। এরা বালকদের ভক্ষণ করে। আর রয়েছে পিশিতাদ পিশাচ, স্কন্ধ নামে পিশাচ। পিশাচদের এইরকম ষোলোটি জাতি আছে। ভগবান ব্রহ্মা পিশাচদের দয়া করে তাদেরকে অন্তর্ধান ও কামরূপত্ব বর দান করে। এরাই সন্ধ্যাতেই ঘুরে বেড়ায়। ভাঙা বাড়ি, ফাঁকা বাড়ি, সংস্কার বর্জিত জায়গায় এরা বাস করে।

এছাড়া নদীতীর্থ, মহাপথ সবজায়গায় এরা থাকে। যারা অধার্মিক, বর্ণাশ্রম ধর্মে মন নেই, তারাই পিশাচের আশ্রয়স্থল। মধু, মাংস, তিল, চুন, চাল, দই, ধূপ, ফুল ইত্যাদি উপহার পিশাচদের দিতে হয়। স্বয়ং ব্রহ্মা এই ব্যবস্থা করেছেন। শূলপানি গিরিশ এদের অধিপতি।

এরপর ঋষার সমস্ত প্রজাদের কথা বলছি, শুনুন। ঋষার পাঁচ কন্যার নাম– মীনা, মাতা, বৃত্তা, পরিবৃত্তা ও অনুবৃত্তা। এদের সন্তানরা হল-মকর, তিমি, রোহিত, পাঠীন প্রভৃতি মাছেরা। কুর্ম জাতীয় বহু জলচর বৃত্তার থেকে উৎপন্ন। মণ্ডুক বিকারগুলোর উৎপাদনকারী হল অনুবৃত্তা। শম্বুক, শুক্তি, বরাটক, শঙ্খ বিশেষ, কালকূট প্রভৃতি প্রাণী প্রসব করে পরিবৃত্তা।

এবার স্বেদজ প্রাণীদের কথা বলছি। মাথার চুলে ও কাপড়ে যে উকুন হয়, তা স্বেদজপ্রাণী। জল ও বৃষ্টি থেকে মৃগশরীরে নানারকম কীট জন্মে। তাদের নাম নীলচিত্র, পিপ্পল, দংশ। অনেক ফলের থেকেও নানারকম কীট জন্মে। কাঠ থেকে ঘুণ, দ্রুম থেকে নীলমাছি, গো, মহিষ থেকে অসংখ্য কীট জন্মায়। অষ্টাপদ কীটও আছে। অন্যান্য নানাপ্রকার মশা ও মাছি আছে। এরকম অসংখ্য স্বেদজ প্রাণীগণ রয়েছে। এইগুলি কর্মফলেই ঘটে থাকে।

এখন নৈঋত প্রাণীর কথা বলছি। এরা উপসর্গজাত। কোন কোন দেবতা যযানিজাত, কিছু দেবতা স্বতঃপ্রাদুর্ভূত হয়েছেন। সুরমা একশো সাপ উৎপাদন করেন। তক্ষক সাপেদের আর বাসুকি নাগেদের রাজা। তাম্রা যে জাতি উৎপন্ন করেন, তা বলছি স্যেনী, ক্রৌঞ্চী ভার্মা, ধৃতরাষ্ট্র ও শকী। গোনী অরনের থেকে মহাবল পক্ষিশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ও জটায়ুকে লাভ করে। সম্পত্তির এক পুত্র, এক কন্যা জাটায়ু থেকে কাক শকুন ইত্যাদির জন্ম। গরুড়ের ভার্য্যা বাসী, ক্রৌঞ্চী, শুকী, ধৃতরাষ্টী ও ভদ্রা। শুকী গরুড় থেকে ছজন পুত্র প্রসব করে। গরুড়ের পুত্র ও পৌত্রদের চৌদ্দ হাজার সন্তান-সন্ততি বংশবিস্তার করেছে।

এরা ছড়িয়ে আছে শাল্মলী দ্বীপ, দেবকূট পর্বত, পঞ্চ শিখর হেমকুট– এই সব দেশে। মহাত্মা গরুড়েরা এইভাবে সমস্ত পর্বতে ছড়িয়ে আছে। ভাম, উলুক, কাক, ময়ূর, কপোত, তিতির– এরা গরুড়-এর স্ত্রী স্বামীর পুত্র। ক্রোঞ্চীর পুত্র হল– কুবরয়, কুরর, সারস প্রভৃতি মাংসাসী পাখী, ধৃতরাষ্ট্রীয় পুত্ররা হাঁস, কল হংস, চক্রবাক ও অন্যান্য হিংসুক প্রাণী। এদের থেকে আবার অসংখ্য পুত্র-পৌত্রাদি উৎপন্ন হয়।

এবার ইরার বংশ বিবরণ শুনুন। এদের তিনটি কমললোচনা কন্যা জন্মে। এরা বনস্পতি, গাছ ও বীরুহে জননী। এদের থেকেই বড় বড় গাছ মহীরুহের ফুলে ভরা লতা, গাছগুল্ম প্রভৃতি জন্মায় এদের বিস্তৃত বর্ণনা একশো বছরে দেওয়া সম্ভব নয়।

অদিতি ধর্মশীলা, দিতি বলশালিনী, সুরভি তপঃশীলা, দনু মায়াশীলা, মুন অধ্যয়নশীলা। অরিষ্টা গতিশীলা, খশা ক্রোধশীলা, কদ্রু কুরশীলা, ক্রোঞ্চী শ্রুতিশীলা, ইরা অনগ্রহশীলা, দনায়ু-ভক্ষণ দক্ষা, বিনতা বহনশীলা, তাম্রা-পাপ শালিনী। এইসব লোকমাতাদের স্বভাব এরকমই। এরা সত্ব, রজঃও তমো গুণে ধার্মিক ও অধার্মিকা দুইই হন।

যেহেতু প্রতি মন্বন্তরে মানুষই দক্ষ কন্যাতে জন্মগ্রহণ করে, এজন্য মানুষই শ্রেষ্ঠ। মানুষই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের সাধক। সুরাসুররাই কার্যসিদ্ধির জন্য মনুষ্যলোকে বার বার জন্ম নেয়। সুর, অসুর, অপ্সরা, গন্ধর্ব, যম, রক্ষ, পিশাচ, সুপর্ণ, পাখি, কৃমি, কীট, পতঙ্গ, জলজ পশুদের বংশ বিবরণ বলা হল। মন পবিত্র হয়ে পরম আদরে এইসব বংশ বিবরণ শুনতে বা যে ব্যক্তি এগুলি নিয়ম করে পড়ে তার পুত্র ও ধনলাভ হয়। তার পরলোকেও শুভ গতি হয়ে থাকে।

.

সত্তরতম অধ্যায়

সূত বললেন–মহাত্মা কশ্যপ এভাবে প্রজা সৃষ্টি করার পর বিভিন্ন প্রজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নির্বাচন করে তাকে সেই রাজ্যে অভিষেক করলেন। এভাবে তিনি ভগবান বৃহস্পতিকে অঙ্গিরস গণের, বিষ্ণুকে ভালবিদের, আদিত্যদরে পাবকদের দক্ষকে প্রজাপতিদের, প্রহ্লাদকে দৈত্যদের, নারায়ণকে সাধ্যদের, বৃষধ্বজকে রুদ্রদের, বিপ্রচিতিকে দানবদের, বরুণকে জলের, বৈবস্বততকে পিতৃগণকে, সাগরকে নদীদের চিত্র রথকে গন্ধর্বদের উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বদের সিংহকে মৃগদের গরুড়কে পাখিদের, মারুতকে ও অশরীরি প্রাণীর বায়ুকে শব্দ, বাসুকিকে নাগেদের, তক্ষককে সরীসৃপ, কামদেবকে অপ্সরাদের, সংবৎসরকে ঋতু, মাস, পক্ষ, বিপক্ষ, মুহূর্ত, পর্ব, কলা, কাষা অয়ন, গণিত ও যোগের, সুরামাকে পূর্বদিকের, কেতুমালকে পশ্চিমদিকের এবং বৈবস্বত মনুকে মানুষের আধিপত্য নিয়োগ করেন।

ভগবান ব্রহ্মা স্বয়ম্ভর সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে ধর্মানুসারে পালন করছেন। আর সেখানে রাজাদেরও অভিষিক্ত করেছেন। মন্বন্তর শেষ হলে আবার সেইসব রাজারা ভাবী মন্বন্তরে মনু হবেন। এইভাবে অতীত ও ভবিষ্যত নৃপতি ও মনুরা আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়ে আসছেন।

প্রজাপতি মহাভাগ কাশ্যপ এইসব পুত্র উৎপাদন করে আবার প্রজা সৃষ্টির জন্য তপস্যা করতে লাগলেন, তিনি ভাবলেন, আমার দুজন গোত্রকর পুত্র হোক। এরূপ চিন্তার ফলে বৎসর ও অসিত নামে দুজন ব্রহ্মবাদী পুত্র হয়। বৎসর থেকে নিধ্রুব ও রৈভ্য জন্মগ্রহণ করে। রৈভ্য থেকে রৈভ্যরা জন্মে। ধ্রুবের পত্নী কুণ্ডপায়ীদের মাতা একপর্ণার গর্ভে আসিতের ব্রশ্নিষ্ঠ নামে পুত্র জন্মে। নিধ্রুব, শাণ্ডিল্য, ও রেভ্য এরা সবাই কশ্যপ দেবল শাণ্ডিল্যদের কথা শুনে মহাযশস্বী হন। বর প্রভৃতিরা দেবলের সন্তান, মানসের পুত্র রিষ্যন্ত, তার ছেলে দম। ত্রেতাযুগের প্রথম রাজা তৃণবিন্দু। এঁর কন্যা অনুপম লাবণ্যময়ী ইলবিলা। রাজা তৃণবিন্দু তাকে পুলস্ত্যের হাতে দান করেন।

ইলাবিলার গর্ভে জন্ম নেয় বিশমা। বিশ্রমার চার পত্নী, এঁরা সবাই পৌলস্ত্য কুলের গর্ব। দেবাচার্য বৃহস্পতির-এর কীর্তিমতী কন্যা ছিল। বিমা সেই মেয়েকে বিয়ে করেন। মাল্যবানের কন্যা পুষ্পেকটা ও বাকা এবং মালীর কন্যা কৈকসীও তার স্ত্রী ছিল। বৃহস্পতির কন্যা দেববর্ণিনী গর্ভে বিশ্রমার পুত্র বৈশ্রবর্ণ জন্ম নেয়। এই বৈশবর্ণ রূপে রাক্ষসের মতো আর বিক্রমে অসুরের মত। এর পিতা একে ত্রিপাদ স্কুলশীর্ষ, শঙ্কুকর্ণ, লোহিতবর্ণ, হস্রবাহু পিঙ্গল, ভীষণ, বিশ্বরূপধর দেখে বললেন–এই বালক স্বয়ং কুবের কেন না ক’ শব্দে অর্থ কুৎসা, এবং ‘বের’ শব্দের অর্থ শরীর। কু শরীরের জন্যই এই বালক কুবের নামে প্রসিদ্ধ। এই কুবের

সিদ্ধির গর্ভে বিখ্যাত নলকুবেরকে উৎপাদন করেন এবং কৈকসী রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পণখাকে উৎপন্ন করেন।

রাবণ দশমাথা, শঙ্কুকর্ণা, পিঙ্গলবর্ণ, চতুষ্পদ, সত্যবুদ্ধি, দৃঢ়তনু, দারুণ ক্রুর ছিলেন। আগের জন্মে ইনি হিরণ্যক শিশু ছিলেন। ইনি চারযুগেই রাজা হয়ে আসছেন। এখন তিনি রাক্ষসদের ত্রয়োদশ রাজা। তিনি ষাটলক্ষ বছর ধরে দেবতাদের ও ঋষিদের ওপর অত্যাচার করে এসেছেন। চব্বিশ ত্রেতাযুগে রাবণ দাশরথি রামের হাতে সবংশে মারা যান।

মহোদয়, প্রহস্ত, মহাপ্রাংজ্ঞ, ও ঘর–পুষ্পেকটার পুত্র। এছাড়া কুম্ভনসী নামে পুষ্পেকটার একজন মেয়ে ছিল। ত্রিশিরা, দুষণ, বিদ্যুৎ, জিহ্বা নামে রাক্ষসরা বাকার পুত্র। এদের কন্যার নাম অশনিকা, আগে যে পুলস্ত্য বংশীয় রাক্ষসদের কথা বলা হয়েছে, তারা সবাই কুরকর্ম। দেব-দুর্জয়, বরপ্রাপ্ত ও পুত্র-পৌত্র সমন্বিত। কুবের হল সমস্ত যক্ষ, রাক্ষস, অসস্ত্য, বৈবমিত্র ব্রহ্ম রাক্ষস, বেদধ্যয়নসীল রাক্ষস ইত্যাদির রাজা সাধারণত চার প্রকার, যাতুদান, ব্রহ্মবান, দিবাচর, নিশাচর, পৌলস্ত্য, নৈঋত, অগস্ত্য ও কৌশিক প্রভৃতি সাতগণ রাক্ষস জাতি। এদের সাধারণ রূপ বর্ণনা শুনুন এরা বৃত্তাক্ষ, পিঙ্গলবর্ণ, মহাকায়, মহোদর, শঙ্কুকর্ণ, দারিতাস্য, স্থূল শীর্ষ, স্কুল নাসিক, গম্ভীরাক্ষ, বিভীষণ, বিকট, স্কুল। এরা অন্নভোগী, মাংসাশী পুরুষ ভক্ষণকারী, মনীষীরা রাক্ষসদের এইরকম রূপের বর্ণনা করেছেন। এদের সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। কারণ এরা মায়াবী।

পুলস্তের সন্তানেরা হল– মৃগ, ব্যাল, দংষ্ট্রী, ভূত, পিশাচ, ভ্রমর, সাপ, হাতি, কিন্নর, মায়াবী জাতি ও ক্রোধী জাতি। ক্রতু, বৈবস্বত মন্বন্তরে কোন পুত্র হয়নি। কিন্তু তিনি নিজের তেজ বিসর্জন দেননি।

এবার ভগবান অত্রি অর্থাৎ তৃতীয় গর্ভে ভদ্রাস্বের দশ সন্তান জন্মে। নাম ভদ্রা, সুদ্রা, মদ্রা, বালদা, মালদা, বেলা, খলা, লোকপলা, মনোরম ও রত্ন কুটা। আত্রেয় বংশের প্রভাকর এদের স্বামী ছিলেন। ইনি ভদ্রায় গর্ভে যশস্বী সোমকে উৎপাদন করেন। একদা স্বভানু সূর্যকে আহত করলে সূর্য স্বর্গের থেকে মাটিতে পড়ে গেলে সমস্ত জগৎ অন্ধকার হয়ে যায়। সেইসময় তার ছেলে সোম আলো দিয়ে জগৎকে অন্ধকার মুক্ত করেন। সূর্য স্বর্গ থেকে পড়ে যাবার সময় অত্রির দ্বারা স্বস্তি তৈহস্ত এরূপ কথা বলার পর আর পড়লেন না। মহাতপা সবিতা অত্রির কন্যাদের মধ্যে নিজের গোত্র উৎপাদন করেন। অত্রির সাহায্যে দেবতাদের যজ্ঞভাগী হন। তিনি নিজের তুল্য দশপুত্র উৎপাদন করেন। এরা তপস্যার প্রভাবে জ্যোতির্ময়, বেদে

পারদর্শী। এদের আবার দুইজন ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র জন্মায়। এরা হলেন দত্তাত্রেয় আর দুর্বাশা। এদের অবলা নামে একটি বোনও ছিল। পুরাণে বলা হয়েছে অত্রিপুত্র মহাত্মা দত্তাত্রেয়া, ভগবান বিষ্ণুর তনুস্বরূপ। এদের বংশে শ্যাম, মৃদুগল, বলারক পবিষ্টি নামে চারজন মহাবল পুত্র জন্মায়।

কশ্যপ থেকে নারদ পর্বত, ও অরুন্ধতী জন্মে। অরুন্ধতী যেসব প্রজা প্রসব করেন, তাদের নাম বলছি শুনুন। নারদ বশিষ্ঠের হাতে অরুন্ধতিকে সম্প্রদান করেন। পূর্বে দেবাসুর সংগ্রামে উপস্থিত হলে, অনাবৃষ্টির জন্য প্রজারা মারা যাওয়ায়, বশিষ্ঠ করুণা করে তপস্যার প্রভাবে আবার অন্ন, ফলমূল, ওষধি ইত্যাদি দিয়ে তাদের রক্ষা করেন। ভগবান বশিষ্ঠ ভগবতী অরুন্ধতীর গর্ভে ব্যক্তি নামে পুত্র উৎপাদন করেন। দ্বৈপায়ণ গুণবান পুত্র শুকদেবকে পেলেন। পীরবীর গর্ভে শুকদেবের ছটি সন্তান জন্মে। তাদের নাম প্রভু, শম্ভ, কৃষ্ণ, গৌর ও ভুরিশ্রবা সুকের আর মেয়ের নাম কীর্তিমতী। এই কীর্তিমতী যোগজননী। ইনি সাত্ত্বগুহের পত্নী। পরাশরদের এই কটি কথা আছে। ঘৃতাচীর গর্ভে বশিষ্ঠের কুশীতির নামে এক ছেলে জন্মে। পৃথুনন্দিনীর গর্ভে বসু নামে তার আর এক পুত্র জন্মে। বসু পুত্র উপমন্যু। উপমন্যুর বংশধরেরা উপমন্যু নামে খ্যাত। মিত্রা বরুণেরা কন্তিন নামে বিখ্যাত বংশধরের একমাত্র বংশ সম্ভুত বলে সবাই বশিষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ। এইযে বংশবিবরণ এটি বশিষ্ঠের একাদশ পক্ষ, আগের আট ঋষি ব্রহ্মার মানস পুত্র। এদের বংশধরেরা পরস্পর ভ্রাতৃ সম্পর্কে সম্বন্ধে। এরাই পরস্পর ক্রমে দেবর্ষিদের নিয়ে এই তিন লোক ধারণ করেছেন এবং এঁদের শত সহস্র পুত্রেরা সূর্যরশ্মির মত সমস্ত জগৎ ব্যপ্ত হয়ে রয়েছেন।

একাত্তরতম অধ্যায়

ব্রাহ্মণেরা সূতের এই সকল বিবরণ বিস্তারিতভাবে শুনে অবশিষ্ট বিষয়ে শোনার জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। শাংশপরান বললেন– যিনি আগে দক্ষ কন্যা সতী ছিলেন, তিনি কিভাবে মেনকার গর্ভে উমা হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন? মেনা যাঁদের মানসী কন্যা, মেনাক দৌহিত্র, একপর্ণা। উমা এবং সর্বপূর্বজা গঙ্গা যাঁদের দৌহিত্রী, সেই পিতৃগণকে? এঁরা কোথায় থাকেন? কিভাবে তাঁরা উৎপন্ন হয়েছেন। তাদের স্বরূপ কি। যে কারণে এই পিতৃগণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হননা। তার কারণ কি? কোন কোন পিতৃগণ স্বর্গে আর কারাই বা নরকে বাস করেন? কোন, কোন শ্রাদ্ধে পিতা, পিতামহ, ও প্রপিতামহের নাম উল্লেখ করে তিনটি পিণ্ড, দান করতে হয়? নরকের পিতৃগণ ও কি প্রকারে ফল প্রদানে সক্ষম?

ঋষিরা এইসকল বৃত্তান্ত সূতকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতে লাগলেন- মন্বন্তরগুলিতে পিতৃগণ জন্মগ্রহণ করেন। তারা দেবপুত্র, অতীত-ভবিষ্যতের ভেদের জন্য জ্যেষ্ঠত্ব বা কনিষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা হয়। পূর্বে মন্বন্তরের শেষে দেবতাদের সাথে যারা অতীত হয়েছেন, এবং যারা এখনও রয়েছেন, তাদের বিবরণ আমি বলছি। মানুষদের শ্রদ্ধার সঙ্গে নিবেদন করা বস্তুই এঁদের শ্রাদ্ধ। ভগবান ব্রহ্মা দেবতা সৃষ্টি করলেও তাদের পূজা করেন নি। এজন্য তারা ব্রহ্মাকে উপেক্ষা করে নিজেরাই সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেন, এরজন্য ব্রহ্মা তাদের শাপ দিলেন। ঐ দেবতারা আবার প্রণত হয়ে পিতামহের কাছে দয়া প্রার্থনা করলেন। তখন ব্রহ্মা তাদের বললেন–তোমরা প্রায়শ্চিত্ত করো। তোমরা ব্যাভিচার করেছে, তোমরা তোমাদের পুত্রদের জিজ্ঞাসা কর, তাহলেই জ্ঞান জন্মাবে। এরপর প্রায়শ্চিত্তকামী ওইসব দেবতারা নিজের পুত্রদের প্রায়শ্চিত্ত বাক্য মন দিয়ে শ্রবণ করলেন এবং কর্মজ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

দেবতারা পুত্রদের কথায় সংজ্ঞা লাভ করলেন। খুশি হয়ে বললেন–তোমরা আমাদের পিতা, আমরা তোমাদের পুত্র। ধর্মজ্ঞান অথবা কাম, কোন বর তোমাদের দেব বল? ভগবান ব্রহ্মা দেবতাদের বললেন– তোমরা সত্যবাদী। তাই তোমাদের পুত্রদের যা বলেছ, তার অন্যথা হবে না। তোমরা বলেছে–আমারা তোমাদের পুত্র। এজন্য তোমাদের বর দিলাম। ব্রহ্মার বরে পুত্রেরা পিতৃত্ব-প্রাপ্ত হলেন আর পিতারা পুত্রত্ব লাভ করল। ঐ পুত্রেরা পিতৃগণ নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মা আরও বলেছিলেন, যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে পিতৃদের পুজো না করে অন্য কাজ করে, তার ঐ কাজের ফল দানব ও রাক্ষসেরা ভোগ করে থাকে।

শ্রাদ্ধে আরাধিত পিতৃগণ আপ্যায়িত হয়ে অব্যয় সোমকে বর্ধিত করে থাকেন। সোম শ্রাদ্ধ দিয়ে আপ্যায়িত হয়ে সবনপর্বত চরাচর সমস্ত জগৎ আপ্যায়িত করেন, যে মানুষ পুষ্টি কামনা করে শ্রাদ্ধ দান করেন, পিতৃগণ তাদেরকে সবসময়ই প্রজা ও পুষ্টি বিতরণ করেন। শ্রাদ্ধে নাম গোত্র উল্লেখ করে তিনটে পিণ্ড দান করলে, পিতা থেকে প্রপিতামহ পর্যন্ত সবসময় সন্তুষ্ট হয়ে পিণ্ডদাতা সন্তানদের আপ্যায়িত করেন।

ব্রহ্মা বলেছেন, শ্রাদ্ধ দিয়েই দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা সিদ্ধ হয়ে থাকে। পিতৃগণই তোমাদের জ্ঞান প্রদান করবেন। পিতৃগণই দেবতা এবং দেবতাগণই পিতৃদেব। এরা পরস্পর পিতা। মুনিগণ এবার সূতকে জিজ্ঞাসা করলেন–দেবতাদের সোমবর্ধন, দেবতা প্রতীম পিতৃগণ কত সংখ্যক কোন কালে তারা বর্তমান থাকেন? সূত বললেন–আগে শংয়ু, পিতা বৃহস্পতির কাছে যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি সেই পিতৃসর্গ বলছি।

পিতা বৃহস্পতিকে পুত্র শংযু একবার বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন–হে তাত, যাদের আমরা পিতৃদেব বলে জানি, তারা কে? তাঁরা সংখ্যায় কত? কি নাম বা কিভাবে প্রাদুর্ভুত হয়েছেন? এদের কেন পিতৃগণ বলে? সবার আগে যজ্ঞে তাঁদের পূজা করা হয় কেন? শ্রাদ্ধ কাকে বলে? কিরূপ দান মহাফলজনক? কোন তীর্থ বা নদীতে শ্রাদ্ধ করলে অক্ষয় ফল দেয়? কোন্ স্থানে শ্রাদ্ধ করতে গেলে শ্রাদ্ধের নির্দিষ্ট কাল কি কি? শ্রাদ্ধের বিধি কি প্রকার? এইসব বিষয়ে আমি বিস্তারিত ভাবে শুনতে চাই।

পুত্র শংযু এভাবে জিজ্ঞাসা করলে বৃহস্পতি তার উত্তরে বললেন– হে পুত্র, তুমি আমায় কয়েকটি উত্তম প্রশ্ন করেছো, এর উত্তর আমি যথাযথ দিচ্ছি। যখন স্বর্গ, পৃথিবী, নক্ষত্র দিক, সূর্য, চাঁদ, দিন ও রাত কিছু ছিল না, তখন সবাই অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। ব্রহ্মা তখন কঠিন তপস্যা শুরু করেন। পিতার কথা শেষ হতে না হতেই শংযু জিজ্ঞাসা করেন– হে পিতঃ। সর্বভূতেশ প্রজাপতি কিভাবে তপস্যা করে ছিলেন?

বৃহস্পতি তখন উত্তরে বললেন–যে, তপোযোগ সব যোগের শ্রেষ্ঠ। ভগবান ব্রহ্মা এই যোগ অবলম্বন করেই ধ্যানের মধ্যে দিয়ে তিন লোকের সৃষ্টি করেন। ভগবান ব্রহ্মা প্রথমে ভূত ভবিষ্যৎ, জ্ঞান লোক ও সমস্ত বেদ প্রকাশ করেন। প্রভু তপস্যা ও যোগের মধ্যে দিয়ে প্রথম দেবতাদের সৃষ্টি করেন। এঁরা আদি দেব নামে খ্যাত। সর্বকামপ্রদ, মহাতেজার, আদিদেবরা দানব ও মানুষেরও পূজ্য। এরা সাতজন এবং ত্রিলোকে পূজিত। এঁদের মধ্যে তিনজন অমূর্ত ও চারজন সমূর্তি সম্পন্ন। এঁদের থেকেই প্রথমে দেবতারা, তারপর ভূমি, তারপর তোক পরম্পরা, তারপর মেঘ, বৃষ্টি আর বৃষ্টি থেকেই লোক সৃষ্টি তারা যোগবলে অন্ন ও ভগবান সোমকে আপ্যায়িত করেন। এ জন্যই তারা লোকপিতা। তাদের লোভ, মোহ ও ভয় নেই, তাঁদের সংশয় নেই, এবং তারা শোকবর্জিত। এরা তোক পরিত্যাগ করে সুমঙ্গল লোকপ্রাপ্ত হন। এঁরা স্বর্গীয়, সুপুণ্য, মহাত্মা ও বিগত পাপ। এই ব্রহ্মাবাদীরা যুগ সহস্রের শেষে জন্ম নেন ও আবার যোগ অবলম্বন করে অবয়বহীন হয়ে মোক্ষ লাভ করেন। যারা গুরুপূজা প্রভৃতি শুভ কর্মের আচরণ করেন, তাদের ঐ ক্রিয়া দিয়ে যোগবৃদ্ধি হয় ও পিতৃগণ আপ্যায়িত হন। পিতৃগণ শ্রাদ্ধে খুশি হয়ে যোগ অবলম্বন করে সোমকে আপ্যায়িত ও জগৎকে জীবিত করে থাকেন।

তাই এই পরমযোগী পিতৃগণকে যত্ন সহকারে শ্রাদ্ধ দান করা কর্তব্য। যোগই পিতৃগণের পরম ফল এবং যোগ থেকেই সোমদেব প্রবর্তিত হন। একজন যোগবিদ ব্যক্তিকে খুশি করতে পারলে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজনের সমান ফল লাভ হয়। সহস্র ব্রাহ্মণ শত স্নাতক, এক

যোগচার্যকে খাওয়ালে মহৎ ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হাজার গৃহস্থ, শত বানপ্রস্থ, সহস্র ব্রহ্মচারী অপেক্ষা একযোগী বিশিষ্ট, যোগী ব্যক্তি যেমন হোন না কেন, নাস্তিক, সংকীর্ণ অকর্মা, চোর, তবু কোন বিচার না করে তাকেই দান করা উচিত।

যদি কোন তপস্বী জলমাত্র গ্রহণ করে এক বছরকাল একপদে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেন, তাহলেও ধ্যানযোগীকে তার থেকে শ্রেষ্ঠ বলতে হবে। এটি হল ব্রহ্মার অনুশাসন। সিদ্ধগণ বিপ্রবেশে এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন, এজন্য অতিথিকে কৃতাঞ্জলি হয়ে সাদরে গ্রহণ করবে এবং তাকে অর্ঘ্য দিয়ে। পদসেবা করে আশ্রয় ও ভোজন দিয়ে অতিথি সৎকার করবে। যোগেশ্বর দেবতারা নানা রূপ ধারণ করে এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন। তাই নর, বিপ্র ও অতিথিদের সবসময় দান করবে। এতক্ষণ আমি দান ও ফলের কথা বললাম।

হাজার অশ্বমেধ, শত রাজসূয় ও হাজার পুণ্ডরীক যজ্ঞ থেকে যোগীদের সংসর্গে বাস করা অনেক পুণ্যজনক। এই অমিততেজা পিতৃগণই আদি। এরপর অবশিষ্ট পিতৃগণ এবং সন্ততি, সংস্থিতি ও ভাবনা প্রভৃতি বিষয় যথাক্রমে বলছি।

.

বাহাত্তরতম অধ্যায়

স্বর্গে শ্রেষ্ঠ সাতজন পিতৃগণ অবস্থান করেন। এদের মধ্যে তিনজন মূর্তিমান ও চারজন অমূর্ত– সূত এই কথা বললেন। এখন তাঁদের প্রজাসর্গ বলছি শুনুন। তাদের ধর্মমূর্তিধর কন্যা ও দৌহিত্রদের ধর্মমূর্তি তিনটে গণ আছে। স্বর্গে বিরজা নামে যেসব ভাস্বর লোক আছে, তারা অমূর্ত পিতৃগণ এবং তারা প্রজাপতির পুত্র। বিরজা লোকের বাসিন্দারা বৈরাজ নামে প্রসিদ্ধ। বৈরজরা প্রথম কল্প। মেনা ঐ পিতৃগণের মানসী কন্যা, ইনি হিমবানের পত্নী। ইনি মৈনাককে প্রসব করেন। মৈনাক সর্বোষধির, রত্নাকর পর্বতপ্রবর ও পবিত্র। ক্রোঞ্চ পর্বত এঁর পুত্র, শৈলরাজ মেনার গর্ভে তিন কন্যা জন্মে। এঁরা হলেন অপর্ণা, পর্ণা এবং একপাটলা। অপর্ণা গৃহ ছেড়ে একপণী বটগাছ আশ্রয় করে এবং একপাটলা একটি পাটলা গাছকে আশ্রয় করে লক্ষ বর্ষ কাল কঠিন তপস্যা করেন।

একপর্ণা একটি মাত্র পাতা, একপাটলা পাটল মাত্র খেয়ে দু'হাজার বছর কাটিয়ে দেন। এঁদের মধ্যে প্রথমা অর্পণা একেবারে উপবাসী থাকতেন। এজন্য তাঁর মা মেনা দুঃখিত হয়ে 'উ' 'মা' অর্থাৎ অনাহারে থেকে এরকম তপস্যা করো না, এরকম নিষেধ করেছিলেন। এই জন্য দুশ্চর ব্রতচারিণী মহাভাগ অপর্ণা এই পৃথিবীতে উমা নামে খ্যাত। যতদিন পৃথিবী থাকবে এই তিনজন তপঃ শরীর, যোগবলান্বিতা শুরু করবে কিভাবে? এদের মধ্যে উমা হলেন মহা যোগী। এই উমাদেবী মহাদেবকে স্বামীরূপে পেয়েছিলেন।

দন্ত, কাম্ব, উশনা, ভৃগুনন্দন উমার ছেলে। অসিতের পত্নী একপর্ণা। ইনি সাধ্বী, তপোব্রতা। এঁর মানসপুত্র বরিক্ষ্ঠ, দেবল। তৃতীয় কুমারী একপাটলা শত শিলাকের পুত্র জৈগীষব্যকে পতিত্বে বরণ করেন। এঁর অযোনিজ-দুই পুত্র শঙ্খ ও লিখিত? শঙ্কর ও শঙ্করীরর পরস্পর আকাঙ্ক্ষায় ভীত হয়ে অগ্নিকে পাঠালেন বিঘ্ন ঘটানোর জন্য। মিলন না হওয়ায় দেবী রেগে গিয়ে অগ্নিকে অভিশাপ দিলেন।

তুমি আমার রতি বিঘ্ন ঘটিয়েছো, এজন্য তুমি এ শুক্র গ্রহণ করে গর্ভধারণ কর। আমি এই দণ্ডাদেশ দিলাম। হে দ্বিজগণ! তারপর অগ্নি রুদ্রাণীর শাপে গর্ভধারণ করে অনেক বছর কাটিয়ে দিলেন। এবং শেষ কালে গর্ভের কষ্টে কাতর হয়ে গঙ্গার কাছে এসে বললেন– গর্ভধারণ করে আমি খুব ক্লান্তিবোধ করছি। তুমি আমার মঙ্গলের জন্য গর্ভধারণ কর। তোমার কষ্ট হবে না। গঙ্গা খুশি হয়ে বললেন–তথাস্তু। অগ্নির মতো দীপ্যমান মহাতেজা রুদ্রাগ্নি সিদ্ধগণেরা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলো। কুমারের জন্মের পর সিদ্ধগণেরা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলো। মধুর স্বরে দুন্দুভি বাজতে লাগলো গন্ধর্বরা গান গাইতে লাগলো। যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, কিন্নর, হাজার মহানাগ, পতঙ্গ অগ্নি শুদ্ধপুত্র কুমারকে দেখার জন্য সেখানে এল। মায়ের মতো স্নেহময়ী দেবপত্নীরা সপ্তর্ষি ভার্যাদের সাথে এসে কুমারকে অভিষেক করলেন।

কুমার সবাইকে দেখবার জন্য কৌতুক করে নিজের ছটি মুখ সৃষ্টি করলেন। তার প্রভাবে দৈত্য, রাক্ষসরা নিহত হন। উনি কৃত্তিকাগণের দ্বারা রক্ষিত হয়েছিলেন বলে তিনি কার্তিকেয় নামে পরিচিত হলেন। বাল্যকালে কার্তিকের খেলার জন্য বিষ্ণু ময়ূর, কুকুর, বায়ু, পতাকা, বীণা, স্বয়ম্ভ ছাগ শম্ভু মেষ প্রভৃতি দান করেন। হে বিপ্রগণ, তারকাসুর বধ করবার জন্য দেবতারা এঁকে দেবসেনাপতিত্বে বরণ করলেন। অভিষেকের পর থেকে দেবতারা; প্রমথগণ, ভূতগণ, বিবিধ মাতৃগণ, ও বিনায়কেরা এঁকে দেব সেনাপতি, নরনায়ক বলতে শুরু করেন।

.

তিয়াত্তরতম অধ্যায়

বৃহস্পতি বললেন– সোমপাদ নামে দেবলোকে একটি লোক আছে। ঐ লোকে মরীচিনন্দন পিতৃগণ। বাস করে। সমস্ত দেবতা ঐ পিতৃণের পূজা করে থাকেন। আচ্ছোদা নামে নদী এঁদের মানসী কন্যা। এর থেকেই আচ্ছেদ সরোবর এসেছে। এই স্বর্গীয় সরোবর আদ্রিকা নামে অপ্সরা ও অসংখ্য বিমানে পরিশোভিত। এই আচ্ছোদা পিতৃগণকে মূর্তিহীন দেখে বিস্মিতা ও দুঃখিতা হন। অন্তঃরীক্ষচারী অমাবসু নামে বসুপিতা আয়ু পুত্রকে বরণ করলেন। ঐ পতিকামা কামরূপিণী ব্যভিচার দোষে স্বর্গ থেকে নীচে পড়ে গেলেন। সেইসময় জ্বলন্ত আগুনের মতো বিমানে অবস্থিত সূক্ষ্ম পিতৃগণকে দেখতে পেয়ে বললেন–আমায় পরিত্রাণ করুন। তারা বললেন–ভয় নেই।

তারা এরকম অভয় দিলে অচ্ছোদা পতন থেকে মুক্তি পেয়ে অতি করুণ স্বরে তাদের খুশি করলেন। পিতৃগণ বললেন–তুমি নিয়মের ব্যতিক্রম করে নিজের দোষেই পতিত হয়েছে। দেবগণ যেরূপে শুভাশুভ কর্ম করে থাকেন, ঐ জন্মেই একই অঙ্গ দিয়ে সেই কর্মের ফল ভোগ করেন। কিন্তু মানুষের কর্মফল মরণের পর ফলে থাকে। তাই তুমি জন্মান্তরে কর্মফলে অমাবসুকে পিতৃরূপে পাবে। অচ্ছোদার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ধ্যান যোগে ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি জেনে বললেন–মহাত্মা অমাবসু মানুষ ও রাজা হয়ে ধারতলে জন্মগ্রহণ করলে, তুমি তার কন্যা রূপে জন্ম নিয়ে আবার নিজ লোকে আসবে।

তুমি আঠাশ দ্বাপর যুগে মৎস্যযোনী পেয়ে অমাবসু থেকে অদ্রিকার গর্ভে জন্মাবে। আর পরাশর ঋষির পুত্রকে উৎপাদন করবে। তুমি শান্তনুর বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে দুই কীর্তিমান পুত্রের জননী হবে। এইসব পুত্র হলে আবার তুমি নিজের লোকে ফিরে আসবে। পিতৃগণ দ্বারা একথা বিবৃত হলে আচ্ছাদা দাসকন্যা সত্যবতী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। গঙ্গা ও যমুনা এই উভয়ের সঙ্গমে আদ্রিকা নামে মৎস্যযোনিতে অমাবসু রাজার বীর্যে তাঁর জন্ম হয়। বিরজা নামে লোকস্বর্গে পিতৃগণ দীপ্তি পেয়ে থাকেন। পিতৃগণের মানসী কন্যা হল পীবরী। ইনি আঠাশ দ্বাপরে যোগিনী, যোগমাতা হবেন।

পরাশর ফুল থেকে উদ্ভূত শুক মহাযোগী মহাতপা। ইনি পীরবী নামে এক কন্যার জন্ম দেন। ঐ কন্যা যোগ মাতৃস্বরূপিণী। ইনি ব্রহ্মদত্তের জননী ও অনুহের মহিষী ছিলেন। ধর্মাত্মা

শুকদেব এই সন্তান সন্ততি উৎপাদন করে মহাযোগ অবলম্বন করে গতি লাভ করেছেন। ইনিই আবার কালান্তরে সর্বব্যাপী মুক্ত মহামুনি হবে।

পিতৃগণের মধ্যে যারা ধর্মমূর্তিধর, তারাই মূর্তিহীন। এই তাদের তিনগণ বলা হয়। এবার চতুর্থ গণেরা হল মূর্তিমান এবং মহাপ্রভ। এরা অগ্নি কন্যা স্বধা থেকে উৎপন্ন। এই পিতৃগণ জ্যোতির্ময় দেবালোকে বিরাজ করেন। এই পিতৃগণের গো নামে মানসী কন্যা স্বর্গে রয়েছেন। ইনি শুক্রের প্রিয় মহিষী ছিলেন। সনৎকুমার এঁকে সম্প্রদান করেন।

ভার্গবদের একত্রিশ সংখ্যক বংশধির বিখ্যাত, এঁদের লোক মরীচিগর্ভ। এরা অঙ্গিরার পুত্র ও সাধ্যদের সাথে বর্ধিত। স্বর্গে উপহুত নামে এক দীপ্ত পিতৃগণ আছেন। ক্ষত্রিয়রা এঁদের উপাসনা করে থাকেন। এঁদের মানসী কন্যার নাম যশোদা। এই যশোদা বিশ্বমহতের পত্নী। বিশ্বকর্মার পুত্রবধূ ও মহাত্মা খট্টাঙ্গ নামে রাজর্ষির জননী। আগে এই খট্টাঙ্গের যজ্ঞে মহর্ষিরা গান করেছিলেন। পিতৃগণ যজ্ঞে অগ্নির আবির্ভাব দেখে মহাত্মা শান্তিল্যের যজ্ঞমান দিলীপ ও সত্যবানকে দর্শন করেন। এই স্বর্গজয়ী অমররাই আদ্যপা নামের পিতৃগণ।

এঁরা পুলহ থেকে উৎপন্ন এবং কর্দম প্রজাপতির পিতা। এরা স্বর্গ লোকে বিমানে করে আকাশমন্তলে বিচরণ করেন। বৈশ্যরা এঁদের শ্রাদ্ধে আপ্যায়ন করেন। এদের বিরজা নামের মানসী কন্যা যযাতির জননী। ইনি আবার নহুষের পত্নী। বশিষ্ঠ প্রজাপতির সুকালা নামে পিতৃগণ, এঁরা, হিরণ্য গর্ভের সূত। শূদ্রগণ এঁদের উপাসনা করেন। স্বর্গের মানসলোকে এঁদের বাস। নর্মদা এদের মানস কন্যা।

দক্ষিণ দেশগামিনী নর্মদা জীবের মঙ্গল করেন। পুরু কুৎসের পত্নী ইনি, দস্যুর জননী। মনুই মন্বন্তরে প্রথমে পিতৃ লোকদের শ্রাদ্ধ প্রবর্তিত করেছেন। তাই দ্বিজগণ! স্বধর্ম রক্ষার জন্য শ্রদ্ধার সাথে রূপোর পাত্রে পিতৃলোকদের শ্রাদ্ধদান করা অবশ্য কর্তব্য। স্বহা মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রাদ্ধ দান করতে হয়। এতে পিতৃলোক খুব খুশি হয়।

অগ্নিতে হোম করে সোম, অগ্নি, ও বৈবস্বতকে আপ্যায়িত করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি ভক্তি ভরে পিতৃগণকে খুশি করেন, পিতৃগণ খুশি হয়ে তাকে তার ইচ্ছামত বর দিয়ে পরিতৃপ্ত করেন। পিতৃগণ সন্তান প্রার্থী ও পুষ্টিকামী সন্তানদের সন্তান, পুষ্টি ও শেষে স্বর্গদান করে থাকেন। দেবতার কার্যের থেকে পিতার কার্য কঠিন। কারণ শাস্ত্রে বলা আছে, দেবতাদের আগে পিতৃগণকে আপ্যায়ন করা উচিত। এতক্ষণ আমি পিতৃগণের স্বরূপ, তাদের লোক, দুহিতা, দৌহিত্র, যজমান সমস্ত কিছুর বিবরণ দিলাম। চারজন মূর্তিমান ও তিনজন

অমূর্ত পিতৃগেণের শ্রাদ্ধ দেবতারা যত্ন সহকারে করে থাকেন। ইন্দ্র, মরুৎ, ব্রহ্মাদি দেবতা, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা সমস্ত ঋষি, যক্ষ, নাগ, সুপর্ণ, কিন্নর, সবাই একমনে পিতৃগণের পূজো করে থাকেন।

এই আত্মা পিতৃগণ শ্রাদ্ধে পরিতৃপ্ত হয়ে সমস্ত প্রজাদের শত সহস্র বর দান করেন। ত্রৈলোক্য, সংসার ও জরা-মৃত্যু ভয় ছেড়ে পিতৃগণেরা মোক্ষ ও যোগ ঐশ্বর্য দান করে থাকেন। যোগ ও উত্তম বিত্তই ঐশ্বর্য স্বরূপ, যেমন পাখনা ছাড়া পাখি উড়তে পারে না, তেমনি ঐশ্বর্য ছাড়া কোন প্রকার লাভ হয়না। সনাতন মোক্ষধর্মই সমস্ত ধর্মের শ্রেষ্ঠ। পিতারা সন্তুষ্ট হলে, সমস্ত কামদায়ক অপ্সরাগণ, বিমান, প্রজা, পুষ্টি, স্মৃতি, মেধা, রাজ্য, আরোগ্য, কোটি, রত্ন, মুক্তা, বৈদুর্য, বাস এবং বাজি, নাগ, হংস, সমুক্তা শোভিতা বিমান লাভ করেন।

.

চুয়াত্তরতম অধ্যায়

বৃহস্পতি বললেন– সোনা, রূপা ও তামা রূপা খচিত পাত্রই পিতৃগণের প্রশস্ত পাত্র। পিতৃগণের উদ্দেশ্যে রূপা দান, অক্ষয় স্বর্গীয় দান বলা হয়। সৎ পুত্রেরা এইসব দান দিয়ে পিতৃলোককে উদ্ধার করে থাকেন। কৃষ্ণজিন সান্নিধ্য, দর্শন, দান ও ব্রহ্মাচর্যের মন্ত্র এইসব দ্রব্য ও মন্ত্র পিতৃগণকে উদ্ধার করে। সোনার পাত্র, রূপার পাত্র, তামার পাত্র, দৌহিত্র, দিবাভাগের অষ্টমভাগ, তিল, বস্ত্র ইত্যাদি দ্রব্য, ত্রিদণ্ডী যোগ শ্রাদ্ধের কাজে ভাল। এটাই সনাতন বাহ্যবিধি বলা হয়। এই বিধি শ্রাদ্ধকারীর আয়ু, কীর্তি, প্রজা ও সন্তান বর্ধন করেন।

যেখানে শ্রাদ্ধ করা হয় ঐ জায়গায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণের জায়গা বিদিকস্থান নামে বিখ্যাত। পিতৃগণের অনুশাসনের জন্য শ্রাদ্ধ সম্বন্ধীয় নানা স্থানের কথা বলব। শ্রাদ্ধীয় স্থান কীর্তনে ধন, আরোগ্য, আয়ু, বল বাড়ে। শ্রাদ্ধের জায়গায় তিনটে গর্ত ও তিনটি খদির কাঠের দণ্ড করতে হবে। গর্তগুলি রজত খচিত হবে আর দণ্ড চার আঙুল পরিমাণ বেষ্টন বিশিষ্ট হবে। ঐ নিচ্ছিদ্র দণ্ডগুলি পূর্ব-দক্ষিণ মুখ করে মাটিতে পেতে পবিত্র কার্য, জল ও ছাগলের দুধ দিয়ে শুচিভাবে ধুয়ে দিতে হবে। এইভাবে তর্পণ করলে তর্পণকারী ব্যক্তি ইহালোকে শ্রীমান ও সর্বগুণসমিন্বিত হয়। এইভাবে পিতৃদেবের অর্চনা করলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়।

চার আঙ্গুল মাটির গর্তে অমাবস্যার দিনে তর্পণের বস্তু স্থাপন করতে হয়। এটি ত্রিসপ্ত যজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ। সেই ব্যক্তি ঐশ্বর্য, আয়ু, সন্ততি, লক্ষ্মী ও মোক্ষ লাভ করে। এই যজ্ঞের

ব্রহ্মানির্মিত অমৃতময়। মন্ত্র বলছি- যথা দৈবাতাজ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিত্য বে চ, ‘নম স্বধায়ে স্বাহায়ে’ নিত্যমেব ভবন্তুযতে। শ্রাদ্ধে আদিতে অবসানে ও পিন্ড প্রদানের সময় এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করতে হয়। এই মন্ত্র পাঠ করলে পিতৃলোকরা। তিন লোক থেকে উদ্ধার করে।

নিয়মিত ভাবে এই মন্ত্র জপ করলে পিতৃলোক প্রীত হয়। আমি অমূর্ত, সমূর্ত, দীপ্ততেজা, ধ্যানী, যোগচক্ষু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের সপ্তর্ষি গনের পিতা পিতৃগণকে নমস্কার করি, মনু, সুরেশ, সূর্য, চাঁদ, চর, নক্ষত্র দিয়ে পৃথিবী এবং দেবর্ষিদের ও জনয়িতা পিতৃগণকে হাতজোড় করে প্রণাম করছি। প্রজাপতি, কশ্যপ, সোম, বরুণ ও যোগ যোগেশ্বর প্রভৃতি পিতাদের নমস্কার করি। সাতলোকের সাত পিতৃগণকে ও যোগচক্ষু স্বয়ম্ভ ব্রহ্মাকে আমার নমস্কার, সপ্তর্ষি সাথে ব্রহ্মর্ষিদের পূজিত এই মন্ত্র আমি বললাম। যে মানুষ বিধিপূর্বক এই অনুষ্ঠান করে সে অন্ন, আয়ু, ও সুত এই তিনবর পিতৃগণের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পরম ভক্তি ভরে, শ্রদ্ধার সাথে সপ্তচিষ মন্ত্র জপ করেন, তিনি এই সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসাগর বেষ্টিত পৃথিবীর রাজা হন। বাড়িতে যে ভোজ্য বস্তু তৈরি হয়ে থাকে, সেগুলি পিতৃগণকে নিবেদন না করে খেতে নেই।

.

পঁচাত্তরতম অধ্যায়

বৃহস্পতি বললেন–শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি পলাশ পাত্রে শ্রাদ্ধ করলে ব্রহ্মচর্য, অশ্বত্থ পাতায় শ্রাদ্ধ করলে রাজ্য, পাকুড় গাছের পত্রে শ্রাদ্ধ করলে সর্বভূতাধিপত্য, বটগাছের পত্রে শ্রাদ্ধ করলে পুষ্ট প্রজা, ধৃতি ও স্মৃতি, কাস্পর্য পত্রে রাক্ষস হানি ও যশ, মধুক পত্রে উত্তম সৌভাগ। ফল্প পত্রে সর্বকামনা, বিপত্রে লক্ষ্মী, মেধা ও আয়ু লাভ করে। বেনুপত্রে শ্রাদ্ধ করলে শ্রাদ্ধ কারীর শস্যক্ষেত্রে অজস্র বর্ষণ করেন, ঐ সব পত্রে যে একবার শ্রাদ্ধদান করেন তিনি নিখিল যজ্ঞের ফলভাগী হন। এভাবে যিনি পিতৃগণকে সুগন্ধি মালা দান করেন, তিনি দিবাকরের মতো দীপ্তি। যিনি মধুদই দিয়ে শ্রাদ্ধ করে ধূপ প্রভৃতি দান করেন তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করেন। যে ব্যক্তি দীপদান করে সে অপ্রতিম চোখ লাভ করে, তেজ, যশ, কান্তি ও বলে পৃথিবীতে বিখ্যাতনামা হয়ে স্বর্গ গমন করে।

দ্বিজেরা প্রথমত ফল, মূল, ধূপদীপ দিয়ে নমস্কার করে, অন্ন প্রভৃতির দিয়ে পুজো করেন। শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণ বায়ুভূত হয়ে দ্বিজ শরীরে আবিষ্ট থাকেন। সুতরাং শ্রাদ্ধকালে অন্ন, বস্ত্র, ভোজ্য ভোক্ষ্য, পেয়, গো, অশ্ব, গ্রাম দান করে দ্বিজত্তমদের পূজা করতে হয়। ব্রাহ্মণরা

ডানহাত দিয়ে দভত, পিণ্ড, ভক্ষ্য, নানা ফুল গন্ধ ও অলঙ্কার একে একে পিতৃগণ এর উদ্দেশ্যে দান করবেন। পিতৃগণকে অন্ন দিয়ে তাদের নাম গোত্র উল্লেখ করে তাদেরকে বস্ত্র, অর্থ, সূত্র দান করবেন।

শ্রদ্ধকারী মাটিতে বসে ঘি, তিল মিশিয়ে তিনটে পিণ্ড পিতৃউদ্দেশ্যে মাটিতে নির্বাপন করবেন। শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি অন্ন, জল, ফুল, ভক্ষ্য দিয়ে মাতামহ পক্ষেরও শ্রাদ্ধ করবেন। আচার্যরা বলে থাকেন, তিনটি পিণ্ড মাতা পক্ষেও 'নমোব'ঃ পিতরঃ সুম্মে এই মন্ত্রে ডানহাত দিয়ে যত্নের সঙ্গে দান করা হয়। ব্রাহ্মণেরা উলুখল, পরিষ্কৃত পান উদক পাত্র থেকে জল ও নতুন ক্ষৌমসূত্র, শোনসূত্র, কাঁপাসিত সূত্র পিতৃগণকে প্রদান করবেন। কালো তিল ও তার থেকে যে তেল হয় সেই তেল, চন্দন, অগুরু, তমাল, পদ্ম, ধূপ, সাদা ফুল এবং পদ্মোৎপল এইসব দ্রব্য শ্রাদ্ধে সুপ্রশস্ত। উগ্রফল দেওয়া যাবে না। শ্রাদ্ধে প্রধান যজমান স্বয়ং দক্ষিণমুখে বসবেন আর আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা উত্তরমুখে বসবেন। পিতৃগণের সামনে যত্নের সাথে কুশ ও দুর্বা ও পিণ্ডদান করবেন।

এইভাবে বিধি অনুযায়ী নিজেরই পিতামহদের অর্চনা করবেন ভগবান প্রজাপতির চুলগুলি মাটিতে পড়ে কাশ রূপে জন্মেছে। তাই শ্রাদ্ধের কাজে কাশ অবশ্যই প্রয়োজন। ঐশ্বর্যকামী ব্যাক্তি তাতেই পিণ্ডদান করবেন। যে ব্যক্তি একবার মাত্র দক্ষিণ মুখ হয়ে পিণ্ডদানের জন্য কুশ ব্যবহার করে, পূর্ব দক্ষিণ মুখ হয়ে বিধি বাক্য করে, তার প্রজা, কান্তি, প্রজাপুষ্টি, দ্যুতি ও কীর্তি চিরস্থায়ী হয়। কাশ সবসময় পবিত্র ও প্রদীপ্ত হয়ে থাকে। ক্রুদ্ধ বা অন্য মনে শ্রাদ্ধের কাজ করতে নেই। একাগ্রমনে শ্রাদ্ধাদি করতে হয়। যা কিছু অবধ্য তা আমি বিনষ্ট করি।

আমার দ্বারাই অসুর, দানব, রক্ষ, যক্ষ, পিশাচ সমূহ নিহত হয়। সুসংহতভাবে এই মন্ত্রে কুশ দিয়ে একবার বেদী লিখে মঙ্গলময় ঐশ্বর্য কামনায় সেই কুশ উত্তর দিকে ফেলে দিতে হবে। এইভাবে যে। ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধে অন্নদান করে, অসুরেরা তার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না। যে স্থানে এই মন্ত্র পাঠ হয়, সেখানে রাক্ষসরা থাকতে পারে না, অশুচি ব্যক্তি শ্রাদ্ধে অন্নদান এমনকি দর্শনও করতে পারবে না। ব্রাহ্মণরা বিধি মেনে শ্রাদ্ধ করবে।

শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণ সন্তুষ্ট হয় ও রাক্ষসেরা অসন্তুষ্ট হয়। পিতৃগণ প্রসন্ন হয়ে বরদান করেন। পুনর্ভব কাশ দিয়েই সমস্ত কাজ করবে। এরপর যত্ন করে হোম সামগ্রী নিয়ে কার্যসিদ্ধির জন্য অস্বর্গ লৌকিক দ্রব্য হোম করবে। একটা হোমের শেষে, সমিধ হোম করে সমাহিত ভবে অন্য হোম বিধান করবে। হোমের মন্ত্র হল–অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বধা অগ্নিরসে নমঃ সোমায়

পিতৃমতে অগ্নিরসে নমঃ, যমায় অগ্নিরসে স্বধা নমঃ এই তিনটে মন্ত্র দিয়ে হোম করলে কার্যসিদ্ধি হয়।

সধূম আগুনে হোম করলে অন্ধ ও পুত্রহীন হয়। দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, নীল বা কালো অগ্নিতে হোম করলে পরাজয় হয়। উজ্জ্বল শিখা বিশিষ্ট, ঘি ও সোনার মত বর্ণ এবং প্রদক্ষিণ করে জ্বলে এমন আগুনই কার্যসিদ্ধি করে, আগুনের দ্বারাই পূজো পেয়ে পিতৃগণ নিষ্ঠা ভরে অগৌনকারী এই প্রশ্ন করবেন, ব্রাহ্মণরা কুরুত্ব ফল ও সমিধ শ্রাদ্ধের বিষয়ে পবিত্র শাস্ত্রকারী নিষ্ঠাভরে অগৌণকারি এই প্রশ্ন করবেন, ব্রাহ্মণেরা গুরুত্ব বলে আদেশ দিলে, স্ত্রী পুত্র নিয়ে অগ্নিতে হোম করবেন, প্লক্ষ, বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, চন্দন, সবল শাল, দেবদারু গাছগুলি স্বর্গীয়। এদের কাঠ হোমের কাজে প্রশস্ত। গ্রাম কাঁটা গাছ, ও অন্যান্য যজ্ঞীয় গাছ থেকে যজ্ঞের কাঠ থেকে সংগ্রহ করাই প্রশস্ত। এটি পিতৃগণ বলেদেন, পিতৃগণের মন্ত্রের শেষে স্বধা ও দেবতাদের যজ্ঞ কাজে স্বাহা মন্ত্র উচ্চারিত হয়ে থাকে।

.

ছিয়াত্তরতম অধ্যায়

সূত বললেন–বৃহস্পতি বিধি অনুসারে নির্দেশ করেছেন যে দেবতা দু-প্রকার পিতৃ দেবতা ও অপিতৃ দেবতা দুজনকেই পুজো করা উচিত।

কিন্তু যজ্ঞবিশেষে দেবতাদের আগে পিতৃদেবকেই পুজা করা বিধেয়। হে ধর্মজ্ঞ। দক্ষের বিশ্বা নামে এক কন্যা ছিল। বিধাতা কন্যাকে ধর্মের হাতে দান করেন। ঐ কন্যার পুত্ররা বিশ্বদেব নাম প্রসিদ্ধ। এই ত্রিভুবন বিখ্যাত, সর্বলোক নমস্কৃত বিশ্বদেবগণ রমণীয় হিমাচল শিখরে সমস্ত অপ্সরা ও দেব গন্ধর্বের মহৎ উগ্র তপস্যা করেন। তপস্যায় পিতৃগণ সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর আমিও যথেষ্ট খুশি হয়েছি তোমরা কোন্ বর চাও বল? তখন বিশ্বদেবগণ একসাথে বললেন–শ্রাদ্ধে আমাদের অংশ থাকুক। এটাই আমাদের কামনা। তখন ব্রহ্মা ও পিতৃগণ বললেন–তাই হবে। এ পৃথিবীতে যেখানে যে শ্রাদ্ধকার্য হবে সব কাজেই আমাদের সাথে সাথে তোমাদের ভাগ রক্ষিত হবে। তোমাদের আসন আগে হবে।

মানুষেরা মালা, গন্ধ, অন্ন দিয়ে তোমাদের পূজা করার পর, আমাদের ঐসব নিবেদন করবে। আমাদের আগে বিসর্জন হবে, তোমাদের হবে পরে। ভূত, দেবতা ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধে রক্ষা ও আতিথ্যের দুটো বিধি আছে। ব্রহ্মা বিশ্বদেবদের এইভাবে বর দিয়ে পিতৃগণের সাথে স্বস্থানে

চলে গেলেন। বেদে মানুষদের পাঁচটি মহাযজ্ঞ বলা আছে। মানুষেরা সবসময় ঐ পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিষ্পন্ন করবে। শ্রাদ্ধ দানকারী ব্যক্তিরা যেখানে ভয় নেই, কষ্ট নেই, অহঙ্কার নেই, শোক নেই, ব্যথা নেই সেই ব্রহ্মলোকে স্থান পান। পঞ্চযজ্ঞ কর্ম শুদ্রদেরও করা উচিত। যে ব্যক্তি পঞ্চযজ্ঞ কর্ম না করে যায়, সে ঋণগ্রস্ত হয়। কেউ বলেন পিতৃলোক জীবিত থাকলেও নৈবেদ্য দান করা যায়।

জলদানের পর বলি ও জলকলস দান করা উচিত। আগে শ্রেষ্ঠ শিং যুক্ত গাভী বলি দিতে হয়। জীবিত পিতাদের পিণ্ড দান কার অনুচিত। নিজের ইচ্ছেমত অন্ন এবং অন্যান্য ভোজ্য দিয়ে পিতৃগণকে খাওয়ানো উচিত। এ সম্বন্ধে বেদবিহিত বিধি আছে। মহাত্মা বৃহস্পতি বলেছেন– আগে পিণ্ডদান করে পরে ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় একজন যোগী ব্রাহ্মণ থাকেন। তবে তিনি যজমানকে উদ্ধার করেন।

যে ব্যক্তি অতিথি ও ধার্মিক ব্যক্তিকে ত্যাগ করে মূর্খ ভোজন করায় সেই দাতা আগের সকর্ম হারিয়ে বিনষ্ট হন। দক্ষিণ মুখ হয়ে জলে দাঁড়িয়ে আকাশকে আচ্ছাদন করবে। দক্ষিণ দিক পিতৃগণের আবাসস্থল। দ্বিজরা আগে একটি পিণ্ড উদ্ধারের কথা বলেছেন, তবে আদেশ দিলে পাঁচটি পিণ্ড উদ্ধার করা যায়। পুষ্প, ফল, ভোজ্য অন্নের অগ্রভাগ উদ্ধার করে আগুনে হোম করতে হয়। যা কিছু উত্তম–অন্ন, ফল ইত্যাদি আগুনে হোম করে পরে দক্ষিণ মুখ হয়ে পিণ্ড দিতে হয়।

বৈবস্বত ও সোমকে পিণ্ড নিবেদন করে পরে উদক আহরণ করে ব্রাহ্মণদের অন্নাদি দিয়ে ভোজন করানো কর্তব্য। ভোজ্য ও সুগন্ধ রস দিয়ে একাগ্রমনে হাত জোড় করে পিতৃগণের উপাসনা করলে সমস্ত ইচ্ছে পূর্ণ হয়। এরপর শ্রাদ্ধকারী লোক স্বধা উচ্চারণ করে অন্ন ইত্যাদি দিয়ে ব্রাহ্মণদের প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে সকার করে হাতজোড় করে সংযত ভাবে বিদায় দেবে।

.

সাতাত্তরতম অধ্যায়

বৃহস্পতি বললেন– হে সৌম্যগণ! যোগাত্মা, মহাত্মা, বিগত পাপ, অব্যয় পিতৃগণ একবার মাত্র অর্চিত হলেও খুশি হয়ে থাকেন এবং মৃত্যুর পর এর স্বর্গ ও সুবিস্তার কম, ঐশ্বর্য লাভের জন্য মোক্ষ লাভ করে যেসব জায়গা অনুগৃহীত করেছেন সেই সব নদী, সরোবর, পুণ্যতীর্থ, দেশ, পর্বত ও আশ্রমের কথা বলছি।

পবিত্র অমরকন্টক একটি ত্রিলোক প্রসিদ্ধ পর্বত। এই পুণ্যময় পর্বতে ভগবান অঙ্গিরা অনেক বছর ধরে কঠিন তপস্যা করেছিলেন। ঐ পর্বতের সীমায় অসুর, রাক্ষস ও মৃত্যুর কোনো গতিবিধি নেই। সেখানে ভয় অলক্ষ্মীও নেই। শৃঙ্গবান ও ম্যাগবান পর্বতের মতো সর্বক্ষণ তেজে দীপ্ত আগুনের মতো ঐ অমরকন্টক পাহাড় যশ ও তেজে দীপ্তি পেয়ে থাকে, ভগবান অঙ্গিরা দক্ষিণ নর্মদার কুশ নামে খ্যাত। এক জায়গায় জলপান করে স্বর্গের সোপান লক্ষ্য করেন। ঐ কুশগুলি মৃদু, সুগন্ধ যুক্ত মসৃণ, মহাতেজা অঘিহরা ঐ কুশগুলি গ্রহণ করেন।

যে ব্যক্তি অমরকণ্টক পাহাড়ে ঐ সব কুশের ওপর পিণ্ডদান করেন, সেই শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয় ও পিতৃগণও তৃপ্ত হয়। ঐ জায়গায় পুণ্যময় জ্বলা সরোবর ও বিশল্যকরণী নদী আজও দেখা যায়। এই সরোবর পর্বতের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে রয়েছে। ঐ সরোবর ও নদীতে স্নান করলে প্রাণীদের পুণ্য হয়। অমরকন্টকের এই সিদ্ধ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তর্পণ করে পিতৃলোককে তৃপ্ত করে তারাই ধন্য, অল্প তপস্যায় তাঁদের সিদ্ধি লাভ হয়। মহেন্দ্র পর্বত ইন্দ্রের থাকার একটি সুন্দর জায়গা, সেখানে শ্রাদ্ধ করলে মহৎ ফল লাভ হয়। সেখানে বিস্বাধঃ শিদ্বয়ে যোগীরা বাস করেন, মানুষ সেখানে গেলে দিব্য দৃষ্টিলাভ হয়।

মানুষ সপ্তগোদাবরী ও গোকর্ণ নামে তপোবনে স্নান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করে। ধূতপাততীর্থে স্নান করে পবিত্র হওয়া যায়। এই গিরির সিদ্ধচারণ সেবিত দেবর্ষি ভবন শৃঙ্গে উঠলে মানুষ স্বর্গে যেতে পারে। ঐ জায়গা থেকে সবসময় চন্দন মিশ্রিত জল বয়ে যায়। ঐসব তীর্থস্থান থেকে তাপণী নদী প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ সাগরের দিকে বয়ে চলেছে। ঐ নদীতে শঙ্খ, মুক্তা উৎপন্ন হয়। নদীর ঐ চন্দন মিশ্রিত শঙ্খ, মুক্তার জল নানা রোগ থেকে মুক্তি দেয়। পাপকারী পিতৃলোকদেরও উদ্ধার করে পুণ্যজনের আবাস, যদির, বিল্ব, পাকুড়, অশ্বত্থ, কাবেরী প্রভৃতি গাছ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দেখা যায়। নর্মদা পিতৃগণের মানসী কন্যা, এতে শ্রাদ্ধ করলে শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়।

পুণ্যময় বিন্ধ্যপর্বতের সাধুরা কখনো কোনো পাপধারা দেখতে পাননা, শুধু পুণ্য ধারাই দেখে থাকেন। সেখানে শুভকাজগুলির সুস্পষ্ট পুণ্যধারাই দেখা যায়। কোশলাতে মাতঙ্গের এক পাপ বিনাশিনী জলাশয় আছে, সেখানে স্নান করলে পাখিরাও স্বর্গে যেতে পারে। কুমার কোশলতীর্থ, কালতীর্থ কালপঞ্জুর পর্বত পাতুকুল সমুদ্রান্ত, পন্ডার কবন, বিমল, বিপাপ, প্রভব, শ্রীবৃক্ষ, গৃধকূট জন্তুমার্গ এবং যোগাচার্য অসিতের পুণ্যময়ী অসিতাতীর্থে শ্রাদ্ধ করলে অনন্তফল দান করে। পুষ্কর তীর্থে শ্রাদ্ধ ও তপস্যা ফলদায়ক। মহোদধি তীরে ও প্রভাসে শ্রাদ্ধ করলেও আগের মত ফলপ্রাপ্তি হয়। নিষ্পাপ যোগেশ্বররা সবসময় ঐ তীর্থের সেবা করে

থাকেন। যেজন ওখানে শ্রাদ্ধ দান করেন তার দেওয়া শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়ে পিতৃগণকে খুশি করে থাকে। অগ্নির সাক্ষাৎ মূর্তির মত ওখানে জাতবেদ নামে এক শিলা আছে। যে ব্যক্তি অগ্নিশিলাতে প্রবেশ করে সে স্বর্গগামী হয় এবং শান্ত নামে অগ্নি হয়ে জন্ম নেয়। ঐ শিলাতে যা দেওয়া হয়, তাই অক্ষয় হয়ে থাকে। জয়শির নামে এক সদ্য বরপদ তীর্থ আছে, ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ দান করলে তা অক্ষয় হয়, শ্রাদ্ধকারী অক্ষয় ফল লাভ করে। কুম্ভতীর্থে শ্রাদ্ধ করলে পাপমুক্ত হওয়া যায়। অজুতঙ্গ নামে তীর্থে সবসময় পিতৃলোকের তর্পণ করা উচিত। এখানে দেবতাদের ছায়া পড়ে।

পাণ্ডবেরা ঐ জায়গায় শ্রাদ্ধ করে নীরোগ হয়। সমস্ত যোগেশ্বর সেবিত তীর্থে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে বা পিতৃঅর্চনা করে, তার পিতৃগণের সাক্ষাৎ লাভ হয়। শিব নামে একটি পুণ্যময় শ্রেষ্ঠ হ্রদ আছে। ব্যাস সর ও ব্রাহ্মসর নামে দুই সরোবর নিয়ে এটি গঠিত। পবিত্র উজ্জ্বন্ত পর্বতে মহাত্মা বশিষ্ঠের পুণ্যময় আশ্রম রয়েছে। ভগবান ব্রহ্মা এইসব তীর্থের মধ্যে পঞ্চম বেদস্বরূপ কপোত নামে তীর্থ রচনা করেন। এই তীর্থে গিয়ে মানুষেরা পাপমুক্ত ও সনাতন গুণের মতো তেজস্বী হয়, ঐ জায়গাতে জপ, হোম ও তপ করলে অনন্ত ফল পেয়ে থাকে। পুণ্ডরীক তীর্থে শ্রাদ্ধ করলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের সমান ফল পেয়ে থাকে।

সিন্ধু সাগরে ও পঞ্চনদ তীর্থে সব কাজই অক্ষয় হয়ে থাকে। মাণ্ডবাতীর্থে মানুষ পবিত্র হয়। সপ্তহ্রদ মানস, মহাকূট, বন্দ, ত্রিকুকুদগিরি, সন্ধ্যা, এবং মহাবেদী এইসব তীর্থে শ্রাদ্ধ করতে হয়। এখানে একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায়। এই দুই তীর্থে অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তি যেতেই পারে না। এখানে অগ্নির শিলা আছে। শ্রাদ্ধ দান করলে অগ্নিকার্য ও শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়। সায়াহ্নে সদ্যোবরপ্রাপ্ত এক তীর্থ আছে, সেখানে মানুষ কৃতত্মা কি অকৃতাত্মা, তা বুঝতে পারা যায়। সপ্তর্ষিরা ঐ তীর্থে পরস্পর হিংসা ত্যাগ করে স্বর্গে যান।

ঐ জায়গাতে নন্দীশ্বরের যে মূর্তি আছে তা পাপী ব্যক্তির চোখে পড়ে না। সেখানে এক কাঞ্চন যুগ আছে, তা প্রদক্ষিণ করলে মানুষ স্বর্গে যায়। কুরুক্ষেত্র তীর্থে তিল দিয়ে পিতৃগণের অর্চনা করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি কুরুক্ষেত্রে বারবার পিতৃশ্রাদ্ধ করে সে পিতার সৎপুত্র ও ঋণমুক্ত হয়। সরস্বতী, ব্যসতীর্থ, গঙ্গা, মৈনাক ও যমুনা তীর্থে শ্রাদ্ধ করা উচিত। যমুনা প্রভাবে শ্রাদ্ধ করলে সব পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই যমুনা যমের বোন ও মার্তণ্ডর কন্যা। ব্রহ্মতুঙ্গ হ্রদে স্নান করামাত্র তখনই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় ও এখানে অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ, জপ, তপ, হোম সব কাজই অনন্তপ্রাপ্ত হয়। মহাতপ বশিষ্ঠ ঐ তীর্থে স্থানভূত হয়ে আছেন।

ঐ তীর্থের গাছগুলি মণিমণ্ডিত দেখা যায়। পিতৃগণ-এর গণকারী নামে এক যোগ পরায়ণা কন্যা দিলেন। ইনি মহাত্মা ব্যাসকে উৎপাদন করেন। মহামুনি ব্যাসদেব এক বেদকে চারভাগে ভাগ করেন। ব্রহ্মতুঙ্গে অচ্ছোদ নামের সরোবরের তীরে পুণ্যাত্মা ঋষিদের আশ্রম আছে। এখানে একবার মাত্র দেওয়া শ্রাদ্ধ অক্ষয় ফল এবং যোগ ও সমাধি দুই-ই উৎপাদন করে।

নন্দা বেদী নামে একটি তীর্থ আছে। যে দুরাচারী, তারা এই তীর্থ দেখতে পায়না। ধীমান মহাদেব দেবালয়ে একপাদে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেন। উমাতুঙ্গ, ভৃগুতুঙ্গ, ব্রহ্মতুঙ্গ, মহালয়, কাত্রবতী, শাণ্ডিলী ও বামগুহা এইসব তীর্থে মানুষ পবিত্র হয়। শ্রাদ্ধ, হোম, তপ, জপ ইত্যাদি অক্ষয় হয়। গুরুভক্ত ব্যক্তিরা ঐ তীর্থগুলিতে একশো বছর ধরে ব্রহ্মচর্য পালন করে আসছেন। ঐ সব তীর্থে স্নান করলে সফল পাওয়া যায়। কালসর্প নামে কশ্যপের মহাতীর্থে ও শালগ্রাম তীর্থে দেওয়া শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়ে থাকে। অসৎ ব্যক্তিরা ঐ তীর্থে যেতে পারে না। ঐ তীর্থে যে হ্রদ আছে সেখানে নাগরাজ সৎ ব্যক্তির দেওয়া পিণ্ড গ্রহণ করেন। ঐ নাগরাজ শ্রাদ্ধে দেওয়া অন্ন খেয়ে শেষ করতে পারে না।

কালঞ্জয়, দশতন, নৈমিষ, কুরুজাঙ্গল, ও বারাণসী তীর্থে যত্নের সাথে শ্রাদ্ধ দান করা কর্তব্য। বারাণসী ধামে যোগেশ্বর সবসময় রয়েছেন। সুতরাং ঐ জায়গাতে দেওয়া শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়। এখানে শ্রাদ্ধ দান করলে মানুষ পবিত্র হয়, অনন্ত ফল লাভ করে। লৌহিত্য, বৈতরণী, স্বর্ণবেদী, সমুদ্রান্ত, গঙ্গা, ধর্মপৃষ্ঠ, পয়া, ব্রহ্মসর ও গৃপ্রকূট এইসব তীর্থে শ্রাদ্ধ করলে মহাফলদায়ক হয়। ভারতের পুণ্যাশ্রম সন্নিধামে এক পবিত্র হ্রদ আছে, তা মানস চোখ দিয়ে দেখা যায়। পঞ্চবন তীর্থে পুণ্যবান ব্যক্তিরা থাকেন। এই স্থানে আজ পর্যন্ত পাণ্ডু বিশালতীর্থ আছে। মহাদেব মুণ্ডপৃষ্ঠ তীর্থে বাস করে। অনেক যুগ ধরে কঠিন তপস্যা করেন। ধর্ম পরায়ণ ব্যক্তি সাপের খোলসের মত পাপ ত্যাগ করে।

লেলিহান সাপেরা সবসময় ফণা বিস্তার করে ঐ তীর্থস্থানকে রক্ষা করে। সাপেরা পাপীদের ভয় দেখায় ও সিদ্ধদের আনন্দ দেয়। ত্রৈলোক্য বিখ্যাত কনকনন্দী নামে এক তীর্থ আছে, ঐ তীর্থের উত্তরদিকে দেবর্ষিদের এক তীর্থ আছে। ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ দান করলে স্বর্গ লাভ করা যায়।

উত্তর মানসতীর্থে গিয়ে মানুষ উত্তম সিদ্ধি লাভ করে, ঐ তীর্থে গিয়ে যথাবিহিত শ্রাদ্ধ করলে মোক্ষ লাভ হয়। শ্রেষ্ঠ সরোবর তীর্থ মানসে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। গঙ্গাদেবী সোমপাদ থেকে এসে মাটিতে পড়েছেন। ঐ জায়গা থেকে আকাশে এক সূর্যের মত তোরণ দেখা যায়। ঐ তোরণ স্বর্ণময় ও স্বর্গদ্বারের মত আবৃত। হিমালয়ে নানা ঋতু বিভূষিত,

সিদ্ধচারণ সেবিত পর্বতে সুষুম্মা নামে এক সরোবর আছে। এই সরোবরে স্নান করলে মানুষ দশ হাজার বছর বেঁচে থাকে এবং শ্রাদ্ধ করলে অনন্তফলদায়ক হয়। দশ পুরুষ উদ্ধার পায়। পাহাড়ের পাদদেশে, গুহায়, গর্তে, ঝর্নায়, গোষ্ঠে, সঙ্গমে, গৃহে যাথাবিধি সবসময় শ্রাদ্ধ করবে। মানুষ এতে মেধাবী হয়ে ব্রহ্মসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে, তমোগুণ নেই যেখানে সেই জায়গাতেই পিতৃগণ পুজো পেয়ে থাকেন। তীর্থ করে পাপী ব্যক্তিরা যদি শুদ্ধ হতে পারে, তাহলে শ্রদ্ধাবান জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও তীর্থ সেবা করে শুদ্ধি লাভ করবেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তীর্থসেবী কখনও কুদেশে জন্মগ্রহণ করেন না, স্বর্গে বাস করেন ও মোক্ষ লাভ করেন। ধ্যানই সনাতন ব্রহ্মতীর্থ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়কে সমান করে মনকে বুদ্ধিতে সংযত করলে সকলেরই নিবৃত্তি ঘটে। ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে মনই বুদ্ধি প্রভৃতির জনক। অনাহার থেকে ইন্দ্রিয় বোধের ক্ষয় হয়। তাই অনশনই তপস্যা। ফলে শুদ্ধতা নির্বাণ লাভ করে।

.

আটাত্তরতম অধ্যায়

বৃহস্পতি বললেন–এরপর শ্রাদ্ধের কাজে কোনগুলি পবিত্র ও কোগুলি বর্জনীয় শুনুন। হিম পড়ার সময় হিম নিয়ে এবং হিম অবস্থানে অগ্নিহোত্রী হয়ে শ্রাদ্ধ করা উচিত। এরকম শ্রাদ্ধ পরম পুণ্যজনক। রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করা উচিত নয়। রাত্রি ছাড়া অন্য সময়ে রাহু দর্শন ঘটলে সমস্ত ব্যয় করেও শ্রাদ্ধ ও দান করবে। গ্রহণের সময় যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে না সে পাকে নিমজ্জিত গাভীর মত পাপী হয়, বহু মাংস যুক্ত ভোগ্য বিশ্বদেব ও পিতৃগণের প্রিয়, সে বস্তু শ্রাদ্ধে দান করলে অসূয়া নাশ হয়।

একদা ত্বষ্টা মহাত্মা দেবেশ কর্তৃক নিবারিত হয়ে শচীপতির সোমরস পান করে পৃথিবীতে আসেন। পুজোর জন্য শ্যামাক ধান উৎপন্ন হয় আর ভূপতিত ত্বষ্টার নাসারন্ধ্র থেকে আখ জন্মায়। তাই আখ শ্লেষ্ম বর্ধক, শীতল ও মধুর। শ্যামাক ও আখ পিতাদের তৃপ্তি বিধান করে। শ্যামাক, হস্তীনাম, পাটাল, বৃহতীফল ও অগস্ত্যশিখা– এরা খুব তীব্র ও কষায়। এছাড়া শ্রাদ্ধের উপযোগী অন্যান্য ফল আছে, যথা– নাগর, ঘুরস, বংশী করীর ইত্যাদি। শ্রাদ্ধ বর্জনীয় হল– লঘুন, পলাভু প্রভৃতি। কেন এগুলি শ্রাদ্ধে বর্জনীয় তা বলছি।

আগে দেবাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় বলির ক্ষতযুক্ত ব্রণ থেকে রক্ত পড়ছিল, তা থেকেই এসব দ্রব্যের উৎপত্তি, এজন্য এরা শ্রাদ্ধে অচল। যে কোন রকম নির্যাস, লবণ, দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য, যে জলে গরু তৃপ্তি পায় না, যে জল রাত্রে তুলে রাখা হয় সেই জল এবং উট, মোষ ও চমরীর দুধ শ্রাদ্ধে লাগেনা। বন্য ফলমূল এনে শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রাদ্ধ করা উচিত।

কোনো জন্তু-জানোয়ার পূর্ণ দেশে বা দুর্গন্ধ যুক্ত ভূমিতে শ্রাদ্ধ করা যায় না। সাগর পর্যন্তগামী নদীগুলির তীর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের দ্বার ত্রিশঙ্কু দেশ শ্রাদ্ধে বর্জনীয়। কলিঙ্গ ও সিন্ধু নদীর উত্তর ভাগ এবং আশ্রম ধর্মহীন দেশ গুলি সযত্নে পরিত্যাগ করা উচিত। নগ্ন বা উলঙ্গ প্রভৃতি লোক শ্রাদ্ধ দেখবে না। এই লোকেদের দেখা শ্রাদ্ধের দ্রব্য পিতৃপুরুষ পান না।

বৃহস্পতি বললেন–ত্রয়ী সমস্ত ভূতের আবরণ স্বরূপ সেই ত্রয়ী বা বেদ যারা পরিত্যাগ করে, এরাই নগ্ন বা উলঙ্গ। যারা ধর্মরূপী বৃষকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র বেদ প্রভৃতিতে মোক্ষ প্রাপ্তির চেষ্টা করে, তারা মোক্ষ প্রাপ্তির যোগ্য হতে পারে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র- এই চারবর্ণ পূর্বে দেবাসুর দ্বারা পাষণ্ড রূপে পরিণত হয় এবং এই সৃষ্টি স্বয়ম্ভুকৃত নয়। এই অবসাদে তারা শ্রাদ্ধবিহীন ও ধর্মশাস্ত্রহীন হয়ে স্বেচ্ছাচারে জীবনযাপন করে।

যারা নিজের ধর্ম আচরণ করে না, তারাই নগ্ন। তাই এই চারজাতি নিজেদের ধর্মভ্রষ্ট হয়ে নগ্নবেদ বলে বিবেচিত হয়েছিল। বৃথাজীবি, বৃথামুন্ডী, বৃথানগ্ন, বৃথাব্রতী, বৃথা জাপী এরা নগ্ন। কুপথগামী মানুষেরও শ্রাদ্ধ বৃথা, এছাড়া অন্যান্য পাপকর্মকারী, দেবর্ষি নিন্দুক, অসুর শ্রাদ্ধে বর্জন করা উচিত।

পিতৃগণ বলেন, কৃতযুগে বেদ পূজা করা হয়, ত্রেতায় পূজাপান দেবতারা, দ্বাপরে যুদ্ধবিদ্যা ও কলিকালে শুধু পাষণ্ডরা পূজার পাত্র। অপবিত্র মানুষ, কুকুর, শূকর- এরা শ্রাদ্ধ দর্শন করা মাত্র শ্রাদ্ধ পণ্ড হবে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

জমাট বাধা ঘি দিয়ে শ্রাদ্ধ করা ঠিক নয়। সাদাসর্ষে ও তিল ছড়িয়ে দেবে। শ্রাদ্ধের দ্রব্যগুলির মধ্যে যদি কিছু শুষ্ক, বা বালু, কঙ্কর, কেশ, কীট থাকে তবে তা বর্জন করবে। দই শাক প্রভৃতি বস্তু শ্রাদ্ধে বর্জনীয়। সেদ্ধ বলবন ও মাসমন্ডব লবণ, এই দুই বস্তু প্রত্যক্ষ লবণ পেলেও পরম পবিত্র, এই সব লবণ শ্রাদ্ধে দেওয়া উচিত। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া উচিত। মাটির পাত্র আবার পুড়িয়ে নিলে শুদ্ধ হয়। ছাই দিয়ে কাঁপাসিক দ্রব্যের শুদ্ধি হয়, লেপনের সাহায্যে মাটি শুদ্ধ হয়।

সাধু ব্যক্তিরা তীর্থ ক্ষেত্রে সবসময় কমণ্ডলু রাখবেন। পাদ প্রক্ষালন ইত্যাদি শৌচ কমণ্ডলু দিয়ে করবেন, কুকুর ও চণ্ডালকে ছুলে ব্রতচারণ করবেন। মানুষের অস্থি স্পর্শ করলে শুদ্ধির জন্য উপোস করতে হয়। বেদপারগ শিষ্ট সাধুরা পাপদেশ বর্জন করবে। পাপসঙ্কুল দেশে বাস করলে মহাপাপ হয়। অবঞ্চকারী ও পাপীদের তির্ষক যোনিতে জন্ম হয়। অশুচি জনকে শুদ্ধ করলে সে স্বর্গলাভ করে। দেবতারা শুচি কামনা করেন।

.

উনআশীতম অধ্যায়

ঋষিরা বললেন–আপনি সমস্ত শ্রাদ্ধ কল্প বলেছেন, এবার অবশিষ্ট ঋষিমত বলুন। সূত বললেন–হে বিপ্রগণ! অবশিষ্ট ঋষিমত বিস্তারিত বলছি, শুনুন। আগে শ্রাদ্ধ, শুনুন। আগে শ্রাদ্ধ বিধির কথা বলেছি, এবার ব্রাহ্মণের কথা বলব। দেব ও পিতৃ কাজে ব্রাহ্মণদের পবিত্র হতে হয়। ব্রাহ্মণের যদি দোষ দেখা যায়, যিনি সাধু সমাজ থেকে বর্জিত, আর যিনি জেনেও পতিত লোকের সাথে মেলামেশা করেন সেই ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে বর্জনীয়। শ্রাদ্ধ গ্রহণ করার জন্যে যত্নের সঙ্গে ব্রাহ্মণের পরিচয় নেওয়া দরকার। পণ্ডিত ব্যক্তিরাই অপরিচিত ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করবেন।

সিদ্ধগণ বিপ্ররূপ নিয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করেন। এজন্য গৃহস্থরা হাতজোড় করে বাড়িতে আগত অতিথিকে অভ্যর্থনা করবেন। পা ধুইয়ে, খাইয়ে তাঁকে পুজো করবেন, দেবতারা নানা রূপ ধরে এই পৃথিবীতে বিরাজ করেন। বিপ্র অতিথিকে ভক্তিভরে পুজো করে নানা ব্যঞ্জনের সাথে খেতে দেবেন, অতিথিকে দুধ দান করলে অগ্নিষ্টোম ফল, ঘৃত দান করলে দিব্য দৃষ্টি, মধুদান করলে অধিরাত্র ব্রত ফল লাভ হয়।

যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ভক্তির সাথে ব্রাহ্মণ ভোজন করান, তিনি সমস্ত যজ্ঞেরই ফল লাভ করে থাকেন। দেব, পিতৃ ও বহ্নি–এরা ব্রাহ্মণের রূপে ভোজন করেন। এরা পূজিত হয়ে মানুষকে ইচ্ছেমতো ফলদান করেন, তাই গৃহস্থ ব্যক্তি সর্বস্ব ব্যয় করেও অতিথি সৎকার করবে। বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, গৃহাগত, দীনবালক, ও যতিদেয়, অতিথি বলে জানবে। অতিথি পরম যোগী স্বরূপ। অতিথি-সুদৃশ্য, সুবিদ্য, বিশেষজ্ঞ, সন্তান সমুদ্ধ, আচারবান না হলেও, সে যদি শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত হয়, তবে তাকে যথাযথ সেবা ও দান করা উচিত।

এরকম করলে যজ্ঞফল লাভ হয়। ভৃগুতুঙ্গে আরোহণ এবং পুণ্য সরস্বতী, পুণ্য মহানদী, গঙ্গা, হিমাচল থেকে নির্গত অনান্য নদী এবং অন্যান্য সমস্ত তীর্থে, ঋষি পূজিত সরোবরে মানুষ স্নান করে পাপমুক্ত হয়। স্বর্গলোকে পূজিত হন। ব্রাহ্মণদের মৃতাশৌচ ও মৃতকাদের অশৌচ দশরাত, ক্ষত্রিয়দের বারোরাত, বৈশ্যদের অর্ধেক মাস ও শূদ্রের একমাস। মৃতিকা, কুকুর, নাপিত, নগ্ন এবং শব বাহকদের স্পর্শ করলে গায়ে বারে বারে মাটি দিয়ে স্নান প্রয়োজন শ্রাদ্ধের কাজে সবকিছু জল দিয়ে পরিষ্কার করা একান্তই প্রয়োজন।

বেদীর উত্তর দিকে সাজাতে হবে, দক্ষিণ দিকে বিসর্জন দিতে হবে। ডানহাত দিয়ে ডানদিকের বেদীতে লিখবে, খাওয়ার পরা আচমন না করলে, ইদ্দিষ্ট স্পর্শ করলে, পা ধুলে ও অধর্মাচরণ করলে অশুচি হয়। পূর্ব মুখে বা উত্তর মুখে নতজানু হয়ে শুদ্ধ জায়গাতে বসে হাত-পা ধুয়ে জল স্পর্শ করবে। পরে স্থির শান্ত হয়ে বসে তিনবার স্বচ্ছ জল পান ও দুবার মার্জন, একবার প্রক্ষালন এবং শেষে নিজের মাথা, হাত ও পা ধোবে। এরকম আচমন করলে শ্রাদ্ধকর্তার বেদ, যজ্ঞ, অপ, দান ও ব্রহ্মচর্য সফল। আচমন না করে, কাজ শুরু করলে, কাজই বৃথা। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে অন্ত্যজদের খাওয়ায়, সে দুরাত্মা। যে মানুষ উঁচু ও নিচু শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের এক সারিতে খাওয়ায় তাকে পাপ স্পর্শ করে। জ্ঞানী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের স্থান সকলের আগে। যে দ্বিজোত্তম ইতিহাস, পঞ্চমবেদ সব পাঠ করেন, জ্ঞানী ব্যক্তির তাঁকেই শ্রাদ্ধকার্যে নিয়োগ করা উচিত। এবার পরক্তিতে ব্রাহ্মণদের স্থানের কথা বলছি। প্রথম যাদের কথা বলা হয়েছে তারা এবং ষড়ঙ্গী বিনয়ী, যোগী, সর্বতন্ত্র ও যাযাবর– এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ পরক্তি পাবেন। আঠারো বিদ্যায় পারগামী যে ব্রাহ্মণ, তিনি পাবেন।

অতিথি, ব্রহ্মচারী, ধ্যাননিষ্ঠ, ধার্মিক, বালখিল্যদের শ্রাদ্ধে খাওয়ানো উচিত। বানপ্রস্থরা পূজামাত্রে তুষ্ট হন। গৃহস্থ ভোজন করালে বিশ্বদেবরা পূজিত হন। বানপ্রস্থরা পূজিত হলে ঋষিরা, বালখিল্যরা পূজিত হলে পুরন্দর, যোগীদের পুজো করলে ব্রহ্মা সাক্ষাৎ পূজিত হয়। পাঁচটি পবিত্র আশ্রমের মধ্যে দেব ও পিতৃ কাজে চারটি আশ্রম পূজণীয়, যারা চার আশ্রমের বাইরে তারা ক্ষুধার্ত হলেও দান করবে না। প্রতিদিন এক ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধকর্মে নিমন্ত্রণ করবে না; যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শ্রাদ্ধে অন্ন খেয়ে থাকেন, তিনি কৃষ্ণবর্ণ হন। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সঙ্গে ভোজন করে থাকেন, তিনি পংক্তিস্পৃষক। কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন এগুলি ব্রাহ্মণের কাজ নয়। মিথ্যাচারী– দুবৃত্ত, দাম্ভিক, লোভমোহ কলার্থী, ব্রহ্মবিক্রয়ী ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে বর্জনীয়।

এঁদের নিয়োগের কোনও বিধি বেদে নেই। যদি কোন ব্যক্তি এদের শ্রাদ্ধের মাঝে নিয়োগ করেন তিনি পাপাচারী হবেন। এরকম ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে খাওয়ালে দাতা দানফল থেকে বঞ্চিত

হয়। যে ব্যক্তি বেতন প্রার্থীর কাজে অধ্যয়ন করে, যিনি বেতন নিয়ে অধ্যাপনা করেন– এরা উভয়েই শ্রাদ্ধ বর্জনীয়। ব্রাহ্মণ জীবিকার জন্য কেনা বা বিক্রয় করেন কিছু তাহলে নিন্দনীয় হন। কারণ ক্রয়-বিক্রয় বৈশ্য শ্রেণী জীবিকা। এতে ব্রাহ্মণের দোষ হয়। যিনি বেদপাঠ করে জীবিকা নির্বাহ করেন, যিনি বৃথা যজ্ঞে গমন। করেন, যিনি নাস্তিক– এঁরা সকলেই শ্রাদ্ধ বর্জনীয়।

যিনি নিজের জন্যই রান্না করেন, দেবতা বা অতিথির জন্য নয়, তিনি শ্রাদ্ধ আমন্ত্রিত হওয়ার উপযুক্ত নয়। ব্রাহ্মণ শূকরের মতো বিকৃতভাবে ভোজন করেন তার হাতের শ্রাদ্ধ পিতৃগণ গ্রহণ করেন না। শ্রাদ্ধ উচ্ছিষ্ট দ্রব্য স্ত্রীলোক বা শূদ্রকে দান করতে নেই। দই ও ঘি মিশিয়ে তা ছেলে বা শিষ্যকে দেবে। ভাত যদি পবিত্র হয় ও গরম থাকে, তা হলেই পিতৃগণ খেয়ে থাকেন। দান, হোম, ভোজন ও বলি ইত্যাদি হাত ও হাতের আঙুল দ্বারা সুচারু রূপে করবে। এই সব কাজ হাঁটুমুড়ে বসে যথা নিয়মে আচমন করে করবে। এরকম করলে শ্রাদ্ধে অসুরদের কাছ থেকে ভয় থাকে না।

যে জ্ঞানবান, ধ্যাননিষ্ঠ, ও দেবভক্ত ও সবসময় ব্রতচারণ করেন, তাঁদের দেখেই জনগণ পবিত্র হয়, চরাচর জগৎ যোগেশ্বর দিয়েই ব্যপ্ত। ঐ সর্বজ্ঞ মহাত্মাদের থেকেই মহাত্মাদের মোক্ষ ইত্যাদি সবরকম। জ্ঞান হয়। তাঁদের পবিত্র গুণে আসক্ত হয়ে তোক সকল শুভ লাভ করে থাকে। যিনি ঋক জেনেছেন, তিনি বেদও জেনেছেন, যিনি যজুর্বেদ জানেন, তিনি অবশ্যই যজ্ঞ জানেন। যিনি সামবেদ জানেন, তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মবিদ এবং যিনি মানস জানেন, তিনি সমস্তই জানেন।

আশীতম অধ্যায়

বৃহস্পতি বললেন– শ্রাদ্ধ সম্বন্ধীয় দান ও তার ফলের কথা এবার বিস্তারপূর্বক বলছি। ইহলোকে যা শ্রেষ্ঠতম, যা নিজের প্রিয়বস্তু, সেসব বস্তু পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তির জন্য তাদেরকে দান করা কর্তব্য। যে মানুষ শ্রাদ্ধের কাজে নতুন বস্ত্র দান করে, তার আয়ু, প্রচুর-ঐশ্বর্য, রূপ এবং পুত্র লাভ হয়। যে মানুষ শ্রাদ্ধ কালে উপবীত দান করে সে নিখিল বিপ্রকে ব্রাহ্মদান করার ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে কমণ্ডলু দান করে, সে দুগ্ধবতী গাভী তার ফলরূপে পেয়ে থাকে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে ফুলমালা দিয়ে সজ্জিত সম্পূর্ণ শয্যা দান করে, সে পরলোকে দিব্য প্রাসাদ পায়।

যে মানুষ শ্রাদ্ধে যতিদের শয্যা, আসন ও ভোজ্যের সাথে রত্নপূর্ণ ভবন দান করে তার স্বর্গলোকে গতি হয়। সে মুক্তা বসান নানা রত্নযুক্ত, চন্দ্রসূর্যের সমান প্রভাব বিশিষ্ট দিব্য বিমান লাভ করে। ঐ বিমানে অপ্সরাগণ তাকে ঘিরে স্তব করে। সুগন্ধি দ্রব্য গায়ে ছড়িয়ে দেয়, কখনো পুষ্পবৃষ্টি করে, কখনো গন্ধবদের সাথে গান করে। যে মানুষ হাজার ঘোড়া ও হাজার হাতি দান করে সে যোগিনীদের সঙ্গে বাস করে। যে মানুষ যোগী পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দীপ দান করে, সে প্রচুর স্বর্ণলাভ করে। অবশ্য জীবন দান করার মতো উৎকৃষ্ট দান আর নেই। প্রাণীদের জীবনদানই অতি পরম দান। অহিংসা সমস্ত ফল দান করে।

শ্রাদ্ধে সোনার পাত্রে দান করবে। সুবর্ণপাত্রে দান করলে দাতা রথ, ভক্ষ্য ও সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রাদ্ধ ভোজনে আসবাবপত্রাদি দান করতে হয়। তাহলে তার ইচ্ছেমত ধন লাভ হয়। শ্রাদ্ধের কাজে সোনা, রূপার জিনিস দান করলে দাতা যথেচ্ছ ধর্ম লাভ করেন। যে ব্যক্তি হেমন্ত ও শীত ঋতুতে ব্রাহ্মণদের কাঠ ও আগুন সংগ্রহ করে দেন, তিনি নিত্যই সংগ্রামে জয়লাভ করেন। এবং সুশ্রী হয়ে দীপ্তি পেয়ে থাকেন।

যে ব্যক্তি সুগন্ধি পাত্রের সঙ্গে ফুলমালা দান করে সে নানা সুখভোগ করে। তার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে দ্বিজ শ্রাদ্ধে ঘৃতপূর্ণ পাত্র দান করেন তার ধেনুদানের পুণ্য লাভ হয়। শ্রাদ্ধে আকাঙিক্ষত বস্তু দান করলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের এবং রম্য গৃহদান করলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

ফলফুল দীপদান করলে সৌরভ লাভ হয়, কূপ, তড়াগ, ক্ষেত্র, গৃহদান করলে স্বর্গে গিয়ে আনন্দ পেয়ে থাকেন। শ্রাদ্ধে রত্নভূষিত শয্যা দান করলে পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন, দাতার অনন্তকাল স্বর্গ বাস হয় এবং দাতাকে রাজাদের সঙ্গে পূজা করা হয়।

কৌশেয় বস্ত্র, কম্বল, অজিল সোনার কাপড়, মৃগলোম এইসব দান বস্তু বিপ্রগণকে ভোজনের পরে দান করলে শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে থাকেন। ইহলোকে স্ত্রী, পুত্র নিয়ে আনন্দে থাকেন। কৌশেয়, ক্ষৌম ও কার্পাস এইসব বস্ত্র শ্রাদ্ধে যে ব্যক্তি দান করে তার মনোবাসনা পূর্ণ হয়। অলক্ষ্মী দূর হয়ে যায়। বস্ত্র হল সর্বদেবময়, বস্ত্র দান ছাড়া যজ্ঞ, তপস্যা, শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয় না। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে বস্ত্র দান করে সে যজ্ঞ, দান ও তপশ্চরণের ফল লাভ করে।

যব, ঘি, শর্করা, মধুপক্ষর, জল, পায়েস যে দান করে সে তার ইচ্ছেমত বস্তু, স্বর্গরাজ্য লাভ করে। ঘি দিয়ে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়। গয়াশ্রাদ্ধে হাতি দান করলে তাকে কখনো শোক

করতে হয় না। জল, পায়েস, মধু, ফল ও নানারকম ভক্ষ দ্রব্য শ্রাদ্ধে দান করে, ইহলোকে সে পরলোকের আনন্দ পেয়ে থাকেন। স্নিগ্ধ বস্তু, দইযুক্ত খাবার বিপ্রদের ভোজন করাতে হয়। শ্রাদ্ধে যত্নের সাথে সব শস্য দান করতে হয়। হাত জোড় করে অতিথিকে খাবার জন্য আসন গ্রহণ করতে বলা কর্তব্য।

ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে গরমভাত ও স্নিগ্ধ ব্যঞ্জন গ্রহণ করতে অনুরোধ করতে হয়। অন্নদান-এর মতো উৎকৃষ্ট দান আর নেই। অন্ন থেকেই সমস্ত প্রাণী জন্মে ও জীবিত থাক। অন্নদান-এর অর্থ জীবন দান। অন্ন থেকেই ত্রৈলোক্য বেঁচে আছে, অন্নই সাক্ষাৎ চরাচর বিশ্ব বিস্তৃত হয়েছে। তাই অন্ন থেকে উৎকৃষ্ট দান আর হবে না।

পিতৃভক্ত মানুষ এই পৃথিবীর যাবতীয় রত্ন, বাহন ও স্ত্রী খুব তাড়াতাড়ি লাভ করে। অতিথিকে অশ্রয় দেওয়া উচিত। হাজার হাজার অতিথি দিব্য আতিথ্য লাভ করা জন্য প্রতীক্ষা করে আছেন। যেসব দানের কথা বলা হল, যে ব্যক্তি ঐসব দান করে, সে পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা হয়। সকার পূর্বক দানই পরম ধর্ম। পিতৃভক্ত মানুষ মনে মনে যা কামনা করেন, পিতৃদেবরা তাই দান করেন।

একাশিতম অধ্যায়

বৃহস্পতি বললেন–কাম্য, নৈমিত্তিক ও নিত্যশ্রাদ্ধের কথা এবার বলছি শুনুন। অষ্টকা তিন প্রকার। প্রথম চিত্রী, এই অষ্টকাই শ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয় প্রজাপত্যা ও তৃতীয়া বিশ্বদেবিত্রী। এটি ধনপুত্র দায়ক। প্রথম অষ্টকা অপূপ, দিয়ে দ্বিতীয়া মাংস দিয়ে এবং তৃতীয়া অষ্টকা শাক দিয়ে করতে হয়। এই হল অষ্টকার দ্রব্য বিধি। বিদ্বান ব্যক্তি ঐসব অষ্টকা সর্বস্ব ব্যয় করেও শ্রাদ্ধ করবেন। এরকম করলে ইহলোক পরলোকে মানুষ সুখী হয়। এই সব কর্ম যারা করেন তাদের সবসময় ভালো হয়। পিপাসার্ত গরু যেমন জলের কাছে এসে থাকে, তেমনি পর্বকালে পিতৃগণ নির্দিষ্ট তিথিতে দেবতাগণ, পুরুষদের কাছে এসে থাকেন।

যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট দিনে পিতৃ ও দেবতাদের পূজা করে না, তার এই জীবলোক বৃথা ও ধন লাভ বৃথা হয়ে যায়। দেবতা ও পিতাদের উদ্দেশ্যে যারা দান করেন, তারা দেবলোক পেয়ে থাকেন। পৌর্ণমাসীতে শ্রাদ্ধ করলে সবার আগে প্রজ্ঞাপুষ্টি, স্মৃতি, মেধা, পুত্র ও ঐশ্বর্য লাভ করে। এরকম প্রতিপদে করলে ধনলাভ হয় ও লব্ধ ধন নষ্ট হয় না। দ্বিতীয়াতে শ্রাদ্ধ করলে তার কোনো বিপদ হয় না। তৃতীয়াতে শত্রুহানি, চতুর্থীতে শত্রুর ছিদ্র দর্শন। পঞ্চমী স্ত্রী লাভ, ষষ্ঠীতে ব্রাহ্মণ থেকে পূজা লাভ, সপ্তমীতে মহাযজ্ঞ ও গণধিপত্য লাভ হয়, অষ্টমীতে ঐশ্বর্য

প্রাপ্তি, নবমীতে ঐশ্বর্য ও স্ত্রী, দশমীতে ব্রাহ্মী, স্ত্রী, একাদশীতে চতুর্বেদ, পাপ প্রণাম ও ঐশ্বর্য দ্বাদশীতে রাজা, জয়শ্রী ও ধন, ত্রয়োদশীতে দীর্ঘায়ু এবং চতুর্দশীতে শ্রাদ্ধ করলে মৃত যুবক, মৃত যমজ সন্তান আর নিহত ব্যক্তির প্রাণ ফিরে আসে।

অমাবস্যায় সবসময় ভক্তিভরে শ্রাদ্ধ করবে, তাতে সমস্ত কামনা সিদ্ধ হবে ও অনন্তকাল স্বর্গ লাভ হবে। অমাবস্যায় সোমদেবকে আপ্যায়ন করবে। এভাবে আপ্যায়িত হয়ে সোমদেব ত্রিলোক পালন করেন। সিদ্ধচারণ গন্ধর্বরা তাকে সবসময় স্তব করবেন। সমানক্ষেত্রে পিতৃকর্ম করলে শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়। যারা পিতৃ ও দেবভক্ত, তারা পরম গতি লাভ করে।

.

বিরাশিতম অধ্যায়

বৃহস্পতি বললেন–যম যাশবিন্দুর কাছে যে নক্ষত্র বিশেষে শ্রাদ্ধের ফল বলেছিলেন, এবার তা বলছি শুনুন। যে অহিতাগি নর মৃত্তিকা যোগে শ্রাদ্ধ করেন, তিনি অপত্য লাভ করেন। অপত্যকামী ব্যক্তি রোহিণী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করবে মৃগশিরা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করেন তেজস্বিতা লাভ হয়। আদ্রা নক্ষত্রে কাজ করলে ক্রবকর্ম হতে হয়। পুণর্বস্ত্রেতে কাজ করলে পুত্র ও ক্ষেত্র লাভ হয়। তিষ্য নক্ষত্র শ্রাদ্ধ করলে যশস্বী ও ধন-ধান্যবান হয়। অশ্লেষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করলে বীরপুত্র লাভ হয়।

মঘায় শ্রাদ্ধ করলে জ্ঞাতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়। এভাবে পূর্ব ফাল্গুনীতে সৌভাগ্য, উত্তরফাল্গুনী শীল, চিত্রায় রূপবান পুত্র লাভ করে। পুত্রের জন্য বিশাখায় শ্রাদ্ধ করবে। অনুরাধা নক্ষত্র শ্রাদ্ধ করলে নররাজ্য বিস্তার করে। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে আধিপত্য লাভ হয়, মূলা নক্ষত্রে আরোগ্য, উত্তর আষাঢ়ায় শোক কমে যায়, শ্রবণায় পরমগতি, ধনিষ্ঠায় বিপুল ধন, অভিজিৎ নক্ষত্রে সাঙ্গবেদ, রেবতীতে বহু দ্রব্য, পূর্বভাদ্রপদে অজাবিক, উত্তরভাদ্র পদে গরু– এই ভাবে বিভিন্ন ফললাভ হয়।

.

তিরাশিতম অধ্যায়।

শংযু বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করলেনপিতৃগণকে দেওয়া কোন্ বস্তু তাদের তৃপ্তি সাধন করে বা কোন্ বস্তু তাদের কাছে অক্ষয় হয়ে থাকে? বৃহস্পতি বললেন–শ্রাদ্ধবিরা, শ্রাদ্ধে যাদেরকে হরি

বলে নির্দেশ করেছেন, তা হল–তিল, ধান, যব, মাস, জল, মুগ ও ফল। এগুলিতে পিতামহগণ একমাস তৃপ্তি লাভ করেন।

এভাবে মাছ দান করবে দুমাস, হরিণ মাংসে তিনমাস, যাশমাংসে চারমাস, পাখির মাংসে পাঁচমাস, বরাহ মাংসে সাতমাস, পৃষত মাংসে আটমাস, সরৌরব মাংসে ন'মাস, করু মাংসে দশমাস, কুর্মমাংসে এগারো মাস, গব্য, মধু, ঘি মিশিয়ে শ্রাদ্ধ করলে এক বৎসর এবং কালো ছাগল ও গাধা দ্বারা শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণ অনন্তকাল তৃপ্তি লাভ করেন। পিতৃগণরা বলে–এমন কি কেউ আমাদের বংশে জন্ম নেয়নি, যে আমাদেরকে ত্রয়োদশী তিথিতে অন্ন, বর্ষা ও মঘাতে অজ ও সর্ব লোহের মাংস দান করবে। তোমরা বহু পুত্র কামনা করবে।

কেন না তাহলে বহু পুত্রদের মধ্যে কোনও একজন গয়াতে যাবে, কেউ গৌরী কন্যা বিয়ে করবে, কেউ নীল বৃষ উৎসর্গ করবে। শংযু বললেন–আপনি গয়ায় শ্রাদ্ধ করলে কেমন ফল লাভ হয়? পিতৃগণের কেমন পুণ্য হয়, তা বলুন। বৃহস্পতি বললেন–সং বৎসরের মধ্যে যে ব্যক্তি গয়ায় শ্রাদ্ধ করে, সে সর্বকামনা লাভ করে, ও স্বর্গলোকে পূজিত হয়। পুত্র গয়াতে গিয়ে শ্রাদ্ধ করে, দিব্য কাম ও মোক্ষলাভ করে। গয়াতে যেতে গেলে প্রথমতঃ যথাবিধি শ্রাদ্ধ করে কটিবেশে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে, গ্রামান্তরে গিয়ে সেখানে শ্রাদ্ধ শেষ করে, খেয়ে, ঐ গ্রাম প্রদক্ষিণ করে চলে যাবে। গয়াতে চুল, দাড়ি, নখ, বপন করতে হয় না।

গয়াযাত্রী ব্যক্তি ব্রাহ্মকুণ্ডু, প্রভাস, ব্রহ্মবেদী ও প্রেত পর্বতে বিধিনিয়মের শ্রাদ্ধ করবে। গয়ার উত্তরে মানসে মৈনাক সংজ্ঞক পর্বত আছে। উত্তরে কনখল ও দক্ষিণে মানস এইসব জায়গাতে স্নান করে, শ্রাদ্ধ করলে পিতৃলোক উদ্ধার পায়। স্বর্গ, পাতাল ও মতে গয়ার মতো তীর্থ আর নেই। যদি কারো পরম গতি লাভে ইচ্ছা হয়, তবে সে ঐ সব জায়গাতে শ্রাদ্ধ করবে। এর ফলে মানুষের কোটিকুল উদ্ধার হয়, পুত্র যদি কখনও গয়াতে যায় তাহলে শ্রাদ্ধে কল্পিত ব্রাহ্মণ গণকে সেখানেই ভোজন করাবে, তারা তুষ্ট হলেই দেবতাগণও তুষ্টি লাভ করে থাকেন।

শ্রাদ্ধের বিপ্রগণের কুলশীল, বিদ্যা বা তপস্যা–বিচার করা কর্তব্য নয়, তারা পূজিত হলেই মানুষ মুক্তিলাভ করে। সেখানে যথাযথ শ্রাদ্ধ করলে মুক্তি লাভ হয়। নিজের জ্ঞাতি, বন্ধু, মিত্র, সুহৃত এদেরও পিণ্ডদান করা যায়। এই পিণ্ডদানেপিণ্ডগ্রহীতা ও পিণ্ডদাতা দুজনেই স্বর্গে যেতে পারে। অজ্ঞাত নাম গোত্র ব্যক্তিদেরকে পিণ্ড দেবার মন্ত্র বলছি যথা–যারা পিতৃবংশে বা মাতৃবংশে জন্মায়, গুরু স্বজর, বন্ধু-বান্ধব, পুত্রদার বিবর্জিত, জ্ঞাতাজ্ঞাত এবং যারা গর্ভসংস্থিত আমি তাদেরকে এই পিণ্ড দিতে বলছি এই অক্ষয় হোক। গয়া ক্ষেত্রে তিলছাড়া

পিণ্ডদান করতে হয়। অন্য বংশেরও পুত্র, দুহিতা, ইষ্ট ব্যক্তিদেরকে যত্নের সাথে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সমাহিত হয়ে পিণ্ডদান করবে।

কৃতঘ্ন, মহাপাতকী প্রভৃতি সকলেই গয়াতে পিণ্ড দিলে নিষ্কৃতি লাভ করে। ব্রাহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, গুরুদ্রোহী ব্যক্তিগণও যদি গয়াতে যান তবে তাদের পাপ নাশ হয়। গয়া তীর্থের মতো দুর্লভ তীর্থ ত্রিভুবনে আর নেই, এখানে পিণ্ড দান করলে নরকের ব্যক্তি স্বর্গে এবং স্বর্গস্থ ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করে। আমাদের বংশে সেই রকম সৎকর্মশালী পুত্র জন্মাক যারা গয়াতে গিয়ে পিণ্ড দান করবে। মকর, চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ, প্রেতপক্ষ চৈত্রমাসে গয়ায় পিণ্ডদান অতীব দুর্লভ। মলমাস, গুরু শুক্রের উদয় ও অস্ত এবং সিংহস্থ বৃহস্পতিতে গয়া শ্রাদ্ধ একান্ত কর্তব্য। বিচক্ষণ ব্যক্তি নিত্যই গয়া শ্রাদ্ধ করবেন।

গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ, জপ, হোম ও তপ অক্ষয় হয়। এজন্য পিতৃক্ষয় দিনে গয়াশ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়। এরপর বৃষোৎসর্গের ফল বলছি, শুনুন। যে ব্যক্তি বৃষ উৎসর্গ করে, সে কুলের অতীত দশ পুরুষ ও অনাগত দশপুরুষ উদ্ধার করে। বৃষলাঙ্গুলের গলিত জল দিয়ে বৃষোৎসর্গে যে যে বস্তু স্পৃষ্ট হবে, সেই বস্তু পিতৃগণের পক্ষে অক্ষয় হবে। বৃষ যদি শিং বা খুর দিয়ে সবসময় মাটি খোড়ে, তার তা পিতৃকুলের মধুকুল্যা স্বরূপ অক্ষয়ত্ব লাভ করে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ গুড়মিশ্রিত তিল অথবা মধুমন্ত্রে মধুমিশ্রিত তিল দান করে, তার এই দান অক্ষয় হয়।

বৃহস্পতি বললেন–দানের ব্যাপারে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করা উচিত নয়, তবে শ্রাদ্ধ দেব বা পিতৃ কর্মে পরীক্ষা করতে হয়। সর্ববেদবিদ, খ্যভাষ্যবিদ, বৈয়াকরণ, পুরাণধ্যায়ী, ধর্মশাস্ত্রধ্যায়ী ইত্যাদি জ্ঞানী, পণ্ডিতকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করা উচিত। এইসব ব্রাহ্মণকে দান করলে তা অক্ষয় হয়। যারা যোগধর্মকারী তারা ধর্মাশ্রয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যিনি এই ব্রাহ্মণকে পূজা করেন, তাঁর পিতৃলোকের সাথে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজা করা হয়। যোগধর্ম পবিত্রের পবিত্র, মঙ্গলের মঙ্গল, সর্ব ধর্মের প্রথম বলে ধরা হয়।

এবার অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণের বিষয় বলছি। মদ্যপায়ী যক্ষ্মারোগ গ্রস্থ, পশুপাল, বণিক, গায়ন, পিতার সাথে বিবাদকারী, যার গৃহে উপজাতি বাস করে, অভিশপ্ত শিল্পোপজীবি, মিত্রদোহী, নাস্তিক, উন্মত্ত, পাঠ, পরস্ত্রী গামী, ব্রহ্মবিক্রয়ী এসব ব্যক্তিকে দান করলে ইহকাল পরকাল কোনও কালেই তা ফলদায়ক হয় না। কুকুর ও রাক্ষসরা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য যেন দেখতে না পায়। এজন্যই তিল ছড়িয়ে দান করতে হয়। রম্য নদীতীরে, সবিৎ সরোবরে ও নির্জন স্থানে শ্রাদ্ধ

দান করলে পিতামহেরা খুশি হন। শ্রাদ্ধ দানে, অশ্রুপাত করতে নেই, মন্ত্র ছাড়া কোনও কথা হবে না। খেয়ে শ্রাদ্ধ করবে না।

কীভাবে শ্রাদ্ধ করলে মহাফল লাভ হয়, সেসব তোমাদের বললাম। বৃহস্পতি বললেন– শ্রাদ্ধকল্প শুনে যে মানুষ হিংসে করে, ঐ নাস্তিক ব্যক্তির নরক প্রাপ্তি হয়। কখনও যোগীদের নিন্দা কুৎসা করবে না, যারা যোগীদের নিন্দা, অপবাদ দেয় তারা কৃমি হয়ে জন্মায়। যিনি যোগ ও চব্বিশ তত্ত্বের পারদর্শী তিনিই জন্ম মরনের পরবর্তী হয়ে থাকেন। যে যোগবিদ বেদ অধ্যয়ন করে, তিনি বেদবেদ্য পরমপুরুষকে লাভ করেছেন। তিনিই যথার্থ বেদবিদ তাকেই বেদ পরায়ণ বলা হয়। পিতৃভক্ত জন। যজ্ঞ, বেদ, কাম, আয়ু ও ধন পেয়ে থাকেন। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করার সময় শ্রাদ্ধ কল্প পাঠ করে, সে পূর্বোক্ত সমস্ত তীর্থ শ্রাদ্ধের ফল পায়।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করলে ইহকালের পরম তুষ্টি লাভ করে। এই বিধি যিনি প্রণয়ন করেছেন। সেই স্বয়ম্ভুকে ও মহাযোগেশ্বরকে আমি প্রণাম করি। বান্ধবগণ নামগোত্র উল্লেখ করে দেবতাদের সাথে পিতৃগণকে কুশবিছানো ভূমিতে পিণ্ডদান করবে। মানুষেরা যা খায়, পিতৃগণও তাই ভোজন করে থাকেন। মন্ত্রের প্রভাবে পিতৃগণের কাছে পিণ্ড উপস্থিত হয়। নাম, গোত্র, মন্ত্র পিতৃগণের অন্ন বহন করে, পিতৃগণের শতশত জন্ম হলেও তারা। তৃপ্তি পান। ব্রহ্মা কর্তৃক এই ব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে। এই পিতৃগণ দেবতা স্বরূপ, দেবগণ পিতৃগণ স্বরূপ। পিতৃগণের দৌহিত্রেরাই তাদের যজমান।

এই লোক সকল তাদের পুত্র, কন্যা, দান, শৌচ, তীর্থফল, দ্বিজত্ব প্রভৃতি নিয়ে ব্রহ্ম আগে যা যা বলেছেন তাই বললাম। আগে সহস্র বর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ হয়। ঐ যজ্ঞের ভগবান ব্রহ্ম গৃহপতি হয়ে পাঁচশো বছর দেবতাদের ওপর প্রভুত্ব করেন, এরকম প্রসিদ্ধ আছে। সূত্র বললেন, ভগবান বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি যেভাবে পিতৃবংশের বর্ণনা করেছিলেন। আমি তেমনই বললাম। এরপর বরুণের বংশের কথা বলছি।

.

চুরাশিতম অধ্যায়

ঋষিরা এই প্রস্তাব শুনে খুশি হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন- হে সূত। রাজাদের বংশ, স্থিতি ও প্রভাব কীর্তন করুন, আমরা তাও শুনব। লোমহর্ষণ সূত মুনিদের একথা শুনে তাদের

কৌতূহল নিবারণের জন্য বললেন– হে মুনিগণ। মহর্ষি ব্যাসদেব আমাকে যেমন উপদেশ দিয়েছেন, আমি তেমন করে রাজাদের বংশ, স্থিতি ও প্রভাব বর্ণনা করছি।

বরুণের স্ত্রী সামুদ্রী দেবী, সুনাদেবী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর কলি ও বৈদ্য নামে দুই ছেলে ও সুরসুন্দরী নামে এক কন্যা জন্মে। কলির জয় ও বিজয় নামে দুই পুত্র ও বৈদ্যের ঘৃণি ও মুনি নামে দুই পুত্র জন্মে। প্রজা ভক্ষণ করার ইচ্ছেতে তারা পরস্পর পরস্পরকে খেয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সুনা দেবীর সন্তান কলির কনিষ্ঠা স্ত্রী, বিশ্বকর্মার কন্যা হিংসা থেকে মদ নামে পুত্র জন্মে।

কলির প্রথমা স্ত্রী নিকৃতি– নাক, বিঘ্ন, সঙ্কট, বিধর্মক নামক রাক্ষস প্রভৃতির জন্ম দেন। এদের মধে বিঘ্ন মস্তকহীন, নাক শরীর শূন্য, সঙ্কট একহস্ত, বিধর্মক এক পাদবিশিষ্ট। সঙ্কটের পত্নী তামসী পূতনা এবং বিধর্মকের পত্নী রেবতী, এদের সহস্র সহস্র পুত্র উৎপন্ন হয়। নাকের পত্নী শকুনি, বিঘ্নের পত্নী আয়ামুখী। সন্ধ্যায়ে বিচরণকারী মহাবীর্য নৈম্মত নামে প্রসিদ্ধ রাক্ষসের পত্নী তামসী, পূতনাও রেবতীর সন্তান। ব্রহ্মার অনুমতিতে স্কন্দ এদের অধিপতি।

বর রমণী বৃহস্পতি ভগিনী প্রভাসখ্য অষ্টম বসুর পত্নী। শিল্পী বিশ্বকর্মা তাঁরই পুত্র, ইনি দেবতাদের বাস্তু নির্মাণ ও শিল্প উদ্ভাবন করেন। তিনিই দেবতাদের বিমানগুলি নির্মাণ করেছেন। সেই মহাত্মার শিল্পগুলি মানুষদেরও উপজীব্য। ত্বষ্টার পত্নী বিরোচনা। ত্রিশিরা অসুর তাঁর পুত্র। ধীমান মহাত্মা বিশ্বকর্মা, দেবতাদের শিল্পাচার্য ছিলেন। তাঁর পুত্র ময় বিশ্বকর্মা বলে প্রখ্যাত হন। ময়ের কনিষ্ঠা ভগিনী সুরেন সবিতার স্ত্রী সংজ্ঞা নামে বিখ্যাত হন। তিনি তপ প্রভাবে সবিতা থেকে মনুকে ও যমজ যম ও যুমনাকে প্রসব করেন। পরে তিনি অশ্বরূপে উত্তর কুরুদেশে গিয়ে তপস্যায় নিযুক্ত হন।

ঋষিরা বললেন–বুধগণ বিবস্বানকে মাতণ্ড বলেন কেন? সংজ্ঞাই যা অশ্বরূপে কেন নাসিকা দ্বারা প্রসব করলেন? আমরা তাই জানতে চাইছি। সূত বললেন– সূর্য প্রথমে একটি অণ্ডাকারে প্রসূত হন। দীর্ঘকাল সেই অণ্ড ছোট হয়ে গেল না দেখে ত্বষ্টা তাকে ভেঙে দিলেন। কশ্যপ অণ্ডের মধ্যে মার্তণ্ডকে স্নেহবশে বললেন– বংস, তুমি অণ্ড, নও, তুমি মার্তণ্ড হলে। অণ্ডটি দুভাগ হলে বিবস্বান মার্তণ্ড নামে পুরাণ সমাজে খ্যাতি লাভ করে। পুরাকালে বিবস্বানের স্ত্রী সংজ্ঞার তিন পুত্র জন্মে। রূপযৌবন শালিনী সংজ্ঞা দেবী মার্তণ্ডের রূপে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। মার্তণ্ডর তেজ তিনি সহ্য করতে কষ্ট পাচ্ছিলেন।

সংজ্ঞার গর্ভে মার্তণ্ডের দুই মহাবল পুত্র ও এক কন্যা উৎপাদন করেন। সংজ্ঞা দেবী বিবস্বানের তেজ সহ্য করতে না পেরে ঠিক নিজের প্রতিমূর্তির মতো ছায়ামূর্তি নির্মাণ

করলেন। সেই মূর্তি হাতজোড় করে সংজ্ঞাকে বলল আমি কি করব? আদেশ করুন। সংজ্ঞা বললেন–তোমার মঙ্গল হোক। আমি বাপের বাড়ি যাব। তুমি নিশ্চিন্তে এই বাড়িতে বাস কর। আর আমার এই দুই বালক সন্তান ও কন্যাকে যত্ন করে প্রতিপালন করো। এই সব কথা আমার স্বামীর কাছে প্রকাশ করো না, ছায়া দেবী একথা শুনে বললেন–আপনি নিশ্চিন্তে আপনার বাবার কাছে যেতে পারেন।

এদিকে সংজ্ঞা কাছে গেলে তার বাবা রেগে গিয়ে বললেন– তুমি পতিকে অবজ্ঞা করো না, তার কাছেই ফিরে যাও। এভাবে পিতা বারবার অনুরোধ করলেও তিনি হাজার বছর ধরে বাবার কাছেই থেকে গেলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত পিতা আদেশ করলে সংজ্ঞাদেবী অশ্বীরূপ ধারণ করে উত্তর কুরুদেশে গিয়ে তৃণ খেয়ে রইলেন। এদিকে দিবাকর সেই ছায়া মূর্তিকে সংজ্ঞা মনে করে তার গর্ভে তেজস্বী, ধর্মজ্ঞ শ্রুতশ্রবা, শ্রুতকর্মা নামে দুই পুত্র উৎপাদন করলেন। তশবা সাবণী মনু নামে এবং শ্রুতকর্মা শনৈশ্চরী গ্রহরূপে প্রখ্যাত।

একবার যম রেগে গিয়ে ছায়াদেবীর গায়ে পাদঘাত করেন, এতে তিনি রেগে গিয়ে অভিশাপ দেন। ধর্মাত্মা যম ছায়া সংজ্ঞার অভিশাপে দুঃখিত পিতার কাছে সমস্ত কথা বললেন। আমি মোহবশে অপরাধ করেছি, জননী আমাকে পাপ দিয়েছেন, আমাকে মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করুন, প্রভু বিবস্বান বললেন– পুত্র আমার মনে হয় এর কোনও বিশেষ কারণ আছে নিশ্চয়ই।

তুমি সত্যবাদী, ধর্মজ্ঞ হলেও তোমার রাগ হলো কেন? মায়ের কথা অন্যথা করা অসাধ্য। কৃমিরা তোমার পা নিয়ে নিলেও তুমি নতুন পা অনায়াসে পাবে। এরফলে তোমার মায়ের কথা সত্য হবে, শাপমুক্ত হয়ে, তোমারও রক্ষা হবে। আদিত্য একথা বললে পরে ছায়া সংজ্ঞাকে বললেন, তুমি একজন সন্তান কে এত বেশি স্নেহ কর কেন। তোমার কাছে তো সব সন্তানই সমান। ছায়াদেবী রহস্য প্রকাশের ভয়ে চুপ করে থাকলেও আদিত্য ধ্যানে সব জানতে পারলেন।

তিনি ছায়াদেবীতে শাপ দিতে উদ্যত হলে, ছায়াদেবী তখন সমস্ত কথা ব্যক্ত করলেন। বিবস্বান রেগে গিয়ে ত্বষ্টার কাছে গেলেন। ত্বষ্টা তাকে অর্চনা করে বললেন– তোমার এক তেজযুক্ত এইরূপ শোভা পায়না। সংজ্ঞা সহ্য করতে না পেরেই বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি তোমার যোগিনী ভার্যাকে দেখতে পারে, যদি আমার কথা শোন। আমি তোমার রূপের পরিবর্তন করে তোমাকে মনোহারী আকার দেব। এই ভাবে ত্বষ্টা দিবাকরের অনুমতি নিয়ে তাকে কিছুটা তেজহীন, মনোরম করলেন।

তখন আদিত্য দেব অশ্বরূপিণী নিজের স্ত্রীকে দেখতে পেলেন। মার্তণ্ডদেব অশ্বরূপ নিয়ে তার কাছে। মিলনেচ্ছায় গেলেন। সংজ্ঞাদেবী পরপুরুষ ভেবে তাকে প্রত্যাখান করলেন। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হল না। সংজ্ঞাদেবীর নাক থেকে নাসত্য ও দস্ত্র নামে অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের জন্ম হয়। এরা অষ্টম প্রজাপতি মার্তণ্ডের সন্তান। পরে আদিত্য সংজ্ঞাদেবীকে নিজের মনোহর মূর্তি দেখালেন এবং দেবীও খুশি হলেন।

এদিকে যম মাতৃশাপে দুঃখিত মনে ধর্ম অনুসারে প্রজাপালন করতে লাগলেন এবং শুভকাজের ফলে লোকপালত্ব পেলেন। এঁর অন্য ভাই শনৈশ্চর গ্রহত্ব লাভ করেছেন। তষ্টা সূর্যদেবের তেজ সমূহ দিয়ে বিষ্ণুর সেই সুদর্শন চক্র দিয়ে কদানব হত্যা করা হয়। যমভগিনী যমুনাদেবী লোকহিতার্থ যমুনা নামে শ্রেষ্ঠ নদীরূপে পরিণত হন। আর এদের সকলের বড়, যার অধিকার চলেছে, সেই বৈবস্বত মনুর বিবরণ এবার বলব।

.

পঁচাশিতম অধ্যায়

সূত বললেন–দেবতাদের সঙ্গে চাক্ষুষ মন্বন্তর শেষ হলে, পৃথিবী রাজ্য বৈবস্বত মনুর অধিকারে এল। বিবস্বানের জ্যেষ্ঠ ছেলে মনুর আত্মতুল্য নজর পুত্র জন্মে ইন্ড্রাকু, নহুশ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, গরিষ্যন্ত, প্রংশু ও নাভাগরিষ্ট, করুষ ও পৃষত্র, এই নজন বৈবস্বতক মনুর ছেলে। হে মুনিগণ। এরকম শ্রুতি আছে ব্রহ্মার আদেশে প্রজাপতি মনু প্রজাসৃষ্টি করে যজ্ঞ আরম্ভ করে মিত্র বরুণের উদ্দেশ্যে আহুতি দিলে এক দিব্য আভরণ ভূষিতা নারী প্রাদুর্ভূত হন।

ইনিই ইড়া, মনু তাকে ইলা বলে সম্বোধন করলেন। ইলা বললেন–আমি মিত্রা বরুণের অংশে জন্মেছি, তাদের কাছে যাব। একথা বলে ইলা মিত্রবরুণের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে বললেন– হে দেবদ্বয়! আপনাদের কোনও আদেশ আমি পালন করব! দুই দেবতাকে বললেন– তোমাকে দেখে আমরা খুশি হলাম।

তুমি আমাদের কন্যা বলে খ্যাত হবে। ইলাদেবী মিত্রা বরুণের কাছে বরলাভ করে ফিরে আসার সময় সোম পুত্র বুধের সঙ্গে মিলিত হল তখন তার গর্ভে বুধের ওরসে পুরুরবার জন্ম হয়। এই ইলাদেবী মনুর বংশে সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত হন। সুদ্যুম্নের উৎকল, পয় বনস্ম তিন পরম ধার্মিক পুত্র জন্মে।

উৎকলের রাজধানী উৎকল, যিনতাশ্বের পশ্চিম দেশ, গয়ের গয়াপুরী, দিনকরনন্দন মনু সন্তান সৃষ্টি করে পৃথিবীকে দশভাগ করে সন্তানদের দান করেন। ইক্ষাকুর অন্য দশপুত্র জন্মে, কিন্তু সুদ্যুম্নোর স্ত্রীভাব রয়েছে বলে তিনি রাজ্য লাভ করতে পারলেন না। বশিষ্ঠের কথা অনুযায়ী, যশস্বী, ধার্মিক সুদ্যুম্বকে প্রতিষ্ঠানপুরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সুদ্যুম্নের স্ত্রীভাব আছে বলে তিনি লজ্জা বশে রাজ্য ত্যাগ করে সেই রাজ্য পুরুরবাকে দান করেন।

সূত বললেন–দেবী ভগবতী কেবার শিবের কাছে এই নিয়ম স্থাপন করলেন–আশ্রমে যে পুরুষ প্রবেশ করবে সে অবিলম্বে সুন্দরী নারীমূর্তি ধারণ করবে। এজন্য সেই উমাবনে পশুপিশাচ সবাই স্ত্রীরূপী। রাজা সুদ্যুম্ন সেই উমাবনে ঢুকে স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হন।

.

ছিয়াশিতম অধ্যায়

সূত বললেন–হে মুনিগণ! এবার মনু পুত্রদের চরিত্রের কথা শুনুন। মনুপুত্র পৃষ গুরুর একটি গাভীকে হত্যা করে খেয়ে ফেলেন, তাই মহাত্মা চ্যবনের শাপে সে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। করুষের অতি পরাক্রমশালী কারুশ নামে একশো সন্তান জন্মে। নাগরিষ্টর ছেলে বিদ্বান ভগনন্দন। ভগনন্দনের ছেলে প্রাংশু। প্রাংশুর ছেলে প্রজানি। প্রজাতির ছেলে বীর্যবান ক্ষনিত্র। ক্ষনিত্রের ছেলে শ্রীমান ক্ষুপ। ক্ষুপের ছেলে বিবিংশর বিবিংশের ছেলে প্রতাপবান খনিনেত্র। ত্রেতাযুগে তাঁর করন্ধম নামে এক ছেলে জন্মে।

করন্ধমের ছেলে অবিক্ষিত। তাঁর পুত্র ধর্মাত্মা চক্রবর্তী সংবর্তমুনির সাহায্যে স্বর্গ্যোন। তখন বৃহস্পতি সঙ্গে সংবর্তের ভীষণ ঝগড়া হয়। মরও চক্রবর্তী হয়েছিলেন। তাঁর ছেলে নরিষ্যন্ত, নরিষ্যন্তের ছেলে দম, দমের ছেলের রাষ্ট্রবর্ধন, তার ছেলে সুধৃতি, তার ছেলে নর, তার ছেলে চোখ, চোখের পুত্র কছুমান, তার ছেলে বেগবান, বেগবানের ছেলে বুধ তাঁর ছেলে তৃণবিন্দু ইনিই ত্রেতাযুগে (তৃতীয়) রাজা হন। তৃণবিন্দুর মেয়ে দ্রবিড়া, দ্রবিড়ার ছেলে বিশ্রবা, তাঁর ছেলের নাম বিশাল।

এই বিশাল রাজা ধার্মিক ছিলেন। ইনিই বিশালপুরী নির্মাণ করেন। বিশালের ছেলে মহাবল হেমচন্দ্র, তাঁর ছেলে সুচন্দ্র, তাঁর পুত্র ধুম্রাশ্ব। তাঁর ছেলে বিদ্বান সৃজ্ঞয় তাঁর পুত্র সংদেব, তাঁর ছেলে পরমধার্মিক কৃশাশ্ব। তাঁর পুত্র মহাতেজস্বী সোমদত্ত। সোমদত্তের পুত্র জনমেজয়, তার ছেলে প্রমতি। তৃণবিন্দুর প্রসাদ বিশাল, রমণীয় রাজারা সকলেই দীর্ঘায়ু, মহাত্মা, ধার্মিক

ছিলেন। শয্যতি রাজার আর্নত নামে এক ছেলে ও সুকন্যা নামে এক মেয়ে জন্মায়, সুকন্যা চ্যবনের স্ত্রী।

আনর্ত্তের ছেলে রেব। রেবের ছেলে বৈবত এঁরই অন্য নাম কুকুষ্মী। ইনি একশো ভাই-এর মধ্যে বড়। ইনি কুশস্থলীতে রাজত্ব করতেন। একসময় ইনি নিজের মেয়ের সাথে ব্রহ্ম সভায় গিয়ে গান শুনেছিলেন। ব্রহ্মার মুহূর্ত কাল পালে মানুষের বহুযুগ পার হয়ে যায়। কুকুর্মী গান শুনে নিজের গৃহে ফিরে এসে দেখলেন সেখানে বসুদেবরা অন্ধক, ভোজ ও বৃষ্ণি বংশীয় অনেকে পরিশ্রম করে একটা সুন্দর পুরী নির্মাণ করেছে। এই ঘটনা শুনে তিনি নিজের রেবতী নামের কন্যাকে বলরামের হাতে সম্প্রদান করে তপস্যার জন্য মেরু পর্বতে চলে গেলেন।

এই কাহিনি শুনে ঋষিরা সূতকে জিজ্ঞাসা করলেন –এতকাল পার হয়ে গেলেও কী জন্য রেবতী তখনও বৃদ্ধা হন নি? এই কুকুর্ম্মী কিভাবে মেরু পর্বতে চলে গেলেও তার বংশ পৃথিবীতে রেখে গেলেন?

যে গানকে রেবতী দীর্ঘকালকে মুহূর্তকাল ভেবেছিলেন সেই গান কিরকম? সেই ব্রহ্মসভায় কোন কোন্ দেবতাই বা ছিলেন? সূত বললেন– ব্রহ্মলোকে গেলে মানুষের খিদে, তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু, ভয় বা রোগ হয় না। গানের বিষয় যে প্রশ্ন করলেন– সে বিষয়ে বলছি। স্বর সাতটি, গ্রাম তিনটে, তাল উনপঞ্চাশ রকমের। এই সব মিলে স্বরসড়প।

ষড়জ ঋষভ, গান্ধার মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, এই সাতটি স্বর। সৌরীরী, হরিচাম্বা, কলোপবালা, যুদ্ধ মধ্যমা, যাঙ্গী, পাবনা, দৃষ্টাশ রো মধ্যম গ্রামের অন্তর্ভুক্ত। ষড়জ গ্রামের কথা শুনুন–উত্তর মন্ত্রা, রজনী, উত্তরা, আয়তা, শুদ্ধ ষড়দা, প্রভৃতি। ষড়জ গ্রামের অন্তর্গত গান্ধার গ্রামের বর্ণনা বলছি–অগ্নিষ্টোমিক, রাজপেরিক, পৌন্ড্রক, অশ্বমধিক, রাজসূয়, চক্রমবর্মক, মহারবৃষ্টিক, ব্রহ্মদান, প্রজাপত্য, নাগপক্ষাশ্রয়, হয়ক্রান্ত, মৃগকান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত, কোকিলের গলার মতো মনোরম সূর্যক্রান্ত সাবিত্র, অর্ধসাবিত্র, সবতো ভদ্র, সুবর্ণ, সুতন্ত্র, বিষ্ণু, ভূতি, বিফল, উপনীত, বিনত, ভগবিপ্রিয়, শ্রী, অবিরম্য, শুক্র ও পুণ্যপদ, পুণ্যারক– এরা গান্ধার গ্রামের অন্তর্ভুক্ত।

ভগবান ব্রহ্ম মোবীরার সাথে গান্ধারী গান করে থাকেন। উত্তরাদি স্বরের অধিদেবতা ব্রহ্মা। হরিনাম মূচ্ছনার অধিদেবতা ইন্দ্র, শুদ্ধ মধ্যমা মূচ্ছনা মরুদেশে অন্তর্গত। উত্তর মন্ত্রখ্য তালের অধিদেবতা ষড়জ। উত্তর ও প্রথম তাল অনুযায়ী উত্তমন্ত্র নাম হয়েছে। দ্রুব, অধিদেবতা, ধৈর্যতের মূর্ছনার নাম উত্তরায়ণ। অগ্নির উপাসনার ষড়ের নাম শুদ্ধ ষড়ষিক, পাঁচটি স্বরের

মূচ্ছনা দিয়ে সাধুগণের মোহ সৃষ্টি করেছিল যক্ষীগণ, তাই মূর্ছনার নাম যাক্ষিকা। ওই মূচ্ছনা শুনে বিষধর সাপেরা মুগ্ধ হয়ে পড়ে। এর দেবতা বরুণ, শকুন্তক মূচ্ছনা দিয়ে কিন্নর গণ গান শোনান। গান্ধার গানে অনুরাগ বিশুদ্ধ গান্ধারীর অধিদেবতা গন্ধর্ব। ষড়ভুজ নামে প্রধান মূচ্ছনা প্রথমে পিতামহের কাছে উপস্থিত হয়। এর অধিদেবতা অনল।

.

সাতাশিতম অধ্যায়

এবার আমি পূর্বাচার্যদের মত অনুসারে যথাক্রমে সঙ্গীতের অলংকার-এর কথা বলছি। নিজ নিজ অনুসুবর্ণ পদ সমূহের যোগ বিশেষকেই অলংকার বলা হয়। পদ, বাক্য, যোগার্থ দিয়ে এর অভিব্যক্তি হয়ে থাকে। স্থান তিনটি বুক, গলা, মাথা। তিন জায়গায় প্রবৃত্ত স্বরই উত্তম। একভাবে যার সঞ্চারণ তা স্থায়ী, নানা আকারে যা সঞ্চরণ তা সঞ্চারী, যার নিম্নগতি তা অবরোহণ এবং যা উন্নতিশীল তা আরোহণ পদবাচ্য। বর্ণতত্ত্ব পণ্ডিতদের একমত। এইসব বর্ণের অলংকার শুনুন। অলংকার চারটি স্থাপনী, মরেজিনী, প্রমাদ ও অপ্রমাদ এদের লক্ষণ বলছি।

উষ্ট্রক লাঘ্য বিকৃতস্বর, একস্থান থেকে উৎপন্ন হয়ে অন্যস্থানে শেষ হয়ে থাকে। কুমার নামে স্বর আস্তে আস্তে বিস্তারলাভ করে। শ্যেনস্বর কান্ত সজ্জাত ও কলা নামমাত্র প্রতিষ্ঠিত। এই শ্যেনস্বর উত্তর অবরোহ, সবিন্দু, স্বর কলা কলা প্রমাণে আবির্ভাব হয়। বিন্দু এক কলা এই বর্ণস্থায়ী অসাবধান বশত স্বরগত বিপর্যয় ঘটে বটে, কিন্তু ইচ্ছে করেও স্বর বিপর্যয় করতে পারা যায়। ষড়জ থেকে আরব্ধ প্রধান স্বরে একান্তভাবে কখনও উচ্চ ও কখনও নীচ ক্রমে আক্ষেপ ও অবস্কন কর্তব্য। কলা স্থান একান্তভাবে বারো রকম। ত্রাসিত স্বরের উচ্চারণে দুটি স্বর পরিব্যক্ত হয়। এর উচ্চারণও আটরকম স্বরে বিহিত।

বর্ণস্থান ও প্রয়োগ বিশেষ অনুযায়ী কলামাত্রা প্রধানতঃ ত্রিশ রকম বলা যায়। সংস্থান, প্রমাণ, বিকার ও লক্ষণ অলংকারের প্রয়োজন এই চার রকম। জনগণের শরীর অলংকারের মতোই সাজানো। অলংকার গানের ঐশ্বর্য দান করে। কিন্তু অতিরিক্ত অলংকার যেমন জনগণের উৎসাহ কমে যায়, তেমনি গানে অযথা অলংকার বিন্যাস গানের ভাবকে ক্ষুণ্ণ করে। সুতরাং নারীর মতোই গানেরও অলংকারের যথাযথ বিন্যাস থাকা উচিত। ষড়জ স্বর তার মধ্য ও মন্দ্র এই তিনভাগে বিভক্ত। যড়জ ও মধ্যম গ্রামের রীতি প্রায় একরকম শব্দময় গানগুলির প্রথম, মধ্য ও শেষ ভাগে অলংকার ইত্যাদির কৌশলে নানারকম রীতি দেখা যায়।

সাত স্বর থেকে অন্য স্বরের উৎপত্তি হয়। গান্ধার স্বর অনুসারে চারটে মদ্রক গীত হয়। পদের ভেদ তিনরকম আর সঙ্গীতের ভেদ সাতরকম। গান্ধার রাগের অনুগত। ভেদ বিবরণ এরকম। মধ্যমস্বরের ভেদক্রম এই রকম। দ্বিতীয় তাল এর চরণ ও মাত্রা সব এর নাভিমণ্ডল স্বরূপ প্রভৃতি অনুসারে কখনো কখনো মাত্রাগুলি লীন অবস্থায় থাকে। সঙ্গীতের যে অংশে মাত্রা অনুসারে তাল বিন্যাস না থাকে সেই অপূর্ণ পাদ বিশিষ্ট অংশকে সাত মতিবীরনা বলা হয়।

যে অংশে নির্দিষ্ট মাত্রা সংখ্যায় ব্যাঘাত দেখা যায়, তাকে যান বলে। শুল্ল ও অপর অন্তিম গানের দ্বিতীয় পাদভাগে সঙ্গীত আরম্ভ হলে প্রকৃত অনুসারে পাদভাগ চার ভাগ থেকে বেড়ে পাঁচ পাদে সম্পূর্ণতা লাভ করে। অর্ধেক ভাগে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। দক্ষিণ ও উত্তর মদ্রকে চারপাদ অন্তেই শেষ হয়ে থাকে। দুই বা অনেক স্বরের একই বিধান পতাকারিন নামে বিখ্যাত।

.

অষ্টআশিতম অধ্যায়

সূত বললেন–বিকুক্ষির ছোট ভাই নিমির বংশ শুনুন। এই নিমিরাজা গৌতম ঋষির আশ্রমের কাছে দেবপুরের মত জয়ন্ত নামে এক বিখ্যাত নগর স্থাপন করেছিলেন। এরই বংশে ঋষি শ্রেষ্ঠ জনক থেকে নেমি নামে সর্বজন মান্য পুত্র জন্মে। ইক্ষাকুর এক পুত্র জন্মায়, ইনি বশিষ্ঠের পাপে বিদেহ হয়েছিলেন। এঁর ছেলের নাম মিথি। মিথির নাম থেকেই মিথিলা পুরির প্রখ্যাতি। মিথিলার অধিপতি রাজা জনক, জনক থেকেই উদাবসু। তাঁর পুত্র নন্দিবর্ধন, তাঁর পুত্র বীর ও ধার্মিক সুকেতু। তাঁর ছেলে মহাবল দেবরাত, তাঁর পুত্র বৃহদ্রথ। তাঁর পুত্র প্রতাপবান মহাবীর্য, তার ছেলে ধৃতিমান, তাঁর পুত্র সুধৃতি, সুধৃতি পুত্র ধর্মাত্মা রাজা ধৃষ্টকেতু তাঁর পুত্র বিখ্যাত হর্ষ। তার পুত্র মরু, তার পুত্র প্রতিত্বক। তাঁর পুত্র কীর্তিরথ। এই কীর্তিরথের পুত্র দেবমীর, তাঁর ছেলে বিবুধ, তাঁর পুত্র ধৃতি।

ধৃতির পুত্র কীর্তিরাজ। তার পুত্র রোমবান। তাঁর পুত্র স্বর্ণরোমা। স্বর্ণরোমার ছেলে নরপতি হ্রস্বরোমা। তার ছেলে বিদ্বান শিরধ্বজ। এই শিরধ্বজ কর্ষণ করার সময় সীতা দেবীকে ক্ষেত থেকে পান। সীতা রাম মহিষী সাধ্বী সতী পতিব্রতা, সূত বললেন– মহাত্মা রাজা শিরধ্বজ রাজা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তখন নিয়ম অনুযায়ী অগ্নিক্ষেত্র কর্ষণে করেছিলেন, সেই সময়ই সীতার আবির্ভাব।

শিরধ্বজের, ভানুমান নামে এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র মেথিল বলে পিরিচিত, শিরধ্বজেয় ভাই কুশধ্বজ। ইনি কাশীর নরেশ ছিলেন। ভানুমানের একটি ছেলে হয়, তার নাম প্রদ্যুম্ন। এর পুত্র মুনি, তার ছেলে উজ্জবহ, তাঁর পুত্র সুতধ্বজ, সুতধ্বজের ছেলে শকুনি। স্বাগত শকুনির ছেলে আর সুরক্ষা স্বাগতের ছেলে, এঁর ছেলে সুশ্রত, তার ছেলে জয়, জয়ের ছেলে বিজয়, বিজয়ের ছেলে ঋত।

ঋতের পুত্র সুনয়। সুনয়ের ছেলে বীতহব্য, বীতহব্যের ধৃতি নামে এক পুত্র জন্মে। ধৃতির ছেলে বহুনাস্ব, তার ছেলে কৃতি। এই কৃতি অবধি জনকদের বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

.

উননব্বইতম অধ্যায়।

সূত বললেন–সোমের পিতা ঋষি অত্রি, সমস্ত লোকের মঙ্গলের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। শোনা যায় পুরাকালে তিন হাজার বছর পর্যন্ত অবিচল ভাবে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তপস্যা করেছিলেন। তিনি মহাবুদ্ধিশালী দ্বিজন্মা ছিলেন। তার দেহ সোমত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। সেই মহাত্মার সোমত্ব ঊর্ধ্বদেশ আক্রমণ করে। তাঁর দুচোখ থেকে সোমস্রাব হতে থাকে।

তখন বিধাতার ইচ্ছায় দশ দিক্‌দেবী সোমকে গর্ভে ধারণ করেন। কিন্তু তারা গর্ভধারণ করে রাখতে পারলেন না। হঠাৎ সেই গর্ভ চারদিক আলোয় উদ্ভাসিত করে ধরায় এসে পড়ল। লোক পিতামহ তখন তাকে ওপরে স্থাপন করলেন। ঐ দেবরূপী সীতাংশু ধর্মিষ্ঠ এবং সত্য প্রতিজ্ঞ। সাদা রঙের হাজার ঘোড়া এঁর বাহন। মানসপুত্ররা লাগলেন।

এরপর সোম আরও তেজস্বী ও দীপ্তিময় হয়ে উঠলেন। তিনি ব্রহ্মার দেওয়া রথে চড়ে একুশবার বসুন্ধরাকে প্রদক্ষিণ করেন। তার তেজ, কিরণ পৃথিবীতে এসে পড়ল। পৃথিবী শয্যাশ্যামতা, হল প্রজারাও রক্ষা পেল। একমাত্র ভগবান সোমই জগতের পালন কর্তা। সেই চাঁদ তেজ লাভ করে বিধি অনুযায়ী কর্ম করে দশশত বর্ষ যাবৎ তপস্যা করেন। সোমদেব নিজকর্মগুণে প্রভু রূপে খ্যাতি লাভ করেন। ব্রহ্মা করে তাকে রাজ্য দান করেন।

দক্ষ প্রজাপতি নিজের সাতাশজন কন্যাকে চাঁদের কাছে সম্প্রদান করেন। এরা নক্ষত্র নামে প্রসিদ্ধ। সোম তখন মহারাজ্য পেয়ে একবার মূয়র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে ব্রহ্মা ব্রহ্মকর্মে নিযুক্ত এবং ভগবান নারায়ণ সদস্য হয়েছিলেন। এছাড়া সনৎ কুমার প্রভৃতি

ঋষিরাও এসেছিলেন। শোনা যায় ঐ যজ্ঞে সোম ব্রহ্মর্ষি দেবকে দক্ষিণা স্বরূপ ত্রৈলোক্যই দান করেন। তিনি যজ্ঞের শেষে স্নান করে সমস্ত দেবতা, ঋষিদের দ্বারা পূজিত হলেন। তিনি রাজাধিরাজ হয়ে দশদিক উজ্জ্বল করলেন।

সেই সময় তিনি ঐশ্বর্য সন্মান লাভ করে দুর্বিনীত হয়ে উঠলেন। বৃহস্পতির স্ত্রী তারা দেবীকে তিনি হঠাৎ-ই হরণ করলেন। দেব দেবর্ষিরা অনেক প্রার্থনা করলেও তিনি তারাদেবীকে ফিরিয়ে দিলেন না। তারা হরণ উপলক্ষ্যে দেব-দানবদের মধ্যে ভয়ঙ্কর একযুদ্ধ বাধে। পিতামহ ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করেন সকলে। তখন তারাকে বৃহস্পতির কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু গর্ভবতী তারাকে বৃহস্পতি গর্ভত্যাগ করতে বললেন। কিন্তু তখনই এক কুমার আবির্ভূত হলেন। আগুনের মত তিনি দীপ্ত।

সেই ভগবান কুমার জন্মের সাথে সাথেই দেবতাদের দেহশ্রী হরণ করলেন, দেবতারা চিন্তিত হয়ে পুত্রের জন্ম পরিচয় বিষয়ে তারাকে জিজ্ঞাসা করল। ঐ কুমারটি চন্দ্রের না বৃহস্পতির, তারা দেবতাদের হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বললেন–না। ব্রহ্মা স্বয়ং এসে জানতে চাইলেন। তখন তারাদেবী বললেন– এই মহাত্মা পুত্রটি চন্দ্রের।

দানশীল প্রজাপতি চন্দ্র তখন এই পুত্রকে বুধ নামে ডাকলেন। তখন বুধ পূর্বদিকে রওনা দিলেন। এই বুধ রাজপুত্রী ইলার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন, সেই পুত্রের নাম পুরুরবা উর্বশীর গর্ভে দুই পুত্র হয়। চন্দ্র জোর করে বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে হরণ করেছিলেন বলে যক্ষারোগে তাঁর দেহ ক্ষীণ হয়ে যায়। তখন তিনি পিতা অত্রির শরণাপন্ন হন। অত্রি তখন তাকে শাপমুক্ত করেন। রোগমুক্ত হয়ে তাঁর, শোভা জ্যোতি বৃদ্ধি হয়।

.

নব্বইতম অধ্যায়

সোমের পুত্র বুধ। বুধের পুত্র তেজস্বী, প্রবল পরাক্রমী, দানশীল পুরুরবা। তিনি সাদী রূপে গুণে ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ, সুন্দরী ঊর্বশী গন্ধর্ব লোক ছেড়ে, দেবতাদের ত্যাগ করে এই নরপতিকেই পতিত্বে বরণ করেছিলেন। চৌষট্টি বছর তারা একসাথে বাস করেন। এঁরা দুজন কখনও চৈত্ররথ বনে, কখনও মন্দাকিনীর তীরে কখনও অলকায়, বা সুন্দর সুন্দর কাননে মিলিত হতেন। ঋষিরা তখন সূতকে জিজ্ঞাসা করলেন –ঊর্বশী অপ্সরা হয়ে কেন দেবতাদের

ত্যাগ করে পুরুরবাকে বরণ করে নিল? সূত বললেন–ঊর্বশী ব্রহ্মার শাপে মানুষ রাজা পুরুরবার সেবা করেছিলো।

ঊর্বশী নিজের শাপমোচনের জন্য স্থির করলেন তিনি সব সময়ে শুধু ঘি খেয়ে থাকবেন। তাদের শয্যার পাশে দুটি মেষ থাকবে আর রাজাকে কখনো তিনি নগ্ন দেখবেন না, মৈথুন কাল ছাড়া। এই তিনটি নিয়ম সম্পর্কে রাজাকে সচেতন করলেন এবং নিয়ম ক্ষুণ্ণ না হওয়া অবধি তিনি রাজার কাছেই থাকবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। এভাবে তারা চৌষট্টি বছর অনুরাগের সঙ্গে একত্র বাস করেন। কিন্তু এদিকে গন্ধর্বরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। স্বর্গবাসী ঊর্বশী আবার দেবতাদের কাছে কিভাবে আসবেন, চিন্তা করলেন।

তাঁরা জানতে পারলেন উর্বশী পুরুবার সঙ্গে কোনো প্রতিশ্রুতির নিয়মে যুক্ত হয়ে আছেন, তখন তারা কৌশলে ঊর্বশীর তিনটি শর্তের বিঘ্ন ঘটালেন। তখনই ঊর্বশী তিরোধান করলেন। রাজা মনের দুঃখে সমস্ত পৃথিবী উর্বশীর খোঁজে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। কত বন, নদীতীর, নানা উপনিবেশ, গিরিগুহা ও ঝর্ণা, নানা নগরে নগরে ঘুরে ঘুরে সকলের কাছে ঊর্বশীর খোঁজ করতে লাগলেন। দুঃখে কাতর হয়ে ঊর্বশীকে উদ্দেশ্য করে আপন মনে মনঃস্তাপ করে বলতে লাগলেন–আমি নির্বোধ, আমায় তুমি দেখছো না কেন? আমার এই অবস্থায় তুমি কোথায় রয়েছে বিরোধ করে? তোমার এরকম জীবনকে আমি ধিক্কার দিই।

তারপর একসময় রাজা দেখলেন প্লক্ষতীর্থের এক সরোবরে উর্বশী সখীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করছেন। ঊর্বশী দূর থেকে রাজাকে দেখে সখীদের বললেন–ঐ যে পুরুষোত্তম রাজা, যার সঙ্গে আমি বাস করেছিলাম। রাজাও তখন কাতর হয়ে ঊর্বশীকে আহ্বান করতে লাগলেন। দুজনে লুকিয়ে দেখা করলেন। ঊর্বশী জানালেন–আমি আপনার দ্বারা গর্ভবতী হয়েছি, কিছুদিন পর আমার নিশ্চয়ই এক কুমার উৎপন্ন হবে। আপনি আমার জন্য শোক করবেন না। রাজা ঊর্বশীর সঙ্গে একটা দিন কাটিয়ে নিজ ভবনে চলে গেলেন।

কিন্তু এক বৎসর কেটে গেলে রাজা একদিন বললেন–তুমি আমার সঙ্গে সবসময়ই থাক। ঊর্বশী জানালেন, এ বিষয়ে গন্ধর্বদের জানাতে হবে আর তাদের কাছ থেকে এ জন্য সম্মতি লাভ করতে হবে। কারণ আমাকে চিরকাল গন্ধব লোকেই বাস করতে হবে। রাজা গন্ধর্বদের কাছে বর চাইলে তার, তথাস্তু বলে অনুমতি দিলেন। কাঠের মধ্যে আগুন ছুঁড়ে দিয়ে রাজা ঊর্বশীর গর্ভজাত কুমারকে নিয়ে নিজের নগরের দিকে চললেন, তখন দেখলেন সামনে একটি অশ্বত্থ গাছ জ্বলছে। একথা গন্ধর্বদের জানালে তার পুরুরবাকে অশ্বত্থ গাছের কাঠের

আগুনে যজ্ঞ করতে বললেন, তাহলে রাজা গন্ধর্বলোকে প্রতিষ্ঠা পাবেন। তারপর পুরুরবা সেই অগ্নিকে তিনভাগ করলেন।

ইলানন্দন রাজা পুরুরবা যুমনার উত্তর তীরে প্রয়াগে রাজত্ব করতেন। তার তেজস্বী ছয় পুত্র জন্মে। এই পুত্রেরা সকলেই গন্ধর্বলোকে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এদের নাম আয়ু, কিম্বায়ু, অমাবসু, শতায়ু, ও গতায়ু ইত্যাদি এরা ঊর্বশীর গর্ভজাত। এদের মধ্যে অমাবসুর পুত্র রাজা ভীম। ইনি বিশ্ববিজয়ী। ভীমের পুত্র শ্রীমান কাঞ্চনপ্রভু, তাঁর পুত্র সুহোত্র। ইনি বিদ্বান ও মহাবল ছিলেন। সুহোত্র, থেকে কোশিকীয় গর্ভে জ জন্মগ্রহণ করেন।

এই জহ্নু একসময় যজ্ঞ করছিলেন, সেই সময় হঠাৎ গঙ্গা যজ্ঞভূমি প্লাবিত করে দেয়, জহ্নু প্রচণ্ড রেগে গিয়ে গঙ্গাকে বলেন, তোমার সমস্ত জল ব্যর্থ হবে। তোমার এই গর্বিত ব্যবহারে ফল এখনই পাবে তুমি, তোমার সমস্ত জল আমি পান করব। গঙ্গাকে পান করছেন দেখে মহাভাগ দেবর্ষি গঙ্গাকে জাহ্নবী নামে তাঁর কন্যারূপে উপহার দিলেন। জহ্নু কাবেরীর পানি গ্রহণ করেন।

গঙ্গা আবার নিজরূপ ফিরে পায়। জহ্নু কাবেরীর গর্ভে সুহোত্র নামে এক ধার্মিক পুত্র উৎপাদন করেন। সুহোত্রের পুত্র অজপ, তার পুত্র মহাযোগ বলাকাশ্ব। বলাকাশ্বের তিন পুত্র গয়, শীল, কুশ। কুশের চার পুত্র। কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্তাঁরয়া ও বসু। রাজশ্রেষ্ঠ কুশাম্ব পুত্রার্থী হয়ে বহুবর্ষ তপস্যা করেন। তপস্যায় শেষে শতক্রতু সাক্ষাৎ আবির্ভূত হন। আর নিজেকে কুশাম্বের পুত্র রূপে কল্পনা করেন।

সুহোত্রের পুত্র গাধি ও কৌশিক। গাধির কন্যা সুন্দরী সত্যবতাঁকে ঋচীকের হাতে সম্প্রদান করেন। এই সত্যবতীর গর্ভে ভৃগুনন্দন জমদগ্নি জন্ম গ্রহণ করেন। সত্যবতীর স্বামী ঋচীক চরু প্রস্তুত করে বললেন– তুমি, তোমার মা এই চরু খেয়ে ফেল। এর ফলে তোমার মার গর্ভে তেজস্বী ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করবেন। তোমারও এক ধৃতিমান, দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মাবে। এরপর গাধি রাজা সপরিবারে ঋচীকের আশ্রমে এলেন, তখন কন্যা সত্যবতী মাতাকে ঋচীকের কথা জানালে, দুজনে দৈবক্রমে পরস্পর পরস্পরের চরু খেয়ে ফেলেন।

ঋচিক সমস্ত কথা জানতে পেরে সত্যবতাঁকে বললেন–তোমার মার দ্বারা তুমি প্রতারিত হয়েছে। তোমার ক্রুর কর্ম। অতি দারুণ এক পুত্র জন্মাবে। তোমার মায়ের গর্ভে তপোধন, ঋষি জন্ম নেবেন। কারণ তোমার মায়ের ভক্ষিত চরুতে আমি তপোবলে সমস্ত ব্রহ্ম গুণ নিহিত করেছি।

সত্যবতী শুনে বললেন–হে মুনে! আপনি ইচ্ছে করলে সমস্ত লোকই সৃজন করতে পারেন, তাতে পুত্র উৎপাদন করবেন এই কথা আর বেশি কি? আপনি আমাকে সরল বুদ্ধি পুত্র দান করুন। পুত্র সম্বন্ধে আমার প্রতি আপনি অন্য ব্যবস্থা করবেন না। ঋচীক বললেন–তুমি যা বলছো, তাই হবে। অর্থাৎ পুত্র হবে তপোধন আর পৌত্র প্রচণ্ড কর্ম। এরপর সত্যবতী ভার্গব জমদগ্নিকে লাভ করলেন আর গাধিরাজার পুত্র হন বিশ্বামিত্র মুনি। পুণ্যবতী সত্যবতী মহানদী কৌশিকী নামে বিখ্যাত হয়ে

পুরাকালে ঈক্ষাকুবংশে সুবেনু নামে এক রাজা ছিলেন। তার কন্যার নাম কামলী রেণুকা, জমদগ্নি ঐ কামলী রেণুকার গর্ভে পরশুরামকে পুত্ররূপে উৎপাদন করে। ঐ পুত্র সমস্ত বিদ্যায় পারঙ্গম, ধনুর্বেদে পারদর্শী। ঋচীক ও সত্যবতীর প্রথম পুত্র জমদগ্নি। মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ এবং কনিষ্ঠ পুত্র শুনঃপুচ্ছ। কৌশিক থেকে ভৃগুর প্রসাদে মহাত্মা বিশ্বমিত্রের জন্ম হয়। ইনি বিশ্বরথ নামেও বিখ্যাত। কৌশিক বংশের মহাত্মাদের বহু গোত্র বিখ্যাত। পার্থিব, দেবরাত, সমর্ধন, উদুম্বর, উদুম্লান, অরক, লৌহিণ্য, রেণু, কারীষু ইত্যাদি এইসব বিশ্বামিত্র গোত্র।

বিশ্বমিত্র থেকে দৃষদ্বতীর গর্ভে অষ্টক নামে এক পুত্র হয়। ঋষিরা জিজ্ঞাসা করলেন –বিশ্বামিত্র ইত্যাদি নরপতিরা কি কি লক্ষণ ধর্ম, তপস্যা বা শাস্ত্র জ্ঞানে ব্রাহ্মণত্ত্ব পেয়েছিলেন? সূত বললেন– ব্রাহ্মণদের অন্যায়ভাবে উপার্জিত দ্রব্য দান পেয়ে যে ধর্ম লাভের জন্য যজ্ঞ করে তার ধর্মফল লাভ হয় না। যে গর্ব করে ব্রাহ্মণদের দান করে, তার দান ও নিষ্ফল হয়। ধন ঐশ্বর্য লাভ করার জন্য যে জপ সাধনা করে, তার দেওয়া সমস্ত দানই নিষ্ফল হয়। হিংস্র প্রকৃতির লোকেরা ধর্ম, করার ইচ্ছাতে দান বা যজ্ঞ করেন, তাদেরও সাফল্য লাভ ঘটে না। কোন কামনা না করে সত্ভাবে উপার্জিত অর্থ যে সৎপাত্রে দান করেই সুখ, স্পর্ধা লাভ হয়, বিশ্বামিত্র তপোবনেই ঋষিত্ব পান।

একানব্বইতম অধ্যায়

সূত বললেন–প্রভার গর্ভে পাঁচজন স্বর্ভানু তনয় জন্ম গ্রহণ করলেন। এঁরা সবাই মহীপতি, মহাত্মা। এদের মধ্যে নরপতি নহুষ সবার থেকে বড়। তার ছেলে পুত্রধর্মা, তার ছেলে ধর্মবৃদ্ধ, তার ছেলে সূতহোত্র। এঁর তিনজন ধার্মিক পুত্র ছিল– কাস, সল ও গৃৎসম্পদ, গৃৎসম্পদের ছেলে সুনক। তার ছেলে শৌনক। এই শৌনকের বংশে নানা কাজের ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ উৎপন্ন হয়েছিল। সনের ছেলে অষ্টির্ষেণ, তার ছেলে চরন্ত। কাসের

ছেলে কাসয়, রাষ্ট্র দীর্ঘতপা। দীর্ঘতপার ছেলে বিদ্বান ধর্ম, তার ছেলের নাম ধন্বন্তরী। ধর্মের বার্ধক্যের সময় তপস্যার ফলে এই মহাতেজা ধন্বন্তরী জন্ম নেন।

ঋষিরা জিজ্ঞাসা করলেন –দেবল ধন্বন্তরী মানুষ লোকে কিভাবে জন্ম নেন। সূত বললেন– দ্বিজগণ! ধন্বন্তরি সম্ভব কথা শুনুন। আগে সমুদ্র মন্থন কালে ধন্বন্তরী উৎপন্ন হয়েছিলেন। সমুদ্র গর্ভে যার যার উৎপত্তি হয়েছিল, তার উৎপত্তি প্রথম। তিনি পরম রূপ সম্পন্ন। ব্রহ্মা তাকে বলেছিলেন- তুমিই অজ। সেই থেকেই তিনি অজ নামে প্রসিদ্ধ। অজ বিষ্ণুকে বললেন– আমি তোমার ছেলে, তুমি আমার যজ্ঞ বিভাগ ঠিক করে দাও। বিষ্ণু বললেন– বিধিমতো বেদে যজ্ঞ বিভাগ সব ঠিক করা আছে। এখন যজ্ঞভাগীদের মত তোমায় কোনও অধিকার দিতে পারবো না। তুমি পরে জন্মেছো। তুমি দ্বিতীয় জন্মে জগতে খ্যাতি লাভ করবে।

তুমি গর্ভাবস্থায় দেবত্ব লাভ করবে। ব্রাহ্মণরা বরুণ মন্ত্র, ঘি ও গন্ধ দিয়ে তোমার অর্চনা করবে। তারপর তুমি আয়ুর্বেদের প্রবর্তক হবে। বিষ্ণু এইভাবে ধন্বন্তরিকে বর দান করে অন্তর্হিত হলেন। দ্বিতীয় দ্বাপরে রাজা দীর্ঘতপা পুত্র কামনায় তপস্যা করেন। তখন তার বিশিষ্ট বুদ্ধিশালী পুত্র রূপে ধন্বন্তরি তার গৃহে জন্ম নেন। ধন্বন্তরী আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রবক্তা। ভরদ্বাজ সেটি চিকিৎসা প্রণালীর সাথে আট ভাগে ভাগ করে শিষ্যদের শিক্ষা দেন। ধন্বন্তরীর ছেলে কেতুমান, তারপর নরপতি ভীমরথ, ইনি দিবোদাস নামে বারাণসীতে অধিপতি ছিলেন।

তার সময়ে ক্ষেমক নামে এক রাক্ষস বারাণসী পুরী ধ্বংস করে ফেলে। আসলে নিকুম্ভ অভিশাপ দিয়েছিলেন, বারাণসী হাজার বছর পর্যন্ত বার বার ধ্বংস হয়ে শূন্য হয়ে যাবে। এই অভিশাপ থেকে দূরে থাকবার জন্য দিবোদাস গোমতীর তীরে তার সুন্দর পুরী তৈরি করলেন।

ঋষিরা একথা শুনে সূতের কাছে জানতে চাইলেন—কেন ধর্মাত্মা নিকুম্ভ বারাণসীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। সূত বললেন– মহাতেজা রাজর্ষি দিবোদাস রাজধানী বারাণসী ধামে বাস করতেন। ঐ সময় মহেশ্বরের বিবাহ হয়। পত্নী পার্বতীর জন্য তিনি কিছুদিন শ্বশুরবাড়িতে বাস করতে লাগলেন। মহেশ্বরের আদেশে তাঁর পারিষদরা বিশেষ বিশেষ রূপ ধরে মহেশ্বরীকে আনন্দ দিতে লাগলেন। কিন্তু মেনকার তাতে আনন্দ হল না। তিনি দেব, দেবী সকলেরই নিন্দে করতে লাগলেন। কন্যাকে বললেন– তোমার স্বামী দরিদ্র কিন্তু সবসময় এইসব নৃত্য গীত নিয়ে রয়েছে, তিনি অনাচারী বলেই আমার মনে হচ্ছে। উমা শিবের কাছে মন খারাপ করে একথা জানালেন। আর এবার পিত্রালয় ছেড়ে মহেশ্বরের বাড়িতে যেতে চাইলেন।

মহাদেব দেখলেন, পৃথিবীতে একমাত্র বারাণসী ধামেই বসবাস করা যায়। কিন্তু সেখানে দিবোদাস নামে এক বিক্রমশালী রাজার বাস। তিনি তখন ক্ষেমক নামে তার এক পার্শ্বচরকে ডেকে বললেন– তুমি বারাণসী পুরী শূন্য করো মহাদেবের আদেশে গণপতি নিকুম্ভ বারাণসী গিয়ে সেখানে মঙ্কন নামে এক নাপিতকে স্বপ্ন দিয়ে বললেন– এখানে আমার মূর্তি বসিয়ে একটি মন্দির স্থাপন কর।

নাপিত রাজার আদেশ নিয়ে নগরদ্বারে মন্দির স্থাপন করল। সেখানে রোজ রোজ মহাসমারোহে পূজা হতে লাগল। গণাধিপতি এভাবে রোজ পূজা পেতে থাকলেন। আর নগরবাসীদের হাজার হাজার বর দিতে লাগলেন। ধন, দৌলত, পুত্র আয়ু সবাইকে তিনি দান করতে লাগলেন। রাজমহিষী সুমনা সেখানে বর নিতে এলেন।

পুত্র লাভের জন্য রাজপত্নী মহাসমারোহে গণেশ্বরের পূজা করলেন। কিন্তু নিকুম্ভ তাকে কোনও কারণে পুত্র দান করলেন না। তিনি ভাববেন, মহিষীকে পুত্র দান না করলে রাজা যখন রেগে যাবেন, তখনই আমার কার্য সিদ্ধি হবে। বাস্তবিক তাই হল। রানির প্রার্থনা নিষ্ফল হল দেখে, রাজা ভাবলেন আমার নগরের দ্বারে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই ভূত রোজ রোজ এত পূজা পায় আর নগরবাসীদের বর দেয়। কিন্তু রানি পুত্রের জন্য এতবার এর অর্চনা করল, তখন ঐ ভূত প্রার্থনা কানে তুলল না। আমি এর মন্দির ধ্বংস করব। এ পূজা পাওয়ার যোগ্য নয়। এইভাবে রাজা প্রচণ্ড রেগে গিয়ে ঐ জায়গা ধ্বংস করলেন।

গণেশ্বর নিজের মন্দির ধ্বংস হয়েছে দেখে রাজাকে শাপ দিলেন– তোমার পুরী ঠিক এই ভাবে শূন্য হবে। তখন মহাদেবের ইচ্ছামত রাজার পুরী ধ্বংস হল। সেই জায়গায় মহেশ্বর নিজের ইচ্ছায় তখনই এক ঐশ্বর্য মণ্ডিত ভবন তৈরি করে নিলেন। মহেশ্বর ও মহেশ্বরী আনন্দে সেখানে দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিন পর আর দেবী ঐ বাড়িতে থাকতে আনন্দ পেলেন না। কিন্তু মহেশ্বর হাসিমুখে বললেন–আমি এখানেই থাকব। এ জায়গা থেকে যাব না। তুমি যেতে হয় যাও। এভাবে তিন যুগে ধর্মাত্মা সর্বদেব নমস্কৃত মহাদেব ঐ পুরেই বাস করতে থাকেন।

কলিযুগে আবার নতুন পুরী স্থাপিত হয়। এভাবে বারাণসী অভিশপ্ত ও পরে আবার পুনর্নির্মিত হয়েছিল। দিবোদাস একবার ভদ্রাগণ্য রাজার একদা ধনুকধারী বীর ছেলেদের হত্যা করে রাজ্য অপহরণ করেন। ভদ্রাগণ্য-এর দুর্দর্ম নামে একটি বালক পুত্র ছিল। সে নিতান্ত ছোট

ছেলে বলে রাজা দিবোদাস তাকে অবজ্ঞা করেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। দিবোদাসের, দৃষদ্বতী গর্ভে প্রতর্দন নামে এক বীর পুত্র জন্মায়।

এদিকে ভদ্রাগণ্য-এর সেই বালক পুত্র পরবর্তীকালে মহারাজ হয়ে শত্রু নিধন করে প্রতদনের কাছ থেকে তার পিতৃরাজ্য আবার অধিকার করলেন। প্রতদনের দুই ছেলে বৎস ও গর্গ। তার মধ্যে বৎসের ছেলে অলর্ক, তার ছেলে সন্নতি। রাজর্ষি অলকের প্রতি আগে শ্লোকে বলা হয়েছিল এই রাজা লোপামুদ্রার প্রসাদে ষাট হাজার ষাট শত বছর পরমায়ু পাবেন। ইনি শাপ থেকে মুক্ত হয়ে ক্ষেমক রাক্ষসকে হত্যা করে আবার সুরম্য বারাণসী ধামে বসবাস করবেন।

অলর্কের পুত্র সন্নতির সুনীথ নামে এক ধার্মিক পুত্র জন্মে। এঁর পুত্র সুকেতু, সুকেতু পুত্র ধর্মকেতু, তাঁর পুত্র মহারথ সত্যকেতু, তাঁর পুত্র প্রজাপালক বিভু। বিভুর পুত্র সুবিভু। তাঁর পুত্র সুকুমার এঁর পুত্র ধার্মিক ধৃষ্টকেতু। এঁর পুত্র বেণুহোত্র, তার পুত্র গার্গ, তার ছেলে ভর্গভূমি এবং বৎসের পুত্র বাৎস্য। এই ভর্গ ও বৎস থেকে বহু সুধার্মিক ব্রাহ্মণ বলবীর্যশালী ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হন। এই আমি কাশীপতিদের বিবরণ বললাম।

এরপর রজি রাজার বংশতালিকা বলছি। রজির একশো ছেলে। এর মধ্যে পাঁচ ছেলে জগৎবিখ্যাত। সেই পুরাকালে ভীষণ দেবাসুর সংগ্রাম শুরু হলে দেব অসুর দুই পক্ষই একসাথে পিতামহের কাছে গিয়ে বললেন–আমাদের মধ্যে কে বিজয়ী হবে, বলে দিন। ব্রহ্মা বললেন–যাঁদের পক্ষে যুদ্ধে রাজা অস্ত্র ধারণ করবেন, সেই পক্ষই ত্রিলোকজয়ী হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

যে পক্ষে রজি সেই পক্ষেই বিজয়লক্ষ্মী, যেখানে লক্ষ্মী, সেখানে ধৃতি আর সেখানেই ধর্ম, ধর্মেরই জয় হয়। তখন দেব দানব সকলে রজির স্তব করতে লাগলেন। তারা সকলেই রাজাকে বললেন–তুমি আমাদের হয়ে যুদ্ধ কর। রজি বললেন–আমি তোমাদের সকলকেই যুদ্ধে জয়ী করব। ইন্দ্র প্রভৃতি সব দেবতাদের পরাস্ত করে আমিই ধর্মাত্মা ইন্দ্র হব। যদি সম্ভব হয়, তাহলেই আমি অস্ত্রধারণ করতে পারি।

ঐ কথার উত্তরে দানবরা বলল– আমাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ। আমরা তাঁরই জন্য যুদ্ধ জয় করে থাকি। তাই হে রাজন! আপনি দেব পক্ষের কথায় বাধ্য হবেন না। কিন্তু সেই সময় দেব পক্ষ বলে উঠলেন রাজন, আপনি সবাইকে জয় করে ইন্দ্র হবেন। আমাদের আপত্তি নেই। এরকম আমন্ত্রণে রাজা ইন্দ্রের সামনে সমস্ত দানবদের বিনাশ করলেন। রজি রাজা দানবদের হত্যা করে দেবতাদের স্ত্রী সকলকে উদ্ধার করলেন। তখন শতক্রতু দেবতাদের সঙ্গে রজি রাজাকে

বললেন–আমি আপনার ছেলে, এই বলে আবার বললেন–আপনি দেবতাদের ইন্দ্র হলেন সন্দেহ নেই। আমি ইন্দ্র আপনার পুত্র রূপে বিখ্যাত হব। দেবমায়ায় বঞ্চিত হয়ে রাজা বললেন–তথাস্তু।

পরে রাজা রজি স্বর্গধামে এলে তার পুত্রেরা ইন্দ্রের কাছ থেকে সমস্ত সম্পত্তি হরণ করে নিল। সাত পুত্র নানাভাবে স্বর্গলোক আক্রমণ করল। হৃত গৌরব মহাবল ইন্দ্র নিজের ভাগ্য বিপর্যয়ে ব্যাকুল হয়ে বৃহস্পতিকে বললেন–হে ব্রাহ্মণ! আমি রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়েছি। আমি নিস্তেজ, দুর্বল ও বিমূঢ় হয়ে পড়েছি। রজি রাজার ছেলেদের জন্যই আমার এমন অবস্থা। আপনি প্রসন্ন হন। বৃহস্পতি বললেন–হে শতক্রতু। তুমি যদি আগে আমাকে এই বলতে, তা হলে তোমার এরকম অবস্থা হত না। তোমার মঙ্গলের জন্য আমি এবার চেষ্টা করব। তোমার রাজ্য, যজ্ঞভাগ তুমি তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে।

তারপর বুদ্ধিমান বৃহস্পতি রজি পুত্রদের বুদ্ধি ভ্রংশ করলেন। তারা নিজেদের ভ্রাতাদের সঙ্গে বিবাদে মেতে উঠল অধার্মিক, ব্রহ্মবিদ্বেষী হয়ে উঠল। সে কারণে তাদের বীর্যবল সবই নষ্ট হয়ে গেল। ইন্দ্র সেই সুযোগে রাজপুত্রদের বিনাশ করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করলেন। ইন্দ্র পুনরায় দৈব ঐশ্বর্য লাভ করলেন।

.

বিরানব্বইতম অধ্যায়

ঋষিরা এবার মহাত্মা মরুত্তের সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সূত বললেন– মহাতেজা রাজা অন্ন কামনায় ষাট বছর ধরে প্রতি মাসে মরুৎসোমের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। মরুগণ তাঁর প্রতি তুষ্ট হয়ে সর্বকাম সমৃদ্ধ অক্ষয় অন্নদান করলেন। যে অন্ন একবার রান্না করা হলে অহোরাত্র মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হত না। সূর্যোদয় হবার পর কোটিবার দেওয়া হলেও নিঃশেষ হবার সম্ভাবনা ছিল না।

মরুত্তের কন্যার গর্ভে যে সব ছেলেরা জন্মেছিলেন তারা সকলেই ধার্মিক মোক্ষদসী, তাঁরা সংসার ধর্ম ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তারপর ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেন। এরপর অনপায় জন্মগ্রহণ করেন। তার থেকে প্রতাপবান ধর্মের উৎপত্তি হয়। ধর্ম থেকে ক্ষাত্রধর্ম ও তার থেকে মহাতপা প্রতিপক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিপক্ষের ছেলে বিশ্ব বিশ্রুত সঞ্জয়, তার ছেলে জয়। তার পুত্র বিজয়, তার ছেলে দ্বিতীয় জয়, তার পুত্র হর্ষত, তাঁর পুত্র প্রতাপবান

সহদেব, তাঁর পুত্র ধর্মাত্মা বিখ্যাত অদীন, তাঁর পুত্র জয়ৎ সেন। তাঁর পুত্র সস্কৃতি, তার পুত্র কৃতবর্মা– এঁরা সকলেই ক্ষত্রধর্মী ছিলেন।

এবার নহুষ বংশের বিবরণ বলছি। রাজা নহুষের সকল পুত্রই ইন্দ্রের মত তেজঃশালী, পিতৃ কন্যা বিরজার গর্ভে ঐ সব ছেলে জন্মায়। তাঁরা হলেন– যতি, যযাতি, সংযাতি ও আয়তি প্রভৃতি। এদের মধ্যে যতি জ্যেষ্ঠ এবং যযাতি সবার ছোট। যতি কাকুৎস্থ কন্যার পানিগ্রহণ করেন। সংযাতি মোক্ষমার্গ অবলম্বন করে মৌনভাবে ব্রহ্মের কাছে থাকেন।

যযাতি ছিলেন পৃথিবীর অধিপতি তিনি উশনার কন্যা দেবযানিকে বিবাহ করেন। অসুররাজ বৃষপর্বার নন্দিনীও তার প্রণয়িনী ছিলেন। দেবযানীর গর্ভে যযাতির যদু ও তুর্বসুর জন্ম হয়। আর শর্মিষ্ঠার গর্ভে হ্য, অনু ও পুরু জন্ম গ্রহণ করেন। যযাতি দেবকুমারের মতো সব পুত্রের জন্মদাতা, রুদ্র খুশি হয়ে যযাতিকে একটি সোনার রথ ও অক্ষয় মহৌষধি দান করেন। ঐ রথ বেগবান ঘোড়া দ্বারা চালিত, এদের দ্বারা তিনি জগৎ জয় করেন।

দেব-দানবদের অপেক্ষা দুধর্ষ ছিলেন রাজা যযাতি। তার সেই রথ পুরু বংশীয় রাজারাও ব্যবহার করেছিলেন। পরীক্ষিতের ছেলে জনমেজয়ের রাজত্বকালের কিছুদিনের পরেও ঐ রথ পুরুবংশীয়দের দখলে ছিল। তারপর মহর্ষিগণের শাপে তা নষ্ট হয়ে যায়। রাজা জনমেজয় গর্গপুত্রকে হিংসা করেন। তাতে গর্গের শাপে রক্ত গন্ধ যুক্ত দেহে এদিকে ওদিক বিচরণ করতে থাকলেন। নগরবাশীরা তাকে পরিত্যাগ করল। কোথাও শান্তি পেলেন না। তখন দুর্দশার কারণ স্বরূপ সেই ঋষিকে অভিসম্পাত করতে লাগলেন। ইন্দ্র নামে এক উদারচেতা মুনি ছিলেন। তিনি জনমেজয়ের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তাঁর আশ্রমে গিয়ে জনমেজয় শাপমুক্ত হন।

আগের সেই দিব্যরথ কুরুবংশীয়দের হাত থেকে চেদিপতি বসুর অধিকারে আসে। তারপর আবার সেই রথ ইন্দ্রের আয়ত্তে এলে তিনি তুষ্ট হয়ে বৃহদ্রথকে দান করেন। তারপর জরাসন্ধের অধিকারে আসে। ভীম জরাসন্ধকে হত্যা করে সেই রথ বাসুদেবকে দান করেন। নহুষের পুত্র রাজা যযাতি নিজের পুত্র যদুকে বললেন– শুক্রাচার্যের শাপে জরা আমায় আক্রমণ করেছে, যৌবন ভোগে এখনও আমি তৃপ্ত হইনি। তুমি আমার জরা সহ পাপ গ্রহণ কর। যদু বললেন– আমি এক ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দান করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

জরা গ্রহণ করলে আমি ভিক্ষা করতে যেতে পারবো না। জরায় শরীর শিথিল হয়ে যায়, আকৃতি দুর্বল হয়ে যায়, দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে যায়। তাই আমি আপনার জরা গ্রহণ করতে

পারছি না। আমি ছাড়া আপনার অনেক প্রিয় পুত্র আছে, তাদের কাউকে অনুরোধ করুন। যযাতি একথা শুনে ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, আমাকে অগ্রাহ্য করে তোমার কি বা কাজ থাকতে পারে আর ধর্ম বিধিই বা কি হতে পারে।

তিনি যদুকে অভিশাপ দিলেন। রাজ্যচ্যুত করলেন। তারপর তিনি তুর্বসুকে বললেন–তুমি আমার জরা গ্রহণ করো। আমি তোমার যৌবন দ্বারা বিষয় ভোগ করব। পরে এক হাজার বছর পূর্ণ হলে পুনরায় আমার পাপ ও জরা ফিরিয়ে নেবো। তুর্মু বললেন–আমি জরা গ্রহণ করতে চাই না। বিশেষত পান বা ভোজনের পক্ষে জরা একেবারেই উপযুক্ত নয়। সুতরাং রাজন, আমি আপনার জরা গ্রহণ করতে উৎসুক নই। যযাতি বললেন–তুমি আমার হৃদয় থেকে জাত হয়েও নিজের বয়স দান করলে না, তোমার প্রজা উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী আর তোমার অধঃপতন ঘটবে।

এবার যযাতি শর্মিষ্ঠার পুত্র দ্রুহ্যকে বললেন–আমার জরা গ্রহণ করো। হাজার বছর পূর্ণ হলে আবার তোমায় যৌবন ফিরিয়ে দেব। দ্রুহ্য বললেন, জরাক্রান্ত ব্যক্তি গজ অশ্ব, রথ বা রমণী কিছুই ভোগ করতে পারে না। সুতরাং আমি জরা নিতে চাই না। যযাতি বললেন–তুমি আমার হৃদয় জাত হয়েও আমার জরা নিতে চাইলে না। এজন্য তোমার কোন প্রিয় কামনাই পূর্ণ হবে না।

যে দেশে কোনও যান নেই, শুধু ভেলা বা নৌকায় যাতায়াত করতে হয়, সেখানে অরাজবংশে তোমায় থাকতে হবে। এই বলে যযাতি অনুকেও একই কথা বললেন। অনু বলল–হে পিতা, আমি এখন শিশু, এখনই আপনার জরা গ্রহণ করে আমি জীর্ণ ও অশুচি হয়ে যাব। তাই আমি আমার বয়স দান করতে পারবো না। যযাতি শাপ দিলেন–তুমি অগ্নিদগ্ধ হবে, তোমার প্রজারাও অকালে বিনষ্ট হবে।

এবার যাতি পুরুকে বললেন–শুক্রচার্যের শাপে জরা আমায় আক্রমণ করেছে, তুমি আমার জরা নিয়ে তোমার হাজার বছরের যৌবন দাও। পুরু তখন বললেন–আপনি যা অনুমতি করবেন। আমি তাই করব। আমি আপনার পাপ ও জরা গ্রহণ করছি। আপনি আমার যৌবন নিয়ে যথেচ্ছো ভোগ করুন। যযাতি বললেন–পুরুবৎস আমি খুশি হলাম। আমি তোমায় বর দিচ্ছি, তোমার রাজ্যের প্রজারা সর্বকাম সমৃদ্ধ হবে। তোমার মঙ্গল হবে।

সূত বললেন–রাজা যযাতি নিজের জরা পুরুর মধ্যে সংক্রমিত করলেন। যযাতি খুশি হয়ে ইচ্ছেমতো নিজ যোগ্য সুখ ভোগ করতে থাকলেন। তিনি দেবতা, ব্রাহ্মণ, দীন, দরিদ্র, বৈশ্য

শুদ্র সবাইকে সন্তুষ্ট করলেন। দস্যুদের দমন করে ইন্দ্রের মতো প্রজাদের পালন করতে লাগলেন। কিন্তু রাজার ভোগের আশা উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে থাকলে, নিজেই একসময় পুরুর কাছ থেকে জরা চেয়ে নিলেন। তিনি পার্থিব সমস্ত ভোগ করে তৃপ্ত। পুরুকে বললেন– আমি তোমার যৌবন নিয়ে বিষয় ভোগ করেছি।

তোমার মঙ্গল হোক। একমাত্র তুমিই আমার প্রিয় পুত্র। তুমি নিজের রাজ্য ও যৌবন গ্রহণ কর। যযাতি খুশি হয়ে কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্যের রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করতে চাইলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরা বললেন– হে প্রভু! শুক্রাচার্যের দৌহিত্র দেবযানীর ছেলে যদুই সকলের বড়। তাকে সিংহাসন দান না করে সর্বকনিষ্ঠ পুরুকে কিভাবে রাজ্য দান করবেন? যদু হলেন সবার বড়, তারপর তুর্বসু, তারপর শর্মিষ্ঠার পুত্রগণ, দ্রুহ্য, অনু, এবং পুরু। আপনাকে আমরা ধর্ম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এবার। আপনি আপনার ধর্ম পালন করুন।

যযাতি বললেন–হে ব্রাহ্মণে ইত্যাদি বর্ণগণেরা! আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কখনোই রাজ্য দান করব না। যে পুত্র পিতা-মাতার কথা শোনে তাকেই শ্রেষ্ঠ পুত্র বলে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়েও, সে আমার আদেশ পালন করেনি, সে পুত্র পদের অযোগ্য, তুর্বসু, দ্রুহ্য অণুও আমাকে অবজ্ঞা করেছে। একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র পুরুই আমার জরা গ্রহণ করে পুত্রের কাজ করেছে। ইন্দ্র আমায় বর দিয়েছিলেন, যে পুত্র তোমার বাধ্য হবে, সেই হবে রাজা।

তাই আপনারাও অনুমতি দিন, পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করি। যে পুত্র গুণবান। পিতামাতার হিতৈষী, সে কনিষ্ঠ হলেও কল্যাণ লাভের যোগ্য। তখন সকলেই বললেন–আপনার প্রিয় পুত্র পুরুই রাজ্যের অধিকারী। বিশেষ করে শুক্রাচার্য যখন বরদান করেছেন, এ বিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। তখন রাজা যযাতি পুরুকে নিজের রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

এভাবে রাজা যযাতি সপ্তদ্বীপা পৃথিবী জয় করে, পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেন। যযাতির পুত্ররা সমস্ত মেদিনীতে রাজত্ব করতে থাকেন। তার ধর্মজ্ঞ রাজা এবং ধর্ম অনুসারেই প্রজাপালন করেন। যে যযাতি কামভোগের জন্য নিজের পুত্রের যৌবন নিয়েছিলেন, তিনিই পুরাকালে বলেন–কামের দ্বারা কাম ভোগের তৃপ্তি হয় না, আগুনে ঘি সংযোগের মত তা আবার বাড়তেই থাকে। তাই কামে হতজ্ঞান হওয়া উচিত নয়।

যখন কোনো কাজ মন ও বাক্য দিয়ে সর্বভূতে সমভাব স্থাপন করা যায়, তখনই ব্রহ্মস্বরূপ লাভ হয়ে থাকে, যখন কারোর থেকে কোন ভয় থাকে না, বা নিজে অন্যের ভয়ের কারণ না হতে হয়, যখন রাগ, দ্বেষ, ইচ্ছা কিছুই থাকে না, তখন ব্রহ্ম স্বরূপ হওয়া যায়। জগতে যা কিছু

কামসুখ বা যা কিছু দিব্য মহৎ সুখ আছে, তা পরম সুখের যোগ্য নয়। সমস্ত সুখের থেকে বাসনা ত্যাগ করাই পরম সুখ।

এই বলে রাজা যযাতি সস্ত্রীক বনে গেলেন এবং তপস্যা করে শত শত ব্রত পালন করে সেখানেই স্বর্গলাভ করেন।

.

তিরানব্বইতম অধ্যায়

সূত বললেন–আমি এবার বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছি যযাতি পুত্র যদুর বংশের। যদুর পাঁচ পুত্র হয়। তার মধ্যে সহস্রজিৎ শ্রেষ্ঠ, সহস্র জিতের পুত্র শ্রীমান সৎজিৎ, সৎজিতের তিন পুত্র। তিন জনই পরম ধার্মিক বলে বিখ্যাত। তাঁদের নাম হৈহয়, হয়, ধনু হয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্মতত্ত্ব, তাঁর পুত্র কীর্তি, তার পুত্র সংজ্ঞেয়, তার পুত্র মহিস্মান, তাঁর পুত্র প্রতাপবান ভদ্রশ্রেন। ইনি বারাণসীর অধিপতি ছিলেন। ভদ্রশ্রেন্যের পুত্র দুর্দম, তার পুত্র ধীমান কনক। কনকের চার পুত্র উৎপন্ন হয়। তাদের নাম কৃতবীর্য, কৃতবর্ম ও কৃতজাত। তার মধ্যে কৃতবীর্যের ছেলে কার্তবীর্য অর্জুন। এই অর্জুন সাত দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। ইনি অনযুতবর্ষ পর্যন্ত তপস্যা করে অত্রি পুত্র দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করেন। তিনি অর্জুনকে চারটি মহান বর দান করেছিলেন।

অর্জুন প্রথমে নিজের হাজার বাহু লাভের বর প্রার্থনা করেন। তাঁর দ্বিতীয় বর প্রার্থনা অধার্মিক লোকেদের ধর্ম পথে নিয়ে আসা। তৃতীয় ধর্মানুসারে পৃথিবী জয় ও পালন। চতুর্থ বর বহু সংগ্রাম জয় করে, বহু শত্রু নিধন করে, নিজের থেকে প্রধান ব্যক্তির হাতে সংগ্রামে নিজের মরণ। এভাবে বর লাভ করে সাতদ্বীপ শাসন করেছিলেন। তার সঙ্গে যুদ্ধকালীন স্থানে মায়ার বশে বহু হাজার রথী আবির্ভূত হত। তিনি রাজা হয়ে সাতদ্বীপে দশ হাজার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই রাজার সব যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়েছিল। তার যজ্ঞের সব বেদী সব যূপই ছিল সোনার তৈরি।

তিনি যজ্ঞ আরম্ভ করলে স্বর্গের দেবতারা, গন্ধর্ব ও অপ্সরারা যজ্ঞভূমিকে শোভা দান করতেন। সে সময় নারদ নামে জনৈক গন্ধর্ব, রাজা কার্তবীর্য অর্জুনের মাহাত্ম গান করেছিলেন মানুষের মধ্যে কেউ যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বিশ্রাম ও শাস্ত্র জ্ঞান দিয়েও অর্জুনের সমকক্ষ হতে পারবে না। সেই অর্জুন সাতটি দ্বীপেরই রথী, খড়গী ও ধনুর্বানধারী হয়ে বিচরণ করতে দেখা যেত। তিনি ধর্মানুসারেই সমস্ত প্রজাপালন করতেন। তিনি সাতাশী বছর রাজত্ব

করেন। তার রাজ্যে তিনি পশুপাল ও ক্ষেত্রপাল রূপে বিরাজ করতেন। তিনি হাজার বাহু দিয়ে হাজার রক্ষীযোগে প্রভাত সূর্যের মত প্রতিভাত হতেন। তিনি সহস্রবাহু নাগের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, তিনি অনায়াসে সমুদ্রের বেগ রোধ করতে পারতেন।

পুরাকালে তিনি একদিন নর্মদাকে অনুসরণ করে সমুদ্রে উপনীত হয়ে সেখানে স্নান করেন, তখন তার হাজার বাহু থেকে যে জল পড়েছিল তাতে বেলা ভূমি প্লাবিত হয়েছিল। পাতালের মহাসুরেরা ভয়ে জড়সড় হয়ে লুকিয়ে পড়েছিল। হাজার হাতের আলোড়নে জল জন্তুরা ভয় পেয়ে যায়। তিনি লঙ্কাপুরে গিয়ে লঙ্কাপতি রাবণকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় বেঁধে নিয়ে, আসেন। পুলস্ত্য তাঁকে খুশি করলে তবে অর্জুন পুলস্ত্যের পৌত্র রাবণকে মুক্ত করেন। জমদগ্নির পুত্র মহাবীর্য পরশুরাম অর্জুনের সহস্রবাহু যুদ্ধক্ষেত্রে তালপাতার মতো ছিঁড়ে ফেলেন। তিনি চিত্রভানুকে পৃথিবী ভিক্ষা দিয়ে দিয়েছিলেন।

সূর্য পৃথিবীকে তাপ আলো দান করতে লাগলেন। হৈহয়-এর সাহায্যে সূর্য সমস্ত পৃথিবীকে দুগ্ধ করলে, সে সময় বরুণের ছেলের একটি শূন্য অবগ্রম পুড়ে যায়। বরুণ দেবের অশ্বিন নামে এক পুত্র ছিল, এই পুত্রই পরে বশিষ্ঠ নামে বিখ্যাত হন। আশ্রম পুড়ে যাওয়াতে তিনি শাপ দিয়েছিলেন। তুমি যত বড় বীর হও, অন্যের হাতে তুমি বিনষ্ট হবে। পরবর্তীকালে পরশুরাম অর্জুনের বাহু কেটে তাঁকে হত্যা করেন। সুতরাং বশিষ্ঠের শাপেই তার মৃত্যু হয়। তার একশো ছেলের মধ্যে পাঁচ জন মহাবলী ছিলেন, তাঁদের নাম শূর, শূরসেন, বৃষ্ঠাঙ্গ, বৃষ ও জয়ধ্বজ। পুত্রেরা অবন্তী দেশ থেকে রাজ্য পরিচালনা করতেন। জয়ধ্বজের ছেলে প্রতাপবান তালজঙঘ তাঁর একশো ছেলে। তারা সকলেই তালজঙ্ঘ নামে বিখ্যাত ছিলেন।

কালক্রমে মহাত্মা হৈহয় পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেন। যথা- বীরহোত্র, ভোজ, আবর্তি, তুন্ডিরেক ও তালজঙ্। এরা সমষ্টিতে অসংখ্য, সকলেই বিক্রমশালী। বীরহোত্রের পুত্র রাজা অনন্ত। তার ছেলে দুর্জয়। তাঁর পুত্র অমিদানি। রাজা অর্জুন নিজের প্রভাবে সমস্ত প্রজাপালন করতেন।

.

চুরানব্বইতম অধ্যায়

ঋষিরা বললেন–আমরা শুনেছি, কার্তবীর্য অর্জু, প্রজাপালক ও প্রজা অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাহলেও কেন মহাত্মা বশিষ্ঠের আশ্রম পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই ঘটনার বিবরণ আমাদের

কাছে বলুন। তখন সূত বললেন–একবার সূর্যদেব অর্জুনের কাছে উপস্থিত হয়ে খাদ্যবস্তু ও অন্ন ভিক্ষা করলেন। রাজা জানতে চাইলেন, কি ধরনের ভোজ্যবস্তু দান করবেন। সূর্য বললেন, আমাকে সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি খাদ্য রূপে দান কর। আমি তাতেই তৃপ্ত হব। রাজা বললেন–আমি মানুষ হয়ে সমস্ত স্থাবর বস্তু দান করতে পারব না। আপনাকে তাই এখন প্রণাম করতে হল। সূর্য তখন সন্তুষ্ট হয়ে তার নিজের সর্বগামী অক্ষয় শরগুলি দান করলেন। এই শর আদেশ পাওয়া মাত্র মেঘ, সাগর শোষণ করবে।

এরপর আদিত্য অর্জুনকে শরগুলি দান করলেন, পরে অর্জুনের কাছ থেকে স্থাবর বস্তুগুলি পেলেন। তখন আশ্রম, গ্রাম, নগর, জনপদ, তপোবন, রম্য কানন– সবই তিনি দগ্ধ করলেন। সূর্য তেজে পুড়ে গিয়ে ধরিত্রী, গাছপালা তৃণহীন হয়ে গেলেন। এই সময় মহর্ষি বশিষ্ঠ নিয়ম পালনের জন্য দশ হাজার বছর ধরে জলের তলায় বাস করছিলেন। মহাতেজ ঋষি তপস্যা শেষ হয়ে গেলে জল থেকে উঠে আশ্রমে এসে দেখলেন সব পুড়ে গেছে। তখনই ঋষি বশিষ্ট রেগে গিয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

এবার রাজর্ষির ক্রোফ্টর বংশ বিবরণ শুনুন। এই বংশে ধনুর্ধর বৃষ্ণি জন্মগ্রহণ করেন। ক্রোষ্টুর এক ছেলে, তার নাম স্বাহি। স্বাহির ছেলের নাম রসাদু। রসাদুর যজ্ঞের ফলে চিত্ররথ নামে এক বীর পুত্র জন্মায়। চিত্ররথও রাজা হয়ে বাহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পরবর্তীকালে তিনি শশবিন্দু নামে বিখ্যাত হন। এই শশবিন্দু মহাবল, মহাবীর্য, প্রজাঅনুরাগী, চক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত রাজা ছিলেন। রাজা শশবিন্দুর একশোজন গুণশালী পুত্র ছিলেন।

এদের মধ্যে ছয়জন বিখ্যাত হন এঁরা হলেন–পৃথুশবা, পৃথুযশা, পৃথুবর্মা, পৃথুজ্জয়, পৃথুকীর্তি, ও পৃথুদাতা। তারা সকলেই শশবিন্দু নামে বিখ্যাত হন। পৃথুশ্রবার অন্তর নামে এক পুত্র হয়। এই অন্তর প্রাচীনকালে ধর্মাত্মা উশনা হয়ে পৃথিবী শাসন করেন। এঁর পুত্রের নামই মরু ও তার পুত্র কম্বলবাই, তাঁর পুত্র বরুক্সকবচ। এঁর পাঁচটি পুত্র ছিল। তাদের নাম রুক্সেযু, পৃথুরুক্স, জ্যামর্থ, পরিখ ও হরি। ভাই জ্যামখকে অন্যান্যরা নির্বাসিত করছে তিনি বনে কাটাতে লাগলেন। জ্যামথের পত্নীর নাম শৈব্যা। ইনি তেজস্বিনী ছিলেন।

রাজা অপুত্রক ছিলেন কিন্তু বিয়ে করে অন্য পত্নী আনেননি। যুদ্ধ জয় করে তার একটি কন্যা লাভ হয়। রাজা তার পত্নীকে বললেন–তোমার যে পুত্র হবে তার সঙ্গে এই কন্যার বিবাহ হবে। রানি শৈব্যা উগ্র তপস্যা করে বিদর্ভ নামে পুত্র প্রসব করেন। এই কন্যার সঙ্গে বিদর্ভের বিয়ে

হয়। তখন তার দুই পুত্র জন্ম নেয়। ক্রথ ও কৌশিক দুই রাজপুত্রের নাম। তৃতীয় পুত্রের নাম লোমপাদ। এই ধার্মিক লোমপাদের ছেলের নাম বস্তু। তার ছেলে আহুতি।

কৌশিক থেকে চেদির জন্ম। চেদি থেকে চৈদ্য রাজারা খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ক্রথ থেকে কুন্তী নামে পুত্র জন্মে। কুন্তীর ছেলে ধৃষ্ট। ধৃষ্টের ছেলে প্রতাপশালী নিবৃতি। এর পুত্র দশাই। তার ছেলে ব্যোমা, তার ছেলে জীমূত। তার ছেলে বিকৃতি, ধার্মিক। রথবর পুত্র নবরথ। এঁর ছেলে দশরথ। তার ছেলে একাদশ রথ। তাঁর পুত্র শকুনি। এইভাবে যথাক্রমে করম্ভক, দেবরথ, দেবক্ষত্র, দেবেন, মধু, মনু, মনুবশ, নন্দন ও মহাপুরুবশ, পুরুব্বান, পুরুব্বহ, সত্ত্ব এবং কীর্তিমান সাত্ত্বত জন্ম নেন। এই জল জ্যামখের বংশ বিবরণ।

.

পঁচানব্বইতম অধ্যায়

সূত বললেন–রূপবতী কৌশল্যা কয়েকজন পুত্র জন্ম দেন। তাঁদের নাম ভজিন, ভজমান, দিব্য, দেবাবৃধ, অন্ধক, মহাভোজ ও যদু নন্দন বৃষ্ণি। এঁদের মধ্যে মৃঞ্জরীর গর্ভে ভজমানের বাহ্য ও উপরিহাব্য নামে দুই পুত্র জন্মে। তার মধ্যে বাহ্যক মৃঞ্জয়ের দুইকন্যাকে বিবাহ করেন। সেই দুই বোন অনেক পুত্রের জননী হন। বাহ্যক থেকে বড় পত্নী গর্ভে নেমি, প্রণব, পুরপুরঞ্জয় বৃষ্ণি জন্ম নেন, বাহ্যকের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে কোটিজিৎ, সহস্রজিৎ, সত্যজিৎ ও বামক নামে চারপুত্র জন্মে।

পুরাণজ্ঞ দ্বিজেরা মহাত্মা দেবাবৃধের পুণ্যরাশির কীর্তন করেছেন। দেবতুল্য দেবাবৃধর পুত্র মানবসমাজে শ্রেষ্ঠ। তিনি দানবীর, সত্যবাদী, বিচক্ষণ ও কীর্তিমান। এঁরই বংশে সুমহান ভোজ ও মার্তিকাবতগণ উৎপন্ন হয়েছেন। বৃষ্ণির স্ত্রী গান্ধারী ও মাদ্রী। গান্ধারীর গর্ভে সুত্রি জন্ম নেন। মাদ্রীর পুত্ররা হল যুধাজিৎ, দেবমীয়ষ ও অনমিত্র। এঁদের মধ্যে অনমিত্র এক পুত্র লাভ করেন। তাঁর নাম নিগ্ন। নিম্নের দুই পুত্র অগ্রসেন ও শত্রুজিৎ। সূর্য শত্রুজিতের সখা। একদিন শত্রুজিৎ রাতে ভ্রমণ করতে করতে তোয়কুল্যা নদীর জল স্পর্শ করে রবির আরাধনা করে থাকেন। তখন ভগবান সূর্য তেজপুঞ্জময় হয়েও উপাসক শত্রুজিতের সামনে অস্পষ্ট রূপে দেখা দেন। রাজা বললেন–আপনার বিশেষ রূপ কিছুই দেখছি না।

তখন ভাস্কর তাঁকে সাম্যক মণি কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন। রাজা শত্রুজিৎ সেটি গলায় পরে নগরে ঢুকলেন। নগরবাসীরা তাঁকে সূর্য মনে করে পিছন পিছন গেলেন। সকলে তাঁকে দেখে বিস্মিত

হয়ে গেল। রাজা শত্রুজিৎ ভাস্কর প্রদত্ত এই মণি তার ভাই প্রসেনজিৎকে স্নেহবশে পরিয়ে দিলেন। সেই স্যমন্তক মণির গুণ এই যে, যেখানে এটি থাকবে সেখানে রোগ ভয় থাকবে না। কৃষ্ণের একবার এই মণি সম্পর্কে খুব লোভ হয়। কিন্তু তিনি লোভ সংবরণ করে থাকেন।

এদিকে প্রসেনজিৎ ঐ মণি গলায় পরে মৃগয়ায় যান, সেখানে একটি সিংহের হাতে তার মৃত্যু হয়। এক জাম্বুবান সেই মণি নিয়ে নিজের গুহায় চলে যায়। সকলে তখন এই মণি রত্ন হরণটি কৃষ্ণের কাজ বলে মনে করে। কারণ কৃষ্ণ মণির প্রতি লালসা দেখিয়েছিলেন। এই মিথ্যা অপবাদ গোবিন্দের খুব অসহ্য হয়ে উঠল। তিনি মণির খোঁজে অনুসরণ করতে করতে জাম্বুবানের গুহায় এলেন।

সেখানে দেখলেন জাম্বুবানের শিশু পুত্রকে তার ধাত্রী সেই মণিটি দেখিয়ে কাঁদতে নিষেধ করছে। সে বলছে– হে কুমার, তুমি কেঁদোনা, এই সামন্ত্যক মণি এখন তোমারই। এরপর জাম্বুবানের সঙ্গে কৃষ্ণের একুশ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। জাম্বুবান পরাজিত হয়ে তার হাতে মণিরত্নটি এবং নিজের কন্যা জাম্বুবতাঁকে অর্পণ করেন। কৃষ্ণ শত্রুজিতের মনি তাঁকে ফেরৎ দিয়ে নিজের অপবাদ মোচন করলেন। জাম্ববতাঁকে বিধিসম্মত ভাবে বিবাহ করলেন এবং মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্ত হলেন।

শত্রুজিতের একশো পুত্র জন্মায়। তার মধ্যে তিনজন খ্যাতি সম্পন্ন। বড় ছেলে ভঙ্গকারের দ্বারবতী নামে স্ত্রীর গর্ভে তিনটি সুন্দরী কন্যা জন্ম নেয়। তাদের একজন সত্যভামা। ইনি ব্রতচারিণী তপস্বিনী। ইনি কৃষ্ণের পত্নী হন। শত্রুজিৎ থেকে পুত্র ভঙ্গকার মণিটি পেয়ে থাকেন। কালক্রমে ঐ মণি শতধন্বার কাছ থেকে অর পেয়ে যান। সত্যভামার পাণিপ্রার্থী হতে চান শতধন্বা। অক্রুর স্যমন্তক মণি পাবার আশায় এ ব্যাপারে শতধ্বনাকে সাহায্যে করার প্রতিশ্রুতি দেন।

মহাবলী শতধন্বা রাত্রিবেলা গোপনে ভঙ্গকারকে মেরে সেই মণি এনে অক্রুরকে দেন। অক্রুর প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে, শতধন্বা এ ঘটনা কারোকে বলবে না। কৃষ্ণ যদি জানতে পেরে অত্যাচার করেন তাহলে সবাই মিলে শতধন্বকে সাহায্য করবে। সমস্ত দ্বারকাপুরী অরের বশে থাকবে।

এদিকে পিতার মৃত্যুতে দুঃখিত হয়ে সত্যভামা বারণাবত নগরে এসে শতধন্বার নিষ্ঠুর কাজের কথা স্বামীকে বলে কাঁদতে লাগলেন। হরি তখন দ্বারকায় এসে জ্যেষ্ঠ হলধরকে বললেন, স্যমন্তকের জন্য সিংহ প্রসেনজিৎকে হত্যা করেছিল। আর এখন শতধন্বও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড

ঘটাল। এজন্য আপনি তাকে শাস্তি দিতে প্রস্তুত হন। শতধন্বার হত্যাতে সাহায্য করুন। তারপর তুমুল যুদ্ধ বাধল। শতধন্ব যুদ্ধক্ষেত্রেও কোথায় অরকে দেখতে পেলেন না, সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও অক্রুর সাহায্য করলেন না। তিনি ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবেন ঠিক করলেন। সিন্ধু ঘোটকে চড়ে পালানোর সময় ঘোটকটির মৃত্যু হল। কৃষ্ণ বলরামকে ডেকে বললেন, শত্রুরা নিহত হয়েছে। এবার পায়ে হেঁটে আমি মণিরত্ন নিয়ে আসি। এই বলে কৃষ্ণ হেঁটে গিয়ে মিথিলাপতি শতধন্বাকে হত্যা করলেন। কিন্তু মণি পেলেন না।

শুনে বলরাম রেগে গিয়ে কৃষ্ণকে বললেন– তুমি ভাই বলে তোমাকে ক্ষমা করলাম আমি দ্বারকায় থাকবো না, তোমার মঙ্গল হোক, আমি মিথিলায় চলে যাবো। এই সময় বুদ্ধিমান ব আত্মরক্ষার জন্য কবচ ধারণ করে নানাবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু করলেন। স্যমন্তক মণি রক্ষার জন্য বস্তু অর্থাৎ অরকে রক্ষাকবচ ধারণ করেছিলেন। তিনি ষাট বছর কাল ধরে যজ্ঞে অন্ন ও বহু দ্রব্য দান করলেন। রাজা দুর্য্যোধন একবার মিথিলায় বলভদ্রের কাছে গদাযুদ্ধ শিক্ষা নেন। অনেকদিন পর বৃষি ও অন্ধক বংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা বলরামকে অনেক অনুনয় করে দ্বারকায় ফিরিয়ে আনলেন। অক্রুর ভঙ্গকারের দুই পুত্র বন্ধুমান ও শত্রুঘ্নকে হত্যা করে দ্বারকা ত্যাগ করলেন। অকুরের প্ররোচনায় শতবহুবার দ্বারা ভঙ্গকারের মৃত্যুতে কৃষ্ণ খুশি ছিলেন না। এদিকে অনাবৃষ্টিতে রাষ্ট্র নষ্ট হতে চলল।

তখন অঙ্কুরকে আবার দ্বারকায় ফিরিয়ে আনা হল। তখন সহস্রাক্ষ বারিবর্ষণ করতে লাগলেন। সব জায়গায় বৃষ্টি হল। কৃষ্ণ যোগবলে জানতে পারলেন, সামন্ত্যক মণি অকুরের কাছেই আছে। তিনি সভার মধ্যে সকলের সামনেই তাকে বললেন–আপনার কাছে যে সামন্ত্যক মণি রয়েছে তা এবার ফেরৎ দিন, দীর্ঘ ষাট বছর ধরে আমার মধ্যে যে রাগের সঞ্চয় হচ্ছে তাকে আর বাড়তে দেবেননা। তখন অক্রুর কৃষ্ণের কথায় মণি ফেরৎ দিলে কৃষ্ণ আবার বড়ুকেই মণিটি দান করেন। এই ভাবে বড়ু অর্থাৎ অক্রুর কৃষ্ণের কাছ থেকে স্যমন্তক মণি লাভ করে স্বমহিমায় বিরাজ করতে লাগলেন। বৃষ্ণির পুত্র অনমিত্র থেকে শিনির জন্ম। শিনির পুত্র সাত্যক। সাত্যকের পুত্র সাতকীর নাম যুযুধান। তার পুত্র ভূতি। ভূতির পুত্র যুগন্ধর। যুগন্ধরের বংশধরেরা ভৌত্য নামে বিখ্যাত। মাদ্রীর পুত্র যুধাজিতের পৃস্নি নাম এক পুত্র উৎপন্ন হয়। পৃস্নির দুই পুত্র– স্বকল্কর ও চিত্রক। স্বকল্ক কাশীরাজ এর কন্যা গান্দিনীকে বিয়ে করেন। এই কন্যাটি বহু বছর মাতৃগর্ভে ছিলেন। গর্ভস্থ অবস্থায় পিতাকে বললেন– গোদান করতে। এই গান্দিনী হলেন অঙ্কুর-এর মা। এছাড়া গন্দিনীর অনেক পুত্র হয়। অক্রুর ও উগ্রসেনীর দেব ও অনুদেব নামে দুই পুত্র ছিল। চিত্রকের পুত্রদের নাম পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব প্রভৃতি। মেয়েরা হলেন– অভূমি, বহুভূমি প্রভৃতি।

সত্যকের চার পুত্র–ককুদ, ভজমান, সমী, কম্বল। বর্হিককুদের ছেলে বৃষ্টি, তার ছেলে কপোত রোথ, তার ছেলে বেরত, তার ছেলে বিদ্বান, তাঁর পুত্র অভিজিত, আর অভিজিতের ছেলে পুনর্বসু, অশ্বমেধের বেদী থেকে পুনর্বসুর জন্ম, বিদ্বান, ধার্মিক। পুনর্বসুর যমজ পুত্র কন্যার নাম আহুক আহুকী, আহুকের বংশে সকলেই সত্যবাদী, বিদ্বান, ধার্মিক। আহুক একুশ হাজার রথী নিয়ে ভোজ রাজ্য আক্রমণ করেন। আহুক তার বোন আহুকীকে আহুকন্ধের হাতে সম্প্রদান করেন। এদের এক ছেলে দু মেয়ে। ছেলেদের নাম দেবক ও উগ্রসেন।

দেবকের ছেলেদের নাম দেবদেব, সুদেব, দেবরঞ্জিত, এদের সাত বোনকেই বসুদেবের হাতে, সম্প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে এক বোনের নাম দেবকী। উগ্রসেনের ছয় ছেলের মধ্যে বড় কংস। ভজমানের ছেলে বিদুরথ। তার তিন পুত্র, নাম রাজর্ষিদেব, শূর ও বিদুর। শূরের ছেলে শমী। শমীর পুত্র স্বয়ম্ভাজ, তার ছেলে হৃদিক। হৃদিকের দশ পুত্র। এঁদের মধ্যে দেবাহেদ কম্বলবহি নামে পুত্র জন্মে। এঁর দুই পুত্র, অসযৌজা ও সুমমৌজা। অসমৌজা অপুত্রক ছিলেন বলে কৃষ্ণ তাঁকে সুদ্রংষ্ট্র ও সূরপা নামে ছেলে দান করেন। এরাই অন্ধক নামে বিখ্যাত। শূর থেকে অস্মকীর গর্ভে দেবমীতুষ, মাধীর গর্বে দেবমানুষ, ভামীর গর্ভে বসুদেবদি দশ পুত্র জন্মে, বসুদেবের জন্ম সময়ে স্বর্গে দুন্দুভি বেজে উঠেছিল এবং পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল। সমস্ত মানবলোকে তার মত সুন্দর কেউ ছিল না। এদের চার বোনের মধ্যে পৃথা অন্যতম।

কুন্তীরাজ পৃথাকে কন্যাত্বে বরণ করলে তার নাম হয় কুন্তী। কুরুবীর পাণ্ডুরাজা কুন্তীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। পৃথার গর্ভে ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র থেকে যথাক্রমে যুধিষ্ঠীর, বৃকোদর ও ধনঞ্জয়- এই তিন পুত্র জন্মে। এই তিন পুত্রই অগ্নির মতো তেজস্বী ও বীর্যশালী ও পরাক্রমী ছিলেন। দুই অশ্বিনীকুমার থেকে মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবের জন্ম বলে শোনা যায়। পৃথার বোন শ্রুতশ্রবার গর্ভে চেদিরাজ শিশুপাল জন্মে। এই শিশুপাল পূর্বজন্মে দশগ্রীব হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ এঁর ভাই। বসুদেবের তেরোজন পত্নীর মধ্যে রোহিণী ছিলেন তাঁর প্রিয়তমা। ইনি বাল্মীকের কন্যা, রোহিণীর গর্ভে বলরাম, সারণ প্রভৃতি পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। বলরামের আবার অনেক পুত্র কন্যা জন্মে। বলরামের ছোট ভাই সারণের পুত্ররা হলেন– ভদ্রাস্ব, ভদ্রবাহু ইত্যাদি। বৈশাখী নামে এক পত্নীর গর্ভে বাসুদেব কৌশিক নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। বসুদেব থেকে দেবকীর গর্ভে সুষেণ, কীর্তিমান, ভদ্রসেন, ইত্যাদি ছয় পুত্র জন্ম নেয়। এদের সকলকেই কংস হত্যা করেন। ঐ সময় বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হন। এর পরে সুভদ্রা নামে কন্যা জন্মে, সুভদ্রা কৃষ্ণা নামেও পরিচিত। পার্থ থেকে সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম।

বসুদেব পত্নীদের গর্ভে বীর পুত্ররা জন্মায়। কিন্তু বসুদেবের পুত্রেরাই কংসের হাতে নিহত হন। যুগন্ধী ও বনরাজী নামেও বসুদেবের প্রণয়িনী ছিলেন। তাদের গর্ভেও পুণ্ড্র ও কপিল নামে দুই পুত্র জন্মে। পুণ্ড্র রাজা হয়েছিলেন আর কপিল বনে গিয়েছিলেন, দেবকীর সপ্তম পুত্র হলে শ্রাদ্ধদেব। এই পুত্র নিষেধ নামে রাজা হয়েছিলেন। এই শ্রাদ্ধদেবই নিষধদের আদি পুরুষ ইনিই মহাবীর একলব্য। কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে পুত্রহীন গণ্ডুষের হাতে চারুদেষ্ণ ও শাম্ব নামে পুত্র দান করেন।

মহাতেজা দেবদেব প্রজাপতি কৃষ্ণ আগে লীলার জন্য মনুষ্যলোকে জন্ম নেন। বসুদেবের তপস্যার ফলে দেবকীর গর্ভে আসেন। তিনি যোগীপুরুষ, দিব্য সুন্দর, তিনিই হলেন সনাতন হরি। ইনিই প্রাচীনকালে প্রজাপতিকে সৃষ্টি করেন। যযাতির বংশধর শ্রীমান বসুদেবের বংশ সত্যিই পবিত্র। কেননা এই বংশে জন্ম নিয়ে নারায়ণ লৌকিক কাজে তৎপর হয়েছিলেন। নারায়ণের জন্মে সাগর কেঁপে উঠেছিল। মঙ্গল বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছিল। তার জন্মকালে অভিজিত নক্ষত্র, জয়ন্তী নামে শর্বরী ও বিজয় নামে মুহূর্ত ছিল। হরি, নারায়ণ ভগবান কৃষ্ণ নয়ন দিয়ে দৃষ্টিপাত করে সকলকে বিমোহিত করে আবির্ভূত হন।

বসুদেব সেই রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করা পুত্রের রূপ ও লক্ষণ দেখে বললেন–প্রভু তোমার এই রূপ সংবরণ করো। কংস আমার অপূর্ব সুন্দর দিব্যকান্তি পুত্রদের সকলকেই হত্যা করেছে। বসুদেবের কথা শুনে ভগবান তার রূপকে সম্বরণ করলেন। পরে উগ্রসেনের আদেশে বসুদেব পুত্রকে নিয়ে– নন্দগোপের বাড়ি গেলেন। নন্দ গোপের স্ত্রী যশোদাও দেবকীর সঙ্গে গর্ভবতী হয়েছিলেন। সেই রাতেই তাঁর একটি কন্যা জন্ম নেয়। বসুদেব ঐ কন্যাকে নিজের বাড়ি নিয়ে এলেন আর কৃষ্ণকে যশোদার হাতে দান করলেন। বাড়ি এসে তিনি কংসকে বললেন– তোমার ভগ্নীর এই কন্যা হয়েছে। মেয়ে হয়েছে। জেনে কংস তাকে ত্যাগ করলেন। কৃষ্ণের কথা জানতে পারল না।

সেই কন্যা বসুদেবের ঘরে বড় হতে লাগল। দেবতারা প্রজাপতির কাছে গিয়ে বললেন– কেশবকে রক্ষার জন্য একানংশা জন্মগ্রহণ করেছেন। যাদবেরা আনন্দের সাথে তাকে পূজা করছেন। দিব্যদেহ বিষ্ণু এই একানংশা দেবী দ্বারাই রক্ষিত হচ্ছেন। ঋষিরা বললেন– ভোজবংশধর কংস কিজন্যে বসুদেবের পুত্রদেরকে সবলে হত্যা করেছিল তা আমাদের কাছে প্রকাশ করে বল। মৃত বললেন– কথিত আছে যুবরাজ কংস প্রায়ই বসুদেব ও দেবকীর সারথি হতেন। একদিন আকাশে কোনও এক অদৃশ্য প্রাণীর এরকম একটি বাণী শোনা গেল, তুমি যাঁদের রথে নিয়ে বেড়াও তাঁদের সপ্তম গর্ভের পুত্রের হাতে তোমার মৃত্যু হবে।

শোনা মাত্র খড় নিয়ে দেবকীকে বিনাশ করতে গেল কংস। অনেক অনুনয় করে বসুদেব কংসকে। শান্ত করলেন। বললেন–দেবকীর গর্ভে সমস্ত সন্তানকেই তিনি কংসের হাতে দান করবেন, এ কথা কখনো মিথ্যা হবে না। পাপী কংস সমস্ত পুত্রদেরই হত্যা করেছিল। বিষ্ণু দেবকীর কামনা পূর্ণ করেছিলেন। যোগাত্মা বিষ্ণুও যোগমায়া দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে বিমোহিত করে তিনি মানুষী তনু গ্রহণ করেন। বাসুদেবের সত্যভামা, গৈজা, সুদেবী, অত্রী, সুশীলা কালিন্দী ইত্যাদি অনেক রাজার কন্যার সঙ্গে বসুদেবের বিবাহ হয়। এঁরা সব স্বর্গলোকের অঙ্গরা, বাসুদেবের পত্নীপদ লাভ করে এঁরা ধন্য। এঁদের গর্ভে অসংখ্য পুত্র কন্যার জন্ম হয়। শিনিংশীয় মহাত্মা বৃহদুথের কন্যা বৃহতী গুনয়ের সাথে মিলিত হল। সুনয়ের অঙ্গদ, ককুদ, শ্বেত নামে শ্বেতা নামে কন্যা জন্মে। এভাবে যাদবদের তিনকোটি ষাট হাজার মহাবল বীর্যবান পুত্র জন্মে অত্যাচারী অসুরদের বিনাশ করার জন্য যাদব নন্দনরা জন্মায়। তারমধ্যে বিষ্ণুর কুলকেই সবাই অমুজন করে। তারা একই কুলে পরিণত হন।

.

ছিয়ানব্বইতম অধ্যায়

সূত বললেন–এবার মনুষ্য প্রকৃতি দেবতাদের বৃত্তান্ত বলছি। যদুবংশীয় প্রখ্যাত বীর সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব ও অনিরুদ্ধ এবং সপ্তর্ষিরা কুবের যক্ষ মণিবর, শালকী বদর, বিম্বন, ধন্বন্তরী, নন্দী প্রমুখেরা মহাদেব শালঙ্কায়ন ও আদিদেব বিষ্ণু এরা সবাই দেবতাদের সাথে পতিন্ন। ঋষিরা জিজ্ঞেসা করলেন বিষ্ণু কেন জন্ম গ্রহণ করলেন? কতবার অবতার হয়েছেন? যুগ যুগ ধরে কি জন্যে তিনি মানুষ সমাজে অবতার হিসাবে জন্মেছেন? ভগবানকে মানবী কিভাবে গর্ভে ধারণ করেছিলেন?

আমরা জানতে চাইছি তার কথা, যিনি নিজের দেহকে দ্বিধাবিভক্ত করে নরসিংহ রূপে আদি দৈত্য হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেন। যাকে যুগে যুগে পণ্ডিতরা সহস্রপদ, সহস্রাক্ষ, সহশ্রাংশু ও সহস্রাশিরা বলে কীর্তন করেন। একনির জলে যার নাভি থেকে ব্রহ্মা উদ্ভূত হয়েছিলেন। যিনি কালনেমিকে হত্যা করেন। পুরাকালে অদিতি যাঁকে গর্ভে ধারণ করেন। যিনি পুরাকালে যুপ, শমিধ, সোম, যজ্ঞীয় দ্রব্য, : যজমণি ও যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ সকল প্রবর্তিত করেন। যিনি ক্ষণ, নিমেষ, কাষ্ঠা, কাল, ত্রিসন্ধ্যা, মুহূর্ত, তিথি, মাস, দিন, বৎসর, ঋতু, আয়ু, ক্ষেত্র, বৃন্দা, সৌষ্ঠব, মেধা, শৌর্য, তিনলোক, তিন অগ্নি, ত্রিগুণ ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। যিনি চার বর্ণ, চার বিদ্যা ও চার আশ্রম সৃষ্টি করেন, আকাশ, ভূমি, জল, বায়ু, 'অগ্নি, চন্দ্র, সূর্যকিরণ প্রভৃতি যাঁর

রূপ। যাঁকে পরম দেব ও পরম তপস্যা বলে জানা যায়, যিনি বেদবিদগণের বিদ্যা, প্রভুদেরও প্রভু, তেজঃ পুত্রের অগ্নি, তপস্বীদের তপস্যা, বিগ্রহীরীদের বিগ্রহ ও গতিশীলাদের গতি, তিনিই দেব মধুসূদন, বায়ুর প্রাণ আকাশ, অগ্নির প্রাণবায়ু, দেবগণের প্রাণ অগ্নি এবং অগ্নির প্রাণ মধুসূদন।

রস থেকে রক্ত, রক্ত থেকে মাংস, মাংস থেকে মেদ, মেদ থেকে অস্থি, অস্থি থেকে মজ্জা, মজ্জা থেকে শুক্র, এবং শুক্র থেকে গর্ভোৎপত্তি, গর্ভের রস বা জল সৌর্য্য রাশি বা উষ্ণা বাপ ও শোণিত তৃথা দ্বিতীয়রাশি বলে উল্লিখিত। কৃষ্ণ বর্গে শুক্র ও পিত্ত বর্গে শোণিত প্রতিষ্ঠাতা কক্ষের ঋণ হৃদয় এবং পিত্তের স্থান নাভি। নাভি পেটের ভেতরে হুতাশানদেব রয়েছেন মন প্রজাপতি, কথ্য সোম, পিত্ত অগ্নি এবং সমস্ত জগতই অগ্নিষেমাত্মক আখ্যায় অভিহিত। এভাবে গর্ভসৃষ্টি হয়। বায়ু এই গর্ভে পরমাত্মার সঙ্গে মিলে প্রবেশ করে ঐ বায়ু পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে শরীরে থেকে গর্ভস্থ প্রাণকে পরিপুষ্ট করে।

প্রাণ, আপান, সমান, উদান ও ব্যান গর্ভের এই পঞ্চ প্রাণ পরমাত্মাকে ধরে রাখে। তারপর পৃথ্বী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি পঞ্চভূতে গর্ভের সঙ্গে মেশে। সমস্ত ইন্দ্রিয় নিবিষ্ট হয়ে নিজ নিজ শক্তি প্রকাশ করতে থাকে। এই দেহের ছিদ্রগুলি আকাশ যোনি, সে সব ছিদ্রপথে জল নিঃসৃত হয়। জ্যোৎস্না হল চোখের রশ্মি। এইভাবে গর্ভস্থ পুরুষ থেকেই যুদ্ধ প্রভৃতি কঠোর কাজ ও সম্ভোগ প্রভৃতি কোমল কাজ প্রবর্তিত হয়ে থাকে। এভাবে সমস্ত লোককে যে সনাতন পুরুষ সৃষ্টি করেছেন, সেই বিষ্ণু কিভাবে নরত্ব পেলেন? এটি বিস্ময়কর বটে যে তিনি কিবাবে মানুষী শারীর পেলেন। আমরা বিষ্ণুর কৃতকর্ম ও আশ্চর্য উৎপত্তি বার্তা শুনতে চাই।

সূত বললেন–আমি সেই মহাতপা যোগীর আবির্ভাব বিবরণ এবং যে রূপে তিনি নরলোকে উৎপন্ন হলেন তা আপনাদের বলছি। বিষ্ণুর অবতার সংখ্যা অনেক তাঁর দিব্য শরীরের বিবরণ বলছি। কালক্রমে যুগ ধর্ম অতিক্রান্ত হলে ধর্ম ব্যবস্থার জন্য সুর-অসুরদের মধ্যে সুসম্পর্ক কি ছিল দেব-অসুর সবাই বলীর শাসনাধীন ছিল। কিন্তু পরে সম্পত্তি কারণে দেব-অসুরদের মধ্যে ভীষণ বিবাদ সৃষ্টি হয়। সে বিবাদ, সংগ্রাম দিন দিন বাড়তে থাকে। এভাবে বরাহ কল্পে তাদের বারোটি সংগ্রাম হয়। প্রথম নরসিংহ সংগ্রাম, দ্বিতীয় বাসন তারপর যথাক্রমে বরাহ, অমৃত যখন, তারকাময়, আড়ীবক, ত্রৈপুর, অন্ধাকর, ধ্বজ, দশমবতি।

একাদশ সংগ্রামের নাম হলাহল ও দ্বাদশ ঘোর কোলাহল। নরসিংহ অবতার অসুররাজ হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন, বামন ত্রৈলোক্য আক্রমণ করে। বলিকে বন্দি করেন।

দেবতাদের সাথে যুদ্ধে মহাবল হিরণ্যাক্ষ নিহত হয়। বরাহ দাঁতে করে সমুদ্রগর্ভ থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। অমৃত মন্থনের ব্যাপারে যে সুর-অসুর সংগ্রাম হয় যেখানে ইন্দ্রের হাতে প্রহ্লাদ পরাজিত হন। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ইন্দ্র বধের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র তারকাময় সংগ্রামে তাকে হত্যা করেন। এই দৈত্য বিরোচন ভবের বর পেয়ে অস্ত্রশাস্ত্র সজ্জিত হয়ে থাকতেন, একে বিনাশ করার অধিকার ইন্দ্রের ছিল না। তখন বিষ্ণু ইন্দ্র দেহে আবিষ্ট হয়ে বিরোচনকে বিনাশ করেন, দেবাসুরের এই যুদ্ধই ষষ্ঠ যুদ্ধ।

অসুরদের ত্রিপুর নামে সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। এই দুর্গের সমৃদ্ধি দেবতাদের কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল। তখন এ্যম্বক ঐ ত্রিপুরের সাথে সেখানকার সমস্ত দানবদের হত্যা করেন। অসুর ও অন্ধকার নামে রাক্ষসদের সঙ্গে অষ্টম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পিতৃগণ দানব পক্ষে যোগদান করেন, তখন মহেন্দ্র, বিষ্ণুর সাহায্য গ্রহণ করে পিক্ষ দলভুক্ত সমস্ত অসুর ও রাক্ষসদের বিতাড়িত করেন। বিচিত্তির সাথে দেবতাদের নবম যুদ্ধ হয়। তিনি মায়াচ্ছন্ন হয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। মহেন্দ্র তার রথধ্বজ লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করে। বিচিত্তির মৃত্যু হয়।

রাজা রাজ কোলাহল নামে সংগ্রামে দেবতা পরিবৃত্ত হয়ে সমস্ত দেবতাদানব নিধন করেন। অসুর পুরোহিত ষণ্ড ও অথর্বকে দেবতার যজ্ঞীয় অমৃত দিয়ে বাধ্য রেখেছিলেন। এইভাবে পুরাকালে সুরাসুর যুদ্ধে প্রজাগণের অমঙ্গলকারী বারোটি সংগ্রাম হয়েছিল। রাজা হিরণ্যকশিপু একটানা এক অবুদ এক লক্ষ আশী হাজার বাহাত্তর বছর ধরে ত্রৈলোক্যের আধিপত্য করেন। তারপর পর্যায় ক্রমে বলী রাজা হন। তিন শাসন করেন এক অবুদ ষাট হাজার বিশ নিযুত বছরে। অসুরদের মধ্যে হিরণ্যাক্ষ প্রহ্লাদ, বলী তিনজনই প্রসিদ্ধ অসুর। দশযুগ পর্যন্ত তিলোক অসুরদের আয়ত্তেই ছিল। রাজ্য ছিল শত্রুহীন। তারপর ইন্দ্র ত্রিলোকের ভার নেন। সমস্ত কিছু থেকে অসুরদের পরিত্যাগ করেন। নিজেরা আধিপত্য পেয়ে সমস্ত কিছু ভোগ করতে লাগলেন। তখন এই দেখে অসুররা শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে বলল– প্রভু! দেবতারা আমাদের অবজ্ঞা করে রাজ্য নিয়েছে, যজ্ঞ ভাগও নিয়েছে, আমরা আর থাকতে পারছি না, এবার আমরা রসাতলে প্রবেশ করব। দুঃখিত শুক্রাচার্য সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– তোমরা ভয় পেয়ো না। আমি নিজে তোমাদের রক্ষা করব। দেখ বৃষ্টি, ওষধি, পৃথ্বী এবং অন্যান্য বীরত্ব সমস্তই আমাতে বিরাজিত। আমি দেবতাদের তা থেকে সামান্য দিয়েছি। তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদের সবই দান করব।

তখন দেবতারা দেখলেন শুক্রাচার্য অসুরদের রক্ষা করছেন, ভরসা দিচ্ছেন। তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। তারা আলোচনা করলেন এই অসুর গুরু শুক্রাচার্য দৈত্যদের

শক্তিশালী করে তুলছে, সুতরাং তাড়াতাড়ি অসুরদের আবাস নষ্ট করে তাদের নিধন করতে হবে। আর অবশিষ্টদের পাতালে পাঠাতে হবে। দেবতারা সুসজ্জিত হয়ে দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন। বহু দৈত্য নিহত হল আর অবশিষ্টরা আহত অবস্থায় শুক্রাচার্যের কাছে গেল। দেবতারাও তাদের পিছনে পিছনে আসতে লাগল। অসুর গুরু তখন তাদের রক্ষা করার ইচ্ছায় বললেন– আগে সমস্ত সংগ্রামে দেবতারাই জয়ী হয়েছে আর অসুররা অধিকাংসই নিহত হয়েছে। এখন তোমরা এই যুদ্ধে যে কয়েকজন অবশিষ্ট আছ,

তাদের জন্য আমি কোন্ ভালো নীতি প্রয়োগ করব। তোমাদের বিজয়ী করার জন্য আমি মহাদেবের কাছে যাবো। আমি জানি বৃহস্পতি ওদিকে দেবপক্ষ নিয়ে যজ্ঞ করছেন। আমাকেও মন্ত্রলাভের জন্য দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে যেতে হবে। তোমাদের ভয় নেই। তোমরা বল্কল গায়ে তপস্যা করো। আমার আসা যাওয়ার মাঝে দেবতারা তোমাদের হত্যা করতে পারবে না। আমি মহেশ্বরের কাছে মন্ত্র পেয়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করব। তাতে তোমাদেরই জয় লাভ হবে।

অসুরেরা তখন বলল- তোমরা সমস্ত লোক অধিকার করে নাও। আমরা বনে গিয়ে বল্কল পরে তপস্যা করব। একথা বললেন–দৈত্যদের প্রতিনিধি প্রহ্লাদ। দেবতারাও তখন যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হলেন। দৈত্যরাও অস্ত্র পরিত্যাগ করলেন। অসুর গুরু শুক্রাচার্য বললেন– তোমরা কিছুদিন এখন কার্য সিদ্ধির জন্য তপস্যা করো। তারপর তিনি মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। প্রণাম করে বললেন–দেবতাদের পরাভব ও অসুরদের জয়ের মন্ত্র আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করতে এসেছি। মহাদেব বললেন– তুমি ব্রহ্মচারী হয়ে পরম নিষ্ঠায় ব্রতচারণ কর। এক হাজার বছর ধরে যদি তুমি অধোমুখে তপস্যা করো তবে তোমার মঙ্গল হবে।

মহাতপা শুক্র খুশি হয়ে মহাদেবকে বললেন–আমি তাই করব। এদিকে দেবতারা বুঝতে পেরে গেলেন শুক্র মহাদেবের কাছে গেছে মন্ত্র লাভের প্রার্থনা করতে। অসুররা যখন তপস্যা করে, তখনই তাদের নিরস্ত্র পেয়ে দেবতারা আক্রমণ করলেন। অসুররা বিচলিত হয়ে উঠে পড়লেন। আমরা বল্কল ধারণ করে তপস্যা করছি এভাবে যুদ্ধ জয় সম্ভব নয়, আমরা এখন গুরু শুক্রের জননীর কাছে আশ্রয় চাই, একথা পরস্পর আলোচনা করে ভীত হয়ে শুক্র জননীর শরণ নিল। তিনি বললেন– দানবরা তোমাদের কোনও ভয় নেই।

দেবতারা অসুরদের ভীত হয়ে শুক্রমাতার শরণাপন্ন দেখেও কোনও কিছু বিচার না করে আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করে নির্বিচারে তাদের মারতে লাগলেন। জননী প্রচণ্ড রেগে বললেন–

আমি দেবতাদের ইন্দ্র বিহীন করব। ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করে দেবতারা যে যার পালিয়ে গেলেন। বিষ্ণুও ইন্দ্রকে বললেন, তুমি আমার দেহে প্রবেশ কর, তোমায় এখান থেকে নিয়ে যাব, একথা শুনে ইন্দ্র বিষ্ণুর দেহে প্রবেশ করলেন। শুক্রমাতা রেগে গিয়ে বললেন–তোমাকে বিষ্ণুর সঙ্গেই দগ্ধ করব। আমার তপস্যার ক্ষমতা দেখুন। তারা দুজনেই শুক্রমাতার প্রভাবে অভিভূত হয়ে আলোচনা করতে লাগলেন কিভাবে এই দেবীর কাছ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ইন্দ্র বললেন–আপনি এঁকে এখনই বিনাশ করুন। বিষ্ণু একথা চিন্তা করা মাত্র তার হাতে চক্র এসে গেল। বিষ্ণু চক্রের আঘাতে দেবীর শিরোচ্ছেদ করলেন। এভাবে স্ত্রী বধ হওয়ায় ভৃগু রেগে গিয়ে বিষ্ণুকে অভিশাপ দিয়ে বললেন– মহর্ষি স্ত্রী জাতিকে হত্যা করা-পাপ, তুমি জেনেশুনে যখন স্ত্রী জাতিকে হত্যা করলে তখন এই অপরাধে তোমায় সাতবার মনুষ্যলোকে বাস করতে হবে।

ভৃগু তখন স্ত্রীর ছিন্ন মস্তক এনে দেহের সাথে যোগ করে হাতে জল নিয়ে বললেন–বিষ্ণু তোমাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, আমি তোমায় সত্য বলে জীবিত করব। যদি আমি সমস্ত ধর্ম আচরণ করে থাকি, সত্য বাক্য বলি ও সত্যের সেবা করে থাকি তবে দেবী তুমি জীবিত হও। ভৃগুর সত্যবাক্যে তখনই তাঁর পত্নী জীবিত হলেন। সমস্ত প্রাণীর সামনে ভৃগুর তপঃ প্রভাবে তাঁর পত্নী জীবন ফিরে পেলেন। এটি তখন অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে পড়ল। ইন্দ্র এই দেখে শুক্রের ভয়ে তখন থেকে আর শান্তি লাভ করতে পারলেন না।

দেবরাজ ইন্দ্র নিজের কন্যা জয়ন্তীকে বললেন–শুক্রাচার্য ইন্দ্রপদ লোপ করার জন্য কষ্টের তপস্যায় নিরত রয়েছেন, তাই আমি ব্যাকুল হয়েছি। তুমি সেই শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে তার সেবা কর, তাঁকে প্রীত কর। শুভচারিণী জয়ন্তী শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে বাবার কথামতো সেবা করতে লাগলেন। তিনি শুক্রাচার্যের সেবার কাজে বহু বছর কাটিয়ে দিলেন। তারপর ভৃগু নন্দনের কঠোর ব্রত সাঙ্গ হল। মহাদেব খুশি হয়ে বর দিলেন। বললেন– আমার বরে তুমি দ্বিজশ্রেষ্ট হবে। আমার যা কিছু মন্ত্র শক্তি তা দিয়ে তুমি সুরসমাজকে অভিভূত করবে। ভৃগুপুত্র বর লাভ করে খুশি হলেন। তার মুখ থেকে মহেশ্বরের স্তোত্র উচ্চারিত হল। তিনি নীললোহিতের স্তব করতে লাগলেন। তুমি শিতিকণ্ঠ, স্বরূপ, সুরর্চা, রিরিহান, লোপ ও বৎসর তোমাকে নমস্কার।

তুমি কপদী, উর্দ্ধরোমা, হয়, করণ, সংস্কৃত, সুতীর্থ, দেবদেব, দ্র, তপঃ চীরবাস, হ্রস্ব, মুক্তকেনা, সেনালী, রোহিত, কবি, গিরিমা, অর্কনেত্র যতি ধন্বী, ভার্গব, সহস্রচরণ, সরশিরা, বিশ্বরপা, ভীমউগ্র, শিব, বদ্র, অনিল, মহাদেব, উগ্র ত্রিনেত্র, পুন্য, ধার্মিক, শুভ, অবধ্য, অমৃতাঙ্গ, নিত্য,

শাশ্বত, শরভলী, ত্রিচক্ষু, সত্য, তপবন, দীপ্ত, চক্র, খর্ব মেঘ, নিশি, তাপখণ্ড, স্ফীত, দুর্গম, দক্ষ, জঘন্য, গর্মণ, সচক্ষু, বামদেব, ঈশান, ভৃগুনাথ, ধীমান, বিপ্রিয়, কৃত্বিকসা।

আপনি পশুপতি ও ভৃগুপতি, আপনি প্রণব, ঋক্ যজু, সাম, ঋধা, যুধা স্রষ্টা, ধাতা, হোতা, হর্তা ভূত, ভব্য, ভব আঘানাকে নমস্কার। আপনি বসু, মাঠ্য, রুদ্র, দেবাত্মা, ঋত্বিক, যজ্ঞাত্মা, আপনাকে প্রণাম। আপনি তপ, যোগ, অহিংসা অলোভ, সত্য, লোকাত্মা যোগাত্মা আপনাকে নমস্কার। আপনি ত্রৈলোক্যস্বরূপ, এই স্তবে আপনাকে কীর্তন করলাম। আমাকে ভক্ত মনে করে আমার ঐ দোষ ক্ষমা করুন।

.

সাতানব্বইতম অধ্যায়

সূত বললেন– শুক্রাচার্য এভাবে মহাদেবের স্তব আরাধনা করে তাকে প্রণাম করলেন। ভবদেব তাকে স্পর্শ করে দর্শন দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। তারপর ইন্দ্র কন্যা জয়ন্তীকে সেখানে বসে থাকতে দেখে হাতজোড় করে বলতে লাগলেন–হে দেবী! তুমি কার পত্নী, কেনই বা আমার দুঃখে কাতর? তোমার ভক্তি ও বিনয় দেখে আমি খুশি হয়েছি। তোমার কি বাসনা বল, সে একান্ত দুর্লভ হলেও, আমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করব। জয়ন্তী বললেন–আপনি তপস্যা দিয়ে আপনার অভিলাষ জানুন। শুক্র দিব্য দৃষ্টিতে তা জানতে পেরে বললেন–তুমি ইন্দ্রের কন্যা আমার কল্যাণ কামনায় এখানে এসেছো, তুমি অদৃশ্য হয়ে আমার সাথে দশ বারে থাকতে চেয়েছো। তোমার সেই ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তুমি আমার গৃহে চল। শুক্র জয়ন্তীর সাথে অদৃশ্য হয়ে দশ বছর একসাথে বাস করলেন।

অসুররা গুরুকে দেখে শুক্রগৃহে এলেন। কিন্তু জয়ন্তীর মায়ায় আচ্ছন্ন শুক্রকে অসুররা দেখতে পেলো না। বৃহস্পতি এই সুযোগে শুক্রের বেশ ধারণ করে তাদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বললেন–তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করেছি, তোমাদের সেই বিদ্যা দেখাবো। এদিকে জয়ন্তীর মোহ দূর হলে শুক্রাচার্যের দিব্য জন্তান জয়মালো এবং দেবযানী নামে কন্যার জন্ম হল। শুক্রাচ্য ভাবলেন এবার তাঁর শিষ্যদের দর্শন দিয়ে আসবেন। কিন্তু অসুরদের কাছে এসে দেখলেন বৃহস্পতি শুক্রের বেশ ধারণ করে অসুরদের প্রতারিত করেছেন। তিনি অসুরদের বললেন–আমিই শুক্রাচার্য, ইনি অঙ্গিরা পুত্র বৃহস্পতি। কিন্তু এই সব বিবাদে অসুররা বিচলিত হয়ে বললেন–ইনি আমাদের দশ বছর ধরে শাসন করছেন, ইনিই আমাদের গুরু, তুমি নও, তুমি বনে যাও।

অসুররা শুক্রাচার্যের কথা অগ্রাহ্য করে বৃহস্পতির অনুগমন করলো। তখন শুক্র অভিশাপ দিলেন–আমার আদেশ তোমরা অগ্রাহ্য করলে, সেহেতু তোমাদের পরাজয় নিশ্চিত। বৃহস্পতিও অভিশাপ বাণী শুনে খুশী হয়ে নিজরূপ ধারণ করে অদৃশ্য হলেন। অসুররা বুঝতে পারলেন, তারা কি রকম ভাবে প্রতারিত ও বঞ্চিত হয়েছে বৃহস্পতির কাছে। তখন দেবতাদের আক্রমণের ভয়ে ভীত অসুররা প্রহ্লাদকে সঙ্গে নিয়ে গুরুর কাছে গেলে শুক্র বললেন–আমাকে তোমরা অপমান করেছে, তোমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত।

প্রহ্লাদ বললেন–বৃহস্পতি আমাদের মোহচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। আপনি অভিমান ত্যাগ করুন। ভক্তদের রক্ষা করুন, না হলে আমরা রসাতলে প্রবেশ করব। শুক্র তখন রাগ সম্বরণ করলেন। বললেন– আমি যে অভিশাপ দিয়েছি তা ফলবেই। এটি ব্রহ্মাই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আমার অনুগ্রহে তোমরা দশ যুগ ধরে যে ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করেছ, আবার সার্বনিক মন্বন্তরে তোমরা দশযুগ রাজ্য পাবে। হে প্রহ্লাদ! তোমার বলী নামে এক পৌত্র জন্মাবে। যে কথা ব্রহ্মা স্বয়ং বলেছেন আমায়। তারপর সেই রাজার রাজ্য অপহৃত হবে। সেই রাজা বলী আবার কামনা বিহীন হয়ে তপস্যা করবে, এজন্য ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সার্বনিক মন্বন্তরে অমরত্ব দান করবেন। তখন ঐ বলীই দেবরাজ্য পাবেন। তাই প্রহ্লাদ তুমি নিরাশ হও না। সময়ের জন্য অপেক্ষা করো। তখন অসুররা অস্ত্রশাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দেবতাদেরকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। তারপর একশ বছর যুদ্ধ করে দেবতাদের পরাজিত করলেন। দেবগণ বললেন–আমার ষণ্ডমার্কের প্রভাবে পরাজিত। তাদের আহ্বান করে বললেন–হে দ্বিজদ্বয় আপনারা অসুরদের ত্যাগ করুন। তখন জয়ী এবং অসুররা পরাস্ত হল। তারা শুক্র-এর শাপে রসাতলে প্রবেশ করল।

তারপর বিষ্ণু নানা অবতারের রূপে অধর্ম নাশ করতে প্রাদুর্ভূত হলেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রহ্লাদের সামনে যে সব অসুরদের অত্যাচার চলছিল তাদের নিহত করার জন্য মানুষ রূপী বিষ্ণুর অবতার এলেন। বৈবস্বত মন্বন্তরেও অন্য এক দৈত্যের উপদ্রব বাড়লে যজ্ঞ শুরু হয়, সেই যজ্ঞের প্রধান হোতা ছিলেন ব্রহ্মা। চতুর্থ যুগে অসুরের আবির্ভাব হলে বিষ্ণু সমুদ্র থেকে উঠে আসেন। হিরণ্যকশিপুর বধ করার জন্য ভীষণ নরসিংহ রূপে দ্বিতীয় অবতার আবির্ভূত হন। ত্রেতার সপ্তম যুগে বলি যখন ত্রিলোকের অধিপতি, তখন অসুররা ত্রিলোক আক্রমণ করলে বামন অবতার হিসেবে বিষ্ণুর আর্বিভাব। ঐ সময় অদিতি নন্দন বামন নিজের অঙ্গ খর্ব করে বৃহস্পতিকে সামনে রেখে দৈত্য বলীর সামনে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণ বেশধারী বামন সময় বুঝে বলীকে বললেন–হে রাজন! আপনি ত্রিভুবনের রাজা, আমায় ত্রিপদ পরিমিত স্থান দান করুন।

এত ক্ষুদ্র আকার দেখে বলি তার এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। তখনই ত্রিপাদ দিয়ে স্বর্গ, আকাশ, পৃথিবী আক্রমণ করলেন সেই মহাযশা ব্রাহ্মণ। সূর্যের থেকেও অধিক তেজে যেন জ্বলতে লাগলেন। নমুচি, শাম্বর ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি অসুরদের পাতালে পাঠালেন। তখন সকলে সেই অদ্ভুত দর্শন বিষ্ণুকে দর্শন করলেন। দেব-দানব অদ্ভুত শরীর দর্শন করে বিষ্ণুর তেজে মোহচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। বিষ্ণু ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্য রাজ্য দান করলেন। আরও সাতটি অবতার আছে, তা শুনুন। ত্রেতাযুগের দশম যুগে ধর্ম সকল নষ্ট হয়ে গেলে, তিনি দত্তাত্রেয় রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এটি তার চতুর্থ অবতার। ত্রেতার ঊনবিংশ যুগে বিশ্বামিত্র পুরঃসর ষষ্ঠ অবতার জামদগ্ন। ত্রেতার চতুর্বিংশ যুগে রাবণ বধের জন্য দশরথের পুত্র রাম অবতার। এটি সপ্তম অবতার। অষ্টম হল বেদব্যাস অবতার। ইনি দ্বাপর যুগে পরাশর থেকে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাপরের শেষ যুগে যখন ধর্ম বিনাশ হতে থাকে, তখন বসুদেবরূপী কশ্যপের ঔরসে দেবতী রূপিণী অদিতির গর্ভে বিষ্ণু জন্ম নেন। এটি নবম অবতার।

এঁর প্রভাব বাক্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। মহাবাহু মধুসূদনের রূপ অদ্বিতীয়। তিনি মানুষ রূপে পৃথিবীতে তার লীলা করেছেন। পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করেছেন। ইনি মানুষ শরীরেই মহাসুর কংস, দ্বিবিদ, আরষ্ট, বৃষভ, পুতনা, কেশী, হয়, কালীয় নাগ প্রভৃতি দানবদের হত্যা করেন। ইনি বানরাজের সহস্র বাহু ছিন্ন করেন। লোকহিতের জন্য এইসব মহাত্মার আবির্ভাব। এই যুগের শেষে বিষ্ণু কল্কি রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এইটি ভাবী দশম অবতার। ইনি অনেক সেনা নিয়ে, রথী, অস্ত্রশস্ত্র সহ যুদ্ধ করতেন। ম্লেচ্ছদের নিধন করেন। বিষ্ণু পূর্বজন্মে যে বীর্যবান প্রমিতি নামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি দেবাংশে মানবরূপে কলির পূর্ণবিদ্যায় কল্কি অবতার পরিগ্রহ করবেন নিজের ভাবী প্রয়োজনের বশবর্তী হয়ে কল্কি গগা ও যমুনার নামে এসে নিজের কর্তব্যের অবসান করবেন। তারপর কল্কি অতীত হলেও রাজাদের মৃত্যুর পর আশ্রয়হীন প্রজারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়ে দুঃখিত ভাবে নগর পরিত্যাগ করে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিহত হবে। তখন বেদ ধর্ম ও আশ্রয় ধর্ম লুপ্ত হবে। প্রজাবর্গ স্থুলকায়, বাকল পরিধায়ী বনবাসী, অল্পায়ু হবে। কলিসন্ধ্যাংশে প্রজারা কলিযুগের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। তারপর কলিযুগ একেবারে নিঃশেষিত হলে, আবার সত্যযুগ প্রবর্তিত হবে।

.

আটানব্বইতম অধ্যায়

সূত বললেন–এবার আমি আপনাদের কাছে তুর্বসু, পুরু, দ্রুহ্য ও অণুর বংশের কথা বলছি। তুর্বসুর পুত্র বহ্নি, তাঁর পুত্র ভোগাহু, তাঁর পুত্র ত্রিশানু, ইনি বীর ও অজেয় ছিলেন। এঁর পুত্রের নাম কনন্ধম, তাঁর ছেলে অবিক্ষিৎ, তার মরুত্ত নামে আরো একজন পুত্রের কথা শোনা যায়। পুত্র মরুও রাজ্য হয়েছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। পুরবাসীরা পুরুবংশীয় দুষ্কৃতকে তাঁর পুত্র রূপে কল্পনা করেন। যযাতি জরাজীর্ণ অবস্থায় তুর্বসুকে অভিশাপ দান করার বহুকাল পরে এভাবে তুর্বসু বংশের সাথে পুরু বংশের সংস্রব ঘটেছিল।

দুষ্কৃতের পুত্র মরুথ, তাঁর পুত্র জলাপীড়। এঁর চার পুত্র- পাণ্ড্য, কেয়ল, চোল এবং কুল্য। এঁদের অধিষ্ঠিত জনপদগুলি এঁদের নামানুসারেই খ্যাত। হ্যের দুই পুত্র, ব ও সেতু। এঁদের মধ্যে সেতুর অরুদ্ধ ও বভ্রর রিপু নামে পুত্র হয়। অরুদ্ধের পুত্র গান্ধার নামে রাজা হন। এঁদের নামানুসারেই বিশাল গান্ধার দেশ। গান্ধার পুত্র ধর্ম, তার পুত্র ধৃতি, তার পুত্র দুর্মদ, তার পুত্র প্রচেতা। প্রচেতার একশ পুত্র। এঁরা সবাই ম্লেচ্ছ রাজ্যের অধিপতি হন। মহাত্মা মনুর বংশধর সভানর। সভানরের পর তার পুত্র বিদ্বান কালনন হন, তাঁর পুত্র ধার্মিক সৃঞ্জয়, তার পুত্র বীর পুরুঞ্জয়, তার পুত্র মহাবীর্য জনমেজয়, তাঁর পুত্র নরপতি মহাশাল, ইনি ইন্দ্রের মত প্রখ্যাত কীর্তি রাজা ছিলেন। এঁর পুত্রের নাম মহামনা, তার পুত্র দুজনের নাম উশীনর ও তিতিক্ষু। এই দুই রাজপুত্রই ছিলেন ধর্মজ্ঞ ও ধার্মিক।

রাজা উশীনর পাঁচ রাজকন্যার পাণি গ্রহণ করেছিলেন। এইসব পত্নীর গর্ভে মৃগ, নব, কৃমি, সুব্রত ও শিবি নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। এঁদের মধ্যে শিবির শিবপুরী, মৃগের মৌধেয়পুর, নবের নবরাষ্ট্র, কৃমির কৃমিনাপুরী আর সুব্রতের অন্বষ্ঠা পুরী। এবারে শিবির পুত্রদের কথা বলছি। বৃষার্ভে, সুবীর, কেকয় ও মদ্র– এই চারপুত্রকে শিবি বলা হয়। তিতিক্ষুর পুত্র মহাবাহু ঊষদ্রথ একজন পূর্বদেশীয় বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তার পুত্রের নাম হেম, তার পুত্র বলি। এই বলিই বিষ্ণুর দ্বারা বন্দী হন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুক্ষ ও পুণ্ড্র বলির পাঁচ পুত্র।

এঁদের নাম অনুসারে পাঁচটি সুসমৃদ্ধ জনপদ প্রসিদ্ধ হয়। বলির পুত্ররা মুনি দীর্ঘতমার ঔরসে বলি মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে জন্ম নেয়। অশিজ ঋষির স্ত্রী মমতার গর্ভে দীর্ঘতমার জন্ম। তিনি তেজস্বী ও কীর্তিমান। এই দীর্ঘতমা তার কনিষ্ঠ ভাই উতথ্যের স্ত্রীকে কামনা করেছিলেন। উতথ্যের স্ত্রী এই গর্হিত কাজে বাধা দেন। ঋষি শরদ্বান প্রচণ্ড রেগে তিরস্কার করে বললেন– তুমি ভ্রাতৃবধূকে কামনা করেছো, তুমি যেখানে খুশি চলে যাও। তিনি দীর্ঘতমাকে সমুদ্রে ফেলে দেন। সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে একসপ্তাহ পরে ঋষিবর তটে উপস্থিত হলেন। সেখানে বলি রাজা

খাদ্য ও আশ্রয় দিয়ে মুনিকে রক্ষা করেন। ঋষি দীর্ঘতমা বলিকে বর দিতে চাইলে, তিনি নিজের স্ত্রীর গর্ভে ঋষিকে পুত্রোৎপাদন করতে অনুরোধ করেন।

কিন্তু রানি সুদেষ্ণা নিজে না গিয়ে দাসীকে রানির পোশাক দ্বারা সজ্জিত করে ঋষির নিকট পাঠালেন। দাসী গর্ভে দুই পুত্র হল। তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ বলে রাজমহিষী তাকে অবমাননা করেছেন। এই কারণে ঋষিবর দীর্ঘতমা রানিকে অভিশাপ দিলেন। রানি অশ্রুজল সিক্ত হয়ে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করলেন। তখন ঋষি বললেন–দেবকুমারের মতো তোমার পাঁচ পুত্র জন্মাবে। সকলেই তেজস্বী, ধার্মিক হবে। এইভাবে বলির রাজার মহিষীকে দীর্ঘতমা পাঁচ পুত্র দান করেন। এই দীর্ঘতমা ঋষির ওপর বৃহস্পতির অভিশাপ কেটে গেলে তিনি আয়ুষ্মন, বহহুষ্মান ও যুবা পুরুষ হয়ে উঠলেন।

এই ঋষিই পরবর্তীকালে গৌতম নামে প্রসিদ্ধ। পিতার সাথে গিরিব্রজে গিয়ে পিতার তৃপ্তির জন্য তপস্যা করলেন। কক্ষীবান, তুমি যশস্বীপুত্র, তোমার জন্য কৃতার্থ হলাম– এই বলে দীর্ঘতমা ব্রহ্মপদে বিলীন হলেন। কক্ষীবান ব্রাহ্মণ এক হাজার পুত্রের জন্ম দেন। তার পুত্রেরা কৃষ্ণাঙ্গ গৌতম নামে খ্যাত। বলি ও দীর্ঘতমার সংবাদ উভয়ের পুত্র লাভের বৃত্তান্ত শুনলেন। বলি তার পাঁচ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন এবং পরে যোগ অবলম্বনে সর্বভূতের অদৃশ্য হয়ে তপস্যা করতে লাগলেন।

রাজা অঙ্গের পুত্র রাজা দধিবাহন। এর পুত্র দ্বিবিরথ, তার ছেলে রাজা ধর্মরথ। এই রাজা বিষ্ণুপদ পর্বতে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। ধর্মরথের পুত্রের নাম রাজা চিত্ররথ। তার পুত্র দশরথ। ইনি লোমপাদ নামেও বিখ্যাত। প্রথম শান্তা নামে এঁর এক কন্যা জন্মেছিল। দশরথের পুত্র চতুরঙ্গ, এঁর পুত্র পৃথুলাম্ব, তার পুত্র চম্প, চম্পের পুরীর নাম চম্পাবতী। রাজা চম্প এখানে ষাট হাজার বছর বাস করেছিলেন, এঁর রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা–নিজ নিজ ধর্মে অনুরক্ত ছিল। সবাই বিষ্ণুপরায়ণ। চম্পের হর্ষঙ্গ নামে এক পুত্র হয়।

বৈতণ্ডিক নামে এঁর এক হাতি ছিল। ইনি মন্ত্রবলে ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতকে ভূতলে এনেছিলেন। এর পুত্র ভদ্ররথ। তার পুত্র বৃহকর্মা, তার পুত্র বৃহদ্রথ। এঁর পুত্র জয়দ্রথ জয়দ্রথের দৃঢ়রথ নামে এক পুত্র হয়। এঁর পুত্র বিশ্ববিজয়ী জনমেজয়। এঁর অঙ্গ থেকেই কর্ণ নামে এক পুত্র হয়। কর্ণ হলেন অঙ্গ দেশের রাজা। তার পুত্রের নাম শূরসেন। তার ছেলে ধ্বজ। ঋষিরা তখন প্রশ্ন করলেন–কর্ণ সূত পুত্র হলেন কিভাবে? সূত্র তখন বললেন–বৃহদ্ভানুর পুত্র রাজা বৃহমানা, তার দুই পত্নী যশোদেবী ও সত্যা। দুই পত্নী থেকেই বংশ দুভাগে ভাগ হয়। জয়দ্রথ

যশোদেবীর গর্ভজাত। সত্যা দেবী থেকে বিজয় উৎপন্ন হয়। বিজয়ের পুত্র ধৃতি, তাঁর পুত্র ধৃতব্রত, তার পুত্র মহাযশা সত্যকর্মা, তার পুত্র সূত অধিরথ। এই অধিরথ কর্ণকে পরিগ্রহ করেন, তাই কর্ণ সূত পুত্র বলে খ্যাত।

এবারে পুরুর প্রজাবৃত্তান্ত শুনুন। পুরুর পুত্র মহাভুজ রাজা জনমেজয়, তার পুত্র অবিদ্ধ, ইনি প্রাচী দিক জয় করেছিলেন। এই বংশের রাজা রৌদ্রাস্বের দশ কন্যা জন্মেছিল। অত্রিবংশীয় প্রভাকর, এই কন্যাগণের পাণি গ্রহণ করেন। রাজর্ষি অনুদৃষ্টের পুত্রের নাম রিবেয়ু। রিবেয়ুর স্ত্রী তক্ষক কন্যা জ্বলনা, এঁর গর্ভে পুত্র রন্তিনার জন্ম। রন্তিনা সরস্বতীর গর্ভে–এসু, ধ্রুব, অপ্রতিরথ নামে তিন ধার্মিক পুত্র ও গৌরী নামে এক কন্যা উৎপাদন করেন। গৌরী মান্ধাতার মাতা। এঁদের মধ্যে অপ্রতিরোধের ধূর্য নামে এক পুত্র হয়, ধূর্যের পুত্র কণ্ঠ। তার পুত্র মেধাতিথি। রন্তি পুত্র অসুর প্রিয় পুত্র ইলিন। ইলিন থেকে। উপদানবী চারপুত্র লাভ করে। সুষ্মন্ত, দুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ। দুষ্মন্ত থেকে শকুন্তলার গর্ভে ভরত জন্মগ্রহণ করেন। দুষ্মন্তের পুত্র ভরত থেকেই ভারতবর্ষ নাম প্রসিদ্ধ হয়। ভরত তার স্ত্রীদের গর্ভে নয় পুত্র উৎপাদন করে। কিন্তু এই পুত্রগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী রাজা ভরতের মনঃপুত না হওয়ায় তাদের মাতার রেগে গিয়ে সমস্ত পুত্রকেই যমালয়ে পাঠালেন। তাই ভরতের মানবজন্ম বিফলে গেল। তারপর যজ্ঞের ফলে মরুতেরা বৃহস্পতি পুত্র ভরদ্বাজকে এনে ভরতকে দিলেন।

রাজা ভরত পুত্র কামনায় যজ্ঞ করেছিলেন, কিন্তু পুত্র লাভ করতে পারছিলেন না। পরে প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ করে মরুদগণকে তুষ্ট করেন, আর ভরদ্বাজকে পুত্ররূপে লাভ করেন। এভাবে ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষত্রিয়ত্বে উপনীত হয়েছিলেন। পুত্র লাভ করবার পর ভরত স্বর্গে গিয়েছিলেন। ভরদ্বাজের ভূমন্যু নামে এক পুত্র হয়, তার চারজন মহাপ্রাণ পুত্র জন্মাল। এঁদের নাম–বৃৎক্ষেত্র, মহাবীর্য, নর ও গাগ্র্য। নরের পুত্র সাস্কৃতি। সাস্কৃতির দুই পুত্র–নাম গুরুবীর্য ও ত্রিদেব। মহাবীর্যের পুত্রের নাম ভীম, তার ছেলে উপক্ষয়, উপক্ষয়ের স্ত্রীর নাম বিশাখা। বিশাখার তিনপুত্র–ত্রয্যারুণি, পুষ্করী, কপি।

বৃহৎক্ষেত্রের পুত্র ধার্মিক সুহোত্র। তার ছেলে হস্তী। হস্তিনাপুরীর নির্মাতা এই হস্তী। হস্তীর তিন ধার্মিক পুত্র। অজামীয়, দ্বিজামীয়, পুরুমীয়। অজমীয়ের তিন সুন্দরী পত্নীর নাম-নলিনী, কোপিণী, ধূমিণী। এইসব পত্নীর গর্ভে অজমীরের কয়েক জন পুত্র জন্মায়। কোপিণীর গর্ভে কণ্ঠনাম পুত্র জন্মায়। কণ্ঠের ছেলে মেধাতিথি। এই মেধাতিথি থেকেই কণ্ঠায়ন দ্বিজদের উৎপত্তি। ধুমিণীর গর্ভে অজমীরের বৃহদসু নামে পুত্র হয়। এঁর পুত্র বৃহদ্বিষ্ণু, তার ছেলে

বৃহকর্মা। তার পুত্র বৃহদ্রথ, তার পুত্র বিশ্বজিৎ, তাঁর পুত্র সেনজিৎ, সেনজিতের লোক বিখ্যাত চার পত্রের নাম রুচিরাশ্ব, কাব্য, রাম ও বৎস।

কনিষ্ঠ বৎস অবন্তক নামে রাজা হয়েছিলেন। এই বৎসরের নামানুসারে পরিবৎসর গণনা করা হয়। রুচিরাশ্বের পুত্র মহাযশা পৃথুসেন, তার পুত্র পার, তার পুত্র নীপ। কথিত আছে, নীপ রাজার একশো পুত্র হয়েছিল। তারা সবাই নীপা নামে খ্যাত। এঁদের মধ্যে একজন কীর্তিমান রাজা ছিলেন নাম সমর, তিনি সত্যিই যুদ্ধ প্রিয় ছিলেন। এঁর তিন পুত্র পর, পার, সত্ত্বদস্ব। এঁরা সর্বগুণসম্পন্ন। পরের ছেলে বৃষ, বৃষুর ছেলে সুকৃতি। ইনি সুকর্মের অনুষ্ঠাতা। এঁর সর্ব গুণযুক্ত পুত্রের নাম বিভ্রাজ। বিভ্রাজের পুত্র মহাযশা রাজা অনুহ। এঁর পুত্র ব্রহ্মদত্ত। তাঁর পুত্র যোগসুনু, এঁর পুত্র রাজা বিশ্বক সেন।

বিশ্বক সেনের পুত্র রাজা উদক সেন। এঁর পুত্র ভল্লাট। ভল্লাটের পুত্র রাজা জনমেজয়। এই জনমেজয়ের জন্য উগ্রায়ুধ সমস্ত নীপদের বিনাশ করেছিলেন। ঋষিরা বললেন–উগ্রায়ুধ কার পুত্র? কি জন্যে নীপদের বিনাশ করলেন? সূত বললেন– যবনীর নামে এক বিদ্বান পুত্র হয়। এই যবনীরের ছেলে ঋতিমান, তার ছেলে সত্যধৃতি। এই বংশে মহৎপৌর নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। তার পুত্রের নাম রাজা রক্লরথ। রক্লরথের পুত্র রাজা সুপার্শ্ব। সুপার্শ্বের পুত্র ধার্মিক সুমতি, তার পুত্র ধর্মাত্মা সন্নতিমায়, তার ছেলে সনতি, এর পুত্র কৃত। ইনি চব্বিশ প্রকার সাম সংহিতার প্রবক্তা। এনার উগ্রায়ুধ নামে বীর পুত্র জন্মায়।

মহার্যশা ক্ষেম এর পুত্র। এই বংশে পুরুজানুপুত্র যক্ষ থেকে পাঁচ পুত্র জন্মে। এই পাঁচ পুত্রই সুবিখ্যাত, মুন্সলের বংশধরেরা। মৌদগল্য নামে পরিচিত। মুদগলের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাযশা ব্রহ্মিষ্ট। এর পুত্রের নাম বধ্য। এর পুত্র কন্যা দিববাদাস ও অহল্যা। এর পুত্র সদানন্দ। এর পুত্র সত্যধৃতি ধনুর্বেদে । পারদর্শী। এঁর পুত্র কন্যা হল কৃপ আর কৃপী বা গৌতমী। এই শ্বারদ্বতের বংশীয়রা গৌতমগোত্রীয়। দিবোদাসের পুত্র রাজা মিত্রয়ু। এঁর পুত্রের নাম মৈত্রেয়। এই বংশের পুত্ররা ভার্গব নামে পরিচিত। এই বংশের সুবামের পুত্র সহদেব। তার পুত্র সোমক। রাজা, অজমীর আবার সোমক হয়ে জন্ম নেন। সোমকের পুত্র হল জন্তু।

সোমকরূপী মহাত্মা অজমীরের একশো পুত্র উৎপন্ন হয়। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পৃষত। ইনি দ্রুপদের পিতা। দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন। তার ছেলে ধৃষ্টকেতু। অজমীরের মহিষী ধূথিনী একশ বছর ধরে দুশ্চর তপস্যা করেন। তপস্যা করতে করতে তিনি ধোঁয়ার মত রঙ ধারণ

করেছিলেন। ঋক্ষ নামে তার এক ধূম্রবর্ণ পুত্র হয়। ঋক্ষ থেকে সম্বরন, সম্বরন থেকে কুরু। এই কুরু পদব্রজে প্রয়াগ হয়ে কুরুক্ষেত্রে পৌঁছান। ইন্দ্রের বরে ঐ স্থান পুণ্যতীর্থ স্থানে পরিণত হয়।

এই কুরু বংশের রাজারা সবাই কুরু নামে বিখ্যাত। কুরুর পাঁচ পুত্র সুধা, জহ্নু, পরীক্ষিত, পুত্রক ও অরিন্দম। সুধার পুত্র সুহোত্র। তার ছেলে চ্যবন। এঁর পুত্র কৃত। কৃতের বিশ্রুত নামে এক পুত্র হয়। সে ইন্দ্রের সখা হয়েছিলেন। বিদ্যোপরিচয় নামে এক অন্তরিক্ষচর বসু থেকে গিরিশ সাতটি পুত্র উৎপাদন করেন। এর মধ্যে অন্যতম বৃহদ্রথ। এই বংশে জন্মায় জর্জ, তার পুত্র নভস। ইনি অতি বীর্যবান ছিলেন। ইনি ঘটনাচক্রে দুভাগে জন্ম নেন। জরা নামে রাক্ষসী এদের এক করেন। এজন্য এঁকে জরাসন্ধ বলা হয়। মহাবল জরাসন্ধ ক্ষত্রিয় জাতিকে জয় করেন। এঁর পুত্রের নাম সহদেব। সহদেবের পুত্র শ্রীমান সোমাধি। ইনি একজন বিশিষ্ট তপস্বী। সোমাধির পুত্র শ্রবা। এঁরা মগধ নামে বিখ্যাত।

সূত্র বললেন–পরীক্ষিতের ছেলে জনমেজয়, তার পুত্র রাজা সুরথ, তার ছেলে ভীমসেন। জহুর পুত্র রাজা সুরথ। তাঁর পুত্র বীর বিদূরথ। এঁর পুত্র সার্বভৌম। জয়ৎসেন সার্বভৌমের পুত্র। জয়ৎসেনের পুত্রের নাম আবধি। এই বংশের প্রতীপের তিন পুত্র দিবাপি, শান্তনু, বাহ্লীক। বাহীকের পুত্র মহাযশা সোমদত্ত। এঁর তিন পুত্র ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল। দেবাপি একজন বিশিষ্ট মুনি। চ্যবন ও ইষ্টক এঁর পুত্র। শান্তনু মহাভিষ নাম ধারণ করে রাজা হন। বলা হয় এই রাজা যে জীর্ণ পুরুষকে স্পর্শ করবেন সে পুরুষ আবার যুবক হয়ে যাবেন। এই মহাত্মা শান্তনু জাহ্নবীর পাণিগ্রহণ করেন। জাহ্নবীর গর্ভে শান্তনুর ভীষ্ম নামে পুত্র জন্মায়।

এই ভীষ্ম পাণ্ডবদের পিতামহ। কালক্রমে দাস কন্যার গর্ভে আরও এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রের নাম বিচিত্রবীর্য। বিচিত্রবীর্য শান্তনুর প্রিয় পুত্র ও প্রজা হিতৈষী রাজা ছিলেন। ঐ বিচিত্রবীর্য ক্ষেত্রে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণে থেকে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর নামে তিন পুত্র জন্মে। গান্ধারীর ধৃতরাষ্ট্র থেকে একশ পুত্র জন্মায়। ঐ পুত্রদের মধ্যে দুর্যোধন সবার বড়। পাণ্ডুর দুই স্ত্রী মাদ্রী ও কুন্তী। এই দুই মহিষীর গর্ভে পাণ্ডুর বংশরক্ষার্থে দেবপ্রদত্ত পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে ধর্ম থেকে যুধিষ্ঠির, বায়ু থেকে ভীম, ইন্দ্র থেকে ধনঞ্জয় এই তিন পাণ্ডব পৃথা গর্ভজাত। মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয় থেকে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করে।

পঞ্চপাণ্ডব থেকে দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচ পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল। তার মধ্যে যুধিষ্ঠির থেকে দ্রৌপদী প্রতিবিন্ধ্য নামে এক পুত্র প্রসব করেন। ভীমসেন ও হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে পুত্র হয়।

ঐ পুত্রের নাম সর্ববৃক। সহদেব ও বিজয়ার সুহোত্র নামে এক পুত্র হয়। নকুল ও কর্ণবতীর গর্ভে নিরমিত্র নামে এক পুত্র হয়। পার্থ থেকে সুভদ্রার গর্ভে বীর অভিমুন্য জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরা ও অভিমন্যুর পরীক্ষিৎ নামে এক পুত্র হয়।

পরীক্ষিতের পুত্র রাজা জনমেজয়। জনমেজয় বাজসনেয়ক ব্রাহ্মণদের মর্যাদা স্থাপন করেছিলেন। এতে বৈশম্পায়ন রেগে গিয়ে তাকে শাপ দিয়েছিলেন– হে দুর্বুদ্ধি, জগতে তোমার কথা স্থির থাকবে না, অন্তত আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন ঐ কথার কোন মূল্য থাকবে না। জনমেজয় উভয় সঙ্কটে পড়ে পৌর্ণমাস যজ্ঞে শ্রীহরি হার দিয়ে প্রজাপতিকে অর্চনা করলেন। জনমেজয় বাজসনেয়ক ব্রহ্ম প্রবর্তিত করে ত্রিখর্বী হয়ে পড়লেন। ত্রিখর্বী অর্থাৎ অস্মকগণ, অঙ্গদেশবাসিনীগণ ও মধ্যদেশীয়গণ ত্রিবিধ লোকের কাছেই খর্ব হয়েছিলেন। পরে তিনি অভিশপ্ত হয়ে বিষাদ ভরে তার প্রবর্তিত ব্রাহ্মণের সাথে ক্ষয়প্রাপ্ত হন। তার পুত্র শতানীক। ইনি সত্য বিক্রম। সতানীকের পুত্র বীর্যবান অশ্বমেধ দত্ত। এঁর থেকেই মহাত্মা অধিসামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। এঁরই অধিকারকালে আপনারা তিন বছর ব্যাপী দুর্লভ দৃশ্য যজ্ঞ শুরু করেছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ। কুরুক্ষেত্র দৃষদ্বতী তীরে আপনাদের যজ্ঞের দুই বছর মাত্র অতিক্রান্ত হয়েছে।

ঋষিরা বললেন–অতীত নয়। এখন রাজা, প্রজাদের বিষয়ের বিবরণ বলুন। সূত বললেন– ব্যাস আমার কাছে ভাবী কলিযুগ ও মন্বন্তর সম্পর্কে যেভাবে বলেছেন, তা আপনারা শুনুন। এখন যে অধিসামকৃষ্ণ রাজ্য শাসন করেছেন, এই বংশের ভাবীকালের নরপতিদের নাম বলছি। এঁর এক পুত্র হবেন, তার নাম নির্বক্ত। হস্তিনাপুরী ধ্বংস হয়ে গেল, সেখান থেকে তিনি কৌশাম্বী নগরীতে গিয়ে বাস করতেন। উষ্ণ নামে তার এক পুত্র হবে। উষ্ণের পুত্র চিত্ররথ। তার পুত্র শুচিদ্রথ। তার পুত্র ধৃতিমান। তার পুত্র সুষেণ, এঁর পুত্রের নাম রাজা সুতীর্থ, সুতীর্থ থেকে রুচ, রুচ থেকে ছিচক্ষ জন্ম নেবেন। এঁর পুত্র মুখীবল, তার পুত্র রাজা পরিপ্লত, তার পুত্র সুনয়, সুনয়ের পুত্র মেধাবী, তার পুত্র দণ্ডপানী, তার পুত্র নিরামিত্র, এঁর থেকেই রাজা ক্ষেমক জন্মগ্রহণ করবেন।

এরপর মহাত্মা ইক্ষবাকু বংশের বিবরণ বলছি। বৃহদ্রথের বীর পুত্র রাজা বৃহৎক্ষয়, তার পুত্র ক্ষয়, তার ছেলে বৎস ব্যুহ, তাঁর পুত্র প্রতিব্যুহ, দিবাকরণ এঁর পুত্র। এই দিবাকরণ অযোধ্যা নগরীতে এখন রাজা হয়েছেন। দিবাকরণের এক যশস্বী পুত্র হবে, তাঁর নাম সহদেব, সহদেবের পুত্র হবেন বৃহদশ্ব, তার পুত্র ভানুরথ, তার পুত্র প্রতিতাশ্ব, তার পুত্র সুপ্রতীত, তার পুত্র সহদেব, সহদেবের পুত্র সুনক্ষত্র, এঁর পুত্র কিন্নর, কিন্নরের পুত্র অন্তরীক্ষ। তাঁর পুত্র সুপর্ণ, তার ছেলে

অমিত্রজিৎ। এঁর পুত্রের নাম ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজের পুত্র ধর্মী, ওঁর পুত্র কৃতঞ্জয়, তার ছেলে ব্রাত, ব্রাতের ছেলে রণজয়, এঁর ছেলে বীর সঞ্জয়। সঞ্জয়ের পুত্র শাক্য। শাক্য থেকে শুদ্ধোদনের উৎপত্তি। শুদ্ধোদনের পর রাহুল, তার পরবর্তী সুমিত্র পর্যন্তই বংশের বিস্তৃতি।

কলিযুগে এই সমস্ত উল্লেখিত রাজারাই রাজত্ব করবেন। এরা সকলেই বীর, যোদ্ধা, সত্যানুরাগী ও জিতেন্দ্রিয়। কলিকালে রাজা, সুমিত্রকে পেয়েই এই বংশ শেষ হবে।

এখন মগধের রাজাদের কথা বলছি। যুদ্ধে জরাসন্ধের পুত্র সহদেব নিহত হলে, তার পুত্র সৌমাধি গিরিব্রজের সিংহাসন আরোহণ করেন। ইনি আটান্ন বছর রাজত্ব করেন। তার ছেলে শ্রুতশ্রবা চৌষট্টি বছর ধরে রাজত্ব করেন। তার ছেলে নিরামিত্র। ইনি একশো বছর কাল রাজ্য ভোগ করেন। তার পুত্র সুকৃত্য, তিনি ছাপ্পান্ন বছর রাজত্ব করেন। তার পুত্র বৃহকর্ম তেইশ বছর ধরে রাজ্য শাসন করেন। এঁর ছেলে সম্প্রতি মগধে রাজ্য শাসন করছেন। ইনিও তেইশ বছর পর্যন্ত রাজ্য শাসন করবেন। এঁর পুত্র শ্রুতঞ্জয় চব্বিশ বছর, তার ছেলে মহাবল মহাবাহু পঁয়ত্রিশ বছর, এঁর পুত্র শুচি আটান্ন বছর, তার পুত্র ক্ষেম আটাশ বছর, তার ছেলে ভুবন চৌষট্টি বছর। এইভাবে বৃহদ্রথ থেকে মোট বত্রিশ জন রাজা এক হাজার বছর প্রায় রাজত্ব করবেন।

এঁদের বংশের অবসান হলে বীতিহোত্র বংশের রাজত্বকালে মুনিক নামে জনৈক কর্মচারী সমস্ত ক্ষত্রিয়দের অবজ্ঞা করে নিজের প্রভু রাজা প্রদৌৎকে হত্যা করে তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসাবেন। সমস্ত রাজারা সেই ভাবী নতুন রাজাকে মান্য করবে। ঐ রাজা কোনো নীতি বিরুদ্ধ কাজ করবেন না। প্রদৌতের বংশধর পাঁচ রাজকুমার একশো আটত্রিশ বছর রাজ্য শাসন করবেন। এরপর আসবেন শক্তিশালী, পরাক্রমী রাজা শিশুনাগ। এঁর পুত্র বারাণসীর রাজা হবেন। তাঁর পুত্র সুকর্ণ ছত্রিশ বছর রাজত্ব করবে। এরপর কুড়ি বছর ক্ষেত্রবর্মার শাসন থাকবে। এরপর পঁচিশ বছর ধরে রাজত্ব করবেন অজাতশত্রু। তারপর রাজা ক্ষতৌজা চল্লিশ বছর পর্যন্ত রাজ্য ভোগ করবেন। তারপর রাজা বিম্বিসার আঠাশ বছর, উদায়ী তেত্রিশ বছর রাজত্ব করলেন।

এভাবে দশজন শিশুনাগ বংশীয় রাজা মোট তিনশো বাষট্টি বছর রাজত্ব করবেন। ইক্ষাকু বংশের চব্বিশজন পঁচিশ, কানকদের চব্বিশ, হৈহয় বংশীয়দের চব্বিশজন, কলিঙ্গদেশীয়দের বত্রিশ, শকদের পঁচিশ কুরুবংশীয় ছত্রিশ। মৈথিলিদের আঠাশ ও সুরসেনদের তেইশ ও বীতিহোত্র বংশের কুড়িজন রাজা একই কালে রাজত্ব করবেন।

সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজার রাজত্বকাল শেষ হলে মহানদীর শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র মহাপদ্ম রাজা হবেন। এই মহাপদ্ম থেকেই শূদ্রযোনিজাত পুত্ররা রাজা হতে থাকবেন। রাজা মহাপদ্ম আটাশ বছর ধরে পৃথিবী পালন করবেন। ঐ রাজার এক হাজার পুত্র জন্মাবে। তাদের মধ্যে মোট বারোজন মাত্র আট বছর করে রাজত্ব করবেন। সব শেষে আসবেন নন্দ রাজা। তিনি একশো বছর রাজ্য ভোগ করবেন। তারপর একসময়ে কৌটিল্যের কৌশলে ঐ সব রাজাই রাজ্যচ্যুত হবেন। কৌটিল্য তারপর চন্দ্রগুপ্তকে রাজ সিংহাসনে স্থাপন করবেন। চন্দ্রগুপ্তর রাজত্বকাল হবে চব্বিশ বছর। তারপর ভদ্রসর রাজা হবেন। ইনি পঁচিশ বছর রাজ্য শাসন করার পর তাঁর পুত্র ছাব্বিশ বছর রাজত্ব করবেন। অশোকের পুত্র কুনাল আট বছর রাজত্ব করবেন। তারপর বন্ধ উপাতিত আট বছর পর্যন্ত রাজ্য ভোগ করবেন। তারপর পুত্র ইন্দ্র পালিত দশ বছর তারপরে নরাধিপা দেববর্মা সাত বছর ও তার ছেলে রাজা শতধর ও তারপর বৃহদ এই নয় রাজার পর ঐ রাজ্য শুঙ্গ বংশীয়রা ভোগ করবেন।

শুঙ্গবংশীয় দেবভূমি নরকাঠায়ন নাম নিয়ে রাজত্ব করবার পর তার পুত্র ভূতিমিত্র চব্বিশ বছর রাজত্ব করবেন। নরপতি নারায়ণ বারো বছর ও পুত্র সুগম দশ বছর। এই চারজন ভাবী রাজা কাঞ্চায়ন দ্বিজ বলে বিখ্যাত। এঁদের সময় শেষ হয়ে গেলে অন্ধ্র রাজারা রাজ্য অধিকার করবেন।

এবার বৈদেশিক বৃষ রাজাদের কথা বলছি। নাগরাজ নষের পুত্র ভোগী বিদেশ রাজ্যের প্রথম রাজা হবেন। তারপর সদাচ, চন্দ্রাংশ, নখবান, ধন ধর্মা, বিংশজ ও ভূতিনন্দ– যথাক্রমে এঁরা রাজা হবেন। অঙ্গবংশীয় রাজার পর রাজা মধুনন্দী, ছোট ভাই নন্দিশা রাজত্ব করবেন। এরপর এঁর বংশের তিন রাজা রাজত্ব করবেন। তাদের নাম দৌহিত্র, শিশুক, বীর্যবান। রাজা শিশুক পূরিকা নগরীতে ও অন্য দুই রাজা কাঞ্চন পুরীতে রাজঐশ্বর্য ভোগ করবেন। মেলায় সাতজন প্রসিদ্ধ নরপতি রাজত্ব করবেন। এরপর পুষ্যমিত্র ও পট্টমিত্র নামীয় তেরোজন রাজা রাজত্ব করবেন। মেঘ নামে নয়জন বিখ্যাত বৃদ্ধিশালী রাজা হবেন। তারপর মগধ বিশ্বস্কানি রাজা হবেন। ইনি তখনকার বিভিন্ন পার্থিবদের উচ্ছেদ করে অন্তবলীয় কয়েকজন ব্যক্তিকে রাজ্য দান করবেন।

এরপর নয়জন রাজা চম্পাবতী ভোগ করবেন। তারপর গুপ্তবংশীয় রাজারা গঙ্গার তীরে প্রয়াগ সাকেত, মগধ প্রভৃতি জনপদে বাস করবেন। মনিধান্য বংশীয় রাজারা নিষধ, যদুক, শৈশীত ও কাল পৌতকে, গুহরাজন কোশল, অন্ধ্র, পৌ, তাম্রলিপ্ত, কলিঙ্গ মহিষ, মহেন্দ্র নিলয় কনক রাজারা সৌরাষ্ট্র, ভক্ষক প্রভৃতি জনপদে একই সাথে রাজত্ব করবেন। এরপর

কিছু ক্রোধী, অধার্মিক রাজা রাজত্ব করবেন। যুগের দোষে এইসব রাজারা খুব দুরাচার করবে। স্ত্রী, শিশু বধ করবে। যে সব জনপদে তারা বাস করবে সেই সব জনপদে ম্লেচ্ছাচার হবে। এরা লোভী, অসত্যবাদী হবে। এজন্য তাদের আয়ু, রূপ, জ্ঞান, বল সবই একটু একটু করে ক্ষয় পাবে। প্রজাদেরও চরম দুর্দশা হবে। এই সময় এইসব অধার্মিক রাজারা কল্কির প্রভাবে ইতস্ততঃ পালিয়ে যাবে। প্রজারাও অনাহারে, ব্যাধিতে, অনাবৃষ্টিতে, পরস্পর বিবাদে কষ্ট পাবে। তখন তারা গ্রাম বা নগর ত্যাগ করে বনে চলে যাবে। অবশিষ্ট মৃতপ্রায় প্রজারা পর্বতে গিয়ে বাস করবে। আর্যরা, ম্লেচ্ছরা একসঙ্গে হিমালয়ের পৃষ্ঠে গভীর অরণ্যে বাস করবে। মানুষেরা মৃগ, মীন, ফলমূল, বিহঙ্গ, মধু, শাক ইত্যাদি খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করবে। ছাগ, মেষ, উট প্রভৃতির পালন করবে।

প্রজারা নিকৃষ্ট ধর্ম পালন করবে। লোকেরা দুর্বল, জরাজীর্ণ হবে। তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করবে। কলিযুগ শেষ হলে কৃতযুগ শুরু হবে।

সপ্তর্ষিরা প্রতি নক্ষত্রে এক এক শত বছর বাস করবেন। এইভাবে তাদের এক একটি যুগ। ঐ যুগ দিব্যসংখ্যায় নির্ণীত হয়। সপ্তর্ষিদের প্রথমত ক্ষেত্রমণ্ডলের পূর্বদিকে এবং পরে উত্তর দিকে দেখা যায়। অন্তরীক্ষের সম মধ্যভাগে যে নক্ষত্র দেখা যায়, তার সাথে সপ্তর্ষি মিলিত হলে তাদের শতবর্ষের পূর্ণতা কাল জানা যায়। তারপর অন্ধ্র রাজাদের রাজত্বের শেষে তারা শতভিষা নক্ষত্রে গিয়ে মিলিত হবেন। সেসময় পৃথিবীর প্রজাসাধারণ বিপন্ন হয়ে পড়বে। সকলেই ধর্ম, অর্থ, কাম হীন হয়ে পড়বে। বর্ণাশ্রম ধর্ম শিথিল হয়ে পড়বে।

শ্রীকৃষ্ণ যেদিন স্বর্গারোহণ করেছেন সেদিন থেকে কলি প্রবেশ করেছে। সেই কলিযুগের সংখ্যা বলছি। তিন লক্ষ ষাট হাজার বছর কলিকালের পরিমাণ নির্ধারিত। দিব্য হাজার বছর এর সন্ধ্যাংশ বলা হয়ে থাকে। কলিযুগ সমস্ত শেষ হয়ে গেলে কৃতযুগ প্রবর্তিত হবে। ইক্ষবাকু থেকে ক্ষত্রিয় বংশের আবির্ভাব, সেই বংশের সুমিত্র পর্যন্ত তার পরিশেষ, বুধ গণ বলে থাকেন ক্ষেমক পর্যন্তই হল ক্ষত্রিয় বংশের শেষ।

এবার ক্ষত্রিয় উৎপত্তির কথা বলছি। পুরুবংশীয় রাজা দেবাপি কঠোর যোগবল অবলম্বন করে কল্পগ্রামে অবস্থান করবেন। ইক্ষবাকু কুলে সোম থেকে সুর্বা নামে এক পুত্র জন্মাবে। এরাই ক্ষত্রিয় কুলের প্রবর্তন করবেন। দেবাপি ওই বংশের আদি রাজা হবেন। কলিযুগ ক্ষীণ ও ভাবী কৃতযুগের প্রবর্তন হলে ঐ দুই রাজা ভাবী সপ্তর্ষির সাথে আবির্ভূত হবেন। ত্রেতাযুগের আদিতে তারাই ক্ষত্রিয় বংশের প্রবর্তক।

দ্বাপরে কি ঋষি, কি ক্ষত্রিয় কেউই থাকবেন না। কৃত ত্রেতা যুগে ঋষি ও রাজর্ষি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বংশের বীজভূত হবেন। সব মন্বন্তরেই থাকবে ক্ষত্রিয় বংশের উপস্থিতি। সন্তানের জন্য সপ্তর্ষিরা যুগে। যুগে রাজাদের সাথে এভাবেই অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। মন্বন্তরের ক্ষয়কাল পর্যন্ত তাদেরকে এভাবেই উৎপন্ন হতে হয়। পরশুরাম ধরিত্রীর সমস্ত ক্ষত্রিয় কুলের উচ্ছেদ সাধন করলে চন্দ্র, সূর্য উভয় বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের পুনরুৎপত্তি হয়। এবার সেই বৃত্তান্তই বলছি। জমদাগ্নকৃত সংহারের পর ঐল ও ইক্ষবাকু উভয় বংশেই আবার সন্তান বিস্তার হয়। ধারাবাহিক ক্রমে ক্ষত্রিয়রা আবার রাজা হয়ে থাকেন। এই দুই বংশে বিখ্যাত রাজা জন্ম নেন।

এর মধ্যে অতীত হয়েছেন একশো প্রতিবিন্ধ্য, একশো নাগ, একশো ঘোড়া, একশো ধৃতরাষ্ট্র, আশি জন জনমেজয়, একশো জন ব্রহ্মদত্ত, একশো ধারী, একশো পৈল, একশো শ্বেত, কাশ কুসাদি নামীয় নরপতি ও শতবিন্দু নামে এক হাজার রাজা। এঁরা সকলেই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে যাঁরা রাজা হয়েছেন তাদের বহু সংখ্যক সন্তান সন্ততি রয়েছে। বৈবস্বত মন্বন্তরে আঠাশ যুগ অতীত হয়েছে। ভাবীকালে এই যুগে আরও চল্লিশ জন বিশিষ্ট রাজা রাজত্ব করবেন। পরে বৈবস্বত মন্বন্তরের অবসান হবে। এই সব রাজবংশ বিবরণ শুনলে আয়ু, কীর্তি, ধন ও পুত্র ইত্যাদি লাভ হয়।

নিরানব্বইতম অধ্যায়

বায়ু বললেন–সূত বর্ণিত তৃতীয় পাদ শুনে ঋষিরা চতুর্থ পাদের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন। সুত বললেন–এখন ভাবী সাবর্ণ মনু ও বর্তমান বৈবস্বত মনুর বিবরণ বলব। ভাবী মন্বন্তরে যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন, তাদের নাম সংক্ষেপে বলছি। অনাগত সাত মহর্ষিই প্রখ্যাত, কুশিক নন্দন গালব, জমদগ্নিসূত ভার্গব, বশিষ্ঠ গোত্রীয় দ্বৈপায়ণ সারস্বত বংশীয় কৃপ, আত্রেয়, দীপ্তিমান, কাশ্যপ, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং ভরদ্বাজ গোত্রীয় অশ্বত্থামা–এই সাত মহাত্মা সাত মন্বন্তরের ঋষি। সুতরাং, অমিতাভ, মুখ দেবগণের তিনটি গণ প্রখ্যাত। এক এক গণে কুড়িজন করে দেব রয়েছেন। এই দেবগণ মরীচি নন্দন মহাত্মা কাশ্যপের পুত্র। ভাবী মন্বন্তরে এরাই দেবতা হবেন। বিরোচন নন্দন বলি এঁদের ভাবী ইন্দ্র। সাবর্ণ মনুর নয়জন পুত্র হবে। তাদের নাম–বীরবান, অবরীয়ান, নির্মোহ, সত্যবাক, কৃতী, চরিফু, আদ্য, বিষ্ণু, কচ ও সুমতি।

ঐ মনুদের মতে অনেকে দক্ষের দৌহিত্র। প্রিয়তম দুহিতার গর্ভজাত। তারা মহৌজা। মহাতপস্বী, মেরুপৃষ্ঠবাসী তাদের অনেকে ব্রহ্মাদিদেব এবং ধীমান দক্ষ প্রজাপতি থেকে

উৎপন্ন। ঋষিরা বলেন– দক্ষ কিভাবে কন্যার পুত্রোৎপাদন করলেন? সূত বললেন–আমি ভাবী সাবর্ণ মনুদের বিবরণ এবং তাদের জন্ম বিষয়ে বর্ণনা করছি। চাক্ষুষ মন্বন্তরের শুরুতে ঐ সব ভবিষ্যৎ মনুর জন্ম হয়। এদের মধ্যে পাঁচজন মনু দক্ষ প্রজাপতির দৌহিত্র চারজন মনু মহর্ষি থেকে উৎপন্ন। একজন ছায়া সংজ্ঞার পুত্র সাবর্ণ। সংজ্ঞা সূত বৈবস্বত মনু সাবর্ণ মনুর জ্যেষ্ঠ। কি বেদ, কি শ্রুতি, কি পুরাণ সর্বত্রই এঁরা প্রভবিষ্ণু, সর্বভূত পতি। ঐ মনুদের দ্বারাই সমগ্র পৃথিবীপালিত।

সম্প্রতি বৈবস্বত মনুর অধিকার কাল চলছে। এবার যাঁরা অবশিষ্ট আছেন অর্থাৎ দেব, ঋষি, দানব, দ্বিজ ইত্যাদির বিবরণ বলছি। ব্রহ্মা বৈরাজলোকে ধর্ম ও ভব সহ এক যোগে উপাসনা কাজে নিরত থাকা কালে দক্ষ প্রজাপতি তাঁর সুব্রতা নামে সর্বকনিষ্ঠ পরম ধার্মিক কন্যাকে নিয়ে ব্রহ্মের কাছে গেলেন, ব্রহ্মা ভব ও ধর্মের সামনে দক্ষকে দেখে বললেন–হে দক্ষ! তোমার কন্যা সুব্রতা চার পুত্রের জন্ম দেবে। ঐ পুত্ররা ভাবীকালে চারজন চতুর্বর্ণের সংস্থাপক মনু হবেন। ব্রহ্মার কথা শুনে সবাই এমন কি ব্রহ্মা নিজেও মনে মনে কন্যার সঙ্গে সঙ্গত হলেন। এর পরে ঐ কন্যা তাদেরই মত চারটে সন্তান তৎক্ষণাৎ প্রসব করলেন। তারা নিজেরা মীমাংসা করে নিলেন। যাঁকে যাঁর মতো দেখতে তিনিই তার পুত্র। এরকম মীমাংসা করে চার দেব নিজ নিজ সমান বর্ণ পুত্রকে নিজের বলে গ্রহণ করলে এঁরা সাবর্ণ মনু নামে বিখ্যাত হন। চাক্ষুষ মন্বন্তর অতীত হলে বৈবস্বত মনুর প্রারম্ভে প্রজাপতি রুচির রৌপ্য নামে এক পুত্র হয়। বৈবস্বত মন্বন্তরে সূর্য থেকে উৎপন্ন দুজন মনু রাজত্ব করেছিলেন। তাদের একজন। বৈবস্বত মনু, আরেকজন সাবর্ণ মনু। সূর্য থেকে ছায়ার গর্ভে যিনি উৎপন্ন হয় তিনি সাবর্ণ মনু। প্রথম মনু দক্ষ পুত্র মেরু সাবর্ণী। এঁর অন্য নাম রোহিত প্রজাপতি। ইনি ভবিষ্য মন্বন্তরের ভবিষ্য মনু। তাঁর অনেক ছেলে, সবাই মহাত্মা। তারা তিন ভাগে বিভক্ত– মরীচি গর্ভ, সুশর্মা ও পার।

ভাবীকালে অদ্ভুত নামে এক দেব এঁদের ইন্দ্র হবেন। পাবক নন্দন ইন্দসুন্দর কার্তিকেয় স্কন্ধ, পুলস্ত্য বংশীয় মেধাতিথি, কশ্যপগোত্রীয় বসু, ভৃগুবংশীয় জ্যোতিষ্মন, অঙ্গিরাবংশীয় দ্যুতি, বশিষ্ঠ্য গোত্রীয় বসিত। আত্রেয় হব্য বাহন, পৌলবংশীয় সুতপা। এঁরা রোহিত মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। প্রথম সাবর্নির নয় পুত্র বিখ্যাত।

তাদের নাম ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, সাপ, হস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, অনীক, ভূরিদ্যুম্ন ও বৃহদ্রথ, দশম পর্যায়ে ধর্মপুত্র দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর নাম ভাব্য। এই ভাব্য মনুর অধিকার কালে সুখমন ও বিরুদ্ধ নামে দুটি গণ প্রসিদ্ধ। এঁরা সকলেই দ্যুতিমন্ত। শত সংখ্যায় বিভক্ত। ধর্মপুত্র মনুর অধিকার কালে এঁরাই দেবগণ হবেন। শান্তি এঁদের ভাবী ইন্দ্র বলে কথিত। পুলহ বংশীয়

হবিষ্মন, ভৃগুবংশীয় শ্রীমান সুকীর্তি, অত্রি ও বশিষ্ট গোত্রীয় আপমূর্তি নামে দুই ঋষি, পুলস্ত্য বংশীয় প্রতীপ, কশ্যপ গোত্রীয় নাভাগ, অঙ্গিরা বংশীয় অভিমন্যু–এঁরাই এ মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা, ভূরিষেণ, বীর্যবান, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভুরিদ্যুম্ন ও সুবর্চা, এই দশজন এই ভাবী মনুর পুত্র।

এই মন্বন্তরে দেবতাদের তিনটি গণ বিখ্যাত। তিনগণের একটি গণে ত্রিশ জন দেব বিরাজমান। পণ্ডিতরা দেব কামজ এবং মুহুর্তাত্মক দেবগণ মনোজবগণ নামে কথিত। এবার এই মন্বন্তরীয় সপ্তর্ষিদের নাম বলছি। কাশ্যপ, হবিষ্মান, ভার্গব, বপুষ্মান, আত্রেয়, বারুণি, বশিষ্ঠ, ভৃগু, আঙ্গিরস, পুষ্টি, পৌলিস্ত্য, নিশ্চর এবং পুলহ অগ্নিতেজা।

এবারে সুকর্ম নামে দেবতাদের কথা শুনুন। সুগর্বা, বৃষভ, পৃষ্ঠ, কৃপি, দ্যুম্ন, বিপশ্চিত, বিক্রম, ক্রম, বিতৃত ও কান্ত- এরা সুকর্মা দেবগণ। এঁদের ছেলেরা হল বয়েদ্দিত, জিষ্ঠ, বচস্বী, দ্যুতিমান ইত্যাদি। এই মন্বন্তরে সপ্তর্ষিরা হলেন কৃতী, আত্রেয়, সুতপা, অঙ্গিরস, তপোমূর্তি, কাশ্যপ, তপস্বী, পৌলস্ত্য, তপোপায়ন, পৌহল, তপোরতি ও ভার্গব তপোমতি, এঁরাই এই মন্বন্তরীয় সপ্তর্ষি।

কাশ্যপ অগ্নী, পৌলস্ত, মগধ, ভার্গব, অগ্নিবাহ, আঙ্গিরস, শুচি, ঔজস্বী ও সুবল এঁরা ভৌত্য মনুর পুত্র। রৌচ্য ও ভৌত্য এই দুই মনু পুলহ ও ভৃগু বংশীয়। ভৌত্য মনুর আধিপত্য কালের অবসানেই কল্পাবসান নিশ্চিত। এইভাবে ত্রৈলোক্য ত্যাগ করে মন্বন্তরীয় প্রধান প্রধান পুরুষেরা ঊর্ধ্বে মহৎলোকে গেলে সেই সময় সমস্ত ত্রৈলোক্য নিরাধার হয়ে পড়ে।

ত্রৈলোক্যের প্রধানগণ অতীত হলে ইন্দ্র প্রমুখ দেবশ্রেষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় দেবগণ, চাক্ষুষ মন্বন্তর পর্যন্ত চতুর্দশ মনুগণ ও অন্যান্য দেবগণ সকলেই তখন ঊর্ধ্বলোক কল্পবাসীদের সঙ্গে মিলিত হন। তারপর মহলোক পরিত্যাগ করে সেই সব চতুর্দশ গণ অনুচরসহ সশরীরে জনলোকে যান। এভাবে দেবগণ মহর্লোক থেকে জনলোকে প্রস্থান করলে অবশিষ্ট চরাচর ভূত বিনষ্ট হয়। তারপর ব্রহ্মা সেই সহদেব, ঋষি, পিতৃ ও দানবদের সংহার করে যুগয়ে মহৎ সৃষ্টির সূচনা করে আবার সৃষ্টি স্থাপন করেন।

সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন ও হাজার যুগে তাঁর রাত্রি হয়। অহোরাত্র জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতেরা ব্রহ্মার দিবরাত্রি মান এরকমই নির্দেশ করেন। নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক প্রলয় বলে উল্লিখিত। তারপর ব্রহ্মা ত্রৈলোক্যবাসী সমস্ত দেবতাদেরকে সংহার করে নিজের দিন অবসানে সৃষ্টি সংহার করে থাকেন। তারপর দিব্য হাজার যুগের অবসানে সেই প্রজাপতি প্রজাপুঞ্জের

সৃষ্টি বিস্তারে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন। ঐ সময় শতবর্ষ ধরে অনাবৃষ্টি হয়। সেই সময় সৌর রশ্মির অসহ্য তেজে সবকিছু জ্বলতে থাকে। সূর্য সপ্তরশ্মি দ্বারা মহাসাগর থেকে জল পান করে। সমুদ্র, নদী, পাতাল থেকে সমস্ত জল পান করে পৃথিবীকে দগ্ধ করান। পাতাল দগ্ধ করে পরে তিনি নাগলোক দগ্ধ করে থাকেন। পৃথিবী দগ্ধ করার পর ঐ আগুনে স্বর্গলোকও দগ্ধ করেন। গন্ধর্ব, পিশাচ, রাক্ষস ইত্যাদিকে দগ্ধ করে থাকেন। এর পর নানা আকারের নানা বর্ণের মেঘ ঘোর গর্জন করতে করতে নভঃস্থল পরিপূর্ণ করে জল বর্ষণ করে। মেঘগুলি তখন প্রলয় রশ্মিকে নিভিয়ে দেয়।

জল দিয়ে সমস্ত লোক আবৃত হলে বুধগণ এই অবস্থাকে একানব বলে বর্ণনা করেন। একানব অবস্থায় কোনোকিছুর তখন সীমা থাকে না, সমস্তই প্রলয় হয়ে যায়। ঐ সমুদ্রের মতো জল সমস্ত মহীমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে। এভাবে একানবে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত নষ্ট হয়ে গেলে তখন একমাত্র সহস্রাক্ষ, আদি পুরুষ ব্রহ্মাই থাকেন।

ঐ প্রভু চতুর্যুগের অবসান হলে সমস্ত ভুবন সলিলাপ্লুত হলে শয়ন ইচ্ছায় রাত্রি কল্পনা করেন। যখন চার প্রকার প্রজার সংহার সাধন করে ব্রহ্মা শয়ন করেন তখন শুধু সপ্ত মহর্ষিই সেই মহাত্মাকে দেখে থাকেন। ভৃগু প্রভৃতি মহাত্মা ঋষিগণ ব্রহ্মার নিদ্রা অবস্থায় ব্রহ্মাকে দর্শন করেন। ব্রহ্মা স্বীয় আত্মায় সমস্ত সংগ্রহ করে একানব জলে তপোময়ী রাত্রিতে বাস করেন।

আদিত্যের তেজে দেব, ঋষি, মনুষ্যাদি, ভূতবৃন্দ দগ্ধ হয়ে যায়। তারপর এরা জল লোকে আশ্রয় নেয়। তারপর ব্রহ্মার রাত্রি অবসানে আবার তারা জন্মগ্রহণ করে। ঋষি, মনু, দেব, চতুর্বিধ প্রজার আবার উদ্ভব হয়। জগতে যেমন সূর্যের উদয়াস্ত অবধারিত তেমনি ভূতগণেরও উৎপত্তি সংসার নামে নিরূপিত, চরাচর ভূতবৃন্দ প্রজাকর্তা প্রজাপতি মহেশ্বর ব্রহ্মার দেহে বারবার প্রবেশ করে ও বারবার নির্গত হয়। এ জগতের যা কিছু সবই তার দ্বারাই সৃষ্ট।

মন্বন্তর যুগ সহস্রাত্মক, এর দুই হাজার যুগ পূর্ণ হলে এক কল্পকাল নিঃশেষ হয়ে থাকে। একে ব্রাহ্মদিন বলে বলা হয়। এই দিন সংখ্যার কথা বিশদে বলছি, মানুষের চোখের একটি স্পন্দনকেও নিমেষ বলা যায়। পনেরো নিমেষে এক কাষ্ঠা। এই কাষ্ঠারই নামান্তর হল লব। পাঁচ লবে এক ক্ষণ। বিশ লবে এক কলা। এই সব সংখ্যা দিয়েই চাঁদ সূর্যের গতি নির্ণয় করা হয়। পনেরো নিমেষে এক কাষ্ঠা। ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা। ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত।

জল দিয়েও এরকম পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। যেমন তেরো পল জল এক প্রস্থ। এর চার প্রস্থে এক নালিক বা এক ঘট। চার আঙ্গুল পরিমাণ চারটে স্বর্ণমাসা দিয়ে কলসীতে ছিদ্র করলে তা

দিয়ে দিন-রাত প্রতি মুহূর্তে দুই নালিক পরিমাণ জল ক্ষরিত হয়। রবির গতি তারতম্য থাকলেও সব ঋতুতে অহোরাত্র ছয়শো দুই কলা কাল নির্দিষ্ট আছে। এটাই মানুষের অহোরাত্র পরিমাণ। ক্ষত্রিয় অহোরাত্রের পরিমাণ ছয়শো দশ কলা। এটাই সাধন মান। এই মানের দ্বাদশ মাসে মানুষদের এক বৎসর হয়। এটাই এক দিব্য অহোরাত্র। এইভাবেই মাস, দিন, ঋতু, অয়ন, বৎসরাদি নির্ণয় হয়।

ব্রাহ্ম দিবসের পরিমাণ দিব্যমানের এক কোটি বিশ লক্ষ নব্বই সহস্রাধিক করা। ঋষিরা একথা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে কাল সংখ্যা বিষয়ক সন্দেহ ভাজনের জন্য জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা মানুষ মান সম্মত সংখ্যা দিয়ে প্রলয় পরিমাণ শুনতে ইচ্ছা করি। ভগবান বায়ু ঋষিদের কথা শুনে সংক্ষেপে বললেন–মানুষ মানের চারশো বত্রিশ কোটি একানব্বই লক্ষ আশি হাজার বছর কালই প্রলয় অবধি ব্রহ্মার দিনমান। মানুষ পরিমাণে এই প্রলয়কাল নির্দিষ্ট হল। প্রলয়ে সাত সূর্য সমুদিত হলে লোক সকল বিলীন হয়ে যায়। জল দিয়ে লোক সকল আপ্লুত হয়। স্থাবর, জঙ্গম, জগৎ নষ্ট হয়ে যায়। সংহার কাজ শেষ হলে প্রজাপতি শান্ত হন। সমস্ত দগ্ধ লোকে অন্ধকারে ঢেকে যায়। এই রাত্রি শুধু সলিলে প্লাবিত। এর অবসানে আবার ব্রাহ্মদিনের সূচনা। এই ভাবে ব্রহ্মার অহোরাত্র পরিবর্তিত হচ্ছে। নিখিল ভূত বিলয় অবধি ব্রহ্মার অহোরাত্র। প্রজাপতি ব্রহ্মার পরমায়ু বিপরার্ধকাল। তিনি এই পরিমাণ কালই অবস্থান করে থাকেন।

প্রলয় বৃত্তান্ত শেষ হল। এটি ব্রাহ্ম নৈমিত্তিক প্রলয় বলে নির্দিষ্ট।

.

শততম অধ্যায়

বায়ু বললেন–যে সব সূক্ষ্মদর্শী ব্রাহ্মণ লোক চরিত্রবান হয়ে যাগযজ্ঞাদির সাথে বিশেষ বিশেষ ধর্মাচারণ করেন, তাঁরা মহর্লোকে দেবতাদের সাথে অবস্থান করেন। আগে যে অতীত অনাগত, ভবিষ্যত কীর্তিমান চোদ্দজন মনুর বিবরণ বলেছি, সেই মনুগণ, ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস, সবাই প্রত্যেক মন্বন্তরে বারবার জন্মগ্রহণ করে থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি মধ্যে যাঁরা শ্রদ্ধাবান সত্যবাদী, দম্ভহীন ভাবে ধর্মাচারণ করেন তারা মহর্লোকে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঋষিরা তখন জিজ্ঞাসা করলেন- হে বায়ু! আপনি যে মহলোকের কথা বললেন– সে কেমন? বায়ু মধুর বাক্যে বললেন–চৌদ্দটি লোক আছে। সেখানে মানবগণ বাস করেন। তার মধ্যে সাতটি কৃত, আর অপর সাতটি অকৃত নামে অভিহিত। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দিব ও

মহঃ এই লোক চতুষ্টয় আণবিক নামে প্রসিদ্ধ। এরা ক্ষয় বুদ্ধিযুক্ত। যেসব লোক ক্ষয় বুদ্ধিহীন, তার উল্লেখ করছি। নৈমিত্তিক লোকসকল প্রলয়কাল পর্যন্ত স্থায়ী। জল, তপ ও সত্য এই তিনটি লোক একান্ত সত্বগুণ বহুল। এদের স্থিতিকাল কল্পান্ত পর্যন্ত। ভূঃ প্রথম, ভূব দ্বিতীয়, স্বলোক তৃতীয়, মহ চতুর্থ, জন পঞ্চম, তপঃ ষষ্ঠ, সত্য সপ্তম। এর পর নিরালোক। ভূর্লোক পার্থিব, ভূব অন্তরীক্ষ এবং স্বলোকেই স্বর্গলোক। পুরাণশাস্ত্রে এটাই নির্ণীত আছে। অগ্নি ভূতের অর্থাৎ ভূলোকের অধিপতি বলে ভূতপতি নামে, বায়ু ভূবলোকের অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোকের অধিপতি বলে ভূস্পতি এবং সূর্য ভব্যের অর্থাৎ স্বর্গলোকের অধিপতি বলে দিবস্পতি নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মা, মহঃশব্দ উচ্চারণ করা মাত্র মহর্লোকের উৎপত্তি হয়েছিল। দেবগণের অধিকার কাল শেষ হলে তারা সেই মহর্লোকে গিয়ে অবস্থান করেন।

জনলোকে পঞ্চমলোক, তা থেকেই জনগণের প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। কল্পান্তকালে লোক সকল দগ্ধ হয়ে গেলে তারা তপলোকে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। ঋভু ও সনৎ কুমারাদি তপঃ উর্ধরেতাগণ ঐ জায়গাতে বাস করেন বলে এটি তপঃলোক নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ব্রহ্মলোক সত্য নামে পরিচিত, ঐ সত্যলোক হল সপ্তম লোক দেবগণ সবাই স্বর্গলোকবাসী। সর্প, ভূত, পিশাচ, নাগ, মানুষাদি ভূতলবাসী, রুদ্র, সাতরস্বা মরুদগণ ও অশ্বিনী কুমারদ্বয় নিকেতহীন, কিন্তু এরা ভূবলোকে বাস করে থাকেন। আদিত্য, ঋভু, সাধ্য ও অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষি এবং পিতৃগণ এরা ভূর্বলোকেই বাস করেন। শুক্র থেকে চাক্ষুষ পর্যন্ত মনুগণ, যাঁরা একবার ভূবলোকে বাস করেছেন তারাও মহলোকে গিয়ে অবস্থান করেন।

সাবর্ণ ইত্যাদি চোদ্দ মন্বন্তরে পুনরাবৃত্তি তপঃলোক থেকেই হয়ে থাকে। সত্যলোক সপ্তম লোক, এরই অন্য নাম ব্রহ্মলোক, এর বিনাশ হয় না। সেখানকার অধিবাসীদের পুনরাবৃত্তি হয় না। ভূর্লোক থেকে সূর্য পর্যন্ত ভূবলোক। সূর্য থেকে ধ্রুব স্বর্গলোক। ধ্রুব থেকে জনলোক পর্যন্ত ভূর্লোকবাসীরা রসাত্মক ও অন্নভোজী। ভূবলোকবাসীরা সোমপায়ী। স্বর্গলোকবাসীরা অদ্যপায়ী। এই দেবতারা যজ্ঞ দিয়ে পরস্পর যাজন করে থাকেন। সপ্তবিধ দেবতা দেববংশেই জন্মগ্রহণ করে থাকেন। চাররকম দেবতা অতীত হয়েছেন। বিবিধ দেবতা অবশিষ্ট আছেন। এঁরাও দশবার জন্ম মরণ দশা পেয়ে, সুষ্ঠভাবে সেই জনলোক ত্যাগ করে বৈরাজ ধামে গমন করেন। যেখানে দশক অবধি বাস করে সেখান থেকে পূর্ব ক্রমে ব্রহ্মলোকে যান।

মুনিরা এরপরে বৈরাজ লোকবাসীদের জীবনযাত্রা বিষয়ে জানতে চান। সূত বললেন– পরিশুদ্ধতম জনলোকবাসীরা বৈরাজলোকে গিয়ে দশকল্প যাবৎ সেখানে বাস করে থাকেন। এঁরা সকলেই জ্ঞানী, সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছমূর্তি। সেখানে শুদ্ধবুদ্ধি সম্পন্ন সনৎ কুমারাদি সিদ্ধগণ

দশকল্প শেষ হলে বৈরাজ ধাম পরিত্যাগ করে উৎসুক হয়ে পরস্পর বলেন, আমরা ব্রহ্মলোক আশ্রয় করলে আমাদের কুশল হবে। এই বলে সেই মহাত্মারা আত্মা দিয়ে ব্রহ্মের মধ্যে লীন হয়ে যান। এঁরা ব্রহ্মানন্দ নিমগ্ন হয়ে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। বৈরাজলোক থেকে ব্রহ্মলোক ছ'গুণ উর্ধ্বে অবস্থিত। সেখানকার অধিবাসীরা সকলেই শুদ্ধ, বুদ্ধ, পরম তপস্বী, তাদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি নেই। এই সমস্ত জ্ঞানী, ব্রহ্মলোকবাসীরা ব্রহ্মার সাথে অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হন।

উর্দ্ধরেতা দেবর্ষিগণ, কর্মযোগের চরম সাধন করে পাপ শরীর ত্যাগ করে অমৃত লাভে সক্ষম হন। যারা সংসার বিরাগী, মোহহীন, সত্যবাদী, শান্ত, দয়াবান, জিতেন্দ্রিয়, নিঃসঙ্গ, শুচি তারাই ব্রহ্মলাভ করেন। ঋষিরা তখন জিজ্ঞাসা করলেন –পরাধ কাকে বলে? তারপরই বা কি? আমরা জানতে চাই। সূত বললেন–আপনারা আমার কাছে পরাধ ও পরের পরিসংখ্যা শুনুন। দশ হাজার এক অযুত, শত সহস্র এক নিযুত, দশ নিযুতে এক কোটি, দশ কোটিতে এক অর্বুদ।

শতকোটিতে এক পদ্ম, সহস্র কোটিতে এক খর্ব, দশ হাজার কোটিতে এক নিখর্ব, শত কোটি সহস্রে এক শঙ্কু এবং সহস্র সহস্র কোটিকে দশ গুণ করলে তাকে সংখ্যাতত্ত্বজ্ঞ মনীষীরা সমুদ্রল সংজ্ঞায় অভিহিত করে থাকেন। সহস্রাযুত কোটিতে এর মধ্যে, সহস্র নিযুত কোটিতে এক অন্ত। সহস্র কোটি কোটিতে এক পরার্ধ এবং দুই পরার্ধে এক পরসংখ্যা নির্ণয় করা হয়। শত সংখ্যাকে পরিদৃঢ় ও সহস্র সংখ্যাকে পরিপদ্মক বলে। অযুত, নিযুত, প্রযুত, অবুদ, নির্বুদ, খর্ব, নিখর্ব, শঙ্কু, পদ্ম, সমুদ্র, মধ্যম, পরার্থ, পর ইত্যাদি মিলে আঠারোটি সংখ্যা।

এই আঠারোটি সংখ্যা পরস্পর গুণিত হয়ে শত শত সংখ্যায় পরিণত হয়। কল্পকালের পরিমাণ সংখ্যা, সৃষ্টি, প্রবৃত্তি কাল থেকে এক পরাধ। এর পরেও এক পরার্ধকাল সৃষ্টি রহিত অবস্থায় যায়। তার থেকে আবার সৃষ্টি শুরু হয়ে থাকে। সুতরাং এক সৃষ্টি থেকে আরেক সৃষ্টি পর্যন্ত কাল এক পরপদ বাচ্য। ব্রহ্মাই একমাত্র স্থিত, এই জন্য সমস্ত জাগতিক পদার্থের মধ্যে সেই ব্রহ্মকে পরপদে অভিহিত করা যায়। তার অর্ধকেই পরিধি বলে। পুরুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্মা এঁরা সংখ্যা দ্বারা গণনার অতীত।

পরার্ধ, পর, ব্রহ্ম, প্রকৃতি ও পুরুষ এই পঞ্চ তত্ত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বিধান নেই। দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন যোগীরাই এই সব তত্ত্ব নির্ণয় করতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্মা এই সমস্ত তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে ব্রহ্মা সেই সমস্তই দর্শন করে থাকেন। ব্রহ্মবাদী ঋষিরা বললেন–ব্রহ্মলোক যতদূর অন্তরে অবস্থিত, এর অন্তর পরিমাণ যত ক্রোশ এবং যেভাবে পরিমাণ করা যায়

ইত্যাদি বিষয়ে বলুন। বায়ু বললেন–এই আমি আপনাদের অন্যান্য বিবষিত বিষয় বলছি, অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত ভাগ অতি মহতত্ত্ব স্থূল বলেই বিভাবিত। মহৎ থেকে ভূতাদি দশ ভাগ স্থূল, এরচেয়ে পরমাণু দশভাগ বেশি, এই পরমাণু অতি সূক্ষ্ম, এটি অনুভব দ্বারাই গ্রাহ্য। কিন্তু চোখ দিয়ে দেখা যায় না। জগতে যা কিছু ভেদ করা যায় না তাই পরমাণু বলে খ্যাত। সূর্য রশ্মির মধ্যে সূক্ষ্ম রজঃকণা দেখা যায়, তাই পরমাণু।

অষ্ট পরমাণুর যে সমবায়, তার নাম এসরেণু, এটি পদ্মরজঃ বলে নির্দিষ্ট, আট এসরেণু দিয়ে এক রথরেণু পরিকল্পনা করা হয়। আট এসরেণু সমবায়কে বুধগণ বলাগ্র নামে নির্দেশ করে। আট বলাগ্রে এক লিক্ষা এবং অষ্ট লিক্ষায় এক যুগ। যুগকাষ্ঠককে এক যব বলে ধরা হয়। আট যব এক অঙ্গুলি বলে কথিত। বারো আঙ্গুল পর্বকে এক বিতস্তি বলা হয়। একুশ অঙ্গুলি পর্বে এক রত্নি হয়ে থাকে। চব্বিশ অঙ্গুলিতে এক হাত পরিমাণ নির্দিষ্ট, বিয়াল্লিশ অঙ্গুলিতে এক কিঙ্কু পরিমাণ হয়। মনীষীরা ছিয়ানব্বই অঙ্গুলিতে এক ধনুঃপরিমাণ নির্দেশ করেন। এই ধনুঃ পরিমাণ এক গদ্যুতি সংখ্যায় নির্দেশ করে।

ধনু, দণ্ড, যুগ ও নালী এসবই অঙ্গুলির মানের সাথে তুলনীয়। তিনশো ধনুতে এক নম্ব হয়। দু হাজার ধনুতে এক গচ্যুতি। আট হাজার ধনু এক যোজন। এভাবে ধনু দ্বারা যোজন নিরূপণ করা হল। এই যোজনা দিয়েই ব্রহ্মাস্থানের ব্যবধান বলাই।

মহীতল থেকে এক লক্ষ যোজন উপরে দিবাকর। দিবাকর থেকে শত সহস্র যোজন উর্ধে নিশাকর, নিশাকর থেকে শত সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে সমস্ত নক্ষত্র মণ্ডল প্রকাশ পেয়ে থাকে। মেরু মণ্ডল তারও দুলক্ষ যোজন ওপরে। নক্ষত্রমণ্ডল থেকে এক একটি গ্রহ পরস্পর পরস্পর অপেক্ষা উর্ধভাগে অবস্থিত। সমস্ত তারা গ্রহের নিচের ভাগে বুধ গ্রহ বিচরণ করে। তার উপরে শুক্র, তার উপরে মঙ্গল, তার উপরে বৃহস্পতি, বৃহস্পতির উপরে শনৈশ্চর বিচরণ করেন। এর থেকে লক্ষ্য যোজন ওপরে সমস্ত সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে এক লক্ষ যোজন ঊর্ধ্বে।

যোজন পরিমাণ দিয়ে ত্রৈলোক্যের মান বলা হয়। এই ত্রৈলোক্যই প্রতি মন্বন্তরে দেবতাদের এবং বর্ণাশ্রমবাসীদের লৌকিক যাগযজ্ঞ প্রবর্তিত হয়ে থাকে। ধ্রুবলোক থেকে মহর্লোক এক কোটি যোজন ঊর্ধ্বে অবস্থিত। আর দু কোটি যোজন ঊর্ধ্বে জনলোক অবস্থিত। এখানে কল্পবাসী ব্রহ্মপুত্র দক্ষ প্রভৃতি সাধু সম্প্রদায় আছেন। এই লোক থেকে চারগুণ ওপরে তপঃলোক রয়েছে। এখানে বৈরাজ নামে দেবতারা রয়েছেন। এঁরা সব সময়ই শান্তিময়, এঁদের ক্লেশ নেই।

তপঃলোকের দু-গুণ ওপরে সত্য লোক রয়েছে। যাঁদের জরা, মরণ বা জন্ম নেই। এ লোকে যাঁদের বাস, এই লোককেই ব্রহ্মলোক বলে। ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তি একবার এখানে এলে আর এই জায়গা থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য কোথাও যান না। ব্রহ্মলোক থেকে অন্যের ঊর্ধ্বভাগের পরিমাণ চার কোটি পঁয়ষট্টি নিযুত যোজন। এই অংশের অধোভাগেই ধ্রুবের অবস্থান।

এবারে অধোগত ভূতবৃন্দের বাসস্থানের কথা বলছি শুনুন। কুরকর্মা প্রাণীরাই নিজ নিজ কর্মফলে ঐ সব জায়গায় গিয়ে থাকে। রৌরব, রোধ, শূকর, তাল, তপ্তকুণ্ড, মহাজ্বাল, বিমোচন, কৃমি, কৃমিভক্ষ রুধিরান্ধ, তমঃ লোহ, অসিজ ইত্যাদি তমসাচ্ছন্ন নরকগুলি যমের অধিকারে থাকে। যারা পাপ কাজ করে তারা কর্মফলের জন্য নরকে যায়। সমস্ত নরকই ভূমির নীচে রয়েছে। কুটসাক্ষী, মিথ্যাবাদী, একপক্ষবাদী নর রৌরব নরকে যায়। এইভাবে গো, প্রাণঘাতী ব্যক্তি রোধ নরকে, ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, স্বর্ণচোর ব্যক্তি শূকর নরকে যায়। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যঘাতী ব্যক্তি তাল নরকে, ভগিনীগামী ও রাজঘাতী ব্যক্তি তপ্ত কুম্ভে, গুরুজনের অবমাননাকারী, গুরুকে কটু কথায় আঘাতকারী ব্যক্তি শাবল নরকে যায়।

এইভাবে ভূমির নীচে সপ্ত নরকের বর্ণনা আছে। অধম থেকে ঐ সব নরকের উৎপত্তি, প্রথমে রৌরব নরক, এটি ওপরে দারুণ ঠান্ডা ও নীচে ভীষণ গরম, এর নীচে তমো নামে ভীষণ নরক আছে তা প্রবল ঠান্ডা, সেখানে সব বিষধর সাপ আছে, অধীচি নরকে যন্ত্র দ্বারা পীড়ন করা হয়। লৌহ নরক তো এর থেকেও ভীষণ অবিধেয় নরক যা অদৃশ্য অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু এখানে পীড়ন ও বধ চলে। নরক ভোগের শেষে কর্মসূত্রে আবদ্ধ জীবরা আবার কর্ম অনুসারেই জন্মগ্রহণ করে। আবার সেই নরকে গিয়ে উকট দুঃখ ভোগ করে। কর্মক্ষয়ে দেবগণকেও নরকবাসী হতে হয়। এভাবে নিজ নিজ কর্মফলে জীবগণের উধ্বগতি বা অধোগতি হয়ে থাকে।

এরপর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণরা আবার বায়ুকে জিজ্ঞাসা করলেন–লোকালোকবাসী নিখিল ভূত বৃন্দের মধ্যে যে সব প্রাণী এ সংসারে বিচরণ করে তাদের কথা বলুন। এই শুনে বায়ু বললেন–প্রাণীপ্রবাহ, অনাদি, অনন্ত, এদের গণনা হওয়া সম্ভব নয়। তবে ব্রহ্মা সংখ্যা পূর্বক যেরূপ নির্দেশ করেছেন তা শুনুন। স্থাবরদের যে সহস্রতম ভাগ, সেই সংখ্যক পার্থিব কৃমি এদের থেকেই উৎপন্ন। এই কৃমিদের সহস্রতম ভাগই জলীয় প্রাণীগণ। জলীয় প্রাণীদের সহস্রভাগে লৌকিক বিহঙ্গগণ, বিহঙ্গধর্মদের সহস্র ভাগে দ্বিপদগণ, দ্বিপদের সহস্রতম ভাগে ধার্মিকগণ, ধার্মিকদের সহস্রতম ভাগে স্বর্গীয় ধার্মিকগণ ও স্বর্গীয় ধার্মিকদের সহস্রতম ভাগে মুক্ত পুরুষগণ।

যে সব পাপাচারী দুরাত্মাগণের মৃত্যু হয় তারা রৌরব নামে তামস নরকে পড়ে উৎকট ও প্রচণ্ড গরম অবস্থা ভোগ করে। স্বয়ম্ভু এরকম বর্ণনাই দিয়েছেন। ঋষিগণ বললেন–মহ, জন, তপঃ ও সত্য এই সব ভূত, ভাবী ও বর্তমান লোক আপনি পরপর বলেছেন। এবার লোকান্তর কি রকম আমাদের কাছে বলুন। বায়ু বললেন–মনীষীরা তর্ক দ্বারা, যোগীগণ যোগ দ্বারা প্রত্যক্ষ করে এবং কর্মীগণ তপস্যাবলে এই তত্ত্ব জেনে থাকেন। ঋভু, সনৎকুমারাদি শুদ্ধ বুদ্ধি, লোকহীন বিরজক, বুদ্ধ, মহর্ষিগণ, সাধুগণ, সেই ঈশ্বর ধাম প্রত্যক্ষ করেছেন।

জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, ধৈর্য ইত্যাদি দশটি গুণ মঙ্গলময় পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত। এই পরমেশ্বরের পরমস্থান পরিমাণ রহিত। চিরস্থির, সুখ দুঃখাদি বৈষয়িক সম্পর্কহীন, মায়াময় সৎস্বরূপ। এটি সমগ্র সৃষ্টির মূল স্থান। মায়াময় মহেশ্বর নিজ মায়া দিয়েই তা নির্মাণ করেছেন। ভূর্লোক থেকে ব্রহ্মলোক, তেরো কোটি পনেরো নিযুত যোজন অন্তরে রয়েছে। ব্রহ্মলোক থেকে এক কোটি পঞ্চাশ নিযুত যোজন ব্যবধানে রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ, উধ্বর্ভাগের সীমা ঐ পর্যন্ত। এরপর আর গতি নেই। সেই অগম্য প্রদেশ নিত্য, অসংখ্য পরস্পর গুণাশ্রয়ী সূক্ষ্ম। তা থেকেই জগকর্তা ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হয়েছেন। তিনি প্রাদুর্ভাব, তিরোভাব, স্থিতি, বিধি, দয়া ইত্যাদির মূল আশ্রয়। তিনি নিজেই প্রকাশিত, যে হিরন্ময় অন্তর্জগৎ সৃষ্টির মূলে তা ঈশ্বর থেকে প্রাদুর্ভূত। ঈশ্বর থেকেই বীজ বিভাগ হয়ে থাকে, ক্ষেত্রজ্ঞই সেই বীজ, প্রকৃতিকে যোনি বলা হয়। মহাত্মা বিভু, লোক সৃষ্টি ও লোক সংস্থানের জন্য প্রকৃতি সহযোগে আত্ম তনু দিয়ে ব্রহ্মলোক ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মলোকের ওপরে আর ব্রহ্মকটাহের নীচের ভাগে একটি সুন্দর পুরী আছে। ঐ পুরীর নাম শিব। ঐ পুরী শত সহস্র যোজন আয়ত, এটি অভ্যন্তরে মহীমণ্ডল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। ঐ পুরীতে তেজোদীপ্ত সূর্যের মতো উজ্জ্বল সোনার মহাপ্রকার আছে। ঐ স্বর্গীয় পুরী ঘণ্টার শব্দে মুখরিত। ঐ জায়গায় জরা-মৃত্যু নেই। ভগবান বৃষধ্বজ ঐ পুরীর অধিস্বামী।

ঐ সুন্দর প্রাসাদ মনের কল্পনার মতোই যেন সাজানো। এখানে রত্নময় বালুকা রয়েছে। চারিদিকে সুগন্ধ যুক্ত ফুল ফুটে রয়েছে। সেগুলি নানা রঙের, এখানে সাতটি মহানদী আছে। এদের নাম হল-বরা, বরেণ্যা, বরদা, বরাহগা, বরবর্ণিনী, বরমা, বরভদ্রা। ঈশ্বরের এই সুন্দর পুরীর কথা কেউই জানেন না। তবে যাঁরা একান্তই ধ্যাননিষ্ঠ, যোগসম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয় তারাই মহাত্মা বৃষধ্বজের এই প্রাসাদ দর্শন করতে পারেন। এই সুমহান প্রাসাদ স্বীয় তেজে দীপ্যমান, রত্নরাজি দিয়ে সুসজ্জিত। প্রাসাদের মধ্যে ত্র্যম্বকের আবাসে লক্ষ্মী, স্ত্রী, বপুঃ মায়া, কীর্তি শোভা ও সরস্বতী প্রভৃতি রূপবতী দেবীরা নিজের আত্মাকে শত কোটি অংশে বিভক্ত করে নিরলসভাবে নিরন্তর সেই ভগবান মহাত্মা মহাদেবকে তুষ্ট করছেন। সুন্দরী দেবীদের

অসংখ্য পরিচারিকা আছে। তারা কেউ কেউ সুভগা, চারুলোচনা, সুন্দরী গজানো, লোহিতনেত্রা। দশবাহুধারী ভগবান মহাদেব নন্দী ইত্যাদি প্রমথগণ, রুদ্রগণের সঙ্গে তিনি বিহার করে থাকেন। রুদ্রগণ সকলেই মহাদেবের মতো উদার ও পরাক্রমশালী। এদের দেখতে ভীষণাকৃতি, এঁরা এক মনে মহাদেবের পূজায় নিরত। তার হাতে দশবর্ণ নামে বিচিত্র ধনু আছে। তাঁর হাতে ত্রিশূলও আছে। তিনি তেজে কান্তিচ্ছটায় অগ্নিশিখার মতোই প্রজ্জ্বলিত। এই মহাত্মা দেবেশের সামনে একটি অতি সুন্দর, মনোহর সোনার তৈরী জলপূর্ণ কমণ্ডলু আছে। চতুর্ভূজাঃ বিজয়া দেবী শ্রীযুক্তা হয়ে শোভা বর্ধন করে মহাদেবের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। বিজয়ার পরনে পাণ্ডুর বসন, অঙ্গে অসি লতা জড়ানো ও বক্ষে বিরাট মুক্তার মালা দুলছে। তার পিছনে অনেক অপ্সরা ও রমণী বিরাজমান। এছাড়া তার পুত্র ময়ূর বাহন সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

যেসব রাজা সোনা দান করেছেন, যেসব ব্রাহ্মণ সংযমী, গৃহধর্মাচারী ও যাঁরা ব্রহ্মবাদী যাঁরা সাত্ত্বিক তপঃসম্পন্ন তারাই এই শিবপুরে দেবাদিদেবের সভাষদ। বারবার মন্বন্তর হওয়া সত্ত্বেও শিবের সভা একই রকম আছে। এবার সেই দেব দেবের সম্বন্ধে অবক্ষয় ঘটনা বলছি। সোনার আভাযুক্ত, প্রচণ্ড গতিশালী কতগুলি বাঘ তাঁর অনুগামী। এদের এই দেবই নির্মাণ করেছেন। এরা যমেরও দর্প হরণকারী। মহাদেবের এই প্রাসাদের স্তম্ভগুলি তার মায়ায় নির্মিত। এক হাজার সিংহ অগ্নিময় পাশ দিয়ে শৃঙ্খলিত করা আছে। সিংহগুলি রূপে তেজে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ত্র্যম্বকের ভবনে এরা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে বাস করছে। এই সিংহগুলি হল মহাত্মা ঈশ্বরের ক্রোধস্বরূপ। তিনি পুরাকালে নিজ দেহ থেকে ক্রোধ রাশিকে সিংহাকারে রূপ দিয়ে অগ্নিময় জালে আবদ্ধ রেখেছেন।

যজ্ঞভাগের জন্য দক্ষের সঙ্গে ঈশ্বরের বিরোধ ঘটেছিল। সেই সময় ঈশ্বরের আদেশে এই সহস্র সিংহের কোনও একটা সিংহকে বন্ধনমুক্ত করা হয়। সেই সিংহ দক্ষের সেই প্রসিদ্ধ যজ্ঞ ধ্বংস করেছিল। ঐ ভবপুরবাসী পুরুষেরা সকলেই বৈশ্বানরমুখ বিশ্বরূপী, কপর্দী, নীলকণ্ঠ। শিবগ্রীব, ত্রিলোচন, জটামুকুটমালী পিনাকধারী মুক্তাহার মণ্ডিত, দেবগণাপেক্ষা সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী। এঁরা আত্মাকে বহুধা বিভক্ত করে অজর ও অমর ভাবে নানা সুদুর্লভ ভোগরাশি উপভোগ করে নানা ভাবে খেলা করছেন। তাদের গতি স্বেচ্ছামত। তারা স্বয়ংসিদ্ধ, মহাত্মাগণই এগারো কোটি রুদ্র। এইসব মহাত্মা রুদ্রদের নিয়ে ভগবান মহেশ্বর সেই পুরীতে বিহার করেন। তবে তারা এক এবং অভিন্ন বায়ু এইভাবেই বর্ণনা করেছিলেন। ঋষিরা তখন বায়ুকে বললেন– আপনার সমস্ত বর্ণনা শুনে আমরা তৃপ্ত হয়েছি। এবার আমাদের সেই মহাদেবের পারিপার্শ্বিক আদিত্যগণ, ক্রোধবিক্রম সিংহগণ, বৈশ্বানরগণ, ভূতগণ ও অনুগামী ব্যাঘ্রগণ-ভীষণ

প্রলয়কালে কোন অবস্থায় অবস্থিত হয় তা, আমাদের কাছে। যথাযথ প্রকাশ করে বলুন। বায়ু বললেন–আমি সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদির কথা বলেছি, এবার অন্য যাঁরা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছেন তাদের পরমতত্ত্ব এখন ব্যাখ্যা করছি।

ব্রহ্মানন্দন, সনক, সনন্দ, সনাতন, বেছু, কপিল, আসুর ও মহাযশামুনি পঞ্চশিখ, এছাড়া অন্যান্য আরও অনেকে সেই আদি কারণ অব্যক্ত ঈশ্বর সত্তা জেনে আগেই পরম গতি পেয়েছেন। তারপর বহুকাল অতীত হলে কল্পাবসানে মহাভূত সমূহের বিনাশ করে যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন ঐ অনেক কোটি রুদ্র সত্যাবলম্বনে জ্ঞানময় তেজে আত্মভাবের উপলব্ধি করেন। এঁদের প্রতি মহেশ্বরী প্রসন্না হন। এঁরা পরমাণুস্বরূপ মহেশ্বরকে পেয়ে ভীষণ জন্ম-মৃত্যুর সংসার নদী উত্তীর্ণ হন। সেই যে সিংহ, আদিত্য, ভূত, ভব্য, অনুগামী বাঘেদের কথা বলেছি, ভগবান ভবদের সৃষ্টি প্রলয়ে বিষ্ণুর সাথে মিলিত ভাবে সৃষ্টি ও সংহার করেন। সংহার কালেই তার রুদ্রমূর্তি দেখা যায়। এই রুদ্রই সামময় ও যজুর্ময়। হে দ্বিজ! তিনি একমাত্র জগতের নাথ, অনাদি নিধন ভগবান। একথা শোনার পর সেই দ্যুতি সম্পন্ন ঋষিরা নিজ নিজ আশ্রমে স্বীয় আত্মায় মহেশ্বরকে ধ্যান করতে লাগলেন। তারা ভক্তিযোগে রুদ্রদেবের শরণাপন্ন হয়ে রুদ্রসালোক্য লাভ করলেন। অমদ্যপাদী, জিতেন্দ্রিয় শূদ্রও যদি ভবে ভক্তি যুক্ত হয়, তবে তারও প্রলয় পর্যন্ত পরমায়ু হয়। আর যদি কোনো মদ্যপ যদি ভক্ত হয়, তবে সে মদ্যপায়ী প্রমথদের সঙ্গে বিহার করে থাকে। এই মহাদেবই মর্তবাসীর দ্বারা পূজিত হয়ে বরদান করে থাকেন।

একশো একতম অধ্যায়

সূত বললেন–পরমপুরুষ স্বয়ম্ভুর প্রত্যাহার বর্ণনা করছি। কল্প শেষ হওয়ার সামান্য সময় অবশিষ্ট থাকতে থাকতেই ঈশ্বর সৃষ্টি প্রত্যাহার করতে আরম্ভ করেন। দ্রুম নামে অন্তিম মনুর অধিকালের শেষে কলিযুগের শেষভাগে জগতে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন ব্রহ্মার সৃষ্ট জগৎ ক্ষয় পেয়ে অদৃশ্য হতে থাকে। এভাবে জগতের সংহার আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ জল সকল ভূমির সন্ধাত্মক গুণ গ্রাস করে ফেলে, তাতে ভূমি জলের মধ্যে লীন হয়ে যায়। তখন আর পৃথিবীর উপলব্ধি থাকে না। কেবলমাত্র জলেরই উপলব্ধি হয়। সর্বজগৎ পূর্ণ করে অনন্ত বিস্তৃত সেই জলরাশি মহাশব্দে মহাবেগে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে থাকে। তারপর জলের রস তেজের মধ্যে মিশে যায়। সেই তেজরাশি বায়ুর মধ্যে মিশে গেলে সব কিছু আলোকহীন হয়ে পড়ে। তখন শুধুমাত্র বায়ুকেই উপলব্ধি করা যায়। আকাশের ওপরে-নিচে-পাশে সব জায়গায় কেবল বায়ুর সঞ্চারণই অনুভূত হয়।

এরপর আকাশ বায়ু গুণকে গ্রাস করে। তাতে বায়ু শান্ত হয়ে যায়। তখন শব্দযুক্ত আকাশ সমস্ত কিছু ঢেকে দেয়। পরে ভূতাদি তামস অহঙ্কারতত্ত্ব আকাশের শব্দগুণকে গ্রাস করে। তখন আকাশের উপলব্ধিও থাকে না। কেবল ভূতেন্দ্রিয়ময় অভিমাত্রিক ভূতাদি তামস অহঙ্কারই প্রকাশিত থাকে। এরপর তাকে গ্রাস করে বুদ্ধিরূপী মহৎ তত্ত্ব। এই মহৎ তত্ত্বাদিই হল আত্মা। যাকে বুদ্ধি, মন, লিঙ্গ, মহান ও অক্ষর প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করে থাকেন। নাম বা বুদ্ধির অভাব হেতু তখনকার সেই অবস্থা জ্ঞাণীগণেরও উপলব্ধির বিষয় হয় না। তবুও চিত্তবৃত্তির কারণেই উপলব্ধি করা যায়। নিজ মদমদাত্মক পরম কারণেই অব্যক্তকারে অবস্থান করেন। এইভাবে প্রত্যাহার সময়ে সাত রকম প্রাকৃত পদার্থের একে অপরের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটে। সপ্তদ্বীপ, গিরি, সমুদ্র সম্বন্বিত সপ্ত লো◌েকাত্মক ব্রহ্মাণ্ড জলের মধ্যে বিলীন অবস্থায় থাকে। এইভাবে জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, ভূতাদি অহঙ্কারত্ব, অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যায়। তারপর এই প্রাকৃত গুণগুলির সমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত প্রকৃতিকেই ক্ষেত্র বলা যায়। ব্রহ্মকেই ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে অভিহিত করা হয়। সকল সৃষ্টিতেই ক্ষেত্রজ্ঞদের আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখা যায়। যারা আলাদা ভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব জানেন, তাদের ব্রহ্মবিদ বলা যায়। ব্রহ্মই বিষয় এবং অব্যক্তই অবিষয়। প্রত্যেক শরীরে সুখ-দুঃখ ইত্যাদির আলাদাভাবে উপলব্ধি ঘটে। প্রকৃতিবশে যখন এই ভেদ প্রবৃত্তির সংযম ঘটে তখন কালাত্মক দ্বারা স্বয়ম্ভর স্থিতিবুদ্ধি বিনিবৃত হয়। তখন ব্রহ্মলোকবাসী সকলেই বৈরাগ্যযুক্ত হন। সুতরাং তাঁদের আত্ম অহঙ্কার বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাতে সেই ক্ষেত্রজ্ঞরা শুদ্ধ নিরঞ্জন রূপে প্রকৃতিতেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন। তাঁদের আর জন্মের পুনরাবৃত্তি হয় না। ধর্ম, অধর্ম, তপ, জ্ঞান, শুভ, অশুভ, সত্য, মিথ্যা, ঊর্ধ্বভাব, অধোভাব, সুখ দুঃখ ইত্যাদি জ্ঞানীদের যা কিছু শুভাশুভ এবং পুণ্য-পাপ ইত্যাদি প্রকৃতিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। আবার সৃষ্টির উৎপত্তির দেহীদের দেহধারণের সাথে সাথে সংযুক্ত হয়।

গুণমাত্রাত্মক বৃত্তিগুলি রাজসী, তামসী ও সাত্ত্বিকী– এই তিনভাবে প্রবর্তিত হয়ে থাকে। ঊর্ধ্বভাগ দেবাত্মক সত্ত্ব গুণাত্মক, অধোভাগ জড়াত্মক তমঃ গুণাত্মক এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী, ইহলোক প্রাপক রজোগুণাত্মক বলা যায়। ত্রিলোকের সর্বভূতের মধ্যে এই তিনটি গুণ পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই জ্ঞানবান ব্যক্তির ক্ষেত্রে গুণগুলি বর্জনীয়। মানুষেরা পাপ গতি লাভ করে। প্রাণীগণ তমোগুণে অভিভূত হয়ে যথার্থ তত্ত্ব জানতে পারে না। সেই জন্যই তিনরকম কাজে আবদ্ধ থাকে। প্রথম প্রকৃত বন্ধন, দ্বিতীয় বৈকারিক বন্ধন, তৃতীয় দক্ষিণাত্মক বন্ধন–এই তিন বন্ধনে প্রাণীগণ আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যারা রাগ-দ্বেষের অতীত, তারাই জ্ঞানী এবং তাঁদের সেই জ্ঞানই জ্ঞানপদবাচ্য। তমোগুণ হল অজ্ঞানতাজনক এবং রজোগুণ নানা কাজের

উৎপাদক। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক– এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কারণে দুঃখময় কাজগুলির উৎপত্তি হয়।

এবার আমি প্রাণীদের মোহ উৎপাদক রাগের কথা বলছি। এই রাগের প্রভাবেই প্রাণীরা বিষয়াসক্ত হয়ে পড়ে। কামনাজনিত দ্রব্যে বাধা পেলে দুঃখ জন্মায়। এই আধি ভৌতিক সংসারে এই অনুরাগের ফলেই জীবের উৎপত্তি ঘটে। অজ্ঞানতা থেকেই অনুরাগের উৎপত্তি। সুতরাং এই অজ্ঞানতাকেই ত্যাগ করা উচিত। এই অজ্ঞান পথ অস্থির ও তির্যক যোনিরও কারণ। আবার তির্যক যোনি থেকে অন্যান্য যন্ত্রণার কারণ ঘটে। জীব সেই অজ্ঞানতা যাতনাস্থান ও ষোলো রকম তির্যক যোনি পেয়ে নানা দুঃখবশতঃ যন্ত্রণাভোগ করে। চিত্ত সত্তমাত্রাত্বক, তত্ত্ব বিচার দিয়ে সত্ত্বের স্ফুরণ হয়। তার ফলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই জ্ঞানপদবাচ্য। এই জ্ঞান থেকেই যোগোৎপত্তি ঘটে। ফলে চিত্তের সত্ত্ব তারতম্যের জন্য সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি ঘটে। মুক্ত হলে লিঙ্গ শরীরের বিনাশ ঘটে থাকে।

তত্ত্বদর্শীরা মোক্ষকে তিন প্রকারের বলে বর্ণনা করেন। জ্ঞান প্রভাবে বিষয় বিয়োগের জন্য একপ্রকার মোক্ষ হয়। তার ফলে রাগ ক্ষয় হেতু লিঙ্গাভাব, সেজন্য কেবল তত্ত্ব নিরঞ্জন তত্ত্ব লিঙ্গাভাব, সেজন্য শুদ্ধত্ব এবং তা থেকে নিষ্ক্রিয়তা জন্মে। এই মোক্ষ দ্বিতীয় প্রকার আর তৃষ্ণাক্ষয়ের জন্য যে মোক্ষ তাই তৃতীয় প্রকার বলে বিখ্যাত। এরপর দোষ দর্শন হেতু বৈরাগ্যের বিবরণ বলছি। দিব্য ও মানুষ পাঁচরকম বিষয়গুলিতে দোষ দেখে অনাসক্তি, অবিদ্বেষ অবলম্বন করা উচিত। দেহীদের বৈরাগ্য অবলম্বন করা উচিত। সংসার অনিত্য, অমঙ্গলদায়ক ও দুঃখময় তা বিবেচনা করে বিশুদ্ধ কাজ করা উচিত। এরূপ করলে সমস্ত প্রাণী তার বশীভূত হয়।

তৃষ্ণাক্ষয় তৃতীয় মোক্ষকারণ বলে বিখ্যাত। দোষ হেতু পাঁচ রকম শব্দাদি বিষয় দ্বেষাভাব, অনাসক্তি আর সেই বিষয়ে প্রীতি ও অপ্রীতি বর্জন এটি বৈরাগ্যের কারণ বলে বিবেচিত। তাঁরা যে বর্ণাচারণ করেন তাই দেবত্ব লাভের কারণ। ব্রহ্মা থেকে পিশাচ পর্যন্ত আট রকম দেব সৃষ্টি। অনিমাদি আট রকম ঐশ্বর্য, এই আট রকম সৃষ্টিভেদের হেতু। বর্ষাকালে আকাশ মণ্ডলে মেঘের মধ্যে ধোঁয়া চক্ষুতে দেখা গেলেও যেমন প্রত্যক্ষ হয় সেরকম জীবের দ্বারা প্রত্যক্ষ না হলেও সিদ্ধরা দিব্যচোখে দেখেন।

জীব, প্রাণ, লিঙ্গ, কারণ প্রভৃতি পর্যায়ে বাচক শব্দে সেই জীবেরই উল্লেখ হয়ে থাকে। সেই জীবই সমগ্র পরিব্যাপ্ত। জাগতিক পদার্থ সমূহ তত্ত্বজ্ঞান হয়ে দেহ পাতান্তে জীব যথেচ্ছ

স্বাধীনভাবে বহির্গত হয়ে থাকে। অব্যক্ত জ্ঞানীর জন্মকারণে সকলের নাশহেতু প্রাণ ইত্যাদি গুণ পরিণামগুলি বিযুক্ত হয়। তখন শরীর ও মনের কর্মবীজ থাকে না বলে জীবের শরীয়ান্তর ঘটে না। সে চতুর্দশ তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে শুদ্ধ হয়ে প্রকৃতিতে প্রতিনিবৃত্ত হয়।

ক্ষেত্রজ্ঞ নামরূপহীন, কিন্তু তাতে নাম-রূপের কল্পনা করা হয় মাত্র। যিনি ক্ষেত্রকে জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞান জন্মালেই জীবের মঙ্গল লাভ হয়। এজন্য ক্ষেত্রজ্ঞকে শুভসংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। জনগণ এই জন্যই সবসময় ক্ষেত্রজ্ঞকে স্মরণ করেন, ক্ষেত্রজ্ঞানশালীর ক্ষেত্রের ভাবনা থাকে না। ক্ষেত্র প্রত্যয় এবং ক্ষেত্রজ্ঞ প্রত্যয়ী।

সংসার রূপ নরক থেকে পুরুষকে পরিত্রাণ করেন বলেও ক্ষেত্রসংজ্ঞা নির্বাচিত হয়েছে। সুখ, দুঃখ ও মোহ- এই তিনভাব ভোজ্য পদবাচ্য। পুরে শয়ন করেন বলে পুরুষ সংজ্ঞা ও পুরের জ্ঞান আছে বলেও পুরুষ নাম নির্বাচিত। পুরুষ তত্ত্বজ্ঞরা বলেছেন–পুরুষ শুদ্ধ, নিরঞ্জন জ্ঞানাজ্ঞান বর্জিত অস্তি নাস্তি প্রত্যয় রহিত। শুদ্ধত্বের জন্য তিনি অনির্দেশ্য এবং সবসময় আনন্দ স্বরূপ বলে সমদর্শন। তিনি আত্মানন্দে মগ্ন। এই জ্ঞানময় পরম পুরুষের দর্শন লাভ করলে মানবের উদ্ধার লাভ হয়। মনের সাহায্যে তাকে পেলে আর বিষয় আসক্ত হতে হয় না। এই ব্যক্ত-অব্যক্ত সৃষ্টি, সংহার সেই পরম পুরুষ থেকেই হয়ে থাকে। পরম পুরুষ সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেন আর লয়কালে গ্রাস করে থাকেন। প্রকৃতির বৈচিত্র্য বশেই সৃষ্টি লয় সাধিত হয়। এই সৃষ্টি ও সংহারে প্রকৃতি ও পুরুষ দুজনই কারণ। সৃষ্টির আদিকাল থেকে অন্তকাল পর্যন্ত সেই পরম পুরুষকে প্রকৃতি দেবী আত্মাতে নিরুদ্ধ করে থাকেন। সৃষ্টির এই তৃতীয় প্রকার হেতু বলা হল।

ঋষিরা বললেন–হে সূত! পুনঃ সৃষ্টি কিভাবে প্রবর্তিত হয়? নতুন সৃষ্টি কি করে সম্ভব হয়, তা আমাদের বলুন। সূত বললেন–এই সৃষ্টির তত্ত্ব সত্যই অবর্ণনীয়। প্রত্যক্ষ ও অনুমান দিয়ে যুক্তি

অনুসারে এ তত্ত্বের আলোচনা করতে হয়। প্রাণীদের ধর্মাধর্ম সমস্তই এই অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন হয়। সত্ত্ব মাত্রাত্মক ধর্ম তখন প্রকৃতির পরিণাম কালে বুদ্ধিপূর্বক সর্বকার্যে প্রবর্তিত হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ কিন্তু অবুদ্ধি পূর্বক প্রকৃতির সেই গুণগুলি উপভোগ করে থাকেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের চব্বিশ প্রকার বিকার ঘটিয়ে মহদাদি সৃষ্টির প্রবর্তন করে। ক্ষেত্রজ্ঞই তখন ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর বলে প্রকটিত হয়। প্রকৃতির অনুগ্রহে ইনি সর্বভূতপতি, মুক্তিদাতা, মহাপদবাচ্য, আদিদেব ব্রহ্মা নামে সিদ্ধ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ অনাদি এবং সূক্ষ্ম, সকলের আদি। অনাদিকাল পর্যন্ত পরস্পর সংযুক্ত।

সংক্ষেপে ব্রহ্মার উৎপত্তি বর্ণনা করছি। অব্যক্ত কারণ স্বরূপ প্রকৃতি পুরুষ থেকে এক মহৈশ্বর্যশালী পুত্র জন্মে। ইনিই ব্রহ্মা। তিনি মহাপদবাচ্য। তার থেকেই এক সাথে ভূতেন্দ্রিয়গুলির জন্ম হয়। এভাবে সৃষ্টির বিস্তার ঘটে থাকে। এই সৃষ্টি খুবই বিস্তৃত। প্রকৃতি এবং পুরুষ রচিত সৃষ্টির বৃত্তান্ত শুনে মেধাবী মানব কখনো মোহগ্রস্ত হন না। যে বিদ্বান ব্রাহ্মণ এই প্রাচীন ইতিহাস শোনেন শোনান, তিনি মহেন্দ্রলোকে বাস করেন। হে ব্রহ্মবাদী মুনিরা, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদানুমোদিত এই মহাপুরাণ, ধন, পুণ্য, যশঃ ও আয়ু প্রদায়ক। যে জন প্রভূত ধন সম্পন্ন মহাতেজা এই কীর্তি কাহিনী বিস্তার করে, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে মহৎপুণ্য লাভ করে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধের সময় এই পুরাণ অন্ততঃ একপাদও ব্রাহ্মণদের শোনায় তার কান সিদ্ধ হয়। আগে ব্রহ্ম, বায়ুকে এই সর্বপাপহর, পুণ্যকর, সুপবিত্র পুরাণ শাস্ত্র দান করেন, বায়ু থেকে উশনা, তার থেকে বৃহস্পতি তা লাভ করেন। বৃহস্পতি থেকে সবিতা, তারপর মৃত্যু, ইন্দ্র ইত্যাদি থেকে শেষে প্রভু দ্বৈপায়ণ এই পুরাণ কথা প্রাপ্ত হল।

একশো দুইতম অধ্যায়

ঋষিগণ বললেন–হে মহাভাগ সূত! আপনি ব্রহ্মদেবের প্রসাদে সমস্ত শাস্ত্র মর্ম উপসংহার বিধির সাথে সেই আঠারো পুরাণ ইতিহাস সম্পূর্ণ ভাবে কীর্তন করেছেন। তার মধ্যে মৎস্য পুরাণে চোদ্দ হাজার, ভবিষ্য পুরাণে পাঁচশো চোদ্দ হাজার, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নয় হাজার, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আঠারো হাজার, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে একশো বারো হাজার, ভাগবত পুরাণে আঠারো হাজার, ব্রহ্ম পুরাণে দশ হাজার, বামন পুরাণে অযুত সংখ্যক, আদি পুরাণে দশ হাজার, বায়ু পুরাণে তেইশ হাজার, নারদীয় পুরাণে তেইশ হাজার, গরুড় পুরাণে একোনবিংশতি হাজার, পদ্ম পুরাণে পঞ্চান্ন হাজার, কূর্ম পুরাণে সতেরো হাজার, বরাহ পুরাণে চব্বিশ হাজার, স্কন্দ পুরাণে একাশী হাজার, অগ্নি পুরাণে আঠারো হাজার, শিব পুরাণে এগারো হাজার সংখ্যক শ্লোক রয়েছে।

এই আঠারো পুরাণকেই মহাপুরাণ বলে। এছাড়া আরও কিছু জানার আছে। সূত বললেন–একদা পরাশর নন্দন ব্যাসদেব সর্ববেদার্থ ঘটিত পুরাণের কথা বলতে বলতে মনে মনে এরকম চিন্তা করেছিলেন যে–আমি বেদবিরোধে বর্ণাশ্রমীদের ধর্ম,বহুবিধ যুক্তিমার্গ ও সূত্র নির্ণয় দিয়ে জীবাত্মা ও ব্রহ্মের ভেদনিরস্ত করে শ্রুতিসম্মত বিচারে অক্ষয়, পরমাত্মা, পরমপদ ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করছি। যাঁকে লাভ করার জন্য মহপ্রাজ্ঞ মুনিগণ ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থাদি ধর্ম, যতিধর্ম, ধ্যান, সমাধি, যম নিয়ম প্রভৃতির আচরণ করে থাকেন। যাঁকে প্রাপ্তির জন্য মনীষীরা সব বাধা পরিত্যাগ করে মাত্র বেদাত্মাকে শিরোধার্য করে নিষ্কাম ভাবে ব্রহ্মার্পণ কর্মে বুদ্ধি

নিয়োগ করে থাকেন। বিচার করে দেখা গেছে যেমন ফেণা, ঊর্মি ও বুলুদ থেকে জল আলাদা নয়, তেমনি এই বিশ্ব থেকেও ব্রহ্ম আলাদা নন, এই বিশ্বও ব্রহ্মের বিকারাভাস মাত্র। ব্রহ্ম থেকেই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয় কিন্তু ব্রহ্মের কোনও উৎপত্তি নেই। ব্রহ্মাকে জানতে না পারলে এই জগৎ জগঞ্জপেই ভাসমান হয়। কিন্তু তাকে জানতে পারলে তখন আর এই জগৎ জগৎ, বলে বোধ হয় না। তিনি চক্ষুর চক্ষু, ত্বকের ত্বক, রসনার রসনা, প্রাণের প্রাণ।

মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রাণ ও ক্রিয়াশক্তি দিয়ে তার স্বরূপ জানতে পারে না। তিনিই পরাকাষ্ঠা ও পরাগতি। এই পরম পুরুষ পরমানন্দ স্বরূপ আনন্দ বিগ্রহ। এই রামবিলাস কৃষ্ণাখ্যরসিক গোপললনাদের মধ্যে বিরাজিত। এঁরই মাথায় রত্ন নির্মিত শিখিপুচ্ছচূড়া লোভমান। এঁরই কানে বিদ্যুৎ প্রভার মতো রমণীয় কুণ্ডলদ্বয় শোভা পায়। ইনিই কুঞ্জে কুঞ্জে লীলা করেছেন। এই পীতাম্বরধারী সর্বাঙ্গে চন্দন মেখে মোহনবাঁশী বাজিয়ে গোপ-বালাদের মন জয় করেছিলেন। এই ব্রহ্মস্বরূপ, নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণই পৃথিবীতে লীলা করে থাকেন।

বেদ হল সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ। বেদব্যাসও তত্ত্ব নির্ণয়ে সক্ষম হলেন না, তখন ভাবলেন আমি কার কাছে যাই? কি করি? জগতে কি এমন কেউ সর্বদর্শন পারদর্শী পুরুষ নেই যাঁর কাছ থেকে এইসকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়? এরকম চিন্তা করে বেদব্যাস তপস্যা শুরু করলেন, ঐ অবস্থায় তিনশো বছর কেটে গেলে চার বেদ তার সামনে আবির্ভূত হল। বেদ সকলের মূর্তি খুব মনোহর, চোখ পদ্ম পাপড়ির মতো, মাথায় জটার মুকুট, হাতে কুশ গুচ্ছ, স্কন্ধদেশে মৃগচর্ম, ব্রাহ্ম ধর্ম তাদের ব্রহ্মরন্ধ্রে, শৈব ধর্ম সিঁথিতে, শাক্ত ধর্ম জিহ্বায়, বৈষ্ণব ধর্ম হৃদয়ে, সৌর ধর্ম নেত্রে এবং বৌদ্ধ ধর্ম তাদের ছায়ায় অবস্থান করছে।

তখন মুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রদীপ্ত, আদিত্য, প্রজ্বলিত হুতাসন, ব্রহ্মতেজোময় বেদ চতুষ্টয় দেখে তাদের যথাযোগ্য ভাবে বন্দনা করলেন। বললেন, আজ আমি কৃতার্থ হলাম। আজ আমার জন্ম, মন, পরমায়ু সফল হল। যেহেতু আপনারা ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান সবকিছুই জানেন, আপনাদের কাছে কিছুটা জানতে চাইছি। বাসনা বিজড়িতচিত্ত কর্মীদের সৎকর্মের ফল স্বর্গ আর ঈশ্বর অর্পিত চিত্ত ব্যক্তিদের কর্মের ফল চিত্ত শুদ্ধি। চিত্ত শুদ্ধি থেকে জ্ঞান ও জ্ঞান থেকে মোক্ষ লাভ হয়। মোক্ষ মানে ব্রহ্মের সাথে একতা প্রাপ্তি। ব্রহ্ম-নিঃসঙ্গ, জ্ঞানরূপ, নিরীহ, অচল, শুদ্ধ, আগুন ও ব্যাপক নির্বিকার ব্রহ্ম বিনষ্ট হন না। এই ব্রহ্ম থেকেই জগৎ প্রকাশিত, পরব্রহ্মই অদ্বিতীয় রূপে বিরাজমান।

এই যে আপনারা ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করেছেন এতে আমার এতটুকু সংশয় নেই। হে মহাভাগগণ! এর থেকেও গূঢ় রহস্য যদি কিছু থাকে, তা আমাকে বলুন। তখন সেই বেদগণ ব্যাসদেবের কথা শুনে বললেন–হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনাকে ধন্যবাদ, আপনিই সাক্ষাৎ বিষ্ণু এবং পরীদের আত্মা। আপনি পুরাণ, ইতিহাস ও সূত্রগুলিতে যে রহস্য বারবার প্রকাশ করেছেন তা আমাদের সম্মত। অক্ষয় পরমব্রহ্মই সর্ব কারণের কারণ। ফুলের রূপ রস-গন্ধের মতো ঐ আত্মস্বরূপের আত্মস্বরূপ আছে। এটি অতীব পরম রহস্য বলে জানবেন।

.

একশো তিনতম অধ্যায়

সূত বললেন–এবার গয়া মাহাত্মের কথা বলেছি। দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারকে প্রশ্ন করলেন–হে সনৎকুমার, শ্রেষ্ঠ তীর্থগুলির কথা আমাদের বলুন। উত্তরে সনকুমার বললেন–পবিত্র তীর্থ গয়াতীর্থের বিষয় শুনুন। এই তীর্থ পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এক সময়ে যজ্ঞের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে গয়াসুর এখানে তপস্যা করেন। ব্রহ্মা এই গয়াসুরের মাথায় একটি পাথর দিয়ে ওখানেই যজ্ঞ করেন। ব্রাহ্মণদেরকে ব্রহ্ম যজ্ঞ শেষ করে গৃহাদি দান করেছিলেন। শ্বেতবরাহ কল্প গয় এখানে একটি যজ্ঞ করেন। এই গয় থেকেই গয়াক্ষেত্র বিখ্যাত। পুত্র গয়াতে গেলে পিতাদের আত্মার আনন্দ ও শান্তি হয়। পিতাগণ বহু পুত্রের কামনা করেন, কারণ কোনো পুত্র গয়াতে যাবে, কোনও পুত্র অশ্বমেধ দিয়ে তাদের তৃপ্তিসাধন করবেন, কেউ বা নীলবৃষ উৎসর্গ করবেন। যে পুত্র তিন পক্ষ গয়াতে বাস করে, তার সাতকুল পর্যন্ত পবিত্র হয়ে থাকে। যে কেউ যখন তখন অন্যের নামে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ড দান করে, সে ব্রহ্মলোকে যায়। ব্রহ্মজ্ঞান, গয়াশ্রাদ্ধ, গোগৃহে মরণ, কুরুক্ষেত্রে বাস-মানুষের এই চার প্রকার মুক্তির কারণ। গয়াতে গিয়ে একবার পিণ্ড দিলেই তার আর কিছু দুর্লভ থাকে না। গয়াতে ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করতে হয়।

তারা তুষ্ট হলেই দেবতারা তৃপ্ত হন। মুণ্ডন ও উপবাস সব তীর্থে করতে হয়। ভিক্ষু গয়াতে গিয়ে দণ্ড প্রদর্শন করবেন, পিণ্ডদান তার কর্তব্য নয়। বিষ্ণুপদে দণ্ড রাখলেই, পিতৃগণের সাথে তিনি মুক্ত হবেন। গয়ায় গিয়ে প্রতি পদক্ষেপেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। পায়েস, চরু, পিঠা, ফল মূলাদি, ঘি, গুড় বা শুধু দই মধু দিয়ে শ্রাদ্ধে পিণ্ড দান করতে হয়। ফলাকাঙ্খী তীর্থ শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তিগণ শ্রাদ্ধদানের সময় কাম, ক্রোধ, লোভ পরিত্যাগ করবেন। গয়াক্ষেত্রের বৈতরণী নদীতে স্নান ও গোদান করতে হয়। এভাবে অক্ষয়বটে গিয়ে ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণ তুষ্ট

হলেই দেবতারা পিতৃগণসহ তুষ্ট হন। মীন (চৈত্র), ধনু (পৌষ), মেষ (বৈশাখ), কন্যা (আশ্বিন) এবং বৃষ (জ্যৈষ্ঠ) রাশিতে সূর্য অবস্থান করেন, এই সবকালই গয়া কাজে দুর্লভ। মাঘ মাসের সূর্যগ্রহণে গয়াশ্রাদ্ধ দুর্লভ।

.

একশো চারতম অধ্যায়

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন–গয়াসুর কিরূপে জন্মগ্রহণ করলেন? কেনই বা তপস্যা করলেন বা কি করে তার দেহ পবিত্র হল? সনৎকুমার উত্তর দিলেন–লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি থেকে সমুদ্ভূত হন। তিনি পূর্বকালে অসুর ভাবে অসুর ও দেবভাবে দেবতাদেরকে সৃষ্টি করেন। দানবদের মধ্যে গয়াসুর–অধিক বলসম্পন্ন ও বৈষ্ণব। তার উচ্চতা একশো-পঁচিশ যোজন ও স্থূলতা ষাট যোজন। গয়াসুর কোলাহল পাহাড়ে বহু হাজার বছর নিঃশ্বাস রোধ করে তপস্যা করেন। দেবতারা তখন পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন, গয়াসুর থেকে আমাদের রক্ষা করুন। ব্রহ্মা দেবতাদের বললেন–চলুন আমরা দেবাদিদেব শঙ্করের কাছে যাই। কৈলাসে গিয়ে কৈলাসপতিকে বললেন–এই মহাসুর থেকে আমাদের রক্ষা করুন। এরপর তারা বিষ্ণুর কাছে গেলেন। বিষ্ণু বললেন–আপনারা সকলে অসুরের কাছে যান আমিও যাচ্ছি।

বিষ্ণু বললেন–হে গয়াসুর! তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি। এবার তুমি বর চাও। গয়াসুর বললেন–হে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবগণ। আমি যেন দেব, ব্রাহ্মণ, নিখিলযজ্ঞ শিলা, দেব, ঋষি, অব্যয়, সর্বপ্রকার যোগী, ধার্মিক অপেক্ষাও পবিত্র হই।

দেবগণ তখন 'পবিত্র হও' এই বর গয়াসুরকে দিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন–আপনি গয়াসুরকে বরদান করলেন, তার দর্শন মাত্রই স্বর্গাদি তিন লোক শূন্য হয়েছে। বিষ্ণু এই কথা শুনে ব্রহ্মাকে বললেন–আপনি গয়াসুরের কাছে গিয়ে যজ্ঞের জন্য তার দেহ প্রার্থনা করুন। ব্রহ্মাকে দেখে গয়াসুর কৃতজ্ঞচিত্তে বললেন–আমি আপনাদের জন্য কি করব বলুন। ব্রহ্মা বললেন–হে অসুর! বিষ্ণুর বরে তোমার দেহ পবিত্র। তাই যজ্ঞের জন্য তোমার পবিত্র দেহ আমায় দান করো। গয়াসুর বলল–সর্বভূতের উপকারে আমার এই দেহে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হোক।

লোক পিতামহ ব্রহ্মা অমৃত, শৌনিক, শান্ত স্বভাব, গোকর্ণ, আত্রেয়, গোভিল, পরস্পর প্রভৃতি মানস প্রজা সৃষ্টি করে গয়াসুরের শরীরে যজ্ঞ করলেন। ধর্মরাজকে বললেন–তোমার গৃহের

শিলা গয়াসুরের মাথায় রাখ, যাতে গয়াসুর অবিচল থাকে। কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও গয়াসুর নিশ্চল হল না দেখে ক্ষীরোদ সাগর থেকে উত্থিত হয়ে আদি গদাধর বিষ্ণু ঐ শিলার ওপর অবস্থান করলেন। এখানে তার নাম হল জনার্দন ও পুণ্ডরীকাক্ষ। এরূপ ব্রহ্মাণ্ড, পিতামহ, প্রপিতামহ, ফলস্বীশ, কেদার ও কনকেশ্বর পাঁচ নামে বিভক্ত হয়েছিলেন। তারপর গজরূপী বিনায়ক, সূর্য, সীতা নামে লক্ষ্মী, গৌরী গায়ত্রী, অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বনায়ক পবন এবং উরগ, যক্ষ, গন্ধর্বগণ, দেবগণ ঐ শিলায় অবস্থান করলেন। শ্রীহরি গদা নিয়ে অসুরকে স্থির করলেন। এজন্য এখানে তার নাম হল আদি গদাধর। গয়াসুর বললেন–হে দেবগণ! আপনারা কেন আমাকে প্রতারিত করলেন? বিষ্ণুর আদেশে কি আমি নিশ্চল থাকতাম না?

দেবগণ নিজেদের পা দিয়ে, বিষ্ণু গদা দিয়ে আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়েছেন। আমি ব্যথিত হয়েও আপনাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। নিবেদন করছি। আমার নামে এই ক্ষেত্র প্রসিদ্ধ হোক। পাঁচ ক্রোশ গয়াক্ষেত্র ও ক্রোশমাত্র গয়াশির-এর মধ্যে সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান থেকে মানবদের মঙ্গল বিধান করুক। আপনারা ব্যক্ত অব্যক্তরূপে সবসময় এই ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হোন, গদাধর স্বয়ং নিখিল লোকের পাপ নাশ করুন। এই তীর্থ সেবীদের ব্রহ্ম ইত্যাদির পাপ বিনষ্ট হোক। নৈমিষ, পুষ্কর, গঙ্গা, প্রয়াগ ও বারাণসী এই সব ও অন্যান্য তীর্থ এবং স্বর্গ ও ভূতল, অন্তরীক্ষ থেকে দেবগণ সবসময় এখানে এসে মানবদের হিতসাধন করুন। নারায়ণ প্রভৃতি দেবতারা বললেন, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে। তখন গয়াসুর আহ্লাদিত হয়ে স্থির হলেন।

তারপর দেবতারা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলে ব্রহ্মা তার যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের জন্য নানা উপকরণসহ গৃহ নির্মাণ করে ছিলেন, এবং তাদেরকে পঞ্চক্রোশী গয়া, যেখানে পাঁচটি গ্রাম, কামধেনু, কল্পবৃক্ষ, পারিজাত প্রভৃতি গাছ, ক্ষীরবহা মহানদী, ঘৃতকুল্যা, মধুশ্রাবী, অন্নাদি, ফলমূলসহ নানা ভক্ষ্য, ভোজ্য দান করলেন এবং ব্রাহ্মণদের বললেন–আপনারা অন্য কারো কাছে কিছু চাইবেন না। কিন্তু লোভবশত দ্বিজরা ধর্মারণ্যে ধর্মের যজ্ঞে ধনাদি গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা রেগে গিয়ে তাদের অভিশাপ দিয়ে ছিলেন–তোমাদের প্রচুর থাকা সত্ত্বেও তোমরা লোভের বশবর্তী হয়েছে, তাই তোমরা অধিক ঋণযুক্ত হবে। রত্নময় পর্বত সকল প্রস্তরময় হবে, নদীগুলি ক্ষীরব থাকবে না, গৃহগুলি মৃন্ময় হবে। পরে অভিশপ্ত ব্রাহ্মণদের প্রতি দয়া করে ব্রহ্মা বললেন–যতদিন পৃথিবীতে চাঁদ-সূর্য থাকবে, ততদিন তীর্থক্ষেত্র থেকে জীবিকা অর্জন করতে পারবেন। যাঁরা গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করবেন, অবশ্যই তারাই আপনাদের পূজা করবেন।

.

একশো পাঁচতম অধ্যায়

নারদ জানতে চাইলেন– গয়াসুর কিভাবে শিলা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং শিলার রূপ ও মাহাত্ম্য কি? নারদের এই কৌতূহলের উত্তরে সনৎ কুমার বললেন–পূর্ব কালে নিখিল বিজ্ঞান পারদর্শী ধর্ম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধর্মের ঔরসে বিশ্বরূপার গর্ভে ধর্মব্রতা নামে এক রূপ যৌবনবতী কন্যা জন্মালেন। ধর্ম কন্যাকে উপযুক্ত স্বামীর জন্য অযুত যুগ তপস্যা করতে বললেন। ব্রহ্মার মানস পুত্র মরীচি সেই কন্যাটিকে বললেন– তুমিই আমার একমাত্র অনুরূপা পত্নী, তোমার আমি 'অনুরূপ' স্বামী। তুমি আমায় ভজনা কর। হে ধর্মব্রতা, তুমিই আমার ধর্মপত্নী হও। ধর্মব্রতা বললেন–আপনি আমার পিতার কাছে প্রার্থনা করুন। একথা শুনে মুনি ধর্মের কাছে ধর্মব্রতাকে প্রার্থনা করলে ধর্ম কন্যাকে মরীচির হাতে অর্পণ করলেন।

ধর্মব্রতার গর্ভে একশো পুত্র জন্মাল। একদিন মরীচি বন থেকে ফুল তুলে এনে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরলেন, তারপর ভোজনের শেষে বিশ্রামরত হলে তার পত্নী পদসেবা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে মরীচি ঘুমিয়ে পড়লে ব্রহ্মা সেই আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। ধর্মব্রতা মনে মনে চিন্তা করলেন, ইনি আমার শ্বশুর, এখন কিভাবে তার পূজা করা যায়। তিনি পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে শ্বশুর ব্রহ্মার পূজা করলেন, ব্রহ্মাও ভোজন অন্তে উত্তম শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। সেই সময় মরীচি ঘুম ভেঙ্গে রেগে গিয়ে ধর্মব্রতাকে অভিশাপ দিলেন, তুমি আমার আদেশ অমান্য করে অন্যত্র গিয়েছ, এজন্য আমার অভিশাপে তুমি শিলা হও। পত্নী ধর্মব্রতা রুষ্ট হয়ে বললেন–পিতা ব্রহ্মা উপস্থিত হয়েছেন বলেই আমি আপনার শয্যা ত্যাগ করে উঠে এসেছি। আমি ধর্ম বুদ্ধিতেই এই কাজ করেছি। আমি নির্দোষ। আপনি যখন এই শাপ দিলেন তখন আমিও আপনাকে শাপ দিচ্ছি আপনিও মহাদেব দ্বারা অভিশপ্ত হবেন। ধর্মব্রতা তার স্বামীকে ব্যাকুল দেখে নিজেও ব্যাকুল হয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর কাঠ জ্বালিয়ে অগ্নির ওপর বসে দুশ্চর তপস্যা করতে লাগলেন।

অভিশপ্ত মরীচিও এমন তপস্যা শুরু করলে ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্যথিত হয়ে হরির শরণ নিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেবাদিগণ আগুনের মধ্যে অবস্থানকারী ধর্মব্রতাকে বললেন–একমাত্র তুমিই এমন কঠিন তপস্যা করবার সামর্থ্য দেখিয়েছ। তুমি বর প্রার্থনা কর। ধর্মব্রতা বললেন–স্বামী শাপ হরণ করবার জন্যই এই ভয়ঙ্কর দুষ্কর কাজ করছি। তাই মরীচি যে শাপ দিয়েছে তা অপনোদিত হোক। দেবগণ বললেন–মরীচির শাপ অন্যথা হওয়ার নয়। দেব দ্বিজ কেউই অন্যথা করতে পারে না। ধর্মব্রতা বললেন–হে দেবগণ! যদি আমাকে স্বামীর শাপ থেকে মুক্ত করতে না পারেন, তবে আপনারা আমায় বর দিন, যাতে আমি শিলা হয়েও ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে নদ,

নদী, সরোবর, তীর্থ, দেব, ঋষি, মুনি ও প্রধান প্রধান দেবগণ থেকেও অতি পবিত্র ও শুভ হই এবং ত্রিলোকের মধ্যে যে সব ব্যক্ত অব্যক্ত লিঙ্গ আছে সেই সমস্ত যেন তীর্থ রূপে সর্বদা আমার দেহে প্রতিষ্ঠিত থাকে। গদাধর সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ একটি দৃশ্যতীর্থ হোক। এখানে শ্রাদ্ধাদি দিয়ে পিতৃগণের মুক্তি হোক।

এখানে সব প্রাণী শরীর পরিত্যাগ করে বিষ্ণুর স্বরূপ প্রাপ্ত হোক। হরি অর্চিত হলে সমস্ত যজ্ঞ যেমন সম্পূর্ণ হয় তেমনি এই তীর্থে স্নান, শ্রাদ্ধ, তর্পণ অক্ষয় ফলজনক হোক। আমার দেহে থেকে যিনি জপ করবেন, তিনি অচিরেই সিদ্ধিলাভ করবেন। এখানে শ্রাদ্ধাদি করে মানুষ পিতৃগণের উদ্ধার করে নিঃসংশয়ে বিষ্ণু লোকে যাবেন। দেবগণ আমার শরীর ছেড়ে চলে যাবেন না। যতকাল ব্রহ্মা থাকবে ততকাল এই শিলাও বর্তমান থাকুক। পতিব্রতা ধর্মব্রতার কথা শুনে দেবতারা বললেন–তুমি যা প্রার্থনা করলে তাই হবে। তুমি যে কালে গয়াসুরের মস্তকে শিলারূপে নিশ্চল হয়ে থাকবে সে সময় আমরাও তোমার উপরে নিজ নিজ পা রেখে নিশ্চল হয়ে থাকব। শিলা রূপিণী ধর্মব্রতাকে এভাবে বর দান করে দেবগণ অন্তর্ধান করলেন।

.

একশো ছয়তম অধ্যায়

সনৎকুমার বললেন–এবার সেই মুক্তিদায়িনী শিলার মহিমার কথা বলছি। এটি পৃথিবীর মধ্যে বিচিত্র শিলাতীর্থ। ঐ শিলার সংস্পর্শে লোক সকল হরিলোক প্রাপ্ত হয়। এভাবে তিনলোক শূন্য হলে যমপুরীও শূন্য হয়ে ওঠে। দেবগণসহ যম ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন–আপনার প্রদত্ত অধিকার এই যমদণ্ড গ্রহণ করুন। ব্রহ্ম উত্তরে বললেন–এই শিলা নিয়ে গিয়ে নিজের গৃহে স্থাপন কর। ব্রহ্মার আদেশে যম সেই শিলা নিজ গৃহে নিয়ে এলেন। আবার নিজ অধিকারে পাপীদের শাসন করতে লাগলেন। দেবরূপিণী এই শিলা এইভাবে জগতে খ্যাত হয়। এই দুই পবিত্র বস্তুর যোগেই ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

এই যজ্ঞভাগী হতে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকে আসতে দেখে শিলা তাদেরকে বললেন–পিতৃগণের মুক্তির জন্য আপনারা এ শিলায় অবস্থান করবেন। তখন কেউ পা দিয়ে, কেউ মূর্তি দ্বারা আবার অনেকে মূর্ত ও অমূর্ত ভাবে শিলায় অধিষ্ঠিত হলেন। মহানদী ও প্রভাবেশ সধাম স্থানে স্নান করে ঐ শিলায় পিণ্ডদান করলে মানবের প্রেতত্ব শেষ হয়। মহানদীতে রাম ও সীতা স্নান করেছিলেন বলে এটি রামতীর্থ নামে বিখ্যাত। এখানে মাতঙ্গ মুনির আশ্রম দেখা যায়। শিলার ডান হাতে কুণ্ড পর্বত প্রতিষ্ঠিত। এই পর্বতে ঈশান, বর্ঘ, বহ্নি, বরুণদ্বয় ও চার রুদ্র–এই সব

মহেশ্বর পিতৃগণের মোক্ষদাতা। ভরতাশ্রমে শ্রাদ্ধাদি করলে অনন্ত ফল লাভ হয়। এখানে চতুর্যগ স্বরূপ সূর্যের চারটে মূর্তি আছে। মূর্তি দর্শন ও স্পর্শ করলে পিতৃগণ উদ্ধার পায়।

শিলার বামপাদেও গিরি আছে, যেখানে পিণ্ডদান করলে পিতৃগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। দেবগণ এখানে নিত্যই রয়েছেন। এইসব তীর্থ ও আশ্রমপদ মানবদের সমস্ত অশুভ কাজ বিনাশ করে থাকে। এই পুণ্য নৈমিষ্যারণ্য ব্যাস, ব্রহ্মা, শিব, হরি ইত্যাদি দেবগণ দ্বারা সেবিত। শিলার বাঁ হাতের পর্বতটি মহাত্মা অগস্ত্য এনেছিলেন। ব্রহ্মা ও শিব এখানে উগ্র তপস্যা করেন। এই পর্বর্তকে স্বর্গ বলা যায়। গন্ধর্বরা এখানে নৃত্য গীত করে থাকেন। সতী, পার্বতী এবং মহাদেব এখানে রয়েছেন।

শিলার দক্ষিণ হাতে ধর্মরাজ ভস্মকুট পর্বত ধারণ করে আছেন। অনসূয়ার সঙ্গে ঋষি অগস্ত্য এখানে বাস করেন। মহর্ষি অগস্ত্য এই স্থানে ব্রহ্মার কাছ থেকে দুর্লভ বর ও লোপামুদ্রা নামে পত্নী লাভ করেন।

এখানে এক বটবৃক্ষ আছে, সেখানে ব্রহ্মা থাকেন। তার সামনে রুক্মিণী কুণ্ড পশ্চিমে কপিলা নদী। এই নদীতে স্নান ও কপিলেশ্বরকে পূজা করলে শ্রাদ্ধকারীর পিতার মুক্তি লাভ হয়। এখানে সরস্বতী কুণ্ড আছে। শিলা বাঁ হাত দিয়ে গৃদকুট পর্বত ধারণ করেছেন। এখানে ঋণমোক্ষ ও পাপমোক্ষ নামক শিব আছেন। ঐ শিবের দর্শনে শিবলোক লাভ হয়। সেখানে গজরূপী বিঘ্ননাশক বিনায়ক রয়েছেন। মুণ্ডপৃষ্ঠের নীচে এক দেবদারু বন আছে। ঐ মুণ্ডপৃষ্ঠ ও অরবিন্দ পর্বত দর্শন করলে পাপ বিনষ্ট হয়। ধর্মরাজের দ্বারা শিলার বামপাদে প্রেত পর্বত স্থাপিত হয়েছে। এই গিরি আগে পাপময় ছিল বলে একে প্রেত পর্বত বলে।

ধর্মরাজের পাদস্পর্শে এই প্রেত পর্বত পরিত্রাণ লাভ করে। মুণ্ড পৃষ্ঠ পর্বতে মহাদেবের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে, এখানে তার বাসস্থান। এটি দর্শন করে মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হয়। ক্ষেত্র মধ্যে গয়াক্ষেত্র অতি পবিত্র। মুণ্ডপৃষ্ঠের সানুদেশে লোমহর্ষণ লোমশ তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করে। লোমশমুনি নিজের তপস্যার ক্ষমতায় বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, কাবেরী, সিন্ধু, মহাবৈতরণী, গঙ্গা, যমুনা গণ্ডকী, অলকানন্দা, কৌশিকী ইত্যাদি নদীকে নিয়ে এসেছিলেন। তাই এ সমস্ত নদীতে স্নান ও পিণ্ডদানে পিতৃগণ স্বর্গ লাভ করেন।

ক্রৌঞ্চপাদে নিক্ষরা নামে পুষ্করিণী আছে, সেখানে নিয়ম করে তিনদিন শ্রাদ্ধ ও স্নান করলে পিতৃগণ পাঁচ রকম পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গলাভ করেন। ভস্মকূট পর্বতে জনার্দন রয়েছেন। এই জনার্দনের বাঁ হাতে জীবিত ব্যক্তির দধি মিশ্রিত পিণ্ডদান করতে হয়। এই পিণ্ডে তিল দেওয়া

চলবে না। পিণ্ডদান। কালে প্রার্থনা করতে হবে–হে জনার্দন, তোমার হাতে পিণ্ড দান করলাম। আমি বা সেই ব্যক্তি মারা গেলে তুমি গয়াশিরে পিণ্ড পৌঁছিয়ে দিও। হে জনার্দন, তুমি পিতৃগণের মোক্ষদাতা, তোমাকে নমস্কার। ধর্মাত্মা ভীম বা জানু মাটিতে রেখে বলেছিলেন, "হে পুণ্ডরীকাক্ষ, তুমি পিতৃগণের মোক্ষদাতা হও, তোমাকে নমস্কার। এই ভাবে শ্রাদ্ধ করে তিনি ভ্রাতৃগণ, পিতৃগণ ও সাতকুলসহ ব্রহ্মলোকে গিয়েছিলেন। লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু সমস্ত দেবতাদের সাথে ব্যক্ত-অব্যক্ত রূপে এই শিলায় রয়েছে। এজন্য এই শিলা দেবময়ী হয়েছে।

.

একশো সাততম অধ্যায়

নারদ জিজ্ঞাসা করলেন–আদি গদাধর, বিষ্ণু কি জন্যে এই শিলায় অধিষ্ঠিত হলেন? তাঁর গদাই বা কিরূপে উৎপন্ন হল? সনৎকুমার উত্তর দিলেন পূর্বকালে গদা নামে এক অসুর ছিল। তার অস্থি বজ্র থেকেও দৃঢ়। এক সময়ে ব্রহ্মা সেই বজ্রসম দৃঢ় অস্থি প্রার্থনা করলে সে তার শরীরাস্থি ব্রহ্মদেবকে অর্পণ করে। তারপর ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা বজ্র সমর্থ কুঁদ দিয়ে গদাসুরের অস্থি থেকে এক অদ্ভুত গদা সৃষ্টি করে স্বর্গে স্থাপন করলেন। তারপর ব্রহ্মনন্দন হেতি রাক্ষস শত সহস্র বছর ধরে তপস্যা করে, বর চাইলেন–দেব, দৈত্য, নরগণের বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা আমি যেন অবধ্য থাকি। দেবগণ তথাস্তু' বলে আজ্ঞা দিলে হেতি ইন্দ্রাদি দেবতাদের যুদ্ধে পরাজিত করে ইন্দ্রত্ব ভোগ করতে লাগল। তখন সকলে ভীত হয়ে শ্রীহরির শরণ করলেন। বিষ্ণু জানালেন-হেতি দেবাসুর দ্বারা অবধ্য। রুদ্রপদ, ব্রহ্মপদ, দিব্য, কশ্যপপদ, পঞ্চাগ্নিপদ, ইন্দ্রপদ, অগস্ত্যপদ ইত্যাদিতে গদাধর বিষ্ণুর ব্যক্তরূপ। গায়ত্রী, সাবিত্রী, সন্ধ্যায়, সরস্বতী, গয়াদিত্য, শ্বেতর্ক, অষ্টবসু, সপ্তর্ষি, বিনায়ক, জনার্দন, মঙ্গলা প্রভৃতি আদি গদাধরের ব্যক্তরূপ।

ব্রহ্মা বললেন–যিনি গুণবিদ হয়েও সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণের অতীত, যাঁকে কোনও পাপ স্পর্শ করে না সেই গদাধর গয়ায় এসেছেন, সেই বরদ গদাধরকে আমি প্রণাম করি। যাঁর জন্ম নেই, যাঁর শব্দাদি ও মুখাদি অবয়ব নেই, সেই গদাধরকে নমস্কার।

যিনি মনের অতীত, যাঁর মতিগতি নেই, যিনি অব্যয়, পণ্ডিতেরা শ্রেষ্ঠ স্তব দিয়ে যাঁকে সবসময় স্তব করেন, যিনি চিদাত্মক, হৃদয়গত, সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বললেন–আমি, আপনি ছাড়া দেবরূপী শিলাতে অবস্থান করব না। আমি ব্যক্তিতাদি রূপে সবসময়, আপনার সাথে মিলে ওই শিলায় অবস্থাতে ইচ্ছা করি। তখন জনার্দন লক্ষ্মীর সাথে

সুব্যক্ত রূপে ঐ শিলায় সর্বস্তুতি করলেন। যারা ভক্তি সহকারে গদাধরের পূজা করে তারা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হলেও রোগমুক্ত হয়। আদি গদাধরের দর্শনে মানুষেরা ধন, ধান্য, আয়ু, আরোগ্য, সুখ প্রভৃতি নানা ভোগ্যবস্তু পেয়ে থাকে।

এভাবে নরগণ গদাধরকে গন্ধদান করলে, গন্ধাঢ্য পুস্পদান করলে সৌভাগ্যশালী, ধূপদানে রাজপ্রাপ্তি এবং শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদি দান করলে তার পিতৃগণ বিষ্ণুপুরে গমন করেন। শিব স্বয়ং গদাধরের স্তব করেছিলেন। শিব বললেন–যে দেবমুণ্ড পৃষ্ট পর্বত ও কল্পতীর্থ রূপে অব্যক্ত আমি সেই গদাধরকে নমস্কার করি। যিনি অব্যক্ত জ্ঞানরূপী, আমি সেই গদাধরকে নমস্কার করি। যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও অহঙ্কার বর্জিত, যিনি জগৎ সুষুপ্তি আদি অবস্থা থেকে মুক্ত, আমি সেই গদাধরকে নমস্কার করি। সনকুমার বললেন–দেবাদিদেব গদাধর মহেশের এরকম স্তবে শিলায় অবস্থান করলেন। গদাধরকে পূজা করলে, ধর্মার্থীকামী ধর্ম, অর্থকামী অর্থ, কার্যকারী কাম ও মোক্ষার্থী মোক্ষ লাভ করে। রাজা বিজয় প্রাপ্ত হন। শূদ্র সুখ লাভ করে। যে ব্যক্তি আদি গদাধর হরিকে পূজা করে পুত্র লাভ করে, এমন কি মন দিয়ে যে সমস্ত বস্তু প্রার্থনা করা যায়, গদাধরে পূজা দিয়ে সেই সমস্তও লাভ করে থাকে।

একশো আটতম অধ্যায়

সনকুমার বললেন–হে নারদ, পূর্বকালে ব্রহ্মা যে গয়াশ্রাদ্ধকারীদের নিষ্কৃতির বিষয় বলেছিলেন, সেই গয়া যাত্রীদের কথা এবার বলছি। গয়াগামী ব্যক্তি বিধিপূর্বক শ্রাদ্ধ, কৌপীন ধারণ, গ্রাম প্রদক্ষিণ এবং শ্রাদ্ধ শেষ ভোজন করে অন্য গ্রামে যাবেন। সন্তুষ্ট হয়ে অহঙ্কারহীন হয়ে যাত্রা করতে হবে। মহানদীর নির্মল জল দিয়ে স্নান করে তর্পণ করবেন এবং নিজের বেদ শিক্ষানুসারে অর্ঘ্য ও আবাহনবর্জিত শ্রাদ্ধ করবেন। পরদিনে শুদ্ধ হয়ে প্রেত পর্বতে গিয়ে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে দেবাদির তর্পণ করে প্রেত পর্বতে সপিণ্ডদের শ্রাদ্ধ করবেন। তারপর আচমন করে পিতৃদেব গণকে আবাহন করে শ্রাদ্ধ করতে হবে। এরপর যত্নের সাথে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম করবেন।

পিতৃ কাজে যখন মানুষ তিল গ্রহণ করে, তখনই অসুরেরা সেখান থেকে চলে যায়। গয়ায় প্রথমে পিতৃকুলের কাজ করতে হয়। ডান হাতে কুশ নিয়ে সমস্ত বস্তু দিয়ে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করবে, অন্যান্য বিধি নিজ নিজ বেদানুসারে অনুষ্ঠিত হবে। যত্নের সাথে পিতৃতীর্থে হাত জোড় করে একমুঠি ছাতু নিয়ে অক্ষয় পিণ্ড দান করতে হয়। মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক তিল ও জল দিয়ে

কুশে আবাহন করবে–দেব, ঋষি, ব্রহ্মা, পিতা, মানব, প্রমাতামহী, মাতামহী, মাতা, প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতাদের জন্য পিণ্ড দান অক্ষয় হোক।

পিতা, মাতা, পত্নী, ভগিনী, কন্যা, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা–এঁদের সাত গোত্র বলে। এঁদের মধ্যে আগের মতোই পিণ্ডদানে, পিতার চব্বিশ, মাতার কুড়ি, পত্নীর ষোল, বোনের বারো, কন্যার এগারো, এই একশ একটি কুলের উদ্ধার হয়।-পিতৃকুলে যাঁরা মারা গেছেন, যাঁদের কোনো গতি নেই, কুশের ওপর তিল জল দিয়ে তাদের আবাহন করছি। মাতামহকুলে জাত যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, যাদের কোন গতি হয়নি কুশের ওপর তিলজল দিয়ে তাদের আবাহন করছি। বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা মারা গেছেন এবং গতি হয়নি তাদেরও তিল জল দান করা যায়। এইভাবে যারা অপঘাতে মারা গেছেন, পশুর হাতে মারা গেছেন, তাদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান হয়।

যাঁরা বান্ধব ছিলেন এবং বান্ধব নন এমন কেউ, পিতৃ ও মাতৃবংশের গুরু, শ্বশুর বংশে যাঁরা মারা গেছেন, এমনকি যাঁদের নাম জানা নেই তাদের উদ্দেশ্যেও পিণ্ডদান করা যায়। স্ত্রী পুরুষের আলাদাভাবে পিণ্ড দান করতে হয়, না হলে তর্পণ নিষ্ফল হয়। মন্ত্রে বলতে হয়-হে ব্রহ্মাদি দেবগণ। আপনারা সাক্ষী হন, আমি গয়ায় এসে পিতৃগণের পিণ্ড দিলাম। তাদের যেন নিষ্কৃতি হয়। আমি দেব, ঋষি ও পিতৃ–এই তিনপ্রকার ঋণ থেকে মুক্ত হলাম। এইভাবে প্রেত পর্বত থেকে শুরু করে গয়াতীর্থের সকল স্থানের পিণ্ডদান করতে হবে। পিতৃগণের মধ্যে কেউ প্রেতরূপে রয়েছে, তিল মিশ্রিত ছাতু দ্বারা সকলকে তৃপ্ত করতে হবে।

.

একশো নয়তম অধ্যায়

সনকুমার বললেন–এবার উত্তর মানসের পঞ্চতীর্থের বিধি বিস্তারিত বলছি। প্রথমে আচমন, হাতে কুশ ধারণ এবং মাথায় জলের ছিটে দিয়ে উত্তর মানসে যাবে। স্নানের পর তর্পণ করে সপিণ্ড শ্রাদ্ধ করবে। এখানে সূর্য প্রণাম করতে হয়। এরপর মৌনী হয়ে উত্তর মানস থেকে দক্ষিণ মানসে যাবে। এই দুই তীর্থের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে ত্রিলোক খ্যাত কনখল তীর্থ। কনখলের দক্ষিণ ভাগে দক্ষিণ মানসতীর্থ। এই দক্ষিণ মানসে আবার তিনটি তীর্থ আছে। এই সব তীর্থে পিতৃগণের মুক্তির জন্য আলাদা ভাবে শ্রাদ্ধ করবে। এরপরে শ্রেষ্ঠ তীর্থ অর্থাৎ ফতীর্থে গমন করবে। পুরাকালে ব্রহ্ম যে গয়াক্ষেত্রে যজ্ঞ করেছিলেন, সেই যজ্ঞের দক্ষিণাগ্নির রজ থেকে এই ফল্গু তীর্থের উৎপত্তি হয়েছে। ত্রিভুবনে বহু তীর্থ ছেড়ে দেবগণ স্নান করার জন্য সেই ফতীর্থে এসে থাকেন।

এই ফল্গু আদি গদাধরের শরীর থেকে এসেছে। গঙ্গার থেকে ফল্গু শ্রেষ্ঠ। এখানে স্নান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা বেশি পুণ্য হয়। যে ব্যক্তি গদাধরকে পঞ্চামৃত দিয়ে স্নান বা পুষ্প চন্দন দিয়ে পূজা করে না তার কৃত শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়। প্রথমে ব্রহ্মতীর্থের কূপে স্নান করে শ্রাদ্ধ করতে হবে। এই কূপ ও যুপের মাঝে শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণের মুক্তি হয়ে থাকে। দ্বিতীয় দিনে ধর্মারণ্যে যাবে। এই ধর্মারণ্যেই ব্রহ্মা যজ্ঞ করেছিলেন। তৃতীয় দিনে ব্রহ্ম সরোবরে স্নান করে সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করবে। ব্রহ্ম যজ্ঞ শেষ করে এই ঘূপ উঠিয়ে ছিলেন। তাই নাম ব্রহ্মঘূপ। এই ঘূপ প্রদক্ষিণ করলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এরপর ব্রহ্মদেবকে নমস্কার করতে হয়।

এখানে একটি ব্রহ্মা কল্পিত আম গাছ রয়েছে, ঐ গাছের সেচন মাত্রই পিতৃগণ মোক্ষ লাভ করেন। তারপর সংযত হয়ে এই মন্ত্রে যমবলি দান করতে হবে। এরপর কাকবলি দান করতে হবে। তারপর চতুর্থ দিনে ফল্গু তীর্থে গিয়ে স্নান ও তর্পণ করে, তারপর গয়া শিরস্থিত বিষ্ণুপদে সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ দান করবে। সাক্ষাৎ গয়াসুরের মাথায় অবস্থিত নাগ, জনার্দন, উত্তরমানস এঁর মধ্যে রয়েছে ফল্গুতীর্থ।

ব্রহ্ম সরোবর থেকে শুরু করে উত্তর মানস পর্যন্ত দেবদুলর্ভ ফল্গুতীর্থ রয়েছে। ক্রৌঞ্চপাদ থেকে গয়াসুর মস্তক পর্যন্ত ফল্গুতীর্থ এবং এটিই সাক্ষাৎ গয়াসুরের মুখ। এই গয়াসুরের মুখে দেওয়া শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়। গদাধরের পাদপদ্মে শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয়। রুদ্র পদে শ্রাদ্ধ করলে মানুষ শতকুল ও নিজে শিবলোকে যায়। এভাবে কশ্যপ পদে শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণের ব্রহ্মলোক, দক্ষিণাগ্নি পদে ব্রহ্মপুর, গার্হপত্য পদে বাজপেয় যজ্ঞ ফল, ফলষজ্ঞ আহরণী পদে অশ্বমেধযজ্ঞ ফল, ফল, মাতঙ্গ পদদ্বয়ে শ্রাদ্ধ করলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়।

পাঁচ রকম পাপকারীও সূর্যপদে শ্রাদ্ধ করলে তার পিতৃগণ অর্কপুরে যেতে সমর্থ হন। এছাড়া কার্তিকের পদে শ্রাদ্ধ করলে পিতৃগণের শিবলোক ও গণেশপদে শ্রাদ্ধ করলে রুদ্রলোক প্রাপ্তি হয়। পূর্বকালে ভরদ্বাজ মুনি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দিব্য কাশ্যপ পদে শ্রাদ্ধ করে পিণ্ডদান করতে উদ্যত হলে সেই কশ্যপ পদ থেকে একটি সাদা ও একটি কালো হাত নির্গত হল। ঐ হাত দেখে মহামুনি ভরদ্বাজ নিজের মা শান্তাকে জিজেস করলেন–এর মধ্যে কে আমার পিতা? আপনার জানা থাকলে বলুন। কোন হাতে আমি পিণ্ডদান করব? শান্তা বললেন–কালো অর্থাৎ কৃষ্ণ হাতে দান কর। ভরদ্বাজ পিণ্ডদান করতে উদ্যত হলে দুটি হাতই বলতে থাকে–তুমি আমার ঔরসজাত রাজপুত্র আমাকে পিণ্ড দান করো। আবার কৃষ্ণ হাত বলে–তুমি আমার ক্ষেত্রজ পুত্র আমায় পিণ্ডদান করো। মাতা বললেন–তুমি উভয়কেই পিণ্ডদান করো।

স্বয়ং রাম দশরথের হাতে পিণ্ডদান না করে, রুদ্রপথে পিণ্ডদান করে শাস্ত্র ভঙ্গ করা হল কিনা চিন্তা করে ভয় পেলেন। কিন্তু দশরথ জানালেন, রাম সঠিক কাজ করেছেন, এতে তিনি মুক্ত হয়ে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হতে পারবেন। রামকে দশরথ আশীর্বাদ করলেন। গয়াশিরে ভীষ্ম তাঁর পিতার হাতে পিণ্ড না দিয়ে বিষ্ণু পদে পিণ্ড দিয়েছিলেন। এতে শান্তনু বলেছিলেন, পুত্র তুমি শাস্ত্রে অবিচল, তুমি ত্রিকালদর্শী হও এবং যেন তোমার বিষ্ণু পদে গতি হয়। তুমি ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করবে। শান্তনু মুক্তি লাভ করলেন।

মানুষেরা যার নাম করে গয়াশিরে পিণ্ডদান করবে তারা নরকস্থ হলে স্বর্গে যাবে এবং মোক্ষ লাভ করবে। মুণ্ড পৃষ্ঠাদির সব জায়গায় এই পদচিহ্ন রয়েছে। বিষ্ণুপদ দিয়ে হেতি অসুরকে মাথা দ্বিখণ্ডিত করে, সেখানে গদা প্রক্ষালন অ-পিণ্ডক শ্রাদ্ধ করতে হয়। অক্ষয় বটে অন্ন দিয়ে যত্ন সহকারে শ্রাদ্ধ করে ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করবে।

এরকম করলে পিতৃগণের অক্ষয় সনাতন ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। বটগাছের কাছে শাক কিংবা শুধু জল দিয়েও যদি একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো হয়, তবে কোটি কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের সমতুল্য হয়। তারপর বস্ত্র ও গন্ধাদি দিয়ে পুত্রাদির সাথে গয়াতীর্থে পুরোহিতকে পূজা করে যত্ন পূর্বক ষোড়শ প্রকার দান করবে। তারপর অক্ষয় বটকে প্রণাম করবে।

এরপর প্রপিতামহ বিষ্ণুকে এই মন্ত্রে প্রণাম করবে যথা, কলিকালে মানবগণ প্রায়ই শিবভক্ত হবে, এজন্য গদাধর হরি লিঙ্গরূপী বন্দনা করি–আমি তার।

.

একশো দশতম অধ্যায়

সনকুমার বললেন–গয়া রাজা বহু অন্ন ও বহু দক্ষিণাযুক্ত যে যজ্ঞ করেছিলেন ত্রিলোকের বলি ও আকাশের তারকা রাজির মতো যজ্ঞীয় দ্রব্যের গণনা করা যায় না। যজ্ঞে যে সব রত্ন সুবর্ণাদি দিয়েছিলেন তা আগে কেউ, কাউকে দেননি। ভবিষ্যতেও কেউ দিতে পারবে না। ব্রাহ্মণগণ ওই যজ্ঞের প্রশংসা করেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি দেবগণ সন্তুষ্ট হয়ে গয়কে বলেছিলেন—'তুমি বর চাও' রাজা গয় প্রার্থনা করলেন ব্রহ্মার দ্বারা যে সমস্ত ব্রাহ্মণ অভিশপ্ত হয়েছেন, তার যজ্ঞে পূজিত হোন ও গয়াপুরী এই নাম বিখ্যাত হোক। রাজা গয়ও বিষ্ণুলোকে গিয়েছিলেন। বিশালনগরীতে বিশাল নামে এক অপুত্রক রাজা ছিলেন। তিনি পুত্র লাভের আশায় গয়াশিরে পিণ্ডদান করেন। পুত্র লাভের পর বিশাল আকাশে তাকিয়ে দেখলেন, শ্বেত,

রক্ত ও কৃষ্ণ পুরুষ পিতা। তিনি বললেন–ইন্দ্রলোক থেকে এসেছি, অন্য দুজন নানা পাপে অত্যন্ত পাপী কিন্তু তোমার পিণ্ডদানে মুক্তি পেলেন। তোমার দেওয়া জলে আমরা তিনজন গতি লাভ করেছি। এবার আমরা স্বর্গবাসী হব।

এক প্রেত রাজ নিজের প্রেতত্ব মুক্তি কামনায় এক বণিককে বলল, আমার নামে গয়াশিরে পিণ্ড দিও। গয়াগামী ঐ বণিক সেইভাবে পিণ্ডদান করলে প্রেত রাজও মুক্তি লাভ করল। মহানদীতে স্নান করে গায়ত্রীর সামনে প্রাতঃসন্ধ্যায় উপাসনা করে সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করলে সমস্ত কুলের ব্রাহ্মণ্য লাভ হয়। সরস্বতী তীর্থে যথাবিধি স্নান করে সকাল সন্ধ্যায় উপাসনা করলে পিতৃগণ বিষ্ণুলোকে গমন করে।

মুণ্ড পৃষ্ঠে গদাধরের পাদ অঙ্কিত বিশাল ক্ষেত্র লেলিহান নামে তীর্থ। এখানে ভারতশ্রমে গিরিকর্ণ মুখে পিণ্ডদান করলে তার শতকুল উদ্ধার পেয়ে থাকে।

দেবনদীতে স্নান করে বৈতরণীতে গো দান করলে একশো কুল উদ্ধার পায়। পিতৃগণের উদ্ধারের জন্য এই বৈতরণী গয়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। এখানে এসে তিনরাত উপোস করতে হয়। কিন্তু যে মানুষ এখানে সোনা ও গোরু দান করে না সে গরীব হয়ে জন্ম নেয়, দশাশ্বমেধিক জংসতীর্থ, অমরকন্টক এবং কোটিতীর্থে স্নান করে মানব যদি কোটিশ্বরের দর্শন করে, সে কোটি জন্ম পর্যন্ত ধনাঢ্য বেদপারগ ব্রাহ্মণ হয়ে জন্ম নেয়।

প্রাচীনকালে পার্বতী ও শঙ্কর পারিজাত কাননে বসে অবস্থান করার সময় মরীচি সেখানে এলে শঙ্কর অসন্তুষ্ট হয়ে অভিশাপ দেন। শঙ্করের শাপে ভীত হয়ে মরীচি তপস্যায় রত হলে মহাদেব তুষ্ট হয়ে বর দেন–তোমার গয়ায় মুক্তি হবে। তখন মরীচি গয়ায় গিয়ে শিলার ওপর বসে কঠিন তপস্যা করতে লাগলেন। তিনি শঙ্করের অভিশাপে কৃষ্ণবর্ণ হয়েছিলেন, পরে শুক্লবর্ণ হন। এবার বিষ্ণু তাঁকে বর দিতে চাইলেন। মরীচি বললেন–আমি শঙ্করের শাপ থেকে মুক্ত হয়েছি, এবার এই শিলা পিতৃগণের মুক্তি দাত্রী হোক। বিষ্ণু আশ্বাস দিলে মরীচি স্বর্গে গেলেন। গয়াতীর্থের একটি পদ্মবনে পাণ্ডু শিলাতে যুধিষ্ঠিরও শ্রাদ্ধ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির পিতার হাতে পিণ্ড না দিয়ে শিলার ওপরেই দিলেন।

পাণ্ডু সন্তুষ্ট হয়ে বললেন–তুমি আমার পরিত্রাণ করেছ। তুমি পৃথিবীতে রাজ্য ভোগ করে ভাইদের সাথে সশরীরে স্বর্গ লাভ করো। তোমাকে দর্শন করা মাত্র নরকবাসীরা পবিত্র হয়ে স্বর্গ ধামে আসবে। এই বলে পাণ্ডু শাশ্বত স্বর্গলাভ করলেন। গয়াকূটে পিণ্ড দিলে অশ্বমেধ যজ্ঞেয়

ফললাভ ও ভস্মকূটে প্রণাম করলে পিতৃগণের উদ্ধার হয়। এখানে স্নান করলে মানব পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। মাতঙ্গ মুনির পদ শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি স্বর্গে যান।

মুনিসত্তম বশিষ্ঠ এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞ থেকে শিব আবির্ভূত হয়ে বশিষ্ঠকে বর দান করতে চাইলেন। বশিষ্ঠ বললেন–হে দেবাদিদেব! যদি আমার ওপর তুষ্ট হন তবে আপনি সব সময়ে এখানে থাকুন। শিব বললেন, "তথাস্তু। ধৈনুকারণ্যে স্নান নমস্কার ও পুজো করে কামধেনু পদে পিণ্ডদান করলে পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে যেতে পারেন। মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্বতের কাছে গয়ানজিতে কর্দমাল তীর্থ। এখানে শ্রাদ্ধ করলে পিতৃঋণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এখানে ফল্গুচণ্ডী, শ্মশানাক্ষী ও মঙ্গলা প্রভৃতির পুজো করতে হয়। গয়াতীর্থের সবক্ষেত্রেই জিতেন্দ্রিয় ঋষি ও দেবগণ রয়েছেন।

গয়াগয়, গয়াদিত্য, গায়ত্রী, গদাধর, গয়া এবং গয়ামুর–এই ছয় গয়া মুক্তি দায়িকা। যে মানব এই পুণ্য গয়া তীর্থ আখ্যান সবসময় পাঠ বা শ্রদ্ধার সাথে শোনে, সে পরমগতি লাভ করে। যে সমাহিত মনে গয়া মাহাত্ম্য অভ্যেস করে, হে নারদ! এই অভ্যাস দিয়েই তার রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়ে থাকে। যার গৃহে এই গয়ার পবিত্র উপাখ্যান আছে, সেই গৃহে শাপ, চোর ও আগুনের ভয় থাকে না। হে নারদ! ত্রিভুবনের যে সব তীর্থ আছে, সেই সব তীর্থই গয়ায় দেখা যায়। এই গয়া আখ্যান সম্বন্ধে আমি যা শুনেছি, সেই সমস্তই বললাম। সূত্র বললেন–সনৎকুমার, ভক্তি সহকারে মুনি পুঙ্গব নারদকে এইসব পুণ্য কথা নিবেদন করলেন, বিদায় নিয়ে নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

ব্রহ্মপুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ

উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

ব্রহ্মপুরাণের সৃষ্টির কথা

রাজসিক মহাপুরাণের মধ্যে ব্রহ্মপুরাণ একটি। পুরাকালে এক সময় প্রজাপতি দক্ষসহ বহু মুনি ঋষি পৃথিবীর রহস্য জানবার জন্য ব্রহ্মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনকেমন করে পৃথিবীর সৃষ্টি হল? পৃথিবীতে প্রাণীর সৃষ্টিই কেমন করে হল? কেমন করে কোন্ কোন্ স্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হল?

ভগবানের নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি। সেই ব্রহ্মাই এই জগতের সৃষ্টিকর্তা বিধাতা। কাজেই তিনি সকল সৃষ্টির রহস্য জানেন। কোন্ কোন্ রাজা কেমন প্রতাপশালী ছিলেন, কিভাবে রাজা প্রমাণ করতেন, কেমন করে পৃথিবী থেকে অত্যাচারীর বিনাশ হয়েছে, বহু বিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন। আর মুনি ঋষিদের কৌতূহল পূর্ণ জিজ্ঞাসায় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মদেব সৃষ্টির বিবরণ এসব ঋষিগণের সামনে প্রকাশ করেছেন। তাই এই পুরাণ ব্রহ্মপুরাণ নামে খ্যাত।

প্রথমে ব্যাসদেব এই ব্রহ্মপুরাণ রচনা করেন। তারপর তিনি তাঁর শিষ্য লোমহর্ষণকে শিশজ দেন। পরবর্তীকালে সেই লোমহর্ষণ সূত নৈমিষারণ্যে যজ্ঞাচারী সেই জ্ঞান দান করেন মুনিগণের সামনে এই পুরাণের কাহিনী যথাযথভাবে বর্ণনা করেন।

রাজা কুবলাশ্ব হলেন ধুন্ধুমার

সূর্যবংশের প্রথম ক্ষত্রিয় রাজা ইক্ষাকু। তিনি অযোধ্যার রাজা ছিলেন, এই বংশে বহু ধার্মিক, প্রতাপশালী। রাজা জন্মেছিলেন। আর স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্রও এই বংশেই অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এই বংশের এক প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। শ্রাবন্ত তার নামানুসারে ওই রাজ্যের নাম হল শ্রাবন্তীপুর। তার পুত্র বৃহদশ্ব। তিনি বহুকাল বীরদর্পে সম্মানের সঙ্গে রাজত্ব করলেন। তার সুশাসনের ফলে দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রজারাও সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করছে। ক্রমে তার বৃদ্ধকাল উপস্থিত হল। বৃদ্ধাবস্থায় সকলেরই ভগবানের প্রতি মন যায়। তারও তাই হল। রাজকার্য আর ভালো লাগে না। তাই গৃহাশ্রম ত্যাগ করবার কথা চিন্তা করলেন। তার পুত্র কুবলাশ্ব গুণ জ্ঞানে বীরত্বে যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েছে। কাজেই তিনি সেই পুত্রের হাতেই রাজ্যের ভার দিয়ে বনে গমন করবেন এমন নির্ণয় নিলেন।

পুরাকালে মানবজীবনে চতুরাশ্রমের প্রথা ছিল। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ আর সন্ন্যাস। রাজা বৃহদ ঠিক করলেন পুত্রের হাতে রাজ্য দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন। তাই একদিন রাজ্যের প্রজাসকল এবং মহামান্য মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে মহা জাঁকজমক সহকারে কুবলশ্বকে রাজসিংহাসনে বসানো হল। বানপ্রস্থে যাবার সময় সমুপস্থিত–এমন সময় মহর্ষি উতঙ্গ "মহারাজের জয় হোক"–বলে রাজসভায় উপস্থিত হলেন। যোগবলে বলীয়ান, মহাশক্তিধর

মহর্ষিকে দেখে বৃহদশ্ব একেবারে অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে মহাসমাদরে পাদ অর্ঘ্যাদি দিয়ে তাকে আপ্যায়ন করলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তার আগমনের কারণ কি?

তদুত্তরে মহর্ষি বললেন–আমি শুনলাম, তুমি নাকি বানপ্রস্থে যাবে?

রাজা বৃহদ বললেন–হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন ঋষিবর।

মহর্ষি বললেন–কিন্তু মহারাজ দেশে এখনও উপদ্রব আছে। একে সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব না করে আপনার বানপ্রস্থে যাওয়া উচিত হবে না।

উতঙ্গের কথা শুনে মহারাজ বৃহদশ্ব একেবারে অবাক।–সে কি! আমি তো চরমুখে জেনেছি যে আমার রাজ্যে কোথায় কোনো উপদ্রব নেই। হে মহর্ষি, আপনি বলুন আপনার তপস্যায় কি কেউ বিঘ্ন ঘটাচ্ছে?

ঋষি বললেন–আমি সমুদ্র তীরে আমার আশ্রমে বসে দীর্ঘকাল ধরে জপ-তপ করছি। জায়গাটি আমাদের পক্ষে বেশ মনোরম। এতাবৎকাল কোনও অসুবিধাই হয়নি। কিন্তু সম্প্রতি আমার সাধনায় বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। এবং আমার যোগশক্তিতে কোনো কাজ হচ্ছে না!

ঋষির কথা শুনে বৃহদশ্ব জিজ্ঞাসা করলেন–কে আপনার সাধনায় বাধা দিচ্ছে? আমাকে বলুন, আমি এখুনিই তাকে বিনাশ করব। কোথায় তার ধাম? কেমন করে উৎপাত করে আমাকে দয়া করে বিস্তারিত বলুন।

ঋষি বললেন–ধুপ নামে রাক্ষস, মধু রাক্ষসের ছেলে সে, তার অত্যাচারে ঋষিগণের সাধনা জপ-তপ সব লোপ পেতে বসেছে। যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব, এমন কি দেবতাগণেরও অবধ্য সেই ধুন্ধু। সমুদ্রের তীরে বালির নীচে সে থাকে। দেবতাদের বরে বলীয়ান হয়ে এমন মদমত্ত হয়ে উঠেছে যে, সে কাউকেই আর ভয় করে না। সবসময় সে সকলের ক্ষতি করতেই ব্যস্ত। তার প্রাসাদ থেকে বছরে একবার করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। এমন প্রবল বেগ তার নিঃশ্বাসে যে, সমুদ্রতীরের সব বালুর রাশি ঘূর্ণিঝড়ের মত পাক খেতে খেতে উপরে উঠতে থাকে। সূর্যের আলোকে সেই বালুরাশিকৃত ঘূর্ণিঝড় ঢেকে ফেলে। মনে হয় যেন অসময়ে সূর্য অস্ত গেল। আর ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠে পৃথিবী। দু-চার মিনিট বা দু-চার ঘণ্টা নয়, একেবারে সাতদিন সাতরাত ধরে এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার চলে। মহারাজ এর ফলেই সকলেরই ক্ষতি হচ্ছে মুনি ঋষিরাও বাদ পড়ছে না। সূর্যের আলো না-পেয়ে কৃষিক্ষেত্র বৃক্ষ অরণ্যের বৃক্ষরাজি সব শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। তার

ফলে ফসল, ফলমূল পুষ্পাদি কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না। আপনি ধর্মের রক্ষক, কাজেই এই অত্যাচারের প্রতিকার না করে আপনার বাণপ্রস্থে যাওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়।

মহর্ষি উতঙ্কের কথা মন দিয়ে সব শুনলেন রাজা বৃহদ। তারপর সবিনয়ে বললেন–হে মহর্ষি! এখন তো ফেরার আর উপায় নেই, আমি সংকল্পে স্থির এবং গমনেও প্রস্তুত হয়েছি। তবে আপনার তপস্যার যোগ-সাধনায় যাতে কোনও বিঘ্নও না ঘটে, সে ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করব। বর্তমানে আমার পুত্র কুবলাশ্ব এ রাজ্যের রাজা। বীর হিসেবে তার খ্যাতি আছে। আমি মনে করি, বীরত্বে কুবলাশ্ব আমার থেকে কোনও অংশে কম হবে না। সে নিশ্চয়ই ধুন্ধুকে বিনাশ করে রাজ্যে শান্তি রক্ষা করতে পারবে।

বৃহদশ্বের কথা শুনে মহর্ষি উতঙ্গ বললেন–মহারাজ, আমি যোগবলে জেনেছি ওই ধুন্ধু কেবল রাজশক্তির দ্বারা নিধন হবে না। দেববলে বলীয়ান ওই রাক্ষস। ওকে বধ করতে হলে আমার তপো শক্তি দিয়ে রাজশক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে হবে। তাই বলছিলাম, আপনি ধার্মিক, আপনিই পারবেন ওই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করতে।

বৃহদশ্ব বললেন–হে ঋষিবর, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। আপনার সাহায্যে আমার পুত্রই ওই রাক্ষসকে বধ করবে। তারপর তিনি তাঁর পুত্র কুবলাশ্বকে ডেকে বললেন–"শোন পুত্র, এই ঋষিবর যাতে নির্বিঘ্নে যোগ সাধনা আর তপস্যাদি করতে পারেন, সকল প্রজাগণের মন থেকে যাতে আতঙ্ক দূর হয়, তা তুমি প্রাণপণে সে চেষ্টা করবে। তুমি সেই পাপাচারী ধুন্ধু রাক্ষসকে বধ কর। বানপ্রস্থে আমি যাবার জন্য প্রস্তুত।

এই কথা বলে বৃহদশ্ব রাজপ্রাসাদ থেকে অরণ্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। বাকি জীবনটা তপস্যা করে কাটিয়ে দেবার জন্য। আর তাঁর পুত্র কুবলশ্ব পিতার আদেশ ও রাজার কর্তব্য, উভয়েই পালন করবার জন্য তার শত সংখ্যক বীরপুত্রকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। তারপর সেই সমুদ্রতীরে উতঙ্গ ঋষির আশ্রমে গেলেন, যেখানে ধুন্ধুকে পাওয়া যাবে।

কিন্তু কোথায়? কোনো রাক্ষসকে তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সেখানে মস্ত উঁচু বালির স্তূপ ছিল। কুবলাশ্ব তার পুত্রদের বললেন–সরিয়ে ফেল এই স্তূপ, খুঁড়ে ফেল সমুদ্রের খাত। খুঁজে বের কর কোথায় সেই রাক্ষস ধুন্ধু লুকিয়ে আছে।

ওদিকে আপন আশ্রমে বসে মহর্ষি উতঙ্ক বিষ্ণুর ধ্যানে রত। আহ্বান করছেন শ্রীহরিকে—এসো এসো হে সর্বশক্তিমান শ্রীহরি। তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। কুবলাশ্বকে দাও তোমার অমিত শক্তি। যাতে সে ধুন্ধুকে বিনাশ করতে পারে।

উতঙ্কের এই আকুল আহ্বানে বিষ্ণুর আসন নড়ে উঠল। তিনি স্মরণ করলেন তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা। তখন তিনি সবার অলক্ষেই কুবলাশ্বের শক্তিকে মহাতেজসম্পন্ন করে তুললেন।

আর এদিকে কুবলাশ্বের শত পুত্র বালি খুঁড়তে খুঁড়তে দেখতে পেল ধুন্ধুর বাসস্থান। আর কি সে আত্মগোপন করে থাকতে পারে? আক্রোশে ও ক্রোধে ভীষণ হুঙ্কার ছাড়ল সে।

কালবিলম্ব না করেই আক্রমণ করল কুবলাশ্বের পুত্রদের। একাই শত বীরের সঙ্গে সংগ্রামে মাতল, দেববলে মহাবলীয়ান সে! তার আক্রমণে একে একে সব বীরপুত্র ধরাশায়ী হতে লাগল। কাউকে তোয়াক্কা করে না সে রাক্ষস। প্রায় সকলেই যখন নিহত, কুবলাশ্বের শত পুত্রের মধ্যে তিনজন মাত্র জীবিত, এমন সময় ধুন্ধুর চোখ পড়ল কুবলাশের দিকে। তার চোখ দিয়ে যেন আগুনের ঝলক বেরিয়ে পড়তে লাগল। ছুটে চলল কুবলাশের দিকে।

এদিকে তখন কুবলাশ্ব কিন্তু বিষ্ণুর তেজে অমিত শক্তির অধিকারী। তারপর ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। ধীরে ধীরে ধুন্ধুর তেজ কমে এল। অবশেষে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ঋষি উতঙ্ক পরম আনন্দ লাভ করলেন। নিঃশঙ্ক হল সকল দেশবাসী। দেশে ফিরে এল আবার শান্তি। ঋষিবর কুবলাশ্বকে আশীর্বাদ করলেন। আর তাঁর যে সাতানব্বই জন পুত্র ধুন্ধুর হাতে নিহত হয়েছিল, তারা সকলেই ঋষির আশীর্বাদের প্রভাবে সদগতি লাভ করল। ধুন্ধুকে বধ করে কুবলাশ্ব “ধুন্ধুমার” নামে বিখ্যাত হলেন।

অপরাধ করে সত্যবত হলেন ত্রিশঙ্কু

সূর্যবংশের এক রাজা ছিলেন এয্যারুণ। তিনি পরম ধার্মিক এবং সুশাসক। তার রাজত্বকালে রাজ্যে কোন অনাচার কিংবা অশান্তিও ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র–সকল বর্ণের সকল প্রজাই নিজের বৃত্তি দ্বারা সন্তুষ্ট ছিল। রাজার শাসনে সবাই খুশি। সবাই শান্তিতে আছে কিন্তু স্বয়ং রাজার মনেই নেই।

রাজা এ্যারুণের একমাত্র পুত্র হল সত্যব্রত। ছোটবেলা থেকেই সে অধার্মিক প্রকৃতির হয়ে উঠল। অপরের ক্ষতিসাধন করা, অন্যের প্রতি হিংসা করা, কাউকে নির্বিঘ্নে থাকতে না দেওয়াই তার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। সব সময় অত্যাচারী মনোভাব। এমন প্রজাহৈতিষী রাজার পুত্র কেন এমন অত্যাচারী হল।

সকল পিতা চায় পুত্র গুণী হোক, যশস্বী হোক, খ্যাতি লাভ করুক। রাজা এয্যারুণও সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর মতই তার পুত্র হবেন সুশাসক। যাতে প্রজারা সুখে শান্তিতে থাকতে পারে। কিন্তু ধার্মিক রাজার হল এক কুলাঙ্গার পুত্র। রাজার সুখের স্বপ্ন দিন দিন দুঃস্বপ্নে পরিণত হল। মনমরা হয়ে গেলেন রাজা। তারপর ভাবলেন, যদি এক সুন্দরী মেয়ে দেখে এর বিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে বোধহয় স্বভাব পাল্টাতে পারে। রাজার কন্যার নাম সত্যবতী। অপূর্ব সুন্দরী। খুব বুদ্ধিমতীও। রাজা তাকেই পুত্রবধূ করে গৃহে আনলেন। মনে আশা করলেন এই পুত্রবধূই তাঁর স্বামীর সকল দোষ সংশোধন করতে পারবে।

কিন্তু বিয়ের পর থেকে পুত্র আর ঘরেই আসেনা। তার অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল। রাজ্যবাসী সকলে ভয়ে থাকে। চরের মুখে রাজা তার সব অনাচারের সব কথা জানতে পারেন। নিজেকেই তিনি ধিক্কার দেন। দেশের লোক তার কত প্রশংসা করে, তার ঘরে জন্ম নিল কিনা এমন পুত্র? বহু চেষ্টা করলেন পুত্রের মতি ফেরাবার জন্য। কিছুতেই কিছু হয় না। অবশেষে তিনি সেই পুত্রকে ধরে গুরুদেব বশিষ্ঠের কাছে নিয়ে গেলেন। আর তারই সম্মুখে তাকে যথেষ্টভাবে ভৎর্সনা করে বললেন–তুই রাজপুত্র হয়ে চণ্ডালের মত ব্যবহার করিস, তুই এখন থেকে ওই চণ্ডালদের সঙ্গেই বাস কর।

তখন থেকে চণ্ডাল পল্লীতেই থেকে গেল সেই রাজপুত্র সত্যব্রত। রাজার আর কিছুই ভাল লাগে না। ধর্মকে আশ্রয় করে সভাবে জীবন-যাপন করে অরণ্যাচারী জীবনকাল কাটিয়ে দেবেন। মনস্থির করলেন, বাকি জীবনটা বনে গিয়ে তপস্যা করেই কাটিয়ে দেবেন। এই চিন্তা করে একদিন রাত্রে কাউকে কিছু না জানিয়েই গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন।

রাজ্যহীন রাজ্য, তার মানে অরাজক দেশ। অত্যাচারে অনাচারে দেশ ভরে গেল। দেশে ধর্ম বলতে আর কিছু থাকল না। সেই সময় সূর্যদেবও কুপিত হলেন, প্রখর হয়ে উঠল তার তেজ। যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে দেশে। খাল, বিল, জলাশয় জলশূন্য হল, ক্ষেতের ফসল সব নষ্ট হয়ে গেল। গাছপালা সব শুকিয়ে গেল, দেশে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

রাজপুত্র যে চণ্ডাল পল্লীতে বাস করে, সেখান থেকে খুব কাছেই ঋষি বিশ্বামিত্রের আশ্রম। মাঝে মাঝে সত্যব্রত চলে যেত সেই ঋষির আশ্রমে। ঋষিকে দেখে সত্যব্রতের খুব ভালো লেগে গেল। ধীরে ধীরে তার মনে ঋষির প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হল।

রাজ্যে যখন এমন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হল, তার কিছুদিন পূর্বে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তপস্যা করবার জন্য চলে যান সাগরতীরে। এদিকে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে আশ্রমেও দেখা দিল প্রবল অনটন। কেমন করে সংসার চলবে? তখন ঋষিপত্নী তার মেজ ছেলেটির গলায় দড়ি বেঁধে একশত গাভীর বিনিময়ে বিক্রি করে দিলেন। গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় সেই ঋষিপুত্রকে ক্রেতা যখন নিয়ে যেতে উদ্যত, এমন সময় সেখানে সত্যব্রত উপস্থিত।

পুত্র বিক্রির ঘটনা দেখে তার মনে দয়া হল, তখন সে সেই ক্রেতার কাছ থেকে ছেলেটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার গলার বাঁধন খুলে দিল। আর ক্রেতার দেওয়া গাভীগুলিকেও ফিরিয়ে দিল। গলায় দড়ি বাঁধা ছিল বলে সেই ছেলেটির নাম হল গালব। এই গালব পরে কঠোর তপস্যার বলে একজন ঋষি হয়েছিলেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পত্নী-পুত্রদের কেমন করে চলবে? তারপর থেকে সত্যব্রত সেই ঋষির বাড়িতেই রয়ে গেল। তাদের অভাব দূর করার চেষ্টা করল। আর কোন অবস্থায় সত্যব্রত ঋষির পরিজনদের ছেড়ে যায় নি। নিজে অত্যাচারী হলেও তাদের সবসময় পালন করল।

দেশের সর্বত্রই দুর্ভিক্ষ। কিন্তু কোনো অভাব ছিল না বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে। কারণ তার ছিল একটি কামধেনু। সেই কামধেনুর কাছে যখন যা চাওয়া হত, সঙ্গে সঙ্গে সে তাই দিয়ে দিত। কিন্তু সত্যব্রত এই বশিষ্ঠ মুনিকে একেবারে সহ্য করতে পারত না। সে ভাবত, তার পিতা তাকে যে ত্যজ্য পুত্র করেছে, এর পিছনে ওই বশিষ্ট মুনিরই হাত আছে। তা যদি না হত, তাহলে তার বাবাকে মুনিবর নিষেধ করতে পারতেন। কিন্তু তা তো তিনি করেননি। তাই সত্যব্রত চেষ্টা করল প্রতিশোধ নেবার।

দুদিন হয়ে গেল কোনোভাবে খাদ্য জোটাতে পারল না সত্যব্রত। ক্ষুধার জ্বালায় নিজেও যেমন সে কাতর, তার চেয়েও বেশি! কাতর বিশ্বামিত্রের পরিজনদের দুদিন ধরে কোনও খাদ্য জোটাতে না পারায় মরিয়া হয়ে সত্যব্রত একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বশিষ্টের আশ্রমে গোপনে ঢুকে তার কামধেনুকে চুরি করে নিয়ে এল। তারপর তাকে মেরে মাংস রান্না করে সবাই খেল। দুদিন উপবাসী থাকার পর বিশ্বামিত্রের পরিজনেরা সেই মাংস খেয়ে খুশি হল।

সকালে উঠে বশিষ্ঠদেব দেখলেন তার কামধেনুটি নেই। তিনি ধ্যানযোগে জানতে পারলেন সত্যব্রতের এই কাজ। বড় শান্তশিষ্ট বশিষ্ঠ মুনি। কিন্তু তাঁর কামধেনুটি চুরি হওয়ায় তার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে অভিশাপ দিলেন–আজ থেকে তোর নাম আর সত্যব্রত থাকবে না। তুই তিন তিনটি অপরাধ (শঙ্কু) করেছিস। তোর নাম হবে ত্রিশঙ্কু। প্রথম অপরাধ হল, পিতার মনে অসন্তোষের সৃষ্টি করা। দ্বিতীয় অপরাধ, কুলগুরুর গো হত্যা আর তৃতীয় অপরাধ, যা খাদ্য হিসেবে গ্রাহ্য নয় তা ভক্ষণ করা।

সত্যব্রত নিজের কানে সেই অভিশাপ বাণী শুনল। কুলগুরু বশিষ্ঠের অভিশাপ–এতো ভঙ্গ হবার নয়। পাপকর্মের ফল তো ভোগ করতেই হবে। তার উপর সারাদেশে দুর্ভিক্ষ, কেমন করে এর প্রতিকার করা যায়–এই চিন্তা করতে করতে সেখান থেকে সে চলে গেল এক গভীর অরণ্যে। আত্মসংযম করে শুরু করল তপস্যা, ধ্যান, ধারণা আর মৌনব্রতও শুরু করল। বারো বছর ধরে কঠোর তপস্যা করল।

এর মধ্যে বিশ্বামিত্র সাগরতীর থেকে ফিরে এসেছেন। গৃহে ফিরে পত্নীর মুখে সব শুনলেন সত্যব্রতের কথা। খুব খুশী হলেন। বারো বছর পর সত্যব্রত ফিরে এলে বিশ্বামিত্র বললেন–ব

তোর কি চাই? তুই আমার পরিবারকে যেরূপে পালন করেছিস, তাতে আমি খুব খুশি হয়ে তোকে বর দিতে চাই। বল কি চাই?

এখন সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু, তিনি বললেন–আমার একটিমাত্র নিবেদন, আমি যেন সপরিবারে স্বর্গে যেতে পারি।

বিশ্বামিত্র বললেন–আমি তোকে তাই পাঠাব। তারপর পিতার সিংহাসনে বসলেন ত্রিশঙ্কু। বিশ্বামিত্র হলেন তার পুরোহিত। দেশে পুনরায় ধর্ম স্থাপিত হল, পূর্বে প্রজারা ভয়ে ছিল তা কেটে গেল। আবার পৃথিবীতে সুবৃষ্টি হল। ধরা আবার শস্যশ্যামলা হল। এইভাবে দীর্ঘকাল ধরে রাজ্য সুশাসনে রাখল ত্রিশঙ্কু। তারপর স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছা হলে, বিশ্বামিত্রকে জানালেন সে কথা। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তেজোবলে ত্রিশঙ্কু স্বর্গের দিকে এগোতে লাগল। কিন্তু বাধা দিলেন দেবতারা। মহা অপরাধী এই ত্রিশঙ্কু, এমন লোকের স্থান স্বর্গে হতে পারে না। ত্রিশঙ্কু ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে বিশ্বামিত্রের খুব ক্রোধ হল–আমার মত মুনিকে অবজ্ঞা? ঠিক আছে আমি এক নতুন স্বর্গ গড়ব। সেখানেই ত্রিশঙ্কুকে রাখব। যেমন কথা তেমনি কাজ। নতুন স্বর্গলোক সৃষ্টি করে ফেললেন। বোঝাই যায় না কোন্টা আসল আর কোন্টি নকল। তারপর সেই কৃত্রিম স্বর্গে ত্রিশঙ্কুকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

অপুত্রক সগর রাজা বহুপুত্রের পিতা হলেও তার দুঃখবৃদ্ধি

সূর্যবংশে বাহু নামে এক প্রবল শক্তিশালী রাজা ছিলেন। বহুরাজ্য হঠাৎ একদিন বিদেশি শত্রুরাজ্য দ্বারা আক্রান্ত হল। রাজা প্রস্তুত না থাকায় যুদ্ধে পরাজিত হলেন। তখন গোপনে রাজমহিষীদের নিয়ে চলে গেলেন বনে। গভীর অরণ্যে ঔর ঋষির আশ্রমে। মহাপরাক্রমী হয়েও পরাজিত হলেন সামান্য শত্রুদের কাছে। এই আত্মগ্লানিতে বাহুরাজা দিন দিন ক্ষীণ হতে লাগলেন। যদিও সপরিবার মহারাজ ঔর ঋষির আশ্রমে বিশেষ সমাদরেই ছিলেন। তথাপি মানসিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে একদিন তিনি দেহত্যাগ করলেন, তার এক মহিষী যাদবী স্থির করলেন স্বামীর চিতায় সহমরণে যাবেন। ঋষিবর ঔর জানতে পেরে তাকে বাধা দিলেন। বললেন–তোমার গর্ভে সন্তান আছে, এ অবস্থায় তোমার সহমরণে যাওয়া উচিত নয়।

ঋষির বাধা শুনে রাজমহিষী যাদবী বললেন–আমার গর্ভের মধ্যে সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে। আমার এক সতীন খাবারের সঙ্গে বিষ প্রয়োগ করে ছিল। তাতে কি আর গর্ভের সন্তান বাঁচে? সাত আট বছর হয়ে গেল তাই সন্তান প্রসব হল না।

রাজমহিষীর আশঙ্কার কথা শুনে ঋষি ধ্যানের দ্বারা সকল ঘটনাবলী জানতে পারলেন না। রানির গর্ভের সন্তান মারা যায়নি। তারপর কিছুদিন পরে সেই আশ্রমেই যাদবীর গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। ঔর ঋষি তার নাম রাখলেন সগর। "গর" মানে বিষ। বিষের সঙ্গেই তার জন্ম, তাই সগর।

ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল সগর। ঋষিবর তাকে পুত্রের মতই স্নেহ করতেন। আর নানাপ্রকার শাস্ত্র শিক্ষা-দীক্ষা পাঠ দিলেন। অসাধারণ তার প্রতিভা, অল্পদিনের মধ্যে সব শাস্ত্র পাঠ করে পণ্ডিত হয়ে উঠল রাজপুত্র। যুদ্ধবিদ্যাতেও দক্ষ হলেন, বহু আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার শিখলেন সগর। ক্ষত্রিয় রাজার পুত্র সগরও ক্ষত্রিয়। ক্ষাত্র ধর্মে বীর্যবান হয়ে উঠলেন ঔর ঋষির আন্তরিক প্রচেষ্টায়।

এদিকে সগরের মনে চিন্তা এল–তিনি তো বংশজাত ক্ষত্রিয়, তাহলে ঋষির আশ্রমে কেন? কে তার বাবা? কোথায় তার দেশ? কেনই বা মায়ের সঙ্গে অরণ্য মধ্যে আশ্রমে বাস করছেন তিনি? মাঝে মাঝে এই প্রশ্ন মায়ের কাছে করতেন। কিন্তু মা কিছুই বলেন না, চুপ করেই থাকেন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে খুব কাঁদেন। মাঝে মাঝে খুব জিদ ধরতেন সগর, এইসব প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্য। তখন তার মা একই উত্তর দেন। বলেন–এখন নয় বাবা, সময় হলে সব জানতে পারবে।

এখন সেই সময় এসেছে সগরকে সব জানাবার। একদিন ঋষি ঔর সগরকে সকল কথা জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে সগরের অন্তরে জেগে উঠল ক্ষত্রিয় তেজ। আর কালবিলম্ব নয়। অল্প কিছু সৈন্য সঙ্গে নিয়ে চললেন আপন পিতৃরাজ্য উদ্ধার করবার জন্য। তার শিক্ষা আগ্নেয়াস্ত্র সকল কখনও বিফল হল না, অল্পক্ষণের মধ্যেই হৈহয় ও তলিজঙ্ঘ বংশ ছারখার হয়ে গেল। পুনরায় পিতৃ-সিংহাসনে বসে রাজ্য পরিচালনা করলেন সগর। পিতা বাহুর মতই তিনি সুশাসক হলেন। প্রজাবৃন্দ সকলেই খুশি। প্রজাদের সকল দুঃখের অবসান হয়েছে। দিনে দিনে সমৃদ্ধ হল তাঁর রাজ্য।

সমগ্র রাজ্য যখন মহাসুখে ভাসছে, রাজা সগরের মনে কিন্তু সুখ নেই। তিনি নিঃসন্তান। তার দুই রানি একজন কৌশিকী। অন্যজন সুমতী। কারো গর্ভে কোনও সন্তান হল না। সেই দুঃখে রাজা সগর সারাক্ষণ চিন্তাগ্রস্ত থাকেন। একদিন এক ঋষি তার প্রাসাদে এলেন। রাজা তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্যে সমাদরে পূজা করলেন। ঋষি সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করতে চাইলেন। রাজা বললেন–আমার কোন সন্তান নাই। সেই দুঃখই আপনি মোচন করুন। আপনি আমাকে এক পুত্র আর ষাট হাজার কন্যা দান করুন।

ঋষি বললেন–তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে। তোমার যখন দুই ভার্যা। তাহলে একজনের গর্ভে জন্মাবে এক পুত্র, অন্যের গর্ভে জন্মাবে ষাট হাজার কন্যা।

কৈশিনী প্রথমে এগিয়ে এসে বলল–আমার গর্ভে এক পুত্রই হোক। সুমতি আর কি করবে! অগত্যা ষাট হাজার কন্যার জননী হতে হবে।

অন্নদান, বস্ত্রদান, স্বর্ণদান, গাভীদান অপেক্ষা কন্যাদান শ্রেষ্ঠ। তাই ঋষির কাছে ষাট হাজার কন্যা প্রার্থনা করেছিলেন মহারাজ সগর। কিন্তু সুমতির সে ইচ্ছা নয়। সেও চায় পুত্রের জননী হতে। সগর রাজা যজ্ঞ করলেন। সে যজ্ঞের চরু কৈশিকী অর্ধেক খেল এক পুত্রের আশা করে আর সুমতি খেল ষাট হাজার পুত্রের বাসনায়।

ঋষির বাক্য কখনও মিথ্যা হবার নয়। যথা সময়ে কৈশিনীর গর্ভে এক পুত্রের জন্ম হল। নাম রাখলেন অসমঞ্জ। আর সুমতি প্রসব করলেন একটি লাউ। কান্নায় ভেঙে পড়ল সুমতি। সগরেরও মন খুব খারাপ হল। ঋষির বাক্য মিথ্যা হল। এমন সময় হল আকাশবাণী–এই লাউটিকে অবহেলা করে ফেলে দিও না। ওর প্রতিটি বীজ থেকে জন্ম নেবে একটি করে পুত্র।

সেই আকাশবাণী শুনে সগর বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করলেন, আমি চেয়েছিলাম কন্যা। কিন্তু এই লাউ থেকে জন্ম নেবে পুত্র? তখন রানি সুমতি বলল–মহারাজ আমি চরু পান করবার সময় পুত্রের বাসনাই করেছিলাম।

আসলে ইন্দ্রের কৌশলে এমন ব্যাপার ঘটেছে। দেবরাজ ইন্দ্র ভেবেছিলেন, সগর রাজা যখন ষাট হাজার কন্যাকে পাত্রস্থ করবে অর্থাৎ বিবাহ দেবে, সেই কন্যাদানের পুণ্যে হয়তো স্বর্গের ইন্দ্রপদ লাভ করবে। তাই ইন্দ্র সরস্বতাঁকে পাঠিয়ে সুমতির কণ্ঠে বসিয়ে চরু খাওয়ার সময় কন্যার পরিবর্তে পুত্রের কামনা করেছিলেন। যাই হোক, সেই লাউ গরম জলে পরিচর্য্যা করতে এক এক করে ষাট হাজার পুত্রের জন্ম হল। যে প্রাসাদ এতদিন ছিল সন্তানশূন্য সেই প্রাসাদ এখন অসংখ্য পুত্রের হাসি-কান্না, চপলতাতে ভরে উঠল। আনন্দে রাজাও দুই রানির মন ভরে উঠল। রাজার সব অবসাদ দূর হয়ে গেল। পিতা-মাতার স্নেহ যত্নে বড় হতে লাগল সেই পুত্রসন্তানগণ। এদিকে বিধাতার ললাটলিখন বিচিত্র!

সগর রাজার গৃহে আবার দুর্ভাগ্য নেমে এল! বড় ছেলে অসমঞ্জ। এই অসমঞ্জ পূর্বজন্মে যোগ্য ছিলেন। কিন্তু অসৎ সঙ্গ হেতু যোগ হতে বিচলিত হন তিনি। এই জন্মে জাতিস্মর হওয়ায় নানান নিন্দিত কর্মের জন্য জনগণের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। ক্রমে ক্রমে অসমঞ্জ যৌবনপ্রাপ্ত হলে রাজা তার বিবাহ দিলেন। একটি পুত্র জন্মাল তথাপি তার স্বভাবের পরিবর্তন হল না। এমনকি শিশুদেরকেও হত্যা করতেও তার বাঁধত না। তিনি নির্বিচারে শিশুদের ধরে সরযূ নদীর জলে ফেলে দিতেন। তার ব্যবহার দেখে তাকে সগর রাজা

নির্বাসিত করলেন। অন্য দিকে বাকি ষাট হাজার পুত্রও সকলেই বড় ভাই-এর অনুগামী। সকলেই নিষ্ঠুর, নির্মম, খল, প্রতারক। তাই সগর রাজার মনে এত দুঃখ। ভাবলেন–এমন পুত্র থাকার থেকে না থাকাই ভালো।

অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান। তার ব্যবহার কিন্তু পিতার ঠিক উল্টো, সে পরম ধার্মিক, সর্বজন হিতে রত। সকলের প্রতি তার করুণা। এমন নাতি পেয়ে রাজাও ফিরে পেলেন মনের আনন্দ। ইতিপূর্বে বহুবার তিনি যজ্ঞ করেছেন। আর একবার যজ্ঞ করলে শতযজ্ঞ পূর্ণ হবে তার। তাই খুশিতে সব আয়োজন করলেন। যজ্ঞের অশ্বকে ছেড়ে দেওয়া হল পৃথিবী পরিক্রমার জন্য, আবার দেবরাজ চিন্তা করলেনআমি নিজে শত যজ্ঞ সাধন করে ইন্দ্রত্ব লাভ করেছি। এই সগর রাজা যদি শত যজ্ঞ পূর্ণ করতে পারে, তাহলে আমাকে হারাতে হবে স্বর্গের সিংহাসন। তাই তিনি স্থির করলেন, যেভাবেই হোক সগরের এ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করতে দেওয়া হবে না। তখন তিনি কৌশলে যজ্ঞের অশ্বটিকে হরণ করে মহর্ষি কপিলের আশ্রমে লুকিয়ে রাখলেন।

সগর রাজা এই যজ্ঞের অশ্বকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছিলেন তার ষাট হাজার পুত্রের উপর। তারা যজ্ঞের অশ্ব না দেখতে পেয়ে চারিদিকে খুঁজতে লাগল। শেষে তারা সেই অশ্বকে কপিল মুনির আশ্রমে দেখতে পেল। মনে ভাবল–এই মুনি অশ্ব চুরি করেছে। তাই তারা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সেই মুনিকে মারবার জন্য উদ্যত হল। কপিল মুনি ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। সহসা চোখ মেলতেই তারা সকলেই ভস্মীভূত হয়ে গেল।

যিনি শুদ্ধসত্ত্ব মূর্ত্তি, যিনি স্বীয় দেহের দ্বারা জগতকে পবিত্র করেন। তার কি কখনও ক্রোধ হতে পারে? সর্বজ্ঞ পরমাত্মার স্বরূপ সেই কপিলদেবের শত্রুমিত্ররূপা ভেদ দৃষ্টি কিরূপ সম্ভৃত হতে পারে? অতএব সগরের পুত্রগণ নিজেদের অপরাধের ফলেই ভস্ম হয়েছে।

সগর রাজা কিন্তু জানতে পারলেন না তার পুত্রদের বিষয়। বহুদিন পরে দেবর্ষি নারদ এসে সব জানালেন তাকে। সগর রাজা মনে ভাবলেন, তাদের ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তিই তারা পেয়েছে। তারপর তিনি তার নাতি অংশুমানকে কপিলদেবের আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন যজ্ঞের ঘোড়া ফিরিয়ে আনার জন্য। বালকের ব্যবহারে কপিলদেব মহাখুশি। ফিরিয়ে দিলেন যজ্ঞের ঘোড়া। আর সগররাজ্যের পুত্রদের উদ্ধারের উপায়ও বলে দিলেন। স্বর্গের গঙ্গাকে মর্ত্যে আনতে পারলে ভস্মীভূত সকলেই গঙ্গাজল স্পর্শে পাপ মুক্ত হবে। ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে এসে সগর রাজাকে দিলেন অংশুমান। যজ্ঞ শেষ হল। তারপর অংশুমানের নাতি ভগীরথ বহু তপস্যা

করে গঙ্গাকে মর্ত্যধামে আনলেন। ভারতবর্ষ পবিত্র হল। সেদিন যদি সগর রাজার পুত্রেরা অপরাধ না করত, আমরা ত্রিভুবন তারিণী গঙ্গাকে ভারতবর্ষের ভূমিতে পেতাম না।

গঙ্গার প্রতি শিবের ভালোবাসায় উমার ক্ষোভ ও গণেশের নিকট দুঃখ মোচনের প্রার্থনা, গৌতমের অতিথিসেবা, গণেশের কৌশলে গৌতম মুনির দ্বারা মর্ত্যধামে গঙ্গাকে আনয়ন ও উমার স্বস্তি।

গঙ্গার দুই ধারা একটি বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষে সাগরসঙ্গমে এসে মিশেছে। তার নাম ভাগীরথী, সগর বংশধর ভগীরথ বহু তপস্যা ও সাধনার বলে স্বর্গধাম থেকে গঙ্গাকে মর্ত্যধামে এনেছিলেন বলে, তারই নামে গঙ্গার এই নাম হয়েছে।

গঙ্গার অপর ধারা হিমালয় থেকে নেমে বয়ে গেছে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ দিক দিয়ে। মহর্ষি গৌতম দীর্ঘকাল বহু তপস্যা করে গঙ্গার এই দ্বিতীয় ধারাকে মর্ত্যে এনেছিলেন বলে তারই নামানুসারে গঙ্গার নাম হল গৌতমী বা গোদাবরী।

হিমালয়ের কন্যা পার্বতী বহু কঠোর তপস্যা করে লাভ করেছেন মহেশ্বরকে। সব নারীরা স্বামীকে ভালোবাসে কিন্তু পার্বতী যেন সবার উপরে। মহেশ্বর পার্বতীকে খুব ভালোবাসেন। কিন্তু গঙ্গার প্রতি মহেশ্বরের আকর্ষণ যেন একটু বেশি। এক মুহূর্তও তিনি গঙ্গাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। এতে পার্বতীর অন্তরে খুব ক্ষোভ। হাজার হোক সতীন তো। পার্বতী ভাবে কিভাবে স্বামীর কাছ থেকে গঙ্গাকে সরিয়ে নেওয়া যায়।

দেবদেব মহাদেব, চতুর্দশ ভুবনে কোথায় কি হচ্ছে, সবই তার জানা। কাজেই গঙ্গার প্রতি উমার যে ক্ষোভ তা শিবের অবিদিত নেই। উমাও যেমন মুখে কিছু না বলে কেবল অন্তরে জ্বলে পুড়ে মরতেন, শিবও তেমনি কাউকে এ ব্যাপারে কিছু বলতেন না। চোখের সামনে থাকলে পাছে পার্বতীর রাগ আরও বেড়ে যায়, তাই তিনি করলেন কি, গঙ্গাকে নিজের বিশাল জটার মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন।

যেমন শঙ্কর, তেমনি শঙ্করী। শিবের চালাকি ধরতে উমার বেশি সময় লাগল না। তখন তিনি রাগে ক্ষোভে একেবারে অস্থির হয়ে সরাসরি তিরস্কার করে বসলেন মহাদেবকে। সতীন আমার চক্ষুশূল, তাকে কিনা মাথায় তোলা? ভেবেছ আমি কিছু বুঝি না? এইরূপে নানান কথায় শিবকে ভৎর্সনা করলেন। কিন্তু তিনি তো ভোলা মহেশ্বর। পার্বতীর এমন ভৎর্সনা শুনেও মুখে

কিছু বললেন–না। হাসি হাসি মুখে সব সহ্য করে নিলেন। তারপর পার্বতীর সঙ্গে এমনভাবে কথাবার্তা বললেন–যে, তাতে তার মন একেবারে জুড়িয়ে গেল।

তারপর কিছুদিন ভালোয় ভালোয় কাটল। কিন্তু আবার যে কে সেই। সতীন গঙ্গার প্রতি বিদ্বেষ স্বামীর উপর ক্ষোভ, সব মিলে যেন পুড়ে মরতে বসেছে দেবী অম্বিকা। সখী জয়ার কাছে বসে কত কাঁদেন। কিন্তু কেঁদে কি ফল হবে? তারপর অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করলেন, এই ব্যাপারটা যদি তার দুই ছেলের কাছে বলেন তাহলে তারা কোনও একটা সুরাহা করতে পারে। কার্তিক বড় একরোখা, তার কাছে লড়াইটাই যেন সব সমস্যার সমাধান করে দেবে এই মনে করে। কিন্তু গণেশ, তার অতীব প্রখর বুদ্ধি আছে। কৌশল করে সব সমস্যা মিটাতে তার মত দক্ষ কে আছে? তবে দেখে মনে হবে নিরীহ, গোবেচারা,-যেন কিছুই জানে না, তার উপর কোন কাজের দায়িত্ব দিলে, সে নিশ্চয় চুপিসারে তা সমাধান করবেই করবে। পাছে কার্তিক কোন কাণ্ড ঘটিয়ে বসে, তাই উমা গণেশকেই ডেকে বললেন–গঙ্গাকে যেমন করে তোক শিবের সঙ্গ ছাড়া করতে হবে। শেষে তিনি গজাননকে এও বললেন–গজানন তুমি যদি এ কাজে সফল না হতে পার, তাহলে আমি কিন্তু এই কৈলাস ত্যাগ করে আবার হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করব।

সতীনের জন্য স্বামীর উপর রাগ করে মা যদি চলে যান, সেটা কি ভালো দেখাবে? বিশেষ করে দুইজন উপযুক্ত ছেলে থাকতে? তাই গণেশ বললেন–মা, তুমি কোন চিন্তা করো না, তোমার আদেশ আমি কখনও অমান্য করিনি। আজও করব না। তবে একটা কথা আমাকে তুমি কোন একটা যুক্তি বলে দাও। যাতে করে ক্ষমা এখান থেকে চলে যেতে পারে।

পার্বতী কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন–আমি মনে মনে একটা উপায় চিন্তা করেছি। তোমার পিতা তপস্যার দ্বারা সহজেই তুষ্ট হন, কোন সৎ ব্রাহ্মণ যদি কঠোর তপস্যায় শিবকে তুষ্ট করতে পারে তখন তিনি বর দিতে উদ্যত হবেন, সেই সুযোগে তপোকারী ব্রাহ্মণ যদি গঙ্গাকে প্রার্থনা করেন, তখন মহেশ্বর তাকে সেই বর না দিয়ে থাকতে পারবেন না।

মায়ের কথা শুনে গণেশ বললেন–ঠিক আছে, তাই আমি করব। কিন্তু তার আগে যদি আমরা দুই ভাই বাবাকে একবার বুঝিয়ে সে ব্যবস্থা করতে পারি। তাহলে সহজেই কাজ মিটে যায়।

গণেশের মুখে এমন কথা শুনে উমা বললেন–না, না তাতে কোন ফল হবে না। আমি তাকে বহুবার বলেছি, এমনকি তিরস্কারও করতে ছাড়িনি কিন্তু তাতে কোন ফল হয়েছে কি?

সেই সময় একটানা চৌদ্দ বছর পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি দেখা দিল। মাঠ, ঘাট, পুকুর খাল, বিল সব শুকিয়ে গেছে। দেখা দিল প্রবল দুর্ভিক্ষ! মানুষ কুখাদ্য খেতে শুরু করল, তার ফলে নানান ব্যাধির স্বীকার হল মানুষেরা। মরতেও লাগল প্রচুর। বিধাতার সৃষ্টি বুঝি লোপ পেয়ে যায়।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মনে ভীষণ চিন্তা, এভাবে সৃষ্টি লোপ পেলে কি হবে? তখন তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে ঘুরতে এসে দেবগিরিতে উপস্থিতি হলেন এখানেই ছিল মহর্ষি গৌতমের আশ্রম। সর্বত্র অনাবৃষ্টি, সব নির্মুল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গৌতমের আশ্রমে তার কোন ছায়া পড়েনি। নানা ফুলে ফলে লতায় সুশোভিত এই আশ্রম। জলের কোন অভাব নেই। সেই দেবগিরিতেই ব্রহ্মা যজ্ঞ শুরু করলেন, তারপর থেকে দেবগিরির নাম হল ব্রহ্মগিরি। সেই অনাবৃষ্টির সময় মহর্ষি গৌতম যজ্ঞ করে চলেছেন এক মনে। ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল গৌতমের খ্যাতি, দলে দলে সবাই আসতে লাগল সেই আশ্রমে। সকলকেই ঋষিবর সমাদর করলেন, সকলের আকাঙ্ক্ষা তিনি পূরণ করতে লাগলেন, স্বর্গলোকেও তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

গণেশও শুনলেন গৌতমের কথা। মনে মনে মায়ের দুঃখের অবসানের উপায়ও স্থির করে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে উমার কাছে গিয়ে বললেন–মা, আর তোমাকে কোনও চিন্তা করতে হবে না। আমি মহর্ষি গৌতমকে দিয়েই তোমার কাজ হাসিল করে দেব। উমা হাত তুলে তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন।

এই কথা বলেই ছদ্মবেশ ধরে মায়াকে নিয়ে চললেন গৌতমের আশ্রমে। দেখলেন সেই সুন্দর আশ্রমটিকে। কি অপরূপ, তার তুলনাই হয় না। কোন কিছুরই অভাব নেই। কত অতিথি আসছে, সমাদর, খাওয়া, দাওয়া সব ব্যবস্থাই যথাযথ ভাবে হচ্ছে।

আশ্রমের পাশে ব্রাহ্মণবেশী গণেশ যখন এই সব দেখছেন আর আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন–কেমন করে সম্ভব একজন মানুষের পক্ষে একসঙ্গে এতগুলো কাজের দেখাশুনা করা?

যাগযজ্ঞের বিরাম নেই। কারো কোথাও কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা, সব দিকেই লক্ষ্য করছেন মহর্ষি গৌতম। তিনি সহসা দেখতে পেলেন ব্রাহ্মণবেশী গজাননকে। তাড়াতাড়ি তাদের কাছে এসে সমাদরে ডেকে নিয়ে গেলেন আশ্রমের ভিতর। তারপর পাদ অর্ঘ্যাদি দিয়ে সেবা করলেন।

গণেশ কিন্তু খুঁজছেন মুনির ছিদ্রপথ, মুনি কোনও অপকর্ম করেন কিনা, দেখতে লাগলেন। কিন্তু না, দিনের পর দিন যায়, মুনির কোনও ছিদ্র গণেশ দেখতে পান না। ইতিমধ্যে আশ্রমের মুনিদের সঙ্গে গণেশের খুব ভাব হয়ে গেল, সবাই তাকে ভালোবাসে তার মিষ্টি ব্যবহারের জন্য। কিন্তু গণেশের সবসময় চেষ্টা মুনির ছিদ্রান্বেষণ করা, অনেক চেষ্টা করেও মুনির কোনরূপ অনাচার খুঁজে পেলেন না। তাহলে কি মায়ের দুঃখ দূর করা যাবে না? মা যে আশীর্বাদ করেছেন, তার আশীর্বাদ কি বিফল হবে?

এইভাবে চিন্তা করতে করতে গজানন একটা মতলব এঁটে সকল অতিথি মুনিগণকে বললেন– আমরা অনেক দিন হল এই আশ্রমে আছি। মহর্ষি গৌতম ও আমাদের সমাদরে নিত্য নিত্য আহারাদি যোগাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের কি উচিত হচ্ছে, এভাবে বসে বসে অলসভাবে শুধু খাওয়া-দাওয়া আর ঘুমিয়ে কাটান? মুনিবরকে এভাবে ব্যতিব্যস্ত করা আমাদের ঠিক হয়নি। এবার আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত।

অতিথি ত্রিশের কথা মুনিদের মনে ধরল। সত্যই তো বহুদিন হয়ে গেল তারা এখানে এসেছেন। মহর্ষি গৌতমের কোন রকম বিরক্তি নাই, সবসময় যখন যেমন কাজ ঠিকঠাক ভাবে করে চলেছেন, কিন্তু মুনিদের একটা বিবেক বোধ থাকা উচিত, এতদিন ধরে একজনের উপর এত কাজের ভার দেওয়া উচিত নয়। গণেশের যুক্তি সবাই এক বাক্যে স্বীকার করলেন।

তারপর সবাই মিলে গৌতমের কাছে গিয়ে বললেন–আমরা এতদিন আপনার আশ্রমে রইলাম। আপনার সঙ্গ পেয়ে আমরা খুব খুশি। এখন আমরা যে যার নিজের আশ্রমে যাই।

তাদের কথা শুনে গৌতম মনে খুব কষ্ট বোধ করে বললেন–আপনাদের হয়তো আমি ঠিকমত সেবা করতে পারছি না। যতটুকু করেছি, তাতে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি। আপনারা আমাকে এই সেবা থেকে বঞ্চিত করবেন না।

গৌতমের এমন কথা শুনে মুনিরা আর কি বলবেন? বলার আর কিছু নাই? থেকেই গেলেন গৌতমের আশ্রমে। গণেশের প্রথম কৌশল ব্যর্থ হল। আবার চিন্তা করলেন গণেশ, কি করা যায়? এই মুনির কাছে অতিথিরা এত প্রিয়। আমিও বিঘ্নরাজ, তোমাকে ছাড়ছি না আমি। যেমন করেই হোক তোমাকে বিপদে ফেলবই। তোমার মত ব্রাহ্মণকেই আমার চাই। মায়ের দুঃখ মোচন–আর কারও দ্বারা সম্ভব হবে না। এবার তিনি ভেবে স্থির করলেন, গৌতম মুনিকে কোন পাপকর্মে ফেলতে পারলে অতিথি মুনিরা তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাতে আমার কাজও সিদ্ধ হবে।

একদিন পার্বতীর প্রধান সহচরী জয়া ছদ্মবেশে সেই মুনির আশ্রমে এলেন। তখন তাকেই ডেকে গণেশ বললেন–এবার আমি একটি কৌশল করেছি, সেটি সাধন করতে তোমাকে বিশেষ প্রয়োজন, তুমি একটি রুগ্ন গাভীর বেশ ধরে গৌতম মুনির সবুজ ক্ষেতের উপর গিয়ে যেন ফসল নষ্ট করছে, এমন ব্যবহার করবে, তখন মুনিবর গিয়ে তোমাকে লাঠি দিয়ে তাড়াতে যাবে। তুমি সামান্য আঘাতেই মাটিতে এমনভাবে পড়বে যেন মরে গেছ। তারপর আমি যা করার করব। দেখবে এবারে আর বাছাধন রেহাই পাবে না। এবার আমার কৌশল সিদ্ধ হবেই হবে।

আশ্রমের কাছেই মুনির সুন্দর ধানের ক্ষেত। পৃথিবীর সর্বত্র অনাবৃষ্টি হলেও মুনির আশ্রমে চালের অভাব নেই। খুব ভালো ফসল হয়েছে। মুনি নিজেই সেই ক্ষেত দেখাশুনা করেন। সবুজ ক্ষেত দেখে মাঝে মাঝে কয়েকটা গাভী আসে তৃণের লোভে। মুনি কিন্তু তেমন কিছু বলেন না। হেট-হাট করে তাড়িয়ে দেন। কোনও দিন প্রহার করেন না। কারণ গোরুকে প্রহার করা মহা পাপ! সেদিন এসেছে। গাভীর রূপ ধরে জয়া, প্রথমে মুনি মুখে শব্দ করে সেই গাভীকে ক্ষেত থেকে তাড়াবার অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু গাভীর সে দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তাই দেখে মুনি কয়েকটি বড় ঘাস তুলে সেই গাভীর গায়ে মৃদু আঘাত করলেন। তাতেই সেই গাভী আর্তনাদ করে সেই ক্ষেতের উপরেই লুটিয়ে পড়ল। যেন প্রবল প্রহারের ফলেই গাভীর এমন দশা হয়েছে, গৌতম মুনি এমন দেখে তো অবাক!

সেই গাভীর আর্তনাদ শুনে গৌতমের আশ্রমের অতিথিরা সকলেই ছুটে এলেন। ছদ্মবেশী গণেশও এলেন। সবাই দেখলেন, একি হল, একটা গাভী মরে পড়ে আছে, কে এমন করে মারল? গৌতমের হাতে তখনও সেই একমুষ্টি ঘাস ধরা। সবাই বুঝতে পারলেন এই গৌতমের আঘাতেই গাভীটির এমন দশা হয়েছে। গাভী হত্যা মহাপাপ, এর পরে কি আর গৌতমের অতিথি হয়ে থাকা চলে? তার দেওয়া অন্ন আর গ্রহণ করা চলেনা।

সবাই মুনির আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত, তা দেখে মুনিবর তাদের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে বললেন,–দোহাই আপনাদের, আমাকে এ ভাবে মহাপাপের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যাবেন না। আমি কীভাবে এই মহাপাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি বলুন। আপনাদের উপদেশমত আমি প্রায়শ্চিত্ত করব। আপনাদের সেবা করার সুযোগ থেকে আমাকে এইভাবে বঞ্চিত করবেন না।

সেখানে শোরগোল বেঁধে গেল। ব্রাহ্মণবেশী গণেশের মনে খুশির আমেজ। এগিয়ে এলেন বিনায়ক। সহানুভূতির সঙ্গে সেই অতিথিদেরকে বললেন–আপনারা কেমন স্বভাবের বুঝতে পারছি না, যাঁর অন্নে এতদিন পেট ভরিয়েছেন, তিনি আজ একটু বিপদে পড়েছেন, তার জন্য কি আপনাদের মনে একটুও দয়ার উদ্রেক হল না? এ আপনাদের কেমনতর আচরণ!

ব্রাহ্মণের কথা শুনে মুনিদের চেঁচামেচি থেমে গেল। গৌতমমুনি যেন একটু আশ্বস্ত হলেন। তখন গম্ভীরভাবে ব্রাহ্মণ বললেন–এই গাভীকে মেরে মুনিবর পাপ করেছেন ঠিকই, তার জন্য তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি আছেন। তাহলে আমি একটি প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতে পারি। তা আপনারা শুনে যদি সমর্থন করেন আর ঋষি গৌতম যদি তা পালন করতে স্বীকার করেন, তাহলে আমি তা বলব।

তখন ঘাড় নেড়ে সবাই ব্রাহ্মণের কথায় সম্মতি জানালে গণেশ বললেন–আমরা শুনেছি ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে পবিত্র গঙ্গা ছিলেন। তারই একটি ধারা শিবের জটার মধ্যে আছে। এই মহাপাপী গৌতম যদি সেই জলধারা এখানে এনে এই স্থানটিকে ধৌত করে দিতে পারে, তবে তার সব পাপ দূর হয়ে যাবে। তখন আর আমাদের থাকার অসুবিধা হবে না।

মুনি আশ্রমস্থিত অতিথিগণ ব্রাহ্মণের কথায় সমর্থন জানালেন, আর গৌতম তা পালনে সম্মত হলেন। কাজটি সহজ নয়, বরং বেশ দুরূহ, তথাপি তাকে করতেই হবে, তা না হলে তিনি মহাপাপ থেকে মুক্তি পাবেন কেমন করে।

সব মিটমাট হয়ে গেল, মুনিগণ যে যার স্থানে এসে বসলেন, কিন্তু মুনিবর গৌতম ভেবে পেলেন না, কেমন করে সম্ভবপর হল এই গাভীর মৃত্যুর ব্যাপার। সামান্য তৃণের আঘাতে কি কেউ মরে? সঠিক তথ্য জানবার জন্য মুনি ধ্যানে বসলেন। মনের ভারটা যেন হালকা হল, আসলে তিনি গাভী হত্যা করেননি। সবই ছদ্মবেশী গণেশ দেবতার কৌশল। কাউকে কিছু না বলে তিনি গণেশ প্রদত্ত সেই গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন, পাপ হোক বা না হোক, গঙ্গা মর্ত্যধামে এলে পৃথিবীর তো মঙ্গল হবে, দেবী পার্বতীর মনেও সুখ হবে।

তারপর ব্রহ্মগিরি থেকে মহামুনি গৌতম কৈলাসে গিয়ে হর-পার্বতীর স্তুতি করলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে হর-পার্বতী দিব্য রূপে দর্শন দিয়ে বললেন–গৌতম তুমি কি জন্য আমাদের এত স্তুতি করছো? আমরা উভয়েই খুব সন্তুষ্ট, কি প্রার্থনা তোমার বল, নিশ্চয় পূরণ করব।

ঈশ্বরের কথায় খুব খুশি হয়ে গৌতম মুনি বললেন–যদি আমার প্রতি আপনি তুষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য আপনার মস্তকে অবস্থিত মর্ত্যে আগমনের আদেশ গঙ্গাকে দিন, মহেশ্বর গৌতমকে গঙ্গাকে দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। মহা উৎসাহে গৌতম গঙ্গাকে নিয়ে চললেন। নানা পথ অতিক্রম করে গঙ্গাকে নিয়ে এলেন ব্রহ্মগিরিতে, আকাশ থেকে দেবতাগণ সব পুষ্প বৃষ্টি করলেন। সবাই গৌতম ঋষির প্রশংসা করলেন, আর সতীনের গমনে পার্বতীও প্রীত বোধ করলেন।

ব্রহ্মগিরি গঙ্গার জলে পবিত্র হল। তারপর গঙ্গা গৌতম মুনিকে বললেন– ঋষিবর, তোমার মহাপাপের ক্ষেত্রকে আমি আমার জলের দ্বারা পবিত্র করে দিয়েছি। আমার কর্তব্য শেষ, এবার আমি ফিরে যাব কৈলাসে।

গঙ্গার কথা শুনে ঋষিবর হাত জোড় করে বললেন–মাগো, পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য আমি তোমাকে শিবের কাছ থেকে প্রার্থনা করে এনেছি। তিনিও আমাকে সেই উদ্দেশ্যে তোমাকে দান করেছেন। আপনার ফিরে যাওয়ার তো কথা ছিলনা। আপনাকে এখানেই চিরকাল থাকতে হবে। খুব বিনয়ের সঙ্গে কথাগুলি বললেন–গৌতম, ফেলতে পারলেন না। গঙ্গাদেবী গৌতমের কথা এবং খুশি হয়েই রয়ে গেলেন মর্তে। তারপর গঙ্গা ব্রহ্মগিরি থেকে বিভিন্ন ধারার ছড়িয়ে পড়লেন বিভিন্ন দিকে।

কপোত কপোতীর অতিথি সৎকার ও ব্যাধের দিব্যজ্ঞান

দেবগিরির বর্তমান নাম ব্রহ্মগিরি। সেখানে এক ব্যাধ বাস করত। তার খুব নিষ্ঠুর স্বভাব ছিল। তার সামনে পশুপাখি কেউ পড়লে আর রক্ষা পেত না। এমনকি সাধু সন্ন্যাসীদেরও মেরে ধরে যার কাছে যা পেত তাই কেড়ে নিত। তার ছেলে মেয়ে বাবাও তেমনি স্বভাবের।

সেই ব্যাধ একদিন শিকারে বেরোল। বেরিয়ে সেদিন সে অনেক শিকার পেল। তির ধনুক দ্বারা সে বহু পশু বধ করল। মাটির উপর খাবার রেখে তার উপর জাল পেতে রেখে দিল। খাবারের লোভে অনেক পাখি সেই জালে এসে ধরা পড়ল। সব পাখিগুলিকে জাল থেকে ছাড়িয়ে খাঁচায় বন্দি করল সে। মনে ভাবল, আজ অনেক অর্থ মিলবে এত পাখি আর পশু বিক্রি করে।

দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেল। এবার ফেরার সময় হয়েছে। খিদেও তার পেয়েছে, আপাততঃ জল না হলে তার চলছে না। কিন্তু গভীর বনের মধ্যে জল কোথায় পাবে? তার

এক কাঁধে মরা পশুর ঝকা আর এক কাঁধে পাখির খাঁচা নিয়ে সে বাড়ি যাচ্ছে, তখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে। তার বাড়ি উত্তর দিকে। এই চিন্তা করে সে চলছে। কিন্তু এ পথ সে তো দেখেনি। কতদিন ধরে সে এই বনে শিকার করতে আসছে। কিন্তু আজ তার এমন হল কেন? পাও আর চলছে না। খিদে ও তেষ্টার জ্বালাও সে আর সহ্য করতে পারছে না। সন্ধে হয়ে এল, না আজ বাড়ি ফেরা হবে না। অন্ধকারে পথঘাট দেখা যাচ্ছে না। সে একটা বিশাল গাছের গোড়ায় বসে পড়ল। দুই কাঁধের ঝাঁকা আর খাঁচা নামিয়ে রাখল মাটিতে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে একেবারে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তাই গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সেই গাছের ডালে অনেক পাখি বাস করত এবং সেখানে এক কপোত দম্পতি বাস করত। সেদিন কপোত খাবারের খোঁজে বের হয়নি। কপোতী একাই গিয়েছিল কিন্তু সন্ধে হল তবু কপোতী ফিরে আসছে না কেন? খুব চিন্তা কপোতের মনে। কোনো বিপদ হয়নি তার। অনেকদিন সে একাই যায় আবার ফিরে আসে। কিন্তু আজ ফিরে এলো না কেন? যদি তার কিছু হয়ে যায়, তাহলে আমারও বেঁচে থেকে লাভ নেই।

বাসায় বসে কথাটা ভুলে গিয়েছিল। কারোর মুখ থেকে খাবার ছিনিয়ে নেওয়ার মত পাপ আর হয় না। কবে কে কার শিকার হবে কে বলতে পারে? সবই অদৃষ্ট। এই ভাবনায় কপোত যখন ব্যাকুল হয়ে পড়েছে হঠাৎ শুনতে পেল কপোতীর গলা। সে বলছে, আমি জানি, ঠিক সময়ে না ফিরলে তুমি উতলা হয়ে পড়বে। কিন্তু কি আর আমি করব বল? আজ যে ব্যাধের জালে ধরা পড়েছি তাহলে কেমন করে আমি বাসায় ফিরব?।

কপোত কপোতীর কথা শুনে চমকে উঠল, তুমি কোথায়?

কপোতী বলল, আমি এই গাছের নীচেই আছি, কথা শুনে কপোত নীচে নেমে এলো দেখল-তার কপোতী জালে বন্দি আর সেই ব্যাধ গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। কপোতের প্রাণটা কেঁদে উঠল কপোতীর জন্য। কপোতাঁকে বলল-কপোতী, তুমি এক কাজ কর, আমি জালের মুখটা ঠোঁট দিয়ে খুলে দিচ্ছি, তুমি বেরিয়ে এস। ব্যাধটা তো ঘুমোচ্ছে। সে কিছু জানতে পারবে না।

কপোতী বাধা দিয়ে বলল–না না, তুমি এমন কাজ করো না। আমরা হলাম ব্যাধের খাদ্য আমাদের খেয়েই এরা বেঁচে থাকে। আর আমাকে সে খুব কষ্ট করে ধরেছে। তুমি যদি এখন জালের মুখ খুলে দাও, আর আমি বেরিয়ে যাই, ব্যাধ যখন দেখবে যে তার জলের মুখ খুলে সব পাখি বেরিয়ে গেছে, তখন সে হতাশ হবে তাই বলছি এমন কাজ করো না।

কপোতীর কথা শুনে কপোত বলল–তাই বলে আমার কাছ থেকে তোমাকে ব্যাধ নিয়ে চলে যাবে, আর আমি বসে বসে দেখব, আমার সামর্থ্য থাকতে আমি আমার স্ত্রীকে রক্ষা করব না, এ কি হয়? তুমি কি বলছ?

কপোতী বলল–তুমি আমাকে খুব ভালোবাস। তাই এমন কথা বলছি। তুমি আমাকে জালে বন্দি দেখে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গেছ। একটু চিন্তা করে দেখ তো আমাদেরকে তুমি যদি মুক্ত করে দাও তাহলে ব্যাধের সংসার চলবে কি করে? ভেবে দেখ, ভগবান ওদেরকে সংসার চালানোর এমন ব্যবস্থাই দিয়েছেন। আজ আমারও ভাগ্যে ছিল ওর শিকার হবার। আমাকে পেয়ে ওদের যদি একটা দিন চলে সেটা তো আমার সৌভাগ্য, আমার এই নশ্বর দেহটা অন্যের সেবায় লাগলে আমি ধন্য হব, ব্যাধের খাদ্য হয়েই তো আমরা জন্মেছি। তার কাছ থেকে খাবার ছিনিয়ে নেওয়া তোমার উচিত নয়।

কপোতীর মুখে এমন কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল কপোত কপোতী ঠিক বলছে। আসলে ব্যাধের জালে আজ সেই কপোতীও বন্দি হয়ে ছিল, এখন বৃক্ষতরে কপোতাঁকে জালবন্দি দেখে কপোত হাহাকার করে বলে উঠল-কপোতী, তুমিই আমাকে বল, এখন আমি কি করব?

কপোতী বলল–স্বামী, তোমার ঘরে আজ ব্যাধ অতিথি হয়ে এসেছে, অতিথির সেবা করা পরম ধর্ম, বেচারা আজ সারাদিন খুব পরিশ্রম করে বড় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি ওর আহারের জন্য ব্যবস্থা কর। আজ সারাদিন বেচারা কিছু খায়নি।

কপোত বলল–তুমি তো জান, আমাদের ঘরে খেতে দেবার মত কিছু নেই।

কপোতী বলল–তুমি এখন একটু আগুনের ব্যবস্থা কর। কপোত সঙ্গে সঙ্গে এক এক করে শুকনো পাতা জড় করে দিল ব্যাধের সামনে। কিন্তু আগুন পাবে কোথায়? ডানা মেলে আকাশে উঠল, দেখল দূরে কারা যেন আগুন জ্বেলেছে, তখন সে এক টুকরো জ্বলন্ত কাঠ ঠোঁটে নিয়ে এসে ওই জড় করা শুকনো পাতার উপর দিল, জ্বলে উঠল আগুন।

তখনো ঘুমোচ্ছে সেই ব্যাধ, কিছুক্ষণ পর তার ঘুম ভাঙলো। সামনে আগুন দেখে অবাক হয়ে চমকে উঠলো, কেমন করে আগুন এল এখানে। তার আঁকায় মরা পশুগুলো সব ঠিক আছে সব খাঁচায় বন্দি পাখিগুলোও ঠিক আছে। ব্যাধ কিছুই বুঝতে পারলো না।

তারপর কপোতী কপোতকে ডেকে বলল–এখন তুমি ওই খাঁচার মুখ খুলে দাও। ওই আগুনে আমার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অতিথির খিদে মিটাই। কপোত তার কথায় বাধা দিয়ে বলল–আমি থাকতে তুমি কেন? তুমি তো বন্দি আর অতিথি এখন আমার। তাই আমিই ওই আগুনে প্রাণ দিয়ে অতিথির সেবা করব। এই বলে সেই কপোত সঙ্গে সঙ্গে সেই আগুনের ওপর পড়ে গেল। ব্যাধ এই দৃশ্য দেখে একেবারে অবাক। তখন কপোতী ব্যাধকে বলল–তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, স্বামী যখন প্রাণ দিয়েছে, আমি তার স্ত্রী হয়ে কেমন করে বেঁচে থাকব? স্বামীর সঙ্গে আমিও মরতে চাই।

কপোতীর কথা শুনে ব্যাধ যেন কেমন হয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত খাঁচার মুখ খুলে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে খাঁচা থেকে কপোতী বেরিয়ে সেই আগুনের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ব্যাধকে বলল–তুমি আমার ছেলেপুলেদের বধ করো না। পতির শোকে কপোতী তার পরেই ঝাঁপ দিল আগুনের উপরে।

সামান্য একটা পাখির এমন ব্যবহার দেখে নিষ্ঠুর ব্যাধও একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। তার বুকেও যেন কষ্ট হতে লাগল। দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। মনটা যেন হাহাকার করে উঠল। নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিল খুব। একটা কপোত কপোতীর হৃদয়ে যে উদারতা যে সহানুভূতি, আর সে কিনা মানুষ হয়ে তার এতটুকুও গুণ নেই। এবং সে আকুল হয়ে উঠল তার মন, খাঁচায় সব পাখিদের ছেড়ে দিল সে। আর তার ঘরে ফিরে যাওয়া হল না।

শাপগ্রস্ত দেবতা রাজা শূরসেনের পুত্রের সর্পরূপে জন্মলাভ, ভোগবতীর সঙ্গে বিবাহ। গোদাবরীতে স্নানে শাপমুক্তি

বহুকাল পূর্বে প্রতিষ্ঠান পুর নামে এক সমৃদ্ধশালী নগর ছিল, সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন শূরসেন। মহা প্রতাপশালী তিনি। একটি বিষয় ছাড়া সকল দিক থেকেই সুখী তিনি। তিনি অপুত্রক। এই একটি মাত্র তার দুঃখ ছিল। তার এই বিশাল রাজ্য ভবিষ্যতে কে শাসন করবে? যৌবন গেল? কাল গেল। আর ক'দিন বা বাঁচবেন? দুশ্চিন্তায় রাজার দিন কাটতে থাকে। এমন সময় তার স্ত্রী গর্ভবতী হলেন। খবরটা শুনে রাজার মনে আর আনন্দ ধরে না। তারপর যথা সময়ে রানির একটি সন্তান জন্ম নিল। দাসী এসে রাজাকে খবর দিল কিন্তু মনে তার কোনো আনন্দ নেই। খবর শুনেই রাজা ছুটে চললেন অন্দরমহলে। গিয়ে দেখেন সবাই চুপচাপ, সকলের মুখ শুকনো। তারপর রাজা একেবারে কাছে গিয়ে দেখল–একটা ছোট সাপ। রাজা অবাক হলেন। রানির গর্ভে জন্মালো একটা সাপ!

রাজার ছেলে হলে এমনিতে ধুমধাম পড়ে যায়। কিন্তু আজ গোটা রাজ্যে সবাই চুপ। কারো মুখে কোনো কথা নেই। রাজা রানি বুঝতে পারছেন না, কি করবেন এই সাপের বাচ্চাকে নিয়ে? ফেলে দেবেন, না পুষবেন? অবশেষে রাজা ঠিক করলেন রাজার ছেলে হয়ে যখন জন্মেছে, তখন থাক, ওকে বড় করে তোলা হোক। তার পর যা হবার হবে, সবই আমার অদৃষ্ট।

সাধ্যমত পরিচর্য্যা হল তার। দিন যায় শিশু সাপ বড় হয়। অন্দরমহলের একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাকে রাখা হয়। আহারাদির কোনো ত্রুটি নাই। সেই ঘরেই খেলে বেড়ায় আপন মনে। মা বাবা মাঝে মাঝে দেখতে যায় তাকে। আর যার উপর পরিচর্যার ভার আছে সে তো যাবেই, অন্য আর কেউ তেমন তার কাছে ঘেঁসে না, যদি কামড়ে দেয়।

দেখতে দেখতে দিন কেটে গেল। বেশ হৃষ্টপুষ্ট হল সেই সাপ, রাজবাড়ির দামী দামী খাবার খেয়ে। একদিন সর্পপুত্রকে দেখে ফিরে যাচ্ছেন রাজা, সহসা শুনলেন মানুষের কণ্ঠে কে যেন বলছে–বাবা, একটু দাঁড়ান, আমি রাজপুত্র এখনও আমার নামকরণটা হলনা, আর হল না আমার কোনো সংস্কারও, বাবা তুমি আমার জন্য এই সব ব্যবস্থা কর।

কথা শুনে রাজা অবাক হয়ে যায়। এখানে এই সাপ ছাড়া আর তো কেউ নেই। তাহলে কি এই সাপই মানুষের মত কথা বলছে? তখন তিনি সাপের কাছে গিয়ে তার গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন, আর সাপও মনের আনন্দে দুলতে লাগল।

তারপর রাজা রাজপুরোহিতকে ডেকে এনে ক্ষত্রিয় বিধান মতে সেই সাপের সকল সংস্কার করালেন, নাম রাখলেন নাগেশ্বর।

মানুষের কণ্ঠে সাপ যখন কথা বলতে পারে, তাহলে এই সাপ নিশ্চয় শাপভ্রষ্ট কোনও ব্যক্তি হবে। এই চিন্তা করে তার ঘরে সুন্দর খাটের উপর সুন্দর বিছানা পেতে দেবার ব্যবস্থা করলেন রাজা।

আরো কয়েকটা বছর কেটে গেল, প্রতিদিনের মত রাজা পুত্রকে দেখতে গেলেন। একদিন দেখলেন পালঙ্কের উপর তার পুত্র বেশ সুখেই শুয়ে আছে, ফিরে আসবেন, এমনসময় আবার সেই মানুষের কণ্ঠে বলল-বাবা আমার বয়স হয়েছে, আমি এখন যুবক। কাজেই আমার বিয়ের ব্যবস্থা কর।

নাগেশ্বরের কথা শুনে রাজা বিস্মিত, কেমন করে এই সাপের বিয়ে হবে। সাপের বিয়ে হবে সর্পিণীর সঙ্গে, কিন্তু উপযুক্ত সর্পিণী পাব কোথায়? কে না চায় পুত্রের বিয়ে দিয়ে ঘরে পুত্রবধূ আনতে? মনে মনে রাজা বুঝতে পেরেছেন, এ সাপ কোন সাধারণ সাপ নয়, কিন্তু কোন্ অদৃষ্ট বলে এমন সাপের আকৃতি, কে বলবে?

রাজা নাগেশ্বরকে বললেন–বাবা, তোমার আমি বিয়ের ব্যবস্থা করছি, কিন্তু কোথায় পাব তোমার মেয়ে, কে তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে?

পিতার কথা শুনে নাগেশ্বর বলল–বাবা আপনি রাজা, আপনি ইচ্ছা করলে সবই পারেন, চেষ্টা করুন নিশ্চয় সফল হবেন।

শূরসেন মহাচিন্তায় পড়লেন। সাপকে কি কোনও নারী বিয়ে করতে চাইবে? তখন তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কিন্তু মন্ত্রীরা কি বলবেন? সাপের বিয়ে। কেউ কি কখনো শুনেছে?

রাজা বললেন–যেমন করেই হোক আপনারা আমার পুত্রের জন্য একটি সুলক্ষণা কন্যা এনে দিন। মন্ত্রীরা কোন দিন নাগেশ্বরকে দেখেনি। রাজার আদেশ পালন করতেই হবে। মন্ত্রীরা একসঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। কিন্তু কুল-কিনারা কিছু খুঁজে পেলেন না। ভাবতে ভাবতে সহসা এক বৃদ্ধ মন্ত্রী বললেন–পূর্বদেশে বিজয় নামে এক রাজা আছে, তার আটজন পুত্র আর একমাত্র কন্যা। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। যদি তিনি কন্যা দিতে রাজি হন। রাজাকে মন্ত্রীরা এই বিষয় জানালে রাজা প্রচুর অলংকার উপঢৌকন দিয়ে সসৈন্যে সেই মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন বিজয় রাজের কাছে।

পার্ষদের সঙ্গে বিজয়রাজ বসে আছেন রাজসভায়, এমন সময় শূরসেনের মন্ত্রী সেই সব উপঢৌকন তাকে দিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। রাজা শুরসেনের নাম ডাক ছিল। তার নাম শোনা মাত্রই বিজয় রাজা খুব উৎসাহের সঙ্গে মন্ত্রীবরকে বসবার আসন দিলেন। এবং তার আসার কারণ জানতে চাইলেন।

উত্তরে মন্ত্রী বললেন–আমাদের রাজার একমাত্র পুত্র নাগেশ্বর, যদি আপনার কন্যার বিয়ে দেন তার সঙ্গে, তাই রাজামশাই আমাকে পাঠিয়েছেন। রাজার পুত্র যে সাপ, সে কথা কিন্তু তারা বললেন না।

মন্ত্রীর মুখে এই কথা শোনামাত্র বিজয়রাজ পরম আনন্দে বলেন উঠলেন–আমার পরম সৌভাগ্য যে শূরসেনের পুত্রবধূ হবে আমার কন্যা। আমার কন্যা ভাগ্যবতী বলতে হবে।

শুভ সংবাদ নিয়ে মন্ত্রী প্রতিষ্ঠা নগরে ফিরে গিয়ে রাজাকে সব বললেন। রাজা কিন্তু চিন্তায় পড়লেন, কেমন করে পুত্রের বিয়ে দেবেন। পুত্রের কাছে গিয়ে সব বললেন রাজা, তখন নাগেশ্বর রাজাকে বিবাহের কৌশল বলে দিল। রাজা বললেন–মন্ত্রীকে। মন্ত্রী আবার চললেন, বিজয়রাজের কাছে গিয়ে বললেন–হে রাজন, আমাদের রাজকুমার নিজে এসে বিয়ে করতে পারবেন না। বিশেষ অসুবিধায় পড়েছেন।

মন্ত্রীর কথা শুনে বিজয়রাজ বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। এও কি সম্ভব, বর আসবে না বিয়ে করতে, তাহলে বিয়ে হবে কেমন? কোনও কারণে যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে কন্যা বরের বাড়িতে যাবে সেখানেই না হয় বিয়ে হোক।

মন্ত্রী বললেন–না বিয়ে এখানেই হবে, রাজকুমারের তেমন ইচ্ছা। কুমার বলেছেন ক্ষত্রিয় আমরা, পাত্রী যখন স্থির, তখন কোনো কারণে পাত্র না গেলেও অস্ত্র কিংবা শস্ত্র কিংবা অলংকার যাকে হোক পাত্র হিসাবে ধরে মালা বদল করালেই হবে। হে রাজা, আপনি রাজকুমার নাশেশ্বরের কোন অস্ত্রের সঙ্গে শুভ লগ্নে আপনার কন্যার মালাবদল করুন। আমরা সমাদরে মহা ধুমধামে বধূমাতাকে নিয়ে যাব।

অগত্যা সেই ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হলেন বিজয়রাজ। অস্ত্রের সঙ্গে মালা বদল হল তার কন্যা ভোগবতীর। নানা অলংকারে সাজিয়ে বিশাল ধুমধামের সঙ্গে শোভাযাত্রা সহকারে চতুর্দোলায় চড়িয়ে শূরসেনের রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হল ভোগবতাঁকে। অন্দরমহলের এক সুন্দর সজ্জিত গৃহে তাকে রাখা হল। পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হল। অনেক দাসী তার দেখা শোনায় থাকল কিন্তু যাঁর জন্য এ বাড়িতে আসা সেই স্বামী কোথায়? তাকে তো দেখা যাচ্ছে না। তিনি কি বিদেশে না মৃগয়ায় গেছেন? এক এক করে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। রাজকুমারের দেখা নেই, এই বিষয়ে কেউ কিছু বলছে না। ভোগবতী সাহস করে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করছে না। ভোগবতী নিজের ঘরে বসে মনে মনে চিন্তা করছে।

এদিকে নাগেশ্বর থাকে তার নিজের ঘরে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দেখা হয় না, কেউ কাউকে চেনেও না। একদিন রানিমা নাগেশ্বরের ঘরে গেল তাকে দেখতে, মাকে দেখে নাগেশ্বর বলল–তোমরা আমার বিয়ে করা বউকে ঘরে আনলে কিন্তু বউ আমার কাছে আসে না কেন?

রানিমা জবাব দিতে পারলেন না। বউমা যাতে কষ্ট না পায় তাই তাকে সবাই মিলে যুক্তি করে ঠকিয়েছে। যখন সে জানতে পারবে তার স্বামী একটি সাপ, তখন সে বাঁচবে কেমন করে? যদি কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলে? এই ভেবেই এতদিন তাঁকে স্বামীর কথা কেউ বলেনি। কিন্তু এখন ছেলে যে বউ দেখতে চাইছে, কি করি এখন?

রানি তখন তাঁর খাস দাসীকে ডেকে পাঠাল, তাকে ভাল করে বুঝিতে ভোগবতীর ঘরে পাঠিয়ে দিল। স্বামীর পরিচয় এমনভাবে পুত্রবধূর কাছে বলতে হবে যাতে করে সে নাগেশ্বরকে দেখামাত্র উদ্ভ্রান্ত হয়ে না পড়ে।

সেই দাসী ভগবতীর কাছে গিয়ে নানা গল্পসল্প করার সময় বলল–এতদিন বিয়ে হয়েছে তোমার, এই প্রাসাদে একা একা থাকতে হচ্ছে, স্বামীর সঙ্গে দেখা নেই, স্বামীর সঙ্গে দেখা করার জন্য মনটা ছটফট করছে, তা আমরা নিশ্চয় বুঝি, তাই এলাম তোমাকে বলতে, তুমি মহা ভাগ্যবতী মা, তোমার স্বামী একজন শাপভ্রষ্ট দেবতা, তার তুলনা হয়না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে মানুষের আকৃতি না ধরে একটি সর্গের আকৃতি ধরে জন্ম নিয়েছে। এই প্রাসাদেই থাকে রাজকুমার। যেহেতু সাপের মূর্তি তার, তাই সে সকলের সামনে বের হয়না, তুমি কি তোমার সেই স্বামীকে একবার দেখতে যাবে?

দাসীর মুখে স্বামীর কথা শুনে স্বামীকে দেখবার জন্য ভোগবতীর প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। আর বলল–সৌভাগ্য না থাকলে মানুষের ভাগ্যে কি দেবতা স্বামী জোটে? আমি নিশ্চয় আমার স্বামীকে দেখতে যাব। তার পরিচর‍্যা করব।

রানিমার কাছে দাসী এসে সব কথা বলল। দুচোখ জলে ভরে এল রানিমার। তারপর পুত্রবধূকে নিয়ে রানিমা নাগেশ্বরের ঘরে এলেন। প্রথমে সাপ দেখে একটু ভয় পেলেও দ্বিধা, সংকোচ কাটিয়ে নাগেশ্বরের দিকে এগিয়ে এল ভোগবতী। রানিমা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন। মন প্রাণ দিয়ে স্বামীর সেবা করতে লাগল ভোগবতী।

একদিন অনেক রাত্রিতে পালঙ্কে শুয়ে আছে নাগেশ্বর ও ভোগবতী। সমগ্র রাজমহল নিশ্চুপ। সহসা নাগেশ্বর ভোগবতাঁকে বলল–এতদিন আমি তোমারই অপেক্ষায় এই শরীর নিয়ে আছি, ভোগবতী এখন তুমি আমাকে মুক্ত কর।

সাপ কথা বলছে দেখে ভোগবতী অবাক হয়ে গেল–হে স্বামী, তুমি কি বলছ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

নাগেশ্বর বলল–ভোগবতী, তোমার কি মনে নেই? আমি কিন্তু পূর্ব জন্মের কথা ভুলিনি। মনে করে দেখ, তুমি আমার পূর্বজন্মে স্ত্রী ছিলে। কৈলাসে শঙ্করের কাছে থাকতাম। একদিন পার্বতীর সঙ্গে মহেশ্বর কি একটা বিষয়ে নিয়ে হেসে উঠছেন দেখে আমিও হাসি চেপে রাখতে পারিনি। তখন আমাকে হাসতে দেখে মহেশ্বর ক্রোধভরে অভিশাপ দিলেন, তুই আমার কথায় হেসেছিস, যা তুই মানুষের ঘরে সাপ হয়ে জন্মাবি।

মহাদেবের অভিশাপ বাণী শুনে আমি বুঝলাম, গুরুজনদের গোপন কথা শুনে কি অপরাধই বা করেছি আমি। তখন আমি মহেশ্বরের চরণতলে লুটিয়ে পড়ে বললাম–প্রভু আমার বড় অন্যায় হয়েছে, তাই আপনি আমাকে শাপ দিলেন, কিন্তু দয়া করে বলুন কেমন করে আমি শাপ থেকে মুক্ত হব?

মহেশ্বর দয়া করে বললেন–বিবাহ করার পর গোদাবরীতে স্নান করলে নরদেহ লাভ করবে। ভোগবতী এবার আমি তোমার দ্বারা শাপমুক্ত হব।

নাগেশ্বরের কথা শুনে ভোগবতীর পূর্বজন্মের সব কথা স্মরণ হল, গোপনেই দুজন চলে গেল দণ্ডকারণ্যে, পবিত্র গোদাবরীর জল যেই না ডুব দিল নাগেশ্বর, সঙ্গে সঙ্গেই অন্যরূপ, অন্যরূপ মানবদেহ, রাজপুত্রই বটে, এক দিব্য যুবক। ভোগবতী স্নান করল সেই গোদাবরীতে। তারপর দুজনে মিলে ভক্তির সঙ্গে মহাদেবের পূজা করল। তারপর গোপনেই ফিরে এল রাজপ্রাসাদে।

প্রভাতে উঠে ভোগবতী এক দাসীর সাহায্যে রাজা ও রানিকে ডেকে আনল। বললেন–দেখুন মা, আপনাদের পুত্র পালঙ্কের উপর শুয়ে আছে, পুত্রকে দেখে তাদের আনন্দের সীমা নেই। নাগেশ্বর পিতা মাতার চরণে প্রণাম করল। তারপর বললেন–পিতা, এবার আমাদের বিদায় দিন, আমরা ছিলাম কৈলাসবাসী, শিবের শাপে আমি সর্পরূপে জন্মগ্রহণ করেছি আপনার ঘরে, এখন শাপমুক্ত হয়েছি। কাজেই এবার বিদায় দিন, আমরা শিবলোকে ফিরে যাই।

দুঃখের সঙ্গে রাজা শূরসেন বললেন–না বাবা, তা কেমন করে হবে? আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আর যে কদিন আমার জীবন আছে, আমি বানপ্রস্থাশ্রমে কাটাতে চাই, তুমি এই রাজ্যের ভার নাও। তুমি রাজ্য পরিচালনা কর। তারপর যখন সময় হবে পুত্রের হাতে রাজ্য দিয়ে তুমি ইচ্ছামত স্থানে যেতে পারবে।

পিতার বাক্য লঙ্ঘন করতে পারল না নাগেশ্বর। প্রতিষ্ঠানপুরে রাজ সিংহাসনে বসে পরম আনন্দে প্রজাপালন করতে লাগলেন। আর তার শাসনে সমৃদ্ধ হল তার রাজ্য।

দিতির ত্রিভুবন বিজয়ী সন্তান লাভের অভিলাষ, কশ্যপের উপদেশে ব্রত ও গর্ভধারণ, ইন্দ্রের দ্বারা। গর্ভচ্ছেদন এবং উনপঞ্চাশ মরুতের সৃষ্টি, দিতির পুত্র হল দেবতা–

কশ্যপের অনেক পত্নী, তাদের মধ্যে প্রধান তিনজন, অদিতি, দিতি আর দনু। অদিতির পুত্ররা দেবতা, দিতির পুত্ররা দৈত্য আর দনুর পুত্ররা দানব। দেবতারা শান্তশিষ্ট, নম্র, বিনয়ী ধীর আর দৈত্য-দানবরা হল খল, কুটিল, অনাচারী, হিংস্র, দেবতাদের ঠিক বিপরীত। একই পিতার সন্তান হয়ে বিপরীত স্বভাব। সবসময় দেবতা আর দৈত্য-দানবের মধ্যে গণ্ডগোল লেগেই থাকত। কখনো কখনো মারামারি করতেও ছাড়ত না। অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধও বাধে। মাঝে মাঝে সবার পিতা কাশ্যপ চুপ করে থাকেন, এ বিষয়ে কাউকে কোন কথাই বলেন না।

বিদ্যা-বুদ্ধিতে দেবতারা অনেক উন্নত। দৈত্য-দানবরা মহাশক্তিধর। কিন্তু দেবতাদের বুদ্ধির জোরে দৈত্য-দানবরা শক্তিশালী হয়েও প্রায় পরাজিত হত। তাই দিতি আর দনুর মনে শান্তি নেই। অদিতির ছেলেদের সবাই সুখ্যাতি করে, শ্রদ্ধা ও সমীহ করে। সেইজন্য অদিতির মনে না জানি কত অহংকার।

ছেলেদের সুখ্যাতি হলে সকল মায়েরই অন্তর আনন্দে ভরে ওঠে। পুত্রদের জন্য অদিতির মনে ছিল সেই আনন্দ। কিন্তু দিতি আর দনু, সেই আনন্দকেই অহংকার ভেবে নিয়ে অন্তরের মধ্যে জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল।

অদিতির এই অহংকার আর সুখ কিভাবে নষ্ট করা যায়, তার উঁচু মাথাটা কিভাবে মাটিতে লুটিয়ে দেওয়া যায়–গোপনে সেই চিন্তাই করতে লাগল দিতি আর দনু। এমন সময় হঠাই সেখানে এসে হাজির নারদ। বললেন–মায়েরা, তোমরা কি চিন্তা করছ আমি জানি। এসব নিয়ে কেন নিজেদের কষ্ট বাড়াচ্ছ? পুণ্যকর্ম না করলে কি মনের মত ফল পাওয়া যায়? তোমরা আমার কথা যদি বুঝতে না পার তাহলে তোমাদের স্বামীদেবতা কাশ্যপকেই জিজ্ঞাসা করলে তো তিনিই তোমাদের বলবেন, এই বলেই দেবর্ষি নারদ সেখান থেকে চলে গেলেন।

দিতি আর দনু নারদের কথা ঠিকমতো বুঝতে পারল না। স্বামী কশ্যপকে জিজ্ঞাসাও করল না! নিজেরাই পরামর্শ করতে লাগল, দনু দিতিকে বলল–অদিতি সবসময় স্বামীর কাছে কাছেই থাকে। আর তার নানাভাবে সেবা করে। তুমি আর তাকে কাছে ঘেঁসতে দিওনা। তুমি

সব সময় তার কাছে কাছে থাক আর সেবা যত্ন কর। দেখবে স্বামীর মন তোমার উপর পড়বে নিশ্চয়।

দনুর উপদেশটা দিতির মনে ধরল, কাশ্যপকে এভাবেই পুরোপুরিভাবে নিজের আয়ত্তে এনে মনের ইচ্ছা সফল করতে হবে। চিন্তামত কাজ শুরু করে দিল দিতি। সবসময় স্বামীর সেবাতেই ব্যস্ত রইল। সে সেবার কোনো ত্রুটি নেই। এইভাবে চলল বেশ কিছু দিন। প্রজাপতি কশ্যপ সন্তুষ্ট হলেন, দিতিকে বললেন–আমার অনেক পত্নীর মধ্যে অদিতিই কেবল আমার এতদিন সেবা যত্ন করত। তোমরা আর কেউ উৎসাহ দেখাতে না, কিন্তু এখন তুমি আমার সেবা যত্ন করে আমাকে খুব প্রীত করেছ, এখন তুমি কী বর চাও বল। কি পেলে তুমি খুশি হবে?

স্বামীর কথায় দিতি খুব খুশি। বলল–স্বামী, আমি এমন এক পুত্র চাই, যে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর। ত্রিভুবন বিজয়ী হবে। সেই পুত্রকে কেউ কোনোদিন হারাতে পারবে না।

–তাই হবে, বললেন–কশ্যপ। কিন্তু তার জন্য তোমাকে একটি ব্রত করতে হবে।

দিতি বলল–সে ব্রত যত কঠোর হোক না কেন, আমি তা পালন করবই। বীরশ্রেষ্ঠ পুত্র আমার চাই-ই।

কশ্যপ বললেন–মন দিয়ে শোন তাহলে দিতি, মন থেকে সকল রকম পাপচিন্তা দূর করে বারো বছর ধরে কঠোর সংযমের মধ্যে থাকতে হবে। যদি সক্ষম হও তা পালন করতে, তাহলে অবশ্যই আমি তোমার বাসনা পূরণ করব।

বীর প্রসবিণী হওয়ার আশায় দিতি তাই করল। বারো বছর যাবৎ কঠিন সংযমের মধ্যে থেকে কাটাল সে, ব্রত পালনে কোনরূপ ত্রুটি নাই। সন্তুষ্ট হলেন কশ্যপ। দিতির গর্ভ সঞ্চার করলেন। তারপর উপদেশ দিলেন, যতদিন গর্ভে সন্তান থাকবে, ততদিন খুব কঠোরভাবে নিয়মের মধ্যে থাকতে হবে। সবরকম সদাচারে থাকতে হবে। মিথ্যে কথা বলা চলবে না। কখনও এলোচুলে থাকবে না। স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের চিন্তা করবে না। উত্তরদিকে মাথা করে শোবে না। সন্ধ্যার সময় শয়ন করবে না। বাড়ি ছাড়া কোথাও যাবে না। জোরে হাসবে না। এইরকম বহু উপদেশ দিলেন কশ্যপ। আর বললেন–যদি নিষ্ঠার সঙ্গে এই নিয়মগুলি পালন করতে পার, তাহলে নিশ্চয় সুপুত্র লাভ করবে।

এই কথা বলে তপস্যার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু কালের জন্য কশ্যপ চলে গেলেন অন্যত্র। তখন দিতি ঋষি অগস্ত্যের আশ্রমে এসে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেন স্বামীর উপদেশ। দিন যায়, গর্ভ বৃদ্ধি পায়।

দনুর পুত্র ময়দানব মায়াবিদ্যা বলে দিতির গর্ভের ব্যাপার জেনে ফেলল। দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তার খুবই বন্ধুত্ব। চিন্তা করলেন দিতির সন্তান যদি নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে বন্ধুর ভীষণ বিপদ হবে। তাই এই ব্যাপারে ইন্দ্রকে জানান উচিত বলে মনে করল সে। দানবদের সঙ্গে দেবতাদের সব সময় শত্রুতা, কিন্তু খুব বুদ্ধিমান ইন্দ্র কৌশল করে ময়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে নিয়েছিলেন। তার কারণ ময়ের বড় ভাই নমুচি তখন দানব প্রধান। একবার সে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করলে দেবতাদের সঙ্গে বাধে তুমুল যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে ইন্দ্র পরাজিত হয়ে প্রাণ ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে লাগলেন। তাকে পালাতে দেখে নমুচি তার পিছে ধাওয়া করল। পেছনে নমুচিকে আসতে দেখে ইন্দ্র প্রাণ বাঁচাতে ঢুকে পড়লেন সমুদ্রের ফেনার মধ্যে, তারপর নমুচি সেখানে এসে তাকে আক্রমণ করলে ইন্দ্র বজ্রের আঘাতে সেখানে নমুচিকে শেষ করে দিলেন। এভাবে দাদার মৃত্যুতে ময় খুব ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করল যেমন করেই হোক এর প্রতিশোধ নেবে। তাই সে শুরু করে দিল বিষ্ণু ও অগ্নির তপস্যা। সেই সময় সে কোন প্রার্থী এলে, তাকে তার ইচ্ছামত দ্রব্য প্রদান করতে লাগল। আর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু আর অগ্নিদেব তাকে দিল নানা বিধ অস্ত্রশস্ত্র। আবার বিষ্ণু ময়কে মায়াবিদ্যা দান করলেন।

মায়ের এই সাধনার কথা ইন্দ্র শুনেই তার একেবারে হৃদকম্পন শুরু হল। চিন্তা করলেন, কেমন করে তপস্যা নষ্ট করা যায়। ভাবতে ভাবতে একটি উপায় স্থির করে ব্রাহ্মণবেশে ময়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত। ব্রাহ্মণকে প্রার্থীরূপে দেখে ময় জিজ্ঞাসা করল, কি পেলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। ইন্দ্র চাইলেন, একমাত্র বন্ধুত্ব। আজব এই প্রার্থনা কিন্তু উপায় তো নাই। যে যা চাইবে ময় তাকে তাই দেবে, আর না দিলে সত্য রক্ষাও হয় না। দানব হলে কি হবে, সত্যভ্রষ্ট হতে কিন্তু ময়ের খুব ভয়। তাই বন্ধুত্ব স্বীকার করল, আর জানতে চাইল পরিচয়।

আত্মপ্রকাশ করলেন ইন্দ্র। সর্বনাশ, যাকে নিধন করার জন্য এই সাধনা, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কি আর করা যাবে। কথা যখন দিয়েছে তখন পালন করতেই হবে।

সেই থেকে ময় হল ইন্দ্রের বন্ধু। এখন ইন্দ্রের জন্য যে কোন কাজ করতে ময় প্রস্তুত। দিতির গর্ভের সংবাদ দিল ময় ইন্দ্রকে। খবরটা শুনেই ইন্দ্র যেন মুষড়ে পড়ল। দিতির পুত্রই তাহলে স্বর্গের অধিপতি হবে।

ময় বলল–এত মুষড়ে পড়লে চলবে না, একটু শক্ত হও আমার কথা শোন। বন্ধু, তুমি এখন কাশ্যপের আশ্রমে চলে যাও। সেখানে তোমার সম্মা দিতির সেবাযত্ন কর, যেমন নিজের মায়ের মত, তারপর সুযোগ পেলে তার গর্ভের সন্তানকে বিনষ্ট করে দাও। গর্ভের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাক। অপূর্ব যুক্তি বন্ধু ময়ের খুব প্রশংসা করেই চললেন।

কাশ্যপের আশ্রমে দেবরাজ মনপ্রাণ দিয়ে সেবা করতে লাগলেন দিতির। আর খুঁজতে লাগলেন সুযোগ। ইন্দ্রকে এভাবে পরিচর্য্যা করতে দেখে দিতি অবাক হলেন। কিন্তু সে যে তার কোন ক্ষতি করতে পারে এটা কিন্তু কখনও ভাবতেও পারলেন না। যথারীতি কশ্যপের উপদেশ মেনে চলে দিতি, ত্রিভুবনবিজয়ী পুত্রলাভের আশায়।

একদিন খুব ক্লান্তি এসেছে দিতির। তখন সন্ধ্যাবেলা। চোখে যেন ঘুম জড়িয়ে আসছে, শুয়েই পড়লেন বিছানায় উত্তর দিকে মাথা রেখে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বামীর নিয়মের কথায় কখন যেন বিস্মৃত হলেন।

ইন্দ্র সুযোগ পেয়ে গেলেন। কালবিলম্ব না করে ইন্দ্র প্রবেশ করলেন দিতির গর্ভের মধ্যে। সূক্ষ্ম আকারে বজ্র মারলেন শিশুর উপর। শিশুটি সাত টুকরো হয়ে গেল। আর্তনাদ করে উঠল। আমার তো এখনও জন্ম হয়নি। আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি। তাহলে কেন আমাকে মারবার জন্য বজ্র প্রয়োগ করলে, তা ছাড়া আমি তো তোমার ভাই, আমাকে এভাবে অসহায় অবস্থায় যে মারলে তাতে কি তোমার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। তুমি তো সাধারণ ব্যক্তি নও, ত্রিভুবনের অধিপতি, তোমার দ্বারা এমন হীন অন্যায় কাজ করা কখনও উচিত হয়নি।

ইন্দ্র ভাবলেন, একটা বাচ্চাকে সাত টুকরো করলাম, এখনও দেখছি সাতটি জীবন্ত ছেলে হয়ে চিৎকার করছে। মা রুত কাঁদতে থাকেন, তাকে থামাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা শুনল না ইন্দ্রের কথা, ইন্দ্রও শুনলেন না তাদের কথা। আবার অস্ত্র প্রয়োগ করে এক এক টুকরোকে আবার সাতটি করে টুকরো করলেন। হয়ে গেল উনপঞ্চাশ খণ্ড কিন্তু তবুও কেউ মরল না। প্রজাপতি কশ্যপের অক্ষয় বীর্য। তাকে বিনাশ করবে কার সাধ্য আছে। সেই উনপঞ্চাশ জনই চিৎকার শুরু করে দিল।

সেই চিৎকারে দিতির ঘুম ভেঙে গেল। বুঝতে পারল, ইন্দ্র শান্তশিষ্ট সেজে তার সেবাযত্ন করতে এসে কি সর্বনাশই না করল। তার সব আশা ব্যর্থ হয়ে গেল। অভিশাপ দিলেন ইন্দ্রকে। ইন্দ্রের অপকর্ম কাশ্যপও জানলেন। তিনিও ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন। ধ্যানযোগে কশ্যপে জানতে পারলেন, ছুটে এলেন অগস্ত্যের আশ্রমে। তার পুত্র হয়ে ইন্দ্র

এমন কুকাজ করল? ইন্দ্র দিতির গর্ভের মধ্যে বসেই বাইরের সব কাণ্ড শুনলেন। ভয়ে আর বেরিয়ে আসতে পারলেন না। কিন্তু পিতা কশ্যপ এসে ডাক দিলেন, ইন্দ্র কোথায়, বেরিয়ে এস, অগত্যা ইন্দ্র বেরিয়ে এলেন। খুব তিরস্কার করলেন কশ্যপ। কি আর বলবেন ইন্দ্র মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর সবাই বসে চিন্তা করতে লাগলেন–এখন কি করা যায়। সবাই মিলে ব্রহ্মকে স্মরণ করলেন। ব্রহ্মা এসে সবকিছু অবগত হলেন। বললেন–এখন তার দ্বারা কিছু হবে না। মহাদেবের স্মরণ নেওয়া হোক। তখন সবাই মিলে স্তব স্তুতি করলেন মহাদেবকে। মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্রকে শাপমুক্ত করলেন। আর দিতির গর্ভের ঊনপঞ্চাশ জন সন্তানকে মরুত নামে অভিহিত করলেন। অমরত্ব লাভ করল তারা, দেব সমাজে ঠাঁই পেল।

দিতির মনে আশা ছিল ত্রিভুবন বিজয়ী সন্তান লাভের। তা আর হল না। তবে তার পুত্রগণ অমর হয়ে দেবতার আসনে বসতে পেল, এটাও কিছু কম নয়।

মহামুনি দধীচির কাছে দেবতাগণ অস্ত্র সংরক্ষণ, মুনি কর্তৃক অস্ত্রের তেজ গ্রহণ ও স্বেচ্ছায় তনুত্যাগ। মুনির অস্থিতে বজ্র নির্মাণ, ঋষিপত্নী লোপামুদ্রার প্রাণত্যাগ, সুধাপানে সন্তানের জীবনধারণ, নাম পিপ্পলাদ, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে শিবের ধ্যান। শিবের তৃতীয় নয়ন থেকে কৃত্যার আবির্ভাব, স্বর্গপুরী ধ্বংস দেবতাগণের পলায়ন। পিপ্পলাদের পিতা মাতাকে দর্শন ও উপদেশ লাভ–

ভাগীরথী নদীর তীরে বিশেষ শান্ত পরিবেশে দধীচি মুনির আশ্রম। দৈত্য দানবেরা কোনরূপ উপদ্রব করতে পারে না। যে-কোন অতিথি আসুন না কেন মুনিবর সবাইকে সমাদর করতেন। তাই সবাই দধীচি মুনিকে খুব শ্রদ্ধা করত। পতিব্রতা লোপামুদ্রা তারই ভার্যা। স্বামীর মত তিনিও সেবা-পরায়ণা, স্বামীর সকল কাজেই হাত লাগাতেন তিনি।

একদিন সূর্যদেব, রুদ্র অশ্বিনীকুমার, বিষ্ণু, যম, ইন্দ্র, আদি দেবতাগণ তাঁর আশ্রমে এলেন। কি সৌভাগ্য! মুনির আর আনন্দ ধরে না। কেমন করে সেবা করবেন তাদের, সেই নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন দধীচি মুনি। দেবতারাও সেই মুনিকে সমাদর করে বললেন–মুনিবর, আমাদের সেবার জন্য এত ব্যস্ত হবেন না। আমরা একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি, সেটা মিটিয়ে এক্ষুনি চলে যাব।

দেবতারা আজ অতিথি মুনির আশ্রমে, তাদের কোনও নিষেধ তিনি শুনলেন না। তাই যথাযোগ্য সমাদরে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসনাদি দিয়ে তাদের পূজা করে বললেন– এবার বলুন, আপনারা কোন্ প্রয়োজনে আমার কাছে এসেছেন? আপনাদের জন্য আমি কী করতে পারি? আমার সাধ্যের মধ্যে হলে আমি নিশ্চয় তা পূরণ করব।

দেবতারা বললেন–দানবদের সঙ্গে সবেমাত্র যুদ্ধ শেষ হল। এবারের যুদ্ধে আমরা জয়ী হয়েছি। আমাদের এই যুদ্ধের পর বহু শক্তিশালী অস্ত্র অবশিষ্ট রয়েছে। কিন্তু এমন কোনও নিরাপদ স্থান আমাদের নেই যেখানে নিশ্চিন্তে ওগুলি রেখে দিতে পারি। তাই এলাম আপনার কাছে। আপনার এই আশ্রমে দৈত্য দানবরা কখনও আসতে সাহস করে না। আপনি যদি এই অস্ত্রগুলি রেখে দেন, তাহলে খুব ভালো হয়। আবার প্রয়োজন হলে নিশ্চয় নিয়ে যাব।

দেবতাদের কথায় মুনিবর সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হলেন। তখন অস্ত্রগুলি সেখানে রেখে দেবতারা ফিরে গেলেন স্বর্গে।

কিন্তু স্বামীর সঙ্গে একমত হতে পারলেন না লোপামুদ্রা। মুনিকে বললেন–আমার মনে হয় দেবতাদের কথায় এভাবে হঠাৎ রাজি হওয়া আপনার উচিত হয়নি। আমরা আশ্রমবাসী, আশ্রমে কেন অস্ত্র শস্ত্র থাকবে? আমাদের শত্রু কেউ নেই।

লোপামুদ্রার কথা শুনে দধীচি মুনি বললেন–কাজটা হয়তো ঠিক হয়নি। কিন্তু দেবতাদের কথা ফেলব কেমন করে? লোপামুদ্রা বললেন–অস্ত্রগুলি যদি কোনো কারণে হারিয়ে যায় কিংবা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? দেবতারা ফেরৎ চাইলে দেবেন কেমন করে?

এবার দধীচি মুনির টনক নড়ল, বললেন–ঠিক বলেছ লোপামুদ্রা, কিন্তু দেবতাদের কথায় না বলব কেমন করে?

যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন উপায় কী? যত্ন করে রেখে দেওয়া ছাড়া আর কী করা যাবে? দেখতে দেখতে তিন লক্ষ ষাট হাজার বছর কেটে গেল। দেবতারা এর মধ্যে একটিবারও এলেন না মুনির আশ্রমে। অস্ত্রগুলি ক্রমশ ক্ষয় হতে লাগল দেখে মুনি বড় সমস্যায় পড়লেন। তাই একদিন মুনি তার ভগ্নি সভস্তিনীর সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। (যার ডাক নাম বক) বড় মহীয়সী নারী, তিনি থাকেন মুনিরই আশ্রমে। কী আর পরামর্শ দেবেন তিনি, কেবল উদ্বেগই বাড়ল।

দিনে দিনে অস্ত্রগুলি প্রভাহীন আর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে দেখে সেগুলি সঠিকভাবে রক্ষার জন্য একটা উপায় স্থির করলেন মুনি নিজেই, যার ফলে দেবতারা যখন অস্ত্রগুলি চাইবে, তখন ঠিক পূর্বের মতই যেন দিতে পারেন। এবার তিনি মন্ত্রঃপুত জল দিয়ে অস্ত্রগুলি ধুয়ে ফেললেন। সেই ধৌত জলের সঙ্গে বেরিয়ে এল অস্ত্রের তীব্র তেজ। কোনো দ্বিধা না করেই দধীচি মুনি তা পান করে নিলেন। অস্ত্রগুলি তেজহীন হল। আর সেই সব তেজ জমা হয়ে রইল মুনির দেহের মধ্যে আর কোনো চিন্তা নাই মুনির।

এই কাজের পর দেবতারা এসে হাজির দধীচির আশ্রমে। চাইলেন তাদের অস্ত্র। বললেন–অসুরেরা আবার আমাদেরকে আক্রমণ করেছে, তাই অস্ত্রগুলি নিতে এলাম।

দধীচি মুনি দেবতাদের কথা শুনে বললেন–আপনারা এতদিন আসছেন না দেখে আমার খুব ভয় হয়েছিল, যদি দানবেরা এসে ওগুলি লুট করে নিয়ে যায়। তাই আমি ওগুলোকে অকেজো করে সব দিব্যশক্তি পান করে দেহাস্থিতে ধরে রেখেছি। আপনাদের ওই পুরনো অস্ত্রের তেজ আমি ফিরিয়ে দিতে পারব না।

মুনির কথা শুনে দেবতারা স্তম্ভিত হলেন, এখন উপায় কী?

মুনিবর একটু চিন্তা করে বললেন–একটা উপায় আছে। যোগবলে আমি আমার দেহ ত্যাগ করব। আপনারা আমার প্রাণহীন দেহ থেকে যেমন খুশি অস্ত্র তৈরি করে নিন।

মুনির এমন কথা শুনে দেবতারা অবাক হলেন, একি সম্ভব? আমাদের জন্য একজন খ্যাতনামা মুনি প্রাণ বিসর্জন দেবেন?

দেবতাদের মুখের ভাবে মুনিবর বললেন–এতে ইতস্তত করার কী আছে? আমার দেহ দিয়ে যে অস্ত্র তৈরি হবে তা দিয়ে অত্যাচারীরা বিনষ্ট হবে, সর্ব স্থানে শান্তি ফিরে আসবে। এ তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। আত্মদানের এমন সুযোগ কে হাতছাড়া করতে চায়?

মুনির কথা শুনে দেবতারা আর কী বলবেন? মৌনী হয়ে সম্মতি জানালেন। যোগাসনে বসলেন দধীচি মুনি, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সংযোগ ঘটিয়ে দিলেন। পড়ে রইল নিষ্প্রাণ দেহ। তাই নিয়ে চলে গেলেন দেবতারা। দিলেন বিশ্বকর্মাকে। তারপর বিশ্বকর্মা শক্তিশালী মুনির অস্থি দিয়ে তৈরি করলেন এক ভয়ংকর বজ্র। তখন অসুরাধিপতি ছিলেন বৃত্র। ইন্দ্রের

দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়ে সেই বজ্র বৃত্রকে সংহার করল। মহামুনি দধীচির কীর্তি ত্রিভুবনে প্রচারিত হল।

আশ্রমে বসে দধীচি মুনি যখন স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন, সেই সময় মুনিপত্নী লোপামুদ্রা মন্দিরে উমার অর্চনায় ব্যস্ত ছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন স্বামীর প্রাণহীন দেহ। তারপর শুনলেন সকল কথা, শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন তিনি। মনে পড়ল তাঁর বহুপূর্বের কথা, যেদিন দেবতারা এসেছিলেন তাদের অস্ত্রশস্ত্র তার স্বামীর কাছে রাখবার জন্য, বুঝতে পেরেছিলেন তিনি, কোন বিপদ ঘটতে পারে। সত্যই হল তাই। কিন্তু আর উপায় কী আছে। স্বামী ছাড়া তিনি বাঁচবেন কেমন করে? ঠিক করলেন এ দেহ আর রাখবেন না। অগ্নিতে বিসর্জন দেবেন। কিন্তু তার গর্ভে যে মহানমুনি দধীচির সন্তান। তাকে নিয়ে যে মরা হবে না। তাই তিনি যোগবলে সঙ্গে সঙ্গেই গর্ভাশয় থেকে শিশুটিকে বের করে একটি পিপ্পল গাছের তলায় রেখে দিয়ে গঙ্গা ধরাদেবী আর আশ্রমের বৃক্ষলতাদের আহ্বান করে বললেন–এই শিশুকে রেখে যাচ্ছি তোমাদের কাছে। তোমারই এর রক্ষক হলে।

তারপর লোপামুদ্রা অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণ বিসর্জন ছিলেন। সকল আশ্রমবাসী হাহাকার করে উঠল। আশ্রমের বৃক্ষলতা, জীব-জন্তুগণও নীরবে কাঁদল। তারা যে এমন মা বাবা উভয়কেই হারাল।

গর্ভধারিণী চলে গেলে সদ্যজাত শিশু বাঁচবে কেমন করে? ওষধি লতা-বৃক্ষাদির অধিপতি সোমদেব সুধার অধিকারীও তিনি। সবাই তো সোমদেবের কাছে গিয়ে সদ্যোজাত মাতৃহারা শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্য আবেদন জানালেন। কোন দ্বিধা না করে সোমদেব দিয়ে দিলেন সুধা। সেই সুধা পান করে শিশু বড় হতে লাগল।

পিপ্পলবৃক্ষই তার সজাগ দৃষ্টি রাখল শিশুটির উপর। তাই শিশুটি পিপ্পলাদ নামে পরিচিত হল। ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল পিপ্পলাদ। বড় হয়ে মনে প্রশ্ন জাগল তার গাছের মা-বাবা গাছ। যে পশু, তার মা বাবা পশু। মানুষের বাবা মা তো মানুষ হবে। কিন্তু সে মানুষ হয়েও তার মা এই পিপ্পল গাছ? ছোট্ট বালক মনের তোলপাড় করা এই সমস্ত প্রশ্ন একদিন পিপ্পলকেই জিজ্ঞাসা করল পিপ্পলাদ। পিপ্পলি কোনও কথা গোপন না রেখে সব জানিয়ে দিল। শুনতে শুনতে পিপ্পলাদের চোখে জল এল। ক্রোধে রাঙা হয়ে উঠল মুখ। এত বড় অন্যায় করল দেবতারা। তাদের জন্যই প্রাণ দিতে হল পিতাকে। আর পিতার অভাবে মাও চলে গেলেন। আমি তাদের পুত্র হয়ে এই অন্যায় সহ্য করব না। প্রতিশোধ নেবই।

পিপ্পলাদকে ক্রোধান্বিত হতে দেখে পিপ্পল তাকে সোমদেবের কাছে পাঠিয়ে দিল। পিপ্পলাদ গেল সোমদেবের কাছে। শুনল একই কথা। সোমদেব কিন্তু সাবধান করে বলল–বাবা, তুমি, দেবতাদের চেন না, মহাশক্তিশালী তারা। প্রতিশোধ নিতে হলে তোমাকেও মহাশক্তিধর হতে হবে। তুমি এখনও বালক। আগে যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত কর, শক্তি লাভ কর, তারপর না হয় প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে।

কথাটা যুক্তিপূর্ণ মনে হল পিপ্পলাদের। জিজ্ঞাসা করল–আপনি বলুন, কার কাছে আমি এসব বিদ্যা শিখতে পারব?

সোমদেব বললেন–এসব বিদ্যা শিখবার জন্য তুমি মহাদেবের কাছে যাও। গোদাবরী নদীর তীরে দণ্ডকারণ্য, সেখানেই বসে তুমি শিবের আরাধনা কর। তাকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই তোমার সিদ্ধিলাভ হবে।

সোমদেবের কথামত পিপ্পলাদ বসল গভীর ধ্যানে। সন্তুষ্ট হলেন শিব। আবির্ভূত হয়ে পিপ্পলাদকে বললেন–বৎস! পিপ্পলাদ কি তোমার প্রার্থনা?

পিপ্পলাদ বলল–আমি চাই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ অর্থাৎ দেবতাগণের বিনাশ।

মহেশ্বর বললেন–বৎস। তুমি কি আমার তৃতীয় নয়ন দেখতে পাচ্ছো? যদি না পাও তাহলে আগে সেই চেষ্টা কর। তারপর অন্য কথা।

পিপ্পলাদ আবার শুরু করল কঠোর তপস্যা। চলে গেল বহুকাল, ধীরে ধীরে তার চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল শিবের তৃতীয় নয়ন। যা দিয়ে তিনি সমুদ্রের মধ্যে বিষকে ধ্বংস করতে পারেন। পিপ্পলাদের মনে আনন্দ আর ধরে না। এবার আমার কার্য সিদ্ধ হবে।

কিন্তু বাধ সাধলেন পিসিমা গজস্তিনী, দধীচির ভগ্নী। বললেন–মন থেকে ঈর্ষা ত্যাগ কর। প্রত্যেকে যে যার নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। যার মনে ঈর্ষা থাকে তার নরকে গতি হয়। এ কথা আমার নয়, তোমার মায়ের। কাজেই দেবতাগণের প্রতি তোমার হিংসা করা তোমার উচিত নয়।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! মন তার তখন দেবনিধনে উন্মত্ত। দেবনিধন সংকল্পে অটল, সেই ইচ্ছাই জানাল শিবকে। শিব আর কি করবেন? তৃতীয় নয়নটি বিস্ফারিত করলেন। এক ভয়ংকর মূর্তি কৃত্যার সৃষ্টি হল। ঘোড়ার মত তার আকৃতি। জ্বলজ্বল করছে তার চোখ। লক

লক করছে তার জিভ। সামনে যাকেই পাবে তাকেই যেন শেষ করে দেবে। বলল–কি করতে হবে আমাকে?

পিপ্পলাদ বলল–যেখানে যত দেবতা আছে সকলকে বিনাশ কর। তার কথা শেষ হতে না হতেই সেই কৃত্যা বিনাশকল্পে হা হা করে এগিয়ে আসছে সেই পিপ্পলাদের দিকেই। পিপ্পলাদ তো অবাক! বলল–আমাকে কেন? আমি তো দেবতা নই। কৃত্যা বলল–দেবতার সেবায় অমৃত পান করে তুমিও দেবতা।

নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে এনেছ। এখন উপায়? প্রাণ ভয়ে ছুটে চলল শিবের কাছে। পেছনে পেছনে ধাওয়া করে চলছে কৃত্যা। শিব কৃত্যাকে বাধা দিয়ে বললেন–পিপ্পলাদের ইচ্ছাতেই তোমার সৃষ্টি হয়েছে। তুমি পিপ্পলাদের কোনও ক্ষতি করবে না। আমার এখান থেকে তুমি এক যোজনের মধ্যে থাকবে না।

অগত্যা কৃত্যা সেখান থেকে চলে গেল। যেখানেই যায়, সেখানেই শুরু হয়ে যায় দারুণ অগ্নিকাণ্ড, স্বর্গপুরেও ভীষণ ব্যাপার। সইতে পারল না দেবতারা। ছুটে এলেন শিবের কাছে। বললেন–হে প্রভু, আমাদের আপনি রক্ষা করুন। কৃত্যার দ্বারা স্বর্গপুরী পুড়ে এখন ছাই। আপনার বরে পিপ্পলাদ দুরন্ত হয়ে উঠেছে। আপনি ওকে একটু শান্ত করুন।

মহাদেব বললেন–আপনারা আপাততঃ আমার কাছে এক যোজনের মধ্যে অবস্থান করুন। পিপ্পলাদকে শান্ত করা যায় কিনা দেখছি।

শিবের কথামত দেবতারা সেইখানেই রয়ে গেলেন। শিব পিপ্পলাদকে ডেকে বললেন–শোন পিপ্পলাদ, তুমি কত বড় মহান ঋষির পুত্র, পৃথিবীর উপকারের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণ দান করেছিলেন। এমন মহান ব্যক্তির ছেলে হয়ে তোমার অন্যের উপর আক্রোশ করা উচিত হয়েছে কি? তাছাড়া দেবতাদের বিনাশ করে কি তুমি তোমার পিতা মাতাকে ফেরৎ পাবে?

মহাদেবের কথা শুনে শান্ত হল পিপ্পলাদ। ভাবলেন–সত্যই তো দেবতাদের বিনাশ করে মা বাবাকে তো ফিরে পাব না। মন থেকে দূর করলেন ক্রোধ। আমার পিতা মাতাকে কত লোক শ্রদ্ধা করত। কত খ্যাতি তাদের। কিন্তু আমার এই পাপচোখে তাদের একটিবারও দেখতে পেলাম না। এমন হতভাগ্য আমি। পিপ্পলাদের মন কেঁদে উঠল। মনমরা হয়ে সে বসে থাকল।

তাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে শিব স্নেহ করে তাকে বললেন–তুমি কেন এমন করে মনমরা হয়ে বসে আছো? কি ভাবছ? আমি তা পূরণ করার চেষ্টা করব।

পিপ্পলাদ বলল–এমনই হতভাগ্য আমি মা-বাবাকে একটিবার দেখতেও পেলাম না। যদি একবার তাদের দর্শন পেতাম। যদি তারা আমাকে আশীর্বাদ করতেন, তাহলে মনে শান্তি পেতাম।

শিব বললেন–পরের জন্য যারা নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারেন, তাদের মৃত্যু নাই। তারা অমর, তাদের আর জড় দেহ থাকে না বটে, কিন্তু চিন্ময় দেহ ধারণ করে সদা বিরাজিত। তোমার যখন পিতা-মাতাকে দেখার এত ইচ্ছা, তাহলে দেখ আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি দান করছি।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে বিমান নেমে এল, সেই বিমানের মধ্যে বসে দধীচি মুনি তার ভার্য্যা লোপামুদ্রার সঙ্গে। পিপ্পলাদ চমকে উঠলেন। কে এঁরা। এঁরাই কি তার মা বাবা?

বিমান থেকে নেমে দধীচি ও লোপামুদ্রা পিপ্পলাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। পিপ্পলাদের আর বুঝতে বাকি রইল না। যে এঁরাই তার পিতা মাতা। লম্বা হয়ে ভূমিতে অর্থাৎ সাস্টাঙ্গে প্রণাম জানাল সে। তাদের চরণে। তারা স্নেহাশীষে ভরিয়ে দিলেন পুত্রের মন। আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল পিপ্পলাদ।

তারপর তারা উভয়েই পিপ্পলাদকে বললেন–শুন পুত্র, আমাদের কিছু উপদেশ। এই চরাচরে কোন কিছুই চিরকাল থাকে না। যতদিন তুমি এই ধরায় থাকবে, নিজের স্বার্থ ভুলে সকলের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করবে। সবসময় চিন্তা করবে–এই জীবনটা তোমার একার জন্য নয়, সকলের জন্য। এখন তুমি নিজের আশ্রমে ফিরে গিয়ে বিয়ে করে সংসারী হও। এই কথা বলে মুনি দম্পতি ফিরে গেলেন সেই দিব্য বিমানে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল পিপ্পলাদ। আর কোনও দুঃখ-ক্ষোভ নাই, ফিরে গেল আপনার আশ্রমে। পিতামাতার আদেশ যথাযথ ভাবেই পালন করে কালে এখন মহান ঋষিতে পরিণত হলেন পিপ্পলাদ।

হরিশচন্দ্রের যজ্ঞে শুনঃশেফের কাহিনী

হরিশচন্দ্র সূর্য বংশের এক ধার্মিক রাজা। তার পিতা রাজা সত্যব্রত, যিনি ত্রিশঙ্কু নামে অমর হয়ে আছেন। বিশ্বামিত্রের চেষ্টায় সশরীরে স্বর্গে যাবার আগে তিনি পুত্র হরিশচন্দ্রকে সিংহাসনে অভিষেক করেন। সুখ্যাতির সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করেন হরিশচন্দ্র। প্রজারা সবাই খুশি। কারও কোন অভিযোগ নেই। তার রাজ্য শাসনে রাজ্যের সকল প্রজারা অত্যন্ত খুশি, সেখানে স্বয়ং রাজার মনে কিন্তু সুখ নেই। তার সবই আছে, কিন্তু কোন পুত্র নেই।

একবার নারদ ও পর্বত ঋষি এলেন তার প্রাসাদে, যথাযোগ্য সমাদরে তাদের আপ্যায়ন ও সেবা করলেন রাজা হরিশচন্দ্র। মুনিদের সঙ্গলোভে রাজার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। এঁদের কাছেই জানিনা কেন কেমন করে পুত্র লাভ করা যায়? মুনিদ্বয় তার আপ্যায়নে সন্তুষ্ট জেনে কথাটা বলেই ফেললেন হরিশচন্দ্র।

ঋষিদ্বয় বললেন–রাজা তুমি এক কাজ কর। তুমি গোদাবরীতে স্নান করে বরুণদেবের উদ্দেশ্যে স্তব কর। তাতে তিনি যদি তুষ্ট হন, তাহলে তোমার পুত্র লাভ হতে পারে।

ঋষিদের কথামত হরিশচন্দ্র পবিত্র গোদাবরীতে অবগাহন করে স্তব শুরু করে দিলেন। বরুণদেব তুষ্টও হলেন। দর্শন দিয়ে বললেন–হরিশচন্দ্র, কি বর চাই তোমার?

রাজা বললেন–পুত্র চাই আর কোন কিছুরই অভাব নেই আমার।

রাজা বললেন–তোমাকে আমি পুত্রলাভের বর দিতে পারি, কিন্তু একটা শর্ত তোমাকে মানতে হবে। খুব কঠিন সেই শর্ত, শুনলে তুমি হয়তো আঁতকে উঠবে।

রাজা ভাবলেন এমন কি শর্ত যা আমি পালন করতে পারব না? বললেন–বলুন আপনার শর্ত। আমি নিশ্চয় পালন করব।

বরুণদেব বললেন–আমার বরে তুমি যে পুত্র লাভ করবে, সেই পুত্রকে আহুতি দিয়েই তোমাকে যজ্ঞ করতে হবে। বরুণদেবের কথা শুনেই হরিশচন্দ্রের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়ল। পুত্র পেয়ে সেই পুত্রকেই আহুতি দিতে হবে? তাহলে পুত্র লাভ হল কেমন করে? পুত্র নাই তাতে আমার দুঃখ আছে। কিন্তু পুত্র লাভ করে সেই পুত্রকে আবার ত্যাগ করতে হবে, এরফলে আমার দুঃখ ত শতগুণ বৃদ্ধি পাবে। কি দরকার এমন পুত্র লাভে?

কিন্তু নিঃসন্তান পিতার হৃদয়ে পুত্র আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে পুনর্বার চিন্তা করলেন–আগে তো পুত্র সন্তান লাভ করি, তারপর কোনও কৌশলে পুত্রকে রক্ষা করার চেষ্টা করব। সে চেষ্টায় যদি সফল হতে পারি, তাহলে আর কোন চিন্তা থাকবে না। এই চিন্তা করে বরুণদেবকে বললেন–আমি আপনার শর্ত স্বীকার করলাম।

যথাসময়ে রানি এক অপরূপ সুন্দর পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। রাজা তার নাম রাখলেন রোহিত। রাজা রানির মনে কি আনন্দ! বহুকাল পরে পুত্রের মুখ দেখে অন্তরে যে কি আনন্দ, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু এ কি? অকস্মাৎ সেই আনন্দ মুখরিত ভবনে যেন নিবিড়ঘন অন্ধকার নেমে এল। বরুণদেব উপস্থিত বললেন– রাজা মনে কর শর্তের কথা, সহসা আকাশ ভেঙে যেন বজ্রাঘাত হল রাজার মাথায়। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বরুণদেবকে বললেন–সবে মাত্র শিশুর জন্ম হয়েছে, এই শিশু এখনও হাসতে শেখেনি। দাঁত বেরোয়নি। এর দাঁত বেরোক তখন আমি যজ্ঞ করব। বরুণদেব চলে গেলেন। শিশুর দাঁত

বেরোল, এখন সে হাসতে পারে, আবার এলেন বরুণদেব। বললেন–কই গো রাজা, এবার যজ্ঞ কর।

রাজা বললেন–দুধে দাঁত, ওগুলি পড়ে আবার নতুন দাঁত উঠুক। আমি যজ্ঞ করব।

বরুণদেব ফিরে গেলেন, রোহিতের দাঁত পড়ে আবার নতুন দাঁত বেরল। আবার রাজার কাছে বরুণদেব এলেন।

রাজা বললেন–রোহিত ক্ষত্রিয় সন্তান। ক্ষত্রিয়মতে পুত্রের সংস্কারাদি হল না। অস্ত্রবিদ্যা শিখল না। এ অবস্থায় বালককে যজ্ঞে অনুমতি দিলে যজ্ঞের হানি হবে। আপনিও দেবতা একজন, এসব আপনার অজানা নেই।

বরুণদেব রাজার কথা স্বীকার করে চলে গেলেন। রোহিতের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা শুরু হল, ক্রমে শিক্ষা সমাপ্ত হল। তখন রোহিত ষোল বৎসরের পরিপূর্ণ যুবক। তার সেই নয়ন মনোহর রূপ নেই দেখে, আর সেই চোখ ফেরাতে পারে না।

এমন পুত্রকে যজ্ঞে বলি দিতে কোন মা-বাবার মন চায়? হরিশচন্দ্র ভুলে গেলেন বরুণদেবের কথা। তিনি রোহিতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। বরুণদেব কিন্তু ভোলেন নি। রাজার কাছে এসে যজ্ঞের কথা কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এতদিন হরিশচন্দ্র নানান ফিকির তুলে পুত্রকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু এবার কি করেন? বরুণদেব সামনে, রাজা কিছু বলতে পারছেন না। চুপ করে বসে আছেন। ক্রমে ক্রমে ছেলের প্রতি তাদের বাৎসল্যে মায়া বসেছে। অন্তর জেগে উঠছে। কিন্তু মুখে কিছু বলছেন না।

বরুণদেব বললেন–কি হল? চুপ করে বসে আছ কেন? বল, এবার যজ্ঞ কবে করছ?

রাজা বললেন–রোহিত এখন যুবক, তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছি। তার উপর এখন আমার আর প্রভুত্ব চলে না। তার নিজের একটা মতামত আছে। রোহিতকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি দেখি সে কি বলে?

রোহিতকে ডেকে আনা হল রাজসভায়, রাজা সন্তান লাভ করার আনুপূর্বিক কাহিনী সব আদ্যোপান্ত খুলে বললেন।

সব শুনে রোহিত অবাক। এতদিন সে তো জানতে পারে নি যে তাকে এভাবে চলে যেতে হবে যজ্ঞের আহুতি হিসেবে। বেঁকে বসল সে। –আমি এই বয়সে কিছুতেই মরতে পারব না। রাজাও পুত্রস্নেহে কিছু না বলে চুপ করে বসে রইলেন।

রাজার কপটতা এতদিন সহ্য করেছেন বরুণদেব, কিন্তু আর নয়। ধৈর্যের তো একটা সীমা আছে? অভিশাপ দিলেন রাজাকে। –তুমি উদরী রোগে ভুগবে।

দেবরাজ ইন্দ্র গোপনে রোহিতকে নিয়ে বনে গেলেন। বহু ঋষির তপোবন সেখানে। গঙ্গার তীরে মনোরম শোভা, তার উপর ঋষিদের আশ্রম, খুব ভালো লাগল রোহিতের। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল সেইসব আশ্রম।

একদিন উপস্থিত হল ঋষি আজীগর্ভের আশ্রমে। বয়সে বৃদ্ধ ঋষির দেহ, জীর্ণ শীর্ণ। ঋষি পত্নীর দশাও তেমনি। দেখে মনে হয় কোন ভাবনা-চিন্তায় ঋষি দম্পতির এমন দুঃখের অবস্থা। খুব দয়া হল রোহিতের, জিজ্ঞাসা করে জানল-ঋষির তিন পুত্র শুনঃপুচ্ছ শুনঃশেফ ও শুনঃলাঙ্গল পাঁচজনের সংসার। কিন্তু সংসার নির্বাহের কোন সংস্থান নেই। রোহিত খুব চিন্তায় পড়ল। কেমন করে দুঃখ মোচন করা যায়।

এমন সময় খবর এল অযোধ্যা থেকে। রাজার উদরী রোগে প্রাণ বুঝি যায়। কুলগুরু বশিষ্ঠদেব পরামর্শ দিলেন, বরুণদেবের কাছে প্রতিশ্রুতি মত নরমেধ যজ্ঞ না করলে রাজাকে সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়। রোহিত মহাচিন্তায় পড়লেন। পিতাকে বাঁচাতে তাঁকেই এখন মরতে হয়। কিন্তু এই অল্প বয়সে তাঁর নিজের প্রাণের উপর এমন মায়া রয়েছে যে তাঁর প্রাণ বিসর্জন দিতে রাজি নয়, তাহলে নিজেকে বাঁচাবে কেমন করে?

সহসা মনে হল সেই দুঃখী ঋষি আজীগর্ভের কথা। তার তিন পুত্রের মধ্যে কোনো একজনকে যদি তিনি বিক্রি করেন, তাহলে তাঁকেও মরতে হয় না। যজ্ঞের দ্বারা বরুণদেবকেও তুষ্ট করা যাবে আর পিতাও আরোগ্য লাভ করবেন।

ছুটে চলল আজীগর্ভের আশ্রমে। ঋষিকে বলল–ঋষিবর আপনার একটি ছেলেকে যদি বিক্রি করেন, তাহলে আপনাদের দুঃখ দূর হতে পারে।

ক্ষুধায় জ্বালায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ঋষি বললেন–আমি আমার ছেলেকে বিক্রি করব। তবে আমার জ্যেষ্ঠ ছেলে শুনঃপুচ্ছকে আমি দেব না। ঋষিপত্নী তার ছোট ছেলে শুনঃলাঙ্গুকে

দিতে চাইলেন না। কাজেই ঠিক হল, শুনঃশেফকেই বিক্রয় করা হবে। শুনঃশেফের মূল্য ধার্য হল এক হাজার গাভী, এক হাজার সোনার মুদ্রা, এক হাজার বস্ত্র আর প্রচুর ধান। একজন ঋষিবালকের জন্য এত যেন একটু বেশিই হয়েছে। হোক তাতে কি? রাজার তো কোনও অভাব নেই।

আজীগর্ভের প্রার্থনামত সব কিছু দিয়ে রোহিত শুনঃশেফকে কিনে নিয়ে গেল পিতার কাছে। হরিশচন্দ্র কিন্তু খুশি হতে পারলেন না। হাজার হোক ব্রাহ্মণ সন্তান, তাকে যজ্ঞ আহুতি দান করে তিনি নিজের প্রাণরক্ষা করতে চান না।

গুরু বশিষ্ঠদেব বুঝিয়ে বলতে অবশেষে রাজী হলেন রাজা। যজ্ঞবেদী সাজানো হল, পুরোহিতগণ মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন। বন্দি হয়ে আছে ব্রাহ্মণ পুত্র শুনঃশেফ, বাঁচার কোন আশা নেই। বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল তার, গোদাবরী নদীতে তাকে স্নান করানো হল। যজ্ঞবেদীর সামনে দাঁড় করান হল।

বালকের মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বামিত্রের খুব দয়া হল, প্রাণটা কেঁদে উঠল, চিন্তা করলেন, কেমন করে বাঁচানো যায়? তারপর বালকের উদ্দেশ্যে বললেন—বৎস তুমি বরুণদেবকে স্তব কর।

একটু পরেই যার মৃত্যু হবে, বুকের ভেতর দুরু দুরু করছে। সে কি পারবে স্তব করতে? বালক মাত্র সে, স্তবের কি জানে? তথাপি নিজের প্রাণ বাঁচাতে দুটি হাত তুলে বরুণদেবের উদ্দেশ্যে আকুল প্রার্থনা জানাল।

দেবতারা মন্ত্রের ভাষা শোনেন না অন্তরের ভাষা শোনেন। বরুণদেব আবির্ভূত হলেন। সেখানে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র আদি ব্রাহ্মণদের সামনেই বললেন—শুনঃশেফকে আহুতি দিতে হবে না। তথাপি এই যজ্ঞ পূর্ণ হবে। যজ্ঞের ফল পুরোপুরিভাবে লাভ করবে।

এই কথা বলে বরুণদেব অন্তর্হিত হলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হল। মুক্ত হল শুনঃশেফ, রাজাও রোগ মুক্তি হল। শুনঃশেফ এখন কোথায় যাবে, যে মা-বাবা পুত্রকে মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। তাদের কাছে যেতে ইচ্ছে হল না তার।

তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বিশ্বামিত্র মুনি বললেন—আমি এই শুনঃশেফকে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে গ্রহণ করছি। স্নেহভরে নিয়ে গেলেন আপন আশ্রমে। ছেলেদের ডেকে

বললেন–আজ থেকে শুনঃশেফ হল তোমাদের বড় ভাই। দেবতার অনুগ্রহে আমি পেয়েছি একে। যদিও এর নাম শুনঃশেফ, তবে আজ থেকে এর নাম রাখলাম দেবরাজ। তোমরা একে যথাসাধ্য সম্মান দেবে।

রাজা শ্বেতের মৃত্যু ও শিবের বরে পুনরায় শিশুর প্রাণলাভ

আজ থেকে বহুদিন পূর্বে কোন এক সত্যযুগে পৃথিবীতে সবাই সুখে শান্তিতে বাস করত। কারো কোনো শোক ছিল না। সকলের পরমায়ু ছিল লক্ষ বৎসর। শিশুকালে কারো মৃত্যুও হত না।

তখন শ্বেত নামে এক বীর, মহাজ্ঞানী, বুদ্ধিমান রাজা ছিলেন। তিনি সুন্দরভাবে রাজ্য পরিচালনা করতেন। কারও কোনো অভিযোগ নেই। সকলেই সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কাল কাটাচ্ছে। কিন্তু এমন অবস্থায় নেমে এল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। শ্বেতের মৃত্যু হল।

কপাল গৌতম নামে এক তো দূরের কথা, ওদিকে তাকাতেই পারছি না।

মৃত্যু দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল শিবের সব অনুচরেরা দণ্ড হাতে শ্বেতকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। চিন্তা করল মৃত্যু যমরাজ দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁর চর আমি। আমি কাউকে ভয়

পাই না। যতই দাঁড়িয়ে থাক শিবের অনুচরেরা, আমি যাব শ্বেতকে আনতে। মৃত্যু গিয়ে দাঁড়াল শ্বেতের পাশে। সে তখন শিবমন্ত্র যপ করছে।

পাশধারী মৃত্যুকে সেখানে দেখে এক শিবদূত বলল–কি হে মৃত্যু, তুমি এখানে কেন? কিছু কি উদ্দেশ্য? মৃত্যু বলল–আমার কাজ কি, তা তোমরা সকলেই জানো। এই শ্বেতের আয়ু ফুরিয়েছে, তাই ওকে নিতে এসেছি।

এই কথা বলেই মৃত্যু পাশ ছুড়ল শ্বেতের উপর, তাকে বাঁধবার জন্য। শিবের অনুচরেরা সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ড দিয়ে সেই পাশ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে সেই দণ্ড মৃত্যুর মাথার উপর তুলে গর্জন করে বলল–ওরে মূর্খ তুই জানিস না,শিবের ভক্তের উপর তোদের যমেদের কোন অধিকার নেই? বলেই মৃত্যুর মাথায় আঘাত করল। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর তার মৃত্যু হল।

এতক্ষণ যমদুতেরা দাঁড়িয়ে দেখছিল এইসব কাণ্ড। যেইমাত্র মৃত্যুর ভবলীলা সাঙ্গ হল, তখনই তারা প্রাণ নিয়ে ছুটে চলল যম পুরীতে। সব কথা বলল যমরাজকে। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন যমরাজ। আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে শিবের অনুচরেরা, তখন তিনি তার প্রধানমন্ত্রী চিত্রগুপ্তকে ডাকলেন। আর ডাকলেন মহিষ, ভূত, বেতাল আধি-ব্যাধি সবাইকে। সকলকে নিয়ে যমরাজ চলেছেন শ্বেতের বাড়িতে।

এদিকে শ্বেতের বাড়িতে হাজির হয়েছেন কার্তিক, গণেশ আর নন্দী। সহসা সদলবলে যমরাজকে আসতে দেখে তারা বুঝতে পারলেন এভাবে আসার কারণ কী? সবাই প্রস্তুত যুদ্ধের জন্য।

আস্ফালন করতে করতে যমরাজ যখন এসে একেবারে শ্বেতের কাছাকাছি হাজির, শিবের দল সব ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। শুরু হল মহা সমর! একদিকে দেব সেনাপতি কার্তিক, তার সঙ্গে লড়াই করতে পারে, যম দলে এমন কে আছে? তার অস্ত্রে প্রহারে যমদূতেরা সব ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়তে লাগল। বহু ধর্মদূত মারাও পড়ল। মৃত্যুলোকের অধিপতি যমরাজও পার পেলো না। প্রাণহীন দেহ নিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

তাদের মধে যারা বেঁচে ছিল, এই অবস্থা দেখে ছুটে গেল যমের পিতা সূর্যদেবের কাছে। সব শুনে সূর্য দেব গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ক্রমে ক্রমে সকলে এই দুঃসংবাদ পেয়ে ব্রহ্মার কাছে এলেন। সবাই মিলে পরামর্শ করলেন–যেভাবেই হোক শিবকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তিনি প্রসন্ন

হলে যমরাজের বাঁচার জন্য কোনো চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু তিনি যদি ক্ষেপে যান তাহলে সর্বনাশ।

আর কালবিলম্ব না করে সবাই চলল শিবের কাছে কৈলাসে। স্তব স্তুতি শুরু করল। শিব ধীরে ধীরে শান্ত মূর্তি ধারণ করলেন। বললেন–দেবগণ! তোমরা আমার স্তুতি করছ কেন? কি চাই?

দেবতারা হাত জোড় করে সবিনয়ে বললেন–হে দেবাদিদেব মহেশ্বর! আপনি হোন আমাদের প্রতি প্রসন্ন! যমকে বাঁচিয়ে দিন।

শিব বললেন–তা হয় না। যম আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে, মৃত্যুর দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। তোমাদের অন্য প্রার্থনা থাকলে বল, পূরণ করব।

দেবতারা বলল–হে মহেশ, আপনি সকলের পূজনীয়, আপনার আদেশমত আমরা নিজ পদে অবস্থান করে প্রজা শাসন করছি। যার যেমন ক্ষমতা আছে সেই অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করছি। যমকেও সকলের পাপ পুণ্যের বিচারের দায়িত্ব দিয়েছেন। সে তার দায়িত্ব ঠিকমতই তো পালন করছে। তাতে তার কোন অপরাধ তো আমরাই দেখতে পারছি না।

মহাদেব বললেন–আমার যারা ভক্ত তাদের ওপর যমের কোন অধিকার নেই। শ্বেত আমার পরম ভক্ত, যমের এত সাহস যে আমি অবাক হয়ে যাই। আমার ভক্তকে নিয়ে যেতে চায়? তোমরাও আমার ভক্ত, তাই তোমাদের আবেদন আমি রক্ষা করব, তবে একটা শর্তে। আমার ভক্তদের কখনও যমালয়ে নিয়ে যেতে পারবে না যম। এই শর্ত তোমরা যদি মেনে নাও, তাহলে আমি যমকে বাঁচতে দেব।

শিবের কথা শুনে দেবতারা চিন্তা করে বললেন–হে মহেশ্বর। আপনি পরম জ্ঞানী। কিন্তু আপনার বাক্য যদি আমরা মেনে নেই, তাহলে পৃথিবীর নিয়ম কেমন করে রক্ষা হবে? কেউ তো আর মারা পড়বে না। মরলেও আপনার লোকে এসে সকলেই অমর হয়ে থাকবে। স্বর্গের সঙ্গে পৃথিবীর পার্থক্য থাকবে কেমন করে?

শিব তার শর্তে অচল হয়ে, বললেন–যদি এই শর্ত মেনে নাও তাহলেই যমকে পাবে। আর একটা কথা যারা আমার ভক্ত, তারা যমের পাঠানো কোন ব্যাধিতেও ভুগবে না। যদি মান তাহলে ঠিক আছে হলে ফিরে যাও।

শিবের এমন কথার উপর আর কার কি বলার আছে? অগত্যা সকলে মেনে নিল মহাদেবের শর্ত। শিবের আজ্ঞায় নন্দী যমের গায়ে গোদাবরীর জল ছিটিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে উঠলেন অনুচরগণের সঙ্গে স্বয়ং যমরাজ। তারপর আপন পুরীর দিকে চললেন।

দেবতারাও মহেশ্বরের পূজা করে যে যার নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন।

মহাশনির কাহিনী

মহা বলবান হিরণ্যদৈত্য দেবতার বরে অজেয়। হিরণ্যের পুত্র মহাশনি পিতার মতই বলশালী আর যুদ্ধে ভয়ংকর।

দেবতা আর অসুরদের মধে চিরকালের দ্বন্দ্ব। মাঝে মাঝে যুদ্ধ লেগেই থাকে। একবার দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে মহাশনির ভীষণ যুদ্ধ লাগল। কখনও দেবতারা পরাজিত হলে অসুরদের জয়োল্লাস ওঠে। আবার কখনও অসুররা পরাজিত হলে দেবতাদের আনন্দ উল্লাস–এই ভাবেই চলছে সেই যুদ্ধ বহুদিন ব্যাপী।

অকস্মাৎ স্বর্গে ঘটে গেল এক বিপর্যয়। একবার সুযোগ পেয়ে মহাশনি ইন্দ্রকে ঐরাবত সহ সুকৌশলে ধরে ফেলল। দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল ঐরাবতের ইন্দ্রকে। পাতালে নিয়ে এল বাবা হিরণ্যের কাছে। দেবসেনারা যে যেদিকে পারল ছুটে পালিয়ে গেল।

পুত্রের প্রভূত প্রশংসা করল হিরণ্য। তারপর কড়া পাহারায় ইন্দ্রকে আটকে রাখল একটি প্রাসাদের কক্ষে। সেখান থেকে ইন্দ্রের পালাবার কোন সুযোগ নেই।

স্বর্গে রাজা নেই, কি ভাবে চলবে অমরাবতী? দেবতারা মহা ভাবনায় পড়লেন। যেভাবে হোক ইন্দ্রকে উদ্ধার করতে হবে, কিন্তু কেমন করে? অসুরদের সঙ্গে লড়াই করে জেতা সম্ভব নয়। কারণ দেবরাজ ইন্দ্রই স্বয়ং অনুপস্থিত, সেখানে কে যুদ্ধ পরিচালনা করবে?

তারপর দেবতারা যুক্তি স্থির করে বিষ্ণুর কাছে গেলেন। সব শুনে বিষ্ণু বললেন–তোমাদের অবস্থা আমি সব বুঝতে পারছি। কিন্তু মহাশনিকে শাস্তি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি চেষ্টা করে দেখি, কোনও কৌশলে ইন্দ্রকে রক্ষা করা যায় কি না।

তারপর বরুণদেবের কাছে বিষ্ণু গিয়ে বললেন–বরুণদেব! ইন্দ্রের অবর্তমানে তুমিই এখন ভরসা। তুমি যদি একটু চেষ্টা কর, তাহলে ইন্দ্রকে শনির কবল থেকে মুক্ত করা যেতে পারে। ইন্দ্রকে বন্দি করে মহাশনি যখন বরুণের পিছনে ধাওয়া করছিল বরুণ বুঝল এ যাত্রায় তার আর রক্ষা নেই, তাই সেই মুহূর্তে একটা যুক্তি স্থির করে নিজের মেয়ের সঙ্গে মহাশনির বিয়ে দিলেন। তখন মহাশনি বরুণের কোনও ক্ষতি না করে বরুণীর সঙ্গে সমুদ্রকে যৌতুক হিসেবে নিয়ে গেল।

এই কারণেই বিষ্ণু নিজেই এসেছেন বরুণের কাছে।

বিষ্ণুর অনুরোধ মানে আদেশের চেয়েও বেশি। আর কাল বিলম্ব না করে বরুণ চললেন পাতালে জামাই মহাশনির কাছে। বরুণকে দেখে তার খুব খাতির করল মহাশনি। তারপর বলল–বলুন বাবা, কি কারণে আমার পুরীতে এসেছেন?

বরুণদেব বললেন–তোমার ক্ষমতা আজ সর্বজন বিদিত। তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে ছেড়ে দাও। এতে তোমার সম্মানের, কোনও হানি হবে না। বরং পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলে সম্মান বৃদ্ধি পায়।

শ্বশুরের কথায় মহাশনি বন্ধ ঘর থেকে ইন্দ্রকে বাইরে এনে ছেড়ে দেবার আগে ইন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলল–তোমার নাম ইন্দ্র, দেবতাদের রাজা, কিন্তু সে যোগ্যতা তোমার কোথায়? কেমন করে কে তোমাকে রাজা করেছে বুঝতে পারছি না। যাই হোক, যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দি হয়ে ছাড়া পাবার জন্য যে অন্যের কাছে সুপারিশ করে, তাকে আমি কাপুরুষ ছাড়া আর কি বলব? নির্লজ্জ তুমি, ছাড়া পেয়েও স্বর্গের সিংহাসনে বসবে। যদি লজ্জা থাকে তাহলে স্বর্গের সিংহাসনে আর বস না। সব সময় সুখ ভোগ করবে এমন চিন্তা তোমার। শুধু একটা কথা মনে রেখ, যার জন্য তুমি আমার কাছ থেকে ছাড়া পেলে তিনি আমার শ্বশুর মশায়। যদি কখনও শুনি যে, তুমি তার উপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছ, তাহলে কিন্তু তোমাকে আমি আবার বেঁধে এনে এই পাতালে আটকে রাখব, যাও এখন আসতে পার।

মহাশনির কথাগুলি যেন এক একটি চাবুকের ঘা! শুনতে শুনতে অপমানে লজ্জায় ইন্দ্র যেন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে লাগলেন, ফিরে গেলেন স্বর্গে। সব কথা বললেন–শচীকে, কোনও কথা লুকোলেন না।

হাজার হোক স্বামী তো, তাই সমবেদনা জানিয়ে শচী বললেন–তুমি যখন মহাশনির কাছে যুদ্ধ করবার জন্য যাও, তখন আমার সঙ্গে একবারও পরামর্শ করলে না। যদি করতে, তাহলে এভাবে তোমাকে বিপদে পড়তে হতো না। তুমি তো আগে ভাগে কিছু জানার চেষ্টা করনা। তাই এখন লজ্জায় অপমানে দুঃখ ভোগ করছ।

ইন্দ্র বললেন–সবই বুঝলাম, কিন্তু এখন কেমন করে আমার অন্তরের জ্বালা মেটাব তাই ভাবছি। কত বড় বড় দৈত্য দানবকে নাশ করলাম! আর এখন কিনা সামান্য মহাশনির কাছে আমার এমন লাঞ্ছনা। যতক্ষণ না এই মহাশনিকে শেষ করতে পারছি, ততক্ষণ আমার মনে কিছুতেই শান্তি হবে না।

শচী বললেন–স্বামী তুমি একটু শান্ত হও। আমার কথা একটু মন দিয়ে শোন, দানব হিরণ্য সম্পর্কে আমার কাকা। কাজেই মহাশনি আমার ভাই। আমি দানবকুলের অনেক গোপন রহস্য জানি। মহাশনি ব্রহ্মার বরে দৈত্যগণের অজেয়, কিন্তু অবধ্য নয়। কাজেই তাকে বধ করতে হলে কোনও কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আমি বলি কি, তুমি তপস্যা কর দণ্ডকারণ্যে গোদাবরীর তীরে বসে, মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট কর। দেখবে, তিনিই মহাশনির বধের কোনও উপায় বলে দেবেন।

শচীর কথা ইন্দ্রের মনে লাগল। সঙ্গে সঙ্গেই চললেন দণ্ডকারণ্যে। মহাদেবের উদ্দেশ্যে তপস্যা শুরু করে দিলেন। কঠোর তপস্যা, প্রসন্ন হলেন শিব, দিব্যরূপ ধারণ করে ইন্দ্রের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন–কি চাই তোমার ইন্দ্র।

ইন্দ্র বললেন–আমি মহাশনির দ্বারা লাঞ্ছিত। সেই অপমানের কথা আমি কখনই ভুলতে পারছি না। আমি ওর নিধনের কোনও উপায় জানতে চাই।

মহাদেব বললেন–ব্রহ্মার বরে সে অজেয়, ওকে বিনাশ করা আমার একার শক্তিতে সম্ভব হবে না। বিষ্ণুর শক্তিরও প্রয়োজন হবে। তুমি শচীকে সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুর আরাধনা কর। তিনি তুষ্ট হলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

শঙ্করের কথা মত ইন্দ্র শচীকে নিয়ে বিষ্ণুর আরাধনায় রত হলেন। ধ্যান করলেন। প্রসন্ন হলেন বিষ্ণু, দেখা দিলেন চতুর্ভূজ মূর্তিতে। বললেন–ইন্দ্র তোমাকে কৌশল করে বরুণের দ্বারা মহাশনির কবল থেকে উদ্ধার করলাম। এখন আবার কি প্রয়োজন হল আমাকে আহ্বান করবার?

ইন্দ্র বললেন–হে প্রভু, আপনার অগোচর কিছুই নয়। আমি মহাশনির বিনাশ দেখতে চাই। যেভাবে সে আমাকে অপমানিত করেছে, তাতে আমি মর্মাহত। আপনি আমাকে শক্তি দিন, যাতে আমি মহাশনিকে বধ করে আমার অন্তরের জ্বালা জুড়াতে পারি।

বিষ্ণু বললেন–তাই হবে। আমার শক্তি, মহেশের শক্তি একত্র মিলিত হয়ে মহাশনিকে নাশ করবে। তোমাকে নিজের এই কার্যে কিছুই করতে হবে না। শুধু দেখ, কেমন করে মহাশনির নাশ হয়।

বিষ্ণু চলে গেলেন। তখন ইন্দ্র দেখল, গঙ্গার জলের ভেতর থেকে এক অদ্ভুত ভীষণাকার মূর্তি উত্থিত হল, এক হাতে চক্র আর এক হাতে ত্রিশূল। বিষ্ণু আর শিবের শক্তিতেই তার সৃষ্টি।

তারপর ভয়ংকর রবে গর্জন করতে করতে ছুটে চলল পাতালে, অল্পক্ষণের মধ্যেই মহাশনিকে বিনাশ করে দিল। ইন্দ্রের অন্তরের জ্বালা মিটল, আর দেবতারাও শান্তি পেলেন।

রাজা শর্যাতি সুপুরুষ ও বীর ছিলেন। তার রানির নাম সৃষ্টিকা। অসাধারণ রূপবতী এবং গুণবতী তিনি। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুছন্দা। যুবাকালেই হয়ে উঠেছেন ব্রহ্মর্ষি। তিনি একাধারে রাজ পুরোহিত আবার রাজবন্ধুও।

একদিন রাজা স্থির করলেন দিগ্বিজয় করতে যাবেন। সেই সঙ্গে দেশ ভ্রমণও করবেন। সঙ্গে নিলেন মধুছন্দাকে। একটার পর একটা দেশ তিনি জয় করতে থাকেন, অল্পদিনের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক রাজ্য জয় করলেন রাজা শর্যাতি কিন্তু তার বন্ধু মধুছন্দার মনে কোনো আনন্দ নেই। তাই দেখে একদিন শর্যাতি তাঁকে বললেন–এত দেশ জয় করে আমার মনে খুব আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু আপনাকে দেখছি যেন ক্রমশ বিমর্ষ হয়ে যাচ্ছেন, কি হয়েছে আপনার মনে কোনও আনন্দ নেই কেন?

মধুছন্দা বললেন–কিছু মনে করবেন না, বহুদিন হল বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, গৃহে ভার্য্যা একা রয়েছে। তার জন্যই মনটা কেমন করছে।

রাজা বললেন–সে কি কথা? আপনি না ব্রহ্মর্ষি? স্ত্রীর জন্য মন খারাপ করবে কেন? আপনার এই ভাবনা শোভা পায় না।

মধুছন্দা বললেন–আমার স্ত্রী যদি পতিব্রতা, সতী সাধ্বী না হত, তাহলে আমি ব্রহ্মর্ষি হতে পারতাম না, পতিসেবা না করে তিনি জলস্পর্শ করেন না, না জানি এখন সে কেমন করে কাল কাটাচ্ছে?

মৃদু হেসে বললেন–তাহলে শর্যাতি আর দেশ ভ্রমণে কাজ নেই, থাক, বরং ফিরে যাই। আপনার মন যখন চঞ্চল, তাই আর এগিয়ে কাজ নেই।

তারপর সবাই ফিরতে লাগল বাড়ির পথে। হঠাৎ রাজার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। এক দূতকে ডেকে বললেন–তুমি তাড়াতাড়ি রাজ্যে ফিরে গিয়ে সব জায়গায় রটিয়ে দাও যে রাজামশায় দিগ্বিজয়ে বের হওয়ার পর এক ভয়ংকর রাক্ষস অতর্কিতে এসে রাজা ও পুরোহিতকে হত্যা করে পালিয়েছে। কোথায় যে লুকলো, বহু খোঁজ করেও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। এই কথা রটনার পর কি ফলাফল হয় আমাকে এসে জানাবে।

রাজার নির্দেশমত সেই দূত তাড়াতাড়ি এসে সেই খবর প্রচার করে দিল। সেই খবর শোনা মাত্রই মধুছন্দার স্ত্রী প্রাণ ত্যাগ করলেন। কিন্তু রাজরানির মনে সন্দেহ হল–এত সৈন্য-সামন্ত থাকতে কেবলমাত্র রাজা আর রাজপুরোহিতকেই কেন বধ করল একটা রাক্ষস, আর কারো কোনও ক্ষতি করল না? রাজরানি বিশেষভাবে খবর নিতে চেষ্টা করলেন, খবরটা কতটা সত্য।

এদিকে রাজা তখন রাজ্যের প্রান্তে এসে উপস্থিত, সেখানে সেই দূত গিয়ে খবর দিল–হে রাজন, আপনার দেওয়া মিথ্যে সংবাদে পুরোহিত পত্নী দেহ ত্যাগ করেছেন। আর রানিমা নোকজন পাঠিয়ে খবরাখবর নিচ্ছেন।

এত কাণ্ড যে ঘটে গেল মধুছন্দা কিছুই জানেন না। দূতের মুখে এই খবর শুনে রাজার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। তিনি ভাবতেই পারেননি যে, কার স্ত্রী কাকে কত ভালোবাসে সেটা পরীক্ষা করতে গিয়েই এমন বিপদ হবে। দেশের রাজা হয়ে তিনি এ কি করলেন! যাকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন, যিনি সবসময় তাঁর মঙ্গল চিন্তা করেন, তারই স্ত্রীকে কিনা তিনি বিনাশ করলেন? ভাবতে পারছেন না, তিনি এখন কি করবেন? যখন মধুছন্দা জানতে পারবে যে রাজার মিথ্যা খবরের জন্যই তার পত্নী প্রাণত্যাগ করেছে কি উত্তর দেবেন তখন? রাজা অন্তরে বড়ই মর্মাহত হলেন, কোন্ মুখে তিনি রাজ্যে ফিরবেন?

তখন তিনি সকল সৈন্য সামন্তকে বললেন–আমার একটি বিশেষ কাজ আছে, সেজন্য আমি এখন নগরে ফিরছি না। তোমরা সবাই ফিরে যাও। রাজ্যে যদি কখন কোনও বিপর্যয় ঘটে, তবে আমি না ফেরা পর্যন্ত তার মোকাবিলা করবে।

তারপর রাজা চলে গেলেন গোদাবরী তীরে। বহু স্নান দান করলেন সেখানে।

এদিকে মধুছন্দা বাড়ি ফিরে দেখে যে তার স্ত্রী তার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ পেয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছে। পত্নীশোকে কাতর হলেন তিনি। কিন্তু রাজার নির্দেশমত তিনি পত্নীর সকার কার্য করতে পারলেন না।

ওদিকে মহারাজ গোদাবরী তীরে বহু দান-ধ্যান করার পর শুকনো কাঠ দিয়ে একটি চিতা সাজিয়ে আগুন জ্বেলে দিলেন। তারপর সেই চিতাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে বললেন–হে গঙ্গা, আমি যদি নিষ্ঠার সঙ্গে স্নান দান করে থাকি, যদি ধর্মমতে রাজ্যপালন করে থাকি, তাহলে আমার জীবনের এখনও যে আয়ু বাকি আছে, সেই আয়ু নিয়ে পুরোহিতের পত্নী জীবিত থোক।

এই বলেই শর্যাতি সেই চিতার আগুনে ঝাঁপ দিলেন। আর এদিকে মধুছন্দা দেখলেন। তাঁর পত্নী ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাচ্ছেন। তারপর উঠে বসলেন। সামনে স্বামীকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

তারপর মধুছন্দা খবর নিয়ে জানলেন যে, রাজা সাতদিনের পরও প্রাসাদে ফেরেননি। রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য ধ্যানে বসলেন তিনি, সব জানতে পারলেন। অবাক হলেন রাজার চরিত্র দেখে। দেশের রাজা হয়ে সে পুরোহিতের স্ত্রীর জন্য প্রাণ ত্যাগ করতে পারে, সেই রাজাকে যেমন করেই হোক ফিরিয়ে আনতে হবে। চললেন সেই গোদাবরী তীরে। যেখানে রাজা প্রাণ বিসর্জন দিলেন। একমনে শুরু করলেন সূর্যের স্তব।

মধুছন্দার স্তবে প্রসন্ন হয়ে সূর্যদেব উপস্থিত হলেন। তার সামনে বর প্রার্থনা করতে বললেন।

মধুছন্দা বললেন–আমার পত্নীর জন্য দেশের রাজা প্রাণ দিয়েছে। আমি সেই রাজা শর্যাতির প্রাণ ভিক্ষা চাইছি। সূর্যদেব রাজি হয়ে বললেন–আরও দুটি বর চাও।

মধুছন্দা বললেন–রাজার যেন কখনো কোনো অমঙ্গল না হয়। আর শেষ বরে আমি যেন এক সৎ পুত্র লাভ করি।

তাই হবেও-বলে সূর্যদেব অন্তর্হিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই চিতা থেকে মহারাজ হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন। মধুছন্দাকে নিয়ে ফিরে এলেন নিজের প্রাসাদে।

যথা ধর্ম তথা জয়

গোদাবরী তীরে ভৌবন নামে এক নগরে কৌশিক নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি খুবই সরল সাদাসিধে ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণী তার উল্টো, খল স্বভাবের। তাদের গৌতম নামে এক ছেলে ছিল তাদের। সেও ছিল ঠিক তার মার স্বভাবের।

মণিকুন্তল এক ধনী বণিকের পুত্র। অতি সরল, ধর্মভীরু সে। কারো কোনও কষ্ট দেখতে পারে না। মণিকুন্তল আর গৌতম–উভয় বিপরীত স্বভাবের, তবু কি কারণে জানি না তাদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল।

একবার মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে গৌতম বলল–চল আমরা দুজনে মিলে বাণিজ্য করতে যাই। শুধু শুধু বাড়িতে বসে কি লাভ? দেশ বিদেশে ঘোরাও হবে আর পয়সাও রোজগার হবে।

বন্ধুর কথা শুনে মণিকুন্তল বলল–কি দরকার? আমার বাবার যা সঞ্চয় যেভাবেই খরচা করি না কেন কোনও ভাবেই ফুরোবে না। সে সব ধন সম্পদে মানুষের সেবা করছি, ধর্ম কর্ম করছি, এর থেকে আর বেশি কী চাই?

মণিকুন্তলের কথা শুনে গৌতম তাকে তিরস্কার করে বলল–বাবার রোজগারের টাকায় ধর্ম কর্ম করছ। এটা কি একটা পুরুষের মত কথা হল? নিজে রোজগার করে খরচ কর, তবেই বাহাদুরি। ছেলের কাজ হবে টাকা রোজগার করে এনে বাবার হাতে দেওয়া। আর তুমি তার বিপরীত করছ।

মণিকুন্তল সেদিন আর কিছু বলল না, তবে মনে মনে চিন্তা করল, বন্ধু কথাটা কিছু মিথ্যা বলেনি। তাই দুজনে রাতের অন্ধকারে বেড়িয়ে পড়ল। মণিকুন্তল বেশ কিছু ধাতু সঙ্গে নিল।

কয়েকদিনে অনেক দূর এসে গেছে। একদিন গৌতম বলল বন্ধু তুমি যে এত ধর্ম-কর্ম কর, সত্যিই কি ধর্ম বলে কিছু আছে জগতে? আমার মনে হয় ধর্ম বলে কিছু নেই। তোমাকে একটা কাহিনী বলি। পরম ধার্মিক একজন ঋষি ছিলেন। পরম সদাচারী তিনি, ধর্ম-কর্ম ছাড়া থাকেন না। এক সময় তার এক পুত্র জন্ম লাভ করল। কি সুন্দর রূপ, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। ঋষি দম্পতির আনন্দের সীমা নেই। নয়নের মণি সেই পুত্র। মাত্র কয়েক মাস বয়স তার, এখনও দাঁত ওঠেনি। চলতেও পারে না। হামাগুড়ি দিয়ে চলে। কখনও পিতার কোলে, কখনও মায়ের কোলে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কোনও রোগ ব্যাধি নেই তার দেহে।

কিন্তু একদিন হঠাৎই বিনা কারণেই মৃত্যু হল সেই শিশুর। কান্নায় ভেঙে পড়লেন ঋষি দম্পতি। মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েন ঋষিপত্নী। কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারেন না। ঋষির মনেও গভীর শোক। ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারেন না। কিন্তু অন্তরে জ্বলে পুড়ে মরছেন কিন্তু কেন এমন হল কোনরূপ রোগ তো ছিল না।

মৃত পুত্রকে নিয়ে কপাল গৌতম গেলেন রাজা শ্বেতের কাছে। জানালেন পুত্রের মৃত্যুর কথা। অবাক হলেন রাজা। তার রাজত্বে কারোরই তো অকাল মৃত্যু হয় না। এখন ব্যতিক্রম হল

কেন? তিনি রাজা হয়ে কোনও অধর্মের কাজ তো করেন নি, যাতে তার রাজত্বে কাউকে অকালে প্রাণ দিতে হবে।

ঋষিকে সান্ত্বনা দিয়ে রাজা শ্বেত বললেন–ঋষিবর আপনি শোক ত্যাগ করুন। আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, যদি সাতদিনের মধ্যে এই শিশুর প্রাণ না দিতে পারি, তবে আগুনের চিতায় আমার প্রাণ বিসর্জন দেব।

এই প্রতিজ্ঞা করে রাজা শ্বেত বসলেন শিবের ধ্যান করার জন্য। তার ধ্যানে তুষ্ট হয়ে দিব্য মূর্তিতে শিব তার সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন–রাজা তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন। কী প্রার্থনা তোমার? আমাকে বল।

রাজা বললেন–আমার রাজ্যে অকাল মৃত্যু নেই। অথচ একটি ব্রাহ্মণ শিশুর মৃত্যু হল, তাই আমার একটিই প্রার্থনা, ওই ব্রাহ্মণ শিশুর প্রাণ আপনি ফিরিয়ে দিন। আর সত্যযুগের স্বাভাবিক যে আয়ু তা যেন সেই শিশুটি পায়।

মহাদেব 'তথাস্তু' বলে যমকে ডেকে পাঠালেন। যমরাজ সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হলেন। মহাদেব বললেন–তুমি যুগের নিয়ম মানছ না কেন? আমার আদেশে এক্ষুণি তুমি ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে দাও।

মহাদেবের কথার উত্তরে যমরাজের বলার আর কী আছে? বাধ্য হলেন শিশুর প্রাণ ফিরিয়ে দিতে। রাজার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হল। শ্বেতের রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে এল।

"শিব ভক্ত শ্বেতের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যমের দলের সঙ্গে কার্তিকের যুদ্ধ, যমাদির মৃত্যু ও শিবের বরে পুনরায় সকলের প্রাণ লাভ।"

.

শ্বেত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। শিবভক্ত তিনি। শিব পূজা না করে, জপাদি শেষ না করে তিনি কিছু আহার করতেন না। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌচেছেন। আয়ু পূর্ণ হতে আর বেশি দিন নেই। তথাপিও করে চলেছেন শিবের আরাধনা। শেষ সময়েও করে চলেছেন শিবমন্ত্র জপ।

পৃথিবীতে কার কখন মৃত্যু হবে, যমের সচিব চিত্রগুপ্তের খাতায় তা সব লেখা আছে। যখন যার মৃত্যুর সময়, তার কিছু পূর্বে যমরাজ তার দূতদের পাঠিয়েছেন তাকে আনবার জন্য।

শ্বেতের কাছে এসে পৌঁছলেন তারা, কিন্তু বিপত্তি ঘটল শ্বেতের বাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা।

যমপুরীতে চিত্রগুপ্ত বসে আছেন। শ্বেত গেলে তার বিচার হবে। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল। দূতেরা আসছে না কেন? ভাবিয়ে তুলল চিত্রগুপ্তকে। গিয়ে বললেন–যমরাজকে। যমরাজ তো অবাক! এমন তো হয়নি কখনও। সঙ্গে সঙ্গে ডাক দিলেন মৃত্যুকে। বললেন–যাও মৃত্যু, তুমি এক্ষুণি শ্বেতকে পাশে বেঁধে এখানে নিয়ে এস।

ভয়ংকর মৃত্যু তার পাশটি নিয়ে গর্বভরে ছুটে চলল শ্বেতের বাড়িতে। দরজার সামনে এসে দেখে সেই যমদূতেরা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনতোমরা অনেকক্ষণ এসেছ শ্বেতকে নিয়ে যেতে। তা এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

দূতেরা বলল–কি করব বুঝতে পারছি না। ভিতরের দিকে একবার চেয়ে দেখ স্বয়ং শিব শ্বেতকে আগলে বসে আছেন।

আমাদের এখানে ধর্ম বলতে কিছু নেই, যদি থাকত তাহলে ধার্মিকরা এত কষ্ট পেত না। যারা জগতে সুখ ভোগ করছে তারা আনন্দে দিন কাটাচ্ছে।

মণিকুন্তল বলল–না তোমার কথা ঠিক নয়। যারা এখন সুখভোগ করছে, দুদিন পরে তারা দুঃখ ভোগ করবে।

গৌতম বলল-ও সব তোমার মনগড়া কথা। চোখের সামনে আমরা দেখছি যা, তাকে কি তুমি উড়িয়ে দেবে?

মণিকুন্তল বলল–না আমি তোমার কথা মানতে পারছি না। চোখের সামনে যা দেখছি তা সবই যে খাঁটি–তা ঠিক নয়।

তারপর গৌতম বলল–বন্ধু আমাদের এভাবে তর্কাতর্কির শেষ হবে না, তার চেয়ে এখানকার

জ্ঞানী গুণী যারা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেই হয়। তুমি যাকে ধর্ম বলছ, সেটা আছে কিনা?

মণিকুন্তল বলল–তাই হোক, তারা নিশ্চয়ই আমার মতে সায় দেবেন।

হাসতে হাসতে গৌতম বলল–তাহলে বাজি রাখতে হয়। যদি তুমি হেরে যাও তাহলে তোমার যত ধনরত্ন আছে তা আমাকে দিতে হবে। এই প্রতিজ্ঞা কর। তবে তো বাজি ধরাই যায়।

ধর্মের প্রতি মণিকুন্তলের স্থির বিশ্বাস। তাই সে রাজি হয়ে গেল।

তারপর তারা চলল আশে পাশে কিছু জ্ঞানীগুণী লোকের কাছে। তাদের মতামত জানতে তারা বললেন–ধর্ম কর্ম আমরা জানি না, শুধু জানি পৃথিবীতে এসেছি সুখভোগ করতে।

এই কথা শুনে মণিকুন্তলের মনটা খুব খারাপ। বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে দেখে গৌতম হেসে বলল–কি বন্ধু বাজিতে হেরেও কি বলবে, ধর্ম আছে?

মণিকুন্তল বলল–হ্যাঁ আছে। সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেলেও বলব ধর্ম আছে। যারা মানে না, তাদেরকে আমি গ্রাহ্যই করি না।

গৌতম বলল–বেশ তাহলে বাজি ধর। আমরা অন্য দেশে গিয়ে ঐ একই কথা অন্য প্রবীণদের জিজ্ঞাসা করব। এবারের বাজি দুটি হাত। মণিকুন্তল রাজি হল। প্রবীণরা শুনে হেসে উড়িয়ে দিল। ধর্ম বলে কিছুই নেই। বাসায় ফিরে এসে গৌতম একটা তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে মণিকুন্তলের দুটো হাত কেটে নিল।

গৌতম বলল–কি এখনও বলবে ধর্ম আছে?

মণিকুন্তল যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বলল–হ্যাঁ আছে। গৌতম তার বন্ধু হয়ে এমন অমানবিক কাজ করল–তথাপি মণিকুন্তল তাকেও ত্যাগ করল না। মনে মনে গৌতম নতুন কৌশল আঁটল। যাতে মণি কুন্তলকে প্রাণে মারা যায়। ঘুরতে ঘুরতে তারা এল গঙ্গার তীরে যোগেশ্বর হরির মন্দিরে। মণিকুন্তল গঙ্গা ও হরির জয়ধ্বনি করল। কিন্তু গৌতম বলল–ধর্ম গেল, হাত গেল, তাও ধর্মের জয়। দিচ্ছ? আর একবার যদি ভগবানের নাম উচ্চারণ কর তাহলে তোমাকে হত্যাই করে ফেলব। বন্ধু বলে ক্ষমা করব না।

মণিকুন্তল হাসতে হাসতে বলল–যতক্ষণ এই দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আমি এই এক কথাই বলব।

গৌতম একেবারে খ্যাপা কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুরি দিয়ে তার চোখ উপড়ে নিল, একা ফেলে চলে গেল।

মণিকুন্তলের হাত নেই, চোখ নেই, সে বন্ধু বলে ডাকল! কিন্তু সাড়া না পেয়ে বুঝল তাকে একা ফেলে গৌতম চলে গেছে।

দিনের শেষে রাত হল। কিছুই বুঝল না সে। যন্ত্রণায় অচেতন হয়ে পড়ে আছে, সেদিন ছিল শুক্লপক্ষের একাদশী। আকাশের কোলে একফালি চাঁদ! প্রতিমাসে এই রাতেই লঙ্কা থেকে বিভীষণের পুত্র তাঁর অনুচরদের নিয়ে এই মন্দিরে আসতেন। সেদিন সবাই এসেছে। মণিকুন্তলকে ঐ অবস্থায় দেখে, ফিরে বিভীষণ পুত্র দয়াপরবশ পিতাকে জানাল। মন্দিরের পাশেই ছিল বিশল্যকরণী গাছ বিভীষণ তা দেখে বললেন–এর ডাল ক্ষতস্থানে লাগালেই হাত আর চোখ ফিরে পাবে।

পিতার কথা শুনে পুত্র তাই করল। মণিকুন্তল হাত ও চোখ ফিরে পেল, চমকে উঠে প্রিয়বন্ধু গৌতমকে ডাকল, মনে মনে ভাবছে, এসব গৌতমই বুঝি করেছে।

আড়াল থেকে বিভীষণ এই ঘটনা দেখে সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে গেলেন লঙ্কায় আর মণিকুন্তল গঙ্গায় স্নান করে বিষ্ণুর পূজা করে বাড়ি ফিরবার কথা ভাবলো। একা একা মহাপুরানগরীতে উপস্থিত হল। সেই রাজ্যের রাজার নাম বলবান। তার একমাত্র কন্যা পরম রূপশ্রী। কিন্তু তার চোখ কানা, বহু চেষ্টা করে তা সারাতে ব্যর্থ, রাজা প্রতিজ্ঞা করল যে তার মেয়ের চোখ ফিরিয়ে দিতে পারবে তার সাথেই কন্যার বিয়ে দেবে।

মণিকুন্তল সে কথা শুনে হাজির হল। সে জানাল সে কন্যার দৃষ্টি দান করতে সমর্থ। রাজা খুশি হয়ে তাকে অন্দরমহলে পাঠিয়ে দিলেন, মণিকুন্তলের স্পর্শে রাজকনা দৃষ্টি ফিরে পেল। রাজা আনন্দে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। আর জানতে চাইল কেমন করে এই অসম্ভব সম্ভব হল?

মণিকুন্তল কিছু গোপন করল না। শেষে বলল–ধর্মই শ্রেষ্ঠ বল যাকে তিনি সারা জীবন সঙ্গী করে রেখেছে।

রাজা বলরাম খুব খুশি হয়ে জাঁকজমক করে মণিকুন্তলের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিলেন। রাজার জামাতা হয়ে মণিকুন্তল রয়ে গেলেন শ্বশুরবাড়িতেই। মাঝে মাঝে বন্ধুর কথা মনে পড়ে। কেমন আছে সে? কোথায় আছে কি করছে সে? গৌতমের প্রতি মণিকুন্তলের এতটুকুও বিরূপতা নেই।

রাজা বলবান রাজকার্য থেকে অবসর নিয়ে মণিকুন্তলকেই রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে বনে গমন করলেন। বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করলেন। একদিন মণিকুন্তল রাজকার্য পরিচালনা করছেন, এমন সময় প্রহরীরা একজনকে দৃঢ়ভাবে বন্দি করে রাজদরবারে নিয়ে এল। মণিকুন্তলের চিনতে ভুলতে হল না, এতো সেই গৌতম, তার বন্ধু, সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন ছেড়ে উঠে গেলেন তার কাছে, তার বাঁধন খুলে দিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন–এ কি দশা তোমার?

গৌতম এখন নিঃস্ব। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তাই বন্দি হয়েছে। তার দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। মণিকুন্তল গৌতমকে শান্ত করে তার পিতা বৃদ্ধ কৌশিককে আনিয়ে বহু অর্থ দান করে বন্ধুর সঙ্গে স্বদেশে প্রেরণ করলেন। আর উপদেশ দিলেন–গোদাবরীতে স্নান করে যোগেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর পূজা করে তারপর যেন বাড়ি ফেরে।

ভক্তিযুক্ত পূজাই শ্রেষ্ঠ

গৌতমী গঙ্গার আরেক নাম গোদাবরী, তারই এক পাশে স্ত্রী পর্বত। তার উত্তরে এক বিশাল শিবলিঙ্গ নাম আদিবেশ।

বেদ মুনি পরম ধার্মিক এবং সুপণ্ডিত। শাস্ত্রমত যথাবিধি মন্ত্রে উপাচারে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিত্য দিন শিবের পূজা করেন তিনি।

আর এক ছিল ব্যাধ, নাম তার ভিল্ল। প্রতিদিন শিকার করে পশুপাখি যা পেত, সেই মৃত পশুর কাঁচা মাংস দিয়ে প্রতিদিন সেও শিবের পূজা করত। যদিও মন্ত্রতন্ত্র তার জানা নেই। মুখে শুধু বলত–হে শিব, তুমি আমার দেওয়া মাংস গ্রহণ করো। এইভাবে ভিন্ন শিব পূজা করে তারপর সে নিজের ঘরে ফিরত।

বেদমুনি নিত্য শুদ্ধচারে শিবের পূজার জন্য ভিক্ষা করতেন আর সন্ধ্যায় এসে দেখতেন শিবমূর্তির চারপাশে কাঁচা মাংসের টুকরো ছড়ানো। তিনি যেসব উপাচার দিয়ে পূজা করেছিলেন সেগুলো অনেক দূরে পড়ে আছে। এই দেখে মুনি খুব অবাক হতেন! কে করেছে এমন কাণ্ড? এত মহা পাপাচার। মনে মনে ভাবলেন তিনি যখন থাকেন না! তখন কোন দূরাত্মা এসে তার পূজার নৈব্যোদি ফেলে দিয়ে কাঁচা মাংস ছড়িয়ে দিয়ে মূর্তি সংলগ্ন স্থানটি অপবিত্র করে দিয়ে যায়। এভাবে কে দেবতার অপমান করে একদিন গোপনে দেখতে হবে।

এইভাবে তিনি পরদিন সকালে গোদাবরীতে স্নান করে নানান নৈবেদ্য ও ফুল দিয়ে শিব লিঙ্গের পূজা করলেন। তার পর লুকিয়ে থাকলেন। ক্রমে বেলা বাড়ল দুপুর হল, বিকেল হল, তারপর সন্ধে নেমে এল অরণ্যমধ্যে। এমন সময় এক ব্যাধিকে দেখতে পেলেন। তাড়াতাড়ি এসে শিকার করা মৃত পশুপাখির বোঝা নামিয়ে রেখে দেখল–কে যেন তাঁর ইষ্টদেবতা শিবকে নানা নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করে গেছে। খুব রাগ হল তার। ছুঁড়ে ফেলে দিল সেই সব উপাচার।

এমন কাণ্ড দেখে মুনির অঙ্গ জ্বলতে লাগল। বুঝতে পারল রোজ এই ব্যাধই এমন করে পাপাচার করে, দেখা যাক কি হয়?

এমন সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল, যা নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না। লিঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল জটাধারী ভস্ম মাখা ত্রিশূল হাতে স্বয়ং শিব। স্নেহের বশে ভিল্লকে বলল-হারে আজ তোর এত দেরি হল কেন? কতক্ষণ তোর অপেক্ষায় আছি। খিদে পায় না বুঝি আমার?

শিবের কথা শুনে ভিল্ল বলল–রাগ করো না ঠাকুর, আজ অনেক শিকার মিলল, সেগুলো ফেলে আসতে পারি না। আর একটু অপেক্ষা কর, তোমার খাবারের ব্যবস্থা করছি।

এই বলে ভিন্ন একটি পশুর চামড়া ছাড়িয়ে বের করে ফেলল মাংস। তারপর ছুটে গেল গঙ্গায়। হাতমুখ ধুয়ে, মুখে করে গঙ্গাজল ভরে নিয়ে তাড়াতাড়ি এসে সেই জল দিয়ে স্নান করিয়ে দিল লিঙ্গকে তারপর মাংস নিবেদন করে চলে গেল নিজের গৃহের উদ্দেশ্যে।

ভিল্লের এমন ব্যবহার দেখে বেদমুনি বিস্ময়ে হতবাক। আবার শিবের উপর রাগও হল প্রচণ্ড। এতদিন নিষ্ঠার সঙ্গে শাস্ত্রবিধিমত তিনি তার পূজা করেছেন। সামান্যতম বিধিও লঙ্ঘন করেননি তিনি। তবুও শিব তাঁকে দেখা না দিয়ে দেখা দিলেন অনাচারী ব্যাধকে। আবার তার

দেওয়া নৈবেদ্য নিবেদন করা সত্ত্বেও ব্যাধকে বললেন–যে, তিনি ক্ষুধার্ত। আজব ব্যাপার! আর ব্যাধের কুলকুচার জলে স্নান করে কাঁচা মাংস খেলেন তিনি।

তারপর সে গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে এলেন। রাগে গরগর করছেন বেদমুনি। তুমি দেবতা হয়ে অনাচারকে মেনে নিলে? আজ আমি একটা পাথর দিয়ে তোমার মাথা ভাঙ্গব। এই বলে একটা পাথর কুড়িয়ে এগিয়ে গেল শিবের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে শিব দেখা দিলেন। বললেন–বেদ, তুমি খুব রাগ করেছ। আমার উপর। ঠিক আছে আমাকে যখন ভাঙ্গবে ঠিক করেছ, তখন ভাঙ্গবে, কিন্তু আজ নয় কাল।

শিবের দেখা পেয়ে বেদমুনি অস্তিত্ব ফিরে গেলেন নিজের বাড়ি। সারারাত ঘুমাতে পারলেন না। শিবের কথা ভেবে কাটল সারা রাত, আজ নিজের কথাও চিন্তা করে অনুশোচনা করলেন মনে মনে।

পরের দিন সকাল হতেই গঙ্গায় স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্রে, শুদ্ধাচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে শিবের পূজা করতে বসলেন। বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে শিবলিঙ্গের উপর ফুল দিতে গিয়ে দেখলেন, লিঙ্গের উপর চাপ চাপ রক্তের দাগ। মনে ভয় পেলেন। গোবর আর গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে দিলেন সেই রক্তের দাগ। তারপর ফুল আর বেলপাতা দিয়ে পূজা করলেন শিবের।

পূজা শেষে লুকিয়ে থাকলেন, ব্যাধের ও শিবের ঘটনা দেখতে।

দেখলেন দুপুরের দিকে ব্যাধ এল। তার দেওয়া নৈবেদ্য দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর নদীতে গিয়ে মুখে করে জল এনে শিবলিঙ্গকে স্নান করাতে গিয়ে দেখে একেবারে চমকে উঠে স্নান করাতে পারল না, নিজের গা বেয়েই পড়ে গেল সব জল, একি ঠাকুরের এমন দশা কে করল? কোন পাষণ্ড ঠাকুরের মাথায় আঘাত করে রক্তপাত করল? কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ভিন্ন। এইভাবে কাঁদতে কাঁদতে তৃণ থেকে বাণ নিয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল, নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল।

ব্যাধের কাণ্ড দেখে শিব দেখা দিলেন–বেদমুনি আড়াল থেকে বেরোলেন। শিব ব্যাধকে স্নেহপূর্ণ বাক্যে শান্ত করে, বেদমুন্নির উদ্দেশ্যে বললেন–মুনি কি দেখলে আর কি বুঝলে? তুমি আমার মাথায় রক্ত দেখে গোবর মাখিয়ে গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে দিলে, আর এই ব্যাধি সইতে না পেরে নিজের জীবনটাই শেষ করতে উদ্যত। শিবের কথায় বেদমুনির দিব্য চক্ষু লাভ হল। বুঝতে পারলেন, তিনি এতদিন শাস্ত্রাচার মেনে বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করে মহাদেবের পূজা

করলেন, আর মূর্খ ব্যাধ সে তো মন্ত্র জানে না। শাস্ত্রাচার জানে না। কেবল মাত্র ভক্তিভরে পূজা করে সে, ব্যাধের মত মুনির অন্তরে ভক্তি কোথায়?

মুনির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ব্যাধের কাছে এগিয়ে গিয়ে দুহাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন।

ইন্দ্র প্রমতি চিত্রসেন সংবাদ

দেবতা ও অসুরদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ বাঁধে। ইন্দ্রের বন্ধু রাজা প্রমতি। দেবতাদের সাহায্যের জন্য স্বর্গে যান। একবার তিনি স্বর্গে গিয়ে দেখেন যে, ইন্দ্রকে ঘিরে অনেক দেবতা পাশা খেলায় ব্যস্ত।

তা দেখে প্রতি বিদ্রূপ করে বললেন–ইন্দ্র যারা তোমার অনুগত তাদের সঙ্গে পাশাখেলায় কি আনন্দ আছে? বন্ধুতে বন্ধুতেই পাশা খেলায় মজা আছে।

যদি আমার সঙ্গে খেল তবে আমারও খুব ভালো লাগবে।

সাধারণভাবে পাশাখেলা হয় না। একটা পণ রাখতে হয়। ইন্দ্র প্রমতির কথায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গেলেন। আর পণ রাখলেন ঊর্বশীকে, প্রমতি পণ রাখলেন তার ডান হাত। শুরু

হল পাশাখেলা। প্রমতি অল্পক্ষণেই ঊর্বশীকে জিতে নিলেন। দ্বিতীয়বার খেলা শুরু হল, পণ রাখলেন ইন্দ্র তার সুবিখ্যাত রথ আর বজ্র। প্রমতি রাখল আবার তার সেই ডান হাত।

এবারেও ইন্দ্র হারলেন, বজ্র আর রথ হারলেন। এবারে জিদ চেপে বসল, যেমন করেই হোক, পরবর্তী খেলায় বন্ধুকে হারাতেই হবে। কিন্তু না! নিজেই হেরে গেলেন, খোয়া গেল আরও কতগুলি প্রিয় বস্তু।

এমন সময় বিশ্বাবসু নামে এক গন্ধর্ব সেখানে উপস্থিত। নাচ গান আর পাশাখেলায় গন্ধর্বেরা খুব পটু। ইন্দ্রকে সেই খেলায় হারতে দেখে, বিশ্বাবসু এগিয়ে এলেন ইন্দ্রের সাহায্যে। গর্বোদ্ধত প্রমতি বিশ্বাবসুকে জিজ্ঞাসা করলেন–এবার কি পণ রাখবেন তিনি?

বিশ্বাবসু বললেন–আমি গন্ধর্বগণের রাজা, পণ রাখলাম গান্ধর্ব-বিদ্যা। খেলা শুরু হল। একদিকে ইন্দ্র আর বিশ্বাবসু অন্যদিকে রাজা প্রমতি। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য ইন্দ্রের! বিশ্বাবসুকে সঙ্গে নিয়েও হেরে গেলেন প্রমতির কাছে।

অহংকারে মত্ত হয়ে রাজা প্রমতি ইন্দ্রকে বললেন–তুমি একেবারেই নিষ্কর্মা। কেমন করে তুমি যে অমরাবতীর রাজা হলে বুঝতে পারছি না। দেবরাজ হওয়ার কোনও যোগ্যতা নাই। না জান পাশা খেলতে, তাহলে কি জান তুমি? তার চেয়ে তুমি এক কাজ কর, তুমি আমার সেবক হয়ে সেবা কর। গর্বে একেবারে উন্মত্ত হয়ে গেছে রাজা প্রমতি। তারপর ঊর্বশীকে বললেন–তোমাকে দেবতারা খুব খাতির করে রূপ-যৌবন আছে বলে। কিন্তু আমি করি না। তুমি আমার দাসী হবার যোগ্য।

প্রমতির এমন কথা শুনে ঊর্বশী বাধা দিয়ে বলল–রাজা তুমি এমন কথা বলো না। দাসীর কাজ করা কি আমার দ্বারা শোভা পাবে?

প্রমতি কিন্তু জেদ ধরেই বললেন–উর্বশী তুমি আমার দাসীর কাজই করবে।

বিশ্বাবসুর ভাই চিত্রসেন গন্ধরাজ সেই সময় সেখানে এসে প্রণতির এমন গর্বিত কথা শুনে তাকে বাধা দিয়ে বললেন–রাজা তুমি পাশা খেলায় খুব দক্ষ বুঝতে পারছি। আমি একবার তোমার সঙ্গে খেলতে চাই।

চোখ দুটি তুলে তাকালেন প্রমতি চিত্রসেনের দিকে। সে খুবই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি! এ আবার কে এল? হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল!

পাশাখেলায় নিয়ম আছে। কেউ এই খেলায় আহ্বান করলে তার সঙ্গে খেলতে হবে। অগত্যা রাজী হলেন মতি, কিন্তু কি পণ রাখবে এ খেলায়? জীবন পণ রাখল চিত্রসেন। খেলা শুরু হল। কয়েকটা দান খেলার পর প্রমতি বুঝলেন চিত্র সেন যে সে লোক নয়, পাশাখেলায় একজন দক্ষ খেলোয়াড়। তাই মন দিয়ে খেললেন, শেষে হার হলো এবার প্রমতির। যা যা সে লাভ করেছিল সব হারতে হল। চিত্র সেন সব জিতে নিল, শুধু তাই নয়। গন্ধর্ব পাশে বন্দি করে তাকে সেই স্বর্গেই রাখল।

বন্দি হয়েই রইলেন মতি, দেশে ফেরা আর হল না। তার পুত্র ও মুনতি মহাভাবনায় পড়ল। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুছন্দার কাছে গিয়ে জানাল পিতার বিষয়।

মধুছন্দা অল্প বয়সেই ব্রহ্মর্ষি, ধ্যানে বসে জানতে পারলেন সব। তখন সুমতিকে বললেন–তোমার বাবা দেবলোকে গিয়ে পাশা খেলে প্রথমে ইন্দ্র আর বিশ্বাবসুকে হারিয়ে খুব অহংকার করেছিলেন। ইন্দ্রকে সেবক এবং ঊর্বশীকে দাসী করতে চান। পরে চিত্ররথ গন্ধর্বের কাছে হেরে সর্বস্বান্ত হলেন, শুধু তাই নয় তার কাছে বন্দিও হন। বর্তমানে তিনি স্বর্গেই বন্দি হয়ে রয়েছেন।

সুমতি, পাশা খেলতে বসলে তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। মানুষ অমানুষ হয়ে যায়। তোমার বাবার অবস্থা হয়েছে তাই।

মধুছন্দার মুখে তার বাবার বন্দি দশা জেনে খুব দুঃখ পেল সুমতি। তারপর সবিনয়ে বলল–বাবাকে কি উপায়ে উদ্ধার করা যাবে অনুগ্রহ করে বলুন।

মধুছন্দা বললেন–তুমি উপযুক্ত ছেলের মতই কথা বলছ, কিন্তু সে যে বড় কঠিন কাজ, পারবে কি তুমি?

সুমতি বলল–এমন কি কঠিন কাজ, যা অসাধ্য? আপনি বলুন যত কঠিনই হোক না কেন অবশ্যই চেষ্টা করব।

মধুছন্দা বললেন–পারবে কি তুমি হাজার বছর তপস্যা করতে? তাতে তোমার বাবা মুক্ত হতে পারবে।

সুমতি তাই করল। নিষ্ঠার সঙ্গে তপস্যা করল হাজার বছর। দেবতাদের খুশি করল। তার পিতা রাজা প্রমতির মুক্তি হল। স্বর্গলোক থেকে ফিরে এলেন রাজা, বুঝলেন পাশা খেলার পরিণাম। তাই তিনি আর জীবনে কখনও পাশ স্পর্শ করেন নি।

একাদশীর মাহাত্ম্য

চণ্ডালরা সাধারণতঃ অধার্মিক আর নিষ্ঠুর হয়। কিন্তু অবন্তী নগরবাসী এক চণ্ডালের স্বভাব ছিল একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। পশুর চামড়ার ব্যবসা করত সে। কিন্তু কোনও লোভ ছিল না। তাতে সংসার চালাতে যতটুকু খরচ সেটুকু হলেই হল। একটি মহৎ গুণ ছিল তার, সুন্দর উত্তাল গাইতে পারত। তার থেকেও তার আর এক বিশেষ গুণ ছিল, বৈষ্ণবীয় আবার পালন করত সে, প্রতি মাসে দুটি একাদশীতে উপবাস করত। বিষ্ণু মন্দিরে গিয়ে সুন্দর সুন্দর ভক্তিমূলক গান গাইত সারারাত্রি বসে। পরদিন সকালে বাড়ি ফিরে কোন বৈষ্ণবকে সেবা দিয়ে তারপর সে নিজের উপবাস ভঙ্গ করত।

এইভাবেই শুদ্ধাচারে থাকে সেই চণ্ডাল। একদিন সকালে বিষ্ণু দেখার জন্য শিপ্রা নদীর ধারে গেল ফুল তুলতে এমন সময় সেখানকার একটি বহেড়া গাছ থেকে বেরিয়ে এল এক ব্রহ্মরাক্ষস। হাঁ করে ছুটে এল চণ্ডালের দিকে।

চণ্ডাল খুব ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু বাইরে যেন ভীত নয় এমন ভাব দেখিয়ে হাত জোড় করে সবিনয়ে বলল–তুমি আজ আমাকে ছেড়ে দাও। কালকে আমাকে খাবে। আমি কথা দিচ্ছি। কালকে সকাল সকাল আমি তোমার কাছে আসব।

চণ্ডালের কথা শুনে রাক্ষস বলল আজ দশ দিন হল এ পথে কেউ মাড়ায় না কাজেই আমি না খেয়েই আছি। মরতে বসেছি খিদের জ্বালায়। আর তুমি বলছ–কালকে খাবে। কিন্তু কেন?

চণ্ডাল বলল আজ আমার বিষ্ণুপূজার দিন। তাই এসেছি ফুল-ফলাদির যোগাড় করতে। তাই অনুরোধ করছি, আজকের দিনটা আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কথা দিচ্ছি, কালকে নিশ্চয় আসব তোমার কাছে।

রাক্ষস বলল–কিন্তু আমি তোমাকে বিশ্বাস করব কেমন করে? তুমি ত মিথ্যা কথা বলে আর নাও আসতে পারো, কি প্রমাণ আছে তোমার?

চণ্ডাল বলল–প্রমাণ আর কি দেব, আমার কথাই আমার প্রমাণ। আমি তিন সত্যি করে বলছি আসব, আসব, আসব। পিছিয়ে এল রাক্ষস, চণ্ডালের পথ মুক্ত হল। ফুল-ফলাদি নিয়ে চণ্ডাল গেল বিষ্ণুমন্দিরে। ব্রাহ্মণ ঠাকুর পূজা শেষ করে চলে গেল আর চণ্ডাল মধুর কণ্ঠে গান গাইল ভক্তি সঙ্গীত। সারারাত কেটে গেল, প্রভাত হতেই চণ্ডাল চলে এল বহেড়া গাছের তলায়। পথে কত লোক জিজ্ঞেস করেছে, বনের দিকে যাওয়ার কারণ কী? সকলের কাছে সত্য কথা বলেছে চণ্ডাল, সবাই শুনে তাকে মূর্খ বলে উপহাস করে বাড়িতেই ফিরে যেতে বলেছিল, কিন্তু ধর্মভীরু চণ্ডাল কারোর কথা শোনে নি। হাজির হল ব্রহ্মরাক্ষসের কাছে।

সত্যি সত্যি চণ্ডাল ফিরে এল দেখে ব্রহ্মরাক্ষস একেবারে অবাক হয়ে গেল। মনে ভেবেছিল যে আসবে না, খাবার কথা ভুলে গেল। ভাবল এ মানুষটা মানুষ নয়। জিজ্ঞাসা করল চণ্ডালকে–তুমি বিষ্ণু পূজা করার পর সারারাত কি করলে? আমার কথা চিন্তা করে তুমি বার বার ভয়ে কম্পিত হয়েছ?

চণ্ডাল বলল–না। ভয় পাব কেন? তোমাকে তিন সত্যি করে কথা দিয়েছি। তাই এলাম, কথা দিয়ে যে কথা রাখে না, সে মহাপাতক? কালকে আমি মন্দিরে গিয়ে পূজা দিলাম, তারপর সারারাত ধরে দেবতাকে গান শোনালাম, তারপর এই সকালে তোমার কাছে চলে এলাম। ঘরেও যাইনি। যদি জানতে পারে তোমার কথা তাহলে আমার স্ত্রী ছেলেপুলেরা কি আসতে দিত?

রাক্ষস বলল–তুমি এভাবে কতদিন বিষ্ণুর পূজা করছ?

চণ্ডাল বলল–প্রায় কুড়ি বছর হল প্রতি মাসে দুটি একাদশীতে এইভাবে পূজা দিয়ে আসছি।

চণ্ডালের কথায় ব্রহ্মরাক্ষস তো অবাক। এ আমি কাকে খেতে যাচ্ছিলাম। এতো বড় পূণ্যাত্মা। এত ঘটা বড় বড় ঘটি। সাধু সঙ্গে সব সিদ্ধি লাভ হয়। আমি যদি এই পূণ্যত্মার একটু পুণ্যলাভ করতে পারি তাহলে আমি এই রাক্ষস যোনি থেকে মুক্তি লাভ করব।

এই চিন্তা করে রাক্ষস চণ্ডালকে তার পুণ্য দান করার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু চণ্ডাল বলল–আমার আর পুণ্য থাকছে কেমন করে? তুমি তো এক্ষুণি আমাকে খাবে, তাহলে সবই তো তোমার কাছে চলে যাবে।

রাক্ষস বলল–আমি মহাপাপী। তাই রাক্ষসযোনি লাভ করে এতো যন্ত্রণা ভোগ করছি। তোমার সাক্ষাৎ যখন পেয়েছি তখন তুমিই আমাকে উদ্ধার কর।

চণ্ডাল বলল–তোমার কি পূর্বজন্মের কথা ঠিক মনে আছে? আমার নাম ছিল দেবশর্মা, পিতা ছিলেন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আমিও বাবার কাছে কাছে থেকে অল্পবয়সে সেই যজ্ঞাদির কাজ কিছু শিখে ছিলাম। একদিন আমি রাজবাড়িতে যুক্ত হচ্ছ শুনে বাবার সঙ্গে গিয়ে ঘৃতাহুতি দিলাম। দশ দিন ধরে যজ্ঞ করেছিলাম। তারপর শেষ আহুতির দিন আমায় মৃত্যু হল। তারপরই আমি এই রাক্ষস হয়েই আছি।

এখন তুমিই আমার ভরসা। কোন সৌভাগ্যের বলে তোমার দেখা পেয়েছি। তুমিই আমাকে উদ্ধার কর।

সব শুনে চণ্ডাল বলল–আমি জানি না, আমার কত খানি পুণ্য আছে? তবে যদি কিছু থাকে তার থেকে তোমাকে কিছু দিতে পারি, তবে আমার একটা শর্ত তোমাকে পালন করতে হবে।

রাক্ষস খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল–কি তোমার শর্ত? আমাকে বল, আমি নিশ্চয় তা পালন করব। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।

চণ্ডাল বলল–শর্ত একটাই। তুমি আর কোন প্রাণী হিংসা করবে না। সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেল ব্রহ্মরাক্ষস। চণ্ডাল তার পুণ্যের কিছু অংশ দান করল তাকে, রাক্ষস চণ্ডালের পায়ে প্রণাম করে চলে গেল। পৃথক নামক তীর্থে আর কোন প্রাণী হিংসা না করে বহুদিন অনাহারে কাটিয়ে মুক্তিলাভ করল।

এদিকে চণ্ডাল বাড়ি ফিরে এল। কিন্তু তার আর সংসার ভালো লাগে না। ছেলের হাতে সংসারের ভার দিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। ঘুরতে ঘুরতে এল বিন্ধ্যাচলে। একদিন সে মনে মনে চিন্তা করল–কেন তার চণ্ডাল কুলে জন্ম হল? পূর্বজন্মে সে কে ছিল?

এইভাবে চিন্তা করতে করতে পূর্বজন্মের কথা তার স্মরণে এল। পূর্ব জন্মে সে একজন সন্ন্যাসী ছিল। ভিক্ষাই ছিল জীবিকা। একদিন ভিক্ষাশেষে যখন আশ্রমে ফিরছে তখন কয়েকজন চোর অনেক গরু চুরি করে পালাচ্ছে, সেই গোরুগুলির ক্ষুরের ধুলো উড়ে তার অন্নের উপর পড়ল। মনে খুব রাগ জন্মাল, কিন্তু কাউকে কিছু না বলে সেই ভিক্ষার সকল জিনিস বাইরে ফেলে দিল। সন্ন্যাসী হয়েও যখন সে রাগ দমন করতে পারেনি, তাই তাকে চণ্ডাল হয়ে জন্ম নিতে হয়েছে।

এক বণিকের ছেলে ছিল তার নাম বিধর। দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করল সে। বিশাল বাড়ি যেন প্রাসাদ। স্বামী স্ত্রী মাত্র দুজনেই থাকে। কোন কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু তাদের একটাই দুঃখ তার পত্নীর গর্ভে কোন ছেলে পুলে হয়নি। তাই বিশ্বধরের বিতৃষ্ণা সংসারে প্রতি যত দিন যায়, সেই বিতৃষ্ণাও তত বৃদ্ধি পায়।

যৌবন কাল গেল। প্রৌঢ় কাল গেল। এল বৃদ্ধ কাল। দিনে দিনে চিন্তা করে বৃদ্ধ। সে যখন মরে যাবে। তার বংশও লোপ পেয়ে যাবে এক দিন, এতদিন পরে করুণা হল, তার স্ত্রী গর্ভবতী হল। বিশ্বধরের মনে খুব আনন্দ। যথাকালে একটি পুত্র লাভ করল সে। পুত্রের মুখ দেখে বৃদ্ধের যে কি আনন্দ হল সকল বিতৃষ্ণা দূর হয়ে গেল। যেন নতুন জীবন লাভ করল। পুত্রের পরিচর্যায় সব সময় সজাগ দৃষ্টি।

দিনে দিনে বড় হতে লাগল সেই শিশু বালক। খেলাধূলা করে বেড়ায়। কি অদ্ভুত সুন্দর দেখতে। কোন রোগ ব্যাধি নেই। তার উপর বৃদ্ধ বয়সের পিতামাতার আদরের ধন। কিন্তু

একদিন হঠাৎ মৃত্যু হল। যেন বজ্রাঘাত হল বাবা-মার মাথায়। আছড়ে পড়ল মৃত পুত্রের উপর। হায়। আমরা কি অপরাধ করেছি যার জন্য আমরা এই বৃদ্ধকালে পুত্রশোক পাচ্ছি। যদি দয়া করে দিলেন ঠাকুর। আবার ফিরিয়ে নিলেন কেন?

সেই বালকের মৃত্যুতে যমরাজ পাঠিয়ে দিয়েছে তার মৃতদের। কিন্তু তারা এসে দেখল যে মা-বাবা জড়িয়ে ধরে রেখেছে তাদের পুত্রকে। কাছে যেতে ভয় করছিল দুতেদের। ফিরে গেল যমলোকে। যমকে বলল সব কথা। যমরাজ ছুটে এল আর কিছুর দের নিয়ে বণিকের বাড়িতে। কিন্তু বালককে কেমন করে নিয়ে যাবে? বাবা মায়ের আকুল কান্না দেখে যমরাজের কঠিন প্রাণও গলে গেল। পারলেন না তাদের কোল থেকে সেই শিশুকে ছিনিয়ে নিতে।

বণিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যমলোকে আর না ফিরে গোদাবরীর তীরে বসলেন। তপস্যা এবং ধ্যানে শান্তি লাভ করলেন যম।

এদিকে যমপুরীতে যম নেই। যমের রাজ্য অবল অবল হয়ে গেল। কে আদেশ করবে? দোর স্ত্রাণ নিয়ে আঘাত হবে? যমদূতের পুরিতে কাটছে। কোন কাজ নেই পৃথিবীতে মানুষও আর মরে না। কিন্তু যম তো হচ্ছেই কাজেই বেড়ে যাচ্ছে। মানুষের সংখ্যা খাদ্যলিখ্যে টান পড়ল। এত লোকের থাকবার জায়গা কোথায়।

এই অবস্থায় ধরিত্রী দেবী ভীত হয়ে পড়লেন। এভাবে যদি বাড়তে থাকে প্রাণীর সংখ্যা তাহলে শেষ পর্যন্ত কোথায় এসে দাঁড়াবে। চললেন দেবরূপ, যজ্ঞের কাছে গিয়ে পড়লেন। তার কাছে বললেন–দেবরাজ আমি আর সইতে পারছি না মানুষের ভার। যমরাজ তার দোষ দেখছেন না। এখন আমি করব কেমন করে? একটা কিছু করুন আপনি। আমার প্রাণ যে ওষ্ঠাগত।

পৃথিবীর কথা শুনে আশ্চর্য হলেন। যম তাহলে আর দায়িত্ব পালন করছে না। তাই তো পৃথিবীতে প্রাণীর মৃত্যু হচ্ছে না। কিন্তু কি করছে সে? তখন সিদ্ধ আর কিংকরদের ডেকে বললেন–তোমরা দেখবে যমরাজ এখন কি করছে? কোথায় আছে?

ইন্দ্রের আদেশ মত তারা যমপুরীতে গিয়ে দেখল, যমরাজ নেই। আর কোথায় যে তিনি তাও কেউ জানে না। ফিরে এসে তারা ইন্দ্রকে খবর দিল।

মহাচিন্তায় পড়লেন ইন্দ্র, তাহলে যমের পিতা সূর্যের কাছে যাওয়া যায়। তিনি নিশ্চয় বলতে পারবেন যম কোথায় আছে? চলল সবাই মিলে সূর্যের কাছে, জিজ্ঞাসা করল যমের সংবাদ।

সূর্যদেব একটু চিন্তা করে বললেন–আমার পুত্র মামন গোদাবরী তীরে তপস্যার রত আছে।

অবাক হয়ে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন-যম আবার কার তপস্যা করছে?

সূর্যদেব বললেন–তা কিন্তু বলতে পারব না।

দেবরাজ কিন্তু খুব চিন্তায় পড়লেন। যমের তপস্যার কারণ কি? যমপুরীর রাজা হয়ে কি তার সাধ মেটেনি? সে কি অমরাবতীর রাজা হতে চায়? বিষ্ণুর তপস্যা করলে, তিনি তো এতটুকুতেই খুশি হয়ে যান। হয়ত যমকে তাই দিয়ে দিতে পারেন।

কিন্তু না, আর তাকে বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। যেমন করেই হোক তার তপস্যা ভণ্ডুল করে দিতে হবে। সিদ্ধ আর কিন্নরীদের পাঠিয়ে দিলেন অনেক বলে কয়ে।

সিদ্ধ কিন্নরগণ সত্বর চলে গেল গোদাবরী তীরে। বহু চেষ্টা করল যমের তপোউদ করার। দিন, না। সব বলল।

শেষ ভরসা আস্মারসন। তাদের দিকে তাকালেন দেবরাজ। কিন্তু সবই চুপ, শক নাটু, দেবল, মৈনবাই সুখ খুল্লা দেবরাজ আমাদের সাধ্য নেই। ওখানে যাবার। তবে আমায় এক পরিচিত মেয়ে আছে, সে হয়ত সফল হতে পারে।

ইন্দ্র আশ্বস্ত হয়ে বললেন–এখুনি পাঠাও তাকে, সফল হলে স্বর্গে তাকে বহু সম্মানিত করা হবে।

মেয়েটি গোদাবরী তীরে উপস্থিত হল যমরাজের কাছে। তার আগমনে সেখানকার পরিবেশের আমূল পরিবর্তিত হল। যম চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাকিয়ে দেখলেন সেই মেয়েটিকে, একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তার কি রূপ। কি সুন্দর দুটি চোখ, কি সুন্দর মুখের হাসি রয়েছে স্থির হয়ে, তিনি আর বসতে পারলেন না। যম উঠে পড়লেন আসন ছেড়ে স্থির কখন বন্দন হল। মেয়েটিও উঠে ও হয়ে গেল।

তারপর স্বয়ং সূর্যদেব এলেন যমরাজের কাছে। স্নেহ ভরে বললেন–তুমি এ কি করছ পুত্র? যার উপর যেমন দায়িত্ব দেওয়া আছে। সবাই তা পালন করে চলেছে ঠিক ভাবে আর তুমি তোমার দায়িত্ব না পালন করে তপস্যার রত হলে? তোমার কাজের অবহেলায় পৃথিবীর কি দশা হয়েছে, একবার চেয়ে দেখ, চরম অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কেউ মারছে না। প্রাণীর সংখ্যা

বেড়ে চলেছে। থাকবার জায়গা পাচ্ছে না। খাদ্য পাচ্ছে না। কাজেই তুমি তোমার নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন কর।

যমরাজ বললেন–আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি পিতা কিন্তু আমার কাজটা মোটে ভাল নয়। আমি যেখানেই যাই সেখানেই কান্না। প্রিয়জন হারিয়ে কেউ সুখী হয় না। তাদের বেদনা আমি সইতে পারছি না।

সূর্যদেব বললেন–কিন্তু পুত্র, সৃষ্টিতে সামঞ্জস্য রাখতে হলে এ কাজটা করতে হবে কাউকে না কাউকে। তোমার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা করে তোমাকে এই গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তোমার রাজ্যের নাম সংযমনীপুরী। সেখানে মানুষ পাপ ভেসে করে পারা করে বিশুদ্ধ হয়। এমন পবিত্র স্থান আর কোথায় আছে?

পিতার উপদেশ মাথা নত করে মেনে নিলেন যমরাজ। আবার তার কাজ শুরু করলেন। পৃথিবীতেও শান্তি ফিরে এল।

অগ্নিপুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ সমগ্র অখণ্ড সংস্করণ

উপদেষ্টা– শ্রী নরেশচন্দ্র শাস্ত্রী

সম্পাদনা • পরিমার্জনা • গ্রন্থনা– পৃথ্বীরাজ সেন

PDF সংস্করণঃ মৈনাক বিশ্বাস

মৎস্য অবতারের কাহিনী

অতীত কল্পের অবসান প্রায় আসন্ন। পদ্মযোনি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা। তিনি দুচোখ আর খুলে রাখতে পারছেন না। ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। নিদ্রাকালে তার মুখ দিয়ে নির্গত হল নানা উপদেশাবলী। যা বেদ নামে খ্যাত। হয়গ্রীব নামে এক অসুর সেই সব বেদরাজি শ্রবণ করল এবং সেখান থেকে চলে গেল।

এ তথ্য ভগবান শ্রীহরির কাছে অজ্ঞাত রইল না। দানবের কাছ থেকে ওইসব বেদরাজি উদ্ধার করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি ক্ষুদ্র মৎস্যের রূপ ধারণ করলেন।

রাজর্ষি সত্যব্রত বৃতমালা নামে এক নদীতে সে সময় স্নান সেরে তর্পণ করার জন্য অঞ্জলি পেতে নদীর পবিত্র স্বচ্ছ জল ভরতে গেলেন। ঠিক এ সময় শফরী নামধারী মৎস্যরূপী ভগবান তাঁর অঞ্জলিপুটে উঠে এলেন। রাজর্ষি তা দেখে জল ফেলে দিতে উদ্যত হলেন। শ্রীহরি কাতর স্বরে বললেন–হে কৃপাবৎসল রাজা, দোহাই এই নদীর জলে আমাকে ত্যাগ করবেন না। এখানে কেউ আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। খেয়ে সাবাড় করে দেবে।

ছোট্ট একটি মাছকে কথা বলতে দেখে রাজর্ষি সত্যব্রত অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি শফরীকে তার কমণ্ডলুর জলে স্থান দিলেন।

পরের দিনই সেই মাছের আয়তন বেড়ে গেল। কমণ্ডলুতে তার স্থান অকুলান। মাছ বললহে রাজা, ওই কমণ্ডলুতে বাস করতে আমার অসুবিধা হচ্ছে। দয়া করে অন্য কোনও বৃহৎ স্থানে আমাকে রাখুন যাতে আমি সুখে থাকতে পারি।

রাজা তখন তাকে একটি বড় কলসিতে জায়গা দিলেন। এক রাতের মধ্যে মাছের চেহারা এত বেড়ে গেল যে, কলসিতে সামান্য নাড়া চাড়া করাও তার পক্ষে অসম্ভব হল।

মাছের অনুরোধে রাজা এবার তাকে একটি সরোবরে ছেড়ে দিলেন। এক রাতের মধ্যে দেখা গেল মাছটি এমন আকার ধারণ করেছে যে, সরোবরে বাস করাও তার পক্ষে কষ্টকর হচ্ছে। আরও বড়ও পরিসর তার চাই। রাজা এবার তাকে নিয়ে এলেন একটা হ্রদে। সেখানেও একই অবস্থা, এক রাতের মধ্যে ওই মাছ মহামৎস্যে পরিণত হল।

মাছ বলল–আমাকে আরও বড় এক পরিসরে রাখার ব্যবস্থা করুন।

রাজর্ষি ঠিক করলেন, এই মাছের পক্ষে সমুদ্রই শ্রেয়। এই মনে করে সাগরের দিকে হাঁটলেন।

মাছ আঁতকে উঠল–রাজা আমাকে সাগরে দেবেন না। ওখানে কত রকমের বড় বড় জলজ জন্তু আছে। আমায় ধরে ওরা খেয়ে ফেলবে। আমার প্রাণ যাবে। ভয়ে আমার বুক কাঁপছে!

রাজা সত্যব্রত বিনীত কণ্ঠে জানতে চাইলেন–হে রূপধারী মৎস্য, আপনি কে? কৃপা করে আপনি আমাকে আপনার পরিচয় জ্ঞাপন করে আমাকে উৎকণ্ঠা মুক্ত করুন।

মৎস্যরূপী শ্রীভগবান বললেন–হে রাজর্ষি, আজ থেকে ছদিন পরে অর্থাৎ সাতদিনের মাথায় সমুদ্রে প্রলয় শুরু হবে। জলে ভেসে যাবে চারদিক। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সব জলের তলায় চলে

যাবে। সে সময় মস্ত বড় একটা নৌকা তোমার কাছে আসবে, আমিই তা পাঠাবো। তুমি ওই নৌকায় সব ধরনের বীজ, ওষধি এবং সাত ঋষিকে নিয়ে উঠে বসবে। বায়ুর প্রবল বেগে নৌকা টাল সামলাতে না পেরে টলমল করবে। ঠিক এ সময়ে একটা মোটা কাছি হাতের পাশে পাবে। আসলে এটা বহুরূপী এক সর্প, আর আমি এ সময়ে এক শৃঙ্গধারী মৎস্যরূপে জলে ভাসব। তুমি সেই কাছির এক প্রান্তে আমার মৎস্য শৃঙ্গের সাথে বাঁধবে। অন্যপ্রান্ত নৌকার সঙ্গে। দেখবে নৌকা স্থির হয়েছে।

শ্রীবিষ্ণু এই উপদেশ দান করে সেই স্থান থেকে সমুদ্রের অতুল নীল জলরাশিতে অদৃশ্য হলেন। রাজর্ষি সত্যব্রত শ্রীহরির আদেশ অনুসারে, বীজ, ওষধি এবং সাত ঋষিকে একত্রিত করে সেই নির্দিষ্ট দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সপ্তম দিনে দেখা দিল সেই প্রলয় দুর্যোগ। সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে উঠল। জলে প্রবল আলোড়ন দেখা দিল। প্লাবিত হল সম্পূর্ণ পৃথিবী। রাজা সত্যব্রত দেখলেন একটা নৌকা আসছে। তিনি সেই নৌকায় বীজ, ওষধি এবং ঋষিদের সঙ্গে নৌকোয় উঠে পড়লেন। সমুদ্রের বিশাল বিশাল তরঙ্গের আঘাতে নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম। বিপদের সম্ভাবনা দেখে রাজা সত্যব্রত আকুল হয়ে শ্রী ভগবানের স্মরণ নিলেন। সেই প্রলয় সলিলে এক শৃঙ্গধারী নিযুত যোজন পরিমিত শরীরের একটি স্বর্ণ বর্ণের মৎস্য ভেসে থাকতে দেখা গেল। কাছির ন্যায় দৃষ্ট বহুরূপী বাসুকির দ্বারা নৌকা এবং মৎস্যের শৃঙ্গের সঙ্গে বাঁধা হল মৎস্য অবতারের পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী। তারপর নৃপতি শ্রীহরির নাম গান করতে লাগলেন।

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, রাজা সত্যব্রতের স্তবে সন্তুষ্ট হলেন শ্রীহরি। তিনি জলে ভাসমান অবস্থায় রাজাকে নানা তত্ত্বকথা শোনালেন। এইসব তত্ত্ব উপদেশকে নিয়ে মৎস্য পুরাণ লেখা হয়েছে।

এরপর শ্রীহরি হয়গ্রীব নামক অসুরকে বধ করে বেদগুলি উদ্ধার করেন। ইতিমধ্যে অতীত কল্পের অবসান ঘটেছে। ব্রহ্মার নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে। শ্রীহরি কর্তৃক তিনি তাঁর চুরি যাওয়া বেদসকল ফিরে পেলেন। শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহ লাভ করে রাজা সত্যব্রত হলেন এই কল্পে বৈবস্বত .(শ্রাদ্ধদেব) মনু, রাজর্ষি সত্যব্রত আর মায়া, মৎস্যরূপধারী শ্রীহরির উপদেশ গাথা সম্বলিত মৎস্যপুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করলে সকল জীবের পাপের বিনাশ ঘটে।

কূর্ম অবতারের কাহিনী

স্বর্গলোকের নন্দন কাননের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন মহামুনি দুর্বাসা। শুনতে পেলেন ঘণ্টা ও শঙ্খের আওয়াজ। সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটে গেলেন। সেসময় ঊর্বশী শ্রী বিষ্ণুর পুজোয় ব্যস্ত ছিল।

দুর্বাসা মুনিকে অতিথি রূপে গ্রহণ করে পরম সমাদরে তাঁর পূজা করল ঊর্বশী। গত রাতে ইন্দ্রের কাছ থেকে সে একটি মালা উপহার পেয়েছিল। অতিথি মুনিকে সেই বাসি মালা দিয়ে সে মুনির পুজো শেষ করল।

দুর্বাসা চললেন এবার ইন্দ্র সমীপে। পথেই তার সাথে দেখা হয়ে গেল। ইন্দ্র তখন ঐরাবতে চড়ে বেড়াচ্ছিলেন। মুনি নিজের গলা থেকে মালাটি খুলে ইন্দ্রের গলায় পরিয়ে দিলেন। ইন্দ্রের চিনতে দেরী হল না যে, এ সেই পারিজাত মালা যা, গতকাল তিনি ঊর্বশীকে দিয়েছিলেন। তার মানে ঋষিও ঊর্বশীর প্রতি টান বোধ করেন। মনে মনে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। গলা থেকে পারিজাত মালা খুলে ছুঁড়ে দিলেন। সেটি গিয়ে পড়ল ঐরাবতের মাথায়। ঐরাবত সেটি মাটিতে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে থেঁতলে দিল।

ঋষি প্রদত্ত আশীর্বাদী সূচক উপহার অবজ্ঞা ভরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ায় দুর্বাসা মুনি ইন্দ্রের প্রতি রুষ্ট হয়ে তাকে শাপ দিলেন–তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে।

ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হলে সুযোগ পেয়ে অসুরগণ দেবতাদের সব কিছু অধিকার করল। স্বর্গচ্যুত হয়ে দেবতারা সদলবলে পদ্মযোনি ব্রহ্মার কাছে এসে হাজির হলেন। ব্রহ্মা তাঁদের সকলকে নিয়ে গেল শিবের কাছে। শিব এবং ব্রহ্মা অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে হাজির হলেন ক্ষীরোদ সাগরের তীরে শ্বেতদ্বীপে, সকলে মিলে শ্রীভগবানের স্তব শুরু করলেন।

দেবতাদের প্রতি সদয় হলে শ্রীহরি সেখানে এসে স্বয়ং আবির্ভূত হলেন।

শ্রীহরি বললেন–হে ব্রহ্মা, হে শিব, হে দেবতাগণ শুক্রাচার্যের মন্ত্রণা দ্বারা দানব ও দৈত্যগণ যতদিন পরিচালিত না হবে, ততদিন তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে তোমরাও কোনো বুদ্ধির হদিস পাবে। তাই বলছি, তোমরা ওইসব অসুরদের সাথে সন্ধি করো। এতে তোমাদের মঙ্গল হবে।

এখন আমি যা বলছি, মন দিয়ে শোন। ক্ষীর সমুদ্রে সমস্ত রকম ওষধি নিক্ষেপ করো, ফলে অমৃত সৃষ্টি হবে। সেই অমৃত তোলার জন্য মন্দার পর্বত দণ্ডরূপে আর বাসুকি রজ্জুরূপে তোমাদের সাহায্য করবে। আমিও তোমাদের সহায় হব। এই কাজ করতে গিয়ে অসুরগণ ক্লেশ ভাগী হবে আর তোমরা তার সুখফল ভোগ করবে।

এই বলে শ্রীহরি সেখান থেকে চলে গেলেন।

দেবতাগণ এলেন অসুর রাজ বলির কাছে। শ্রীবিষ্ণুর উপদেশ সম্পর্কে অবগত হলে অসুরেরা অমৃত পানের আশায় দেবতাদের সঙ্গে হাত মেলাল।

এইভাবে শুরু হল সমুদ্র মন্থনের কাজ। বহু কষ্টে দেব ও অসুরগণের সাহায্যে মন্দর পর্বর্তকে। উত্তোলিত করা হল কিন্তু ক্ষীরোদ সাগরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। এবার স্বয়ং শ্রীহরি একাজে হাত লাগালেন। এক হাতে তিনি মন্দর পর্বতকে তুলে ধরলেন। এবং গুরুড়ের পিঠে চাপিয়ে দিলেন। গরুড় অনায়াসে এই পাহাড়কে এনে স্থাপন করল ক্ষীরোদ সাগরের বক্ষে। এবার সর্পরাজ বাসুকিকে পর্বতের চারধারে ঘিরে বেঁধে ফেলা হল। অসুররা রজ্জুর এক প্রান্ত এবং দেবগণ অন্য প্রান্ত ধরে সমুদ্র মন্থন করতে শুরু করলেন।

কিন্তু দেখা দিল বিপত্তি। গুরুভারে পর্বত সমুদ্রের তলায় ঢুকে যেতে শুরু করল। সবাই শুকনো মুখে ভাবতে লাগলেন কি করা যায়। আবার শ্রীহরির স্মরণ নিলেন সকলে। শ্রীহরি এক কুর্মের রূপ ধারণ করে সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে পৃষ্ঠদেশে তুলে ধরলেন সেই বিশাল মন্দর পর্বতকে। আবার শুরু হল মন্থনের কাজ।

প্রথমে উঠল তীব্র হলাহল বিষ, যে বিষের জ্বালায় ত্রিভুবনের সব প্রাণ বিনষ্ট হবে। লোকপালগণ অতিশয় ভীত হয়ে শিবের স্মরণ নিলেন। শিব স্বয়ং সেই হলাহল পান করে জগতকে বিষমুক্ত করলেন। নিজে হলেন মৃত্যুঞ্জয়। কণ্ঠে ধারণ করে নাম নিলেন নীলকণ্ঠ।

বিষের বিনাশ ঘটল। সুরাসুরগণ আবার মহোল্লাসে মন্থনের কাজ শুরু করলেন, এবার উঠে এল এক গাভী। নাম সুরভি। যজ্ঞাদির প্রয়োজনে পবিত্র ঘৃত কামনা লাভে ব্রহ্মবাদী ঋষিকুল সেই গাভী গ্রহণ করলেন। এবার উঠে এল এক অশ্ব, শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা। দৈত্যরাজ বলি তাকে সাদরে নিয়ে এলেন। পাওয়া গেল ঐরাবত নামক এক হস্তি। চারি দণ্ড বিশিষ্ট সেই গজ নিলেন স্বয়ং ইন্দ্র। ভগবান হরি কৌস্তুভ নামক পদ্মরাগ মণিটি বক্ষে ধারণ করার বাসনায় সেটি গ্রহণ করলেন। পাওয়া গেল এক কল্প বৃক্ষ, নাম পারিজাত। এবার সমুদ্র উথিত করে উঠে এলেন স্বয়ং মহাদেবী লক্ষ্মী। সেই দেবীর রূপের কাছে অসুর ও দেবগণ কামাসক্ত হলেন। সকলে মিলে তার সেবায় রত হলেন। কিন্তু লক্ষ্মীদেবী কারো কাছে গেলেন না, সদয় হলেন শ্রীহরির প্রতি। তাকেই স্বামী রূপে গ্রহণ করলেন।

এবার মন্থন করে পাওয়া গেল সুরা। অসুরগণ তা পান করে মহাতৃপ্ত হল। অতঃপর উঠে এল এক পুরুষ অপূর্ব তার দেহবল্লরী, অলঙ্কারে বিভূষিত, হাতে তাঁর কলস, অমৃত ভাণ্ডার। সুরাসুরগণ এই অমৃতের জন্যই মন্থন চালিয়ে ছিল। সেই আশা তাদের পূর্ণ হতে চলেছে। অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। দেবতারা পারবে কেন দানবের সাথে? অমৃতের ভাণ্ড চলে গেল অসুরদের হাতে। তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, খুবই বিশৃঙ্খলা দেখা

দিল, দেবতারা মুখ ভার করে শ্রীবিষ্ণুর কাছে হাজির হলেন। শ্রীবিষ্ণু এক অপরূপা নারীর মূর্তি ধারণ করলেন। তাকে দেখে অসুরদেরও মনে কামনা জাগল। তারাও ওই সুন্দরীর পরিচয় জানতে চাইল। এবং সেই অপরূপা মোহিনীকে অনুরোধ করল অসুরদের মধ্য অমৃত বণ্টন করার জন্য।

নারীরূপী শ্রীহরি বললেন– পণ্ডিতরা বলে থাকেন, কামিনীকে কখনও বিশ্বাস করো না। তোমরা আমার প্রতি এত আস্থাশীল হচ্ছো কেন?

অসুরদের সঙ্গে কামিনীর পরিহাস ছলে নানা কথা বার্তা হল। দৈত্যরা অমৃতের ভাণ্ড নির্দ্বিধায় ওই নারীর হাতে তুলে দিল।

ভগবান বললেন–আমি যা করব, তা যদি তোমরা মেনে নাও, তাহলে হে অসুরগণ, এই অমৃত আমি ভাগ করে তোমাদের দিতে পারি।

অসুরগণ তখনও পর্যন্ত কামিনীর আসল পরিচয় জানে না। তারা বলল–বেশ তোমার কথাই আমরা মেনে নিলাম।

তারপর সেই মোহিনী রমণী দেবতা ও অসুরদের পৃথক পৃথক সারিতে বসতে বললেন। নানা অঙ্গ ভঙ্গি করে কথায় প্রলোভনে অসুরদের ফাঁকি দিয়ে দেবতাদের সেই অমৃত দান করলেন, জরমরণহারিণী অমৃত সুধা থেকে বঞ্চিত হল দানবরা তাদের ভাগে কিছুই পড়ল না। কিন্তু তারা মুখে কিছু বলল না। বিষণ্ণ বদনে বসে রইল।

কিন্তু রাহু নামে এক অসুর সেই মোহিনী রমণীর ছলাকলা বুঝতে পেরে নিজেদের সারি থেকে সে ঢুকে পড়ল দেবতাদের সারিতে, পরনে দেবতার বেশ। সূর্য ও চন্দ্রের মাঝে একটু জায়গা ফাঁকা পেয়ে সেখানে বসে পড়ল। মোহিনী মূর্তি তাকেও সুধা বিতরণ করল। সে সঙ্গে সঙ্গে তা পান করল। চন্দ্র আর সূর্য ওই দানবের আসল পরিচয় শ্রীহরিকে জানিয়ে দিলেন। শ্রীহরির রাহুর মস্তক সুদর্শন চক্রের সাহায্যে কর্তন করলেন। তখনও পর্যন্ত অমৃত দ্বারা পুষ্ট হয়নি রাহুর দেহ। ফলে তার মুণ্ড ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অমৃত পানের প্রভাবে তার মস্তকটি অমরত্ব লাভ করল।

দেবতাদের বিষ্ণুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেই অমৃত রূপ ফল লাভ করলেন। কিন্তু অসুর ও দানবরা সকল তা থেকে বঞ্চিত হলেন। মানুষ প্রাণ, ধন, কর্ম এবং বাক্যাদি দ্বারা যা কিছু করে

সব শ্রীহরিকে নিবেদন না করে পুত্রকন্যা এবং অন্যান্যদের জন্য রেখে দেয়, এ সবই হল অসৎ। আর শ্রীভগবানে অর্জন করে শরীর ইত্যাদি শোষণের জন্য দেবাদির যা কিছু করা হয়, তা হল সৎ। রথের মূল দেশে জল সেচ করলে যেমন গাছের শাখা প্রশাখা পাতা, ফল, ফুল ইত্যাদি যেমন পরিতৃপ্তি লাভ করে ভগবান শ্রীহরিও তেমন সন্তুষ্ট হন।

বরাহ অবতারের কাহিনী

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নির্দেশে স্বায়ম্ভুব মনুর তিন কন্যা শ্রদ্ধা সৃষ্টিতে ব্রতী হলেন। কিন্তু আরও সৃষ্টি চাই। ব্রহ্মা মনুকে আরও সৃষ্টির আদেশ করলে তিনি বললেন–হে পিতা প্রলয় সলিলে ত্রিভুবন জল মগ্ন হলে জীব কোথায় গিয়ে ঠাঁই নেবে?

ব্রহ্মা ভাবলেন তাই তো ধরিত্রীকে উদ্ধার করার একটা উপায় বের করতে হয় শ্রীহরি তার নাসারন্ধ্র থেকে এক বরাহ মূর্তির আবির্ভাব করলেন। সেই বরাহ দেখতে দেখতে মহা আকার

ধারণ করলেন, তিনি প্রচণ্ড গর্জন করে উঠলেন। ধরিত্রীর সন্ধানে জলে ডুব দিলেন, ঘ্রাণের সাহায্যে তাকে অবলীলায় নিজের দাঁতের অগ্রভাগ দ্বারা জল থেকে তুলে ধরলেন ধরণিকে।

ভগবান বরাহ দেবের কাজে বাধা দিতে ছুটে এলেন দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ। তিনি তার গদার আঘাতে দৈত্যের বিনাশ ঘটালেন তখন বরাহদেবের গায়ের রং ছিল তখন নীল। ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাদের বুঝতে দেরি হল না যে ইনিই স্বয়ং শ্রীহরি। সকলে মিলে তখন তাঁর স্তব করতে শুরু করলেন।

একদিন দক্ষ কন্যা দিতি কামশরে পীড়িত হলেন। তিনি স্বামী কশ্যপের কাছে এসে হাজির হলেন। তার কামপীড়া প্রশমিত করার জন্য স্বামীকে আবেদন জানালেন। কিন্তু মহর্ষি কশ্যপ রাজি হলেন না। তিনি দিতিকে নানা ধর্মতত্ত্ব শোনালেন। কিন্তু দিতি নাছোড়বান্দা। অতএব শেষ পর্যন্ত সেই নিষিদ্ধ সন্ধ্যায় মুনি কশ্যপের বীর্য ধারণ করলেন নিজ গর্ভে।

কশ্যপ বললেন–সন্ধ্যাকালে মৈথুন করা নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও তুমি মৈথুনে রত হয়েছ, যেহেতু তোমার চিত্ত পবিত্র ছিল না, তোমার অভিশপ্ত ওই গর্ভ হতে দুটি কুলাঙ্গার পুত্রের জন্ম হবে। তারা ত্রিলোকের সকলের দুঃখের কারণ হবে। ভগবান শ্রীহরির দ্বারা তাদের বিনাশ হবে। তবে ভগবানের প্রতি এবং স্বামীর প্রতি তোমার অবিচল ভক্তি আছে। যার প্রভাবে তুমি এক নাতি লাভ করবে, যে হবে শ্রীবিষ্ণুর মহান ভক্ত।

স্বামীর মুখে এই কথা শুনে দিতি মনে মনে অত্যন্ত দুঃখ পেল, পরক্ষণেই ভগবতবৎসল নাতির কথা শুনে তার মন খুশি হল। শত বছর ধরে দিতি কশ্যপের বীর্য গর্ভে ধারণ করেছিলেন। সেই গর্ভের তেজে চারিদিকে অন্ধকার নেমে এল। ঢাকা পড়ে গেল সূর্য-চন্দ্রের মুখ। দেবতাগণ বিচলিত হলেন, অন্ধকারের কারণ জানতে চেয়ে ব্রহ্মার কাছে দেবতারা ছুটলেন।

ব্রহ্মা বললেন–আমার চারপুত্র সনক, সনদ, সনাতন ও সনকুমার। তারা যোগ শক্তির প্রভাবে চিজগতে বৈকুণ্ঠ লোকে হাজির হয়েছে। তাদের দেখে মনে হয় পাঁচ বছরের বালক, আসলে তাঁরা সমস্ত জীবকুলের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ও আত্মতত্ত্ববেত্তা। তাঁরা দিগম্বর হয়ে স্বর্গের প্রবেশদ্বারে এলে বাধাপ্রাপ্ত হয়। জয় ও বিজয় নামে দুই প্রহরী তাঁদের ঢুকতে না দিলে তাঁরা রেগে গিয়ে অভিশাপ দিল–তোমরা এই মুহূর্তে দানববংশে জন্ম নেবে।

জয় ও বিজয় তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তারা সেই পাঁচ দিগম্বরের পায়ে পড়ে মাথা কুটতে লাগল। কিন্তু মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে তা তো আর ফেরৎ নেওয়া যায় না। কিন্তু উপায়?

স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি মুশকিল আসান হয়ে আবির্ভূত হলেন। তিনি চতুঃসনকে দর্শন দিলেন এবং বললেন–তোমাদের যথোপযুক্ত অভিশাপ দিয়েছে।

তারপর দুই প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বললেন–তোমরা শান্ত হও। আমার আশীর্বাদে তোমরা আবার এই স্বর্গপুরীর দ্বারী হয়ে ফিরে আসবে।

চতুঃসনকের অভিশাপ শত বছর পরে দিতির গর্ভজাত দুই যমজ পুত্র হয়ে জয় ও বিজয় জন্ম নিল। তাদের ভূমিষ্ঠ ক্ষণে ত্রিভুবন ব্যাপী নানারকম ভীতিপ্রদ ও আশ্চর্যজনক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে গেল।

দুই পুত্রের মধ্যে আগে যার জন্ম হল, কশ্যপ তার নাম রাখলেন হিরণ্যাক্ষ আর দিতি যাকে প্রথমে গর্ভে ধারণ করেছিল, তার নাম রাখা হল হিরণ্যকশিপু।

কঠোর তপস্যা করে হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বর লাভ করলেন। সেই বরের প্রভাবে সে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে উঠল। আর ব্রহ্মার বরে হিরণ্যাক্ষ হল অত্যন্ত পরাক্রমশালী এবং গর্বোদ্ধত। আর হিরণ্যাক্ষ ও ব্রহ্মার বলে অতীব গর্বোদ্ধত হল। তারা কাজের ওপর মস্ত বড়ো একটা ঢাকা নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের যত্রতত্র বিচরণ করত। তাদের পথ আটকে দাঁড়াবে এমন সাধ্য কার আছে? কাউকে তারা ভয় পেত না। সকলেই তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে, ত্রিভুবন জুড়ে চলেছে তাদের রাজত্ব।

একদিন হিরণ্যাক্ষ সমুদ্রের তলদেশে প্রবেশ করল। বরুণদেবকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান জানাল।

বরুণদেব বললেন–হে বীর! তোমার যুদ্ধ করার যখন এতই বাসনা তখন আদিপুরুষ ভগবান বরাহদেবের কাছে যাও। তোমার অভিলাষ তিনিই পূর্ণ করবেন।

হিরণক্ষ এলো নারদের কাছে, বরাহদেব কোথায় আছেন? জেনে নিয়ে সে এসে হাজির হন রসাতলে, তখন বাহদেব তার দুটো দাঁতের ওপর পৃথিবীকে ধারণ করে ওপরদিকে তুলে নিয়ে চলেছেন। এ দৃশ্য দেখে দৈত্য হিরণক্ষ অত্যন্ত চটে গেল। বরাহরূপী শ্রীহরির উদ্দেশ্যে যা নয় তাই বলে গালাগাল দিল। তারপর তাকে আক্রমণ করল।

শুরু হল দুজনের মধ্যে গদাযুদ্ধ। কী ভীষণ সেই যুদ্ধ! এক সময় শ্রীবিষ্ণুর হাত থেকে গদা পড়ে গেল। স্বর্গ থেকে দেবগণ এ যুদ্ধ দেখে আঁতকে উঠলেন। ভগবান এবার সুদর্শন চক্র তুলে নিলেন। হিরণক্ষ গদা ছেড়ে হাতে নিল ত্রিশূল, চক্র এবং ত্রিশূলের মধ্যে যুদ্ধ চলল।

এরপর অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে তাঁরা মুষ্টি যুদ্ধে মেতে উঠলেন। বজ্রকঠোর এক মুষ্টি প্রহার এসে পড়ল দৈত্যের মস্তকে, হিরনাক্ষের মাথা টলে গেল। চোখ বিস্ফারিত হল। তারপর বিশাল এক কাটা গাছের মতো মাটিতে সশব্দে পড়ে গেল।

অসুরকুলজাত দিতি পুত্র হিরণাক্ষকে শ্রীহরি নিজের মূর্তি দর্শন করালেন। হিরণ্যাক্ষের নামের বিনাশ হল, তার নশ্বর দেহটি পড়ে রইল, সে ঠাঁই পেল বৈকুণ্ঠলোকে। ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতাগণ বলে উঠলেন–আহা, কী সৌভাগ্যজনক মৃত্যু।

দেবতাগণ এরপর হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের সংহারকারী বরাহরূপী শ্রীহরির স্তব করতে শুরু করলেন।

নৃসিংহ অবতারের কাহিনী

লক্ষ্মী-নারায়ণের দর্শন উদ্দেশ্যে একবার ব্রহ্মার মানসপুত্র চতুঃসেন বৈকুণ্ঠধামে এসে হাজির হলেন। কিন্তু দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে জয় ও বিজয় নামে দুই দ্বারী। তারা তাকে বাধা দিলে তিনি তাদের অভিশাপ দিলেন– অসুরবংশে জন্ম হবে এবং তিন জন্মে শাপ মুক্ত হয়ে আবার বৈকুণ্ঠ ঠাঁই পাবে।

এক জন্মে তারা দিতির পুত্র হয়ে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে জন্ম লাভ করে। বরাহরূপী শ্রীবিষ্ণু ওই হিরণক্ষের বিনাশ ঘটালে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। সে ঠিক করল ওই মৎস্য, কূর্ম ও বরাহ রূপধারী হীন নারায়ণের মাথা শূল দ্বারা ছিন্ন করে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে।

সে নিজেকে অজেয়, অমর করবার বাসনায় মন্দর পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হল। ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে সেই তপস্যার ফলে হিরণ্যকশিপুর মস্তক হতে সৃষ্টি হল ধূমযুক্ত তমোময় অগ্নি। চারদিকে ছড়িয়ে সেই অগ্নি নদী ও সমুদ্র সকালে বিচলিত হল, ধরণী কেঁদে উঠল, দৈত্যের তপস্যার তেজ দেখে দেবতারা ভীত হলেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি ব্রহ্মার সমীপে সে প্রণাম নিবেদন করে বললেন– হে তাত, আমরা হিরণ্যকশিপুরের তপস্যার ঘোর প্রভাবে দুর্বিষহ কষ্ট ভোগ করছি। আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

ব্রহ্মা মন্দর পর্বতে এলেন। হিরণ্যকশিপুকে দেখা দিয়ে বললেন– হে বৎস তোমার তপস্যায় আমি মুগ্ধ, বলো কী বর প্রার্থনা করো।

হিরণ্যকশিপু বললেন–প্রভু আমাকে অমর হবার বর দান করুন।

–শোনো, জগতে কেউ অমর হয় না, ব্রহ্মা বললেন–তবে তোমাকে এমন বর দেব যা জগতে দুর্লভ। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তোমার মৃত্যু হবে না, ঘরের ভিতরে বা বাইরে তোমার মুত্যু হবে না। দিনে বা রাতেও তোমার মরণ হবে না। আমার সৃষ্ট প্রাণীগণের দ্বারা তোমার মৃত্যু হবে না। কোনো অস্ত্র তোমায় মারতে পারবে না। যুদ্ধে তুমি সর্বদা হবে অজেয়।

ব্রহ্মার বর শুনে দৈত্য অত্যন্ত খুশি হল। এবার সে ব্রহ্মার বরে বলীয়মান হয়ে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি বিষোদগার করতে শুরু করল। স্বর্গ মর্ত্য পাতালে সমস্ত দেবাসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব, যক্ষ ও রাক্ষসদের কাছে নিজেকে অজেয় প্রমাণ করল। স্বর্গরাজ্য অধিকার করে ইন্দ্রের বাসভবনে রাজা হয়ে অবস্থান করতে শুরু করল।

সকল দিক অধিকার করার পরও দৈত্যের মনের অভিলাষ এখনও পূর্ণ হয়নি। হিরন্যকশিপুর পত্নী ছিলেন কয়াধু। তার চার পুত্র। সবচেয়ে ছোট ছেলের নাম প্রহ্লাদ। সেই পুত্র সত্য প্রতিজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়, বালক সুলভ কোনোরকম আচরণ তার মধ্যে দেখা যেত না। সর্বদা শ্রীহরির পাদপদ্মে মতি ছিল ব্যাপ্ত। প্রহ্লাদের এ হেন আচরণ দেখে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি পুত্রকে তার আদর্শ মেনে চলার আদেশ দিলেন। কিন্তু কোনো ফল হল

না দেখে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে পাঠিয়ে দিলেন শুক্রাচার্যের এই দুই পুত্র ষণ্ড ও অর্ঘকের কাছে। সেখানে থেকে প্রহ্লাদ দানবীয় শিক্ষা লাভ করবেন।

কিন্তু প্রহ্লাদের এসব শিক্ষাদীক্ষার প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। তার কাছে শ্রীকৃষ্ণ একজনই। শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তনই তার কাছে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। কিছুদিন পরে পুত্র গৃহে ফিরে এলে পিতা হিরণ্যকশিপু তাকে কোলে বসিয়ে বললেন, এতদিন ধরে তুমি গুরুর কাছে কী শিক্ষা লাভ করলে?

অম্লান বদনে প্রহাদ জবাব দিলেনশ্রবণ, কীর্তন, বিষ্ণুস্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নয় প্রকার ভক্তি। যে শিক্ষা লাভ করে ভগবানের প্রতি সম্যক মন-প্রাণ সঁপে দেওয়া যায়, তাই হল শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। অথচ যে গুরুর কাছে আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তার এ সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই।

পুত্রের কথা শুনে পিতা রাগে ফেটে পড়লেন। বললেন– গুরু যদি এ শিক্ষা না দিয়ে থাকে তোর এমন দুর্মতি হল কীভাবে?

প্রহ্লাদ বললেন– পরমার্থ গতি ভগবান শ্রীহরিকে জানতে হলে চাই বাহ্যিক বিষয়গুলির প্রতি অনীহা। বিষয় স্পৃহাশূন্য উদারচেতা মহত্তম ব্যক্তিগণের চরণরেণু দ্বারা যে পর্যন্ত অভিজ্ঞতা না হওয়া যায়, সেই পর্যন্ত বেদবর্ণিত কাজ এবং কর্মের অনুষ্ঠান করলেও মানবের প্রতি সংসার দুঃখজনক। সে শ্রীহরির চরণকমল স্পর্শ করতে পারে না।

দৈত্যরাজ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে ছেলেকে কোল থেকে মাটিতে নামিয়ে দিলেন। এবং তাকে বধ করার আদেশ দিলেন।

শূল হাতে অনুচরের দল ছুটে এল। প্রহ্লাদের মতি শ্রীহরির চরণে সমর্পিত। তাই ওই শূলের আঘাত প্রহ্লাদের ক্ষতি করতে পারল না।

দৈত্যরাজ তাকে হত্যার জন্য নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন সামান্যতম। পাগলা হাতির পায়ের তলায় ফেলে দিলেন, পর্বতের চূড়া থেকে নীচে ফেলে দিলেন, বিষ প্রয়োগ করলেন, দিনের পর দিন অনাহারে রাখলেন, বিষধর সাপেদের মাঝে ছেড়ে দিলেন, কিন্তু কিছুতেই ওই নিষ্পাপ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত বালক প্রহ্লাদের বিনাশ ঘটাতে পারলেন না।

দৈত্যপতি ভ্রূ-কুঞ্চিত করে চিন্তা করতে লাগলেন, এসময় এগিয়ে এলেন শুক্রাচার্যের পুত্রদ্বয়– ষণ্ড ও অর্ঘক। তারা বললেন– হে দৈত্যরাজ, আপনার ভঙ্গি দেখে সমস্ত লোকপাল গণ ভয়ে কম্পমান। প্রহ্লাদ বালক, তার আর দোষ কী, সৎসঙ্গের অভাবের ফলেই তার মধ্যে এমন বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে গেছে। পিতা শুক্রাচার্য এসে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে বরুণের পাশ দিয়ে বেঁধে রাখুন। দেখবেন, কোথাও যেন পালিয়ে না যায়।

গুরু পুত্রদ্বয়ের বাক্যে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদকে গৃহস্থ ধর্মী রাজগণের উপযুক্ত যে ধর্ম, তা শিক্ষা দিতে আদেশ করলে, শুক্রাচার্যপুত্র ষণ্ড ও অর্মক তাঁকে ধর্ম, অর্থ, ও কাম বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করলেন। তথাপি প্রহ্লাদ অন্যান্য বালকদের সঙ্গে সেই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক তত্ত্বকথা শোনাতেন।

গুরুগৃহে অন্যান্য ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি মিষ্টি হেসে বলতেন- হে অসুরনন্দনগণ, ভাগবত ধর্ম সন্ধানে জ্ঞান বাল্যকালেই শিক্ষা নেওয়া উচিত। কারণ আশি লক্ষ যোনিতে ঘুরে তারপর মনুষ্য যোনিলাভ করা যায়। এই মনুষ্য জন্মই বিষ্ণুর আরাধনায় পরমার্থ দাতা। কামনায় তাড়িত হলে বিষ্ণু ভক্তি অর্জন করা যায় না। বাল্যকাল থেকে বিষ্ণুর প্রতি মতি স্থির রাখলে জীবনে কোনো কিছুতেই ভীত হতে হয় না। শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করে পরম গতি সম্ভব যা অতি মঙ্গলকর।

হে রাজন সখাবৃন্দ, শ্রীহরি অতি সহজেই প্রসন্ন হন। কারণ তিনি সকল প্রাণীর হৃদয়েই অবস্থান করছেন। যে কোনো জন, যে কোনো সময় তার মনের উপাচার দিয়েই তার পাদবন্দনা করতে পারে। যদি আমরা তাঁর নামকীর্তন করতে পারি, আর তার চরণসেবা করতে সমর্থ হই তাহলে বলুন মুক্তিও তার কাছে তুচ্ছ বলে মনে হবে।

বপ্রহ্লাদের সখারা তার মুখে এমন ধর্মতত্ত্ব উপদেশ শুনে বিস্মিত হত। তারা জানতে চাইল, কার কাছ থেকে প্রহ্লাদ এমন বিদ্যা লাভ করেছেন।

প্রহ্লাদ বললেন– আমি মাতৃজঠরে থাকাকালীন আমার পিতা কঠোর তপস্যা করতে মন্দর পর্বতে চলে গিয়েছিলেন। এই অবসরে দেবতারা দৈত্যদের আক্রমণ করলেন। দৈত্য প্রধানরা তাদের সবকিছু নিয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। দেবরাজ ইন্দ্র এই অবসরে আমার মাকে হরণ করলেন। ইন্দ্র কর্তৃক হিরণ্যকশিপুর মহিষীকে হরণ করার কালে নারদ মুনির সঙ্গে ইন্দ্রের সাক্ষাৎ ঘটে। পথের মাঝে নারদ জানতে চাইলেন- হে ইন্দ্র এই নারী হরণের কারণ কী?

ইন্দ্র বললেন–ইনি কয়াধু, হিরণ্যকশিপুর পত্নী, কয়াধু গর্ভবতী। এক অসুরের জন্ম দেবে ওই গর্ভ। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে মেরে ফেলব। তাই আমি এই নারীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছি।

দেবর্ষি নারদ বললেন– তুমি ভুল করছ। এর গর্ভে বেড়ে উঠছে এমন এক শিশু যে নিজগুণে ভগবত ভক্ত হবে। এর বিনাশ ঘটলে তোমাকে অচিরেই স্বর্গ ত্যাগ করতে হবে। শ্রী প্রহ্লাদ বলতে থাকেন– নারদের বাক্য শুনে ইন্দ্র আমার মাকে ত্যাগ করে চলে গেলেন স্বর্গলোকে। নারদ তারপর আমার মাকে নিজের আশ্রমে নিয়ে গেলেন আর বললেন।–তোমার স্বামী হিরণ্যকশিপু প্রাসাদে ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি নিশ্চিন্তে এখানে বাস করো। আর তুমি হবে ইচ্ছা প্রসবিণী।

নারদ তারপর আমার মাকে ভগবত তত্ত্বকথা শোনাতে লাগলেন। মায়ের গর্ভে বসে আমি সেই সকল উপদেশ শ্রবণ করেছিলাম। যা আজও বিস্মৃত হইনি আমি।

জন্ম মৃত্যুর আবর্তন বিনাশ করার জন্য অনেক উপায় থাকলেও ভক্তি যোগ থেকেই দেবর্ষি নারদ শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। গুরু সেবা, সকল লব্ধ বস্তু সমর্পণ, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের প্রতি আরাধনা, শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন, শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম চিন্তন– সবই ভক্তি যোগে করেন– ফলে ঘটে থাকে। সকল প্রাণীতেই শ্রীহরি বাস করেন– একথা স্মরণে রেখে হিংসা ভুলে যাওয়া উচিত। এভাবে পঞ্চইন্দ্রিয় ও ষড়রিপুকে বশীভুত করা সম্ভব। লাভ হয় ভক্তি, যে ভক্তির দ্বারা শ্রীহরির চরণে চিত্তনিবেদিত হয়। তাই সখাগণ, তোমরা চিত্তমাঝে সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চিত্র অঙ্কিত করে তার ভজনা করো।

প্রহ্লাদের মুখ নিঃসৃত মধুক্ষরা ভক্তিব্যঞ্জক শব্দাবলী বালকদের অভিভূত করল। বালকেরা আর আচার্যের শিক্ষা গ্রহণ করল না।

ছাত্রদের এমন ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা দেখে গুরু শুক্রাচার্য সমস্ত ঘটনা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে জানালেন। তিনি পুনরায় পুত্র নিধনের চেষ্টায় মেতে উঠলেন। হুঙ্কার দিয়ে বললেন– ওরে অবোধ বালক। আমি ক্রুদ্ধ হলে ত্রিভুবন থরথর করে কেঁপে ওঠে ভয়ে, আর তুই সামান্য এক বালক হয়ে আমার আদেশ অমান্য করছিস কোন্ সাহসে? তোকে আমি মৃত্যুপুরীতে পাঠিয়ে দেব।

–রাজন, আপনি প্রহ্লাদের পিতা, ক্রোধ সংবরণ করুন। ওই ক্রোধই আপনার আসল শত্রু। যে পরম পুরুষ সকলের বল, সেই বিষ্ণুর প্রতি মতি রাখুন। অসুরভাব ত্যাগ করুন।

হিরণ্যকশিপু বললেন– ওরে পাপিষ্ঠ। তুই কি জানিস, এই ত্রিভুবনে আমি সকলের পরমেশ্বর। তোর মৃত্যু অনিবার্য। দেখি তোর বিষ্ণু তোকে কীভাবে বাঁচায়। যদি সবেতেই তার অবস্থান হয়, তাহলে এই পাথরের স্তম্ভে তাকে দেখছি না কেন?

প্রহ্লাদ ধীর কণ্ঠে জবাব দিলেন– পিতো! শ্রীবিষ্ণু সবেতেই বিরাজমান। অতএব এই স্তম্ভেই তিনি বর্তমান।

শ্রী নারদ বললেন– ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তখন হিরণ্যকশিপু ভঙ্গ হস্তে তেড়ে এলেন। তিনি সজোরে আঘাত করলেন সামনের পাথরের স্তম্ভে। অতি ভীষণ শব্দ শোনা গেল এবং পরমুহূর্তে এক নর সিংহের আবির্ভাব ঘটল। যার অর্ধেক নর এবং অর্ধেক পশুর। তার ভয়ানক দুটি চোখ ফুটে বেরোচ্ছে দুটি গোলা, অতি উন্নত ও তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি। খঙ্গের মত ধারালো তার জিভ, অতি ভয়ংকর সেই মূর্তি। ইনিই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

এমন বিকট রূপী নরসিংহের মূর্তি দেখে হিরণ্যকশিপু ভাবলেন, মহামায়াবী হরি এইভাবে তার বিনাশ করতে চাইছে।

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গদা ঘোরাতে ঘোরাতে দৈত্যরাজ ছুটে এলেন। নরসিংহকে বধ করতে উদ্যত হলেন। নরসিংহরূপী শ্রীহরি হিরণ্যকশিপুকে গ্রহণ করলেন। ঠিক যেমন গড়ুর মহাসর্প গ্রহণ করে তাকে আক্রমণ করে, আবার ছেড়ে দিলেন।

নরসিংহের হাত থেকে রেহাই পেয়ে দৈত্যরাজ ভাবলেন, তার ভয়ে নরসিংহ কম্পমান। এবার তিনি খঙ্গ ও চক্র নিয়ে সেই ভয়ংকর নরসিংহকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন।

নরসিংহের বিকট হাসিতে ফেটে পড়লেন। সভার দ্বারদেশে নিজের উরুদ্বয়ের উপর দৈত্য রাজকে স্থাপন করে নিজের নখর দিয়ে তার উদর বিদীর্ণ করে দিলেন। পিতামহ ব্রহ্মার বচনানুসারে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বিনাশ ঘটল। সন্ধ্যার সময় দ্বারদেশে শ্রীহরির উরুর ওপর তার নখরাঘাতে দানবরাজের মৃত্যু হল।

দৈত্যরাজের অন্যান্য অনুচরদেরও নৃসিংহ তার নখের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে দিলেন। হাজার হাজার অসুরের মৃত্যু হল। তখনও তিনি ক্রোধে উন্মাদ। তিনি সিংহাসনে এসে

বসলেন। তার ভয়ংকর মুখ ও চেহারা দেখে কেউ তার সম্মুখে যেতে সাহস করল না। আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করা হল। অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ নৃত্যগীতে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করল। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাগণ, প্রজাপতিগণ, চতুর্দশ মনু, সকলেই করজোড়ে তার বন্দনা করতে লাগলেন। তা সত্ত্বেও তার রাগ প্রশমিত হল না।

শ্রীব্রহ্মার আজ্ঞায় শ্রীপ্রহ্লাদ পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন নৃসিংহদেবের কাছে। মাটিতে পড়ে তার পাদস্পর্শ করলেন। শ্রী নৃসিংহদেব বালক প্রহ্লাদকে হাত ধরে উঠিয়ে বালকের মস্তকে আপনার কমল হস্ত রাখলেন। ভগবানের করস্পর্শে শ্রীপ্রহাদের শরীরে বিদ্যুৎ শিহরণ ঘটে গেল, রোমাঞ্চিত হলেন তিনি। দুচোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল আনন্দের বারিধারা। চিত্তে তার অপার আনন্দ। তিনি নিজের বুকে নৃহরির পদযুগল স্থাপন করলেন। তার স্তব করতে শুরু করলেন।

দেবর্ষি নারদ বললেন–শ্রীপ্রহ্লাদের মুখে শ্রীহরির গুণকীর্তন শুনে নৃসিংহদেব সন্তুষ্ট হলেন। তার ক্রোধ দূর হল। তিনি প্রহ্লাদকে বললেন– হে বৎস, তোমার স্তবে আমি প্রসন্ন হয়েছি। বলো কী বর তুমি চাও?

প্রহ্লাদ বললেন– হে শ্রীহরি, যে জিনিস মনকে মলিন করে, তা আমি চাই না। যে কাজ বীজ, প্রাণ, আত্মা, ধর্ম, ধৈর্য, বুদ্ধি, লজ্জা, শোভা, তেজ, স্মৃতি ও সত্যকে ধ্বংস করে সেই কামবীজের বিনাশ আমি চাই, আপনি আমাকে সেই বর দান করুন।

নৃসিংহদেব বললেন– হে প্রহ্লাদ, আমি জানি, তুমি আমার একান্ত ভক্ত। তোমাদের মতো ভক্তদের পরলোকে বা ইহলোকে কোনো ভোগবিলাসের প্রতি আসক্তি থাকে না। তথাপি তোমাকে এই মন্বন্তর পর্যন্ত দৈত্যকুলে বাস করে সমস্ত রকম ভোগ করতে হবে।

প্রহ্লাদ বললেন– হে দেব, আপনার পবিত্র স্পর্শে আমার পিতা ধন্য হলেন। কিন্তু উনি আপনাকে অনেক নিন্দা করেছেন। এ জন্য তাকে যেন পাপ ভোগ না করতে হয়, এই আমার প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন– হে বৎস, দৈত্যবংশে জন্মে তুমি এই কুলকে পবিত্র করেছ, এক বংশ পুরুষের সঙ্গে তোমার পিতাও পাপ মুক্ত হয়েছেন।

নৃসিংহদেবকে প্রফুল্ল বদনে বসে থাকতে দেখে ব্রহ্মা এগিয়ে গেলেন। তিনি শ্রীভগবানের স্তব করতে লাগলেন।

ভগবান বললেন– হে পদ্মযোনিব্রহ্মা, খল প্রকৃতির সাপকে দুধ পান করালে যেমন অনিষ্টেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেইরকম, আপনি আর কখনও এইসব অসুরদের বরদান করবেন না।

এই কথা বলে শ্রীহরি সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।

এবার দৈত্য ও দানবদের রাজা করা হল প্রহ্লাদকে। ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাগণ তাকে আশীর্বাদ করলেন। প্রহ্লাদ তাদের পৃথক পৃথক ভাবে চরণ বন্দনা করলেন। তারপর সকলে যে যার ভবনে ফিরে গেলেন।

চতুঃসেনের অভিশাপ মতো দ্বিতীয় জন্মে জয় ও বিজয় রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রূপে রাক্ষসযযানিতে জন্ম লাভ করল। শ্রীরামচন্দ্র তাদের বিনাশ ঘটিয়েছিলেন। অনন্তর তারা এই যুগে শিশুপাল ও দন্তবক্র রূপে জন্মলাভ করে। শ্রীহরির প্রতি শুক্রবারের কারণ তোমারই স্বচক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা মুক্ত হয়েছেন। মৃত্যুর সময় যে যা চিন্তা করে মৃত্যু গ্রহণ করে, পরজন্মে সে সেইরূপ লাভ করে।

বিষ্ণু বিচিত্রময় চরিত্র এই পুণ্য আখ্যান যে পাঠ করে, যে শ্রবণ করে, তার সমস্ত পাপের বিনাশ ঘটে।

বামন অবতারের কাহিনী

বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব বৈবস্বত হলেন সপ্তম মনু। বর্তমানে চলছে তার রাজত্বকাল। শ্রাদ্ধদেবের দশ পুত্র- ইক্ষাকু, নভর্গ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নিষ্যন্ত, নার্ভাগ, দির্ষ, তরুষ পৃষধ এবং বসুমান।

এই সময়কালে কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে দেবগণের কনিষ্ঠ বামনরূপী শ্রীহরির আবির্ভাব ঘটে।

বিশ্বকর্মা তাঁর দুই কন্যা ছায়া ও সংজ্ঞাকে দান করেছিলেন সূর্যের হাতে। সংজ্ঞার গর্ভে তিন পুত্র-কন্যার জন্ম হয়। যম, যমুনা ও শ্রাদ্ধদেব। ছায়ার পুত্র-কন্যাদের নাম গধান, শমৈশ্বর ও কন্যা তপতী। সূর্যের আর এক স্ত্রীর নাম বড়থা, তিনি অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের জন্ম দিয়েছিলেন। সন্তুরপ বিয়ে করেছিলেন সূর্যতনয়া তপতাঁকে।

সপ্তম মন্বন্তর শেষ হলে সূর্যপুত্র সাবর্ণি অষ্টম মনুর কাল শুরু হবে। এই সময় বিরোচনের পুত্র বলি হবেন তাদের তৃন্দ্রা। যে দৈত্যরাজ বলি বামনদের প্রার্থনায় তিন পা সমান ভূমি দান করার অঙ্গীকার করে সসাগরা পৃথিবীই অর্পণ করেছিলেন। আর শ্রীহরি তাকে কৌশলে সুতলে গিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখেন।

নবম মনু হবেন বরুণের পুত্র দক্ষ সাবর্ণি। উপমন্যুর পুত্র ব্রহ্ম, সাবর্ণি– দশম মনু, ধর্ম সাবর্ণি– একাদশ মনু, রুদ্রসাবর্ণি– দ্বাদশ মনু, দেব সাবর্ণি– ত্রয়োদশ মনু এবং ইন্দ্র সাবর্ণি– চতুর্দশ মনু। এইভাবে এক কল্প শেষ হবে।

হে রাজন! সকল মন্বন্তর অধিপতি, মনু পুত্রগণ, মুণিগন, ইন্দ্রগণ, দেবগণ– সকলে পরমেশ্বরের দ্বারা চালিত হয়ে থাকে, তিনিই সব কিছুর নিয়ামক।

ইন্দ্রের দ্বারা পরাজিত ও ভ্রষ্টশ্রী হলে মহাত্মা বলিকে শুক্রাচার্য আবার জীবিত করে তুললেন। গুরু তাকে বিশ্বাজিত যজ্ঞ করার আদেশ দিলেন। সেই যজ্ঞের আগুন থেকে একটি রথ উঠে এল। তাতে সিংহ চিহ্নিত ধ্বজা রয়েছে মহামূল্যবান মণি খচিত। এর পর্ব উঠে এল সুবর্ণ রঞ্জিত দিব্যধনু অক্ষয় শরযুক্ত তূণীর দ্বয় ও দিব্য কবচ। শেতামহ প্রহ্লাদ অম্লান পুষ্পযুক্ত একটি মালা ও শুক্রাচার্য একটি শঙ্খ দান করলেন।

বিরাট সেনাদল নিয়ে বিরোচন পুত্র বলি যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে ইন্দ্রপুরী আক্রমণ করলেন। প্রাসাদের চারপাশ সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শঙ্খে ফুঁ দিলেন। শঙ্খধ্বনি শুনে ইন্দ্র বুঝতে পারলেন বলি যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

বলির এমন দুঃসাহসে ইন্দ্র বিস্মিত হলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি বললেন– হে দেবেন্দ্র, ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া এই বলিকে কেউ বিনাশ করতে পারবে না। তাই তোমাদের ততদিন অন্যত্র সরে থাকাই শ্রেয়।

ইন্দ্র তখন অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে অন্য রূপ ধারণ করে স্বর্গ ছেড়ে চলে গেলেন।

প্রহ্লাদের পৌত্র বলি হলেন ত্রিভুবনের অধীশ্বর। তিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞও করলেন।

এইভাবে দেবতাগণ দৈত্যগণের ভয়ে অদৃশ্য ভাবে লুকিয়ে থাকলে দেবমাতা অদিতি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তিনি স্বামী কশ্যপকে সব কথা জানালেন। পুত্রদের দুর্দশার কথা জানিয়ে প্রতিকারের উপায় বের করতে বললেন।

কশ্যপ স্ত্রীকে পরম পুরুষ ভগবান জনার্দনের পুজো করার উপদেশ দিয়ে বললেন– ভগবান তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ করুন।

এরপর প্রজাপতি কশ্যপ ভগবানের পাদপদ্ম বন্দনা করার নিয়মবিধি বলে দিলেন।

ফাল্গুন মাসের শুক্লাপ্রতিপদ থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত বারোদিন পয়োব্রত পালন করে শান্ত মনে ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করতে হয়। পাদ্য আচমনীয় স্নান, বস্ত্র উপবীত, গন্ধ, ধূপ, মন্ত্র ও আহ্বান এইসব উপকরণের সাহায্যে দ্বাদশার মন্ত্র জপ করবে করজোড়ে বলবে- দেবতাগণ আর স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যার পাদপদ্মে সৌরভ কামনা করে উপাসনা করে থাকেন। সেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি প্রণাম জানাই। শ্রীবিষ্ণুর স্তব শেষে চারদিক প্রদক্ষিণ করবে। তারপর ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম নিবেদন করবে। ভগবানের প্রসাদি ফুল মাথায় গ্রহণ করবে, তারপর তাকে বিসর্জন দেবে।

বারোদিন ধরে নিষ্ঠা সহকারে পয়োব্রত পালন করতে হবে। এই বারোদিন বিছানায় শোবে না, রোজ তিনবার স্নান করবে, অসৎ কথাবার্তা বলবে না, কামবাসনা করবে না, উত্তম খাদ্য গ্রহণ করবে না।

প্রত্যেকদিন অনুষ্ঠানের শেষে হোম, পূজা সমাপ্ত করে ব্রাহ্মণদের ভোজন করাবে।

ত্রয়োদশীর দিন স্নান সেরে পট্টবস্ত্র পরিধান করে শাস্ত্র অনুসারে পঞ্চামৃত দিয়ে বিষ্ণু মূর্তিকে স্নান করাবে। দুধ দিয়ে চরু তৈরি করবে। বিষ্ণুকে তা নিবেদন করবে। আচার্য ও ব্রাহ্মণদের বস্ত্র ও ধেনু দান করবে। ব্রাহ্মণদের তুষ্ট করতে পারলে বুঝবে, শ্রীহরি তোমার প্রতি সদয় হয়েছেন। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাসহকারে যে ভক্ত শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম বন্দনা করে, তার অভিলাষ তিনি পূর্ণ করেন। হে ভদ্রে, তুমিও তোমার ঈপ্সিত বর লাভ করবে।

স্বামীর উপদেশকে মস্তকে ধারণ করে দেবমাতা অদিতি পয়োব্রত অনুষ্ঠান করতে শুরু করলেন শঙ্খ– চক্রগদাপদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু তার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। অদিতি সেই পরম

পুরুষের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু বন্যা বয়ে গেল। শরীর তখন কম্পমান।

শ্রীবিষ্ণু বললেন—আমি অন্তর্যামী, সকলের মনের বাসনা অবগত আছি। হে দেবী, আমি কথা দিচ্ছি, তোমার গর্ভে জন্ম নিয়ে তোমার পুত্রগণকে রক্ষা করব।

এরপর ভগবান কশ্যপের মধ্যে প্রবেশ করলেন। দীর্ঘকাল তপস্যা দ্বারা সংরক্ষিত সেই বীর্য অদিতির গর্ভে স্থাপন করলেন। অদিতির গর্ভে স্বয়ং শ্রীহরি প্রবিষ্ট হলেন। দেবতারা মহোল্লাসে তাঁর চরণ বন্দনা করলেন।

এইভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অদিতির গর্ভ হতে আবির্ভূত হলেন। জলভরা মেঘের মতো তার গায়ের রং, কানে কুণ্ডল, বক্ষে শ্রী বৎস চিহ্ন শোভা পাচ্ছে। পায়ে নূপুর হাঁটু পর্যন্ত বনফুলের মালা, বিভিন্ন অলঙ্কারে তিনি সুসজ্জিত। তারপর তিনি পিতা মাতার ন্যায় খর্বাকৃতি বামনরূপ ধারণ করলেন। তার উপনয়ন দেওয়া হল। দেবতা ও মহর্ষিগণ তাকে নানারকম উপহারে ভূষিত করলেন।

নর্মদা নদীর তীরে ভৃগুকচ্ছ নামক স্থানে ভৃগুবংশীয় দৈত্যরাজ বলি যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। বামনদেব সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

অনিন্দ্যকান্তি বামনরূপী শ্রীবিষ্ণুকে দেখে দৈত্যরাজ বলি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি তাকে বসার আসন দিলেন। তার চরণ বন্দনা করলেন।

বলিরাজ জানতে চাইলেন, তার এখানে আগমনের কারণ কী তিনি আরো বললেন— আপনি যা কিছু প্রার্থনা করবেন। সব আমি নির্দ্বিধায় দান করব।

বামনদেব বললেন— হে রাজন, আপনার দানের কথা আমি শুনেছি। সেই কারণেই আমার এখানে আসা। তবে আমি খুব বেশি কিছু চাই না। আমার পাদ পরিমিত ত্রিপাদ ভূমি হলেই আমার চলবে, আপনি আমায় তা ভিক্ষা দিন।

মহাদানবী বলি হো হো করে হেসে উঠলেন— হে ব্রাহ্মণ কুমার, তোমার বয়স অল্প, তার ওপর অনভিজ্ঞ। স্বার্থ বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই আমি ত্রিভুবনের একমাত্র রাজা। তুমি চাইলে আমি এক-একটা দ্বীপ দান করতে পারি। আর তুমি কিনা সামান্য তিন পা ভূমি প্রার্থনা করছ? শোনো, এমন ভূমি প্রার্থনা করো যা তোমার জীবন নির্বাহের কাজে লাগে। প্রহ্লাদের নাতি। কী

করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কপটতার আশ্রয় নেয়। কথা রাখতে গিয়ে যদি প্রাণ দিতে হয়, তা করতেও আমি রাজি, তথাপি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারব না। বললেন– হে গুরুদেব, আমি সত্য হতে বিচলিত হতে পারব না, আমায় ক্ষমা করবেন।

গুরু শুক্রাচার্য বলির একথা শুনে অত্যন্ত রেগে গেলেন তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, আমাকে পর্যন্ত অবজ্ঞা করতে তোমার কুণ্ঠা হচ্ছে না, তোমার দর্প চূর্ণ হবে। তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে। এই আমি অভিশাপ দিলাম।

তথাপি বলিরাজ তার কর্তব্যে অনড় রইলেন। তিনি কমণ্ডলু থেকে জল গ্রহণ করার জন্য ঢাললেন। কিন্তু জল পড়ল না। আসলে শুক্রাচার্য দৈত্যরাজ বলিকে রক্ষা করার জন্য কীট হয়ে কমন্ডলুর জলের মুখে বসে ছিলেন। তাই জল পড়ছিল না।

বামনদেব এবার এগিয়ে এলেন। কমন্ডুলের নলের মুখের ময়লা সরানোর জন্য কুশের খোঁচা দিলেন, কীটরূপী শুক্রাচার্যের একটা চোখে আঘাত লাগল। সেটি নষ্ট হয়ে গেল। এবার কমণ্ডলু থেকে হল গ্রহণ করে দৈতরাজ বলি সঙ্কল্প করলেন এবং বামনদেবের তিন পাদ পরিমিত জমি দান করলেন।

এবার বামনদেব একটি পদের দ্বারা বলির অধিকৃত সমুদয় ভূভাগ অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী শরীরের দ্বারা আকাশ এবং বাহুসমূহের দ্বারা দিকসকল ব্যাপ্ত করলেন। দ্বিতীয় পদ রাখলেন স্বর্গের ওপরে। অধিকৃত হল মর্ত্যলোক, জনলোক ও তপোলোক শ্রীবিষ্ণু তার উর্দ্ধচরণ রাখলেন সত্যলোকে। কমলযোনি ব্রহ্মা সেই চরণের পুজো করলেন।

ব্যাপার স্যাপার দেখে দৈত্যরাজের সাঙ্গপাঙ্গরা অত্যন্ত ক্ষেপে গেল। সকলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাড়া করল সেই বামনকে, তাকে তারা বধ করবে। কিন্তু বলিরাজ তাদের পথ আগলে দাঁড়ালেন। বললেন– তোমরা রসাতলে চলে যাও।

ভগবানের অভিপ্রায় জেনে শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড় দৈত্যরাজকে বরুণ পাশে আবদ্ধ করলেন।

শ্রীজনার্দন বললেন– হে দৈত্যরাজ, তিনপাদ পরিমিত জমি দান করবে বলেছিলেন, পৃথিবীর সকল স্থান জুড়ে আমার দুই পদ রেখেছি। তৃতীয় পা রাখার স্থান দান করো।

বলি বললেন– হে দেবশ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে মিথ্যেবাদী প্রতিপন্ন করতে চাইছেন, কিন্তু আমি তা হতে দেব না। আপনি আপনার তৃতীয় চরণ আমার মস্তকে স্থাপন করুন। ঐশ্বর্য ভ্রষ্ট হলেও

আমি অপকীর্তি হতে যেমন ভয় ভীত হই অন্য কোনো ভাবে যত দুঃখ লাভ করিনা কেন, তাতে তেমন আমি ভীত নই।

এমন সময় সেখানে ভগবত বৎসল প্রহ্লাদ, সে হাজির হলেন। তিনি সেই বামনদেবকে প্রমাণ করে বললেন– হে ভগবান, ইন্দ্রপদ বলি লাভ করছে, আপনারই সহায়তায়। আর সেই ইন্দ্রত্ব আপনিই আবার কেড়ে নিলেন। এ অত্যন্ত প্রশংসনীয় ব্যবস্থা।

বলির পত্নী সতী বিন্ধ্যাবলী, স্বামীকে বরুণ পাশে বাধা পড়ে থাকতে দেখে জনার্দনকে করজোড়ে প্রণাম নিবেদন করে বললেন– হে জনার্দন, এই ত্রিজগৎ আপনারই ক্রীড়াস্থল হিসেবে সৃষ্ট। কিন্তু সামান্য বুদ্ধিধারী জীবগণ তা বিস্মৃত হয়। সেই নির্লজ্জ ব্যক্তিগণ আপনাকে, অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের অধীশ্বর, তাঁকেই দান করতে চায়।

ব্রহ্মা বললেন– হে ভগবান, হৃত সর্বস্ব দানকারী এই বলিকে আপনি বরুণ পাশ থেকে মুক্ত করুন। কপটতা শূন্য যে ব্যক্তি আপনার চরণে তুলসি বা এক ফোঁটা গঙ্গাজল দিয়ে বন্দনা করে, সে আপনার কৃপায় উত্তম গতি লাভ করে। আর এই বলি, নিজের সর্বস্ব অর্থাৎ বল দ্বারা অর্জিত স্বর্গাদি এমনকি নিজের দেহ পর্যন্ত দান করেছে, তাকে কেন এত দুঃখ পেতে হচ্ছে?

তখন শ্রীবিষ্ণু বললেন– হে কমলযোনি, আমি যার প্রতি সদয় হই, তার সকল কিছু হরণ করি। কারণ ধন সম্পদ মানুষকে অহংকারী করে তোলে। আর সেই জন্য আমার প্রতি তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। দৈত্য ও দানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই বলি দুর্জয় মায়াকে জয় করেছে। তাই বিপদের মধ্যে পড়েও দুঃখে ভেঙে পড়ে নি। ধন, স্থান সব গেল, শাপবদ্ধ হয়েও সংকল্প থেকে চ্যুত হয়নি। গুরুর তিরস্কার ও অভিশাপও তাকে সত্য থেকে এক তিল সরাতে পারেনি। তাই আমি তাকে খুশি দান করলাম, যা দেবতাদের কাছে দুষ্প্রাপ্য। বলি পুনরায় আমারই সহায়তায় সাবর্ণি মন্বন্তরে এই স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র হবে। যতদিন না হচ্ছে, ততদিন সে বিশ্বকর্মার তৈরি করা সুতলে বাস করবে। আমার কৃপার প্রভাবে সেখানে তার মনে বা দেহে কোনো ক্লেশ বা পীড়ার উপদ্রব হবে না।

এবার শ্রীভগবান বলিকে বললেন– হে দৈত্যরাজ বলি, তোমার মঙ্গল হোক। তুমি তোমার আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে সুতলে চলে যাও, খুব শিগগির তোমার দানবীর ভাবের বিনাশ ঘটবে। তুমি সর্বদা আমার দর্শন পাবে। আর যারা তোমার শাসনকে অগ্রাহ্য করেছে সেই সব দৈত্যরা আমার চক্রের দ্বারা ধ্বংস হবে।

বলির চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রুধারা বেরিয়ে এল। তিনি বললেন– হে ভগবান, নীচজাতি অধমকুলে জন্মলাভ করেও আপনি আমার প্রতি যে কৃপা করলেন, মনে হয় দেবগণও ওই কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

বলিরাজ বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করে অনুচরদের নিয়ে সুতলে চলে গেলেন। বালির কাছ থেকে স্বর্গরাজ্যে উদ্ধার করে শ্রীহরি ইন্দ্রকে তা ফিরিয়ে দিলেন। এইভাবে অদিতির অভিলাষ পূর্ণ হল।

শ্রী প্রহ্লাদ বললেন– হে ভগবান, জগৎপূজ্য ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁর চরণ বন্দনা করেন, সেই আপনি অসুরযোনি লাভ করে আমাদের দ্বার রক্ষক হলেন। আমরা অতিশয় দুর্বৃত্ত খল স্বভাবের। কী করে আপনার কৃপা দৃষ্টি লাভ করলাম জানি না। আপনার আচরিত কর্ম অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। আপনি সর্বজ্ঞ, আপনি সর্বজীবের চৈতন্য স্বরূপ, আপনি সমদর্শী, আপনি ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু।

জনার্দন বললেন–হে বৎস প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হোক। তুমি সুতলে গমন করো। সেখানে পৌত্রের সঙ্গে বসবাস করলো। শঙ্খ –চক্র –গদা পদ্মধারী আমাকে সর্বদা দেখতে পাবে।

ভগবানের আজ্ঞা শিরোধার্য করে শ্রীপ্রহ্লাদ করজোড়ে তাকে প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর প্রণাম করে ফিরে গেলেন সুতলের দিকে।

বামনরূপী শ্রীহরির এই আখ্যান যে পাঠ বা শ্রবণ করে, অথবা দেবকার্যে, পিতৃকার্যে যে কোন কাজে এই বামন চরিত কীর্তন করলে সকল বাসনা পূর্ণ হয়।

পরশুরাম অবতারের কাহিনি

পদ্মযোনি ব্রহ্মার পুত্র অত্রি মুনির নেত্র থেকে চন্দ্রদেবের আবির্ভাব ঘটেছে। দেব গুরু বৃহস্পতির স্ত্রীর নাম তারা। এক সময় চন্দ্র তাকে হরণ করে নিয়ে আসেন। তাকে গর্ভবতী করে। তিনি এক পুত্রের জন্ম দেন, নাম বুধ, সেই বুধের ঔরসে এবং সুদ্যুম্নের নারী অবস্থায় ইলার গর্ভে পুরুরবা এক সন্তানের জন্ম হয়।

পুরুরবা বংশজাত সন্তান গাধির। গাধির কন্যা হলেন সত্যবতী। তিনি ঋচী মুনিকে স্বামী রূপে বরণ করেন। গাধির কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। আর সত্যবতীরও কোনো পুত্র লাভ করতে পারেননি। পুত্র সন্তানের কামনা করে ঋচীক মুনি শ্বাশুড়ির জন্য ক্ষাত্রমন্ত্রে চরু তৈরি করলেন। তারপর তিনি স্নানে গেলেন। সত্যবতীর মাতা অর্থাৎ ঋচীকের শ্বাশুড়ি মনে করলেন, ঋষি নিজের পত্নীর জন্য নিশ্চয়ই উত্তম চরু তৈরি করেছেন, আমি ওটা গ্রহণ করব।

কন্যার নিকট তিনি চরু খেতে চাইলেন। কন্যা সত্যবতী নিজের চরু মাকে দিয়ে দিলেন। আর মায়ের চরু নিজে পান করলেন।

ঋষি স্নান সেরে ফিরে এসে চরু খাওয়ার গল্প শুনে বললেন– প্রিয়ে, তোমার গর্ভে এক দুর্দান্ত ক্ষত্রিয় পুত্রের জন্ম হবে। আর তোমার মাতা জন্ম দেবেন এক ব্রহ্মজ্ঞের।

এমন সাংঘাতিক কথা শুনে সত্যবতী অত্যন্ত উতলা হয়ে পড়লেন। তিনি স্বামীর পায়ে ধরে প্রার্থনা জানালেন স্বামী, আপনি এই কার্য বন্ধ করুন।

সত্যবতীর প্রার্থনায় ঋষি বললেন– বেশ, আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার পুত্র ব্রহ্মর্ষি হবে। কিন্তু তোমার নাতি হবে ঘোর ক্ষত্রিয়।

সত্যবতী অবশেষে জমদগ্নি নামে এক পুত্রের জন্ম দিলেন। জন্মদগ্নি বিয়ে করলেন রেনুর কন্যা রেনুকাকে। রেনুকার গর্ভে জন্ম নিল বসুমদ প্রমুখ অনেকগুলি সন্তান। তাদের মধ্যে কনিষ্ঠ হলেন রাম, যিনি পরবর্তীকালে পরশুরাম নামে সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন।

এদিকে মহারাজ গাধির পুত্র– পুরুকুৎসীর গর্ভে জন্ম নিলেন বিশ্বামিত্র। যিনি ক্ষত্রকূলে জন্মলাভ করেও ব্রহ্মমন্ত্রে মন্ত্রিত চরু ভক্ষণের জন্য মহামুনি হয়েছিলেন।

মহামুনি জন্মদগ্নির পুত্র রামকে বাসুদেবের অংশরূপে জ্ঞান করা হয়। তিনি পূজনীয় বেদ, ব্রাহ্মণ বিরোধী অতীব গর্বিত ক্ষত্রিয়কুলকে অতি অল্প অপরাধেই পরশুরাম একুশবর বিনাশ করে পৃথিবীকে ভারমুক্ত করেন।

হৈহয় বংশের পতি হলেন কার্তবীর্যাজুন। তিনি ছিলেন শ্রীহরির অবতার দত্তাত্রয়ের উপাসক। তাঁর আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীহরি তাকে সহস্র বাহু দান করেছিলেন। তিনি সেই সহস্র বাহু দ্বারা নর্মদা নদীর জল আটকে দিলেন। ফলে সেই জল ভাসিয়ে দিল লঙ্কেশ্বর রাবণের দোবার্চনা ভূমি। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মহারাজ কার্তবীর্যাজুন ছিলেন অমিত শক্তিশালী। বানরকে যেমন খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখা হয়, তিনিও ঠিক তেমনভাবে রাবণকে বন্দি করলেন। মহিষ্মতী নামক নিজের প্রাসাদে। কিছুদিন বাদে তাকে মুক্ত করে দেন নেহাত অবজ্ঞাবশে।

একদিন রাজা কার্তবীর্যাজুন অনুচরবর্গকে নিয়ে মৃগয়ায় বেরিয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে মহর্ষি জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হয়ে তার আতিথেয়তা গ্রহণ করলেন। মুনি রাজা এবং তার অনুচর বর্গের সকল আপ্যায়ন সুসম্পন্ন করলেন কামধেনুর সাহায্যে।

অগ্নিহোত্র ধেনুর অপূর্ব কীর্তি দেখে রাজা অত্যন্ত মহর্ষির কাছে ওই কামধেনু লোভাতুর হয়ে প্রার্থনা করলেন। ঋষিবর তা দিতে আপত্তি জানালেন। কিন্তু রাজা কোনো আপত্তি শুনলেন না। জোর করে ছিনিয়ে নিলেন। সেই ধেনু নিয়ে এলেন মহিষ্মতী পুরীতে।

পরশুরাম সেই সময় আশ্রমে ছিলেন না। ফিরে এসে সব অবগত হয়ে অত্যন্ত কুপিত হলেন। তিনি কার্তবীর্যাজুনকে বিনাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি মহিষ্মতী নগরী আক্রমণ করলেন। রাজার সতেরো অক্ষে সেনার সাথে অনায়াসে যুদ্ধ করে পরশুরাম সমস্ত রাজ সৈন্যের বিনাশ করলেন।

এবার এগিয়ে এলেন স্বয়ং রাজা কার্তবীর্যাজুন। পরশুরাম তার পরশুর দ্বারা রাজার হাতগুলি কর্তন করলেন। হাজার হাত মাটিতে খসে পড়ল। রাজার মুণ্ড মাটিতে পড়ে গেল। পিতার বিনাশ দেখে তার অযুত সংখ্যক পুত্র ভয়ে প্রাণ নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। কামধেনুকে উদ্ধার করে পরশুরাম আশ্রমে ফিরে গেলেন।

পিতা জমদগ্নি সব বিবরণ শুনে পুত্রকে অত্যন্ত তিরস্কার করলেন। রাজাকে হত্যা করে পরশুরাম অত্যন্ত পাপকাজ করেছেন। পাপের ভার লাঘব করার জন্য পিতার নির্দেশে তিনি তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। এক বছর পর ফিরে এলেন আশ্রমে।

একদিন মহর্ষি জমদগ্নি পত্নীর জল নিয়ে ফিরে আসতে দেরি হল। জমদগ্নি কুপিত হয়ে রেণুকার পুত্রদের হত্যার আদেশ দিলেন। পুত্ররা কেউই মাতৃহত্যা করতে রাজি হলেন না। এগিয়ে এলেন পরশুরাম। পিতার তপস্যার প্রভাব সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তাই পরশুরাম তার মা এবং বড়ো ভাইদের হত্যা করলেন। পিতা জমদগ্নি পরশুরামের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তিনি পুত্রকে বরদান করতে চাইলেন।

পরশুরাম বললেন– হে পিতা, আপনি যদি আমাকে বর দিতে আগ্রহী হন, তাহলে এমন কাজ করুন, যার ফলে আমার মা এবং বড় ভাইরা আবার প্রাণ ফিরে পায়। এই মৃত্যুর ব্যাপারটা তারা যেন ভুলে যান।

জমদগ্নি মন্ত্রবলে পত্নী ও পুত্রদের বাঁচিয়ে দিলেন। পিতার তপস্যার অমোঘ শক্তি সম্পর্কে অবগত থাকার জন্য পরশুরাম মা এবং বড়ো ভাইদের বিনাশ করতে মোটেও কুণ্ঠিত হননি।

এদিকে নৃপতি কার্তবীর্যের পুত্ররা পিতার মৃত্যুর কথা চিন্তা করে অত্যন্ত অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন। একদিন তারা দেখলেন পরশুরাম বনের পথ ধরে কোথায় চলেছেন। আশ্রমে নিশ্চয়ই মুনি জমদগ্নি একা আছেন। এই কথা চিন্তা করে তারা আশ্রমে আক্রমণ করলেন। জমদগ্নির মুণ্ড আর ধড় আলাদা করে দিলেন। পরশুরামের মা এই দৃশ্য দেখে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। মায়ের আকুল কান্না পরশুরাম শুনতে পেলেন। তিনি ছুটে এলেন আশ্রমে। মৃত পিতাকে দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। ক্রোধে ফেটে পড়লেন পরশুরাম। হাতে নিলেন পরশু বা কুঠার, ক্ষত্রিয় বংশের নাশ তিনি করবেন।

তিনি মহিষ্মতী পুরীতে এসে প্রবেশ করলেন। রাজার পুত্রদের নিধন করলেন। দেখতে দেখতে সেখানে একটি পর্বতের সৃষ্টি হল। এইভাবে ক্ষত্রিয়গণ অনাচারী হলে পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন।

বর্তমানে তিনি মহেন্দ্র পর্বতে অবস্থান করছেন। আগামী মন্বন্তরে তিনি বেদ প্রবর্তক সপ্তর্ষিদের মধ্যে একজন হবেন। এইভাবে শ্রীহরি ভৃগুবংশে জন্মলাভ করে ক্ষত্রিয়কুলকে বহুবার বিনাশ করেছিলেন।

শ্রীরাম অবতারের কাহিনি

সূর্য বংশজাত রাজা দশরথ। অযোধ্যার প্রতাপশালী রাজা মৃগয়ায় বেরিয়ে শব্দভেদী বাণের দ্বারা এক ঋষিবালক, বধ করেন। তার অন্ধ পিতা-মাতা পুত্রের শোকে পাগল হয়ে রাজাকে অভিশাপ দিলেন যে, তিনিও পুত্র শোকে মারা যাবেন।

দশরথ বললেন–আমি অপুত্রক, পুত্রশোক পাব কী করে?

অন্ধমুনি বললেন– পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করো, পুত্রলাভ হবে।

পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করলেন রাজা দশরথ। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পৌরহিত্যে যজ্ঞ সুসম্পন্ন হল। যজ্ঞে উত্থিত চরু, রাজা তার তিন রানিকে খেতে বললেন।

ভগবান শ্রীহরি এবার চার ভাগ হয়ে তিন রানির গর্ভে প্রবেশ করলেন। যথাসময়ে বড়রানি কৌশল্যা, জন্ম দিলেন রামের। কৈকেয়ীর গর্ভজাত সন্তান হল ভরত। আর ছোটো রানি সুমিত্রা দুই পুত্রের জননী হলেন- লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

এদিকে রাজা জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণের সময়ে অজোনিসম্ভবা এক কন্যাকে লাভ করলেন। নাম দিলেন সীতা। তিনি আসলে স্বয়ং দেবী লক্ষ্মী।

গুরুদেব বশিষ্ঠের অধীনে চারভাই বিদ্যার্জন করলেন। তারা অস্ত্রবিদ্যাতেও পারদর্শী হয়ে উঠলেন। সেই সময় এক বিশদ দেখা দিল। তপোবনে মুনি– ঋষিরা হোম– যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারতেন না। লঙ্কেশ্বর রাবণের অনুচরেরা যত রাক্ষস-রাক্ষসী এসে তা পণ্ড করে দিত। মহামুনি বিশ্বামিত্র রাক্ষসের উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য রাজা দশরথের শরণাপন্ন হলেন। এবং তার কাছে রাম ও লক্ষণকে প্রার্থনা করলেন।

রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্র পথে চলেছেন। এমন সময় ভীষণ আকৃতির এক রাক্ষসী তাদের পথ আগলে দাঁড়াল। নাম তাড়কা। বিশ্বামিত্র তাকে দেখে কাঁপতে থাকলেন। শ্রীরাম এক বাণে সেই রাক্ষসীকে ধরাশায়ী করে দিলেন।

এবার তারা এলেন সেই স্থানে, যেখানে ঋষি গৌতমের অভিশাপে অহল্যা পাষাণ হয়ে পড়ে আছে। মুনি বিশ্বামিত্র রামকে তাঁর চরণ স্পর্শ দিতে বললেন। রামের পায়ের ছোঁয়া মাথায় পেয়ে অহল্যা সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করলেন। তিনি করজোড়ে শ্রীরামের প্রশস্তি গাইলেন।

এবার তারা চললেন তপোবনের দিকে। মাঝে আছে গঙ্গা নদী। নদী পার হয়ে যেতে হবে। কিন্তু নৌকার মাঝি রাজি নয়। যাঁর পায়ের স্পর্শে পাষাণী মানবী হয়ে যায়, তাহলে হয়তো তার নৌকো মানব-মানবী হয়ে যাবে। মাঝি রামচন্দ্রের চরণ যুগল ধুয়ে দিলেন। তাকে সাদরে নৌকায় বসালেন। তারপর তাদের গঙ্গা নদী পার করে দিলেন। রামচন্দ্র ওই মাঝির প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার নৌকাটি সোনায় পরিণত করলেন।

অবশেষে তিনজনে তপোবনে এসে উপস্থিত হলেন। রামচন্দ্র জানতে পারলেন, রাক্ষসদের উপদ্রবে ঋষিরা নির্বিঘ্নে হোম –যজ্ঞ করতে পারে না। রামচন্দ্র তাদের আশ্বস্ত করলেন। যজ্ঞ শুরু হতেই দলে দলে রাক্ষস-রাক্ষসী ধেয়ে এল। শ্রীরাম তার বাণের সাহায্যে প্রত্যেকের বিনাশ ঘটালেন। এইভাবে তপোবন হল রাক্ষস মুক্ত।

মুনি-ঋষিদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে এলেন মিথিলাতে, রাজর্ষি জনকের গৃহে অতিথি হলেন।

রাজা জনক অতি সমাদরে অতিথি সৎকার করলেন। বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণের পরিচয় দিয়ে বললেন, শ্রীরামের সঙ্গে আপনার কন্যা সীতার বিবাহের ব্যবস্থা করুন।

রাজা জনক শ্রীরামের রূপ দেখে অত্যন্ত পুলকিত হলেন। তবুও তিনি সংশয়াপূর্ণ মনে বললেন–মুনিবর আমার একটি ধনুক আছে, স্বয়ং শিব সেটি আমায় দান করেছিলেন। আমি পণ করেছি, যে ব্যক্তি ধনুকে গুণ দিয়ে সেটি ভাঙতে পারবে, তার হাতেই আমি কন্যা সম্প্রদান করব।

ইতিমধ্যেই রাম লক্ষ্মণের আগমনবার্তা পৌঁছে গেছে অন্তঃপুরে, সীতার সখীরা জানাল, রামের রূপের কথা। সীতা মনে মনে উৎফুল্ল হলেন। পরক্ষণেই মুষড়ে পড়লেন– ওই পুরুষ কি হরধনু ভঙ্গ করে তার বাবার পণ রক্ষা করতে পারবেন? ইতিপূর্বে অনেক বড়ো বড়ো বীর এসেও সেই ধনুক ভাঙতে পারেননি। তুলতে পর্যন্ত পারেননি।

শ্রী রামচন্দ্র কিন্তু অনায়াসে হরধনু ঊর্ধ্বদিকে তুলে ধরলেন। গুণ দিতে গিয়ে তা ইক্ষু দণ্ডের মতো ভেঙে গেল।

জনক রাজা অত্যন্ত খুশি হলেন। অযোধ্যায় দূত পাঠিয়ে দিলেন, রাজা দশরথকে বিয়ের সংবাদ জানিয়ে।

দশরথ মহা আনন্দে চতুরঙ্গ দলের সঙ্গে ভরত ও শত্রুঘ্নকে নিয়ে মিথিলায় এসে উপস্থিত হলেন।

শুভলগ্নে রাম ও সীতার বিয়ে হল। ওই একই সঙ্গে বিয়ে হল জনকের অপর কন্যা ঊর্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণের। জনক রাজার ভাই কুশধ্বজের দুই কন্যা মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তি। তারা ভরত ও শত্রুঘ্নকে স্বামীত্বে বরণ করলেন।

পরের দিন দশরথ চার পুত্র ও চার পুত্রবধূকে নিয়ে অযোধ্যার পথে এগোলেন। পথে দেখা হল পরশুরামের সঙ্গে।

তিনি বললেন– জগতে একজনই রাম থাকবে। পুরাতন হরধনু ভঙ্গকারীকে আমি বধ করব।

শ্রীরাম এগিয়ে এসে বললেন–আমিই সেই রাম। হরধনু যদি পুরোনো ছিল, তাহলে আপনারটা আমায় দেখান দেখি।

পরশুরাম ক্রোধ ভরে নিজের ধনুঃশরটি শ্রীরামচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন। এ সময় রাম পরশুরামের তেজ হরণ করে নিলেন। সকলে খুশি মনে অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

মহারাজ দশরথ বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি রামকে রাজা করার জন্য মনস্থ করলেন। এ সংবাদ দাসী কুঁজী মন্থরার কাছে থেকে জানতে পারলেন মেজোরানি কৈকেয়ী। মন্থরার কুমন্ত্রণায় রানী দশরথের কাছে পূর্ব প্রতিশ্রুত দুটি বর চেয়ে নিলেন। একবরে রামকে চোদ্দো বছরের জন্য বনে পাঠাতে হবে এবং দ্বিতীয় বরে ভরতকে সিংহাসনে বসাতে হবে।

কৈকেয়ীর মুখে এমন নির্মম পরিহাস শুনে রাজা কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গেলেন, সঙ্গে গেলেন পত্নী সীতা এবং অনুজ লক্ষ্মণ। পুত্রের শোকে রাজা দশরথ– হা রাম, হা রাম, করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

খবর পেয়ে মামাবাড়ি নন্দীগ্রাম থেকে ফিরে এলেন ভরত। মাকে অত্যন্ত তিরস্কার করলেন। পিতার শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করে তপস্বীর বেশে বনে এলেন। চিত্রকূট পর্বতে দেখা হল রামের সঙ্গে। পিতার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে ভরত দাদা রামকে অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করলেন।

পিতার শোকে শ্রীরাম শোকাহত হলেন। তিনি বললেন– ভাই ভরত, তুমি অযোধ্যায় ফিরে যাও। চোদ্দ বছর পূর্ণ হলেই আমি আবার রাজকার্য হাতে তুলে নেব। ততদিন তুমিই হলে অযোধ্যার রাজা।

ভরতের মন চাইছিল না। তবু ভ্রাতৃআজ্ঞা পালন করতেই হবে। অবশেষে শ্রীরামের পাদুকাযুগল মাথায় করে ফিরে এলেন রাজ্যে। সিংহাসনে সে দুটি স্থাপন করে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

চিত্রকুট পর্বতে পিতার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে অগস্তের তপোবন ঘুরে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ এলেন পঞ্চবটী বনে। সেখানে কুটির নির্মাণ করা হল। অনুজ লক্ষ্মণ, রাম ও সীতার সেবায় নিয়োজিত সর্বক্ষণ।

লঙ্কার রাজা রাবণের বোন শূর্পনখা একদিন ওই বনে এসে ঢুকল। রাম –লক্ষ্মণের দিব্য মূর্তি দেখে সে কামে জর্জরিত হল। সুন্দরী নারীর রূপ ধরে তাকে বিয়ে করার জন্য প্রার্থনা করল।

কিন্তু রাম লক্ষ্মণ আপত্তি করলেন। সুর্পনখা রেগে গিয়ে সীতাকে গিলে খাওয়ার জন্য উদ্যত হল। রেগে গিয়ে লক্ষ্মণ সেই রাক্ষসীর নাক, কান কেটে দিলেন। হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বোন গিয়ে দাঁড়াল দাদা রাবণের কাছে। রাবণ সমস্ত কথা অবগত হয়ে ঠিক করলেন সীতা দেবীকে চুরি করে নিয়ে আসবেন। এজন্য তার প্রয়োজন হল মামা মারীচকে। মারীচ মায়াবলে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারত।

সে সোনার হরিণের রূপ ধরে কুটিরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেই সময় সীতা সেই সুন্দর হরিণ ধরে এনে দেওয়ার জন্য রামকে অনুরোধ করলেন। রাম ছুটলেন হরিণ ধরতে। অনেক দূর যাওয়ার পর রাম একটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। মারীচ আহত হল। আর রামের কণ্ঠস্বরে চেঁচিয়ে উঠল– ভাই লক্ষ্মণ! আমায় রক্ষা করো। তারপর মারীচ মারা গেল।

শ্রীরামের আকুল আর্তনাদ শুনে সীতা চঞ্চলা হলেন। দেবর লক্ষ্মণকে তিনি জোর করে পাঠিয়ে দিলেন স্বামীর উদ্দেশ্যে। কুটিরে তখন একাকিনী সীতাদেবী। এই সুযোগে তপস্বীর ছদ্মবেশে রাবণ ভিক্ষার ঝুলি হাতে দাঁড়ালেন কুটিরে সামনে। সীতা ভিক্ষা দিতে এগিয়ে এলে তাকে পুষ্পক রথে তুলে লঙ্কার দিকে যাত্রা করলেন। হা রাম, হা রাম” করে সীতাদেবী কাঁদতে কাঁদতে গায়ের আভরণ ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন। রাজা দশরথের বন্ধু জটায়ু পাখির কানে সীতার এই হৃদয় বিদারক ক্রন্দন ধ্বনি পৌঁছোল। তিনি রাবণের পথ আগলে দাঁড়ালেন। রাবণ খঙ্গর আঘাতে জটায়ুর পাখা ছেদন করলে মৃতপ্রায় পাখিটি মাটিতে পড়ে গেল।

রাবণ সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে এসে রামকে ভুলে গিয়ে তাকে বিয়ে করতে বললেন। সীতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন– শ্রীরাম বিনা আমি কাউকে পুজো করি না। আমায় হরণ করার ফলে তুই নির্বংশ হবি।

রাগে দুঃখে অপমানে রাবণ সীতাকে অশোকবনে বন্দি করে রেখে দিলেন। সীতাকে পাহারা দেওয়ার জন্য শত শত ভয়ংকর দর্শন চেড়ী নিয়োগ করা হল।

এদিকে মায়াবী রাক্ষসকে মেরে রাম কুটিরের অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা হল। তিনি ভাইকে বকুনি দিয়ে বললেন– সীতাকে একা কুটিরে রেখে তোমার বেরিয়ে আসা উচিত হয়নি। না জানি কপালে কী আছে!

কুটিরে ফিরে এসে দুই ভাই হতবাক। সীতা নেই, তাকে চারদিকে খোঁজা হল। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না।

খুঁজতে খুঁজতে অরণ্য মধ্যে এক জায়গা থেকে একটি কঙ্কণ কুড়িয়ে পেয়ে রামচন্দ্র চিনতে পারলেন, এ সীতারই অলংকার, বুঝলেন, সীতাকে কেউ চুরি করেছে।

পথে আহত ও মৃতপ্রায় জটায়ুর সঙ্গে তার দেখা হল। জানতে পারলেন, লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করেছে। তাকে বাধা দিতে গিয়ে পক্ষীটির মরণাপন্ন অবস্থা।

খানিকবাদে জটায়ুর মৃত্যু হল। সরযূ নদীর তীরে জটায়ুর অগ্নি–সকার করে রাম-লক্ষ্মণ ঋষ্যমূক পর্বতে এলেন। সেখানে বাস করতেন সুগ্রীব, হনুমান, সুষেণ, নল ও নীল নামে পাঁচ বানর। তারা রাম ও লক্ষ্মণকে প্রণাম করলেন।

শ্রীরাম সীতাহরণের কথা জানিয়ে বানরদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

সুগ্রীব বলল– আমি আমার ভাই বালির দ্বারা নিজ রাজ্য থেকে বিতাড়িত। যদি রাজ্য ফিরে পাই, তাহলে কথা দিচ্ছি সীতা উদ্ধারে সাহায্য করব।

রাম সুগ্রীবের সাথে মিতালি পাতালেন। তারপর ছলে বলে কৌশলে বালিকে হত্যা করে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করে দিলেন।

সুগ্রীবের আহ্বানে বহু বানর সেনা এসে জড়ো হল। শ্রীরাম তাকে উদ্ধার করতে আসবেন– সীতাকে এই কথা বলে আশ্বস্ত করার অভিপ্রায়ে হনুমান গেল লঙ্কায়। সেখানে গিয়ে আগুনে সব ছারখার করে দিল। তারপর সীতার সঙ্গে দেখা করে তার কুশল সংবাদ নিয়ে ফিরে এল রামের কাছে।

তারপর নল এবং অন্যান্য বীরসেনারা শিলার ওপর রামনাম লিখে সাগরে ভাসিয়ে দিল। তৈরি হল সেতু। সেই সেতু ধরে সকল বানর সেনা এসে হাজির হল লঙ্কায়।

রাবণের ভাই বিভীষণ ছিলেন সৎ। তিনি দাদা রাবণকে বললেন–যে, সীতাদেবীকে ফিরিয়ে দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের চরণে ঠাঁই নাও। রাবণ ভাইয়ের তোষামোদ বাক্য শুনে অত্যন্ত কুপিত হলেন। তিনি বিভীষণকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন। অপমানিত বিভীষণ এলেন রামের কাছে। তার চরণে আশ্রয় নিলেন। রামচন্দ্র তাকে বন্ধু বলে স্বীকার করলেন।

রণক্ষেত্রে স্বয়ং রাবণ এসে দাঁড়ালেন। রাম অনায়াসে বাণের আঘাতে তার মাথার দশটি মুকুট মাটিতে ফেলে দিলেন। অপমানিত হয়ে রাবণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলেন। তারপর কিছুদিন

কেটে গেল নীরবতার মধ্যে, ইতিমধ্যে বালির পুত্র অঙ্গদ রাবণের সভায় হাজির হয়ে একথা সেকথা বলে তাকে তাতিয়ে দিয়ে এল।

এবার রামের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বেছে বেছে বীরদের পাঠাতে থাকলেন লঙ্কেশ্বর রাবণ। রাবণের পুত্র মেঘনাদ। মেঘের আড়ালে থেকে যুদ্ধ করতে লাগল। সে নাগপাশে রাম-লক্ষ্মণকে বন্দি করল। পবনদেব গরুড়ের সাহায্য নিয়ে রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশ মুক্ত করলেন।

রাবণের আর এক ভাই কুম্ভকর্ণ। সে ছমাস জাগে। অসময়ে জাগালে তাঁর মৃত্যু হবে। এমন বর ছিল তার। কিন্তু লঙ্কার এই দুরাবস্থার দিনে চুপ করে কি বসে থাকা যায়। রাবণ তাঁকে ঘুম থেকে তুলে দিলেন। এবং পাঠিয়ে দিলেন রণাঙ্গনে। রামের বাণে তাঁর মৃত্যু হল।

এরপর বীরবাহু, মকরা প্রভৃতি রণদক্ষ বীররা এল। কিন্তু কেউই প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারল না। এবার যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দাঁড়াল বিভীষণের বালক পুত্র তরণী সেন। সে ছিল শ্রীরামচন্দ্রের পরম উপাসক। তার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত প্রতিটি বাণ ব্যর্থ হল রামচন্দ্রের। তিনি তখন ওই বালককে বধ করার জন্য বিভীষণের সঙ্গে পরামর্শ করতে শুরু করলেন। বিভীষণ বললেন– ব্রহ্মবাণই ওর মৃত্যুবান।

রাম ব্রহ্মবাণ নিক্ষেপ করবেন। তরণীর মুণ্ড কেটে পড়ে গেল মাটিতে। সেই কাটা মুণ্ড রামনাম জপ করতে লাগল।

ইন্দ্রজিৎ বহু যুদ্ধ জয়ী বীর। যুদ্ধে অপরাজিত থাকার প্রার্থনায় শিবের পুজো করার জন্য যজ্ঞাগারে প্রবেশ করল। তার পুজো শেষ হলে কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না। তাই বিভীষণের যুক্তিতে লক্ষ্মণ ও হনুমান যজ্ঞগৃহে প্রবশে করলেন। হনুমান যজ্ঞ পণ্ড করে দিল। আর লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র মেরে ইন্দ্রজিতের সংহার করলেন।

পুত্রশোকে অধীর হয়ে রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। রাবণের শক্তিশেল বাণের আঘাতে লক্ষ্মণ মারা গেলেন। সুষেণ বৈদ্যের পরামর্শে হনুমান গন্ধমাদন পাহাড়কে তুলে নিয়ে এল। সেখান থেকে আহরণ করা হল বিশল্যকরণীর গাছ। সেই ঘ্রাণে লক্ষ্মণ প্রাণ ফিরে পেলেন।

রাম-রাবণের যুদ্ধ শুরু হল। যতবার রামের বাণ রাবণের মুণ্ডু কেটে দিল, ততবার সেগুলো অদ্ভুত ভাবে জোড়া লেগে যেতে লাগল।

বিভীষণের পরামর্শে রামের আজ্ঞায় হনুমান এল রাবণের পত্নী মন্দোদরীর কাছে। মিথ্যে আছিলায় নিয়ে এল রাবণের মৃত্যুবাণ। সেই বাণ নিক্ষেপ করে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কেশ্বর রাবণকে নিধন করলেন।

সীতাকে অশোক কানন থেকে উদ্ধার করা হল। ইতিমধ্যে বনবাসের চৌদ্দ বছর পার হয়েছে। পুষ্পকরথে চড়ে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা ফিরে এলেন অযোধ্যায়। অযোধ্যাবাসী আনন্দে নাচতে লাগল। শ্রীরাম সিংহাসনে বসলেন, পাশে বসালেন পত্নী সীতাকে। দেবতারা স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। সীতা বহুদিন রাক্ষসের ঘরে ছিল। তাঁর চরিত্র কলঙ্কিত হয়েছে এই অপবাদ শুনে রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠালেন। তখন সীতাদেবী ছিলেন গর্ভবতী, বাল্মীকি মুনির আশ্রমে তিনি ঠাঁই পেলেন। সেখানেই দুই যমজ পুত্র লব ও কুশের জন্ম হল। মুনি দুই শিশুকে নানাবিধ শস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করে তুললেন।

এদিকে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ করছেন। যজ্ঞের ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দেশ-বিদেশ ঘুরে ঘোড়া এসে দাঁড়াল পঞ্চবটী বনে। তার কপালে জয়পত্র লেখা দেখে লব ও কুশ। তাকে বন্দি করল।

এ খবর শুনে শত্রুঘ্ন ছুটে এল। বালকদের সাথে যুদ্ধ হল। এবং অবশেষে শত্রুঘ্ন পরাজিত হয়ে বন্দি হলেন। ভরত ও লক্ষ্মণও যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দিত্ব গ্রহণ করলেন। শেষে অশ্বমেধ ঘোড়া উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন স্বয়ং রামচন্দ্র। তিনি জানতেন না যে এই দুই শিশু যোদ্ধা তাঁরই আত্মজ। তিনিও তাদের সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠলেন না। অবশেষে মূচ্ছা গেলেন।

যুদ্ধে জয় লাভ করে নাচতে নাচতে লব-কুশ মা সীতাদেবীর কাছে ফিরে এল। যুদ্ধের বৃত্তান্ত শুনে মা কেঁদে আকুল হলেন। ঠিক করলেন আর বেঁচে থেকে কী লাভ। বিধবার মৃত্যু হওয়াই শ্রেয়। আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য তৈরি হলেন।

এ সময় বাল্মীকি মুনি এগিয়ে এসে তাকে একাজ থেকে নিবৃত্ত করলেন। তারপর মন্ত্রপুত জল ছিটিয়ে দিলেন শ্রীরাম ও অন্যান্যদের ওপর। রাম যজ্ঞশ্ব, ভ্রাতা ও অনুচরবর্গকে নিয়ে ফিরে গেলেন অযোধ্যায়।

বাল্মীকি লব ও কুশকে সঙ্গে নিয়ে রামের সভায় এসে হাজির হলেন। দুই পুত্র বীণা বাজিয়ে সুমধুর কণ্ঠস্বরে রামায়ণ কীর্তন করলেন। শ্রীরাম জানতে পারলেন, এই দুই শিশু তাঁরই সন্তান।

মুনির পরামর্শে রামচন্দ্র সীতাদেবীকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। কিন্তু প্রজারা জানালেন, সীতা দেবীকে আবার অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে। কারণ আগেরবার তিনি যখন এই পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তখন তারা কেউ সামনে ছিল না।

এ কথা শুনে সীতাদেবী অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। তিনি ক্ষোভে দুঃখে ধরিত্রীমার নাম স্মরণ করলেন। পৃথিবী দুভাগ হল। সীতা ধরিত্রী গর্ভে প্রবেশ করলেন।

মাকে হারিয়ে লব-কুশ কাঁদতে শুরু করল। রামচন্দ্র ধনুকে বাণ সংযোজন করলেন ধরিত্রীর উদ্দেশ্যে। ব্রহ্মা তাকে একাজ থেকে বিরত করলেন।

শ্রীরাম তাঁর রাজ্যপাট ভাইদের এবং ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। পূর্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য রাম একদিন দুঃখিত হয়ে লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করলেন। তারপর ভরত ও শত্রুঘ্নকে নিয়ে সরযূ নদীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। বৈকুণ্ঠ লোকে গিয়ে চার ভাইয়ের মিলন হল এবং সৃষ্টি হল এক অদ্বিতীয় নারায়ণ।

বলরাম অবতারের কাহিনি

চিরকাল সুখ কোথাও বিরাজ করে না। রামচন্দ্রের অবর্তমানে অযোধ্যায় বেড়ে গেল স্বেচ্ছাচারিতা। প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত রইল না। অনাচার, পাপাচারে দেশ ভরে গেল। পণ্ডিত ও ধার্মিকেরাও সেই পাপাচার থেকে রেহাই পেলেন না।

এসময় পাপের বিনাশ ঘটাতে স্বয়ং শ্রীহরি বলরামকে সঙ্গে নিয়ে ব্রজধামে এসে উপনীত হলেন।

ভোজবংশে শক্তিশালী রাজা আহুকের দুই পুত্র উগ্রসেন ও দেবক। উগ্রসেনের পুত্র কংস, অত্যন্ত দুরাচারী। দেবকের কন্যা দেবকী, তার স্বামীর নাম বসুদেব। তিনি শূরসেনের পুত্র। কংস বর কনের রথের সারথি হলেন। এসময় আকাশ বাণী শোনা গেল। দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসের প্রাণহন্তারক হবে।

সেই দৈববাণী শুনে কংস ক্ষেপে গেলেন। তিনি দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। বসুদেব বহু চেষ্টা করে স্ত্রীকে কংসের হাত থেকে রক্ষা করলেন। কংস তাদের বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

বসুদেব তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো দেবকীর গর্ভের প্রতিটি সন্তানকে কংসের হাতে তুলে দিলেন। এইভাবে দেবকীর ছয়টি সন্তানের বিনাশ ঘটল।

দেবকী সপ্তমবারের জন্য গর্ভবতী হল। ভগবানের ইচ্ছায় দেবী যোগমায়া দেবকীর সেই গর্ভ আকর্ষণ করে বসুদেবের অন্য পত্নী রোহিণীর গর্ভে প্রবিষ্ট করালেন। রোহিণী সেই পুত্রের জন্ম দিলেন। গর্গাচার্য তার নাম রাখলেন, বলরাম। রোহিণী তখন কংসের ভয়ে গোপরাজ নন্দের ঘরে বসবাস করছিলেন।

দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে নন্দ ও যশোদার পুত্র রূপে বড়ো হতে লাগলেন। বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দুটি ভাই নানা লীলাখেলার মাধ্যমে ব্রজবাসীদের মুগ্ধ করে রাখতেন। বড়ো হয়ে তাঁরা গেলেন গোচারণে। অনেক গোপবালক তাদের সখা হল।

কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করার জন্য কংস প্রলম্ব নামে এক দানোকে পাঠাল। সখা রূপে সে ঢুকে পড়ল গোপবালকদের সঙ্গে। দুপক্ষে খেলা শুরু হল। এক পক্ষে বলরাম ও তার সাথীরা। অন্য পক্ষে কৃষ্ণ ও তার সখীরা। দানো প্রলম্ব ছিল কৃষ্ণের পক্ষে। কৃষ্ণের দল হেরে গেল। এখন বিজিত দলকে মাথায় নিয়ে নাচতে হবে। প্রলম্ব এগিয়ে এসে বলরামকে মাথায় নিয়ে মথুরার দিকে পা বাড়াল। বলরাম বুঝতে পারলেন, এ নির্ঘাত কোনো অসুর। পা দিয়ে সজোরে মারলেন এক লাথি। প্রলম্বাসুর সেখানেই অক্কা পেল।

কৃষ্ণ-বলরামকে হত্যা করতে এ পর্যন্ত কংস অনেক রাক্ষস-অসুরদের পাঠিয়েছেন। কিন্তু কেউই কাজ শেষ করে ফিরে আসতে পারেননি। বরং প্রাণ দিয়েছে। তাই কংস ঠিক করলেন তিনি দেবকীকে আর বাঁচিয়ে রাখবেন না। খড়্গ উঁচিয়ে ধরে ছুটে এলেন কারাগারে। দেবকীকে লক্ষ্য করে খড়্গ তুলতেই বলরাম অনন্ত রূপে হাজার ফণা বিস্তার করে ভীষণ শব্দে গর্জন করতে লাগলেন। তার চোখ দুটি দিয়ে আগুনের গোলা বেরিয়ে এল। কংস ভয়ে কারাগার থেকে ছুটে পালিয়ে গেলেন।

বলরাম আসলে অনন্তদেব। তিনি সর্বদা শ্রীহরির পাশে থেকেছেন। ত্রেতাযুগে রামের পাশে ছিলেন লক্ষ্মণ হয়ে, দ্বাপরে কৃষ্ণের দাদা বলরাম আর কলিতে হাড়াই পন্ডিতের পুত্ররূপে নিত্যানন্দ হয়ে নিমাইয়ের পাশে থেকেছেন।

কৃষ্ণ বলরামের উপস্থিতিতে বৃন্দাবনে সর্বদা আনন্দের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে।

এদিকে কংস কৃষ্ণ নিধনের জন্য চিন্তা করছেন। অবশেষে নারদের পরামর্শে তিনি কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় ডেকে পাঠালেন।

কৃষ্ণ কংসের সেই আয়োগব নামে ধনুকটিকে অনায়াসে ভেঙে ফেললেন। কুবলয়বীড় নামে এক মত্ত হাতিকে পাঠানো হল দুই ভাইকে নিধন করতে। দুই ভাই হাতিকে মেরে তার দাঁত দুটো উপড়ে নিল।

এবার চানুকের সঙ্গে কৃষ্ণ আর মুষ্টিকের সঙ্গে বলরামের মল্ল যুদ্ধ শুরু হল। দুই মল্লবীর দুই ভাইয়ের হাতে প্রাণ দিল। এবার কংসকে বিনাশ করা হল। বসুদেব ও দেবকীকে কারামুক্ত করা হল। মথুরার রাজা হলেন উগ্রসেন। দুই ভাই তাকে রাজকাজে সাহায্যে করলেন।

তারা গেলেন অবন্তী নগরে। সান্দীপানি মুনির কাছে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করে ফিরে এলেন। জরাসন্ধকে পরাজিত করে এলেন দ্বারকায়।

ত্রেতাযুগে রাজ্যের রাজা রৈবতকের কন্যা রেবতী উপযুক্ত পাত্রের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়ে তপস্যা করেছিলেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে তাকে বর দিয়েছিলেন। দ্বাপর যুগে দ্বারকার বলরাম হবে তার উপযুক্ত স্বামী। রাজা রৈবর্ত কন্যা রেবতাঁকে নিয়ে দ্বারকায় এলেন। ত্রেতাযুগের মানুষরা ছিল চৌদ্দ হাত লম্বা। বিশাল আকারের লোক দেখে দ্বারকাবাসীরা ভীত হল। তারা কৃষ্ণ বলরামের কাছে ছুটে এল।

রাজা তাদের কাছে সব কথা খুলে বললেন—এবং ব্রহ্মার বরানুসারে রৈবতীর সাথে বলরামের বিয়ে হল। যেহেতু রেবতী উচ্চতায় অনেক লম্বা ছিলেন, তাই লাঙলের দ্বারা তার নিজের উচ্চতার সমান করে নিলেন। দ্বাপর যুগে মানুষরা ছিল সাত হাত লম্বা আর সত্যযুগে তাদের উচ্চতা ছিল একুশ হাত।

অনেকদিন পর বলরাম বৃন্দাবনে এলেন। নন্দ ও যশোদাকে প্রণাম করলেন। শ্রীকৃষ্ণের খবর জানালেন, গোপীদের সাথে তিনি রাসলীলায় মেতে উঠলেন। জলকেলি করার জন্য যমুনার

ডাক পড়ল। বলরাম অন্য খেলায় মত্ত থাকাতে যমুনা ফিরে যেতে উদ্যত হল। তখন বলরাম লাঙলের সাহায্যে তাকে আকর্ষণ করল। তারপর তারা জলকেলি করলেন। কিছুদিন বৃন্দাবনে কাটিয়ে বলরাম ফিরে এলেন দ্বারকায়।

কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করা কালে বন্দি হলেন। বলরাম এই খবর পেয়ে গদা নিয়ে ছুটে গেলেন। বলরামের শক্তির কাছে হার স্বীকার করে দুর্যোধন নিজের কন্যা ও শাম্বকে তার হাতে তুলে দিলেন।

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ রোধ করার জন্য কৃষ্ণ অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু বিফল হলেন। মনের দুঃখে বলরাম তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি এলেন নৈমিষারণ্যে, সেখানে লোমহর্ষণ মুনি শৌনকাদি ষাট হাজার ঋষিদের সামনে বসে পুরাণকাহিনি ব্যক্ত করছিলেন।

বলরামকে দেখে সকলে উঠে দাঁড়াল, প্রণাম করল। কেবল লোমহর্ষণ মুনি বাদে, অপমানে বলরাম একটি কুশের অগ্রের দ্বারা মুনির মাথাটি কেটে ফেললেন।

নৈমিষারাণ্যে এক অসুরের উপদ্রব চলছিল। বল্লাসুরকে বিনাশ করে বলরাম সেখানে শান্তির বাতাবরণ ফিরিয়ে আনলেন।

কৌশিক, প্রয়াগ ইত্যাদি তীর্থস্থান ঘুরে প্রভাসে এসে তিনি শুনলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রচণ্ডভাবে শুরু হয়ে গেছে।

স মা প্ত